বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ—

ভ্রমণ—

পত্রগুচ্ছ— ৭, ১৮৭, ৩৯২, ৬১৪, ৮৩২, ১০৯৪

অনুবাদ—

উপন্যাস—

সংস্কৃত কাব্য—

গল্প—

কবিতা

নাচ-গান-বাজনা—

বিবিধ—

আত্ম-পরিচিতি—

রেকর্ড-পরিচয়— ৩[illegible]

মাসিক বসুমতী
॥ কার্ত্তিক, ১৩৬৭ ॥

(জলরঙ)

ধ্যানভঙ্গ

—শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

★ ★ ★ ★ ★ ★

পারমাণবিক শক্তি ও আইন

★ ★ ★ ★ ★ ★

শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)

পরমাণু শক্তি আইনের (১৯৪৮ সালের ২১ শ আইন) ৩নং অনুচ্ছেদে পারমাণবিক শক্তির একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা আছে। তাতে বলা হয়েছে—"পারমাণবিক বিভাজন প্রক্রিয়া বা অপর কোন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয়, তা-ই পরমাণু শক্তি। তবে প্রাকৃতিক দ্রব্যান্তরকরণ প্রক্রিয়া বা তেজস্ক্রিয়তার অবক্ষয়জনিত যে শক্তি, পারমাণবিক শক্তির পর্যায়ে সেইটি পড়ে না।"

পারমাণবিক শক্তি থেকে উদ্ভূত যে আইনগত প্রশ্ন বা সমস্যা আলোচ্য, আজকের দিনে সেটি খুব একটা জরুরী সমস্যা না হতে পারে, কিন্তু আগামী দিনের পক্ষে তা সর্ব্বাধিক জটিল সমস্যা। আণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শুধু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটেনি, উপরন্তু, মানুষ ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কের ধারণারই বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। এই আবিষ্কার দ্বারা পারিমাণিক ভাবে মানুষের সামর্থ্য অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়েছে শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে না, পৃথিবীতে জীবনের অবলুপ্তি ঘটাবার মতো ক্ষমতাও মানুষের করায়ত্ত হয়েছে এর মারফৎ।

মানুষ এই শক্তিকে বরণ করে নিয়েছে মিশ্র মনোভাব নিয়ে। প্রথম দুটি আণবিক বোমা বর্ষিত হয় হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর। ভূপৃষ্ঠ থেকে দুটি নগরীই বিলুপ্ত হয়ে যায়—কত শত নর-নারী ও শিশুর আর কোন চিহ্নই থাকে না। সদ্য ফল লাভ হয়—জাপানের আত্মসমর্পণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। বিজয়ী জাতি সমূহ আনন্দোৎসবে মত্ত হলেন। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের জীবন সম্পর্কে যে উদ্বেগ ছিল, তার অবসান হল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধজনিত সকল দুঃখ দৈন্যের ওপর হ'ল যবনিকাপাত। কিন্তু আনন্দের প্রথম পর্যায়ের ইতি হওয়া মাত্র মানুষ ভাবতে সুরু করে গভীরভাবে। প্রশ্ন ওঠে মানুষের প্রাণ এমনি অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থায় ধ্বংস করে যুদ্ধের অবসান ঘটানো, কোন নীতিগত সত্য মূল্য এর আছে কি? যুদ্ধের বিভীষিকার সঙ্গে মানুষ পরিচিত। কিন্তু সেই বিভীষিকা এড়াবার জন্যে অজ্ঞাত অথচ অপরিমেয় ভয়াবহতা সমন্বিত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাওয়া—এর যৌক্তিকতা আছে কি আদৌ?

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হতে থাকে। মানুষ বুঝতে পারে—এই থেকে বিচ্ছুরিত তাপ ও উৎপন্ন সংঘাত বিস্তীর্ণ এলাকাকে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলকে করে ফেলে বিষাক্ত। এরই ফলে মৃত্যু ও ধ্বংস এসে দেখা দেয়, আরও বৃহৎ অঞ্চলে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আলোড়িত করতে থাকে মানুষের মন। নৈতিক কিংবা মানবিকতার দিক থেকে এই ধরণের বিধ্বংসী বোমা বিস্ফোরণ সমর্থন করা যায় কি না? রাজনৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ হতেও এ কি যথার্থ সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

কতক লোক এই যুক্তিটি হাজির করেন—তাড়াতাড়ি যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্যে আণবিক বোমার ব্যবহার একটি কার্য্যকরী পন্থা। কিন্তু তাঁদের এ যুক্তি নিম্নোক্ত দুটি কারণে টিকে না—(ক) সামরিক প্রয়োজনে যত প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন মনে হতে পারে, এতে তার চেয়ে হয় অনেক ব্যাপক বিনষ্টি। (খ) এতৎসৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার অজ্ঞাত এলাকায় অগণিত নর-নারীর ধ্বংস-সাধন। সুতরাং এই শ্রেণীর যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার দু'টি দিক থেকে বিচার বিবেচনা করতে হবে—এর অমানুষিকতা ও অবৈধতা।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের অমানুষিকতা সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে মতের ঐক্য সম্ভব। এই সব অস্ত্র যে পরিমাণ প্রলয় ঘটায়, তাতে সাধারণ লোকের বিবেক বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু এই বিক্ষুব্ধি অনেক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তার কারণ এই প্রলয় সংঘটনের জন্য অস্ত্রটিকেই দায়ী করা হয়, অস্ত্র নিক্ষেপকারীকে নয়। কোন পদাতিক সৈন্য যদি নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকের উপর অত্যাচার করে, তাকে যুদ্ধব্যভিচারী বলে অপরাধী করা হয়, কিন্তু আণবিক অস্ত্রে শত শত নিরপরাধের হত্যাকারীকে সে চক্ষে দেখা হয় না।

পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে এখনও কোন চুক্তি বা মতৈক্য সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে যখনই গভীর ভাবে বিবেচনার কথা চলে, তখনই এর সামরিক গুরুত্বের দিকটা বড় করে দেখা হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধুনিক ঠাণ্ডা লড়াই, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধের মনোভাব—এ সকলের দরুণ আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি কিংবা আইন মারফৎ আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। অথচ আণবিক যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই। বলতে কি, আন্তর্জ্জাতিক আইনের সক্রিয়তার বৈভব মাত্র আছে। জাতিগুলো বিশেষতঃ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিসমূহ যদি একটা বোঝাপড়ায় না আসতে পারে, যাতে করে আণবিক অস্ত্র পরিহার এবং এর উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হবে, তা হলে আণবিক শক্তির মারাত্মক ও ভয়াবহ অগ্রগতি বন্ধ করা যাবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়, সে সময় যে বিতর্কের উদ্ভব হয়, প্রসঙ্গতঃ এর উল্লেখ করা চলতে পারে। আর্ল জাওইট অনেকটা সংযম রক্ষা করে এইরূপ মন্তব্য করেন—"পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে গিয়ে যে কোন সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার জন্য সম্ভাব্য সর্ব্বরকম ব্যবস্থা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবলম্বন করেছেন দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু এর পরও একটি কথা থেকে যায় এই পরীক্ষার ফলে যেরূপ বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপন্ন হতে পারে, তাতে সমস্যা দেখা দেবেই। বৈধ-কাজে পারমাণবিক

বিস্ফোরণ বিপন্ন সমুদ্রের দরিয়ার ওপর দিয়ে জাহাজ চালানো প্রয়োজন হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আইনে লোকদের দূরে থাকবার সতর্কবাণী জ্ঞাপক দেবার অধিকার নেই।"

আণবিক পরীক্ষার বৈধতার বিরুদ্ধে আরও জোর আক্রমণ চালিয়ে ডাঃ ইমানুয়েল মারগোলিস বলেন—চার লক্ষ বর্গমাইল জলভাগ "সতর্কীকৃত এলাকার" পরিণতকরণ সমুদ্রপথের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা চলতে পারেনা। কতকগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চল স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ্য।

বিভিন্ন চুক্তির বলে বিশেষ পুলিস বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পেলেও সমুদ্রপথের স্বাধীনতা একটি অবিমিশ্র স্বাধীনতা। হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষাকল্পে 'সতর্কীকৃত এলাকা' সৃষ্টি কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এই পরীক্ষা রাষ্ট্রসংঘ সনদ এবং প্রাক্তন জাপ দ্বীপের জন্য যে অছি চুক্তি হয়, তার পরিপন্থী।

অপর দিকে এই জাতীয় সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টায় 'আমেরিকান জার্নাল অব্ ইন্টারন্যাশনাল ল'-এর সুযোগ্য সম্পাদক মায়ারস এস্ ম্যাকডুগাল কতকগুলো যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে দাবী করছে, আসলে সেটা আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুতির দাবী। অপর কারো ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ, যেমন, নৌ-বন্দর ডুবিয়ে দেওয়া, অঞ্চল আক্রমণ, এমন কিছু এই দাবীর লক্ষ্য নয়। নিতান্ত জরুরী তাগিদে অপরের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব কম বাধা সৃষ্টি করে কয়েকটি প্রস্তুতি ব্যবস্থা অবলম্বনেরই এই দাবী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে আণবিক অস্ত্র-নির্মাণ কর্মসূচী নিয়েছে, স্বাধীন জাতি সমূহের আক্রমণ প্রতিহত করার উপযোগী প্রতিশোধাত্মক ক্ষমতার যে অভাব নেই, সেইটির নিশ্চয়তা দেওয়াই এর লক্ষ্য। আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হলেও আত্মরক্ষার জন্যে যেন অস্ত্রশস্ত্রের কমতি না পড়ে, আলোচ্য কর্মসূচীর পিছনে এই লক্ষ্যটিও রয়েছে।

কোন্ পক্ষের যুক্তি ঠিক, সে আমার বলবার নয়। সব দিক খুব ভালরকম বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে। মোটের ওপর, এই কথাটি আমি জোর দিয়ে বলব যে, আলোচ্য বিষয়ে মতামতের যে প্রকাণ্ড ব্যবধান, তা এখনও ঘুচে যায় নি।

দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার থেকে যে সব আইনগত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, সেগুলির কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

পারমাণবিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়, জাতীয় জীবনে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব সেইখানেই নিহিত। ভারতে এই ক্ষেত্রটিতে কি প্রয়াস করা হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ দেখা যাক। পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য ভারত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর ভাবা পারমাণবিক জ্বালানীর সাহায্যে ভারতে এমন বিদ্যুৎ কারখানা চালানোর আশা করেন যাতে ১৯৬২ সাল ও ১৯৬৫ সাল মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ১০ লক্ষ কিলোওয়াট। অপ্সরা, জারলিনা ও কানাডা-ভারত রি-এক্টর স্থাপন—এ সকলের সংবাদ থেকে শিল্পের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির ব্যবহার ব্যাপারে কতটা এগিয়ে যাওয়া গেছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

রি-এক্টর যেমন শক্তির উৎস, তেমনি উহা অপরিসীম ও অপরিজ্ঞাত বিপদেরও উৎস। প্রথমতঃ এটা বিধ্বস্ত হলে বিপদ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা থেকে যে তাপ ও সংঘাত উৎপন্ন হবে, তাতে মুহূর্তে বড় রকম বিপর্যয় ঘটা বিচিত্র নয়। বিদীর্ণ পারমাণবিক পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েও বিপদ ঘটাতে পারে। এই পদার্থগুলো অতিমাত্র বিষাক্ত। এ সব চোখেও দেখা যায় না, অনুভূতও হয় না। এই পারমাণবিক পদার্থ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে কতদূর ছড়িয়ে পড়বে, তা-ও অজ্ঞাত।

মানব জাতির নিরাপত্তার জন্য এই যে নতুন আবিষ্কার, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে বর্তমানে ভারতে যে আইন-বিধি আছে, তা যথেষ্ট কিনা, এই প্রশ্নটি উঠতে পারে। ১৯৫৪ সালের পরমাণু শক্তি আইনে কেন্দ্রীয় সরকার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, ব্যবহার, বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়েছেন। এই আইনের বলেই কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারী মালিকানাধীন পারমাণবিক পদার্থ, কারখানা প্রভৃতি যা যা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সহায়ক হতে পারে, সেগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অধিকার জন্মেছে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে প্রবেশ করে ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকার একই বিধানে অর্জন করেছেন। আইনের ১৬নং ধারাটিতে ক্ষতিপূরণের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে বলা হয়েছে, এই আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে যদি কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেক্ষেত্রে ইহার পরিমাণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত সালিশ মারফৎ নির্দ্ধারিত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উপধারাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে মূল আইনেই কিন্তু তথাপি ক্ষতিপূরণের জন্যে যে সব ধারা-উপধারার ব্যবস্থা রয়েছে, তা আশানুরূপ নয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা বিচ্ছুরিত পদার্থ থেকে যে আঘাত বা ক্ষতি হবে, এগুলোতে তার বিষয় উপযুক্ত বিচার বিবেচনাই করা হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কেউ যাতে আণবিক শক্তির উৎপাদন বা ব্যবহার করতে না পারেন কিংবা এই ব্যাপারে গবেষণা চালাতেও অধিকার না পান, আলোচ্য আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সেভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতাও প্রদত্ত হয়েছে। এই থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পারমাণবিক শক্তি একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত ও লাইসেন্স ব্যবস্থাধীন শিল্প। অবস্থা এইরূপ হওয়ায় আরও কয়েকটি আইনগত প্রশ্ন এক্ষেত্রে বিবেচনার কথা এসে যায়। পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন বা ব্যবহারকালীন আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ দায়ে দায়ী করা যাবে ঠিক কাদের? ঠিক কারাই বা এইরূপ আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন? প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে সহজেই বলা যায়, পারমাণবিক কারখানা (সরকার, বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী বা ব্যক্তিবিশেষ পরিচালিত) যে যে লোক চালাবেন, তাঁরাই সংশ্লিষ্ট যথার্থ ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে দায়ী হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা বিচ্ছুরিত পদার্থকণিকা থেকে দূরবর্তী স্থানে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতি বা আঘাতের জন্য কাকে দায়ী করা যাবে? এইরূপ আঘাত হয়ত সঙ্গে সঙ্গে

দেখা যাবে না, অনুভূতও হবে না। আঘাত পরিদৃষ্ট বা অনুভূত হতে হতে হয়ত পারমাণবিক কারখানার মালিক মরেও যেতে পারেন, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী লিকুইডেশনেও চলে যেতে পারে কিংবা বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন হয়ত থাকলোই না। শিল্পের লাইসেন্সদাতা হিসাবে সরকারের উপর চূড়ান্ত দায়িত্ব ফেলার কোন বিধান বর্তমানে নেই।

এ ছাড়া ক্ষতির পরিমাণ যা নির্দ্ধারিত হতে পারে, তা হয়ত সংশ্লিষ্ট শিল্পের আর্থিক ক্ষমতার বাইরেই চলে যাবে। এ প্রসঙ্গে দুইটি উপায়ের কথা বলা যেতে পারে—এক বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা, দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণদানে সরকারের দায়িত্বগ্রহণ। কিন্তু তখনও প্রশ্ন উঠবে ঠিক কত পরিমাণ অবধি বীমা রাখতে হবে। আণবিক দুর্ঘটনাজনিত আঘাত কতটা কি হবে, এটা কেউ বলতে পারে না। দশ লাখ, বিশ লাখ, কি কোটি টাকার বীমার ব্যবস্থা হলেই কি যথেষ্ট হবে? বীমার পরিমাণ যদি সীমাহীন হয়, তা হলে এই বীমার খরচই কি হবে বা এর প্রিমিয়ামই হবে কত? অপরদিকে রাষ্ট্র যদি ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেন, সেই ক্ষতিপূরণ কত অবধি হবে? ১৯৫৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি আইন প্রণয়ন করেছে—যাতে সেখানকার ফেডারেল সরকার পারমাণবিক শক্তি শিল্পকে প্রতিটি আণবিক দুর্ঘটনার জন্য সর্বাধিক ৫০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এইটি যে একটি বড় রকম দায়িত্ব নেওয়া এবং সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার নিজের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে চাইছে। কলকাতার সমগ্র ব্যবসায় অঞ্চল, বহুমূল্য অট্টালিকাসমূহ এবং বাণিজ্য পণ্য বোঝাই দোকান-পাট ও গুদামঘরগুলো আণবিক দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয় এবং ভূমিসাৎ হয়, সেক্ষেত্রে এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণেই কি যথেষ্ট হবে? এক্ষেত্রে তৎপরতার সঙ্গে একটিমাত্র কথাই কেউ কেউ বলবেন—পারমাণবিক কারখানাগুলো সমৃদ্ধ নগর এলাকা হইতে বেশ দূরে যদি স্থাপিত হয়, তা হলে ক্ষতিপূরণের অর্থ পর্য্যাপ্ত নয়, এইরূপ প্রশ্ন প্রায় উঠবে না। কিন্তু আমি জানতে চাইব—কতদূর এই কারখানা থাকবে? বিচ্ছুরিত আণবিক পদার্থের আওতা থেকে কোন অঞ্চলকে কি বাইরে রাখা যায়? আণবিক বোমা নিয়ে বিকাণী আটোলে যে পরীক্ষায় হয়, তাতে ভারতের কি কোনভাবে ক্ষতি হয়েছে? এর নেতিবাচক উত্তর এলেও আমি আপত্তি করতে পারব না, পরন্তু এইরূপ উত্তর যদি সত্য হয়, তা'হলেই খুশী হব।

আরও প্রশ্ন উঠতে পারে। এই ক্ষতি পূরণের অধিকারী কে বা কারা হবেন? পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানার শ্রমিকগণ যদি আহত হন তাঁরা বা তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিগণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু আণবিক দুর্ঘটনার দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ার বহুকাল পরে আহত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির যদি দৈহিক ক্ষতি হয় তাঁরা কি ক্ষতিপূরণ পাবেন? যদি তাঁরাও পান তবে তামাদি আইন অনুসারে কতদিন মধ্যে এই দাবী বা মোকদ্দমা করতে হবে তার বিধান বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।

আমি ইচ্ছামত কতকগুলো সমস্যার কথা মাত্র আলোচনা করলাম। আরও বহু বিষয়ে ভাববার নিশ্চয়ই অবকাশ রয়েছে। সে সময় এসেছে যখন পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত সকল আইনগত প্রশ্ন ও সমস্যাই গভীরভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বাঁচতে যেখানে হবে, সে অবস্থায় প্রাণ বিপন্ন হতে পারে, এমন সমস্যাবলী মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না।*

অনুবাদক—শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য্য

* ২রা জুলাই (১৯৬০) সারা ভারত গণতান্ত্রিক আইনজীবী সম্মেলনের (কলকাতা) আলোচনা-চক্র সভাপতি হিসাবে মাননীয় বিচারপতির প্রদত্ত ইংরাজি ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

চেনা মুখ

শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত

সেই চেনা মুখ মনের দুয়ারে বারে বারে টোকা দেয়
জানে না দুয়ারে অর্গল তার বন্ধ?
আবার কখনও হৃদয়েতে হানা দেয়
অলস প্রহরে যখন সাগরে উঠেছে ঝড়;
বহুদূরব্যাপী বেলাভূমি নিস্তব্ধ।

বন্ধ দুয়ারে মৌন সময় যাচে
যদিও হারায় দুনিয়ার রংয়ে নিরন্তর।
বিলীন মুখের আবছায়া ছবি কাঁপে
শূন্য ধূ ধূ এ মরুপ্রান্তরে কখনও বা ডুবে যায়।
আবার কখনও বা ফুটে ওঠে ক্রমে হৃদয়ের আয়নায়।

ঐ মুখ মোর অনেক রাতের স্মৃতি
কত হাসি আর অশ্রুজলেতে লেখা।
স্পর্শকাতর বেদনায় কত রঙীন্ করেছে প্রীতি,
প্রেমের কোমল বিবর্ণ ত্বকে জ্বলে সে মুখের রেখা।
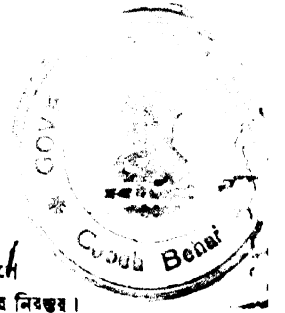
প্রকৃতির শক্তি উৎস—লবণ

'জ্ঞানান্বেষক'

পৃথিবীতে যতরকম পদার্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে নুনের মত অত্যাবশ্যক কিছু নেই। এই নুন খেতে না পেলে মানবজাতি মরে যাবে এবং অনেক জন্তু জানোয়ারও লুপ্ত হয়ে যাবে। নুন ছাড়া বহু আধুনিক শিল্প চলতে পারে না।

বহু শতাব্দী আগে স্বীকৃত হয়েছে যে একজন মানুষকে তার নুন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। একেবারেই যদি নুন খেতে না দেওয়া হয় তবে এক মাসের বেশী খুব কম লোক বেঁচে থাকতে পারে এবং নুন খেতে না দেওয়ার দণ্ড ভয়ানক রকমের একটা শাস্তি বলা যেতে পারে।

আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগ উপশম ও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্তে নুন ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত চলছে। ডাক্তাররা জানেন যে মানুষের শরীরে যে পরিমাণ লবণ প্রয়োগ করা হয় তা' এ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড-এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং খাদ্যতালিকা থেকে নুন বাদ দেওয়া অথবা নিয়ন্ত্রণ করা মূত্রগ্রন্থির রোগের একটি সুবিদিত চিকিৎসা।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যের পক্ষে নুনের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকেই জানে। অবিরত ঘাম হয়ে শরীরের যে ক্ষয় হয় তা পূরণ করবার জন্তে কিছু অতিরিক্ত নুন প্রয়োজন হয়। এই সতর্কতা অবলম্বন করা হলে তাপে ক্লান্তি ও সর্দিগর্মি হবার সম্ভাবনা নেই।

শ্রমিকরা, বিশেষতঃ ইস্পাত তৈরী ও অন্যান্য ভারী শিল্পে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে তাদের শরীরের নুনের ক্ষয় পূরণ করা দরকার। এটা না করা মাংসপেশীতে খিল ধরার কারণ হতে পারে। এই সমস্ত দূর করার জন্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইস্পাতশিল্প শ্রমিকদের বিশেষ গন্ধযুক্ত নুনের ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়েছিল। এটা এত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যে এখনও এই ব্যবস্থা চালু আছে।

বহু জন্তু জানোয়ার স্বভাবতই জানে যে নুন তাদের শরীরের পক্ষে হিতকর। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কুকুরকে নুন খেতে না দিলে তিন সপ্তাহের বেশী সে বাঁচতে পারে না এবং গবাদি পশু ও ভেড়াকে উপযুক্ত পরিমাণ নুন খাওয়াতে হয় স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্তে। মাংসাশী জন্তুদেরও নুন প্রয়োজন এবং তারা কাঁচা মাংস থেকে এটা পেয়ে থাকে।

আধুনিক শিল্পে নুনের কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নুনের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাচ তৈরী, এলুমিনিয়ম তৈরী, ধাতু গলানো ও মাংস প্যাক করার কাজে নুন ব্যবহার হয়। আধুনিক রাসায়নিক শিল্পে নুন প্রধান কাঁচা মাল এবং সাবান তৈরী, চর্বি ও নানাবিধ তৈল শোধন, ব্লিচিং পাউডার, কীটনাশক দ্রব্য ও সার উৎপাদনে নুন ব্যবহার হয়। জল পরিশ্রুত করা, কাগজ তৈরী, মাখন তৈরী করতে নুন প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে নুনের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উত্তরোত্তর চাহিদা মিটাবার জন্ত নুন উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা বিশ্বে খাদ্য হিসাবে ও শিল্পের প্রয়োজনে বছরে ২ কোটি টন নুন দরকার হয়। তিন বছর আগে উইণ্ডসরের একটি নতুন পাহাড়ে নুনের খনি খোলা হয়েছে। সেখানে ১০০ ফুট মাটির নীচে সঞ্চিত ২৭ ফুট স্তর থেকে দৈনিক ৫০০ টন নুন সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। অতীতকালে নুন এত মূল্যবান ছিল যে, ল্যাটিন স্যালারিয়াম (অর্থ নুন টাকা) কথা থেকে বেতন কথাটির উদ্ভব হয়েছে। রোমান সৈন্তদের নুন কিনবার জন্ত যে ভাতা দেওয়া হত, তার নাম স্যালারিয়াম। ইতালীর একটি প্রাচীন রাস্তার নাম ভায়া স্যালারিয়া (নুনের রাস্তা), কারণ এই পথ দিয়ে নুন চালান হত। প্রাচীনকালে কোন মানুষের সঙ্গে বসে "নুন খাওয়ার" অর্থ ছিল তার সঙ্গে পবিত্র বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। প্রাচ্য দেশের কোন কোন জাতির মধ্যে এখনও এর প্রচলন আছে। মধ্যযুগে সামাজিক পদমর্যাদা দেখান হত টেবিলে কোন ব্যক্তি নুন থেকে উঁচুতে বসেছে, কি নীচে বসেছে। আজও পৃথিবীর কোন কোন দেশে টাকা অপেক্ষা নুন বেশী লোভনীয়। ব্রহ্মদেশে একটি গির্জা তৈরীর জন্ত তিনজন দেশীয় শ্রমিক পুরস্কার হিসাবে ছয় পাউণ্ড নুন চায়।

কয়েক পাউণ্ড নুন আনবার জন্তে তিব্বতীয়া "পৃথিবীর ছাদ" (তিব্বতকে বিদেশীরা এই নামে অভিহিত করে) থেকে নেমে আসে এবং টিম্বকটু লবণকেন্দ্র থেকে নুন আনবার জন্তে সাহারা মরুভূমিতে বার্ষিক উটের ক্যারাভ্যান বিশেষ দর্শনীয়। বহু শতাব্দী ধরে নুনের ব্যবসা করে এই সহরটি অতুল সম্পদ সংগ্রহ করেছে। নুন শিক্ষার উন্নয়নে সাহায্য করে, নুন লেনদেনের কেন্দ্ররূপে টিম্বকটুর যখন বেশ সুনাম ছিল তখন সেখানে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল এবং শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্ররূপে তার প্রসিদ্ধি ছিল।

কৃষিবিজ্ঞানীরা গত ১৫ বছর ধরে নুনকে সাররূপে ব্যবহার করবার জন্তে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নুনের উপকারিতা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান আহরণ করেছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এক একর জমিতে যদি ৩০০ থেকে ৫০০ পাউণ্ড নুন মিশানো যায়, সেখানে যে বীট চিনি উৎপন্ন হবে তা থেকে অনেক বেশি চিনি পাওয়া যাবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মাটিতে নুন মিশালে বীট বেশ শক্ত হয় ও যন্ত্রে পেষাইএর উপযোগী হয়। কিন্তু জমিতে বেশী পরিমাণ নুন মিশালে তার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং কোন কোন বিরাট শুষ্ক ভূখণ্ড যে অনুর্বর হয়ে গেছে তার কারণ জমিতে নুনের ভাগ বেশী হয়ে গেছে।

নুনের শতকরা একভাগের দশমাংশ পরিমাণ যে জলে আছে মানুষের শরীরে তা সহ্য হয়। জন্তু-জানোয়ারেরা অবশ্য এর চেয়ে আরও বেশী লোনা জল পান করে। অধিকাংশ গাছপালায় বেশী নুন দরকার হয় না এবং জমি বেশী লোনা হয়ে গেলে তা কৃষিকার্যের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

এক সময় যে জমি উর্বর ছিল তা মরুভূমিতে পরিণত হয়, তার কারণ যে নদীগুলি সেচের জল দান করে জমিকে উর্বর করে তার জলে লবণের ভাগ বেশী থাকে। সেই জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় ও নুনের ভাগ থেকে যায়। কালক্রমে সেই জমি চাষের

অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, এইভাবে মাত্র এক বছরে একর-পিছু চার টন নুন জমা হতে পারে।

নুনের ক্রিয়া এখন কৃষিবিজ্ঞানীরা ভূবিজ্ঞানীরা রসায়নবিদরা ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা অনুসন্ধান করে দেখছেন। তাঁদের একটি অন্যতম লক্ষ্য হল, যে জল দিয়ে জমিকে উর্বর করা হবে তা' সেই জমির পক্ষে শস্য উৎপাদনের উপযোগী হবে কিনা তা' স্থির করা। বিশেষ শুষ্ক অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য জমির লবণাক্ততার সঙ্গে ফসলের সমতা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সেখানে চাষের সাফল্য নির্ভর করবে প্রধানত: কি ভাবে সেচের জল সরিয়ে দেওয়া হবে ও লবণাক্ত মাটি ধুইয়ে দেওয়া হবে তার ওপর। মাটি স্বভাবত: লবণাক্ত হলেও যাতে বিভিন্নপ্রকার গাছপালা বৃদ্ধি হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এরকম অবস্থায় ক্ষতি হবে না এমন গাছপালা তৈরী করে উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা সাহায্য করতে পারেন। শিল্পের ব্যবহৃত লবণও কৃষিতে ব্যবহৃত লবণের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা যায়, এই লবণ খনি থেকে চাই-এর আকারে তোলা হতে পারে অথবা লবণহ্রদ অথবা সমুদ্র থেকে লবণাক্ত জল সংগ্রহ করে তা বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিয়ে নুন সংগ্রহ করা যেতে পারে। তৃতীয় পন্থা হল, ছিদ্রকরা একটি গর্তের মধ্য দিয়ে জল ঢুকিয়ে দিয়ে মাটির ভিতরে মজুত লবণের চাই গলিয়ে দেওয়া এবং পাম্প করে লবণাক্ত জল বের করে দেওয়া।

পোলাণ্ডের উইএলিক্‌সার নুনের খনিতে বহু শতাব্দী ধরে নুন সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং আজও তা' নিঃশেষিত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখানকার নুন খুব উৎকৃষ্ট নয়, বরং কাদা মিশানো। কিন্তু পাঁচ শত মাইল অঞ্চল জুড়ে চার শত গজ পুরু নুনের স্তর রয়েছে। উটার বিরাট লবণ হ্রদ থেকে প্রচুর নুন পাওয়া যায়। এটা ৭৫ মাইল চওড়া।

নুন সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য সাধারণ লোকের কাছে খুব চমকপ্রদ। অল্পবিস্তর লবণাক্ত জলের কোন কোষ বিশুদ্ধ জলে পরিবর্তিত করলে ঐ কোষ ফেটে যায়। লবণহীন জল অংশত: রক্তকণিকাকে ফাটিয়ে দিয়ে এবং রক্তপ্রবাহের মধ্যে পটাসিয়াম—লবণ প্রবেশ করিয়ে এবং অংশত: মূত্রাশয়ের কাজ বন্ধ করিয়ে দিয়ে উচ্চতর প্রাণীর জীবনহানি ঘটায়। শুধু যে প্রত্যক্ষভাবে পটাসিয়াম দিয়ে বিদীর্ণ রক্তকণিকাগুলো হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয় তা নয়, ইহা পরোক্ষভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে, কারণ এর ফলে ঐ রক্তকণিকা ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেন বের করতে পারে না।

এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, মানুষের দেহে দৈনিক আধ আউন্স নুন দরকার। নুন দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেখা গেছে, যে সীরাম বিভিন্ন প্রকার জীবাণু বিনষ্ট করে, নুন বের করে নিলে তা জীবাণু নষ্ট করতে পারে না। বোধ হয় নুনের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার হচ্ছে রাস্তা তৈরীতে। ইথাকা (নিউইয়র্ক) থেকে নিকটবর্তী বিমানঘাঁটি পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণে নুনের নিরেট চাই ব্যবহার করা হয়েছিল, এই রাস্তাটির ২০ বছর পর্যন্ত কোন গুরুতর ক্ষতি হয়নি। লণ্ডন সহরের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে নুনের ওপর নির্ভর করে বলা চলে। এক হাজার বছর আগে বৃটেনের নুনের খনিগুলি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে নুন সরবরাহ করতো এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে যাত্রার পথে অশ্বচালিত ট্রেণগুলো বর্তমান ওয়েষ্টমিনষ্টার সেতুর কাছে এক জায়গায় টেমস নদী পার হতো। সেই পারঘাটায় ক্রমশ: একটি জনপদ গড়ে ওঠে, আজকের লণ্ডন তারই বর্ধিত রূপ।

বর্তমানে নুনের চাহিদা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেলেও পৃথিবীতে নুনের অভাব কখনও ঘটবে না। নুনের খনিগুলো ও লোনা হ্রদগুলো নিঃশেষিত হয়েও যদি যায়, হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্রগুলি নুন সরবরাহ করে যেতে পারবে।

তুমিও হাত ধরো

তুষার চট্টোপাধ্যায়

তোমার উপকূলে হাজার বার
কত না জলরঙে ছবি আঁকি
জোয়ারে উত্তরোল কি দুর্বার
ফেনার কান্নায় ঢেউ ভাঙি।

পেরিয়ে কান্নার ধূসর স্রোত
মুছেছি সীমানায় আঁধার রাত
ঢেউয়ের সংঘাতে ছড়িয়ে ক্রোধ
সাগর-মোহানায় বাড়াই হাত।

তুমিও হাত ধরো
কুটিল দরিয়ায় আমাকে দাও স্রোত সান্ত্বনা
তুমিও হাত ধরো
ব্যথার সীমানায় এবার আঁকি এসো আলপনা।।

ধূলির ধরণী

আরতি সেনগুপ্ত

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দেখলে দেখা যায়, বিরাট কতকগুলো নীল সমুদ্র আর নানা রংয়ের কতকগুলো দেশ কিন্তু যখন দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখি, দেখা যায় গাছ-পালা নদী-নালা, পাহাড়-পর্ব্বত আর সমুদ্রের কাছাকাছি হ'লে দিকচক্রবালব্যাপী অসীম নীলাম্বুরাশি। মানচিত্রে দেখা যায়, দেশগুলো সব জল দিয়ে বিভক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটাকে একত্র ক'রে দেখলে দেখা যায়, এ জল বা সমুদ্রগুলো একটাই সমুদ্র আর ডাঙ্গাগুলো তার মাঝে মাঝে দ্বীপ, এমন কি মহাদেশগুলোও তাই; সমস্ত পৃথিবীটা একটা বিরাট গোল পদার্থ। পৃথিবীর সত্যিকারের রূপটা ঠিক এর উল্টো। বরং জলগুলো ভাগ হতে পারে, ডাঙ্গার উপরে নদী পুকুর ছাড়াও বিরাট হ্রদ দেখা যায় কিন্তু ডাঙ্গাগুলো সমস্ত একসঙ্গে জোড়া, ভারতবর্ষের সঙ্গে আরব-সাগরের নীচ দিয়ে রয়েছে আফ্রিকার সঙ্গে আটল্যান্টিকের নীচ দিয়ে রয়েছে আমেরিকার যোগ। অর্থাৎ কোন রকমে পৃথিবীর সমস্ত জল শুকিয়ে ফেলতে পারলে হেঁটে ঘুরে আসা যায় পৃথিবীটা দেশ থেকে দেশান্তরে।

সমুদ্রের মাঝে যে দ্বীপগুলো, এরাও কেউ দেশ বা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সমুদ্রের নীচ দিয়ে রয়েছে এদের মাটির যোগ। এরা শুধু সমুদ্রের মাঝখানে কতকগুলো পাহাড় আর ঐ দ্বীপগুলো সেই পাহাড়ের চূড়া। সমুদ্রগুলো হচ্ছে পৃথিবীর গায়ের নীচু জায়গা আর পাহাড়গুলো হচ্ছে উঁচু জায়গা, এইটুকুই শুধু তফাৎ।

পৃথিবীর পরিধি হ'চ্ছে পঁচিশ হাজার মাইল আর ব্যাস আট হাজার মাইল (৭১১২) অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর দিয়ে সারা পৃথিবীটা ঘুরে আসতে অতিক্রম করতে হবে পঁচিশ হাজার মাইল আর এফোঁড়-ওফোঁড় একটা ফুটো করতে পারলে তার দূরত্ব হবে আট হাজার মাইল। এই যে আট হাজার মাইল দূরত্ব এবং উপরের চল্লিশ-মাইল জায়গা মাত্র হচ্ছে মাটি, অর্থাৎ এই ব্যাসরেখার এধারে চল্লিশ আর ওধারে চল্লিশ মাইল ফুটো হবে মাটির উপর দিয়ে আর বাকীটা পাথর আর ধাতু।

এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তর, এটা কি রকম? কেউ আজ পর্যন্ত সেখানে যায়নি, কেউ দেখেওনি। পৃথিবীর উপরের এই যে চল্লিশ মাইলের মাটির আস্তরণ, পৃথিবীটাকে একটা কমলা-লেবুর সঙ্গে তুলনা করলে তা হবে শুধু এই লেবুর বাকলটির মত। মাটির উপরে খনি খুঁড়তে মানুষ আজ পর্যন্ত গিয়েছে এক মাইল অর্থাৎ কমলা-লেবুর আস্তরণের উপরে কেবল একটু ছুঁচের খোঁচার মত। কিন্তু ভূতত্ত্ব-বিদরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এর অনেক তথ্যই নির্ণয় করতে সমর্থ হ'য়েছেন। খনির ভিতরে তাঁরা পৃথিবীর ভূস্তর অন্বেষণ করেছেন, আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করেও তাঁরা দেখেছেন। তারে ঝোলানো ক্যামেরা দিয়ে সমুদ্রের নীচের ফটো তুলেছেন, ডাক্তারদের বুক-ঠোকার মত ঠুকে ঠুকে দেখেছেন সমস্ত পৃথিবীটার উপবিভাগ। এই সব পরীক্ষায় তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন পৃথিবীটা তৈরী মাটি পাথর আর ধাতুতে, আর তার সঙ্গে মেশানো আছে জল, বাতাস ও গ্যাস।

পৃথিবীর উপরে অল্প-বিস্তর চল্লিশ মাইল মাটি, তারপর প্রায় সাতশ পঞ্চাশ মাইল মাটি আর পাথর মেশানো অবস্থায়, তার পর এক হাজার মাইল শুধু পাথর আর একেবারে কেন্দ্রে চার হাজার মাইল শুধু ধাতু।

পৃথিবীর অভ্যন্তরটি অত্যন্ত গরম এবং যতই নীচে যাওয়া যায় এ উষ্ণতা ততই বাড়তে থাকে। এই মাটি আর পাথর মেশানো জায়গাটার পরের পাথর রয়েছে গলিত অবস্থায়, এবং একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে স্থান নিয়েছে সব ধাতু; যেহেতু তারাই হচ্ছে এই পৃথিবীর সব চাইতে ভারী জিনিষ। এই ধাতুও রয়েছে একেবারে গলা অবস্থায়। এই গলা ধাতু ও পাথরের নাম দেওয়া হ'য়েছে 'ম্যাগ্‌মা'।

পৃথিবীর উপরকার মাটির আস্তরণ তো চল্লিশ মাইল অথচ সেখানে আমরা সোনা-রুপো-তামা পাই কি করে? পাহাড়ী জায়গায় এত পাথরই বা এল কোথা থেকে? এর উত্তর হ'লো, পৃথিবীর অভ্যন্তরটা অত্যন্ত গরম এবং সেইজন্য সেখানকার সমস্ত বস্তু গলা। গলা বস্তুতে তাপ দিলেই সেখানে আরম্ভ হবে একটি মন্থন। এই মন্থন ওখানে রাত্রি-দিন চলে এবং পৃথিবীর উপরে কোন দুর্ব্বল জায়গা বা ছিদ্রপথ পেলে সেখান দিয়ে এই গলিত পদার্থ বেরিয়ে এসে জমা হয় সেখানে। এই ছিদ্রপথই হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। কখনো তা বেরোয় ক্ষুদ্র পরিসরে কখনো বা বিরাট জায়গা জুড়ে। কখনো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল থেকে তা ঠেলে ওঠে কিন্তু একেবারে বাইরে বেরিয়ে আসে না আটকে থাকে ঐ চল্লিশ মাইল মাটির আস্তরণের মধ্যে। তার পর তা জমে ওখানে তৈরী হয় সোনা-রুপোর খনি। কোটি কোটি বৎসরের আন্দোলনে তৈরী হয়েছে এত খনি এত পাথর।

পৃথিবীর নিজের জন্ম হ'লো দু'শো থেকে চার শ' কোটি বৎসরের মধ্যে। এর একটা মাঝামাঝি বর্ত্তমান নিলে তা হচ্ছে তিন শত কোটি বৎসর। আজকের পৃথিবীর যে চেহারা তা হ'চ্ছে এই এত দিনের নিরন্তর আলোড়নের ফল। পৃথিবীর এই আলোড়ন বন্ধ হ'য়ে যায়নি, কোনদিন হবে না, কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও থামবে না সে, প্রতি মুহূর্ত্তে একটা কর্ম্মযজ্ঞ চলেছে এখানে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনও হয়—পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ছোট বড় কোন না কোন আগ্নেয়গিরি এই মুহূর্ত্তে অগ্নি উদ্গার করছেই। আর তার সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে গ্যাস আর লাভা। এই লাভাই হ'লো গলন্ত ম্যাগ্‌মা।

পাথর পৃথিবীতে আছে শত শত লক্ষ লক্ষ রকমের, কিন্তু গোড়ায় ওরা খালি তিন রকম। আগ্নেয়-শিলা—তা হ'চ্ছে গলা ম্যাগ্‌মা বাইরে এসে জ'মে যাওয়া, পাললিক-শিলা হ'চ্ছে বহুদিন

ধরে এক জায়গায় মাটির পলি পড়ে পড়ে কালক্রমে জমে শক্ত পাথর হ'য়ে যাওয়া আর প্রস্তরীভূত শিলা, কোন গাছ-পাতা, ফল, হাড় বহু দিনের বিবর্ত্তনে পাথরে পর্য্যবসিত হওয়া। হীরকখণ্ড হচ্ছে পাথর, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য, গোমেদ, নীলা এরাও পাথর। পাথরের আছে অসংখ্য রকম রং। কখনো একই কখনো বা বিভিন্ন। কখনো স্বচ্ছ কখনো অস্বচ্ছ—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কালো, ময়লা, কোন রঙই বাদ নেই। কখনো থাকে বিচিত্র রকমের নক্সা।

খনি থেকে আমরা যে ধাতু পাই, সে ধাতু সোজাসুজি তৈরী অবস্থায় থাকে না সেখানে। ধাতুময় কতকগুলো জায়গা থাকে যেখানকার মাটি বা পাথরের সঙ্গে মেশানো থাকে ধাতুর গুঁড়ো। সেই সব মাটি-পাথর ঝুড়ি ভর্ত্তি করে তুলে এনে নিষ্কাশণ করা হয় ধাতু। সেটা করবার জন্য নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে এবং সঙ্গে আছে ধোয়া, জাল দেওয়া, ছাঁকা এই সব। বহু লোক বহু কল-কব্জা যন্ত্রপাতি প্রতিদিন কাজ করে এই সব করতে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে যা মেশানো ছিল মাটিতে, মানুষ তা তুলে এনে লাগিয়েছে তার কাজে। এমনি করে মানুষের ধাতুসম্পদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর অনেকটা অংশ আবার পৃথিবীতে ফিরেও যাচ্ছে আমাদের অনবধানের জন্য। বহু ধাতুনির্ম্মিত বস্তু আমাদের হারিয়ে যায়, বহু বস্তু নিষ্প্রয়োজনে আমরা ফেলে দিই, তারা ধীরে ধীরে চলে যায় মাটির নীচে। একমাত্র লোহা ছাড়া আর কোন ধাতু মাটির সঙ্গে আবার মিশে যায় না। কাজেই আবার যদি কোন দিন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তাকে পাওয়া যায়, পাওয়া যাবে সেই অবস্থাতেই, পরিণত হবে না সে মাটি-মেশানো ধাতু বা ধাতু-মেশানো মাটিতে।

একেবারে যে তৈরী পরিশোধিত ধাতু পাওয়া যায় না, তা নয়। কোন কোন খনিতে সোনা থাকে গুঁড়ো গুঁড়ো, কোন খনিতে তা থাকে টুকরো টুকরো। সেই জন্য গুঁড়ো খনির সোনার দাম হয় বেশী, যেহেতু তা পরিশোধনের পরিশ্রম এবং ফলতঃ তার খরচা হয় বেশী। আজ পর্য্যন্ত সব চাইতে বড় সোনার টুকরো পাওয়া গেছে প্রায় দেড় মণ ওজনের একটি খণ্ড। তা পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়ার একটি খনিতে।

খনি থেকে তৈল পাওয়া যায় কেরোসিন, পেট্রোল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি—অথচ খনিজ কোন বস্তুর মধ্যেই তৈলাক্ত পদার্থ নেই। জলে তৈলাংশ থাকে না, পাথর নিঙড়ে তৈল পাওয়া যায় না, ধাতুর ভেতরে তৈল নেই—তৈলটা নিতান্তই জৈবিক পদার্থ, ও শুধু থাকে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীরে। গাছের গায়ে, কাঠে, বাকলে, ফলে, ফুলে, পাতায় বীজে সব জায়গাতেই অল্পবিস্তর তৈল থাকে, তবে সব চাইতে বেশী থাকে বীজে। জীবের শরীরে তৈল থাকে চর্ব্বিরূপে। তা হ'লে এই খনিজ তেলটা ওখানে এল কি করে? বৈজ্ঞানিকদের অভিমত—এ হচ্ছে যুগ-যুগান্তের মৃত্যুর সৃষ্টি। আবহমানকাল থেকে সংখ্যাতীত জীবজন্তু, মাছ, পাখী, সরীসৃপ, মানুষ মরে পৃথিবীর উপর পড়ে থেকে থেকে পচে মাটিতে মিশেছে আর তার শরীরের তৈলের অংশ একটু একটু করে জমে জমে তৈরী হয়েছে ঐ তৈলের খনিগুলো। গাছপালা, ফুল-ফল বীজ যা পৃথিবীর উপরে পড়ে পচেছে তাদের তেলের অংশও এমনি করে মাটিতে মিশেছে। তারপর তা সেখানে বহু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে দিয়ে তৈরী হয়েছে এক নতুন তেলের মসলা, যা বাদাম তেলও নয়, নারকেল তেলও নয়, তিমির চর্ব্বিও নয়, শুয়োরের চর্ব্বিও নয়, সে এক নতুন জিনিষ যা পরিশোধন করে আমরা পাই কেরোসিন, পাই পেট্রোল।

পৃথিবীটা তৈরী হয়েছিল সূর্য্যের একটা অংশ ছিটকে এসে, তারপর সেই জ্বলন্ত পদার্থটা ধীরে ধীরে জমে জমে জীবের বাসের উপযুক্ত হ'লো। তার ধাতুর অংশ চলে গেল কেন্দ্রে, তার উপরে রইল পাথর, তার উপরে মেশানো অবস্থায় পাথর আর মাটি, আর একেবারে উপরে শুধু মাটি—এই মাটিটি হচ্ছে এই বাইরের আস্তর।

এই যে মাটি, এ-ও একদিনেই তৈরী হয়নি, বহু দিন ধরে বহু পাথরকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এই মাটিতে পরিণত হতে হয়েছে। আদিম পৃথিবীতে জল ছিল কিন্তু মাটি ছিল না। ওর সবই ছিল পাথর, ছোট আর বড়। সর্ব্বদাই পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে—নদীর স্রোতে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ছে পাথর, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ঘষে যাচ্ছে তার কিছু অংশ, ছড়িয়ে যাচ্ছে গুঁড়ো, এমনি চলেইছে পৃথিবী সর্ব্বক্ষণ। পাথর কেবলই ছোট থেকে ছোটতর হতে হতে ক্রমে ক্ষুদ্র হয়ে পরিণত হচ্ছে মাটিতে। প্রথমে বড় বড় পাথর পাহাড়ের গায়ে বিরাট চাং Rocks, তা হচ্ছে ছোট ছোট খণ্ড Boulders, তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হচ্ছে নুড়ি Pebbles, নুড়ি ভেঙ্গে হচ্ছে কাঁকর Gravel, কাঁকর ভেঙ্গে হচ্ছে বালুকা Sand, বালুকা ভেঙ্গে হচ্ছে ধূলি Dust। এই Dust বা ধূলিই হ'লো মাটি বা Soil। অর্থাৎ পৃথিবীর উপরকার এই যে চারণ মাইল মাটি যার উপরে আমাদের বাড়ীঘর, ক্ষেত-খামার, রাস্তাঘাট দাঁড়িয়ে, সেটা সম্ভবতঃ অনেক দিনের অনেক জমা ধলো।

কাঁদে ভগবান

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ফুল ঝরে যায় নেই কারো চোখ
পথে উদাসীন সরে যায় লোক।
দানব সহর বধির পাষাণ
কাঁদে অসহায় শিশু ভগবান।

বালজাকের পত্রাবলী

(সহোদরা মাদাম সুরভাইলকে বিবাহের পর লিখিত)

তোমার বিমর্ষভাবের পত্র পেয়ে আমি অবাক হলাম। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে তুমি দার্শনিক হয়ে ওঠ। যন্ত্রণায় পৃথিবীতে কিছু আসে যায় না, এ কথাটা কী তুমি স্নেহের বোনটি জান না? তোমার বিমর্ষভাব যদি এক শ' গুণ বেড়ে থাকে তবে এক শ' কোটা হতাশাও প্যারিস থেকে বিউস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তায় মাইল ফলক কী সরিয়ে দেবে? বা সমস্ত জীগব্যাপী ব্যবধানের সেতু কী বাঁধিয়ে দিবে? তোমার ও আমার এই ব্যবধানের জন্য এগুলোকে আমি অভিশাপ দিই। আমাদের তুমি যদি ভুলে যাও তবে তোমাকে দোষারোপ করব—কারণ আমরা স্মৃতিকে জাগাতে পারি—কিন্তু আমাদের এই বিচ্ছেদের জন্য যদি তুমি মুষড়িয়ে পড় তবে তোমাকে দোষ দেব। এক শ' কথা না বলে আমি তোমাকে একটি কথাই বলব—এই বিমর্ষভাব আমাদের পরস্পরের উপস্থিতির সুরাহা বিষয়ে কিছু করতে পারবে না।

বোজার বোনটেস কত মহৎ ও সাধু প্রকৃতির নাগরিক ছিলেন। তাঁর ধ্যান ধারণা গ্রহণ কর। স্নেহের বোনটি আমুদে হও, সান্ত্বনা পেতে শিক্ষা কর, যাত্রাপথে কল্পনাকে উদ্দীপ্ত কর—একে কাজে লাগাও—পরিকল্পনা কর: সন্তোষ ও সান্ত্বনা তুমি পাবে অন্ততঃ পক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনে যাত্রা অব্যাহত থাকে, এত বিষণ্ণ হয়ে আমাদের পত্র লিখ না। মনে হয় তোমার কাছে গিয়ে তোমার কাঁচের আসবাবপত্রের ঘরে গিয়ে রঙীন কাগজ লাগাই, সংসারের সব কাজ দেখি, তোমার গৃহে পাতা কাঠের মেঝে পরিষ্কার করে দিই, তোমার আলোগুলো দেখি আর স্বয়ং শ্রীমতী সুরভিলকে দেখি।

সকলের বিচ্ছেদের ব্যথা তোমাকে সইতে হবে। আর আমাদেরও কী ব্যথা হয় না যখন তোমার হাসিভরা মুখ দেখি না, তোমাকে স্কিপিং করতে দেখি না—তুমি বকতে, চীৎকার করতে, লাফাতে আর এগুলিও দেখি না আর। আমার বাইশ বছর বয়সে যখন আমার মান প্রতিপত্তি ছিল না তখন সর্বদা অন্তহীন বিরক্তির মাঝে তোমার মত বয়সে এ সব কী আমাকে সইতে হয়নি?

তবে এখন আমার কপাল ভাল। গত পনের দিনের মধ্যে ভেবে ঠিক করেছি কী ভাবে এক হাজার ক্রাউন পেতে হবে। কতকগুলো উপন্যাসের বিনিময়ে এ টাকা আমি লোকদের কাছ থেকে পাব আর তোমার শ্বশুরবাড়ীর প্রেণি এগুলোর বেশ চাহিদা হবে। বিউক্সের কথা মনে হলে আমার মনে হয় তুমি যে রাস্তায় থাক তার নামকরণ এমন হল কেন? অবশ্য এ বিষয়ে কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। তোমার কাছে একটা সংবাদ দেব। সংবাদপত্রে সে খবর যথাযথভাবে পরিবেশিত হয়নি। এক মিছিল বার করে এক মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। যখন ছাত্ররা এল তখন দরজা বন্ধ। সেখানে বাগানটি সেঁটে দেওয়া হল। এ কাজ থিয়েটার শেষ হলে যেমন ভাবে করা হয়, ঠিক সেই রকম ভাব করা হল।

কর্তৃপক্ষ জানালেন সে অনুষ্ঠান আর হবে না। ছেলেরাও জানাল লিখে যে পুজো করবার স্বাধীনতা অনুযায়ী মৃতের বন্ধুবর্গ সেখানে সমাগত হয়েছে। আকস্মিক ভাবে সেদিন সাত আট হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল। সকলে কালো কোট পরেছিল। প্যারিসের সৈন্যরা সেই কবরখানা রক্ষা করছিল। সেই আদেশের বিরুদ্ধে ছেলেরা অবরোধ ভাঙবার চেষ্টা করছিল। একজন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে রক্ষীদের আদেশ দিল। অধস্তন কর্মচারীরা সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল। এদেরই মধ্যে এক নবীন ছোকরা জনতার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সেই অফিসারটির সামনে হাজির হল—যে অফিসারটি গুলী চালানোর হুকুম দিয়েছিল। বুকটা খুলে ছেলেটা বলল, 'আমি প্রস্তুত, আমার মৃত্যুতে পুজো করবার স্বাধীনতা থাকবে।' 'বেশ, বেশ' বলে লোকরা চীৎকার করল। তারপর পার্শ্ববর্তী একটা ছোট মাঠে জনতা জমায়েত হল। নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে একটা বক্তৃতা দেওয়া হল। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত সকলে প্রতিজ্ঞা করল যে হারানো-স্বাধীনতার জন্য আগামী বছর তারা কালো কোট পরে আসবে। তারপর দু'-একজন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে টুপি আস্তে আস্তে খুলে লোলমাণ্ডের (এই যুবককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল) বাড়ীর পাশ দিয়ে তারা চলে গেল। এই শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্যারিস শহরে চমক এনে দিয়েছে।

আমি তোমাকে গোপনে একটা কথা বলি। আমাদের বুড়ী মা ক্রমশঃ ঠাকুরমা হয়ে যাচ্ছেন—আমার ভয় হয়, তার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। সর্বদা বুড়ো ঠাকুরমার মতন তিনি নালিশ করেন—সন্ধ্যাবেলাকার শীতে তিনি ছটফট করেন, কারও কারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আবার হঠাৎ বিদ্যুতের মত তার মেজাজ পালটিয়ে যায়। এ ছাড়া আরও বলবার কিছু আছে—যেসব ঠিক বুড়ী ঠাকুরমার কাজের মত। যাকে নিয়ে আমার

খুব ভয় হয়, আলোকে বসে আমি এই দেখতে পারছি যে মায়ের দুর্বলতা আরও বাড়বে। বাড়ীতে একটা বিকৃত বোধ বিরাজমান, আর এ-জন্ত আমি অসুবিধায় পড়েছি। আমাদের পরিবারে এখন মোটে চারজন লোক আছে, আমরা একটা ছোট শহরের মতন। পরিবারের আমরা পরস্পরের দিকে শুধু তাকাই। একটা উদাহরণ দিই—সেদিন আমি প্যারিস থেকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিঃশেষ হয়ে ফিরলাম। মাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম অথচ আমার জন্ত মা একটা কালো কোট বানিয়েছিলেন। আমার এ বয়সে মনে কিছু দাগ ধরে না—এটা অনেকটা বৃদ্ধের মত, তবে করুণার স্পর্শে মার সম্মুখে উপস্থিত হতে আমাকে কোন কষ্টের মধ্যে পড়তে হয় না। কারণ বিশেষভাবে জানি, এ একটা উৎসর্গ কিন্তু আমার পক্ষে যা মনে করার ছিল তা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মায়ের বিষণ্ণ বিদ্রোহী ভাব তুমি বুঝতে পারছ, এ ঘটনা থেকে মায়ের মুখের হাবভাব বুঝতে পারছ। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সব কিছু তীক্ষ্ণ ভাবে কান করেছিলাম এই জন্ত যে আমি কী করেছি। এমন সময় লরেন্সিয়া এসে মাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল এবং বোনের কাছ থেকে দু'-তিনটে মধুর কথা শুনে মায়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। বলতে গেলে এক বিন্দু জল ছাড়া কিছুই নাই তবু এ আমাদের জীবনধারণের কথা জানাবে। আঃ, আমাদের পবিত্র বংশে আমরা সকলে এক একটা স্বতন্ত্র স্বভাবের জীব। সত্যি, ভাবলে করুণা হয় এই জন্ত যে আমাদেরকে উপন্যাসে কোন রূপ দিতে পারলাম না। এই উত্তম বর্ণনা ছাড়াও যে তুমি আবার আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে এসেছ এ কথা আমি ভাবতে পারি। আহা কী ভাবে যে কী আসে—আর আমরা আমাদের জীবনযাত্রায় একটুও সাফল্যের সুযোগ নিই না, তার পরিবর্তে সকলকে আঘাতের জন্ত আমরা সচেষ্ট? মনের খোলা ভাব নিয়ে কেউ কেউ বাঁচবার জন্ত রাজী হয়—তবে আমি, তুমি বা বাবা এই ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি ভাবি তুমি হয়ত আমাদেরই একজন হতে। উন্মত্ত লোকেরা যখন একজন অপরজনকে বাক্সর মধ্যে পিষে মারবার চেষ্টা করে, যখন কোন লোক কারও অসংভাব দেখে ভ্রুকুটি দেখায় তখন মনে হয় লোকটি অতিরঞ্জিত তুচ্ছতা দূর করে, আর যারা মানুষের আন্তর বৃত্তিকে না বুঝে সেই আন্তর বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে তাদের দেখে আমি বিরক্ত হই, আর একেই বুদ্ধির ব্যবহার আমরা বলে থাকি। আমি আমাকে জানি না। তুমি এবং আমি এক—চালাকির কথা দূরে সরিয়ে দাও—আর আমাদের মধ্যে যে স্নেহ ছিল সেই স্নেহকে এস আমরা আঁকড়িয়ে ধরি। আঃ! আমার তিনটে কলম যা ডাকযোগে এসেছে তা ডাকঘরে পড়ে আছে, তারা এ-ভাবে বঞ্চনা করে আমাদের, আমাদের সরকার সদাশয় নয়, তাই আমাকে বেশী পরিমাণে লিখতে দিতেও তারা উৎসাহী নয়। আমি তোমার মত নই, কারণ তোমার পত্র আমি সরাইখানার হিজিবিজি লেখার মত বাইরে লিখে রাখি না—তবে তা ছাপার হাতেরও নয়, তিন পাতায় তুমি তিনবার লেখ, তুমি জান না হয়ত যে লরেন্সিয়া আগষ্টাসের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়েছে, তবে তাদের এমন কিছু লিখ না যাতে সন্দেহ হয়, কারণ এ গোপন কথা আমি তোমাকে জানালাম। তার বোনের একথা বোঝাতে আমাকে বেগ পেতে হয়েছিল এই জন্ত যে লেখকরা প্রবঞ্চক হয়ে থাকে, এই প্রেমের লীলায় (তবে তা ভাগ্য বিষয়ে এ-কথা মনে রেখ) আমাকে সে হয়ত ভীষণ ভাবে ঘৃণা করবে যখন জানবে অশ্রদ্ধার সঙ্গে তার প্রেমের অনুরাগ বিষয়ে মন্তব্য করলাম, টাকার অভিশাপ—তবে চিন্তিত হও না, আমি যদি সত্যিই প্রতিভাবান হই তবে সকলের জন্ত প্রচুর টাকা সঞ্চয় করব। টুরিন যাবার আগে পুনরায় আমাকে পত্র লিখতে পার। এখান থেকে ২৮ বা ৩০শে জুনের আগে যাব না। আমি নিজেই তোমাকে আমার অভিযান বিষয়ে লিখব।

আর বেশী আমার কী বলবার আছে। তোমার কথা ভাবি—এ-কথা আর বলব না, রাতে খেতে বসে তোমার কথা মনে পড়বে। এ-টা আমার স্বভাব। আর যখন আমরা প্রায় এক সময়ে খেয়ে থাকি তখন তুমি খানিকটা সময় ছেড়ে দিতে পার এই ভেবে 'ভাই আমাদের কথা ভাবছে। সে খুব ভাল ছেলে, ভাল লোক আর চিঠি ছাপাখানায় গেলে তা ছেপে প্রায় ত্রিশ পাতা হবে।' মহৎ ঈশ্বর! কেন এ-সব আমার উপন্যাসে লিখি না? এ থেকে অনেক উপকরণ পাওয়া যেত। তোমাকে যখন লিখি তখন একচোখা ফিঙে পাখীর মত বকবক করি আর আমার মিত ভাষণের কথা ভুলে যায়। আমার চিঠি তোমাকে উজ্জীবিত করুক। ঈশ্বর তোমাকে আর যেন বিষাদগ্রস্ত না করেন।

বোনটি এখন বিদায়। আরাম কেদারা থেকে উঠে দেখ তোমার ভাই বাইরের ঘরে এখন দাঁড়িয়ে আছে। 'কেমন সুন্দর আলো জ্বলে দেখ।' 'হ্যাঁ তার আলো জ্বলে না?' 'সত্যি ঘড়িটার নির্মাণ-কৌশল কি সুন্দর,' 'না, কিছু ভেব না—রাতে খেতে আসছ'—"বিউস্ক যাবার পথ ভুল কর না—' যত্ন নাও, হ্যাঁ রোদনকারী ঢোল বাজাচ্ছে আমার জন্তে।' 'মনে রেখ ঠিক পাঁচটা'—'হ্যাঁ', 'বেশ' এই কথাটা সুরভাইল বলে। আমি যখন বাইরে যাই তখন তুমি বেড়াতে বার হচ্ছ।

'তোমার সঙ্গে আমি আসব।'

উঃ—এ-একটা স্বপ্ন তাই দুঃখের কারণ, তবে বোন, বিদায়। তোমাকে সোহাগ জানিয়ে। ইতি—

(সহোদরা মাদাম সুরভাইলকে লিখিত)

স্নেহের বোনটি: লিখতে বসে আমার খুব কষ্ট হয় যদি না সেই প্রত্যেকজাত গীতি-কবির কথা না লিখি, আর তুমি নানা আখ্যায়িকার বক্তব্য শুনতে পাবে আরও যথাযথ পত্রও পেয়ে থাকবে আমরা দেখছি সেই সুন্দরী ভাইঝিটিকে সেই পরিবার কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। যাক আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ঠাকুমারা হলেন শুকিয়ে যাওয়া বুড়ো মানুষ। একটি যুবতী মেয়ে এবং আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার মধ্যে বসিয়ে একজন আধাবয়সী মেয়ের কথা ভাবত। ভাবলে উভয়ের সঙ্গে তুলনা করলে সেই মেয়েটির বিষয়ে তোমার ধারণা স্পষ্ট হবে। মনে হয় সেই মহিলা অভিজাতবংশীয়া এবং সেই কারণে বারুদের স্তূপের মত। অবশ্য এ রকম মেয়ে আমি চোখে দেখিনি। সেই মহিলা কেন লরেন্সিয়াকে প্রীতির সঙ্গে বাহুতে জড়িয়ে ধরল। এই ভাবটা শাশুড়ীদের মধ্যে ঠিক দেখা যায় না। আমার ইচ্ছে করে এ রকম শাশুড়ী আমি যেন পাই। সেই ভদ্রমহিলা বলল, ছেলে তার কত প্রশংসা করে এবং যতখানি তার পাওনা তার চেয়ে তিনি বেশী পান। আমি

তাঁকে ভীতা নারীরূপে দেখতে ইচ্ছুক—আমি করুণা প্রদর্শন করি যারা ভীতু লোকের সঙ্গে মিশতে থাকে। আর একজন শাশুড়ী আছেন যাঁর চিবুক দেখে ধরা যায় তাঁর প্রেম করার বয়স পার হয়ে গেছে, তাই তিনি করুণার পাত্রী। কিন্তু তিনি ভাবেন বয়সকে তিনি আর আমল দেবেন না এবং তিনি সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে চান। আর একজন দ্বিতীয় বোন আছেন—যিনি একজন রাষ্ট্রের হিসাব-রক্ষকের পত্নী। বছরে সেই মহিলার স্বামীর তিন হাজার ফ্রাঁ আয়। সত্যি এটা ভাল, প্রীতিপ্রদ এবং মোটেই নীরস নয়। আমি তাঁকে নিজে দেখিনি। কিন্তু সেই শ্বশুরকে দেখেছি। তাকে দেখতে সুন্দর, পূর্ণচন্দ্রের মত তার মুখ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এসেছে সেই পরিবারে। আর সেই স্বর্গরাজ্যে লরেন্জিয়ার বিয়ে হবে—অবশ্য তা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে।

গতকাল আমরা লরেন্জিয়ার ভাবী খুড়শাশুড়ীকে দেখলাম। তার স্বামীর ঠাকুরমার তিনি দ্বিতীয়া কন্যা। তিনিও একজন হোমরা-চোমরা পদস্থ সরকারী পরিচালকের পত্নী—যার কথা হয়ত তুমি বাবার কাছ থেকে শুনেছ এবং এই ভদ্রমহিলার সেই সুন্দরী মেয়ের কথা চিঠির প্রথম অংশে তোমাকে লিখেছি। তোমার সেই শহরের মধ্যে বসে থেকে তুমি যদি ভাব, সেই মহিলাটি কীরূপ তাহলে তোমাকে তোমার দুটি হাত দিয়ে তোমার চোখ দুটো ঢাকতে হবে। আর সেই যুবতীর প্রতিচ্ছবি তোমাকে কল্পনায় গড়ে নিতে হবে। অবশ্য সেই মহিলার নাম আমার স্মরণে নাই। তার মুখে স্বর্গীয় হাসির বিচ্ছুরণ, দেহ লম্বা, পূর্ণদেহ আর সুন্দর কাঠামো সেই যুবতীর। ভবিষ্যতে আত্মীয়ের বিষয়ে তোমার ধারণা হবে। তার পর আমাদের সেই প্রভেদের গীতি-কবির প্রসঙ্গে অর্থাৎ লরেন্জিয়ার স্বামীর প্রসঙ্গে এসে পড়েছি। শ্রীমতী সুরভাইদের চেয়ে তিনি একটু লম্বা। মুখটা সাধারণ, সুন্দরও না, কুশ্রীও না—তবে তাকে একটু বেশী বয়সের বলে মনে হয় এইজন্য যে, ওপরের চোয়ালে দাঁত নাই। তবে পাত্রটি খারাপের ভাল। সে কবিতা লেখে। সে একটা আশ্চর্য ভাব। দু বারের বেশী প্রতিযোগিতায় সে যোগ দেয়নি—তবে প্রতিবার সে উপহার পেয়েছে। বিলিয়ার্ড খেলায় সে নিপুণ। সে শিকারী, ঘোড়ায় চড়তে পারে, সংক্ষেপে তুমি তার প্রতিভার কথা বুঝতে পারবে যে তার মধ্যে আত্মনির্ভর ভাব আছে। কারণ ভাল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার পথে সে এগিয়ে গেছে এবং তার মধ্যে এমন খানিকটা ভাব আছে যে অংশ গর্বের ব্যারোমিটারে মাপলে ঠিক নীচে নির্দ্ধারিত হবে না। আমাদের এই পরিবারে আমরা সকলে ফুটফুটে—এই গুণে গুণান্বিত। আমরা তার মধ্যে এটা খুব কমই দেখব। তবে তুমি বলতে পার মানুষ যখন সব কিছু এত সুন্দরভাবে করতে পারে তখন তার উন্নতি বিধানের জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। লরেন্জিয়া সুখী হোক এ কথা সে আশা করে। পিয়ানোর অভাব একটা হীরের দুল দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া হবে। অন্য গহনাও ভাল হবে, তবে সব কিছু টাকার ওপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ টাকা যদি তৈরী আর ঠিক থাকে।

মার ইচ্ছে তার জামাই মার্কে যেন ঠিক ভাবে চালিয়ে নেন। আর জামাইও মাকে সর্বদা জড়িয়ে ধরে এবং বাগদানের দিন ছাড়া লরেন্জিয়াকে সে চুমু খায় নি। এক কথায় লরেন্জিয়া পটে আঁকা ছবির মত সুন্দরী। কী সুন্দর তার হাত, তার বাহুযুগল। তার রঙ পাতলা বটে তবে মনোমুগ্ধকর। তার কথাবার্তার জন্য লোকে তার প্রশংসা করে—এ তার বোধশক্তির প্রাচুর্যের জন্য এবং এ তার স্বাভাবিক বোধ যা এখনও পূর্ণ বিকাশিত হয় নি। তার চোখ সুন্দর—চোখের রঙ ফিকে হলেও লোকে তার প্রশংসা করে—তার বিয়ে সুখের হবেই—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ঠাকুরমার খুব আনন্দ। এ-বিয়েতে বাবারও পুরো মত আছে—আর আমার মতই তোমার মত। তোমার বিদায়ের দিনের স্মৃতি মনে করে মার কথা ভাব তা হলে বুঝতে পারবে লরেন্জিয়া ও আমাকে কত ব্যথা পেতে হবে। প্রকৃতি দেবী গোলাপে কাঁটা ছড়িয়ে রাখেন। মা প্রকৃতি দেবীকে অনুসরণ করেন।

'হেনরি সুখী নয়, তার ছেলের অসুখ। সে আর কিছু করবে না তাকে আর অন্য স্কুলে পাঠাতে হবে। সে নীরস নীতিকে ধরেছে। তার সব শিক্ষা নষ্ট হবে। ছেলেদের তারা ঘরে রাখে। সামান্য কিছুর জন্য শাস্তি দিয়ে তাদের ধ্বংস করে'। এ-থেকে তুমি বুঝতে পারছ মা কথা বলছে।

আমার জন্য একটা ছোট ঘর ঠিক আছে। সেখানে আমি এ-মাসের পনেরই চলে যাব। আমি নিজেকে কাজে ঠিক ভাবে বন্ধ রাখব। তা হলে আমার কাজ ঠিক সুষ্ঠু ভাবে চলবে। প্রত্যেক মাসে আমি উপন্যাস লিখে মাসে ছ'শ ফ্রাঁ উপায় করব, এই আশা আমি করি। জীবনের বাধা-বিপত্তিকে যবে সরিয়ে দেবে। আর তা হলে সুখ-দুঃখের অংশ তোমাদের সঙ্গে নিতে পারব। তা হলেই এ হবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ আমার নাই।

মার বাড়াবাড়ি দেখে আমার করুণা হয়। তাকে এ-কথা বলবার পৃথিবীতে আর কেউ নাই। দুঃখ পাবেন মা যদি তিনি আনন্দ করেন এই ভেবে যে সকলের সুখের জন্য তিনি এ-কাজ করছেন। উপরন্তু বিপরীত কাজই তিনি করছেন।

বোনটি বিদায়। তোমাকে সোহাগ জানাই আমার স্নেহ দিয়ে আর তোমাকে অনুরোধ করি, তোমার ভয়াতুর অনুভূতির বিপক্ষে লড়াই কর। তোমাকে আমার আবার মনে পড়ছে। তুমি ওয়াল্টার স্কটের শেষ উপন্যাস কেনিলওয়ার্থটি পড়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিষ। আমার উপন্যাস শেষ হয়ে এসেছে। শেষ অধ্যায়টা ধরেছি। তোমাকে বইটা এক সঙ্গে পাঠাতে পারি—অন্য কাউকে পড়তে দেবে না। তবে এক কথায় ধরে নাও এটা হবে আমার মহৎ সাহিত্যকীর্ত্তি। এ অবস্থায় টুরিন বা বিউস্ব-এ যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে পৈতৃক গৃহ যদি ছাড়তে হয় তবে উপন্যাস লেখবার জন্য—এর পিছনে গবেষণা ও প্রচুর কষ্টসাধ্য শ্রমের প্রয়োজন। ইতি—

Aix, September, 1, 1832

মা গো আমার মা, তোমার চিঠি পড়ে আমি গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছি—আর এর জন্যই না তোমাকে এত ভালবাসি। আমার জন্য তুমি সবই করেছ, তাই ভাবি মনের শান্ত ও নম্র ভাব দিয়ে কখন তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাব? ইতি,

Villeparisis 1821

স্নেহের বোন শ্রীমতী সুরভাইল,

দীর্ঘ আলোচনায় আমি যা বক্তব্য বলব সে-বক্তব্যের চেয়ে বেশী লরেন্সিয়া দু'ছত্র লিখে তোমাকে বোঝাবে এবং বোঝাতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে লরেন্সিয়া কৌতূহলী, সুতরাং ভাল ভাবাও তার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পার। আমি একজন সাধারণ দর্শক হবে বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বলছি যে, নাটকের গতি দ্রুত হয়নি। বিমর্ষশক্তির পরিবেশ দেখে উপসংহার বিষয়ে লেখতে পার এই আশা করি।

একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে আমার অধীরতা শান্ত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে একটা সামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বয়ক ছিল, পরিচিত বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিল। আরও অনেকের মধ্যে আমাদের কনিষ্ঠ ভাই হেনরিও উপস্থিত ছিল। এ-ছাড়া আরও কয়েকজন দুর্লভ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাইরের ঘরে এ-অনুষ্ঠানপর্ব চলছিল নড়াচড়া, কথাবার্তা, গল্প এবং প্রশংসা চলছিল। লরেন্সিয়ার এক ভাবী ননদকে আমি দেখলাম। দেখে মনে হল সে বোধ স্বর্গীয় কাননের অপ্সরী। নল খাগড়ার মত ঋজু তার দেহ এবং মুখশ্রীটি মনোরমা, সত্যি বলছি সে মুখশ্রীটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে চেয়েছ আর পত্র লিখেছ এক দুঃখভারাক্রান্ত মানুষকে—যে সবচেয়ে বিষাদগ্রস্ত আর সবচেয়ে অসুখী আর যে লোকটি একটা সুন্দর প্রকোষ্ঠে স্থির হয়ে বসে থাকে।

এই দুঃখের ছোঁয়া আনন্দের দিনে ধরা যায় না, তা জানি। কিছু বলবার আগে পত্রিকার উপন্যাসের দিনটির জন্ম অপেক্ষা করব। মনের অবস্থা যখন এই রকম তখন আমার কাছ থেকে অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয়ে তুমি কী আর আশা কর?

প্রভেন্সের সেই গীতি-কবি (লরেন্সিয়ার ভবিষ্যৎ স্বামী) প্রতিদিন প্রাতরাশের সময়, রাতে আহারের সময় এবং কোর্টে আসে। তবুও তার জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে এমন কোন 'কাজ', কথা এবং হাবভাব দেখা যায় না যা দেখে স্নেহ প্রকাশ পায়। আমি হৃদয় ও মন দিয়ে উপলব্ধি করেছি, আমাকে যে-মেয়ে গভীর ভাবে তার প্রেম দিয়ে বেশী করে ভালবাসবে না তাকে আমি বিয়ে করব না। এই থেকে আমার মনে অনেক গভীর চিন্তা জেগেছে এই ভেবে যে, কী ভাবে প্রেমপথে প্রবেশ করা যায়। লরেন্সিয়া যে সুখী হবেই এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ একটি উদার ছেলেকে বোনটি আমার বিয়ে করছে। বোন চতুর মেয়ে আর লরেন্সিয়ার মতামতও ভাল। তবে আমি মনে করি সামাজিক পরিবেশ বিষয়ে সকলকে ভাবতে হবে—কারণ এ-টি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্ত—যেটি এক মিলিত সংযুক্তির ফলস্বরূপ। আর আমি সহযোগী সঙ্গতি খুঁজে পাবার চেষ্টা করব—অবশ্য যদি আমি বিয়ে করি।

উপহার, দান, তুচ্ছ বস্তু আর দু'-চারমাসের মামলায় সুখ আসে না। এ একটা নির্জন ফুল—খুঁজে পাওয়া কঠিন আর যে একা অসুখী সে সমাজেও অসুখী—যখন মরে তখনও অসুখী, যখন জীবিত থাকে তখনও অসুখী। আর এই বর্ণনায় দেখে কেউ যেন খুব বিশেষে পরিণত না হয়। তুমি বুঝছ যে আমি সর্বদা আমুদে নই।

মীনৃষ্ট্রেল ম্যান

[নিগ্রো কবি ল্যাংষ্টন হিউজ]

যেহেতু আমার আনন সতত
পূর্ণ তরল হাসিতে,
আর কণ্ঠ আমার
পূর্ণ নিয়ত গানেতে,
বুঝেও বোঝনি তোমরা বন্ধু
কত না নীরব গোপন বেদন
কাঁদাইছে মোর মন!

যেহেতু আমার আনন সতত
দীপ্ত তরল হাসিতে,
শুনিতে পাওনি তোমরা বন্ধু
কেঁদেছি কত যে নিভৃতে!
আজিকে চটুল চরণ আমার
চঞ্চল দেখি নৃত্যে,
বুঝিলে না হায় আমি যে বন্ধু,
ঢলিয়া পড়িনু মৃত্যুতে!

অনুবাদ—শ্রীঅঞ্জলি ভট্টাচার্য্য

সৈনিক

[Rupert Brooke-এর "The Soldier" কবিতার অনুবাদ]

মৃত্যু যদি চুম্বন করে মোরে
একটি কথাই মনে রেখ শুধু ভাই,
ইংলণ্ডের শান্ত মাটির ডোরে
বাঁধা আছে মন আজকে যে প্রাণ নাই।
ঐ নিরালায় দেশের মাটির কোলে
একটি যে প্রাণ লুকানো সমাধি তলে—
ইংলণ্ড তারে রূপ দিয়েছিল আর দিয়েছিল স্নেহ,
ফুল দিয়েছিল ভালবাসিবারে, বাঁধিবার তরে গেহ
দিয়েছিল মাটি উর্বর ক্ষেত। তার একান্ত দেহ
ইংলণ্ডের বাতাসে বাতাসে নিয়েছিলো প্রাণবায়ু,
নদীর জলে স্নানান্তে তারে সূর্য দিয়েছে আয়ু।
মৃত্যুর পর স্নিগ্ধ মুক্ত প্রাণ
বিশ্ব-অংশ হৃদয় স্পন্দনে: স্বাধীন চিন্তা দৃপ্ত শব্দগান
রেখে যাবে তার দেশের মাটির কোণে।
আলোক সদৃশ-উজ্জ্বল স্বপ্নেরা,
বান্ধবপ্রীতি, সহজ সরল হাসি—
ইংলণ্ডের আকাশের নীচে শান্তির কপোতেরা
ডানা মেলে উড়ে বাতাসে বেড়াবে ভাসি।

অনুবাদক—দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কথামুখ

১

অন্ধকার। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। সেই অন্ধকারে প্রবহমান জলস্রোতও মনে হচ্ছিল যেন কালো কালির মত। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে ছেদহীন অন্ধকার শুধু।

হার্মাদ জলদস্যু রোজারিও তার বিশমাল্লাবাহী নাওয়ের পাটাতনের উপরে নিঃশব্দে একাকী অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। ছয় ফুটের কাছাকাছি প্রায় দৈর্ঘ্যে, বিরাট পেশীবহুল দেহ। পরিধানে পাতলুন ও কামিজ। বুকের 'পরে আঁটা বর্ম। কটিবন্ধে ঝুলন্ত খাপ সমেত তরবারি ও পারা পিস্তল। পিঙ্গল দুটি শ্যেন চক্ষুর তারা দূর অন্ধকারে স্থির নিবদ্ধ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই রোজারিও মাল্লাদের নোঙর ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিল। সাগর-সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান ও মেলা আসন্ন। নানা দিক থেকে এই সময় বহু যাত্রী ঐ পথ দিয়ে সাগর-সঙ্গমের দিকে যায়। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে অবিশ্যি সোনাদানা খুব বেশী থাকে না। সেদিক থেকে তাদের লুণ্ঠন করে খুব বেশী লাভবান হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু রোজারিওর এবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য ঠিক লুণ্ঠন নয়। একটি শিশু সন্তানের তার প্রয়োজন।

ভায়লার একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তার একটি সন্তান হলো না। মাতা মেরীর কাছে সন্তান কামনায় অনেক প্রার্থনাই সে জানিয়েছে কিন্তু মাতা মেরী ভায়লার সে মনস্কামনা অদ্যাপিও পূর্ণ করেনি।

রোজারিও ভায়লাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বলেছে, কি হবে তোর ছেলে নিয়ে ভায়লা ?

ভায়লা ঘাড় নেড়ে বলেছে, বা রে, একটা ছেলে থাকবে না আমার, কেমন কথা বলো তুমি। ছেলে আমার একটা চাই। আজো একটা ছেলে হলো না! আমার কি কম দুঃখ।

তা ছেলে হবার বয়স তো তোর এখনো পার হয়ে যায়নি রে!

বয়সটা বুঝি কম হলো। দেড় কুড়ি প্রায় বয়স হতে চললো না, আর কবে হবে!

তা সত্যি। দেড় কুড়ি ঠিক ঠিক না হলেও কাছাকাছি প্রায় বয়েস হতে চললো বৈ কি ভায়লার। ভায়লার ছেলে কোল না আজ পর্যন্ত বলে রোজারিওরও কিছুটা ভয় ছিল বৈ কি! ভায়লার বয়েসের তুলনায় তার বয়েস অনেক বেশী। সে কোন না এক কুড়ি বছর বয়েসের পার্থক্য হবে দুজনার মধ্যে। অটুটযৌবনা ভায়লা আর তার দেহে বার্ধক্যের চিহ্ন ইতিমধ্যেই অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। গত আট বছরেও ভায়লাকে সে একটি সন্তান দিতে পারেনি। আর যত দিন যাচ্ছে রোজারিওর মনে হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও বুঝি তার মধ্যে লোপ পাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাপারটা যেন আরো বেশী উপলব্ধি করে রোজারিও যখনই ভায়লাকে সে দু বাহু বাড়িয়ে ইদানীং বক্ষের 'পরে টেনে নেয়।

আগেকার দিনের সেই উদ্দাম কামনা যেন সে আর দেহের কোথাও খুঁজে পায় না এবং পেলেও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় তা।

একটুতেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। অবশ হয়ে আসে সব কিছু। ঝিমঝিম করে স্নায়ুগুলো। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে যেন রোজারিওর মনের পাতায় ভেসে ওঠে ঐ মুহূর্তে আর একখানি মুখ। তরুণ ডি'সুজা।

তার অর্দ্ধেকেরও কম বয়েস সেই শয়তান ইবলিশের বাচ্চাটার। প্রশস্ত বক্ষপট। শালপ্রাংশু সম দুটি বাহু। থুতনীর নীচে সামান্য কটা দাড়ি। ওষ্ঠের উপরে সরু চিকণ গোঁফের রেখা।

রোজারিও জানে, ভায়লার প্রতি তার নজর আছে এবং যেদিন থেকে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে রোজারিওর সুখশান্তি সব গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় ভাল করে রাত্রে আজকাল সে ঘুমোতে পর্যন্ত পারে না। কতবার ইচ্ছা হয়েছে চুপি চুপি এক রাত্রে গিয়ে ঘুমন্ত ডি'সুজার বক্ষে সমূলে তার কটিদেশের ছোরাটা বসিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস হয়নি।

ঘুমালেও ডি'সুজা সর্বদা সতর্ক থাকে। তাছাড়া ইবলিশের বাচ্চাটার গায়ে অসুরের মত শক্তি। যদি যুদ্ধে ওর শক্তির কাছে ও পরাভূত হয়?

আবার মনে হয়েছে এই বোধ হয় জগতের রীতি। মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে—এই দুনিয়ার কানুন।

সেও তো তার প্রথম বয়সেই একদিন গভীর রাত্রে তার

কমাণ্ডারের বুকে ছোরা বসিয়ে তার অঙ্ক থেকে তার আদরিণী ডায়নাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভায়লার আগে এসেছিল ডায়না তার জীবনে। নীলনয়না স্বর্ণকেশী বিস্রস্তা ডায়না। ষোড়শী ডায়না। ডায়না। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ডায়না!

পঁচিশ কি ত্রিশ বছর হবে। তারপর এলো আজকের ভায়লা।

কিন্তু যৌবনের সেই সিংহ রোজারিও আজ আর সে নেই। তিন কুড়িরও বেশী বয়স হয়ে গিয়েছে আজ তার। বার বার দু'বার অসুখ হয়ে সারা গায়ে ঘা ফুটে বের হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করে আজকাল রোজারিও। নইলে রোজারিও কি ঐ ইবলিশের বাচ্চাটাকে আস্ত রাখত একদিন? কবে ও তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে দরিয়ার ক্ষুধার্ত হাঙরগুলোর মুখে ছড়িয়ে দিত।

ঐ ইবলিশের বাচ্চা ডি'সুজা যে সেটা জানেনা তা নয়। কিন্তু আজ আর রোজারিওর সে ক্ষমতা নেই। কথাটা ডি'সুজা জানে এবং বোঝেও।

নইলে আর চোখ অমন করে রোজারিওর দিকে চেয়ে হাসত না ইবলিশের বাচ্চাটা। বড় বড় মুলোর মত লালচে দাঁতগুলো বের করে হাসতে হাসতে গোঁফে তা দেয় শয়তানটা।

খোলা নদীবক্ষে পৌষের হিমশীতল বাতাসে যেন চোখে-মুখে ছুঁচ বিঁধায়। আজকে যদিও এখনো কুয়াশা নামেনি তবু রোজারিও জানে কুয়াশা ঠিক নামবেই। প্রত্যহ আজকাল রাত্রে কুয়াশা নামে।

কুয়াশা নামলেই মুশকিল, কিছু দেখা যায় না তখন আর। দু-চার হাতের মধ্যেও নজর চলে না। ঝাপসা কুয়াশায় দৃষ্টি সামনে থেকে মুছে যেন সব একাকার হয়ে যায়।

ভায়লা একটা বাচ্চা চায়। রোজারিও ভায়লাকে বাচ্চা দেবে এবারে। হঠাৎ তার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছে।

এই সময়টা এই মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে এসে কোন কোন হিন্দু নারী নাকি দরিয়াতে তাদের প্রথম জাত সন্তানকে গঙ্গামাঈকে নিবেদন করে তাদের মানসিক শোধ করে। প্রায় প্রতি বছরই ঐরকম মানসিক শোধ করতে দু'-চারজন আসে।

এবারেও কি দু'-একজন আসবে না? দরিয়া থেকে নিবেদিত বাচ্চাকে ওরা তুলে নিতে দেবে না। বাধা দেবে। গোলযোগের সম্ভাবনাও আছে। আর কাকদ্বীপের কাজী সাহেবটা অত্যন্ত হারামজাদা। কাজ কি হাঙ্গামায় তার চাইতে পথেই সে লুঠ করে নেবে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে সে রকম কোন বাচ্চা থাকলে।

সেই বাচ্চা নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে সে ভায়লার হাতে। নে, বাচ্চা নে ভায়লা। তোর বাচ্চার এত সখ।

ওদেরও বলবার কিছু থাকতে পারে না। ওরা তো সে বাচ্চাকে দরিয়াতে বিসর্জন দিতেই এসেছে। অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকে রোজারিও, কোন যাত্রীদের নাও দেখা যাচ্ছে কি না।

দুদিন ধরে আশে-পাশে অপেক্ষা করছে সে তীর্থযাত্রীদের আগমনের জন্য।

হঠাৎ একসময় নজরে পড়ে রোজারিওর, বহু দূরে অন্ধকারে একটা আলোর মালা যেন কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে রোজারিও। বুঝতে কষ্ট হয় না রোজারিওর, ঐ আলোর মালা তীর্থযাত্রীদেরই নৌকার আলো। সার বেঁধে নৌকা আসছে সাগরযাত্রীদের—তারই আলো।

ক্রমশঃ জলের ছল-ছল শব্দকে ছাপিয়ে ছপ-ছপ ছপ-ছপ একটানা একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ ওর কানে আসে।

ছপ-ছপ ছপ-ছপ—দাঁড়ে জলকাটার শব্দ। স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট হয় নৌকার আলোগুলো। আরো স্পষ্ট শোনা যায় দাঁড়ে জল কাটার শব্দ। একটানা জলকল্লোলের সঙ্গে জলকাটার সেই শব্দটা যেন মিশে যাচ্ছে।

কি করবে রোজারিও, হামলা দিয়ে পড়বে কি ঐ নৌকাগুলোর উপর? তীর্থযাত্রীদের নৌকা হলেও একেবারে নিরস্ত্র নয় ওরা। রোজারিওদের ভয়েই ওরা এই ধরণের তীর্থযাত্রার পথও একেবারে নিরস্ত্র অসহায়ভাবে পাড়ি দিতে সাহস পায় না।

লাঠি, সোটা, বল্লম, সড়কী তো থাকেই সঙ্গে, দু-চারটে গাদা বন্দুকও যে থাকে না তাও নয়।

সে কারণে অবিশ্যি রোজারিওর কোন ভয় নেই। কারণ চের বেশী সশস্ত্র সে এবং সকলেই তার দলের প্রয়োজন হলে বন্দুক হাতে দাঁড়াতে পারে। একদল তীর্থযাত্রীর তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কথাটা তা নয়। যুদ্ধ সে চায় না। প্রাণহানিও করতে চায় না সে কারো আজ। সে কেবল চায় একটি বাচ্চা ছেলে তার ভায়লার জন্য।

ভায়লা ইদানীং যে ভাবে বাচ্চা বাচ্চা করে ক্ষেপে উঠেছে তার জন্য তো তার সেই কারণেই। আর সেও চায় আজ একটু বিশ্রাম।

হাঁ, দরিয়ায় দরিয়ায় নাও ভাসিয়ে ঘুরে ঘুরে, অনেক হামলা, অনেক যুদ্ধ করে করে ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আজ সত্যিই রোজারিও।

কবে কোন সেই কৈশোরকাল থেকে দরিয়ায় দরিয়ায় ভাসতে শুরু করেছে, ভাল করে বুঝি মনেও পড়ে না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ, লোনা পানী আর লোনা হাওয়ায় পুড়ে ঝলসে দেহটা তামাটে হয়ে গিয়েছে।

শুধু দরিয়ার পানী আর পানী। ডাঙ্গা-বন্দরের সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচয় তার। তবু আজ সেই ডাঙ্গাতেই ফিরে যেতে চায় রোজারিও।

সাতগাঁর এমোয়েল নদীর ধারে গীর্জাটার কাছাকাছি একটা বাড়ি তৈরী করেছে। একা মানুষটা, সংসারে তার কেউ নেই। ভায়লাকে সে আপন বিটির মতই স্নেহ করে, সে বার বার বলেছে রোজারিও আর ভায়লা সেখানে গিয়ে যদি থাকতে চায় তো তাদের ঘর দেবে।

ভায়লারও একান্ত ইচ্ছা এই দরিয়ায় ভেসে ভেসে আর না বেড়িয়ে সেখানে গিয়েই থাকে। রোজারিওকেও অনুরোধ জানিয়েছে অনেক বার। দরিয়ায় নয় এবারে মাটিতে ঘর বাঁধবার অনুরোধ।

কিন্তু দরিয়ার পানীয় এমনি নেশা যে বোম্বাবিওর পক্ষে সে নেশা কাটিয়ে ওঠা আদৌ সম্ভবপর হয় নি। মাটির মেয়ে ভায়লা, দরিয়ার মর্ম সে বুঝবে কেমন করে ?

মাথার উপরে ঐ খোলা আকাশ। দিগ-দিগন্ত বিস্তৃত শুধু জল আর জল। সেই জল কখনো শান্ত কখনো উদ্দাম উত্তাল আথালী পাথালী, কখনো শব্দহীন, কখনো গর্জনমুখর।

প্রখর সূর্যালোকে ঝিলিক হেনে চোখ ঝলসে দেয় দিনের বেলায় আবার রাত্রে চাঁদের আলোয় গা ঢেলে ঘুমায়।

কখনো অস্তগামী সূর্যালোকে লাল আবির গুলে দেয়, কখনো মেঘের ছায়ায় শ্যামলা হয়ে ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। ক্ষণে চেনা, ক্ষণে অচেনা। ক্ষণে ভয়ঙ্করী, ক্ষণে মনোহারিণী।

বোম্বাবিওর কাছে দরিয়া প্রাণ, সম্পদ, আশ্রয় আর আশ্বাস। মাটির মেয়ে ভায়লা এ দরিয়ার মর্ম বুঝবে কি করে ?

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হলো বোম্বাবিওর। ডি'ক্রুজ কখন এসে ইতিমধ্যে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, অন্যমনস্ক বোম্বাবিও টেরও পায় নি।

কাপ্তান !

কে, ডি'ক্রুজ—

ঐ দূরে জলের মধ্যে একটা কি দেখতো ? চাপা গলায় ডি'ক্রুজ বললে।

কোথায় ?

হুই। হুই যে। দেখায় ইউ সি—

ডি'ক্রুজের নির্দেশ মত এবারে বোম্বাবিও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করে চেয়ে দেখে। সত্যিই, ঐ দূরে কি যেন একটা জলের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে আসছে।

দেখছো কাপ্তান, কি ওটা ?

হুঁ, চল তো দেখি।

দুজনে তাড়াতাড়ি নৌকা থেকে ভাসমান ছোট বোটটা খুলে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে দাঁড় বেয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলে।

ওদিকে তখন তীর্থযাত্রিবাহী সার বাঁধা নৌকাগুলো ডাইনে বাঁক নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কিছুদূর বোট নিয়ে এগুতেই সহসা ওদের কানে ভেসে এলো একটা কচি শিশুর কান্না।

ওঁয়া—ওঁয়া—

অন্ধকার জলের ভিতর থেকে কান্নার শব্দটা ভেসে আসছে।

নদীবক্ষে শিশুকণ্ঠের কান্না শুনে সত্যিই চমকে উঠেছিল প্রথমটায় বোম্বাবিও। কেমন বুঝি মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। আপনা হতে হাতের দাঁড় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু একা বোম্বাবিওরই নয়, ডি'ক্রুজেরও হাতের দাঁড় বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা বুঝি মুহূর্তের জন্যই।

কারণ, পরক্ষণেই আবার শিশুকণ্ঠের সেই কান্না ওদের সচকিত করে তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে দাঁড় ফেলে কয়েকটা ক্ষিপ্র টানে একেবারে ভাসমান বস্তুটির সামনে গিয়ে পৌঁছায়।

স্তিমিত তারার আলোয় এবারে বোম্বাবিওর নজরে পড়ে পিঠের 'পরে একটা বাচ্চা শিশু নিয়ে কে একজন ব্যর্থ চেষ্টা করছে জলে ভেসে থাকবার। পিঠের বাচ্চাটাই কাঁদছে।

জলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্রহস্তে বাচ্চা সমেত মানুষটাকে ছোট ডিঙিটার উপর তুলে নিতেই আশ্চর্য হয়ে দেখলো বোম্বাবিও, এক নারী তার পিঠের সঙ্গে বছর দেড়েকের একটি শিশু শক্ত করে তারই পরিধেয় বস্ত্রের অংশ দিয়ে বাঁধা।

ডিঙিতে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নারীর জ্ঞান লুপ্ত হলো। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি সেই জ্ঞানহীনা নারীর দেহের বাঁধা থেকে ক্রন্দনরতা বাচ্চাটাকে মুক্ত করে বুকে তুলে নেয় বোম্বাবিও।

ইতিমধ্যে চারিদিকে নদীবক্ষে একটু একটু করে কুয়াশা নামতে শুরু করেছিল।

নৌকায় তুলে এনে কেবিনের পাটাতনে ডি'ক্রুজ শুইয়ে দিল স্ত্রীলোকটিকে। তখনো তার জ্ঞান ফেরেনি। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছিল।

গায়ের ভেজা জামাটা খুলে তাড়াতাড়ি একটা গরম চাদর দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে বুকের পরে তুলে নিতেই বাচ্চাটার কান্না থেমে যায়।

সমস্ত ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিত। বাচ্চাটা একটা ছেলে। সুন্দর মোমে গড়া যেন শিশুটি। কালো কষ্টিপাথরের মত দেহের বর্ণ, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

ঠিক ঐ সময় কেবিনের খোলা দরজাপথে এসে ভিতরে প্রবেশ করল ভায়লা, বোম্বাবিও।

এই যে ভায়লা আয়—এই দেখ কি এনেছি তোর জন্য—

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে নৌকায় শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনেই বোম্বাবিওর কেবিনে ছুটে এসেছিল ভায়লা।—একটা বাচ্চার কান্না যেন শুনলাম। ভায়লা বলে।

হাঁ হাঁ—বাচ্চা ছেলে। এই নে—

দুহাতে বাচ্চা ছেলেটাকে ভায়লার সামনে তুলে ধরলে বোম্বাবিও।

নৌকার আলোয় বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় যেন একেবারে বোবা হয়ে যায় ভায়লা। কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত বের হয় না।

তারপরই দুবাহু অধীর আবেগে প্রসারিত করে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কোথায়, কোথায় পেলি—আহা রে—দে, দে—

বোম্বাবিও বাচ্চা ছেলেটাকে ভায়লার প্রসারিত দু'হাতের 'পরে তুলে দিতেই ভায়লা বাচ্চাটাকে বুকের উপর চেপে ধরে।

বাচ্চাটা আর একবার কেঁদে ওঠে।

বুকের 'পরে ধরে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ভায়লা বাচ্চাটাকে।

কোথায় পেলি রে ?

দরিয়ায়।

এটা, এটা কিন্তু আমার—

তোরই তো।

কাউকে কিন্তু আর দেবো না।

দিস না।

না দেবো না। এ বাচ্চা আমার, আমারই—বলতে বলতে কেবিনের বাইরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই এতক্ষণে হঠাৎ পাটাতনের 'পরে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল ভায়লা।

স্ত্রীলোকটির জ্ঞান তখনো ফেরেনি।

সিক্তবস্ত্র, আলুলায়িতকুন্তলা, পাটাতনের 'পরে তখনো পড়ে আছে স্ত্রীলোকটি।

পূর্ণ যুবতী। যৌবনপুষ্ট দেহে সিক্ত শাড়ী লেপটে আছে, কিছুটা স্থানচ্যুতও হয়ে গিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভাদলা ফুলু ঠেঙা সেই জ্ঞানহীনা নারীর দেহের দিকে তাকিয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত কোন বাক্য সরে না তার মুখ থেকে।

তার পর এক সময় মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে ওকে।

যোজাফিও বলে, জানি না, দরিয়ায় ভেসে যাচ্ছিল তুলেছি। ওরই পিঠে বাচ্চাটা বাঁধা ছিল।

কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ভাদলা চেয়ে থাকে সেই ফুলু ঠেঙা নারীর দিকে। ঐ সময় বুকের মধ্যে বাচ্চা ছেলেটা আবার কেঁদে ওঠে।

[ক্রমশঃ।

অকল্যাণের প্রতীক পানাসক্তি

মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে অনেক সময় মানুষ মদ খায় না মদই মানুষকে খায়। পানাসক্ত ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে এই অভ্যাসের দাসত্ব করেন তখনই এই প্রবাদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

পানাসক্তি অনেক সার্থক সফল জীবনকেই ধ্বংস করেছে, নিয়ে গেছে সর্ব্বনাশের অতলে। সেইজন্যই মদ্যপান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিষপান করার সমতুল্য, একথা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই কু-অভ্যাসের কবলে পড়লে প্রায়শঃই মানুষ হারিয়ে ফেলে আত্মসংযম, ক্রমশঃই তলাতে তলাতে হয়ত একদিন তার চৈতন্য ফিরে আসে, যখন ফেরার পথ আর খুঁজে পায়না সে।

কোন মাতাল যখন জোরগলায় পানদোষ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করে তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা হয়ে যায় এই জন্যই যে কাজটি অত্যন্ত কঠিন। পানের তৃষ্ণা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে আপন সংকল্পে অবিচলিত থাকা সুরাপায়ীর পক্ষে প্রায়ই অসাধ্য হয়ে ওঠে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও তাই অনেক সময়ই পানাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে এই কু-অভ্যাসের কবলমুক্ত করতে পারেনা, নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে।

তবে কি উপায় আছে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার? স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে মনে। সুরাপানের সর্বনাশা মোহ থেকে পরিত্রাণের তবে উপায় কি নেই?

পানাসক্তি যাঁদের প্রবল তাঁদের পক্ষে একটি মাত্র পথ আছে যার দ্বারা তাঁরা নিজেকে আবার সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তা হল আত্মপ্রবঞ্চনা না করা। সরল ভাবে নিজেকে এই কু-অভ্যাসের দাসত্বকে মেনে নিয়ে কোন মাতাল যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তবে একদিন না একদিন তিনি সফল হবেনই। প্রথম প্রথম দু-একবার সংকল্পচ্যুতি ঘটলেও হতাশার কোন কারণ নেই। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শুভসংকল্পের দ্বারা এই সর্বনাশা প্রবৃত্তিকে ক্রমেই তিনি প্রশমিত করে আনতে পারবেনই। স্বজনস্নেহে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখ চেয়ে পানাভ্যাস বর্জ্জন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলে এমন একদিন আসবেই যেদিন অভিনত মদ্যপও সগর্বে বলতে পারবেন আজ আমি মুক্ত, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই আন্তরিক হওয়া চাই পানাসক্তির প্রভাব অত্যন্ত জোরালো কাজেই এর কবলমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাকেও কোন ফাঁকি থাকলে চলবে না, আর নিজের শক্তি দ্বারাই যে শুধু এই সর্ব্বনাশা প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব, এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মদ্যপের মুক্তি।

পাশ্চাত্য সভ্যতাশ্রয়ী আধুনিক সমাজে মদ্যপানের অভ্যাস ক্রমেই বহুলপ্রসারিত হয়ে উঠছে, প্রত্যেক সমাজসচেতন ব্যক্তিরই এর সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে, আশা করা যায় মানুষের শুভবুদ্ধি একদিন এই অকল্যাণকে সমূলে ধ্বংস করে সুস্থ সুন্দর সমাজ-জীবনকে রক্ষা করবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে।

২৮

রাতের অন্ধকারে একা-একা চলল পুণ্ডরীক। কেউ যেন তাকে না দেখে। দেখলেও যেন অনুমান করতে না পারে কোথায় চলেছে।

পরনে দীন বেশ, পায়ে ধুলো। বিলাস-মণ্ডন কিছু নেই।

নিমাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল পুণ্ডরীক। প্রণাম করবার আগেই পড়ল মূর্চ্ছিত হয়ে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে কাঁদতে লাগল। 'কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, আমার সর্বস্ব, তুমি সকল জগৎ উদ্ধার করলে, শুধু আমাকেই তুমি করলেনা। একমাত্র আমার প্রতিই তুমি বিমুখ। একমাত্র আমিই বঞ্চিত।'

ভক্তরা সকলে অবাক। এ কে? কার এই কাতরতা? চিত্তে কৃষ্ণপ্রীতির আবির্ভাব না হলে এমন চিত্তদ্রবতা হয় কী করে? চিত্তদ্রবতা না হলে রোমহর্ষ হয় কী করে? রোমহর্ষ না হলে কী করে প্রকাশ পায় অশ্রুকলা? আর অশ্রুকলা ছাড়া কী করে চিত্তশুদ্ধি সম্ভব?

ভক্তরাও কাঁদতে বসল।

আর, এ কী অদ্ভুত, যাকে আগে কখনো চোখে দেখেনি তাকেই নিমাই বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'পুণ্ডরীক, বাবা, তোকে আজ দেখলাম স্বচক্ষে। আমার তপ্ত হৃদয় তুই শীতল করলি, শীতল করলি চোখের পিপাসা।'

এ কে আপন জন, বুকে নিয়ে আর ছাড়তে চায় না নিমাই।

মহানন্দে কীর্তন আরম্ভ হল।

নিমাই বললে, 'এর নাম পুণ্ডরীক, উপাধি বিদ্যানিধি। কিন্তু প্রেম ছাড়া আর বিদ্যা কী। তাই আজ থেকে ওর পদবী হল প্রেমনিধি।'

স্পর্শ থেকে যখন সে মুক্ত হল তখনই সে প্রণাম করল নিমাইকে।

'চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।' অনেক জন্মাজত পাপ তুমি হরণ করো যেমন সুসমৃদ্ধ প্রজ্বলিত আগুন কাষ্ঠস্তূপকে দগ্ধ করে ভস্ম করে নিঃশেষে। যা থেকে মনে ভয় আসে তাই অমঙ্গল—সেই অমঙ্গলও তুমি হরণ করো। ভয় আসে কোত্থেকে? দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ থেকে। দ্বিতীয় বস্তু কী? আগে প্রথম বস্তুর খোঁজ নাও। তুমিই প্রথম বস্তু। দ্বিতীয় বস্তু অহং, দেহসুখ। তুমি সেই দেহাভিনিবেশ হরণ করো। কিন্তু তুমি কি চুরি করে পালিয়ে যাও? না, তুমি ধরা পড়ো, ধরা দাও। হরণ করেছ, পরে সেই শূন্যতা পূরণ করো। তুমি নিজেই সেই কারাগৃহের শূন্যতায় বন্দী হয়ে থাকো।

গদাধর বললে নিমাইকে, 'ওঁর নগম্য ব্যবহার বুঝতে পারিনি। মনে এসেছিল অবজ্ঞা। এখন অনুমতি করুন, আমি ওঁর কাছে দীক্ষা নেব।'

সানন্দে অনুমতি দিল নিমাই। গদাধরের গুরু হল পুণ্ডরীক।

নিমাইয়ের দুই ভাব। 'কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু পরকাশ। কখন রোদন করে বোলে মুঞি দাস।' কখনো হুঙ্কার কখনো আর্তি। কখনো বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসে, কখনো আবার ধুলায় গড়াগড়ি দেয়। কখনো ঘোষণা করে, আমিই সেই, কখনো আবার ভক্তদের গলা ধরে বলে, কিসে আমার কৃষ্ণে মতি হবে বলে দাও দয়া করে। কখনো অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দেয়, নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করে, আবার কখনো দন্তে তৃণ ধরে দাস্যযোগ মেগে বেড়ায়। কখনো নিত্যানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পা তুলে দিয়ে সকলের থেকে প্রণাম নেয়, আবার কখনো 'আমাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে চলো।' বলে এমন কান্না কাঁদে, যে যে দেখে সেই আবার কাঁদতে বসে সুর মিলিয়ে।

ভগবানের ভাব যখন ধরে তখন তা এক প্রহরের বেশি স্থায়ী হয় না, কিন্তু সেদিন শ্রীবাসের বাড়িতে নিমাই সাত প্রহরিয়া ভাব ধরল। আর-আর দিন দাস্যভাবে নাচে, আর্তি নিয়ে কীর্তন করে, আজ একেবারে সজ্ঞানে, দ্বিধাহীন ক্ষিপ্রতায় বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসল। বললে, 'আমার অভিষেক করো।'

ভক্তরা গঙ্গাজল আনতে ছুটল। একশো আট ঘট ভরে উঠল দেখতে-দেখতে। আঙিনায় পিঁড়িতে বসিয়ে নিমাইকে স্নান করাতে লাগল সকলে।

শ্রীবাসের দাসীও এই স্নানসেবার সুযোগ নিয়েছে। সেও জল বয়ে আনছে ঘড়া করে কিন্তু তাতে শুধু গঙ্গাজলই নয়, মেশানো আছে কিছু নয়নের জল।

নামই তার দুঃখী।

নিমাই বললে, 'তোমার নাম বদলে গেল আজ থেকে। আজ থেকে তোমার নাম সুখী হয়ে গেল।'

দুঃখীর আনন্দ তখন কে দেখে!

স্নানান্তে নবীন বসনে-লেপনে শোভিত হয়ে নিমাই বসল আবার বিষ্ণুখট্টায়। নিত্যানন্দ ছত্র ধরল। যে যা পারল বিচিত্র উপচারে পূজা করতে লাগল। যার উপচার নেই সে দিল চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।

সাত প্রহর ধরে, প্রাতে এক প্রহর কাল থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ব্যক্ত থাকল নিমাই। এরই নাম মহাপ্রকাশ।

যে যা পরতে দিচ্ছে পরছে, খেতে দিচ্ছে খাচ্ছে, যেমনটি সাজতে বলছে সাজছে। ক্লান্তি নেই বিরক্তি নেই বিকৃতি নেই।

এ মহাপ্রকাশ। একে তো শুধু বাইরে দেখছি না, হৃদয়েও দেখছি।

'শ্রীবাস, মনে পড়ে দেবানন্দের বাড়ীতে সেই ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে?' বলতে লাগল নিমাই। 'শুনতে শুনতে তুমি কাঁদতে লাগলে বিহ্বল হয়ে, মাটাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে। তুমি কেন কাঁদছ, তোমার কিসের এ আবেশ, অবোধ পড়ুয়া কিছুই বুঝতে পারল না। বললে, এ লোকটা কাঁদছে কেন, হয়েছে কী? যেমন গুরু তেমনি তার শিষ্য, যেমন কথক তেমনি তার শ্রোতা। সবাই মিলে তোমাকে তারা বাড়ির বার করে দিল। আর দেবানন্দ বারণ করল না, বাধা দিল না'—

'তুমি—তুমি কী করে জানলে? তুমি তখন কোথায়?'

'শোনো। তুমি বাড়ীর বাইরে বসে বিরলে কাঁদতে লাগলে। তোমার আরেকবার ভাগবত শোনবার অভিলাষ হল। তোমার দুঃখ দেখে আমি তখন বৈকুণ্ঠ হতে চলে এলাম, বসলাম তোমার হৃদয়ে। হৃদয়ে বসে-বসে ভাগবত শোনালাম তোমাকে। তোমার সমস্ত দেহ-মন ভাগবত হয়ে উঠল।'

সব কথা মনে পড়ল শ্রীবাসের। নতুন করে কাঁদতে বসল।

অদ্বৈতকে বললে, 'মনে পড়ে একদিন তুমি গীতার একটি শ্লোকের সম্যক অর্থ বুঝতে পারছিলে না, সারাদিন উপবাস করেছিলে, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেই শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম?'

'কোন শ্লোকটি বলো তো?'

'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।'

অদ্বৈত স্তব করতে বসল।

ডাকল গঙ্গাধরকে। নিমাই বললে, 'তোমার মনে আছে রাজভয়ে সেই পালিয়ে যাচ্ছিলে রাত্রে, খেয়াঘাটে এসে দেখলে নৌকা নেই। রাজার লোক এসে ধরবে, পরিবারের মান-ইজ্জৎ থাকবে না, কাঁদতে লাগলে অঝোরে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে, আমি নৌকো নিয়ে হাজির হলাম। নৌকো দেখে তোমার আনন্দ আর ধরে না, কাতরে কেঁদে উঠলে, আমাকে শিগগির পার করো, আমি তোমাকে একজোড়া কাপড় ও এক টাকা বকশিস দেব। আমি তোমাকে পার করে দিলাম। কি, মনে আছে? তোমাকে পার করে দিয়ে চলে গেলাম বৈকুণ্ঠে। কেন পার করেছিলাম জানো? তুমি যে অসহায় হয়ে ডেকেছিলে আমাকে।'

গঙ্গাধর ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

'কই শ্রীধর কই?' হুঙ্কার করে উঠল নিমাই। 'তাকে ধরে নিয়ে এস।'

'কে শ্রীধর?'

'আমাকে যে নিত্যনিয়মিত কলাপাতা আর খোলা যোগায়। বহু একবার কথা দিয়েছিল তার আর খেলাপ করেনি। খোলাবেচা জ্ঞানে তাকে কেউ চিনল না এখনো।'

'কী করে শ্রীধর?'

'সর্বরাত্রি হরি বলে, বিনিদ্র কাটায়। প্রতিবেশী পাষণ্ডীরা তাকে সহ্য করতে পারেনা। বলে, শ্রীধরের ডাকে কানে তালা লাগে, ঘুমুতে পারি না। পেট ভরে খেতে পায় না, খিদের জালায় রাত জেগে চেঁচায়, পাষণ্ডীরা শ্রীধরের মুণ্ডপাত করে। কিন্তু

যাকে শ্রীধর প্রেমভাবে দীঘল আহ্বান করে সেই তাকে রক্ষা করে।'

শ্রীধরকে পাকড়াও করল ভক্তেরা। বিশ্বম্ভরের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'এস এস, আমাকে দেখ, বলো, আমাকে চিনতে পারো?'

এ কী, সেই উদ্ধতের শিরোমণি, চঞ্চল যুবক—মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শ্রীধর।

'তোমার খোলায় কত অন্ন খেয়েছি। কত জিনিস কেড়ে খেয়েছি তোমার হাত থেকে। কি, মনে পড়ে? চিনতে পেরেছ আমাকে?'

'কই আর পারলাম?' শ্রীধর মুক্তধারায় কাঁদতে লাগল। 'গঙ্গাপূজা করতাম আমি, তুমি বললে, যার তুই পূজা করছিস আমিই তার বাপ। কই আর তা বিশ্বাস করলাম! কই আর তাই চিনলাম তোমাকে!'

'এবার তবে আমার রূপ দেখ।'

শ্রীধর দেখল গৌরাঙ্গের পা থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্ছে। দক্ষিণে বলরামকে নিয়ে বংশীহাতে দাঁড়িয়ে আছে তমালশ্যামল।

'লোকে তুলসী-চন্দন দিয়ে তোমার চরণ পায়। আমি কি পাব কলার খোলা দিয়ে?' বলতে বলতে মূর্চ্ছিত হল শ্রীধর।

'শ্রীধর, ওঠো, আমার স্তব করো।'

শ্রীধর উঠে স্তব করতে লাগল। সরস্বতী বসল তার রসনায়।

নিমাই বললে, 'শ্রীধর, বর চাও। তোমার দারিদ্র্য আমি দূর করব। দেব তোমাকে অষ্টসিদ্ধি।'

'প্রভু, আর কত ছলনা করবে?' গদগদ ভাষে বললে শ্রীধর। 'আমি'—

'না, তোমাকে চাইতে হবে বর। আমার দর্শন যে ব্যর্থ নয় তাই প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং প্রার্থনা করো।'

শ্রীধর বললে, 'যে প্রভুকে আমি খোলা পাতা দিয়েছি, যিনি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন, কলহ করেছেন, তিনিই অচঞ্চল হয়ে আমার হৃদয়ে বসবাস করুন।'

গৌরাঙ্গ বললে, 'শুধু তা কেন? অষ্টসিদ্ধি না নাও আমি তোমাকে এক রাজ্যের রাজা করে দেব।'

'রাজত্ব দিয়ে আমি কী করব? কী করব আমি প্রভুত্ব দিয়ে? আমি রাজত্ব-প্রভুত্ব চাই না। শুধু এই করো যেন সুখে দুঃখে আমি তোমার নাম করতে পারি। নামে-যশে বেশে-বাসে আমার কী হবে? তাতে অহঙ্কার ছাড়া আর পাব কী? শুধু তোমাকে ভালোবাসতে দাও প্রাণ ভরে।'

'তোমার মত বৈষ্ণব আর কে আছে?' বললে নিমাই, 'তাই বেদগোপ্য ভক্তিই তোমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, আমাতেই তোমার প্রেম হোক। কে বলে তুমি দরিদ্র, কে বলে তুমি নগণ্যের একজন!'

অশ্রুতে ভাসতে লাগল শ্রীধর।

কলামূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিল তাহা॥

বৈষ্ণব আচার কী? সতত শ্রীকৃষ্ণস্মরণই সার আচার। স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। যে আচারে হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি ফুটে থাকে, ভক্তি স্ফূর্তি পায়, তাই বৈষ্ণবের সদাচার। আর যে আচারে কৃষ্ণস্মৃতি ঢাকা পড়ে, ভক্তি মুখ লুকোয়, কৃষ্ণবিস্মৃতিই ঘনীভূত হয় তাই বৈষ্ণবের অসদাচার।

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনে-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল, কৃষ্ণস্মরণের প্রধান সহায়। শেষ পর্যন্ত শঙ্করাচার্যও বললেন, 'ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।' ক্ষণার্ধের সৎসঙ্গও জীবের পক্ষে সৌভাগ্য, সর্বাভীষ্টপ্রদ। 'সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।' সাধু কে? সৎ কে? ভগবৎ-ভক্তই সাধু, ভগবৎ-ভক্তই সৎ, মহৎ। যে সর্বত্র সমদর্শী, সমচিত্ত, যে প্রশান্ত অর্থাৎ যে ভগবানে স্থিত, যে অক্রোধ, যে শোভন-হৃদয়, যে পরদোষ গ্রহণ করে না, যে ঈশ্বরে প্রীতিমান এবং সেই প্রীতিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সংসারে থেকেও যে সংসারে অনাসক্ত, ভগবৎ-ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের দরকার

তার অতিরিক্তে যার স্পৃহা নেই, সেই সাধু। কৃষ্ণপ্রেম পাবার প্রধান সাধনও এই সাধুসঙ্গ। আর এই বৈষ্ণবাচার।

খোলাবেচা শ্রীধর—তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি॥

এবার ডাক পড়ল মুরারির।

'মুরারি, তুমি অধ্যাত্মচর্চা ছেড়ে দাও।' বললে গৌরাঙ্গ।

'কেন, অধ্যাত্মচর্চা কি ভালো নয়?'

'ভালো কি মন্দ তা আমি বলছি না। কিন্তু অধ্যাত্মচর্চা করতে গেলে আমাকে হারাবে, আমাকে পাবে না। আমি অধ্যাত্মচর্চার ফল নই।'

জ্ঞানমার্গে নৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ। চর্মচক্ষে যখন আমরা সূর্যের দিকে তাকাই তখন কী দেখি? দেখি নির্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ। সূর্যের হাত পা মুখ চোখ আছে, এ আমাদের অনুভব হয় না। যেমন কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে রয়েছে এক দীপ। দূর থেকে যদি তাকাই তবে শুধু এক আভা দেখি, দীপ্তি দেখি, না দেখি শিখা, না বা দীপাধার, না বা ঘেরাটোপ। যদি নিকটে আসি তখন শিখা ও আধার ও আবরণ সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি দীপের সলতে পর্যন্ত দেখি, দেখি বা সলতের মুখের পোড়া দাগ। যে জ্ঞানমার্গের উপাসক সে শুধু ঐ আভাটাই দেখে—দেখে অদ্বয়তত্ত্বের নির্বিশেষ স্বরূপ, কিন্তু যে ভক্তিমার্গের উপাসক সে স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখে। শুধু কৃষ্ণের কান্তি নয়, দ্যুতি নয়, দেখে কৃষ্ণের পা দুখানি।

'তুমি তো রামের হনুমান, তোমার আবার অধ্যাত্মচর্চা কী!' বললে নিমাই।

'আর তুমি যদি সেই হনুমান আমিই সেই রাঘবেন্দ্র। আমাকে দেখ।'

মুরারি তাকাল। দেখল বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই বসে নেই, বসে আছে শ্রীরামচন্দ্র। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে আছে।

শ্রীধর দেখল কৃষ্ণ, মুরারি দেখল রাম।

মুরারি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মুরারির পদবী গুপ্ত। সে সার্থকনামা। মুরারিকে সে হৃদয়ে গুপ্ত করে রেখেছে।

'হরিদাস কোথায়! হরিদাস কোথায়!' ব্যাকুল হয়ে উঠল নিমাই।

'হরিদাস বাড়ির বাইরে বসে আছে।' ভক্তদের কে বললে।

নিজেই নিমাই ডাক দিল হরিদাসকে। 'হরিদাস, আমাকে দর্শন করো।'

'তোমাকে দেখতে আমার অধিকার কী!' বাইরে থেকে বললে হরিদাস। 'আমি দীনহীন কাঙাল, আমি কি তোমার কৃপার যোগ্য? তবু তুমি যতই আমাকে কৃপা করছ আমি ততই বুঝছি আমি কত অধম, কত অকিঞ্চন।'

'হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় ব্যথা পাই। তুমি এস আমার সামনে। আমি তোমাকে দেখি।'

হরিদাসকে ধরে সকলে নিয়ে গেল নিমাইয়ের কাছে।

'যখন তোমাকে ওরা নির্দয়ের মত মারছিল আমি চক্র হাতে নেমে এসেছিলাম বৈকুণ্ঠ থেকে।' বললে নিমাই। 'কিন্তু দুরাত্মাদের কী করে মারি, তুমি যে মনে মনে শুধু ওদেরই কুশল চিন্তা করছিলে, ওদের মঙ্গলের জন্যেই বারে বারে ডাকছিলে আমাকে। আমি যদি পাপিষ্ঠদের সংহার করতাম তবে কি তোমার এই মহত্ত্ব জগৎ জানতে পারত? বুঝত কি ভক্তের মহিমা? আমি কী করলাম? আমি তোমাকে বুকে করে রইলাম। যেমন ছিলাম প্রহ্লাদকে বুকে করে। তোমাকে কোনো ব্যথা বুঝতে দিলাম না। সমস্ত প্রহার নিজে নিলাম গা পেতে, সর্বাঙ্গে তার চিহ্ন লেগে আছে।'

হরিদাস মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥

'হরিদাস, ওঠ।' ডাকল বিশ্বম্ভর। 'মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ।'

কোথায় কী দেখবে, হরিদাস মহাবেশে অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগল। 'কই, কই, আমি তোমাকে পারলাম স্মরণ করতে? আমি দীনাতিদীন স্মরণবিহীন। তোমাকে স্মরণ করতে জানত দ্রৌপদী, জানত প্রহ্লাদ, একবারের মত জেনেছিল অজামিল। বিবসন করতে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে টেনে নিয়ে এল দুঃশাসন। দ্রৌপদী স্মরণ করল তোমাকে, আর তুমি তার বস্ত্রে

প্রবেশ করলে। তার স্মরণ প্রভাবে তার বস্ত্র অনন্ত হয়ে উঠল।

'হরিদাস, বর প্রার্থনা করো।'

'প্রভু, যদি এই অকিঞ্চনকে আরো কৃপা করবে তবে আমাকে আরো দীন করো। যেন অভিমানের ছায়াটুকুও হৃদয়ে না পড়ে। আর যারা তোমার ভক্ত আমি যেন তাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে ধন্য হই।'

তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে॥

নিমাই বললে, 'আর্তি বিনা প্রেমধন মেলে না। তোমার মিলল সেই প্রেমধন। হরিদাস, তোমার যত ভক্ত নিয়েই আমার ঠাকুরালি। নিরন্তর আমি তোমার দেহে-মনে বাস করছি, তোমাকে যে শ্রদ্ধা করে, জানবে সে আমারই প্রতি ভক্তিমান।' সমবেত ভক্তদের এবার লক্ষ্য করল। বললে, 'যার যা ইচ্ছা বর নাও।'

যার যা ইচ্ছা তাই যাচ্ঞা করতে লাগল। যার যেখানে রতি যাইল তারই বর্ধনা। আর ভক্তবাক্য সত্যকারী বিশ্বম্ভরের মুখে এক কথা—তথাস্তু।

বাইরে পিঁড়ায় বসে মুকুন্দ কাঁদছে। ভক্তিধর্ম মানত না, তাই নিমাই তাকে দর্শন দিচ্ছে না। প্রভু যে তাকে দণ্ড দিয়েছে এই তো তার প্রিয়তা, তাতেই সে চরিতার্থ। কিন্তু কোটি জন্ম পরেও কি তার দর্শন পাব না? হ্যাঁ, কোটি জন্ম পরে পাবে। তাতেই মুকুন্দ সিদ্ধকাম। অন্তত কোটি জন্ম পরে তো পাব।

আর নিমাইয়ের কৃপাকটাক্ষে এক পলকেই কেটে গেল কোটি জন্ম।

অদ্বৈত বললে, 'প্রভু, সর্বোত্তম, তোমার এই ঐশ্বর্যরূপ আমরা সহ্য করতে পারছি না, তুমি আবার সেই মনোরম নররূপ ধারণ করো।'

'বেশ, আমি তবে চলে যাচ্ছি।'

নিমাইয়ের দেহ খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সে মূর্চ্ছা আর কাটে না। নাকে নিশ্বাস নেই, নাড়িতে স্পন্দন নেই, সর্ব অঙ্গ অসাড়। তবে কি নিমাই সত্যি সত্যি চলে গেল?

সমস্ত রাত কাটল, প্রভাত হল, তবু নিমাইয়ের চেতন নেই।

তবে কি এবার শচীমাকে খবর দিতে হয়?

প্রখর জ্যৈষ্ঠ মাস, দু প্রহর বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হল, তবু নিমাই নিষ্প্রাণের মত পড়ে আছে। আর কী, ভক্তরা বললে, এবার তবে কীর্তন আরম্ভ করি।

কীর্তন সুরু হল। ক্রমে ক্রমে আনন্দকল্লোল।

কীর্তনের গুণে নিমাই স্পন্দিত, পুলকিত হয়ে উঠল। তার ধূলিধূসর দেহে জাগল স্বভাবলাবণ্য। চোখ মেলল নিমাই। কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'এ কী? এত বেলা হয়ে গিয়েছে? তোমরাও সবাই বসে আছ চুপ করে!'

'আর ফাঁকি চলবে না।' বললে শ্রীবাস। 'এবার সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলেছি।'

'ফাঁকি? কিসের ফাঁকি?' নিমাই সরলমুখে তাকিয়ে রইল।

'বা, তুমি কাল থেকে অচেতন হয়ে পড়ে আছ। তাই তোমাকে ঘিরে বসে আছি আমরা।'

'ছি ছি, আমার জন্যে তোমাদের কত কষ্ট হল বলো তো? কত তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হল।' নিমাই অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'থাক ও-সব। চলো স্নান করে খাইগে এখন।'

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

[ক্রমশঃ।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোনারকের মন্দিরগাত্রের একটি মূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্রটি শ্রীপি, ছি, দাস কর্তৃক গৃহীত।

বিজ্ঞানভিক্ষু

এগারো

ছুটির নিমন্ত্রণ

"Free yourselves from the spirit of the school, you will then be capable of doing something on your own."

—*August Kekule'*

সভার শেষে শংকর অনুভব করে যে একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে দেহ-মন তার ভেঙে আসছে। আজ শিকদারের হয়েছে পরাজয় কিন্তু তবুও তার মন ভরে উঠছে না কেন?

নির্জন 'হল' ঘরের টেবিলের ওপর দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে সে পড়ে থাকে।

দূর থেকে সুমিত্রার নজরে পড়ে শংকরের ভাবান্তর। নিঃশব্দে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথার ওপর ধীরে ধীরে হাতটা রাখে।

শংকর মুখ তোলে—সহস্র রাত্রি জাগরণের কালিমা তার চোখে-মুখে।

শংকাভরা কণ্ঠে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, "কী শংকর, অসুখ করলো না কি?"

শংকর একটু লজ্জা পায়, "না না, সে রকম কিছু নয়, সুমিত্রা—কেবল একটু যেন ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।"

শাসনের সুরে সুমিত্রা বলে, "লক্ষ্য করছি গত কয়েক রাত ধরে শেষ প্রহর অবধি আলো জ্বলে তোমার ঘরে। শরীরের এতো অবহেলা কর কেন, আমায় বলতে পার?"

শংকর হেসে বলে, "তাহলে, শরীরের অবহেলা করার জন্য একা আমায় দোষ দাও কেন? তোমারও নিশ্চয়ই রাত্রে ঘুম হয় না, তা নইলে আমার ঘরের আলো দেখলে কী করে?"

সুমিত্রা একটু অপ্রতিভ হয়, "বা, তা কেন? মাঝে মাঝে কি রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে পারে না?"

শংকর বলে, "ঘুম ভাঙবেই বা কেন? তোমার তো আমার মতো কোনো দুশ্চিন্তার বালাই নেই হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে।"

সুমিত্রা বলে, "তা আবার নেই? মাঝে মাঝে মনে একটা ব্যর্থতাবোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, তোমাদের প্রজেক্টে আমার দ্বারা কোনো সাহায্যই হচ্ছে না। আর তা ছাড়া অন্য অনেক ভাবনাও তো আছে।"

শংকর এবার সুমিত্রাকে কাবু করেছে, কৌতূহলী প্রশ্ন তার, "কী ভাবনা?"

সুমিত্রা জড়তার ভাবটা চট করে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

"এই যে বললাম—তোমাদের কোনো কাজেই লাগলাম না, এ সম্বন্ধে একটা আত্মগ্লানির বোঝা তো আছে। আর তা ছাড়া—"

শংকর বলে—"আর তা ছাড়া—?"

সুমিত্রা পাল্টা আক্রমণ সুরু করে এবার—"আর তা ছাড়া সে কথা তোমাকে জানিয়েই বা লাভ কী? ইদানীং প্রায় সবসময়েই দেখি তুমি তপস্যায় রত। এই শংকর যাদের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। দূর থেকেই বোঝা যায়, এখানে ছলাকলা চলবে না—আমার অপটুতার জন্য পাওয়া যাবে না বিন্দুমাত্র সহানুভূতি।"

শংকর আহত হয়, অনেক পাল্টা অভিযোগ আরও—"বা রে, আমি তো দেখতে পাই ঠিক তার উল্টোটা। গত এক মাস ধরে দেখা তোমার যখনই পাওয়া যায় হয় হবিবুল্লার গ্রন্থাগারে বই-এর তাড়া নিয়ে অবিরাম ছুটোছুটি করছ—না হয় তোমার কলমটা কামড়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তোমার এই মুদ্রাদোষ আছে তা জানো?"

সুমিত্রা বলে, "মাঝে মাঝে কাজ তো করতে হবে, কাজ না করলে কাজের ভাণও তো করতে হবে, না হলে বড়োকর্তারা অসন্তুষ্ট হবেন যে। আর মুদ্রাদোষের কথাটা যে বললে—তুমি মনে কর যে মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের বাইরে?"

সুমিত্রাকে এবার একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে শংকর।

"মনে আছে সুমিত্রা—আমেরিকার ফুটবল খেলার কথা? প্রত্যেক স্কুল-কলেজের টীমের একজন করে সুন্দরী 'চীয়ার-লীডার' থাকে—দলকে উৎসাহিত করবার জন্য। তুমিই তো আমাদের চীয়ার লীডার—এটা তো বড়ো কম কাজের কথা নয়। বলতে গেলে একমাত্র তুমিই তো দলটিকে সংঘবদ্ধ করে রেখেছ, উৎসাহ দিয়ে-নীরবে আমাদের আবদার সহ্য করে!"

আগের প্রসংগ কিন্তু শংকর ছেড়ে দিতে চায় না-বলে "কিন্তু কই, আর কী কী ভাবনা আছে তোমার বললে না তো?"

সুমিত্রা হেসে বলে, "সব ভাবনার কথা তোমায় বলতে যাবো কেন? ধরে নাও কী ভাবে আমের চাট্‌নী বাঁধতে হয় তাই নিয়ে

বড্ডো মেয়েলী ভাবনা! যাই হোক। রাত হয়ে গেল, এখন লক্ষ্মীছেলের মতো ঘুমোতে যাও।"

শংকর অনুরোধ করে, "চলো না—একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাক। দেখেছ আকাশে আজ কেমন চাঁদের আলো?"

সুমিত্রা আপত্তি করে "এই শীতের মধ্যে? তোমার কী মাথা খারাপ হোলো না কি? আর তা ছাড়া তোমার সংগে এখন চাঁদের আলোতে বেরোলে অ্যান্টিগ্রাভিটির আলোচনা বন্ধ হয়ে আমাদের অভিসারের আলোচনা সুরু হবে তোমাদের নৈশ আড্ডায়!"

শংকর আব্দার করে, "তাহলে না হয় বারান্দায় গিয়ে বসা যাক কিছুক্ষণ? তোমার সংগে দেখাই হয় না আজকাল। এক কাপ কফি খাওয়াবো কিন্তু।"

হাতঘড়িতে সময় দেখে সুমিত্রা বলে, "না রাত্রি পৌনে এগারোটায় সময় কফি খাওয়া তোমার বন্ধ করতে হবে। এক কাপ গরম দুধের যোগাড় যদি করতে পার, তবে না হয় মিনিট পনের বাইরে বসা যেতে পারে। কিন্তু ঐ পনের মিনিটে তোমাকে কথা দিতে হবে কিন্তু যে তারপরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে তুমি।"

শংকর বলে, "দেখা যাক চেষ্টা করে—হোস্টেল থেকে গরম দুধ মেলে কিনা।"

দুধের পেয়ালা নিঃশেষ করে সুমিত্রা বলে, "ভালো কথা, শংকর, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

শংকরের মুখ ম্লান হয়ে যায়, "সুমিত্রা, আজ তর্কে আমার জয় হয়েছে বটে কিন্তু সেটা যুক্তি দিয়ে নয় কতকটা গায়ের জোরেই। তাই এ জয়ের কোনো আনন্দ নেই। কারণ, এ কথাটা তুমিও জানো আর আমিও জানি—যে শিকদারের যদি এতোটুকু জনপ্রিয়তা অবশিষ্ট থাকত তাহলে এ জয় আমার হোতো না। যদি তাঁর ইকোয়েশনের বদলে পাল্টা কতকগুলো ইকোয়েশন খাড়া করে তুলতে পারতাম যাতে প্রমাণ হয় অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব!"

"সুমিত্রা ভদ্রলোক বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়—সব দিক থেকেই আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধানীয়। কিন্তু যখন দেখলাম পরশুরামের কুঠার উদ্যত প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির উপরে, তখন একটি হৈ-চৈ করে তাঁকে থামিয়ে দিতে হোলো। প্রথম জাতীয় নির্বাচনের আগে যখন রাজনীতি নিয়ে মত্ত থাকতাম তখন আমাদের বিরোধীপক্ষের মীটিং ভাঙার দু-একটা কায়দা জানা ছিল। এটাও হচ্ছে কতকটা সেই জোর করে সভা ভাঙার মতো। কিন্তু অন্তরে রয়ে গেছে একটি অপরাধ বোধ—যেন একটা ভীষণ ছেলেমানুষী করে ফেলেছি।"

সুমিত্রা বলে, "কেন, অনর্থক মন খারাপ করো শংকর? একদিকে প্রজেক্টের অগ্রগতি—অন্যদিকে শিকদারের মতামত—এর মধ্যে একটা পথ তোমাকে বেছে নিতেই হবে। উপায় তো ছিল না শংকর! এই সংঘাত তো চিরকাল এড়াতে পারতে না।"

শংকর স্বীকার করে সুমিত্রার যুক্তি, "সে কথা ঠিকই—তর্কের লাঠালাঠি একদিন বেধে যেতোই।"

"কিন্তু সুমিত্রা, তুমি হয়তো সম্পূর্ণ জানোনা শিকদারের জীবন কাহিনী। দুর্ভাগা দেশে জন্ম, তাই নোবেল পুরস্কার ওঁর লাভ হল না। অতো বড়ো পণ্ডিত সারা দুনিয়াতে বেশী নেই। বিলেতে প্রফেসর ডিরাকের সংগে যখন দেখা করতে যাই তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাঃ শিকদারকে চেনো?" ডিরাকের মতে অতবড়ো প্রতিভাবান লোক জগতে দশজনের বেশী নেই। ডিরাক সেদিন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছিলেন, কী ভাবে শিকদার তাঁর এক থিয়োরির ভুল শুধরে দেন। শিকদারের ওপরে ছিল দেশবাসীর অনেক আশা। কিন্তু ভারতে ফিরে এসে সারাজীবন ভদ্রলোক কিছুই করলেন না—কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণ করেই কাটিয়ে দিলেন। এর জন্য কিন্তু দায়ী আমরাই—ভারতবাসী। শিকদারদের আমরা কোনো সুবিধা দিইনি সময় থাকতে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার। রাজনৈতিক নেতাদের দিয়েছি রাজার সম্মান, কিন্তু জ্ঞানগুরুদের করেছি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত অবহেলা।"

সুমিত্রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, "মনোবিজ্ঞানীর ক্ষমতা আর জ্ঞান কতোটুকু সে কথাটাই ভাবি! সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। শিকদারদের যদি সামান্য বদলে দেবার একটা সরল রাস্তা থাকতো তবে দুনিয়ার চেহারাটাই বদলে দেওয়া যেতো! হয়তো বা এই অক্ষমতার জন্য বিজ্ঞান-সমাজে মনোবিজ্ঞান আজও রইল অপাংক্তেয় হয়ে! এখনও আমরা মনের অন্ধ-গলিতে গলিতে মাথা খুঁড়ে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, শংকর, বড়ো রাজপথটা রয়ে গেছে অনেক দূরে!"

"কিন্তু কী যে হতে পারতো সে সম্বন্ধে দুঃখ করেই বা লাভ কী বলো!"

নীরবে দুজনের কাটে কিছুক্ষণ। সংপ্রকৃতির মধ্যে শংকর সুমিত্রা একটা মিলন-সেতু খুঁজে পায়। বাইরে থেকে ঝির-ঝির করে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়। সুমিত্রাই আবার নীরবতা ভংগ করে, "এই শংকর—"

শংকর বলে—"বলো।"

সুমিত্রা বলে, "চলো কাল শনিবার আছে, আগ্রা থেকে ঘুরে আসি। যাবে?"

শংকর উৎসাহিত হয়ে ওঠে "বেশ তো। চলো না।"

দুজনেই এবার পরম উৎসাহে আগ্রা ভ্রমণের জল্পনা-কল্পনায় নিমগ্ন হয়ে যায়। সুমিত্রার মাতুলের গাড়ীটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সুমিত্রার দুই বন্ধু অর্থাৎ বন্ধু আর বান্ধবী আগ্রাতে আছেন। এঁরা স্বামি-স্ত্রী-দুজনেই আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁদের কাছ থেকে জোর তাগাদা আসছে একবার ওদের কাছে ঘুরে আসবার জন্য।

শংকর একটু আপত্তি তোলে, "তোমার বন্ধুদের ওখানে দুজনে গিয়ে ভর করা কি উচিত হবে? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—আগ্রা হোটেলে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক অন্ততঃ আমার একটা জায়গার জন্য।'

সুমিত্রা বলে, "অচেনা বলে কুণ্ঠিত হচ্ছ বুঝি? আমার বান্ধবীর স্বামী তোমার কিন্তু একজন বড়ো ভক্ত। এ সি কার্লেকরের নামটা তোমার চেনা-পরিচিত, মনে হয় কি? আর ললিতাও তোমাকে চেনে—তবে সেটা পরোক্ষে।"
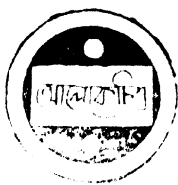
[illegible] —ডাঃ অমিতাভ রাহা
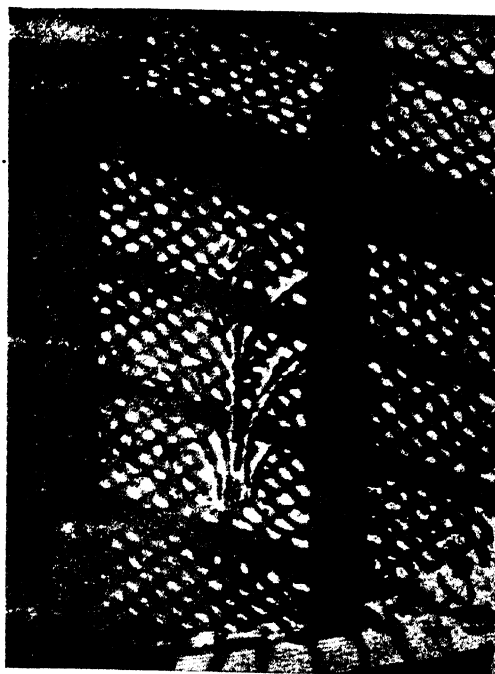
তাজমহলের শিল্প —তরুণ চট্টোপাধ্যায়

রাঁচি লেক —শ্রীতারাণী সিংহ রায়

॥ শিশু-মেলা ॥

কাকে চাইছেন ?

—পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

—প্রভাতকুমার বসু

কান্নাহাসির দোলা

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লজ্জাবতী

—সুকুমার রায়

বাঙলার গ্রাম

শংকর বলে, "ও কার্লে'কর? তা এতক্ষণ বলোনি কেন? ওর সংগে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান মাঝে মাঝে হয়। আমাদের প্রথম আলাপ হয় কোথায় জানো? নিউইয়র্কের 'ট্রিপ্‌ল-এ এসের' মীটিং-এ। আর তোমার বান্ধবীদের কাছে আমার বদনাম করে বেড়াও বুঝি?"

সুমিত্রা হেসে বলে, "তা একটু-আধটু করি—যে গুণের আকর তুমি!"

তারপর গম্ভীর ভাবে সুমিত্রা যোগ করে, "দেখেছ শংকর, হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর আবহাওয়াতে কী রকম একটা গুমোট ভাব? সত্যি, এ প্রজেক্টের বাইরে যে আমাদের একটা অস্তিত্ব আছে—সে কথা আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। বাইরের জগতটা রয়ে গেছে তেমনই রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে ভরা। সেখানে হবিবুল্লার যন্ত্রের নাম কেউই শোনেনি। জীবনযাত্রার স্রোত চলেছে আগেকার মতোই কখনো ঢিমেতেতালায় আর কখনো বা দ্রুত লয়ে। চলো, তাই দেখে আসা যাক—আমাদের বাদ দিয়ে জগতটা চলছে, না থেমে আছে!"

শংকর বলে, "কিন্তু বাইরে গেলেও যে হবিবুল্লার প্রেতাত্মা আমাদের পরিত্যাগ করবে এমন আশ্বাসটাই বা কোথায়?"

একটু ভেবে আবার বলে সে, "তবে একদিক থেকে তুমিই ঠিকই বলেছ সুমিত্রা—আমাদের প্রায় পুনর্জন্ম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জাতিস্মরের আবছায়া স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—জন্মান্তরে আমি ছিলাম শংকর রায় কোলকাতার 'ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স'-এর সহকারী অধ্যাপক। দিবারাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটতো নিতান্ত শারীরিক চাহিদা মেটাতে—আহারে ও নিদ্রায়। বাকী সময়টায় চলতো "কী ৬ থিয়োরি"-র চর্বিত চর্বণ। ছুটির দিনে মেসে পাশের ঘরের নিশাপতি কি রমেনদা'র সংগে নিরঙ্কুশ আড্ডা কখনো বা রাজনীতি, কখনো ফুটবল-ক্রিকেট, আবার কখনো বা মেয়েদের নিয়ে গল্প। সে শংকর রায়ের অস্তিত্ব ছিল অনেক সহজ—তোমার কথা মতো 'ছোটো সীমার' মধ্যে ছোটোখাটো খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। 'হবি'-র মধ্যে ছিল—জাতীয় সরকারের কেষ্ট-বিষ্টু স্থানীয় লোকেদের মুণ্ডপাত করা, সমসাময়িক ইংরেজি-বাংলা সাহিত্যের অবনতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করা, সময়ে সময়ে সংগীত ও কলার সমঝদারের 'পোজ' নেওয়া—আর চাকুরীজীবনে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান সতীর্থদের প্রাণভরে ঈর্ষা করা। জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল—প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে একরাশ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রকাশ করা।

"সেই সহজ সুখ-দুঃখের দিনগুলো আবার ফিরে পাওয়া যাবে?'

"আচ্ছা সুমিত্রা', পুরানো দিন ফিরে পাওয়ার জন্য এ ব্যর্থ কামনাই বা কেন?"

সুমিত্রা বলে, "পরিবর্তনের ওপরে আমাদের যে চিরন্তন ভয় তার জন্যই এই কামনা।

শংকর বলে, "কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, সুমিত্রা! পরিবর্তনে ভয় হবে কেন? পরিবর্তন না হলেই তো জীবন একঘেয়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।"

সুমিত্রা বলে, "সেটা কেবল আমাদের মুখের কথাই। পরিবর্তনটা তখনই কাম্য—যখন সেটা আবদ্ধ থাকছে চিরকালের চেনা-জানা পরিবেশের মধ্যে। আসলে কিন্তু বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তনে আমাদের নিদারুণ আতংক—অজানা পরিবেশ সম্বন্ধে একটা অশরীরী ভয় রয়ে গেছে আমাদের মনের অন্তস্তলে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো না কেন—দেশভ্রমণের কথাটা। আজ অবশ্য সবদেশের সমাজের নাগরিকতার মাপকাঠিটা প্রায় এক ধরণের হয়ে আসছে—তাই সবদেশের পরিবেশটা আমাদের অল্পবিস্তর জানা—সেই দেশভ্রমণে ভয় আমাদের জাগে না কিন্তু পঞ্চাশ একশো বছর আগেও বিদেশযাত্রাটা একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। আমার প্রপিতামহের ভালো চাকরী মিলেছিল ইরাণে। কিন্তু জানা পরিবেশটা ছেড়ে একেবারে অচেনা দেশে যেতে হবে বলে তিনি শেষ পর্যন্ত আর গেলেন না। তখনকার দিনে ইরাণ কেন, দিল্লী আগ্রা যাওয়াটাই ছিল একটা অসাধারণ ঘটনা। আমার সেই প্রপিতামহই আবার উত্তর-ভারত ঘুরে এসে একখানা ভ্রমণ-কাহিনী লিখে ফেললেন। ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, সে কাহিনীতে নাকি মহারাষ্ট্রের তখনকার শিক্ষিত সমাজে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আগেই বলেছি, এখন মানুষের গমনাগমন হয়ে এসেছে সহজ, বোম্বাই কোলকাতা দিল্লীর সমাজের কাঠামোটা প্রায় এক হয়ে এসেছে, তাই বোম্বাই ছেড়ে আমার দিল্লী আসাটা কারো মনে আলোড়ন তুলবে না। ভিখারাম দেশপাণ্ডের প্রপৌত্রী আজ যদি দিল্লী আগ্রার ভ্রমণ কাহিনী লেখে কেউই সে কাহিনী পড়বে না।

মূল কথাটা হচ্ছে, অচেনাকে আমরা মেপে নিতে চাই চেনার মাপকাঠি দিয়ে। যেখানে সে মাপকাঠিটা চলে না সে অচেনাকে প্রাণপণে পরিচয় করবার চেষ্টা করি। কতকটা এই জন্যেই বিদেশে গিয়েও সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুলি একটা ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ।

অন্য দেশের মানুষের রীতিও ওই একই রকমের শংকর! মার্কিণ সৈন্যের দল গত যুদ্ধের সময় ভারতে এসে গড়ে তুলেছিল কন্‌ভেন্ট টাউন, ওয়াশিংটন টাউন তাদের অস্থায়ী ছাউনীতে। সেখানে রাস্তার নাম ছিল 'ব্রডওয়ে,' 'মেন স্ট্রীট,' 'ফার্স্ট স্ট্রীট,' ব্যারাকের নাম ছিল "ভেরোনিকা লজ"—যেমনটি দেখা যায় ওদেশের যে কোনো সহরেই।

আজ মনে করলে হাসি আসে, আমেরিকা যাবার সময় জাহাজ যখন আলেকজান্দ্রিয়া ডক ছাড়লো—কেবিনে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেঁদেই কাটিয়েছিলাম। কতকটা সেটা পরিজন-বিচ্ছেদের দুঃখে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অজানার ভয়ে। আজ জগতটা দেখার পর সাহসটা বেড়েছে—বৃহত্তর পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় চলে যাবার আগ্রহের সংগেই। কিন্তু তোমাদের আবিষ্কার যদি সফল হয়, আর মংগল কি শুক্রগ্রহে যাবার জন্য আমার ডাক আসে—তবে ভয়েই মারা যাবো হয়তো!

আজ তোমরা পরিষ্কার করেছ চেনার মাপকাঠিটা। অচেনার রাজ্যে প্রবাসী মনটা এখনো কোনো অবলম্বন খুঁজে পায় নি। তাই বোধ হয় এই দুঃখবোধ—অতীতের গতানুগতিক শৃংখলা হারানোর জন্যে।

সুমিত্রার কথাগুলো শংকরের মনে আলোড়ন তোলে। সত্যিই তো! 'প্রাক্টিকেশন'-এর মতো থিয়োরি সবই তো বরবাদ করা

হোলো—সেই বিরাট ফাঁকগুলো ভরে তোলা যাবে কী দিয়ে? আবার কী খাড়া করা যাবে নূতন কোনো মতবাদ? কোথা থেকে মিলবে সে মতবাদের ভিত্ত?

তাছাড়া অ্যান্টিগ্রাভিটি'তে তার এ বিশ্বাসের কি কোনো সত্যিকারের কারণ আছে? শংকরের মনে পড়ে যায় বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মন্তব্য—

"A belief is true when there is a corresponding fact; and is false when there is no corresponding fact."

কিন্তু 'ফ্যাক্ট'গুলো কী রকমের? রবিবুদ্ধার যন্ত্র? মাধ্যমিকদের 'লেভিটেশন'-এর নজীর? বুজরুকী ছিল না কি তার মধ্যে? শিকদার কি সত্যই ভুল করেছেন?

না, এতোগুলো নজীর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। হঠাৎ শংকর বলে ওঠে, "সুমিত্রা, এখন আমাদের দরকার কী জানো? গ্রাভিটেশন সম্বন্ধে একটা আনকোরা নতুন থিয়োরি। যাতে অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব।"

সুমিত্রা বলে, "আচ্ছা শংকর, মহাকর্ষটা কী ধরণের শক্তি? গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান—বা পড়ন্ত আপেলের ঘটনা ছাড়াও সেটার আর কোনো ভাবে প্রকাশ করা যায় না কি?

শংকর ভেবে বলে, "না সুমিত্রা, মোটামুটি ওইটুকুতেই আমাদের জ্ঞান শেষ হয়েছে। গ্রাভিটি হচ্ছে আমাদের গণিতের একটা সম্বল। অসুবিধা হচ্ছে যে পরীক্ষাগারে গ্রাভিটি সৃষ্টি করার উপায়ও আমাদের খুবই সীমাবদ্ধ।

"প্রায় চল্লিশ বছর আগে ইওটোভস্ আইনষ্টাইনের গ্রাভিটেশন থিয়োরির সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য কতকগুলো পরীক্ষা করেছিলেন। তার পরে কেউই বিশেষ মাথা ঘামায় না ও সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে দু-একজন 'গ্রাভিটি' সম্বন্ধে দু-একটা থিয়োরির পত্তন করেন—কিন্তু এই পর্যন্তই।

মানুষের কাছে মহাকর্ষ কেমন জানো?—একটা অনুভূতি। তার কোনো বাস্তব সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত! যেমন ধরো হাওয়া—যখন তা বইছে তখনই তার অস্তিত্ব জানা যাচ্ছে।"

সুমিত্রা বলে—"কিন্তু হাওয়াকে তরল করলে তো দেখতে পাওয়া যায়।"

শংকর বলে,—"সে কথাটা ঠিক। আমার উপমাটা ঠিক হোলো না!, কথাটা একটু ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু এখনকার মতো সমস্যাটা কী জানো? নতুন আবিষ্কার মানুষে করে কী করে? আইডিয়া তার আসে কোথা থেকে?

"সভ্যতার প্রথম প্রভাতে গুহাবাসী মানুষকে কে বলে দিল, যে পাথরে পাথর ঠুকলে আগুন বেরোয়। তার পর চাকা আবিষ্কারের প্রেরণা এলো কোথা থেকে! এ সব কল্পনা কি বাইরে থেকে আসে, না অন্তর থেকে?"

সুমিত্রা বলে, "থামলে কেন শংকর বলে যাও না আরো।"

শংকর বলে, "তার পর, আইনষ্টাইন কী করে আবিষ্কার করলেন—'রিলেটিভিটি'র? আইনষ্টাইনকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন, শুনবে?

"You know it is not so astonishing after all that I found the principle of relativity. Usually people make up their minds about time and space in their early childhood. I, however, could not stop wondering about this problem and still pondered it as a grown man. Of course, as a mature person, I had a greater chance to gain a deeper insight into it."

"দেখ সুমিত্রা, তোমার আজকের কথাগুলোর সংগে কেমন চমৎকার ভাবে মিলে যায়। যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য হয়তো প্রয়োজন শিশুমনের বাধা-বন্ধনহীন কল্পনা!"

"সুমিত্রা, তোমার মনোবিজ্ঞান কী বলে এ সম্বন্ধে? বড়ো আবিষ্কার সম্ভব হয় কী করে?"

সুমিত্রা বলে, "মনোবিজ্ঞানের এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট মতামত নেই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত শংকর, কিন্তু আমার নিজস্ব একটা থিয়োরি আছে আবিষ্কারের মনস্তত্ত্বের ওপরে। তাই তোমাদের চিন্তার ধারাটার খবর রাখতে চেষ্টা করি—যেদিন তোমরা সফল হবে সেদিনই জানা যাবে আমার থিয়োরির কোনো কার্যকারিতা আছে কিনা।"

শংকর বলে, "আর যদি আমরা বিফলমনোরথ হই, তবে?"

ম্লান হেসে সুমিত্রা বলে, "তাহলে, তোমার সেদিনের 'রেডিও অ্যাক্টিভিটি'র থিয়োরির মতো, আমারটাকেও বানের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।"

শংকর বলে, "কিন্তু 'থিয়োরি'-টা কী?"

হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ে সুমিত্রার—আর্তনাদ করে ওঠে সে। "ও মা, দেখ, রাত বারোটা বাজতে চলল, আজ আর নয় শংকর। অন্য একদিন সুবিধা মত তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এখন আর একটি কথাও নয় সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল ভোরবেলাই যে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে—সে কথা খেয়াল আছে?"

একটা কথা শংকরের মনে পড়ে যায়, "একটা কথা বোধহয় ভেবে দেখোনি, সুমিত্রা! আমরা কোথাও বেরুলেই তো সংগে থাকে সিকিউরিটির লেজুড়। এখন আগ্রা যাচ্ছি শুনলে বোধহয় একজনের জায়গায় তিনজন এসে জুটবে। তোমার মামার ছোটো বাড়ীতে জায়গা হবে তো?"

শংকরের উৎসাহ যেন নিবে আসে।

সুমিত্রা বলে, "সে ভারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও না কেন?"

• • • •

সে রাত্রে শংকরের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হোলো না।

[ক্রমশঃ।

"You can't tell real pearls with false teeth."

—Zsa Zsa Gabor.

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন নাথ

‘প্রতিমা দেবী বিলাত গিয়াছেন। কবি স্থির করিলেন গ্রীষ্মকালটা নৌকোয় থাকিবেন চন্দননগরের কাছে।···’ রবীন্দ্রজীবনী। খণ্ড ২। পৃঃ ৪৬৪।

তখন গ্রীষ্মকাল। ১৩৪২ সাল। ‘বীথিকা’ রচনাকাল।

কবির মাসাধিককালীন অস্থানিক সংগী ছিলেন শ্রীমতী রাণী চন্দ, শ্রীঅনিলকুমার চন্দ এবং জনকয়েক ভৃত্য।

কবি এসেছিলেন শান্তি দূর করতে, শান্তি পেতে। তাঁর সংগী সংগিনীদের সে দিকে নজর ছিলো প্রখর। তবু মাঝে মাঝে বসতো সান্ধ্য আসর। একদিন তিন বন্ধু শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শহীদ সুহরাবর্দী এবং কবি সুধীন দত্ত বসেছিলেন সে আসরের ভাগ নিতে।

কবি অধিকাংশ সময় থাকতেন গৃহতরণী ‘পদ্মা’য়। আর, সংগী-সংগিনীরা থাকতেন চন্দননগরের রমাস্থান স্ট্রাণ্ড-এর প্রত্যন্ত দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত লাল রংগা বাড়িটায়। ‘পাতালবাড়ী’ ব’লে লোক জানে। কবির মনের একঘেঁয়েমি কাটতো পালটা-পালটি অবস্থানে!

আলস্য আনন্দ ফাঁকের সময়টা কবিতা রচনায় (‘বীথিকা’-অন্তর্গত ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতা ‘সঞ্চয়িতা’য় দ্রষ্টব্য) আর ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গত সুরেন ঠাকুর কৃত ‘চার অধ্যায়’ এর ইংরাজী অনুবাদ পরীক্ষায়।

এ প্রসংগে স্থানীয় তিনজনের জবানবন্দী কাহিনী আকারে পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনার্থ পরিবেশন করা যাচ্ছে।

১

গোন্দলপাড়া পল্লীর দুটি ছোট ইস্কুল-পড়া ছেলে কবিকে দেখতে গেছে। কবির কবিতার সাথে সবে তাদের পরিচয় হ’য়েছে। তাই বিরাট কৌতূহল তাদের মনে। কিন্তু কবি কেমন, কে জানে?

হালকা গেরুয়া সিল্কের জোব্বা পরণে। শুভ্র চপ্পল শোভে চরণে।

মুগ্ধ চোখে পলক পড়েনা ছেলে দুটির। এই রবি ঠাকুর!

কী দেখ্‌ছো, অমন অবাক হ’য়ে!

·· ·· ··

ওঃ! রবিঠাকুরকে দেখতে এসেছো? রবিঠাকুরের কবিতা পড়েছো?

হাঁ। উত্তর দেয় একটি ছেলে।*

বলো দেখি, শুনি।

আজ আমাদের ছুটী, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটী—

বাঃ! সুন্দর! শুন্‌বে, আমিও একটা জানি।—মনে করো মাকে নিয়ে বিদেশ ঘুরে যাচ্ছি অনেক দূরে··

মিষ্টি কণ্ঠে আবৃত্তি ক’রে শোনালেন কবি! ছেলে দুটি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো কবিতার একটি জ্যান্ত ছবি!

কবির তুলতুলে রাঙা পায়ের ওপরটায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করলে ছেলেরা।

কবি তাদের বিদায় দিয়ে বল্লেন: আবার এসো ছোট বন্ধুরা!

তখন চন্দননগর ফরাসীদের অধীনে একটি উপনিবেশ। সৌখীন জিনিষপত্রের বিরাট সমাবেশ। সিল্ক আর মদের অঢেল কারবার। খাও পরো বেপরোয়াভাবে, কেউ নেই বকার। তবে বাইরে নিয়ে যেতে মানা।

অমনি সীমান্ত পুলিশ দেবে হানা।

করো আইনকে ফাঁকি দেবার কায়দা! তবেই হ’বে ফায়দা!

বলো হরি! হরি বোল!—মড়া সাজাও। করো বিলাপ। ভেতরে নিষিদ্ধ জিনিষপত্র ঠেসে নাও। দেখবে সাফ্‌ধুন মাফ!

নীচের কাহিনীটা ঐরি পটভূমিকায় রচিত:

২

বনমালি! ব—ন—মা—লি!

এঁজ্ঞে কত্তা!

এঁজ্ঞে এঁজ্ঞে করলে হ’বেনা! এদিকে আয়!

কত্তা! হাতজোড় করে ব’লে বনমালী: কী আজ্ঞা, কও!

কাছে আয়। কানে কানে বলবো।—ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলেন কবি কী গোপন কথা!

কত্তা একটু জোরে কও। বয়সটা তো কম হ’লোনি। কানে একটু কম শুনতে লাগে।

তবে শোন্‌ হতভাগা! গগন ফাটিয়ে বলি—তুই আমার জন্যে মরতে পারবি?

এ ক্যামনতর আজ্ঞা বটে কত্তা?

সে কী রে!—পরিহাসতরল কণ্ঠে কবি বলেন—আমার জন্য এ সামান্য কাজটা করতে পারবিনে? তোকে করতেই হ’বে। মরতেই হ’বে তোকে!

এঁ—জ্ঞে—ক—ত্তা!

নাঃ! তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবেনা, দেখছি। তুই একটা আস্ত বোকা!

এঁজ্ঞে কথা ঠিক কয়েছ!—হাসি ছুটলো বনমালীর মুখে।

আরে! সত্যি সত্যিই কী তোকে মরতে বলেছিলেম। দেখছিলেম, তুই তোর কত্তাকে কতোখানি ভালোবাসিস্‌।

এঁজ্ঞে কত্তা। তোমার জন্যে জান কবুল!

এইতো দেখছি, বোল ফুটেছে মুখে; না রে না, তোকে মরতে হবে না। তোকে মরতে বলে কী আমি পাতক হবো! ফাঁসি কাঠে ঝুলবো!

না কত্তা, তোমার জন্যে আমি মরণকে আর ডরাই না!

বটে। তবে তোকে আর মরতে হ’বেনা আমার জন্যে।

শুধু মরার মতো খাটিয়াতে ঢাকা হোয়ে গড় পেরোতে হ’বে। ব্যস্‌!

(কর্তা: কবি। বনমালী: ভৃত্য) শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া) কথিত।

---

* কবি শ্রীহেমন্ত দে’র সৌজন্যে।

৩

আপনার মতো এতোবড়ো কবি হওয়া যায় কী ক'রে ?

আমায় বড়ো কবি বলো তোমরা। আমায় ভালোবাসো বলে।

আপনি শুধুই বড়ো নন্। অ—নে—ক বড়ো। আমাদের মতন মানুষের চেয়ে অনেক ওপরে। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই কিন্তু একটা বড়ো ভুল কথা বললে। আমি কবি। আমি সবাইকার জন্তেই তো লিখি। প্রবীণদের জন্তে যা' লিখি, তা যদি নবীনরা না বোঝে, সেটা আমার দোষ নয়। আমি সবাইকার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই আছি। থাকবো চিরকাল।

আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি কিন্তু !

তবে বলি শোনো। যার চু'রাবস্থায় সবে হাতে খড়ি হয়েছে, সে ছিঁচকে চোর। সে ধরা পড়ে যায়। বেদম প্রহারও খায়। আর যে পাকা, সে চোরের'পর বাটপাড়ি ক'রে তবে বড়ো হয়। আর যারা মানুষের মন প্রাণকে খোড়াই কেয়ার করে তা' হরণ করে, তারা জাত ডাকাত—নবাব-বাদশাহ, রাজা-মহারাজা! লোকে তাদের সেলাম ঠোকে। ভয়ে ভক্তি করে।

এই যে দেখছো আমার এতো বাক্স পেটরা। জানো কী আছে এতে ! শুধু বই আর বই আর বই। বড়ো বড়ো লোকের লেখা বই। আমি এগুলো পড়ি। এরাই আমার পারের কড়ি। এদের মধ্যে যে-ভাব যে-ভাষা তা' নিজের ভাবে নিজের ভাষায় চুবিয়ে নতুন রঙে ছাপিয়ে ছাড়ি। তখন লোকে বাহবা দেয়। বলে, আহা ! 'মরি মরি !'

আসল কথা কী জানো—চাই অধ্যয়ন। চাই অনুধ্যান। চাই বড়ো হওয়ার সাধন !

(প্রশ্নকর্তা : তেলিনীপাড়ার জমিদার শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরদাতা : কবি)

৪

কী হে, বলি, অতো কী ভাবছো, আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে ?

আজ্ঞে, না, কিছু ভাবছিনে।

কিছু ভাবছিনে বললেই আমি শুনবো, নিশ্চয়ই কিছু ভাবছো।

বিশ্বাস করুন, আমি কিছু ভাবছিনে।

তবে এতো গম্ভীর কেন বড়ো ?

এমনি। শুধু শুধু।

না, এমনি নয়। আমি জানি, কী ভাবছো তুমি বলবো ?

বলুন, শুনি।

ভাবছো, আমার পায়ে গোদ আছে।

গোদ ! সে কী ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাবছো, এই গরমেও আমি কালাজোব্বা পরে আছি, শুধু পায়ের গোদ ঢাকবার জন্তেই। ভাখো আমার পায়ে সত্যি সত্যিই গোদ নেই। দেখলে তো ? এবার তোমার একটা কাজ করতে হ'বে, সবাইকে বলে বেড়াতে হ'বে যে, আমার পায়ে গোদ নেই, কেমন ? রাজী তো ?—ব'লে কবি হালকা হাসিতে ফেটে পড়লেন !

([illegible])

৫

নাকের বদলে নরুণ পেয়ে তাক্-ডুমাডুম্ করার কাহিনী ছেলেবেলায় অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু একটা টেবিলবাতির বিনিময়ে কবিতা ! কেউ কখনো শুনেছেন ?

স্থানীয় জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার কবির ব্যবহারের জন্তে একটি টেবিলবাতি দিয়েছিলেন। ভারী সুন্দর ছিলো জিনিষটি। মূল্যের অংক দিয়ে তার মূল্যাংকন হয়না। কবি খুব খুশী। কিন্তু হ'লে হবে কি। একদিন আচম্কা সেটা গেলো ভেংগে। কবির খুশীতে ধরলো ফাটল।

বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের সাথে ক'দিনে কবি অন্তরংগতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিলেন। তবু টেবিলবাতিটি ভেংগে যাওয়ায় কবি সংকোচ বোধ করলেন। যে জিনিষটি গেলো, তা' তো আর ফিরে পাওয়া যাবেনা ঠিক তেমনটি ! এ-ভাবনায় কবির মন বেদনাহত হ'লো। তিনি তাঁদের বল্লেন : বলো, কি দিয়ে এর শোধ দিলে হয় ? সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন : ছিঃ ছিঃ এ কি কথা ! এমন কথা ব'লে আমাদের অপরাধী করবেন না !

: না না তা' বল্লে কী হয় ! একটা কিছু দিতেই হবে আমাকে। আর তোমাদেরও তা' নিতে হ'বে।

সবাই থ। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

কবি বল্লেন : একটা কবিতা যদি লিখে দি ? হ'বে শোধ ? সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। কবিতা ! তাও কবি নিজের হাতে লিখে দেবেন বলছেন। সবাইকার মনের খুশীর বাঁধ যেন ভেংগে পড়লো।

তখন সুধীরা দেবী * মুখ ফুটে বলে ফেললেন সে-সুযোগে : আমার ভাইঝির বিয়ে আসছে তেরোই আষাঢ়।

এ তো অতি শুভ সংবাদ। কবি জিজ্ঞেস করেন : কী নাম তার ?

শোভনা। **

কবি অমনি লিখে দিলেন এক শুভবাণী। †

হাটখোলা (চন্দননগর) নিবাসী জমিদার
শ্রীসত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে।

* শ্রীসত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পত্নী।

** উত্তরপাড়ার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-পরিবারের স্বর্গত অবনীনাথ-এর পৌত্রী এবং ১৪৮ ল্যান্সডাউন রোড কোলকাতা ২৫ নিবাসী শ্রী বরদালাল গাংগুলীর পত্নী।

† নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে
হৃদয় সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্নেহে ও ভক্তিতে
পুণ্যে ও সেবায় ; থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রতা।
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা
স্থলয়ে রোপিত হোলো ; দেবতার প্রসাদ বর্ষণ
নববর্ষা-ধারা সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ,
পূর্ণ হোক্ প্রেমরসে, মাধুর্য্যের ধরুক মঞ্জরী ;
চিরসুন্দরের দান, উঠুক সকল শাখা ভরি
বিশ্বের সেবার তরে সর্বকল্যাণময় ফল,
বিস্তার করুক শান্তি স্নিগ্ধ তার ছায়াচ্ছায়াতল।

১৫ আষাঢ়, ১৩৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

ব্যারিষ্টার ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কনভেন্ট রোডের বাড়ীটি দোতলা। নিজের উপার্জনের সৃষ্টি। পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে জীবন শুরু করেননি। তবে মস্তিষ্কটি যে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই মস্তিষ্কের জোরে উপার্জন করেছিলেন প্রচুর। তবু ঐশ্বর্য্যের প্রতি মোহ জন্মায়নি কেন কে জানে। যা কিছু বড়, ভারি আর বিরাট, তাতে তাঁর আতঙ্ক যেন। তাই খানক'য়েক ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী করিয়ে ভাড়া দিয়েছিলেন বটে, নিজের বসবাসের বাড়ীটি কিন্তু ছোট। ছোট হ'লেও অনেক পরিশ্রমে গড়া। বাড়ীর প্ল্যানটি অবধি ইন্দ্রনাথের নিজের। সাজিয়েছিলেনও অনেক সখে। সৌখীন সাজসজ্জায়।

বিয়ে করেননি, বাড়ীতে ইন্দ্রনাথ একা। দোতলা বাড়ীও তাঁর খালিই পড়ে থাকত, ঘরগুলো কোন কাজেই লাগত না। ইন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডী ছিল শোবার ঘর আর লাইব্রেরী-ঘরটিতে সীমাবদ্ধ অনেকদিনের সাধের লাইব্রেরী। সেই যখন ল' কলেজে পড়তেন, তখনই হোষ্টেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন নিজের একটি লাইব্রেরীর। বাস্তবে সেই পাঠাগার অনেক যত্নে সাজিয়েছিলেন, যদিও সেখানে আইনের চেয়ে সাহিত্য প্রাধান্য পেয়েছিল বেশী।

পরিচয়ের পরিধি ছিল বিশাল, কিন্তু অন্তরঙ্গতা ছিল একটি মানুষের সংগে। তিনি এটর্ণী অমরনাথ দত্ত। তাঁরই বাড়ীতে, তাঁরই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মাঝে ইন্দ্রনাথের অবসর সময় কাটত। বাড়ী সাজিয়ে নিজে দেখে যত না তৃপ্তি পেতেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেতেন অমরনাথদের দেখিয়ে।

অমরনাথ বলতেন, "সবই তো হ'ল। কিন্তু এবার একটি বিয়ে কর, নাহ'লে মানাবে কেন?"

ইন্দ্রনাথ সহাস্যে উত্তর দিতেন, "কি দরকার ভাই, বেশ তো আছি নির্ঝঞ্ঝাটে। তোমার মত জড়িয়ে পড়ে লাভ কি?"

কিন্তু জড়িয়ে পড়তে একদিন হ'ল। ইন্দ্রনাথের বোন সর্বাণীর বিয়ে হয়েছিল বারাসাতের এক পুরোণো জমিদার-বাড়ীতে। অত্যন্ত গোঁড়া পুরোণোপন্থী পরিবার। সর্বাণী বাপের বাড়ী আসতেই পেত না। বাবা-মা না থাকায় কেউ তাকে জোর করে আনেওনি কোনদিন। ইন্দ্রনাথ নিজের পসার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, বোনের জন্য চিন্তাও বিশেষ করেননি কোনদিন। অকস্মাৎ একদিন সর্বাণীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সম্বিত ফিরল। তারপর একদিন সর্বাণীর মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। ক্রমে তারই সংগে জড়িয়ে গেল ইন্দ্রনাথের নিস্তরঙ্গ জীবন। তা'ই হাসি কান্নায়, আনন্দ-বেদনায় জড়িত হয়ে গেল এ বাড়ীর প্রতিটি মুহূর্ত; মুখর হয়ে উঠল প্রতিটি ঘর-দালান।

একে একে অনেকগুলো বছর কেটে গেল, বড় হয়ে উঠল শর্মিষ্ঠা—ইন্দ্রনাথের ভাগ্নী। প্রাণ-প্রাচুর্য্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য আর বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বলে উঠল যেন। বয়সটা একটু বেশী হওয়ার সংগে সংগে ইন্দ্রনাথকে আরও বন্দী করে বাঁধল, আরও কাছে এল। সে ছিল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী, তাঁর কোর্টের দৈনন্দিন গল্পের উৎসাহী শ্রোতা, বেড়াতে যাওয়ার সংগী। গান গেয়ে, আবৃত্তি শুনিয়ে, ইন্দ্রনাথের মনটাকে মামলার চিন্তা থেকে জোর করে টেনে এনে বিশ্রাম দেওয়া তার নিত্যকার ডিউটি ছিল।

...তারপর একদিন দিনের রূপ বদলালো।...

হঠাৎ হার্টের এ্যাটাকে অকালেই চোখ বুঁজলেন ইন্দ্রনাথ।

শর্মিষ্ঠার চারদিকের দেওয়ালগুলো এক মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়ল যেন। বজ্রাহত দৃষ্টিতে ফাঁকা ঠেকল সবকিছু। বিরাট পৃথিবী শূন্য মনে হ'ল।

সেও আজ দু'বছরের ওপর হয়ে গেছে। সেই থেকে ইন্দ্রনাথের বাড়ীতে শর্মিষ্ঠা একা। ইন্দ্রনাথের উইল অনুযায়ী শর্মিষ্ঠাই তাঁর সম্পত্তির একমাত্র মালিক।...এই দু'বছরে জীবনের গতি আবার স্বাভাবিক হয়েছে। ইন্দ্রনাথহীন জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে শর্মিষ্ঠা। তারও একমাত্র আকর্ষণের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ অমরনাথের বাড়ী। তাঁর মেয়ে নন্দিতা ওর বন্ধু। নন্দিতা বি-এ পাশ করে আর পড়েনি। শর্মিষ্ঠা এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছিল তার এক বছর আগে। সিক্সথ্ ইয়ারের শেষাশেষি ওর এ্যালসেসিয়ান কুকুরটার সাংঘাতিক অসুখ করায় সেই যে পড়াশুনায় ইতি দিয়েছে, তারপর আর পড়েনি। তখন ইন্দ্রনাথ সবেমাত্র মারা গেছেন। অমরনাথ অনেক বলেছিলেন শেষ পরীক্ষাটা দিতে, কিছুতেই রাজী হয়নি।

হেসে বলেছে, "বুলোর অসুখটা অজুহাত মামা, পড়তে আর ইচ্ছে করছে না। এবার খুব ভাল করে রবীন্দ্রসংগীত শিখব।"

বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই গরমটা এবার খুব জাঁকিয়ে বসেছে।

বাইরে কাঠ-ফাটা চড়া রোদ। রাস্তার পিচ গলছে।

দুপুরে সকাল-সকাল স্নান-খাওয়া সেরে প্রতিদিনের মতই লাইব্রেরীতে ঢুকেছিল শর্মিষ্ঠা। জানলাগুলো বন্ধ, রোদের তাপ

নেই তাই। ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। পাখার তলায় বসে বই পড়তে পড়তে কখন যে বিকেল হয়ে এসেছে, টেরও পায়নি। একসময় পুরোনো চাকর ভুবন এসে ঘরে ঢুকল। বন্ধ জানলার একটা-দুটো খুলতেই এক ঝলক গরম বাতাস ছুটে এল। শর্মিষ্ঠা মুখ তুলে দীর্ঘচোখে তাকাল বাইরের দিকে।··রোদ পড়ে আসছে, বাতাসটা তবু এখনও গরম।··দুপুরের রোদে কোথায় লুকিয়ে ছিল পাখীর দল, এখন আবার বেরিয়েছে।··আকাশময় দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের আনাগোনা।··

বইটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ল।

ভাল লাগছে না। গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিক বেড়িয়ে এলে হ'ত। নন্দিতাকে নিয়ে এখন সে প্রায়ই যায়। আজ অবশ্য নন্দিতা বাড়ী থাকবে না বিকেলে।···পায়ের কাছে ঠাণ্ডা মেঝের আরামে শুয়ে এতক্ষণ গভীর ঘুমে ডুবেছিল বুনো। শর্মিষ্ঠা উঠতেই কান খাড়া করে উঠে বসল সোজা হয়ে।

শর্মিষ্ঠা সহাস্যে তাকাল তার দিকে, "চল্ বুনো, তোকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।···ভুবনদা, গঙ্গার ধারে বেড়াতে চললাম। নন্দা বাড়ী নেই, ফিরে যদি ফোন করে তো বলে দিও, আমি শ্যামবাজার ঘুরে আসব।"

বৈকালিক প্রসাধন সেরে বুনোকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবসময় যে নিজে চালায়, তা নয়। অমরনাথ থেকে ভুবন অবধি সকলেরই ভারি আপত্তি তার এই গাড়ী চালানোয়। অবশ্য তাতে কান দেবার পাত্রী সে নয়।

তাদের আশংকার উত্তরে হাই বেপরোয়া ভংগীতে হেসে বলে, "চারদিকে এক্সিডেণ্ট হচ্ছে বলে গাড়ী চালাতে পাব না? অভয়দা চালালে আর হবে না তো এক্সিডেণ্ট?"

কিন্তু অভয়পদ যখন মুখখানা করুণ করে বলে, "আপনি কেন চালাবেন দিদি, আমি তো রয়েছি।"—তখন ভারি সংকোচ হয় তাকে বিমুখ করে নিজে চালাতে।

আজ তবু ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরোল।

অভয়পদ বললে, "আমি কি আর কেউ সংগে যাব না দিদি?"

পাশের সিটে বুনো জানলা দিয়ে মুখ বার করে বসে আছে।

তাকে দেখিয়ে দিল শর্মিষ্ঠা। হেসে বলল, "এই তো রয়েছে বডি-গার্ড, আর কাউকে কি দরকার?"

ফোর্ট উইলিয়ামের প্রবেশ-পথের কাছাকাছি গাড়ী পার্ক করল শর্মিষ্ঠা। সংগীটিকে নামিয়ে নিয়ে লক্ করল গাড়ী। তারপর এগিয়ে চলল, পাশে পাশে বুনোও।

সবে সূর্যাস্ত হয়েছে; গঙ্গার জল তারই আভায় গৈরিক একেবারে। রাস্তাটা প্রায় নির্জন। মাঠের দিকে গাড়ী অবশ্য দাঁড়িয়েছে দু'চারখানা, ছোট ছেলেমেয়ের দল খেলা করছে মাঠে। কিন্তু প্রকৃত বায়ুসেবীদের ভীড় হয়নি এখনও।···যাঁরা আসেন গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আয়েসী দেহে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে আর মেদ কমাতে, যাঁরা আসেন যুগলে—অঁাধার বুঝে, আড়াল খুঁজে সবার আঁখি এড়াতে, আর যাঁরা আসেন নীচু ঘরের দম-আটকানো উত্তাপ থেকে পালিয়ে মুক্ত আকাশ-বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে,—

[illegible]

করবেন কখন উত্তাপের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে যায় বাতাস থেকে। কেউ বা বারবার তাকাবেন আকাশের দিকে, দেখবেন কখন গোধূলিক্ষণ পার হয়ে আঁধার নামে। কেউ বা ত্বরিৎ হাতে সংসারের কাজগুলো সেরে রাখবেন, অফিস-ফেরৎ ক্লান্ত স্বামীকে সামান্য একটু আরামদানের বাহুল্যহীন বস্তুর উপকরণগুলি সাজিয়ে রেখে খুসী করতে চেষ্টা করবেন তাঁকে। তাঁরই মন-মেজাজের ওপর নির্ভর করছে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দটুকু।

সন্ধ্যার পর যখন বড় ভীড় হয়ে যায়, তখন আর বেড়াতে ভাল লাগে না। তার চেয়ে এমনি সময় এসে বেড়িয়ে যাওয়া ঢের ভাল। শর্মিষ্ঠা ফুটপাথ ধরে দক্ষিণমুখে অনেকখানি এগোল আপন মনে।··ফিরল যখন, তখনও আলোর রেশ আছে একটু। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা নামে অনেক দেরীতে।

মাঠের দিকে বেশ ভীড় হয়ে গেছে এখন। তবু আজ সপ্তাহের দিন, তেমন বেশী ভীড় হবে না, হলেও রাতে হবে। ভীড় এড়াতে শর্মিষ্ঠা রাস্তা পার হয়ে গঙ্গার দিকে এল।·· কাছাকাছি একটা বেঞ্চ, নদীর দিকে চেয়ে একটি লোক বসে সিগারেট টানছে। রাস্তাটা পার হতেই লক্ষ্য পড়ল। শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে পড়ে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে যেন দীপংকর রায়। তবু মনে হওয়ামাত্র পিছন থেকে ডাকা যায় না। শর্মিষ্ঠা রেল-লাইনটা পার হয়ে কাছে এল। দীপংকর রায়ই বটে। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তন্ময় হয়ে ভাবছে কি। শর্মিষ্ঠা এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি। অথবা কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়েও গ্রাহ্য করেনি। এমন অনেকেই তো আসছে, যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেকের দিকে কে আর নজর দিচ্ছে।

শর্মিষ্ঠার মুখে হাসি ফুটল একটু। উপস্থিতি-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গলাটা ঝাড়ল বার দুই।

একটু চমকে ফিরে তাকাল দীপংকর। তারপরই বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, "আরে, কি ব্যাপার!"

হাসল শর্মিষ্ঠা, "ধ্যান করছিলেন, বিঘ্ন ঘটালাম?"

—"ধ্যান আবার কি! অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?"

পথের একটা বেওয়ারিশ লোম-ওঠা খোসলা কুকুরের দিকে এগিয়ে যাবার বাসনা বুনো অনেক কষ্টে সংযত রেখেছে শর্মিষ্ঠার ভয়ে। সে একটা ধমক দিতে হতাশ ভাবে বসে পড়ল।

শর্মিষ্ঠা নিজেও বেঞ্চের একধারে বসে দীপংকরকে অন্য জায়গাটুকু নির্দেশ করে দিল; "বসুন।"

বাধ্য হয়ে বসে পড়লেও স্বজাতিটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির রেখেছে বুনো, আর ফুঁসছে রাগে।

তার দিকে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠা হেসে বলল, "কি রাগ দেখেছেন? রাস্তায় কুকুর দেখলে যেন, সেই যাকে বলে—বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে যায়।"

দীপংকর উত্তর দিল না। মৃদু হেসে বুনোর মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করল শুধু। বুনো গ্রাহ্যও করল না, মুখটা বরং ঘুরিয়ে নিল।

শর্মিষ্ঠা অপাঙ্গে একটু দেখল দীপংকরকে। তারপর হেসে বলল আবার, "কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ রায়! আমার একা

[illegible]

কথাও জিগেস করতে পারছেন না, এই তো? সে তার পিতামাতার সহিত এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে গেছে।"

দীপংকর সহজ হবার চেষ্টা করল।—"বেশ, শুনে সুখী হলাম। তবে আপনারা কেউ আসবেন আশা করে আসিনি। এমনই মনটা খারাপ লাগল, চলে এলাম তাই।"

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হল এবার, "মন খারাপ কেন? দিদির খবর ভাল তো?"

—"হ্যাঁ, সে সব কিছু নয়। আমার একটি ডাক্তার বন্ধু ক'বছর বিহারে প্র্যাকটিস করছিল, সে ক'দিন হ'ল এসেছে,—সম্ভবতঃ কলকাতাতেই থাকবে। তারই সংগে ঘুরছিলাম এ ক'দিন। এখন সে গেল তার প্রফেসরের কাছে। তাই এখানে এসে বসে আছি।"

—"তা এর মধ্যে মন খারাপের কি ঘটেছে?"

গঙ্গার দিকে চেয়ে নীরবে একটু বসে রইল দীপংকর। কি যেন ভাবল।

আস্তে আস্তে বলল, "এখানে বসে বসে ভাবছিলাম অনেক কথা—ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।"

দীপংকরের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে আর কিছু বলল না শর্মিষ্ঠা। দীপংকরকে হাসি-খুসী, স্ফূর্তিবাজ দেখতেই অভ্যস্ত। আজ তাকে এত গম্ভীর আর আনমনা দেখে মনে মনে অবাক হল বেশ।·· কারণ কিছু অনুধাবন করা যাচ্ছে না।··

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল দু'জনে।··

সন্ধ্যা নেমেছে ধীর মন্থর পায়ে। নদীবক্ষের জাহাজগুলোয় আলো জ্বলছে, জলে তাদের প্রতিবিম্ব। ছোট ছোট ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় সোনার মুকুট। অস্পষ্ট আলোয় তীরে বাঁধা অনেকগুলো গহনা-নৌকো চোখে পড়ে।··অনেক নৌকোয় কেরাসিনের কুপি জ্বলছে। তোলা উনুনে রান্না চড়িয়েছে মাঝিরা।

··কিছুক্ষণ পরে শর্মিষ্ঠা উঠে পড়ল।—"এবার কিন্তু উঠব আমি। আপনি যাবেন? চলুন না, নন্দাদের বাড়ী যাব।"

দীপংকর রাজী হ'ল না।

অগত্যা একাই ফিরল শর্মিষ্ঠা।

নন্দিতাদের বাড়ীর নীচের তলায় অমরনাথের অফিসঘর সরগরম, মক্কেলদের ভিড় সেখানে। বুনোকে নিয়ে শর্মিষ্ঠা ওপরে উঠে গেল। ভাঁড়ার ঘরে সাক্ষাৎ মিলল নন্দিতার। নন্দিতার মা সুষমা সন্দেশ তৈরী করতে বসেছেন, সেখানেই বসেছিল।

শর্মিষ্ঠাকে দেখে সুষমা বললেন, "আয়, কোথা থেকে এলি?"

—"একাই গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এলাম।—জুতোটা খুলে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, সুষমা হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "দেখিস, দেখিস, তোর বুনো না ঢোকে।"

বুনোকে দরজার কাছে বসতে বলে ঘরে ঢুকল শর্মিষ্ঠা।

একটা কাঠের পিঁড়ে টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, আজ গঙ্গার ধারে কার সঙ্গে দেখা হ'ল জান মামী? ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের সঙ্গে।

—"ওমা তাই বুঝি? তা তাকেও ধরে নিয়ে এলি না কেন? সে তো দেবু বাইরে গিয়ে অবধি আসে না মোটেই। তোর মামাও সেদিন খোঁজ করছিল।"

—"বলেছিলাম তো, এলেন না। কে এক ডাক্তার বন্ধু এসেছেন"—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় বলেছিল বটে সে কথা। সেই যে ক'দিন আগে একদিন হঠাৎ এল, তোরা ছিলি না, সেদিন বন্ধুর অনেক গল্প করছিল। ওর ছেলেবেলার বন্ধু, বললে, যদি রাজী করতে পারি তো নিয়ে আসব। তা কই, আনলে না তো।"

—"কে জানে। আমি বাবা কোন বন্ধু-টন্ধুর কথা শুনিনি। নন্দা শুনেছিলি?"

নন্দিতা নীরবে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

সুষমা বললেন "জানবি কি! তোদের সঙ্গে সম্পর্ক তো তার তাস খেলার। ছুটির দিন ছাড়া আসেও না, এলেই তাকে চেপে ধরে তাসে বসানো! কোথায় গল্প করবি, তা নয়—তোর মামা নাচছে তাস-তাস করে, তোরাও ইন্ধন যোগাচ্ছিস!"

শর্মিষ্ঠা হেসে ফেলল।—"শুধু শুধু মামাকে অমন করে বলছ কেন মামী! উনিও তো আজকাল এ পথ মাড়ান না। গল্প করতে কি ওঁর অফিসে যাব নাকি? আসলকথা ভদ্রলোকের ভয়, এখনই পুরোনো হয়ে গেলে পরে আর আদর হবে না।"

"হ্যাঁ, তোমায় বলেছে। তোমাদেরও দোষ আছে বাপু, তোমরাই বা কবে ডাক! সে বেচারী একা থাকে, তা দেবু বাড়ী নেই বলে তার এখানে আসাও বন্ধ হয়ে গেছে।"

সুষমার কণ্ঠে অভিযোগের সুর। শর্মিষ্ঠার চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি ফুটল। নন্দিতার দিকে তাকাল একবার, চোখোচোখি হতে দুষ্টুমির হাসি ফুটল তার মুখেও।

—"কি দরকার মামী, এখন থেকে! বিয়েটা হয়ে যাক না, দেখবার দিন তো পড়েই রয়েছে।"

শর্মিষ্ঠার মুখে বিজ্ঞ অভিব্যক্তি।··হাসি চাপতে গিয়ে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে নন্দিতার।

নন্দিতার দাদা দেবাশীষ যখন দীপংকরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সীমানাটা বাড়িয়ে তাকে বাড়ীর ভেতর এনেছিল, আর অমরনাথ সহজেই সম্মতি দিয়েছিলেন তাতে, তখন সুষমা অনেক প্রতিবাদ করেছিলেন এবং স্বামী-পুত্রের সঙ্গে তর্ক করতে এটা তাঁর একটা প্রধান যুক্তি ছিল।

আজ কিন্তু শর্মিষ্ঠার কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনিটা খেয়াল করলেন না।

কড়ায় সন্দেশ নাড়ার দিকেই চোখ আর মনের অনেকটা নিযুক্ত রেখে বললেন, "তা কি আর করা যাবে বল্‌। তোর মামা আর দেবু যে কত রকম 'ফ্যাচাং' তুলতে পারে দেখছিস তো। দেবুর পরীক্ষা পরীক্ষা করে তো কতদিন গেল। তারপরও কি এদিকে হুঁস আছে মানুষটার! এর বাড়ী ভাগ, ওর ডাইভোর্স নিয়েই উন্মত্ত হয়ে আছে দিনরাত—নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাববার সময় কই?··আর আমার কথার তো কোন দাম নেই, তোমরা যে সবাই কর্ত্তা! গরমকালে কষ্ট হবে, বর্ষায় অসুবিধে হবে—কাজেই 'অঘ্রাণের' আগে হচ্ছে না! কিন্তু তা' বলে কি

ছেলেটাকে পর করে দিতে হবে? আজকাল আর কেউ অত মানে না যে বিয়ের আগে মিশবে না!"

শর্মিষ্ঠা এবার হো হো করে হেসে উঠল, "ওরে নন্দা, সেই যে মামী প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিল মামার সঙ্গে মিঃ রায়কে আনার জন্যে—স যার ইচ্ছে মিশুক, আমি পছন্দ করি না,—মনে আছে নাকি তোর? আর মনে রাখিসনি যেন, মামী এখন আপ্-টু-ডেট হয়েছে।"

নন্দিতা হাসি চাপতে পারল না আর।

সুষমাও হেসে ফেলেই সামলে নিলেন। কড়া থেকে খুন্তিটা তুলে ধরলেন মাথার ওপর, "বেরো, বেরো এখান থেকে হতচ্ছাড়া মেয়ে! নইলে দেব বসিয়ে খুন্তির বাড়ি! একটা মনের কথা বলতে গেলুম, উনি এলেন ঠাট্টা করতে। আমি তোর ঠাট্টার যুগ্যি? আমি বলছি ওঁকে!"

—"রাগ করছ কেন মামী! ছেলেবেলায় তো অনেক তাড়না করেছ, তখন ভয়ও তোমায় করত একটু-একটু। তাড়নার বয়স পেরিয়েছি, মিত্ররূপে গণ্য করবার বয়স আমাদের অনেকদিন হয়েছে।"

—"তোমার সঙ্গে কথায় পারব! দেবু তোমায় সাধে বলে ন্যায়রত্ন তর্কভূষণ!"

—"শর্মি, তোকে বলা হয়নি, দাদার চিঠি এসেছে।"—নন্দিতা মুখ খুলল এতক্ষণে।

—"কবে ফিরবে রে?"

—"কি জানি, লেখেনি কিছু।"

—"আচ্ছা আসুক, এলেই তোমার ফেয়ার-ওয়েল, আর দেরী করা হবে না।"

নন্দিতার অগ্নি-দৃষ্টি উপেক্ষা করে সুষমার দিকে ফিরল, "তোমার ছেলে আমায় অনেকদিন চিঠি দেয়নি কেন বলতো মামী?"

—"আমি কি করে জানব রে!" সুষমা হাসলেন, "তুই বরং চিঠি লিখে কৈফিয়ৎ নে।"

—"ইস, আমার চিঠির উত্তর দেয়নি, আমি আবার যেচে চিঠি দেব! বয়ে গেছে আমার।"

"শর্মি, ওঠ এখান থেকে।" নন্দিতা উঠে দাঁড়াল, "মা ঠাকুরদের মিষ্টি গড়ছ, তোর বাইরের কাপড়, ছুঁতে তো দেবে না, আমিও পালাচ্ছি মা, বড্ড গরম হচ্ছে।"

ওরা চলে গেল।

সুষমা সন্দেশ গড়তে গড়তে বামুনঠাকুরের উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন। আজ পুডিং করেছিলেন, শর্মিষ্ঠার জন্য রাখা আছে, বলবেন দিয়ে আসতে। শর্মিষ্ঠা পুডিং খেতে ভালবাসে।

এমনি করেই এদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে শর্মিষ্ঠা। চিরদিন মেয়ের দাবীতে আসে যায় এ বাড়ীতে। অমরনাথ—সুষমাও নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোন তফাৎ রাখেন না। ইন্দ্রনাথ মারা গিয়ে অবধি বরং শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধেই ওঁদের ভাবনা বেশী। একটি ভাল বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন অমরনাথ, সুষমার ব্যস্ততা ছিল আরও বেশী। স্ত্রীর ব্যস্ততার উত্তরে অমরনাথ মাথা নেড়ে বলেছিলেন, বিয়ে দিতে হয় তো সব আগে শর্মির মত নেওয়া দরকার।"

সুষমা শুনে রাগ করেছিলেন, কোন দরকার নেই। তুমিই আদর দিয়ে ওর মাথাটি খেলে। কর দেখি বিয়ের ব্যবস্থা, দেখা যাবে তারপর শর্মি রাজী হয় কি না।

কিন্তু অমরনাথ আইনের লোক, মাথাটা ঠাণ্ডা। শর্মিষ্ঠাকে চিনে নেওয়ার মধ্যে তাঁর ভুল ছিল না। তাই শর্মিষ্ঠাকে বাদ দিয়ে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে রাজী হননি তিনি। স্থির করেছিলেন শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কাই সত্য হল। শর্মিষ্ঠা হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা, কিছুতেই তাকে রাজী করানো গেল না। সে আজ প্রায় দেড় বছরেরও বেশী হয়ে গেল। তারপর অনেকদিন ধরে অনেক রাগারাগি, অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে, বিশেষ করে সুষমার সঙ্গে। রেগে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন সুষমা, চোখের জল ফেলেছেন অনেক। শর্মিষ্ঠাকে টলানো যায়নি তবু।

নতুন উদ্যমে অমরনাথও বুঝিয়েছেন একাধিকবার।

শর্মিষ্ঠা সাফ জবাব দিয়েছে, "ওসব আমার দ্বারা হবে না মামা। একটা অজানা, অচেনা লোককে বিয়ে করতে পারব না, পছন্দ-অপছন্দের কোন প্রশ্ন নেই!"

অমরনাথ শান্ত প্রকৃতির লোক। বিশেষতঃ ছেলেমেয়ের ওপর রাগতে পারেন না মোটেই। শর্মিষ্ঠার সপ্রগলভ জবাবের উত্তরেও হেসে বলেছেন, "হ্যাঁরে, তা কেমন পছন্দ তোর, তাই না হয় বল। অর্ডার দিয়ে গড়িয়ে আনি কুমোরটুলি থেকে।"

শর্মিষ্ঠাও হেসেছে, "কেমন আমার পছন্দ তা কি আমিই জানি! কাউকে পছন্দ হলে আপনায় বলব তখন যে এই রকম আমার পছন্দ।"

—"তুই যে কবে পছন্দ করবি মা, তখন আমি থাকলে হয়। তোর মামা তো দিব্যি পালালো—আমারই যত ভাবনা! এক তো একা থাকিস, তার ওপর সম্পত্তির মালিক। এমনি করে খেয়াল-খুসী মত চলতে গিয়ে কি বিপদে পড়বি, এই আমার ভয়! যদি লোক চিনতে ভুল করিস?"

শর্মিষ্ঠাকে থামানো শক্ত, "আপনারা বেছে দিলেও তো সে ভুল হতে পারে মামা, পারে না? তবে আমি যখন বিয়ে করব তখন আপনায় তো বলব, তখন দেখবেন যাচাই করে?"

কথাটা সেই থেকে চাপা পড়েছে।

শর্মিষ্ঠার তর্কের যুক্তিগুলো মেনে নিয়েই যে থেমেছেন ওঁরা, এমন নয় অবশ্য।

সুষমা বলেছেন, "শর্মির বিয়ের কথায় আর থাকব না। কি দরকার আমার পরের বন্ধনে!"

অমরনাথ ভেবেছেন, হাজার হোক পরের মেয়ে, বড়ও হয়েছে। বেশী জোর করি কি করে! তার ওপর যা খামখেয়ালী মেয়ে, সত্যি যদি সুখী না হয়—জোর করে বিয়ে দিয়ে শেষে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না!

ইতিমধ্যে নন্দিতার জন্য একটি ভালো সম্বন্ধ পেয়েছেন।

ছেলেটির নাম দীপংকর রায়, পেশা ইঞ্জিনিয়ারিং। একটা জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের অন্যতম পার্টনার।...তারই সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে নন্দিতার প্রায় বছরখানেক আগে থেকে। এতদিন না হওয়ার মত গুরুতর কোন বাধা কিছুই ছিল না। দেবাশীষের পরীক্ষাও অনেকদিন হয়ে গেছে। আসল কথা, বিয়েটার জন্য বিশেষ কোন ব্যস্ততা নেই অমরনাথের, হলেই হল, এই ভাব। বরং মনের কথা বোধহয় মেয়েটা পর হয়ে যেতে যত দেরী হয় ততই ভালো।... কিন্তু এর মধ্যে এ বাড়ীতে দীপংকরের গতিবিধি সহজ হয়ে গেছে। দেবাশীষকে শিখণ্ডী রেখে আলাপ হয়ে গেছে নন্দিতার সংগেও তার। আর শর্মিষ্ঠা তো কোন কিছুই পরোয়া করে না, তার সঙ্গে আলাপ অনেকদিন আগেই হয়েছিল। আজ সুষমা যে অভিযোগ করছিলেন, তাতে অতিশয়োক্তি ছিল অনেকখানি। তবে বর্ত্তমানে দীপংকর যে আসাটা কমিয়েছে, সে কথা সত্যি। দেবাশীষ কলকাতায় নেই, গেছে দেশভ্রমণে। সে না থাকায় দীপংকর বোধ হয় আসতে সংকোচ বোধ করে।

সেদিন শর্মিষ্ঠা যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত হয়ে গেছে বেশ। ওপরে এসে দেখল শোবার ঘরের টেবিলে একটা চিঠি রয়েছে। ভুবন রেখে গেছে নিশ্চয়ই। চিঠিটা তুলে নিয়ে ঠিকানায় নিজের নামটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল শর্মিষ্ঠা, পরিচিত হাতের লেখা। আজ মিথ্যেই অভিযোগ করে এল সুষমার কাছে। একই সঙ্গে চিঠি ছেড়েছে দেবাশীষ—নিজেরটা তার এতক্ষণ হাতে পড়েনি, এইমাত্র। চিঠিটা খুলতে-খুলতে নিজের মনেই খুশীর হাসি হাসল।

[ক্রমশঃ

শুল্কনীতি

রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিকট হইতে রাজস্ব বা শুল্ক আদায় একান্ত আবশ্যক। রাজতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় হইতেই রাজা বা গবর্ণমেন্টের এই অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তবে গবর্ণমেন্টের একথাও বুঝা উচিত যে, জনসাধারণের ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা তাহাদের উপর চাপানো অনুচিত, এবং দেশের নাগরিকদের নিকট হইতে যে রাজস্ব বা শুল্ক আদায় করা হয়, তাহার বিনিময়ে তাহাদের ধন, প্রাণ, সম্মান, ধর্ম্ম ইত্যাদি রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের গ্রহণ করা উচিত। এই দায়িত্ব কেবল মুখে বা কাগজ-কলমে স্বীকার করিলেই চলিবে না; কার্য্যদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের ভারতীয় নৃপতিগণ প্রজাদের নিকট হইতে অতি অল্প রাজস্বই গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানকালের ন্যায় শতশত প্রকার শুল্ক তখনকার দিনে ছিল না। অথচ এই অল্প রাজস্ব গ্রহণ করিয়াই প্রাচীনকালের রাজারা প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। কোন প্রজার বাড়ীতে চুরি হইলে রাজা এইজন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতেন। এইরূপ স্থলে অপহৃত মাল অনতিবিলম্বে পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে হিন্দু রাজারা রাজকোষ হইতে প্রজাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দান করিতেন। ইহার প্রমাণ পাই বিষ্ণুসংহিতায়। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্বমেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ। অনবাপ্য তু স্বকোষাদেব দদ্যাৎ।"

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে পৃথিবীর কোন দেশেই এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বর্ত্তমান কালে সকল রাষ্ট্রই জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ধন আহরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বিনিময়ে তাহাদিগকে প্রায় কিছুই দেন না। জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার দায়িত্ব বর্ত্তমানে কেবল কাগজে কলমেই স্বীকৃত হয়; কার্য্যে নহে।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত যখন নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন, তখন যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির উপর স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন এবং প্রবল পরাক্রান্ত গ্রীক্ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই নিদারুণ বিপর্য্যয়ের সময়েও জনসাধারণ যাহাতে করভারে জর্জ্জরিত না হয়, তৎপ্রতি রাজসরকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রজাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কৌটিল্য পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি প্রজাদের নিকট হইতে শাস্ত্রবিহিত পরিমাণের অধিক রাজস্ব আদায় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জনগণের পীড়াদানের অপরাধে অভিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি যদি অল্প পরিমাণ অর্থ আহরণ করিয়া থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা রাজকোষে জমা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমবারের অল্প অপরাধ হিসাবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি তিনি এইভাবে অধিক অর্থ আহরণ করিয়া থাকেন, অথবা অল্প অর্থ আহরণ করিলেও তাহা যথাসময়ে রাজকোষে জমা দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাঁহাকে দণ্ডদান করিতে হইবে।

"যঃ সমুদয়ং দ্বিগুণমুৎপাদয়তি স জনপদং ভক্ষয়তি। স চেৎ রাজার্থমুপনয়ত্যল্পাপরাধে বারয়িতব্যঃ; মহতি যথাপরাধং দণ্ডয়িতব্যঃ"।

—কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। অধ্যক্ষপ্রচারঃ। নবমোঽধ্যায়ঃ।

মূলে আছে "দ্বিগুণমুৎপাদয়তি" (যদি দ্বিগুণ আদায় করেন)। ইহার ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—দ্বিগুণ বলিতে

এখানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত বুঝিতে হইবে (দ্বিগুণং কৃৎপ্রাদধিকম্)।

বর্ত্তমানে যে দেশের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে যত বেশী রাজস্ব আদায় করিতে পারেন, সেই গবর্ণমেণ্টই তত বেশী বাহাদুর বলিয়া বিবেচিত হন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জনসাধারণও করভারে জর্জ্জরিত। রাশিয়া চীন প্রভৃতি কমুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে তো জনসাধারণে সর্ব্বস্বই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ একশ্রেণীর লোক ইহাকেই ভাল মনে করেন, এবং ভারতবর্ষেও সাম্যবাদের ধুয়া তুলিয়া এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ-সাধনের জন্ত তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিগুলির রাষ্ট্রীয়করণের ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্রীতদাসরূপে পরিণত হয়, এবং ইহা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু নৃপতিগণ প্রজাদিগকে পরম আত্মীয় মনে করিতেন। কোন প্রজার মৃত্যুর ফলে তাহার পরিবারবর্গ দুর্গতির সম্মুখীন হইলে রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইত। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। সমুদ্রে জাহাজডুবি হওয়ার ফলে যখন একজন বণিক নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন এই সংবাদে ব্যথিত হইয়া রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার রাজ্যে ঘোষণা করিবার জন্ত মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—

"যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্।"

বঙ্গার্থ—এইরূপ ঘোষণা করা হউক যে, যে কোন প্রজার কোন স্নেহভাজন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে যদি ঐ আত্মীয় কোনরূপ পাপের (গুরুতর অপরাধের) ফলে মৃত্যুবরণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুষ্মন্ত তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইবেন (ঐ আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্য সর্ব্ববিধ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন)।

রাজা দুষ্মন্ত নিহত বণিকের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন নাই; উক্ত বণিকেরই একটি মাতৃগর্ভস্থ সন্তানকে তাহার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালেও নীতিগতভাবে দুর্গত নাগরিকের রক্ষার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার কোন স্বীকৃতি নাই। করমের খোঁচায় বর্ত্তমানে অনাহার-মৃত্যু ব্যাধিমৃত্যুতে এবং দুর্ভিক্ষ সুভিক্ষে পরিণত হয়। বিনা চিকিৎসায় বা সরকারী অত্যাচারের ফলে যে সকল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের কোন রেকর্ডই রাখা হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—একই জমি বা একই বস্তুর উপর পুনঃ পুনঃ রাজস্ব বা শুল্ক স্থাপন করা হয়। যখন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত রাজস্ব দিয়া কোন জমি ভোগ করেন, তখন সেই জমিতে তাঁহার যে কোন প্রকার ফসল ফলাইবার অবাধ অধিকার স্বীকার করা উচিত। কিন্তু এইরূপ স্থলেও যখন কেহ নিজ জমিতে সুপারি বা এইরূপ অন্ত কোন বিশেষ প্রকারের ফসল ফলান, তখন রাষ্ট্র প্রত্যেকটি সুপারিবৃক্ষ বা অনুরূপ অন্ত ফসলের উপর নূতন আর একটি রাজস্ব বসান। আমাদের বিবেচনায় ইহা অসঙ্গত। জমির রাজস্ব নেওয়ার পর সেই জমিতে রাষ্ট্রের আর কোন নৈতিক অধিকার থাকে না; সুতরাং তাদৃশ জমিতে সুপারি বা যে-কোন ফসলের উপর শুল্ক বসাইলে ইহাকে জুলুমই বলিতে হইবে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ধনবান্ ব্যক্তিগণের উপর নানাবিধ আয়কর বসাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের আয় বা ধনরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। ইহা সঙ্গত নহে। একজন ধনবান্ ব্যক্তির নিকট হইতে যদি গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র সে ধনবান্ বলিয়াই মোটা রকমের আয়কর আদায় করেন, তাহা হইলে তাহার আয় ও ধনরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান যুগের গবর্ণমেণ্ট সমূহ কেবল আয়করই গ্রহণ করেন, দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

দেশের শিল্পসংস্থাগুলির উপর এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সম্পত্তিকর বসাইয়াছেন, ইহা ততোধিক অনুচিত। এই সকল শিল্পসংস্থা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। হাজার হাজার লোকের প্রদত্ত অল্প অল্প মূলধনের সমষ্টি দ্বারা ইহাদের এক একটি গঠিত হইয়াছে। ইহারা জনসাধারণের সম্পত্তি। একটি সমগ্র গ্রামকে একটি ইউনিট্ ধরিয়া যদি তাহার উপর সম্পত্তিকর বসানো হয়, তবে যেমন হইবে, শিল্পসংস্থার উপর সম্পত্তিকর বসানোও ঠিক তেমনি। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ কর জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

কোম্পানীর নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ কালেও গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতিরেকেই ইহা করিয়া থাকেন। কোন কোম্পানী ব্যবসায়ে লাভ করিলে যদি গবর্ণমেণ্ট তাহার নিকট হইতে কর আদায় করেন, তবে কোম্পানীর ক্ষতির সময়েও তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন গবর্ণমেণ্টই তাদৃশ দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

সম্প্রতি প্রায় প্রত্যেক দেশেই গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও এইরূপ কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ত স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে থাকার ফলে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে; কারণ, পরের টাকা খরচ করিবার সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা জলের মত উহা খরচ করিয়া থাকেন। এইভাবে যে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে, তাহা সংগ্রহের জন্ত গুরুভার-নিপীড়িত জনসাধারণের ঘাড়ে আরও কতকগুলি নূতন করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ভার জনসাধারণের হাতেই তুলিয়া দেওয়া উচিত, জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া অনায়াসে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহাতে দুইদিকই রক্ষা হইবে। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর নূতন করের চাপ পড়িবে না এবং দ্বিতীয়তঃ অপরিমিত সরকারী অপব্যয় রহিত হইবে। অবশ্য ইহার ফলে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলবিশেষের ভাণ্ডারে কোটী কোটী টাকা জমা হইবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ কি এতই বড় যে, তাহার জন্ত জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে হইবে?

অপর পক্ষ হয়তো বলিবেন—শিল্পসংস্থাসমূহ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইলে, সম্প্রতি জনসাধারণের কিছুটা অসুবিধা থাকিলেও

অদূর ভবিষ্যতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের আয় যাহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে, তখন তাঁহাদের করের লাঘব হইবে। ইহার উত্তরে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অদূর অতীতে যে সকল শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছেন, তাহাদের কোনটি হইতেই জনসাধারণ এইরূপ উপকার পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোটী কোটী টাকা লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু এই দুর্নীতির যুগে তাহা জনগণের স্বার্থে লাগে না। সরকারী কলমের খোঁচায় প্রচুর লাভের আকরস্বরূপ কলিকাতার পরিবহন-সংস্থা, বাসগৃহ-নির্ম্মাণ-সংস্থা, মৎস্য-ব্যবসায় প্রভৃতির প্রত্যেকটিতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিই হইতেছে এবং এই সকল ক্ষতি পূরণের জন্য জনসাধারণের ঘাড়ে আবার নূতন নূতন করের বোঝা পড়িতেছে।

অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে বাস্তবিকই ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিপুল লাভ যে ছিদ্রপথে বহির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহা ধরিবে কে? গবর্ণমেণ্টের হাতে যদি পরিচালন-ভার না থাকিত, এবং শেয়ারহোল্ডারদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা এই ভাবে অর্থ হরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই চুরি শেয়ারহোল্ডাররা ধরিতে না পারিলেও গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আজ যে শুটকির ভাঁড়ারের চাবি বিড়ালের হাতে। শুটকি রক্ষা করিবে কে?

পীড়াদায়ক অসংখ্য করের মধ্যে ভারতীয় জনগণের চিত্তে সর্ব্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে মৃত্যুকর। পরিবারের একজন লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন সমগ্র পরিবার শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। মনুষ্য-সমাজের শাশ্বত প্রথা এই যে, এইরূপ দুঃসময়ে তাঁহারা শোকাভিভূত পরিবারকে সান্ত্বনা ও নানাবিধ আশ্বাস দিয়া তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। প্রাচীন-ভারতে যে রাজা বা গবর্ণমেণ্টও এই রকম বিপদের সময়ে শোকাভিভূত পরিবারের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান ভারত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ শোকার্ত্ত পরিবারকে মৃত্যুকর নামে একটি গুরুতর করভারে অধিকতর জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আচরণ মানবতার বিরোধী।

মৃত্যুকর স্থাপনের অনুকূলে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা যুক্তি দেখান যে, পৃথিবীর অন্যান্য কোন কোন দেশেও এইরূপ মৃত্যুকর আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাহা থাকিবে, তাহাই ভারতে চালাইয়া দিতে হইবে, ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়? তিব্বতে একজন নারী একসঙ্গে ৪৫ জন স্বামী এবং পাকিস্তানে একজন পুরুষ একসঙ্গে চারিজন পর্য্যন্ত পত্নী রাখিতে পারেন; অতএব এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতেও কি তাঁহারা উল্লিখিত দ্বিবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবেন? পারস্যের কোন কোন অঞ্চলে সহোদর ভাই ভগিনীদের মধ্যে—এমন কি পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্রের মধ্যেও বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে (Aryan Trail in Iran and India—by Dr. N. N. Ghose দ্রষ্টব্য)—এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতেও কি তাঁহারা তাদৃশ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন?

বস্তুতঃ যে সকল দেশে মৃত্যুকর স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সকল দেশের আচার-আচরণ ও ভারতীয় জনগণের আচার-আচরণের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। আবহমান কাল হইতে ভারতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ সামর্থ্য অনুযায়ী ধনব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোটী-পতির শ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং লক্ষপতির শ্রাদ্ধে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। দেশের চরিত্রবান্ ধর্ম্মীয় নেতারা, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, দরিদ্র জনসাধারণ, নাপিত, ধোপা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মিস্ত্রী, এমন কি বিভিন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি পর্য্যন্ত এইরূপ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনলাভ করিয়া থাকেন। দরিদ্রেরা ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হয় এবং শ্রাদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্ষৌরকর্ম্ম, বস্ত্র ধৌত করা প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নাপিত, ধোপা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাও অর্থলাভ করিয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করিয়া একদিকে যেমন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধনলাভ করেন, অপর দিকে তেমনি এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া সাধারণ লোকেরাও ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া উঠে। মৃত্যুকর স্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধের আড়ম্বর রহিত করিয়া আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ এই সকল সৎকার্য্যের বিলোপ-সাধন করিতেছেন। নূতন কিছু করার উন্মাদনায় তাঁহারা যেন বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

মৃত্যুকর, আয়কর প্রভৃতির আর একটি মারাত্মক দোষও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক। যেদিন বিত্তশালী ব্যক্তির উপর গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কর স্থাপন করেন, সেইদিন হইতেই স্বাভাবিক নীতি অনুসারে বিত্তহীনকে সাহায্যদানের দায়িত্বভারও তাঁহাদের স্কন্ধে উঠে। যদিও তাঁহারা সেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না, তথাপি ইহাই শাশ্বত রীতি। গবর্ণমেণ্ট যদি এই দ্বিতীয় দায়িত্ব স্বীকার করেন (স্বাভাবিক রীতি অনুসারে স্বীকার করাই উচিত), তাহা হইলে যে সকল লোক প্রচুর ঋণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ পরিশোধের বা অন্ততঃ তাহার এক বিপুল অংশ পরিশোধের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলে প্রত্যেকটি মানুষ সারা জীবন বিবিধ ভাবে অপব্যয় করিয়া প্রচুর ঋণ করিয়া যাইতেই চেষ্টা করিবেন। ফলে রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া রাষ্ট্রপরিচালনই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল বিত্তশালীর বিত্ত হরণ করেন, কিন্তু বিত্তহীনকে সাহায্য করেন না, তাহা হইলে দস্যু হইতে তাঁহাদের কোন পার্থক্য থাকিবে না; কারণ, দস্যুরাও এইভাবে ধনবানের বিত্ত হরণই করিয়া থাকে।
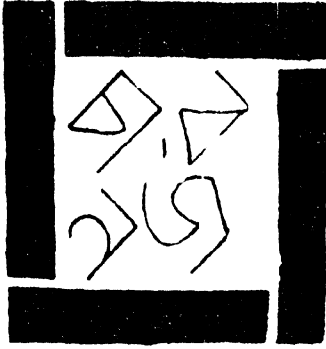
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

[অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চীফ-ইঞ্জিনীয়ার]

স্বপ্ন যেমন দেখেছেন, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রযত্নও নিয়েছেন এই মানুষটি বরাবর। জীবনের সূচনা থেকেই গভীর বিশ্বাস তাঁর মনে—পর্য্যাপ্ত উদ্যম ও একাগ্রতা যদি থাকে, ভাগ্যোন্নতি না হয়ে পারে না। লক্ষ্য করবার যে, কার্য্যক্ষেত্রে এই দাবী ও প্রত্যাশা তাঁর ব্যর্থ হয়ে যায়নি। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চীফ-ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এস্. এন্. চক্রবর্ত্তী (সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) এদিক থেকে বোধ করি একটা দৃষ্টান্তই হয়ে পড়েছেন।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন্ পথ ধরে যেতে হবে এগিয়ে, সুরেন্দ্রনাথের জীবন-প্রভাতেই এ লক্ষ্যটি প্রায় স্থির হয়ে যায়। পূজ্যপাদ পিতা বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ছিলেন সে যুগের একজন স্বনামধন্য ইঞ্জিনীয়ার। রুরকী কলেজ (টমসন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) থেকে ১৮৯০ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং ফাইন্যাল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তারপর তাঁর সমগ্র চাকরি-জীবনটা কাটে উত্তর প্রদেশেই (তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ) এবং সেইটি বিশেষ গৌরবের মধ্য দিয়ে। ১৮৯৩ সালে রায়বেরেলিতে (উত্তর প্রদেশ) সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়—প্রিয়জনরা আশা রাখেন এই নবজাতকও বড় হয়ে একদিন বাবার মতোই হবে ইঞ্জিনীয়ার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যথাসময়ে পড়াশুনো সুরু হয়ে যায় সুরেন্দ্রনাথের। গোড়া থেকেই তিনি ছিলেন একজন বিশেষ মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র। ১৯০৮ সালে বারাণসী কুইন্স্ কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কুল লিভিং পরীক্ষায় (ফাইন্যাল) কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন। দু' বছর পরই আই-এস-সি পাশ করেন কুইন্স্ কলেজ থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এলাহাবাদ মুইর কলেজ থেকে তিনি পাশ করেন বি-এস-সি. আর সে বছর (১৯১২) প্রথম হবার গৌরব জুটে তাঁরই। পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রী চক্রবর্ত্তী তখন ভর্ত্তি হন রুরকী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। ইতোমধ্যে (১৯১৩) বিপিনবিহারী পরলোকগমন করেছেন—সুরেন্দ্রনাথের দায়িত্ব আরো বুঝি বেড়ে গেলো। এ সময় পুণ্যময়ী জননীর (৺প্রমদা সুন্দরী দেবী) কাছ থেকে সাহস ও উৎসাহ পেলেন অপরিসীম। ইঞ্জিনীয়ারিং ফাইন্যাল পরীক্ষা (১৯১৫) শেষে দেখা যায়, তাঁর গুণবত্তা স্বীকৃতি পেয়েছে—পরীক্ষায় গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন এই উদীয়মান যুবক।

এর পরই সুরু হয় শ্রীচক্রবর্ত্তীর কর্মজীবন—যে জীবনটিও বলতে গেলে আগাগোড়া সাফল্য-বিজড়িত। সর্বভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের চাকরি নিয়ে তিনি প্রথমেই যোগদান করেন তৎকালীন যুক্তপ্রদেশে সরকারী দপ্তরে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে আপন যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন—ইঞ্জিনীয়ার সুরেন্দ্রনাথের নাম তখন বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে যায়। ইত্যবসরে তিনি দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটিতে ডেপুটেশনে যাবার একটি সাদর আহ্বান পান এবং সে সুযোগটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত দিল্লীতেই তিনি কাটান আর এই সময় মধ্যে তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতার স্পর্শ পেয়ে পুরাতন দিল্লী যেন একটা নতুন রূপ প্রাপ্ত হয়—যার পরিচয় আজও সেখানে বিদ্যমান।

দিল্লীর কাজ শেষে ইউ, পি-তে (যুক্তপ্রদেশ) ফিরে যাবার পর সরকারী মহলে সুরেন্দ্রনাথের সমাদর আরো বেড়ে যায়। আপন যোগ্যতাবলে ক্রমে ১৯৪৩ সালে তিনি উত্তর প্রাদেশিক সরকারের চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন। এই দায়িত্বপূর্ণ আসনটিতে ১৯৪৭ সাল অবধি তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন। ইত্যবসরে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে—সুরেন্দ্রনাথের কাছে আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বান। মাতৃভূমির সেবার সুযোগ মিলবে বলে তিনি চলে আসেন এখানে এবং ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সরকারের সড়ক উন্নয়ন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আজও পশ্চিমবঙ্গে যে বৃহৎ সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলেছে, গোড়ায় তা প্রণয়ন ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের শ্রম ও চিন্তা কম নিয়োজিত হয়নি। প্রভূত সম্মান নিয়ে চীফ-ইঞ্জিনীয়ারের এই দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি ১৯৫৩ সালে।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনধারার একটি বৈশিষ্ট্য—কাজ ছাড়া বসে থাকতে তিনি কখনই রাজী নয়। তাই দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যখন বন্যাবিধ্বস্ত হলো, উত্তর প্রদেশে অবসর-জীবন কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লিখে জানান তিনি—বন্যার্ত্তদের পুনর্বাসন ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে তাঁর যদি কিছু করণীয় থাকে, স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তা করবেন। সরকার অমনি তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন এবং নিয়োগ করেন সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-পুনর্গঠন-বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও এডমিনিষ্ট্রেটার পদে। কোনরূপ বেতন নিতে না

চাইলেও মাসান্তে মামুলি এক টাকা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। জনসেবক ও দরদী প্রাণ সুরেন্দ্রনাথকে বুঝি দেখতে পাওয়া গেলো এই জরুরী মুহূর্ত্তে। বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে বিপন্নদের মাঝে তিনি ঘুরে বেড়ান এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে দুর্গতদের স্ব স্ব শ্রমে ঘর-বাড়ি তৈরী করে নেবার এক অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তিনি। এইটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'নিজের বাড়ি নিজে বানাও' পরিকল্পনা নামে পরিচিতি লাভ করে। এই পরিকল্পনায় সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তদারকীতে দুই হাজার গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার বাড়ি তৈরী হয়েছে, এ সামান্য ব্যাপার নয়। নতুন দায়িত্বভার থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন গত মার্চ্চ মাসে মাত্র। কিন্তু তাঁর সেই 'নিজের বাড়ি নিজে বানাও' পরিকল্পনাটি এখনও চালু আছে এবং এইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ভারত সরকারেরও। পশ্চিমবঙ্গে বিগত বর্ষে (১৯৫৯) পুনরায় যে বন্যা হয়, তা দেখেশুনেও উক্ত পরিকল্পনায় ১ লক্ষ বাড়ি নির্ম্মাণের জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন।

এই প্রখ্যাত চক্রবর্ত্তী-পরিবারটির আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের (পূর্ব্ববঙ্গ) পঞ্চসার গ্রাম। পরিবারের প্রত্যেকটি সন্তান, প্রতিটি মানুষ কর্ম্মজীবনে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছেন। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেঃ জেনারেল শ্রী ডি, এন, চক্রবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রও (অজিতকুমার) রুরকী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং বর্ত্তমানে কর্ম্মনিযুক্ত রয়েছেন রেলওয়েতে। গঠনকর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এখন অবধি মনের দিক থেকে যথেষ্ট বলিষ্ঠ। অবসর-জীবন তাঁর কাছে নিতান্ত অনভিপ্রেত—তিনি চান কাজ, আর সেটি একটু-আধটু নয়। যুব-বাংলা তাঁর কর্ম্মের আদর্শটি গ্রহণ করলে এগিয়ে যেতে পারবে, এইটুকু বলতে দ্বিধা নেই।

শ্রীবিধুভূষণ মালিক

[এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু কমিশনার]

নিরহঙ্কার শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য, বাংলা ও উত্তর-ভারতীয় কৃষ্টির সমন্বয় সাধন, ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা, মমতাবোধ, মানবদরদ ও প্রখর আইন-জ্ঞান—এইগুলির একত্রীকরণ হয়েছে ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীবিধুভূষণ মালিক মহাশয়ের মধ্যে। পূজাবকাশে একদিন তাঁহার এলাহাবাদস্থ গৃহের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানারূপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রী মালিকের কর্ম্মজীবনে ক্রমোন্নতির কথা জানিতে পারি।

গোপীনাথ বসুর (পুরন্দর খাঁ) অধস্তন পুরুষ ও হুগলী জেলার একচাকা গ্রামের বসু-মল্লিক পরিবারের সন্তান বিধুভূষণ ১৮৯৫ সালের ১১ই জানুয়ারী কটক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রায়-বাহাদুর ৺চন্দ্রশেখর মালিক কাশ্মীররাজ্যের প্রধান বিচারপতি ও দেওয়ান ছিলেন। মাতা শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী হলেন উড়িষ্যার বিশিষ্ট আইনজীবী পরলোকগত লালবিহারী ঘোষের কন্যা। শ্রীঘোষ ও নেতাজীপিতা ৺জানকী নাথ বসু একত্র কটকে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। শ্রীমালিকের বংশগত পদবী হল বসু-মল্লিক। এক পাঠান সম্রাট এই পরিবারকে 'মালিক' উপাধিতে ভূষিত করেন। বংশপরম্পরায় আজও সেই ধারা বজায় আছে। আজ তিনি সর্ব্ব ভারতে শ্রী বি, মালিক নামে সমধিক পরিচিত। ইঁহার প্রপিতামহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺শিবহরিকে লইয়া স্বগ্রাম হইতে কাশীধামে আসেন। তখন হইতে মালিক পরিবার তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। চন্দ্রশেখরবাবুর জ্যেষ্ঠতাত রায় বাহাদুর গোপালহরি মালিক ১৮৭৫ সালে কাশ্মীররাজ্যের এস, পি, নিযুক্ত হন।

বিধুভূষণ বারাণসী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট, ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে অর্থনীতি-শাস্ত্রে এম, এ, ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৯ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী কোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। তিন বৎসর পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কন ইন-এ যোগদান করিয়া ১৯২৩ সালের নভেম্বরে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। সেখানে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করেন। কলিকাতা 'বার'-এ আসিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তদীয় সহধর্ম্মিণী—বিচারপতি ৺সারদা চরণ মিত্রের পৌত্রী ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীশরৎ মিত্রের দুহিতা পরলোকগতা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি এলাহাবাদে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমতী মালিকের আদর্শ শ্রীমালিকের কর্ম্মজীবনকে প্রভাবিত করে। দুঃখের বিষয়, ১৯৪১ সালে শ্রীমতী মালিক মৃত্যু মুখে পতিত হন।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে শ্রীমালিক ডঃ সুরেন্দ্র সেনের সহকারী হিসাবে আড়াই বৎসর কাজ করেন। পরে ঐকান্তিক আগ্রহ ও স্বচেষ্টায় তিনি যশের শিখরে উঠেন। তাঁহার পরিচালিত আনাপুর, নারহান, সাহানপুর ও সিভিলিয়ান-বিচারপতি প্লাউডেনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত একত্রে দুইটি মামলা পরিচালনা করেন।

শ্রীবিধুভূষণ মালিক

১৯৪৩ সালে শ্রীমালিক ভারতের এ্যাডভোকেট-জেনারেলের পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই কিন্তু পর বৎসর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৭ সালে উহার প্রধান-বিচারপতি হন। ১৯৪৮ সালে তিনি উত্তর-প্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করিয়া ১৯৫৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কয়েক মাস প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে কার্য্য করেন।

১৯৫৬ সালে লর্ড রীডের সভাপতিত্বে "রয়াল কমিশন অফ ইংল্যাণ্ড" গঠিত হইলে ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমালিককে উহার অন্যতম সদস্য রূপে গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন মালয়ের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে, ইহা স্থির করা উক্ত কমিশনের কার্য্য ছিল। সেই সময় শ্রীমালিক মালয়ের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন ও বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় ইসলামীয় শাসনতন্ত্র (Islamic Constitution) প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তিনি সুদৃঢ় ও সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন—কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা শেষ পর্য্যন্ত মালয়ে ইস্‌লামিক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন অনুমোদন করেন।

স্বদেশে ফিরিবার পর শ্রীমালিককে 'State Servants Integration Committee'র চেয়ারম্যান পদগ্রহণে আহ্বান জানান হয়, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে সক্ষম হন নাই।

পরলোকগত শ্রীফজল আলীর সভাপতিত্বে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট সংখ্যালঘুভাষাভাষীরা (Minority Language Groups) জানান যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন হইলে তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। তজ্জন্য উক্ত কমিশন সুপারিশ করেন :—

(১) সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থরক্ষার্থে রাজ্যপালদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হোক; বা

(২) তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার্থে রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক একজন সংখ্যালঘু-কমিশনার নিয়োগ করা যাইতে পারে; বা

(৩) একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিশন গঠন করা।

শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দুই নম্বর সুপারিশ গ্রহণ করেন। ফলে, শাসনতন্ত্রের ৩৫১এ ধারানুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্বয়ং শ্রীবিধুভূষণ মালিককে (১৯৫৭ সালের ৩০শে জুলাই) ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু কমিশনাররূপে নিয়োগ করেন। এই কার্য্যভারের জন্য শ্রীমালিককে ভারতের প্রতি রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে বিবরণ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার প্রদত্ত প্রতিটি বিবরণ লোকসভা ও রাজ্যসভায় উপস্থাপিত করিতে হয়। সম্প্রতি তিনি আসাম পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবরণ দাখিল করিয়াছেন। বিহার শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক এক ইস্তাহার জামসেদপুর এলাকায় প্রয়োগ করা শ্রীমালিক অনুমোদন করেন নাই। প্রকাশ, স্থানীয় অধিকাংশ ছাত্র অহিন্দী ভাষাভাষী। অথচ উক্ত ইস্তাহারে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের কথা জানান হইয়াছে।

শ্রীমালিক নানারূপ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে রোটারী ক্লাব, লায়নস্ ক্লাব, ইউ, পি, অটোমোবাইল এসোসিয়েশন, রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খেলাধূলায় তিনি বরাবর পারদর্শী ছিলেন এবং অধুনা তিনি নিয়মিত গলফ্ খেলিয়া থাকেন। বিবিধ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহে তাঁহার গৃহের গ্রন্থাগারটি দর্শনীয় এবং বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়

[বিশিষ্টা বৈজ্ঞানিক]

বৈজ্ঞানিক জগতে বাংলার অবদান সমগ্র বিশ্বে আজও অম্লান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতমা। একক মহিলা হিসেবে—সর্বপ্রথম বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে তিনি শুধু স্বীয় নামই অলংকৃত করেন নাই, গৌরবান্বিত করেছেন সমগ্র ভারতীয় নারী-সমাজকে। আদি বাসস্থান হুগলী জিলার গোপীনাথপুর হলেও, ১৯১৭ সালে কলিকাতায় এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃকুল এবং পিতৃকুল বহু পূর্ব হতেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ স্বর্গত তারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিহার সরকারের অধীনে এক পদস্থ অফিসার ছিলেন এবং মাতামহ স্বর্গত হেমনাথ ঘোষাল মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং তদানীন্তন বাংলা সরকারের প্রধান কেমিক্যাল পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী শ্রীবরদা চট্টোপাধ্যায় (ডি, এস, সি, এফ, এন, আই,) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কেমিষ্ট্রি, মেটালজি এবং জিওলজির প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সালে বাংলা সরকারের বৃত্তি পাইয়া বেথুন কলেজিয়েট স্কুল হতে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৪ সালে বাংলা

ডাঃ শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়

সরকার, নবাব আবদুল লতিফ এবং ফাদার লেফনট বৃত্তিগুলি সহ বেথুন কলেজ হতে আই, এস. সি পাশ করে, ১৯৩৬ সালে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স সহ বাসন্তী দাস স্বর্ণপদক লাভ করে স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হতে বি, এস সি ডিগ্রী লাভ করেন।

অতঃপর শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় রৌপ্যপদক এবং যোগমায়া দেবী স্বর্ণপদক সহ এম. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন। উক্ত সালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে স্যার পি, সি রায় স্কলার নিযুক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লাণ্ট, সিন্থেটিক অর্গানিক কেমিষ্ট্রি, সিরিও কেমিষ্ট্রি এবং অর্গানিক এনালিটিক্যাল কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া গবেষণা করিতে থাকেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় গবেষণা কার্য্যের জন্য ১৯৪০ সালে তাঁহাকে নাগার্জ্জুন পদক দান করা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা ভূষিতা হন এবং মাউন্ট পদকও লাভ করেন। ১৯৩৮ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালীন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। এই সময়ে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে দশমাস বয়স্ক শিশুকন্যা সহ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্য বিশ্ব-পরিক্রমায় বাহির হন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে তাহার জয়মাল্য অর্জ্জন করেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আজও বর্ত্তমান। আজও বহু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায়ের অর্গানিক কেমিষ্ট্রির গবেষণার তথ্যাদি উদ্ধৃত করা হয়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের প্লাণ্ট কেমিষ্ট্রিতে বিশেষ করে Rauwolfia, Vinea, Rosea, Aegle, Dioscorea delto'diaর উপর গবেষণার তথ্যাদি মূল্যবান হিসাবে বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভ করেছে। Rauwolifia & Vinaca বহু মূল্যবান ঔষধের প্রধান অংশ বিশেষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় দেশী এবং বিদেশী বহু বিজ্ঞান-সংস্থার স্থায়ী সদস্যা এবং ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বহু আন্তর্জ্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলনে। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রত্যেকটি বিজ্ঞান সংস্থা ছাড়াও কয়েকটি বিদেশী বিজ্ঞান-সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যা ছাড়াও তিনি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন কেমিষ্ট্রি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং বোর্ড অব এসোসিয়েট এডিটর প্রভৃতি বিবিধ সংস্থার স্থায়ী সদস্যা। এই বৎসর শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্ট কমিশন রিভিউয়ার কমিটিতে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব-ভারতীর অনুরোধ ক্রমে 'ভারতীয় বনৌষধি' এবং বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতির অনুরোধে 'সরল মাধ্যমিক রসায়ন' নামে দুইখানা বাংলায় বিজ্ঞানের বই প্রণয়ন করেছেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও, একথা ঠিক যে, শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মত বিদুষী নারী দেশের এবং দশের গৌরব।

ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং সাহিত্যিক]

গণিতের সংগে সাহিত্যের কোন স্বদয়গত সম্পর্ক আছে কিনা আমাদের জানা নাই ; তবে, বিখ্যাত গণিতজ্ঞও যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক হইতে পারেন, ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ তাহার জলন্ত নিদর্শন।

গণিতজ্ঞ ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ সাহিত্য-জগতে "ভাস্কর" নামেই চিরপরিচিত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সারাজীবন কাটিয়েও আজ পর্য্যন্ত ছাড়তে পারেননি সাহিত্যকে। আজ থেকে ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে যশোহর জেলার মাসিয়াড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। যশোহর জেলার ভদ্রবিলা গ্রামস্থ স্বর্গত লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্কুলশিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ ১৯১২ সালে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম স্থান অধিকার করিয়া আই-এ পাশ করেন এবং বাংলাভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমচন্দ্র পদক প্রাপ্ত হন।

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের—Ryan স্কলারশিপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলারশিপ এবং দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১৮ সালে (Applied Mathematics) ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গীয় সরকারের Research Scholarship পাইয়া গণিতে গবেষণা কার্য্য করিতে থাকেন।
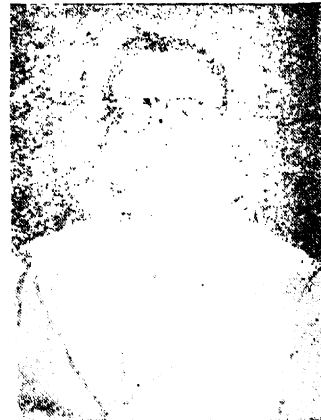
ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ঘোষ তথায় গণিতের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক Whittaker এর নিকট আপেক্ষিক তত্ত্বে (Relativity Theory) গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৯২৭ সালে Ph. D. Degree লাভ করেন। ১৯২৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৮ সাল হইতে প্রায় দুই বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে ডাঃ ঘোষ Dacca-University Mathematical Society এবং Indian Physico-Mathematical Journal প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩০ সালে ডাঃ ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হইবার পর অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৫০, এই সময়ের মধ্যে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের Honorary অধ্যাপক ছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ের জন্য উচ্চ গণিত বোর্ড, ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে গণিতের পরিভাষা প্রচলিত, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতির সদস্যরূপে ইনিই প্রণয়ন করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সিলেবাস পরিবর্ত্তন কমিটির সদস্য এবং হুগলীযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ইহার কনভীনর ছিলেন।

যৌবনকালে ডাঃ ঘোষ বাংলার ও ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইউরোপে অবস্থানকালে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের বহুস্থান মোটর সাইকেলে ভ্রমণ করিয়াছেন। এদেশেও গত তেত্রিশ বৎসর যাবৎ ইনি ট্রেনে ও স্বচালিত মোটর গাড়ীতে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন।

সকল বয়সেই খেলাধূলার প্রতি ইঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। পরিণত বয়সেও প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে গড়ের মাঠে এবং দেশপ্রিয় পার্কে ইনি টেনিস খেলিতেন।

ছাত্রজীবন হইতেই সাহিত্যের প্রতি ডাঃ ঘোষের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব হইতেই ইঁহার নিজনামে এবং "ভাস্কর" এই ছদ্মনামে লিখিত গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রেডিও-বক্তৃতা প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে। ইঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির নাম—সরস প্রবন্ধ ও গল্প—'লেখা'; সরস ছোট গল্পের বই—'শুভশ্রী, ফুল-অফ-থি, কথিকা, ভজহরি, মজলিস, ভজহরির সংসার, ফাগুন'; উপন্যাস—'পূর্ণিমা'; নাটক—'কলের গরু'; কবিতা—'ভাগীরথী'; গল্প সংগ্রহ—'ভাস্করের শ্রেষ্ঠ-ব্যঙ্গ গল্প'; জীবনী—'বাংলার একটি বিস্মৃত বংশ'; প্রবন্ধ পুস্তক—'গণিতের ভিত্তি শিক্ষার কথা'; ভাষা-বিষয়ক—German Word Book for Beginners, French Word-Book for Beginners'; স্বাস্থ্য-বিষয়ক—'পঞ্চাশের পরে', স্কুলপাঠ্য—'Matriculation Algebra'.

ডাঃ ঘোষ বহু বিশিষ্ট সভাসমিতির সভ্য,—যেমন, National Institution of Sciences, India, Indian Science News Association, Calcutta Mathematical Society, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি।

অবসর গ্রহণের পর ইনি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তদবধি সরকার-অনুমোদিত চিকিৎসকরূপে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং সাহিত্য-চর্চা—ইহাই তাঁহার অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ভগবদ্‌ভক্ত ধার্মিক প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত। রামকৃষ্ণ-মিশনের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রায় বাল্যাবধি।

সেণ্ট জন পার্স-এর কবিতা

[Eloges থেকে]

তারা বিশাল এবং নমনীয় ধাতব পাতগুলো দোকানে টেনে নিয়ে গেল;
যা শুষ্ক, কম্পমান এবং যার অবরুদ্ধতায় আকাশের সমগ্র বক্রতা
আভাষিত।
যদি দেখতে চাও, ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াও; না হলে কিছুই দেখতে পাবেনা।
নগর ক্রোড়ে পীত হয়ে আছে। সূর্য্য বন্দরের সমুদ্রে বজ্রনির্ঘোষ
ছুড়ে দিল। অমসৃণ পথের শেষে যে একপাত্র খাবার ভাজা হচ্ছে, তা থেকে
ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে—
আর পথটি অন্ত প্রান্তে বাঁক নিয়ে কবরের ধুলোয় গিয়ে বিনত হয়েছে।
(কারণ ওখানে কবরভূমি রয়েছে, পিউমিস পাথরের বিস্তারে মহিমান্বিত
হয়ে; তাতে কুঠরির গোলকধাঁধা আর ক্যাসোয়ারী পাখির পিঠের মত
বৃক্ষের ভিড়)

অনুবাদ: অশোক মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

৩১

পরদিন খুব ভোরে সানিনের ঘুম ভেঙে গেল। জাগতিক সুখের শিখরে উঠেছিল সে, কিন্তু তার জন্য তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। আসল প্রশ্ন ছিল—কি করে তার জমিদারী তাড়াতাড়ি ও সুবিধা দরে বিক্রী করতে পারবে। ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল সে, একটার পর একটা উপায় তার মনে আসতে লাগল—কিন্তু কোনোটাই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত নয়। একটু বাইরের মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে এলে ভাল লাগবে ভেবে সে বেরুল। সে স্থির করেছিল, একটা উপায় বের করে তবে জেম্মার কাছে যাবে।

ঐ যে ঠিক সামনে যাচ্ছে—মোটা মোটা হাত-পায়ের গড়ন, দোহারা চেহারা, কিন্তু সুন্দর পোষাক পরে, একটু দুলে দুলে হাঁটছে, কে ও? কোথায় যেন দেখেছে এ রকম ঘাড়, শনের মত চুল এসে পড়েছে, ওই মাথা—যেন সোজা কাঁধ থেকে উঠে গেছে, নরম মোটাসোটা পিঠ, নরম হাত দুটো? এ কি পলোজভ, তার স্কুলের সহপাঠী—পাঁচ বছর হয় যার কোনো খবরই সে জানে না? সানিন তাড়াতাড়ি হেঁটে এগিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখল—হলদে রং-এর চওড়া মুখ—ছোট ছোট শুয়োরের মত চোখ, চোখের পক্ষ আর ভুরু সাদা, ছোট চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট, দাড়িহীন গোল চিবুক—মুখের ভাব অলস, খিট খিটে, অবিশ্বাসী—এ যে সত্যিই ইপ্পোলিত পলোজভ!

সানিনের মনে হল 'আবার আমার সৌভাগ্য-তারকা?'

'পলোজভ! ইপ্পোলিত সিদোবিচ! তাই না?' দাঁড়িয়ে গেল লোকটি। ছোট ছোট চোখ তুলে দেখল এক মুহূর্ত—তার পর সরু গলায় ঠোঁটের ভিতর থেকে আওয়াজ এল 'দমিত্রি সানিন?'

'ঠিক সেই' সানিন চেঁচিয়ে উঠল, পলোজভের হাত চেপে ধরল। হাত দুটি ছিল ধূসর রং-এর চামড়ার দস্তানায় ঢাকা, প্রাণহীনের মত ঝুলছিল দুপাশে। 'অনেকদিন আছ এখানে? কোথা থেকে এলে? কোথায় আছ?'

পলোজভ আস্তে আস্তে বলল, 'ভীসবাডেন থেকে কাল এসেছি। আমার স্ত্রীর জন্য কেনাকাটা করতে এসেছি। আজই ফিরে যাচ্ছি ভীসবাডেনে।'

'ও, হ্যাঁ! তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে। আর শুনেছিলাম তোমার স্ত্রী নাকি অসামান্যা সুন্দরী?'

পলোজভ চোখ ঘুরিয়ে নিল 'হ্যাঁ, সবাই তাই বলে।'

সানিন হাসল, 'দেখছি এখনও তুমি স্কুলে যে সুবোধ বালক ছিলে তাই আছ'।

'কেমনই বা বদলাব?'

সানিন এবার জোর দিয়ে বলল, 'শুনেছি তিনি নাকি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী?'

'হ্যাঁ, সবাই তা-ও বলে।'

'কেন, তুমি নিজে তা জানো না, ইপ্পোলিত সিদোবিচ?'

'দেখ বন্ধু, দমিত্রি···পাভলোভিচ—হ্যাঁ, পাভলোভিচ আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে মাথা ঘামাই না।'

'সত্যি, কোন কিছুতেই নয়?'

পলোজভ অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'কোন কিছুতেই নয় বন্ধু, সে তার নিজের পথে চলে—আমি আমার নিজের পথে।'

সানিন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন?'

'আমি তো এখন কোথাও যাচ্ছি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। যখন কথা শেষ হবে হোটেলে গিয়ে প্রাতরাশ খাব।'

'আমি আসতে পারি তোমার সঙ্গে?'

'প্রাতরাশে?'

'হ্যাঁ।'

'সানন্দে এসো—একা-একা খাওয়ার চাইতে দুজনে হলে খুব ভাল হয়। তুমি তো বেশী কথা বল না, না?'

'আমি তো তাই মনে করি।'

'আচ্ছা, এসো তাহলে।'

পলোজভ এগিয়ে চলল, সানিনও তার পাশে পাশে। পলোজভের ঠোঁট আবার বন্ধ হয়ে গেল, দুলে দুলে হাঁটছিল সে—সানিন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, কি করে এই নির্বোধটি একটি সুন্দরী ও ঐশ্বর্যশালিনী স্ত্রী লাভ করল! স্কুলে সবাই তাকে অত্যন্ত নির্বোধ, জড়স্বভাবের ও পেটুক বলে জানত। স্কুলে তার নামই ছিল—'বোকা' বলে। আশ্চর্য!

'আর তার স্ত্রী যদি খুব ধনী হয়—সবাই বলে সে নাকি ঠিকেদারের মেয়ে—সে তো আমার সম্পত্তি কিনে নিতে পারে? যদিও সে বলছে তার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই সে সংশ্লিষ্ট নয়, সে-ও কি সম্ভব? আর 'আমি যথাযোগ্য এমন কি লোভনীয় দামই চাইব। চেষ্টা করেই দেখা যাক না! হয়ত এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার সৌভাগ্য-তারকা আমাকে সাহায্য করছে। আমি চেষ্টা করেই দেখব।

পলোজভ সানিনকে ফ্রাঙ্কফোর্টের একটি অন্যতম প্রধান হোটেলে নিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে ভালো ঘরটিই ছিল তার। চেয়ার-টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত করে রাখা ছিল পিচবোর্ডের বাক্স, কাঠের বাক্স, বাণ্ডিল···'এ সব মারিয়া নিকোলায়েভনার

খাবার—বুঝলে (পলোজক্তের, স্ত্রীর নাম মারিয়া নিকোলায়েভনা)। চেয়ারে বসে টাই ঢিলে করে আর্তস্বরে বলল, 'বড় গরম।' তারপর প্রধান ওয়েটারকে ডেকে ভোজ্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়ে প্রাতরাশের অর্ডার দিল। আমার গাড়ী যেন ঠিক একটায় প্রস্তুত থাকে। ঠিক একটায়, শুনলে?'

প্রধান ওয়েটার নত হয়ে অভিবাদন করে ভৃত্যসুলভ পটুতার সঙ্গে অন্তর্হিত হল।

পলোজক্ত ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলল। নাক কুঁচকে ভুরু ওপরে তুলে এমন ভাব করল যেন কথা না বললেই বেঁচে যায় সে। সে যেন অপেক্ষা করছিল সানিন নিজেই কথা বলবে না, ওকে কথা বলাবে।

সানিন তার বন্ধুর অবস্থা বুঝতে পেরে নেহাতই দরকারী দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করল। জানতে পারল পলোজক্ত দুবছর উহ্লানে সেনাদলে ছিল (সেনাদলের ছোট কোট পরে তাকে নিশ্চয়ই ভীষণ মজার দেখাত) তিন বছর হল বিয়ে করেছে, এক বছরের ওপর স্ত্রীর সঙ্গে বিদেশে আছে, ভীসবাডেনে তার স্ত্রী কি যেন চিকিৎসা করাচ্ছে নিজের। সেখান থেকে তারা প্যারিসে যাবে। সানিন তার নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছু না বলে সোজাসুজি বলল, সে তার ভূসম্পত্তি বিক্রী করতে চায়।

পলোজক্ত চুপ করে শুনছিল, যেদিক থেকে প্রাতরাশ আসবে সে দরজার দিকে ঘন ঘন চাইছিল। অবশেষে খাবার এল। প্রধান ওয়েটার ও দুটো বাচ্চা ছেলে অনেকগুলি থালা আনল, রূপোর ঢাকা দিয়ে ঢাকা।

পলোজক্ত টেবিলে বসে সার্টকলারে ন্যাপকিন গুঁজে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জমিদারী কি টুলা গুবারনিয়ায়?'

'হ্যাঁ'

'ইয়েফ্রেমভ জেলায়—আমি জানি।'

সানিনও টেবিলের পাশে বসে বলল, 'তুমি কি আমার আলেক্সোয়িভকা জান?'

'নিশ্চয়ই জানি।' পলোজক্ত ট্রাফল ও অমলেট পুরল মুখে, 'আমার স্ত্রী মারিয়া নিকোলায়েভনার পাশেই জমিদারী। ওয়েটার, ছিপি খোলো তো বোতলটার। তোমার জমি ভালই, কিন্তু তোমার কৃষাণরা সব গাছ কেটে ফেলেছে। কেন বিক্রী করে দেবে?

'আমার টাকার দরকার, বন্ধু, সস্তায় দেব। ভাল কথা, তুমিই কিনে ফেল না কেন?'

পলোজক্ত এক গ্লাস মদ পান করে ঠোঁট মুছল, আবার শব্দ করে চিবোতে লাগল।

অবশেষে বলল 'হুঁ', আমি জমিদারী কিনি না—আমার টাকা নেই, মাখনটা এগিয়ে দাও তো। অবশ্য আমার স্ত্রী কিনতে পারে। তার সঙ্গেই কথাবার্তা হোক। যদি তুমি বেশী না হাঁকো তাহলে সে কিনে নিতে পারে। কিন্তু দেখ, জার্মানরা কি গাধা। মাছ রাঁধতে জানে না। আর ভেবে দেখ মাছ রান্না কত সোজা। তবু সারাক্ষণ চেঁচাচ্ছো, আমাদের পিতৃভূমি এক হোক। ওয়েটার, এই বিচ্ছিরি খাবারটা নিয়ে যাওতো।'

সানিন জিজ্ঞেস করল 'তুমি কি বলতে চাও তোমার স্ত্রী-ই সব দেখাশোনা করেন?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা কাটলেটগুলো বেশ হয়েছে তো। খেয়ে দেখো। দমিত্রি পাভলোভিচ, আমি তো বলেছিই আমার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই আমি নেই—এখনও বলছি।'

পলোজক্ত আওয়াজ করে চিবিয়ে চলল।

'হুঁ, কিন্তু ইপ্পোলিত সিদোরিচ, কি করে তার সঙ্গে কথাবার্তা হবে?'

'এ তো খুব সোজা, দমিত্রি পাভলোভিচ। ভীসবাডেনে চল, কাছেই তো। ওয়েটার, ইংলিশ মাস্টার্ড আছে? নেই! নেই কেন? সময় নষ্ট কর না। পরশুই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমার গেলাসে ঢেলে দিই—দাও—এই মদটা খুব ভাল।'

পলোজক্তের মুখ আরক্ত ও সজীব দেখাচ্ছিল। খেলে বা পান করলেই তার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আসত।

সানিন বলল—'আমি বুঝতে পারছি না কি করা উচিত।'

'তোমার কি এতই তাড়া বিক্রী করার?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই।'

'অনেক টাকা চাই?'

'হ্যাঁ, কি বলব? আমি স্থির করেছি—বিয়ে করব।'

পলোজক্ত মদের গেলাস ঠোঁটের কাছে তুলেছিল, টেবিলে রেখে দিল।

'বিয়ে!' বিস্ময়ের সুরে ভাঙা গলায় বলল। 'মোটামোটা হাত দুটো পেটের ওপর রাখল 'হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, শীগগিরই।'

'তোমার ভাবীপত্নী নিশ্চয়ই রাশিয়াতে?'

'না, সে রাশিয়ার নয়।'

'কোথায় তাহলে?'

'এখানে, ফ্রাঙ্কফোর্টে।'

'কে সে?'

'সে জার্মান—মানে—প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে ইটালীয়ান। সে ফ্রাঙ্কফোর্টের অধিবাসী।'

'টাকাকড়ি আছে মেয়েটির?'

'কিছুই নেই।'

'তাহলে তোমাদের প্রেম নিশ্চয়ই খুব গভীর?'

'কি যে বল! নিশ্চয়ই।'

'আর তার জন্যই টাকা চাই তোমার?'

'হ্যাঁ, সেজন্যই।'

পলোজক্ত মদ পান করে মুখ ধুলো, জলে ডুবিয়ে আঙুল ধুয়ে তোয়ালেতে সাবধানে মুছল, একটা চুরুট ধরাল, সানিন চুপ করে দেখছিল।

পলোজক্ত মাথা হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আর কোন পথ নেই। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর। যদি সে ইচ্ছে করে তাহলে তোমার সব গণ্ডগোল মিটিয়ে দিতে পারে।'

'কিন্তু কি করে তার সঙ্গে দেখা হবে? তুমি তো বললে পরশু চলে যাচ্ছ।'

পলোজক্ত চোখ বুজলো।

তার ঠোঁট দিয়ে চুরুটটাকে ঘোরাচ্ছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—'আমার কথা শোন। বাড়ী গিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি

ঘুমিয়ে নাও, এখানে ফিরে এস। আমি একটায় যাচ্ছি। আমার গাড়ীতে অনেক জায়গা আছে, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে। সেই ভাল হবে সবরকমে। এখন আমি ঘুমাব। খাওয়ার পর আমি সবসময়ই ঘুমোই। প্রকৃতি দেবী তাই চান, আমিও বাধা দিই না। আমাকে আর বিরক্ত করো না।'

সানিন এক মুহূর্ত ভেবে দেখল, মন স্থির করে মাথা তুলল।

'আচ্ছা আমার মত আছে। তোমাকে বলবার—আমি সাড়ে বারোটায় এখানে আসব, ভীসবাডেনে একসঙ্গে যাব। আশা করি, তোমার স্ত্রী আমার উপর রাগ করবেন না।'

কিন্তু ততক্ষণে পলোজভের নাক ডাকছিল। ঘুমের ঘোরেই বলল, 'আমাকে বিরক্ত কর না।' পা দুটো সরিয়ে নিয়ে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সানিন আর একবার চেয়ে দেখল স্থূল দেহটির দিকে—মাথা, গলা, উঁচু করে ওঠা চিবুক—আপেলের মত গোল—হোটেল থেকে বেরিয়ে রসেলীর দোকানের উদ্দেশে বড় বড় পা ফেলে রওয়ানা হল। জেম্মাকে প্রস্তুত হতে হবে।

৩২

ওর সঙ্গে দেখা হল তার দোকানে—তার মা-ও ছিলেন সেখানে। ফ্রাউ লেনোর নীচু হয়ে দুটো জানলার মাঝের জায়গাটুকুর একটা ভাঁজকরা স্কেল দিয়ে মাপ নিচ্ছিলেন। সানিনকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন তিনি খুশী হয়ে—তবু মনে হল একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন।

বললেন—'কাল তোমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই আমি আমাদের দোকানের উন্নতির উপায় চিন্তা করছি। আমি মনে করেছিলাম সামনে কাচ লাগান দুটো কাবার্ড এখানে হলে কেমন হয়। আজকাল এর খুব রেওয়াজ হয়েছে। তাছাড়া...'

সানিন বাধা দিল, 'চমৎকার! সব কিছুই ঠিক করে ভেবে দেখতে হবে বৈ কি কিন্তু একটা জরুরী কথা আছে—আমার সঙ্গে আসুন।' এক হাতে ফ্রাউ লেনোর ও অন্য হাতে জেম্মাকে ধরে পেছনের ঘরে গেল। ফ্রাউ লেনোর ভয় পেয়ে গেলেন, হাত থেকে তার স্কেল পড়ে গেল, জেম্মাও ভয় পাচ্ছিল কিন্তু সানিনের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করল। সানিন যদিও গম্ভীর হয়েছিল, তবু তার চেহারায় আনন্দ মেশানো ছিল।

দুজনকে বসিয়ে সানিন নিজে দাঁড়িয়ে রইল, চুলের ভিতর হাত চালিয়ে বলতে লাগল পলোজভের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভীসবাডেনে যাওয়ার অভিপ্রায়, তার জমিদারী বিক্রীর চেষ্টা ও সম্ভাবনা শেষে বলল—'আমি যে কত খুশী হয়েছি সে আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে রাশিয়ায় যেতেই হবে না। আর যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক আগেই হয়ত আমাদের বিয়ে হতে পারবে।'

'কবে যাবে?' জেম্মা জিজ্ঞেস করল।

'আজই এক ঘণ্টার মধ্যে। আমার বন্ধু একটা গাড়ী ভাড়া করেছে, তার সঙ্গেই যাব আমি।'

'আমাদের চিঠি লিখবে তো?'

'গিয়েই লিখব। সেই ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলেই লিখব।'

'তুমি বললে তার খুব টাকা আছে—সেই মহিলাটির?' এবারে বিষয়ী ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন।

'ভীষণ বড়লোক ওরা! ওর বাবা ছিলেন কোটিপতি। আর মেয়েটিকেই সব দিয়ে গেছেন।'

'তাকেই দিয়ে গেছেন? আচ্ছা এবারে তোমার ভাগ্য! কিন্তু দেখ সস্তায় বেচবে না। বুদ্ধি খরচ করবে ও দাম সম্বন্ধে অটল থাকবে! মনের আবেগ যেন তোমাকে ভাসিয়ে না নেয়। বুঝতে পারছি তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেম্মার স্বামী হতে চাও। কিন্তু সাবধান হবে। মনে রাখবে—তোমার জমিদারী থেকে তুমি যত বেশী আদায় করতে পারবে—তত বেশী তোমাদের দু'জনের ও তোমাদের সন্তানের জন্য থাকবে।'

জেম্মা সরে গেল। সানিন হাত নাড়িয়ে বলল, 'আমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে পারেন, ফ্রাউ লেনোর। আমি দরকষাকষি করব না। ঠিক দাম চাইব। যদি তাতে সম্মত হন মহিলাটি, ভালই—তা না হলে চলে আসব।'

জেম্মা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চেন মহিলাটিকে?'

'কখনও চোখে দেখিনি।'

'কবে ফিরে আসবে?'

'যদি বিক্রী করতে না পারি তবে পরশু। তা না হলে আরো একদিন কি দু'দিন। যাই হোক—আমি এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করব না। আমার হৃদয় এখানে ফেলে যাচ্ছি জানই তো। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—এখনই আমার হোটেলে যেতে হবে। ফ্রাউ লেনোর—আপনার হাতটা দিন তো আমায়—ভাগ্যের জন্য আমরা রাশিয়াতে সবসময়ই তা করি।'

'ডান হাত না বাঁ হাত?'

'বাঁ হাত—এটা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি কিনা! পরশু ফিরে আসব আমি ঢাল নিয়ে—কিম্বা ঢালের ওপরে। মন বলছে জয়ী হব আমি। বিদায়—প্রিয় বন্ধুগণ!'

ফ্রাউ লেনোরকে জড়িয়ে ধরে আদর করল সে। জেম্মাকে বলল, এক মিনিটের জন্য তার নিজের ঘরে যেতে। একটা দরকারী কথা আছে তার সঙ্গে...আসলে সে জেম্মার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছিল সকলের চোখের আড়ালে। ফ্রাউ লেনোর বুঝতে পেরে আর জানতে চাইলেন না—এই দরকারী কথাটি কি?

জেম্মার ঘরে সানিন কখনও এর আগে আসেনি। প্রেমের যাদুমন্ত্র, তার দীপ্তি, তার আবেগমধুর শঙ্কা একসঙ্গে তার মনকে প্রদীপ্ত করে তুলল যখন সে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল। চারদিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে নীচু হয়ে জেম্মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল—'তুমি কি আমার?' শীগগিরই ফিরে আসবে তুমি?'

'আমি তোমার—আমি শীগগিরই আসব।' কয়েক মিনিট পর সানিন রাস্তা দিয়ে প্রায় ছুটে যাচ্ছিল তার হোটেলে। পান্টালেওনকে দেখতেই পেল না সে—দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খল বেশে ডাকছিল সে তাকে হাত নেড়ে—মনে হচ্ছিল যেন ভয় দেখাচ্ছে।

সানিন ঠিক পৌনে একটায় পলোজভের কাছে উপস্থিত হল।

একটা চার-ঘোড়ার গাড়ী হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সানিনকে দেখতে পেয়ে পলোজভ শুধু বলল—'তাহলে তুমি তোমার মন স্থির করে ফেলেছ।' টুপি, ওভারকোট ও বড় জুতো পরল। যদিও গরমকাল, কানে তুলো গুঁজল। বারান্দায় গেল। তার আদেশমত ওয়েটাররা তার অসংখ্য বাক্স ও বালিশ গাড়ীতে রাখছিল। পলোজভের বসার জায়গাটি ছাড়া গাড়ীতে আর একটুও জায়গা ছিল না। পলোজভের পায়ের কাছে খাবারের ঝুড়িটি ছিল। ওয়েটারদের অনেক বখশিস দিল পলোজভ, কোনরকমে গাড়ীতে গিয়ে ঢুকল, দারোয়ান তাকে সাহায্য করল ঢুকে বসতে, বসে বালিশ ও প্যাকেটগুলো ঠিকঠাক সরিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে সানিনকে ঢুকতে ইশারা করল যেন বলল—তুমিও এস। সানিন তার পাশে বসল। পলোজভের মারফৎ গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিল কি ভাবে চালালে সে বেশী বখশিস পাবে। দরজা বন্ধ হল, গাড়ী চলল।

৩৬

আজকাল রেলে ফ্রাঙ্কফার্ট থেকে উইসবাডেনে যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। সেকালে ঘোড়ার ডাকগাড়ী তিন ঘণ্টার বেশ আর ঘোড়া বদল হত অন্ততঃ পাঁচ বার।

পলোজভ চুরুট মুখে ঢুলতে ঢুলতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কথা সে মোটেই বলেনি। একবারও সে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখল না। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তার কোন আকর্ষণই ছিল না। বলল যে প্রকৃতি তার কাছে বিষের মত। সানিনও কথা বলেনি। সেও প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছিল না—অন্য ভাবনাতেই তার মন বিভোর হয়েছিল—প্রতি স্টেশনে পলোজভ জামা পাল্টা চুকিয়ে দিচ্ছিল—ঘড়ি দেখে গাড়োয়ানদের বখশিস দিচ্ছিল যথাযোগ্য। অর্ধেক রাস্তার পর খাবারের ঝুড়ি থেকে দুটো কমলালেবু বের করল সে, দুটোর মধ্যে বেশী ভালটা নিজের জন্য রেখে অন্যটা সানিনকে দিল। সানিন তার সঙ্গীটির দিকে চেয়ে জোরে হেসে উঠল।

'কি হয়েছে হাসছ কেন?' পলোজভ জিজ্ঞেস করল। সাবধানে তার আঙুলের সাদা ছোট নখ দিয়ে খোসা ছাড়াচ্ছিল লেবুর।

সানিন উত্তরে বলল, 'কেন হাসছি? আমাদের এই যাত্রার কথা ভেবে হাসছি।'

অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি লেবুর কোয়া মুখে ফেলে পলোজভ জিজ্ঞেস করল, 'এতে হাসির কি আছে?'

'কি অদ্ভুত ভেবে দেখ। কাল আমি চীনদেশের সম্রাট সম্বন্ধে যেমন কিছুই ভাবিনি—তেমনি তোমার কথাও মনে হয় নি আমার। আর আজ আমি তোমার সঙ্গে গাড়ীতে চলেছি তোমার স্ত্রীর কাছে আমার সম্পত্তি বিক্রী করতে—আর তোমার স্ত্রীকেও চিনি না আমি।'

পলোজভ বলল, 'সত্যি কিছুই বলা যায় না। যখন বয়স বাড়বে দেখবে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নেই। ভেবে দেখ—তুমি কি কখনও আমাকে কল্পনা করতে পেরেছিলে—অশ্বারোহী সেনা হিসেবে? কিন্তু তাই আমি হয়েছিলাম আর গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ আদেশ করতেন আমায় 'দুলকি চালে চল—মোটা সৈনিক—আরো একটু তাড়াতাড়ি।'

সানিন তার মাথার পেছন দিক চুলকাল। 'ইয়োরিভিচ সিমোনিচ—তোমার স্ত্রী কেমন বল তো? তার মেজাজ কেমন? তার সম্বন্ধে আমার কিছুটা জানা দরকার।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে রেগে উঠল পলোজভ, 'হ্যাঁ' তার পক্ষে তাড়াতাড়ি যাবার আদেশ দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমার পক্ষে? কাজেই পালিয়ে এলাম সেনাদলের সুনাম আর পোষাক ফেলে—কাজ নেই আর ব্যাজ লাগিয়ে। কি বললে? আমার স্ত্রী! সে, যে অন্য আর পাঁচজনের মতই একটি রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু তার কাছে ভালমানুষ সেজে থেকো না, সে এ-সব ভালবাসে না। কেবলই বকবক করে যাবে—হাসাতে চেষ্টা করবে তাকে। তোমার প্রেমের ব্যাপারটি বল ওকে, একটু কৌতুক মিশিয়ে, বুঝলে!

'কৌতুক?'

'হ্যাঁ। তুমিই তো আমাকে বললে প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চাইছ। তাকে বল এ-সব।'

সানিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। এতে আবার কৌতুককর কি দেখলে? পলোজভ শুধু চোখ ঘোরাল। তার চিবুক দিয়ে কমলালেবুর রস গড়াতে লাগল।

একটু থেমে সানিন জিজ্ঞেস করল 'তোমার স্ত্রীই কি তোমাকে ফ্রাঙ্কফোর্টে বাজার করতে পাঠিয়েছিল?'

'হ্যাঁ'

'কি কিনলে?'

'বুঝতে পারবে না। খেলনা।'

'খেলনা? তোমাদের ছেলেপুলে আছে বুঝি?'

পলোজভ সানিনের কাছ থেকে হঠাৎ করে সরে গেল। 'কি? আমার ছেলেমেয়ে থাকবে কেন? এসব মেয়েলী খেয়াল—তুচ্ছ জিনিষ—মেয়েদের সৌখীন পোষাক ও প্রসাধন দ্রব্য—বুঝতে পারলে!'

'তুমি বুঝি এ-সব ভাল কিনতে পার?'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু তুমিই তো আমায় বললে তোমার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই তুমি নেই!'

'হ্যাঁ, অন্য কোন ব্যাপারেই নেই। এ তো আর সেরকম কিছু নয়। আর কোন কিছু করার নেই বলেই বাজার করি। তাছাড়া আমার স্ত্রী আমার রুচির প্রশংসা করে। আর দাম-দর আমি খুব ভাল করতে পারি।'

এই কথাগুলো বলেই পলোজভ শ্রান্ত হয়ে পড়ল।

'তোমার স্ত্রী কি খুব বড়লোক?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক—কিন্তু টাকা-কড়ির ব্যাপার সব সে নিজেই দেখা-শোনা করে।'

'কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, তোমার অনুযোগ করার মত কিছু নেই।'

'আমি তার স্বামী—সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমি কেন না তার সুযোগ নেব? তাছাড়া আমি খুবই দরকারে আসি তার। আমি তার কাছে মূল্যবান সম্পত্তি। আমি হচ্ছি ভীষণ সুবিধেজনক স্বামী।'

পলোজভ একটা রেশমী রুমাল দিয়ে মুখ মুছে জোরে নাক ঝাড়ল। যেন বলতে চাইল 'দয়া করে আমাকে দিয়ে আর কথা বলিও না। দেখছ না কি কষ্ট পাচ্ছি আমি?'

সানিন আর কিছু বলল না। আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

উীসবাডেনে সেই হোটেলটি ছিল রাজপ্রাসাদের মত। গাড়ী গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই দূরে কোথা থেকে ঘণ্টা বেজে উঠল, সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল। কালো কোট পরিহিত ভদ্র চেহারার কয়েকটি লোক প্রধান প্রবেশপথের আশে-পাশে ঘুরছিল। সোনালী পোষাকপরা একটি লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল গাড়ীর।

বিজয়ী বীরের মত পলোজভ গাড়ী থেকে অবতরণ করে সুবাসিত সুন্দর গালিচামোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সুবেশ রাশিয়ান চেহারার একটি ছেলে দৌড়ে এলো তার কাছে, সে ছিল তার চাকর। পলোজভ তাকে বলল ভবিষ্যতে সবসময়ই তাকে নিয়ে বাইরে যাবে সে। কারণ আগের দিন ফ্রাঙ্কফোর্টে রাত্রে সে গরমজল পায়নি। চাকরটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হল শুনে তখনই প্রভুর পা থেকে বড় জুতো খুলতে নীচু হল।

পলোজভ জিজ্ঞেস করল, 'মারিয়া নিকোলায়েভনা কি বাড়ী আছেন?'

'হ্যাঁ, হুজুর, পোষাক পরছেন। কাউন্টেস লাসুনস্কায়ার সঙ্গে আহার করতে যাবেন তিনি।'

'ও—তিনি। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও। গাড়ীতে কিছু জিনিষ আছে। তুমি নিজে গিয়ে বের করে ওপরে নিয়ে এস। আর তুমি—দমিত্রি পাভলোভিচ—তুমি একটা ঘর ঠিক করে নাও। পোনে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এস। আমার সঙ্গে খাবে তুমি।'

হেলে দুলে পলোজভ চলে গেল। সানিন একটা সস্তায় ঘর নিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে একটু বিশ্রাম করল, তার পর তার বন্ধু মহামান্য রাজকুমার বন পলোজভের ভাড়াকরা বিরাট মহলটিতে প্রবেশ করল।

সে দেখতে পেল 'রাজকুমার' একটি চমৎকার অভ্যর্থনা কক্ষে অতি সৌখীন মখমলে মোড়া চেয়ারে বসে আছে। তার প্রশান্ত বন্ধুটি ইতিমধ্যে স্নান করেছে ও এখন, পরে আছে সাটিনের একটি অতি সুন্দর ড্রেসিং গাউন। তার মাথায় ছিল একটি লাল ফেজ টুপি, সানিন তার কাছে গিয়ে খুব মন দিয়ে কয়েক মিনিট দেখল তাকে। পলোজভ ঠিক পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। সানিনকে দেখে তার মাথাও ফিরাল না, কথাও বলল না। বস্তুতঃ অতি রাজকীয় ছিল দৃশ্যটি। সানিন কয়েক মিনিট চেয়ে থেকে থেকে কথা বলে এই পুণ্যময় নীরবতা ভঙ্গ করতে যাচ্ছে—হঠাৎ পাশের ঘরের দরজা খুলে একটি সুন্দরী তরুণী ঘরে প্রবেশ করলেন। কালো লেশের ফ্রিল দেওয়া সাদা রেশমের পোষাক পরেছিলেন তরুণী—আঙুলে হীরের আংটি—গলায় হীরের হার—চৌকাঠে দাঁড়ালেন—তিনিই ছিলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা পলোজভা। তার সুন্দর বাদামী চুল মুখের দুপাশে বেণী বাঁধা ছিল—খোঁপা করা ছিল না।

৩৪

সঙ্কোচ ও ব্যঙ্গ করা অদ্ভুত হাসি হেসে ভদ্রমহিলাটি একটি বেণীর শেষপ্রান্ত উঁচু করে তুলে ধরে তার উজ্জ্বল বিশাল ধূসর দুটি চোখে সানিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ক্ষমা করুন, আমি জানতাম না আপনি এখানে আছেন।'

পলোজভ মাথা না ঘুরিয়ে বা না উঠে শুধু হাত দিয়ে সানিনকে দেখিয়ে বলল—'সানিন—দমিত্রি পাভলোভিচ—আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'হাঁ, আমি জানি—তুমি তো বলেছিলে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশী হলাম। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম ইপ্পোলিত সিদোরিচ—আমার ঝি না আজ...'

'তোমার চুল বাঁধতে পারে নি বুঝি?'

'হ্যাঁ, যদি কিছু না মনে করো। ক্ষমা করবেন।' মারিয়া নিকোলায়েভনা আগের মতই হেসে ও মাথা নেড়ে সানিনকে বললেন। ঘুরে দ্রুতপায়ে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাবণ্যময় গ্রীবা, অপরূপ কাঁধ দুটি ও অনন্যসুন্দর কটিদেশ দেখিয়ে প্রস্থানপথে রেখে গেলেন সুন্দর ক্ষণস্থায়ী আবেশ।

পলোজভ উঠে দাঁড়াল, চিন্তিত মনে হেলে-দুলে সেই দরজা দিয়েই অন্তর্হিত হল।

সানিনের একটুও সন্দেহ ছিল না যে ভদ্রমহিলা খুব ভালো ভাবেই জানতেন 'রাজকুমার' পলোজভের অভ্যর্থনাকক্ষে সে বসে আছে। তিনি এসেছিলেন শুধু তার চুল দেখাতে আর তার চুল ছিল সত্যিই ভারী সুন্দর। অবশ্য মেডেম পলোজভার এই ছলনাতে মনে মনে খুশীই হয়েছিল সে। যদি সে আমাকে তার রূপরাশি দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকে, তাহলে হয়ত জমিদারীর জন্য ভাল দামই পাব আমি ওর কাছ থেকে। তার হৃদয় তখন জেম্মাতে পূর্ণ, আর কোন রমণীর স্থান ছিল না সেখানে। অন্য মেয়েদের চোখেই পড়তো না তার, নিজের মনেই ভাবল সে 'আমি যে শুনেছিলাম—সত্যিই দেখছি তাক লাগিয়ে দেবার মতই ভদ্রমহিলা।'

সানিন যদি তার বর্তমান উত্তেজিত মনের অবস্থায় না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তার অন্য ধারণা হত মহিলাটি সম্বন্ধে। মারিয়া নিকোলায়েভনা পলোজভা (অবিবাহিত অবস্থায় তার নাম ছিল কলিশকিনা) ছিলেন অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তিনি যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তা নয়—সত্যি বলতে কি—সমাজের নিম্নস্তরে তার জন্ম—তার চেহারায় তা ফুটে উঠেছিল নির্ভুলভাবে, তার কপাল ছিল নীচু, নাকটা ছিল মোটা ধরণের, নাকের সামনের দিকটা উঁচু, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের মত ত্বক ছিল না নির্মল, হাত ও পা ছিল না লাবণ্যময়। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তাকে দেখে সবাই থমকে দাঁড়াতো, তার কারণ কি সে ছিল পুশকিন বর্ণিত 'সৌন্দর্যের প্রতিমা'? তা নয়, তার অসাধারণ রমণীসুলভ রূপ, লাস্যময়ী চেহারা—রাশিয়ান আর বেদেনীর সংমিশ্রণ সব পুরুষকে মুগ্ধ ও বিহ্বল করে দিত।

কিন্তু জেম্মার ছবি সানিনকে রক্ষা করেছিল। প্রাচীন কবিরা যাকে ত্রিগুণ বর্ম বলে সঙ্গীতে বর্ণনা করে গেছেন।

দশ মিনিট পর মারিয়া নিকোলায়েভনা স্বামিসহ আবার দেখা দিলেন। সানিনের কাছে এলেন—এমন ভঙ্গিমায়—হায়, যা দেখে

দুর্ভাগে কত হতভাগা আগন্তুকের মাথা ঘুরে গেছে। তাদের একজন বলেছিল—সে এমন ভাব নিয়ে আসে যেন মনে হয় তোমার সারা জীবনের সুখ নিয়ে আসছে সে। সানিনের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাশিয়ানে বললেন, 'আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, কেমন? আমি শীগগিরই ফিরে আসছি।' তার স্বরে ছিলো স্নেহমাখানো নির্লিপ্ততা।

সানিন সশ্রদ্ধভাবে অভিবাদন করল। কিন্তু ততক্ষণে মারিয়া নিকোলায়েভনা দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে আগেকার মতই তার লাস্যময় রূপের আবেশ ছড়িয়ে গেলেন।

যখন হাসলেন তিনি তখন তার গালে একটি নয়, দুটি নয়, তিন তিনটি টোকা পড়ল। তার সুন্দর দীর্ঘ গোলাপী ঠোঁটের চেয়েও তার চোখ দুটি বেশী হেসে উঠল। সানিন লক্ষ্য করল, তার ঠোঁটের বাঁ কোণে ছোট্ট তিল আছে।

পলোজভ আবার মন্থর পায়ে ঘরে এসে তার চেয়ারে বসল। আগের মতই চুপ করে ছিল সে। কিন্তু থেকে থেকে তার এই অল্পবয়সেই কোঁচকানো মাংসল গালে অদ্ভুত হাসি দেখা যাচ্ছিল।

তাকে প্রৌঢ় দেখাচ্ছিল কিন্তু সানিনের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় ছিল সে।

তার অতিথির জন্যে যে আহারের ব্যবস্থা করেছিল তাতে অতি বড় পেটুকও সন্তুষ্ট হত। কিন্তু সানিনের মনে হল এ যেন অন্তহীন অসহ্য ক্লান্তিকর। পলোজভ খেল 'আস্তে আস্তে, ভাব দিয়ে, মন দিয়ে ও প্রত্যেকটি জিনিসের কদর বুঝে।' লোকে যেরকম মনোনিবেশ করে বই পড়ে। প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রত্যেক গ্রাসের আগে শুঁকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রাসের পরে মদ খেয়ে ও তারপর ঠোঁট চেটে…কিন্তু যখন বলসান মাংস এল হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল সে—কিসের সম্বন্ধে? মেরিনো ভেড়ার সম্বন্ধে। বলল একপাল ভেড়া কিনবে সে, অত্যন্ত আগ্রহে ও স্নিগ্ধ স্বরে বিস্তৃত বিবরণ দিল। সে প্রায় ফুটন্ত এককাপ কফি খেল। অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে সে ওয়েটারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল গতকাল তাকে ঠাণ্ডা কফি খেতে হয়েছে—বরফের মত ঠাণ্ডা। তারপর তার হলদে গজ-দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে হাভানা চুরুটের ধূম পান করতে করতে…নিত্যকার অভ্যাসমত ঘুমিয়ে পড়ল। খুশীই হল সানিন, ঘরে পায়চারি করতে লাগল সে, পুরু গালিচায় ঢাকা মেঝেতে শব্দ হলনা একটুও। জেমার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখছিল সে, সুখবর নিয়ে যেতে পারবে ভেবে আনন্দ হচ্ছিল তার। কিন্তু পলোজভ আজ একটু তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল—উঠে বলল, 'মাত্র দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।' এক গ্লাস সোডাওয়াটার খেল, সাত আট চামচ রাশিয়ান হজমি ওষুধ খেল। চাকরটি সবুজ-এর 'কিয়েভজার'-এ করে ওষুধটি নিয়ে এল। পলোজভ বলল এই ওষুধটি ছাড়া সে খুব সম্ভবতঃ বেঁচে থাকতে পারত না। ফোলা ফোলা চোখ দুটি সানিনের দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল তাস খেলবে কিনা। সানিন সানন্দে রাজি হল। তার ভয় হচ্ছিল তা না হলে এখনই হয়ত পলোজভ তার ভেড়ার বাচ্চা, ভেড়ী আর মোটা লেজওলা ভেড়ার গল্প শুরু করবে। দুজনে বসবার ঘরে গেল, ওয়েটার এক প্যাকেট তাস নিয়ে এলে খেলা শুরু হল। অবশ্য টাকা দিয়ে খেলছিল না তারা।

মারিয়া নিকোলায়েভনা কাউন্টেস লাসুনস্কায়ার কাছ থেকে ফিরে এসে তাদের এই নির্দোষ আমোদে নিযুক্ত দেখতে পেলেন। জোরে হেসে উঠলেন তাস ও তাসখেলার টেবিলের দিকে চেয়ে। সানিন লাফিয়ে উঠল কিন্তু তিনি বললেন, 'খেলে যান—আমি পোষাক বদলে আসছি।' তার হাতের দস্তানা ছুঁড়ে ফেলে পোষাকের খসখস আওয়াজ তুলে দরজার ভেতর গিয়ে ঢুকলেন।

সত্যি খুব শীগগিরই ফিরে এলেন তিনি। তার সৌখীন পোষাক ছেড়ে একটা বেগুনী রেশমের ঢিলে গাউন পরেছিলেন। গাউনটির হাতা ছিল ঝোলানো, কোমরে একটি মোটা কর্ড জড়ানো ছিল। স্বামীর পাশে বসে পড়লেন—যখন সে বোকা বলে সাব্যস্ত হল তখন বললেন, 'মোটকা, যথেষ্ট হয়েছে।' ('মোটকা' কথাটা শুনে সানিন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে চাইল তার দিকে, তিনি কিন্তু সানিনের চোখে চোখ চেয়ে গর্বের হাসি হাসলেন—আবার তার মুখে টোকা পড়ল।) 'যথেষ্ট হয়েছে, তোমার খুব ঘুম পেয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, আমার হাতে চুমু দিয়ে বিদায় নাও। মঁসিয়ে সানিনের সঙ্গে একান্তে আমি কথা বলব।'

পলোজভ নিজের শরীরটা টেনে তুলল চেয়ার থেকে, বলল, 'আমার ঘুম পায়নি, কিন্তু তুমি যদি চাও তো আমি তোমার হাতে চুমু দিয়ে চলে যাচ্ছি।' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, হাতের তেলো ওপরের দিকে করে, সানিনের দিকে চেয়ে হাসলেন।

পলোজভও তার দিকে চাইল। তাকে শুভরাত্রি না জানিয়েই সে বিদায় নিল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার অনাবৃত কনুই টেবিলের ওপর রেখে, এক হাতের নখগুলো অন্য হাতের নখ দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে সাগ্রহে বললেন, 'আমাকে সব খুলে বলুন, সত্যিই কি আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন?'

এ কথা বলতে বলতে তিনি মাথা নত করে সানিনের চোখের দিকে জিজ্ঞাসু স্থিরদৃষ্টিতে চাইলেন।

৩৫

মেডেম পলোজভার এরকম অতি ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে অন্য সময় হয়ত সানিন অপ্রস্তুত বোধ করত। যদিও সমাজের উচ্চস্তরের সব রকমের লোকের সঙ্গেই মিশেছে সে। কিন্তু এখন তার মনে হল এই স্বাধীনতা ও ঘনিষ্ঠতা তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে শুভলক্ষণ। সে ঠিক করল এই ভদ্রমহিলার সব খেয়ালই চরিতার্থ করবে। হাল্কা সুরে তাই উত্তর দিল 'হ্যাঁ, বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'কা'কে? একজন বিদেশিনীকে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ নয় বোধ হয়? তার সঙ্গে কি আপনার ফ্রাঙ্কফোর্টেই প্রথম দেখা হয়েছে?"

'হ্যাঁ।'

'কে তিনি, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। সে একজন খাবার-বিক্রেতার মেয়ে।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা চোখ বড় বড় করে ভুরু তুললেন ওপরের দিকে।

আস্তে বললেন, 'ও, সে তো খুব ভালো কথা। সত্যি, খুব

ভাল। আমি তো ভেবেছিলাম আপনার মতো তরুণ বোধ হয় নিঃশেষই হয়ে গেল পৃথিবী থেকে। খাবার-বিক্রেতার মেয়ে!'

সসম্ভ্রমে সানিন বলল, 'দেখছি, আশ্চর্য হয়েছেন আপনি। কিন্তু দেখুন প্রথমতঃ আমার কুসংস্কার নেই…'

মারিয়া নিকোলায়েভনা বাধা দিলেন—'প্রথমতঃ আমি একটুও আশ্চর্য হই নি। আমারও কোন সংস্কার নেই। আমি নিজেও একজন মুজিকের মেয়ে (রাশিয়ান কৃষক)। হাঁ সত্যি। কিন্তু আমি আশ্চর্য ও আনন্দ বোধ করছি এমন একটি লোকের দেখা পেয়ে যে ভালবাসতে ভীত নয়। আপনি তাকে ভালবাসেন, তাই না?'

'হাঁ'

'সে কি খুব রূপসী?'

এ প্রশ্নে সানিন একটু ক্ষুব্ধ হলো…কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না—দেরী হয়ে গেছে।

সে শুরু করল, 'আপনি তো জানেন—মারিয়া নিকোলায়েভনা, প্রত্যেক প্রেমিকই মনে করে তার প্রেমিকার মত রূপসী আর কেউ নয়। কিন্তু আমার প্রেমিকা সত্যিই প্রকৃত রূপসী।'

'সত্যি? কি ধরণের চেহারা? ইটালীয়ান? গ্রীক দেবীদের মত?'

'হাঁ, তবে মুখশ্রী অতি সুন্দর।'

'তার কোন ছবি নেই আপনার কাছে?'

'না।' (সে সময় ফটোগ্রাফী ছিল না ও ডাগুয়েরোটাইপ সবে জনপ্রিয় হচ্ছে)

'কি নাম তার?'

'তার নাম হচ্ছে—জেমা।'

'আর আপনার নাম?'

'দমিত্রি'

'আর পৈতৃক নামটি আপনার?'

'পাভলোভিচ।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা সে রকম শান্তস্বরে বললেন, 'দমিত্রি পাভলোভিচ, শুনুন, আপনাকে ভাল লেগেছে আমার। আপনি অতি চমৎকার লোক। আপনার হাত দিন আমায়। আমরা বন্ধু হলাম।'

তার মজবুত, ফর্সা সুন্দর গড়নের আঙুলগুলো দিয়ে সানিনের হাত জোরে চাপ দিলেন। তার হাত প্রায় সানিনের হাতেরই সমান ছিল কিন্তু ছিল বেশী মসৃণ, বেশী গরম ও বেশী নরম—আর প্রাণশক্তি ছিল তাতে বেশী।

'বলতে পারেন আমার মাথায় এখন কি চিন্তা এসেছে?'

'কি?'

'রাগ করবেন না আপনি। আপনি বললেন তার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে আপনার। আচ্ছা সত্যিই কি তার প্রয়োজন ছিল?'

সানিন ভুরু কুঁচকে বলল 'আমি বুঝতে পারলাম না মারিয়া নিকোলায়েভনা!'

মারিয়া নিকোলায়েভনা শান্তভাবে হাসলেন। গালে এসে-পড়া একগুছি চুল মাথা নাড়িয়ে পেছনে করে দিলেন। অন্যমনে বললেন 'হাঁ সত্যিই প্রেমে পড়ে গেছেন। একজন নাইট। আর সবাই বলে কিনা আদর্শবাদীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা খাঁটি রাশিয়ান সুরে কথা বলছিলেন খাঁটি মস্কোর ভাষা—সম্ভ্রান্ত বংশের চাল নয় সাধারণ লোকদের মত।

বললেন, 'আপনি বোধ হয় মানুষ হয়েছেন প্রাচীনপন্থী ধার্মিক একটি পরিবারে। রাশিয়ায় কোথায় আপনার দেশ?'

'টুলা গুবার্নিয়ায়।'

'তাহলে তো আমরা একদেশী। আমার বাবা…আপনি জানেন আমার বাবা কে ছিলেন, তাই না?'

'হাঁ, আমি জানি।'

'তার জন্ম হয়েছিল টুলাতে…তিনি ছিলেন টুলার লোক। আচ্ছা…(ইচ্ছে করেই মারিয়া নিকোলায়েভনা এই কথাগুলি সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন) আচ্ছা, এবারে কাজের কথায় আসি।'

'কি বললেন—কাজের কথা? কি বেচতে চান আপনি?' মারিয়া নিকোলায়েভনা চোখ ছোট ছোট করে চাইলেন 'আচ্ছা, কিসের জন্য এসেছেন আপনি এখানে বলুন তো?' যখন চোখ ছোট ছোট করে চাইলেন মনে হলো তার দৃষ্টিতে করুণা ও ব্যঙ্গ মেশানো—যখন বড় বড় চোখে চাইলেন, তখন তাদের গভীর দ্যুতি চোখে দেখা দিল—কাঠিন্য ও কুটিলতা। তার ভুরু দুটি ছিল চওড়া, রাত্রির মত কালো, পশুলোমের মত হেলানো, তাতেই তার চোখ দুটি মনে হতো অপরূপ।

'আপনি আমার কাছে আপনার জমিদারী বেচতে চান, তাই না? বিয়ে করতে আপনার টাকার দরকার—ঠিক না?'

'হাঁ'

'অনেক টাকা চাই আপনার?'

'কয়েক হাজার ফ্রাঁ হলেই চলবে আমার। আপনার স্বামী আমার জমিদারী জানেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আমি চড়া দর হাঁকব না।'

'মারিয়া নিকোলায়েভনা আস্তে ডান থেকে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক ভাবে উচ্চারণ করে সানিনের জামার হাতা আঙুল দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বললেন—'প্রথমতঃ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ নিই না, কাপড়-জামা সম্বন্ধে তার ধারণা চমৎকার। দ্বিতীয়তঃ আপনি কেন ন্যায্য দাম চাইবেন না? আপনার প্রেমের খাতিরে আপনি আপনার সম্পত্তি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কেন আপনার দুর্বলতার সুযোগ নেব? আমি ন্যায্য দামই দেব। আপনার ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আপনাকে বঞ্চিত করব আমি, সে আমার স্বভাব নয়। দরকার হলে আমি অতি নির্দয় হতে পারি কিন্তু সে একেবারে ভিন্নরূপে।'

সানিন বুঝতে পারছিল না ভদ্রমহিলা তাকে বিদ্রূপ করছেন না সত্যি সত্যি বলছেন। নিজেকে বলল—আচ্ছা, দেখে নেব, আমার নিজের স্বার্থ বাঁচিয়ে চলতেই চেষ্টা করব।

একটি রাশিয়ান সামোভার, চায়ের জিনিষপত্র, দুধ, রাস্ক ও অন্য আরো অনেকরকম খাবার একটা বড় ট্রেতে করে নিয়ে একটি

ভৃত্য ঢুকল। সানিন ও পলোজভার মাঝে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল।

তিনি এক পেয়ালা চা ঢেলে দিলেন তাকে। এক ডেলা চিনি দিলেন তাতে হাত দিয়ে, যদিও টেবিলে তার কাছেই চিনি দেবার চিমটে রাখা ছিল। 'আশা করি হাত দিয়ে দেওয়াতে আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, না, এমন সুন্দর হাত দুটি দিয়ে···' কথাটা শেষ না করেই সে চায়ে চুমুক দিল। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি।

সে আরম্ভ করল, 'আমি জমিদারীর জন্য কম দাম চেয়েছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম আপনারা বিদেশে আছেন, হয়ত হাতে প্রচুর টাকা নেই, তাছাড়া এভাবে ভূসম্পত্তি কেনা বা বিক্রী করা একটু অদ্ভুত, তার জন্য আমাকে খানিকটা বিবেচনা করতে হবে বৈ কি।'

সানিন তার যুক্তিগুলো বলে যেতে লাগল। মারিয়া নিকোলায়েভনা হাত জোড় করে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অবশেষে চুপ করল সে।

বলে উঠলেন তিনি, 'বলে যান, বলে যান।' তাকে যেন বলতে সাহায্য করলেন—'আমি শুনছি—শুনতে ভাল লাগছে, বলে যান।'

সানিন বলতে লাগল তার জমিদারীর কথা, কতখানি জমি, ঠিক কোথায় অবস্থিত, কি কি আয়ের পথ আছে তা থেকে, কি করলে তার আয় বাড়বে। সে তারপর তার বসতবাটীর বর্ণনা দিয়ে বলল, অতি মনোরম ও রমণীয় দৃশ্য তার চারপাশে। মারিয়া নিকোলায়েভনা চেয়ে রইলেন তার দিকে ও সোৎসাহে। মাঝে মাঝে তার ঠোঁট ঈষৎ নড়ে উঠছিল কিন্তু হাসেন নি তিনি একটুও। তার নীচের ঠোঁট চেপে ধরলেন তিনি। সানিন আর কিছু বলার না পেয়ে চুপ করল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা শুরু করলেন—'দমিত্রি পাভলোভিচ' একটুখানি দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন 'দমিত্রি পাভলোভিচ। দেখুন বুঝতে পারছি আপনার জমিদারীটা কেনা আমার পক্ষে লাভজনকই হবে। দাম দরও করব। কিন্তু দুদিন সময় দিন আমায়। আপনি দুদিন আপনার প্রেমিকাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না? আমি আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চাই না। সত্যি বলছি। কিন্তু এখনই যদি আপনি পাঁচ ছ' হাজার ফ্রাঁক চান তাহলে আনন্দের সঙ্গে ধার দিতে রাজী আছি আমি—আর পরে সব বোঝাপড়া হবে।'

সানিন উঠে দাঁড়ালো 'মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি একজন প্রায় অচেনা লোককে সাগ্রহে ও সানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন, আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু সত্যিই যদি আপনার দরকার থাকে আমার জমিদারী ক্রয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে তাহলে আমি দুদিন থাকব বৈ কি।'

'দমিত্রি পাভলোভিচ, সত্যিই আমার প্রয়োজন। আপনার কি খুব কষ্ট হবে? খুব? সত্যি বলুন আমাকে।'

'আমি আমার প্রণয়িনীকে ভালবাসি মারিয়া নিকোলায়েভনা, তার কাছ থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে সহজ নয়।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা নিশ্বাস ফেলে বললেন—'অতি চমৎকার লোক আপনি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। এখন যাবেন আপনি?'

সানিন বলল—'হ্যাঁ, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ভ্রমণের পর আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন বৈ কি। বিশেষতঃ আমার স্বামীর সঙ্গে (ডুরাকী) তাস খেলার পর।' 'আচ্ছা, বলুন না, আমার স্বামী ইপপোলিত সিদোরিচ কি আপনার একজন বড় বন্ধু?'

'আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম।'

'আর সে কি চিরকালই এরকম ছিল?'

'কি রকম?'

মারিয়া নিকোলায়েভনা একবারে হেসে উঠলেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে লাল হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত পায়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সানিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সানিন নত হয়ে অভিবাদন করে দরজার দিকে গেল।

তিনি পেছন থেকে বললেন 'শুনতে পাচ্ছেন, কাল সকালে খুব ভোরে আসবেন।' সে পেছন ফিরে চেয়ে দেখল, তিনি তার হাত দুটি মাথার পেছনে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। জামার ঢিলে হাতা দুটি গুটিয়ে কাঁধে উঠে গেছে। সেই দুটি অনাবৃত বাহু, সর্বোপরি তার সারা দেহ সেই আধশোওয়া ভঙ্গীতে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল—সানিনকেও তা স্বীকার করতে হল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।

বিজন ভট্টাচার্য

১০

নতুন রোভার গাড়ীর গায়ে বিশ্বতোষের নাম লেখা না থাকলেও ইসমাইল সতীর অনেক দিনের চেনা ড্রাইভার। সুতরাং সত্যব্রত গোপন করে গেলেও গাড়ীর রহস্য চাপা থাকে না সতীর কাছে। সতী জানতে পারে, বন্ধুর বলে দিন দশ প'নেরো হলো যে গাড়ীখানা ব্যবহার করছে সত্যব্রত, সেটা একান্তই বিশ্বতোষের গাড়ী সামান্য বিষয়, তবু সতীর কাছে ঘটনাটা বেমালুম চেপে গিয়েছে সত্যব্রত।

মাত্র মাস কয়েক বিয়ে হয়েছে সতীর। এর মধ্যেই মানুষটাকে একটু একটু চিনতে পেরেছে সে। আগে দেখেছিল বাইরেটা, এখন দেখছে ভেতরটা। দিন যত যাবে, এই চেনার পরিধি ততই বেড়ে যাবে। তারপর একদিন আসবে যখন নতুন করে আর কিছুই চেনবার থাকবে না।

সতী বোঝে, মানুষ হিসেবে সত্যব্রত একটু ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দেখবার করবার যা যার ওকেই কর, ও কার প্রতি কি আচরণ করলো না করলো ধর্তব্যে এনো না। তা হলেই বাদ-বিসংবাদ, গণ্ডগোল যত। হতো না এমনটি, যদি একটু সচেতন হতো। বুঝতে চেষ্টা করতো অন্যের দিকটা। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গী নেই সত্যব্রতর। স্বার্থবাদী, খানিকটা বোকার মত। একটা নির্বোধ লোক যে কি ভাবে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে চলতে পারে সব সময়, সে-ও সতীর আর এক খটকা। স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে স্বার্থ নষ্টই তো সে করে বেশী। এইখানে মানুষটা যে কত অসহায়, সে কথা কিন্তু দুনিয়া তখন মোটেই .বিবেচনা করে না। সতীর মনের এ-ও আর এক দুঃখ।

ক'মাসই বা বিয়ে হয়েছে! কিন্তু এর মধ্যেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ছোটোখাটো নব নব দুঃখের কারণ ঘটছে। একটা উদাহরণ তার—বিশ্বতোষের গাড়ী।

নিজের যখন গাড়ী নেই, তখন গাড়ী প্রথমতঃ না চড়াই ভাল। এর আগে যে আসা যাওয়া করেছে সত্যব্রত সতীদের বাড়ী, তখনও তার কোন গাড়ী ছিল না। আর গাড়ী ছাড়া চলা যায় না, এ কথা সতীও তাকে কোন দিন বুঝতে দেয় নি। তবু দরকার হলো পরের গাড়ীর—বিশ্বতোষের গাড়ী। এ নিয়ে কোন কথা চলবে না। কারণ সতী জানে তাতে অশান্তি হবে। এই রকম আরও অনেক বিষয়।

এই তো সেদিন। সত্যব্রতই অনুযোগ করছিল সতীর কা যে, শ্বশুর অন্নদা রায়ের অর্থের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে শুভময় নাকি তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। সে জন্যেই সে নাকি তার মনোহরপুকুরের বাড়ীতে যাতায়াত করে না আত্মমর্যাদার প্রশ্ন তুলে বলছিল, কি জানি শ্বশুর মশাই যা আবার মনে করেন যে জামাই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে চলাফে করছে! সতী শুনল কথাটা কিন্তু কোন জবাব করলো না জবাব করলো না এই কারণে যে সত্যব্রতর কথাটার মধ্যে অনেকা বাড়াবাড়ি ছিল। প্রথমতঃ, অন্নদা রায় অতটা ছোট অন্তঃকরণে লোক নন। দ্বিতীয়তঃ, অত ইজ্জত জ্ঞানই যদি সত্যব্রতর থাকবে যে সে ইতিমধ্যেই তার বাবার দেওয়া ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে দ পনেরো হাজার টাকা ছয়-নয় করে খরচ করে ফেলতো না আর শ্বশুরবাড়ীতে যে যায় না সত্যব্রত তার কারণও সতী অবিদিত নয়।

ঘটনাটা খুবই নোংরা। তবু সত্যি যা তা অস্বীকা করবার নয়। সত্যব্রত যে মনোহরপুকুরের পথ দিয়ে হাঁ না, তার কারণ হচ্ছে সেই পনেরো হাজার টাকার অসম্মান অর্থাৎ মাতুল হরপ্রসাদের কথা মত বিয়ের রাতে যে পনেরে হাজার টাকা অন্নদাবাবু স্বর্ণলতিকার নামে চেক কেটে দিয়েছিলেন সেই টাকা স্বর্ণলতিকার বিনা হস্তক্ষেপে কয়েক মাস পর তামাদি হয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আবার অন্নদাবাবুর কাছেই ফিরে যায়। বিয়ে কিছুদিন পর শ্রীরামপুরে স্বর্ণলতিকার সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়ে অন্নদাবাবুর কাছে পরিষ্কার হয় ব্যাপারটা। স্বর্ণলতির অন্নদাবাবুকে পরিষ্কারই বলেন, না না, আপনার টাকা আমি কেন নিতে যাবো? আমার কোন টাকার দরকার নেই। দিতে হবে আপনি আপনার মেয়ে-জামাইকে দেবেন! পাঁচবার বৌরাণী কথা শুনে সেদিন অন্নদা রায়েরও বেশ ভাল লেগেছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, রাজরাণীর মত অন্তর যে মায়ের তাঁর ছেলের কখনো সেরকম দোষত্রুটি থাকতে পারে না।

পরে পরে শুনেছিল সতী ঘটনাটা তার বাবার কাছেই। কিন্তু মায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর ছিটেফোঁটা ছোঁয়াচও ছেলের চরিত্রে যে স্পর্শ করে নি, এ-ও তার অবিদিত ছিল না। স্বর্ণলতিক টাকা ফেরৎ দিতেই মায়ের সঙ্গে ছেলের ফাটাফাটি ঝগড়া স্বর্ণলতিকা তোলেন ইজ্জৎ-এর প্রশ্ন। বলেন, সামান্য পনেরো

হাজার টাকা নিয়ে তিনি কখনও মাথা হেঁট করতে পারবেন না অন্নদা রায়ের কাছে। আর সত্যব্রতর যুক্তি হলো, ও টাকা তার বাবার পাওনা টাকা। সে বলে, ঐ টাকা অস্বীকার করে স্বর্ণলতিকা অন্নদা রায়ের কাছে মহানুভব সাজতে পারেন। কিন্তু তাতে করে মা হয়ে তিনি ছেলের ওপর বিশ্বাসঘাতকতাই করেছেন। স্বর্ণলতিকার সঙ্গে যে দেখাসাক্ষাৎ নেই সত্যব্রতর ইদানীং সে-ও এই এক কারণেই। কাজেই মর্য্যাদাবোধ আর ইজ্জৎ-জ্ঞান সত্যব্রতর নতুন করে আর কি দেখবে সতী? অবিশ্যি টাকার মূল্য সর্বদাই আছে কিন্তু প্রাণের এতখানি অপচয় করে কখনই নয়। অথচ সতী জানে, এই ক্ষতি ক্ষতি নয় সত্যব্রতর কাছে। তাই সে দিনের শুভদৃষ্টি আজ যদি থেকে থেকে তাড়সে চমকে ওঠে সতীর মনে, তাতে দুঃখের কারণ থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই সতীর।

অনেক সময় অনেক কারণে মন খারাপ হয়ে যায় সতীর। দুঃখ আসে, রাগ হয়। কিন্তু সাধ করে যে সোনার শিকল স্বেচ্ছায় সে গলায় পরেছে, নিজের ভাল না লাগলেও পরের কাছে সব সময়ই তার বড়াই করতে হবে। মনের এই ধরণের একটা খারাপ অবস্থায় সতী দু'-তিন দিন একেবারে কথা বন্ধ করে দেয় সত্যব্রতর সঙ্গে। যার যার তার তার ভাবে গা এলিয়ে সংসার করে। কাজকর্ম সবই করে, শুধু মুখে কথা বলে না। ঝুটো আত্মসম্মানবোধে সত্যব্রতও কিছু কম যায় না। কইবে না তো ক'য়ো না কথা। সত্যব্রত তখন ভাববাক্যে ইট-কাঠ-দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে। —খাওয়া সম্ভব হ'লে খেয়ে নিতে পারা যেতো, অমুক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যেতে হ'লে যাওয়া যেতে পারতো,—এই রকম আর কি। গায়ে গা লাগিয়ে একত্র বসবাস। ভাববাক্যের অশরীরী এক তৃতীয় সত্তা অনিত্যকালের জন্তে দৈবজীবনের সাইত হতে পারে না। একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিনের দিনই সাইত হাওয়া। তুচ্ছ প্রয়োজনের একটা ছুট মুহূর্তে—গায়ে হাত দিয়ে কথা বললে কেন?—বাঃ, যেচে কথা কইতে লজ্জা করছে না?—এই রকম একটা সরাসরি মৃদু অভিযোগের সূত্র ধরে নাকে চোখে মুখে আবেগ উচ্ছ্বাসের অন্তরঙ্গ মাতন। একজন আর একজনকে যেন খড়কুটো বেলুনের মতো তখন হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথায়, কোন্ আকাশের কিনারায়!

এক খণ্ড মেঘ ছিলো না আকাশে। স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধানের মাঝখানে শুধু নিদারুণ এক জ্বালাময়ী রিক্ততা ঘুরপাক খাচ্ছিলো চক্রাকারে। হঠাৎ নৈঋতের রক্তমেঘেই ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া গেল। গুরু-গুরু গর্জনে কেঁপে উঠলো সৃষ্টি দিগন্ত থেকে ছুটে এলো পুঞ্জ পুঞ্জ কালো হাতীর দল—ঝড়-বাদলের তুফান তুলে ডুবিয়ে দিয়ে গেল তৃষিত তাপিত সৃষ্টিপ্রাণ। সতীর চোখে আবার সেই আনত শুভদৃষ্টি। সত্যব্রতর চোখের সামনেও তখন একডালি রসরূপ সগন্ধ পুষ্পচন্দন। কথা তখন দু'জনেরই গান হয়ে গেছে।

আবার নতুন করে শপথ গ্রহণ। হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার—বলো আরও ভালোবাসবে, বলো—ভুল করে রাগের মাথায় কখন কি কথা বলে ফেলেছি সে কথা তুমি মনে ক'রে রাখবে না। দাবী আর দাবী—আর তার সর্তহীন স্বীকৃতি,—সবটাই তখন মধুর হয়ে উঠেছে দুজনের কাছে।

হাসি পায় সতীর তখন নিজের মনেই। এই আগেই না মনে

হয়েছিলো তার সব কিছু শেষ হয়ে গেল? এ আবার তবে কিসের স্বপ্ন! মুঞ্জরিত আশা-কাননে কামনার এত মৌমাছি তো ফুলের বাসরেও গুঞ্জরণ করেনি কোনদিন! মধুগন্ধের কোনই ব্যবস্থা নেই অথচ সমস্ত পরিবেশটাই যেন সুধাগন্ধে ভরে গেছে, ম' ম' করছে চারদিক। কি করে কি হয়ে গেল নিমেষে! ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে খুলে ধরে সতী নিজেকে। এত রূপ ছিলো নাকি তার? পলকে পলকে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গী, নাভি-কটি জঘনে কটাক্ষে নেত্রপাত, চুম্বন মধুনিঃশ্বাসে বসন্তের স্বাদু আস্বাদন। সারা দেহে সমুদ্রের ঊর্মিমালা সফেন লাস্যে মালা হাতে যেন শৃঙ্গারের একটি ঠমকে সুর ফাঁকতায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ত্রিতালের লয়ে পায়ের ঝিল্লরায় মেলা টানবার আগে।

বিকেলবেলাটায় বাড়ী ছিলো না সত্যব্রত। দুপুরে বলে গিয়েছিলো, সেজেগুজে তৈরী হয়ে থেকো। সন্ধ্যা নাগাদ এসে বিশ্বতোষের ওখানে যাবো। কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সতী। অলস দুপুরে বিশ্রাম নিতে গিয়েই হলো যত বিভ্রাট। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একা একা সে বিবাহিত জীবনের খতিয়ান খুলে বসলো—কি দিয়ে কি হলো না হলো। দুই আর দুয়েই চার হয়না অনেকসময় অঙ্কের হিসেবেই। আর এ তো মন দেওয়া নেওয়ার কূট বীজগণিত, হিসেবে কখনও মেলে? বাইরের অন্ধকার ঘরে ঢুকে আয়নায় কালো ছায়া ফেলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সম্বিৎ ফিরে আসে সতীর। এখনি সত্যব্রত ফিরে এসে হৈ-চৈ চেঁচামিচি সুরু করবে।

বিশ্বতোষের ওখানে যেতে হ'লে একটু সেজেগুজে যেতে হবে বৈ কি? আর হয়েছে এই বিশ্বতোষ। খালি শোন বিশ্বতোষের কথা। এটা চালে হয়েছে। অমন করিৎকর্মা লোক না কি হয়না। একটা খুঁটি বুর্জোয়া।

আশ্চর্য! দোষ দিচ্ছে না সতী কিন্তু বিশ্বতোষ কেমন মানুষ তা কি এখন তাকে সত্যব্রতর কাছে জানতে হবে? সব কথা বলা যায়না। অনেক সময়ই বোকার মতো শুধু চুপ করে শুনে যেতে হয়। সত্যব্রত জানেনা সত্যব্রতর সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগেই বিশ্বতোষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিলো সতীর। ভালোলাগেনি বিশ্বতোষকে। তাই না জড়িয়েই সন্তর্পণে চুপ ক'রে সরে এসেছিলো। সত্যব্রত জানেনা এতে ক'রে তাকে পরিবারের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। স্নেহান্ধ পিতার মনেও আঘাত করতে হয়েছে। আজ সে সব তুলে সত্যব্রতর কানে তুলে লাভ নেই। সত্যব্রতর ভালো লেগেছে বিশ্বতোষকে, ভালো কথা। এমন কথাও তো সতী বলতে চায়না যে বিশ্বতোষকে দেখলে সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু সত্যব্রতর কথামতো বিশ্বতোষের সঙ্গে কথায়-বার্তায় আচরণে যদি তার সৌহার্দ্যের মনোভাব তেমন ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে না-ই ওঠে আজ, তাতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে সত্যব্রতর? এখানে সত্যব্রতর কথা অমর্যাদা করবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। অথচ প্রশ্নটা উঠবে সেই দিক দিয়েই। এখানে সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে সতীর এমনি সব ইতিবৃত্তান্তের অবতারণা করতে হয়, যে তাতে ক'রে সতী নিজেই ছোট হয়ে যাবে।

এ কথা শোনবার, বা বোঝবার মতো ধৈর্য কোথায় সত্যব্রতর?

স্বর্ণবরণ চম্পক-বর্ণের ওপর হালকা প্রসাধনই মানায় ভাল সতীকে। কপালে পরে মাদ্রাজীকেউড়ীর খয়েরী টিপ। খোঁপায় পরে ফুলের বেড়। কানে দুটো হীরের ফুল। বিশ্বতোষের দেওয়া নেকলেসটা ইচ্ছে করেই আজ গলায় পরে নেয়। সতী ভাবে, আপ্যায়ন করবার আগেই আপ্যায়িত হয়ে যাবে বিশ্বতোষ। সত্যব্রত সঙ্গে থাকবে বলেই এটুকু উদারতা সে আজ দেখাতে পারে বিশ্বতোষকে। মেঘছেঁড়া জ্যোৎস্নার মতোই এক ঝলক হাসি খেলে যায় সতীর চোখের তারায়। অনুরাগে রাঙা এই জয়োল্লাস যার জন্যে, সে যদি তার মর্ম বুঝতো প্রতিটি মুহূর্তে সে এমনি ধারা বিজয়িনী হতে পারতো।

কথাগুলো শোনায় খেদের মতো। শোনাবেই ত। প্রত্যাশা সতীর অনেক কি না। কিন্তু সতী জানে এই দুঃখ এই ক্ষতি সাময়িক। আজই আছে, কাল তার কোন আফশোষ থাকবে না। কোন খেদ থাকতে দেবে না সত্যব্রত সতীর জীবনে।

ভয়শঙ্কা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সুখস্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে স্বর্ণসন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলে সত্যব্রত এলো ঝড়ের মতো। খোঁপা খুলে কৌটা মুছে বিস্রস্ত হলো রূপযৌবন। আবার নতুন ক'রে করো প্রসাধন। কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হলো অধরোষ্ঠ অভিমানে। রাগ ক'রে সতী বলে,—এতো ক'রে সাজলুম, দিলে তো সব নষ্ট করে? বেশ, এমনিই যাবো।

দুষ্টুমি ক'রে হাসে সত্যব্রত। বলে: যেতে পারো আপত্তি নেই। তবে আমাকে বাদ দিয়ে, একা-একা।

: কেন শুনি?

: চুরির দায়ে ধরা প'ড়ে সেধে মার আর কে খেতে চায় বলো? নাইট এরান্ট্রির এত বড় একটা সুযোগ পেয়ে তোমার বিশ্বতোষদা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন?

: সে বিশ্বতোষদা' কেন? যে কোন ইয়ং বেঙ্গল।

: তবে তো বাড়ীর বাইরে বেরুনোই উচিত হবে না আমার।

সতী কটাক্ষ ক'রে বলে: এখন থেকে সমঝে চলো। কক্ষণও আর এমনটি ক'রো না কিন্তু।

মাথা নেড়ে নিষেধ মানায়। কানের হীরে ঝিলিক দিয়ে ওঠে সতীর চোখে-মুখে। রমণীয় হয়ে ওঠে সতী সত্যব্রতর চোখে।

এবার কটাক্ষে কঠিন অনুশাসন। সংযত হয় সত্যব্রত। বলে—আচ্ছা ছেড়ে দিলাম। চটপট তৈরী হয়ে নাও।

এক টুকরো জয়। তবু তাতেই খুসী হয় সতী। এই খণ্ড খণ্ড জয় করতে করতেই জয়ী হবে একদিন।

সত্যব্রত এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো সতীকে। রূপসায়র উছলে উঠেছে তার চোখে। তার মনে হয় কোন অপ্সরী, মর্ত্যের সংসারে আগুন জ্বালাতে চলেছে।

: কই চলো?

সতীকে অগ্রবর্তিনী করে অনুগমন করে সত্যব্রত বিশ্বতোষের রথে।

১১

বিয়ের পর প্রথম আসছে সতী এ বাড়ীতে। তাই সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি রাখেনি বিশ্বতোষ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে প্রতীক্ষা বাড়ছে, সতী আসছে। ফটকের কাছে সশস্ত্রধারী দুজন পাঞ্জাবী শান্ত্রী ফৌজীকায়দায় দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের ভঙ্গীতে। বিশেষ কোন অতিথি আপ্যায়নের দিনে ওরা সামরিক আদবকায়দা মেনে চলে। গেটের দুধারে দুই থামের মাথায় সাদা বর্তুলাকার আলো ছাড়াও নীলচে আলোর ধারা নেমেছে আউটহাউসের ওপরকার দুটো ফ্লাডলাইট থেকে। সমস্ত লনটাকে উদ্ভাসিত করে সেই আলো ঠিকরে পড়ছে পাথরের নুড়িবিছানো রাস্তায়। পোর্টিকোতে অপেক্ষা করছে বিশ্বতোষ। শেলী চাটার্জীর সঙ্গে দীঘার সৌন্দর্যের কথা বলে সময় কাটাচ্ছে।

সতী-সত্যব্রতকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে অভিজাত ঘরের যে সব পুরুষ ও মহিলা আগে থাকতে এসেছেন, তাঁরা ছিটিয়ে আছেন বাগানে আর লনে। একখানা করে গাড়ী ঢুকছে আর ঘাড়গুলো তাদের মরালের মত তখ্‌খুনি ঘুরে যাচ্ছে। কলগুঞ্জন একটু থেমেই আবার কলহাস্যের কলকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

লনের এক পাশে ছোট্ট একটি চন্দ্রাতপের নীচে শেরি শ্যাম্পেন আর হুইস্কির বোতল সাজিয়ে সাদা পোষাকে বয়-বাটলাররা টেবিল সাজাচ্ছে। আর পামগাছের শ্রেণীবদ্ধ টবের আড়ালে বাজছে ব্যাণ্ড।

মধুনিশির মদির স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাসরে ঢুকছে কুমারী রাত্রি আসবের পেয়ালা হাতে।

কিন্তু সতী-সত্যব্রতকে চৌষ্ঠ না জানিয়ে পার্টি শুরু হতে পারবে না—সর্ত্তাধীন আমন্ত্রণ ছিল বিশ্বতোষের। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সকলে।

কার্ডের নির্ঘণ্ট মত পার্টি শুরু হবার কথা সাড়ে ছটায়। কিন্তু সতী-সত্যব্রত দেরী করে আসাতে পার্টি শুরু হলো সাতটারও পরে। অতিথিদের মধ্যে হোমরাচোমরা রহমান্য বিত্তশালী অনেকেই। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এমনিতে হয় তো তাঁরা ঘুরে চেয়েও দেখতেন না কে সত্যব্রত। কিন্তু অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতির দরুণ তাঁদের সকলের নজর গিয়ে পড়লো সতী-সত্যব্রতর ওপর। সতী ছিল সত্যব্রতর পাশেই। সোনালী বর্ডার দেওয়া কালো সিল্কের শাড়ীতে তাকে দেখাচ্ছিল মোহিনী এক যুবতীর মতো। বিশ্বতোষ মাঝখানে থেকে আলাপ করিয়ে দিল সত্যব্রতকে প্রত্যেকের সঙ্গে। স্বল্প কথায় ভূমিকা যা দিল বিশ্বতোষ সত্যব্রতর হাতে করে সবাই এই কথাই বুঝল যে মার্চেণ্ট বিশ্বতোষ এতদিন পর কাণ্টিনেণ্ট ফেরতা সত্যব্রতর মধ্যে একটি পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন দত্তগুপ্তর প্রারম্ভিক স্তুতিবচন শেষ না হতেই এগিয়ে আসেন লোহাপাট্টির ছত্রপতি শিবাজী ভগবানদাস লোহার। বংশপরম্পরায় লোহার কারবার করে করে সোনা আর লোহা তাঁর চক্ষে সমান হয়ে গেছে এখন। বিশ্বতোষের বাড়াবাড়ি প্রশংসার উত্তরে সতীকে নমস্কার করে বলেন, সোনাচান্দর কি আছে দেখী যায়

মশায়ের কত্তা আপনি—বহুত দামী আদমী আছেন আপনার পিতাজী—তাঁকে আমার নমস্কার দিবেন। ভগবানদাসের কথা শেষ না হতেই বিশ্বতোষ হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় সত্যব্রতকে পেট্রল কিং রঘুবীর সিং-এর কাছে। সৌখীন শিখযুবাপুরুষ রঘুবীর সিং-এর কথায় বার্মিংহামের বনেদী জমজমা। পাঞ্জাব তার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি মাত্র। আসলে ঘরবাড়ী তার সবই বিলেত। এইখানেই আলাপ হলো সত্যব্রতর মিলমালিক আম্মুভাই প্যাটেলের সঙ্গে। বিলেতে সহ-অবস্থানকালে যে দময়ন্তীর প্রেমপত্রের সুধাবিন্দা করে দিয়েছে, আজ সেই দময়ন্তীকে চাক্ষুষ দেখতে পেল সত্যব্রত। আম্মুভাই জড়িয়ে ধরল সত্যব্রতকে। স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে এনে সত্যব্রতর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললো, এই সেই দময়ন্তী। সোসাইটিতে অবিশ্যি রূপে গুণে দময়ন্তীর নামডাক ছিল যথেষ্টই। তবু প্রস্তাবনা নেই, কোন ভূমিকা নেই, দময়ন্তীরও একটু খটকা লাগলো প্রথমটা। সতীর মুখে তার ছায়াপাত হতেই হো হো করে হেসে ওঠে আম্মুভাই। সতীকে আশ্বস্ত করে হেসে বলে, Nothing intriguing madam. When at Paris we shared the same room and Satyabrata helped me in answering the lyrics of Damayanti as I had no Poetry in me.

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল সতী আর দময়ন্তী। আম্মুভাই-এর কথা শুনে ওরা দুজনেই হাসতে লাগলো দাপাদাপি করে। তারপর পরিচয়ের সূত্র ধরে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিল—সারা লনময় ভেসে বেড়াতে লাগলো সতী।

পার্টি জমে উঠেছে এতক্ষণে। জ্যাজ-এর দোলা গ্লাসে গ্লাসে ঠোক্কর খেয়ে মাথায় চড়ছে। অন্নদা বাবুর বন্ধু কণ্টাক্টর দেবীতোষ মুখুজ্যে জামাই সত্যব্রতকে হঠাৎ আপনজন ঠাউরে তারস্বরে নিজের ছত্রভঙ্গ ঘরসংসারের কাহিনী বলতে থাকেন। মীনাক্ষী যদি স্বেচ্ছায় ডাইভোর্স চায় তো দেবো ডাইভোর্স। আজ বিশ বছর সংসার করবার পর সে যদি মনে করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সে সুখী হবে, আমি জোর করে তাকে কক্ষনও ধরে রাখবো না। সত্যব্রতর প্রাণটাও আবার তখন এমনি স্পর্শকাতর হয়ে আছে যে, যে কোন দুঃখীর দুঃখ দেখে সে তখন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। দেবীতোষ বাবুর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে সে আরও খানিকটা হুইস্কি খেয়ে ফেলে। সতীর প্রাণ সব সময়ই ফুল্ল কুসুমিত। ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির ধার ধারে না সে। বিশ্বতোষের সঙ্গে থেকে সে শুধু সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়ায় ভেসে ভেসে।

সোসাইটি সতী আগেও দেখেছে, আগেও পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বতোষ যেন আজ গোটা একটি সোসাইটিটাকে এক তোড়ায় বেঁধে উপহার দিয়েছে সতীকে। প্রীতি সৌহার্দ্যের আভাস সুস্পষ্ট,—বিশ্বতোষের আচরণে প্রশ্ন নেই তাতে। কিন্তু তবু আলো-ঝলমল এই রাতের বাসরে একটা জিজ্ঞাসা যেন কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়ে যায়, সতী ঠিক বুঝতে পারে না।

রাত দশটা নাগাদ ঝিমিয়ে আসে পার্টি। বিশ্বতোষ আর সতী-সত্যব্রতকে নৈশ অভিবাদন জানিয়ে জুঁই জাঁই বেরিয়ে যায় গাড়ীর পর গাড়ী। রঘুবীর সিংজীকে বিদায় জানিয়ে বিশ্বতোষ সত্যব্রতকে বলে, রাজাগজা কেউই নন এঁরা কোনদিন কিন্তু একটা কথা মিঃ সেন জেনে রাখবেন যে কর্তৃত্ব এঁদের যে কোন সিংহাসনে। আপনার সঙ্গে যে পরিচয় হলো, দেখবেন বৃথা যাবে না।

জ্যাজ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। আসর প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। একান্ত পরিচিত আত্মীয় বন্ধু ছাড়া আর বড় কেউই নেই কোনখানে। পামগাছের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে হয় তো একটু একাকীত্ব খুঁজছিল বিশ্বতোষ। এমন সময় খণ্ড মেঘের মত ভাসতে ভাসতে সতী এসে দাঁড়াল পাশে। ঘুরে তাকায় বিশ্বতোষ। দেখে, একটা তাজা লাল গোলাপ কেউ হাত দিয়ে ঘেঁটেছে যেন। ছুটোছুটি করে সম্ভাষণ জানাতেই একটু ম্লান হয়ে গেছে সতী। তবু রাতের পরিপ্রেক্ষিতে এই মৌনরূপই যেন মানিয়েছে ভাল। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে সতীকে। কিন্তু বিশ্বতোষ সেকথা গোপন করে যায়। বলে: সত্যব্রত এলো না?

হাসে সতী। বলে, না আমিই এলাম। অন্যায় হলো?

: অবাক করলে:

: নয়তো কি? খালি শোন মুখে সত্যব্রত! আমি ছাড়া বুঝি পার্টি হ'তো?

: কক্ষনো না। আজকের অনুষ্ঠানে তুমিই তো মক্ষিরাণী সতী। হাজারটা চোখ শুধু তোমাকেই দেখেছে।

: তুমি বুঝি তাই ফিরে দেখলে না!

: অবকাশ আর কখন পেলাম বলো? রথী-মহারথীরা বিদায় নিতেই আড়াল করে দাঁড়াল সত্যব্রত সেন। ঐ যে, এক মুহূর্ত অদর্শনের পরই দেখ ছুটতে ছুটতে আসছে এই দিকেই।

সতী ফিরে দেখে, সত্যিই ছুটতে ছুটতে আসছে সত্যব্রত। উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে বলে, কোথায় ছিলে বল তো?

সত্যব্রত বলে, কটন কিং আম্মুভাইকে বিদায় জানিয়ে এলাম।

সত্যব্রতর কথার উত্তরে টিপ্পনি কেটে সতী বিশ্বতোষকে লক্ষ্য করে বলে, কিন্তু রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে আর কোন রাজাগজা। তুমি একা কেন?

সতীর ঠাট্টা ধরে ফেলে বিশ্বতোষ। হেসে বলে, ভুল করলে সতী! আম্মুভাই-এর মিলের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের ওপর শেয়ার এখন ওরিয়েণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজের। আর আজকেই আমি মিলের নামটা কোম্পানীর ডিরেক্টরস মিটিং-এ উত্থাপন করেছি কোন্ সূত্রে। সুতরাং···বাকি কথাটা চেপে নিয়ে বিশ্বতোষ বলে, খবরটা অবিশ্যি তোমার জানবার কথা নয়। আমি নিজেও উত্থাপন করতাম না, যদি না তুমি সেনকে ছোট করতে।

বিশ্বতোষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয় সতী। তবু পরিহাস করে হেসে বলে, তা হলেও বড় জোর পার্শ্বচর হলো।

: রাজা তো আর নয়?

সৌহার্দ্যের হাল্কা আবহাওয়াটাকে বজায় রেখেই সত্যব্রত সতীর কথার প্রতিবাদ করে। বলে, এ তুমি হিংসে করছো সতী!

কা'কে? তোমাকে? ঠাট্টাছলে ঘুরিয়ে দেয় কথাটা সতী। বলে, ইস, হিংসে কথাটার মধ্যে আত্মশ্লাঘার একটা রেশও শোনা যায় কানে। কিন্তু তারিফ করতে গিয়ে তার ঠোঁটের সবটুকু রক্ত যেন শুকিয়ে যায়। সাদা ফ্যাকাশে দু কুচি ঠোঁট আক্ষেপ করে বলে ওঠে পরমুহূর্তেই, চলো বাড়ী চলো।

সত্যব্রত গদগদ হয়ে বলে, why the night is still

young টলে টলে কথা বলে সত্যব্রত: বন্ধুভাগ্যটাকে হিংসে করছো তো ?

তাদের খেলা চলছে কথাবার্ত্তায়। একটু অসতর্ক হলেই বেকাঁস কিছু হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়াটাকে যতটা সম্ভব হালকা রেখেই খিল খিল করে হাসে সতী। বলে, তা কে আর কোন বন্ধুর খাতিরে এত বড় পার্টি দিচ্ছে বলো ?

সতীর কথায় হেসে উত্তর করে বিশ্বতোষ। বলে, এতক্ষণে সতী যাই কেন বল না, তোমাকেও হিংসুটে লাগছে। সত্যব্রতকে তুমি হিংসে করতে পারো না।

রাত হয়েছে। আয়াস করে কথা বলা,—কথাও আর আসছে না মুখে যেন। সত্যব্রত কিন্তু তখনও সতীর মুখ থেকে একটা অভিনব কিছু শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়ে আছে। অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে চোখ-মুখটা কেমন জ্বল-জ্বল করছে। বিশ্বতোষেরও কম আগ্রহ নেই সতীর কথায়। সবটা থেকে সেও কোন কিছু পাল্লা করবারই চেষ্টা করছে মনে হয়। কিন্তু সতী আর পেরে উঠছে না পাল্টা-পাল্টিতে অত্যন্ত ভারী লাগছে আবহাওয়াটা। এগুতে গিয়ে সত্যব্রতর পা-টা আর একবার টলে গেল। এর পর কথাও নিঃসন্দেহ টলতে সুরু করবে। বিব্রত বোধ করে সতী। বলে, চল চল বাড়ী চলো। রাত হয়েছে।

চলো। স্নেহভার টেনে গাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে যায় সত্যব্রত সতীর কাঁধে ভর দিয়ে।

হিংসে-অসূয়াই যদি বাসা বাঁধবে মনে এতখানি আন্তরিকতা নিয়ে বলে কি করে কথা বিশ্বতোষ। এও তো বড় আশ্চর্য্যের কথা, আড়াল করে দাঁড়াল সত্যব্রত আর বিশ্বতোষ অমনি তা ই স্বীকার করে নিল ? অবাক লাগে সতীর। হবেও বা। নাগালের বাইরে চলে গেছে বলেই হয় তো বিশ্বতোষ আপনা থেকেই ভেতরে গুটিয়ে গেছে। তারপর গোটা মানুষটাই বদলে গেছে আস্তে আস্তে। তারপর সত্যব্রতর সঙ্গে সৌহার্দ্দের সম্পর্কটা তো নিজের চোখেই দেখলো সতী। অস্বীকার করবার তো কিছু নেই। নইলে এক মুহূর্ত্ত অদর্শনের পর ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে সতী ছেড়ে বিশ্বতোষের চোখে সত্যব্রত সুন্দর হয়ে ওঠে কি করে ? অনুকম্পায় ভরে ওঠে সতীর মন বিশ্বতোষের জন্যে। বিদায় নিতে গিয়ে বলে, একদিন এসো না সময় করে।

: বেশ তো। যেতে বললেই যেতে পারি।

: নেমন্তন্নের অপেক্ষা করছিলে বুঝি ?

: একটা অপেক্ষা থাকে তো বলতে হবে !

: এইবার আসবে তো ?

: আসবো।

গাড়ীতে উঠে মুখ বার করে কথা বলে সতী। বলে: তোমার গাড়ীটা পেয়ে কিন্তু আমাদের ভারী সুবিধে হয়েছে।

: আমার আবার কি ? গাড়ী তো সেনের।

: তার আমি কোন খবর রাখি না ?

: সেই ভরসাতেই তো দিয়েছিলাম গাড়ী। কি জানি, অমলা রায়ের মেয়ে, পরের গাড়ীতে যদি আবার পা না দাও !

: অমলা রায়ের একখানা ছেড়ে পাঁচখানা গাড়ী আছে। মেয়ের কিন্তু একখানাও নেই।

: অমলা রায়ের মেয়ের কাছে ছুটোই বিলাস। গাড়ী যখন একখানা ছেড়ে পাঁচখানা ছিল তখন দেখেছি তোমাকে পায়দলে চলেছ। আবার দেখলাম পাঁচখানা ছেড়ে একখানাও নেই, গাড়ী ছাড়া তুমি চলতে পারছো না। গাড়ী থাকা না থাকায় তো কথা নয় সতী, আসল কথা হলো চলাটা। চলনটাই তোমার এমন ধারা, কি বলবো···! গাড়ীর ওপর ঝুঁকে পড়ে তুড়ি বাজিয়ে ছন্দ খোঁজে কথায় বিশ্বতোষ। বলে, এর পর মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে কথা ছেড়ে কাব্য করতে হয়। কিন্তু তুমি তো জান সতী, কবিতা আমার কোনদিনই আসে না।

স্মিত হেসে সতী বলে, আচ্ছা পরের দিন শুনবো সে কাব্য।

: সে তো নিছক গদ্য।

: গদ্য ছন্দে পদ্য হতে বাধা নেই।

: আচ্ছা: গুড নাইট,—Happy dreams, সত্যব্রতর মাথা তখন গাড়ীর পিঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে ঢুলঢুল হয়ে। ফরাসী সুগন্ধ 'কোন একটি ফুল'এর সুবাসে সুবাসিত সতীর পিঠ ছুঁয়ে, ছুঁয়ে সে শুধু আবৃত্তি করে চলে, 'চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা···'

আলিপুর এভিন্যু ধরে গাড়ী তখন ছুটে চলেছে তীরের মত।

অনেক রাত। ছত্রভঙ্গ আসরের মাঝখানে চকচকে তেলেভা কাঠের চেয়ারগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতে গিয়ে দেয়ালী পোকায় ভিড়ে বিশ্বতোষ দেখে শ্রাবস্তীর কারুকাজ করা এক বনলতা সেনের মুখ। সতীর মুখের সঙ্গে তার হুবহু সাদৃশ্য আছে। [ক্রমশঃ।

নবসূর্য্য

[আশীর্ব্বাণী]

বসুমতী মাতা ভবতারিণী দেবী রচিত

নবীনের নবসূর্য্য ঘোষিয়া বিজয় তূর্য্য
উপনীত তোমাদের দ্বারে,
হয়ে এক মন-প্রাণ হও সবে আগুয়ান
শ্রমদানে তুষ্ট কর তাঁরে।

তোমাদের ভাবীকাল রচে সুখ-স্বপ্নজাল
অবহেলি ছিন্ন নাহি কর,
বিজাতীয় পদস্পৃষ্ট অনশন ব্যাধিক্লিষ্ট
এ ভারতে পুনঃ তুলে ধর।

করি তারে রণ দান বাড়াও জাতির মান
দেশমাতা হবে তব ধন্য,
স্বার্থে করি বিসর্জ্জন নিষ্ঠারে কর অর্জ্জন
ধরাতলে হও হে বরেণ্য।

ধারাবাহিক উপন্যাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

সিঁড়ির নীচে দারোয়ান-চাকরদের বিশ্রাম করবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পরমেশবাবু যখন হিমাদ্রিকে রঞ্জনাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার জন্যে বিধিমতে তালিম দিচ্ছিলেন তখন যে মানুষটা আড়ি পেতে সেখানকার সমস্ত কথাগুলো বর্ণে বর্ণে শুনছিল তার নাম ভজহরি নয়—তার নাম রঞ্জনা।

পরমেশবাবুর চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে সে-ই দাঁড়িয়ে ছিল ওদের দুজনার অলক্ষ্যে—সিঁড়ির ওপরের বাঁকটায়। প্রথমে অবশ্য আড়ি পাতার উদ্দেশ্য নিয়ে মোটেই আসেনি সে। এসেছিল হিমাদ্রিকে ফেরাতে।

দোতলায় হিমাদ্রির সামনে একা বসে থাকতে তার ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল, সেটা সত্যি। কিন্তু অমন করে উঠে গিয়ে আরও বেশী সংকোচ হচ্ছিল তার। পাছে তার আচরণে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে মিনিট দু'য়েক পরেই সে আবার ফিরে এসেছিল ড্রইংরুমে। কিন্তু এসে দেখলে সবেমাত্র বন্ধকরা পাখাটা যোশান্ চেক্ করে আস্তে আস্তে থেমে আসছে।

হিমাদ্রি নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে।

আরও ভয় হলো। মনে হল নিশ্চয় হিমাদ্রি কিছু মনে করেছে তার ব্যবহারে। তাই সে হিমাদ্রিকে আর একটু বসতে অনুরোধ করবার উদ্দেশ্যে নেমে আসছিল নীচের। হঠাৎ কানে এলো—খুকীকে চলে যাচ্ছি বলে নেমে এসেছো তো? ভালোই হয়েছে। আর যেতে হবেনা ওপরে। একটা গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে।......দেখো রঞ্জনার কানে যেন যায় না কথাটা—ইত্যাদি।

পা'দুটো আপনা হতেই কেমন যেন আটকে গেল। এভাবে কারো কথা শোনাটা যে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ সে নীতিজ্ঞানটুকুও লোপ পেল একেবারে।

ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের সমস্ত কথাই কানে এসেছে। পরমেশবাবুর কথার ভাবার্থ আর গোপন নেই রঞ্জনার কাছে। কথার মধ্যে আকারে ইংগিতে তাকেও অবশ্য কিছুদিন থেকেই এ ধরণের একটা আভাস দিচ্ছিলেন পরমেশবাবু। কিন্তু আজকের মন্তব্যগুলো শোনবার আগে পর্য্যন্ত এমন স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি এ বিষয়ে।

খাওয়া'দাওয়ার পরে তাই আজ পরমেশবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিল রঞ্জনা।

—কী লজ্জা! অন্ধ মোহে বাবা এ কী কাণ্ড করে চলেছেন! কাছ থেকে মৌনসম্মতি পেয়েই হবে বাবা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চাইছেন।

উঃ, কী করে হিমাদ্রিকে বোঝাবে রঞ্জনা এই নির্লজ্জ কাঙালপনার মধ্যে তার এতটুকুও অংশ নেই?

হায় ভগবান! এত লজ্জা এত কলংকও অদৃষ্টে ছিলো! এমন করে যেচে প্রেম আর কেঁদে সোহাগ করাকে রঞ্জনা যে কত ঘৃণা করে তা কী একদিনের তরেও কেউ বুঝলো না? দুনিয়ার কাছে তার আত্মমর্য্যাদাটুকু পর্য্যন্ত বজায় রাখতে দিলো না কিছুতে?

হিমাদ্রি সম্ভবতঃ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

এ ধরণের প্রগল্ভতার পর সেটা কতখানি মর্মান্তিক লজ্জার হবে সেটা কী একবারও ভেবে দেখেছেন বাবা?

অথবা যদিই হিমাদ্রি কৃপাকটাক্ষে পুরোন দিনের ভালবাসার মর্য্যাদা ভুলে রঞ্জনার পাশে এগিয়ে আসতে চায়, তবে রঞ্জনাই কী পারবে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আগেকার মত তার কাছে যেতে? আত্মসমর্পণ করবার আগেকার সেই প্রবৃত্তি তার আছে কী? আর কী তা হয়? যে দিন একবার হারিয়ে গেছে প্রাণপণ সাধনাতেও কী আর তা ফিরে পাওয়া যায়?

তা ছাড়া সব থেকে বড় কথাটাই যে ভুলে যাচ্ছেন বাবা। সেদিনের রঞ্জনার কাছে হিমাদ্রির ঘরে যাবার মতন যা কিছু উপকরণ ছিল আজ তার ক'টাই বা আছে?

কোন্ অধিকারে কোন্ দাবীতে আজ আর সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে রঞ্জনা? সে মর্যাদা পাবার মত কী পরিচয় আজ আর আছে তার?

তাছাড়া একদিন স্বেচ্ছায় যে জিনিষ ত্যাগ করেছিল রঞ্জনা আজ ইচ্ছা করা মাত্র সে জিনিষ সে কী ফিরে পেতে পারে? এ দুনিয়ায় তা কী কখনও সম্ভব হয়?

না না, রঞ্জনা তা চায় না। চাইলেও পাবার অধিকার তার নেই।

জীবনে যারা শুধু পেয়েই সন্তুষ্ট—নিতে পেলেই সুখী হয়, তাদের দলে ভিড় বাড়ায় নি রঞ্জনা—আজও বাড়াবে না। পরস্পর আদান-প্রদান ছাড়া জগতে কোন সম্পর্কই কোন দিন স্থায়ী হতে পারে না—সে কথা সে ভালো করেই জানে।

তাই আজ যখন রঞ্জনার দেবার মত আর কিছু নেই তখন আর শুধু নেবার জন্যে কাঙালের মত কারো কাছে হাত বাড়াবে না সে—

পরমেশবাবু হয়ত ভাবছেন, রঞ্জনার জীবন থেকে এই ছ'টা মাসের স্মৃতি মুছে ফেলে দেবেন। যে করেই হোক্ তালি দিয়ে একটা দিক্‌নির্ণয় করে জুড়ে চালিয়ে দেবেন রঞ্জনার পালছেঁড়া জীবনের নৌকাটাকে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে?

মিথ্যার এত বড় তালিতে কোন জিনিষ কখনও চলতে পারে? সে তালি তো একদিন ফাঁসবেই। সেদিন ভরাডুবি আটকাবে কে? ···কিন্তু পরমেশবাবু দারুণ আঘাত পাবেন। এত ঘাত-প্রতিঘাতেও বোধকরি এই একটি আশা নিয়ে তিনি আজও দাঁড়িয়ে আছেন। ভেঙে পড়েননি।

কিন্তু নিজের হাতে রঞ্জনা যদি তাঁর এ আশাটাও ভেঙে চুরমার করে দেয় তাতে তাঁর মেণ্টাল ব্রেকডাউন হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া একথাও স্বীকার করতেই হবে যে, হিমাদ্রি তাঁর একান্ত অনুগত। সে যে ঘটনার পর আজও এ বাড়ীতে আসে, নিঃসঙ্গ পরমেশবাবুকে পাঁচটা কথাবার্তা বলে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে, তাতে সত্যিই তার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু সে মহৎ সে উদার সে ভদ্র বলেই কী এত বড় সুযোগ নেওয়া উচিত হবে রঞ্জনাদের?

এই কথাটাই আজ স্পষ্ট করে পরমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করবে রঞ্জনা। তার জন্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিল সে। ও নিশ্চিত জানে, স্নানাহার করতে যত দেরীই হয়ে যাক রাত্রে শুতে যাবার আগে পরমেশবাবু একবার এ ঘরে আসবেন। সেই যে একদিন রাত্রিবেলায় ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠেছিল রঞ্জনা তারপর থেকে রোজ শুতে যাবার আগে একবার করে এঘরে আসেন পরমেশবাবু।

বেশীর ভাগ দিনই রঞ্জনা তখন ঘরের জোরালো আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে বিছানার ওপর।

পরমেশবাবু এসে বসেন ওর বিছানার একধারে। গল্প করতে চেষ্টা করেন একটু। তারপর এ কথা সে কথার মধ্যে দিয়ে রোজই একবার করে অনুরোধ করেন—তুই বরং আমার ঘরে শুবি চল্ না মা! মায়ে-পোয়ে শুয়ে শুয়ে দুটো সুখদুঃখের কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়ি। তোকে এ ঘরে রেখে ও ঘরে গিয়ে শুতে মন সরে না আমার।

রঞ্জনা আপত্তি করে। বলে—না বাবা, আমি এইখানেই বেশ আছি। নিজের জায়গায় না শুয়ে কিছুতে ঘুম আসতে চায় না আমার। তুমি ভেবো না আমার জন্যে।

পরমেশবাবু তবুও ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাননা। একটুও তাড়াতে পারেন না সেগুলোকে। উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন—কী জানি মা, তোর শরীরটা আজকাল এত কাহিল হয়ে গেছে যে তোকে একলা ঘরে শুতে দিতেও ভয় হয় আমার।

রঞ্জনা জানে, পাছে সে ভয় পায় রাতে সেইজন্যেই বাবা তাকে একলা শুতে দিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু উপায় কী? বাবার ঘরে গিয়ে শোওয়া যে তার পক্ষে অসম্ভব।

এ ঘরে শুলে তবু বাবার চোখ এড়িয়ে ঘুম-না-আসা রাতগুলো কোন রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কদাচিৎ মধ্যরাতে বাবা যদি ঘুম ভেঙে গেলে তাকে এ ঘরে দেখতে আসেন তবে তার চটির আওয়াজ শুনে সতর্ক হয়ে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকাও অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। কিন্তু সারাটা রাত যদি তাঁর চোখের সামনে শুয়ে থাকতে হয় তবে হয়ত নিজেকে তাঁর কাছ থেকে লুকুতে পারবে না রঞ্জনা। তাঁকে আরও ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে এর ওপর নিজের অসুস্থতার খবর দিয়ে। তার চেয়ে বরং যত কষ্টই হোক একা-একা এ ঘরটায় শুয়ে থাকা অনেক ভালো।

কিন্তু এ ঘরে শুয়ে থাকতেও রঞ্জনার ভারী কষ্ট হয়—ভয় করে। জেগে জেগে শুয়ে রাত কাটানো তবুও ভালো, তাতে নিজের মনের ভাবনাগুলোই হুল ফোটায় শুধু। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট হয় একা শুয়ে বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে যদি কোনদিন কোন সময় তার দুটি অবসন্ন নয়নে ঘুম আসে—তখন? কারা যেন সব এসে দাঁড়ায় ওর চার পাশে। বলে—বসেন, রোঞ্জনা দেবী, দোয়া করে বসেন গরীবখানায়। আরাম করুন, চা নিন—ওদের কথা বলার ভঙ্গী চোখের চাউনি সবই যেন অসহ্য লাগে রঞ্জনার কাছে।

রঞ্জনা সভয়ে সরে আসতে চায়—পালাবার চেষ্টা করে ওদের কাছ থেকে। কিন্তু পালাতে পারে না। ওদের ঘরের চারদিকে আট ফুট গরাদওলা জানলাগুলো জেলখানার মত বন্ধ থাকে। তার থেকে মুক্তি নেই—হাজার মাথা কুটলেও নিষ্কৃতি নেই সেখান থেকে। তবু তখন কী জানতো রঞ্জনা যে ওই জানলাগুলো আদপে জানলাই নয়? ওগুলো সব দরজা। ইচ্ছা মত চাবি ঘুরিয়ে খোলা যায় বাইরে থেকে।

তাই ও যখন বাইরে যাবার জন্যে চীৎকার করে কেঁদেছিল, সমস্ত শক্তি দিয়ে পাগলের মত যুঝেছিল ওদের সঙ্গে—তখন ওরা হা-হা করে হেসেছিল শুধু। বলেছিল—এ কী কখনও হয় বিবিজান? চিড়িয়া তো এখন খাঁচায় বন্ধ হয়ে গেছে।

···বুকের মধ্যেটা কেমন যেন খালি খালি বলে মনে হয় রঞ্জনার। জ্বালা ধরে যায় সারা শরীরে।

তারপর একটা চলন্ত মোটরের আওয়াজে ভোঁ ভোঁ করে মাথার ভিতরটা। ছুটে পালাতে চায় রঞ্জনা। চীৎকার করে উঠে ঘুমটা যখন ভাঙে তখন ঘেমে নেয়ে গেছে সে। তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে গেছে গলার ভেতরটা। বুকের কাছটায় কাঁপছে থরথর করে। উঠে ঘাড়ে মাথায় একটু জল দিতে চায় রঞ্জনা কিন্তু সারা শরীরটা অবশ হয়ে থাকে, উঠতে পারে না। রঞ্জনার ভারী কষ্ট হয় তখন। একা শুয়ে থাকতে বুড্ড ভয় করে।

কিন্তু এ সব কথা বাবাকে বলে কী লাভ? এর আর কী প্রতীকার করবেন বাবা? বুড়ো মানুষটার চিন্তার পরিমাণটা আরও একটু বাড়বে বৈ তো নয়।

—উঃ, মাথার যন্ত্রণা আবার একটু একটু বাড়ছে। ঘাড়ের কাছটা আবার দপ্‌দপ্ করছে সেই রকম। বাবাকে না বলে একবার ডাক্তার দেখাতে পারলে মন্দ হত না—কিন্তু বাবা যে টের পেয়ে যাবেন? এমনিতেই তো রঞ্জনার জন্যে সর্বদা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, তাতে আরও অস্থির হয়ে পড়বেন এ সব কথা শুনলে। থাকগে, বাবাকে আর কোন রকম ত্যক্ত করবে না রঞ্জনা।

তার জন্যে বাবা অনেক সহ্য করেছেন—অনেক ধৈর্য ধরেছেন

তার মুখ চেয়ে। যে আঘাতে মা শেষনশ্বে নিলেন, কেবল রঞ্জনার মুখ চেয়ে সে আঘাত বাবা মুখবুজে সহ্য করেছেন। পাছে রঞ্জনার মনে ব্যথা লাগে তাই কোনদিন মুখ ফুটে একটা আক্ষেপ—এমন কী একটা প্রশ্ন পর্য্যন্ত করেন নি। কিন্তু মনটা যে তাঁর কতটা ঝাঁঝরা হয়েছে তা রঞ্জনার চেয়ে বেশী কে বুঝবে?

ভাবতে ভাবতে রঞ্জনা ডান হাতে নিজের মাথাটা টিপে ধরে দুই পাশে। একবার উঠে বসে পরমেশবাবুর আগমনের পথটা তাকিয়ে দেখে ভালো করে। কৈ না, বাবা তো আসছেন না এখনও? আবার আসতে আসতে শুয়ে পড়ে রঞ্জনা। মাথাটা আজ তার বজ্ঞ ধরেছে। বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছে না যেন।

—আচ্ছা, বাবা তো সবই জানেন। হাজারিবাগ হসপিট্যাল থেকে এসে তো মায়ের কাছে সবই বলেছিল রঞ্জনা। কিছুই গোপন করেনি। তবে? বাবা কী আর শোনেন নি মায়ের কাছে?

কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে আশ্চর্য্য লাগে রঞ্জনার। রঞ্জনাকে কোনদিন কোন প্রশ্ন করা তো দূরের কথা, তাঁকে দেখলে মনেও হয় না তিনি সুজন বলে কারোকে কোনকালে চিনতেন।

রঞ্জনা বুঝতে পারে রঞ্জনাকে ভোলাবার জন্যেই তিনি এমন করে সুজনকে ভোলবার সাধনা করছেন।

কিন্তু ঐ তাঁর নিতান্ত ব্যর্থ প্রয়াস। রঞ্জনা কী পারবে সুজনকে ভুলতে? এ কী জলের দাগ?

সুজন যে রঞ্জনার বুকে-পিঠে গরম লোহার শিক পুড়িয়ে দাগা দিয়েছে। সে-দাগা কী কোন দিন মিলিয়ে যেতে পারে?

ভালো ব্যবহার মানুষ হয়ত একদিন ভুলে যায় কিন্তু এত কঠিন এত নির্মম ব্যবহার মানুষ ভোলে কী? অতি বড় সোহাগিনীও বহুকাল স্বামীর ঘর করার পরে বিধবা হয়ে হয়ত কোন একদিন সে স্বামীকে ভোলে। কালের গতিতে বিস্মৃতির স্তর জমে ওঠে মনে। কিম্বা স্বামীর হাতে নির্য্যাতিতা কোন মেয়ে বহুদিন অদর্শনের পর মনে মনে ক্ষমা করে স্বামীকে।

কিন্তু রঞ্জনা? রঞ্জনা কী পারবে? স্বামী হয়ে তার সঙ্গে যে ব্যবহার সুজন করেছে, তা কী জীবনে কোন দিন তার পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব?

বাবা কি যেন বলছিলেন হিমাদ্রিকে! সুজন মারা গেছে? মোটর এ্যাক্সিডেণ্টে? উঃ, তাই যদি সত্যি হোত? তাতে বোধ হয় এর চেয়ে অনেক সুখী হত রঞ্জনা। নিজের মনের মধ্যে সুজনের যে মূর্ত্তিটা দেখে সে আজ ঘৃণায় শিউরে ওঠে তার চেয়ে মোটর এ্যাক্সিডেণ্টে থেঁতলে-যাওয়া শরীরটা ঢের বেশী সুন্দর থাকতো রঞ্জনার কাছে।

সে শরীরটা জড়িয়ে ধরে পথের ধুলোয় শুয়ে চীৎকার করে কাঁদতে পারতো রঞ্জনা। শত দুঃখের মাঝেও খুঁজে নিতে পারতো নিজের দুর্ভাগ্য-জীবনের শেষ পরিণাম।

সে-পরিণামের বেদনার দুঃখ যত দুঃসহই হোক্, তবু তাতে এমন বঞ্চনার লজ্জা নেই।

ছিঃ ছিঃ, এমন করে কারুর সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত ভালবাসা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যেতে পারে মানুষে? কি বিচিত্র প্রকৃতি একটা লোকের সাথে যে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছিল রঞ্জনা! যার ফলে নিজে সে আজ সম্পূর্ণ রিক্ত—নিষ্ফল বজ্রে-পোড়া গাছের মত। স্বেচ্ছায় কৃতকর্মের হাজার অনুশোচনাতেও মনের খেদ মেটে না আজ।

শুধু সুজনের একটা দক্ষতার কথা ভেবে আজও বিস্মিত না হয়ে পারে না রঞ্জনা।—সেটা সুজনের অভিনয়-পারদর্শিতার কথা। কী অদ্ভুত অভিনয়ই না সে করে গেল রঞ্জনার সঙ্গে—সেই প্রথম দিন থেকে এই শেষ দিন পর্য্যন্ত। যাতে একদিন এক লহমার জন্যেও রঞ্জনা তাকে সন্দেহ করতে পারে নি। তার আসল স্বরূপটা যে কতটা নিকৃষ্ট কতটা জঘন্য, তা কল্পনাতেও ভেবে দেখবার সুযোগ পায় নি কোনদিনের তরে।

সব অভিনয়। রঞ্জনার সঙ্গে সুজনের যত কিছু কথাবার্ত্তা যত কিছু আচার-আচরণ সমস্ত—অভিনয়। প্রায় এক বছর ধরে সুজন যা কিছু করেছে যা কিছু বলেছে সবই শুধু অভিনয়।

আচ্ছা তাই কী?

আজ মনে হয় মাঝে মাঝে সুজন যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যেত, সেই বা তার অভিনয় ছাড়া আর কী হতে পারে? কিন্তু তখন রঞ্জনা সত্যিই কাতর হতো ওর বিষণ্ণ মুখ দেখলে। কাছে এসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে খোসামোদের সুরে জিজ্ঞাসা করতো—কী হয়েছে তোমার বলো তো? এত কী ভাবছো আজকে?

তখন হঠাৎ কেমন যেন ছলছল করে উঠতো সুজনের চোখ দুটো। রঞ্জনার হাত ধরে কাছে টেনে নিতো অকারণে। বলতো —চলো রঞ্জন, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না—কোনদিন যেতে পারবে না।

ওর কথা শুনে খিলখিল করে হাসতো রঞ্জনা। নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতো—আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী? বলো কোন ঘাটে ভিড়াবে তোমার সোনার তরী?—বলি তোমার কী মাথা পাগল হল না কী? বাড়ী থেকে গেলাম পাটনা সেখান থেকে গেলাম লক্ষ্ণৌ আবার সেখান থেকে আগ্রা—এই করেই তো বেড়াচ্ছি অনবরত। তাতেও তোমার আমায় নিয়ে পালাবার সখ মিটলো না এখনও?

রঞ্জনার হাতের পাতা দুটো টেনে নিয়ে তাইতে নিজের মুখটা ঢেকে বসে থাকতো সুজন—কথা বলতে না। কোন কথা বললেও দিতো না রঞ্জনাকে। কথা বলবার বা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলেই বলতো—লক্ষ্মীটি রঞ্জন, কথা বোলো না এখন। কোন কথা জানতে চেয়ো না আমার কাছে, প্লিজ। শুধু একটু চুপ করে বসো আমার কাছে।

বাধ্য হয়ে তখনকার মত চুপ করে গেছে রঞ্জনা। পরে আবার একসময় চেপে ধরেছে সুজনকে। বলেছে—আজ তোমায় আমার কাছে বলতেই হবে কী ভাবো তুমি অমন করে মাঝে মাঝে। তখন সুজন হেসেছে। বলেছে—কেন আমার ওপর এমনই বা কী দাবী আছে তোমার যে তোমাকে ছাড়া আর কিছু চিন্তা করবারও অধিকার নেই আমার?

রঞ্জনা বলেছে—ও সব বাজে কথায় আজ আর ভুলবো না। আমি, আমায় বলতেই হবে কী তোমার এত ভাবনা।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সুজনের মনোবেদনার আদি-অন্ত

খুঁজে পায়নি রঞ্জনা। নানান্ রঙ্গভঙ্গী নানান্ রহস্যবিদ্রূপের ঘূর্ণীতে ফেলে সুজন ঠিক তলিয়ে দিয়েছে রঞ্জনার প্রশ্নটাকে।

তাই তো সময় সময় সুজনের ব্যবহার প্রহেলিকা বলে বোধ হত রঞ্জনার। বিশেষ করে ইদানিং তো ওর ব্যবহারে রীতিমত ধোঁকা লাগতো মনে।

আজ অবশ্য আর কোনখানে ধোঁকা নেই। সুজনের সব কথা সব কিছু আচরণের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কোনখানে আর বুঝবার বাকী নেই রঞ্জনার। সে সবগুলো আজ আপনা হতে এসেংপূরুষ্কান পূরণের প্রশ্ন সমাধানের মত পর-পর বসে গেছে রঞ্জনার চোখের সামনে।

তখন কিন্তু মনে হোত—নিশ্চয় এমন একটা কোন ব্যথা আছে সুজনের মনের গভীরে যা তাকে মাঝে মাঝে এত বিচলিত করে তোলে। সেটা যে কী তা জানবার হাজার চেষ্টা করেও রঞ্জনা কোনদিন তা জানতে পারেনি। যতবার যত কথার পৃষ্ঠে তা জানতে চেয়েছে ততবারই তাকে এড়িয়ে গেছে সুজন। পাশ কাটিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে সুকৌশলে। কিন্তু তখন কী রঞ্জনা বুঝতো এতো !

বরং পাছে এ নিয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করলে সুজন ব্যথা পায় তাই নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে কোনদিন তাকে খুব বেশী উৎপীড়ন করেনি।

বিয়ের আগে অবশ্য সুজনের মনের এই গভীর ব্যথার এতটুকুও আভাস জানতে পারেনি রঞ্জনা। তখন একটা চপলমতি বাচ্ছা ছেলের মত সহজ মনে হোত সুজনকে। ওর রকম দেখে হাসি পেতো রঞ্জনার। গান শোনবার খেয়াল হলে গান করিয়ে করিয়ে ও দম ছুটিয়ে দিতো রঞ্জনার। বেড়াতে যাবার মন হলে জামা-কাপড় পরতে একটু সময় দেবারও ওর ধৈর্য্য থাকতো না। ও সব সময়ই অবুঝ আর উদাস। সবতাতেই উচ্ছাস-প্রবণ।

বিয়ের পরে অবশ্য ঠিক আর এতটা সহজ সুবোধ্য ছিল না সুজন। ধীরে ধীরে তার অনেক পরিবর্ত্তনই নজরে পড়লো রঞ্জনার। তবু তা নিয়ে কোনদিন কোন অনুযোগ আনে নি সে। হাসিমুখেই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল।

অবশ্য এ কথাটা একেবারে ধ্রুব নিশ্চয় যে, ওর স্বরূপ মূর্ত্তিটা যদি কল্পনাতেও আনতে পারতো রঞ্জনা তাহলে কখনই মানিয়ে নিতে পারতো না সে।

শেষ অবধি ওর সম্পূর্ণ পরিচয়টা যেদিন রঞ্জনা জানতে পারলো—তখন আর মানিয়ে নেওয়া না নেওয়া প্রশ্নও চলে না—অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ভাবতে ভাবতে একটা সকরুণ হাসি ফোটে রঞ্জনার বিবর্ণ ঠোঁটে। ছলছল দুটি চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে রাঁচির মুনলাইট হোটেলের সাত নম্বর ঘরটা। যেখানে গিয়ে সুজন তার মুখোসটা একটু একটু করে খুলে ফেললো মুখের ওপর থেকে।

—না—না, রঞ্জনা আর ভাববে না ওসব কথা। রাঁচির ওই সর্বনাশা ক'টা দিনের স্মৃতি আর টেনে আনবে না মনে। ওই দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলে বড় কষ্ট হয় রঞ্জনার। বাড়ের

কাছের চোটখাওয়া জায়গাটা আবার দপদপ করতে থাকে। সমস্ত মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা হয় যেন।

উঃ, রঞ্জনা কেন যে ভুলতে পারে না! যতবার ভুলতে চেষ্টা করে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে মনের মধ্যে থেকে, ততই যেন আরও স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে দিনগুলো। ভিড় করে এসে দাঁড়ায় রঞ্জনার চোখের সামনে। বিদ্রূপনেত্রে রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলে—তুমি না কী আমাদের মুছে ফেলতে চাও তোমার জীবন থেকে? বটে? তাই না কী কখনও হয়? আমরাই যে তোমার ইতিহাস। যতই চেষ্টা করো—কখনই আমাদের তুমি বাদ দিতে পারবে না—কিছুতেই লুকুতে পারবে না। আমরা তোমার জীবন থেকে অচ্ছেদ্য হয়ে গেছি।

উঃ, কী কষ্ট যে হয়! যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়তে থাকে মাথাটা। যত রাত হয় ততই যেন আজকাল বাড়তে থাকে যন্ত্রণাটা।

বাবাকে লুকিয়ে এবার সত্যি একবার ডাক্তার দেখাবে রঞ্জনা। জানতে চাইবে কী হয়েছে তার মাথার মধ্যে।

শুধু যে রাতে বাড়ে তাই নয়, একটা কিছু চিন্তা মনে এলে যেন আরও অসহ্য হয়ে ওঠে যন্ত্রণাটা।

কী করে যে এই বিভীষিকাটার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে রঞ্জনা!

যন্ত্রণাটা বিভীষিকা? না তার চেয়েও বড় বিভীষিকা ঐ চিন্তাটা? কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও এর কোনটার হাত থেকেই রেহাই পায় না রঞ্জনা।

প্রতিটি রাত্রে ওরা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় রঞ্জনার কাছে। কালো কালো প্রেতের মুখ বাড়িয়ে দেয় রঞ্জনার পানে। রঞ্জনাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। আচ্ছন্নচেতনায় রঞ্জনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে সেই একান্ত অবাঞ্ছিত চিন্তার অরণ্যে। অত্যন্ত অনতিঃপ্রেত দিনগুলোর ঘটনাকীর্ণ জটিলতার অতলান্তিক গহ্বরে।

বর্তমান জগতটাই কেমন অস্পষ্ট হয়ে যায়। মুছে যায় নিকটতমের চিরপরিচিত আকৃতি আচরণ। স্পষ্টতর চোখে দেখতে পায় রঞ্জনা—মুনলাইট হোটেলের সব কিছু। ওই তো মুনলাইট হোটেলের ল'নে দশ নম্বর ঘরের ওই কালো মত মেয়েটা চেয়ার পেতে উল বুনছে—রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। রঞ্জনাকে ডেকে আলাপ করে দু'-চারটে কথা কয়ে ইচ্ছাকৃত সরলতা দেখিয়ে বলেছে—আপনার স্বামী বুঝি এখানে এসে নতুন কোন কাজকর্মের চেষ্টা করছেন ভাই? রোজই দেখি সকাল থেকে বেরিয়ে যান একলা—ফিরে আসেন রাত্তির করে?

মেয়েটির কথার জবাব দিতে পারেনি রঞ্জনা। বাজে একটা অছিলা করে চলে এসেছে নিজের ঘরে।

কী বা বলবে সে? যে প্রশ্ন অহর্নিশি তার নিজের মনটাকেই কুরে কুরে খাচ্ছে সে নিজেই তার কী উত্তর দেবে?

কিন্তু কেন এমন হল? কেন এমন মর্মান্তিক পরিবর্তন হল সুজনের? এই তো আজ মাত্র সাত দিন হলো রাঁচির এই মুনলাইট হোটেলে এসে উঠেছে ওরা। এর মধ্যেই সম্পূর্ণ বাইরের লোকেরও নজরে পড়বার মত উপেক্ষা কী করে করলো সুজন রঞ্জনাকে? কৈ আগে তো এমন ছিল না? এর আগেও আগ্রা লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা আর আর কত জায়গায় বেড়ালো ওরা। কৈ তখন তো এমন ছিল না সুজন? এমনতর অদ্ভুত প্রশ্ন করে কেউ বিব্রত করেনি রঞ্জনাকে।

গত ক'টা মাসে কত জায়গাতেই তো ওরা ঘুরেছে। কতক ট্রেনে, কতক মোটরে, পায়ে হেঁটে রোজ বিকেলে বেড়ানোটাও তো ওদের নিত্যকর্মের তালিকায় বাঁধাধরা। তাই বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোর অভ্যেসটা এমন পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, না বেড়ালে এখন রীতিমত খারাপ লাগে শরীরটা। কিন্তু এই রাঁচিতে এসে পৌঁছে হঠাৎ সুজন যে কেন রঞ্জনাকে এত দূরে সরিয়ে দিলো তার কোন হদিস করতে পারে না রঞ্জনা।

এতদিন কখনও কখনও সুজনের ব্যবহারে খোঁকা লেগেছে রঞ্জনার। কোন কোন আচরণ বিস্ময় জাগিয়েছে অন্তরে। কিন্তু বর্তমানে সুজন নিজেই রঞ্জনার কাছে একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। সারা দিনের মধ্যে কিছুতেই তাকে ধরাছোঁয়ার ভিতর আনতে পারে না রঞ্জনা।

ক'দিন ধরে রোজই মনে মনে ভাবে রঞ্জনা—আজ সুজন বাড়ী এলে একটা গুরুতর রকমের ঝগড়া করবে তার সঙ্গে। অভিমান করবে, অনুযোগ জানাবে তাকে বেড়াতে না নিয়ে যাওয়ার জন্যে। রঞ্জনা ইচ্ছা করলে অবশ্য একা-একা বেড়াতে পারতো খানিকটা। মোটরেবল্ রোড ধরে না গিয়েও কাঁচা রাস্তায় নেমে দেখে আসতে পারতো সহরতলীর এদিক-ওদিক। ওই যে সামনের ঐ সাঁকোটা পার হয়ে একটু দূরে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে—মন হলে রঞ্জনা বেড়িয়ে আসতে পারতো ওদিকটায়। কিন্তু একা-একা বেড়াতে যে কোনকালেই ভালো লাগে না রঞ্জনার। মন ভরে না কিছুতে। টং টং অমনধারা বেড়িয়ে আসতে কারই বা ভালো লাগে? রঞ্জনা তো আর ডিস্‌পেপসিয়া রোগী নয় যে, একা-একা ঘুরে খিদে বাড়াবে?

তার চেয়ে বরং সোজাসুজি সুজনকেই সে জিজ্ঞাসা করবে, তার সম্বন্ধে সুজনের এমনতর উদাসীনতার কারণটা কী?

কিন্তু রাত প্রায় ন'টা বাজিয়ে সুজন যখন প্রতিদিনকার মত হোটেলে ফিরে এলো, তখন দূর থেকেই তার চালচলন কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল রঞ্জনার। কাছে আসতেই গন্ধ হতে রঞ্জনা বুঝতে পেরেছিল সুজন আবার মদ খেয়েছে। আর কথা বলতে পারে না সে।

বিয়ের পর এই আরেকটা নতুন আবিষ্কার রঞ্জনার। বিয়ের আগে যার আভাসও টের পায়নি কোনদিন।

প্রথম যেদিন মদ খেয়ে এসে রঞ্জনার কাছে ধরা পড়েছিল সুজন, সেদিন সারারাতের মধ্যে সুজনের সাথে কথা বলতে পারেনি রঞ্জনা। প্রবৃত্তি হয়নি কিছুতে।

অবশেষে হাতে-পায়ে ধরে মদ ছেড়ে দেওয়ার বহুতর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে সুজন তার মান ভাঙিয়েছিল।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারে নি।

আগে তবু মাঝে-মধ্যে এক-আধ দিন খেতো সে, আজকাল রোজই খেতে সুরু করেছে। তবু একথা সত্যি যে মদ খেয়ে তাকে মাতাল হতে আগে কোনদিন দেখেনি রঞ্জনা।

কিন্তু মাত্রার সেই সীমারেখাটা পর্যন্ত এই রাঁচিতে এসে হারালো সুজন।

আজও তাই সন্ধ্যাবেলায় একেবারে মত্ত অবস্থায় যখন সুজন তার নিজের নির্দিষ্ট কামরাটায় ফিরে এলো তখন তাকে দেখে আর কথা বলতে পারলো না রঞ্জনা।

ঝগড়া করা তো দূরের কথা, সারাদিনের সাজিয়ে-রাখা সমস্ত কথাগুলো গোলমাল হয়ে গেলো মনের মধ্যে।

কিন্তু স'রে গিয়েও আজ সম্পূর্ণ চলে যেতে পারলো না রঞ্জনা নীরবে সহ্য করে বা অভিমান করে সরে থাকলে সুজনের আর কোনদিনই চৈতন্য হবে না—সে কথাটা সে বুঝেছে।

তাই বাধ্য হয়ে নিজেকে খানিকটা প্রস্তুত করে নিয়ে সুজনের সুমুখে এসে দাঁড়ালো রঞ্জনা। উদ্ধত ভঙ্গীতে বললে—সমস্ত দিনটা কোথায় কাটিয়ে এলে? আমি যে একটা মানুষ, নিছক একলা এখানে পড়ে আছি, তা-ও কী তোমার খেয়াল থাকে না আজকাল?

হেসে উঠে সুজন জবাব দেয়—আরে তোবা তোবা! এ কেয়া বাত? তোমার কথা মনে থাকবে না? তবে আমি এখানে আছি কী করতে?

—খুব হয়েছে। আমার জন্তে ভেবে ভেবে একেবারে সারা হয়ে গেলে তুমি? সারাদিনটা কোথায় কাটিয়ে এলে একবার জানতে পারি না?

—কোথাও যাই নি। মাইরী বলছি তোমায়। এই মোড়ের মাথায় 'বার'-এ বসেছিলাম।

ক্ষেপে গিয়ে রঞ্জনা বললে—তবে আর কী? ধন্য করেছ আমায়। লজ্জাও করে না তোমার?

—উঁ! কী বললে? লজ্জা? নাঃ, লজ্জা ঘেন্না মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসা কিছু নেই আমার—থাকতে পারে না।

রাগতে গিয়েও ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে রঞ্জনা। বিকৃত স্বরে বলে—উঃ এত শীগগির যে তোমার এত অধঃপতন হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

—অধঃপতন? কৈ না তো! নাঃ, নতুন করে আর কী অধঃপতন হবে আমার? আমি তো তাই রসাতল-.করতা।

একটু থেমে রঞ্জনার কাছে সরে এসে বলে—রাগ করেছো? উঁ! সত্যি বলছি—আমার কোন উপায় ছিল না। থাকলে—থাকলে আমি কখ্খনও এ কাণ্ড করতাম না।

নেশার ঘোরে জামা-জুতা সুদ্ধই বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সুজন। বালিশে মুখ গুঁজে সেই এক কথা বার বার বলতে থাকে—বিশ্বাস করো রঞ্জনা, আমার কোন উপায় নেই। থাকলে আমি এমন কাজ করতাম না।

আর সহ্য করতে পারে না রঞ্জনা। সরে যায় ওর সামনে থেকে।

বাইরের ল'নে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার চেষ্টা করে একটু।

বাবা-মার সাবধানবাণীগুলো আজ আবার দু'কান ভরে শুনতে

পাচ্ছে রঞ্জনা। নিষ্ফল একটা কান্না ঠেলে উঠেছে গলার কাছে।

রাত প্রায় এগারোটা বেজে যাবার পর রঞ্জনা যখন তার নিজের ঘরে এলো তখন সুজন অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে এসে দুজনকার রাত্রির খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে আছে রঞ্জনার জন্যে। সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও খেতে বসতে হয় রঞ্জনাকে। অনিচ্ছা জ্ঞাপনের বাক্যালাপটুকুর পর্যন্ত প্রবৃত্তি হয় না।

খাওয়া সুরু করার সামান্যক্ষণ পরে বাঁ হাতে একটা চিঠি রঞ্জনার দিকে বাড়িয়ে দেয় সুজন। নতমুখে শুধু বলে—পড়ে দেখো।

একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতেই চিঠিটা নিলো রঞ্জনা। মেলে ধরলো নিজের চোখের সামনে।

ইংরেজীতে লেখা চিঠিখানা বাংলায় তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

'প্রিয় সুজনবাবু,

আপনি আমাদের সঙ্গে যে মাল সরবরাহের চুক্তি করেছিলেন আশা করি তা আপনার মনে আছে। আপনার কথার ওপর নির্ভর করে কোম্পানী আপনাকে এ পর্যন্ত প্রচুর টাকা দিয়েছে। আশা করি সে কথাও আপনি বিস্মরণ হন নি।

কিন্তু তথাপি মাল সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত আপনি করেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে আপনার গাফিলতিই এর একমাত্র কারণ।

ইতিপূর্ব্বেও আপনাকে সতর্ক করে আমরা কয়েকখানি চিঠি লিখেছি। কিন্তু শেষের দিকে চিঠির উত্তর পর্যন্ত পাই নাই।

বর্ত্তমানে এই চিঠিখানিই আমাদের তরফ থেকে শেষ চিঠি বলে জানবেন।

এই চিঠিতে আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি যে কমিটির মিটিংয়ে আগামী ২৬শে জুলাই উক্ত মাল সরবরাহের শেষ দিন বলে ধার্য্য হয়েছে। ঐ দিনে ওই জিনিষ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে আমাদের সাথে আপনার চুক্তি ভঙ্গ হবে। আপনি কোম্পানীতে বহুদিন যাবৎ কাজ করছেন, এক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের প্রতিফল আপনাকে বলাই বাহুল্য।

অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কী? —ইতি
কোম্পানির পক্ষে'

নামসইটা পড়া যায় না। চিঠিতে পত্রলেখকের সম্পূর্ণ নামধাম কিছুই নেই। তবুও চিঠিটা যে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুজনকে বিচলিত করবার পক্ষে যথেষ্ট, তা বুঝে নিতে দেরী হয় না রঞ্জনার। ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলে—কালকেই তো ছাব্বিশে জুলাই। জিনিষটার কোন ব্যবস্থাই করতে পারো নি তো?

সুজন কথা বলে না। নিঃশব্দে রঞ্জনার হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে রেখে দেয় স্লিপিংস্যুটের বাঁদিকের পকেটে। রঞ্জনাও আর কথা বাড়ায় না। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা স্থগিত রেখে খাওয়াটা শেষ করে নেয় হাত চালিয়ে।

যদিও তার মনটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় নি তবু সুজনের এ'কদিনকার রহস্যময় গতিবিধির একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়ে আগের চেয়ে সুস্থ হয় মনটা।

তবু দু'-তিনটা প্রশ্ন কিছুতেই রঞ্জনার মনটাকে ছেড়ে যেতে চায় না। যতবারই রঞ্জনা তাদের তাড়াবার চেষ্টা করে মন থেকে, ততবারই তারা উড়ে উড়ে আসে মাছির মত।

—আচ্ছা চিঠিটায় অত গোপনতার আশ্রয় নিয়েছে কেন ওরা? নাম নেই, ঠিকানা নেই, কী জিনিষ সাপ্লাই করতে হবে তারও নাম উল্লেখ করা নেই একবারও? তবে কী বাবার কথাই সত্যি? সুজন একটা স্মাগলার? আফিম কোকেন বা ঐ জাতীয় কোন নিষিদ্ধ মাদক জিনিষ সাপ্লাই করাই তার ব্যবসা?

এতদিন স্বামীকে শুধু উপার্জনক্ষম জেনেই খুশী ছিল রঞ্জনা কিন্তু হঠাৎ আজ তার মনে রাজ্যের যত বদ্ চিন্তা ঢুকলো কেন? সুজনের পেশা সম্বন্ধে রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুললো তাকে।

তাই খাওয়া দাওয়ার পরেই পেটের ঐ তরল পদার্থের গুণেই হোক বা যে কারণেই হোক্ সুজন কেমন সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারলো। কিন্তু রঞ্জনার চোখে ঘুম এলো না কিছুতে।

—আচ্ছা ওরা যেন কেমন একটা ভয় দেখিয়েছে না—চিঠিটার ভেতর? সুজন সম্বন্ধে কিছুটা মারপ্যাঁচ নিশ্চয় ওদের হাতে আছে। তা না হলে এতটা সাহস ওদের আসছে কোথা থেকে?

কিন্তু ওরা কী করবে সুজনের? কতটা পর্যন্ত ক্ষতি করা সম্ভব ওদের পক্ষে?

সুজনকে ওরা কী পুলিশে দেবে? কিন্তু তাতে কী ওদেরও নাম জড়িয়ে পড়বে না?

হয়ত নিজেদের বাঁচিয়ে সুজনকে ফাঁসাবার মত কোন যুক্তিসল্লা করে রেখেছে ওরা?

কিন্তু সত্যি যদি তাই হয়—ওরা যদি সুজনকে পুলিশে দেয়? তবে কী হবে? রঞ্জনা কী করবে? সে যে এ সব বিপদ থেকে মুক্তি পাবার কোন দিক্‌নির্ণয়েরই উপায় জানে না।

তবে? তবে কী শেষ পর্যন্ত মুখে চুণকালী মেখে আবার ফিরে যাবে কলকাতায়?

ছিঃ ছিঃ, লোকে বলবে কী?

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রঞ্জনা, স্বপ্ন দেখেছে পরমেশবাবুকে—তিনি বলছেন—একটু সময় থাকতে তো তুই আমাকেও সব কথা জানাতে পারতিস খুকী? এককালে তো আমার সঙ্গে জুডিসিয়াল লাইনের অনেকের সাথেই আলাপ ছিল—একবার না হয় দেখতাম চেষ্টা করে—কিছু করতে পারি কী না?

আবার দেখেছে—সুজনকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে। রঞ্জনার মিনতিতে কর্ণপাতও করছে না। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাতকড়ি-দেওয়া সুজনকে।

...বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসলো রঞ্জনা। এমনতর দুঃস্বপ্নভরা অগভীর ঘুমে তার তৃপ্তি মিলবে কেমন করে?

ও'খাটে সুজন গভীর সুপ্তিমগ্ন। ওর বলিষ্ঠ বুক ঘুমের তালে তালে ওঠা-নামা করছে।

ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জনার মনে হয় আগেকার চেয়ে অনেক ময়লা হয়ে গেছে সুজন। ওর ঘুমন্ত মুখেরও কোনখানে সুনিদ্রার পরিতৃপ্ত ভাব নেই বরং যেন কয়েকটা দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট রেখা ফুটে রয়েছে কপালের ওপর।

ভোরবেলায় উঠে নিজের অনিদ্ররজনীর ক্লান্তিটুকু মুছে ফেলবার বাসনায় সামনের ল'নে গিয়ে বেড়াচ্ছিল রঞ্জনা। সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘরে ফিরে এসে সে দেখলে, সুজন স্নান করে বাইরে যাবার পোষাক পরছে।

প্রাতরাশের খালি পেয়ালা-পিরিচগুলো ছড়িয়ে আছে টেবিলের ওপর।

ড্রেসিং-টেবিলে দাঁড়িয়ে গলার টাই-বো'টা বাঁধছিল সুজন। আয়নায় রঞ্জনার ছায়া পড়তে দেখে একটু রুক্ষ স্বরে বললে—কী ব্যাপার, সকাল থেকে তোমার তো দেখাসাক্ষাৎই পাওয়া যায় না দেখি। ছিলে কোথা? নাও একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও। বেড়াতে যাবো আমরা।

ওর কথায় আজ বেড়াতে যাবার অনুরোধ নয়, আদেশের সুর। রঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হয়। তবু কোন রূঢ় কথা বলে না।

মুখে আসে—আজ তুমি বেড়াতে যাবে কী? আজ না তোমার ওদের কাছে মাল ডেলিভারী দেবার দিন?

কিন্তু মুখ ফুটে এ কথা বলে না সে। সুজনের মুখ দেখেই সে বুঝতে পারছে যে জিনিষ যোগাড় করতে পারেনি সুজন। মিথ্যে আর তাকে খুঁচিয়ে কী হবে? তার চেয়ে যদি বেড়াতে গিয়ে কিছুটা ভুলে থাকতে পারে সেটাই বরং অপেক্ষাকৃত সুখকর নয় কী?

এই সব নানান কথা বিবেচনা করেই বোধ হয় সুজনের সকালবেলাকার প্রথম সম্ভাষণের কটুস্বরটুকুও গায়ে মাখলো না রঞ্জনা। নিজের তোয়ালে-সাবানগুলো হাতে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে দরজা দিলো সে।

বেরিয়ে এসে দেখলে, সুজন ওর জন্যে পেটিকোট জামা শাড়ী বেছে রেখেছে খাটের ওপর।

বাদ বাকী অন্য সমস্ত জামাকাপড় দুজনকার দুটি পৃথক স্যুটকেশে ভর্ত্তি করে নিয়েছে বাইরে যাবার জন্যে।

রঞ্জনা বললে—এ কী, সমস্ত বাক্সবন্দী করে ফেললে যে? আমরা কী আজ ফিরবো না এ হোটেলে? সুজন উত্তর করলো—কী জানি! যদি মনোমত একটা ডাকবাংলো পেয়ে যাই এক-আধদিন থাকতেও পারি হয়ত। তাই নিয়ে নিলাম স্যুটকেশ দু'টা। মোটরের ক্যারিয়ারেই তো যাবে। আলাদা লাগেজ কেয়ার তো আর দিতে হবে না।

রঞ্জনা আর কিছু না বলে নিজের ব্রেকফাষ্ট ট্রেটা টেনে নিলো কাছে। টয়লেট সেরে যতশীঘ্র সম্ভব তৈরী হয়ে নিলো বাইরে যাবার জন্যে। ক'দিন পরে বাইরে যাবার আনন্দে মনটা তার মেতে উঠেছে।

কিন্তু তার মধ্যেও যেন কিছুটা খচ্‌খচ করে মনের ভেতরটা।

বার বার মনে হয় সুজন তার ঠিক স্বাভাবিক মেজাজে নেই। কোম্পানীর ওই চিঠিটা তার সমস্ত স্ফূর্ত্তি নষ্ট করে দিয়েছে।

গাড়ীতে উঠেও তাই বিশেষ কোন কথা বলে না সুজন।

রঞ্জনা যতই বাজে কথা টেনে এনে তাকে অন্তমনস্ক করবার চেষ্টা করে, ততই সে যেন আরও গম্ভীর হয়ে যায় দাঁতে দাঁত চেপে।

এমনিতেই মোটরে দূরের রাস্তা যেতে ভারী ভালবাসে রঞ্জনা। এইটাই তার সবচেয়ে প্রিয় ভ্রমণ। তাতে আজ ক'দিন পরে বেড়াতে পেয়ে মনটা তার মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে চলে যাচ্ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে।

দু'ধারে বড়ো বড়ো গাছ। কোথাও তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে পথশ্রান্ত পথিকের জন্ত শ্যামছায়া বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও ওরা রুক্ষ ব্যবধান রেখে মাথা উঁচু করে উদ্ধত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে যেন—সূর্য্যের সাথে লড়াই করার বাসনায়।

গাড়ী ছুটেছে রাঁচি-হাজারিবাগ রোড ধরে। সাধারণতই একটু জোরে গাড়ী চালায় সুজন। সেটাই যেন খাপ খেয়ে যায় ওর প্রকৃতির সাথে। কিন্তু ওর আজকের গাড়ী চালানোর সাথে সে সব সময়ের কোন তুলনা হয় না। ওর আজকের স্পীড-মিটারের কাঁটাটা লক্ষ্য করলে অতি বড় দুঃসাহসীও চমকে যাবে নিঃসন্দেহে।

জানলা দিয়ে ছুটে-আসা বাতাসের অত্যাচারে রঞ্জনার চুল উড়ছে—এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাইশোর সিল্কের অঞ্চলপ্রান্ত।

রঞ্জনা রসিকতা করে বলে—এই, কী করছো? আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী, সে কথা তো জানিই। কিন্তু তাই বলে আমায় নিয়ে এমনধারা ঝড়ের বেগে উড়ে বেড়ালে লোকে স্বয়ং পক্ষীরাজ ঘোড়া বলে সন্দেহ করবে যে তোমাকে?

রঞ্জনার কথাগুলো সুজনের কান পর্য্যন্ত বোধহয় পৌঁছায় না—বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মাঝপথে। দু'ধারের মাঠে পাঁচন-হাতে রাখাল থমকে চেয়ে আছে ওদের গাড়ীর দিকে। পিঠে ছেলেবাঁধা সাঁওতালের মেয়ে বা বাঁক-কাঁধে মিশকালো পুরুষের দল সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নেমে দাঁড়ায় ওদের দেখে। তবুও গাড়ীর গতি একটুও কম করে না সুজন। উল্কার বেগে ছুটে চলে গাড়ীটা।

সামনের নির্জন রাস্তাটার বুকের ওপর একঝাঁক পাখী নেমেছে। কী যেন শস্য ছড়িয়ে গেছে বোধ হয় কোন পথচারী। আর তারই লোভে সাহস করে পথের ওপর নেমে এসেছে এই পাখীগুলো। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মহানন্দে।

গাড়ীর অবিশ্রান্তগতিতে রঞ্জনা ঠিক বুঝতে পারে না ওগুলো ঘুঘু না পায়রা।

ওদের গাড়ীর শব্দ পেয়ে দু'-চারটে পাখী পাখার ঝটপট আওয়াজ তুলে উড়ে পালালো চক্ষের নিমেষে। পারলো না শুধু একটা। চীৎকার করে উঠলো রঞ্জনা। একটা পাখী চাপা পড়েছে ওদের গাড়ীর চাকায়। অল্প একটু রাস্তা লাল হয়ে গেল। দেখে রঞ্জনা মুখ ঢাকলো দু'হাতে।

সুজনের কিন্তু তাতে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। চকিতের জন্তেও একবার পিছু ফিরে তাকালো না সে।

এমন কী গাড়ীর ব্রেকটা কষবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলো না এক্ষেত্রে, করবেই বা কেন? আজ তো নতুন মোটর-ড্রাইভিং শেখেনি সে? রঞ্জনার মত কাঁচা মন নিয়েও চলে না রাস্তায়। ও ভালো করেই জানে পথ চলতে না জেনে যে পথে পা দেয় তার এমনধারা বিধিলিপি খণ্ডাতে পারে না কেউ।

রঞ্জনা বলবার চেষ্টা করে—কী হয়েছে বলতো! আজকে তোমার? এমন ভূতুড়ে গাড়ী হাঁকাচ্ছো কেন তুমি? একটা কাণ্ড বাধাবে না কী?

বাতাসের দাপটে ওর এ কথা ক'টাও সুজনের কানে পৌঁছায় না বোধ হয়। অন্ততঃ সুজনকে দেখে মনে হয় না কোন কথা সে শুনতে পেয়েছে।

ওর বাহুতে একটু ঠেলা দেবার চেষ্টা করে রঞ্জনা। ওকে সজাগ করে দিতে চায়। কিন্তু সে-ও বৃথা।

সুজনের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না তাতে। শুধু মাঝখানে একবার মিনিট দুয়েকের জন্তে গাড়ীর গতিটা খানিকটা হ্রাস করে সুজন। বাঁদিকের পকেট থেকে কিসের একটা শিশি বার করে খানিকটা ঢেলে নেয় গলায়। তারপর আবার যথাপূর্ব্ব।

অগত্যা মুখটা ওর দিক থেকে ফিরিয়ে নেয় রঞ্জনা। কোন কথা না বলে জানলার বাইরে চেয়ে দ্রুত অপস্রিয়মান বৃক্ষের শোভা নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করে।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে নিজে ধৈর্য্য ধরবার চেষ্টা করে। ভাবে—সুজনের হাতে সে তো তার জীবনের লাগামটাই ছেড়ে দিয়েছে। তবে আর কী হবে অনর্থক ব্যস্ত হয়ে? [ক্রমশঃ।

উপহার

সমীরিকা দেবী

গ্রহণ কর—
তুচ্ছ কবির তুচ্ছ প্রেমের দান,
হয়েছি পড়ে ক্লান্ত কাতর
লিখতে পারিনি আজ।
তবু মনকে, শান্ত তাপস করে
ভুলিয়ে রেখেছি দুঃখ-ভরা গানে
ছিল কত তাতে মর্ম্মর কাহিনী
প্রতিজ্ঞা করেছিনু একদিন—
তুলে যাব আমার শেষ
প্রেম গাঁথা চিঠির কাহিনী।

তাই—
তুচ্ছ কবির নিঃসঙ্গ দান
মনেই কর আমার জীবনে
পেয়েছি প্রীতির উপহার।
অভাগা এই কবির মনে
কি গান ছিল মর্ম্মে গাঁথা?
ক্ষমিয়া সকল চরণ পথে
উজার করেছি কবির খাতা—
গ্রহণ করিও মনেই করে
প্রীতির উপহার।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

বারানসী

নীলকণ্ঠ

চার

ভ্রমণ-কথাটার গোড়াতেই চোখে-না-পড়া-অসম্ভব দুটি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে যা তা হচ্ছে ভ্রম। শুধু কাশী-কাঞ্চি-গোদাবরী প্রত্যক্ষ করবার কারণেই নয়; মনের ভ্রম, মানসিক সর্বপ্রকার বিভ্রম দূর করবার কারণেও বটে,—দূরের ট্রেনে চাপা চাই। ট্রেনই স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ সব চেয়ে বড় ট্রেনিং-এর জায়গা। ট্রেনে চাপলে অন্ত আর কোন ভুল না ভাঙুক একটা ভ্রম যে কাটেই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আজও,—স্বাধীন ভারতে যারা মনে করে যে ভারত ঠিক স্বাধীন হয়নি,—তাদের ভ্রম দূর করবার জন্যেই অন্ততঃ দূরপাল্লার ভ্রমণে ট্রেণ চাপা দরকার অথবা ভারত সরকারের টাকায় ট্রেণে চাপানো দরকার তাদের সর্বাগ্রে। বাসে ট্রামে চাপলেও হয়; তবে ট্রেণে চাপলে সব চেয়ে বেশী, সব চেয়ে আগে যে জ্ঞান অতি অবশ্যই হয়,—তা হচ্ছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। এরোপ্লেনের কথা বলতে পারি নে; আমরা যারা প্লেনে আছি তাদের কথা বলছি। উড়োজাহাজ কেন, শুধু জাহাজের কথাও বলতে পারা সহজ নয় আমাদের মতো যারা আদার ব্যাপারী তাদের পক্ষে। সেই স্বাধীন ভারতে পাবলিক ম্যানের কৃপায় আমাদের মতো পাবলিক বাদের সর্বাঙ্গ লিক করছে সর্বদাই তাদের চুলিপরা আঁখিপদ্মেও প্রতিভাত হয় নির্মল সূর্যাকরোজ্জ্বল এ বার্তা, ট্রেণে পা দেবার মুহূর্তেই সে স্বাধীনতা তো বটেই স্বাধীনতার চেয়ে একটু বেশিই আমরা পেয়েছি নেহরুরাজের কৃতিত্বে। স্বাধীনতা পেয়েছে ঘানা; স্বাধীনতা পাবে আলজিরিয়া। আমরা কেবল স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইনি। স্বা-ধী-ন-তা-র সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমরা যে অপূর্ব বস্তু আজ লাভ করতে চলেছি তার নাম : তা-ধি-ন্-তা!

স্বাধীনতা নয়; তা-ধিন্-তা-ই প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র। রাজনীতি থেকে সুরু করে ভায়া অর্থনীতি,—নীতিহীন নীতির সর্বক্ষেত্রে নীতিকে বরবাদ করে জয়যুক্ত করছি যাকে জীবনের সর্বত্র তা ওই তা-ধিন্-তা-ও নয়। তা আসলে হচ্ছে তা দিন,—তা! অর্থাৎ যে তা দিতে জানার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কপালে বোলো অশ্বশক্তির বাতাসনিয়ন্ত্রিত লেটেষ্ট মডেল ক্রাইসলার-ও কার,—আর সবাকার কপালে ঠিক সময়ে ঠিক তা না দিতে জানার কারণে অশ্বডিম্ব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলছে তাই; বলছে,—তা ধিন-তা! বলছে,—তেরে-কেটে-তাক! অর্থাৎ তেড়ে ধর; দু' কাণ কেটে ফেল; আর তাক্ কর! ঠিকই বলছে। অসংখ্য শহীদের ত্যাগে আসে স্বাধীনতা আর তাগে থাকে, তাগ করে থাকে ঠিক সময়ে গদিতে গদা হাতে বসবার জন্যে শহীদ সুরাবর্দীরা! কি পূর্ব কি অপূর্ব ফাঁকিস্তান।

ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতে আজ সবাই স্বাধীন। সব চেয়ে বেশি স্বাধীন, ট্রামে, বাসে, ট্রেণে। না। ট্যাক্সিতে। কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যেয়, রাতে, অথবা কখনও কখনও দিনের আলোতেও এমন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'-পোজে আজকাল লোককে যেতে দেখছি। স্ত্রীলোক সঙ্গে যে সন্ধ্যে হয়, ইভনিং ইন প্যারী না ইভনিং ইন ক্যালকাটা, বর্ণনায় বেশী কে। ভারতীয় ছবির পর্দায় চুম্বন-দৃশ্য দেখান যায় না; হিন্দী ছবিতে যা-ও বা দেখানো যায় বাঙলা ছবিতে তা-ও না। অতি অধুনা ছবির বিজ্ঞাপনেও নিষিদ্ধ হয়েছে কোনওরকম উত্তেজক ইলাস্ট্রেশান। কিন্তু ট্যাক্সিতে জোড়ায় জোড়ায় সুখের পায়রাদের সান্ধ্যবিহার আর বন্ধ হবার নয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি যে। ম্যাসাজ হোম বন্ধ; হোটেলেও মাঝে মাঝে রেড হয়; অতএব রেড রোডের নির্জন অন্ধকারে ট্যাক্সিতে অল্পপরিসর বিবরে বেপরোয়া হও। ট্যাক্সি চালায় যে সে এতে আপত্তি করে না। আপত্তি করলে ট্যাক্সি চলবে কিন্তু মিটার চলবে না ক্রুদ্ধ। এই রকম খদ্দের তার লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই-ই। লক্ষ্মী কারণ পয়সা বেশি দিতে তার আপত্তি অল্প অথবা একেবারেই নেই; সরস্বতী কারণ তার কৃপায় বেবি ট্যাক্সির চালক সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বেবি নেই আর।

এই এক আশ্চর্য্য দেশ। ছবিতে বিসদৃশ কিছু ঘটনার আগেই সেন্সার [হিন্দি ছবি না হলে]! কিন্তু ট্যাক্সিতে তার আসল ছবি আরও বিসদৃশ হোক, বলবার নেই কেউ! সেন্সার কর আর যাই কর,—স্বাধীন ভারতে যারা শাসন করছে আর যারা শাসিত হচ্ছে তাদের কারুর মধ্যেই আর সেন্স নেই। হ্যাঁ, সত্যিই বলছি; No Sense Sir!

কলকাতার রাস্তায় যারা গাড়ি চাপে কেবল তারাই নয়, যারা পথ চলে তারাও স্বাধীন এতদূর যে গাড়ির শিঙা ফুকলে অথবা নিজের জীবনের শিঙা ফোঁকবার অবস্থা হলেও তাদের প্রাণে ভয় নেই একটুকু। এমনভাবে তারা রাস্তা হাঁটে আজকাল যে মনে হয় রাজা-মহারাজা কেউ ফুলবাগিচায় সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে। এক্সিডেন্ট হলে আজকাল গাড়ি পোড়ানো এবং গাড়ির চালককে আধমরা করাই রীতি। কিন্তু কলকাতায় রাস্তায় গাড়ির দুর্ঘটনায় যারা প্রতিদিন পড়ে তাদের মধ্যে কতজন গাড়ি চালাবার দোষে আর কতজন পথ চলতে না জানার অথবা জেনেও বাহাদুরী করবার

কারণে সেকথা বলা প্রশান্ত মহলানবীশের পক্ষেও রীতিমত শক্ত।

মোড়ে মোড়ে, 'রাস্তা পেরুবার সময় দেখে পেরুন' লিখে কার কাজ হচ্ছে কলকাতায় জানেন? স্কুলের ছাত্রদের। দশটার সময় যে ক্লাস হবার কথা, সে ক্লাসের ছেলেরা স্কুলে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে এগারোটায়। প্রশ্ন করলে মাষ্টারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে পথ চলবার নিশানা; School Ahead ! Go Slow !

বেনারসের কথা বলতে বেনারস এক্সপ্রেসের এত বাজে কথা কেন বলছি এ নিয়ে মাথাব্যথিয়ে কোনও লাভ নেই। ধানভানতে শিবের গীত থেকেই সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের জন্ম। ধান ভানতে বসে কেবল ধানই ভানলে মানুষের সঙ্গে কলুর ঘানির বলদের কোনও তফাৎ থাকত না। বেনারসের কথা লিখতে বসে কেবল বেনারসের কথাই লিখলে তা বিনা রসের গোল্লা হয়; রসগোল্লা হয় না কিছুতেই। দীর্ঘপরিশ্রম করে নাটক লিখে নিয়ে একজন গেছে সমালোচকের কাছে। সমালোচক রায় দিয়েছেন: Its all work and no play. তাই কাশীর ঈশ্বর শিবের গীত গাইতে বসে ধান ভানছি যে আমি তাতে বৈয়াকরণদের বিধান ভাঙছি বটে কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ করছি 'বাজে কথা'র রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বলেছেন, 'বলার কথা না থাকলেও বকতে যেজন পারে, ওস্তাদ সে সেলাম করি তারে।'

বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলার হচ্ছে বেনারস; বলার কথা আমার তার আগে বেনারস এক্সপ্রেস।

কারণ বেনারস এক্সপ্রেসেই আমার দাদুর সঙ্গে দেখা। দাদুর চেহারাটি বেশ। নবকার্তিক। চুল পেকেছে কিন্তু পড়েনি। থার্ড ক্লাসে যাবার সাজ নয়; রীতিমত সৌখীন। সকলের সমান বয়সী দাদুকে নিয়ে আমরা মেতে উঠলাম। দাদুর ঠিক উল্টো দিকে বসা নাতির বয়সী এক ছোকরা লাইটার জ্বালাবার চেষ্টা করছে বারবার দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে। বারবার ব্যর্থ হয়। রবার্ট ক্লাসের ছাত্র বলে নয়; মার্কিন ট্রাউজার [নাইয়ের ওপরে যার ট্রাউজার বলতে কিছু নাই] পরা, বাঁহাতের কবুয়ের কাছে রিসটওয়াচ বাঁধা, মুখে ম্যারিক্যান সিগ্রেটের কল্যাণে তার ভারতীয় ঠ্যাং তাকে তবু মচকায় না। দাদু অনেক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন; আমরাও। ফস করে দাদু চেন টানবার জন্যে হাত বাড়াতেই আমরা হা-হা করে উঠেছি; হাহাকার করে উঠেছি: কারণ কি? পঞ্চাশ টাকা ফাইন বিনা কারণে চেন টানলে তা জানেন?—দাদু রিটর্ট করেন: কিন্তু চেন টানছি এমনই নয়; কারণ আছে? কি কারণ? দাদু প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেই ছোকরাকে বলে: ভাই তুমি খুব হাওয়ার মধ্যেও সিগারেট ধরাতে পার আমি জানি; কিন্তু এখন তার দরকার নেই! আমি চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাইটারটা জ্বালিয়ে নাও?—আমাদের হাসি আসবার আগে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে এগিয়ে দেন দাদু এই নাও এই আগুনে লাইটারটা জ্বালাও—? নাও, নাও, লজ্জা কোর না।

ইতোমধ্যে দাদুর পায়ের ওপর একজন দাঁড়িয়েই আছে। দাদু অনেকক্ষণ বাদে বললেন: নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বুঝি। দণ্ডায়মান ব্যক্তির ভ্রূক্ষেপও নেই দাদুর কথায়। রাগেন দাদু এবারে: চোখে কি অন্ধ গুঁজেছ না কি? আস্ত একখানা পায়ের ওপর দাঁড়িয়েও টের পাচ্ছ না; তাতেও যখন নেমে দাঁড়ায় না সেই লোক: তখন দাদু আর না পেরে বলেন কি হে শুনতে পাও না না কি কানে?

বোঝা যায় এতক্ষণে; শুনতে পায়ই না কানে; সত্যিই পায় না। তাই পরের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে; নিরুপায়। কিন্তু শুনতে সে পায় না সেকথা কাউকে বুঝতে দিতে চায় না; তাই বলে দাদুর মুখের দিকে লক্ষ্য করে: আমাকে কিছু বলছেন?

দাদু বলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনাকেই বলছি—

এবারে ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়: আমি ভাবছি, বুঝি আমাকে কিছু বলছেন?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই থাকেন অতঃপর দাদুর পায়ের ওপর। দাদু সরিয়ে নেন না পা।

কিন্তু এরপর দাদু যা করলেন তা বলার অতীত।

সারা গাড়ি যাতে অধুনা অনির্দিষ্ট নোটিশ সর্বদাই বলছে: ৬৪ জন বসিবেক; ১২৮ জন দাঁড়াইবেক; ২৫৬ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক, এবং ৫১২ জন ঝুলিবেক, সেই গাড়ির এক প্রান্তে একজন বসেছিল; সে উঠল একেবারে অপর প্রান্তের বাথরুমে যাবার জন্যে। অর্থাৎ South•Pole থেকে North Pole। ভীড় ঠেলে, দাদুর

কাছ বরাবর পৌঁছতে দাদু পথ আটকালেন। সে যত এগোবে; দাদু ততই কাছা চেপে ধরে। কি ব্যাপার। ভদ্রলোক বলে: ছাড়ুন দাদু—। দাদু নাছোড়বান্দা; আমরা সবাই মিলে দাদুকে বলি: ওকে যেতে দিন বাথরুমে। দাদু সমান জোরে বলেন। না; যেতে হবে না—। আমরা পুনর্প্রশ্ন করি। কেন, যেতে হবে না কেন? কেন আবার,—দাদুর উত্তর তৈরীই আছে: কারণ, যেতে যেতে, বাথরুম পর্যন্ত পৌঁছতে বেনারস এসে যাবে যে ভাই।

হাসির হররা ওঠে। যেরকম হাসি বাঙলা ছবিতে সব চেয়ে করুণ দৃশ্যে উত্তম অভিনয় ছাড়া হাসা অসম্ভব!

কাশীতে যে-হোটেলে উঠব বলে ঠিক করেছিলাম সে-হোটেলের একজন পার্মানেন্ট বোর্ডারের নামে পরিচয় পত্র দিয়েছিলো যে তার নাম ইয়ে মল্লিক। ইয়ে মল্লিক হচ্ছে রিডার্স ডিজেষ্টের ফিচারের ভাষায়: দ্য মোষ্ট আনফরগেটেবল ক্যারেক্টর আয়াভ এভার মেট। তার চিঠি নিয়ে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটিতে ঢোকবার মুখে দেখি রাস্তার ওপর রকেই হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসে আছে একজন। চিঠি বার করে জিজ্ঞেস করি; এখানে জ্যোতির্ময় দত্ত রায় বলে কেউ থাকেন? চিঠির ওপর আবার চোখ নামাই; জলজল করছে সেখানে ইয়ে মল্লিকের হস্তাক্ষরে: জ্যোতির্ময় দত্ত রায়। জ্যোতির্ময় দত্ত রায় বলে এ হোটেলে কেউ থাকে না শুনে আশ্চর্য হই না যে তার কারণ ওই ইয়ে মল্লিক। আমি নয়; ইয়ে মল্লিককে যারাই চেনে তারাই আশ্চর্য হবে না কেউ। আর ইয়ে মল্লিককে কলকাতায় চেনে না কে? ফ্রম টালা টু টালিগঞ্জ? বালি টু বালিগঞ্জ? চেনে অবশ্য ইয়ে মল্লিক বলে নয়; চেনে,—ইয়ে মামা। ইয়ে মামা য়ুনিভার্সাল মামা। তার ছেলে তাকে কি বলে ডাকে জানি না, আর সবাই ডাকে মামা বলেই; বেশির ভাগ ইয়ে মামা বলেই।

সেই ইয়ে মামা একা নয়; তার বাড়ির সবাই এক ব্যাপারে বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ নাম মনে রাখতে পারে না কারুর। ইয়ে মামাদের বাড়ির সবাইকেই লোকে, এমন কি স্ত্রীলোকেও, এক কথায় ইয়ে মামার বাড়িকেই তারা ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলে অভিহিত করে থাকে। করার কারণ, কেউ নাম মনে না করতে পেরে, 'ইয়ে' দিয়েই কাজ সারে। তারই ফলে সেই বিখ্যাত বাড়ি। সেখানে জজ আছেন, উকিল, ডাক্তার, এমনকি ভারত-বিখ্যাত আবিষ্কারকও এবাড়িতে অতীতে এসেছেন একবার। নাম করবার মতো এই সব লোকেরাও কিন্তু অন্যের নাম করার বেলায় নাম ভুলে গিয়ে, 'ইয়ে' দিয়ে ইসারায় সারে সব। নিজেদের বাড়ির লোকেদের নামও মনে থাকে না এদের।

ইয়ে মল্লিকদের বাড়িতে নিম্নলিখিত সংলাপ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা!

—এই যে ইয়ে, ইয়ের কিছু হলো?

—না, ইয়ের এখনও ইয়ে কিছু হয় নি—

—ইয়ের কাছে যে নিয়ে গিয়েছিলে ইয়েকে তা ইয়ে কি বলল?

—ইয়েকে পরীক্ষা করে ইয়ে বলল যে ইয়ের এখন ইয়ে হবে কি বলে গিয়ে বেশ কয়েক ইয়ে দেরী আছে!

এমন লোকেদের একসঙ্গে বারোমাস যে বাড়িতে বাস তাকে লোকে ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলবে, এ আর বিচিত্র কি!

ইয়ে মামার চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝি, নাম ভুল করেছে ইয়ে মামা। তখন ইয়ে মামার মুখে শোনা হোটেলের সেই স্থায়ী বাসিন্দার হুবহু বর্ণনা দিতে, রকে বসা হোটেলের সেই ভদ্রলোক বলেন: আপনি যাকে খুঁজছেন, তার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র সেন; জ্যোতির্ময় দত্ত রায় নয়। কে পাঠিয়েছে আপনাকে চিঠি দিয়ে? ইয়ে মামা?

নীল আকাশ থেকে বাজ পড়লে অথবা জহরলালের মুখে: 'পাকিস্তান অন্যায় করেছে,' শুনলেও এতটা স্তম্ভিত হতাম না।

আমাকে বাক্যাহত অবস্থা থেকে উদ্ধারের আশায় আবার শুরু দেন রকে বসা ভদ্রলোক: ইয়ে মামা, কেউ হয় আপনার?

আজ্ঞে না, আমি বলি: এক পাড়ায় থাকি; মামাদের বন্ধু, তাই ইয়ে মামা বলে ডাকি—

আপনার নাতির এক গেলাসের হলেও, আপনি ইয়ে মামা বলেই ডাকতেন! এবং আমার বাবা বেঁচে থাকলেও ইয়ে বলে ডাকতে গিয়ে; ডাকতে পারতেন না; মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতই, —ইয়ে মামা—

রকে বসা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি: ইয়ে মামাকে কতদিন চেনেন আপনি?

তা ইয়ে দীর্ঘকালের, জবাব আসে; কি রকম আলাপ তাহলে বলি শুনুন—

ভদ্রলোক বলেন; আমি শুনি।

ভদ্রলোক বলেন: কাশীর এই গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে উঠেছেন আপনার চূড়ো মামা সেবার। একদিন সকালে আপনাদের ইয়ে মামার ঘরে ঢোকবার আগে, সারপ্রাইজ দেবার জন্যে ইয়ে মামার ভাল নাম ধরে ডেকেছি। বিমলচন্দ্র মল্লিক আছেন?—বলব কি মশাই,—ইয়ে মামা এসে ঘাড়ের ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে চুমু খেয়ে অস্থির।

কী ব্যাপার?—আমি জিজ্ঞেস করি।

বাঁচিয়েছিস ভাই—ইয়ে মামা বলে।

কি রকম?

এই তাখ, বলে একটা ফর্ম দেখায় ইয়ে মামা;—খাটের ওপর পড়েছিল ফর্মটা। তুলে নিয়ে বলে—এখানে সই দিতে বলেছে; নিজের পুরো নাম,—কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, আজ তুই আমার ভালো নাম ধরে ডাকতে আমার মনে পড়ল; তুই বাঁচালি ভাই!

রকে বসা ভদ্রলোকের গল্পের নটেগাছ কিন্তু তখনও মুড়োয়নি। তিনি বলেন: এর পরেও আছে। ইয়ে মামা ফর্মে নাম সই করতে গিয়ে থেমে গেল আবার; ফর্ম থেকে চোখ তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করল: এই ইয়ে, আমার ভালো নামটা কি যেন বললি যে—!

[ক্রমশ:।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি জেলের মধ্যে Prince Kropohkin এর "Conquest of Bread" বইটা পেয়েছিলুম। পড়ার পর মনে হল, বইটা বাংলায় প্রকাশ হওয়া দরকার। গোপনে বাংলা করতে সুরু করলুম।

মার্কসের নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ-কৌশল বিধিবদ্ধ করা, মার্কসবাদকে বিকশিত করা,—এগুলো যেমন লেনিন করেছিলেন, ঠিক তেমনি প্রিন্স ক্রপটকিনও বাকুনিনের অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদের নীতি ও আদর্শকে বিধিবদ্ধভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের কৌশল তাঁর রচিত কয়েকখানা বই মারফৎ (Anarchist Communism, Conquest of Bread, Field Factories and Workshop প্রভৃতি) প্রচার করেছিলেন।

তাছাড়া, মার্কসের সময়ে গণবিপ্লব ও কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন সম্পর্কে আদর্শ, নীতি ও কর্মপ্রণালী নিয়ে বাকুনিনই তার সঙ্গে সবচেয়ে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং পরাস্ত হয়েছিলেন। সুতরাং ক্রপটকিনের বইগুলো না পড়লে মার্কসবাদ বোঝা পাকাপোক্ত হয় না।

কিন্তু আমার কাজটা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ একদিন আমার অন্তরীণের আদেশ এসে গেল—চললুম জলপাইগুড়ী ডুয়ার্সে ফালাকাটা থানায়।

অন্তরীণ অবস্থায় সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা ভেবে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছ থেকে আমার চোখের অবস্থা সম্বন্ধে—আমার যে আবার গ্লুকোমার আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলুম। তখন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন অনুপ সিং নামক এক পাঞ্জাবী।

রাত্রে রওনা হয়ে ভোরে জলপাইগুড়ীতে পৌঁছে সরাসরি গিয়ে উঠলুম পুলিস ক্লাবে, এবং সেখানে লটবহর রেখে এস. পির অফিসে গেলুম। সেখানে ডি. আই বি ইনস্পেক্টর আমার ভার নিলেন। এস. পি. হডসন সাহেব, যিনি ঢাকায় বিনয় বোসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন—দেখে মনে হল বেশ কাজের লোক। শুনলুম, ভয়ানক কড়া, সমস্ত পুলিসবাহিনী সর্বদা "তটস্থ" থাকে—ভয় করে, একটু এদিক ওদিক হলেই শাস্তি পায়, কারো রেহাই নেই। আমার সঙ্গে ২।১টা কথা বলেই ছেড়ে দিলেন।

মোটরে সরাসরি ফালাকাটায় গিয়ে আমাকে রেখে আসার বন্দোবস্ত হল—এবং সেদিন সেখানে থেকে পরদিন সকালে যাওয়া স্থির হল। '২৭ সালে পাবনার কামারখন্দে অন্তরীণে গিয়ে প্রথমে যে তরুণ মুসলমান দারোগার হাতে পড়েছিলুম, পুলিস ক্লাবে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হল—তিনি জলপাইগুড়ী জেলায় বদলী হয়েছেন—নামটা বোধহয় খুরসেদ আহম্মদ। কিন্তু দেখলুম, আমার সঙ্গে খোলামেলা ভাবে আলাপ করলেন না। মনে হল, ভয় পান। সম্ভবত সেটা হড্‌সনের রাজত্ব বলে।

আমি কিন্তু ভাবছিলুম, এত তাড়াতাড়ি অন্তরীণ করার অর্থ প্রথমতঃ—লেখা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কোন চার্জ নেই, আর দ্বিতীয়ত—অন্তরীণের পরের অবস্থাই মুক্তি, সুতরাং কিছুদিন নির্বিবাদে কাটাতে পারলেই ছেড়ে দেবে।

যাই হোক,—পরদিন সকালে মোটর এল—এবং একজন ডি, আই, বি, সাবইন্সপেক্টরের সঙ্গে রওনা হলুম। এই মোটর-যাত্রার কথাটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

জলপাইগুড়ী থেকে ফালাকাটা ৩৮ মাইল। সাবডিভিশন আলিপুর ডুয়ার্স ৩০ মাইল। কুচবিহার ২৪ মাইল। ফালাকাটা থেকে সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন—বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের টারমিনাস মাদারীহাট ১৪ মাইল। যেদিক দিয়েই যাও, বেশ কয়েক ঘণ্টা গরুর গাড়ী চড়তে হয়। তাই মোটরের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সহরের সীমানা পার হওয়ার পরই মোটর সটান গড়গড়িয়ে নামলো তিস্তা নদীর গর্ভে—জলের মধ্যে—এবং বেশ কিছু দূর সেই অগভীর জলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে মোটরটা উঠলো চড়ার উপর। আবার চড়ার উপর দিয়ে দৌড়। তার পর তিস্তার মাঝের প্রধান ধারা রীতিমত নদী। সেখানে চড়ার ধারে অপেক্ষা করছিল প্রকাণ্ড একজোড়া মাচাবাঁধা নৌকা। মোটর উঠলো সেই নৌকার উপর—নৌকা ছাড়লো। তার পর বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে নৌকা গিয়ে ভিড়লো আর এক চড়ায়। আবার মোটর চড়ায় নেমে দৌড় দিলে। তার পর আর এক দফা অগভীর নদীগর্ভে নেমে জলের মধ্য দিয়ে চলে মোটর গিয়ে উঠলো তিস্তার অপর পারের

বার্ণেশ জংসনে—ছোট রেল বি, ডি, আর সেখান থেকে গেছে মাদারীহাটে। বর্ষাকালে তিস্তার এই তিন ধারা মিলে নদীর রূপ হয় বিরাট ও ভয়ঙ্কর।

বার্ণেশ থেকে বেশ প্রশস্ত এক পিচঢালা পাকা সড়ক সিধে চলে গেছে চাবাগান অঞ্চলে—আমাদের মোটর সেই সড়ক ধরে চললো। কিছু পরেই জলঢাকা নদী, বেশ বড় নদী, তার উপর নতুন পুল তৈরী হয়েছে ঐ পিচঢালা রাস্তার সঙ্গে। শুনলুম দু'লাখ টাকা খরচ হয়েছে—প্রায় সিকি মাইল লম্বা সুন্দর পুল—এখনকার দিন হলে সত্যি খরচ হতো ১০ লাখ, এবং বিল হতো ২০ লাখ।

পুল পার হয়ে কিছু দূর গিয়ে ময়নাগুড়ি থানা ও বাজার। ১৯১৬ সালে এই থানাতে অন্তরীণ ছিলেন প্রথমে অনুকূলদা' (মুখার্জি) এবং পরে আমাদের টালার সতীশ নিয়োগী। '৩২ সালে ওখানে থাকেন বোধ হয় প্রফুল্ল ত্রিপাঠি (ঠিক মনে নেই)।

ময়নাগুড়ির পর ধূপগুড়ী থানায় পৌঁছালুম—সেখানে তখন থাকেন শৈলেন রায় (ছাত্র নেতা—এ, বি, এস, এ)। ধূপগুড়ী ছাড়ার পরই আমাদের মোটর পিচঢালা সড়ক ছেড়ে ডাইনে ঘুরে পড়লো কাঁচা রাস্তায়—দু দিকে মাঠ, ক্ষেতভুঁই, এবং দূরে জঙ্গল—মাঝে মাঝে বেশ বড় নিবিড় জঙ্গল—জঙ্গলে বাঘ তো থাকেই,—একটা জঙ্গল নাকি, ভালুকের আড্ডা। পথে অনবরত একটার পর একটা ছোট ছোট পুল বা ক্যালভার্ট—কোথাও বা মজা জলভরা খালের ওপর পুল, কোথাও বা দু দিকের নীচু জমির বর্ষার জল চলাচলের জন্যে ক্যালভার্ট।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল তোরসা নদী—স্বল্পপরিসর গভীর পার্বত্য নদী—একটানা প্রবল স্রোত। উঁচু পাড়ের মাঝে খানিকটা যেন ভেঙ্গে খেয়াঘাট তৈরী হয়েছে। আমাদের মোটর হুড়মুড় করে নামলো সেই খেয়াঘাটে, এবং আবার এক মাচা বাঁধা জোড়া নৌকোয় গিয়ে উঠলো। মাঝিরা লগি ঠেলে খানিক উজানে গিয়ে এমন এক কৌশলে নৌকোটাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিলে যে নৌকোখানা এক চোটে খানিক ভাঁটিতে অপর পারের ঘাটে গিয়ে লাগলো। মোটর আবার পাড় ভেঙ্গে উঠে ছুটলো—মেঠো পথে। অনেকক্ষণ অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ঝাঁকানি খেতে খেতে দুপুর পার হওয়ার পর পৌঁছালুম কালাকাটার সীমানায়—একটা জঙ্গল-ভরা খালের পুল—শুনলুম সেখানে বাঘ থাকে।

পুল থেকে সিধে আধমাইলটাক পথ এলেই কালাকাটার কেন্দ্র বিন্দু একটা তেমাথা। ঐ আধ মাইলের মধ্যে তহশীলদারের অফিস ও কোয়ার্টার, একটা ছোট আমলা-পাড়া, একটা মাইনর স্কুল, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি। আর তেমাথার একদিকে কয়েকখানা বাড়ী ও দোকান এবং তার পর হাটখোলা,—আর অন্যদিকে থানা। তারপর একটা কালীবাড়ী এবং তারপর এক জোতদার—কনট্রাক্টরের বাসা। থানার পেছন দিয়ে একটা ছোট রাস্তা হাটখোলার আর একদিকে মিশেছে, সেখানে এক বড় জোতদারের বাড়ী—নাম বংশীধর তেওয়ারী কানপুরের লোক—দারোগাকে দেখলেই আগে সেলাম করেন,—এবং তিনিই আমার একজন non-official visitor! আর একজন non-official visitor এক মুসলমান বড় জোতদার হাটখোলার [illegible] বাসী। তিনি থানার বন্ধুলোক—মামলার তদ্বির ও মুরব্বীর permanent tout, আমার সঙ্গে তাঁর খুব খাতির হয়েছিল,—তিনি বলতেন, detenu বাবুর সঙ্গে মেলামেশায় আমার কোন ভয় নেই,—আমাকে তো স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটই বলে দিয়েছেন দেখাশুনা করতে। তিনি বুঝেছিলেন, আমার চাকর না থাকলে চাকর খুঁজে দেওয়া, কাঠ না থাকলে কাঠ জোগাড় করে দেওয়া, এই সব হল তাঁর সরকারী ডিউটি!—মন্দ নয়।

হাটের পিছন দিকে একটু বেশ্যাপল্লীও আছে,—এবং পাশ দিয়ে চলে গেছে এক নদী। ধান, পাট ও তামাক প্রধান ফসল। পাট ও তামাক ঐ নদী দিয়ে বাইরে চালান যায়,—এবং নৌকো বোঝাই নারকেল—ছোবড়াসমেত—চালান আসে। হাট বেশ বড়,—বন্দর জায়গা বলে অনেক দূর থেকে লোক আসে, কুচবিহার থেকেও দোকানদার আসে। স্থানীয় দোকানদারেরা মনিহারী মাল আনে কুচবিহার থেকেই।

কালাকাটা ডুয়ার্সের খাসমহালের অন্তর্গত। ডুয়ার্স হচ্ছে ভোটানের তরাই অঞ্চল—আগে ভোটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ইংরেজ এই তরাই অঞ্চলটা কেড়ে নিয়ে ভোটানকে পাহাড়ের উপর আটকে দিয়েছে। ডুয়ার্স unregulated territory খাসমহাল একজন Deputy Commissioner-এর শাসনাধীন—জলপাইগুড়ীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার বহির্ভূত। Deputy Commissioner সাহেবের ভাললোক বলে সুনাম আছে।

কালাকাটার ভৌগোলিক অবস্থান চমৎকার। তখনকার E. B. R. টাইমটেবলে রেলওয়ের যে ম্যাপ ছিল,—তাতে দেখা যেত, কলকাতা থেকে খাড়া উত্তরে মেল লাইন উঠে গেছে, এবং লালমণির হাট থেকে আসামের দিকে একটা শাখা বেরিয়ে গেছে। এই দুই লাইনের দ্বারা যে কোণ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বেশ খানিক জায়গা সাদা—উত্তরে হিমালয়ের পাহাড়ের কেন্নোর মতন দাগগুলো। এই সাদা জায়গাটার মাঝখানে হচ্ছে কালাকাটা।

হিমালয়ের তরাই ডুয়ার্স ম্যালেরিয়ার ডিপো। এ এক সাংঘাতিক ধরণের ম্যালেরিয়া। প্রথমে এক বা দেড় দিন সমস্ত শরীরটা গামছা নিংড়ানোর মতন মোচড়াতে থাকে, রোগী হো-হো শব্দে হাঁপাতে থাকে, তার পর জ্বর ওঠে ১০৫.৬ ডিগ্রী। যদি কয়েকদিনের মধ্যে রোগী সুস্থ না হয়, তাহলে প্রস্রাব রাঙা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত কালো হয়ে যায় তখন প্রায়শঃই রোগীর মৃত্যু হয়। এই জন্যে রোগটাকে বলে Black water fever এ রোগের একমাত্র নিমেষের ওষুধ ডাবের জল। ডাব এক টাকায় একটা পর্যন্ত বিক্রি হয় তখনকার দিনেই।

ডুয়ার্সের উত্তর অংশ গভীর বনজঙ্গল—বাঘ, ভালুক, হাতী প্রভৃতি বন্যজন্তু প্রচুর—আর প্রচুর নানা রকমের সাপ—বড় বড় ময়াল সাপ পর্যন্ত। দক্ষিণ অংশেই মাঝে মাঝে লোকালয় আছে। বাঘের উৎপাত সর্বত্র বারোমাস—চিতাবাঘ। সময় সময় হাতীর দলও হানা দেয় জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে,—এবং বড় অজগর সাপও মাঝে মাঝে আসে এবং মারা পড়ে।

সাধারণ অধিবাসী প্রধানত রাজবংশী এবং মেচ প্রভৃতি আর দু একটা অনুন্নত জাত। মাঝে মাঝে ২ ১০ জন সাঁওতালও আছে। লোক ক্রমশ বাড়ছে এবং ক্রমশ জঙ্গল অঞ্চলে চাষের জমি বাড়ছে। এর জন্যে সরকারী ব্যবস্থা চমৎকার। প্রথমে তিন বছর পর্যন্ত খাজনা দিতে হয় না, তারপর সামান্য খাজনা।

ঐ সব অনুন্নত জাতের অনেক লোক বিনা খাজনায় জমি পাবে বলে অনেক খেটে খুটে জঙ্গল সাফ করে সাপ বাঘের সঙ্গে লড়াই করে' চাষের জমি তৈরী করে, এবং তিন বছরে যখন রীতিমত ফসল হয়, তখন সামান্য খাজনা কবুল করেই থেকে যায়। আর এক ধরণের লোক আছে,—নির্বোধ,—তারা তিন বছর পরে ঐ তৈরী জমি ছেড়ে দিয়ে আবো জংলা জায়গায় চলে যায়, ঐ বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার জন্যে। তৈরী জমি যখন অন্য লোকে নেয়, তখন খাজনা একটু বেশী হয়। এমনি করে লোকবসতি এবং চাষবাস ক্রমশ উত্তর অঞ্চলে বেড়ে চলেছে, সংকারী আরও বাড়ছে।

অনেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাত হিসেবে "বাহে" বলে জানেন, কিন্তু "বাহে" কথাটা ওদের কথার মাত্রা—জাতটা রাজবংশী। দরিদ্র অজ্ঞ অনুন্নত জাত বলে তথাকথিত উন্নত জাতের লোকেরা ওদের নীচু চোখে দেখতো। একজন রাজবংশী লেখাপড়া শিখে উকীল হয়েছিলেন, কিন্তু বার লাইব্রেরীতে অন্যান্য উকীলেরা তাঁর সঙ্গে বসতেন না। সেই লোকই রাজবংশীদের মধ্যে আন্দোলন করে "রাজবংশী ক্ষত্রিয়" বলে সকল রাজবংশীর উপাধি প্রচলন করেন "বর্মণ"—এবং সকল রাজবংশীর উপবীত ধারণেরও প্রবর্তন করেন। এখন সকলেরই গলায় উপবীত, সকলেই বর্মণ— হল্পটু বর্মোন, ঝল্পটু বর্মোন, খোট্টি বর্মোন প্রভৃতি। অবশ্য তার সঙ্গে যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনও আছে।

ডুয়ার্স অঞ্চলে খাঁটি আদিবাসী একটা প্রধান জাত "মেচ" স্বাধীন বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভায় একজন "মেচ" মন্ত্রী নেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলুম। ওদের মধ্যে রীতিমত পয়সাওয়ালা লোকও আছে। ফালাকাটা অঞ্চলে থাউচং মেচের নাম প্রসিদ্ধ। তার প্রচুর জমি, বড় বড় গরুর এবং মহিষের পাল, প্রচুর টাকা। চেহারা এবং পোষাক অবশ্য দরিদ্র চাষীর মতন।

রাজবংশী, মেচ প্রভৃতি ও দেশীয় লোকেদের পোষাক বড় মজার কাপড়-জামা পরার চলনই যেন নেই। মেয়েরা একখানা পাঁচ হাতি কাপড়ের টুকরো বুকের ওপর থেকে লুঙ্গীর মতন পরে। আর পুরুষদের অঙ্গে মোটমাট একটা ছইঞ্চি চওড়া ও ফুট দুই লম্বা ন্যাকড়ার ফালি—কোমরের ঘুনসির সঙ্গে একটা মুড়ো পিছন দিকে বেঁধে কপনীর মতন ঘুরিয়ে সামনের দিকে এনে ঘুনসীর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আর একটা মুড়ো কোলের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া। এঁটে বাঁধার গরজটুকুও নেই। মাঠে দেখা যায় চাষী এই বেশেই জমিতে হাল দিচ্ছে, বাড়ীতেও এই বেশ। হাটে বাজারে আসার জন্যে একখানা সাত হাতি কাপড় অনেকে রাখে। হাট থেকে ফিরে বাড়ীর কাছে যেতে না যেতেই সেটা খুলে ফেলতে পারলে বাঁচে—বলে, গরম লাগে!

জোয়ান ছেলেরা ক্রমে মডার্ণ হচ্ছে, ঘাড়ের চুল মিহি করে ছাঁটে—তার উপর দিয়ে একটি টিকিও হয়ত ঝোলে—সামনে তেল চুকচুকে টেরি। ঠিক এমনি একটি জোয়ানকে হাটে আসতে দেখলুম—কাঁধে বাঁক দুদিকে ঝুড়ি তরকারী তারই একটার ওপর ছোট একখানা কাপড় জড়ো করা আছে—কর্তা চলেছেন ঐ ছইঞ্চি চওড়া ন্যাকড়ার ফালি পরে। হাটের কাছে গিয়ে কাপড়খানা পরবেন। সহর বন্দরে কাপড় না পরলে চলে না, তাই।

ভাষার বাহার চমৎকার। "আপনি" কথাটা শ্রেফ জানেই না, কিন্তু "তুমি" বা "তুই" এর সঙ্গে বেমালুম আসেন, যান, কন, বসেন বলে। কথার মাত্রা বাহে কিম্বা বাবেহে—আমরা যেমন বলি বাপু যে কিম্বা বাপু হে। আমি-তুমি গুলো বহুবচনেই বলে—হামড়া বা তোমড়া। তার সঙ্গে একটা লা (গুলা) জুড়ে দিয়ে হামাল্লা বা তোমাল্লাও বলে। মনিব যখন চাকরকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলে "এত্তি আসেন রে"—অর্থাৎ "এ দিকে আয়"—তখন অদ্ভুত ঠাট্টা মনে হয়। তারপর যখন শুনবেন,—চাষা গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং গরুটা কিছু এদিক-ওদিক চলছে দেখে চাষা এক ঘা ডাণ্ডা মেরে রেগে বলছে, শালাড় গড়, ওত্তি কোটে যান?—এত্তি ঘাটা দেখেন না?" (ওদিকে কোথায় যাস? এদিকে পথ দেখতে পাস না?) তখন হেসে না ফেলে উপায় আছে?

ভাষার আর এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য—তিরস্কার বা প্রহার করা অর্থে ওরা বেমালুম একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। এক দিয়ারের চৌকিদারের সঙ্গে দারোগার একটা মামলা সম্পর্কে কথা হচ্ছে—চৌকিদার বলছে, সাহেব ধাতানি দেবে আপনাকে—আমাকে তো পাবে না!—চৌকিদার বেমালুম বললে, সাহেব···তোমাক্!

মানুষগুলো কিন্তু অদ্ভুত সরল। নিজের বয়েস কেউ বলতে পারে না। এক বুড়ো চৌকিদারকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সে বললে, "কাঁয় জানে এলা, কত বা হৈল,—তোমরা পছন্দ করি লন কেনে।" বলল সেই যখন বড় ভূমিকম্প হয়েছিল (ভূমিকম্পকে কি বলেছিল, ভুলে গেছি)—"তালায় মুই গাবুর হচু"—অর্থাৎ তখন আমি জোয়ান। ঠাট্টা করে বলা হল,—তবু একটা একটা আন্দাজ করে বলনা—১২।১৩ বছর হবে? —সে একটু বিপন্ন ভাবে বললে,—"কাঁয় জানে, তা হবার পারে!"

এমন রেওয়াজও নাকি আগে ছিল,—থানায় এজাহার লেখাতে এলেই যে টাকা দিতে হয়, এটা সর্ববাদীসম্মত। আর আসামীর বিরুদ্ধে মামলা হবে যত (নম্বর) ধারার, ফরিয়াদী দারোগাকে তত টাকা দেবে। আবার, ওদের ধারণা, ধারার নম্বর যত বেশী, মামলা ততই কড়া। ৩০২ ধারার মামলায় (খুন) —৩০২ টাকা,—আর ৩২৬ ধারায় (সাংঘাতিক আঘাত) ৩২৬ টাকা। ২৪টা টাকা বেশী পাবার জন্যে দারোগারা নাকি ৩২০ এর মামলাকে ৩২৬ করে দিয়ে বলতো দিয়েছি ঠুকে ৩২৬। ফরিয়াদী সন্তুষ্ট হয়ে ৩২৬ টাকা দিয়ে যেত।

অবশ্য চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপরাধেরও বহর কম নয়। খোল-করতাল বাজিয়ে হরিসংকীর্তনের দল চলেছে—পুলিস আটক করলে, খোলের মধ্যে ডাকাতির মাল, অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়লো— ডাকাতের দল—এমন দৃষ্টান্তও আছে।

যাই হোক,—ফালাকাটা থানায় নাম লিখিয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র রেখে একজন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে হাট দেখতে চললুম—সেদিন হাটবার। বেশ বড় হাট। দারোগা এক চাকরও জোগাড় করে রেখেছিলেন—ডান হাতটা প্রায় কনুয়ের কাছ পর্যন্ত কাটা—দেখে কেমন পুলক লাগলো, তা বলা বাহুল্য। সেও সঙ্গে গেল।

বাজারে প্রচুর চাল বিক্রি হচ্ছে সাধারণতঃ সকলে যা খায়—মোটা, বেঁটে, বিশ্রী। বিক্রি হচ্ছে, ১১'২০ হিসেবে টাকায় ১৩ থেকে ১৬ সের দরে। খোঁজ নিয়ে আবিষ্কার করলুম ভোগ ধানের আতপ খুব সরু ও ছোট এবং চমৎকার সুগন্ধ—৬ টাকা মণ। তা-ই কিছু সংগ্রহ করলুম। মোটা চালের চিঁড়েও বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। সেই চিঁড়ে নাকি বাহেরা আধসের খায় একবারে। গুড়ের নাগরীর মতন ছোট কলসীতে দই বিক্রী হচ্ছে—পচা টকো দই, বুদ্‌বুদ উঠছে। শুনলুম, জ্বরে বাহেদের পথ্য হচ্ছে—আধসের-টাক ঐ মোটা চিঁড়ে এবং আধসেরটাক ঐ টকো দই। চিঁড়ের পর দই ঢেলে দিয়ে খাবলা খাবলা করে খেয়ে ফেলে!

হাটে মাছ প্রায় নেই—শুনলুম শীতকালে ভাল মাছ পাওয়া যাবে। শীতকালে ভাল মাছ যা পাওয়া যায় দেখেছি—সত্যিই ভ'ল চমৎকার চওড়া কই মাছ ৫'৬টায় একসের—যা আর কোথাও দেখিনি। অন্যান্য মাছও কিছু আসে, মামুলী। আর বুড়ী তোরসার ইলিস, সে এক অপূর্ব জিনিস—গোবর-মাটী চটকে ছাঁচে ফেলে রং করে দিলে যেমন হয়। ইলিস-কুল-কলঙ্ক।

চাকর ছোকরা না কি অনেক একক অফিসারের কাছে কাজ করেছে—combined hand—ঠাকুর-চাকর। দেখলুম, সত্যিই চমৎকার তার ঐ একটা মাত্র হাতে যেন ভেল্কী খেলে—হাতা-খুন্তি-চামচ চালায় অবিরাম ও নিপুণ ভাবে। রান্নারও ওস্তাদ এবং অসম্ভব চটপটে। দেখতে দেখতে ঐ দেড়টা হাতে কাঠের উনুনে ভাতে ভাত নামিয়ে খাইয়ে দিলে—খেয়ে তৃপ্তি হল আশাতীত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও আশাতীত।

রাত্রে কি ব্যবস্থা হবে? সে জিজ্ঞাসা করলে মুরগী খান? আমি সংশয়িত চিত্তে বললুম—খাই। সন্ধ্যাবেলা সে এক বাচ্ছা মুরগী—কাটা ও ছাড়ানো—নিয়ে এল। কতদাম? সে বললে চোদ্দ পয়সা ১০ ১২ পয়সায়ও পাওয়া যায়—আমি একটু বড় দেখে আনলুম।

সুতরাং পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল—দিনের বেলা নিরিমিষ্যি, আর রাত্রে মুরগী। এমনি চললো প্রায় তিন মাস। তারপরে মাঝে মাঝে ভাল মাছ চললো। এত সস্তায় এত ভাল খাওয়া আর কোথাও হয়নি।

যে দারোগা প্রথমে আমাকে জমা নিয়েছিলেন, তিনি কয়েকদিন পরেই বদলী হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান,—এখন এলেন এক হিন্দু দারোগা—উমাচরণ বিশ্বাস—জাতিতে সূত্রধর। দুজনেই লোক ভাল। উমাচরণবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, গিরীনদাকে চেনেন? গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়? '১৬ সালে আমি যখন পচাগড়ে ছিলুম, তিনি সেখানে ডেটিনিউ ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন।—সুতরাং তাঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। কিন্তু তিনিও কিছু দিন পরে বদলী হয়ে গেলেন! এলেন এক মুসলমান দারোগা—পাজির পা-ঝাড়া,—কিন্তু ভীতু। সুতরাং আমিও কোমর বাঁধলুম।

আমার ঘরটি ছিল ভাল—থানার মতনই পাঁচফুট উঁচু প্লাটফরমের ওপর টিনের চালের ঘর। মোটা শালের খাম্বার ওপর চওড়া মোটা তক্তার প্ল্যাটফরম—তৈরী হয়েছিল ইনস্পেকটিং অফিসারদের সাময়িক বাসের জন্যে। বাঘ ও সাপের উৎপাত এড়ানোর জন্যেই এমন ব্যবস্থা। রাত দশটার পর লোক রাস্তায় বেরোয় না,—বেরুলে অন্তত দুজনে বেরোয় লণ্ঠন নিয়ে। বাঘ অবশ্য চিতা—মানুষখেগো নয়,—কিন্তু মানুষকে খাবাথুবি মেরে পালায়। লোকের বাড়ী থেকে ছাগল, বাছুর, এমনকি কুকুর পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। তহশীল অফিসের একজন কর্মচারী ভাল শিকারী—একদিন পুলের জঙ্গল থেকে এক বাঘ মেরে আনলেন—দেখলুম—মাথা থেকে ল্যাজের ডগাপর্যন্ত ফুট আষ্টেক লম্বা। স্কুলে বাংলা পড়ান এক মুসলমান যুবক—"পণ্ডিত সাহেব"—তিনিও শিকারী। দুজনেরই বন্দুক আছে।

আমার ঘর এবং কালীবাড়ীর মাঝে আমার non official visitor মুসলমান জোতদার সাহেবের একটা বড় টিনের গুদাম আছে—ধান বোঝাই। তার পিছনে ছোট্ট মেথর পাড়া। তার পাশে কালীবাড়ী সংলগ্ন একটা আনারসের ক্ষেত। একদিন দুপুর বেলা সেখানে এক হৈ হৈ কাণ্ড। সেখানে একটা ছাগল চরছিল,—হঠাৎ তার পরিত্রাহি চীৎকার শুনে মেথররা গিয়ে দেখে, এক অজগর সাপ ছাগলটাকে পিছন থেকে কামড়ে ধরে তার পিছনের পা সমেত পেটটাকে জড়িয়েছে। তারা ঢিল মেরে চেঁচামেচি করতে সাপটা ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়ে পিছনের থানার জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেছে। ব্যাপারটা শুনে দারোগা বন্দুক নিয়ে গেলেন,—মেঘনাদ নামক এক কনষ্টেবল ছুটলো একটা ক্যাঁচা নিয়ে। আমরা আরো অনেকে গেলুম। সকলে যখন হতাশ হয়েছে, মেঘু বলে, শালাকে খুঁজে বার করবোই। এখানেই কোনো গর্তে ঢুকেছে।

মেথররা দা-কোদাল-খন্তা নিয়ে থানার জঙ্গল কাটতে সুরু করলো। একটু সাফ হতেই একপাশের পাড়ে একটা ফাটল দেখা গেল। মেঘুর উৎসাহে মাটি কাটা সুরু হল এবং একটু পরেই যেন চকচকে বিচিত্র নক্সা দেখা গেল। এক মেথর এক কোদালের কোপ দিলে এবং মেঘু ক্যাঁচা দিয়ে তাকে গেঁথে ফেললে। তারপর মাটি কেটে বার করা হল অপরূপ বিচিত্র বর্ণ প্রকাণ্ড সাপ—ফুট দশেক লম্বা, মাঝখানটা আমার উরুর মতন মোটা। সাপটার গলার খানিক নিচেই কোদালের কোপ লেগে একপাশের অর্ধেকটা কেটে গেছে। তার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে মেঘু আর মেথররা টানতে টানতে তহশীল অফিস এবং জোতদার বাবুদের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে কিছু বখশিস পেলে। তারপর সেটাকে ফেলে দিয়ে এল পুলের নীচের জঙ্গলে।

এরই মধ্যে একদিন থানায় গিয়ে দেখি নতুন S. D. O. এসেছেন—বেশ লম্বা সৌম্যমূর্ত্তি এক সাহেব—নাম বোধ হয় Baker, আমার মনে হল হিজলীতে গুলী চলার সময় সেখানে এই নামের Commandant ছিলেন। আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনিই কি হিজলীতে ছিলেন? সাহেব বললেন,—হ্যাঁ, তুমিও কি হিজলীতে ছিলে? আমি বললুম,—না, আমি নামটা শুনেছিলুম। Baker সাহেবেরও ভদ্রলোক বলে সুনাম আছে।

আবার তার কিছুদিন পরে এক ছোকরা-সাহেব এলেন, নতুন S. D. P. O.—নাম বোধ হয় বর্জ—মেদিনীপুর থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। পরে শুনলুম, ইনিই মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের হত্যাকারী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যকে পিছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ধরেছিলেন। বুঝলুম, Backward অঞ্চল বলে এখানেই বাছা বাছা মাল পাঠানো হচ্ছে।

'৩২ সালের শেষ এবং '৩৩ সালের গোড়া এই সময়টার মধ্যেই মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট বিপ্লবীদের (বি ভি দল) হাতে খুন হয়েছে। তার পর আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গার্লিক খুন হয়েছে এক ১৬।১৭ বছরের তরুণের হাতে। সব কথা ঠিক ঠিক মনে নেই, এবং সময় সম্বন্ধে আগু পিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। যতদূর মনে আছে, মেদিনীপুরে কৃষ্ণজীবন ঘোষ এবং প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়েছিল, আর একজনের কথা মনে নেই। আর গার্লিকের আততায়ী কোর্টের মধ্যে গুলী করার পরই বোধহয় পটাসিয়াম সায়েনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার নাম বা পরিচয় কেউই জানতে পারেনি অনেকদিন পর্যন্ত। শেষে জানা গেছে, তার নাম কানাই ভট্টাচার্য, জয়নগরে বাড়ী, যুগান্তর দলের সাতুদার চেলা। পুলিস তার নামে হুলিয়া করে' তার ফটো সমস্ত রেলষ্টেশনে টাঙিয়ে রেখেছিল, কিন্তু জয়নগরের কোন লোকও সে ফটো সনাক্ত করেনি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সরকার যে সন্ত্রাসবাদ চালিয়েছিল, তাতে বিপ্লবীদের সাহেব মারার কর্মসূচীও একটা "মরিয়া" ভেদে পরিণত হয়েছিল। আবার তার জবাবে শেষ পর্যন্ত সরকার বাহাদুর Suppression of Terrorism Act নামে এক অদ্ভুত কালাকানুন তৈরী করেছিলেন। এতদিন পুলিস রিপোর্টে শুধু বিনা বিচারে আটক চলতো, এবং মামলা ও জেল-ফাঁসি হত খুন-ডাকাতির সম্পর্কে। নতুন কালাকানুনে পুলিস রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই যাকে তাকে ধরে মামলার ঢং করে ছ' মাস কারাদণ্ড দেওয়া হতে লাগলো। কারো ওপর সন্দেহ হলেই পুলিস অবাধে তার বাড়ী সার্চ করে, এবং বেআইনী কিছুই না পেলেও,—একখানা স্বদেশী বই মাত্র, যেটা সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত বইও নয়,—পেলেই "undesirable book" বলে' মালিককে ঐ আইনে জেল দিত।

নিরুপায় ক্রোধে জেলে এবং বাইরে বিপ্লবীরা বলতো,—আর একটা যুদ্ধে ইংরাজ জড়িয়ে পড়লে আমরা এর শোধ নোব। পরে আর একটা যুদ্ধ সত্যিই যখন এল, তখন দুই বৃহত্তম বিপ্লবী দল—যুগান্তর এবং অনুশীলন গান্ধী-কংগ্রেসে ডুবে গলে' মিলিয়ে গেছে। চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র সুভাষবাবুরা।

এই সময়ে ('৩২-'৩৩ সাল) সুভাষবাবু ইউরোপে ছিলেন। ভারতে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিণতি দেখে তিনি ভাবতে সুরু করেছিলেন, কংগ্রেস অহিংসা নীতি ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরতে পারে কিনা। এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমা রোলাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন,—ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি অহিংসা নীতির অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়, যদি অহিংসা নীতি স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে অন্য পন্থা অবলম্বন করা কি অন্যায় হবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন,—না, অন্যায় হবে না।

সুভাষবাবু সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবেন, অথচ কংগ্রেসের নামেই সেটা করতে চান,—মহাত্মার আশীর্বাদের মোহ কিছুতে ত্যাগ করতে পারেন না,—তাঁর ব্যর্থতার মূল এইখানে। পরবর্ত্তীকালে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা গেছে। সে সব কথা যথাসময়ে আসবে।

যাই হোক, ইতিমধ্যে হালাকাটায় আর একজন ডেটিনিউ রাখার ব্যবস্থা হল, একটা নতুন ঘর তৈরী হল—বাঁশের উঁচু মাচার উপর খড়ের চাল ও দরমায় বেড়া দেওয়া বেশ বড় ঘর। নতুন ডেটিনিউ এলেন বরিশালের এক তরুণ জীবন গুহঠাকুরতা অনুশীলন দলের লোক। আমি অনুশীলন দলের নয় দেখে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল আমার সঙ্গেই Joint mess.

পড়াশুনার বইটই বিশেষ কিছু ছিলনা—একখানা Pears' cyclopaedia ছিল—সেখানাকেই পড়ে শেষ করেছিলুম,—এবং Agarpara যে also called Barrackpore এটা দেখে মনে হল, এই রকম কত নির্ভুল তথ্যই না আমরা ঐসব বই থেকে পেয়ে থাকি।

অমরদার (চ্যাটার্জি) কাছে কিছু বই চেয়ে চিঠি লিখেছিলুম, এবং তিনি পাঠিয়েছিলেন Book of knowledge এর ১২টা ভল্যুমের মধ্যে ৬টা—বাকিগুলো নাকি কে কে পড়তে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। যাই হোক, তাতে আমার লেখাপড়ার খোরাক ছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু অনুবাদও করতুম,—এবং "বিড়ির ধোঁয়ায়" নাম দিয়ে একটা ডায়েরীর মতন লিখতুম,—তারমধ্যে আমার চিন্তাধারাও গেঁথে রাখতুম।

হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে হডসন (S. P.) এসে হাজির। থানার রাস্তায় একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়া মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে সেখানে হিন্দু কনষ্টবলেরা একটা নুড়ি শিব রেখে পূজো করতো। একজন সেটার চারিদিকে খানিক জায়গা নিয়ে একটা বেড়া দিয়েছে। সাহেব বোধ হয় খবর পেয়েছিলেন, এবং বোধ হয় মুসলমান পুলিসদের কাছ থেকেই। হডসন হুড়মুড় করে সটান সেই বেড়ার কাছে উপস্থিত। কে বেড়া দিয়েছে? একজনকে গিয়ে দাঁড়াতেই হল। সাহেব তার কিছু জরিমানা করে বেড়া ভাঙিয়ে দিয়ে, তবে ঠাণ্ডা হলেন।

তার পর নতুন ডেটিনিউয়ের ঘর হয়ে আমার ঘরে এসে উঠলেন। আমি good morning বলে বসতে বললুম। তিনিও good morning বলে চেয়ারে বসলেন। আমি বসলুম বিছানায়। সাহেব বললেন,—"নতুন ডেটিনিউ কি রকম লোক? সাধারণ ভদ্রতাও জানে না। আমি তার ঘরে গেলুম তাকে দেখতে, আর সে চুপ করে বসেই রইলো, আমার দিকে তাকালোও না। কাজেই আমি তার সঙ্গে কথা না কয়েই চলে এসেছি।"

আমার কি জবাব দেওয়া উচিত, ভেবে একটু ইতস্তত করে বললুম—"লোক ভালই,—তবে young man, এবং without trial এ বন্দী থাকায় সর্বদাই একটা Sense of injustice feel করে। তাছাড়া সাধারণত বাঙ্গালীর ছেলেরা একটু Shy হয়ে থাকে। সুতরাং you needn't mind."

সাহেব বললেন—"হুম।" তার পর আমি একটা নতুন রকমের কথা পাড়লুম, "জেল থেকে internment এ পাঠায়, এবং তার পরের ধাপে release করে দেয়, এই তো রেওয়াজ। আমি এখানে ছ মাসের ওপর কাটালুম নির্বিবাদে সুতরাং এখন আমার release due হয়েছে। আমি একটা দরখাস্ত করবো—তুমি কি recommend করবে?"

সাহেব বললেন,—"তুমি দরখাস্ত করে দেখ,—আমি duly forward করবো।"

সাহেব চলে যাওয়ার পরই আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে এক দরখাস্ত লিখে দারোগার কাছে দিয়ে এলুম—মুক্তি প্রার্থনা করে নয়,—আমার কেসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর জবাব এলনা দেখে একবার জলপাইগুড়ী যাওয়ার চেষ্টা সুরু করলুম। ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, এবং মাথাধরা লেগেই আছে, সুতরাং চোখের জন্তে আমার দুর্ভাবনা হয়েছে—হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকালে একটা আলোর ঝাঁটার মতন দেখি সুতরাং একবার চোখ পরীক্ষা করা দরকার। দরখাস্ত করলুম।

সে দরখাস্তের জবাব এল—জলপাইগুড়ী সদর হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি পেলুম। দু'জন কনষ্টেবল সঙ্গে দিয়ে আমাকে সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখন জলপাইগুড়ীর সিভিল সার্জন Dr. Young—যিনি '২৪ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন—আমার চেনা লোক।

২১ দিন হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করে প্রস্রাব পরীক্ষা করে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাওয়া গেল প্রচুর। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন রিপোর্ট দিলেন অক্সালু'রিয়া চোখের পক্ষে খারাপ। Dr. Young-এর সঙ্গে '২৪ সালের সুবাদে আলাপ হল। তিনি বললেন, হাসপাতালে opthalmoscopic examination-এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু চোখ দুটো একটু টিপে টুপে পরীক্ষা করে বললেন, গ্লুকোমার আক্রমণের ভয় নেই।

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় S. P.র সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন, তোমার release-এর দরখাস্ত আমি recommend করে পাঠিয়েছিলুম—আমি তো তোমার সম্বন্ধে কিছু জানতাম না,—কিন্তু Calcutta I. B. তোমার যা history পাঠিয়েছে, তা দেখে I felt embarrassed—তোমার release-এর আশা নেই। তবে যদি তুমি একটা undertaking দাও, আমি আর একবার বলে দেখতে পারি।

বুঝলুম, এটুকুও Calcutta I. B.র instruction—বললুম আমি সরকারী undertaking-এর terms জানি—আমি তাতে সই করতে রাজী নই। সাহেব বললেন, কেন? তুমি তো বল, তুমি terrorism সমর্থন কর না? আমি বললুম, আমি একথা লিখে দিতে পারি যে, আমি terrorism movement-এর সঙ্গে সম্পর্ক আগেও যেমন রাখিনি, ভবিষ্যতেও রাখবো না। কিন্তু সরকারী গৎএর একটা সর্ত হচ্ছে, আমাকে যদি কেউ terrorism-এর দিকে টানতে চায়, আমি পুলিসকে সে কথা জানাবো। সে সর্তে আমি কিছুতেই রাজী নই—On principle.—সাহেব একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন,—then remain here on principle.

[ক্রমশঃ।

পথ

বুদ্ধদেব গুহ

দুয়ারের পায়ে এসে ঠিক, ইঁটে বাঁধা পথ
থমকে দাঁড়িয়ে গেছে; এক
হৃত-উদ্দেশ্য প্রয়াসের মতো।

এগিয়েই যেতো যদি দুয়ার পেরিয়ে; দূরের নক্ষত্র
একান্ত একাকী স্থির সীমান্ত-প্রহরী যেখানে
যদি যেতো অবশেষে পৌঁছে সেখানে, তবে কি পেতোনা
আকাশ মাটির মাঝে সঙ্গোপিত গভীর দ্যোতনা?
অন্তহীন সেই পথে তুমি কখন তো বাড়াওনি পা
গুণে গুণে পথ চল আজও, যে পথের দূরত্ব মাপা।

যথারীতি দিন গেলে বলদের কেনাকাটা করে
মন্থর জীবনে তুমি যেই বুড়ো হবে;
নাতিদের হাত ধরে ভৌগোলিক এ দেশ দেখাবে;
ভ্রষ্টনীড়-বিহগের মতো তারা বুঝি চঞ্চল হবে না।
স্বার্থের জোরে মাথাকুটে টাকা-আনা-পাই কুমি খুঁটে
দুলালেরা কোন দিনো গলে মর্যাদার মালা দোলাবে না।

বাইরে ঝড়ের ডাক, সুদূর পথের হাতছানি
অবিচ্ছিন্ন উপেক্ষায়, নিশ্চয় ফিরে যাবে জানি।

রক্ত ! রক্ত !!

শ্রীসুব্রতকুমার পাল

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা আশা করি কারো অজানা নেই। বিশশতকের এই মানবজাতি নানা মানবেতর অবস্থার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানবজাতি আজ প্রজাতি-বৃক্ষের (Geneological tree) সর্বোচ্চ শাখায় আরোহণ করবার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু এরাই একদিন অ্যামিবারূপে (Amoeba) জলে পঙ্কে নির্বোধ শিশুর মত খেলা করে বেড়াত। আমরা জলে যে অক্সিজেন গোলা থাকত তাই দেহের ছিদ্র দিয়ে টেনে নিয়ে শ্বাসকার্য চালাতাম। দেহ থেকে ক্ষতিকর পদার্থগুলো এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Carbon Dioxide) গ্যাস জলে পরিত্যাগ করতাম। এই জল থেকেই আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতাম। আশে-পাশের জল থেকে আবশ্যকমত তাপের আদান-প্রদান করে দেহের তাপসাম্য রক্ষা করতাম। কখনো বাইরে থেকে জল টেনে নিয়ে, আবার কখনো শরীর থেকে জল বের করে দিয়ে দেহের জলীয় উপাদানের সমতা রক্ষা করা হত।···

কিন্তু আজ আমরা অনেক জটিল হয়ে গেছি। শ্বাসকার্যের জন্য আমরা লাভ করেছি ফুসফুস, পেয়েছি অন্ননালী এবং তার সহকারী গ্রন্থিসমূহ, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্ক্রান্ত করবার জন্য রয়েছে বৃক্ক (Kidney) রক্তসঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড।···কিন্তু আজও আমরা ভুলতে পারিনি সেই আদি ও অকৃত্রিম সুহৃদকে—জলাশয়কে। যে ছিল বাইরে, তাকে আমরা গ্রহণ করেছি অন্তরে—রক্তরূপে। তাই অনেক জীববিজ্ঞানী রক্তকে বলেছেন—মানুষের আভ্যন্তরীণ হ্রদ (Internal lake of human being) উক্তিটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

রক্তের রাসায়নিক বিচার করে দেখা গেছে যে, এতে শতকরা ৯১-৯২ ভাগ জল আছে। এবং জলের কয়েকটি বিশিষ্ট কার্য (যথা, দেহের তাপসংরক্ষণ, ইত্যাদি) মূলত জলের কাছ থেকে ধার করা। তাছাড়া, জলে রয়েছে নানা প্রকারের লবণ-জাতীয় পদার্থ যা আমাদের পুরানো দিনের সমুদ্রজলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রক্তে কী কী আছে ঃ—

(ক) রক্তকণিকা—রক্তকণিকা দুই প্রকারের—

(১) লোহিতকণিকা (Redblood corpuscle) (২) শ্বেতকণিকা (White Blood corpuscle) অণুচক্রিকা (Thrombocyte) বলে আরও এক জাতীয় রক্তকণিকা আছে।

(খ) রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma) :—

(১) জল শতকরা ৯১-৯২ ভাগ (২) আমিষজাতীয় (Protein) ৭% যথা, অ্যালবুমিন, (Albumin) গ্লোবিউলিন, (Globulin) ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)।

(গ) অজৈব পদার্থ—যেমন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন। লৌহ, তাম্র ইত্যাদি।

(ঘ) চর্বিজাতীয় বা স্নেহজাতীয় পদার্থ।

(ঙ) বিভিন্ন হর্মোন (Hormone), এনজাইম (Enzyme)।

রক্তের কাজ ঃ—

আগেই বলেছি, এককোষী প্রাণী অ্যামিবার (Amoeba) জীবনকে ঘিরে'ছিল জলাশয়ের জলরাশি। এই জল অ্যামিবাকে শ্বাস-প্রশ্বাস, পুষ্টিসাধন, ক্ষতিকর পদার্থের রেচন (Excretion), তাপ সংরক্ষণ প্রভৃতি জীবদেহের অত্যাবশ্যক কাজগুলোতে সহায়তা করতো। যেহেতু রক্তকে বলা হয়েছে "আভ্যন্তরীণ জলাশয়", সুতরাং মানবদেহে রক্ত ঠিক উপরিউক্ত কাজগুলোই সম্পাদন করে থাকে।

(ক) শ্বাসক্রিয়া ঃ ফুসফুস দিয়ে আমরা যে অম্লজান (Oxygen) গ্রহণ করি, রক্তই তা শরীরের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। আবার, দেহকোষ থেকে পরিত্যক্ত অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbon-Dioxide) ফুসফুসে বয়ে আনে। এমনি করে রক্ত শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

(খ) পুষ্টিসাধন ঃ আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার সারাংশ রক্তই অন্ননালী থেকে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

(গ) রেচন ঃ দেহের প্রতিটি কোষে অহরহ রাসায়নিক ক্রিয়া চলেছে। এর ফলে কোষের ভিতরে নানা ক্ষতিকর পদার্থের সৃষ্টি হয়। রক্ত সেই পদার্থগুলো শরীর থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় রেচন (Excretion)।

(ঘ) রক্তে ৯০ ভাগ জল আছে। এর দ্বারা রক্ত শরীরের প্রয়োজনীয় জলীয় উপাদানের সমতা রক্ষা করে।

(ঙ) তাপ-সাম্য ঃ জলের কতকগুলি মহৎ ধর্ম আছে :—

(১) জল অনেক তাপ নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে।

(২) জলের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য।

(৩) জলের বাষ্পীভবনের জন্য প্রচুর তাপের প্রয়োজন।

৯০ ভাগ জল আছে বলে রক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে উপরের সমস্ত গুণই লাভ করেছে।

১ নং গুণের দ্বারা রক্ত দেহের অনেক তাপ নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে। তার ফলে দেহের তাপ হঠাৎ খুব বেড়ে বা হঠাৎ খুব কমে যায় না। শরীরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন ২নং গুণের দ্বারা রক্ত ভিতরের তাপকে ত্বকে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ৩নং গুণের দ্বারা তাপ বাইরে চলে যায়। এমনি করে রক্ত দেহের তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে।

(চ) রোগ প্রতিরোধ :

রোগ প্রতিরোধে রক্তের ভূমিকা অসাধারণ। রক্তের শ্বেতকণিকারা রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের উদরসাৎ করে

ফেলে। এই ক্ষমতাকে বলা হয় জীবাণুভুক্তি (Phagocytosis)। এছাড়াও, রক্তের গ্লোবিউলিন অংশ 'অ্যান্টিবডি' (Antibody) সৃষ্টি করে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। রক্তে আরও নানাবিধ বিষ-নিরোধক (Antitoxin) পদার্থ থাকে যা শরীরকে বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

(ছ) শরীরের অন্তঃনিঃস্রাবী (Endocrine) গ্রন্থিগুলির কোন নালী নেই (Ductless)। রক্তই এদের উত্তেজক রস বা হর্মোন (Hormone) শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। দেহের অন্দরমহলের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায় হর্মোনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান লেখক অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, (জ্ঞানবিজ্ঞান, দ্বাদশবর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, দ্রষ্টব্য)।

শ্বাসকার্য, পুষ্টিসাধন, রেচন, তাপসংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ এবং হর্মোন সংবাহন প্রভৃতি কাজের দ্বারা রক্ত দেহের ভিতরকার আবহাওয়ার (Internal environment) সমতা রক্ষা করছে।

রক্ত জমাট বাঁধে কী করে :—

রক্তের তঞ্চন বা জমাট বাঁধার (Coagulation) মূলে রয়েছে রক্তের কয়েকটি উপাদানের ক্রিয়াকলাপ। রক্ত-তঞ্চনের জন্য চারটি বস্তু অপরিহার্য :

(১) প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin)।
(২) থ্রম্বোপ্লাস্টিন (Thromboplastin)।
(৩) ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)।
(৪) ক্যালসিয়াম আয়ন (Calcium ion)।

প্রোথ্রম্বিন এবং ফাইব্রিনোজেন এই দুইটি প্রোটীন এবং ক্যালসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে রক্তমাংসে মুক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু থ্রম্বোপ্লাস্টিন মুক্ত অবস্থায় রক্তে থাকেনা; থাকে অণুচক্রিকাদের দেহের অভ্যন্তরে এবং আরও নানা টিস্যুতে (Tissue)। থ্রম্বোপ্লাস্টিন প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে (Thrombin) পরিণত করে; ক্যালসিয়াম আয়ন অনুঘটকরূপে (Catalyst) কাজ ক'রে এই পরিবর্তন সূচিত এবং ত্বরান্বিত করে। থ্রম্বিন তখন ফাইব্রিনোজেনের উপর ক্রিয়া করে 'ফাইব্রিন' নামক আর একটি পদার্থ সৃষ্টি করে। এই ফাইব্রিন (Fibrin) জলে দ্রবণীয় নয় বলে অধঃক্ষিপ্ত (Precipitated) অর্থাৎ আলাদা হতে থাকে এবং একত্র হয়ে জটের সৃষ্টি করে। সেই জটের (Clot) মধ্যে রক্তকণিকারা আটকে পড়ে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে বলা হয় রক্ততঞ্চন (Blood clotting) সংক্ষেপে ঘটনাটি এই :

(১) প্রোথ্রম্বিন + থ্রম্বোপ্লাস্টিন + ক্যালসিয়াম = থ্রম্বিন।
(২) থ্রম্বিন + ফাইব্রিনোজেন = ফাইব্রিন।
(৩) ফাইব্রিন + রক্তকণিকা = জট (clot)।

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রিয়াশীল থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তে এত অকিঞ্চিৎকর পরিমাণে থাকে যে, রক্ত শিরা-ধমনীতে জমাট বাঁধে না। অধিকন্তু রক্তে 'হেপারিন' (Heparin) নামে একটি তঞ্চন-প্রতিরোধক (Anticoagulant) পদার্থ আছে। এই হেপারিন রক্তের তরলতা রক্ষা করে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিনকে নিষ্ক্রিয় করে।

যখন অণুচক্রিকারা ধ্বংস হতে থাকে কিংবা রক্তবাহী নালীর কোন স্থান যখন বিকৃত হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নিঃসৃত হতে থাকে। ফলে রক্ত জট বাঁধে।

কোন জায়গায় কেটে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ঐ ক্ষতস্থানের নিকটস্থ স্থানের কোষ থেকে এবং আহত অণুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নির্গত হয়ে রক্তে জট সৃষ্টি ক'রে ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করে ফেলে। ফলে রক্তপাত স্বতঃই বন্ধ হয়ে যায়।

উৎসর্গ

(জন মেসফিল্ডের A Consecration কবিতা অবলম্বনে)

জাগাদেবীর বিজয়-মাল্য যাদের গলায় দোলে
আমার এ গান নয় রে তাদের নয়
রাজা উজির হর্ম-চূড় ধনীর স্তাবক যারা
তাদের নিয়ে সময় আমার করিনি অপচয়।
সম্পদ আর সমারোহের মাশুল জোগান দিয়ে
শূন্য উদর ম্লানদেহ রিক্ত হল যারা
আমার এ গান শুধুই তাদের নিয়ে।
চাইনে শাসক চাইনে শোষক চাইনে সেনাপতি
আমার চাওয়া সামান্য ঐ সৈনিককে ভাই,
ভাগ্যহারা, ছন্নছাড়া গোলাম আছে যত
আমার রচা কাব্যে আমি তাদেরি গান গাই।
মাল্লা, মাঝি, খালাসী আর শ্রমিক কত শত
ঝড়ে জলে আগুনজ্বালায় খাটছে অবিরত,
তাদের নালিশ, তাদের অভিমান
কণ্ঠে আমার দিল আনি সবহারাদের গান।
অন্য কবি যাঁরা
সুরা আর সম্ভোগের স্তুতিগানে তাঁরা
মুখর করুন কাব্য তাঁদের যত
চাইনে আমি হতে তাঁদের মত।
মন শুধু মোর তৃপ্ত হতে চায়
শরীরখানার জঞ্জালে আর নোংরা আবর্জনায়।
করুন ভোগ অন্য কবি সব
পুষ্পমাল্য সজ্জাভোজ্য কাঞ্চন-বৈভব।
আমার তরে থাক
একটি মুঠি ছাই আর আঁস্তাকুড়ের পাঁক।
অন্ধ খঞ্জ ভিক্ষু হ'য়ে জন্ম নিল যারা
রৌদ্র-তাপে আঁধার-রাতে বৃষ্টি শীতে তারা
চাতক পাখির স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছে দিশাহারা—
আমার গানে আমার কাহিনীতে
তাদের অমর জীবন-কথা কইবো শুধু আমি।

অনুবাদ : বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

মুখোশ

বারীন্দ্রনাথ দাশ

হাজরার মোড়ে ট্রাম ধরলো পরাশর। তখন দুপুর বেলা। ট্রামে লোকজন বেশী। লেডিজ সীটে শুধু একটি মেয়ে বসে। সামনের দিকে এগোতে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পরাশর একনজর দেখলো। মেয়েটি বেশ সুশ্রী দেখতে। চোখে কালো গগলস্, হাতে হাল ফ্যাশানের ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনে সিল্কের শাড়ি। আরেক নজর দেখলো পরাশর,—গগলস্ নয়, ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, সিল্কের সাড়ি নয়, দেখলো মেয়েটির নিচু-গলা পাতলা ব্লাউস।

চলে যাচ্ছিলো একেবারে সামনের সীটের দিকে। হঠাৎ একটি চেনা গলা শুনে ফিরে তাকালো।

"পরাশর?"

যে লোকটি তাকে ডাকলো সে বসেছিলো মেয়েটির ঠিক সামনের সীটে।

"আরে! শ্যামাপদ?"

তার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলো পরাশর। পরনে ফিটফাট স্যুট, গলায় টাই, চেনাই যায় না শ্যামাপদকে। কে বলবে এই শ্যামাপদ অনেক বছর আগেকার এক লাজুক আই-এ ক্লাশের ছাত্র, কারো সঙ্গে মেশে না, শুধু নিজের মনে বসে ছবি আঁকে। পরাশর তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলো। সেই সরু সরু আঙুল, তবে আগের মতো ফরসা নিটোল আর নেই, শির বেরিয়ে পড়েছে, তামাটে রং হয়ে গেছে রোদ্দুরে পুড়ে। পাতলা গড়ন সেই আগের মতোই, রুক্ষ হয়ে গেছে মুখখানি, কিন্তু এত বছরেও চেহারা আর বদলায়নি। শুধু মাথার সামনের দিকে একটু টাক পড়ে যাচ্ছে।

"কতো বছর পরে দেখা"—

"হ্যাঁ, অনেক বছর। দশ-বারো বছর হবে, তাই না?"

"কি করছিস আজ-কাল?"

"আমি?" বললো পরাশর, "আমার একটি কাপড়ের দোকান আছে লেক মার্কেটে।"

"তুই একটা চাকরি করতিস শুনেছিলাম?"

"সে তো অনেক বছর আগের কথা। থার্ড ইয়ারে পড়া ছেড়ে দিয়ে রেশনিং-এ চাকরি নিয়েছিলাম। কিন্তু সে চাকরি বেশীদিন থাকলো না। কিছুদিন চাকরির চেষ্টাচরিত্র করে যখন দেখলাম কিছু হচ্ছে না, তখন বৌয়ের গয়নাগাঁটি কিছু বেচে ঠাকুরের নাম নিয়ে একটি দোকান খুলে বসলাম। এখন মোটামুটি ভালোই চলছে। গত বছর দোকানটাকে আরো বাড়িয়েছি। আয় না একদিন?"

"এখন যাচ্ছিস কোথায়?"

"ফ্র্যাংক-রসএ। বৌয়ের ভাই, খুব অসুখ যাচ্ছে মাসখানেক হোলো। কী যে ওষুধ লিখে দিয়েছে ডাক্তার, কোথাও পাচ্ছিনে। যাক্ তোর কি খবর বল। কোথায় আছিস?"

একটু হাসলো শ্যামাপদ। বললো, "এখন আছি পার্কসার্কাসে।"

"তুই তো আই-এ পাশ করে আর পড়লি না। কি করছিস এখন?"

"আর দশজন যা করে," শ্যামাপদ হাসতে হাসতে বললো, "চাকরি।"

পরাশর আরেক বার শ্যামাপদর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলো। হেসে বললো, "দেখে তো মনে হচ্ছে খুব ভালো চাকরি করিস। সরকারী চাকরি?"

"না ভাই! বেসরকারী চাকরি। আই-এ পর্যন্ত বিদ্যে নিয়ে কি আর ভালো সরকারী চাকরি সম্ভব? আমি আছি একটি মাড়োয়ারী ফার্মে। ওদের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেল্‌স্ ম্যানেজার।"

"বাঃ, বেশ বেশ। খুশী হলাম শুনে। অপূর্বকে মনে আছে? সে এম-এ পাশ করলো, বি-টি পাশ করলো। কি করে জানিস? স্কুল-মাষ্টারি। প্রায়ই আসে, টাকা ধার চায়। বিজনকে মনে আছে? ইকনমিক্সে অনার্স ছিলো যার? হ্যাঁ, সে-ও এম-এ পাশ করলো ইকনমিক্সে। এখন এ-জি বেঙ্গল-এ আছে। আপার ডিভিশান। আমরা তো ভাই ওদের মতো পড়াশুনো করতে পারলাম না, পেটে বিদ্যেও নেই তেমন কিছু। তবে তাদের চাইতে কিছু খারাপ নেই, কি বলিস? হাঃ হাঃ হাঃ।"

"হাঃ হাঃ," পরাশরের সঙ্গে একমত হোলো শ্যামাপদ।

পরাশর একবার পেছন ফিরে তাকালো। গগল্‌সপরা মেয়েটি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার নিচু-গলা ব্লাউসের দিকে তাকালো পরাশর, তারপর শ্যামাপদর দিকে ঝুঁকে পড়ে খুব আস্তে আস্তে বললো, "পেছনে একটি মেয়ে বসে আছে, দেখেছিস?"

শ্যামাপদ একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল, তারপর বললো, "ওসব দেখবার বয়েস কি এখনো আছে রে ভাই?"

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম।
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে।

ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকরী
ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

LIFEBUOY SOAP

L. 17-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

"দেখবার বয়েস চিরকালই থাকবে." হাসতে হাসতে উত্তর দিলো পরাশর, "দেখতে বেশ, কি বলিস?"

শ্যামাপদ একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

"বিয়ে-থা করেছিস?" পরাশর জিজ্ঞেস করলো।

"তা একটা করেছি."

"ছেলেপুলে?"

"একটি ছেলে."

"ব্যস্?"

"ব্যস্। আর কতো। তোর?"

"তিন ছেলে। দুই মেয়ে। হাঃ—হাঃ."

শ্যামাপদও হাসলো।

"আরো একটা হবে শীগগিরই। হাঃ—হাঃ—"

শ্যামাপদ হেসে চুপ করে রইলো।

"একদিন আয় আমাদের বাড়ি."

"আসবো."

"আসিস। পুরোনো বন্ধুদের কারো সঙ্গে দেখাশোনা হয় না, খিস্তি-কিস্তি করতে পারি না. ভালো লাগে না একটুও।" বলে পরাশর আরেক বার পেছন ফিরে তাকালো। তারপর বললো খুব চাপা গলায়, "কী ব্লাউসের ফ্যাশান হয়েছে মাইরী, একবার ফিরে তাকিয়ে দেখ."

শ্যামাপদ ফিরেও তাকালো না. কোনো উত্তরও দিলো না।

কনডাক্টার এলো। পাঞ্জাবির পাশের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলো পরাশর। জিজ্ঞেস করলো, "তোর টিকেট কাটা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ." বলে শ্যামাপদ তার হাতের টিকিট দেখালো।

পরাশর একটা এসপ্লানেডের টিকিট কাটলো। শ্যামাপদ দেখলো, মানিব্যাগের ভিতর থেকে কয়েকটি দশ টাকার নোট উঁকি মারছে। পরাশর মানিব্যাগ আবার পাশের পকেটে রাখলো।

"ওহে টাকা তুই পাশের পকেটে রাখছিস?" জিজ্ঞেস করলো শ্যামাপদ, "যদি পকেটমার হয়?"

"আমার পকেট থেকে? হুঁঃ। আমার পকেট মারা অতো সহজ নয় বাবা! আমি খুব হুঁশিয়ার লোক."

"তবু মানিব্যাগ পাশের পকেটে রাখার চাইতে বুক পকেটে রাখা ভালো। পাশের পকেট থেকে পকেটমার হওয়া সোজা।"

"ঠিক তার উল্টো। পাশের পকেট থেকে পকেটে হাত রেখে পথ চলা যায়, বুকপকেটে তো আর হাত রেখে চলা যায় না। তা ছাড়া টাকাও এমন কিছু বেশী নয়। বড় জোর শ-খানেক টাকা আছে। সে টাকা আমার টাকা।"

শ্যামাপদ পরাশরের মুখের দিকে একবার তাকালো, হাসলো একটুখানি। তারপর বললো, "টাকা যতো কমই হোক না কেন, পকেটমার হলে কি ভালো লাগে?"

"আমার সে ভাবনা নেই। আমার পকেটমার হলেও টাকা খোয়া যায় না."

"কি রকম?"

"ব্যবসা করি, দু-চারজন লোকের সঙ্গে চেনাজানা আছে। যদি পকেটমার হয় তো কোনো একজনকে গিয়ে বলি, ভাই অমুক জায়গায় আমার পকেটমার হয়েছে। ব্যস, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মানিব্যাগ ফেরত পাওয়া যায়। যদি তোর কোনো দিন পকেটমার হয় তো আমার কাছে চলে আসিস। আমি ঠিক ফেরত পাইয়ে দেবো."

শ্যামাপদ একটু হেসে বললো, "বেশ, জানা রইলো."

"আমার যে পকেটমার হয়নি দু-একবার তা নয়, কিন্তু সে শুধু দু-একবার। বেশির ভাগ সময় আমি নিজেই পকেটমারকে হাতে হাতে ধরে ফেলেছি। পকেটমার যতো চালাকই হোক না কেন, আমার মতো হুঁশিয়ার লোকের পকেটে হাত দেওয়া শক্ত."

শ্যামাপদ হাসিমুখে চুপ করে রইলো।

"তোর এত পকেটমারকে ভয় কেন?" জিজ্ঞেস করলো পরাশর, "বেশ কিছু গচ্চা দিয়েছিস বুঝি?"

"একবার", শ্যামাপদ হাসিমুখে উত্তর দিলো।

"কোথায়?"

"বেহালার ট্রামে."

"ট্রাম-বাসের ভীড়ে একটু সাবধান থাকতে হয়."

"ভীড় একেবারে ছিলো না। শুধু আমি আর আমার পাশে একজন ভদ্রলোক."

"তাহলে নিশ্চয়ই সে নিয়েছে."

"তা তো বটেই."

"ভদ্রলোক না আরো কিছু। পিকপকেট ভদ্রলোক সেজে বসেছিলো."

"পিকপকেটের ভদ্রলোক হতে বাধা কি", শ্যামাপদ বললো, "পকেটমারকে দেখে যদি পকেটমার বলে চেনা যায়, তাহলে কি আর ওদের ব্যবসা চলবে?"

"কতো টাকা খুইয়েছিলি?"

"দুটো একশো টাকার নোট."

"কোথায় ছিলো?"

"বুক-পকেটে."

"তা তো খোয়া যাবেই। বুক-পকেটে কেউ মানিব্যাগ রাখে?"

"বুকপকেটে মানিব্যাগ ছিলো না", শ্যামাপদ বললো, "মানিব্যাগ ছিলো পাশের পকেটে। আমি মানিব্যাগে টাকা রাখি না, শুধু খুচরো রাখি। টাকা থাকে আমার বুকপকেটে অন্য দু-চারটা কাগজপত্তরের সঙ্গে। এসপ্লানেড থেকে বেহালার ট্রাম ধরেছিলাম। প্রথম দিকটায় লোকজন কিছু ছিলো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো আমাকে। খিদিরপুর ছাড়িয়ে হাওড়ার সঙ্গে ট্রাম ফাঁকা হয়ে গেল। সামনের দিকের একটি সীটে দুজন লোক বসছিলো। তাদের একজন উঠে যেতে আমি সেই সীটে গিয়ে বসলাম। এতক্ষণ কণ্ডাক্টার আমার কাছে টিকিট চায়নি। এবার আসতেই আমি পাশের পকেটে হাত দিয়ে দিকে মানিব্যাগ নেই। আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন,—কি হোলো? মানিব্যাগ হারিয়েছেন? আমি ঘাড় নাড়লাম।—পথে-ঘাটে একটু সাবধানে চলতে হয় মশা?—উপদেশ দিলেন সেই ভদ্রলোক। তারপর বললেন—ভাড়ার পয়সাটা তাহলে দেবেন কি করে? বড়ো যাবেন বলুন, টিকিট না হয় আমিই কাটিয়ে দিচ্ছি। আমি বললাম, না, না, আমার কাছে টাকা আছে। বলে বুকপকেট থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বার

করে কণ্ডাকটারকে দিলাম। তারপর ভদ্রলোককে বললাম, পিকপকেট খুব বুদ্ধিমান নয়। শুধু মানিব্যাগই তার চোখে পড়েছে, তার মধ্যে আছে শুধু কয়েক আনা খুচরো। বুঝলেন মশাই, আমার বুকপকেটে দুটো একশো টাকার নোট, আর একটি দশ টাকার, একটি পাঁচ টাকার নোট আছে। সে-টাকা পিকপকেটের চোখে পড়েনি। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক খুব হাসলেন। আমিও খুব হাসলাম। কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের গন্তব্যস্থল এসে গেল। তিনি নেমে পড়লেন ট্রাম থেকে। ফাঁকা ট্রামে একলা সীটে আমি একা বসে। হু-হু করে ট্রাম চলেছে। অনেকটা পথ আসবার পর কি যেন মনে হোলো। বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখি দশ টাকার নোট আর পাঁচ টাকার ভাঙতিটা ঠিক আছে, কিন্তু একশো টাকার নোট দুটো নেই। আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। দেখি, কেউ নেই ট্রামের ভিতর। হঠাৎ কি মনে হোলো, পাশের পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আমার মানিব্যাগটা আবার পকেটে ফিরে এসেছে।"

শ্যামাপদর কাহিনী শুনে পরাশর খুব হাসতে লাগলো, "তাহলে সে বার খুব বোকা বনেছিলি বল্‌?" বলে পেছন ফিরে আবার মেয়েটির দিকে তাকালো।

গল্প করতে করতে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড় এসে গেল।

"আমি এখানেই নামবো", বললো পরাশর।

"চল, আমিও এখানেই নামবো", শ্যামাপদ উত্তর দিলো, "আমি যাবো অবশ্যি এসপ্ল্যানেডের দিকে। এখানে নামলে খানিকটা পথ তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তারপর বাকী পথটুকু একা হেঁটে চলে যাবো'খন।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে অনেক লোকজনের ভিড়। তাদের মাধ্য পথ করে হেঁটে গেল পরাশর আর শ্যামাপদ। স্মিথ-ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের ওষুধের দোকানের সামনে এসে পরাশর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে বলে উঠলো, "আমার মানিব্যাগ?"

মানিব্যাগ নেই। পরাশরের মুখ শুকিয়ে গেল।

"আমি তোকে আগেই বলেছিলাম," শ্যামাপদ বললো।

"ট্রামে নিশ্চয়ই খোয়া যায়নি," বললো পরাশর, "ট্রাম ফাঁকা ছিলো, আর তুই ছিলি পাশে। নিশ্চয়ই এখানে এই ভিড়ের মধ্যে কেউ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। যাগগে, টাকাটা ঠিক ফিরে পাবো। আমি একজনকে চিনি, যাকে বললে মানিব্যাগটা ঠিক ফেরত পাওয়া যাবে। এ তো একটা দলের ব্যাপার, সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু উপস্থিত কি করা যায়? বৌয়ের ওষুধটা কিনতে হবে তো!"

"কতো লাগবে?" শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করলো।

"দশ টাকার মতন লাগবে।"

শ্যামাপদ কোনো কথা না বলে পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে দিলো।

"আচ্ছা, আসিস একদিন আমার ওখানে," বললো পরাশর।

"হ্যাঁ, আসবো," শ্যামাপদ উত্তর দিলো।

পরাশর ঢুকলো ওষুধের দোকানে। শ্যামাপদ চলে গেল অন্য দিকে।

শ্যামাপদ বাড়ি ফিরলো ঘণ্টাখানেক পরে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে একটি সরু গলি বেরিয়েছে। পথের দু-পাশে পুরোনো জীর্ণ কয়েকটি ফ্ল্যাট-বাড়ি। তারই একটির ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটি ঘরে কড়া নাড়লো শ্যামাপদ।

যে এসে দরজা খুলে দিলো তাকে এখানে দেখতে পেলে হয়তো স্তম্ভিত হোতো পরাশর। খুব ভাল ফ্যাশানের সাজগোজ করে সে ট্রামে বসেছিলো পরাশর-শ্যামাপদর পেছনে। এখন কিন্তু তার সাজ খুব ঘরোয়া, তার বসন আধ-ময়লা, জীর্ণ, অবিন্যস্ত।

দরজা খুলে দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়ালো। ঘরের ভিতর ঢুকলো পরাশর। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিলো। দুটো রুমের একটি ছোটো ফ্ল্যাট, অত্যন্ত নোংরা, অগোছালো,—তক্তপোশ, আলনা, নড়বড়ে কেরোসিন কাঠের টেবিল আর চেয়ার আর টিনের তোরঙ্গে ঠাসাঠাসি।

"লক্ষ্মী!" ডাকলে শ্যামাপদ।

"যাই।"

মেয়েটি চলে গিয়েছিলো পাশের ঘরে। শ্যামাপদর ডাক শুনে আবার বেরিয়ে এলো, এসে একটি মানিব্যাগ দিলো শ্যামাপদর হাতে।

পরাশরের মানিব্যাগ।

শ্যামাপদ নিজের মনে একটু হাসলো। ব্যাগ খুলে টাকা বার করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, "কতো আছে গুণে দেখেছো?"

"দশ টাকার এগারোখানি নোট আছে।"

শ্যামাপদ টাকা না গুণেই পকেটে ঢোকালো।

"কাপড় ছাড়বে না?" লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলো।

"না। এক কাপ চা করে দাও। তারপর বাড়িভাড়াটা দিয়ে আসি।"

"বাড়িভাড়া দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে তো?"

"কেন?"

"আজকের মতো অনেক হয়েছে। আর নয়," মৃদু গলায় লক্ষ্মী বললো।

খালি মানিব্যাগটি লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিলো শ্যামাপদ।

"কি করবো এটা?"

"রেখে দাও, ফেলে দাও, যা খুশি করো।"

একটা কথা মনে পড়াতে শ্যামাপদর হাসি পেলো। বলল, "তুমি যেরকম অ্যাপ-টু-ডেট মেয়ে সেজে পেছনে বসেছিলে, পরাশর বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলো তোমার দিকে। ওর খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে।"

"আমার খুব খারাপ লাগছিলো। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না কেন?"

"দিতাম। কিন্তু ওর মানিব্যাগটার উপর যখন চোখ পড়লো তখন ভাবলাম, থাক, আর আলাপ করিয়ে দিয়ে কাজ নেই।"

"আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি," লক্ষ্মী বললো।

"কি?"

"পুরোনো বন্ধু তোমার, এত বছর পর দেখা হোলো, তুমি তার পকেট থেকেও মানিব্যাগ তুলে নিলে? আমি ভাবতেই পারিনি। যখন দেখলাম সীটের পেছন দিকের ফাঁক দিয়ে তুমি মানিব্যাগ গলিয়ে দিচ্ছো আমার দিকে আমি সত্যি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। না নিয়ে উপায় ছিলো না বলেই নিলাম, কিন্তু আমার একটুও ইচ্ছে করছিলো না। এ কি কথা, পুরোনো বন্ধু তোমার!"

"যার যা পেশা। আমি ডাক্তার হলে তার চিকিৎসা করতাম না? আমি উকীল হলে তার মামলা হাতে নিতাম না?"

লক্ষ্মী একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "আমার আর ভালো লাগছে না।"

শ্যামাপদ লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে দেখলো, জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"আমার ভয় করে।"

শ্যামাপদ আস্তে আস্তে বললো, "আজ এত বছর ধরে তুমি আমি মিলে এত কিছু করলাম, কোন দিন তোমার ভয় করলো না, আজ তুমি ভয় পাচ্ছো?"

"আমার নিজের জন্যে নয়," লক্ষ্মী উত্তর দিলো, "আমার ভয় করে তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?" শ্যামাপদ হেসে উঠলো।

"যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাও?"

শ্যামাপদ মাথা নাড়লো।

"আমি অনেক দিন থেকেই তোমায় বলবো বলবো ভাবছিলাম," লক্ষ্মী বললো, "আর কেন? একটা ছোটখাটো দোকান করলে হয় না? তোমার বন্ধু তো কাপড়ের দোকান করে বেশ আছে। যদি একটা দোকান করো আমি খুব সহজ ভাবে তোমার সঙ্গে কাজ করতে পারবো। এ রকম ভয় করবে না।"

"যদি আমার সঙ্গে বেরোতে ভয় করে তো বেরিয়ো না। ঘরে বসে থাকো।"

"না, তাও আমার ভয় করে। তোমায় চোখের আড়াল করতে পারবো না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শ্যামাপদ। তারপর বললো, "আমি ভাবছি তুমি কতো বদলে যাচ্ছো। মিস্তিরের রেস্তরাঁয় যখন চাকরি করতে তখন তো এ রকম ভীতু তুমি ছিলে না? বৌ-বাজারের সেই গয়নার দোকানে ওদের সন্দেহ হতে যখন তাড়াতাড়ি লোহার গেট বন্ধ করে দিলো, তখন তো তুমি ভয় পাওনি? বালীগঞ্জের সেই ব্যারিষ্টারের বাড়িতে—"

"থাক, থাক, ওসব পুরোনো কথা আর নয়," শ্যামাপদকে থামিয়ে দিলো লক্ষ্মী।

"আমি শুধু বলছিলাম, আগে তো তুমি ভয় পেতে না?"

"তখন খোকা ছিলো না," উত্তর দিলো লক্ষ্মী।

"হুঁ," শ্যামাপদ চুপ করে রইলো। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "মনে পড়ে লক্ষ্মী, তোমাকে কি অবস্থার মধ্যে মিস্তিরের কবল থেকে বার করে এনেছিলাম?"

"হ্যাঁ, মনে পড়ে। তাই এদ্দিন মুখ বুজে তোমার সব কথা শুনে এসেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে, তোমায় বলে দেওয়া উচিত এভাবে আর বেশী দিন চলবে না। তুমি কতো বড়ো বাপের ছেলে, আমিও কি রকম পরিবারের মেয়ে—কিন্তু আজ আমরা কোথায় নেমে এসেছি একবার ভেবে দেখ তো?"

শ্যামাপদ কোনো উত্তর দিলো না। অনেকক্ষণ বসে বসে সিগারেট টানলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কাছেও তো কিছু টাকা আছে, না?"

"হ্যাঁ।"

"কতো?"

"এই, একশো পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে। কেন?"

"ভাবছি, মুদী দোকানের পাওনাটা মিটিয়ে দেবো।"

"কাল সকালে দিলেই হবে," লক্ষ্মী উত্তর দিলো।

সে চা করে এনে দিলো। চুপচাপ বসে চা খেলো শ্যামাপদ। লক্ষ্মী পাশের ঘরে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছিলো। খোকার দেখাশুনা করবার জন্যে একটি বুড়ি ঝি রাখা হয়েছিলো, সে খোকার দু-তিনটে জামা কেচে এনে শুকোতে দিলো পেছন দিকের বারান্দায়।

শ্যামাপদ পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বার করলো। গুণে দেখতে গিয়ে একটু থামলো। তারপর হঠাৎ ডাকলো, "লক্ষ্মী!"

"কি?" লক্ষ্মী বেরিয়ে এলো।

লক্ষ্মীকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে বলা হোলো না। কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো। শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি নোটের তাড়া পকেটে পুরে, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

দরজা খুলে দেখে, পরাশর।

"তুই?" অবাক হয়ে গেল শ্যামাপদ, "তুই আমার বাড়ির খোঁজ পেলি কি করে?"

"কেন?" পরাশর যেন একটু অবাক হোলো, "তুই তো আমায় তোর ঠিকানা বলেছিলি।"

"তাই নাকি?" মনে মনে আরো বেশী অবাক হোলো

শ্যামাপদ। সে কাউকে তার ঠিকানা দেবে, এ অসম্ভব ব্যাপার। "যাই হোক, হঠাৎ এসময় কি মনে করে?"

পরাশর পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করলো। বললো, "টাকাটা ফেরত দিতে এলাম।" বলতে বলতে হঠাৎ চোখ পড়লো লক্ষ্মীর উপর। একটা অপরিসীম বিস্ময় তার মুখের উপর পরিস্ফূট হয়ে উঠলো। কিন্তু সে মুখে কিছু বললো না।

দু-তিন মুহূর্ত সে বা শ্যামাপদ কেউই কোনো কথা বলতে পারলো না।

হঠাৎ লক্ষ্মীই বলে উঠলো হাসিমুখে, "বাঃ, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

একটি নড়বড়ে চেয়ারের উপর এসে বসলো পরাশর। ততক্ষণে শ্যামাপদও সামলে নিয়েছে নিজেকে।

আস্তে আস্তে গল্প করতে লাগলো ওরা দু-জন। লক্ষ্মী ভেতরে চলে গেল।

গল্প করতে করতে শ্যামাপদ আঁচ করবার চেষ্টা করতে লাগলো, পরাশরের এখানে আসবার আসল মতলবটা কি।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বেরিয়ে এলো ধূমায়মান চায়ের কাপ হাতে করে।

শ্যামাপদ আর পরাশর চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলো। লক্ষ্মী কিছুক্ষণ আশেপাশে ঘুরঘুর করলো, গুছিয়ে রাখলো এটা ওটা সেটা। তারপর ভেতরে চলে গেল।

"নতুন মানিব্যাগ কিনেছিস?" শ্যামাপদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

"না, এখনো কিনি নি।" উত্তর দিল পরাশর।

"এবার আর মানিব্যাগ পাশের পকেটে রাখিসনে!"

শ্যামাপদর কথা শুনে পরাশর একটু হাসলো।

"তুই না কাকে যেন চিনিস বলছিলি, যে তোর ম্যানিব্যাগ ফেরত এনে দিতে পারে। তাকে খবর দিয়েছিস?"

পরাশর উত্তর দেওয়ার আগে একবার জামার পাশের পকেটে হাত ঢোকালো। মনে হোলো যেন একটুখানি চমকে উঠলো সে। তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি," একটু যেন ব্যঙ্গ অনুভূত হোলো শ্যামাপদর গলায়, "সে ম্যানিব্যাগটা ফেরত এনে দিতে পারবে বলেছে?"

পরাশর একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না। আস্তে আস্তে পকেট থেকে হাত বার করলো।

শ্যামাপদর চোখ কপালে উঠলো। পরাশরের হাতে তার সেই মানিব্যাগ।

"টাকাগুলো?" বেরিয়ে এলো শ্যামাপদর মুখ থেকে।

পরাশর মানিব্যাগ খুললো। শ্যামাপদ দেখলো ভেতরে এক-তাড়া দশ টাকার নোট।

শ্যামাপদ আস্তে আস্তে একটি সিগারেট ধরালো। মানিব্যাগ পকেটে ঢোকালো পরাশর।

"একটু বোসো। আমি এক্ষুণি আসছি। তারপর একসঙ্গে বেরোবো," বলে শ্যামাপদ উঠে পড়লো।

টেবিলের উপর পড়েছিলো একটি সিনেমা মাসিকের মোটা শারদীয়া সংখ্যা। সেটি তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো পরাশর।

পাশের ঘরে ঢুকে শ্যামাপদ লক্ষ্মীকে কাছে ডাকলো। চাপা কণ্ঠাগলায় জিজ্ঞেস করলো, "মানিব্যাগটা পরাশরের পকেটে কি করে এলো?"

লক্ষ্মী ম্লান হাসলো। বললে, "দেখলে তো, আমার হাত তোমার চাইতেও পাকা হয়ে উঠেছে। তোমারও চোখে পড়লো না।"

"হুঁম্। টাকাটা এলো কোত্থেকে?"

"আমার হাতে যে টাকা ছিলো, তার থেকে দিয়ে দিয়েছি। ভাবনা কি? ওর টাকাটা তো তোমার পকেটে আছে।"

শ্যামাপদ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো লক্ষ্মীর দিকে। তারপর বললো, "তোমায় একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছিলাম, খেয়াল আছে? পরাশর এসে পড়লো বলে বলা হোলো না।"

"কি কথা?"

"পরাশরের মানিব্যাগে যে নোটগুলো ছিলো, যে টাকা এখন আমার পকেটে আছে, সেগুলো সব জাল।"

"জাল?" লক্ষ্মীর মুখ শাদা হয়ে গেল।

"ভাগ্যিস ও টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিতে যাইনি। কী কেলেঙ্কারি হোতো একবার ভাবতো?—আর তুমি এ কি করলে?

ওর জাল নোটের বদলে ওকে আসল নোট দিয়ে দিলে। এখন উপায় ?"

লক্ষ্মী মুখ নিচু করে চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "পরাশর কি টের পেয়েছে মানিব্যাগটা আমি ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি ?"

"কেন টের পাবে না ?"

লক্ষ্মী কোনো উত্তর দিলো না। শ্যামাপদ একটু চুপ করে থেকে বললো, "দেখি কি করা যায়। আমি পরাশরকে নিয়ে বেরোচ্ছি। যদি পারি ওর পকেট থেকে আবার মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে ওর পকেটে ওরই জাল নোটগুলো গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে ও এখন সব টের পেয়ে গেছে। ও যে রকম হুঁশিয়ার ছেলে, পেরে উঠবো কি না কে জানে !"

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "পরাশর বাবু যে বললেন ওঁর কাপড়ের দোকান আছে—"

"সব বাজে কথা। আমি ওর মুখ দেখেই ওর একটি কথাও বিশ্বাস করতে পারি নি। যা'ই হোক, ওর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কী লাভ ? আমাদের টাকাটা উদ্ধার করতে পারলেই হোলো।"

লক্ষ্মী আর শ্যামাপদ অন্য ঘরে ফিরে গেল। মাসিকপত্র টেবিলে রেখে পরাশর উঠে দাঁড়ালো।

পরাশরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল শ্যামাপদ।

সে ফিরলো ঠিক আধ ঘণ্টা পরে। লক্ষ্মী তক্তপোশের উপর বসে একটা শার্ট রিপু করছিলো। শ্যামাপদকে দেখে সে মুখ তুলে তাকালো।

"ওর জাল নোট ওর পকেটেই চালান করে দিয়েছি," ক্লান্ত গলায় বললো শ্যামাপদ, "ওর মানিব্যাগটাও তুলে নিয়েছি ওর পকেট থেকে। টেরই পায়নি," বলে শ্যামাপদ মানিব্যাগটা তক্তপোশের উপর ছুঁড়ে ফেললো। তারপর কপালের ঘাম মুছলো রুমাল দিয়ে।

লক্ষ্মী চুপ করে বসে রইলো। শ্যামাপদ মানিব্যাগটা খুললো।

"আরে ? শালা এক বদমাইশ, টাকাগুলো সব সরিয়ে নিয়েছে মানিব্যাগ থেকে ?"

শূন্য মানিব্যাগটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী হেসে ফেললো। বললো, "আমি জানতাম ওর মধ্যে টাকা নেই।"

"কি করে জানতে ?"

সিনেমা-মাসিকটি দেখিয়ে দিলো লক্ষ্মী, বললো, "আমরা যখন ও-ঘরে তখন পরাশর ওটি উল্টে পাল্টে দেখছিলো। ওটি খুলে দেখ না একবার।"

শ্যামাপদ মাসিকপত্রটি ওল্টালো।

ভেতরে দশ টাকার কয়েকটি নোট। জাল নয়, আসল নোট, যে-টাকা লক্ষ্মী রেখেছিলো সেই মানিব্যাগে।

শ্যামাপদ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "এর মানে ?"

"পরাশর নিজেই রেখে গেছে," লক্ষ্মী উত্তর দিলো, "আমি জানতাম ও রেখে যাবে। তবে ও যদি এখানে এসে আমায় না দেখতো, কি করতো জানি না।"

শ্যামাপদ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে বললো, "যাও, স্নান করে এসো। আমি তোমার জন্যে এক কাপ খুব ভালো, গরম চা করে এনে দিচ্ছি।"

সেক্সপীয়রের দ্বিতীয় সনেট

যখন চল্লিশ শীত হানা দেবে তোমার ললাটে,
তোমার রূপের ক্ষেতে টেনে দেবে সুগভীর রেখা,
যৌবনের মত্তমদ এখন যা উজ্জ্বল স্বরাট,
শীর্ণ আগাছা হবে, কড়ি মূল্য তার থাকে লেখা,
তখন শুধালে কেউ কোথায় তোমার রূপ লীন,
কোথায় তাবৎ ধন তোমার সে প্রমত্ত দিনের,
সাক্ষী তোমার চোখ, কোটরের গভীরে মলিন,
মূর্তিমান গ্লানি আর লজ্জাহীন স্তুতি-বিলাসের।
কত স্তব পেত আর তোমার রূপের আবেদন,
তদুত্তরে বলতে যদি, "আমার এ অনিন্দ্য সুত
ভরাবে অতীত ত্রুটি, শুধবে আমার মূলধন"—
প্রতিপন্ন করে দিয়ে রূপ তার উত্তরাধিগত।
নবারব্ধ ক'রো তাকে যখন অথর্ব তুমি হবে,
উষ্ণ তার রক্ত দেখ তোমার তুহিন হবে যবে।

অনুবাদ : শ্রীঅরুণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্রোহী

(ফরাসী গল্প)

জঁা পল সার্তর

ওরা আমাদের একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে নিয়ে এল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমাদের। ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা টেবিল আর তার চারিধারে বসে আছে চারজন অফিসার। আরো কয়েকজন বন্দী ঘরের মধ্যে রয়েছে। ওরা আমাদের তাদের দিকেই ঠেলে নিয়ে গেল।

এক একজন বন্দীকে টেবিলের কাছে নিয়ে আসা হোলো, আর তাদের নানা রকম প্রশ্ন করা হতে লাগল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলতে লাগল প্রশ্ন। কিন্তু ওরা উত্তরগুলি শুনছে বলে মনে হোলো না। শুধু খস্ খস্ করে লিখে যেতে লাগল একজন অফিসার।

অবশেষে টমকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হোলো টেবিলের কাছে। ওরা প্রশ্ন করল টম কি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে? কোনো উত্তর দিল না টম। কারণ ওর পকেটের কাগজপত্রেই ওর অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে।

জুয়ানকেও কোন প্রশ্ন করল না। শুধু কি লিখে চলল অফিসার কাগজে। জুয়ান বলে চলল "আমি দোষী নয়। আমি দোষী নয়।" ওরা জুয়ানকে টেনে নিয়ে গেল।

এবার এল আমার পালা।

"তোমার নাম পাবলো ইবিটা?"

"হুঁ" আমি বললাম।

"রামন গ্রীস কোথায়?" প্রশ্ন হল।

"জানিনা"—আমি বললাম।

"সে তোমার বাড়ীতেই ছিল গত কয়েক দিন?"

"আমি জানিনা।"

অফিসার লিখে চলল। তারপর ওরা আমাদের টেনে নিয়ে চলল।

টম বলল একজন রক্ষীকে—ওদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের নিয়ে কি করবে?

"তোমাদের ঘরেই বিচারের ফলাফল জানানো হবে।" একজন রক্ষী উত্তর দিল। অবশেষে আমাদের কারাকক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া হোলো। ছোট অপরিসর কক্ষ। চারটে খাটিয়ায় খড়ের গদি বিছানো রয়েছে। আমরা অবসন্ন হয়ে বসে পড়লাম ঐ গদির উপরে।

ঘরের ছোট খুপরী দিয়ে দিনের আলো এসে পড়ছে ঘরের মাঝখানে।

ভয়ানক শীত করতে লাগল আমার। আমাদের নিজেদের পোষাকের বদলে যে পোষাক ওরা দিয়েছে তাকে শীত মানানো যায় না। টম উঠে ঘরে পায়চারী শুরু করে দিল শরীর গরম করবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকলেন একজন মেজর।

"স্টেইনবক, ইবিটা আর মিরব্যাল।" মেজর তার হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোলো, কাল সকালে তোমাদের গুলী করে মারা হবে।"

জুয়ান চীৎকার করে উঠল, "আমি দোষী নয় তোমরা ভুল করছ, আমায় ছেড়ে দাও।"

মেজর মুচকি হেসে বললেন "তোমার নাম রয়েছে এখানে। যাক্ আর কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার এখানে আসবেন। তিনি তোমাদের সঙ্গেই আজ রাত কাটাবেন।" এই বলে মেজর চলে গেলেন।

আমরা বসে বসে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কাল এ সময়ে আর পৃথিবীর আলো আমাদের চোখে পড়বেনা। সমস্ত ব্যথা বেদনা শেষ হয়ে যাবে একটি বুলেটের আঘাতে। মৃত্যু কি ভয়ংকর। তার ভয়াবহতা যেন ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল আমার শিরা বেয়ে।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল কারা কক্ষের। দুজন রক্ষীর সঙ্গে একজন সাধারণ পোষাকের লোক ঢুকল ঘরে।

"আমি একজন ডাক্তার। আপনাদের সঙ্গে আজ সারারাত থাকবার হুকুম দেওয়া হয়েছে আমাকে।"

"আমাদের সঙ্গে থেকে আপনি কি করবেন?" আমি বললাম।

"আপনারা যা বলবেন তাই করব, আপনাদের জীবনের বাকি সময়টুকু কাটাতে—"

"নিন ধূম পান করুন বলে ডাক্তার সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল আমার দিকে।"

"প্রয়োজন নেই" ঘৃণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

মুখে একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার ইচ্ছা হোলো একটা ঘুষি মেরে ওর মুখটা ভেঙ্গে দিই।

ডাক্তার তখন এগিয়ে গেল টম আর জুয়ানের কাছে। একটা হাত তুলে নিল জুয়ানের। জুয়ান ছিনিয়ে নিল ওর হাত। চীৎকার করে বলল "রাস্তার কুকুর। দূর হয়ে যাও তুমি।"

ডাক্তার একটু সরে বসল। আর চাইতে লাগল আমাদের দিকে

হঠাৎ আমার মনে হল ভয়ানক গরম লাগছে আমার। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম দর দর করে ঘাম ঝরছে। এতক্ষণ কিছুই টের পাইনি। কিন্তু ঐ হতভাগা ডাক্তার লক্ষ্য করেছে ও আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে কেন। শয়তান। ওর দিকে পেছন ফিরে আমি শুয়ে পড়লাম উপুর হয়ে।

কিন্তু কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। আবার উঠে পড়লাম। তারপর ঘরে পায়চারী শুরু করলাম। কেউ কোন কথা বলল না। টম মাথায় হাত রেখে চোখ বুজে পড়ে আছে। জুয়ান

চুপচাপ শুয়ে আছে। কারো কাছেই আর যেন এ জগতের কোন অস্তিত্ব নেই।

আমার মনে পড়তে লাগল পুরোনো দিনের কথা। সেই আটলাণ্টিকের তীরের ছোট শহরের সরাইখানার কথা। যেখানে বসে চলত আমাদের আড্ডা।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রশ্ন করল টম ডাক্তারকে। "আপনি তো ডাক্তার। মরতে কি খুব সময় লাগে ?"

"না মানে••" ডাক্তার উত্তর দিতে গিয়ে পারলেন না।

"আমি জানি অনেক সময় একটা বুলেটে কাজ হয় না।" জুয়ান বলে উঠল। আমি এই সব কথাবার্ত্তা সহ্য করতে পারছিলাম না। চীৎকার করে বললাম, "ভগবানের দোহাই, দয়া করে তোমরা চুপ কর।"

টম তবুও আপন মনে বকে যেতে লাগল। চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ও কথা বলতে চেষ্টা করছে মনে হোলো। হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত একটা কল্পনার সঞ্চার হোলো। ভাবলাম বলুক ও, প্রাণ মন উজাড় করে শেষ বারের মত বলে নিক। আমরা আর বেঁচে থাকব না। এই মারাত্মক চিন্তাটাই মানুষকে পাগল করে দিতে পারে মুহূর্ত্তের মধ্যে। কেন আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি না ?

আর ভাবতে পারছি না কালকের কথা—কালকেই আমাদের মৃত্যু। আমি অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলাম। এর আগেও অনেক বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। তবে আর মৃত্যুকে ভয় কেন ? কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি ওরা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে দেওয়ালের দিকে। আর সাত আটটা বন্দুক উঁচু হয়ে আছে আমার দিকে।

হঠাৎ বোধ হয় আপন মনে চীৎকার করে উঠেছিলাম। ডাক্তার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা ফিরিয়ে নিলাম আবার।

কি আমার অপরাধ ? স্পেনকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। আমি তাই বিদ্রোহী। আমার মনে হতে লাগল না আমি মরব না। আমি অমর। আমি আরও ভোগ করব জীবনের আনন্দ। কেউ আমাকে মারতে পারে না।

হঠাৎ সেই ডাক্তার বলে উঠল "বন্ধুগণ, তোমাদের কাউকে, মানে কোন প্রিয়জনকে শেষবারের মত কিছু জানাতে হলে আমাকে বলতে পার। আমি সে কথা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।"

টম আর জুয়ান বলে উঠল "আমাদের কেউ নেই।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। হঠাৎ টম বলে উঠল "পারলো, কন্যাকে কোন কথা জানাবে না তুমি ?"

"না" আমি বললাম।

মুখে না বললেও আমি ভুলতে পারছিলাম না ওর কথা। ওর নরম চুমা আর সুন্দর দেহশ্রীর কথা। কাল আমি থাকবো না। সত্যিই কি আর আমার দেখা হবে না ওর সঙ্গে ? আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে হয়ত ও কেঁদে উঠবে চীৎকার করে। ওর সেই সুন্দর গভীর চোখ দু'টির কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

আমার চিন্তার সূত্রটা কেটে গেল জুয়ানের কথায়।

ও বলে উঠল "আর মাত্র দু'ঘণ্টা"।

কথাটা ভীষণ ভাবে আঘাত করল আমাকে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশ পাতলা হয়ে আসছে আর নিয়ে আসছে গভীর কালোছায়া আমাদের প্রাণে।

দেখলাম জুয়ান কাঁদছে। ও মৃত্যুর কথা চিন্তা করে চলেছে। এক মুহূর্ত্তে আমার মনে হল যেন আমিও ওর মত কাঁদতে চাই।

টম বলে উঠল "শুনতে পাচ্ছ ?"

কান পেতে শুনলাম বাইরে অনেক লোকের পদধ্বনি। বুঝতে পারলাম আমাদের বোধহয় এইবার নিতে আসবে। বাইরে আমাদের গুলী করবার আয়োজন করা হচ্ছে।

টম ডাক্তারের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খেতে লাগল। ও যেন ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে, তাই সহজ ভাবেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। ওর জন্য অনুকম্পা বোধ করলাম।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল দুজন মেজর চারজন সৈন্যের সঙ্গে।

"টাইনবক, জুয়ান, মিরবাল উঠে দাঁড়াও।" ওরা বলল।

জুয়ান হঠাৎ ভেঙে পড়ল কান্নায় "আমি দোষী নয়। তোমরা ভুল করছ আমায় ছেড়ে দাও।"

সৈন্য চার জন এগিয়ে এসে দু'পাশ থেকে টেনে তুলল ওদের দু'জনকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল বাইরে।

একজন মেজর দূরে দাঁড়িয়ে বললেন "ইবিটা তোমাকে পরে নিয়ে যাচ্ছি।"

ওরা চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না কেন আমাকে ওরা নিয়ে গেল না। এই মৃত্যুযন্ত্রণা আর ভাল লাগছে না। সমস্ত তাড়াতাড়ি শেষ হলেই ভাল হ'ত। মধ্যে মধ্যে গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম আর কেঁপে উঠতে লাগলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আবার ওরা ফিরে এল। তারপর আমাকে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। যেখানে একজন অফিসারকে দেখতে পেলাম।

"তোমার নাম ইবিটা ?" প্রশ্ন করল অফিসার।

"হাঁ"

"র‍্যামন গ্রীস্ কোথায় ?"

"জানি না।"

"শোন ইবিটা! র‍্যামন গ্রীসের বর্তমান বাসস্থানের কথা বলে দিলে তোমায় জীবনভিক্ষা দিতে পারি। ভেবে দেখ।"

"আমি জানি না কোথায় আছে সে। আমি জানতাম সে মাদ্রিদে ছিল" আমি বললাম।

অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "শোনো তোমাকে পনের মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে ভেবে দেখ।" অফিসার আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

জানি না ওরা কি ভাবছে। টম আর জুয়ানকে মেরে ফেলেছে, আমাকে আরও এক ঘণ্টা বাঁচিয়ে রেখে হয়ত কিছু জেনে নিতে চেষ্টা করছে।

একটা ছোট ঘরে আমাকে এনে বন্ধ করে দিল রক্ষী। কিন্তু আমি জানতাম ওরা ভয়ানক ভুল করল। যদিও আমি জানতাম কোথায় আছে র‍্যামন গ্রীস্। কিন্তু আমি নিশ্চিত গ্রীসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি কখনই করব না। আমার প্রাণের বদলেও না, কেন জানি না, একটা ঘৃণার ভাব আমার মনে এল গ্রীসের প্রতি। মনে হয় রাত্রের কনচার কথা মনে পড়ায়—ইচ্ছা করলেই আমি বাঁচতে পারি। ওর জীবন থেকে আমার জীবন কম মূল্যবান নয়। কিন্তু তবুও ওকে আমি ধরিয়ে দিতে পারি না। হয়ত এ আমার একগুঁয়েমি বা অন্য কিছু।

আর কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমাকে আবার হাজির করল সেই অফিসারের সামনে।

"ইবিটা, কি ঠিক করলে?" অফিসার প্রশ্ন করলেন।

"আমি জানি কোথায় র‍্যামন গ্রীস আছে। কবরখানায় ও লুকিয়ে আছে।"

"বেশ।" বলেই উঠে দাঁড়ালেন অফিসার। তারপর বললেন, "শোন ইবিটা, যদি চালাকী করে থাক আমাদের সঙ্গে, তাহলে হাতে হাতে ফল পাবে।"

অফিসার আমাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমার ভয়ানক হাসি এল। আর কিছুক্ষণ আমি বেঁচে থাকব—মনে মনে আমি দেখতে পেলাম ওরা কবরখানা তছনছ করে ফেলছে। কিন্তু গ্রীসকে পাইনি। ইচ্ছা করেই ওদের মিথ্যা খবর দিয়েছি।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন সেই অফিসার। তাঁকে মোটেই দুঃখিত মনে হল না। তিনি আদেশ দিলেন, আমাকে যেন মাঠের ধারে অন্য বন্দীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি বললাম, "তাহলে আমাকে মারা হবে না?"

"জানি না, অন্ততঃ এখন নয়।" অফিসার বললেন।

এর পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য বন্দীদের কাছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কেন আমাকে ওরা হত্যা করল না।

একটি খোলা জায়গায় আরও অনেক লোক জমা হয়েছে। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ বন্দীদের ভীড়। হঠাৎ একজন বন্দী এগিয়ে এল আমার দিকে। তার নাম গার্সিয়া।

"তুমি এখনও বেঁচে আছ ইবিটা? তোমাকে আবার দেখব আশা করিনি। খবর শুনেছ? র‍্যামন গ্রীস ধরা পড়েছে" ও বলল।

"কে বললে"—আমি কেঁপে উঠলাম।

"হাঁ। আজ সকালে ওর আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ও বেরিয়ে যায় কবরখানার দিকে। ওখানেই ও লুকিয়ে ছিল। সেখানেই ওরা ওকে দেখতে পেয়ে গুলী করে। ও মারাত্মক আহত হয়ে ধরা পড়েছে।"

কবরখানায় ছিল র‍্যামন গ্রীস। হায় ভগবান! আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মাটির ওপর আমি বসে পড়লাম। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে আমি হেসে উঠলাম। এত জোরে হেসে উঠলাম যে, আমার চোখে জল এসে গেল।

অনুবাদ—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

আরও এক হাজার বছর পরে,
ইতিহাস হয়ে যাবে আমাদের স্বপ্ন আর মায়া।
আমাদের প্রান্তরের সবুজ নদীর তীরে গজাবে শাল্মলী;
আমাদের এইক্ষণ,
মৃত্যু আর কান্না ছেড়ে কথার অঞ্জলি হবে কবে।

তুমি সে সন্ধ্যার স্বপ্নে
মুখোমুখি বসে থাকা দূর সিন্ধুতীরে-ওড়া পাখি।
সোনালি প্রশান্ত প্রান্তে একবার কারে যেন বেসেছিলে ভালো।
হৃদয় হারানো হিমে গাঢ় সে রক্তিমা নিয়ে মুখে;
কখন সন্ধ্যায় তার স্বপ্ন আর সিন্ধুতীর হেলায় হারালো।

সকালের লাল রোদ

জয়ন্তী রায়

সকালের লাল রোদ মাঝে মাঝে আনে
আশ্চর্য রক্তিম আশা,
স্পর্শে তার উচ্ছ্বসিত ভাষা
উজ্জ্বল প্রাণের আহ্বানে।
মনে হয় আমার স্বরূপ যেন অন্য কেউ
আমার হৃদয়ে যেন সাগরের ঢেউ
শঙ্খ বাজায়।
মনে হয় আমি সেই ফুল—সূর্যমুখী,
সূর্য্যের পানে চেয়ে রোজ ফুটে উঠি;
মনে হয়—আমি সেই পাখী;
আকাশের দিকে মুখ—
রাত্রি শেষে ঘুম ভেঙে ডাকি।

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

ওর ভাগ্যে আজ শিকা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না অর্থাৎ ওর কেসটা আজই শেষ হত, কিন্তু কি যেন কারণে হল না। পরে শুনেছিলাম—যা ঘটেছে তা কিছুটা সত্যি।

মীরার কথা বলছি। মীরাকে মা-বাবার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় কোর্ট থেকে এবং যত অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয় তার থেকেই। এই কেসেরই আসামী বরুণকে সে অনুরোধ করে জামিন করে নিতে অথবা তার কাছে যাওয়ার অর্ডার করাতে। কিন্তু কোর্ট থেকে তেমন অর্ডার হয় না। না হলে বরুণের তো অনিচ্ছা নেই ওকে নিয়ে যেতে—বরুণ বুঝায় তাকে। মীরা কিন্তু অবুঝ। সে জড়িয়ে ধরে বরুণের কোমর, ছাড়ানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে কোর্ট কনেষ্টবলদের পক্ষে। এমন অতর্কিতে ঘটনাটা ঘটেছে যে, স্বপ্নেও কেউ এমনটা ভাবতে পারেনি। কোর্ট লক-আপ থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা! অবাক কোর্ট অফিসাররা, অবাক দর্শকমণ্ডলী, হতভম্ব ফিমেল ওয়ার্ডার।

বরুণের মুখখানা কালো হয়ে গেল। বললে, আমি কি করতে পারি?

কিছু করতে হবে না—মীরার স্বর বিকৃত হয়ে যায়—চল, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। সত্যি-সত্যি মীরা সেই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ওকে ঠেলে নিয়ে একেবারে গিয়ে উঠল সেকেণ্ড অফিসারের কোর্টে। কোর্টে খেলে গেল চাপা হাসির ঢেউ উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে। হাকিম নির্বিকার। কি ভাবলেন এক মিনিট—তার পর বোধ করি এই অভূতপূর্ব হাস্যকর পরিস্থিতি এড়াবার উদ্দেশ্যে ওর জামিন কেটে দিয়ে পরের দিন তারিখ ফেলে দিলেন। অবশ্য মোক্তারের প্রার্থনা মতই তিনি এ অর্ডার করেন। সেদিনের মত ফিরে এল মীরা।

পরের দিন। মীরার তারিখ ছিল হাজিরার। কিন্তু মীরার ভয় ছিল যদি ওর মা-বাপের হাতেই ওকে জোর করে দেওয়া হয়;—তাই মীরার নিরাপত্তার অস্ত্র ধারণ অহিংস উপায়ে—কোর্টে সে যাবে না কিছুতেই। এ দিকে যতই ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যেতে লাগল ১০—১০।০টার দিকে, আমাদেরও ততই একটা অস্বস্তির ভাব বাড়তে লাগল।

কোর্টের কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভিতরে গেলাম। বুঝালাম মীরাকে নানা রকমে। বললাম—এটা কোর্টের আদেশ অমান্য করার উপায় নেই।

মীরা ওয়ার্ডের ভিতরে একটা জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে—আমি ঘরের সম্মুখে ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে। জমাদারণী মাঝখানে।

জমাদারণীও আমার হয়ে তাকে বোঝাল। এমন কি এ-ও বলল যে, কোর্টে গেলেই যে বাবা-মা'র কাছে দিয়ে দেবে, তা কি যে হয়? কালকে তবে দেয়নি কেন?

ঘরের ভিতর থেকেই উত্তর দিল মীরা এবার। এতক্ষণ ও চুপ করেই ছিল। বলল, আচ্ছা আর একটা জমাদারণী আসুক।

এবার আমার স্বরে একটু উষ্মা প্রকাশ পেল। জমাদারণীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? সে এলে আমরা তাকে কোর্টে পাঠিয়ে দেব। তোমার সেজন্য ভাবনা কি? এখন তো এ যাচ্ছে তোমার সঙ্গে।

মীরার সেই গোঁ—ওই জমাদারণী আসুক।

তখন আমি বললাম—ওর সঙ্গে তোমার কি কোন বন্দোবস্ত আছে যে ও না হলে কোর্টে যাবে না। তা ছাড়া ও তো রোজই কোর্টে যাচ্ছেনা।

না—সেই একই অসহায় স্বর গমগম করে বেরিয়ে এল ফিমেল ওয়ার্ডের তিন-ক্যাপাসিটির ঘর থেকে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম গেটে। বললাম কোর্ট কনেষ্টবলদের। ওরা বলল—আচ্ছা থাক, এরপর জমাদারবাবু আসবেন তিনি না হয় নিয়ে যাবেন ওকে পরে। বস্তুতঃ প্রায় দিনই মেয়ে আসামীরা পরেই যায়। এক সঙ্গে যদি বা কোনদিন যায়—মেয়ের দল জমাদারণী সমেত পিছনেই যায়। বলা বাহুল্য, তারও পিছনে থাকে এক কনেষ্টবল। ভাশুর-ভাদ্রবধূর সসম্ভ্রম দূরত্ব মেনে সে চলে।

আর এক জমাদারণী এল। আবার এর আগেই কোর্ট জমাদার এসে বসে আছেন। কিন্তু মীরাকে ফিমেল ওয়ার্ড থেকে বের করা গেল না।

জেল-সুপারকে জানালাম ঘটনা টেলিফোনে। তিনি প্রথমেই বিস্মিত হলেন—ও যায়নি কাল? বললাম—না স্যার। তবে কাল এসেছে অনেক দেরিতে;—কিন্তু আজকে আবার ওর হাজিরার তারিখ। অথচ ও তো কিছুতেই যাবে না। আমাদেরও পরে দোষ আসতে পারে ভেবেই কথাটা আপনাকে জানালাম।

—তারিখ আছে যখন তখন···আচ্ছা, আমাদের জমাদারণী ক'জন? কথার মোড় পরিবর্তন করলেন হঠাৎ।

—দুজন।

—তবে 'বাইফোর্স' দিতে হবে। হ্যাঁ, দেখুন, একথাটা ওদের জানিয়ে দিন।

—দিয়েছি।

তা হলে দেখুন কোর্ট থেকে কি অর্ডার হয়। পরে দরকার হলে না হয় 'ফোর্স এ্যাপ্লাই' করা যাবে।—রিসিভার রেখে দিলেন।

কথাবার্ত্তার মর্ম্ম জানিয়ে দিলাম কোর্ট জমাদার বাবুকে।

'সুপার' বললেও আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। মেয়ে আসামীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি! দৃশ্যটা কল্পনা করেও মনটা কেমন যেন ধিক্কারে ভরে উঠল। আবার আমাকে হতে হবে তার দায়ভাগী!

আনতে হবে তাকে পুরুষের কৌতূহলী ও কৌতুক-উজ্জ্বল দৃষ্টির সমুখ দিয়ে। হয়ত বা তার চুল রইবে আলু থালু, বসন রইবে বিস্রস্ত মুখমণ্ডলে ছাপ থাকবে অসহায়তার—এই ভাবে তাকে আনতে হবে। তারপর আছে আদালতের ভবিষ্যৎ। সে দিনগুলো আরও ভয়াবহ। বিরূপ সমালোচনার তীক্ষ্ণতায় ছিন্নভিন্ন, টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে সে দিনের মুহূর্তগুলো।

এই সব চিন্তা করতে করতে কোর্টে গেলাম কি অর্ডার হয় জানবার জন্যে। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—যোগ বুঝে দাওয়াইটা ও হাকিমের (S. D. O. তথা Supdt,) কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে। যাওয়ার সময় দেখে গেলাম এস. ডি. ও. কোর্টে এসেছেন। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

সি এস আই'র সঙ্গে দেখা করলাম। আমার বক্তব্য তিনি শেষ করতে দিলেন না। মাঝপথেই বলে উঠলেন—বুঝেছি। এ কথা সব বলেছি সেকেণ্ড অফিসারকে। তিনি অবশ্য এ বিষয়ে এখনই কিছু সিদ্ধান্ত করেননি। তিনি শুধু অপেক্ষা করছেন, ওর বাবা ও মামার আসবার অপেক্ষায়। তারা এলেই ওর সম্বন্ধে অর্ডার হবে। আর—ওরা এলেই বা কি হবে? ওকে কি রাখতে পারবে ধরে?—অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন তিনি। একটু থেমে বললেন, আমাদের মতে বরুণের কাছে ওকে দিলেই ভাল হয়। অন্যথায় ও আবার পালিয়ে আসবে বরুণের কাছে। গতকাল এখানে ও যা করেছে—ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখেছি, ওর মত আর একটি দেখিনি আমার এতখানি বয়সে। দোষ তাদেরও দিইনে। তারা দেখেছেন যা, তাই বলছেন। মীরার মত বয়সের মেয়ে যেখানেই বরুণের মত ছেলেকে নিয়ে প্রকাশ্যে এত মাতামাতি করবে, সেখানেই এই ধরণের মন্তব্য স্বাভাবিক।

মীরার-ই বা দোষ কি? যারা ওকে চেনে তারা বলে বয়স ওর যথেষ্ট হয়েছে; অন্ততঃ এটুকু বুঝবার মত বয়স হয়েছে যে এক নূতন জগতের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছে তার সামনে ঐ বরুণ। হোক সে ড্রাইভার, হোক সে মাতাল, হোক সে অভদ্র তবু সে ওকে টানছে দুর্নিবার আকর্ষণে। কাঁচপোকার আকর্ষণ তা নয়, যে-আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার উথলে ওঠে এ সেই আকর্ষণ। মীরার যৌবন-সমুদ্র সে আহ্বানে উত্তাল, উদ্বেল হয়ে উঠেছে—দেহের বাঁধন যেন আর মানতে চাইছে না।

সি, এস, আই যা বলতে চেয়েছিলেন সে কথা আমি জানি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে গতকালকার ঘটনার বিষয় শুনতে আসিনি। আমি জানতে এসেছিলাম কোর্টের কি নির্দ্দেশ হয়। তিনি বললেন, এখন কিছু হয়নি এবং হবেও না। যখন যা হয় আপনাকে জানানো হবে অবশ্যই।

—আচ্ছা, তা হলে আমি এখন আসি। আর মোটেই দাঁড়ালাম না।

সকাল থেকেই শুনছিলাম, আজকে মীরা যাবেই। কেউ বলছে—বিকেলে এখান থেকে একেবারে বিমানঘাঁটি, তারপর কলকাতা নিয়ে যাবে ওর বাবা। এখান থেকে বিমানঘাঁটি পর্য্যন্ত অবশ্য পুলিশ পাহারায় যাবে। কোন কোন উৎসাহী মহল থেকে শোনা গিয়েছিল টিকিট কাটা নাকি হয়ে গেছে প্লেনের জন্য।

আর এক ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, এখান থেকে পুলিশ পাহারায় ওকে পৌঁছে দেওয়া হবে ওর পিত্রালয়ে—তারপর পিতার দায়িত্ব।

কিন্তু মীরার সম্বন্ধে কোর্টের যে ধরণের নির্দ্দেশ হউক না কেন এবং মীরা যে পথে যেখানেই থাক না কেন, আমাদের তো গর্ভের দায়িত্ব সাপকে বের করতে হবে। সেইখানেই তো দুশ্চিন্তা।

সমস্তটা দিন ঐ চিন্তা।

বিকেল ৪টা। গেট-ওয়ার্ডার এসে খবর দিল—এক দারোগাবাবু ডাকছেন। তারপর আমাকেই যেন উদ্দেশ করে বলল—একখানা জীপ-গাড়ীও এসেছে।

—জীপ? কেন? আমিও প্রশ্ন করি ফিরে।

—কি জানি। ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে।

জানালা দিয়েই দেখতে পেলাম, ধূসর রঙের একখানা জীপ গেটের সামনে গেটের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো।

ব্যাপারটা ক্রমেই জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তাড়াতাড়ি সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম অফিসে।

গিয়ে দেখি, অফিসে বসে আছেন টাউন-সাব ইন্সপেক্টর সংক্ষেপে 'টাউনবাবু'। তার কাছ থেকে যা সংগ্রহ করলাম তার মর্ম এই—মীরাকে এখান থেকে ওর বাবাকে দিয়ে দিতে হবে আমাদের এবং ওরা তাকে সদলবলে জীপে চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তুলবেন পিতৃ সদনে। বলা বাহুল্য, মীরার বাবাও যাবেন ঐ সঙ্গে।

গেটের সামনে লোকে লোকারণ্য; পশ্চিমে সদর রাস্তার উপরেও। গেটের সামনের ভিড় সরাতে বেগ পেতে হল না মোটেই—বলতেই সরে গেল, ঠিক যেমন পিঁপড়ের দল সরে যায় কেরোসিন তেলের একটি ফোঁটায়।

শুধালাম দেখি কি অর্ডার হয়েছে কোর্ট থেকে।

বললেন টাউনবাবু, ওর বাবার কাছেই যাবে ও, আর আমরা এসকর্ট করে দিয়ে আসব বাড়ী পর্য্যন্ত। তবে অর্ডারখানা কোর্ট-বাবু নিয়ে আসছেন। এই, যাও তো কোর্টবাবুকে খবর দাও। এক কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করে বললেন শেষের কথাগুলো।

আমি বললাম, তার দরকার নেই। দেখি, এদিককার অবস্থা। আমি যাচ্ছি ভিতরে।

—না থাক। বাধা দিলেন তিনি। কোর্টবাবু আসুন; তারপর না হয় যাবেন।

আমি বসে পড়লাম। বসেই দেখছি, রাস্তার উপর জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রাস্তার দিক থেকে কে একজন এসে বললে, বরুণ এসেছে ক্যামেরা নিয়ে, ফটো তুলবে বলে। এই যে রিক্সার উপর দাঁড়িয়ে। সত্যিই দেখলাম বরুণকে, ক্যামেরা হাতে। এবং ক্যামেরার মুখ এইদিকেই। বুঝলাম, ফটোটা ও তুলবে যখন মীরাকে জীপে তোলা হবে তখনই।

টাউনবাবুকে বললাম, দেখুন ফটো তুলতে দেওয়াটা মোটেই উচিত হবে না। তারপর শ্রীমতীর ভাবগতিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তা হলে এক কাজ করুন—আপনারা বরং ঘণ্টাখানেক পরে এসে ওকে নিয়ে যাবেন। আর গাড়ীখানা এখন না-হয় গেটের সামনে থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে বলুন।

আমার যুক্তিই এ অবস্থায় সব চেয়ে ভাল মনে হল টাউনবাবুর।

তিনি গাড়ী সরিয়ে দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত যে জনতা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল তাও অনেক হাল্কা হয়ে গেল। মাথার উপর বকুলের দলটা একটু বড় হয়েছে দেখা গেল। বিমার উপর বকুল এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার বসে পড়ল এবং পরম নির্লিপ্ততায় উত্তরমুখো চেয়ে রইল।

কোর্টবাবু এলেন। হাতে তার কোর্টের অর্ডারটা। ফুলস্কেপ ফুলশীটের মাথার উপরের দিকে সামান্য কয়েক ছত্র লেখা। ঐ ছত্রটিই মীরাকে ঘরছাড়া করেছে।

অর্ডারটি দিলেন তিনি আমাকে। পড়ে দেখলাম। এবার আমাকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে।

কোর্টবাবুকে একটু আড়াল দিয়ে গেলাম—পরিস্থিতি খুব সহজে পার হওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তিনি বললেন, বলুন গিয়ে—কোর্টবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক'টা কথা জিজ্ঞেস করেই তিনি চলে যাবেন।

ফিমেল ওয়ার্ডে গেলাম। কোর্টবাবুর নাম শুনেই চটে উঠল মীরা—যাব না।

অনেক বুঝালাম মীরাকে—কোর্টবাবু তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাবেন। ও বলে, না উনি বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। আমাকে বাবার কাছেই দিয়ে দেবেন।

আমি বললাম—তোমার বাবা এর মধ্যে আসছে কোথা থেকে? ওখানে ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। আর তোমার বাবা যদি ওখানে থাকে, তুমি আবার ভিতরে চলে আসতে পারো।

কোন উত্তর নেই।

বাইরে নীল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যার ম্লানিমা। ফিমেল ওয়ার্ডের মাথার উপরকার খণ্ডিত আকাশে তার আভাস। মীরা বসে আছে ফিমেল ওয়ার্ডের সিঁড়িতে—চিন্তাভারাক্রান্ত, অবনত। বিষণ্ণ আকাশের মতই। ভবিষ্যতের ভাবনায় আচ্ছন্ন তার সারা মন। অনাগত দিনের অনিশ্চিত মুহূর্তের হিসাব নিকাশ করছে বোধ হয়।

আমার সময় নেই। দ্বিতীয় দুর্বাসার মত তাগাদা দিলাম আবার। বললাম—তোমার খালাসের হুকুম আমরা পেয়ে গেছি। যা কষ্টই হোক, আজ তোমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে। এই ওয়ার্ড, এই জমাদারণী—কেউ আজ রাত্রির মতও তোমাকে আশ্রয় দেবে না। কোর্টের আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এবার ধীরে ধীরে বলল মীরা—আমি সন্ধ্যের সময় যাব। এখন নয়।

কেন? অপার বিস্ময় আমার কণ্ঠে।

মীরা নিরুত্তর।

মিনিট দুই নিঃশব্দে কাটবার পর আমিই ফিরে প্রশ্ন করলাম—যাবে কি যাবে না, বল?

সন্ধ্যের সময় যাব।—আবারও বলল মীরা।

প্রায় চীৎকার করে আমি বললাম—না, এখনি যাবে।

অস্পষ্ট কি যেন বলল, শোনা গেল না। জমাদারণীও শুন

পারেনি। আমিও আর তা শোনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম না। চলে এলাম।

অফিসে এসে উপস্থিত সবাইকে বললাম—ও তো কিছুতেই আসবে না এখন। বলে কি সন্ধ্যের সময় যাব। একথা শুনে একজন মন্তব্য করলেন—তা তো যাবেই। ওরা যে নিশাচরীর জাত।

আমি সে কথায় কান দিলাম না। বললাম—তবে আর কি হবে। তা হলে আপনারা বরং 'লক-আপ'-এর সময়ই আসবেন।—সময়?—এই ধরুন আর ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে।

টাউনবাবুর কণ্ঠে ক্লান্তির সুর বেজে উঠল—জানেন, আজ সকাল থেকে এই একটা 'কেসের' জন্যে আটকে আছি। এখনও ঠিক নেই কখন শেষ হবে।

সহানুভূতি জানালাম মোলায়েম সুরে—কি করব বলুন। দেখলেন তো, আমি নিজে পর্যন্ত গিয়ে বললাম।

একটু যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন টাউনবাবু। নড়ে চড়ে বসলেন—আর মশাই বলবেন না। আরে বাপু যাবি তো বরুণের সঙ্গে, সে তো জানা-ই আছে। আজকের মত বরিয়ে আমাদের রেহাই দে না। নাচতে নেমেছে, তবু ঘোমটা! কত দেখলাম অমন···

কথা শেষ না হতেই ভিতর থেকে খবর এল মীরা যেতে চেয়েছে এবং এখনই আসতে চায় সে।

বাস, আর কথা আছে! আমাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। বিয়ের কনে যেন এসে গেছে, সেইভাবে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। গেটে আসামী ছিল; তাদের তাড়াতাড়ি ভিতরে দিয়ে দেওয়া হল। টাউনবাবু খবর দিয়ে গাড়ী আনালেন; আনালেন মীরার বাবাকে এবং মামাকে। ছোট্ট অফিস ঘরে লোক ধরে না। কতক বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। গেটের বাইরেও ছোট-খাটো ভিড় জমেছে। রাস্তার উপর লোকের ভিড় একটু হালকা। গাড়ীখানা এখান থেকে চলে যাওয়ার দরুণই অনেক লোক আস্তে আস্তে সরে পড়েছে। নেহাৎই পথচারী বোধহয় তারা।

মীরা অফিসে এল। আমি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পেলাম। কেন না, frailty মানেই তো woman, সুতরাং সাক্ষাৎ, সশরীরে অফিসে না-আসা পর্যন্ত ওর মুখের কথাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি।

আমরা সব কাজ ফেলে রেখে মীরার বিদায়ের আয়োজনেই মন দিলাম। আগে থেকেই খাতা-পত্রের কাজ সেরে রেখেছিলাম। শুধু তার সই নিয়ে, জিনিষপত্র দেখে মিলিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ছোটো-খাটো দু-একটি কাজ বাকি ছিল।

জিনিষপত্র অর্থাৎ কাপড়-চোপড়, প্রসাধনদ্রব্য কম ছিল না ওর। একা মীরার পক্ষে ওগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই অফিসে বসে তিনটি বাণ্ডিল করা হল। তাতে আধুনিকার সাজ-সজ্জার কোনও উপকরণ বাদ ছিল না।

প্রথমে একটা বাণ্ডিল মামার হাতে তুলে দিয়ে বললে মীরা—ধর তো মামা। দ্বিতীয়টা দিল বাবার হাতে—কোন কথা বলল না। তার পর শেষ বাণ্ডিলটা নিজে তুলে নিল। শেষে, কেন জানি না, হেঁট হয়ে টেবিলের তলায় আমার পায়ে হাত দিয়ে [illegible]। এমন অবস্থা যে, সরে বসবারও উপায় ছিল না। কাজেই কি করব—থাক, থাক—ইত্যাদি বলে চাপা দিলে তাকে তুললাম। সোজা হয়ে আবার যখন দাঁড়াল মীরা, তখন দেখলাম, তার আয়ত চোখ দুটিতে অশ্রু-বিন্দু টলটল করছে ঝরে পড়বার অপেক্ষায়।

জীপ-গাড়ীটা গেটের ভিতরে সবটা 'ব্যাক' করে আনা হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বাইরের লোককে কাটা কুলতে না দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, একটি পার্টির সুবিধামত গাড়ী সাজিয়ে নেওয়া চলবে এখান থেকে নিশ্চিন্তে। তাই হল টাউনবাবুর নির্দেশে মীরাকে বসানো হল পিছনের সীটে। তার দুপাশে বাবা ও মামা। আর পুলিশরা ২১ জন এবং টাউনবাবু বসলেন এদিক-ওদিক করে চেপেচুপে।

পুলিশের জীপ হাঁট দিতে-না-দিতেই ছুটল। গজ ২০-৩০ গিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে। আবার গজ ৪০-৫০ গিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরে সদর রাস্তায় উঠে ছুট। রাস্তার লোকগুলো—এমন কি বরুণের দলও—মহা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে গেল।

মীরা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল—শুধু জেলখানার জীবনেই নয়, আদালতকক্ষেও। আমরা সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঐ আলোচনাতেই কাটালাম। ২১ জনকে মন্তব্য করতে শোনা গেল—এবার বোধ হয় ও বাড়ীতে থাকবে। কারণ, মনের দিক থেকে ওর একটা 'শক' লেগেছে। না হলে এবার বাবা ও মামাকে দেখে চোখের জল পড়ল যে। চোখের জল পড়তে আমিও দেখেছি। কিন্তু সে-জলে যে অতীতকে ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল সে, তা আমার মনে হয়নি। অতীতকে ভোলা তার সহজ নয়, এমন কি অসম্ভব বললেও চলে। দৈনন্দিন অভাব অনটনের করাল গ্রাস থেকে গোপনে রক্ষা করে এসেছে বরুণ শুধু মীরাকেই নয়—মীরার ছোট বোনকে, বাপকে এবং মাকে। তার থেকে বরুণ হয় ওদের অসামাজিক গার্জিয়ান। অবিবাহিতা, সমর্থ মেয়ের গার্জিয়ানগিরি অসামাজিক ভাবে চলে না বেশি দিন। পক্ষাঘাতী, অক্ষম বাপ দেখে শুনেও বারণ করতে পারে না। ফলে দিনে দিনে মীরা ভালবেসে ফেলেছে বরুণকে।

মীরা চলে যাওয়াতে ফিমেল ওয়ার্ড ঝিমিয়ে পড়ল। কলকাকলী নেই, ঝগড়াঝাটি নেই, নালিশ নেই। মীরাই নালিশ করত না, মীরার নামেও নালিশ আসত।

রাত্রি সাড়ে ন'টা: বাতি নিবে গেছে ফিমেল ওয়ার্ডের। বাতি জ্বালাতে গিয়ে যদি বলা হল ওকে—জমাদারণী বুড়ো মানুষ, চোখে দেখে না; বাতিটা জ্বালিয়ে দাও—দেবে না ও। শুধু হাসবে, বলবে—ওটা কি আমার কাজ?

আবার একদিন। রাত্রি প্রায় আটটা। ফিমেল ওয়ার্ডে গোলমাল শুনে গিয়েছি। এবার জমাদারণীর নালিশ মীরার বিরুদ্ধে। ছিন-ক্যাপাসিটির ঘরে পাঁচজন চলছে তখন। মীরা আর রেণু শুয়েছিল পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হয়ে। একসময় কি খেয়াল হল, বলে—গরম লাগছে, পূব-পশ্চিম লম্বা হয়ে শোবে দরজার দিকে মাথা করে। দরজাটা পশ্চিম দিকে। জমাদারণীর গারদের মাথা লাগিয়ে, পূবদিককার দেয়ালে পা তুলে দিয়ে ঠেলতে লাগল জমাদারণীকে। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল তাকে একেবারে লোহার

দরজার সামনে, আর হাতেরও কম ব্যবধানে। গোলমাল হল তখনই—ওরা কিন্তু পা দেয়ালে লাগিয়ে শুয়ে গুঁতুই ঠেলছে জমাদারণীকে। বেচারা বুড়ী উপায়ান্তর না দেখে চীৎকার করে সিপাইকে ডাকে। তার পর জমাদার—শেষে আমি।

সব ঘটনা শুনে বললাম—ঐ যে দুজন শুয়ে আছে, ওদের গরম লাগছে না?

ওদের দিকে তো কম্বলের গাঁট নেই।

তবে তোমরা ওদিকে শোও; ওরা এদিকে আসুক।

ভুরু নাচিয়ে মীরা বললে—যাব না ওদিকে, পায়খানার সামনে।

কণ্ঠে একটু তিক্ততার ঝাঁঝ এনে বললুম—এদিকেও যাবে না ওদিকেও থাকবে না। তবে কি জমাদারণীর পায়ের উপর মাথা রেখে শোবে?

নিরুত্তর।

আমি বললাম—আজ রাত্রির মত যেমন শুয়ে ছিলে, তেমনই থাক। কাল একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না, দেখব। জায়গার অভাবে কম্বলের গাঁটটি আমরা গুদামে রাখতে পারিনি।

রাত্রে আর গোলমাল হয়নি। ওরা আগে যেমন শুয়েছিল তেমনই শুয়ে বাকি রাত্রিটা।

সেদিন 'মেল-ওয়ার্ডে'র (Male ward) পাঁচিল ঘেঁষে কয়েকটা ইটের টুকরো এসে পড়ল। রিপোর্ট দিয়ে আমাদের ওয়াল-গার্ড (wall-guard) যার ডিউটি-ই হচ্ছে পাঁচিলের উপর পাহারা দেওয়া—কিছুই না ভিতর থেকে পাস হয়ে যায়। কিন্তু আপনারা যা ধারণা করছেন তা নয়। ওয়াল-গার্ড মাইনে-করা লোক নয়। ভিতরের অধিবাসীদেরই সগোত্র সে—হয়ত কারো আত্মীয়ও। তবু এই রকম কয়েক শ্রেণীর লোক দিয়ে জেলখানার অনেক কাজ চলে। ওটা ওদের প্রমোশন নয় স্বর—চাকরিটা যদিও বিনা মাইনের।

ওয়াল-গার্ডের রিপোর্ট পেয়ে ভিতরে গেলাম। প্রাথমিক তদন্তে যা বুঝলাম, ওগুলো ফিমেল ওয়ার্ড থেকেই এসেছে মনে হল। এর পর জমাদারকে নিয়ে ফিমেল ওয়ার্ড গেলাম। ঐ ধরণের সিমেণ্ট ভাঙা কোথায় থাকতে পারে লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল ওদের পায়খানার সারির সামনে। জিজ্ঞাসা করতে মীরা-ই প্রথমে অস্বীকার করে। জমাদারণী কিছু জানে না। এ যেন 'ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি' গোছের। সাক্ষাৎ প্রমাণ অভাবে কিছু করা গেল না। তবু আমার সন্দেহের কথা জানিয়ে এলাম।

ভাগ্যক্রমে সুপার এলেন পরের দিন। বললাম তাঁকে ঘটনাটা। তিনি বললেন—idle brain থাকলেই এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। কোন কাজ করতে দিন ওদের।

কি কাজ দেওয়া যায়? মনে পড়ল, ফিমেল ওয়ার্ডে জল দেওয়া নিয়ে প্রায়ই গোলমালের সৃষ্টি হয়। এবার ওদের জল ওরা নিজেরা তুলুক।

কিন্তু মীরা বেশী সেয়ানা। নিজে তো জল তোলেই না, উপরন্তু যারা তা তোলে, তাদেরও ও পরামর্শ দেয় দড়ি ছেড়ে দিতে ইদারার মধ্যে। অবশ্য আমাদের তাতে খুব অসুবিধা নেই। বালতি তোলার কাঁটা অফিসেই আছে। যখন বুঝতে পারা গেল, এ অপরাধ ইচ্ছাকৃত, তখন জমাদারণীকে শাসানো হল। ফল হল কিছুটা। এরই কিছুদিন পর মীরা খালাস পাওয়াতে সবাই কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মনে পড়ে, এবার যেদিন দ্বিতীয়বারের জন্য মীরা আসে। এর আগে যখন ও আসে, তখন জামিনে চলে যায় কিছুদিন থেকে। এবার এসেছে প্রায় মাস তিনেক হল। ওর জামিনে যাওয়ার দিনটির কথা মনে পড়ে আমাদের আজও। সেদিনের সে যাওয়ায় অবশ্য তার অনিচ্ছা ছিল। কোর্টের আদেশ সেদিন কার্য্যকরী করা হয়েছে গায়ের জোরেই বলতে হবে। কোর্ট-কনষ্টেবলরা সেদিন এসে বলাবলি করেছে—আজ কোর্টে যে বহু অত্যাচার হৈল বা। শুনেছি, মীরা যেতে চায়নি ফিরে তার বাপ-মার কাছে, মোক্তার যিনি তার হয়ে জামিন দাঁড়িয়েছেন, তিনি কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাকে বাইরে আসতে অনুরোধ করে বলেছেন—এস মা, তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু এজলাসের বাইরে, চকোর্টের বারান্দায় আসতেই তাকে নাকি তার মা-বাবা জোর করে টেনেই রিক্সাতে তুলে দিয়েছেন। তার সেই বিস্রস্ত বসন, অবিন্যস্ত কেশপাশ ভয়ার্ত দুটি কাতর চক্ষু, দু' হাতে দরজা আঁকড়িয়ে ধরা—বর্ণনাতেই বুঝতে পারলাম মীরার অবস্থা। আর এই অবস্থাটা অত্যাচারেরই সামিল।

মীরার বয়স পরীক্ষার আদেশ হয়েছিল। সাধারণভাবে চেহারা দেখাবার জন্য ডাক্তারবাবু দেখলেন তাকে। নাম ধাম, বাবার নাম বাড়ীর অবস্থা ইত্যাদি নানা কথা শুধালেন তাকে। তার পর আসল জায়গায় ঘা দিলেন। বললেন, বরুণের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় কেমন করে হল মা?

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল—কবিগানের আসরে।

তারপর?

তারপর থেকেই আমি যাতায়াত করতাম ওদের বাড়ীতে।

মা বাবা কিছু বলতেন না?

হাঁ—ঘাড় নাড়লে মীরা—মারধোরও করতেন সময় সময়।

তবু কেন যেতে, মা বাবার কথা অগ্রাহ্য করে?

আমার ওকে ভাল লাগে; আমি ওকে বিয়ে করব।

ডাক্তারবাবু তো একথা শুনে অবাক! এইটুকু মেয়ে বলে কি! তাঁর এতখানি বয়সে এক ফোঁটা মেয়ের মুখ থেকে সামনাসামনি এমন অদ্ভুত কথা শোনেননি। কিছুক্ষণ গেল তাঁর

সে বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। তারপর আবার শুরু করলেন ডাক্তারবাবু—কেমন করে তুমি জানলে মা, বরুণ তোমাকে বিয়ে করবে?

ও আমাকে বলেছে। আমায় সে ভালবাসে।

ভালবাসার তুমি কি বোঝ?—ডাক্তারবাবু ক্রমে ক্রমে একটু কঠোর হয়ে উঠছেন।

মীরা এবার কোন উত্তর দিল না। খোলা দরজাটা দিয়ে যে অশ্বত্থগাছটা দেখা যায়, সেই দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে রইল। ডান পা'খানা একটু একটু দোলাচ্ছে যেন।

জানো তুমি, বরুণ তোমাকে বেশি দিন রাখবে না। ২।৪ দিন, ব্যস্ তারপরেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে আর এক মীরার কাছে।

আমায় বেলাতে তা করবে না। দৃঢ় প্রত্যয় মীরার কণ্ঠে।

এবার আর ডাক্তারবাবু স্থির থাকতে পারলেন না; বলেই ফেললেন—তুমি যা ছেলেমানুষ, এখনও কিছুই বোঝ না। জেনে রেখো এর পরিণাম—হয় বেশ্যাবৃত্তিতে আত্মবিলুপ্তি, নয় তো আত্মহত্যাতে জীবনের দীপ নিবানো নিজের হাতে। রূপ, যৌবন যতদিন আছে ততদিন একজন বরুণই নয়, অনেক বরুণকেই পাবে; অনেকেই তারা আদর করবে, স্বর্গ রচনা করতে চাইবে তোমাকে নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তোমাকে দেখবে না। প্রশস্ত রাজপথই হবে তোমার শেষ আশ্রয়। এখনও বুঝে দেখ, ফিরবার পথ আছে—ফিরে যাও ঘরে।

একটু থেমে আবার বললেন, তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি অভিজ্ঞতাও অনেক দামী। অনেক বেশ্যাপল্লীতে চিকিৎসার খাতিরে আমি গিয়েছি—হাসপাতালেও চিকিৎসা করাতে এসেছে অনেকে। চোখের জলে ভেসে ক্ষত-বিক্ষত দেহ-মনের যে ইতিহাস তারা শুনিয়েছে, তাদের মূলেও ঐ একই কাহিনী—অবুঝ মনের দিক্‌ভ্রান্ত বেদনার বিপথগামিতার সকরুণ ইতিহাস।

এক মিনিট আর বললেন না; উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি হয়ত তোমার শেষ পরিণতি দেখার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকব না। কিন্তু চোখের জল যদি কোনদিন পড়ে মা-বাবার কথা মনে করে, সেদিন এই বুড়ো ডাক্তারটার কথা মনে পড়বে—একদিন এই কথা বলেছিল।

ডাক্তারবাবু পা বাড়ালেন। অফিসের বাইরে সিঁড়িতে পা দিতেই আমার চোখ পড়ল তাঁর ষ্টেথস্কোপের উপর। সেটা ভুলে টেবিলের উপরেই ফেলে চলে যাচ্ছিলেন। এগিয়ে দিতেই একটু হেসে হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন। তারপর আমি হাত তুলে নমস্কার করতেই, প্রতি-নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বলেছেন হয়ত খাঁটি কথাই। মীরার পরিণতি তিনি চোখে তো দেখতেই পাবেন না, কানেও শুনতে পাবেন কিনা সন্দেহ। সরকারী চাকরির মেয়াদ তাঁর শেষ হয়ে যাবে আর দু'তিন মাসের মধ্যে—তাই তিনি বোধ হয় এই ইঙ্গিত করলেন।

মীরার মা-বাবা দেখা করে গিয়েছেন জেলখানাতে এসে। বৃদ্ধ পিতার তপ্ত বিকৃত কণ্ঠস্বরে, মায়ের চোখের নীরব অশ্রুধারায় মন ভেজেনি মীরার। তার চোখে তখন রঙীন স্বপ্ন; অনাস্বাদিত জীবনের অপূর্ব বৈচিত্র্যময় পাতা খুলছে তার জীবনে; রোমাঞ্চ জেগেছে তার ১৬।১৭ বছরের প্রতিটি অঙ্গে। সুতরাং যে পথ তাকে ঘর থেকে ডেকে এনেছে বাইরে, সেই পথেরই সর্বনাশা মোহ ছেয়ে আছে তখনও তাকে। অতএব মা-বাবার কথা তার ভাল লাগে না। বাবা অনেক মিষ্টি কথা বললেন নরম সুরে; এমন কি ত্রুটি করেননি বলতে যে, তার প্রার্থনাই পূর্ণ করা হবে। তবু মীরা লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে বলেছে—বরুণ যদি জামিন নেয়, তবে যাব।

মীরার সঙ্গেই প্রথমবার বরুণও এসেছিল জেলে কিন্তু তিন-চার দিন পরেই জামিনে চলে যায়। তাই আমি মীরাকে নিছক মিথ্যা কথা একটা বললাম প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখবার [illegible]—সে জামিনে মুক্তি পেয়ে এ টাউন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আমাকেই যেন উত্তর দিল মীরা—যদি, [illegible], সে জামিন নিতেই যাব। তার কণ্ঠে কি বিতৃষ্ণ পরুষ কথা [illegible]!

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। বাবা আবারও শুধালেন মেয়েকে—তবে তুই যাবি না?

না, না, না। স্থির দৃঢ় উত্তর মেয়ের।

যেন বাজ করবার জন্যেই পিতৃকণ্ঠ উচ্চারিত হল ঠিক তেমনই উচ্চগ্রামে—পথে পড়ে তোমাকে মরতে হবে, মরতে হবে, মরতে হবে, এই আমি বলে গেলাম। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে, দুটো সিঁড়ি নেমে চলে গেলেন মীরার বাবা।

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই মীরা কোর্টে যায়, আর ফেরে না। জমাদারণী বলে—জামিনে চলে গেল।

• • • •

এবার বাড়ী যাওয়ার দু'দিন পরে ভোরবেলা একদিন শুনলাম—মীরা পালাচ্ছিল রাত্রিশেষের অন্ধকারে। পাড়ার লোকে ধরে ফেলেছে।

কয়েক দিন পরেই কানে এল—মীরার বিয়ে হয়ে গেছে ঐ বরুণেরই সঙ্গে। আশ্চর্য হইনি আমি। আমি যেন জানতাম—ঘরে ও-মেয়েকে ওর মা-বাবা অন্ততঃ রাখতে পারবে না। আগেই বলেছি, মীরার চোখের জলে সেদিন মন গেলে অনুশোচনা ঝরে পড়েনি, ব্যর্থ-প্রেমের হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়নি ওর দেহ-মন, ভবিষ্যতের যাত্রাপথ ওর মনে হয়নি সেদিন তমিস্রাময়। আমার সন্দেহই সত্য পরিণত হল—চোখের জল শুধু জলই হয়ে রইল মীরার বাবার জীবনে, মায়ার মনে। দু'জনেই সেদিন ভুল বুঝেছিলেন—অন্ততঃ আমার ধারণা। আশায় চক্‌চক্ করে উঠেছিল চারটি চোখ। আজ বোধ হয় সে চোখে জলও শুকিয়ে গেছে।

বয়স জিনিসটা ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক—আরও বিভ্রমকারী। মীরার জীবনে তারই অম্লান চিহ্ন রয়ে গেল রক্তে ও রেখায়। বরুণের পূর্ব-ইতিহাস মীরা জানে—সে-ইতিহাস কলঙ্কজনক, তবু আস্থা হারায় না, বর্তমান স্বভাব মীরা চেনে, তবু ভালবাসে; তার ক্ষমতা মীরার অজানা নয়, তবু তার আশ্রয়েই সে নিরাপদ মনে করে। বিশেষ একটা বয়স শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে দিনের সমষ্টিই নয়, নূতন নূতন জগতের দুর্নিবার আকর্ষণের প্রতীক এই বয়স তাদের কাছে। তাই তাদের ফিরবার পথ থাকে না—ফিরতে পারে না যে-পথ দিয়ে একবার ভুল করে চলে আসে, সেই পথ দিয়ে। [ক্রমশঃ।

আধুনিক গৃহিণীদের মতে
সার্ফে কাচা কাপড়
সবচেয়ে ফরসা হয়
খুব সহজে!
হাজার হাজার গৃহিণীরা আজ সার্ফ ব্যবহার করে জেনেছেন যে সার্ফের মতো এত ফরসা করে কাপড় আর কোন কিছুতেই কাচা যায় না।
সার্ফের কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। কাপড়ের ভেতরের সব ময়লা, এমনকি লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে—তাই সার্ফে কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়।
আধুনিক এই কাপড় কাচার পাউডারটিতে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। তাই সার্ফই আজকের দিনে কাপড় কাচার সবচেয়ে সহজ উপায়।
ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ-জামা, ফ্রক, সার্ট, তোয়ালে, ঝাড়ন, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এক কথায় আপনি বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই সার্ফে কাচুন—দেখবেন রঙীন কাপড় ঝলমলে আর সাদা কাপড় ধবধবে ফরসা করে তুলতে সার্ফের জুড়ী নেই।
Surf
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER
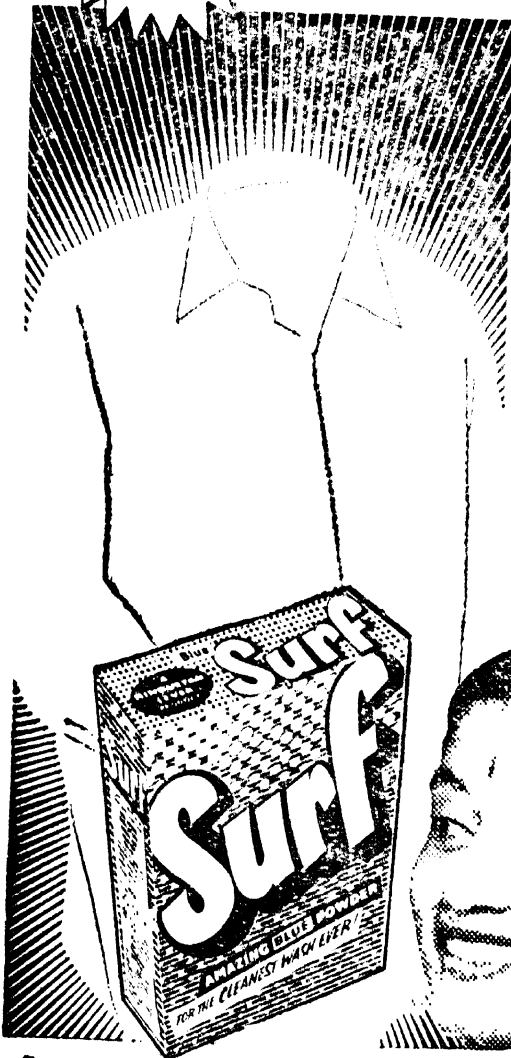
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সম্বুদ্ধ

পরদিন সকালে যখন গেলাম, বেলা প্রায় আটটা। সকালবেলার প্রখর রৌদ্র চতুর্দিক প্লাবিত। দোতলার বারান্দায় ডাক্তার বসিয়াছিলেন। আমিও সেইখানে গিয়া বসিলাম।

সামনের খোলা ছাদে খাটটাকে বাহির করা হইয়াছে। রামদীন প্রচুর জল ঢালিয়া তাহাকে ধুইয়া মৃত্যুর স্পর্শ দূর করিতেছে। ছাদের উপরেই একপাশে জলের কল।

আমরা ঠিক কি কথাবার্তা বলিতেছিলাম স্পষ্ট মনে নাই। হঠাৎ একটি কাণ্ড ঘটিল। সিঁড়ি বাহিয়া খোকার ছোট্ট কুকুরটি উঠিয়া আসিল। তাহার পিছনে খোকা। তাহার হাতে একটা লাল ফিতা ও ঘুঙুর। সেইটা সে কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দিবে। কুকুরের তাহাতে প্রবল আপত্তি। কুকুর সরিয়া যাইতে চায় আর খোকা তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে যায়। কিছুক্ষণ আমাদের চেয়ার আর বেঞ্চির পায়ার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরাধরির খেলা চলিল। তারপর কুকুরটা হঠাৎ ছুটিয়া ছাদে গিয়া, খাটটার তলায় বসিয়া পড়িল। খোকা হামা দিয়া খাটের তলায় ঢুকিতে যাইতেছিল, রামদীন বারণ করিল, ভিজে যাবে।

অগত্যা খোকা খাটের বাহিরে উবু হইয়া বসিয়া কুকুরকে ডাকিতে লাগিল। কুকুর সে ডাককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে খাটের তলায় শুইয়া পড়িল—খোকার দিকে চাহিয়া চোখ মিটমিট করিয়া অল্প অল্প লেজ নাড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত। কি হইল? আমিও উঠিয়া গেলাম। খাটের উপরে জল থৈ থৈ করিতেছে। সাধারণত এসকল খাটে আগাগোড়া তক্তা থাকে না, থাকে ফাঁক ফাঁক করিয়া পাটি বিছানো, তাহার উপরে গদি। এ খাটে তাহা নয়। অতি মসৃণ তক্তা, একেবারে এমন মিল-দিয়া বসানো যে একবিন্দু জলও নীচে পড়িতেছে না—খাটের তলায় কুকুর পরম নিরাপদে শুইয়া আছে।

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া মনে হইল, তিনি অত্যন্ত চিন্তামগ্ন। ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখ গম্ভীর, যেন কি একটা কথা মনে করি-করি করিয়াও মনে আনিতে পারিতেছেন না।

কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন খাটটার দিকে, তারপর সোজা গিয়া সেই ঘরটিতে ঢুকিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে বাহির হইয়া আসিলেন। কোন কথা কহিলেন না। আমিও চুপচাপ বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, খাটটা কোথা থেকে তৈরি, কিছু জানেন?

কহিলাম, আমি সেই সময়েই প্রথম দেখেছি ওটাকে। তার আগে ত ওপরে উঠিনি কোনদিন।

ডাক্তার আবার চিন্তামগ্ন ছিলেন। তার পর মুখ তুলিয়া ডাকিলেন, রামদীন, এদিকে এসো ত।

রামদীন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

ডাক্তার কহিলেন, মাইজী কোথায়?

—নীচে কারা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন।

—আমাকে একটা কথা বলতে পারবে?

—কি বলুন?

—এই খাটটা কবে কেনা হয়েছে? নতুন মনে হ'ল।

—হাঁ। একেবারে নতুন। চার পাঁচদিন মাত্র বাবু শুচ্ছেন এটাতে। রোজ ত ওপরে আসতেন না। লাইব্রেরী-ঘরেই ঘুমিয়ে যেতেন অনেক দিন।

—কারা তৈরী করেছে এটা জান?

—বটুবাবু।

—বটুবাবু কে?

—বটুবাবুই ত জানি। কাঠের দোকান আছে কলকাতায় এই ঘরের সব জিনিস তাঁর করা। তিনি নিজেই এসে সব সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাতি-টাতি সব।

—এখানে এলেন কি করে?

—এখানেই ত বাড়ি তাঁর। দোকান কলকাতায়। এখানেও কারখানা আছে। ভারি কারখানা, অনেক কাজ হয়। বাবুজীর সঙ্গে খাতির ছিল। বাবুজী হামেশা যেতেন।

—কত বয়স?

—ত্রিশ-বত্রিশ। রইস্ আদমী। বড় সয়ানা। বাবুজী খুব প্রীত করতেন।

—বাড়িটা কোথায়?

—নদীর ধারে। আমি জানি।

—মাইজী জানেন?

—জী হাঁ।

—আচ্ছা, যাও।

ইহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। শ্রাদ্ধের দিন নিকটে আসিল। শ্রাদ্ধ অনাড়ম্বর। অল্প লোকের আমন্ত্রণ।

ডাক্তার আমাকে কহিলেন, আপনাকে একবার যেতে হবে। বটুবাবুর কথা হয়েছিল, মনে আছে? তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

—লোকটি কে?

—এখানকারই। ধনীর ছেলে, কার্নিচারের বড় কারবার। রামদীন ভুল বলেনি। কাঠওয়ালা বলতে যা বোঝায় তা নয়, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত। ওঁর ছাত্র, তাঁর স্ত্রীও ওঁর ছাত্রী। দু'জনকেই বলতে হবে এবং বিশেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে হবে যাতে আসেন।

—বিশেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ কেন?

—উনি নাকি খুব ভালবাসতেন এঁদের, এঁরাও খুব শ্রদ্ধা করতেন।

—কিন্তু, তাই যদি হয় ক'দিনে একবারও ত আসেন নি?

—ছিলেন না। ঘটনার আগের দিন এসেছিলেন। সেই দিনই কলকাতায় চলে যান। শুনলাম ফিরেছেন সম্প্রতি। আপনি চলে যান চিঠি নিয়ে। একবার গিয়ে যদি দেখা না পান হয়ত আবার যেতে হবে।

দুঃখ করিলেন—সেদিনও দেখা হ'ল, তখন কি একবারও ভেবেছি এতবড় সর্বনাশ আসন্ন।

কহিলাম, সে ত মানুষের হাত নয়। তাহলে আসছেন ত?

—নিশ্চয়। কিন্তু বাবার কথা মনে হলেই বুক শুকিয়ে ওঠে। ওঁর সামনে যে কি বলে গিয়ে দাঁড়াব।

—তার আর কি করবেন। আপনার স্ত্রীকেও কিন্তু নিয়ে আসবেন। ওঁদের বিশেষ অনুরোধ।

—তাই যাব।

সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনার সময় স্থির হইয়াছে। ব্রাহ্মদের এসকল অনুষ্ঠান আমি আগে দেখি নাই। বেশ সংযত ও সংহত আয়োজন। ক্ষুদ্র স্থান, ব্রাহ্মসমাজ বলিতে বিশেষ কিছু নাই। উপাসনার জন্য কলিকাতা হইতে একজন আচার্য আসিয়াছেন। সৌম্য-কান্তি বৃদ্ধ। অতি চমৎকার ভাষায় ও উচ্চারণে উপাসনা করিলেন। আমি এতবড় শ্রদ্ধাহীন পাষণ্ড, আমারও মনে হইল যেন কথাগুলি তাঁহার মর্ম নিংড়াইয়া বাহির হইতেছে।

উপাসনা শেষ হইতে রাত্রি গভীর হইল। তারপর মিষ্টিমুখ। রাত্রি তখন দশটা বাজে। আকাশ বিকাল হইতেই মেঘে ভরা ছিল, এবার হাওয়া এবং বৃষ্টির আভাস দেখা দিল। অতিথিরা ক্রমে বিদায় লইতে লাগিলেন।

বটুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর তখনও খাওয়া হয় নাই। ডাক্তার তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। সকলে চলিয়া যাইবার পর আমরা একসঙ্গে খাইতে বসিলাম। খাওয়া শেষ হইতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল।

বটুবাবু কহিলেন, আর দেরি নয়। এবার একটি গাড়ি ডাকাতে হয়।

ডাক্তার কহিলেন, জল আসছে। এত রাত্রিতে গাড়ি পাওয়া শক্ত হবে। তাছাড়া, অত দূরে বাড়ি, এই রাত্রি, দুর্যোগে—থেকে গেলে হ'ত না?

বটুবাবু না না, বলিয়া আপত্তি তুলিলেন। ডাক্তার সে আপত্তি গায়ে মাখিলেন না। অধ্যাপক-পত্নী এবং আমরাও পীড়াপীড়ি করিলাম। সমস্যা মিটাইয়া দিল রামদীন, কহিল, গাড়ি পাওয়া অসম্ভব। সে এক গাড়িওয়ালাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সেও ভাগিয়াছে।

তখন আর করার কিছু নাই। থাকিতেই হইল। ডাক্তার কহিলেন, আপনাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। রামদীন, ওঁদের বিছানা ঠিক করেছ?

—জী। সব ঠিক আছে।

—চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

বটুবাবু বলিলেন, কোন্ ঘরটা বলে দিন না। আমি সব চিনি।

—তা হোক। আজকে আপনি অতিথি। আমাদের ত্রুটি হ'লে চলবে কেন?

আমরা লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া ছিলাম। ডাক্তার উপরের পথ ধরিলেন। বটুবাবু কহিলেন, আবার উপরে কেন। এই ঘরেই ত বেশ থেকে যাওয়া যেত।

—উপরে আরও ভাল থাকবেন। চলুন।

উপরে আসিয়া সেই ঘরে সকলকে ঢুকাইয়া দিলেন ডাক্তার। সেই খাটটি ঠিক সেইখানে বসানো; আলোটি তেমনই জ্বলিতেছে।

ঘরের মধ্যে পা দিয়াই বটুবাবু পিছাইয়া আসিলেন। তীব্রস্বরে কহিলেন, এই ঘরে? না না। এঘরে আমি থাকতে পারব না।

—পারতেই হবে।

ডাক্তারের কণ্ঠ হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ ও কঠিন শোনাইল, আমি রীতিমত চমকাইয়া গেলাম। চকিতে পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি দুই চৌকাঠে দুই হাত রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ কঠিন এবং শান্ত। কহিলেন, ব্যস্ত হবেন না, বসুন। এঘরে শোবেন কি না শোবেন সে মীমাংসা পরে হবে। তার সঙ্গে আরও কথার মীমাংসা করবার আছে। বসুন, বসুন সবাই।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এবার ঠাহর হইল, ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা চেয়ার সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। তারপর কে আগে বসিল জানি না, কিন্তু দেখিলাম প্রত্যেকেই এক একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া পড়িয়াছি।

ডাক্তার বসিলেন একেবারে দরজা জুড়িয়া। তাঁহাকে না ঠেলিয়া ফেলিয়া কাহারও দ্বার পার হইবার উপায় নাই, এবং স্পষ্টই বোঝা গেল, ঠেলিয়া ফেলাটা খুব সহজ হইবে না।

ডাক্তার ডাকিলেন, রামদীন!

নীচে হইতে রামদীন উত্তর দিল, জী।

ডাক্তার কহিলেন, তুমি যাও, যেমন বলেছি, ফটকে দাঁড়াবে।

—জী।

ডাক্তার দ্বার বন্ধ করিলেন। চাবি লাগাইলেন, চাবিটি নিজের পকেটে রাখিলেন। কহিলেন, এইবার আমাদের কিছু ঘরোয়া আলাপ আছে। সঙ্কোচ বা দ্বিধার কোন কারণ নেই। এখানে সবাই আমরা ঘরের লোক।

বটুবাবুর মুখ উত্তেজনায় পাণ্ডুর, ঠোঁট কাঁপিতেছে। কহিলেন, এসবের মানে কি?

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে কহিলেন, বলছি। অস্থির হবেন না। আর ত কেউ ছটফট করছে না আপনার মত? আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন?

বটুবাবু উত্তর দিলেন না। মুখ ঘুরাইয়া জানালার দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, সুবিধে হবে না। ওটাতে আজই শিক বসানো হয়ে গেছে।

—এ সকল কি ব্যাপার, বুঝিতেছি না। আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া দেখিতেছিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, একজনের কাছে শুধু মাপ চাইবার আছে আমার।

বটুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে মাপ করবেন মা-লক্ষ্মী, বাধ্য হয়েই আপনাকেও অসম্মান করতে হ'ল।

বটুবাবুর স্ত্রী কথা কহিলেন না। মুখ ও চক্ষু নত করিয়া, যেমন বসিয়া ছিলেন তেমনই বসিয়া রহিলেন। শুধু দেখিলাম, তাঁহার দুই হাতের আঙুলগুলি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ডাক্তার কহিলেন, বটুবাবু, এই ঘরে, এই খাটে শুতে আপনার ঘোরতর আপত্তি। এত আপত্তি, যে কথাটা বলবামাত্রই আপনার চেহারা আচরণ বদলে গেছে। কেন, বলবেন কি? আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি, ঘরে আলো জ্বলছে, ভূতের ভয় নিশ্চয়ই করেন না আপনি?

বটুবাবু নীরব।

ডাক্তার কহিলেন, এই খাট আপনার উপহার, আপনারই ডিজাইন করা। এই ঘরের সব আসবাব আপনি নিজে এসে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। গ্যাসের পাইপে আপনি ফুটো করে দিয়েছেন, দিয়ে মোম দিয়ে তাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন, বলবেন কি?

বটুবাবু নীরব।

ডাক্তার কহিলেন, চুপ করে থাকবেন না। মনে রাখবেন, নিজেদের মধ্যে অনেক জিনিসই মিটিয়ে নেওয়া যায়—পরের হাতে গেলে আর সামলাবার সুযোগ থাকে না। এটাকে পুলিসের হাতে দিতে হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করবেন না। বলুন।

ঘরের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া স্পষ্ট দৃঢ় স্বর শোনা গেল: আমি বলছি।

বটুবাবুর স্ত্রী। সকলে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি অনুচ্চ দৃঢ় স্বরে কহিলেন: আমি বলছি। উনি আমার ওপরে নজর দিচ্ছিলেন।

আবার সব চুপ।

ডাক্তার কহিলেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি করে?

—আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম।

আমার কানের পাশে একটি ক্ষীণ স্বর শুনিলাম: আমিও তাঁর ছাত্রী ছিলাম।

অধ্যাপক-পত্নীর সে স্বরে যতখানি বিলাপ, ততখানিই তিক্ততা।

—তাই?

—হ্যাঁ। এ ছাড়া আর পথ ভেবে পাইনি।

—কিন্তু—

—কিন্তু থাক্। অধ্যাপক-পত্নী কথা কহিলেন: এ আলোচনা নিরর্থক। আমি জানতাম। প্রস্তুত হয়েও ছিলাম কতকটা।

—জানতেন?

—হ্যাঁ। সেইজন্যেই আপনাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারছিলাম না।

ডাক্তার অনেকক্ষণ নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর মৃদুস্বরে কহিলেন, কেন? Frigid?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার আবার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন, আপনি prosecute করবেন?

—না। স্পষ্ট স্বর, তাহাতে দ্বিধা বা জড়িমার লেশমাত্র নাই।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, বেশ।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কহিলেন, আসুন বটুবাবু! সন্দেহ আর সংশয়ের চেয়ে খোলাখুলি হ'য়ে যাওয়া ভাল। রামদীন?

গেট হইতে রামদীন কহিল, জী।

—গাড়ি।

একটি গাড়ি আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বটুবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, আমাকে পুলিসে দেবেন না?

—দেবার মালিক উনি। ওঁর ইচ্ছে নয়।

—কিন্তু—

—কিছু, কিন্তু নেই। আমরা কেউ কিছু শুনতে পাই নি।

বটুবাবুর স্ত্রী উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারকে প্রণাম করিলেন। দুইজনে নামিয়া গেলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ডাক্তার কহিলেন, চলুন, আমরাও যাই এবার।

গেটের বাহিরে আসিয়া ডাক্তার কহিলেন, এ বাড়ির কাজ শেষ হ'ল। আপনি কবে চলে যাচ্ছেন?

কহিলাম, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।

বলুন।

—এই রাত্রে? আচ্ছা, চলুন।

আমার ঘরে আসিয়া দুইজনে বসিলাম। কহিলাম, আপত্তি না থাকে ত রাতটা এইখানেই থেকে যান।

—যাব। কিন্তু কথাটা কি?

—ব্যাপারটা কি হ'ল?

—বোঝেন নি?

—একেবারেই বুঝিনি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু পুরোপুরি বুঝিনি। সেইটে বুঝে নিতে চাই।

—পরের ব্যাপার। যাদের, তারা মিটিয়ে নিলে। এখন আর এ বুঝে আপনার কি হবে?

—কিছু না হোক, নিজের মনকে বোঝানো হবে। যা হল, মনে হচ্ছে তাতে একটা অন্যায় আমরা করেছি, জেনেশুনে একজন প্রকাণ্ড অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছি।

ডাক্তার হাসিলেন। কহিলেন, বিচার করবার মালিক কি আমরা? না, বিচার করাই খুব সোজা?

—আচ্ছা, সে পরে বুঝব। ব্যাপার আমার নয়, মানি। কিন্তু, নিজে, যখন জড়িয়েই গেলাম এর মধ্যে, তখন নিজের বিবেককেও একটা জবাব দিতে হবে। আমি যতটা বুঝেছি, বলে যাচ্ছি। যেটা বুঝিনি আপনি বুঝিয়ে দেবেন বলুন?

—দেব।

—আচ্ছা, অধ্যাপক মারা যান নি খুন হয়েছেন—খুন করেছেন বটুবাবু—অধ্যাপক তার স্ত্রীর প্রতি অসঙ্গত ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই রাগে।

—রাগে ঠিক নয়, আত্মরক্ষার্থে।

—বেশ, তাই। কিন্তু খুনটা করলেন কি ভাবে? আপনিই বা বুঝলেন কি করে? আপনিই ত সার্টিফিকেট লিখে দিলেন Asphyxia.

—ঠিকই দিলাম। Asphyxia-তেই মারা গেছেন তিনি। সেটা নিজে থেকে হ'তে পারে, অন্যের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। মিথ্যে ত লিখিনি।

—সৃষ্ট হ'ল কি করে? আপনিই বা কি করে বুঝলেন?

—খাটটাকে দেখে। খটকা আমার প্রথমেই লেগেছিল,

কারণ অত সুস্থ মানুষ হঠাৎ মারা যায় না। আমি ডাক্তার তাকে বহুবার দেখেছি, পরীক্ষাও করেছি। তাঁর স্বাস্থ্যের সব খবরই আমি জানতাম।

—খাটটাকে দেখে মানে?

—বলছি। মৃতদেহ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। নাকের ডগা আর ঠোঁট নীল হ'য়ে যাওয়া মানে, কোন বিষের ক্রিয়া। তখনই আমি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতাম। সামলে যেতে হ'ল, তাঁর স্ত্রীর আচরণ দেখে।

—কেন? তিনি ত অত্যন্ত সংযত ছিলেন।

—সেইজন্যই। অতটা সংযত থাকা স্বাভাবিক নয়। স্পষ্ট বুঝলাম, একটা কিছুকে তিনি প্রাণপণে চেপে রাখছেন। সেটা কি? দুঃখ নয়। দুঃখকে ওভাবে চেপে রাখবার দরকার নেই। চাপা দিচ্ছিলেন, সন্দেহকে। তিনিও সন্দেহ করেছিলেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কিন্তু তিনি সে সন্দেহ ব্যক্ত করতে রাজি হলেন না। কাজেই আমিও প্রমাণ খুঁজতে গেলাম না।

—তারপর?

—তারপর, খাটটি দেখে প্রমাণ পেলাম। ওরকম খাট সাধারণতঃ তৈরি হয় না। স্পেশাল তৈরি। চারধারে তক্তা দিয়ে, একটা চৌবাচ্ছা বানানো হয়েছে, জল পর্যন্ত চুঁইয়ে পড়ে না—না রাস্তে পড়ে, সেইটেই উদ্দেশ্য ছিল। তখন গিয়ে গ্যাসের পাইপটাকে দেখলাম, সব স্পষ্ট হয়ে গেল।

—বুঝলাম না।

—বলছি বুঝিয়ে। এখানে যে গ্যাস ব্যবহার হয়, সেটা কোল্-গ্যাস। মানে কার্বন মনক্সাইড। বাতাসের চেয়ে ভারী ছেড়ে দিলে মাটিতে নেমে আসে। ভয়ানক বিষাক্ত গ্যাস। নাকে মুখে ঢুকলে মানুষ প্রথমে অজ্ঞান হবে, তারপর মারা যাবে। ঘুমের মধ্যে হ'লে প্রায় কিছু টের না পেয়েই মরে থাকবে, শুধু শ্বাসকষ্টের চিহ্নটা থেকে যাবে মুখের চেহারাতে।

ঐ চৌবাচ্ছা খাটকে দেয়ালের গায়ে রাখা হ'ল। তার ঠিক ওপরে, মাথার কাছে, গ্যাসের পাইপ নামানো হ'ল, পাইপে একটি সরু ছাঁদা, তাতে মোম টিপে দেওয়া। বাতি যখন জ্বলবে বাতির তাতে পাইপ গরম হ'য়ে উঠবে, মোমটা গলে যাবে, গ্যাস বেরিয়ে আসবে এবং খাটের সেই চৌবাচ্ছায় এসে জমবে, ফলে খাটে নিদ্রিত ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যু।

খাট উপহার দিয়েছেন, ঘর সাজিয়েছেন, বটুবাবু। অতএব এ তাঁরই কাজ। এটুকু বুঝতে কষ্ট নেই। এখন প্রশ্ন হ'ল, কেন করলেন? শখ করে কেউ মানুষ খুন করে না, বিশেষ করে শিক্ষিত মার্জিত লোক। করতে প্রবৃত্তি হয়, যখন এমন কিছু একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার ওজন ফাঁসির দড়ির চেয়ে বেশী। সেটা কি হতে পারে? সম্পত্তি, বা জিদ্ বা ইজ্জৎ। অধ্যাপকের সঙ্গে বটুবাবুর সম্পত্তিগত সম্পর্ক নেই। বাহিরের চোখে শত্রুতাও নেই, তিনি ছাত্র এবং প্রিয় ছাত্র। তাহলে বাকি থাকল, ইজ্জৎ।

এক্ষেত্রে সেটা হতে পারে। একমাত্র নারীঘটিত। হয় বটুবাবু অধ্যাপকের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট, নয়ত অধ্যাপক বটুবাবুর স্ত্রীর প্রতি। প্রথমটা হলে বটুবাবু কণ্টক উৎপাটন করছেন। দ্বিতীয়টা হলে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করছেন। আড়াল থেকে তাঁকে দেখলাম, প্রথম শ্রেণীর লোক বলে মনে হল না। অতএব বাকি রইল দ্বিতীয়টা।

ঝোঁকটা কার দিক থেকে, তার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল, অধ্যাপকপত্নীর কথায়। তিনি স্বামীর মৃত্যু টের পাননি, কারণ তিনি অন্য ঘরে শুতে অভ্যস্ত, নিয়মিত। এটা স্বাভাবিক নয়। আজ তিনি সেই কথাটাই আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি frigid.

—তার মানে কি?

—ওর মানে হচ্ছে, জড়-প্রকৃতি। দাম্পত্যজীবনে এরা তৃপ্তি পায় না, দিতেও পারে না, তাই সেটাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এ একরকমের মানসিক বিকলতা, সাধারণত শিশুকাল থেকে অতিরিক্ত prudery বা দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে এর জন্ম। শিক্ষিত এবং তথাকথিত cultured সমাজেই এর ব্যাপকতা বেশী।

এবার বুঝে নিন। অধ্যাপক, বেশী বয়সে বিয়ে করেছেন, ছাত্রীকে। তার মানেই, মোহে পড়ে। বিয়ের পরে দেখলেন, স্ত্রী frigid। সভ্য লোক, হৈ-চৈ কেলেঙ্কারি করলেন না এ নিয়ে। হয়ত ভাবলেন বইয়ের নেশা নিয়ে ভুলে থাকবেন, পারলেন না। মনে মনে প্রচণ্ড অতৃপ্তি জমে রইল। ফলে আবার আরেকজনের দিকে আকৃষ্ট হলেন। এও ছাত্রী। আশ্চর্য নয়, কারণ এই প্রকৃতির পণ্ডিতরা কুনো হয়, বইয়ের বাইরে মনুষ্য-সমাজকে চেনে না; কাজেই যাকে দেখে তাকে ভাল লেগে যায়। এবং এদের সঙ্গে যারা অসঙ্কোচে সহজে মিশতে আসে তারা হচ্ছে ছাত্রীদল। অন্য মেয়ে এরা দেখেও না, চেনেও না।

নূতন ছাত্রীর ওপরে আকর্ষণ জন্মাল। দৈবক্রমে সে বিয়ে করল তাঁরই ছাত্রকে, জানাশোনার মধ্যে। অতএব সংস্রব বজায় রাখা সহজ হ'ল। সেই লোভে, বাস করছেন অন্যত্র অথচ বাড়ি বানালেন এইখানে; ক্রমে সংকল্প করলেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এইখানে এসে বাস করবেন। তার মানে কাছাকাছি। তাদের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক। আরও গড়াতে দিলে আর সামলাতে পারবে না হয়ত অশোভন আচরণ ইতিমধ্যেই একআধবার করেও ফেলেছেন

হৈ-চৈ করবার জিনিসও নয়। অগত্যা তারা ভেবে-চিন্তে যা উপায় পেলে তাই অবলম্বন করল।

অধ্যাপকের স্ত্রী বললেন, জানতেন। জানতেন কিনা জানিনে। তবে আন্দাজ হয়ত করেছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ ছিল মনে হয় না। ক্ষোভ যদি থাকত তবে নিজের ভুল শুধরে নিতেন, স্বামীকে নিজের দিকে টেনে ফেরাবার চেষ্টা করতেন। তা করেননি। বরং আরও ঠেলে দূরেই সরিয়ে দিয়েছেন সম্ভবত। ছেলে, বাগান, জীবজন্তু, বাড়িঘর সবার জন্যেই খেটেছেন, স্বামীকে দিয়েছেন উপেক্ষা।

স্বামীর মৃত্যুর পরেও, যেটা সামলাতে চেষ্টা করেছেন সেটা শোক নয়, স্বামীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর ছিল না। সামলেছেন কেলেঙ্কারি, জানাজানি না হয়, তাঁর গোপন কথাটা প্রকাশ না হয়। I am not sorry for her.

—তবে খুঁজে বার করলেন কেন?

—কিছু না, একটা কৌতূহল-নিবৃত্তি। একটা কাণ্ড হ'ল, কেন হ'ল ধরতে পারব না, এবং চেষ্টা না করে চুপ করে থাকব, এটা নিজের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা। আর—একজন লোক একটা crime করবে, করে ভাববে কেউ তাকে ধরতে পারল না—এমন মিথ্যে বাহাদুরিই বা নিতে দেব কেন তাকে?

—কিন্তু তাহলে, এখন তাকে ধরিয়ে দিতে চাইছেন না কেন?

—দিয়ে কি লাভ হবে? প্রথম কথা, মামলা প্রমাণ হবে না। দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, autopsy করবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। আর্য ঋষিরা অনেক মাথা খাটিয়ে এই কায়দা করে রেখে গিয়েছেন—পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত। অনুমান দিয়ে মামলা প্রমাণ হয় না।

দ্বিতীয় কথা, প্রমাণ যদি হ'তই, তাতে বটুবাবুর ফাঁসি হত—প্রতিহিংসা-নিবৃত্তি ছাড়া আর কী ফল হ'ত তাতে? বটুবাবু না হয় খুনী। তাঁর স্ত্রী, অধ্যাপকের স্ত্রী, অধ্যাপকের ছেলেটি, অধ্যাপক নিজে—প্রত্যেককে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঢি-ঢি পড়ে যেত, কারো কোন সম্ভ্রম আর অবশিষ্ট থাকত না। লাভ হ'ত কার, এবং কি ভাবে?

—তবুও, এত বড় একটা অপরাধের বিচার ত হওয়া দরকার?

—হ্যাঁ, যদি অপরাধটা কার সেটা নিঃসংশয়ে স্থির করা যায়। বটুবাবু খুনী, তিনি স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছেন। হয়ত বা অধ্যাপকেরও সম্ভ্রম বাঁচাতে চেয়েছিলেন—তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর স্ত্রী রূপসী, সেইটেই তাঁর অপরাধ। অধ্যাপক প্রেমুক, কারণ তিনি জীবনের অর্ধেককাল শুকনো বিদ্যাচর্চায় কাটিয়েছেন এবং তারপর বিবাহিত জীবনে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, স্বামীকে বঞ্চিত রেখেছেন। তিনি frigid, কারণ হয়ত তাঁর বিস্মৃত শৈশবের কোন বিশ্রী অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে একটা দৈহিক বিমুখতা এসেছিল। বা তাঁর পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর আচরণ এবং কথায় তাঁর মনে আঘাত লেগেছিল, বা তাঁর কোন মূর্খ উপদেষ্টার কথা থেকে বা তাঁর পড়া কোন বইয়ের ভ্রান্ত নীতিবাক্য থেকে তাঁর মনে কতগুলো অর্থহীন সংস্কার বাসা বেঁধেছিল।

অপরাধের কেন্দ্রস্থলটা কোথায় এবং কার কতটুকু অংশের দায়িত্ব কার, সে সূক্ষ্ম বিচার করবে কে—একজন মাইনে-করা জজ আর কতগুলো অশিক্ষিত জুরি? এদের হাতে সে বিচারের ভার তুলে দেবার দায়িত্ব কে নেবে?

আমি আর তর্ক করিলাম না। কহিলাম, আমাদের করবার কিছুই নেই কি?

—আছে। একে একেবারে ভুলে যাওয়া। মানুষকে যাঁরা তিনি গড়িয়েছেন, বিচার তিনিই করবেন। তাঁর সৃষ্টির প্রথমরূপ করে দেওয়া ত আমাদের সাধ্য নয়।

বাকি রাত্রিটুকু আমার ঘুম ছিল না। খালি তাঁহার শেষ কথা কয়টি মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। ইহাই কি সত্য, বিচারের ভার মানুষের উপরে নয়?

পরদিন আর অধ্যাপকের বাড়িতে গেলাম না। বুঝিয়াছিলাম, ইহার পর আর আমার সাক্ষাৎ তাঁহার প্রীতিকর হইবে না।

দিন দুই পরে সে শহর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

ডাক্তার আমার ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন একছত্র চিঠি দিয়া জানাইলেন, বটুবাবু মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়াছেন।

সমাপ্ত

আগ্যক্ষর

শ্রীকালীপদ কোঙার

ক বলতে কৃষ্ণনাম কার যেন পড়েছিল মনে
আমারও তেমনি ঠিক হয় ক্ষণে ক্ষণে।

তোমার নামের আগ্যক্ষর তা দিয়ে ত শব্দ হয় কত
এমন কি সর্বাধিক নামে তোমারি নামের আগ্যক্ষর।

তথাপি ও একটি অক্ষরে কত যেন মধু ক্ষরে
জাগে তব প্রিয় নামখানি ভেসে ওঠে তব মুখখানি।

জানি না এমন কেন হয় ইচ্ছা করে ভাবি তা তো নয়,
[illegible]

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা-১০

কাশ্মীরের কোলে কয়েকদিন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিহীন চাষীদের দুরবস্থা সর্বত্র সমান। তবে এই সব গরীব লোক অনেকেই নৌকায় বাস করে এবং মজুরের কাজ করে। এখানকার গাছপালা, তরি-তরকারির সঙ্গে বাঙলার অনেক মিল আছে। বাঙলার ন্যায় সমতলক্ষেত্রগুলিও বৃক্ষতৃণাদিতে শ্যামল। বাঙালীদের সঙ্গে প্রধান মিল হচ্ছে কাশ্মীরীরা চাউলভোক্তা অর্থাৎ 'ভেতো।' পার্বত্য দেশমাত্রেই গমভোক্তা, এরূপ ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখলাম, যেমন দেখেছি কন্ট্রোলের যুগে দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ীদের গম বা আটা খাওয়ায় আপত্তিতে। বাসে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করে জানলাম, গত বছর কাশ্মীরে ভাল ধান না হওয়ায় খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ভারত সরকার ১০৲ টাকা মণ সস্তা চাউল কাশ্মীরীদের সরবরাহ করে খাদ্য-সঙ্কট লাঘব করার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য কাশ্মীরীরা হিন্দুস্থানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো এবং বক্সী গোলাম মহম্মদ না হলে ভারতের কাছ থেকে এই সাহায্য অপর কেউ এনে দিতে পারত না, এরূপ মন্তব্যও সাধারণ কাশ্মীরী কয়েকজন করল। জানি না, এটা তাদের অন্তরের কথা, না আমরা ভারতবাসী বলে আমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এরূপ তারা বলল। একথাও শুনলাম যে এ বছর ভাল ধান হয়েছে বলে কাশ্মীর সরকার খাদ্য সংগ্রহ করছেন এবং ধান যাতায়াতের উপর কর্ডন বা নিয়ন্ত্রণ বসেছে। বিভিন্ন পথে কয়েক বার আমাদের বাসে ধান্যের জন্য তন্ন তন্ন তল্লাসী করা হল এবং প্রভিন্সিয়েল প্রহরীরা বা শুল্কপ্রহরীরা আন্তরিকতা ও সততার সহিতই তল্লাসী করল বলে মনে হল। বোধ হয় কাশ্মীরীরা অপেক্ষাকৃত সরল ও সৎ। এই নিয়ন্ত্রণ মাত্র ৩৪ মাসের জন্য, এইরূপ শুনলাম। সন্ধান লইয়া জানলাম জমিদারী প্রথা বিলোপ ও ভূমি সংস্কারের কার্য্য চলছে। ভারত সরকারের সাহায্যে কাশ্মীরে উন্নয়নকার্যও আরম্ভ হয়েছে দেখা গেল। গ্রামাঞ্চলে সমাজ উন্নয়নকেন্দ্র, সমবায় সমিতি, পশুচিকিৎসা ও পশু উন্নয়নকেন্দ্র প্রভৃতি চোখে পড়ল। পথঘাট ও সেচখালের উন্নয়নও আছে। সরকার হইতে প্রতিষ্ঠিত মৎস্য চাষ কেন্দ্রও দেখিলাম।

কৃষি ছাড়া অপর জীবিকা কাশ্মীরীদের হচ্ছে কুটিরশিল্প। কাশ্মীরের রেশম ও পশমশিল্প, এখানকার শাড়ী, শাল, গালিচা ও কাঠের কারুশিল্প জগদ্বিখ্যাত। ব্যক্তিগত মালিকানা, সমবায় সমিতি, ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে এই সকল শিল্প পরিচালিত হচ্ছে। কাশ্মীর সরকারের শিল্প ও কারুশিল্প প্রদর্শনী বা মেলা স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি শালের ফ্যাক্টরী দেখতে গেলাম ও সকলে মিলে বেশ কয়েকখানা শাল কিনলাম। কলকাতা থেকে ১০৲।১৫৲ টাকা তফাৎ হবে কোন কোনখানির মূল্যের এবং দেখে নিতে পারলে জিনিষও উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রীনগরে বাজারের দোকান থেকেও কেহ কেহ বেশ কিছু সওদা করলেন, বিশেষ করে মহিলাদের দোকানে দোকানে দ্রব্য ও দর যাচাই করা ব্যাপারে ধৈর্য্যের বোধ হয় জগতে আর তুলনা নেই। কাঠের সৌখীন উপহারের জিনিষও কেহ কেহ কিনলেন। দীর্ঘ পথের ভ্রমণ-ব্যয় কিছু বেশী বলেই সমস্ত কাশ্মীরশুদ্ধ কিনে আনা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়নি একথাও বলে রাখা ভাল। সকালে সহরের মধ্যে গিয়ে আর যে জিনিষ চোখে পড়ল তা কাশ্মীরের অপরূপ সুন্দর মানুষগুলি। পুরুষরা যেমন সুপুরুষ, নারীরাও অনিন্দ্যা—যেন স্বর্গের অপ্সরা। শিশুরা যেন তুলি দিয়ে আঁকা ছবি। এরা যেন দেবশিশু। মেয়েদের আবরু বেশী, যদিও বাহিরে কাজকর্ম করে। মেয়েরা ফটো তোলা পছন্দ করে না। শিশুদের ফটো না তুলে পারা গেল না।

এই দিন সকালে প্রথম দফা কেনাকাটা করা গেল। দুপুরে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই শিকারায় বেরিয়ে পড়লাম কাশ্মীরের অপূর্ব মোগল উদ্যানগুলি দেখতে। ডাললেকের মনোরম সৌন্দর্য, শঙ্করাচার্য পর্বত, দূরে হরিসিং পর্বতদুর্গ দেখতে দেখতে আমরা নৌকাযোগে এসে পৌছুলাম প্রথম নিশাতবাগে। নিশাতবাগের সম্মুখস্থ তিনটি হ্রদের এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতের প্রতিবিম্ব হ্রদের স্বচ্ছ বুকে-পড়ে এক অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে। দুঃখের বিষয়, আমরা দেরীতে কাশ্মীরে এসেছি, ফলে এই প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার অন্যতম অঙ্গ প্রস্ফুটিত শতদলের শোভা দর্শনে বঞ্চিত হলাম। পুষ্পহীন মলিন বৃন্ত ও পত্রগুলিই মাত্র হ্রদের বুকে পড়ে আছে। হ্রদের উপর থেকে ধূসর পাহাড় ও শুভ্রমেঘখচিত নীলাকাশের পটভূমিকায় সবুজের মেলা নিশাতবাগ দেখতে দেখতে উপরে উঠলাম, উদ্যানে প্রবেশ করলাম। দীর্ঘপথ নৌকাযোগে আসতে আসতে দিনের সূর্য তখন হ্রদের স্বচ্ছ বুকে দীর্ঘ ছায়া ফেলে ক্রমে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

নিশাতবাগ পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধাপে ধাপে নির্মিত ও সুবিন্যস্ত একটি অপরূপ উদ্যান। দেখে মনে হয় নানাবর্ণের পুষ্পখচিত শ্যামল গালিচা ধাপে ধাপে কেউ বিছিয়ে রেখেছে। উদ্যানটি মোগল সম্রাট শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খান পরিকল্পিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৫ গজ ও প্রস্থে ৩৫১ গজ এবং ১২টি ধাপে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ধাপ যেন এক একটি ছাদ। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ইহার সংস্কার সাধন করা হয়। উদ্যানের পটভূমিকাস্বরূপ পর্বত হতে ঝরণার জল নলবাহিত হয়ে বাগের মধ্য দিয়ে ছাড়া হয় এবং উদ্যানগাত্রে ঝরণার সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জলাশয়ে নির্মিত ফোয়ারা থেকে জল ঊর্দ্ধমুখে উঠে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইরূপ জল ছাড়া সব দিন হয় না, সপ্তাহে মাত্র দু'দিন হয় এবং আমরা ইহা দেখার সুযোগ পাইনি। অবশ্য আর একদিন এইরূপ আর একটি উদ্যান অচ্ছলবাগে এই ফোয়ারার খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এইদিন আমরা নিশাতবাগ থেকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে জলপথ ত্যাগ করে বাস ধরে আর একটি

অপরূপ উদ্যান দেখতে গেলাম। এটির নাম শালিমার। এই বাগানটিও পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা-কাটা। তিনটি অংশে বাগানটি বিভক্ত। শুনা যায়, বর্তমানের চেয়ে আরও বিস্তৃততর ছিল এই উদ্যানটি। এটি দৈর্ঘ্যে ১৭৭৭ ফুট ও প্রস্থে ৮০ ফুট। এই উদ্যানটি নাকি মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞী বিশ্বসুন্দরী নূরজাহানের জন্য তৈরী করেছিলেন এবং গ্রীষ্মের কয়েক মাস সম্রাট সস্ত্রীক এই ভূস্বর্গে বাস করতেন। শুনা যায়, এই উদ্যানটি ইরানের সম্রাট প্রথম চোসরোসের (খৃঃ অঃ ৫৩১-৭১) বিখ্যাত গালিচার অনুকরণে রচিত। এইখানেই সন্ধ্যাদেবী তার কালো ঘোমটা টেনে দিল। আমরা চশমাশাহী নামক অপর উদ্যান দেখার আশা ত্যাগ করে ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় অর্থাৎ হাউসবোটে ফিরলাম। অমোদের 'গাইড' আমাদের ডিসপ্যাচ্ করায় অর্থাৎ বিভ্রান্ত করায় আমাদের চশমাশাহী যাওয়া ঘটল না। প্রথম থেকে ঘোরা'ফেরা না বেরিয়ে যদি বাসে বেড়াতাম তাহলে এই আফশোষ থাকতো না। তাড়াতাড়ায় আর চশমাশাহী দর্শন ঘটে উঠল না। তবে দুটো বাগান দেখে খানিকটা অনুমান করে লওয়া গেল। একথা না বলে পারা যায় না যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি তারই অঙ্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য-নিকেতন এই মোগল উদ্যান কেউ না দেখে। সন্ধ্যার পর হাউসবোটে ফিরে ক্লান্ত হয়ে সকলে আহারাদি করে শুয়ে পড়ছে, এমন সময় সবচেয়ে প্রবীণ ও আমুদে সাথী নরেনদা' হেঁকে উঠলেন, "কেউ শুয়ো না, শুয়ো না; আজ বিজয়া দশমী। কোলাকুলিটা সেরে নেওয়া যাক।" কেউ কেউ তখন কাশ্মীরের শীত থেকে রেহাই পাবার জন্য ইতোমধ্যেই লেপের ভিতর আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙালীর মন পূজার বিজয়ার কথা মনে পড়তেই নেচে উঠল। মন চলে গেল নিমেষে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, নদী পার হয়ে দীর্ঘ ১২০০ মাইল দূরে শরতের বাঙলা মায়ের কাছে। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত শরতের বঙ্গমাতার ছবি—

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।

তারপরে সকলে ৺বিজয়ার আলিঙ্গনও শুভেচ্ছা বিনিময়াদি হল। কিন্তু এত রাত্রে নৌকার উপর তো কোন মিষ্টি নাই! কী উপায়? অমনি নরেনদা'র পকেট থেকে আপেল বেরুল। এটা সর্বদাই তাঁর পকেটে থাকতো। তিনি সকলকে এক এক কুচি খেতে দিয়ে বিজয়ার মুখরক্ষা করলেন। বন্ধুবর অজিত বললে—তাতে কি, মিষ্টি নরেনদা'র কাছে পাওনা থাকলো, কলকাতায় গিয়ে হবে। এখনও শ্যামাপূজা পর্যন্ত যখন বিজয়ার মেয়াদ আছে। সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। মেয়েরা তো হেসে লুটোপুটি।

পরদিন প্রাতে আমরা শ্রীনগর থেকে পূর্বদিকে ৬০ মাইল দূরে পহলগাম অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের বাসে আর একদল বাঙালী ভ্রমণার্থী জুটলেন। আমাদের হাউসবোট-ওয়ালাই এই যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেদিন সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরতে হবে বলে আমাদের খাবার সঙ্গেই লওয়া হল। পহলগাম থেকে তুষারতীর্থ অমরনাথ যেতে ২৮ মাইল পথ তুষারের উপর দিয়ে চলতে হয়। পহলগামে এসে এক অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখে মন আনন্দে ভরে গেল। তিন দিকে পাহাড়, পাইন আর ফার বৃক্ষরাজি শ্যামল আস্তরণ সৃষ্টি করেছে, আর তার উপর দিয়ে উঁকি মারছে তুষারমণ্ডিত পর্বতশীর্ষ। পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে লিডার'নদী। উপলখণ্ডের বাধাবিঘ্ন ভেদ করে কলকল নিনাদে ছুটে চলেছে তটিনী। তুষারগলিত জলে পুষ্ট অসংখ্য নির্ঝরিণী মিলিত হয়ে ছোট ছোট নদীর কি ভাবে সৃষ্টি হয় এবং সমতলে এসে বিপুলকায়া নদীতে পরিণত হয়, সে বিষয়ে একদিকে যেমনই জ্ঞান হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে। এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। কবির ভাষায় এ যেন—

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।"

বাসওয়ালা পহলগামে আমাদের মাত্র ঘণ্টাখানেকের সময় দিয়েছিল এবং খাওয়া-দাওয়ার সময়ও এরই মধ্যে ধরা। কাজেই ঘোড়াওয়ালা যতই পাহাড়ের উপরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগুক না আমাদের যাওয়া সম্ভব হল না। আমরা অল্পক্ষণ পহলগামে ঘুরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরস প্রাণ ভরে পান করে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এরই মধ্যে কেহ কেহ আসন্ন তুষারপাতের সম্ভাবনায় নির্জনপ্রায় বাজার থেকে সস্তায় আখরোট কিনলেন। কেহ কেহ পাঁচ সের করে কিনে ফেললেন। অমরনাথের রাস্তা ক্রমে পহলগাম থেকে নীচু ও উঁচু হতে হতে চলে গেছে। দূর থেকে অমরনাথের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানালাম। শুনলাম, নবেম্বরের প্রথম থেকেই অর্থাৎ ৭।৮ দিনের মধ্যেই এদিকে তুষারপাত শুরু হবে এবং এই পথ বন্ধ হয়ে যাবে। পহলগামের উচ্চতা ৭০০০ হাজার ফুট অর্থাৎ দার্জিলিং-এর চেয়ে উঁচু। পহলগামে যাওয়ার পথে আমরা প্রথমে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ ও পরে মটন নামক স্থানে মার্তণ্ডদেবের মন্দির দেখেছি। বর্তমান মন্দির পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের উপরে প্রাচীন গান্ধর্বকলার নিদর্শন মার্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে ঝরণার জল একটি কুণ্ডে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং অসংখ্য মাছ খেলা করছে স্বচ্ছ জলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে কিছু পাণ্ডা আছে দেখলাম। এরা নাম-ধামের জন্য যথারীতি পীড়াপীড়ি শুরু করতে লাগল এবং বাঙালী দেখে অনবরত প্রাক্তন বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বর্তমান বিধান পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে লাগল। একজন পাণ্ডার খাতায় দেখলাম, ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বাঙলায় লিখে দিয়েছেন—"পহলগামের পথে" আমিও মহাজনগত-পন্থা অনুসরণ করে বাঙলায় অনুরূপ লিখে দিলাম। ওদের নামটা দেওয়াও হল অথচ তখন তখনই ওরা বাঙলা লেখা উদ্ধার করতে পারবে না, এই যা ভরসা।

পহলগাম থেকে আমরা ফিরলাম অন্য পথে। এই পথে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে প্রথমে দেখলাম অনন্তনাগ। অনন্তনাগ একটি ঝরণা ছাড়া কিছুই নয়। পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণা বেয়ে এসে একটি কুণ্ডের মধ্যে পড়েছে এবং নালা দিয়ে সহরে বয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের মধ্যে একটি ছোট্ট মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছেন এবং কুণ্ডের তীরে দুইটি মন্দির। মন্দিরে শিব, গণেশ প্রভৃতি নানা দেবতার বিগ্রহ রয়েছেন। এখানে একটি ছোট ঘটনা ঘট্‌ল। দুইজন কোটপ্যাণ্টপরা ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের ফটো তোলাতে আপত্তি করে বললেন, "দেবমন্দিরের ফটো তোলা নিষিদ্ধ, একথা কি আপনারা জানেন না?" অবশ্য তাঁরা ইংরাজীতে বললেন, আমরাও ইংরাজীতে উত্তর দিলাম। আমরা বললাম, "সব জায়গায় সব দেবমন্দিরের ফটো তোলা নিষিদ্ধ নয়। ভারতের বহু দেবমন্দিরের ফটো আমরা তুলেছি। তবে এই মন্দিরের ফটো তোলা যে নিষিদ্ধ এমন কোন বিজ্ঞপ্তি দেখছিনা, বা এতক্ষণ সেকথা কেউ বলেনওনি।" কড়া করে এইরূপ উত্তর দেওয়াতে তাঁরা অবশ্য নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনন্তনাগ একটি সহর, এখানে অনেকগুলি সরকারী অফিসাদি আছে এবং একটি বাজারও আছে।

অনন্তনাগ থেকে আমরা গেলাম কোকরনাগ। কোকরনাগ তুষারশীর্ষ পর্বতের পদতলস্থ একটি মনোরম গ্রাম্য অঞ্চল। এখানেও একটি সুন্দর ঝরণা পাহাড় হতে নেমে আসছে। এই ঝরণার জল নাকি অত্যন্ত উপকারী। শুনা যায়, এই জল নাকি দেশবিদেশে প্রেরিত হয়। এই ঝরণার ধারে একটি ডাকবাংলো আছে। মনোহারী পুষ্পোদ্যান শোভিত ও নির্ঝরিণী-বিধৌত বাংলোটি ছুটি উপভোগের উপযুক্ত স্থান। এখান থেকে আমরা অপর একটি মোগল উদ্যান 'আচ্ছাবল' দেখতে গেলাম। এখানেও পাহাড় থেকে ঝরণা বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর ঝরণার জল ধরে অসংখ্য জলধারা ও ফোয়ারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পত্রপুষ্পে ফোয়ারায় সে এক অপরূপ দৃশ্য। এই জল কতকগুলি জলাধারে ধরে রেখে Trout culture Farm (মৎস্য চাষ কেন্দ্র) কাশ্মীর সরকার তৈরী করেছেন। মাছকে খাওয়ানো দেখতেও বেশ চমৎকার। এই উদ্যানেও নাকি জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান মাঝে মাঝে বাস করতেন। আচ্ছাবল বাগান দেখে আমরা সেদিনকার মতো শ্রীনগরে আমাদের নৌকাভবনে ফিরলাম।

পরদিন সকাল ৯টায় আমরা রওনা হলাম বহু-প্রত্যাশিত তুষাররাজ্য খিলানমার্গের পথে। শ্রীনগর থেকে ট্যাংমার্গ ২২ মাইল বাসে যেতে হয় এবং ট্যাংমার্গ থেকে ৪ মাইল গুলমার্গ এবং গুলমার্গ থেকে ৩ মাইল খিলানমার্গ। ট্যাংমার্গের পর থেকে ৭ মাইল পথ টাট্টু ঘোড়ায় যেতে হয়। গুলমার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। পাইন বৃক্ষসারির মধ্য দিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে ক্রমশঃ উপরে উঠে এসে একটি উপত্যকা—নাম তার গুলমার্গ বা 'পুষ্পোদ্যান।' খিলানমার্গ না দেখলে কাশ্মীর ভ্রমণ অসম্পূর্ণ—এই কথা আমাদের আগের দিন পহলগামের একদল বাঙালী সহযাত্রী বলেছিলেন বলেই আমরা শত বাধা সত্ত্বেও খিলানমার্গের তুষাররাজ্যে পৌঁছিবার মনোবল পেয়েছিলাম।

তাঁদের সহিত যে চারজন মহিলা ছিলেন তাঁরাও অশ্বপৃষ্ঠে এই দুর্গম পথে তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য খিলানমার্গে পৌঁছিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আমাদের মাতৃকা সঙ্গিনীরা মনে বল ও ভরসা পেয়েছিলেন। আমরা একদলে ১১ জন পর্যটক—৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মেয়ে এক একটি অশ্ব নিয়ে ট্যাংমার্গ থেকে গুলমার্গের পথে রওনা হলাম। এর আগে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত পারব কিনা এই আশঙ্কা মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। তার উপর ভয় করতে লাগল বিশেষ করে মেয়েদের কথা ভেবে। তাই এক একজন সাহায্যকারী সঙ্গে নিলাম। খানিক দূর ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে বেশ খানিকটা অভ্যাস হয়ে গেল এবং সাহসও বাড়তে লাগল। মেয়েরা যখ ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারছেন দেখলাম তখন শুধু ভয়ই কেটে গেল ম মনে বেশ আনন্দ হতে লাগল। আনন্দ হতে লাগল বিশেষ করে এই ভেবে যে, মেয়েদের জন্য আমাদের কর্মসূচী বাতিল করে ফিরে আসতে হবে না। তাই আনন্দ-কোলাহল করে আমরা পার্বত্যপথে শ্রেণিবদ্ধভাবে অশ্বপৃষ্ঠে চলতে লাগলাম, যেমন চলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গী বন্ধুবর অজিত, নরেনদা', সুখেন্দু, দিলীপবাবু, সুশীলদা' তেমনই অশ্বপৃষ্ঠে চলতে লাগলেন অপর্ণা, অনুরাধা, নন্দিতা, পুন... প্রভৃতি। এইরূপ আরও বহুদল, বাঙালী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী অশ্বপৃষ্ঠে পর পর সারিবদ্ধভাবে চলতে লাগলেন; প্রায় পঞ্চাশজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এ যেন অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী কোন দুর্গ জয় করতে যাচ্ছেন। কেউ যেন রাণা প্রতাপ, কেউ শিবাজী, কেউ যেন ঝাঁসীর রাণী—লক্ষ্মীবাঈ অথবা চাঁদ সুলতানা।

আমরা যে সব ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম তার প্রত্যেকটির নাম আছে। ঘোড়াওয়ালারা আমাদের প্রথমেই নিজের নিজের ঘোড়ার নাম বলে দিয়েছিল। কোনটির নাম তেনজিং, কোনটি জন, কোনটি রাজা এইরূপ। আমারটির নাম ছিল 'বিজয় বীর'। নাম ধরে ডাকলেই সাড়া দিচ্ছিল ঘোড়াগুলি। এমন শিক্ষিত ঘোড়া দেখিনি। আরোহীর যাতে বিপদ না হয় সেই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রেখে আমাদের পিঠে নিয়ে ঘোড়াগুলি চলেছে পা ফেলে ফেলে এবং পা মেপে মেপে। দেখলাম, দুই-চারজন দুঃসাহসী তরুণ পদব্রজেও চলেছেন।

আগেই বলেছি পার্বত্যপথে আমরা চলেছি। তাই বিপদ ছিল নিশ্চয়ই এই বন্ধুর দুর্গম গিরিপথে চলায়—তার উপর অনভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার হয়ে চলায়। এ ছাড়া মেয়েদের এই বিপদের অংশীদার করাও কম বিপদের কথা নয়। কিন্তু আমাদের বিপদের এইখানেই শেষ নয়। ট্যাংমার্গ থেকে গুলমার্গের ৪ মাইল পথের মাঝামাঝি পৌঁছেছি, এমন সময় কোথা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘ করে এল এবং ক্রমে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। একে কাশ্মীরের শীত, তাতে চলেছি ঘোড়ায় চড়ে তুষাররাজ্যাভিমুখে—তার উপর এল বৃষ্টি! কিন্তু হিমালয়ের আকর্ষণ এমনই প্রবল, বিশেষ করে কাশ্মীরের আসল রূপ তুষারাবৃত পর্বতশিখরে পৌঁছুবার আকর্ষণ তখন এমনই দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে যে আমরা বৃষ্টিকে ক্রক্ষেপ না করেই অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হতে লাগলাম। গুলমার্গে যখন পৌঁছুলাম তখন যাকে বলে মুষলধারে বৃষ্টি, তাই নেমে এল আমাদের মাথার উপর। আমরা তাড়াতাড়ি গুলমার্গের ডাকবাংলোয় ঢুকে পড়লাম। কথা ছিল, এখানে মধ্যাহ্নভোজন সেরে খিলানমার্গের পথে রওনা

হয়। কিন্তু এখানে এসে আমাদের দলের মধ্যে কেহ কেহ মত বদল দিলেন। একজনের গুলমার্গ থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল পূর্ব থেকেই, কারণ পরদিন তাঁকে দিল্লীতে জরুরী কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয় ও বার্থ রিজার্ভ করতে হবে। তাঁর পরিবারের লোক অর্থাৎ ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যাদের 'গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে আর অগ্রসর হতে না চাইলে তার অর্থ বুঝা যায়। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আরও চড়াই ও দুর্গমপথে তুষারের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে অগ্রসর হবার অনিচ্ছার হেতুও উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের সাথে সাথে আরও কিছুজন পুরুষ সঙ্গীও আর অগ্রসর হতে চাইলেন না। অবশ্য এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের পক্ষে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করত সম্ভব হল না, কিন্তু যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, তাঁরাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন কেন তাহা বুঝা গেল না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত গুলমার্গ থেকে আমাদের সহযাত্রী অর্দ্ধশতাধিক সৈন্য বাহিনীর অনেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন, বিশেষতঃ বাঙালী বোধ হয় মাত্র আমরা চার জনই অবশিষ্ট ছিলাম যারা—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার"—

বলে দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন করার জন্য শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছিলাম। বাকি তিন মাইল পথ সত্যই দুর্গম, কারণ যেমন চড়াই তেমনই পিছল তুষারজলে পিচ্ছিল। তাছাড়া রাস্তা বলে কোন কিছুই নাই, শুধু পাথরের মধ্য দিয়ে পা-চলা রাস্তা খিলানমার্গ পর্যন্ত গিয়েছে।

তুষারাবৃত পর্বতশিখর দূর থেকে দেখেছি দার্জিলিং-এ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলগিরি, গৌরীশৃঙ্গ দেখেছি দার্জিলিং-এর 'টাইগার হিল' থেকে। তার সৌন্দর্য অনুপম ছিল কিন্তু অন্য প্রকারের। আর সেই বরফশুভ্র তুষারের উপর দিয়ে যাব, তুষার হাত দিয়ে স্পর্শ করব, এই তুষার-জগের নেশা আমাদের খিলানমার্গে পৌঁছবার আকর্ষণ যেমন দুর্নিবার করে তুলল, তেমনই পায়ের নীচে তুষার, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে পথের শত বাধা বিঘ্ন জয় করার মনোবল দিল। তাই আমরা দুইজন বাঙালী পুরুষ ও দুইজন মেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চললাম সকলের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝে বৃষ্টির রিমঝিম ধারা অগ্রাহ্য করে গুলমার্গ থেকে খিলান-মার্গের দিকে। গুলমার্গের বিখ্যাত মনোরম গলফ খেলার মাঠ নয়নমনোহর উপত্যকা পিছনে ফেলে আমরা পাইন ও দেবদারুর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ খাড়াপথে এগিয়ে চললাম। আমাদের এই বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথের আর এক বিঘ্ন টাংমার্গের বাস আমাদের জন্য বেলা ৪টার সময় ছেড়ে চলে যাবে শ্রীনগরে অর্থাৎ আমাদিগকে মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে দুর্গম পথে যাতায়াত করতে হবে ৬ মাইল আর গুলমার্গ থেকে ৪ মাইল পথ ১৷৷৹ ঘন্টায় অতিক্রম করে টাংমার্গে ফিরতে হবে। এক কথায় সময়ের টানাটানিও পথের কম বিঘ্ন নয়।

গুলমার্গের ডাকবাংলোয় চা পান করে আমরা খিলানমার্গের পথে রওনা হলাম। আমাদের দলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ তখন মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিতে রাজী হলেন না বলে আমরাও মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম না। এঁরা নীচের দিকে রওনা হলেন অর্থাৎ টাংমার্গের দিকে, আমরা ৪ জন উপরের দিকে অর্থাৎ খিলানমার্গের দিকে। গল্ফ মাঠ পেরিয়ে খানিকটা যেতেই আমরা দেখলাম, গুলমার্গের ঘরবাড়ীর ছাদে ছাদে, বাড়ীর সামনে মাঠে মাঠে বকের পালকের ন্যায় সাদা সাদা আস্তরণ। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন ধোপায় কাপড় কেচে ছাদে ছাদে, মাঠে মাঠে শুকাতে দিয়েছে। ঘোড়াওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইয়ে ক্যা হ্যায়? উত্তর দিল—ইয়ে বরফ হ্যায়। ভাবলাম, গুলমার্গেই তো তুষার পড়েছে, আমাদের সঙ্গীরা বৃষ্টির ভয়ে বা অন্য কারণে ট্যাংমার্গে ফিরে না গিয়ে গুলমার্গটাও যদি ঘুরে দেখতেন তাহলে অন্ততঃ তুষারের খণ্ড খণ্ড রূপ দেখতে পেতেন। তুষারের সন্ধান পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম, কখনও কখনও মেয়েরা হয়ত পিছিয়ে পড়তেন; কিন্তু আর কোন দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই, আর কোন চিন্তাই নেই, যেন "একলা চল্, একলা চল্ একলা চল্ রে" এই রকম মনোভাব নিয়ে আমরা চলেছি গন্তব্যপথে।

আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথে উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে চলেছে। কোথায় পা ফেললে পা পিছলাবে না, কোথা দিয়ে গেলে পাথরের খণ্ডগুলির বাধা সৃষ্টি হবে না, এ যেন ঘোড়াগুলিকে কে শিখিয়ে দিয়েছে, সেই ভাবে পথ বেছে বেছে ঘোড়াগুলি চলেছে। একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। গুলমার্গে এসে আমার সাহায্যকারী বা 'হেলপার' পায়ের জুতা নেই, বরফে যেতে পারব না বলে সরে পড়েছে, অর্থাৎ পথের যে অংশটি বেশি দুর্গম সেইখানেই সাহায্যকারী অনুপস্থিত। অবশ্য আমি খানিকটা পথ অশ্বপৃষ্ঠে চড়েই একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম বলে আর 'হেলপারের' প্রয়োজনও ছিল না। তবুও হেলপার পয়সা কম নিতে ছাড়েনি একথা বলাই বাহুল্য। খানিক দূর যেতেই আমরা এক জায়গায় দেবদারুকুঞ্জের মধ্যে থামলাম ঘোড়াগুলির বিশ্রামের জন্য। এখানে বৃক্ষতলে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তুষারে আবৃত হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গী কয়েকটি অবাঙালী তরুণের দল ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই তো তুষার হাতে তুলে নিয়ে গোল গোল করে বল পাকিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করে দিল—কেহ কেহ কাদা ছোড়াছুড়ির ন্যায় তুষার ছোড়াছুড়ি খেলতে লাগল। আমরাও তুষার হাতে করে নিয়ে স্পর্শ করলাম।

বহু ইংরাজী পুস্তকে ইউরোপে তুষারপাতের কথা পড়েছি; তুষারের রাজ্য মেরু প্রদেশের লোকের জীবনযাত্রার কথাও পড়েছি। ভারতের সিমলা, দেরাদুন, মুসৌরী ও কাশ্মীরে তুষারপাতের কথা এতদিন পুস্তক বা সংবাদপত্রে পাঠ করেছি মাত্র।

কিন্তু আজ সেই তুষারের এত সন্নিকটে এসে, তুষারের উপর দিয়ে হাঁটতে পেরে, তুষার স্পর্শ করতে পেরে হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের উদয় হল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম খিলানমার্গের দিকে, সেখানে গিয়ে পথ শেষ, পৃথিবী শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এর পরে পর্বতচূড়া ও আকাশ যেন এক হয়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন এর পরে আর কোন দেশ নেই, তীর্থস্থল নেই। মনে হল এই কি সেই মহাভারত বর্ণিত মহাপ্রস্থানের পথ? এই পথেই কি যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন? এমনি করে আমাদের এই পথেই কি তাঁরা মহাযাত্রা করেছিলেন? শুনলাম, এই পর্বতশিখরের পরে নাঙ্গাপর্বত এবং নাঙ্গাপর্বত পার হলেই সোভিয়েট রাশিয়ার এলাকা। আমরা খিলানমার্গে পৌঁছিয়ে দেখি, এর পরে যেন আর একটি পর্বতচূড়া রয়েছে এবং ঘোড়াওয়ালা বলল, বৃষ্টি না হলে আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতাম। এই চূড়াটি যেন হাতের কাছে। খিলানমার্গের পর যেন পৃথিবী শেষ হয়ে গিয়েছে, একথা আগেই বলেছি। তবে দূরে এই খিলানমার্গের পটভূমিকা রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি পর্বতশৃঙ্গ এবং এটি পেরিয়ে ভারতের বাহিরে যাওয়া যায় একথা শুনলাম। আমরা যেন তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের পটভূমিকায় গিয়ে দাঁড়ালাম—আমাদের পিছনের দেওয়াল থেকে পায়ের নীচে পর্যন্ত যেন তুষারশুভ্র একখানি বস্ত্র কেউ বিছিয়ে দিয়েছে, আর তারই আশে-পাশে তুষারাবৃত পাইনবৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কোন ঘরবাড়ী নাই, কোন লোকবসতি নাই। মাত্র একখানি তাঁবু ফেলে একটি কফির দোকান করে কোন এক ব্যক্তি নিজে কিছু রোজগার করছেন বটে কিন্তু তিনি ভ্রমণার্থীদের এই তুষারশীতল জনহীন পর্বতশীর্ষে এক কাপ গরম কফি খাইয়ে অশেষ উপকার সাধন করছেন একথা বলতেই হবে। পথশ্রান্ত, শীতক্লিষ্ট ও বৃষ্টিস্নাত আমরা এক কাপ করে গরম কফি পেয়ে যেন নবজীবন ফিরে পেলাম। চার আনা করে এক কাপ কফি এই দুর্গমস্থানে এমন কিছু বেশী বলে মনে হল না।

আমরা এখান থেকে দূরে অস্পষ্ট ঝিলাম নদী দেখলাম। আগেই দেখেছি ফিরোজপুর নালা নাম্নী স্রোতস্বিনী। আমাদের জীবন সার্থক হল হিমালয়ের তুষারধবল একটি শিখরে পৌঁছুতে পেরে। বদরীনারায়ণ, কৈলাস, মানস সরোবরের কথা শুনেছি, কিন্তু আজিও দেখিনি, জানি না কোনদিন ভাগ্যে দেখা হবে কিনা। তবে কাশ্মীরের এই তুষাররাজ্যে না এলে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখাই যে অসম্পূর্ণ থেকে যেতো একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম খিলানমার্গে এসে। আমাদের সম্মুখের পর্বতশৃঙ্গ দেখে মনে হল যেন রজতগিরির ন্যায় মহাদেব মহাধ্যানে নিমগ্ন। এই রূপ দেখেই হয়ত শাস্ত্রকার মহাদেবকে রজতগিরির তার তুলনা করেছেন, আর বলেছেন—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।"

রজতগিরিসদৃশ তুষার-ধবল খিলানমার্গ দেখে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরলাম। কারণ আমাদের টাংমার্গ ফিরে বাস ধরতে হবে, সাত মাইল পথ আবার ঘোড়ার পিঠে যেতে হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় দিনের বেলা ক্রমশঃ আলোহীন হয়ে আসতে লাগল। ফিরবার পথে টাংমার্গের কাছাকাছি এক জঙ্গল অতিক্রম করার সময় আর এক বিপদ দেখা দিল। পথের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল এক বাঘ। কেউ কেউ বিশ্বাস করল না যে সত্যিই বাঘ। কিন্তু দলের কাটিল যখন কেউ কেউ এগিয়ে দেখতে চাইলে ঘোড়া আর সেদিকে এগুল না। ঘোড়া যে ভয়ে মেয়েদের পিঠে নিয়ে পাকদণ্ডপথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়নি এটাই আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। যাক্, অবশেষে আমরা নিরাপদে টাংমার্গের সমতলভূমিতে ফিরে এলাম। বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না শুনে আমরা সোজা এসে বাসে উঠলাম। আমাদের সেদিন আহারাদি হল না। আমরা সন্ধ্যায় শ্রীনগরে ফিরলাম। হাউসবোটে চা-জলযোগাদি সেরে সন্ধ্যার পর শেষ দিনের মত আমরা সওদা করতে বেরুলাম। কাশ্মীরের শাল, মেয়েদের ক্লোক, কোট, স্কার্ফ, ওয়ালনাটের কারুকার্যখচিত বাক্স ও অন্যান্য সৌখীন দ্রব্যাদি—যে যাহা পারল কিনল।

পরদিন প্রাতে আমরা কাশ্মীর ও জম্মু কাশ্মীর পরিবহনে কাশ্মীর ত্যাগ করলাম। ফিরবার পথে আমাদের বাসের ড্রাইভারটি সুদক্ষ না হওয়ায় শ্রীনগর থেকে জম্মুর পথে বাসখানি পাহাড়ের গায়ে আটকে দিল। অনেক কষ্টে বাসখানি অপর একখানি বাসের ড্রাইভার ও উভয় বাসের যাত্রীদের সমবেত চেষ্টায় উদ্ধার করা হল। কিন্তু তারপর থেকে ড্রাইভার বাসখানি বাঁয় পাহাড় থেকে দূরে রেখে চালাতে গিয়ে বেশি ডানদিক ঘেঁসে চালাতে লাগল। কিন্তু তার বিপদও কম নয়, সামান্য এদিক ওদিক হলেই অতল খাদে গিয়ে বাস পড়বে। এই ভেবে ভয় করতে লাগল। এইভাবে বিপদ-সঙ্কুল পথে একদিকে পর্বতগাত্রে ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার ভয়, অপরদিকে অতলখাদে তলিয়ে যাবার ভয়ের মধ্যে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা জম্মুতে এসে পৌঁছাই রাত্রি ৮।০ টায়। জম্মু Guest House-এ রাত্রিবাস করলাম। Guest House-এ ভীড়ের জন্য জায়গা পাওয়া যায় না আর কি। পরদিন প্রাতে অপর একখানি বাসে জম্মু ত্যাগ করলাম। এখান থেকে পাঠানকোট সমতল বললেই চলে। ফিরবার সময় দেখি, পিছনের পর্বতশৃঙ্গগুলি যাবার সময় যাহা তুষারাবৃত ছিল না সেগুলি প্রায় সব কয়টাই তুষারাবৃত হয়ে সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। পাঠানকোট থেকে দিল্লী ও আগ্রা ঘুরে ৩০শে নবেম্বর কলকাতায় ফিরলাম। কয়েক দিন ধরে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নৈসর্গিক সুষমাস্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন করে থাকল।

সমাপ্ত

Safety through strength is no longer a possible thing. Consider the dinosaurs.

—BERTRAND RUSSELL.

সর্বহারা

গীষ্পতি ভট্টাচার্য্য

ধরণীর রং ফেরে ;—
কে যেন চিত্র আঁকিছে আকাশে মেঘে।
বিহগেরা ফেরে কুলায়ে তাদের,
মানুষেরা ফেরে ঘরে।
আমি কোথা ফিরি ?   ফিরিবার ঘর
কোথায় আমার তরে !

মরণ পেতেছে আসন তাহার
বিশ্ব-মর্ম-মাঝে,—
বাতাসে হুতাশ, আকাশে ধরায়
মরণ-বাঁশরী বাজে।

যদি ফিরে যায়,
ধরণীর বুকে লুটায়ে তাহার
কিরণ-রেখাটি মরে।
সেই দিকে চেয়ে,
আমার দু' চোখে
দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরে।

তপন যখন এল সকালবেলা
তখন তাকে দেখে,
মল্লিকা ফুল ফুটল অনেক মনে,
মানে, মনের কুঞ্জবনে ;—
তুলেও তখন তোমরা কি কেউ এলে
সেই শান্ত সকালবেলায় ?
হয়ত খেলায়, নয়ত কাজের ছলে
রইলে ঘরে কাজে, নয়ত গেলে
অন্যদিকে চলে।

এলে না কেউ,
তুললে না কেউ
সাজি ভরে তাদের,
গেলে না ত' নিয়ে
তোমার দেবালয়ে।
আপন বৃন্তে কেঁপে কেঁপে
সকাল তাদের গেল বিফল হয়ে।

তখন ছিল শুভ্রসকাল—
চলল বেলা বয়ে
শুকিয়ে এল হাসি তাদের
প্রখর তাপে সয়ে।

চলল বেড়ে বেলা—
উষ্ণ বাতাস তাদের সাথে
চলল খেলে তপ্ত নিঠুর খেলা।
বৃন্তে তাদের
সবুজ আভা ছিল তখন তো।

মালা গেঁথে কারও [illegible]
কেউ বা যদি তাদের দে[illegible]
একটু আশা—নিবু-নিবু প্রদীপখানির
ক্ষীণ শিখাটির মতো।

কিন্তু হেথায় এল না কেউ।
হয়ত কাজের টানে
ঘরের মাঝে আটকে আছে—
নয়ত গেছে অন্য কোনখানে।

দিনের শেষে ঝিমিয়ে এল তারা।
সকালবেলার মল্লিকারা
সন্ধ্যাবেলায় হল বৃন্তহারা।
মনে হল মালঞ্চে মোর
শেষ হল ফুল ফোটা
এবারকারের মত।
আর ত হেথায় থাকবে না ফুল
শুষ্ক বৃন্ত যত যতই বাতাস পাবে
নড়বে ততই শুকনো খড়ের মত।

কিন্তু হঠাৎ একি হ'ল !—
সন্ধ্যা যখন
পুরোপুরি নামল আমার মনে,
কোথায় ছিল হাসনুহানার ঝাড়,
গন্ধে ভরে উঠল অকারণে।
যে ফুল চোখে যায় না দেখা তারই গন্ধভারে
কুঞ্জবনের বাতাস কেন উঠল হয়ে ভারী ?
এই যে সুবাস এ ত ঠিকই হাসনুহানারই।

হঠাৎ মনে উঠল ভেসে
একটি ছোট কথা
একটু সান্ত্বনা।—
কথাটা যে হয়ত জানা ছিল
তবুও মন জেনেও জানত না।
আমার এ মন
বিশ্ব-মনের অংশ যদি হয়,
তা হলে নিশ্চয়,
এই সুরভির একটু ছোঁয়া
হাল্কা হাওয়ার টানে
পৌঁছবে সেইখানে।
জীর্ণ দেহের বৃন্ত থেকে খসে যখন
পড়ে যাবে মন
হয়ত তখন
লোকান্তরে যাত্রাপথের হাওয়া
এই অকালের ফুলের গন্ধে একটু মধুর হবে
সহজ হবে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া।
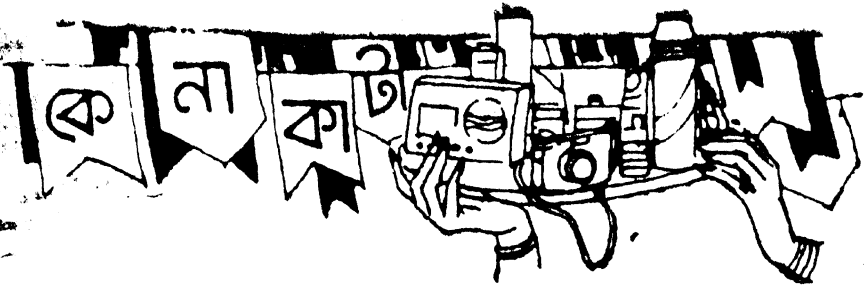
কর্ম্মোন্নতির কয়েকটি সূত্র

সমাজ ও সংসারে বেশিরভাগ লোককেই খেতে পরতে হয় সাধ্যমত কাজ করে। অল্প সংখ্যক মাত্র ভাগ্যবান আছেন, যাঁদের হয়ত খাওয়া-পরার জন্তে ভাবতে হয় না। রোজগারের খেটে খেতে হয় যাঁদের, বিশেষ ভাবে যাঁরা চাকরিজীবী, বেতনভুক কর্মী— জীবনে উন্নতির জন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলো সূত্র তাঁরা অবশ্য মানবেন। সাধারণ অবস্থায় এই সূত্রসমূহ অনুসরণের দ্বারা বিলম্বে হলেও সুফল সুনিশ্চিত দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষিত কর্মপন্থা বা সূত্রগুলোর গুরুত্ব তাই এতো অধিক

প্রথমটায় চাকরি বা কাজ পেতেই যেমন অন্ততঃ সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতাটুকু চাই, চাকরি পেয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্তও চাই সমধিক যোগ্যতা। দৈনন্দিন কাজের বেলায় নিজের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অভাব হয়ে পড়লে চেয়ে-চিন্তে বেশিদূর ঠিক এগিয়ে যাওয়া চলে না। কাজেই এই দিকটাতে চাকরিজীবীর খুব সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে। যথার্থ কাজ দিয়ে গেলে কাজের মূল্য থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই। বঞ্চিত হলে অবস্থায় প্রতিকারের জন্তে সঙ্গত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং প্রতিকার হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

সমাজ-কাঠামো এখন অবধি সর্ব্বত্র সমাজের অনুকূল নয় বলে চাকরিজীবনে হতাশ হতে হচ্ছে কত লোককেই। সম-যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সম-পর্য্যায়ের কাজ বা চাকরি পেল না, এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। কিন্তু এরই মাঝে বিশেষ যোগ্যতাবলে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে, তা-ও বহুক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। গোড়াতেই হতাশ না হয়ে যিনি যে কর্মসংস্থানেই থাকুন, তাঁকে সেখানেই উন্নতির প্রয়াস নিতে হবে, এইটি সাধারণ দাবী। তবে এ দাবী মেনে চলা একান্ত অসম্ভব মনে হলে কিংবা মানলেও কার্য্যকরী কিছু ফল হবে না বুঝলে, সময় থাকতেই চাকরি বদবদল করে নেওয়া সমীচীন। মোট কথা, পছন্দসই ও যোগ্যতা মাফিক কাজটি জুটিয়ে নিতে হবে আর সেটি যে কোন উপায় ধরেই হোক্।

এসব থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়—চাকরিতে যাবার আগেই এর ভাল-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ সব ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব ভেবে নেওয়া উচিত। তেমনি আবার চাকরিতে যোগদান করে এইটি ধরে থাকা ঠিক হবে কি না হবে, অল্পদিন মধ্যেই মনের ভেতর এর বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া চাই। নির্দ্ধারিত কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে হয় এবং সুষ্ঠু ভাবে হয়—সেই লক্ষ্য ও প্রযত্ন রাখতে হবে সব সময়। কাজের চাপ যদি কখনও পড়ে যায়, দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্তে আগ্রহ বা ব্যাকুলতা যেন উপস্থিত না হয়। সমস্ত রকম অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাতে সম্ভবপর হয়, সেই দিকে নজর থাকা যেমন দরকার, সঙ্গে সঙ্গে দরকার স্বাস্থ্যটি মজবুত রেখে চলা, ব্যবহারটি সুন্দর রাখা এবং যোগ্যতা বাড়িয়ে যাওয়া। এমন সব পন্থা বা সূত্র ধরেই চাকরি-জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়া স্বাভাবিক। পর্য্যাপ্ত গুণবত্তা কোথাও যেখানে জায়গা খুঁজে না প্রত্যাশিত কর্ম্মোন্নতি স্বপ্ন হয়েই থাকে, হতাশা ও বিক্ষোভ সেখানে আসবে, এ প্রায় নিশ্চয়।

টাকা পয়সা ধার করা

মানুষের জীবন সব সময়ই সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে চলবে, কোথাও কখনই আটকাবে না, এমন দাবী প্রায় চলে না। সেজন্ত টাকা পয়সা খরচার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা চাই-ই। আয় বুঝে ব্যয় করার কথাটা উড়িয়ে দিলে এখন অন্ততঃ হবে না, বরং এযুগে এইটি বিশেষ ভাবে মেনে না চললে নয়।

জরুরী অবস্থায় হাতে অর্থের টানাটানি থাকলে ধার দেনা করতে হয়, এ সকলেরই জানা। কিন্তু তাই বলে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' —হুবহু এই নীতি অনুসরণ করতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ঋণ করবার আগে তো বটেই, এমন কি, ঋণ গ্রহণের মুহূর্ত্তেও ভাবতে হবে বিশেষ রকম—যতটা ঋণের বোঝা নেওয়া হচ্ছে, সবটাই সে মুহূর্ত্তে অপরিহার্য কি না। অর্থহীন বিলাস ব্যসনের জন্তে টাকা পয়সা নির্ব্বিচারে ধার করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সেই ধরনের কাজ করতে গেলেই যখন-তখন সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। অপর দিকে ধার দেনা বা ঋণের টাকা পরিশোধ না করা অবধি স্বস্তি আসবে না, এগিয়ে যাবার প্রেরণা মিলবে না।

সংসার-জীবনে অন্ততঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকদের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলার দাবী রাখা যায়। নিতান্ত সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, ব্যয় সেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে করতে যাওয়া নিশ্চয়ই সমর্থন যোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পরিবার পরিজনের কিংবা ব্যক্তিগত কোন দায় বা সমস্যা মেটাতে ধার-দেনা যদি একান্ত করতেই হয়, কোথা থেকে কি সর্ত্তে সেটি করলে পর ততটা অসুবিধা হবে না, লক্ষ্য রাখতে হবে বৈ কি। ঋণ করবার পর, সে দীর্ঘ মেয়াদীই হোক্ কি স্বল্প মেয়াদীই হোক্, ঋণ পরিশোধের প্রশ্নটিই বড় কথা। সম্পূর্ণ ঋণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটি মনের সামনে রাখতে হবে সর্ব্বক্ষণ। বে-হিসেবী হয়ে পড়লে, হিসাবে ভুলচুক হলে ঠকতে হবে, ভুগতে হবে, এ স্বীকার্য্য।

আগেই বলতে চাওয়া হলো, আয় যেখানে সীমিত, সেখানে যদৃচ্ছা টাকা-পয়সা খরচ করলে চলবে না, অপচয়-অপব্যয় যতটা সম্ভব বন্ধ করতেই হবে। কোন একটা মূল্যবান জিনিষ কিনবার

হয়ত শপথ হল, প্রয়োজনও দেখা দিল, কিন্তু তাই বলে বাজারে বেশ কিছুটা খোঁজ খবর না নিয়ে কিনতে গেলেই অতিরিক্ত দাম চলে যেতে পারে। অনেক সময় কিস্তিতেও কতকগুলো জিনিষ বিক্রী হয়, সেটা কতটা সুবিধাজনক, এ-ও বিবেচনা করা দরকার।

অবস্থার বিপাকে ধার-দেনা বা ঋণ করবার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সংসারী মানুষকে তবু যতদূর সম্ভব এ পথ এড়িয়ে চলা যায়, দেখতে হবে তা-ই। সোনাদানা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস বন্ধক রেখে, হ্যাণ্ডনোট দিয়ে এবং আরও নানা সূত্র ধরে ঋণ পাওয়া যায় বা যেতে পারে। কিন্তু কোন্ ব্যবস্থায় সুদের পরিমাণ কম পড়বে আর কোথায় সর্তের শক্ত বাঁধন বা কড়াকড়িতে পড়তে হবে না, এ সকল বাচাই করতে হবে আগেভাগেই। কাজ-কারবার করতে গেলে ঋণের প্রয়োজন হয় কিংবা অনেক সময় ঋণ না হলে চলতেই পারে না। সে সব স্থানেও ঝুঁকি নেওয়ার পূর্ব্বেই হিসাব করে দেখতে হবে—মুনাফা কতটা হতে পারে, মোটামুটি কতদিন মধ্যে ঋণের টাকা সুদসমেত পরিশোধ করা যাবে পুরোপুরি। অর্থাৎ পরিকল্পনা করতে হবে ভাল রকম ধার-দেনা করতে যাবার আগেই, আর এই ভাবে কাজ করলে দুশ্চিন্তা বা বিপদ সহসা আসতে পারে না, এটুকু বলা যায়।

শিল্প হিসাবে বেবী ফুড

আজকের দিনে সব দেশেই, আমাদের ভারতেও, বেবী ফুড বা শিশু খাদ্যের চলতি খুব বেশি। তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এর প্রচলন যে হারে বেড়ে চলেছে, এখানে এখনও ততটা ব্যাপক হয় নি। সর্ব্বত্রই গ্রামাঞ্চলের চেয়ে সহরে এর প্রচলন অধিক এবং এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

বেবী ফুড বা শিশু খাদ্যের জন্ম বেশি দিনের কথা নয়, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও এর ব্যবহার প্রায় দেখতে পাওয়া যায়নি—এ দেশে তো নয়ই অন্য দেশেও। নারীদের স্বাস্থ্য যেখানে ভেঙ্গে পড়তে থাকে অর্থাৎ শিশুদের বেঁচে থাকবার জন্য মাতৃস্তন্য যখন অভাব ঘটল এবং চাহিদা অনুযায়ী দুগ্ধ সরবরাহ কঠিন হল, তখনই বিকল্প শিশু খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশ বড় হয়ে দেখা দেয়। এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলগুলিতে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে, প্রচুর আলোচনা গবেষণা হয়ে চলে। এরই পরিণতিতে শিশুদের জন্য এই অতি মূল্যবান জিনিষটি আবিষ্কৃত হয়।

একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, আজ বেবী ফুড একটি মস্ত শিল্পে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব বাজারের দোকানে দোকানে নানা ধরণের বেবী ফুড বা শিশু খাদ্য সাজানো দেখতে পাওয়া যায়। যে গৃহে স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর পুষ্টির অভাব হচ্ছে, সেখানেই হাজির করা হয় কোন না কোন বেবী ফুড। মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে বা অন্য কতকগুলো কারণে চিকিৎসকরাও এই শ্রেণীর ফুডের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিকল্প খাদ্যের জন্যে আগের দিনের মতো এখন আর ততটা ভাবতে হচ্ছে না। এ নিঃসন্দেহ যে, মায়েরা এই দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন, বহুল পরিমাণে।

বেবী ফুডের একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান আমেরিকার গারবার কোম্পানী। মাত্র বছর ৩০।৩১ আগেকার কথা। ডরোথি গারবার নামে এক মার্কিণ নারী বাড়ীখানা করে শিশুর যত্ন নিতে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছিলেন। দিনের পর দিন এই অবস্থা দেখে তাঁর স্বামীর মনেও গভীর চিন্তার উদ্রেক হয়। ডরোথির মাথায় হঠাৎ একটি বুদ্ধি খেলে। স্বামীর কাছে বিকল্প একটি শিশু খাদ্য তৈরীর প্রস্তাব রাখেন সেদিনের ব্যাকুল জননী। মার্কিণ মুলুকের একটি রন্ধনশালায় যে গবেষণা আলোচনা হয়, আজকের দিনের বেবী ফুড শিল্প গড়ে তুলতে তা সাহায্য করেছে অসামান্য।

আজ পৃথিবীর নানা দেশে বেবী ফুড উৎপাদনের অসংখ্য কারখানা গড়ে উঠেছে। হিসাবেই দেখা গেছে—যতদিন যাচ্ছে, শিশু খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে ততই। এই থেকে বেশ বুঝা যায় যে, বেবী ফুড শিল্পটি সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে দিন দিন এবং এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নিশ্চিত।

শস্য সংরক্ষণ ও আধুনিক গুদামঘর

বিজ্ঞানের পুরো অগ্রগতির যুগ চলেছে এক্ষণে। সব ব্যাপারেই আজকাল তাই বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় কিংবা অনুসরণের দাবী রাখা হয়। খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পুরাতন পদ্ধতির ক্রমে রূপান্তর ঘটছে। শুধু উৎপাদন কেন, শস্য সংরক্ষণ, যা উৎপাদনের মতোই একটি বড় জিনিস, সেখানেও দেখা যাবে আমদানী করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। শস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক গুদামঘরেরও সৃষ্টি হয়েছে সেই থেকেই।

এতকাল এদেশে সর্বত্র শস্যগোলা (পুরাতন পদ্ধতির) প্রাচুর্য্য দেখা গেছে। এক্ষণে সরকারী উদ্যোগে ও সহায়তায় বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত হচ্ছে কিছু কিছু আধুনিক গুদামঘর (বিজ্ঞানসম্মত)। এই গুদামঘরের পরিকল্পনা কিন্তু হয় ১৯২৮ সালেই অর্থাৎ ইংরেজ আমলে। রাজকীয় কৃষি-কমিশন সে সময় পণ্যদ্রব্য মজুত রাখবার জন্যে জোর দেন এ ধরণের গুদামঘরের ওপর। এর অল্পদিন বাদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি একটি সুপারিশ করেন—যাতে বলা হয় যে, গুদামঘর মারফত দেশে অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। দেশব্যাপী বিজ্ঞানসম্মত গুদামঘর স্থাপনের সুপারিশ রাখেন এর পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পল্লী ঋণ তদন্ত কমিটিও। আলোচ্য সুপারিশগুলোকে কেন্দ্র করেই কৃষিজাত দ্রব্য উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণের আইন গৃহীত হয় আর সেটি ১৯৫৬ সালে। ক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদামঘর পর্ষৎ গঠনের ব্যবস্থা হয়।

একটি হিসাবে দেখা যায় যে, বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে গুদামঘর কর্পোরেশনের পরিচালনাধীনে গুদামঘর স্থাপিত হয়েছে ১৪৮টি। আরও ১২৭টি গুদামঘরের নির্মাণকাজ শেষ হবার কথা ১৯৬০ সালের ভেতরই। রাজ্যের গুদামঘর কর্পোরেশনগুলোর অধীনে মোট ৩৫৬টি গুদামঘর রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তৃতীয় পরিকল্পনায়। পরিকল্পিত গুদামঘর সমূহ স্থাপিত হলে খাদ্যশস্য ও অপরাপর পণ্যদ্রব্য মজুত রাখা চলবে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন।

নির্ভরযোগ্য হিসাব অনুসারেই এক্ষণে কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশনের আওতায় আছে ১২১টি গুদামঘর। আরও ১১টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে এই বছরের মধ্যেই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় গুদামঘরের সংখ্যাও এখনকার তুলনায় নিশ্চয়ই বাড়বে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(ভূতনাথ ও কাশীনাথ প্রবেশ করিলেন)

ভূতনাথ। বেশ ছেলে যা হোক বাবা, পড়া নেয়েছিস ?

গজেন। আমি যাব না।

ভূতনাথ। যাবে কি যাবে না জানতে পারবে যখন চ্যাংদোলা করে বেঁধে নিয়ে যাব, ওঠ।

মহামায়া। বাবাজী কি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে ?

ভূতনাথ। তুই থাম মাগী। বেদের মেয়ে। বামুনের ছেলেকে ভুলিয়ে ভাঁড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে আসা, ওঠ পিশাচসিদ্ধ, ওরা পিশাচসিদ্ধ, ছোট ছেলে পুড়িয়ে খায়, বড় ছেলেকে মা কালীর কাছে বলি দেয়।

গজেন। তোমার মিথ্যে কথা।

বৈরাগী। না রে মিথ্যে কথা নয়, বাবাজী ঠিক ধরেছে, আমরা ছেলে চুরি করি কি করে জানতে পারলে বাবা।

ভূতনাথ। সেটি কাল সকালে জানতে পারবে। যখন রাজার লোকে এসে বেঁধে নিয়ে যাবে।

গজেন। আমি নিজে ইচ্ছে করে এসেছি।

ভূতনাথ। তোমাতে আর তুমি আছ কি না। তোকে তো মন্তর তন্তর দিয়ে যাদু করেছে। রাত্তিরে তোকে হয় সাপ না হয় ব্যাং করে হাঁড়ির মধ্যে পুরে রাখবে। সকালে আবার মন্তর পড়ে মানুষ করবে।

গজেন। হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তুমি আমায় সাপ করে দিতে পার, সত্যি বল পার ?

বৈরাগী। কেন রে তোর সাপ হতে ইচ্ছে হয় নাকি ?

গজেন। হুঁ আমার সাপ হতে ইচ্ছে হয়, ব্যাং হতে ইচ্ছে হয়। টিকটিকি, গিরগিটি, গরু ছাগল, ভেড়া, সিংহি, বাঘ, সব হতে ইচ্ছে হয়।

বৈরাগী। বটে, তা সাপ হয়ে কি করবি ?

গজেন। এই ভূতনাথদা আর কাশীনাথদার মাথায় ছোবল মারি।

বৈরাগী। কি সাপ হবি ? কেউটে না ঢোঁড়া। কেউটে গোখরো হলে যাকে ছোবল মারবি, সে মারা যাবে, ঢোঁড়া হলে ওদের কিছুই হবে না।

ভূতনাথ। (জনান্তিকে) হ্যাঁ রে কেশে, সত্যি সাপ করে দেবে নাকি ?

কাশীনাথ। ওরা মনে করলে পারে। তুই ওদের ভয় দেখাতে গেলি কেন ?

গজেন। ঢোঁড়া সাপের মোটেই বিষ নেই বাবা ?

বৈরাগী। না।

গজেন। বিষ আছে, কামড়ালে খুব লাগে, অথচ মারা যায় না, এমন সাপ নেই ?

বৈরাগী। না, আচ্ছা এক কাজ করা যাক। তুই হনুমান হবি, তোর নাম গজেন কেমন, রুদ্র অংশ—ঠিক হবে। তুই হনুমান হ।

গজেন। হনুমান হলে কি হবে ?

বৈরাগী। যার ওপর তোর রাগ "জয়রাম" বলে এক লাফে তার কাঁধে চড়ে বসবি আর নামবিনে।

গজেন। যদি ঘাড় থেকে ফেলে দিতে চায় ?

বৈরাগী। এদিক ওদিক মাথা নাড়লেই গালে চড় মারবি। জব্দ হয়ে থাকবে।

ভূতনাথ। গজেন, তুই যাবিনি তো ? আমরা যাই। পণ্ডিত মশায়কে গিয়ে বলি গজেন এল না।

বৈরাগী। ওরে গজেন যা বাবা, যা, তোর দাদাদের সঙ্গে বাড়ী যা। সমস্ত দিন শ্মশানে বসে আছিস গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে যাস।

গজেন। আমি যাব না। আমি হনুমান হব। তুমি মন্তর পড়ে আমায় হনুমান কর। বাড়ী যাইতো ভূতনাথদার কাঁধে চড়ে যাব।

কাশীনাথ। (জনান্তিকে) ওরে ভূতো, ওর রকম ভাল নয়, দেখছিসনে ওর ঘাড়ে অপদেবতা ভর করেছে। চল পালিয়ে যাই। ও হনুমান যদি না-ও হয় এমনিই কাঁধে চাপবে।

ভূতনাথ। হ্যাঁ সেই রকমই মনে হচ্ছে। ওর চোখের চাউনি ভাল নয়, সন্নিসী ঠাকুর মন্তর পড়ে ওকে বশ করে ফেলেছে। ওকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে আবার পণ্ডিতমশাই রাগ করবেন, কি যে করি।

কাশীনাথ। পণ্ডিতমশায় রাগ করবেন বলে গজেনের জন্যে আমাদের প্রাণ দিতে হবে নাকি ? ওপর ভাগনেকে নিজে এসে নিয়ে যান। চল্—

ভূতনাথ। তুই যাবিনে তো গজেন ?

গজেন। না—

ভূতনাথ। তোর জন্যে বাড়ীশুদ্ধ কেউ খায়নি, মাঠাকরুণ কাঁদছেন।

গজেন। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

বৈরাগী। ওর সঙ্গে যাবিনে কেন ?

গজেন। ও আমায় ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে মারে। নিজে কিছু জানেনা।

ভূতনাথ। আমি ব্যাকরণ জানিনে? আমি তায় পড়েছি আর ব্যাকরণ জানিনে?

গণেশ। তোমার আগাগোড়া অন্যায়—তুমি আবার তার পড়বে কি? (ভয়ের অভিনয়) আঁ—আঁ—আঁ—আঁ।

ভূতনাথ। (সভয়ে) ও কি রে! ও কি রে।

গণেশ। (ভয়ের অভিনয়) ঐ-ঐ—পাপৃষ্ট মাথাটা চোখ কান নাই, ঐ আসছে ঐ আসছে।

ভূতনাথ। ওরে বাবা, ওরে বাবা, কেশে শীগ্‌গির আয়—রামনাম বল, রামনাম বল।

কাশীনাথ। রাম, রাম, রাম!

[কম্পন ও উভয়ের প্রস্থান।

মহামায়া। ও গণেশ, গণেশ, ও বাবা তুইও ভয় পেয়েছিস নাকি?

গণেশ। (হাস্য) না ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।

বৈরাগী। তাইতো রে বেটা—তুই তো খুব সেয়ানা ছেলে হয়েছিস?

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা—তুই সত্যি আমাদের কাছে থাকবি না কি—

গণেশ। তুমি আমার মায়ের মত—আমার মায়ের নাম আর তোমার নাম এক। আজ আমার মাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে—আমি তোমাদের কাছে থাকবো।

মহামায়া। তবে চল দুটো খেয়ে নিবি। তুই যে সমস্ত দিন কিছু খাসনি—

বৈরাগী। হ্যাঁ রে তুই ওদের ভয় দেখালি—ঐ ভৈরবঘাট শ্মশান ডাকসাইট ভূতের আড্ডা, এখানে তোর নিজের ভয় করেনা?

গণেশ। না—।

বৈরাগী। সবার ভয় হয় আর তোর ভয় হয় না?

গণেশ। আমার মা মরবার সময় বলে গিয়েছিল—তুই যখন খুব ভয় পাবি তখন আমায় ডাকিস্, আমি তোকে দেখা দেব।

বৈরাগী। হুঁ—তুই তো খুব ছেলে দেখছি। আর তোর মা-ও দেখছি—একটা মায়ের মত মা ছিল।

গণেশ। আজ আমি এই শ্মশানে থাকবো—দেখব ভয় পাই কিনা। বুঝছ ঠাকুর, মা আমার কাছে কাছে আছে, আমি শুধু ভয় পাইনে বলে মাকে দেখতে পাইনে কেমন।

বৈরাগী। তুমি আমায় একটু ভাবিয়ে তুললে বাবা। আচ্ছা, তোর মা কি রকম দেখতে ছিল, মনে আছে তোর?

গণেশ। আছে—আবার নেই। আমি মুখে কিছু বলতে পারবো না—আমার মনে-প্রাণে গাঁথা আছে। দেখলেই চিনতে পারবো। (মহামায়ার প্রতি) অনেকটা তোমার মত, আবার অনেকটা তোমার মত নয়।

মহামায়া। ওকে আর বসিও না, সমস্ত দিন কিছু খায়নি—আয় বাবা, দুটি খেয়ে নিবি (জনান্তিকে) খাওয়া হলে ছুট-ছল-চাতুরী করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসবো।

গণেশ। (সহসা ভাবাবেশে গান) না মা, না, তোমার পায়ে পড়ি মা, আর ছল-চাতুরী করো না মা! আমি আর ভুলবো না, আর ভুলবো না!

গান

ওমা আর করো না ছল
কতবার ভুলিয়ে মা গো
দিয়ে চতুর্বর্গ ফল
এবার আমি ভুলবো না মা
ধরিনু চরণতল ॥
ওমা কত জন্ম লুকাচুরি
খেলেছ আমার সনে
আসি বলে গেছ চলে
রেখেছ কত কাঁদনে
শত জন্ম তোমা হারা
কত কেঁদেছি মা বলে তারা
তোমার জনম-মরণ খেলায়
সার হ'ল মোর অশ্রুজল ॥

মহামায়া। (জনান্তিকে) এ কে? এমন ছেলে তো দেখিনি!

বৈরাগী। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় সিদ্ধ—মহাভাগ্যবান ভক্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ভবদেব সিদ্ধান্ত শিরোমণির চতুষ্পাঠী।

ভবদেব। আজ আমি সর্বাগ্রে গণেশের পাঠ নেব, তোমরা সবাই অবহিত হয়ে শ্রবণ কর। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণের অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা উঠতে পারে। গণেশ এদিকে এস—(গণেশ আসিল)।

ভবদেব। কই, তোমার পুঁথি কই?

গণেশ। হারিয়ে গেছে।

ভবদেব। হারিয়ে গেছে? তোমরা এমন আশ্চর্য্য কথা কখনো শুনেছ? পাঠার্থী অধ্যাপকের কাছে পাঠ নিতে এসে বলছে—পুঁথি হারিয়ে গেছে।

ভূতনাথ। হারিয়ে যায়নি পণ্ডিত মশাই, ও পুড়িয়ে ফেলেছে।

ভবদেব। তুমি পুঁথি পুড়িয়ে ফেলেছ?

গণেশ। (মাথা নাড়িয়া সায় দিল) ঐ ভূতনাথদার জ্বালায়।

ভবদেব। ভূতনাথ কি বলেছে?

গণেশ। ও রোজ রোজ আমায় পড়তে বলে, নিজে পড়তে পায় না—আমার মুখস্থ না হলে শুধু শুধু মারে আর কান মলে দেয়।

ভবদেব। তাই তুমি পুঁথি পুড়িয়ে ফেলেছ?

গণেশ। আমি নিজে পোড়াইনি—সেদিন ভয়ানক বর্ষা, দিদি উনুন ধরাতে পারছিল না, আমি বললাম, এই নিয়ে যা, খাসা শুকনো তালপাতা রয়েছে।

ভবদেব। যেমন দিদি, তেমনি ছোট ভাই?

গণেশ। আমার পুঁথি না থাকলে সেদিন কারো খাওয়া হ'তো না।

ভবদেব। হা হতোহস্মি! এই ছেলেকে আমি লেখাপড়া শেখাব? আমার প্রপ্রপিতামহ দুর্গাহরি তর্কবাচস্পতি মশায়েরও সাধ্য নেই?

গণেশ। তুমি মুখে মুখে পড়েই বাওনা মামা—তোমার তো

পণ্ডিতের ঘরের অন্ন পরম পবিত্র, অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণের এ কাম্য। আচ্ছা বাবাজী তুমি যাও—মাঠাকরুণকে বলে এস। আপনার এ ছাত্রটি অতি বুদ্ধিমান ছাত্র।

ভবদেব। (গজেন্দ্রকে দেখাইয়া) আপনি এর কথা বলছেন?

কমলাকান্ত। হাঁ—আপনাকে উনি যে প্রশ্ন করেছেন খুব বড় প্রশ্ন।

ভবদেব। হাঁ বুদ্ধি আছে, খুব বুদ্ধি! তবে কিনা—

কমলাকান্ত। ছেলেটি বেশ সুদর্শন—আর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন। দেখি বাবাজী তোমার কররেখা? (গজেন্দ্র হাত দেখাইল) (অনেকক্ষণ পর রেখা দেখিয়া) সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মশায়, এই দেখুন এই দেখুন, একবার এই রেখাটি লক্ষ্য করুন।

ভবদেব। তাইতো এতো অতি বিশিষ্ট রেখা, আমি তো এতদিন লক্ষ্য করিনি!

কমলাকান্ত। (ভবদেবকে) আমি আপনার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—আপনার উপদেশ চাই।

ভবদেব। ভাল আপনার প্রয়োজন আপনি ব্যক্ত করুন।

কমলাকান্ত। আপনি আপনার ছাত্রদের নিজের নিজের পাঠাভ্যাস করতে বলুন। আমি পৃথকভাবে আপনাকেই দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো।

ভবদেব। ভো: ভো: ছাত্রগণ, তোমরা এখন মনে মনে নিজেদের পাঠাভ্যাস কর। আমি মহারাজের সঙ্গে একটু অন্য আলোচনা করবো। গজেন্দ্র, যাও বাবা, তুমি তোমার নিজের আসনে গিয়ে বসো।

গজেন্দ্র। না মামা, তুমি আমার পড়াও—অক্ষর কি বল?

কমলাকান্ত। আমি বুঝেছি তুমি নাছোড়বান্দা ছেলে। তুমি পণ্ডিতমশাইকে সহজে ছাড়বে না। আচ্ছা এখন একটু শান্ত হয়ে বস। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মশায়ের কাছে আমি দু-একটি কথা নিবেদন করবো—যাও বাবা যাও।

(গজেন্দ্র স্বস্থানে গিয়া বসিল)

ভবদেব। আপনার কি বক্তব্য মহারাজ!

কমলাকান্ত। ছেলেটি বুঝি আপনার ভাগিনেয়?

ভবদেব। হাঁ।

কমলাকান্ত। "নরানাং মাতুলক্রমঃ" আশা করা যায়, একদিন আপনার মতই সুপণ্ডিত হবেন। উনি আপনার নাম রক্ষা করবেন।

ভবদেব। ব্রাহ্মণী সেই আশায়ই তো ওকে পুত্রবৎ পালন করছেন।

কমলাকান্ত। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল তো?

ভবদেব। হাঁ—কুশল বৈ কি।

কমলাকান্ত। দেখুন, গত রাত্রে মহামায়া মহারাণীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন—কল্যাণী ষোড়শী মূর্ত্তিতে—মা তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, শীঘ্র কলির কলুষে পুণ্যভূমি প্লাবিত—

ভবদেব। মহামায়া স্বপ্ন দেখালেন, রাণীমাকে?

কমলাকান্ত। হাঁ, দেবী বললেন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাচারী হবে, অনাচারী হবে, অন্নবিচার থাকবে না—সমাজ উৎসন্ন যাবে, আমার স্বামী রাজা সমাজপতি, তিনি যেন সাবধানে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যেন কষ্ট না পান।

ভবদেব। তিনি কি দেবীর কোন প্রত্যাদেশ পেয়েছেন?

কমলাকান্ত। সেটি মায়ের প্রত্যাদেশ কি তাঁর স্বপ্নাবস্থার কল্পনা আমি ঠিক পাচ্ছি না। রাণী আমাকে বললেন—একটি পবিত্র কিশোর ব্রাহ্মণকুমারকে নিজের কাছে রাখবেন—সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে একটি পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণকুমারীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে তাকে তোমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে হবে মহা পণ্ডিত অথচ গৃহী। অনাসক্ত সংসারী—ভক্তিমান শাস্ত্রকুশলী, সংসারে থেকেও তার আচরণ হবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর মত।

ভবদেব। অনাসক্ত সংসারীর কথা শাস্ত্রেই পড়া যায় মহারাজ! আমি কখনো চক্ষেও দেখিনি।

কমলাকান্ত। এখানে এসে আপনার ভাগিনেয়কে দেখে আমার মন বড়ই উল্লসিত হয়েছে—আপনি যদি অনুমতি করেন, যদি বলেন, আপনার ব্রাহ্মণী ছেলেটিকে পুত্রবৎ পালন করছেন—সেখানে আমার উত্তর—আমি কাছেও তাকে নিয়ে যাচ্ছিনে—তিনি কারো পোষ্যও হবেন না—কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হলে আমার দান গ্রহণ করবেন।

ভবদেব। এ বেশ ভাল প্রস্তাব মহারাজ! আমার ভাগিনেয় যখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তখন ও যে ভাগ্যবান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে—

কমলাকান্ত। আপনি কি সন্দেহ করেন?

ভবদেব। প্রথম—গজেন্দ্র সুপণ্ডিত হতে পারবে কিনা এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নই। দ্বিতীয়—

কমলাকান্ত। দ্বিতীয় কি?

ভবদেব। আপনি যে রকম সদাচারী ব্রাহ্মণ চাইছেন—

কমলাকান্ত। হাঁ, আমি শুনেছি, চণ্ডালের শব স্পর্শ করেছে, সে কি আপনার এই ভাগিনেয়?

ভবদেব। শুধু তাই নয়, শ্মশানে এক বৈরাগী-দম্পতির অন্ন গ্রহণ করেছে।

কমলাকান্ত। আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন?

ভবদেব। ও প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। জোর-জবরদস্তি করে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে বটে। ও কোন নিয়মই পালন করেনি। ধরতে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমি আর ব্রাহ্মণী।

কমলাকান্ত। কিন্তু আপনার ভাগিনেয় সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত। এ রকম কর-রেখা আমি অন্য কোন ছেলের দেখিনি!

ভবদেব। ভয় তো সেইখানেই মহারাজ! অসামান্য বুদ্ধির অধিকারী যারা হয়, তাদের পদে পদে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষ ওর বাপ ছিলেন জন্মবৈরাগী।

কমলাকান্ত। গজেন্দ্রের মা বেঁচে আছেন?

ভবদেব। না, গজেন্দ্র যখন আট বৎসরের শিশু, তখনই সে দেহত্যাগ করেছে। জন্মটা দুঃখেই গেছে।

কমলাকান্ত। তাহলে স্বামীর শোকেই দেহরক্ষা করেছেন?

ভবদেব। যা বলেন গজেন্দ্র তা তখন অতি শিশু ও কিছুই জানেও না, বলতেও পারে না। মা মা করে কেঁদেই অস্থির।

(গজেন্দ্র আগ্রহ সহকারে শুনিতেছিল—নিকটে আসিল।)

গণেশ। আমার মায়ের কথা বলছ মামা, আবার বল।

ভবদেব। তোমার মায়ের কথা আর কি বলবো বাবা, জন্ম-দুঃখিনী। আমার মা-মরা বোন কত যত্নে মানুষ করেছিলাম। সবই বরাত, দুঃখ আমি আর কি করবো? একদিনও তাকে সুখী করতে পারিনি।

গণেশ। গাঁয়ের লোকেরা আমায় বলেছিল—তোর মা মামার বাড়ী গেছে। তাই এখানে এসেছিলাম, নইলে আসতাম না।

ভবদেব। এখানে আসতে না—কোথায় যেতে?

গণেশ। মায়ের খোঁজে। তুমিই তো আমায় ভুলিয়ে রেখেছো। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবলই বল—ব্যাকরণ নিয়ে আয়, তোর বর্ণবোধ হয়নি, অক্ষর পরিচয় হয়নি। অক্ষরের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যত বাজে কথা।

ভবদেব। দেখছেন, মহারাজ ছেলেটার রীতিনীতি জ্ঞান কত কম? আমি ওর মামা, সেইটিই জানে, আমি যে ওর অধ্যাপক, সে জ্ঞান নেই।

কমলাকান্ত। হুঁ, ছেলেটি একটু অস্বাভাবিক বটে।

ভবদেব। বাপ ঐ রকম, মা ঐ রকম, ছেলে অস্বাভাবিক হবে না? অতি নিষ্ঠা, অতি বিশ্বাস যে অন্ধ বিশ্বাসেরই মত। এসব ভাল নয়। শোক, দুঃখ এ তো সংসারে আছেই, জ্ঞানের দ্বারা শোক ক্ষয় করতে হবে। তবেই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

গণেশ। জ্ঞান কা'কে বলে?

ভবদেব। যা দ্বারা জানা যায়।

গণেশ। কিসের দ্বারা জানা যায়, কি জানা যায়?

ভবদেব। তুই থাম বাপু। পড়বিনে, শুনবিনে চিন্তা করবিনে অথচ সব জানতে চাইবি কি করে হবে

গণেশ। কি করে হবে তা আমি কি জানি, তাহলে আমাকেই তো লোকে পণ্ডিত বলবে।

ভবদেব। হ্যাঁ রে, মহারাজ এখানে বসে আছেন আর তুই এইরকম পাগলামি কচ্ছিস?

গণেশ। হাঁ করবো, হয় তুমি আমায় অক্ষর বুঝিয়ে দাও নইলে আমি তোমাদের সব পুঁথি পুড়িয়ে দেব।

কমলাকান্ত। আপনি একটু অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করুন না শিরোমণি মশায়।

গণেশ। জানলে তো? মামা কিছু জানেনা শুধু কতকগুলো শোল্লোক মুখস্থ। তাতেই জোরে ফাঁকি দিয়ে বড় বড় বিদেয় নিয়ে আসে।

কমলাকান্ত। ছিঃ বাবা, অমন কথা কি মুখে আনে? উনি একে তোমার মাতুল তার উপর দিগগজ পণ্ডিত।

ভবদেব। তুই দূর-হ হতভাগা। আমার সামনে থেকে চলে যা।

গণেশ। আচ্ছা মহারাজ—আপনি মামাকে বললেন দিগগজ পণ্ডিত আবার মামা আমাকে বললেন হাতিমূর্খ। আসলে হাতী তাহলে কি? পণ্ডিত না মূর্খ?

কমলাকান্ত। না বাবা—তুমি একখানা ছেলে বটে। তোমার কাছে সাবধান হয়ে কথা বলতে হয়।

গণেশ। অথচ মামা আপনার কাছে আমার নামে কত লাগানি দিলে দেখলেন তো? বাবাকে পর্যন্ত বাদ দিলে না।

ভবদেব। ছোঁড়াটা জ্বালালে দেখছি।

ভূতনাথ। আমাদেরই কি কম জ্বালায়। আপনি পাছে বিরক্ত হন মাঠাকরুন শুনলে রাগ করেন, সেই ভয়ে আমরা আপনাকে কিছু জানাইনে।

গণেশ। ওই বলুক না কি করি?

ভূতনাথ। ওর জন্যে আস্ত কাপড় পরবার উপায় নেই। কাপড় ছেঁড়ে। টিকি কেটে দেয়, ঘুমুলে মুখে কালি মাখিয়ে দেয়, পুঁথি ফেলে দেয় তাছাড়া যা খুসী তাই বলে।

গণেশ। কাপড় ছিঁড়তে, কালি মাখাতে দেখেছ কোনদিন?

ভূতনাথ। দেখবো যেদিন সেদিন মজাটি টের পাবে—

গণেশ। কেমন করে জানলে কাশীনাথদা এসব করেনা?

কাশীনাথ। আমার নামে কোন কথা বলিসনি, আমি এমনি আছি বেশ আছি রাগলে আমি কারো নই।

গণেশ। (ভ্যাংচাইয়া) তা কি আর জানিনা?

ভবদেব। আঃ! তোমরা বিবেকজ্ঞানশূন্য বলদপরায়ণ আর অসহ্য! মহারাজ আসলে আমি সমীহ করে কথা বলি আর তোমাদের একটুও ভাবান্তর নেই, সংযম নেই। এতদিন তোমাদের জন্য যে পরিশ্রম করেছি, সে দেখছি আমার ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়েছে।

গণেশ। আমিও সেই কথাই বলি মামা। তোমার ছাত্রেরা এক একটি বংশধর। ওদের কিছু হবে না। ওদের ছেড়ে দাও ওরা চরে খাক—

কমলাকান্ত। ছিঃ—এসব কি কথা! কিশোর বালকের মুখে এ ধরণের কথা তো ভাল নয়? এ সব কুসংস্কারের ফল। আপনার ছাত্রদের আপনি একটু রীতিনীতি শিক্ষা দেবেন সিদ্ধান্তমশায়। আপনার ভাগিনেয় আপনার বয়স্ক ছাত্রদের কাছে থেকেই ঐ রকম অপভাষা শিক্ষা করেছে।

ভবদেব। এদের জ্বালায় আমায় দেখছি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হবে। (গণেশের প্রতি) বল তোর পড়া বল, অক্ষর কা'কে বলে বল।

গণেশ। আমি জানলে আর তোমায় জিজ্ঞাসা করবো কেন?

ভবদেব। অ, আ, ক, খ, অক্ষর। আর কিছু তোমার জানবার দরকার নেই। বল স্বরবর্ণ প্রকারভেদ ক রকম।

গণেশ। আগে অক্ষর সম্বন্ধে কথা শেষ হ'ক।

ভবদেব। (উত্তেজিত হইয়া) এর বেশী তোমার জানা দরকার নেই।

গণেশ। দরকার আছে, অ, আ, ক, খ, যদি অক্ষর হ'ল তাহ'লে ক্ষর কি?

ভবদেব। তুমি তা বুঝতে পারবে না হতভাগা।

গণেশ। তুমি এক কথায় বলেই দেখ না বুঝতে পারি কি না পারি।

ভবদেব। আমায় রাগাসনি গণেশ।

গণেশ। পড়া দিতে গেলে রাগ করবে। না পড়লে রাগ করবে—তোমার সব তাতেই রাগ। আজ আমার পড়তে ইচ্ছে হয়েছে—আজ যদি রাগ করে আমায় না পড়াও আর কক্ষনো আমি তোমার কাছে পড়তে আসবো না।

ভবদেব। তবেই আর কি আমার ভয়নক ক্ষতি হবে, তুইই মূর্খ হয়ে থাকবি।

গজেশ। আর ছাত্র মূর্খ হলে পণ্ডিতের বুঝি খুব সুনাম হবে—থাক্ তোমার আর পড়াতে হবে না আমি বুঝে নিয়েছি ও বৈরাগী ঠাকুর—বৈরাগী ঠাকুর—বলি ও বাবাঠাকুর, একবার এদিকে এস।

(বৈরাগীর প্রবেশ)

বৈরাগী। আমায় এখানে ডাকলে কেন, এ তো পণ্ডিতের টোল। আমি এখানে কি করবো।

গজেশ। তুমি আমায় অক্ষর শিখিয়ে দেবে।

বৈরাগী। আমি তো লেখাই না, আমি গান গাই।

কমলাকান্ত। কি গান গাইবে—অক্ষরের গান গাইতে পারো?

বৈরাগী। (গজেশের প্রতি) অক্ষরের গান শুনবি নাকি?

গজেশ। হ্যাঁ শুনবো—

বৈরাগী। বেশ, অক্ষরের গান গাইছি।

(বৈরাগীর গান)

আমায় পাঠশালাতে শিখিয়েছিল
তালপাতার উপর
অ আ ক খ আদি করে
পঞ্চাশৎ অক্ষর—
যত বলে লেখ, লেখ
দাগা বুলোও পথ দেখ।
আমি কিছুই বুঝতে নারি
(আমার) মাথা ঘোরে নিরন্তর
অকার ইকার, একার, ওকার
বিসর্গ ও অনুস্বর
নিরুপাধি পরব্রহ্ম নির্বিকার নিরাকার
সাধ করে যে ধরেছে আকার (মা আমার)
এই জগতে যা চোখে দেখ
আমার মায়ের আকার জেনে রেখ
স্বরূপে মায় যে দেখেছে
সেই তো আছে নিরুত্তর
বীজরূপা মহাশক্তি
শব্দব্রহ্ম এক রকম॥

গজেশ। আমি মায়ের সে রূপ দেখবো তুমি আমায় দেখাতে পারো?

বৈরাগী। আমার সঙ্গে এস। [প্রস্থান।

কমলাকান্ত। গজেশকে নিয়ে চলে গেল যে—

ভূতনাথ। ও সেই বৈরাগী। গজেশ একরাত্রি ওর সঙ্গে শ্মশানে ছিল—?

ভবদেব। আমার মনে হচ্ছে সন্ন্যাসী ওকে নিয়ে গেল। ও আর ফিরবে না।

কমলাকান্ত। আপনি ডাকুন।

ভবদেব। গজেশের বাপও সন্ন্যাসী ছিল—

(অপর্ণা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুক্তকেশীর প্রবেশ)

ভবদেব। কি গ্রহ—তুমি যে একেবারে চতুষ্পাঠীতে এসে উপস্থিত হলে অপর্ণা!

অপর্ণা। সন্ন্যাসী ছেলেটাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল—আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো! ও গজেশ গজেশ, ও রে বাসুনি আমার কথা শোন্ কথা শোন্। [প্রস্থান।

(বিষ্কম্ভক)

(গায়িকা) কে গো চক্রী সারথী চালাও রথ
চলে রথের চাকা
ছিল সরল ঋজু পথ
কেন যে পথ হ'ল বাঁকা
আকাশে গর্জে অশনি
যা না ফিরে ঘরে কাল ফণী
ঘোর অমানিশা সঙ্গিনী
এ বিজনে পথহারা চলেছি একা॥
দক্ষিণে ঘন বন
বামে মহাসাগর
সমুখে পথরেখা
কণ্টক ভর ভর
বিষম শর্বরী আঁধার ঢাকা
বাজাও বাঁশরী শ্রীহরি
গহন কুঞ্জ কেন
পাব না দেখা॥

২য় দৃশ্য

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ—সকলের প্রবেশ

বৈরাগী। এইবার আমি যাই মা।

অপর্ণা। না তুমি বস, আমি তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো। (গজেশের প্রতি) তুমি কি মনে করেছো, তোমার মা মরে গিয়েছে বলে তুমি যা খুসী তাই করবে?

গজেশ। আমি কি তাই বলছি?

অপর্ণা। তবে কার হুকুমে তুই ঘর ছেড়ে চলে গেলি?

গজেশ। আমি তো মামার সামনে দিয়ে চলে এলাম, মামা তো কিছু বললে না?

অপর্ণা। তোর মামা কি সংসারের কোন খবর রাখেন? ক্ষিদে পেলে তবে মামার কাছে খাবার চাওনা কেন? সে সময় আমার কাছে এস কেন?

গজেশ। তুমি যে ভাত বেঁধে দাও।

অপর্ণা। তুমিই বা কি রকম বৈরাগী বাবু, ছোট ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও?

বৈরাগী। আমি তো ভোলাতে পারিনি মা, তুমিই তো আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এলে।

অপর্ণা। চেষ্টা তো করেছিলে—আমি ঠাণ্ডা সময় মত গিয়ে পড়েছিলাম—সেদিনও তো তুমিই নিয়ে গিয়েছিলে?

বৈরাগী। আমি কোনদিনই নিয়ে যাইনি মা। ও ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে যায়।

মুক্তকেশী। ঐ দেখ মা, তুতনাথদা কাশীনাথদা সবাই এইদিকে আসছে।

অপর্ণা। ওদের বারণ করে আর কেউ যেন এদিকে না আসে।

[মুক্তকেশীর প্রস্থান।

গঙ্গেশ আমায় সত্যি কথা বল— কেন তুমি বার বার সন্ন্যাসীর কাছে যাও. একরাত্রি তুমি ওর সঙ্গে শ্মশানে ছিলে ওর স্ত্রীকে তুমি মা বলে ডাকো শুনতে পাই—ওরা শ্মশানে মশানে থাকে, ভিক্ষে করে খায়—ওঁদের সঙ্গে তোমার এত মেলামেশা কেন?

গঙ্গেশ। ওকে দেখলে আমি সব ভুলে যাই—মনে হয় উনি যা বলেন তাই ঠিক আর সব বেঠিক। মামীমা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আদেশ দাও আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাই।

অপর্ণা। ওর সঙ্গে কোথায় যাবে?

গঙ্গেশ। শ্মশানে মশানে, পাহাড়ে জঙ্গলে নদীর ধারে, সমুদ্রের তীরে কত জায়গায়, যেখানে নিয়ে যাবেন

অপর্ণা। কি জন্য তুমি আমার বাড়ী থাকতে চাও না?

গঙ্গেশ। এখানে আমার ভাল লাগে না।

অপর্ণা। ভাল লাগে না কেন?

গঙ্গেশ। আমি জানিনে।

অপর্ণা। কেউ তোমায় অযত্ন করে?

গঙ্গেশ। মামা কেবল পড়তে বলে, তুমি কেবল খেতে বল, ঘুমুতে বল—আর বল দুরন্তপনা করিসনি।

অপর্ণা। কি করলে তোমার ভালো লাগে?

গঙ্গেশ। আমি বলতে পারিনে, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি দিনকতক ঘুরে আসি।

অপর্ণা। আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, তোমায় আমার চোখে চোখে থাকতে হবে।

গঙ্গেশ। কি করবো বাবাঠাকুর! তুমি একটা মন্তর পড়ে দেও মামীমা যেন আমার কথা একেবারে ভুলে যায়।

বৈরাগী। তুমি ওঁর কাছে বাড়ীতেই থাক।

গঙ্গেশ। আচ্ছা মামীমা, বৈরাগীঠাকুর আমাদের বাড়ীতে থাকুন না।

বৈরাগী। আমি তো গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিনে বাবা!

গঙ্গেশ। থাকলেই বা

অপর্ণা। আমি রোজ তোর কাছে তোর মায়ের গল্প করবো।

গঙ্গেশ। তুমি মুখেই বল আমার মাকে সবাই ভুলে গিয়েছে তোমারও মনে নেই।

বৈরাগী। যে চলে যায় তার কথা দিন দিন সবাই ভোলে, সেই দুঃখেই তো ঘর ছেড়ে পালিয়েছি বাবা?

গঙ্গেশ। মামীমা আমায় এত ভালবাসে, আজ যদি মরে যাই দুদিন পরে আমার কথা আর মনে থাকবে না?

বৈরাগী। তোমার মামীমার তোমার মত একটি ছেলে হয়েছিল, তাকে উনি কত যত্ন করতেন, সে মা বলে ডাকতো, ওঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসতো। যখন মারা যায় উনি বোধহয় এক মাস বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। লোকে মনে করেছিল উনিও বাঁচবেন না। কতদিন হয়ে গেল, সে চলে গিয়েছে উনি আছেন।

অপর্ণা। তুমি কি করে জানলে ঠাকুর?

বৈরাগী। তোমার আচরণে বুঝেছি মা! তোমার মুখে পুত্রশোকের ছাপ আছে।

অপর্ণা। আমি তাকে ভুলিনি বাবা! তার শোক একে পেয়ে চাপা দিয়ে রেখেছি।

বৈরাগী। আমি জানি মা। একবার হারিয়েছিলে বলে, আর হারাতে চাও না। হারানোর দুঃখ তোমার জানা আছে। তবে যে শিশু একদিন তোমায় মা বলে ডেকেছিল, তাকে তুমি ভুলেছ, তার কথা আর মনে নেই। মনে করবার চেষ্টা কর তার কথা মনে পড়বে না।

অপর্ণা। (কিছুক্ষণ পরে অতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া) বাবা, আমি পাষাণী।

বৈরাগী। তুমি একা পাষাণী নও মা! আমরা সবাই পাষাণ, সবাই পাষাণী।

গান

সুমুখ থেকে যে চলে যায়
তার কথা আর ভাবে না মন।
চোখের সামনে যখন থাকে
কত যত্ন কর তাকে
দূরে সরে গেলে পরে
কেউ করে না অন্বেষণ।
ছিল সে নয়নপুতলী
কত মিঠে লাগতো যে তার
চাঁদমুখের বুলি
সেই সাধনার ধন জীবন রতন
গিয়েছ ভুলি
আবার কারে নূতন করে
ভাবছো যে আপন।
তুমি খোঁজ তারে
যার ভাণ্ডারে
আছে তোমার সব হারাধন।

(ভবদেব গানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন)

ভবদেব। সত্যি হারাধন পাওয়া যায়, না শুধুই কথা?

বৈরাগী। একবার খোঁজ করে দেখুন না পণ্ডিত মশাই!

ভবদেব। কোথায় খোঁজ করবো বাবা

ঐ ভূমা আর নমো বৈ সঃ—

ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থবৃক্ষ আর দুই সুপর্ণ—

সপ্ত উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে তোমাদের বাউলের গান পর্য্যন্ত বাবা, কথা তো ঐ এক। কত টীকা, কত ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা, টীকার টীকা, কূট তর্ক, শাস্ত্রসমুদ্র, আসল বস্তু কোথায়।

অপর্ণা। আমার মাথার দিব্যি রইলো তুমি যদি আর শাস্ত্র বিচার করবে।

ভবদেব। কেন তোমার আবার কি হলো? আমি শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত আমি শাস্ত্রবিচার করবো না?

অপর্ণা। না।

ভবদেব। আমি কি ইচ্ছে করে শাস্ত্রবিচার করি ব্রাহ্মণী!

অপর্ণা। তবে বিচার কর কেন?

ভবদেব। শাস্ত্রবিচার না করলে লোকে বিদেয় দেবে কেন ?

অপর্ণা। কেবল সংসার, সংসার, বিধান আর বিদেয়, তর্ক আর চেঁচামেচি, তবুও একটু ভাল কথা নেই ভগবানের নাম নেই, কিসের জন্য এত ?

ভবদেব। সে তো কখনো ছিলনা আজও নেই, হঠাৎ তুমি চটে গেলে কেন ?

অপর্ণা। আমার আর এসব ভাল লাগছে না।

(সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ ও পশ্চাৎ মুক্তকেশী)

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁরে অপর্ণা, তোদের কাণ্ডখানা কি আমায় বলতে পারিস ? রান্না-বান্না হবে না শুধুই ভাগনেকে নিয়ে গান বাজনা করলেই চলবে।

মুক্তকেশী। দিদিমা তুমি এখান থেকে যাও, শীগগির যাও, মা তোমায় মানা করেছে।

সিদ্ধেশ্বরী (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমার ঘাট হয়েছে দিদি। নিজের গালে নিজে চড় খাচ্ছি, যেমন আজও বয়েস খুঁটি হয়ে বসে আছি মরবার নামটিও নেই তেমনি আমার ঠিক শাস্তি হচ্ছে। এইবার নাকে খৎ দিই আর যদি কখনো তোমাদের কোন কথায় থাকি।

ভবদেব। আহা—হা-হা কি দুর্দৈব। আপনার আবার কি হল। এই মুক্তকেশী, কে বলল তার দিদিমাকে—

মুক্তকেশী। যা বললাম তুমি শুনলে তো—বাবা আমি কি রাগের কথা বলেছি, মা আমায় বলে দিলেন এখন যেন এখানে আর কেউ না আসে।

অপর্ণা। তা আমি কি মাকে আসতে বারণ করেছি ?

মুক্তকেশী। তা আমি কি করে জানবো, তুমি তো কারো নাম করনি।

ভবদেব। তোমরা সবাই বুদ্ধিমতী। আপনিই বা হঠাৎ গালে মুখে চড়াতে গেলেন কেন ?

সিদ্ধেশ্বরী। আমার পোড়াকপাল বাবা, বুড়ো বয়সে মেয়ে জামাইয়ের অন্ন মুখে দিতে হচ্ছে ? যদি একটা পেটের সন্তান থাকতো।

অপর্ণা। থাম মা ও কথা থাক চুপ কর।

সিদ্ধেশ্বরী। (রোদন) একটা পরের ছেলের জন্যে নিজের পেটের মেয়ে আমায় অপমান করে।

ভবদেব। কি বিপদ, আপনি রোদন করেন কেন ? আপনার কে থাকলে কি হতো।

বৈরাগী। যে ছেলে মারা গেছেন তার জন্যে শোক কচ্ছেন ! ওঁর দোষ কি।

ভবদেব। সে তো বহুকালের কথা। সে শোক এখনো আপনার আছে ?

সিদ্ধেশ্বরী। সে কি ভোলবার যে বাবা, সে ভোলবার নয়। সব গাঁথা আছে এইখানে।

ভবদেব। আপনাকে দেখে তো আমার কোন দিনই মনে হয়নি আপনার শোক দুঃখ কিছু আছে।

বৈরাগী। এ জায়গাটা শুকনো ডাঙা, শক্তমাটি দেখে ভুলবেন না, খানকটা মাটি খুঁড়ুন, জল বেরোবেই।

ভবদেব। তুমি একটু থামো বাবা, এর উপর আর ফোড়ন দিওনা।

সিদ্ধেশ্বরী আমি পোড়াকপালী, সেকালে কতই ছিল, তুমিও তো বাবা কিছু দেখেছিলে। আজ তোমরা ছাড়া আপনার বলতে আর কিছু নেই। তুমি বাবা আমার পেটের ছেলের মত তোমার বাপ মায়ের জন্যে যদি আমায় কাশী পাঠিয়ে দিতে পারো। আমি একটু শান্তিতে থাকি।

ভবদেব। তা না হয় দিলাম কিন্তু আজ একসঙ্গে আপনাদের সবার কি হ'ল আমি বুঝতে চেষ্টা করছি।

সিদ্ধেশ্বরী। তোমার মস্ত বড় নাম, দেশশুদ্ধ লোক সকাল বেলা উঠে আগে তোমার নাম করে, তোমার বাড়ীতে আজ দেশের রাজা, আমি বলতে এসেছিলাম রান্নাবান্না আজ হবে কি হবে না। কি অন্যায় কথা বলেছি বাবা।

অপর্ণা। তুমি কিছু অন্যায় বলনি মা, অন্যায় আমার—তুমি রান্নাঘরে যাও আমি এক্ষুণি গিয়ে ব্যবস্থা কচ্ছি। গাইগুলো দোওয়া হয়েছে মুক্ত ?

মুক্তকেশী। গাই দুয়েছি, কুটনো কুটেছি জল এনেছি, আমার কোন কাজ বাকি নেই।

ভবদেব। তাহলে তুমি এক কাজ কর মা—পাড়ায় কোথায় কি ঘোঁট হচ্ছে একবার খবরটা নিয়ে এস।

অপর্ণা। ও সত্যি যাবে। তুমি ঐ রকম করে বল ও আরো আস্কারা পায় ! মুক্ত তুই মাকে নিয়ে রান্নাঘরে যা। মা, রাগ করোনা। [মুক্তকেশী ও সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান।

বাবা, তুমি আজ এখানে আমার হাতের রান্না ভাত দুটি খাবে।

বৈরাগী। আমি তো গৃহস্থের বাড়ীতে কিছু খাইনে মা, তুমি আমায় দুটি চাল দাও। আমি শ্মশানে পাক করে খাব।

অপর্ণা। গঙ্গেশ, এখানে বসে থাক্ কোথাও যাসনি। আমি চাল নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

ভবদেব (বৈরাগীর প্রতি) তুমিই দেখছি নাটের গুরু। কি বলেছ এদের ?

বৈরাগী। আমি তো কথা বলিনি বাবা, আমি গান গাই।

ভবদেব। তোমার ও গান বড় সর্বনেশে গান বাপু! তুমি গেরস্থর বাড়ীতে এসে এসব গান গাও কেন ? সবাইকে দলে টানবে মনে করেছো নাকি।

বৈরাগী। মহামায়ার সংসার। তিনি নিজে খেলাঘর সাজিয়ে দিয়েছেন, আমার সাধ্য কি বাবা অবেলায় খেলা ভাঙি—

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। কি করবি গঙ্গেশ ওঁর সঙ্গে যাবি ?

গঙ্গেশ। আমি গেলে তুমি বাঁচ, তোমার মা বাঁচে, মামা বাঁচে, সবাই বাঁচে ? আমি যাবোনা।

অপর্ণা। তুইতো বলছিলি এখানে থাকবিনা, এখানে তোর ভাল লাগেনা।

গঙ্গেশ। বলেছি বলেছি না বলেছি না বলেছি আমি যাবনা।

অপর্ণা। বেশ তো না যাস্ না যাবি চাল কটা দিয়ে আয়।

গঙ্গেশ। না আমি চাল দেবনা কিছু দেবনা।

অপর্ণা। তোমায় দিতে হবেনা বাবা—আমিই দিয়ে আসছি।

গঙ্গেশ। যাও বাবাঠাকুর তুমি চলে যাও, এখানে আর এসনা।

[বৈরাগী ও পশ্চাৎ অপর্ণার হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

ভবদেব। হ্যাঁরে গজেশ, তোর এসব কি কাণ্ড বলতো? এসব ক্যাপামি না বদমায়েশি?

গজেশ। কোন সব?

ভবদেব। পড়াশুনো করিসনে, একটু আধটু দুষ্টুমী করিস এ বোঝা যায়—রাজার কাছে তুই কি বলে আমার যা খুসী তাই বললি। রাজা কি ভাবলে বল দেখি?

গজেশ। রাজা কিছু ভাবেনি ও আমায় ভালবাসে। তুমি কিছু মনে করোনা মামা—রাজাকে আর তোমাকে নিয়ে একটু খেলা করলাম।

ভবদেব। তোমার খেলার চোটে আমার যে প্রাণান্ত বাবা।

(অপর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

গজেশ। মামী শোন—

অপর্ণা। কি?

গজেশ। (জনান্তিকে) আমি বিয়ে করবো—তুমি আমার বিয়ে দাও।

অপর্ণা। (হাসিয়া) বেশ তো হবে।

গজেশ। রাজা কমলাকান্ত বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে—একটি ভাল মেয়ে আছে। মামাকে বলছিল, রাজার ইচ্ছে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়। মামা আমার নামে পাঁচ কথা লাগিয়ে ভাংচি দিচ্ছিল।

ভবদেব। (অপর্ণার প্রতি) আমার নামে কি বলছে গা—

গজেশ। ওঁর ইচ্ছে ভূতনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়—ভূতনাথের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় আমি কিন্তু অনর্থ কাণ্ড করবো, হয় আমার সঙ্গে বিয়ে দাও আর তা নয়তো মামা নিজে বিয়ে করতে চায় করুক।

ভবদেব। আরে গেল যা—হতভাগাটা বেজায় পাজি তো! বেরো আমার সুমুখ থেকে দূর হ'-দূর হ'।

গজেশ। মামীমা তুমি বোঝাপড়া কর বাপু। [প্রস্থান।

ভবদেব। কি রকম পাজি দেখছ একবার। আমি আগে ভাবতাম ওটা পাগল, এখন মনে হচ্ছে বদমাইশ।

অপর্ণা। তা তুমিই বা এত রাগ করছো কেন, তোমার বয়সে পণ্ডিতেরাও তো বিয়ে করে। ছেলেমানুষ ও তাই মনে করেছে।

ভবদেব। হাঁ। ছেলেমানুষ। আমি এই বয়সে আবার বিয়ে করতে পারি—একি ছেলেমানুষের কথা। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

অপর্ণা। তোমার রাগ দেখে একটু সন্দেহ হয়। যাক্ তুমি রাগ করোনা। তুমি যাও রাজার কাছে গিয়ে বস। তিনি একা আছেন।

ভবদেব। যাচ্ছি—কিন্তু তুমি গজেশকে আর প্রশ্রয় দিওনা। আমি এখন থেকে ওকে ভয়ানক শাসন করবো—তুমি বাধা দিওনা।

অপর্ণা। তোমার ভাগনে—তুমি শাসন করবে, আমি কথা কইতে যাবো কেন? পারো ভালই।

ভবদেব। এটা যেন রাগের কথা—রাগের কথা বলে মনে হচ্ছে। তুমি শুধু শুধু রাগ করছো কেন?

অপর্ণা। না রাগ করবো কেন? আমি কোন দুঃখে রাগ করবো, আমার গরজ।

ভবদেব। লোকে দুঃখেও রাগ করেনা গরজেও রাগ করেনা। তাছাড়া রাগের কারণ বাইরেও থাকেনা। যে রাগ করে তার অন্তঃপ্রকৃতি অনুসন্ধান করলে তবেই রাগের কারণ পাওয়া যায়, বাইরে থাকে রাগের উত্তেজক পদার্থ—বুঝেছ?

অপর্ণা। তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আর বিচার করোনা। তোমার বিচারের জ্বালায় দেখছি শেষ পর্যন্ত আমি পাগল হব, তুমি গজেশকে মার, কাট, শাসন কর, আদর যত্ন কর আমি একটি কথাও কইবো না। [প্রস্থান।

ভবদেব। আহা—এইটিই তো রাগের লক্ষণ—"রজোগুণ-সমুদ্ভব" কারণ বাইরে নয় কারণ তোমার প্রকৃতিতে।

(গজেশের পুনঃ প্রবেশ)

গজেশ। মামীমা, আমি এখন থেকে তোমায় মা বলে ডাকবো।

অপর্ণা। থাক্ আর তোমায় মায়া বাড়াতে হবে না।

গজেশ। না সত্যি মা বলে ডাকবো। মরা-মায়ের কথা আর ভাববো না বিশ্বাস না হয় এক্ষুণি ডাকছি, মা-মা-ওমা মা কি কানের মাথা খেয়েছ নাকি? উত্তর দাও।

অপর্ণা। কি বলবি বাপু বল।

গজেশ। আমার খিদে লেগেছে, ভাত দাও।

ভবদেব। এইবার রাগ কর, খুব জব্দ করেছে, ছোঁড়াটার মাথা আছে, (গজেশের প্রতি) দুষ্টবুদ্ধি ছেড়ে একটু পড়াশুনায় মন দাও বুঝলে?

গজেশ। না খিদের সময় আমার আর কিছুতে মন যায় না—

ভবদেব। থাক্ আজ আর কিছু বলছিনে, আজ বাড়ীতে একটা সম্ভ্রান্ত অতিথি এসেছেন, এরপর আমি তোমায় একবার দেখে নেব, তোমায় যদি শাসন করতে না পারি।

গজেশ। দিব্যি গেল না মামা, তুমি আমায় শাসন করতে পারবে না।

ভবদেব। আচ্ছা? সে আমি বুঝবো। [প্রস্থান।

গজেশ। (অপর্ণার হাত ধরিয়া) ওমা—চল দাঁড়িয়ে রইলে কেন? অপর্ণা অত্যন্ত গম্ভীর।

অপর্ণা। গজেশ তুই আমায় মা বলে ডাকিসনি—

গজেশ। তোমায় মা বলে ডাকবো না তো কাকে মা বলবো?

অপর্ণা। তা আমি কি জানি, আমি পরের ছেলের "মা" হতে পারবো না বাপু, আমার যদি তেমন বরাতই হবে—

গজেশ। ছেলে আবার পরের ছেলে হয় নাকি। আমি বলছি তুমি আমার "মা" আর তুমি বলছো তুই পরের ছেলে, বেশ যাহোক আমি পরের ছেলে নই আমি "মায়ের ছেলে" (সহসা ভাবাবেশ)—

গান

পরের ছেলে নই মা আমি
আমি যে মা মায়ের ছেলে
"মা" বলে এসে'ছ কাছে
পর বলে যাবে ফেলে।
দুখ্ পুর হয়ে'ছ বলে
মা নেবে না কোলে তুলে
এই যদি হয় মায়ের বিধান
যাও না আমায় পায়ে ঠেলে।
কাঁদবো আমি নিরবধি
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যদি
দেখি তোমার পাষাণ হৃদি
গলে কি না চোখের জলে। [ক্রমশঃ।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ দে জেরী)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা হলেও, একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যেই যে আমরা আটকা পড়েছি তা বুঝতে আর বাকী রইল না। চারিদিক দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে, গাছের ভাঙা ডালপালা নৌকার গায়ে এসে ধাক্কা লাগাচ্ছে। জলের মধ্যে ঝপঝাপ ঝটপট আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই দেখবার উপায় নেই। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত নিরুপায় এখন আমরা। চারিদিক অন্ধকারে ডুবে এসেছে, সামনে কিছুই দেখবার উপায় নেই। এখানেই এই কালরাত্রি এখন আমাদের কাটাতে হবে, তারপর রাত পোয়ালে যা হয় ভেবে-চিন্তে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

অল্প জলেই আমরা নোঙর ফেলে, নৌকার দুধারে দুটো কাঠের খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে মজবুত ক'রে নৌকাগুলিকে বাঁধলুম। সে রাত্রে অনেকই প্রায় নিরম্বু উপবাস দিল। খাবার ব্যবস্থায় যদিও ঘাটতি পড়েনি, তবুও মন ও শরীরের অবস্থা সকলেরই এমন যে, খাওয়ার প্রবৃত্তি কারুরই হ'ল না—এমন কি বুনো দাঁড়ি-মাঝিদেরও না।

এখানে রাত্রে নৌকায় আলো জ্বালার প্রশ্নে আমিই বাধা দিলুম। মিথ্যে আলো জ্বেলে আমাদের আগমনবার্ত্তা কোন জীবজন্তুকে না দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দলের বুনো সর্দার, গাইড প্রভৃতি সকলেই এতে আপত্তি তুলে ভয় দেখাল যে, এর ফলে রাতের অন্ধকারে বনের হিংস্র জীবজন্তুরা নিঃশব্দে এসে আক্রমণ করতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আলো জ্বেলে রাখাই স্থির হ'ল।

সারা রাতটাই প্রায় জেগে কাটল। জেগে জেগে দিনের মুখ দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলুম। ক্রমশঃ ভোর হয়ে এলো। ঘুম-জড়ানো চোখে, বজরার ভেতর থেকে, পাটাতনের উপর বেরিয়ে এলুম বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্যে। সেই ভয়াবহ রাত্রির উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পর প্রভাতের আলো মনের উপর প্রচ্ছন্ন এক স্বস্তির অনুভূতি জাগাল। এলিসকেও আমি ডেকে নিয়ে এলুম বাইরে। অন্যান্য সকলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ছতরির মধ্যে পড়ে আছে তখনও। বিশেষ অপরাধও নেই তাদের, কারণ সারাদিনই অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তারা।

বাইরে দাঁড়িয়ে এলিস ও আমি দু'জনেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলুম। কি অদ্ভুত এই দৃশ্য। যেমন ভীতিপ্রদ, তেমনি নয়নানন্দকর। পৃথিবীতে প্রকৃতির এই রহস্যলীলা বোঝা ভার। একদিকে সে যেমন উদার, মহান্, আনন্দদায়ক, অপরদিকে তেমনি হিংস্র, ক্রূর ও বীভৎস। কি উদ্ভিজ্জগতে, কি জীবজগতে কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। কোথাও লতাগুল্ম কোন দীর্ঘায়তন গাছকে আশ্রয় করে স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠেছে, আবার কোথাও বা সেই লতাগুল্ম দীর্ঘায়তন গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে তাকে এমনভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে যে, তার অস্তিত্বই লোপ পাবার যোগাড়। নানা আকারের বিচিত্র সব গাছপালা, বিচিত্র তাদের ফল, ফুল পাতা বীজ নিয়ে এখানে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে। আর তাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে বহুরূপী জীবজন্তুর দল।

এলিস বললে, 'বন্যা হয়ে ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে ; তা না হলে এ দৃশ্য তো আমরা দেখতে পেতুম না।'

আগের সে ভীতি এখন আর এলিসের মনকে মুষড়ে ফেলে না দেখে, মনে মনে আমি উৎসাহিত বোধ করলুম। তবে হ্যাঁ, দৃশ্য বটে! চারিদিকে জলে জলময় হলেও, জলের গভীরতা এখানে যে বেশী নয়, তা আমাদের নৌকাগুলি আটকে যাওয়া থেকেই বোঝা গেল। তাছাড়া অনতিদূরে কিছুটা চরের মত উঁচু একটা জায়গাও দেখা গেল। প্লাবনের বেগে ও ঝড়জলের দাপটে সেই উঁচু জায়গাটায় এসে চারিদিকে বন্য জীবজন্তুরা আশ্রয় নিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে আঁচড়া-আঁচড়ি ও কামড়াকামড়িও করছে অনেকে।

দূরবীণটা এলিসের হাতে দিয়ে আমি বললুম, 'দেখ একবার' যারা দূরে অস্পষ্ট ছিল, তারা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় এলিস চমকে উঠল। মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরুল তার. 'কি অদ্ভুত'!

অদ্ভুতই বটে! এক জায়গায় ঝড়ের বেগে ও জলের স্রোতে ভেসে এসে একটা কৃষ্ণকায় জাগুয়ার এমন ভাবে একটা গাছের ডালের মধ্যে আটকে গেছে যে, বাছাধনের আর নড়বার-চড়বার উপায় নেই। আর এক জায়গায় আর একটা জাগুয়ারকে হাজার হাজার বৃহদাকার কাঠ-পিঁপড়ে এসে এমন ভাবে আক্রমণ করেছে যে, অতবড় হিংস্র ধূর্ত্ত জন্তুটিকে একেবারে কাহিল ক'রে ফেলেছে—মাটির উপর লুটোপুটি খাচ্ছে সে। কিন্তু তার পেছনেই দু'-তিনটে বন্য পিঁপড়েদের যম এ্যান্ট-ইটার এসে দাঁড়িয়েছে তাদের লম্বা লম্বা শুঁড়োল মুখ দুলিয়ে।

এমন ভাবে জঙ্গলে এ্যান্ট-ইটারদের এর আগে আমি দেখিনি। এলিস তাদের দেখেই উত্তেজিত হয়ে বললে, 'এবার বোধ হয় জাগুয়ারটা বেঁচে যাবে, ওরা নিশ্চয়ই পিঁপড়েদের নিঃশেষ করবে এবার।'

কিন্তু কে-কা'কে নিঃশেষ করে। হঠাৎ আমাদের চোখের সামনেই চকিতে একটা গাছের ঝোপ থেকে নধর একটা লাল পুমা বেরিয়ে এসে, হুড়মুড় করে একটা এ্যান্ট-ইটারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। বাকী অন্য দুটো প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারলে সে চম্পট

পুমা ও এ্যান্ট-ইটারের মধ্যে বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তি চললেও, পুমার বিক্রমের কাছে পিঁপড়ে-খেকোর বেশীক্ষণ যোঝা মোটেই সম্ভব হ'ল না। কিন্তু ঠিক এই সময় অভাবনীয়ভাবে পুমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। একেই বলে ভগবানের মার। ঝটাপটির মধ্যে দু'জনে তারা যখন গড়াতে গড়াতে জলের ধারে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির কাছে এসে ঠেকেছে, তখন হঠাৎ গাছের উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড মোটা ডাল যেন এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। প্রথমে ব্যাপারটা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঘটনাটা আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। যেটাকে একটু আগেও আমরা গাছের ডাল মনে করেছিলুম, সেটা যে দীর্ঘাকার একটা বোয়া সাপ তা বুঝতে আমাদের আর বাকী রইল না। গাছের একটা নীচু ডালে এতক্ষণ ঝুলছিল সাপটা, পুমাটা যেই তার কাছে এসেছে, অমনি তাকে আক্রমণ করলে মারাত্মক ভাবে। এবং এমন মারাত্মক ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে বেড় দিয়ে একেবারে পিষ্ট করে ফেলল যে, পুমা বাবাজীর বলবিক্রম যেন চক্ষের নিমেষে উবে গেল! দুর্ব্বল এ্যান্ট-ইটারের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল যেন এই বোয়া সাপ, এবং বেচারা পিঁপড়ে-খেকো ক্ষতবিক্ষত দেহে সেইখানেই প'ড়ে কোঁপাতে লাগল।

'জোর যার মুলুক তার' যুগ বর্ত্তমান মানুষের মধ্যে থেকেই যেখানে এখনো যায়নি, সেখানে বন্য জন্তুদের কথা না তোলাই ভাল। সেই আদিম প্রবৃত্তির চাক্ষুষ ছবি চোখ ভরে আমরা দেখছিলুম আর ছবি তুলে নিচ্ছিলুম আমাদের ফিল্ম ক্যামেরায়।

এই সময় আশ-পাশ থেকে একটু ফিসফাস শব্দ কানে আসতেই চেয়ে দেখি, আমাদের আশ-পাশের নৌকাতে বুনোরা তখন সবাই প্রায় উঠে বসেছে। আমি ও এলিস তাদের দিকে তাকাতেই, তারা সকলে এক সঙ্গে মাথা নত ক'রে প্রাতঃপ্রণাম জানালে। আমাদের প্রধান গাইড 'টাইগার' শুধু ভাঙা ইংরেজীতে বললে, 'গুড্ মোরনইং'! এই কথাটি সে বরাবরই এইভাবে উচ্চারণ করত। এলিস বহুবার তাকে শুদ্ধ উচ্চারণ করাবার জন্য চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয়নি।

এখন যেমন করেই হোক পরিত্রাণের একটা উপায় আমাদের বার করতেই হবে। তাছাড়া কাল রাত থেকে কারুর পেটেই কিছু পড়েনি। খাবার পেলে এই বনের মানুষরা যেমন উৎসাহিত হয়, তেমনি না পেলে একেবারে যেন মুষড়ে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এখান থেকে এখন কোনদিকে কোথায় যাব আমরা। আসল নদী-পথ ছেড়েই যে আমরা এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি টানের বেগে, এবং এটা যে একটা উঁচু বন-দ্বীপ তা দিনের আলোয় স্পষ্টই বোঝা গেল। অনতি দূরেই দ্বীপের যে উঁচু জায়গাটা দেখা যাচ্ছিল, সেইখানেই উপস্থিত আমাদের আশ্রয় নিতে হবে এবং তারপর আবার আমরা গন্তব্যপথের উদ্দেশে যাত্রা করব। কিন্তু নৌকা সমেত ওখানে পৌঁছান খুবই মুস্কিল। এদিকের অল্প জল ও ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় বলে, আমরা কয়েকজন হেঁটে জল ভেঙেই ওখানে যাব স্থির করলুম; বাকী লোকেরা যে দিকে জল বেশী সেই দিক দিয়ে নৌকাগুলি নিয়ে যাবে স্থির হ'ল। বন্য হিংস্র জন্তুদের ওখান থেকে সাময়িকভাবে তাড়াতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল। তবে এটাও আমরা জানতুম যে, তা যদি আমরা না পারি, তাহলে উপস্থিত ওদের পড়শী হয়েই আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

কোথাও হাঁটু-জল, কোথাও এক-বুক, আবার কোথাও বা গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে, সামান্য জিনিসপত্র ও বিভলবার দুটো হাতে নিয়ে আমরা জলে নামলুম। সঙ্গে তিন-চারজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী মাল-পত্রগুলি মাথায় ও পিঠে বেঁধে নিলে। লাঠি দিয়ে সামনের জল মাপতে মাপতে 'মরণ-দ্বীপ'-এ এসে উঠলুম আমরা। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় ঘণ্টাখানেকেরও বেশী সময় লাগল আমাদের। অপর দিকে, অপেক্ষাকৃত বেশী জলের উপর দিয়ে নৌকা দু'খানিও এসে পৌঁছে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে।

খানিকটা বদ্বীপের মত দেখতে এই জায়গাটা। এক পাশে নদী তার গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে খরস্রোতে। গত দিনের বন্যার তোড় অনেকটা কমে এলেও, জলের টান এখনও বেশ প্রবল। কালা ও ইণ্ডিয়ানরা সকলেই নৌকা দু'খানাকে তীরে বেঁধে প্রয়োজনীয় মালপত্র ডাঙায় নামাতে লাগল। তাঁবু খাটাবার জন্যে যে সব জিনিসপত্রের প্রয়োজন, সেগুলি সবার আগে তারা খুলে ফেললে। সামান্য কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে এলিসের ও আমার তাঁবু তাড়াতাড়ি খাটিয়ে দিল তারা। আমাদের তাঁবুর পাশেই গাইডদের তাঁবু পড়ল এবং তারই একটু দূরে রইল অন্যান্য ইণ্ডিয়ান ও কালারা।

ইণ্ডিয়ান ও কালারা সব সময়েই দু'দলে আলাদা আলাদা থাকত। যদিও সকল সময়ে এক সঙ্গেই তারা কাজ করত, তবুও এদের মধ্যে যেন একটা রেষারেষি ও ব্যবধানের ভাব ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এদের কারুর প্রতিই আমাদের পক্ষপাতিত্বের কোন কারণ ছিল না। কারণ, এই অভিযানে এরা সকলেই আমাদের প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। এদেশের এই পথে সাধারণতঃ এই দুই সম্প্রদায়েরই লোক দেখা যায় সব চেয়ে বেশী। তাছাড়া এই সব ব্যাপারে এক জাতের লোক থাকলে পাছে তারা কোন কারণে হঠাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে বিপদে ফেলে, সেজন্য এই দু' সম্প্রদায়ের লোকই কিছু কিছু নেওয়া আমি উচিত মনে করেছিলুম। এটাকে খানিকটা রাজনীতির চাল হিসাবেও ধরা যায়।

কাফির ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে নিগ্রো জাতীয় কালারাই ছিল দলে ভারী। কিন্তু কালাদের চেয়ে কাজের লোক ও বুদ্ধিমান ছিল এই ইণ্ডিয়ানরা। দোভাষী ও গাইড হিসাবে যে চার জন লোক নির্ব্বাচিত হয়েছিল, তাদের দু'জন ছিল ইণ্ডিয়ান এবং বাকী দু'জন ছিল কালা নিগ্রো। এরা চারজনই অল্পবয়সী এবং চেহারার দিক থেকে চারজনই জোঁয়ান। ভাঙা-ভাঙা কিছু ইংরেজীও এরা বলতে পারে। মোটা টাকা দেবার অঙ্গীকারে অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক হিসাবেই আমি এদের দলে নিয়েছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে এখানে আর এক কাণ্ড ঘটল। এই নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও বিপদের উপর সে আর এক বিপদ! সকল রকম বিপদের জন্যেই যদিও আমি প্রস্তুত ছিলুম, তবু এই ধরণের ঘটনা আমাদের দু'জনকেই ভাবিয়ে তুললো।

সকাল সকাল ডিনার সেরে, সে রাত্রে আমরা বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নেব বলে সন্ধ্যার দিকেই শুয়ে পড়লুম। শয্যা নেবার পূর্ব্বে স্থির করে দেওয়া হ'ল যে, কালারা আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবে, আর

আমাদের তাঁবু পালা ক'রে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবে কারিব ইণ্ডিয়ানরা। কিন্তু শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ইণ্ডিয়ানদের তাঁবু থেকে গোলমালের আওয়াজ আমাদের কানে এল। সাধারণতঃ তাদের যে ধরণের গোলমাল ও ঝগড়াঝাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এ গোলমাল ঠিক সে ধরণের নয় ব'লে এলিস একটু চিন্তিত হয়ে বললে, 'দেখ, ব্যাপারটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না, তুমি উঠে একটু খোঁজ নাও।' সব সময়েই ইণ্ডিয়ানদের এই গোলমেলে ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ত—ওদের ব্যবহারে কেমন বিচলিত হয়ে পড়ত সে। আমি তাকে বললাম, 'বোধ হয় আজ রাত্রে কালাদের বদলে ওদের রাত জাগতে দেওয়া হয়েছে বলে ওরা চটেছে মনে মনে —এতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

এক হিসাবে ভয় পাবার অনেক কিছুই আছে—কারণ এই এক দল নরখাদকের বংশধরদের হাতে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী। ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ওরা আমাদের সাবড়ে দিতে পারে—এতগুলি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক এক সঙ্গে শত্রুতা করব ইচ্ছে করলে কি-ই বা করতে পারি আমরা ?

যাই হোক, সে কথা ভেবে ভেবে পড়বার ছেলে আমি নই। তা যদি হ'ত তাহ'লে আর এলিসকে নিয়ে এই ভয়াবহ রহস্যপূর্ণ অজানা পথে পা বাড়াতাম না। সামান্যক্ষণের মধ্যে এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ওদের চাপা গোলমালটা যেন হঠাৎ হৈচৈ-এ পরিণত হ'ল। ব্যাপারটা আর অবহেলা করা উচিত নয় ভেবে আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম এবং ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর দিকে এগুলুম, লম্বা টর্চ্চ ও রিভলবারটা হাতে নিয়ে। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে রিভলবারের পরিবর্ত্তে ওষুধের বাক্সটা আনলেই ভাল ছিল মনে হ'ল।

একটি জোয়ান ছেলেকে ঘিরে ওরা সবাই হা-হুতাশ করছে আর চেঁচাচ্ছে পরিত্রাহি। ছেলেটাও গোঙাচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। ভীষণ জঙ্গুলে-জ্বর হয়েছে তার, গা পুড়ে যাচ্ছে উত্তাপে। এমন যন্ত্রণা দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়—তাছাড়া সে আমাদেরই দলের বিশেষ প্রয়োজনীয় একজন। এদের একজনকে হারানো মানে এখন আমাদের কাছে অনেক কিছু। আর সময় নষ্ট না করে, তক্ষুণি আমি তাঁবু থেকে ওষুধের বাক্সটা ওদেরই একজনকে দিয়ে আনালুম এবং ওর যন্ত্রণা কমাবার জন্যে একটা ইন্‌জেকসন দেব স্থির করলুম। কিন্তু ইন্‌জেক্‌সনের ছুঁচ বার করতেই তারা সকলে একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠল এবং ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি, ইড়িং-বিড়িং করে নিজেদের ভাষায়, নিজেদের মধ্যে গলা ছেড়ে কথা বলাবলি করতে লাগল। আমি দোভাষীর সাহায্যে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, এই ইন্‌জেক্‌সনে তার যন্ত্রণার উপশম হবে, কিন্তু সে কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এই ছেলেটিকেই কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে ও বড়ি খাইয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা ভাল করে দিয়েছিলুম। কিন্তু ওদের সেই থেকেই ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ইন্‌জেক্‌সনের ফলেই তার ক্ষতি হয়েছে এবং বর্ত্তমান শারীরিক অবনতির কারণও এই ইন্‌জেক্‌সন।

এটা ওদের বদ্ধ-সংস্কার ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তা ভেবে আমি কারু কথায় কান না দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে, ওদের সামনেই ছুঁচ ফুটিয়ে ওকে ইনজেক্‌সন দিয়ে দিলুম। ছুঁচ ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এক সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল। আমার সান্ত্বনার কথায় কান দেবার মত তখন ওদের কারুরই যদিও উৎসাহ ছিল না, তবুও আমি এই বলে তাঁবুতে ফিরে এলুম যে, আমাকে যেন ঘণ্টাখানেক পরেই আবার খবর দেওয়া হয় ওর অবস্থা সম্বন্ধে।

ঘণ্টাখানেক কেটেছে কি কাটেনি, আমি তাঁবুতে এসে এলিসকে সমস্ত ঘটনাটা বলা সবে শেষ করেছি, এমন সময় বাইরের বিকট চীৎকার, হৈ-হল্লা ও কান্নাকাটিতে আমরা দু'জনেই ভীত সচকিত হয়ে উঠলুম।

এলিস বললে, 'ছেলেটা বোধ হয় মারা গেল।'

'বোধ হয় তাই হবে।' উত্তরে শুধু এই ক'টি কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে আর কিছুই বেরুল না। [ক্রমশঃ।

নাইটিঙ্গেলের জন্মকথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নাইটিঙ্গেল পাখীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তবে তার সুমধুর কণ্ঠস্বর হয়ত তোমরা অনেকেই শোনোনি। আর শুনবেই বা কি করে বলো—সে তো আর আমাদের এই বাংলা দেশের পাখী নয়? তবে না শুনলেও নাইটিঙ্গেলের গান যে ভারি মধুর তা তোমরা ইংরেজী কবিতা পড়ে নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছ। আজ শোনো সেই নাইটিঙ্গেল পাখীর জন্মকথা।

অনেক অনেক বছর আগে, গ্রীস দেশের এথেন্স রাজ্যে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর ছিল দুই মেয়ে। বড়টির নাম প্রোকনে আর ছোটটির নাম ফিলোমেলা। দু'জনেই তারা অপূর্ব্ব রূপসী। সোনার বরণ গায়ের রঙ। পদ্মের মত মুখে কাজল-কালো চোখ। সে চোখ দেখলে মনে হয় যেন ফুটন্ত পদ্মে এক জোড়া ভ্রমর বসেছে। এদের মধ্যে আবার ছোট মেয়ে ফিলোমেলাকেই দেখতে বেশী সুন্দর।

দিন যায়। দুই বোন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। রাজা তাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বড় বোন প্রোকনের বিয়ে হল থ্রেস রাজ্যের রাজা টেরিয়াসের সঙ্গে। কিছুদিন বাদে তাদের একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হল। কিন্তু টেরিয়াসের মনে সুখ নেই। সে ফিলোমেলাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তা হবার নয়। দিদি বেঁচে থাকতে জামাইবাবুকে বিয়ে করতে ফিলোমেলা চায় না।

তাই টেরিয়াস বন্দী করে প্রোকনেকে লুকিয়ে রাখল। সবাইকে জানিয়ে দিল যে প্রোকনে মারা গেছে। এইবার সে ফিলোমেলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। ফিলোমেলা তার সব চালাকি ধরে ফেলল। ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করল টেরিয়াসের প্রস্তাব। কিন্তু টেরিয়াসও কম শয়তান নয়। সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেই। তাই সে ফিলোমেলাকে বন্দী করল আর যাতে না সে কা'কেও তার কুকীর্ত্তির কথা জানাতে পারে, তার জন্য তার জিবটা দিল কেটে। ফিলোমেলা বোবা হয়ে গেল।

ফিলোমেলা কিন্তু সমস্ত কথা একটা কাগজে লিখে গোপনে পাঠিয়ে দিল তার বোনের কাছে। দুই বোন গোপনে মিলিত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে তারা যাবে কোথায়? টেরিয়াস সমস্ত কথা জেনে ফেলল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে সে ছুটল তাদের পেছনে। দুরন্ত ক্রোধে সে

তাড়া করল দুই বোনকে, হাতে তার শাণিত কুঠার। অসহায়া দুই নারী তখন দেবতা জিউসের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগল, হে দেবতা, তুমি আমাদের রক্ষা কর। দেবতা তাদের কাতর প্রার্থনা শুনলেন। দেবতার বরে তারা দু'টি পাখী হয়ে উড়ে গেল। টেরিয়াস আর তাদের নাগাল পেল না।

বড় বোন প্রোকনে হল একটি সোয়ালো আর ছোট ফিলোমেলা নাইটিঙ্গেল। সেই থেকেই পৃথিবীতে নাইটিঙ্গেলের উৎপত্তি।

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই

বিলয়মৃণালে পদ্ম

হান্স আণ্ডেরসেনের মা-বাবা এত গরিব ছিলেন যে যখন তাঁরা সংসার করতে শুরু করেন, তখন অধিকাংশ আসবাবপত্রই তাঁদের নিজের হাতে বানিয়ে নিতে হয়েছিলো। বিছানা পাতা হ'তো যে তক্তপোশে, তা আসলে ছিলো এক কাউন্টের কফিন রাখার কাঠামো। সেই জন্যে ঐ তক্তপোশটি তাঁরা বেশ একটু ভয় মিশ্রিত কৌতূহলেই অবলোকন করতেন। কালো কাপড়ের কিছু-কিছু টুকরো-টাকরা তখনো তাতে আটকে ছিলো—কিন্তু আঠারোশো পাঁচ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে এই তক্তপোশের উপরেই শবদেহের বদলে শুয়ে-শুয়ে কাঁদছিলো একটি সদ্যোজাত শিশু—আণ্ডেরসেনদের ছেলে, নাম হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেন। বড়ো হবার পরও হান্স নামটি পছন্দ হয়নি ছেলেটির, কোনোকালেই না। তার নিজের কাছে তার নাম ছিলো শুধুই ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেন, কিন্তু বিদেশে সে পরিচিত হান্স ব'লে এবং ইংরেজি দুনিয়ায় সে শুধুই আণ্ডেরসেন, বা হান্স আণ্ডেরসেন।

বাবামশাইও তখন দস্তুরমতো বালকই, ছেলের জন্মের সময় বয়েস ছিলো মাত্র বাইশ। তাঁর পেশা ছিলো জুতো সেলাই, কিন্তু বড়ো বেশি স্পর্শভীরু ছিলেন তিনি। তাছাড়া জাগরস্বপ্নের প্রতিও ছিলো অপরিসীম টান, তাই জীবনে কোনকালেই বিশেষ উন্নতি করতে পারেন নি। জুতো সেলাই ব্যাপারটাও তেমন জুতসই ক'রে করতে পারতেন ব'লে কিংবদন্তী বলে না। একবার এক জমিদার গিন্নির জন্য নমুনা হিসেবে একজোড়া জুতো তাঁকে বানাতে হয়েছিল। আশা করেছিলেন, এর ফলে জমিদার-বাড়ির জুতো সেলাইয়ের কাজটা পেয়ে যাবেন, আর সেই কাজ যদি জুটে যায় তো আর পায় কে—থাকার জন্য ছোটো এক বাসা বানানো যাবে তাহ'লে, আর থাকবে দুটি-একটি গোরু, কিছু মুরগি, আর একটি বাগান।

রেশমি কাপড় পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে সেই জন্য, কথা ছিলো নিজে চামড়া জোগাবেন। সারা বাড়ির সব মনোযোগ, আশা ভরসা, কথাবার্তা সব তখন চলতো ঐ জুতোজোড়াকে নিয়ে: হান্স ক্রিশ্চিয়ান প্রার্থনা করতো, 'বাবা যেন ভালো ক'রে জুতো বানাতে পারে, ঈশ্বর', এবং অবশেষে একদিন যখন রুমালে বেঁধে জুতোজোড়া জমিদার-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হ'লো—বাচ্চা হান্স উদগ্রীব হ'য়ে বাইরে দাঁড়িয়ে শুভসংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু বাবামশাই যখন ফিরে এলেন হান্সের চোখে পড়লো তাঁর রক্তহীন ফ্যাকাশে রোগা মুখটা রাগে তেতে উঠেছে জমিদার-গিন্নি নাকি পায়েই দেননি জুতো, বরং তাঁর দামি রেশমি কাপড় নষ্ট করার জন্য নাকি ধমকেছেন। 'আহা, আনকোরা সিল্কের কাপড় ছিলো আমার!' শুনে হান্সের বাবা ছুরি বার করেছিলেন পকেট থেকে, টুকরো-টুকরো করেছিলেন নতুন জুতোজোড়া, বলেছিলেন, 'তবে আমার আনকোরা চামড়াও নষ্ট হোক!'

জুতো-সেলাইয়ের ব্যবসাটা আর যাকেই মানাক, তাঁকে যে মানায় না—এটা বোধহয় বাবামশাই বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হান্স ক্রিষ্টিয়ান তাঁর চোখে জল দেখেছিলো। গ্রামার স্কুল থেকে একটি বাচ্চা ছেলে এসেছিলো জুতোর মাপ দিতে। ভারি চৌকশ ছেলে—মস্ত দেমাক তার নিজের লেখাপড়ার জন্য—গর্ব ক'রে সারাক্ষণ সে তার বইপত্রের কথা বলেছিলো, আর তখনি, শুনতে শুনতে, জল এসে গিয়েছিলো বাবামশাইয়ের চোখে। হান্স দেখেছিলো বাবামশাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন, ঠোঁট কাঁপছে তাঁর থরোথরো। 'অমনতর লেখাপড়া শেখাই আমার উচিত ছিলো'—ফিশফিশ ক'রে বলেছিলেন বাবা।

এই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসলে এসেছিলো জন্মসূত্রে, হান্সের ঠাকুমার কাছ থেকে। সুঠাম শরীর ছিলো বুড়ি ঠাকুমার, চোখ ছিলো বিশাল সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল, ধরণধারণ এত কেতাদুরস্ত ছিলো যে দারিদ্র্য আর কর্কশ প্রতিবেশের সঙ্গে তা মোটেই খাপ খেতো না। এমন নয় যে তা তিনি বুঝতে পারতেন না, বরং ঠিক তার উল্টো; খুব ভালো ক'রেই সব বুঝতেন বলে অসংখ্য সব গল্প বলতেন—তাঁর বলার কায়দা ছিলো আশ্চর্যরকম—যাদের প্রতিপাদ্য থাকতো এই যে তিনি মোটেই ক্যাল্না নন, জন্ম তাঁর রীতিমতো অভিজাত বংশে। এগুলি যে নিছকই গল্পকথা, হান্স তা বড়ো হ'য়ে বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু প্রথম থেকেই এটা অনুভব করতে পেরেছিলো যে পরিবারের উপরে কিসের যেন কুটিল কালোছায়া ঝুলছে। তার ঠাকুরদা ছিলেন বাতুল, নিষ্ঠুর ছিলেন না ব'লে বেঁধে রাখা হ'তো না, তাই অনায়াসেই রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। তার ফলে সকলেই তাঁকে চিনতো জানতো, এবং তাঁর পাগল চেহারাটা কারোরই অজানা ছিলো না।

বোধ করি এই কারণেই হান্সের বাবা কারো সঙ্গে বন্ধুতা করেননি। হান্সেরও কোনো বন্ধু ছিলো না। কেবল তার মা আনে মারিই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতেন। এ কিন্তু পাড়া-পড়শিদের মতো মোটেই কোনো দেমাক ছিলো না তাঁর। অল্পবয়েসী বাবামশাই ছিলেন নেহাৎই নির্বিকার আর উদাসীন। সব ভালোবাসা আর অবসর তিনি উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর বাচ্চা ছেলেকে। রকম-সকম দেখে কখনো-সখনো তো এমন মনে হ'তো যে দুজনের মধ্যে বয়েসের কোনো পার্থক্যই নেই। হোলবের্গের রচনাবলী এবং 'আরব্য রজনী' থেকে হান্সকে গল্প, কবিতা, নাট্যাংশ প'ড়ে শোনাতেন বাবা, নিজের হাতে বানিয়ে দিতেন হরেক রকম খেলনা আর পুতুল-নাচানো থিয়েটার। ছোটোদের খুশি করার, মজা দেবার, তাদের জন্য সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাবার ক্ষমতা ছিলো পারিবারিক

বৈশিষ্ট্য! পাদাল ঠাকুর্দা'টি মজার-মজার কাঠের খেলনা বানিয়ে পথে ঘাটে ছোটোদের বিলিয়ে দিতেন। যার সঙ্গে দেখা হ'তো তাকেই খেলনা উপহার দিতেন তিনি—তাকে চেনেন, নাই চেনেন। হান্সও বড়ো হ'য়ে—যখন তাকে সবাই বুড়ো মানুষ বলতো—পুতুল-নাচানো থিয়েটার বানাতেন, কাগজ কেটে-কেটে তৈরি করতেন ফুল লতা পাতা, ডানাওয়ালা পরী, লালপাখাওয়ালা দেবদূত, ব্যালেরিনা, ছোটোখাটো কুঁজোমানুষ, মেলে-ধরা ছাতা, আর মেয়েদের শেমিজের লেস-এর মতো সাদা রাজহাঁস।

গ্রীষ্মকালের প্রতিটি রোববারে হান্সের বাবা তাকে বনের ভিতরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। গিয়ে হয়তো শুয়ে পড়তেন ঝিলের ধারে ফাঁকা জায়গায় মাটির উপর। ঝিমুতে-ঝিমুতে স্বপ্ন দেখতেন, আর ছোট্ট হান্স একা-একা তাঁর আশেপাশে খেলা করতো। বছরে একবার মে মাসে মা-মণিও সঙ্গে যেতেন—এইটেই ছিলো বছরের মধ্যে তাঁর একমাত্র প্রমোদ-ভ্রমণ। সে-দিন তিনি প'রে নিতেন তাঁর একমাত্র ভালো পোশাক একটা সাটিনের জামা; কেবল কোনো সামাজিক উৎসবে যেতে হ'লেই এটা তিনি পরতেন, আর নয়তো সারা বছরই তা সযত্নে তোলা থাকতো। সঙ্গে নিতেন ভিতরে বেশি পুর দেওয়া স্যাণ্ডউইচ, আর একটা পাত্রে ক'রে বিয়ার। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরার সময় হ'লে ঘর সাজাবার জন্য ঝিলের ধার থেকে কুড়িয়ে আনতেন রূপোলি ঝিনুক।

ঘর অবশ্য ছিলো মাত্র একটি, আর একটি ছোটো রান্নাঘর—এখন সেই ছোটো ঘরবাড়ি দেখা যাবে মুঙ্কেমোলেস্ট্রায়েড-এ—কিন্তু সেই ছোটো বাসাই নিরাপদ আর স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলেছিলেন মা-মণি—ভ'রে তুলেছিলেন মায়া মমতা ভালোবাসা দিয়ে। সেই ভদ্রমহিলাটি জীবনের কাছ থেকে কিছুই প্রায় পাননি, কেবল আজীবন তাঁকে দিয়েই যেতে হয়েছে; কিন্তু এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে যে তার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন; বারে-বারে রূপকথা লিখতে গিয়ে হান্স আণ্ডেরসেন ছেলেবেলার সেই নানারঙের দিনগুলিতে ফিরে যেতো।

'আপনকথা জীবনকথা'-য় হান্স লিখেছিলো: 'আমাদের একমাত্র ছোট্ট ঘরটার সমস্ত জায়গাই প্রায় ভরাট থাকতো জুতো-সেলাইয়ের বেঞ্চি আর সাজসরঞ্জামে। তা ছাড়া ছিলো বিছানা, একটা তক্তপোশ, আর আমার শোবার জন্য ক্যাম্পখাট। চার দেওয়ালেই টাঙানো থাকতো ছবি। বাবামশাইয়ের কাজ করার বেঞ্চির উপরে একটা কাবার্ডে থাকতো বইপত্র আর স্বরলিপির খাতা। ছোট্ট রান্নাঘরে ছিলো একসারি তামার থালাবাসন—আর সেই ছোটো রান্নাঘরটির অল্প একটু ফাঁকা জায়গাই আমার কাছে অনেকখানি মনে হ'তো,—ঐটুকু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে যখন বসতুম, নিজেকে তখন মনে হ'তো মস্ত বড়োলোক ব'লে। দরজার গায়ে কয়েকটা ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা ছিলো, আর তা-ই ছিলো আমার আর্ট-গ্যালারি।'

ঐ ল্যাণ্ডস্কেপগুলির কথা আছে 'বুড়ো জাদুকর উম্রি-উম্রিলি-উম্রিক্কি' গল্পে; উম্রি-উম্রিলি-উম্রিক্কি ছোটোদের চোখে স্বপ্ন মাখিয়ে দিতো। পরীস্থানের কাজল মাখিয়ে দিতো চোখের পাতায়, আর তারপর নিঝুম ঘুমের ভিতরে পাল-তোলা নৌকোর মতো স্বপ্নেরা ভেসে আসতো।

'বুড়ো জাদুকর উম্রি-উম্রিলি-উম্রিক্কি তার সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করলে ছবিকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে রঙে-রেখায় আঁকা পাখিরা সজীব হ'য়ে গান গাইতে শুরু ক'রে দিলে। কেঁপে উঠলো গাছের ডালপালা থিরথির, মেঘেরা চলাফেরা শুরু করলে এলোমেলো; তুমি একটু ভালো ক'রে তাকালেই দেখতে পাবে দূরপ্রান্তরে দুলে উঠছে মেঘের ছায়াশীতল ছায়া।'

'বুড়ো জাদুকর তুলে নিলে হিয়ালমারকে, কোলে ক'রে সোজা তাকে নিয়ে এলো ছবির কাঠামোর ভিতরে। হিয়ালমার তার পা রাখলে ছবির মধ্যে, লম্বা রোগা হাওয়ায় দোলা ঘাসবনে। সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, ডালপালার চৌকো গোল ফাঁকফোক দিয়ে সোনালি রোদ ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে মাথায়। তারপরেই সে দৌড়ে চ'লে গেলো নদীর ধারে, উঠলো গিয়ে ছোট্ট নৌকোটায়, যা এতক্ষণ তীরে লাগানো ছিলো। নৌকোর রঙ লাল আর কালায় ডোরাকাটা, আর রূপোলি আভার মতো জ্বলজ্বল করছে তার পালগুলি'···

'আহা, সত্যি, কী যে মজা লাগে অমন করে পাল তুলে চলতে। কখনো বনজঙ্গল: ঘন, গভীর আর অন্ধকার। আবার কখনো আচমকা রোদমাখানো অপরূপ ফুলবাগান, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে টলটলে মর্মর পাথরের মস্ত মস্ত কেল্লা, অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে রাজকন্যারা—সেই রাজকন্যারা আর কেউ নয়—সেই সব ছোটো মেয়ে, যাদের হিয়ালমার ভালো করেই চেনে এবং রোজ যাদের সঙ্গে সে পাড়ায় খেলাধুলো করে। নৌকোর মধ্যে হিয়ালমারকে দেখে লাজুক হেসে তারা তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত···'

নিজের ছোটো ক্যাম্পখাটে নয়, মা বাবার বড়ো তক্তপোশটায় শুতে ভালোবাসতো ছোট্ট হান্স। মা বাবার শুতে দেরি হ'তো বলে তাঁরাও তাকে মর্জিমাফিক তাঁদের বিছানাতে শুতে দিতেন। 'ফিন'-এর কাঠের শয্যা হ'লো আসলে দেয়ালের গায়ে লাগানো চারটে কাঠের খুঁটি, আর তার উপরে বিছানা চাদর পাতার জন্য থাকে দিনেমার 'ডুনে' (Dyne), শাদা লিনেনের ঢাকনি দেয়া পালকের জাজিম, যা একদিকে যেমন আরামের, তেমনি অর্থকরী, কেননা তার ওয়াড় হতো একই সঙ্গে সুজনি আর গায়ের চাদর। বাবামশাই যে বেঞ্চিটায় বসে কাজকর্ম করতেন, তার উপরে ছিলো এক কাবার্ড, গোটা দ্বীপের মধ্যে সেটাই বোধ হয় একমাত্র, যার উপরে ছিলো চিত্র আঁকা, নীল রঙের মধ্যে এক থোকা গোলাপ আর কিছু ফলন্ত গাছ—ঘরের লোহার চুল্লিটার গায়েও নানা রকম কারুকাজ করা ছিলো। তার ফুলগুলির লাল রঙের দিকে তাকাতে হান্সের ভালো লাগতো। কেননা সেখান থেকেই তো জাগতো মায়ের শরীরের ঘনিষ্ঠ আদরের মতো একটানা উত্তাপ। বিছানার পর্দা নামিয়ে দিলে বিছানাই হয়ে উঠতো একটি ছোটো বাড়ি, কিন্তু জালিকাটা পর্দার ভিতর থেকে দেখা যেতো মোমবাতির কম্পিত দীর্ঘ শিখা আর জ্বলজ্বলে চুল্লির তাপ। হান্স শুয়ে শুয়ে শুনতো, বাবামশাই উদাস গলায় বই পড়ছেন, আর মা-মণি কখনো প্রশংসা করছেন লেখার, আবার কখনো বা হয়তো বাধা দিচ্ছেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া কোনো দরকারী কথা বলার জন্য। আর হান্স শুয়ে থাকতো স্বপ্নের ভিতর মোহের মতো—ঘুম আসছে না, ঘুম নামছে

আকাশ ছেয়ে—এই দুই মিশেল করে সচেতনতার এক অদ্ভুত তন্দ্রা যেন তৈরি হয়ে আছে, কানে আসছে একটানা গলার স্বর, শব্দরা জড়াজড়ি করে ডুবে যাচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। আর তখন সেই আচ্ছন্ন, সহজ, মোহের ধূপদানী থেকে ওঠা ধূপের ধোঁয়ায় ছাওয়া ঘরটা যেন পৃথিবীর নিরাপদতম ও প্রিয়তম আশ্রয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতো।

আনে মারি সব সময়েই সাজিয়ে গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন ঘরটাকে। তুষার শাদা মশলিনের পর্দা বা ধবধবে স্বুজনিগুলোর জন্ত একটু দেমাকও ছিলো তাঁর, আর ঠাকুমার অভিজাত চলন বলনের ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিতে তালিম দেবার জন্য হান্সকে তিনি শিখিয়েছিলেন খুব কম অর্থ ব্যয় করেও কীভাবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা যায়, যা উত্তরকালে হান্সের প্রচুর কাজে এসেছিলো। ছেলেকে সযত্নে নিজের হাতে পোশাক পরিয়ে দিতেন আনে মারি। বাবামশাইয়ের পুরোনো কোট প্যাংলুন কেটে হান্সের মাপসই করে নিতেন—বো এর মতো করে গলায় বেঁধে দিতেন একটি ধবধবে রুমাল—আর সাবান দিয়ে ধোয়া ঝাঁকড়া মাথার চুল কোঁকড়া করে দিতেন সযত্নে।

জীবনের প্রতি আনে মারির যে মনোভাব ছিলো তা ঠিক চাষীদের মতো, সহজ এবং অকৃত্রিম। সামাজিক উৎসব কি পালা-পার্বণের খোঁজ খবর রাখতেন তিনি, আর যত গরিবই হোন না কেন—উৎসবের দিনে প্রথাসিদ্ধ জমকালো খাবারদাবারের ব্যবস্থাই হতো বাড়িতে—ভাতের পরিজ, হাঁসের রোষ্ট, তাছাড়া বড়ো দিনে আপেলকেক, ঈষ্টারে হ্যাম আর সবুজ মাষ্টার্ড, আর হোয়াইট সানটাইডের দিনে ভেড়ার রোষ্ট।

কখনো-সখনো আবার হান্সকে তিনি শাসনও করতেন, ধমকে দিতেন দস্তুরমতো। তার বশে যাওয়ার কথাটা অনেকক্ষণ ধ'রে ব্যাখ্যান করতেন। আর সেই সঙ্গে আদর্শ হিসেবে ছেলের সামনে নিজের বাল্যকাল তুলে ধরতেন। যখন তিনি ছোটো ছিলেন তখন তাঁকে পাঠানো হ'তো ভিক্ষে করতে—আর সেই লজ্জায় এত মিইয়ে যেতেন তিনি যে তখন সারা দিন একটি সাঁকোর নিচে কান্নাকাটি ক'রে কাটাতেন। ঠাণ্ডার দিনে পাঁজরায় ছুরি চালাতো কনকনে উত্তুরে হাওয়া, জ'মে যেতো শরীরের সব রক্ত। তবু এক পয়সাও রোজগার না ক'রে বাড়ি ফেরার সাহস হ'তো না। ছোটো হান্সের মনে বোধহয় গভীর ভাবে দাগ কেটে গিয়েছিলো সেই নিদারুণ বর্ণনা। তাই বহু বছর পরে সেদিনকার সেই ছোট মেয়েটির জন্ত সে মৃত্যুহীন প্রাণের খবর এনেছিলো 'ছোট্ট দেশলাইওয়ালী'তে।

তাঁর বাল্যবেলার কত কিছুই যে পরে রূপকথার মধ্যে মিশে গিয়েছিলো, আজ আর তার কোনো সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে না। ছোট কোঠা আর রান্নাঘর, ছাতে ওঠার দড়ির সিঁড়ি, ছাদের জল পড়ার সরু ঢালু জায়গাটা—যেখানে ছিলো তার মায়ের একটুখানি বাগান, যেখানে একটি বাক্সের উপর গজাতো সবুজ শাকসজি লতাপাতা—সব কিছুই তার রূপকথায় এখনো দেখা যায়। 'তুষার রাণী'র মধ্যে সেই বাগানে এখনো নিত্য ফুল ফোটে, চিরকালের জন্ত সেখানে ফুটে আছে আলোর ফুল, ফুলের রঙ, রঙের আলো।

'কোনো বড়ো শহরে এত বাড়িঘর আর এত লোকজনের ভিড় যে কারো পক্ষেই ভালো ক'রে বাগান করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না আর তাই অনেককেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় টবের মধ্যে ফুলগাছের চারা লাগিয়ে। এমনি এক শহরে থাকতো দুটি ছেলেমেয়ে—দুজনেই বয়সে ছোটো। তাদের বাগানটা আর যা-ই হোক, টবের ফুল-বাগানের চাইতে বড়ো ছিলো। তারা দুজনে অবশ্য ভাইবোন নয়, কিন্তু তারা একে-অন্যকে এত ভালোবাসতো যে এক হিসেবে তাদের ভাইবোনই বলা চলে। তাদের বাবা-মা থাকতেন মুখোমুখি গায়ে লাগানো দুই বাড়িতে। প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদ জোড়া ছিলো বলতে গেলে—কেবল মধ্যখান দিয়ে বৃষ্টিপাদলের জল পড়ার সরু ঢালু একটুখানি জায়গাই বাড়ি দুটিকে আলাদা ক'রে রেখেছিলো। আর এই দুই বাড়িরই ছাদে ছিলো একটি করে ছোটো জানলা। তার ফলে হ'তো কি, এই জলপড়ার জায়গাটুকু জানলা টপকে পেরোতে পারলেই অনায়াসে গিয়ে পৌঁছানো যেতো অন্য বাড়িতে।'

'ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা একটি ক'রে বড়ো কাঠের বাক্স ব্যবহার করতেন, যার মধ্যে রান্নাবান্নার শাকসজি গজাতো। বাক্সদুটি তাঁরা বসিয়ে রেখেছিলেন ছাদের যেখান দিয়ে জল পড়তো, সেখানে। এত কাছাকাছি যে বাক্স দুটি প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে থাকতো। ছোটো, সুন্দর দুই গোলাপগাছ গজিয়েছিলো বাক্সদুটিতে—রঙিন ঝুমকোলতা তাদের লম্বা ডালপালাকে জড়িয়ে থাকতো—আর টুকটুকে লাল ঝুমকো-লতা গায়ে জড়ানো গোলাপ-ডালেরা জানলার দিকে তাদের বাহু বাড়িয়ে দিতো, তারপর এমনি ক'রে দুটিগাছে এক হ'য়ে গিয়ে রাস্তার উপরে, জানলার ধারে, তৈরি ক'রে দিয়েছিলো একটি ফুলের তোরণ।'

ফুলের সঙ্গেই বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো হান্স। 'লেখকদের মধ্যে খাঁটি দিনেমার যদি কাউকে বলতে হয় তো সে হলাম আমি,' একদা সে এ-কথা বলেছিলো, কারণ দিনেমারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হ'লো ফুল ভালোবাসা। বোধকরি কেবলমাত্র চীনে কি জাপানীরাই এই ফুল ভালোবাসার ব্যাপারে দিনেমারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। প্রত্যেক কোঠা বাড়ির জানলার গায়ে জড়িয়ে বেড়ে ওঠে আইভিলতা, পাতাবাহার, সবুজলতায় সুন্দর ফুল—যেন তারাও পরিবারেরই অংশ। 'টবের ফুলের মতামত তুমি বেশী বিশ্বাস করতে পারোনা,' তার রূপকথার একটি প্রজাপতি বলেছিলো 'তারা বড্ড বেশি মেশামেশি করে মানুষের সঙ্গে।' গ্রামদেশে যাবার পথে কেবলি চোখে পড়বে একের পর এক নার্সারি উদ্যান, আর হটহাউস, ফুলের দোকান আর ফুলের বাজার, যেখানে ফুল প্রচুর, অজস্র, রকমবেরকমের আর সস্তা। একটি চীনে প্রবচনই তো আছে যে দেশে ফুলের দাম বেশি, যেখানে তা বিলাসের উপকরণ, তাদের এখনো সভ্যতার প্রথম সূত্র শেখা বাকি আছে।

রোববার দিন ঠাকুমা যখন আসতেন, সঙ্গে আনতেন থোকা থোকা ফুল। কাবার্ডের শেলফের ফুলদানিটায় সেই ফুলগুলি সাজিয়ে রাখার ভার ছিলো হান্সের উপর। এ-কথা ভাবতে সবসময়েই অবাক লাগে কেমন ক'রে তার বড়োসড়ো চওড়া হাত দক্ষতায় রমণীর কাজকর্ম ক'রে ফেলতো—কাগজের ফুল তৈরি কি পুতুল সাজানো, তোড়া বাঁধা বা মালা গাঁথা—সবই সে আশ্চর্য সুন্দরভাবে করতে

পারতো। এমনকি একবার তার গৃহকর্ত্রীর রজতজয়ন্তী বিবাহ বার্ষিকীতে সে ফুল দিয়ে একটি চেয়ার সাজিয়েছিলো—তখন সে দস্তুরমতো বুড়িথুরথুরে, কিন্তু তবু একলাই সব কাজ করেছিলো, কারো সাহায্য গ্রহণ করেনি।

হান্সের ঠাকুমা পাগলা গারদের ফুলবাগানের দেখাশুনো করতেন, মাঝে মাঝে হান্সও তাঁর সঙ্গে সেখানে যাবার অনুমতি পেতো—বিশেষ ক'রে যেদিন বাগানের জঞ্জালে আগুন লাগিয়ে সমস্ত আবর্জনা নষ্ট করা হ'তো সেদিন তো বটেই। সে কিন্তু কেবলমাত্র ফুল দেখতে কি জ্বলজ্বলে আগুনের তাপ পোয়াতে যেতো না। ভয় আর কৌতূহল মনের মধ্যে দুই ভাব নিয়ে উঁকি মারতো সেইসব ঘরে, যেখানে উন্মত্ত বাতুলদের আটকে রাখা হ'তো। কাছে যাওয়াটা নিষিদ্ধ ছিলো—কিন্তু একদিন সে দরজার ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পায় এক মহিলাকে, গায়ে তাঁর পোশাক নেই বললে চলে, শুয়ে আছেন খড় বিছোনো বিছানায়। আলুথালু চুল তাঁর এসে লুটিয়ে পড়েছে ঠাণ্ডা মেঝেয়—আর অদ্ভুত ছেঁড়া গলায় সেই অবস্থাতেই তিনি এমনভাবে গান গাচ্ছেন যে তা দেখেই হান্সের মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশিরে এক ঠাণ্ডা স্রোত সোজা উঠে গেলো মাথায়। তারপর আচমকা লাফিয়ে উঠলেন সেই মহিলা, ঝাঁপ খেয়ে পড়লেন বন্ধ দরজায়। যে ছোট্ট ঘুলঘুলিটা দিয়ে তাঁর খাবার দেয়া হ'তো—ঝপ ক'রে খুলে গেলো সেটা—আর তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এলো লম্বা একটি সাদা হাত, নীল শিরা-আঁকা, রক্তহীন, বাঁকানো আঙুলের ডগায় বড়ো-বড়ো নোখ। তাঁর আঙুলের ডগা শুধু কেবল হান্সের শরীর স্পর্শ করলো, আর অমনি ভয়ে নিঃসাড় হ'য়ে গেলো হান্স। অবশ হ'য়ে গেলো হাত পা, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো সে নিস্পন্দ। আর তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু ক'রে দিলো। অন্যেরা যখন ছুটে এলো ভয়ে তখন সে হতচেতন সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

বোধহয় এই ভয়ের দরুণই ঠাকুর্দাকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলতো। ওডেন্সে এবং আশেপাশে ভদ্রলোক সুপরিচিত ছিলেন; গৃহবধূরা তাঁকে খেতে দিতেন, ছোটোরা তাঁকে ভালোবাসতো, আবার একটু পাখা-গজানো ছেলেরা মাঝে-মাঝে তাঁর পিছন-পিছন গিয়ে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়তো। হান্স একবার এইসব ছেলের নিষ্ঠুর শোরগোল শুনতে পেয়েছিলো। পিছনে ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে ছড়া কেটে হাসিঠাট্টা ক'রে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক উস্কোখুস্কো চেহারার বুড়ো ভদ্রলোককে তারা তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে করুণায় কেঁপে উঠেছিলো হান্সের সমস্ত শরীর আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো সে নিজেকে। পরে যখন সে জানতে পারলো যে এই হ'লো তার ঠাকুর্দা—তার একজন আপনজন তখন লজ্জায়—দুঃসহ লজ্জায়, তার মন পীড়িত হ'য়ে গিয়েছিলো।

ছোটোরা আবার মাঝে-মাঝে তাকেও ক্ষ্যাপাতো। তার থিয়েটারের পুতুলদের নিয়ে কিংবা তার গল্প কবিতা নিয়ে তারা ব্যঙ্গ করতো, বিদ্রূপ করতো, কৌতুকে ফেটে পড়তো, আর তার ফলেই—ধীরে ধীরে সে আত্মসমর্পণ করলো নির্জনতার কাছে ভালোবাসলো নির্জনকেই, আর তা-ই হ'য়ে উঠলো তার আসল জীবন—অনুভবে আন্দোলনে ব্যাকুলতায় সংরক্ত, ছায়াময় ও নিঃসঙ্গ—যেখানে সে চিরকালের একলা মানুষ। টেঁপারী বোপের উপর মায়ের এপ্রনের এক কোণা বেঁধে দিতো সে, আরেকটি কোণা থাকতো ঝাঁটার হাতলে, আর উঠোনে এই চাঁদোয়ার তলায় ব'সে সে গল্প বানাতো। ছেলেরা তাকে যতই ক্ষ্যাপাক না কেন' তবু তাদের গল্প বলতে ভালো লাগতো—এটা তো ঠিক যে কেউ যদি না শোনেন তো গল্প বানিয়ে কোনই লাভ নেই—আর মাঝে মাঝে সে যেতো পাগলা গারদের কাছে ছোটো একটি বাসায় সেখানে গরীব মেয়েরা এসে তাঁত বুনতো। তারা তাকে আদর করতো আর তার চেয়েও যেটা জরুরি তা এই তারা চুপ করে তার গল্প শুনতো। ডাক্তাররা কথায়-কথায় যা ব্যবহার করেন, যেমন 'হৃৎপিণ্ড,' 'ফুসফুস,' 'অন্ত্র'—এই সব শব্দ সে জোগাড় করেছিলো, মাঝে-মাঝে খড়ি দিয়ে দরজার পাল্লায় অদ্ভুত সব ছবি আঁকতো সে, 'মানব শরীরের গঠন প্রণালী' এই জাতীয় নাম হ'তো ছবিগুলোর, যদিও মানব শরীরের পক্ষে তার কতটা যোগ থাকতো, তা বলা সম্ভব হ'তো না।

বুড়িরা বলতো, 'কী চালাক আর চটপটে হান্স! বাঁচলে হয়।' আর একথা শুনতে হান্সের খুব ভালো লাগতো। স্বাস্থ্য তার বিশেষ ভালো না, বড্ড বেশি ঢ্যাঙা আর রোগা, সারসের মতো লম্বা তার ঠ্যাং (সারস তার প্রিয় পাখি, তা কি এইজন্যেই?) আর সারা জীবন এই চেহারা নিয়েই তাকে কাটাতে হয়েছিলো। প্রায় সব সময়েই ঘরে থাকতো ব'লে বড্ড স্পর্শভীরু ছিলো শরীর। বড়ো বেশি নমনীয়, আর চোখ দুটি সমস্ত শরীরের তুলনায় এত ছোটো যে মনে হ'তো যেন তার সুন্দর কেশগুচ্ছের আড়াল থেকে একটু উঁকি দিচ্ছে। কেউ যে তার চেহারা দেখে 'কিম্ভূত' বলতে পারে, তা তার কখনোই মনে হ'তো না। বুড়িদের প্রশংসা তার খুব ভালো লাগতো। নেশার মতো আর তেমনি মোহের মতো সে চুপ করে বুড়িদের কাছে শুনতো ভীষণ সব গল্প, যাদের মধ্যে ডাইনি, প্রেত, অসুখবিসুখ, তুকতাক, দুর্ঘটনা, মৃত্যু—সব আছে।

চাষীদের যত কুসংস্কার আছে, সব ছিলো আনে মারির। অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তিনি ছেলের মাথায় এই সব কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিতে একতিলও কার্পণ্য করেননি।

যখন হান্সের বয়স ছয় তখন ১৮১১ সালের সেই মস্ত উল্কাটি আকাশে দেখা দিলো। মা হান্সকে ব'লে দিলেন যে এই রাগী উল্কাটি পৃথিবীকে চুরমার ক'রে দিয়ে যাবে. তবে নেহাৎ যদি শেষ মুহূর্তে দয়া হয় তাহ'লে আলাদা কথা—তখন গোটা পৃথিবীকে সে চুরমার করবে না এটা সত্যি কিন্তু তখনও একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটবে। শুনে হান্স ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপে উঠলো, সেই ভয়াবহ, মস্ত আগুনের গোলার লম্বা জ্বলজ্বলে ল্যাজের দিকে তাকিয়ে ভয়ে সে নীল হ'য়ে গেলো—আর এমন সময় বাবামশাই এসে শান্ত গলায় তাকে ব'লে দিলেন এটা আসলে কী, যদিও তার ব্যাখ্যা আনে মারির মোটেই পছন্দ হ'লো না। আনে মারি ভাবতেন তাঁর স্বামী সব সময়েই ভীষণ সব কথা ব'লে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করেন।

একদিন তিনি বাইবেল বন্ধ করতে করতে বলেছিলেন, 'যিশু ঠিক আমাদেরই মতো একজন মানুষ, তবে ব্যক্তিত্ব ছিলো অসাধারণ।' এই ঈশ্বরনিন্দা শুনে আনে মারি ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন—আর হান্স ভেবেছিলো এই বুঝি মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ে, কিন্তু কিছুই ঘটলো না, কিছুই না, আর বাবার এই কথাগুলি চিরকালের মতো তার মনে

দাগ কেটে থেকে গেলো। বাবা আরো যে সব কথা বলতেন, তার অনেকই হান্সের মনে দাগ কেটে গিয়েছিলো। একবার তিনি বলেছিলেন, 'সব চেয়ে বড় শয়তান আমাদের নিজেদের ভিতরেই আছে,' আরেকবার বলেছিলেন, 'ধর্ম-বিষয়ে আমার কোনো গোঁড়ামি নেই।' এ সব কথা যখন হান্স ভাবতো, তখন মনে হ'তো ভিতর থেকে কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, এটা যে তার খুব ভালো লাগতো তা নয় বরং আসলে বেশ খারাপই লাগতো তার, কিন্তু ক'জন আর জেমস ব্যারির 'পিটার প্যান' হ'তে পারে, চিরকাল কেউ মায়ের কোলে কাটাতে পারে না। যত বিশাল এবং ভয়াবহই হোক না কেন, অনিবার্য ভাবেই মুখোমুখি হ'তে হয় বহির্জগতের। তাকে উপভোগ করার প্রক্রিয়া ধীরে-ধীরে শিখে নিতে হয়,—যে তা পারে না, তার আর তলিয়ে না গিয়ে উপায় কী?

হান্স যেদিন প্রথম থিয়েটার দেখতে গেলো, তার কথা সে কোনো দিন ভুলবে না। এটা যে তার জীবনে কত বড়ো এক ঘটনা, তাকে দেখে তা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। আসলে মোটেই রোমান্টিক ছিলো না সে, বরং বোধ হয় তার উল্টোটাই ছিলো। নাটক না দেখে সারাক্ষণ সে হলঘরের ভিড় দেখেছিলো আর ভেবেছিলো—'আহা, এখানে যত লোক আছে, ঠিক তত চা মাখন যদি থাকতো আমাদের—কী ভালোই না লাগতো খেতে।' কিন্তু তখন এ-কথা ভাবলে কি হবে, থিয়েটার কিন্তু সেদিন থেকেই তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছে টেনে নিলো। যখন টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকার মতো পয়সা নেই—তখন সে হ্যাণ্ডবিল চেয়ে আনতো। তারপর বাড়ি এসে ব'সে ব'সে নাটকের নাম আর কুশীলবের তালিকা দেখে গোটা নাটকটাই মনে-মনে বানিয়ে নিতো। উঠোনে ব'সে গল্প বানানোর চাইতে একটা আস্ত নাটক মনে-মনে কল্পনা ক'রে বানিয়ে তোলা ঢের বেশি মজার—এই তার মনে হ'তো তখন।

তারপর একদিন বাবামশাই ঠিক করলেন, হান্স স্কুলে গিয়ে পড়াশুনো করবে। আনে মারি ছেলেকে এক মেয়ে-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন; ছেলেদের স্কুলে ভর্তি হ'লে আর রক্ষে নেই, বেত্তিয়ে মাষ্টারমশাই গায়ের ছাল তুলে নেবেন।

সেখানে সে শিখলো বর্ণমালা কা'কে বলে, কেমন ক'রে বই পড়তে হয়, বানান করার কায়দাই বা কী। বেশ ভালো লাগলো হান্সের, তার চেয়েও ভালো লাগলো সেই স্কুলের ঘড়িটা। যখন ঘন্টা বাজে, ছোটো-ছোটো মূর্তি বেরিয়ে আসে ঘড়ির ভেতর থেকে, নানা রকম আওয়াজ করে, তারপর আবার ভিতরে চলে যায়। ঐ ঘড়িটাকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েই যত গণ্ডগোল—এমন সুন্দর ব্যাপারটা লক্ষ্য না ক'রে কেউ ব'সে ব'সে শুকনো বানান মুখস্থ করে নাকি? অন্তত হান্স করলো না, আর করলো যা বলে বেত পড়লো শপাং, বই-পত্র গুটিয়ে নিয়ে বগলদাবা করে হান্সও সটান বাড়ি ফিরে এলো।

গরিব ইহুদি ছেলেদের জন্য একটা স্কুল ছিলো, এবার হান্স এই স্কুলে ভর্তি হ'লো। এখানে মাষ্টারমশাই তাকে স্নেহ করতেন খুব, কিন্তু এখানেও হান্স সুখ পেলো না। মেয়ে-স্কুলে পড়ার সময় প্রথম মার খেয়েছিলো হান্স, কিন্তু এখানে যা ঘটলো, তা মারধোরের চেয়েও বেশি—আরো বেশি পীড়াদায়ক। ছবি আঁকার হাত ভালো ছিলো হান্সের। একদিন সে একটা কেল্লার ছবি এঁকে একটি ছোটো মেয়েকে দেখালো; তার ইচ্ছে ছিলো তার আঁকা ছবি দেখে সেই বুড়ি তাঁতিয়া যেমন মুগ্ধ হয়েছিলো তেমনি যেন এই মেয়েটিও হয়। তাই, ঠাকুমার মতো, সে বললে, এই কেল্লাটা হ'লো তাদের বাড়ি, আর আসলে সে তো মস্ত এক রাজবংশের ছেলে। মেয়েটি তার কথা মোটেই বিশ্বাস করলে না। তখনই তার থেমে-যাওয়া উচিত ছিলো—কিন্তু তা না ক'রে সে তাকে বিশ্বাস করাবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলো। শুধু তাই নয়, এবার এমন সব কথা সে ভেবে বার করলো, যা তার ধারণা অনুযায়ী খুবই চিত্তাকর্ষক। বললো, সে নাকি দেবদূতদের সঙ্গে কথা বলেছে, কী সুন্দর তাদের লাল পাখা, হাতে আগুনের তলোয়ার—ইত্যাদি। শুনে মেয়েটি একপাশে স'রে গিয়ে পাশের ছেলেটিকে নিচু গলায় বললে, 'জানিস, হান্স ঠিক ওর ঠাকুর্দার মতো—একেবারে বদ্ধ পাগল!'

তক্ষুণি কান গরম হয়ে গেলো হান্সের, [illegible] লাল হ'য়ে তেতে উঠলো, কপালের শিরা দুটির নীল রেখা ফুলে উঠলো, আর মনে হ'লো এক্ষুণি তার ভীষণ অসুখ করবে। ছেলেদের যেদিন ঢিল ছুঁড়তে দেখেছিলো হান্স ঠিক সেদিনকার মতো অবস্থা হ'লো তখন। বাইরের এই মস্ত পৃথিবীতে লোকেরা চিরকাল এমনিই ব্যবহার করে। এই আবিষ্কার তাকে ভয় পাইয়ে দিলো। সেই মুহূর্তে শামুকের মতো মস্ত এক শক্ত খোলার ভিতর ঢুকে যেতে ইচ্ছে করলো তার। আর সেই খোলার নামান্তর তার বাড়ি—সেই ছোট্ট সুখী আরাম, অথচ সেই বাড়িটাও এখন ধ্বংসে পড়ছে বার্লিন প্রাসাদের মতো—বাইরেটা কী কঠিন, আর কী ঠাণ্ডা, একেবারে পাঁজরা ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বেঁধে।

তখন নেপোলিয়নের আমল—মস্ত লড়াই চলছে একের পর এক। কথা উঠলেই সবাই ঘুরে-ফিরে নেপোলিয়নে গিয়ে পৌঁছোয়, এমন কি আণ্ডারসেনদের ছোটো ঘরটাতেও তাঁর একটা ছবি ঝলতো। সম্রাটকে বাবামশাই কী শ্রদ্ধা করতেন, হান্সের তা মনে ছিলো। অনেকদিন পরে একবার নেপোলিয়নের শোবার ঘরে ঢুকেছিলো সে, বাবামশাইয়ের কথা মনে করে বালিশে সন্তর্পণে হাত রেখেছিলো তখন। সঙ্গে যদি আর কেউ না থাকতো নির্ঘাত নতজানু হ'য়ে বসতো সে, পরে এই কথা বলেছিলো একবার।

এবার জুতোনির্মাতার কথা বলার পালা হলো; আনে মারি তো কান্নাকাটি ক'রে খুন। কী ঘটবে না-ঘটবে, অস্থিতে মজ্জায় অনুভব করলেন আনে মারি, আরো জানতেন যে তাঁর এই স্পর্শভীরু নমনীয় স্বামীটি সৈনিক হবার যোগ্য নন মোটেই। কয়েক দিনের মধ্যেই তার নাম লেখে নেয়া হ'লো, আর তার দিন কয়েক পরেই হান্স একদিন শুনলো সৈনিকেরা সব চ'লে গেছে। অসুখ ক'রে বসেছিলো হান্সের, হাম হয়েছিলো; বড়ো বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে শুনতে পেলো দামামার আওয়াজ। অন্য সময় দামামার আওয়াজ তার খুব ভালো লাগতো, কী উত্তেজনার ব্যাপার এই ঢাক-পেটানো, কিন্তু এখন তাকে তার মনে হ'লো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন এবং ভয়ানক। বাবাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে, কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে! আর তার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার যেটা, তা এই: ঠাকুমা এই ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়লেন। একদিন হান্সকে তিনি বললেন, 'তুই যদি এখন মরতে পারিস, তবেই ভালো, তা'হলে আর কষ্ট সইতে

হবে না।' এ কথা শুনে হান্স আবার অনুভব করলো যে তার ভয় অমূলক নয়। তার ছোট্ট পৃথিবীটা চুরমার হ'য়ে গেলো। যাকে শৈশব বলে, তা সে আট বছর বয়সেই হারিয়ে বসলো।

অন্য সব কিছুর মতোই এই যুদ্ধও জুতোনির্মাতাকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়ে গেলো। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছুবার আগেই সব শেষ, নেপোলিয়নের হার হ'য়ে গেলো। ফিরে এলেন তিনি, কিন্তু সমস্ত স্ফূর্তি অন্তর্হিত। আর-কোনো আশার কথা রইলো না তাঁর মুখে, রইলো না উচ্চাশার কোনো উজ্জ্বল আবেদন, এত রোগা হয়ে গেলেন তিনি যে চিবুকের হাড় ছুঁচলো হ'য়ে ফুটে বেরোলো। তার পর এমন একদিন এলো তাদের বাড়িতে—আনে মারি পাঠালেন হান্সকে—না, ডাক্তার ডাকতে নয়, পাড়ার এক মেয়ে রোজাকে ডেকে আনতে। মন্ত্রজানা সেই স্ত্রীলোকটি দস্তুরমতো ভীতিউদ্দীপক সুর ক'রে মন্ত্র পড়লো। সেই একটি পশমি সুতো বেঁধে দিলো হান্সের কব্জিতে। আর তার হাতে তুলে দিলো ছোটো একটি সবুজ ডাল। যিশুকে ক্রুশে চড়াবার সময় যে গাছ কেটে আনা হয়েছিলো, এই ডালটা নাকি সেই গাছেরই অংশ। হান্স ফুঁপিয়ে উঠলো, 'তবে কি বাবামশাই ম'রে যাবেন?' এক মুহূর্ত চুপ থাকলো স্ত্রীলোকটি, তারপরেই সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'ভয় কি? যদি মারা যান তো রাস্তায় তাঁর প্রেতাত্মার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়ে যাবে।'

সেই ছোট্ট ছেলেটি ভয়ে এত কুঁকড়ে গিয়েছিলো যে ভালো করে হাঁটতে পারছিলো না। রাস্তায় যে কোনো ভূত-প্রেত দেখতে পেলো না বটে, কিন্তু তিন দিন পরেই বাবামশাই মারা গেলেন। প'ড়ে থাকলো তাঁর মৃতদেহ বিছানার সাদা সুতির পর্দার আড়ালে। হান্স তার মার সঙ্গে ছোট বিছানাটায় শুয়ে সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিলে। বাইরে সারা রাত ঝিঁঝি ডাকলো, ব্যাঙের তৎপর গলাও শোনা গেলো রাত-ভোর পর্যন্ত, আর কোনো একটা গাছের কোটরে একটা তক্ষকও সে রাতে খুব উল্লাস প্রকাশ করলে।

'কেন তোমরা তাঁকে গান শোনাতে চাচ্ছো? তিনি তো মারা গেছেন।' আনে মারি ভুতুড়ে গলায় তাদের জানালেন। 'তুষারকুমারী তাঁকে নিয়ে চ'লে গেছে।'

হান্সের রক্তের ভিতর এই কথার সমস্ত যবনিকা উন্মোচিত ক'রে দিলো। এবার শীতের সময়, জানলায় যখন তুষারের সাদা স্তর জমেছিলো, তামার পয়সা গরম ক'রে বাবামশাই তখন সেই বরফের গায়ে ফুটো করে দিয়েছিলেন। সেই ফুটো দিয়ে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো, বাইরে যেন একটি রূপসী তরুণী দাঁড়িয়ে তার দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে। 'আমাকে নিতে এসেছে মেয়েটি,' হেসে বলেছিলেন বাবামশাই।

এখন তিনি প'ড়ে আছেন মৃত, প'ড়ে আছে একটি তরুণ শরীর, যার মুখটি জীর্ণ, জরাগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ। হান্সের জন্য তিনি যে শেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিতর প্রতিধ্বনি তুলেছিলো তাঁর নিজের নষ্ট জীবনের প্রতি করুণ ধিক্কার। নিজের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যেন তিনি। 'হান্স যাই হ'তে চাক না কেন,' আনে মারিকে তিনি বলেছিলেন, 'তাকে তাই হ'তে দিয়ো। যদি তা পৃথিবীর সবচেয়ে উজবুক ব্যাপারও হয়, তবু তুমি কোনো বাধা দিয়ো না। যা ওর ইচ্ছে, তাই যেন ও হ'তে পারে।'

[ক্রমশঃ

শ্রবণ-কীর্ত্তন

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রহ্লাদ যে নবলক্ষণাক্রান্ত পুংসার্পিত ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রথম দুইটি হইল শ্রবণলক্ষণা ও কীর্ত্তনলক্ষণা। হরিকথা শ্রবণে যাঁর রুচি আছে সেই ভক্ত শ্রীধরপাদপদ্মে অবিস্মৃতি লাভ করেন, তাঁহার গুণানুবাদ আদরের সহিত শ্রবণ করিয়া। ঐ দুর্লভ অবিস্মৃতি অর্থাৎ 'সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা' তাঁহার কথা স্মরণ করিলে অভদ্র ক্ষয় পায় এবং কল্যাণ, সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও জ্ঞান-বৈরাগ্য বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বিস্তার করে। এ সব কথা ভাগবতে আছে। আরও কথিত হইয়াছে যে, কর্ণরন্ধ্রপথে হরিনাম প্রবেশ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়পদ্মকে নির্ম্মল করে। এরূপ আরও অনেক কথা আছে। আবার একথাও বলা হইয়াছে যে, সাধুর মুখ হইতেই হরিকথা শ্রবণ করিবে। "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদি কপিলবাক্য।

যাহা শোনা হয় নাই তাহা বলা সম্ভব নয়, সেইজন্য কেহ কেহ বলেন যে, আগে হরিকথা শ্রবণ করিলে পরে কীর্ত্তন করিবার অধিকার জন্মে। ভাগবতেও বলা হইয়াছে যে, সত্যযুগে হরিধ্যানে [illegible] ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যা দ্বারা এবং কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন হইতেই তাহা পাওয়া যায়। কলিকাল দোষের সমুদ্রস্বরূপ, তথাপি ইহার একটি শ্রেষ্ঠগুণ আছে যে একমাত্র কীর্ত্তন হইতেই (কীর্ত্তনাৎ) লোকে মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কীর্ত্তন করিয়া, না কীর্ত্তন শুনিয়া, এই ফললাভ ঘটে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা থাকে যে কীর্ত্তন শুনিব, না কীর্ত্তন করিব? অবশ্য কীর্ত্তন করিলে তদ্দ্বারা শ্রবণের কাজও যুগপৎ সাধিত হয়। কলিযুগপাবনাবতার মহাপ্রভু ও "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলেন নাই যে কলির জীবের সাধন হরিকথা শ্রবণ, না কীর্ত্তন। তিনি যে কীর্ত্তন গাহিয়া প্রথম প্রচার করেন যথা—"হরি হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি, তাহা এখন অচলপ্রায় শোনা যায় কদাচিৎ। সেই স্থলে "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদির কীর্ত্তনই সর্ব্বত্র শোনা যায়।

ঐটি লইয়াও বাদানুবাদ হইয়াছে যে, উহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়, না মনের ভিতরে জপ্য? কেহ দেখাইয়াছেন যে উপনিষদে যে মন্ত্রটি রহিয়াছে তাহাতে "হরে রাম" শ্লোকার্দ্ধ প্রথমে এবং

হরে কৃষ্ণ" শ্লোকার্দ্ধ পরে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ঐটি মন্ত্র এবং জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ঐ মন্ত্রটিকে উল্টাইয়া হরে কৃষ্ণ" দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তিনি উহাকে জপের জন্ত নির্দ্দেশ দেন নাই, কীর্ত্তনের জন্তই বলিয়াছেন।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতোক্ত "গুণানুবাদ শ্রবণ"কে বাদ দিয়া শুধু নামকীর্ত্তনই গ্রহণ করা হইয়াছে। কীর্ত্তন শব্দের অর্থই হইল যে কীর্ত্তনীয় ব্যক্তির লীলাগুণরূপ, এ সবের বর্ণনা তাহাতে থাকিবে। "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদির কীর্ত্তন প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে কাহার কথা কীর্ত্তন করিতেছি? কেহ বলেন যে, হরে শব্দটি "হরা" (=রাধা) শব্দের সম্বোধন পদ; আবার অপরে বলিলেন যে, ঐটি "হরি" শব্দেরই সম্বোধন পদ। সুতরাং কীর্ত্তনের লক্ষ্য স্থির করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, "নামাঙ্ক ভক্ত যশোঽঙ্কিতানি" না হইলে তাহা কীর্ত্তনপদবাচ্য হইবে কি না তাহাও বিচার্য্য। কীর্ত্তন যদি বিকৃত হয় তবে তাহা উল্টা অর্থ, "ন-র্ত্ত-কীত্তে" কি পর্য্যবসিত হইবে না? বস্তুতঃ বর্ত্তমানে কীর্ত্তন নামে এক শ্রেণীর সঙ্গীত সর্ব্বত্র চলিতেছে, হরিগুণানুবাদ না থাকায়, তাহাকে ঐ নর্ত্তকীপদবাচ্য বলা উচিত। ঐ জাতীয় রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলাগান শুনিলে, স্বামী বিবেকানন্দ স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলিয়াছিলেন দু'হাতে চাবুক লাগাইতে।

ভাগবতে নারদ বলিতেছেন, (১-৬-৩৫) যে-সব লোক বিষয়-ভোগেচ্ছা দ্বারা পুনঃপুনঃ পীড়িত হইয়া আতুর হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভবসিন্ধুপারের তরণী যে একমাত্র "হরিচর্য্যানুবর্ণনং" আমি তাহা দেখিতে পাইলাম। হরির চর্য্যা, অর্থাৎ লীলারই অনুবর্ণন, অর্থাৎ কীর্ত্তনই উপদিষ্ট হইতেছে। পুনশ্চ (১-৫-২২) বলা হইয়াছে যে, বিবেকবান ব্যক্তিরা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণবর্ণনকেই নিষ্ঠাসহকৃত তপস্যা, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের অবিচ্যুত সত্যফল বলিয়া নির্ণীত করিয়া থাকেন। এখানেও গুণবর্ণনকেই কীর্ত্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গহীন শব্দোচ্চারণ মাত্রকেই কীর্ত্তনপদবাচ্য বলা সমীচীন কি না, তাহা সুধিগণের বিচার্য্য।

একথা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মন্ত্র বা নাম, যাহা গুরু জপের জন্ত উপদেশ দেন, এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে না। কীর্ত্তন ব্যাপারটা কি হইতে গিয়া কিসে দাঁড়াইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

যে নবধা ভক্তিলক্ষণ লইয়া এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার একটি লক্ষণ লইয়া এক এক জন ভক্ত যে পরমার্থ লাভ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে—"বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে" শুকদেব কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। ভাগবতে নারদও পরপ্রয়োজন হিসাবে (১-৬-৩৪) বীণাসহযোগে হরিকথা গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার কথা বলিতেছেন। হরিকথাই কথা, অন্ত কথাকে "মৃষা গিরস্তাঃ হ্যসতীরসংকথাঃ" বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। একজন ভক্ত বলিয়াছেন যে—

রজনী হইলেই যামিনী হয় না, যদি পূর্ণচন্দ্র না থাকে।
রমণী হইলেই কামিনী হয় না, যদি পতিব্রতা না হয়।
নৌকা হইলেই তরণী হয় না, যদি গুরুকর্ণধার না হন।
আর কাহিনী হইলেই কথা হয় না, যদি কৃষ্ণকথা না হয়।

শ্রুতি বলিতেছেন, "অন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"—অন্য কথা ত্যাগ কর, তাহাই অমৃত লাভের একমাত্র সেতু। সে কথার এত গুণ ভাগবত বলিতেছেন—

তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই পুণ্যজনক, তাহাতেই ভগবানের গুণের উদয় হয়। তাহাই সুন্দর, তাহাই রুচিজনক, নিত্য নব নব রূপে অনুভূত ও সর্ব্বকালে মনের মহোৎসবস্বরূপ। ইহাই যাহার স্বরূপ, আমরা কি সেইরূপ হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাই? যাহা সচরাচর শুনি তাহাকে কীর্ত্তন বলিব না নর্ত্তকী বলিব? যাহার উদ্দেশ্য হইল "ভগবদ্‌গুণোদয়ম্" তার মাঝে যখন শুনি "কানু কহে রাই" ইত্যাদি, তখন কি কীর্ত্তন শ্রবণের ফল হয়?

আর একটি কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। রত্নাকর দস্যুর রামনাম মুখ দিয়া বাহির হইত না। নারদ বারম্বার বলিয়া দিলেও সে যাহা উচ্চারণ করিতেছিল, তাহা "রাম" হইতে ছিল না। পরে নাকি "মরা মরা" বলিতে বলিতে তার মুখে রামনাম ফুটে। এযুগেও নরোত্তমদাসের বিবর্ত্তবিলাসে বলা হইয়াছে—

"অসাধুর সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় তবু নাম কভু নয়॥"

তাই বলিতেছিলাম যে, যদি শ্রবণ করিতে হয়, তবে শুধু সাধুর কাছেই শ্রবণ করিব; আর যদি ভগবদ্‌গুণোদয় না করিতে পারি, তবে তেমন কীর্ত্তনই করিব না।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

প্রতীক্ষা

প্রভাতী দত্ত

নগরীর রাজপথ আজও ভয়ে ভরা:
ভীরু প্রেম জীবনেরা যারা দিল ধরা,
সাহারার শেষ প্রান্তে,
মরুভূর উষর আকাশে,
অথবা সে—
কোন এক দেশে
এখনও দাঁড়ায়ে তারা প্রান্তিক প্রহরী।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মানুষের দুই ভাব। জীবভাব আর বিশ্বভাব। অমিত ঘোষের বেলায় জ্ঞানের বচনটি পরিমিত ভাবে একটু বদলে নিয়ে দেখছে ধীরাপদ। তারও দুই ভাব—একটি জীবভাব, অন্যটি বিজ্ঞানভাব। কিন্তু এই তত্ত্বরীতির সামঞ্জস্য চীফ কেমিষ্টের মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার। কারণ, ওই দুটি ভাবই বড় বেশি সমভাবে উপস্থিত। একটির বর্তমানে অপরটির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত।

ফলে এই দুই ভাবের সঙ্গেই একটা প্রচ্ছন্ন বিরোধ ফ্যাক্টরীর অন্য কর্মকর্তাদের। শুধু বড় সাহেব বা ছোট সাহেবের নয়, হয়ত চারুদিরও, হয়ত লাবণ্যরও। এমন কি হয়ত ধীরাপদর নিজেরও।

তুচ্ছতম সংঘাতেও জ্বলে উঠতে পারে মানুষটা। সেই জীবভাবটির সামনাসামনি মুখোমুখি দাঁড়ানো শক্ত তখন। কারণ, তার রীতিতে আপস লেখা নেই। ফ্যাক্টরীর অন্য মালিকদের পক্ষে অন্তত এ দাপট বরদাস্ত করা সহজ নয়। বিশেষ করে মালিকানার অংশ যাদের অনেক বেশি। অথচ বরদাস্ত করতে হয়। হয় বলেই ক্ষোভ আর বিরক্তি। তাছাড়া ব্যবসায়ের দিক থেকেও ক্ষতি। যে-কোনো কাজই হোক বা যতবড় কাজই হোক, অশান্ত মুহূর্তে তাকে কাজের মধ্যে পাওয়া দায়। পেলেও কাজ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে কাজ পণ্ডই করবে বেশি। নয়তো, ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে এক উদগ্র তাড়নায় বেরিয়ে পড়বে কোনোদিকে। এমন কি, ঘরে শুয়ে বসেও কাটিয়ে দিতে পারে দু'-দশ দিন। জুনিয়র কেমিষ্ট আছে আরো আট-দশজন। পারতে তারা তখন নতুন কাজে হাত দিতে চায় না, চীফ কেমিষ্টের মেজাজের ঝক্কি নেবে কে? পছন্দ হল তো ভালো, না হলে যত টাকাই লোকসান হোক, দেবে সব তচনচ করে।

এ রকম লোকসান অনেকবার হয়েছে।

এই লোকসান ধীরাপদ কিছুটা নিজের চোখে দেখেছে, আর গল্পের ছলে শুনেছেও। চারুদি বলেছেন, কর্মচারীদের কারো কারো মুখে শুনেছে, অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রর অসহিষ্ণুতা থেকেও টের পেয়েছে। কিন্তু এর ফলে বরাবরই সব থেকে বড় ধকলটা যায় লাবণ্যর ওপর দিয়ে। সেই অপদস্থ হয় সব থেকে বেশি। কারণ, এখানকার এই কাজের স্রোতে চীফ কেমিষ্টের অনুপস্থিতির জন্যেও পড়ে থাকার উপায় নেই। কাউকে এসে দাঁড়াতে হবে, নির্দেশ দিতে হবে, স্যাম্পল যাচাই করতে হবে, কাজ অনুমোদন করতে হবে।

অমিত ঘোষের অনুপস্থিতিতে এই দায়িত্ব নিয়ে এসে দাঁড়াতে হয় লাবণ্য সরকারকে। সে শুধু পাস-করা ডাক্তারই নয়, বি, এস সি পাসও। গোড়ার দিকের অন্তরঙ্গ দিনে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাকে যে কেমিষ্টের কাজেও যোগ্য সহকর্মিণী করে তুলেছিল অমিতাভ ঘোষ! তখন যে একদিনের জন্যেও ওই আসন শূন্য থাকলে রীতিমত দাবি নিয়েই এসে দাঁড়াত লাবণ্য সরকার।

সেই দাবিই গলায় কাঁটা হয়েছে পরে।

লাবণ্যর বিশ্বাস, চীফ কেমিষ্টের এ-ধরণের অপচয়-প্রবৃত্তির আসল কারণ তার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ। তাকে জব্দ করার জন্যে আর অপদস্থ করার জন্যে। অবশ্য তাতে ক্ষতি কিছু হয় না। কারণ, এই বিশ্বাসের ভাগীদার স্বয়ং অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রও। প্রয়োজনে সে বরং সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সান্ত্বনায় ক্ষতির নৈতিক দায় ভোলাটা শক্ত। ইদানীং ওই বিভাগটির সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণে লাবণ্যর বিশেষ আপত্তি লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। জরুরি তাগিদেও যেতে রাজি হয় না। সিতাংশুকে বলে, কি লাভ, একটু এদিক-ওদিক হলে সব তো নতুন করে করতে হবে আবার, ও যেমন আছে থাক, এলে হবে।

অসুখের পর তিন সপ্তাহ বাদে ধীরাপদ কারখানায় এসে দেখল মাঝ-বয়সী সিনিয়ার কেমিষ্ট নিযুক্ত হয়েছেন একজন।

জীবন সোম, অভিজ্ঞ রসায়নবিদ। তাঁকে নিয়ে আসায় কৃতিত্ব সিতাংশু মিত্রর।

ধীরাপদর মনে হল, ওই নবাগতটিকে কেন্দ্র করে এই কর্মমুখর পরিবেশের তলায় তলায় কি একটা অস্বস্তি থিতিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, মনে মনে তারই প্রতীক্ষায় ছিল যেন সকলে। ও এলে পরিস্থিতি সহজ হবার আশা।

হিমাংশু মিত্র হাসিমুখে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছেন প্রথম। ভালোই তো আছ মনে হচ্ছে, এভাবে অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বোসো না, অনেক ঝামেলা এখন।

ঝামেলা কি সেটা আর বলেন নি, ওর আবিষ্কারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। বরং ধীরাপদর স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, যে জায়গায় থাকো দেখলাম, অসুখ তো বারোমাস

এমনিতেই হতে পারে। আমার ওখানেও উঠে আসতে পারো, বেশির ভাগ ঘরই খালি পড়ে আছে।

ধীরাপদ জবাব দেয় নি। আমন্ত্রণে খুশি হবার বদলে বরং সঙ্কোচ বোধ করেছে। আর, সেই সঙ্গে কেয়ার-টেক বাবু আর মানুকের শ্রীবদন দুটি চোখের সামনে ভেসে উঠতে হাসিও পেয়েছে। প্রথম দিনের দর্শনে ঠাট্টার ছলে তার ও-বাড়িতে বসবাসের সম্ভাবনার কথা শুনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একযোগে হকচকিয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র তাকে দেখে খোলাখুলি খুশি। বুদ্ধিমানের মত পদমর্যাদার বেড়াটা নিজের হাতে আগেই ভেঙে দিয়েছিল। ফলে এই খুশির ভাবটা অকৃত্রিমই মনে হয়েছে ধীরাপদর। আপনি এসেছেন। বাঁচা গেল। একদম সুস্থ তো এখন?

ধীরাপদ হেসে মাথা নাড়ল। সুস্থ।

যাক, বসে বসে এখন ঝামেলা সামলান তাহলে—

কিসের ঝামেলা? ধীরাপদর হালকা প্রশ্ন।

এদিকের সব কিছুরই। আমার তো আর দেখাশুনার ফুরসত নেই, বাবার কাণ্ড—

বাবার কাণ্ডর ব্যাখ্যায় ছেলের তুষ্টির অভাব লক্ষ্য করল ধীরাপদ। সেদিন সুলতান কুঠিতেও করেছিল। কোম্পানীর প্রসাধন-শাখার জমি কেনা হয়েছে কলকাতার বিপরীত প্রান্তে। সিতাংশু এঞ্জিনিয়ারও নয়, কনট্রাক্টরও নয়, অথচ বাড়ি তোলার সব দায়-দায়িত্বও এখন থেকেই তার কাঁধে। নতুন ব্যবসা দাঁড় করানোর ঝক্কি তো আছেই এরপর।

বিরস বদন। শাখা সম্প্রসারণে উৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব সুস্পষ্ট। ব্যবসা বাড়ানো দরকার, নতুন কিছু করা দরকার, বড় সাহেব সে-অভিপ্রায় অবশ্য আগেও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করে কিছু একটা করে ফেলার এত আগ্রহ ধীরাপদরও অস্বাভাবিক লাগছে। কেন লাগছে ভাবতে গিয়ে হাসিও পাচ্ছে আবার, সোজা-পথে কোনো কিছু ভাবতে না পারাটা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তারও।

সিতাংশু জিজ্ঞাসা করল, এদিকের খবর শুনেছেন? নতুন সিনিয়র কেমিষ্ট নেওয়া হল একজন···

শুনেছি।

আলাপ হয় নি? আলাপ করে নেবেন, বেশ গুণী লোক, অনেক বড় বড় ফার্মএ কাজ করেছেন। নিয়ে তো এলাম, এখন ক'দিন টিকে থাকতে পারেন কে জানে, এদিকে তো গোড়া থেকেই খড়্গহস্ত।

উনি চান না এঁকে? খড়্গহস্ত কে হতে পারে সেটা যেন ধীরাপদরও জানাই আছে।

কি উনি চান আর কি চান না উনিই জানেন। বাবাও যেমন, সরাসরি একটা বোঝাপড়া করে নেবেন তা না, কেবল ইয়ে—। সিতাংশুর মুখে বিরক্তির কালচে ছাপ। বাপের প্রতি ছেলের এতটা অনাস্থা ধীরাপদ আগে দেখেনি। অমিতাভ ঘোষের উদ্দেশেই বিরূপ মন্তব্যের ঝাঁঝে সোজা হয়ে বসল সে, নিজে কিছু দেখবে না, অন্যে দেখতে এলেও বরদাস্ত হবে না, আর মিস্ সরকারই বা বছরের পর বছর এ অপমান সহ্য করবেন কেন—তাঁর অন্য কাজ নেই না আত্মসম্মান নেই?

ধীরাপদ চুপ। মুখ তুলে ক্ষুব্ধ মূর্তিটি দেখল একবার।

—বাবার ধারণা ভাগ্নে মস্ত বিদ্বান। বিদ্যা ধুয়ে আমরা জল খাবো? কাজ চলে কি করে? না পার্টিকে বিদ্বান লোক দেখিয়ে দিলেই হবে।

ধীরাপদ অল্প একটু মাথা নেড়েছে হয়ত। অর্থাৎ, সমস্যা বটে। তারপর আলাপের সুরে বলেছে, ওই কেমিষ্ট ভদ্রলোকটিকে নেবার আগে অমিতবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিলে মন্দ হত না বোধহয়।

শোনামাত্র দ্বিগুণ বিরক্তি।—তার সঙ্গে কোনো পরামর্শ চলে, না পরামর্শ করে কিছু করা যায়?

অর্থাৎ, এতদিন ধরে তাহলে লোকটার আপনি কি দেখেছেন আর কতটুকু চিনেছেন। সিতাংশু উঠে যাবার পর ধীরাপদর মনে হয়েছে, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। পরামর্শটা ছোট সাহেব অন্তত করতে গেলে বিপরীত ফল অনিবার্য। কিন্তু তার কথা থেকে আর একটা সংশয়ও উকিঝুকি দিচ্ছে। চীফ কেমিষ্টের খামখেয়ালীর দরুণ অসুবিধা মাঝেসাজে হয় ঠিকই। তাছাড়া কাজও দিনে দিনে বাড়ছেই। অভিজ্ঞ লোক একজন দরকার বটে। কিন্তু অভিজ্ঞ সিনিয়র কেমিষ্ট নিয়ে আসা শুধুই সেই দরকারে, না কি, বছরের পর বছর লাবণ্য সরকার আর অপমান সহ্য করতে-রাজি নয় বলেও? ধীরাপদর মনে হল, যোগ্য লোক সংগ্রহের কাজটা সিতাংশু মিত্রই করেছে যখন, সেটা এই বিবেচনার ফলেও খানিকটা হতে পারে। অন্যথায়, জেনেশুনে এভাবে চীফ কেমিষ্টের মেজাজের ঝক্কি না নিয়ে বুদ্ধিমানের মত ধীরেসুস্থে বাবাকে দিয়েই যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করাতে পারত। বেগতিক দেখলে বড় সাহেব সিনিয়র কেমিষ্ট নিয়োগের ভারটা হয়ত অমিতাভ ঘোষের ওপরেই ছেড়ে দিতেন। বড় সাহেবের বিচক্ষণতায় ধীরাপদর আস্থা আছে।

……কিন্তু যে কারণেই হোক, সম্প্রতি ছেলের যে তা নেই, দেখছে। নেই কেন?

লাবণ্যর কথা মনে হতে ধীরাপদ উসখুস করতে লাগল। এসে অবধি দেখা হয়নি। তখন ছিল না, এখনো আসেনি বোধহয়। এলে এ ঘরে একবার পদার্পণ ঘটতই। তবু উঠে দেখে আসবে কিনা ভাবছিল।

ঘরে ঢুকলেন যিনি, তিনি অপরিচিত। *কিন্তু একনজর দেখেই ধীরাপদর মনে হল ইনিই সেই নবাগত সিনিয়র কেমিষ্ট—জীবন সোম। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে বয়েস, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, কালো, একমাথা খড়খড়ে চুল। দেখলে মনে হয়, চুলের সঙ্গে একগাদা* ধুলো মিশে আছে।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ সাদর অভ্যর্থনা জানালো, বসুন বসুন—আমিই যাব আপনার কাছে ভাবছিলাম।

অভ্যর্থনায় খুশি হলেন বোধহয়। বসে ধীরাপদর মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।—এখানে এসেই আপনার কথা শুনেছি, আপনি অসুস্থ ছিলেন……আজ এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম। এখন ভালো তো বেশ?

হ্যাঁ। ধীরাপদ আলাপের দিকে এগোলো, কেমন লাগছে বলুন, অবশ্য আপনি যে-সব ফার্ম দেখেছেন তার তুলনায় আমাদের অনেক ছোট ব্যাপার।

না বললেই ভালো হত। কারণ, এক মুহূর্তের আলাপে বিনা ভণিতায় ভদ্রলোক নিজের সমস্যাটা সরাসরি এভাবে মুখের ওপর ব্যক্ত করে বসবেন ভাবেনি। ডাইনে-বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে বললেন, ছোট আর কি, তবে সুবিধের ঠেকছে না খুব। লোভে পড়ে ছেড়ে-ছুড়ে এলাম……এ বয়সে না এলেই ভালো হত। এখানকার চীফ কেমিষ্ট আমাকে চান না হয়ত।

ধীরাপদ ফাপরে পড়ল। মন্তব্যের আশায় ভদ্রলোক চেয়ে আছেন। দ্বিধান্বিত মুখে বলল, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে না চাওয়ার তাঁর তো কোনো কারণ নেই।

জীবন সোম বললেন, ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গেই বনছে না হয়ত—কিন্তু ভুগছি তো আমি।…এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু আমার মুখ দেখতেও তাঁর আপত্তি বোধ হয়, কিছু বলতে গেলেই সাফ জবাব, যা কিছু বক্তব্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে বলতে হবে, তাঁর কাছে নয়।

ধীরাপদ নিরুত্তর। কি-ই বা বলার আছে। একবার ভাবল জিজ্ঞাসা করে কি অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু জেনেই বা কি হবে, সে ওপরওয়ালা নয় তাঁর ভরসাও কিছু দিতে পারবে না। শুধু মনে হল, চীফ কেমিষ্ট লোকটিকে সঠিক জানা থাকলে ভদ্রলোক হয়ত এতটা বিপন্ন বোধ করতেন না।

কিন্তু জীবন সোমের পরবর্তী আর্জি শুনে ধীরাপদ রীতিমত অবাক। শুধু আলাপের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আসেননি সেটা স্পষ্টতর হল আরো। মিষ্টার ঘোষ আপনার বিশেষ বন্ধু শুনেছি, এঁরাও বলছিলেন আপনি এলে আর তেমন অসুবিধে হবে না। আমার হয়ে আপনিই একটু বুঝিয়ে বলুন না তাঁকে, আমি কোনরকম ষড়যন্ত্র করে এখানে ঢুকে পড়িনি, আমাকে কাজ ছাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।…ভালোর আশা কে না করে?

যুক্তি মিথ্যে নয়, অনুরোধও অসঙ্গত নয় কিছু। কিন্তু ভদ্রলোককে মুশকিল আসানের এই রাস্তাটা দেখিয়ে দিল কে! লাবণ্য সরকার না সিতাংশু মিত্র? এ ধরণের আলগা ভরসা বড় সাহেব দেননি নিশ্চয়। অস্বস্তির একশেষ ধীরাপদর। সবিনয়ে জানিয়ে দিল, নিজে থেকে বুঝতে না চাইলে চীফ কেমিষ্টকে কিছু বুঝিয়ে বলাটা খুব সহজ নয়। আর সেও সামান্য কর্মচারী এখানকার—বন্ধুত্বের খবরটাও তেমন ভরসা করার মত কিছু নয়, তবে সুযোগ *পেলেই এ ব্যাপারে সে চীফ কেমিষ্টের সঙ্গে আলোচনা করবে।*

জীবন সোম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ধীরাপদ ওই বিভাগটির সমাচার মোটামুটি জেনেছে। তার কুশল খবর নিতে আর যারা এসেছে তাদের মুখেই শুনেছে। অমিত ঘোষ এ পর্যন্ত বড় রকমের বিঘ্ন কিছু ঘটায়নি। এসটিমেট বা সাপ্লাই ফাইলে শুধু ষ্টেটমেণ্ট জমছে, স্বাক্ষর পড়ছে না। মান-অনুমোদনের ছাড়পত্রের অভাবে মাঝে মাঝে মাল আটকে থাকছে। এ ধরণের অসুবিধেও বেশিদিন থাকার কথা নয়, কারণ, চীফ কেমিষ্টের অনুপস্থিতিতে নতুন সিনিয়র কেমিষ্ট শীগগিরই এসব ছোটখাট দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা পাবেন আশা করা যায়। নইলে

কে আনার সার্থকতা কী? তবু ওই কর্মপরিবেশে একটা আশঙ্কা পাকিয়ে আছে অন্য কারণে।

আসল দুর্যোগ থেকে অনাগত দুর্যোগের ছায়াটা যেন বেশি। বর্তমানে চীফ কেমিষ্টের এই সমাহিত বিজ্ঞান-ভাবটা অকৃত্রিম মনে করছে না কেউ। ওর আড়ালে জীব-ভাবটাই প্রবল দেখছে। কখন কোন্ মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে একটা ঠিক নেই যেন। এই অস্বাচ্ছন্দ্যটাই সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে।

বাইরে এসে ধীরাপদ পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরটা এক টুপি দেখে নিল। শূন্য। মহিলা এখনো আসেনি। কেন আসেনি বা কখন আসবে ইচ্ছে করলেই খবর নিয়ে জেনে নিতে পারে। অফিসের কেউ না কেউ জানে নিশ্চয়। ভিতরে ভিতরে এক ধরণের প্রতীক্ষার মত অনুভব করছে বলেই ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল।

নিচে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল একটু। কিসের প্রস্তুতি নিজেরও অগোচর। কিন্তু দরকার ছিল না, অ্যানালিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টএ অমিতাভ ঘোষ নেই। ফিরল আবার। দোতলায় নয়, একেবারে তিনতলায় উঠল। লাইব্রেরি ঘরও শূন্য। সম্প্রতি দিনের বেশির ভাগ সময় এই দু'জায়গার এক জায়গাতেই থাকে জানত। আসেইনি মোটে।

দোতলায় তার ঘরের সামনে যে মূর্তিটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে ধীরাপদ খুশিও, অবাকও। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদার। হাসি-হাসি, সঙ্কোচ-বিড়ম্বিত প্রতীক্ষা। এখানে আসাটা একান্তই দুঃসাহসের কাজ হল কিনা, চোখের দৃষ্টিতে সেই সংশয়।

তুমি এখানে, কি আশ্চর্য! এসো এসো। কাঁধে হাত দিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো, বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন, ভিতরে এসে বসলেই পারতে—বোসো। নিজেও বসল, তুমি এখানে হঠাৎ, কি খবর?

কাঁধে হাত পড়তেই রমেন হালদার নিশ্চিন্ত। আপ্যায়নে আরো বিগলিত। মেডিকেল হোমের মাইনের দিনে যেমন দেখেছিল, এখানকার এত জাঁকজমকের মধ্যেও তেমনিই দেখছে।

আপনার খুব অসুখ গেল শুনলাম, তাই···

তাই ভালো হয়ে যাবার পর এলে দেখতে?

সলজ্জ-বদনে রমেন ত্রুটি প্রায় স্বীকারই করে নিল। বলল কাজের চাপ বড্ড বেশি এখন, তাছাড়া বাড়িটাও ঠিক জানা নেই। আজ আপনি জয়েন করছেন শুনে ম্যানেজারবাবুই ছুটি দিয়ে দিলেন, বললেন, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে এসো।

ম্যানেজারবাবু! বলো কি? চোখে-মুখে তরল অবিশ্বাস ধীরাপদর।

বলবে না কেন? রমেন হালদারও উৎফুল্ল, লোক চিনতে বাকি কার? যে-ব্যাভার করেছে আপনার সঙ্গে আর কেউ হলে বুঝিয়ে ছাড়ত—আপনাকে চিনেছে বলেই নিশ্চিন্ত এখন।

শোনার ইচ্ছে থাকলে ধীরাপদ প্রশংসা-বচন আরো খানিকটা শুনতে পারত। সে-অবকাশ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নিজের ওষুধের দোকান করার প্ল্যান কতদূর? আমাকে তো আর নেবেই না ঠিক করেছ···

মেডিকেল হোমের মাইনের দিনেও ধীরাপদ হালকা করে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। উদ্দেশ্য ঠাট্টা করা নয়। পারুক না পারুক, ছেলেটার ওই ইচ্ছের উদ্দীপনা ভালো লেগেছিল। তেমনি তাজা আছে কি না ওটা, সেই কৌতূহল। রমেন হালদার সেদিন লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু আজ এই থেকেই কিছু একটা বক্তব্যের মুখে এগোতে চেষ্টা করল। লজ্জিত-মুখেই ধীরাপদকে ব্যবসায় পাবার আশাটা ছেঁটে দিল প্রথম, আপনাকে তখন চিনলে ও-রকম বোকার মত বলতাম না···। তারপর একটু থেমে হতাশার সুরে একেবারে স্থূল বাস্তবের খাদে মুখ থবড়ে পড়ল। আমারও আর কোনদিন কিছু হবে না, ক'টা টাকা মাইনে···মাস গেলে একটা টাকাও বাঁচে না, উল্টে ধার হয়ে যায়, ক'দিন আর মনের জোর থাকে।

সত্যি কথা। ছেলেমানুষের মুখে এই সত্যি কথাটাই ধীরাপদ আশা করেনি। কিন্তু রমেন হালদারের কথার এটুকুই শেষ নয়। তার নিবেদনের সার মর্ম, মনের জোর তা'বলে তার এখনো কম নয়, শুধু ধীরাপদ একটু অনুগ্রহ করলেই কিছুটা সুরাহা হয়।

কানে লাগল কেমন!—আমি কি করলে কি হয়?

কি হয় এতক্ষণে বোঝা গেল। গোড়াতেই বলেছিল বটে কাজের চাপ সম্প্রতি বড্ড বেশি। ধীরাপদ তখন খেয়াল করেনি। তবু মনে মনে ছেলেটার তারিফই করল সে। সেয়ানা বটে। তার আর্জি, দিন পনের হল মেডিকেল হোমের কাজ ছেড়ে একজন অন্যত্র চলে গেছে। পনের টাকা বেশি মাইনে ছিল তার, আর তার কাজও ও-ই করছে আপাতত, অতএব ও-জায়গায় যদি তাকেই পাকাপাকি বহাল করা হয়···
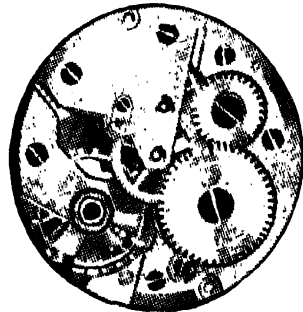
ধীরাপদ আলগা কথার মধ্যে নেই আর, জবাব দিল, আমি কি করতে পারি বলো, ও-সব মিস সরকারের ব্যাপার, তাঁকে বলে দেখো।

রমেন হালদার সবিনয়ে জানালো, সে চেষ্টা করা হয়েছিল, অর্থাৎ, তাঁকে বলানো হয়েছিল। কিন্তু ফল বিপরীত হয়েছে, দেখা হলেই উনি এখন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তাকান ওর দিকে।

ছেলেটার কথাবার্তার এই ধরনটাই ভালো লাগে ধীরাপদর। হেসে ফেলল, কাকে দিয়ে বলিয়েছিলে, ম্যানেজারবাবু?

না, ঢোঁক গিলল, সর্বেশ্বরবাবুকে দিয়ে, ওঁর সেই ভগ্নিপতি···

হালকা বিস্ময়ে ধীরাপদ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখল একপ্রস্থ। ওই নামের ভদ্রলোকটিকে এতদিনে আর মনেও পড়েনি। এখন পড়ছে। হাসির রসে ভেজা ফরসা মুখ, কোঁচানো কাঁচি ধুতি, গিলে পাঞ্জাবীর নিচে ধপধপে জালিগেঞ্জি, পায়ে চেকনাই হলদে নিউকাট, হাতে সোনার ঘড়ি সোনার ব্যাণ্ড, বুক থেকে গলা পর্যন্ত মিনেকরা সোনার বোতাম, মাথার চুলে কলপ-ভাঙা শাদার উঁকিঝুঁকি। বিপত্নীক, পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে। প্রায়ই ভোগে যারা, আর, মাসির হাতের ওষুধ না পড়া পর্যন্ত যাদের একটাও এমনিতে সেরে ওঠে না—মাসি-অন্ত প্রাণ সব। পরিচয় অন্তে রমেনের সেই সঠিক মন্তব্য আজও ভোলেনি ধীরাপদ।

আবারও হেসেই ফেলল, তুমি বড্ড দুষ্ট, এখন ফল ভোগো!

রমেনের মুখ কাঁচুমাচু, আমি তো আমার ভালোর জন্যেই চেষ্টা করেছিলাম দাদা, আপনি যে তখন অসুখে পড়েছিলেন, ম্যানেজার বাবু আমার জন্যে বলতে যাবেন কেন, আমি ভাবলাম ওঁকে দিয়ে বলালেই কাজ হবে—নিজের ভগ্নিপতি, খাতিরও করেন দেখি···।

তা উনি যে তোমার জন্যে বলেছিলেন জানলে কি করে, ভুরু কোঁচকাতে দেখে?

দায় বড়। সহজাত চপলতা দমন করে মাথা নাড়ল। —তা' ছাড়া সর্বেশ্বরবাবুও জানিয়েছেন। মিস সরকার তাঁকে পষ্ট বলে দিয়েছেন, অফিসের ব্যাপারে এভাবে বলা-কওয়াটা উনি পছন্দ করেন না। আচ্ছা, আমার কি দোষ বলুন দাদা—

শেষ করা গেল না। দরজার দিকে চেয়ে রমেন হালদার নির্বাক, আড়ষ্ট একেবারে।

লাবণ্য সরকার। হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছিল। ওকে দেখে হাসির বারো আনা ওপরঅলা সুলভ গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল। আবির্ভাবের লঘু ছন্দ শিথিল হল।

শশব্যস্তে রমেন হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিনয়াবনত অভিবাদন সম্পন্ন করল একটা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য সরকার লক্ষ্য করল কি করল না। এই-ই রীতি এখানকার। ধীরেসুস্থে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতে ধীরাপদই ওর হয়ে কৈফিয়ত দিল যেন, বলল, ওকে চিনলেন তো? ভাবী ভালো ছেলে, আমাকে খুব পছন্দ ওর—অসুখ করেছিল শুনে দেখতে এসেছে।

ভালো ছেলের মুখের ওপর আর একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ —লাবণ্য চেয়ার টেনে বসল। ধীরাপদ রমেনকে বিদায় দিল, তুমি তো আবার কাজে যাবে এক্ষুনি? আজ যাও তাহলে, আবার দেখা হবে।

শুধু এই নির্দেশটুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন, আবারও বিশেষ করে কর্ত্রীটির উদ্দেশেই আনত হয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল সে। গমন বৈচিত্র্যটুকুও উপভোগ্য। লাবণ্য সরকার হাসিমুখে তাকালো এবারে, প্রশ্রয়ের হেতু আবিষ্কারের চেষ্টা করল দুই এক মুহূর্ত। —ভারী ভালো ছেলে বুঝলেন কি করে? আপনাকে দাদা বলে?

হাসছে ধীরাপদও। মাথা নাড়ল, বলে।

লাবণ্য ঠাট্টা করল, গোড়ায় গোড়ায় আমাকেও দিদি ডাকার চেষ্টায় ছিল, আমার তো তবু ভালো ছেলে মনে হয়নি একটুও।

দরদী সুরে ধীরাপদ বলল, সেই ব্যথা বেচারা জীবনে ভুলবে না।

আপনাকে বলেছে বুঝি? লঘু ভ্রূকুটি।

বলেছে যখন, তখন আপনার মতই ও-ও-আমাকে নিজের সমব্যথী সহকর্মী বলে জানত—দাদা সম্পর্কটা তখনই পাতিয়েছিল, কোনো ফলের আশা না করেই।

তবু হালকা জোরের ওপরেই তার ধারণাটা খণ্ডন করতে চেষ্টা করল লাবণ্য, আমি বলছি ও একটুও ভালো ছেলে নয়। এসেছিল কেন, চাকরির তদবিরে?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, সে-ই যেন ধরা পড়েছে।—সেটা কি অপরাধ?···কিন্তু বেচারার কোনো আশা ভরসা নেই দেখছি।

নেই কেন, করে দিন। কিছু করা না করার মালিক তো এখন আপনি।

ব্যাপার তুচ্ছ, আর লাবণ্য সরকার বললও তেমনি তাচ্ছিল্য করেই। তবু উক্তিটা একেবারে শ্লেষশূন্য মনে হল না ধীরাপদর। মনের ভাব গোপন করে জবাব দিল, আমি মালিক হলে তো ওর হয়েই যেত, কিন্তু হওয়া না হওয়াটা কার হাতে সেটা ভালো করেই জানে। আমি অবশ্য একটু সুপারিশের আশা দিয়ে ফেলেছিলাম, তখন কি আর জানতুম···

কি জানত না সেটা আর বলার দরকার হল না। হাসি দিয়েই তুচ্ছ প্রসঙ্গের সহজ সমাপ্তি টেনে দিল। ধীরাপদর ধারণা, সুপারিশটা প্রথম ভগ্নিপতি সর্বেশ্বরের মারফত হয়েছিল বলেই মহিলা এত বিরূপ।

লাবণ্য সরকারও আলোচনাটা ছেঁটে দিল তক্ষুনি। দিল বটে, কিন্তু নির্বিকার চোখ দুটো ওর মুখের উপর তেমনি বিঁধে রইল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কখন এলেন আজ?

চেয়ারে হেলান দিয়ে ধীরাপদ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা, সেই সকালেই তো···।

অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, সেই সকালে আসেনি শুধু, আসার পর থেকে এ পর্যন্ত মুহূর্ত গুনেছে।

সুরসিকার মতই হাসির ছোঁয়া লাগিয়ে বেদনাটুকু উপলব্ধি করে নিল লাবণ্য সরকার। তারপর বসার ভঙ্গিটা দেখাদেখি আর একটু শিথিল করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সকালে এসেছেন যখন মিস্টার মিত্রর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাহলে? উনি তো রোজই আসছেন আজকাল···।

প্রশ্ন স্পষ্ট, তাৎপর্যটুকু নয়। রোজ আসছেন বলার মধ্যে ঈষৎ বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন মনে হল। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বড় মিত্র না ছোট মিত্র, কোন্ মিত্র?

এ্যালবাম

—দীপালী দত্তচৌধুরী

দিলওয়ারা জৈন মন্দির (আবু)

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মরত রামকিঙ্কর

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়
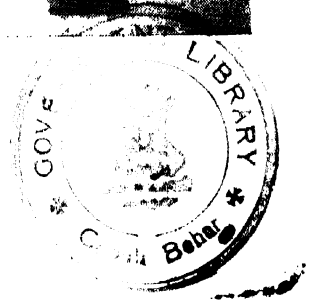
সবার চেনা —মানবেন্দ্রনাথ মিত্র

ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে
নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে
যেন ভুলবেন না।

মৃৎশিল্পী —কিরণচন্দ্র পোদ্দার

ছবি তোলার ছবি —দীপক চাকলাদার

অভিমান

—অনিল কর্মকার

ইলোরা গুহার অভ্যন্তরে —সুখেন্দুকুমার মণ্ডল

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

লাবণ্য টিপ্পনী কাটল, বড় মিত্রর কথাই বলছি, ছোট মিত্রকে নিয়ে কবে আর আপনি মাথা ঘামান?

দেখা হয়েছে। ভয়ল প্রতিবাদ, কিন্তু বড় মিত্রকে নিয়েই বা কবে আবার মাথা ঘামাতে দেখলেন আমাকে?

আপনি মাথা না ঘামালেও উনি ঘামাচ্ছিলেন, রোজই একবার করে আপনার খোঁজ করতেন কবে আসছেন। হালকা বিশ্লেষণের আড়ালে থামল একটু, দেখলও একটু।—বললেন কিছু?

অসুস্থতার পর তিন সপ্তাহ বাদে অফিসে এসে এই প্রশ্নটাই প্রথম শুনবে, ধীরাপদ কল্পনাও করেনি। তারই মত সরাসরি ফিরে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে সঙ্কোচ। ধীরাপদ পেরে ওঠে না, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে চেয়ে থাকতে, খুঁটিয়ে দেখতে। এই রমণী মুখও কি হৃদয়ের দর্পণ? হবেও বা…। লাবণ্য সরকারের হাবভাব, কথাবার্তা এমন কি হাসিটুকুও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যভরা লাগছে না খুব। নারী চোখের অতলে কিছু একটা সমস্যা উকিঝুঁকি দিচ্ছে, সেই সঙ্গে কোতুকও একটু।

নবাগত সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোমের মত অমন ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্রর কোতের মতও স্পষ্ট নয় অত।

যা সহজ ধীরাপদ তাই করল প্রথম। হাসতে লাগল। তারপর যথাযথ সত্যি জবাবই দিল। বড়সাহেব বললেন, আবার যেন এভাবে অসুখবিসুখ বাঁধিয়ে না বসি, অনেক ঝামেলা এখন। আর বললেন, তাঁর বাড়ির বেশির ভাগ ঘরই খালি পড়ে থাকে, অনায়াসেই সেখানে এসে থাকতে পারি।

মুখের দিকে চেয়ে লাবণ্য সরকার চুপচাপ অপেক্ষা করল খানিক। আরো কিছু শুনবে আশা রেখেছিল হয়ত। কিন্তু ওইখানেই শেষ হচ্ছে দেখে অনেকটা নির্লিপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার আপত্তি কেন, বউদির আদর যত্ন পাবেন না বলে?

এ পরিহাস অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে লাবণ্য সরকারের মুখে। ধীরাপদ থতমত খেয়ে গেল কেমন। সেই একদিনে কতটুকুই বা দেখেছে সোনা বউদিকে, আর কতটুকুই বা জেনেছে? মেয়েলি ঠাট্টা না বড় সাহেবের বাৎসল্যের কথা শোনার ফলে মনের জ্বালায় সমূহ আবিষ্কার কিছু? ধীরাপদ আবারও হাসতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত হল না তেমন।

বিস্ময়-ব্যঞ্জনা লাবণ্যর চোখে পড়ল কি না সেই জানে। প্রসন্নমুখেই প্রসঙ্গ বদলে ফেলল চট করে।—যাকগে, আপনি এখন কেমন আছেন বলুন দেখি।

অন্তস্তলের কি এক জটিল অবস্থা থেকে অব্যাহতি আপাতত। অনুযোগ ভরা দুই চোখ তুলে তাকালো ধীরাপদ, এতক্ষণে…! আপনাকে বলব সেই আশায় সকাল থেকে নিজের স্বাস্থ্য সমাচার নানাভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে এতক্ষণে ভুলেই গেলাম।

লাবণ্য হাসিমুখে বলল, ভালোই আছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে।

বিরস বদনে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল ধীরাপদ, ভালো থাকা কাকে বলে আপনারাই জানেন।…মানুষ ছেড়ে অসুখবিসুখের ওপরেও আর আস্থা নেই আমার।

আবারও একটা পরিহাসের আঁচ পেয়ে লাবণ্য সকৌতুকে চেয়ে আছে। ধীরাপদ টেনে টেনে বলল, এই একটা অসুখে অনেক আশা করেছিলাম। আশা ছিল, উনি একটু অন্তত ঘোরালো পথে চলবেন, আর তার ফলে আরো দু'চারদিন অন্তত আপনাকে এই দীনের কুটিরে দেখা যাবে। কিছুই হল না…।

নিজের প্রগলভতায় ধীরাপদ নিজেই পরিতুষ্ট। লাবণ্য সরকারও হাসল একপ্রস্থ। ওজন-পালিশ করা হাসি নয়, দাঁতের আভাস চিকিয়ে-ওঠা ঝকঝকে হাসি।—বড় দুঃখের কথা, কিন্তু ওই আশা রোগের ধকল সামলাতে জানেন তো? মুখ দেখে তো কিছুই বোঝার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল মুখে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, বসুন, টেবিলে একগাদা কি জমে আছে দেখলাম—দেখে আসি। এক্ষুণি পালাচ্ছেন না তো?

ধীরাপদ নিজের অগোচরে মাথা নেড়েছে হয়ত। লাবণ্য ঘরের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই সংটুকুই ভূমিকা শুধু। অনুকূল আবহাওয়া রচনা করে গেল একটু। তার সঙ্কেত আছে কিছু। সেটা শুনতে বাকি। কিন্তু সে-কৌতূহল ঠেলে দিয়ে মনের তলায় কে-যেন চোখ রাঙাচ্ছে।

আবার? আবারও?

তলায় তলায় চকিত অস্বস্তি কিসের। লাবণ্য সরকার তার প্রয়োজনে খুশির হাওয়া রচনা করে গেছে—কিন্তু সেই খুশির বাতাস ওর গায়ে এসে লাগে কেন? গা জুড়ায় কেন? সকাল থেকে কোন আশার দাবিত্রো অমন উসখুস করছিল থেকে থেকে? এই একটু আগে যে প্রস্থান-পরা তনু-সম্মোহন থেকে নিজের চোখ দুটো ছিঁড়ে টেবিলে এনে রাখতে হয়েছিল, তাই বা গোপন করবে কাকে?…আশা-রোগ। ঠাট্টা? একবারের ওই ধকল সামলাতে পেরেছিল কি? সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাণ্ডাটা লাগল কেমন করে, পড়ন্ত শীতের রাতে ওভাবে চান করে অসার কারণটা কি। সময়ে শকুনি ভটচায এসে না গেলে সত্যিই হয়ত সুলতান কুঠি ছাড়তে হত ওকে। সেই থেকে সোনাবউদিকে তো এড়িয়েই চলছে একরকম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ও-রোগের প্রশ্রয় আর দেবে না, প্রবৃত্তিটাকে লাগামের মুখে রাখবে।

এই লাগাম?

লাবণ্য আবারও ঘরে এলো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। হাতে কিসের ফাইল একটা। কাজেরও হতে পারে, সহজ পদার্পণের উপলক্ষও হতে পারে। ফাইলটা ধীরাপদর সামনে ফেলে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল।

ধীরাপদ ওপর থেকে নামটা দেখে নিল, তানিস সর্দারের ফাইল। কুটুম্ব লিভার এক্সট্রাক্ট-এ আধপোড়া হয়ে হাসপাতালে ছিল যে। মুখ তুলতে লাবণ্য বলল, লোকটা জয়েন করেছে, আপনার নিজস্ব বিবেচনার ব্যাপার—আমি ভয়ে হাত দিইনি ওতে। হাসতে লাগল, এমনিতেই তো লোকটা চটে আছে আমার ওপর, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একেবারে বউসুদ্ধ এসে হাজির হয়েছিল আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে—অসুখ শুনে ভয়ানক মন খারাপ। ঠিকানা পেলে আপনার বাড়ি যেত, পেল না বলে অসন্তুষ্ট।

ধীরাপদ কোনো মন্তব্য করল না দেখেই ঠাট্টা করল, আপনারও বোধহয় পছন্দ হল না, বউটার মুখ দেখে অস্থির

ছিলেন, এখন হাসিমুখ দেখতে পেতেন আর অনেক ভক্তি-তার কথাও শুনতে পেতেন দু'জনার।

ধীরাপদ দেখছে, হাসছেও একটু একটু। তেমনি জবাব দিল, তো মন্দ হাসিমুখ দেখছি না, এবারে দুই একটা ভক্তিশ্রদ্ধার া শোনালে আর খেদ থাকে না।

রাগের বাঞ্জনা টিকল না, জব্দ করতে পারলে জব্দ হতে আপত্তি মেয়ের যে সুরসিকা নয়। লাবণ্যর বচনে আর ভ্রূ রেখায় ভি-স্বীকারের প্রস্তুতি।—ওদের মত অতটা কি পারব, বলুন কি নতে চান।

ধীরাপদর হাতের খেয়ালে সামনের ফাইলটা ডাইনে-বাঁয়ে লে একপ্রস্থ।—আমার কেমন মনে হয়েছিল আপনারই কিছু দায় আছে, আর সেটা ঠিক এই তানিস সর্দার আর তার বউয়ের খাট নয়।

লাবণ্যর চোখ দুটো এবারে তার মুখের ওপর থমকে রইল কটু। শুধু কথাগুলো নয়, বলার ধরনটাও অন্যরকম লাগল। চার মুহূর্ত চেয়ে থেকে ছদ্ম-শঙ্কার মন্তব্য করল, আপনাকে যতো খছি ততো ভয় বাড়ছে আমার।

ধীরাপদ ম্রিয়মান।—এটা কি প্রশংসার কথা?

খুব নিন্দার কথা। দু'হাত টেবিলে রেখে লাবণ্য সামনের দিকে টান হয়ে বসল একটু। শাড়ির আধখানা আঁচল কাঁধ থকে কনুইয়ে ভেঙে এলো। জোর দিয়ে বলল, এতদিন াদে এলেন আপনি, অফিসের ব্যাপারে আলোচনা তো ছিলই কিছু, কিন্তু এদিকে তো বেলা শেষ দেখি···আপনার তাড়া আছে?

ধীরাপদ সভয়ে বলল, অফিসের আলোচনা হলে তাড়া আছে। এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?

অমিতবাবুর ওখানে দেরি হয়ে গেল। আপনি আজ আসবেন জানি, আগে আসারই ইচ্ছে ছিল—

সংকোচের লেশমাত্র নেই, তৎপর জবাব। এ-রকম কোনো একটা প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল যেন। কৌতূহলের থেকেও ধীরাপদর বিস্ময় বেশি। এতদিন এই একজনের প্রসঙ্গই সন্তর্পণে পরিহার করে আসতে দেখেছে। এখনো জবাবদিহির দরকার ছিল না। অথচ লাবণ্য সরকার সাগ্রহে তাই করল।

অমিতবাবুর ওখানে মানে বাড়িতে?

হ্যাঁ।

শরীর ভালো তো? অফিসে এলেনই না—

শরীর ভালই। মতি-গতি ভালো না।

অভিযোগ নয়। চিকিৎসক রোগের কারণে অভিযোগ করে না। সংশয়াতীত কোনো রোগ-নির্ণয়ের মতই নির্বিকার আর স্পষ্ট উক্তি। ধীরাপদর কৌতূহল বাড়ছে, বিস্ময়ও। দু-চোখ টান করে তাকাবার সুযোগ হল এবারে। সেটা ভালো করার দায়িত্বও কি আপনার ওপরেই নাকি?

জবাবে লঘু কৌতুকের আভাস। দায়িত্বটা প্রায় স্বীকার করে নিয়েই বলল, ডাক্তারের দায় কম নাকি—সময় বিশেষে ওটাও রোগের আওতায় পড়ে। থামল একটু, আলোচনা শুরু করে হালকা কথায় সময় দিতে আপত্তি। এদিকের ব্যবস্থাপত্রের কিছু অদলবদল হয়েছে···শুনেছেন সব?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, শুনেছে। সিতাংশু মিত্র আর জীবন সোম এসেছিলেন জানালো। বলল, কাউকে তো খুশি দেখছি না তেমন।

লাবণ্যর মতে সিতাংশুর অসন্তোষের হেতুটা অসঙ্গত নয় হয়ত। জিজ্ঞাসা করল, মিঃ সোমের আবার অখুশির কারণটা কী?

কাজ-কর্মের সুবিধে হচ্ছে না···কো-অপারেশন পাচ্ছেন না।

লাবণ্যর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়ল কয়েকটা।—কাজ-কর্মের সুবিধের জন্যে তাঁর এখনি অত ব্যস্ত হবার দরকারটা কী? মিঃ মিত্রকেও সেদিন ও কথা বলে এসেছেন—

লাবণ্যর মিঃ মিত্র অর্থাৎ বড়সাহেব। ধীরাপদ নিরুত্তর।

জীবন সোমের প্রসঙ্গও আর টানা প্রয়োজন বোধ করল না লাবণ্য। বলল, ও কথা থাক, এখন মুশকিল হয়েছে অমিতবাবুকে নিয়ে, তিনি ভাবছেন সবাই তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র লেগেছে—তাঁর মামাও।

ধীরাপদর খানিক আগের অনুমান মিথ্যে নয়। লাবণ্যর সব সমস্যা আর আলোচনা ওই একজনকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু সমস্যাটা যেমন জটিল, ওর সঙ্গে এই আলোচনার বাসনাটাও তেমনি অস্পষ্ট।

—ও দুদিনেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। শোনার আগ্রহ প্রবল বলেই ধীরাপদর উক্তিটা নিস্পৃহ।

লাবণ্য তক্ষুণি মাথা নাড়ল, ওই ভদ্রলোকের বেলায় অত সহজে ঠিক হয় না কিছু। সত্যি হোক মিথ্যে হোক ভিতরে বড় রকমের একটা নাড়াচাড়া পড়লেই একেবারে অস্থির কাণ্ড—ভালো হাতে অসুখ বাঁধানোর দাখিল।···এ রকম আমি আগেও একবার দেখছি··· ভালো করে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলা দরকার তাঁকে।

আলোচনার উদ্দেশ্য বোঝা গেল।

ধীরাপদর জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আগেও একবার লাবণ্য কবে দেখেছিল এরকম, সত্যি হোক মিথ্যে হোক, বড় রকমের নাড়া-চাড়াটা কবে পড়তে দেখেছিল এর আগে। সেটা এই কর্ম-বাণিজ্যে লাবণ্য সরকারের বন্ধন বরণের পরেই কি না, সেই কারণেই কি না—অমিতাভ ঘোষের বুকের কোনো দিক খালি হয়ে গিয়েছিল বলে কি না।

জানা সম্ভব নয়। লাবণ্যর বক্তব্য শেষ হয়েছে মনে হয় না, শোনার আশায় ধীরাপদ নিরুত্তর।

এই প্রথম রমণী-মুখে একটু বিধার ভাব। নিরুপায় একটু হাসির চেষ্টাও। নিজের সমস্যার ঢাকনা সরালো তারপর. ভদ্রলোকের ধারণা কি জানেন ? এই সব কিছুর মূলে আমি—সিতাংশু বাবুকে বলে কয়ে সিনিয়র কেমিষ্ট আনার ব্যবস্থাটা আমিই করেছি—

ধীরাপদর মজাই লাগছে শুনতে। রমণীর মন শুধু দূর থেকেই দুর্জ্ঞেয় বোধহয়। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসাই করে বসল, সেটা একেবারে ঠিক নয় বলছেন ?

আয়নায় ঘা খেলে আলোর বদলে যে-টুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু শুধু। তারপরেই রূপান্তর। নির্বাক, কঠিন। শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিল। সোজা হয়ে বসল একটু। টেবিলের ওপরের হাত দুটো নিজের কাছাকাছি গুটিয়ে নিল। নিটোল দুই বাহুতে ধবধবে আঁট ব্লাউসের কনুই ঘেঁষা হাতাও দুটোর লাবণ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। দৃষ্টি খরখরে।

অমিতবাবু এর মধ্যে আপনার ওখানে গেছলেন ?

না তো···কেন ? নির্ভেজাল বিস্ময়।

আপনার কথা শুনে ভাবলাম, ধারণাটা আপনিই তাঁর মাথায় এনে দিলেন কি না।

কথাটার প্রতিক্রিয়া এতটা গোলমেলে হবে ধীরাপদ ভাবেনি। সবিনয়ে জবাব দিল, তাঁর নিজের ধারণা-শক্তি আমার থেকে কম নয়।

লাবণ্যর পর্যবেক্ষণরত দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর স্থির তেমনি। কণ্ঠস্বর রূঢ় শোনালো, আপনি আর কতদিন এসেছেন এখানে, দায়িত্ব নেবার লোকের অভাবে ওখানে কি অসুবিধের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় তারই বা কতটুকু জানেন ? আমি সে ঝুঁকি নিতে যাব কেন ? আমি ভুগব কেন ?

ধীরাপদ সমব্যথীর মতই সায় দিল তক্ষুনি, একটু আগে সিতাংশুবাবুও এই কথাই বলছিলেন—

সিতাংশুবাবুর কথা থাক, আপনি কি বলেন ?

উষ্মার ঝাপটায় ধীরাপদ যথার্থই কাহিল।—নিরুপায় বিড়ম্বনার পাল্টা বিস্ময় জ্ঞাপন করল, এসব বড় ব্যাপারে আমি কি বলব !

নীরবে দুই এক মুহূর্ত তার মুখের ওপর তপ্ত ব্যঙ্গ ছড়ালো লাবণ্য সরকার। সস্নেহে বলার রাস্তাটাই যেন দেখিয়ে দিল তারপর। —আর কিছু না পারেন, অমিতবাবুকে গিয়েই বলুন তাহলে, তাঁকে জব্দ করার জন্যেই সিনিয়ার কেমিষ্ট আনা হয়েছে এখানে—তারী খুশি হবেন।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার উপক্রম করতে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি বাধা দিল, বসুন বসুন—। এমন শ্লেষটাও একটুও বেঁধেনি যেন, হাসিমুখে বলল, অমিতবাবুকে খুশি করার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই, আপনি কি করলে খুশি হবেন তাই বলুন।

লাবণ্য জবাব দিল না। দেখছে। আর, লোকটার গণ্ডারের চামড়া কিনা তাই ভাবছে হয়ত।

ধীরাপদর মুখে এবারে আন্তরিক গাম্ভীর্য। আপনাদের সমস্যাটা সত্যিই আমার মাথায় ঢোকেনি এখন পর্যন্ত।···কোম্পানীর দরকারে সিনিয়ার কেমিষ্ট আনা হয়েছে, সেটা না বুঝে কেউ যদি মাথা গরম করেন তা নিয়ে আপনারা ভেবে কি করবেন ?

কিছু না ভেবেই অসহিষ্ণু-কণ্ঠে লাবণ্য বলে উঠল, তাঁকে চিনলে আপনিও ভাবতেন, ও-ভাবে মাথা গরম করলে শক্ত অসুখ হয়ে বসতে পারে—ভাবি এই জন্যে।

ধীরাপদর দুচোখ এবারে সম্মুখবর্তিনীর মুখের ওপর নিবদ্ধ। ভাবনার এটাই একমাত্র নিগূঢ় হেতু বলে মনে হল না। হাসতে লাগল, দুর্বোধ্যতার বিভাসটুকুও প্রায় অকৃত্রিম। বলল, ডাক্তারদের তো রোগ নিয়েই কারবার···তার জন্যেই বা বিশেষ করে আপনার এত চিন্তা কেন ?

লাবণ্যর এতক্ষণের বিরূপতা থেকে তপ্ত ভাবটুকুও যেন ছেঁকে সরিয়ে নেওয়া হল একেবারে। স্থাপিত দৃষ্টিটা স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। যে-দুর্বলতা সংগোপনে লালনের বস্তু তাই যেন ছিঁড়েখুঁড়ে প্রকাশ্য আলোর এনে ফেলা হয়েছে।

ধীরাপদ তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল, যাক, এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি বলুন।

বলতে সময় লাগল। তার আগে নতুন করে আরো একবার ভালো করে দেখে নেবার প্রয়োজন আছে যেন লোকটাকে।

···ভেবেছিলাম পারেন। ভাবা ভুল হয়েছে। থামল একটু, অনুচ্চ কঠিন শ্লেষে বিদ্ধ করার শেষ চেষ্টা। বড়সাহেব আপনাকে আদর করে নিজের বাড়িতে এনে রাখতে চান আবার অমিত বাবুও আপনাকেই একমাত্র বন্ধু বলে ভাবেন।···আপনি কি করতে পারেন আমি বলব !

ধীরাপদ হাসছে। পরিস্থিতি তারই করায়ত্ত। রাগ করল না, কৃত্রিম-প্রশস্তি খণ্ডনের চেষ্টাও করল না। ওই সৌভাগ্য-বৈচিত্র্য তার নিজেরই বিস্ময়ের কারণ যেন।—আশ্চর্য। অথচ দেখুন, আমি ডাক্তার নই—বড়সাহেবের ব্লাডপ্রেসারও মাপিনি কখনো বা চীফ কেমিষ্টের মতিগতি ভালো করার দায়ও ঘাড়ে নিইনি, কেন যে কি হয়—

স্বর্ণকারের ঠুকঠাক, কর্মকারের এক ঘা। অনেকক্ষণ ধরে ওই ঠুকঠাকের জবাব দেয়নি ধীরাপদ। দেবার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দিয়ে পারা গেল না।

না, লাবণ্য সরকার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেনি, ঘর ছেড়ে সবেগে প্রস্থানও করেনি তক্ষুনি। আরো খানিক বসেছিল। আরো খানিক দেখেছিল। ঠাণ্ডা নির্লিপ্তমুখে তারপর অফিস সংক্রান্ত আরো দুচার কথা বলেছিল। কোন্ ফাইলটা আগে দেখা দরকার, কোন্ প্যামফ্লেটটা অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে, কোন লেবার ইউনিটের কি আর্জি।

তারপর উঠে গেছে।

তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকো। আমি আমার কাজ করে যাব। দু'জনার কাজের মাঝে যে যে যোগ তাতে আর বাড়তি কিছু যুক্ত হবে না। আমি ভুল করেছিলাম। নিজেকে বড় বেশি উন্মুক্ত করেছিলাম। আর না। আর একটুও না। এবারে ভুল করার আগে ভাবব, হিসেবের জাল বুনে বুনে এগোবো।

লাবণ্য সরকার বলেনি অবশ্য। কিন্তু সবই বলার দরকার হয় না।

শান্ত ছেদ কি একটা। সামনের চেয়ারটা বড় বেশি শূন্য লাগছে ধীরাপদর। ওটা বুঝি আর তেমন করে ভরবে না। [ক্রমশঃ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

তারপর একসময়—একরকম নিজের অজান্তেই হাতের খাতা বিছানার উপর নামিয়ে রেখে মঞ্জু যখন এসে জানালার শিক ধরে—দাঁড়ালো, তখন প্রায় সে চোখ বুজে বলে যেতে পারে।

…বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা বাহিরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি। কাছের লোককে তারা দূরে ঠেলে, আপনকে করে পর, স্বপক্ষকে পেছন থেকে করতে থাকে বলহীন।…যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে ঊর্দ্ধে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে তখন আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করে, নিজেদের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রু পক্ষের স্পর্দ্ধাকে তোলে প্রবল করে—'

জানালার দুটো শিক দুহাতে মুঠো করে ধরে মুখটা জানালায় চেপে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চুল আর মুখটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া—এ ধাতে নেই মঞ্জুর। এক মাথা উড়ো চুল নিয়ে রোজ গিয়ে চায়ের টেবিলে বসে, রোজ বিরক্তি প্রকাশ করে মৌরী। তবু মঞ্জুর স্বভাব শোধরায় না। একদিন আয়নার কাছে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে মুখটা পরিষ্কার করে এলো তো দশদিন আ[illegible]সে মুখো হয়না সে। আজও তার এলো মেলো চুলের বি[illegible] দুটো পড়ে রয়েছে ঘাড়ে পিঠে। ছোট ছোট উড়ো চুলগুলো [illegible]-ড় রয়েছে মুখের এপাশে ওপাশে।

কাল [illegible]য় সমস্ত রাত বৃষ্টি গেছে। গলিতে দাঁড়ানো জল এখনো নেমে যায়নি। কাপড় কোমরে গুজে, পাজামা প্যান্ট হাঁটুর উপর টেনে তুলে ধরে কাজের মানুষ কাজের তাড়ায়—আসা যাওয়া করছে জল ঠেলে। ফেরিওয়ালা হেঁকে চলেছে, 'ঢাকাই বাখরখানি।' 'জেলীম্যান মেমসাহেব জেলীম্যান' কেক—প্যাটি…আকাশভরা মেঘ। বৃষ্টি আবার আসবে। দিনের উপায় যা কিছু হোক করে নেওয়ার জন্য দোতলা তেতলার দিকে চোখ তুলে তাকাতে তাকাতে একটানা স্বরে ডেকে চলেছে তারা। জানলায় দাঁড়ানো মঞ্জুকে দেখে একবার করে তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে আর ডেকে উঠছে, 'বাখরখানি' 'জেলীম্যান' মেমসাহেব জেলীম্যান কেক—প্যাটি…

কিন্তু মঞ্জু এসব কিছুই দেখছিল না। তার দৃষ্টির সামনে জল দাঁড়ানো গলি নয়, পাগলা আনন্দে ওলট-পালট খেয়ে স্নান করে চলা ওদের সেই নারকেল গাছটা নয়। দু'পায়ে জল ঠেলে চলা এই মানুষগুলো নয়, হেঁকে চলা ফেরিওয়ালা নয়—মেঘভরা আকাশ নয়। যতদূর দৃষ্টি চলে মঞ্জুর সামনে ধূ-ধূ করছে জনশূন্য মাঠ, আর অবারিত প্রান্তর। আকাশে জ্বলন্ত সূর্য্য। নীচে উত্তপ্ত মাঠে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে গরু ভেড়া ছাগল। গরু চরানো মেয়ে বসে আছে গাছের তলায় গালে হাত রেখে। সূর্য্যতাপে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। মাথার সোনালি চুল তার রোদের আলোয় জ্বলছে আর হাওয়ায় উড়ছে আগুনের শিখার মতো। নীল চোখের দৃষ্টি তার নীল আকাশে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এক এক বার দমকা বাতাস উঠছে। সে দমকা বাতাস এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বয়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে। গরুচরানো মেয়ের কানের পাশে শব্দ উঠছে সোঁ-সোঁ। সে মেয়ে শুনছে—শোন, শোন, শোন। ওগো মেয়ে শোন। সাহস করে এগিয়ে যাও। আমি তোমার সহায় হব। দেশের বড় দুর্দ্দিন। দূরে গীর্জ্জার পেটা ঘড়ি বেজে চলেছে ঢং-ঢং-ঢং।

মঞ্জুর দুই গাল আর দুই ভুরুর উপর গভীর দাগ কেটে চললো সমান্তরাল রেখায় চলে যাওয়া জানালার শিক দুটো। দূর থেকে যদি কেউ এখন মঞ্জুকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখে, মানুষ ভাববে না, ভাববে ছবি। কালো মেঘের একটা কালো মুখের ছবি। প্রথম দৃষ্টিতে ভাববে, শিল্পীর হাতে অতি সযত্নে আঁকা ছবি। মুখকে রমণীয় করার দিকে শিল্পীর কোন আগ্রহ ছিলনা। প্রশস্ত কপালের উপর এলোমেলো গোটা কয়েক গোলাকৃত রেখায় ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন চুলের। মুখের ডৌল তুলতে হাতের তুলিটা একবার ঘুরিয়ে এনেছেন অবহেলায়। কাঁধ আর শাড়ীর আভাস দিয়ে গেছেন শুধু তুলি স্নান করে। কিন্তু না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে চমকে উঠতে হবে তাকে। এঁকেছেন শিল্পী—ঐ আলো পড়া চোখ দুটো যে রশ্মি ছড়াচ্ছে, ঠোঁটের ডান কোণে পড়ে থাকা রোদের টুকরোটা ঠোঁটে যে ধার তুলছে—আপন শক্তির প্রকাশ শিল্পী রেখে গেছেন সেখানে।

সকাল এগিয়ে চললো। পাশের ঘর থেকে পিসীমার হাতের ঘন্টার ধ্বনি এসে মিলে যেতে লাগলো মঞ্জুর কানের সেই গীর্জ্জার পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দের সঙ্গে। করপোরেশনের লোক এসে রাস্তার আগার ড্রেনের মুখ খুলে দিল। জল তোড়ে নেমে চললো নীচের দিকে। পাহাড়া দিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ঘিরে দাঁড়ালো বস্তীর ছেলে মেয়েরা জল নেমে যাওয়া দেখতে। মেঘের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো রোদ মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করতে লাগলো বিষণ্ণমুখী মেয়ের মুখের হাসির মতো।

জল নেমে গেলে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তায় হাঁটা দিল মঞ্জু। ঘুরবে ঘুরবে কেবল ঘুরবে সে। কেবল নিরুদ্দেশ ঘোরায় ঘুরে বেড়াবে সে আজ।

মেডিকেল কলেজের সামনে এসে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে পড়লো মঞ্জু। রক্ত-বিক্রির দীর্ঘ লাইনটার দিকে তাকিয়ে নেমে পড়েছে সে। এ লাইন তার পরিচিত। লাইন দিনকে দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে এক রকম তার চোখের ওপর। কত টাকা করে দেয়? যাই দিক টাকা উপায়ের একটা সন্ধান যেন হঠাৎ মিলে গেল তার। লম্বা লাইনের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়ল গিয়ে সে। একজন করে ভেতরে যায় রক্ত দিতে, সবার সঙ্গে সঙ্গে এক পা করে এগোয় মঞ্জু আর

ভাবে, মৌয়া জানতে পেলে চেঁচামেচি করে একসা করবে। তারপর ঘরে শিকল তুলে তালা বন্ধ করে বলবে, 'থাকো।' নীল যদি এখন পথ চলতে গিয়ে ওকে এখানে দেখতে পায় তবে কি করবে। কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। শুধু নীরবে এসে সেও দাঁড়াবে সব পেছনে। ওর রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে, বাড়িয়ে দেবে সে তার হাত। তারপর বাইরে এসে বলবে, চলুন কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক

আর রজতের গাড়ী যদি এখন এখান দিয়ে যায়? সে ওকে দেখতে পায়? না, সে বুঝবেই না এটা এখানে কিসের লাইন। সে ভাববে 'বোম্বাইকা বাবু' দেখার টিকিট কাটার লাইন পড়েছে এটা। মঞ্জুও দাঁড়িয়েছে এসে ঐ 'বোম্বাইকা বাবুর' টিকিট কাটাতে। আচ্ছা, রজতের বন্ধ দরজার কাছে পৃথিবী কি তেমনি থেমে আছে? তার ঘরে কি সেই একই উল্লাস ফুর্তি হুল্লোড় চলছে? গ্লাসে গ্লাসে তেমনি সোনালি মদ পরিবেশন করে চলেছে ওয়েটার। কৌচে কৌচে তেমনি হেলে মনোহর ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সব রূপসী রমণী?

'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ব্লক—বৃটিশ যুগে ছিল নাকি কেবল ইউরোপীয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট। কালা আদমীদের প্রবেশের অধিকার ছিল না সেখানে। তখন তার চেহারাও নিশ্চয়ই তার নামানুযায়ী ছিল। এখনকার মতো মলিন দীনহীন চেহারা ছিল না। তারই মাটির তলার অন্ধকার ঘরে ব্লাড-ব্যাঙ্ক। যদিও আলো জ্বলছে তবু ভেতরে ঢুকে প্রথমটায় সব অন্ধকার দেখলো মঞ্জু। কিন্তু ওর দেখা না দেখায় কি আসে যায়। তার হাত ততক্ষণে ডাক্তারের হাতে চলে গেছে। ব্যস্ত ডাক্তার তার আঙুল স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে মুছছে। মঞ্জু বসলে আঙুলে সূই ঢুকিয়ে মাপমতো রক্ত টেনে নিয়ে, ফের আঙুলটা স্পিরিটে মুছে ছেড়ে দিল তাকে। আর একটা বাড়ানো হাত টেনে নিল হাতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সূই ফোঁড়া আঙুলটা মঞ্জু দেখল। পিঁপড়ের কামড়ের মতো, একটা ছোট লাল বিন্দু। লাগেওনি একটু। একটু দাঁড়ালো। মাথাটা কি ঝিমঝিম করছে? না কিছুনা। তাই যদি করবে তবে ঐ হাড্ডিসার কঙ্কাল, না খাওয়া মানুষগুলো রক্ত দিচ্ছে কি করে। হাতের মুঠোর দশ টাকার নোটটা ব্যাগে ভরল। মন্দ কি হল।

কিন্তু মাথার ভেতর এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ঘুরিয়ে এনে মিলিয়ে উঠতে পারেনা মঞ্জু—খাওয়ার জন্য রক্ত বেচা, আবার সেই রক্তের জন্য খাওয়া। আবার খাওয়ার জন্যে রক্ত বেচা, আবার সেই রক্তের জন্যেই খাওয়া—বৃত্তটা কি মিলছে? বৃত্তটা কি ঘুরছে? এই বৃত্তটাই কি কৃষ্ণের হাতের সুদর্শন চক্রের বৃত্ত?

রজতের মস্ত মেহেগনি কাঠের ভারি পাল্লার দরজায় অঙ্গুলের টোকা দিয়ে যেন সেই টোকার শব্দে চৈতন্য হলো মঞ্জুর—সে রজতের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে এখানে এলো কি করে। ট্রামে উঠে? বাসে চেপে? না কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে সোজা শূন্য দিয়ে তুলে এনে রজতের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিলো! রজতের বন্ধ দরজার কাছে পৃথিবী তেমনি থেমে আছে কি না, তার ঘরে সেই রকম হুল্লোড় উল্লাসই চলছে কি না—গ্লাসে গ্লাসে মদ, কৌচে কৌচে রূপসী নারী তেমনি বসে আছে কিনা, যদিও এ কথা তার মনে এসেছিল কিউতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেজন্য মঞ্জু সে সব সত্যি কিনা দেখবার জন্য এখানে এসে উপস্থিত হতে পারেনা—কখনই পারে না।

ততক্ষণে—ভেতর থেকে রজত বার কয় উপর্যুপরি ডেকে ফেলেছে—কাম ইন—কাম ইন—

না, মঞ্জু যাবে না। পলকে রজতের ঘরের অভ্যন্তরটা চোখের উপর ঘুরে গেল ওর। হয়তো সবে মাত্র রজত ঘুম ভেঙে উঠেছে। কফির পেয়ালা সামনে করে তিক্ত বিরক্ত মুখে বসে আছে রাতের অবসাদ অবসন্নতা নিয়ে—না! নিঃশব্দে নিঃসাড়ে চলে যাবার জন্য ফিরছিল মঞ্জু, কিন্তু তক্ষুনি রজতের পরিচিত বয়টাকে কিছু ধোয়া কাপড় জামা হাতে উঠে আসতে দেখে থামল সে। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে এইমাত্র আসতেও দেখেছে। এখন এসে দরজার কাছ থেকে এ ভাবে ফিরে যেতে দেখলে কি ভাববে কে জানে। না আর চলে যাওয়া যায় না। লোকটাও ততক্ষণে এসে দরজা খুলে ধরে সসম্ভ্রমে বলছে, যাইয়ে মেম সাব।

ভেতরেই যেতে হলো মঞ্জুকে।

কিন্তু না—রজত কফির পেয়লা নিয়ে বিতৃষ্ণ মুখে বসে নেই। যে চেহারাটা রজতের সব চাইতে বেশী পরিচিত মঞ্জুর কাছে, তার কথা মনে হলেই যে চেহারাটা মঞ্জুর সব আগে চোখের উপর ভেসে ওঠে, সেই ভাবেই দেখল রজতকে। হাত দুটো পেছনে রেখে, সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে কার্পেটের উপর খালিপায় পায়চারি করছে সে। এই মাত্র এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। তাই মঞ্জুর ঘরে ঢোকা দেখতে পেলো না।

কাঁধের ব্যাগ নিঃশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোফায় বসলো মঞ্জু। আর ফের ওদিক থেকে এদিকে ঘুরে, মঞ্জুকে সোফায় বসে থাকতে দেখে একেবারে চমকে উঠল রজত বিস্ময়ে আনন্দে বলে উঠল, আরে মঞ্জু!

রজতের কণ্ঠে আনন্দের কোন পরিমাণ ছিল না। বয়টাও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে একবার তার মুখের দিকে তাকালো।

রজত এসে মঞ্জুর সামনে দাঁড়ালো। বললো—তুমি এখন আমার ঘরে, আমার সামনে বসে রয়েছ, এ আমি ভাবতেই পারছি নে·······

একেবারে ছেলেমানুষি আহ্লাদ প্রকাশ।—মঞ্জু বহুদিন বাদে এসেচে। জয়ার আত্মহত্যার দিন সেই যে হাসপাতাল থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মঞ্জু রজতের কাছে বিশ্রামের জন্য এসে তাকে মত্ত এবং তার শয্যায় অর্দ্ধশায়িত তার মত্ত বান্ধবীকে দেখে চলে গিয়েছিল, আর সে এমুখো হয়নি। সংকল্প ছিল তার, আর এ মুখো হবেও না। রজতও বুঝেছিল তা। তাই কি ওকে দেখে তার এই বিস্ময় প্রকাশ? কিন্তু না। রজতের খুশী আর বিস্ময় দুটোই এতো বেশী যে ওকে বেড় পেলোনা মঞ্জু। বললো—আমি আর আসবো এটা হয়তো আপনি ভাবেননি, তাই আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হতে পারেন কিন্তু এতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে করছেন কেন আমার আসা—এটা আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনে।

রজত বসতে বসতে বললো—তোমার আসাটা নয়—তোমার এই মুহূর্তের আসাটাকে সত্যি একেবারে একটা অবিশ্বাস্য আশ্চর্য্য ঘটনা মনে হচ্ছে আমার। কারণ, এই মুহূর্তে ঘরের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম তোমার জন্য।

রজতের বলার ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যে মঞ্জু যথার্থই এবার বিস্মিত হলো।

রজত বললো—আমি তোমাকে কি ভাবে যে চাচ্ছিলাম তার পরিমাণ তুমি জাননা। তাই সেই আমার চাওয়ার সঙ্গে তোমার এই আসাটা যে কি আশ্চর্য্য ঘটনা তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। আমি ভাবছি—অবাক হয়ে ভাবছি, সে কোন শক্তি, যে আমার চাওয়ায় তোমাকে এনে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল!

রজতের কথার ওজন হাল্কা করতে চাইল মঞ্জু। হেসে বললো—ভৌতিক কাণ্ড নয় তো?

হাসল রজতও। বললো—না। মরে যখন যাইনি তখন ভৌতিক নয়। তবে আধিভৌতিক তো নিশ্চয়ই। সোফার উপর কাত হয়ে পড়ে থাকা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট-এর কৌটাটা তুলে নিয়ে তার মধ্যে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল সে। তারপর টিনের মুখটা বন্ধ করে সেটাকে ফের সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—তা যার কাণ্ডই হোক, যদি এমনি অবিশ্বাস্য ঘটনা কিছু কিছুও ঘটত, তবেই তো আর পৃথিবীটাকে বসবাস করার পক্ষে এমন নিদারুণ একঘেয়ে ঠেকত না—লাইটারে টিপ দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিল রজত। তারপর বললো—তুমি তো আবার কফি পছন্দ করো না। চা বলি।

বলতে হলো না। বয় এসে ঢুকল ট্রে হাতে। ওদের সামনে চায়ের ট্রে নামিয়ে চলে গেল নীরবে।

—দেখলে, কেমন কাজ শিখিয়েছি। সাহেবের কাছে কে এলে, কি পরিবেশন করতে হবে তা পর্যন্ত জানে। চা না কফি, অরেঞ্জ স্কোয়াস না বিয়ার।

রজতের কথা, তার এই কাত হয়ে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া, তার মুখের হাসি—সব কিছুর আড়ালে কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট বেদনার সুর রয়েছে মনে হলো মঞ্জুর। যা ইতিপূর্বে রজতের ভেতর সে আর কখনো দেখেনি। পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে তার হাতলটা আঙুলে ঘুরিয়ে নিজের দিকে এনে এ কথাটাই ভাবতে ভাবতে কাপে চুমুক দিতে লাগল সে। তারপর রজতকেও চুপ দেখে জিজ্ঞাসা করল—আমার কথা কেন ভাবছিলেন, তা তো বললেন না?

ছাইদানে ছাই ঝাড়ল রজত হাত বাড়িয়ে। বললো—তোমার কথা আমি কারণ ছাড়াই ভাবি। তবে আজ ভাবছিলাম, চলে যাবার আগে একবার দেখা করার জন্য।

—চলে যাবার আগে মানে?

—'কে যেন বলে মোরে চলো দূরে

কে যেন কানে কানে কয়

আর নয় আর নয়'—

বুঝলে মঞ্জু? ভেবেছিলাম, চুপচাপ চলে যাবো। কিন্তু আজ যাওয়ার দিনটি যখন এসে উপস্থিত হলো, তখন একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য সে যে কি চঞ্চলতা বোধ করতে লাগলাম—

—আজই যাচ্ছেন!

—আজই যাচ্ছি। চারটার সময় আমার প্লেন। কাল এ সময় লণ্ডনে বসে লাঞ্চ খেতে না পারলেও, রাতের ডিনারটা করতে পারবো। তারপর অবশ্য কবে যে কোন দেশের কোন হোটেলে আমার চাল বরাদ্দ রয়েছে, তা আমিও জানিনে। এ হলো আমার খবর। এখন তোমার খবর বলো। জয়া কেমন আছে?

—ভালো।

—হাসপাতালে না বাড়ীতে সে?

—এখনও হাসপাতালে।

—ভোরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে ক'টা মাষ্টারি করছ?

—একটাও নয়।

—কেবল দিন-রাত টাকার ভাবনা করছ?

চুপ করে রইল মঞ্জু।

—ডাক্তার এসেছিল?

—ডাক্তার কে?

—তোমার দিদির যার সঙ্গে বিয়ের কথা।

—ও! হাঁ।

—তাই বলো। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সোজা হলো রজত। বললো—বলেছিলাম না, ডাক্তার আসবেই। তা, তোমার দিদি কি বলছেন? বেচারা ডাক্তার তার প্রসাদলাভ করেছেন তো?

—মনে হয় করবেন।

—ডাক্তার এখন এখানে?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়ীতে রোজ আসেন?

—হাঁ।

—জানো আমি তোমাদের এমনি আসরে কতদিন গিয়ে যে মনে মনে উপস্থিত হয়েছি তার ঠিক নেই। তোমার দিদির সঙ্গে আলাপ করেছি। বৌদির হাত থেকে চা নিয়ে গিয়ে তোমার পাশে বসেছি। ডাক্তারকে সাত দিনের ভেতর বিয়ের তারিখ ফেলতে বলেছি। হাসপাতালে জয়াকে দেখতে গেছি। সেখানে মমতার সঙ্গে পরিচয় করেছি। শুধু কি তাই—সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো রজত। পায়চারি করতে করতে বললো—ছটুর কথা ভেবেছি। জয়ার সঙ্গে কথা বলেছি—তোমাদের সেই ভাঙ্গা বাগানবাড়ীটা স্কুলের জন্য দেখে এসেছি। আরো কত কি যে করেছি তার ঠিক নেই। আচ্ছা মঞ্জু!

মঞ্জুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত—তুমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে তুমি দৈববাণী শোন বলে—

—ঠাট্টা করে বলিনি। আমি শুনি।

রজত তাকিয়ে রইল মঞ্জুর দিকে। মঞ্জু বললো—রামকৃষ্ণদেব কালী দর্শন করতেন। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ। মীরা হাসতেন, কাঁদতেন, গাইতেন গোপাল দর্শন করে—মিথ্যে কি এ সব?

—তুমি কি শোন?

নিরুত্তর বসে রইল মঞ্জু।

—বল? আকুলতা প্রকাশ পেলো রজতের গলায়। আমি আজকের দিনটি সঙ্গে নিয়ে যাবো মঞ্জু! বলো।

রজতের মুখে তার চলে যাবার কথাটা আচমকা শোনার পর থেকে বুকের ভেতরটায় যে মঞ্জুর কি হচ্ছিল, তার রূপটা সে নিজেই ধরে উঠতে পারছিল না। একটার পর একটা রক্তের ঢেউ যেন ছলাৎ করে এসে বুকের উপর আছড়ে পড়ছিল। কোন মতে সংযত কণ্ঠে সে জবাব দিয়ে চলেছিল রজতের কথার। একটু সময় চুপ করে থেকে বললো—শুনি কে যেন বলে আমাকে, দেখো কি আশ্চর্য্য রকম প্রস্তুত সবাই। কারু দরজায় ঘা দিতে হবে না, কাউকে ডাকতে হবে না, সাড়া পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়বে সবাই—

—তার পর?

—তারপর হয় জনস্রোত আমরা জলস্রোতের মতো সব পাঁক ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলবো। নয়তো এই পাঁকের ভেতরই ছিটিয়ে চলবো আমরা পদ্মবীজ।

—তার পর?

—তার পর আর কি? এ দ্যুলোক মধুময় হবে, মধুময় হবে পৃথিবীর ধূলি। দিন মধুময় হবে, মধুময় হবে রাত। বাতাস মধুময় হবে; মধুময় হবে নদী—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধিঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্ নঃ বনস্পতিঃ
মধু মান্ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রজত। যেন হিমালয়ে তপস্যারত ঋষি-কণ্ঠ নিঃসৃত বেদমন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল তার কানে—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধিঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো—

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল।

এরই ভেতর কখন এসে যেন বয় ড্রিঙ্কের সাজ-সরঞ্জাম রেখে গিয়েছিল। এবার নিয়ে এলো মধ্যাহ্ন-আহার। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে টেবিল ঝেড়ে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বয় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। পালিশকরা জুতোর মচমচ শব্দ তুলে ঘরে এসে প্রবেশ করলো রজতের ম্যানেজার। মৃদু কণ্ঠে স্যার বলে সম্বোধন করে কিছু কাগজপত্রের একটা ফাইল তার সামনের টেবিলের উপর রেখে কলম বাড়িয়ে ধরল রজতের দিকে। ম্যানেজারের হাত থেকে কলম নিয়ে কাগজের ওপর একটু করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে সই দিয়ে চলল রজত আর একটু ঝুয়ে দাঁড়িয়ে সই করা পাতা উল্টে নতুন পাতা বের করে দিতে লাগল ম্যানেজার। সই-এর পর্ব শেষ হলে ম্যানেজার কিছু ব্যবসায়িক নির্দেশ নিয়ে যাবার সময় তেমনি মৃদু গলায় জানিয়ে গেল, দেড়টা বেজে গেছে। আর এক ঘণ্টার ভেতর তাদের দমদমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়তে হবে। নইলে আজ জৈনদের নাকি একটা মিছিল বের হবে। তার আগে ঐ পথটা পার না হলে গাড়ী আটকে যাবার সম্ভাবনা আছে। ম্যানেজার ফাইল নিয়ে চলে গেল।

বয় গিয়ে খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অকারণে এটা ওটা নাড়াচাড়া ও এদিক ওদিকে করতে লাগল। উদ্দেশ্য, সাহেবকে খাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

উঠে দেয়ালে লাগানো পাঙ্খা খাবার টেবিলের দিকে যেতে মঞ্জুকে ডাকল রজত—এসো। একটু খেয়ে নাও আমার সঙ্গে। তারপর আমায় দমদম প্লেনে তুলে দিয়ে বাড়ী যাবে।

মঞ্জু বসল গিয়ে খাবার টেবিলে। সুপডিসটা টেনে ভরা এক চামচে সুপ প্রথমেই তুলে ধরল রজত মঞ্জুর মুখের কাছে। হাঁ করতে হলো মঞ্জুকে। পর পর আরো কয়েক চামচ সুপও তাকে মুখে নিতে হলো এমনি হাঁ করে করে। তারপর বাকীটা নিজে খেয়ে, সুপপ্লেট বয়ের হাতে তুলে দিয়ে কাঁটায় গেঁথে মাংসের টুকরা তুলে দিল রজত মঞ্জুর হাতে। মাংসের টুকরোটা গালে ফেলে ফেলে চিবুতে চিবুতে চোখ নত করে কান্নাঠাসা গলায় ঢোক গিলতে লাগল মঞ্জু।

বয় ওর জন্য জল এনে রাখল টেবিলে। পস্ ঢেলে দিল

ফ্রিজে। বরফ তুলে দিলে জলে। খাওয়া হলে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল বয়। কিছুক্ষণ বাদে মস্ত মস্ত স্যুটকেস দুটো এসে বের করে নিয়ে গেল দুটো লোক। রজত পাশের ঘর আর এঘর করে পোষাক পরতে পরতে বললো—এক দিন ভয় দেখিয়েছিলে তুমি আমাকে, 'দিতে পারেন সব' বলে। আজ আমি যদি বলি, সব নেও। পারবে সব নিতে পারার সাহস দেখাতে? কাজ করতে হলে টাকা চাই। সে টাকা বাবা কাকা দাদা মামা বা স্বামীর না হলে ছোঁয়া চলবে না, এ কুসংস্কার বা মিথ্যে সম্মানবোধ নিশ্চয়ই তোমার নেই। সবার টাকার মতো শুভাকাঙ্খীর টাকা, বন্ধুর টাকাও সমান গ্রহণীয় এটা নিশ্চয়ই তোমারও মত। তাই ব্যবস্থা করে গেলাম। ঘুরে এসে দেখবো, তোমার প্রতিষ্ঠিত স্কুল। তোমার কাজ। তোমার জয়াকে। তোমার জয়াকে আর তোমাকে—কোটটা হাতে নিয়ে সিগারেটের টিনটা কোটের পকেটে ভরে শূন্য ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল রজত কিছু রয়ে গেল কিনা।

আর দেরাজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মঞ্জুর রজতের শূন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে কান্নায় গলা বুজে এলো। কাল আর এসময় রজতকে এ ঘরে পাওয়া যাবে না।

দরজায় টোকার শব্দের সঙ্গে ডাক শুনতে পাওয়া গেল—স্যার!

—কামিং, বলে সাড়া দিল রজত। তারপর ধরা গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে রজত যেন আপন মনেই বলতে বলতে মঞ্জুর দিকে এগিয়ে এলো—প্রেম নিয়ে অনেক খেলেছি। আজ যদি সে আমাকে নিয়ে খেলা সুরু করে থাকেই—আই মাষ্ট অনার হার। মঞ্জুর হাতটা হাত বাড়িয়ে করমর্দনের ভঙ্গিতে ধরতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ মঞ্জু রজতের অতি কাছে এগিয়ে এসে তার মুখটা রজতের মুখের দিকে তুলে ধরে চোখ বুজল।

একটু সময় আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইল রজত। তারপর মঞ্জুর মুখটা দুহাতে তুলে ধরে তার কাগজের মতো সাদা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বহু অনিচ্ছার ভোগও অভ্যাস বশে করেছে রজত—আজ যেন অমৃতভাণ্ড মুখ থেকে নামিয়ে রাখল। মঞ্জুর মুখ ছেড়ে দিয়ে তার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললো—নীলের জন্য যৌতুক রইল। চলো। মঞ্জুর হাত উত্তপ্ত মুঠোর মধ্যে ধরে রজত বেরিয়ে এলো বাইরে।

শেষ

কাসাবিয়াঙ্কা

[Mrs. F. Hemans-এর ইংরাজী কবিতার অনুবাদ]

ডেকের উপর আগুন জ্বলেছে সকলি গিয়াছে চলি
বালক দাঁড়ায়ে অর্ণব 'পরে মৃতদেহ যায় জ্বলি।
(তবু) সে দাঁড়ায়ে উজ্জ্বল আভায় সুন্দর মনোহর
মহাঝটিকার প্রভুত্ব তার জন্মে লভিছে বর।
বীর সেই শুধু বীরের শোণিত বহিছে ধমনী ভরে
শিশু সৌরভে বীরের দর্পে এসেছে অবনী করে।
আগুন নাচিছে চারিদিক ঘিরে আসিছে মৃত্যু ত্বরা
বালক না যায় সরিয়া কোথাও পিতার আদেশ ছাড়া।
পিতা তার হায় নিচের তলায় মৃত্যুতে অচেতন
না পায় শুনিতে পুত্রের ডাক শান্তিতে আবরণ।

চিৎকার করি বালক তাহার পিতারে ডাকিয়া কহে
"সময় এখন হয় নাকি পিতঃ, মৃত্যু আমারে দহে।"
বালক জানে না পিতা যে তাহার রয়েছে সংজ্ঞাহীন
পুত্রের ডাক পায়নি শুনিতে মৃত্যু করেছে লীন।
আবার বালক শুধালো পিতারে, "পারি কি যাইতে পিতঃ"
কামান কহিল মহা হুঙ্কারে পিতা তোর আজ মৃত।
আগুন ঘিরেছে চারিদিকে তার লাগিতেছে উত্তাপ
ললাটের কেশ বাতাসে দুলিছে পিতা তার নির্ব্বাক।
মৃত্যু শিয়রে বালক দাঁড়ায়ে নির্ভীক স্থির
পায়ে সে রাখিতে পিতার আদেশ বীর সে উচ্চ শির।

পাল মাস্তলে মণ্ডলাকারে আগুন নাচিছে ঘিরে
"এখানে অমনি পুড়িয়া মরিব" কহিল সে অতি ধীরে।
সহসা ঢাকিল বালকের দেহ দীপ্ত বহ্নি-শিখা
পতাকা জ্বলিল বালক মরিল হায় রে ভাগ্যলিখা!
বজ্রের মত এক হুঙ্কারে সব হল এলোমেলো
চারিদিকে শুধু ভস্মিল খুঁয়াতে বালক কোথায় গেল?
মাস্তল হাল বিলীন হয়েছে ধ্বংসের স্তূপে

• • • •

বালক সেথায় রহিল দাঁড়ায়ে স্থবির নবরূপে।

অনুবাদ : এস এস এহিয়া

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৫। কানন থেকে পুরীর পথ অনেক দূর। অথচ গৃহ-ব্যাপারে হলধারী বলরামের কুতূহল অনেক বেশী। তাই দ্রুত চরণে ও বিস্তৃতবেগে এগিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আর ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ চললেন মন্থর চরণে। নানান্ সৌভাগ্যশ্রী কুড়োতে কুড়োতে চললেন তিনি, সম্পত্তি-ভার-বাহী করিশাবকের মত, উদার মাধুর্যে, ধীরে ধীরে বাঁশী বাজিয়ে, খেলতে খেলতে হেলতে দুলতে চললেন তিনি; একটু যান আর অনুরাগের দান পান হৃদয়ে। দাদা চলে গেছেন, দূর হয়ে গেছে ভয়, তাই সঙ্কোচহীন আনন্দে তিনি দেখতে দেখতে চলেন ব্রজপুরের চন্দ্রশালিকাগুলি। সহচরেরা তাঁকে দেখিয়ে দেন।

২৬। চন্দ্রশালিকায় সমাসীনা ছিলেন ব্রজপুরীর প্রণয়ভাব—প্রসিদ্ধা মত্ত খঞ্জননয়নারা। তাঁদের আননশ্রেণীর আনুকূল্যে গগনবীথি যেন পূর্ণচন্দ্র পরম্পরায় পরাচিতা হয়ে গিয়েছিল; তাঁদের নয়নের সমারোহে দিক্‌সরসী যেন নীল পথে আস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের লাবণ্যময় শরীরকলায় নভোমণ্ডল যেন নির্মেঘ-বিদ্যুন্ময় হয়ে গিয়েছিল; এবং তাঁদের মণিভূষণের কিরণ-তুরঙ্গের বীথিতে বীথিতে মহাব্যোম যেন ইন্দ্রধনুতে ইন্দ্রধনুতে পূর্ণ লালিত্যময় হয়ে গিয়েছিল। আহা, তাদের ভ্রূতরঙ্গের সে কী অপূর্ব ইঙ্গিত! তারা যেন হাসন্ত আকাশকুসুমের মুখে উড়ন্ত ভ্রমর; দিক্‌সুন্দরীদের মালিক্ত ঢাকা লজ্জা। কত আর বলি! চন্দ্রশালিকার প্রণালীগুলিও যেন প্রবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্যের অমৃতরসের।

২৭। গোঠ থেকে ফিরবেন তাঁদের নায়ক, তাই দর্শনের আশায় ও আনন্দে উৎকণ্ঠিতা হয়ে সুকণ্ঠীরা এতকাল চন্দ্রশালিকায় আরোহণ করে বসেছিলেন। বিষের মত তাঁদের প্রসিদ্ধ অনুরাগ-রসটিকে··কণ্ঠে না ধরে, হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা বসেছিলেন, এত উচাটন মন নিয়ে তাঁরা বসেছিলেন যে বুঝতেই পারেননি কখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেল, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয় হয়।

২৮। তারপরে হঠাৎ যখন দেখলেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে দিন তখন তাঁদের মনে হল···তাঁদেরও জীবন-পুষ্প এবার বুঝি বা খসে পড়ে। কিন্তু আশপাশের বাঁধন অত সহজে ক্ষয়ে যায় না। তাই চোখের জলের অঞ্জলির ভিতর দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন,···বহুদূর থেকে কৃষ্ণ তাঁদের আসছেন, মেঘশ্যাম যেন এক নবীন জ্যোতি উষ্ণীষের পার্শ্বে শিখিশিখণ্ড কাঁপছে, চন্দ্রশালিকাগুলিতে লগ্ন তাঁর দৃষ্টি। অমৃতস্যন্দি সেই জ্যোতিঃ পদার্থটিকে দু বাহু বাড়িয়ে কার না আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে হয়? কার না রসনা আস্বাদন করতে চায় সেই কল্যাণের ধারাটিকে? গগনভিত্তিতে চিত্রলেখার লেখার মত তাই বিমুগ্ধা হয়ে রইলেন ব্রজসুন্দরীদের সংহতি।

২৯। এবং শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন—
তাঁদের দুনয়নের কজ্জল,
শ্রুতিমূলের ইন্দীবর,
বক্ষের ইন্দ্রনীল মণিহার
সর্বাঙ্গের কস্তূরিকার অনুলেপন।

এমন সময়ে তাঁর প্রিয় নর্মসহচর·····প্রণয়রসের যিনি পরিণাম,··· পরিহাসের পাকে হাসির যোগান দিয়ে তিনি বললেন—

৩০। "প্রিয়বয়স্য, বয়সও বাড়ছে আর এই চোখে কতই না অদ্ভুত কাণ্ড দেখছি জগতে। আপনি সূর্য, বন রাজত্বের (বন অর্থে জল ও কানন) জলে ভাসছেন, আর ঐ চন্দ্রশালিকার দিকে চেয়ে দেখুন ভালবাসার কুঁড় কোড়াতে আকাশে ফুটেছেন পদ্মফুলের দল। বলিহারি যাই! গুণের সাগরে চাঁদ হয়ে আপনি অধোদেশে কলা বিস্তার করছেন, আর ঐ দেখুন, ঊর্দ্ধদেশে। কুমুদ্বতী হয়ে ফুটে রয়েছেন·· ···ঐ যেন কে······আনন্দে ঢল ঢল। বিধাতার সংসার সবই দেখছি বিপরীত! তাই বলি কৌতুকের সীমানা নেই ভুবনে। কিমাশ্চর্য্যং। চমৎকার!" এই বলতে বলতে নর্মসহচর ছল করে চিনিয়ে দিলেই বৃষভানুনন্দিনীকে···গোকুলের কুলললনাদের যিনি প্রধানা।

৩১। তাঁদের দিকে এবং তাঁর দিকে ঢলে পড়ল; যিনি নয়নের উৎসবকার,······তাঁর ও নয়ন। তাঁদের সকলেরি অর্ন্তর বিভোর,·····নিরুপাধি সৌম্যের মত এক কুসুমের সুমহাসৌরভ—রঞ্জনের অনুরাগের পরমোৎকর্ষতায়। অসীম দয়ায় সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ তখনি সত্য সত্যই যেন নিজের হৃদয়ের সঙ্গে বিনিময় করে নিলেন তাঁদেরও হৃদয়। ছেদ পড়ে গেল যেন সারা দিনের বিচ্ছেদে। কটাক্ষ-সৌন্দর্য্যের ঢেউ-মঙ্গল ঐ অনুরাগ-সুধার যুগল প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাঁকে।

শ্রীকৃষ্ণের পথ চেয়ে ব্রজপুরে বসেছিলেন নন্দ-যশোদা। তাঁদের প্রথমে নয়নগোচর হল—গোখুর-খুর-ক্ষুণ্ণা পৃথিবীর ধূলিজাল; তার পরে তাঁদের শ্রুতিগোচর হল হম্বা হম্বা···গাইয়াদের গভীর চারু ঘোষণা, তারপরে তাঁরা কানে শুনলেন,···মুরলীরব, বাঁশী বাজছে। তার পরে দেখলেন দুলছে একটি নীল জ্যোতি, এবং তার পরেই শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজে প্রবেশ করল ধেনুর পাল। একে বাছুরডাকা বেলা, তারা দৌড়তে দৌড়তে এল। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বেণুর ধ্বনি শুনে কী তাদের আহ্লাদে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা! আর কী কর্ণরম্য তাদের গদগদ বাণী···হম্বা হম্বা।

৩২। দেখতে দেখতে, চরণ-চারণের মহিমায় পৃথিবী দেবীকে পবিত্র করে দিয়ে নিজের নিজের নিলয়ে মিলিয়ে গেলেন

শ্রীবনমালার লীলাধেনুর দল এবং শ্রীকিরণমালার আলোকধেনুর দলটিও।

কৃষ্ণ-সহচর-জননীদের সঙ্গে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন ব্রজরাণী। শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই উৎসবের কৌতুকে, সর্ব সঙ্গ বিসর্জন দিয়ে,··· "গোপালন ক'রে বন থেকে ফিরছে তাঁর গোপাল, কত কালের না-দেখা তাঁর গোপাল"···দ্রুত পায়ে দৌড়িয়ে গিয়ে ব্রজরাণী বুকে জড়িয়ে নিলেন তাঁর দুলালকে। কোথায় কি ছাই কখন কি রীত করতে হয় সব কি ভুলিয়ে দেয় দর্শন? শেষে সিংহদ্বার দিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে।

৩৩। তারপরে প্রবেশ করলেন বালকদের দল! কোমলকান্ত তাঁদের সহচর-ভাব, ভাবের চর্য্যা, চর্য্যার আর্য্যতা। জননীরা তাঁদের নিয়ে যেতে চাইলেও তাঁরা যেতে পারলেন না। মধুরস্নিগ্ধ কণ্ঠে গম্ভীর হয়ে তাঁরা ব্রজেশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, এবং নিতান্ত সৌহার্দ্যই যেন বলালো—

"মা, বলা যায় না আজ যা ঘটেছে আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যতার একশেষ। আমাদের বলভদ্র দাদা, অতো ভদ্রোজ্জ্বল যাঁর বিক্রম, তাঁকেও কিনা খেলার মর্য্যাদা ভেঙে গোপবালকের ভেক ধরে নিয়ে পালাল এক অসুর? হ্যাঁ, অসু-রহিত করেছেন তাঁকে দাদা। আর এই আপনার ছেলেটি, ধনে-প্রাণে যিনি আমাদের বাঁচান, আমাদের সকল অরিষ্টের যিনি হন্তা, তিনি কিনা নিখিল গোধন নিধন হচ্ছে দেখে পান করে ফেললেন অতি করাল একটা দাবানল। হয় পান করছেন, নয় আপনার ছেলেটি পূর্ণ বাক্‌সিদ্ধ। দাবানলও শেষ হল, সৌরভেয়ীরাও শান্তি পেল।"

৩৪। জননীদের সঙ্গে নিয়ে যে যাঁর ঘরে চলে গেলেন গোপবালকেরা। তারপরে ব্রজেশ্বরী মণি-মঙ্গল দীপ দিয়ে নীরাজিত করলেন নিজের তনয়টিকে, তাঁর অনন্তলীলাধরটিকে, তাঁর সকল সুখের মূর্ত্তিমান ঐ মণি-মন্দিরটিকে। তারপরে রাজ্যমানবপু! শ্রীকৃষ্ণের মেঘাঙ্কুরনিভ করকমল ধরে, বাৎসল্য-স্নুত-পয়োধরা তিনি ধৃতিহারা অবস্থায় প্রবেশ করলেন নিজের সদনে। লক্ষ্মীশ্রীর আলোকে ভরে উঠল যেন ঘর।

৩৫। এবার শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়ালেন বাল-পরিচারকেরা। তাঁরা সকলেই অকৈতব কলাপণ্ডিত। ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায় বদ্ধ তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়, তাঁদের সাহায্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্পন্ন করলেন তাঁর সায়ংতন গাত্রোমার্জনাদি ক্রিয়া-কলাপ।

তার পরে আহারান্তে যখন বক্ষে উল্লসিত করেছিলেন হার, তখন মনে হল ধারাধর মেঘের উপর দিয়ে বুঝি ঐ উড়ে গেল বকের পাঁতি; বুঝি ঐ তুলোর মত মেঘের ছবিতে পড়ল স্থির বিদ্যুতের লিখন। তার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন চন্দনপঙ্ক দিয়ে অনুলেপন করলেন অঙ্গ তখন মনে হল ঐ মেঘের উপরেই বুঝি এবার অমল দেশকালাতীত এক হিমানী তারপরে বুকের উপর···কৌস্তুভ মণিরাজ জ্বললেন—সূর্য্যমণ্ডলসকাশ। কর্ণের দুটি কুণ্ডল যেন বৃহস্পতি ও শুক্রের ছবি। বদনমণ্ডলে শরৎনিশার নিতান্ত সুখী নিশাকরের আনন্দ। মাথায় শ্বেত উষ্ণীষের বলাকা উড়িয়ে মেঘশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন দেখা গেল তিনি তার মূর্ত্তিমান হৃদয়ের মত প্রিয়নর্ম-সুহৃদদের হাত থেকে যতনায় দেওয়া তাম্বুল নিচ্ছেন, মধুর-মধুর কথা কইছেন, কথা শুনছেন এবং যেন ঐ মেঘের মতই বিশ্ব-হৃদয় থেকে চুরি করে নিচ্ছেন বৈশাখের উকণ্ঠা। মরি মরি···মনোহতীত সে মাধুরী। আর তার চরণের মণিপাদুকা ধীরে ধীরে তাঁকে নিয়ে চলেছে পুরতোরণের অভিমুখে; ধীরে ধীরে কাঁপছে শ্রীঅঙ্গের পবন-মন্দ-দুলেয় পীতবসন। ঐ বসন ক্ষণিকেই তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছেন কয়েকটি অনুরাগী অনুচর।

বন্দনমালিকায় সুললিত ব্রজপুরের সিংহদ্বার। সেখানে এসে শ্রীকৃষ্ণের চোখে পড়ল নয়ন-সুখী একটি স্থল। সাদা হয়ে রয়েছে ধূলায়। ভ্রম হয় কর্পূরের ধূলি—ধবলিত বলে ভ্রম হয় বৈশাখ-রজনীর জ্যোৎস্না-শুভ্রায়িত বলে। এবং সেই প্রদেশটির চতুর্দ্দিকে তিনি দেখতে পেলেন গাভীর পাল। গাভীরা শুয়ে রয়েছে সুখে। চন্দ্রকান্তমণির একখান সুন্দর পাথর থেকে ঝরে পড়ছে, জলা ধোঁয়ার মত উড়ছে জলের গুড়ো, উপবনের পবন এসে তাতে গা ভিজিয়ে নিয়ে আশ্রয় করছে গাভীদের। উৎসব স্পষ্ট হচ্ছে যেন তাদের এক একটি গণ্ডশৈল···যদিও গোগণ্ডদশা তাদের পেরোয়নি। ভ্রমরবরণ শৃঙ্গগুলি যদি তাদের মাথার উপর না জেগে থাকত তাহলে সেই সমস্ত প্রদেশটিকেই জ্যোৎস্নাময় বলেই মানতে হত, গাভীময় নয়। শ্রীকৃষ্ণের মনে হল কে যেন এই গাভীদের সিঞ্চন করে দিয়ে গেছে একটি উত্তম সুম-বসে। এরা আছে বলেই যেন ব্রজের পথগুলি এত সুন্দর! ব্রজের সিংহদ্বারের মণিচ্ছবির জৌলুষের মতই এরা যেন উল্লসিত হয়ে রয়েছে পথে পথে।

পথের বুকের উপর পদ-কমল আবীল করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে চললেন। যেদিকেই নয়ন ফেরান সেদিকের গায়েই যেন গড়িয়ে যায় অতিসুখের গহনা।

এমন সময় সমস্ত আভীরদের ইচ্ছা হল সায়ং দোহনের। রসবৈদগ্ধ্য সকলেরই ছিল। তাঁদের উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে অথচ অতি কৌতুকের প্রদর্শনী না করে, শ্রীকৃষ্ণ আরম্ভ করে দিলেন গো-দোহন। আর মদনহস্তী মাড়িয়ে গেলে রাজীব-রাজির যেমন হয় তেমনি দশা হল গোকুল-কুলললনাদের। দোহনের ধ্বনি শুনে তাঁদের কোথায় যেন অ-তাচ্ছিল্য উপে গেল গুরুজন-বিষয়ক বল বা ভয়। তাঁরা ছুটলেন, আরোহণ করলেন চন্দ্রশালিকায়, তাঁদের হাত ধরে উপরে তুলে নিলেন যেন মন-মাতানো মদন। শিশু-হরিণের মত চোখ করে তাঁরা দেখতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন···আকাশে রচনা করে দিলে ইন্দীবরের বর-কানন।

৩৬। তারপরে তাঁদের নয়নগুলি যেন নিজেরাই রূপ বদলিয়ে নিয়ে চাঁদা মাছের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদনের অমৃত-করতোয়ায় (নদীবিশেষ)। যেন ঐ ঝাঁপদেওয়াতেই তাঁদের আনন্দ। অতএব এরপর নিজেদের নয়নগুলিকেও সামলানো দায় হয়ে দাঁড়াল ললনাদের। তাঁরা কেবল দেখতে লাগলেন,—তাঁকে, যিনি দোহন করছেন গাভী, আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নের সুখটিকেও।

৩৭। সেই গোদোহনের নির্মল বিলাসের বর্ণনা করা ব্রহ্মাদির পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু ছোট পাখীর দল কি কখনও পৌঁছুতে পারে নক্ষত্র সদনে? তবুও মূর্খ কবি অতি দুর্দ্দম রসনার লোভে পড়েই আজ অবহেলা করতে পারছে না বর্ণনা, তাই বলছে হরি দুধ দুইছেন গাভীর;—চলতে চলতে পাদাগ্রে কর দিয়ে

তিনি বসেছেন ; সমুল্লসিত হয়েছে তাঁর 'ত্রিক' ; উল্লসিত হয়ে রয়েছে পায়ের গোড়ালি, দুটি জানুর মধ্যে ঘটি রেখে তিনি বসেছেন ; জানুর কাপড় সরে গিয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে পায়ের রঙ ; গাভীর উদরের সঙ্গে মৃদু আঘাত লেগে ঈষৎ শিথিল হয়ে গেছে মাথার পাগ ; আর তাঁর দুটি হাতের ফুলের মত অঙ্গুলি বাঁকিয়ে,—

হরি দুধ দুইছেন গাভীর। অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ডগাটিকে তিনি ভিজিয়ে নিয়েছেন দুধের কণা দিয়ে ; বাঁট থেকে দুধ ঝরছে আপনা হতে ; ঝক্কক্ ; তবুও, ধীরে ধীরে—

হরি দুধ দুইছেন গাভীর। আর গাভীটি অনুভব করছে ভগবানের পাণিস্পর্শ। বৎসের চেয়েও তিনি যে তার অধিকতর প্রিয়। তাই পয়োধর থেকে স্নেহে ঝরছে দুধ, নিজেই দুহ্যমানা হচ্ছে গাভী। দুধের ধারা ঝরছে দোহনীর মধ্যে ; সুগভীর ধারা ধ্বনি। এক ঘট পূর্ণ করে আর এক ঘটে যেতে যেতে পৃথিবী ভাসিয়ে দিচ্ছে গাভী দুধে।

৩৮। গোদোহন মঙ্গল দেখতে দেখতে উৎসবপরবশার মত হয়ে যেতে লাগলেন চন্দ্রশালিকাবর্তিনীরা। যদিও গুরুজনদের ভয়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁদের নিষ্কম্পত্ব, তা সত্ত্বেও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল তাঁদের মন তা সত্ত্বেও কলায় কলায় বাড়তে লাগল আনন্দ, তা সত্ত্বেও চঞ্চল হয়ে উঠল নয়ন—ঢাকা পাতা, দেখার আনন্দে ভারী হয়ে উঠল মনোরথ; দুর্বহ হয়ে উঠল সহস্র সহস্র রথ—শকটের চেয়ে।

৩৯। সেখানে ছিলেন কয়েকটি সোনার সুন্দরীলতার মত দেখতে ললনা। নিজের নিজের সহচরীদের প্রতি এত সহজ এত সুন্দর তাঁদের মনোভাব, যে ভুলেও স্খলন সম্ভব নয় সে সৌহার্দ্যের, ভাবের সেই দুর্গ-ভেদ বিশ্বধূর্তেরও সাধ্যাতীত। তাঁদের মধ্যে চলত আত্ম-হৃদয়ের সদয় সরল প্রকাশ। তাই সংলাপ হতে লাগল—

৪০। "ওলো সই, চরিতার্থ হয়ে গেছে আমার নয়নের নির্মাণ। কেন জানিস্ ? যেহেতু, অনেকক্ষণ ধরে সে নয়ন যে···পান করেছে লো···পান করেছে জলদসুন্দরের অভিরামময় সৌন্দর্য। আর তাও বলি গুণের ঘাট নেই এই শ্রীকৃষ্ণটির, কত কলাই না তিনি জানেন ! সত্যিই ব্রজপুরের গুরুজনদের এবার পুড়ে খাক্ হয়ে যাবার দাখিল হয়েছে এই শরীর। ঐ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েই এবার তাকে নির্ঘাত বশে আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ ঐ সই লো, বুদ্ধি খুলছে আমার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যুক্তি-ভরা বুদ্ধি। কেলি-লতিকে, ভ্রমর বিনে মলিন হয় কমলিনী, এতো সহজ কথা।

ওলো শ্রেষ্ঠ সুন্দরি ! তাই বলি, আমাদের এই শ্রেষ্ঠ আঙ্গিনায় তাঁকে এখন নিয়ে আসাই আমাদের কর্তব্য। আমার মন্ত্রের কৌশলটা একবার দেখ।

কেলিলতিকা বললেন—"কি রকম···?" উত্তর এল—"সই, তবে বলি শোন,—আমাদের এই ব্রজপুরে প্রথম-বয়সী এমন অনেক গাইগরু রয়েছে যাদের দুইতে কারোর সাহসেই কুলোয় না।··· এত তারা দাপাল। কাজেই, দোহনের অভাবে গব্যবিত্তবে ঘাটতি পড়ে ব্রজপুরে। অতএব গুরুজনদের হৃদয়-আকাশে তপ্ত সূর্য যে অনল বর্ষাবেন এতো স্বাভাবিক।"

৪১। প্রশ্ন :—"তারপর ?"

উত্তর :—"তাই বলছিলুম, কমলমুখি, প্রধান প্রধান গুরুজনদের কাছে গিয়ে তুই বল্—গাইগুলোকে দোয়ানো দরকার, দোহন বিনে গরুগুলো নিষ্ফলা হয়ে যেতে বসেছে। দুর্দান্ত গাইগুলো যাকে দেখলে গোলমাল না ক'রে দুধ দুইতে দেবে, তাকে আপনারা ডেকে আনুন, এনে দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা করুন।"

তাঁরা নির্ঘাৎ তখন জিজ্ঞাসা করবেন—"কে সে, কোথায় থাকে সে ?" তখন তাঁদের কাছে···এই এখানে যা দেখছিস্, তা কলিয়ে বলতে হবে তোকে, তারপরেই সই দেখবি, গুরুজনেরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছেন। জানিস্ তো, নিজেদের কাজের বেলায় সকলেই সেয়ানা হয়, মুখ ফেরায় না কেউ।

৪২। চতুরা কেলিলতিকা তখন বললেন—"এই ব্রজপত্তনে সই, একটিই তো রয়েছেন ইন্দ্র। তিনিই তো সবার শরণ, আনন্দের কারণ, তিনিই তো করেন মনোব্যথার উৎপাটন। যা বলেছিস ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তিনি তো তাঁর বুদ্ধিটিকে সঁপে রেখেছেন তাঁর বাপ-মায়ের পায়ে। তিনি তো আর ফট করে প্রকাশ করবেন না তাঁর স্বাধীনতা।"

উত্তর এল—"যাঃ, বাজে বকিস নে আর। যত সব রুগ্ন যুক্তি তোর। শোন্—ব্রজের দুঃখে সুখে, আর তার ফল ভুগতে রয়েছেন একমাত্র ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী। ব্রজবাসীদের উপর তাঁদের বাৎসল্যের অন্ত নেই। গুরুজনদের দুঃখের কথা তাঁদের কানে উঠলেই, তাঁরাই দেখিস দুধ দুইতে পাঠাবেন ঐ ইন্দ্রটিকে।"

৪৩। সখীদের মধ্যে যখন এই রকমের রঙ্গ চলেছে কৌতুক-কথার মধুপ্রসঙ্গ, রসময় সময় তখন আর কিন্তু বসে নেই। সেও চলেছে। সময়ের গতিরাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও গতি শেষ হয়ে গেছে লীলাদোহন। বনমালার ভ্রমরগান শুনতে শুনতে তিনিও চলেছেন আলয়ে।

৪৪। চলেছেন, আর তাঁর বুকের উপর তারা কাটছে চঞ্চল হার। কে হারাতে পারে সে সৌন্দর্য্য ? আর তাঁর তখনকার সেই চৌদিকে নয়ন-কমল-হানার অপার ব্যাপার ! ব্রজনগরের নাগরিকদের হৃদয়-তরঙ্গগুলি যেন ভেসে গেল সমুদ্রের মত আনন্দের প্লাবনে। কোথায় যেন তলিয়ে গেল কুম্ভীরের মত গুরুগম্ভীর তাঁদের গৌরব। অবহেলায় আলয়ের নিকটে চলে এলেন শ্রীকৃষ্ণ।

৪৫। যতদূর দেখা যায়, ততদূর ললনারা চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণ-মুখের অভিসারে নিমেষ ভুলল তাঁদের অরুণ নয়ন। আর যখন তাঁকে দেখা গেল না, যখন তাঁদের সর্বেন্দ্রিয় অভিমানভরে বলে উঠল—"পেয়েছি গো, তাঁকে পেয়েছি," তখন আবার অভিসার থেকেই যেন ফিরে এল তাঁদের নয়ন। কিন্তু তাঁদের মনগুলি অন্য খেলা খেলল, তারা তাঁরই সুখ-শয়নে যেন ঘুমিয়ে পড়ল··· তাঁকেই সঙ্গী করে।

সারাদিন ধরে অনুরাগিণীর দল এই ভাবে তাঁদের সর্বদেহে অনুভব করতেন বিষ-বিসর্প-জ্বালার মত মর্ম সঞ্চারিণী এক যাতনার উন্মীলন ; গ্রীষ্মের তীব্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে করাল হয়ে উঠত তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহ কিন্তু সে বেদনা জ্ঞাপন করবার পাত্র খুঁজে পেতেন না তাঁরা। কিন্তু সেই জ্বলন্ত খুনে যাতনাকেই তাঁরা আবার নির্বাপিত করতেন······ যখন দিন শেষ হয়ে আসত, যখন নির্দোষ নিদাঘ-প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসতেন, আসতেন তাঁদের প্রতি নয়নে দৃষ্টিদানের মহিমা ঘটিয়ে, আর তাঁদের নয়নগুলি তাঁকে দেখত, আকুল হয়ে দেখত লাবণ্য টল-টল বহির্বিহার কৃষ্ণের।

[ক্রমশঃ।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রদর্শনী

অশোক ভট্টাচার্য

গত ১১ই সেপ্টেম্বর একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন হলো। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আচার্য নন্দলাল বসুর ইদানীংকার, অর্থাৎ ১৯৫৯সালে আঁকা পঞ্চাশটি ছবির একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী। একাডেমির কর্তৃপক্ষরা আচার্যের ছবির প্রদর্শনী দিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জনসমক্ষে উন্মুক্ত করে একই সঙ্গে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন ও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের পরই যে নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হলো নন্দলাল বসু। নন্দলালের দীর্ঘজীবনব্যাপী শিল্পরচনা কী রসবিচারে কী সংখ্যায় এক অভাবনীয় সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। তার ওপর তাঁর ছবির বিভিন্ন পর্যায়ে আঙ্গিকের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন তার সঙ্গে তুলনা চলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার সঙ্গেই। তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশৈলীকে পুনর্জীবিত করেছেন। পুরাণের চিত্রগুলি তাঁর চিত্রায়ণে নবরূপ লাভ করেছে; তা ছাড়া দেশের সামগ্রিক রূপ তার নিসর্গ, মানুষ ও চেতনাকে নিয়ে তাঁর শিল্পে নানা ভাবে আবির্ভূত হয়েছে।

নন্দলালের বর্তমান প্রদর্শনীটিতে পূর্ববর্তী চিত্রকীর্তির রোমন্থন নেই; আছে এক শিশুসুলভ সারল্যের প্রকাশ যা কিনা বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ হলেই অর্জন করা যায়। কখনও সখনও দু-একটি ছবি তাঁর পুরনো ছবিকে স্মরণে আনলেও প্রতিটি ছবির মানসিকতাই অতীব সারল্যে অভিষিক্ত। এখানে নেই আয়োজনের আড়ম্বর, চেষ্টার স্বাক্ষর কিংবা মহৎ চিত্ররচনার প্রয়াস। ছবি এখানে শিল্পীর বর্তমান খেয়ালী মনের প্রকাশ, যা কিনা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দীপ্ত তুলিতে অঙ্কিত। কী বিষয় নির্বাচনে, কী বস্তুসংস্থাপনে, কী বর্ণে সর্বত্রই রয়েছে প্রবীণের সংযম, বিজ্ঞের সুমিতিবোধ। আরও ভালো লাগে যখন দেখি আমাদের অবহেলিত দেশ তার সামান্যতায়, তার নিঃসঙ্গতায় এবং তার চিরন্তনতায় ছবিগুলিতে মূর্ত। একটি কুমোর দাওয়ায় বসে মাটির পাত্র তৈরী করছে; উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ ধরে দুটি বাউল হেঁটে চলেছে; গ্রামবধূ সবে তার পর্ণকুটির থেকে পা বাড়িয়েছে জল আনতে; এমনি কত বহু পরিচিত অথচ মনহরণকারী ছবির সমাবেশ! সমুদ্রকেও শিল্পী এঁকেছেন, তার উদ্দামতায় নয়, রেখার নম্রতায়; পাহাড়কেও তিনি এঁকেছেন, তার গাম্ভীর্যে নয় নিরাভরণতায়। 'পাহাড়ি শহর' ছবিতে দেখতে পাই পাহাড়ের কোলে সাজানো ক'টা কাঠের ঘর, দূরাগত পথ, আর তাতে দু-একটা পথচারী এবং দূরে শুভ্র নগাধিরাজ। এখানে শিল্পিগণ এক নতুন আঙ্গিককে খুঁজে পেয়েছেন শেষ বয়সের প্রান্তে। অধিকাংশ ছবিই জলরঙের এবং রঙ কেবলমাত্র কালো, আর কখনও বা পাঁশুটে। প্যাস্টেলে আঁকা দু-একটি ছবির মধ্যে 'চন্দ্রালোকে পাঁচটি পাখি' ছবিটি মনোরম তার ব্যঞ্জনায় আর সংযমে। পুরনো পদ্ধতিতে আঁকা আঁধার পথে গরুর গাড়ি এবং নদীতে নৌকোর যে দুটি ছবি ছিল তাও সবিশেষ উল্লেখ্য।

নন্দলাল বসু অঙ্কিত একটি রেখাচিত্র

আচার্য শিল্পীর বর্তমান প্রদর্শনী প্রমাণ করলো, এখনও তিনি সজীব ও সাবলীল। সুতরাং আমরা আজও তাঁর কাছ থেকে নতুনতর শিল্প রচনা আশা করবো।

তিন জন শিল্পী

গত ৬ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত শ্রীইলা রায়চৌধুরী, শ্রীঅতীন মিত্র ও শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের একটি মিলিত চিত্রপ্রদর্শনী আর্টিষ্ট্রী হাউসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিল্পীরা প্রত্যেকেই তরুণ এবং এই টাদের প্রথম স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ। এঁদের তিন জনের কাজের ধারা এক পর্যায়ের নয় এবং তিন জনই তিনটি বিভিন্ন পথের পথিক।

শিল্পী তিন জনের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ছবির সমাবেশ করেছেন শ্রীঅতীন মিত্র। প্রকৃতির সত্তাকে তিনি চেনেন। তাঁর প্রতিটি কাজেই রয়েছে শিল্পিসুলভ নিজস্ব নির্বাচন ও সাবেগ আত্মপ্রকাশ। তাঁর কয়েকটি ছবি সম্পর্কে উচ্ছভাষণ চলতে পারে। সফুল দুটি গাছ এবং দুটি পথিককে দেখিয়ে শিল্পী তাঁর বসন্ত (১) ছবিটিতে এক সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। 'মনসুন' (২) এবং 'বনের মধ্য দিয়ে' ছবি দুটিও মনোরম। শিল্পীর এই জলরঙের ছবিগুলির পাশাপাশি রাখা যেতে পারে 'নদী পেরিয়ে' নামক তেলরঙের ছবিটিকে। ছবিটি ত্রুটিশূন্য না হলেও এ ছবি শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বীল করে তোলে।

ছবির বিষয় নির্বাচনে এবং কোনো এক ধারায় নিজেকে সাবলীল ভাবে প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে। দু-একটি ছবির বাস্তবধর্মী বিষয় মনকে আকর্ষণ করলেও, আঙ্গিকগত আড়ষ্টতা এবং আলো ও ছায়ার অপপ্রয়োগ অনেক ছবিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে নাম করা যেতে পারে 'পিতা ও পুত্র' ও 'আকর্ষণ' ছবি দুটি। কিন্তু শিল্পী যেখানে বিষয়কে তার স্বতঃস্ফূর্ততায় ধরতে চেষ্টা করেছেন সেখানে তিনি অনেক বেশী সফল। যেমন নাম করা যেতে পারে 'জেলেনী' ও 'রথযাত্রা'র; এবং মনে হয় এই পথেই তাঁর প্রকৃত বিকাশ ঘটতে পারে। অপরপক্ষে 'লক্ষ্যহারা' ছবিটিও ভালো লাগে। 'ঝড়ি বিক্রেতা' ছবিটি একটি উত্তম রচনা হলেও পশ্চিম-ভারতীয় শিল্পীদের মনে করিয়ে দেয়।

শ্রীইলা রায়চৌধুরীর রচনাবলী অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তার বিষয়ও চিরাচরিত ভাবেই ক্ষয়িষ্ণু এক ধারাকে বহন করছে, রীতি তাও অতি ব্যবহারে ক্লান্তিকর। ভবিষ্যতে তাঁকে আরও বেশী ব্যক্তিতান্ত্রিক বিকাশে অভ্যস্ত দেখবো আশা করি।

দু'জন বিদেশী শিল্পী

দু'জন বিদেশী শিল্পীর দু'টি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে। ইংরেজ চিত্রকর বি, এস, ক্লার্কের প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হলো একাডেমির নতুন ভবনে এবং সুইডিশ চিত্রকর রোলফ সোডারল্যাণ্ডের প্রদর্শনীটি আর্টিষ্ট্রি হাউসে।

ক্লার্কের প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে দশটি ছিল তৈলচিত্র আর কিছু স্কেচ। তাঁর প্রতিটি ছবিই উচ্চমানের পরিচায়ক। উজ্জল লালরঙের প্রতি স্বভাবত একটা প্রবণতা থাকলেও নিসর্গচিত্রে এই তরুণ শিল্পীর নৈপুণ্য স্বতঃপ্রকাশিত। তেলরঙা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ ভালো লাগলো 'মাউন্টেন ল্যাণ্ডস্কেপ'।

সোডারল্যাণ্ডের অধিকাংশ ছবিই জলরঙের। ভারতের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানকে শিল্পী চিত্রায়িত করলেও রঙের মুখস্থ ব্যবহারের ফলে কোনো ছবিই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। বরং তাঁর আঁকা সুইডেন ও স্পেনের নিসর্গচিত্রগুলি অনেক বেশী প্রাণবন্ত বলে মনে হয়েছে।

মীরা দেবীর ছবি ও ভাস্কর্য

মীরা দেবীর চিত্র ও ভাস্কর্যের একটি একক প্রদর্শনী গত ৩১শে আগষ্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ম্যাক্সমুলার ভবনে (ইনাকো হাউস: ব্রাবোর্ণ রোড) জর্মাণ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির নতুন পরিবেশ এবং শিল্পীর শিল্পকার্যের নতুনত্ব দর্শকদের পক্ষে উপভোগ্য হয়েছিল।

মীরা দেবী তাঁর প্রথম জীবনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের শিল্পী কালীপদ ঘোষালের শিক্ষানবিশী করেন এবং তাঁর চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৪১ সালে কলকাতায় বাৎসরিক প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনী প্রাচ্যরীতির কাজের জন্য তাঁকে প্রথম পুরস্কারে অলঙ্কৃত করেন। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন এবং তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাতেই ১৯৫২ সালে। এর পর মীরা দেবী জর্মাণীতে গিয়ে কুন্‌ষ্টাকাডেমি মিউনিক-এর অধ্যাপক শিল্পী টনি ষ্টাড়লার ও পরে অধ্যাপক এরিক প্রেটি ও কিরচনরের তত্ত্বাবধানে শিল্পশিক্ষা করে এসেছেন।

স্বভাবতই মীরা দেবীর শিল্পসৃষ্টিতে পশ্চিমের এই শিক্ষার প্রভাব কার্য্যকরী হয়েছে। বস্তু সংস্থাপনে (composition) ও বস্তুর ঘনত্ব (Mass) নির্ণয়ের মধ্যে তাঁর এই শিক্ষার সুফল লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তাঁর ছবিগুলিতে এবং বিশেষত স্কেচে, রেখার দুর্বলতা চোখে পড়ে এবং মাঝে মাঝে রঙের ক্ষেত্রে ছাত্রীসুলভ অসংযমও লক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে শিল্পীর প্রশংসা না করে পারা যায় না—তা হলো বিষয় নির্বাচনে শিল্পীর মানবপ্রেম। সেই বিষয়কে চিত্রায়িত করতে আন্তিক সংবেদনশীলতার যে পরিচয় তাঁর কয়েকটি ছবিতে পাওয়া যায়, তাও এই সঙ্গে প্রশংসার্হ। শুধুমাত্র নিসর্গচিত্র হিসাবে বিষয়ের দুর্লভতা শিল্পীর এই বিশিষ্টতারই সাক্ষ্য।

তবু আঙ্গিকগত ভাবে মীরা দেবী যে আজও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, তা তাঁর ছবির বিভিন্ন চরিত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিটি ছবিই তৈলচিত্র এবং প্রতিটি ছবির মধ্যেই রয়েছে যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কয়েকটি ছবি চোখে পড়ে যাতে এ মনোভাব ততটা কার্যকরী নয়—এবং সেখানে শিল্পী উত্তম শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা অর্জন করেছেন; প্রেম (৬), মায়া (৩), মিসেস এ (১১) প্রভৃতি ছবি হলো এই শ্রেণীর। এ ছাড়া প্রধানত যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়েছে, তাতে কখনও রথীন মৈত্র, কখনও শেরগিল আবার কখনও বা কালীঘাটের পটচিত্রের আভাস মেলে। আশা করা যায়, শিল্পী ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীতে আপন শিল্পরীতির নির্দিষ্ট একটি রূপ উপস্থিত করতে সক্ষম হবেন।

ভাস্কর্যের যে ক'টি নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে জিরাফ ও মোরগের ব্রোঞ্জ দুটি ভালো লাগলো।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জোসেফিন

শ্রীছায়া চৌধুরী

নিরালা ছোট্ট ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপটি। তারই মাঝে তার চাইতেও বোট্ট একটা জেলেপাড়া—আর সেখানেই চিনির কলের ওপরে ছোট্ট একটা ডিঙ্গিমস্তন ঘরে বাস করে এক গরীব মেয়ে। তার নাম হল, মেরী জোসেফ রোজ তাসের লা প্যাজেরী। কিন্তু সবাই তাকে ছোট্ট করে ডাকতো—জোসেফিন।

এই সময় দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল বন্যা এল। জোসেফিনের সুখের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে গেল। বিদ্রোহীরা তার স্বামীকে হত্যা করলো। একরাশ দেনা আর নাবালক দুটো শিশু নিয়ে জোসেফিন চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথই জোসেফিনের চোখে পড়লো না। আগামী দিনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে জোসেফিন শিউরে উঠলো। এসময়ে পথ দেখাতে এল বান্ধবীরা। তারা বললো—'আবার বিয়ে কর জোসেফিন।'

'কিন্তু কা'কে বিয়ে করবো? আমার এ বিপদকে কে মাথায় তুলে নেবে সাহস করে? তোরাই বল্।'

'তোদের ভার তুলে নিতে পারে এমন একজন লোক অবশ্য আছে। লোকটির এখনও তেমন নাম হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে।'

জোসেফিন তার উদ্ধারকর্ত্তার পরিচয় জানতে অতি ব্যগ্র হয়ে উঠলো। বান্ধবীরা জানালো—'তার নাম নেপোলিয়ন। এই কিছুদিন হল যুদ্ধ থেকে ফিরেছে। তবে এক-গা ঘামাচি ছাড়া আর কিছু কিন্তু যুদ্ধ থেকে আনতে পারেনি। মাথাটাও নেড়া করে কামাতে হয়েছে। আর বয়সে তোর থেকে ছ'বছরের ছোটই হবে।'

ছ'বছরের ছোট! জোসেফিন মনে মনে হিসেব করলো, ত বয়স এখন তেত্রিশ। তাহলে নেপোলিয়নের হবে সাতাশ বছর কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনস্থির করে ফেললো। কেননা, একজন স্বামী ছাড়া এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন পথই সে খুঁজে পেলনা। আর তাছাড়া তাকে দেখতেও তো অতি বিশ্রী। তার উপর আবার সামনের দুটো দাঁত অতি বিশ্রী ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নাঃ, একেই বিয়ে করবে জোসেফিন।

কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা তো করতে হবে? সেটা কি করে সম্ভব? কি ভাবে দেখা করা যায়? অনেক ভেবে জোসেফিন তার বারো বছরের ছেলেকে নেপোলিয়নের কাছে পাঠালো। উদ্দেশ্য—তার মৃত স্বামীর তলোয়ারটা আছে কিনা। নেপোলিয়ন জানালেন, তাঁর কাছেই আছে আর সেটা ফিরিয়ে দিতে তিনি সব সময়েই প্রস্তুত।

জোসেফিন তো সুযোগ পেয়ে গেল। তার পরদিনই সাজগোজ করে চললো নেপোলিয়নের কাছে। মুখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, চোখে অশ্রুর বন্যা এনে তো নেপোলিয়নের মন জয় করে ফেললো।

নেপোলিয়ন তো তার ব্যক্তিত্বে আর মাধুর্য্যে সব ভুলে গেলেন। আর এর পর যখন জোসেফিনের কাছে চা পানের আমন্ত্রণ পেলেন তখন তো আনন্দে গর্বে একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

চা-এর টেবিলে জোসেফিনের মুখোমুখি বসলেন তিনি। বারান্দার কাটা থামগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়েছে বুনো একটা ফুলের লতা। বাড়ীর চারপাশে ঘন জঙ্গল আর আগাছার ভিড়। ফুলের আর জংলা গাছের গন্ধ একসঙ্গে মিশে বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। সে গন্ধে যেন নেশা লাগে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে নেপোলিয়নের। সন্ধ্যার ম্লান আঁধারে, মোমবাতির মৃদু আলোকে, ফুলের নেশা লাগানো ভারী গন্ধের আবিলতার মাঝে চা'য়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নেপোলিয়ন হঠাৎ শুনতে পেলেন—মুখোমুখি বসা জোসেফিন ফিসফিস করে বলে চলেছে 'আপনি যেরকম যুদ্ধ করেছেন, এরকম যুদ্ধ আর কেউ করতে পারেনি, কেউ পারবেও না। পৃথিবীর সব নামকরা সেনাপতিদের সঙ্গে এর পর লোকে আপনার নামও করবে। দেখবেন—লোকের মুখে মুখে ঘুরছে শুধু একটি নাম, সে নাম হল নেপোলিয়ন—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দি গ্রেট ......সেদিন আমার কথা কি তোমার একটুও মনে পড়বে না, নেপোলিয়ন?'

এরই তিন মাস পরে একটা সাধারণ গির্জ্জায় তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পরে আটচল্লিশ ঘণ্টাও যায়নি, যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়নের ডাক পড়লো। ইটালীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। তাকে যেতেই হবে। বাধ্য হয়ে নেপোলিয়ন চলে গেলেন। এ যুদ্ধ তাঁর কাছে শাপে বর হয়ে দাঁড়ালো। অত্যন্ত হীনবল সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন যেভাবে যুদ্ধ জয় করলেন, তা ইতিহাসে তাঁকে অমর করে তুললো। হাজার বছরের মধ্যেও ইউরোপ এরকম একটা বীরত্বের সাক্ষাৎ পায়নি।

কিন্তু এ সবের চাইতেও বেশী অবাক্ করা ব্যাপার হলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন একটা করে চিঠি আসতো জোসেফিনের কাছে। অনুরাগ মাখানো, আবেগে ভরা মিষ্টি চিঠি সব। নেপোলিয়ন লিখছেন—

'প্রিয়তমে জোসেফিন—

তোমার প্রেমের আবেগে আমি আমার সব যুক্তি—সব বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। শুধু কি তাই? আমি খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না; বন্ধু, বান্ধব, যশ, খ্যাতি, মান—নাঃ। কিছু চাই না আমার। শুধু যুদ্ধজয়ই আমার নেশা—আর সে শুধু তোমাকে খুশী দেখবার জন্যে। আর তা যদি না হতো—তাহলে এতক্ষণ আমি ঠিক পালাতাম এখান থেকে—পালাতাম প্যারীর পথে—আর আমাকে দেখতে পেতে তোমার পায়ের নীচে।

ভালোবাসা তোমার সীমাহীন—সেই অসীম প্রেমে তুমি আমায় পাগল করেছ—তুমি আমায় মাতাল করেছ। তোমার ছবিটা কাছে না থাকলে আমি হয়তো এতক্ষণে উন্মাদ হয়ে যেতাম। জোসেফিন—আমার প্রিয় জোসেফিন।'

কিন্তু নেপোলিয়নের অন্য সব চিঠির তুলনায় এ চিঠিখানা তো নেহাৎ-ই পানসে। প্যারীর সব মেয়ে তো এসব চিঠি পড়ে পাগল হয়ে উঠলো। কিন্তু যার জন্যে নেপোলিয়ন এতো মাতাল হয়ে উঠেছিলেন, সে কিন্তু এসবে কোন মনোযোগই দেয়নি। তার মন তখন অন্য এক লোকের কাছে বাঁধা পড়েছে। নেপোলিয়নকে 'তো সে ভাবালু' ছাড়া আর কিছুই তখন ভাবতে পারতো না। তাই তাঁর ওসব চিঠির কোন জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করতো না।

শেষ পর্যন্ত জোসেফিনের উদাসীনতায় ব্যথিত হয়ে নেপোলিয়ন তাকে চিঠি লিখত না। এর কিছুদিন পরে, প্যারী যাওয়ার পথে, জোসেফিন শুনতে পেল—এক কৃষ্ণকেশী মিশরীয় কন্যার সঙ্গে নেপোলিয়নের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। জোসেফিনের বান্ধবীরা সব সময়েই এই ঘনিষ্ঠতার কথা তাকে জানাতো। উত্ত্যক্ত হয়ে জোসেফিন বলতো—

'নেপোলিয়ন যাই-ই করুক না কেন, আমি জানি—আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী।'

অবশেষে নেপোলিয়ন দেশে ফিরে এলেন। বহুদিন পরে আবার দুজনের দেখা হলো। মন খুলে দুজনে দুজনের প্রাণের কথা বললো। কিন্তু ফল দাঁড়ালো—জোসেফিন নিজের ঘরেই নিজে আটক হয়ে রইলো।

এর পরেই সংসারে নানা ঝামেলা দেখা দিল। নেপোলিয়নের বোনেরা সব জোসেফিনকে ঈর্ষা করতো হিংসা করতো। তারা জানতো জোসেফিনের রুচিজ্ঞান তাদের চাইতে অনেক বেশী উঁচু দরের। কাজেই নিশ্চয়ই জোসেফিন তাদের হীনরুচির জন্যে ঘৃণা করে। যতই তারা এসব কথা ভাবতো, ততই তারা জোসেফিনের উপর ক্ষেপে উঠতে লাগলো। বার বার নেপোলিয়নকে বলতে লাগলো—ওই বুড়ি ডাইনিটাকে ত্যাগ করো। ওটাকে ছেড়ে দাও।
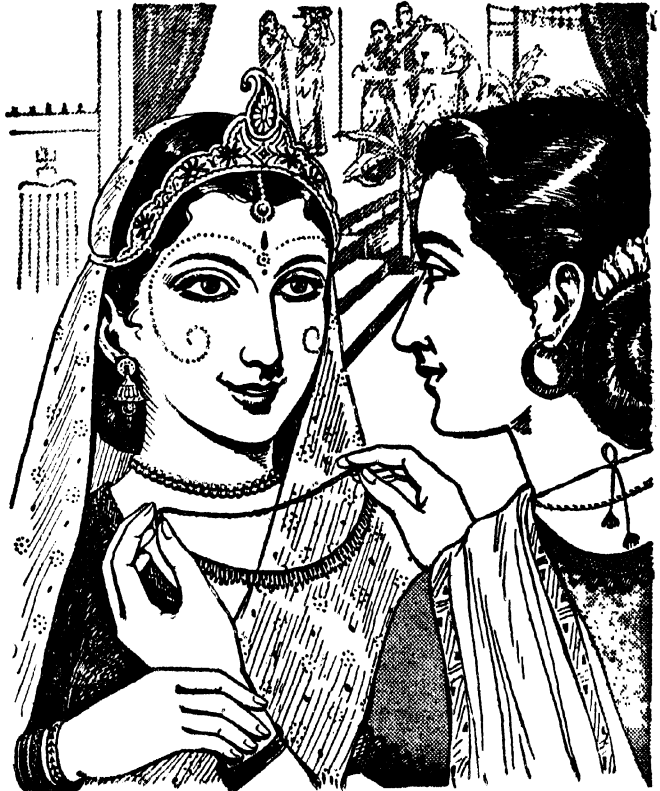
দিয়ে এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে কর। ওই ডাইনিটা তোমাকে মায়া করে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু এ ত্যাগ বোনেদের প্ররোচনায় নয়,—এ ত্যাগ তাঁর পিতৃহৃদয়ের হাহাকারে। জোসেফিনকে নেপোলিয়ন গভীরভাবে ভালবাসতেন। তবু বাধ্য হয়ে যখন তালাকনামায় সই করলেন, কলমের কালি আর চোখের জলে সব একাকার হয়ে গেল। জোসেফিনকে বাহত ত্যাগ করলেও অন্তরের আসন থেকে তাকে নির্বাসন দিতে পারলেন না। জোসেফিনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করার পরে, অন্তলোকের সান্নিধ্য তাঁকে বিরক্ত করে তুললো। দিনের পর দিন তিনি প্রাসাদের এক নির্জন কোণে বসে অনন্ত আকাশের অসীম শূন্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

কিন্তু তবু এক এক করে দিন কাটলো, মাস কাটলো। আস্তে আস্তে ক্ষতের মুখ শুকিয়ে এল। বাইরে থেকে আর তার কোন দাগ কেউ দেখতে পেলেনা। এরপর সাম্রাজ্যের আকাঙ্খায় বাধ্য হয়ে একদিন অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরী লুইসিকে বিয়ে করে বসলেন।

ভালবাসার কাঙাল নেপোলিয়ন মেরীর কাছে একটু ভালবাসার আশ্রয় চেয়েছিলেন। কিন্তু জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর জীবন থেকে প্রত্যাশিত প্রেম দূরে চলে গিয়েছিল। মেরী তাঁকে ভালবাসলো না। পিতার প্ররোচনায়, রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে শুধু বাধ্য হয়েই মেরী নেপোলিয়নকে বিয়ে করেছিল। ভালোবেসে নয়। তাই জীবনভর শুধু মেরীর ঘৃণার বোঝাই নেপোলিয়ন বয়ে চলেছেন। মেরী শুধু নিজেই তাকে ঘৃণা করেনি—তার ছেলেকেও—বাপকে ঘৃণা করাতে শিখিয়েছে।

হতভাগ্য নেপোলিয়ন জীবনে শুধু একবারই ভালবেসেছিলেন—প্রেম তাঁর দুয়ারে শুধু একবারই এসেছিল—তাকে দুহাতে ঠেলে ফিরিয়ে দেওয়ার তীব্র অভিমানে আর সে তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে এল না। জোসেফিনকে যেভাবে ভালবেসেছিলেন—জীবনে আর কাউকে সে ভালবাসা দিতে পারেন নি। জোসেফিনই তাঁর জীবনের প্রথম ভালবাসার পাত্রী—সেই শেষ। তাদের দুজনের প্রেমের মাঝখানে আর কারও আসন ছিল না, কারও অধিকারও ছিল না। অনাদৃতা জোসেফিনের কবরের পাশে নানা আগাছার ভিড়। তবু তারই মাঝে কার যেন বুকের রক্তে রাঙানো রাঙা গোলাপের রাশি। আর তারই পাশে দেখা যায়—কার যেন নোয়ানো মাথা—চোখের জলের দুটি ধারা কবরের শীতলতাকে যেন স্নেহের উত্তাপে উষ্ণ করতে চাইছে—শুধু শোনা যায় একটা অতি মৃদু অনুতপ্ত স্বর—

জোসেফিন—প্রিয়তমে জোসেফিন—আমি জানি—আমি জানি—তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারো না, তুমি আমায় ক্ষমা কর—জোসেফিন—।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে নেপোলিয়নের নাম আছে তার পাশে কোথাও জোসেফিনের নামের একটু ছায়াও নেই। না, কোন আতস কাচ ধরলেও সেখানে ওনামের কোন সন্ধানও পাওয়া যাবে না। কিন্তু নেপোলিয়নের অন্তরের গোপন মণিকোঠায় যে নামটি চিরজীবনের জন্যে খোদাই করা ছিল—তাহল—দুটি অক্ষর—জোসেফিন। তাই জীবনের শেষ শয্যায় শায়িত বীর সেনাপতি নেপোলিয়ন কোন যুদ্ধজয়ের কথা বলেন নি—বলেন নি কোন নতুন আকাঙ্খার কথা—শুধু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে হৃদয় চিরে যে দুটি কথা বেজে উঠেছিল—সে হল জোসে—ফিন।

মাধবীলতা

আরতি ঠাকুর

দরজাটা খুলে দিয়েই একটু আশ্চর্য্য হয় বৃদ্ধা ইন্দুমালতী। বহুকাল পর একমাত্র নাতি পরমেশ আজ এসে উপস্থিত। কি মনে ভেবে এসেছে কে জানে! খবর-টবর না দিয়েই এসে পড়েছে ও।

ব্যস্ত হোয়ে বুড়ী দিদিমা দোরাকেই একখানা পাটি বিছিয়ে দিল বসবার জন্য। ওর হাত-মুখ ধোয়ার জন্য জল আনতে বললে মহীধরকে।

—কি বাবা, আজ প্রায় পাঁচ বছরের পর কি মনে কোরে এলে?

—এই মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিলো দিদিমা, বড় একলা মনে হোচ্ছিলো, তাই তোমার কাছে চলে এলুম।

—ভালোই কোরেছ তুমি এসে, কোনদিন ভগবান আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন—কে জানে! সবার আগে তোমার বিয়েটা দেখে যেতে পারলে সুখী হোতুম। ভগবান কি আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরবেন? আমার মত হতভাগিনীর কোন সাধ-আহ্লাদই মিটলো না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইন্দুমালতী।

আগুনের আঁচে আবীরের রক্তাভা লেগেছিলো ইন্দুমালতীর মুখে। কয়েক বছরের মধ্যেই বুড়ীর মুখের চামড়া আরও কুঁচকে গেছে, চোখ দুটো কোটরগত হোয়েছে আরও বেশী—পরমেশ লক্ষ্য কোরলো। তবুও অশীতিপর এই বৃদ্ধার ঘরের কাজ-কর্ম্ম করার শক্তি দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয় পরমেশ।

রান্নাঘরের পিছন দিকে কচুগাছগুলো বর্ষায় ভিজে বড় হোয়ে উঠেছে। পেঁপের গাছগুলোতে কতকগুলো পেঁপে এসেছে। পেঁপের ডাল বেয়ে লাউয়ের ডগা মাচায় এগিয়েছে।

উনুন থেকে লাল মাটির হাঁড়িতে আতপ চাল সিদ্ধ হওয়ার ঘ্রাণ বাতাসে সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বর্ষায় ভিজে রান্নাঘরের কাঁচা মাটির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ এক অপূর্ব্ব আমেজ সৃষ্টি কোরলো পরমেশের মনে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। সহরের অভ্যস্ত কোলাহলের মাঝে কাটানো জীবনযাত্রার বিপরীত স্রোত এইখানে। মনটা যখনই বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়, তখনই পরমেশ চলে আসে আসামের এই জনবিরল গাঁয়ে। মনের নিঃসঙ্গতা আর পরিবেশের নিস্তব্ধতার উপলব্ধি যেন একই মনে হোল পরমেশের।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ইন্দুমালতী শুধোয়—বিয়ে-টিয়ে কোরবে না বাবা! মরবার আগে তোমাকে বিয়ে কোরে সুখী দেখতে পেলে শান্তি পেতুম। তুমিই এ বংশের আশা-ভরসা সবই—জানিনে ভগবান আমার সাধ পূর্ণ কোরবেন কি না।

—কি বোলছো দিদিমা, বিয়ের কথা,—মনের মত মেয়েই খুঁজে পাইনে।

—এত বড় সহরে মেয়ের অভাব না কি রে? চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল তোর, আর তুই এখনও মেয়ে খুঁজে পেলিনে? কি

যে তোর মতিগতি—থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে ইন্দুমালতীর মুখখানা বড় উদ্বিগ্ন দেখায়।

সত্যি তো এক একটা কোরে জীবনের চল্লিশটা বছর পেরোল, তবুও পরমেশ মনোমত মেয়ে খুঁজে পায় না সারা দুনিয়ায়! এর ভিতর কিন্তু ওর জীবনে বহু মেয়ে এসেছে, গেছে—সদা নিত্য-নতুন সঙ্গিনীর সাহচর্য্য লাভ কোরেছে কিন্তু ওর মনের অতল তলায় কেউ প্রবেশ কোরতে পারেনি আজ অবধি।

পরমেশ তখন কোলকাতায় একটা বৃটিশ ফার্মে চাকরী করে। কোনো একটা কাজের উপলক্ষ্যে ওর একবার এ সি আই অফিসে যেতে হয়—ওখানকার বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম। সেদিন গাঙ্গুলী সাহেব বেজায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর পরমেশ একটু অধৈর্য্য হোয়ে উঠলো। এমন সময় গাঙ্গুলী সাহেবের ষ্টেনো মিলি মজুমদার এসে পরমেশকে বোললে—আজ মিঃ গাঙ্গুলী খুব ব্যস্ত, আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে আর একদিন আসেন তো ভালো হয়।

—আচ্ছা, আমি অন্য একদিন আসবো। মিলির মুখের দিকে লক্ষ্য না কোরেই পরমেশ বলে ওঠে।

—মাপ কোরবেন, মিলি কিছু বোলতে একটু উৎকণ্ঠিত হয়—অল্প থেমে আবার বলে, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

—আপনি নিঃসঙ্কোচে বোলতে পারেন, দ্বিধাহীন ভাবে পরমেশ উত্তর দেয়।

—শুনেছি আপনাদের অফিসে লেডী ষ্টেনোগ্রাফারের পোষ্ট একটা খালি আছে। যদি সুবিধে হয়, আমি কাজটা নিতে চাই। কারণ এখানে মাইনে বড় অল্প আর তাছাড়া অন্যান্য অনেক অসুবিধে। আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে এই খবরটা দিয়ে আমায় একটু উপকার করেন···

—না না, উপকারের কি আছে, মুখের কথা টেনে নিয়ে পরমেশ বোললো। তবে পোষ্টটা এখনও খালি হয় নি, সামনের মাসে হবে। আচ্ছা আমি নিশ্চয়ই খবর দেব আপনাকে।

পরের মাসে পরমেশের অফিসে লেডী ষ্টেনোগ্রাফারের পোষ্টটা খালি হোল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিলি এসে পোষ্টটা নিয়ে নিল। তখন থেকেই পরমেশের সঙ্গে মিলির ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

প্রতিদিনের অভ্যস্ত রীতিতে মিলি এসে পরমেশের সব কাজ গুছিয়ে ঠিকঠাক কোরে যায়। পরমেশ এখন ওর নতুন 'বস'। পরমেশ ডিক্‌টেট করে, মিলি লিখে যায় একটানা—এই ভাবে ওদের প্রতিদিনের কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়। অফিসে হাজারো রকমের মেয়ে কাজ করে, কোনো মেয়েরই সান্নিধ্যে এসে এতটুকু চাঞ্চল্য পরমেশ প্রকাশ করে না। মিলি এটা লক্ষ্য করে।

অফিস ফেরৎ বাড়ী যাবার সময় মিলি ও পরমেশ একসঙ্গেই বাড়ী ফেরে। কখনও কখনও মিলি প্রস্তাব করে—রেড রোড দিয়ে গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসার জন্ম।

সেদিন মিলির সাজে বেশ পারিপাট্য ছিল। আকাশের নীল ওর শাড়ীতে, মুখে পাউডারের প্রলেপ একটু, হালকা কোরে লিপষ্টিক দিয়ে রাঙিয়েছে অধর। গায়ের রঙের সঙ্গে সব মেকআপটাই বেশ সুরুচিসম্মত দেখাচ্ছিলো। ওর প্রসাধনের সুরভি হাওয়ায় ভেসে আসছিলো আর সুরভির সেই মদির গন্ধে পরমেশের মনটাকে খানিক উতলা কোরে দিচ্ছিল।

—কি ভাবছেন মিস মজুমদার? গঙ্গার নির্জন তীরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পরমেশের কণ্ঠে যেন ঢেউ-এর ঝলক লাগলো।

অপ্রত্যাশিত একটা উষ্ণতা অনুভব কোরলো মিলি পরমেশের কণ্ঠে।

মিলির মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিলো।—সম্মুখে অস্তগামী সূর্য্যের অন্তরালে একটা সন্ধ্যাতারা ঝিকমিক কোরছে। দূরে টিটাগড়ের কল-কারখানার ধোঁয়া ক্রমশঃ আকাশকে আচ্ছন্ন কোরে দিচ্ছে।

উদাস কণ্ঠে মিলি বলে—ভাবছি, অফিসের এই দশটা পাঁচটা নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের সাথে আজকের নিভৃত অবকাশের এই ব্যবধানটুকু।

—আপনি কি লেখেন-টেখেন মিস মজুমদার?

—আগে লিখতুম একটু-আধটু। দৈনন্দিন কেরাণীগিরির কর্মক্লান্ত জীবনে অবসরই বা কতটুকু মেলে। কাজের ফাঁকের একটু অবসরেই কত লোকের সংস্পর্শে আসা—সময় পেলেই এই সব চরিত্রগুলোকে রূপ দিতে ইচ্ছে করে। বিধবা মা আর ছোট ভাই-বোনদের জীবনধারণের উপকরণ জোটাতেই বাইরের জীবন আমার জর্জরিত।

মিলির আক্ষেপ দেখে একটু অনুকম্পা বোধ করে পরমেশ। সহানুভূতির সুরে পরমেশ বলে—সত্যি, তোমার এই ত্যাগের তুলনা নেই।

পরমেশের মুখ থেকে তুমি সম্বোধন শুনে মিলি উৎফুল্ল হোয়ে ওঠে। ঠিক যেন এই ধরণের একটা আবেগই মিলি আশা কোরছিলো পরমেশের কাছ থেকে। উচ্ছল উচ্ছ্বাসে টলমল কোরে ওঠে মিলির অন্তর।

—না, আমি আর কি করেছি, আপনার জন্যই এই ভালো চাকরীটা পেলাম, তার জন্ম আমি চিরকৃতজ্ঞ।

মিলির কণ্ঠের কৃতজ্ঞতায় পরমেশ খুশী হোল। আরও নিবিড় হোয়ে পরমেশ বোসলো মিলির কাছে। মিলির নরম হাতখানা কুড়িয়ে নেয় পরমেশ। এক অপূর্ব্ব আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে মিলি।

—চল আজ ওঠা যাক, বেশ রাতও হোয়ে গেল। তুমি এখান থেকে একা যেতে পারবে তো, কপট কৌতুকে পরমেশ বলে।

—ইস্, এত রাত্রিতে আমি একলা কি কোরে যাবো? আর তাছাড়া মা আমায় বকবেন না?

—আর আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরলে কিছু বোলবেন না? কিছু মনে কোরবেন না তিনি?

—বাঃ, কেন মনে কোরবেন? আপনার কথা তো মাকে কত বলেছি। সত্যি আপনার সঙ্গে পরিচয় হোলে মা খুব খুশী হবেন। মিলির কণ্ঠে যেন একটা ছোট মেয়ের আদুরে সুর উথলে উঠলো।

ট্যাক্সীতে উঠে বোসলো ওরা দুজনে। রেড রোড দিয়ে হু-হু খাসে ছুটেছে গাড়ীটা। রাস্তার দু'পাশে শুধু অন্ধকার: মাঝে মাঝে

ল্যাম্পপোষ্টগুলোর জোনাকীর দীপ্তির মত আলোর আভাস এখানে সেখানে। অস্পষ্ট দেখা গেল গড়ের মাঠ আর কালো কালো আবছা গাছের ছায়ামূর্তিগুলো। নিবিড় ঘনিষ্ঠ হোয়ে বোসলো পরমেশ মিলির পাশে। ওর হাতখানা তুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধোরলো।

নিমেষের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে যায়। মিলির শরীরের সকল শিরা-উপশিরা যেন উত্তেজনায় আবিল হোয়ে উঠলো একজন উদ্দাম উত্তাল যুবকের স্পর্শের আবেশে। ওর চোখ দুটো বুজে এসেছে। বাড়ীর দোড়গোড়ায় এসে পৌঁছতে সজোরে হাতটা পরমেশের মুঠো থেকে টেনে নেয়। ঝট কোরে দরজাটা খুলে নেমে যায় মিলি।

পরদিন অফিসে এসে আশ্চর্য্য লাগলো মিলির। কালকের সেই মোটরের ট্যাক্সীর ভিতর উতলা হোয়ে ওঠা পরমেশের সঙ্গে আজকের অফিসের চেয়ারে বসা পরমেশের কোথায়ও যেন মিল নেই। মিলির মনে কালকের নেশার ঘোর এখনও কাটেনি—কেমন একটা আচ্ছন্ন মনোভাব।

কিন্তু মিলির সঙ্গে পরমেশের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বেড়ে চললো। ওদের দু'জনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়—পথে-ঘাটে, সিনেমা-রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই ওরা বন্ধু-বান্ধবীর দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারেনি। সকলেই জানে ওদের এনগেজমেন্ট হোয়ে গেছে—বিয়ের বেশী দেরী নেই।

ওদের প্রেমের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোল একদিন নিউএম্পায়ারে ছবি দেখতে গিয়ে। তন্ময় হোয়ে মিলি ছবি দেখছে পরমেশের কাঁধে হেলান দিয়ে। অন্ধকারে পরমেশ মিলির কাঁধে হাত তুলে দিল। তন্ময়তা ভেঙে মিলি বোললো—পরমেশ, মা বোলছিলেন পরশু দিনই বিয়ের একটা ভালো দিন আছে। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

—কি পাগলের মত বোকছো মিলি? বিয়ে-ফিয়েতে আমি বিশ্বাস করিনে। বিয়ে কোরলেই সব রোমান্স নষ্ট হোয়ে যায়—কেন এই তো বেশ আছি, আমরা দুজনে বন্ধু! লঘু কোরে নেয় পরমেশ মিলির কথাটা।

স্তম্ভিত হয়ে আঁতকে ওঠে প্রায় মিলি। ও যেন শোনা কথাটায় এখনও নিজের কানকে বিশ্বাস কোরতে পারছে না। কি বলে পরমেশ!

পর্দার আড়ালে প্রেমিকার সারা জীবন না পাওয়ার এক দুর্বিষহ বেদনার পুঞ্জীভূত মেঘ হোয়ে উঠেছে। মিলির মনেও সেই একই মেঘোদয় হোল।

আশ্চর্য্য মানুষ পরমেশ! মিলি ভাবে। এতদিন ধরে একটা মেয়ের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি কোরে খেলা কি ওর উচিত হোয়েছে? মিলি আর থাকতে পারলো না, তীব্র অভিমানে সজল হোয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো। পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘ ফেটে বর্ষা নামলো ওর দুচোখ ছাপিয়ে।

বহুদিন পর্য্যন্ত মিলির সঙ্গে পরমেশের যে কি হোল সে ঘটনা কেউ জানেনা। পরমেশের অফিসে আর মিলিকে কেউ দেখতে পায়নি।

তবে এই ঘটনার পরিসমাপ্তিতে পরমেশ খুব নিশ্চিন্ত হোল। ওর মনের গোপন কোণে হালকা একটা সুর। বিগতদিনের ঘটনাগুলো যেন কিছুই নয়—হাওয়ায় ধূলো উড়ে গেছে কোথায়।

তারপর পরমেশের জীবনে আরও কত মেয়ে এলো—এলো করবী, ছন্দা, সীমা। পরমেশের মনে এই সব মেয়েগুলোই যেন একই ধাতু দিয়ে তৈরী—অনুভূতির দিক দিয়ে এদের সঙ্গে গ্রাম্য অবুঝ মেয়ের কোন পার্থক্যই নেই। এদের আন্তরিক মাধুর্য্যে পরমেশের মন ভরে উঠেছিলো সত্যি. কিন্তু সে ভরা মনও একদিন শূন্য কোরে মিলিয়ে গেল কোথায়—কোন মৃগতৃষ্ণার অনুসন্ধানে।

পরমেশের হিতাকাঙ্খী বন্ধুরা বহু উপদেশ দিল ওকে—যমটা তোমার প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ালে চোলবে কি কোরে? এবারে কাউকে বিয়ে কোরে সেটল্‌ড হোয়ে যাও।

—কি কোরে বিয়ে কোরবো আমি, কাউকে ভালবাসতে পারলুম না আজ অবধি, পরমেশ হালকা সুরে উত্তর দেয়।

আজও তাই দিদিমার মুখে বিয়ের কথা শুনে নির্ভুল অতীতে বিচরণ কোরছিলো পরমেশ আর যৌবনের সেই রঙমাখানো দিনগুলো আর তার বিচিত্র ঘটনা সবই মনের মণিকোঠায় প্রতিফলিত হোয়ে উঠছে। আজ যৌবনের অনেকগুলো বছর পার হওয়া এই প্রাক-প্রৌঢ়ত্বের দোরগড়ায় এসে পুরনো দিনের ঘটনাগুলো বসন্ত-বাতাসের সুখস্পর্শের মত ওর মনে একটা আমেজ সৃষ্টি কোরলো।

সেই আমেজের লয় ভেঙে রান্নাঘরের পিছন দিক দিয়ে ফুলদার মেখেলা পরে ছপ ছপ শব্দ কোরে ঢুকলো মাধবীলতা। ইন্দুমালতীর প্রতিবেশী বোষ্টম শিবনাথ ভকতের মেয়ে মাধবীলতা।

কি মাধবীলতা, তোর কিছু চাই—ইন্দুমালতী জিজ্ঞেস করে।

—বাবা এইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন পরমেশদা'র জন্য, মাধবীলতা বলে। এক-হাঁড়ি দই আর কিছু চিড়ে মাটিতে নামিয়ে রেখে বুকের বিকাটা ভাল করে সংবৃত কোরে নেয়। ত্রস্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো ও।

—এইখানটায় রাখ। এরই মধ্যে শিবনাথ টের পেয়ে গেল পরমেশ এসেছে বলে, ইন্দুমালতী শুধোয়।

মাধবীলতার দাঁড়াবার ভঙ্গীতে যেন একটা লঘলাম ছন্দ আছে। পরমেশ ওর সন্ধানী চোখ দুটো ওর মুখের উপর নিবদ্ধ কোরে বোললো—তুই শিব ভকতের মেয়ে! এত বড় হোয়ে গেলি এর মধ্যে? এই সেদিন জন্মাতে দেখলুম তোকে, আর আজ বিহা-মেখলা পরে কত বড় লাগছে, আমি তো চিনতেই পারিনি গোড়ায়। আচ্ছা তোর বাবাকে বলিস, সন্ধ্যের দিকে যাব তোদের বাড়ী।

—আচ্ছা, আমি বোলবো বাবাকে। এই বলে ঘরের পিছন দিকে প্রস্ফুটিত কেয়াঝোপের আড়ালে চঞ্চল ভঙ্গীতে মাধবীলতা অদৃশ্য হোল।

—শোন দিদিমা, মাধবীলতা এত বড় হোল কি কোরে?

পরমেশের গলায় বিস্ময়ের সুর দেখে ইন্দুমালতী বলে—হবে না কেন? চোদ্দ-পোনেরো বছরের হোল মেয়েটা, যা বাড়ন্ত শরীর—দেখছো না কি রকম বড়সড় হোয়ে উঠেছে। বৌ মারা যাবার পর থেকেই শিব ভকত বড় চিন্তিত হোয়ে পড়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। মেয়েটার বিয়ের জন্য ভাল পাত্র খুঁজেই হয়রাণ শিব ভকত—এক নিশ্বাসে ইন্দুমালতী বলে ফেলে কথাগুলো।

—হ্যাঁ, তাইতো, গত বার আমি যখন এসেছিলাম ওর জন্য

ঢুকি মকেল নিয়ে আসি। এই কয়েক বছরের মধ্যেই বড় হোয়ে গেল মেয়েটা। মেয়েরা কি রকম তাড়াতাড়ি বড় হোয়ে যায়—আশ্চর্য্য বোধ করে পরমেশ।

ভকতদা', ও ভকতদা'—বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে পরমেশ। লণ্ঠনটা নিয়ে এসো, যা অন্ধকার, দেখতে পারছিনে কিছু।

শিবনাথ ভকত মৃদঙ্গ নিয়ে গান ধোরেছিলো মৃদু কণ্ঠে। এই গানই ওর সব দুঃখ, জ্বালা, তাপ থেকে ওকে ভুলিয়ে রাখে। ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে বিভোর হোয়ে যায় শিবনাথ। পরমেশের চীৎকার শুনে সাগ্রহে লণ্ঠন নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে আসে।

—এসো, বাবা এসো, আমার কি পরম সৌভাগ্য, তুমি আমার বাড়ীতে পা দিয়েছ। তোমার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ধরে বোসেছিলুম আমি। চল ভিতরে গিয়ে বসি, বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছাট আসছে।

উঠোনটা পার হোয়ে ঘরে এসে বসে পরমেশ। ঘরের ভিতর মিটমিট কোরে লণ্ঠনটা জ্বলছে। বহুদিনের পুরনো একটা ভাঙ্গা টেবিল, আর চেয়ার একখানা। পরমেশকে চেয়ারে বোসতে দিয়ে, পাটি একখানা মেঝেতে বিছিয়ে বুড়ো ভকত বসে পড়ে।

—মাধবীলতা, ও মাধবী মা! তোর পরমেশদা' এসেছেন। এক কাপ চা নিয়ে আয় তো মা! ঘর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকে শিবনাথ।

হাসির ঝলক নিয়ে এসে দাঁড়ালো মাধবীলতা। ওর লাবণ্যভরা মুখখানা অপূর্ব্ব সুন্দর মনে হোল পরমেশের। ওকে ভালো কোরে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য নড়ে-চড়ে বোসলো পরমেশ।

মাধবীলতা ঘর থেকে চলে যাবার পর পরমেশ বলে—ভকতদা,' শুনছি তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য নাকি বড় ব্যস্ত হোয়ে পড়েছ?

—হ্যাঁ বাবা, আমার তো একমাত্র ঐ দুশ্চিন্তাই পেয়ে বসেছে—মেয়েকে পার কোরলে তবে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে পারবো। ভগবানের ইচ্ছেয় আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে একটা পাত্র কোনরকমে পেয়েছি। সামনের অঘ্রাণেই বিয়ে দেব বলে ভাবছি। ছেলেটা আমাদের গ্রামেরই নীরু ভকতের ছেলে—তবে ছেলেটা খুবই ভালো।

—শুনে খুব খুসী হোলুম। ভালোয় ভালোয় হোয়ে যাক শুভ কাজটা—খুসী মনে বলে পরমেশ।

—তুমি বিয়ে অবধি থেকে গেলে বড়ই আহ্লাদ হবে আমার।

—দু'মাসের ছুটিতে এসেছি আমি, এর মধ্যে বিয়ে হোলে নিশ্চয়ই আসবো।

ঘরের সামনের দালানটাতেই ক্যাম্প খাট বিছিয়ে শুয়ে থাকে পরমেশ। ইন্দুমালতীর উঠোনের চারিপাশে অনেক ফুলগাছ, গোলাপ, গন্ধরাজ, হাসনুহানা আরও কত কি। খুব ভোরেই মাধবীলতা ফুলের সাজি নিয়ে আসে ফুল তুলতে। খট করে বাঁশের দরজাটা খোলার আওয়াজেই প্রথমেই চোখ পড়ে ফুলদার মেয়েলাটার দিকে। কারণ দরজার নীচে একটু ফাঁক। মাধবীলতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তবুও ওর কাছে বড় মধুর লাগে এই ঘুম ভাঙ্গাটা। কোন কোন দিন মাধবীলতার একটু দেরী হোলে অধীর হোয়ে প্রতীক্ষার এই প্রহরটা গুণতে থাকে পরমেশ।

ভাবতে ভালো লাগে ওর—সেদিনকার সেই বাচ্চা মেয়েটির কৈশোর পার হোল—দুদিন পর ওর বিয়েও হোয়ে যাবে। চোখের সামনে ওর জন্ম দেখতে দেখতে কত বড় হোয়ে গেল—মায়া লাগে ওর মাধবীলতাকে।

পরমেশের ঘুম ভেঙ্গে যাবে বলে মাধবীলতা আস্তে ওর কোমল হাতটা দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়। জেগে উঠলেও ঘুমের ভাণ কোরে ওর চলে যাওয়ার দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পরমেশ।

একদিন সকালবেলা অতি সন্তর্পণে পরমেশ মাধবীলতাকে কাছে ডাকলো। ওর মাথার চুলে আঙুলের স্নেহের পরশ বুলিয়ে শুধায়—মাধবী, কাল তোর বিয়ে, তোর কি চাই?

—আমি আর কি চাইবো, আমার যা দেবে তাই নেবো পরমেশদা'। ঈষৎ লজ্জায় শরীরটা অবগুণ্ঠিত কোরে নেয় মাধবীলতা। বুকের বিহার সোনালী রঙ, সকালের সূর্য্যের সোনালী আভার সঙ্গে মিলে অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে। সেই রঙ পরমেশের চোখে আবেগের নেশা ধরিয়ে দেয়। ওর সারা অন্তরে যেন অনেক ভালোবাসা স্নেহ লুকিয়ে আছে এই মাধবীলতার জন্য। চল্লিশ বছরের এই প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে ওর বহুদিনের সঞ্চিত ভালোবাসা, প্রেম এই মেয়েটার গায়েই যেন ঢেলে দিল।

মাধবীলতার বিয়ে হোয়ে গেল। আইবুড়ো পরমেশ বিয়েতে যায়নি—সেদিন বড় বিষণ্ণবোধ কোরছিলো ও। বহুদিন পর সেদিনই পরমেশ আবিষ্কার কোরলো যে, জীবনে কোনো মেয়েকেই যদি ও সত্যি ভালোবেসে থাকে তো সে হোল শিবনাথের মেয়ে মাধবীলতা।
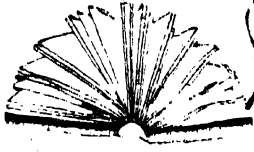
উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

নজরুল চরিত মানস

রবীন্দ্রযুগে, রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করে কাব্যরচনা করা যে বিরল সংখ্যক প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলে চিহ্নিত করা হয়, এ আখ্যাতে তাঁকে ভূষিত করা সত্যই সমুচিত; ঝড়ের মতই দোলা দেয় তাঁর কাব্য, ভাগ্যের দক্ষিণ মুখকে অস্বীকার করেন তিনি বরাবর; দেবতার মঙ্গলাশিসপ্রদ করকে প্রত্যাখ্যান করে, তিনি আবাহন জানান ঝড়ের ধ্বংসের দূতকেই অন্তরের মধ্যে; প্রলয়-বিষাণ বাজিয়ে ডাক দেন তিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে সর্ব অপমানের শৃঙ্খল চ্যুত হওয়ার জন্য।

এই মহাবিদ্রোহী কবির জীবনকাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে রচিত আলোচ্য পুস্তকখানি নানা কারণেই বোদ্ধা পাঠকসমাজে আদৃত হওয়ার যোগ্য। লেখক প্রভূত শ্রম স্বীকার করে কবির সৃজনী প্রতিভার বহুমুখী ধারাগুলিকে সংগৃহীত করে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন; নজরুলের দেশাত্মবোধী রচনা, তাঁর প্রেম-কবিতা, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বোপরি তাঁর সঙ্গীত—এ সব কিছুরই অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে আলোচ্য গ্রন্থে। আমরা পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। "নজরুল চরিত মানস"—ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত।—প্রকাশক আয়নুল হক খাঁ, নবযুগ প্রকাশনী—২১ বি নাসিরুদ্দীন রোড, কলিকাতা ১৭। পরিবেশক ভারতী লাইব্রেরী—৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দশ টাকা।

মহাচীনের ইতিকথা

বহুদিনাবধি আমরা পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস মুখস্থ করে আসছি, অথচ প্রতিবেশী এশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে রয়ে গেছি প্রায় অজ্ঞ, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতির পক্ষে এই হয়ত ছিল স্বাভাবিক একদিন, কিন্তু আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে, এখন আর ঘুমিয়ে থাকা চলে না, নিজেদের পাশের পড়শীদের সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকা আর সাজে না ভারতবাসীর; আলোচ্য গ্রন্থখানি বহন করে এনেছে আমাদের প্রতিবেশী চীনের খবর, বিশাল এই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন-এর ধারাবাহিক কাহিনী, এর বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা।

এসবই বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক যথোচিত নিষ্ঠা ও শ্রমের সহিত বিশাল চীনসাম্রাজ্যের আগাগোড়া সম্পূর্ণ একটি ইতিহাসকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। চীনের বিগত সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতা, তার পুরাতন ও নূতন সমস্যাসমূহ, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি, তার সামাজিক আচার-আচরণ—এসব কিছুরই একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে। এই প্রাচীন মহাদেশটি সম্বন্ধে কত নূতন তথ্যেরই না সন্ধান দিয়েছেন তিনি আমাদের, যেজন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে দিনের পর দিন। চীন দেশ সম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা দাবী করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। বইটির অঙ্গসজ্জা বিষয়োচিত ও মনোরম। প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয় রূপেই শোভন। লেখক—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিমচাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—সাত টাকা।

দশ পুতুল

রহস্য-সাহিত্যের দরবারে বর্তমান যুগে যিনি অনন্যা, সেই আগাথা ক্রিষ্টির রচনাকে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠকের সামনে হাজির করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বনামধন্য 'ত্রিবেণী প্রকাশন'—তাঁদের এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের এই প্রচেষ্টারই প্রথম ফল।

"দশ পুতুল" শ্রীমতী ক্রিষ্টির 'Ten little niggers' নামে বিখ্যাত আখ্যানটির অনুবাদ; অনুবাদ-কর্মটিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা বড় সহজসাধ্য নয়; ভাষান্তরিত করার সময় অনুবাদককে সচেতন থাকতে হয় সামগ্রিকভাবে রচনার সাবলীলতা বজায় রাখার জন্য সর্বদা; এই কঠিন কর্মে বর্তমান অনুবাদক সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন; কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ, ভাব সাবলীল, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে রোমাঞ্চময় পরিবেশ বজায় থেকেছে আগাগোড়া মূল গ্রন্থের মতই। শ্রীমতী ক্রিষ্টির রচনা-বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ রাখতে সক্ষম হয়েছেন অনুবাদক যা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বইটির অঙ্গসজ্জাও সুন্দর। আমরা এই অনুবাদ-গ্রন্থটির সাফল্যকামী। অনুবাদক—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড। ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চতুষ্কোণ

স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি বহুপূর্ব্ব-প্রকাশিত এক উপন্যাসের নবতম সংস্করণ। আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক রাজকুমার আদর্শবাদী ও স্বপ্নবিলাসী, মানুষের দেহের গঠনের সঙ্গে মনের গঠনের সমতা আছে কিনা, এই তার সমস্যা। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে অনুভব করার শক্তি তার নেই; খিটখিটে নিউরোটিক এই যুবকের মধ্যে আধুনিক

জনমানসের অসুস্থ প্রকৃতিকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক সরল জীবনে বাঁচতে পারছে না, অন্তর্দ্বন্দ্বে নানাবিধ বিকৃতিতে সে নিয়তই জর্জরিত—এই অশান্ত যুগমানবের আকুল আত্মজিজ্ঞাসাই আলোচ্য উপন্যাসখানির মূল বক্তব্য; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অননুকরণীয় রচনাশৈলীর জন্য বইটি আকর্ষণীয়, এ ছাড়া কোন বিশেষত্ব এর নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোরম। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু

বুদ্ধদেব বসুর সদ্যঃপ্রকাশিত এই গল্প-সংগ্রহ, মোট সাতটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। বুদ্ধদেব বাবু আজকাল গল্প উপন্যাস অনেক কম লেখেন, এ ধরণের অনুযোগ তাঁর পাঠকরা প্রায়শঃ করে থাকেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের আনন্দ বর্দ্ধন করবে নিঃসন্দেহ; গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব—তাদের ঔজ্জ্বল্য, বুদ্ধদেবের শাণিত বিশেষ ভাষারীতি তাদের যে রূপ দিয়েছে তা মধুর না হলেও মনোহারী; গভীর জীবনবোধ-এর পরিচয় পাওয়া যায় এগুলির মধ্যে; প্রথম গল্প 'একটি জীবন' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সাধারণ মানুষের নির্ব্বোধ মানসিক প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক এই গল্পটির মাধ্যমে, আজীবন পরিশ্রম করে এক দরিদ্র শিক্ষক প্রণয়ন করলেন বাংলা ভাষার এক বিরাট অভিধান, যে মহৎ কাজের তিলমাত্র মূল্য তিনি পেলেন না জীবিত থাকতে; মৃত্যুকালে তাই পৌছল তাঁর শয্যাপাশে মহা আড়ম্বরে—জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত পরাজিত মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তখন সম্পূর্ণরূপেই; মানুষের জীবন যাদের কাছে অবজ্ঞাত তাদের মিথ্যা ভাণ, কৃত্রিম হৃদয়বত্তাকে মর্মান্তিক বিদ্রূপ করা হয়েছে এই কাহিনীটিতে। বুদ্ধদেবের লেখার যা প্রসাদগুণ সেই তীব্রোজ্জ্বল ভঙ্গী প্রায় সবকটি লেখাতেই উপস্থিত আর তারই জোরে সব গল্পগুলিই হয়ে উঠতে পেরেছে রসোত্তীর্ণ। বইটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিনটাকা মাত্র।

বাঘিনী

'বাঘিনী' সমরেশ বসুর সদ্যঃপ্রকাশিত এক উপন্যাস। সমরেশ বসু দক্ষ শিল্পী, সুনিপুণ হাতে বুনেছেন তিনি এক বিচিত্র বিষয়-বস্তুকে আলোচ্য গ্রন্থে। বে-আইনী সুরা প্রস্তুতকারী এক যুবক এর নায়ক, নায়িকা তারই সহকারিণী এক অগ্নিসম্ভবা নারী, দুর্গা তার নাম; প্রকৃতপক্ষে দুর্গাই এই উপন্যাসের প্রাণসত্তা, তাকে কেন্দ্র করেই আবর্ত্তিত হয়েছে সমস্ত কাহিনীটি; নীচ জাত, নীচবৃত্তিধারিণী এই নারী পুরাণোক্তা যে কোন মহীয়সীর মতই চরিত্র-গৌরবের গর্ব করতে পারে, এমনই তার তেজ, এমনই তার আন্তর শুচিতা; তার রূপ যৌবন লুব্ধ প্রমত্ত মধুকরের দল তাই তাকে কামনা করে ও সম্ভ্রম করে, ভয় করতে বাধ্য হয়। এই বাঘিনী নারীও একদিন ভালবাসল, সমর্পণ করলো নিজেকে নিঃশেষে দয়িতের কাছে আর সব মেয়ের মতই; আর যেদিন বিপদের কাল-বৈশাখী ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে মহা আবর্ত্তের মাঝে, সেদিনও নিজের প্রেমকে অমলিন রেখে গেল সে, প্রেমাস্পদকে বাঁচালো সব অমঙ্গল হতে, দেখিয়ে দিলো তাকে কল্যাণের—ন্যায়ের—সত্যের পথ। আত্ম-বলিদানে মহিমময়ী দুর্গা-চরিত্র সত্যই এক রহস্য, পাঁকে-ফোটা পঙ্কজিনীর মতই এই চরিত্রটি মুগ্ধ করে মনকে, অভিভূত করে হৃদয়কে। অপূর্ব্ব কৌশলে রূপায়িত করেছেন এই চরিত্রটিকে যশস্বী কথাসাহিত্যিক, তাঁর ভাষা-রীতিও বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত, তবে এক এক জায়গায় কোন এক স্বনামখ্যাত লেখকের লিখন-শৈলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায় তাঁর ভাষাতে, আশা করি, এসম্বন্ধে সমরেশবাবু ভবিষ্যতে আর একটু সাবধান হবেন। বইটির আর সব চরিত্রগুলি যথাযথ ভাবেই এসেছে গিয়েছে, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে না পারলেও তারা একেবারেই যে অনুল্লেখ্য তা নয়। বইটিতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় সর্বত্র, যার জন্য বিষয়বস্তুটি হয়েছে সামগ্রিক ও জীবন্ত; এ ধরণের আঙ্গিক অবশ্য বর্ত্তমান বহু সাহিত্যিকরাই বেছে নিয়েছেন আপন আপন বক্তব্যকে জোরালো করে তোলার তাগিদে। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে তা সার্থক হয়, তা বলা যায় না; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই আঙ্গিক সুন্দরভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। লেখকের বিষয়বস্তুর আবেদন পাঠকের মর্ম স্পর্শ করতে পারে সহজেই, আর এখানেই উপন্যাসটির চরম সার্থকতা। বলা বাহুল্য, উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লেগেছে, আমরা এর সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম—সাত টাকা মাত্র।

আয়ুবের সঙ্গে

বর্ত্তমানে সাংবাদিকের ভূমিকা কি রাজনীতিতে কি সাহিত্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এই গুরু দায়িত্ব পালনের ভার পড়েছিলো একদিন লেখকের, যার ফলে তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এক বহু-আলোচিত ব্যক্তির, যাঁর কার্য্য-কলাপের প্রতি আজ অনেকের সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ; ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, এই পাকিস্তানের বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতা 'ফিল্ডমার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁর পূর্ব্ব-পাকিস্তান সফর উপলক্ষে কলিকাতা হতে লেখক ঢাকা যান, তাঁর সপ্তাহ ব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। পাকিস্তানের নানা সহরে ভ্রমণ করেছেন তিনি ফিল্ড মার্শালের সহগামী সাংবাদিকযূথের সহিত, আয়ুব খাঁর ভাষণ শুনেছেন, জনতার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে দেখেছেন; পাকিস্তানের বর্ত্তমান ডিক্টেটর সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি করতে পেরেছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তারই পরিচয় আঁকা হয়েছে। সাংবাদিক লেখক জাতে সাহিত্যিক আর সেজন্যই এই ক্ষুদ্র লেখকের পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে পাঠক যে রস আস্বাদন করেন, তা বিশুদ্ধ-সাহিত্য-রস যাতে জারিত হয়ে নীরস সংবাদ-সাহিত্য উত্তীর্ণ হতে পেরেছে রস-সাহিত্যের পর্য্যায়ে সহজেই; বস্তুতঃ যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতের' পর ঠিক এধরণের সরল সাংবাদিকতা আর দেখা যায়নি বড়। পাকিস্তানের জন-গণ-মন-ভাগ্যবিধাতা প্রেসিডেন্ট 'আয়ুব খাঁ' সম্বন্ধেও একটি পরিষ্কার ধারণা হয় বইটি

পড়ে, যা অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠককেই আনন্দ দেবে। বইটিকে আমরা সাদর স্বাগত জানাচ্ছি। আঙ্গিক সাধারণ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা। লেখক—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

রাজায়-রাজায়

'রাজায়-রাজায়' প্রাণতোষ ঘটকের সদ্যঃপ্রকাশিত উপন্যাস। আলোচ্য গ্রন্থে অতীত বাংলার এক মনোরম ছবি এঁকেছেন লেখক কালি-কলমে; প্রায় একশো বছর আগের বাংলার সামাজিক বিধিব্যবস্থার একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছে এতে। মূলতঃ সে যুগের ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজেরই রীতি-নীতি এর বর্ণিত বিষয়; ভয়াবহ ও ঘৃণ্য কৌলীন্য প্রথার কবলগ্রস্তা এক অসামান্যা রূপসী ব্রাহ্মণ-কন্যার বিয়োগান্ত জীবনকথা শুনিয়েছেন গ্রন্থকার তাঁর স্বকীয় বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। প্রাণতোষ বাবুর যা একান্তই নিজস্ব, সেই উজ্জ্বল বর্ণনাবহুল ভাষারীতিই বইখানির সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেকালের সমৃদ্ধিশালী অভিজাত হিন্দুসমাজের ঘরোয় ছবিটি একান্ত অন্তরঙ্গতায় পাঠকের সামনে ধরা দেয় লেখকের বর্ণনাচাতুর্যে, পড়তে পড়তে মনে হয় কয়েকটি বর্ণাঢ্য অদ্ভুত চিত্র দেখছি। আধুনিক অধিকাংশ লেখকের মত কোন ইজম্ নিয়ে মাথা ঘামান না আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁর লেখা পাঠককে চেতন অবচেতন মনের বিশ্লেষণের ধাঁধায় বিভ্রান্ত করে তোলে না কখনই; কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড জীবন-চিত্র আঁকেন তিনি সহজ পারঙ্গমতায়, আর সে চিত্রগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রায়শঃ তাদের রং-এর বাহারে—রূপের ঝলকে। বাংলার এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের রূপকথার মতই আলোচ্য উপন্যাসখানি আমাদের আকৃষ্ট করে, আনন্দ দেয়। আশাকরি বইটি পাঠক-সমাজের হাতে যথাযোগ্য সমাদরে বঞ্চিত হবেনা।—উপন্যাসটির অঙ্গসজ্জা এক কথায় ত্রুটিহীন। প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—নয় টাকা।

চাবি-কাঠি

শক্তি মুখোপাধ্যায়

তুমি মানো আর নাই মানো
সংসারে গুরুত্ব অনেক আছে
চাবি কাঠি নিয়ে।
ছোট বড় মাঝারি যাবতীয়
সোনা রূপা তামা লোহা
আরো সব ধাতু দিয়ে গড়া
তালা যদি ঝোলাও কখনো,

কাঁচা পাকা কোঠা বাড়ির আবদ্ধ দুয়ারে
কিংবা ভাঁড়ার ঘরে, চাবি কাঠি নিয়ে
কয়েকটি মুহূর্ত ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
কয়েকটি বিন্দুর মত অবশেষে মৃদু চাপ দিলে
সকল দুয়ার সেদিন উন্মুক্ত হবে।

এতবড় বিস্তীর্ণ নীলাকাশ
পৃথিবীর মাথার উপর
কালো কালো মেঘ যদি আসে সেথা
উন্মাদের মত
স্নেহময়ী মাটির পৃথিবী তার
ছায়া ছায়া অন্ধকারে ডুবে
অন্ধ হয়ে যাবে।
তখন দুরন্ত হাওয়া তার চাবি-কাঠি হয়ে
কয়েকটি মুহূর্ত ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
কয়েকটি বিন্দুর মত অবশেষে মৃদু চাপ দিলে
অশান্ত মেঘের দল উড়ে চলে যাবে।]

খোলা আকাশের মত মানুষের মন নিয়ে
জীবনে অনেক খেলা খেলে;
তুমি যদি কিছুই না পেলে,
নিরালায় চুপি চুপি মনের দুয়ারে এসে
স্নেহহীন প্রেমহীন তালা যদি
ঝোলাও সেখানে,
তোমার পাষাণ প্রেম সৃষ্টিছাড়া হয়ে
অবিরত মাথা খুঁড়ে দেয়ালে দেয়ালে।
ভাবো তুমি—
রক্তের কৌটো দিলে যদি আসে
মনের মানুষ!

ব্যর্থ প্রেমিক তার বুকের পাঁজরে যদি
চিরদিন তালা দিয়ে রাখে
হৃদয়-মরুতে আর কোনদিন ফুটবে না
ভালোবাসা-ফুল।
নিদারুণ বাসনার তপ্ত জ্বালায়
জীবনে জোয়ার যদি আগাতেই চাও'
খুঁজে-পেতে নিয়ে এসো
চটুলা চপলা এক ষোড়শী যুবতীর
কটাক্ষ নয়নবাণ
একটি চাবি-কাঠি।

চট্টগ্রামের পল্লীকবি আলওয়াল

প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি চট্টগ্রাম। তার একদিকে কর্ণফুলী নদী আর অন্যদিকে বংগোপসাগর—এই দু'টে মিলে চট্টলার মাটিকে করেছে উর্বর। শুধু তাই নয়, এর দু'পাশে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড়ো অসংখ্য পাহাড়। সেই পাহাড়ের বুকে সবুজ ঘাসের সমারোহ। মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন এদের গায়ে পরিয়ে দিয়েছেন সবুজ ওড়না। চট্টগ্রামের এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনে গড়ে উঠেছে তার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির সরসতা ও প্রাণের সবুজ সমারোহ বহু প্রাচীন কাল থেকেই এখানে সাহিত্য আর কাব্যরসের উপাদান জুগিয়েছিলো। চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ তারই সার্থক প্রকাশ।

আজ হতে প্রায় চারশো বছর আগে এই প্রকৃতির লীলানিকেতনে জন্মেছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলমান পল্লীকবি—জৈনুদ্দীন, মোহাম্মদ সগীর, মোহাম্মদ কবীর, বাহরাম খাঁ, দৌলত উজীর, দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলওয়াল প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অমূল্য অবদানের কথা আজো অনেকের কাছে অজ্ঞাত। অথচ সেদিন তাঁদের মতো পল্লীকবিরাই সাহিত্যে এনেছিলেন এক যুগান্তর। তাঁদের আগে হিন্দু কবিরা বাংলা সাহিত্যকে ধর্মমূলক রচনার মধ্যেই রেখেছিলেন সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন হিন্দুযুগের ইতিহাস-পুরাণের কথা, প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও বীরগাথা আর দেব-দেবীর মাহাত্ম্য ও অলৌকিক শক্তি—এগুলোই ছিলো তখনকার বাংলা সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু। এ হোল প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কথা। তারপর চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে এক আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ডুবে গেলো বাংলা সাহিত্য। এই যুগের 'গীতাবলী" ও 'পদাবলী"-সাহিত্যই ছিলো চিন্তাশীল মানুষদের প্রধান উপজীব্য বিষয়। আবার পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শাক্ত আর শৈব সম্প্রদায়ের মানুষরা ধর্মমঙ্গল মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতি দেব-দেবীদের কেন্দ্র করে এক খাঁটি ধর্মমূলক সাহিত্য গড়ে তুললেন। এভাবে বাংলা সাহিত্যে ঢুকলো এক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সংস্পর্শ থেকে বাংলা সাহিত্য সরে গেলো অনেক দূরে।

কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী কোন কিছুই স্থায়ী হতে পারে না বেশী দিন। যুগের সঙ্গে তাল রেখে আসে পরিবর্তন। রূপান্তর হয় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক অবস্থায়। তাই আমাদের বাংলা সাহিত্যেও দেখা গেলো তার প্রতিফলন। নিছক ধর্ম সাহিত্য থেকে তাকে অন্য পথে চালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো সেদিন। আর এই গুরুদায়িত্ব নিলেন তখনকার মুসলমান পল্লীকবিরা। তাঁরা মৌলিক রচনা, অনুবাদ আর অন্যান্য লেখার মধ্য দিয়ে সেকালের সামাজিক আর রাজনৈতিক ছবি এঁকে বাংলা সাহিত্যকে করে তুললেন সম্পদশালী। তাঁদের সাহিত্যে স্বীকৃতি পেলো মানবীয় ধর্মের মাহাত্ম্য আর এভাবে সাহিত্য থেকে মুছে গেলো ধর্মের প্রভুত্ব ও একঘেয়ে গতানুগতিকতা। সুতরাং সম্পূর্ণ বাংলা উপাদানে আর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হোল নতুনভাবে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই সব পল্লীকবিরা সত্যিই বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন এক বিরাট রূপান্তর।

সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রামের অন্যতম খ্যাতনামা পল্লীকবি আলওয়াল প্রাচীন কবিদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। হিন্দুরা যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তেমন চট্টগ্রামবাসী মুসলমানদের ঘরে ঘরে আলওয়ালের নাম আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। আলওয়াল তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠা করলেন মানবীয় প্রেমের আদর্শ। কিন্তু এই মানবীয় প্রেম অনেক ক্ষেত্রে মানবাতীতের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এর স্থান মানবজগতে, কিন্তু এর পরিণতি রূপকথার পরীরাজ্য। এই প্রেম সম্ভোগসুখের জন্যে নয়, জীবন পণ করে এই প্রেম লাভ করতে হয়। এখানেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে আলওয়ালের কাব্যের রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

আলওয়ালের লেখা কাব্যগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই হোল অনুবাদ। একথা ঠিক যে, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে তার নিজস্ব ভাবধারাই একমাত্র পাথেয় নয়। এর ফলে সাহিত্য একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই তাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন অন্যান্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পাঠকদের ভালোভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ অন্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যোগাড় করে নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধনই হোল একমাত্র পথ। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অন্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ নিজ সাহিত্যকে করে তোলে যথেষ্ট সম্পদশালী। আধুনিক যুগের সাহিত্য হোল তার সাক্ষ্য। যা হোক, ষোড়শ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদের কোন প্রশ্নই ছিলো না। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে তখন কিছু অনুবাদ হয়েছিলো বটে, কিন্তু তা ছিলো একেবারে দুর্বোধ্য।

তাই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পল্লীকবিরা এই দুরবস্থায় কবল থেকে, বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করবার জন্যে তখনকার অন্যতম সম্পদশালী ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলোর অনুবাদ আর ভাবানুবাদে মনোযোগী হলেন।

অনুবাদ-সাহিত্যে আলওয়াল প্রাচীন কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি কোথাও মূল রচনার মৌলিকত্ব নষ্ট করেন নি, বরং তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার ফলে তা তাঁর নিজ [illegible]রই সামিল হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্যগুলো অনুবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে নতুন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আলওয়ালের কাব্যের মধ্যে "পদ্মাবতী" হোল প্রধান। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন হিন্দী কবি শেখ মালিক মোহম্মদ জায়সী হিন্দীভাষায় "পদুমাবৎ" নামে এক কাব্য রচনা করেন। আলওয়ালের "পদ্মাবতী" হোল তারই বাংলা অনুবাদ। আর এটাই ছিলো আলওয়ালের 'সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম' রচনা। জানা যায়, আরাকানের মুসলমান প্রধান মন্ত্রী মার্গ ঠাকুরের অনুরোধে আলওয়াল রচনা করেছিলেন ১৬৫১খৃঃ। এর পর তিনি লিখলেন "সতীময়না লোরচন্দ্রানী" নামে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। চট্টগ্রামের আরেকজন বিখ্যাত পল্লীকবি দৌলতকাজীর "সতীময়না" কাব্যকে আলওয়াল এই নামে সম্পূর্ণ করেন। এই কাব্যে নায়ক-নায়িকাদের দাম্পত্য জীবনের একটা দিক বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর চরিত্রগুলো অল্প আয়তনের মধ্যে এতো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এই অপূর্ব মিলনান্ত নাটক আলওয়ালকে অমর করে রেখেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

তারপর ১৬৫১-৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আলওয়াল প্রসিদ্ধ পারসিক কাব্য "সয়ফুলমুলুক বদিয়ুজ্জমাল" অনুবাদ করলেন তাঁর তৃতীয় রচনা হিসেবে। আর এই কাব্যের স্থান তাঁর "পদ্মাবতী"র পরেই। এর পর ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি যশস্বী পারসিক কবি নেজামী গঞ্জনবীর কাব্য "হপ্তপয়করে"র কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করলেন "সপ্তপয়কর" নাম দিয়ে। আরব আর আজমের সুলতান নোমানের ছেলে বাহরাম পাশের সাতটা রাজ্য জয় করে সাতজন পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এই সাতজন রাজকন্যার মুখে "হপ্ত পয়করের" অর্থাৎ সাতটা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। তারই কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি পাঠকদের জানবার জন্যে :

"আনন্দ উৎসবে রায়, যেদিন গৃহে যায়
সবে পরে সেই বর্ণমাস।।
নৃত্যগীত অবশেষে গৌরাইয়া কেলিরসে
শয়ন সময় বাহরাম।
কহে রাজকন্যা প্রতি শুন শুন গুণবতী
কহ এক প্রসঙ্গ উপাম।।
এই মতে সপ্তরাত্রি সপ্ত বিজ্ঞা কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।
এই পুস্তকের সূত্র শুন শুন সাধুপুত্র
রসাসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ।।"

এটা আমাদের কাছে সহজে অনুবাদ বলে মনে হয় না। অনুবাদ যে এতো স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে পারে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। হয়তো এই বিংশ শতাব্দীতে এটা আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়কর মনে না হতে পারে, কারণ আজ বাংলা পরিভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে অনুবাদও খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকে বাংলা পরিভাষার দৈন্যের কথা ভেবে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আলওয়াল তাঁর যুগকে অতিক্রম করেছিলেন। আজ হতে তিনশো বছর আগে একজন চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে শুদ্ধ বাংলায় রচনা করা সত্যিই হতবাক করে তোলে বর্তমান যুগের মানুষকে। হয়তো তাঁর কাব্যগুলোর কোন কোন অংশে স্থানীয় কথ্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা গেছে, কিন্তু তা' কোথাও ভাষার মর্যাদাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার রচনা করা সত্যিই হতবাক করে তোলে বর্তমান যুগের মানুষকে। হয়তো তাঁর কাব্যগুলোর কোন কোন অংশে স্থানীয় কথ্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা গেছে, কিন্তু তা' কোথাও ভাষার মর্যাদাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যরস সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠেছে।

আলওয়ালের আর দু'টো রচনা হোল "তোহফা" (১৬৬৪) ও "সেকান্দরনামা" (১৬৭৩) পারসিক কবি ইয়ুসুফ গদার লেখা "তোহফা" বা তত্ত্বোপদেশ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন আরাকানের রাজমন্ত্রী সোলায়মানের অনুরোধে। এই কাব্যগ্রন্থে আছে মুসলমানধর্ম সম্পর্কিত উপদেশ আর করণীয় ক্রিয়াকলাপগুলো

কথা। তার পর ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে আলওয়াল লিখলেন তাঁর সর্বশেষ রচনা "সেকান্দরনামা।" এটা বিখ্যাত পারসিক কবি নেজামী গজনবীর লেখা কাব্যের বাংলা অনুবাদ। এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আলেকজেণ্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী।

এভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে আঘাত হেনে দরদী পল্লীকবি আলওয়াল তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন এক বৈচিত্র্য আর নতুনত্ব। শুধু তাই নয়, সাহিত্যে ভাষার রূপ পরিবর্তনেও তাঁর দান অনবদ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চলতি আর কথ্য শব্দ সংমিশ্রণের ফলে পূর্ব আর পশ্চিম-বাংলার পাঠকদের কাছে তা' ছিলো একেবারে দুর্বোধ্য। ভাষার এই দৈন্য দূর করবার জন্যে আলওয়াল প্রবর্তন করলেন সমসাময়িক আদর্শ ভাষা ও ছন্দের। শুধু তিনি নন, তখনকার অন্যান্য পল্লীকবিদের রচনায় মধ্যেও দেখা গেছে তাঁর প্রভাব। এই প্রসঙ্গে আলওয়ালের একটা কবিতার ছন্দ ও ভাষা তুলে দিলুম :

"আসিয়া আসন পরে বসিয়া রাজন।
পন্থ পরিশ্রম ক্লেশ কৈল নিবারণ॥
সপ্তখণ্ড পৃথিবীর নৃপতি আজ্ঞাভুক্ত।
নিয়োজিল প্রতি খণ্ডে ন্যায়ের উপযুক্ত॥
ভূপতি সঙ্গতি ছিল যত নৃপদল।
প্রতিজ্ঞায় দড় করি আছিল সকল॥
নৃপতির হস্তে পাই যোগ্য পুরস্কার।
স্বীয় স্বীয় দেশে গেল হরিষ অন্তর॥"

এই ধরণের পাণ্ডিত্যমূলক ভাষা আর ছন্দের উৎকর্ষ, সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে দিলো এক নতুন রূপ। এভাবে বাংলা ভাষা ও ছন্দ বাঁধা নিয়মের পর্দা ঘুচিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে শিখলো।

সুতরাং আলওয়ালের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য সেদিন প্রত্যক্ষ করলো সমস্ত পুরানো বাঁধা বেষ্টনের আদর্শের নিশ্চিত মৃত্যু। তাই লোকসাহিত্যে দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে প্রচুর গান রচনা হবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি যে মানবসঙ্গীত খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, সেটাই ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে উঠলো প্রথমে প্রেমসঙ্গীতে আর পরের শতকে দেশাত্মবোধক রচনার মধ্য দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, সাহিত্যে ও শিল্পে যে একটা বিশিষ্ট পরিণতি ফুটে উঠেছে, নতুন সৃষ্টি রচনা ও আবিষ্কারের পথে যে নবতর আর অজস্র সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে তার মূলে আছে দেশেরই সৃজনী-প্রতিভা। আর সেদিন আলওয়ালের মতো কবি-প্রতিভাই বাংলা সাহিত্যে এক বৈচিত্র্য বা নতুনত্বের আমদানী করে তার মোড় দিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, সমাজ বিবর্তনে এই সব পল্লীকবিদের অমূল্য অবদানের কথা আজো ওঠেনি বাংলা সাহিত্যের খাতায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের পথ প্রদর্শক এই সব লোক-কবিদের মহামূল্য রত্নরাজি আবিষ্কার করাই হোল আজকের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর একান্ত কর্তব্য। এভাবে যে শুধু তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে তা' নয়, এই মহান প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এক নবযুগের সূচনা করবে বাংলা সাহিত্যের আকাশে।

—অংশুরঞ্জন সেন

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

চিত্রগীতি

"নতুন ফসল"—নিউ থিয়েটার্স (এক্সিবিটরস্) প্রাইভেট লিমিটেড। সংগীত পরিচালনা :—আর, সি, বড়াল। N 77017 (চিত্রগীতি)—"সুখের সাগরে দুখ উপজিল" ও "বন্ধু, তুমি যে আমার প্রাণ"—গান দু'খানি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

N 77018 (চিত্রগীতি)—"সাধ করে পুষিলাম ময়না" ও "চিনবি কেমনে"—গান দু'খানি গেয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর—নির্মলেন্দু চৌধুরী।

N 77019 (চিত্রগীতি)—"আমার যেমন বেণী"—গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর—নির্মলেন্দু চৌধুরী। "আহারে হৈমবতী" গেয়েছেন মিণ্টু দাশগুপ্ত।

"হসপিটাল"—এন-সি-এ প্রোডাকশনস্। সংগীত পরিচালনা :—অমল মুখোপাধ্যায়। N 77016 (চিত্রগীতি)—"এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়" ও "ঘুম মাঝি ওই হাল ধরেছে"—গান দু'খানি গেয়েছেন গীতা দত্ত।

"শিশু রঙমহল"—N 82899 (ছোটদের গান)—"মাগো, বৃষ্টি ভেজা কেন মানা" ও "যাচ্ছি পুজোর ছুটিতে"—(মঞ্জু, কৃষ্ণা, শান্তা ও চন্দনা) ও (কৃষ্ণা, মঞ্জু, শান্তা, চন্দনা ও পিণ্ট)।

N 82900 (ছোটদের গান)—"ছোট্ট পরী" ও "তা তিনি তাক তেনাক যাদু"—শৈলেন, কৃষ্ণা, মঞ্জু, দীপ্তি ও পিণ্ট।

আমার কথা (৭০)

শ্রীমতী বাণী ঘোষাল

"বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক হস্তে" বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর এই চিরন্তন মূর্তি কল্পনা করেই বোধ হয় জন্মেছিলেন শ্রীমতী বাণী ঘোষাল। তাই জীবনের তেইশ বৎসর ধরে একদিকে গান অপর দিকে

শ্রীমতী বাণী ঘোষাল

পড়া দুইয়েরই চর্চা করে যাচ্ছেন সমান তালে। শ্রীমতী ঘোষাল আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের শেষ প্রান্ত পৌঁছে "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" নিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সময়ানুসারে পৌঁছালাম শ্রীমতী ঘোষালের দরজায়, জানালাম আগমন উদ্দেশ্য। কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে আমন্ত্রণ জানালেন শ্রীমতী ঘোষাল—বলতে লাগলেন তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনের ইতিবৃত্ত।

শ্রীমতী ঘোষাল বললেন—এই কলিকাতা মহানগরীর বুকেই ১১৩৭ সালে জন্মেছি আমি। আমার পিতৃপুরুষের ভিটে বরিশাল জিলার "বৈদদাকোটা" গ্রাম হলেও সেখানে গিয়েছি মাত্র জীবনে একবার। আমার সঙ্গীত-জগতে প্রবেশের পিছনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পটভূমিকা না থাকলেও, আমার মায়ের উৎসাহ যে এ পথে আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মা নিজে গান গাইতে পারতেন, কাজেই তাঁর চেষ্টাতে ছয় বৎসর বয়স থেকে শ্রী সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ক্লাসিক, আধুনিক গান শিখতে আরম্ভ করি।

তখন আমি দেশবন্ধু স্কুলের ছাত্রী। গান এবং পড়াশুনা দুই-ই একসঙ্গে চালাতে লাগলাম। ম্যাট্রিক পাশ করার আগেই ১১৫০ সালে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "বাঁশরিকার বাঁশরী বাজাও" গানখানা এইচ, এম, ভিতে রেকর্ড করি। রেকর্ডখানা করার পর থেকেই জনসমাজে আমার কিছুটা পরিচিতি ঘটে বলে মনে হয়, এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন জলসার আসরে গান গাইবার আমন্ত্রণও পেতে থাকি। আজও মনে পড়ে কোন এক জলসার আসরে আমার গান শুনে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ৺সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে গান শেখাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি খুশী মনেই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করি। গান শেখার প্রসঙ্গে পড়াশুনার কথাটাও না বলে পাচ্ছি না। তাছাড়া গানের জন্যে পড়াশুনায় ভাঁটা পড়েনি জীবনে একদিনও। দুটাই আমার কাছে সমান-ভাবে আদর পেয়েছে। ১১৫২ সালে দেশবন্ধু গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ কলেজে আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হই। ১১৫৪ সালে আই-এ পাশ করে ঐ কলেজেই বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হই। কলেজ-জীবনে নিয়মিত কলেজ ফাংশানে গান গাইতে থাকি। ভাল গান জানলেও বেতারশিল্পী হতে না পারলে সঙ্গীত-সমাজে পরিচয় লাভ করা যায় না জেনে ১১৫১ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে অডিশনও দিই এবং বেতার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত হয়ে বেতারশিল্পিরূপে নিয়মিত বেতারে গান গাই। কোন গান জনসমাজে বেশী আনন্দ দিতে পেরেছে ঠিক বলতে না পারলেও যতদূর মনে পড়ে ১১৫৩ সালে ৺পূজা রেকর্ডে সলিল চৌধুরীর সুরে গাওয়া "তেলের শিশি ভাঙলো বলে," "ইস্কাবনের দেশে" গান দুখানি এবং দিলীপ সরকারের সুরে 'হায় চাঁদ তুমি শুধু" গানখানা জনচিত্তে কিছুটা আসন সংগ্রহ করতে পেরেছে বলে মনে হয়। এছাড়া ১১৫৬ সালে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া "কুয়াশায় ঘেরা নীল পাহাড়ে" "তোমার দেওয়া এ" গান দুখানিও জনগণ গ্রহণ করেছিল বলে মনে পড়ে। ১১৫৬ সাল আমার জীবনে গানের দিক বাদ দিয়ে ও কলেজ জীবনের দিক দিয়ে বিচার করলেও স্মরণীয় হয়ে থাকে। আমি বি-এ ডিগ্রি লাভ করে কলেজে অধ্যয়ন শেষ করি। তারপর থেকেই পড়াশুনা বন্ধ রেখে গানের দিকে একটু নজর দিই। রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখবার উদ্দেশ্যে "দক্ষিণীতে" ভর্ত্তি হই এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ডিপ্লোমা পাই। আজ পর্য্যন্ত গানের রেকর্ড করেছি কম পক্ষে ২৫ খানার উপর। রবীন্দ্র সঙ্গীতে এখনও আমার কোন রেকর্ড নেই। তবে ভবিষ্যতে করার আশা রাখি।

শ্যামাসঙ্গীতে কোন রেকর্ড না থাকলেও রেডিওতে শ্যামাসঙ্গীত গাইছি নিয়মিত। রেকর্ড করা ছাড়া ও সিনেমায় প্লে ব্যাকে গান করেছি কয়েকখানি ছবিতে। সবগুলির নাম মনে না থাকলেও 'কার পাপে', 'আঁধি' এবং 'ভোলামাষ্টার' প্রভৃতি বইগুলির নাম আজও মনে পড়ে। ১১৫৬ সালে বি-এ ডিগ্রি লাভ করার পর পুনরায় এম-এ পড়ার ইচ্ছা জাগে মনে। এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম-এ পড়ার ইচ্ছা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় উপস্থিত হই। দুঃখের বিষয়, সেখানে কোন সিট না পেয়ে অগত্যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" নিয়ে এম-এতে ভর্ত্তি হই। বর্ত্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি এবং আসছে বছর এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার আশাও রাখছি। গান আর এখন কারো কাছে শেখা হচ্ছে না এবং কা'কেও শেখাচ্ছি না। নিজের মাষ্টার নিজে হয়েই গানের চর্চা বজায় রেখে যাচ্ছি। আমার গান শেখার ইতিহাসে নিত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৺সুধীরলাল চক্রবর্তী ছাড়াও শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী মহাশয়ের নাম জড়িত থাকবে। পড়া এবং গান ছাড়া ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ছবি এখনো আঁকতে পারি নি, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমান নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি।

"I would rather make my name than inherit it."

—Thackeray

বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এমন অনেক তাস আছে যেগুলির গেমে উৎসাহিত করবার মত শক্তিশালী কিন্তু যেহেতু একের-উপর, একের ডাকের শক্তির সীমা বহুদূর প্রসারী এবং উদ্বোধনকারী এক ডাক অন্ততঃপক্ষে একচক্র সীমা বাঁচিয়ে রাখতে স্বতঃ বাধ্য, সুতরাং প্রথম থেকেই ডাক বাড়িয়ে ডাক বিনিময়ের পথ জটিল করবার প্রয়োজন কি? বরঞ্চ আস্তে আস্তে শক্তি যাচাই ক'রে নির্দ্দিষ্ট ডাকে পৌঁছান সহজ ও সরল—কোনও সময়ে—কোনরূপ অসুবিধার সম্ভাবনা থাকে না। যাচাই ক'রে নেবার রাস্তা যখন খোলাই, তখন তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজনীয়তা কি? আগেই বলা হ'য়েছে যে, উদ্বোধনী ডাক দিতে গেলে দ্বিতীয় চক্রে ডাক দেবার মত প্রস্তুতি থাকা দরকার। সেই প্রস্তুতি কিরূপ জানবার সুযোগ একের উপর একের ডাকেই বেশী। সুতরাং শক্তি কিরূপ ও কোথায় নিহিত জানতে পারলে উচ্চতর ডাকে, এমন কি স্লামে পৌঁছাতে পারা যায় সহজে পরস্পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ডাকের বিনিময়ে। অযথা সেই সুগম রাস্তা দুর্গম ক'রে তোলবার আবশ্যকতা আছে বলে ত' আমার মনে হয় না।

তর্কের খাতিরে ধরা যাক—উপরোক্ত ৫ ও ৬নং তাস দুটিই শক্তিশালী এবং সম্মিলিত শক্তিতে দুটি হাতেই গেম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ ডাকে চুক্তি করলে, গেম করা সম্ভব, সেটি যাচাই করার প্রয়োজন প্রথমে। তার অর্থ এই যে, খেঁড়ীর উদ্বোধনী ডাকটি কিরূপ ও কত দূর শক্তিশালী এবং তাসের বিভাগ কিরূপ জানা দরকার। জানতে গেলেই তাকে স্বাধীনভাবে আর একবার ডাকবার সুযোগ দিতে হবে এবং সেই সুযোগ দেওয়া সম্ভব একমাত্র একের 'উপর' একের ডাক দিয়ে।

মনে করুন ৫নং তাসের খেঁড়ী ডাক উদ্বোধন করেছেন নিম্নতম শক্তিতে যথা:—ই-৭, ৪; হ-গো, ৫, ২; রু-টে, সা, ৮, ৬, ২; চি-টে, ৮, ২। সুতরাং দুটি হাতের সম্মিলিত শক্তিতে একমাত্র গেম হওয়া সম্ভব নো-ট্রাম্প ডাকে। যদি না চিড়িতন প্রথম খেলা হয় (lead) এবং উক্ত খেলোয়াড়ের নিকট পাঁচখানি চিড়িতন ও ইস্কাবনের সাহেব থাকে। তা সত্ত্বেও এরূপ সম্ভাবনাময় তাসে তিনটি নো-ট্রাম্পের ডাক হবে প্রায় সব সময়েই। আবার দেখুন, উদ্বোধনকারীর তাসটির কিছুটা রদবদল করে। মনে করুন তিনি ডাক দিয়েছেন নিম্নরূপ তাসে যথা:—ই-গো, ৪, ২; হ-বি, ১০, ২; রু-টে, সা, ৮, ২; চি-বি, গো, ৫। এই তাসে উদ্বোধনী একটি রুহিতনের ডাক খুবই সমীচীন, কিন্তু খেঁড়ীর একটি হরতনের ডাক এলে তাসটিতে আর কোনও ডাক নেই একমাত্র একটি নো-ট্রাম্প ছাড়া। অর্থাৎ খেঁড়ীকে জানান যে, উদ্বোধনী ডাকের পক্ষে নিম্নতম শক্তিতে প্রথম ডাকটি উদ্বোধন করা হয়েছে এবং একের ডাকের বেশী ওঠবার ক্ষমতা তার নিজ হাতে নেই। অর্থাৎ প্রথম সুযোগেই খেঁড়ীকে জানান সম্ভব হয় যে, তাসটির পিঠজয় করবার মত শক্তি পরিমিত এবং তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প জাতীয় (৪-৪-৩-২, ৪-৩-৩-৩ গোছের)। সুতরাং সম্মিলিত উচ্চতাসমূল্য ৬ থেকে ৬½ ট্রিকের মত। গেম করা তবুও শক্ত হয়ে পড়ে এবং নির্ভর করে—রুহিতন ও হরতন রংয়ের তাসের বিভাগ ও ইস্কাবনের সাহেবের অবস্থিতির উপর। তা সত্ত্বেও এরূপ সম্মিলিত শক্তিতে গেমের ডাক হবে তিনটি 'নো-ট্রাম্প'।

৬নং তাসের উচ্চতাসমূল্য ৩+ রুহিতন সাহায্য না থাকায় প্রথমেই গেমে উৎসাহিত করা অর্থাৎ দুটি হরতন ডেকে ডাক জটিল করা উচিত নয়। খেঁড়ীর হাতের শক্তি ও তাসের বিভাগ যাচাই করবার উদ্দেশ্যে একটি হরতন ডেকে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় চক্রে প্রস্তুতি কিরূপ জানবার জন্য। এইরূপ ভাবে ডাকের বিনিময়ে পরস্পরের শক্তি যাচাই করে নির্দ্দিষ্ট ডাকে পৌঁছানই হচ্ছে ডাকের প্রধান উদ্দেশ্য। মনে করুন, উদ্বোধনকারী একটি রুহিতন ডেকেছেন নিম্নলিখিত তাসে:—

ই-সা, বি, ৩; হ-সা, ৪, ২; রু-টে, সা, ১০, ৫, ২; চি-১০, ৭ (ট্রিকমূল্য ৩½)। দুটি হাতের সম্মিলিত শক্তি ৬½+ট্রিক (৩½+৩) অর্থাৎ স্লাম ডাকের (Slam) কাছাকাছি, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়, একমাত্র চিড়িতন রংয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় চক্র রোখবার তাসের অভাবে (lack of first or second round control in clubs). কারণ প্রথমেই বিপক্ষদল চিড়িতনের টে ও সা দুটি পিঠ টেনে নেবেন। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ট্রিকের সাথে সাথে বিপক্ষদলের পিঠজয় রোখবার তাসের (control) প্রয়োজন স্লাম করবার জন্য। ঐ একই প্রকার শক্তিতে, সামান্য রদবদলে, এবং চিড়িতনের দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাসের বর্ত্তমানে স্লামের খেলা করা সম্ভব কেন, সুনিশ্চিতই বলা চলে। যথা:—

উদ্বোধনকারীর তাস	উচ্চতাস-মূল্য	খেঁড়ীর তাস	উচ্চতাস-মূল্য
ই-সা, বি, ৩	১	ই-টে, ৫, ২	১
হ-সা, ৪, ২	½	হ-টে, বি, ১, ৫, ৩	১½
রু-টে, ১০, ৭, ৫, ২	১	রু-৩	×
চি-সা, ১০	½	চি-বি, গো, ৪, ২	½
	৩		৩

দুটি হাতের সমষ্টিগত উচ্চতাস-মূল্য মাত্র ৬, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিটি রংয়ের রোখবার তাস থাকায় (control-first/second round) হরতন রংয়ে ছ'য়ের ডাকে খেলা করা খুবই সহজ—একমাত্র চিড়িতনের টেক্কা ছাড়া আর কোন পিঠই পাবেন না বিপক্ষদল। এইরূপ বিশেষত্ব থাকার জন্যই এই খেলাটি এত চিত্তাকর্ষক। যাহোক এ বিষয়ে স্লামের ডাকের পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

(খ) একটি নো-ট্রাম্প ডাক

উদ্বোধনী একটি ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের পর্য্যায় দুটি :—

(১) একটি বড় রংয়ের ডাকের উপর অর্থাৎ একটি ইস্কাবন বা একটি হরতনের উপর।

(২) একটি রুহিতন বা একটি চিড়িতনের ডাকের উপর।

দুটি ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে বদলী ডাকের উপযোগী তাসের অভাব জানান হয় ; উপরন্তু জানান হয় যে, উচ্চতাস-মূল্য সীমাবদ্ধ, ১+ থেকে ১½+ পর্য্যন্ত (এবং তাসের বিভাগ কতকটা নো-ট্রাম্প জাতীয়)। ডাকের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় চক্রে ডাক এলে রং নির্ব্বাচনে সাহায্য করা ছাড়া অন্য দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত, এই বুঝে উদ্বোধনকারীকে দ্বিতীয় চক্রে ডাক দিতে হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি ইস্কাবন বা হরতন এবং একটি রুহিতন বা চিড়িতন ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমতঃ একটি ইস্কাবনের উপর দুটির ডাক ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু এ রকম তাস অনেক সময়েই আসে, যে তাসে ইস্কাবন ছাড়া অপর রংয়ে বেশী পিঠ পাওয়ার সম্ভাবনা এবং তাসের শক্তি ১½ ট্রিকের মত, অথচ কোন রংয়ে দুটির ডাক দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত। এরূপ তাসে একটি নো-ট্রাম্প ডাক দিয়ে একচক্র ডাক বাঁচিয়ে রেখে খেঁড়ীর দ্বিতীয় ডাকের অপেক্ষায় থেকে গুণাগুণ বিচার করে ও তদনুযায়ী পথ অবলম্বন করবার সুযোগ পাওয়া যায়। একটি হরতনের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের পরিমাপ সামান্য পৃথক। এক্ষেত্রে একটি হরতনের উপর একটি ইস্কাবনের ডাক চলে। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি নো-ট্রাম্প ডাকের অর্থ এই যে, উক্ত হাতে একটি ইস্কাবন ডাক দেওয়ার তাসের অভাব, বদলী দুয়ের ডাকের উপযুক্ত শক্তি নেই অথচ পাস দেওয়া চলে না এই ভেবে যে উদ্বোধনকারীর হাতে নিম্নতম শক্তি অপেক্ষা কিছু বেশী শক্তি থাকলে হরতন রংএর বদলে অপর কোন রংয়ে বা নো-ট্রাম্পে বেশী পিঠ জয়ের সম্ভাবনা আছে। একটি রুহিতনের ডাক হ'লে একটি ডাকের পক্ষে একটি ইস্কাবন বা একটি হরতনের পথ খোলা কিন্তু তবুও একটি নো-ট্রাম্প ডাকা প্রয়োজন হয় শুধু সেই সকল হাতে যেখানে ঐরূপ ডাকের উপযোগী তাসের অভাব, তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প জাতীয় এবং দুটি চিড়িতন ডাকবার পক্ষে অনুপযুক্ত। উচ্চতাস মূল্য এক্ষেত্রে ১½ থেকে ২+ পর্য্যন্ত হতে পারে। আবার একটি চিড়িতন ডাকের বেলায় তিনটি একের ডাকের পথ উন্মুক্ত থাকে যেমন একটি ইস্কাবন, হরতন বা রুহিতন। এতগুলি পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও একটি নো-ট্রাম্প ডাকের বিশেষ কারণ থাকা প্রয়োজন। এই কারণটি ভাষ্যতঃ এরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়া দরকার, যা দ্বারা উদ্বোধনকারীকে বাধ্যতামূলক দুয়ের ডাকে তোলা যায় অর্থাৎ উচ্চতাস মূল্য হওয়া দরকার ২+ থেকে ২½ ট্রিক পর্য্যন্ত এবং তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী। সুতরাং অন্যান্য ডাকের উপর নো-ট্রাম্প ডাকের উচ্চতম ট্রিকদর যেখানে এক্ষেত্রে সেটি নিম্নতম ট্রিকদর দরকার। এইরূপ ডাকের উপকারিতা বহু খেলায় খুবই কার্য্যকরী হ'তে দেখা গেছে।

নীচে কয়েকটি একের ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

	মোট ট্রিক দর	খেঁড়ীর উদ্বোধনী ডাক
১। ই-সা, ৯, ২ ; হ-বি, ৭ ; ক্ল-বি, ১০, ৩, ২ ; চি-বি, গো, ৩, ২	১½	একটি হরতন
২। ই-বি, গো, ৪ ; হ-গো ৫, ৪ ; ক্ল-গো, ১০, ৫, ৩ ; চি-সা, ৯ ৭,	১+	একটি হরতন
৩। ই-সা, ৮ ; হ-সা, ১০, ৩, ২ ; ক্ল-গো, ৯, ৬, ৩ ; চি বি, ১০, ৪	১½	একটি ইস্কাবন
৪। ই-বি, ৯, ২ ; হ-বি গো, ৪, ৩ ; ক্ল-১০, ৭, ৪ ; চি-সা, ৩, ২	১+	একটি ইস্কাবন
৫। ই-টে, ১০, ৮ ; ক্ল-গো, ৬ ; ক্ল-সা, ৯, ২ ; চি-বি, গো, ১০, ৫, ২	২+	একটি হরতন
৬। ই-১০, ৯, ৩ ; হ-৭, ৫ ; ক্ল ৯, ৮, ৫ ; চি-টে, সা, ৮, ৬, ৩	২	একটি হরতন
৭। ই-বি, ১০, ৪ ; হ-সা ৯, ৭ ; ক্ল-গো, ৩, ২ ; চি-সা, গো, ৯, ৩,	১½	একটি রুহিতন
৮। ই-টে, গো, ২ ; হ-বি, ৭, ৩ ; ক্ল-গো, ৭ ; চি-সা, ১০, ৭, ৫, ২	২+	একটি রুহিতন
৯। ই-টে, ১০, ৪ ; হ-বি, গো, ৪ ; ক্ল-টে, ৭, ৩, ২, চি-গো, ১০, ৫	২½	একটি চিড়িতন
১০। ই-টে, বি ; হ-গো, ৭, ৫, ২ ; ক্ল-সা, গো, ১০, ৩ ; চি-৬, ৫, ৩	২½	একটি চিড়িতন

উপরের নমুনাগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন উদ্বোধনী ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্পডাকের ক্ষেত্র কিরূপ বিস্তৃত। এরূপ সত্ত্বেও উদ্বোধনকারী—খেঁড়ীর কাছ থেকে নিম্নতম বা তদপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী পাওয়া যেতে পারে এইরূপ আন্দাজ করে দ্বিতীয় চক্রে ডাক দিতে হবে।

৬ নং তাসে টে, সা সমেত পাঁচখানি চিড়িতন থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনও রংয়ে কিছুমাত্র শক্তি না থাকায় একটি নো-ট্রাম্প ডাকাই শ্রেয়ঃ, দুটি চিড়িতন ডাকলে উদ্বোধনকারী আবার একটি ডাক আশা করতে পারেন। কিন্তু সেরূপ শক্তি ও খেঁড়ীর ডাকে সাহায্য করবার ক্ষমতা না থাকায় দুটি চিড়িতন ডাক সমর্থনযোগ্য নয়। ১০ নং তাসে একটি চিড়িতনের ডাকের উপর একটি রুহিতন বা একটি হরতনের ডাক চলে কিন্তু তাসটিতে অতিরিক্ত শক্তি থাকায় উপরন্তু ইস্কাবন ও রুহিতনে বাঁয়ে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছ থেকে প্রথম খেলা এলে একটি করে পিঠ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় সবদিক থেকে বিচার করলে একটি নো-ট্রাম্প ডাকই শ্রেয়ঃ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(গ) একের উপর বদলি ডাক দুটির
(Two-over-one)

এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু একটির ডাকের উপর বাধ্যতামূলক অন্য রংয়ের দুটির ডাক। এরূপ ডাকের প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত কমদরের রংয়ে ডাক দিতে গেলে (in a lower-ranking suit) এ-ডাকটিও একটির-উপর-একটির ডাকের পর্য্যায়ের তফাৎ শুধু একটি

াক বাড়ানোর দরুণ ; খেসারৎ স্বরূপ কিছুটা বেশী শক্তি যোগান—ই শক্তি উচ্চতাস-মূল্য বা পিঠ জয় করবার ক্ষমতা—দুটির মধ্যে যে কানটি দিয়ে পূরণ করা যায়। সাধারণভাবে এরূপ ডাক দিতে গলে প্রয়োজন নিম্নরূপ শক্তির :—

(ক) শক্তিসম্পন্ন ছয় তাসে ·· অন্ততঃ ১½ ট্রিক বা সামান্ত বেশী

(খ) পাঁচ তাসে ·· কমপক্ষে ২+ ট্রিকে

* (গ) চার তাসে ··· ন্যূনতম ২½ ট্রিকে

উক্তরূপ শক্তির অভাবে বা রংয়ের তাসের সংখ্যার কমে কি ডাক দেওয়া কর্ত্তব্য, সেটা নির্ভর করে তাসের অবস্থিতি ও খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার উপর এবং উদ্বোধনকারীর নিকট থেকে দ্বিতীয় চক্রে কি ডাক আসতে পারে সেটি ঠিকমত আন্দাজের উপর। যেমন মনে করুন, খেঁড়ী তাস পেয়েছেন নিম্নরূপ এবং উদ্বোধনী ডাক হ'য়েছে একটি ইস্কাবন, অতঃপর খেঁড়ী কি করবেন? প্রত্যেকটির পাশে পাশে উত্তর লিখে দেওয়া হ'ল পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য।

	ট্রিক দর	কি ডাক হবে
১। ই-৭, ৩ ; হ-টে, সা, গো, ১০, ৫ ;		
রু-৬, ৪, ২ ; চি-১০, ৩, ২	২+	দুটি হরতন
২। ই-৫, ২ ; হ-সা, বি, গো, ৯, ৫ ;		
রু-৭, ৬, ৩ ; চি-সা, ৮, ৪	১½+	দুটি হরতন
৩। ই-৪, ৩ : হ-১০, ৫, ৩ ;		
রু-টে, বি, গো, ৮, ৩ ; চি-বি, গো, ৩	২+	একটি নো-ট্রাম্প
৪। ই-গো, ১০, ২ ; হ-৫, ২ ;		
রু-৯, ৭, ৩ ; চি-টে, সা, বি, ৩, ২	২+	দুটি ইস্কাবন
৫। ই-৮, ৩ ; হ-টে, বি, ৬, ২ ;		
রু সা, ৮, ৯, ৬ ; চি-সা, ১০, ৩	২½	দুটি হরতন
৬। ই টে ; হ-টে, ১০, ৩, ২ ;		
রু-বি, গো, ১০, ২ ; চি-গো, ৪, ৩, ২	২½+	দুটি রুহিতন
৭। ই-৯, ৩ ; হ-১০, ৯, ২ ;		
রু-টে, বি, ১০, ৮, ৭, ২ ; চি-৭, ৩	১½	দুটি রুহিতন

১নং ২নং তাসের বিশেষত্ব এই যে খেঁড়ীর ডাকের সাহায্য করবার মত তাস হাতে নেই কিন্তু শক্তিশালী হরতন রংয়ে দুটির বা বেশীর খেলা করা সম্ভব হবে খেঁড়ীর উদ্বোধন যোগ্য তাসের শক্তির সাহায্যে।

৩নং তাসে দুটি রুহিতন ডাক অপেক্ষা একটি নো-ট্রাম্প ডাক দেওয়া উচিৎ এই হিসেবে যে, দুটি রুহিতন ডাকের পর খেঁড়ী দ্বিতীয় চক্রে দুটি হরতন বা দুটি ইস্কাবন ডাকলে তাসটিতে আর ডাক দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ডাক দিলে ডাকটি আত্মঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু প্রথম চক্রে একটি নো-ট্রাম্প ডাকের পর দুটি হরতনের উপর দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলে উদ্বোধনকারীর কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না বুঝতে যে খেঁড়ীর হাতের তাসের দর ২ ট্রিকের কম ত' নয়ই বরঞ্চ কিছু বেশী থাকার সম্ভাবনা, উপরন্তু ইস্কাবন বা হরতন রংয়ে সাহায্য করবার তাসের অভাব। সুতরাং শক্তি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ আছে রুহিতন ও চিড়িতন রংয়ে। এতটা খবর জানবার পর উদ্বোধনকারীর বিশেষ অসুবিধা থাকে না ঠিকমত ডাক নির্দ্ধারণে। আবার দ্বিতীয় চক্রে উদ্বোধনকারী দুটি চিড়িতন ডাক দিলে উক্ত তাসে দুটি রুহিতন ডাক চলে। এই ডাকের অর্থ বুঝতে কোনওরূপ অসুবিধা হওয়া উচিৎ নয় খেঁড়ীর। এই ডাকের মর্ম্ম এই যে খেঁড়ীর হাতে একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী সর্ব্বোচ্চ দরের তাস আছে অর্থাৎ ২+ টিকের কাছাকাছি এবং শক্তিটি রুহিতন রংয়েই বেশী। উদ্বোধনকারী নিজ হাতের শক্তি অনুযায়ী শেষ চুক্তি নির্ব্বাচন করিবেন। তিনি ঐ ডাকে ছেড়ে দিতে পারেন বা দুটি কি তিনটি নো-ট্রাম্প দিতে পারেন—যা ঠিক করবেন তিনি সেইটিই ডাকের শেষ, কারণ দুটি রুহিতন ডাক দিয়ে খেঁড়ীর সকল শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং তার আর করবার কিছুই নেই।

৪নং তাসে দুটি চিড়িতন ডাক অপেক্ষা দুটি ইস্কাবন ডাকই ভাল। এই ডাকের দ্বারা শক্তি সীমাবদ্ধ জানান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে এও জানান হচ্ছে যে উক্ত রংয়ে অন্ততঃ বি, × × তিন তাস, গো, ১০, × তিন তাস অথবা চারখানি ছোট তাস বর্ত্তমান উপরন্তু প্রায় তিনটি পিঠ জয় করবার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। উদ্বোধনকারী নিজ হাতের শক্তি অনুযায়ী অতঃপর অগ্রসর হবেন।

৫নং তাসে দুটি হরতনের পর উদ্বোধনকারীর কাছ থেকে দুটি ইস্কাবনের এলে আর একটি ডাকের উপযোগী তাস আছে যথা দুটি নো-ট্রাম্প কারণ দুটি হাতের সমষ্টিগত শক্তি প্রায় ৫½ টিপের কাছাকাছি সুতরাং দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের খেলা একরূপ সুনিশ্চিত বলা চলে।

৬নং তাসে উদ্বোধনকারী একটি ইস্কাবন ডাক আসায় এবং ঐ রংয়ের টেক্কা হাতে থাকায় (যদিও একক) তাসটিতে কিছুটা সম্ভাবনার আলো দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় ডাকের প্রকৃতি কোথায়? সেটি জানবার উদ্দেশ্যে দুটি রুহিতন ডাকাই শ্রেয়ঃ। দুটি হরতন ডাক এলে গেমের প্রশ্ন ত' ওঠেই না বরঞ্চ রুহিতন ও চিড়িতনের কনট্রোল (Control) সহ সামান্ত বেশী ট্রিক থাকলে বড় খেলা করাও অসম্ভব নয়। ফিরতি ডাক দুটি ইস্কাবন এলে একক টেক্কা থাকা সত্ত্বেও চার'টি ইস্কাবন ডাক হবে কিন্তু ফিরতি দুটি নো-ট্রাম্প ডাক এলে কিছুটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিরূপ তাসে এরূপ ডাক আসা সম্ভব? খেঁড়ী কি বাধ্য হয়ে এরূপ ডাক দিয়েছেন না ডাকটি স্বাভাবিক? স্বাভাবিক ডাক হ'লে বড় খেলার সম্ভাবনা থাকায় সেটি যাচাই করবার উদ্দেশ্যে ডাকের পক্ষে অনুপযুক্ত তাসেই তিনটি চিড়িতন ডাকা যেতে পারে। এতে খেঁড়ীর জবাবের উপর পরবর্ত্তী ডাক নির্ভর করবে।

৭নং তাসে রুহিতন ছাড়া অন্য শক্তি না থাকায় দুটি রুহিতন এবং প্রয়োজন হ'লে পরে তিনটি রুহিতন ডাক হ'বে। দুটি রুহিতনের উপর উদ্বোধনকারীর দুটি নো-ট্রাম্প ডাক এলে উক্ত রংয়ের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য হেতু তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

---

* এরূপ ডাকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কয়েকটি বিশিষ্ট-ক্ষেত্রে যেখানে খেঁড়ীর ডাকের রংয়ে একখানি বা অপর কোনও একটি রংয়ে কেবলমাত্র একখানি অথবা ছোট দুখানি তাস থাকে অর্থাৎ তাসটি যখন নো-ট্রাম্প ডাকের পক্ষে অনুপযোগী।

প্রয়োজন অপেক্ষা একটি বেশী বদলী ডাক
(Single jump)

উদ্বোধনকারীর একটির ডাকের উপর অন্য রংয়ে প্রয়োজনের অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত ডাক নিশ্চিত গেমের নির্দ্দেশ দেয় এবং এরূপ ডাক গেমে পৌঁছাবার আগে ছাড়া চলে না। কিরূপ তাসে এরূপ জোরালো (Forcing) ডাক দেওয়া উচিৎ, নীচে তার সাধারণ প্রথা দেওয়া হ'ল :—

(ক) ফাঁকহীন বা প্রায়ঃফাঁকহীন (Solid or sami-solid) কোন রংয়ের তাস অথবা খেড়ীর রংয়ের উচ্চতাস সহ .. ৩½ ট্রিক

( ) খেড়ীর ডাকের রংয়ে স্বাভাবিক সাহায্য করবার তাস সমেত ... ৪ "

(গ) চার তাসে ডাকের উপযুক্ত তাস সহ ... ৪½ "

নীচে কয়েকটি নমুনা তাস সহ উদ্বোধনকারীর ডাকের উপর কি ডাক হবে দেখান হ'ল :—

	উদ্বোধন ডাক	ট্রিক দর	ডাক হবে
১। ই-সা, বি, ১০, ৫, ২ ; হ-সা, বি, ৫ ; ক্ল ৬ ; চি-টে. বি, ৭, ৩	হ-১	৩½	ই-২
২। ই-বি ১০, ৫, ২ ; হ-সা, ৩ ; ক্ল-টে, সা, বি. ৪ ; চি-সা, গো, ৯	ই-১	৪	ক্ল-৩
৩। ই-টে, ২ ; হ টে, বি, গো, ৭ ; ক্ল-সা, গো, ৩ ; চি-টে, ৪, ৩, ২	ক্ল-১	৪½	হ-২
৪। ই-টে, ৩, ২ ; হ-সা, ৮, ৪, ২ ; ক্ল- X ; চি-টে, সা, বি. ৯. ৪, ২	হ-১	৪	চি-৩

৩নং তাসটিতে অনেকে দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী মনে করতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ ডাকের শক্তির সীমা ৩ থেকে ৩½ ট্রিকের মত। সুতরাং পার্থক্য বজায় রাখবার জন্য দুটি হরতনের ডাক অধিক কার্য্যকরী।

এছাড়া এমন কয়েকটি তাস আসে যেগুলির ট্রিকদর ৩½এর বেশী খেড়ীর ডাকের রংয়ে জোরদার সাহায্যসহ (Strong Support) অর্থাৎ রংয়ের ডাক একধাপ বাড়িয়ে ডাকবার চেয়েও বেশী শক্তিশালী, সেরূপক্ষেত্রেও কোন কাল্পনিক ডাক সৃষ্টি করতে হয় পূর্ণক্ষমতা খেড়ীকে জানাবার উদ্দেশ্য। যেমন মনে করুন— উদ্বোধনী ডাক হয়েছে একটি ইস্কাবন এবং আপনি তাস পেয়েছেন নিম্নরূপ :—

১নং	২নং
ই-টে, গো, ৯, ৭, ৩	ই-সা, বি, ৯, ৫, ২
হ-৪, ২	হ-৫
ক্ল-সা, গো, ২	ক্ল সা, বি, ১০, ৬
চি-টে, সা, ৫	চি-টে, বি, ১০

১নং তাসে তিনটি চিড়তন ও ২নং তাসে তিনটি রুহিতন ডাক প্রশস্ত, কারণ উভয় তাসেই ইস্কাবন রংয়ে আশাতীত সাহায্য করবার শক্তিসহ ৩½ ট্রিক অথবা বেশী শক্তিশালী তাস বর্ত্তমান এবং রংয়ের ডাক একটি বাড়িয়ে ডাকার চেয়েও অধিক জোরদার। এখানে জানান প্রয়োজন যে, ইস্কাবন বা হরতন রংয়ের ডাককে একটির অধিক বাড়িয়ে ডাকার সীমারেখা ২½ থেকে ৩ ট্রিকের মত।

প্রয়োজন অপেক্ষা দুটি বা বেশী বদলী ডাক
(Double or multiple jump)

আগেই বলা হ'য়েছে যে, এরূপ ডাক এককালীন ডা পর্য্যায়ে (Pre-emptive) পড়ে। খুব সাবধানের সহিত ডাকের প্রয়োগ দরকার, যেন খেড়ীর পক্ষে বোঝাপড়ার ভুল হয়। উদ্বোধনকারীকে চিন্তা করতে হবে এরূপ ডাকের প্রয়ো কি? প্রয়োজন আছে কি! এমন কতগুলি তাস পা যায় যেগুলিতে বিপক্ষদলের ডাকে বাধাদানের কোনও ক্ষ থাকেনা অথচ ডাক আদান-প্রদানের কোনও রাস্তা নে একডাকেই এই পুরা খবরটি দেওয়া সম্ভব ; উপরন্তু জানান যায় ঐ রংয়ে খেলা হ'লে প্রায় ৬টি পিঠ জয়ে সাহায্য করা যেতে প ট্রিক দর ১ থেকে ১½। উচ্চদরের রংয়ে (Major Suit সুতরাং গেমে ডাকটি তুলে দেওয়া হয়। উদ্বোধনকারী এরূপ ডা পর নিজ তাসের শক্তি অনুযায়ী আরও অগ্রসর হতে পারেন।

নিম্নদরের তাসে (Minor Suit) এরূপ ডাকের প্রয়ে একমাত্র কার্য্যকরী হয় বিপক্ষদলের ডাকে প্রবেশে অসুবিধা সৃ করা ও অপরপক্ষে উচ্চমূল্য তাসের ও বিপক্ষদলের ডাকে বাধাদানে ক্ষমতার অভাবও জানান হয় খেড়ীকে। রংয়ের তাসের সংখ্যা থেকে ৭ এবং সাধারণতঃ উভয় উচ্চমূল্য তাসের সংখ্যাল্পতা বর্ত্তমান।

উপরোক্ত ডাকগুলি ছাড়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটির ডাকের উপর প্রথম সুযোগেই দুটি এমন কি তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন:—

দুটি নো-ট্রাম্প ডাক

এই ডাক দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, তাসটির বিভাগ নো-ট্রাম্প জাতীয় ট্রিকদর ২½ থেকে ৩ এর মত (৩½ এর বেশী কোন মতেই নয়) এবং বদলী ডাকের পক্ষে উপযুক্ত তাসের অভাব। আরও বিশেষত্ব থাকা চাই :—

১। ছবি তাস (টে, সা, বি, গো, ১০ এর মধ্যে) অন্ততঃ পক্ষে ছয়টি—

২। ন্যূনতম ডাকের বাইরের দুটি রংয়ে (unbid Suit) প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রে পিঠ রোধবার ক্ষমতা—তিনটিতে হ'লেই ভাল হয়।

৩। উপরোক্ত ছখানি ছবির মধ্যে দুই বা তিনতাসে খেঁড়ীর ডাকের রংয়ের একটি ছবি।

নীচে কয়েকটি দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী নমুনা তাস দেওয়া হলো :—

	উদ্বোধনী ডাক	ট্রিক দর
১। ই-সা, গো, ২ ; হ-বি, ৩ ; ক্ল-টে, ১০, ৮, ৩, ; চি-সা, ৯, ৫, ৩	হ—১	২½
২। ই-বি, গো, ৩ ; হ-টে, বি, ৪ ; ক্ল-সা, ৩, ২ ; চি-টে, ৭, ৩, ২	ক্ল—১	৫½
৩। ই-টে, সা, ২ ; হ-৯, ৬, ৩ ; ক্ল-সা, বি' ৪, ৩ ; চি-গো, ১০, ৫, ৩	হ—১	৩+
৪। ই-টে, ৪, ৩ ; হ-গো, ৩, ২ ; ক্ল-সা, ৩ ২ ; চি-সা, বি, গো, ৪	হ—১	২½
৫। ই-সা, ৫, ৪ ; হ-টে, ১০, ৩ ; ক্ল-সা, বি, ৬, ২ ; চি-বি, গো, ৪	ই—১	৩

[ক্রমশঃ।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফর

পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরে এসেছে। দলের অধিনায়ক খ্যাতনামা খেলোয়াড় ফজল মামুদ। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বয়সে তরুণ। দলটি বিশেষ শক্তিশালী করে গঠন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ভারত সফরে এসেছেন। ফজল মামুদ (অধিনায়ক), ইমতিয়াজ আমেদ, আলিমুদ্দিন, ইজাজ বাট, হানিফ মহম্মদ, হাসিব আসান, ইন্তিখাব আলম, জাবেদ বুর্কি, মহম্মদ হুসেন, মহম্মদ ফারুক, মহম্মদ মুনাফ, মুস্তাক মহম্মদ, নাসিমুল গণি, সঈদ আমেদ, সুজাউদ্দিন, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস, জাফর আলতাফ।

ভূতপূর্ব ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড় ডাঃ জাহাঙ্গীর খান দলের সঙ্গে ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। সফরকারী দলের জাবেদ বুর্কি অক্সফোর্ড "ব্লু"। তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়—যিনি এ পর্য্যন্ত টেষ্ট ম্যাচ খেলেন নি। অধিনায়ক ফজল মামুদ বলেছেন যে, দলটি তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হলেও তাঁদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিভাগেই পাকিস্তান দল শক্তিশালী। তবে ব্যাটিং অপেক্ষা বোলিংই অধিক শক্তিশালী বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এই দলে চারজন ফাষ্ট বোলার একজন ন্যাটা লেগ-স্পিনার একজন ডাহিনা লেগ-স্পিনার। একজন অফ-স্পিনার ও একজন গুগলি বোলার রয়েছে।

ফজল মামুদ ফাষ্ট বোলার মহম্মদ ফারুকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ক্রিকেট-ইতিহাসে মহম্মদ ফারুক একদিন প্রাক্তন ভারতীয় ফাষ্ট বোলার মহম্মদ নিসারের স্থান অধিকার করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। মুস্তাক মহম্মদ সম্পর্কে ফজল মামুদ বলেছেন যে, তিনি বর্ত্তমানে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে খেলছেন। ১৯৫৮ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে মুস্তাক মহম্মদ যেরূপ খেলেছিলেন, সেই অনুপাতে বর্ত্তমানে তাঁর খেলা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ খেলোয়াড় জাফর আলতাফ সম্পর্কে ফজল মামুদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে হয়তো তিনি টেষ্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করে ফেলবেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট দল "রাবার" লাভ করবেন কি না এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে অস্বীকার করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, পাকিস্তান ক্রিকেট দলের এবারকার ভারত সফরে তাৎপর্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে। এবার তারা "রাবার" পেলে ভারতের বিরুদ্ধে একই বছর "ডাবলস" লাভ করবে। কারণ কিছুদিন আগে বিশ্ব অলিম্পিক হকি ফাইনালে পাকিস্তান ভারতকে পরাজিত করেছে।

ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পূর্ব্ব টেষ্ট খেলার ফলাফল আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তান ভারতকে একবার টেষ্ট ম্যাচে হারিয়েছে; কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে দু'বার পরাজিত করেছে। ভারত বিগত পাকিস্তান সফরে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচই অমীমাংসিত ভাবে শেষ করেছিলো। সুদীর্ঘ ২৮ বছরে ভারতের পক্ষে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয়নি মাত্র ৯ বৎসরে পাকিস্তান সেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। তারা ভারত, ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ন্যায় খ্যাতনামা দলকে পরাজিত করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে, এ থেকে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে, ক্রিকেটের উন্নতির দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। ভারত বিরাট দেশ। এখানে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোন অভাব নেই। বোম্বাইতে পাকিস্তান ও ভারতের যে প্রথম টেষ্ট খেলা হবে—খেলা আরম্ভের বহু পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে। খেলা দেখার আসনের ব্যবস্থা হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার। এ থেকেই বোঝা যায়, এখানকার ক্রীড়ামোদীদের ক্রিকেট খেলার আগ্রহ কতটা বেশী। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কিন্তু এখন নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। সম্প্রতি তাঁরা বাৎসরিক সাধারণ সভা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এখনও ভারতীয় দল গঠন করে উঠতে পারেন নি ভারতীয় বোর্ডে নতুন সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন। দেখা যাউক এঁদের রাজত্বে কি হয়।

নরি কন্‌ট্রাক্টর অধিনায়ক মনোনীত

সম্প্রতি ভারতীয় কনট্রোল বোর্ডের সাধারণ বার্ষিক সভায় প্রখ্যাত খেলোয়াড় বিজয় হাজারেকে নিয়ে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটি গঠিত হয়েছে। এই দলের অপর সভ্য হচ্ছেন—শ্রী এম, দত্ত রায়, শ্রীগোপালন ও শ্রীহেমু অধিকারী। পূর্ব্বের চেয়ারম্যান লালা অমরনাথ এবার স্থান পান নি। এবারকার কমিটিতে অধিকারীই একমাত্র নতুন সভ্য।

এবারকার খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটির মতিগতি এখনও কেহ বুঝতে পারেন নি। তবে প্রখ্যাত খেলোয়াড় হাজারের ওপর সকলের আস্থা আছে। নির্ব্বাচনী কমিটি সম্প্রতি এক সভা মিলিত হয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান নরি কনট্রাক্টরকে প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত করেছেন। আশা করা যায় যে, এবারকার কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটবে।

পেশাদারী টেনিস দলের কলিকাতা সফর

জ্যাক ক্রামারের দল বলে পরিচিত বিশ্বের চারজন কৃতী পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড় এসলে কুপার, ম্যাল এণ্ডারসন, এলেক্স অলমেডো ও এণ্ডিস খিমিনো ভারত সফরে এসেছেন। সম্প্রতি

তাঁরা কলকাতায় আমন্ত্রণ মূলক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সুন্দর আবহাওয়া ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে সাউথ ক্লাবের হার্ড কোর্টে এই খেলার ব্যবস্থা হয়।

জ্যাক ক্রামারের নেতৃত্বে পূর্ব্বেও একটা পেশাদারী দল কলকাতা সফর করে গেছে। কিন্তু এবারকার দলে যে চারজন খেলোয়াড় এসেছেন তাঁদের আগমন এই প্রথম। সেই কারণে এঁদের খেলা দেখার উৎসাহ ও উদ্দীপনা এখানকার টেনিস-অনুরাগীদের মধ্যে কোন সময়ই অভাব দেখা যায়নি। যা এর আগে যে সকল পেশাদার খেলোয়াড় এসেছেন তাঁদের তুলনায় এবার খেলোয়াড়গণ কিছুটা তরুণ। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সমাবেশে যে উন্নত পর্য্যায়ের খেলা আশা করা গিয়েছিলো, সে আশা সকলের পূরণ হয়নি। খেলোয়াড়রা মাঝে মাঝে তাঁদের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন তা হলেও কোথায় যেন প্রাণের অভাব অনুভূত হয়েছে। কোন সময়ই তাঁদের খেলা হৃদয় দিয়ে উপভোগ করা যায়নি। তবে খেলোয়াড়রা সব সময় দর্শকদের আনন্দ দানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খেলার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অভাবে দর্শকদের খেলা দেখে সম্যক তৃপ্তি হয়নি।

এবারকার দলের সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার এ্যাসলে কুপার। প্রথম দিন কুপারের অপূর্ব্ব ক্রীড়াচাতুর্য্য দর্শকদের মনে রেখাপাত করলেও দ্বিতীয় দিনের খেলা দেখে সকলেই হতাশ হয়েছেন। কলকাতায় তিনি ভারত সফরে প্রথম পরাজয় বরণ করেন। তাঁকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন স্পেনের খেলোয়াড় জিমেনো। জিমেনো গত উইম্বলডনে ভারতের সেরা খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণকে পরাজিত করেছিলেন। এখন তাঁর খেলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বর্ত্তমানে তিনি বিশ্ববিশ্রুত সব খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে একাধিক বার সাফল্য অর্জ্জন করে—টেনিস মহলে নিজেকে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কলকাতার টেনিস-রসিকদের কাছে জিমেনো তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। সর্বদিক দিয়ে বর্ত্তমান দলের তিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এর পর অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাল এণ্ডারসনের কথা উল্লেখ করতে হয়। "সার্ভিসে" তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর "লব"গুলিও সত্যই দেখার বিষয়। সর্ব্বাপেক্ষা হতাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রবাসী পেরুর কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় ১৯৫৯ সালের উইম্বলডন বিজয়ী এ্যালেক্স অলমিডো। তবে তাঁর খেলার অসাধারণ নৈপুণ্যের ঝিলিক মাঝে মাঝে দেখা গেলেও—তা দেখে দর্শকদের মন ভরেনি। তবে খেলা দেখে মনে হয়েছে যে তাঁর খেলার চেষ্টার যেন কিছুটা অভাব রয়েছে। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হ'লো :—

সিঙ্গলস প্রথম রাউণ্ড

এ্যাসলে কুপার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৪—৬ ও ১০—৮ সেটে ম্যাল এণ্ডারসনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

জিমেনো (স্পেন) ৬—২ ও ৬—৪ সেটে অলমিডোকে (যুক্তরাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

ফাইন্যাল জিমিনো (স্পেন) ১—৭ ও ৬—১ সেটে কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

তৃতীয় স্থানের খেলা

ম্যাক এণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ৭—৫ ও ৬—২ সেটে অলমেডোকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডাবলস প্রদর্শনী

কুপার ও জিমেনো ৬—৩ ও ৬—৪ সেটে এণ্ডারসন ও অলমিডোকে পরাজিত করেন।

অলমেডো ও জিমেনো বনাম এণ্ডারসন ও কুপারের খেলা ৭—৫, ৫—৬ ও ৭—৭ গেমে খেলা আলোর অভাবের জন্য অমীমাংসিত থেকে যায়।

ভারতীয় টমাস কাপ দল গঠিত

"টমাস কাপ" বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে ভারতকে থাইল্যাণ্ডের সহিত খেলতে হবে। আগামী ১১শে ও ২০শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্ককে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকার ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। রেলওয়ে দলের প্রতিনিধিত্ব করিলেও বাঙ্গালার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় দীপু ঘোষ ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডী ছাড়া এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে ভারতীয় টমাস কাপ দলে স্থান পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। দীপু ঘোষ মনোনীত হওয়ায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করবেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের না[ম] প্রদত্ত হ'লো :—

নান্দু নাটেকর (বোম্বাই) অধিনায়ক, অমৃতলাল দেওয়া[ন] (রেলওয়ে), সি. ডি. দেওরাজ (বোম্বাই), দীপু ঘো[ষ] (রেলওয়ে), সুরেশ গোয়েল (উত্তরপ্রদেশ), শ্রীএস, আর, ছাদ (ম্যানেজার)।

রুশ ফুটবল দলের ভারত সফর

রুশ ফুটবল দলের নাম শুনলেই ভারতবাসীর মনে এক নতু[ন] উন্মাদনা এনে দেয়। প্রখ্যাত খেলোয়াড় ন্যাটোর নেতৃত্বে যে দল[টি] এসেছিলো সেটা রুশ জাতীয় দল। এবারকার দলটি সোভিয়ে[ত] ইউনিয়নের লীগের একটা খ্যাতনামা দল। এবার রুশ দল[টি] এক মাসব্যাপী ভারত সফর করবেন। ৩০শে নভেম্বর দলটি দিল্লীতে পৌঁছাবে। তারা ভারতের বিভিন্ন নয়টি স্থানে তিনটি টেষ্ট স[হ] দশটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশ[ন] আগন্তুক দলের ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত করেছেন। তবে এই ক্রীড়াসূ[চী] রুশ সরকারের খেলাধূলা বিভাগের অনুমোদন-সাপেক্ষ। নি[ম্নে] ক্রীড়াসূচী দেওয়া হল :—

২রা ডিসেম্বর—দিল্লীতে প্রথম টেষ্ট
৪ঠা " —পাটনায় খেলা
৮ই " —জোড়হাটে খেলা
১১ই " —কলকাতায় প্রথম খেলা
১৩ই " — " দ্বিতীয় টেষ্ট
১৫ই " —কটকে খেলা
১৮ই " —মাদ্রাজে খেলা
২১শে " —বাঙ্গালোরে খেলা
২৫শে " —হায়দ্রাবাদে খেলা
৩১শে ডিসেম্বর অথবা ১লা জানুয়ারী—বোম্বাইতে তৃতীয় টে[ষ্ট]

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিঃ কেনেডীর জয়—

ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ জন ফিটজেরাল্ড কেনেডী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিপাবলিকান দলের প্রার্থী মিঃ রিচার্ড নিক্সনকে পরাজিত করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আট বৎসর পর একজন ডেমোক্রাট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। ইহার মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। ১৯৩২ সালের নির্ব্বাচন হইতে ১৯৪৮ সালের নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত পর-পর পাঁচটি নির্ব্বাচনেই ডেমোক্রাটিপ্রার্থী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ কেনেডী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অনুমান সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মিঃ আইসেন হাওয়ার যদি প্রার্থী হইতে পারিতেন তাহা হইলে কি হইত তাহা বলা কঠিন। মার্কিণ শাসনতন্ত্রের নূতন যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহাতে একজনের পক্ষে দুই টার্ম্মের অধিক প্রেসিডেণ্ট হওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এইজন্যই প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেন হাওয়ার এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন নাই। রিপাবলিকান দল হইতে প্রার্থী হইয়াছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ নিক্সন। মিঃ কেনেডী রোমান ক্যাথলিক। তাঁহার ধর্ম্ম লইয়াও নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু উহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তিনি-ই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা হইতে ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে, প্রোটেষ্টাণ্ট ভোটারদের দিক হইতে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। মিঃ কেনেডীর বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর। এত কম বয়সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আর একজন মাত্র হইয়াছিলেন। তিনি থিওডোর রুজভেল্ট। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তিনি প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্টরূপে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম ম্যাক কিন্‌লের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রেসিডেণ্ট হন। মিঃ কেনেডী বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেও বিত্তশালী এবং কৃতী ব্যবসায়ী। লেখক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি আছে। তাঁহার পুস্তক "Profiles in courage" পুলিৎসার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ১৯৪১ সালে তিনি মার্কিণ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় লেফ্‌টেন্যাণ্টরূপে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তিনি কিছুদিনের জন্য সাংবাদিকতা বৃত্তিও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ কেনেডী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন খুব বেশী দিনের কথা নয়। বস্তুতঃ, ১৯৪৬ সাল হইতে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। ঐ বৎসর মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী মিঃ হেনরি ক্যাবট লজকে পরাজিত করিয়া তিনি সিনেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি পুনরায় সেনেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিঃ কেনেডী ৩৩৪টি ইলেকটোরাল ভোট পাইয়াছেন এবং মিঃ নিক্সন পাইয়াছেন ১৮১টি ইলেকটোরাল ভোট। ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থীই শুধু প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন নাই, প্রতিনিধি পরিষদে এবং সেনেটে ডেমোক্রাটিক দলের সদস্যসংখ্যা কিছু হ্রাস পাইলেও উক্ত দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রহিয়াছে। নূতন নির্ব্বাচন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটিক দল ২৫৩টি আসন এবং রিপাবলিকান দল ১৬৬টি আসন দখল করিতে পারিয়াছে। পুরাতন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটিক দলের সদস্য ২৮৩ জন এবং রিপাবলিকান দলের সদস্যসংখ্যা ১৫৪ জন। সেনেটে ডেমোক্রাটিক দলের সদস্যসংখ্যা ৬৬ জনের স্থানে ৬৩ জন হইয়াছে এবং রিপাবলিকান দলের সদস্যসংখ্যা দুই জন বাড়িয়া ৩৬ জন হইয়াছে। মার্কিণ কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের রিপাবলিকান দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল না। তা সত্ত্বেও শাসন পরিচালনকার্য্যে তাঁহাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব, না রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকাতেই উহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিণ কংগ্রেসে মিঃ কেনেডীর ডেমোক্রাটিক দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেস এক দলের হওয়ায় মিঃ কেনেডীর পক্ষে কোন নীতি কার্য্যকরী করা কঠিন হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মিঃ লিণ্ডন বেনস জনসন। তিনি সেনেটে ডেমোক্রাটিক দলের নেতা এবং ডেমোক্রাটিক নীতি কমিটির চেয়ারম্যান। তাছাড়া তিনি সেনেটের বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান কমিটির চেয়ারম্যান এবং আর্ম্মড্ সার্ভিসেস কমিটির সদস্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন উহার অধিবাসীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার গুরুত্ব কিছু কম ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তিবর্গের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরণা, উদ্যোগ এবং কার্য্যকরী সাহায্যে নাটো প্রভৃতি সামরিক জোট গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ কেনেডী এবং মিঃ নিক্সনের মধ্যে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে মিঃ নিক্সনই অধিকতর পরিচিত এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি হয়ত মিঃ কেনেডী অপেক্ষা অনেক ভালভাবে মার্কিণ নীতির ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন। তাছাড়া পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ডেমোক্রাটিক দল ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্যও নাই। রাশিয়া, চীন, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা

এবং আফ্রিকা সম্বন্ধে এই দুই দলের উদ্দেশ্য ভিন্ন ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাতীয় প্রতিশ্রুতিগুলি এবং জাতীয় স্বার্থগুলি রক্ষা করা সম্পর্কে মিঃ কেনেডী এবং মিঃ নিক্সন উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবু মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারগণ মিঃ কেনেডীকেই জয়ী করিলেন কেন, তাহা লইয়া গবেষণা অবশ্যই করা যাইতে পারে। কিন্তু উত্তরটা সঠিক হইবে কি না সন্দেহ। অনেকে মনে করেন, এবারের মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে আন্তর্জ্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কিছু ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল এবং মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনা, প্যারীর শীর্ষ-সম্মেলন পণ্ড হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের যোগদান পর্য্যন্ত ঘটনাবলী কোন না কোন ভাবে নির্ব্বাচনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভকে খুসী করিবার জন্য মার্কিণ ভোটদাতারা মিঃ কেনেডীকে ভোট দিয়াছেন এ কথা যেমন স্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি মিঃ কেনেডীও রাশিয়াকে তোষণ করিবার নীতি গ্রহণ করিবেন, কিউবার সহিত একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন, কিম্বা কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বীকার করাও তেমনি অসম্ভব।

এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে, কোন রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে রাজী নহেন, এ কথা মঃ ক্রুশ্চেভ জানাইতে ক্রটি করেন নাই। অনেকে মনে করেন, তাঁহার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার উদ্দেশ্যই ছিল, এই কথাটা মার্কিণ ভোটারদিগকে ভাল করিয়া জানাইয়া দেওয়া। এই ধারণা হয়ত মিথ্যা নয়। মিঃ নিক্সন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নীতিই সমর্থন করিয়াছেন। এই নীতি হইতে ইউ-২ বিমানও যে বাদ পড়ে নাই এ কথা বলাই বাহুল্য। ইহার উত্তর দেওয়া যে মিঃ কেনেডীর পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়াকে তোষণ না করিয়াও যে অধিকতর যোগ্যতার সহিত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইতে তিনি সমর্থ, ইহা মিঃ কেনেডী বুঝাইতে পারিয়াছেন। নির্ব্বাচনের দুইদিন পূর্ব্বে ৬ই নভেম্বর তারিখে মিঃ নিক্সন একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। তাঁহার প্রস্তাবটি হইল এই যে, তিনি যদি নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলে তিনি কম্যুনিষ্টদেশগুলির নেতাদিগকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি কম্যুনিষ্টনেতাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে এই প্রস্তাব করিবেন যে, তাঁহারা যেন পোল্যাণ্ড, পূর্ব্বজার্ম্মাণী, চেকোশ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগারিয়া এবং বাল্টিক রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতার দীপশিখা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য মিঃ আইসেনহাওয়ারকে আমন্ত্রণ করেন। ইহা সত্যই এক অভিনব শান্তি পরিকল্পনা। বাল্টিক রাজ্য অর্থাৎ লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এষ্টোনিয়া রাশিয়ার অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই সকল রাজ্যকে মঃ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য মিঃ আইসেনহাওয়ার আমন্ত্রিত হইবেন এবং এই আমন্ত্রণ আসিবে মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট হইতে ইহা সত্যই অদ্ভুত প্রত্যাশা। মিঃ নিক্সনের এই প্রস্তাব যে সময় উপস্থিত করা হয় তখন উহা লইয়া বিতর্কের আর সময় ছিল না। মিঃ নিক্সন নির্ব্বাচিত হইলে উক্ত প্রস্তাব সত্যই কার্য্যকরী করিতেন কি না তাহা আলোচনা করা অবান্তর। কিন্তু মিঃ নিক্সন নির্ব্বাচিত হইলে মঃ ক্রুশ্চেভের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইত না এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হইত। মিঃ কেনেডী নির্ব্বাচিত হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এই ক্রমাবনতি বন্ধ হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

মিঃ কেনেডী মার্কিণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার অধিকতর সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণের জন্য আরও বেশী ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিবার এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে আরও মর্য্যাদাশালী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ডালেসী নীতির বিরোধিতাও তিনি করেন নাই। সেনেটার কেনেডী পূর্ব্বে যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, নির্ব্বাচনী অভিযানের সময় তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, একথাও সত্য। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া ফ্রান্সের সান্ধ্য পত্রিকা 'ফ্রান্সসয়ার'-এর সংবাদদাতার সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিঃ কেনেডী বলিয়াছেন, রাশিয়া যদি শুভেচ্ছা সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দেয় তাহা হইলে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি সম্মত আছেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরমাণু বোমার পরীক্ষাকার্য্য স্থগিত রাখার ব্যাপারে রাশিয়ার সহিত তিনি মতৈক্য আসিতে পারিবেন। এ সম্পর্কে সক্রিয় আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইলে পুনরায় পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা হইবে। মার্কিণ-পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উহা আরও কার্য্যকরী করা হইবে, অতীতের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা হইবে এবং রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হইবে। বার্লিন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের বার্লিন দখল করিয়া লইতে দেওয়া হইবে না। ক্যুময় ও মাৎসু দ্বীপ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তিনি একসময়ে বিপজ্জনক মনে করিতেন। কিন্তু উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলিয়াছেন যে, ফরমোসা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে চীনের উপকূলবর্ত্তী ক্যুময় ও মাৎসু দ্বীপ তিনি রক্ষা করিবেন এবং শত্রুর আক্রমণে হটিয়া আসিবেন না। ডলারের মূল্য হ্রাস করিবেন না বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। আগামী ২০শে জানুয়ারী (১৯৬১) মিঃ কেনেডী প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট হওয়ায় মার্কিণ-পররাষ্ট্রনীতিতে বিপুল কোন পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। তবে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা যে নাই, তাহাও নয়। এই আশাতেই তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ায় বিশ্বের উদারপন্থীরা আনন্দিত হইয়াছেন।

কেনেডীর নির্ব্বাচনে প্রতিক্রিয়া—

মিঃ কেনেডী নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু রাজ্যপাল সম্মেলনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। তিনি নাকি মিঃ কেনেডীকে ভারতের হিতৈষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নেহরুজী অবশ্য সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, পররাজ্যের নির্ব্বাচন সম্পর্কে মত প্রকাশ করা প্রথা

নয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, মার্কিণ সরকার যখন ভারতের নীতিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তখনও মিঃ কেনেডী ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ায় পরিকল্পনার জন্ম ভারত কয়ত আরও বেশী সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে। লণ্ডনের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে একজন অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করিতে পারিবে। মস্কো বেতারে মিঃ কেনেডীর নির্ব্বাচন সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মিঃ নিক্সনের বিরাট রাজনৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে আইসেনহাওয়ার-নিক্সনের শাসন-ব্যবস্থার অবসান সূচিত হইল। সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' মন্তব্য করিয়াছেন, মার্কিণ ভোটদাতারা বর্ত্তমান সরকারের উপর আস্থা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা এমন ভাবে ভোট দিয়াছেন যাহাতে নেতৃত্ব তথা সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ মিঃ কেনেডীকে অভিনন্দন জানাইয়া যে তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সময়ে যে ভাবে মার্কিণ-সোভিয়েট সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, নূতন প্রেসিডেণ্টের সময় অনুরূপ ভাবে ঐ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে।

আলজেরিয়া সম্পর্কে মিঃ কেনেডীর ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য ফ্রান্স তাঁহার উপর মোটেই প্রসন্ন ছিল না। পূর্ব্বে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া এই সমস্যার সত্বর মীমাংসা করা প্রয়োজন। তাঁহার এই অভিমতের জন্যই ফ্রান্সে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া এই আশঙ্কা দ্বারাই বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। তবে ফ্রান্স এখন মনে করিতেছে যে, আলজেরিয়ার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মিঃ কেনেডীর সমর্থন পাওয়া যাইবে। পশ্চিম জার্ম্মাণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল মিঃ কেনেডীর নির্ব্বাচনকে অভিনন্দিত করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, নির্ব্বাচনী বৎসরে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে, নির্ব্বাচন শেষ হওয়ায় তাহার অবসান ঘটিয়াছে এবং মার্কিণ কংগ্রেসে মিঃ কেনেডীর পর্য্যাপ্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকায় তিনি কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থনে তাঁহার নীতি কার্য্যকরী করিতে পারিবেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক মহলের দৃঢ় ধারণা এই যে, মিঃ কেনেডীর সহিত পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। বিরোধী সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল মিঃ কেনেডীর উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।

জাপানের বিরোধী দলগুলি মিঃ কেনেডীর নির্ব্বাচনকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। শাসক দল অর্থাৎ লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, মিঃ কেনেডীর জয়লাভে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না এবং জাপানের সহিত মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। উক্ত দলের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাও

বলা হইয়াছে যে, জাপান ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে নূতন নিরাপত্তা চুক্তি হইয়াছে তাহার কোন সংশোধন করা প্রয়োজন হইবে না। এই নূতন চুক্তিটি মার্কিণ সেনেট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং সেনেটে তখন যেমন ডেমোক্রাটিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এখন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বজায় রহিয়াছে। এই নিরাপত্তা চুক্তি লইয়া জাপানে যে বিপুল হাঙ্গামা হইয়াছে এবং হাঙ্গামার ফলে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে জাপান ভ্রমণ বাতিল করিতে হইয়াছে, একথা এই প্রসঙ্গে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মিঃ কেনেডীর নির্ব্বাচনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, এই নির্ব্বাচনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কঙ্গোর পরিস্থিতি—

প্রায় পাঁচ মাস হইতে চলিল কঙ্গোর পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা ঘোরালো হওয়ার মধ্যে কাসাভুবু ও মোবটুর পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনটি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামার শীল্ডের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল কঙ্গো সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এই রিপোর্টের বিরোধিতা করার মধ্যে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীদয়ালের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বেলজিয়ানরা আবার দলে দলে কঙ্গোতে ফিরিয়া আসিতেছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহার রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া বেলজিয়াম সামরিক ও অর্দ্ধসামরিক ব্যক্তিরা কঙ্গোতে রহিয়াছে। বেলজিয়ামদের সমর্থনে মোবটু এবং সৈন্যবাহিনী নানা স্থানে জঘন্য অত্যাচার চালাইতেছে। কঙ্গো হইতে বেলজিয়ামদিগকে অপসারণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে আবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বেলজিয়াম সরকার এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীদয়ালের রিপোর্ট প্রসঙ্গে দুই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি হইল এই রিপোর্ট সম্পর্কে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব এবং অপরটি সাধারণ পরিষদে এই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার সময় কাসাভুবুর নিউইয়র্কে উপস্থিতি এবং সাধারণ পরিষদে তাঁহার বক্তৃতা দান। কঙ্গোর কোন্ সরকারের প্রতিনিধিদল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন গ্রহণ করিবেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই। কাসাভুবু দাবী করেন তাঁহার নেতৃত্বের যে প্রতিনিধিদল আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আসন দান করা উচিত। সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিঃ বোল্যাণ্ড কাসাভুবুকে প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে নয়, কঙ্গোর রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিবার সুযোগ প্রদান করেন।

কাসাভুবুর বক্তৃতা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বক্তৃতাটি যে বেশ কৌশলপূর্ণ ভাষায় রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বক্তৃতায় কঙ্গোর পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, যখন তিনি উপযুক্ত সময় হইয়াছে মনে করিবেন, সেই সময় কঙ্গোর আইনের বিধানের মধ্যে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিবেন। গিনির প্রতিনিধি ইসমাইল তোরে এই অভিযোগ করেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাসাভুবু যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা প্যারীতে এবং ব্রুসেলসে রচিত হইয়াছে এবং তিনি সব সময়ই ফরাসী ও বেলজিয়ান্ উপদেষ্টাদ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন। কাসাভুবুর বক্তৃতার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কঙ্গোর প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আটটি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই প্রস্তাবে বিতাড়িত প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুমুম্বা আদিতে যে প্রতিনিধি দল নিযুক্ত করিয়াছেন সেই প্রতিনিধি দলকেই অবিলম্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন প্রদানের জন্য দাবী করা হইয়াছে। কাসাভুবু বেলজিয়াম সরকারের মনের মত ব্যক্তি। বেলজিয়াম সরকার তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। বেলজিয়ানরা কঙ্গো ত্যাগের পূর্ব্বে সেখানে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে গঠিত পার্লামেণ্টের সমর্থনে মিঃ লুমুম্বাই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কাসাভুবুকে দেওয়া হয় প্রেসিডেণ্টের পদ। কর্ণেল মোবটুর অভ্যুত্থান হয় কাসাভুবুর সমর্থনে। মোবটু চব্বিশজন কলেজের ছাত্র লইয়া গঠন করেন কলেজ অব হাই কমিশনার্স। কাসাভুবু এক ডিক্রী জারী করিয়া উহাকে কাউন্সিলে পরিণত করিয়াছেন উহাকে আইনগত মর্য্যাদা দিবার জন্য। মোবটুর সমর্থক একদল গুণ্ডা জাতীয় সেনাবাহিনী আখ্যা লাভ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট কাটাঙ্গার তথাকথিত প্রেসিডেণ্ট সোম্বের সহিত মোবটুর একটা আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। সোম্বে এক বৎসরের জন্য মোবটুর শাসনকে মানিয়া লইয়াছেন। ইহা-ই কঙ্গোর বর্ত্তমান পরিস্থিতি। শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের রিপোর্ট সম্পর্কে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই কাসাভুবু-মোবটু চক্রেরই অনুকূল।

মার্কিণ সরকার এক সময়ে মিঃ হ্যামারশীল্ডকে সাদা চেক দিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। যদিও একথা বলা হইয়াছে যে, কঙ্গোলী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাবের বিরোধী মার্কিণ সরকার নয়, কিন্তু মিঃ হ্যামারশীল্ডকে বেশ মোলায়েম ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রীদয়ালের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বেলজিয়ানদের উপর অত্যধিক চাপ দিলে তিনি মার্কিণ সরকারের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবেন। বেলজিয়ামের শুভেচ্ছার উপর মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট আস্থা আছে। শ্রীদয়ালের রিপোর্টে কঙ্গোর প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর তাহার নিজের স্বরূপ গোপন রাখিতে পারে নাই। কঙ্গোর পরিণতি কোন্ পথে তাহা সত্যই বুঝিয়া উঠা কঠিন। গত ১ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদ কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনা হঠাৎ স্থগিত রাখা হইয়াছে। আফ্রো-এশীয় কন্‌সিলিয়েশন কমিশন যাহাতে কঙ্গো পরিদর্শনে যাইতে পারেন এবং পরিদর্শন অন্তে রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন, সেই জন্যই নাকি আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। পনেরটি রাষ্ট্র লইয়া এই দলটির কঙ্গো সফরের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন বিরোধী দল গুলির মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করা এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশন যাহাতে আহূত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা। কিন্তু সাধারণ পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনা যে-ভাবে স্থগিত রাখা

হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় না যে, মীমাংসার চেষ্টার জন্য সুযোগ দিবার জন্যই উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। কঙ্গোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এই অভিযোগে রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু কঙ্গোতে প্রধান হস্তক্ষেপকারী যাহারা, তাহারা এখনও লিওপোল্ডভিলে সক্রিয় রহিয়াছে। তাহাদের প্রভাবে নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুলুম্বাকে পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়াই বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিরোধটা আসলে মিঃ লুলুম্বার সহিত কাসাভুবু ও মোবটুর নয়, বিরোধটা কঙ্গোর স্বাধীনতা ও সংহতির প্রতীক মিঃ লুলুম্বার সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের। আফ্রো-এশীয় কনসিলিয়েশন কমিশন কঙ্গো যাইয়া এই বিরোধের কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন, এতখানি ভরসা করা কঠিন।

আলজেরিয়ার যুদ্ধের সপ্তম বৎসর—

আলজেরিয়ার যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। কবে এই যুদ্ধের শেষ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফারাৎ আব্বাস যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এই আশঙ্কা অমূলক, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গল অবশ্য বলিয়াছেন যে, 'ফরাসী আলজেরিয়া' অলীক বস্তু। কিন্তু আলজেরিয়ার অধিবাসীদের কাছে 'আলজেরিয়ান আলজেরিয়া' এখনও অলীক বস্তুই হইয়া রহিয়াছে। গত ৪ঠা নভেম্বর (১৯৬০) ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গল আলজেরিয়া সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আলজেরিয়া সম্পর্কে নূতন কোন নীতি তিনি ঘোষণা করেন নাই। পুরাতন নীতির আবৃত্তিই তিনি করিয়াছেন। তবে তাঁহার আলজেরিয়া নীতির যাহারা বিরোধী তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে আলজেরিয়ার যুদ্ধের মীমাংসা এবং রিপাবলিককে রক্ষা করিবার জন্য পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এমন কথাও শোনা যাইতেছে যে, সম্ভবতঃ আগামী ১৫ই জানুয়ারী (১৯৬১) এই গণভোট গ্রহণ করা হইবে। তাঁহার উক্ত ৪ঠা নভেম্বর বক্তৃতায় একক ভাবে যুদ্ধ-বিরতির ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন, বলিয়াছেন, "One may even envisage that one day, we may decide to suspend the use of arms in Algeria except in case of legitimate self-defence." অর্থাৎ 'ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, একদিন কেবল ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষার জন্য ব্যতীত আলজেরিয়ায় আমরা অস্ত্রধারণ করিব না।' আলজেরিয়ার বিদ্রোহী নেতারা কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তারূপে গ্রহণ করায় প্রেসিডেণ্ট দ্য গল তাঁহাদেরও কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলিবে এবং উহার পরিণতি সোভিয়েট আলজেরিয়াতেও হইতে পারে।

আলজেরিয়ার সহিত ফ্রান্সের লড়াইয়ের সপ্তম বৎসরের প্রারম্ভে উভয় পক্ষই মনে করিতেছেন যুদ্ধ আরও দীর্ঘ দিন চলিবে। প্রেসিডেণ্ট দ্য গল আলজেরিয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আলজেরিয়া ফরাসী সার্ব্বভৌমত্বের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিবে। অবশ্য নূতন আলজেরিয়া রাষ্ট্র গঠনের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান হইবে। প্রেঃ দ্য গল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতী নহেন। তবে ভোট গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের প্রতিনিধিদিগকে আমন্ত্রণ করা হইবে, এই আশ্বাস তিনি দিয়াছেন। এই সকল প্রতিনিধিরা বোধ হয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহ হইবেন না। কিন্তু প্রেঃ দ্য গলের এক সর্ত্ত, সর্ব্বাগ্রে বিনা সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। তার পর তিনি বিদ্রোহী নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বিদ্রোহীনেতারা বিনা সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ করিতে রাজী নহেন। গত জুন মাসে (১৯৬০) আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একদল প্রতিনিধি প্যারীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ফরাসী সরকারের নিকট তাঁহারা যে ব্যবহার পাইয়াছেন তাহাতে ফরাসী সরকারের সহিত কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে, এরূপ আশা বিদ্রোহী সরকার আর করেন না। আলজেরিয়ার অধিবাসীদের স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ করিবার পরিবর্ত্তে প্রেঃ দ্য গল বিদ্রোহী নেতাদিগকে সোভিয়েট জুজুর ভয় দেখাইয়াছেন। মূল সমস্যাকে এড়াইবার জন্য তাঁহার এই প্রচেষ্টায় বিদ্রোহী নেতারা আদৌ ভীত হন নাই। আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফারাৎ আব্বাস বলিয়াছেন, "পশ্চিমী শক্তির অস্ত্রে নিহত

হওয়া অপেক্ষা চীনের অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।"

অহিংসার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, আলজেরিয়ার বিদ্রোহীরা বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক নয়। ইন্দোচীন হইতে কোন শিক্ষা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আলজেরিয়ার স্বাধীনতার জন্য কিছু করিতে পারিবে সে-সম্বন্ধেও আশা করিবার কিছুই নাই। সাধারণ পরিষদ ফ্রান্সের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আলজেরিয়া স্বাধীনতা পাইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদকে প্রেঃ দ্য গল তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভের আর পথ কি? মিঃ ফারাৎ আব্বাস বলিয়াছেন, "ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপর উৎপীড়ন চালাইতেছে। এই অবস্থায় আমাদের মিত্র চাই। সে-মিত্র আমরা পাইয়াছি মস্কোতে এবং পিকিংয়ে।" বিদ্রোহীদিগকে কমুনিষ্ট দেশগুলি হইতে অস্ত্রসাহায্য গ্রহণে বিরত করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ব্বপাকিস্তানে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা—

পূর্ব্বপাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল অঞ্চলে গত অক্টোবর মাসে (১৯৬০) দুই বার প্রকৃতির যে রুদ্র তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংবাদ বাহির বিশ্বে পৌঁছিতে শুধু বিলম্বই হয় নাই, ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বোধ হয় এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নাই। গত ১০ই অক্টোবর প্রথম ঘূর্ণিবাত্যা প্রবল বেগে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলায় দক্ষিণাঞ্চল এবং উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত। সেই সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দ্বারা বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অনেকাংশ প্লাবিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় বার প্রায় ঐ সকল অঞ্চলেই প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হয় ৩১শে অক্টোবর তারিখে। ঐ তারিখে ঝড়ের বেগ হইয়াছিল ঘণ্টায় ১০০ হইতে ১২০ মাইল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ। বাত্যাবিধ্বস্ত, অঞ্চলগুলির সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীই ঘূর্ণিবাত্যায় ভূমিসাৎ হইয়াছে, না হয় সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে ভাসিয়া গিয়াছে। করাচী হইতে সরকারী ভাবে ঘোষিত সংবাদে প্রকাশ, দুইটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, মৃত্যুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী।

ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে পূর্ব্বপাকিস্তানের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূল অঞ্চলে যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহাকে পাকিস্তানের একটা জাতীয় দুর্যোগ বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে না। এই সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ দেশে উপস্থিত না থাকাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি তাঁহার সমস্ত কর্ম্মসূচী বাতিল করিয়া দেশে ফিরিলেন না কেন, সে-প্রশ্ন লইয়া আমাদের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। স্মরণকালের মধ্যে ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের এইরূপ ধ্বংসলীলা বোধ হয় আর হয় নাই। সামরিক শাসনের অপ্রতিহত প্রভাব-ও প্রকৃতির রুদ্র রোষের সম্মুখে একান্ত অসহায়।

দক্ষিণ-ভিয়েটনামে বিদ্রোহ বানচাল—

দক্ষিণ ভিয়েটনামে একটি সামরিক বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর ক্ষমতা দখলের জন্য প্যারাস্যুট বাহিনী প্রত্যূষে সাইগনে প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাসাদ অবরোধ করিয়া বিদ্রোহীরা প্রেসিডেণ্টকে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাহাতে সম্মত না হইয়া তিনি বলেন, "আমি একমাত্র শবাধারে করিয়াই প্রাসাদ ত্যাগ করিব।" পরে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুরক্ত সৈন্যরা আসিয়া পড়ায় বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ত্রিশ ঘণ্টা সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। বিদ্রোহীদের দুই জন নায়ক দেশত্যাগ করে। বিদ্রোহ অল্প সময়ের মধ্যেই বানচাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্রোহের সহিত কমুনিজম বা কমুনিষ্টদের কোন সম্পর্ক নাই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই এই বিদ্রোহ হইয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

দক্ষিণ-ভিয়েটনামের প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও তিন বার তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, কিন্তু তিনি রক্ষা পাইয়া যান এবং তাঁহার শাসনও কায়েম থাকে। অধিকাংশ সৈন্যবাহিনীই তাঁহার সমর্থক, বিদ্রোহের ব্যর্থতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভিয়েটনামে তিনি জনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট, একথা ইহা দ্বারা বুঝা যায় না। তিনি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অনুরাগী, তাঁহার নীতিও উহা দ্বারাই পরিচালিত হয়। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ-ভিয়েটনাম কোন সামরিক জোটে যোগদান করিতে পারে নাই। দক্ষিণ-ভিয়েটনাম কোন সামরিক জোটে যোগদান করেও নাই। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দিয়েম উহাকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছেন। স্বাধীনতা বলিতেও দক্ষিণ-ভিয়েটনামে কিছু নাই।

১৮ই নবেম্বর, ১৯৬০

পেনিসিলিন আজ অনেক পুরানো হয়ে গেছে!

১৯২৯ সালে জন্মেছে পেনিসিলিন। ছাব্বিশ বছর আগে। তারপর বৈজ্ঞানিকেরা ৩,৫০০ রকমের কি তার চেয়েও কিছু বেশী রকমের এ্যাণ্টিবাওটিক্সের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু আজ ডাক্তারী শাস্ত্রে তার মধ্যে মাত্র পনেরোটি স্থান করতে পেরেছে। তেত্রিশটি মারাত্মক রোগ সারছে তা' দিয়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে পোলিও অবধি নানা রোগের নাম আছে তাতে।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

এবার প্রত্যাখ্যানের পালা। একের পর এক প্রত্যাখ্যান করে গেছি অসংখ্য প্রস্তাব। প্রস্তাবগুলি সর্বতোভাবেই আকর্ষণীয় এবং লোভনীয়ও। একটি নয়, দু'টি নয়—অনেক—অনেক—অনেক প্রস্তাব। কোন কোন প্রস্তাবে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও ছিল। কেন প্রত্যাখ্যান করলুম এ প্রশ্ন যদি করেন তা হ'লে উত্তর পাবেন যে এক জায়গায় স্থির নিশ্চল হয়ে কাজ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে কাজ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মন ভ্রমণপিপাসু, গতির পূজারী, চলমানতার উপাসক। আমি চেয়েছিলুম আমার নিজস্ব ব্যালে সম্প্রদায়টিকে আবার গড়ে তুলতে এবং তারই মাধ্যমে আমার সঙ্কল্প ছিল ব্রহ্মার ভরতমুনির হাতে নাট্যবেদ সমর্পণ করার সময় থেকে নাট্যকলার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ধারাকে রূপ দেবার। এই প্রচেষ্টা যদি সত্যি সত্যি কোনদিন রূপ নিত তাহ'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তা এক বর্ণবহুল ও দর্শনযোগ্য ব্যালেতে পরিণত হোত। এ বিষয়ে কয়েকজন ধনীকে আমি বলেওছিলুম, আমার বাসনা জানিয়েছিলুম তাঁদের, তাঁদের কাছে ব্যক্ত করেছিলুম আমার অন্তরের অভিলাষ। এই প্রচেষ্টাটির মধ্যে দিয়ে কয়েকটি নতুন কলাকৌশলের প্রচলন শুরু করার অদম্য বাসনাও আমার মনের মধ্যে ছিল। যেমন ধরুন মঞ্চ এবং পর্দার একটা সংমিশ্রণ সাধন, অর্থাৎ মঞ্চের কাজ যথানির্ধারিত হতে থাকবে, আর ঠিক সেই সঙ্গেই তালে তাল রেখে তার পিছনে খাটানো পর্দায় ছায়াচিত্রের প্রতিফলন ঘটবে—এক কথায় যাকে আমরা—ব্যাক প্রোজেকসান বলে থাকি—আরো বিশদ হই—যাতে আপনি যা দেখবার দেখে চলেছেন অর্থাৎ শিল্পীর কায়িক উপস্থিতি সেখানে ঘটেছে, শিল্পীর যা করণীয় সে তাই করে চলেছে—সেই সঙ্গে পরিস্থিতি বা আবেষ্টনী সম্বন্ধে দর্শকের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবার জন্য ব্যাক প্রোজেকসানের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পশ্চাৎপট হিসেবে গৃহীত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে আর সেই প্রদর্শন চলছে ব্যাক প্রোজেকসানের সাহায্যে।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার প্রাণপাত নিষ্ঠা সত্ত্বেও কোন ধনীই আমার কল্পনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন না। এলেন না কেউই। কেউই এসে বললেন না ঠিক আছে, চালিয়ে যাও তোমার কাজ, পিছনে আমি আছি। কারুর মুখে শুনলুম না একটুকু আশার বাণী, কারুর কাছে পেলুম না একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি আন্তরিকতা, একটুখানি সহযোগিতা, অথচ ঐ একটুখানি সহযোগিতা যদি আমি পেতুম তা হ'লে সেই সহযোগিতা আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই গণ্য হোত। আমি কাজে সফল হতে পারতুম, পেতুম অফুরন্ত উৎসাহ আর তার বদলে ধনীর দল আমাকে অভিনেত্রী হিসেবে বোম্বাইয়ের ছবির জগতে আটকে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন, তাঁদের আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করার একমাত্র কারণই হচ্ছে তাই অর্থাৎ তাঁরা চেয়েছিলেন যে মাত্র অভিনেত্রী হিসেবেই আমি বোম্বাইতে

দিনাতিপাত করি, সেইজন্যেই আমার কোন কল্পনাকেই তাঁরা প্রশ্রয় দিতে রাজী হলেন না।

কিন্তু আমিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই নিরুৎসাহিতা, অসহযোগিতা সহানুভূতিশূন্যতা—এরাই হোক আমার পথ চলার পাথেয়, এরাই আমাকে জোগাক শক্তি আমার আশাহত মনে এরাই আবার আঁকতে থাকুক রঙীন স্বপ্ন। আমি চেয়েছিলুম 'অজন্তা'কে কেন্দ্র করে বিশ্ব-পরিক্রমণ করতে, কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য বা ইঙ্গিতাভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমি চেয়েছিলুম অজন্তাকে এক ফিচার ফিল্মের রূপ দিয়ে সাধারণ্যে তাকে তুলে ধরতে কিন্তু এবার এই আশার বাদ সাধল আমার শারীরিক অসুস্থতা, এই প্রেরণা আমি পেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' থেকে, আমার ভ্রমণের প্রারম্ভে আমি বহুবার এই অনবদ্য কবিতাটিতে নৃত্যরূপ দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা লিপিবদ্ধ করে রাখার ঔচিত্য উপলব্ধি করছি—এই বহুলতার পিছনে একটি কারণ আছে। আমার এই বাহুল্যের হেতুই ছিল যে আমার প্রবল বাসনা যে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ আমি প্রধান মন্ত্রীর রিলিফ ফাণ্ডে দান করি (১৯৫২), কিন্তু যে কোন প্রদর্শনী যত লাভই সে করুক, যত টাকাই সে ঘরে তুলুক, তার রূপ দেবার সময়ে একটি প্রাথমিক খরচের ভার বহন করতে হয়—সেই দায়িত্বের সম্মুখীন কেউই হতে চাইলেন না, কিন্তু তাতে কতটুকুই বা আসে যায়—সাময়িক ভাবে উৎসাহ, উদ্যম, উদ্দীপনায় মালিন্যের প্রলেপ লাগে বটে কিন্তু এই প্রলেপ তো স্থায়িত্বের দাবীদারও নয়—উপমার আলোয় দেখা যায় যে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্যে কত ঘর-বাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, ঝড়ের প্রলয়নাচনের কি ভয়াবহ মত্ততা, ঝড়ের ইশারায় সমস্ত আকাশ কৃষ্ণবর্ণে ঘনঘোর হয়ে ওঠে। কিন্তু আবার পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে দেখা যায় রশ্মিমান সূর্যকে, তার প্রসন্ন আলোয় ঝড়ের গ্লানি মুছে যায়, আকাশ আবার মেঘমুক্ত হয়ে ওঠে দিবাকরের আবির্ভাবে। এও তো তাই, জীবনে প্রতি পদক্ষেপে আছে হতাশা, আছে আঘাত, আছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-লাঞ্ছনা কিন্তু এইটেই তো জীবনের একমাত্র রূপ নয়, এ নয় জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি, জীবনকে দেখার আর একটি কোণও আছে। সেই কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে জীবনে আনন্দও আছে, হাসিও আছে, গানও আছে। আমার প্রস্তাব যখন একের পর এক ধনীর দল নাকচ করে চলেছেন ঠিক

সেই সময়ে আমার কোন বন্ধু আমায় বুদ্ধি জোগালেন শ্রীএস, কে, পাতিলকে এ বিষয়ে একবার বলবার জন্তে। আজকের দিনের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীএস, কে, পাতিল তখন বোম্বাইয়ের পৌরপাল এবং বোম্বাইয়ের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। শ্রীপাতিল আমায় সত্যিই উপকার করলেন, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড দুঃখের পর যেমন একটি পরিপূর্ণ আনন্দ আসে, তেমনই ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতার পর একটি সার্থকতার প্রতিচ্ছবি আমার চোখের সামনে ধরা দিল। এতকাল কেবল নিরুৎসাহিতাই পেয়ে এসেছি, এবার পেলুম একটি জীবন্ত আশ্বাস। এতকাল কেবল অন্ধকারেই হাতড়ে মরেছি, এবার অফুরন্ত আলোকের প্রতিশ্রুতি। শ্রীপাতিল আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীজি, পি, নায়ারের সঙ্গে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জানালেন, তাঁর কাছে গৃহীত হ'ল আমার প্রস্তাব। আমার মনে হ'ল সপ্ত স্বর্গ যেন আমার হাতের মুঠোয়, ক্রমাগত ব্যর্থতার পর সার্থকতার একটুখানি আলো মানুষের নয়নগোচর হলে মানুষের মনের অবস্থা বোধ হয় এই রকমই হয়ে থাকে। মনে হল, কি যেন একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল। আমাকে জানানো হল যে ক্যান্সার রিলিফ ফাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে এই প্রদর্শনীটি যেন বোম্বাইতে প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই সবকিছুর মূলে শ্রীপাতিল, কারণ তিনি না থাকলে হয়তো কিছুই হোত না। তাঁর আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা ভোলবার কথা নয়, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। প্রযোজক আমার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেন নি আমি যা যা চেয়েছিলুম তৎক্ষণাৎ তাঁরা সে বিষয়ে তাঁদের পূর্ণশক্তি দিয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, আমাকে পরম আনন্দে, পরম নিশ্চিন্ততায় পরম শান্তিতে কাজ করার সমস্ত সুবিধে তাঁরা ক'রে দিয়েছেন। কর্মী বা কুশলীদের মধ্যে আমি আমার মনোনীত কয়েকজনকে চেয়েছিলুম। সঙ্গীতের জন্তে চেয়েছিলুম তিমিরবরণকে, শিল্প-নির্দেশনার জন্তে চেয়েছিলুম শান্তিনিকেতনের মনীষী দেকে, বলা বাহুল্য আমার কোন আশাই প্রযোজক অপূর্ণ রাখেন নি। এই প্রদর্শনী কতখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়ে আমার নিজের কোন কিছু বলা শোভন নয় বলেই মনে করি। এ বিষয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৫২ তারিখের ইভনিং নিউজের অভিমতের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি তুলে ধরা এ ক্ষেত্রে শ্রেয়: বলে মনে হয়—

"Madam Sadhana Bose has been telling me the history behind her latest ballet..yesterday when I visited the Excelsior I noticed that Madam Bose has lost little of her outstanding talent and the new work lacks nothing in the way of showmanship. It is difficult for me to understand why the performance have not achieved a great support from the general public Perhaps for the high prices of the seat are partly to blame..Evening News.

এ বিষয়ে আমার নিজেরও সামান্য বক্তব্য আছে এবং আমার এই মতের সঙ্গে আমি দেখেছি কয়েকজনের মত মিলেও গেছে, সাধারণ্যের আশানুরূপ সহযোগিতা না পাবার পিছনে আমার মতে যে হেতুটি বিদ্যমান—সেটি হচ্ছে—সেই সময়ে বোম্বাইতে লঘু আমোদ-প্রমোদের প্রচলন খুব অধিক পরিমাণেই ছিল—যেখানে লঘু আমোদ-প্রমোদের ব্যাপক জয়যাত্রা সেখানে এই বিরাট গভীরতাসম্পন্ন বিষয়বস্তুটির লোকের মনে প্রাধান্য বিস্তার করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—তা ছাড়া সাধারণ দর্শকের মনে বৌদ্ধদর্শনে, বড়রকমের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—বৌদ্ধদর্শনের সূত্র অনুধাবন করা থেকে সাধারণ দর্শক অনেক বেশী আনন্দ পায় হালকা প্রমোদ থেকে। জ্ঞানান্বেষণ থেকে প্রমোদরসের প্রতি তাদের টানটাই যেন বেশী বলে মনে হয়।

অবশ্য 'ইভনিং নিউজ'ও যে কথা বলেছেন তাও মোটেই অযৌক্তিক নয়। তাঁরা ঠিকই বলেছেন যে প্রবেশমূল্য সর্বসাধারণের উপযোগী হয়নি। এর সর্বনিম্ন মূল্য ছিল একশো টাকা। একশো টাকা দিয়ে টিকিট কাটা ইচ্ছা থাকলেও সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় 'সাধ থাকে তবু সাধ্য থাকে না' সুতরাং প্রবেশমূল্যের এই বর্ধিত হার অনুষ্ঠানটিকে সাধারণের আশানুযায়ী পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত করার জন্তে খানিকটা দায়ী এ কথা বললে অন্তত: আমার মতে মিথ্যাভাষণের দায়ে দুষ্ট হতে হয় না। এবং এই মূল্যনির্ধারণ ঠিক আমার ইচ্ছানুসারে হয়ও নি। এই মূল্য নিরূপিত হয়েছিল আমার প্রযোজকের, ইচ্ছানুসারে তাঁর ইচ্ছাতেই এই মূল্য স্থিরীকৃত হয়, তাঁর কাছে আমি নানাভাবে উপকৃত, এই অনুষ্ঠানের তিনিই প্রধান ঋত্বিক, তাঁর আনুকূল্য সর্বাংশে পুষ্ট করেছে এই প্রচেষ্টাকে, তাঁর কাছে সেদিক দিয়ে শিল্পী হিসেবে আমি যথেষ্ট ঋণী—সেই সব ভেবেই তাঁর ইচ্ছায় আমি বাধা দিইনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিনি, সে সম্বন্ধে কোন ভিন্নমত প্রকাশ করিনি।

এঁর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়ে গেল এবং অজন্তার মহড়াও শুরু হয়—এ-হেন সময়ে হ্যাঁ—এই এ-হেন সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে—যাতে ঘটনার স্রোতধারা আবার একটা নতুন মোড় নিল। একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন, অনেক কাগজপত্র দেখালেন—আদবকায়দা বা নিয়ম-কানুনের বা রীতি প্রণালীর কোন ত্রুটি নেই সেই সব ছাপা কাগজ-পত্রের মধ্যে। লক্ষ্য করলুম "V. I. P." বলতে যাঁদের বোঝায় সেই সব রথী-মহারথীদের নাম সেই সব কাগজে ছাপার হরপে। চিত্রতারকাদের হকি খেলার জন্তে যে কমিটি গঠিত হল সেই কমিটির নামকরণ হল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটি। এই উপলক্ষে এদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান পরিচালিকা হিসেবে আমার নামটি লিপিবদ্ধ করতে চাইলেন। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম অগ্রদূত দাদা ফালকের জন্মোৎসব পালন করা। সহজেই অনুমেয় যে, একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক খুবই, শুধু এই বললেই তো বলা হয় না চিত্রতারকা হিসেবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার অন্যতম প্রধান কর্তব্যও। এঁরা আমাকে একটি রাত মাত্র মনস্থির করার সময় দিলেন। হকি ম্যাচের পর কথা হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা তখন সব দিল্লীতে আছেন, স্থির হল আমাকেও দিল্লী গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে হবে এবং স্পোর্টসের জন্তে

ন্যাশানাল থিয়েটার এবং সংস্কৃতিবিষয়ক পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তাঁদের সিদ্ধান্তে আমার অভিমত অনুযায়ী সম্মতি দান করতে হবে—এ জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁদের দ্বারা হয়ে আছে। শুধু আমার অভিমত এবং সম্মতির অপেক্ষায় তাঁদের ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারছে না। আমার কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছেই এ সব তথ্য সম্পর্কে অবহিত হলুম, স্বীকার করছি যে, এই বিরাট আয়োজনে আমার যোগদান সম্পর্কে আমার নিজের সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব পোষণ করাই উচিত ছিল কিন্তু যে সম্প্রদায় আমার আহ্বান জানালেন তাঁদের প্রতি আমার আস্থা বজায় ছিল পূর্ণমাত্রায়। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জোয়ান ক্রফর্ডের প্রসঙ্গে

বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েও কর্মোদ্যমে যাঁরা তরুণ-তরুণীদেরও পরাজিত করার শক্তি রাখেন, চিত্রজগতে বিগত এবং বর্তমান যুগের মধ্যবর্তী যোগসূত্ররূপে যাঁরা বর্তমান, হলিউডের চিত্ররাজ্যে এক ঐতিহ্য সৃষ্টির গৌরব যাঁদের অধিকারগত, প্রতিভাময়ী শিল্পী জোয়ান ক্রফর্ডের নামোল্লেখও তাঁদের সঙ্গে অনায়াসে করা চলে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরধন্য অসংখ্য ছায়াচিত্র এঁর অনবদ্য অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার কল্যাণে আজ ইনি হলিউডের চিত্ররাজ্যে এক বিশেষ সম্মানজনক আসনের অধিকারিণী।

জোয়ান ক্রফর্ড এই নামে তিনি সারা বিশ্বে প্রচারিতা হলেও এটি কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। বিলি ক্যাসিন-ই আজ এই নামে সর্বসাধারণ্যে পরিচিতা, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত টেক্সাসের সান আন্তোনিওয় বিলির জন্ম। এ হচ্ছে ১৯০৮ সালের কথা। তারিখটি হচ্ছে ২৩এ মার্চ। ষোলো বছর বয়েস থেকে কর্মজীবনের সূত্রপাত —তবে অভিনেত্রী হিসেবে নয়। অভিনয়-জগতের দুয়ার তখনো তাঁর সামনে অর্গলমুক্ত হয়নি। বিলি চাকরি নিলেন একটি সাধারণ দোকানে। তারপর লুসিলি লে সুর নাম নিয়ে সিকাগোয় নর্তকীর পেশা গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই সময়ে ভাগ্যদেবতা তাঁর প্রসন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি এই ভাগ্যান্বেষিণী তরুণীটির প্রতি, ভাগ্যদেবতার বিরূপতাই তখন সে পেয়েছে, পায়নি তাঁর প্রসন্ন আশীর্বাদ। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তখন তাঁকে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, দিনের অন্ন সংগ্রহ করাও রীতিমত আয়াসসাধ্য হয়ে উঠল। কাজ নেই, আছে অভাব, খাবার সময়ের অভাব নয়, খাবারেরই অভাব।

ভাগ্যের চাকা ঘুরল, ভাগ্যদেবতার প্রসন্ন কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপিত হল শিল্পীর শিরোদেশে, জীবনের নতুন ইতিহাসের রূপায়ণ শুরু হল ১৯২৫ সালে, জোয়ান প্রভূত সুনাম অর্জন করলেন ছায়াচিত্রে অভিনয় করে। ছবিটির নাম "প্রেটি লেডিজ" সাত বছরের মধ্যে দেখা গেল হলিউডের প্রথম দশজন তারকার তালিকায় জোয়ান ক্রফর্ডের নাম। জীবনযুদ্ধে বিজয়িনীর পরম পুরস্কার।

আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে সুপরিচিতা হয়ে উঠলেন জোয়ান, অত্যন্ত মিশুকে স্বভাবের মেয়ে তিনি। ছবির রাজ্য ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেতে লাগল, নানাবিধ প্রীতি-উৎসবে তিনি সক্রিয় অংশ নিতে লাগলেন, তাঁকে দেখা যেতে লাগল পার্টিতে, নাচের আসরে, নাইট ক্লাবে। জোয়ান জীবন-প্রেমিকা, জীবনকে তিনি ভাল বেসেছেন উদগ্রভাবে, জীবন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। পুরুষদের সঙ্গে মিশতে খুব আনন্দ পান জোয়ান, তিনি বলেন, এর ফলে নানাবিধ চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, তাতে চরিত্রবৈচিত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়ে যায়। জোয়ান অফুরন্ত আনন্দ পান নাইট ক্লাবগুলির মধ্যে।

১৯৪৫ সালে য়্যাকাডেমী পুরস্কার পেলেন জোয়ান "মিলড্রেড পায়ার্সে" অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

তিপ্পান্ন বছরের জীবনে চার বার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন জোয়ান। তাঁর স্বামীরা হলেন যথাক্রমে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস জুনিয়ার, ফ্রাঙ্কোট টোন, ফিল টেরী এবং ডাঃ য়্যালফ্রেড ষ্টিল। শেষোক্ত জন সম্প্রতি পরলোকগত হয়েছেন। চারটি পালিতা কন্যাকে নিয়ে জোয়ান সুখে দিনাতিপাত করছেন।

ছবির রাজ্যে জোয়ানের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখবার জিনিষ। সকল বিষয়ে তিনি অত্যন্ত যত্নবতী, তাঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয় চলে। শিল্পী হিসেবে ছবির পরিচালককে তিনি 'বস' এর সম্মান দিয়ে থাকেন কিন্তু তাই বলে নিজের স্বতন্ত্র অভিমত প্রকাশ করতে

বাদল পিকচার্সের 'মায়াহারা' ছবির নায়িকার ভূমিকায় মালা সিন্‌হা। আলোকচিত্র—হেমেন মিত্র

তিনি কোন দিনই পিছপাও নন। ছবির কলাকৌশলাদি সম্বন্ধে জোয়ানের জ্ঞান সুগভীর। অলসতা জোয়ানের অসহ্য, আচরণে কোন প্রকার অভব্যতা তিনি বিন্দুমাত্র সহ্য করতে রাজী নন।

বাড়ী ফিরে এসে জোয়ান ভিন্ন মানুষ, তখন রান্না আর গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কোন কাজ তাঁর নেই। রাত্রিতে যে দিন বাড়ী থাকেন সেদিন পড়াশুনো ছাড়া আর কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে তাঁকে দেখা যায় না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সচিব আসেন, তাঁর সাহায্যে প্রতিটি চিঠির তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন। বিশেষভাবে যা লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে এই—আজ পর্যন্ত জোয়ানের কোন অনুরাগী কখনও বলতে পারবেন না যে তাঁকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাওয়া যায় নি। প্রত্যেকটি চিঠির উত্তর দিয়ে তিনি পত্রদাতাকে সম্মান জানিয়ে থাকেন।

অজানা কাহিনী

জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাবরণ, প্রেমকে কেন্দ্র করে ঘাত-প্রতিঘাত এবং সর্বশেষে জীবনের মধুময় পরিণতি—এই পটভূমি অবলম্বন করেই 'অজানা কাহিনী' ছায়াচিত্রের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। ছবির নায়িকা বাবার একমাত্র মেয়ে। সুন্দরী, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা, রুচিসম্পন্না। সুপ্রিয় নামক একটি যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয়, আলাপ পরিণত হয় ঘনিষ্ঠতায়—শেষে আয়োজন চলতে থাকে বিবাহের। মিলনের সেই মধুর লগ্নটি যখন দুয়ারে সমীপবর্তী সেই রকম কোন একটি দিনে নায়িকার চোখে ধরা পড়ে গেল সুপ্রিয়র আসল রূপ, সুপ্রিয় আসলে অতি জঘন্য চরিত্রের লোক, নায়িকা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেল। বিবাহ সে নিজেই ভেঙে দিল, তার বাবা এর প্রকৃত কারণ জানতে পারলেন না (মেয়েই জানাল না)। পিতাপুত্রীতে কলহ। পরিশেষে পিতার ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুবরণ—মৃত্যুকালে তিনি উইল করে গেলেন যে কন্যা বিবাহ না করলে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর মন্দপ ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকারে চলে যাবে। বাবার সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে (টাকার লোভে নয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জন করে, মদ্যপ স্বত্বাধিকারীর হাতে প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ হয়ে যাবে, ফলে তারা নিরন্ন হতে পারে এই চিন্তা করেই) সে বিয়ে করে বসল এক ফাঁসির আসামীকে (অর্থাৎ আইনের চোখেই সে নিজেকে বিবাহিতা বলে প্রমাণ করতে চাইল)। বিবাহের পরেই জানা গেল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আসল অপরাধী নয়। আসল অপরাধীর সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল থাকার ফলেই তাঁকে ফাঁসিকাঠে জীবন বলি দিতে হচ্ছিল। এইবার গল্পের পট পরিবর্তন। নায়িকা প্রথমে কথা দিয়েছিল নায়ককে যে সে কোন দিন কোন কিছুর দাবী নিয়ে নায়কের সামনে দাঁড়াবে না। পরে নায়িকা যখন স্ত্রীর দাবী নিয়ে তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে স্বীকৃতি দিতে নায়ক নারাজ, পরে অনেক ভুল বোঝাবুঝি। ঘটনাস্রোতের মধ্যে দিয়ে শেষে নায়ক-নায়িকার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের অবসানে গল্প পরিসমাপ্তি।

ছবিটিতে বৈচিত্র্য আছে। কৌতূহল সৃষ্টির অনেক উপাদানই বিদ্যমান কিন্তু সর্বতোভাবে বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি যে, শ্রীসুনীলবরণ পরিচালিত এই ছবিখানি ছায়াছবি হিসেবে আমাদের মনে আনন্দরসের সঞ্চার করতে পারে নি, সে দিক দিয়ে ছবিখানি সফলতা অর্জনে অসমর্থ হয়েছে। চিত্রগ্রহণ এবং শব্দগ্রহণ একেবারে ব্যর্থ। অনেক স্থানে চিত্রগ্রহণ চোখে পীড়া দেয় এবং সংলাপাদি প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না। পরিবারের য়্যাটর্ণি বন্ধুকে নায়িকা একবার 'আপনি' বলছে পরমুহূর্তেই 'তুমি' বলছে; এই সামান্য দিকটিতেও পরিচালক নজর দেননি। যে চিঠির শেটটি দেখানো হয়েছে তাতে একাধিক হস্তাক্ষর, একটি চিঠি লিখতে একাধিক হস্তাক্ষরের প্রয়োজন হয়, এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না। রবীন মজুমদার অভিনীত চরিত্রটির পরিণতি কি? চরিত্রটি অর্ধপথেই মিলিয়ে গেল, চরিত্রটি অসম্পূর্ণ। চিত্রনাট্যে তাকে পূর্ণতা দেওয়া হয় নি। সমস্ত ছবিটির মধ্যে সবচেয়ে যা আমাদের দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে তা হচ্ছে নামকরণ। সমস্ত গল্প অনুধাবন করে গল্পের সঙ্গে এই নামকরণের মিল কোথায় বা তাৎপর্য কি সে সম্বন্ধে কোন সদুত্তর মেলে না। ছবির যা গল্পাংশ তার সঙ্গে এই নামকরণের কোন সামঞ্জস্যই নেই।

নায়ক-নায়িকা এবং সুপ্রিয়র চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন যথাক্রমে অসিতবরণ, সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং দীপক মুখোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, নীরাজ দাস, বেচু সিংহ, অপর্ণা দেবী, নমিতা সিংহ, সাধনা রায়চৌধুরী, চিত্রা মণ্ডল, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয়দক্ষতার যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে।

নদের নিমাই

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুণ্য জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে আজ পর্যন্ত অনেকগুলি ছবিই মুক্তিলাভ করল। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন এবং সন্ন্যাস তথা প্রচারক জীবন উভয়কে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং এই জাতীয় চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব আর কিছুই নেই। কেন না, এই পুণ্যকাহিনী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙলার ঘরে ঘরে সুপ্রচারিত, তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যজীবন প্রেমের করুণায় এবং মৈত্রীর আলোয় আলোকিত, তার এক বিরাট আবেদনকে অস্বীকার করা কোনমতেই চলে না এবং এই আবেদন ক্ষণকালীন নয়, চিরকালীন। তা ছাড়া এর ইতিহাসমূল্যও অনস্বীকার্য। নদের নিমাই ছবিটিতে মহাপ্রভুর শুভজন্মপরিগ্রহ থেকে শুরু করে সংসার ত্যাগ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। এর সময়সীমা চব্বিশ বছর। এই সময়ের অন্তর্বর্তী শ্রীচৈতন্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ক্রমানুসারে এক এক করে সাজিয়ে এক সামগ্রিক রূপ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে সকলের সামনে। ঘটনা ও বিষয়বস্তু এক হলেও চৈতন্যদেবের জীবন-কেন্দ্রিক অন্যান্য ছবিগুলির সঙ্গে এই ছবির তুলনা করলে এর দুটি বিশেষত্ব ধরা পড়বে। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীচিত্রগুলিতে বিশ্বরূপ অনুপস্থিত। বিশ্বরূপের উল্লেখ অবশ্য সব ছবিতেই আছে কিন্তু এই ছবিতে বিশ্বরূপকে দেখানো হয়েছে—তেমনই চৈতন্যদেবের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীও চৈতন্যজীবনীচিত্রগুলিতে পরিত্যক্তা কিন্তু এই ছবিতে তাঁকেও দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় ছবির সঙ্গীতই হচ্ছে প্রাণ, কিন্তু কোন কিছুরই বাহুল্য

ভালো নয়। এই কথাটি এই ছবির প্রসঙ্গে অনায়াসেই প্রযোজ্য। ছবির মধ্যে গানের সংখ্যা কিছু কমালে ছবিটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। গানের সংখ্যাধিক্য চিত্রনাট্যের গতিকে ব্যাহত করেছে।

প্রধান ভূমিকায় অসীমকুমারের অভিনয় হৃদয়ে রেখাপাত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনের পরবর্তী অংশ অবলম্বন করে যে ছায়াচিত্রটি গড়ে উঠেছিল, সেই ছবিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকায় এই শিল্পীকেই দেখা গিয়েছিল আর সেই ছবির মাধ্যমেই এই অভিনেতার প্রথম আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য শিল্পীরাও আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, যথা—ছবি বিশ্বাস (অদ্বৈতাচার্য), জহর গাঙ্গোপাধ্যায় (জগন্নাথ মিশ্র), নীতিশ মুখোপাধ্যায় (চাপালগোপাল), প্রশান্তকুমার (নিত্যানন্দ), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীবাস), সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিদাস), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (শচী দেবীর ভগ্নীপতি), সন্তোষ সিংহ এবং জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (নিমাইয়ের পাঠশালাদ্বয়), শ্যাম লাহা (জগাই), জহর রায় (মাধাই), তুলসী চক্রবর্তী (ঈশান), নৃপতি চট্টোপাধ্যায় এবং মণি শ্রীমানী (চাপালগোপালের অনুচরদ্বয়), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (রঘুনাথ), শোভা সেন (শচীমাতা), সবিতা বসু (বিষ্ণুপ্রিয়া), রেণুকা রায় (বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী), তপতী ঘোষ (বাঈজী), অপর্ণা দেবী (অদ্বৈত-গৃহিণী), স্বাগতা চক্রবর্তী (বৈষ্ণবী) প্রভৃতি।

ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রথীন ঘোষ এবং ছবিটির পরিচালক শ্রীবিমল রায়।

শেষ পর্যন্ত

দর্শকসমাজকে সর্বতোভাবে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে রূপালী পর্দার বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে "শেষ পর্যন্ত"। হাস্যরসাত্মক ছবিতে যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, এই ছবিটির মধ্যে সেগুলির উপস্থিতি লক্ষণীয়। মুক্তিপ্রাপ্ত হাসির ছবির সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়, সময়ের স্বল্প ব্যবধানে অন্যান্য ছবির মত হাস্যরসাত্মক ছবি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়ে থাকে—তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন না কোন দিক দিয়ে বিচার করলে সেগুলির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয় কিন্তু "শেষ পর্যন্ত" তাদের ব্যতিক্রম। রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের "বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস" কাহিনীটিই পরিবর্ধিত আকারে চলচ্চিত্রের রূপ নিয়েছে। কাহিনী পরিবর্ধনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন যশস্বী সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ছবির সঙ্গে ইতঃপূর্বে ইনি কয়েকখানি হাসির ছবিও উপহার দিয়েছেন বাঙলাদেশের দর্শকসমাজকে। এ কথা আমরা বলতে পারি যে, 'শেষ পর্যন্ত' তাঁর পরিচালিত অন্যান্য হাসির ছবিগুলিকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে গেছে।

গল্পের মূল হচ্ছে হোটেল। পুরীতে ভুবন দত্তের হোটেলের খুব নামডাক। বিশ্বাস-দম্পতি পুরীতে বেড়াতে আসেন। হোটেল ব্যবসায়ের জয়জয়কার দেখে বিশ্বাসগৃহিণী পুরীতেই হোটেল খোলার সিদ্ধান্ত করেন। স্বামীর একরকম অনিচ্ছাতেই তিনি হোটেল খোলেন। ভুবন দত্তের স্বার্থে ঘা পড়ে, শুরু হয় রেষারেষি, এদিকে ভুবন দত্তের ভাইপোর সঙ্গে প্রণয় ঘনীভূত হয় বিশ্বাসের ভাগনীর। কলকাতাতেই তাদের প্রথম পরিচয়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক ঘটনার ঘনঘটা। সুখ, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, সর্বশেষে ভুবন দত্তের ভাইপোর সঙ্গে বিশ্বাসের ভাগনীর বিবাহ এবং সর্বপ্রকার রেষারেষির অবসান।

পরিচালক গল্পটিকে সাজিয়েছেন ভালো, বিভিন্ন ঘটনা টুকরো টুকরো অধ্যায়কে একত্রে ক্রমানুসারে গ্রন্থনের ক্ষেত্রে তিনি মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যুগপৎ কৌতুক এবং কৌতূহলের সমাবেশ ঘটেছে এই ছবিতে। বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে নাট্যরস রীতিমত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি চরিত্রের আগমন ঘটেছে যাদের সঙ্গে মূল গল্পাংশের কোন যোগ না থাকলেও তাদের আবির্ভাব তাৎপর্যশূন্য নয়, এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিই প্রতীকধর্মী, সেদিক দিয়ে বিচার করলে এদের গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। সমগ্র ছবিটিতে এরাও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। বিশ্বাস-দম্পতির চরিত্র দুটির একটিকে আত্মবিশ্বাস এবং অপরটিকে আত্মমর্যাদার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। ছোটখাটো ভুলত্রুটি যে নেই এমন কথা অবশ্যই বলা চলে না। সামান্য সামান্য ভুল-ত্রুটি এ ছবিতেও বিদ্যমান, যেমন একটির বিষয় উল্লেখ করা যাক, ভাগনী যতই ভিন্ন ধরণের পোষাকে নিজের আকৃতি গোপন করে রাখুক, তার গলার স্বর শুনে মামী তাকে চিনতে পারছেন না—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'শিলালিপির' নায়িকার ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র—হেমেন মিত্র

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অনুভা গুপ্তা। বলতে গেলে সমস্ত ছবিটিকে তিনি একাই টেনে নিয়ে গেছেন। বহু কাল পরে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁকে আবার দেখা গেল। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবেন বসুর অভিনয়ও দর্শকমনকে স্পর্শ করে, এঁদের অভিনয় সম্পূর্ণ সার্থক। নায়ক বিশ্বজিত সু-অভিনয় করেছেন। নায়িকা সুলতা চৌধুরীর অভিনয় ভালো হয়েছে কিন্তু তবু তাঁকে এখনও আরও অনুশীলন করতে হবে। অল্প আবির্ভাবের মধ্যেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তরুণকুমার এবং গীতা দে। অন্যান্য ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মলয় বিশ্বাস, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, রেণুকা রায়, সন্ধ্যা দেবী, অজন্তা কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শিল্পি-পরিবর্তন

সেতু এবং ডাউনট্রেণ নাটক দুটির ভূমিকালিপির পরিবর্তন ঘটেছে। সেতু এবং ডাউনট্রেণ নাটক দু'টির শিল্পী হিসেবে বর্তমানে যথাক্রমে অসিতবরণ এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য আত্মপ্রকাশ করছেন না। তাঁদের পরিবর্তে ঐ ভূমিকা দুটিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন যথাক্রমে অসীমকুমার এবং মহেন্দ্র গুপ্ত।

পূর্বসূরী-সম্বর্ধনা

মিনার্ভার অঙ্গারের দু'শো রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ই কার্ত্তিক লিটল থিয়েটার দল এক স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল কয়েকজন প্রবীণ নাট্যসেবীর উপস্থিতি। দীর্ঘকাল রঙ্গালয়কে সেবা করে, সুখদুঃখময় জীবনের এক বিরাট অংশ নটনাথের বেদীমূলে উৎসর্গ করে, রঙ্গালয়ের বিভিন্ন আবর্তন বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য হিসেবে আজ যাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত তাঁদের কয়েকজনকেও এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধা জানানো হল। সেদিন রঙ্গমঞ্চে সম্মানিত অতিথিরূপে দেখা গেল হেমন্তকুমারী দেবীকে, দেখা গেল নীরদাসুন্দরী দেবীকে, দেখা গেল তারকনাথ বাগচী, মণীন্দ্রনাথ দাস এবং ভূতনাথ দাসকে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সুসংবাদ পরিবেশন করি। ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী প্রদত্ত নটগুরু শিশিরকুমারের একটি আবক্ষ মূর্তি মিনার্ভায় স্থাপন করা হল।

"আমি এখনও রূপকথা পড়ি"—অড্রে হেপবার্ণ

বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে অড্রে হেপবার্ণের। তা স্বত্বেও এ কথা স্বীকার করতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না যে, তিনি এখনও রূপকথা পড়তে ভালোবাসেন। বয়স ক্রমশঃ বেড়ে চলছে ঠিকই তবু রূপকথার জন্যে ছেলেবেলায় তাঁর যে পরিমাণ আগ্রহ, নিষ্ঠা ও বাসনা ছিল আজও তা অব্যাহতই আছে। প্রভূত সুনামের অধিকারিণী এই যশস্বিনী অভিনেত্রীটির সারা মুখাবয়ব এখনও হাসির দীপ্তিতে ভরে ওঠে যে কেউ তাঁর সামনে একবার রূপকথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে। যাঁরা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে সেই সময়ে তাঁর মুখ দেখে মনে হয় যেন এই প্রশ্নের জন্যেই তিনি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মনে হয়, এবার যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সারা মুখে তখন তাঁর এক অদম্য প্রাণপ্রাচুর্যের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। অড্রে পরিষ্কার বলেন যে আমি রূপকথা এখনও পড়ি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদির মধ্যে রূপকথাই আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দিতে পারে। আনন্দলাভের পরম এবং প্রধান সহায়ক হচ্ছে এই রূপকথা এবং আমার মতে রূপকথা হচ্ছে যেন এক মহান আনন্দরসের অফুরন্ত উৎস। আমি যখন তিন মাস প্যারীতে ছিলুম (যে সময়ে মল ইন্‌'গ্রেড বার্গম্যানের ছবিতে কাজ করছে) সে সময় গৃহস্থালীর তদারকী প্রভৃতি করেও আমি নিয়মিতভাবে রূপকথার রাজ্যের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর এর জন্যে আমার দৈনন্দিন কর্তব্য বিশেষ করে মেলের (অড্রের স্বামী প্রখ্যাত অভিনেতা মেল ফেরার) প্রতি আমার যে বিশেষ কর্তব্য সেই কর্তব্যপালনে বারেকের তরেও ছেদ পড়েনি।

অড্রে বলেন যে, বিবাহিত জীবন এবং শিল্পসাধনা কোনটাই কোনটার ক্ষতি করে না। একের জন্যে অপরকে ত্যাগ করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। সংসারযাত্রা নির্বাহ করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। শিল্পসাধনায় সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে দাম্পত্যজীবন কখনই বাধাসৃষ্টি করে না। সুতরাং সকল সময়েই মনে রাখতে হবে যে, এই দ্বিবিধ সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করতে হবে।

অড্রে বলেন যে, অনেককেই দেখা যায় যাঁরা বিয়ের পর একটির দিকেই যত্নবান, অন্যদিকটি তাঁদের দ্বারা উপেক্ষিত, তাঁরা আপন আপন সাধনাতেই মশগুল, অন্যদিক সম্পর্কে তাঁদের যেন কোন দায়িত্বই নেই। কিন্তু এই আচরণ কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। আমার নিজের যখন বিয়ে হল আমি স্থির করলুম যে, কাজ যদি আমাকে করতে হয় তা হলে বছরের মধ্যে কাজের সময়কেও ভাগ করে নেব। আমি কি শুধু অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ণ— এতকাল তাই ছিলুম বটে কিন্তু আমার আবার একটি পরিচয় আছে, সেটি হচ্ছে আমি একজনের স্ত্রী—আমার কাছ থেকে যার অনেক কিছু প্রাপ্য আছে। তাই ঠিক করলুম যে, বছরে তিন মাস কাজ করব আর তার পরবর্তী তিন মাসে সম্পূর্ণভাবে নিজের গৃহস্থালীর কাজে আত্মনিয়োগ করব। আর সেই সময়ে সামগ্রিকভাবে আমার মধ্যে মিস অড্রে হেপবার্ণের কোন অস্তিত্বই থাকবে না, যা থাকবে তার নাম মিসেস মেল ফেরার।

সংবাদ-বিচিত্রা

আলাউদ্দীনের জীবনীচিত্র: আলী আকবরের প্রযোজনায়: তপন সিংহ পরিচালক (?)

ভারতবন্দিত মনস্বী সুরসাধক আচার্য আলাউদ্দীন খানের সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ গৌরবময় জীবনকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ ছায়াছবি নির্মাণের আয়োজন চলছে! আগামী বছরে এর চিত্রগ্রহণ সুরু হবে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন আলাউদ্দীন খান সাহেবের সুযোগ্য এবং যশস্বী পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খান। খুব সম্ভব, তপন সিংহ ছবিটি পরিচালনা করবেন। আলী আকবর বলেছেন যে, আমার বাবার জীবনের সমস্ত ঘটনাটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত করতে গেলে তা তিনটি পূর্ণ-দৈর্ঘ ছবির সমান দীর্ঘ হয়ে পড়বে, তাই একটি ছবির মধ্যে যতটা দেখানো যায় সেই ভাবেই চিত্রনাট্য রচিত হচ্ছে—

আলাউদ্দীন খান সাহেবের বয়স বর্তমানে নব্বই অতিক্রম করে গেছে।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের চিত্রপ্রযোজনা : পরিচালক দেবকী বসু

আসন্ন রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য এবং প্রচার বিভাগের উদ্যোগে পাঁচটি ছায়াছবি রূপ নেবে। ছবিগুলির পরিচালনা-ভার দেওয়া হয়েছে বাঙলার প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসুকে। পাঁচটি ছবির কাহিনীই অস্পৃশ্যতাকে পটভূমি করে গড়ে উঠেছে। ছবিগুলির নামও ঘোষিত হয়েছে যথা রুই দাস, শঙ্করাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ, শুচি এবং প্রাচীন বটবৃক্ষের আত্মকথা। বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল এবং শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য স্তোত্রপাঠ শুনতে পাওয়া যাবে।

পূর্ব্ববাংলার প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গীয় ছায়াছবি

পনেরখানি পশ্চিমবঙ্গীয় ছায়াছবি পূর্ববঙ্গের সাধারণ প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রদর্শনের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন পূর্ববঙ্গ সরকার। এইজন্যে প্রস্তাব করা হয়েছে যে একুশখানি ছবি কলকাতা থেকে ঢাকায় পাঠানো হবে, তার মধ্যে থেকে তাঁরা পনেরোখানি ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্যে নির্বাচিত করে নেবেন। এই নির্বাচন করবেন নবগঠিত ফিল্ম ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশান অফ ইষ্ট পাকিস্তান। এই উপলক্ষে বি, এম, পি, এ, একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় পাঠানো স্থির করেছেন।

বীণা রায় আগামী নির্ব্বাচনে লোকসভার সদস্যপদপ্রার্থিনী

আগামী সাধারণ নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের ইষ্ট নিমার নির্বাচনকেন্দ্র থেকে যিনি লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থনা করে নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণা হচ্ছেন, শোনা যাচ্ছে তিনি একজন খনামধন্যা চিত্রাভিনেত্রী। চিত্রামোদীমহলে তাঁর নাম যথেষ্ট প্রচারিত। তিনি শ্রীমতী বীণা রায়। বীণা রায় এবং তাঁর স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বামী অভিনেতা প্রেমনাথ এঁরা উভয়েই স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

বিধানসভা-সদস্যের চলচ্চিত্রে অবতরণ

অন্ধ্র বিধানসভার ভূতপূর্ব ডেপুটি স্পীকার শ্রীপি, এস, সি, রাও ভক্ত রামদাস চিত্রে ভূমিকা গ্রহণ করছেন বলে জানা গেল। মঞ্চাভিনেতা হিসেবে অবশ্য ইনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন। আরও একজন বিধানসভা-সদস্য—শ্রীএস, ব্রহ্মারাও এই ছবিতে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করবেন।

কোরীয় চলচ্চিত্রসমূহে নির্দিষ্ট নীতির আবশ্যকতা অনুভূত

কোরীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি এবং আইনাদি প্রণয়নের জন্যে কোরিয়ার চিত্রপরিচালক-সংস্থা তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে কোরিয়ার চলচ্চিত্র-জগতের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্যেই নির্ধারিত আইন বা নীতি আবশ্যক। তাঁরা তাঁদের সরকারকে আরও অনুরোধ জানিয়েছেন যে, এই কাজ শুরু করার প্রাক্কালে যেন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালির চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিধানসমূহ খুব যত্নসহকারে অনুধাবন করা হয়।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হলিউডের ভূমিকা

মিঃ কেনেডী যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিদায়ী সহ-রাষ্ট্রপতি মিঃ নিক্সন। এই নির্বাচনে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মিঃ কেনেডী ও মিঃ নিক্সন উভয়েই শিল্পীদের সহযোগিতা পান। কেনেডীর সমর্থকদের মধ্যে পিটার লফোর্ড, হেনরি ফণ্ডা, জেফ চ্যাণ্ডলার, স্যামি ডেভিস জুনিয়ার, বেটি গ্রেবল, জুডি গার্ল্যাণ্ড, গ্রেস কেলী, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা এবং টনি কার্টিস এবং নিক্সনের সমর্থকদের মধ্যে জেমস ইুয়ার্ট, গ্যারি কুপার, জেমস কেগনি, ফ্রেড ম্যাকমারে, ফার্ক ডগলাস, জেরি লুইস, শার্লি টেম্পল এবং ডিক পাওয়েল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

লোরেন বোকলের পরিণয়

বিখ্যাত অভিনেতা পরলোকগত হামফ্রি বোগার্টের সহধর্মিণী প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী লোরেন বোকল (৩৭) অভিনেতা জেসন রবার্ডস জুনিয়ারের (৩১) সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জেসন রবার্ডসের সঙ্গে স্বর্গতঃ হামফ্রি বোগার্টের আকৃতিগত আংশিক সাদৃশ্য অনেকের চোখেই ধরা পড়েছে।

উটেদের জল নিয়ে যাবার জন্য গলায় কোন জায়গা নেই!

ডারহামের বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানবিদ ডক্টর স্যুট নেলসন সস্ত্রীক (স্ত্রী ও একজন বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী) সাহারা মরুভূমিতে অনেকদিন এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা করে এসে জানাচ্ছেন যে চলতি মতবাদ অনুযায়ী উটের জল ধরে রাখবার মত কোনও পাত্র নেই শরীরে। গলায়, পেটে কি বুকে কোথাও। কিন্তু উট যে জল বিনা দিনের পর দিন মরুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে সে কথাটা তো মিথ্যা নয়? তাঁরা বলেছেন, একশোর ওপর টেম্পারেচারে উটেরা ভেতরে ভেতরে এত ঘামে যে জলের চাহিদা তাইতেই মিটে যায় এদের।

কার্ত্তিক, ১৩৬৭ (অক্টোবর—নভেম্বর, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকল্পনার জন্য ১৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক যোজনায় ২০ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমি সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনার প্রস্তাব।

২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) : নেফা সীমান্তে তুতিং-এর নিকট ভারতীয় সৈন্যের উপর চীনা ফৌজের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) : আসাম সরকারী ভাষা বিল স্থগিত রাখা সম্ভব নহে—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিকট আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি, পি, চালিহার পত্র।

৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) : বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় মাতৃভাষাকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হইবে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত ভাষা কমিটির রিপোর্ট পেশ।

৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর) : তৃতীয় পরিকল্পনায় (পঞ্চ বার্ষিক) কৃষিখাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন—পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি সংক্রান্ত সদস্যমণ্ডলীর অভিমত।

৬ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর) : শিল্পায়নের উপরই পশ্চিম বঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল—পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক আসানসোলে রাজ্য শিল্প মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে মন্তব্য।

৭ই কার্ত্তিক (২৪শে অক্টোবর) : সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া আসাম বিধান সভায় সরকারী ভাষা বিল গ্রহণ—অসমীয়া ভাষাই রাজ্যের একমাত্র রাজ্যভাষা বলিয়া ঘোষিত।

৮ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর) : দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের ৪৮ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গে অব্যয়িত—রাইটার্স বিল্ডিংস-এ উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে তৃতীয় যোজনার খসড়া আলোচনা।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর) : ভাষা বিলই আসামে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে আসাম রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার স্বীকৃতি।

১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক ভিলাই ইস্পাত কারখানায় রেল ও কাঠামো নির্ম্মাণ মিলের উদ্বোধন।

১১ই কার্ত্তিক (২৮শে অক্টোবর) : ১৯৬১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে লোক গণনা আরম্ভ—পশ্চিম বঙ্গের সেন্সাস সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রী জে, সি, সেনগুপ্তের বিবৃতি।

১২ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর) : ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্ব্বাচিত ... প্রদেশের ভাষা প্রবর্তন দ্বারা কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (মধ্য প্রদেশের রবিশঙ্কর শুক্লনগর অধিবেশন) কর্তৃক গৃহীত।

১৩ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর) : একটানা উদ্বাস্তু আগমন স্রোতে পশ্চিমবঙ্গ নিরুপায়—এপর্য্যন্ত ৫৭ হাজার নর-নারীর (বাঙালী) আসাম ত্যাগ, মাত্র তিন সহস্র ব্যক্তির আসাম প্রত্যাবর্ত্তন।

১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর) : ধর্মঘটে যোগদানকারী সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রতিহিংসার খড়্গ চালনা—নূতন করিয়া ছাঁটাই, সাসপেন্সন ও বদলির নির্দ্দেশ।

১৫ই কার্ত্তিক (১লা নভেম্বর) : ১৪৪ ধারা অমান্য করায় কোলাপুরে ৮ শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার—মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির বিক্ষোভের জের।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর) : সরকারী ভাষা বিল সম্পর্কে আসামে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অসন্তোষ দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পন্থের সহিত বৈঠকান্তে শিলং-এ প্রত্যাবর্ত্তনের পর আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার ভাষণ।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর) : হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকারদানে সরকারের অস্বীকৃতি—মাদুরাই-এর ছাত্রসভায় স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রীসি, রাজাগোপালাচারীর মন্তব্য।

১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন—দিল্লীতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ডাঃ কে, এল শ্রীমালী (কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব) কর্তৃক চার দফা কর্মসূচী বর্ণনা।

১৯শে কার্ত্তিক (৫ই নভেম্বর) : সার্ব্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ—রাজ্য শিক্ষা সচিব সম্মেলনের দুই দিবস ব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ মিন্টো অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর) : ভূপালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন—স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ভারতের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর) : বর্ত্তমান ভাষা বিল বাঙালীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে—আসামের হোজাই-এ নিখিল আসাম বঙ্গভাষী সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দের মন্তব্য।

২২শে কার্ত্তিক (৮ই নভেম্বর) : আসাম ভাষা বিল প্রত্যাহৃত না হইলে কাছাড় বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হইবে—করিমগঞ্জ, শিলচর ও হাইলাকান্দির কংগ্রেসীদের যুক্ত ঘোষণা।

২৩শে কার্ত্তিক (৯ই নভেম্বর) : নেতাজী কন্যা শ্রীমতী অনিতা বসুর ডিসেম্বর মাসে ভারত আগমন ও তিন মাস কলিকাতা সহ বিভিন্ন স্থান সফরের আগ্রহ।

২৪শে কার্ত্তিক (১০ই নভেম্বর) : টোকিও হইতে বিমানযোগে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ারমার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জীর মৃতদেহ স্বদেশে আনয়ন—দমদম বিমানঘাঁটিতে বৃদ্ধামাতার উপস্থিতিতে শোকার্ত্ত।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর) : দিল্লীতে পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় [এয়া]র মার্শাল মুখার্জ্জীর শেষকৃত্য সম্পন্ন।

২৬শে কার্ত্তিক (১০ই নভেম্বর): নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু'র দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক—চীনের [সী]মান্ত নীতি সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনার কথা।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ও বনসচিব শ্রীহেমচন্দ্র নস্করের বলিয়াঘাটাস্থিত (কলিকাতা) বাসভবনে জীবনাবসান।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর): দৈনিক একটি করিয়া গম বোঝাই মার্কিণ জাহাজ ভারতে প্রেরণ—ভারতস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ এলসওয়ার্থ বাঙ্কারের ঘোষণা।

২৮শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর) চীন কর্ত্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁসিয়ারী—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক শ্বেতপত্র (চতুর্থ) পেশ।

২৯শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর): বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন মুলতুবী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলার ক্ষোভ প্রকাশ।

৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর): রাজনৈতিক দলকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য দানের বিরোধিতা—লোকসভায় কোম্পানী আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে বিতর্ককালে বিরোধী সদস্যদের জোরালো মন্তব্য।

বহির্দেশীয়—

১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর): কাটমাণ্ডুতে ভারতীয় টাকা বৈধ মুদ্রা বলিয়া গণ্য নহে—নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের ঘোষণা।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর): আণবিক শক্তি চালিত ও রকেটবাহী সাবমেরিণ সোভিয়েট ইউনিয়নে আছে—মস্কো-এ শ্রমিক সমাবেশে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের উক্তি।

৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর): পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত দ্বীপগুলিতে সংক্রামক রোগ ও মহামারীর আশঙ্কা—ঝঞ্ঝায় মৃতের সংখ্যা পাঁচ সহস্রাধিক বলিয়া অনুমিত।

৭ই কার্ত্তিক (২৪শে অক্টোবর) : তিব্বতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রাশিয়ার সমর্থন দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারস্কজোল্ডের নিকট তিব্বতী ধর্ম্মগুরু দালাই লামার পত্র।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর): কাশ্মীরের প্রশ্ন বিস্ফোরণোন্মুখ 'টাইম বোমার' সামিল, 'প্যাণ্ডোরার বাক্সের মত নহে'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সদম্ভ ঘোষণা।

১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর): নেপালে তিন হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা—পুলিসের গুলীতে ১৩ জন বিদ্রোহী হতাহত।

১২ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর): কিউবার গুয়েণ্টানামো নৌঘাঁটিতে ১৪ শত মার্কিণ নৌ-সৈন্য অবতরণ—কিউবান প্রধান মন্ত্রী ফিদেল কাস্ট্রোর সতর্কবাণী।

১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর) : ঝটিকা-বিধ্বস্ত পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উপকূল বলয়ে আবার প্রচণ্ড ঝড় ও ধ্বংসলীলা—ঝঞ্ঝা ও বানে প্রায় ১২ সহস্র নরনারী নিহত হওয়ার সংবাদ।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর): মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক কক্ষপথে নূতন উপগ্রহ (১০ পাউণ্ড ওজন বিশিষ্ট) স্থাপন—মহাশূন্য হইতে বেতার সংকেত পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা।

১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : চীনের অস্ত্রে আলজিরিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে—আলজিরীয় বিপ্লবী সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফেরহাট আব্বাসের ঘোষণা।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর): বৃটেনে পোলারিস সাবমেরিন ঘাঁটি স্থাপনের ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি—অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রুশ সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভের তীব্র সমালোচনা।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর) : 'সোভিয়েট এলাকা লঙ্ঘিত হইলে চরম প্রত্যাঘাত হানা হইবে'—সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুশ প্রতিরক্ষাসচিব মার্শাল মালিনভস্কির সতর্কবাণী।

২৩শে কার্ত্তিক (৯ই নভেম্বর): টোকিও'র ভোজনালয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জীর আকস্মিক জীবনাবসান।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জন কেনেডি নির্ব্বাচিত—প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাব্লিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সনের পরাজয় বরণ।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর) : পাশাপাশি রাজ্য দক্ষিণ ভিয়েটনাম ও লাওসে সামরিক অভ্যুত্থান—সায়গনে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে তীব্র সংগ্রাম—লাওসের ধর্মীয় রাজধানী লুয়াং প্রবাং বিদ্রোহীদের কবলে।

২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নভেম্বর): দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রেসিডেন্ট দিয়েম বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান বানচাল—৩০ ঘণ্টা পর বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর) : প্রেসিডেন্ট কামাল গুরসেল কর্ত্তৃক অকস্মাৎ তুরস্কের জাতীয় ইউনিয়ন কমিটি পুনর্গঠন—'বিপজ্জনক' অভিযোগে কমিটির ১৪ জন সদস্য বিতাড়িত ও স্বগৃহে অন্তরীণ।

২৯শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর) : 'যুদ্ধ পরিহার ব্যতীত মানব-জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব'—প্যারিসে ইউনেস্কোর (রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান, ও সংস্কৃতি সংস্থা) প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরারম্ভের দাবী—রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক কমিটিতে ১১টি জাতির পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের প্রস্তাব পেশ।

দুই মূর্তি

"আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালিহার দুই মূর্তি ক্রমশ: ভালভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আসাম বিধানসভায় ভাষা বিল আনিবার পর কংগ্রেস হাইকমাণ্ড রায়পুর এ, আই, সি, সি পর্যন্ত কয়েকটি দিন সবুর করিতে বলিলেন। তাঁহাদের চিঠিখানা একবেলা পরে আসিয়াছে এই অজুহাতে তাহা করা হইল না। বিল পাশ হইয়া গেল। চালিহা রায়পুর গিয়া ভোল বদলাইয়া ফেলিলেন। সেখানে অবস্থা অসুবিধাজনক বুঝিয়া বলিয়া দিলেন যে, গোটা বিলটিই তিনি সংশোধন করিয়া সকলকে সুখী করিয়া ছাড়িবেন। রায়পুরে ছিল বাঘের গর্ত। শিলং সহরে ঘরে ফিরিয়াই আবার লাঙ্গুল সম্প্রসারিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন—না, বিল বদলানো যায় না। আসাম ভাষা বিল বদলাইবার মালিক কে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই মিলিবে। বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে পাহাড়িয়ারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, তাহারা আসামীদের চেয়ে অনেক উচ্চে, অনেক বেশী বুদ্ধি এবং সংগঠনশক্তি তাহারা রাখে। ইহাদের সংগঠনশক্তি ঘর জ্বালানো বা নারীধর্ষণে প্রযুক্ত হয় নাই, হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। তাহারা সম্পূর্ণ সভ্যতাসম্মত উপায়ে তাহাদের শক্তি প্রয়োগ করিতেছে।" —দৈনিক বসুমতী।

ভারত Vs নাগা

"কিছুদিন আগে ভারতীয় বিমানবহরের যে নয়জন বৈমানিক বিদ্রোহী নাগাদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পাঁচজন মুক্তিলাভ করিলেও বাকী চারজনের মুক্তিলাভ তো দূরের কথা, তাঁহাদের সন্ধানই মিলিতেছে না। সেদিন লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে দেশরক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ সিং মাজিথিয়া এই তথ্য প্রকাশ করায় অনেক সদস্য স্বভাবতঃই বিস্মিত হইয়াছেন। শ্রীহেম বড়ুয়া সত্যই বলিয়াছেন যে, নাগা অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের চেষ্টা, নাগা জাতীয় সম্মেলনের সহযোগিতা এবং ভারতের দেশরক্ষা-বাহিনীর কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও যে চারিজন ভারতীয় বৈমানিক বন্দীর কোন খোঁজই পাওয়া যাইতেছে না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অধিকন্তু পাঁচজন ভারতীয় বৈমানিককে যে খালাস করিয়া আনা হইয়াছে তাহাও নাকি নাগাদের সঙ্গে "কথাবার্তা" বলিবার (অর্থাৎ তাহাদের গায়ে হাত বুলাইবার) পর সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ভারত গভর্ণমেণ্টের নাগা নীতি বিদ্রোহী নাগাদের কাছে তাঁহাদের সম্মান ও সম্ভ্রম খুব বেশী বাড়াইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। তার আরও একটি প্রমাণ এই যে, নাগারা নাকি ভারতীয় বন্দীদের জন্য মুক্তি মূল্য চাহিয়াছে।"

—যুগান্তর।

তাড়াহুড়ার ফল

"যেমন অন্যান্য ব্যাপারে তেমনি উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেই পরিকল্পনার সহিত মূল সংকল্পের, উদ্যোগের সঙ্গে আধুনিক কালোপযোগী শিক্ষানীতির সামঞ্জস্য প্রায়ই থাকিতেছে না। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে; বৎসরে বৎসরে আরও বাড়িবে। কলেজে স্থানসঙ্কুলান হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম। প্রতিকার হিসাবে শিক্ষানীতি-বিধায়কগণ ঠিক করিলেন, এক দিকে অযোগ্য ছাত্রদের ভিড় কমাইতে হইবে, অন্য দিকে কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এক দিকে ছাত্রের ভিড় কমাইতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সংকোচন, অন্য দিকে কলেজগুলিতে ভিড় কমাইবার জন্য নূতন নূতন কলেজ স্থাপন। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস শুরু হইয়াছে এই ভাবে; ফলাফল বিচারের সময় এখনও আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্পর্কে শিক্ষানীতি-বিধায়কগণ যতদূর মনে হয় সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রধানত চলতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতিবিধানের দিকেই নজর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গোল বাধিয়াছে এইখানেই। দেশের উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের কর্তা এক-আধজন নহেন; দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং চৌহদ্দি নানা ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরি-কমিশন, অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা-দপ্তর, প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক সংস্থা এবং সবগুলির মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা মোটেই প্রশস্ত এবং সরল নয়। ফলে উচ্চশিক্ষার নীতিনির্ধারণে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে নিত্য নূতন গরমিল।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

গণতন্ত্র ও টাকার থলি

"ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে শাসক পার্টি, শাসকশ্রেণী ও কংগ্রেসী সরকার বারম্বার এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, এই পার্টি বিদেশের টাকায় চালিত হইয়া থাকে। কখনও তাঁহারা বলেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে পার্টির তহবিলে টাকা আসিতেছে, কখনও বলেন, চীন হইতে, কখনও বা অন্য কোন স্থান হইতে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মত আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মুখেও এই ধরণের কথা প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ নির্বাচন যতই আগাইয়া আসিবে ততই এই সব কথা তাঁহারা আরও জোরের সহিত বলিতে থাকিবেন, ইহাও আমরা জানি। কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, গত বুধবার লোকসভায় সরকারপক্ষ হইতে কোম্পানি (সংশোধন) বিল নামে যে বিলটি আনা হইয়াছে, তাহাতে দেশী ও বিদেশী বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যাহাতে শাসক পার্টির তহবিলে মুক্তহস্তে এবং প্রকাশ্যেই টাকা ঢালিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সকলেই জানে, স্বাধীনতা পরবর্তী বার বৎসরে স্বাধীন ভারতে বৃটিশ লগ্নীপুঁজির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এই বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ এবং ইহার সঙ্গে হাত মিলাইয়া টাটা-বিড়লা জাতীয় দেশী রাঘববোয়ালেরা যাহাতে শাসক পার্টিকে চাঁদির জুতা মারিয়া শোষণের রাস্তা সুগম রাখিতে পারে, উপরোক্ত ব্যবস্থার অর্থ যে তাহাই সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।" —স্বাধীনতা।

মন্থরগতি যান

"কলিকাতা সহর হইতে রিক্সা এবং ঠেলা প্রভৃতি মন্থরগতি গাড়ী সরাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হইতেছে।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ পশুর কাজ করিবে, ইহা ঘোর লজ্জাজনক। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মহিষকে রোদে বাহির করিলে পশুক্লেশ নিবারণী পুলিশ উহার চালককে ধরে এবং মহিষটিকে ছায়ায় নিয়া যায়, কিন্তু মানুষ ঠেলাগাড়ী ঠেলিয়া যখন মহিষের কাজ অথবা রিক্সা টানিয়া বলদের কাজ ঐ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে করিতে থাকে তখন তাহাতে বাধা দিতে কেহ আসে না। পুলিশের ডি, আই, জি, ট্রাফিক এ বিষয়ে মন দিয়া উচিত কাজ করিয়াছেন। এবার এক নূতন বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। মেয়র কেশব বসু বলিয়াছেন—মানুষকে পশুর কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে কর্পোরেশনকে বার্ষিক ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা সেলামী দিতে হইবে। ছোট লালবাড়ীর সৌরভ ধাপার মাঠকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে কিন্তু কেশব বসুর এই দাবী তার উপরেও টেক্কা দিয়াছে। যে চীন রিক্সাগাড়ীর প্রবর্তক সেখানে এখন মানুষে রিক্সা টানে না। মানুষ-ঠেলা মালগাড়ী দুনিয়ার কোন দেশে চলে না। সভ্যতার কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে হইলেও কর্পোরেশনকে খেসারৎ দিতে হইবে ?"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

হাসপাতাল সপ্তাহ

"আজ ১৪ই নভেম্বর হাসপাতাল সৌজন্য সপ্তাহ আরম্ভ। জীবজগতে ব্যাধি প্রাকৃতিক, ব্যাধির প্রতিরোধ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানব-সভ্যতা আজিকার যে বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বিগত শতাব্দীর দিকে কেন, চলতি শতাব্দীর প্রথমের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই আলোচনা দীর্ঘ, কাজেই আমরা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা-জগতের আলোচনায় আসিতেছি। যেহেতু ব্যাধি প্রাকৃতিক, কাজেই ব্যাধির আক্রমণ মানুষ বুঝিয়া সুন্দর বা কুৎসিত, ধনী অথবা দরিদ্র দেখিয়া হয় না। এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিযান বা দান মানুষ বুঝিয়া সৃষ্টি ও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তবুও আজিকার পৃথিবী গরীব দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা সমস্যার কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে গরীব মানুষের চিকিৎসার সমস্যার বিরাট প্রশ্ন জাতির সম্মুখে রহিয়াছে। আজিকার পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি যখন গরীব মানুষের চিকিৎসার পর অর্থাৎ রোগমুক্তির পরে পুনরায় সবল জীবন লাভের বিষয় চিন্তা করিতেছেন অনুন্নত ভারতবর্ষ তখন গরীব মানুষের সামান্য চিকিৎসার কথা চিন্তা করিতেছেন। তবুও এই দেশের গরীব মানুষের রোগাক্রমণের একমাত্র আশ্রয়স্থান যেটুকু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সেই হাসপাতাল সমূহের সৌজন্য সপ্তাহ বলিতে কি বোঝায় তাহা আমরা সঠিক কিছু জানি না।"

—বারাসাত বার্তা

লোক গণনা

"আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ মধ্যে সেন্সাস অথবা লোক গণনা কার্য্য সম্পন্ন হইতে যাইতেছে। যদিও সেন্সাসকে 'লোক গণনা' বলা হয় বটে কিন্তু ইহা শুধু লোক গণনাই নয়, এই লোক গণনার মাধ্যমেই ভারতবর্ষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র সংগৃহীত হইবে। এই সমস্ত সংগৃহীত

তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতরাষ্ট্র যে প্রধান কাজ হাতে লইয়াছে তাহা হইতেছে কোটি কোটি অবহেলিত মানুষের উন্নয়ন কার্য্য। কাজে কাজেই সেন্সাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য এবং নির্ভুল সেন্সাস প্রস্তুত করার মধ্যেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ভর করে। বস্তুতঃ ত্রিপুরায় নির্ভুল তথ্যের যথেষ্ট অভাব প্রতি ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়। কারণ, এখানে কোন কালেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই। তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনা ত্রিপুরা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এইগুলির একটিও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। অতএব আগামী সেন্সাসের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা গড়িয়া তোলার অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জনসাধারণ এবং সেন্সাস কার্য্যে নিয়োজিত কর্ম্মিগণের সহযোগিতায় একটি নির্ভুল সেন্সাস প্রস্তুত হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, ত্রিপুরার জনসাধারণ এই মহৎ কার্য্যে তাহাদের সমস্ত প্রকারে সহযোগিতা করিয়া ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা গঠনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। সেন্সাসের মত জরুরী কাজ অবশ্যই রাজনীতি ও দলাদলির উর্দ্ধে।"

—গণরাজ (আগরতলা)

ভারতের স্বাধীনতা

১৯৫৮ সালের কুখ্যাত নেহেরু-নূন চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু পাকিস্তানকে বেরুবাড়ী উৎকোচ দিবার ক্ষমতা লাভের জন্য পার্লামেণ্টে আগামী অধিবেশনেই সংবিধানের নবম সংশোধন বিল আনয়ন করিতেছেন। যাঁহারা নেহেরুর তোষণনীতির সহিত সম্যক পরিচিত তাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। এই তোষণনীতির ফলেই নেহেরু সরকার পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই তোষণনীতির দ্বারাই নেহেরু সরকার ভারতের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিবেন। বাংলার উপর বর্ত্তমান ভারত সরকার সন্তুষ্ট নহে, তাহার কারণ দৃঢ়কণ্ঠে বাংলা প্রতিটি অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করে। তাই এই বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বাংলার বিধানসভা তথা বাংলার জনগণের সর্ব্বসম্মত প্রতিবাদ এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্ত্তৃক ইহাকে সংবিধান-বিরোধী বলিয়া রায় দেওয়া সত্ত্বেও বেরুবাড়ী হস্তান্তরকে বৈধ করার আগ্রহ বাংলাকে অধিকতর দুর্ব্বল ও সমস্যা-জর্জ্জরিত করার মনোভাবেরই পরিচয়। নচেৎ যে পাকিস্তান চুক্তির অজুহাতে একটির পর একটি দাবী আদায় করিয়াই তাহা ভঙ্গ করিতেছে তাহার সহিত চুক্তির সার্থকতা কোথায়? অবশ্য ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইতেছে। পাকিস্তান হুঙ্কার ছাড়িলেই এক এক টুকরা মাংসের মত বাংলার এক এক খণ্ড ভূমি তাহার দিকে আগাইয়া দিলেই সাময়িকভাবে পাকিস্তানকে তুষ্ট করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকে সায়েস্তা করা হইতেছে।"

—বর্ত্তমান ভারত (হুগলী)।

লেখাপড়ার দফা রফা

"আজ-কাল ইস্কুল-কলেজে রাজনৈতিক নেতারা নিজ নিজ দলের ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্য আড়কাঠি খুলিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল ছাত্ররা পড়াশুনা না করিয়া যদি নেতাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে সাহায্য করে তবে তাহারা অধিক প্রশংসা পাইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, প্রশংসা পাইতে কার না ইচ্ছা হয়। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা করিয়া পড়াশুনা করিয়া উত্তম ছাত্র হিসাবে প্রশংসা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু দল পাকাইয়া দলের পোষ্টার লিখিয়া বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা বা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্মান করিয়া যত সহজে দলীয় নেতাদের প্রশংসা লাভ করা যায় তত সহজে উপরোক্ত কর্ম্মে অর্থাৎ পড়াশুনা করিয়া নাম করা যায় না। আজ-কাল বিদ্যালয়গুলিতে কোন ছাত্র উত্তম পড়াশুনা করে তাহা জানিবার উপায় নাই কিন্তু কোন ছাত্র ইউনিয়নের পাণ্ডা বা কোন ছাত্র ঐ ধরণের কাজের করিৎকর্ম্মা যুবক, তাহা অনায়াসে বলিয়া দেওয়া যায়।" —জি টি রোড।

সরকারী দপ্তর ও মুসলিম কর্ম্মী

"সম্প্রতি স্থানীয় 'আর্য্য' পত্রিকায় স্বাধীনতার পর আজ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের পুলিশ দপ্তরে মুসলিম কর্ম্মী এবং কালেক্টরীতেও মুসলিম কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাছাড়া কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যাধিক্যও হওয়ার কারণ অজ্ঞাত।'—এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক যুগ পরেও এই ধরণের সংবাদ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চরম বিরোধী কি না তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। সকলেই অবগত আছেন যে, উপরোক্ত বিভাগসমূহে চাকুরী গ্রহণের সময় কিরূপ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। ১৯৫২—৫৪ সালের তুলনায় মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ডবল হইয়াছে এই সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং সেই জন্যই সংবাদদাতাকে 'নাকি' শব্দের প্রভূত সদ্ব্যবহার করিতে হইয়াছে। যাহারা এইরূপ ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করে তাহারা কী ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক?"

—নিশান (বর্দ্ধমান)।

আদিবাসী কল্যাণ

"ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার অর্থাৎ আদিবাসী কল্যাণ। সরকারী নাম, ঐ নামের সরকারী দপ্তর রয়েছে, মন্ত্রী রয়েছেন। আদিবাসী পার্লামেন্টের সদস্য, বিধান সভার সদস্য আছেন। আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের হাকিম রয়েছেন মহকুমায় আমাদের জেলায়। প্রচার আধিকারিক রয়েছেন, সেটেলমেন্টের মোকর্দমা বিনামূল্যে দেখাশোনার জন্য কানুনগো রয়েছেন, তাছাড়া বিশেষ সুযোগ আছে—শিক্ষার জন্য, চাকুরীর জন্য, রাস্তার জন্য, পানীয় জলের জন্য ইত্যাদি। কেবল তাই নয়, সুযোগ সুবিধা আজ আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। দপ্তর, হাকিম, এম, পি, এম, এল, এ, মন্ত্রী, বরাদ্দ টাকা। সুযোগ সুবিধা সবই আরও কিছুদিন থাকবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কল্যাণটা কার জন্য। সেটা যদি জনকয়েক এম-পি, এম-এল,-এ, আর অফিসারের জন্য হয়, তবে কল্যাণ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সেই কল্যাণ স্পুটনিকের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার বাইরে যে বিরাট জনগণ সেখানে যেই তিমির সেই তিমিরই রয়েছে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

কাঁথির লবণশিল্প

"লবণশিল্প এ দেশের একটি প্রধান আবশ্যকীয় শিল্প। কাঁথির সমুদ্রতীরে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া লবণ প্রস্তুত হইতে পারে এবং সহজ উপায়ে ও অল্প ব্যয়ে উহা পাওয়া যায়। স্বাধীনোত্তর কালে এই শিল্পটির উন্নয়ন বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি পড়িয়াছে সত্য এবং এজন্ত লবণ প্রস্তুত বিষয়ে অনেকবার সরকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে ইহার প্রসার লাভ ঘটে নাই। ফলে সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী বিস্তৃত স্থান অনাদৃত ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে সারা বৎসরে অনুমান ৩৫।৪০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। একমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই প্রয়োজন হয় ১২ লক্ষ মণ লবণ। কাঁথি এবং সুন্দরবনের কয়েকটি কারখানায় মাত্র ৩ হইতে ৩।০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। সরকারী হিসাব মত জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ৩৬।০ লক্ষ মণ ও মেদিনীপুর জেলাতে ৯ লক্ষ মণ লবণের ঘাটতি রহিয়াছে। কাঁথির সমুদ্রতীরে বেঙ্গল সল্ট কোং এবং পশ্চিমবঙ্গ সল্ট কোং প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রস্তুত লবণ এ দেশের চারিদিকেই রপ্তানী হইতেছে। এছাড়া অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও লবণ প্রস্তুত কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন ইহা খুবই শুভ কথা। দেশের অভাব মোচনে সমুদ্রতীরে সহজলভ্য লবণ উৎপাদন দ্বারা অর্থাগমের পথ প্রশস্ত এবং এক শ্রেণীর বেকার যুবকগণের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা যে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ও আনুকুল্যের অভাবে নামে মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে।" —নীহার (কাঁথি)।

লভ্যাংশের ট্যাক্স

"এবার স্থানীয় বহু চা কোম্পানী পূজার পূর্ব্বেই লভ্যাংশ ঘোষণা করেন। কিন্তু অংশীদারগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা তাঁহাদের করতলগত হইতে পারে নাই। টাকায় ৩০ নয়া পয়সা করিয়া কাটিয়া লভ্যাংশ গ্রহণ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলে খুব বেশীর ভাগ অংশীদারই সেই মুক্তিপত্র গ্রহণে সক্ষম হন নাই। প্রথমতঃ তাহাদের অফিসে অফিসে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় অংশ সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তারপর যথাযথ ভাবে ফরম পূর্ণ করতঃ অফিসে দেওয়া তারপর সরকারের মুক্তিপত্রদান বিষয়ক নির্দ্দেশ। যিনি যখন ফরম নিয়া যান, অফিসে গিয়া শুনিতে পান মাত্র একজন অফিসার, তাই যথেষ্ট বিলম্ব হইবে। আমাদের নিকট সংবাদ সেভাবেই পৌঁছায়। তারপর শুনা গেল যে ফরমে সরকার সার্টিফিকেট তথা মুক্তিপত্র দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন সে ফরমই ফুরাইয়া গিয়াছে। ব্যস্, অতি সম্প্রতি আবার ফরম আসিয়াছে, কিন্তু অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তারপর সেই একখানা মুক্তিপত্রের নকল গেজেটেড অফিসার দ্বারা এ্যাটেষ্ট করাইয়া অফিসে অফিসে দিলে তবে লভ্যাংশ। কোম্পানী আইন অনুসারে লভ্যাংশ ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে কোম্পানীকে লভ্যাংশ দিয়া দিতে হইবে। তার অর্থ অংশীদারকে অকারণ আবার মণিঅর্ডার খরচও বহন করিতে হইবে। কিন্তু এত মনিঅর্ডার নেওয়ার মত ডাকঘরেও বিশেষ ব্যবস্থা নাই। এটা কোম্পানীগুলোর সঙ্কট। আমরা ইণ্ডিয়ান টী প্ল্যাণ্টাস এ্যাসোসিয়েসনকে অনুরোধ করি, তাঁহারা উপরোক্ত বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা

করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বিষয়গুলো অতীব গুরুতর।"

—ত্রিস্রোতা জলপাইগুড়ি

শোক-সংবাদ

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, প্রধান শিক্ষাব্রতী, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১শে কার্তিক ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এস, সি উপাধি অর্জন করেন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুদীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মিণ্টো অধ্যাপক, সেনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অফ আর্টসের সভাপতি এবং আর্ট ফ্যাকাল্টির সভাপতিরূপে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের শিক্ষাজগতের সেবা করে সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী হন। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তক উক্ত বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় লাহোরে ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান-কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ১৯২১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ন্যাশানালিষ্ট পার্টির নেতা হিসেবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভার এবং অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। প্রমথনাথ ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের সহসভাপতির, বঙ্গীয় অর্থনীতি সমিতির সভাপতির, ভারতসভার অন্যতম সভাপতির, ফেডারেশান হলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। প্রমথনাথের মৃত্যুতে বাঙলাদেশ একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ এবং নেতাকে হারাল।

মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈমানিক বাঙলার তথা ভারতের গৌরব এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় গত ২২এ কার্তিক মাত্র ৫০ বছর বয়সে টোকিওতে ভোজনকালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে লোকান্তরিত হয়েছেন। মার্শাল মুখোপাধ্যায়ের এই আকস্মিক এবং অকালমৃত্যু যেমনই বেদনাদায়ক তেমনই করুণ। এই অকালমৃত্যু কেবলমাত্র তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতার বা শোকাহত পরিবারবর্গেরই নয়—সারা দেশের এক বিরাট ক্ষতি। ১৯২১ সালে ডাক্তারি পড়ার অভিপ্রায়ে ইনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে শিক্ষার্থিরূপে থাকাকালীন শুনতে পান যে ভারতীয়গণকেও বিমানবাহিনীতে নেওয়া হবে, এই নবতর কর্মপথ তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং এই পথেই তিনি পদক্ষেপ শুরু করেন। আপন অসাধারণ প্রতিভায় কর্মজীবনে তিনি যথেষ্ট সুনাম এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেন এবং ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করতে থাকেন। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদে রাজাকর আন্দোলনের সময় ইনি ভারতীয় বিমানবাহিনী পরিচালনা করেন। ১৯৫৪ সালে ইনি ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ভারতীয় বিমানবিভাগের সংস্কার সাধন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠনের কাজে সুব্রত মুখোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আজকে দেশের এই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর সামরিক নেতৃত্ব দেশকে নানাভাবে উপকৃত করতে পারত কিন্তু সে আশা নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল। তাঁর অধিনায়কত্বে সামরিক বিভাগ নানাভাবে উন্নতিসাধন করেছিল। ভারতের দরবারে বাঙলার মুখ তিনি উজ্জ্বল করে গেলেন। ভারতরাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্ণধার এই সুদক্ষ রণবীর ছিলেন আজকের দিনের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত বাঙালীর এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই গৌরবময় জীবনের অকাল অবসানে সারা দেশ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

হেমচন্দ্র নস্কর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন ও মৎস্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপাল হেমচন্দ্র নস্কর গত ২৬শে কার্তিক ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯২৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহচর্যে ইনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত ইনি মহানগরীর পৌরসভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে মহানগরীর পৌরপালরূপে নির্বাচিত হন। ইনি কয়েকবার বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্যও নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৪ সালে সাপ্রু কমিটির সদস্যরূপেও কাজ করেন। প্রোগ্রেসিভ অ্যাসেম্বলি পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সিডিউল্ড কাষ্ট পার্টির ইনি নেতা ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালের নিখিল ভারত হরিজন লীগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ সালে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভায় ইনি বন ও মৎস্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় থেকে আমৃত্যু তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

কলকাতার প্রধান ধর্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, প্রবীণ সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক মহাশয় গত ৬ই কার্তিক ৮৮ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ছাত্রজীবনে ইনি গণিতে কেম্ব্রিজের ট্রাইপসলাভ করেন এবং আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯৭ সালে ইনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলকাতার প্রধান ধর্মাধিকরণের স্থায়ী বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন।

সরযূবালা ঘোষ

সরযূবালা ঘোষ মহাশয়া গত ২০এ কার্তিক ৬৭ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। ইনি বরিশালের বিখ্যাত সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী এবং সাংবাদিক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহধর্মিণী ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এঁর পুত্র,

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,
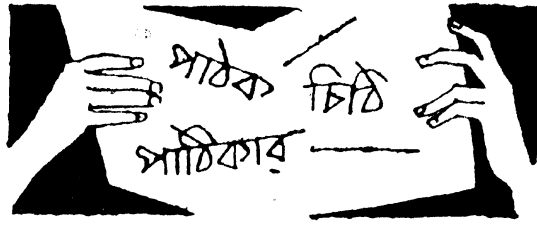
আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই! আমি জনৈক পুরানো সাংবাদিক এবং দেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির সহিত সংশ্লিষ্ট রয়েছি। কিছুকাল পূর্বে বন্ধুবর শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত গিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। অবশ্য আপনার তাহা স্মরণ থাকার কোনো হেতু নাই। কলকাতার অনেক প্রধান সাংবাদিকেরা ও সাহিত্যিকেরা, বিশেষতঃ 'বসুমতী'র সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমাকে জানেন।

এই সঙ্গে মাসিক বসুমতী মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ও ফাল্গুন সংখ্যায় শুদ্ধিকৃত পত্র সম্পর্কেও শ্রীঅনন্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ "সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" সম্পর্কে দু'একটি তথ্যগত ভুল সংশোধন করে একটা ছোট লেখা পাঠালাম। যদি যোগ্য মনে করেন, আগামী সংখ্যা মাসিকে যথাযোগ্য স্থানে প্রকাশ করলে সুখী হব। বিপ্লবী বীর সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে সংঘটিত ঐতিহ্যমণ্ডিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও চট্টগ্রামের বহুসংখ্যক বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু গুরুত্ব আছে। এসব ঘটনার ভুল প্রমাদ যেন সাধারণে প্রচারিত না হয়, এ উদ্দেশ্যেই আপনাকে সঠিক জ্ঞাতব্য বিষয় জানালাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিপ্লবী ঘটানাবলীও স্পেশ্যাল সকল বিচারগুলির তখন (১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ ইং পর্যন্ত) চট্টগ্রামে আমি একমাত্র "সংবাদদাতা" ছিলেন। তখন আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'এসোসিয়েটেড প্রেস', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ইউনাইটেড প্রেস' প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ দৈনিক ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেইহেতু, সকল ঘটনাবলীর বিবরণীর সহিত আমার যোগাযোগ ছিল। এখনো এসকল ঐতিহাসিক ব্যাপারের অনেক কিছু অপ্রকাশিত রয়েছে। তখনকার চার-পাঁচটি চাঞ্চল্যকর বিপ্লবী মামলার আভ্যন্তরীণ বহু ঘটনার তথ্যাদি একমাত্র আমারই জানা আছে। আমি তাহার বিবরণী লিখে যাচ্ছি! চট্টগ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকে আমি গত কয়েক বৎসর থেকে এখানে পত্রিকা অফিসের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ প্রতিনিধিরূপে আছি!

"পত্রিকা"-"যুগান্তরে"র বার্তাসম্পাদকগণ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, শ্রীযতীন মুখার্জি, প্রমুখ প্রবীণ সাংবাদিকেরা আমাকে ভালই জানেন। শ্রী বিশ্বাস ও মুখার্জি কিছুদিন Armovry Raid Case রিপোর্টিং এ চট্টগ্রামে ছিলেন। শ্রীমোহিত মৈত্রও আমার খুব পরিচিত।

পুনরায় ধন্যবাদ ও নমস্কারান্তে ইতি—শচীন্দ্রনাথ দত্ত।

সবিনয় নিবেদন, দীর্ঘকাল মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পাঠিকা হিসেবে আমার যোগাযোগ। প্রথম যে কবে মাসিক বসুমতীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় সে হিসেব হারিয়ে গেছে—তবে এইটুকু বলতে পারি যে সে অনেককালের কথা কিন্তু এতকালের মধ্যে মাসিক বসুমতীর এমন একটি সংখ্যা নেই—যা আমার অপঠিত। মাসিক বসুমতীর আজকের এই ব্যাপক জয়যাত্রায় ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার যে কতখানি যোগ রয়েছে তা শুধু আমার কেন কারোরই জানতে বাকী নেই, ইতিহাস একদিন সাক্ষ্য দেবে যে আপনার নিরলস প্রচেষ্টা, উদার মনোভাব এবং অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী মাসিক বসুমতীকে একদা ভারতের সাময়িক পত্র কুলের সম্রাটের আসনে অভিষিক্ত করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সকলেরই চিরদিন মনে থাকবে যে সংখ্যাতীত অখ্যাত নামহীন প্রতিষ্ঠাহীন নবীন সাহিত্যসেবীকে পাঠক দরবারে পরিচিত করার প্রথম গৌরব আপনারই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে মাসিক বসুমতীর বিভাগগুলি, সকল বিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তিরাই আপন আপন বিষয়গুলিকে দেখতে পাবেন মাসিক বসুমতীর পাতায়। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত "বর্ণালী" উপন্যাসটির সম্বন্ধে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে এ সমালোচনা নয়—জিজ্ঞাসা মাত্র কিছুকাল আগে দেখলুম "বর্ণালী" উপন্যাসটিকে "আগামী সংখ্যায় সমাপ্য" বলে ঘোষণা করা হয়েছে—তারপর বোধ হয় দু'তিনমাস হয়ে গেল "বর্ণালী"তো যথারীতিই বেরোচ্ছে—তা হল "আগামী সংখ্যায় সমাপ্য" ঘোষণাটির অর্থ কি?

গত দু' তিন সংখ্যা ধরে লক্ষ্য করে আসছি যে মাসিক বসুমতীতে ছোট গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আসছে, ছোট গল্প আমরা পড়তে চাই, ছোট গল্প আমরা আশা করে থাকি, ছোট গল্প সত্যিই আমাদের বিশেষ করে ভালো লাগে, সুতরাং ছোট গল্পের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভালো লাগবে। শিকার এবং রোমাঞ্চ কাহিনীও অনেকদিন দেখতে পাই নি, মাঝে মাঝে ঐ সম্বন্ধীয় কাহিনী কিছু কিছু প্রকাশ করতে অনুরোধ করি। ঐ সম্বন্ধীয় রচনাগুলির গুণ অনেক, ওগুলি পড়তেও ভালো লাগে, ঐ কাহিনীগুলিতে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যও থাকে, আবার বেশ একটা শিহরণের স্পর্শও থাকে রচনাগুলির মধ্যে (অবশ্য এটা লেখকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।) আপনার এবং মাসিক বসুমতীর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আপনাকে নমস্কার নিবেদন করি।
—শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

আমার কথা—নাচ-গান-বাজনা

প্রিয় প্রাণতোষ, বিশেষ দরকারে চিঠি লিখতে বাধ্য হোলাম। গত সংখ্যার বসুমতীতে "আমার কথা" বিভাগে আমার সম্বন্ধে যে সব

লেখা হোয়েছে, তা এত ভুলভাবে ছাপানো হয়েছে, যাতে করে বহু পাঠকের কৈফিয়তের সম্মুখীন হোতে হচ্ছে। অতএব এ বিষয় ভুলগুলি যদি সংশোধন করে দেন তাহলে আমি বিশেষ উপকৃত হব। এ ছাড়া আমার মনে হয় final pressingএর আগে বোধ হয় যদি একবার আমাকে দেখিয়ে নিতেন তাহলে এ গোলমাল হোত না। ভুলগুলি হচ্ছে··যথাক্রমে—

১। 'এই জানালার কাছে বসে আছে' এটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, এটা আমার সুর দেওয়া নয়।

২। আমি বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি সুশান্ত লাহিড়ীর কাছে, সুশান্ত রায় নয়। ইত্যাদি :—আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

কন্‌ট্রাকট ব্রীজ

গত দুমাস যাবৎ ধারাবাহিকভাবে কন্‌ট্রাকট ব্রীজ সম্বন্ধে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত যে সুললিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার জন্ত আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বুদ্ধক্রীড়ার মধ্যে তাসখেলা অন্যতম এবং তাসখেলার মধ্যে কন্‌ট্রাকট ব্রীজ সেরা খেলা। তাই আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকাতে বিশেষ পরিচিত ধীরেন বাবুর লেখা দেখে যে শুধু আনন্দিত হলাম তাই নয়—বরং, এই বিশিষ্ট খেলাটার যে সময়োচিত প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে তুলে ধরেছেন এর জন্ত আপনাদের দুজনকেই প্রীতি জানালাম। নমস্কারান্তে শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায় ১৩এ, অভয় সরকার লেন, কলিকাতা—২০

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আগুই, হুগলী হইতে শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা বসু কর্ত্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত গ্রাহকের জন্য—

Mrs. Nandita Bhatnagar, B. Sc.
C/o Dr. S. P. Bhatnagar, M. Sc.
Dept. of Physiology
Mcgil University
Montreal-2
CANADA.

Please send Masik Basumati from Kartick for six months—Mrs. Namita Choudhuri, G. P. O. Box-191, Bangkok, Thailand.

ছয় মাসের জন্ত মাসিক বসুমতীর চাঁদা অগ্রিম পাঠাইলাম।—Dr. S. Das, Hingurakgoda, Ceylon.

Subscription for monthly Basumati is sent herewith. Please enlist me as a subscriber of the Journal.—Mrs. Amiya Banerjee, Uganda Sugar Factory Ltd. Post Box No. 1, Lugazi Uganda, B. E. Africa.

ষাণ্মাসিক চাঁদা কার্ত্তিক—চৈত্র ১৩৬৭ ;—শ্রীমতী চিন্ময়ী গুহ, শিমুলতলা।

Please renew my membership for another six months from Kartik for which I am remitting Rs. 7·50—Mrs. Amita Sanyal, Jalpaiguri.

আগামী কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ১৩৬৭ পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর জন্ত ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠালাম।—বান্ধব লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান।

মাসিক বসুমতীর জন্ত ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।—রাখশ্রী ব্যানার্জী, নিউ দিল্লী।

ছয় মাসের চাঁদা কার্ত্তিক—চৈত্র ১৩৬৭ পাঠাইলাম।—জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর।

Please receive Rs. 7·50 as subscription for half year for the monthly Basumati.—Mrs. Hasi Guha, Bombay.

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের মূল্য বাবদ ৭৷৷০ পাঠাইলাম। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া সুখী করিবেন। এই পত্রিকার বিষয়বস্তু সত্যই যুগোপযুক্ত এবং আনন্দদায়ক।—শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জী, খানবাদ।

Sending herewith Rs. 7·50 nP. for six months is from Kartick onwords.—Mrs. Probhabati Mookherjee, Agra.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য ৭'৫০ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ, রাণীগঞ্জ।

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম।—Sm. Uma Rani Dey, Cuttack.

I am sending herewith Rs. 7·50 nP. as half yearly subscription from the month of Kartick.—Sm. Manika Dey, Bombay.

Sending Rs. 15/- for the year 1367 B.S. for a new member of Masik Basumati from Aswin.—Saila Bala Aich, Kamrup, Assam.

Sending a sum of Rs. 24/- only being yearly subscription of Basumati.—Namsai Club, (Nefa).

কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ আরও ৭৷৷০ টাকা পাঠাইলাম।—মীনাক্ষী চৌধুরী, Sindri.

আমি পুনরায় ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিতা করিবেন।—শ্রীমতী ভক্তিলতা বিশ্বাস, ২৪ পরগণা।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম।—রেবারাণী সমাদ্দার, জলপাইগুড়ি।

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক হইয়া '৬৭ সালের কার্ত্তিক—চৈত্র চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী কানন দেবী, নদীয়া।

ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ছয় মাসের গ্রাহক মূল্য ৭'৫০ পাঠাইলাম।—Rajganj Mahendra Nath High School, Jalpaiguri.

ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম। বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক বসুমতীর গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—M. Ferdaosuddin, Midnapore.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা অগ্রিম ৭'৫০ পাঠালাম পূর্ব্ববৎ পত্রিকা পাঠাবেন। মাসিক বসুমতীর·কাগজগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল এবং মুদ্রণও পরিচ্ছন্ন বোধ হচ্ছে, সেজন্ত ধন্যবাদ। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।—শ্রীমতী অণিমা শেঠ, ডিব্রুগড়।

রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য

—রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খোদিত

(কাঠ-খোদাই)

[চিত্রাধিকারী—প্রাণতোষ ঘটক]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৯শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

মা জপের আসনে বসে আছেন। আরতি হয়ে গেছে। রাধুর স্বামীর জন্য মাংস রেঁধে এনেছিলুম, রাধুকে ডেকে তেতলায় তার ঘরে রেখে আসতে বললেন। আমি রেখে এসে প্রণাম করে বসলুম। মা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। একটি আত্মীয়া মেয়ে এসে মাকে বলছেন, "তুমি আমার মনটি ভাল করে দাও, আমার মনে বড় অশান্তি, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই, যা আছে তোমাকে লিখে পড়ে দিয়ে যাব। আমি মরবার পরে তুমি সেই মত কাজ কোরো।"

মা হেসে বললেন, "তা কবে মরবি গো।" শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা হলে, আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও, এ সব জায়গায় যেন একটা বিপদ করে বসো না। এমন জায়গায় থেকে, আর আমার কাছে যে—(এই পর্য্যন্ত বলেই সামলে নিয়ে বললেন) এই সব সাধু-ভক্ত, ঠাকুর, এমন স্থানে থেকেও যদি তোর মনের অশান্তি না ঘোচে, তবে তুই কি চাস বল্ দেখি? * * * কি জীবন তুই পেয়েছিস বল্ দেখি? কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। এ জন্মটা যে কিনে নিয়ে যেতে পারতিস। এ স্থান যখন চিনলি নি—চিনবি একদিন যখন অভাব হবে, তবে এখন বুঝলি নি। তোর পাপ মন, তাই শান্তি পাস নে। কাজ কর্ম্ম না করে বসে থেকে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। একটা ভাল চিন্তা কি তোর কিছু করতে নেই? কি অশুদ্ধ মন গো,"—বলেই আবার হেসে উঠে আমার পানে তাকিয়ে বলছেন, "কি ঠাকুরের লীলা মা দেখছ! মায়ের বংশটি আমার কেমন দিয়েছেন! কি কুসংসর্গই করছি দেখ। একটি ত পাগল-ই, আর এইটিও পাগল হবার গতিক হয়েছে। আর ঐ দেখ আর একটি, কাকেই বা মানুষ করেছিলুম মা. একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে. কখন স্বামী ফিরবে। মনে ভয়, ঐ যে গান বাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐখানেই ঢুকে পড়ে। দিন রাত সামলে নিয়ে আছে,

কি আসক্তি মা! ওর যে এত আসক্তি হবে তা জানতুম না।” আত্মীয়াটি বিষণ্নমুখে উঠে গিয়ে শুলেন।

মা—“কত সৌভাগ্যে মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজ কর্ম্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলবো মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁশ থাকতো না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে * বসে জপ করছি, চারদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সে দিন কখন ঝাউ তলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্য রকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে সাড়ি। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে-যোগেন সে দিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সে সব কি দিনই গিয়েছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, ‘তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও। জপ ধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে। আহা! তখন কি মনই ছিল আমার। বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁশি গড়িয়ে দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল (মা নবতে ধ্যানস্থ ছিলেন, তাই শব্দটা যেন বজ্রের মত লেগেছিল—কেঁদে ফেলেছিলেন)। সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে, বাগ্‌দি, ডোমের মাঝেও তিনি—তবে ত মনে দীনভাব আসবে। ওর (পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ার) কথা কি বলবো মা, জয়রামবাটীতে ডোমেরা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে, ঘরে দিতে এসেছে। আমি বললুম, ‘ঐখানকে রাখ,’ তা তারা কত সাবধান হয়ে রেখে গেল। ও বলে কি-না ‘ঐ ছোঁয়া গেল, ও সব ফেলে দাও’—এই বলে তাদের গালাগাল—‘তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস?’ তারা তো ভয়ে মরে। আমি তখন বলি, ‘তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নেই; আবার তাদের মুড়ি খেতে পয়সা দি—এমন মন ওর! রাত তিনটের সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের) বারান্দায় বসে জপ করুক্ না, দেখি—কেমন মনে শান্তি না আসে! তাতো করবে না, কেবল অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর?

“আমি ত মা তখন অশান্তি কেমন জানতুম না। এখন ঐ ওদের জন্যে, আর কিক্ষণে ছোট বৌ ঘরে এল, আর তার মেয়েকে মানুষ করতে গেলুম, সেই হতে যত জ্বালা। যাক্ সব চলে যাক্, কাউকে আমি চাই নে। এ কি মেয়ে সব হল গা! একটা কথা শোনে না। মেয়েলোক এত অবাধ্য?”

গোলাপমা—“আবার কেমন করে সাজে দেখ না, ভাবে—তবেই বুঝি বর ভালবাসবে।”

মা—“আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন। একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার * রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, ‘দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।’ আমি বললুম, ‘আচ্ছা।’ আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, ‘কে, তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারিনি। আমি মনে করেছিলুম—লক্ষ্মী; কিছু মনে করোনি।’ আমি বললুম, ‘তা বললেই বা।’ কখন আমাকে ‘তুমি’ ছাড়া ‘তুই’ বলেননি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন। তিনি বলতেন, ‘কর্ম্ম করতে হয়, মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।’ একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে বললেন, ‘এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখবো, লুচি রাখবো ছেলেদের জন্যে।’ আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেড়ে বালিশ করলুম। চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম।

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

* শ্রীশ্রীমা নহবতে নীচের কুঠরীতে থাকতেন। উহার পশ্চিমের বারান্দায় সিঁড়ির পাশে গঙ্গার দিকে দক্ষিণ মুখ করে তিনি ধ্যান করতেন।

* সেদিন সরুচাকলি পিঠে আর সুজির পায়েস করে, অন্য লোক নেই দেখে, শ্রীশ্রীমা নিজেই সন্ধ্যার পর ঐ সব ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুরের জগতে প্রেম

'সুরসাধক'

মীরাবাঈ আর রাণী দোপানী ভারত-সাহিত্যে অতুলনীয়, সকলেই জানেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীতকার শালিয়াপিন সম্বন্ধে একটি মজার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, কথিত হয় যে, তিনি প্যারিসের পথে পথে নৈশ বিহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং সে সময় প্রায়ই তিনি ভাবাবেশে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করতেন ; এই রকম কোন এক রাত্রে একটি রূপজীবিনী তাঁকে পাকড়াও করে এবং তাদের অভ্যস্ত রীতিতে আমন্ত্রণ জানায়, বলা বাহুল্য, শালিয়াপিন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি।

বিস্মিতা বারবধূ না কি সুরের এই ঐন্দ্রজালিককে প্রশ্ন করেছিল সেদিন তার নৈশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ; উত্তরে তিনি জানান যে এটা তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত একটা বিষয় ; মেয়েটিও না কি সহাস্যে শুভ কামনা জানিয়েছিলো তাঁকে। শালিয়াপিনের সম্বন্ধে যে কি ধারণা হয়েছিল সেদিনের সেই নগণ্যা পথচারিণীর, সে বিষয়ে অবশ্য ইতিহাস নির্ব্বাক।

সংগীতের জগতের তিনটি বিখ্যাত বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনীর নায়ক ছিলেন তিনটি বিখ্যাত সুরকার,—বিঠোফেন, বারিলিয়জ ও ব্রামস্।

বিঠোফেন সারাজীবন প্রেমের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়িয়েছেন ; তাঁর অসংখ্য প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের নায়িকাও ছিল বিভিন্ন। ভিয়েনার পথে পথে ভ্রমণ করার সময় তিনি নাকি প্রত্যেক সুরূপা নারীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতেন এবং তাদের অনেকের কাছ থেকেই পেতেন সাড়া।

অভিজাত মহিলা, চপলা সাধারণী, বন্ধু-পত্নী, বালিকা ছাত্রী, মধ্যবয়স্কা ব্যারনেস—এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর প্রেমধন্যা।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক কাহিনী বিঠোফেনের যে প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে শোনা যায়, তার নাম লিজা ফ্লকার্জার।

১৮০৫ সনের বসন্তকালীন ঘটনা এটি, তখন বিঠোফেন ভিয়েনার এক সহরতলীতে বাস করছিলেন, অনবদ্য সিমফনীর অনেকগুলিই রচিত হয় সে সময়।

বিঠোফেনের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল লিজার পিতা এক হেয় নিম্নশ্রেণীর মদ্যপ ; কন্যার চরিত্র অনেকাংশেই ছিল পিতার অনুরূপ।

প্রথম দর্শনেই প্রেম, দিনের পর দিন বিঠোফেন সেই চাষীর অঙ্গনে তৃষিত চোখে অপেক্ষা করতেন এই রমণীকে শুধু একবার দেখার প্রত্যাশায়, লিজা তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েও সম্পূর্ণ উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি সেদিন এই বরেণ্য সুরসাধককে ; তার চোখে বিঠোফেন ছিলেন ভিয়েনার এক উন্মাদ সঙ্গীতকার মাত্র।

দিনের পর দিন চলত এই নিষ্ফল অভিসার, মাঝে মাঝে হতাশা আচ্ছন্ন করে ফেলত বিঠোফেনের অন্তরকে ; অবশেষে এক অপ্রীতিকর ঘটনার মাধ্যমে লিজার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যান তিনি। জীবনে আর কোনদিন তাকে দেখেন নি বিঠোফেন।

জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়ে হেক্টর বারিলিয়জ একদিন আবিষ্কার করলেন যে, সারাজীবন তিনি শুধু এক নারীকেই ভালবেসেছেন, সে রমণী এষ্টেল ডুবোয়।

অতি বাল্যকালেই দেখা দিয়েছিল এই প্রেমের অঙ্কুর। হেক্টর তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র, এষ্টেল অষ্টাদশী তরুণী।

প্রায় পঞ্চাশ বছর মানসী এষ্টেলকে দেখেননি হেক্টর, আর এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁর মনের কথা রয়ে গেছে, অবলা এষ্টেল জানতেও পারেন নি তখনও যে, একটি মানুষ এই সুদীর্ঘকাল ধরে মনে মনে যে স্বপ্নজাল বুনে গেছেন তিনিই তার নায়িকা।

অবশেষে একদিন প্রভূত আয়াস স্বীকার করে পাওয়া গিয়েছে এষ্টেলের ঠিকানা ; লায়ন্সের এক গৃহে শুভ্রবেশা এক বৃদ্ধার বিস্ময়চকিত চোখের সামনে উপবেশন করেছেন প্রৌঢ় সুরকার, শুনিয়েছেন তাঁকে আপন কাহিনী অকপটে।

আদ্যোপান্ত সব শুনে এষ্টেল সেদিন যা বলেছিলেন, তা মনে করলে হতভাগ্য সঙ্গীতজ্ঞের উপর করুণা হয়।

হেক্টর তাঁর মানসীর সম্মুখে শুনেছিলেন যে তিনি (এষ্টেল) সুদীর্ঘকাল অতিশয় সুখী দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেছেন, স্বামীকে চারটি সন্তান উপহার দিয়েছেন ও বর্ত্তমানে নাতি-নাতনীর পিতামহী হয়ে অত্যন্ত শান্তিতে আছেন।

বারিলিয়জ জানিয়েছিলেন সেদিন বিদায় শুধু এষ্টেলকেই নয়, তাঁর জীবনব্যাপী প্রেমের স্বপ্নকেও, পরে অবশ্য তাঁর মানস-প্রিয়ার সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তিনি আরও কিছুদিন, কিন্তু সে নেহাৎই দগ্ধস্তূপে আগুনের ফুলকি খোঁজা, আজীবন যে প্রেমের কল্পনা রঙীন করে রেখেছিল তাঁর অন্তরকে তার আলো তখন নির্ব্বাপিত।

জোহানস্ ব্রামস্-এর জটিল প্রেমজীবনের পঙ্কিল পরিবেশে একটি নাম একদিন আপন মহিমায় শতদলের মত বিকসিত হয়ে উঠেছিল, সে নাম ক্লারা সুম্যানের।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক ব্রামস্ জীবিকার জন্ম একদিন বাধ্য হন হামবুর্গের এক নোংরা পতিতা-পল্লীতে পিয়ানো বাদকের কাজ স্বীকার করে নিতে, সেখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনে তার প্রভাব এড়াতে পারেননি শিল্পী।

বিশ বছরের যুবক ব্রামস্ যেদিন প্রথম রবার্ট সুম্যানের গৃহে পদার্পণ করেন, জানিনা সেদিন আকাশে বাতাসে কার বাঁশী বেজেছিল, কারণ সেদিনই ছিল এই প্রতিভাবান যুবকের জীবনের পরম লগনের দিন, ক্লারাকে দেখলেন তিনি সেদিন।

রবার্ট সুম্যানের পত্নী ক্লারা সুম্যান নিজেও ছিলেন এক প্রতিভাময়ী সুরশিল্পী, ব্রামস্-এর শক্তিকে চিনতে ভুল করেননি তিনি সেদিন।

ক্রমে ক্রমে সুম্যান-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলেন ব্রামস্, আতিথ্য গ্রহণ করলেন তাঁদের সাদর স্নেহছায়ায়, দিনের পর দিন তাঁর কাটতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে, জীবনে প্রথম গৃহ-সুখের মাধুর্য্য আস্বাদন করলেন তিনি।

কিন্তু সুখের দিন ক্ষণস্থায়ী, সুখী সুম্যান-পরিবারে ঘনিয়ে এলো বিপদের কালো মেঘ, রবার্ট হঠাৎ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে নিয়ে যেতে হল উন্মাদাগারে, ক্লারা তখন অন্তঃসত্ত্বা, এই দুর্দ্দিনে তরুণ ব্রামস্ ক্লারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন উৎসাহ দিয়ে সাহায্য দিয়ে, তীব্রতম দুঃখের বন্ধুর দিনগুলি ক্লারার কেটেছে তাঁর-ই একান্ত সহযোগিতায়, আন্তরিক প্রেমে।

জোহানস্ অপেক্ষা ক্লারা প্রায় চোদ্দবছরের বড় ছিলেন এবং প্রথমে ক্লারার মনে তাঁর প্রতি প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য ও স্নেহের ভাবেরই প্রাধান্য ছিল বেশী, কিন্তু একদিন সভয়ে ক্লারা উপলব্ধি করলেন তিনি প্রেমে পড়েছেন, এই তরুণ শিল্পীর উচ্ছল কামনা প্রতিহত করার মত কোন শক্তিই খুঁজে পাননি সেদিন জায়া ও জননী ক্লারা।

পরিচিত সমাজের আওতা থেকে অনেক দূরে হল্যাণ্ডের রটারডাম নামক পল্লীসহরে মিলিত হলেন প্রণয়ী যুগল।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী প্রেমজীবনে কখনও ক্লান্তি বোধ করেননি ব্রামস্ ও ক্লারা। সমাজ-সঙ্গত প্রথায় তাঁরা মিলিত হননি; এমন কি, সুম্যানের মৃত্যুর পরও বিবাহ দ্বারা প্রেমকে নৈতিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি তাঁরা কখনও, কারণ ক্লারা জানতেন ব্রামস্-এর মত প্রতিভা বন্ধন স্বীকার করে না কোনদিনই, আর সুম্যান নামটির উপর ক্লারার যে কত মমতা তা উপলব্ধি করেছিলেন ব্রামস্ সহজেই।

দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা ভালবেসেছেন পরস্পরকে, সে ভালবাসায় ছিলনা ছেদ, ছিলনা ক্লান্তি, আকাশের এককোণে শুকতারার মতই সে প্রেম জোহানস্ ব্রামসের অন্তর-লোক আলোকিত করে রেখেছিল আপন মহিমায় ও মাধুর্য্যে।

ব্রামসের জীবনে অগণ্য নারীর পদক্ষেপ ঘটেছে কিন্তু ক্লারার স্থান ছিল সে সবের অনেক উর্দ্ধে, তিনিই ছিলেন শিল্পীর চিত্তাকাশে একমাত্র ধ্রুবতারা, ব্রামসের চির প্রিয়তমা।

প্রেমের ইতিহাস

(জনৈকা বিশেষজ্ঞ)

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মহারের ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে শঙ্কিত হয়ে রেঃ টমাস ম্যালথাস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জন্মহারের ঊর্দ্ধগতি রোধের জন্ম যুবক-যুবতীর পক্ষে বিবাহ বিলম্বিত করাই একমাত্র উপায়, যার ফলে পুত্র কন্যার সংখ্যা কিছুটা কম হওয়া সম্ভবপর।

ম্যালথাসের মতের পরিপোষক ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকটও সেদিন এই বিলম্বিত উদ্বাহ প্রথা একান্ত অসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়নি। বিশেষতঃ নারীর পক্ষ হতে যে এর বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকতে পারে, সেদিনের যুগমানসে তা ধারণা করাও সম্ভব ছিলনা। নারীর যৌন সম্ভোগেচ্ছা তৎকালীন সমাজে অতিশয় অস্বাভাবিক ও গর্হিত বলে মনে করাই রীতি ছিল।

সেদিনের সমাজে আদর্শ নারী ছিল বিনয় মাধুর্য্য ও সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি, স্বভাবকোমলা ও সততই পুরুষের প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সে যুগের সমাজে অতি নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বলেই বিবেচিত হত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা প্রায়শঃই হতেন সম্পূর্ণরূপে স্বামীর বা পিতার অধীন—কারণ তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছুই থাকত না ও স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের কোন পথই ছিল না খোলা।

প্রায় সমস্ত দেশেই পুরুষ ছিল প্রধান। নারীর স্বাধীনতা এই পুরুষ-প্রধান জগতে কখনও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। নেপোলিয়নের মত মহাজনের মতেও নারীর স্থান ছিল সর্ব্বদাই পুরুষের নীচে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতেন, "স্ত্রীর প্রতিটি কার্য্যকলাপের উপর একচ্ছত্র সম্রাটের মতই শাসনদণ্ড পরিচালনা করার শক্তি থাকা উচিৎ প্রত্যেক স্বামীর।"

নারীকে ভোটাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে টমাস জেফারসনের যুক্তি ছিল এই যে, কোমল রমণী-হৃদয় রাজনীতির কঠিন বাস্তবতা গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে না কখনই।

উচ্ছ্বাসী-কবি কীটস্ বলেন যে, রমণী যেন এক দুগ্ধশুভ্র কোমল মেষশিশু, শক্তিমান নরের আশ্রয়ের জন্ম যে ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষমান। ভিক্টোরিয়ান যুগে সমাজে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল, তা কেবল বহির্মুখী; অন্দর মহলে দাম্পত্য জীবনের আদর্শকে আঁকড়ে রাখা হল নৈতিকতার বিবিধ শৃঙ্খলে বেঁধে এবং যা কিছু এই প্রচলিত নীতিবোধকে ঘা দিতে পারে, সেরকম সমস্ত মতবাদকেই অপাঙক্তেয় করে রাখা হল দুর্নীতির তকমা এঁটে দিয়ে।

অদ্ভুত নৈতিক শুচিবায়ুতার আওতায় বেড়ে উঠতেন সে যুগের

য়েরা। দেহের স্বাভাবিক বৃত্তিকে ঘৃণা করতে শেখানো হত তাঁদের বং সেই সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করা ভদ্রমহিলার পক্ষে অনুচিত লেই বিবেচনা করা হত। দেহ-মিলনের আনন্দে নারীর যে ভূমিকা, গ্য নেহাৎই নিষ্ক্রিয় হিসাবেই গণ্য করা হ'ত, কারণ কোন মহিলা য এ ধরণের জিনিযে আনন্দ পেতে পারেন, সে কথা বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না ভিক্টোরিয়ান সমাজ।

শৈশবাবধি এই ধরণের শিক্ষা মেয়েদের মনের উপর যে কি রকম প্রভাব বিস্তার করত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ অধিকাংশ ভিক্টোরিয়ান নববধূর পক্ষে ফুলশয্যা ছিল কণ্টকশয্যারই সমতুল্য।

মোট কথা, সে যুগের মেয়েদের পক্ষে দৈহিক আনন্দের বা যৌন-সম্ভোগেচ্ছার কথা আভাস-ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করার উপায় ছিল না। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার জন্য সেদিনের সমাজ মেয়েদের সে অধিকার দেয়নি।

আজ সেদিন বিগত, বিস্মৃতপ্রায়। বর্ত্তমান যুগকে শুধু আণবিক যুগই বলা হয় না, বর্ত্তমান যুগের আরেক নাম যৌন-যুগ। নর-নারীর প্রেম নিয়ে আজকের দিনে বহু আলোচনা চলে এবং তা শুধু 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম' জাতীয় প্রেমের জন্য নয়, দেহস্পর্শই আজকের প্রেমের শেষ কথা।

দেহবাদী প্রেম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের সুচিন্তিত গবেষণার ফলস্বরূপ যৌনবিজ্ঞানের উপর মূল্যবান পুস্তক রচিত হয়েছে। বিখ্যাত মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ এইসব রচনার মূল্য ক্রমেই এখনকার মানুষ বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছে। অর্থহীন কুসংস্কারের বাঁধন থেকে আজকের যুগমানস মুক্তি পেয়েছে এঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে।

জীবনের এক প্রধান ও প্রয়োজনীয় দিককে যাঁরা অকুণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন বহু বাধা-বিপত্তির আবরণ মুক্ত করে, সেইসব অনলস দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের নাম অবিস্মরণীয়।

আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানের জনক এই সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এক বন্ধুর কাজে সহায়তা করার সময় ফ্রয়েড যেসব ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সংস্পর্শে আসেন, তারাই জীবনের এই জটিলতম দিকের গ্রন্থিমোচনে তাঁকে প্রেরণা দান করে। যৌন-জীবন যে মানুষকে কতদূর প্রভাবিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে নতুন জ্ঞানলাভ করেন তিনি, আর তারই ফলে জন্ম নেয় যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থগুলি।

ক্রমে ক্রমে নারীসমাজ আত্মসচেতন হয়ে উঠল; জন্ম-শাসন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারের জন্য মেয়েরা আন্দোলন শুরু করলেন, প্রেম ও বিবাহকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রাখার রক্ষণশীলতা হয়ে উঠল উপহাসের বস্তু, বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কবৃন্দ নৈতিক রক্ষণশীলতাকে 'অবাস্তব' আখ্যায় ভূষিত করলেন।

স্ত্রীলোকের যৌনাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি পেলো এবং কয়েকটি রাষ্ট্র—যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি—বিবাহ-প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ না ঘটালেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটিকে প্রায় একটি খবরের কাগজ বা একটি নূতন হ্যাট কেনার মত অনায়াসসাধ্য বিষয়ে পরিণত করল।

ভিক্টোরিয়ান সমাজের রক্ষণশীলতা রূপকথার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। আধুনিক যুগ প্রেমকে স্বীকৃতি দিল কিন্তু গুরুত্ব দিল না। স্ত্রী-পুরুষের জীবনে একটা ক্ষণিক আনন্দের আবশ্যকীয় যন্ত্র হিসাবে প্রেমের মূল্য নিরূপণ করা হল।

জীবনের নানা তিক্ততা, হতাশা ও ক্লান্তির প্রতিষেধক হিসাবে মানুষ আজ প্রেমকে চায়। প্রেমের কাছে আজকের মানুষ খুব বেশী দাবী করেনা, কোন বড় প্রত্যাশা তার নেই। কারণ, আধুনিক মানুষ জানে বেশী আশা করলেই জীবনের কাছে ঠকতে হয়, কাজেই "ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া" শ্রেণীর প্রেমেও তাদের অরুচি নেই, নেই অসন্তোষ। সহজ ভাবেই আজ মানুষ প্রেমকে জীবনে স্থান দিয়েছে মনগড়া বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল মুক্ত করে, আর পাঁচটি জিনিষের মতই প্রেম আজ তার কাছে শুধু প্রয়োজনীয়, তার বেশী কিছু নয়। রোমান্সের অঞ্জন-মাখা চোখে আজকের ছেলে-মেয়েরা তাকায় না পরস্পরের দিকে, প্রেমে আঘাত পেলে ঝাঁপ দেয় না পর্ব্বত-শিখর থেকে বা মরে না জলে ডুবে। ওসব আজকের প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে অকল্পনীয় রূপেই হাস্যকর ও অসম্ভব। বড়জোর দু' একদিন আপিসের ফাইল দেখতে ভুল করে উপরওয়ালার তিরস্কার সহ্য করে। হয়ত বা দু' এক মুহূর্ত্তের জন্য জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন বলে মনে হয়; শুধু এইটুকুই আর কিছু নয়। আজকের যুগে প্রেম নয় কোন অপরূপ রূপকথা, তা শুধুই পথ-চলার গান।

এয়ার মার্শাল

জগদীশচন্দ্র দাশ

সুব্রত, তুমি চলে গেলে!
টোকিওর ভোজনশালে।
খবর আসার একটু আগেও কে জানতো
মৃত্যুদূত করেছে ষড়যন্ত্র।

মহাকাল, তুমি ইতিহাসের নিঠুর নিঠুর খবর পাঠাও;
মানুষ তার মাল-মসলা; আমাদের হৃদয় ভেঙে দাও।

জীবনের স্থিতি কত কে জানে!
মৃত্যু সদাই তার আঁচল ধরে টানে।
জীবন দরজায় নেই ত প্রহরী
শত্রুর বার মিত্রের বাড়ী।

সুব্রত, পূর্ণ করি গেলে না যে ব্রত,
যদিও তাহার পরে তোমার আত্মার প্রভাব সতত।
আমাদের কী আছে সান্ত্বনা!
তোমার বীরত্বগাথা ম্লান হবে না।

মিশরে তিন মাস
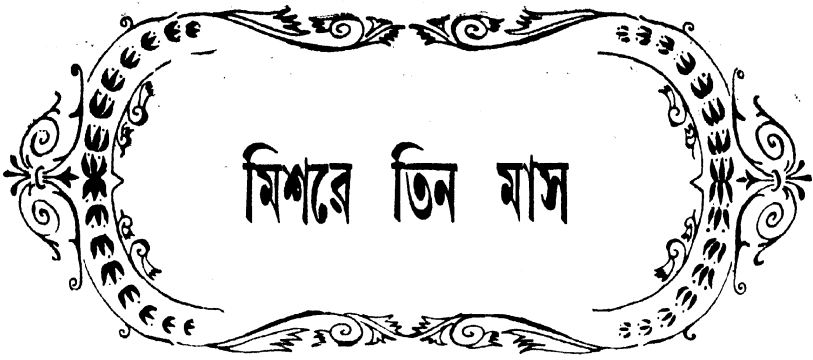
যাদুসম্রাট—পি, সি, সরকার

আজ তিনমাস হয় মিশরে এসেছি—এদেশের লোকেদের সাথে মিলে মিশে—এদের ভাষা শিখে—এদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে—এদের সম্পর্কে নূতন ধারণা হয়েছে। কাগজে যখন হাফটোন ছবি ছাপা হয় তখন আমরা সেটা ফটো হিসাবেই দেখতে পাই—কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, ঐ ছবিটা কতকগুলি সাদা এবং কালো বিন্দুর সমষ্টিমাত্র। দূর থেকে সমগ্র মুসলমান জগতকে আমরা ইসলামীদুনিয়া বলেই মনে করতাম—এখন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি, হাফটোন ছবির সাদা কালো বিন্দুর মতই এখানেও নানা রংএর সমষ্টি যা' দূর থেকে ঠিকমত ধরা পড়ে না। আরব-পারস্য (ইরাক-ইরাণ), সৌদীআরব, সুদান, মিশর—সবই মুসলমানের দেশ—কিন্তু মুসলমানে মুসলমানে ঐ সাদাকালো বিন্দুর মতই কোনও মিল নাই।

ইরাণ (পারস্য) থেকেই ধরা যাক—বাগদাদ-চুক্তি অনুযায়ী ইরাণ, পাকিস্থান এবং তুরস্ক, তিনদেশ প্রিয় বন্ধু। সম্প্রতি বাগদাদ (ইরাক) আংশিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইরাণ, পাকিস্থান এবং তুরস্ক ইঙ্গ-মার্কিনের সূত্রচালিত পুতুল বিশেষ। মিশর ঠিক তার বিপরীত—এরা স্বতন্ত্রমতাবলম্বী অনেকটা ভারত, ঘনা, ইন্দোনিশিয়ার মত। ইরাণের মুসলমানেরা শিয়া সম্প্রদায়ের আর ইরাকের মুসলমানেরা প্রধানত: সুন্নি সম্প্রদায়ের—এই ইরাণ ইরাক তথা শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া বহু শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। কয়েক বৎসর আগে একজন ইরাণী মুসলমান কাবা ধর্ম্মস্থানকে অপবিত্র করেছিল অজুহাতে বা অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়—ইরাণীরা এর প্রতিশোধ হিসাবে ইরাণ থেকে যাত্রী পাঠানো রীতিমত নিয়ন্ত্রিত করে দেন। এই বৎসর ইরাণে ও ইরাকে নূতন করে ঝগড়া সূত্রপাত হওয়ার পর কারবালার পরিবর্ত্তে মক্কা ও মদিনা হজ্জ করবার জন্য ১৬০০০ ষোল হাজার ইরাণী মুসলমান যাত্রী পাঠানো হয়।

সৌদী আরবের ইতিহাসে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক নেতাই সে দেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন—সর্ব্বপ্রথম হজরত মোহাম্মদ, তারপর তাঁর দুই সাথী ওমর ও বকর। এর এক হাজার বৎসর পর ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল ওয়াহাব। (নেজ্দী মুসলমান) এই মুহাম্মদ ওয়াহাব-এর সময় থেকেই সৌদীবংশ ও ওয়াহাবী মুসলীম ধর্ম্ম এক হয়ে যায়। সৌদীআরব মিশরের দলে যোগ দেয় নাই—মিশরের বর্ত্তমান কর্ণধার প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে তারা ভয় করে, ওদিকে ইরাকের দলেও তারা যোগ দেয় নাই, কারণ ইরাকের বর্ত্তমান কর্ণধার জেনারেল কাসেমকে তারা বিশ্বাস করে না। জেনারেল কাসেমএর মতিগতি নাকি কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন আর তাদের অন্যনেতা মাদাবী (Mahdawi) ও তথৈবচ। তবে কি সৌদীআরব কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষী? রাজনৈতিক দাবাখেলার এই সব বিষয় বুঝা কষ্টকর! এককালে এই সোবিয়েৎ রাশিয়াই সকলের আগে সৌদীআরব রাজত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল—আর আজ জেদ্দাতে সকল দেশের রাষ্ট্রদূতের দপ্তর আছে, শুধু সোভিয়েৎ রাশিয়া এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলি বাদে।

বর্ত্তমানে সৌদীআরবে আমেরিকার যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখা যায়—এর কারণ এদের তৈলখনি। এককালে ইংরেজরা সৌদীবংশকে প্রচুর অর্থ সাহায্য আরও নানা সহায়তা করে দাঁড় করিয়েছিল—কাজেই এতদিন তৈলশিল্পে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল। বর্ত্তমানে আমেরিকার দিকে পাল্লা ভারী হয়েছে। কিন্তু যে-কোন দিন ঐ প্রাধান্য অন্যদেশের হাতেও গিয়ে পৌছতে পারে। জাপান ইতিমধ্যে একটি 'লীজ' পেয়েছে—পশ্চিম-জার্ম্মাণীও একটি 'লীজ' পেতে বসেছে। প্রেসিডেণ্ট নাসের সমস্ত আরব মুসলিমকে একত্র করে নূতন আরব জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেছেন—সিরিয়া তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়াতে মধ্যপ্রাচ্যে এই আরব জাতীয়তাবাদ খুব জোরালো হয়েছে। বর্ত্তমানে মিশর এবং সিরিয়া মিলে 'ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিক' (U.A.R.) গভর্ণমেণ্ট সৃষ্ট হয়েছে এবং এর সর্ব্বময় কর্ত্তা আরব জাতীয়তাবাদের জনক প্রেসিডেণ্ট নাসের।

প্রেসিডেণ্ট নাসের চাহেন এই সৌদীআরবকে তাঁর আরব জাতীয়তাবাদের দলে টেনে আনতে। সৌদীআরব ইঙ্গ-মার্কিণের বুদ্ধিমত "প্যান-ইসলাম" 'অখণ্ড মুসলীম জাতীয়তাবাদ' প্রচার করছে। সৌদীআরবের অন্তর্গত হেজাজ হচ্ছে মুসলমান ধর্ম্মের পীঠস্থান, কাজেই সৌদীআরবকে কেন্দ্র করে অখণ্ড মুসলিম জাতীয়তাবাদ নাসেরের 'আরব জাতীয়তাবাদে'র বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়েছে। পাকিস্থান আরবীয় দলের নয়, সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন সৌদীআরব ভ্রমণে এসেছিলেন—তাঁরা ঘরে বসে কি সলাপরামর্শ করেছেন, সময়ে তা' জানা যাবে। মিশর কিন্তু সৌদীআরবকে দলে টানতে খুবই চেষ্টা করছে কিন্তু সৌদীআরবে নূতন যে আন্দোলন চলছে তার ফলে মিশরের সাথে এদের মৈত্রী অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর প্রত্যেকদেশই বড় হবার চেষ্টা করছে।

ভারত, মিশর, পাকিস্থান, সুদান—সবাই নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধতর করার চেষ্টায় দেশের শিল্পকে রাষ্ট্রায়াত্ত করার চেষ্টা করছে। দেশে নূতন শিল্পকেন্দ্র খোলা হচ্ছে—চাকুরীর ক্ষেত্র শুধু স্বদেশবাসীদের জন্য উন্মুক্ত রেখে দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। সৌদী-আরবও ঠিক সেই পথ ধরেছে। এরা ঠিক করেছে যে, সৌদীআরবের তৈলখনিতে শুধু সৌদীআরবীয় লোকদিগকেই নিযুক্ত করা হবে। এই ভাষ্য অনুযায়ী বিদেশীয়দের বরখাস্ত করে—সেই সমস্ত চাকুরীস্থলে সৌদীআরবীয় মুসলানদিগকে নিযুক্ত করা আরম্ভ হয়েছে। ফলে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, দেড় হাজার ভারতীয় এবং সমান সংখ্যক পাকিস্থানীর চাকুরী ১৯৬২ সালের মধ্যেই খতম হবে, আর সে স্থলে সৌদীআরবীয় মুসলমান চাকুরীয়া নিযুক্ত হবে। ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের চাকুরী চলে গেলে সৌদীআরবের কিছুই আসে যায় না সত্যিকথা, তবে এর সঙ্গে আরও প্রশ্নজড়িত রয়েছে। বহু লেবানিজ, সিরিয়ান, জর্ডানীয়ান ও মিশরীয় বর্ত্তমানে ঐ তৈল-শিল্প-কেন্দ্রে চাকুরী করছে—তাদের চাকুরী গেলে সৌদীআরবের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হবে। সিংহল থেকে সমস্ত ভারতীয়দের তাড়িয়ে দিয়ে শুধু লঙ্কা-বাসীদের জন্য লঙ্কা আন্দোলন করলে ভারতীয়রা কখনও খুশী হবে কি? ঠিক সেই ব্যাপার! এটা সৌদীআরবের মহা সমস্যা—। একদিকে মিশরকে খুশী রাখতে হবে, অপরদিকে নিজের দেশের উন্নতি, নিজের দেশের সমৃদ্ধি, নিজের রাষ্ট্রায়ত্ত করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা দূর করতে হবে।

আমরা মিশরে থাকা কালে পণ্ডিত নেহেরু কায়রোতে এলেন, আফগানিস্থানের রাজা এলেন, প্রেসীডেণ্ট আয়ুব খাঁন এলেন, সুদানের কর্ণধার এলেন—অর্থাৎ নানাদেশের রথীমহারথীরা যাতায়াত করলেন। পণ্ডিত নেহেরু এদেশের বন্ধু—কিন্তু তাঁর সম্বর্দ্ধনা সব চাইতে দুর্ব্বল মনে হল। আর সব চাইতে আনন্দ জৌলুস দেখা গেল পাকিস্থানের বেলায়। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখাঁকে মিশরের লোকেরা পছন্দ করতেন না—কিন্তু নাসের পকিস্থান ঘুরে এসে ভাল কথা বলে বলে লোকের মন ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আয়ুবখাঁন স্যুয়েজখাল জাতীয়করণ সংঘর্ষের সময় ইংরজ ফরাসীর পক্ষ টেনে মিশরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—ভারত বরাবরই মিশরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু মিশরের লোকদের বিশ্বাস ভারত ভালবাসে রাজনৈতিক ভালবাসা অর্থাৎ মুখের ভালবাসা, আর পাকিস্থানের ভালবাসা অকৃত্রিম,—ঝগড়াটা শুধু বাহিরের লোক দেখানো।

প্রেসিডেণ্ট নাসের বললেন পাকিস্থান যা কিছু করেছিল সবই দায়ে পড়ে করেছিল, অন্তরে অন্তরে মুসলমান হিসাবে দুই দেশে মিল অবিচ্ছেদ্য এবং অকৃত্রিম। তাই তাঁকে মহাসমারোহে সম্মানিত করা হ'ল—সমগ্র মিশরের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রেসিডেণ্ট নাসের আর প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁনের ফটো,—মিশর আর পাকিস্থানের পতাকায় সমগ্র মিশর ঝলমল করছিল।

আমাদের এই কয়েকমাসের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি—ভারতকে এরা ভালবাসে কিন্তু ঈর্ষা ও ভয়ের সঙ্গে। পণ্ডিত নেহেরুর ক্ষুরধার বুদ্ধির এরা প্রশংসা করে—তাঁর রাজনৈতিক চাল এরা বুঝে না, ভয়ের সঙ্গে অনুসরণ করে—এদের মনে বিশ্বাস এ যেন কোন এক নূতন চাণক্য পণ্ডিত। পক্ষান্তরে পাকিস্থানকে এরা ভালবাসে নিজের লোক হিসাবে—'এক জাতি এক প্রাণ একতা'র বুলি দিয়ে। আমরা রাস্তায় বের হলেই জিজ্ঞাসা করে আপনি কি পাকিস্থানী?" আমরা উত্তর দেই না "হিন্দী" (বলাবাহুল্য এরা ভারতীয়কে সংক্ষেপে হিন্দী বলে), তখন আর এক ধাপ আগাইয়া জিজ্ঞাসা করে "আপনি মুসলমান?" বলেই উত্তরের জন্য উদগ্রীব হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—যেই বললাম "না, হিন্দু", তখন মুখের ঔজ্জ্বল্য কমে গেল—বলল "ভাল, ভাল, হিন্দী ভাল, নেহেরু-নাসের ভাই ভাই বন্ধু।" মুখের কথা এবং মনের ভাব দেখলেই বুঝা যায়, ওটা বাইরের কথা, শেখানো বুলি, নিজেদের কথা মনের ভাব লুকবার একটা উপায়মাত্র।

আমরা 'ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিক' গভর্ণমেণ্টের সাংস্কৃতি মন্ত্রী এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে এদেশের সরকারী থিয়েটারে এক সপ্তাহের জন্য 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শন করতে আসি। উদ্বোধন-রজনীতে সমস্ত বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত, মিশরের সেরা সেরা লোকেরা এবং সাত জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। জনগণের আগ্রহে সাতদিনের স্থলে মোট ত্রিশদিন যাতুবিদ্যা প্রদর্শিত হয়ে এদেশে নূতন রেকর্ড সৃষ্ট হ'ল সত্যি, কিন্তু আমার এখনও মনে হয় যে, আমি যদি মুসলমান হতেম এবং যদি পাকিস্থানী হতেম, আমাকে নিয়ে এরা আরও নাচানাচি করতেন। পূর্ব্ববঙ্গে (পাকিস্থানে) আমার জন্ম হয়েছিল—সেই কথাটাই এরা বারবার ফলাউ করে বলে বেড়িয়েছে।

'প্যান ইসলাম'ই বলুন আর 'আরব জাতীয়তাবাদই' বলুন, দুইটিই আমাদের পক্ষে সমান মারাত্মক। জঙ্গলে গেলে সাপে খেলেও খাবে আর বাঘে খেলেও খাবে, ঠিক সেই রকম। তবে এরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য কিছুতেই করতে পারবে না। পারস্য উপসাগরে কতকগুলি সেখরাজ্য আছে—যেগুলি ইংরেজ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ স্বীকার করে নিয়েছে—ইরাণ কিন্তু তাদেরকে স্বীকার করে না। যদি আমরা আমাদের 'পাসপোর্ট' নিয়ে এখানে এক মিনিটের জন্যও যাই—যদি আমাদের পাসপোর্টে এই দেশের একটা ছাপ পড়ে, তবেই বিপদ—ঐ পাসপোর্ট সমগ্র ইরাণে অচল হয়ে গেল—ঐ পাসপোর্ট তারা আটকে দিবে, আমাদিগকে আর জীবনে ইরাণের ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না—জীবনে নয়! কাজেই আমাদিগকে দুইটি পাসপোর্ট বই নিতে হয়, একটি ইরাণে দেখাবার জন্য সাধারণ 'পাসপোর্ট', আর অপরটি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি বিশেষ দেশের ও ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্য। দুইটা 'পাসপোর্ট' হলেই চলবে না, তিনটে চাই। এখানে যে নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ইজরাইলের সৃষ্টি হয়েছে—সেইটিকে সমগ্র আরবরাষ্ট্র 'বয়কট' করেছে। এদেশে ইজরাইল নাম উচ্চারণ করলেই বিপদ। ইজরাইলে যেতে হলে আলাদা 'পাসপোর্ট' নিতে হয় এবং একবার ইজরাইলে গেলে সে আর আরবরাষ্ট্রে পা দিতে পারবে না—জীবনেও নয়। এ যেন ঠিক বোড়ের চাল—কোন ঘরের পর কোন ঘরে যেতে হ'বে জানা না থাকলেই সব কিস্তিমাৎ হয়ে যাবে।

আমরা মিশরে কেমন আছি—হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তর খুব ভাল আছি—খুব আনন্দে আছি—প্রেসিডেণ্ট নাসেরের রাজত্বে কোনও কিছুর দুঃখ নেই—একেবারে রামরাজত্ব। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান এবং মিশর ঠিক একরকম শাসনতন্ত্রে আছে। মিলিটারী রাজত্ব—"প্রজাদের টু" করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই—এমনই প্রতাপ"। বোম্বাই থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে এরোপ্লেনে মিশরের রাজধানী কায়রোতে

যাওয়া যায়—প্রতিদিন এরোপ্লেন যাতায়াত করছে। কিন্তু এই ছয় ঘণ্টা দূরত্বের পথে একটা এয়ারমেইল পত্র দিন তবে কমপক্ষে সাতদিন পরে গিয়ে পৌঁছুবে—আমার একটা এয়ারমেইল চিঠি একুশ দিন পরে পেয়েছি। এর কারণ কি—মিশর থেকে যত চিঠি লেখা হয় আর মিশরে যত চিঠি আসে, সবগুলি সেন্সর-অফিসে খোলা হয়। ফলে সব চিঠিই অসম্ভব দেরীতে পৌঁছায় আর অনেক চিঠি পৌঁছায় না। আমার বহু চিঠি পৌঁছায় নাই। বাধ্য হয়ে খামে পত্র না লিখে সাদা পোষ্টকার্ডে পরিষ্কার করে পত্র লিখতাম। এয়ার-মেইলে একটা পোষ্টকার্ড ছাড়তে এক টাকার ডাকটিকিট লাগে—পৌঁছাতে চার দিন। অথচ মিশরের ডাকঘরে পোষ্টকার্ড বিক্রয় হয় না, প্রচলন নাই, এয়ার-লেটার পর্য্যন্ত নাই। শুধু খামে পত্র দাও আর সেন্সর হ'য়ে দুই সপ্তাহ পর পৌঁছাবে বসে থাক। দেশের এক সহর থেকে অন্য সহরে গেলে পঞ্চাশবার পুলিস আসবে—গাড়ী তল্লাসী করবে। হোটেলে গেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস-অফিসে 'পাসপোর্ট' জমা দিতে হয়—দেখা করতে হয়—ফটো পাঠাতে হয়।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে জনগণ খুব ভালবাসে। যে কোনও পত্রিকা খুললে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রশস্তি এবং অন্ততঃ তার দশ রকমের ফটো ছাপানো দেখা যাবে। মাঝে মাঝে এক একদিন একশটা ছবিও ছাপা দেখতে পাবেন। সমস্ত সংবাদপত্র সরকারের অধীনে—মন্ত্রীরা সমস্ত জিনিষ পাস করে ছাপতে দেন। কার জন্য কি ছাপা হবে না হবে একেবারে তুলায় ওজন করে দেওয়া রয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট নাসের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোনও 'শো' দেখতে যান না। রাস্তায় যখন বের হন, সমস্ত রাস্তা দুই পাশে মিলিটারী ও পুলিশে ভর্ত্তি থাকে—মধ্যখান দিয়ে অনেকগুলি দরজা-বন্ধ সিডান মোটর চলে যায়—এবং তার একটির মধ্যে রয়েছেন প্রেসিডেণ্ট নাসের। যত জায়গায় বক্তৃতা দেন, খুব উঁচু থেকে এবং সহস্র সহস্র লোকের উপস্থিতিতে। আমরা আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখানকে দেখতে গেলাম—অত ভীড় ঠেলে বহু কষ্টে পিকাডিলি হোটেলের বারান্দায় জায়গা পেলাম—দুইদিকে পুলিশ আর সৈন্যের সারি তারপর জনসমুদ্র মধ্যখান দিয়ে অনেক মোটর সাইকেল অনেক কাঁচবন্ধ মোটর গাড়ী গেল—সকলে বললো ঐ দ্বিতীয় গাড়ীতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখান গেলেন। আমরা গাড়ীদেখে ধন্য হলুম। আর নেহেরুকে সবসময়েই দেখেছি খোলা গাড়ীতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে— অবশ্য এদেশে যেদিন নেহেরু আসেন আমি তাঁকে দেখতে যাইনি—তিনি শেষ রাত্রে এসেছিলেন। সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে নাসের এদেশের জনগণের চিত্তজয় করেছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী, সংস্বভাবাপন্ন প্রেসিডেণ্ট নাসের আরবীয় যুবকের এক নূতন আদর্শ। তাঁকে জনগণ ভালবাসে, বিশ্বাস করে এবং তাঁকে স্বীকার করে একমাত্র নেতা হিসাবে। নাসেরও দেশকে বড় করার জন্য নিজের বুদ্ধিমত সবরকম চেষ্টাই করছেন—মিশরের উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট। এই অঞ্চলে ভারতের টাকার মূল্য একেবারে কমে গিয়েছে—এমনকি পাকিস্থানের মুদ্রার চাইতেও নীচে। মধ্যপ্রাচ্যে কতকগুলি দেশে যেমন কুয়েট, বাহরেইন প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় টাকা ও নয়া পয়সার প্রচলন আছে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশের জন্য একরকম নোট আর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সেই নোট অন্য রং এর (লাল রং) ছেপে চালু করেছেন। ফলে ভারতীয় নোটের দাম কমে গিয়েছে—ভারতীয় লালনোটের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী। এডেনে পোষ্টাফিসে মনিঅর্ডারে 'টাকা নয়া পয়সা' লিখতে হয় কিন্তু দিতে হয় ইষ্ট-আফ্রিকার 'শিলিং'। এটা ইংরেজ প্রভুদের ম্যাজিক—সবজায়গাতেই তাদের ম্যাজিক চলছে। [বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধটা মিশর ছেড়ে এসে লেবানন দেশে বসে লিখে বেইরুত থেকে ডাকে পোষ্ট করলাম]

সন্ধ্যা

[কবিতাটি American কবি Emily Dickinsonএর Evening কবিতার মূলানুবাদ]

ঝিঁঝিরা সুরেলা, আলো অবসর প্রাপ্ত,
কাজের মানুষ ফেরে একে একে, তাদের কাজ সমাপ্ত।

ঘাসের শরীর প্রায় অবনত শিশিরের ভারে,
প্রদোষ দাঁড়িয়ে ঠিক যেন এক আগন্তুক।
হাতে কালো টুপি, ভদ্রতা ভরা নতুন মুখ,
দাঁড়াতে কিম্বা হয়তো এখনি চলে যেতে পারে।

স্তব্ধতা এল যেন এক প্রতিবেশী,
জ্ঞান যেন কোন অদেখা মুখ বা অজানা নাম।
শান্তি সে যেন গৃহে একসাথে সকলের মেশামেশি,
এবং এভাবে সন্ধ্যার আমি দেখা পেলাম।

[illegible]

॥ শরৎচন্দ্রের পত্র ॥

আমার আর আপনার কথা, সাহিত্যে কে সবচেয়ে নিপুণ ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন যদি বলতে বলা হয়, তাহ'লে সবাই একবাক্যে বলবেন, শরৎচন্দ্র। কথাটা ধ্রুব সত্য, কারণ রাজা-বাদশা আর জমিদার নিয়ে তাঁর কারবার নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সুখ-দুঃখগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাননি অথচ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি এবং সবার উপরে সত্য, একমাত্র রাজা-বাদশা আর জমিদারই তাঁদের রচনার চরিত্রসর্বস্ব ছিল না। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা করতে আসিনি, আমার অতোবড় ধৃষ্টতাও নেই। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি পত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। তাঁর জীবনের সহজ কয়েকটি ঘটনার কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পকার এবং উপন্যাস-রচয়িতা শরৎচন্দ্র। তাঁর বাংলাদেশে আবির্ভাবও যেমন আকস্মিক আর রচনার সমাদরও তেমনি অভূতপূর্ব। সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আমরণ মানুষের সুখ-দুঃখ তিনি যেমনটি অনুভব করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেননি। সেইজন্যই অনুভূতির গভীরতা আর মানবহৃদয়ের দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর জুড়িদার কেউ নেই। ধর্ম আর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু নিষ্ঠুর সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা অত্যাচারিত নরনারীর বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, আর অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস অশ্রুসজল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও আছে, কিন্তু সমাধান নাই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তাছাড়া আর কিছু নই।"

তাঁর লেখার ব্যক্তি আর সমাজের সমস্যার ইঙ্গিত আছে কিন্তু সমাধান নেই আর সমাধান গল্পের অপরিহার্য্য অঙ্গও নয়।

লেখিকা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক জায়গায় লেখেন,... "অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।"... সমাজের কোথায় সমস্যা, কোথায় দোষ, শরৎচন্দ্র তা জানতেন কিন্তু সমাধানের পথ তিনি তাঁর লেখায় আনেন নি, কারণ সমাজে তাঁকেও বাস করতে হয়েছিল। সমাজ ছাড়া কেহই সুষ্ঠু ভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। তাই এখানেই তাঁর এমন সতর্কতা, এমনই দুর্বলতা।

চিঠির আর এক জায়গায় পাওয়া যায়, "...আমাকে না জানিয়া এক হিন্দু ঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না..." তদানীন্তন গৃহস্থ-বধূর সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "...তুমি লিখিয়াছ, যে স্বামীকে জানিল না, চিনিল না, তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।"

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখছেন, "সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া ওঠে।... তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবী সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নেই।...একটা কথা।...যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষদের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না। ...সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।... সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এ কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।..."

লীলা গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেন, "...দিদি, আমি কোনকালে খাওয়া ছোঁয়ার বাদবিচার করিনে, কিন্তু...মেয়েদের হাতে আমি কোনদিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে, যাঁদের বাপ মা দু-জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে।...সমাজচ্যুত হোন্ তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো জাত হ'লে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে শরৎ বাবু শুধু লেখেন বড় বড় কথা কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে।"

ওপরের চিঠিটিতে তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র যে অসবর্ণ বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন, তা বেশ

বোঝা যাচ্ছে। লিখেছেন, "আমি একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙ্গালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হ'য়েছিল। দুর্নামে দেশ ভ'রে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ ক'রে আসে তাদের শতকরা আশীজন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি। আর বিধবা হলেই বা কি। দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে জন্যে হয় সেটা পর-পুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিষটা যখন নিজেরা নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এদুঃখ মাথায় তুলে নেয়।..."

এবারে শরৎচন্দ্রের চিঠির অন্যদিকগুলো আলোচনা করা যাক, যা বেশ কৌতুকপ্রদ ও চিন্তনীয়। শরৎচন্দ্র কি রকম হাস্য-রসিক ছিলেন, তা সুগায়ক দিলীপকুমার রায়ের চিঠিতেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। "মণ্টু, তোমার নামেতো আর ওয়ারেণ্ট ছিলনা যে সাধু হ'তে গেলে? আর না। এই পত্র পাবামাত্র চলে আসবে। আবার না হয় দিনকতক পরে যেয়ো, ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধকরি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী...দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য যে দংশন সহ্য করে। এ বাঙ্গালীর পোষা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। আর একটা কথা। বারীন শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে এটা সে কর্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েছে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে।" এই রসটি আরও Climaxএ উঠেছে, যখন "...অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশীক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে-ঘাটে বিদেশে,—বুঝেছ ত? এটা শেখাই চাই।"

আবার বলছেন, "অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প জমবে। জমজ ক'রে বলবে যে, পেত্নী তুমি চোখে দেখেছো। তার পরে ভাবতে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যই শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট করে থাকবারই বা দরকার কি?" হাসাবার এমন কসরৎ সত্যই অপূর্ব। দিলীপ রায়কে আর একটি চিঠিতে লেখেন-..."আমার গিরীশ মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরীতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরীর প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যা:—ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্ত মুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রী গু মাড়িয়ে ফেলেছি।

ওঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়তো অম্বল সারবে না।" কথার ছলে তিনি যেমন হাসাতেন, চিঠির গম্ভীরতার মধ্যেও এমনি ধরণের হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন। অনিলবরণ সম্বন্ধে তিনি আর এক জায়গায় কৌতুক করেছেন, "তোমাদের অনিলবরণ শুনেছি ধূলোকে চিনি করতে পারে। আশ্রমের সমস্ত চিনি নাকি তিনিই supply করেন, এ কি সত্য? আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনে, কারণ তাহলে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্যে? কলকাতায় এসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।" অনিলবরণ সম্বন্ধে তিনি এমনই কৌতুক অনুভব করেছিলেন যে, চিঠির লেখার পরেও পুনশ্চতে আবার তাঁর কথা স্মরণ করেছেন, "অনিলবরণের চিনি করতে পারার খবরটা নিশ্চয় দিয়ো। পারলে জাভা চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।"

হাসাবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা!

ওঁর 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে যে রকম আলোড়ন উঠেছিল, অন্য কোন বই সম্বন্ধে এতো বোধ হয় ওঠেনি। তিনি উপেন গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন "...কাগজের জন্য প্রথম চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে, কি আর বলিব। সে আমার বহু দিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় জ—প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অস্বীকার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। এখন, দ্বিজবাবু প্রভৃতি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সম্পাদকও registery চিঠি ক্রমাগত লিখছেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। এমন কি, পুরাতন বন্ধু বান্ধব, club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি?..."

আর একটিতে "ফণীর * কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তারমত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না... আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ।... চরিত্রহীন তার কাগজে বার হবে না, একথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে সে যদি ধরিয়া বসিত যে সে-ই প্রকাশ করিবে, তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কিভাবে শেষ হয়, কোন কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে।" 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে ওঁর কত ভালো ধারণা! "...আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপর যাহা ভরসা নেই অবশ্য সে ও-রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহি

* ফণীন্দ্রনাথ পাল।

করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা যতদূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে), তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে লোক ইচ্ছা করিয়া একটা 'মেসের ঝি'কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরু গিরি করিলাম।"

ফণীবাবুকে লিখছেন, "···চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে! নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনিতেছি, ওটাতে "মেসের ঝি" থাকাতে রুচি নিয়ে একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক, লোকে যতই কেন নিন্দাকরুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা art এর ধার ধারে না, তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কায হবে। তবে ওটা psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel। এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।"

প্রমথ ভট্টাচার্য্যকে লিখেন, "···তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনের'—যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেকদিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি।···পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।···আমার এ সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে।" একদিকে এটা তার 'বকাটে' লেখা আর একদিকে "কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে। কেই বা ভাল বলিবে" লক্ষ্যণীয়। "তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত, তা হ'লে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হ'লে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না।···একটা কথা বলি, নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethics এর Student, সত্য Student, Ethies বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না।" উপরের এই কয়েকটি চিঠির ঘটনা থেকে অনুসন্ধান করা শক্ত নয় যে, 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়েছিল। 'যমুনা' বলে, আমার চাই 'চরিত্রহীন', 'ভারতবর্ষ' বলে আমায় না দিলে কান্নাকাটি করবো। শরৎচন্দ্র 'ক্রমশঃ' ভাবে গল্প উপন্যাস ছাপাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে ফণীবাবুর চিঠিতে পাই,···"রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম। এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে। বোধ করি একেবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না। কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয়না,"—আর একটিতে, 'পথ-নিদ্দেশ' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না।" এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি 'ক্রমশঃ' ভাবে লেখা প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। ক্রমশঃ প্রকাশের এমন একটি অসুবিধা, যে, দীর্ঘ দিনের নানারূপ চিন্তায় পাঠকবর্গের প্রকাশিত ক্রমশঃ গল্পের Link সহজেই হারিয়ে যায়। বোধহয় এই জন্যই তিনি এতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের লেখার সম্বন্ধে খুব বেশীরকম সজাগ ছিলেন, এবং সে লেখা যে ভালো, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। লেখকের যখন নিজের লেখার প্রতি প্রত্যয় জন্মে তখনই তাঁর লেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। শরৎচন্দ্রের এই প্রত্যয় ছিল, তাই তাঁর লেখা এত অপূর্ব ভাবে উৎরিয়েছে। ফণীবাবুকে লিখেছেন, "যে আমার লেখা পাড়তে ভালোবাসে, সে এই কাগজ [যমুনা] পড়িবে, এই আমার ধারণা। তাছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু, অশ্রদ্ধা ক'রে, বা-তা ক'রে, তর্জমা ক'রে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এসব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই।···চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই Grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালোবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি। শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ, একটা লেখা বটে।" এমনি ধরণের আরো অনেক ক'টি চিঠিতে দেখা যায় তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি কিরূপ বিশ্বাসী ছিলেন।

শ্রীসুশীলকুমার মণ্ডল সংগৃহীত

বাঁচতেই হবে

সুকুমার ঘোষ

সংঘাতে তবু বাঁচতেই হবে
হোক না ঝাপসা ধূসর ম্লান ;
ভাঙ্গা দেয়ালের পিঠের ছায়াতে
অস্বাভাবিক আলোর টান।

বিদ্রূপ গ্লানি বয়ে সয়ে আজও
সমস্যাগত সফলতার
রূপ নিয়ে আসে আগামী কালও
নিশ্চিত আশা, হয়নি হার।

আরেক সৃষ্টি—প্রস্তুতি তারই
অপরূপ সেই প্রণয়-বাক্ ;
ঘরভাঙা থেকে ঘর বাঁধাতেই—

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যশোর জেলার বুঢ়ন-গ্রামে যবনকুলে জন্ম হরিদাসের।

জাতিকুল নিরর্থক, যে-কোনো অবস্থায় বিষ্ণুভক্তি হতে পারে তাই বোঝাবার জন্যে এই নীচকুল নির্বাচন।

জাতিকুল নিরর্থক—সভে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে পূজ্য—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধমকুলেতে ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
সেইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥

বুঢ়ন ছেড়ে বেনাপোলে এসে জঙ্গলের মধ্যে কুটির তৈরী করেছে হরিদাস। সেখানে বসে সে, কী আশ্চর্য, তুলসীর সেবা করে আর রাত্রি-দিন নাম করে তিন লক্ষ। এর মধ্যে দু লক্ষ নাম মনে-মনে, আরেক লক্ষ সশব্দে, উচ্চরোলে। কেউ শুনুক সজ্ঞানে, এরই জন্যে সরব উচ্চারণ। মানুষ হও মানুষ, নয় তো পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ যে আছে কাছে, শোনো নামধ্বনি। দেখ মায়াবন্ধন থেকে পাও কিনা ত্রাণের উপায়।

পরমকরুণ হরিদাস। জীবমঙ্গলে নিযুক্ত করেছে নামকে।

ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষে করে খায়। নিষ্কিঞ্চন-ভাবে অবস্থান করে।

যে দেখে সেই আকৃষ্ট হয় হরিদাসে। এমন লোক আর হয় না। ভজন ছাড়া আর তার লক্ষ্য নেই জীবনে। চিন্তা নেই। উৎসাহ নেই। দেহ-দৈহিক নেই। শব্দে-নিঃশব্দে শুধু নাম, শুধু ভজন-পূজন। নামকীর্তনের প্রকটমূর্তি।

রামচন্দ্র খানের চোখ টাটাল। সে, যাকে বলে দেশাধ্যক্ষ, ও-অঞ্চলের জমিদার। সকলে হরিদাসকে গণ্য-মান্য করে, ভালোবাসে, এ তার অসহ্য হয়ে উঠল। কে একটা চালচুলোহীন লোক, পরের ঘরে ভিক্ষে করে বেড়ায়, বনের মধ্যে পাতার কুটিরে বাস করে, তার কি না এত প্রতিপত্তি! সকলের শ্রদ্ধাভক্তি কি না একা তারই জন্যে। আর সে এতবড় একটা জমিদার, দেশের মাথা, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দাঁড়াও, হরিদাসের জারিজুরি বার করে দি।

ওর সমস্ত জৌলুস তো সাধুতার, দুর্ভেদ্য বৈরাগ্যের। ওর সেই বৈরাগ্যের দেয়ালে যদি ছিদ্র করতে পারি, যদি ওর সংযমের বাঁধ দিতে পারি টলিয়ে, তাহলেই ও লোকচক্ষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওর সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না।

সুন্দরী গণিকা লক্ষহীরার শরণ নিল রামচন্দ্র।

বললে, 'তুমি হরিদাসকে চেন?'

'কে হরিদাস? বৈরাগী হরিদাস?'

'হ্যাঁ, ঐ জঙ্গলে যে কুটির বেঁধে বাস করে নির্জনে।'

'চিনি। নাম শুনেছি।'

'তোমাকে তার বৈরাগ্যধর্ম নাশ করতে হবে।' গম্ভীর হল রামচন্দ্র।

এক মুহূর্ত বা দ্বিধা করল লক্ষহীরা।

'কি, পারবে না? পারবে না ওর মনোহরণ করতে? ওর ভজন ভুলিয়ে দিতে?'

'পারব।' যৌবনগর্বিতা গণিকা দৃঢ় হল এবার। 'তিন দিনেই ওর মতিগতি ফিরিয়ে দেব। ঘটাব চিত্তচাঞ্চল্য।'

'বেশ, তবে আমার পাইক সঙ্গে দিচ্ছি, যথাকালে তোমাকে আর হরিদাসকে যেন বেঁধে আনে একসঙ্গে।'

'না, আগে একবার আমি নিজে গিয়ে দেখি। সঙ্গ করি।'

বিলাসবিভ্রমের সাজ ধরল গণিকা। নিশাযোগে অনাহূত দাঁড়াল এসে হরিদাসের দরজায়। দেখল কুটিরের সামনেই তুলসীমঞ্চ। কেন কে বলবে, নমস্কার করল তুলসীকে। ঘরের মধ্যে বসে আছে হরিদাস। কে জানে কেন, তাকেও নমস্কার করল লক্ষহীরা। কেউ তাকে কিছু বলে দেয়নি, শিখিয়ে দেয়নি, তবু কিসের প্রেরণায় তার এই প্রণিপাত? যার ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে, কেন তাকে এই সংবর্ধনা? এত বর্ণাঢ্য ফুলফল থাকতে কিসের তুলসীমঞ্জরী! নিজেকেই নিজে বুঝতে পারে না লক্ষহীরা। এ বুঝি বা বৈরাগীর মাহাত্ম্য। তার ভজনস্থানের মহিমা।

লক্ষহীরা উঠে এল ঘরের দাওয়ায়। প্রদীপ্ত দীর্ঘতায় দাঁড়াল দরজা ধরে। দেখ আমি বরণীয় কিনা। লোভনীয় কিনা।

উদাসীন হরিদাস। যেন আর কিছু দেখছে। আর কিছু ভাবছে।

দাওয়ায় বসল লক্ষহীরা। যৌবনকে অনাবৃত করতে লাগল। বললে, ঠাকুর, প্রথম যৌবনে তুমি কী অনিন্দ্যসুন্দর! তোমাকে দেখে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে। কোন্ নারীর না হবে! কে বল থাকবে নিস্পৃহ হয়ে। তোমার স্পর্শের জন্যে আমি কাঙাল হয়েছি, তোমাকে না পেলে বাঁচব না কিছুতেই।'

তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥

হরিদাস রুষ্ট হল না। মধুর স্বরে বললে, 'বেশ, ভালো কথা, তোমার বাসনা পূর্ণ করব। কিন্তু দেখছ আমার প্রত্যহের নিয়মিত নামসংখ্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। নামসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কাজ করি না। সুতরাং নামসংখ্যার সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করো। নামসমাপ্তি হলেই আমি তোমার আদেশ পালন করব। তুমি ততক্ষণ শোনো আমার নামকীর্তন।

তাই শুনি। লক্ষহীরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রাত্রিকাল। নির্জন বনের মধ্যে গোপন কুটির, সাক্ষাতে উপযাচিকা সঙ্গমোৎসুকা যুবতী নারী,—অথচ যুবক হরিদাস তন্ময় হয়ে নাম করে চলেছে। নামই কামকে রেখেছে ঘুম পাড়িয়ে।

রাত্রিমধ্যে নামসংখ্যার সমাপ্তি হল না। নাম করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

প্রভাত হতে ক্লান্ত হয়ে চলে গেল লক্ষহীরা। রামচন্দ্রকে গিয়ে বললে, 'আজ শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নিয়ে এসেছি। কাল নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে আকাঙ্ক্ষা।'

সন্ধ্যাগমে আবার লক্ষহীরা এসেছে হরিদাসের কুটিরে।

হরিদাস বললে, 'কাল তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।'

'কষ্ট!' বিভোরের মত তাকাল লক্ষহীরা।

'বা, কাল একটুও কোথাও শুতে পারোনি, ঘুমুতে পারোনি, ঠায় বসে রয়েছ নিঃশব্দে। যে আশা নিয়ে বসেছিলে, তাও পারিনি মেটাতে।' হরিদাসের কণ্ঠে কাতরতা ঝরে পড়তে লাগল: 'আমার অপরাধ নিও না। আমাকে মার্জনা কোরো।'

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।' এই বৈষ্ণবোপদেশ। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।' রূঢ়কথা বলে মনে কষ্ট দেওয়া বাক্যদ্বারা উদ্বেগ আর মনে মনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করা মনের দ্বারা উদ্বেগ। আর উদ্বেগ হলেই ভজনের ব্যাঘাত।

লক্ষহীরা আবার তুলসীমঞ্চকে প্রণাম করল। আবার হরিদাসকে। বসল দ্বারপ্রান্তে। বললে, 'মনোবাঞ্ছা আজকে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।'

'নিশ্চয়ই হবে।' আশ্বস্ত করল হরিদাস। 'আমার সংখ্যানামকীর্তন শেষ হোক। পরে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অঙ্গীকার করব। তুমি ততক্ষণ আমার নামকীর্তন শোনো।'

কাল সমস্ত রাত্রি শুনেছে। বিরক্তি ধরেনি এতটুকু। ক্লান্তি আনেনি একবিন্দু। সে নাম ঘুমকে তাড়িয়েছে। বসিয়ে রেখেছে একাসনে।

মন্দ কি, ভুবনমঙ্গল হরিনাম আর একটু শুনি। শুধু শুনি না, বলি, জিহ্বায় উচ্চারণ করি।

'হরি হরি।' কখন হঠাৎ বলে ফেলেছে লক্ষহীরা।

আবার রাত ভোর হতে চলল, নামকীর্তনে বিচ্ছেদ নেই। 'উষিমিষি' করে উঠল গণিকা। ঠাকুর আর কত আমাকে ছলনা করবে?

হরিদাস বুঝতে পারল তার মনের কথা। বললে, 'তুমি ভুল বুঝো না। মোটেই ছলনা করছি না তোমাকে। এক মাসে এক কোটি নাম নেব, এই এক ব্রত নিয়েছি। আজ সেই ব্রত সাঙ্গ হবে এমনি আশা করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত রাত ধরে নাম করেও তার পূরণ হল না। অল্পই আর বাকি আছে। কাল নিশ্চয়ই শেষ হবে। আর তখন স্বচ্ছন্দে, অবাধে আমি তোমার সঙ্গ করব।'

রামচন্দ্রকে সব বললে ফের লক্ষহীরা।

আবার সন্ধ্যা হতেই হরিদাসের ঘরের দুয়ারে অতিথি হল।

যথারীতি প্রণাম করল তুলসীকে, হরিদাসকে, আর নাম শুনতে-শুনতে ক্ষণে-ক্ষণে বলে উঠতে লাগল: 'হরি-হরি। হরি-হরি।'

প্রসন্ন-উজ্জ্বল মুখে বললে হরিদাস, 'আজ আমার সংখ্যানাম পূর্ণ হবে। তখন তোমার মনের বাসনাও পূর্ণ করব।'

কীর্তন করতে-করতে আজও রাত প্রভাত হল। হরিদাস বললে, 'এতক্ষণে আমার সংখ্যাপূর্তি হল। বল, মনে এখন তোমার কিসের বাসনা?'

'কৃষ্ণসেবার বাসনা।' লক্ষহীরা হরিদাসের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'প্রভু, আমার পাপের অন্ত নেই, তবু কৃপা করে নিস্তার করুন আমাকে। আমি আমার নিজের বুদ্ধিতে আসিনি, রামচন্দ্র খান আমাকে পাঠিয়েছে—'

'আমি সব জানি।' বললে হরিদাস, 'তার জন্যে রামচন্দ্রের প্রতি আমার দুঃখও নেই, রাগও নেই। আমি বরং তোমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম।'

'আমার জন্যে?' লক্ষহীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'এক পাপাচারিণী গণিকার জন্যে?'

'রামচন্দ্র যেদিন প্রথম তোমাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করল, আমি তো সেদিনই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যেতে পারতাম। কিন্তু গেলাম না কেন? গেলাম না, শুধু তোমাকে উদ্ধার করব বলে।'

সেইদিন আমি যাইতাঙ এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাঙ তোমা-নিস্তার লাগিয়া॥

'তবে কৃপা করে বলুন, কী করে আমার ভবক্লেশ দূর হবে।'

'তোমার যা-কিছু আছে ঘরের দ্রব্য, সব ব্রাহ্মণকে দান করে দাও। তারপর আমার এই কুটিরে এসে বাস করো।'

'আপনার কুটিরে?' লক্ষহীরা আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, নইলে আর কোন্ ঘর আছে তোমাকে আশ্রয় দেবে? এখানে থেকে সর্বদা হরিনাম করবে আর তুলসী সেবা করবে।' হরিদাস বললে উদারস্বরে: 'আর এতেই পাবে তুমি কৃষ্ণচরণ। আর তাতেই ভববন্ধনের অবসান।'

এই উপদেশ দিয়ে হরিদাস বেনাপোল ছেড়ে চলে গেল চাঁদপুর, সপ্তগ্রামের কাছাকাছি।

আর, কী করল লক্ষহীরা?

সমস্ত গৃহবিত্ত ব্রাহ্মণদের দান করল। মাথা মুড়ল। একবস্ত্রে ঘর ছাড়ল। ঘর ছেড়ে চলে এল হরিদাসের কুটিরে। দিনে-রাত্রে তিন লক্ষ নাম করতে লাগল।

কিন্তু জীবনধারণের উপায় কী? উপায় চর্বণ আর উপবাস। ফল? ফল প্রেমানন্দ।

তুলসী-সেবন করে চর্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির মূল। মহতের কৃপা ছাড়া ভক্তি অলভ্য। 'মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।' কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ তো দূর-স্থান, মহতের কৃপা ছাড়া সংসারবন্ধনেরও ক্ষয় নেই।

শুধু সাধুসঙ্গেও হবে না, যদি সাধুকৃপা না লাভ হয়। সাধুসঙ্গ হল অথচ কোনো অপরাধের দরুণ সাধুকৃপা লাভ হল না, তাহলে পাব না ভক্তিফল। তবে সঙ্গ থেকেই কৃপালাভের সম্ভাবনা। আর যদি কোনো সাধুভক্তের কৃপায় কারুর মঙ্গলোদয় হয়, হরিকথায় শ্রদ্ধা জাগে, আর সে যদি সংসারে অত্যন্ত

বিরক্তও না হয় আসক্তও না হয়, তাহলেই তার ভক্তি সিদ্ধিপ্রদ। আর কী সে সিদ্ধি? সেই সিদ্ধি প্রেম। 'ভক্তিফল প্রেম হয়—সংসার যায় ক্ষয়।' তাই ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপাসাপেক্ষ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'আমার ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে যারা আমাকে ভজনা করে, শুধু তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।'

আর, প্রহ্লাদ বলছে তার গুরুপুত্রকে, যে পর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষদের চরণধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্যন্ত মানুষের মতি ভগবৎচরণ স্পর্শ করতে পারে না। আর শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি হলেই সমস্ত অনর্থের অপগম।

সুতরাং মহৎকৃপা ছাড়া ভগবানে রতি হয় না, আর ভগবানে রতি না হলে অনর্থনিবৃত্তি, সংসার-নিবৃত্তিও হবার নয়।

চাঁদপুরে বলরাম আচার্যের ঘরে এসে উঠল হরিদাস। হিরণ্য দাস আর গোবর্ধন দাস মুলুকের দুই মজুমদারের পুরোহিত বলরাম। রঘুনাথ দাস তখন বালক, পাঠশালার ছাত্র। প্রায়ই সে আসে হরিদাসের কাছে, যে নির্জনে পর্ণশালায় বসে কীর্তন ছাড়া আর কিছু জানে না। হরিদাসের কৃপা রঘুনাথের উপর গিয়ে পড়ল, যার ফলে পরবর্তী কালে নিমাইয়ের কৃপা পেল রঘুনাথ।

একদিন বলরাম বহু মিনতি করে হরিদাসকে মজুমদারদের সভায় নিয়ে গেল। হরিদাসকে দেখে দু ভাই, হিরণ্য আর গোবর্ধন পায়ে পড়ে প্রণাম করল, সম্মানিত আসন দিল বসতে। পণ্ডিতসভায় অনেক সজ্জন বিদ্বান উপস্থিত, স্বভাবতই নাম-মাহাত্ম্যের কথা উঠল। কেহ বললে, নামই মোক্ষ-লাভের উপায়। হরিদাস, তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম কর, তুমিই বল নামের ফল কী?

হরিদাস বললে, 'পাপক্ষয় আর মোক্ষ, এরা নামের প্রত্যক্ষ ফল নয়। নামের প্রত্যক্ষ ফল কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম হলে আর পাপ কোথায়, মোক্ষই বা কতদূর! সূর্য উঠলে অন্ধকার যেমন চলে যায়, তেমনি প্রেমোদয় হলে আর পাপ থাকে না, মুক্তিও পাওয়া যায় সর্বত্র। মোক্ষ আর পাপক্ষয় নামের আনুষঙ্গিক ফল। কিন্তু যে ভক্ত, কৃষ্ণ—দিতে চাইলেও মুক্তি সে ছোঁয় না।

মুক্তি? মজুমদারদের আরিন্দা, খাজনা আদায়ের কর্তা, গোপাল চক্রবর্তী জিগগেস করল,—মুক্তি হয় কিসে?

মুক্তি তো তুচ্ছ ফল। মাত্র নামাভাস থেকেই মুক্তিলাভ করা যায়।

যেমন করেছিল অজামিল। সে মহাপাপী, কিন্তু যে মুহূর্তে পুত্রকে ডাকবার ছলে আভাসমাত্র চার অক্ষর 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেছে, সেই মুহূর্তেই তার পাপরাশি ভস্ম হয়ে গেছে। কোটিজন্মকৃত পাপেরও ঘটেছে প্রায়শ্চিত্ত। বিষ্ণুদূতরা চলে আসতেই তাদের সঙ্গলাভ হবার দরুণ তার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হল। ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় থেকে প্রত্যাহরণ করে আত্মাতে সে মনঃসংযোগ করল। তারপর চিত্তের একাগ্রতায় দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত করে ভগবানে নিযুক্ত করল। চলে গেল বৈকুণ্ঠে। যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ।

> নামাভাসই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির হেতু।
> নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
> শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥
> হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়।
> শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥

কিন্তু গোপালের এসব যুক্তিহীন ভাবুকতা সহ্য হল না। হরিদাসকে সে উপহাস করে উঠল। উপস্থিত পণ্ডিতদের সম্বোধন করে বললে, 'ভাবুকের কথা শুনুন সকলে। কোটিজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করেও যে মুক্তি পাওয়া যায় না, এই ভাবুকের কথায় তা কিনা মাত্র নামাভাসেই পাওয়া যাবে অনায়াসে। নির্বুদ্ধিতার স্পর্ধা আর কতদূর যেতে পারে? তপস্যা-টপস্যা সব চুলোয় গেল, শুধু ছল করে নাম করলেও নাকি মুক্তি!'

'আমাকে দোষ দেবেন না।' বিনীত কণ্ঠে বললে হরিদাস, 'এ স্বয়ং শাস্ত্রের কথা।'

'নামাভাসমাত্রেই যদি মুক্তিলাভ হয়, ভক্তরা তবে তা হাত বাড়িয়ে নেয় না কেন?' ক্রুদ্ধ-ভঙ্গি করল গোপাল। 'কেন তবে তারা কষ্ট করে সাধন-ভজন করে?'

'বলেছি তো, ভক্তিসুখের কাছে মুক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ।' বললে হরিদাস, 'সাযুজ্যমুক্তিতে কি আনন্দ

নেই? আছে। কিন্তু তাতে আনন্দের বৈচিত্র্য নেই, চমৎকারিতা নেই। যে ভক্তির এই আনন্দ-চমৎকারিতার স্বাদ পেয়েছে, সে আর ব্রহ্মানন্দকে চায় না। সমুদ্র পেলে কে আর চায় গোষ্পদকে?'

কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাল গোপাল। সে বাজি ধরল। বললে, 'বেশ, বাজি ধরো, যদি শাস্ত্রের প্রমাণে নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহলে তোমার নাক কেটে দেব।'

'স্বচ্ছন্দে।' হরিদাস এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু যদি শাস্ত্র-প্রমাণে বিপরীত সাব্যস্ত হয়, তাহলে কী হবে? গোপাল কী করবে? সে দিক দিয়ে কোনো সর্ত আরোপ করল না হরিদাস। হরিদাসের মনে কোনো ক্রোধ নেই, কাঠিন্য-কার্পণ্য নেই।

সভাস্থ সকলে হাহাকার করে উঠল। নাম-মাহাত্ম্যকে অবজ্ঞা করছে গোপাল, আর নামমূর্তি স্বয়ং হরিদাসকে. কী না জানি অমঙ্গল হয় গোপালের!

বলরাম ক্ষেপে উঠল, গোপালকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি এক মহাপণ্ডিত মহাতার্কিক এসেছ। যারা ঘটাকাশ পটাকাশ করে, যাদেরকে সকলে ঘট-পটিয়া বলে, তাদের একজন হয়ে তুমি ভক্তির কী বুঝবে?'

মজুমদাররা দু ভাই আরো চটল। চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিল গোপালকে।

সমস্ত সভা হরিদাসের পায়ে পড়ল। আমাদের কোনো দোষ নিও না।

'না, তোমাদের কী দোষ। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারই বা কী দোষ।' করুণ নেত্রে গোপালের দিকে তাকাল হরিদাস। 'তার মন তর্কনিষ্ঠ। কিন্তু নামমাহাত্ম্য তো তর্কের গোচর নয়। নাম চিৎস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত। তাই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তর্ক করে নামমহিমা আয়ত্ত করা যায় না। সে আয়ত্তির বিষয় নয়, আস্বাদের বিষয়। আর যেখানে বিষয় অপ্রাকৃত, সেখানে শাস্ত্রের উক্তি ছাড়া কিছু নেই নির্ভর করবার।'

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এইসব তত্ত্ব?

'কিন্তু আপনাকে কী রকম অপমান করল গোপাল—'

'না, না, আমার জন্যে কারুর কিছু দুঃখ পেতে হবে না।' অদোষদর্শী হরিদাস বললে, 'কৃষ্ণ সকলের কুশল করুন।'

হিরণ্য দাস গোপালকে বারণ করে দিল, তার বাড়িতে যেন না ঢোকে। যদিও গোপালের দোষ হরিদাস ধরেনি, তবুও ভগবান তাকে শাস্তি দিলেন। গোপালের কুষ্ঠ হল, নাক খসে পড়ল, হাতের আঙুল কোঁকড়া হয়ে গেল।

এ কী অঘটন।

ভক্ত অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে, কিন্তু ভগবান ভক্তনিন্দা সইতে পারে না।

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥

গোপালের কথা জেনে ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল হরিদাস। বলরামের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল শান্তিপুর। অদ্বৈতের সঙ্গে মিলতে। [ক্রমশঃ।

প্রার্থনা

শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

রাত্রির বন্ধুর পথ শেষ হয়ে এলে
শিশির-ভেজা ঘাসে তুমি তোমার
প্রথম স্বাক্ষর এঁকে দিও। তখন আমি আর
আকাশ চাইবো না; ভুলবো চেনা ঘর।
তারপর মেঘে মেঘে বেলা হলে
বিষণ্ণ এক সাপের মত তোমার ক্লান্তি
আমায় ফিরিয়ে দেবে অতীতের স্মৃতিগুলি···
সেই একতারা হাতে বাউল, ধূলিরাঙা উদাসী পথ,
আমার কৈশোর যেখানে এক অনির্বাণ স্বপ্ন হয়ে ছিল।

দার্শনিক অলডাস হাক্সলি

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে গঙ্গার তীরে হাজার হাজার স্নানার্থীর সমাবেশ হয়েছে। রাহু এসে গ্রাস করবে সূর্যকে, আর সেইজন্য যাতে রাহুর সেই অশুচি স্পর্শ থেকে সূর্যদেব তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করতে পারেন, হাজারো কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে। কিছুদূরে এক জায়গায় শ্রেণীবদ্ধভাবে বসেছে সাধুসন্ন্যাসীর দল। তারা যোগাসনে বসে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। এক বিদেশী পর্যটকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া হাস্যকর বই কি! সাধুদের লক্ষ্য করে পর্যটক ঠাট্টার সুরে লিখেছেন—

"It was the Lord Krishna himself, who, in the Bhagavad Gita, prescribed the mystic squint. Lord Krishna, it is evident, knew all that there is to be known about the art of self-hypnotism'.

পর্যটক হচ্ছেন অলডাস হাক্সলি, এসব কথা লিখেছেন তিনি 'জেস্টিং পাইলেট' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ১৯২৬ সালে। অলডাস হাক্সলির জীবনে তখনো নাস্তিক্যের যুগ চলছে। সুতরাং সে সময়ে ওরকম বেপরোয়া ঠাট্টা তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ছিল না। গীতাপাঠকরা জানেন, হাক্সলি সাধুদের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ উক্তির ইঙ্গিত করছেন।

'সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥'

অর্থাৎ, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্নপূর্বক দেহ, মস্তক এবং গ্রীবাদেশ সমভাবে ধারণ করে আপন নাসিকাগ্রে অনন্যদৃষ্টি হবেন।

গীতায় নানা রকম যোগের কথা বলা হয়েছে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, ইত্যাদি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ চিত্তকে স্থির রাখবার একটা প্রক্রিয়ার কথা বলছেন অর্জুনকে। আর এর ভেতর ভারতভ্রমণকারী ইংরেজ ব্যঙ্গরসিক অলডাস হাক্সলি 'আত্মসম্মোহনের কলাকৌশল' আবিষ্কার করলেন।

এই হাক্সলি যিনি পাতার পর পাতা সাধু আর স্নানার্থীদের ব্যঙ্গ করেছিলেন, গীতার বিখ্যাত শ্লোকটিকে স্মরণ করে 'যোগীদের ট্যারা চোখ' বলে বাঁকা হেসেছিলেন, সেই নাস্তিকপ্রবর হাক্সলির ওপর ভারতবর্ষ সূক্ষ্ম ও সুন্দর একটি প্রতিশোধ নিয়েছে। অধুনা প্রকাশিত ভগবদ্গীতার এক ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন অলডাস হাক্সলি। তাতে গীতা সম্বন্ধে তাঁর বর্তমান চিন্তা এইরূপ—'The Bhagavad Gita is perhaps the most systematic scriptural statement of the Perennial Philosophy.'

অর্থাৎ, ভগবদ্গীতা বোধহয় শাশ্বত দর্শনের সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা।

সেই ১৯২৬এর 'জেস্টিং পাইলেট'-এর হাক্সলি আর আজকের 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'র হাক্সলি এক ব্যক্তি নয়, অথবা, যথার্থ বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে, এক ব্যক্তি হলেও তাঁর মনের চিন্তাভাবনা বিস্ময়কর রূপান্তর লাভ করেছে। হাক্সলি এখন ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। পশ্চিমে প্রাচ্যদর্শনের সুবিখ্যাত প্রচারক, স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রীস্টোফার ইশারউডকৃত গীতার ইংরেজি তর্জমার ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকাও তাঁর লেখা। স্বামিজীরা আজকাল অলডাস হাক্সলির ওপর প্রবন্ধ লেখেন।

এক ফরাসী লেখক অনেকদিন পূর্বে হাক্সলিকে 'ইউরোপের বায়ুরোগ' আখ্যা দিয়েছিলেন। আখ্যাটির ভেতর হাক্সলির বিস্তৃত অধ্যয়ন, আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সর্ববিষয়ে অদম্য কৌতূহলের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু একটু চাপা বিদ্রূপও কি ছিল না? যখন যে দিকে হাওয়া বইছে, তখন তিনি সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নিজের যেন কোন গতি নেই, চলার ক্ষমতা নেই। অপরের ভাবনা চিন্তা কুড়িয়েই তাঁর দিন গেল। কিন্তু হাক্সলি সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত, চমকপ্রদ উক্তিটি, আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ সত্য নয়। হাক্সলি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে, গল্পে, উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর নানা মতামতকে নিজের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা, একটা বিপরীত চিন্তা ও সন্দেহও তাঁর ছিল। প্রথম দিকের রচনায় একটা বড় সন্দেহই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে-সময়কার উপন্যাসগুলো পড়লেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'ক্রোম ইওলো,' 'এ্যান্টিক হে,' 'দোজ ব্যারেন লিভস,' এমন কি কিছু পরিণত বয়সের 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'ও হাক্সলির সন্দেহ ও নাস্তিক্য (নাস্তিক্য কেবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়) ধারণ করে আছে। পাত্রপাত্রীদের মুখে আধুনিককালের সকল বাক-বিতণ্ডা-বিতর্ক তিনি সুকৌশলে বসিয়ে দিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন কোন আলোচনা-সভায় বসে বিদগ্ধমণ্ডলীর পরস্পরবিরোধী মতামত শুনছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিভিন্ন বিচিত্র ভাবনা, সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলো ফুলঝুরির মত শূন্যে নানা রং কেটেই নিভে যায়। লেখক নেপথ্যেই থাকেন, তিনি কোন বিশেষ পক্ষের নন; নিরপেক্ষ থেকেও যে সকল মতের একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবেন তাও নয়, এক প্রকার নাস্তি নাস্তির শূন্যবাদকে তিনি যেন মেনে নিয়েছেন—এই রকম মনে হয়।

পরবর্তীকালে 'এণ্ডস্ এ্যাণ্ড মীনস্' গ্রন্থে হাক্সলি স্বীকার করেছেন যে, জীবনের কোন তাৎপর্য তিনি বা তাঁর সমসাময়িককালের যুবকেরা তখন খুঁজে পাননি। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মোহভঙ্গের যুগ। অনেক মিথ্যা আদর্শের সঙ্গে পুরণো মূল্যগুলোও ভাঙতে সুরু করেছে। সেই ভাঙনের মুখে, সেই মোহ মোচনের ম্লান গোধূলি-ছটায় 'অর্থহীনতার দর্শন', হাক্সলি যাকে ইংরাজিতে বলেছেন 'ফিলসফি অব মিনিংলেস নেস' নবীনরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এরকম সার্বিক অর্থহীনতা আপাত উত্তেজক হলেও, বিশেষ করে যৌবনের প্রথম লগ্নে, বেশিদিন তাকে সহ্য করা যায় না। তাই জীবনের নতুন অর্থ অন্বেষণে কেউ চলে গেল কমিউনিজমের লাল নিশানের নীচে, এলিয়টের মত কেউ শান্তি পেল ইংলণ্ডের চার্চে আর পশ্চিমী সভ্যতার ঐতিহ্যে, কেউ বা রোমান ক্যাথলিক আশ্রয়ে। কিন্তু অলডাস

হাক্সলির মন, যে মন অত্যন্ত সজাগ, অতি সচেতন, বহু অধ্যয়নে পরিশীলিত, এক অন্ধ-বিশ্বাস থেকে আর এক অন্ধ-বিশ্বাসে ঝাঁপ দিতে রাজি হয়নি। তাই ধীরে ধীরে তাঁকে ওপরে উঠতে হয়েছে, সন্দেহ অবিশ্বাসের চোরাবালি থেকে ওপরে, একটু একটু করে গড়তে হয়েছে তাঁর সমন্বয়ী ধর্মবিশ্বাসকে।

হাক্সলির চিন্তার এই বিবর্তনের দিক থেকে তাঁর 'আইলেস ইন গাজা' উপন্যাসটি বিশেষ মূল্যবান। এর যে নায়ক, এ্যান্টনি বিভিস—সে লেখকেরই মানস প্রতিচ্ছবি। সেও যুদ্ধোত্তর কালের নাস্তিক যুবক, ভোগবাদ, সুখবাদ, শূন্যবাদের আবহাওয়ায় সেও গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে কেবল সুখ আর সম্ভোগে তৃপ্ত নয়। জীবনের একটা সামগ্রিক তাৎপর্য সে লাভ করতে চায়। সে চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, আর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের মনোভূমি খুঁজে পায় এক ঈশ্বরভিত্তিক ঐক্যবোধে। সব মানুষ, কেবল মানুষই বা কেন, সব জীব ও জীবন এক সত্তার স্ফুরণ। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি পরস্পর থেকে, বিভিস এইভাবে চিন্তা করছে, আর এই বিচ্ছিন্নতা, এই পার্থক্য হচ্ছে অশান্তির মূল। গভীরে নেমে যেতে হবে, গভীরে রয়েছে শান্তি, সেখানে পৌঁছে অনুভব করতে হবে ঐক্য। বিভিস তার ডায়েরির পাতায় সূত্রাকারে টুকরো টুকরো বাক্যে লিপিবদ্ধ করেছে তার ধারণা। একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ নিচ্ছি—

'Frenzy of evil and separation. In peace there is unity. Unity with other lives. Unity with all being.'

—অশুভ আর বিচ্ছিন্নতার এই উন্মত্ততা। শান্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঐক্য। ঐক্য সকল জীবের সঙ্গে, সকল প্রাণের সঙ্গে।

'আইলেস ইন গাজা' লেখার সময় থেকেই হাক্সলি খৃষ্টীয় মিষ্টিসিজম এবং ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তদর্শনের দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। মিষ্টিকদের অপরোক্ষ অনুভূতি, বৌদ্ধধর্মের উদারতা ও অহিংসা, এবং বেদান্তের সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভেতর হাক্সলি যেন দেখতে পেলেন নতুন আলো। ধর্ম মানেই গোঁড়ামি নয়, সাম্প্রদায়িক অন্ধতা নয়, পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মমতগুলির ভেতর থেকে কয়েকটি মৌল নীতিকে বের করে আনা যায়। তাদেরই নাম দিয়েছেন হাক্সলি শাশ্বত দর্শন। 'আইলেস ইন গাজা'তে যে ধারণাটি ছিল সূত্রাকারে, অঙ্কুরাবস্থায়, তাই ক্রমে আরও চিন্তা, অনুশীলন ও অনুভবের দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে রূপ নিয়েছে শাশ্বত দর্শনে। আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের যে অবস্থা, তাতে আশা করা যায় না যে, কোন একটি ধর্মকে সকল মানুষ গ্রহণ করবে। অথচ একটি সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বাস না থাকার ফলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে শান্তি ও সংহতি গড়ে তোলা যাচ্ছে না। হাক্সলি প্রায় গণিতবিদের মতই সতর্কভাবে ধর্মশাস্ত্র সমূহের একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক কষে বের করে এনেছেন। সংক্ষেপে তাঁর এই শাশ্বত দর্শনের সূত্রগুলোকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

এক,—বিশ্বের চেতন অচেতন সব পদার্থই এক অসীম অনন্ত দিব্যসত্তার প্রকাশ। হিন্দু দর্শনে এই সত্তাকে বলা হয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মের প্রথম বিকাশ ত্রিধারায়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে। বৌদ্ধরা দিব্য সত্তাকে বলেন মহামন বা জ্যোতির্ময় শূন্য। দেবতাদের স্থানে তাঁরা বসিয়েছেন ধ্যানীবুদ্ধদের। খৃষ্টধর্মের সঙ্গেও এ ধারণার কোন বিরোধ নেই। খৃষ্টান মরমীরাও বলেন যে, এক ঈশ্বর আদি ও অনন্ত। জগৎপিতা, ত্রাণকর্তা পুত্র (যীশু) ও আত্মা—এই ত্রয়ী—সেই ঈশ্বর-সত্তারই তিনটি বিভাব। সুফীদের উপলব্ধিতেও ধরা দিয়েছে এক পরম সত্য, আল হক্।

দুই,—দিব্য সত্তা সম্বন্ধে যে আমরা কেবল বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে পারি তা নয়, তাকে উপলব্ধিও করতে পারি। সব ধর্মেই এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি, অপরোক্ষানুভূতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তিন,—মানুষের স্বভাবে রয়েছে দুটো দিক। এক—তার বাইরের ব্যক্তিত্ব, আর ক্ষুদ্র ভাসমান অহং, অন্যটি তার অমর আত্মা যা সেই দিব্য জ্যোতিরই একটি কণা। এই আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েই মানুষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারে, কেননা আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

চার,—পৃথিবীতে মানবজীবনের একটি কাম্য, একটিমাত্র উদ্দেশ্য রয়েছে—নিজের স্বরূপকে জানা, দিব্য সত্তাকে উপলব্ধি করা।

ঘাম ঝরছে অবিরাম

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

অহরহ মানুষের শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, কিছু তার আগোচরে ঘটে যাচ্ছে। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত। অন্যগ্রহের পরিচিতি তার নখ-দর্পণে। কিন্তু তার নিজের শরীরের মধ্যে প্রতি মূহুর্তে যে বিরাট রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যজ্ঞ চলছে, তার বিষয় হয়তো কিছুই জানে না। বিশ্বের যতো রসায়নাগারের প্রক্রিয়া আছে সমস্ত একত্র করলে একজন মানুষের দেহের প্রক্রিয়ার একাংশ হবে কিনা সন্দেহ।

এই বিরাট রসায়ন-ক্রিয়ার সামান্য এক অংশ হল মানুষের দেহের স্বেদ রচনা। স্বেদ রচনা আপাতঃদৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং সাধারণের ধারণা শরীরের কেবল দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে যায়। স্বেদ সৃষ্টি করে স্বেদ-গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি দেহের চর্মের মধ্যে স্থিত এবং গ্রন্থির মুখ দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত। স্বেদ-গ্রন্থির সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুপ্রান্তের যোগ আছে। স্নায়ুপ্রান্ত স্নায়ুশিরার মাধ্যমে স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্নায়ুমণ্ডলী কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে, সেই উত্তেজনা স্নায়ুশিরা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্নায়ুপ্রান্তে উপনীত হয় এবং স্নায়ুপ্রান্তের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বেদ-গ্রন্থিগুলিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

স্বেদ-নিঃসরণ আমাদের সর্বদা হচ্ছে। কোন সময়ে আমরা অনুভব করতে পারি, কোন সময়ে আমরা অনুভব করতে পারি না। যে স্বেদের নিঃসরণ আমরা অনুভব করতে পারি না, তাকে বলা হয় অনুভবহীন-স্বেদ। এ-ছাড়া যে স্বেদ সৃজিত হয় স্বেদগ্রন্থি থেকে,

তার বিষয় বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের দেহে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ স্বেদগ্রন্থি আছে। এই স্বেদগ্রন্থিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থির ইংরেজী নামকরণ হল এক্রিন গ্রন্থি (Eccrine gland)। এক্রিন গ্রন্থির নাম হয়েছে খুব সম্ভব প্রাচীন গ্রীক ভাষার 'এক্রেসিস্' শব্দ থেকে। এক্রেসিস্ কথার অর্থ নিঃসরণ। এক্রিন গ্রন্থি দেহের সর্বত্র বিরাজিত এবং এ থেকে জলের মত তরল স্বেদ নিঃসৃত হয়। এ ছাড়া আমাদের দেহে আর এক প্রকার স্বেদগ্রন্থি আছে; এই গ্রন্থির নাম অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি (Apocrine gland)। অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি, এক্রিন গ্রন্থির চেয়ে আকারে বড় এবং নিঃসরণও করে অদ্ভুত এক প্রকার স্বেদ। এই স্বেদ-গ্রন্থিগুলি পুরুষের বগলে, নারীর স্তনাগ্রে এবং জনন-গ্রন্থির আশে পাশে অবস্থিত। অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি থেকে যে স্বেদ নিঃসৃত হয়, তা সাধারণ স্বেদের চেয়ে ঘন এবং তাহাতে অদ্ভুত একপ্রকার গন্ধ বর্তমান। সাধারণ ঘামের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায়, এই ঘামে সে সব জিনিষ পাওয়া যায় না। এই স্বেদের বিষয়ে ডা: ইয়াম কুনু ভারি কৌতূহলব্যঞ্জক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রাণী-জগতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় উভয়কে আকর্ষণ করছে। পশু-জগতে পরস্পরকে আহ্বান করবার পদ্ধতি আছে, কোন পশু বিশেষভাবে চীৎকার করে আহ্বান করে, কোন প্রাণী অন্য কোন ভাবে করে। মানুষের মধ্যে চীৎকার নেই, অহেতুক আহ্বান নেই। সেটা সমাজবিরোধী বলে। মানুষের মনের মধ্যে যখন যৌনলিপ্সা জেগে ওঠে, তখন কয়েকটি অঙ্গ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি তাদের মধ্যে অন্যতম। অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ স্বেদ-রচনা হয়।

সাধারণত: আমরা গ্রীষ্মকালে ঘামি। বাইরের আবহাওয়া গরম থাকলে স্বভাবতই দেহের অভ্যন্তরও গরম হয়ে ওঠে। শরীরের আভ্যন্তরিক গরম যদি দেহের বাইরে বের করে না দেওয়া যায়, তাহলে সমস্ত দেহ দেহের নিজস্ব উত্তাপে ঝলসে যাবে। বাইরের গরম যে মুহূর্তে শরীরের চর্মে এসে স্পর্শ করলো, শরীরের স্নায়ুপ্রান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং সেই উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীতে পৌঁছে গেল। স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনায় স্বেদ-গ্রন্থির স্নায়ুপ্রান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ফলে স্বেদ রচনা হয়।

মনের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে দেহে স্বেদের সৃষ্টি হয়। এ স্বেদ সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে না। আবেগের ঘাম সাধারণত: হাতের চেটোয়, পায়ের তলায় এবং বগলে ফুটে ওঠে। অত্যন্ত বেশী মানসিক উত্তেজনা ঘটলে অনেক সময়ে সর্বাঙ্গে ঘাম সৃষ্টি হয়, এ ঘাম-সৃষ্টি করে মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্র।

ব্যায়ামজাত স্বেদের কথা সর্বজনবিদিত। এই স্বেদ মানসিক কেন্দ্র ও উত্তাপকেন্দ্র উভয়ে একসঙ্গে সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও মানুষের স্বেদ আরও অনেক কারণে সৃষ্টি হয়, যথা অত্যধিক বমি করলে, জাহাজে বা বিমানে চড়লে, কোন কারণে দম বন্ধ হয়ে এলে এবং সর্বোপরি অনেক সময়ে সাধারণ নিদ্রার সময়।

স্বেদকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষিত করে দেখা গেছে—এর মধ্যে লবণ প্রচুর পরিমাণে আছে। এ ছাড়া ইউরিয়া আছে এবং অত্যধিক পরিশ্রমের ঘাম সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে 'ল্যাকটেট' আছে। এগুলি সমস্তই দেহের দূষিত পদার্থ। কিছুকাল পূর্বেও আমাদের ধারণা ছিল, স্বেদের ভিতর দিয়ে শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে যায়। ইদানীং কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সে দৃষ্টি-ভঙ্গী ক্রমশ: পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। ডা: পট্টবর্দ্ধন ও ডা: হোসেন গ্রীষ্মদেশবাসীর স্বেদ নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, স্বেদের সঙ্গে শরীরের লৌহধাতু নির্গত হয়ে যায়। লোহা দেহে রক্ত সৃষ্টির জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। আমাদের দেশের লোক সাধারণত: রক্তাল্পতায় ভোগেন; তার অন্যতম কারণ অধিক স্বেদ নিঃসরণ। ডা: সালগানিক মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি দেখেছেন স্বেদের সঙ্গে লবণ, লৌহধাতু এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন নিঃসৃত হয়ে যায়। ভিটামিনের মধ্যে রিবোফ্লেবিন, থিয়ামিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ও ভিটামিন সি নির্গত হয়ে যায়।

তাহলে কি দেহের ঘাম ভাল? ভাল। এইজন্য ভাল যে, শরীরের উত্তাপকে ঠিক মাত্রার মধ্যে রাখতে সাহায্য করে। বাইরের আবহাওয়ায় যত গরম হবে, শরীরের মধ্যে থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে তত স্বেদ সৃষ্টি হবে। যে দূষিত পদার্থগুলি দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়, সেগুলিরও নিষ্কৃতি একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে রক্ত দূষিত হয়ে যায় এবং একবার রক্ত দূষিত হলে এই পদার্থগুলি যকৃৎ, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয় এবং প্লীহায় জমা হয়। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

স্বেদ নিঃসরণে যে পরিমাণ জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়ে যায়, তার পূর্ত্তি দেহের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। আধুনিককালের বিশেষজ্ঞদের অভিমত, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মদেশবাসীর উচিত প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর জলীয় পদার্থ পান করা। উজবেকস্থানের আদিবাসী প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন কাজ করে, তখন দিনের বেলায় গুরুপাক কোন খাদ্য খায় না। সারাদিন চা, কফি, সরবৎ এবং ফলের রসের তৈরি মদ পান করে। সন্ধ্যার পর, আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হলে গুরুপাক ভোজ্য গ্রহণ করে। আমাদের দেশেও স্বাস্থ্য যদি সবল ও সুস্থ রাখতে হয়, তাহলে গরমের সময় নানা রকম ফলের রস খাওয়ার প্রয়োজন। ফলের রস অর্থে আমি বেদানা, ন্যাসপাতির উল্লেখ করছি না। গ্রীষ্মকালে স্থানীয় যে ফল সংগ্রহ করা যায়, যথা কাঁচা আম, ডাব প্রভৃতি, তার রস। ডাব খেতে পারলে সব চেয়ে ভাল। এই ফলটি যেন ক্রান্তীয় দেশের অধিবাসীদের জন্য একান্তভাবে সৃষ্ট। বেলের সরবৎও দেহকে পুষ্টিদান করতে পারে। বহিরাগত পুষ্টিকর খাদ্যের চেয়ে, আমাদের জলাদেশের তৈরি খাদ্য আমাদের পক্ষে অনেক পুষ্টিকর। পোলাও, কালিয়ার নাম অত্যন্ত লোভনীয় এবং প্রত্যেকেরই লোভ হয় খেতে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মদেশের অধিবাসীর পক্ষে এই গুরুপাক খাদ্য হজম করা বেশ আয়াস সাপেক্ষ। তার চেয়ে পান্তাভাত অনেক পুষ্টি ও শীতলতা দান করতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকসম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে ভোর বেলায় উঠে পান্তাভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠে চলে যায় চাষ করবার জন্য। শীতকালে গরম ফ্যানে ভাত আলু সেদ্ধ অথবা কাঁঠাল বিচি সেদ্ধ আর নুন দিয়ে খেয়ে ছোটে মাঠে। অথচ তাদের স্বাস্থ্য অটুট এবং অনেক বেশী কষ্টসহিষ্ণু। দেশ ও আবহাওয়ার অনুকূলে যদি খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহলে অহেতুক অসুস্থতার হাত থেকে বাঁচা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ—সান্ধ্য-বৈঠকে

(অনুবাদ)

নীরদবরণ

এই বৈঠকগুলির জন্ম হল ১৯৩৮ সালে নবেম্বর মাসে ঠিক দর্শনের মুখে শ্রীঅরবিন্দের পা ভাঙার দুর্ঘটনার পর। তখন তাঁকে নির্জন বাস বন্ধ করতে হয় এবং ডাক্তার মণিলাল আম্বালাল পুরাণী চম্পকলাল, ডাক্তার বেচারলাল, ডাক্তার সত্যেন্দ্র ও আমি—এই ক'জনের উপর তাঁর সেবাশুশ্রূষার ভার পড়ে। মণিলাল ছাড়া সকলেই আশ্রমবাসী সাধক। তিনি বরোদা থেকে প্রতি দর্শনে যাতায়াত করতেন। আরও দু'একজন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে—ডাক্তারী কারণে।

গোড়ায় যখন শ্রীঅরবিন্দকে অগত্যা বিছনায় শুয়ে থাকতে হয়, সেই সময় তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সাথে আলাপ সুরু করেন এবং কয়েকবছর ধরে তা' চলতে থাকে। আমার বিশ্বাস, তাঁর সেবার প্রতিদান স্বরূপ তিনি আমাদের এই অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়েছেন। বৈঠকেই আমারা তাঁকে খুব কাছে পাই, যেন তিনি আমাদেরই পরম বন্ধু, এমন কি সখা। এমন কোন বিষয় ছিল না, যা আমরা নিঃসঙ্কোচে তাঁর সাথে আলোচনা করিনি। তিনিও তাঁর বহুদর্শী অভিজ্ঞতা ও হাস্য-মধুরতা দিয়ে আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে কার্পণ্য করেননি।

আমাদের মাঝে দু'একজন এসব কথার রেকর্ড রেখেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদ গেছে অনেক। পুরাণী তাঁর রেকর্ডের কিয়দংশ ইংরাজীতে ছাপিয়েছেন বলে আমি বাঙালী পাঠকের জন্যে আমার রেকর্ডের বাংলা অনুবাদ ছাপাতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। বাঙালী সমাজ এখনও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, অনেকে বিশেষ খবরই রাখেন না বললে ভুল হবে না। আশা করি, এই সমস্ত কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্বের আলো সেই অন্ধকার কিছুটা দূর করবে।

তবে বলে রাখা দরকার যে, রেকর্ডগুলো শ্রীঅরবিন্দের দেখবার অবসর হয়নি। তাঁর মতামতের জন্যে অনুবাদকই সম্পূর্ণ দায়ী।

আমি। ঋষিরা নাকি "মন্ত্র" শুনতেন: এটা কি অন্তঃশ্রুতি?

শ্রীঅরবিন্দ। হ্যাঁ, তাই। কখনও একটা লাইন, কখনও একটা স্তবক, আবার কখনও পুরো একটা কবিতাই শোনা যায়। এমন কি, একবারেই সবটা নেমে আসতে পারে। শ্রেষ্ঠ কবিতা ওভাবেই লেখা হয়ে থাকে।

আমি। আমার মনে আছে আমার কবিতার একটি লাইন—আপনি তার সুখ্যাতি করেছিলেন—'A fathomless beauty in a sphere of pain', যেন কেউ কাণে কাণে বলে গেল।

শ্রীঅরবিন্দ। তাই! এটাই অন্তঃশ্রুতি, কিন্তু তাতে বিপদও আছে; মাঝে মাঝে প্রতারিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কেননা নিম্নস্তরের প্রেরণাও ও রকম সহজে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আসতে পারে।

আমি। তা আবার বলতে! কতবার আমি ঠকেছি! মনে করেছি কী চমৎকার লাইন, কত স্বচ্ছন্দে এল। আর আপনার মন্তব্য তাদের ধূলিসাৎ করে দিল।

শ্রীঅরবিন্দ। স্বপ্নেও কত সুন্দর কবিতা লেখা হয়—যেমন অধিপ্রাকৃত (Surrealist) কবিতা, অথচ কাগজে বসালেই মনে হয় কী বাজে!

সেক্সপীয়ারের কবিতা ত বন্যার মত নামত, কিন্তু চতুর্থ হেনরীতে নিদ্রাকে সম্বোধন করে যে চারটি লাইন আছে,—

In cradle of rude imperious surge ইত্যাদি, এগুলো বাকি লাইনগুলির মাঝে যেন জ্বল জ্বল করছে। এরা যে উপর থেকে সোজা নেমে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা তাঁর সেই লিরিকটি—

Take, O, take those lips away, এ'র সমস্তটা উপর থেকে নেমে আসা।

এই সময় ডাক্তার মণিলাল এলেন। আমাদের আলোচনা থামল। [illegible] কবিতাভক্ত নন। এসেই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন, স্যার?" এটা তাঁর নিত্যকার প্রশ্ন। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে কখনও শুধু হাসতেন, কখনও হাতের ভঙ্গি করতেন, কখনও বা ডাক্তারকেই পাল্টা জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কেমন?" মণিলালও মিষ্টি হেসে "ভাল ঘুম হয়নি, স্যার!" "আজ বেশ হাল্কা লাগছে", ইত্যাদি উত্তর দিতেন। গুরু-শিষ্যের এই দৈনন্দিন স্বাস্থ্য-সংবাদ আমরা বেশ উপভোগ করতাম। মণিলালকে আসতে দেখলেই আমরা টিপ্পনি কেটে নিজেদের মাঝে বলাবলি করতাম, "এই, গুরুর স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা করবে এবার। চল, এগিয়ে যাই।" ভদ্রলোকও আমাদের কৌতুক বুঝতে পেরে হাসতেন। রসিক না হলেও সমজদার ছিলেন। সেজন্যে বোধহয় গুরু তাঁকে নিয়ে বেশ ঠাট্টাতামাসা করতেন।

কিছুক্ষণ পরে মা এলেন। তাঁর বসা মাত্র—

মণিলাল। মা, ছারপোকা, বিছু, মশা ইত্যাদি মারা কি পাপ? আমি মশা মারতে পারি, কিন্তু ছারপোকা মারতে হাত সরে না।

মা। কেন? দুর্গন্ধের জন্যে?

মণিলাল। হতে পারে; কিন্তু মারায় পাপ আছে কি?

মা। (হেসে) শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস কর না। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, যোগশক্তি দিয়ে মশাদের তাড়িয়ে দিতাম। শ্রীঅরবিন্দ তাতে আপত্তি করতেন।

শ্রীঅরবিন্দ। মশার সাথে বন্ধুত্ব করতে বলে'।

মণিলাল প্রশ্নটা আবার তুললেন।

শ্রীঅরবিন্দ। পাপ কাকে বলে? তুমি তাদের না মারলে তারা গিয়ে অন্যদের কামড়াবে ত? তাতে তোমার পাপ হবে না?

মণিলাল। কিন্তু তাদের যে প্রাণ আছে, স্যার—

শ্রীঅরবিন্দ। আছেই ত!

মণিলাল। যদি তাদের মারি—

শ্রীঅরবিন্দ। বেশ, তাতে কি?

মণিলাল। কেন, পাপ হয় না? আমি বলছি না যে আমরা বধ করি না, প্রতি নিঃশ্বাসে কত বীজাণু ত মারছি।

মা। (হেসে) ডাক্তারেরা মারে না?

মণিলাল। মারে বৈকি, কিন্তু সে তো ইচ্ছাকৃত নয়।

আমি। জৈনরা নাকি লোক ভাড়া করে এনে ছারপোকাকে তাদের রক্ত উপহার দেয়!

মণিলাল। ওসব গাঁজাখুরী গল্প!

শ্রীঅরবিন্দ। তবে একটা গল্পই শোন, ঐতিহাসিক। গজনীর মামুদ শা যখন ভারত আক্রমণ করে, সে এক জৈনরাজাকে তার ভ্রাতার সাহায্যে পরাজিত করে তাকে সিংহাসনে বসায় এবং পুরান রাজাকে বন্দী করে তার তত্ত্বাবধানে রেখে যায়। নূতন রাজা পড়ল মহা ফাঁপরে। সে ভাইকে নিয়ে কি করবে? জৈন বলে সে বধ করতে পারে না। অবশেষে সাব্যস্ত হল যে, তার সিংহাসনের নীচে একটা গর্ত্ত খোঁড়া হোক। সেখানে রাজাকে জীবন্ত পুঁতে মাটি ঢেলে দেওয়া হোক। তাতে সে মরল বটে, কিন্তু ভাই তাকে বধ করল না ত। (হাস্য)

মা। প্রকৃত জৈন হতে হলে যোগী হওয়া চাই। তখন যোগশক্তি দিয়ে এসব প্রাণীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়।

মণিলাল। মানছি, কিন্তু মা, সাপ, বিছু মারা কি করে উচিত হতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ। কেন নয়? আত্মরক্ষার্থে মারতেই হবে। আমি বলছি না যে, তুমি যেখানে সাপ পাও তাড়া করে বধ করবে। কিন্তু তাদের দ্বারা কারও প্রাণ বিপন্ন হলে নিশ্চয় তার অধিকার আছে তাদের মারবার।

মা। গাছগাছড়ারও ত প্রাণ আছে। তুমি কি বলতে চাও যে একটি মশার দাম একটি গোলাপের চেয়ে বেশি? চারাগাছের অনুভব-শক্তি আছে, তা বোধ হয় তুমি জান না।

আমি। কারো কারো মতে বিড়াল কুকুর মারা মানুষ মারার চাইতে কম অপরাধজনক।

নানা প্রশ্নের গোলমালে আমার মন্তব্যটা চাপা পড়ে গেল কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সজাগ কাণে পৌঁছেছে। গোলমাল থামলে তিনি বললেন, "তুমি কি বলছিলে? বিড়াল কুকুর মারায় মানুষ মারার চাইতে কম অপরাধ?"

মা। এ তো দেখছি বেশ মানব-হিতৈষী।

শ্রীঅরবিন্দ। প্রাণ প্রাণই, বিড়ালকুকুরের হোক বা মানুষের হোক। এ নিয়ে দুইএর মাঝে কোন তফাৎ নেই। মানুষ নিজের সুবিধার জন্যে তার মনোমত ধারণা সৃষ্টি করে।

এই সময় মা নিজের কাজে চলে গেলেন আমাদের কথা-বার্ত্তাও অন্য মোড় নিল। আমাদের বৈঠকে এক নুতন ভদ্রলোক উপস্থিত। তিনি কোন মফঃস্বল কলেজের অধ্যক্ষ, আবার সখের হোমিওপ্যাথ। তাই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আলাপ সুরু হল। প্রত্যেকে তার শোনা অভিজ্ঞতা থেকে হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত গুণের স্বপক্ষে নজির উপস্থিত করল। রাগ, হিংসা, এমন কি সাধনায় নৈরাশ্যেরও নাকি প্রতিকার আছে এই শাস্ত্রে।

শ্রীঅরবিন্দ। বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত রসই নাকি আমাদের রাগ ইত্যাদি রিপুর আক্রমণের হেতু: ভালবাসাও নাকি তাই। কিন্তু (ঈষৎ হেসে) অহং ব্যাধি সারাতে পারে কি তোমাদের হোমিওপ্যাথি?

হোমিওপ্যাথ। যদি পারত আমিই প্রথম এগিয়ে যেতাম।

মণিলাল। তুমি যে তোমার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন, তাতেই অর্দ্ধেক রোগ সেরে গেছে। কি বলেন, স্যার?

শ্রীঅরবিন্দ। তা বলা যায় না। তবে ওটা প্রথম ধাপ বটে।

আমি। দ্বিতীয়টি?

শ্রীঅরবিন্দ। নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে পৃথক করে নেওয়া। মনে করা সব কিছুই যেন তোমার বাইরের প্রকৃতির অংশ বা অন্য কারও। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে অন্তরের পুরুষ জাগে এবং প্রকৃতির ক্রিয়ায় সায় দেওয়া বন্ধ করে। ফলে ব্যক্তির স্বভাবের উপর প্রকৃতির আধিপত্য চলে যায় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবই তাকে চালায়। কিন্তু যদি স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকে, তাহলে পুরুষ হয় তার দাস—অনীশ, সাক্ষী।

প্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখানও করতে পার, সেটা আরো জোরালো উপায়। চিন্তা বা ভাব তোমার ভিতর প্রবেশের পূর্ব্বেই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, আমার চিন্তার বেলায় যেমন আমি করেছি। এটা আরো শক্তিশালী উপায়, ফলও তেমনি তাড়াতাড়ি আসে। আর একটা উপায়, মনের দ্বারা দমন করা। কিন্তু তাতে মনের প্রকৃতিই বশ করতে চায় প্রাণের স্বভাবকে। ফল হয় আংশিক ও সাময়িক। জিনিষগুলো ভিতরে চাপা পড়ে মাত্র। সুযোগ পেলেই তারা বের হয়ে আসে।

শুনেছি যে, একদিন কাশীর ঘাটে এক যোগী স্নান করছিল, পাশের ঘাটে স্নান করছিল এক সুন্দরী কাশ্মীরি মেয়ে। তাকে দেখামাত্রই যোগীটি নাকি তার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে। মনের দ্বারা দমন যে কেমন বিফল হয়, এটা তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু যোগের ফলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু নীচে থেকে উপরে ভেসে ওঠে, যার অস্তিত্বই হয়ত আগে টের পাওয়া যায়নি। বহু লোকের মুখে একথা শুনেছি। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। আমি দেখলাম একদিন কি ভাবে ক্রোধ উঠে এসে আমায় অধিকার করছে, কিছুতেই তাকে দমন করা গেল না। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, কেন না রাগ ছিল আমার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ। আর একবার যখন আমি আলিপুর জেলে, বিচারের অপেক্ষায়, এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছিল, কোনমতে ফাঁড়াটা কেটে যায়। ব্যাপারটা হল এইরকম: কুঠুরীতে ঢুকবার আগে কয়েদীদের কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করা নিয়ম। আমরা তাই করছি, আর কোত্থেকে একজন স্কচ্ ওয়ার্ডার এসে অকারণে আমায় একটা ধাক্কা দেয়। আমার দলের ছেলেরা ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে। আমি উত্তেজিত না হয়ে শুধু তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালাম, সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গিয়ে জেলারকে ডেকে আনল। আমার এই ক্রোধকে বলা যেতে পারে সংক্রামক ক্রোধ (Communicative anger), সমস্ত যুবার দল ক্ষেপে দরোয়ানকে মারতে প্রস্তুত হল। জেলারটা ছিল ধর্ম্মপ্রবণ লোক। দরোয়ান নালিশ করল যে, আমি তাকে উদ্ধত দৃষ্টি দিয়েছি। জেলারের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, এরকম অভদ্র ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত নই মোটেই। জেলার সকলকে শান্ত করে যাবার সময় বলল, "আমাদের সবাইকে জ্বলা বইতে হবে।"

কিন্তু মনে রেখো, ক্রোধ আর রুদ্রভাব এক জিনিষ নয়। সে অভিজ্ঞতাও আমার কয়েকবার হয়েছে।

আমি। রুদ্রভাব কি শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পের সেই সাপের ফোঁস-ফাঁসের মত?

শ্রীঅরবিন্দ। মোটেই না। এটা সত্যিকারের ক্রোধ। প্রবল অন্যায় বা দোষের কিছু দেখলে তার বিরুদ্ধে যে ভীষণ কঠোরভাব প্রকাশ পায়, তাই হল রুদ্রভাব—যেমন শিবের রুদ্রভাব। রাগ হল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, সেটা ওঠে নীচের থেকে; আর রুদ্রভাব ওঠে অন্তর থেকে। উদাহরণ দিচ্ছি: ব' একদিন মার বিরুদ্ধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে ভয়ানক চেঁচাতে লাগল। তার চীৎকার শুনে আমার ভিতরটা এমন প্রচণ্ড কঠোর হয়ে উঠল যে, কিছুতেই তাকে দমন করা গেল না। বাইরে গিয়ে তাকে বললাম, "কে, কে এমনভাবে মার প্রতি চীৎকার করছে?" শোনামাত্র সে শান্ত হয়ে চলে গেল।

আমি। সে নাকি দারুণ বদরাগী ছিল?

শ্রীঅরবিন্দ। ঠিক কথা। এই দোষ ছাড়া, তার সাধনায় খুব নিষ্ঠা ছিল। নানা জিনিষ সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়েছিল এবং সাধনায় এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এই ভূত তাকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসত। তখন সে কতগুলি আসুরিক শক্তির কবলে পড়ে যেত, নিজেকে তখন কিছুতেই সামলাতে পারত না। এরাই বেচারীর সাধনা ব্যর্থ করেছে, কারণ এখান থেকে চলে যাবার পর নাকি সে এদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। যখন তারা তার ঘাড়ে চাপত, তখন কোথায় তার অন্যায় বুঝতে পারত না। উল্টো মাকে ও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করত। অথচ তার প্রতি আমাদের স্নেহ ও সহিষ্ণুতার অন্ত ছিল না। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে দোষ-স্বীকার করে প্রতিজ্ঞা করত যে, এই শেষবার। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? সেই অপশক্তিগুলি এসে আবার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তার দেমাক ও আত্মসম্মান দোষ-স্বীকারে বাধা দিত।

এটাই হল ভুল। নিজের দোষ বা অন্যায়কে কখনও সমর্থন বা ন্যায্য প্রমাণ করতে নেই। এই অজুহাতে তখন তারা বারবার ফিরে আসে, শেষে তাদের বর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আমি। অমুক শুনছি এত বছর তপস্যা করেও চলে যাবে—বার বছর।

শ্রীঅরবিন্দ। তপস্যা? সে যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব পেত, তাহলে হয়ত থাকত।

আমি। সে তো মা'র কাজে প্রচুর সাহায্য করেছে বলছে?

শ্রীঅরবিন্দ। সাহায্য শুধু? আমি তো ভেবেছিলাম সেই-ই চালাচ্ছে আশ্রম!

আমি। এদেরও ত একদিন ভগবান-লাভ হবে?

শ্রীঅরবিন্দ। সবাই একদিন ভগবানকে পাবে। একজন মাকে জিজ্ঞেস করে, তার ভগবান-লাভ হবে কিনা। মা উত্তর দিলেন যে, হবে, যদি না সে কোন বোকামি ক'রে তার আয়ুচ্ছেদ করে। আর তাই-ই সে করল!

পরীর গান

(জন কীটস্)

কেঁদো না আর—কেঁদো না আর!
আগামী বরষে জাগিবেই দেখো কুসুমভার।
ফেলো না—ফেলো না আঁখির জল!
নূতন কুঁড়িরা ঘুমায় মূলের মর্মতল।
মোছ গো নয়ন—মোছ নয়ন
অমরাবতীতে করিনু আমি এ-গীত চয়ন
গানেতে নামাই বেদনাভার—
কেঁদো না আর।

চাও হে মাথার উপরে চাও
ফুলে ফুলে ঢাকা শাখায় কাহার দেখাটি পাও?
চেয়ে দেখো, ওগো চেয়ে দেখো—
অশোকের শাখে গান করি, এই গান শেখো।
আমার মধুর কণ্ঠস্বর
পীড়িতমনের বেদনাহর—
কেঁদো না হে আর কেঁদো না'ক!
আগামী ফাগুনে ফুল ফুটবেই জেনে রাখ।
বিদায়—বিদায়—বিদায় নিলেম আমি এবার,
আকাশের নীলে মিলাই তা'হলে, নমস্কার!

অনুবাদ: জীবনকৃষ্ণ দাশ

কি বই লিখি

শ্রীবিনায়ক শঙ্কর সেন

কি বই লিখি—এ সমস্যার আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই বিচার করবার দরকার কি বই পড়ব, এবং কি বই পড়ব বিচারেরও পূর্ব্বে বিচার করবার আছে—বই আমরা পড়ি কেন? মানুষ বই পড়ে নানা কারণে, বিভিন্ন লোকের কাছে তার বিভিন্ন রকম প্রয়োজন। কেউ বই পড়েন তাঁর হাতে কিছু বা অনেক উদ্বৃত্ত সময় আছে বলে, যা কোন না কোন উপায়ে কাটাবার দরকার। সহজে, সস্তায় এবং নির্ঝঞ্ঝাটে সময় কাটাবার পক্ষে বইএর মত এমন ব্রহ্মাস্ত্র মানুষ বোধ করি আর আবিষ্কার করেনি। কেউ বই পড়েন জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহায়। কারণ মানুষ তার সমস্ত রকম জ্ঞান যত সহজে পুস্তকের মাধ্যমে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেছে, এমন আর কিছুতে নয়। আর একদল আছেন বই পড়া যাঁদের নেশা, কাজ-খাওয়া-ঘুমোনো-বিশ্রামের মত বা আরও জোর দিয়ে বলসে বলতে হয় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত বই তাদের চাই-ই, তা নইলে তাদের জীবন মৃত্যুতুল্য, বই কেনবার সামর্থ্যের বা বই সংগ্রহ করবার সু-সুযোগের তাদের যতই অভাব হোক, সময় বা অবসর তাদের থাক আর নাই থাক। এঁরা চেয়ে-চিন্তে, পুরোণো বইএর মারফতে, অবৈতনিক গ্রন্থাগারে যেমন করেই হোক এঁদের প্রয়োজনীয় অন্ততঃ পক্ষে প্রয়োজন মেটাবার মত রসদ সংগ্রহ করবেনই। এই তিনটি প্রধান দল ছাড়াও উপদল রয়েছেন অনেক, যার বিচার এখানে গৌণ। এদের আবার বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি, কেউ এক বা কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিয়ে চলতে ভালবাসেন, কেউ চলেন সমস্ত দিকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব, পক্ষীতত্ত্ব, জীবনী, শিল্প, সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, ব্যবসা, খেলাধূলা—এক কথায় জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কিছুই তাঁদের বাদ যায়না। কিছুই বাদ দিতে তাঁরা রাজী নন। যিনি যেই পথেই চলুন, পাঠাভ্যাস মাত্রই লাভজনক। কারণ, পাঠ মাত্রেই কিছু না কিছু জ্ঞানোন্মেষ হবেই।

এই তিন পাঠক দল ছাড়াও আছে বৃহত্তম পাঠকের দল, যাদের বাধ্য হয়ে পাঠ করতেই হয়, তা ছাত্র সমাজ। তারা এক সম্পূর্ণ আলাদা গোষ্ঠী, আলাদা জাত, যাদের প্রয়োজন ভিন্ন, ধারা ভিন্ন, উদ্দেশ্য ভিন্ন, দর্শন ভিন্ন।

মানুষ মানুষ হয়েছে তিনটি কারণে। তার সুচতুর হাতের মালিকানা, তার উন্নততর মস্তিষ্ক আর তার বাঙ্ময়তা। সে তার মস্তিষ্কের অদম্য কৌতুহলে তার চার পাশের বস্তুসম্ভারের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখেছে—কখনো পেয়েছে আনন্দ, কখনো ভয়, কিন্তু সর্ব্বদাই তার কাছে একটি প্রশ্ন উদ্যত ছিল 'কেন'। কেবলই সে ভেবেছে 'এ আমার জীবনপথে সহায়ক না ক্ষতিকর'। তার পৃথিবীর সমস্ত স্পর্শমান বস্তুকে সে হাতে তুলে নেড়েচেড়ে দেখেছে, তার বিচার করেছে, 'এ কি এবং কেন'? প্রথমে সে স্পর্শমান দৃশ্যমান বস্তুর নাম দিয়েছে, তার পর নাম দিয়েছে অদৃশ্য বস্তুর আর ভাবের। এসেছে তার ভাষা, তার প্রকাশ করবার শক্তি। নিজের চিন্তা, নিজের অভিজ্ঞতা সে ব্যক্ত করেছে সঙ্গীর কাছে আর দলের কাছে। তার অভিজ্ঞতার ফল, চিন্তার ধারাকে ছন্দে গেঁথে কণ্ঠস্থ করে' তাকে সঞ্চয় করেছে। কণ্ঠস্থ করিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে সে তাকে রক্ষা করেছে আর রেখে গেছে মানুষের ধারায় তার বংশধরের ব্যবহারের জন্য। ধীরে ধীরে তৈরী হয়ে' উঠেছে তার সাহিত্য, তার শিল্প, তার বিজ্ঞান, তার ইতিহাস, তার সমাজ, তার নীতি। তারও পর মানুষ উদ্ভাবন করেছে লিপি, লিপিবদ্ধ করেছে তার ভাবধারাকে, কখনো সৃষ্টির আনন্দে, কখনো প্রয়োজনের তাগিদে, ভাবিকালের মানুষ—তার জাতির, গোষ্ঠীর, দেশের মঙ্গল চিন্তায়।

এক সময় মানুষের পুঁথি ছিল তার স্বহস্ত-লিখিত বা অনুলেখনের প্রস্তুত। সে পুঁথি ছিল যেমনি দুর্ম্মূল্য তেমনি দুষ্প্রাপ্য, তার পঠন-পাঠন ছিল সীমিত, বিদ্যার্জ্জন ছিল কঠিন। যন্ত্রের উন্নতিতে আজ পুস্তক হয়েছে সহজ-লভ্য, সর্ব্ব সাধারণের সম্পদ।

মানুষের দল চলেছে চিরদিন দুটি দলে—বাহু-বল আর বুদ্ধি-বল। বাহুবল বুদ্ধিবলকে কখনো অধ্যুসিত করেছে, কখনো বুদ্ধিবল বাহু-বলকে করেছে পরাজিত। কিন্তু তুলনায় বুদ্ধিবল, চিরদিন শ্রেষ্ঠ বলে' বিবেচিত হয়েছে, কারণ, তার সীমারেখা নেই। এই বুদ্ধিবল তার 'আয়ু ও জীবন রস' সংগ্রহ করেছে সাহিত্য থেকে। সে সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গীন সাহিত্য।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে আমরা সাহিত্য বলতে বুঝি কেবল কাব্য। বাংলার যে সাহিত্যের আমরা গর্ব্ব করি, যে সাহিত্য আমরা বলি, যে কয়েক শতাব্দী ধ'রে বাংলা দেশে গড়ে' উঠেছে, যার বিকাশ হয় গত পূর্ব্ব শতকে আর পুষ্ট হয়েছে গত এক শতকে অর্থাৎ ১৮৫১ থেকে আজ পর্য্যন্ত, সে সাহিত্য যে নিতান্তই ধর্ম্মতত্ত্ব, উপন্যাস, গল্প, ছোটগল্প, কবিতা ও নাটকের সাহিত্য, এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি কি? সেকলে যখন বলে'ছিলেন, বাংলা ভাষায় পড়বার মত বই নেই, আমরা অভিমানক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। এই উক্তিতে সেকলের হয়তো অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু কথাটা সত্য।

সাহিত্য কি কেবল এইটুকু? কাব্য দিয়ে আমরা সময় কাটাতে পারি, আনন্দও পেতে পারি, রসোত্তীর্ণ কাব্য হয়তো আমাদের মুগ্ধও করতে পারে, সে সাহিত্যের যথেষ্ট জানা থাকলে এবং উচিতমত ছাড়পত্র থাকলে কলেজের অধ্যাপকের আসনও অলঙ্কৃত করা যায়, কিন্তু জীবনপথে চলবার মত সম্পদ তাতে কোথায়?

ইউরোপীয়েরা এদেশে আসবার পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যা সীমাবদ্ধ ছিল ধর্ম্মতত্ত্ব, শাস্ত্র, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ ও এমনিধারা কয়েকটি জিনিষে। ইংরেজ এল উন্নততর জ্ঞান নিয়ে, ভারতবর্ষে বিস্তার করল তাদের আধিপত্য, তাদের কাছ থেকে আমরা একটা নতুন জাগরণের সাড়া পেলুম। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আরম্ভ হলো আমাদের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নানা দিক খুলে গেল আমাদের চোখের সম্মুখে; কিন্তু গোড়াগুড়ি আমরা রয়ে গেলুম কেরাণী। আমরা বেঁচে থেকেছি, কিন্তু জীবনযাপন করিনি। তার প্রমাণ—ইংরেজের জ্ঞান ধার করেও দেশের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করবার কোথাও এতটুকুও চেষ্টা হয়নি কোনদিন। আজও বাংলাদেশে

রসায়ন, স্থাপত্য, চিকিৎসা, আইন পড়ানো হয় ইংরেজীতে। তার প্রধানতম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ—বাংলা ভাষায় পড়াবার পক্ষে এসব বিষয়ে কোন বই নেই। আমরা যদি বিশ্বের দরবারে সমান আসন পেতে চাই, মানুষের জয়যাত্রায় যদি সমান তালে পা ফেলে চলতে চাই, তাহলে অবিলম্বে আমাদের নিজেদের ভাষায় এই সমস্ত বিষয়ে পুস্তক তৈরী হবার দরকার। সাহিত্যিক মানে যে কেবল কবি ও ঔপন্যাসিক নয় (কবি ও ঔপন্যাসিকদের উপরে আমার একটুকুও আক্রোশ নেই, তাঁরা তাঁদের কাজ করে চলেছেন নিশ্চয়ই) এই কথাটা দেশের লোকের—পাঠকের, লেখকের, প্রকাশকের বোঝবার পক্ষে সময় অতি উচ্চতর হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে যেখানে যার অভিজ্ঞতার এতটুকুও দেবার আছে, তা লিপিবদ্ধ হবার দরকার এবং তা সন্ধান করে বাইরে আনবার দায়িত্ব পুস্তকের প্রকাশকের। পরোক্ষভাবে সে দায়িত্ব অবশ্য পাঠকেরই, কারণ, পাঠক চাইলে প্রকাশক মানুষ সন্ধান করতে বাধ্য হবেনই।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বিদ্যায়তনে নৃতত্ত্ব পড়ানো হয়, ভূতত্ত্ব পড়ানো হয়। উদ্ভিদতত্ত্ব—আকাশতত্ত্ব—পশুতত্ত্ব—পক্ষীতত্ত্ব পড়ানো হয়, পদার্থবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সবই পড়ানো হয়। দেশে এ বিষয়ে জ্ঞানী গুণী লোকেরও অভাব নেই, অথচ বাংলাভাষায় এসব সম্বন্ধে ক'খানা বই আছে প্রশ্ন করলে লজ্জায় আমাদের মাথা হেট হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের ইতিহাস পড়তে হয় আমাদের বিদেশীর চোখ দিয়ে—সে ইতিহাস আগাগোড়া পক্ষপাতদুষ্ট। তাও পড়ানো হয় স্কুল-কলেজে এবং প্রায় সেইখানেই হয় সেই পাঠের শেষ। এ যেন কোন রকমে পরীক্ষা পাশ করবার পর চাকরী পাবার জন্য ওষুধ গেলার মত বই মুখস্থ করে' মরা। এই যে ইতিহাস, এ ইতিহাসই বা সাহিত্যের গোষ্ঠীভুক্ত হতে' পারবে না কেন? ইতিহাস পড়েও যে উপভোগের আনন্দ পাওয়া যায়, বাংলার পাঠক তা' বুঝবে কবে? এর অনেকখানি অপরাধ বাংলার লেখকের ও প্রকাশকের। বাংলাভাষায় রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, নিখিল নাথ রায়, অক্ষয় মৈত্রেয়, রমেশ মজুমদার, সুরেন দাশগুপ্ত—এঁদের লেখা ছাড়াও অনেক ভাল ভাল ইতিহাসের বই এ লেখকের চোখে পড়েছে, কিন্তু সে সব বইয়ের ছাপা বাঁধাই এত নিকৃষ্ট যে, তা কিনতে ইচ্ছে করে না। আরও বড় কথা, সে সব বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকে, "স্কুল শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক অমুক অমুক শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত," অর্থাৎ সে বই দরকার কেবল স্কুলের ছেলেদের, এক কি দু' বৎসর পড়ে' ফেলে দেবার জন্য। অথচ সেই বই-ই ভাল ছাপা সুদৃশ্য বাঁধাই দিলে দরদী পাঠক তা' নিজের লাইব্রেরীভুক্ত করতে গর্ব্ব অনুভব করবেন।

জাতির ইতিহাস-জ্ঞানই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা-বোধ, দিতে পারে নিজের দোষ-ত্রুটীকে সংশোধন করে' এগিয়ে চলার পথনির্দ্দেশ। অনুসন্ধানী মাত্রই জানেন—জ্ঞানের পরিধি যত বাড়তে থাকে, তার সরবরাহের কেন্দ্রকেও ততই প্রশস্ত করতে হয়। তাই তার জন্য চাই বাংলাভাষায় লক্ষ লক্ষ ইতিহাস।

বাংলাভাষায় ভূগোলের অবস্থাও ইতিহাসেরই মত, সম্ভবতঃ তার চাইতেও খারাপ। চেষ্টা করলে তবু দু'একজন ঐতিহাসিকের নাম করা যায়, ভৌগোলিক একজনও নয়। অথচ ভূগোলও শুধু জানবার আগ্রহেই পড়া যায়না কি? উপভোগের আনন্দ কি তাতে নেই, সাহিত্যরস কি তাতে পরিবেশন করা যায় না? জানবার আগ্রহ, উপভোগের আনন্দ বা সাহিত্যরস ছাড়াও প্রয়োজনের দিকই কি তার কিছু কম? রেলের চাকুরের, পোষ্টাফিসের চাকুরের তো হামেশাই ভূগোল-জ্ঞান দরকার করে। তাদের জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য বিশেষ ধরণে বিশেষ ভূগোল তৈরী করা যায়না কি? এসব জিনিষ স্কুলের ঐ চার দেয়ালেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? সেইজন্যই বোধ করি আমাদের দেশের পোষ্টাফিসে, রেলের অফিসে কাজের গতি অত মন্থর। জ্ঞান-জীবন ও চাকরী-জীবন যেন দুই ভিন্ন জন্ম, দ্বিতীয়টির আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমটির শেষ।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'ব্যবসায়িক ভূগোল' বা Commercial Geography। আমাদের দেশেও ব্যবসাদার আছে কিন্তু ভূগোল না জেনেও তার ব্যবসা চলে। বরং ভূগোল না জানলেই তা ভাল চলে, যেহেতু লক্ষ্মী আর সরস্বতী এ দেশে এক সঙ্গে থাকে না। কবে এ ধারণা আনন্দের বিষয় না হয়ে পরিতাপের বিষয় হয়ে উঠবে? এ ধরণের একটি বই ওদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে নতুন পথ দেখিয়েছে, বহু নতুন জীবিকার বীজ বপন করেছে। এ দেশের এ অদ্ভুত ধারণা অপসারিত হবার দরকার।

মানুষ বনের পশুকে বশ মানিয়ে তার কাজে লাগিয়েছে। যাকে সে তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেনি, তাকেও বাদ দেয়নি —তার চামড়া, তার মাংস, তার হাড়, তার দাঁত, তার দুধ, তার পিত্ত, তার রক্ত, তার বিষ্ঠা, কিছুই সে ব্যবহার করতে ছাড়েনি। গাছ থেকে মানুষ নিয়েছে তার রস-কস-আঠা-মধু-বিষ-ছাল-আঁশ-কাঠ-পাতা-ফুল, পাখীর নিয়েছে হাড়-মাংস-পালক, পোকার নিয়েছে শরীর-বাসা-সুতো, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে সে নিয়েছে সোনা, রূপো, লোহা, তামা, টিন, সীসে, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, অভ্র, তেল, গন্ধক, কোবল্ট, সিলিকা, কয়লা, লিগনাইট, বক্সাইট, এ্যাসফল্ট, উরেনিয়াম, রেডিয়াম। এই যে বিশ্ব-ব্যাপী সম্পদ, তার সংগ্রহের পথ, তার মোক্ষণ, তার শোধন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ লিপিবদ্ধ থাকে পুস্তকের পাতায়। কিন্তু এদেশে নয়।

আমরা এ সব জিনিষই বাজারে কিনি অথচ তার এতটুকুও সংবাদ রাখি না, গোড়ায় সে বস্তু কোথা থেকে আসে। সংবাদ রাখবই বা কি ক'রে, তার উৎস মুখ কোথায়? তার জন্য প্রয়োজন পুস্তকের। শুধু জানবার আগ্রহেই নয়—আমাদের দেশে এবং তারপর বৃহত্তর পৃথিবীতে কি গাছ আছে, সে গাছ কোথায় আছে, তার কাঠ, তার পাতা, তার ফল-ফুল-রস-কস আমাদের কি কাজে লাগে; আমাদের নদী-নালা-পুকুরে কি মাছ, কোন্ ব্যাঙ, কোন্ সাপ, কোন্ কুমীর, কোন কচ্ছপ, কোন শামুক, কোন ঝিনুক পাওয়া যায়, তাতে আমাদের কোন্ প্রয়োজন মেটে; আমাদের বনের পশু, পাখী, পোকার কাছ থেকে কি লাভ আর কি ক্ষতি আমরা পেতে পারি জানলে বোধহয় আমরা কেরাণী না হয়ে মানুষ হ'য়ে উঠতে পারি। প্রকৃতির সম্পদকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারি; যথাযথ ব্যবহার করতে পারি। যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে বিশ্বের অর্থও হয়তো নিজের দেশে নিয়ে আসতে পারি। ভারতবর্ষের মত খনিজ-সম্পদ ধনজ-সম্পদের মত বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ খুব কম দেশেই আছে। এ দেশের মত বিরাট কৃষি-সম্ভাবনা তো বোধকরি চীন ছাড়া আর কোথাও সম্ভবপরই নয়। অথচ এর রাক্ষসী অপচয় শুধু আমাদের

...নানের অভাবে। দু'একজন বিদেশী বিদ্বান সরকারী কর্ম্মচারী দিয়ে ...দ সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার সম্ভব নয়। তার জন্য চাই দেশব্যাপী ...মস্ত মানুষের জাগ্রত অনুভূতি এবং জনগণের সে চেতনা জাগাতে ...রে শুধু আমাদের নিজেদের ভাষায় এ বিষয়ে লেখা বই। তাও ...কখানা দু'খানা নয়। বস্তিবাসী থেকে আরম্ভ করে' বিদ্বানের ...রে পৌঁছবার মত ছোট ও বড়, সাধারণ ও বিশেষ—কোটি কোটি ...ই। এরা কি সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ লাভ করতে পারে না?

কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার জানা একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বিদ্যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। কিন্তু তিনি জানতেন সমস্ত বিলেতী গাছ-গাছড়া আর তার ইংরেজী আর ল্যাটিন নাম। চার্ট আর বই ছাড়া হাতে-কলমে তিনি পড়াতে পারতেন না। এ বিদ্যার কোন মূল্য নেই, অন্ততঃ যথেষ্ট নয় এবং এ বিদ্যাদানে দেশের বা মানবতার এমন বিশেষ কোন উপকারও হয় না। তাঁর মত বিদ্বান মানুষের উচিত ছিল দেশের গাছ-গাছড়া পঠন করা, তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা, দেশের ভাষায় পুস্তকের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণকে দান করা। তার জন্য প্রয়োজন সজাগ অনুসন্ধানী চোখ, মৌলিক জ্ঞান-পিপাসা এবং গভীর দেশাত্ম ও মানবাত্ম বোধ।

সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ শ্রেণীতে মৎস্যতত্ত্ব (Fishery) সংযোজিত হয়েছে। তাদের একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলুম,—"তোমাদের বিলেতী মাছ সম্বন্ধে শিখে কি লাভ হবে, দেশেরই বা তোমরা কি উপকার করবে? দেশী মাছ সম্বন্ধে পড়বার মত কোন বই তোমরা পাও কি?" তার উত্তরে সে বলেছিল,—"হাঁ মশায়, দেশী মাছ সম্বন্ধেও কিছু বই আছে এবং যা আছে এখনকার মত কাজ চলবার পক্ষে তাই'ই যথেষ্ট।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব বই'ই সাহেবের লেখা এবং আরও মজা এই, যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা এ দেশে কেউ ছিলেন বিচারক, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেউ পুলিসের চাকরে, কেউ বা ব্যবসাদার। এ সব বই ইংরেজীতে লেখা। এ ব্যাপারে আমাদের চোখ খোলা উচিত।

সময় কাটানো, জ্ঞানার্জ্জন, পঠন-নেশা ছাড়াও শুধু প্রয়োজন মেটাতেই কত বই হতে' পারে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আত্মজীবনী লেখার হিড়িক পড়েছে। সাহিত্য যে কেবল কাব্য-সাহিত্যই নয়, তার জন্য যে নতুন পথ কাটা চলতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ দিকেও তাঁরা অর্থাৎ কৃতী ব্যক্তিরা নতুন পথিককে পথ বাৎলে দিতে পারেন। বিশেষ জীবিকায় বিশেষ পথে চলতে কি কি বিশেষ ব্যক্তি-সত্তার প্রয়োজন হয়, নিজের চরিত্রের কোন দিক চর্চ্চা এবং কোনদিক সংশোধন করা দরকার সাহিত্য-গর্ব্বিত বাঙ্গালীর আজও এ ব্যাপারে ডেল কার্ণেগী, হার্ব্বার্ট ক্যাসান, নেপোলিয়ান হিলের দ্বারস্থ হতে হয় মুমূর্ষু, নিষ্প্রভ, আশাহত চিত্তকে চাঙা করতে।

লুই ক্যারল ছিলেন আঙ্কিক। অঙ্ক ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-নিদিধ্যাসন। অঙ্কের ম্যাজিক, অঙ্কের ধাঁধাঁ, অঙ্কের রসিকতা, অঙ্কের গল্প, অঙ্কের সংবাদ, অঙ্কের ইতিহাস ছিল তাঁর জিহ্বাগ্রে। তিনি বেশ কয়েকখানি বড় বড় এবং বহু ছোট অঙ্কের বই তাঁর দেশকে দিয়ে গেছেন, যাতে অঙ্ককে তিনি আলোচনা করেছেন অসংখ্য দিক থেকে। বৃহত্তর অঙ্কের দিক তো আছেই, অত্যন্ত সাধারণ সাধারণ অঙ্কে কাঁচা মানুষ কি করে' কোন্ পথে চলে অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্ত করতে পারে, তাও আছে। আমাদের দেশেও আঙ্কিকের অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা বেশীর ভাগই প্রসব করেছেন হয়তো স্কুল-শিক্ষা-পর্ষৎ কর্ত্তৃক অনুমোদিত কোন বিশেষ শ্রেণীর পাঠ্য একখানি 'পাটিগণিত', এ অতি দুঃখের কথা। বাংলার শিশু-সাহিত্যও বর্ত্তমানে প্রায় বড়দের সাহিত্যের সঙ্গে জাহাজের পেছনে জালিবোটের মত চলেছে। তাতেও কতগুলো কল্পিত ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প, এ্যাড্ভেঞ্চারের গল্প গুটি-কত ফাঁকা অনুপ্রাস আর বাক্যালঙ্কার সমন্বিত শিশু-সমাজের গল্প আর 'সুকুমারী' ধরণের ছড়ার নকলের নকল ছাড়া আর কিছুই প্রায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সান্ত্বনার সাহিত্যের দিকে মন দিলে একটা নতুন পথও খোলে, শিশুদেরও উপকার হয়। তাদের কানের কাছে "তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ", "ভবিষ্যতের রাষ্ট্র সমাজ সংসার তোমাদেরই মুখ চেয়ে আছে" ইত্যাদি বড় বড় কথার লবজ আমরা প্রায়ই ঝাড়ি। কিন্তু কোনদিন সে ভার নেবার জন্য তাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে, সে পথ বাৎলে দিই কি? সম্ভবতঃ নিজেরাই পথ জানিনে তাই। আশ্চর্য্য নয় যে ছাত্ররা আজ এত বিশৃঙ্খল, এ অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। তা করতে পারে একমাত্র উচিতমত বই।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রাম-উন্নয়ন, শিল্প-কৃষি-শিক্ষা উন্নয়নের অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে, কিন্তু কোন পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে না, যদি না তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পুস্তক উন্নয়নেরও একটা পরিকল্পনা থাকে। তবে, আরও অনেক বিষয়ের মতই এ বিষয়েও শুধু সরকারের উপরে নির্ভর করলে চলবে না। তাহ'লে তা হবে ঝিনুক দিয়ে খাইয়ে দেবার আশা করবার মত। সরকার একটি ভিন্ন মানুষ নয়, দেশের মানুষ নিয়েই সরকার, প্রতিটি দেশবাসীকে অবহিত হতে হবে এবিষয়ে, তা হলেই আসতে পারে প্রকৃত সাফল্য। দেশ এইমাত্র স্বাধীন হয়েছে, হঠাৎ ততটা আশা করা হয়তো ঠিক হবেনা। আবার আর একদিক বিচার করলে মনে হয় সেকথা ভাবলে চিরদিনই আমরা পিছিয়ে থাকব। জন-জাগরণের সময় অসময় নেই, ও হঠাৎই হয়।

ইংরেজের ভাণ্ডারে ডাকাতি করবার আমাদের অফুরন্ত জিনিষ আছে, সেটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার দরকার। কিন্তু কেবল তার উপরে নির্ভর করে থাকলেই চলবে না, আমাদের নিজেদের মৌলিক গবেষণা, মৌলিক অনুসন্ধান, মৌলিক চিন্তা দিয়ে মৌলিক বস্তু সৃষ্টি করতে হবে। তা নইলে আমরা পঙ্গু হ'য়েই থাকব—খোঁড়ার লাঠিটি ছাড়া কোনদিন চলতেই পারব না।

দেশে যে এ জাগরণ আরম্ভ হয়নি তা নয়, কিন্তু যেটুকু হয়েছে, তা কোন ক্রমেই আজও আলোক বিকিরণ করবার মত হয়ে ওঠেনি। এই বিপুল কাজের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরে, লেখকের, পাঠকের, প্রকাশকের। সর্ব্বপ্রথম পাঠকের, কারণ তার চাহিদার উপরেই নির্ভর করবে লেখক ও প্রকাশকের বিষয় নির্ব্বাচন। অপরপক্ষে লেখক ও প্রকাশকের অবদানের উপরেই নির্ভর করবে দেশের ও দশের মঙ্গল ও অগ্রগতি। যা দরকার তা বিপুল সংখ্যায় অনুসন্ধান, শিক্ষা ও প্রয়োগ সাহিত্য। লেখক যে কেবল কবি, গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক নন, যে-কোন মানুষ—যারই কিছু দেবার আছে, তিনিই—যে লেখক হতে পারেন, সর্ব্ব-সাধারণের এই চেতনার উন্মেষ হবার দিন এসেছে এবং পাঠকেরও বোঝবার দিন এসেছে যে, পাঠের পরিধি বহুবিস্তৃত।

বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক

এরূপ ডাকের সুযোগ খুব কমই আসে কিন্তু যখন আসে তখন সেটি সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই বিবরণী দেওয়া হ'ল :—

১। তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প শ্রেণীয় অর্থাৎ ৪-৩-৩-৩ বড় জোর ৪-৪-৩-৩ হ'তে পারে।

২। ছয়টি বা সাতটি ছবি তাস-সমেত ৪ টিক (কচিৎ ৩½ হতে পারে থেঁড়ীর ডাকের রংয়ে উচ্চতাস অর্থাৎ টে, সা, বি র মধ্যে একটি বা দুটি সমেত)।

৩। প্রতিটি রংয়ের উচ্চতাস টে, সা অন্তত: পক্ষে বি থাকা প্রয়োজন, দুটি টেক্কা বাঞ্ছনীয়।

এই ডাকের বিশেষত্ব এই যে, প্রথম সুযোগেই থেঁড়ীকে উচ্চতাসের ক্ষমতা ও তাসের বিভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকীবহাল করা হয়। কেহ কেহ মন্তব্য করেন যে, উক্ত ডাকটিতে গেম হয়ে যাওয়ার পর প্রথম ডাকদারের আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে খেলোয়াড়ের হাতে সমস্ত তাসের উচ্চশক্তিসম্পন্ন ছবিতাসের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী, তার তাড়াতাড়ি গেম বন্ধ করবার কারণ থাকতে পারে কি তার থেঁড়া ডাক উদ্বোধন করবার পর? সে তো যে কোনও সময়ে গেমে পৌছতে পারবে। তবে এরূপ ডাকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আছে বৈকি—এরূপ তাসে পিঠ টানবার (Playing trick) শক্তির অভাব হেতু সম্মিলিত শক্তিতে ৭½ f ট্রিকেও শ্লাম করা সম্ভব হয় না, অনেক ক্ষেত্রে এই খবরটি পাওয়ার সুযোগ ঘটে উদ্বোধনকারীর এবং তার নিজ হাতে পিঠ জয় করবার মত বেশী তাস থাকলে সে টেক্কার খবর নিয়ে (শ্লামের ডাক দ্রষ্টব্য) অনায়াসে ছোট এমন কি বড় শ্লামেও পৌছতে সক্ষম হতে পারে। নীচে একের ডাকের উপর তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী তাসের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল—

১। ই-টে, বি, ৩; হ-টে, ৭, ২; রু-সা, গো, ৩, ২; চি-বি, গো, ৫।

২। ই-সা, ৯, ২; হ-টে, সা, ৩; রু-টে, ৫, ২; চি-সা, বি ১০, ২।

৩। ই-বি, ১০, ৫; হ-সা, বি, ১০; রু-টে, সা, ৯, ২; চি-টে, ৫,-৪, ২।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্বোধনী রংয়ের একটি ডাক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে; এখন আসা যাক উদ্বোধনী একটি নো-ট্রাম্প ডাকের পর পরবর্ত্তী খেলোয়াড় পাস দিলে থেঁড়ার কি কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে আলোচনায়।

উদ্বোধনী একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উত্তরে থেঁড়ীর ডাক (Responses to opening No-trump bid),

আগেই বলা হ'য়েছে নো-ট্রাম্প ডাকে উদ্বোধনে প্রয়োজন সর্ব্বনিম্ন ৩½ ট্রিক থেকে ৪ f ট্রিক পর্য্যন্ত তাস। এই ডাক হয় সাধারণত: পরিমিত শক্তিতে ও তাসের সুসম বিভাগে। সুতরাং খুব দুর্ব্বল হাতে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন হয় না এরূপ ডাককে কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া। যা'হোক সাধারণভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কিরূপ শক্তিতে কি ডাক দেওয়া উচিৎ, নীচে দেখান হ'ল :—

ক) এক f ট্রিক বা কমে "পাস" দেওয়াই উচিৎ। কেবল ৬ বা ততোধিক সংখ্যাবিশিষ্ট কোন রংয়ের তাস থাকলে ঐ রংয়ে দুটির ডাক দেওয়া কর্ত্তব্য, এমন কি ½ f ট্রিক থাকলেও।

খ) ২ f ট্রিক থাকলে—দুটি নো-ট্রাম্প তোলা যেতে পারে। ব্যতিক্রম হবে শুধু সেসব ক্ষেত্রে যেখানে কোনও রংয়ে মাত্র একখানি তাস থাকে (Singleton)। সে ক্ষেত্রে কোন রংয়ের দুটি ডাকা দরকার।

গ) ২½ থেকে কিছুটা বেশী f ট্রিক থাকলে—বিভাগ অনুযায়ী তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকে তুলে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাস নো-ট্রাম্প ডাকের অনুপযুক্ত হ'লে রংয়ের তিনটি ডাক দিয়ে গেমে উৎসাহিত করা উচিৎ।

তাসের বিভাগ কিছুটা অস্বাভাবিক হ'লে (unbalanced) অর্থাৎ ৫, ৪, ৩, ১; ৫, ৫, ২, ১, ৪, ৪, ৪, ১, হ'লে :—

ক) ২ থেকে ২½ f ট্রিক—পাঁচতাসে উঁচুদরের রংয়ে (Major Suit) দুটির ডাক হ'বে কিন্তু পাঁচ তাসের রংটি নীচুদরের হ'লে (Minor Suit) দুটি নো-ট্রাম্প ডাকই উচিৎ। দ্বিতীয় তাসে (৫, ৫, ২, ১) প্রথমে বড়দরের তাসে দুটির ডাক হবে এবং উদ্বোধনকারী দুটি নো-ট্রাম্প দিলে অপর রংয়ের পাঁচতাসে তিনটির ডাক হবে। ৪, ৪, ৪, ১ এর ক্ষেত্রে একটি নো-ট্রাম্পের উপর কমদরের চারতাসে দুটির ডাক হ'বে, কারণ উদ্বোধনকারীর সঙ্গে দ্বিতীয় চক্রের বড় রংয়ের ডাক মিলে গেলে গেমের সম্ভাবনা থাকে।

খ) ১ f ট্রিকে—সাততাস উঁচুদরের রংয়ে গেম ডাকা যায়।

গ) ½ f ট্রিকে—আটতাসে ঐ।

৪। উদ্বোধনকারীর ডাকের উপর দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে

এই অবস্থাটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল মনে হয়। উদ্বোধনকারীর একটির ডাকে জানতে পারা যায় যে, তার তাসের শক্তি তিন f ট্রিকের কাছাকাছি এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড় তার উপর একটির ডাক দিলে ১½ f ট্রিক এবং দুটির ডাক দিলে ২ f ট্রিকের কাছাকাছি। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের তাসের সমবেত f ট্রিকদর প্রায় ৪½ থেকে ৫এর কাছাকাছি। নিজহাতের উচ্চতাস-মূল্য যোগ ক'রে মোটমূল্য ৮½ থেকে বাদ দিলে চতুর্থ খেলোয়াড়ের নিকট বাকী f ট্রিকের হিসাব সহজেই অনুমান করা যায় এবং সেই অনুপাতে নিজের ডাক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যাহোক, দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের পর তৃতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের সাধারণ নিয়ম নীচে দেওয়া হ'ল :—

১। উদ্বোধনী ডাকে একটি বাড়ান···দরকার (ক) দুই f ট্রিকসহ বিবি বা গো, ১০ সমেত তিনখানি রং। (খ) ½ f ট্রিকসহ অন্তত: ৪ খানি রং। (গ) ১ f ট্রিকসহ অন্তত: ৫ খানি রং।

২। একটির উপর একটি বদলী ডাক··দরকার অন্ততঃ f ট্রিক।

৩। একটির উপর একটি নো-ট্রাম্প··দরকার অন্ততঃ ২ f ট্রিক পরন্তু বিপক্ষদলের ডাকের একখানি বড় তাস ; দুখানি হ'লেই ভাল।

৪। একটির উপর দুটির বদলী ডাক··দরকার ২ f ট্রিক ও খানি উক্ত রংয়ের তাস—৫ বা ৪ খানি উক্ত রংয়ের তাস ও ২½ ট্রিক বা কিছু বেশী।

প্রয়োজন বোধে কিছুটা রদবদল করতে হয় সময়ে সময়ে। যেমন নে করুন উদ্বোধনকারী ডাক দিয়েছেন একটি হরতন এবং বিপক্ষদল কটি বাড়িয়ে ডাক দিয়েছেন দুটি ইস্কাবন ; এক্ষেত্রে দুটির ডাক বার মত তাসে বাধ্যতামূলক তিনটির ডাকে সাহায্য দিতে হয়, রণ সাহায্যের উপযুক্ত তাস যে আছে, এটি জানাবার সুযোগ আর ও মিলতে পারে। উদ্বোধনকারী একপ অবস্থার বিষয়টি স্মরণে রেখে গ্রসর হ'লে কোনওরূপ অসুবিধার কারণ হয় না, বরং লাভের ম্ভাবনাই বেশী। মনে করুন উদ্বোধনকারী ডাক দিয়েছেন একটি স্কাবন, বিপক্ষদল ডাক দিয়েছেন তিনটি রুহিতন এবং থেঁড়ী তাস পেয়েছেন নিম্নরূপ। থেঁড়ী কি করবেন ?

১। ই-সা, ১০, ২ ; হ-সা, ৯, ৮, ৫ ; রু-৭, ৩ ; চি-টে, ১০, , ৩ f ট্রিকদর ২।

২। ই-বি, ১০, ৫, ৩ ; হ-টে, ৮, ৪, ৩ ; রু-২ ; চি-সা, গো, , ৩ f ট্রিকদর ২।

উভয়ক্ষেত্রেই তিনটি ইস্কাবন ডাকা যুক্তিসঙ্গত। এই সুযোগে সাহায্য না দিলে থেঁড়ীর কিছু বড় তাস থাকলে নষ্ট হ'তে পারে এবং বিপক্ষদল সামান্য খেসারৎ দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয় উদাহরণের তাসটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাসটির মূল্য যদিও ৩f ট্রিক তবুও চরিত্রগত বিশেষত্বে, বিপক্ষ দলের ডাকের মাত্র একখানি (Singleton) ও থেঁড়ীর ডাকের বিবিসহ চারখানি তাস থাকায়, পিঠ জয়ের ক্ষমতা (playing trick) অনেক বেশী ইস্কাবন রংয়ে : উপরন্তু ইস্কাবন ও রুহিতন রং বাদে অপর দুটি রংয়ে অর্থাৎ হরতন ও চিড়িতনে প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রের রোখবার তাস থাকায় হাতটি খুবই সম্ভাবনাময়। সুতরাং তিনটি ইস্কাবন ডাকের প্রশ্ন ত' ওঠেই না, এক্ষেত্রে একবারে চারটি ইস্কাবন ডাকা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

থেঁড়ীকে উদ্বোধনকারীর ডাকে সাহায্য বা বিকল্প ডাক দেওয়ার সময়ে স্মরণে রাখতে হবে যে, খেলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল খে'লে বেশী পয়েন্ট সংগ্রহ করা। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ডাক দিতে হয় এবং এইরূপ ডাক দিতে গেলে মাঝে মাঝে ফাঁদেও পা পড়ে যায়। এরূপ সময়ে উহার সদ্ব্যবহার করাও উদ্বোধনকারীর থেঁড়ীর ডাকের অঙ্গ। তখন উক্ত থেঁড়ীর চিন্তার বিষয় হবে যে, তারপক্ষে লাভজনক পন্থা কোন্‌টি,—নিজেদের ডাকে খেলা করা না বিপক্ষদলের ডাকে ডবল দিয়ে খেসারৎ আদায় করা ? যিনি এটি ঠিকভাবে বিচার করতে সক্ষম,—বলা বাহুল্য যে, এবিষয়ে ঠিকমত বিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে প্রয়োজন অভিজ্ঞতার এবং সেটি অর্জন করা সম্ভব ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে বা পাশে ব'সে খেলা দেখে,—তিনিই উঁচুদরের খেলোয়াড় বলে পরিগণিত হ'ন। 'ডবলের' সফলতা অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে তাসের বিভাগের উপর (Distribution of cards), সে বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকতে হয় ডবল দেবার সময় নচেৎ ফল হয় বিপরীত। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, ডবল না দিয়ে মুখ বুজে থাকলে বিপক্ষদল বিভাগের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনও আভাষ না পেয়ে ডাকে খেসারৎ দিয়ে থাকেন কিন্তু ডবল দিয়ে সচেতন করলে চুক্তির খেলা করা অসম্ভব হয়না। এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে "বিপক্ষদলের ডাকে ডবল"এর (Donbling) পরিচ্ছেদে।

৫। বণ্টনকারীর ডাক পরবর্তী খেলোয়াড় ডবল দিলে

এরূপ ডবল দেন বিপক্ষদলের দ্বিতীয় খেলোয়াড় তাঁর থেঁড়ীর নিকট ডাক আদায়ের জন্য (Informatory or Take out Double)।

এরূপ ডবলের পর প্রথম সুযোগেই নিজের হাতের শক্তি কিরূপ থেঁড়ীর জানান উচিত উদ্বোধনকারীকে, নচেৎ ডাক বেড়ে গেলে সে সুযোগ আর নাও মিলতে পারে। এরূপ অবস্থায় ডাক দেওয়ার সাধারণ নিয়ম নিম্নরূপ :—

১। ২ থেকে ২½ f ট্রিকসহ উচ্চতাসে রি-ডবল (Redouble)। এতে থেঁড়ীর ডাকের রংয়ে সাহায্য থাকার সম্ভাবনাই অধিক ; না থাকলে অন্য তিন রংয়ে উপরোক্ত f ট্রিকদর বিভক্ত থাকলেও চলবে।

২। ২½ বা বেশী f ট্রিকসহ অসাধারণ গোছের (freak) তাস থাকলে গেমে উৎসাহিত করবার জন্য নূতন রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক দিতে হবে (forcing bid)। এক্ষেত্রে থেঁড়ীর ডাকের বিকল্প সাহায্য থাকা প্রয়োজন।

৩। সাধারণ গোছের ১ থেকে ২ f ট্রিকের মত তাসসহ কোন রংয়ের ৫ বা ৬ খানি তাস হাতে থাকলে এই সুযোগে সেই ডাকটি দিয়ে যাওয়া উচিত, যেন 'ডবল' হয়নি মনে ক'রে।

৪। উঁচুতাসের অভাব অথচ তাসের বিভাগ অনুকূল হ'লে ডবলের পর থেঁড়ীর ডাক অবস্থানুযায়ী বাড়িয়ে দেওয়া উচিত চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডাকে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য অন্ততঃ। যথা উদ্বোধনী ডাক একটি ইস্কাবন, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় 'ডবল' দিয়েছেন এবং থেঁড়ী তাস পেয়েছেন :—

ই-বি, ১০, ৫, ৪, ২ ; হ-গো, ৯, ৪ ; রু-৫ ; চি-বি, গো, ১০, ৩। এরূপ তাসে ডবলের পর পাস দিলে আর ইস্কাবন রংয়ে সাহায্য দেবার সুযোগ নাও আসতে পারে, উপরন্তু থেঁড়ীর হাতে এত বেশী সংখ্যক ইস্কাবন আছে উদ্বোধনকারীর না জানা থাকায় নানাবিধ জটিলতা সৃষ্ট হ'তে পারে। প্রথমতঃ ইস্কাবনের বিভাগের অসাধারণত্ব তার অজানা থেকে যায়, ফলে বিপক্ষদলের উঁচুডাকে ডবল দিলে সেটির খেলা করে নেওয়া সম্ভব হ'তে পারে ; দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনবোধে বেশী ডাকে কিছু খেসারৎ দিয়ে বিপক্ষদলের গেম বন্ধ করা সম্ভব হয়, অনেক সময়ে সে সুযোগও দেওয়া যায়, উপরন্তু চতুর্থ খেলোয়াড়ের পক্ষে মুখ খোলবার পথে বাধা সৃষ্টি ত' আছেই। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, ডবলের পর একের ডাককে একটি বেশী ডাকে বাড়ান অর্থে গেমে উৎসাহিত করা (Game forcing) বোঝায় না, বোঝায় এককালীন ডাকের মত (in the category of pre-emptive)। ডবলের পর থেঁড়ীর কিরূপ ডাক হ'বে, নমুনা তাস সহ নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

	উঃ ডাক	খেঁড়ীর ডাক	ট্রিক
১। ই-সা, গো, ৯ ; হ-বি, গো, ৮, ২ ; রু-সা, ৭ ; চি-টে, গো, ১০, ৩	রু-১	রি-ডবল্	২½+
২। ই-টে, ১০, ৩, ২ ; হ-গো, ৬ ; রু-বি, গো, ৭, ৬ ; চি-সা, বি, ২	হ-১	ঐ	২½
৩। ই-টে, বি, ১০, ৮, ৪, ২ ; হ-বি, ২ ; রু-৭, ২ ; চি-সা, গো, ৩	হ-১ বা রু-১	ই-২	২½+
৪। ই-সা, ১০, ২ ; হ-বি, গো, ৬ ; রু-গো, ৫ ; চি-টে, সা, গো, ৬, ৪	রু-১	চি-৩ বা রি-ডবল্	৩+
৫। ই-টে, গো, ১০, ৬, ৩ ; হ-বি, ৪, ২ ; রু-গো, ২ ; চি-১০, ৫, ৩	রু-১	ই-১	২
৬। ই-বি, ১০, ৩ ; হ-টে, ১০, ৯, ৮, ২ ; রু-৯, ৮, ২ ; চি-৭, ৩	রু-১	হ-১	১+
৭। ই-সা, ৯, ৮ ; হ-সা, ১০, ৯, ৮, ৭ ; রু-৭, ৫ ; চি-৫, ৩, ২	চি-১	হ-১	১
৮। ই-বি, গো, ১০, ৪ ; হ-গো, ১০, ৫, ৪, ২ ; রু-৫ ; চি-বি, ৪, ৩	হ-১	হ-৩	½+
৯। ই-বি, গো, ১০, ৯, ৮, ৫, ২ ; হ-৫ ; রু-৭, ৩ ; চি-বি, ৭, ৩	রু-১	ই-৩	½+

চতুর্থ খেলোয়াড়ের উদ্বোধনী ডাক

(Opening Bid by fourth hand)

তিনটি হাত পাস দেবার পর চতুর্থ খেলোয়াড় মুখ খোলবার আগে চিন্তা করবেন যে, তার খেঁড়ীর দ্বিতীয় হাতে কিছু কম ট্রিকে ডাক দেওয়ার সুযোগ পেয়েও ডাক দিতে পারেননি। তার উচ্চ তাসমূল্য ২ ট্রিকের কম হওয়াই সম্ভব। এ অবস্থায় উদ্বোধনী ডাক দিতে গেলে সমস্ত ঝুঁকিই তাঁকে নিতে হয়। চতুর্থ খেলোয়াড় ডাক দেওয়ার মানে অন্য খেলোয়াড়দের বিশেষত: বিপক্ষদলের দ্বিতীয় চক্রে ডাক দেবার সুযোগ ক'রে দেওয়া। যদি কোনও সময়ে চতুর্থ খেলোয়াড় ডাক দেবার ফলে বিপক্ষদল ডাক ছিনিয়ে নিয়ে গেম করতে সক্ষম হন, পয়েন্টের কথা বাদ দিয়েও, অবস্থাটা বড়ই লজ্জাকর হ'য়ে পড়ে। গেম যদি নাও করতে পারেন তাঁরা কিন্তু ডাকটি ছিনিয়ে নিয়ে কিছু পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'লেও সেও কম লজ্জাজনক নয়। সুতরাং চতুর্থ হাতে ডাক দিতে গেলে প্রয়োজন প্রথম উদ্বোধন-ডাকের চেয়েও কিছু বেশী শক্তির তাস এবং উঁচু রংয়ের উপর বেশী দখল, নচেৎ কিছুসংখ্যক পয়েন্ট সংগ্রহের আশায় ডাকতে গেলে ঠকতেই হতে পারে বেশী দানে। বিশেষ বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়াই ভাল, সন্দেহ থাকলে পাস দেওয়াই শ্রেয়:। নীচে কয়েকটি নমুনা তাস ও কি ডাক হবে দেখান হ'ল :—

	ট্রিকদর	কি ডাক হবে
১। ই-৮, ৭, ২ ; ২, ৪, ৩ ; রু-টে, সা, ৪, ৫, ৩ ; চি-সা, বি, ২ ;	৩	পাস
২। ই-৪, ৫ ; হ-৯, ৭, ৩ ; রু-টে, বি, ৫, ২ ; চি-টে, বি, ৪, ২ ;	৩	পাস
৩। ই-৭, ৩ ; হ-টে, গো, ৩, ২ ; রু-টে, বি, ৪, ৩ ; চি-৭, ৬, ৩ ;	২½	পাস
৪। ই-সা, গো, ৯ ; হ-টে, সা, ১০, ৫, ২ ; রু-৩, ২ ; চি-বি, ১০, ২ ;	৩	ই-১
৫। ই-টে, বি, গো, ৯, ৫, ৩ ; হ-সা, বি, ৩ ; রু-৭, ২ ; চি-সা, ৩ ;	৩	ই-১

১নং হাতে ইস্কাবনের বা হরতনের কোনও বড় তাস না থাকায় পাস দেওয়াই ভাল। ২নং হাতে সেই একই কথা, উপরন্তু হাতটিতে মাঝের তাস না থাকায় পাস ছাড়া কোন ডাক দিতে গেলে বিপদে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী তিন ট্রিক থাকা সত্ত্বেও। ঐরূপ একই উত্তর ৩নং হাতে। ৪নং হাতে কিন্তু ৩ ট্রিক থাকায় এবং উঁচুদরের রংয়ে হরতন ও ইস্কাবনে উপরন্তু চিড়িতনে রোখবার তাস থাকায় একটি হরতনের ডাক দেওয়া চলে ; খেঁড়ীর কাছ থেকে দুটি রুইতন ডাক এলে দুটি হরতন ডাকা যেতে পারে। ৫নং তাসটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির ও সম্ভাবনাময়। খেঁড়ীর কাছ থেকে অল্প সাহায্য পেলে গেম করা অসম্ভব নয়।

উদ্বোধনী দুটির ডাক (Opening tow bid)

একের উদ্বোধনী ডাক যখন খেঁড়ী অন্তত: একচক্র (One round) বাঁচিয়ে রাখতে আইনত: ও ধর্ম্মত: বাধ্য তখন উদ্বোধনী দুইয়ের ডাকের প্রয়োজন কি—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে। কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে বৈ কি! কিন্তু সচরাচর যে ভাবে এই ডাকের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় দূরদর্শিতার অভাবে সেটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ বলা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে গেমের ডাকে পৌঁছে একটি এমন কি দুটি খেসারৎ দিতেও দেখা যায়। সাধারণভাবে ৫ টি ক থেকে ৫½ টিকের তাস পেলেই কোনও রংয়ের দুটির ডাক দেওয়া হয়ে থাকে, এ প্রথাটি কতদূর ক্ষতিকারক তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত উদাহরণে। মনে করুন আপনি বণ্টন করে তাস পেয়েছেন:—

	টি ক দর
ই—টে, বি, ৪, ২	১½
হ—টে, বি, ৭	২
রু—টে, সা, ২	২
চি—৫, ২,	—
মোট	৫½

এ তাসটিতে উচ্চতাস মূল্য ৫½ ট্রিক কিন্তু তাসটিতে পিঠজয় করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও ছোট তাসের সংখ্যা বেশী থাকায় বাধ্যতা-মূলক দুইয়ের ডাক অচল বলা চলে নি:সন্দেহে। দুইয়ের ডাক দিতে হলে দিতে হয় দুটি ইস্কাবন কিন্তু একবার নিজমনে চিন্তা করে দেখুন এরূপ চারতাসে, টে, বি ও দুখানি ছোট, দুটির ডাক কি সমীচীন? কোনও মতে এ ডাক সমর্থন করা যায় না। খেঁড়া, শূন্য ট্রিক হাতে প্রথানুযায়ী দুটি নো-ট্রাম্প ডেকে বাঁচাতে বাধ্য হলেন প্রথম চক্রে কিন্তু অত:পর আপনি কি করবেন? তিনটি ইস্কাবন ডাক চলে না এবং কতকটা বাধ্য হয়েই ঝুঁকি নিতে হয় তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকে। ফলে হয়ত বড় জোর ছয়টি পিঠ নিয়ে তিনটি খেসারৎ দিতে হয় সুতরাং কেবলমাত্র ৫½ বা ৬ ট্রিকসহ তাস পেলেই গেমে প্ররোচনামূলক

ডাক চলে না ; প্রয়োজন অন্তবর্ত্তী তাসের, যার দ্বারা পিঠ জয়ের সম্ভাবনা বেশী। পিঠ জয় করবার সহায়ক তাসের অভাব ঘটলে একের ডাক দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে এই আশায় যে, খেঁড়ী উক্ত ডাকটি নিজ শক্তি অনুযায়ী বাঁচিয়ে রাখবেন অন্ততঃ এক চক্র। যদি খেঁড়ীর ঐরূপ ক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে আপনার বাধ্যতামূলক দুইয়ের রংয়ের ডাক কিরূপ মারাত্মক হতে পারে বুঝতেই পারছেন।

উদ্বোধনী দুইয়ের ডাক সুতরাং অতি নিপুণতাতে বিচার ক'রে দিতে হবে। এরূপ ডাক প্রযোজ্য হবে শুধু সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে গেম নিজের করায়ত্ত অথবা যৎসামান্য সাহায্যেই উহা সম্ভব। সুষম বিভাগের তাসে অর্থাৎ তাসের বিভাগ যখন ৪-৩-৩-৩ অথবা ৩-৪-৩-২ এবং প্রথম খেলা বামে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এলে পিঠ বাড়বার সম্ভাবনা বেশী (with tenace position) সেরূপ তাসে দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দিয়ে উদ্বোধন করা যেতে পারে।

খেঁড়ীর কাছ থেকে একটিমাত্র পিঠ পাওয়া যাবে এরূপ আশা ক'রে যেখানে গেম নিশ্চিত, এরূপ তাসে দুইয়ের ডাক শুরু করা যেতে পারে। যেমন ইস্কাবন বা হরতন রংয়ে নয় পিঠ, রুহিতন বা চিড়িতন রংয়ে দশ পিঠ ও নো-ট্রাম্প আট পিঠ জয় করবার ক্ষমতা একার হাতে থাকলেই তবে ঐরূপ ডাক উদ্বোধন করা উচিত, নচেৎ একের ডাক দিয়ে সুরু ক'রে পরে গেমে জোর দিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম করা চলে জোরালো দো-রংয়া তাসে। এরূপ তাসে উচ্চতাস-মূল্য কম হলেও পিঠজয়ের শক্তি বেশী থাকায় গেমে উৎসাহিত করা চলে। ঐ দুটি রংয়ের মধ্যে একটি রং উচ্চতাসে সমৃদ্ধ ও অন্যটি সামান্য নিকৃষ্ট হ'লেও বিশেষ ক্ষতি হয় না সচরাচর। দুটি রংয়েরই মাথা ভাঙ্গা থাকলে বিপদের সম্ভাবনা এসে পড়ে অনেক সময়ে, কারণ এরূপ তাসের বিভাগ কোনও একটি হাতে থাকলে অপরাপর তাসগুলির বিভাগও কিছুটা অস্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিপক্ষদলের প্রথম খেলবার সুযোগ থাকায় প্রথমেই তুরুপ করিয়ে একখানি রং কমিয়ে দেওয়ার পর নিজ অপর রং ফেরাই করা ও বিপক্ষদলের নিকট থেকে রং কেড়ে নেওয়া—দুটি কাজ একসাথে করা সম্ভব হয় না সেরূপ ক্ষেত্রে। দো-রংয়া তাসের সফলতা নির্ভর করে কতকটা তাসের বিভাগের ও উচ্চতাসের উপর ; তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অস্বাভাবিক বিভাগের ক্ষেত্র হচ্ছে শতকরা ১০ থেকে ১৫ দানে। শতকরা ৮৫ থেকে ৯০দানে সফল হবারই সম্ভাবনা। যাহোক দো-রংয়া তাসে গেমে উৎসাহকারী দুইয়ের ডাক দিয়ে উদ্বোধন করতে গেলে কতগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চললে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সেগুলি নিম্নরূপ :—

১। আগেই বলা হ'য়েছে যে, রংয়ের দুইয়ের ডাক দিতে গেলে ইস্কাবন ও হরতনের ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে ৯ পিঠ এবং রুহিতন ও চিড়িতনের ক্ষেত্রে ১০ পিঠ জয় করবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

২। ইস্কাবন বা হরতন রংয়ে আটটি পিঠ জয় করবার তাসেও ঐরূপ ডাক চলে তিনটি রংয়ে প্রথম চক্রে প্রথম রোখবার তাস অর্থাৎ টে, বা ছুট (Ace or void) এবং চতুর্থ রংয়ে জোরদার তাস সা, বি অথবা বি, গো, ১০ সমেত তাস থাকলে, ইহার মধ্যে সা, বি সমেত তাসই বাঞ্ছনীয়।

৩। উঁচু তাসের সংখ্যা (Honour tricks) ছোট তাসের সংখ্যার চেয়ে বেশী থাকা প্রয়োজন।

নীচে কয়েকটি দুটি রংয়ের ডাকের নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

	অনার ট্রিক দর	পিঠ জয়ের ক্ষমতা
১। ই-টে, সা, বি, ৯, ৬, ২ ; হ-সা, ৫, ৩ ; রু-× ; চি-টে, সা, গো, ৬	৫½	৯
২। ই-টে, ৫ ; হ-সা, বি, গো, ৪ ; রু-টে, সা, বি, গো, ৬, ৪ ; চি-৫	৪½+	১০
৩। ই-সা, ৭ ; হ-টে, সা, বি, ১০, ৮ ; রু-টে, ৪ ; চি-টে, সা, গো ২	৬+	৯
৪। ই-টে, সা ; হ-টে, বি, ২ ; রু-সা, বি, গো, ৯, ৬, ৫, ৪, ২ ; চি-×	৪½	১০ থেকে ১০½
৫। ই-টে, সা, ৫, ২ ; হ-টে, সা, বি, ৪, ৩ ; রু-৫ ; চি-টে, সা, ৬	৬½	৭ থেকে ৯
৬। ই-টে, বি ; হ-টে, বি, ৯, ৭, ৬, ৫, ২ ; রু-সা, ১০ ; চি-টে, সা	৫½	৮ থেকে ৯
৭। ই-৫ ; হ-টে, সা, বি, ১০, ৬ ; রু-টে, বি, গো, ৬, ৫, ৪ ; চি-টে	৫+	১০ " ১১
৮। ই-টে, সা, বি, ১০, ৮, ২ ; হ-× ; রু-× ; চি-সা, বি, ১০, ৯, ৮, ৬, ২	৩½	১০ " ১১

৬নং তাসে উচ্চতাস মূল্য ৫½ ট্রিক এবং বড় জোর সাধারণ তাসের বিভাগে ৪ পিঠ খোয়া যেতে পারে (ই-১, ২-১, এবং রু-২)। হরতনের বিভাগ অস্বাভাবিক হ'লে আরও একটি কি দুটি পিঠ বেশী খোয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। তৎসত্ত্বেও খেঁড়ীর কাছ থেকে যৎসামান্য এমন কিছু নয় রু-বি ও হ-গো থাকলেই গেম সুনিশ্চিত এই স্থানে দুটি হরতন ডেকে গেম আহ্বান জানান খুবই সঙ্গত। ৫নং তাসটি আবার বিচিত্র ধরণের। তাসটির উচ্চতাস মূল্য ৬½ ট্রিক কিন্তু অস্বাভাবিক বিভাগের হেতু তাসটিতে দুইয়ের ডাক যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দুটি কারণে, প্রথমতঃ দুটির ডাক দিতে হলে দিতে হয় হরতন কিন্তু খেঁড়ীর কাছ থেকে তিনটি রুহিতন ডাক এলে, এরূপ ডাক আসা খুবই সম্ভব, পড়তে হয় অসুবিধায় ; তখন আর চার তাসে তিনটি ইস্কাবন ডাকা চলে না এবং বাধ্য হ'য়ে তিনটি হরতন ডাকা ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকে না। পক্ষান্তরে দুটি নো-ট্রাম্প ডাক এলে একইরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় ; তখন আর তিনটি ইস্কাবনের ডাক যুক্তি যুক্ত নয় উক্ত চারখানি তাসে। আবার দেখুন মাত্র টে, সা, বড় চার তাসে দুটি ইস্কাবন ডাক খুবই অসঙ্গত অথচ ন্যায্যপক্ষে খেঁড়ীর কাছে সামান্য সাহায্য যথা ই-বি ও হ-গো থাকলে তাসটিতে গেম অপরিহার্য্য ; সুতরাং খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ খেঁড়ীর কাছে বি, গো সমেত চারখানি ইস্কাবন থাকলে তাসটিতে ছোটস্লাম (Small slum) খুবই স্বাভাবিক—এমন কি শুধু বি সমেত চারখানি ইস্কাবন থাকলে ও উক্ত রংয়ের বিভাগ স্বাভাবিক অর্থাৎ ৪—৪—৫—২ হ'লে ছোটস্লাম হওয়াও অস্বাভাবিক নয়—নির্ভর করে সম্পূর্ণ হরতনের বিভাগের ওপর। খেঁড়ীর কাছে রুহিতনের টেক্কা ও পাঁচখানি ছোট ইস্কাবনের তাস থাকলে এবং ইস্কাবনের বিভাগ বিপক্ষদলের হাতে ২—২ হ'লে বড় স্লামের (Grand slam) কোনওরূপ ছিদ্রই থাকে না কিন্তু দুটি হরতন দিয়ে ডাব উদ্বোধন করলে ঐ ইস্কাবনের ডাকটি চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবন খুবই অধিক। সুতরাং কি করা যায় এরূপ তাসে? মনে হ বিভাগের অস্বাভাবিকতা হেতু একটি ইস্কাবনের ডাক দিয়ে নিশ্চ

বন্ধ করে অপেক্ষা করতে হয় এই ভেবে যে, নয় খেঁড়ী নয়ত বিপক্ষ দল এই ডাকটিকে অন্ততঃ একচক্র বাঁচিয়ে রাখবেন। যদি সম্ভব না হয় খেঁড়ীর পক্ষে এবং বিপক্ষদল কিছুটা সজাগ থেকে পাশ দেন, বড়ই হাস্যকর পরিস্থিতি হয়ে পড়ে অবস্থাটা তখন। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকে একটি চিঁড়িতন ডাক পছন্দ করেন। যা হোক, এরূপ তাসে অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে ডাকের সাধারণ নিয়ম থেকে কিছুটা রদ-বদলের প্রয়োজন হয়—নির্ভর করে অভিজ্ঞতা ও খেঁড়ীদের মধ্যে পরস্পর বোঝাবুঝির ওপর।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ৭ নং ও ৮নং তাসের উচ্চতাস মূল্য যথাক্রমে ৫+ এবং ৩½ ট্রিক কিন্তু দুটি তাসে নিজ ডাকে পিঠজয় করবার ক্ষমতা প্রচুর—সাধারণ বিভাগে প্রথমোক্ত তাসে একটির বেশী পিঠ হারাবার সম্ভাবনা নেই এবং দ্বিতীয়টিতেও প্রায় তদ্রূপই—বড়জোর দুটি পিঠ জয় করা সম্ভব হতে পারে বিপক্ষদলের। উভয়ক্ষেত্রেই উচ্চতাসমূল্য খুব বেশী না হলেও পিঠ জয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী নিজের ডাকে। সুতরাং এরূপ তাসে দুইয়ের ডাক দিয়ে উদ্বোধন অপরিহার্য। আবার এরূপ তাসও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলির উচ্চতাসমূল্য যথেষ্ট বেশী কিন্তু পিঠ জয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় এবং বাড়তি পিঠ জয় করবার উপযোগী তাসের অভাবে গেমে উঠে যথেষ্ট খেসারৎ আক্কেলসেলামী দিতে হয়। এরূপ তাসের কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল—

	মূল্য (f ট্রিক)	পিঠজয়ের ক্ষমতা
১। ই-টে, সা, ৭, ২ ; হ-টে, বি, ৫ ; ক্ল-টে, সা বি, ; চি-৫, ৩, ২ ;	৬	৬ থেকে ৭
২। ই-টে, বি, ৩ ; হ-টে, সা, ৭, ৮, ৬ ; ক্ল-৫, ২ ; চি-টে, সা, ৩ ;	৫½	৫–৬
৩। ই-টে, সা, ৫ ; হ-টে, সা, ৩ ; ক্ল-টে, সা, ৫, ২ ; চি-বি, ৪, ৩ ;	৬	৬

১নং তাসের f ট্রিকদর ৬ কিন্তু পিঠ হারাবার সম্ভাবনা ৫½ থেকে ৬টি, ২নং তাসের f ট্রিকদর ৫½ আর পিঠ হারাবার সম্ভাবনা ৬ থেকে ৭ এবং ৩নং তাসের f ট্রিক দর ৬+ আর পিঠ হারাবার সম্ভাবনা ৬টি। সব কয়টি তাসে ট্রিকদর অপেক্ষা পিঠ হারাবার সংখ্যা সমান বা বেশী ; সুতরাং দুইয়ের ডাক দিয়ে উদ্বোধন ক'রে বাধ্যতামূলক গেমে পৌঁছে খেসারৎ দেওয়া কোনও রকমে। সুতরাং একের উদ্বোধন ডাক দেওয়া কর্ত্তব্য উপরোক্ত তাসে এবং খেঁড়ী বাঁচিয়ে রাখতে পারলে গেমের ডাক দেওয়াতে একরূপ নিশ্চিত উপরন্তু উচ্চ তাসের অবস্থিতি জেনে নিয়ে পরস্পর তাসের মাধ্যমে শ্লামের ডাকে পৌঁছানও কিছুমাত্র অসম্ভব হয়না।

উদ্বোধনী দু'টি নো-ট্রাম্প ডাক

(Opening Bid of Two No-Trump)

উদ্বোধনী কোন রংয়ের দুটির ডাক যেরূপ বাধ্যতামূলক, দুটি নো-ট্রাম্প ডাক ঠিক সেরূপ নয়। কিছুমাত্র শক্তি বা বিশেষত্ব না থাকলে খেঁড়ী এই ডাক ছেড়েও দিতে পারেন। উদ্বোধনী দুটি নো-ট্রাম্প দিতে গেলে প্রয়োজন :—

১। তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী অর্থাৎ কোন রংয়ের তাস মাত্র একখানি থাকবে না। দুখানি তাস থাকলে অন্ততঃ সাহেব সমেত হওয়াই প্রয়োজন।

২। উচ্চতাসমূল্য ৫+ থেকে ৫½+ f ট্রিকের মত এবং ন্যূনপক্ষে আটখানি ছবিতাস (টে, সা, বি, গো, ১০এর মধ্যে)।

৩। প্রত্যেক রংয়ে পিঠজয় রোখবার তাস—দু'তাস হলে অন্ততঃ সাহেব সমেত এবং তিন তাসে বি, ১০ সমেত।

এই ডাকের বিশেষত্ব এই যে, উঁচুদরের রংয়ে ডাকবার উপযোগী তাসের অভাব, অপরপক্ষে কোনও একটি রংয়ে রোখবার ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং প্রথম খেলা বাঁদিকের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এলে সুবিধা হয় অর্থাৎ একটি বাড়তি পিঠজয়ের সম্ভাবনা।

লম্বা ও ছিদ্রহীন (Solid) নীচুদরের রংয়ের (Minor Suits) ছখানি বা সাতখানি তাসে এবং সকল রংয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রে রোখবার তাসে দুটি নো-ট্রাম্প ডাক চলে এবং বহু সময়েই উহা কার্য্যকরী হতে দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ৪½ থেকে ৫ f ট্রিকেই ডাকটি দেওয়া যায়। নীচে দুটি নো-ট্রাম্প দিয়ে উদ্বোধনী ডাকের উপযোগী নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

১নং	২নং	৩নং
ই-টে, বি, ৩	ই-টে, বি	ই-টে, বি, গো, ৪
হ-সা, গো, ১০, ৫	হ-সা, বি, গো	হ-টে, সা, বি
ক্ল-টে, সা, ৩	ক্ল-টে, সা, ৯, ৭	ক্ল-টে, গো, ৯
চি-সা, বি, ১০	চি-সা, ১০, ৯, ৩	চি-সা, গো, ৯
ছবিতাস=১০	=৯	=১০
f ট্রিককর—৫+	=৫½+	=৬

৪নং	৫নং
ই-সা, ১০,২	ই-টে, গো, ১০
হ-টে, ৯	হ-সা, ৫
ক্ল-টে, গো, ৯	ক্ল-সা, ৭
চি-টে, সা, বি, গে, ২	চি-টে, সা, বি, গো, ৮, ৬
ছবিতাস=৯	=৯
f ট্রিকদর=৫+	=৪½

৫নং তাসে উদ্বোধনকারীর হাতে উচ্চতাস-মূল্য ৪½ ট্রিক, কিন্তু ছিদ্রহীন চিঁড়িতন রংয়ের ছখানি তাস ওপর তিন রংয়ের উচ্চতাস থাকায় এবং প্রথম খেলা বাঁদিকের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এলে একটি পিঠ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় দুটি নো-ট্রাম্প ডাক খুবই কার্য্যকরী। খেঁড়ীর কাছে উপযুক্ত উচ্চতাস থাকলে চিঁড়িতন রংয়ে বা নো-ট্রাম্প ডাকে শ্লামের ডাকে পৌঁছবার কোনও অসুবিধার উদ্ভব হবার কারণ নেই। অপরপক্ষে হাতে কিছু না থাকলে খেঁড়ী দুটি নো-ট্রাম্পের ডাকে ছেড়েও দিতে পারেন—এ ডাক বাধ্যতামূলক না হওয়ার দরুণ এবং এরূপ ডাকে কোনওরূপ কুফলের সম্ভাবনা ত' নেই, বরঞ্চ কিছুমাত্র তাস থাকলেই খেঁড়ী তিনটি নো-ট্রাম্পের ডাকে তুলে দিলে চুক্তির খেলা সম্পন্ন ক'রে গেম করা খুবই সঙ্গত।

[ক্রমশঃ।

নামকরণ প্রসঙ্গে

প্রলয় সেন

গল্প-কবিতা-উপন্যাসের সার্থক নাম নির্বাচন করা যে রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এ কথা সাহিত্যিকমাত্রেই জানেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও অনেক ক্ষেত্রে কবিতার যোগ্য নামকরণের জন্য পাঠকের রসবুদ্ধির শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রচনার ভাববস্তুর সঙ্গে নামকরণের যোগ অব্যবহিত। সমগ্র রচনার বিষয়, ভাব ও মেজাজের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাকে একটিমাত্র অভিধায় আভাসিত করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং জোড়াতালি দিয়ে হেলাফেলা করে 'গৌরবে বহুবচনে' রচনার সঙ্গে যে কোন একটা নামের লেবেল এঁটে দিলেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হবার নয়।

বোধহয় এ-কারণেই এযুগের লেখক রচনার নামকরণ বিষয়ে সদা সতর্ক। কেননা, বাজে লেখার মত ছেঁদো নামও পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। যেমন, হাল-আমলের কোন এক সাহিত্য-রসিকের কাছে 'সন্তর জ্যোতিঃ', 'সৌদির বিয়ে', 'তোমায় আমি ভালবাসি' বা 'ছবি যাকে লাগেন' গোছের বই পড়তে দিলে তিনি যে তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে বটতলা-মার্কা বলে নিঃসঙ্কোচে আবর্জনার একত্রীভূত করবেন সন্দেহ নেই। সেই পুরাতনী প্রবাদ 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী' একথা সাহিত্যপুস্তকের ক্ষেত্রে অংশতঃ হলেও প্রযোজ্য! অবশ্য তাই বলে পাঠক যে সর্বদা তীর্যক বা তীক্ষ্ণ নাম দাবী করবেন, তা নয়। সাদামাটা নামেও পাঠকের অরুচি নেই। নইলে, 'কালিন্দী', 'ইছামতী', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' বা একেবারের হাল-আমলের 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' বা 'গড় শ্রীখণ্ড'—ইত্যাদি অনতিব্যঞ্জিত নামগুলো এযুগের সতর্ক পাঠকসম্প্রদায়ের কাছে সানন্দগ্রাহ্য হল কেন? আসলে, বিষয়বস্তু বা রচনাভঙ্গীর মত নামকরণের ক্ষেত্রেও পাঠক প্রত্যাশা করে সাহিত্যিক বিশুদ্ধি। যাকে ইংরেজী সমালোচনার ভাষায় বলা হয়ে থাকে, 'an echo of the magnificent mind'. মনোহর ভঙ্গী, রমণীয় বিষয় বা পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদের মত সুপ্রযুক্ত নামকরণের সার্থকতা এইখানে।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যগ্রন্থগুলোর নামকরণ তেমন চমকপ্রদ বা মনোহর ছিল না। এর পিছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। প্রথমতঃ, সেকালের সাহিত্যগ্রন্থসমূহ ছিল প্রধানতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্য প্রাধান্য পাওয়ায় কোন বিশেষ দেবদেবীর নামেই সেগুলোর নামকরণ করা হত। মনসামঙ্গল, চর্যাপদ, চৈতন্যচরিতামৃত, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি অজস্র নামই এর উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থরচনার প্রতিষ্ঠিত ভঙ্গীর মত (যেমন, গ্রন্থোৎপত্তির বর্ণনা, চৌতিশা, বারমাস্যা) নামকরণের ক্ষেত্রেও পূর্বানুসৃতি বজায় রাখা হত। মঙ্গল, বিজয়, পুরাণ ইত্যাদি কথাগুলি পেছনে বসিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থসমূহ রচনা করা হত। যেমন, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভাগবতপুরাণ বা শূন্যপুরাণ। ইচ্ছে থাকলেও সেযুগের কবিদের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কোন সাংকেতিত নাম নির্বাচনের স্পর্ধা ছিল না।

উনিশ শতক থেকে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের দেশে হাওয়া বদলের পালা শুরু হল। আমাদের চিন্তা-ভাবনার জগতে এল মস্ত আলোড়ন। ফলতঃ, যুগান্তরে সাহিত্যসৃষ্টিরও অবস্থান্তর ঘটলো। উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আলোয় বর্ধিত বাঙালীমানস উচ্চকিত হয়ে উঠল। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, বৃহৎবিপুল জীবনকে নব নব ভঙ্গীতে দেখবার দুর্জয় চেষ্টা, স্বাজাত্যবোধ, বিশ্বমানবতাবোধ সে যুগের সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হতে লাগল। 'সবকিছুকে জানব' এই অবজেকটিভ, সংহত এবং একমুখী সাহিত্যচেষ্টা সেযুগের সাহিত্যগ্রন্থগুলির বিষয়ের মধ্যে যেমন নামকরণেও তেমনি স্পষ্টরেখ হয়ে উঠল। 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা', 'সীতারাম' 'রাজসিংহ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'স্বর্ণলতা', 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'মেঘনাদ-বধকাব্য', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'নীলদর্পণ', 'জনা', 'বুদ্ধদেব চরিত' ইত্যাদি সংখ্যাতীত নামগুলিই সেই আকুতির নীরব সাক্ষী।

উনিশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ভাবের ক্ষেত্রে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটালেন। তাঁর অন্তর্মুখীনতা, অপার ভাবুকতা, এবং লিরিক সংবেদনা সাহিত্যে বিষয়ের মত নামকরণের ক্ষেত্রেও নতুন আলোর বন্যা বইয়ে দিল। তাঁর কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের নামকরণে সাজেশন বা ব্যঞ্জনাধর্ম আমৃত্যু ক্লান্তিহীন প্রসারতা লাভ করল। মানসী, সোনারতরী, মহুয়া, পত্রপুট, সানাই, নবজাতক, জীবিত ও মৃত—ক্ষুধিত পাষাণ—ছুটি—শেষকথা—রবিবার—ল্যাবরেটরী, ডাকঘর—অচলায়তন—ফাল্গুনী—মুক্তধারা—রক্তকরবী, চোখের বালি—ঘরে-বাইরে—চতুরঙ্গ—শেষের কবিতা—মালঞ্চ ইত্যাদি অসংখ্য নাম এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিকুলের মধ্যে, যতীন্দ্র বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন, এমনকি মোহিত লাল, নজরুল বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যকবিতার নামকরণে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিঃশঙ্ক প্রভাব। 'বনতুলসী', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্রআবীর', 'মৌরীফুল', 'স্মরগরল', 'বিস্মরণী', 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' বা 'মরুশিখা—মরুমায়া—মরীচিকা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম মিলিয়ে পড়লেই এ যুক্তির সারবত্তা বোধগম্য হবে।

নাটক বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রবৃত্তের লেখকেরা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নাম নির্বাচন করেননি। প্রসঙ্গতঃ শরৎচন্দ্রের কথা স্মরণীয়। শরৎচন্দ্র উপন্যাস বা গল্পের নামকরণে কদাচিৎ সাজেশন আনবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাস বা গল্পের নামকরণ সোজা বিষয়কে লক্ষ্য করে বা নায়ক-নায়িকার নামে সৃষ্ট হয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলোর নামকরণও প্রায়শঃই প্রত্যক্ষবিষয় সংশ্লিষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যুগ জিজ্ঞাসার একটানা স্রোত বহুশাখায়িত হয়ে ওঠে। একই যুগে বাস করে আশা-নিরাশা বিদ্রোহ ক্লান্তি তিরিশের বহুলপ্রসবী কবি লেখকদের রচনায় স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকে। এই বিচিত্রতা আজো পর্যন্ত নানাখাতে বয়ে চলেছে। স্বভাবতই এই অতি আধুনিক যুগের রচনায় নামকরণের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

বিশেষ করে কবিতা ও ছোটগল্পের নামকরণে এই বিচিত্রতা সুপ্রত্যক্ষ। কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির', 'ফেরারী ফৌজ', 'প্রথমা', 'সাগর থেকে ফেরা', 'চোরাবালি', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'ক্রন্দসী', 'অর্কেষ্ট্রা', 'সংবর্ত', 'বন্দীর বন্দনা', 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'কুসুমের মাস', 'উৎসের দিকে', 'পদাতিক', 'চিরকূট', 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' বা হাল আমলের 'আলোকিত সমন্বয়', 'দূরান্ত বাধা', 'একা এবং কয়েকজন'—এই অসংখ্য নামের মেলায় পাঠকসম্প্রদায় বিমুগ্ধ।

ছোটগল্পের নামকরণে এযুগের গল্পকারেরা রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছেন, একথা বলা হয়ত হঠকারিতা হবে না। এযুগের গল্পের নামকরণে আমরা আশ্চর্য বিস্তার লক্ষ্য করছি। গোপন অগোপন প্রত্যক্ষ বা অনুভব্য—ভাবনার প্রান্তভূমিকে এযুগের ছোটগল্প স্পর্শ করেছে এবং করছে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'অযান্ত্রিক', 'সুন্দরম', 'নীলনেশা', 'কাঠগোলাপ', 'ধানকানা', 'অকাল বসন্ত', 'চর্যাপদের হরিণী'—ইত্যাদি নামে এই বহু বিচিত্র রসই পরিবেশিত হচ্ছে।

কবিতা বা ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসে বাস্তব এবং সমসাময়িকের উপস্থিতি অনেক বেশী পরিমাণে অন্তরঙ্গ। সে-কারণে আবহমান কালের প্রচলিত ধারাটি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নামকরণ প্রচেষ্টা একালেও চলছে, চলবেও আরো অনেকদিন। এতৎসত্ত্বেও উপন্যাসের নামকরণে ব্যঞ্জনাধর্মকে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা করছেন এযুগের ঔপন্যাসিকেরা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা ঋণী। তাঁর 'চোখের বালি' দিয়েই উপন্যাসের নামকরণের নতুন উষার স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল। আধুনিককালে এ বিষয়ে 'পথের পাঁচালী', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পরাধীন প্রেম', 'সোনার চেয়ে দামী', 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'দ্বৈরথ', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'ঝড় ও ঝরাপাতা', 'সপ্তপদী', 'পঙ্কপুত্তলী', 'শতকিয়া', 'ভোরের মালতী', 'বৈতালিক', 'মন্দ্রমুখর', 'শিলালিপি', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'অচিন রাগিণী', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মোমের পুতুল', 'রেণু তোমার মন', 'আকাশ পাতাল', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'ফানুসের আয়ু' ইত্যাদি উপন্যাসগুলির নাম উল্লেখ্য। প্রতীক ধর্ম, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, রোমান্টিক স্বাধিকতা, মৃদু নাটকীয়তা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নামকরণ ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, সুখের কথা।

আকাশ, তারা, মেঘ, ঝড়, পর্বত, সমুদ্র, হৃদয়, অন্ধকার, নির্জনতা সুদূরতা ইত্যাদির সাহায্যে এ যুগের সাহিত্যগ্রন্থগুলোর নামকরণ ক্রমাগতই প্রসারিত হচ্ছে। এই সর্বগ্রাসী বৈচিত্র্যপিপাসা এমন কি সমালোচনামূলক গ্রন্থের নামকরণকে প্রভাবিত করছে। এ বৈচিত্র্য-পিপাসার স্থায়িত্ব সবটুকু লেখকের নয়, পাঠকেরও তাতে অংশভাগ রয়েছে।

সুতরাং 'নামে কি আসে যায়' এ আপ্তবাক্যে অন্ততঃ এ যুগের সন্ধানী পাঠক প্রতারিত হতে রাজী নয়।

সুজাঁও

[এলাহাবাদ থেকে ৩০ মাইল উত্তরে যমুনার তীরে নির্জনে সুজাঁও মন্দির]

সন্তোষকুমার অধিকারী

সবুজের সীমাশেষ, তারপর বালুচর ধূ ধূ
যমুনার নীলবুকে কাঁপে এক শীতের বিকেল,
দিন শেষ রৌদ্ররেখা দূরে দূরে সরে যায় শুধু
ইতস্তত: উড়ে যায় সাদা হাঁস, তিতির অঢেল।

ভাঙ্গা গম্বুজের শিরে গোধূলির বিলোল কৌতুক,
পথচলা রমণীর চোখে জাগে অবাক বিস্ময়,
কঠিন মিনার আর পরিত্যক্ত প্রস্তরের বুক
যমুনায় ছায়া ফেলে; চেয়ে দেখি কাঁপছে সভয়
নীল জলে অন্ধকার। শূন্যভরা বিজন মৌনতা;
আকাশ-আসঙ্গে মগ্ন সঙ্গীহীন পাহাড় সুজাঁও;
দূর গ্রামে ঘণ্টা বাজে, যমুনার হৃদয়ে স্তব্ধতা;
এখানে পৃথিবী এক দিনান্তের গভীরে উধাও।

ওপারে আঁধার কাঁপে আম্রবনে ছায়ার কুটিরে
গভীর অতল জলে কাঁপে মন নীল যমুনার;
দূর বালুচরে পাখী বসেছে নদীর তীরে তীরে;
একটি প্রদীপ শুধু জেলে রাখে সুজাঁওর পার।

বঙ্গে শরৎ

মোহাম্মদ রিয়াজ-উদ্দীন পাঠান

অতীত দিনের অনেক কথাই পড়ছে যে আজ মনে,—
বাংলা দেশে আসত শরৎ হর্ষধ্বনির সনে।
ছেলেমেয়েরা জুটত এসে,—শিউলি গাছের তলে;—
মনের সুখে করত খেলা,—সন্ধ্যা-সকাল হ'লে।
সবাই ছিল সহজ-সুখী, ছিল না দুখের লেশ,
ভেজালবিহীন দুধ-ঘি ছিল, হাজার গরু মেষ।
ক্ষেতের ফসল খামার পানে চলত ভারা ভারা,
'নুন আনতে তেল ফুরালো', ছিল না এমন ধারা।
শাসন-নামে করত শোষণ, যদিও বিদেশবাসী;
মধুর রোলে বাজত তবু আগমনীর বাঁশী।

এখন ত ভাই শাসক মোরা সকল মোদের হাতে,
তবুও কেন শরৎ আসে অশ্রুজলের সাথে?
ক্ষুধায় কাতর, শীর্ণ-দেহ, ছেলেমেয়ের দল,—
মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে নেইকো বুকে বল।
ফুলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, পড়ছে ঝরে ঝরে,
ডালায় ভ'রে কেউ রাখে না মহাপূজার তরে।
সুধার পরশ নেইকো হেথা, ক্ষুধার জ্বালা এসে,
অশ্রুজলে সারলো পূজা মোদের সোনার দেশে।
দ্বিগুণ ফসল ফলছে মাঠে, খাচ্ছে বিদেশবাসী;
শীর্ণ দেহে কে আজ বাজায় আগমনীর বাঁশী?

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

রোকেয়া ওরফে রীনার 'কেস'-এর যবনিকা পড়ল আজ। কোর্ট থেকে সাব্যস্ত হল—ও রীনা রায়-ই হবে, রোকেয়া বেগমে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। তা ছাড়া ও অতীতকে ও নিজ হাতেই মুছে ফেলতে চায়, অস্বীকার করে ধর্ম্মের বাঁধনকে, অন্তর দেবতা বলে মেনে নিয়ে তার দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে একটা মানুষের জন্য—তার ধর্ম্ম চায়নি, তার সমাজ চায়নি। চেয়েছে শুধু তাকেই, ভালবেসেছে শুধু সেই একজনকেই। সে অমরেশ রায়। অমরেশ ছিল ওর গৃহ-শিক্ষক। বইয়ের পাঠ নিতে নিতে কখন যে রোকেয়া ওর অন্তরটিও অধিকার করে বসেছে, তা বোধ করি কোন পক্ষই টের পায়নি।

রোকেয়া বেগমের বাবা-মা—হয়ত পূর্বতন চৌদ্দ পুরুষই মুসলমান। কিন্তু রোকেয়ার ভাল লাগেনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের সৌভ্রাত্র, ভাল লাগেনি তার আবাল্য সহচর-সহচরী, স্নেহময় পিতা-মাতার স্নিগ্ধ কুটীর। সে কালি দিয়েছে কুলে; হিন্দু গৃহ-শিক্ষক অমরেশকে ভালবেসেছে—ভালবেসে ঘর ছেড়েছে কলঙ্কিনী রাই। তিনমাস নিখোঁজ থাকবার পর বের করেছে পুলিশে।

রোকেয়া যেদিন আসে, সেদিনই ছিল ওর সিঁথিতে সিঁদুর পরা, হাতে ছিল লাল শাঁখা; অর্থাৎ ও তখন আর রোকেয়া নয়—রীনা।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবা-মা-ঠাকুরদা-দিদিমা সবাই মুসলমান!

উত্তর পেলাম—হ্যাঁ।

অমরেশ কি করত?

আমাকে পড়াত। হাইস্কুলে ক্লাস সেভেন-এ পড়ি আমি।

মনে মনে ভাবলাম, মা-বাবা ওর নিশ্চয় মনে করছেন—মেয়েকে আধুনিকা ক'রে গড়ে তুলতে গিয়েই এই ব্যাপার ঘটে গেল। কিন্তু সত্যি কি তাই? তা হলে মোগল-সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা হিন্দু বুন্দেলারাজকে কি করে ভালবাসল?

রীনার মা-বাবা-মাসীমা এসে দেখা করে গিয়েছেন। বুঝিয়েছেন তাকে নানারকমে; কৃতজ্ঞতার দোহাই পেড়ে তার অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করতে চেয়েছেন; তার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভগিনীকে তার দিকে এগিয়ে ধরেছেন; পিতৃগৃহের সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন, প্রচুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তালিকা সব তুলে ধরেছেন তার সামনে। শুধু এই কথাটি বলেননি—সে যাকে হৃদয় দিয়ে চেয়েছে, তার হাতেই তাকে তুলে দেওয়া হবে।

ওর মাসী বললেন—মা-বাবা মানুষ করে কি এই জন্যে? ছোটবেলা থেকে দুঃখকষ্ট ক'রে স্নেহ-মায়া মমতা দিয়ে শিশুকে বড় করে তোলে—তার কি এই প্রতিদান?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে রীনা—মনে কর আমি মরে গেছি। আমি যাব না; তোমাদের ঘরের একটা খড়-কুটো-ও চাই না আমি।

মাসী নাছোড়বান্দা। আবার বললেন—এ রকম তো কত হয়। ভুল বুঝো না মা, ফিরে চল। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে দিনে দিনে। তুমি তো এখন ছেলেমানুষ।

রীনার একই উত্তর—মুই যামু না।

বাবার প্রশ্ন—কতদিন এখানে থাকবি এইভাবে?

সারাজীবন।

আমি বললাম—তা তো হয় না। আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল সে। তারপর বলল—মা-বাবার কাছে গেলে আমাকে জোর করে পাকিস্থানে পার করে দেবে। আপনি তো জানেন না।

বাবা প্রতিবাদ করে উঠলেন—না, না, তা কেন হবে?

আগুন ঝরা দুই চোখে বাবার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মেয়ে বলল—মুই যামু না। যাও তোমরা, আমাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে আমি আত্মহত্যা করব।

ব্যস, মা-বাবার মুখ বন্ধ। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চোখের জলে বাবা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে রীনার মায়ের দিকে দেখিয়ে বললেন—তোর মা আজ ৪।৫ দিন জল গ্রহণ করেনি—

মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে উঠল মেয়ে—না খেলে নিজেই শুকিয়ে মরবে। আমি তো খেতে বারণ করিনি কাউকে।

মা তাকিয়েছিলেন এতক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে, স্থির দৃষ্টিতে। মেয়ের উত্তর শুনে তার চোখে জল এসে গেল। হঠাৎ কোলের মেয়েটা কেঁদে উঠল। তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলেন।

দলবল উঠে পড়লেন আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে। বাবার চোখের জলে অফিসের দরজার চৌকাঠের সামনের খানিকটা জায়গা ভিজে গেছে। জলের দাগ তখনও শুকায়নি। রীনা দাঁড়িয়ে দেখল তাদের গমন-পথের যেটুকু অংশ অফিস-ঘর থেকে দেখা যায়।

আমি ভাবতে লাগলাম, বিধাতার কি অপূর্ব্ব রহস্য-সৃষ্টি মেয়েদের দেহে-মনে যে, একটা বিশেষ বয়সে মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে হেলায় তুচ্ছ করে বেরিয়ে আসতে পারে তাদের মায়া-মমতার বাঁধন কেটে। তখন ধর্ম্ম থাকে না, আচার লুপ্ত হয়, বিচার বিসর্জ্জিত হয়।

সেদিন কোর্টে যাওয়ায় পথে রীনার দৃষ্টি-পথে প'ড়ে যায় প্রণয়ী অমরেশ। ছুটে গিয়ে সে আশ্রয় নিতে চায় অমরেশের পক্ষপুটে। কিন্তু তার জিম্মাদার তখন কোর্টের কনষ্টেবল। তারাও ছুটে আসে

হৈ হৈ করে। সরিয়ে দেয় অমরেশকে নির্ম্মম শাসন করে, রূঢ় বাক্যবাণ বিঁধে। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে হাসির টুকরো ; কেউ বা উঠে শিস্ দিয়ে।

অমরেশের বাবাও এসেছিলেন কোর্টে। অমরেশের তারিখে তারিখে আসতেন তিনি। এ-ঘটনাতে তাঁর মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে গেল একটু—পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছেলেকে যখন ভালবাসে ঐ মেয়ে এবং ছেলেরও যখন আপত্তি নেই, তখন মেয়ের ধর্ম্মে কি প্রয়োজন? মন নিয়েই যখন সমস্যা, তখন তার সমাধান হলেই হল। হিন্দুর মেয়েও হিন্দু ছাপ কপালে নিয়ে জন্মায় না, মুসলমান মেয়েরও অঙ্গে থাকে না মুসলমানী চিহ্ন। রক্তের রঙ্ দুজনেরই মান।

* * * *

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে নিভা সরকারের কথা। বগুড়া জেলায় আদমদীঘি থানায় বাড়ী। পিতার নামই ওয়ারেণ্টে লেখা আছে—স্বামীর নাম নয়।

জেলে একা আসেনি। কোলে ছিল তার এক শিশু-কন্যা—এগারো দিন তার বয়স। চেহারায়, পোষাকে-আশাকে সম্ভ্রান্ত ঘরের বলেই মনে হল।

কৌতূহলী মন সজাগ হয়ে উঠল। নাম, বাবার নাম, বাড়ী, কাপড়-চোপড় অর্থাৎ 'প্রাইভেট প্রপার্টি' (এমন কি, শিশুটি পর্য্যন্ত—শিশুও মাতার 'প্রাইভেট প্রপার্টি' বলে গণ্য করা হয়) মিলিয়ে নিয়ে ক্ষান্ত হতে পারলাম না। এখানে আসার ইতিহাস—বিশেষতঃ এই অবস্থায়—জানতে চাইলাম। অত্যন্ত নীচু গলায় উত্তর এল—কলকাতা গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে 'পাসপোর্ট' হারিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করছিলাম বিনা পাসপোর্টে যদি হিলি দিয়ে পাকিস্থানে যেতে পারি।—চুপ করল নিভা সরকার।

প্রশ্ন করবার ছিল, কিন্তু আর ইচ্ছা হল না।

কোর্ট-কনেষ্টবলের দল ততক্ষণে উস্‌খুস্ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। নিভার কথা শেষ হতে না হতেই তারা সুরু করল—না হুজুর। এই বাচ্চাকে ফেলিয়ে এ দোনো ভাগতেছিল। লেকিন হিলি বোডার-সে পাকড়্ গিয়া। আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। বাকিটা হাজত ও ওয়ারেণ্টেই স্পষ্ট।

নিভার সঙ্গে একই রিক্সাতে যাত্রী হিসাবে ধরা পড়েছে রবীন মালাকার। এবং একই 'বোস'। বাড়ী দেখলাম একই গ্রামে। তাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে নিভার মুখের দিকে চাইতেই দেখি, ফর্সা মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য! তারপর পুলিশের ঐ ধরণের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেও এন কম করেও ১০।১১ মাস আগেকার স্বেচ্ছাচারিতার ও কলঙ্কের কটা ঘন আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল।

গোটা ত্রয়েক আসামী 'রিসিভ' করতে বাকী ছিল। কেরাণীবাবু এসে পড়াতে আমি তার দিকেই কাগজপত্রগুলো ঠেলে দিয়ে বললাম—নিন। প্রথমেই ছিল রবীনের ওয়ারেণ্ট। নিভাকে 'রিসিভ' করা হয়েছিল আগেই ; অন্য আর আসামী যা ছিল, তা পুরাণো অর্থাৎ জেল থেকে কোর্টে নিয়েছিল।

রবীনের নাম-ধাম ইত্যাদি মিলিয়ে নেওয়ার পর নিভাকে কেরাণীবাবু শুধালেন—ইনি কি আপনার স্বামী?

রবীনবাবু কি আপনার স্বামী হন?

আলমারী আর দেওয়ালে মিলে যেখানে একটা কোণ সৃষ্টি করেছে, সেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিভা সরকার। আড়কোণা করে ধরা, সযত্নে ন্যাকড়ার কাঁথায় ঢাকা এগারো দিনের শিশু-কন্যা তার কোলে।

ছোট্ট নিম্নস্বরে একটি অস্পষ্ট উত্তর এল নিভার কাছ থেকে। আমাদের মনে হল নিভার উত্তর—হ্যাঁ। মুখটা তার আরও নেমে এল বুকের উপর।

কেরাণীবাবু জানতেন না নিভার কেস। ওরা দুজন নূতন 'আমদানী' অর্থাৎ (New Admission) দেখে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই যা অনুমান করেছিলেন, তাই প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে এসেছিল তাঁর মুখ থেকে।

মুখে 'হাঁ' বললেও নিভা মনে মনে তার এই উত্তরের অপরিসীম লজ্জাটাও অনুভব করতে পেরেছে। তাছাড়া এগারো দিনের শিশু-কন্যার জন্যই তো তার অতীতকে মুছে ফেলা যাবে না কিছুতেই।

জমাদারের মারফৎ পেলাম নিভার সোনার চুড়ি, পাকিস্থানী টাকা পাঁচটা, হিন্দুস্থানী টাকা এক টাকা এক আনা। রবীনেরও ছিল একটা টাকা, হিন্দুস্থানী।

পরের দিন নিভা চায় চা ও বিস্কুট। নিজের জন্যই শুধু নয়—রবীনের জন্যও ঐ একই আর্জ্জি পেশ করল সে। ওদের পয়সা থেকে সে ব্যবস্থা করে দিলাম। অফিস-ঘরে বসে যাকে আপন-জন বলে মুখে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেছিল, একটি রাত্রি হাজত-বাসের পর মনের দিক থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্ত করে ফেলে নিভা সরকার।

দু'দিন দু'রাত্রি হাজতবাসের পর আসে ওদের দুজনেরই মুক্তির নির্দ্দেশ—জামিন-নামা। এর পর-পরই ভেসে আসে সংবাদ—এদের দুজনের আজ বিয়ে হবে কোর্টে দাঁড়িয়ে। আয়োজন সম্পূর্ণ—এদের যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

শুনেছি, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা কোর্টে দাঁড়িয়ে এদের বিয়ে হয়েছে—সিভিল ম্যারেজ।

এখান থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় নিভাকে আমরা তুলে দিই এমন একজন লোকের হাতে যিনি পরিচয় দিলেন তাদেরই গ্রামের লোক ব'লে এবং সম্পর্কে নিভার ভগ্নীপতিও হন। লোকে বলে, এই ভগ্নীপতির স্কন্ধে দুজনের কৃতকর্ম্মের ফল ছলে চাপিয়ে দিয়ে ওরা সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল। সকালের দিকে এসে রিক্সা থেকে নেমে নিভা বলে ভগ্নীকে—মেয়েটাকে একটু দেখো, আমি আসছি। মেয়েটাকে একরকম জোর করেই তুলে দেয় ভগ্নীর কোলে—কোন প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়েই। তারপর বিকেল নাগাতও কোন খবর না পেয়ে ভগ্নীপতি থানায় খবর দেয়। ফলে এই দুর্ভোগ—থানা-পুলিশ জেল-হাজতবাস। হিন্দুসমাজে বাস করে কুমারী নিভার কোন দোষ দেখতে পাইনে। নিভা জানে, চাতুরী ছাড়া কোন জায়গায় তার সম্মানের স্থান নেই। তবু একেবারে বিনষ্ট বা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি যাকে নিজের দেহাংশ দিয়ে, মর্ম্ম দিয়ে, স্নেহ-মমতায় ধরে রেখেছে দেহাভ্যন্তরে দশটি মাস ধরে। যেদিন হউক, যখন হউক, ভগ্নীপতির কাছে থাকলে সে তো চিনতে পারবে তার আত্মজাকে ; তার ভুল হবেনা এ জীবনে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে গেলে নিভার চেহারায় ধরা পড়ত। সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও নিভা তার মায়ের চোখকে কোনক্রমেই এড়াতে পারত না। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে; বড় বড় ছুটি চোখের নীচে কালিমা; সারা মুখমণ্ডলে অপরিমেয় ক্লান্তির ছাপ; বেশি কথা বলতে গেলে যেন হাঁপিয়ে আসছে—এই তো নিভা। একি কোন মায়ের চোখে ধরা পড়তে দেরি লাগে, না বুঝতে সময় লাগে এর কারণ? তবু নিভা কিনতে চেয়ে ছিল জীবনের মূল্যে পুরাণো পরিচয়; ফিরে যেতে চেয়েছিল যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ—সেই পদচিহ্ন ধরে। নিভা কি ভুল করেছিল? নিভা একা-ই কি সেজন্য জবাবদিহি করবে? সমাজের উঁচু স্তরের রন্ধে রন্ধে যে লোভ, যে কামনা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে, তারই হাওয়ায় নীল হয়ে যাচ্ছে নিভা সরকারের দল।—এই হচ্ছে জবাব।

● ● ●

এবার মূল কাহিনীতে ফেরা যাক।

শেষ হয়ে গেল রোকেয়ার কেস।

অমরেশকে মাঝি করেই ভেসেছে রোকেয়া। অমরেশও নিপুণ মাঝির মতই তাকে টেনে তুলেছে কূলে। পাড়ি দিয়ে এসেছে অনেকটা পথ, শঙ্কা-সঙ্কুল অভিযান শেষ হল তার। বিরহ-রাত্রির শেষে অরুণালোকিত হয়ে উঠেছে তার মিলনানন্দের প্রভাত। সে লাভ করেছে তার হৃদয়ের মানসী।

অমরেশ এসেছে জেলখানাতে, কিন্তু দেখা করেনি ওর সঙ্গে। অথচ নিজেকে দূরে রেখেও ওর মন তৃপ্তি পায়নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে—ওর কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা, শরীর কেমন আছে, ইত্যাদি। লজ্জায় বোধহয় বলতে বেধেছে—ওর কথা কিছু বলে কিনা। অমরেশকে দেখে একটু লাজুক প্রকৃতির বলে মনে হয়। অথচ ওর মত ছেলে যে সাহস করে এই মেয়েকে নিতে চায় নিজের সমাজ, ধর্ম, অগ্রাহ্য করেই—এতে আমরা আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি। রোকেয়া এখানে এসে রীনা হয়েছে; আমরাও ওই নামেই ডাকি। যদিও আমাদের রেজিষ্টারে দুই নামই আছে—রোকেয়া বেগম ওরফে রীনা রায়, বাবার নাম—মুসলমানী নাম-ই। অমরেশকে এ-ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করতে দেখেছি। সে বলত নিশ্চয়ই ওকে আমি গ্রহণ করব। আমি ওকে হিন্দুমতে বিয়ে করেছি—ও আমার স্ত্রী।

শেষের দিকে রীনার খুব ঘন ঘন তারিখ পড়তে লাগল। রীনাকে শুধালে ও বলত, কি জানি বোধ হয় ঐ তারিখেই আমার কেস শেষ হয়ে যাবে।—এর বেশি আর ও কিছু জানত-ও না, বলতেও পারত না। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, রীনার সিঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়ার জোর আছে। অমরেশকে সে ফিরে পেয়েছে তার কাছে; তার স্বপ্ন সার্থক, প্রার্থনা সফল।

প্রায় সাড়ে তিন মাস এখানে ছিল রীনা। এই কয়মাসে ওর চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। উদ্ভিন্ন-যৌবনার অঙ্গে অঙ্গে জেগেছে সাড়া, বহির্মুখী মন খুঁজেছে সঙ্গী, বিরহ রাত্রির অবসানের অপেক্ষায় কাটিয়েছে দিন আর রাত, রাত আর দিন ফিমেল-ওয়ার্ডের অপরিসর গৃহে। মাথায়ও যেন একটু বড় হয়েছে—অবশ্য আমরা রোজ দেখি বলে এত সব খুঁটিনাটি আমাদের চোখে অত সহজে ধরা পড়ে না। তবু একদিন হঠাৎ চোখে পড়ে, সত্যিই তো ওর পরিবর্ত্তন হয়েছে—চেহারায়, লালিত্যে ও সুষমায়। বালিকা-বয়স ছেড়ে পা বাড়িয়েছে রহস্যময়ী কিশোরীর পথে।

রীনা সিঁদুরের কৌটাটা খুব বড় করেই পরত—কেন জানি না, জানতে চাইওনি কোনদিন। তাদের বাড়ীতে এ প্রথার বালাই নেই, তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে এটা করত কিনা বলতে পারি না। তবে ও যেদিন জেলে আসে, সেদিন সিঁদুরের কৌটা সঙ্গেই এনেছিল। স্নানের পর নিয়মিত সে সিঁথিতেও সিঁদুর পরত, কপালেও কৌটা দিত, লাল শাঁখা ও নোয়াতেও দিতে ভুলত না—অর্থাৎ মনে-প্রাণে স্বামীর ধর্ম্ম পালন করত।

তার এই প্রায় [illegible]র্বলের মত 'টিপ্' দেখে জেল-সুপারেরই প্রথম দিন আশ্চর্য্য মনে হয়ে[illegible]।

তিনি হেসে মন্তব্য করেছিলেন, অত বড় সিঁদুরের কৌটা দেখলে তো ওর বাবা-মা 'ফিট' হয়ে যাবে। বাবা-মা 'ফিট' অবশ্য হননি, তবে কপালের সিঁদুরের উজ্জ্বল কৌটা এবং সিঁথির সরু সিঁদুর রেখা—পিতামাতার মনে জ্বালা ধরিয়েছিল।

একদিন জেল-সুপারকেই প্রশ্ন করে বসে—আমাকে আর কতদিন এখানে রাখবেন? উত্তর দিলেন জেল-সুপার তথা এস, ডি, ও,—জামিনে তো যেতেই বলছি তোমাকে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেন জানি না, জামিনে যাওয়া ওর হয়নি।

রীনাকে ভালবাসত ফিমেল ওয়ার্ডের সবাই। চঞ্চলা কিশোরী, হেসে হেসে বেড়াত দিনরাত। তারপর দুজন তারই মত প্রায় 'কেসে' এসে পড়ল। এখন সে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিধায়, তারাও তার পরিচর্য্যায় দিন কাটাত। জমাদারণীদের একজন বিধবা, একজন সধবা। সুতরাং তারাও তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখত মেয়ের মত করে। তার চুল বেঁধে দিত, সিঁদুর পরাত—প্রসাধনে সুন্দর করে তুলত কচি মুখখানাকে। যেদিন কোর্টে যেত, সেদিন তার সঙ্গীরা ওকে একখানা লাল শাড়ী পরাত। শাড়ীখানা ওদেরই মধ্যে থেকে একজন পছন্দ ক'রে ওকে পরতে বলত। এই শাড়ীখানায় ওকে মানাত চমৎকার—একেবারে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। হাতে থাকত একটা ছোট্ট মেয়েদের রুমাল—গোলাপী রং। পায়ে স্যাণ্ডাল। এ হেন অবস্থায় রীনাকে দেখে কারোর মনেই উঠত না মানুষের ধর্ম্মের কথা।

প্রথম দিকে রীনা ছিল শান্ত, নির্ব্বিরোধী, নিরীহ, সরল, গ্রাম্য বালিকা। কোন কথা শুধালে উত্তর না দিয়ে হাসত শুধু। হাসিটি ছিল তার মধুর। মুখখানাতেও ছিল অপূর্ব্ব লালিত্য। চোখে ছিল নবোঢ়া কিশোরীর সলজ্জ ছায়া। শেষের দিকে তার দেহে-মনে এসেছিল বন-হরিণীর চঞ্চলতা। তার কলকল কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠত ফিমেল ওয়ার্ড। সে শব্দ-তরঙ্গ পার হয়ে আসত ফিমেল-ওয়ার্ডের ভিতরের দরজা। এ পারে পুরুষ আসামীর দল কখনও কখনও থাকত উৎকর্ণ হয়ে। জোর হাওয়াতে ফিমেল-ওয়ার্ডের প্রবেশ পথের দরজা ধাক্কা দিলে জমাদারের কাছে খবর পৌঁছত—ফিমেল ওয়ার্ডসে বোলাতা হ্যায়। জমাদার নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হলে দু'পক্ষেই বকুনি খেত—জমাদারণী এবং এ-পক্ষে পুরুষ বন্দীর দল।

একদিন জেল-সুপার শুধালেন রীনাকে—বাপের কাছে যাবে? যাবে তো বল, আজই ব্যবস্থা করে দিই।

রীনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করল—বাবার কাছে যাওয়ার জন্য কি এতদিন জেলখানার ভাত খাচ্ছি? বাবার কাছে গেলেই মেরে ফেলবে। একটু থেমে বলল—(বোধ করি বাল্য-জীবনের স্মৃতি তার মনে পড়েছে)—বাবা মা-কে যা মারে এক-একদিন!

হাসলেন সুপার। শুধালেন—মাকে তোমার বাবা এখনও মারে নাকি? দেখেছ তুমি নিজে?

—মিছা কইমু ক্যান্। যেন পাল্টা প্রশ্ন করল রীনা।

—ও, খুব মারে, না?

—হ্যাঁ, বলে চোখ দুটো একটু কুঁচকে হেসে উঠল। হাসলে ওর চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে যেত।

আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না সুপার। বেরিয়ে এলেন ফিমেল-ওয়ার্ড থেকে। অফিসে এসে বসে বললেন—ওর ভয়, 'বাবা' ওকে মেরে ফেলবে।

আমি যোগ করলাম তাঁর মন্তব্যে—শুধু তাই নয় স্যার, আরও একটা ভয় ওর আছে।

কি?—সুপারের কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

—ভয় যে, ওর বাবা ওকে পাকিস্থানে পার করে দেবে। তারপর হয় সেখানে বিয়ে দেবে, নতুবা মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করবে সেখানেই।

—অসম্ভব নয়।—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সুপারের।

দেখতে দেখতে কেটে যায় মাস-তিনেক। তখনও রীনা কোর্টে যায় আর ফিরে আসে। এদিকে ছেঁড়ে তার পরনের শাড়ী, ফেঁসে যায় গায়ের ব্লাউজ। এমনি অবস্থায় আমরা ওকে একদিন বলি—তুমি একখানা চিঠি লেখ বরং অমরেশকে। ঠিকানা জানো তো? হেসে ফেলে সে গড়-গড় করে বলে গেল—গ্রাম, পোষ্ট অফিস,—আর জিলা তো এই জিলা-ই। সুতরাং সেটা অপ্রয়োজনবোধে আর বলল না।

চিঠি সে লিখেছিল। আর তার ভাষা ছিল, সদ্য-বিবাহিত স্ত্রীর অন্তরের উৎসারিত বাণীময় ছন্দ যেন। নিজের শরীরের দিকে অমরেশ যেন যত্ন করে, সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে—ইত্যাদি। এমন কি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম দিতেও ভোলেনি সে। নিজের কাপড়ের প্রয়োজনের কথা একবার ছাড়া উল্লেখ করেনি। এ সত্ত্বেও অনেক কথাই তার অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। এই চিঠি থেকে সেটুকু বুঝতে বাকি থাকে না।

তার এই চিঠি নিয়ে একটা ঘটনা হয়েছিল—সেটা বলি। ফিমেল ওয়ার্ড থেকে যথানিয়মে চিঠিখানা আমাদের অফিসের 'রাইটারের' হাতে আসে। কিন্তু সে 'রাইটারটা' ছিল কেমন একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির। দাঁত দিয়ে নখ-খোঁটা তার ছিল একটা প্রধান মুদ্রাদোষ। আর একটা মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলত কখনও কখনও একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায়। প্রত্যেক আসামীর বয়স, উচ্চতা, দাগ (identification marks) ইত্যাদি লেখা জেলখানার অতি অবশ্য করণীয় ব্যাপারের অন্যতম। কর্ত্তব্যটা মেডিক্যাল অফিসারের। কিন্তু এসব জায়গায় অর্থাৎ আমি যেখানকার কথা বলছি, তাদের কাজও অনেক সময় আমাদেরই করতে হয়—যেমন এই দাগ লেখা, ওজন লেখা। 'রাইটাররাই' আমাদের সাহায্য করে এসব কাজে। এইভাবে আসামীর দাগ খুঁজতে বললে রাইটারটি বলত লিখুন—নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি তিল, পৃষ্ঠদেশে ক্ষতচিহ্ন ইত্যাদি। নিজের রোগের কথায় ডাক্তারবাবুকে একদিন ও বলেছিল—ক্ষুধামান্দ্য ও শিরোঘূর্ণন।

যাক!—রাইটার রীনার চিঠি নিয়ে গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে গেট খুলবার অপেক্ষায়, এমন সময় ছোঁ মেরে চিঠিখানা নিয়ে গেল ওর হাত থেকে কে যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখে—সদ্য আগত অর্থাৎ দু'দিন আগে এসেছে এমন দু'জন তার হাত থেকে চিঠি নিয়েছে।

বিকেলে দুজনকে ডাকানো হল অফিসে। অপরাধ—প্রথমত: রাইটারের হাত থেকে চিঠি ছিনিয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত:, সে—চিঠিখানা এমন ভাবে ছিঁড়েছে যে, আর সেটা ডাকে দেওয়া চলবে না। দ্বিতীয় অপরাধের উত্তরে বলল, 'কাইলেই টানাটানি করতে করতে ছিঁড়ে গেছে—ইচ্ছা ছিল না ছিঁড়বার।'

ওদের দোষ নেই হয়ত। রীনার ইতিহাস এখানকার হিন্দুসমাজে এমন আলোড়ন তুলেছে যে, তার সম্বন্ধে ভিতরে এবং বাইরে অগাধ কৌতুহল অপেক্ষা করছে। বাইরের ২।১ জন আমাকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করেছে—হাঁ মশায়, মেয়েটা দেখতে কেমন, বয়সটা কত হবে? সুতরাং যারা কাছাকাছি আছে, ব্যবধান শুধু একটা কাষ্ঠ-কপাট এবং পাকা পাঁচির—তাদের কৌতুহল যে আরও উদগ্র হয়ে উঠবে, সেটা অস্বাভাবিক নয় কিছু। বুঝি সে কথা। আবার একথা-ও জানি, ভিতরের কয়েদীরা নারী মাত্রেরই বিষয়ে অত্যন্ত কৌতুহলী। তাদের সমগ্র সত্তায় নারী দর্শনেও হয়ত অদ্ভুত শিহরণ জাগে; অনেক সময় তারা হাঁ করে চেয়ে থাকে দলবদ্ধভাবে কোন নারীর দিকে। কিন্তু শুধু বুঝলেই এবং জানলেই এসব ক্ষেত্রে চাকরি করা চলে না।

ছিঁড়ে চিঠিখানাকে এমন ভাবে নষ্ট করেছে ওরা যে, রীনাকে নূতন একখানা চিঠির কাগজ দিতে হল আর ওদের করতে হল রিপোর্ট। শাস্তি ওয়ার্ণিং-এ সমাপ্ত হল। চিঠি পড়ে ওরা কি আনন্দ পেয়েছে জানিনা। চিঠিতে অবশ্য স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক মেনে নিয়েই রীনা লিখেছিল। এটুকু সাধারণ জ্ঞান তার ছিল—বোধ করি সব বিবাহিতা মেয়েরই থাকে—যে, মনের সব কথা বন্ধ খামের চিঠিতেও স্বামীকে বলা যায় না। তার চিঠিতে সে জানিয়েছিল কাপড় চোপড়ের স্বল্পতার কথা; চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল স্বামীর জন্য চঞ্চল ব্যাকুলতা। সম্বোধন ও সমাপ্তিতে চিঠিতে যে বিশেষ শব্দগুলো সদ্য-বিবাহিত দম্পতীর কাণে অপূর্ব্ব অর্থগৌরবে ভূষিত হয়ে ধরা দেয়, রীনাও সেই সম্বোধন ও সমাপ্তির শব্দ ব্যবহার করেছিল। এ চিঠিতে ফল হয়েছিল—কাপড় চোপড়, ব্লাউজ, স্যাণ্ডাল এসেছিল।

যেদিন কোর্ট থেকে রীনা আর ফিরে আসেনি, সেদিন অমরেশ এসে তার কাপড় চোপড় নিয়ে গেছে। কেসের কি হল—ওকে জিজ্ঞেস করলে হেসে উত্তর দিল—আমি-ই পেলাম। দুটো কথাতেই আমরা বুঝলাম। প্রায় সাড়ে তিনমাসের ব্যবধান ঘুচে গেল আজ। রীনার জীবনে দেখা দিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত। আকাশের মেঘলা ভাব, অপরাহ্ণের ম্লান আলো—দুজনের হাসির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে রীনাকে ঘিরে জনতা। দূরে থেকেও তাকে চিনতে ভুল হয়নি আমার—লাল রঙের শাড়ী পরা ৫'-২' রীনা রায়।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

২

ডায়লা তাড়াতাড়ি সেই শিশুটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

ভিজে জামায় এতক্ষণ ছিল, তায় আবার পৌষের সেই প্রচণ্ড শীতে দেহে কাঁপুনী ধরেছে তখন বাচ্চাটার, তাই আবার কেঁদে ওঠে।

বুকের মধ্যে দোলাতে দোলাতে ক্রন্দনরত বাচ্চাটাকে ডায়লা রোজারিওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আমার কেবিনে যাচ্ছি—ভিজে জামা ছাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কিছুক্ষণ অন্তত আগুনের তাপ দিতে হবে। ডায়লা পাশেই নিজের কেবিনের মধ্যে চলে গেল।

অচেতন সেই নারীদেহ তখনো তেমনি কেবিনের কাঠের পাটাতনের উপরে অসহায় ভাবে পড়ে ছিল। রোজারিও সেই অচেতন দেহটার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

কাপ্তান।

হ্যাঁ। ডি'ক্রুজের ডাকে চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়।

কাপ্তান।

ইয়েস্ ডি'ক্রুজ।

এটাকে তাহলে দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দিই।

দরিয়ার জলে। না, না—

তবে কি করবে ওকে নিয়ে?

কি করবো? অন্যমনস্কের মতই যেন নিজেকে নিজে প্রশ্নটা করে রোজারিও।

হাঁ, জ্ঞান ফিরে এলেই তো বাচ্চাটার খোঁজ করবে, তারপর হয়ত চেঁচামেচি কান্না কাটি শুরু করে দেবে। তার চাইতে টেনে দরিয়ার জলে ফেলে দিই লেঠা চুকে যাবে।

না। মৃদুকণ্ঠে বলে রোজারিও।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই রোজারিওর মুখের দিকে তাকাল ডি'ক্রুজ। মৃদুকণ্ঠে শুধাল, তাহ'লে—

এক কাজ কর ডি'ক্রুজ।

কি?

ছোট ডিঙ্গিতে করে নিয়ে গিয়ে বালুর চরে ফেলে রেখে আয়।

আসলে রোজারিওর মনের মধ্যে অচেতন ভূলুণ্ঠিতা ঐ নারী কেমন যেন একটা মমতা জাগায়। চিরদিনের নিষ্ঠুর মনটা যেন তার হঠাৎ নরম হয়ে যায়।

বাচ্চাটাকে তো ছিনিয়েই নেওয়া হলো, আবার প্রাণে মারা কেন।

কাপ্তান রোজারিওর প্রস্তাবে ডি'ক্রুজ কিন্তু একটু অবাকই হয়। একে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার উপর ওকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই ভবিষ্যতের জন্য একটা জট পাকিয়ে রাখা।

কিন্তু আমি বলছিলাম কাপ্তান, ওটাকে একেবারে শেষ করে দিলেই হতো না?

না রে না। যা বলছি তাই কর। চল, আমিও তোর সঙ্গে যাবো। বলতে বলতে রোজারিও নিজেই নীচু হ'য়ে সেই সিক্তবস্ত্রে ভূলুণ্ঠিতা নারীর অচেতন দেহটা কাঁধের উপরে তুলে নিল দু হাত দিয়ে।

চল ডি'ক্রুজ।

পূবের অন্ধকার আকাশটার ম্লান একটু একটু করে আলোর রেখা ধরেছে। বালুর চরে এসে ডিঙ্গি ভাগালো ডি'ক্রুজ। সেই নারী তখনো অচেতন। রোজারিও অচেতন নারী দেহটা ডিঙ্গির খোল থেকে তুলে নিল আবার কাঁধের 'পরে। ঢেউয়ের তালে তালে ছোট ডিঙ্গিটা এমন ভাবে দুলছে যে, কাঁধের 'পরে অমন একটা ভারী বোঝা নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা সত্যিই কঠিন, রোজারিও তাই কোন মতে টলতে টলতে ডিঙ্গি থেকে জলের মধ্যে নামল, তারপর এগিয়ে গেল পাড়ের দিকে।

জলের কিনারা থেকে বেশ কিছুদূর গিয়ে বালুর উপরে ধীরে ধীরে অচেতন নারী দেহটা নামিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিল। বোধ হয় তখন সেই নারীর লুপ্ত চৈতন্য ক্রমশঃ ফিরে আসছে। বালুর 'পরে শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়লো। মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল রোজারিও। অতঃপর রাত্রি শেষের আবছা আলো আঁধারে আর একবার তাকাল সেই বালুর 'পরে শায়িত অচেতন নারীর মুখের দিকে। গায়ের সিক্ত বস্ত্র জায়গায় জায়গায় লেপটে আছে, আবার জায়গায় জায়গায় এলো মেলো হয়ে গিয়েছে। মাথার কালো চুলের রাশি অযতনে বালুর 'পরে লুটিয়ে পড়েছে।

ডিঙ্গি থেকে ডি'ক্রুজের আহ্বান শোনা গেল, কাপ্তান—

হ্যাঁ, যাই।

রোজারিও দ্রুত পায়ে গিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে বসল। এবং রোজারিও ডিঙ্গিতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ছোট দাঁড়টা দিয়ে জলের তলায় মাটিতে একটা সবল হাতের ধাক্কা দিয়ে ডি'ক্রুজ ডিঙ্গিটা পুনরায় স্রোতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল এবং আরো কিছুক্ষণ পরে দেখতে দেখতে রাত্রি শেষের আলো-ছায়ায় ছোট ডিঙ্গিটা যেন নদীর বুকে মিলিয়ে গেল।

আরো মিনিট দশেক পরে 'আঃ মাগো' অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে পাশ ফিরল সুলোচনা।

সত্যিই লুপ্ত চেতনা ফিরে আসছিল নদীর ধারের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু একটু করে তখন সুলোচনার।

হতভাগিনী সুলোচনা।

বিবাহের পর দীর্ঘ ছয় বছর কোন সন্তান হলো না বলে, শ্বশুর ও স্বামীর বংশ রক্ষা হলো না বলে, কত লজ্জা অপমান ও তিরস্কারের ও লাঞ্ছনার গ্লানিই না তাকে সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর গঙ্গাদেবীর কাছে মানত করে দীর্ঘ ছয় বছর বাদে যখন ছেলে হলো, তাও বুঝি নতুন করে সূচনা জাগালো আর এক মর্মন্তুদ অভিশাপের।

বেচারী। তখন কি করে জানবে, কি করে বুঝবে, দেবতার কাছে মুখের একটা তার সামান্য প্রতিশ্রুতিই শেষ পর্যন্ত আবার তার সমস্ত সৌভাগ্যকে, যে সৌভাগ্যের আলো দীর্ঘ ছয়বছর পরে ক্ষণেকের জন্য মাত্র তার ভাগ্যাকাশে উঁকি দিয়েছিল, উঁকি দিয়েই সেটা মেঘে ঢাকা পড়বে।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল সুলোচনা মা গঙ্গার কাছে, মাগো, সন্তান দে মা, বন্ধ্যার এই কলঙ্ক থেকে আমাকে মুক্তি দে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি মা, আমার প্রথম সন্তান তোকে আমি দেবো। দেবতা বোধহয় অলক্ষ্যে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে হাসলেন।

বছর না ঘুরতেই সন্তানসম্ভাবিতা হলো সুলোচনা। এবং দীর্ঘকাল পরে বহু প্রত্যাশিত বহু আকাঙ্ক্ষিত হরনাথ মিশ্রের স্ত্রী সুলোচনার সন্তান সম্ভবনায় এবং তারই আনন্দে মিশ্র গৃহের সকলেই বুঝি ভুলে গেল দেবতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাটা।

এবং আশ্চর্য দশমাস দশদিনের মধ্যে কারো একটিবার সে কথাটি তো মনে পড়লই না, এমনকি পুত্র জন্মাল সুলোচনার, সেই পুত্র ক্রমে দেড় বৎসর প্রায় বয়স হলো তবু কারো মনে পড়ে না, যে পুত্রকে নিয়ে তারা সকলেই আনন্দে মেতে উঠছে, সেই পুত্রের উপর তাদের কোন অধিকার নেই।

দেবতাকে উৎসর্গীকৃত সে সন্তান। দেবতার দেওয়া আশীর্বাদ দেবতাকেই তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। দেবতার কাছে অঙ্গীকার করা রয়েছে তাদের। নবদ্বীপে পণ্ডিত-অগ্রগণ্য রামানন্দ মিশ্রের একমাত্র পুত্র হরনাথ মিশ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। কালীতারা, নয়নতারা, জয়তারা প্রভৃতি পাঁচ কন্যার পর পুত্র হরনাথ। সেই একমাত্র পুত্রের জন্য রামানন্দ মিশ্র অনেক অনুসন্ধান করে মুকুন্দাবাদের এক গরীব গৃহস্থঘর থেকে অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী সুলোচনাকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন।

ঘর আলো করা পুত্রবধূ। যেমন রূপ তেমনি গুণ। বধূর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। কিন্তু একটি দুটি করে করে চারটি বছর গড়িয়ে গেল;

সুলোচনা যখন মাতৃত্বের দ্বার মিশ্র-বংশকে পুন্নাম নরক থেকে রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনাই দেখাতে পারল না, একে একে গৃহে সকলেরই মুখে চিন্তার রেখা পড়ল।

চিন্তা শেষ পর্যন্ত অসন্তোষে পরিণত হতে লাগল। কিন্তু ভাগ্যের পরে তো কোন হাত নেই। মানুষ ভাগ্যের ক্রীড়নক। মিশ্রগৃহিণী জগদ্ধাত্রী দেবী পুত্রবধূর সন্তানলাভের কামনায় সত্যি সত্যিই যেন এবারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

জপ তপ, স্বস্ত্যয়ন, দেবতার আশীর্বাদী প্রসাদী ফুল, কবচ—চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না, জগদ্ধাত্রীদেবীর কিন্তু ক্ষীণতম আশার আলোটুকুও দেখা গেল না।

আরো একবছর অতিবাহিত হলো। অভাগিনী সুলোচনার সুন্দর মুখখানি যেন ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় ও ব্যর্থতায় এতটুকু হয়ে গেল। জগদ্ধাত্রী বললেন, পুত্রের আবার বিবাহ দেবেন। এবং কথাটা অর্থাৎ তার মনোগত বাসনা একদিন তিনি পুত্র হরনাথের কাছে প্রকাশ করলেন।

গৃহেই টোল রয়েছে। পিতা পুত্র সেই টোলেই অধ্যাপনা করেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে টোলের অধ্যাপনা করে গৃহাভ্যন্তরে এসেছে হরনাথ, জগদ্ধাত্রী দেবী পুত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হর—

কি মা?

আমার এবং তোমার জন্মদাতার ইচ্ছা—তুমি আবার দার পরিগ্রহ কর।

কথাটা বেশ কিছুদিন ধরেই যে গৃহমধ্যে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছিল এবং হরনাথের কাণেও যে আসেনি তাও নয়। এবং একদিন যে তার কাছেই সোজাসুজি প্রস্তাবটা আসবে তাও সে জানত। কিন্তু এতটুকু গুরুত্বও দেয়নি হরনাথ সেই আলোচনাকে। কারণ দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ যে সে এ জীবনে করতে পারবে না, তার পক্ষে চিন্তারও অতীত, এইটুকুই হরনাথ জানত।

মায়ের প্রস্তাবে তাই হাসিমুখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতকণ্ঠে বললে,—হঠাৎ এমন উদ্ভট ইচ্ছা তোমাদের মনে জাগল কেন মা?

বড়বোন কালীতারা কিছুদিন হলো পঞ্চমবার সন্তানসম্ভাবিতা হ'য়ে পিতৃগৃহে এসে অবস্থান করছিল। সে আড়ালেই ছিল। হরনাথের কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, উদ্ভট ইচ্ছাটা এর মধ্যে কোথায় দেখলে ভাই? সংসারে থাকতে গেলে ধর্মশাস্ত্র সবকিছু মেনে চলতে হবে তো?

পূর্ববৎ মৃদু হেসে হরনাথ জবাব দেয়,—ধর্ম ও শাস্ত্র বুঝি বলে দিদি সংসারে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে থাকতেই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করা?

সে স্ত্রী রুগ্না বা নিষ্ফলা হলে বলে বৈকি। কালীতারা জবাব দেয়।

রুগ্না সে নয়, তাছাড়া সে যে নিষ্ফলাই—তার এই সতের বছর বয়সেই বা প্রমাণিত হয়ে গেল কি করে অবিসংবাদী ভাবে।

অ মা। দাদা কি বলে শোন! বৌয়ের ঐ বয়েসে আমার দুর্গা, শ্যামা হয়ে গেছে না। কালীতারা টিপুনী কেটে ওঠে।

জগদ্ধাত্রী বলেন, না হয়, কালী ঠিক কথাই বলেছে। তাছাড়া

এক গণ্ডূষ জলের অভাবে তোর ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ কুম্ভীপাক নরকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সর্বক্ষণ পাক খেয়ে বেড়াবে—এই কি তুই চাস।

কিন্তু মা, এক স্ত্রী বর্তমানে শুধু তার সন্তান হলো না বলে আর এক স্ত্রী ঘরে নিয়ে আসবো—এই বা কেমন যুক্তি তোমাদের।

তুমি তো সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য করছো না বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ। ধর্মের জন্য করছো।

তাছাড়া এতে অন্যায়টাই বা কি আছে দাদা। কালীতারা যোগ দেয়, বাবার পিতামহ বাবার মুখেইতো শুনেছি বংশ রক্ষার জন্য চার চারবার বিবাহ করেছিলেন। এতো সংসারে আকচারই হচ্ছে।

হাঁ, বাবা—তুই আর অমত করিসনে। আমি পাত্রী দেখেছি—হরিহর ন্যায়রত্নের সর্বসুলক্ষণা একটি কন্যা আছে—তার সঙ্গেই সামনের অগ্রায়ণে আমি তোর বিয়ে দেবো।

হরনাথ মা বা ভগ্নীর সঙ্গে আর তর্ক করে না। সে তখনকার মত সেখান থেকে প্রস্থান করে কিন্তু দু চারদিন যেতেই হরনাথ বুঝতে পারে সহজে সে নিষ্কৃতি পাবে না। মাতা ও ভগিনী বদ্ধ-পরিকর। এমন কি তার পিতা রামানন্দ মিশ্রও যে ব্যাপারটার পূর্ণ সমর্থন করছে তাও সে বুঝতে পারে। হরনাথ কি করবে বুঝতে পারে না। বেচারী নিরপরাধিনী সুলোচনা কি দোষ করেছে যে, হরনাথ তার উপরে এমন অন্যায় করবে। কিন্তু সেই সুলোচনাও যখন নিভৃতে শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে স্বামীকে সেই কথাই বললে, হরনাথের বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। কয়েক মুহূর্ত তার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বের হয় না। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে স্ত্রীর মুখের দিকে।

কি বলছো তুমি সুলোচনা?

কেন, অন্যায় কি বলছি?

অন্যায় নয়?

কেন, অন্যায় হবে কেন? মা, ঠাকুরঝিদি তো ঠিকই বলেছেন। আমার জন্য তোমার ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ পুন্নাম নরকগামী হবেন আর অভাগী আমি জেনে শুনে সেই পাপের ভাগী হবো। না, না—তুমি বিবাহ কর—

সুলোচনা।

হ্যাঁ, তুমি বিবাহ কর।

পারবে তুমি তা সহ্য করতে?

কেন পারবো না?

কেন পারবে না তা নয়, আমি জিজ্ঞাসা করছি পারবে কি না। মুহূর্তকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হরনাথ বলে, তুমি পারলেও, জেনো আমি পারব না সুলোচনা। জেনে শুনে আমি আমার সহধর্মিণীর উপর এত বড় অন্যায় করতে পারবো না।

কিন্তু হরনাথের সমস্ত দৃঢ়তা যেন বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে যায়, যখন শেষ পর্যন্ত পিতা রামানন্দ একদিন পুত্রকে ডেকে সামনে বসিয়ে বললেন, বোস হরনাথ। রামানন্দ মিশ্র চিরদিন অত্যন্ত রাশভারী লোক এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলতে হরনাথ কখনো পারেনি। চিরদিন পিতার গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনলেই হরনাথের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠতো। তাই পিতার ডাকে পিতার সামনে এলেও পিতা তাকে বসতে বললেও সে বসতে পারে না। অদূরে সসম্ভ্রমে মাথা নীচু দাঁড়িয়ে থাকে, ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

নিজের কক্ষে একখানি ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে সাংখ্যদর্শন পাঠ করছিলেন রামানন্দ মিশ্র। বইখানি মুড়ে রেখে পুনরায় পুত্রের দিকে তাকালেন—

তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা তুমি আবার দার পরিগ্রহ কর।

হরনাথ জবাব দেবে কি সে তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে।

আমি জানি হরনাথ, বধূমাতার দিক হতে এটা সত্যিই নিতান্ত অবিচার করা হচ্ছে, আমাদের কিন্তু সংসারে থেকে সংসার ধর্ম পালন করতে হলে বহুক্ষেত্রে আমাদের অনোন্যপায় হয়েই এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছুকে স্বীকার করে নিতে হয়।

হরনাথ যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল তেমনই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামানন্দ বলতে লাগলেন, এক্ষেত্রে তোমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথাটাও যে আমার মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু কি করবে বলো। কত আশা করে নিজে পছন্দ করে একদিন মা লক্ষ্মীকে গৃহে এনেছিলাম, আজ বুঝি আমারও তার সামনে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াবার সাহস নেই। কি করবো, আমারও যে হাত পা বাঁধা। আমিও যে নিরুপায়। গাঢ় হয়ে আসে শেষের দিকে রামানন্দ মিশ্রের কণ্ঠস্বর। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। সাংখ্যদর্শনের পুঁথিখানা আবার খুলে তারই পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন।

চিরদিন মিতবাক রামানন্দ মিশ্র। পুত্র হরনাথ বুঝতে পারে তাঁর যা বলবার ছিল পুত্রকে বলা হয়ে গিয়েছে।

হরনাথও তাই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে এবং শেষ পর্যন্ত গৃহে বিবাহের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলোচনাকে বুঝি ভগবানই রক্ষা করলেন। বিবাহের সব যখন স্থির হতে চলেছে, সহসা এমন সময় আবিষ্কৃত হলো সুলোচনা সন্তানসম্ভবা। মিশ্র গৃহে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

রামানন্দ মিশ্র নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন। অনেকে নানা মন্তব্য করতে লাগল কিন্তু রামানন্দ কারো কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। নির্দিষ্ট দিনে সুলোচনা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কালো কষ্টিপাথরের মতই অপূর্ব রূপলাবণ্যময় এক পুত্র।

রামানন্দ সানন্দে পৌত্র মুখ দর্শন করে বললেন, গোপাল, আমার ঘরে স্বয়ং গোপাল এসেছে গিন্নী। পৌত্রের নামকরণ করলেন নিজেই—গোপাল মিশ্র।

সকলেরই মনে আনন্দের হাসি, একমাত্র সুলোচনার মুখেই হাসি নেই। এত কষ্টের এত সাধের সন্তান, তবু তো এর 'পরে কোন অধিকারই নেই মা হয়েও তার। মা গঙ্গার কাছেই মানত করা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ তার ঐ সন্তান। প্রথম সন্তানকে সে সাগরে বিসর্জন দেবে। সে যে নিজ মুখে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে।

কথাটা যে গৃহের অন্য সকলে জানত না তা নয়, সকলেই জানত। কিন্তু তথাপি আনন্দের মধ্যে কারো যেন সে প্রতিজ্ঞার কথা মনেই পড়ে না।

সকলের স্নেহ ও পর্যাপ্ত ভালবাসায় গোপাল বড় হতে লাগল। গোপাল বৃদ্ধি পাচ্ছে মিশ্রগৃহে যেন শশিকলার মত দিনে দিনে।

ক্রমে সে হামা দিতে শেখে এবং আরো কিছুদিন পরে টলমল পায়ে হাটে। মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়।

গোপাল, আমার গোপাল! নন্দদুলাল, নন্দকিশোর। কিন্তু গোপালের যখন মাত্র চোদ্দ মাস বয়েস, মিশ্র গৃহে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল।

হরনাথ কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। কবিরাজ আসেন, ওষুধ দেন, কিন্তু কোন ফল দেখা যায় না। চিন্তায় সকলের মন কালো হয়ে যায়। এমন সময় একদিন এলেন মিশ্রদের কুলগুরু। এবং কুলগুরুই একদিন যেন বজ্র নির্ঘোষে জানালেন—হরনাথের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

জগদ্ধাত্রী কেঁদে পড়লেন, কি বলছেন গুরুদেব!

হ্যাঁ, দেবতার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছো।

সে কি!

কেন? মনে নেই তোমাদের মা গঙ্গার কাছে তোমার পুত্রবধূ সন্তান কামনা করে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাঁর আশীর্বাদে সন্তান হলে সেই প্রথম সন্তানকে সে সাগরে বিসর্জন দেবে?

কুলগুরুর কথায় সকলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো সেই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার কথা। এখন তাহলে উপায়?

অবিলম্বে মানত পালন কর, তাহলেই হরনাথ সুস্থ হয়ে উঠবে।

জগদ্ধাত্রী যেন পাষাণ হয়ে যান।

একি সর্বনেশে কথা! গোপাল তাদের এত আদরের বংশধর, গোপালকে সাগরের জলে বিসর্জন দিতে হবে! একি সমস্যা! একি সংকট! একদিকে তার প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের জীবন, অন্যদিকে তার এত আদরের বংশধর!

সুলোচনাও শুনলো সব কথা। সে যেন পাথর হয়ে গেল।

গৃহ-দেবতার সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো অভাগিনী জননী, দেবতা, তবে কি তাই তোমার মনোগত বাসনা? আমার গোপালকে না নিয়ে তুমি কিছুতেই তৃপ্ত হবে না? বল ঠাকুর, বল—মায়ের মুখের কথাটুকু কি কেবল তুমি শুনছো দেবতা, অন্তরের কথা কি শোননি! নিজে দিয়ে আবার তুমি নিজেই কেড়ে নেবে! হরনাথ কিন্তু বললে সুলোচনাকে, না; না—এ হতে পারে না সুলোচনা। গোপাল, আমাদের গোপালকে তুমি সাগরে বিসর্জন দিও না।

স্বামীর পায়ের উপরে উবুড় হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুলোচনা, বলে দাও, তুমিই বলে দাও কি করি আমি, কি করি—এ যে দেবতার রোষ—

না; না—দেবতার রোষ নয়। এ আমাদেরই অন্ধ কুসংস্কার—

কুসংস্কার!

হ্যাঁ, নইলে কেড়েই যদি নেবেন তো তোমাকে আমাকে ঐ সন্তান দেবেন কেন? কারো কথায় তুমি কর্ণপাত করো না।

কিন্তু তুমি—

আমার যদি মৃত্যু এসে থাকেই—

সহসা দু'হাতে স্বামীর মুখ চেপে ধরে স্বামীর বুকের 'পরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুলোচনা, ব'লো না, ব'লো না গো, ওকথা ব'লো না—ব'লো না—।

[ক্রমশঃ।

আমি আর আমাকে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমি আর আমাকে
আমার মাঝে লুকিয়ে রাখব না।
নিত্য ও প্রত্যহ আমি এই অন্তর্দাহ চেপে
পুঞ্জীভূত বেদনার ব্যাপ্তির প্রগাঢ়তা বাড়িয়েছি।
আমি তোমার মুখোমুখী দাঁড়িয়েও
আমার অন্তর্নিহিত আগামী প্রয়াসকে
আমার আড়াল দিয়ে আর ঢেকে রাখব না।
আমার বোধের প্রবাহধারায়
কোন অগ্রমুখী নদীর নীরবতার স্পন্দন শুনেছ?
আমার তীব্রতার নির্লিপ্ততায়
কোন স্বপ্নপিয়াসী মিথুনের অকথিত
পুলকের গুঞ্জন শুনতে পাও?
নিত্য আমি প্রাচুর্য্যের পশরা সাজিয়ে
তোমায় সাজিয়ে চলি আমার অন্তরীক্ষে বল আর কতদিন?
তোমার এই নৈঃশব্দময় সম্ভারণ
আমায় শুধুই বিষণ্ণ বিস্ময়ের দিকে ঠেলে দেয়।
তোমার এই নির্ব্বাক উচ্ছলতা
আমায় শুধুই বিহ্বল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে চলে।
আমি আর আমাকে

বিজ্ঞানভিক্ষু

[পূর্বপ্রকাশিতাংশের পর]

বারো

স্রোতের ফুল

"Great floods have flown
From simple sources ; and great seas have dried
When miracles by the greatest have been denied"
—*Shakespare*

আগ্রাতে যখন ওরা পৌছল একটানা গাড়ী চালিয়ে, মধ্যাহ্নের সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপরে উঠে গেছে। সারা রাস্তাটা ওদের কেটে গেছে লঘু হাস্য-পরিহাসে, হবিবুল্লার প্রসংগ ওঠেনি একবারের জন্যও। মাঝখানে কেবল কিছুক্ষণ গাড়ী থামানো হয়েছিল—প্রাতরাশের জন্য।

আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় সুমিত্রা ধূলিধূসরিত গাড়াটা দাঁড় করালো একটা ছোটো দোতলা বাড়ীর সামনে। গৃহস্বামী আর গৃহকর্ত্রী ওদের অভ্যর্থনা জানান সাদরে। কার্লেকর শংকরকে বসালো বৈঠকখানায়—ললিতা সুমিত্রা দুই সখীতে চলে গেল অন্দরমহলের দিকে। ওধার থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে শংকর আন্দাজ করে নিল যে পরচর্চা টা ওদিকে জমে উঠেছে বেশ।

হাসিখুশীতে ভরা বিয়ের প্রথম বছর। ছোটো সংসারে অনাড়ম্বর স্বচ্ছলতার ছাপ। শংকরের মন ভরে যায় তৃপ্তিতে—স্বল্প পরিচয়ের প্রথম দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে দেরী হয় না তার। সুতরাং পনেরো মিনিটের মধ্যে দুই পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র মগ্ন হয়ে গেছে 'নিউক্লীয়ার ম্যাগনেটিজম' সম্বন্ধে গভীর আলোচনায়। যখন সেটা জমে ওঠে, তখনই আবার সভা ভংগ করতে হোলো দুই সখীর ভর্ৎসনায়। সুমিত্রার অনুযোগ—"ছেলেদের দোষ হচ্ছে অন্য মানুষের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করা। ললিতাও তো মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী, কই ওর সংগে এখনো পর্য্যন্ত সাইকলজি সম্বন্ধে আমার একটা কথাও তো হয় নি।"

* * *

মধ্যাহ্নভোজনের পালা শেষ হলে, বাকী দিনটা কোথা দিয়ে উড়ে চলে কথাবার্তায়, হাস্য-পরিহাসে।

রোদের তেজ একটু কমে গেলে ঘর ছেড়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে শহরের বাজারে। ললিতা-সুমিত্রা সওদা করে জরীর সাড়ী আর নাগরা। শংকর আর কার্লেকর নিজেদের মিলিয়ে দেয় চকবাজারের সংকীর্ণ পথে—জনপ্রবাহের মধ্যে।

মানুষের ভীড়ে যে এত বড়ো একটা আশ্বাস থাকতে পারে—শংকর তা কোনদিনই উপলব্ধি করেনি। তন্ময় হয়ে শংকর দেখে জনস্রোত —কোলাহল কানে বেজে ওঠে সংগীতের মতো। হঠাৎ কী খেয়ালে সামনের একটা ফুলের দোকান থেকে কিনে নেয় একছড়া রজনীগন্ধার মালা। তারপর কী ভেবে, হয়তো বা লোকলজ্জা এড়াবার জন্যই, কেনে আর তিনটি মালা ওদের সকলের জন্য। শংকরের কার্যকলাপ স্মিতমুখে লক্ষ্য করে যায় কার্লেকর। কিন্তু কোনও মন্তব্য করে না।

কেনাকাটার পর্ব শেষ করে যখন সুমিত্রা আর ললিতা ফিরে আসে, দিনের আলো তখন ম্লান হতে বসেছে। মনে মনে শংকর একটা 'ষ্ট্র্যাটেজি' ঠিক করে নিয়েছিল প্রথমেই, একটা মালা ললিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—"এই নিন পদার্থ-বিজ্ঞানের তরফ থেকে মনো-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে জয়মাল্য।"

মালাটা হাতে নিয়ে ললিতা হাসিমুখে বলে, "অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু 'ট্রানস্ফার্ড এপিথেট' হয়ে যাচ্ছে না ? প্রথম মালাটাই অপাত্রে দান করে বসলেন !"

সুমিত্রার মুখে ফুটে উঠলো সূর্যাস্তের রং। কার্লেকর আর ললিতা উচ্চগ্রামে হেসে ওঠে। শংকরও বোকার মতো একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে থাকে।

* * *

তারপর দিনের উৎসব শেষ হয় যমুনা-বক্ষে।

আগ্রা-ফোর্টের ঘাট থেকে দুটো নৌকা ভাড়া নিয়েছে ওরা। একটায় সুমিত্রা আর শংকর, আর একটায় কার্লেকর-দম্পতি। কার্লেকরদের কৌশলে দু নৌকার ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলে। শেষে বাঁকের মুখে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি। দূরে দেখা যায় তাজমহলের মর্মর—সূর্যাস্তের অপরূপ রঙে আঁকা।

শংকর-সুমিত্রার কথা হারিয়ে গেছে—দ্বিধা-লজ্জায়।

শংকরই আস্তে আস্তে সুরু করে, "মনে আছে সুমিত্রা, হার্ভার্ডের কথা ? মনে করে নাও ওই আগ্রাফোর্টটা হচ্ছে এম, আই, টি-র সৌধের শ্রেণী, আর তাজটা হচ্ছে হাভার্ডের এলাকা। কাল—সাড়ে তিন বছর আগের জুন মাসের এক অলস দিনের শেষ। মনে করে নাও—গ্রীষ্মের মন্থর সন্ধ্যায় ভরে গেছে নদীর কূল ছাত্রছাত্রীদের কলরবে। পেছনের পটে দেখা যায়—বষ্টন সহরের আকাশচুম্বী বাড়ীগুলোর জানালা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্য্যাস্তের উজ্জ্বল সোনা। সামনে বাঁকের পর চার্লসনদী মিশে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরে। নদীতীরে কোথায় কনসার্ট হচ্ছে সিবেলিয়াসের সপ্তম 'সিম্ফনি'। তারই দূরাগত প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে ওপার থেকে। এমনই নৌকার ওপরে বসে পাত্রপাত্রী—শ্রীশংকরপ্রসাদ রায় ও শ্রীমতী দেশপাণ্ডে।"

সুমিত্রার চোখে প্রতিফলিত হয় সূর্য্যাস্তের আলো।

অন্যমনস্ক হয়ে সে বলে, "হাঁ শংকর, সেদিনের কথা মনে গাঁথা থাকবে চিরকাল। কেম্ব্রিজ—ম্যাসাচুসেটস্-এ সেটাই আমার শেষ অপরাহ্ন। তার পরের দিন সকালেই রওনা হয়েছি কালিফোর্নিয়ার দিকে—পি, এইচ, ডি-র ক্লাসে ভর্তি হবার জন্য। সেদিনের সব কথাগুলোই মনে আছে আমার।

"তুমি অনুযোগ করেছিলে—আমি হৃদয়হীনা, এতোদিনের বন্ধনটা এতো সহজেই কাটিয়ে দিতে পারলাম কী করে! বলেছিলে, তোমার ক্ষমতা থাকলে ওখানেই ধরে রেখে দিতে আমাকে। জিজ্ঞাসা করেছিলে—পেশা—'কেরীয়ার'টাই আমার কাছে শেষে বড়ো হয়ে উঠল—সংসার পাতার চেয়ে?

"শংকর, আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হৃদয়কে সেদিন শক্ত করে বেঁধে নিতে কতোটা অমানুষিক চেষ্টার দরকার হয়েছিল। সেদিন তুমি যদি জোর করে বলতে—সুমিত্রা, তোমার যাওয়া হবে না—সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

"সেদিন অনেক অর্ধসত্য যুক্তির জাল আমাকে বুনে তুলতে হয়েছিল। বলেছিলাম আমার হাত-পা বাঁধা, ভারত সরকারের ইচ্ছায় আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। তুলেছিলাম মারাঠি-বাঙালীর মিলনের বাধার মামুলি কথা; তর্ক করেছিলাম যে, তোমার গণ্ডীর মধ্যে—ওই পরিবেশে আমিই একমাত্র ভারতীয় কুমারী মেয়ে—তাই তোমার মন হয়তো আমাকেই আঁকড়ে ধরেছে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে। দেশে ফিরে যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান মিললে এ-মোহ মিলিয়ে যাবে—যেমন করে ভোরের কুয়াশার মায়া মিলিয়ে যায় সূর্য্যালোকে।"

শংকর বলে, "কিন্তু খাটাবার মতো জোর তো আমার ছিল না, সুমিত্রা! দেশে ফিরে নিজের পায়ে দাঁড়াবার নিশ্চিত অবলম্বন কিছুই ছিল না সেদিন। তবে স্থির করেছিলাম—তুমি যদি রাজী হও তবে ওদেশেই না হয় দিনকতকের মতো ঘর বাঁধা যাবে। কিন্তু মূল প্রস্তাবেই যখন তোমার কোনো উৎসাহ পেলাম না—তখন মনে একটা বড়ো আঘাত লাগল।

"তুমি চলে যাবার পর বষ্টন সহরটা হয়ে উঠলো কয়েদখানা। বিদেশী রেস্তরাঁয় গেলে তোমার কথাটা মনে পড়ে, সিনেমা 'হল'গুলোও মধুর স্মৃতিতে ভরপুর। প্রফেসর ভেনোর আরো দুবছর সে সুবর্ণ-সুযোগেও মন ভরে উঠলো না। বছর পার না হতেই তাই একরকম পালিয়ে গেলাম ইংল্যাণ্ডে।"

নতমুখে সুমিত্রা রজনীগন্ধার পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলছিল অন্যমনে। বলে "সে কথাও আমার মনে থাকবে শংকর চিরকাল। একমাসের ওপর তোমার কোনো চিঠি নেই। তোমার হয়তো জানা ছিল না—বার্কলেতে কী প্রত্যাশা নিয়ে তোমার চিঠির জন্য বসে থাকতাম। কখনো বা ডাকপিওনের অপেক্ষায় ক্লাশের সময় গেছে বয়ে। ধীরে ধীরে পরিকল্পনা গড়ে উঠছিল ছ-মাসের মধ্যে কোনো রকমে থিসিস একটা খাড়া করে আবার বষ্টনেই ফিরে তোমায় অবাক করে দেব। এমন সময় চিঠি এলো তোমার লণ্ডনের ডাকঘরের ছাপ নিয়ে। মনে এলো দুর্জয় অভিমান—ইংল্যাণ্ড যাবার কথাটা একবার জানাবারও সময় হয়নি তোমার!"

স্রোতে ভাসমান ফুলের পাপড়িগুলোর ওপরে নজর পড়ে সুমিত্রার। হঠাৎ তার গলার স্বর যায় বদলে—

"এই শংকর—"

শংকর জিজ্ঞাসা করে—"কী হোলো আবার?"

সুমিত্রা ওকে দেখায়, "ওই দেখ, ফুলের পাপড়ীদুটো কেমন একসংগে গিয়ে মিশছে। আচ্ছা এটাও কি মাধ্যাকর্ষণের জন্য?"

শংকর বলে, "দূর—ওটা হচ্ছে স্রোতের ধর্ম। কোনো কঠিন বস্তুর বাধা পেলে জলের স্রোত তার একদিকে আবর্তের সৃষ্টি করে এর ফলে সব ভাসমান জিনিসেরই একত্র হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করোনা কেন, শংকর রায়ের মন কেন সুমিত্রার কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়,—সেটাও কি মাধ্যাকর্ষণ?"

সুমিত্রা বলে, "মিথ্যা কথা। দেশে ফিরে এই দেড় বছরের মধ্যে একখানা চিঠিও তোমার কাছ থেকে পাইনি। মাধ্যাকর্ষণ যদি এতই দুর্বল হোতো—তবে অ্যান্টিগ্রাভিটির সন্ধানে আমরা এ বৃথা পণ্ডশ্রম করে মরছি কেন?"

শংকর পাল্টা অনুযোগ করে, "তুমিই বা চিঠি দিলে কোথায় জানো সুমিত্রা, ফিরবার পথে বম্বেতে জাহাজ থেকে নেমে এক প্রবল ইচ্ছা ছিল, তোমাদের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবার কিন্তু মনে হোলো ভয়—শংকর রায়কে তুমি চিনতে পারবে তো হয়তো বা দেখব বিয়েই হয়ে গেছে তোমার এর মধ্যে—বাড়ীর দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবে। বিশেষ করে বিলেত থেকে দেশে ফেরার চারমাস আগে তোমাকে যে চিঠি লিখি, তার কোনো জবাব পাইনি।"

অভিমানভরা সুরে সুমিত্রা বলে, "বেশ, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা জানা গেল। আমাকে এতই নীচু ভাবো তুমি?"

শংকর বলে, "চিঠির একটা জবাব দিলেও তো পারতে?"

সুমিত্রা বলে, "বারে, কী করে জবাব দেব? বম্বে থেকে কিছুদূরে তখন একটা ট্রেনিং সেণ্টারের ভার নিয়েছি। বাড়ী থেকে তোমার চিঠি আমাকে 'রিডাইরেক্ট' করে দেয়নি। প্রায় চার মাস পরে সে চিঠি যখন হাতে পড়ল, তখন কোন্ ঠিকানায় জবাব দেব জানা ছিল না।

"এ ছাড়া মনকে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম—কল্পনাবিলাস চলবে না।"

নীরবে শংকর কিছুক্ষণ নিজের মালাটা থেকেও পাপড়ী ছি

যায়। বলে, "সুমিত্রা, স্রোতের পাপড়ীর কথা বলছিলে না? আগেকার যুগে অনেক দার্শনিক মহাকর্ষের কিন্তু এইরকমই একটা ব্যাখ্যা দিতেন। রেনে দেকার্তে সে মতবাদের খণ্ডন করেন।

"যাক্‌গে সে কথা! চুলোয় যাক্ 'গ্রাভিটি' আর 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'।

"সুমিত্রা, আর বৃথা ঝগড়া করে লাভ কী? আমার সংগে ঘর বাঁধতে এখন কিছু আপত্তি আছে?"

সুমিত্রার মুখ পাণ্ডুর হয়ে যায়—সন্ধ্যায় ঘনায়মান অন্ধকারে শংকর তা দেখতে পায় না। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায় অবিচ্ছিন্ন নীরবতায়। সুমিত্রা নিরুত্তর!

"কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো?"

"সহজে ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না বলে—"

সুমিত্রার মৃদু কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায় না।

শংকর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, "সব কথায় তোমার 'সাইকলজি'-র প্যাঁচ! হাঁ কি না বলতে পারো না?"

আরো কিছুক্ষণ সুমিত্রা নীরবই থাকে। হঠাৎ মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করে, "শংকর, তোমার ক্ষমাগুণ কতটা?"

শংকর হতবুদ্ধি হয়, ভ্রূ-কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করে, "হঠাৎ এ কথার মানে? তোমার কোন্ অপরাধটা ক্ষমা করতে হবে?"

"ধরো, তোমার মানসীর যে মূর্তিটা চোখের সামনে গড়ে তুলেছ, সেটা যদি আমি রূঢ় আঘাতে ভেঙে দিই, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?"

শংকরের বিস্ময় বেড়েই চলে, মেয়েটার হোলো কী?

"যদি কোনো মানসী থাকে আমার—সে তো তুমিই। তোমার মূর্তিটা তুমি কী করে ভাঙবে ভেবে পাচ্ছি না। আর একটু পরিষ্কার করেই বলো না কেন?"

"শংকর, আমার সম্বন্ধে যে ধারণা তুমি করে রেখেছ, সেটা যদি সত্য না হয়, তাহলে সইতে পারবে কি?"

শংকরের হঠাৎ মনে হয় সুমিত্রা তার সংগে দুষ্টুমি সুরু করেছে।

"পারবো গো পারবো।" শংকর এবার সুমিত্রার হাত ধরে ফেলে।

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা সুমিত্রা কিছুক্ষণ করে না। তারপর শংকরের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে কৌশলে নিজের হাত সরিয়ে নেয়। তারপর কৌতুকভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "আমি অসতী হলেও পারবে?"

শংকর আহত হয়, "ভুলে যাচ্ছ, আমরা বিংশ শতাব্দীর নাগরিক, সুমিত্রা। এর আগে কতোবার হৃদয়দান করেছ—সে প্রশ্নে কী যায় আসে? এ ছাড়া তুমি তো জানো না আমি সৎ কি অসৎ!"

সুমিত্রা বলে, "দেখো, তোমাকে কেমন চটিয়ে দিলাম!"

শংকর বলে, "কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর?"

আবার নিরুত্তরের পালা। কিছুক্ষণ পরে অসহিষ্ণু শংকর সুমিত্রার হাত আবার ধরে ফেলে। হঠাৎ এক ফোঁটা উষ্ণ জল পড়ে শংকরের হাতে। শংকর স্তম্ভিত হয়—"এ কী সুমিত্রা, তুমি কাঁদছ?"

সুমিত্রা নিরুত্তরই থাকে!

মহাবিব্রত হয়ে শংকর বলে, "এই দেখ, ভালো মনস্তাত্ত্বিকের পাল্লায়ই পড়েছি। বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে ফ্যাঁস করে কেঁদে ফেলে।"

কিন্তু তবুও সুমিত্রার তরফ থেকে পাওয়া যায় না কোনো সাড়া। শংকর কী করবে ভেবে পায় না। হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ যায় সুমিত্রার আত্মসংবরণ করতে। তারপর ধরা গলায় বলে, "শংকর, দয়া করে এক্ষুনি তোমার প্রশ্নের উত্তর চেয়ে বোসো না আমাকে মনস্থির করতে কিছুটা সময় দাও। কথা দিচ্ছি, সময় হলে আমিই তোমাকে জানিয়ে দেব প্রশ্নের উত্তরটা। কিন্তু তোমাকেও আজ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—যতোদিন তোমাকে জানাবার ক্ষমতা না হয় আমার, অক্ষমতার কারণও জানতে চাইবে না।

"একটা কথা জেনে রেখো শংকর, তোমার সংগে বিয়ে না হলে আর কারো ঘরণী হওয়া আমার চলবে না। আমার জীবনে তুমি যে কতখানি—সে খবর তুমি জানো না।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শংকর বলে—বেশ, তা হোলে তোমার ইচ্ছাই অটুট থাক। কিন্তু কী এমন রহস্য আছে তোমার যে, আমাকে পর্যন্ত বলা চলে না।

ততক্ষণে সুমিত্রা আবার চাংগা হয়ে উঠেছে, স্বভাব-সুলভ কায়দাতেই বলে।

"বিয়েটা একটা দুরূহ ব্যাপার। হুট করে সমাধা করে ফেললেই হয় না—বিশেষ করে সাতাশ বছরের বুড়ো ধাড়ী মেয়েদের। সমারসেট মম্-এর সেই গল্পটা মনে আছে তোমার?

"গল্পের নায়ক অ্যাশেনডেন পড়লো রুশদেশের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রেমে। মেয়েটি সুন্দরী, বিদুষী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী। কিন্তু দুজনের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছেন মেয়েটির স্বামী।"

শংকরের চাঞ্চল্য অনুভব করে সুমিত্রা হেসে ফেলে।

"ভুল বুঝো না শংকর। আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি। যাই হোক, অ্যাশেনডেন মেয়েটিকে অনুরোধ করতে থাকেন স্বামীত্যাগ করে তাঁর সংগে পালাতে। ভদ্রমহিলা শেষে রাজী হল, কিন্তু একটা সর্তে। চিরকালের মতো ঘর বাঁধার আগে একটা মহড়া দিয়ে নিতে হবে। দুজনেরই পূর্ণ বয়স, পাকাপাকি ব্যবস্থার পর যদি দেখা যায় দুজনের মনের মিল হচ্ছে না, তখন ফেরার পথও তো থাকা চাই একটা!

"কিন্তু কিন্তু করে অ্যাশেনডেন অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলার সংগে এক সপ্তাহ প্যারীতে কাটিয়ে আসার জন্য। ট্রেণে কিছুক্ষণ কাটলো রীতিমতো কাব্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ভদ্রমহিলার মাথা ঘোরে ট্রেণে উঠলেই। তাই সেণ্টপিটার্সবার্গ থেকে প্যারী অবধি সারাক্ষণই অ্যাশেনডেনের কাঁধে রই'ল প্রেয়সীর মাথার ভার। রুশীয় মহিলা বুঝলে তো—ওদের ক্ষীণাংগী তন্বীদেরই ওজন প্রায় দু মণের কাছাকাছি। প্যারীতে হোটেলে পৌঁছে ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন!

কিন্তু আর একটা মুস্কিল বাধলো প্রাতরাশের সময়। ভদ্রমহিলা খেতে চাইলেন "স্ক্র্যাম্বলড্ এগ"—ঘাঁটা ডিম। এটা কিন্তু অ্যাশেনডেনের দুচক্ষের বিষ। কিন্তু কী আর করা যায়, প্রেয়সীর মুখ চেয়ে ভদ্রলোক সেটাকে কোনোরকমে গলাধঃকরণ করলেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনও প্রাতরাশের সময় ওই একই অবস্থা—

"স্ক্র্যাম্বলড্ এগ" ! চতুর্থদিন নায়ক অনুযোগ করেন—রোজ ওই এক ঘ‍ঁাটা ডিম ভালো লাগে তোমার ? নায়িকা জবাব দেন—ওটা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস, আর তাছাড়া 'স্ক্র্যাম্বলড্ এগ' খেলে নাকি বুদ্ধি খোলে !

"পরের দিন বেগতিক বুঝে আশেনডেন অর্ডার দিলেন মাত্র একপ্লেট ঘ‍ঁাটা ডিমের। নিজের জন্য ফরমাস করলেন অন্য কিছু। ভদ্রমহিলার হোলো দারুণ অভিমান—মানভঞ্জন পালার শেষে অগত্যা অ্যাশেনডেনকেও খেতে হোলো ওই অখাদ্য। এ দিকে গাড়ী করে কোথাও বেড়াতে গেলেও ভদ্রমহিলার মাথা ঘোরে—দেহবল্লরী তিনি এলিয়ে দেন নায়কের স্কন্ধে !

"ছদিনেই, প্রেম ছুটে গেল অ্যাশেনডেনের !"

শংকর বলে, "আমার কিন্তু 'স্ক্র্যাম্বলড্ এগ্' খেতে খুবই ভালো লাগে। আর যদি দেহভারের কথা তোলো—"

সুমিত্রা প্রসংগে বাধা দিয়ে বলে, "স্ক্র্যাম্বলড্ এগ্-এর কথা হচ্ছে না। আমার রান্না মারাঠিখানা সহ্য হবে তো তিনবেলা ! ভাগ্যে জুটবে না তোমার গলদাচিংড়ার কালিয়া, রুইমাছের মুড়ো আর শুক্তো-আলুর দম। সইতে পারবে রোজ দোসে, দহিবড়া শ্রীখণ্ড চাটনী ? শুধু তাই নয়। বাড়াতে ধুমধাম করে করতে হবে গণপতি-পুজো, ছেলেপিলেদের পাঠাতে হবে মহারাষ্ট্র মণ্ডল-পরিচালিত মারাঠি পাঠশালায়।"

শংকর ভয়ের ভাণ করে, "বাবা, সর্ত যে দেখছি অনেকগুলো ! বলো, আর কিছু আছে ফর্দে ?"

সুমিত্রা হেসে বলে, "দেখ, ঘাবড়ে গেলে তো, এ সব না হলে আমার আত্মীয় স্বজন, সমাজের লোকেরা হায়-হায় করবেন—মেয়েটির কী কপাল ! ভালো ঘরবরে পড়ল না এতো রূপগুণ শিক্ষা দীক্ষা নিয়েও ! কোন সুদূর বাংলা মুলুকে—মচ্ছির দেশে বিয়ে হয়ে গেল ! কেন, দেশে কি আর পাত্র ছিল না ?"

"তাছাড়া ঘটকালি করতে গেলে, হোক না তা নিজেরই ঘটকালি—ভালো করে সব সন্ধান নিতে হয়, পাত্রের স্বভাব-চরিত্র কেমন, বসতবাড়ী আছে কিনা, গোয়ালে কটি দুধেলা গাই, মাসিক উপার্জন কতো, ননদিনীরা কলহ-প্রিয়া কিনা—আরো কতো কী। তারপর কোষ্ঠীর মিল করতে হবে—তবেই তো কথাবার্তা হবে পাকা !

"উপযুক্ত পাত্র মিললে অবশ্য কোষ্ঠীর অমিলে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশে অনেক জ্যোতিষী আছেন সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে তাঁরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুরই সংস্থান ওলট-পালট করে দিতে পারেন—আর তোমরা কি ছার অ্যান্টিগ্রাভিটির সন্ধানে প্রাণপাত করছ !

"তারপর, বিয়ের দিনে বর আসবে ঘোড়ায় চড়ে, দামী স্যুট তার পরণে—মাথায় থাকবে উষ্ণীষ আর কোমরবন্ধে তরোয়াল—ছত্রপতি শিবাজীর আমল থেকে ওইটাই নিয়ম কিনা—আর রীতিমতো মিছিল করে। সে মিছিলের আগে থাকবে গড়ের বাদ্য আর পেছনে ঢোল-কাঁসি-সানাই। তার দুপাশে থাকবে কমসেকম পঞ্চাশ-বাতির সারি, লাল-নীল-হলদে-বেগুনী ইউনিফর্ম-পরা বাহকের কাঁধে। উপচারের এতোটুকু বাদ পড়লে চলবে না, সমস্ত প্রথামতো সমাধা করা চাই। নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন-অসজ্জন, বাঁওড়-অপোগণ্ড সবকটা মেয়েলি কাঁদে বরের মাথা গলানো চাই ! তবেই না পাঁচজনে বলবে—মচ্ছিখোর বাঙালী হলে কী হয়, ছেলেটি খুব মন্দ নয় !"

শংকর করুণভাবে বলে, "কিন্তু আমি তো ঘোড়ায় চড়তে জানি না—তাছাড়া পাগড়ী-তরোয়ালই বা পাব কোথায় ?"

সুমিত্রা অভয় দেয়, "শিখে নেবে। আর আজকাল তরোয়াল-উষ্ণীষ সবই ভাড়া পাওয়া যায় যাত্রার দলে বা দশকর্ম ভাণ্ডারে।"

শংকর বলে, "তার চাইতে বলোনা কেন, সবচেয়ে ভালো হয়—সশস্ত্র অভিযান করে তোমাকে লুঠ্ করতে পারলে। বিবাহটা হবে খাঁটি সামরিক ষ্টাইলে। ছত্রপতির আমলে সেটাও তো চল্‌তি ছিল।"

সুমিত্রা বলে, "তা হোলে তো খুবই চমৎকার হোতো। কিন্তু এখন যে আমরা সভ্য হয়েছি। জাতীয় সরকারের আইনের ক্যাঁচাকল রয়েছে, পুলিশ-পয়গম্বর রয়েছে। আর তাছাড়া বরও যে জানেনা কী করে তরোয়াল ঘুরোতে হয়। চেয়ারে বসা আর অংক কষা ছাড়া আর কিছুই সে শেখেনি ! তার একমাত্র যুদ্ধ হচ্ছে—বাগ্‌যুদ্ধ ! শরীরের মধ্যে দুটো অবয়বই তার নড়ে চড়ে—একটা হচ্ছে চোয়াল, আর একটা হচ্ছে জিহ্বা !"

দুজনের হাসির শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে নদীর নির্জন তীরে।

দেখা গেল, কার্লেকরদের নৌকাটা আবার ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ললিতা প্রশ্ন করে, "এত হাসি কিসের ?"

সুমিত্রা বলে, "এই দেখনা একটা ফর্দ তৈরী হচ্ছিল।"

কার্লেকর জিজ্ঞাসা করে, "কিসের ফর্দ ?"

সুমিত্রা বলে, "কিসের আবার—ধোপার !"

এবার চার জনেরই সম্মিলিত হাসি ওঠে উচ্চগ্রামে।

● ● ●

সন্ধ্যাটা ভরে যায় ললিতার সেতারের সুরের মূর্ছনায়। সকলের উপরোধে সুমিত্রাকেও অগত্যা গান গাইতে হয়। ভীরু, কম্পিত সুরেলা কণ্ঠস্বর ! শংকর ভাবে এ যেন আর এক সুমিত্রা—যে মেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে, সভাসমিতিতে বড়ো বড়ো বক্তৃতা দেয়, তার সংগে এ মেয়েটির কোনো সম্পর্কই নেই !

● ● ● ●

গভীর রাতে শ্রান্তদেহ শয্যায় এলিয়ে দিয়ে শংকর অনুভব করে যে, আজ মন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে—কী যেন একটা পাওয়ার সার্থকতায়। সুমিত্রার রহস্যময় ব্যবহারটাও সে আনন্দকে ম্লান করে দেয় না। জগতটাই যেন আনন্দের স্রোতে ভাসছে যমুনার জলে ফেলে দেওয়া পাপড়ীর মতো। চকবাজারের সংকীর্ণ পথে জনস্রোত—সারা পৃথিবীতে দু'শো সত্তরকোটি মানুষের জনস্রোত ! তার মধ্যে দুটো পাপড়ী—সুমিত্রা আর সে পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে !

সুমিত্রা এই প্রশ্ন করেছিল। ওকে কী একটা উত্তর দিয়েছিল শংকর। স্মরণ করতে চেষ্টা করে শংকর·····

স্রোতের ফুল। স্রোতের ফুল··স্রোত··স্রোত···। কোথায় যেন খট্‌কা বাধে শংকরের। হঠাৎ ভেসে ওঠে হবিবুল্লার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতার একটা টুকরো—

"বিরাট স্রোত বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত···"

স্রোত ? ভাসমান ফুলের পাপড়ী !

মহাকর্ষ কি এমনই একটা ব্যাপার নয় ?

স্রোত ! কেন হবে না ?

উত্তেজনায় শংকর উঠে বসে।

বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত বিরাট স্রোত ?

বিছানা ছেড়ে উঠে শংকর পায়চারি করতে থাকে।

ধরে নেওয়া যাক, কল্পনা করা যাক এই রকম একটা স্রোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে চলেছে—মহাশূন্যের 'কারভেচার'-এর মধ্য দিয়ে। কতগুলো ডাইমেনশন্‌ তার ? চারটে, পাঁচটা না ছটা ? পদার্থের সংস্পর্শে তাতে জেগে ওঠে আবর্ত—তার ফলে মাধ্যাকর্ষণ !

কিন্তু কিসের স্রোত ? শক্তির ? ইলেকট্রনের ? আলোককণিকার ? মিউট্রিনো, হাইড্রোজেন অণু না কসমিক পার্টিকল্‌-এর ? নাঃ, কল্পনা অতদূর পৌঁছয় না ! অংক কষে দেখতে হচ্ছে।

আলো জ্বেলে দেয় শংকর, মাথার মধ্যে তার আগুনের হল্কা। পকেট থেকে কলম আর কতকগুলো কাগজের টুকরো বের করে—রেস্তরাঁর বিল, চিঠি, চিঠির খামের অংশ। তারপরে অংক কষতে বসে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় সমস্ত কাগজের টুকরো।

কাগজ কোথায় আছে, ঘরে ?

শংকর চারদিকে খুঁজে বেড়ায়। আবিষ্কার করে বইএর থাকে রয়েছে কয়েকখণ্ড 'ম্যাথেমেটিক্যাল টেবলস্‌' আর একখানা 'হ্যাণ্ডবুক অফ ফিজিক্স'। সেগুলো নামিয়ে রাখে সে। কাগজ তো মিলল না !

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শংকর। তাইতো ! এখন উপায় ?

মরিয়া হয়ে কার্লেকরদের দরজায় সে আঘাত করে—"ডাঃ কার্লেকর। ডাঃ কার্লেকর।"

ভেতর থেকে শোনা যায় কার্লেকরের নিদ্রাজড়িত কণ্ঠস্বর, "কে ? ডাঃ রায় না কি ? কী হোলো ?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে শংকর বলে, "আমাকে একটু কাগজ দিতে পারেন ? মাথায় একটা ইকোয়েশান এসেছে, সেটাকে তাড়াতে পারছি না। এখন আবার সেটাকে না লিখে রাখলে, কাল আবার ভুলে যাব।

ভেতর থেকে শোনা যায় ললিতার চাপা হাসির শব্দ।

● ● ● ●

কার্লেকরের কাছ থেকে পাওয়া গেল একটা 'রাইটিং প্যাড'; অংকের বসে যায় 'টেনসর ক্যালকুলাস' কষতে।

তেরো

সমাধান

"We may picture the world of reality as deep flowing stream ; the world of appearanc is its surface, below which we cannot see. Event deep down in the stream throw up bubbles an eddies on to the surface of the stream. Thes are transfers of energy and radiation of ou common life, which affect our senses and s activate our minds ; below these lie deep water which we can know only by inference."

James Jeans.

Physics & Philosophy

সূর্যের আলো যখন পর্দার ফাঁক দিয়ে পড়ল ঘরের ভেতে শংকর তার 'ইকোয়েশন'গুলো মিলিয়ে দেখছে। *বহুবারের অংগু চালনায় মাথার চুল অবিন্যস্ত ; চোখ দুটো ঈষৎ রক্তিম ;—কিন্তু মু তার অপরিসীম তৃপ্তি ! সবই প্রায় মিলে যাচ্ছে শেষ ইকোয়েশ থেকে—পৃথিবীর মহাকর্ষের পরিমাপ, চন্দ্রসূর্যের সংস্থান, 'লাপ্লাস পয়শন ইকোয়েশন,' সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ !*

কিন্তু পৃথিবীর সংস্পর্শে মূল স্রোতে আবর্তের স্বরূপ দু' একদিনের মধ্যে অংক কষে বার করাও অসম্ভব ! সেজন্য 'চাই 'কম্পিউটার'। সাতটা 'ডাইমেনশন'-এর এই বিরাট স্রোতের বিকাশ··তার প্রকৃত রূপ এক বছরেরও কাগজে-কলমে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা যাবে না। তাই তো ! এখন উপায় ?

আস্তে আস্তে সুমিত্রার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় শংকর। কিছুক্ষণ বাদে পাওয়া গেল সুমিত্রার সাড়া। কয়েক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে আসে সুমিত্রা ঘুমভরা চোখে।

"এ কী শংকর—কী চেহারা হয়েছে তোমার ? রাতে ঘুমোওনি নাকি ?"

শংকর বলে, "সুমিত্রা—সুমিত্রা, মনে হচ্ছে যেন পেয়ে গেছি অ্যান্টি-গ্রাভিটির সন্ধান। এর জন্য কিন্তু দায়ী তুমি, তা জানো ?"

সুমিত্রার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—"কী করে ?"

"ঐ যে কাল সন্ধ্যায় তুমি প্রশ্ন করেছিলে স্রোতে ভাসমান ফুলের পাপড়িগুলো একত্র হয় কি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ? কথাটা তখন তলিয়ে দেখি নি। রাত্রে হঠাৎ মনে পড়ে গেল হবিবুল্লার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতার একটা কথা—'বিরাট স্রোত বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত'। অংক কষে দেখলাম যে, মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে এই রকমের একটা স্রোত থেকে। এটা কিন্তু সাধারণ নদীর স্রোতের মতো নয়—এটা চলেছে আমাদের অগোচরে, কমপক্ষে সাতটা ডাইমেনশন জুড়ে ! কল্পনাও সেখানে পৌঁছায় না—কিন্তু অংক কষে বের করা যায় তার স্বরূপ কিছুটা—অন্ততঃ আমাদের স্পেস-টাইম কন্টিন্যুয়াম-এ আর তিন'ডাইমেনশন'-এর দৃশ্যমান জগতে, সে স্রোতের প্রভাব কেমন হওয়া উচিত সেটা বেরিয়ে আসে গণিতের সাহায্যে।

"তারপর এই দেখ, এই ইকোয়েশন থেকে মিলে যাচ্ছে মিউট্রনো

মহাকর্ষের নিয়মাবলী—গ্রাভিটেশনের স্বরূপ। সুমিত্রা, গ্রাভিটির স্বরূপ যদি এই রকমের হয়, তবে অ্যান্টিগ্রাভিটিও সম্ভব।

"অবশ্য ইকোয়েশনগুলোর মধ্যে অনেক আন্দাজ ও গোঁজামিল লাগাতে হয়েছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র ঠিকমত বের করতে হলে 'কম্পিউটার'-এর সাহায্য চাই। কতকগুলো 'কনষ্ট্যাণ্ট' এক-সংগে জড়িয়ে একটা আন্দাজ মত ইকোয়েশনে বসিয়ে দিয়েছি। সেগুলোও যাচাই করে নেওয়ার দরকার 'কম্পিউটার' দিয়ে।

"সুমিত্রা, আমাদের যে এখুনি দিল্লী ফিরে যেতে হয়।"

সুমিত্রা আকাশ থেকে পড়ে, "এখুনি? সে কী করে হয়?"

শংকর বলে, "মহামুস্কিল! তা তুমি না হয় থেকেই যাও, আমি ফিরে যাই। জানো, এখান থেকে দিল্লীর প্লেন কখন ছাড়ে?"

সুমিত্রা বলে, "বা রে! কাজের বেলা কাজী—আর কাজ ফুরালেই পাজী! আমাকে একলা ফেলে যাবে?"

শংকর একটু লজ্জা পায়, "না না, তা কেন! বেশ তো চলো, না হয় প্রাতরাশের পরই বেরিয়ে পড়া যাবে।"

সুমিত্রা বলে, "তা-ও কী হয়? কার্লেকরদের বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া কি অতিথির পক্ষে সমুচিত ব্যবহার? একটা দিন বৈ ত নয়!"

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো শংকর ছটফট করে, "একটা দি-ন? কেন?"

সুমিত্রা বলে, "এর মধ্যেই ভুলে গেছ? আমাদের কথা ছিল সোমবার ফেরার। ললিতাও সেই ভাবে প্লান করে রেখেছে।"

শংকর হতাশ হয়ে দরজার চৌকাঠে বসে পড়ে, "সেই সোমবার!"

ওর ভংগী দেখে সুমিত্রা হেসে ফেলে, "হাঁ, আজ রবিবার!"

"শোনো, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমার ওপরে সে ভার ছেড়ে দাও। একটা ব্যবস্থা দেখছি।"

ওদের বিতর্কের আওয়াজে কার্লেকর-দম্পতির ঘুম ভেঙে গেছে। বেরিয়ে এসে ওরা জিজ্ঞাসা করে, সমস্যাটা কী?

সুমিত্রা বলে, "এই দেখ না, রায়ের যে একটা কনফারেন্স আছে আজ, সেটা কাল আগ্রা রওনা হবার আগে মনেই ছিল না! ওর তাতে উপস্থিত না থাকলে নাকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুখচোরা লাজুক, তোমাদের স্পষ্ট করে বলতেও পারছে না। আমাদের যে, তাহলে এখনই ছেড়ে দিতে হয় ভাই!"

ললিতা আকাশ থেকে পড়ে, "ও মা, সে কী কথা? আজ যে আমাদের বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল!"

অপ্রস্তুতের মতো শংকর বলে, "তাহলে থাকগে কনফারেন্স।"

সুমিত্রার চোখে ইসারা! বলে, "কিন্তু তুমি যে বলছিলে কতকগুলো রিসার্চ স্কীমে টাকা পাওয়া যাবে কি না—আজ তার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।"

কার্লেকর বলে, "তা হলে তো যেতেই হয় ওঁদের, ললিতা।"

ললিতা রাগ করে, "তুমি থামো! তা কী করে হয়?"

কার্লেকর ওকে বোঝায় "কয়েক জন ছেলের জীবিকা হয়তো নির্ভর করছে এই রিসার্চ স্কীম অনুমোদিত হবার অপেক্ষায়। ডাঃ রায়ের যদি সেখানে উপস্থিত থাকলে সুবিধা হয় তাহলে যাওয়াই উচিত।"

ললিতা ক্ষুণ্ণ হয়, কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে, "আবার কবে আসছেন বলুন?"

শংকর অম্লান বদনে প্রতিশ্রুতি দেয়, "যতো শীঘ্র সম্ভব—হয়তো বা পরের মাসেই!"

* * *

চা-এর নামে বেশ গুরুভোজন সমাধা করে ওরা আবার রওনা হয়ে যায় দিল্লীর দিকে।

বিদায় নেবার আগে ললিতা আবার আসবার জন্য ওদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। টিফিন কেরীয়ারে ভরে দেয় একরাশ আহার্য-সামগ্রী আর 'থার্মোফ্লাস্ক'-এ কফি।

আগ্রার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে শংকর বলে, "আর একটা দিন থেকে এলেই হোতো!"

সুমিত্রা ভর্ৎসনা করে, "থাক আর বলতে হবে না, যতো দোষ যেন আমারই! আমাকে আগ্রায় ফেলে রাতারাতি প্লেনে পালিয়ে আসবার মতলব করেছিল কে শুনি?"

তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, "শংকর, জবরদস্তি করে তোমার দেহটাকে হয়তো আটকে রাখা যেত। কিন্তু তোমার মন পড়ে থাকতো ওই ইকোয়েশনগুলোর মাঝখানে। মধ্যে থেকে বনভোজনটাই হোতো মাটি! তার চেয়ে চলো, 'কম্পিউটার'টার সংগে তোমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক—যতো শীঘ্র সম্ভব।"

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শংকর বলে,—"হুঁ।"

সুমিত্রা বলে—"হুঁ কী?"

শংকরের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা তাকিয়ে দেখে গাঢ় ঘুমে শংকর অচেতন। গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে পেছনের সীটের ওপরে রাখা একটা বাণ্ডিল থেকে একটা ছোটো বালিস বার করে সন্তর্পণে ওর মাথার নীচে রাখে। তার পরে সস্নেহ-কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার চেয়ে আবার গাড়ীটাকে চালু করে।

* * *

ঘণ্টা দুই একটানা চলার পর সুমিত্রা গাড়ীটাকে দাঁড় করালো একটা বটগাছের ছায়ার তলে। পাশে শংকরের গভীর নিদ্রায় তখনো পর্যন্ত কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। ওর কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দেয় সুমিত্রা।

শংকরের ঘুম ভেঙে যায় "এসে গেছি নাকি?"

সুমিত্রা বলে, "না গো না। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে না? তাছাড়া এতক্ষণ একটানা গাড়ী চালিয়ে হাতে-পায়ে জং ধরে গেছে—একটু হাত পাগুলো ছড়ানোরও দরকার।"

সেই গাছতলায় একটা চাদর বিছিয়ে ওদের মধ্যাহ্নভোজন সুরু হয়। চারদিকে বন্ধুর জমি—ঘনসন্নিবিষ্ট অসমান মাটির ঢিবি বিশৃংখল ভাবে ছড়ানো। মানুষের অনবধানতায় এক সময়ের উর্বরা জমি আজ বন্ধ্যা—ক্ষয় হয়ে গেছে সহস্র বর্ষার উচ্ছৃংখল জলের লক্ষ ধারায়। শীতার্ত শুকনো হাওয়া রচে যাচ্ছে দিগন্তে ধূলির কুয়াশা।

হঠাৎ সুমিত্রা প্রশ্ন করে, "শংকর, 'পশ্চুলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স'-টা কি? সোজা ভাষায় আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো?"

শংকর চাংগা হয়ে ওঠে, "আইনষ্টাইনের প্রথম যুগের একটা প্রবন্ধে—যতোদূর মনে পড়ে উনিশশো সাত সালের শেষের দিকে,—

'রিলেটেভিটি' সংক্রান্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটাতে তিনি প্রথম প্রকাশ করেন 'পশ্চলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স'। ১৯১৫ সালের পর 'জেনারাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি'র মধ্যে এইটাই পরিবর্ধিত হয়ে রূপান্তরিত হয় 'প্রিন্সিপ্‌ল্ অফ্ ইকুইভ্যালেন্স'-এ। সোজা ভাষায় আইনষ্টাইনের মতে যে-কোনো বস্তুর ওপরে মহাকর্ষের প্রভাব আর সে বস্তুর 'ইনারশিয়া' সমান। ইনারশিয়া মানে কী বোঝো তো?"

সুমিত্রা বলে, "কতকটা। যেমন ধর আমার গাড়ীটা ঠেলে নড়াতে গেলে একটা শক্তির দরকার হয়, সে শক্তিটা লাগে গাড়ীটার 'ইনারশিয়া' বা স্থৈর্য অতিক্রম করতে। তাই না?"

শংকর বলে, "হাঁ ঠিকই বলেছ। ধরো মহাশূন্যের কোথাও, যেখানে কাছাকাছি গ্রহ তারা কিছুই নেই—তোমার গাড়ীটা গতিবেগ বাড়িয়ে চলেছে সেকেণ্ডে ৩২ ফিট করে। ওই গাড়ীর মধ্যে বসে যে চাপটা অনুভব করবে তুমি, সেটা পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে কিছুই ভিন্ন নয়। গাড়ীর মধ্যে তুমি নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবে, শরীরেরও স্বাভাবিক ওজন অনুভব করবে। এক কথায়, গাড়ীর ক্রমবর্ধমান গতির কথাটা যদি তোমার না জানা থাকে, তোমার ধারণা হবে যে, তুমি পৃথিবীর ওপরেই রয়ে গেছ।

"এর উল্টোদিকটা দেখতে গেলে—ধরো, তোমার গাড়ীর গতিবেগটা আর বাড়ছে না—অথবা থেমে রইল মহাশূন্যে তোমার গাড়ীটা। তখন কিন্তু তুমি আর মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাবই অনুভব করবে না। একটা স্প্রিংএর দাঁড়িপাল্লার ওপরে তোমায় যদি বসিয়ে দেওয়া যায়—তোমার ওজন কিছুই ধরা পড়বে না দাঁড়িপাল্লাতে। এই গ্লাস থেকে কফি ঢাললে মাটিতে পড়বে না। তোমার যদি মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থেকে থাকে, শত চেষ্টা করেও তোমাকে বোঝানো যাবে না—মাধ্যাকর্ষণ কী জিনিস। এককথায়, ওই গাড়ীর ভেতরে কোনো যন্ত্রেই মহাকর্ষের অস্তিত্ব ধরা যাবে না।

"মোটামুটি এটাই হচ্ছে 'ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপ্‌ল'।"

"এটাকেই এতোদিন বিজ্ঞানসাধকেরা গ্রহণ করেছেন সত্য বলে। অনেক সংগত কারণও আছে 'ইকুইভ্যালেন্স' মেনে নেবার। কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হচ্ছে যে—প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু চেষ্টাও করা হয় নি মহাশূন্যে তোমার গাড়ীটার মতো স্থির কোনো বস্তুর মধ্যে থেকে বা পড়ন্ত উড়োজাহাজ, বা স্পুটনিকের মধ্যে থেকে 'গ্রাভিটি'র অস্তিত্ব অপ্রমাণ করবার।

"প্রফেসর শিকদার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, Principle of equivalence যদি সত্য হয়, তবে হবিবুল্লার আবিষ্কারটাকে বাতিল করে দিতে হবে। তিনি এটা প্রমাণ করলেন দুদিক থেকে। প্রথমে তিনি দেখালেন, যে কোনো বস্তু, যার গুরুত্ব আছে, স্থৈর্য আছে—তার মাধ্যাকর্ষণও আছে। অন্যদিকে দেখালেন, যদি ধরে নেওয়া হয় হবিবুল্লার বাক্সটার মতো কোনো বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি নেই—অথবা তার বিপরীত শক্তিটা আছে, তা হলে এমনই একটা ইকোয়েশন পাওয়া যায়, যার কোনো অর্থ নেই। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, যেহেতু 'প্রিন্সিপ্‌ল অফ ইকুইভ্যালেন্স' ধ্রুব ও সত্য, হবিবুল্লার আবিষ্কারটা সম্ভব নয়।"

সুমিত্রার প্রশ্ন, "কিন্তু শংকর, তোমার স্রোতের ইকোয়েশান থেকে

শংকর বলে, "এখনো ঠিক ও সম্বন্ধে তলিয়ে ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছে—ইকুইভ্যালেন্স খাটবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সবক্ষেত্রে নয়। তার মানে ওটাকে একটু সংশোধন করে নিতে হবে।"

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু স্রোতটা কিসের"? শংকর বলে, "তা তো জানিনা। মনে করো কোনো পরমাণুকণার 'ফোটন্' 'মেশন্' 'নিউট্রিনো'—ইত্যাদির কিম্বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ানো—হাইড্রোজেন অণুর-বা হিলিয়াম পরমাণুর স্রোত এটা। অথবা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরংগ—বেতার তরংগের একটা গুণও হতে পারে। একটা অজানা 'পার্টিকল'-এর স্রোত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আরো একটু অংক কষে দেখলে—এই স্রোতের রূপের কিছুটা বোধ হয় ধরা পড়বে।"

সুমিত্রা বলে, "তবে এর একটা নামকরণ করা হোক। যেমন—'রায়ন্'।"

শংকর হেসে ফেলে, "যদি কেউ পরে প্রমাণ করে দেয় যে, একটা বিদ্যুৎকণা বা আলোক-কণা ছাড়া কিছুই নয়—তখন ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক-সমাজে অপদস্থ হবো যে। নাঃ, 'রায়ন্' চলবে না।"

সুমিত্রা দমবার পাত্রী নয়, "তবে 'গ্রাভিট্রন' অথবা 'গ্রাভর্ণ?"

শংকর বলে, "'গ্রভিট্রন' নয়—'গ্রাভিটন' বলে একটা পরমাণুকণার অস্তিত্ব ধরে নিয়ে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু আর আইনষ্টাইন। হয়তো বা আমাদের এই প্রাইমারী পার্টিকল তাঁদের বর্ণিত 'গ্রাভিটন্' ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা প্রমাণ করতে সময় লাগবে অনেক। আপাততঃ না হয় তোমার কথামতো একটা পোষাকী নাম দেওয়া যাক—'গ্রাভন্'। এ নামটা কিন্তু অপাততঃ অস্থায়ী ভাবে বহাল করা হোলো—কালের ধোপে হয়ত নামটা নাও টিকতে পারে।"

সুমিত্রা সায় দেয়, "বেশ, তাহলে 'গ্রাভন'ই থাকুক। কিন্তু শংকর এই গ্রাভনের স্রোত কি দেখা যায় না—বা কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না?"

শংকর মাথা নাড়ে, "না সুমিত্রা, আমার কল্পনা সত্য হলেও, এই স্রোতটা থেকে যাবে চর্মচক্ষুর অতীতে—স্বপ্নেরও অগোচর কতদিনের জন্য, কে জানে! হয়তো বা চিরকালই এটা থাকবে মানুষের নাগালের সীমার বাইরেই! কেন জানো? ধরো, এই মাটির ঢিবিটা, ওই বটগাছটা—এদের দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, উচ্চতা আছে। এই তিন 'ডাইমেনশন' দিয়ে যাবতীয় বস্তুর আমরা পরিমাপ করি, ধারণা করি। এই তিন 'ডাইমেনশনের' বাইরে বটগাছটার যদি অন্য কোনো 'ডাইমেনশন' থাকে, আমরা শতচেষ্টা করলেও তার পূর্ণস্বরূপ জানতে পারব না। আমার স্রোতের কমপক্ষে সাতটা 'ডাইমেনশন'! হয়তো সূক্ষ্ম হিসেব করতে গেলে আরো 'ডাইমেনশন'-এর প্রয়োজন হতে পারে।

"কোনো পদার্থ যার গুরুত্ব আছে—এই স্রোতের মধ্যে একটা curl বা আবর্তের সৃষ্টি করে। সে আবর্তেরও বিকাশ কমপক্ষে চতুর্থ পঞ্চম ডাইমেনশান জুড়ে। সেই আবর্তের ফলে সব ভাসমান পদার্থই এক সংগে মিশবার জন্য ছোটে—কেবল এইটিই আমাদের পরিমাণ সাপেক্ষ তার ফলে আমাদের জানা তিন ডাইমেনশনে পাওয়া যাচ্ছে মহাকর্ষের পরিচয়।

"তোমার তিন ডাইমেনশনের নদীর স্রোতের কথা জানা না থাকলে যেমন দেখা যেতো দুটো ফুলের পাপড়ী পরস্পর পরস্পরকে

—শরৎচন্দ্র নন্দ

শি
শু
ম

আলোকচিত্র

—কানাই রায়

—অজিত দাস

—বৈদ্যনাথ রায়

মল্লভূমের কারুশিল্প

উড়িষ্যার কারুশিল্প —পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

—সুখেন্দুকুমার মণ্ডল

শোনমার্গ (শ্রীনগর)

—রণজিৎকুমার

প্রাতরাশ
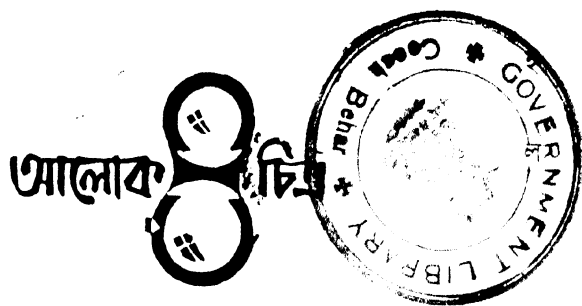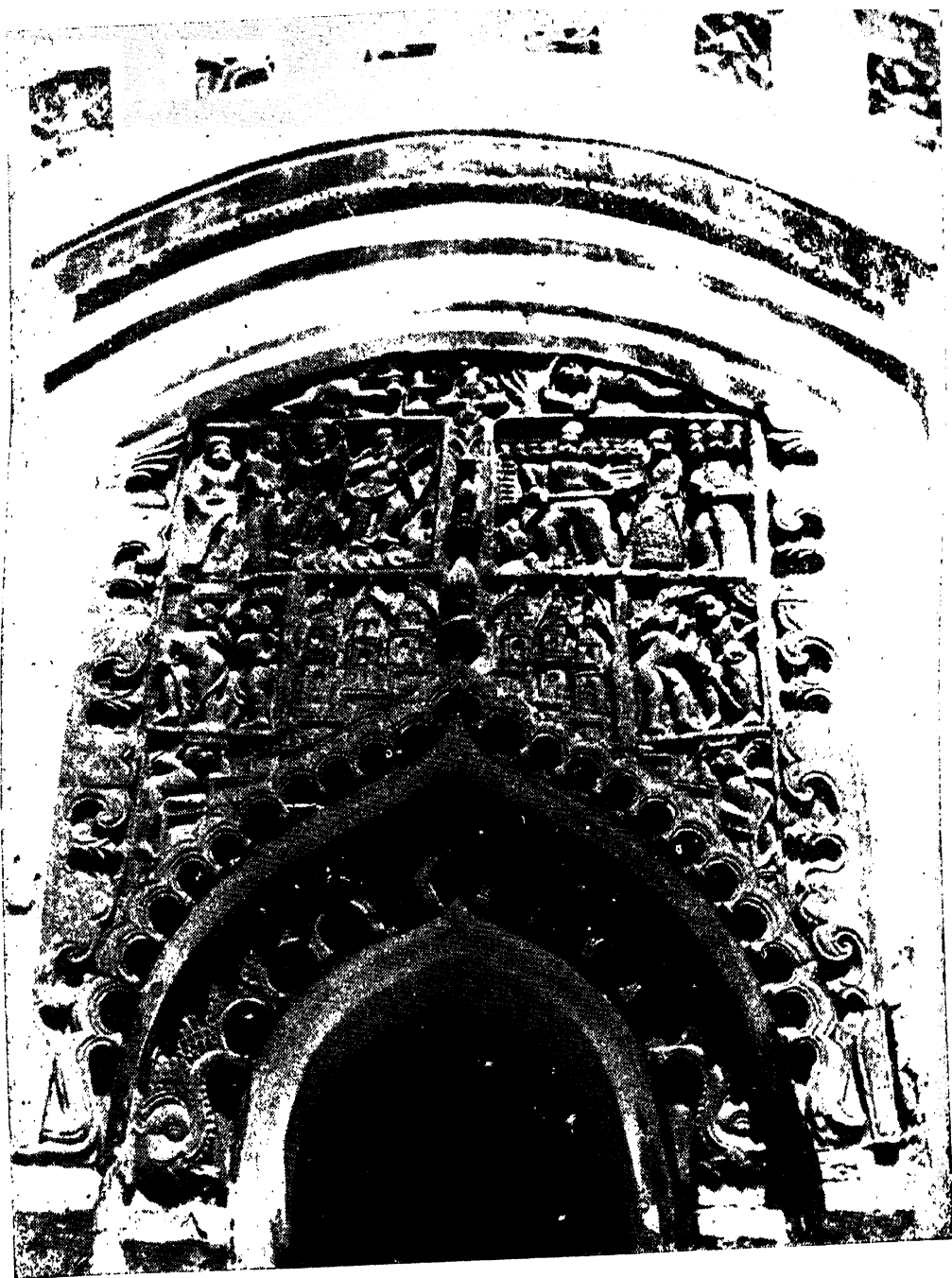
সুমিত্রার প্রশ্ন, "কিন্তু গ্রাভন-স্রোতের অস্তিত্বটাই বা প্রমাণ করবে কী করে ?"

শংকর বলে, "প্রমাণ করাটাও এখনো আমাদের বিদ্যার অতীতে। গণিতে কিন্তু সাতটা কেন, হাজারটা, লক্ষটা 'ডাইমেনশন' প্রকাশ করা যায়। সেই অংক কষেই দেখা যায় যে, আমাদের স্পেস-টাইম-কন্টিন্যুয়ামে গ্রাভনের স্রোতের প্রভাব মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের সংগে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, উপস্থিত প্রমাণ দেবার মতো কোনো পন্থাই আমাদের জানা নেই। এমন কি যদি 'অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভবপরও হয় তাহলেও গ্রাভন-থিয়োরি অপ্রমাণিতই থাকবে। হয়তো বা কোন সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে বড়োদরের বৈজ্ঞানিক কেউ এটাকে প্রমাণ বা বাতিল করে দেবেন। আগেই বলেছি, আমাদের জ্ঞান বা যন্ত্রের পাল্লা অতোদূরে পৌঁছায় না যে !"

সুমিত্রা কিছুক্ষণ ভেবে মন্তব্য করে "এটাও তাহলে 'ইকুইভালেন্স'-এর মতোই একটা 'পশ্চুলেট' হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

শংকর স্বীকার করে, "কতকটা তাই বৈকি। তবে আশার কথা কি জানো সুমিত্রা, মাধ্যাকর্ষণ আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সংক্রান্ত অনেক চিরন্তন প্রশ্নের অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক উত্তর মেলে আমাদের গ্রাভন-থিয়োরি থেকে। যেমন ধরো, কী ভাবে মহাশূন্যে-ছড়ানো বহুদূরের নক্ষত্র নীহারিকায় চলেছে টানাটানি * গ্রাভন থেকে পাওয়া যায় এর একটা সহজ ব্যাখ্যা। তারপর আর দুটো কঠিন প্রশ্ন—মনে করো আজ এইমাত্র একটা নতুন তারার জন্ম হল—কতোদিন লাগবে তার আকর্ষণের প্রভাব পৃথিবীতে পৌঁছাতে ? এই প্রভাব আসবেই বা কিসের অবলম্বনে ? আইনষ্টাইন অবশ্য এ দুটো প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছিলেন—আলোক-তরংগের মতো গ্রাভিটেশনের তরংগ আছে—এ দুই তরংগের গতিবেগ সমান। আর অবলম্বনের প্রশ্ন ওঠে না—কারণ, কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের কাছাকাছি মহাশূন্য বেঁকে যাওয়ার ফলেই মহাকর্ষ। গ্রাভনের মতবাদ থেকে এ প্রশ্ন দুটোর উত্তর সহজেই মিলে যায়—অন্য থিয়োরিগুলোর মর্যাদা রেখেও। জলের অণু অথবা গ্রাভন যেমন স্রোতকে বহন করে নিয়ে চলেছে, তেমনি আবার ঢেউকেও তরংগায়িত করছে।

"তারপর, নীহারিকাগুলো আবর্তের মতো দেখায় কেন—এ জিজ্ঞাসারও একটা চটকদার উত্তর মেলে আমাদের প্রবাহ থেকে। কল্পনা করো, জলের ঘূর্ণীটা পাথরের মতো জমে গেছে। এখন একটা 'করাত দিয়ে সেটাকে যদি কাটা যায়—সে কাটা জায়গাটাই 'ক্রশ্-সেকশন' দেখাবে ঘূর্ণীর মতোই। ঘূর্ণীর ডাইমেনশন তিনটে—আর তোমার 'ক্রশ-সেকশন্' হচ্ছে দুটো ডাইমেনশনে। নীহারিকার আকৃতি আমাদের গ্রাভনের আবর্তের তিন 'ডাইমেনশন্'-এর 'ক্রশ-সেকশন্' অথবা 'ইন্টারসেপ্ট্' বললেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

"সব নীহারিকাই আবার ঘূর্ণীর মতো নয়। এই 'টারবুলেন্স' অথবা আলোড়নেরও একটা সহজ কারণ মেলে আমাদের প্রবাহের মতবাদ থেকে।

"তারপর 'কসমোলজি' আর 'অ্যাষ্ট্রোফিজিক্স'-এর সব চেয়ে মোক্ষম সমস্যা—নীহারিকাপুঞ্জের দূরত্বের সংগে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগটাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই গতিবেগ বৃদ্ধি একশো দশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে হাইড্রা নীহারিকাপুঞ্জ পর্যন্তই। হালে হাইড্রার বাইরেরও কতকগুলো নীহারিকাপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে। সঠিক পরিমাপ এখনো সম্ভব হয়নি, তবে মনে হচ্ছে যেন সুদূরতম নীহারিকাগুলোর বেলায় এই গতিবেগটা যেন আবার কমে আসছে। কে জানে, হয়তো বা নদীর মাঝগাঙের মতো গ্রাভনপ্রবাহের একটা মাঝদরিয়া আছে, যেখানে স্রোতের বেগটা সবচেয়ে বেশী !"

সুমিত্রা নীরবে কিছুক্ষণ গ্রাভনের স্রোতের একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করে। তার কপালে পড়ে সূক্ষ্মরেখা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, "মহাকর্ষের স্বরূপটি না হয় বোঝা গেল—কিন্তু অ্যান্টিগ্রাভিটি !"

শংকর বলে, "সেটাও এখনো মনের মধ্যে ঠিকমত দানা বাঁধেনি। অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব করতে হলে একটা পাল্টা আবর্তের সৃষ্টি করতে হবে গ্রাভনের স্রোতে।

কিন্তু সবচেয়ে আশার কথা কী জানো ? স্রোতের মতবাদ থেকে এটা সম্ভব—অন্ততঃ কাগজে-কলমে। তরংগের থিয়োরি থেকে তা সম্ভব নয়—বড় জোর 'ইন্টারফিয়ারেন্স' সৃষ্টি করে হয়তো বা সে তরংগ নাকচ করা যেতে পারে। কিন্তু বিপরীত শক্তির সৃষ্টি করা চলে না। যেমন, আলোক-তরংগের বিপরীত কোনো জিনিষের কল্পনাই করা যায় না।

"এখন এই গ্রাভনের প্রবাহে পাল্টা আবর্তের সৃষ্টি করতে গেলে চাই একটা 'ফোর্স-ফীল্ড' শক্তির ক্ষেত্র। সামান্য একটু খতিয়ে দেখেছি মাত্র এ সম্বন্ধে, মনে হচ্ছে এটা এমন কিছু অসম্ভবও নয়। পৃথিবীর মতো গ্রহের সংস্পর্শে গ্রাভনের আবর্তের স্বরূপটা ঠিকমতো জানা গেলে, চুম্বকের ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিকক্ষেত্র, রেডিও তরংগ বা শ্রবণাতীত শব্দ-তরংগের ক্ষেত্র—বা এসব ক্ষেত্রের সমন্বয় করে কোনো বিশেষ বিশেষ দিকে প্রয়োগ করলে হয়তো বা আবর্তটাকে বদলে দেওয়া যেতেও পারে। অন্ততঃ এগুলো পরীক্ষা সাপেক্ষ।"

সুমিত্রা হাততালি দিয়ে ওঠে ছেলেমানুষের মতো আনন্দের আতিশয্যে ; "তা হোলে তো কেল্লা ফতে !"

শংকর হেসে ফেলে, "দূর, এটা এখনো একটা 'বন্য আইডিয়া'—হয়তো কোথায় কেঁসে যেতে পারে। প্রথমে বাওকে দিয়ে যাচাই করানোর দরকার—অংকে কোথাও ভুল হয়ে গেছে কি না।

"এমনও তো হতে পারে যে, বুড়ো শিকদারের কথাটাই ঠিক।"

"কিন্তু হবিবুল্লা ?"

"ওই একটাই ভরসা। একমাত্র সেই জানতো এর সত্যাসত্য।"

---

* পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণ্যমান যুগ্ম-তারকার মধ্যে কল্পিত aspidal lineএর আবর্তন ঠিক তরংগের থিয়োরি থেকে নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা যায় না। হার্ভার্ডের অধ্যাপক মেক্সিকান গণিতজ্ঞ Birkhoff একটা থিয়োরি দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গ্রাভিটেশন-তরংগ আর আলোক-তরংগের গতিবেগ সমান—কিন্তু কোন পদার্থের গতিবেগের সংগে গ্রাভিটি-তরংগের আপেক্ষিক গতিবেগের তারতম্য হয়।

চোদ্দ

ষড়যন্ত্র ?

"All philosophers who find
Some favourite system to their mind ;
In every point to make it fit
Will force all nature to submit."

Thomas Love Peacock.

ব্যারাকে ফিরে ওরা দেখলো সহকর্মীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেছে। শিকদার কাল রাত্রে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছেন।

সেটার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সন্ধ্যায় বসবে এক জরুরী বৈঠক। শংকর ও সুমিত্রার নামে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে আগ্রায়।

'হল'ঘরে রাওএর সংগে দেখা। রাও বললে, "যাক, তোমরা এসে পড়েছ—আমাদের একটা দুর্ভাবনা ঘুচল।"

শংকর জিজ্ঞাসা করে, "ভদ্রলোক হঠাৎ কেন পদত্যাগ করলেন—কিছু জানো ?"

রাও বলে "সঠিক জানি না। আমার মনে হয় শুক্রবার রাতের মিটিং থেকেই এর সূত্রপাত। কাল সমস্ত দিন ব্যারাকেই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেলেন—ফিরলেন গভীর রাতে। আজ সকালেই প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী এসে বললেন—শিকদার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। উনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, গণিতের সাহায্য না নিয়েও উনি প্রমাণ করে দেবেন যে, হবিবুল্লার আবিষ্কারটা একেবারেই মনগড়া।"

শংকর বলে, "তাইতো—শেষে ভদ্রলোকের মস্তিষ্কবিকৃতি না হয়!"

রাও বলে, "শুধু তাই নয়। ওঁর কাহিনীর ফলে দলের দু-একজনের মধ্যেও ভাঙনের আভাষ দেখতে পাচ্ছি। হয়তো বা আরো দু-একখানা পদত্যাগপত্র দাখিল হবে।"

শংকর চিন্তিত হয়, বলে, "রাও, পরশুদিন রাতে নেহাত গায়ের জোরেই ভদ্রলোককে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তির সম্বল আমাদের বিশেষ ছিল না।"

রাও বলে, "তা হলেও বেশ করেছ। খুব ভালো কাজ করেছ। মেনে নিলাম না হয় বড়ো পণ্ডিত—কিন্তু সব সময় সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে কতোদিন সেটা আর সহ্য হয়!"

শংকর বলে, "যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, সে রাতে শিকদারের মতামতের বিরুদ্ধে খাড়া করবার মতো পাকা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমাদের ছিল না। আজ কিন্তু কতকগুলো পাল্টা 'ইকোয়েশন' খাড়া করে দেওয়া যাবে।"

রাও বলে, "কী বলছ তুমি ? সে আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু 'ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল' নিঃসন্দেহে খণ্ডন করবার মতো কোনো হাতিয়ারই পাই নি।"

শংকর বলে, "আরে না না, 'ইকুইভ্যালেন্স'-এর কথাটা বাদ দিলেও চলবে। এই দেখ না, এইগুলো ভালো করে 'চেক' কর, একটা কিছু পেয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে।"

রাইটিং প্যাডের কাগজের তাড়াগুলো তুলে ধরে শংকর।

কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে রাও বলে—"ঠিক বুঝতে পারলাম না তো। দেখছি তোমার 'ফ্লুইড ডাইনামিক্স'-এর কোনো 'ইকোয়েশন' এটা। কিন্তু এতগুলো 'ভেক্টর' নিয়ে কী করবে তুমি ? কিসের 'ফ্লো'র কথা বলতে চাও তুমি ?"

শংকর বলে, "কিসের স্রোত সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারব না এখন। সুমিত্রা আর আমাতে মিলে ওর একটা চটকদার নাম দিয়েছি—'গ্রাভন'। পরে হয়তো দেখা যাবে এটা আমাদের জানার মধ্যেই কোনো প্রাইমারী পার্টিকল। মূল থিয়োরিটা হচ্ছে, জলের স্রোত যেমন ভাসমান পদার্থগুলোকে একত্র করবার চেষ্টা করে, এই গ্রাভনের স্রোত একত্র করবার চেষ্টা করছে মহাশূন্যে বর্তমান যাবতীয় বস্তুকে—গ্রহ, তারা, সূর্য, চন্দ্রকে। এর ফলেই আমরা অনুভব করছি 'গ্রাভিটেশন'।

রাও দ্বিধা প্রকাশ করে, "কিন্তু পুরাকালের এমনই একটা থিয়োরি কি বাতিল হয়ে যায় নি ?"

শংকর বলে, "সে কথা কতকটা সত্য। কিন্তু ডেমোক্রিটাসের আমলে তিনটে ডাইমেনশনের বাইরে মানুষের কল্পনা বা গণিত পৌঁছোত না।"

কিছুক্ষণ কাগজগুলো উল্টে-পাল্টে দেখে রাও, তারপর মন্তব্য করে "'আইডিয়া'টা চিত্তাকর্ষক, অভাবনীয় বললেও চলে। কিন্তু ধোপে টিকবে তো ?"

শংকর বলে, "তা বলতে পারব না। তবে মূল ইকোয়েশনটা থেকে টেনসর ক্যালকুলাস আর 'ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস' করতে করতে এতটা ইকোয়েশনে আসা গেছে। এই দেখ, এই শেষ পাতায় এই ইকোয়েশন থেকে পৃথিবীর 'গ্রাভিটেশন কনষ্ট্যান্ট' প্রায় মিলে যাচ্ছে—তারপর এই দেখ, 'লাপ্লাস-পয়শন' ইকোয়েশনের 'ডেরিভেশন'। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা গোঁজামিল আছে—কতকগুলো 'অ্যাপ্রক্সিমেশন' আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। কিন্তু ভালো করে তলিয়ে দেখলে কম্পিউটারের সাহায্যে নির্ভুল ইকোয়েশনটা পাওয়া উচিত।

"রাও, তোমার গণিতের জ্ঞানে আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার ভিতটা এদিকে আবার তেমন পোক্ত নয়, অনেক সময়ে সামান্য যোগ-বিয়োগ-ইন্টিগ্রেসনেই আমার ভুল হয়ে যায়। তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ—তুমি এগুলো ভালো করে পরীক্ষা করো—না হয় আরেকবার কষে দেখ। ভুল অংক নিয়ে শিকদারের সামনে দাঁড়ালে মাথা কাটা যাবে। না হয় অন্য দু একজনকেও দেখিয়ে নাও। এর কথায়—ব্যাপারটার খুঁটিনাটি সবই একেবারে অনুবীক্ষণের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে নাও। আমি এখন চললাম কম্পিউটার চালু করতে।"

"সন্ধ্যাবেলা সভাটা আজ জমবে বলে মনে হচ্ছে।"

* * *

সভার অধিবেশন সুরু হয়ে গেছে। শংকর দেখে সভাস্থলে একটা থমথমে ভাব—যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। কৃষ্ণস্বামী দেশের বিভাগের কেষ্ট বিষ্টুদের একটা বড়ো দল জুটিয়ে এনেছেন।

কৃষ্ণস্বামীই আরম্ভ করলেন সভা। ঘোষণা করলেন যে, প্রফে[illegible] শিকদারের পদত্যাগ-পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আজ এই সভা। সে পদত্যাগপত্রে প্রফেসর শিকদার করেছেন কতগুলো অ[illegible] মন্তব্য। সে মন্তব্যের আলোচনায় আসবার আগে সকলের ত[illegible] থেকে প্রফেসর শিকদারকে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে[illegible] পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করে নেবার জন্য। তাঁর মতো একজ[illegible] বৈজ্ঞানিকের অনুপস্থিতিতে প্রজেক্টের অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাব[illegible]

শিকদারের বলার পালা এবার। সকলে নড়ে চড়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। আজকের সুর তাঁর মার্জিত ও মোলায়েম।

"বন্ধুগণ, যখন এ প্রজেক্টে প্রথম কাজ সুরু করি তখন কতগুলো অসংগতি আমার নজরে পড়ে। গত একমাসের মধ্যে সে সমস্ত অসংগতির সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করার পর নতুন অসংগতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে কতকগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে।"

শিকদারের কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে খাদে নেমে আসে। রাও-শংকরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়।

"প্রথমে আমাদের বলা হোলো—হবিবুল্লা খান নামধেয় কোনো তরুণ একটা অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিন উদ্ভাবন করেছে। একটা ফিল্ম আমাদের দেখানো হলো প্রমাণ-হিসাবে। সে ফিল্মে দেখানো হয়েছে একজন যুবককে মাটি থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট উঠতে। ফিল্মটা একেবারেই পরিষ্কার ওঠে নি—ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্যে যুবককে ভালো করে দেখা যায় না। ক্যামেরাটাও ঠিক মতো ফোকাসে ছিল না।

"সেদিন রাত্রে আমাদের পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স—হবিবুল্লার তথাকথিত অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনের ধ্বংসাবশেষ হিসাবে।"

"গত শুক্রবার রাত্রে আমি এ সভায় প্রমাণ করে দিয়েছি যে, যদি ডা: আইনষ্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকের ওপরে আমাদের আস্থা থাকে, তা হলে অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা চলে না। সেদিন কেউ কেউ অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক নজীর তুলেছিলেন—লেভিটেশন ইত্যাদির।"

শিকদারের অগ্নিদৃষ্টি শংকরের ওপরে।

"যখন দেখলাম, আমার সহকর্মী বৈজ্ঞানিকেরা মহামানব আইষ্টাইনের দানকে অস্বীকার করে কুসংস্কারকেই বরণ করে নিলেন, তখন সভাস্থল ত্যাগ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর রইল না। দেশের বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারার দৈন্য যে কতটা, মনে মনে সেটা উপলব্ধি করে মর্মাহত হয়েছি।

"দ্বিতীয় অসংগতি, হবিবুল্লার গ্রন্থাগার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সাময়িক-পত্র বাদ দিলে সেখানে বইএর সংখ্যা সাত হাজার দুশো তিন। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখন প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় মানের একটা অংক কষতে চাই। দিনে যদি একখানা করে বইও শেষ করা যায়—হবিবুল্লার গ্রন্থাগারের সমস্ত বই নিঃশেষ করতে কতটা সময় লাগে জানেন? প্রায় বিশ বছর! এই লাইব্রেরীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে স্ফীতকায় টেক্স্ট-বই যেগুলোকে খুব সহজপাঠ্য বা সহজপাচ্য বলা চলে না। যেমন ধরুন গ্রের 'অ্যানাটমি'। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, বা এমন কোনো অসাধারণ ব্যক্তির দেখা আপনারা পেয়েছেন কিনা—যিনি গ্রের 'অ্যানাটমি' একদিনে অধ্যয়ন করতে পারেন?

"ধরে নেওয়া গেল যে, আমাদের হবিবুল্লা সে অসাধ্যসাধন করেছিল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল একত্রিশ বছর। বই সংগ্রহের নেশা তার সুরু হয় তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকে। বাকী জীবনের মধ্যে পাঁচ ছয় বছর বাদ দিতে হয় তার নিরুদ্দেশ-যাত্রা আর পৃথিবী-পর্যটনের জন্ত। অতএব বন্ধুগণ, আমাদের হবিবুল্লা দশ বছরেই সে অসাধ্যসাধন করল কী করে আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

"সমস্ত বই-ই কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে—হবিবুল্লার হাতের লেখা নোট আর লাল-নীল পেন্সিলের দাগ রয়েছে সমস্ত বইএর মধ্যে—আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত!"

"তৃতীয় অসংগতি হচ্ছে—হবিবুল্লার ওই লাইব্রেরীর বইগুলোর মধ্যে দেখা যায় দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত পরস্পর-বিরোধী ধারা। আপনারাই বলুন, যে লোক Hermann weyl-এর Space, Time, Matter" পড়ে চিত্তবিনোদন করে, সেই লোকই আবার কী করে "সচিত্র মারণ, উচাটন, বশীকরণ-এর রসগ্রহণ করতো?"

"চতুর্থ অসংগতি, তার রসায়নাগার। রসায়নাগারে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক পদার্থের একটা তালিকা আমি সংকলন করেছি। সরকারের তরফ থেকেও তার একটা ইনভেন্টরীর রিপোর্ট আপনাদের সকলের কাছেই আছে। সরকারী ইনভেন্টরীতে কিছু ভুল আছে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। যদি দরকার হয় আমার নির্ভুল তালিকা আপনারা দেখে নিতে পারেন। সে যাই হোক, কোন কোন জিনিস বেশী মাত্রায় খরচ বা ব্যবহার হয়েছে সে সম্বন্ধেও একটা হিসেব আমি করে রেখেছি। সাধারণ রসায়নের জ্ঞান থেকে আমার এটা ধারণায় আসছে না যে, এই সমস্ত 'কেমিক্যাল' খরচা করে কোন রাসায়নিক পরীক্ষা সম্ভব হতে পারে! শুধু আমি নয়, রসায়নের প্রবীণ অধ্যাপক গোপালাচারিও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি এ সম্বন্ধে। আমার কথা অবিশ্বাস হলে তাঁকেই আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

"পঞ্চম অসংগতি—পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী। সব মিলিয়ে মিটার ইত্যাদি মাপের যন্ত্র বাদ দিলে দুশো একাশিটা যন্ত্র আছে সেখানে। তার মধ্যে একশো বাহাত্তরটা যন্ত্র বাজার থেকে কেনা। পঁয়ষট্টিটা যন্ত্র সম্পূর্ণ ঘরে তৈরী। আর চুয়াল্লিশটা বাজারের থেকে কেনা যন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে অনেক যন্ত্রে হবিবুল্লার কর্মদক্ষতা দেখে অভিভূত হয়েছেন—আমিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারিনি। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই—যে ব্যক্তি একটা 'অ্যানালগ-কম্পিউটার' এর মতো জটিল যন্ত্র অতি চমৎকারভাবে নিজের হাতে গড়ে তুলতে পারে, একটা সামান্য ম্যাগ্নেটোমিটারের সার্কিটে তার ভুল হল কী করে?

"ওই ল্যাবরেটরীগুলো আমি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি। ছোটোখাটো আরো অনেক অসংগতি আমার নজরে পড়েছে। সব কিছুর তালিকা এ সভায় উপস্থিত করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আর একটা ব্যাপার আমার লক্ষ্যে পড়েছে, এটাই সবচেয়ে সন্দেহজনক। আমার বহু বর্ষের অভিজ্ঞতায় দেখেছি—যখন কোনো বিজ্ঞানসাধক নিজের হাতে কোনো যন্ত্র নির্মাণ করেন, সে যন্ত্রের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ থেকে যায়। সামান্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা থাকলেই বলে দেওয়া যায় কোন্ যন্ত্র কার হাতের তৈরী। হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা 'পার্সনালিটি'র ছাপ নয়, একাধিক এমন কি বহু 'পার্সনালিটি'র স্বাক্ষর!

"ভেবে দেখতে গেলে এ সমস্ত অসংগতির দুটো উত্তর হয়—

(১) হবিবুল্লা বলে কোনোদিন কারো অস্তিত্ব ছিল না—সমস্ত

কাহিনীটাই মিথ্যা। সরকারী ভাবে আমাদের একটা মিথ্যা ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে।

(২) একাধিক ব্যক্তি হবিবুল্লা খান বলে পরিচিত ছিলেন।

"প্রথম উত্তরটা বাতিল করে দিতে হয়, কারণ হবিবুল্লা খানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। আর জাতীয় সরকারই বা আমাদের মিথ্যা ভাঁওতা দেবেন কেন?

"সুতরাং দ্বিতীয় উত্তরটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হয়। প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী ও তথাকথিত প্রজেক্ট-এর বৈজ্ঞানিকদের আমার সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য যে, তাঁদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কেউ বা কোনো দল তাঁদের অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছে। আমার ধারণা এটা কোনো সংঘবদ্ধ দলের কাজ—কোনো বড়ো 'অর্গানাইজেশন'-এর অপকীর্তি!

"আপনারা নিজেদের খুব বিচক্ষণ বলে মনে করেন—কিন্তু ভেবে দেখুন তো, যদি কোনো প্রতারক হবিবুল্লা খান বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাদের প্রত্যয় করাতে চায় যে, অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব, আপনারা এই প্রতারণা কি সহজে উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন? ভেবে দেখুন, সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্, সার অলিভার লজ্, এঁদের মতো তীক্ষ্ণদর্শী বড়ো বৈজ্ঞানিকের চোখেও ধূলো দিয়েছিল তথাকথিত মাধ্যমিকের দল? এই প্রবঞ্চকের দলের পক্ষে টিমারপুরের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করাটা কী এমনই একটা অসম্ভব ব্যাপার? একটা তারের সাহায্যে নকল হবিবুল্লাকে শূন্যে তোলা কি এমনই বিজ্ঞান-বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা? ধোঁয়ার জালে চারিদিক তখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—সে তারটা কারো দৃষ্টিগোচর হবার সম্ভাবনা ছিল না! হয়তো অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সরকারী ফটোগ্রাফারের সংগেও এদের ষড়যন্ত্র ছিল!

"হবিবুল্লার কাহিনী আমরা জেনেছি স্বরাষ্ট্রবিভাগের গোয়েন্দা পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে। এঁদের অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্বন্ধে খুবই উঁচু ধারণা আমার কোনোদিনই ছিল না। বৃটিশ শাসনের আমলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোতে এঁরা বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন—আমি নিজেই একজন ভুক্তভোগী। দেশের স্বাধীনতা এলেও এঁদের পদ্ধতির বিশেষ সংশোধন হয়নি। এঁদের অনবধানতার ফলে দুজন হবিবুল্লার কাহিনী এক সংগে মিলে একটি উদ্ভট জগাখিচুড়ীর সৃষ্টি হয়েছে। হবিবুল্লার কাজে-কর্মে তার লাইব্রেরীতে ল্যাবরেটরীতে একটা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। একজন হবিবুল্লা ছিল নিয়মতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন সুদক্ষ কর্মী। আর একজন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অধীর, অমনোযোগী। খান কোম্পানীর ম্যানেজার হবিবুল্লাকে—যে হবিবুল্লাকে জানতেন হরিকিষণ গুপ্ত—সরিয়ে দিয়েছিল হয়তো বা পৃথিবী থেকেই এই প্রবঞ্চকের দল। তার জায়গায় এরা বসিয়ে দিয়েছিল জাল হবিবুল্লাকে। একমাত্র হরিকিষণ গুপ্তই সনাক্ত করতে পারতেন হবিবুল্লাকে, কিন্তু তাঁর সংগেও সাক্ষাৎকার হয়নি জাল হবিবুল্লার গত এগারো মাসে।

"এই কারণেই আমি এ প্রজেক্ট থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাই। 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'-র সম্বন্ধে পণ্ডশ্রম করা সময়ের অপব্যয়—দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ অযথা ব্যয় করে লাভ কী? যদি অ্যান্টিগ্রাভিটির মূল রহস্য সম্বন্ধে আপনাদের কৌতূহল মেটাতে চান, তবে পুলিশের ওপরেই আবার সে কাজের ভার ছেড়ে দিন। তারা বরং করে পুনরনুসন্ধান করে দেখুক হবিবুল্লার জীবনের সমস্ত তথ্যগুলো। সমবেত বন্ধুদের ও প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীকে শেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি—এ প্রজেক্টের ওপর যবনিকাপাত করবার জন্য।"

শিকদারের এ অদ্ভুত বিশ্লেষণে সভার লোক স্তব্ধ হয়ে গেছে। শংকরের ওপরে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—অনেকের মুখে সন্দেহের ছায়া—শংকর কি পারবে এ যুক্তিগুলো খণ্ডন করতে?

দ্বিধা না করে শংকর দাঁড়িয়ে ওঠে। আজ তার স্বরে জড়তার লেশমাত্র নেই। দৃঢ়কণ্ঠেই সে ঘোষণা করে—

"প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী ও সমবেত বন্ধুগণ! প্রথমেই আমি বলতে চাই নিজের তরফ থেকে, আর সমবেত অনেক কর্মীর তরফ থেকে—যে, 'প্রজেক্ট'-এর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রফেসর শিকদারের সংগে আমরা একমত নই।

"তিনি তুলেছেন একরাশ অসংগতির কথা। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, কিছু অসংগতি কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না? বস্তুত: অসংগতি না থাকলেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক অথবা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়াত। প্রতারকের দল যদি টিমারপুরের বাড়ীর অগ্নিকাণ্ড আর হবিবুল্লার শূন্যে ভ্রমণ—এ দুটো ঘটনা একসংগে এমন নিখুঁতভাবে সংঘটন করবার নির্ভুল পরিকল্পনা করতে পারে, হবিবুল্লার লাইব্রেরী আর ল্যাবরেটারীর অসংগতিগুলো তারা নিশ্চয়ই সংশোধন করে দিত। বিশেষ করে যখন কতকগুলো ভুল স্থূলদৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যায়।

"তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিলাম যে হবিবুল্লার আবিষ্কার একটা প্রতারণা। কিন্তু এ প্রতারণার উদ্দেশ্য কী? মোটিভটা কী? এমন বিকৃত-মস্তিষ্ক কেউ কি আছেন, যিনি অথবা যাঁরা দেশের কয়েকজন নিরীহ বৈজ্ঞানিককে কেবলমাত্র অপদস্থ করার জন্য এককোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার একটা ল্যাবরেটারী ছেড়ে দেবেন?"

সভাস্থল থেকে ওঠে চাপা হাসির মৃদু গুঞ্জন। শংকর সেটাকে মিলিয়ে যেতে দেয়, তারপর আবার বলে, "প্রফেসর শিকদারের উত্থাপিত প্রথম অসংগতির কথাটা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করা যাবে। দ্বিতীয় অসংগতি তাঁর মতে হবিবুল্লার গ্রন্থাগার। সেখানে সাত হাজারেরও বেশী সংখ্যায় বই দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেছেন। কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র দেশেও হবিবুল্লার চেয়ে কম বিত্তশালী অনেক লোকেরই ঘরে সাত হাজার বই আছে। প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীর নিজস্ব লাইব্রেরী আমরা সকলেই দেখেছি, সেখানে অন্তত: নয় হাজার বই আছে।

"স্বীকার করে নিতে হবে যে সমস্ত বই আদ্যোপান্ত পড়া হবিবুল্লার জীবনে সম্ভব হয়নি। প্রফেসর শিকদারের অংক সেখানে নির্ভুল। কিন্তু একটা কথা তিনি বোধহয় ভেবে দেখেননি। গ্রের 'অ্যানাটমি' বা 'অকসফোর্ড ডিকশনারী' হচ্ছে 'রেফারেন্স'-এর বই। এমন উন্মাদ কেউ নেই জগতে যিনি ওগুলো নাটক-নভেলের মতো একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেন!"

এবার আবার হাস্যধ্বনি শোনা যায়।

শংকর বলে চলে, "দরকার হলে বা কোনো সন্দেহ হলে রেফারেন্সের বই-এর কোনো একটা বিশেষ জায়গায় আমরা নির্ভুল তথ্যের অনুসন্ধান করি। লাল নীল পেন্সিলের দাগ থেকে এটা প্রমাণ করা যায় না যে, প্রতি বইটাই হবিবুল্লা আদ্যোপান্ত পড়েছিল। তবে প্রত্যেক বইখানা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করত। ভেবে দেখুন,

এই প্রজেক্টে এমন কর্মী নেই, যিনি এই মাত্র একমাসের মধ্যে অন্ততঃ শ' তিনেক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করেননি।

"তারপর গ্রন্থাগারের বইগুলোর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ধারার কথা। এর ব্যাখ্যা অতি সহজ। হবিবুল্লার ছিল অসাধারণ জ্ঞানের নেশা। তাই জগতে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সে তার সন্ধান রাখবার চেষ্টা করত। এইভাবে তার মনের প্রসার বেড়ে গিয়েছিল— অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের এটাই বোধ হয় সবচেয়ে প্রধান কারণ। এটা কি এমনই একটা অসম্ভব ব্যাপার? আমরা কি চেষ্টা করি না বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সন্ধান রাখতে? আর ডাকিনতন্ত্রের কথা যদি তোলেন, আমরাও কি অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন করি না অলীক অবাস্তব অসম্ভব নাটক-নভেলের রস গ্রহণ করে? এর ফলে কি বিজ্ঞান-সাধনায় কারো বাধা পড়ছে? এমনকি প্রফেসর শিকদারও কেবল 'ম্যাথেমেটিক্যাল ফিজিক্স'-এর নীরস গণিত নিয়েই সময় কাটান না। আজ আমরা প্রমাণ পেলাম যে, তিনি ডিটেক্‌টিভ রহস্যোপন্যাস সম্বন্ধেও প্রচুর খবর রাখেন! তা নইলে ষড়যন্ত্রের এমন রোমহর্ষক কাহিনী কোথা থেকে উদ্ভাবন করলেন তিনি?"

এবার তুমুল হাস্যরোলে ঘর যেন ফেটে যায়। শিকদার একবার উঠে দাঁড়ান, তারপর কী ভেবে আবার বসে পড়েন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শংকর হাস্যধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরও, তারপর আবার বলে চলে—

"তারপর রসায়নাগারের কথা। প্রফেসর শিকদারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও একটা নোটবইতে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর সব জিনিসেরই একটা তালিকা রেখেছি। হয়তো বা প্রফেসর শিকদারের মতো অতটা নির্ভুল নয় আমার তালিকা। কিন্তু রাসায়নিক 'রিএজেন্ট'-এর খরচার মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ধাতু গলিয়ে ফেলতে চাই অ্যাসিড—তাই অ্যাসিডের বোতলগুলো প্রায়ই খালি। আর 'অর্গ্যানিক সলভেন্ট'—জৈবদ্রাবক লাগে প্লাস্টিক-রবার ইত্যাদি দ্রবীভূত করবার জন্য—তাই 'সলভেন্ট'-এর খরচাও বেশীই হয়েছে। কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ—লবণ ইত্যাদি লাগে 'ইলেক্ট্রোপ্লেটিং'-এর কাজে, সেগুলোরও ব্যবহার হয়েছে দেখা যায়। মূল কথা হচ্ছে, কলেজের ছাত্রদের মতো রসায়নের কোনো মৌলিক পরীক্ষার জন্য হবিবুল্লা রসায়নাগার ব্যবহার করেনি, ওটাকে সে গড়ে তুলেছিল পদার্থ বিজ্ঞানের কাজের সহায়তার জন্য।

"পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে প্রফেসর শিকদার দেখেছেন যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের ছাপ। সমবেত বন্ধুদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় সবসময়েই থাকতো ল্যাবরেটরীতে। আমি সলিমের কথা বলছি। তা ছাড়া খান কোম্পানীর লোক এসে সাহায্য করেছে যন্ত্রপাতি সন্নিবেশের কাজে। সুতরাং একাধিক 'পার্সনালিটি' অথবা বিভিন্ন যন্ত্রে কর্মদক্ষতার তারতম্যের একটা সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়— হবিবুল্লার যমজকে নিয়ে টানাটানি না করেও।

"দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কথাটা তুলেছেন শিকদার। একবার ভেবে দেখুন তো—দ্বৈত ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যেও পাওয়া যায় না? এই জটিল জীবন-সংগ্রামের দিনে এমন কোনো লোকের সন্ধান আপনারা পেয়েছেন কি, যার ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় না বিভিন্ন পরিস্থিতিতে?

"আর সবশেষে আলোচনা তুলতে চাই প্রফেসর শিকদারের বর্ণিত প্রথম অসংগতি সম্বন্ধে। অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব—অন্ততঃ কাগজে কলমে!"

সভাস্থলে এবার আবার মৃদু গুঞ্জন ওঠে। শিকদার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, "গায়ের জোরে সে কথা বললেই হয় না, প্রমাণ করো না তুমি—কী করে সম্ভব।"

শংকর বলে, "প্রমাণ হবিবুল্লার যন্ত্র—প্রমাণ যে যন্ত্র আমি পরিকল্পনা করেছি। প্রফেসর শিকদার, 'ইকুইভ্যালেন্স' একটা থিয়োরি মাত্র, মহাকর্ষকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু এর চেয়ে একটা ভালো থিয়োরি খাড়া করা যেতে পারে, যাতে গ্রাভিটি-অ্যান্টিগ্রাভিটি কেন—মহাশূন্যে স্পন্দিত অনেক শক্তির তরংগেরই ব্যাখ্যা করা চলে।"

তারপর শংকর বলে যায় গ্রাভনের স্রোতের কথা, কী ভাবে মানুষের পর্যবেক্ষণের সীমার মধ্যে সেটা মহাকর্ষরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। তারপর বোর্ডের ওপরে লিখে চলে 'ইকোয়েশনের' পর 'ইকোয়েশনের' সারি।

রাও এর উপদেশে গ্রাভন স্রোতের আরো তিনটা 'ডাইমেনশন' বাড়ানো হয়েছে। মূল ইকোয়েশন গ্রহণ করেছে দশটা 'ডাইমেনশন'! শেষ 'ইকোয়েশন' থেকে শংকর বের করে নিউটনের মহাকর্ষের নিয়মাবলী, 'লাপ্লাস-পয়শন ইকোয়েশন' এমন কি 'আইনষ্টাইনের 'পশ্চুলেট্ অফ ইকুইভ্যালেন্স'! তারপর বিপরীত আবর্ত তৈরী করবার জন্য তার 'ফীল্ড ইকোয়েশনে'র বিশদ ব্যাখ্যা করে।

উপসংহারে শংকর বলে, "মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে জানা হয়তো মানুষের সাধ্যাতীত। গ্রাভন একটা 'থিয়োরি'-মাত্র, আপাততঃ এর সার্থকতা হচ্ছে এই জন্য—যে মহাকর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত থিয়োরিগুলোর চেয়ে গ্রাভনের মতবাদকে সম্প্রসারণ করা চলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে। আইনষ্টাইনের 'রিলেটিভিটি প্রিন্সিপ্‌ল' যেমন নিউটনের কোনো আবিষ্কারই নাকচ করে দেয় না—কেবল সংশোধিত করে, তেমনি গ্রাভন থিয়োরির সংগে আইনষ্টাইনের 'রিলেটিভিটি'-বা তরংগের যে কোনো প্রচলিত থিয়োরির কোনো বিরোধ হবে না। বস্তুতঃ আইনষ্টাইনের গ্রাভিটেশন সম্পর্কিত কোনো একটা ইকোয়েশনের মধ্যে বিভিন্ন 'ডাইমেনশন'এর প্রবাহের 'ভেক্টর' বা গতি যোগ করলে গ্রাভনের মূল ইকোয়েশনে পৌছানো যায়। বক্তৃতার শেষে শংকর কম্পিত কণ্ঠে যোগ করে তিরোধানের দুসপ্তাহ আগে মহামানব আইনষ্টাইনের বাণী—

"There are so many unsolved problems in physics. There is so much that we do not know; our theories are far from adequate."*

শিকদার হঠাৎ উন্মাদের মতো চীৎকার করে ওঠেন "এ হতে পারে না! কী করে হবে? সারাজীবন কি আমি তা হলে ভুল শিখেছি?" অপ্রকৃতিস্থের মতো টলতে টলতে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর শিকদার। প্রজেক্ট অ্যান্টিগ্রাভিটি থেকেও।

* * *

সভাস্থ সকলে নিঃশব্দে স্থাণুর মতো বসে থাকে। সহসা কৃষ্ণস্বামী ভাবাবেগে শংকরকে আলিংগন করেন। চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু!

[ক্রমশঃ।

*"An Interview with Einsteim" I. Bernard Cohen. Scientific American, July 1955 p. 69.

আদম-সুমারীর প্রাচীন ইতিহাস

গোপালচন্দ্র সাঁতরা

আদম-সুমারী বলিতে আমরা লোক-গণনা বুঝি। কিন্তু লোক গণনা আদম-সুমারীর একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও নিছক লোক-গণনাই আদম-সুমারীর একমাত্র কাজ নয়। সর্ব্ব প্রকার জাতীয় উন্নতি-মূলক পরিকল্পনার সঙ্গে ইহার সুগভীর সম্পর্ক আছে। আদম-সুমারী উপলক্ষে নাগরিকদের সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকই কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হয়। সমগ্র দেশ ও অঞ্চল-বিশেষের জন-সংখ্যা ও জনগণের গতি-প্রকৃতি জানা না থাকলে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় গভর্ণমেন্টের পক্ষে যথারীতি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়। আদম-সুমারী হইতে জাতির জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পেশা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেগুলি প্রতিনিয়তই জন-সমাজের নানাবিধ কাজে লাগে। পৃথিবীর নানা দেশে আদম-সুমারী গত ১৫০ বছর ধরিয়া চালু আছে। আদম-সুমারীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রূপে না হইলেও কোন না কোন রূপে ইহা সুপ্রাচীন যুগ হইতেই পৃথিবীতে চালু ছিল। যতদূর মনে হয়, তাহাতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে সুমেরীয় সভ্যতার আমলে সর্ব্ব সাধারণের ধন সম্পদের সরকারী হিসাব প্রস্তুত করা হত। ইহা হইতেই পরে জন-গণনার রীতি উদ্ভূত হইয়াছিল বলা চলে। মিশরীয় সভ্যতার প্রথম যুগে প্রতি বৎসর নীল নদের বন্যায় প্লাবিত জমি জনসাধারণের মধ্যে নতুন করিয়া বণ্টন করিতে হইত বলিয়া লোক গণনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। হিব্রুগণ লোক গণনার পদ্ধতি মিশরীয়গণের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। বাইবেলে লোক-গণনার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, ইসরাইলে ডেভিড লোক-গণনার ব্যবস্থা করায় দেশে মড়ক দেখা দিয়াছিল এবং তাহার পরে দীর্ঘদিন খৃষ্টান জগতের অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আদম-সুমারী জাতির পক্ষে অকল্যাণজনক। রোমাণদের কাছে আদম-সুমারী অতি পরিচিত ছিল। এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আদম-সুমারী অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া জানা যায়। কিন্তু রোমাণ সম্প্রদায়ের পতনের পর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষ খাঁটি আদম-সুমারীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময় কেবল জমি-জমা ও ধন-সম্পদের তালিকা প্রস্তুত হইত মাত্র। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেগরিকিং গার্হস্থ্য করের ভিত্তিতে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যার একটা পরিমাপ করিয়াছিলেন এবং পাঁচ হাজার নরনারীর বয়সের ভিত্তিতে সমগ্র জাতির বয়সগত একটা আনুমানিক হিসাব রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে কোনক্রমেই আদম-সুমারী বলা চলে না।

আধুনিক পর্য্যায়ঃ—আধুনিক অর্থে যাহাকে আদম-সুমারী বলা চলে, অর্থাৎ কর সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যতীত জনগণের সংখ্যা ও অবস্থা আবিষ্কারের যে চেষ্টা, তাহা বোধহয় সর্ব্বপ্রথম হয় কানাডায় কুইবেকে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কুইবেকে এই আদম-সুমারী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের অন্তর্গত সুইডেনে প্রথম আদম-সুমারী গৃহীত হয়।

অতঃপর ধীরে ধীরে ইহা ইউরোপে ও আমেরিকায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মার্কিণ শাসনতন্ত্রের ১নং ধারায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে আদম-সুমারী অনুষ্ঠিত হইবে। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আদম-সুমারী গৃহীত হয় ১৮০১ খৃঃ এবং তদবধি সেখানেও প্রতি দশ বৎসর অন্তর আদম-সুমারী গৃহীত হইতেছে। জনসাধারণের কোন কোন অংশের মধ্যে আদম-সুমারী-বিরোধী একটা ভীতি ও সন্দেহ আছে। তাহাদের ধারণা যে, সংগৃহীত তথ্যাদি প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আদম-সুমারীতে লব্ধ সকল তথ্যই গভর্ণমেন্ট গভীর গোপনতার মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিতে বাধ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আদম-সুমারীর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক সমতা বিধানের প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯০০ সালের পূর্ব্বে এই সমতা বিধান সম্ভব হয় নাই। ১৮৭২ খৃঃ সেণ্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পরিষদের অধিবেশনে আদম-সুমারীর একটা আন্তর্জাতিক মাপকাঠি নিরূপণের প্রয়াস করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ১৮৯৭ সালের একটি অধিবেশনে পুনরায় এই প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং হাঙ্গেরীর পরিসংখ্যানবিদ জোসেফ কোরাজির প্রস্তাব ক্রমে স্থির হয় যে, ১৯০০ সাল হইতে আদম-সুমারী গ্রহণের ব্যাপারে কতগুলি আন্তর্জাতিক রীতি মানিয়া চলা হইবে। তদবধি আদম সুমারী একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় আদম-সুমারীঃ—বৃটিশ আমলে ১৮৮১ সালে প্রথম আদম-সুমারী প্রবর্ত্তিত হয়। বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ভারতীয় আদম-সুমারী বহুলাংশে বৃটিশ ধারানুযায়ী। এই ধারা অনুসারে আদম-সুমারীকে একটা সাময়িক ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা

হয় এবং ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র সরকারী দপ্তর স্থায়িভাবে রাখা হয় না, যখন আদম-সুমারী গ্রহণের প্রয়োজন হয় তখন বিশেষ আইনের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র সাময়িক দপ্তর সৃষ্টি করা হয় এবং সেই দপ্তরের উপর লোকগণনার সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট একজন সেন্সাস কমিশনার নিয়োগ করেন এবং তাঁহার অধীনে থাকেন জেলা সেন্সাস অফিসার, চার্জ সুপারিণটেণ্ডেণ্ট, সার্কেল পরিদর্শক ও ব্লকের গণনাকারিগণ। সাধারণতঃ অবৈতনিক হয়। আইনের দ্বারা সকল সরকারী কর্ম্মচারী, স্কুল, কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার, সামাজিক কর্ম্মী প্রভৃতিকে সাময়িকভাবে বিনা বেতনে গণনাকারী নিযুক্ত করা হয়। আদম-সুমারীর পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লোকগণনার ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত—এইভাবে আদম-সুমারীর কাজ বিভক্ত থাকে। চূড়ান্ত আদম-সুমারী গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে প্রাথমিক আদম-সুমারী গ্রহণ করা হয়, লোক-গণনার সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে বহু বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এবং এক এক জন গণনাকারীর উপর এক একটি বিভাগের পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে ৭০০ হইতে ১০০০ এক হাজার পর্য্যন্ত নরনারী থাকে, প্রতিটি জেলায় আদম-সুমারীর অধিকর্ত্তারূপে থাকেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহার অধীনে একজন জেলা সেন্সাস অফিসার নিযুক্ত করা হয়। বড় বড় শহরে ওয়ার্ড অনুযায়ী লোক গণনা করা হয়। আমেরিকায় আদম-সুমারী ব্যবস্থা কিন্তু অনেকটা ভিন্ন প্রকারের। মার্কিণ শাসন-ব্যবস্থায় আদম-সুমারীর একটি স্থায়ী দপ্তর সারা বছর ধরিয়াই তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। ১৯০২ খৃঃ ব্যুরো অফ সেন্সাস নামক এই স্থায়ী দপ্তরটি স্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে যে কয়টি আদম-সুমারী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তারিখ অনুযায়ী মোট লোক সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

বৎসর	লোক সংখ্যা	বৎসর	লোক সংখ্যা
১৮৮১	২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ	১৯২১	৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ
১৮৯১	২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ	১৯৩১	৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ
১৯০১	২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ	১৯৪১	৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ
১৯১১	৩১ কোটি ৫২ লক্ষ	„	„

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় আদম-সুমারী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল, একথা কোনক্রমেই স্বীকার করা চলে না। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের প্রথম আদম-সুমারীকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে প্রথম আদম সুমারী:—ভারতে গৃহীত ১৯৫১ সালের আদম-সুমারী একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বিধি সম্মত আদম-সুমারী। ১৯৫১ এর আদম সুমারী গ্রহণ আরম্ভ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং ইহা শেষ হয় ১৯৫১ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে। আদম-সুমারীর আসল কাজ শেষ হইবার পর শেষ তিন দিন সংগৃহীত তথ্যাদির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কল্পে প্রতি বাড়ীতে পুনরায় লোক-গণনাকারিগণ উপস্থিত হন এবং জন্ম ও মৃত্যুর হার নিরূপণের ব্যাপারে ১লা মার্চ্চকেই প্রামাণ্য তারিখ বলিয়া ধরা হইয়াছিল। বড় বড় শহরে লোক গণনার

ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ও তাঁহাদের অফিসগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। আদম-সুমারী গ্রহণ উপলক্ষে বেশ কয়েকমাস ধরিয়া ইহার প্রস্তুতি কার্য্য চলিয়া ছিল। সারা ভারতের জন্য আদম-সুমারীর কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন শ্রী আর.এ. গোপালস্বামী। সুষ্ঠ ভাবে গণনাকার্য্য সমাপ্তি কল্পে সাময়িক ভাবে সারা ভারতের জন্য ছয় লক্ষ গণনাকারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ১৯৫১-এর আদম-সুমারীতে লোক-গণনাকারিগণকে হাত-খরচ হিসাবে সামান্য অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তাহাও দেওয়া হইত না। লোক গণনা ছিল সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ। তাই ১৯৪১ সালে যে আদম-সুমারীর ব্যয় ছিল মাত্র দুই লক্ষ টাকা, ১৯৫১ সালে তাহা বাড়িয়া এগার লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাব মতে প্রতি হাজার নরনারী গণনার পিছনে খরচ হইয়াছে মাত্র ৪৩ টাকা। এত কম খরচে পৃথিবীর আর কোন দেশে আদম-সুমারীর কাজ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা ও বৃটেনের সাম্প্রতিক আদম-সুমারীর ব্যয়ের সঙ্গে ভারতীয় আদম-সুমারীর ব্যয় তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে আমেরিকায় যে আদম-সুমারী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ১৫ কোটি জনসংখ্যার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৯ কোটি ডলার। ইংল্যাণ্ডের ১৯৫১-এর এপ্রিল মাসে যে আদম-সুমারী হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ৫ কোটি জন সংখ্যার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। সেই অনুপাতে ভারতের প্রায় ৩৬ কোটি জনসংখ্যা গণনার জন্য ১১ এগার লক্ষ টাকা ব্যয় অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯৫১ সালের আদম-সুমারী

লোক সংখ্যা:—ভারতের জনসংখ্যা আলোচ্য আদাম-সুমারী হিসাবে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪৮৫ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় এলাকা ধরা হয় নাই। এই হিসাবের সঙ্গে ১৯৪১ সালের হিসাব তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে বৃদ্ধির হার শতকরা ১২.৫ ভাগ; কিন্তু ১৯৩১-৪১ সালে গড় বৃদ্ধির হার ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১৬.৬ ভাগ। জন বসতি প্রতি বর্গ মাইলে ৩১২ জন।

সাম্প্রদায়িক হার:—ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিম্নোক্ত রূপ:—

সম্প্রদায়	মোট সংখ্যা	শতকরা আনুপাতিক হার
হিন্দু—	৩০৩৪০৫৬৭৯	৮৪.৯৯
শিখ—	৬২১৯১৩৪	১.৭৪
জৈন—	১৬১৮৪৬	০.৪৫
বৌদ্ধ—	১৮০৭৬৭	০.০৬
খৃষ্টান—	৮১৫৭৭৬৫	২.৩০
জরথুস্ত্র—	১১১৭৯১	০.০৩
মুসলমান—	৩৫৪০০১১৭	৯.৯৩
ইহুদী—	২৬৭৮১	—
খণ্ডজাতি—	১৬৬১৮৯৭	০.৪৭
খণ্ডজাতি ও ভিন্ন অন্যান্য	৪৭১৪৮	০.০৩

পুরুষ ও নারী:—ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ—১৮৩৩০৫৬৬৪ জন এবং নারী—১৭৩৫২৩৮৩১ জন। আনুপাতিক হারে প্রতি ১০০০ জন পুরুষের স্থলে ৯৪৭ জন স্ত্রীলোক রহিয়াছে।

শহরবাসী ও পল্লীবাসী:—ভারতে ক্রমশ: শহর-মুখীনতা দেখা যাইতেছে। ১৯৫১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে,—বর্ত্তমান মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ নরনারী অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লক্ষ লোক শহরে বাস করে। ১৯৪১ সালের হিসাবে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ মোট শতকরা ১৪ ভাগ। ভারতে মোট শহরের সংখ্যা ৩০১৮। উহাদের মধ্যে ৭৫টি বৃহৎ নগরী। এই ৭৫টি বড় শহরের মিলিত লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতে মোট পল্লীবাসীর সংখ্যা ২৯৫০০৪২৭১ জন, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ জন পল্লীতে বাস করে। ভারতে মোট পল্লীবাসীর সংখ্যা ৫,৫৮০৮৯ জন।

জীবিকা:—(১) প্রায় ২৪, ৯১, ২২, ৪৪৯, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল।

(ক) জমি আছে এমন চাষী—	১৬,৭৩,৪৬,৫০১
(খ) জমি নাই এমন চাষী—	৩,১৬,৩৯,৭১৯
(গ) কৃষি মজুর—	৪,৪৮,৮১,৯২৩
(ঘ) চাষ করে না এমন জমির মালিক—	৫৩,২৪,৩০১
(২) অকৃষক লোকসংখ্যা হইতেছে—	১০,৭৫,৭১,৯৪০
(ক) কৃষি ব্যতীত অন্য উৎপাদনে নিযুক্ত—	৩,৭৬,৬০,১৯৭
(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য—	২,১৩,০৮,৮৭১
(গ) যানবাহন—	৫৬,২০,১১৮
(ঘ) অন্যান্য কাজে ও বিবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত—	৪,২৯,৮২,৭৪৫

জন্ম-মৃত্যু:—১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে ভারতে জন্মের হার গড়ে হাজার করা ৪০ ও মৃত্যুর হার গড়ে হাজার করা ২৭ জন ছিল।

ভারতের ভূমি:—ভারতের মোট ভূমি এলাকার পরিমাণ ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৩৬ ভাগ চাষাবাদ-যোগ্য। উহাকে একর হিসাবে ধরিলে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৮৪,২৮,৯৬৪ একর। ভারতে মাথাপিছু ০.৭৫ একর চাষের জমি আছে। মোট চাষের জমির শতকরা ২৬ ভাগ ধান ও ১১.৮ ভাগে গম উৎপন্ন হয়। ভারতে শতকরা ১১.৪ ভাগ জমি বনভূমি।

এবার ভারতে আদম-সুমারী আরম্ভ হইবে আগামী ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছু অংশ থেকে ১৯৬১ সালের ১লা মার্চ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, এ হলো প্রথম পর্য্যায় এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়টি আরম্ভ হইবে ১৯৬১ সালের ১লা মার্চের সূর্য্যোদয় হইতে ১৯৬১ সালের ৩রা মার্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ৩রা মার্চ শেষ হইবে। আদম সুমারীর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইবে মার্চ মাসের দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে। অতএব ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ আদম-সুমারী, লোকগণনা (সেন্সাস) যাহাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য জনসাধারণের সহৃদয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে সুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় ব'লে ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!

রেডিও
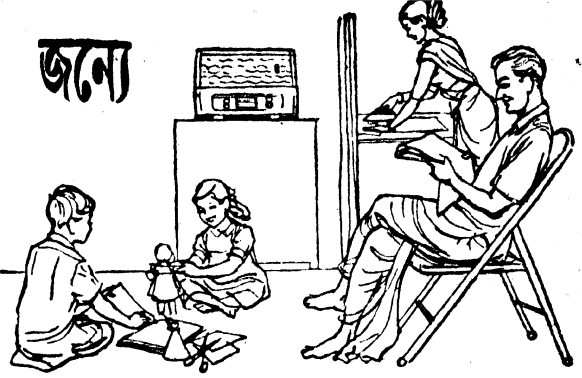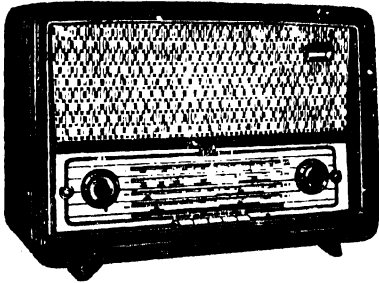
ন্যাশনাল-একো মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভালব, ৯ ফাংশান, ৪ ব্যাণ্ড এসি রেডিও, মনোরম মোল্ডেড কেবিনেট, পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশান, টেপ রেকর্ডারের বিশেষ ব্যবস্থা। 'মনস্থনাইজ্‌ড'।
দাম ৪১৫৲ নীট
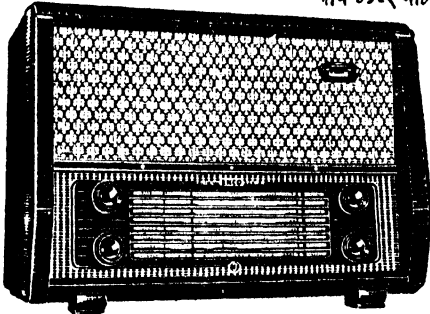
ন্যাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি : 'নিউ প্রমুথ' ৭ ভালভ; ৮ ব্যাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি অসামান্য। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর-এফ- স্টেজ সংযুক্ত, এছাড়া এক্সটেনশন স্পীকার ও গ্রামোফোন পিক্‌-আপের বন্দোবস্ত আছে। 'মনস্থনাইজড'
দাম ৬২৫৲ নীট

ক্লীয়ারটোন বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে গরম বা স্টস্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩,৫ ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।
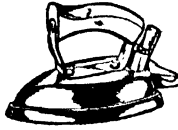
ক্লীয়ারটোন ঘরোয়া ইস্ত্রি
ওজন ৭ পাউণ্ড; ২৩০ ভোল্ট, ৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি। ব্যাকালাইটের হাতল।
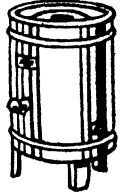
ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ
দুটো হট্‌প্লেট ও উনুন আছে—প্রত্যেকের আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড ৫,৫০০ ওয়াট।

ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেট্‌লি
৩ পাইট জল ধরে; ক্রোমিয়ম কলাই করা। ২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।
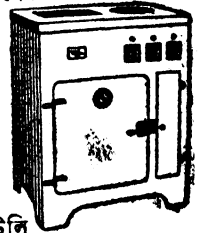
ক্লীয়ারটোন টুইন্‌ হট্‌ প্লেট
রান্নার জন্যে। প্রতি প্লেটের আলাদা কন্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি। সর্বোচ্চ লোড ৩,৫০০ ওয়াট।

ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং স্টীল চেয়ার ও টেবিল
নানা রঙের পাওয়া যায়। আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী। গদি মোড়া কিংবা গদি ছাড়া পাওয়া যায়।

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১।১৮, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২ • ফ্রেজার রোড, পাটনা • ৩৬।৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • যোগধিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ

JWTGRA 311

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বর চণ্ডালের বাড়ী

যজ্ঞেশ্বর, পত্নী—দীনতারিণী

দীনতারিণী। বেই কি বললে ?

যজ্ঞেশ্বর। একটু রাগ করেছে বোধহয়।

দীনতারিণী। তা আমাদের দোষটা কনে ;

যজ্ঞেশ্বর। কি জানি কি ভাবলে সেই জানে। বললাম এ বেলাডা থেকে যাও, তা অলেজ্য কথা কিছু বলেনি, বললে কি করে থাকি দাদা, ধান কাটা আরম্ভ হয়েছে। মোদেরই যেন সব গেছে। আর সবার তো আর তা লয়।

দীনতারিণী। তা তুমি একটিবার ক্ষেতখামারের দিকি গেলে না ?

যজ্ঞেশ্বর। আর ক্ষেতখামার। তুমি তো আর উঠে বসোনি তাই তোমারে আর বলিনি। সে সব আর কিছু লেই—যার ক্ষেত-খামার তানার সঙ্গে সঙ্গেই সব গেছে।

দীনতারিণী। সব গেছে কি গো ? তোমরাই তো বলা কওয়া করতে এবারে ভাল ফলন ফলবে ?

যজ্ঞেশ্বর। মনে তো হয়েল তাই। তখন তো আর কপালে আগুন লাগেনি। বিষ্টু চলে যাবার দিন পাঁচেক পরে দিন ছুই পূবে য়াব করলো মনে পড়ে ?

দীনতারিণী। তা হবে, আমার কিছু মনে নেই।

যজ্ঞেশ্বর। সেই বাতাসে সব ফসল একেবারে মাটিতে শুয়ে প'ল আমি তো আর তখন কিছু দেখিনি দিন আষ্টেক আগে নীলমণি এসে বললে জেঠা, একবার মাঠখানা দেখে এস। গিয়ে দেখি যব ' গাছ সব মাটির উপর লুটুচ্ছে, বিষ্টু যেমন করে শুয়েছিল তারাও যেন বিষ্টুর শোকে তেমন করে ধরাসনে পড়ে রয়েছে। কপালে একটি চড় মেরে বললাম, ভগবান যারে মারে তারে কি এমন করেই মারে।

দীনতারিণী। সবারই এই রকম হয়েছে না শুধু মোদের ক্ষেতে ?

যজ্ঞেশ্বর। অল্প বিস্তোর গিয়েছে সবার তবে তারা আধাআধি আন্দাজ পাবে, মোরা আর কিছুই পাব না। মোদের পরে বিধি বৈরী। নইলে জলজ্যান্ত সা যোয়ান বেটা এমনি করে চলে যায়।

দীনতারিণী। হ্যাঁ গা, তা কি হবে ? তাহলি।

যজ্ঞেশ্বর। ভেবে আর কি হবে বল ? না হয় কখনো যা করিনি, তাই করবো, বুড়ো বয়সে ভিক্ষে মেগে খাবো। জীব দিয়েছেন যে.তার খাবার ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

দীনতারিণী। হ্যাঁ যাদের জন্যি ভাবনা তাদের তো নিয়ে গেল, মোরা খাই আর না খাই—কি আর হবে।

যজ্ঞেশ্বর। বৌটোর বোধহয় যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না।

দীনতারিণী। পেরথম পেরথম বলতো 'মা আমি যাবনি।' ছাওয়ালডারে নিয়ে তোমাদের এইখেনে থাকবো, বুড়ো বয়সে তোমাদের কম্ম করবো ! বাপটার দেখে ঢুকরে কাঁদতি লাগল।

যজ্ঞেশ্বর। আমি দু একবার বললি হয়তো থাকতো, তা কি ভরসায় থাকতি বলবো। ঘরে দুটো ধানও থাকবেনা যে দুবেলা দুটো ভাত খাতি দেব, হা রে ভগবান !

দীনতারিণী। দুত্তোর ভগবান। ভগবান সব করবে, তুমি ব্যাওরাখানা কি আমায় বলতি পার ? সত্যি কেউ ভগবান আছে, না এমনিই লোকে বলে।

যজ্ঞেশ্বর। আমাদের এক সন্নেসি ঠাকুর, বিষ্টুকে যেদিন শ্মশানঘাটে পোড়াতে যাই সেদিন বলিছিল মা আছে—মা—

দীনতারিণী। তুমুও যেমন, ঐ সব মুকেই বলে—

যজ্ঞেশ্বর। এত লোক সব্বাই কি আর মিথ্যে কথা বলে। মোদের কম্মফল হয়তো আর জম্মে কার ছেলে মেরে ফেলেছি, হয় আমার কম্ম, নয় তোমার কম্ম, কি যেই ছেলে তার কম্ম। তারই বা হিসেব রাখছে কেডা ? কি করেছি কি করেই বা জানবো।

দীনতারিণী। কি যে করি কাজে তেমন মন লাগেনা, পরাণডার ভেতর যেন পুড়ে যাচ্ছে। কার জন্যেই বা কাজ। ছেলেমেয়ের লেগেই ঘর—সে-ই যখন গেল তখন আর টাকা কি হবে, বেই ওদের নিয়ে গিয়েছে ভালই করেছে।

(বৈরাগীর প্রবেশ ও গান)

ওরে মন, তোমার অন্য ভাবনা অকারণ
সর্ব্ব দুঃখ শঙ্কা হরণ
ভাবনা করো কালোবরণ।

(তোমার) ঘরে আঁধার নয়ন-ঢাকা
সর্ব্ব অঙ্গে কালিমাখা
(আর) কিসের তরে জীবন রাখা
কর কালিদহে অবতরণ।

দুই কালের কথা শুনি বেদে পুরাণে
কথ গাঁথা পরাণে সকলে জানে
কালো রূপে ব্রজের কালো মজাল গোকুল
ব্রজগোপীর রইল না কুল ভাসলো দুকূল
(ডুবলো) অকূল জলে জীবন মরণ।

আর কালীরূপ উদয় হল রক্তবীজ বধে
বাম করে অসি ধরা
অসিতবরণা তারা
কোটি অসুরের মুণ্ড মায়ের পদ-কোকনদে
ভাসে রুধিরহ্রদে
(তখন) ত্রিলোচন ধন্য হলেন
হৃদে ধরে শ্রীচরণ।

যজ্ঞেশ্বর। বাবা, তুমি দেবতা।

বৈরাগী। না বাবা আমি তোমারই মতন, একদিন তোমারই মত জ্বালায় জ্বলেছি।

দীনতারিণী। জ্বালার কোন ওষুধ আছে বাবা ?

বৈরাগী। ওই তো বললাম মা, "কর কালিদহে অবতরণ" কালি যখন মেখেছ মা, আর ভয় কি। অত বড় বেটা যখন যমের হাতে তুলে দিয়েছ, আর তো তোমার যমের ভয় নেই।

দীনতারিণী। যমের ভয় আর করিনে বাবা!

বৈরাগী। পনের আনা ভয় তো মানুষের ওইখানেই, দুঃখু পাক, কষ্ট পাক্, রোগে ভুগুক্, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, হাজার কষ্ট পেয়েও মানুষ বেঁচে থাকতেই চায়। মরতে চায় না। তোমার ছেলেকে তুমি ভালবাসতে—সে যেখানে গেছে, সেখানে যেতে তোমার ভয় নেই।

দীনতারিণী। আমায় নিয়ে যাচ্ছে কই বাবা ?

বৈরাগী। ঠিক নিয়ে যাবে মা, সময় হলেই এসে বলবে চল। আর দেরী করো না।

দীনতারিণী। তত দিন কি নিয়ে থাকি।

যজ্ঞেশ্বর। বুড়ীটে দিন-রাত কাঁদে, বেই এসেছেল নাতিটে আর বৌটারে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল, ক্ষেতের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেল।

বৈরাগী। তোমাদের খুব বরাত বাবা, একসঙ্গে এত সুবিধে হয় না। মায়ের নাম কর বাবা, মায়ের নাম কর। তোমাদের উপর মায়ের খুব দয়া।

দীনতারিণী। ছেলে ম'ল, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হ'ল, এতে আমাদের সুবিধে হ'ল।

বৈরাগী। ঠিক তাই মা, তোমার ছেলে যখন ছোট ছিল, তুমি কি করতে ? খেলনা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতে, যতক্ষণ ভুলে থাকে, মা পাঁচ কাজে ব্যস্ত থাকেন, তার পর ছেলে যখন মা-মা বলে কাঁদে, মা তখন ছুটে এসে ছেলে কোলে নেন্।

যজ্ঞেশ্বর। ওরে বুড়ি চল না, এক কাজ করি; বাবাঠাকুরের সঙ্গে দুজনে মায়ের নাম করে বেরিয়ে পড়ি—নিয়ে যাবা আমাদের ? আর কিসের মায়া—কিসেরই বা ঘর-সংসার ? চল যাই।

বৈরাগী। বেশ তো, চল না।

যজ্ঞেশ্বর। তোমার আপত্তি নেই তো বাবা ?

বৈরাগী। আপত্তি করবো কেন ? তোমরা তো আর আমার ঘাড়ে চড়ে যাবে না। আমিও চলবো, তোমরাও চলবে।

যজ্ঞেশ্বর। চল যাই, বাবাঠাকুরের মত ভিক্ষে করতি করতি যাব।

বৈরাগী। সে যখন যাও, তখন যাবে। আজ আমায় দু মুঠো চাল ভিক্ষে দাও, অন্য কোথাও জুটলো না।

যজ্ঞেশ্বর। সে কি বাবাঠাকুর, তুমি সাধুপুরুষ, এমন খাসা গান গাইতে পার, তোমায় কেউ ভিক্ষে দিলে না ?

বৈরাগী। গাঁয়ের লোকেরা সব এককাট্টা হয়েছে, সবাই বলে আমি নাকি গেরস্তর মন ভাঙাই, ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যাই। রাজার কাছে নালিশ করে ভৈরবঘাটের শ্মশান থেকে আমার আস্তানা তুলে দেবে।

যজ্ঞেশ্বর। আমি একদিন ভৈরবঘাটে তোমার খোঁজে গিয়েছিলাম বাবা, দেখা পাইনি।

বৈরাগী। ভয়ে ভয়ে আছি বাবা। একা গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়, বরাতের ফের দেখ বাবা, ঘর ছেড়ে শ্মশানে বাস করি এখানেও রাজার ভয় দেখায়, দাও বাবা দুটো চাল দাও।

যজ্ঞেশ্বর। হ্যাঁ দিই।

দীনতারিণী। আমি এনে দিচ্ছি তুমি বস। [প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। তাই দেও, বাবাঠাকুরকে হাত করে তোর বুকের আগুনের জ্বলুনি কেটে যাবে। একটা ধোকা লাগছে বাবা—তোমায় বলেই ফেলি। কি বল বাবা।

বৈরাগী। বল।

যজ্ঞেশ্বর। মোদের ঘরের কোন জিনিষ তো কেউ কোনদিন নেয়না বাবা। মোদের থেকে একটু যারা বড় জাতি তারাও মোদের ঘরের জিনিষ নেয়না। তুমি মোদের ঘরে চাল চাইলে এটা কেমন ধারা ব্যাপার হ'ল ?

বৈরাগী। খুব সোজা ব্যাপার। পেটের দায়ে।

(দীনতারিণীর চাল লইয়া প্রবেশ)

এস মা অন্নপূর্ণা, দাও ভিক্ষে দাও—

দীনতারিণী। বেশী চাল ছিলনা বাবা! নিজের পোড়া পেটের পেটের জন্যে দুটি রাখতে হল কিনা ? তোমার হয়তো পেট ভরবে না বাবা—আমার দিতে লজ্জা হচ্ছে বাবা!

বৈরাগী। তুমি যা হাতে করে দেবে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে দাও মা! (ভিক্ষা লওন)

দীনতারিণী। চাঁড়ালের মেয়ে বাবা—কেউ মোদের কাছে কিছু চায়না—মোরাও হাতে করে কখনো কিছু দিইনি। সত্যি বাবাঠাকুর আমার বড্ড আহ্লাদ হচ্ছে। আমার বিষ্টু গেছে। অতবড় ছাওয়াল চলে গেল—আজ এক মাস আমি মাটিতে শুয়ে কাঁদি। এই মাত্তর বেই মিন্‌সে বৌটারে নাতিটারে নিয়ে গেল। ঘর আমার খাঁ খাঁ কচ্ছে, তবু আহ্লাদ হচ্ছে বাবা, এমন আহ্লাদ কখনো হইনি যেদিন বিষ্টুর বে দিয়ে বউ ঘরে তুলি—সেদিনও এমন আহ্লাদ হইনি—যেদিন খোকা হয়েল পাড়ার পাঁচজনকে তেল হলুদ দিয়েলাম সেদিন এত আহ্লাদ হয়নি।

বৈরাগী। তুমি আমায় একদিন রেঁধে খাওয়াবে মা ?

দীনতারিণী। এ্যাঁ তুমি বল কি বাবা ? মোর হাতের রাঁধা ভাত-তরকারি তুমি খাবা বাবাঠাকুর ?

বৈরাগী। পেলে বর্তে যাই বলে খাবা ? কাল তোমার হাতে রান্না খাব—মা! কি খাওয়াবে বল ?

দীনতারিণী। তোমার কি খেতে ভাল লাগে বাবা ?

বৈরাগী। তোমার বিষ্টু যা খেতে ভালবাসতো, তুমি তরকারি রেঁধে রেখ—আমার খুব ভাল লাগবে।

দীনতারিণী। (সজল নয়নে) সে পান্তাভাতের আমানি যে বড় ভালবাসত বাবা।

বৈরাগী। আমিও আমানি খেতে ভালবাসি মা, আমি তোমায় সত্যি কথা বলছি। এখন আমি যাই।

যজ্ঞেশ্বর। উঁহুহু—তুমি যাবা কনে বাবা—বস আমি তোমায় ছাড়ছিনি।

বৈরাগী। ছাড়বিনি তো কি করবি আমায় নিয়ে?

যজ্ঞেশ্বর। মুই তোমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে থাক্‌বো? তোমায় চিনতে পারছি বাবা!

বৈরাগী। বটে!

যজ্ঞেশ্বর। ছল করে ভিকিরী সেজেছ, আমি বুঝতি পারিছি, চল তোমার সঙ্গে যাব আমি, তোমায় ছাড়বো না। (স্ত্রীর প্রতি) যাবি তো আয়।

দীনতারিণী। আচ্ছা, তোমার কি কোন বুদ্ধি-বিবেচনা কোনকালে হবেকনি। একটা মাত্তারের জ্ঞানকথা বল তো শুনতি ইচ্ছে করে, কাল বাবাঠাকুর এখানে পাত পাড়বেন কোথায় দুটো ভাল মন্দ জিনিষ পত্তর যোগাড় করা—তা নয়, বলে কিনা ঘর দোর ছেড়ে বিরাগী হ'ব। বিরাগী হবার তো একটা সময় অসময় আছে গা!

যজ্ঞেশ্বর। তুই বুঝতি পাল্লিনি মাগী, ও ভুলুচ্ছে, আবার পাক দিয়ে দিয়ে বাঁধবে। তুই কি সত্যিই মনে করেছিস, উনি পেটের দায়ে ভিক্ষে করে—খাতি পায় না বলে চাঁড়ালের ম্যায়ের হাতের রান্না খাবে, দূর বোকা মাগী! বুঝতি পারছি তোর ঘর ছাড়তে মায়া হচ্ছে,—

দীনতারিণী। না হয় কাল যাব—বাবাঠাকুরকে সকাল' সকাল খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে দু' জনে ওনার সঙ্গে যাবো!

যজ্ঞেশ্বর। তবেই তুমি গিয়েছ—

বৈরাগী। ছিঃ আমি ভিখিরী মানুষ, পাঁচ দোর ভিক্ষে করে খাই।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি ভিখিরী, তুমি মানুষ, তুমিও বললে মুইও শুনরোয়লাম, ভিখিরী চাঁড়ালের বাড়ী ভিক্ষে করে চাঁড়ালের মেয়েকে মা বলে ডেকে তার হাতের রান্না ভাত খেতে চায়, অমনি বললেই হল? চালাকি কর কার কাছে ঠাকুর! আমার পনের বোল গণ্ডা বয়েস হ'ল, মাথার চুল পাক ধরেছি আমি মানুষ দেখিনি!

(গঙ্গেশ, মহামায়া, তৎপশ্চাৎ মুক্তকেশীর প্রবেশ)

গঙ্গেশ। আমি যাব না দিদি, তুই বাড়ী যা।

বৈরাগী। মহামায়া, তুমি যে এখানে?

মহামায়া। তোমার দেরী দেখে ভাবলাম, তুমি ভিক্ষে পাও না পাও, আমি নিজে ভিক্ষেয় বেরুই।

বৈরাগী। তুমি ভিক্ষে পেয়েছ?

মহামায়া। এখন কারো কাছে যাওয়া হয়নি, পথে এদের সঙ্গে দেখা। এই পাগলা ছেলের পাল্লায় পড়ে এই পর্য্যন্ত আসতে হ'ল।

বৈরাগী। আমি ভিক্ষে পেয়েছি, চল ঘরে যাই।

মহামায়া। তোমার গঙ্গেশ তো রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে, মামার বাড়ীতে আর যাবে না।

বৈরাগী। (গঙ্গেশের প্রতি) তোমার আবার কি হ'ল—তুমি ক্ষেপলে কেন?

গঙ্গেশ। নিজে ক্ষেপিয়ে বেড়াবে আর জিজ্ঞাসা করবে ক্ষেপলে কেন, ক্ষেপলে কেন? যাও তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

মুক্তকেশী। লক্ষী ভাইটি আমার, চল বাড়ী চল।

গঙ্গেশ। না যাব না, আমি এখানে এই বিষ্ট দার মায়ের কাছে থাকবো। ও বিষ্ট দার মা, আমি তোমায় মা বলে ডাকবো, তোমার বাড়ীতে থাকবো ভাত খাব আর তোমার গরু চরাব। তোমাদের গরু আছে?

মুক্তকেশী। হ্যাঁরে তুই বলিস কি, চাঁড়ালের ভাত খাবি, গরু চরাবি? ও মা আমার কি হবে?

গঙ্গেশ। ও মা তোমার কিছু হবে না। তুমি থাম—ও বিষ্ট দার মা, ভাত থাকে তো ভাত বাড়, আর ভাত না থাকে তো ভাত চড়াও।

দীনতারিণী। (যজ্ঞেশ্বরের প্রতি) হ্যাগা, এসব কি—এই ব্রাহ্মণের ছাওয়াল বলে কি—আর এঁরাই বা কানারা।

যজ্ঞেশ্বর। ভোজবাজি রে মাগী ভোজবাজি, বাজিকর বাজি দেখাচ্ছে। তুমি বস না এখানে।

গঙ্গেশ। (দীনতারিণীর প্রতি) যাও মা যাও, আমার ক্ষিদে লেগেছে আমি কিছু খাইনি, বাড়ীতে রাগ করে ভাত ফেলে এসেছি।

বৈরাগী। কার উপর রাগ করলে সোনার চাঁদ?

গঙ্গেশ। সব্বার উপর।

বৈরাগী। মামা-মামীর উপর রাগ হল কেন?

গঙ্গেশ। (মুক্তকেশীর প্রতি) বলি, তোমার মা বাবার-গুণ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিই।

মুক্তকেশী। তা ভাঙবে বৈ কি। নইলে আর কলিকল বলবে কেন? মা ছেলের মতন করে মানুষ করলে, বাবা বাপের মতন ভালবাসেন, কত যত্ন করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন—তাঁদের নিন্দে না করলে আর বাহাদুরী হবে কি করে?

গঙ্গেশ। তুই কিছু জানিসনে। মামা কাল রাত্রে মামীকে বলে, গঙ্গেশকে ভাত দিতে পারবে না ভাত চায় ছাই খেতে দেবে, মামীর তত দোষ নেই মামী দিতে চায় নি। মামা-মামীতে ঝগড়া হয়েছিল, আর তুই বলছিস মামা কিছু জানে না, উনুনের ছাই ভাতে উড়ে পড়েছে।

মুক্তকেশী। তাই বলে তুই এইভাবে মা-বাবার মাথা হেঁট করবি?

গঙ্গেশ। কেন করবো না—আমায় ছাই খেতে দেয় কেন? তুমিই বল না বিষ্টু দার মা, মানুষকে কেউ ছাই খেতে দেয়, আর কে ছাই খায় বলতো—ছাই খাবার।

দীনতারিণী। আহা বাছা আমার। যাও বাবা দিদির সঙ্গে বাড়ীতে যাও, আমার ঘরের কিচ্ছুটি যে তোমায় দেবার যো নেই বাবা!

মুক্তকেশী। চল্ বাড়ী চল্—

গঙ্গেশ। (মহামায়া) আচ্ছা মা, তুমিই বল দেখি আমার রাগ হয় না?

মহামায়া। ঠিকই তো—রাগ হবার কথা। যাক্ এখন রাগ পড়ে গেছে তো?

গঙ্গেশ। (মাথা নাড়িয়া) না, সত্যি সত্যি যে থালার এক কোণে এক মুঠো ছাই দিয়েছিল।

মুক্তকেশী। তুই তিন দিন টোলে যাসনি, পড়া মুখস্থ করিসনি, বাবার রাগ হয় না?

গঙ্গেশ। রাগ হয়েছে বলে অমনি ছাই খেতে দেবে না কি?

আমারও রাগ হয়েছে, আমি বিষ্টু দার মায়ের কাছে থাকবো, ওদের ভাত খাব। এই বললাম এইখেনে?

(প্রতিবাসী নীলমণির প্রবেশ)

নীলমণি। ও জেঠা—জেঠা, (লোকজন দেখিয়া) ও বাবা, তোমার বাড়ীতে এত লোকজন কেন, জেঠীর ভালমন্দ কিছু হয়েছে নাকি?

দীনতারিণী। না রে বাবা, তোর জেঠি ঠিক আছে।

যজ্ঞেশ্বর। কি রে নীলু—

নীলমণি। (জনান্তিকে) এই দিকে এস এইখানে। মহারাজ তোমার বাড়ীর খোঁজ করছিল? আমি ওই ধারে করিয়ে রেখে এয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। মহারাজ আবার কেডা রে?

নীলমণি। রাজা, রাজা, মহারাজা—সেই সভা করে খুব উঁচু সোনার জলচৌকির উপর বসে—রোজ খীর-খন্তি খায়, পায়েস খায়, আসকে পিঠে খায়—সঙ্গে পেয়াদা পাইক, পেটমোটা বামন থাকে, লোকে তানারে খুব ভয় করে সেই রাজা—তুমি পালাও তো পালাও, মুই বলে আসি জেঠা বাড়ী নেই।

যজ্ঞেশ্বর। মুই পালাব কেন? তুই মহারাজারে ডেকে নিয়ে আয় [নীলমণির প্রস্থান। ও বিষ্টুর মা।

দীনতারিণী। কি গা।

যজ্ঞেশ্বর। আবার মহারাজা আসে যে—

দীনতারিণী। শুনতিছি তো।

যজ্ঞেশ্বর। কেন বুঝতি পারিছিস্—

দীনতারিণী। না।

যজ্ঞেশ্বর। ঠিক এসে বলবে। বিষ্টুর মার হাতের রান্না খাব। তুই দেখে নিস্।

(নীলমণির সঙ্গে একদিক দিয়া রাজা কমলাকান্তের প্রবেশ, হাসিতে হাসিতে অন্য দিক দিয়া বৈরাগী ও মহামায়ার প্রস্থান)

রাজা কমলাকান্ত। এটা কার বাড়ী?

যজ্ঞেশ্বর। আমার মহারাজ?

রাজা কমলাকান্ত। (গঙ্গেশ ও মুক্তকেশীকে দেখিতে পাইয়া) এ কি, তোমরা এখানে কেন? তুমি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মহাশয়ের ভাগিনেয়—আর তুমি তাঁর মেয়ে তো?

গঙ্গেশ। আমি গঙ্গেশ।

কমলাকান্ত। তোমরা সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলে-মেয়ে, তোমরা চণ্ডালের বাড়ীতে কেন? (স্বগতঃ) মহামায়া যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাই বুঝি সত্য হতে চললো, বুঝি কলুর কলুষে সব একাকার হয়।

গঙ্গেশ। আমি বিষ্টু দার মাকে মা বলেছি, আমি এখানে থাক্‌ব, খাব।

কমলাকান্ত। কি সর্ব্বনাশ, তোমার অন্নবিচার নেই?

গঙ্গেশ। না নেই। আমি তো আর পণ্ডিত নই—আমি মুখ্যু।

কমলাকান্ত। ব্রাহ্মণের সন্তান তো? অমন মামার ভাগিনেয়, এরকম রুচি কেন?

গণেশ। আমি মামার মত হব না বাবার মত হব, আমি শুনেছি আমার বাবা যেখানে সেখানে থাকতেন যার তার বাড়ীতে খেতেন।

মুক্তকেশী। ও রাগ করে এসেছে মহারাজ!

কমলাকান্ত। আমি তা বুঝতে পেরেছি—যাও বাড়ী যাও।

গঙ্গেশ। না, আপনি না হয় সে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না-ই দেবেন। না হয় বড়জোর ভুতনাথদার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। হকুগে আমার কিছু এসে যায় না।

কমলাকান্ত। (যজ্ঞেশ্বরের প্রতি) বাড়ীর মালিক তুমি?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!

কমলাকান্ত। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেকে ভাত খেতে দেবে?

যজ্ঞেশ্বর। আমার নিজের খাওয়াই জোটে না, আমি ওকে খাওয়াব!

কমলাকান্ত। তবে ও তোমার বাড়ীতে আসে কেন? কেমন করে?

যজ্ঞেশ্বর। আপনি এসে আমার গর্দ্দান নেবার হুকুম দেবেন বলে আর কেন? আজ সকাল থেকে এই চলছে মহারাজ, একজন সন্নিসী এসে বললেন, বড় খিদে, হয় খেতে দাও, নয় চাল দাও।

কমলাকান্ত। সন্ন্যাসী তোমার বাড়ীতে খেতে চেয়েছে?

যজ্ঞেশ্বর। আমি তো মনে করেছিলাম আপনি এসে বলবেন "বড় খিদে"

কমলাকান্ত। সন্ন্যাসী কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর। এস বাবাঠাকুর, কথা বল,—

কমলাকান্ত। কে তোমার বাবাঠাকুর?

যজ্ঞেশ্বর। তাইতো মহারাজ, এইতো ছিল, তাহলে অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।

কমলাকান্ত। কেউ বাইরে খোঁজ নাও তো?

যজ্ঞেশ্বর। সে আর খোঁজ নিতে হবে না, মহারাজ, সে হাওয়ায় মিশে গেছে।

কমলাকান্ত। হাওয়ায় মিশে গেছে কি?

যজ্ঞেশ্বর। হুঁ সে পারে, যা তো বাবা নীলু—বাইরেটা একবার দেখে আয়—[নীলমণির প্রস্থান। তাকে আর পাওয়া যাবে না।

কমলাকান্ত। পাওয়া যাবে না?

গঙ্গেশ। আমি যাই।

কমলাকান্ত। তুমি কোথায় যাও?

গঙ্গেশ। সে আমার আপনার আর কেউ আপনার নয়।

কমলাকান্ত। সে তো ভৈরবঘাটের শ্মশানে থাকে।

গঙ্গেশ। সেখানে তাকে এক দিন দেখেছিলাম, আর দেখিনি, কোথায় থাকে কেউ জানে না।

(নীলমণির প্রবেশ)

কমলাকান্ত। দেখা পেলে?

নীলমণি। না মহারাজ—বাহিরে আপনার কত লোকজন রয়েছেন, তারা কেউ দেখেনি।

কমলাকান্ত। তোমাদের ছেলে মারা গেছে? (যজ্ঞেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়িল) বেশ জোয়ান ছেলে।

যজ্ঞেশ্বর। আর ও কথা মনে করিয়ে দেবেন না।

কমলাকান্ত। তোমার ক্ষেতের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেছে, শুনলাম।

যজ্ঞেশ্বর। কিছু নেই।

কমলাকান্ত। নীলমণি—বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, তার ভিতর যিনি সবচেয়ে বুড়ো তাঁকে ডেকে আন—বল আমি ডাকছি—

নীলমণি। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। রাজামশায়, (সভয়ে) আমার কোন দোষ নেই, আমার উপর রাগ করবেন না। এরা নিজেরা আমার বাড়ীতে আসে, আমি তো কাউকে আসতে বলিনি।

কমলাকান্ত। চুপ কর—কথা বলো না।

(নীলমণি ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রীমশায়, এই লোকটিকে আমি একশো বিঘে জমি নিষ্কর দান করেছি, এর নাম যজ্ঞেশ্বর—আজই একে জমি দেখিয়ে দেবেন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

কমলাকান্ত। আপনার কাছে নগদ টাকা কত আছে?

মন্ত্রী। এই একতোড়া মোহর আছে।

কমলাকান্ত। (যজ্ঞেশ্বরকে তোড়া দিয়া) এই নাও, তোমায় একশো বিঘে জমি নিষ্কর দিচ্ছি, একশো বিঘে জমি চাষ করা সোজা কথা নয়, তোমার ছেলে নেই লোকবল নেই। এতে হাজার এক মোহর আছে। এই দিয়ে তুমি বাড়ী-ঘর কর, চাষে খরচ কর।

যজ্ঞেশ্বর। এসব আপনি আমায় দেচ্ছ কেন?

কমলাকান্ত। তোমরা বৃদ্ধ বয়সে ছেলে হারিয়েছ, আমি তোমাদের রাজা, তোমার ছেলের কাজ আমাকেই করতে হবে। যখন যা অভাব অনটন হবে আমায় জানাবে। নীলমণি, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। শোন যজ্ঞেশ্বর,—

যজ্ঞেশ্বর। বলুন, মহারাজ!

কমলাকান্ত। ভৈরবঘাটের বৈরাগীকে আমাকে একবার দেখাতে পারো?

দীনতারিণী। কাল তো তিনি এখানে আসবে, আপনিও এস—দেখা হয়ে যাবে।

যজ্ঞেশ্বর। অত সোজা লয় রে মাগী। হয়তো স্বপন দেখাবে। বেলতলায় আমার খাবার ঢেলে দিবি।

কমলাকান্ত। তুমি কি বলছো?

যজ্ঞেশ্বর। মহারাজ, ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব?

কমলাকান্ত। নির্ভয়ে বল।

যজ্ঞেশ্বর। সে বৈরাগী সেজে এসেছিল, বৈরাগী লয়।

কমলাকান্ত। তবে সে কি? বহুরূপী?

যজ্ঞেশ্বর। মুই অবিশ্যি কোন রূপ ধরতি দেখিনি, তবে আপনি তো জান, জ্ঞানা লোকেরা বলেন যেই শিব সেই কেষ্ট সেই কালী।

কমলাকান্ত। তুমি শিব, রাম, কৃষ্ণকালীর কথা কি বলছো?

যজ্ঞেশ্বর। তা জানিনা মহারাজ, তবে ভৈরবঘাটের সন্নিসী আপনি যারে মনে কচ্ছ, তিনি মানুষ লা তিনি মহাদেব।

কমলাকান্ত। তিনি মহাদেব?

(যজ্ঞেশ্বর মাথা নাড়িল, রাজা মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া অনিচ্ছার হাসি হাসিলেন।) আচ্ছা চলুন— [সকলের প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর। দিলে সব গণ্ডগোল করে।

দীনতারিণী। তাইতো গা, এ যে ভেল্কাই দেখালে।

যজ্ঞেশ্বর। ভেবেছিলাম—বাবাঠাকুরের সঙ্গে বিবাগী হয়ে বেরুব। এখন ল্যাও ঠ্যালা? হাজার এক মোহর আর একশ বিঘে জমি, কেন ঠাকুরকে দুমুটো চাল দিতে গেলে?

দীনতারিণী। তুমি কি ভাবছো বাবাঠাকুর আর আসবে না? আমি বলছি কাল সে নিশ্চয় আসবে।

যজ্ঞেশ্বর। আমি ভাবছি, কাল যদি আসে, আর তোমার হাতের ভাত খায়, রাজামশায়ের রাজ্যি হয়তো থাকবে না।

দীনতারিণী। কেন রাজার রাজ্যি থাকবে না কেন?

যজ্ঞেশ্বর। মোদের হয়তো এই বুড়ো বয়সে রাজা রাণী করে দেবে। কিছু বলা যায় না, কিছু বলা যায় না। আমি কাল এলে বলবো "বাবাঠাকুর দোহাই তোমার, তুমি ভাত খেও না পারো তো চাল দুমুটো ফিরিয়ে দাও" একশো বিঘে জমি আর হাজার মোহর দেখাচ্ছে আমার এই বয়সে, মোহর আর জমি নিয়ে যমের বাড়া যাব আর কি?

বিষ্কম্ভক, গায়িকা

তুমি হাস-কাঁদ বারে বারে
আলো দেখে খুসী হলে
মূর্চ্ছা গেলে ঘোর আঁধারে।
কার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ
ভেবেও তুমি ভাবলে না রে॥
মাথার উপর একবার দেখ চক্ষু চেয়ে
পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ নীলাকাশ ছেয়ে
কত পথে কত
ছোটে অবিরত
ঘোরে কার চারিধারে
রাজা, প্রজা, ছোট, বড় উঁচু নীচ
কেন ভেদাভেদ, বুঝেছ কি কিছু,
সেই বাজাকরের মেয়ে
নাচে ধেয়ে ধেয়ে
কত আসে যায় পলকে মিলায়
সাগর শুকায়ে নদ নদী ধায়
করুণা ঝরে শতধারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ

রাত্রি—এক প্রহর গত

ভবদেব, ভূতনাথ, কাশীনাথ।

ভবদেব। মহারাজ স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চণ্ডালের বাড়ীতে গিয়ে ভূমি-স্বর্ণ দান করলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এর মধ্যে যেন কোন রহস্য আছে। মহারাজ শাস্ত্রজ্ঞ, এরূপ তামসিক দানের উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা তোমরা নিদ্রা যাও গঙ্গেশের দিকে একটু দৃষ্টি রেখ।

(ভূতনাথ, কাশীনাথ আচার্য্যের পাদবন্দনা করিলেন)

মা জগদম্বা রক্ষা করুন। (ভূতনাথ কাশীনাথ ভিতরের দিকে গেলেন)

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। তুমি এইমাত্র বাড়ীতে এলে?

ভবদেব। হ্যাঁ, দ্রব্যাদি সব বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছ তো?
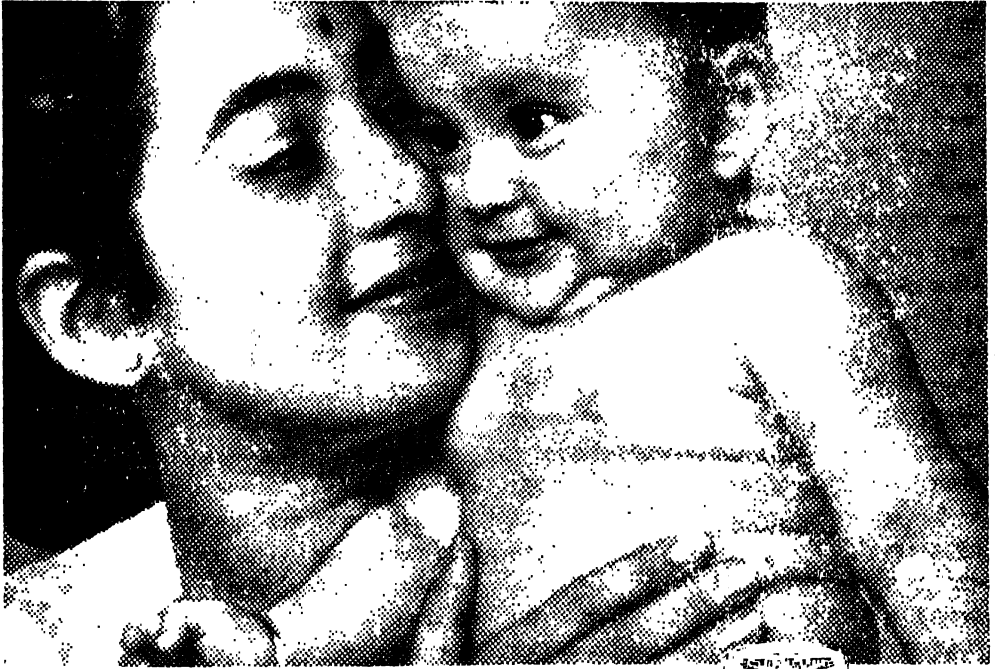
অপর্ণা। আজ কি কাণ্ড হয়ে গেছে শুনেছ ?

ভবদেব। হ্যাঁ, ও পাড়ার বিদ্যাবাগীশ খুড়োর সঙ্গে পথে দেখা, তাঁর কাছে কিছু কিছু শুনেছি।

অপর্ণা। তুমি কাল রাত্রে আমাকে দিব্যি দিয়ে গেলে, আমি আর কি করি ভাতের থালার এক পাশে একটু ছাই রেখে দিয়েছিলাম। ও তো বুদ্ধিমান ছেলে, বুঝতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল।

ভবদেব। ব্রাহ্মণী, আমি স্বীকার করছি আমারই অন্যায়, আমি ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়েছিলাম, মূর্খ হয়ে আছে, পাঁচজনে পাঁচরকম অনাচার অত্যাচারের কথা আমার কানে তোলে। বড় অন্যায় করেছি।

অপর্ণা। সমস্ত দিন কেঁদে আর বাঁচি না। পেটে ধরিনি বটে, তবুও আমার পেটের ছেলের চেয়ে কম নয়। মা হয়ে আমি এ কি করলাম ?

ভবদেব। যাক্, যাক্, আর ও-কথা চিন্তা করো না। চল বাড়ীর ভিতরে যাই।

অপর্ণা। গঙ্গেশকে ওদের এখানে শুতে দিতে আমার ইচ্ছে ছিল না। কি জানি, আবার যদি একা কোথাও চলে যায়—

ভবদেব। না, যাবে না। আমি ভূতনাথ, কাশীনাথকে গঙ্গেশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছি।

অপর্ণা। যখন ফিরে এল, আর যেন সে ছেলে নয়—আমার মুখের দিকে চাইতে পারে না। কেবলই কাঁদে, খেতে পারে না। ভাতের উপর চোখের জল পড়তে লাগলো, এখন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভবদেব। তাহলে বোধ হয় অনুতপ্ত হয়েছে। কিছু বলেছিল ?

অপর্ণা। একটি কথাও বলেনি, যে ছেলে কেবল কথা বলে সে একেবারে চুপ ! যতক্ষণ জেগেছিল কেবল গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

ভবদেব। দেখা যাক্ এর পর থেকে যদি ওর কোন পরিবর্ত্তন হয়।

অপর্ণা। পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেন যে তুমি দিব্যি দিলে, আমারই বা কেন দুর্বুদ্ধি হ'ল—মনে কেবলই কু গাইছে, তুমি একবার গঙ্গেশকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বল—

ভবদেব। তুমি অত ভেবো না, একটু শাসন করাও তো দরকার। অন্য রকমে শাসন করলেই হ'ত। পরিবর্ত্তন যদি ওর হয় একটু যদি পড়াশোনায় মন দিতে পারে, ও যে রকম বুদ্ধি ও আমার নাম রাখতে পারবে। কাল সকালে উঠে আমি ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মিষ্টি কথা বলবো। আজ রাতে আর আহারাদি করবো না—আজ অমাবস্যার রাত্রি, বড় পরিশ্রান্ত আছি। এখনই ঘুমুবো। চল বাড়ীর ভিতর চল।

অপর্ণা। তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একবার নিজে দেখে আসি গঙ্গেশ ঘুমুচ্ছে কিনা।

ভবদেব। আচ্ছা যাও যাও, নিজের চোখে দেখে এস। (যন্ত্রসঙ্গীত) (অপর্ণা ঘরের ভিতর গেলেন) বুঝতে পেরেছি তোমার প্রাণে আঘাত লেগেছে। আমারই অন্যায়—আমি অতটা বুঝিনি, ওই তো গঙ্গেশ ঘুমুচ্ছে, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চলে এস। (অপর্ণার পুনঃপ্রবেশ) ঘুমুচ্ছে তো ?

অপর্ণা। হ্যাঁ ঘুমুচ্ছে, তবে এখনো সে কান্নার ভাবটা যায়নি। ঘুমের ঘোরে কার সঙ্গে যেন কথা কচ্ছে, কি বলছে বুঝলাম না—শুধু মা কথাটা কানে গেল।

ভবদেব। যে মা ওর দিকে ফিরেও চাইলে না, একা ফেলে চলে গেল ও আজ তার কথা মনে করে রেখেছে। আর যে ছোটবেলা থেকে বুকে করে মানুষ করলে—তার কথা একটিবারও ভাবে না—হায় রে সংসার, চল।

অপর্ণা। অমন কথা বলো না—আমার কথা খুব শোনে, তোমার উপর রাগ করে আমি দুদিন গঙ্গেশের সঙ্গে কথা কইনি, তাতেই এত দুঃখ, লেখাপড়া করুক, না করুক আমায় খুব ভক্তি করে। [উভয়ের প্রস্থান।

(যন্ত্রসঙ্গীত অতি করুণ রহস্যময় সুরের মূর্চ্ছনা—মধ্য রাত্রিতে যখন ধরণী সুপ্ত—সেই সময় ব্যথিত ধরণীর বুকে অনাদিকাল হইতে যে বিষাদ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই সুনিবিড় করুণ অভিব্যক্তি, যে বেদনার শুধু সুর আছে ভাষা নেই। ঘরের ভিতর গঙ্গেশের ঘুম ভাঙ্গিল সে শয্যা ছাড়িয়া অতি ধীরে বাহিরে আসিল—তারপর এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, তাকে যেন নিশিতে ডাকিয়াছে। একমনে কি শুনিতে লাগিল।)

(অর্দ্ধঘুমন্ত কাশীনাথ এবং ভূতনাথ ঘর হইতে বাহিরে আসিল।)

কাশীনাথ। তুই আমায় ডাকলি কেন বলতো ?

ভূতনাথ। একা কেউ জেগে থাকতে পারে ; তুই আমার সঙ্গে গল্প করবি।

কাশীনাথ। তুই বা শুধু শুধু জাগতে গেলি কেন ?

ভূতনাথ। শুধু শুধু জাগবো না তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে, একটু তামাক খাই—আর পরামর্শ করি।

কাশীনাথ। কিসের পরামর্শ ?

ভূতনাথ। বলছি দাঁড়া—হুঁকো-কলকেটা নিয়ে আসি—

(ভূতনাথ বাহিরের দিকে গেল।)

কাশীনাথ। ওরে ভূতো—কোথায় গেলি রে ; শীগগির আয় আমার ভয় কচ্ছে, (হুঁকো কলকে হাতে প্রবেশ)

ভূতনাথ। সত্যি ভাই, আজ আমারও কি রকম গা'টা যেন ছমছম কচ্ছে। বাইরে অন্ধকারও তেমনি, একেবারে গাঢ় অন্ধকার।

কাশীনাথ। তুই চল, শুইগে। কাল সকালে তখন পরামর্শ করা যাবে।

ভূতনাথ। সকালে সময় কোথায়, হয় মাঠাকরুণ না হয় ভট্টাচার্য্য মশায়ের ফাই ফরমাস খাটতে হবে। এ সব আমার আর ভাল লাগছেনা—আমি ভাবছি গ্রামে গিয়ে টোল খুলি।

কাশীনাথ। আগে একটা উপাধি জোগাড় কর, নইলে কে তোমায় পণ্ডিত বলে মানবে ?

ভূতনাথ। তুমি দেখছ তো—ভসচায মশায় আর কা'কে পড়ান ? ধরতে গেলে মাত্র তুমি আর আমি তাঁর ছাত্র। আর সবাইকে তো আমিই পড়াই। নারায়ণ, গঙ্গেশ, শম্ভুচরণ, নন্দলাল, দীননাথ, হরেকৃষ্ণ সব তো আমারই ছাত্র।

কাশীনাথ। বিদ্যেও তাদের তেমনি হচ্ছে।

ভূতনাথ। সে কি আমার দোষ ? ভসচায্যি মশায় নিজেও হার মেনেছেন। ও সব ছেলেকে মা সরস্বতী গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না।

কাশীনাথ। তুই উপাধি নিবিনে ?

ভূতনাথ। উপাধি নিতে হলে বোধহয় এজন্মে কুলিয়ে

উঠবে না—বত্রিশ বৎসর পেরিয়ে গেছে, চুলে পাক ধরছে পণ্ডিত মশায় পড়াতে বসলেন তো একটি সূত্র তিন দিন, এই ভাবে ন্যায়শাস্ত্র পড়লে আমি কবেই বা বিবাহ করবো, আর কোনকালেই বা সংসারধর্ম্ম করবো ?

কাশীনাথ। সংসারের ধর্ম্মের অর্থ তো শ্রাদ্ধের সময় বিদায় গ্রহণ ? কিছু কাব্য ব্যাকরণ পড়েছি, কালিদাস, মাঘ, নৈষধের শ্লোক ব্যাখ্যা করতে পারি, আমাদের তো আর দশকর্ম্ম করতে মন চাইবে না। রাজা কমলাকান্তর মত একটি দাতাকর্ণ সভায় না থাকলে শুধু শ্রাদ্ধের বিদায়ের ভরসায় সংসার চালানো বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমি সংসারধর্ম্মের দিকে নেই দাদা ! আমার তো এখনো স্মৃতি চলছে, ন্যায় আরম্ভই হয়নি। আমি ঠিক করেছি, শিরোমণি মশায়ের টোল ছেড়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি"—তবে একটি রাজা টাজা পাই তখন দেখা যাবে। তুমি যদি চলে যেতে চাও ভাই, পণ্ডিত মশায়কে ধরে একটা উপাধি আদায়ের ব্যবস্থা কর।

ভূতনাথ। উপাধির জন্যে ভাবনা নেই যে আমি নিজেই নিয়ে নেব। রাজা কমলাকান্ত একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে বিবাহ দিয়ে টোল খুলে দেবেন শুনেছিস্ তো ?

কাশীনাথ। ও চেষ্টা করো না ভায়া ঠকবে, যে মাসীক্রুণ নিজে হাত দিয়েছেন, গঙ্গেশের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

ভূতনাথ। পণ্ডিত মশায়ের মত নেই, গঙ্গেশ যে মূর্খ।

কাশীনাথ। তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু নেই, গঙ্গেশের চেয়ে তুই মূর্খ। মাসীকরুণ হাত দিয়েছেন যে যত বড় পণ্ডিত হোন্ না। কতক্ষণ আপত্তি টিঁকবে ? তুই দেখে নিস ছ মাসের মধ্যে গঙ্গেশের বিয়ে হবে, গঙ্গেশ টোল খুলবে, উপাধি হবে বিদ্যাবাচস্পতি, তুই তামাক খাস তো তামাক খা।

ভূতনাথ। আরে, আগুন নেই যে মালসায়।

কাশীনাথ। তবে থাক আর তামাক খেয়ে কাজ নেই, চল।

ভূতনাথ। তুই বস না—আমি ব্যবস্থা কচ্ছি, শোন, তুই আমার নাম করে পণ্ডিত মশায়কে একটু বল্ না, নিজের কথা তো আর নিজে বলা যায় না ?

কাশীনাথ। কি বলতে হবে ? ভূতনাথ অতি সুপাত্র ?

ভূতনাথ। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা বল্‌বি, তুই আমার নাম করবি আমি তোর নাম করবো, তুই আমায় বৈদান্তিক পণ্ডিত বলবি আমি বলবো কাশীনাথ পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। তারপর যার অদৃষ্টে কন্যালাভ থাকে সে পাবে।

কাশীনাথ। ভাল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। আমি রাজি, তবে দাদা, আমাদের অদৃষ্ট কন্যালাভের অদৃষ্ট নয়। বরাতে কন্যালাভ থাকলে বহু পূর্ব্বেই হত। কত অনূঢ়া কন্যার বিবাহ বিস্ফারিত লোচনে শুধু চেয়েই দেখলাম। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম থেকে আরম্ভ করে আজ বিশ বৎসর যাবৎ দুই সহস্র কন্যার বিবাহ দেখেছি। যে ফুল এত দিন ফোটেনি আজ কি তা ফুটবে ভ্রাতঃ! তুমি তামাক খাও। আগুনের চেষ্টা দেখ।

ভূতনাথ। চকমকি নেই, কয়লা নেই, বাতদুপুরের সময় একটু তামাক খাব, তার ঝঞ্ঝাট দেখ না। দেখি যদি নারিকেল ছোবড়া যোগাড় করতে পারি, আর কি এ বয়সে এত কষ্ট করে তামাক সেজে খাওয়া পোষায় ? এখন কোথায় ছাত্র, ভৃত্য না হয় গৃহিণীর হাতের সাজা তামাক খাব—তা নয়, কর্ম্মভোগ দেখ না (বাহিরে দিকে চাহিয়া সভয়ে) ওরে কেশে ওটা কি রে—

কাশীনাথ। ওদিকে আর চেয়ে দেখিসনে। আমি জানি বেলগাছে থাকেন ব্রহ্মদৈত্য, মাঝে মাঝে খড়ম পায়ে দিয়ে বেড়ান।

ভূতনাথ। যদি মানুষ হয় ?

গঙ্গেশ। আমি বসে আছি। আমি গঙ্গেশ।

ভূতনাথ। গঙ্গেশ, তুই কখন উঠে এলি ?

গঙ্গেশ। অনেকক্ষণ, ঘুম হল না। কে যেন কাঁদছে, কি গান কচ্ছে, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ ?

ভূতনাথ। এই সেরেছে, ওরে কাশীনাথ শুনছিস—গঙ্গেশ আবার গান শোনে, কান্না শোনে সে।

কাশীনাথ। আমিও শুনেছি। ও সেই ব্রহ্মদৈত্য। গান গায় কাঁদে মেঘদূতের শ্লোক পড়ে। আমাদেরই মত ভট্টাচার্য্য মশায়ের কোন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। এইখানেই কুমার অবস্থায় মারা যায়, কত অপূর্ণ কামনা নিয়ে ধরা ছেড়ে যেতে হয়েছে, সেইজন্যেই কাঁদে গান গায়, তবে উনি খুব শান্তপ্রকৃতি, কখনো কারো অনিষ্ট করে না।

গঙ্গেশ। তুমি নিজে দেখেছ কাশীনাথদা ?

কাশীনাথ। হুঁ।

ভূতনাথ। ওরে গঙ্গেশ, আমরা তামাক খাব একটু আগুন এনে দিবি ?

গঙ্গেশ। হুঁ, কলকে দাও (কলিকা লইল)।

ভূতনাথ। কোথেকে আগুন আনবি বলতো ?

গঙ্গেশ। যেখানে পাব সেখান থেকে আনবো।

কাশীনাথ। ভয় পাবি না তো ?

গঙ্গেশ। তোমরা তো জান—আমি ভয় পাই না, ভয় পেলে তো বেঁচে যাই।

কাশীনাথ। থাক ভাই, তোর গিয়ে কাজ নেই। আজ অমাবস্যা, মঙ্গলবার।

গঙ্গেশ। তোমরা ভয় পেয়ো না দাদা, আমি আনবোই, কারো বাড়ী যদি আগুন না পাই ভৈরবঘাটের শ্মশানে একটা না একটা চিতা জ্বলছেই, আমি সেখান থেকে আগুন নিয়ে আসবো।

গঙ্গেশের গান

আমার শ্মশানে মশানে কিবা ভয়
শ্মশানবাসিনী মা দেবেন বরাভয়।
ভূত, প্রেত, শাঁকচুন্নী
তারাই আমার ভাই-ভগিনী
আছে মুখ-চেনাচিনি।
(কত জন্মে ঘাটে বাটে
এক সাথে বেচা-কিনি)
ভূতেশ্বর বাবা যেথায়
গাইছেন শ্যামা মায়ের নয়
যাদের কথা কেউ শোনে না
তারাই সেথা কথা কয়।

[প্রস্থান।

কাশীনাথ। কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না ভূতনাথ !

ভূতনাথ। আমার দোষ কি ভাই! ও তো কারো কথা শুনবেও না। সত্যি ভৈরবঘাট শ্মশানে যাবে নাকি?

কাশীনাথ। ও যা ছেলে, যেতে পারে। যাবি ওর সঙ্গে, চল ফিরিয়ে আনি।

ভূতনাথ। আমার মনে হচ্ছে আমার আশে-পাশে কারা কাঁদছে, হাসছে গান গাইছে, আচ্ছা দেখতো দেখতো, ঘর-বাড়ী কাঁপছে না আমার দেহ কাঁপছে?

কাশীনাথ। ও আর দেখতে হবে না। ঐ বেলগাছের তিনি, একটু আগে যাঁকে দেখেছ, বুঝতে পেরেছি তিনি ঘরের চালের উপর ভর করেছেন।

ভূতনাথ। ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনে।

কাশীনাথ। চেঁচাসনে হতভাগা, এখুনি ভট্চায্যিমশায় উঠে পড়বেন।

ভূতনাথ। উঠুক, উঠুক, সবাইকে উঠতে বলি, না উঠলে ঘর চাপা পড়বে যে—ওগো তোমরা সব—

কাশীনাথ। আঃ চুপ কর।

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ভৈরবঘাট—রাত্রি দ্বিপ্রহর

ভৈরবীর নৃত্য ও গান

হর উরোপরে বিহরে
কে রামা অপরূপ সঙ্গিনী
তাণ্ডব রসবিবশা বিবসনা ত্রিভঙ্গিনী
এ কি রঙ্গ রঙ্গিনী।
দানবদলনী ধনী নাথে রে
অসুর-লাঞ্ছিত ধরণী বাঞ্ছিত
চরণ পরশ পেয়ে বাঁচে রে—কে রে ভৈরবসঙ্গিনী।
নরকর-কিঙ্কিণী বাজিছে ঝিণি-ঝিনি
অসুর-শোণিত-ধারে রঞ্জিত মেদিনী—
ঝলমল ঝলমল
গল বিলম্বিত
মুণ্ডমালা দল
পদতল চুম্বিত
(দানে) দক্ষিণে বরাভয়, উলঙ্গিনী।

যজ্ঞেশ্বর ও তাহার স্ত্রী দীনতারিণীর প্রবেশ।

যজ্ঞেশ্বর। কারা যেন গান গাচ্ছে।

দীনতারিণী। এখানে সব ভূতপেরেত পিরেশ দলে দলে নাচে, গান করে, এখানে আর বসে না চল, জনমানব নেই।

যজ্ঞেশ্বর। মোদের আর কেডা কি করবে। এতদিন ভয় করেছি, আর কিসির ভয়? মোর ডোমদাদারা কনে গেল?

দীনতারিণী। তোমার কি হয়েছে বল তো? এ রকম কচ্ছ কেন?

যজ্ঞেশ্বর। চিতে জ্বলছে, মানুষজন কেউ কোথাও নেই, ব্যাপারখানা কি, কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনে!

দীনতারিণী। তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি? এ ভৈরবঘাট শ্মশান, লক্ষ মড়া পোড়ানো হয়েছে, দিনরাত চিতা জ্বলে এখানে, মানুষ আসে?

যজ্ঞেশ্বর। তার দেখা এইখানেই মেলবে। আমি ভাবছি চিতেয় আগুন দিয়েই লোকগুলো পালাল।

দীনতারিণী। সন্ধ্যের পর এখানে কেউ থাকে না। সবাই জানে ভৈরবঘাটে শ্মশানে একটিবার আগুন দিলেই হ'ল ও আর নিবরে না। রাতে এখানে ভূতে মড়া পোড়ায়, তুমি চল।

যজ্ঞেশ্বর। ওই চিতেয় নিজের হাতে বিষ্টুকে শুইয়ে দিছি। মুখে আগুন দিইছি।

দীনতারিণী। আর ওসব কথা ভেবো না। ঘরে চল।

যজ্ঞেশ্বর। ঘরে কি করে যাই বল দেখি, হাজার এক মোহর কাছে থাকলি ঘরকে যাওয়া যায় না, ঘুম আসে। মলেও যে গতি হবে না। মোহরের পিছনে পিছনে দুর্গতি হবে, একবার দেখা পালি হয়, মোহরের তোড়া দিই পায়ে ফেলে।

দীনতারিণী। তুমি কি মোহর ফিরিয়ে দেবে?

যজ্ঞেশ্বর। ফিরিয়ে দেব না তো কি করব? পাগল হব না কি! ফিরিয়ে দিয়ে বলবো, ঠাকুর সঙ্গে নাও তো নাও, নইলে এই চললাম।

দীনতারিণী। কালকের দিনটা ঘরে থাক, বাবাঠাকুর আসুক আমার কাছে খেতে চাইলে।

যজ্ঞেশ্বর। খেতে দিসনি ওকে, খেতে দিসনি।

দীনতারিণী। তোমার যেমন কথা, নিজে খেতে চাইলে। ম বললে, আর তুমি বলছ খেতে দিও না?

যজ্ঞেশ্বর। দু মুঠো চাল দিয়েছো, তাই একশো বিঘে শিক্কর জমি আর হাজার এক মোহর। খেতে দিলে একটা কত বড় ওলট-পালট ব্যাপার করে দেবে বুঝতি পারছ না? তার জের চলবে সাতজন্ম।

দীনতারিণী। এতদিন দুঃখ-কষ্ট গেছে, এখন বুড়ো বয়সে য বরাতে একটু সুখ হয়, তাতে তোমার অতটা কেন বলতো?

যজ্ঞেশ্বর। এই যে, সর্ব্বনাশ করেছে—তুমি এখনো [illegible] চাইছো?

দীনতারিণী। তা ভগবান যদি দেন, এ তো আর তোমার আ[illegible] হাত নয়।

যজ্ঞেশ্বর। ভগবান তো আর শুধু সুখ দেয় না। আগে [illegible] দেয়, তারপর দুঃখ আসে। আপনিই আসে সে আর চাইতে হয় ন[illegible] বিষ্টুকে যখন কেড়ে নিল—মনে মনে বললাম, মা তোমার সু[illegible] বুঝে লিইছি আর দুঃখও বুঝে লিইছি—এইবার ক্ষেমা দাও আর দরকার নেই। তারপর এই কাণ্ড। ভগবান নিজে [illegible] মোদের লোভ দেখাচ্ছে, তুমি বুঝতি পাচ্ছ না?

দীনতারিণী। তা বাবাঠাকুর যদি ভগবান হয়, কাল [illegible] মোদের বাড়ী খাবে তখন জিজ্ঞেস করলেই তো পারবা।

যজ্ঞেশ্বর। কাল হয়তো এক ছোঁড়া সেজে যাবে—কি ভেড়া হয়ে যাবে, তা মুই কেমন করে জানবো? মোরা কি চি[illegible] পারবো?

(নেপথ্যে শব্দ—ভোঃ ভোঃ লম্বোদরজননি!)

দীনতারিণী। ও কিসের শব্দ!

যজ্ঞেশ্বর। নিশ্চয়ই সেই। আর কারও সাধ্যি নেই, রাত্তিরে শ্মশানে একা আসে, (উচ্চৈঃস্বরে) বাবাঠাকুর এই [illegible] এই দিকে।

দীনতারিণী। যেও না যেও না আমার মাথা খাও, চলে এ[illegible]

যজ্ঞেশ্বর। এই যে এই দিকে আসছে, গান গাইছে।

দীনতারিণী। ওদিকে আর চেয়ে দেখ না, শীগগির এস।

[প্রস্থান।

মহামায়ার গান

কে গো চক্রী সারথী চালাও রথ
চলে রথের চাকা
ছিল সরল ঋজু, সে পথ কেন হল বাঁকা।
[রঙ্গমঞ্চ ভীষণ অন্ধকার, মধুর সঙ্গীত]
(ভূত প্রেত, শঙ্খিনী, ভৈরবী প্রভৃতির সমবেত আনন্দ-সঙ্গীত)
ওই আমার পাগলী মা, চললো সমরে
আমরা মায়ের সঙ্গে যাই
আমরা মায়ের সঙ্গে যাই।
ভূত প্রেত দত্যি দানা
যাদের সঙ্গে চেনা শোনা, সবাই এস ভাই,
বট অশথ সাক্ষী থেকো
সাক্ষী থেকো গঙ্গা মাই।
ভয়ঙ্করী চললো সমরে
কৃপাণ ধরে বাম করে
অসুরের মুণ্ডপাত করে
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে
আয় না মোরা নাচি গাই
আর ঘুরপাক খাই, ঘুরপাক খাই।
ও মা, এ কি বাবা যে চরণে শুয়ে
ও মা তোর কি নেইকো হায়া ও বেহায়া,
দেখ না চেয়ে বাবার বুক যাচ্ছে দ'মে
আর ভুঁড়ি যাচ্ছে নুয়ে
যেমন পাগলী তেমন পাগল
জন্মে এমন দেখি নাই।
বাজাও শাঁক ঘন্টা, ঢাক ঢোল
কাঁসী দামামা
ডাক মায়ের কানের কাছে
ও-মা ও-মা ও-মা
বলে দাও ক্ষমা দাও ওগো
হররমা
এবার দেখ না চেয়ে পাগলী মেয়ে
(বাবা আমার)
প্রাণে বেঁচে আছেন কি নাই।
(গঙ্গেশ কলিকাহস্তে প্রবেশ করিলেন)

গঙ্গেশ। কে গান গায়? মধুর কণ্ঠ, (গঙ্গেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন) কিন্তু কে?

নেপথ্যে শব্দ—যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণুর্ন রুদ্রো
ন কালো ন বা পঞ্চভূতা নিলাসাঃ।
(ভৈরবমূর্ত্তি বৈরাগী প্রবেশ করিলেন)

বৈরাগী। তদা কারণীভূতসত্ত্বৈকমূর্ত্তি-
স্বমেকো পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।

গঙ্গেশ অতি ভয়ে তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তিই দেখিলেন—প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। গঙ্গেশের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বৈরাগী। তুমি কে?

গঙ্গেশ। তুমি কে?

বৈরাগী। কি জন্য তুমি এই নিশীথে ভৈরবঘাট শ্মশানে এসেছ?

গঙ্গেশ। তুমি কেন এসেছ?

বৈরাগী। শ্মশান আমার বাসস্থান।

গঙ্গেশ। তুমি কে?

বৈরাগী। গঙ্গেশ, ভাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

গঙ্গেশ। তুমি আমায় জান?

বৈরাগী। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

গঙ্গেশ। ভয় পাব কেন? ভয় পাইনি তো?

বৈরাগী। ভয় পেলে তোমার মা তোমায় কি করতে বলেছিলেন?

গঙ্গেশ। আমার মা বলেছিলেন—

বৈরাগী। তোমার মা যা বলেছিলেন, তুমি তাই কর, তুমি অতি ভয়ে মায়ের উপদেশ ভুলে গিয়েছ—তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার পূর্ণ ফল আজ পাবে। বল—জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

গঙ্গেশ। (আবিষ্টের মত) জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

বৈরাগী। জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

গঙ্গেশ। জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

বৈরাগী। জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

গঙ্গেশ। জয় মা মহাকালী, মহাবিদ্যা।

বৈরাগী। এই মাতৃমন্ত্র তোমার জন্মার্জ্জিত মহাবিদ্যা। মাকে ডাক—

নমস্তে চণ্ডিকে চণ্ডি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি
নমস্তে কালিকে কালমহাভয়বিনাশিনি।
শিবে রক্ষ জগদ্ধাত্রি প্রসীদ হরবল্লভে।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং জগৎপালনকারিণীম্।

[বৈরাগীর প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

১৭৭ বছরের কচ্ছপ বেঁচে আছে!

১৭৭৭ সালে তার জন্ম। ক্যাপ্টেন জেমস কুক এটি Tongatabu-র রাজাকে উপহার দেন। রাজ-পরিবারে সযত্নে এটি এখনও রক্ষিত আছে, এ খবর এনেছেন হনলুলুর ব্রিটিশ-মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ। কচ্ছপটি বাঁচাবার জন্য সে দেশের রাজার চিঠি থেকে ব্যাপারটি জানা যায়।

বিজন ভট্টাচার্য

১২

ধনাঢ্য শিল্পপতি অন্নদা রায়ের মানসটা ছিল খানিকটা শিল্পীর। নইলে সামান্য টাকার মূলধন নিয়ে দশ বছরের মধ্যে 'রায় কোম্পানী' লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার ফেঁদে বসতে পারতো না।

ফাটকার বাজারে বাজি লড়ে স্বনামধন্য কোটিপতির রাজস্থানী খানদানের সৌভাগ্য কোনদিনই হয়নি অন্নদাবাবুর। সাফল্য এসেছে তিল তিল করে। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর। রক্ত ঢেলে ঢেলে। পৃথিবীর অন্য সব দেশে যন্ত্র যখন মন্ত্রের মতো কাজ করছে, নন্দীভৃঙ্গীর মতো দু হাতে লুটে আসছে সমৃদ্ধি মানুষের কল্যাণে। আমাদের দেশে তখনো তপোবনের আশ্রমিক আবহাওয়া। বিংশ শতাব্দীর ঘোর কলিতেও সনাতনী মন আমাদের তখনো গৈরিক উত্তরাধিকারের মালা জপছে। ইংরেজের দরকার তখন স্রেফ কাঁচা মালের। স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু সব জাহাজভর্ত্তি রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে বিলেতে। উৎপাদন যা কিছু, সেখানেই হবে। তারপর যথাযোগ্য কাঞ্চনমূল্যে সেগুলোকে আবার আমরাই কিনে নেব ঘটী-বাটি-চাটি বাঁধা দিয়ে।

এই যেখানে রেওয়াজ, সেখানে শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতি বিশ্বকর্মার কামারশালেই তোলা ছিলো। লক্ষ্মীর আনাগোনা ছিলো কিছুটা তেল-নুন। চাল-ডাল-মশলাপাতির বিকিকিনির হাটে। তা সে কারবারেও লাভ ছিলো নাকের বদলে নরুণ পাওয়ার মতো। সাজের চাইতে বায়না বেশী—শুল্ক মাশুল ট্যাক্স বার-বরদারী চুকিয়ে লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে উঠতো সামান্যই। ভাগ্য সেদিন অপ্রসন্ন। কালঘুম তখনও সমাচ্ছন্ন করে আছে আমাদের। অন্নদাবাবুর ঘুম ভেঙেছে কিন্তু সেদিনের সেই সকালে।

সাহেব কোম্পানীর সাধের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে অন্নদাবাবু পাড়ি জমালেন কালাপানি। বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাসায়ার আর ম্যাঞ্চেষ্টারে শিক্ষানবিশীর সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা কলকারাখানায় বৈদেশিক শিল্পোৎপাদনের রীতিনীতি রপ্ত করলেন। তারপর রাজানুগ্রহ নিয়ে দেশে ফিরে এসে দিশিবিদেশী স্বার্থ মিশিয়ে চালু করলেন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান—রয় এণ্ড রজার্স।

পাট, তুলো, সরষে, লবঙ্গ হাতের কাছে যা পেলেন প্রথমটা, দু'হাতে মুঠো করে ধরলেন। আর বৎসরান্তে বাজিকরের মতো শেয়ারের ঢাকনা তুলে অংশীদারদের দেখালেন সবগুলো কাঠের ঘুঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে।

যৌথ বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার কয়েক বছর পর অন্নদা রায়ের সমৃদ্ধি যখন বিদেশের ব্যাঙ্কেও উপচে পড়ছে, তখন ভাগ্য তুষ্ট হ'লে যা হয় আর কি। মিসেস রজার্স গেলেন মারা। বুড়ো রজার্সের মন গেল ভেঙে। কাজকর্মে শৈথিল্য দেখা দিল। আলীপুরের বাংলোবাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় একদিন চুর চুর হয়ে অন্নদাবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে রজার্স বললো : রয়, আমি তোমে যাবো। আমার সেয়ারগুলো তুমি কিনে নাও।

যাঁহা প্রস্তাব, তাঁহা কাজ—অন্নদা রায় সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনব্যাঙ্কের ওপর পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার হুণ্ডি কেটে দিলেন। আর আলীপুরের বাড়ীতে মিসেস রজার্সের স্মৃতিসৌধ তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে রজার্সের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য লাভ করলেন।

মনের আশা রঙে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো এবার। অন্নদাবাবু বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে চালু করলেন কাপড়ের মিল, পাটকল, ছাপাখানা। লোহালক্কড়ের কারখানা। আমানত জমা বিনিয়োগ হয়ে গেল যন্ত্রপাতিতে। আরো টাকা চাই। পঞ্চাশটা মেশিনের পঞ্চাশ দফা খোরাক। আর খোরাকী-ও সে টন টন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভারড্রাফট নিয়ে কাঁচামালের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু পরের টাকায় কারবার করবার ঝুঁকি অনেক। স্বদেশী মাল, খোলা-বাজারে টেকদার বিলিতী জিনিষের সঙ্গে টক্কর নিতে হবে। অথচ সরকার পক্ষ থেকে কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই। এমন তেমন হ'লে মর্টগেজ হয়ে যাবে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি। বানচাল হয়ে যাবে যাবৎ পরিকল্পনা। উদ্বিগ্ন হলেন অন্নদা রায়। মূলধন বাড়াতে হবে। আমানত জমার অঙ্কের ডাইনে তড়িঘড়ি আরো চার-পাঁচটা শূন্য বসিয়ে ফেলতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

খবর পেয়ে এলো ভগলান দাস লোহার, জগন্নাথ বাজোরিয়া, আর মূলচাঁদ পুরণচাঁদের দল। সবাই অকুণ্ঠ সাহায্য করতে চায় রায় মশাইকে এ মহা প্রচেষ্টার। দশ বিশ লক্ষ টাকা কোন সমস্যাই হতে পারে না। ওদিকে জাহাজঘাটে মেসিন পড়ে আছে। সাত দিনের মধ্যে মাল খালাস করতে না পারলে লোকসানের অন্ত থাকবে না। কারবারেও বদনাম হবে প্রচুর। গুডউইল নষ্ট হবে।

সাত-পাঁচ ভেবে অন্নদাবাবু গেলেন বিশ্বতোষের বাবা অমিয়নাথের কাছে—বঙ্গবিহার কয়লাখনি অঞ্চলের ছত্রপতি সম্রাট। প্রথমেই তিনি দেখা করলেন অমিয়নাথের স্ত্রী প্রফুল্লনলিনীর সঙ্গে। জাহাঙ্গীর অন্নদাবাবুর কাছে প্রফুল্লনলিনীর আনুগত্য ছিলো নূরজাহানের মতো। প্রফুল্লনলিনী-ই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বিত্তশালী রাজরাজড়ার

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'কাডল'
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL

সক্রিয় সাহায্য ছাড়া-ও অমিয়নাথের সঞ্চিত অমৃতভাণ্ড চুরি করে তিনি উপঢৌকন দিয়ে এলেন অন্নদা রায়কে। নিজের ঘর ভেঙে পরের ঘর গড়ে দিয়ে এলেন নিজের হাতে। অমিয় বাবু প্রথমটা ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু দুর্নিবার পত্নীপ্রেমে তাঁর সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরক্ষণেই কুটোর মতো ভেসে গেল। কৃতজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি হিসেবে অন্নদা রায় পরে কোম্পানীর অংশীদার করে নিলেন বিশ্বতোষকে—দেখাশোনা যা, সব ছেলেই করবে অমিয়নাথের হ'য়ে।

গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বজ্রআঁটুনী। পাকাপোক্ত বনিয়াদ। 'রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানী' দাঁড়ালো পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে। দ্বৈত নিপুণ হাতের পরিচালনায় সুষ্ঠ উৎপন্ন-সম্ভার দেশের বাজারে সমাদৃত হলো। লাগলো যুদ্ধ। কিন্তু অভিশাপ এলো মা-লক্ষ্মীর সোনার ঝাঁপি নিয়ে বরদান হিসেবে ছ' শিফটের জায়গায় ছ' শিফট। পাঁচ হাজার মজুরের জায়গায় পঁচিশ হাজার মজুর দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা খেটেও চাহিদা মেটোতে পারছে না। আরো শ্রম চাই, আরো মাল চাই। ওয়াগন-ভর্তি মাল যেমনি পাচার হতে লাগলো সরকারী তাগিদে, তেমনি আসতে লাগলো বস্তাবন্দী টাকা। টাকা আর টাকা—সাদা টাকা, কালো টাকা, টাকায় টাকায় লাল-হয়ে গেলো রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানী।

যুদ্ধ থেমে যেতেই এলো মন্দা। সাংগঠনিক পরিকল্পনার অভাবে হাতে-গড়া মৃত্যুবাণ ঘুরে এসে লক্ষ্যভেদ করলো বক্ষঃস্থল—উঠে গেল অনেকগুলো ফার্ম। শ্রমিক-বিক্ষোভের জন্য দীর্ঘ পাঁচ-ছ' মাস কারখানা লকআউট রেখে লালবাতির অন্তিম রোশনাই জ্বেলে দিলো অনেক কোম্পানী। ধাক্কা এলো, ধাক্কা গেল—ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও ব্যবসায়ী জগতে ইজ্জতের সঙ্গে টিঁকে রইলো রয় এণ্ড মুখার্জি।

তারিফ করতে হয় অন্নদা রায়ের ব্যবসাবুদ্ধি আর বিশ্বতোষের অক্লান্ত কর্মকুশলতা। এক মেশিন বন্ধ হয় তো সাংগঠনিক পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চালু হয় সব স্বতন্ত্র মেশিন। শ্রমস্বার্থ খর্ব না করে চারিয়ে দেওয়া হয় সেই শক্তি বিভিন্ন কলকারখানায়। মুনাফার ঘাটতি হলো ত' বন্ধ করে দিলেন বোনাস, শলা ক'রে মাইনেও কমিয়ে কমিয়ে দিলেন কারিগরদের। কিন্তু তবু একটি মজুর ছাঁটাই করলেন না অন্নদাবাবু। কোম্পানীর স্বার্থ আপাত ক্ষুন্ন করে ও লোহার কৌটার মধ্যে যত্ন করে ধরে রাখলেন শিল্পপতির ভ্রমরা-ভ্রমরী। কিন্তু কালো অক্ষরে দেশের ভাগ্য আবার নতুন করে লিখে দিল ইংরেজ। লাগলো দাঙ্গা। রক্তগঙ্গায় দেশের মাটি শোধন করে স্বাধীনতা এলো বিনা রক্তপাতে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্যোগ দেখা দিল। রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানীর চার পাঁচটা বড় বড় কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে ওখানে ডুবে গেল গোটা কুড়ি ব্রাঞ্চ-অফিস। দেশের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থায় সমাজজীবন উচ্ছৃঙ্খল হতে বাধ্য। তবু দিনরাত্রির অথৈ মোচনায় দাঁতে দাঁত টিপে হাল ধরে বসে রইলেন অন্নদাবাবু সুদিনের অপেক্ষায়।

মেশিনের চোখে চোখ রেখেই অতিক্রান্ত হলো কয়েকটা বছর, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুপ্রভাতে। রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানীর বয়লার, ইঞ্জিন, লেদ, আবার গরম হয়ে উঠলো। কলকারখানায় আবার নতুন করে সুরু হলো উৎপাদন। ছায়ার মতো পাশাপাশি সব সময়ই বিশ্বতোষ—জবরদস্ত কড়া একজিকিউটিভ, বাজী জেতা বাচ্চা ঘোড়ার মতোই অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি। প্ল্যান ছাপিয়ে তার কাজটাই অন্নদাবাবুর চোখে হয়ে উঠতো একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। এমন কি, অন্নদাবাবুও সব সময় বুঝতে পারতেন না, এ প্ল্যান তাঁরই প্ল্যান। এই কর্মনৈপুণ্যই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একদিন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো অন্নদাবাবুর মনে। কিন্তু তারপর তিনি দেখলেন যে তাঁর ধারণার কোন ভিত্তি নেই। পরীক্ষা করলেন নানাভাবে। দেখলেন গুরুদক্ষিণা দিতে বিশ্বতোষ আঙুল কেটে দিতেও দ্বিধা করছে না। আরো দেখলেন, প্রফুল্লনলিনীর স্মৃতিও বিশ্বতোষ আর তাঁর মধ্যে কোন কালোছায়া ফেলে নেই। সব সংশয়ের যেদিন অপনোদন হলো, অন্নদা রায় স্থির করে ফেললেন যে সতীকে তিনি বিশ্বতোষের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। এইখানেই কেমন যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। অনেকগুলো বিরোধী স্বার্থ এমন বিশ্রীভাবে জট পাকিয়ে গেল এইখানেই যে অন্নদাবাবু তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়ে খেই ধরাতে পারলেন না। বৈষয়িক স্বার্থ—টাকাকড়ি শেয়ার মুনাফার লাভ-লোকসানের খতিয়ান ধরে নয়, আঘাত এলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে—আত্মজা সতীর তরফ থেকে। আপৎপাত ঘটে গেল এইখানেই। একটা গ্রহ যেন আর একটা গ্রহের ধার ঘেঁষে যাবার নিদানকালে চুল পরিমাণ ব্যবধানের গণ্ডগোলে লণ্ডভণ্ড করে দিলো সৃষ্টি। কোন কিছুই নেই, অন্নদাবাবু হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন, যে বিশ্বতোষ তার সমস্ত শেয়ার-পত্র মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে। সেই ভগবানদাস লোহার, সেই বাজোরিয়া, সেই আম্মুভাই প্যাটেল। সেই লালচাঁদ পুরণচাঁদেরা সময় বুঝে না কি সব সময় ঘিরে আছে বিশ্বতোষকে।

অন্নদাবাবু প্রথমটা বিশ্বাস করেননি। দিশী-বিদেশী অনেক প্রতিযোগী স্বার্থ লেনদেনের বাজারে ঘা খাচ্ছিলো এতদিন, অন্নদাবাবু ভাবলেন, এ বুঝি বা তাদেরই রটনা। এমন কি পার্সোনাল সেক্রেটারী নাম্বিয়ার যখন তার পনেরো বছরের আনুগত্য নিয়ে কথাগুলো বলতে এলো অন্নদাবাবুর কাছে তখন তিনি এক হাতের বাড়ি মেরে তার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন—ঠিক করছে, বেশ করছে মুখার্জি। রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানীর শেয়ার যদি লোকসানের হয়ই তো সে বেচে না দিয়ে কি ধরে রাখবে সেই সব বরবাদী শেয়ার?

কথাটা বললেন বটে অন্নদা রায়, কিন্তু চল্লিশ ডিগ্রী রক্তচাপ বেড়ে গেলো সেই দিনই বিকেলবেলা। তিন-চারবার ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন বিশ্বতোষের সঙ্গে কিন্তু লাইন ধরাতে পারলেন না। তিনবারই এনগেজড। চারবারের বার যদি বা লাইন পেলেন, বেয়ারা জানালো নিকাল গিয়া সাব। তখন পরিষ্কার হলো অনেক কথাই। প্রায় মাসাধিক কাল অফিসে আসে না বিশ্বতোষ। শরীর খারাপ, অথচ দিল্লী বম্বে মাদ্রাজ ঘুরতে কামাই নেই। শুভময়কে ডিরেক্টরস বোর্ডে নেবার সময় কেন যে বিশ্বতোষ অত আপত্তি করেছিলো, সে কথাটাও এখন বোধগম্য হলো যেন অন্নদাবাবুর। একটা একটা করে মনে পড়ছে ঘটনা—আর অমনি তার ডালপালা ছড়িয়ে দৈত্য হয়ে উঠছে অন্নদাবাবুর চোখের ওপর। পঞ্চাশটা কলকারখানার বিস্তৃত এলাকার মধ্যে কোথায় কি ভাবে যে সেই দৈত্য লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে? যতই ভাবেন, ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অন্নদাবাবু। তাহ'লে কোম্পানীর কি হবে? মেমোরাণ্ডামে আছে বটে, যে কোম্পানীর বিদায়ী অংশীদার তার

নামের সমস্ত শেয়ারপত্র, লেনদেন চুকিয়ে চলে যাবার আগে কোম্পানীর কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করে যেতে বাধ্য কিন্তু তাই যদি হয়, তবে একসঙ্গে অত টাকাই বা অন্নদাবাবু পাবেন কোথায়? টাকা তো আর সোনার ইট ক'রে মনোহরপুকুরে বাড়ীর দেওয়ালে গেঁথে রাখা হয়নি? টাকা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। একটা চালু সাবালক কোম্পানীর টাকা ডান হাত বাঁ হাত ঘুরতি ফিরতি হয়ে অন্য পাঁচটা নাবালক কোম্পানীর তহবিলে বিভিন্ন খাতে টগবগিয়ে ফুটছে। নাবালক কোম্পানীগুলোকে সাবালক করে দিয়ে, আবার চলে যাবে সেই টাকা ভিন্ন দিকে, অজস্র ধারায়। অন্নদাবাবু খাটছেন, টাকাও খাটছে। সুতরাং বিশ্বতোষের শেয়ার বাবদ সমস্ত টাকাটা পাচ্ছেনই বা কোথায় অন্নদাবাবু একসঙ্গে? টাকার ব্যবস্থা করতে হলে দশটা কোম্পানী মর্টগেজ পড়ে যায়। উঠতি-পড়তির চলতি বাজারে তার ভবিষ্যৎ মূল্যায়নই বা এখন লভ্যাংশের পড়তায় পড়বে কোন হিসাবে? অস্থির জীবনে শেয়ার বাজার তো আরও অনিশ্চিত। শান্তি-অশান্তিরও প্রশ্ন আছে। সমীকরণের প্রশ্নও সুদূরপরাহত। তবু সহ-অবস্থানিক পর্বে লাগ বললেই এখন যুদ্ধ লাগছে না। অতঃপর থাকে মাত্র একটি পন্থাই—নতুন নতুন অংশীদার আমদানী করে কোম্পানী চালু রাখা। দামী শেয়ারের মোটামোটা শেয়ার হোল্ডার—সেই বাজোরিয়া, সেই ভগবানদাস, সেই অবাঞ্ছিত লালচাঁদ পুরণচাঁদের দল। অন্নদাবাবু ভাবতেও শিউরে ওঠেন। এরা কোনদিন গড়বে না। উপরন্তু হাতে গড়া তৈরী কোম্পানী আশুমুনাফার আপাত লোভে ফাটকার বাজারে বিক্রী করে দেবে। জুয়াড়ীর মেজাজে কেনাবেচার নেশা। ফাটকায় আরম্ভ, ফাটকাতেই শেষ। না জানি গোটা কোম্পানীটাকেই দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাজারে ডাকাডাকি সুরু করবে পরের দিন। অন্নদাবাবু ভাবেন, আর তালুমূল শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়।

মাদ্রাজ থেকে বিশ্বতোষ ফিরে আসে দিন সাতেক পরে। কাল-বিলম্ব না ক'রে অন্নদাবাবু সেই দিনই দেখা করতে যান বিশ্বতোষের সঙ্গে বাড়ীতে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফিরেছে বিশ্বতোষ কলকাতায়। অন্নদাবাবু সাতটা নাগাদ গিয়ে হাজির। জরুরী কথা আছে।

প্রথমটা একটু খটকা লেগেছিল বিশ্বতোষের মনে। কিন্তু পরে ভেবে দেখে, না ঠিকই আছে ব্যাপারটা। এই মুহূর্তে-ই এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ছিলো।

প্রথমটা যেন চিনতেই পারছিলেন না অন্নদা রায় বিশ্বতোষকে। নইলে চেনা-জানা অতিপরিচিত মুখের দিকে কেউ অমনি করে তাকিয়ে থাকে না।

দু'চোখের স্থির দৃষ্টিতে নজরবন্দী হয়ে সামনাসামনি বসে এসে বিশ্বতোষ। এবার তার নজর পড়ে অন্নদাবাবুর দিকে। নিষ্পলক দ্বিধাহীন চোখে। সে-ও তাকিয়ে থাকে অন্নদাবাবুর দিকে। মাঝখানের অন্তরঙ্গ অনেকগুলো বছরের সমস্ত স্মৃতিকথাগুলো যেন একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে। ঘসাকাচের আয়নার ভেতর দিয়ে যেন একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নতুন করে পরিচয় হচ্ছে দু'জনের।

অন্নদাবাবু-ই কথা বলেন প্রথমটা—বলেন: আমি এলাম, মানে দরকারটা মনে হচ্ছে এখন আমারই। আমারই কোম্পানী, আমারই সব, গেলে আমারই যাবে। থাকলে আমারই থাকবে। কেননা যা দেখছি আর শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে, রয় এণ্ড মুখার্জি কোম্পানী সম্পর্কে তোমার আর কোন ইণ্টারেষ্ট নেই।

: বলুন—ব'লে চুপ করে অপেক্ষা করে বিশ্বতোষ।

হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেন অন্নদাবাবু। একটু পরে ঢোক গিলে বলেন, এখন আমার এখানে একটা অনুরোধ হচ্ছে যে শেয়ার যদি একান্তই বিক্রী কর তো আমার চেনাজানা লোকের কাছে বিক্রী কর। বাজোরিয়া আম্বুভাইরা তোমাকে যে রেট দিচ্ছে, আমি তোমাকে তার চাইতে ভাল রেটই পাইয়ে দেবো। এতে ক'রে ব্যক্তিগত স্বার্থ আমার কানাকড়ি নেই। কারণ তুমি বললেই বুঝতে পারবে যে প্রতি শেয়ার বাবদ বাড়তি যে টাকাটা আমায় দিতে হবে তোমাকে, সেই টাকাটা আমার শেয়রের টাকা থেকেই পরে তারা adjust করে নেবে। বলবে, অন্য কোন শেয়ারহোল্ডার বা আপনি নিজে কেন কিনে নিচ্ছেন না আমার শেয়ার? এর উত্তর তুমি নিজেই জানো, আমার হাতে **Fluid cash** অত নেই। হ্যাঁ, পারি এক বিক্রী করে দিয়ে। কিন্তু সেটা করাও এখন অসম্ভব। কেননা, নতুন কতকগুলো সরকারী বেসরকারী টেণ্ডারের বাধ্যবাধকতা আছে। তাছাড়া ব্যাপারটাও দাঁড়াবে আত্মহত্যার সামিল হয়ে। প্রাইভেট সেক্টরের ভেতর এর জন্যে যে ক্ষতি ভোগ করতে হবে, তাতে করে বিজনেস ওয়ার্ল্ড-এও টেঁকা যাবে না। ইত্যাকার কারণে আমার অনুরোধ যে শেয়ার যদি তুমি বিক্রী করোই, আমার আস্থাভাজন জনাকয়েক লোকের কাছেই বিক্রী করো—তাতে তোমার লোকসান নেই। আমার লাভ আছে। লাভ অর্থে—কোম্পানীটা টিঁকে যাবে আর কি। অন্যথায় কোম্পানীর অস্তিত্বের আমি আর কোন কারণ দেখি না। সন্তানবাৎসল্যে একদিন হাতে করে গড়েছি সব—প্রতিটি কলকব্জার মঙ্গলামঙ্গল ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছি, তাই এতগুলো কথা তোমাকে বললাম। তুমি জানবে, কোন্ স্বার্থে কেন এই সাংঘাতিক পথ তুমি বেছে নিলে, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

কোম্পানীর প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে আশঙ্কা করে বাড়ী বয়ে এসে সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন অন্নদাবাবু। স্পষ্টই বোঝা গেল শিরদাঁড়াটা বেঁকে গিয়েছে। দেহভার টেনে নিয়ে এসেছেন শুধু সেটি সম্পূর্ণ ভেঙে যাবার আগে।

মনে মনে খুসী হয় বিশ্বতোষ। মনের গহীনে অনেক দিনের পুরোন আহত একটা মুহ্যমান সাপ যেন এতদিনে একটু বাতাস পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে বিশ্বতোষের মায়ের কথা মনে করে। বলে: আপনার কথা আমি কখনই অমান্য করতাম না কাকাবাবু! তবে বাজোরিয়া আর লালচাঁদ পুরণচাঁদের কাছে কতকগুলো বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে এমন ভাবে জড়িয়ে আছি যে, অন্য কোন উপায়ে সেই দেনা এখন আর আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

: দেনা?—বিস্ময় প্রকাশ করেন অন্নদাবাবু।

: কবেকার দেনা?

পুরোন সুড়ঙ্গের মুখে মাকড়সার জাল পড়েছে। তবু হাওয়া লেগে প্রাণসঞ্চার হয়—বন ঘন জিভ বার করে সেই সরীসৃপ। নিষ্পলক দুটো পাথরের চোখে কথা বলে বিশ্বতোষ: দেনা অনেক দিনকার। মা'র প্ররোচনায় পড়েই অবিশ্যি এই দেনাটা হয় বাবার। পনেরো লক্ষ

টাকা। আমি তখন খুবই ছোট। ঘটনাটা আমি জানতেই পারতাম না, যদি না এটর্ণী দত্তগুপ্ত মশাই আমাকে সেদিন চিঠিখানা না দেখাতেন।

: কি চিঠি ?

: চিঠিখানা মা-ই লিখেছেন বাবাকে—জয়পুর থেকে। লিখছেন, শুনবেন ?

অস্বস্তিবোধ করেন অন্নদাবাবু। বলেন : প্রতিপাদ্য বিষয় আমি আর শুনে কি করবো ?

: শুনুনই না ! চল্লিশ বছর আগেকার লেখা চিঠি। আমার পক্ষে তো কার্যকারণটা ঠিক ধরা সম্ভব নয় !—চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে পড়তে আরম্ভ করে বিশ্বতোষ। বলে : সবটা না শুনলেন। টাকার কথাটা যেখানে আছে, সেইটুকু শুনুন। লিখছেন, হ্যাঁ—'এই পনেরো লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ভিন্ন আমাদের মধ্যে যে দুরতিক্রম্য প্রাচীর আপনা হইতেই উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কোনকালেই অপসৃত হইবে না। নানাকে আমরা উভয়েই ভালবাসি। তুমি একদিন বলিয়াছিলে, নানার জন্য আমাদের সব কিছু করা উচিত। নানার মতো উদ্যোগী ছেলে আজ বাংলা দেশে যদি দুই-দশজন থাকিত তাহা হইলে বাংলার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—ঋষি দেখিয়াছেন স্বপ্ন, আর নানা আজ সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ সব তোমারই কথা। আজ হঠাৎ সেই সব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া গিয়া নানার সঙ্গে আমার জয়পুরে চলিয়া আসার প্রতি একরূপ ঘৃণা বক্রোক্তি তোমার শোভা পায় না। আমি পিত্রালয়ে আরো মাসাবধি কাল থাকিয়া দেহমনের স্বাস্থ্য ফিরিলেই তোমার নিকট ফিরিয়া যাইব। জয়পুরের কুমারবাহাদুরকে তুমি কি গুণ করিয়াছ, আজও সে তোমার কথা রোজই বলে। স্বামী-গরবে গরবিণী হইয়া আমি তখন ময়ূরীর মতো রাজবাটী প্রদক্ষিণ করি। নানার শরীর ভাল নাই। স্বাস্থ্যের কারণে আরো দিন দশেক থাকিয়া সে কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে। আমি নিজহস্তে তার সেবা-যত্ন করিতেছি। ভুলিয়া যাইও না, বৃন্দাবনে একই কৃষ্ণ, এবং সেই কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার একমাত্র সে তুমিই। বাঁশীর ফুৎকার শুনিলেই নিশ্চিত ফিরিয়া যাইব।

পুনঃ—নানার সম্পর্কে বিবেচনা করিও। আমি এখানে কুমার-সাহেব, গন্ধর্বনগররাজ প্রমুখ বিত্তশালী রাজপুরুষদের নিকট হইতে নানা কোম্পানীর যন্ত্রপাতি বাবদ কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছি।

চিঠিতে ঝড়ের আবেগ—পড়তে পড়তে হঠাৎ বিশ্বতোষের গলাতেও সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে জয়পুর থেকে মা প্রফুল্লনলিনী লিখছেন বিশ্বতোষের বাবা অমিয়নাথকে। নানা, অর্থাৎ অন্নদা রায়ের পক্ষ সমর্থন করে। সুদীর্ঘ চিঠি। অন্নদা রায়ের ব্যবসায়িক সাফল্যের নাড়ীনক্ষত্র লিপিবদ্ধ করা আছে তাতে। কিন্তু চিঠি পড়া শেষ হতে না হতেই উঠে পড়েন অন্নদাবাবু। চোখ তুলে তাকাতেই বিশ্বতোষ দেখে, হলঘরের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় গি পড়েছেন অন্নদাবাবু। দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান তাড়াতাড়ি।

চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখে বিশ্বতোষ। দরকার হলে নতু হিসেবে আবার একদিন টেনে বার করবে। স্বনামধন্য শিল্পপ অন্নদা রায়ের কর্মবহুল জীবনের নিগূঢ় ইতিবৃত্তান্ত খুলে ধরবে। ত কোম্পানীর খাতে বিশ্বতোষের নামে কাগজে-কলমে যে টাকা গচ্ছি আছে, তা বাদে উদ্বৃত্ত এই পনেরো লক্ষ টাকার হিসে প্রফুল্লনলিনীর চিঠিতে সাব্যস্ত হলো না।

কেননা, বিশ্বতোষের বাবা অমিয়নাথ পর্যন্ত এই টাকার দলিলপত্র বিশ্বতোষকে দেননি। মনে হয়, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর সেই ঘৃণ ইতিবৃত্তান্তের অধ্যায়টা-ই সম্পূর্ণ গোপন করে যেতে চেয়েছিলেন বিশ্বতোষের কাছে। এমন কি, প্রফুল্লনলিনীকে পরে যে স্বতন্ত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অমিয়নাথ মোটা মাসোহারা দিয়ে, তা'ও শোনা যায়, বিশ্বতোষকে নিষ্কলুষ ক'রে বড় ক'রে তুলবার খাতিরেই।

একদিন গুলী-ও চালাতে হয়েছিলো অমিয়নাথকে। জন্মদিনে আশীর্বাদ করবেন ছেলেকে। প্রফুল্লনলিনী জোর করে ছেলে নিয়ে এলেন। অমিয়বাবু রাজী হলেন না। বললেন, অকল্যাণ হবে ছেলের তুমি আশীর্বাদ করলে। তুমি ফিরে যাও। কথায় কথায় ঝগড়া বেধে যায়। জ্বলন্ত অঙ্গারবর্ষী কথাবার্ত্তা। মনে বিষ, কথায়-ও বিষ। শেষ পর্যন্ত রিভলভার টেনে বার করেন অমিয়বাবু। বক্ষপঞ্জর ভেদ করার-ই কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিভলভারের নল স্ত্রীর ডান হাতের পাঞ্জায় চেপে ধরে গুলী করেন অমিয়নাথ।

তিন তিনটে আঙুলই উড়ে যায় গুলীতে। প্রফুল্লনলিনী শোকে দুঃখে বলেছিলেন—আমি খুঁতো হয়ে বেঁচে থাকতে পারব না। তুমি বরং আমার বুকে গুলী কর। নানার চোখে আমি কুশ্রী হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না। অনেক রাতে, ডাক্তারের হেফাজতে প্রফুল্লনলিনীকে ফ্ল্যাটবাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন অমিয়বাবু।

সেই যে পালিয়ে এসেছিলেন, আর স্ত্রীর মুখদর্শন করেননি অমিয়বাবু।

সবই শোনা কথা বিশ্বতোষের। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মনে টুকরো টুকরো কালো কালো ছবির প্রেতমিছিল। অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে বিশ্বতোষ। এখন থেকে আর চুপ করে বসে থাকা নেই। কক্ষচ্যুত উল্কা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের বাইরে। গতিপথেই ছাই হয়ে যেতে পারে। আবার দারুণ বিঘ্ন ঘটাতেও পারে নিয়ম ও শৃঙ্খলার রাজ্যে। কিছু ঠিক নেই।

সত্যব্রতর ওখানে যাবে বলে আগে থেকেই কাগজ আর চিঠিপত্র আলমারীতে রেখেই গাড়ী নিয়ে সে বেরিয়ে যায় মুহূর্তে।

[ক্রমশঃ।

চাঁদের কলঙ্কের পরিমাণ !

বায়নাকুলার আর টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা গেছে, সম্প্রতি যে চাঁদের কলঙ্ক বা ক্রেটার'গুলির ব্যাস প্রত্যেকটির না হলেও বেশ কয়েকটিরই কিঞ্চিদধিক এক শত মাইল। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

তবুও কিন্তু এক সময় থামলো গাড়ীটা। হঠাৎ যেন ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা হতে।

একটু আগেকার চুপ করবার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল রঞ্জনা। উদ্বেগব্যাকুল স্বরে জ্ঞাসা করলে—কী হোল? হঠাৎ কেন থেমে গেলো গাড়ীটা? কিছু খারাপ হলো না কী?

রাস্তার বাঁ দিকে ঘেঁষে গাড়ীটা রাখলো সুজন। একলাফে নামলো গাড়ী থেকে। এতক্ষণে বোধকরি তারও মনে ভয় ঢুকেছে। বিবর্ণ হয়ে উঠেছে মুখটা।

ইঞ্জিনের বনেটটা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো বার বার গাড়ীটা একটু গর্জ্জে উঠলো, কেঁপেও উঠলো দু'-একবার। কিন্তু চালু হল না।

রঞ্জনা এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ী। সে শুধু দারুণ উদ্বেগে তাকিয়ে ছিল সুজন আর তার গাড়ীর গতিবিধির পানে।

বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। সেই কোন সকালে খেয়ে দেয়ে হোটেল থেকে রওনা হয়েছে ওরা। সারাদিন আর খাওয়া দাওয়াও হয়নি ভালোমত।

গাড়ীতে কিছু বিস্কুট আর মিষ্টি ছিল, তাই খেয়েছে একটু। সমস্ত দিন মোটরে বসে বসে বেজায় ক্লান্ত লাগছে শরীর তার ওপর এ কী বিপদ? ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় রঞ্জনার। বলে—কী রকম বুঝছো? চলবে তো? তা না হলে কিন্তু ভয়ানক মুস্কিল হবে এই মাঠের মধ্যে।

সুজনই কী বোঝে না তা। ইঞ্জিনের ভেতর প্রায় অর্দ্ধেকটা শরীর গলিয়ে দিয়ে ঝুয়ে পড়ে সেটা মেরামত করবার চেষ্টা করে সে।

রঞ্জনাকে বলে—ষ্টার্টটা টেনে থাকো না হয় সরে এসে ডান পা দিয়ে এ্যাক্সিলেটরটায় চাপ দাও জোর করে কিন্তু দু'জনকার মিলিত প্রচেষ্টাতেও কাজ হয় না বিশেষ। ক্লান্ত সুজন ইঞ্জিনের কালিলাগা ময়লা একটা কাপড়ে হাতটা মুছতে থাকে ঘষে ঘষে। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বলে—নাঃ এ আমার দ্বারা হবে না দেখছি। মিস্ত্রি ডেকে আনতে হবে।

—এ্যাঁ? কী হবে তাহলে? আমি এই মাঠের মধ্যে একলা গাড়ীতে বসে থাকতে পারবো না তার চেয়ে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

—পাগল? তুমি কোথায় যাবে? তোমায় নিয়ে কী তাড়াতাড়ি রাস্তা হাঁটা যায়? তার চেয়ে বরং দেখি আশে-পাশের কোন বাড়ীতে তোমায়—এই রাস্তায় আমার একজন চেনা লোকের বাড়ীও ছিল। আগে কয়েকবার এসেও ছিলাম সে বাড়ীতে।

রঞ্জনা এ পাশে ও পাশে তাকিয়ে বলে, কৈ মাঠের মাঝখানে ওই লালরংয়ের বড় বাড়ীটা ছাড়া আর তো কোন বাড়ীই নেই এখানে?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সুমুখের একটা বাড় দেখিয়ে দেয় রঞ্জনা। বলে—ওই যে ওই বগেনভেলিয়া গাছটা উঠেছে বাঁশের গেটটার ওপরে। বাঁদিকটায় আউট হাউস—দেখতে পাচ্ছো না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই তো মনে হচ্ছে ওদের বাড়ী। অনেক দিন আসিনি তো? তুমি একটু বসো গাড়ীর ভেতর। আমি একবার দেখে আসি কে আছে না আছে বাড়িতে

রঞ্জনাকে বসিয়ে সুজন চলে যায় বাড়ীর ভিতর।

বাধ্য হয়ে বসে থাকতে হয় রঞ্জনাকে। তার ছোট হাতঘড়িটায় চারটে বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। শরীরটা অবসন্ন সত্যি কিন্তু মনটা তার চেয়েও অনেক বেশী বিপর্য্যস্ত।

এখানে এই অপরিচিত বাড়ীটায় কতক্ষণ একলা থাকতে হবে কে জানে

একটু পরেই সুজন ফিরে এলো। বললে—আমি সব বলে ক'য়ে এসেছি। সিঙ্গীরা কেউ নেই এখানে। থাকলে আর মিস্ত্রি ডাকবার জন্যে ব্যস্ত হতে হতো না আমায়। ওরাই লোকজন দিয়ে ঠিকঠাক করে দিতো গাড়ীটা। যাই হোক ওদের দ্বারোয়ান, চাকর, নায়েব, গোমস্তা সবই আছে বাড়ীতে। তোমার কোন ভাবনা নেই। তুমি ওপরে চলে যাও। ওখানে গিয়ে একটু অপেক্ষা করো। আর হ্যাঁ, আমার যদি আসতে একটু দেরী হয় তাতে ব্যস্ত হয়ো না। দেখছো তো কাছাকাছি বসতি নেই। আমাকে হয়তো একটু দূরে যেতে হবে মিস্ত্রি আনতে।

রঞ্জনা ভয় পেয়ে সুজনের একটা হাত চেপে ধরে। বলে—সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে এসো কিন্তু। একা-একা অচেনা ওই দ্বারোয়ান-চাকরগুলোর কাছে আমায় বসিয়ে রেখে খুব বেশী দেরী করো না যেন।

—না না সে ঠিক হবে'খন। বলে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিয়ে রঞ্জনাকে নেমে পড়বার ইঙ্গিত করে সুজন। তারপর গাড়ীর পিছনে ক্যারিয়ারের চাবি ঘুরিয়ে রঞ্জনার স্যুটকেশটা হাতে তুলে নেয়। বলে—চলো তোমায় গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি একটু।

রঞ্জনা বলে—কিন্তু স্যুটকেশটা আবার কেন নামাচ্ছো গাড়ী থেকে? ওটাকে নিয়ে এখন আমি কী করবো?

যদি দরকার হয়। বাথরুম টাথরুম সবই তো রয়েছে এখানে। অকারণে কেন শুকিয়ে বসে থাকবে? কাপড়

জামা ছেড়ে একটু বিশ্রাম করো। সারাদিনই তো ঘুরেছো। বলতে বলতে গেটের কাছে এসে দাঁড়ায় ওরা দু'জন। ওদের পদশব্দে একজন দ্বারোয়ান বেরিয়ে আসে ফুলগাছের ডাল সরিয়ে। বলে—আইয়ে আইয়ে সাব্।

সুজন বলে—নেহি রামভকত, হাম আউর অন্দর নেহি যাউঙ্গে। তুম মেমসাব্ কো লে যাও। ফজিরসে টহলকে উনকো বহুত তং লাগগিয়া।

ওর কথায় বাধা দিয়ে রঞ্জনা বলে—তুমিও ভেতরে চলো না বাপু একবার। একটু জিরিয়ে নিয়ে যেও খ'ন মিস্ত্রি ডাকতে।

—না না আমায় আর দেরী করিয়ে দও না। আমি যাই—তুমি ভেতরে যাও—

বাইরের ওই দ্বারোয়ানটার সামনে আর বিশেষ কিছু বলতে পারে না রঞ্জনা। সংকুচিত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় সামনের দিকে, চার-পাঁচ পা গিয়ে আবার পিছু ফিরে তাকায়—বোধহয় সুজনকে আবার একবার দেখতে চায়। কিন্তু গেটের কাছে ভেতরে বাইরে কোনখানেই সে দেখতে পায় না সুজনকে। রঞ্জনাকে এই নর্বান্ধব পুরীতে রেখে তারই কী নিশ্চিন্ত আছে? সম্ভবতঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে মিস্ত্রি ডাকতে গেছে সে।

বাড়ীটার সামনের দিকে বেশ খানিকটা জমি। একখানা মোটর যাবার মত চওড়া কাঁকর-বিছানো রাস্তা, মধ্যখানে ঘাসের সার্কেলটাকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে।

আর ঐ ঘাসের গোলাইটার ওপরে ফোটা দু'-চারটে হালকা ফুল নিপুণ কারিগরের হাতে বোনা কার্পেটের মত সুন্দর লাগছে পশ্চিমে ঢলা সূর্য্যের ঝিকিমিকে আলোয়।

অন্য সময় হলে রঞ্জনা এমন একটা জায়গায় এসে একটুক্ষণ দাঁড়াতো। মুগ্ধদরদীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করতো আশপাশের সৌন্দর্য্য।

পড়ন্ত বেলায় এই নির্জন সুন্দর বাড়ীটার একটা আলোকচিত্র তুলে নিতো নিজের মনের মধ্যে।

কিন্তু এখন তার সে মেজাজ ছিল না। সারাদিনের পথশ্রান্ত অবসন্ন শরীরটাকে নিয়েও হয়ত কিছুটা আনন্দ করা যেতো মনের উৎসাহটা অক্ষুণ্ণ থাকলে।

কিন্তু আজকের মনটা তার সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে সুজনের মোটরটার ঐ আকস্মিক ইঞ্জিন-বৈকল্যে।

তার ওপর সুমুখের ঐ যমদূতপ্রমাণ দ্বারোয়ানটা তাকে যে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়েও যথেষ্ট ভয় করছিল তার। গা ছমছম করছিল রীতিমত। সিঁড়ির গোড়াটায় গিয়ে তাই সে থমকে দাঁড়ালো একটু। বাইরের চেয়ে বাড়ীর ভেতরটায় অনেক বেশী অন্ধকার জমেছে। বলা বাহুল্য, এখানে ইলেক্ট্রিক নেই।

তাছাড়া বাইরের আলো নিঃশেষ হবার আগেই এদিকে ঘরের কোণে আঁধার জমে ওঠে। তাই ঘরে পা দেবার আগেই ঘরে রাত্রিবাসের ভাবনাটা বেশী করে মনে আসে রঞ্জনার।

—উঃ, কী বিপদেই সে পড়লো সে আজ।

—আইয়ে মেমসাব। উপরমে আপকা কামরা ঠিক হায়। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দ্বারোয়ান ওকে বিশ্রাম করবার মত আস্তানা দেবার ভরসা দেয় বোধ হয়।

কী-ই বা করবে রঞ্জনা। বাধ্য হয়ে উপরতলায় উঠে আসে

দারোয়ানটার পিছু পিছু। এ বাড়ীর ডিজাইনটা অনেকটা আগেকার কালের বাড়ী মত। বারান্দার কোলে বড় বড় ঘর।

প্রথম ঘরটা সোফাকৌচ দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে দামী দামী বাতিদান। টেবিলের উপর স হু সাজানো একরাশ ফুলেরও অভাব নেই।

কিন্তু সে সমস্ত জিনিসকে ছাপিয়ে যে দুটি জিনিস সর্বপ্রথম ব্যক্তি-নির্বিশেষে চোখের উপর আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা রাখে সে দু'খানি দুটি নগ্নগাত্রিকা বিদেশিনীর তৈলচিত্র। তাদের লজ্জাবিজড়িত ভঙ্গীমাটুকু চিরন্তন, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শিল্পীর অঙ্কনমাধুর্য্যে তারা কতটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—সোজা চোখে তাকিয়ে তা বিচার করবার মত সৎসাহস রঞ্জনার অন্তত ছিল না।

তাই চোখ নামিয়ে দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল রঞ্জনা। ভিতরে ঢুকতে রীতিমত দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল মনটা। কিন্তু স্যুটকেশ হাতে দারোয়ান ভিতরে ঢোকায় তার আগমনবার্তা বোধ হয় ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে আহ্বান জানাতে ঘরের ভিতর থেকে একজন ভদ্রলোক শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন দ্বারপ্রান্তে। বললেন—আসেন, আসেন রোঞ্জনা দেবী। ইধানমে কেনো দাঁড়িয়ে আসেন? ভিতরমে আইসেন। বসেন ইধারে।

রঞ্জনা বুঝতে পারে—ইনিই গৃহস্বামী। অথচ সুজন যে বললে—বাড়ীর কেউ নেই বাড়ীতে শুধু লোকজন আছে। তবে?

হয়ত লোকজনদের মুখে ভুল খবর পেয়েছে সুজন। কিন্তু তাহলে রঞ্জনার নামটা ইনি জানলেন কি করে?

যাই হোক, অত ভাবনার সময় ছিল না। হাত তুলে একটা সৌজন্য নমস্কার করে রঞ্জনা। বিনীত কণ্ঠে বলে—দেখুন আমাদের মোটরটা এই রাস্তার ওপর খারাপ হয়ে গেছে। ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি আমরা তাই—

হাঁ হাঁ, ও সোব তো হামে জানে। ওর জন্তে আপনি কেনো ঘাবড়াচ্ছেন? ও সোব ঠিক হোয়ে যাবে।—কথার শেষে রঞ্জনার নমস্কারের প্রতিদানে হাত দু'টি তুলে বুকের কাছে জোড় করলেন ভদ্রলোক।

রঞ্জনা লক্ষ্য করলো, ভদ্রলোকের হাতে প্রায় গোটা দুয়েক আংটি। তার জহরতগুলোর আকার দেখলে মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করবারও সাহস থাকে না।

যাই হোক ভদ্রলোক সসম্মানে রঞ্জনাকে নিয়ে এলেন ঘরের ভিতর। সেখানে আরও একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে। চেহারাটা তাঁর ভিন্ন ধরণের হলেও তিনি যে এই ভদ্রলোকেরই সমগোত্রীয় তা বোঝা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

ছবিগুলোর দিকে পিছন ফিরে একটা চেয়ারে বসলো রঞ্জনা। ওগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করেই তার কর্ণমূলে আগুনের ছোঁয়া লাগছে। দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পূর্ণবয়স্ক ভদ্রলোকের সামনে সেদিকে চোখ তুলে চাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

ওঁদের মধ্যে প্রথম জন ততক্ষণে হাঁকডাক সুরু করে দিয়েছেন—এ হরবিলাস, এ শিউচরণ চা লে আও। টোষ্ট মাখ্খন ওউর দোঠো এগ-পোচ। জলদি ভেজ দেও।

রঞ্জনা অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে। ওদের এ-হেন উগ্র খাতির গ্রহণ করতে। কিন্তু উপায় কী?

দু'-একবার বলবার চেষ্টা করে—কেন আমার জন্তে আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন? মিছিমিছি অসময়ে এসে—

কুছ নেহি, কুছ নেহি। আপনার লিয়ে ইয়ে কুছ না আছে। গরীবখানায় যোখন আইলেন দোয়া করে—থোড়া বহুত আরাম তো করনা চাই।

এর পর আর কী বলবে রঞ্জনা। তাকে চা' টোষ্ট 'না খাইয়ে ওঁরা যখন কিছুতেই ছাড়বেন না তখন তাকে খেতেই হয় বাধ্য হয়ে। অবশ্য খিদেটাও তার বড় মন্দ পায় নি।

খাওয়া দাওয়ার পরে ছাদের দিকে একটি 'এ্যাটাচড বাথরুম দেওয়া সুন্দর ঘরে নিয়ে যান গৃহস্বামী। বলেন—সব আপনে আরাম কোরেন। আজ রাতমে ওঁর কোই আপনাকে ডিসটার্ব করবে না। ডিনার হামে ভেজবে। কাল সোকালে ফিন মোলাকাত হোবে। আচ্ছা?—

রঞ্জনা বলে—কিন্তু আমার হাসব্যাণ্ড তো এখুনিই এসে পড়বে।

কথাটা শুনে একটু যেন চুপ করে থাকেন উনি। তারপর বলেন—আপ শোচিয়ে মাত। মি: মিশ্র আসলে হামি নিজে তাঁকে সোঙ্গে করে লিয়ে আসবো আপনার কাছে।

গৃহস্বামী বিদায় নেন। রঞ্জনা গা ধুয়ে আসে বাথরুম থেকে। খানিকটা বিশ্রাম করে। তারপর এক সময় রাতের খাবার খায়। কিন্তু তখনও সুজন আসে না। অপেক্ষা করতে করতে খানিকটা ঘুমিয়েও পড়ে রঞ্জনা সমস্ত দিনের পথক্লান্তিতে।

আবার ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানার ওপর। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে বাইরে গাড়ী সারাবার মত কোন আওয়াজ শোনা যায় কী না?

কিন্তু কৈ? চারিপাশের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে একমাত্র ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই তো শোনা যায় না। ঘরের জানলাগুলো মস্ত বড় বড়। তার গরাদে ধরে কতক্ষণ বাইরে গেটের সামনেটা দেখার চেষ্টা করে রঞ্জনা, ঘরের মোমবাতিটা হাতে করে আলো ফেলতে চেষ্টা করে চোখের সামনেটা।

কিন্তু কোন উপকারেই লাগলো না মোমবাতির আলো। বাইরের বাতাস লেগে শুধু তার শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠে বার-বার। ধরে থাকতে থাকতে গরম মোম গড়িয়ে এলো হাতের ওপর। কিন্তু অন্ধকারের বিন্দুমাত্র ফিকে হয় না তাতে।

হঠাৎ মনে পড়লো স্যুটকেশের ভেতরে রাখা টর্চটার কথা। তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা টেবিলে রেখে স্যুটকেশটার ভেতর হাতড়াতে লাগলো রঞ্জনা। একে অন্ধকার ঘর—তাতে আ[illegible] বাক্সটা আজ সুজন গুছিয়ে দিয়েছে সকালে। তাই টর্চটা খুঁজে পেতে রঞ্জনার বেশ একটু অসুবিধা হয় আজকে। তবু শেষ পর্যন্ত মোমবাতি আলোর সাহায্যেই টর্চটা খুঁজে পায় রঞ্জনা। স্যুটকেশের ছিটকিনিতে হাতটা একটু ঘসড়ে যায় এই যা। বাঁ হাতে [illegible] হাতের কনুইটায় হাত বুলিয়ে আবার জানলার কাছে ছুটে যায় রঞ্জনা। টর্চের আলো ফেলে গেটের বাইরে।

কিন্তু কই? কিছুই তো নজরে পড়ে না?

ছোট্ট আলোকবিন্দুটা অন্ধকারের মহাসাগরে নিজেকে হারিয়ে ফেললো যেন।

গেটটা অনেক কষ্টে একটু আবছা মত দেখতে পেলো রঞ্জনা কিন্তু গেটের বাইরেটায় একটুও নজর পৌঁছালো না তার। আচ্ছা এরা গেটে তালা দেয় না কেন রাত্তিরে? বোধহয় বাগানের চারপাশে কোন উঁচু পাঁচিল নেই শুধু কাঁটাতারের বেড় দেওয়া বলেই আর গেটটায় তালা লাগায় না ওরা। বাড়ীর সদর দরজাটাই বন্ধ করে দেয় শুধু।

কিন্তু সুজন এত দেরী করছে কেন? যদিও রঞ্জনাকে এরা খুবই যত্ন করছে তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত কতকগুলো লোকের মধ্যে একা রাত্রিবাস করতে অস্বস্তি লাগে না রঞ্জনার? ভয় করে না মনে মনে

সুজনটার যদি এতটুকুও বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে। চিরকালটা বাইরে বাইরে থেকে কী রকম যেন যাযাবরের মত স্বভাবটা হয়ে গেছে ওর। কোনখানে স্থিতিও হতে পারে না আবার কোনখানে থাকতে অসুবিধাও বোধ করে না ও'। সুজন সঙ্গে থাকলে রঞ্জনাও তখন না হয় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় সব রকম পরিবেশে। কিন্তু আজ? আজকের পরিবেশ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা-ও কী সুজন বুঝতে পারলো না?

ভাবতে ভাবতে কখন ক্লান্ত রঞ্জনা আবার এসে বিছানায় শুয়েছে। টর্চ নিবিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই তা জানতে পারেনি।

ঘুম ভাঙ্গলো তখন সকাল হয়ে গেছে। শিউচরণ বেয়ারা বেড-টি এনে নক্ করছে দরজায়।

রঞ্জনা ওকেই জিজ্ঞাসা করে—শিউচরণ, কোই মোটর মেকানিক লেকে মিস্ত্রির সাব আভি আয়া নেহি কেয়া?

—জী নেহি মেমসাব। বলে চা নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল শিউচরণ।

রঞ্জনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যাবার সময়—যে ছাদের একখানি ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে—সেই ছাদে আসবার কোলাপসিবেল গেটটায় চাবি দিলো শিউচরণ।

রঞ্জনা চেঁচিয়ে বারণ করা সত্বেও সে ভ্রূক্ষেপও করলে না তার দিকে।

রঞ্জনা অবাক হয়ে যায়।—এ আবার কী ধরণের অসভ্যতা? রঞ্জনা কী জেলখানার কয়েদী? তাকে ওরা তালা দিয়ে রাখছে কেন?

এর জন্যে অবশ্য মোটামুটি ভাবে খুব বেশী অসুবিধা নেই রঞ্জনার। ঘরের পাশেই বাথরুম। তাই চা'টা খেয়ে স্নান করতে গেল রঞ্জনা। ঠিক করলো—গৃহস্বামী, অর্থাৎ সেই যে বলরামজী না কী যেন নাম ভদ্রলোকের তার সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করবে তাকে তালা দেওয়া হয়েছে কী কারণে?

স্নান সেরে পরিষ্কার একখানি কাপড় পরে তার আপাত কর্তব্য সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করছিল রঞ্জনা। এমন সময় দ্বিতীয় বেয়ারা হরনারাণ এসে বললে—বড়া হুজুর সেলাম ভেজা। ছোটা হাজরী লাগা দিয়া।

স্লিপারটা গলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হরনারাণের সঙ্গে সেই বাইরের ঘরটায় এলো রঞ্জনা।

বিরাট এক ব্রেকফাস্টের আয়োজন সাজিয়ে ওঁরা তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তবে সে প্রাতরাশ একা রঞ্জনারই। ওঁদের বোধ হয় সে পর্ব আগেই চুকে গেছে। রঞ্জনাকে সামনে বসিয়ে আদর আপ্যায়ন অনুরোধ উপরোধ করে খেতে বসালেন ওঁরা। কিন্তু খাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ পাবার মত মনের অবস্থা তখন নেই রঞ্জনার।

—সারারাতে সুজন কেন ফেরে নি! তার কী হল? কী করে রঞ্জনা তার তল্লাস করবে, এই সব চিন্তাতেই মনটা তার ডুবে আছে একেবারে।

অবশ্য খেতে না পারার আরও একটা কারণ ছিল সেটা সঠিক ব্যাখ্যা তখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি রঞ্জনা, আজ বুঝতে পারে ওদের ব্যবহার বা আতিথেয়তা যত ভদ্রই হোক, তবু ওদের চাউনিতে এমন একটা বিশ্রী ভাবের আভাস ছিল যা রঞ্জনার সর্বাঙ্গে একটা দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি করে তাকে বিব্রত করে তুলেছিল বার বার।

তাই ওদের শত অনুরোধ উপরোধ সত্বেও সুস্থ ভাবে খেতে পারে না রঞ্জনা। একটু ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করে—আচ্ছা সহর তো এখান থেকে খুব একটা বেশী দূর নয়, তবে কেন এত দেরী হচ্ছে মিস্ত্রি আনতে?

ওরা ওর প্রশ্ন শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না—কেমন যেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে

গৃহস্বামী সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন, আজ তো আপনার মিজাজ আর শরীর বিলকুল ঠিক হোয়েছে না রোঞ্জনা দেবী। তব খানাপিনা করে লিয়ে হামাদের একঠো গান শুনাইতে হোবে আপনাকে। দোয়া করে আপনি নারাজ হোবেন না।

কথার শেষে ওরা যেন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, কী একটা কথা বলাবলি করে কানে কানে।

তারপর অন্য জন বলতে থাকেন—আপনে তো ড্যান্স ভি বহুত ভালো জানেন। তা একঠো ড্যান্স ভি আজ হোবে ইখানে। আপনার ড্যান্স হামি লোগ দেখেছে। দু' তিন বার আপনার বাস্তে আপনার কোলেজের চ্যারিটি শোমে টিকিট কিনলাম হামরা। লেকিন আজ এহি বাড়ীশে একঠো ড্যান্স হোনা চাই। কী বলো বলরাম ভাইয়া। তোমহার মতলোব কী বোলে ?

রঞ্জনা চটে যায়, অপমানবোধ করে। বলে—দেখুন আমার মন-মেজাজ এখন ঠিক নেই। ও'সব কিছু এখন ভালো লাগছে না। আমার স্বামী মানে আমার হাজব্যাণ্ডকে আসতে দিন, তারপর এক সময় হবে'খন।

ওর কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলো দু'জনে। তারপর সেই চিমনলাল বলে রোগামত লোকটা বললে—হাজব্যাণ্ড ? কোন হ্যায় ও ? ও—হামাদের হারেলাল—মানে, সুজোন বাবু ? আরে না না ও আর আসবে না। ও তো কাল বিকালবেলাতেই চলে গেছে গাড়ী নিয়ে। আর কেন আসবে ও ? ওর কাম খোতম হয়েছে।

রঞ্জনা ভীষণ অবাক হয়। বলে—এ সব কী বলছেন আপনি ? আপনার কোন কথার মানেই আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা তার বন্ধুলোক, আপনাদের উচিত তার কেন আসতে দেরী হচ্ছে, লোক পাঠিয়ে তার খবর নেওয়া। তা নয়—

—মিছে কেনো মনে কোষ্ট করছো রোঞ্জনা দেবী ? সুজনকে বাস্তে আর মাথা ঘামিয়ো না তুমি। ও' তুমহার কোই নেহি। যতো গয়না শাড়ী জামা দিলো সে সোব কুছ্ ওর নেহি। সোব হামিলোগ ভেজেছি। ও' কী দিবে ? ও তো একটা দালাল।

—চুপ করুন আপনি। এ সব কী সুরু করেছেন এখানে ? সুজন আমার স্বামী। তার সম্বন্ধে একটা কথাও আপনাদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাই না।

—আ—হা। আপনি বিগড়াচ্ছেন কেন আমাদের কোতাটা আগে শুনে লিন। তুমহাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ধোঁকা দিয়েছে সুজোন। ও সব ঝুটা। পুরুত ভি পুরুত না কী নারাণ ভি নারাণ না। ও পোয়লা নম্বর চিটিংবাজ আছে একটা। লেকিন অভি তো হাম আউর হামকা এ দোস্ত মিঃ চিমনলাল তুমাকে মোর কুছ দেনে কা লিয়ে তৈয়ার হ্যায়। আভি ওর কোথা তুমি ভুলে যাও। এখোন থেকে তোমাকে এহি বাড়ীতে থাকতে হোবে।

ওদের কথার-ভাবভাষায় রঞ্জনা একেবারে বিমূঢ় হয়ে যায়। ওর গলার ভেতরটা অবধি শুকিয়ে ওঠে। তবু নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা হারায় না। সজোরে টেবিলটা ঠেলে চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী রকম ভদ্রলোক আপনারা ? আমাকে একা পেয়ে যা খুশী তাই বলে আমাকে অপমান করছেন ? সরে যান পথ ছাড়ুন, আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দিন। আর এক মুহূর্তও আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই।

ওরা হাসতে থাকে রঞ্জনার রাগ দেখে, তারপর চিমনলাল বলে উল্লেখিত সেই রোগামত বশ্রী লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, এ কেইসা বাত হ্যায় বিবিজান ? হামিলোক তুনো ফ্রেণ্ড তুমার কলেজ ফাংসানে তুমাকে দেখে অবধি দোশ হাজার রূপেয়া বেট লাগিয়েছি—খালি তুমার উপরে। হামি তো ভি কেতনা কোশিস করেছিলাম তবু পারেনি তুমাকে আনতে। হামি নিজে গিয়াছিলাম তোমার ফাদারের কাছে! লেকিন উনে তো আমার প্রোপোজালটা এ্যাকসেপ্টই করলেন না। তোখন বলরাম ভাইয়া কেতো বুদ্ধি করে তবে সুজোনকে পাঠালো। ও বহুত হুঁসিয়ার আদমি খুব কায়দা করে কাম হাসিল করলো। তুমহাকে বার করলো বাড়ী থেকে।

হঠাৎ বলরামজী বলে ওঠেন—হ্যাঁ ভাইয়া এবার ঠিক যো কাম ও করলো ও আর কোই পারতো না, লেকিন শেষের দিকে ও বহুত হ্যারাস ভি করলো আমাদের। পনরো দিনকা ভিতর রোঞ্জনা দেবীকে ইখানসে পৌঁছে দিবার কোথা দিয়ে দো মাহিনা রেখে দিলো খালি ফালতু বাত করে করে। তুম ভি তো জানো চিমন ভাইয়া শেষের পাঁচ-পাঁচঠো চিঠিকে ও শালে বদমাস কোন জবাবই দিলো না। খালি টাকা লে' আও—আউর টাকা লে' আও। আরে বেকুব দশ হাজার টাকার বাজাকা, মালমে হাম কেয়া বিশ হাজার রূপেয়া লাগায়গা ?

এবার রঞ্জনার দিকে একটু প্রেমিক প্রেমিক হেসে বলেন—লেকিন এখোন তুমহার লিয়ে ও কুছুনা। হামার তুমি জো কুছ ভি চাও—

—আমি কিছু চাই না আপনাদের কাছে। এভাবে আমাকে অপমান করবার কোন অধিকারই আপনাদের নেই। হতে পারে আপনাদের টাকা আছে কিন্তু টাকার জোরে মানুষের এ অধিকার জন্মায় না জানবেন। তাছাড়া আমি তো আপনাদের টাকার প্রত্যাশী নই। আপনারা মেয়ে চান—টাকা ফেললে অনেক মেয়ে পেতে পারেন। আমার ওপর এরকম অত্যাচার করবার মানে কী ?

—আরে টাকা দিলে মেয়ে পাওয়া যায় ও তো হামি জানে রোঞ্জনা দেবী। বাত তো ও হি হ্যায়। এ তো বাজার সে সওদা কোরবার চিজ নোয় ? ও সোব হামিলোক পছন্দ কোরি না। বাঙালী লেড়কীসে হামিলোককা ফ্যান্সি হ্যায়। আউর ও ভি ইমানদার ঘর কী হোনা চাই। এই—যেইসা হ্যায় তুম—বলতে বলতে রঞ্জনার বাঁ কাঁধে হাত রাখেন সেই চিমনলাল নামে উল্লেখিত লোকটি।

হাতটা ছুঁড়ে দিয়ে ছিটকে সরে আসে রঞ্জনা। সরে গিয়ে বলে—খুব সাবধান আপনি। যতটা পর্য্যন্ত এগিয়েছেন তার চেয়ে আর একপা' এগোবার চেষ্টা করলে আমি পুলিশ ডাকবে—সহজে ছাড়বো না।

ওদের ঘরের মধ্যে যেন মস্ত একটা রংতামাসার খেলা সুরু হয়েছে এমন ভাবে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো ওরা। বললে—না ন রোঞ্জনা দেবী, দোয়া করে ওই কাজটি করবেন না আপনে। শুনেই ভীষণ ডোর লাগছে আমাদের, আরে বাপ পুলিশ! আরে বাব এখুনি এলে শালালোক নগদা দোশটা টাকা সেলামী লিয়ে যাবে ওমন কাজটি কোরবেন না। তার চেয়ে তুমি কী চাও কী খেতে ভালোবাসো হুকুম করে দাও। হামি এখুনি লিয়ে আসবে।

এবার রঞ্জনা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এরা পুলিশকেও ভ

করে না একটু ? তবু মুখে সে ভাব ফুটতে দেয় না সে। সদম্ভ ভঙ্গীতে বলে—থাক্। আপনাদের কোন জিনিস স্পর্শ করবারও প্রবৃত্তি নেই আমার। দয়া করে শুধু এখন চলে যেতে আমায় অনুমতি দিন আপনারা—ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়ায় রঞ্জনা। গৃহস্বামী বলরামজী পথ আটকান। বলেন—কেন এত নারাজ হচ্ছো রোঞ্জনা বিবি সুজোনের চিঠ্যা দেখই মজে গেছো তুমি তা না হলে কী ওর আছে ...মান ? তাছাড়া ঘরে ওর ইস্ত্রী আছে—ছেলেপেলে আছে। তুমি তাদের চিঠি দেখবে ?

—যথেষ্ট হয়েছে। আপনারা যে কত বড় দুরাত্মা তা প্রমাণ করতে আর ছলচাতুর্য্যের দরকার হবে না। সুজনের বদনাম ছড়িয়ে আপনারা আমার মন জয় করতে পারবেন না—

—বদনাম ? ওঃ হো তুমি এখোনো বিশ্বোয়াস করো নাই যে সুজোন তোমায় ধোঁকা দিয়েছে ?—এই দেখো হামি ভি পুরি ব্যবসাদারী আদমি আছি। সোব জিনিসের ডকুমেণ্ট রেখে কাজ করি। বলতে বলতে একটা মোটা জাবদা ফাইল এনে প্রায় রঞ্জনার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেয় বলরামজী। বলেন—এটা লিয়ে আপনা কামরামে চলে যাও। পোড়ালিখা তো ওনেক শিখিয়েছো। খুব করে পোড়ে দেখো তারপোরে কী বোলো শুনা যাবে। বুঝে দেখো—হামাদের কেতনা টাকা তুমি খেয়েই লিয়েছো—আর তা ফিরে আসবে না। ফিরলেও হামিলোক লিবো কেন ? দাদন দেওয়া টাকা কী ফিরাতি হোয় ?

চিমনলাল বলেন—হাঁ হাঁ আপনা মনকে পুছো তুমহারই ও সুজোন হামারি পাওকা থাপরা হায় কী নেই ? আর ওই তো তোমাকে বিকে দিয়েছে। আর কী রোয়াব দেখাতে লাগছো তুমি ?

মাতালের মত টলতে টলতে সেই ফাইলটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে রঞ্জনা। নাঃ পালাবার কোন উপায় ছিল না। সে পা বাড়াবার আগেই ওরা কলিং বেল টিপে হরনারাণকে ডেকে দিয়েছে ওকে ওর ঘরে পৌছে দিয়ে আসবার জন্যে।

ঘরে পৌছে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কপাটের ওপর মাথাটা রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রঞ্জনা। সেখান থেকেই শুনতে পেলো কোলাপসিবেল গেটে চাবি দিয়ে যাচ্ছে ওরা।

রঞ্জনা ওদের বন্দী—ওদের ক্রীতদাসী।

ওদের আজ্ঞা মতন ওদের মনোরঞ্জন করাই তার বাকী জীবনের বাধ্যতামূলক কাজ।

উঃ, এ কোথায় এসে পড়লো রঞ্জনা ! কী করে নিষ্কৃতি পাবে এ দানব দুটোর হাত থেকে ? কিন্তু সুজন ? সত্যিই কী সুজন তাকে ইচ্ছা করে তুলে দিয়ে গেছে ওদের হাতে ?

ওরা তো বললো এই ফাইলটাই তার প্রমাণ। দেখা যাক, কোন রকমে বিছানার ওপর বসে ফাইলটার মলাট ওলটায় রঞ্জনা।

—এই তো সুজনের হাতের লেখা। এটা—এদের লেখা চিঠির কপি আর এই যে সুজনের লেখা উত্তর। সমস্ত মিলিয়ে থাকে থাকে সাজিয়ে রেখেছে ওরা। কিন্তু কেন ? রঞ্জনাকে

পাকাপাকিভাবে অপমান করবার অধিকার প্রমাণিত করবে বলে? কিন্তু এগুলো কী? একগাদা ক্যাশমেমো কিসের? চ্যাং ওয়াং নামে একটা চাইনীজ ডাইংক্লিনিং-এর বিল দেখছি যে—ও স্যুটভাড়া করার রসিদ। রঞ্জনাদের বাড়ী যে নিত্যনতুন স্যুট পরে সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে যেতো সুজন সেগুলো সবই তাহলে তার ভাড়া করা? আর ওগুলো কী? একটা পাতার ওপর আঠা দিয়ে লাগানো ট্রেণের আর সিনেমার টিকিটের কাটপিসগুলো মেরে তলায় একটা মোটা টাকার বিল করে দিয়েছে সুজন। সুজনেরই হাতের লেখা। সন্দেহের আর অবকাশ রইলো কোথায়?

একটার পরে একটা পাতা উল্টে যায় রঞ্জনা। আর অবাক-বিস্ময়ে উপলব্ধি করতে থাকে তার বিচিত্র ভাগ্যের বিড়ম্বনা। রঞ্জনার যাবতীয় কাপড় কেনার ক্যাশমেমো ব্লাউজের বিল, হোটেল-বাসের সমস্ত চার্জ এমন কী পাটনার সেই বিয়ে নামক প্রহসনটার যাবতীয় খরচ-খরচার ফর্দ্দ পর্য্যন্ত এই ফাইলটার ভিতরে উপস্থিত। এমন কী পেট্রলের বিলগুলো পর্য্যন্ত এদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে সুজন৷

অপিসের কাজ করার নাম করে মাঝে মাঝে সে কী এই কাজই করতে বসত—খাতাপত্তর সাজিয়ে?

উঃ, তাহলে কিছুই সুজনের নয়? সে শুধু রঞ্জনাকে পথে টেনে আনবার হংসদূত মাত্র? রঞ্জনার সর্বনাশ করবার সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়েই সে রঞ্জনাদের বাড়ীতে গিয়েছিল?

আর রঞ্জনা সেই ফাঁদে কেমন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে। কী অপরিসীম বিশ্বাসেই না আত্মসমর্পণ করলে তার কাছে!

রাণী হবার সাধ করে মালা পরালে ওই পেটমোটা কুচক্রীগুলোর গোলামের গলায়।

তাই তো ওদের চিঠিগুলোয় শুধু নির্দ্দেশ আর কৈফিয়ত তলবের উদ্ধত সুরে ভরা। আর তারই উত্তরে সুজনের খোসামোদের ভাষায় লেখা চিঠিগুলো পর পর সাজিয়ে রেখেছে ওরা। রঞ্জনার চোখে সুজনের স্বরূপ প্রকাশ করে দেবার জন্যে ওরা প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছে।

কেন বা রাখবে না? অন্যের টাকায় যার আকণ্ঠ ভর্তি, সেই সুজনকে যদি রঞ্জনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তুলে দিয়ে থাকে, তবে অন্য লোকে কেন তাকে পরিহাস করবে না?

উঃ, কি মতিচ্ছন্ন যে হয়েছিল রঞ্জনার! এ কোন্ দেশী আহাম্মকী যে করেছে সে!

সমস্ত দিনের ভেতর আর দরজা খোলেনি রঞ্জনা। একা বসে বসে সেই সর্বনাশা বিষপাত্রটাকেই সুমুখে রেখে পাতার পর পাতা উল্টে গেছে শুধু। নিজের ভুলের পরিমাণ খতিয়ে দিকহারা জীবনটার পরিণাম চিন্তা করে শিহরিত হয়েছে। আর? আর আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে সমস্ত দিন।

লাঞ্চটাইমে আবার এসেছিল ওরা। ওরা মানে ওদের চাপ্‌রাশী খান্‌সামারা। পঞ্চব্যঞ্জনের বাটি সাজিয়ে বহুবার ডাক দিয়ে বলেছিল—মেমসাব খানা তৈয়ার হো গেয়া। মেমসাব দরওয়াজা খুলিয়ে, খানা লে আয়া হুঁ।

রঞ্জনা সাড়া দেয় নি। দরজা খোলে নি।

সমস্ত দিনে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা কুটেছে—মিনতি করেছে তাকে মৃত্যুবর দেবার জন্যে। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করতে পারেনি। কারণ পালাবার চেষ্টা যে এক্ষেত্রে একান্ত নিষ্ফল তা সে বুঝেছিল।

তবু শেষ পর্য্যন্ত পালালেও কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

কৃষ্ণপক্ষ রাতে আকাশে যত কালি যত অন্ধকার ছিল সব ঝরে পড়েছে রঞ্জনার মাথার ওপরে—মসীলিপ্ত করে দিয়েছে রঞ্জনাকে।

...নিশীথরাত্রে তখন ওর ঘর থেকে ফিরে যাচ্ছে ওই বলরাম দোবে আর চিমনলাল।

দাদন দেওয়া টাকার উশুল করতেই এসেছিল ওরা কিম্বা ভেবেছিল হয়ত ডানা ভেঙে দিলেই পাখী খাঁচায় ঢুকবে।

রঞ্জনা ওদের দরজা খুলে দিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে এমনটি অবশ্য আশা করেনি ওরা। এসেছিল দরজার পাশে আট ফুট লম্বা যে জানলারূপী দরজা আছে সেইটা দিয়ে। বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল ওটা।

ঘর থেকে যাবার সময় আর তালাটা লাগায় নি ওরা। বোধহয় চাকরদের কারুকে পাঠাত তক্ষুণি। কিন্তু তার আগেই উঠে এলো রঞ্জনা।

হাতড়ে হাতড়ে উঠে দাঁড়ালো ছাদের পাঁচিলের মাথায়। তারপর নীচের দিকে কিছুমাত্র না দেখে লাফিয়ে পড়লো নীচেয়। যেখানে গিয়ে পড়লো রঞ্জনা সেটা একটা কাঁটাগাছের ঝোপ। হাত-পা কেটে ক্ষতবিক্ষত হলো কিন্তু মারাত্মক কোন আঘাত লাগেনি তার।

দাঁড়াবার সময় নেই, এক্ষুণি আবার ওরা খোঁজ করবে হয়ত কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়েই গেটের দিকে। তারপর গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায়।

বাড়ীর লোকজনেরা সম্ভবতঃ ঘুমুচ্ছিল। গৃহকর্তাদের এক সময় লাগছিল তাদের ডেকে তুলতে। সেইটুকু সময় কাজে লেগে গেল রঞ্জনার।

কতক্ষণ যে সে ছুটেছে হুঁস ছিল না তার। দশ মিনিট কি এক ঘণ্টা কী হয়ত দু'-চার ঘণ্টাই হবে তার জ্ঞান ছিল না।

ক্লান্তির পর্য্যন্ত কোন বোধ ছিল না শরীরে। কেন ছুটছিল কী চেয়েছিল সে? আত্মহত্যা করতে? ক্লেদাক্ত শরীরটার জ্বালা চিরকালের মত জুড়োতে চেয়েছিল কী আর তাই কী সে পথের ওপর ইচ্ছে করেই শুয়ে পড়েছিল? মোটরের আওয়াজ শুনেও সরে যায়নি পথ থেকে? না কী মাথার ভেতরটাই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল? মোটর আসছে বুঝেও সুমুখ দিক থেকে বে বিপদের সম্ভাবনা স্মরণে আসেনি তার? শুধু মনে ছিল পিছন থেকে কারা যেন তাকে তাড়া করেছে—পালাতে হবে।

তারপর আর জানে না রঞ্জনা। কে ছিল গাড়ীর ভিতর? ক বা তারা ব্রেক কষ্‌লো—রঞ্জনাকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছে স্থানীয় হাসপাতালে।

জ্ঞান হবার পর প্রথম কয়েক দিন সত্যিই নিজের নামধাম কিছু মনে ছিল না রঞ্জনার।

পরে অবশ্য মনে পড়েছিল—তবু বলেনি।

নতুন করে আর ফিরে আসতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না তার। আসতে হল। হাসপাতালের জিজ্ঞাসার তাগিদে বলতে হল নিজের নাম-ঠিকানা।

তাছাড়া বাবা আর মা'র স্নেহচ্ছায়া ছাড়া আর কারো কথা ভাবতেও ভালো লাগছিল না যে।

কিন্তু তাই বা পেলো কৈ রঞ্জনা? মা-ও যে ছেড়ে চলে গেল তাকে। রঞ্জনার জীবনের এত বড় লাঞ্ছনা সহ্য করবার মত ক্ষমতাই আর ছিল না যে তাঁর শরীরে। কিন্তু রঞ্জনাকে আর কত দিন এ লাঞ্ছিত জীবনটার ভার বইতে হবে কে জানে?

—মা গো, তোমার মত তোমার রঞ্জনা যদি এত সহজে নিষ্কৃতি পেতে পারতো। তুমি কী পারো না মা তোমার খুকীকে তোমার কাছে ডেকে নিতে? এ জীবনটা যে কত দুঃসহ কত দুর্বহ হয়ে উঠেছে তুমিও কী তা বুঝতে পারো না মা?

—বাবা পুরুষমানুষ, তাঁর মনের গঠনটাই আলাদা, তাঁকে কী করে একথা বোঝানো যায়, তার পক্ষে তো এ পরাজয়ের গ্লানিটুকু মুছে ফেলে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কী তা পারবে শেষ পর্যন্ত?

বলো না মা, তুমি বলে দাও। তুমি না বলে দিলে কে এ সময় রঞ্জনাকে পথ বলে দেবে?

হিমাদ্রি? হিমাদ্রি আজও রঞ্জনাকে চায়? সত্যিই কী সে মনে মনে আজও রঞ্জনার আশাপথ চেয়ে আছে? নয়ত কী? কেন সে আজও আসে রঞ্জনাদের বাড়ীতে?

—রঞ্জন! রঞ্জন? ও কী মা একা শুয়ে শুয়ে তুই অমন করছিস কেন? চোখ-মুখ অমনতর কেন লাগছে তোর? শরীর খারাপ কী?—পরমেশবাবুর ডাকে চেতনা ফিরে এলো রঞ্জনার। নিজের মনের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে। চিন্তার গোলকধাঁধায় পড়ে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। বিছানার ওপর এবার আস্তে আস্তে উঠে বসলো রঞ্জনা। ওর চোখমুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে।

ওর চেহারার অবস্থা দেখে পরমেশবাবু জল গড়িয়ে আনেন কুঁজো থেকে। বলেন—খেয়ে নে। চোখে-মুখে জল দে একটু। শান্ত হ' মা!

রঞ্জনা জল খায়। ঘাড়ে মাথায় জল দেয় একটু। তার পর কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে—আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম বাবা! আমার কাছে একটু বসো তুমি। কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

পরমেশ বাবু বলেন—কী কথা রে? এমন কী কথা তুই বলবি আমায়?

একটু চুপ করে থাকে রঞ্জনা। তারপর বলে—আমি সব শুনেছি। হিমাদ্রিকে তুমি যা বলছিলে। কিন্তু কেন বাবা! এর কী বা দরকার ছিল?

—কে? কে বললে তোকে? ওই ভজা ব্যাটা বুঝি? দেখ না ও শালার আমি কী দাওয়াই দিই।

—না বাবা মিথ্যে তুমি রাগ করছো। ভজাদা' আমায় কিছুই বলেনি। আমি নিজের কানেই শুনেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি এ কাজ তুমি কেন করলে? তুমি তো জানো এ আর সম্ভব নয়। কেন মিছিমিছি একটা—

—কে বলেছে সম্ভব নয়? হিমাদ্রির সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দেবই। আমার ওপর একটাও কথা বলবি না তুই।

—কেন তুমি মিথ্যে এমন আশা করছো বাবা? কেন হি... আমায় বিয়ে করবে? আর সে করলেই বা আমি করবো কেন?

—কেন করবি না শুনি? তোর কী হয়েছে? একটা ... প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে নিজের সারাজীবনটা নষ্ট করবি না কী? কতকগুলো বাজে কথা কয়ে নিজের মেজাজ খারাপ কর... ভেবে দেখ দেখি সমস্ত জীবনটা তোর বাকী এখনও—

—থাকলেই বা বাকী। এই তো আমি দিব্যি আছি তো... কাছে। এই রকম করেই তো বেশ স্বচ্ছন্দে আমার জী... কাটিয়ে দিতে পারি।

—দূর পাগলী! আমি কী চিরকালই বেঁচে থাকবো... আমার যে দিন ঘনিয়ে আসছে—যেতে হবে না আমায়? এই ভা... শরীরে আমি কতদিন তোকে আগলে নিয়ে বসে থাকবো ব... আমি চলে গেলে মাথার ওপর একটা কেউ নেই। কী নিয়ে এ... তুই থাকবি তখন?

—একটা চাকরী নেব। যে কোন স্কুলের বোর্ডিংয়ে থে... টিচারী করবো। কিম্বা নার্সিং শিখে নেবো—তেমন করেও তো ক... মেয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় বাবা! বিয়ে করা ছাড়া যে আর কোন পথ খোলা নেই, এমন কথা তুমি ভাবছো কেন?

—যারা বিয়ে না করে মাষ্টারী করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, তু... তাদের সঙ্গে এক নো'স্ রঞ্জন। মিথ্যে কতকগুলো অবাস্তব চিন্ত... করিসনি। দুনিয়াটা এত কী সোজা রে? এখনও এ পৃথিবীটাকে একটুও চিনতে পারলিনে তুই? আমার অবর্তমানে কোথাও চাকরী করে জীবিকা নির্বাহ করা অন্তত: তোর পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে যে পথেই যাবি, তোর ওই রূপই তোকে বিপদে ফেলবে। পদে পদে পথে নামাবে টেনে। জঞ্জাল জোটাবে। মোটে তো একটা বিভীষিকা দেখেই তোর শরীর ভেঙেছে কিন্তু অমন কত বিভীষিক... যে সংসারে পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে তার কোন কল্পনা আছে তোর? ও সমস্ত বাজে কথাগুলো তুই ছেড়ে দে খুকী! শুনেই যখন ফেলেছিস তখন নিজেই ভালো করে বুঝে দেখ দেখি হিমাদ্রিকে মেনে নেওয়াই তোর পক্ষে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মঙ্গলকর নয় কী?

—কিন্তু বাবা এ যে পাপ। আমাকে একজন ঠকিয়েছে বলেই আমি অন্যকে ঠকাতে পারি না।

—পাপ? কিসের পাপ? আমি বলছি এতে তোর কোন পাপ নেই। আর যদিই বা এ অন্যায় হয়, অধর্ম হয়, তবে তার শাস্তি আমি নেবো। এই আমি তোর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলছি তোর সমস্ত অপরাধ সমস্ত পাপের বোঝা মাথায় তুলে নেবো আমি। তুই নিশ্চিন্ত হ'। নিজের মনটাকে স্থির করে নে। নিজের জীবনটাকে একটা নিরাপদ আশ্রয় পেতে দে। তোকে এমন মনমরা দেখে আমি কি করে থাকি বল্? তোর দিকে যে আমি আর তাকাতে পারিনে মা!—তা ছাড়া আমি তো তোকে অপাত্রে দিতে যাচ্ছি না! হিমাদ্রিকে আমি আগে যতটা চিনতাম, এখন তার চেয়েও বেশী চিনেছি রে। ও যে কতটা খাঁটি সোনা, দুঃখের দিনেই তা ভালো করে যাচাই হয়ে গেছে। এমন সোনা ফেলে মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের এত দুর্গতি হোল। তুই ওকে আর দুঃখ দিসনে মা! আমি জানি, ও সত্যিই আজও তোকে ভালোবাসে।

পরমেশ বাবুর বুকের কাছে মাথাটা রেখে অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে রঞ্জনা। তারপর ধীরে ধীরে বলে—এবার তুমি শুতে যাও বাবা। আমার বড় ঘুম পেয়েছে।

অনেক দিন পরে বিকেলবেলায় বেশ খুশী খুশী মেজাজে কলঘর থেকে স্নান করে এলো হিমাদ্রি। ভিজে গায়ের ওপর তোয়ালেখানা জড়িয়ে নিয়ে আয়নার সুমুখে এলো, দাঁড়ালো চুল আঁচড়াতে। অনেক দিন পরে আবার যেন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো নিজের সঙ্গে। সহজ ভাবে চোখ তুলে তাকালো নিজের দিকে। তারপর লঘুহস্তে একটু প্রসাধন সেরে নিয়ে ধোপভাঙ্গা একখানা কাপড় পরে তৈরী হল রঞ্জনাদের বাড়ী যাবার জন্যে।

আজ বেলা তিনটে নাগাদ এই শুভযাত্রার আয়োজনের একটা বড় পর্ব চুকিয়ে নিয়েছে সে। নিদ্রাবীর দীনেশচরণকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিজের গাড়ীখানা ধুইয়ে নিয়েছে ঝকঝকে করে। বাকী শুধু নিজের প্রস্তুতি।

—আচ্ছা রঞ্জনা কিছু জানে না, না? হিমাদ্রির সাথে তার বিয়ের সম্বন্ধে পরমেশ বাবু তাকে কিছু বলেননি।—ভালোই হয়েছে। হিমাদ্রি নিজেই ওকে বলবে। যেমন করেই হোক ওর সম্মতি আদায় করে নেবে। অনুনয় করে বলবে—রঞ্জনা, এবার আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। তোমার কোন আপত্তি, কোন অজুহাত আর আমি শুনবো না। মিছিমিছি কত দেরী হয়ে গেল, বল তো? তুমি যাওনি বলে আমাদের বাড়ীটাই যে কত প্রাণহীন হয়ে আছে তা কি তুমি বুঝতে পারো না? মায়ের কথা ভেবে ইতস্তত: করছো? না না, মা এখনও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন তোমার জন্যে। আর অন্য সব কিছু আমি ঠিক মানিয়ে নেবো'খন।···তুমি শুধু চলো। জামাটা গায়ে চড়িয়ে আবার আয়নার দিকে তাকালো হিমাদ্রি।

—যাবার আগে মাকে একটা প্রণাম করে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বড্ডো লজ্জা করছে যে। মা'ই বা কী ভাববেন? এমনতর সেজেগুজে গিয়ে দাঁড়ালে—

আবার গায়ের থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে ফেললো হিমাদ্রি। ধুতির ওপর শুধু গেঞ্জিটা পরে নিয়ে মায়ের ঘরে এসে দাঁড়ালো সে। মেঝেয় বসে একটা থালার ওপর সুপারী কেটে কেটে জমা করে রাখছিলেন সুধাময়ী।

অনেক দিন পরে হিমাদ্রি যখন কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে একটা প্রণাম করে বসে পড়লো পাশটায়, তখন প্রথমটায় তিনি অবাক হয়ে তাকালেন একটু।

কিছুদিন ধরে তাঁর প্রতি হিমাদ্রি যে অনাসক্ত ভাব দেখিয়েছে তাতে করে তাঁর মনেও যে একটু অভিমানের মেঘ জমেনি তা নয়।

তবু আজ এই অবেলায় হিমাদ্রি যখন এসে তাঁর পাদস্পর্শ করলো তখন অনেকটাই যেন নরম হয়ে এলো মনটা।

হিমাদ্রির চিবুকস্পর্শ করে মৃদুচুম্বন দিয়ে বললেন—পাগল ছেলে। হঠাৎ বিকেলবেলায় এসে আমায় পেন্নাম করছিস কেন রে?

তারপর হিমাদ্রিকে এক মুহূর্ত্ত দেখে নিয়ে বলেন—কোথাও বেরোবি বুঝি?

মাথাটা দুলিয়ে একটা সমর্থনজ্ঞাপনের ভঙ্গী দেখায় হিমাদ্রি। তারপর মায়ের সুপারীর থালাটা একটু সুমুখ পানে ঠেলে দিয়ে মাথাটা রাখে সুধাময়ীর জানুর ওপর। কথা বলে না।

সুধাময়ীও জাঁতিটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে হাত বুলোন হিমাদ্রির মাথায় সদ্যঃস্নাত ভিজে চুলের ওপর। হিমাদ্রির এই অভ্যস্ত নিবিড় ভঙ্গীটা তাঁর অন্তরেও বহুদিনের পরে আজ স্বস্তির বাতাস লাগায়।

মনে হয় যেন প্রবাসী ছেলেটি আজ ঘরে ফিরে এসেছে অনেক কালের পরে। আর বহুদিন পরে মায়ের হাতের সস্নেহ পরশে হিমাদ্রিরও ইচ্ছা হচ্ছিল আর একটুক্ষণ মায়ের কাছে থাকতে। কিন্তু উপায় ছিল না। যথেষ্ট তাড়া আছে তার। ওখানে গিয়ে আবার রঞ্জনাকে তৈরী হয়ে নেবার সময় দিতে হবে যে।

হয়তো প্রথমটায় সে রাজীই হবে না সিনেমায় যেতে। কিন্তু হিমাদ্রি তাকে রাজী করাবেই—যেমন করেই হোক্, তার হাত ধরে টেনে আনবেই নিজের পাশটিতে।

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায় হিমাদ্রি। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে—এবার আমি আসি মা। সুধাময়ীর ইচ্ছা করে হিমাদ্রি কোথায় যাচ্ছে তা জানতে চাইবার। কিন্তু সে বিষয়ে আর প্রশ্ন করেন না তিনি। ছেলে তাঁর বড় হয়েছে। যদি সে একদিন বিকেলে একটু বেড়াতেই যায় কোথাও—তবে তা নিয়ে মেলা প্রশ্ন করা ভালো কী?

নিজের ইচ্ছাটাকে তাই ভিতরেই দমন করে নেন সুধাময়ী, মুখে শুধু বলেন—এসো বাবা।

নিজের ঘরে এসে জামাটা গায়ে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয় হিমাদ্রি। রঞ্জনার সাথে সম্ভাব্য কথাবার্ত্তার নানান কল্পনা তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসেছে।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

৩৬

সানিনের ঘরে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আলো জ্বলছিল। টেবিলে বসে সে 'তার জেম্মাকে' চিঠি লিখছিল। সব কিছুই লিখল সে। পলোজভ দম্পতির বর্ণনা দিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী লিখল তার নিজের মনের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কথা। চিঠি শেষ করল তিনদিনের দিন তার সঙ্গে দেখা করবে বলে, এই কথাটি লেখার পর তিনটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল। ভোরে উঠে চিঠিটি ডাকে দিতে গেল ও সেখান থেকে বেড়াতে গেল চিকিৎসাগৃহ-বাগানে। ইতিমধ্যেই সেখানে বাজনা বাজতে সুরু হয়ে গেছে। লোকজন অত ভোরে খুবই কমছিল। রবার্ট লে ডায়বল-এর স্বরলিপি সঞ্চয়ন থেকে একটি বাজনা বাজছিল তখন, দাঁড়িয়ে শুনল খানিকক্ষণ, তারপর কফি পান করে প্রধান পথ ছেড়ে গলিপথে এসে একটা বেঞ্চে বসে নানা কথা চিন্তা করতে লাগল।

হঠাৎ তার কাঁধে একটা ছাতার বাঁটের বেশ জোর আঘাত লাগল। চমকে উঠল সে···দেখল মারিয়া নিকোলায়েভনা একটু ধূসর সবুজরং এর পাতলা পোষাক, সাদা নেটের টুপি, ও সুয়েড দস্তানা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। গ্রীষ্মের প্রভাতটির মতই সতেজ ও গোলাপী দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু তার চলাফেরা ও চাহনিতে তখনও গভীর ঘুমের নেশা মাখানো ছিল।

'সুপ্রভাত। আজ সকালে আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই আপনি বেরিয়ে গেছেন। আমি এইমাত্র দুগেলাস পান করলাম। এখানে এরা আমাকে জল খেতে দেয়, ভগবান জানেন কেন। আমার মত স্বাস্থ্য কজন লোকের আছে? আর তারপর একঘণ্টা হেঁটে বেড়াতে হয়। আপনি আমার সঙ্গে হাঁটবেন? তারপর কফি পান করব।'

সানিন দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'আমার হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে বেড়াতে খুব ভাল লাগবে আমার।'

'তাহলে আপনার হাতটি দিন আমায়। ভয় পাবেন না, আপনার প্রেমিকা দেখতে পাবে না, সে এখানে নেই।'

জোর করে একটু হাসল সানিন। মারিয়া নিকোলায়েভনা যখনই জেম্মার নাম করতেন—তার কাছে কেমন যেন অপ্রীতিকর লাগত। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সুবোধ ছেলের মত নত হল তার দিকে······ মারিয়া নিকোলায়েভনার হাত ধীরে ধীরে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

খোলা ছাতাটা কাঁধে রেখে তিনি বললেন 'এদিকে আসুন। এই পার্কের সবই আমার চেনা। দেখার মত সব কিছুই দেখাচ্ছি আপনাকে। আর দেখুন (এই দুটি কথা ছিল তার মুদ্রাদোষ) এখন আমরা সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কিছু কথা বলব না, প্রাতরাশের পর এ সম্বন্ধে কথা হবে। এখন আমি আপনার কথা শুনতে চাই। তাহলে আমি বুঝতে পারব কি ধরণের লোকের সঙ্গে লেনদেন হচ্ছে আমার। তার পরে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমার সম্বন্ধেও আপনাকে বলব। রাজী আছেন?'

'কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনি এ থেকে কি আনন্দ পাবেন?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে যাচ্ছি না আমি।' মারিয়া নিকোলায়েভনা কাঁধ ঝাকুনি দিলেন। 'প্রাচীন দেবীপ্রতিমার মত সুন্দরী যার প্রেমিকা, তার সঙ্গে আমি মন দেওয়া নেওয়ার খেলা করব? কিন্তু দেখুন আমি হচ্ছি ব্যবসায়ী, আপনার কাছ থেকে মাল কিনতে যাচ্ছি। আপনার মাল সম্বন্ধে সব শুনতে চাই। বলুন। আমি শুধু মাল সম্বন্ধে শুনেই সন্তুষ্ট থাকি না। যার কাছ থেকে কিনছি তার নিজের সম্বন্ধেও জানতে চাই। এই নীতিটি আমার বাবার কাছে শেখা। আচ্ছা, আরম্ভ করুন······। ছেলেবেলার কথা ছেড়ে দিতে পারেন। যখন বিদেশ ভ্রমণে বেরোলেন সেখান থেকে সুরু করুন। এতদিন কোথায় ছিলেন? এত তাড়াতাড়ি হাঁটবেন না, এত তাড়া নেই আমার।'

'আমি এখানে ইটালী থেকে আসছি। ইটালীতে কয়েকমাস ছিলাম আমি।'

'মনে হয় ইটালীর সবকিছুর প্রতিই আপনার অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। আশ্চর্য যে আপনি সেখানে কাউকে পেলেন না। আপনি শিল্পকলা ভালবাসেন? চিত্রাঙ্কন, না সঙ্গীত?'

'আমি শিল্পকলা ভালবাসি, যা কিছু সুন্দর তাই ভালবাসি আমি।'

'আর সঙ্গীত?'

'সঙ্গীতও'

'কিন্তু আমি একটুও ভালবাসি না। আমি শুধু রুশ গান ভালবাসি। আর তাও বসন্তে, গ্রামে—নাচ ও গান, লাল সুতির পোষাক, মেয়েদের কপালে মুক্তার মালা, মাঠে ছোট ছোট ঘাস, ধোঁয়ার গন্ধ—আমি ওসব ভালবাসি। কিন্তু আর আমার কথা নয়। আপনার কথা বলুন।'

ওরা হাঁটতে লাগল, মাঝে মাঝে সানিনের দিকে চাইছিলেন তিনি। খুব লম্বা ছিলেন ভদ্রমহিলা, সানিনের মুখ ও তার মুখ একেবারে কাছাকাছি ছিল।

প্রথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাড়া ছাড়া ভাবে বলতে আরম্ভ করল কিন্তু শেষে প্রায় বাচাল হয়ে উঠল মুখর হয়ে বলে যেতে লাগল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ছিলেন খুব ভাল শ্রোতা। আর এত সরল ছিলে

LIFEBUOY SOAP

আ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম।
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে।
ঘরে বাইরে ধূলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধূলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 17-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

তনি যে অন্যরাও তার সংস্পর্শে এসে নিজের অজ্ঞাতেই সরল হয়ে েত। কার্ডিনাল রেভজ্ঞ অন্তরঙ্গতার ভয়ঙ্করী রূপ বলে যা বর্ণনা করে গছেন, তিনি ছিলেন তারই মূর্তি। সানিন তার ভ্রমণ কাহিনী, পটাসবুর্গে তার জীবন, তার যৌবন সম্বন্ধে বলে যেতে লাগল। মারিয়া নকোলায়েভনা যদি অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতেন, সম্ভ্রান্ত দশের মহিলাদের মত যদি হত তাঁর আচরণ তাহলে সানিন কখনও নঃসঙ্কোচে মন খুলে বলে যেতে পারত না। কিন্তু তিনি নিজের ম্বন্ধে বলতেন অত্যন্ত সাদাসিধে লোক তিনি, কোন কায়দাকানুনের ার ধারেন না, সানিনেরও তাই ধারণা হল। এই 'সাদাসিধে লাক'টি মার্জার সুলভ ভঙ্গিতে সানিনের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন, চার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সানিনের পাশে হাঁটতে াঁটতে চপলমতি যৌবনের সর্বগ্রাসী উন্মাদনা ও স্নিগ্ধ মোহ বিস্তার করতে লাগলেন, যা দুর্বলচিত্ত নশ্বর মানবের কাছে সর্বনাশী মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়। এই উন্মাদনা, এই মোহ বিস্তারের ক্ষমতা আছে এক মাত্র স্লাভ প্রকৃতিতে, আর তাও কেবল মাত্র সেই শ্রেণীতে, যে শ্রেণীর লোকেরা বর্ণ সঙ্কর, অনেক স্তরের, অনেক জাতের রক্ত এসে মিশেছে যাদের মধ্যে।

সানিন ও মারিয়া নিকোলায়েভনা এক ঘণ্টার উপর এই ভাবে হেঁটে হেঁটে বক বক করে যেতে লাগলেন। এক জায়গায়ও স্থির হয়ে দাঁড়ান নি তারা, পার্কের অন্তহীন পথগুলি ধরে হেঁটে যেতে লাগলেন, কখনও উঁচুতে উঠে প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন—না দাঁড়িয়ে নীচে নামলেন। কখনও নিবিড় বৃক্ষবেষ্টিত ছায়ায় হাতে-হাত ধরে ঘুরে বেড়ালেন। সানিন মাঝে-মাঝে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিল। সে কখনও জেম্মা—তার প্রাণাধিক প্রিয় জেম্মার হাত ধরে এতক্ষণ বেড়াতে পারে নি··· আর এই ভদ্রমহিলা দখল করে বসেছেন তাকে। একাধিক বার সে জিজ্ঞেস করেছে 'আপনি ক্লান্তিবোধ করছেন না?' তাতে উত্তর পেয়েছে 'আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।' এখানে ওখানে আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হল তাদের, প্রায় প্রত্যেকেই মারিয়া নিকোলায়েভনাকে অভিবাদন জানালেন—অনেকে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে আর অনেকে প্রায় ভৃত্যসুলভ ভঙ্গীতে। তাদের একজন অতি সুন্দর পোষাক পরিহিত সুদর্শন শ্যামবর্ণ চেহারা—দূর থেকে ভদ্রমহিলা ডাকলেন তাকে—নির্দোষ প্যারিসের ফরাসীতে বললেন—'কাউণ্ট, আজ কিম্বা কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না, বুঝলেন।'

নিঃশব্দে টুপি তুলে নত হয়ে অভিবাদন জানালেন তিনি।

'কে উনি?' সানিন জিজ্ঞেস করল, সব রাশিয়ানদের মতই তার প্রশ্নকরার খারাপ অভ্যেসটি ছিল।

'উনি? একজন ফরাসী—এখানে অনেক ফরাসী আছেন। ওর সঙ্গে আলাপ আছে আমার। এখন কফি পানের সময় হয়েছে। চলুন বাড়ী যাই। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ক্ষিদে পেয়েছে আপনার। আর সম্ভবতঃ এতক্ষণে আমার ভাল লোকটি তার আঁখি জোড়া খুলেছেন।'

'ভাল লোক! আঁখি জোড়া' সানিন নিজের মনেই বলল 'কি চমৎকার ফরাসী বলে! কি অদ্ভুত লোক এই ভদ্রমহিলাটি।'

সানিন 'নিকোলায়েভনা ভুল বলেন নি। তিনিও সানিন

ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে খাবার সামনে প্রাতরাশের জন্য বসে আছে।

মুখ ভার করে বলল—'আমি ভাবছিলাম তুমি বোধহয় আর আসছ না। তোমাকে ছাড়াই কফি পান করতে যাচ্ছিলাম আমি।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা বেশ ফুর্তির সঙ্গেই বললেন—'তাতে আর কি হয়েছে? রাগ হয়েছিল বুঝি তোমার? তুমি জানো তোমার পক্ষে রাগ করা ভাল, তা না হলে পচে যাবে তুমি। দেখো একজন অতিথি নিয়ে এসেছি। ডাকো ওয়েটারকে। কফি খাওয়া যাক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কফি, তুষার ধবল টেবিলক্লথের ওপর, ড্রেসডেনের চীনামাটির পাত্রে।' টুপি ও দস্তানা ছুঁড়ে ফেলে হাততালি দিলেন।

পলোজভ ভুরুর নীচে থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মারিয়া নিকোলায়েভনার দিকে। 'আজ হঠাৎ এত প্রাণময় হয়ে উঠলে কেন, মারিয়া নিকোলায়েভনা?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কি, ইপ্পোলিত সিদোরিচ! ঘণ্টা বাজাও! বসুন, দমিত্রি পাভলোভিচ, আর একবার কফি চলুক। হুকুম করতে কি আনন্দই যে হয় আমার। পৃথিবীতে আর কোন আনন্দই এ আনন্দের সমান হতে পারে না।'

'যখন লোকে তোমার হুকুম শোনে।' তার স্বামী রাগত স্বরে বলল।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। সেজন্যই এত খুশী আমি। বিশেষ করে তোমার প্রতি। তাই নয় কি, মোটকা? এই যে কফি এসেছে।'

ওয়েটার একটা বড় ট্রে নিয়ে এল তাতে একটা অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ছোঁ মেরে তুলে নিলেন বিজ্ঞাপনটি।

তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন 'একটা নাটক? জার্মাণ নাটক, যাই হোক জার্মাণ হাস্য কৌতুকের চেয়ে ভাল।' ওয়েটারের দিকে ফিরে বললেন—'আমার জন্য একটা বক্স ভাড়া কর—কিম্বা যদি ফ্রেমডেন লোগে পাওয়া যায় তাহলে আরো ভাল হয়। শুনলে—ফ্রেমডেন লোগেই চাই আমার।'

ওয়েটার সাহস করে বলল—'আর যদি নগর প্রধান সেটা আগেই ভাড়া নিয়ে থাকেন?'

'তাহলে তাকে দশ থেলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফ্রেমডেন লোগে আমার জন্য নেবে' বুঝলে?

বিনয়ে নত হল ওয়েটারের শির।

'আপনি যাবেন আমার সঙ্গে থিয়েটারে দমিত্রি পাভলোভিচ জার্মাণ অভিনেতারা অতি বাজে, কিন্তু বলুন আপনি যাবেন··যাবেন তো? সত্যি? খুব চমৎকার! তুমি যাবে না তো, মোটকা।'

'তুমি যা বল।' পলোজভ পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল।

'তুমি বরং বাড়ী থাক। থিয়েটারে গেলে তুমি শুধু ঘুমাও আর তাছাড়া জার্মাণ তুমি ভাল জান না। বলছি কি করবে তুমি—দেওয়ানকে একটা চিঠি লেখ, মিল সম্বন্ধে তুমি তো জান কৃষকদের শস্য পেষাণ সম্বন্ধে। তাকে বল আমার এ একেবারেই মত নেই আমি এসব বরদাস্ত করব না। চি

পলোজভ বলল, 'আচ্ছা।'

'সেই ভাল। খুব ভাল তুমি। এখন ভদ্রমহোদয়গণ একবার যখন দেওয়ানের নাম নিয়েছি তখন কাজের কথায় আসা যাক। ওয়েটার প্রাতরাশের জিনিষপত্র যখন উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তখন আপনি, দমিত্রি পাভলোভিচ আপনার জমিদারী সম্বন্ধে সর্বাকিছু বলবেন। কত দাম—কত টাকা অগ্রিম চান সব কিছু। ('এতক্ষণে' সানিন ভাবল 'ভগবানকে ধন্যবাদ') কিছুটা আপনার কাছ থেকে আমি আগেই শুনেছি। মনে পড়ছে কি সুন্দর আপনি আপনার বাগানের বর্ণনা দিয়েছিলেন, কিন্তু মোটকা তো সেখানে ছিল না। তাকে শুনিয়ে দিন, তার মাথা থেকেও একটা কিছু বেরোতে পারে। আপনার বিয়েতে সাহায্য করছি ভেবে আমার আনন্দ হয়। তাছাড়া আমি বলেছিলাম প্রাতরাশের পর এ সম্বন্ধে কথা হবে। সব সময়ই আমি আমার কথা রাখি, তাই না, ইপ্পোলিত সিদোরিচ?'

পলোজভ নিজের মুখের ওপর হাত বুলাল, 'এ কথা অনস্বীকার্য, তুমি কাউকে কখনও ঠকাও না।'

'আর কখনও ঠকাবো না। আসুন দমিত্রি পাভলোভিচ খুলে বলুন সব কথা।'

৩৭

সানিন খুলে বলল সব। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তার জমিদারী বর্ণনা করল অবশ্য এবারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাদ দিয়ে। পলোজভের কাছে মত জানতে চাইছিল মাঝে মাঝে তার বর্ণনা ও মূল্য সম্বন্ধে। কিন্তু উত্তরে পলোজভ মাথা নেড়ে শুধু হুঁ-হুঁ করছিল ভগবান জানেন সানিনের মতে তার মত ছিল কি না বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার কাছ থেকে সাহায্যের দরকার ছিল না মারিয়া নিকোলায়েভনার। সানিন অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করল তার সম্পত্তি পরিচালনা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত জ্ঞান ও ক্ষমতা দেখে। জমিদারী চালনা সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন তিনি, অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে লাগলেন। অবান্তর প্রশ্ন করলেন না, কোন অসংলগ্ন কথা বললেন না। সানিন কল্পনা করতে পারেনি এরকম প্রশ্নোত্তরের পাল্লায় পড়বে আর তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না সে। দেড় ঘন্টা ধরে এই সওয়াল জবাব চলল। সানিনের মনে হল সে যেন অপরাধী হয়ে এক প্রবল প্রতাপ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিচারপতির সম্মুখীন হয়েছে। নিজের মনে মনে বলল 'এ যেন ঠিক উকিলের জেরা।' মারিয়া নিকোলায়েভনা সব সময় হাসছিলেন—যেন এ সব ছিল একটা বড় ঠাট্টা—কিন্তু তাতে সানিনের কিছু সুবিধে হল না। আর যখন এই জেরাতে ধরা পড়ল ভূমিভাগ ও আবাদী কথাদুটির ঠিক অর্থ সে জানে না তখন ঘামতে লাগল সে···

অবশেষে মারিয়া নিকোলায়েভনা নিষ্পত্তি করলেন। 'আচ্ছা, আমি এখন আপনার জমিদারী সম্বন্ধে সব কিছুই জানলাম, অন্তত আপনি যা জানেন। মাথাপিছু দাম কত ধরেছেন?' (তখনকার দিনে কৃষক সংখ্যা অনুসারে ভূসম্পত্তির দাম ধরা হত।)

'দেখুন··আমি মনে করি··দেখুন অন্তত: পাঁচশ রুবল-এর কম নয়··'অতি কষ্টে কোন রকমে বলল সানিন। (হায় পান্টালেওন—কোথায় তুমি এই মুহূর্তটিতে? আর একবার বল তুমি—বল তুমি—'এ যে বর্বরতা।')

মারিয়া নিকোলায়েভনা উপরের দিকে চাইলেন চিন্তিত মনে। একটু পরে বললেন, 'হ্যাঁ, কেনই বা নয়? এ তো ন্যায্য দাম বলেই মনে হচ্ছে আমার। কিন্তু দেখুন আমি দুদিন সময় চেয়েছিলাম। আপনাকে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দাম ঠিক হলে কত অগ্রিম চান তাও ঠিক হবে। এখন··যথেষ্ট হয়েছে' সানিন কিছু বলতে চাইছে বুঝতে পেরে বললেন 'এতক্ষণ অনেক নোংরা অর্থ আলোচনা হল··আর নয়—বৈষয়িক আলোচনা কাল হবে, দেখুন—আমি আপনাকে (কোমরে বাঁধা ছোট ঘড়িটির দিকে চেয়ে বললেন) তিনটে পর্যন্ত সময় দিচ্ছি··আপনার বিশ্রামের দরকার বুঝতে পারছি। রুলেট খেলুন গিয়ে।'

সানিন বলল, 'আমি পয়সা দিয়ে খেলি না'।

'সত্যি? অবশ্য আপনি হচ্ছেন আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি। আমিও অবশ্য জুয়া খেলি না। এভাবে টাকা নষ্ট করা বোকামি। তাহলে নাচ ঘরে গিয়ে লোকের চেহারা দেখে আসুন। ভীষণ অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা দেখতে পাবেন। একটি অদ্ভুত বুড়ী আছে। তার মাথায় মুকুট আর ঠোঁটের ওপর গোঁফ—আশ্চর্য। আমাদের একজন রাজকুমারও আছেন—উনিও ভীষণ কৌতুহল উদ্দীপক। রাজোচিত শারীরিক গঠন, উন্নত নাসা—যখন এক খেলার বাজী রাখেন তখন ক্রস করেন। সাময়িক পত্রিকাগুলো দেখুন, ঘরে বেড়ান, এক কথায় যা ইচ্ছে তাই করুন। কিন্তু আমি আপনাকে তিনটের সময় আশা করব। ঠিক তিনটে। আমরা খাব ঠিক সময়ে। এই হতভাগা জার্মাণরা তাদের অভিনয় আরম্ভ করে সাতটার সময়। হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি 'আপনি আমার ওপর চটেননি তো?'

'বলুন তো মারিয়া নিকোলায়েভনা, আমি কেন চটবো আপনার ওপর?'

'আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। দেখবেন—আরো পাওনা আছে আপনার।' চোখ ছোট ছোট করে চাইলেন তিনি, তার হাসিমুখে আবার কুঞ্চন দেখা দিল 'বিদায়'।

সানিন অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। ভীষণ হাসির আওয়াজ শুনতে পেল তার পেছনে, যেতে যেতে দেওয়াল আয়নায় দেখতে পেল—মারিয়া নিকোলায়েভনা তার স্বামীর ফেজটুপি চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন আর সে অসহায়ের মত দু'হাত ছুঁড়ছে।

৩৮

আঃ, সানিন নিজের ঘরে গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ঠিকই বলেছিলেন তার বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সদ্য পরিচিতের কাছ থেকে, এই হঠাৎ দেখার হাত থেকে, এই কথাবার্তা থেকে বিশ্রাম। এই ভদ্রমহিলার অনাকাঙ্খিত ঘনিষ্ঠতা, তার নিজের প্রকৃতির একেবারে বিপরীত প্রকৃতির এই মহিলা তার হৃদয়ে যে কামানল জ্বালিয়ে তুলছিলেন তার হাত থেকে বিশ্রাম। আর কোন সময় এ আরম্ভ হয়েছে? প্রায় তার পরদিন থেকেই যেদিন সে জানতে পারল জেম্মা তাকে ভালবাসে, যেদিন জেম্মার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হল। এ যে অঙ্গীকারভঙ্গের তুল্য! সে তার নির্মল ও পবিত্র প্রেমিকার কাছে হাজার বার ক্ষমা চাইল—যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারছিল না কি অপরাধ করেছে সে। তার দেওয়া

ক্রসটিকে হাজার বার আদর করল। সে তখনই ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল—কেবল দ্রুত ও মনোমত নিষ্পত্তির আশায় তাকে ভঁগবাডেনে আটকে থাকতে হল। প্রিয় ক্যারকোর্টে, সেই প্রিয় বাড়ীটিতে, সেই বাড়ী এখন তার নিজের বাড়ীর মতই, জেম্মার কাছে, জেম্মার পায়ে। কিন্তু কোন উপায় নেই। পেয়ালা নিঃশেষ করে পান করতে হবে তাকে—পোষাক পরে থেতে যেতে হবে—সেখান থেকে থিয়েটারে···আহা যদি কাল ভোরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

আর একটি জিনিষ তাকে ক্লেশ দিচ্ছিল। এমন কি রাগ হচ্ছিল তার। জেম্মার চিন্তা, তাদের দু'জনের মিলিত জীবন—তাদের ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে চাইছিল সে কিন্তু এই অদ্ভুত মহিলা—এই মারিয়া নিকোলায়েভনা সব সময় তার মনে জেগে উঠছিলেন—সব সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলেন, তার ছবি ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না সানিন, তার কণ্ঠস্বর কানে বাজছিল, তার কথা, তার সে অভিনব গন্ধ—তাজা, মৃদু হলদে লিলিফুলের মত গন্ধ তার পোষাক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এই মহিলাটি স্পষ্টতই তার সঙ্গে খেলছিলেন। প্রথমে একটি কৌশলে, তারপর অন্য কৌশলে। কিন্তু কেন? কি চান তিনি? একি অতুল ঐশ্বর্যশালিনী আদরিণী ভ্রষ্টা রমণীর সামান্য খেয়াল? আর তার স্বামী? কি অদ্ভুত। তার সঙ্গে তার কিরূপ সম্বন্ধ? এ সব চিন্তা কেন আসছে সানিনের মাথায়, মঁশিয়ে পলোজভ ও তার স্ত্রী তার কাছে কি? কেন সে তার মন থেকে এই রমণীর ছবি সরিয়ে দিতে পারছে না? তার সমস্ত অন্তর যখন আর একটি রমণী গ্রীষ্মের দিনের মত সুন্দর ও উজ্জ্বল রমণীতে জুড়ে আছে? কেন এই দেবদুর্লভ চেহারার পিছনে এই রমণীর চেহারা উঁকি দিচ্ছে? কিন্তু সত্যিই কুটিল হাসি নিয়ে এই রমণীর মুখ জেগে আছে তার মনে। শিকারী ধূসর দুটি চোখ, তার নৌকাগুলি, সাপের মত বেণী, সত্যিই কি তারা তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে তার আর সাধ্য নেই ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার?

মাথা খারাপ হল না কি তার? এই অর্থহীনতার শেষ হবে কাল নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু মহিলা কি কাল যেতে দেবেন তাকে?

এই জিজ্ঞাসাগুলো তার মনে বারবার জেগে উঠতে লাগল। যখন প্রায় তিনটে বাজে, কালো ফ্রক কোট পরে পার্কে হেঁটে বেড়াতে গেল পলোজভের ঘরে যাওয়ার আগে।

তাদের বসার ঘরে সানিন এসে দেখল কোন এক দূতাবাসের সেক্রেটারী—লম্বা, জার্মান চেহারা, সাদা চুল ঘোড়ার মত লম্বা মুখ, চুলের সিঁথি মাথার পেছনে পর্যন্ত নেমে গেছে (তখনকার দিনে এ ছিল নতুনত্ব) বসে আছে আর তার সঙ্গে কে এই লোকটি? এ যে ফন ডনহোফ, কয়েকদিন আগে সে যে অফিসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল! এখানে তার দেখা পাবে আশা করেনি সে কখনো, এক মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ বোধ করল সে, অবশ্য অভিবাদন করতে ভুল হল না তার।

'আপনাদের বুঝি আগেই পরিচয় ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা, সানিন যে খানিকটা বিব্রত বোধ করছিল তা ভদ্রমহিলার চোখ এড়ায়নি।

ডনহোফ বলল, 'সে সৌভাগ্য আমার আগেই হয়েছে।' মারিয়া নিকোলায়েভনার দিকে একটু সরে অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে বলল 'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম···আপনার একদেশের···এক রাশিয়ান।'

'না, সত্যি?' তিনিও অনুচ্চকণ্ঠে চমকে উত্তর দিলেন, ভয় দেখানোর মত আঙুল নাড়লেন। তখনই সেই শীর্ণ চেহারার সেক্রেটারীও ডনহোফের কাছে বিদায় চাইলেন। সেক্রেটারীটি তার সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে হাঁ করে চেয়েছিল তার দিকে। ডনহোফ তখনই বিনয় নম্রভাবে বিদায় নিল। মনে হল বলার আগেই বুঝতে পেরেছিল সে কি ধরণের আচরণ আশা করা যায় পরিবারের বন্ধুর কাছ থেকে। সেক্রেটারীটি কিন্তু জিদ করে থাকতে চাইল, মারিয়া নিকোলায়েভনা অতি সহজেই তাড়াতে পারলেন তাকে। বললেন 'আপনাদের রাজপরিবারের ভদ্রমহিলাটির কাছে ফিরে যান।' (ঠিক সে সময়ে মনাকোর একজন রাজকুমারী ভীসবাডেনে বাস করছিলেন। তাকে দেখতে ছিল অতি বাজে শিথিল চরিত্রের রমণীর মত) 'আমার মত নীচবংশের লোকের সঙ্গে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন?'

হতভাগ্য সেক্রেটারীটি উত্তর দিল, 'মহাশয়া, পৃথিবীর সব রাজকুমারী একত্র হয়েও'·····

মারিয়া নিকোলায়েভনা কিন্তু নির্দয়—সেক্রেটারীটিকে বিদায় নিতেই হল।

আমাদের দিদিমারা যাকে বলে গেছেন, 'তার নিজের চেহারার সব সৌন্দর্য দেখিয়ে' সে ভাবেই সেজে ছিলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা। পরে ছিলেন একটি গোলাপী রেশমী পোষাক। কানে ছিল একটি প্রকাণ্ড হীরার কুণ্ডল। তার চোখ দুটিও হীরার মত জ্বল জ্বল করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল খুব খোসমেজাজে আছেন ও তাকে দেখাচ্ছিল অপরূপ সুন্দর।

সানিনকে তার পাশে বসিয়ে প্যারিস সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু করলেন, বললেন কয়েকদিনের মধ্যেই প্যারিস যাচ্ছেন। জার্মানদের সম্পর্কে বললেন এরা অতি নির্বোধ, যখন চালাক হতে চায় তখন বোকা বনে যায়, যখন বোকা হওয়া দরকার তখন বোকার মত চালাক হয়ে যায়। হঠাৎ অসংলগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি সে একটি মেয়ের জন্য এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন যে অফিসারটি তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিল।

সানিন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করে জানলেন?'

'জগত জনরবে ভর্তি, দমিত্রি পাভলোভিচ। আর আমি জানি আপনি নির্দোষ ছিলেন, প্রকৃত নাইটের মত ব্যবহার করেছেন। বলুন না এই ভদ্রমহিলাই কি আপনার ভাবীপত্নী?'

সানিন ভুরু কোঁচকালো···

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করব না। আপনি এ সম্বন্ধে কথা বলতে চান না, ক্ষমা করবেন, আর জিজ্ঞেস করবো না! রাগ করবেন না।' পলোজভ পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজের একটি পাতা নিয়ে হাজির হল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাও তুমি? খাবার বুঝি তৈরী হয়ে গেছে?'

'খাবার এখনই দেওয়া হচ্ছে। উত্তর দেশের 'মধুমক্ষিকা'তে কি পড়লাম আমি বলতে পার—রাজকুমার গ্রমবয় এর মৃত্যু হয়েছে।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা মুখ উঁচু করে চাইলেন—'সত্যি? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন। আমার জন্মদিনে প্রতি ফেব্রুয়ারীতে

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি
ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

বলতে বলতে ঘুরে চাইলেন সানিনের দিকে, 'কেমেলিয়া ফুল দিয়ে আমার সব ঘরগুলি সাজিয়ে দিতেন তিনি। কিন্তু কেবলমাত্র সেজন্যই পিটার্সবুর্গে শীতকালে বাস করবার কোন মানে হয় না। —তার বয়স নিশ্চয়ই সত্তর অতিক্রম করেছিল,' এ কথাটা বললেন তার স্বামীকে লক্ষ্য করে।

'হ্যাঁ, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ বেরিয়েছে কাগজে। রাজসভার সবাই উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার কোভরিঝকিন এই উপলক্ষ্যে একটা কবিতা লিখেছিলেন।'

'আচ্ছা, খুব ভাল তো!'

'পড়ে শোনাব তোমাকে! রাজকুমার তাকে একজন খাঁটি রাজনীতিজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন।'

'না, না, হতেই পারে না। উনি আবার রাজনীতিজ্ঞ হবেন কি? তিনি ছিলেন তাতিয়ানা ইউরিয়েভনার আদমী। এবারে খেতে যাই। মৃতই মৃতের সৎকার করুক। দমিত্রি পাভলোভিচ আপনার হাতটা দিন।'

আগের দিনের মতই আজকের ভোজটিও ছিল চমৎকার। কথাবার্তা ভালই চলছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনা খুব বাকপটু ছিলেন—যা মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, বিশেষত: রাশিয়ান মেয়েদের মধ্যে। কথা খুঁজে পেতে দেরী হচ্ছিল না তার, আর তার দেশের মেয়েরাই ছিল তার আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। সানিন একাধিক বার তার মনোজ্ঞ ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যে জোরে হেসে উঠল। মারিয়া নিকোলায়েভনা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন—ভণ্ডামি, মিষ্টি কথা ও মিথ্যাকথা আর সব জায়গায়ই তা দেখতে পেতেন। সমাজের নিম্নস্তরের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন, সে শ্রেণী থেকে এসেছেন তিনি তার জন্য গর্ব বোধ করছিলেন। তার আত্মীয়স্বজন, তার ছেলেবেলার অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে লাগলেন, বললেন তিনি নিজে গ্রাম্য—পাড়াগাঁয়ের কথায় মুখর হয়ে উঠলেন। সানিন দেখল এই বয়সের মেয়েদের তুলনায় তিনি জীবনে অনেক কিছুই বেশী দেখেছেন, জীবনযুদ্ধে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন।

আর পলোজভ খেয়ে যাচ্ছিল চিন্তান্বিত মনে। মনোযোগ দিয়ে পান করছিল, তার স্ত্রী বা সানিনের দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল তার খুদে খুদে চোখ দিয়ে। মনে হচ্ছিল তার ফ্যাকাশে চোখ দুটি আধ বোজা কিন্তু আসলে খুব বড় বড় চোখেই চেয়ে দেখছিল সে। 'কি চমৎকার, কি চালাক লোক তুমি।' মারিয়া নিকোলায়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন তার দিকে চেয়ে। 'ফ্রাঙ্কফোর্টে কি চমৎকার বাজার করেছো তুমি। তোমার কপালে একটা চুমু দেব আমি, কিন্তু তুমি তো এসব ভালবাস না।'

'হ্যাঁ, বাসি না।' রূপোর ফলা-কাটা ছুরি দিয়ে আনারস কাটতে কাটতে পলোজভ উত্তর দিল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টকটক আওয়াজ করতে করতে বললেন—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে 'আমাদের বাজী এখনও আছে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা। তুমি হারবে।'

'... ... ... 'দেখা যাবে।' মারিয়া নিকোলায়েভনা—এবারে হারবে তুমি—যদিও তোমার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে।'

সানিন জিজ্ঞেস করল, 'বাজীটা কি নিয়ে জানতে পারি?'

'এখন নয়' উত্তর দিলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা হাসলেন এবারে।

ঘড়িতে সাতটা বাজল। ওয়েটার এসে জানাল গাড়ী প্রস্তুত। পলোজভ স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।

'দেওয়ানকে চিঠি লিখতে ভুলে যেয়ো না যেন,' মারিয়া নিকোলায়েভনা হল থেকে চেঁচিয়ে বললেন।

'চিন্তা কর না, ভুলব না। আমি সবসময়ই কথা রাখি।'

৩৯

১৮৪০ সালে ভীসবাডেন থিয়েটারটি ছিল একটি অতি কুৎসিত অট্টালিকা, অতি সাধারণ নীতিবিষয়ক মাঝারি রকম নাটক পরিবেশন করত। অন্য সব জার্মাণ থিয়েটার যথা কার্লসরুহে কোম্পানী বিখ্যাত হের ডেভ্রিয়েন্টের নেতৃত্বে চালিত নাটকগুলি থেকে এর মান উঁচু ছিল না।

'মহামান্যা মেডেম ফন পলোজভ' এর জন্য নির্দিষ্ট বক্সটির পেছনে (ভগবান জানেন কি করে ওয়েটারটি এটা জোগাড় করতে পারল নিশ্চয়ই সে নগরপ্রধানকে ঘুষ দিতে পারে নি, পারে নাকি?) ছিল ছোট একটি বিশ্রাম কক্ষ, তাতে ছিল কয়েকটি সোফা। ব... ঢোকার আগে মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনকে পাতলা পর্দা টেনে দিতে বললেন—তাতে থিয়েটারের অন্য লোকদের ... যাবে না।

তিনি বললেন, 'আমি চাই না কেউ আমাকে দেখে, তাহলে সবাই ভীড় করে আসবে।' তাকে বসালেন তার পাশে দর্শকের দিকে পেছন ফিরে, তাতে মনে হচ্ছিল বক্সে কেউ নেই।

ঐকতান সুরু হল—'ফিগারোর বিবাহ' গীতিনাট্যের মুখ... বাজতে লাগলো। পর্দা সরে গেল, নাটক সুরু হল।

অসংখ্য ঘরোয়া নাটকেরই একটি ছিল এই নাটক। লে... বিদ্বান কিন্তু প্রতিভাবান নন, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে কিন্তু য... পরিশ্রম করে লেখা, কোন ত্রুটি ছিল না তাতে—কিন্তু গল্পটি প্রাণহীন—কোন মহৎ বা জীবন্ত আদর্শ নিয়ে লেখা হলেও অ... নীরস ছিল গল্পটি। এই নীরসতাকে বলা যেতে পারে এশিয়াটিক যেমন সাধারণ কলেরা ও এশিয়াটিক কলেরা। মারিয়া নিকোলায়ে... ধৈর্যের সঙ্গে প্রথম অঙ্কের অর্ধেকটা দেখলেন কিন্তু যখন গল্পের না... (নায়কটি পরেছিল বাদামী ফ্রককোট, হাত ছিল ফোলানো, ... মখমলের কলার, ডোরাকাটা ওয়েষ্টকোট ঝিনুকের বোতাম লাগ... সবুজ প্যাণ্ট, সাধারণ চামড়ার ষ্ট্র্যাপ লাগানো ও সাদা স্যুয়েড দস্ত... তার প্রেমিকা বিশ্বাসভঙ্গের খবর জানতে পেরে হাত মুষ্টিবদ্ধ বুকের ওপরে স্থাপন করল, কনুই দুটি সূক্ষ্ম কোণে রাখল, কুকুরে... ঘেউ ঘেউ করতে লাগল, মারিয়া নিকোলায়েভনা আর সহ্য ... পারলেন না।

'অতি নিকৃষ্ট ফরাসী অভিনেতাও অখ্যাত ছোট প্রা... সহরে উৎকৃষ্টতর ও স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারে যে প্রথমশ্রেণীর জার্মান অভিনেতার চেয়ে।' অত্যন্ত বিরক্তির

…লেন। তার পাশে সোফাটি হাত দিয়ে ফুলিয়ে সানিনকে …ললেন এখানে আসুন, আমরা গল্প করি।'

সানিন এল। মারিয়া নিকোলায়েভনা তার দিকে চেয়ে বললেন 'আপনি দেখছি দুধের মত নরম। আপনার স্ত্রী আপনাকে অতি সহজে চালাতে পারবে। ওই সাটি—তিনি তার পাখার বাঁট দিয়ে চিংকাররত অভিনেতাকে দেখালেন —অভিনেতাটি একটি বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের পাঠ অভিনয় করছিল। ওই সাটিকে দেখে আমার প্রথম যৌবন মনে …ড়ছে। আমি একদা এক গৃহশিক্ষকের প্রেমে পড়েছিলাম। …নি ছিলেন আমার প্রথম—না—আমার দ্বিতীয় প্রেমিক। আমি প্রথমে প্রেমে পড়ি ডনস্কয় মঠের এক ভ্রাতৃর। আমার বারো বছর বয়স তখন। তার সঙ্গে দেখা হত শুধু রবিবারে। তিনি মখমলের গাউন পরতেন, ল্যাভেণ্ডার আতর মাখতেন, ধুনুচি হাতে এগিয়ে যেতেন ভিড় ঠেলে, মহিলাদের ফরাসীতে 'ক্ষমা করবেন' বলতে বলতে। কখনও চোখ তুলে চাইতেন না। তার চোখের পক্ষ্ম ছিল এতখানি লম্বা।' বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কনিষ্ঠার অর্দ্ধেকটা দেখালেন সানিনকে। 'আমার শিক্ষকের নাম ছিল মঁশিয়ে গাষ্টন। খুব জ্ঞানী ছিলেন তিনি আর খুব কড়া মেজাজের। তিনি ছিলেন সুইস ও খুব শক্তিশালী চেহারা ছিল তাঁর। গোঁফ ছিল আলকাতরার মত কালো, গ্রীক চেহারা, ঠোঁট দেখে মনে হত গলানো লোহা দিয়ে তৈরী। আমি তাকে ভয় করতাম। একমাত্র ওই লোকটিকেই আমি জীবনে ভয় করেছি। তিনি ছিলেন আমার ভাই-এর শিক্ষক। আমার ভাই জলে ডুবে মারা গেছে। একটি বেদে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে আমার নাকি মৃত্যু হবে অতি অস্বাভাবিকভাবে। এসব বাজে। আমি এ সব বিশ্বাস করি না। আপনি কি ইপ্পোলিত সিদোরিচকে ছোরা হাতে কল্পনা করতে পারেন?'

সানিন বলল, 'ছোরা ছাড়াও অন্য অনেক রকম জিনিষ থেকে প্রাণহানি হতে পারে।'

'সব বাজে কথা। আপনার কি কুসংস্কার আছে? আমার একটুও নেই। যা ঘটবার ঘটবে। মঁশিয়ে গাষ্টন আমাদের বাড়ীতে বাস করতেন, তাঁর ঘর ছিল ঠিক আমার ঘরের উপরে। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম, অনেক রাত্রে ঘুমোতে যেতেন তিনি—গভীর শ্রদ্ধা বা ওই ধরণের ভাবে মন ভরে যেত আমার। আমার বাবা বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষাই দিয়েছিলেন। জানেন, আমি ল্যাটিন পর্যন্ত জানি।'

'আপনি ল্যাটিন জানেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানি। মঁশিয়ে গাষ্টন আমাকে শিখিয়েছিলেন। ঈনিড পড়েছিলাম তাঁর কাছে। বড় বাজে, কিন্তু কয়েকটি জায়গা খুব সুন্দর আপনার মনে পড়ে সে জায়গাটা যখন ডিডো ও ইনিয়েস বনে গিয়েছিল?……'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে।' তাড়াতাড়ি বলল সানিন। ল্যাটিন সে অনেক দিন আগেই ভুলে গেছে, ইনিড সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র।

মারিয়া নিকোলায়েভনা অপাঙ্গে চাইলেন তার দিকে। 'তাই বলে মনে করবেন না আমি খুব বিদুষী। ভগবান জানেন আমি তা নই। আমি বিশেষ কিছুই জানি না। লিখতে পারি না বললেই হয়…জোরে পড়তে পারিনা…পিয়ানো বাজাতে জানিনা…সেলাই করতে জানিনা এমন কি ছবি আঁকতেও জানিনা আমি—কিছুই জানিনা। যা দেখছেন তা ছাড়া আর কিছুই নই আমি।

দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে যেতে লাগলেন—'আমি আপনাকে এসব বলছি তার কারণ প্রথমতঃ ওই আহাম্মকগুলোর দিকে মন দিতে হবে না (বলে মঞ্চের দিকে দেখালেন, মঞ্চের ওপর তখন নায়িকা তার কনুই দুটো বের করে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।) 'আর দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে ঋণী আমি—কাল আপনি আপনার সম্বন্ধে বলেছিলেন।'

সানিন বলল—'আপনি আমার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন তাই।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার দিকে ফিরে চাইলেন হঠাৎ—'আপনার জানতে ইচ্ছে করে না কি ধরণের মেয়ে আমি? অবশ্য আমি তাতে আশ্চর্য হই নি।' বলে তিনি সোফার গায়ে হেলান দিলেন। 'যখন একটি পুরুষ বিয়ে করতে যাচ্ছে, তাও আবার প্রেমে পড়ে ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ে তখন অন্য মেয়ের বিষয় চিন্তা করার সময় কোথায় তার?'

মারিয়া নিকোলায়েভনা চুপ করলেন, তার বড় বড়, সুদর্শন দুধের মত সাদা দাঁতগুলো দিয়ে পাখার বাঁট খুঁটতে লাগলেন।

আবার সানিনের মধ্যে কামনার বহ্নি জেগে উঠল। ছু'দিন থেকে তার সমস্ত মন জুড়ে আছে এই বহ্নির ধূমরাশি।

নিম্নস্বরে কথাবার্তা চলছিল তাদের দুজনের মধ্যে, প্রায় ফিসফিস স্বরে, তাতেও সানিন যুগপৎ বিরক্তি ও উত্তেজনা অনুভব করছিল।

কখন শেষ হবে এ খেলা? দুর্বলচিত্ত লোকেরা কখনও নিজে থেকে যবনিকা টানতে পারে না কোন কিছুতে, অপেক্ষা করে থাকে পরিসমাপ্তির।

মঞ্চের ওপর কেউ হাঁচল। হাসাবার জন্য লেখক তার নাটকে এই হাঁচিটি দিয়েছেন, এ ছাড়া আর হাসির কিছু ছিল না বইটিতে। দর্শকেরা হাসল নকুতজ্ঞে। হাসতে পেরে বাঁচল যেন।

সানিনও বিরক্ত হয়ে উঠল হাসির চোটে। সে নিজেও সময় সময় বুঝতে পারছিল না সে রাগ করছে না উপভোগ করছে, বিরক্তি বোধ করছে না তৃপ্তি পাচ্ছে। আহা, জেন্যা যদি তাকে দেখতে পেতো।

মারিয়া নিকোলায়েভনা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা মজার নয় কি? সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে একজন এসে বলল আপনাকে—'আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।' কিন্তু কেউ তো সেরকম নির্বিকার হয়ে বলতে পারে না—'আমি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি।' আর দুটোরই শেষ পরিণতি এক নয় কি? মজার মনে হয় না আপনার?'

সানিন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল—'মারিয়া নিকোলায়েভনা, অনেক তফাত আছে তাতে। যারা সাঁতার জানে তাদের পক্ষে জলে ঝাঁপ দেওয়াতে ভয়ের কিছু নেই। আর অদ্ভুত বিয়ের কথা যখন তুললেন···'

কথাটা শেষ করল না সানিন, দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা পাখা দিয়ে নিজের করতলে আঘাত করলেন—'কথাটা শেষ করুন, দমিত্রি পাভলোভিচ, যা বলতে চেয়েছিলেন বলে ফেলুন। আমি জানি আপনি কি বলতে চান—আপনি বলতে চান—'যখন এ প্রসঙ্গটা তুললেনই তখন জিজ্ঞেস করছি আপনার বিয়ের চেয়ে অদ্ভুত বিয়ে কেউ কোথাও দেখেছে? ভুলে যাবেন না আপনার স্বামীকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি।' তাই বলতে চেয়েছিলেন আপনি; আপনি নিজে অবশ্য সাঁতার কাটতে জানেন।'

সানিন আরম্ভ করল, 'ক্ষমা করবেন—'

'সত্যিই তাই নয় কি? সত্যিই তাই নয় কি?' মারিয়া নিকোলায়েভনা জোর করতে লাগলেন—'বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আমি যা বলেছি তা ঠিক নয় কি?'

সানিন কোন দিকে চাইবে বুঝতে পারছিল না। 'আচ্ছা, আপনি যখন জোর করছেন, তাহলে বলছি তাই ঠিক।' কোনরকমে বলল সানিন।

মারিয়া নিকোলায়েভনা মাথা নাড়লেন। 'আচ্ছা, তাহলে··· আপনি সাঁতার জানেন বলে আপনার মনে কখনও কি এ প্রশ্ন জাগে নি—কেন একটি রমণী—দরিদ্র নয়, নির্বোধ নয়, সরলও নয় কেন সে এ রকম বিয়ে করল? হয়ত আপনার এসব জানতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক, আমি আপনাকে কারণ জানাবো, এখন নয়, বিরতির পর যখন আবার অভিনয় সুরু হবে। আমার ভয় হচ্ছে কেউ হয়ত এসে পড়বে'···

মারিয়া নিকোলায়েভনা কথাটি শেষ করতে না করতেই বক্সের দরজার একপাটি খুলে গেল, একটি মুখ দেখা গেল। লাল মুখ, ঘেমে চকচক করছে—যুবক কিন্তু ইতিমধ্যেই দন্তহীন হয়েছে, লম্বা নাক লম্বা লম্বা পাতলা চুল পরিবেষ্টিত বাদুড়ের মত প্রকাণ্ড কান দুটি, দুটি অত্যুজ্জ্বল অনুসন্ধানী চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, তার ওপরে পাঁশনে আঁটা, বক্সের ভেতর মারিয়া নিকোলায়েভনাকে দেখতে পেয়ে হাসিতে ভরে গেল তার সারা মুখ, মাথা নেড়ে ঘন ঘন অভিবাদন করলেন। এবারে মাথার পেছনে সরু গলাও দেখা গেল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা রুমাল নেড়ে জানাতে বললেন—'আমি বাড়ী নেই, রে দে পি। আমি বাড়ী নেই, আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে চাইলেন মুখের মালিক ভদ্রলোকটি, জোর করে হাসলেন। মিসেসের পদপ্রান্তে একদা তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারই অনুকরণে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে 'আচ্ছা, ভাল, ঠিক আছে,' বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সানিন জানতে চাইল 'কে এই অদ্ভুত লোকটি?'

'লোকটি? একজন সমালোচক ভিসবাডেনের। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচক, ভেড়ুয়া বলতে পারেন। স্থানীয় ঠিকেদারদের বেতনভোগী, কাজেই সবকিছুর প্রশংসা ও সব কিছু সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হয় তাকে। যদিও ভেতরে ভেতরে রাগ পুষে রাখেন, মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। আমি ভয় করি তাকে, অত্যন্ত কুৎসা রটিয়ে বেড়ান ভদ্রলোক। এখনই গিয়ে সবাইকে বলে বেড়াবেন আমি থিয়েটারে এসেছি। কিন্তু তাতে আর কি এসে-যায়, যাকগে।'

ঐকতান ওয়ালজ ধরল, পর্দা কেঁপে কেঁপে ওপরে উঠল, একটানা কাতরানি ও কষ্টকল্পনা অভিনয় সুরু হল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা আবার সোফাতে ডুবে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'দেখুন বাধ্য হয়ে আপনাকে আমার পাশে বসতে হচ্ছে, আপনার প্রেমিকার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলে—তাই বলে নির্দয়ের মত চোখ ঘোরাবেন না। বুঝতে পারছি আপনাকে তো বলছিই যেখানে খুসী যেতে পারেন আপনি, কিন্তু এখন আমার গল্প শুনুন। আমি সবচেয়ে কি ভালোবাসি জানতে চান?'

সানিন বলল 'স্বাধীনতা।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার হাতটি সানিনের হাতের ওপর রাখলেন।

'ঠিক বলেছেন, দমিত্রি সানিন।' তার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য ও অকৃত্রিম ঐকান্তিকতা ফুটে উঠল। 'সবচেয়ে প্রথম ও সবচেয়ে উপরে স্বাধীনতা, মনে করবেন না আমি দম্ভ প্রকাশ করছি, এতে প্রশংসার কিছু নেই, কিন্তু আমি চিরকালই এরকম ছিলাম, মৃত্যুপর্যন্ত চিরকালই এরকম থাকব। যখন ছোট ছিলাম অনেক অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে, তার জন্য কম কষ্ট পাইনি।···আমার শিক্ষক মশায় গাষ্ঠিন আমার চোখ খুলে দেন। এখন আশা করি বুঝতে পারছেন কেন আমি ইপোলিত সিদোরিচকে বিয়ে করেছি। আমি একেবারে স্বাধীন, একেবারে মুক্ত তার কাছে, বাতাসের মত, হাওয়ার মত মুক্ত। বিয়ের আগেই জানতাম, তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমিই আমার প্রভু হয়ে থাকব।

মারিয়া নিকোলায়েভনা হাত থেকে পাখা ফেলে দিলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

'আর একটি কথা আপনাকে বলতে বাধা নেই। চিন্তা করতে আমার কোন আপত্তি নেই—আমাদের মনও সেজন্ত পেয়েছি আমরা, ভালোই লাগে চিন্তা করতে—কিন্তু আমি নিজে আমার কাজের পরিণতির কথা চিন্তা করি না—কক্ষনো করি না—পরিণতি যাই হোক না কেন কখনও অনুতাপ করি না। অনুতাপ করা বৃথা সময় নষ্ট মনে হয় আমার কাছে। আমার নীতি হচ্ছে'—এবারে ফরাসীতে বললেন—'পরিণতিকে টেনে এনো না'—'রাশিয়ানে একে যে কি বলে জানি না। সত্যিই তো কি হবে পরিণাম চিন্তা করে? এ জগতে আমাকে আমার কাজের জন্ত কারুর কাছে সাফাই গাইতে হবে না। আর ওখানে? (হাত দিয়ে দেখালেন ওপরের দিকে) ওখানে তাদের যেমন খুসী সেরকম নিষ্পত্তি করুক। শেষ বিচারের দিনে আমি তো আর আমি থাকব না। শুনছেন আপনি? বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

সানিন মাথা নীচু করে এতক্ষণ বসে ছিল, এবারে মাথা তুলল। 'আমি একটুও বিরক্তি বোধ করছি না, মারিয়া নিকোলায়েভনা, খুবই উৎসুক হয়ে শুনছি আপনার কথা। কিন্তু স্বীকার করছি বুঝতে পারছি না কেন আপনি এসব আমাকে বলছেন।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা সোফাতে একটু সরে বসলেন, 'নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না···সত্যিই কি আপনার বুঝতে এত দেরী হয়? না এ শুধু বিস্ময় প্রকাশ?'

সানিন তার মাথা আর একটু উঁচু করল। মারিয়া নিকোলায়েভনা তাঁর মুখের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে শান্ত স্বরে বলতে লাগলেন, 'এসব বলছি আপনাকে, কারণ আপনাকে আমার ভাল লাগে। আশ্চর্যান্বিত হবেন না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি চাইনে আপনি আমার সম্বন্ধে একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি নিয়ে যান। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না আমার, তবু আমি চাইনে আপনি ভুল ধারণা নিয়ে যান। সেজন্যই আপনাকে প্রলুব্ধ করে একা নিয়ে এসেছি এখানে, এত খোলাখুলি ভাবে কথা বলছি, সত্যি, আমি মিথ্যে বলছি না। দেখুন, দমিত্রি পাভলোভিচ, আমি জানি আপনি অন্য একটি রমণীর প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তাকে—কিন্তু আমার নির্লিপ্ততাকে পুরস্কার দিয়ে যান। অবশ্য আপনিও এই সুযোগে বলতে পারেন 'পরিণামকে টেনে এনো না।'

হাসলেন তিনি কিন্তু মাঝপথেই হাসি থেমে গেল। নিজের কথা শুনে নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন মনে হল—স্থির হয়ে বসে রইলেন। সাধারণতঃ তার নির্ভয় চোখ দুটি থাকত খুসীতে ভরা। কিন্তু এখন শঙ্কা এমন কি বোধহয় বিষাদেরও ছায়া পড়েছিল তাতে।

'এ যে সাপের মত ভয়ঙ্কর, এ যে সাক্ষাৎ সর্পিনী' ভাবল সানিন। 'কিন্তু তবু কি সুন্দর!'

মারিয়া নিকোলায়েভনা খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দিন তো চশমাটা, মঞ্চের দিকে একটু দেখতে চাই। সত্যিই কি নায়িকাটি ভীতির উদ্রেক করছে? মনে হচ্ছে সরকার ওকে নীতিশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশে নিযুক্ত করেছেন যাতে কোন যুবক তার প্রেমে পড়তে না পারে।'

সানিন চশমাটি এগিয়ে দিল, এক মুহূর্তের জন্ম তিনি তার হাত ধরে রইলেন, চশমা নিলেন।

এবারে হেসে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখুন এত গম্ভীর হয়ে যাবেন না। কেউ যেমন আমাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারবে না, তেমনি আমি কাউকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করি না। স্বাধীন জীবন ভালোবাসি আমি। কোন বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে চাই না, শুধু নিজের জন্মই যে তা মনে করি তা নয়। একটু সরে বসুন। এবারে অভিনয় শুনি মন দিয়ে।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা অভিনয় দেখার চশমাটি দিয়ে মঞ্চের দিকে চেয়ে রইলেন, সানিনও সেদিকে চেয়ে দেখল। আধো অন্ধকার বক্সটির ভেতর বসে এই কামলোলুপ রমণীর দেহের উষ্ণতা ও সুগন্ধ মেশান বাতাস শ্বাস নিতে লাগল—অনিচ্ছাকৃতই তার মনে আসতে লাগল সারা সন্ধ্যা মহিলাটি তাকে যা বলেছেন—বিশেষ করে শেষ মুহূর্তগুলিতে যা বলেছেন।

[ক্রমশঃ

অনুবাদ :—আশা দাস।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪৭। এই রকম করেই গ্রীষ্মের দিনগুলি কেটে গেল শ্রীকৃষ্ণের। কৌতুকের সুর চড়েই যায় অহরহ, আর সঙ্গে সঙ্গে সফলও হয় তার ধেনুরক্ষণ ও বনবিহার।

৪৮। তারপর আর একদিন···খেলায় মেতে, মাধুর্য্য-মহিমায় পৃথিবীকে মধুরিত করতে করতে, পথিকদের ও রসিকদের প্রণাম কুড়োতে কুড়োতে, কুতূহলী হলী ও সহচরদের সঙ্গে নিয়ে গোপালনে চলেছেন নন্দকিশোর·····কাননে;—হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশ-দর্পণে জলদাঙ্কুর-দেহবর্ণা তিনি দেখতে পেলেন মালতী-মালিনী আষাঢ়লক্ষ্মীকে। চোখ ফেরানো যায় না এত তাঁর পৃথ্বীরঞ্জন রূপ! তাঁর দুনয়নে চকিত চকিত খেলছে চঞ্চল চপলা, অঙ্গে তাঁর দুর্লভ শোভাকদম্বের বিপুল পুলক, দিগন্ত-দৃষ্টি বরাননে ঝুরঝুরে মেঘের আনন্দিত অশ্রু। তাঁর নিঃশ্বাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল দূর দিগন্তের কুসুমগন্ধ, কুন্তল-কলাপে ঢেউ তুলছিল মত্ত কলাপীর নীল নৃত্য, সীঁথিতে কাঁপছিল বলাকার মুক্তা। কী অপূর্ব তাঁর পান্নার মণিমঞ্জরীর মত নবীন তৃণের তল্প-নয়ন। ইন্দ্রগোপকীটের রশ্মির মত, কী মোহন তাঁর আলতামাখা চরণের পরিক্রমণ। রসবর্ষী মেঘের স্তপনের মত কী মেদুর তাঁর কণ্ঠস্বনন, বনরাজিনীল অংশুকের সে কী নির্মল সরস কমনীয়তা। উড়ন্ত ভ্রমরের মত সে কী তাঁর কটাক্ষপাতের চঞ্চলতা। ধরণী-লোল কদম্ব-রেণুর চৌদিকে যেন আজ অধিবাস।

৪৯। সারা বছরের মধ্যে এই সময়টিই যে রসময় এবং রম্য, ···সকলের মধ্যেই উপস্থিত হয় এই নির্ণীতি। কারণ তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন মহাবৈদ্য 'মহাকালে'র হস্তে সূর্যাতাপক্লিষ্ট জীবের প্রাণরক্ষার সমুচিত ঔষধই হচ্ছে এই বর্ষাঋতু।

৫০। এই ঔষধের কৃপায় ধরণীর যেন ফিরে আসে নিঃশ্বাস, উল্লসিত হয় তরুলতা, মেদুরিত হয় গগনতল, আকৃষ্ট হয় দিক্‌দিগন্ত, নিদ্রা যান দিনমণি, প্রবাসে যায় সন্তান, গর্বিত হয় ময়ূর, আনন্দিত হয় ডাহুক, সরসিত হয় চাতক, হাসি ফোটে কদম্বের ঠোঁটে, স্নান করে ওঠে গিরিশ্রেণী, ধৌত হয় বনবীথি, মাংসল হয় নদীর অস্থি-সর্বস্ব চয়, শান্ত হয় হরিণদের দাবানল-ভয়, ক্ষান্ত হয় গোধনের অতিদূর প্রচার।

৫১। অতএব এই বর্ষাকাল-লক্ষ্মী যে শ্রীমান্ নন্দকিশোরের পক্ষে প্রশস্তকীর্তিময়ী হয়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে!

৫২। আষাঢ়-শ্রাবণের এই দিনগুলিতে যখন প্রচুর গজিয়ে উঠত শুভগন্ধ গন্ধেল ঘাস, শ্রীকৃষ্ণের নৈচিকী গাভীর দল তখন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মসমস শব্দে চিবোত সেই ঘাস আর ধীরে ধীরে চরতে চরতে সঞ্চয় করত মাধুর্য্য, বৃন্দাবনের দংশন-বিরহিত মশকদের সঙ্গে খেলা করতে করতে প্রকাশ করত পুচ্ছ-দোলনের বিপুল লালিত্য; উদরপূর্তির আনন্দে স্পৃহাশূন্য হৃদয় নিয়ে বিশ্রামের অভিলাষে বেছে নিত স্নিগ্ধ-পল্লব-তৃণ-হরিৎকানন-তল। তারপরে যখন তারা তাদের রোমন্থ-মন্থর মুখগুলিকে শ্রীভগবানের অভিমুখীন করে এবং গোল গোল ঘুমন্ত নয়নগুলিতে আদর ও আলস্যের উৎসব ফুটিয়ে প্রচেষ্টা করত সুখশয়নের,—তখন তাঁর বালক সহচরদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ খেলায় উঠতেন মেতে। নবফুটন্ত কদম্বকোরকগুলি হত তাঁদের খেলার কন্দুক। এবং ততঃপর অমর-নগরীর লীলা-নাগরীরা যখন সেই খেলা দেখবার লোভে বিকল হয়ে উঠতেন ক্ষণকাল, আর মেঘের ফাঁক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এসে পড়ত সূর্যের কিরণ-রেখা, তখন অলস হয়ে পড়তেন তিনি, ঘামে ভিজে যেত মুখ, বিম্বফলের মত রাঙা হয়ে উঠত ঠোঁট। কন্দুক খেলা ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন মাটির বুকে বসে পড়তেন, অলঙ্কৃত করে রম্যতরুর তরুণ মূল, তারপরেই আবার যখন ঘনীভূত হয়ে উঠত ঘনঘটা, কর্পূররেণুর মত জলবিন্দু গায়ে মেখে, মালতীলতিকার কুসুমগন্ধে মাধুর্য্য-নত হয়ে সেবার উদ্দেশ্যে যখন আবার ছুটে আসত পূর্ব-সমীর, তখন মনোহরণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠতেন শ্রীনন্দকিশোর; তাঁর বামকক্ষতলে রাখালিয়া পাঁচন বাড়ি, তাঁর বামজঙ্ঘার উপর দক্ষিণ জঙ্ঘার অক্ষত-লোভনীয় তেজস্বী শোভা। মল্লার রাগে তাঁর বাঁশী উঠত বেজে। সে কী ধৈবতবহুল, ষড়জ-পঞ্চম-বর্জ্জিত মন্দোমল্লারের মনোমল্লারের লয়াভিরমণীয় গান! সে গান ছড়িয়ে পড়ত বনে বনে, উৎকর্ণিত করত কুরঙ্গদের, উৎকর্ণ করত ধেনুদের, যেন কর্ণাকর্ষণ করত আত্মসহচরদের। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ সেই মুরলী-সঙ্গীতের পর্দায় ছোঁয়া লাগাতেন "শ্রুতির।"

৫৩। অমৃতের যেন ধারাবর্ষণ হত সেই 'শ্রুতি'র মহিমায়। ইন্দ্রিয় ব্যাপারের পারে পৌঁছে যেত জীবলোক। আর আনন্দ-নিবিড় মেঘলোক থেকে দুর্নিবার বেগে তখন ঝরে পড়ত জল। এত প্রবল হত সেই জলশ্রুতি যে, কমঠ-পৃষ্ঠ-কঠিন ধরণীর তল্প-শয়ন এতটুকুও পঙ্কিল হবার আর অবকাশ পেত না এবং নৈচিকী গাভীর দল যারা গুরুতর আহারের পর শান্তিতে ঘুমবার চেষ্টায় থাকত, তারাও অনুদ্বিগ্ন আনন্দে সহ্য করত সেই বর্ষণ। বৃষ্টির আঁধারে তারা দুর্লক্ষ্য হয়ে যেত লোক-নয়নের, কিন্তু তাদের নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে রইতেন শ্রীভগবান।

৫৪। ধারাসার সেই বর্ষণ দেখে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটে আসতেন তাঁর সহচরেরা। নিজের নিজের চেলাঞ্চল অঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাথার উপর তাঁরা বিস্তৃত করে ধরে থাকতেন, সেগুলিতে নিষ্কপট পট-মণ্ডপের কাজ করত চেলাঞ্চলপুঞ্জ। অসমঞ্জস বৃষ্টিধারা তৎক্ষণাৎ গড়িয়ে পড়ে যেত মাটিতে। মানামানের জ্ঞান তাঁদের থাকত না। বৃষ্টির জল কিছুতেই পড়তে দিতেন না শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে।

৫৫। প্রচুর আনন্দে তাঁর বিশ্বৈকপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে বলতেন—"ভাই, মল্লার রাগের সাক্ষাৎ স্বভাবই হচ্ছে, গমকের দমকে মেঘের সৃষ্টি করা। কিন্তু বড় নীরবে হয় এর নীর-বর্ষণ। তোমার গানের কৌশলেই কেমন যেন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে জগৎ-জোড়া একটা কান্নার। তাই বলছি, গানের বিত্তে ফলিয়ে আর কাজ নেই তোমার। সূর্য্যের আলো আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাদলে। মর্য্যাদা হানি কোরোনা ভাই দিনের। যদি কর, তাহলে এই চললুম আমরা, চটপট। স্থির আনন্দ দিচ্ছে জানি, স্নিগ্ধ করছে জানি, তবু বলছি, থামাও। থামাও তোমার ঐ দুরন্ত বাঁশরীর গান, ধারাসার বর্ষণকে থামাও। তা না হলে, এই তৃণশয়ন থেকে ধেনুগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে আমরা পালাচ্ছি।"

৫৬। সহচরদের মুখে সবেগে এই রকমের কত যে সরস পরিহাসের প্রকাশ হতে থাকত তার ইয়ত্তা নেই। হাস্য-পুষ্ট হয়ে উঠত শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের অবিধুর জ্যোতিঃ। মহামধুর বাঁশরীতে তিনি তখন তুলতেন অন্য তান। তানের অভিসারে পথ দিয়ে ছুটে চলত ধেনুবৃন্দ। আর দিগ্বিদিকে নয়ন হেনে শ্রীকৃষ্ণ চলতেন, প্রশংসায় ফেটে পড়ত পথিকজনতা।

শ্রীকৃষ্ণ চলতেন, আর তাঁর অঙ্গের তরঙ্গবতী তরলতায় উচ্ছলিত হয়ে উঠত এক বিস্ময়ভরা জ্যোতির্ময়তা; তার কাছে ছার নীলপদ্মের জ্যোতির্নীলতা, মহামরকতের জ্যোতিঃশ্যামলতা; সে জ্যোতির উৎসবে যেন নিরুদ্ধ-বেগ হয়ে যেত মেঘজ্যোতির প্রসার-সরসতা।

শ্রীকৃষ্ণ চলতেন, আর তাই যেন তাঁকে দেখাত অন্য রকমেরা অনুপম যেন এক উদার সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত। এগিয়ে এগিয়ে ধেনুর; চলত। তাদের পুচ্ছরোম চুঁয়ে চুঁয়ে জল ঝরত, খুরের আঘাত লেগে এক কণাও ধুলো উড়ত না পথে। আর তাদের পিছনে পিছনে শ্রীকৃষ্ণ চলতেন ;—মনুজাকৃতি যিনি বিখ্যাত ব্রহ্মা ;

পরাগের উপরাগহীন নীলপদ্মের যেন স্তব ;
ঘনরস-দাতা মেঘের যেন দ্বিতীয় স্বরূপ ;
মহত্তর সৌভাগ্য-বিগ্রহ যেন পৃথিবীর।

পীন পয়োধরের ভারে বিবশ হয়ে অলস চরণে যখন ব্রজের কাছে এসে পৌছত ধেনুর দল, তখন বেণুধ্বনি করে তাদের তাড়া দিতেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অদূর থেকে লক্ষ্য করতেন ব্রজপুরের লক্ষ্মীশ্রী।

৫৭। তাঁর মনে হত সেই লক্ষ্মীশ্রী যেন সবে স্নান সেরে উঠেছেন বৃষ্টির জলধারায়। কে যেন তাঁর পায়ে জড়িয়ে দিয়েছে মেঘবরণ মহোজ্জ্বল একখানি দিক্‌ব্যাপিনী নীল শাড়ী। প্রত্যেক গৃহের শিখরে শিখরে মাতাল ময়ূরদের শিখণ্ড-শিল্পের স্নিগ্ধ সমারোহ দেখে তাঁর মনে হত, লক্ষ্মীশ্রী যেন তাঁর স্নানসিক্ত ঘনাতিঘন অপরিমিত কেশভার বাতাসে মেলে দিয়ে শুকাচ্ছেন। স্ফটিকের অট্টালিকায়, অট্টালিকায় মেঘমুক্ত সন্ধ্যারাগের প্রতিফলিত সৌন্দর্য্য দেখে তাঁর মনে হত, লক্ষ্মীশ্রী যেন তার ভালস্থলে এঁকে ফেলেছেন সিন্দূরশোভন ঐ বিন্দুটিকে। আঃ হাঃ, ব্রজপুরের ওগুলো কি গবাক্ষ? কি আশ্চর্য, চুরাশী হাজার নয়ন মেলে পুণ্যের জোরে লক্ষ্মীশ্রী যেন গবাক্ষচ্ছলে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন শ্রীকৃষ্ণের রূপৈশ্বর্য্য। যেন পতাকাচ্ছলেই হাতের পাতা

নাচিয়ে নিজেই নাচিয়ে রাখছেন কৃষ্ণাগমন সুখের আশায় ভরা নিজের হৃদয়খানিকে। তারপরে যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখতেন আকাশে মেঘ নেই অথচ প্রতি প্রাসাদের পৃষ্ঠ থেকে প্রণালা মুখে ধারাকারে মাটিতে ঝরে পড়ছে নির্ঝর-জল আর সেই জল থেকে উঠছে সুগন্ধলতা 'রেণুকা' আর এলা বালুকার পরিমল, তখন তাঁর মনে হত লক্ষ্মীশ্রীই যেন তাঁর গোঠ-থেকে-ফিরে-আসা ধেনুদের চরণধাবণের ছলে ঢেলে দিচ্ছেন ওই অকৈতব শ্রদ্ধা।

৫৮। ব্রজপুরে এই ভাবে ফিরে আসতেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই অমেয় মন্মথ-মথন সৌন্দর্য্য নিয়ে। তারপরে তিনি তাঁর ধেনুদের প্রবেশ করিয়ে দিতেন গোশালার সুন্দর উদার বিশালতায়। ব্রজপুরের তিমির-যবনিকা যেন খুলে পড়ে যেত জ্যোতির মাঙ্গল্যে। দৌড়ে তিনি পৌঁছে যেতেন আঙিনায়। তারপরে ধীরে ধীরে একে একে পরজনদের পাঠিয়ে দিতেন যে যার ভবনে। তখন যেন সেখানে সৃষ্টি হয়ে যেত এক বিরহের বাসর। মন খারাপ হয়ে যেত শ্রীকৃষ্ণের। তারপরে বয়স্যবালকদের দিকে প্রণয়ভরা নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে, এবং সেই একটি কটাক্ষেই যেন তাদের পরিতুষ্ট করে, তিনি প্রবেশ করতেন ভবনোদরে। ভোগৈশ্বর্য্যের সেথায় ছড়াছড়ি, স্বর্গলোকেও বোধ হয় এত সম্পদ হয় না। মা যশোদা ছুটে আসতেন, তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিতেন, পূর্ব-পূর্ব-দিনের চেয়েও উপচে পড়ত পান-ভোজনাদির যত্ন আর কৌশল। তারপরে নন্দদুলাল শয়নে যেতেন। কী কর্পূর-ধবল শয্যা! বালিশটিও কী সুন্দর! কী সুগন্ধ, কী অখণ্ড তার কোমলতা। ফুল ভেবে তাতে যেন ভ্রমর এসে বসলেই হয়। মাথা ছোঁয়ালেই এনে দেয় গায়ের ঘর্ম আর মনের শান্তি।

৫৯। এদিকে বৃষভানুনন্দিনীর অন্তরে নিদারুণ জ্বলে উঠেছে কৃষ্ণানুরাগ-মহানল। সে আগুনের জ্বালা যেমন ঘন ঘন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে মূর্চ্ছা দেবীকে, তেমনি আবার ঘটিয়েছে প্রাণসখীদের আনন্দ-বিলাস। নিখিল কুটুম্বেরা ভাবতে বসে গেছেন, এ আবার কী রোগের আবির্ভাব হল রাজার দুলালীর? রোগশান্তির ঔষধ চিন্তা করতে বসে গেছেন তাঁরা। কিন্তু সাধারণে বুঝবে কেমন করে এ আগুনের যে কী জ্বালা? এ যে সকলের পূর্বানুভূতির বাইরে। সে আগুন নেবাবার উদ্দেশ্যেই তদানীন্তন শ্রাবণ-ধারাকে তিরস্কৃত ক'রে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল প্রিয়সহচরীদের অশ্রু-নির্ঝর, সিক্ত করে দিয়ে তাঁর পরনের শাড়ী। কিন্তু বৃষভানুনন্দিনীর অশান্তির হ্রাস নেই। তাঁকে ঘিরে কেমন যেন ঘনিয়ে আসে নবীন বিপদের রাশি, আর তাঁর কেবলই দুষ্প্রাপ্য ব'লে মনে হয় পরম উপায়টিকে। তাই ধীরে ধীরে তাঁর শিথিল হয়ে যায় আশাবন্ধ। আসন্ন লয়ের তীব্রতার সম্মুখীন হয়ে তাই তিনি বিস্মৃত হয়ে যান তাঁর বহির্বৃত্তি। একদিকে পুষ্পধনুর শরাঘাতের ঘন ঘূর্ণন, অন্যদিকে ঘন-ঘূর্ণায়মান দিগবনিতাদের প্রতাপিত রস-বর্ষণের সান্দ্র সমারোহ।

৬০। প্রিয়ের অনুরাগ লাভ করলেও প্রিয়ার সাথে যেমন বাদ সাধে বাধা, তেমনি আবার প্রিয়াই হয়ে দাঁড়ান প্রিয়ের হৃদয়মন্দিরের একমাত্র হ্লাদিনী অন্তর্বিলাসিনী। রাধার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণেরও হল তাই। তবুও তাঁর বাৎসল্যাদি রসে প্রকাশ-শক্তি এত প্রবল যে পিতা মাতা বন্ধু-স্বজনাদি সকলে ভাবতেই পারলেন না যে তাঁর লীলায় উদারতায় কোথাও ঘটেছে লেশমাত্র লঘুতা।

৬১। লঘন—বর্ষণ—সৌভাগ্য মাননীয় একটি একটি ক'রে দিন যায়,—

মণি-কিরণ-বর্দ্ধন শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিবরের উপত্যকার প্রশস্ততায়—

গন্ধতৃণের পর্য্যাপ্ত শ্যামলতায়—

সুরভি গাভীর দল চরে বেড়ায়;

আর পর্বত-চূড়ায় বর্ষণ-সরস গন্ধশিলার সিংহাসনে উপবেশন করে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ;—নিকটেই পাষাণ-সায়রে রঙ ছড়িয়ে খেলা করে বৃষ্টির স্ফটিক আর গিরিরাজের পদ্মরাগ।

শ্রীকৃষ্ণের কাছেই ঘোরেন ফেরেন সহচরদের দল। তাঁদের রঙ্গ দেখে হাসি সামলাতে পারেন না শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ হাসবেই, যদি সে দেখে···একদল মানব হাত ধরে টানাটানি করছেন মেঘের আর সেই মেঘ দয়া করে চেপে বসে রয়েছেন স্ফটিক পাহাড়ের শিলাজতুর দুর্গন্ধ মাথায়; যদি সে দেখে···মেঘের পেটের ভিতরকার চিকিয়ে-ওঠা বিদ্যুতের ভয়ে হঠাৎ কাঁপতে লেগে গেছেন তাঁরা, আর সেই বিদ্যুতের ভীষণ ছটা রেগে চোখ পাকিয়ে মারতে আসছেন তাঁদের; যদি সে দেখে···সেই ভীরুর দল মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছেন, পালাতে পালাতে আবার পাকশাট মেরে আনন্দে চীৎকার করতে করতে যাচ্ছেন সেই বিদ্যুৎ-ছটাটাকে, তার পরেই আবার মেঘের প্রচণ্ড গর্জনে আঁতকে উঠে মারছেন দৌড়, দৌড়তে দৌড়তে তাড়া খাচ্ছেন বিদ্যুল্লতার, আর মেঘের দল তাঁদের হারিয়ে দিয়ে তাদের মুখের উপরেই ফুৎকার দিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছেন নীরন্ধ্র শীকর-জল। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু হাসছিলেন তা নয়, তিনিও আবার মাঝে মধ্যে মেয়েদের দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছিলেন ধাতুখণ্ড, আর অদ্ভুত বর্ণৈশ্বর্য্য ফলিয়ে এমন ভাবে রাঙিয়ে ফেলছিলেন উত্তরীয় বসন যে তেমনটি আর কেউ কখনও দেখেনি। সেগুলিকে পেয়ে সহচরদের সে কী নাচ! আর লক্ষ্মীলাঞ্ছিত-বক্ষ শ্রীগোবর্দ্ধন-বনবিহারীর সে কী আনন্দবেগপুষ্ট রসিকতা!

তারপরে তাদের সকলের বর্ষাসুলভ ফলমূলকন্দ আহরণের কী ঘটা। শ্রদ্ধার পায়ে শিকল পরছে তখন প্রণয়। অঙ্কুরিত আনন্দের সঙ্গে ফলাহারের সে কী নবীন সমারোহ! হাজারো দাঁতের শাদা হাসি শাদা ক'রে দিতে চাজারো পশুর মন। তারপর সহচরেরা—কৃষ্ণের মন বোঝেন তাঁরা—শ্রীকৃষ্ণকে পান খাওয়াবেন বলে,···পালাতেন। করতল-লভ্য সুপুরীগাছ থেকে কাঁচা সুপুরী ছিঁড়তে হবে তো? আমূল পাতায় ভরা পান-গাছ থেকে সোনার রঙের পাতায় চূণ নিতে হবে তো? অতিজীর্ণ সুরভিশিলা চূর্ণ ক'রে চূণ বার করতে হবে তো? কর্পূর-কদলীর গুঁড়ি থেকে চুঁইয়ে রস নিতে হবে তো? তা না হলে কি আর শ্রীকৃষ্ণকে দেবার মত তাম্বুল সাজা হয়? অতএব তাঁরা পালাতেন।

৬২। সেই বর্ষণ সময়ে হর্ষণোজ্জ্বল হয়ে নয়নপ্রান্তে অঞ্চল টেনে দিয়ে আনন্দঃ আনন্দঃ ধ্বনি হলে কখনও সখনও যখন আনন্দ-মূল গিরি গোবর্দ্ধনের দর্পণোদর সন্নিভ গুহামন্দিরে পৌঁছে যেতেন শ্রীকৃষ্ণ এবং ঐরাবতশিশুর মত বসে থাকতেন নিস্তব্ধ, তখন সেই সহচরেরা চরাচর মনোহর শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে সুরু করে দিতেন এক পরম খেলা, খেলায় উঠত কোলাহল, উঠত হল-হলারাব, আরাবের প্রতিধ্বনি উঠত "আনন্দম্ আনন্দম্" অনন্ত কৌতুক-পরম্পরায় কন্দরে

কন্দরে বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সেই আনন্দম্‌ আনন্দম ধ্বনি, প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দূরে উঠত "কে ডাকে, কে ডাকে"—হুঙ্কার; গোপশিশুদের দূষণ ভূষণ হয়ে দাঁড়াত শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তিনি ডগমগ করে উঠতেন আনন্দে, অনবস্থার এক নবীন স্থানস্থের আনন্দে।

৬৩। কখনও কখনও যখন শ্রাবণলক্ষ্মীর হাসির মত ঝরে পড়ত শিল, তখন সহচরেরা প্রতিধ্বনি-ক্রীড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে শিল কুড়োতে দৌড়ে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে, আর ভুঁয়ে চোখ, ঘাড় নীচু, দাক্ষিণ্যকে অস্তে পাঠিয়ে, শিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে।

৬৪। আবার বৃষ্টি থামলে গুহামন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসতেন শ্রীকৃষ্ণ। মন যে তাঁর কম খুশী হোতো তা নয়। বসে পড়তেন গিরি-শিখরের মনোহর মরকত-শিলাসনে। শিলাসনটি যে মন ভোলাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সঘন—বর্ষণ-বিধৌত, চমুরু-বধূজন পুচ্ছপুট মৰ্জ্জিত, কস্তুরী-হরিণ-তরুণী-মদ-গন্ধি পান্নার একটি শিলাসনে চন্দ্রসুন্দর মুখ ও হৃদয় নিয়ে বসে থাকা কি কম আরামের? ঘসে বসে তিনি দূরের পানে চেয়ে থাকতেন, আর তাঁর চোখে ফুটে উঠত দিগন্তজোড়া এক বনরাজির নিবিড় নীলকান্তি। বন-রেখার বলয়াকৃতিতে কোথাও যেন ছেদ নেই। মনে হত তিনি যেন ছবি দেখছেন এক মোহিনী বিনোদিনীর···যাঁর কদম্ববিলাস মধু পরাগ-মাল্যে অনুরাগ ঝরছে ঝঙ্কার-মুখর মাতাল ভ্রমরদের, যাঁর নয়নের অপাঙ্গ শ্লেষে অলঙ্কৃত হয়েছে ব্রজধামের হরিণী-নয়নাদের•সরস চাহনি, আর যাঁর ভাস্বর-গীত অংশুকের অঞ্চলে বিলাস-লিখিত হয়েছে গোচারণ-লীলার চারুতার। তাঁর কাছে যেন একাকার হয়ে যেত আকাশ ও পৃথিবী; হোথায় ওই মেঘের মকরত অঙ্কুরের মত মেদুরতা, আর হেথায় এই গন্ধিকতৃণ ও কহলারের শ্যামল কোমলতা, হোথায় ওই উচ্চ নীচ ভাবহীন আলোকের বাহুল্য, আর হেথায় এই সূর্য্যরাগহীন শীতলতার পর্য্যাপ্ত ব্যাপ্তি। দৃষ্ট-ধন্য হোতো তার চোখ, অতিধন্যতম হোতো তাঁর সহচরদের প্রাণ।

৬৫। পর্বতের তরাই প্রদেশে আলস্যহীন তৃণাস্বাদ লালসায় যথেচ্ছ চরে বেড়াত শ্রীকৃষ্ণের নৈচিকী গাভীর দল। হিংসা নেই, পশুভয় নেই, তাই নিরাতঙ্কে যখন তারা চরত, তখন দূরে পর্বত শিলাসনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হত বিশ্ব-সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিলাসগৃহের তিনি যেন একটি ইন্দ্রনীলমণির আরম্ভ স্তম্ভ! তারপরে হঠাৎ দেখা যেত সেই নীলমণিস্তম্ভটিতে যেন পতাকা উড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেত ভরাট-গলার এক দীর্ঘ-গম্ভীর প্লুত স্বর। অবাক হয়ে ফিরে চাইতেন গোপবালকেরা আর তাঁরা দেখতে পেতেন পীত বসনাঞ্চল নাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করছেন তাঁর প্রিয় গাভীদের, প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে··"শবলি! কালি! ধবলি!" ইত্যাদি নাম, এবং নাম শ্রবণ মাত্রেই তৃণগুল্মাদির বিশালতা ভঞ্জন করে,—এক সূত্রে বাঁধা বহু শালভঞ্জিকার মত, দৌড়ে দৌড়ে আসছে গাভীরা। সুপুষ্ট পালানগুলির বাধা সত্ত্বেও তারা যেন মন্ত্রবলে দৌড়চ্ছে, মুখে তাদের গদগদ ধ্বনি হম্বা-হম্বা। কষ্ট দেখে কৃপায় চঞ্চল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার চীৎকার করতেন "দৌড়সুনি রে দৌড়সুনি রে"; কিন্তু অমন কোমল গলার কলধ্বনি শুনে কেউ কি আর থামতে পারে? আয়াসহীন দ্রুতচরণে ছুটতে ছুটতে কিন্তু হঠাৎ তারা থেমে যেত; ভগবানের আজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যেই গিরিবরের আসন্ন উপত্যকায় পৌঁছেই এক সঙ্গে গোল বেঁধে তারা থেমে যেত! মুগ্ধ হয়ে যেতেন গোপশিশুরা।

৬৬। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ পাহাড় থেকে নামতেন। ভ্রমর-ভাষায় বেজে উঠত তাঁর বাঁশরী, বিরাম টেনে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নামতেন আর ঐ বাঁশরীর তানে··যেন গিরি-কানন বিহারী পশুপাখীদের সকলের কায়া থেকেও বেরিয়ে নেমে আসত উচাটন মন, পথের সাথী হত বাঁশুরিয়ার।

৬৭। এই রকম করে দিনের পর দিন রঙ্গ করত বর্ষা বিলাসের অপ্রতিহত কৌতুক। ধেনুরা ঘরে ফিরত, সহচরের ঘরে ফিরতেন, আর তাঁদের অনুগামী হয়ে মন্দিরে ফিরত এক জোড়া মঞ্জুল পদপঙ্কজ, শর আরঞ্জনে রয়েছে পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার শেখর মণিসঞ্জরীর দক্ষিণতা। শ্রীহরির সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত পদন্যাসের তালে তালে দূর হয়ে যেত ধরণীর অসুখ ভার; আর তাঁর সিকতা-রুচির রসার্দ্র বক্ষে পত্রাবলী রচনা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জু মঞ্জীরের মণিমঞ্জরী রুনু রুনু করে বাজিয়ে চলত অনিন্দ্য এক ফেরা-গোষ্ঠের গান। [ক্রমশঃ।

তোমার শান্ত মন

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তরাত্মা হিমালয় কিছুতেই কাঁপবে না জানি
ভূমিকম্প যতো হোক, টলে টলে যাক শিবালিক,
কোমল পলল দিয়ে গড়া তনু আর্য্যাবর্তরাণী
বজ্রাসনে আগ্নেয় শিলার পরে থাকবেই ঠিক।
শ্বেত পাথরের স্বপ্ন দু'ধারে দু'পাশে রেখে তার
নর্মদার গতিভঙ্গ প্রবাহিত হবে চিরকাল,
মুগ্ধ রাতে ক্ষয় ক্ষতি আঙুলে গোনাই শুধু সার—
দু'চোখে গোলাপী শ্বেত, অস্পষ্ট চাঁদের আলো লাল।

এই সব চিরন্তন, এই সব বসে বসে দেখি,
আর ভাবি বাঁচবেই খাজুরাহো নৃত্যসী অপ্সরা,
বিদিশার ভগ্নসৃষ্টি, সাঁচীর বিস্ময় মরবে-কি,—
তোমার উত্তাল মন আজকে চলেছো শান্তি ভরা।
জড়তা বিশ্বের ধর্ম, প্রাণ তাই সৃষ্টিছাড়া ক্ষেদ,
নিজের আবেগে চলে, কিছুতেই নিয়ম মানে না—
সেখানে শান্তির মানে তৃপ্তিঢাকা মৃত্যুর বিচ্ছেদ,
জড় পৃথিবীতে তার ফুরিয়েছে সব লেনা-দেনা।

তবু যদি তুমি চাও, আবেগের সমাপ্তিই হোক,
চিরস্থায়ী জড়তার জয় মেনে হিম হেসে বলি—
(অন্তরাত্মা মর্মে মর্মে মরুক, তবুও নেই শোক)
এই যে তোলো তো সব..বেশ বেশ, আজ চলি তবে।

সিক্ত যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

দুই

যতক্ষণ না শর্মিষ্ঠার গাড়ীটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, ততক্ষণ সেই দিকে চেয়ে বসে রইল দীপঙ্কর, তারপর উঠে পড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাবটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে। এবার বাড়ী ফেরা দরকার, শুভজিৎ এসে বসে থাকবে নাহলে।

দীপঙ্করের বাড়ীতে আর কেউ নেই। বাবা-মা অল্পদিনের তফাতে মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। বিশেষ কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই তেমন। একটি বড় বোন আছেন কেবল, তাঁরও বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন—দূরের মানুষ হয়ে গেছেন, থাকেন পাঞ্জাবে। দীপঙ্কর একাই থাকে।

এতকাল মেসেই কেটেছে, খুব সম্প্রতি বেলেঘাটায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্লটে নিজে একটা বাড়ী করেছে। বাবা ছিলেন মার্চেণ্ট অফিসের সাধারণ কেরাণী, চিরদিন একখানা ভাড়া ঘরে কেটেছে। সংসারের ঝামেলা সামলে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিলেন অনেক কষ্টে। তাই মারা গেলেন যখন, উইল করে তাকে দিয়ে যাবার মত কিছুই ছিল না। দীপঙ্কর তখন সবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।···তারপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ক' বছরে, এখন ভালোই রোজগার করে। একা মানুষ, খরচা কম, এই কয়েক বছরের মধ্যে তাই ছোট একটা বাড়ী করা সম্ভব হয়েছে।

বাড়ী ফিরে দেখল বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছে শুভজিৎ।

দীপঙ্কর কাছে এসে দাঁড়ালো। "কখন এলি শুভো?"

তেমনি করেই বসে থেকে চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে দীপঙ্করের দিকে হাসিমুখে তাকাল শুভজিৎ, "তা বেশ কিছুক্ষণ, তুই কি ভামবাজারে ঘুরে এলি?"

—"আরে না। আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিলাম, তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরবি ভাবিনি।"

দীপঙ্কর এখনও তেমনই গম্ভীর আর অন্যমনস্ক, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথাটা বলতে খেয়ালই রইল না।

একটু থেমে আবার বলল, "চল ওপরে, ছাদে গিয়ে বসি।" হাতের বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে উঠে পড়ল শুভজিৎ।

এক কলেজে আই, এস-সি পড়তে ভর্তি হয়ে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর আই, এস-সি পাশ করেই একজন গেল মেডিক্যাল কলেজে, আর একজন আস্তানা গাড়ল বি, ই, কলেজ-হোষ্টেলে। কিন্তু এইটুকু মাত্র সময়ই তাদের এমন এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধেছিল যে সে বাঁধন আর কোন কারণেই কোনদিন আলগা হয়নি। তাই কর্মজীবনে দীপঙ্কর রইল কলকাতায় আর শুভজিৎ পাটনার কাছাকাছি একটা গ্রামের হাসপাতালে কাজ নিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু বন্ধুত্ব ব্যাহত হয়নি।

তারপর একে একে তিন বছর কেটেছে। এর মধ্যে একবার মাত্র দীপঙ্কর শুভজিতের কাছে গিয়েছিল, আর দেখা হয়নি। চিঠিপত্রও ইদানীং কমে এসেছিল। কারণ শুভজিৎ কোনদিনই নিয়মিত চিঠির উত্তর দেয় না সে—দীপঙ্করের শত অনুরোধেও এর মধ্যে একবারও কলকাতায় আসেনি। তবু যেদিন দীপঙ্করকে খবর না দিয়েই কলকাতায় চলে এল, সেদিন ট্রেণ থেকে নেমেই ঠিকানা খুঁজে এসে দাঁড়াল দীপঙ্করের নতুন বাড়ীর দরজায়। দীপঙ্কর অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে সেদিন মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকেছিল শুধু শুভজিতের দিকে, কথা বলতে পারেনি।

ছাদে এসে দীপঙ্করের খেয়াল হ'ল পেতে বসবার জন্য একটা মাদুর-টাদুর হলে হত। সিঁড়ির মুখে এসে নিজের সংসার-তরণীর মাঝিদের উদ্দেশ্যে অনেক হাঁকাহাঁকি করল, সাড়া পাওয়া গেল না কারুর। একটি চাকর এবং একটি ঠাকুর তার সংসার ম্যানেজ করে। এখন বোধহয় উভয়েই সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে। আরও বহু শতবারের মত আজই ওদের বিদায় করে দেবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করে দীপঙ্কর বিরক্তচিত্তে নীচে নেমে গেল। পাতবার মত কিছুর অভাবে বিছানা থেকে বেড-কভারটা তুলে নিয়ে ফিরে এল। সেটা পেতে বসল দু'জনে।

দক্ষিণে বাতাস বইছে হু-হু করে—উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন। কি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে···রাস্তায় বেলফুল বিক্রেতার হাঁক শোনা যাচ্ছে একটানা···মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বাঁশীওয়ালা তার বাঁশীতে করুণ সুর ধরেছে একটা।

হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে শুভজিৎ, চেয়ে আছে নীল আকাশের দিকে।···মনটা চলে গেছে কোন্ সুদূরে—কি যে আকাশ-পাতাল ভাবছে তা ওই জানে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হ'ল দীপঙ্কর সেই থেকে চুপ করে আছে, এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। ভারি বিস্ময়বোধ করল শুভজিৎ—এমন তো কখনও হয়নি। বরং শুভজিৎ চুপ করে থাকবে, আর দীপঙ্কর কথা বলে যাবে, এটাই তো চিরদিনের নিয়ম। এই কলকাতায় এসে অবধি এ ক'দিন দীপঙ্করের কত যে অজস্র কথা শুনেছে তার হিসেব নেই। দীপঙ্করের সব কথাই তার জানা। নন্দিতাদের না দেখলেও তারা কেউ অপরিচিত নয়। চিঠির মারফৎ দীপঙ্করের সব খবর পেত। আর যা কিছু বা অলিখিত ছিল, এ ক'দিনে বলা হয়ে গেছে সব। যখনই অবসর পেয়ে দু' বন্ধুতে বসেছে,

দীপঙ্করের কথা শুনতে শুনতেই কেটে গেছে সে সময়টুকু। কিন্তু আজ তার হল কি?

—"কি রে, এত চুপচাপ যে! কি ভাবছিস?"

—"না কিছু নয় তো।" দীপঙ্কর একটু নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। শুভজিৎ উঠে বসল প্রায়। অষ্টমীর চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করে দেখতে চেষ্টা করল দীপঙ্করের মুখ! বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, "কি হল রে তোর? বলছিস না কেন?"

—"আর কি বলব? অনেক কথা ভাবছি বসে বসে। আমার কোন কথারই কোন দাম নেই তোর কাছে। সেই তো শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এলি, অথচ তিন বছর ধরে আমি কতবার বললাম—আঁচড়ও কাটেনি তোর মনে।"

শুভজিতের শান্ত কণ্ঠে অল্প একটু হাসির ছোঁয়াচ লাগল, "কে এমন অভিমান করতে শেখালে রে, নন্দিতা?"

একটু চুপ করে থেকে আবার আগের মত শুয়ে পড়ল। গভীর স্বরে আস্তে আস্তে বলল, "কেন শুধু শুধু রাগ করছিস বলতো! ডাঃ ব্যানার্জির চিঠিটা তো দেখলি, উপায় ছিল আমার না এসে?"

—"ছাখ, ওসব আমার জানা। চিঠিটা যখন তুই দেখিয়েছিলি, মনে হয়েছিল ডাঃ ব্যানার্জিকে একটা প্রণাম করে আসি, তোর জেদকেও হার মানিয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু এখন তোর রকম দেখে সব গোলমাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে তুই না এলেই ভাল হ'ত। তুই বলবি এ আমার উচ্ছ্বাস। তোর মত পাথর-চাপা মন আমার নয় বটে, তবু এ যে আমার উচ্ছ্বাস নয়, তা মনে মনে তুইও জানিস।"

একটু থেমে আবার বলল, "বাড়ী করবার আগে একমাত্র তোরই পরামর্শ নিয়েছিলাম, আর কারুর নয়। বাড়ী করে তৃপ্তি পাইনি তুই দেখিসনি বলে। অথচ তুই সেই কলকাতাতেই থাকবি, কিন্তু এখানে থাকবি না। ভাবছিস কিছু বুঝিনি আমি। আমি জানি মেশ ঠিক হয়নি বলেও এই যে ক'দিন আছিস, আমার বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে তাও থাকতিস না। নিশ্চয়ই হোটেলে গিয়ে উঠতিস। এর পর বোধ করি আর আসবি-ই না।"

অভিযোগ শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল শুভজিৎ।

—"তুই তো জানিস একটা সৃষ্টিছাড়া মানুষ আমি, কেন আমায় এমন করে জড়াতে চাইছিস বলতো?"

অসহিষ্ণু শোনাল দীপঙ্করের কণ্ঠস্বর। "জড়াব আবার কি? সোজাসুজি একটা কথার জবাব দে—তুই এখানে থাকলে ক্ষতিটা কি?"

—"কেন অবুঝ হচ্ছিস দীপু! এটা ভাবিস নে কেন যে নন্দিতাও একটা পরিপূর্ণ মানুষ, তার কথাটাও মনে রাখা দরকার। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যাই হোক, তবু তোর বিবাহিত জীবনে আমি একটা তৃতীয় ব্যক্তি মাত্র। তার কি করে ভাল লাগবে অহোরাত্র একটা অন্যলোকের উপস্থিতি? তাছাড়া—নিজেরও ভয় আছে আমার—সমাজ ছাড়া জীব আমি, যদি মানিয়ে নিতে না পারি?"

—"এতই যদি ভেবেছিস তো আমায় জানাসনি কেন? কেন তুই বারণ করলি না আমায় বিয়ে করতে। তুই তো সব জানিস—হঠাৎ যেদিন অমরনাথ বাবু বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, সেদিন অনেক ভেবেও কূল-কিনারা না পেয়ে তোকে লিখেছিলাম। তখন 'হ্যাঁ' বললি কেন? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি বিয়ে করার অর্থ তোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

—"তখন তো আমার কলকাতায় আসার বা এসে এখানে থাকার কোন সমস্যা ছিল না দীপু! এসব কথা তখন মনেও হয়নি আমার। রাজী হতে বলেছিলাম কেন না—ভেবে দেখেছিলাম একটা আঁচলের বাঁধন তোর একান্তই দরকার। মুখে যতই বড় বড় কথা বলিস, মনে মনে তুই ভারি দুর্বল। তাই খুশী হয়েই তোকে রাজী হতে বলেছিলাম।"

—"তাই বলে এখন তুই এত কাছে এসেও পর হয়ে যাবি? তার চেয়ে আমি ওঁদের জানিয়ে দিই আমি এ বিয়ে করব না।"

—"তুই কি পাগল হয়ে গেলি? এতদিন ধরে যে কথা দেওয়া আছে তার কোন মূল্য নেই? যাঁরা তোর সম্পত্তির কথা ভাবেন নি—তোর বাড়ীটাও তো শেষ হয়নি তখন—শুধু তোকে দেখেই মেয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারবি?"

—"হ্যাঁ, কেন পারব না। তোর সঙ্গে যতদিনের সম্বন্ধ আমার তার চেয়ে বেশীদিন দিইনি কথাটা। তাছাড়া আমি এমন একটা দুর্লভ পাত্র নই—আমার জন্যে মেয়ের বিয়ে ওঁদের আটকাবে না।"

শুভজিৎ এবার হেসে উঠল।—"হয়েছে, খুব বীরত্ব দেখিয়েছিস বুঝতে পেরেছি নন্দিতা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতার অপবাদ পর শত্রুতেও তোকে দিতে পারবে না, তোর যত দুর্বলতা আমার সম্বন্ধে দয়া করে ভদ্রতার বালাই রাখ্ একটা।" পরক্ষণে গম্ভীর হ'ল "দীপু, কেন ভাবছিস বলতো আমি পর হয়ে যাব? তোর সুখ দুঃ ছাড়া কি আমি! না এসে থাকতে পারব? তবুও কথা দি রাখছি আমায় যেদিন ডাকবি সেদিনই পাবি। তাবলে তোর এ বাড়ীতে থাকতে বলিসনি অবুঝের মত।"

দীপঙ্কর একটু চুপ করে থেকে রেগে গেল হঠাৎ।—"আমি জা শুভো, আমার সুখ-দুঃখে তুই আসবি। এবার তো প্রচুর রোজগা করবি, তোর প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক, কাজেই বন্ধুস্ত্রী দামী উপহার দিবি। তার চোখ খারাপ হলে প্রথমেই আম মনে হবে শুভো তো রয়েছে—আই-স্পেশালিষ্ট!...দুঃখ এই, যে সুখ-দুঃখের ভাগ আমাদের দিবি না তুই।"

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা।...

শুভজিৎ উত্তর দেয়নি কিছু। চুপ করে শুয়ে আছে।...

দীপঙ্করের উত্তেজনাটা কমে এল। বলল, "থাকগে, আর আলোচনা নয়। তোর জেদের ওপর তো কোনদিন কোন ক চলেনি। ফার্স্ট ইয়ারে যখন আলাপ হয়েছিল তখন আমাদের বয় ছিল পনেরো, এবার তিরিশ হ'ল—এতগুলো বছরে তোকে খানিকটা অন্ততঃ চিনেছি। বেশী টানাটানি করতেও ভরসা পাইনা, শে হয়তো আবার বিহারে চলে যাবি।"

শুভজিৎ হাসল।—"তা আর কি করে যাব? ডাঃ ব্যানার্জি তো রেজিগনেশন-লেটার দিইয়ে ছাড়লেন। গেলে খাব কি?"

—"সে তুমি অনেক কিছুই পার। বিহার না হোক পালিয়ে যাবার জায়গার অভাব তোমার! বলে ক'দিনের মধ্যে ঠিক ক তুমি ভিয়েনা চলে গিয়েছিলে!"

শুভজিৎ বলল না কিছু। বলবার তার আছেই বা কি দীপঙ্করের অভিযোগ আর অভিমানের উত্তর আছে কি কিছু কিন্তু তেমনি আবার ওর ডাকে সাড়া দেবারও উপায় নেই

কিন্তু দীপঙ্কর তা বুঝবে না। ওর ওই অবুঝ মন দিয়েই ও শুভজিৎকে বন্দী করেছে। শুভজিৎ ওকে ছাড়তে পারে না।

পরিষ্কার আকাশের গায়ে তারাগুলো জ্বল্-জ্বল্ করছে। মাঝে মাঝে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘ উড়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে তাদের। দক্ষিণ বাতাসের সেটা বুঝি পছন্দ নয়—ধাক্কা দিয়ে তাই সরিয়ে দিচ্ছে সাদা মেঘের আবরণ, তারাদের চোখে খুসীর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠছে আবার। হাসি-কান্নার পালা চলেছে সারা আকাশ জুড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অন্যমনে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল শুভজিৎ। খেয়াল হতে দেখল, দীপঙ্কর কখন উঠে গেছে।

ভিয়েনা থেকে পাশ করে ফিরে মাস ছ'য়েক কলকাতায় ছিল শুভজিৎ। তখন ডাঃ ব্যানার্জি সাগ্রহে তাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে নিয়েছিলেন। মাস কয়েক পরে তাঁর হাসপাতালে ভালো পোষ্টে ঢোকার সুযোগ ছিল একটা। কিন্তু তার আগেই বিহারে একটা ছোট হাসপাতালের ইনচার্জ হয়ে চলে গেল শুভজিৎ। দীপঙ্কর ছাড়া এই যাওয়ার যাঁর আপত্তি ছিল, তিনি ডাঃ ব্যানার্জি। ডাঃ ব্যানার্জির অতি প্রিয় ছাত্র ছিল সে, স্নেহ করতেন তিনি। প্রকাশ না থাক, তবু সত্যটা অবিদিত ছিল না শুভজিতের। ভিয়েনা যাওয়ার পিছনে তার ব্রিলিয়েণ্ট রেজাল্টের মতই কার্যকরী ছিল ডাঃ ব্যানার্জির সহায়তা। শুভজিতের ওপর অনেক আশা ছিল তাঁর। তাই সে যখন তাঁর কথাও না শুনে চলে গেল, তখন তাঁর রাগের সীমা ছিল না। শুভজিৎ জানত সব। এও জানত ডাঃ ব্যানার্জি রগচটা মানুষ, রাগ পড়তে তাঁর দেরী হবে না। মাঝে মাঝে চিঠি দিত ডাঃ ব্যানার্জিকে এবং উত্তর পাওয়াটা সৌভাগ্য বিবেচনা করত। নিয়মিত চিঠি দেবার হুঁশ ব্যানার্জি সায়েবের ছিল না। শেষের দিকে শুভজিতের চিঠি দেওয়াটাও কমে এসেছিল। কিছুদিন আগে এই মানুষটির কাছ থেকে অযাচিত ভাবে একটা চিঠি পেল। টাইপ করা ইংরিজী চিঠি, অন্যবারের তুলনায় বেশ বড়। বেশ একটু অবাক হয়েই পড়তে শুরু করল শুভজিৎ আর পড়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

'প্রিয় শুভজিৎ,

ভিয়েনা থেকে ফেরার অল্পদিনের মধ্যেই যেদিন তুমি জোর করে কলকাতা ছেড়েছিলে, সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার কোন কথায় আর থাকব না। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছি, সেজন্য আমি গর্বিত। আমার এক কলিগের ব্লাডপ্রেসার ষ্ট্রোক্ হওয়ায় তিনি রিজাইন দিয়েছেন। ডাঃ দে'র কথা বলছি, তুমি তো চেন। ওই পোষ্টে একজন এফিসিয়েণ্ট ইয়াং ডাক্তার নেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমি অবশ্য ইন্টারেস্টেড্ নই, যে ডাক্তারই আসুক, তারই সঙ্গে কাজ করব। আমি আর ক'দিন?

দিন কেটে যাচ্ছে। আসছে বছর রিটায়ার করব। শরীরটা ভেঙেছে। হাসপাতালের অপারেশন্ ইত্যাদির ঝক্কি সামলে চেম্বারের কাজটা অতি-পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে। অথচ চেম্বারটা বন্ধ করতে পারি না কিছুতেই। এটা আমার পয়সার নেশা নয়, পেশার নেশা। বন্ধুজনেরা বলছেন একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট রাখতে। কিন্তু তুমি আমার এমন বদ অভ্যাস করে দিয়েছ যে অন্য কারুর কাজ পছন্দ হয় না। সেজন্য আমি লজ্জিত, চেষ্টা করছি অভ্যাসটা বদলাতে। উপায় কি? সাহায্য করবার কেউ নেই যখন! আজকাল সন্তানের কাছ থেকেও

সহযোগিতার আশা নেই। আর আমি তো ব্যাচিলার মানুষ—আশা করাটা অন্যায় আমার পক্ষে। কি বল ?

আশা করি ভাল আছ।

তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট চেতনা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তোমার আড়াল করে আর না রাখে, এই প্রার্থনায়—

স্নেহময় ব্যানার্জি।'

চিঠি পড়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায়নি শুভজিৎ। আপাত-অর্থহীন চিঠিটার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধে হয়নি। এই নীরব আহ্বান উপেক্ষা সত্যিই সম্ভব কিনা অহোরাত্র ভেবেছে কয়েক দিন। তার পর চাকরী ছাড়ার ব্যবস্থা করেছে। যথাসময়ে এ্যাসিষ্টেন্ট-ইন্-চার্জকে বুঝিয়ে দিয়েছে সব দায়িত্ব। শেষে একদিন দীর্ঘ তিন বছর পরে কলকাতাগামী ট্রেণে উঠে বসেছে।

দীপঙ্করের বিস্ময় কাটতে সে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। পাখাটা ফুলস্পীডে চালিয়ে দিয়ে বলেছিল, "হঠাৎ তুই এলি যে ?"

চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়ে পকেট থেকে ডাঃ ব্যানার্জির চিঠিটা বার করে নীরবে দীপঙ্করের হাতে দিয়েছিল শুভজিৎ। আর চিঠি পড়ে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল দীপঙ্কর।

তারপর হেসে বলেছিল, "ওঃ, ডাক্তারের এমন কূটবুদ্ধি, তোকে অবধি ঘায়েল করে দিল।"

পরদিনই সন্ধ্যায় ক্যামাক ষ্ট্রীটে ডাঃ ব্যানার্জির বাড়ী দেখা করতে গেল শুভজিৎ। এখানেই নাচে তাঁর চেম্বার। তখন চেম্বারের কাজ সেরে উপরে চলে গেছেন তিনি। শুভজিৎ স্লিপ পাঠাতে নিজেই হাতে একটা ডাক্তারি ম্যাগাজিন নিয়ে নেমে এলেন—পড়ছিলেন বোধ হয়।

ঘরে এনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, হঠাৎ তোমার আবির্ভাব ?"

এই শিক্ষকটিকে চিনতে শুভজিতের বাকি নেই। জানে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলবে না, "আপনি ডাকলেন স্যার, তাই।" তাহলে প্রলয় ঘটবে। কখন ডেকেছেন ডাঃ ব্যানার্জি ? কেনই বা ডাকবেন ? চিঠিটা আছে শুভজিতের সঙ্গে ? তাহলে বার করুক তো, পড়ে দেখবেন ডাঃ ব্যানার্জি কোথায় লেখা আছে এ-কথা ! সুতরাং শুভজিতের উত্তরটা এসবের ধার দিয়েও গেল না, "আপনার চিঠিতে ডাঃ দের পোষ্টটার খবর পেয়ে ভারি লোভ হল স্যার, তাই চলে এলাম ও চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে। আর ভাল লাগছিল না ! আপনি যদি বলেন তো এখানে এ্যাপ্লাই করে দেখি। অবশ্য ডেট ওভার হয়ে গেল কি না জানি না।"

"না, তা হয়নি। এখনও ক'দিন সময় আছে, তুমি এ্যাপ্লাই কর কালই।" সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

পুরোনো কাজের সব ব্যবস্থা করে আসতে শুভজিতের কম সময় লাগে নি। এ্যাপ্লিকেশন পাঠানোর দিন পেরিয়ে যাবে, আশঙ্কা তার ছিলই। তবু ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা না করে ওখান থেকে এ্যাপ্লিকেশন পাঠায়নি। জানত শুধু ডাঃ ব্যানার্জির চেম্বারে কাজ করলেও তার প্রয়োজন মিটবে—তাই নিশ্চিন্ত ছিল। এখন আন্দাজ করল ডাক্তার নেওয়ার প্রস্তাবে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই কমিটির এই মেম্বারটি তাকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথাও প্রকাশ করবার উপায় নেই।

শুভজিৎ অন্য কথায় এল। "স্যার, একটা কথা বলছিলাম। একেবারে তো চাষা হয়ে গেছি—আর চোখ নিয়ে স্পেসিফাই তো করিওনি এ ক'বছর, আপনার চেম্বারে কাজ প্র্যাক্টিস না করলে হসপিটালের কাজ পারব না।"

ব্যস্, ডাঃ ব্যানার্জিকে খুসী করতে আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না।

—"কি ? তিন বছরে তুমি কাজ ভুলেছ ! ইউ সিলি ল্যায়ার !···চেম্বারের কথা বলছ ? যদি দায়িত্ব নাও তাহলে তো বাঁচি আমি। এবার তুমি চালাও, আমি বসে দেখব। মাঝে মাঝে দু'-চারটে রুগী দেখতে দিও কেবল, তাহলেই হবে—একটা নেশা তো !"

প্রসন্ন কণ্ঠে হা হা করে হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন কফির জোগাড় আনতে। শুভজিৎকে নিজে কফি তৈরী করে খাওয়াবেন। এটি তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। খুব খুসী হলে এই খাতিরটি তিনি করে থাকেন।

সরঞ্জাম এলে সাড়ম্বরে কফি তৈরী করতে করতে বললেন, "কোন আক্কেলে তিন-তিনটে বছর নষ্ট করলে শুভজিৎ ! সত্যি আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি তুমি এ রকম করবে !"

শুভজিৎ হাসল একটু। বলল, "কেন স্যার, নতুন ডাক্তারদের প্রতি গভর্ণমেন্টের উপদেশই তো তাই—গ্রামে যাও। আমি যেখানে ছিলাম সেটা তো তবু প্রায় মফঃস্বল সহরের মত।"

ডাঃ ব্যানার্জি চটে উঠলেন, "গ্রামে যাও ! উপদেশ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু ছেলেগুলো সব গাঁয়ে গিয়ে বসে থাকলে নতুন কাজ শিখবে কি করে বলতে পার ? কোন সুযোগ আছে সেখানে ? আগে অভিজ্ঞ হোক তারা। বরং আমাদের মত বুড়োদের যেতে বলায় তবু একটা মানে হয়। ওসব গালভরা কথা আমি ঢের শুনেছি। গ্রামোন্নতির নামে শুধু বাকচাতুরী ফলান নেতারা, আর পাশ করে বেরিয়েই ডাক্তারগুলো সব নির্বাসনে যাক—এদিকে কর্তাদের ফোড়া কাটতেও ইউরোপ—আমেরিকা থেকে ডাক্তার আসুক ! যত সব ভণ্ডামি ! নিজের দেশের ডাক্তারদের কোন সুযোগ দেব না, অথচ নিজেদের মূল্যবান প্রাণ তাদের হাতে ভরসা করে তুলে দিতে পারি কি ! কি জানে দেশী ডাক্তাররা ? চমৎকার ব্যবস্থা !"

ডাঃ ব্যানার্জির আগ্রহে পরদিনই চেম্বারে যোগ দিল শুভজিৎ। কয়েক দিনের মধ্যে হ্যারিসন রোডে একটা মেসে ঘর পেয়ে উঠে গেল দীপঙ্করের বাড়ী থেকে। ক'দিন পরে হাসপাতালেও ইনটারভিউ দিতে ডাক পড়ল, তারপর একদিন মনোনয়নের সংবাদ পেল। খবরটা শুনে শূন্যমনে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল শুভজিৎ, স্বভাবটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে আনন্দের কোন উচ্ছ্বাসই এল না মনে, অন্ততঃ ওকে দেখে বোঝা গেল না কিছু। শুধু সন্ধ্যায় চেম্বার থেকে ফেরবার সময় অন্যমনেই দীপঙ্করের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ক'দিনই দেখা হয়নি তার সংগে, আজও বাড়ী ছিল না সে। খবরটা লিখে রেখে চলে এল।

মেসে ফিরে স্নান সেরে এসে আলোটা জ্বালাল। ভীড় এড়াতে একটা পুরো ঘরই ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োজন অল্প, জিনিষপত্র যৎসামান্য। কাজেই সারা ঘরটাই প্রায় শূন্য পড়ে আছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেন ঘরের শূন্যতাটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করল একবার, তারপর দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিল।

ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে আনা নতুন ডাক্তারি বইগুলোর একটা টেনে নিতে গিয়েও থেমে গেল—ইচ্ছে করছে না।···তার বদলে বাঁশীটা খুঁজে বার করে খাটের ওপর পা তুলে বসল। চোখ বুজে বাঁশীতে ফুঁ দিল তারপর। বিহারে থাকতে এটি ওর নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ধ্য-সঙ্গী ছিল। কলকাতায় এসে অবধি একদিনও বসে নি নিয়ে। আজ সন্ধ্যায় শূন্যমনের খোরাক জোগাতে মনে পড়েছে তাকে।···

একটু পরেই দরজায় ধাক্কার শব্দে বাঁশী থামাল শুভজিৎ। একটু অবাক হয়েই বাঁশীটা বিছানায় রেখে দিয়ে দরজাটা খুলল—সামনে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর। শুভজিৎকে দেখেই গম্ভীরভাবে বলল, "এখনও বাঁশী বাজাস! ও সঙ্গীটাকে আজও বাতিল করিসনি তাহলে! বাঁশীর সৌভাগ্য।"

"আয়", দীপঙ্করের কথার উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে তাকে ভেতরে আহ্বান করল শুভজিৎ। "রাত হয়ে গেছে, খুব খুঁজেছিস তো ঠিকানা?"

তক্তপোশের ওপর গম্ভীর মুখে এসে বসল দীপঙ্কর। রাগ তার এখনও পড়েনি, একদিনও আসেনি সে শুভজিতের মেসে। আজ বাড়ী ফিরে স্লিপটা পেয়ে আর থাকতে পারেনি। ঠিকানাটা শুভজিৎ আগেই দিয়েছিল, খুঁজে চলে এসেছে।

শুভজিতের প্রশ্নের উত্তরে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই বলল, 'না, তেমন কিছু খুঁজতে হয়নি। কবে জয়েনিং?"

নিঃশ্বাস ফেলল শুভজিৎ "থাক কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে আসিসনি, এই ঢের!" একটু থেমে উত্তরটা দিল, "এই তো ক'দিন পরে জয়েনিং, ফার্ষ্ট মে।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।···

শুভজিৎ দেখছে দীপঙ্করকে—অটল গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। দীপঙ্কর যে এত রাগ করতে পারে জানা ছিল না। দীপঙ্করের চটে থাকাটা ভারি অস্বস্তিকর।

—"দীপু, নন্দিতাদের বাড়ী নিয়ে যাবি বলেছিলি, কই একদিনও তো গেলি না?" হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করল।

শুভজিৎ কলকাতায় আসার দিন থেকে দীপঙ্কর বহুবার তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে শ্যামবাজারে।

একটু শান্ত হেসে শুভজিৎ বলেছে, "হবে হবে, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?" কখনও বা বলেছে, "হোক'না বিয়ে তোর, নন্দিতার সঙ্গে আলাপ করা কি পালিয়ে যাচ্ছে?"

দীপঙ্কর বুঝেছিল শুভজিতের ইচ্ছে নেই যেতে। অন্য সময় হলে, কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েও লেগে থাকত, বার বার চেষ্টা করত রাজী করাতে। কিন্তু সেই যে তার বাড়ী রইল না শুভজিৎ, সেই অভিমানটাই এত বড় হয়ে বেজেছিল যে তাকে শ্যামবাজারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল দীপঙ্কর।

সেটা যে শুভজিৎ বোঝেনি এমন নয়। আজ তাই দীপঙ্করের অভিমান ভাঙাতে নিজের থেকেই যেতে চাইল, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে আর তাকাল না।

অপ্রত্যাশিত অনুরোধ শুনে দীপঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করল "হুঁ! ভূতের মুখে রামনাম। কতবার বলা হয়েছে আপনাকে যেতে শুনেছেন কি? মুখে রাগ প্রকাশের চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা নরম শোনাল।

শুভজিৎ একটু হেসে বলল, "এই তো এবার যাব। বিয়ের তো দেরী আছে এখনও। আর তোর বৌ হবে যখন, আগের থেকে নন্দিতার সংগে আলাপ করে রাখাটা দরকার। কি বলিস?"

দীপঙ্কর মহা খুশী হয়ে গেল। শুভজিৎ তার কথায় যেতে রাজী হয়েছে, এটাই মস্ত বড় কথা। এর পরও আর রাগ পুষে রাখতে দীপঙ্কর অন্ততঃ পারবে না।···এখন আর আগের মত গল্প করতে বাধা নেই, একদিনের না-বলা কথাগুলো সব বলে ফেলতে অসুবিধে নেই কিছু। তার জন্য যদি বাড়ী ফিরতে রাত এগারটা বেজে যায়, যাক। [ক্রমশঃ।

মৃত্যুর মোহানা পেরিয়ে

শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ

লক্ষ মৃত্যুর মোহানা পেরিয়ে এলাম
মুক্তবন্ধ জীবনের সিংহদ্বার পানে।
উদয়রবির আলোক বিভায়
বসন্ত সমীরণের দোলায় দোলায়
কনকচাঁপার চমকলাগা গন্ধমায়ায়
বনবীথিকার সবুজ শ্যামলিমায়
তোমার কান্তি তোমার সুর সুমধুর
তোমার রূপ তোমার ছবি, ওগো নিঠুর।

তব গানে তব ছন্দে আজি জাগে হৃদয়পুর
অন্তরে বাহিরে ঝণন-ঝনন বাজে তোমার নূপুর।
ছিল আঁখি ছিল নাকো শুভদৃষ্টি
নিমীলিত ধ্যানের নেত্রে আজি হেরিনু
তোমার বিচিত্র বর্ণাঢ্য সৃষ্টি।
কোটি কোটি মানবের লাগি
রচিলে নিখিল ভুবন নিরুপম কল্পনায়
অনন্ত ঐশ্বর্যমাঝে প্রকাশিলে প্রশান্ত মহিমায়।

আর এক কালান্তরে জীবনের নূতন পরিচয়
লভিলাম পথে-প্রান্তরে চলিতে চলিতে
সকল সঞ্চয় নিঃশেষে হারায়ে নবীন অভিজ্ঞান
তোমার এ রূপমালঞ্চে আমিও এক মালাকর।
কিছু মোর এ জীবনের নহে ত সামান্য
আজিকার দলিত যত নম্র নবাঙ্কুর
সোনালী সূর্যের কিরণ-সম্পাতে
সৌবাসি ফসলে হবে ভরপুর।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১২

ধীরাপদ চুপচাপ বসেছিল অনেকক্ষণ।

তিন সপ্তাহ বাদে এসে প্রথম দিনটার এমন সমাপ্তি অভিপ্রেত ছিল না। লাবণ্য সরকারের শ্লেষ আর বিদ্রূপ গা-সওয়া। আর, সেটা যে ভালো লাগত না বা লাগে না এমনও নয়। তবে ধীরাপদ এই কাণ্ড করতে গেল কেন ?

অমিত ঘোষের সামনে লাবণ্যর রূপান্তর আগেও দেখেছে। তার প্রসঙ্গে মুখের বিপরীত রেখা-বিন্যাস আগেও লক্ষ্য করেছে। অবশ্য তার দুর্বলতা এত স্পষ্ট করে আগে আর বোঝা যায়নি। কিন্তু সেটা এমন গোপন কেন ? ধরা পড়ে লাবণ্য তো ওর মুখের ওপর হেসে উঠতে পারত।

গোপনতা বড়সাহেবের কারণে, না ছোটসাহেবের ?

অবসন্ন দিনের মতই ধীরাপদর ভিতরেও শিথিল শ্রান্তির ছায়া পড়ছে একটা। বিশ্লেষণী চোখ দুটো কে-যেন সেইদিকেই ফেরাতে চাইছে থেকে থেকে। ধীরাপদ চাইছে না। তার অস্পষ্ট ইশারায় রাজ্যের অস্বস্তি।···অমিত ঘোষ প্রিয়জন তোমার, এ আবিষ্কারে তোমার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তার বদলে ওই বিমর্ষ ছায়াটা কিসের ? লাবণ্য সরকারের দুর্বলতা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোনো দুর্বল আশায় টান পড়ল ? নিজেরও অগোচর নিভৃতের কোনো ?

অনেক হয়েছে, আর অফিস করে না। ধীরাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

অমিত ঘোষের সঙ্গে দেখা আরো দিন তিনেক পরে। বাড়ি গিয়ে দেখা করবে কিনা ভাবছিল। সেদিন অফিসে এসেই শুনল চীফ কেমিষ্ট লাইব্রেরিতে।

করিডোরের দেয়াল ঘেঁষে লাবণ্য নিজের ঘরের দিকে আসছিল। ধীরাপদকে তিন-তলার সিঁড়ির দিকে এগোতে দেখে গতি মন্থর করল একটু। এর মধ্যে ফাইল অনেক পাঠিয়েছে, নিজে আসেনি। বরং ধীরাপদ দিনান্তে দুই-একবার তার ঘরে গেছে। যখনই গেছে ব্যস্ত দেখেছে। নয়তো শূন্য চেয়ার দেখে ফিরে এসেছে। কথাও যা দু'-চারটে হয়েছে, কাজের কথাই।

···মেডিক্যাল হোমের খালি জায়গায় আপনার ওই রমেন হালদারকেই নেওয়া হয়েছে—আজ নোট গেছে।

ব্যক্তিগত সুসমাচার শোনার মত করেই ধীরাপদ হাসল একটু।

—ও জেনেছে ?

মিঃ মিত্রর টেবিলে ফাইল গেছে, সই হয়ে আসুক···ইচ্ছে করলে তাঁর হয়ে আপনিও সই করে দিতে পারেন।

পারে কি পারে না সেই আলোচনা এড়িয়ে ধীরাপদ আবারও হেসে পাশ কাটানোর উপক্রম করল।

আপনি অমিতবাবুর কাছে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

লাবণ্যর নিরাসক্ত দুই চোখে আগ্রহও নেই, আবেদনও নেই। —সিনিয়র কেমিষ্ট এসেছেন বলে তাঁর যদি আমার 'পরে কোনো অভিযোগ থাকে, আপনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন, যা বলার আমি বলব।

আর দাঁড়ায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ধীরাপদর মনে হল, অমিত ঘোষের কাছে যে দুতিয়ালির আশা নিয়ে মহিলা সেদিন ওর কাছে এসেছিল, সেটাই আজ প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল। সেদিনের সেই কথাবার্তার পর আর ওকে একটুও বিশ্বাস করে না হয়ত। না করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যে লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় চলেছে, সম্প্রতি বর্তমানে মেজাজটি তার কোন্ তারে বাঁধা জানা থাকলে অমন সপাসপ ওপরে উঠে যেত না হয়ত। কুশনে গা ছেড়ে দিয়ে মোটা একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। ধীরাপদ দূর থেকে দেখল একটু, তারপর এগিয়ে এসে পাশেই বসে পড়ল।

অমিত ঘোষ মুখ তুলে তাকালো শুধু একবার। গম্ভীর তন্ময়তায় আবার বইয়ের দিকে চোখ ফেরাল। আলাপের অভিলাষ নেই।

ক'দিন দেখা না পেয়ে আজ ভাবছিলাম আপনার বাড়ি যাব। ধীরাপদর প্রসন্ন অবতরণিকা।

দরকার আছে কিছু ? বইয়ের পাতা ওলটালো একটা। নিরুত্তাপ প্রশ্ন।

দরকার আর কি, কতদিন দেখা নেই বলুন তো, তিন সপ্তাহ বিছানায় পড়ে রইলাম, রোজ ভেবেছি আপনি আসবেন—একদিনও এলেন না।

আপনার আপনজনেরা তো সব গেছলেন···। বই থেকে মুখ তুলল না এবারেও, নিস্পৃহ মন্তব্য।

মনে মনে ঘাবড়ালেও ধীরাপদ হেসে উঠল, আপনি কম আপনজন নাকি ?

জবাব নেই। গম্ভীর বিরক্তি। পড়ছে।

আর কথা বাড়ানো নিরাপদ নয় জেনেও উঠে আসা গেল না। অথচ এই অবস্থায় কথা যদি বলতেই হয়, সেই কথার পিছনে নিঃশঙ্ক জোর থাকা দরকার। ফলাফল কি হতে পারে জেনেও ধীরাপদ নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার মেজাজের হঠাৎ এ অবস্থা কেন ?

বই কোলের ওপর রেখে আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল। দেখল ছ'-চার মুহূর্ত। ওপরঅলা নীরব গাম্ভীর্যে দু-চোখে নিচের কর্মচারীর ধৃষ্টতা দেখে।

আপনার কাজ নেই কিছু ?

থাকবে না কেন, ধীরাপদর নিরুপায় জবাব, আমার কাজটা আপাতত আপনার সঙ্গেই।

আর একটু সরে বসল, পড়ার পৃষ্ঠায় একটা আঙুল ঢুকিয়ে রেখে বইটা বন্ধ করল। চোখে চোখে তাকালো তারপর।—বলুন।

বলা মাথায় রেখে মানে মানে সরে পড়লে কেমন হয় এখন ? সম্ভব নয়। তার হাতের সোনার রঙে নাম লেখা ঝকঝকে মোটা বইটার দিকে চোখ গেছে ধীরাপদর। বইখানা ভারী সুদৃশ্য লাগছে যেন। আলাপের সুরে বলল, এই অসুখটার আগেও দেখেছি আপনি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত, নতুন কোনো ওষুধবিষুদের প্ল্যান ভাবছেন নাকি ? কি বই এটা ?

অমিত ঘোষের চোখে মুখে সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণু উগ্রতা দেখলেও ধীরাপদ মনে মনে স্বস্তি বোধ করত হয়ত। কিন্তু তার বদলে অমিত ঘোষ পাথর-মূর্তি একেবারে। বই হাতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে।

আয়রণ ইন ইনট্রাম্যাসকুলার থেরাপি। বুঝলেন ?

ধীরাপদ বিপদগ্রস্তের মত মাথা নাড়ল। বোঝেনি।

শেষবারের মত গভীর আর গম্ভীর দৃষ্টি-ফলাকায় ওকে প্রায় ছ'খানা করে অমিত ঘোষ গটগটিয়ে লাইব্রেরি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ধীরাপদই কুশনে গা ছেড়ে দিল এবার। ঘামছে একটু একটু।

গোটা কারখানায় কি একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো কথা কাটাকাটি নেই, তর্কাতর্কি নেই, কোনরকম বিরুদ্ধাচরণও নেই, অথচ ভিতরে ভিতরে কেউ কিছু বরদাস্ত করতে রাজি নয় যেন। সেই কিছুটা কি, সেটাই ধীরাপদ সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না।

সমস্ত কারখানায় মানসিক পরিবর্তন এসেছে একটা, তাই শুধু অনুভব করে

হিমাংশু মিত্রর কোনো নির্দেশ কেউ অমান্য করেনি এ-পর্যন্ত। এমন কি ছেলেও না। প্রসাধন বিভাগের নতুন বিল্ডিং উঠছে শহরের আর এক-প্রান্তে, বাপের নির্দেশে মুখ বুজে সেখানে কোন তত্ত্বাবধানে লেগে আছে সে। নতুন শাখা চালু করার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তবু হিমাংশু বাবু ঠিক যেন খুশি নন। মুখের সেই আত্মপ্রত্যয়ী হাসির ভাবটুকু কমে আসছে, প্রসন্নতায় টান ধরছে।

ধীরাপদর মনে হয়, যা তিনি করাচ্ছেন তাই হচ্ছে, কিন্তু যা তিনি চাইছেন তা হচ্ছে না। কিন্তু কি সেটা ? কি চাইছেন আর কি হচ্ছে না ?

সিতাংশু মিত্র দিনে একবার করে আসে কারখানায়। বিকেলের দিকে, ছুটির আগে। কাজ সেরেই আসে বোঝা যায়। কারণ, হিমাংশু বাবু খোঁজ-খবর করেন, কাগজপত্র দেখেন। ইদানীং তিনি প্রায়ই দিনে দুবার করে আসছেন কারখানায়। সকালে আসেনই, বিকেলের দিকেও মাঝে মাঝে আসেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। কোনো একটা কাজ হয়নি শুনলে খুশি হন বোধ হয়, কিন্তু সেও বড় শোনেন না। ধীরাপদর এক এক সময় মনে হয়, কাজ করানো আর কাজ করা নিয়ে বাপে-ছেলেতে যেন নীরব রেষারেষি চলছে একটা।

সিতাংশুর এখানকার কাজের দায়িত্ব বেশির ভাগ ধীরাপদর ঘাড়ে এসে পড়েছে। দায়িত্ব নেবার লোক আরো ছিল, কিন্তু বড় সাহেবের এই-ই নির্দেশ। এটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ না তার কাজের প্রতি আস্থা সে-সম্বন্ধেও ধীরাপদ তেমন নিঃসংশয় নয়। কারণ নিজের কর্মক্ষমতার ওপর নিজেরই ভরসা কম। অবশ্য নিজের কর্মতৎপরতার অনেক অনুকূল নজির মনে মনে খাড়া করেছে। যেমন, ও আসার পর থেকে বিজ্ঞাপনের উন্নতি হয়েছে, প্রচারকাজ ভালো হচ্ছে, সেল বেড়েছে, বাইরের ডাক্তাররা সুখ্যাতি করেছেন, এমন কি কর্মচারীরাও তার সদয়
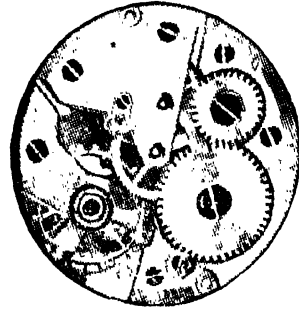
ব্যবহারে কিছুটা তুষ্ট। কিন্তু এর কোনোটাই ধীরাপদ একেবারে নিজস্ব বিচক্ষণতার পর্যায়ে ফেলতে পারছে না।

লাবণ্য সরকার ঘরে আসে কম, ফাইল পাঠায় বেশি। কারখানার ফাইল, মেডিক্যাল হোমের ফাইল। বড় সাহেবের ব্যবস্থা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, কোনো আপত্তি বা অভিযোগ নেই। অথচ তার এই নিরাসক্ত চালচলন, ব্যবহার—সবটাই ওই নিঃশব্দ প্রতিবাদের মত মনে হয় ধীরাপদর। বিকেল পর্যন্ত কাজ করে, তার পর সিতাংশু এলে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যায়।

এই যাওয়াটাও যেন নীরব অথচ স্পষ্ট প্রতিবাদ হিসেবে।

অসুখের পরে কাজে যোগ দেবার পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ধীরাপদ বাড়তি কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। ঠিক সাত দিনের মাথায় বড় সাহেব প্রস্তাব করলেন, অফিসের পর সন্ধ্যার দিকে তাঁর বাড়িতে জরুরী আলোচনার বৈঠক বসবে। কারখানা প্রসঙ্গে আলোচনা, আসন্ন দশম বার্ষিকী উৎসবের বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা, প্রসাধন শাখার ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা। এক কথায় যাবতীয় উন্নতি সমস্যালোচনা আর পরিকল্পনার বৈঠক হবে সেটা। বড় সাহেব থাকবেন, ছোট সাহেব থাকবে, ধীরাপদ থাকবে, অমিতাভ ঘোষ থাকে ভালো নয়ত প্রয়োজনে সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোমকে ডাকা হবে।

লাবণ্য সরকারের থাকা সম্ভব নয়। কারণ তার সে সময়ে মেডিক্যাল হোমের অ্যাটেণ্ডান্স। সেটা অপরিহার্য।

প্রথম দিন দুই আলোচনার নামে বসেই কেটেছে একরকম। বড় সাহেব পরে এসেছেন, আগে উঠেছেন। কিন্তু তারা দুজন সময়মত এসেছিল কি না খোঁজ করেছেন। তারা বলতে ধীরাপদ আর সিতাংশু। অমিতাভ ঘোষ আসেনি, আসবে কেউ আশাও করেনি। আলোচনা কিছুই হয়নি, ব্যবসায়ের উন্নতি প্রসঙ্গে ভালো ভালো দু'-পাঁচটা কথা শুধু বলেছেন বড়সাহেব। অপ্রাসঙ্গিক হালকা রসিকতাও করেছেন একটু আধটু। তাঁর হয়ে বক্তৃতা লিখে লিখেই নাকি ধীরাপদর মুখখানা আজকাল অত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়েছে, অল্প বয়সের গম্ভীর মুখ দেখলে তাঁর মত বুড়োরা কি ভাবেন, মেয়েরা কি ভাবে, ছোটরা কি ভাবে, ইত্যাদি। কেয়ার-টেক বাবুকে ডেকে চা জলখাবারের অর্ডার দিয়েছেন। ছেলে কতদূর কি এগলো না এগলো সেই খবর করেছেন একটু। চা জলখাবার আসতে নিজের হাতে টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে দিয়েছেন।

বিকেলের এই আলোচনা-বৈঠকে বড়সাহেবকে আবার আগের মতই খুশি দেখছে ধীরাপদ।

কিন্তু ধীরাপদর নয়, মুখ সারাক্ষণ থমথমে গম্ভীর সিতাংশুর। তার দিকে না চেয়েই বড়সাহেব সেটা লক্ষ্য করেছেন, তারপর ধীরাপদকে ঠাট্টা করেছেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধীরাপদর চোখের সমুখ থেকে একটা রহস্যের পরদা খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে গেছে। এমন নির্বোধ তো ও ছিল না কোনো কালে, এই জানা কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে এত দেরি! আসলে লাবণ্য সরকারের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে রাখতে চান বড়সাহেব, তফাতে রাখতে চান! সেটা হয়ে উঠছিল না বলেই একটা অকারণ ক্ষোভের আঁচ লাগছিল সকলের গায়ে। এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা বা দুজনের একসঙ্গে বসে যাওয়ার খবরে বড়সাহেবের উষ্ণভাব ধীরাপদ নিজেই তো কতবার লক্ষ্য করেছে। হোক লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ, টাকা যার আছে ও-টাকা তার কাছে কিছুই নয়—ছেলেকে সরাতে হবে, তফাতে রাখতে হবে। সেই জন্যেই প্রসাধন-শাখা বিস্তার। আর সেই জন্যেই অসময়ের এই আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা—যে-সময়ে নির্বাক প্রতিবাদে লাবণ্য সরকার আর সিতাংশু মিত্র সকলের নাকের ডগা দিয়ে হনহনিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর যে-সময়টা মেডিক্যাল হোমে লাবণ্য সরকারের অপরিহার্য হাজিরার সময়।

ধাঁধার জবাব মিলে যাচ্ছে—গাঁটে গাঁটে, খাপে খাপে।

সেদিন ধীরাপদর এই ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হয়েছে মানকের কথা শুনে। অবশ্য সে শোনাতে আসেনি কিছু, বরং চাপা আগ্রহে শুনতেই এসেছিল কিছু। সুযোগ সুবিধে বুঝে ঝাড়ন হাতে টেবিল-চেয়ার ঝাড়-মোছ করতে এসেছিল মানকে।

বড় হল-ঘরে ধীরাপদ একা বসেছিল। বড়সাহেব আসেননি তখনো। ছোটসাহেব একবার এসে ঘুরে গেছে, বাবা এলে তাকে ভিতর থেকে ডেকে আনতে হবে।

ধীরাপদর সামনের টেবিলটাই আগে ঝেড়ে-মুছে দেওয়াটা দরকার বোধ করল। তারপর কাছে একটা মানুষ আছে যখন একেবারে মুখ বুজে থাকা যায় কি করে। ক্ষোভ কি কম জমে আছে! ঘর-দোর একদিন না দেখলে কি অবস্থা হয় সেটা ও ছাড়া আর কে জানে! তারিপ নেবার বেলায় অন্য লোক। গোটা জীবনটা তো এই একজায়গায় গোলামী করে কেটে গেল, তবু আশা বলতে থাকল কি! যেদিন পারবে না, দেবে দূর করে তাড়িয়ে। ব্যস হয়ে গেল।

ধীরাপদকে শুনিয়ে আপন মনে খানিক গজগজ করে হঠাৎ কাছে ঘেঁষে এলো মানকে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, ছোট সাহেব রাজি হলেন বুঝি?

ধীরাপদ প্রশ্নটা সঠিক বুঝে উঠল না। মানকের মুখে চাপা আগ্রহ আর অনধিকার চর্চার সঙ্কোচ।

কিসে রাজি হলেন?

ওই যে···বিয়েয়। কেয়ারটেকবাবু বলছিলেন আসছে ফাল্গুনেই হতে পারে। আপনি জানেন না?

ধীরাপদ ততটা জানে না গোছের মাথা নাড়ল। কৌতূহল মেটাতে এসে কিছুটা কৌতূহলের খোরাক দিতে পেরেছে বলেও মানকের তৃপ্তি একটু। বড়সাহেবের নেকনজরের এই ভালো-মানুষটাকে তেমন চটকদার খবর কিছু দিতে পারলে আখেরে ভালো ছাড়া খারাপ আর কি হতে পারে। অতএব যতটা জানে আর যতটা ধারণা করতে পারে প্রসন্ন উত্তেজনায় তার সবটাই বিস্তার করে ফেলল সে।

···রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা। রাজকন্যে নয়, ভুল বলল, কেয়ারটেকবাবু বলেছিলেন 'মিনিশটারে'র কন্যে। 'মিনিশটার' মন্ত্রী না বাবু? তা কেয়ারটেকবাবু তো আবার ইংরিজি বলতে পেলে বাংলা বলেন না। তাঁকে অর্থাৎ হবু শ্বশুরকে এই বাড়িতেই ওরা বারকতক দেখেছে। মেয়ে নিয়েও বেড়াতে এসেছিলেন একদিন। পরীর মত মেয়ে। দু গালে আপেলের মত রঙ বোলানো আর ঠোঁট দুটো টুকটুক করছে লাল—'লিপটিকের' লাল, চিত্তির-করা পটে আঁকা মুখ একেবারে। সেই রেতেই তো বড়সাহেবের কি রাগ ছোট সাহেবের ওপর—ছোটসাহেব যে বাড়ি ছিলেন না!

মনের মত শ্রোতা পেয়ে চাপা আনন্দে আরো একটু কাছে ঘেঁষে এসেছে মানকে।—আসল কথা কি জানেন? ছেলে এ বিয়েতে নারাজ, তাঁর বোধহয় মেম-ডাক্তারকেই মনে ধরেছে—কাউকে বলবেন না যেন আবার বাবু।

ধীরাপদ মাথা নাড়তে আশ্বস্ত হয়েছে।—ওর আর কি, সব তো শোনা কথা, কেয়ারটেকবাবুর বলা কথা। তাঁর তো 'সন্ধকথায়' আড়ি পাতা সুবিধে—যতক্ষণ বাড়ি থাকেন সাহেবরা আর জেগে থাকেন, দোরগোড়ায় ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো তাঁকে—তাঁরই শোনার সুবিধে সব। তিনি বলছিলেন, এই বিয়ে নিয়েই ছেলেতে বাপেতে মন কষাকষি। আর বলছিলেন, বড়সাহেবের ইচ্ছে যখন হয়েছে, বিয়ে হবেই, এই ফাল্গুনেও হতে পারে।

এরপরেই মানকের বিরূপতা কেয়ারটেকবাবুকে কেন্দ্র করে। কেয়ারটেকবাবু নাকি ওকে শাসিয়েছেন, বিয়েটা হয়ে গেলে ও টেরটি পাবে। ও যেন কাজ না করেই এতকাল আছে এ বাড়িতে—খায় দায় আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। হাতে পায়ে খেটে খায় ওর ভয়টা কিসের। আর বিয়ে হচ্ছে ভালই তো হচ্ছে—মেয়েছেলে না থাকলে গৃহস্থ-বাড়ি তো মরুভূমির মত—কি বলেন বাবু, ভয়টা কিসের?

ধীরাপদ মাথা নেড়ে আবারও আশ্বাস দিয়েছে হয়ত, ভয় নেই। নিজের অগোচরে মানুকে একটা সত্যি কথাই বলে ফেলেছে। বাড়িটাকে গৃহস্থ বাড়ি বলে কখনো মনে হয়নি বটে, আর এ-বাড়ির মানুষ কটিও যেন ঘরের মানুষ নয়। এত নিরাপদ সচ্ছলতা সত্ত্বেও ছন্নছাড়ার মত এদের জীবন শুধু ভাসছেই, কোথাও নোঙর নেই।

গৃহস্থ-তত্ত্ব নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয়ে ওঠেনি ধীরাপদর। বড়সাহেব বা ছোটসাহেবের হাবভাব রকমসকমের অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু লাবণ্য সরকারের এই পরিবর্তনের অর্থ কী? সে হঠাৎ এত ধীর গম্ভীর কেন? অমিতাভ ঘোষের প্রতি সেদিনের সেই গোপন দুর্বলতা সত্যি হলে (সত্যি বলেই বিশ্বাস ধীরাপদর) তার তো এ-ব্যবস্থায় খুশি হবার কথা!

···ছোট বিপদের আড়ালে ছিল, এখন বড় বিপদের সম্ভাবনা কিছু?

যে ধাঁধাঁটা সেদিন অমন সুন্দর মিলে গিয়েছিল, সেটা তেমন আর মিলছে না এখন। আবারও জট বেঁধেছে কোথায়।

একটা ছোট ঘটনায় অমিতাভ ঘোষের নীরব অসহযোগিতা স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

প্রহসন কৌতুকাবহ।

ভাবনা সত্ত্বেও ধীরাপদর হাসিই পেয়েছে এক-একসময়। আরো হাসি পেয়েছে লাবণ্যর দুরবস্থা দেখে। সরকারী স্বাস্থ্যনীতির দৌলতে ওষুধের কারখানায় বছরে দু'পাঁচটা বড়সড় অর্ডার আসে। শুধু এখানকার নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও। এবারের যে অর্ডারটা এসেছে সেটা খুব বড় না হলেও তেমন ছোটও নয়।

কিন্তু ছোট হোক, বড় হোক, চুক্তি অনুযায়ী সেটা সরবরাহ করাই চাই। অন্যথায় সুনাম নষ্ট, মর্যাদা হানি।

কোনো ওষুধের দেড় লক্ষ ইনজেকশান অ্যামপুলের অর্ডার। বছর দুই আগে এই ইনজেকশানই আর একবার সরবরাহ করা হয়েছিল। আবারও চাই। আগের বারে এই ওষুধের প্রধান কর্মকর্ত্রী হিসেবে লাবণ্য সরকারের নাম স্বাক্ষর ছিল। অর্থাৎ, ওষুধ তার তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু কাজটা আসলে করেছিল অমিতাভ ঘোষ। সহকর্মিনীর প্রতি তার প্রীতির আবেগে তখনো ঘা পড়েনি এমন করে। তাকে মর্যাদা এবং পরিচিতি লাভের এই সুযোগটুকু দিতে চাফ কেমিষ্টের দ্বিধা ছিল না তখন।

এ-সব ওষুধের ফরমূলা বা উপাদান-সমষ্টি ক্রেতা বিক্রেতা নির্মাতা সকলেরই চক্ষুগোচর। গোপন নেই কিছুই। ফরমূলা আর পরিমাণ বা পরিমাপ লিখেই দিতে হয়। তবু প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানীরই গোপন বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে, যা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এই প্রস্তুত-প্রণালী বা প্রোসেসিংএর দক্ষতা যে উপেক্ষার বস্তু নয়, সেটা শুধু ধারাপদ নয়, লাবণ্য সরকারও এই প্রথম বোধহয় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল।

ওষুধটা তৈরি হচ্ছিল সিনিয়র কেমিষ্ট জীবনবাবুর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু প্রতিবারই স্যাম্পল করে দেখা গেল ওষুধটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে কেমন আর অ্যামপুলে তলানীর মতও পড়ছে একটু। সপার্ষদ জীবন সোম অনেক মাথা ঘামালেন, অনেক কিছু করলেন। ওষুধের ঘোলাটে ভাবটা যদিই বা কাটানো গেল, তলানী থেকেই যাচ্ছে। ওদিকে হাতে সময়ও বেশি নেই।

কিন্তু সমস্যার পরোয়া আর যে করুক, অমিতাভ ঘোষ করবে না। তার সাফ জবাব, ও ওষুধ আগের বারে যে তৈরি করিয়েছে সেই করুক, তার দ্বারা হবে না।

অর্থাৎ লাবণ্য সরকার করুক। আগের বারে সেই করেছে। কাগজে কলমে তার স্বাক্ষর আছে।

লাবণ্য সরকারের ডাক পড়েছিল। তাকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু দুবছর আগে যে-কাজ সে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুধু, এতদিন মন থেকে তা ধুয়ে মুছে গেছে।

তার সঙ্কট। আর সেই জন্যেই পরিস্থিতিটা সকলের উপভোগ্য যেন।

সমাধান না হলে ছোট সমস্যাও বড় হয়ে দাঁড়ায়। রাগে দুঃখে লাবণ্যই হয়ত সিতাংশুকে বলেছে ব্যাপারটা। ছেলের ক্রুদ্ধ অভিযোগ থেকে বাপেরও জানতে বাকি থাকেনি। কোম্পানীর সুনাম আর মর্যাদার প্রশ্ন যেখানে সেখানে এসব ছেলেমানুষি আর কতকাল বরদাস্ত করা হবে?

ছেলের মত বড়সাহেব অতটাই উগ্র হয়ে ওঠেননি। বরং ব্যাপারটা বুঝে নেবার পর লাবণ্যর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে হাসি গোপন করেছেন বলে মনে হয়েছিল ধারাপদর। বড়সাহেবের কাছে সত্যি জবাবদিহিই করে গেছে লাবণ্য সরকার। আগের বারের কাজটা সে নিজে হাতে করেনি। পাশে ছিল। তাকে সই করতে বলা হয়েছিল, সে সই করে দিয়েছিল।

তারা চলে যেতে হিমাংশুবাবু হালকা মন্তব্য করেছেন, এবারেও পাশে থাকলে গোল মেটে কি না সে চেষ্টাই তো আগে করা উচিত ছিল। কি বল?

কিন্তু সমস্যাটা হালকাও নয়, হাসিরও নয়। বড়সাহেব ভুরু কুঁচকে ভেবেছেন তারপর।

তলায় তলায় সকলেই একটা দ্রুত নিষ্পত্তি আশা করছে, ফয়সালার কথা ভাবছে। এ-ধরণের ছোটখাট গোলযোগে এই ব্যতিক্রমও নতুন। আগে মেঘ অনেকটা একদিকেই ঘনাতো, এক তরফাই গর্জাতো। তখন সময়ের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করা হত খানিকটা।

এখন বিপরীতমুখী দুটো মেঘ দেখছে ধারাপদ। সংঘাতের আশঙ্কা।

অবশ্য এ-ক্ষেত্রে চুপচাপ নির্ভর করার মত সময় কম হাতে। এই পরিস্থিতিতে আপাতত যা করে রাখা উচিত, সেদিকটা কেউ ভাবছে বলেও মনে হয় না। চিঠি লিখে বা তদবির করে ইনজেকশান সরবরাহের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু মিয়াদ বাড়িয়ে রাখা দরকার। কোনো কোম্পানীর পক্ষে সেটা গৌরবের নয় বটে, কিন্তু তেমন প্রয়োজনে অস্বাভাবিকও কিছু নয়।

সে-চেষ্টাটা ধারাপদ নিজেই করে দেখতে পারে। কিন্তু করবে কি করে, বড়সাহেবের কোনো নির্দেশ নেই। ভাগ্নেকে ডেকে হুকুম না করুন অনুরোধ করতে পারতেন। তাও করেছেন মনে হয় না। আপস করে চলতে তিনিও আর চান না হয়ত, এই নির্লিপ্ত প্রতিকূলতায় বড় বিরোধের সূচনা দেখছেন কি না কে জানে! তাই বোধহয় চুপ করে আছেন, দেখছেন শেষ পর্যন্ত কি হয়।

বাপের কাছে নালিশ পেশ করেও সিতাংশুর মেজাজ জুড়োয়নি। ধারাপদর ঘরেও এসেছিল সেই দিনই। কড়া মন্তব্য করেছে, কোম্পানীর প্রোসেসিং মেথড কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয় সেটা তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া দরকার, নিজে কাজ করুক না করুক—গেল বারে ও ওষুধ কি ভাবে তৈরী হয়েছে তা সে দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য।

স্পষ্ট করে কে জানিয়ে দেবে অথবা কে তাকে এই বাধ্যতার মধ্যে টেনে নিয়ে আসবে সেটা আর মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেনি বলেই ধারাপদ চুপ করে ছিল। সিতাংশু মিত্র সমস্যাটা বড় করে দেখছে কি মনের ক্ষুব্ধ মুহূর্তে একটা ওলট-পালট গোছের বোঝাপড়াই বেশি চাইছে, সঠিক বোঝা মুশকিল। বাড়ির সান্ধ্য-বৈঠকে আবারও এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছিল সে। কিন্তু হিমাংশুবাবু এক কথায় সে আলোচনা বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, তুই পারফিউমারি ডিভিশান নিয়ে আছিস সেদিকটাই ভাব না এখন, এ নিয়ে মাথা গরম করার দরকার কি—

ধারাপদর ধারণা, দরকার দুই কারণে। প্রথম, তার বর্তমান মনের অবস্থায় মাথা গরম করার মতই খোরাক দরকার কিছু। দ্বিতীয়, মানকের রাজকন্যের কাহিনীটা গোপন ষড়যন্ত্র নয় হিমাংশু মিত্রর। ছেলের বিয়ে দিয়ে রাজকন্যে ঘরে আনার অভিলাষ লাবণ্যরও একেবারে না জানার কথা নয়। এ অবস্থায় নিজের অবিমিশ্র প্রীতির নজির হিসেবে লাবণ্যর সঙ্কট-মোচনের চেষ্টাটা সিতাংশুর পক্ষে স্বাভাবিক বইকি। লাবণ্যর এই হেনস্থার কারণ অমিতাভ ঘোষ না হয়ে আর কেউ হলে তাকে ভালো হাতে শিক্ষা দিতে পারত। শিক্ষা দিয়ে নিজের এই বিড়ম্বনার মুহূর্তে লাবণ্যকে তুষ্ট করা যেত।

সেটুকুও পারা যাচ্ছে না বা করা যাচ্ছে না।

এই দুদিন ধরে লাবণ্য সরকারও ধীরাপদর ঘরে আগের থেকে বেশি আসছে একটু। বড়সাহেব সরকারি সাপ্লাইয়ের গোলযোগের ব্যাপারটা জানার পর থেকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথাও উত্থাপন করেনি বা কোন রকম আগ্রহ দেখায়নি। ফাইল আনা-নেওয়া বা নোট-বিনিময়ের ব্যাপারটা আবার আগের মত হাতে-হাতে বা মুখে-মুখে সম্পন্ন করছে।

আসা-যাওয়াটাই শুধু আগের মত, আর কিছু নয়।

দুটো দিন ধারাপদও একেবারে চুপচাপ ছিল, তারপর সেই তুলল কথাটা। না তুললেই বা করবে কি, ওদিকে সিনিয়র কেমিষ্ট জীবনবাবুও নির্লিপ্ত। তাঁর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই যেন। তাঁকে হুকুম করলে ওই ফরমূলা নিয়ে তিনি অন্যভাবে ওষুধ তৈরি করে দিতে পারেন এই পর্যন্ত। আগে কি হয়েছিল না হয়েছিল সে-ভাবনা তাঁর নয়।

যে-ফাইলের খোঁজে এসেছিল লাবণ্য সরকার সেটা তার হাতে না দিয়ে ধীরাপদ বলল, বসুন। তারপর ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে সাদামাটা ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, সরকারী অর্ডারটা সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা হল কিছু?

বসতে বলা সত্ত্বেও লাবণ্য বসত কিনা সন্দেহ। প্রশ্ন শুনে বসল। হাতের কাছে ফাইলটা টেনে নেবার ফাঁকে নিজেকে আরো একটু সংযত করে নিল হয়ত। ব্যবস্থা হল কি না সেটা তো আমার থেকে আপনার অনেক ভালো জানার কথা, বড়সাহেব আপনাকে বলেন·নি কিছু?

সেদিন বড়সাহেবের কাছে লাবণ্য জবাবদিহি করে আসার পরেও শুধু ধীরাপদই তাঁর ঘরে ছিল—সেই ইঙ্গিত। হেসেই মাথা নাড়ল, কাজের কথা কিছু বলেন নি। ভাবল একটু, আমার মনে হয় লেখালেখি করে সাপ্লাইয়ের মিয়াদটা আরো কিছু বাড়িয়ে নেওয়ার দরকার।

সেই দরকারের পরামর্শটা কি বড়সাহেবকে আমি দেব? তপ্ত প্রশ্ন।

ধীরাপদ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আমাকেই বলতে বলছেন?

লাবণ্য চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, আগে মানুষটাকেই দেখে নিল একপ্রস্থ। তারপর তেমনি চোখে চোখ রেখে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, না বলাই ভালো, বললে গোলমালটা মিটে যেতে পারে।

অর্থাৎ, গোলমাল মিটলে আপনাদের মজা মাটি।

কারখানার এ-পরিস্থিতি ভালো লাগছিল না, আলোচনার উদ্দেশ্যেই প্রধান ছিল। কিন্তু সেটা আর হল না, লাবণ্যর এই শেষের টিপ্পনী একেবারে মুখ বুজে হজম করার মত নয়। বিশ্বাস তো করেই না, উল্টে মজা দেখার দলের একজন বলে ভাবে ওকেও। মুখের হাসিটুকু আবরণ মাত্র, ভিতরে ভিতরে ধীরাপদও তেতে উঠল।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু বলবেন?

না···। ধীরাপদ মাথা নাড়ল, এই যখন ভাবেন আপনি, কি আর বলার আছে?

লাবণ্যর এরপর ওঠার কথা, উঠে চলে যাবার কথা। উঠল না। ধীরাপদর জবাবে আবারও কিছু বলার ইন্ধন পেল বোধ হয়। মুখের দিকে চুপচাপ দুই-এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হাসতে চেষ্টা করল একটু। হাসির আভাসে চাপা বিদ্বেষটুকুই ঝলসে উঠল একবার। বলল, অর্ডার সাপ্লাইয়ের আর মাত্র ছ'-সাত দিন বাকি, সবাই যে-রকম চুপচাপ বসে আছেন কি আর ভাবতে পারি?···ওদিকে বড়সাহেব শুনলাম ছেলের সঙ্গেও এ আলোচনায় রাজি নন, তাঁর কাজের ভার আপনি নিয়েছেন যখন, এখানকার ব্যাপারে তাঁর আর দায়িত্ব কি।··· মনে হয় দায়িত্বটা আপনার, লাবণ্যর ঠাণ্ডা দুই চোখ ধীরাপদর মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি, রোজই তো দুবেলা বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় শুনি··তাঁর সঙ্গে এ পরামর্শটা করে ওঠার সময় আপনি এতদিনেও পেয়ে ওঠেননি বোধ হয়?

বিদ্বেষের হেতু বোঝা গেল। অমিতাভ ঘোষকে কেন্দ্র করে তার সেদিনের সেই উত্তাপ আর অবিশ্বাস দূর হওয়া দূরে থাক, এই ঝামেলায় ফেলে সেটা আরো অনেক গুণ বেড়েছে। তবু, এত কথার মধ্যে এই ব্যক্তিগত খোঁচাগুলি না থাকলেও হয়ত ধারাপদ লাবণ্যর সম্ভ দুর্গতির দিকটাই বড় করে দেখত। কিন্তু ছেঁড়া-তার নতুন করে বেঁধে সুর তোলার ধাত নয় ওরও। সে-চেষ্টাও করল না আর, আলোচনার মেজাজ আগেই গেছে। নির্লিপ্ত জবাব দিল, বড়সাহেব সব জেনেও কিছু বলছেন না যখন, পরামর্শ আর কি করব।···এই ব্যাপারটায় আমার থেকেও হয়ত আপনার ওপরেই তিনি বেশি নির্ভর করে আছেন।

লাবণ্যর মুখভাব বদলাল একটু। চকিত বিস্ময়।—তিনি কিছু বলেছেন?

ধীরাপদ ঘুরিয়ে জবাব দিল, না, ওই সেদিনের পরে এ-সম্বন্ধে আর কিছু বলেননি।

সে দিন বলতে সিতাংশু যে-দিন চীফ কেমিষ্টের ছেলেমানুষির দরুণ কোম্পানীর সুনাম আর মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে সরোষে বাপের কাছে এসে হাজির হয়েছিল, আর, লাবণ্য আগের সরকারী অর্ডার সরবরাহ লিপিতে নিজের স্বাক্ষরের জবাবদিহি করে এসেছিল।

স্বল্পক্ষণের নীরব প্রতীক্ষা লাবণ্যর। সেদিন কি বলেছেন?

বক্তব্যের জালটা মনোমত গুটিয়ে এনেছে ধীরাপদ। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জবাব দিল, বলা ঠিক নয়··মনে হল, তাঁর ধারণা আপনি ইচ্ছে করলেই এই সামান্য গণ্ডগোল মিটে যেতে পারে।

কি করে?

বড়সাহেবের পাশে থাকার কথাটা বলে উঠতে পারল না। বলল, আগের মতই অমিতবাবুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে।

সাদা পর্দায় রঙ ঠেকানো যায় না, ধীরাপদর সাদা মুখ সত্ত্বেও রঙ্গ গোপন থাকল না। যে-ভাবেই বলুক লাবণ্যর যেটুকু বোঝবার বুঝে নিল। মুখ না তুলেও ধীরাপদ রমণী-মুখের নির্বাক দাহ উপলব্ধি করছিল।

একটা মানুষকে একেবারে গোটাগুটি দুই চোখের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে সময় মন্দ লাগে না। লাবণ্য তাই নিয়ে এসেছে, সময়ও লেগেছে। তারপর খুব ঠাণ্ডা আর খুব শান্ত মুখে বলেছে, বড়সাহেবের এই ধারণাটা আগে একবার তাহলে বড়সাহেবের মুখ থেকেই শুনে নিই, কি বলেন?

স্ত্রীলোকের সকল তর্জন নয়, ভাতের শাসানী নয়। সেই গোছেরই হয়ে দাঁড়াল অনেকটা। সহজতার হালকা মুখোশটাতে বড় রকমের ঘা পড়ল একটা। ধীরাপদ মুখ তুলল। চোখে চোখ রাখল। দৃষ্টিবিনিময় নয়, দৃষ্টি-তাপ শুষে নেবার মতই দৃষ্টি বর্ষণ করল যেন এক প্রস্থ। তারপর নিঃশঙ্ক জোরালো জবাব দিল, সেই ভালো। আমার কথাটাও বড়সাহেবকে বলবেন অনুগ্রহ করে, যে-টুকু প্রশংসা লাভ হয়···

লবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে, বারান্দা ধরে নিজের ঘরে চলে গেছে। ধীরাপদর তখনো চোখ সরেনি, পলক পড়েনি। তখনো যেন দেখছে চেয়ে চেয়ে।

প্রীতি নয়, দরদ নয়, সেই চোখে অকরুণ গ্রাসের নেশা। [ক্রমশঃ।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ লে ভেরী)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

কান্না ও চাৎকার শব্দের মধ্যে দিয়ে রাগ, দুঃখ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা সব যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসছিল আমাদের উদ্দেশ্যে।

আমি ও এলিস দু'জনেই একরকম ছুটে তাদের তাঁবুতে গেলাম। হঠাৎ যাদুদণ্ডের ছোঁয়ার মত সবাই একেবারে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে উঠল। দু'-একজন কটমটিয়ে যে তাকালো না এমন নয়! ছেলেটার বাপ ও কাকা তখনও কেবল কাঁদছিল আর বিড়-বিড় করে কি সব যেন বকছিল ঠোঁট নেড়ে। বাকী অনেকেই মুখ ফিরিয়েছিল অন্য দিকে। এমন কি আমাদের দোভাষী ইণ্ডিয়ানটিও বিশেষ কোন আগ্রহ দেখালো না বা কথাবার্ত্তা বললো না আমাদের দেখে।

ব্যাপারটা বুঝতে মোটেই দেরি হ'ল না আমার। আমি একবার ছেলেটার বুকে হাত দিয়ে দেখলুম; কয়েক মিনিট আগেই মারা গেছে সে। গায়ের তাপ তখনও একেবারে কমে যায় নি।

এলিস ও আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁবুতে দু'জনেই ফিরে এলুম। ঘটনাটার মধ্যে ভাববার অনেক কিছুই আছে। তবুও সেদিন সারা দিনটা এমন পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটেছে যে, বিছানা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমরা গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলুম।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন প্রথম সূর্য্যের আলো ঝকমকিয়ে গাছপালার আবরণ ভেদ করে দেখা দিয়েছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন-বাষ্প নেই। যে দিকেই চোখ মেলা যায়, সেদিকেই সব স্পষ্ট। বনের হৈ-চৈ-এ জন্তুরা কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে যেন। গত কালের মত আজকে বিশেষ মারাত্মক রকমের কেউই নজরে পড়ছে না। এক রাত্রেই জল অপেক্ষাকৃত অনেক কমে গেছে। তবু জলের [illegible] আবহাওয়ায়।

কিন্তু আজকের এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল গত দিনের নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ভারাক্রান্ত মনকে খুশি করলেও, ইণ্ডিয়ানদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, গত রাত্রের বিপদের কথা মনে করে আমি একটু চিন্তিত হয়েই পড়লুম এবং আস্তে আস্তে ওদের তাঁবুর দিকেই এগিয়ে গেলুম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও কারু এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। মৃত ছেলেটির সৎকার ওরা করল কিনা দেখবার জন্যে আমি একেবারে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু কোথায় ওরা! সমস্ত তাঁবু ফাঁকা; মৃতদেহটিও উধাও! একমাত্র আমার সঙ্গী গাইডটি ছাড়া আর একটিও লোকের গন্ধ-বাষ্প নেই সেখানে। এই দৃশ্য দেখে তার মুখ দিয়েও একটি কথা বেরুচ্ছে না, হতবাক্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে সে। ইতিমধ্যে কালা আদমিদের তাঁবু থেকে কয়েকজন এসে পড়ল আমার কাছে। কিন্তু তাদেরও অবস্থা সঙিন! এই কয়েক দিনের মধ্যে, বনে-জঙ্গলে-নদীতে, বন্যহিংস্র জন্তুদের ভয়ে আর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে যা না ভয় পেয়েছিল তারা, এই মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে তাদেরও সবার মুখ যেন এতটুকু হয়ে গেছে!

এ-সময় সাহস হারানো মানেই এদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। একলা মানুষের পক্ষে এ ধরণের বিদেশী বন্যদের নিয়ে বিপদজনক অজানা পথে অভিযান যে কতটা দুঃসাহসের ব্যাপার, হঠাৎ সেই সময় ক্ষণেকের জন্যে আমি তা অনুভব করলুম। সাহসের সঙ্গে একটু চেঁচিয়েই গাইডটির উদ্দেশে আমি বলে উঠলুম, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, খোঁজ নিয়ে দেখ চারিদিক—নৌকোটার দিকে একবার দেখ গিয়ে!

নৌকা দু'খানা অনতিদূরে গাছের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা ছিল। কয়েকজন ইণ্ডিয়ান ও জনকতক জংলী ছিল বড় নৌকাটায়, আর ছোটটায় ছিল অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

গাইডকে নিয়ে আমি সেই দিকে এগুলুম। নৌকা-দুটির কাছাকাছি হতেই ওরা সকলে একসঙ্গে যেন কি বলে উঠল। কোন বিপদে পড়লে বা ভয়ের কোন ব্যাপার হলে, এক সঙ্গে কথা বলাটা ওদের চিরকালের অভ্যাস। জংলীদের মধ্যে প্রধান গাইড টাইগার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, ছোট নৌকাটা নিয়ে গত রাত্রে ওরা সবাই উধাও হয়েছে।

খবরটা শুনেই বেশ একটু দমে গেলুম। প্রথমতঃ, এই দুর্গম জলপথে নৌকা ও সেই সঙ্গে মালপত্র হারানো মানে অনেক কিছু! দ্বিতীয়তঃ, ইণ্ডিয়ানরা চ'টে-মটে যে কি করবে তারও ঠিক নেই! কিন্তু এ নিয়ে এখন আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলে আমাদের চলবে না। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে আমি এলিসকে ঘটনাটা সব বললুম। তারপর দু'জনে যুক্তি করে একটা পথ বার করলুম। মধ্যে মধ্যে এলিস এমনি অনেক ব্যাপারে এমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে যে, একজন নামকরা বিচক্ষণ এ্যাডভোকেটের পক্ষেও তার সমাধান করা শক্ত।

এবারও এলিসের কথামত আমি টাইগার সমেত আমাদের সঙ্গী সমস্ত কালা লোকদের ডেকে পাঠিয়ে, উদাত্তস্বরে একটা বক্তৃতা দিলুম। বললুম—বিশ্বাসঘাতকরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে! যথাসময়ে আমি তাদের প্রতিশোধ নেব! এখন তোমরাই আমার বল-ভরসা! তোমরা বীরের দল, যে হীরকের সন্ধানে তোমরা বেরিয়েছ আমার সঙ্গে, ইতিহাসে তার কথা চিরদিনের জন্যে লেখা থাকবে। তোমাদের প্রত্যেককে আমি পুরস্কৃত করব, যদি তোমরা

আবার আমায় প্রতিশ্রুতি দাও যে, কোন দিন, যত বিপদই হোক তোমরা আমাকে ছেড়ে যাবে না শেষ পর্য্যন্ত।

আমার এই বক্তৃতার মর্ম্মাংশ টাইগার ও কালাদের সর্দ্দার ওদের সবাইকে নিজেদের ভাষায় বুঝিয়ে দিলে। ওরা সবাই একবাক্যে প্রতিশ্রুতি দিলে যে, ওরা কোন অবস্থাতেই আমাদের ছেড়ে যাবে না।

আমি ওদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তখন বললুম, তাহলে আর দেরি নয়, এখনই এখান থেকে মালপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা করতে হবে।

এর পর যে পথে আমরা পাড়ি দিলুম তাকে 'হারানো জগৎ'ই বলা যায়। এই 'লষ্ট ওয়ার্ল্ড'-ই আমাদের অভিযানের শেষ অঙ্ক বলা যায়।

এলিসের জীবনে অরণ্যের এই ভয়াবহতার সঙ্গে কখনো যে পরিচয় ঘটেনি তা আগেই বলেছি। কাজেই বৃটিশ গুয়েনার এই গহন অরণ্যে সে নিজেকে যে ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল তাতে সত্যিই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম। বিশেষ ক'রে, বন্য কালাদের সঙ্গে তার জন্মদিনটিকে উপলক্ষ্য করে সে যে ভাবে মেলামেশা করে কাটিয়েছিল, তাতে তার সাহসের তারিফ না করে উপায় নেই। কিন্তু এই জঙ্গল ছেড়ে যেদিন সকালে আমরা আমাদের ইণ্ডিয়ান লোকজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে 'এস্কুইবো' নদীর উপর আবার পাড়ি দিলুম, সেদিন মনের সাহস আমাদের দু'জনেরই যেন ভিতরে ভিতরে অনেকটা শিথিল হয়ে গেল।

বাইরে প্রকাশ না করলেও হঠাৎ ইণ্ডিয়ানরা যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তার পিছনে যে একটা দুরভিসন্ধি আছে তা বুঝতে আমাদের বাকী ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কথা হ'ল এই যে, তারা যদি সত্যিই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে, তাহলে তার প্রতিকার আমরা কি করব? এমনি একটা ভারী মন নিয়ে আমরা নৌকা নিয়ে এগুতে লাগলুম। কিছুদূর এই ভাবে অতিক্রম করার পর, এমন এক জায়গায় আমরা এসে পড়লুম, যেখানে ম্যাপ না দেখে, বিচার না করে, আর মোটেই এগুনো চলে না। কারণ, চারিদিক থেকে নদীর বিভিন্ন শাখা বেরিয়ে সে জায়গাটা এমন হয়েছে যে, খুব ভাল করে ম্যাপ না দেখা পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক করবার উপায় নেই। সার্ভের যন্ত্রপাতিগুলি তাড়াতাড়ি বার ক'রে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ম্যাপের জায়গাগুলি মেপেজুপে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটির হদিস পাওয়া গেল। তখন আমরা মনে বল নিয়ে, এই নদীর যেটা সবচেয়ে বড় শাখা সেই 'রুপনুনি'র দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। পনেরো মিনিট হয়েছে-কি-হয়নি, এলিস হঠাৎ আমার গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে তীরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। চশমাটা একটু কপালের দিকে তুলে দেখলুম, সবুজের ঘন বনের মধ্যে একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে, আর তার মাথার উপর রয়েছে একটা বন্যবরাহের মাথার খুলি। অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের মনে হ'ল—এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের কিছু হবে।

কিন্তু আমার বিশ্বস্ত কালা ভৃত্য জিমি এটা দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেল। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে সে আমায় বললে যে, আর এ জায়গায় থাকা চলবে না। তার কাছে তখন হীরে বা সোনার কোন মূল্যই নেই। ঐ খুলিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে, ওটা হচ্ছে সাবধান করবার একটা সঙ্কেত। ইণ্ডিয়ানদেরই অন্য এক বংশ ঐ সঙ্কেত দেখিয়ে এটাই সাবধান করতে চাইছে যে, বিদেশীরা যেন কেউ এখানে না থাকে।

এর পর সে এই ইণ্ডিয়ানদের নানা সংস্কার প্রথা ও প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন প্রণালীর গল্প বলতে লাগল। আর তা শুনতে শুনতে আমাদের দু'জনের মনে ভয় যে না হচ্ছিল তা নয়, তবুও আমরা সাহস সঞ্চয় করে তা শুনছিলুম।

আগের দিন সেই ইণ্ডিয়ান ছেলেটির ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হওয়ার পরই কারিবরা ও খর্ব্বাকৃতি আওয়াইরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সেই ঘটনাটিকেই লক্ষ্য করে জিমি বলতে লাগল যে, যখন কোন ইণ্ডিয়ান নিহত হয়, তখন তার নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ই তার প্রতিশোধ নেয়। ওদের বিশ্বাস, ওদের মধ্যে যখন কেউ অপরের দ্বারা নিহত হয়, তখন আত্মীয়ের বাপ বা ভাইয়ের আত্মা আর মানুষের আত্মা থাকে না, তখন সে একটা জন্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই মানুষ-আত্মাকে ফিরিয়ে আনতে হলে আত্মীয়-হত্যাকারীকেও হত্যা করতে হবে। তাই যতক্ষণ সে তা না করতে পাচ্ছে, ততক্ষণ সে নিজেকে জন্তু বলেই মনে করে।

জিমি আরও বলতে লাগল যে, এই প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন রীতি আছে। যদি আত্মীয়ের মৃত্যু হয় বিনা রক্তপাতে, যেমন শ্বাসরোধ হ'য়ে, তাহলে প্রতিশোধকারী বোয়া সাপে পরিণত হয়। যদি আত্মীয়ের এমন মৃত্যু হয়, যাতে তার রক্তপাত হয়েছে, তাহলে প্রতিশোধকারী হিংস্র ব্যাঘ্রে পরিণত হয়। আর এরা যেমন জন্তু হবে, তেমনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার পদ্ধতিও হবে বিভিন্ন। যদি সাপ হয়, তাহলে আততায়ীর দুই হাতের হাড় সে গুঁড়ো ক'রে দেবে, আর যদি বাঘ হয়, তাহলে আততায়ীকে সে যত রকমে শাস্তি দিক না কেন, আততায়ীর মৃত্যুর পূর্ব্বে সে তার গলায় নিশ্চিত কামড় দেবে।

এমনি ধারা আরও অনেক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী সে বলে যেতে লাগল। তার বক্তব্য শেষ হলে, আমি শুধু একটি কথাই বললুম, বেশ মজা তো! কিন্তু আমার কথায় সে কান দিলে না। তার চোখ দুটো কপালে তুলে সে বলে উঠল যে, হয় এলিসকে নয় আমাকে ঐ ছোকরা কারিব ইণ্ডিয়ানের আত্মীয় বেছে নেবে, আমাদের তাঁবুতে তার মৃত্যু হওয়ার জন্য। এ কথা সত্যি যে, সে ম্যালেরিয়াতেই মারা গেছে, কিন্তু আমরা যে তার যন্ত্রণা নিবারণ করবার জন্যে তার হাতে হাইপোডারমিক ছুঁচ দিয়ে ইনজেকসন দিয়েছি, আর তাকে বড়ি খাইয়েছি, তাতেই আর আমাদের বাঁচবার উপায় নেই।

ইণ্ডিয়ানদের ধারণায় বিষাক্ত তীরও যা আর হাইপোডারমিক ছুঁচও তাই। আর ওষুধের বড়িটি ওদের বিষাক্ত বড়িরই সমান—যে বড়ি দিয়ে ওরা মাছ মারে।

এই সব বলতে-বলতেই জিমি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'কালাইমা তোমাদের ধরবেই!' আমরা অবশ্য তা শুনে মোটেই বিচলিত হলুম না। এলিস ও আমি দু'জনেই ওর এই আতঙ্কে ওদের বন্য মনের কুসংস্কার বলেই উড়িয়ে দিলুম।

কিন্তু কালারা যতই আমাদের প্রতিশ্রুতি দিক, ব্যাপারটাকে যে ওরাও সহজ ভাবে নিতে পারেনি তা ওদের নৌকা চালাবার ধরণ থেকেই বেশ বোঝা যেতে লাগল। এটা আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল, দিন কয়েক পরে যেদিন নৌকায় যেতে যেতে দারুণ শব্দ

আমাদের কানে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন বনের মধ্যে কামান দাগছে কারা। এই শব্দে কালারা তো দাঁড় টানতে-টানতে হাঁপাতে লাগল আর গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল সকলে। তারপর জঙ্গলের ওই শব্দও যত বাড়তে লাগল, তাদের গোঙানিও বাড়তে লাগল সেই পরিমাণে। যেন ঐ শব্দকে তারা আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তারপর সকলে তারা একসঙ্গে প্রার্থনার সুরে চীৎকার করতে লাগল—

আই! আই! আই! আই!
ওগো নদী, রক্ষা চাই!
ওগো নদী করো কৃপা!
আজ যেন বেঁচে যাই!
আই! আই! আই! আই!

শব্দ যেন আর থামতেই চায় না! কালাদের চীৎকারও থামে না। ভয়ে তারা এমন হয়ে গেছে যে, তাদের হাতের দাঁড় আর ঠিক ভাবে পড়ছে না। তাদের ঝাঁকানিতে নৌকাখানা দুলে দুলে উঠছে—উল্টে যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়! এমনি একটা অবস্থার মধ্যে আমরা যখন নদীর একটা বাঁকের মুখে এসে পড়লুম, তখন আমাদের তীরন্দাজ একটি লোক 'ইণ্ডিয়ানস্' বলে চীৎকার করে উঠে সামনের দিকে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম, একটা ডিঙি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, ছপ ছপ দাঁড় ফেলে দ্রুত গতিতে। [ক্রমশঃ।

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন

রাজধানীর ডাক

যতদিন বাবামশাই ছিলেন, ততদিন হান্সের অন্তত এমন একজন ছিলো সুখেদুঃখে সমানভাবে যার দিকে তাকানো যায়। জুতো শেলাই করতেন বাবামশাই, উপার্জনও খুব অল্প ছিলো কিন্তু হ'লে হবে কি, যথেষ্ট মার্জিত ছিলেন তিনি। বুদ্ধিমান। রঙ্গব্যঙ্গের ক্ষমতা ছিলো তাঁর, যাকে বলে দস্তুরমতো তীক্ষ্ণধী ছিলেন। ছেলের ভালোমন্দ বিচার করতে পারতেন তিনি। সমালোচনা বা মূল্যায়ন দুই ব্যাপারেই তাঁর যথেষ্ট অভিরুচি ছিলো। কিন্তু এখন আর হান্সের এমন কেউ রইলো না যিনি রাশ টানতে পারেন।

মা তো পষ্টাপষ্টিই এ-কথা জোর গলায় ব'লে দিতেন যে, ছেলে তাঁর শুধু অদ্ভুতই নয়, অসাধারণও বটে—জগতের কারো সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। একবার তাঁরা অনেকে মিলে এক জায়গায় ধানের শিষ কুড়োতে গিয়েছিলেন। সেখানকার গোমস্তাটি আবার অশালীন এবং বর্বর ব'লে যথেষ্ট দুর্নাম কিনেছিলো—কাউকে সে রেয়াৎ ক'রে কথা কইতো না। আর ব্যবহারও এমন কর্কশ ছিলো যে সবাই তাকে রীতিমতো ভয় পেতো। তা তাঁরা যখন ধানের শিষ কুড়োচ্ছেন, এমন সময় দেখা গেলো মস্ত এক চাবুক হাতে সেই গোমস্তাটি হস্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আসছে। দেখেই তো সকলের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে গেলো। আর এক মুহূর্তও দেরি না। আনে মারি এবং অন্যান্য মেয়েরা সবাই চট ক'রে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন—কিন্তু হান্স বেচারার কাঠের জুতোজোড়া আবার পা থেকে খুলে গিয়েছিলো, আর খালি পায়ে ধানের ক্ষেতে খুব-একটা জোরে ছোটা প্রায় অসম্ভব বলা চলে, কেননা খড়ের খোঁচায় পা একেবারে কেটে-ছ'ড়ে যায়। সুতরাং, যে-ভয় করা গিয়েছিলো, তাই হ'লো। গোমস্তামশাই রাগে ফুঁশতে-ফুঁশতে এসেই চাবুক তুলে দিলো—কিন্তু হান্সও তো কম যায় না। সেই একরত্তি ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো: 'তোমার সাহস তো কম না! জানো, ভগবান দেখতে পাচ্ছেন, তবু তুমি কিনা আমাকে মারতে চাচ্ছো!' গোমস্তাটি তৎক্ষণাৎ ভ্যাবাচাকা খেয়ে চাবুক নামিয়ে নিলে। তারপর বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে নাম জিগ্যেস করলে তার, কাঁধে চাপড় মেরে একটু আদর ক'রে খুশিভাবেই তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিলে।

সগর্বে এই গল্পটি সবাইকে ব'লে বেড়াতেন মা। 'কাজেই দ্যাখো, আমার হান্স কেমন অদ্ভুত ছেলে। তার সঙ্গে কি অন্য কারো কোনো তুলনা চলে?' তারপর সেই সঙ্গে আরো-একটা কথা তিনি যোগ ক'রে দিতেন, 'সব্বাই তাকে ভালোবাসে।'

তা, সত্যি বলতে, হান্সকে কিন্তু বেশ-একটু অদ্ভুতই দেখাতো। মস্ত এক ঢিলে কোট গায়ে দিতো সে, পায়ে থাকতো শক্ত কাঠের জুতো, আর একটা মাথা-ভাঙা চ্যাপ্টা টুপি থাকতো মাথায়। কিম্ভুত একটি আনাড়ির মতো দেখাতো তাকে। চেহারাও তো ভালো ছিলো না, তার উপর সবসময়েই কেমন একটা অপ্রতিভ ভাব ফুটে বেরোতো তার চলাফেরা থেকে। ফলে লোকে তাকে নিয়ে সুযোগ পেলেই হাসাহাসি করতো। চোখ বুজে থাকতো সে তখন—তা-ই ছিলো তার স্বভাব—খেয়ালই করতে চাইতো না তাদের হাসি-মস্করা, ভাবতো যে তাতে বুঝি লোকেরা তাকে অন্ধ মনে ক'রে হাল ছেড়ে দেবে। এদিকে তো সারাক্ষণই অনর্গল বকবক করে চলেছে, কিন্তু তার কথা বোঝে এমন লোক প্রায় ছিলোই না। ফলে বড্ড নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়তে হলো তাকে, বড়ো বেশি একা। বাবামশাইয়ের মৃত্যুতে হারালো তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ও সঙ্গীকে। মা তো কাপড় কাচার কাজে বাইরে-বাইরেই সারা দিন খুইয়ে আসেন—ঠাণ্ডা নদীর জলে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে কাপড় ধোয়া-মোছা করতে হয় তাঁকে। কাঠের মুগুর দিয়ে ভারি-ভারি কাপড়চোপড় পেটাতে হয় সারা দিন। ফলে বেচারি হান্স সারা দিনই বসে থাকে বাড়িতে তার খেলনা-থিয়েটার নিয়ে। কখনো পুতুলের পোশাক বানায় ব'সে-ব'সে, কখনো নাটক প'ড়ে শোনায় পুতুলদের। অদ্ভুত এক নিভৃত জীবন, সঙ্গিহীন, নির্বান্ধব, একলা।

ছেলেকে আবার কোনো স্কুলে পাঠানো যায় কিনা, কিছুদিন ধরে সে কথাই মনে-মনে বিবেচনা করছিলেন আনে মারি। অনেক ভেবে-চিন্তে গরিবদের জন্য যে সিটি-স্কুল আছে, সেখানেই তাকে পাঠানো সাব্যস্ত হ'লো। কিন্তু সেই স্কুলে পাঠ্যতালিকার ভিতর ছিলো ধর্মকর্ম পুজো-আর্চা, লিখতে-পড়তে শেখা আর যোগ-বিয়োগের সাধারণ জ্ঞান। তাছাড়া শেখাবার ধরণও ছিলো এত বাজে যে, হান্স বেচারি প্রায় কিছুই শিখলো না, সত্যি বলতে। তার উপর ছেলেগুলো তো সব একেকটা আস্ত মিচকে শয়তান, সব-সময়েই সুযোগ খুঁজছে কা করে পিছনে লাগা যায়। যাকে বলে উৎপীড়ন, ঠিক তা-ই করতো তারা। হান্স তো আর গল্প বলার প্রলোভন

কিছুতেই সামলে থাকতে পারতো না। ফলে একদিন গোটা ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেরা তার পিছন-পিছন সমস্বরে চাঁচাতে-চাঁচাতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো: 'এই যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত নাট্যকার যাচ্ছেন!' আবার, তৎক্ষণাৎ, ঠাকুর্দার কথা মনে প'ড়ে গেলো হান্সের—সঙ্গে-সঙ্গে এক বিষম ভয়ে সে ভ'রে গেলো। তাহ'লে কি সেই বাচ্চা মেয়েটির কথাই ঠিক? সে কি তবে সত্যিই তার ঠাকুর্দার মতো? তারপর থেকে জীবনে আর কখনোই হান্স সমবয়সীদের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারেনি; তাদের সান্নিধ্য এড়াবার জন্য একটি বালকের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, তাই সে করলে। আর আঁকড়ে ধরলো তাদের যারা তার সত্যিকার বন্ধু এবং বলাই বাহুল্য, তারা সকলেই হ'লো বয়স্ক লোক, তার চেয়ে তো অনেক, অনেক বড়ো।

স্কুলের কাছে ছোট একটা বাড়ী ছিলো, সেখানে থাকতেন দুই মহিলা। গাঁয়ের বিশপের বিধবা বউ আর তাঁর বোন—বিশপমশাই আবার কবিতাও লিখতেন, যতদিন বেঁচে ছিলেন। কী একটা কাজে যেন হান্সকে এক দিন সেই বাড়িতে পাঠানো হয়েছিলো। গিয়ে ছাখে, গোটা বাড়িভর্তি কেবল বই আর বই। এত বই যে কোনো বাড়িতে থাকতে পারে, তা সে স্বপ্নেও কোনোদিন কল্পনা করেনি। তার বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা তার চোখের তারায় এমন জ্বল-জ্বল করে ফুটে বেরোলো যে মহিলা দুজনের মায়া হ'লো। তাকে তাঁরা ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন, যত্ন করে কথা বললেন তার সঙ্গে, আর তার ফলে অচিরেই দেখা গেলো নিত্যই সে দুই বেলা ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হচ্ছে, এবং রীতিমতো আপ্যায়িত করা হচ্ছে তাকে। মহিলারা পড়তেন, সে ব'সে ব'সে উৎকর্ণ হ'য়ে সব মনোযোগ দিয়ে শুনতো, তাছাড়া বই ধার নিয়ে যেতো সে বাড়িতে ব'সে পড়ার জন্য এবং সর্বোপরি এটাই ছিলো একমাত্র জায়গা যেখানে সে মন খুলে কথা বলতে পারতো। একেবারে উন্মোচিত করে দিতে পারতো অন্তরাত্মা, কিন্তু তা নিয়ে কেউ তাকে হাসিঠাট্টা করতো না। কী তার কৃতজ্ঞতা, তা ব'লে বোঝানো যায় না। ওডেন্সে-র যাদুঘরে সাটিনের তৈরী একটা বেঢপ পিনকুশন আছে, কোনোকালে হয়তো চকচকে সাদাই ছিলো, কিন্তু কালক্রমে আদি জৌলুশ নষ্ট হ'য়ে ধূসর-হলুদ এক ধরণের রঙ হয়েছে তার। এই পিনকুশনটাই হান্স নিজের হাতে বানিয়েছিলো বিশপের বিধবার জন্য—তার প্রত্যেকটা সূঁচের ফোঁড়ের মধ্য থেকে ফুটে বেরোচ্ছে তার কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা।

ঐ বাড়িতেই সে প্রথম নাম শুনলো উইলিয়ম শেক্সপীয়রের। মস্ত একজন বিদেশী নাট্যকার নাকি তিনি, হান্সের দেশের এক রাজপুত্রকে নিয়ে এক নাটক লিখেছেন! কয়েক দিন পরেই তারই ফলাফল হিসেবে দেখা গেলো হান্সের পুতুলের থিয়েটারে নতুন একটি নাটকের শতাধিক রজনী ধ'রে অভিনয় হচ্ছে, এবং তার নাম 'হ্যামলেট।' একটি বিষয়ে অন্যছেলেদের ঠিক উল্টো ছিলো হান্স। কোনো নাটকে যদি মঞ্চের উপর কেউ আর্তনাদ করে না-ই মারা গেলো, তাহ'লে তা কি আবার কোনো নাটক নাকি? এই ছিলো তার ধারণা; মৃত্যু ব্যাপারটাই তো কী রকম নাটকীয়! কিন্তু শুধু যে নাটকীয়তাই তাকে চেতিয়ে তুলতো তা-ই নয়। অনুবাদের মধ্য দিয়ে জানলে কী হবে, তবু 'হ্যামলেট', 'রাজা লিয়ার' আর 'মধ্য গ্রীষ্মের এক রজনীর স্বপ্নকথা'র ভিতরকার অন্তর্লীন কবিতা তাকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিলো। এই জিনিসটা সে ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলে যে, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, এবং কবিপ্রতিভা হ'লো এমন একটি দুর্লভ মহত্ত্ব—যার দীপ্ত গৌরব সর্বকালের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। 'আমার ভাই তো কবি ছিলেন', বিশপ মশাইয়ের আইবুড়ো বোনটি প্রায়ই গর্বের সঙ্গে এ-কথা বলতেন, আর প্রত্যেকটি কথার মধ্য থেকে পুলক আর শিহরণ ফুটে বেরোতো তখন। কাজেই আগুন জ্ব'লে উঠলো হান্সের মনে; অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেই সে মস্ত এক নাটক লিখে বসলো—আস্ত একখানি ট্র্যাজেডি, শুধু বিয়োগান্তই নয়, বিষাদ ও দুঃখে ভরপুর; নাম হ'লো—'আবর আর এলফিরা।'

নিজের লেখা পড়ার সময়ে হান্সের কোনো রকম লজ্জা-সংকোচের বালাই ছিলো না; যাকে পেলো, তাকেই ধ'রে-ধ'রে সে 'আবর আর এলফিরা' প'ড়ে শোনালো। এ-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই ছিলো না যে, তার মতো সকলেই নাটকটির প্রশংসা করবে। কিন্তু তাদের এক প্রতিবেশিনীর নন্দন ছিলো আকাট বোকা আর শয়তানিতে ওস্তাদ—সেই প্রতিবেশিনীটি একদিন এই নাটক নিয়ে মারাত্মক এক ঠাট্টা করে বসলেন। দিনেমারদের ভাষায় 'আবর' কথাটা অনেকটা পাটমাছের প্রতিশব্দের মতো শোনায়। পাশের বাড়ির গিন্নীটি বললেন, তা, বাছা, নাটক লিখেছো, সে তো বেশ কথা। কিন্তু "আবর আর এলফিরা নাম দিয়েছো কেন নাটকের? বরং যদি "পাট আর কড মাছ" বা এই রকম কোনো নাম দিতে, তাহ'লে দিব্যি মানাতো।' কড! তার সুন্দরী এলফিরার বদলে কিনা কড! গ্রন্থকারত্বের পর এই প্রথম মারাত্মক একটি আঘাত পেলো হান্স—কেউ যেন বে-আইনিভাবে তার তলপেটে ঘুষি বসিয়ে দিলো! এই রসিকতা বিমর্ষ ক'রে দিল। গোটা নাটকটাই চিরকালের মতো তার কাছে নষ্ট হ'য়ে গেলো। মা অবাধ্য ছেলেকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলেন; 'তার ছেলে লিখুক দেখি এমন একখানা নাটক! পারবে কোনো জন্মে? পারবে না; আর সেইজন্যেই হিংসে-বিষে জ্ব'লে-পুড়ে এমন কথা বলেছে তোকে!' কিন্তু হান্স তাতে মোটেই কোনো সান্ত্বনা পেলো না—তেমনি মনখারাপ হ'য়ে থাকলো আর কিছুকাল।

কিন্তু কেউ যদি সত্যিকার লেখক হয়, যাকে বলে, অস্থিতে-মজ্জায় গ্রন্থকার, তাহ'লে তাকে কিছুতেই থামাতে পারে না, এমন কি ঠাট্টা-মস্করাও নয়। হান্স এবার নতুন একটি লেখায় হাত দিলে—এখানে আবার এক রাজা আর তার রাণী থাকলেন। লিখতে গিয়ে কিন্তু একটা ভারি মুশকিলে পড়া গেলো। রাজা-রাণী কী ক'রে সাধারণ লোকেদের মতো কথাবার্তা কইতে পারেন? রাস্তার ঘাটের লোকেরা যে-ভাষায় কথা বলে, তাঁরা নিশ্চয়ই সে ভাষায় কথা বলেন না, নিশ্চয়ই কোনো বৈদেশিক ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকেন। হান্সের যে এই ছোট্ট ধারণাটুকু গজিয়েছিলো, এটাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় তখনো কতকগুলি ব্যাপারে তাঁর পরাদৃষ্টি ছিলো,—কেননা তখন কিন্তু দিনেমার রাজসভায় সত্যিই আলেমান ভাষা ব্যবহার করা হ'তো। তা, নাটক লেখবার আগে সে একটা অভিধান ধার ক'রে নিয়ে এলো—তাতে ইংরেজি, ফরাশি আর আলেমান শব্দের দিনেমার প্রতিশব্দ দেয়া ছিলো—তারপর ঐ অভিধান দেখে-দেখেই সে নিজের মনোমতো ক'রে একটি খিচুড়ি ভাষা বানিয়ে নিলে। ফলে দেখা গেলো, নাটকের এক জায়গায় রাজকন্যা তাঁর বাবামশাইকে জিগ্যেস করছেন, 'গুটেন মরগেন মন পের, হার

গোডট স্লীপিং ?' এ-রকম একটা চমকপ্রদ সংলাপ ব্যবহার করতে পেরে হান্সের খুশি ছাখে কে !

সব ছোটোরাই যা ক'রে থাকে, হান্সও কতকগুলি ব্যাপারে তা-ই করতো ! তালিকা বানাতে তার খুব ভালো লাগতো, কাজেই বাবামশাইয়ের একটা পুরোনো হিসেবের খাতায় সে একটা মস্ত তালিকা রচনা ক'রে ফেললে—অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাম থাকলো তাতে, সবগুলি তার নাটকের নাম—এখনো লেখেনি অবশ্য তবে একদিন সে লিখবেই। 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী'র ভবভূলালের মতো আর কি—বই লেখা কতদূরে প'ড়ে থাকলো, তা ভগবান জানেন—কিন্তু বইয়ের নাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আকার, সব ঠিক হ'য়ে আছে—এখন কেবল ভূমিকাটা লিখে ফেললেই, 'খুব বড়ো বই হবে কিনা !' যেহেতু নাটকগুলি আর লিখে ওঠা হয়নি, কাজেই যত রাজ্যের লোকজনকে ধ'রে-ধ'রে সে নাটকগুলির নামই শোনাতো একের পর এক : 'এই সবগুলি নাটকই আমি একদিন লিখবো।' ফিরিস্তি দেওয়া শেষ হ'লে সগর্বে সে বলতো। সেই নোংরা, কাটাকুটি ভরা, ছোট্ট হিসেবের খাতাটা এখন আছে কোপেনহাগেনের 'রয়াল লাইব্রেরি'তে—তাদের সম্পদের অন্যতম হিসাবে।

কবিতাও সে লিখতো, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তার কেটে যেতো বই প'ড়ে কি দিবাস্বপ্ন দেখে। স্পষ্ট একটা বাক্য লিখতে তিনবার তার পেন্সিলের ডগা ভাঙতো, আস্ত একটা বানান শুদ্ধ ক'রে উঠতে পারলে তো সেদিন একটা সাম্রাজ্য বিজয় হ'য়ে গেলো, আর পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ এবং ছোট্ট অঙ্কটা করতে হ'লেও তার মাথা ঘেমে যেতো, কান গরম হ'য়ে উঠতো, জিভ শুকিয়ে যেতো সে যাকে বলে উত্তেজনার ব্যাপার। কিন্তু 'গোগ্রাসে গেলা' যাকে বলে, সেই জিনিশটাই সে করতো কোনো বই হাতে পেলে, আর আস্ত বইটাই কিছুকালের ভিতর তার একেবারে কণ্ঠস্থ হ'য়ে যেতো। নাটকের দৃশ্য হ'লে তো কথাই নেই, সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত প্রত্যেকটা সংলাপ সে চটপট ব'লে ফেলতে পারতো। কিন্তু এই ছোট্ট সুখী ব্যক্তিগত জীবনটাও একদিন শেষ হ'লো ; আনে মারি বললেন, পড়াশুনো যখন তার হ'লোই না, তখন এবার তার কাজ-কর্ম শেখা উচিত, এবং সেই জন্যই তাকে এক তাঁতির কাছে শিক্ষানবিশী করতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো।

প্রথম দিন ঠাকুমা এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ; পথে সারা রাস্তা ত'ার সে কি বিলাপ ! সমস্ত ক্ষণ ধ'রে তিনি যে-সব খেদোক্তি করলেন, তার সারমর্ম হ'লো এই যে, 'হা ভগবান ! আমার কপালে কি না এ-ও ছিলো ! শেষকালে কি না আমাকে চর্মচক্ষুতে দেখতে হ'লো যে আমার নাতি—আচ্ছা ! একটা বই ছুটি নাতি নেই আমার, সে কি না আধা ভিখিরি গরিব ছেলে ছোকরা আর বর্বর অসভ্য লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে যাচ্ছে আর তাকে নিয়ে যাচ্ছি কি না আমিই ?'

হান্সের মনে এই সব কথা যতটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো প্রথমটায় কিন্তু সেই তাঁতিপাড়া ততটা খারাপ ছিলো না। তাঁতিরা ত'র সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি, যাকে নির্দয় বলা যায় ; 'বেশ অদ্ভুত ছেলেটা, না ? কারো সঙ্গেই মেলে না—দস্তুরমতো অসাধারণ, আর বেশ মজার, তাই না ?' এই কথা বলাবলি করতো তারা নিজেদের মধ্যে এবং সেই জন্যেই অন্যান্য মারমুখো ছেলেদের হাত থেকে হান্সকে তারা রক্ষা করতো। আর শেষে যখন জানা গেলো ছেলেটির গানের গলাও বেশ ভালো, তা ছাড়া সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে, তখন তো আর কোনো কথাই নেই, মাকুর টানাপোড়েন থামিয়ে দিয়ে তাকে তারা সোজাসুজি প্রমোদ বিতরণ করতে বলতো। হান্সের কাছে ব্যাপারটা কী-রকম ঠেকলো ? আর কী রকম—দস্তুরমতো গর্বের ব্যাপার নয় কি ? 'আমাকে কি না বলছে গান গাইতে। শেষ কালে তবে প্রতিভার সমঝদার পাওয়া গেলো দু-চারজন।' হান্সের ফূর্তি ছাখে কে। গান তো গাইলোই, সেই সঙ্গেই একাই অভিনয় করলে শেক্সপীয়রের নাটকের দৃশ্য, হোলবের্গের আস্ত সব মস্ত নাটক, এবং নিজের নাটক তো আছেই সেই সঙ্গে। এখন একদিন হ'লো কি, তাঁতিদের একজন বললে, নির্ঘাৎ ও একটি মেয়ে, না-হ'লে কারো গলায় স্বর কি অমন স্বচ্ছ মধুর আর শুদ্ধ হয় ? অমনি সবাই মিলে হান্সের হাত-পা পাকড়ে ধরলে, সত্যিই সে ছেলে না মেয়ে—ব্যাপারটা তো ঠিক মতো তদন্ত ক'রে দেখতে হয় ! হাত-পা ছুঁড়ে নানারকম ভাবে প্রতিবাদ জানানোর পর কোনো মতে তাদের মুঠিকে একটু শিথিল ক'রে তুলে হান্স সেই যে বাড়ির দিকে ছুটলো, আর কখনো ঐ তাঁতশিল্পীদের কাছে ফিরে এলো না। 'যাবো না আমি, কিছুতেই যাবো না, ম'রে গেলেও না,' প্রবল গলায় এই একই কথা সে বার বার বললো তার মাকে। তখন একটা তামাকের কারখানায় তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া হ'লো, এবং সেখানেও যথারীতি এই একই ঠাট্টার পুনরাবৃত্তি ঘটলো, তাছাড়া তামাকের গুঁড়ো তার হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর হ'লো, কেননা কাশি শুরু হ'য়ে গেলো তার ; তার রোগা ও স্পর্শভীরু বাবার কথা স্মরণ ক'রে মা তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনলেন।

হান্সের বাপ মারা গেছেন বছর দুয়েক হ'লো, এদিকে আনে মারি হলেন রক্তমাংসের একজন টগবগে স্ত্রীলোক, বয়সও বেশি নয় ; হান্সের বাবাকে বিয়ে করার আগে বেআইনি এক মেয়ে হয়েছিলো তাঁর, নাম কারেন মারি। কোনো-এক আত্মীয়বাড়িতে তাকে বাণ্ডিল বেঁধে চালান ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। মায়ের সঙ্গে মেয়ের দেখাশুনো হ'তো খুবই কম। এখন আনে মারি আবার বিয়ে ক'রে বসলেন। হান্স কেবল বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—যা কিছু তার বাবামশাই ভালোবাসতেন, সব একটা কোথাকার উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকের কাছে চ'লে গেলো। নতুন স্বামীটিও জুতো সেলাইয়ের ব্যবসা করে ; হান্সের বাবা জুতো মেরামতের কাজ করার জন্য যে বেঞ্চি বানিয়েছিলেন, সে কিনা সেখানেই ব'সে ব'সে ঠুকঠুক ক'রে জুতোর গোড়ালি তৈরি করে। সে কিনা শোয় তাঁরই বিছানায় ; এবং হান্সের বাবার মতো সে-ও কিনা আনে মারিকে স্ত্রী বলে। শুধু তাই নয়। এই লোকটি কিনা ধীরে ধীরে তাকেও সরিয়ে দিলে—এই আগন্তুকটি কিনা ধীরে ধীরে তার মায়ের সব মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে নিলে—আর লোকটিও তেমনি, নির্দয়ভাবে না হ'লেও আস্তে, চাতুরী ক'রে, ধীরে ধীরে হান্সকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিতে লাগলো ! এই সংবাপের পরিবারের লোকজন আবার এমন বিয়েতে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলো। এতে নাকি তাদের মর্যাদা আহত হয়েছে—ফলে কিছুতেই তারা আনে মারি বা তার ছেলেকে বাড়িতে ঢুকতে দিতো না। কী তিক্ত সেই সব দিন সে, হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেন, আশ্চর্য একটি ছেলে, যে কিনা

নাটক লিখতে পারে এবং যার বন্ধুবান্ধব হ'লো সব লেখা-পড়া জানা ভদ্র ও মার্জিত লোকেরা—তাকে কিনা এক মজুরের বাড়িতে ঢোকবার যোগ্য নয় ব'লে 'প্রবেশ নিষেধ' ঘোষণা করে দেওয়া হ'লো। আহত গর্বে দুমড়ে গিয়ে সে মুখে বললো যে 'আমি তার তোয়াক্কাই করি না। কেন করবো! একদিন আমি বিখ্যাত হবো—নির্ঘাৎ হবো—কাজেই তাদের পরোয়া করার কোনো মাথাব্যথা নেই আমার।' কিন্তু এই কথাগুলির আড়ালে শোনা যেতো ভীত, আহত একটি শিশুর চাপা কান্না—এই কারণেই চাপা যে, কাঁদতে পর্যন্ত তার সাহস হয় না।

মা এখন তাকে এক পুরোদস্তুর দর্জি বানাবার কথা ভাবছিলেন! নিজের খেলাঘরের পুতুলদের জন্য সারাক্ষণই তো সূঁচ-সুতো নিয়ে ব'সে থাকে, আর পোষাক বানায়—তাছাড়া, 'আমার হান্স, তার হাত তো জাদু জানে, যে কোনো কাজই করতে দেওয়া হোক না, ও তা ঠিক পারবে! দ্যাখ তাকিয়ে ষ্টেগমান-এর দিকে, লোকে তাকে বলে ওস্তাদ কারিগর,' ছেলেকে উস্কে দেবার জন্য বলতেন মা, 'দ্যাখ, বড়ো রাস্তায় আস্ত একটা দোকানঘর আছে তার, তার নিজের দোকান, তার জানলাগুলি কী মস্ত মাপের, দেখেছিস? তাছাড়া কত লোক খাটে তার কাছে। কী ধনীলোক একবার ভেবে দ্যাখ।' কি হান্স 'দেখবেই না' পণ ক'রে ব'সে রইলো, ইচ্ছে ক'রে চোখ বুজে রইলো সে। মনে মনে সে এর মধ্যেই জেনে গেছে যে, মস্ত এক অভিনেতা হবে সে। 'অভিনেতাদের চাবুক মারা হয়, তাছাড়া এত খোসামোদ করতে হয় যে তেলের জোগাড় দিতে দিতেই তোর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কেউ তাদের সম্মান করে না, একবার অপছন্দ হ'লেই লোকে হৈ-হৈ করবে', প্রায় বিভীষিকাগ্রস্তের মতো বললেন আনে মারি। আসলে তিনি কিন্তু সার্কাসের সস্তা খেলোয়াড়দের কথা ভাবছিলেন, কিন্তু যার কথাই তিনি ভাবুন না কেন, হান্স তাতে কান পাতলে তো! সে ভাবছে নাটকের নায়কদের কথা। নাটকে যাদের নায়ক করা হয়, কী করে তারা? কী আবার করবে? একের পর এক দুঃখ-কষ্ট বিপদের মধ্য দিয়ে যায় তারা, এমন সব দুঃখ কষ্ট পায় যা প্রায় ধারণাতেই আনা যায় না। আর শেষকালে কোন রাজা কি পরী এসে তাকে সাহায্য করে, অমনি ঠিক ইন্দ্রজালের মতো, সে রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে পড়ে—প্রশংসায় তখন কান প্রায় ঝালাপালা হয় আর কি! বিখ্যাত তো হ'তেই হয়, প্রশংসা তো চারপাশ থেকে শেষকালে আসবেই, কিন্তু তার জন্যে তোমাকে কী হ'তে হবে—না, সত্যিকার একজন নায়ক হ'তে হবে।

এদিকে সংবাপটি ঘর-গেরস্থালি নতুন একটা বাড়িতে সরিয়ে আনলেন। নতুন বাড়ির চারপাশ জুড়ে বাগান গেছে—একেবারে নদীর পাড় পর্যন্ত। নদীর পাড়ে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, মস্ত এক পাথরের চাঁই ছিলো। হান্সের মা সেই পাথরের উপরেই আছড়ে-পাছড়ে কাপড় সাফ করেন। সেই পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো হান্স—মাঝে-মাঝে গলা ছেড়ে গান গাইতো, প্রায়ই নিজের মনে—একেবারে নিজেকেই শোনাবার জন্য, কিন্তু অনেক সময়েই ভিড় জ'মে যেতো তার চারপাশে। বুড়োবয়সী ধোবানীদের একজন তাকে একদিন জ্ঞান দিলে যে, ওডেন্সে নদীর শেষ প্রান্তে হ'লো চীনদেশ। যেই এ-কথা শোনা, অমনি হান্সের গানের জোর আরো বেড়ে গেলো। মনে-মনে সে ভাবলে চীনদেশের রাজপুত্তুরের কানে নিশ্চয়ই তার গানের সুর পৌঁছুবে একদিন—আর তখন তার গান শুনে সেই রাজপুত্তুর এতটাই মুগ্ধ হবে যে, জলপথে মস্ত এক ময়ূরপঙ্খীতে ক'রে একদিন আসবে তার কাছে—তাকে এনে দেবে ধন-সম্পদ রত্ন-বিত্ত, আর সেই সঙ্গে খ্যাতি—আস্ত পৃথিবীতে তাকে সে ঘুরিয়ে আনবে, আর যেখানেই হান্স যাবে সেখানেই উঠবে প্রশংসার শোরগোল, আর শেষকালে অবশ্য একদিন সে ফিরে আসবে এই ওডেন্সেতে—আর এখানে এসে মস্ত এক চকমিলানো দালান বানাবে সে, ঠিক যেমন সুন্দর রাজবাড়ীতে থাকে চীনদেশের রাজপুত্তুর। এই রাজার বাড়ি অনেক বছর পরে ঘুরে এলো তাঁর 'কোকিল' গল্পে, সত্যিই সেই প্রাসাদ তিনি চিরকালের জন্য বানিয়ে দিলেন, যার ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই, চিরকালের উদ্দেশে তিনি নিবেদন ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নের প্রাসাদ।

···'পৃথিবীতে সব চেয়ে জমকালো আর সব চেয়ে সুন্দর কোনো রাজবাড়ি যদি থাকে তো সে হ'লো চীন-সম্রাটের প্রাসাদ। আগাগোড়া ঝকমকে মসৃণ চিনেমাটি দিয়ে তৈরি এই বহুমূল্য প্রাসাদ, কিন্তু তা হ'লে হবে কি, সেই সঙ্গে বড্ড ঠুনকো, বড্ড পলকা। পাছে ভেঙে চৌচির হ'য়ে যায়, এই ভয়ে একটিবার সেই প্রাসাদ ছুঁতে কেউ সাহস পেতো না। সেই প্রাসাদের চারপাশে জুড়ে মস্ত বাগান। সেখানে ছিলো কোনোকালের না-দেখা সব ফুল, আর সেই সব রূপসী ফুলের বোঁটায় বাঁধা ছিলো রুপোর নূপুর। হাওয়া এলে দুলতো গাছের ডাল, বাজতো সেই রুপোলি নূপুর ঠুনঠুনিয়ে, আর সেই টুংটাং বাজনা শুনে পথ চলতে লোকেরা সব থমকে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখে চমকে যেতো। এমনি মন-ভোলানো ভঙ্গিমাতে গোছানো ছিলো বাগানের আর যা কিছু সব। সে বাগান যে সামনে কত দূর গেছে, কেউ জানতো না। বাগানের মালিও জানতো না শেষ কোথায় বাগানের। বাগান যেখানে শেষ, অপরূপ এক অরণ্য আছে সেখানে—আকাশ-ছোঁয়া গাছ আর পাতাল-ছোঁয়া হ্রদ সেখানে। সেই অপরূপ বন ঢালু জমি পেরিয়ে সোজা গিয়ে মিশেছে নীল অতল সমুদ্রে। আর সমুদ্দুরের তীরে কী সব মস্ত মস্ত গাছ! তাদের ছড়ানো ডালপালার তলা দিয়ে অনায়াসে চ'লে যেতে পারতো বড়ো বড়ো জাহাজ।'···

তা, কেবল যে এই অলীক রাজকুমারের জন্যে সে গান গাইতো, তা অবশ্যি ঠিক নয়—একটা একেবারে কাঁচা বাস্তব ব্যাপার ছিলো। কাঠের সেই মস্ত গামলাগুলির ওধারে ছিলো শহরের এক মস্ত ধনীব্যক্তির বাগান আর হান্স এটা জানতো সেই ধনী ব্যক্তিটি প্রায়ই তার বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এসে চুপিসাড়ে ঐ কাঠের গামলাগুলির আড়ালে ব'সে তার গান শোনেন—তার গান—ভাবো কী ব্যাপার! সে, যে কিনা একটি নেহাৎই গরিব ছেলে, এত সব মস্ত লোকেরা কিনা তার গান শোনেন। হান্সের ফূর্তি আর সান্ত্বনা দুয়েরই উৎস ছিলো এটা। খুব ভালো গলা ছিলো তার, শুনতে সত্যি ভালো লাগতো। শীগগিরই বিভিন্ন বাড়ি থেকে তার ডাক পড়তে লাগলো, 'হান্স, একবার আমাদের বাড়ি এসে গান শোনাবে? লক্ষ্মীটি, এস কিন্তু।' যারা ডাক পাঠাতেন তাদের ভিতর একজন ছিলেন ঘোড়সোয়ার বাহিনীর এক কর্নেল, 'কী সুন্দর দেখতেই না ছিলেন—এই কর্নেল হোয়েখ-গুল্ডবের্গ। গুল্ডবের্গদের আবার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব'লে খ্যাতি

ছিলো, তার উপর দূরদৃষ্টিও ছিলো তাঁদের। হান্সের ভিতর এমন একটা কিছু সেই কর্নেল দেখেছিলেন, যাকে তিনি কিছুতেই পাকামি ও মজার বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তিনি ঠিক করলেন যে এই ছেলেটিকে দিয়ে একবার প্রিন্স গবর্ণরের কাছে গান শোনাতে হবে—এই প্রিন্স গবর্ণর পরে আবার রাজা অষ্টম ক্রিষ্টিয়ান হয়েছিলেন।

শুনতে যতটা চমকপ্রদ মনে হয় ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ততটা নয়। দিনেমারদের দেশে রাজ পরিবারের সঙ্গে দেশের লোকের বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। এমন কি আজকের দিনেও, কোপেনহাগেনের ক্রিষ্টিয়ানবর্গ কেল্লার মশনদ-ঘরে, রাজধানীতে থাকার সময়ে রাজামশাই রাজ্যের যে কোনো প্রজার সঙ্গে প্রতি পনেরো দিন পর-পর দেখা করেন।

হান্সের কিন্তু ব্যাপারটা যথেষ্ট চমকপ্রদ ঠেকলো। রাজদর্শনের আগে কর্নেল গুল্ডবের্গে বার বার করে হান্সকে ব'লে দিলেন, প্রিন্স যদি সুযোগ দেন তো হান্স তাকে তাঁকে যেন প্রার্থনা করে যে তাকে গ্রামার-স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হোক। এই পরামর্শ শুনে হান্স অবশ্যি মস্ত একটা ধাক্কা খেলো। ইস্কুলের কথা শুনলেই তখন তার পিত্তি জ্বলতে শুরু করতো। তা ছাড়া আনে মারির দেমাকি কথাবার্তাও কানে ঢুকতো তার—আর আনে মারি প্রায়ই গর্ব ক'রে বলতেন 'আমার হান্সের কথা বলছো? ও তো স্কুলের বইপত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়েই ব'লে দিতে পারে কোথায় কী আছে। এত ভালো পড়াশুনো পারে যে, ওর পড়ার মতো বইপত্র কি আর খুব বেশি আছে স্কুলে?' 'এই চকচকে সোনালি সুযোগটা কিনা কোন স্কুলের কথা ব'লে-ক'য়ে নষ্ট ক'রে দেবো,' মনে-মনে ভাবলে হান্স, 'রাজার সঙ্গে দেখা হবে কিনা আমার—আর এ-রকম একটা তুচ্ছ কথা বলবো তাঁকে?' এই সুযোগটা সে নষ্ট করতে চাইলে না। কাজেই সেই মস্ত রাজবাড়ির বিরাট হলঘরে প্রিন্সের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্ভীক ও দৃঢ় গলায় বললে যে, তার চিরকালের বাসনা সে একজন অভিনেতা হয়, এবং তার পরেই, বলা নেই কওয়া নেই, সোজাসুজি আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলে। প্রিন্স হাসলেনও না, হাততালিও দিলে না। কেবল মুখে বললেন যে, হান্সের আবৃত্তি শুনতে অবশ্যি বেশ লাগলো, তবু তাতে প্রতিভার কোনো ছাপ নেই, এবং সে যদি কোনো কাঠের মিস্ত্রীর সাকরেদি করে, তা হ'লেই ভালো করবে—আর কাঠের মিস্ত্রির কাজ তো খারাপ নয়, বেশ সম্মানের কাজ।

সারা জীবন ধ'রে হান্স যত শুভানুধ্যায়ী ও সুপরামর্শ পেয়েছিলো, পৃথিবীতে কেউই বোধ হয় এত সুপরামর্শ পায়নি। সারা জীবন ধ'রে তার উপকার কিসে হয়, এই জন্য পরোপকারীরা তাকে যত কথা বলেছিলো—শুনেও সে যে শেষ পর্যন্ত শারীরিক ভাবে টিকে থাকতে পেরেছিলো, এটাই যথেষ্ট বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়। উপকারের ঠ্যালা সামলাতে-সামলাতেই তো তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার কথা—নিছক প্রাণশক্তির জোরেই সে বেঁচে গেলো। এমন নয় যে, সত্যিকার সমালোচনা সে অনুধাবন করতে পারতো না। পারতো, বরং বেশ ভালোভাবেই পারতো; কিন্তু ভীষণ সেই পথ—কাঁটায় ভরা, ক্ষত ক'রে দেয়, এবং চারদিক থেকে এত নিন্দা ও পরামর্শ শুনে কান্নায় না ভেঙে প'ড়ে তার কোনো উপায় ছিলো না—যদিও নিজের চোখের জলের জন্য তার লজ্জার সীমা ছিলো না। প্রত্যেকটি কথার ভেতরকার শুভেচ্ছা সে ভিতরে-ভিতরে অনুভব করতে পারবে; তারা তাকে ব্যথাও দিলে, কিন্তু তার ভিতর এমন একটা সুনিশ্চয়তার ভাব ছিলো, সব পরামর্শ একযোগে মিলেও যাকে কিছুতেই হঠিয়ে দিতে পারে নি।

যাতে রাজবাড়িতেই কেঁদে না ফেলে, এই জন্যে ভিতরে ভিতরে অনেক কষ্ট করতে হ'লো তাকে। কোনো রকমে সব কান্না চেপে রেখে প্রিন্স অভিবাদন ক'রে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো—কিন্তু হতাশায় তখন সে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছিলো। কেউ যেন তাকে শূন্যে তুলে আছাড় মারলো—এমনি তার মনে হ'লো। তার হৃদয় একেবারে রক্তাক্ত হ'য়ে গেলো তখন, যখন সবাই প্রিন্সের পরামর্শকে সমর্থন করলে। যাদের সে বন্ধু ব'লে ভেবেছিলো, তারা পর্যন্ত কেউ তাকে বুঝতে পারলো না, এমনি একটা ক্ষোভে সে ভ'রে গেলো—না কর্নেল গুল্ডবের্গ, না অন্য সব সম্ভ্রান্তজন যাদের বাড়িতে গিয়ে সে গান শোনাতো। এমন কি সেই বিশপ মশাইয়ের বিধবা বউটি পর্যন্ত তাকে বললেন যে, প্রিন্সের কথামতোই তার কার করা উচিত। কেন তারা এ-রকম ভাবছে, এটাও আবার অনেকে স্পষ্ট ভাষায় বিশদ ক'রে দিলে। এমন বিশ্রী যার চেহারা, যাকে দেখলেই হাসি পায় এত ঢ্যাঙা আর লিকলিকে তালপাতার সেপাই, সে আবার অভিনয় করবে কী? এমন কি তাকে যদি দেখতে ভালোও হ'তো, তবু সে অভিনয়ের কোনো সুযোগ পেতো না। এক নম্বর কারণ, সে গরিব; আর দুই নম্বর কারণ—একটু ভব্যভাবে তারা যোগ ক'রে দিতো—বংশের সবাই তো এককেটা পাগল। কিন্তু হান্স কোনো কথা শুনলে তো? 'কিচ্ছু শুনবো না আমি,' জেদি একরোখা ছেলের মতো সে বললো বারে বারে। সবাই যখন দেখলো যে তাকে বোঝানো অসম্ভব, কিছুতেই হান্স তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে না, তখন সবাই তাকে অবাধ্য ও জ্যাঠা ছেলে বলে একে-একে পরিত্যাগ ক'রে গেলো।

মাঝে মাঝে আনে মারির মনে হ'তো হান্স বুঝি ইচ্ছে করে যত রাজ্যের ঝামেলা জুটিয়ে আনে। ওডেন্সে সরকারি ভাবে ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য দুটি শ্রেণী ছিলো—একটা হচ্ছে প্রধান পুরুতঠাকুরের, আরেকটা তাঁর সহকারীর। বাইরে অবশ্য বলা হ'তো যে কোন ছেলে কার কাছে দীক্ষা নেবে, এটা সে নিজেই ঠিক ক'রে নেবে। কিন্তু স্বভাবতঃই ধনীর ছেলেরা যেতো প্রধান পুরুতের কাছে, গরিবরা তাঁর সহকারীর কাছে। এখন, হান্সের যখন দীক্ষা নেবার সময় হ'লো, সে সোজাসুজি বায়না ধ'রে বসলো, 'আমি প্রধান পুরুত-ঠাকুরের কাছে যাবো।'

'কিন্তু কেন? গিয়ে তোর কোন লাভটা হবে, শুনি?' আনে মারি জিগ্যেস করলেন। 'বরং তারা তোকে অবহেলার চোখে দেখবে। কেন যাবি তুই প্রধান পুরুতের কাছে?' কেন সে যেতে চায়, তা হান্স ঠিক মতো ব'লে বোঝাতে পারলো না। আসলে ব্যাপারটার মধ্যে বিশদ করারই বা কী আছে? সে তো আসলে সভ্য-ভব্য লেখাপড়া জানা ছেলে—তাই নয় কি? অন্তত তার তো তাই ধারণা, তা ছাড়া ওদিকে গরিব, অমার্জিত, ও বাজে ছেলেদের সম্পর্কে তার আবার একটা ভীষণ ভয় আছে। কাজেই শেষ অবধি সে গেলোই প্রধান পুরুতের কাছে। কিন্তু তার জন্য তাকে যথেষ্ট দাম দিতে হ'লো। পুরুতঠাকুর তো তার সঙ্গে সরাসরি ঠাণ্ডা, নীরক্ত ও

নিষ্প্রাণ ব্যবহার করলেনই, উপরন্তু প্রতি পদেই তার চলা-বলায় খুঁত ধরতে লাগলেন। অন্য সব ছেলেরা তো একেবারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে তাকে। যেন সে একটা মানুষই নয়, কোনো জিনিস শুধু। আর হান্সের মনে হ'লো, এখানে সে মানায় না—বড্ড বেমানান সে এদের মধ্যে, বেড়াল আর মুর্গির মধ্যে যেমন অসহায়ভাবে বেমানান ছিলো বিশ্রী হাঁসের ছানাটি। কেবল একটি ছোট্ট মেয়ে ভারি কোমল ব্যবহার করলে তার সঙ্গে—একবার সে হান্সকে একটা লাল গোলাপও দিয়েছিলো।

কবি হলেন গিয়ে—শুধু যে লেখাতেই তা নয়, অনুভূতিতেও। সব চেয়ে ছোট্ট জিনিসও তার কাছে প্রচুর এবং অর্থময় ব'লে মনে হয়—কেননা তা তো কেবল সেই জিনিসটুকু হ'য়েই খালাশ পায় না, আরো গভীর কোনো কথা কানে কানে বলে দেয়। অর্থ তার কিছু না কিছু থাকবেই, কখনো হয়তো তার দুটো মানে, কখনো বহুত্ব, কয়েক হাজার—দিব্যদৃষ্টির উপর তা নির্ভর করে। সহজেই সে খুশি হয় কিংবা মন খারাপ করে বসে থাকে, এটা তো এক দিক থেকে তার সত্যিকার কবিপ্রাণের নজির, তা ছাড়া যিনি সত্যিই কবি, তিনি সব সময়েই আস্ত একটা তোড়ার বদলে কেবল একটিমাত্র গোলাপকেই বেশি মর্যাদা দেবেন—এটা তো নিঃসন্দেহ। এই গোলাপটা তার সব বিষাদ দূরে সরিয়ে দিলো, তার সামনে থেকে মিলিয়ে গেলো নির্দয় লোকজন, কি মনের সব তিক্ত অনুভূতি—কেবল থাকলো লাল একটি গোলাপ, রক্তের মতো লাল, জ্বলজ্বলে, 'সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ', তার আরক্তিম হৃৎপিণ্ড।

অবশেষে এলো তার দীক্ষার দিন। আনে মারি আর হান্সের ঠাকুমা অলস ভঙ্গিতে প্রথামতো সেই মস্ত ক্যাথিড্রালটায় এলেন হান্সের দীক্ষা গ্রহণ দেখতে। ঢলঢলে এক ব্রাউন রঙের স্যুট পরেছে হান্স, আসলে পোশাকটা তার বাবামশাইয়ের কেটে ছেঁটে কোনো রকমে তার মাপসই করে নেয়া হয়েছে শুধু, আর রয়েছে বরফের মতো ধবধবে এক শাদা শার্ট, আর জীবনে এই প্রথম আস্ত এক জোড়া বুট জুতো। মস্ত ভয় ছিলো তার যদি লোকে তার পায়ের এই আশ্চর্য জুতোজোড়া না দেখতে পায়। কাজেই সে করলে কি, তার পাৎলুনের উপর দিয়ে পায়ের ডিম ঢেকে পরলে সেই জুতো। মচমচে শব্দ হ'লো চকচকে নতুন জুতোর, আর এই শব্দটা তার দেমাকের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিলে, কেননা সে ভাবলে, এই শব্দ শুনে সবাই তাকাবে তার দিকে, তার পায়ের দিকে, আর সুন্দর নতুন জুতো-জোড়াকে দেখবে। কিন্তু তার পরেই, হঠাৎ ভীতির সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে যে, এই শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও পবিত্র মুহূর্তে সে কি না ঈশ্বরের চেয়ে আরো গভীর ভাবে ভাবছে তার জুতোর কথা! কেউ তাকে ব'লে দেয়নি, নিজে থেকেই সে মুহূর্তে বুঝে নিলো কী ভীষণ পাপ হ'লো এটা, এবং প্রায় উন্মাদের মতো সে প্রার্থনার বই থেকে স্তোত্র আওড়াতে লাগলো, কিন্তু আবার সবিস্ময়ে আতঙ্কের একটু পরেই আবিষ্কার করলো যে, তবু জুতোর কথা বারে বারে হানা দিচ্ছে তার মনে।

এই জুতো-জোড়াই পরে 'লাল জুতো' গল্পে অমর হ'য়ে গেলো, যে গল্পের মধ্যে ছোট্ট কারেন—সেই জুতো-জোড়া পরেছিলো কি না ঠিক এই মুহূর্তের হান্সের মতোই শুধু কেবল জুতোর কথা ভাবছিলো।

···'কারেন গির্জেয় গেলো লাল জুতো প'রে। সে যখন গির্জেয় ঢুকছে, কবরখানার মূর্তিগুলো থেকে শুরু করে দেয়ালে ঝোলানো সাধু-সন্তদের ছবি, ঢিলেঢোলা কালো জামা পরা সন্ন্যেসিনীরা সবাই যেন হাঁ ক'রে তার লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে রইলো। আর তার মনেও লাল জুতো ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই: বিশপমশাই যখন তার মাথায় হাত রেখে দেবতার দয়ার কথা শোনালেন, পুণ্য জল ছিটিয়ে তাকে দীক্ষিত করলেন, সুসমাচারের বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন তার কাছে, এবং যখন গম্ভীরে বাজলো অর্গ্যান, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা টাটকা মিষ্টি গলায় গান ধরলো, তখনও কারেন শুধু কেবল তার লাল জুতোর কথাই ভেবে চললো।'···

দিনেমারদেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত একটা মাটির শুয়োর-ছানাকেই পয়সাকড়ি জমাবার টিনের কৌটোর মতো ব্যবহার ক'রে থাকে। এমন কি, এখনো ডেনমার্কে সব গ্রামে শহরে এই সব পেট মোটা শুয়োরছানা বিক্রি হয়—কোনোটা তৈরি নিছকই মাটি দিয়ে, কোনোটা বা চিনেমাটির—আর তাদের পিঠে থাকে ছোট্ট একটা গর্ত, ভিতরে পয়সা ফেলার জন্য। হান্সের ছিলো খুব সাধারণ একটা মাটির শুয়োর, কিন্তু এই চোদ্দ বছর ধ'রে যত পয়সা সে জমিয়ে ছিলো, সব ছিলো এটারই ভিতর। মাঝে মাঝে খুচরো এক-আধটা পয়সা পেয়েছে, কখনো বা সে উপার্জন করেছে গান শুনিয়ে কি কোন কাজ ক'রে দিয়ে—সব পয়সাই সে এখানে রেখেছিলো, একটি পয়সাও খরচ করে নি কোনোদিন। কিন্তু যখন সে দেখলো যে মা আজকাল দর্জিগিরি শেখার জন্য বড্ড বেশি ক'রে চাপ দিচ্ছেন, তখন সে ঠিক ক'রে ফেললো, এবারে মরীয়ার মতো একটা কিছু সে ক'রে ফেলবেই। ঐ শুয়োরটা ভেঙেচুরে সব পয়সা বের ক'রে নিয়ে সোজা যেতে হবে রাজধানীতে—কোপেনহাগেনে।

পয়সাকড়ি গুণে দেখা গেলো মাত্র তেরো রিগসডালের, হ'লো। পঞ্চাশ ষাট টাকার মতো আমাদের হিসেবে—কি তার চেয়েও কিছু কম হয়তো, যদি তখনকার কালের কথা চিন্তা করি। কিন্তু হান্সের ফূর্তি ছাখে কে! এ তো রীতিমতো রাজকোষ—তা-ই তার মনে হ'লো। মাকে সে বারে বারে অনুনয় করলো, 'আর ভয় কী? এখন তো আমি চ'লে যেতে পারি।'

'কিন্তু সেখানে গিয়ে তুই করবি কী?' বিমূঢ় মা জিগ্যেস করলেন।

সেই চিরন্তন উত্তরটি ঠোঁটের কোণায় আটকে ছিলো 'বিখ্যাত হবো।'

'কিন্তু কী ক'রে? কেমন ক'রে?' আনে মারি শুধোলেন।

হান্স তো সেই কবে সব জেনে ব'সে আছে। 'প্রথমে ভীষণ সব দুঃখকষ্ট, কিন্তু শেষ কালে বিখ্যাত হ'য়ে ওঠা যায়ই যায়।'

'বিখ্যাত' হওয়ার কথাটা দিনের মধ্যে সে এতবার ক'রে বলতো যে শেষে যদি আনে মারি তার কথাকে বিশ্বাস ক'রে বসেন তো তাঁকে তেমন দোষ দেয়া যায় না, কিন্তু যখন জানা গেলো ছেলের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মতি জানিয়েছেন, তখন সমস্বরে চারদিক থেকে হৈ-হৈ জেগে উঠলো। প্রতিবেশীরা বললে যে একটি বাচ্চা ছেলেকে একা এত দূরে যেতে দেওয়ার মতো ভীষণ ব্যাপার কস্মিন্ কালেও শোনা যায় নি—বিশেষ ক'রে ঐ মস্ত শহরে, যেখানে মানুষের মাথা মানুষে খায়, যেখানে কিনা কাউকেই সে চেনে না, অথচ আনে মারি রীতিমতো বয়স্ক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কিনা তাতে রাজি হ'য়ে গেলেন। গালে হাত দিয়ে

তারা বললে, 'এমন কথা তো কোনো জন্মে শুনিনি!' আর তাদের চোখগুলিকে এই ভাবে কপালে উঠতে দেখে আনে মারির বুক কেঁপে উঠলো, কথা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি নিষেধ করলেন, 'না, কিছুতেই তুই যেতে পারবি না!' হান্স তো কেঁদে-কেটে অস্থির। 'এ সব বদ মৎলব ওকে ছাড়তে বলো,' প্রতিবেশীরা বুদ্ধি দিলো আনে মারিকে, 'ও সব কথা ওকে মাথায় আনতে দিয়ো না।' কিন্তু হান্স নাছোড়বান্দা; 'মাথায় আনতে দিয়ো না'বললে কি হবে, মগজে যখন এই ভাবনাটা তার মাথায় অনেক দিন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন সেই ভাবনা তাড়ায় কার সাধ্যি। মাকে সে মনে করিয়ে দিলো বাবামশাই কী বলেছিলেন, 'সবচেয়ে বোকার মতো কাজ করতে চাইলেও ওকে কোনো বাধা দিয়ো না।'

আনে মারি আরো মুশকিলে প'ড়ে গেলেন। কী করবেন, ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলেন না কিছুতেই। উদ্বেগও বাড়ছিলো ক্রমশঃ। নতুন স্বামীটি তো আস্ত এক কুঁড়ের বাদশা। তিনি ভেবেছিলেন বিয়ের পর এমন একজনকে পাবেন, যে তাঁর দায়িত্বের ভাগ নেবে কিছু-কিছু। কিন্তু এখন দেখা গেলো স্বামীটিকেও শেষ পর্যন্ত তাঁকেই ভরণপোষণ করতে হচ্ছে—তাঁরা দুজন তো আগেই ছিলেন। সারা দিন তিনি নদীতে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচেন। জলের ঠাণ্ডায় বাতের অসুখটাও বেশ গুরুতর ভাবে চাড়িয়ে উঠলো, এখন নিয়মিত ব্র্যাণ্ডি গলায় না-ঢাললে বাতের ব্যথা দূর হয় না। 'তাছাড়া ব্রাণ্ডি খেলে শরীরটাও বেশ গরম থাকে, ঠাণ্ডায় আর কিছুতেই কাবু করতে পারে না,' বলতেন তিনি, 'কিন্তু দাম তো আগুনের মতো!' খুব দুঃখের ব্যাপারটা—হয়তো জীবনে এই প্রথম শুধুই নিজের জন্য কিছু টাকা চাচ্ছিলেন তিনি। হান্স যাতে ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় জীবনে, যাতে ভালোভাবে জীবন শুরু করতে পারে—এই জন্য তিনি কম চেষ্টা করেননি। তাছাড়া এটা তো মানতেই হয় যে তাকে সারাজীবন অলসভাবে বাড়িতে ব'সে খাওয়াবার মতো টাকা তাঁর নেই। উপরন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে এই বাচ্চা ছেলেটি একা একা কোপেনহাগেন পর্যন্ত চ'লে যেতে পারে। 'নাইবর্গের চেয়ে বেশি দূর ও যেতে পারলে তো,' প্রতিবেশীদের বললেন তিনি, 'যখন নিজের চোখে দেখবে সমুদ্দুর কী মস্ত আর কী ভীষণ, তখন সুড়সুড় করে আপনিই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।'

হান্স কিন্তু কী কী করবে, সব কর্মসূচী স্থির ক'রে ফেলেছিলো। সেবার বসন্তের সময় রয়াল থিয়েটারের কয়েকজন গায়ক-গায়িকা আর অভিনেতারা ওডেন্সে-তে এসেছিলো। তার কল্পনাতে তারা কেবল উশকেই দিলো না, পুনর্জীবন দিয়ে গেলো প্রায়। ব্যালে-নাচের কথা শুনলো সে, শুনলো মাদাম শাল নামে এক নর্তকী আছেন, নাচেন তিনি একক নৃত্য, অথচ তার জনপ্রিয়তা প্রায় অসীমে পৌছেছে আজকাল। তার মাথায় এক মতলব খেলে গেলো ও-সব শুনে; ইভেরসেন নামে এক লোকের এক ছাপাখানা ছিলো—সে আবার হান্সের বন্ধুদের অন্যতম। হান্স তাকে গিয়ে বললো যে মাদাম শালের সঙ্গে সে দেখা করতে ইচ্ছুক, ইভেরসেন যেন তাকে একটি পরিচয়পত্র লিখে দেয়। 'কিন্তু আমি যে তাঁকে জানিই না।' ইভেরসেন বললে। হান্সের কাছে সেটা মোটেই কোনো জরুরি ব্যাপারই নয়, 'তাতে কী এসে-যায়,' বললে সে, এবং চিঠির জন্য প্রায় ছিনে জোঁকের মত সঙ্গে লেগে থাকলো। বুড়ো ইভেরসেন তাকে আন্তরিকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'কোপেনহাগেনে তুমি যেয়ো না হান্স। বরং মাথা ঠাণ্ডা করে এখানেই কোনো কাজ শেখ, যাতে আখেরে তোমার ভাল হবে।' 'ছাই হবে। ভীষণ পাপ হবে সেটা,' হান্স ব'লে উঠলো চীৎকার ক'রে।

অগত্যা ইভেরসেনকে হার মানতেই হ'লো। মাদাম শালকে একটা চিঠি লিখে দিলো সে। 'তিনি কিন্তু তোমার কোনো সাহায্যই করবেন না,' আগে থেকেই সে হান্সকে মোহমুক্ত ক'রে দিতে চাইলো। 'বরং গিয়ে রয়েল থিয়েটারের অধ্যাপক রাবেক-এর সঙ্গে দেখা কোরো—যদি তিনি কিছু করতে পারেন।' সে সব কথা হান্স মন দিয়ে শুনলে তো? সে তখন এই বহুমূল্য চিঠি পেয়েই আহ্লাদে আটখানা।

ছোট্ট একটা বাণ্ডিল বেঁধে তার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেন মা। ডাকঘরের ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানকে অনেক ব'লে-ক'য়ে তিনি হান্সকে কোপেনহাগেনে নিয়ে যেতে রাজি করলেন; 'নিয়ে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু কিছু কড়ি ফেলতে হবে,' কোচোয়ান সরাসরি জানিয়ে দিলো। শেষ অবধি রফা হ'লো তিন রিগসডালের এ এবং তাও সর্ত থাকলো হান্সকে ওডেন্সের বাইরে গিয়ে গাড়িতে চড়তে হবে—আর রাজধানীতে ঢোকবার ঠিক আগেটাতেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে হবে। 'না-হ'লে পয়সাটি ভাগ-বাঁটোয়ারা হ'য়ে বেহাত হ'য়ে যাবে। আর তাই যদি হয় তো আমার এত ঝক্কি পোয়াবার কোনো মানে হয়?' সে বুঝিয়ে দিলো সব।

একদিন বিকেলে হান্স তার মায়ের সঙ্গে শহরের তোরণদ্বারে গিয়ে হাজির হ'লো। পুরোনো বাচ্চাটা জামা তার পরনে। দীক্ষার সময়ে যে পোশাক পরেছিলো, তা হ'লো চকচকে চৌকণা পোশাক, রাস্তায় সেটা প'রে ময়লা করার কোনো মানে হয়? সেই পোশাকটা বাণ্ডিলের মধ্যেই আছে, কিন্তু জুতোটা সে কিছুতেই পা থেকে খুলতে রাজি হ'লো না। তদুপরি মাথায় থাকলো মস্ত এক শোলার টুপি, স্পষ্ট বোঝা যায় টুপিটা বয়স্ক কোনো লোকের, কেননা প্রায় চোখ ঢাকে আর কি টুপির ডগা! যা-কিছু পয়সা-কড়ি সব রইলো তার পকেটে—তার যক্ষের ধন। হাতে থাকলো বাণ্ডিলটা, আর রাস্তায় খাবার জন্য থাকলো মাংসের পুর-দেয়া কতকগুলি রুটি। বয়স তখন তার মাত্র চৌদ্দ, কিন্তু এর মধ্যেই লম্বায় মাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বুড়ি ঠাকুমাও সারা রাস্তা হেঁটে এলেন নাতির দিগ্বিজয়-যাত্রা দেখতে। ঘোড়ার গাড়িটা যতই কাছে এ'লো, তাঁর চোখ ততই জলে ঝাপসা হ'য়ে গেলো, কোনো কথাই তিনি বলতে পারলেন না নাতিকে। আর তাঁকে কোনোদিন দ্যাখেনি হান্স—১৮১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। এমন কি, তাঁকে যে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে, তাও সে পরে খুঁজে বের করতে পারেনি। গরিব লোকদের যেখানে সমাহিত করা হয়, সেখানে সমাধি ফলকে কোনো চিহ্ন থাকে না। ও-রকম কোনো জায়গায় তাঁর কালো কফিন মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে—এ কথা তাঁর কাছে কী-রকম জঘন্য ও অনভিজাত মনে হ'তে পারে, হান্স তা বুঝতে পেরেছিলেন।

কথা অবশ্য সে-ও কিছু বলতে পারলো না। তারও গলার কাছটায় ডেলা-ডেলা ব্যথা ভিড় ক'রে এলো, যেন তারা শব্দ হ'য়ে বেরিয়ে আসবে এক্ষুণি। ঠাকুমাকে চুমো খেলো সে, আনে মারিকেও—

বারে-বারে চুমো খেলো জড়িয়ে ধ'রে, তারপর কোনো এক সময় কান্না চাপতে পারছে না দেখে নিজেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো—আর ডাকগাড়ির কোচোয়ান সজোরে গলা ফুলিয়ে শিঙায় ফুঁ দিলে। ঝলজ্বলে একটা বিকেল সেটা, পশ্চিম থেকে লাল-সোনালি আলোকরশ্মি পাঠিয়ে দিয়েছে বেলাশেষের সূর্য, আর দিগন্তের কাছে আকাশটা হঠাৎ এক আশ্চর্য গোলাপি আভায় ভ'রে উঠেছে। সেই লাল সূর্যের অনেক রশ্মি—আর তার চোখের জল—তার দৃষ্টিকে ঝাপসা ক'রে দিলে, যখন গাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো। ঝাপসা ভাবে দূর থেকে সে দেখলো তার মা আর ঠাকুমাকে, দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্রমে তাঁরা ছোটো হ'তে হ'তে শেষকালে কালো একটা ফুটকির মতো হ'য়ে গেলেন। যখন তাঁরা দিগন্তে মিলিয়ে গেলেন, তখন সূর্য গাছের আড়ালে চাপা প'ড়ে গেছে। [ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীশিবু গুপ্ত

ওই যে দূরে লালরঙের দোতলা বাড়ীটি দেখিতেছ, উপরে একটি পতাকা বাতাসে ফড়-ফড় করে উড়িতেছে, এই বাড়ীটির সঙ্গে অতীতের বহু রহস্য জড়িত স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আছে। যখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করিতেছিল, সেই সময়ে ওই যে বাড়ীটির কথা বলিলাম—ওটির ভিতর থেকে বাহির হইল এক তরুণ বাঙ্গালী যুবক এই ভারতমাতার পরাধীন শৃঙ্খল মোচন করিতে, হাসিমুখে মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে কঠোর সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিশিখা লকলক করে জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নিশিখার মাঝে তিনিও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন পরাধীনতার গ্লানি দূর করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশে তরুণ যুবকগণ এই সংগ্রামে "হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল জয়গান"; বৃটিশ শাসকগণের গুলীর সম্মুখে বীরের মত বুক পেতে দাঁড়াল। এমনি করে অতীতের বাঙ্গালাদেশের তরুণ যুবকগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেদের রক্ত দিয়ে নিজেদের বিজয় গৌরব-কাহিনী তুলে ধরিলেন। তাহার পরে আবার এক ভীষণ ঘটনা ঘটিল জান—ওই যে বীর বাঙ্গালী যুবকটির কথা বলিলাম, তাঁহার দর্পে সমগ্র ভারত কাঁপিতে লাগিল. তখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকগণ চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এই যুবকটিকে নজরবন্দী করে তাঁর বাড়ীতে আটক রাখিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি পারেন? যাঁহার মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন বার বার উঁকি মারিতেছে তাঁহাকে কাহার সাধ্য নজরবন্দী করে রাখে? এই যুবক একদিন সমগ্র বৃটিশ শাসকদের চোখে ধূলা দিয়া ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসকগণ হিমসিম খাইয়া গেলেন, তিনি ভারতের বাহিরে যাইয়া খুব কষ্ট স্বীকার করে দিনের পর দিন স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছিলেন, তাহা মানুষের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার! দিনের পর দিন তিনি এই রকম কষ্টের মধ্যেও নিজের ধৈর্য্য হারান নাই। তিনি দূর দেশ থেকে ভারত-সন্তানদের কাছে রক্তভিক্ষা চাহিলেন—"আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

তাঁহার এই ভিক্ষায় তেত্রিশ কোটি ভারত-সন্তান সাড়া দিলেন। 'রক্ত দিতে মোরা প্রস্তুত, তাহার পরিবর্ত্তে মোরা চাই স্বাধীনতা'। ভারত-সন্তানদের সাড়ায় তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি আরও কঠিন পথে অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই সময় গঠন করিলেন সৈন্যবাহিনী, এই বাহিনীতে সকল শ্রেণীর তরুণ যুবক-যুবতীগণ দলে দলে এসে যোগ দিয়া তাঁহার পার্শে এসে দাঁড়ালেন। এই সৈন্যবাহিনীর নাম রাখিলেন 'আই, এন, এ'। এই 'আই, এন, এ' বাহিনী লইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মণিপুরে ভীষণ যুদ্ধ করিলেন, তাঁহার অসীম বীরত্বে সমগ্র বিশ্ববাসী হতবাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন, একজন বাঙ্গালীর সন্তান কি না করিতে পারে!

আজ অনেকে বলেন, এই বাঙ্গালী বীর সন্তানটি জীবিত নাই। আবার অনেকে বলেন, তিনি জীবিত আছেন—চীন অথবা রাশিয়ায়। বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট এক স্বাধীনচেতা পত্রিকা "দৈনিক বসুমতী"তে আমরা অনেক কিছু তাঁহার বিষয় দেখিতে পাইয়াছি ওই পত্রিকাতে বহু প্রমাণস্বরূপ তথ্য দিয়া প্রমাণিত করেছেন, তিনি মরেন নাই জীবিত আছেন। এবং ভারতবর্ষের এমন একদিন আসিবে যে সেই দিন তাঁহার আগমন তখনই প্রয়োজন হইবে, আমি কিন্তু জানি না ইহার কত দূর সত্য-মিথ্যা—তবে এইটুকু বলিতে পারি, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আজ মনে-প্রাণে এই আশা নিয়েই বসে আছেন। কবে যে এই বীর সন্তানের পদধূলি আবার বাঙ্গালার মাটিতে পড়িবে।

শুনলে তো ওই বাড়ীটির রহস্য? এটা তো আমি খুব ছোট করে আজ তোমাদের বলিলাম। যদি সত্যি সত্যি সবটুকু রহস্যের কথা বলিতে আরম্ভ করি, তবে একটি বিরাট ইতিহাস তৈয়ারী হয়ে যাবে—জানো তো? এখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পেরেছো আমি যাঁর কথা বলিলাম—ইনি হচ্ছেন আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর ভারতের বাহিরে চন্দ্র বোস বলে পরিচিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই রকম কত-শত বাঙ্গালী বীর সন্তানের কথা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে। আজ কেউ তাহা দেখে না। তাই তো আজ বাঙ্গালীর এই রকম অবস্থা ভাই! আজ বাঙ্গালী জাতিটাকে ধ্বংস করিতে কতকগুলি অবাঙ্গালী বদ্ধপরিকর। বাঙ্গালীরা আজ ভীষণ দুর্দিনের মধ্যে পড়িয়াছে, যদি আজ বাঙ্গালী অতীতের মত সংঘবদ্ধ ভাবে সকল ক্ষেত্রে না চলে, তবে এই গৌরবময় বাঙ্গালী-জাতির অদূর ভবিষ্যতে কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

অতীতের স্বপ্ন

বিভা সরকার

আগ্রা দুর্গের শূন্য দরবারে-আম-এ ঘুরতে ঘুরতে মন স্বপ্ন দেখে—দরবারে বসে আছেন সম্রাট আলমগীর। হিন্দুবিদ্বেষী চতুর ধর্ম্মান্ধ রাজা মুসলমানদের জিন্দাপীর, আল্লার ফকির!

কিন্তু রাজা! তোমার ধমনীতে যে হিন্দুরক্তের সংমিশ্রণ, সে কি তুমি ভুলতে পারছো না? তাই বুঝি তোমার এ হিন্দু-দ্রোহ? হে সম্রাট! তোমার পিতামহ জাহাঙ্গীর ছিলেন রাজপুত-রাজকন্যা অম্বরকুমারী যোধবাঈয়ের পুত্র। পিতা শাহজহান-জননীও ছিলেন রাজপুতকুলবালা।

ফকিরবেশী সম্রাট মালা জপে চলেছেন সিংহাসনে বসে বসে কোন ছলনায়! অন্তর তাঁর এখন কি জপছে? ধর্ম্মের আড়ম্বরে রাজা দিন গুজরাণ করতেন, তবু কি রাজ্যলিপ্সা! এর জন্য তুমি কি না করেছ? শেষ দিন পর্য্যন্তও তোমার শান্তি ছিল না। হে অবিশ্বাসী, তুমি যে আপন ছায়াকেও বিশ্বাস করতে পারনি। তোমার ছায়াও যে তোমায় ভয়বিহ্বল করে তুলেছিলো। তুমি ছিলে ছলনাময়। ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলে, তাই তো রূপে রসে গন্ধে ভরা এই বসুন্ধরাও তোমায় ছলনা করেছিলো!

ঐশ্বর্য্য সমারোহের মাঝখানে জীবন-পেয়ালা তোমার হয়ত ভরে উঠেছিলো, অমর্ত্য ঐশ্বর্য্যে কিন্তু তুমি তা পান করতে পাওনি। তোমার অন্তর তাই আজন্ম চিরপিপাসিত। তুমি কৃপার পাত্র। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষকে তুমি কোনও দিনই বিশ্বাস করনি। প্রকৃতি তাই তার নির্ম্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। হত্যায় হত্যায় তুমি আপন বংশকে প্রায় নিঃশেষ করেছো। যৌবনে পিতাকে, মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে করেছো বন্দিনী। প্রৌঢ়ত্বে আপন প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছো। এক-আধ দিন নয়। দীর্ঘ বাইশ বছর সেলিমগড়ের লৌহযবনিকার অন্তরালে কোন তপস্যায় সে অভাগিনীর দিন কেটেছে কে রাখে তার খবর? সেলিমগড়ের নির্ম্মম তোরণ—কন্যার মৃত্যুর আগে তুমি খুলে দাওনি রাজা! হঠাৎ চিন্তাজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে সারা সভায় চমক খেলে গেল। প্রহরিবেষ্টিত খাঁচার সিংহের ন্যায় যে ও বন্দী।

চচা খুদা কসম—আর যাই সাজা দাও, আমায় পপীর সরবৎ দিতে বল না—অসহায় বেদনায় গুমরে উঠলো নবযুবকের আতুর কণ্ঠ। আমার মৃত্যুর হুকুম দাও চচা কিন্তু দোহাই তোমার—আমায় তিলে তিলে পাগল করে মের না! দারা শুকোর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শুকো আজ কাকার করুণাপ্রার্থী।

কুটিল হাস্যে সমস্ত সভাসদকে শুনিয়ে অভয় দিলেন পিতৃব্য—না, তোমায় পপীর সরবৎ দেওয়া হবে না।

কিন্তু বন্দিগৃহে সেই পপীর সরবৎ পান করেই নিস্ফল অভিসম্পাত দিয়ে গেল বন্দী—সম্রাট শাহজহানের নয়নমণি সুলেমান শুকো মিথ্যাচারী ছলনাময় আপন পিতৃব্যকে। সাক্ষী রইল তার পাষাণ কারাগার আর মহাকালের রোজনামচা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি। অঙ্গুরীবাগ সামনে পড়ল। মোগল আমলের নিদর্শন যা আজও কালের কবল বাঁচিয়ে হৃতশ্রী হয়ে পড়ে আছে। হয়ত একদিন এই চমণ (বাগান) শোভায় ঔজ্জ্বল্যে স্বর্গীয় সুষমা নামিয়ে এনেছিলো। খাসমহলের তলা দিয়ে বাগানের মাঝখানে বয়ে চলেছে এক কৃত্রিম ঝর্ণা বা জলধারা। অঙ্গুরীবাগের মাঝখানে একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা। পাঁচটি ফোয়ারা-বিশিষ্ট। গ্রীষ্মের দিনে রাজমহলের বিলাসিনীরা এখানে নাকি অবগাহন করতেন। এক পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে মাটীর নীচের শীতল বিশ্রামগৃহে—যেখানে সম্রাট ও প্রধান হারেমবাসিনীরা প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে অব্যাহতি পেতেন। বৈভবের চূড়ান্ত দেখিয়ে গেছেন এই মোগল বাদশাহরা। কিংবদন্তী বলে, এই মাটী নাকি বড়ই সুফলা। এ মাটী আনা হয়েছিলো কাশ্মীর থেকে। [illegible] ফুটতো বসরাই গোলাপ ভারে ভারে, এরই ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছে গুচ্ছে ফলে থাকতো আঙ্গুর। প্রিয়তমাকে হয়ত উপহার দিতেন সম্রাট স্বহস্তে উৎপাটিত করে লীলাচ্ছলে!

—মন স্বপ্ন দেখে—বসে আছেন শাহজহান আপন সযত্ন-রচিত এই খাসমহলে বা বিশ্রাম মহলে। পার্শ্বে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহল।

পিতার পদতলে স্নেহধন্যা মোগলরৌষণ কন্যা জাহানআরা, 'গৌরব-গরবিনী জনন'র ভাবষ্যৎ প্রতিনিধি সম্রাট-বেগম। মোগল হারেমের প্রধানারাই হতে পারতেন সম্রাট-বেগম। তাঁরা ছিলেন বিশেষ ভাবে রাজ-অনুগৃহীত। তাঁদের কাছে থাকতো রাজার পাঞ্জা দেওয়া শীলমোহর। সেই পাঞ্জার জোরে তাঁরা পারতেন যাকে ইচ্ছা হারেমের বা দুর্গের বাইরে পাঠাতে। এক কথায় মোগল হারেমে তাঁদের ছিলো অপ্রতিহত ক্ষমতা। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর সম্রাট এ ক্ষমতা তুলে দেন আপন করুণাময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা দেবোপমা কন্যা জাহানারার হাতে।

আজন্ম যুদ্ধবিগ্রহ ঝড়ঝঞ্ঝার পর ক্ষণিক বিশ্রাম, কিছুদিনের আনন্দ, তাও তিনি পেয়েছিলেন মাত্র তিনটি বছর—তারপর জীবনের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তাঁর চিরসঙ্গিনী মমতাজ মহল। জীবন ভর পড়ে রইল শুধু বিরহ শুধু জ্বালা!

সেই ক্ষণ-আনন্দময় দিনগুলির—একটি আনন্দ-আসর জমে উঠেছে। রূপে রূপে সুন্দরীদের সমারোহে সে সভা বুঝি ইন্দ্রসভার লজ্জা দেয়! বীণাবাদিনী মৃদু মৃদু ঝঙ্কারে মধুর গুঞ্জন তুলেছে। সে সঙ্গীতলহরী মহল ছাপিয়ে ঊর্দ্ধ আকাশে মহাশূন্যতায় লীন হয়ে যাচ্ছে। মাণিক্যখচিত সুরাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ্করী। থেকে থেকে স্বর্ণনির্মিত হীরক-খচিত রাজপেয়ালা পূর্ণ হয়ে উঠছে বহুমূল্য পার্শিয়ান সুরায়। মরি! মরি! কি তার রং! গলান চুণি যেন পেয়ালায় টলমল করছে। তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে সসম্ভ্রমে সম্রাজ্ঞীর পদতলে। হাতে তার বহুমূল্য পানের বাটা। মরকত-খচিত জর্দার কৌটা সোনার থালায় সাজানো। মর্ত্ত্যের অপ্সরীরা নৃত্য করছে রাজদম্পতীর সামনে কমনীয় নৃত্যছন্দে। লালালাস্যে তারা বুঝি হার মানায়, মেনকা-রম্ভাকে। অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় পার্শিয়ান ধূপাধারে মৃদু মৃদু পুড়ছে গুগগুল লোবান। ইচ্ছে করে শুধাই এত বিলাস তোমরা শিখলে কোথায় রাজা? তোমরাই ভোগ করতে জান। এ বিদ্যায় আমরা তোমাদের বহু পশ্চাতে। আমরা যে ঋষির বংশধর—সন্ন্যাসী গৃহী। তাই আমরা অমিতব্যয়ী হয়ে যেতে পারি, অমিতাচারী পথভ্রষ্ট হতে পারি—অর্থের অপব্যয় করতে পারি কিন্তু এমন করে বিলাস-বৈভব কি সম্ভোগ করতে জানি?

তোমরা শিল্পদেবতার পূজারী, তাই শিল্পীর মতই এ বৈভবের সমারোহ সাজাতে জানো। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। ধীরে ধীরে সভা ভঙ্গ হয়ে আসে। সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া ক্ষীণতর হয়ে উঠতে থাকে ধূপদান থেকে। একে একে আলো নিবে আসে। স্তিমিত দীপাধারের আলো চন্দ্রালোকের কুহক সৃষ্টি করে। মন বিহ্বল হয় এ সমারোহে। সভার সবাই একে একে চলে যায় কুর্ণিশ জানিয়ে। বহুমূল্য গালিচায় রত্নখচিত তাকিয়া বিছিয়ে বিদায় নেয় রাজকিঙ্করীর দল। শূন্য বিশ্রামগৃহে সম্রাট-দম্পতী বিশ্রাম নেবেন। কালোবরণ যমদূতের মত খোজা—অপূর্ব্ব কারুময় মখমলের পর্দা টেনে প্রহরায় দাঁড়ায়। চমকে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়—কোথায় কি! চোখ রগড়ে বার বার দেখি, শূন্য খাসমহল প্রেতিনীর মত অট্টহাস্য করে ওঠে। দূরে ঘণ্টা বাজে দুর্গতোরণ বন্ধ করার—ঢং ঢং ঢং।

বেলুড়-হালিবিড

বাণী সিংহ

অবশেষে মনের আশা পূর্ণ হোল। অনেক বাধা-বিপত্তি ঠেলে, ঘর-সংসার ও বাইরের বন্দোবস্ত করে দু'জনে বার হয়ে পড়লুম। দক্ষিণ-ভারত সম্বন্ধে অনেক গল্প অনেকের কাছে শুনেছি।

যতটা পারা যায় দক্ষিণ-ভারতই ঘুরবো, এই বাসনা নিয়ে একদিন মাদ্রাজ মেলে উঠে পড়লুম।

পুরী, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ ইত্যাদি গল্প ফেঁদে আসল বক্তব্য গুলিয়ে ফেলতে চাই না, তাই ওগুলো বাদ দিলাম, অবশ্য শিল্পে, সৌন্দর্য্যে কারো মহিমা কম নয়। যা যা দেখলুম সবই অপূর্ব সুন্দর, দেখে দেখে সাধ মেটে না। তবে এগুলির কাহিনী প্রায়ই পড়া যায় ও বন্ধু-বান্ধবের মুখেও খুব শোনা যায়—তাই আর পুনরাবৃত্তি করলুম না।

তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, ধনুস্কোটি, রামেশ্বর ঘুরে আমরা ব্যাঙ্গালোরে এসে পৌছলুম—ও সেখানে একদিন কাটিয়ে মহীশূরের দিকে রওনা হলুম। ব্যাঙ্গালোর চমৎকার সহর, তবুও মহাশূর যেন মন হরণ করলো। পাহাড়ের ফ্রেমে বাঁধানো একটি নয়নাভিরাম ছবি চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো। পথঘাট, বাগান, অট্টালিকা, মন্দির, রাজপ্রাসাদ নিয়ে আপন মহিমায়, গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মহীশূর। যা দেখি সবই ভালো লাগে, যেটা ছেড়ে যাই, মনে হয় আর একবার ফিরে গিয়ে ভালো করে দেখে নিই। রাজপ্রাসাদে মহারাজের শিল্পপ্রিয়তার নিদর্শনের পাশেই রয়েছে, তাঁর ললিতকলার প্রতি অপূর্ব অনুরাগের নিদর্শন, কোমল-কঠোরের যেন জীবন্ত সংমিশ্রণ। আজো মনে স্পষ্ট জেগে আছে দুটি চিত্রের অনবদ্যতা, একটি বিষয় হচ্ছে, 'উমার তপস্যা' ও অপরটি 'সন্ধ্যাদীপ'। তপঃক্লিষ্টা উমার ধ্যানস্তিমিত আঁখি, অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত, যেন জপে রত, আর পদ্মের মৃণাল জড়ান দুটি হাতের কি অবর্ণনীয় মুদ্রাভঙ্গি, আত্মসমর্পণের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর কখনও দেখবো না।
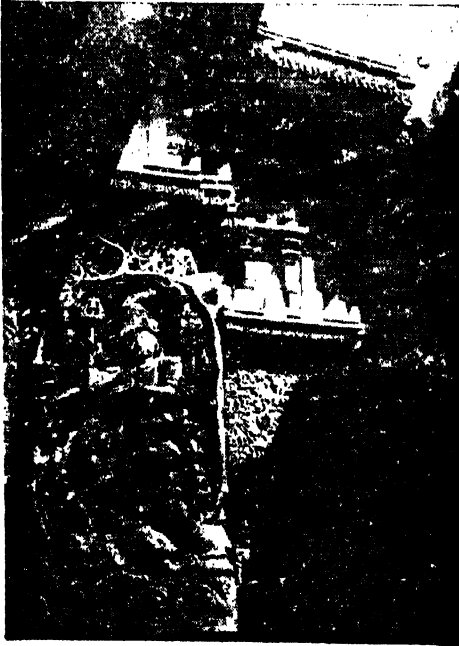
হালেবিড—নটরাজের গজাসুরবধের পর, তার দেহের উপর তাণ্ডব-নৃত্য

আর অপরটি সন্ধ্যাদীপ, কিশোরী বধূ সন্ধ্যা দীপ জ্বেলে, এক হাতের আড়ালে শিখাটিকে আড়াল করে চলেছে, কোথায় তা জানি না! বুঝি বা তুলসীতলায়, নয়ত মন্দিরে দেবতার আরতির জন্য—সমস্ত মুখটি দীপের আলোয় উদ্ভাসিত, আয়ত চোখ, আরক্তিম অধর, ললাটের সিন্দুর-টিপ জ্বল-জ্বল করছে—সে যাকে আলো দিতে যাচ্ছে, তার আগে যে নিজেই নিজের আরতি করে ফেলছে, তা বোঝবার অবকাশ নেই। পাছে বাতাসে নিবে যায় সেই ভয়ে একাগ্র হয়ে শিখাটির দিকে চেয়ে আছে।

হয়ত অবান্তর বাজে লিখে ফেললুম, তবুও মনে যে জিনিস গভীর ছাপ রেখে গেছে, তার প্রকাশ না করে পারলুম না। আরো অনেক রাজ-ঐশ্বর্য্য ছড়াছড়ি আছে সেখানে, সে গল্প বহুবর্ণিত; তাই আর বাড়ালুম না।

মহীশূরের আর একটা জিনিস না লিখে পারছি না, সেটা হচ্ছে চন্দন-গাছ। চামুণ্ডি পাহাড়ে উঠতে ট্যাক্সি থেকে ড্রাইভার দেখালো, না বলে দিলো চোখেই পড়তো না হয়ত, ছোট নিম গাছের মত গাছ, পাতাগুলিও নিমপাতার ধরণের। কাঁচা অবস্থায় কোনও গন্ধ পাওয়া যায় না। শুনলুম শুকাবার পর এর সুগন্ধ পাওয়া যায়। চন্দন গাছের কোনও ফুল বা ফল হয় না, এ গাছ আপনা থেকে উদ্ভব হয়। সম্ভব পুরানো গাছের শিকড় থেকে নতুন চারা উদ্ভব হয়। গাছ পরিণত বয়স্ক হলে আপনা থেকেই মরে যায়। তখন মহীশূর সরকারের থেকে যাঁরা এই বন রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরা এসে সেই শুকনো গাছ নিয়ে কারখানায় যান। সেখানে তৈরী হয় চন্দন-আতর সাবান ও নানা রকম চন্দন কাঠের খেলনা। চন্দন গাছ অত্যন্ত সাবধানে রক্ষা করা হয়। প্রহরীরা সব সময় চারদিকে লক্ষ্য রাখে, গাছ নষ্ট করলে শাস্তি পেতে হয়।

মহীশূর থেকে বেলুড় যাবার ঠিক ছিলো, ৭৪ মাইল ট্রেণ, হাসান ষ্টেশনে রাত প্রায় ২টো হবে নেমে ষ্টেশনে রাত কাটিয়ে ভোরে বাস ধরা, হাসান থেকে ২৫ মাইল বাস, তারপর বেলুড় পৌছানো; বাসে যেতে প্রচুর ধূলা ও আরও প্রচুর ঝাঁকানি খেয়ে অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌছানো গেলো। শরীর অবসন্ন, পেটে ক্ষিদে, রাতে ঘুম না হওয়ায় ক্লান্তি, তবুও নতুন জিনিস দেখবো, ছবিতে যে শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তা প্রত্যক্ষ করবো এই আনন্দে সব কষ্ট দূর হয়ে গেলো বেলুড় পৌছে।

হাসান থেকে বেলুড় পৌছালুম বেলা ৮টা আন্দাজ, ওখানে ট্রাভেলার্স বাংলোতে ওঠা হোল। সেখানে স্নান সেরে, সামান্য জলযোগ ইত্যাদির পর চৌকিদারের জিম্মায় জিনিসপত্র রেখে আমরা আবার বার হলুম। পথে শোনা গেলো, হালিবিডের বাস ছাড়ছে এখনই, সেটা ওখান থেকে ৬ মাইল দূরে, গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা দুই লাগে। সকালে মাত্র একটা বাস ছাড়ে, সুতরাং সেদিন না গেলে আবার পরদিন, সারাদিন অপেক্ষা করতে হয়, আমরা তাই আগেই হালিবিড দেখার মনস্থ করলুম। বেলুড় ফিরে এসে দেখবো, সারাদিন ধরে। ৬ মাইল পথ আধ ঘণ্টায় পৌছে গেলুম, বাস থেকে নেমে মাইল খানেক হাঁটতে হয়। যাত্রীদল কিছু সঙ্গেই ছিলেন, হৈ হৈ করে প্রচণ্ড রৌদ্র উপেক্ষা করে মন্দিরে পৌছালুম। মাদ্রাজ আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি থেকে পরিচয়পত্র আমার স্বামী এনেছিলেন, মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক আমাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন, ও বুঝিয়ে দিলেন। চারিদিকে পাহাড়, জঙ্গল, ও জলাশয় দিয়ে ঘেরা সুন্দর

মন্দির, দেবতা শিবলিঙ্গ, উত্তরে একজন ও দক্ষিণধারে একজন অধিষ্ঠিত, রাজা রাণীর নামে তাঁদের নাম, বিষ্ণুবর্দ্ধন শৈলেশ্বর ও শান্তলেশ্বর।

মন্দিরের বাইরের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে হাজার হাজার মূর্ত্তি খোদাই করা। মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত থেকে নেওয়া সব পৌরাণিক কাহিনী। এক একটা লাইন চলে গেছে একটা কাহিনী অবলম্বন করে। যেমন সমুদ্র মন্থন, বামন অবতার, পারিজাতহরণ, শিব-পার্ব্বতীর নানালীলার বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি। তলার দিকে হাতির সারি, তারাও আক্রমণোদ্যত, ঘোড়ার পিঠে সৈনিক যুদ্ধরত, পদ্মবনে হাঁসের দল, মুখে পদ্মনাল ধরে আছে। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি বিভিন্ন ভঙ্গির, ভিন্ন রূপের প্রকাশ। এ যে কত সুন্দর, কত অনবদ্য তা প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। নটরাজ শিবের কত বিচিত্র মূর্ত্তি, অন্ধকাসুর বধ, গজাসুর বধ, যুদ্ধের আগের নৃত্যরত অবস্থা, যুদ্ধকালের নৃত্য, পরের বিজয় নৃত্য, এমনি কত যে তার সংখ্যা গণনা করা যায় না। মনে হচ্ছিল আরো কয়েক জোড়া চোখ, ও আরো কিছু মন যদি এখনকার মত পাওয়া যেত শিবের বরে। তাহলে আরো কিছু দেখে, মনে ধরে রাখতে পারতুম, হায় ভগবান! কলিতে তুমি পাষাণ, তাই মনের কথা বুঝলে না।

চোখ বা মন ত বেশী নেই, ওটা পাওয়া সম্ভবও নয়, কিন্তু যা পাওয়া যেতে পারতো, তাও ত আমাদের নেই, তা সময়। এতই সংক্ষেপ সময়, যে প্রাণ ভরে কিছু যে দেখবো তার উপায় নেই। কোনও মতে চোখ বুলিয়ে যাও, দাঁড়িও না, এখনি বাসের বাঁশী বাজবে, আর ওটি চলে গেলে, এ বিজন পুরীতে তখন বাবার অনুচরবা যদি দয়া করে দর্শন দেন, তাহলে। কারণ, শোনা গেলো রাত্রে মন্দিরে কেউ থাকে না। ৪টা বাজলে সবাই চলে যায়, হায় দেবতা! কাল তোমার সব গৌরব হরণ করেছে, একদা সমৃদ্ধ নগরী আজ জনহীন, দেবতা পূজারী বিহীন, আজ শুধু টুরিষ্টের ভীড়, তারা দেখে সাল, তারিখ, করে এবং কে একে প্রতিষ্ঠা করেছিলো, কেই বা পরিত্যাগ করলো। প্রভাতে মঙ্গল আরতি নেই, নেই পূজারিণীর পুষ্প-চন্দন মাখা আবেদন, সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজে না, আরতি নেই। আছে বাদুড়, পেঁচা আর সাপ শিয়ালের আসর। বার বার ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করলেও আর বেশীক্ষণ সাধ মিটানো গেলো না, কারণ প্রায় এক মাইল পথ বাস ধরতে হবে। ঐ মন্দিরদ্বার থেকেই একটি পাথুরে খোয়ার রাস্তা বেরিয়েছে, সেটি নাকি আর একটি জৈনমন্দিরে যাবার পথ, শোনা গেলো, স্থাপত্য শিল্পকলা খুব বেশী সেখানে নেই, তবে মিউজিক্ স্তম্ভ আছে একটি। সেটা খুবই আশ্চর্য্য জিনিস। আমরা মাদুরা ও তাঞ্জোরে আগেই মিউজিক স্তম্ভ দেখে এসেছি, কাজেই ওই রোদের মধ্যে আর হাঁটবার ইচ্ছা হোল না। একটা জিনিস দক্ষিণ-ভারতের অনেক জায়গায় চোখে পড়লো, যেটা হোল, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন সব ধর্ম্মই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে, বিরোধিতা সে যুগে খুব বেশী ছিলোনা, সেটা আজকাল বেশী চোখে পড়ে।

প্রায় দেড়টার সময় আমরা আবার বেলুড় এসে পৌছালুম, স্নান আহার, ও কিছু বিশ্রাম সেরে ৪টা আন্দাজ বেলুড় মন্দির যাবার জন্য রওনা হলুম। ট্রাভলার্স বাংলো থেকে মন্দিরের দূরত্ব বেশী নয়, আধ মাইলটাক হবে। বিকালের পড়ন্ত আলোর পটভূমিতে ঈষৎ কালচে, প্রায় সিমেণ্ট রং-এর মন্দিরটি দূর থেকে যেন আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত লাগছিলো। অন্য অন্য দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের মত গোপুরম এরও আছে, কিন্তু মন্দিরের গঠন একেবারে ভিন্ন।

মন্দিরটি সমতল-মস্তক। আট কোণবিশিষ্ট তারার মত আকারে গঠিত। বেশ বড় পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, প্রাঙ্গণের উপর মন্দিরের সামনে অরুণস্তম্ভ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত সুবৃহৎ স্তম্ভটি মাটিতে পোঁতা নয়, পাথর-বাঁধানো চত্বরের উপর একটি বেদীতে আলগা বসানো। আলগা বসানো যে আছে তার প্রমাণ, স্তম্ভটির তলা দিয়ে নিচু হয়ে দেখলে অপর দিকের আলো দেখা যায়।

এ সব থাক ইতবাহ্য—আসল আসল দর্শনীয় যা, যার জন্য দুদিন ধরে কত কষ্ট সহ্য করে এই দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া, তার কথা এবার বলবো।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, ছাদের ঠিক নিচেই ব্রাকেট মত, সেগুলিতে এক একটি অপরূপ সুন্দরী অপ্সরামূর্ত্তি, যেন তারাই ছাদটাকে ধরে আছে। তাদের নাম মদনিকা। এমনি আঠারোটি মূর্ত্তি আঠারোটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও তারা কালো পাথরে খোদাই, তাহলেও মনে হয় আমাদের কল্পনায় উর্ব্বশী তিলোত্তমার যে অপরূপ রূপের একটা অদেখা অজানা বিমুগ্ধ ধারণা বাসা বেঁধে আছে, এরা যেন সেই রূপেরই প্রতিচ্ছবি। তারাই যেন দল বেঁধে নেমে এসেছিলো, হঠাৎ কোন দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাদের সেই লীলাচঞ্চল মূর্ত্তি পাষাণে পরিণত হয়েছে। ঐ আয়ত নয়নে যে কটাক্ষ নেই, সুগঠিত বুকে যে স্পন্দন নেই, বঙ্কিম

অধরপ্রান্ত ঈষৎ হাসিতে যে এখনই আরো একটু বিকশিত হবে না, সামনে দাঁড়িয়ে চোখে দেখলেও একথা মানতে মন চায় না। তারা এমনই প্রাণবন্ত!

একটি সুন্দরী দর্পণ হাতে নিয়ে নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে, প্রসাধন অন্তে এক হাতে দর্পণ ও অপর হাত মাথার পিছন দিয়ে সীমন্তের কাছে ধরা, সারা মুখে-চোখে গর্ব ভরা হাসি উছলে উঠছে। একজন স্নানান্তে উঠে দাঁড়িয়েছে, পায়ের কাছে একটা বিছে, যেন তার ভয়ে ও অসম্বৃত লজ্জায় সারা দেহ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে, না পারছে সরে যেতে, বা না পারছে দেহ আবৃত করতে।

আর একজন সুন্দরীর বসনপ্রান্ত এক দুষ্ট বানরে টেনে ধরেছে, সে এক হাতে কাপড় সম্বরণ করছে ও অপর হাতে একটা ছোট গাছের ডাল দিয়ে বানরকে তাড়না করছে। তার চোখে-মুখে ভ্রূকুটি ও বিরক্ত ভাব। কারো মুখের কাছে ভ্রমর এসে উত্যক্ত করছে, সে হাত নেড়ে তাড়াতে ব্যস্ত। এক হাতে ফুলের ডাল, সামনে ভ্রমর, নয়নে তার ভ্রূকুটি। কেউ বা নৃত্যরত, কেউ বা বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ-বাদ্যরত। এই আঠারোটি মূর্তিই অপূর্ব্ব সুন্দর, এ রূপের যেন তুলনা নেই, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি তা ঠিক করা যায়না। সব মূর্তিগুলিই ঈষৎ আড় ভাবে মন্দিরের ছাদের কার্নিসের তলায় বসানো। পাথরের বুকে প্রাণ-সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু রূপ যে কত অপরূপ রূপে ফোটানো যায় তা দেখলুম। কোন সাধকের কল্পনায় যে এই রূপ ধরা দিয়েছিলো আর তার এই অপূর্ব প্রকাশ যে কত সাধনায় সম্ভব হয়েছে, ভাবলে মন অভিভূত হয়ে পড়ে।

এবার মন্দির-মধ্যকার কথা বলি।

দেবতার নাম 'চেন্না-কেশব', তাঁর দেহ পুরুষের ও মুখ নারীর। এই নর-নারী, বা অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তিও অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর দেহ পুরুষের দৃঢ়তা ও বলদৃপ্ত ভাবে ভরা, ও মুখখানি নারীর সুকুমার মাধূর্য্য মাখা। সর্ব্বাঙ্গে পুরুষের আবরণ, আর নাকে, কানে ও মাথায় নারীর আভরণ। দেবতার সামনে একটি বেদীর উপর মোহিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, নিকষ-কালো পাথরে তৈরী, অপূর্ব্ব সুন্দর সেই মূর্ত্তি! বোধহয় পুরাকালে যে মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করে মহাযোগী মহেশ্বর আত্মহারা হয়েছিলেন, এই মূর্ত্তি তারই নিদর্শন, আর দেবতার 'অর্দ্ধনারীশ্বর' রূপও সেই সময়কার মনে হয়। মোহিনী নাম তার সার্থক, কালোপাথর ফেটে যেন লাবণ্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কি চোখ-মুখের গঠন, কি অপূর্ব্ব দেহভঙ্গি! তবুও মূর্তিটি আজ অক্ষত নেই, দুটি হাতই কনুই থেকে ভাঙ্গা, জানিনা কোন অত্যাচারীর এই সৌন্দর্য্যের উপর নির্মম হতে হাত কাঁপেনা, তারা কি মানুষ! ঠিক এমনি নির্মমতা দেখেছি ভুবনেশ্বরে এমনি অপরূপ মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরী, তাঁরও কোনও পাষণ্ড এমনি করে দুটি হাত, ও নাকটি ভেঙ্গে দিয়েছে। মন্দিরের মধ্যেও ছাদের চার কোণে চারটি মদনিকা আছে। তারা চারটি স্তম্ভের গায়ে ভর দিয়ে যেন ছাদটি ধরে আছে। একজনের হাতে চুড়ি পরা একগোছা, আর সে চুড়ি সেই সুগোল মণিবন্ধে নাড়াচাড়া করে, পাথরের হাতে পাথরের চুড়ি কেমন করে কত সূক্ষ্ম নিপুণতায় যে সম্ভব হয়েছে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হোত না।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের অপর কারুকার্য্য ও মন্দিরমধ্যে ছাদের শিল্পকলাও দেখবার মত। যাঁরা শিল্পী ও এমনি ধরণের শিল্প-অনুরাগী তাঁরা পরিতৃপ্ত হবেন এমন সৌন্দর্য্য দেখে। জনসমাগম খুব বেশী হয় না, থাকবার জায়গাও ঐ একটি মাত্র বাংলো, দোকানপাটও খুব বেশী নেই, এই প্রায়-জনহীন প্রান্তরে কারা যে এসে এমন সৌন্দর্য্যের ফুল ফুটিয়েছিলো, আর কেনই বা এখানে জনপদ গড়ে ওঠেনি, সে কথার কেউ জবাব দিলোনা।

যদি আবার জীবনে সুযোগ কোনও দিন আসে, তবে আবার একবার যাবো, সেইখানে মদনিকাদের মাঝে, সেই মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে আত্মহারা অর্দ্ধ-নারীশ্বর দেবতার পায়ের কাছে প্রদীপ ধরে—আর একবার চোখ ভরে সেই রূপ দর্শন করে আসবো।

মাশুল

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুর আজ সেজেছে। চারুর স্বাস্থ্য নেই, সৌন্দর্য্য নেই, রংয়ের জলুষ নেই। আছে একপিঠ, কালো মিশমিশে, থাক্-থাক্ গোছাধরা চুল। হাঁটু ছাড়িয়েও প্রায় এক বিঘত। বাড়তি আগাটুকু সাপের ফণার মত ঢেউতোলা। চারুর যতকিছু সাজসজ্জা, সব ঐ চুল নিয়ে। তবু ত সে চুলে নিয়মিত চিরুণী পড়ে না, মাসের কতদিন যে বিনা তেলে কাটে তার ঠিক নেই! একেক সময় রাগে বিরক্তিতে ঘ্যাচঘ্যাচ করে হয়ত কেটেই ফেলল বিঘতখানেক। কিন্তু আবার বছর না ঘুরতেই যে-কে সেই।

গরমের দিনে কি যে শাস্তি। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছোটে। আঁটসাঁট ক'রে খোঁপা বেঁধেও মনে হয় যেন ডবল মাথা। সত্যি, প্রায় নিজের মাথার সমানই খোঁপা হয় একটা। আঁচড়াতে বসলে থৈ পাওয়া যায় না। বসে থাকলে সারাটা জায়গা ছাড়া চুলে থৈ থৈ করে। বাঁ হাতে দু প্যাঁচ জড়িয়ে না দিলে বসা যায় না। জ্বালা যন্ত্রণা কি কম! একেক সময় নকুলের হাতে কাঁচি গুঁজে দিয়ে বলে—দাও ত, একেবারে ঘাড় পর্য্যন্ত ছেঁটে দাও ত। আর পারি নাই এই বোঝা বয়ে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, এ পোড়াচুলের তেল যোগাই কোথা থেকে।

এগুলো আক্ষেপ। এমন চুলে তেল জোটে না, নকুলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় নকুল চারুর চুলের অরণ্যে মুখ লুকায়। নাড়া পেয়ে অকস্মাৎ বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত ঢল নেমে আসে। সেই অথৈ সমুদ্রে মুখ ডুবিয়ে নকুল বিষণ্ণ গলায় বলে—তার চেয়ে আমার একটা হাত কেটে ফেলতে বল। তেল ফুরিয়েছে, সে কথা আমায় বলনি কেন চারু? শুধু শুধু আজ দশ আনা পয়সা খরচ করে সিনেমা দেখলাম একটা। সাথে আর কিছু যোগ দিয়ে সুগন্ধি তেল হোত এক শিশি।

চারুর মায়া হয়। বলে—এ আবার কি কথা! বৎসরান্তে একদিন একটু সখ ক'রে সিনেমা দেখবো, তাও আমার এই পোড়া চুলের জন্য বাদ পড়বে! এ আবর্জ্জনা রেখে কি হচ্ছে বল দেখি? কেবলমাত্র তোমার সখের জন্য এতকাল ব'য়ে বেড়িয়েছি। নয়ত কি যে অসুবিধে••

চুলের উল্লেখে যত সোহাগ উথলে ওঠে নকুলের। দু'হাতে চুল মুঠো ক'রে চেপে ধরে বলে—এমন সম্পদ রাজার ঘরেও নেই। তুমি আমার এলোকেশী রাজকন্যা।

চারু হেসে উঠে বলে—হ্যাঁ, রাজকন্যাই বটে। কি শ্রীতে কি সমৃদ্ধিতে, রাজকন্যা ছাড়া কি?

নকুল আহত হয়। কিন্তু সমৃদ্ধির সাথে ঐ শ্রীটুকু যোগ থাকে ব'লে ঠাট্টাও আসে গলায়—তোমার চুল আমি ইনসিওর ক'রে রাখব।

অবাক গলায় চারু বলে—সে আবার কি!

—বিলেতে যার যা সুন্দর, অমনি ইনসিওর ক'রে রাখে। পরে নষ্ট হ'লে কোম্পানী টাকা দেয়। অবশ্য কিস্তিবন্দীতে তোমাকে প্রিমিয়াম দিতে হবে।

বিশদ ভাবে বোঝাতে বসল নকুল। শুনতে শুনতে গালে হাত উঠল চারুর—ও মা, চোখ, নাক, পা, আঙুল এ-সবও নাকি ইনসিওর করা যায়! চুল নিয়ে চারুর প্রথম দিকে অহঙ্কার ছিল। এমন চুল দেখা যায় কৈ। পাঁচজনের মুখে শুনে শুনে গর্ব্বে পা পড়ত না তার। আর নকুল ত ঐ কেশ দেখেই মজেছে। নয়ত কি আকৃতিতে কি প্রকৃতিতে নকুলের ধারে কাছেও তার ঠাঁই হওয়ার কথা নয়। নকুল ম্যাট্রিক পাশ, ভদ্র সন্তান, সরকারী বাসে কণ্ডাক্টরি করে। ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা। দোষের মধ্যে মাথায় অল্প টাক। আর সেই জন্যেই বুঝি চুলের উপর তার অত টান! নয়ত একটা ঝিয়ের মেয়ে, কালো কুৎসিত দেখতে, যেচে এসে বিয়ে করে কে?

নকুলের আদর আহ্লাদ তাও ঐ চুলে। চুমু খাবে, ঐ চুলে। বেশি আবেগে অস্থির হোলে দু হাতে চুল নিয়ে নিজের মুখে বুকে ছড়িয়ে ধরে। দেখে দেখে একেক সময় কেমন একটা আক্রোশ জন্মে চারুর। হোলই বা তার সামনের দুটো দাঁত উঁচু, ঠোঁট দুটো পুরু, তবু একটি নিবিড় ওষ্ঠস্পর্শ স্বাদ পাবে না সে? চুলকে তখন শত্রু মনে হয়। মনে হয়, কালই এ আপদ দূর করবে সে,—ক'রে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। চুলের জন্যই চারু; না চারুর জন্যই চুল। প্রথমদিকে যাই থাক, এখন বিয়ের এই দীর্ঘ তিন বৎসর পরেও কি বিন্দুমাত্র ভালবাসা জন্মোনি তার প্রতি?

কিন্তু প্রতিজ্ঞা মনে মনেই থাকে। কাঁচি ছোঁয়াতে গেলেই নিজের উদ্ভট খেয়ালীপনায় বিচলিত হয় চারু। আমি কি পাগল! একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চিরদিনের জন্যে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেব এই ঐশ্বর্য্য?

চারুর রাগ অভিমানও তাই ঐ ঐশ্বর্য্য নিয়ে। সংসারের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জানাতে গেলেও ঐ চুলের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। চুলের তেল জোটে না, ফিতে-কাঁটা জোটে না, এমন অভাবের সংসারে এ বিলাস আর রাখবে না ব'লে আক্ষেপ জানায়। নকুল বিচলিত হয়। দুঃখিত হয়, দেখে দেখে একটা মজার খেলায় মেতে ওঠে চারু।

শাড়ী নয়, সৌখিন জিনিষ কিছু নয়, চারুর জন্য ভালবেসে সে কিছু আনবে, তাও ঐ কেশসজ্জার। ঝুমকো বসান রূপোর ফুল। নয়ত রং-বেরংয়ের ফিতে। নয়ত গরুর গাড়ীর চাকার মত গোল এক চাক্তি। কি না কি এক ফ্যাসনের খোঁপা বেরিয়েছে। পথে-ঘাটে দেখে সখ করে কিনে এনেছে নকুল। নয়ত খুব বেশি হচ্ছে একশিশি গন্ধতেল। প্রথম দিকে পুলকে নেচে উঠত চারু। কিন্তু আজকাল কেমন যেন একটা হতাশা এসে ভর করছে ওকে। কিসের কাছে, কার কাছে যেন হেরে যাচ্ছে। প্রশ্নপত্রের উত্তরটা যেন বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে দিনকে দিন।

চারুর মুখের দিকে পাঁচ মিনিট চেয়ে থাকতেও বোধ হয় নকুলের বিরক্তি বোধ হয়। কোন ছুতোয় সে চুলে হাত দেয়। আলতো ভাবে ঠোঁট ছোঁয়ায়।

চারু হয়ত বলে—জান আজ আগা কেটেছি এক বিঘত।

বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে নকুলের কপাল—সে কি? আছেই ত ঐ এক সম্পদ। তা ও দূর করতে না পারলে শান্তি নেই। ঐ চুল গেলে ত মুখের দিকেও চাওয়া যাবে না।

চারুর তখন সত্যি সত্যিই কান্না পায়। ঝঙ্কার দিয়ে বলে—অতই যদি, তবে একটা মানুষকে বিয়ে করতে গেলে কেন? একগোছা চুলের সাথে বিয়ে করলেই পারতে?

আর আদর ক'রে নকুল বেরিয়ে যায়। তারপর সারাটা দিন চারু প্রশ্ন-উত্তরের ঠেলাঠেলিতে অস্থির হয়ে ওঠে। এমনি একদিন নয়। আজকাল কেমন একটা ঈর্ষাও জন্মেছে চুলের ওপর।

এ পাড়ায় চারুর চুল এক গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইবুড়ো মেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ ভাই, কি তেল মাখ, বল ত?

চারু তাদের সরু সরু বিনুণীর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে হাসে। বলে—আবার তেলও! বিনে তেলেই বাঁচি না, এ আপদ গেলে বাঁচা যায়।

মেয়ের দল চোখ বড় করে আক্ষেপের স্বর টানে—ইস্, আমরা এত যে যত্ন করি, তবু সেই টিকটিকির ল্যাজ।

বিকেলের দিকে কেউ কেউ আবার চুল বেঁধে দিতে আসে। চারু হেসে বলে—কি হবে!

তারা বলে—তোমার আর কি হবে ; এমন চুল ; আমাদের নেড়েচেড়ে সুখ।

কত ছাঁদে, কত ঢংয়েই বাহার ক'রে খোঁপা বেঁধে দিয়ে যায়। কাঁটাতে যখন কুলোয় না, নিজের মাথার কাঁটা বসিয়ে মনোমোহিনী এক খোঁপা তৈরী করে। সমবয়সী কেউ হোলে ঠাট্টা ক'রে বলে—নকুলদার আজ মাথা ঘুরে যাবে।

চারু হেসে বলে—নূতন ক'রে এই বুড়ো বয়সে আর কি ঘুরবে ভাই! ও ঘুরেই আছে। ওর জ্বালায়ই ত এ জঞ্জাল দূর করতে পারি না। নয়ত শাস্তি কি কম, এই পাহাড় ব'য়ে বেড়ান! টিনের ঘরের পাঁচ ভাড়াটের এক চিলতে উঠোনে বসে চুল শুকোতে হয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অন্য বৌরা কেমন বিশ্রাম-আলস্যে গা ঢেলে দেয়। তার কি জো আছে! ওঠোনে বসে, ঐ এক ফালি রৌদ্রে নেড়ে-চেড়ে চুল শুকোও।

রাগ হয়, বিরক্তিবোধ হয়, কিন্তু মায়া এসে হাত চেপে ধরে। কাঁচি আবার নামিয়ে রাখতে হয়।

আজ শীতের এই দ্বিপ্রহরে রোদে বসে চুল শুকোতে মন্দ লাগছিল না। নকুলের একটা উলের জামা বুনছিল চারু। হঠাৎ নিজের নাম শুনে পেছন ফিরল সে।

সামনের মস্ত তেতলা বাড়ীর ছাদ থেকে গিন্নী চারু চারু ক'রে ডাকছেন। ত্রস্তে-ব্যস্তে চারু উঠে বসল। কি ব্যাপার! গলা উঁচিয়ে বলল—আমায় ডাকছেন?

গিন্নী মাথা দোলালেন হ্যাঁ, তাকেই ডাকছে। আলগা হাতে কোন রকম একটা খোঁপা জড়িয়ে মাথায় কাপড় তুলে পা বাড়াল চারু।

ছাদে শীতের রৌদ্রে গা এলিয়ে বসে একখানা বই পড়ছিল গিন্নী। চারু আসতেই সমাদর ক'রে বসালেন পাটীতে। মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে চুল খুলে দিলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ গা বাছা, কি তেল মাখ চুলে, বলত? এমন চুল! আমি রোজই ছাদ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি। তোমার চুলের গল্প আমরা বাড়ীর সবাই বলাবলি করি। এমন কি আমার ছোট ছেলে পর্য্যন্ত সেদিন বলছিল, মা, এ সেই রূপকথার কেশবতী কন্যার গল্প। বেশ চুল।

চারু সলজ্জে হাসল শুধু। এমনভাবে খোলা উঠোনে বসে চুল শুকোন দৃষ্টিশোভন নয় বোধ হয়। কিন্তু উপায় কি? তাছাড়া, নকুল ছাড়া, পুরুষ মানুষ কেউ যে আবার চুলপাগলা হ'তে পারে এ-ও জানা ছিল না।

গিন্নী শেষে খেদোক্তি ক'রে বললেন—আমার রুমার সব চুল উঠে যাচ্ছে। কত রকম তেলই মাখালাম! এই দেখ না, এমন চমৎকার সম্বন্ধটা ঐ এক খুঁতের জন্য বাতিল হ'য়ে গেল।

গিন্নী যেন সে দুঃখ ভুলতে পারেন না। আট শ' টাকা মাইনে পায় ছেলে। ইঞ্জিনীয়ার। বাপ ডাক্তার। বাড়ী, গাড়ী। ছেলের মা অপছন্দ ক'রে গেল রুমাকে ঐ চুলের জন্য। কেমন লাগে বল ত?

গিন্নীর আক্ষেপ আর শেষ হয় না। চারু বুঝতে পারল এখন তাকে ডাকার কারণ। কিন্তু সে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। আশ্চর্য্য, অমন রাণীর মত রূপ, চোখ ঝলসান সৌন্দর্য্য, এক অল্প চুলের দোষে বাতিল! ও মেয়ের যে চুল অল্প, সে-ও ত জানা ছিল না। কত নিত্যি-নূতন ঢংয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চুল বেঁধে কলেজ গেছে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে চারু সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ছুটো ফুরফুরে লাল পাতলা ঠোঁটে যখন হাসে চারুর মনে হয়, সারাদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে ওই মধুর হাসি পান করে।

গিন্নী আবার বললেন—এমন দুঃখ হয় মা! সামান্য একটু দোষের জন্য এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া হ'য়ে গেল। তাই ভাবলুম, তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি, কি মেখে এমন চুল হোল তোমার?

লজ্জিত গলায় চারু বলল—মাসের মধ্যে দশ দিন হয়ত তেলই দিই না। যত্ন কি বলছেন, পারলে আমি সমস্ত চুল বিলিয়ে দিতাম। এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ আপনার মেয়ের, সামান্য চুলের জন্য...

গিন্নী বলছেন—না মা, সামান্য বোল না। মেয়েদের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ত ওই চুলেই। তা যাদের হয়, অমনি অমনি হয়, যত্ন-আত্তির দরকার হয় না। না হওয়ার হোলে, শত যত্নতেও হবার নয়। বাড়ী ফিরে গর্ব্বে একেবারে ফেটে পড়ল ননদ উষার কাছে—গিন্নীর ছোট ছেলে নাকি বলেছে কেশবতী রাজকন্যা, বাড়ী শুদ্ধ সবাই নাকি আমার চুলের গল্পে অস্থির। হাসিও পায়। যে না চুল...

ভাজের উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে উষা ব্যঙ্গোক্তি করল—তা ঠিক। কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল!

সাথে সাথেই রেগে উঠল চারু—বেশ বেশ, কুঁচবরণ না হোক কালোবরণই আছি, কারো ঘাড়ে গিয়ে ত পড়তে যাইনি।

কটাক্ষটা উষাকে। শ্বশুরবাড়ীতে হেনস্থা করে, স্বামীটা মাতাল। নকুল জোর ক'রে নিয়ে এসেছে নিজের সংসারে, উঠতে-বসতে ননদ-ভাজে ঝগড়াও যেমনি, ভাবও তেমনি।

চারু আবারও বলল—অমন গোরাবরণ দিয়ে কি হয়! ফর্সা উষা মুহূর্ত্তে জ্বলে উঠল। তুমুল লাগল এই নিয়ে। কেঁদে-কেটে উষা বাক্স গুছোতে বসল—আমি আজই যাব। যে না শাঁকচুন্নী চেহারা। দাদা ত ফিরেও তাকায় না মুখের দিকে ওই চুল যতদিন আছে। তারপর ঘাড় ধরে ক্ষেদিয়ে দেবে। গুমোর দেখব তখন। চুলের ঠমকেই গেল। আরে, ভারী হাতে অসুখে পড়লেই ত ওই সৌখীন জিনিষ বরবাদ। সোহাগ ত দাদার ওই চুল নিয়ে! তা যাবে, চুল তোর সব যাবে। যাবে, যাবে...কাল পেত্নী, ভূত, শাঁকচুন্নী দাদা তখন ফিরেও দেখবে না। ঝিয়ের মেয়ে ছিলি, পথের ভিখিরি হবি।

রাগে, দুঃখে, আক্রোশে বিষোদ্গীরণ করতে লাগল উষা। আর একটা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চারু। এতক্ষণ দুজনেই সমান চেঁচিয়েছে, হঠাৎ নিস্তব্ধতায় উষা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, চারুর দু'গাল বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কাছে এসে উষা হাত টেনে ধরল চারুর—আর বলব না। সব রাগের কথা। রাগ না চণ্ডাল। তুই কাঁদিস না বৌ!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চারু দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল। উদ্বিগ্ন উষা বার বার দরজা ধাক্কাতে লাগল—বৌ, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল।

কিন্তু চারু তখন ডুবে গেছে অগাধ কান্নার সাগরে। ছি, ছি, তার এই পরাজয়ের কথা উষাও জানে! সত্যিই কি চারুর কোন মূল্য থাকবে না নকুলের কাছে? সারাটা জীবন বিনা প্রেম ভালবাসায় কাটাতে হবে! না, না, চারু তা সহ্য করতে পারবে না। আমার জন্যই ত চুল, চুলের জন্য ত আমি নই?

শীতের বেলা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নকুলের বুঝি ফেরার সময় হোল।

ট্রাঙ্ক খুলে, একমাত্র সিল্কের সাড়ীটা টেনে বের করল। সখের ব্লাউজটাও। তারপর সারাটা সন্ধ্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাজাল নিজেকে। সরু করে চোখে কাজল দিল। স্নো-পাউডার মেখে, কুমকুমের টিপ পরল। হালকা ভাবে সিঁদুর ঘষল ঠোঁটে। ঘুরিয়ে শাড়ী পরল। সবশেষে কাঁচি নিয়ে বসল চৌকীর ওপর। একটু দ্বিধা নয়, একটু মায়া নয়, নির্মম হাতে কাটল ঘাড় ছাড়িয়ে অনেদূর পর্য্যন্ত। গোছাভরা চুল হাতে নিয়ে অবোধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিক, তারপর খবরের কাগজে মুড়ে একপাশে রেখে দিল।

নিজেকে কেমন হাল্কা লাগছে। কেমন অভাববোধ পাকিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে। আয়নায় নিজের ছাড়া চুলের চেহারা দেখে কেমন অন্য মানুষ বলে বোধ হচ্ছে। নিজেকে যেন চিনতে পাচ্ছে না।

কিন্তু এ ভাল হোল। এমনভাবে সংশয়দোলায় দুলে দুলে অশান্তিতে আর পুড়ে মরা যায় না।

লণ্ঠনের অল্প আলোয় প্রথমটা ঠিক ঠাহর হয় নাই। দড়ির আলনায় জামা টাঙ্গিয়ে রেখে এমুখো ফিরতেই চাপা একটা আর্তনাদের মত বেবোল মুখ দিয়ে নকুলের—এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ করেছ?

টুলের উপর লণ্ঠনটা রাখা। তারই পাশে নকুলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে চারু। মুহূর্ত্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখী হোল নকুলের। নকুলের চোখে রাগ, বিস্ময়, বেদনা, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। সামনে এসে আলতো ভাবে চারুর কাঁধে হাত রেখে উদগ্র গলায় ডাকল—চারু!

চারু স্পষ্ট চোখ রেখেছে নকুলের চোখে। কিন্তু যেন কোন বোধ নেই। নকুল একটু ঝাঁকানি দিল—এই চারু!

আচমকা যেন সম্বিৎ ফিরল—কি!—চুল কি হোল?

অকস্মাৎ হি-হি ক'রে হেসে উঠল চারু।—আচ্ছা, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে! বল না?

এবার রীতিমত শঙ্কিত হোল নকুল। এই আধো-আলো আধো অন্ধকারে কেমন অপ্রকৃতিস্থ মনে হোল চারুকে। শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল—চুল কাটলে কেন? এমন সেজেছই বা কেন?

অকস্মাৎ চারু মুখ ঢেকে বসে পড়ল চৌকাটার উপর।—পুড়ে গেছে। লণ্ঠনের পলতে জ্বালতে গিয়ে চুলে আগুন ধরে গিয়েছিল। ছুটোছুটি করে কাঁচি এনে আমি যতটুকু পেরেছি, কেটে ফেলেছি।

এর পর কান্নাটুকুর জন্য কিন্তু মিথ্যা অভিনয় করতে হোল না। সমস্ত বুক তোলপাড় ক'রে অসহ জ্বালায় দুচোখ ফেটে অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুলের শোকে না নিজের দুঃখে কে বলবে!

সে কি? ছুটে এসে নকুল হাত চেপে ধরল চারুর। কান্নাভেজা মুখখানা আপন বুকে চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল—আর কোথাও লাগে নি ত? দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত! দেখি, দেখি…
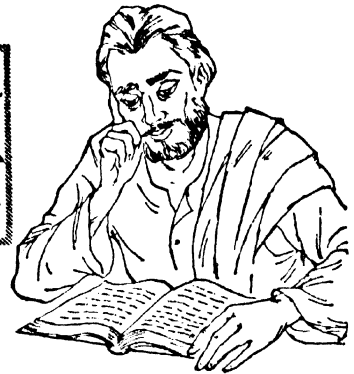
হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে শঙ্কিত গলায় বলল—তবু রক্ষে, চুলের উপর দিয়ে গেছে! নয়ত কি হোত বল ত?

গভীর স্নেহে চারুর ঠোঁটে, ঠোঁট ছুঁইয়ে হেসে বলল—তাই বুঝি সেজে-গুজে দেখা হচ্ছিল, নূতন চেহারায় কেমন দেখায়! সত্যি, কেমন নূতন নূতন লাগছে তোমায়!

এর পরেও কি দ্বিধা আছে? আছে কোন সন্দেহ? অসহ্য সুখে চারুর কান্না পেতে লাগল। আসলে কান্নাটা বোধ হয় চুলের শোকে!

প্রসাধনে সুরুচি

শ্রীমতী কল্পনা সেনগুপ্তা

আমরা সবাই জানি যে, অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়, অথচ দেহের শোভা-সৌন্দর্য বিধায়ক এবং মনের প্রফুল্লতার সহায়ক যে সব চিত্তাকর্ষক দ্রব্য, তাহাই এ যুগের প্রসাধন দ্রব্য। এগুলিকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন বহুলপ্রচলিত শ্রেণী এবং খুব কম প্রচলিত শ্রেণী। প্রথম ভাগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে এই কটিকে—স্নো, ক্রীম, পাউডার, সুগন্ধ তেল, সেণ্ট, আলতা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে যেগুলিকে, তাহা হইল—নেইল-পোলিশ, আই-ব্রো-পেন্সিল, লিপ্‌ষ্টিক, রুজ প্রভৃতি।

সত্য বলিতে গেলে, প্রসাধন দ্রব্যগুলি প্রধানত নারীদের অঙ্গ-সজ্জার জন্যই সৃষ্ট, পুরুষের জন্য তেমন নয়। তবু দেখা যায়, সুগন্ধ তেল, সেণ্ট ও পাউডার—এ তিনটি কোন কোন আধুনিক যুবকও ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু প্রসাধনে মার্জিত রুচির পরিচয় দিতে না পারিলে, স্বভাবতই তাহা কুরুচির সাক্ষ্য বহন করে এবং অন্যান্যের পক্ষে উহা হাস্যকর ও সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশ অত্যন্ত গরীব। তারপর বর্তমানকার চড়া বাজারে মধ্যবিত্তদের পক্ষে খাদ্যে ও বস্ত্রে ভদ্রোচিত নিম্নতম মানটি পর্যন্ত বজায় রাখিয়া চলাই মুস্কিল হইয়া উঠিয়াছে। তাই প্রসাধন-ব্যয় ঐসব পরিবারে অপব্যয়ের একটি প্রিয় বাহন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তবু এমন সব ক্ষেত্র রহিয়াছে, যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণীদেরও পোষাক-প্রসাধনের কিছুটা পারিপাট্য প্রায় অপরিহার্য হইতে বাধ্য—বিশেষত সহরাঞ্চলে।

নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা যেমন পুরুষের চিরন্তন বাসনার বিষয়, তেমনি নারীর অলঙ্করণ ও প্রসাধন প্রভৃতি তাহারও নিজ নিভৃত অন্তরের পরম কাম্য কাম। শুধু আধুনিক যুগে নয়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নারীর প্রসাধনের বিশেষ সার্থকতা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কালিদাসের কাব্যগুলির নায়িকাদের বর্ণনায় এবং কবিগুরুর উহারই প্রতিধ্বনিতে আমরা নারীর প্রসাধন ও কেশ-বিন্যাসের একটি অপরূপ প্রতিচ্ছবি পাই: যেমন—

'অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে, ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখত সুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে।'

আধুনিক যুগ মূলত বৈজ্ঞানিক যুগ। তাই আজকাল বিভিন্ন রকমের চিত্তাকর্ষক প্রসাধন দ্রব্য অতি সহজলভ্য হইয়া আছে। সুতরাং এসবের ব্যবহারও আজ ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু এসব দ্রব্য সৌন্দর্য ও সুষমা বৃদ্ধির সহায়ক, তাই এগুলির ব্যবহারের মধ্যেও সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব ও সুরুচির পরিচয় পরিস্ফুট থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। একমাত্র সেই ভাবে ব্যবহার-নৈপুণ্য দেখাইতে পারিলেই প্রসাধনে সুরুচির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, নতুবা নয়। অন্তরে যাহাদের শুভ্রতা ও বুদ্ধিদীপ্ত রুচিবোধ রহিয়াছে, তাহাদের প্রসাধন-প্রক্রিয়া একটি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ধরণের আর্টের পর্যায়ে গিয়া পৌছায়, এবং সেই শ্রেণীর প্রসাধন-প্রীতিই সার্থক।

একখানি সুন্দর রঙীন শাড়ী। কিন্তু সম-সুন্দরী ও সম-বয়স্কা দুটি তরুণী বান্ধবীর অঙ্গে সেই শাড়ী সমভাবে শোভা বর্ধন করিবে না। কারণ, শাড়ীখানি যাহার গায়ের রং ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে ভাল মানানসই হইবে, তাহারই শোভা-সৌন্দর্য বিধানে উহা প্রকৃত সহায়ক হইবে। তাছাড়া শাড়ীখানি পরিবার মধ্যেও কলা-কৌশল খাটাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। একই শাড়ী একজনের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর রূপবর্ধক, অপরের পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ-বর্ধক হইল বা মোটেই তাহা হইল না।

তেমনি বিভিন্ন কমনীয় দ্রব্যে প্রসাধন করিলেই রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি হয় না! উহাতে একদিকে যেমন প্রয়োজন বয়স, রং, রূপ ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি, অপর দিকে থাকা চাই ঐসব ব্যবহারের **artistic taste**—অর্থাৎ ব্যবহারের অবশ্য-জ্ঞাতব্য রীতি-কৌশল প্রভৃতির সম্যক জ্ঞান। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত পারিবারিক আর্থিক অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া প্রসাধনীয় দ্রব্যের ব্যবহার করাটা সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। এখন অজ্ঞতা, কুরুচি ও ও বাড়াবাড়ি জনিত নানা উদাহরণ সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা করা যাক।

অনেক তরুণীর, এমন কি, বয়স্কাদের মধ্যে দেখা যায় যে তাহারা উগ্রগন্ধ সেণ্ট ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং তাহা এমনভাবে ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় যে, ঘরে বা বাইরে পার্শ্ববর্তী লোকদের যেন বিজ্ঞাপন দিয়া তাহারা জানাইয়া দিতে চায়—'ওগো তোমরা দেখ, দেখ, আমি কেমন সেণ্ট মেখেছি! আবার অনেকে মুখে এমনভাবে পাউডার লেপন করে যে, উহা হাওয়ার সঙ্গে ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। মনে হয়, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ইহাদের পাউডার ব্যবহারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সাবান, স্নো, ক্রীম ব্যবহারের মধ্যেও আধিক্য-দোষ-দুষ্ট হইয়া ব্যবহারকারিণীদের কখনো কখনো অপরের কাছে উপহাসের যোগ্য করিয়া তুলিয়া থাকে। বাড়ী হইতে মাত্র দশ বিশ মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেই—তা তিন-চার-পাঁচ বা যতবারই হোক—অমনি মুখে সাবান ও পাউডার বিলাস যে অনিবার্যভাবে করিতেই হইবে, ইহার কোন ভদ্রোচিত মানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃত্রিমতা-প্রীতির একটা শোভন সীমা রেখা টানিয়া চলিতে শেখা খুবই প্রয়োজন—বিশেষত সাধারণ সব পরিবারে। উল্লিখিত সব ধরণে প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার নির্ভেজাল কুরুচিরই পরিচায়ক।

সহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে আজকাল এমন বিস্ময়কর তরুণীও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের চমকপ্রদ প্রসাধনপ্রিয়তা সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও নিম্নতম রুচিবোধকেও নির্বিঘ্নে হার মানাইয়া দেয়! ইহারা রকমারি প্রসাধনে এতই বেশী আসক্তিপূর্ণভাবে অভ্যস্ত

দিনের শেষে

—জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

দৈনিক বসুমতীর পাঠক

—চিত্ত নন্দী

কালিঝোরা বাংলোর একাংশ —অম্বুজকুমার মুখোপাধ্যায়

চঞ্চলনেত্রা
—দেবু দাস
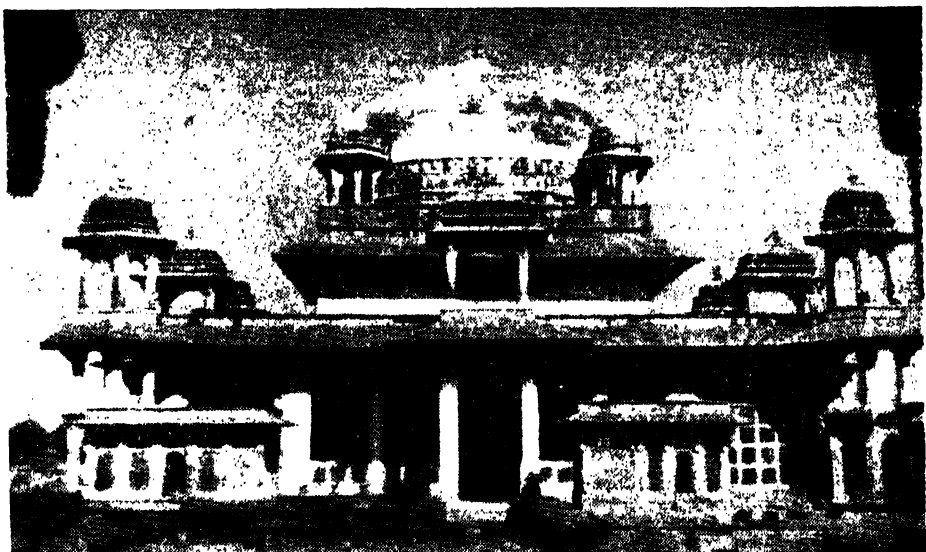
মহম্মদ ঘোরীর স্মৃতি —অনিলরঞ্জন কুণ্ডু

মৃগনয়না —দেবু দাস
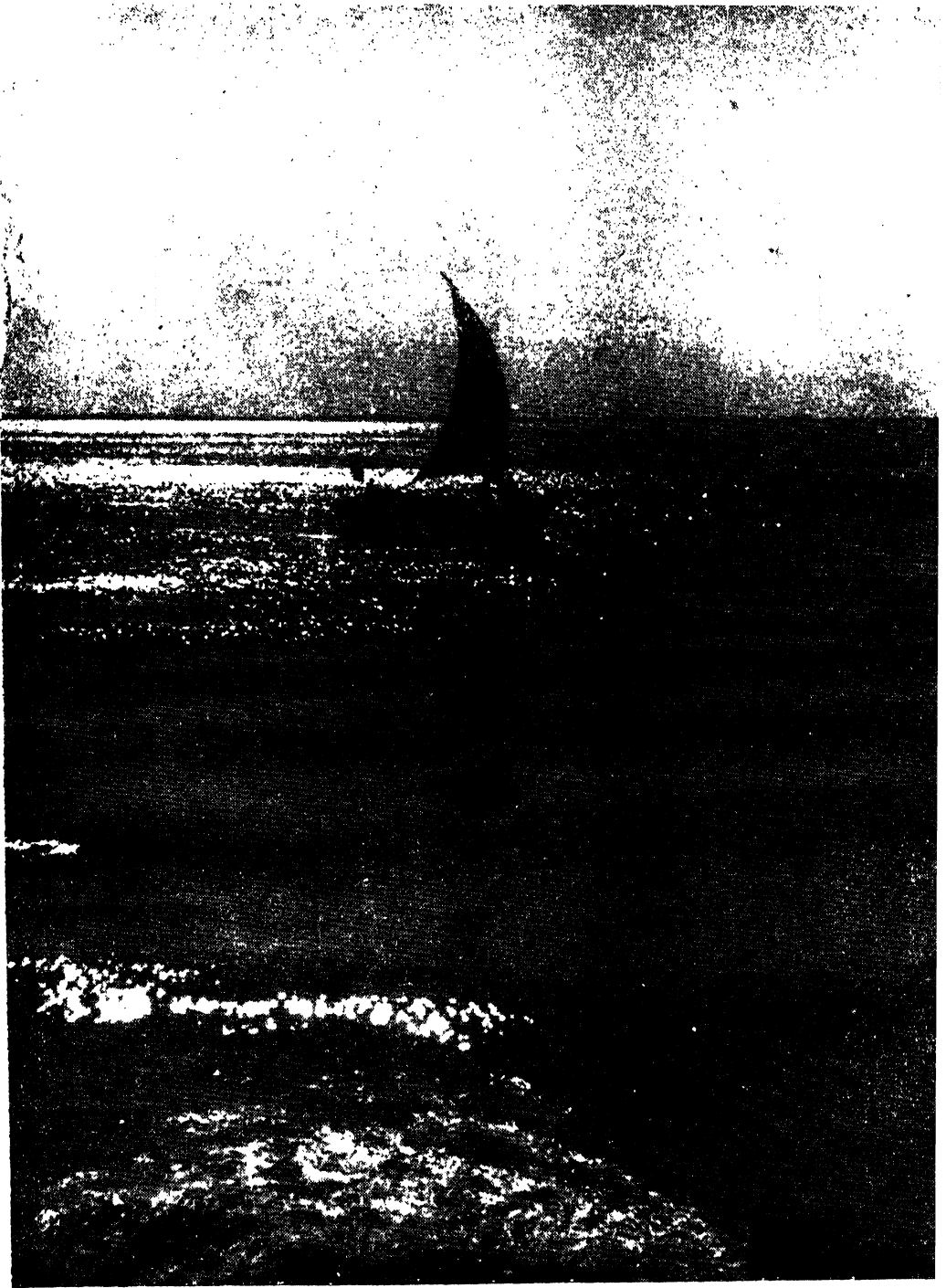
হইয়া পড়ে যে, ওসব এক-আধ দিন বাদ দিয়াও মানুষ স্বাভাবিকভাবে ও মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, ইহাও যেন সত্যই তাহাদের ধারণার অতীত হইয়া দাঁড়ায়। স্বভাবতঃই মনে হয়, অন্য যে কোন কর্তব্যের উপরে এবং খাদ্যের সমভিত্তিতে প্রসাধন প্রক্রিয়াকে ইহারা ভাবিতে সুরু করিয়াছে। স্বাভাবিক স্তরের অন্যান্যে যে ইহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ইহারাই বরং প্রকাশ্যে বা আড়ালে গর্ব করিয়া বলে, 'ওরা সব backward—আধুনিকতার ওরা বোঝে কি'? আসলে ইহারাই যুগোপযোগী ভদ্র-আধুনিকতা নিজেরা কিছুই বোঝে না। অথচ বেয়াড়া উগ্র আধুনিকতা লইয়া এদেরই দম্ভ কতখানি! ভাবুন, দুর্গতি আর কাহাকে বলে! ইহারা নিজ সংসারের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় বহুক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াও তার সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। দেখা যায়, ইহারাই গৃহকর্মে মাকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। কারণ বিকৃত-রুচি, কর্মকুণ্ঠ, সুগন্ধগতপ্রাণ এই সব তরুণী গৃহকর্মকে ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

আরো লক্ষ্য করা যায়, ইহারা সাধারণত ভগ্নস্বাস্থ্য, তার উপর তন্বী হইবার জন্য মূল খাদ্য ভাত খায় কম: কিন্তু ইহারাই আবার চা-রেস্তোরাঁর উৎকট ভক্ত! নানা কৃত্রিমতার বর্মে আচ্ছাদিত ঘৃণ্য উগ্র-আধুনিকতার নিত্য-পূজারী এসব ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের সঙ্গে কুতর্কের জন্যও বেশ উদ্দীপনা দেখাইয়া থাকে।

ইহাদেরই মধ্যে যাহারা প্রসাধনে কুরুচির শেষ সীমায় পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রসাধনেও—অর্থাৎ লিপ্ষ্টিক্, আই-ব্রো-পেন্সিল ও রুক্ প্রভৃতি ব্যবহারেও নিত্য-অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়ায়। এগুলি কি সত্যই প্রগতিমূলক আধুনিকতা? এসব কি কোনমতেই শোভন-সুরুচির পরিচায়ক? এতটা বাড়াবাড়ি যে কৃত্রিমতার রঙীন আবরণে বিশুদ্ধ নোংরামি ও কদর্য রুচিহীনতা, তাহা ইহারা মানিতেই অনিচ্ছুক। কেহ বুঝাইয়া বলিলে উল্টিয়া তাহাদেরই ইহারা ভুল বোঝে বা তাহাদের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হয়। ওই মত পথের তরুণ যাহারা, তাহাদের জীবনের মুখ্যকর্ম হইল আড্ডাবাজি, পোষাক-প্রসাধনে চরম অপব্যয় ও সিনেমার প্রতি উদ্দাম আকর্ষণ। তাছাড়া দেখা যায়, মা-মাসী বাজারে গেলেও বাজারের থলেটি পর্যন্ত হাতে নিতে মানহানির আতঙ্কে ইহাদের চরম অনিচ্ছা। এই সব গন্ধহীন রঙীন ফুল পরিবারের মধ্যে নানা অদ্ভুত অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বাপ-মার জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে। এসব আদর্শহীন শ্রীমানদের ভবিষ্যৎ জীবন দিকে দিকে মসীলিপ্ত হইতে বাধ্য।

খুবই বড়লোকের ঘরের তরুণী গৃহিণী যাঁহারা, যাঁহাদের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করিয়া অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন বড়-একটা থাকে না—অফুরন্ত গল্প করা, সিনেমা দেখা এবং ডিটেকটিভ্ ও প্রেমের উপন্যাস পড়া যাঁহাদের পরম প্রিয় কার্য, তাঁহাদেরই পক্ষে শেষোক্ত শ্রেণীর (অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের) বিভিন্ন প্রসাধনের নিয়মিত ভক্ত হওয়াটা তবু কতকটা শোভা পায়। এই পর্যায়ের উল্লিখিত সব প্রসাধনের সত্যিকারের প্রয়োজন হয়, সিনেমা-থিয়েটারে নায়িকাদের 'মেক্-আপ' করিবার সময়। কিন্তু ঘর-বাড়ীর মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন তো অভিনয় নয়?

গরীব দেশের শতকরা নব্বইটি পরিবারে যেখানে দুরন্ত অভাব-অনটনের মর্মান্তিক হাহাকারধ্বনি নিত্য শোনা যায়, সে-সব পরিবারের মেয়েদের অতিরিক্ত প্রসাধনপ্রিয়তা বা শেষোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলির নিয়মিত ব্যবহার কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নয়। স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্যের দীপ্তিময়ী আভা যাহাদের অঙ্গে প্রকৃতিদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ বিরাজ করে, তাহারা গালে ও ঠোঁটে কৃত্রিম রং মাখিয়া সং সাজিতে যায় না! তাছাড়া বড়ঘরের বা ছোটঘরের সুরুচিসম্পন্না তরুণী যাহারা, তাহারা উভয় শ্রেণীর প্রসাধনের কোনটিরই অত্যাধিক্যে অভ্যস্ত হইয়া নিজেদের অপরের সাক্ষাতে হালকা ও হাস্যাস্পদ করিয়া তোলেনা।

তবে ইহা সত্য যে, বিবাহাদি উৎসবে যোগদানের সময় উভয় শ্রেণীর প্রসাধনেই অনেকখানি যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যে সব উগ্র-আধুনিকাদের ক্ষেত্রে প্রসাধনায় ঐ সব দ্রব্য খাদ্যের সমান বা জীবনের চরম লক্ষ্য (summum bonum of life) হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা সত্যই কৃপার পাত্রী। দেখা যায়, ইহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ স্বরুচিসম্পন্ন জীবনসঙ্গী আবিষ্কারের জন্য সিনেমা, রেস্তোরাঁ, পার্ক, লেক্ ও ময়দান প্রভৃতিকে নিভৃত স্বয়ম্বর-সভা করিয়া তুলিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করেনা। শুধু কলেজ ও আফিসে নয়, বহুসময় রাজপথেও অত্যধিক ও উগ্র-প্রসাধনে জ্বলজ্বলায়মান বহু তরুণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ঐভাবে যেন নিজেদের সাধারণ শ্রেণী হইতে উপরে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ভদ্রপ্রকৃতির ও সুরুচিসম্পন্ন লোকেরা তাহাদের দেখিয়া কত সময় হয়তো চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'হায় রে, দুঃখিনী, দুর্গতি আর কা'কে বলে?'

সুতরাং একথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নিজ নিজ পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সুসমঞ্জস হইলে এবং আধিক্য-ভারাক্রান্ত না হইয়া যথাসম্ভব সুরুচিমণ্ডিত হইলে, এ যুগে আধুনিক প্রসাধন প্রথা শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যের সত্যই অনেকখানি সহায়ক, তাই বরণীয়। আর ঐ মত না হইলে, উহা কার্যত হইয়া দাঁড়ায় বাহিরের বাজে লোকের চিত্তে চমক লাগাইবার একটি হীন অপকৌশল মাত্র, তাই সর্বথা নিন্দনীয়।

স্বল্পমূল্যে সুন্দর সুন্দর যে দ্রব্যগুলি দেহের সৌন্দর্য, মুখের কমনীয়তা মনের মাধুর্য এবং প্রাণের প্রাচুর্য্য আনিবার পক্ষে সত্যিকারের সহায়ক হইতে পারে, সে সবকে রুচিবিকার ও অশোভন ব্যবহারের দ্বারা প্রসাধন-প্রক্রিয়াটিকেই একটি নির্মম সমালোচনার বিষয়, আর নিজেদের জঘন্য উপহাসের কেন্দ্র করিয়া তোলার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সার্থকতা নাই। ফুলের সুগন্ধ পাপড়িগুলিকে দলিত করিয়া তার সকণ্টক বৃন্তগুলিকে উঁচুতে তুলিয়া ধরাই কি ঠিক? তাই বলিতে হয়—

'দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি   এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।'

এই অত্যাধুনিকা 'বিনোদিনীদের' রূপসজ্জা ও অত্যদ্ভুত প্রসাধন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উচ্ছ্বাসে কোন মহৎ কবিই কিছু লিখিতে পারেন না—কালিদাসস্য কা কথা!

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

চিত্তচকোর

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের যে জিনিষটি নিয়ে আমরা সত্যই গর্বিত হওয়ার দাবী করতে পারি, তা হল তার ছোট গল্প। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারদের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে বাঙ্গলা ছোট গল্পের মাথা আজ বিশ্বের যে কোন সাহিত্যের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম। ছোট গল্পের এই আধুনিক প্রগতির পথে যাঁরা পথনির্দ্দেশক সেই স্বনামধন্য সাহিত্যব্রতীদেরই অন্যতম সুবোধ ঘোষ। ছোট গল্পের কারুকার্য্য যে কত নিখুঁত হতে পারে সুবোধ ঘোষের প্রথম আবির্ভাবেই একদিন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সুদূর অতীতে—তাঁর সদ্যপ্রকাশিত আধুনিক এই গল্পসংগ্রহটি পড়তে পড়তে মনে হয়, আজও বোধ হয় এই ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। মোট নয়টি ছোট গল্প একত্র গ্রথিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে—যার প্রায় সবগুলিই আত্মপ্রকাশ করেছে ইতিপুর্ব্বেই কোন না কোন পত্র-পত্রিকায়; নিখুঁত আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলি সত্যই অতিশয় উপভোগ্য, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয়ে উজ্জ্বল কাহিনী সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে লেখকের কুশল কলমের টানে টানে। সুবোধ ঘোষের অনবদ্য সুন্দর ভাষা গল্পগুলির প্রসাধনকার্য্য সমাপন করেছে, যেন নবযৌবনা নায়িকাকে সাজানো হয়েছে নবমল্লিকার মালায় নিপুণ করে। সাহিত্যরসিক বইটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। বইটির অঙ্গসজ্জাও সুন্দর। প্রকাশক—বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯ দাম—তিন টাকা মাত্র।

পশ্চিমের জানলা

পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা ও সরকারী চাকুরির লোভনীয় আরাম উপভোগ করেন মুষ্টিমেয় যে কয় জন, দেবেশ দাশ সেই সৌভাগ্যবানদেরই অন্যতম। আশ্চর্য্য এই যে, এ সত্ত্বেও তিনি ভোলেন নি তাঁর আপন ধর্ম, আসলে তিনি জাত সাহিত্যিক। সাহিত্য তাঁর পেশাও নয়, নেশাও নয়, সাহিত্য তাঁর প্রাণ, তাঁর জীবন, তাই জীবনেরই স্পন্দন অনুভব করা যায় তাঁর রচনায় এত গভীরভাবে। 'পশ্চিমের জানলা' তাঁর নবতম রচনা, পশ্চিমের প্রাণসত্তাকে উপলব্ধি করেছেন লেখক হৃদয় দিয়ে, তারই প্রকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টি। ইউরোপের মর্মবাণী সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই রম্য রচনা জাতীয় কাহিনীগুলির মাধ্যমে। আজকের ইউরোপ কি ভাবে কি করে তার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করেছে আলোচ্য গ্রন্থখানি! যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ঘটেছিল যে বিপর্য্যয় তার ভস্মস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে আজকের ইউরোপ। পাশ্চাত্যের নর-নারী হারিয়েছিল তাদের গৃহ-সংসার পরিজন হারায়নি শুধু তাদের অপরিমেয় মনোবল অদম্য সাহস, যে সাহস প্রেরণা যুগিয়েছে তাদের আবার উঠে দাঁড়াতে জীবনের পথে মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলতে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে এই পথচলা দেখেছেন লেখক আর তাঁর সেই দেখাকে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে—'পশ্চিমের জানলা' তাই শুধু এক রম্য কাহিনী মাত্রই নয়, তা মানুষের পথ চলার গান। দেবেশ দাশের ভাষা লিরিকধর্মী। স্বচ্ছন্দ মধুর ও প্রাণবন্ত ভাষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আবেদন অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। বইটির প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, দাম—পাঁচ টাকা।

বিবি-বেগম

নবাব বাদশার অন্তঃপুরের রঙীন পরদার অন্তরালে একদা ঘটেছিল যে মন দেওয়া-নেওয়ার, দুর্মদ কামনা-বাসনার রঙে রাঙানো ঘটনাগুলি, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে আজকের পাঠকের সামনে। মনোজ্ঞ কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের প্রেমগাথা শুনিয়েছেন শিবানী ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থে। প্রেম মানুষের জীবনে সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা বলশালী, সুদূর অতীত থেকে আজ পর্য্যন্ত কখনই মানুষ পারেনি এর প্রভাবকে অতিক্রম করে চলতে। প্রেমের হাত থেকে মানুষ যত না সুখ-শান্তি পেয়েছে তার অধিক পেয়েছে দুঃখ ও বেদনা; তবু প্রেমহীন জীবন আজও মানুষ কল্পনা করতে পারে না। ঊষর মরুর মতই ভয়াবহ সে জীবন। নবাবী আমলের রোমান্সও ছিল আজকের মতই সুখ ও দুঃখের উভয়বিধ স্পর্শে অনুরণিত, বাদশাজাদীরাও প্রেমে পড়লে সেদিন যা আচরণ করতেন আজকের নব্য নায়িকার থেকে তার ছিল না বিশেষ কিছু পার্থক্য। প্রেমের অমোঘ শক্তি সামনে প্রণতি জানাতে হত শক্তিমান সম্রাটকেও একদিন; রাজকীয় প্রেমকাহিনীগুলি এই সত্যেরই স্বাক্ষরবাহী। বিবি-বেগম-এ এই রকম কয়েকটি রাজকীয় প্রেমের গল্প বলেছেন লেখিকা, ইতিহাসকে বিকৃত না করে ও আপন মনের মাধুরী দিয়ে ছুপিয়ে নিয়েছেন তিনি কাহিনীগুলিকে; তাই তারা হয়ে উঠেছে রসোচ্ছল ও উপভোগ্য। রচনাগুলি রোমান্টিক মানুষের মনকে সহজেই ছুঁতে পারে; আমরা বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি একথা সহজেই বলতে পারি। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—নয়া প্রকাশ, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, দাম—আড়াই টাকা।

তুঙ্গভদ্রা

ইতিহাসরসাশ্রিত গল্প-উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান, আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই শ্রেণীর। শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

এর আগেই আমাদের অবহিত করেছেন, তাঁর রচনা সম্বন্ধে আপন শক্তিতেই। বলতে বাধা নেই যে তাঁর এই সাম্প্রতিক রচনাটিও খুসী হওয়ার মতই। সুদূর অতীতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে গড়ে উঠেছে 'তুঙ্গভদ্রা'র কাহিনী—ইতিহাসের সত্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ না করেও সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনীটি জমে উঠেছে লেখকের মুন্সীয়ানায়। যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অতীতের ঐশ্বর্য্যময়ী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর বিজয়নগরের ইতিকথা। যে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা একদিন ছিলেন সমগ্র ভারতের সম্মান ও ঈর্ষ্যার পাত্র। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই নগরী, আজ যে তুঙ্গভদ্রাকে ভারত সরকার বাঁধছেন দেশোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত হিসাবে। যুগ-যুগান্ত আগের সেই 'তুঙ্গভদ্রা' যখন আজকের মতই বয়ে যেত, তখনকার মানুষের কথাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আজকের সাহিত্যকারের কুশল কলমের মুখে। হয়ত আগামী যুগের কোন রচনাতেও অনাদৃতা থাকবে না 'তুঙ্গভদ্রা' তার কুলু কুলু ধ্বনি প্রেরণা যোগাবে—যার ফলে রচিত হবে আর এক নূতন কাহিনী সেদিনের সেই তুঙ্গভদ্রার তীরে। লেখকের ভাষা সুন্দর ও সমৃদ্ধ। আঙ্গিক সাধারণ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২ দাম—চার টাকা।

ডাক্তার জিভাগো

পাষ্টেরনাকের 'ডাক্তার জিভাগো'র নাম আজকের দিনের কোন শিক্ষিত মানুষের অপরিচিত নয়, বস্তুত: এই উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে যে আলোড়ন জেগেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর! এই উপন্যাস পাষ্টেরনাককে একদিকে যেমন এনে দিয়েছিল যশের স্বর্ণমুকুট, আর একদিকে তেমনি বিপদ ও বিড়ম্বনার ডালা। স্বদেশে তিনি পাননি সমাদর, রুশ সরকার রাশিয়ায় উপন্যাসটির প্রচার বন্ধ করে দেন ও দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক দেওয়া হয় লেখকের প্রতি। অথচ বিদেশের সুধী সমঝদারগণ এই রচনাটির জন্য-ই 'নোবল পুরস্কার' দানে ভূষিত করেন বরিস্ পাষ্টেরনাককে, যে পুরস্কার সাহিত্যকার মাত্রের-ই স্বপ্ন, সাহিত্য সাধনার চরম স্বীকৃতি। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অবলম্বনে পাষ্টেরনাক রাশিয়ার যে চিত্র এতে এঁকেছেন তা এক মূল্যবান ও প্রামাণ্য দলিলরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তবু এটাই 'ডাক্তার জিভাগো সম্বন্ধে শেষ কথা নয়, মানুষের আসল সার্থকতা কোন পথে? এই জিজ্ঞাসাই ধ্বনিত হয়েছে এই বিখ্যাত উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে। যুদ্ধ-বিপ্লব ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের প্রাণসত্তাকে যাচাই করতে চেয়েছেন পাষ্টেরনাক এতে। 'ডাক্তার জিভাগো' তাই বিভ্রান্ত মানুষের আত্মার এক অশান্ত ক্রন্দন আর সেটাই তার সব চেয়ে বড় পরিচয়। অনুবাদকদ্বয়ের ভাষা সাবলীল ও ছন্দোময়, সর্বোপরি বুদ্ধদেব বসুর সার্থক সম্পাদন-কৃতিত্বে অনুবাদটি সহজেই প্রাণধর্মী হয়ে উঠেছে। জিভাগোর কবিতাগুলি যা বুদ্ধদেব স্বয়ং অনুবাদ করেছেন বইটির এক অমূল্য সম্পদ। এই বিশ্বখ্যাত উপন্যাসটির অনুবাদ—বাংলা ভাষায় হওয়ায় পাঠক-সমাজের একাংশ বহুল পরিমাণে উপকৃত হলেন। আঙ্গিকেও অতি সমৃদ্ধ পুস্তকটি। আমরা এই সার্থক অনুবাদকর্মটিকে সাদর স্বাগত জানাই। অনুবাদক—মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসুর। প্রকাশক—ডি মেহরা, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, সহযোগিতায় বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলিকাতা—১২, দাম—বারোটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দুলারীবাই

আলোচ্য উপন্যাসটি বারীন্দ্রনাথ দাশের সাম্প্রতিকতম রচনা, বারীন্দ্রনাথ দাশ অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকগণের প্রথম সারির একজন, কলিকাতার একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা ইতিপূর্বেই পাঠক-সমাজের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থটিতেও রয়েছে এক প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাঁর জন্য। অসামাজিক জীবন যাপন করে যে সব নারী জীবিকা অর্জন করে তাদেরই একজনের ব্যথা বেদনা আশা আকাঙ্খাকে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন লেখক। দুলারীবাই পেশাদার বাইজীর কন্যা, নাচে গানে হাবে ভাবে পুরুষের মনোহরণ করাই তার কৌলিক পেশা—তবু কেমন করে না জানি নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখত সে। বাস্তবের কঠিন স্পর্শে যে স্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল একদিন, দুলারীর মন সেদিন মরে গেল, বেঁচে রইল তার দেহটাই শুধু। অন্তরের গভীর হতাশাকে গোপন করে বিখ্যাত গায়িকা, সহস্রবন্দিতা দুলারী টেনে নিয়ে চলল তার জীবনটাকে নোঙরছেঁড়া নৌকার মতই উদ্দেশ্যহীন ভাবে। নারীমনের এই সহজ আকুতিটুকু লেখক অতি নিপুণ ভাবে ফুটিয়েছেন। দুলারীবাই সহজেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, কোথাও 'বোরিং' নয়। আমরা বইটি পড়ে যে সুখী হয়েছি একথা স্বচ্ছন্দেই বলতে পারি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশক—কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

নিকষিত হেম

সর্বাধুনিক লেখকগোষ্ঠীর ভিতর যাঁরা পাঠক-সমাজের পরিচিত শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন, আলোচ্য গ্রন্থখানি এই লেখকের একটি সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস। এক বিচিত্র সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে এই স্বল্পপরিসর পুস্তকটিতে, সামাজিক যে সম্বন্ধবন্ধনকে মানুষ বহুদিন হতে মেনে আসতে অভ্যস্ত আজকের যুগ তার অনেকগুলিই বাতিল করে দিয়েছে। তবু সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে জৈবপ্রেম আজও অকল্পনীয়, লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে অবস্থা-বিশেষে ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভবও নয় অসঙ্গতও নয়। কাহিনীর নায়ক শিবনাথ বাল্যকাল হতেই ঘরছাড়া, পরিণত যৌবনে ঘরে ফিরে দেখলো সে লাবণ্যকে, তারই আপন সহোদরা—যৌবনের যাদুদণ্ড যার দেহে এনে দিয়েছে অম্লান বসন্তশ্রী, মুগ্ধ হল শিবনাথ, বিপরীত সম্বন্ধের বেড়া ডিঙিয়ে তার মন গ্রহণ করল এই তরুণীকেই। বলা বাহুল্য, লাবণ্যর সংস্কার সায় দেয়নি এই অসামাজিক আহ্বানে। মনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে নিপুণ কলমেই এঁকেছেন শান্তিরঞ্জন।

গতানুগতিক সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে লাবণ্যর মানসিক প্রতিক্রিয়া যা তার বিবাহিত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত হয়, রেখায়িত করেছেন লেখক জোর বলমেই—তবে তাঁর প্রকাশভঙ্গী আর একটু মার্জ্জিত ও শালীন হলেই বোধহয় তাঁর এই সাহিত্যকর্মটি আর একটু সার্থক হয়ে উঠতে পারত। বইটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—তিন টাকা।

বিদেহী

ধনঞ্জয় বৈরাগীর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'বিদেহী' কিছুদিন আগে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল একটি সিনেমা-পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। একটু ভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও এর প্রতি আছে অসীম কৌতূহল প্রায় সব মানুষেরই মনে, আলোচ্য গ্রন্থখানিও রচিত হয়েছে তারই উপর। পরলোকগতা পত্নীর আত্মা কি ভাবে অপরাধী স্বামীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করল তাই এই গ্রন্থখানির মূল বক্তব্য।

ধনঞ্জয় বৈরাগী আজকের সাহিত্যের দরবারে অপরিচিত নন, স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় তিনি নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঝরঝরে ভাষায় লেখা বইটি—আদ্যোপান্ত সুখপাঠ্য, রোমাঞ্চ কাহিনীর অনুরাগী পাঠক বইটি পড়ে খুসী হবেন বলেই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯ দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বৈঠকী গল্প

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ বিষয়বস্তুর কোন অভাব নেই—নানা রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আজকের সাহিত্য। বৈঠকী গল্পের উপর আরও কয়েকটি বই লেখা হয়েছে ইতিপূর্ব্বেই, আলোচ্য বইখানি এই ধরণেরই আরেকটি রচনা। কয়েকটি ছোট গল্প ও একটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। কোন বিশেষত্বের দাবী না করতে পারলেও সাধারণ ভাবে সুপাঠ্য বলা যেতে পারে এগুলিকে, তবে এতই সাধারণ যে পাঠকমনে কোন দাগ পড়ে না বললে অন্যায় করা হয় না। বইটি আরও অনেক বৈশিষ্ট্যহীন রচনার ক্ষেত্রে আরেকটি সংযোজন মাত্র। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সাধারণ। বৈঠকী গল্প—সন্তোষকুমার দে প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

রক্তগোলাপ

আলোচ্য বইখানি একটি ছোট গল্প-সংগ্রহ। সাহিত্যের আসরে আজ ছোট গল্পেরই জয়-জয়কার—নানাপ্রকার পরীক্ষা চলেছে ছোট গল্প নিয়ে। যার ফলে অধিকাংশ গল্পই আর যাই হয়ে উঠুক না কেন গল্প যে হচ্ছে না, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। বর্ত্তমান গল্পসংগ্রহটি আর যাই হোক, এই আপাত দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত। গল্পগুলি পড়তে বসলে অন্ততঃ তার অর্থবোধ করার জন্য মনের দেয়ালে মাথা কুটতে হয় না। সহজ সরল ভাষায় লেখা ঝরঝরে কয়েকটি গল্প পড়তে পারার খুসীতেই ভরে ওঠে মন। লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ নন এমন কিছু, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও নেই তাঁর লেখায়, তবু গল্পগুলির মাধ্যমে যে লিখনশৈলীর পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা প্রতিশ্রুতিময়। ষোলো সতেরোটি গল্পের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ করেই মন টানে, 'উন্মেষ' 'একালের কাহিনী' 'পোষ্টার' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখ্য বিশেষভাবেই। বইটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ। রক্তগোলাপ—সন্তোষকুমার দে। প্রকাশক—কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ দাম—তিন টাকা

কাটাকুটি

দীপঙ্কর গোস্বামী

হরেক রকম কাটাকুটি, তাদের কথা বলব আজ
প'ড়ে শুধু মজা পাবে নেইকো দুঃখ নেইকো লাজ।
নদীর বুকে সাঁতার কাটে দলে দলে সাঁতারবিদ্
গহন রাত্তে চুপিসাড়ে চোরের দল কাটে সিঁদ্।
কথা কাটাকাটি হলে মাথা গরম হয়
বিপদ কেটে গেলে মনে না রয় কভু ভয়।
নদীর জলের মতন করে সময় সদাই কেটে যায়
দুষ্টু ছেলে বাড়া কাটে যখন তারা স্কুল পালায়।

রেলে কাটা পড়ে লোকে পাঁঠাকাটার মত
আরো কত কাটাকাটি বলব বল কত?
বাবুরা সব টেরা কেটে বুক ফুলিয়ে পথ চলে—
বাজারে খুব কাটতে থাকে জিনিষগুলো ভাল হলে।
মাথা কাটা যায় শোনো, রাজা রেগে গেলে—
ভুল করে সব জিভ কাটে, যত লাজুক ছেলে।
চুল কাটে সুতো কাটে আর কাটে কাঠ—
যোগ-বিয়োগে ভুল হলে কাটা যায় আঁক।

নাপিতরা সব নখ কাটে আর করে বকবক্
দুধ কেটে গেলে গিন্নীর চোখ জ্বলে ধকধক্।
কাটাকুটির ছড়া কেটে পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের
লাগল কেমন বোলো মোরে জানতে আমার ইচ্ছে ঢের।
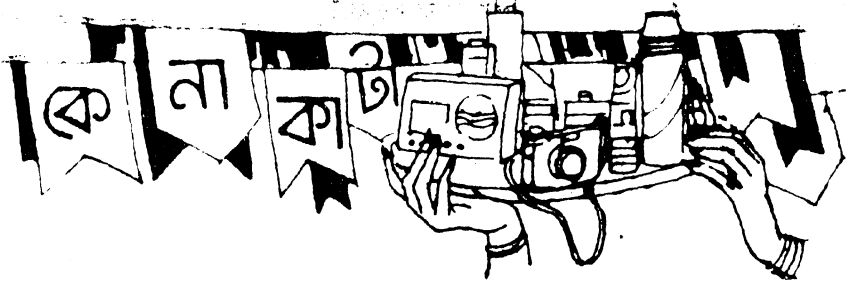
বিশেষজ্ঞ হতে হলে

জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করতে হলে কোন না কোন বিষয়ে 'স্পেশালিষ্ট' (বিশেষজ্ঞ) হওয়া প্রয়োজন। চাই সে লেখাপড়াতেই হোক, কারুকর্ম্মেই হোক, গান-বাজনাতেই হোক, খেলা-ধূলোতেই হোক কিংবা অপর কোন পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য কি রাজনীতিতেই হোক। একটা কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণগত স্বাতন্ত্র্য যদি থাকে, তা হ'লে বাঁচবার সংগ্রামে টিকে থাকা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠতে পারে, কে কোন্ দিকে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করবে, কোন্ লাইনে কাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। উত্তরে বলতে হবে প্রথমেই—এইটি কারো ওপর চাপিয়ে দেবার জিনিষ নয়। যার যে দিকটিতে ঝোঁক আছে, প্রতিভা আছে, ভেবে চিন্তে তার পক্ষে সে লাইনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। ছেলেবেলা থেকেই এই ব্যাপারে ভাল রকম লক্ষ্য থাকা দরকার। কারণ তখন থেকে যে-দিকে জোর দেওয়া হবে, অভ্যাস গড়ে উঠবে যে-ভাবে, ভবিষ্যতের বুনিয়াদ হয় তা-ই।

একটা ধারণা অনেককেই পোষণ করতে দেখা যায়, তারা সাধারণ লোক, সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু এই সাধারণের ভেতরও যে কোথাও অসাধারণত্ব থাকতে পারে, সামান্যও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে অসামান্য এইটি প্রায় তলিয়েই দেখা হয় না। ফলে সম্ভাব্য উন্নতি ও অগ্রগমনের পথটুকু রুদ্ধ হয়ে যায় আপনি। আবার এক শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ মিলে যারা সব ব্যাপারেই হাত দিতে ব্যস্ত—কোন দিকেই যেন তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অভাব নেই। কিন্তু এরূপ হলেও সাধারণতঃ খুব বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া চলে না। এর কারণ, কোন মানুষের পক্ষে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া, 'সব জান্তা' বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

সঙ্গে সঙ্গে যে-জিনিসটা বলতে হবে—গড়পড়তা মানুষ নিষ্ঠা ও উদ্যমের সহায়তায় কোন না কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করতে অবশ্য সক্ষম। জীবনের সূচনা থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার, কিছুতেই পিছিয়ে থাকব না, এই দৃঢ় দাবী রেখে চলা চাই। মনের স্বাভাবিক প্রবণতা কোন্ দিকে, কোন্ লাইনটি ধরলে পর সত্য দেখানো চলবে বিশিষ্টতা, এইটি নিরূপণ করে এগিয়ে যাওয়াই সমীচীন। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত—কোন মানুষই বলতে গেলে সব দিক থেকে অযোগ্য ও অক্ষম হয় না। কার কোন্ দিকটিতে বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভা রয়েছে অমনি যদি ধরা না যায়, খুঁজতে হবে নিবিড়ভাবে।

মনীষী প্ল্যাটোও বলেছেন—প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা বিশেষ গুণ থাকে, নিজের বিশেষ ক্ষেত্রটিতে যায় বিকাশ সম্ভবপর। সুতরাং কার কোন্ কাজে বিশেষ সক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আগে থেকেই সে-টি জান্‌বার-বুঝবার সঙ্কল্প রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে যে-টি বড় কথা—কোন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হতে চাইলে 'সব জান্তা' হওয়ার নেশাটা ছাড়া চাই। একটি বিষয়ে যদি বিশেষ দখল বা অধিকার জন্মে গেলো, সেখানেই জানতে হবে রয়েছে উন্নতির বীজ। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মূল্য বা মর্য্যাদা আজই হোক্ কি কালই হোক্, মিলবেই আর এ দাবী অবান্তর বলা চলে না।

একটু আগেই বলতে চাওয়া হলো সব ব্যাপারে পারদর্শিতা বা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের চেষ্টা না করতে যাওয়াই ভাল। তার প্রধান কারণ, একজন মানুষের কোন একটা বিশেষ দিকেই প্রতিভার স্ফুরণ হওয়া সম্ভব, সর্ব্বক্ষেত্রে নয়। সকল দিকে হাত দিতে চাইলে কোনটির ওপরেই বিশেষ অধিকার আসবে, এমন আশা নেই। এই শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যে জীবনে ব্যর্থতাই মিলে থাকে, বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে তারা বরং অযোগ্যই প্রমাণিত হন। সব কিছুতে স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা ছেড়ে একটি দিকে সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করলে সাফল্যের আশা বরং বেশি।

বিশেষজ্ঞ হওয়া অর্থই একটি বিশেষ বিষয়ে ব্যাপক অধিকার অর্জ্জন। এতে মনের যেমন জোর হয়, দশজনের শ্রদ্ধার দৃষ্টিও সহজে আকর্ষণ করা যায়। যে কোন দিকে বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে পারলে পাশাপাশি একটা ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে। কাজের কোন্ ক্ষেত্রটিতে জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে হবে, স্থির হওয়া মাত্র ষোল আনা মন ও মনোযোগ থাকতে হবে তার ওপরই। একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের কথা এইখানেই কিন্তু এসে যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের জীবন-চরিত আলোচনা করলে, এই কর্ম্মনীতি ও আদর্শই চোখে পড়বে। শ্রম এবং কৃচ্ছতা স্বীকার করতে হবে বলে সঙ্কল্পিত লক্ষ্য থেকে পিছু হটা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আর সে সব ক্ষেত্রে সাফল্য ও উন্নতির আশা যে সুদূরপরাহত, এ অমনি ধরে নেওয়া চলে। বিশেষজ্ঞ হতে হলে, কার্যক্ষেত্রে বিশিষ্টতার ছাপ রাখতে হলে যে নীতিগুলি অপরিহার্য্য, সেগুলি অনুসরণ না করলেই নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য—কয়েকটি কথা

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—কথাটি চলতি সুদূর অতীতকাল থেকেই। কিন্তু আজও এর ভেতর যে সত্যটি রয়েছে, তা লোপ পেয়ে যায়নি। আর্থিক জগতে বেশ বড় হতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথই প্রশস্ত। চাকরি করে কয়েকজন ভাগ্যবানই মাত্র বাড়ি গাড়ি করতে পারেন, সাধারণ করণিকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বা জমানো টাকা কোথা থেকে হবে? কিন্তু ব্যবসা যদি ঠিক বুঝে শুনে

করা যায়, পর্য্যাপ্ত নিষ্ঠা ও শ্রম যদি নিয়োজিত থাকে এর পিছনে, তা হলে লক্ষ্মীর অপার কৃপা লাভ সাধারণতঃ অসম্ভব নয়।

যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যই করতে যাওয়া হোক, টাকা পয়সার মূলধন ছাড়া আর একটি বড় মূলধন হলো সততা। এই শেষোক্ত মূলধনটি অক্ষুণ্ণ রেখে চললে, ব্যাবসায়ে সহসা মার খাওয়ার ভয় থাকে না। পরন্তু এই নীতিতে আসল মূলধন দিন দিন বেড়েই যেতে থাকে, ব্যবসায়ে সুনাম জুটে যায় তাড়াতাড়ি। আর একবার এই সুনামটি করে ফেলতে পারলে কাজ-কারবার সম্প্রসারিত হয়ে চলবে, এ-ও পরীক্ষিত ব্যাপার।

সূচনাতেই বড়দরের একটা ব্যবসা ফাঁদতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যার যেমন পুঁজি, তাকে সেইটির ওপর ভিত্তি করেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও কাঠামো ঠিক করতে হবে। বড় বড় ব্যবসায়ের জন্য জাঁক-জমকও চাই নিতান্ত বড়রকম—সাধারণ দোকান-পাট করতে গেলে সাধারণ ভাবেই কাজ করে চলতে পারা যায়। তবে এ যুগটি প্রচার ও বিজ্ঞাপনের যুগ, মোটামুটি বাইরের সাজ-সজ্জা না রাখলে এখন হয় না। অর্থাৎ যা-কিছু কাজ-কারবারই করা হবে, লোকের দৃষ্টিতে তা পড়া চাই। সততার সঙ্গে ব্যবসায়ীর আর একটি জিনিস যে-টি চাই, সে হচ্ছে মিষ্টি ব্যবহার। ক্রেতা বা গ্রাহক যেন সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট বোধ করেন, এমন পরিবেশ রাখা অত্যাবশ্যক বলা চলে।

ব্যবসায়ে আবশ্যক পুঁজির প্রশ্ন যেমন আছে, কে কোন্ ব্যাবসাটি নিয়ে নামবে বা কার পক্ষে কোন্ ব্যবসায়ে নামা সত্যি ঠিক হবে, এইটি-ও একটি কম বড় কথা নয়। যার যে বিষয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই, সেদিকে হাত দিতে গেলে পুঁজি নষ্ট হবার ভয় থাকবে, কাজ কারবারে সহজে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। অবশ্য, এমনও দেখা যায়, কাজ করতে করতে অজানা জিনিসও জানা হয়ে গেলো, নতুন ধরণের ব্যবসাতেও মুনাফা হতে থাকলো ভাল ভাবেই। কিন্তু তবু যথেষ্ট সাবধানতা চাই, সতর্ক হয়ে পা ফেলা চাই, ব্যবসায়ে নামবার আগে তো বটেই, ব্যবসায়ে নেমে যেয়েও।

আর একটি বড় জিনিস, ব্যবসায়ে তদারকী থাকতে হবে বিশেষ রকম আর সেইটি আগাগোড়া। কারবার চলছে, সুতরাং আপনি চলবে—এরূপ আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব ব্যবসায়ীকে কখনও যেন পেয়ে না বসে। প্রত্যক্ষ তদারকীর যেখানেই অভাব হয়, দেখা যায়, ব্যবসায়ের অগ্রগতি আগের ধারায় আর নেই। যে জিনিসটি নিয়ে কাজ-কারবার করা হবে, সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ অধিকার থাকা অত্যাবশ্যক, তা একটু আগেই বলতে চাওয়া হলো। ব্যবসা ছোটই আকারেই হোক, আর বড়ই হোক, পর্য্যাপ্ত জ্ঞানও অভিজ্ঞতা রেখে যত্ন নিয়ে চালিয়ে গেলে এবং বাজারের গতি ও চাহিদার দিকে নজরে রেখে কখন কী করণীয়, নিরূপণ করে নিতে পারলে—আশা রাখবার সাহস জাগবে আপনি। সময় করে হিসাব কষে দেখতে হবে—একটু হলেও এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে কি না। আর এ-ও সত্যি ধাপে ধাপে ব্যবসায়ে অগ্রগতি দেখা গেলে ব্যবসায়ী বা কারবারীর মনে নতুন প্রেরণা ও উদ্যম অবশ্য জাগবে।

ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীর পক্ষেই আরও কয়েকটি নীতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। ব্যবসায়ের পসার ও সুনাম দুই-ই এ সকলের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ক্রেতা বা গ্রাহকের সুযোগ-সুবিধার দিকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে। অর্ডার অনুযায়ী যে-সময়ে যে-জিনিসটি সরবরাহ করা প্রয়োজন, সেইটি সেই সময় মধ্যেই ব্যবস্থা করার জন্য তৎপরতা চাই। যে পণ্য নিয়ে কাজ কারবার করতে যাওয়া হচ্ছে, তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ পণ্যমান কখনই ক্ষুণ্ণ হতে দিলে চলবে না। অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে চাওয়াও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন গ্রাহ্য নীতি নহে, বরং সুনাম বা 'গুড উইল' বাড়াবার দিকে নজর রেখে কাজ-কারবার করে যাওয়াই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।

সিগার মোড়বার তামাক পাতা

ভারতে তামাক চাষের পত্তন কতকাল আগে হয়েছে, সঠিক বলা কঠিন। তবে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজরা এই দেশে তামাকের চাষ চালু করেন। উষ্ণমণ্ডলের ফসল হলেও ভারতের সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই আজও এর চাষাবাদ। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার নাম করা যেতে পারে—তামাক উৎপাদনের এই দুইটি জেলা হচ্ছে বড় কেন্দ্র। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পূর্বে রংপুরের (এক্ষণে পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত) তামাকের খ্যাতি ছিল দূরাঞ্চলেও।

তামাক উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ, মোটামুটিভাবে তা বলা যেতে পারে। কারণ, এই পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ভারতের স্থান বোধ হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরই। বৎসরে মোট উৎপাদিত তামাকের একটা মোটা অংশ রপ্তানী হয়ে যায় দেশ থেকে বাইরে। কিন্তু তবু যে কথা না বললে নয়, সে হচ্ছে সব শ্রেণীর তামাকের দিক থেকেই ভারত আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেনি। যেমন, এ প্রসঙ্গে নাম করা চলে সিগার মোড়বার তামাকের কথা। এই মোড়বার পাতা বা র‍্যাপার বিদেশ থেকে আমদানী না করলে এখনও চলে না।

প্রাক্-স্বাধীনতার আমলে সিগার মোড়বার তামাক কিছু পরিমাণে উৎপাদিত হতো তৎকালীন ভারতে। কিন্তু সেটি ছিল সম্পূর্ণভাবে রংপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ, আর তা এতটা উৎকৃষ্ট ধরণেরও ছিল না। দেশ-বিভাগের ফলে এই সুযোগটুকু পর্য্যন্ত ভারতের চলে যায়, কারণ রংপুর সেই থেকেই হয়ে আছে একটি পাক্ রাষ্ট্রভুক্ত এলাকা। সিগার মোড়বার তামাকের চাহিদা কিন্তু থেকে গেল এখানে প্রচুর—যার জন্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। আমেরিকা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া—এ সকল রাষ্ট্রের উপরই ভারতকে আলোচ্য শ্রেণীর তামাক পাতার জন্যে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়।

ভারতে তামাক পাতার উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে চেষ্টা চলে আসছে বেশ কিছুকাল থেকেই। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদিত তামাক যাতে ক্রমেই আরও মানোন্নত হতে পারে, সেদিকেও সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো নজর রাখছেন। একর পিছু এর ফলন বৃদ্ধিকল্পে অনেক গবেষণা আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে। সিগার মোড়বার তামাক পাতার চাহিদা মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় তামাক কমিটি একটি উদ্যম চালিয়েছেন কোচবিহারের দিনহাটায়। এই শ্রেণীর তামাক চারার চাষ হচ্ছে উত্তর বঙ্গের এই বিশেষ এলাকাটিতে এবং পরীক্ষার সাফল্যও অর্জ্জিত হয়েছে এর ভেতরই। দিনহাটার সরকারী উদ্যোগে তামাক সংক্রান্ত একটি স্থায়ী গবেষণা ভবনও নির্মিত হয়েছে। উৎকৃষ্টতর বীজ, ও রাসায়নিক সার সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা যদি নিশ্চিন্ত থাকে, তাহ'লে সিগার মোড়বার তামাক পাতার ঘাটতি বহুলাংশে পূরণ হবে, এ নিঃসন্দেহ।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা
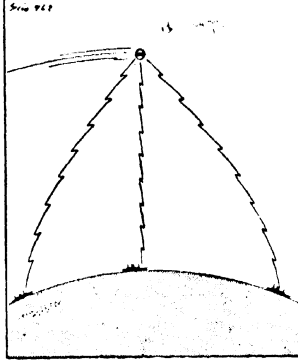
১। বিশেষজ্ঞরা বলেন অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে ফিসালিয়া ফিসালিস অথবা পর্ত্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়ার মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোন কোন জীবনরক্ষী একে হাঙ্গর অথবা ব্যারাকুডা (বিরাট সামুদ্রিক মাছ) অপেক্ষাও ভয় করে।

২। সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ট্রানজিট-১বি নামে পৃথিবীতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়েছে। উহা নৌচালনায় খুব সহায়ক হয়েছে এবং বৈমানিক ও নাবিকরা দিনে কিংবা রাত্রে যে কোন আবহাওয়ায় তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে। এটি ও অন্যান্য যে উপগ্রহ পরে ছাড়া হবে তাতে নৌবাহ-বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটবে আশা করা যায়।

৩। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন সবাই চেকে লেনদেন করে। অর্থ বিশেষজ্ঞদের মতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যত টাকা লেনদেন হয় তার অন্ততঃ শতকরা ৯০ ভাগ এইরকম চেক মারফৎ হয়। ১৯৬০ সালে একমাত্র ফেডারেল ট্যাক্সের হিসাব বাবদ তিন কোটি ব্যক্তিগত চেক লেনদেন হয়।
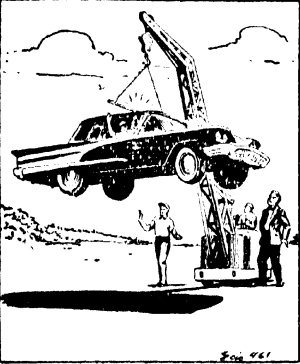
১। কোন কোন নতুন আঠার এত শক্তি যে তা এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে লাগিয়ে ৭ হাজার পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে ঝুলিয়ে রাখা যায়। সম্প্রতি একটি মার্কিণ প্রতিষ্ঠান এক ফোঁটা আঠা দিয়ে চারজন যাত্রীসহ একটি মোটরকে একটি লোহার ডাণ্ডা থেকে ঝুলিয়ে রাখে।

২। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঘাস জন্মায়। অন্য কোন গাছ-গাছড়া পৃথিবীতে এত ব্যাপকভাবে দেখা যায় না। শুনলে অবাক হবেন বাঁশও এক ধরণের ঘাস ও বাঁশঝাড় বেড়েই অনেক বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়।

৩। অনেকের ধারণা ঘুমের সময় মানুষের দেহ বিশ্রাম পায়। কিন্তু আসলে ঘুমের সময় বিশ্রাম পায় মানুষের মস্তিষ্ক। কথা বলার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি এই সমস্ত উচ্চতর গুণগুলি মানুষের মস্তিষ্কের এই অংশেই আছে।

১। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কারখানার মালিকরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মচারীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে থাকেন, এজন্য তারা কর্মচারীদের নগদ পুরস্কার দেন। দশ বছরে ফোর্ড মোটর কোম্পানী তাদের একজন কর্মচারী আর, ম্যারোনকে এইভাবে ২৯৫০০ ডলার পুরস্কার দিয়েছে।

২। মানুষের চারপাশে যে কতরকম প্রাণী আছে তা অনেকে ধারণাই করতে পারে না। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে দু-একটা প্রজাপতি বা বড় দু-একটা গুবরে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাত্র এক একর (তিন বিঘা) পরিমাণ স্যাঁতসেঁতে জমিতে প্রায় চার লক্ষ কীট-পতঙ্গ বেঁচে থাকতে পারে।

৩। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপে রাজা কামেহামেহা নিজেই বর্শা ছোঁড়ার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বর্শা লুফে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি এত নিপুণ ছিলেন যে একসঙ্গে ৬টি বর্শা ছোঁড়া হলে তিনি ৩টি হাত দিয়ে ধরে ফেলতেন, ২টি তার পায়ের ফাঁক দিয়ে চলে যেত আর অদ্ভুতভাবে শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে আর একটি বর্শাকে তিনি এড়িয়ে যেতেন।
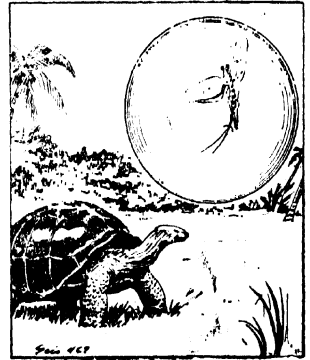
১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কংক্রিট দিয়ে যে সমস্ত গাঁথুনি তৈরী করা হয়েছে তার মধ্যে গ্রাণ্ড কৌলি বাঁধ সব চেয়ে বড়। ওয়াশিংটন রাজ্যে কলম্বিয়া নদীর ওপর এই বাঁধটি ৪১৭৩ ফুট বিস্তৃত। বাঁধের জলাধারটির নাম রুজভেল্ট লেক। এটা কানাডা সীমান্তে ১৫১ মাইল

২। গ্যালিলিও ও নিউটনের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দশ লক্ষ তারা দেখা যেত আর আজকের দিনে জ্যোতির্বিদরা কোটি কোটি তারা আবিষ্কার করেছেন।

৩। কোন কোন জন্তুর আয়ু যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমনি আবার কোন কোন জন্তু অল্প সময় বেঁচে থাকে। মরিশাস দ্বীপে একটি কচ্ছপ ১৫০ বছরের বেশী বাঁচে। আবার মে-ফ্লাই নামে একরকম মক্ষিকার সমগ্র জীবনকাল মাত্র ২০ মিনিট।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীঘ্র মুক্তির আশা নেই বুঝে মনটা খারাপ হয়ে গেল,—কিন্তু সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম—What cannot be cured, must be endured.

অমরদার এক চিঠি পেলুম। কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে (তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত) টালার গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাশীপুরের জিতেন্দ্রিয় বসুর বিরুদ্ধে যথাক্রমে যোগেশ ঘোষ (গয়লাদের খোকা) এবং মৃগেন মজুমদার কাউন্সিলর পদপ্রার্থী।—টালার বাসিন্দা উপেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, এবং তাঁর সঙ্গে অমরদা'ও (চট্টোপাধ্যায়) বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অমরদা, উপেনদা, যোগেশ এবং মৃগেনকে (কেষ্টো মজুমদার) জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা 'আমায় চেনে কি না'। তারা বলেছে,—"হাবুদাকে চিনি না? তিনি থাকলে আমাদেরই সমর্থন করতেন।" অমরদা' আমাকে সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি লিখে দিলুম, কেষ্টো আমাদের একটু জুনিয়ার হলেও আমাদের সঙ্গে খেলাধূলোও করেছে,—আর যোগেশকেও শিশুকাল থেকেই জানি—Good boy বলে দুজনেরই সুনাম আছে—ওরা ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে শুনে খুসী হলুম।

৩৩ সালের আমের সময়। আম পাওয়া যায় প্রচুর,—সবই দেশী আম, কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে,—প্রায় সব আমেই পোকা হয়। কৃমির মতন পোকা নয়,—যে পোকা গোলাকার মাকড়সার মতন, সাদা আকারে আমের মধ্যে জন্মে শেষে শক্ত ও কালো হয় এবং আমের খোসা ফুটো করে' বেরিয়ে উড়ে যায়। অর্থাৎ প্রায় সব আমের গায়েই ছোট ছোট গোল গোল ফুটো দেখা যায়। সেই আম কেনাই ভাল। ফুটোহীন আম কিনলে, তার ভেতরে পোকা দেখা যায়—সাদা, শুকনো ধরণের পোকা—বেছে ফেলে দিয়ে আম খেতে হয়। খাওয়া যায়,—কারণ পোকা থাকে ৫।৭।১০টা মাত্র!

একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফেরার পথে আম পেয়ে কিনে ফিরছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি, থানার বারাণ্ডায় দারোগা সাহেবের সঙ্গে বসে আছেন এক চা-বাগানের বাঙ্গালী ম্যানেজার। দারোগা সাহেব একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, ৬টা বেজে গেছে। অর্থাৎ Govt order violate করেছি। আমি "হুঁ" বলে চলে এলুম, এবং কতকগুলো আম কেটে, কিছু নিজেদের জন্যে রেখে কিছু ওদের পাঠিয়ে দিলুম।

কয়েকদিন পরে ঠিক এইভাবে আর একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে,—ওরা দুই মূর্তি বসে আছেন,—দারোগা সাহেব আবার মুখ টিপে হেসে বললেন,—সেদিন তো আম খাওয়ালেন,—আজ কি খাওয়াবেন?

ইঙ্গিতটা ভাল লাগলো না—বললুম, এইবার একদিন কানমলা খাওয়াতে হবে। বাইরের একজন ভদ্রলোকের সামনে চাল মারছিলেন,—এখন আমার কথায় অপ্রতিভ হয়ে কাষ্ঠহাসি হেসেই বললেন,—তা আপনারা পারেন।

দুর্গোৎসব এল—বারোয়ারী দুর্গা পূজা হল। বিসর্জনের দিন বিকালে দারোগা সাহেব ও জোতদার সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—প্রতিমা নিয়ে মিছিল চলেছে, প্রতিমা দেখে জোতদার সাহেব বললেন,—"হুঁ:—হিন্দুদের কি কাণ্ড—ভগবানের আবার বউ, ছেলে, মেয়ে!"

আমি একটু শ্লেষের সুরে বললুম,—"হ্যা—আল্লার একজন পিওন থাকলেই চলে (মহম্মদের কাছে দেবদূত) সেটা চাই-ই।"

দারোগা সাহেব চোখ টিপে দিলেন, জোতদার সাহেব চেপে গেলেন। তারপর বাসায় ফেরা পর্যন্ত সবাই গম্ভীর। এমনি করে আমার ওপর দারোগা সাহেবের বিরাগ দানা বাঁধছিল।

আমিও একটা লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হতে লাগলুম। কারুরই কাজকর্ম নেই, অফুরন্ত সময়—দারোগা সাহেবের তাসের নেশাও আছে,—ব্রে খেলার। একটা তাসের আড্ডাও গড়ে উঠতে সুরু করেছিল—ওদের আড্ডা—আমি পরে যোগ দিয়েছিলুম। আমাকে নেওয়ার পর দারোগা সাহেব একটা নতুন খাতা কেড়েছিলেন—এক ইঞ্চি মোটা, পেজ নম্বর দেওয়া একটা জেনারেল ডায়েরী বুক। দারোগা সাহেবের নেশা বেশী, কাজেই উনিই পয়েণ্ট লিখতেন। নিয়মিত খেলোয়াড় দারোগা সাহেব, জমাদার বাবু, আমি এবং জোতদার সাহেব! তাঁর অনুপস্থিতিতে নেওয়া হত "বাঁছন বাবুকে" (Agricultural demonstrator—আমরা বলতুম "demon")। দারোগা সাহেব খাতায় আমাদের তিনজনের নাম লিখতেন, এবং নিজের নামের একটা ইনিসিয়াল লিখতেন,—ঠিক যেমন ইনিসিয়্যাল তিনি অফিসিয়াল কাগজপত্রে দিয়ে থাকেন।

আমি সেই জেনারেল ডায়রীর দুটো পেজ-নম্বর দেওয়া পাতা,—দারোগার হাতের লেখা এবং ইনিসিয়াল দেওয়া ব্রে খেলার পয়েণ্ট লেখা পাতা,—একদিন লুকিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে রেখে দিলুম,—দারোগা

আমায় কোনোদিন ল্যাং মারতে এলে সেই কাগজ দুটো হবে আমার মোক্ষম ল্যাং।

পুজোর পর থেকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। আমাকেও ধরলো ভাল করেই। কলকাতায় বদলীর জন্যে লেখালেখি সুরু করলুম। বাজারে তখনো মাছের আমদানী নেই। অসুখের পর পথ্যের জন্যে জাওলা মাছ খুঁজে পেতে যোগাড় করতে হয়।

একবার অসুখের পর হাটে গিয়ে কিছু সিঙিমাছ পেয়ে, দর করে দাম দিয়ে চলে এসেছি—চাকর গিয়ে নিয়ে আসবে। চাকর ফিরে এসে বললে, মাছ হাটবাবু নিয়ে গেছে,—জেলে পয়সা ফেরৎ দিয়েছে। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো,—দারোগার কাছে গিয়ে নালিশ করলুম।

দারোগা আমাকে নিয়ে হাটে গিয়ে জোতদার সাহেবের আড়তে বসে জেলেকে ডেকে পাঠালেন,—এবং হাটবাবুকেও। হাটবাবু বললেন, আমি আগে ওকে দাম দিয়ে গিয়েছিলুম। জেলেকে দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি রে? হাটবাবু আগে দাম দিয়েছিল?" জেলে মাটীর দিকে চেয়ে বললে "হ্যাঁ"।

আমি হাটের মাঝে চীৎকার করে দারোগা সাহেবকে ধমক দিয়ে বললুম,—"আমাকে এখানে কোর্ট দেখাতে এনেছেন? হাটবাবু জিনিস নেওয়ার আগে দাম দিয়ে জিনিস ফেলে রেখে যাবে,—সাক্ষী দিয়ে বোঝাতে চান?" বলে' রেগে এবং বেগে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলুম।

কিন্তু এমন করে আমাকে বেকুফ বানিয়ে চাল মেরে চলে যেতে দিলে চলবে না—দিনে দিনে জীবন দুর্বহ করে তুলবে। সুতরাং পাল্টা আঘাত একটা দিতেই হবে। ভেবে চিন্তে ডেপুটী কমিশনারের কাছে একটা নালিশের দরখাস্ত লিখে থানায় দিয়ে এলুম—মাছের মামলা নয়,—তার চেয়ে বড় অন্ত এক মামলা। দরখাস্ত দিয়ে এসে দেখি, চাকর মাছগুলো নিয়ে এসেছে।

আমরা অনেকদিন ধরে অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনেক ঘটা করে এসেছি,—কিন্তু ফালাকাটায় এসে যে সহজ ও সর্বাত্মক অস্পৃশ্যতা বর্জন দেখেছি,—তা অভাবনীয়।

গ্রামে অনেক খাটা-পায়খানা আছে,—এবং আমার ঘরের পাশেই মেথরদের পাড়া। তারা সকালে ময়লার টব মাথায় করে নিয়ে যায়,—আর তারপর তহশীল অফিসের বাবুদের বাড়ী বাড়ী ফরমাস্ খেটে বেড়ায়। কারো বাড়ী গরুর জাবনা দেয়, মুসলমান বাবুদের বাড়ী গরুর দুধও দুয়ে দেয়,—দোকান থেকে জিনিসপত্তরও কিনে এনে দেয়।

হাটবারে কাণ্ডটা হয় অসম্ভব। হাটবাবুর আইনসঙ্গত কাজটা যে কি, তা জানতে পারিনি,—কিন্তু প্রত্যক্ষ বেআইনী কাজ হচ্ছে হাট থেকে "তোলা" তোলা। তাঁর বাহিনী ঐ মেথরের দল। তারা ধামা নিয়ে হাটে ঘুরে প্রত্যেকের বিক্রেয় মালের এক এক খাবলা তুলে নেয় যদৃচ্ছভাবে। শুধু তরি-তরকারী নয়, চাল-ডালও,—এমন কি, চিঁড়ে-মুড়ি পর্যন্ত। সেইসব মাল নিয়ে গিয়ে জড়ো করা হয় ঐ মেথর-পাড়ারই উঠানে। তারপর বাঁকে করে' ভারে ভারে তারাই নিজেদের বখরা রেখে তহশীল অফিসের বাবুদের বাড়ী বাড়ী বণ্টন করে' আসে। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতুম না। যখন প্রথম দেখি, তখন চমক লেগেছিল,—পরে ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এখন ডেপুটী কমিশনারের কাছে এই বেআইনী কাণ্ডের বিবরণ দিয়ে লিখলুম,—"এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনের যুগে আমি এসব কথা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি,—কিন্তু এইভাবে "তোলা" তোলাটা শুধু বেআইনী অত্যাচার নয়,—স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতার একেবারে বিপরীত।"

ফল হল আশাতীত। তিনদিনের মধ্যে ডেপুটী কমিশনার আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে এক চিঠি লিখলেন,—আর তহশীলদারের ওপর এমন কড়া এক হুকুম জারী করলেন যে, হাটে "তোলা" তোলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

স্কুলের ভাল ছেলেরা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হলে লোকের প্রশংসার মুখে যেমন প্রসন্ন লজ্জায় গম্ভীর হয়ে থাকে, আমার মনোভাব হল কতকটা তেমনি। আর অন্যান্য মাতব্বরেরা অপ্রসন্নতা চেপে রেখে, —যেন কিছুই হয়নি, বা কেউই কিছু জানেন না,—এমনি ভাবে একটু বেশী অমায়িক ভাবে কথা কন। তহশীল অফিসের সংশ্লিষ্ট ২১ জন লোক যেমন চুপি চুপি আমাকে বলে গেল ডেপুটী কমিশনারের কড়া হুকুমের কথা,—তেমনিভাবে চাপা গুঞ্জরণে আমার রিপোর্টের কথাটাও "চাউর" হয়ে গিয়েছিল। হাটবাবু হাটে কচিৎ মুখ দেখান। মেথরদের লোকসান একটু অন্যায্য হল। কিছুদিন এমনি চলার পর মেথরেরা গোপনে আবার যৎসামান্য তোলা তুলতে সুরু করলো—ভিখারীর মতন ভাবে। ক্রমে আবার "তোলা" চালু হল একটু নিরীহভাবে। কিন্তু "জাগ্রত দেবতার" মতন আমার দরখাস্তের জোরের কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। কনষ্টেবলরা আমাকে দিয়ে দরখাস্ত লেখাতে সুরু করেছিল।

শীতকালে নতুন ধান উঠলো—আমার ঘরের পাশে জোতদার সাহেবের গুদামে গাড়ী গাড়ী ধান উঠতে সুরু করলো। বাজারে নতুন ধানের দর ॥৵০ দশ আনা মণ।

জোতদার সাহেবের নিজের জমির ধান ছাড়াও খাতকদের কাছ থেকে আসছে প্রচুর ধান,—গত বছরের, অর্থাৎ কয়েক মাস মাত্র আগের কর্জ দেওয়া ধানের হিসাবের আদায়ী ধান—॥০ আটআনা মণ হিসাবে!

এই অভাবনীয় ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারলুম না। পরে অনুসন্ধান করে যা জানলুম,—তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। দারিদ্র্যের চাপে নতুন ধান ওঠা মাত্র চাষারা কিছু কিছু ধান হাটে নিয়ে আসে, এবং আড়তদারের মহাজনেরাই এককাট্টা হয়ে যথেচ্ছ দামে সেগুলো কিনতে থাকে,—তারাই দরটা দাবিয়ে রাখে। সাধারণ খরিদ্দার তখন থাকে না।

মহাজনেরা ওৎ পেতে বসে থাকে,—খাতকের ঘরে ধান ওঠা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে, গত বছরের "কর্জা" ধান আদায়ের জন্যে। হাটে যখন ॥৵০ দশ আনা মণ,—এবং খাতকের বাড়ী থেকে—বা জমি থেকে— ধান নিয়ে আসার খরচটা যখন মহাজনকেই বহন করতে হবে, তখন ধানের দর ॥০ আট আনা মণ না হলে চলবে কেন? কিন্তু কতটা "কর্জার" পরিবর্তে কতটা আদায়?

অনুসন্ধান করে' একটা হিসেব পাওয়া গেল। মহাজনের পাওনা আদায় দিয়ে এবং কিছু বীজধান রেখে চাষাদের ঘরে যা থাকে —তাতে মাত্র কয়েকমাস চলে, অনেকেরই এই অবস্থা। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাদের ধান কর্জ করে' খেতে হয়। জোতদাররাই

সাধারণতঃ মহাজন। অন্য মহাজনও আছে। যে চাষা যে জোতদারের জমি চষে, সে কর্জ করতে আসে ঐ জোতদারেরই কাছে। অন্যের কাছে যাওয়ার হুকুম নেই,—গেলে নানাভাবে তাকে জব্দ করা হবে। কাজেই জোতদার মহাজনদের কাছে অনেক চাষাই চিরকাল বাঁধা থাকে। যাদের নিজেদের সামান্য জমি আছে,—তাদের অনেককেও এমনিভাবে মহাজনের কাছে যেতে হয়, এবং কারো না কারো কাছে বাঁধাও পড়তে হয়। চাষাদের জীবনে এ বিড়ম্বনা যেন চিরন্তন।

ধরুন সামনের আষাঢ় মাস নাগাদ হাটে ধানের দর চড়তে চড়তে দেড় টাকা মণ হল। আমার বন্ধু জোতদার সাহেবের প্রজা তাঁর কাছে এল ধান কর্জা নিতে। এখনো মাস পাঁচেক খেতে হবে,—৭।৮ মণ না হলে চলবে না। জোতদার ধম্‌কে-ধামকে ঠিক করলেন ৫ মণ দেবেন। হাটে ৫ মণের দাম ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা। মুসলমান হয়ে সুদ নিয়ে ধর্ম খোয়াতেতো পারেন না! তাই ঠিক হল তিন টাকা মণ হিসেব করে খৎ লিখে দিতে হবে ১৫৲ পনেরো টাকার! সামনের বছরে নতুন ধান উঠলে হাটের দরে ধান নিয়ে খতের দেনা শোধ করতে হবে! অর্থাৎ ৩০ মণ ধানই হয়ত লাগবে ১৫৲ টাকার জন্যে।

সুতরাং সব কর্জা শোধ হবেনা—হাতে পায়ে ধরে কিছু বাকি রাখতেই হবে,—এবং তার জন্যে খৎ যেমন ছিল তেমনিই থাকবে! আবার কয়েকমাস পরে কর্জা,—আবার আর এক দফা এই দুপুরে ডাকাতির পুনরাবৃত্তি!

বিশ্বাস হল না। বললুম, ধান ওঠার পর সব ধান তুলে নিয়ে এলেও তো শেষ পর্যন্ত সব কর্জা শোধ হবে না। ব্যাখ্যাকার বললে, মোট কথা, চাষাদের কয়েক মাসের খাওয়ার মতন ধান রেখে বাকিটা তুলে আনা হয়,—খতের ওপর খৎ জমতে থাকে, এমনি চলে বছরের পর বছর। জোতদার-মহাজন যদি কোনোদিন কারো উপর বেশী চটে যান, তাহলে তার মারণাস্ত্র সব সময়েই তাঁর হাতে মজুদ থাকে—হয়ত কারো জমি কেড়ে নেন,—হয়ত কাউকে "গোলাম" করে রাখেন,—এমনি ভাবেই চাষাদের একটা স্তরের জীবন চলে!

সারা দেশে কৃষকদের এই স্তরটাই যে সবচেয়ে বড়,—সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বেঙ্গল ডুয়ার্সের খাসমহলে হয়ত অবস্থা অপেক্ষাকৃত ঘোরালো,—কিন্তু সর্বনিম্ন স্তরের কৃষকদের অবস্থা সর্বত্রই মোটামুটি এই রকম।

কৃষি-মজুর, যারা "জন" খেটে খায়—এ ধরণের ঋণের বোঝা হয়ত তাদের ঘাড়ে নেই, কিন্তু চাষের সময় ছাড়া তাদের কাজ থাকে না বলে বারো মাসের গড়পড়তা অবস্থা এই রকমই হীন। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীর চরখা প্রচারের প্রধান ধুয়োই ছিল এই যে, যেহেতু চাষাদের বারোমাস কাজ থাকেনা, অতএব বেকার সময়টাতে যদি তারা চরখা কাটে, তাহলে তাদের কাপড়ের সমস্যা মিটতে পারে।

সারা ভারতে কৃষকদের ঘাড়ে ঋণের বোঝার মোট পরিমাণ শোনা যেত ১২০০ কোটি টাকা। বলা হত, ঋণের ভারে তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ডও যে বেঁকেই গিয়েছিল,—তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার ভাবে:

"···শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,—
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,—
জানেনা সে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে—
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

তারপর এ সমস্যার সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখেছেন:

"এই সব মৌন ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব দীর্ণ ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে—
যখনি জাগিবে তুমি, তখনই যে পলাইবে ধেয়ে
পথ কুক্কুরের মত।···"

ভাবাবেগে কবি সংঘবদ্ধ কৃষক-বিদ্রোহের কথাই বলে ফেলেছেন। কমিউনিষ্টিক আইডিয়া! তাই আজ সারা দেশে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাটা বর্জন করেই তাঁর শ্রাদ্ধ করেন।

আমাদের বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর আদি ও অকৃত্রিম বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যেও এটা হারাম। গান্ধী-কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শাস্ত্রেও এটা হারাম। বিপ্লব বা স্বাধীনতা কাদের জন্যে? এ প্রশ্ন তোলাটাও হারাম।

ভারত মাতা আসলে ভারতের ম্যাপ-মাতা!—মানুষের কথা মাত্র একটা কথায় পর্যবসিত—ভারতবাসী। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ চাষা এবং ১২।১৩ ভাগ মজুর মূক—বাকি ৭।৮ শতাংশের নিচের স্তরের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখর স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভদ্রলোকের ছেলেরা,—যুবক ও ছাত্ররাই সৈন্য ও সেনাপতি। তার উপরের স্তরটা, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। তার উপরে রাজা-জমিদার, ধনিক-বণিক বিপ্লব-বিরোধী।

দেশের এই ৯২।৯৩ শতাংশ চাষা ও মজুরের শ্রমের ফলের অধিকাংশ রসই বাকি ৭।৮ শতাংশ পরগাছাকে পুষ্ট করতে চলে যায়—নিম্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবী বাবুরা ঐ ৭।৮ শতাংশেরই তল্পানি। কে বিপ্লব করবে কাদের জন্যে? কাদের নিয়ে? তাই আমাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা হয়েছে একটা Smuggling affair,—এবং তার ফলও হয়েছে তদনুযায়ী।

রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন চাষার নমুনাও ফালাকাটায় দেখলুম। একদিন দেখি, হাট থেকে দুজন গেরুয়াপরা সাঁওতাল চাষা, দুই ভাই, আমার বাসার সামনে মাঠে এসে বসে আছে আমাকে দেখবার জন্যে—গান্ধীবাবার এমন উচ্চস্তরের চেলা যে, সরকার নজরবন্দী করে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে! ওরা দুই ভাই চরখা কাটে,—এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল ও মিটিং করে, কিম্বা হয়ত বে-আইনী কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বলে, ছমাস জেল খেটে এসেছে।

আমি হাট থেকে এলে আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে, এবং গান্ধীবাবার কিছু গুণগান শোনালে। আমি বললুম, আমরা মহাত্মাজীর কংগ্রেসের লোক, তাঁর কাজও করেছি, কিন্তু আমরা তাঁর

অহিংসার কথাটা মানিনা। আমরা বলি, ইংরেজকে মেরে তাড়াতে না পারলে ভারতমাতা স্বাধীন হবে না।

তারা একটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে যেন চক্ষু-লজ্জার খাতিরে নিষ্প্রাণভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে,—কিন্তু আমার বেশ মনে হল,—যে উৎসাহ নিয়ে ওরা এসেছিল, সেটা নিভে গেছে। ওরা আবার নমস্কার করে বিদায় নিল যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে।

চুলোয় যাক্। বিপ্লব ভাবলেই বলশেভিক বিপ্লবের কথা মনে পড়ে। লেনিন বিপ্লবের পরের দিনই ঘোষণা করেছিলেন, অতঃপর সমস্ত চাষের জমির মালিক বলে গণ্য হবে চাষারাই, যারা নিজেরা চাষ করে। জমিদার, মোহন্ত জমিদার, জারের গোষ্ঠী এবং রাজপুরুষেরা, যারা জমি চাষ করে না, কোন জমির ওপর তাদের কোনো অধিকারই থাকবেনা। বিপ্লবী বলশেভিক সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সারা দেশে চাষারা নিজেদের এলাকায় জমিগুলোর দখল নিতে সুরু করে দিয়েছিল। শ্রমিকদের বিপ্লবী সরকার এক চোটে সারা দেশে কৃষকদের সমর্থন অর্জন করে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল।

৩২ সালে তাদের প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সম্পূর্ণ ও সফল হয়েছে। গুরুশিল্পের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—বড় বড় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে,—রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন, যা প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার পুনর্গঠন হয়েছে,—দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদন হয়েছে প্রচুর,—চাষের জন্য ট্র্যাক্টরও তৈরী হয়েছে প্রচুর,—এবং বড় বড় সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামারে সে সব ট্র্যাক্টর চলছে,—জলহীন অথচ উর্ব্বর কালোমাটীর বিশাল ভূখণ্ডে বড় বড় সেচ ব্যবস্থা হয়েছে,—এবং এই সব কাজের নতুন কেন্দ্রগুলোতে নতুন নতুন বড় বড় সহর গজিয়ে উঠেছে,—পুরোনো ও নতুন সহরে শত শত স্কুল ও হাসপাতাল হয়েছে।

নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন সর্বনিম্ন প্রয়োজনের স্তরে রয়ে গেছে,—কারণ আগের কাজ আগে করতে গিয়ে সর্বপ্রকার অর্থ ও শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন অগ্রাধিকার পাবে। সহরে বেকার নেই এবং সকলেই খেতে পায়। সকলে মিলে শ্রমোন্মাদে মাতোয়ারা।

যে ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো গোড়ায় তাদের পিষে মারতে চেয়েছিল,—তারপরে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়নি,—এবং তারপরে তাদের দেশগঠনের কাজে মোটা মাইনের বিশেষজ্ঞরূপে দলে দলে কাজ করতে গিয়েছিল,—তারা এই সময়ে কলকারখানাও নির্মাণস্থলে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে সুরু করেছিল। বিলাতের মেট্রোপলিটান ভিকার্স নামক ইঞ্জিয়ারিং কোম্পানীর ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের এই রকম ধ্বংসাত্মক কাজ ধরা পড়ে তাদের বিরুদ্ধে ৩৪ সালে মামলা হয়েছিল, এবং অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। তবু তাদের শাস্তিদান সম্বন্ধে বলশেভিক সরকার রীতিমত উদারতা দেখিয়েছিল। এসব খবর এক ইংরাজ কর্তৃক লিখিত পুস্তকের বিভিয়ু থেকে (ষ্টেটসম্যান কর্তৃক) আমরা জানতে পারি।

ধনবাদী দুনিয়ায় আর্থিক অবস্থা চলছিল এর বিপরীত। ২৯ সাল থেকে ৩৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট চলেছিল। ধনবাদী শাস্ত্রে আর্থিক সঙ্কটের স্বরূপ সকলে বোঝেন কিনা সন্দেহ। —এ আর্থিক সঙ্কট হচ্ছে বাড়তি উৎপাদন থেকে উদ্ভূত—Crisis of over-production, আবার ধনবাদী দেশের এই over-production কথাটার অর্থও চমৎকার। দেশের লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন,—সকলের সকল জিনিসের অভাব মিটে গিয়েও উদ্বৃত্ত হয়েছে,—সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, তারই নাম over-production,—এবং কথাটার ন্যায্য অর্থ এই হওয়াই উচিত। কিন্তু ধনবাদী শাস্ত্রে over-productionএর অর্থ "effective demand"এর অভাবে উৎপন্ন মাল জমে যাওয়া আর "effective demand"এর অভাবের অর্থ খরিদ্দারের অভাব। অর্থাৎ উৎপন্ন মাল খরিদ্দারের অভাবে জমে গেলে যে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ বা সংকোচ করতে হয়,—কাজ-কারবারে মন্দা, বেকারবৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দেয়,—সেই অবস্থার নামই economic crisis বা আর্থিক সঙ্কট। ২৯ সাল থেকে ৩৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র ধনবাদী দুনিয়ায় এই আর্থিক সঙ্কট চলেছিল।

অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপন্ন মালের কাটতি কমে গিয়ে মাল জমে গিয়েছিল, উৎপাদন সঙ্কোচ করতে হয়েছিল, বেকারী এবং জনগণের দুর্দ্দশা বাড়ছিল। এর মূল হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের আর্থিক অবস্থা। শিল্পপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী দেশগুলোতে যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমী যুদ্ধ-লিপ্ত দেশগুলো থেকে শিল্প-পণ্য আমদানী কমে যাওয়ায় বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছিল, লোকের দুর্দ্দশার অন্ত ছিলনা। একমাত্র শিল্পোন্নত প্রাচ্য দেশ জাপান যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ায়, এবং যুদ্ধটা ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকায়, প্রাচ্যের শিল্পপণ্যের বাজার প্রধানতঃ বৃটিশ মালের বাজার রীতিমত দখলকরে ফেলেছিল।

যুদ্ধের পর এইসব অনুন্নত দেশে অল্পবিস্তর economic nationalism বা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মনোভাব বা আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল,—এবং নিজেদের শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় বিদেশী মালের ওপর সংরক্ষণ-শুল্ক বসানো সুরু হয়েছিল। এই অবস্থার সঙ্গে বৃটেনকে জাপানী মালের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে তার প্রাক্-যুদ্ধকালের বাজার পুনর্দখল করা কঠিন হয়ে উঠেছিল, এবং তার ফলে রপ্তানী হ্রাস এবং over-production—উৎপাদন সংকোচ ও বেকার বৃদ্ধি চরমে উঠেছিল।

বৃটিশ বামপন্থী শ্রমিক-নেতা ফেনার ব্রকওয়ে ৩২ সালে বৃটেনের নানা সহর এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক-বস্তিতে বেকার শ্রমিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করে ৩২ সালে একখানা বই লিখেছিলেন—Hungry Britain—বস্তি এবং বেকার শ্রমিকদের দুর্দ্দশার সে চিত্র অভাবনীয়রূপে ভয়াবহ।

এ অবস্থার প্রতিকার ধনবাদী অর্থনীতি-শাস্ত্রে নেই,—তাই সে শাস্ত্রের অনুশাসন কিছু কিছু সংশোধন করে একটু-আধটু সমাজতান্ত্রিক রং চড়িয়ে বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীন্‌স এক "নূতন" অর্থ নৈতিক মতবাদ প্রকাশ করেন,—লোকে সেটার নাম দিয়েছিল new economics. আমেরিকায়ও এই আর্থিক সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট "new deal" নামে কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কানাডার এক মেজর ডগ্‌লাস "Social Credit" নামক এক নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কার এবং চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। এইসব নূতন নূতন প্ল্যানের একটাও কার্যকরী হয়নি। কয়েক বছরে

উৎপাদন সংকোচের পর জমা মাল কেটে যাওয়ার পর স্বভাবতই আর্থিক সঙ্কটের অবসান হয়,—অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদন আবার চালু হয়।

আমাদের দেশে তখন প্রাক্‌যুদ্ধের বিনিময় হার ১\ = ১শিঃ ৪ পেঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন সুরু হয়েছে,—এবং ভারতের বৃটিশ অর্থসচিব ১ শিঃ ৬ পেঃ বিনিময় হার পর্যন্ত নামতে রাজী—তার নিচে নয়—এই নিয়ে,—অর্থাৎ ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনের সঙ্গে বৃটেনের রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনের লড়াই সুরু হয়েছে।

ওদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও ভাঙ্গাগড়া চলেছে। যুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থায় জার্মানীর ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সে সময়ে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ নরম্যান অ্যাঞ্জেল্স Great Illusion নামক এক বই লিখে বলেছিলেন, মিত্রশক্তি এবং জার্মান অর্থনীতিবিদ সন্ধিসভার প্রতিনিধিরা নির্বোধের মতন যে বিরাট বিরাট অঙ্কের ঋণের বোঝা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছেন, সেটার কোনো মানে হয় না,—কারণ এই বিরাট ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রকৃত পক্ষে আদায়ই হয় না। জার্মানীর যে শিল্পশক্তি তার সামরিক শক্তির উৎস,—খেসারতের বিপুল অর্থ আদায় করতে হলে সেই শিল্পশক্তির পুনর্গঠনে সাহায্য করতে হয়,—আর জার্মান শিল্পজাত মাল মুফতে আমদানী করে খেসারৎ আদায় করতে গিয়ে দেশের শিল্পোৎপাদন সংকোচ করতে হয়,—বেকারী ও জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়—তার জন্যে Social Insuranceএর খরচ বাড়াতে হয়। এ কথাগুলো পরবর্তীকালে বাস্তবে মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

জার্মানীর কয়লা-শিল্পকেন্দ্র সার প্রদেশটার শাসন এক ইণ্টার-ন্যাশান্যাল কমিশনের হাতে দেওয়া হয় ১৫ বছরের জন্যে—এবং সেখানকার উৎপন্ন কয়লা সবটাই ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্স পাবে, স্থির হয়। এর ফল হল বড় মজার। ফ্রান্সের হাতে প্রচুর কয়লা আসায় ফ্রান্স আন্তর্জাতিক কয়লার বাজারে বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো, এবং বৃটেনের কয়লাশিল্প প্রচণ্ড আঘাত খেলো।

ফলে জাতিসংঘের সভায় জার্মানী পুনরস্ত্রসজ্জার দাবী পেশ করলে, ফ্রান্স করলে তার প্রবল বিরোধিতা, এবং বৃটেন করলে সমর্থন। মিত্রশক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে জার্মানী একে একে ভার্সাই-চুক্তির সর্ত অগ্রাহ্য করে চলতে সুরু করলো। ক্ষতিপূরণ আদায়ের নতুন নতুন প্ল্যান—ইয়ং প্ল্যান, ডজ প্ল্যান প্রভৃতি একে একে অকেজো হতে লাগলো। সর্বশ্রেণীর জার্মাণদের মনেই ভার্সাই-চুক্তি একটা জগদ্দলের মতন চেপে বসেছিল,—এবং ভার্সাই চুক্তি বিরোধিতার উপরই একটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলো—হিটলারের ন্যাশান্যাল সোসিয়ালিষ্ট পার্টি বা নাৎসী দল।

সংগঠনটা হল সেমি-মিলিটারী এবং তার প্রকৃতি হল সন্ত্রাসবাদী। টাকা জোগাতে লাগলো ক্রোড়পতি থাইসেন-রোজেনবার্গ প্রভৃতি। ধরুন যেমন আমাদের দেশে নলিনী সরকার-মহারাজা সূর্যকান্ত টাকা জোগাচ্ছেন, এবং আমাদের মধুদা' (সুরেন ঘোষ) দল গড়ছেন। ইটালীতে মুসোলিনী কর্তৃক যে ফ্যাসিজম্ প্রবর্তিত হয়েছিল, জার্মাণ

নাৎসীদলও গঠিত হল সেই আদর্শেই। মুসোলিনী তখন দাদা,—হিটলার ছোট ভাইটি।

ভার্সাই-চুক্তির পর জাতিসংঘ গঠিত হয়—এবং তার প্ল্যানটা তৈরি করেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন। আমেরিকা ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত থাকবে না বলে' জাতিসংঘে যোগ দেয় না, —এবং পরাজিত জার্মাণীকে জাতিসংঘে আসন দেওয়া হয় না।

এখানে ভারত সম্বন্ধে একটু মজাদার ইতিহাস এসে পড়ছে। ভারত যে একটা Self Governing Country, এই অজুহাতে বৃটেন ভার্সাই সন্ধি সভায় তার এক মাইনে-করা "ভারতীয় প্রতিনিধি" নিয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলেন, ওটাকে এনেছো কেন? বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মাথা চুলকে আমতা আমতা করে জবাব দেন,—ওরা লড়াইয়ে অনেক খেটেছে এবং মরেছে,—তাই। উইলসন বল্লেন,—বেশ,—বসে থাকুক,—ভোট দিতে পারবে না। সেই ব্যবস্থাই বৃটেন মেনে নেয়। যুদ্ধে ইটালী মিত্রশক্তির পক্ষে লড়েছিল, কিন্তু ভার্সাইয়ের লুটের যথোচিত বখরা পায়নি বলে চটেছিল। ইটালীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনও বেড়ে চলেছিল, গভর্ণমেণ্ট বাগ মানাতে পারছিল না। এই অবস্থায় মুসোলিনী তার কমিউনিষ্ট-বিরোধী দলবল নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে এবং রাজা মুসোলিনীকে সরকারী কর্তৃত্ব দেন। এই ভাবে মুসোলিনী ও ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা হয়। সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থা সাহায্যে মুসোলিনী কমিউনিষ্টদের দমন করে' ডিক্টেটরী শাসনের প্রবর্তন করেন,—এবং প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করার ধুয়ো তুলে আবিসিনিয়া দখলের প্ল্যান এঁটে নৌ-বহরকে শক্তিশালী করতে থাকেন। এ বিষয়ে ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। ওদিকে জাতিসংঘের আদর্শ নিরস্ত্রীকরণ, এবং তার জন্যে সভা এবং আলোচনাও চলে—ফ্রান্স-ইটালীর এই প্রতিযোগিতা রুখতে পারে না এবং ৩১।৩২ সালে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল করে।

এশিয়ায় জাপানও ৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করে পু-ই নামক এক ছোকরাকে রাজা সাজিয়ে বসায় এবং অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। জাতিসংঘ সে বিষয়েও কিছুই করতে পারেনা।

ফলতঃ ধনবাদী দুনিয়ায় আর্থিক সংকট, জাতিসংঘের ব্যর্থতা, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রভৃতি মিলে জার্মানীতে হিটলারের সাফল্য চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, এবং হিটলার ৩৩ সালে জার্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার—চ্যান্সেলার—হন। সুতরাং এই সময়টা থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠনের দিকে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই সময়কার চিত্র অপরূপ। রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভার প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতে আসার পর ৩২ সালের গোড়াতেই মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়,—সারা দেশে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়,—কংগ্রেস ও তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থা বেআইনী ঘোষণা করে তাদের ছাপাখানা, তহবিল, অফিস প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হয়,—এবং ৩২ সালে মে মাসে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের রিপোর্টে জানা যায়, মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়েছে ৮০ হাজার—এসব কথা আগে বলা হয়েছে।

তারপর এল ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশী প্রতিনিধি (ব্যবস্থা পরিষদে) দেওয়ার সঙ্গে অনুন্নত সম্প্রদায়ের—পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে—এই অজুহাতে মহাত্মাজী ৩২ সালের সেপ্টেম্বরে "আমৃত্যু অনশন" ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই তিনি জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের দিক থেকে হরিজন সেবার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন এবং সেটা ঘোষণা করেছিলেন। এখন তাঁর "আমৃত্যু অনশন" সুরু হওয়ায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারা—ডাঃ আম্বেদকর পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং তার ফলে হল পুণা প্যাক্ট—তাদের প্রতিনিধিসংখ্যা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে "জয়েণ্ট ইলেক্টোরেট" ব্যবস্থায় রাজী করা হল। এই পুণা প্যাক্ট এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এক বিচিত্র ইতিহাস আছে,—যা অনেকেই জানেননা। সে কথা আগামী সংখ্যার জন্য রেখে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিচিত্র পরিণতির কথাই আপাতত চলুক।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে বেআইনী কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসলো কলকাতায়, ময়দানে—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে (ঠিকমনে নেই), পুলিশ লাঠিচার্জ করে' সে কংগ্রেস ভেঙ্গে দেয়। মালব্যের হিসাব অনুসারে তখন গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০০০০। সারা দেশে পুলিশ-মিলিটারীর তাণ্ডব চলছে—লাঠি-গুলীর সঙ্গে পিটুনী-পুলিশ অভিযান, পাইকারী জরিমানা, জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—সবই চলছে। নেতৃহীন জনগণও অহিংসভাবে লড়ে' চলেছে। এই অবস্থার মধ্যেও গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া যে কংগ্রেসের শাস্ত্রে মহাপাপ, জেল থেকে মহাত্মাজীরা এই অনুশাসন প্রচার করছেন।

৩৩ সালের মে মাসে আর এক অনশন সুরু করলেন,—উদ্দেশ্য নিজের এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের পাপমোচন (purification) এবং হরিজন (depressed class, অস্পৃশ্য) সেবার দিকে অধিকতর ঘনিষ্ট ভাবে আত্মনিয়োগের জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা।

পাপমোচন হলও। সরকার মহাত্মাজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দিলে। এবং কংগ্রেসের অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেণ্ট তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে' ছয় সপ্তাহের জন্যে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করলেন।

অবস্থা দেখে ইউরোপ থেকে বিঠলভাই ঝাবেরভাই প্যাটেল (সর্দার প্যাটেলের দাদা) এবং সুভাষচন্দ্র বসু এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে বললেন,—আইন-অমান্য আন্দোলনরূপ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে,—সুতরাং নূতন নেতৃত্বে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজা প্রয়োজন।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো বাস্তব অবস্থা বদলায় না। মহাত্মাজীই কংগ্রেসের কর্ণধারণ করে রইলেন,—এবং বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন (জুলাই, ১৯৩৩)। বড়লাট অনুমতি দিলেন না। কিন্তু তবু তারপরেই কংগ্রেস নেতারা "গণসত্যাগ্রহ" বন্ধ করে দিলেন, এবং পিতিরক্ষার জন্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালু রাখলেন।

সরকার এসব পরিবর্তন গ্রাহ্য করলে না—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদের ওপর অত্যাচার সমানে চালিয়ে চললো। আগষ্ট মাসে (৩৩) আবার মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করলো এবং মাস কাবার হওয়ার আগেই ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজীও রাজনীতি ছেড়ে "হরিজন সফরে" বেরিয়ে পড়লেন। ৩৩ সাল শেষ হল। আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছি—সাত মাস ধরে' বদলীর জন্যে লেখালেখি করছি। হঠাৎ একদিন আমার বদলীর খবর এসে হাজির—কলকাতায় নয়, বহরমপুর বন্দীশালায়। চললুম বহরমপুরে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, আই-ই-এস্

[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষতের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট]

শ্রীহট্টের যে চন্দ-পরিবারটির সুনাম ও ঐতিহ্য বহুদূরব্যাপী ছড়িয়ে আছে, সেই পরিবারেরই একটি উজ্জল বিকাশ শ্রীঅপূর্বকুমার। দেশের শিক্ষা ও সমুন্নতির নানা ক্ষেত্রে এই মানুষটির যোগ্যতার স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। একজন শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ হিসাবেই নয়, কর্ম-জীবনে শিক্ষা-সংগঠক হিসাবেও তিনি প্রমাণিত করেছেন আপন বৈশিষ্ট্য।

১৮৯৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচন্দ জন্মগ্রহণ করেন আসামের শিলচরে। পূজ্যপাদ পিতৃদেব কামিনীকুমার চন্দ ছিলেন সে সময়কার একজন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী ও দেশসেবক। ছেলেদের ওপর তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও চরিত্রগত প্রভাব বিশেষ রকম পড়ে—যার দরুণ অপূর্বকুমার, অরুণকুমার (বর্তমানে স্বর্গগত), অশোককুমার ও অনিলকুমার—সব কয়টি ছেলেই বড় হবার স্বপ্ন দেখেন এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথও খুঁজে পান।

অপূর্বকুমারের সমগ্র ছাত্র-জীবন বিশেষ গৌরবমণ্ডিত ও সফলতা-পরিপূর্ণ। প্রথম পাঠ তিনি অবশ্য সুরু করেন শিলচরের বিদ্যালয়েই। কিন্তু অল্পদিনের ভেতরই শান্তিনিকেতনে যেয়ে পড়াশুনোর সুযোগ মিলে যায় তাঁর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তিনি আসতে পারেন সে সময়ই। পরবর্ত্তী জীবনেও বহুদিন কেটেছে তাঁর বিশ্বকবির কাছাকাছি থেকে—যে স্মৃতি আজও তাঁর নিকট পরম সুখাবহ।

শান্তিনিকেতনে বছর দুই কাটিয়ে শ্রীচন্দ চলে যান বারাণসী এবং সেখানে যেয়ে ভর্ত্তি হন সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১০ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দু' বছর বাদে বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তারপরই তাঁর অন্তরে দেখা দেয় উচ্চশিক্ষা ও ব্যাপকতর জ্ঞানার্জনের দুরন্ত তাগিদ। চলে যান তিনি সরাসরি বিলেতে—অক্সফার্ড থেকে ইংরেজী সাহিত্যে ডিগ্রী পেতেও (১৯১৭ সাল) তাঁর বিলম্ব হয় না। বছর তিন মধ্যেই তাঁর খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত হয়—প্রভূত সম্মানজনক আই-ই-এস পদে তিনি মনোনয়ন লাভ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট সমুন্নত হয়ে অপূর্বকুমার স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯১৯ সালে। তারপর থেকে সুরু হয় তাঁর কর্মজীবনের সর্বাধিক উজ্জ্বল অধ্যায়। প্রথম মুহূর্তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে যোগদান করেন। অধ্যাপক হিসাবে দক্ষতা প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। এবারে কলকাতা ছেড়ে চলে যান তিনি ঢাকায় এবং সেখানকার কলেজে প্রথমেই সিনিয়র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যক্ষপদ তিনি অলঙ্কৃত করেন। তাঁর যোগ্যতা বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেলো এইখানে।

ইতোমধ্যে শ্রীচন্দকে আবার টেনে আনা হলো কলকাতায়—প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী অধ্যাপকের আসন তিনি পেলেন। তারপর একে একে কৃষ্ণনগর কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ—এ সকল উচ্চশিক্ষাসংস্থার অধ্যক্ষের দায়িত্ববহুল পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হন। কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবকমণ্ডলী—সকল মহলে তাঁর তখন বিশেষ সুনাম ও পরিচিতি।

আপন যোগ্যতা ও অধিকারবলে অপূর্বকুমার তৎকালীন বাংলা সরকারের নিকট আরও নানাভাবে মর্যাদা আদায় করেন। ১৯৩৪ সালে কিছুদিনের জন্যে তাঁকে জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হয়। এখানেও অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিশিষ্টতার ছাপ রাখতে সমর্থ হন। যার ফলে তিনি ছয় মাসকাল অস্থায়ী ডি, পি, আই, হিসাবেও কার্য্য পরিচালনার সুযোগ পান। অতিরিক্ত ডি, পি, আই'র দায়িত্বভার তাঁর ওপর অর্পিত হয় ১৯৪৫ সালে। পর বৎসরই পাকাপাকিভাবে জনশিক্ষা বিভাগীয় ডিরেক্টারের আসনটি তিনি অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভারও একজন সদস্য।

জাতির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শ্রী চন্দ বিদেশ সফরে গেছেন কয়েকবারই। ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালীন তিনি ভারতের হয়ে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনশিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন। তারও আগে ১৯২৯ সালে ভারতের পক্ষ (ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস) থেকেই তিনি গিয়েছিলেন কানাডায়—সেখানে সে সময় ছিল 'শিক্ষা ও বিরাম' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান। ঐ সম্মেলনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সম্মেলন শেষে বিশ্বকবির সঙ্গেই জাপান প্রভৃতি কয়েকটি দেশ সফরের সুযোগ মিলে যায় তাঁর।

অপূর্বকুমার যখন সরকারী উন্নয়ন বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী, তখন তাঁরই ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইউরোপে যেয়ে দেশীয় সংস্থাগুলোর জন্যে যন্ত্র-কুশলী (টেকনিশিয়ান) সংগ্রহ করে আনার। এই দায়িত্বটিও সেদিনে তিনি অপূর্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেন।

শ্রী চন্দের কর্মবহুল জীবন এইখানেই কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে পর শ্রীচন্দ অবসর গ্রহণের প্রাক্কালীন ছুটিতে যান বটে, কিন্তু তাঁকে আবার আহ্বান করা হয় কাজের জগতে। এই সময় তাঁর হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি মাদ্রাজ রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের গুরু কার্যভার গ্রহণ করেন। দু' বছর যেতে না যেতেই আবার তাঁর নিকট ডাক পৌঁছে সমস্যাসঙ্কুল বাংলার। অপূর্বকুমার এবার একটি নতুন আসন পেলেন এবং সে বুঝি আরও দায়িত্বসম্পন্ন। তাঁকে সসম্মানে নিযুক্ত করা হয় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-পর্ষতের প্রথম প্রেসিডেণ্ট—যে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তিনি ১৯৫৩ সাল অবধি।

তারপর থেকে চলেছে অপূর্ব্বকুমারের তথাকথিত অবসর জীবন। 'তথাকথিত' বলা হচ্ছে এইজন্ত যে, আসলে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও অবসর-অলস জীবন কাটাতে রাজী নন। এ নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। আজও তাই তাঁকে সবসময় কর্মব্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কিছুকাল থেকেই তিনি ভারত সেবক সমাজের প্রদেশ আহ্বায়ক। তাঁর কাছ থেকে যুব বাংলার এখনও অনেক শিখবার-জানবার আছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র রায়

[এলাহাবাদ 'নর্দ্দান ইণ্ডিয়া পত্রিকা'র সম্পাদক]

বিদেশী শাসনকালে স্বদেশী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রভৃত আয়োজন করেন ইংরাজ শাসকবর্গ। আবার বিপ্লব-পন্থী বঙ্গের প্রেসের উপর সে চাপ ছিল দুর্দ্দমনীয়। যদিও আইনতঃ ও সাক্ষাৎভাবে সম্পাদকের উপর সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িত, তবুও তাঁহার সহকারীদের বহু সময় বহু দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইত। কোন সহকারী যদি আবার স্বদেশসেবীর সন্তান হতেন, তবে নির্য্যাতন কিছুটা বেশী হত।

ময়মনসিংহ জেলার বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ও ভূম্যধিকারী ৺চন্দ্রকুমার রায়ের তৃতীয় পুত্র এবং এলাহাবাদ 'নর্দ্দান ইণ্ডিয়া পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীহেমচন্দ্র রায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রমোদ রায় ছিলেন একজন বিপ্লব-পন্থী নেতা। চন্দ্র কুমারবাবুর নিকট হইতে বিপ্লব-পন্থী ও অহিংসাবাদীরা বরাবর সমভাবে আর্থিক, নৈতিক ও গোপন সাহায্য প্রচুর পেয়েছেন। তা ছাড়া অভাবগ্রস্ত প্রজারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মনে করিতেন।

স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র আনন্দমোহন কলেজ হইতে আই-এ, কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য আগ্রহান্বিত হন—তজ্জন্য সংবাদপত্র-জগতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। একদিন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে এক বক্তৃতার আয়োজনে হেমচন্দ্র শ্রীমতী কুমুদিনী ও শ্রীশচীন্দ্র বসুর সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা হলেন প্রখ্যাত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা ও জামাতা। তাঁহাদের মাধ্যমে শ্রীরায় পরিচিত হলেন স্বনামধন্য মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। সুযোগ এল সাংবাদিকতার হাতে খড়িতে। 'সঞ্জীবনী' সম্পাদকের অনুপ্রেরণা তাঁহার মনে প্রচুর উৎসাহ দিল। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের নিকট শিক্ষানবিশী করিতে থাকেন। তখন শ্রীঘোষ 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক। উঁহার বার্ত্তাসম্পাদক শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ও হেমচন্দ্রকে প্রচুর সাহায্য করেন। ইঁহার পর শ্রীরায় একদিন এ্যাডভান্স-সম্পাদক স্বর্গীয় পি, কে, চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০—৩৭সাল পর্য্যন্ত তিনি 'এ্যাডভান্স'এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইউ, পি, আই, এর পার্ট-টাইম রিপোর্টার নিযুক্ত হন। কিন্তু রিপোর্টারের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হল সর্টহ্যাণ্ড। তজ্জন্য শ্রীরায় উহা শিখিতে থাকেন এবং তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই ব্যাপারে শ্রীমতী রায়ের উদ্দীপনা উল্লেখযোগ্য। 'এ্যাডভান্স'এ তিনি প্রুফরীডার, হেডরীডার, সাব-এডিটর ও সহঃ-সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি 'পত্রিকা'র এলাহাবাদ অফিসে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে নব-প্রবর্ত্তিত 'নর্দ্দান ইণ্ডিয়া পত্রিকা'র সম্পাদকপদে বৃত হন।

শ্রীহেমচন্দ্র রায়

রিপোর্টার হিসাবে তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার পরিচয় ছিল। শ্রীরায় মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের মতন conversationalist হয় না। ১৯৩৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি শ্রীরায়কে দেশ-বিভাগ যে অবার্থ, তাহা জানান—কিন্তু উহা প্রকাশ করিতে বারণ করেন। ভবিষ্যত-দ্রষ্টা কবির কথা কয়েক বৎসর পরে বাস্তবরূপ গ্রহণ করে।

ভিন্ন প্রদেশে বাঙ্গালীর সম্মান ও গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি সম্পাদক শ্রী রায় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছেন। উপরন্ত সেই প্রদেশবাসীর ও বাঙ্গালীর স্বার্থ-সমন্বয়ের জন্য তিনি চেষ্টিত। উত্তর-ভারতে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণকায়। তবুও শ্রীরায় তৎসম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে বহির্বঙ্গে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীরায় জানান যে, বর্ত্তমানে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে সংবাদপত্র পরিচালনা ও সাংবাদিকতা দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ ছিল—এখন উহা ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছে। মনোবৃত্তি এবং আদর্শের গভীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা সাংবাদিকতা-স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত সংবাদপত্র-সেবী এখন অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন। তজ্জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক-কর্ম্মচারী সঙ্ঘর্ষ সংবাদপত্র-জগতে প্রবেশ করিয়াছে। যদি সাংবাদিকরা মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের পুনরায় সঞ্জীবিত করিতে না পারেন, তবে সাংবাদিকতার আদর্শ খর্ব্ব হইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীতিনকড়ি মিত্র, আই-এস্-ই

[রাজ্য-সরকারের অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার]

শ্রীতিনকড়ি মিত্র

ছেলেবেলা থেকেই হাতে-কলমে কাজ করার প্রবল ঝোঁক ছিল এই মানুষটির। অন্তরের ভেতর হতে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন—যার দরুণ এগিয়ে চলবার পথ তাঁর প্রশস্ত হয় ধাপে ধাপে। কী করে বড় হতে পারবেন, নিষ্ঠাবান্ গঠনকর্ম্মী হবেন, এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা ও দাবী। কৈশোরের সেই স্বপ্ন ও সাধনার সত্যি একটি সার্থক পরিণতি স্বনামধন্য ইঞ্জিনীয়ার শ্রীতিনকড়ি মিত্র।

কলকাতার হোগলকুড়ের বিখ্যাত মিত্রবংশে শ্রীতিনকড়ি জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০ সালে। তাঁর পিতা ৺শরৎচন্দ্র মিত্র ছিলেন সেকালের একজন নামকরা আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ্। পুত্রের জীবন নিতান্ত সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক, এর জন্যে তিনি অপরিসীম যত্ন নেন গোড়া থেকেই। মাতা শ্রীযুক্তা সরসীবালাও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই লক্ষ্য নিয়ে আশিস্-বর্ষণ করে চলেন। এমনি অনুকূল পরিবেশে তিনকড়ির পড়াশুনো আরম্ভ হয়—জীবন-সংগঠনে তাঁকে ব্রতী হতে দেখা যায় নিবিড়ভাবে।

প্রাথমিক পড়াশুনো বাংলার বাইরে হলেও শ্রীমিত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কলকাতার স্কুল (সেণ্ট পল কলেজিয়েট স্কুল) থেকেই। সে অবশ্য ১৯১৬ সালের কথা। ১৯১৮ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হতে তিনি আই-এস্-সি পাশ করেন এবং তারপরই সুরু হয় তাঁর সঙ্কল্পিত ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়ন। নিজের মনোমত লাইনে যেতে পারায় তিনকড়ি বিশেষ উৎসাহবোধ করেন। আই. ই. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মর্য্যাদাস্বরূপ ফোরবস পদক ও বৃত্তি পান তিনি। ফাইন্যাল বি. ই. পরীক্ষাতেও (১৯২২) তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পায়—গুণানুসারে এতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৩ সালে নির্দ্দিষ্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে আই. এস্. ই (ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার সার্ভিস) পদে নিযুক্ত হন তিনি সগৌরবে।

শ্রীমিত্রের কর্ম্মজীবন কলকাতায় সুরু হয় বটে, কিন্তু এখানে বেশীদিন থাকা সম্ভব হয় না। নতুন দায়িত্বভার নিয়ে তাঁকে যেতে হয় ঢাকায় এবং তারপরই বরিশালে। তখন তিনি সহকারী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে ছিলেন অধিষ্ঠিত। বরিশাল থেকে কালিম্পং, কালিম্পং থেকে ডুয়ার্স ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আবার তিনি চলে আসেন কলকাতায়—প্রেসিডেন্সী সার্কেলের সিটি ডিভিশনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যভার তখন তাঁর হাতে। ১৯৪০ সাল নাগাদ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব নিয়েই তিনি দার্জ্জিলিং যান।

ইত্যবসরে শ্রীতিনকড়ির যোগ্যতার কথা সরকারী ও বেসরকারী মহলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে নতুন মর্য্যাদায় ভূষিত করা হয়—দার্জ্জিলিং নর্দ্দার্ন সার্কেলের তিনি নিযুক্ত হন সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয়কে এই শ্রেণীর দায়িত্বশীল পদে বসানো হয়নি। দার্জ্জিলিং থেকে একই দায়িত্বভার নিয়ে তিনি আসেন হুগলীতে (সেণ্ট পল সার্কেল)। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। সাময়িক কারণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তখন অনেকটা প্রশস্ত করার প্রয়োজন হয়। শ্রীমিত্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে এই কাজটি সেদিকে সম্পন্ন হয়—যার পুরো সুবিধা আজও ভোগ করতে পারা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের সড়ক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শ্রীমিত্রের অবদান রয়েছে সত্যি অনেকখানি। ১৯৪৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ এলাকার সড়ক উন্নয়নের ব্যাপারে আবশ্যক বিধি-ব্যবস্থার জন্যে তাঁকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে (স্বাধীন আমল) তিনি পশ্চিম বঙ্গের পূর্ত্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। নিতান্ত দক্ষতার সহিত এই পদের গুরুদায়িত্বভার তিনি পালন করে চলেন এবং তাঁর সমাদরও হয় প্রচুর।

১৯৫৫ সালে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদ থেকে শ্রীতিনকড়ি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পদিন বাদেই সরকার তাঁকে আবার আহ্বান করে আনেন এবং নিয়োগ করেন তাঁকে সরকারী গৃহনির্ম্মাণ বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে। দু-বছর পরই অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে তিনি নিযুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক-সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি এই পদ থেকেও অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি অলঙ্কৃত করে আছেন রাজ্য গৃহ নির্ম্মাণ পর্ষদের (সরকারী) পরিকল্পনা শাখার চেয়ারম্যানের সম্মানজনক আসন।

ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে শ্রীমিত্রের দক্ষতা ও কর্ম্মশক্তির স্বাক্ষর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বহু যায়গায়। কলকাতার নতুন সেক্রেটারীয়েট ভবন (১৫ তলা), ব্যারাকপুরস্থ গান্ধীঘাট, বেলগাছিয়া ব্রিজ এবং এন্ আর সরকার হাসপাতাল, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল প্রভৃতির সম্প্রসারণ—এসব বড় বড় নির্ম্মাণ-কাজ তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। সেজন্য তিনি বহুদিন দেশবাসীর নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, এ বলা যায়।

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্র নাথ দে

[বিশিষ্ট চিকিৎসক]

এই আড়ম্বরবিহীন, মিষ্টভাষী, সদালাপী লোকটিকে দেখিলে বোঝা যায় না যে, এই লোকটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী কিম্বা কোন বিশেষ গুণের অধিকারী। কিন্তু যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসিয়াছেন কিম্বা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সহিত মিশিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জানেন কি গুণ তাঁহার মধ্যে নিহিত আছে। আজ হ'তে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ থানার এলাকাধীন ডাহুকা নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে ডাক্তার দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পরলোকগত গঙ্গা-নারায়ণ দে মহাশয় একজন বিচক্ষণ বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন। ডাক্তার দে শৈশবে গ্রাম্য প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন ও ইংরাজি ১৯০৫ সালে ফাইন্যাল পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি আকুই মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন (এখন এই বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে) এবং ইংরাজী ১৯১০ সালে উক্ত বিদ্যালয় (আকুই মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়) হইতে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। পার্শ্ববর্ত্তী মান্দাড়া গ্রাম নিবাসী পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ্ আশুতোষ বসু মহাশয় তৎকালীন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই বালকের (ডাঃ দের) মধ্যে প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পান ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই বালক একদিন দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। সত্যই তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল ও উক্ত বিদ্যালয়টিরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল! অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় আসেন ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯১৪ সালে উক্ত বিদ্যালয় হইতে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি ১৯১৬ সালে ১ম বিভাগে আই, এস, সি পাশ করেন।

আই, এস, সি, পাশ করিবার পর তাঁর ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছা প্রবল হয় ও তিনি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯২২ সালে তিনি এম্-বি, পাশ করেন। নিম্নে তাঁর গুণাবলীর ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহা প্রদত্ত হইল :—

১। প্রাইমারী ১৯০৫ সাল বৃত্তিলাভ। ২। মধ্য ইংরাজী ১৯১০ সাল বৃত্তিলাভ। ৩। ম্যাট্রিক—১৯১৪ সাল। ৪। আই, এস্ সি ১৯১৬ সাল (২২শ স্থান অধিকারর)। ৫। এম্, বি, ১৯২২ সাল। ৬। ডি, টি, এম (কলিঃ) ১৯৩৫ সাল। ৭। ডি, পি, এম (লণ্ডন) ১৯৩৮ সাল। ৮। এম, আর, সি, পি (এডিনবরা) ১৯৩৯ সাল। ৯। Certified Psychoanalyst ১৯৪৬ সাল। ১০। In-Charge of Dept. of Neurology & Psychiatry, Calcutta Madical College—১৯৪৯—১৯৫৭ সাল। ১১। Hony. Psychiatrist, Lumbini Park ১৯৪০—অদ্যতক। ১২। Hony. Physician in Mental Diseases. Dum-Dum Central and Presidency Jails—১৯৪১ অদ্য তক। ১৩। Lecturer Post Graduate Dept. of Psychology, Calcutta University—১৯৪১ অদ্য তক। ১৪। Head of the Dept. of Psychological Medicine, University College—১৯৫৯ অদ্যতক।

লোকচক্ষের অন্তরালে ডাক্তার দের অনেক দান আছে। অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের ইনি সাহায্য করেন। বিনা পারিশ্রমিকে অনেক রোগীকে দেখেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন, যাঁহারা তাঁর নিকট প্রকৃতই গরীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেশের কোন পরিচিত রোগী কলিকাতায় তাঁর নিকটে গেলে তিনি যত্নসহকারে তাঁকে দেখেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন। ডাক্তার দে কলিকাতা প্রবাসী হইলেও তিনি তাঁর জন্মভূমির প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রতি বৎসর তাঁর স্বগ্রাম ডাহুকায় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তাঁর আসা চাইই ও তিনি এই সময় কলিকাতায় কোন জরুরী কাজ থাকিলেও তাহা উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ কারন না। এরূপ প্রখ্যাত চিকিৎসক হইয়াও তিনি নিরভিমান। একসময়ে তাঁর নিজ গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে এক ভদ্র গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যায়; ডাক্তার দে তখন দেশে তাঁর নিজ বাড়ীতে ছিলেন। তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণকার্য্যে অগ্রণী হন ও অর্থ বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করেন। ডাক্তার দে এখন বৃদ্ধের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছেন, তাঁর দেশবাসী তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত তথ্যগুলির অনেকাংশ ডাক্তার দের অগ্রজ প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীসুসন্তোষ কুমার দে এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈশপের উপদেশ

'Any excuse will serve a tyrant.'

'Little friends may prove great friends.'

'Gratitude is the sign of the noble souls.'

'It is easy to despise what you can not get.'

'Familiarity breeds contempt.'

'A liar will not be beleived even when he speaks truth.'

'Never trust a friend who deserts you at a pinch.'

—From *Æsop's Fables.*

প্রদর্শনী : আধুনিক ও প্রাচীন চিত্রকলা : কারুশিল্প

অশোক ভট্টাচার্য

সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিষ্ট্‌স-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী আর্টিষ্ট্রি হাউসে গত ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির বিশেষ গুরুত্ব এই যে, মোটামুটি একই চিন্তাধারায় চিন্তিত এবং একই শিল্পাদর্শে বিশ্বাসী বেশ কয়েকজন সম্ভাবনা-সম্পন্ন তরুণ শিল্পী এখানে নিজেদের শিল্প কর্মকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। অবশ্য প্রদর্শক শিল্পীদের মধ্যে দু-একজন আছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই কৃতীশিল্পী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন যেমন অনিলবরণ সাহা এবং সোমনাথ হোড়।

এ কথা যদিও অস্বীকার করা যায় না যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের বিশেষ ছাপ প্রদর্শনীর বিভিন্ন ছবির মধ্যে পরিস্ফুট, তবু সামগ্রিক ভাবে এই প্রদর্শনী আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর প্রয়াস সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত করে তোলে না। কারণ তরুণ শিল্পীদের মধ্যে মাত্র দু-একজনই যা সামান্যতম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দুঃখের হলেও একথা উল্লেখ না করে পারা যায় না, এমন ছবি প্রদর্শনীতে উপস্থিত আছে যা অন্য খ্যাতনামা শিল্পীর সুপরিচিত ছবিকে দর্শন মাত্র মনে করিয়ে দেয়। শিল্পাদর্শ সম্পর্কে শিল্পীদের নিজস্ব চিন্তার অভাবই হয় তো এই দীনতার কারণ। তবু কোনো কোনো তরুণ শিল্পীর রচনায় তেল রং ব্যবহারের ব্যাপারে যে স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা গেল, তাই হলো এই প্রদর্শনীর সব থেকে বড় আশার দিক।

প্রদর্শিত চিত্রাবলীর মধ্যে যে শিল্পীর সব কটি ছবিই রসোত্তীর্ণ, তিনি হলেন অনিলবরণ সাহা। তার ষাঁড় (২১), খিলান সমূহ (২২) এবং মতিমসজিদ (২৩) তিনটি ছবিই রঙের সুমিত ব্যবহারে এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থক। খিলান সমূহ ছবিটির বস্তু সংস্থাপন (composition) এবং পরিপ্রেক্ষিত রচনা সফল হয়েছে; ষাঁড়ের ছবিটিতে যে বর্তুলতা ও ঘনত্ব আরোপিত হয়েছে তা স্বভাবতই গুণগত ভাবে মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত সীলটির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু পাশাপাশি ভাবে সোমনাথ হোড়ের ছবি তেমন উজ্জ্বল নয়। একদা বিখ্যাত শিল্পী, যিনি কি না গ্রাফিক আর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ এক মান-নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই শ্রীযুক্ত হোড়ের ইদানীংকার তেলরঙের ছবিগুলি দর্শকসমাজ ও তাঁর শিল্পকৃতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তাঁর শিল্প রচনার বর্তমান অবস্থাকে একটা বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর হিসাবে গ্রহণ করেও, যদি কেউ তাঁর শাদা মেয়ে (৩) ছবিটি দেখে শিল্পীকে আপন শিল্প-সাধনায় মার্গচ্যুত মনে করেন তবে হয়তো তা অন্যায় হবে না।

মা (কাঠ খোদাই) শিল্পী সুভাষ রায়

অন্যান্য শিল্পীদের রচনার মধ্যে সনৎ করের সিঁড়ি (২৫), প্রকাশ কর্মকারের ক্ষুধা (৩০), অরুণ বোসের একটি ষাঁড় (২৪) এবং শৈলেন মিত্রের অনাহারে মৃত (১৭) ছবি কটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্যামল দত্তরায়ের যাদুকর (২৪) ছবিটি সুনিপুণ বর্ণ-প্রয়োগে ও বস্তুসংস্থাপনের গুণে এবং অরুণাভ দত্তের রক্তিম রাত (৪২) বস্তু সংস্থাপনে ও পরিবেশ রচনায় অধিকতর সফলকাম। সুভাষ রায়ের মা (৪০) নামক কাঠখোদাইটি প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনা (১৭) ও সহ-অবস্থান (৪৮) দুটি ছবিই উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয়টি যদিও

খিলানশ্রেণী : শিল্পী অনিলবরণ সাহা

কিছু পরিমাণে বর্ণের দিক থেকে রক্তশূন্য। প্রদর্শিত ভাস্কর্যের নমুনাগুলি তুলনামূলক বিচারে দুর্বল। শর্বরী রায় চৌধুরীর বস্তু সংস্থাপন (৭) ছবিটি তার রচনার সারল্যে মনোরম।

মধ্যযুগের পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রাবলীর প্রদর্শনী—

আধুনিক শিল্পীদের প্রদর্শনীটির ঠিক সমসাময়িক কয়েকটি দিন ধরে একটি অতি মূল্যবান চিত্র-প্রদর্শনী একাডেমির ক্যাথেড্রেল বোর্ডের নতুন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ললিত কলা একাডেমির উদ্যোগে পশ্চিম-ভারতের উজ্জ্বলতম শিল্প-ঐতিহ্যের যুগের প্রায় দুই শত ছবির একটি মনোজ্ঞ সমাবেশ ঘটে গেল নিঃশব্দে। এই প্রদর্শনীতে চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত জৈন পাণ্ডুলিপি চিত্র থেকে শুরু করে, বিভিন্ন রাজপুত শৈলীর চিত্রাবলী, এমন কী কিছু মুঘোল চিত্র রীতির ছবি, যার কাল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, উপস্থিত ছিল। অথচ দুঃখের কথা এমন একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীকে উদ্যোক্তারা প্রায় বিশেষ কোনো প্রচার ব্যতিরেকেই ঘটে যেতে দিলেন এবং হয়তো বহু বিশিষ্ট চিত্র-রসিক এই মূল্যবান প্রদর্শনীর ছবিগুলিকে চাক্ষুস দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। চিত্রগুলি, যাকে এক কথায় মিনিয়েচার আখ্যা দেওয়া হয়েছে, বিকানিরের শ্রী মতিচাঁদ খাজাঞ্চির সংগ্রহভুক্ত। এবং আশার কথা, ললিত-কলা একাডেমি আশ্বাস দিয়েছেন এর পরও আরও কয়েকটি এই ধরণের দুর্লভ সংগ্রহের সঙ্গে শিল্পরসিক ও সাধারণ দর্শকদের পরিচয় ঘটাবেন। তাঁদের এই সাধু উদ্দেশ্য ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত।

বর্তমান প্রদর্শনীর চিত্রাবলী সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না। কেন না কালের নিষ্ঠুর বিচারকে সহ্য করে এতোদিন টিঁকে থেকেই তারা প্রমাণ করেছে যে, শিল্প হিসাবে তাদের মূল্য অনস্বীকার্য। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে পশ্চিম ভারতে বিপুল চিত্রাবলীর ভূমিকা সম্পর্কে বরং এখানে দু-একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অজন্তা, বাঘ, ইলোরা, সিওনবসাল প্রভৃতি গুহাচিত্রের পরই ভারতীয় চিত্রের প্রকাশ, যা আজও টিঁকে আছে, ঘটেছে পূর্বভারতের ১১শ শতাব্দীর বৌদ্ধপাণ্ডুলিপি চিত্রে এবং পশ্চিম ভারতের ১২শ শতাব্দী থেকে শুরু করে এক নিরবচ্ছিন্ন জৈন পাণ্ডুলিপি চিত্রের সৃষ্টিতে। যেন এই ধারার ঐতিহাসিক সূত্রকে ধরেই রাজপুত চিত্রকলার বিকাশ। তারপর মুঘোল কোর্টের প্রভাবে পারস্য চিত্রের প্রভাবে বিশেষ এক ধারার জন্ম, যাকে মুঘোল চিত্ররীতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রদর্শনীতে এই ঐতিহাসিক ধারাটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটে গেল। যদিও মুঘোল চিত্র-রীতির প্রতিনিধিস্থানীয় চিত্র এতে ছিল না, তবু এখানে রাজপুত শৈলীর বিভিন্ন ধারার সমাবেশ ঘটেছিল, যেমন মেবার, মালোয়া, মারোয়ার, বুন্দি এবং বিকানির। অধিকাংশ রাজপুত ছবির বিষয় হলো বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজকীয় প্রতিকৃতি। দু'একটি ছবি আছে যাতে সাধারণ জীবনের মনোরম প্রতিফলনও ঘটেছে সুনিপুণ-ভাবে। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও উদ্যোক্তারা সব কটি ছবিকেই 'মিনিয়েচার' আখ্যা দিয়েছেন, এর মধ্যে অধিকাংশ ছবিই কিন্তু 'মিনিয়েচার' ছবির আঙ্গিকে রচিত নয়, যেমন পাণ্ডুলিপি চিত্রাবলী। হয়তো ছবিগুলির ক্ষুদ্রায়তনই এই নামকরণের জন্যে দায়ী।

মৃৎশিল্প প্রদর্শনী—

গত ১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহ কাল ধরে আর্টিষ্ট্রি হাউসে কারু-শিল্পের একটি অত্যন্ত উৎসাহজনক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অলইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্টস বোর্ডের অধীনে ক্যালকাটা ডিজাইন সেণ্টারের উদ্যোগে সাধারণ মাটির উজ্জ্বল পাত্র, খেলনা, ইত্যাদি দ্রব্যসমূহের প্রদর্শনীটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা ডিজাইন সেণ্টার কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন কারু-শিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত রয়েছে। বর্তমান প্রদর্শনীটি তাদের পটারী সংক্রান্ত চর্চার ফল প্রদর্শন করে। এই প্রদর্শনীতে ব্যবহারের উপযুক্ত সুন্দর ডিজাইনের টব, পাত্র, খেলনা, টাইল ইত্যাদির যে সমাবেশ ঘটেছে, তা ইতিমধ্যেই দর্শকদের কাছে আবেদন করতে পেরেছে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উইলহেলম ময়েনাক'এর তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা সেণ্টারের কর্মীদের উৎপাদনগত গবেষণা। এই গবেষণার ফলে তাঁরা সাধারণ গঙ্গা-মাটির দ্রব্যগুলিকে পুড়িয়ে এমন ঔজ্জ্বল্য দান করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ইতিপূর্বে ছিল অভাবনীয়। সেই সঙ্গে বর্ণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁরা অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন—প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্যগুলি তার নির্ভুল দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, এখনকার কর্মীরা দাবী করছেন, সাধারণ মাটির তৈরী মূর্তিকে পুড়িয়ে তাঁরা প্রায় পাথরের স্থায়িত্ব দানে সক্ষম। ভাস্করদের কাছে এটা একটা বিশেষ সুখবর।
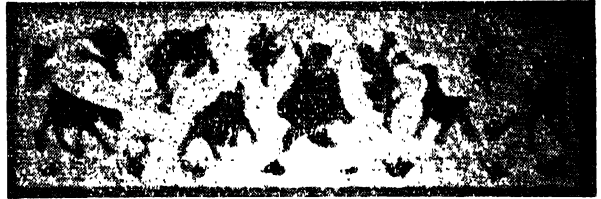
চিত্রিত টাইল : ক্যালকাটা ডিসাইন সেণ্টার

দেশের ভগ্নপ্রায় মৃৎ-শিল্পকে নতুন নাগরিক সভ্যতার উপযুক্ত কোরে তোলার উদ্দেশ্যে ডিজাইন সেণ্টার গঠিত। তাঁরা যদি দেশের অগণিত মৃৎ-শিল্পীর কাছে তাঁদের গবেষণার ফলকে পৌঁছে দিতে পারেন এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী নতুন নতুন ডিজাইনে তাদের পটু কোরে তুলতে পারেন, তবে, তা হবে জাতীয় দায়িত্বপালনের অনুরূপ। তাঁদের অনুশীলন কী শিল্পগতভাবে, কী উৎপাদনগতভাবে, দিনে দিনে আরও ফলপ্রসূ হোক, এই আশা করি।

উজ্জ্বল মৃৎপাত্র ও খেলনা : ডিজাইন সেণ্টার
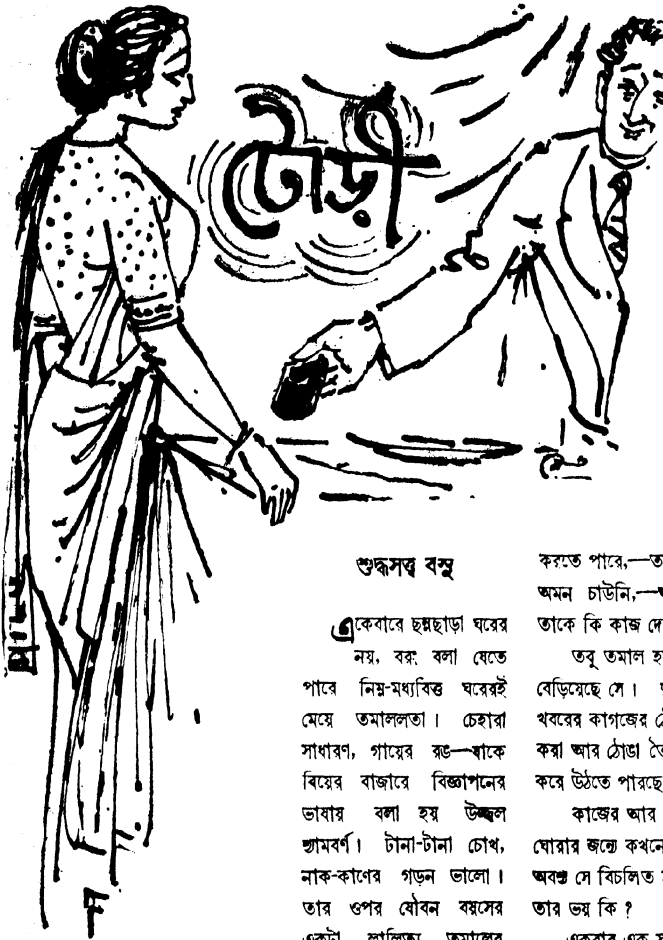
শুদ্ধসত্ত্ব বসু

একেবারে ছন্নছাড়া ঘরের নয়, বরং বলা যেতে পারে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরেরই মেয়ে তমাললতা। চেহারা সাধারণ, গায়ের রঙ—যাকে বিয়ের বাজারে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টানা-টানা চোখ, নাক-কাণের গড়ন ভালো। তার ওপর যৌবন বয়সের একটা লালিত্য তমালের দেহের সর্বত্র উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। বাপ নেই, বিধবা মা আর এক পাগল পিসিমা সংসারে, এ ছাড়া ছোট ছোট গোটা দুয়েক ভাই-বোন। ইংরেজসরকারের আমলে বাংলা দেশের কোন এক পল্লীতে সামান্য একটু কুঁড়ে ছিল ; মা-পিসিমা শাক তুলে, বেতের চুপড়ি বুনে, ধান ভেনে কি মুড়ি ভেজে এক মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতো, কিন্তু সেখানে থাকা গেল না—জনস্রোতের সংগে চলে আসতে হলো কোলকাতায়। শিয়ালদা ষ্টেশন, অসুখ বিসুখ, অনাহার ক্যাশডোল—সব রকম অবস্থা পার হয়ে শেষে সহরতলীর এক প্রান্তে ছোট একটা অপরিসর ঘর ভাড়া করে উঠে এল তমালেরা।

তমাল চাকরীর কথা ভাবে, তার মা-ও চেষ্টা করে কোথাও বাসন মেজে কি রান্না করে দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা যায় কি না। সংসার বড় কঠিন জায়গা। কিছু সুবিধে হয় না। লোকবল না থাকায় জোরদখলী জমি মেলেনি, ধরা করার কৌশল রপ্ত না করার জন্যে সরকারী ঋণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং জীবনদ্বন্দ্বের রূঢ় নিষ্ঠুর এক অধ্যায়ে ছিটকে পড়েছে—তমালেরা ক'জন।

পিসি তার পাগল। সরবে সংসারের সব কাজকর্ম করে। যতটুকু কাজ করে তার চেয়ে ঢের বেশী বকে।

তমালের মা বাড়ী বাড়ী ঝিয়ের কাজের চেষ্টা করে। ছোট ভাইটা টাকা দুয়েকের প্লাষ্টিকের চিরুণী আর খেলো ছিটের রুমাল নিয়ে সহরের ফুটপাথে বসে, কখনো আনতে পারে বা টাকাটা, সিকিটা, কখনো বা হাজতঘরে কয়েকটা দিন কাটিয়েও আসে।

তমালও কাজের চেষ্টায় বের হয়। কাঁচা বয়স, কোথায় কি চাকরী সে করবে! তার মা যে দু-এক জায়গায় বলেওনি তমালের কাজের জন্যে—তা নয়, কিন্তু তমালকে দেখে সকলে পেছিয়ে গেছে। নিটোল স্বাস্থ্যের ভরযৌবন একটা মেয়েকে নিয়ে কি করবে সকলে? অফিসে মেয়ে-কেরাণীর কাজের যোগ্যতা নেই তমালের, অন্তত স্কুলফাইন্যাল পর্যন্ত পড়তে হয়, কিন্তু তমালের বিদ্যের কোঠায় শূন্যই বলতে পারা যায়। কোন রকমে বাঁকা অক্ষরে বাংলায় তার নামটা সে সই করতে পারে,—তাও তাতে কোনো যুক্ত অক্ষর নেই বলে। তাছাড়া অমন চাউনি,—অমন দেখতে শুনতে—হলোই বা কালো—কে তাকে কি কাজ দেবে!

তবু তমাল হতাশ হয় না। ঘুরে ঘুরে সহরের অর্ধেকটা প্রায় বেড়িয়েছে সে। দুঃস্থদেরও কাজের ব্যবস্থা আছে বৈ কি এখানে। খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে খেতে পারে সে—কিন্তু কাগজ জোগাড় করা আর ঠোঙা তৈরীর কৌশলটা জানার অভাবেই সে যেন কিছু করে উঠতে পারছে না।

কাজের আর সংসারের চিন্তায় এমনি রাস্তায় রাস্তায় এলোমেলো ঘোরার জন্যে কখনো সখনো দু-একজন পিছুও নিয়েছে তার। তাতে অবশ্য সে বিচলিত হয়নি। নিজের হাতের মুঠো শক্ত থাকলে আর তার ভয় কি?

একবার এক সার্কাস পার্টি থেকে একটা লোক এসেছিল তার পিছু পিছু তাদের বাড়ী পর্যন্ত। তার মার কাছে দরবারও করেছিল—তমালের চাকরীর জন্যে। প্রথম প্রথম মাসে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা পাবে—খোরাকী বাদে আর কাজ শিখে গেলে একশোর ওপর মাইনে। সার্কাস পার্টির সংগে ঘুরতে হবে, তারের খেলা, জালের খেলা, আগুনের বলের খেলা—সব খেলাই শিখতে হবে। গতি হয়ে যাবে মেয়েটার।

তার মা রাজী হলো না, বললে—বাবা, আমরা গরীব মানুষ, ছেলেমেয়ের জন্যে আমাদের বড় মায়া। তমুকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

তমালেরও ইচ্ছে নয়—সে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্কাস পার্টির সংগে ঘুরে বেড়ায়। আর বিশেষ করে এই রকম সব মানুষের সংগে—চোখের চাহনিতে যাদের মলিন পংকিল মদিরতা ফুটে ওঠে যখন তখন।

কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। অনাহারে মরা যায় তবু, কিন্তু অর্ধাহারে মরা সব চেয়ে বেশী কষ্টের। তিলে তিলে ছোট ভাইটার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে—চিরুণী রুমাল বেচার জন্যে সকালে বিকেলে পথের ধারে করুণ মুখে বসে থাকে, ফিরে এসে ফেনমাখা ভাত এক মুঠো গেলে, ছোট বোনটার স্কুলে যাওয়ার এত সখ, একটা দ্বিতীয় ভাগ

বইও কিনে দিতে পারে না! তার মার বুকে এ সব ঘটনা কতখানি বেদনার সৃষ্টি করে—তমাল বোঝে না, কিন্তু সে বড় জ্বালা অনুভব করে। এই সহরের অপচয়ের দিকে তার চোখ পড়ে, কতটুকু অপচয়ই বা সে দেখেছে—তাতেই তার মনটা টনটন করে। নিজেকে নিস্পৃহ রেখে, হাতের মুঠো শক্ত রেখে কি সে পারবে না একটা চাকরী জোটাতে?

তমাললতা কাজের চেষ্টায় ঘোরে। দু-একটি মেয়ে-বন্ধু তার আছে, তাদের কাছে যায়, পরামর্শ করে। কেউ অর্থার্জনের অপবিত্র ইংগিত করে, কেউ বা জীবন-সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে।

পাড়ারই এক বৃদ্ধ বললেন—তুমি যে কাজের চেষ্টায় ঘুরে মরছো—কে তোমাকে চাকরী দেবে মা! ধরলুম—সদাশয় মানুষও আছে হয়তো একটা কাজও দিতে পারে করে, ধরো কোনো মেয়েস্কুলের ঝি, কি কোনো মেয়েরা বেশী আছে—এমন অফিসে মেয়ে-পিয়নের কাজ, কিন্তু দেবে ত' সেই পুরুস-মানুষ। এমনি হয়তো কাজ দিলে তোমাকে, কিন্তু তোমার মতো সোমত্ত বয়সের মেয়েকে চাকরী দিলে লোকে নিন্দে করবে যে। শুধু শুধু লোকের নিন্দে কুড়োতে যাবে কে—বলো মা!

এই বুড়োকে তমালের কোনদিনই ভালো লাগেনি, বিপত্নীক বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক, টাকার কঞ্জুস। চোখের দৃষ্টিশক্তি নেই, গলিতনখদন্ত ব্যাবৃত্তেন্দ্রিয়ং। তবু হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার ঢঙে একটা পৌরাণিক নায়কের গন্ধ পাওয়া যায়। তবে বলে খুব মিষ্টি কথা। মা বা মেয়ে ছাড়া মুখে কথা নেই।

কখনো বলেন—চাকরী চাকরী করে হাল্লাক হচ্ছিস,—তা আমি বলি কি মা, তুই এই বুড়োর টেকো মাথায় যে ক'গাছি চুল রোজ পাকছে—তা টেনে হিঁচড়ে তোল দেখি। আমি না হয়—তোর একটা ব্যবস্থা করবো।

তমাল রাগবে না হাসবে। বুড়ো ভালো বলেন কি মন্দ ইঙ্গিত করেন—বোঝবার উপায় নেই।

ধীরে ধীরে সংসারে মালিন্যের একটা ছায়া বিস্তারলাভ করছিল। মাকে প্রায়ই উপোস করতে হয়, তমাল কত দিন পেট ভরে ভাত খেতে পায়নি, ভালো খাওয়ার কথাও দূরস্থান। কোনরকমে ছোট ভাইবোন দুটির জন্যে যা হোক কিছু জোগাড় করতে হচ্ছে। ছেঁড়া কাপড়ে ওই স্বাস্থ্য ঢাকা যায় না; তবু সেলাই করে কোনরকমে আব্রু রেখে তমাল বের হয়। এই একটি সাধারণ তাঁতের শাড়ীই তার সম্বল। সস্তা ছিটের এই একটি ব্লাউজও প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একদিন তমালের চাকরী হয়ে গেল—আর চাকরী হলো তাদের পাড়ার ওই বুড়ো ভদ্রলোকের সুপারিশেই। ধর্মতলার মোড়ে সন্ধ্যের সময় দেখা সেই বৃদ্ধের সংগে। এদিকে মা সম্বোধন ঠিক করা হলো, কিন্তু নিতান্ত খেলো রসিকতা মিশিয়েও কিছু বলতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন—কি গো মা, চাকরী করবে একটা?

চাকরী? তমালের চাকরী? চাকরীটা তোমার পক্ষে লাগসই বটে। ওরা এইরকম খুঁজছে, এই বয়সের, এই স্বাস্থ্যের ঠিক এমনটি চাইছে। যদি চাকরী করো তো বলো—তোমাকে বাহাল করে দিয়ে আসি।

তমাল চাকরীর সর্তাদি না জেনে কি করে জবাব দেবে, সে বুড়োর দিকে চোখ তুললে।

বুড়ো বললেন—একটা দোকানের চাকরী, চৌরংগী পাড়ার এক রেস্তোরাঁয়। আট ঘণ্টা ডিউটি, মাইনে চল্লিশ টাকা। উপরি হিসেবে টিপস আছে।

তমাললতা সহজ সুরেই বললে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন চাকরী, কি তার ব্যাপার।

সহজ ব্যাপার। চা-চপের দোকান। খদ্দের আসবে, এটা দাও সেটা দাও—এনে দেবে; একটু যত্ন করে, হয়তো বা একটু হেসেও। যা খাবে তার ধরা দাম আছে, বিল দেবে প্লেটে করে এনে—দুটো মৌরি ছড়িয়ে দিয়ে। টাকা দেবে, চেঞ্জ ভাঙিয়ে দেবে ফেরৎ যা পাবে। যেটুকু বখশিস দেবে হাত পেতে নেবে, একটু হেসে নমস্কার করবে, বলবে—আবার আসবেন। ব্যস মাইনে চল্লিশ, উপরি আরো চল্লিশ। তার উপরির কথা নাই বা বললাম।—বুড়ো হা-হা করে একটু হাসলেন। পানের ছোপে দু-একটা যে দাঁত আছে তা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু সেই ক'টি দাঁত বের করতেও তার লজ্জা হলো না।

তমালের একবার মনে হলো চাকরীটা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তাকে কেই বা আর কোন চাকরী দেবে, ভেবে সে রাজী হলো। হাতের মুঠো যদি শক্ত করে ধরে রাখতে সে পারে তা হলে কার সাধ্য তাকে বেকায়দায় ফেলে। নিজের ওপর বিশ্বাস নিয়ে সে কাজে যোগ দিলে।

রেস্তোরাঁর ম্যানেজারটি ছোকরা বয়সের। তমালের তাকেই বেশী ভয় করতে লাগলো, কিন্তু দেখা গেল ম্যানেজার ছোকরাটি রসিক, কিন্তু অভদ্র নয়। দিদি-দিদি করে কথা বলে, মিষ্টি এক আধটা চটুল ইয়ার্কি হয়তো বা করে কিন্তু ওই পর্যন্ত, নিজেকে সে মেয়েদের সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

দোকানে আরো মেয়ে আছে, রেখা, ননী, অতসী, সুনন্দা। কিন্তু তমালের মতো লাজুক আর মুখচোরা কেউ নয়। খদ্দেরের সংগে একটু রসিকতা, একটু মদির ইয়ার্কির ভাব, চোখ টেপা, একটু হাসির ঝিলিক, হাতে হাত ঠেকে যাওয়া নিয়ে স্বল্প একরত্তি কাব্যি করা—তমালের এ সব বস্তু নেই, ফলে তমালের টেবিলে খদ্দের আসে না তেমন। টিপস ত' জোটেই না। দ্বিধা, সংকোচ, কখনো বা ভীতিবিহ্বলতা তমালকে মেরে দিয়েছে।

সবচেয়ে ভাগ্য ভালো অতসীর। দেখতেও যেমন, চলনে বলনেও তেমন। সুনন্দারও দিনটা মন্দ কাটে না। ফর্সা রঙ, তার ওপর হাসলে মুখে টোল পড়ে, খদ্দেরকে মাতিয়ে দিতে পারে, তাতিয়ে দিতে পারে। ননীরও মন্দ উপায় হয় না। একটু বাচাল ধরণের মেয়ে, কথার জাহাজ। যে কোন কথাই তাকে বলুক না কেউ—অদ্ভুত সুন্দর করে সে জবাব দিতে পারবে। কথা দিয়ে সে টেনে রাখে খদ্দেরকে। অনেক ফুল আছে গন্ধে নয়, শুধু বর্ণেই, রূপের উচ্চকিত বিন্যাসেই ভোমরাকে টেনে রাখে। ননী সেই জাতের মেয়ে। রেখা ওদের কাছে পাঠ নেয়। কখনো কিছু হয় কখনো তমালের মতো শূন্যতা।

ম্যানেজার দু-একদিন সাবধান করে দেয় তমালকে—তোমার টেবিলে এত কম সেল হলে চলবে কেন? আফটার অল—আমাদের বিজনেসটাও তোমাকে দেখতে হবে। তিন মাসের ওপর হলো—এখনো তুমি ঠিক কাজটা পিক্ আপ করতে পারলে না, তোমারই বা চলবে কি করে?

একেবারে বোঝাই রেস্তোরাঁ না হলে তমালের টেবিলে কখনো কেউ আসে না। আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট খরিদ্দার কেউ তো তমালের নেই। এ নিয়ে সুনন্দা ঠাট্টা করে, অতসী করুণার হাসি হাসে, ননী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলে, এমন কি রেখাও ফোড়ন কাটে, তমাল বুঝি তার দয়িতের প্রত্যাশায় আছে!

দয়িত? প্রেম? এই সংকীর্ণ-রেস্তোরাঁর সংকীর্ণতর অপরিসর ছোট্ট হাঁফধরা একটা খুপরি কেবিনে স্বল্প সময়ের জন্য যারা চা খেতে আসে তাদের কাউকে বেছে নিয়ে প্রেম করা! ভাবতেও তমালের গা ঘিন-ঘিন করে।

কিন্তু রাত দশটায় বাড়ী ফেরার সময় কখনো কখনো এলোমেলো উদ্দাম বাতাস ক্লান্ত তমালের দেহে-মনে একটা খুসির ঝড়ের সৃষ্টি করে। মনে যেন কোন্ গান বেজে ওঠে, যৌবন বয়সের অকারণ আনন্দ-করুণ এক ইমনের আলাপ তার সারা দেহে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। আকাশ-বাতাসকে তার আগেও সুন্দর মনে হতো, হঠাৎ এই ঘুণধরা সহর, জীর্ণ পথ-ঘাট—সব কিছুই তার ভালো লেগে যায়। কি পাইনি তার হিসাব তার মেলাতে তার মন যেন তখন রাজী হয় না!

ধীরে ধীরে ঈর্ষা তারও অন্তরে বাসা বাঁধে। অথচ সাংসারিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। মাকে ঝি-গিরি করতে হয় না। ছোট ভাইটাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা সে দিয়েছে টিপ্‌সের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে পাড়ায় ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের দোকান দিতে। সেটাও এখন একটু দাঁড়িয়েছে, ভাইটা সেখানে এক আধটা করে খুচরো ষ্টেশনারী জিনিসও কিছু কিছু আনা-বেচা করে দুপয়সা আনছে ঘরে। তাঁতের ডুরে শাড়ীর বদলে একটু বেশী দামের গোটা চারেক ফ্যান্সী কাপড় হয়েছে তার, নিলেনের, এমন কি খাটাও ভয়েলেরও জামা উঠেছে গায়ে। একটু স্নো-পাউডার যে না ব্যবহার করে—এমন নয়, হাতে স্যাচেল নেয়, কখনো সখনো চোখে কাজল কি সুর্মাও টানে। ননী টিটকিরি করে, পরজন চিত সনে—

তমাল তার মানে বোঝে না। এটুকু বোঝে বেশ ও বাহারের ওদের চোখ পড়েছে। তমালের ঈর্ষা হয়েছে অতসীর স্বাস্থ্য আছে, জৌলুস আছে, সুনন্দার হাসি আছে, ননীর কথা আছে, তমালেরই বা নেই কি?

কিন্তু তবু ত' তোর শ্যাম নাগরের দেখা মিলছে না লো—ননী তমালের ঠোঁট টিপে ধরে বলে।

অতসীর জন্যেই রেস্তোরাঁ চলছে। থিয়েটার বায়স্কোপে যেমন নায়িকাদের মধ্যে ষ্টার থাকে, তেমনি এই রেস্তোরাঁর ষ্টার হচ্ছে অতসী, সুনন্দাও বটে। কিন্তু তমালের বেদনাবোধ প্রখর হয়ে ওঠে। নিজেকে ছোট করে না, তার যৌবনমনের স্নেহ-প্রেমসিক্ত বসন্তোৎসবের উল্লাসে কোনো সংগী কি পাবে না সে? এই চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। ঈর্ষার জ্বালা ধরে তার মনে, অতসীর টেবিলের দিকে তাকায়, স্যুটপরা একটি যুবক রোজ সন্ধ্যার পর আসে, হাসে, গল্প করে। ননীর টেবিলেও নির্দিষ্ট খরিদ্দার এসে বসে, গল্প-গুজবে সরগরম হয়ে ওঠে। সুনন্দার স্নিগ্ধ হাসির প্রত্যুত্তর দেবার লোক থাকে। তমালও প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে পড়ে। মনের কোন্ গভীর দেশ থেকে দীর্ঘশ্বাসের একটা বেদনা-প্রবাহ পাক খেতে খেতে যেন বেরিয়ে আসে। নৈরাশ্য যেখানে যত বেশী, সেখানেই হিংসা বুঝি তত আক্রোশে ফুলে ওঠে। অতসীর টেবিলে তাকায় বার বার, সুনন্দার দিকে দেখে, ননীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশর হানে।

সেদিন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সারাদিন ধরে এই প্যাচপ্যাচানি কোলকাতা সহরকে কেমন যেন ঘেয়ো রোগীর মত করে তুলেছে। দোকানে খদ্দেরপাতিও কম ছিল। সুনন্দার টেবিলে যে লোকটি রোজ এসে বসে বসে চা, টোষ্ট, পরোটা খায়, খোস গল্প করে যায়, সে লোকটি আজ বেশ নিরিবিলিতে সুনন্দার সংগে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেল। অতসীর জন্যে কি সুন্দর একটি ফটো এলবাম এনে দিয়েছে তার সেই স্যুটপরা যুবকটি! দোকানের কাজে তাগিদ নেই। একটানা অনলস আড্ডার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অতসী যুবকটির মুখোমুখি বসে জীবনকে যেন উপলব্ধি করতে পারলো। তমাল ছটফট করে। বর্ষা মানুষের মনে বিরহের এমন চাবুক বসিয়ে দেয়—তা ত' জানা ছিল না। বৃষ্টির এই জল বুঝি নিরন্তর কোন্ বিরহদগ্ধ আকাশের কান্না,—সমস্ত বিরহী-হৃদয়ের জন্যে আকাশের বুঝি এই ব্যাকুলতা!

রূপোপজীবিনার মতোই কি রেস্তোরাঁর এই অসহায় মেয়েরা খরিদ্দার আকর্ষণের জন্যে নিজেদের বেশে-বিন্যাসে চারুদর্শন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে? তমাল এদিক থেকে কখনো জিনিসটি ভেবে দেখেনি। আজ দোকান প্রায় ফাঁকা। অতসীর বান্ধবটি চলে গেছে, সুনন্দার টেবিলও খালি, ননী, রেখা—সকলেই যেন কর্মহীন, আলস্যোপভোগের আনন্দে গুঞ্জন-মুখর। আর তমাল এসব কি আকাশ-পাতাল ভাবছে!

ছুটি হবার তবু কিছুক্ষণ দেরী ছিল,—খদ্দের নেই বলে রেস্তোরাঁ থেকে আগে চলে যাওয়া যাবে না। বরং এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে বসে বসে। এমন সময় একটি সুবেশ যুবক এসে ঢুকলো দোকানে। রক্তজবার মতো চোখ, চুল উস্কখুস্কো। সভ্য, সুপুরুষ, সৌম্যদর্শন। তমাললতার কেবিনেই সরাসরি ঢুকলো। অতসী, সুনন্দা, রেখা, ননী—কারুরই চোখ এড়ালো না। তারা ভাবলে ম্যানেজার যখন তমালের চাকরী সম্পর্কে চরম নোটিশ দেবে কি না ভাবছে—ঠিক সে সময় যদি মেয়েটার একটু বরাত ফেরে—ক্ষতি কি! সহানুভূতির একটা স্নিগ্ধ উপলব্ধিতে তাদের সকলেরই মন ভরে উঠলো!

সেই গৌরকান্তি যুবকটি তমালের দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন চমকে উঠলো। তমালও বিস্মিত হলো—চেনা নাকি ভদ্রলোক!

সে তমালের মুখের দিকে তাকালে, আয়তাক্ষীর বেদনার্ত মুখে যৌবন-চাঞ্চল্যের যেমন একটা প্রকাশ ছিল, তেমনই বিরহপীড়িত কোন্ এক প্রত্যাশার ব্যঞ্জনাও বুঝি প্রকট ছিল।

কোনো ভূমিকা বা ভণিতা না করেই যুবকটি বললে—আমি বড় তৃষিত, একটু পানীয় চাই।

তমাল বিনীত অথচ করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কি আনবো বলুন? চা, না কফি? —না, কোনো জল, কার্লসবাডের জলই আমরা রাখি।

যুবকটি বললে—কি জানি, কিসে এ তৃষ্ণা মিটবে! তুমি—আই মীন্, আপনি বিচার করে যা হয় একটা কিছু দিন। প্লিজ্।

যুবকের চোখ দুটো আরক্ত হয়ে উঠেছে। মাথাটা সোজা করে রাখতে পারছে না, টেবিলের ওপর প্রথমে হাত রেখে তার ওপর মাথা রাখলে। তমালের কেমন যেন মায়া হলো। এক কাপ

কফি নিয়ে এসে সে অত্যন্ত যত্নে, অতি সন্তর্পণে যুবককে ডেকে দিলে—এই নিন কফি।

কফি, ও হ্যাঁ। এ তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছি, বহু ড্রিংক করেছি—কিন্তু কিছুতেই জ্বালা জুড়োয় না! যুবকটি মুখ তুললে।

জ্বালা? কিসের জ্বালা? প্রশ্নটা বুক ঠেলে মুখের ডগায় এলেও উচ্চারণ করতে পারলো না তমাল।

আজো যে যুবকটি ড্রিঙ্ক করে এসেছে—এ সম্পর্কে তমালের সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কিসের বেদনা সে বহন করছে? সে একটুখানি স্পষ্ট, একটুখানি উচ্চকিত হয়ে নিজেকে যুবকটির দিকে বিকীর্ণ করতে চায়।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করলে—কি খাওয়া যায় বলো ত? একটু ক্ষিদেও পেয়েছে—

তমাললতা যেন নিজের পরমাত্মীয়কে খাওয়াচ্ছে নিজের হাতে রান্না করে—ঠিক'এই রকম ভাবে আন্তরিকতার সংগে পরিবেশন করলে কিছু খাবার।

অভিভূত মায়াচ্ছন্ন কি এক স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে যুবকটি। একটু স্পর্শ চায় তমালের, একটুখানি হীরক-হাসির হিল্লোলকণা কুড়োতে চায়। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনে—তাই নিয়ে মনে মনে যুবকটি যেন ফাল্গুনী রচনা করতে চায়।

তমালের ডালেও লাগলো আগুন। এ কোন্ ফাল্গুনের বহ্নি নিয়ে এলো এই যুবক?

দোকান বন্ধ হবার একটু আগে বিদায় নিয়ে গেল যুবকটি, কথা দিয়ে গেল—আবার আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। জীবনের রৌদ্র-রূঢ় এই ধূসর মরুর মধ্যে তমাল একটি আশ্চর্য অপূর্ব সুস্নিগ্ধ শ্যাম মরুদ্যান। মানুষে মানুষে যে ব্যবধান সেটুকু দূর করে দিয়ে তমালের আবির্ভাবকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে এই যুবক—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই সে বিদায় নিলে।

গান জানে না তমাল, তবু বাণী জাগে, অনির্বচনীয় এক সুর জাগে! বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় গান। কে বলেছে মানুষ একা, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটির থেকে আর একটির স্পর্শ পাওয়া যায় না, নাগাল পাওয়া যায় না,—মাঝখানে শুধু বিরহের কান্নার লোনা জল!

ম্যানেজার হাসলে, তমালের কল্যাণে তবু এত দিন পরে একটি রেস্তওয়ালা খদ্দের এসেছে। অতসী, সুনন্দা, রেখা, ননী সবাই হাঁ হয়ে গেল—তমাল ছুঁড়িটাও ত' তবে এবার জাতে উঠলো। এতদিন ন্যাকামি আর ঢঙ নিয়ে সঙ সেজে বসেছিল সে, আজ তার সেই ভড়ংটুকু গেল খসে। ভালই হলো। আভিজাত্যের না হোক, শুচি চৈতন্যের একটা ভুয়ো বেড়াজাল তৈরী করে তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে তমাল যে নীরব আস্ফালন বা মূক ভর্ৎসনার বাণে তাদেরকে জর্জরিত করবে সেটুকু আর চলবে না।

তমালের মনে রঙ লেগেছে। তার আকাশে বসন্ত এসেছে। প্রাণে ফাল্গুন দোলা দিয়েছে। চুল আঁচড়ায়, বাহার-দেওয়া জামা পরে, টিপ আঁকে কপালে, চোখের কোলে কালো রেখা টানে। একটু ব্যাকুল বাসনায় কাতর হয়, বসন্তের গানের জন্যে ছটফট করে। পঞ্চশর যেন উদ্দাম করে জাগ্রত করে দিয়েছে বসন্তকে তার মনের দরজার সামনে।

রেস্তোরাঁয় আসে তমাল, খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাতের শক্ত মুঠো তার শিথিল হলো না কি? ননী প্রশ্ন করে। তমাল হাসে, বলে—না, ভাই না। হাতের মুঠো যার তরে ধরেছিলাম, সেই যে এসেছে কাছে! এত কাল এরই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছি।

ক'দিন কেটে গেল, তমালকে আবার বুঝি প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে হলো। সেই যুবকটি ত' তার প্রতিশ্রুতি রাখলে না? হাজার খরিদ্দার দোকানে আসে, কিন্তু তমালের ছুটি চোখ খুঁজে ফেরে সেই আত্মভোলা একটি যুবককে—এক ডাকে যাকে সে নিজের পরমাত্মীয় বলে জেনেছিল।

কিন্তু বেশীদিন প্রতীক্ষা করতে হলো না। দু'-একদিন পরেই ফের সেই যুবকটি এসে হাজির। বিন্যস্ত বেশভূষা, সযত্নে আঁচড়ানো চুল, ব্যাকব্রাস করা। বেছে বেছে তমালের কেবিনে এসে হাজির। এসেই সে তমালকে লক্ষ্য করে বললে—আপনাকেই খুঁজছি।

তমাল চমকে উঠলো;—আবার আপনি কেন?

সংযত, প্রশান্ত অথচ গম্ভীর ভব্য কণ্ঠে যুবকটি বললে—মার্জনা করবেন, সেদিন রাত্রের ব্যবহারটা একটু কেমন অভদ্র হয়ে গিয়েছিল, তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি। নিজের মধ্যে নিজেকে ঠিক ধরে রাখতে পারিনি। তাই সুস্থ চৈতন্য ফিরে পাবার সংগে সংগেই ক্ষমা চাইতে এসেছি। সেদিনের ব্যবহারে যদি কোনো দুঃখ, যদি কোনো বেদনা পেয়ে থাকেন—যদি কেন, পেয়েছেন নিশ্চয়ই, কাউকে অপমান করার অধিকার ত' আমার নেই? তার জন্যে অকপট ক্ষমা চাইছি। আর, আর বলতে সাহস হয় না—হয়তো সমীচীনও নয়, এই পার্স'টা দিয়ে গেলাম—

যন্ত্রচালিতের মতো যুবকটি পার্স'টি টেবিলে রেখেই বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনই চকিতে, এমনই নাটকীয় ভাবে ঘটে গেল, যাতে তমালের পক্ষে থ' হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না। প্রথম ধাক্কা সামলাবার পর বুক ভেঙে তার দীর্ঘনিশ্বাস নামলো। সামনেটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে তার। নিয়ন লাইটের নীলাভ রঙকে যেন সহসা আলকাতরার পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে।

হতাশ-বেদনার প্রাখর্যে তমাল ভেঙে পড়লো, কান্নায় কান্নায় ফুলে উঠলো তার বুক, ভেঙে পড়লো সে টুকরো টুকরো হয়ে। টেবিলের ওপর মাথা ঠুকে সে যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থায় এলিয়ে পড়লো। কেবিনে আর কেউ নেই, শুধু যুবকটির ফেলে যাওয়া পার্স'টা তমালের দিকে চেয়ে বোধ হয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের দৃষ্টি হানছিল।

নীলকণ্ঠ

পাঁচ

কাশীতে পা দেবার আগে ট্রেনে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, আরেকটি দুর্ঘটনা,—যে কথাটা না বলে নিলে এখানে আর বলবার স্কোপ পাওয়া যাবে কি না বলা শক্ত। কাশীযাত্রার কাহিনী যেমন বিচিত্র কাশীযাত্রীর ভ্যারাইটিও তেমনই কম নয়। ধর্মের যণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের এই কাশীতে একই সঙ্গে এক গলিতে এমন গলাগলি করে বাস যে কাশীতে কেবল নিরামিষভোজীদেরই একচ্ছত্র অধিষ্ঠান এমন মনে করলে কাশীর প্রতি না হক কাশীযাত্রীদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের দোষ হবে। কাশী কেবল ধার্মিকদের তীর্থ নয়; অধর্মের বিদ্যালয়ে যারা আজীবন সতীর্থ কাশী তাদেরও সমান আকর্ষণ ক্ষেত্র। কাশী বিশ্বনাথের; বিশ্বের যতেক অনাথের, কাশী ধর্মের যণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের। কাশী কেবল গলির নয়; বরুণা এবং অসির, পুণ্যের করুণা এবং কলঙ্কের মসির একইসঙ্গে গলাগলির এই কাশী। আলোছায়ার; মেঘ ও রৌদ্রের; রাগ ও অনুরাগের; সাদা-কালোর; হাসি-কান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা এই কাশী কেবল ভারতের নয়; মহাভারতের। যে মহাভারত একা পাপের অথবা পুণ্যের ক্ষেত্র নয়; কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবজীবনের মহৎ কুরুক্ষেত্র। যে মহাভারতে দুর্যোধনের পরাজয় আর যুধিষ্ঠিরের জয় কালের বিচারে তুল্যমূল্য। কাশী, আজকের এই মহাভারতের সঙ্গে স্মরণের অতীত এক প্রত্যুষ-প্রদোষের মহাভারতের, শেষ সেতু; অশেষ যোগসূত্র।

এবং কাশী যদি না হত তাই তাহলে কাশীকাণ্ড হত প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা। বর্তমান কলম অন্ততঃ উদ্যত হত না এই কাশীর ইতিবৃত্ত গ্রন্থনে। কাশী ভাল এবং মন্দের; শুভ এবং অশুভের; সুন্দর এবং অসুন্দরের। কাশী জ্ঞানী এবং মূঢ়ের; রাজা এবং প্রজার; অন্নপূর্ণের এবং নিরন্নের। কাশীর যিনি অধীশ্বর তিনি শুধু শিব নন; তিনি নটরাজ। তাঁর নৃত্যোন্মত্ত দুপায়-এর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব জীবন এবং মৃত্যু, আনন্দ এবং বেদনা, বিচ্ছেদ এবং মিলন, অমৃত এবং হলাহল একই সঙ্গে, একই অঙ্গে এত অপরূপ যা বিশ্লেষণের বিষয় নয়; যা ব্যাখ্যার অতীত; যা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝবার নয়; অন্তরের অন্তস্তলে বার বার বা জবার।

যার এক ঘাটের প্রাচুর্য অতিরিক্ত আর আরেক ঘাটের অবস্থা অতিরিক্ত তারই নাম কাশী।

এই কাশীর এক প্রান্তে রৌদ্রালোকিত দ্বিপ্রহরেও অসংখ্য অন্ধগলিতে নিশীথ রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার। অন্তপ্রান্তে উত্তরবাহিনী গঙ্গার দুতীরে দুবেলা অনাদি অনন্তকাল থেকে জবাকুসুমসঙ্কাশ কত কোটি কোটি দিবাকরের উদয়-অস্ত মহিমায় এই পুণ্যভূমি অনিমেষলোচন। জলের অতল থেকে এর ঘাটে ঘাটে উঠে গেছে আকাশ-উদ্ধত শিব প্রাসাদ আর মন্দিরচূড়া। শাঁখ কাসর ঘণ্টা ধূপধূনা চন্দন-চর্চিত এই কাশীতেই অনতিদূরে শ্রুত হচ্ছে শিল্পীর পায়ে সুরের আলাপ; অসুরের কানে তা বহন করে আনার বদলে সঙ্গীতের সুধা ধ্বনিত করছে কলুষ কামনার বিরামহীন নূপুরনিক্কণ। এই সেই কাশী যেখানে নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকায় চলেছে অন্নকূটের উৎসব; আর তার একটু দূরেই পড়ে রয়েছে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত কত ত্রৈলঙ্গ, কত বিজয়কৃষ্ণ, কত নিজের পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ মহাত্মার শব।

এই কাশী যাবার পথেই ট্রেনে আমার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—যার কথা যথাসময়ে আমার লেখা হয়নি। ভদ্রলোকের নাম-ধাম কোনটাই জানিনে; জানলেও জানাতে পারতাম কি না বলা শক্ত। এবং হেরম্ব মৈত্র না হয়েও আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে বাধ্য হতাম: জানি; কিন্তু বলব না। মিথ্যে বলতে পারিনে, এ কারণে নয়; কারণ, কারণে অকারণে কেবল মিথ্যেই এখনও বলতে পারি; আর কোনও কথাই বলব-বলব করেও বলে উঠতে পারিনে; কখনও আইনের ভয়ে কখনও লোকে, না কি স্ত্রীলোকে কি ভাববে সেই ভয়ে। আমি যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। আমি যে বাঙালী। ভগবান আছেন কি না জানিনে; থাকলে, আমার একটি কথাই জানাবার আছে: বারান্তরে বাঙালী করে পাঠিও না; পাঠালে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক করে পাঠিও না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক আজ বিধাতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি বলে কিছু নেই; যা আছে তার নাম হওয়া উচিত আজনীতি। যদিও নীতির সঙ্গে আজ আর কি ব্যক্তির, কি জাতির, কি যুগের কিছু মাত্র যোগ নেই, তবুও একে বলছি যে আজনীতি; তার কারণ এ নীতির ইংরেজি মরাল নয়; পলিসি। একদিন আমাদের রাজনীতিতেও অনেষ্টি ইস দ্যা বেষ্ট পলিসি বলত; আজনীতি আজ বলে ডিসনেষ্টি ইস দ্যা বেষ্ট পলিসি। কেবল কংগ্রেস বলে যে তা নয়; দেশের যারা ডিসগ্রেস তারাও বলে; অর্থাৎ সেই লেফটিষ্ট পার্টি বলে যারা পরিচিত হতে চায় পশ্চিম নয় পশ্চাৎ বঙ্গে, এবং আসলে যারা সার্কাস পার্টির চেয়েও অধম; কেন না সার্কাস পার্টিতে দু'-একটা বাঘ-সিংহ এখনও থাকে কিন্তু রাজনৈতিক সার্কাস পার্টিতে পশ্চিমবঙ্গে যারা নেতা, অর্থাৎ অভিনেতা তারা কেউ বাঘ-সিংহ নয়; কেবল ক্লাউন। বামপন্থী নয়; আমাদের যারা বামে তারা আসলে বামাপন্থী। আমাদের লেফটিষ্টরা

বিশ্বাসে নয়; এক্সিডেণ্টে লেফটিষ্ট। দুর্ঘটনায় ডান হাত কাটা গেলে যারা ল্যাটা হতে বাধ্য হয় তাদেরই মতো কংগ্রেসে ঢুকে গদিতে আসীন হয়েই গদা ঘোরোবার সুযোগ পায়নি যারা তারাই এদেশে লেফটিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে নয়; সারা ভারতবর্ষের যারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তাদের সেই গল্পের পাতা জলে পড়ে কুমীর হয়েছে—নাম কংগ্রেস; ডাঙায় পড়ে হয়েছে বাঘ; নাম লেফটিষ্ট; আধখানা জলে এবং আধখানা ডাঙায় পড়লে কি হতো তারই উত্তর দেবার জন্যে নির্বাচনের মুখে দেখা দেবে স্বতন্ত্র পার্টি; পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে, কম্বলের লোম বাছলে, ভারতবর্ষ নামে এক গাঁয়ের ঠক বাছলে যা থাকে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত থেকে প্রত্যহের, প্রতিমুহূর্তের 'জ্বালা' বাদ দিলে, বরবাদ করলে তার চেয়ে খুব বেশি থাকে কি? না। আজকের ভারতবর্ষে বাঙালী হয়ে জন্মানোই একটা অপরাধ; তারপর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হয়ে আসাটা গোদের ওপর বিষফোড়া; বোঝার ওপর শাকের আঁটি; অথবা তার চেয়ে একটু বেশীই,—ভারতবর্ষের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য-পীড়িত প্রদেশ, এই বাঙলার জনসাধারণের স্কন্ধে একগাদা। [কম্পোজিটরের কাছে নিবেদন, 'দার' জায়গায় 'ধা' করবেন না যেন; করলে বর্তমান লেখকই বিপদে পড়বেন; কেন না 'দা'র জায়গায় 'ধা' পড়লে, যা দাঁড়ায় এরা সত্যিই তাই; উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেবার ক্ষেত্রে এদের লালফিতাও হঠাৎ শম্বুকগতি ত্যাগ করে; তাই] মন্ত্রীর ওপর আবার গাদা গাদা উপমন্ত্রীর সঙ্গেই বোধ করি তার একমাত্র তুলনা চলে।

লক্ষ্য করবেন, শুধু বাঙালীর কথা বলছি না; মধ্যবিত্ত বাঙালী 'ভদ্রলোক'-এর' কথা বলছি। শুধু বাঙালী বললে 'ভেগ' কথা বলা হয়। কারণ স্যার অমুকও বাঙালী; আবার মাসিক পাঁচ হাজারী চাকরে ভুলেও যে বাড়িতেও একটা বাঙলা কথা বলে না, কাঁটা-চামচে ছাড়া খায় না, যাদের ছেলেমেয়েরা বাবাকে ড্যাডি, মাকে মামমি ছাড়া ডাকে না; ঠাকুরের বদলে বাবুর্চি; চাকরের পরিবর্তে বয়; জলযোগের জায়গায় ব্রেকফাষ্ট, মধ্যাহ্নাহারের বিকল্পে লাঞ্চ এবং নৈশাহারের নামে ডিনারই যাদের রেওয়াজ, আদমসুমারীতে তারাও বাঙালী ছাড়া আর কোন [বজ্জ,] জাত বলুন? আবার আপনি তিনি আমি, আমরাও বাঙালী, আমরা যারা বিত্তহীন এর লজ্জা ঢাকবার জন্যে নিজেদেরকে বলি মধ্যবিত্ত; আমরা যারা, আজ বাঙলা মাসের কত তারিখ জিজ্ঞেস করলে বলি, জানুয়ারী এত, তারাও তো, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' তাদেরই বংশধর।

বড়লোক এবং একেবারে নীচতলার লোক এদের কারুর কথাই নয়; কারণ এদের কাউকেই ভদ্রলোক সাজতে হয় না। তাই এদের একদলের জ্বালা বলতে বুঝি, জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে সহজে চলতে ফিরতে না পারার জ্বালা; আর আরেকদলের কার্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের জ্বালা ভুলতে সন্ধ্যেবেলায় তাড়ির জালার পাশে গিয়ে তাড়াতাড়ি বসতে না-পাওয়া। এরা সব কালে সব দেশে সব প্রদেশে,—এক; এদের কথা নয়। এদের কথা বলবার জন্যে আমাদের দেশেও কংগ্রেস আছে; কম্যুনিষ্ট আছে। যাদের কথা বলবার জন্যে কেউ নেই, আমি সেই মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের কথাই বলছিলাম। তাদের জ্বালাই রিয়্যাল জ্বালা; দাঁড়কাকের ময়ূর সাজতে যাওয়ার যেমন জ্বালা। বিত্তহীন হয়েও মধ্যবিত্ত সাজার কাটা ঘায়ে, ভদ্রলোক হবার নুনের ছিটের মর্মান্তিক জ্বালা।

বড়লোকের বিয়েবাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটিই নয় শুধু; নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত মূল্যের প্রেজেণ্টেশান বাগিয়ে নিয়ে এককাপ কফি আর একমুঠো কাজু বাদামের বড়লোকী কার্পণ্য পর্যন্ত আমরা মার্জনা করি। কারণ আমরা যে মধ্যবিত্ত, আর ওঁরা যে বড়লোক। সর্বহারাদের বস্তির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন একবার দয়া করে এবার। তাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে। কিন্তু অন্নপ্রাশন, উপনয়ন নেই। বিবাহ আছে, কিন্তু পণের টাকা অথবা লোক খাওয়াতে উদ্বাহবন্ধনের উদ্বন্ধনে পরিণত হবার কোনও রেকর্ড নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে তাকান অতঃপর। ভিখারীর চেয়েও দুরবস্থা [না কি, এই জায়গায়, একটি জায়গায়,—দুরাবস্থা, ব্যাকরণ অসঙ্গত হয়েও জীবনসঙ্গত হবার কারণে বিদ্যাসাগর-বারণ সত্ত্বেও আর্য প্রয়োগ] যে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের তার অবস্থা বর্ণনার অতীত। ভিখারীর আছে তবু তার চাইতে লজ্জা নেই; মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নেই, তবু দিতে না পারার আছে দুস্তর লজ্জা।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নেই কি? ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত একগাদা পয়সার [ধার করে; বাঁধা দিয়ে; ভিক্ষে এবং চুরি করে হলেও] শ্রাদ্ধ করা, কারণ এসবই তার পরিবারের মতে, জীবনে একবার তো, বার বার নয়, অতএব। বার বার

মরা, শ্রাদ্ধ যে একবারই এ তো অভ্রান্ত বেদবাক্য ; এ সন্দেহ যার, সে নয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক। এর ওপর আছে। ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে শুনিয়ে, বিবাহ দিয়ে ছেলেমেয়ের বাপ করে আবার মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক না তৈরী করা পর্যন্ত যার রেহাই নেই, কেবল সেই তো আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। অধুনা আবার তার ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেনে না পড়ালে, যেখানে মাইনে মাসে ত্রিশ, সিণ্ডেরেলা প্লের জন্যে ড্রেস বাবদ অতিরিক্ত পঞ্চাশ, দুমাস, বড়জোর তিন মাস অন্তর, তেইশখানা খাতা। ছেচল্লিশখানা বই, এবং পড়া শেষে বাঙলা না শেখার কারণে বাঙালী ছেলেমেয়ের বুড়ো বয়সে আবার বাঙলা শেখানোর জন্যে প্রাইভেট ট্যুটার মারফৎ কেঁচে গণ্ডুষ!

বাঙালীর অধঃপতনের এই চিত্র যখনই আমার আঁখিপদ্মে প্রতিভাত হয়, তখন অতীত বাঙালার প্রাতঃস্মরণীয় কীর্তির কথা মনে পড়ে না। রামমোহন বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ। কারুর কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য মনে পড়ে ; মনে পড়ে, তিনি সাত কোটি সন্তানকে একদা বাঙালী না করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, আজ বেঁচে থাকলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কথা প্রত্যাহার করে বলতেন : মানুষ না করে তাদের আবার বাঙালী করে দাও। মানুষ হতে গিয়ে সাত কোটি আড়াই কোটিতে এসে ঠেকেছে ; অবিলম্বে আবার বাঙালী হতে না পারলে আড়াই কোটি দূরের কথা ; কটিদেশে কাপড় পর্যন্ত আর থাকবে কি না বলা শক্ত!

কাশীর কথা উঠলে আমার যেমন ত্রৈলঙ্গ, শ্যামাচরণ, অথবা গোপীনাথ কবিরাজের কথা অতি অবশ্যই মনে জাগে বটে কিন্তু তার আগে, অনেক আগেই যার কথা মনে না হয়ে পারে না, তিনি অখ্যাত অবজ্ঞাত কাশীর দিদিমা। তেমনি আজকের অধঃপতিত বাঙালীর কানে নবজাগরণের বাণী উচ্চারণ করবার কালে যাঁদের জয়ধ্বনি করি তাঁরা নিশ্চয়ই রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং সব শেষে উল্লেখ করলেও সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ; কিন্তু তাঁদেরও, অর্থাৎ এই সব প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বসূরীদেরও পূর্বে যার কথা, যার জয়ধ্বনি আমার জিহ্বায় সর্বাগ্রে ডানা ঝাপটায় সে একজন কুখ্যাত সুজ্ঞাত গুণ্ডা। তার নাম বেয়াকুফ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেকালে বিধানসভায় এবং উত্তমকুমার ছবির পর্দায় হাজির ছিলেন না ; ন্যু এম্পায়ারের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নব্যনাট্যান্দোলন, নাটকের বদলে আলোক-আভা-সম্পাত অথবা স্বাধীনতার দাম মাত্র আট পয়সা হয়নি তখনও ; সেই যে কালে একটি অক্ষরও না জেনে এদেশে কাগজের সম্পাদক কিংবা চিরস্থায়ী সহকারী সম্পাদক হওয়া চালু হয়নি অথবা যখন লোকে চুরি করলে জেল খাটত, কিন্তু তখন জেল খাটলে চুরি করার অক্ষয় অধিকার অর্জন করত না ; একুশ বছর বয়স হলেই ভোট দিতে পারার একুশে আইন যেদিন চালু হয়নি ভারতবর্ষে ; অথবা হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন [?] দেশে জীবনে একবারই হত,— বার বার হতে পারত না সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে বেয়াকুফের নাম আজকের দিনে কোনও রাজনৈতিক নেতার চেয়ে কম কুখ্যাত ছিল না।

ধর্মতলায় অধর্মের হেডকোয়ার্টার ছিল বুদ্ধিমান বেয়াকুফের। কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশেই যেমন লেখক-প্রকাশক-পাঠকদের প্রাণকেন্দ্র, কারণ এদেশে ওই তিনপ্রকার লোকেরই [স্ত্রীলোকের কথা বলছি না ; আমার ঘাড়ে একটাই মাথা] প্রায়ই কলেজের সঙ্গে কোনও রকম যোগ ছিল না ; এখন নেই, ভবিষ্যতে থাকবে কিনা বলা শক্ত ; তেমনই অধর্ম করবার জন্যে ধর্মতলার চেয়ে উপযুক্ততর নামের রাস্তা, যেখানে গলির নাম ইংরেজী ষ্ট্রীট, ষ্ট্রীটের বিকল্প এভেন্যু, পাঁচতলা বাড়ীর নাম স্কাইস্ক্র্যাপার, মেসের লেটারহেডে ম্যানসন, এক ছটাক ওপেন স্পেসের পরিচয় পার্ক, বেকারের ক্রিডেন্সিয়াল ফ্রিলান্স জার্ণালিষ্ট। পুরস্কারের অথবা পেনসনের প্রত্যাশায় সরকারের পদলেহনকারীর নাম সাহিত্যিক ; এবং নোটলেখা, খাতা না দেখে নম্বর দেওয়া, অন্য কলেজে পার্টটাইম এটেণ্ডেন্স এবং প্রাইভেট ট্যুসানের কারণে ইউ-জি-সি গ্রাণ্টপ্রাপ্ত কালেজে আসলে লেকচারার কিন্তু কমান্ এরারের মহিমায় অধ্যাপকের বিজ্ঞাপন যেমন এডুকেশানিষ্ট বলে, সেই এই কলকাতায় সেদিনও ছিলো না ; আজও নেই।

সেই সে কলকাতার কুখ্যাত গুণ্ডা বেয়াকুফের কাছে গেছেন সেদিনকার এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। ডেলী প্যাসেঞ্জার সেই ভদ্রলোক বড়বাবু হবার পর ইন্টার ক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ড ক্লাসে পা দিয়েই বিপদে পড়েছিলেন। প্রায়ই সাহেবরা সেদিন সেকেণ্ড ক্লাসে বাঙালী কালাচামড়াদের আশা করত না ; যদি দৈবাৎ কেউ তাদের সহযাত্রী হত তো তাদের তামাশা করত। নির্দোষ তামাশা নয় ; থুতু, পা তোলা, কখনও কখনও গায়ে হাত তোলাও ছিলো, এই বিনে পয়সার তামাশা দেখতে কখনও কখনও ভীড় করত যারা, স্বজাতির হেনস্থায় সব চেয়ে সুখী সে [রজ]-জাতের নাম বাঙালী, তাদের ফাউ ; অর্থাৎ অতিরিক্ত আইটেম। আমাদের কাহিনীর নায়িকা [!] ভীরু বড়বাবু যে গাড়ীতেই উঠতেন, বিশেষ দুজন সাহেব খুঁজে খুঁজে সেই কামরায় উঠে রোজ রোজ সেই একই পালার পুনরাবৃত্তিতে উদ্যত হত নিঃসঙ্কোচে। বড়বাবু টাইম পালটেও সুবিধে করতে না পেরে এলেন ধর্মতলায় বিখ্যাত বেয়াকুফের কাছে।

বেয়াকুফের এই বিখ্যাত আড্ডা সেদিন কলকাতা শহরে কারুর অজানা ছিল না ; সম্ভবতঃ পুলিশের ছাড়া। পুলিশের ছাড়া এইজন্যে বলছি যে আজকের কলকাতাতেও তাহলে লালবাজার সত্ত্বেও কেন তবে কালোবাজারের জয়যাত্রা অব্যাহত। কালোবাজারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ কালোবাজার প্রকাশ্য বাজার নয় বলেই সব সময় হয়ত লালবাজারের পক্ষে তার গায়ে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকাশ্যে যেসব বেআইনী বাজার বসে তার সম্পর্কে আমরা জানি ; কিন্তু লালবাজার নিশ্চয় জানে না। উজ্জ্বল উদাহরণ কলকাতাময় ছড়িয়ে। খুব সম্প্রতি লেডি চ্যাটার্লীর লাভার শ্লীল বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশ তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে, আপনারা জানেন। কিন্তু সেই সব নিষিদ্ধ পুস্তক যা প্রকাশ্যেই অশ্লীল তা হলে কি করে সুরেন বাড়ুজ্জে রোড ধরে কর্পোরেশনে বাড়ীর লাল অংগে প্রকাশ্যে দিনের পর দিন 'বিকৃত' হয়? এই সব ষ্টলে সেক্সপীয়ারের বই বিক্রীত হবার জন্যে গাদা করা থাকে ; কিন্তু বিকৃত হবার জন্যে যারা এখানে আসে তাদের দেখেই দোকানদার ফিসফিস করে বলে : সেক্স বুক চাই বাবু? যে কেউ কোনও দিন সন্ধ্যায় এখানে গিয়ে এক মিনিট অথবা এক মিনিটও নয়, দাঁড়ালেই জানতে পারেন? কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই জানে না ; জেনেও পুলিশ কিছু বলবে না অথবা

[illegible]নি কিন্তু বলেন না—বলার মত কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি নন পুলিশও।

ছায়াছবির অশ্লীল পোষ্টার নিয়ে হৈ-হৈ-এর শেষ নেই অথচ এই কলকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, নির্জন রাস্তায়, ভীড়াক্রান্ত আলোকোজ্জ্বল রাজপথেই কখনও বা, ট্যাক্সিতে সে অবস্থায় যেতে-আসতে দেখা যাচ্ছে নরনারীকে, তা কি অশ্লীল পোষ্টারের চেয়ে কম জীবন্ত? ম্যাসাজ হোম বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই ম্যাসাজ হোমের এবং কখনও কখনও রীতিমত ভদ্র হোমেরও মেয়েদের এসে দাঁড়ানো বন্ধ হয়নি ল্যাম্পপোষ্টের তলায় তলায় সন্ধ্যা হতে না হতে। এরা সব পতিতা নয়; অথচ ভদ্রজীবন থেকেও বিচ্যুত,—এদের দেখে আমার কেন জানি না অবধারিত রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে। 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে, কে দেয় নেয় সন্ধ্যেবেলায় তারে?'—এদের কথা আপনারা জানেন, আমরা জানি, কিন্তু আরক্ষবাহিনী নিশ্চয়ই জানে না।

এ ছাড়া আরও যা জানি তা আপনারাও জানেন; কিন্তু আপনারাও বলেন না; আমরাও, না। কখনও কখনও কেউ কেউ বইতে লেখেন গল্পের ছলে; কিন্তু তার আগে, গোদা টাইপে; এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বাস্তব জগতের কারুর সঙ্গে এতটুকু মিল নেই; যদি থাকে তবে বুঝতে হবে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত,—লিখে দিতে ভোলেন কদাচ।

দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবই আমাদের সব অনর্থের মূল; এবং আমাদের, মধ্যবিত্তদের নির্মূল হবার কারণও হবে ওই, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবেই। রবীন্দ্রনাথের, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা উভয়েই বিধাতার রুদ্ররোষে সমান ভাবে জ্বলে যায়,—এই জীবনসত্য আমাদের জীবনে এখনও কবিতা হয়ে আছে বলেই যে আমরা ভয় পাই প্রতিবাদ করতে তা নয়; আসলে আমরা ভয় পাই, তার কারণ আমাদেরও এই আলেকজাণ্ডার উবাচ, 'সত্যিই কি আশ্চর্য এই দেশে' পুলিশকে যদি কোনও তথ্য দেবার দুঃসাহস করেন তাহলে আসামীর আগে আপনার সাজা হয়ে যাবে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ বলবে, আপনি কি করে জানলেন যে এমন হয়। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছেন। ব্যস! হয়ে গেল আপনার! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা; পুলিশে বাগে পেলে সে-আঠার বাঁধন খুলবে কে?

গোটা ভারতবর্ষেই তো আজ আসামীদের সাজাই আজকে সব চেয়ে কম হয় অথবা একেবারেই হয় না। তাই সেকথা থাক; তার বদলে এখন বেয়াকুফের কথা হচ্ছিল, তার কথাই হোক!

বেয়াকুফের আড্ডার সামনেটা হোটেল; পেছনটায় তার আসল কারবার। সেখানে হোটেলের মেনুর মতো কার্ডে ছাপা রয়েছে তার রেট খদ্দেরের জন্যে: পুরো খুন—হাজার টাকা; আধমরা: পাঁচশো; সামান্য শিক্ষা: একশো। সেকেণ্ড ক্লাসের ডেলি প্যাসেঞ্জার বড় বাবু সামান্য শিক্ষাই দিতে চাচ্ছিলেন সাহেবদের; বেয়াকুফের নির্দেশ মতো একশো টাকায় নোট একখানা এবং একখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের দাম গুঁজে দিলেন।

পরের দিন ট্রেণ ছাড়বার মুহূর্তে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে উদয় হয় কলকাতার কুখ্যাত বেয়াকুফ, বড়বাবু এবং সাহেবদের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। সাহেবরা আরও অবাঞ্ছিত আগন্তুককে দেখে বিস্মিত হয় কিন্তু বুঝতে দেরী হয় না তাদের যে এ নিরীহ ভদ্রলোক নয়; দুর্দান্ত সন্তান। চুপ করে থাকে সাহেবরা। কিন্তু একটু বাদে চুপ করে আর থাকা যায় কতক্ষণ? এতদিনের অভ্যাস। অতএব সাহেবরা এসমুস্থাল বুলি করতে আরম্ভ করে, বেয়াকুফকে বাদ দিয়ে বড় বাবুকেই। থুতু দেয়; পা তুলে দেয় বড়বাবুর বুকে। বেয়াকুফ আঙুল ইসারা করে বড়বাবুকেও সাহেবদের বুকে পা তুলে দিতে বলে। বড়বাবু পারবেন কেন? ছাপোষা বাঙ্গালী; দুর্দান্ত সাহেবের বিয়াল্লিশিঞ্চি বুকে পা তোলার মত পা কোথায় তার। কথা বড়বাবু শুনছে না দেখে বেয়াকুফ গেঞ্জির তলায় রাখা ছোরা দেখায়; অর্থাৎ কথা না শুনলে সে এবার বড়বাবুকেই ফাঁসাবে। বড়বাবু চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে, দুর্গানাম জপতে জপতে সাহেবের বুকে তুলে দেয় পা!

সাহেবরা প্রথমটা এত শকড্ হয় যে বুঝতেই পারে না কি হয়েছে,—তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতেই গর্জন করে ওঠে: হোয়াট? ডার্টি নেটিভস? কাওয়ার্ড বেঙ্গলীস?

বেঙ্গলীস বলতেই উঠে পড়ে বেয়াকুফ; ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহেবের বুকের ওপর; চীৎকার করে বলে বেয়াকুফ; হোয়াট? বেঙ্গলীস? প্লুর‍্যাল জেণ্ডার? [অর্থাৎ একজন বাঙালী না বলে তুমি প্লুর‍্যাল নাম্বার বললে কেন] চীৎকার করে বেয়াকুফ, আর সমানে হাত চালায়। সাহেবদের মুখ ফাটিয়ে নেমে যায় বেয়াকুফ, সেই কলকাতার কুখ্যাত গুণ্ডা, ট্রেণ পরের ষ্টেশানে পুরো হল্ট করবার আগেই।

সাহেবরা শুধু গোঙ্গায়; বড়বাবু নামবার আগে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সরিয়ে দিয়ে যায় ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া চলচ্ছক্তিরহিত চতুষ্পদকে [দুই সাহেবের দু পা প্লাস দু পা ইকোয়াল টু ওয়ান চতুষ্পদ]।

বেয়াকুফ গুণ্ডা শিক্ষিত ছিলো না; কিন্তু তার gender sense ছিলো ঠিকই! আমাদের শিক্ষা হয়েছে কিন্তু gender sense হয়নি আজও।

এই আমার এক দুরারোগ্য দোষ। এই,—এক কথা বলতে, একের কথা বলতে-বলতে আরেকের কথায় কলমের যখন-তখন নাক গলানো। দোষ আমার নয়; দোষ আদি ও অকৃত্রিম বাঙালীত্বর। শীল থেকে শীলে, ব্রজেন শীল থেকে পঞ্চশীল, গিরিশ ঘোষ থেকে

দ্বারিক ঘোষ যেতে আমাদের মুহূর্তের তর সয় না। বলতে সুরু করেছিলাম অসমাপ্ত ট্রেণ-পর্বের যে-ভদ্রলোকের কথা তিনি মধ্যবর্তী বয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালীই। ট্রেণে তাঁর সঙ্গে চলেছিলো আর যারা তারা সবাই কাশীতে বাঈজী পাওয়া যেত একদা কেমন এবং এখন কেমন যেন তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না যে, তাই নিয়ে আলোচনায় উন্মত্ত হয়েছিল। ভদ্রলোক শুনতে শুনতে আর শুনতে পারলেন না। বললেন, লোকে কাশী যায় ধর্ম করতে না অধর্ম করতে বলা শক্ত। আলোচনারত যুবকেরা তার কথায় কর্ণপাত করে না দেখে রাগে ফেটে পড়লেন: বাঈজীর অভাব নেই ভারতবর্ষে; তার জন্যে কাশীকে কলঙ্কিত করবার অর্থ কি? যুবকদের যে দলপতি সে বলল: আমার কথাও তাই; এদেরকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে মেয়েমানুষ, সেই সব মেয়েমানুষ যারা দেহের ব্যবসা করে তারা ক্যালকাটা টু কাশী, অবিকল এক। তার জন্যে কাশীতে গিয়েও কেবল ডালকামুণ্ডিতে 'মুণ্ড'মণ্ডনের অর্থ, একমাত্র অকর্মণ্য অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া আর কি হতে পারে!

কিন্তু যুবকদের যূথপতি যতই বলুক মোগলদের হাতে পড়ে তাকেও শেষ পর্যন্ত খানা খেতেই হলো কাশীতে। অর্থাৎ সদলবলে যেতে হলো ডালকামুণ্ডির ভুবনবিখ্যাত পতিতা-পাড়ায়। সেখানে মধ্যরাত্র পর্যন্ত বাঈজীসঙ্গে কাটিয়ে যখন বেরুচ্ছে তারা তখন কে একজন বললে নতুন এক মেয়েমানুষ এসেছে ডালকামুণ্ডিতে যার নাম ডালিয়া,—যাকে একবার দেখে না এলে কাশীতে আসার মানে হলেও, ডালকামুণ্ডিতে আসার মানে হয় না কোনও। পীড়াপীড়িতে রাজি না হয়ে উপায় থাকে না অসুর-দলপতি বৃত্রের। সেই মধ্যরাত্রে এদোর ওদোর করতে করতে ডালিয়ার ঘরের ঠিকানায় পৌঁছে ঠুক ঠুক করতে দেখা গেল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; অর্থাৎ লোক আছে। অত্যন্ত উত্তেজক ছবি দেখতে এসে উদগ্র দর্শকের 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলতে দেখে মনের যে অবস্থা হয় তারই মতো অথবা তার চেয়েও হতোদ্যম যুবকেরা যখন চলে যাবার জন্যে'পা বাড়িয়েছে ক্ষুণ্ণতর মনে তখন খুট করে আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। সবাই মিলে হুড়মুড় করে ডালিয়ার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো এক লাফে। কেবল দলপতি সেই 'কাপ্তান' নয়; বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সে তখনও।

বাইরে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিলো একজনাকে। সেই একজন,—সেই মুহূর্তে ডালিয়ার ঘর থেকে যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্তর্পণে আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডিঙি ডিঙি মেরে মেরে যাতে ডালকামুণ্ডির অপবিত্র মাটির অশুচি তাকে স্পর্শ না করে, সে ছাড়া আর কেউ নয়। মুখটা দলপতির ভারি চেনা। তবুও তাকে থামিয়ে লজ্জা দিলো না কাপ্তান। ট্রেণে মরাল-লেকচার-দেওয়া সেই মধ্যবয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী,—'কাশীতে যায় যারা তারা ডালকামুণ্ডিতে যায় কেন', তার অর্থ খুঁজে পেলেন কি না জিজ্ঞেস করবার ভারি ইচ্ছে করছিলো বটে কাপ্তানের, তবুও চেপে গেল সে। চেপে গেলো কারণ, কেন বলা শক্ত, তবুও তার সে মুহূর্তে মনে না হয়ে পারেনি সে ভদ্রলোকও তাকে চিনতে পেরেছেন। একটু পরে দলপতি গুণগুণ করে একটি গানের সুর, যা নাকি সেই পলায়নরত ভদ্রলোকের গাইলে ঠিক হত, নিজেই ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকলো গিয়ে ডালকামুণ্ডিতে নবাগত তারকা; ডালিয়ার ঘরে। গানটা রবীন্দ্রনাথের সেই: এ পথে আমি যে গেছি বার বার···!

এই কাশীর এক দিক; কিন্তু তার আর এক দিকও আছে। সেই একদিন যেমন কাশীর এক দিকের ছবি পেয়েছি তেমনই তার আর 'এক' দিকের ছবির জন্যে চলুন যাই আর 'এক'দিন-এর কাছে।

সেই আর-'এক'দিন-এ সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সম্মুখে গিয়ে নত হয়ে, প্রণত: হয়ে দণ্ডায়মান হই আসুন। শিবের জটামুক্ত জাহ্নবী যেখানে উত্তরবাহিনী সেই কাশীর গঙ্গায় তখন কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে অবগাহন-উদ্যত হয়েছে সর্বপাপঘ্ন সহস্রাংশু জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর। দিনের আলো অন্তর্হিত হয়নি আর এসে উপস্থিতি হয়নি তখনও তারাদের ফুলতোলা আকাশের আঙিনায় রমণীয় রাত্রি। 'পরমাশ্চর্য সেই প্রদোষালোকে গঙ্গার তীরে বসে আছেন মর্ত্যভূমিতে অমর্ত্যভূমির আভা;—ত্রৈলঙ্গস্বামী। ধ্যাননিরত ধূর্জটি শিষ্যরা অবলোকন করছে সেই হিমালয়শিখরে করুণার তুষার গলে গলে পড়ছে। এমন সময় সঙ্গীজনসমভিব্যাহারে দেখা দিয়েছেন অদূরে ধুতি-চাদর-পরা ছড়ি হাতে বাঙালী এক বাবু। এসে দাঁড়াতেই ধ্যানভঙ্গ হয় ধূর্জটির। হিমালয়ের আনন থেকে সূর্য্যলোকে অপহৃত হয় তুষারশুভ্র আবরণ। ত্রৈলঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন বাঙালী আগন্তুককে। একজনের অঙ্গে কটিবাস; আরেকজনের সর্বাঙ্গে সম্পন্ন সংসারীর ভেক। আলিঙ্গনান্তে একটি কথারও বিনিময় হয় না। দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেন নীরবে।

আগন্তুক বিদায় নেবার পর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিষ্যদের বিস্ময়ের কারণ, ত্রৈলঙ্গ কাউকে এমন আপ্যায়ন করেন না। ত্রৈলঙ্গ অপনোদন করেন বিস্ময়ের ছায়া শিষ্যদৃষ্টির অরণ্য থেকে: কাঠের লেঙটি পরে যোগীরা যাঁর অন্ত পান না অনন্তকাল ধরে, চটি-চাদর-ধুতি-পাঞ্জাবীপরা এই গৃহস্থ সংসারে বাস করেই সন্ধান পেয়েছেন সেই 'সার'-এর।

কাশীর আর 'এক'দিন আর 'এক' দিক' এই আগন্তুক-এর নাম: শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

[ক্রমশ:।

জানি না কেন যে

বন্দনা বসু

আমার লাগি যে আরো দুটি চোখ জাগে
জানি না কেন যে চিরকাল অনুরাগে।
উৎসুক উজ্জ্বল
কখনো তা ছলোছল
যেন জলভার মেঘের ইশারা মাগে।

কালো সে চোখের চাহনিতে আমি বাঁধা
মনে মনে তাই আমার হাসা ও কাঁদা।
আরো দু'-চোখের ভাষা
দিতে চায় ভালবাসা
সেই দুই চোখ আমারো যে ভালো লাগে

রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়ন

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোনো প্রতিভাবান স্রষ্টার সৃষ্টির মূল্য ঠিক-ঠিক নিরূপণ করতে হলে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মধারার মৌলিক সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। তা না হলে যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর হয় না। সংখ্যায় ও বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্র। একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সম্যক পরিচয় দেওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে তৎসম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা আলোচনা করব।

সংগীতের মৌলিক তত্ত্বগুলির মধ্যে সুর প্রধানতম। এই সুর বিধিবদ্ধভাবে ও বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত স্বরসমষ্টি মাত্র—যার সাহায্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়। সংগীতের স্বর, ব্যাকরণের স্বরের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত। এ সম্বন্ধে পূর্বে একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : বসুমতী ১৩৬৭ শ্রাবণ সংখ্যা)। ভাব প্রকাশ করাই যে সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সংগীতাচার্যগণ যথেষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সামগান থেকে আরম্ভ করে ছন্দোগান, প্রবন্ধগান এবং ধ্রুবপদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কি ভাবে তাঁরা সংগীতের সাহায্যে ভাবপ্রকাশের ধারাকে প্রবহমান রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল।'(১)

এই ভাবপ্রকাশের তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতরচনায় বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে কথার সঙ্গে সুর সার্থকভাবে মিলিত হয়েছে। ব্যাকরণের অক্ষরগুলি দ্বারা গঠিত এক-একটি শব্দ যেমন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, সংগীতের স্বরগুলি দ্বারা গঠিত এক-একটি স্বরবিন্যাসও বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। এই দুইয়ের মিলন যখন পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয় তখনই ভাব প্রকাশের পূর্ণতা ঘটে। আমাদের সংগীতে এক সপ্তকে (গ্রামে) সংখ্যা গণনায় স্বর দ্বাদশটি প্রতীয়মান হলেও প্রকৃত পক্ষে এক সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি (ধ্বনিস্থান) আবহমান কাল থেকে স্বীকৃত। এক-একটি বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য এক-একটি বিশেষ ধ্বনিস্থানের ব্যবহার হয়। আমাদের সংগীতের এই শ্রুতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সজাগ ছিলেন তা তাঁর উক্তি দিয়েই প্রমাণিত হয় :

'এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরই যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগরাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়।'

এবং এই শ্রুতি-তত্ত্বকে যে রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন গানের সুর বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যায়। তবে তার জন্য বিশেষ শ্রবণশক্তি ও ধারণা থাকা আবশ্যক। রাগরাগিণী গঠনের ভিত্তি এই শ্রুতি-তত্ত্বের উপর আধারিত। আমাদের দেশের প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতাগণের উপর রাগরাগিণীর প্রভাব অসীম। যে-কোনো প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতার ঐতিহ্যবাহী গানের ধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি হবে রাগরাগিণীর রসে তিনি কত অধিক সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর উপাদানগুলিকে পেয়েছি। সুতরাং যে-ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রাগটি তার সঙ্গে মিলে থাকবেই। আমাদের দেশের গান যেমন করেই তৈরি হোক না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করতে থাকবে।'(২)

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে রাগগুলিকে(৩) তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালংক এবং সংকীর্ণ। শুদ্ধ রাগ স্ব-গঠিত, অর্থাৎ তাতে অন্য কোনো রাগের মিশ্রণ নেই। ছায়ালগ বা সালংক রাগ দুই রাগের মিশ্রণে গঠিত। সংকীর্ণ রাগ দুইয়ের অধিক রাগের মিশ্রণে গঠিত। রবীন্দ্রসংগীতে এই তিন প্রকার রাগেরই সন্ধান মেলে। তা ছাড়া আরো কতকগুলি বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাগ-মিশ্রণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের চিরাচরিত নিয়মকে যেমন অনুসরণ করেছেন, আবার নতুন ভাবে কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন যার ফলে তাঁর গানে টোড়ী-ভৈরবী, রামকেলী-ভৈরবী, বিভাস-ললিত ইত্যাদি মিশ্র রাগের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তা ছাড়া, রাগভিত্তিক কোনো কোনা রবীন্দ্রসংগীতে যথাযথ ভাব প্রকাশের খাতিরে রাগের নির্দিষ্ট নিয়মের বিচারে বর্জিত স্বর বা স্বরাবলীর ব্যবহার হয়েছে। যেমন বেহাগ রাগের গানবিশেষে

১। ভারতী ১২৮৮।

২। ছন্দ।

৩। বর্তমানে রাগরাগিণীর পরিবর্তে রাগ শব্দটি প্রচলিত।

নির্দিষ্ট স্থানের অবরোহে কোমল নিষাদের প্রয়োগ হয়েছে (৪) বেহাগ রাগের অবরোহে কোমল নিষাদের এরূপ ব্যবহারে রাগটিকে বেহাগড়া অথবা বেহাগ-খাম্বাজ পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। বরঞ্চ ভাবের দিক থেকে বিচার করলে এরূপ প্রয়োগ সার্থক মনে হয়! তবে একটু উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ-সব বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা আবশ্যক।

হিন্দি ও অন্যান্য ভাষার কতকগুলি গানের সুর-তালের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ন্যূনাধিক দেড়শো গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দিগান-ভাঙা! মাদ্রাজী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী মহীশূরী, বিলাতী গান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতও কিছু কিছু আছে। সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য কারণে হিন্দিগান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। এই সব গানে কাব্যাংশের ভাবগত পার্থক্য তো আছেই, তা ছাড়া সুর-তালের দিক থেকে মূলানুগ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ হুবহু মূল-গানের সুরে তালে লয়ে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা খুব কম, অধিকাংশ মূল গানের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

সুরের বিচারে রবীন্দ্রনাথের লোকসংগীত অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। লোকসংগীত শব্দটির মধ্যেই তার অর্থ ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বাংলা দেশের লোকসংগীতের সুরকে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ব্যবহার করেছেন। বাংলার সংগীতধারায় কীর্তন ও বাউল গান বিশেষভাবে ঐতিহ্যবাহী! রবীন্দ্রসংগীতে এই দু'প্রকার সুরেরই বৈচিত্র্যের অভাব নেই, যার ফলে আগরযুক্ত কীর্তন, আগরহীন কীর্তন, কীর্তনাঙ্গ, বাউল বাউলাঙ্গ, মিশ্রিত কীর্তন-বাউল ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা নগণ্য নয়। তা ছাড়া, কিছু সংখ্যক সারি, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি ইত্যাদি সুরের রবীন্দ্রসংগীতও আছে।

সংগীতের মৌলিক তত্ত্বগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ছন্দ অন্যতম প্রধান বিষয়। তাল ও ছন্দের প্রকার ভেদে আমাদের দেশের সংগীতের প্রাচীন যুগে ও আধুনিক যুগে অনেক পার্থক্য হয়েছে। সেই তুলনা-মূলক বিচারের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলে, বর্তমানে উত্তর-ভারতীয় সংগীতের অধিকাংশ তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, ধামার ইত্যাদি তাল, খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি তাল এবং অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীতে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা তাল কুশলতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র ছন্দ প্রয়োগের দিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যার ফলে তাঁর গানে নিম্নলিখিত তালগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে:

ঝম্পক তাল—৩।২ মাত্রার ছন্দ, ষষ্ঠী তাল—২।৪ মাত্রার ছন্দ, রূপকড়া তাল—৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ, নবতাল—৩।২।২।২ মাত্রার ছন্দ, একাদশী তাল—৩।২।২।৪ ছন্দ, নব পঞ্চতাল—২।৪।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ এবং অন্তরবর্তী আরো বহুপ্রকার ছন্দ।

এ-সব ছন্দকে রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি বলা সঙ্গত নয়। কারণ, আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে এ-সব ছন্দের উল্লেখ আছে। তবে হয় গানে ছন্দগুলির ব্যবহার প্রচলিত হয় নি কিম্বা প্রচলিত হলেও কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত তালের মাত্রাসমষ্টি হিসাব করলে দেখা যায়, চার থেকে আঠারো পর্যন্ত মাত্রা-সমষ্টির সব তাল রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য তেরো ও সতের মাত্রার তাল ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। তার মধ্যে গীতবিতান প্রথম খণ্ডে পূজা ও স্বদেশ, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক এবং তৃতীয় খণ্ডে সব পর্যায়ের অবশিষ্ট গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পর্যায়গুলির কোনো-কোনটির উপ-পর্যায়ও আছে। আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী গান আনুষ্ঠানিক পর্যায় ছাড়াও অন্য পর্যায়ে ছড়িয়ে আছে। সুরের দিক ছেড়ে শুধু কাব্যাংশের দিক থেকে বিচার করলেও রবীন্দ্রসংগীতের কাব্য সাহিত্যক্ষেত্রে অতি উন্নত মান অধিকার করে আছে। মানব-মনের এমন কোনো অনুভূতি আছে কি না সন্দেহ, যার উপযোগী ভাব কোনো না কোনো রবীন্দ্রসংগীতে পাওয়া যায় না; সমাজের প্রয়োজনীয় এমন অনুষ্ঠান কমই আছে, যার উপযোগী রবীন্দ্রসংগীতের সন্ধান মেলে না। রবীন্দ্রসংগীত ব্যক্তির পক্ষে যেমন উপযোগী, সমাজের পক্ষেও তেমনি উপযোগী। এ হিসাবেও রবীন্দ্রসংগীত অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ভানু সিংহের পদাবলী কবির বাল্যবয়সে ছদ্মনামে লেখা রচনা। কবি এই রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কৌতুকচ্ছলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে নব উন্মেষশালী প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। 'ব্রজবুলি' ভাষায় লিখিত ও তদুপযোগী সুরে যোজিত ভানু সিংহের পদাবলী সমগ্র রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যায়ে চিহ্নিত করার মতো। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য তিনখানি—বাল্মীকি প্রতিভা, কাল মৃগয়া ও মায়ার খেলা। মূলতঃ গীতিনাট্যের প্রেরণা বিদেশ থেকে পেলেও, গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু ও রবীন্দ্রনাথের স্বভাবজাত প্রতিভা তুলির স্পর্শে গীতিনাট্যগুলি যে নিজস্ব রসে পুষ্ট এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই জানেন। নিজস্ব রসে পুষ্টির গুণ নৃত্যনাট্যেও আছে। নৃত্যনাট্যও তিনখানি চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা। গীতিনাট্য মায়ার খেলাকেও কবি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কখনও মঞ্চে রূপায়িত করার সুযোগ হয়নি। নৃত্যনাট্যের যুগ রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নৃত্য-সহযোগিতার স্বর্ণময় যুগ। বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত স-নৃত্য পরিবেশনের যে ধারা শান্তিনিকেতনে অনুসৃত হয়ে আসছিল, তা সর্বোচ্চ মানে পৌঁছয় এই নৃত্যনাট্যের যুগে—যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা নামে পরিচিত হয়। এই নৃত্যধারা কোনো একটি বিশেষ নৃত্য-পদ্ধতির গণ্ডিবদ্ধ নয়—মণিপুরী, কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম্ ইত্যাদি কোনো একটি মাত্র পদ্ধতিতে এই ধারা সীমাবদ্ধ থাকে না—কাব্যাংশের ভাব প্রকাশের জন্য যেখানে যে-নৃত্যের ধারা প্রয়োজন সেখানে সেই নৃত্যের যোজনাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য এরূপ প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। অপর দিকে স-নৃত্য পরিবেশনের উপযোগী এক একটি স্বতন্ত্র গান নিয়েও যদি বিচার করা যায়, যেহেতু বিভিন্ন গান বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে, সেজন্য সব গানেই একই পদ্ধতির নৃত্য যোজনা করা চলে না। উক্ত প্রসঙ্গে অঙ্গসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার দিকটাও অবশ্য বিবেচ্য।

৪। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' গানের সঞ্চারীর অংশ তুলনীয়।

রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ অব্যাহত রাখার জন্য রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রসংগীতের অনুষঙ্গ অবশ্য বিচার্য। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের কর্মধারায় চিন্তা, যুক্তি ও মননশীলতার ছাপ স্বভাবতই ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর গানে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে একটি পরিণত আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে পাই, তাঁর গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি তানপুরা, এস্রাজ, গানবিশেষে বাঁশি এবং তাল-যন্ত্র হিসাবে পাখোয়াজ তবলা খোল ইত্যাদি নির্বাচন করতেন। ভারতবর্ষের সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নির্বাচন-রীতির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠসাধনা চিরাচরিত। তার কারণ এই যে, সমস্ত স্বরের মূল আধার যে স্বর তার সংস্কার প্রধান সর্ত সংগীতোপযোগী রঞ্জকত্ব ও অনুরণনশীলতা। তানপুরার সঙ্গে বিধিবদ্ধ ভাবে অনুশীলনের ফলে কণ্ঠে সেই রঞ্জকত্ব ও অনুরণনশীলতার গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে হেতু তানপুরার সুরেলা আওয়াজে সে-সব গুণ বিদ্যমান। তা ছাড়া আমাদের সংগীতে এক সপ্তকে যে বাইশটি ধ্বনি-স্থান স্বীকৃত, তানপুরার তারের সামঞ্জস্যধর্মী আওয়াজ থেকে সে-সব ধ্বনির গুঞ্জন পাওয়া সম্ভব। এ দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে, আনুষঙ্গিক যন্ত্র হিসাবে এস্রাজ বা তদনুরূপ যন্ত্র বিশেষ উপযোগী, কেন না, তারের উপর স্বাধীনভাবে অঙ্গুলিচালনার সুযোগ থাকায় ঐ সব যন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধ্বনি উৎপন্ন করা সম্ভব। তাল-যন্ত্রের নির্বাচনও রীতি-অনুযায়ী করা প্রয়োজন। ধ্রুপদাঙ্গ গানের সঙ্গে পাখোয়াজ, খেয়ালাঙ্গ ও অন্যান্য ভাঙ্গা তালের গানের সঙ্গে তবলা, কীর্তনাঙ্গ ও অন্যান্য হাল্কা তালের গানের সঙ্গে তবলা, কীর্তনাঙ্গ ও বাউলাঙ্গ গানের সঙ্গে খোল বাজানো হয়ে থাকে, অবশ্য গানের চাল অনুযায়ী ঠেকা, পড়ন, রেলা ইত্যাদি গঠন করতে হয়। আসল কথা, গানে ও বাদ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আশাবাদী ছিলেন। তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রসংগীতের ঠিক-ঠিক মূল্যায়ন ও রূপায়ণ করা উচিত। এ দায়িত্ব শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর—যাঁরাই রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন করেন। আসন্ন রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য।

আমার কথা (৭১)

শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার (ঘোষ)

[বিশিষ্টা গায়িকা]

যাঁর সুমধুর কণ্ঠে "বাংলার বধূ··বুকে তার মধু" গানখানি একদা বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত পুরো এক যুগের উপরে বাংলার চিত্রাকাশের পর্দার আড়াল থেকে যাঁর কণ্ঠ সঙ্গীতপিপাসুদের আনন্দ দিয়েছে, তিনি শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার। আজও বাংলার সঙ্গীত-জগতে সুপ্রভা সরকারকে না চিনলেও "বড়দিকে" চেনেন সবাই। সঙ্গীত-জগতে শ্রীমতী সরকার বড়দিদি নামেই সমধিক পরিচিত, শ্রীমতী সরকার শুধু গানেই বড়দিদি নন, আলাপ আলোচনা এবং ব্যবহারেও সত্যিকারের বড়দিদি।

শ্রীমতী সরকার বলেন :—১৯১৮ সালে কলিকাতার ভবানীপুরে আমি জন্মগ্রহণ করি। ছোটবেলা হতেই বৈঠকখানা-ঘরে বাবার সেতার আর ঠাকুরঘরে মায়ের শ্যামাসঙ্গীত শুনে শুনে আমার মনেও গানের বীজ অঙ্কুরিত হতে লাগলো। এ ভাবে দিনের পর দিন আনন্দের মধ্যেই আমাদের দিন কাটতে লাগলো। হঠাৎ নিয়তির পরিহাসে আমার ১২ বৎসর বয়সেই আমরা বাবাকে হারালাম। সমস্ত জগত আমাদের কাছে অন্ধকারময় হয়ে উঠলো। সমাধানের অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে আমরা সপরিবারে মামার বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। মামার বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে গানের প্রবেশ নিষেধ। হঠাৎ এই নূতন পরিবেশে আমার মনের গানের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবার উপক্রম হলো। একমাত্র স্নানের ঘরে গুনগুনিয়ে গান গাওয়া ছাড়া আমার গানের চারাটিকে বাঁচিয়ে রাখার অন্য কোন উপায় রইল না। কিন্তু যা হবার তা রোধ করার ক্ষমতা বুঝি ভগবানেরও নাই। গান শেখার সম্পূর্ণ আগ্রহকে দমন করে যখন অন্য পাঁচজনের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি এমন সময় ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতো উপস্থিত হলেন আমার জ্যাঠতুতো ভাই শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ। তিনি মামাদের অনুপস্থিতিতে আমাকে গান শেখাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে হলোও তাই। মামারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই পাশের বাড়ীতে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে গান শিখতাম। যে কারণেই হোক, মামার বাড়ীতে আমাদের বেশী দিন থাকা হলো না। দুই বৎসর পরেই আমরা পুনরায় ভবানীপুরে ভিন্ন বাসা করে চলে গেলাম। ভর্তি হলাম পি, এম, দাস গার্লস স্কুলে। আমার গান শেখার ইতিহাসে সব থেকে মজার ঘটনা ঘটেছিল আমার ১৪ বৎসর

বয়সে। তখন স্কুলে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী আমি। স্কুলের পথে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী। রোজ স্কুলে যাওয়া-আসার পথে শুনতে পেতাম শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুমধুর কণ্ঠের গানের রেওয়াজ। মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম তাঁর বাড়ীর দরজায়। রোজ রোজ এভাবে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারাপদ বাবু জিজ্ঞেস করলেন আমি কি চাই। কামনা চেপে না রাখতে পেরে প্রকাশ করলাম মনের একান্ততম গোপন আশার কথা। আগ্রহভরে আমন্ত্রণ জানালেন তারাপদ বাবু, শেখাতে লাগলেন গান। বাড়ীতে কাউকেও কিছু না বলে গান শিখতে লাগলাম তাঁর কাছে। একদিন তারাপদ বাবু "ভূপালী" রাগ অনুশীলন করতে দিলে শত চেষ্টা সত্বেও তা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারলাম না বলে স্নেহভরে কষে মারলেন এক চড়। সেই চড় খাওয়ার পর হতে দেখা করিনি আর তাঁর সঙ্গে। এর পর জীবনের মোড় ঘুরে গেল অন্য দিকে, আলাপ হলো লীলা দেশাইর সঙ্গে।

শ্রীমতী দেশাই তখন বাংলার চিত্রাকাশে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে হওয়ায়মানা, নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীর সাথে অভিনয় করেছেন অজস্র ছবিতে। শ্রীমতী দেশাই আমার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে নিয়ে গেলেন নিউ থিয়েটার্সে নেপথ্যে গান করার উদ্দেশ্যে। নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী আমাকে অপ্রাপ্তবয়স্কা মনে করে ফেরৎ পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারের পর আমি একটু দমে গেলেও দমেন নাই শ্রীমতী দেশাই। ছয় মাস পার না হতেই পুনরায় নিয়ে গেলেন নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীতে। শ্রীরাইচাঁদ বড়াল এবং শ্রীপঙ্কজ মল্লিক তখন নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীর সঙ্গীত পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক। এবারে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন, মনোনীত হলাম "জীবন-মরণ" চিত্রখানিতে প্লেব্যাক করার জন্য। জীবনের প্রথম এই গান—

"হায় কভু যে আশায়
দিন বয়ে যায়।"

জীবন-মরণে প্লেব্যাক করার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি এবং দিদি চিত্রে গান গাইবার জন্যও মনোনীত হলাম। এর পর থেকে এক ধারায় চললো বিভিন্ন চিত্রে গান গাইবার পালা। ঠিক কত বইতে গান গেয়েছি তা সঠিক মনে করে উঠতে না পারলেও গরমিল, বাংলার মেয়ে, সিংহদ্বার, মাই সিষ্টার ওয়াসেং নাসা, ভুয়মণ, রামের সুমতি, চন্দ্রবেণী, স্বপ্ন ও সাধনা, ৭নং বাড়ী, চোখের বালি, শাপমুক্তি, স্বয়ংসিদ্ধা, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি বইগুলির নাম আজও মনে পড়ে। আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে খুসী এবং আনন্দের ব্যাপার যে আজ পর্য্যন্ত যত চিত্রে গান করেছি তার প্রত্যেকটি গানই হিট song হিসাবে জনসমাজে আদর পেয়েছে। চিত্রজগতে গান গাইতে আরম্ভ করবার কিছুদিন মধ্যেই শ্রীলীলা দেশাইর সংগে ভারত ভ্রমণে বার হই এবং বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত গানের আসরে গান গাই। চিত্রজগতের কৃপায় সঙ্গীত-জগতে যখন নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলাম তখন আপনা হতেই অল ইণ্ডিয়া রেডিও হতে আহ্বান এলো গাইবার জন্য এবং কোনরকম অডিসন না দিয়েই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে আজ গান গেয়ে যাচ্ছি বেতারশিল্পী হয়ে।

শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার (ঘোষ)

চিত্রজগৎ এবং বেতারজগৎ ছাড়াও সব মিলে গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করেছি ৩০০খানার উপরে এবং আজ পর্য্যন্তও সংশ্লিষ্ট রয়েছি মেগাফোন কোম্পানীর সাথে। গানের মধ্যে জীবনের বহু বৎসর কাটিয়ে দিলেও নারীর চিরন্তন আদর্শ সংসার করার কথা ভুলি নাই এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে, একথাই বিশ্বাস করি মনে-প্রাণে। কি বিয়ের আগে কি বিয়ের পরে সংসারের প্রতিটি কাজ করে যাচ্ছি নিজ হাতে। স্বামিপুত্রকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তার তুলনা নাই। সংগীতজগতে গান করলে সংসার করা যায় না, সে কথা বিশ্বাস করি না। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জীবনের প্রথমার্দ্ধ হতে যৌবনের শেষ সীমায় এসে আধুনিক ছেড়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি যেন বিশেষ আগ্রহ জেগে উঠলো প্রাণে। তাই ৩৭ বৎসর বয়সে ভর্ত্তি হলাম সঙ্গীতভারতীতে, শুরু করলাম ধ্রুপদ এবং খেয়াল গান এবং শেষ করলাম সসম্মানে। গত বৎসর ধ্রুপদ এবং খেয়াল গানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ডিপ্লোমা নিলাম সঙ্গীতভারতী থেকে। আমার গান শেখার ইতিহাসে নির্দিষ্ট কোন গুরুমহাশয় নাই বললেই চলে, নিজের চেষ্টা এবং চিত্রজগতই আমার গুরুমহাশয়। বেতারে গান গাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি আমার গানের চর্চা, স্বামিপুত্র এবং সংসার ফেলে ব্যাপক ভাবে গানের জগতে প্রবেশের ইচ্ছাও আর নাই। বয়সও হয়েছে, তাই পাকাপাকি ভাবে গানের শিক্ষকতা করেই কাটিয়ে দিতে চাই বাকী জীবন এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে হয়েছেও তাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সঙ্গীত-একাডেমী হতে নিয়োগপত্র পেয়েছি লেকচারারের এবং আসছে মাসের প্রথম থেকে যোগ দিচ্ছি সেখানে।

"Poverty is the parent of revolution and crime."

—*Aristotle*

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, '৬০)

অন্তর্দেশীয় :—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) : 'ভাষা বিলের দ্বারা আসামের ভাষা সমস্যার সমাধান হয় নাই'—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ।

২রা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনের আরও তিন বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধির আয়োজন—লোকসভায় বিল উত্থাপনকালে তুমুল বিতর্ক।

স্বতন্ত্র পার্ব্বত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী—হাফ্লং-এ (আসাম) সর্ব্বদলীয় পার্ব্বত্য নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাব।

৩রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক গান্ধীসাগরে (মধ্যপ্রদেশ) গান্ধী সাগর বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত—উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রস্তাব গ্রহণ।

৫ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর) : সর্ব্বসম্মত অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বেরুবাড়ী হস্তান্তরের চক্রান্ত—মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে রাজ্য বিধান সভায় (পশ্চিমবঙ্গ) প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) : 'বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অনুমোদনের প্রয়োজন নাই'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পন্থের সদম্ভ ঘোষণা।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : 'ভারত-চীন বিরোধ শুধু সীমান্তের ব্যাপার নহে—আরও গুরুতর সমস্যা'—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর বিল বিধান সভায় আসিবে না—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্পষ্টোক্তি।

কঙ্গোয় ভারতীয় সামরিক লোকজনের উপর আক্রমণ গুরুতর ঘটনা—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উদ্বেগ প্রকাশ।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধে সারা পশ্চিমবঙ্গে গণ-আন্দোলন চালানো হইবে—কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় সঙ্কল্প গ্রহণ।

পাক্-ভারত আর্থিক বিরোধ অমীমাংসিত—উভয় রাষ্ট্রের অর্থসচিব-দ্বয়ের দিল্লী বৈঠকের সমাপ্তি।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : স্বতন্ত্র পার্ব্বত্য রাজ্য গঠনের দাবী কার্য্যতঃ নাকচ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থ কর্ত্তৃক পার্ব্বত্য নেতাদের নিকট জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের ক্ষমতা সম্প্রসারণের নূতন প্রস্তাব হাজির।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) : বাংলার মানুষকে গো-মহিষাদির মত উপঢৌকন দেওয়া চলিবে না—সারা বাংলা বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় (কলিকাতা) নেতৃবৃন্দের দৃপ্ত ঘোষণা।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : পশ্চিমবাংলার গ্রামে নিরন্ন ভূমিহীন কৃষকের অসহায় ও মর্ম্মন্তুদ অবস্থা—রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্ত্তৃক সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির সমালোচনাকালে চিত্র উদ্ঘাটন।

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) : বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বেরুবাড়ী হস্তান্তর কোনমতেই চলিবে না—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে সুস্পষ্ট দাবী।

১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : 'জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান এখনও নাশকতামূলক কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৫ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : ভারত-পাকিস্তান চুক্তির (১৯৫৮) বলে সংগৃহীত ভূমি সম্পর্কে রচিত সংযুক্তিকরণ বিল নামঞ্জুর—সংবিধানবিরোধী বিল গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অসম্মতি।

শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা (রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী) নির্ব্বাচিত—পণ্ডিত পন্থের মধ্যস্থতায় উত্তর প্রদেশে দীর্ঘদিনের মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের অবসান।

১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিকল্প প্রস্তাব (ত্রিপুরার কোন অঞ্চল দানসংক্রান্ত) অস্বীকার—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রস্তাবে কলিকাতায় ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ—ময়দানে বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর স্বৈরাচারী নীতির তীব্র নিন্দা।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : কলিকাতায় সন্নিহিত উল্টাডাঙ্গা রোড ষ্টেশনে শোচনীয় ট্রেণ দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে পাক্-ভারত চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সাফ কথা।

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : 'বেরুবাড়ী' দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মান বাঁচে নাই, জেনারেল আয়ুবের (পাক্ প্রেসিডেণ্ট) কাছে হার হইয়াছে—স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রীসি, রাজাগোপালাচারীর বিবৃতি।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : "আসামে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং সময় আসিলেই আসাম দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে"—লোকসভায় স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পন্থের উক্তি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বহু বিতর্কিত পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল (সংশোধন) বিল গৃহীত।

২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ—বামপন্থী দলগুলির (পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে বিধানসভা অভিমুখে বিক্ষোভ অভিযান।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) : নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসরকাল বৃদ্ধি—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভোটের জোরে বিল পাশ—প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

ত্রিপুরায় আইন সভা গঠনের জন্য বিভিন্ন দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা—আগরতলায় প্রতিনিধি সম্মেলনে ২৬শে জানুয়ারী 'দাবীদিবস' পালনের সঙ্কল্প

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক রাজ্য বিধান সভায় বেরুবাড়ী সংক্রান্ত দলিলপত্র পুস্তিকাকারে পেশ—উপস্থাপিত বিবরণে অঞ্চল খয়রাতির প্রশ্নে সরকারী গোঁজামিল।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) : 'বেরুবাড়ী হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা ব্যতীত এখন গত্যন্তর নাই'—দিল্লীতে বেরুবাড়ী প্রতিনিধি দলের নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সাফ জবাব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা (?) কুমারী অনীতা বসুর কলিকাতা উপস্থিতি ও সাদর অভ্যর্থনা।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) : 'বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গেরই থাকা উচিত, তবে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) মর্য্যাদা রক্ষার সমস্যাই সব শেষের প্রশ্ন'—রাজ্য বিধান সভায় (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অসহায় অবস্থা ব্যক্ত।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে বিধানমণ্ডলীর (পশ্চিমবঙ্গ) অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ—পার্লামেণ্টে বেরুবাড়ী বিল আনয়নের প্রশ্নে রাজ্য বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের প্রবল উত্তেজনা।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান পরিষদ রণাঙ্গনে পরিণত—সংযুক্তিকরণ বিল সম্পর্কে কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের অবতারণা।

বেরুবাড়ী খয়রাতির প্রতিবাদে ২০শে ডিসেম্বর (১৯৬০) পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হরতাল—সারা বাংলা বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটির ঘোষণা।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে নেহরু-নুন চুক্তি কার্য্যকরী হইবেই—নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর স্পষ্টোক্তি।

বহির্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) : নিকারাগুয়া ও গুয়েতামালা অভিমুখে মার্কিণ রণপোতবহর—কম্যুনিষ্ট আক্রমণ নিরোধের জন্য মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বন।

করাচীতে ভারত মহাসাগরাঞ্চলীয় বিজ্ঞান সভার চতুর্থ সম্মেলন আরম্ভ—পাক শিল্পসচিব মিঃ আব্দুল কাসেম খাঁ কর্তৃক উদ্বোধন।

২রা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : ভারতের মধ্য দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর সরাসরি রেল যোগাযোগ—রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক্-ভারত বৈঠকে পদ্ধতি সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৫ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর) : সাধারণ নির্বাচনে জাপানের ক্ষমতাসীন দলের (উদারনৈতিক ডেমোক্র্যাট দল) পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : কঙ্গোলী সৈন্যদের হাতে ভারতীয় সামরিক অফিসারগণ (রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে কার্য্যরত) লাঞ্ছিত—গাড়ী কাড়িয়া লইয়া নিদারুণ প্রহার।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : আঙ্গোলায় আফ্রিকানদের উপর পর্ত্তুগীজদের পৈশাচিক অত্যাচার—নির্বিচারে মারধর, গ্রেপ্তার ও হত্যার সংবাদ।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : লিওপোল্ডভিলে হইতে কঙ্গোর পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার নাটকীয় অন্তর্দ্ধান—কর্ণেল মবুটুর (ক্ষমতাসীন সামরিক নেতা) সৈন্যদের বেড়াজাল ভেদ করিয়া ষ্টানলেভিলে যাত্রা।

১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : কর্ণেল মবুটুর নেতৃত্বে কঙ্গোলী সেনাদল কর্তৃক লুমুম্বা গ্রেপ্তার।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : প্যাথেট লাও বাহিনী কর্তৃক লুয়াং প্রবাং (লাওস) বেষ্টন—দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহী জেনারেল কেটমির সৈন্যদলের সহিত প্রবল সংগ্রাম।

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : অবিলম্বে লুমুম্বার মুক্তি ও কঙ্গোলী বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ চাই—সোভিয়েট সরকারী বিবৃতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিকট দাবী।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী অপসৃত হইলে কঙ্গোতে বাহিরের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য—নিরাপত্তা পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কজোল্ডের রিপোর্ট।

রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের অনুসৃত নীতি চীনের রাষ্ট্রনায়ক লি সাউ চি কর্তৃক পূর্ণ সমর্থন।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) : দ্য গলের (ফরাসী প্রেসিডেণ্ট) উপস্থিতিতে আলজিয়ার্সে প্রবল বিক্ষোভ আরম্ভ—বিক্ষোভ দমনে ফরাসী ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়োগ—কয়েকটি স্থানে খণ্ডযুদ্ধ।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) : 'কঙ্গোর পার্লামেণ্ট আহ্বান কর ও কর্ণেল মবুটুর (বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী) দলকে নিরস্ত্র কর'—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের দাবী।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) : ইথিওপিয়ার সেনাবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল—সম্রাট হাইলেসেলাসীর অনুপস্থিতিতে সৈন্যদলের আকস্মিক বিদ্রোহ—যুবরাজকে ইথিওপিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর) : রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নেপালের সমস্ত শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ—মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট বাতিল—প্রধান মন্ত্রী কৈরালা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ গ্রেপ্তার।

কঙ্গোর ভবিষ্যৎ—

স্বাধীনতা লাভের পাঁচ মাস পরেও কঙ্গোর পরিণতি কোন পথে এবং কি ভাবে হইবে, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তড়িৎ গতিতেই কঙ্গোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম দিকেই অভিযোগ উঠে যে, কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পশ্চিমী শক্তিবর্গের এজেন্টরূপে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কাজ করিতেছে। অভিযোগটা কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে উঠায় উহাকে প্রচার কার্য্য বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে তাঁহাদের সকলের ভুল ভাঙ্গিয়াছে কিনা তাহা বলা কঠিন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখোস পরিয়া কঙ্গোতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে অনেকখানি সিদ্ধ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কাসাভুবুর প্রতিনিধিদলকেই কঙ্গোর প্রতিনিধিদল বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কাসাভুবু এবং পরোক্ষভাবে মবটুর গবর্ণমেণ্টকেও স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। কাসাভুবুর এই জয়ের পর বন্দিদশা হইতে প্রধান মন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার রোমাঞ্চকর পলায়ন কাসাভুবু ও মবটুর যে পরাজয় সূচনা করিয়াছিল লুমুম্বা পুনরায় ধৃত হওয়ায় তাহা তাঁহাদেরই জয়ে পরিণত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বাকে গুলী করিয়া হত্যা করার হুমকীও দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে হত্যা করিলেই কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী শক্তি হীনবল হইয়া পড়িবে, ইহাই হয়ত মবটুর ধারণা। কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিলে কঙ্গোতেই তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রাম সুরু হইতে পারে এই আশঙ্কাতেই হয়ত লুমুম্বার জীবন রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু থিসভিলের সামরিক শিবিরে তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইতেছে। প্রহার করিয়া তাঁহাকে আধমরা করা হইয়াছে। তাঁহার মাথা কামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, হাত দু'খানা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে পিছনের দিকে। একটি মানুষের বাসের অযোগ্য অস্বাস্থ্যকর কক্ষে তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রশকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও কঙ্গোতে এখনও পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের সমর্থিত কাসাভুবু ও মবটুর পূর্ণাঙ্গ জয়লাভ হয় নাই।

লুমুম্বার সমর্থক কঙ্গোর সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এণ্টোইনে গিজেঙ্গা ষ্টানলিভিলেতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিরাপত্তা পরিষদে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বা এখন বন্দী, এই জন্য তিনি নিজে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন এবং সাময়িক ভাবে ষ্টানলিভিলেকেই রাজধানী করা হইল। এবার সমস্যাটি পশ্চিমীশক্তিবর্গের দিক হইতে নূতন আকার ধারণ করিল। পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন কাসাভুবু মবটুর পক্ষে, এই যুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মবটু চক্রকেই কঙ্গোর 'ডি ফ্যাক্টো' সরকাররূপে পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু সেই পার্লামেণ্টেরই আস্থাভাজন সহকারী প্রধান মন্ত্রী—প্রধান মন্ত্রী বন্দী থাকায় শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আইনসঙ্গত সরকার গঠন করিয়াছেন। মবটুর মত ডাণ্ডার জোর তাঁহারও আছে, ষ্টানলিভিলিতে তিনি অসহায় নহেন। মধ্য ও উত্তর কঙ্গোর চারটি প্রদেশ ওরিয়াণ্টাল, ইকুয়েটর, কিভু এবং কাসাই লুমুম্বার সমর্থক। ওরিয়াণ্টাল প্রদেশটি কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিতেছে। লুমুম্বার সমর্থক সহকারী

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

প্রধান মন্ত্রী গিজেঙ্গা ওরিয়েণ্টাল, ইকুয়েটর এবং কাসাই প্রদেশের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্যকামী ইকুয়েটর প্রদেশের বিরুদ্ধে মবটুর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেখানে বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। এদিকে কাসাভুবু ও মবটুর মধ্যেও বনিবনাও হইতেছে না বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠার সম্ভাবনাতেই মবটু ব্রাজভিলে যাইয়া তাঁহার বেলজিয়াম মুরুব্বিদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন যে, এখন হইতে তিনি তাঁহার স্বজাতি কঙ্গোলীদের মধ্য হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। কাসাভুবুর অনুপস্থিতিতে মবটুর সৈন্যদের লিওপোল্ডভিলে তাঁহার প্রাসাদে হানা দেওয়ার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। লুকানো অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান করাই না কি এই হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও নাকি পাওয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিদল এবং সৈন্যবাহিনীর সহিত মবটুর বিরোধ চরমে উঠিয়াছে। তাঁহার সৈন্যরা কয়েকজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে লাঞ্ছিত ও গুরুতর প্রহার করিবার স্পর্দ্ধাও প্রদর্শন করিয়াছে। মবটুর সৈন্যরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাসপাতাল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। এই হাসপাতাল প্রহরায় নিযুক্ত নাইজেরিয়াম সৈন্যদের সহিত মবটুর সৈন্যদের রীতিমত সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সামরিক দ্রব্যাদি বহন না করিবার জন্য মবটু অট্রাকো নামক বেলজিয়াম কোম্পানীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর প্রয়োজন নাই বলিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

কঙ্গোর অবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত সামান্য আলোচনা হইতেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঘটনা-স্রোত অতি দ্রুত ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাসাভুবু মবটুচক্র বেলজিয়মের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইতেছে, তাহাকে আইনসঙ্গত বলিয়াই পশ্চিমী শক্তিবর্গ মনে করেন। লুমুম্বার সমর্থক সহকারী প্রধানমন্ত্রী গিজেঙ্গাল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়াছেন, সেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি ঘানা, গিনি, সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাহারা সাহায্য দেয়, তাহা হইলে তাহাও আইনসঙ্গত হইবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। উহার পরিণতিতে

কঙ্গোতেই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইবেন, তাহাও খুব স্বাভাবিক। কঙ্গোতে তাঁহারা যাহা ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ঘটিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই! কঙ্গো বারুদ-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পশ্চিমী শক্তিবর্গের এজেন্টরূপে এতদিন কঙ্গোতে যাহা করিয়াছেন, উহা তাহারই পরিণতি। উহার জন্য দায়িত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরই। গত সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার দূতাবাস কঙ্গো হইতে অপসারিত হইয়াছে। উহার পর ঘানা, গিনি, সংযুক্ত-আরব-রাষ্ট্র কঙ্গো হইতে সরিয়া আসিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়াও কঙ্গো হইতে সরিয়া আসিতেছে। সংযুক্ত-আরবরাষ্ট্র, ঘানা, গিণি এবং মালি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কন্‌সিলিয়েশন কমিশন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরাপদ নহে বলিয়া ঘানা তাহার পুলিশবাহিনী লিওপোল্ডভিলে হইতে সরাইয়া লইয়াছে। মিশরীয়, যুগোশ্লাভ এবং সিংহলী সৈন্যও অপসারণ করা হইয়াছে। মরক্কোর সৈন্য কঙ্গোতে আছে বটে, কিন্তু মরক্কোকে মবটুর সমর্থক বলা চলে না।

লুমুম্বার গ্রেপ্তার সম্পর্কে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ড একই স্বরে কথা বলিয়াছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিরাপত্তা-পরিষদে বলিয়াছেন যে, কঙ্গো-কর্তৃপক্ষের লুমুম্বাকে গ্রেপ্তারের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মিঃ হ্যামারশীল্ড বলিয়াছেন যে, লুমুম্বার গ্রেপ্তার আইনসঙ্গত, কারণ গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় কাসাভুবু দস্তখত করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া লুমুম্বাকে মুক্তি দিবার জন্য নিরাপত্তা-পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পরিষদে ভারত ও অন্যান্য সাতটি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে যে-সকল দাবী করা হইয়াছে তন্মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান অন্যতম। কঙ্গো হইতে অবিলম্বে বেলজিয়াম সামরিক ও আধা-সামরিক কর্ম্মচারী, উপদেষ্টা এবং কারিগরি-বিদ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদিগকে অপসারিত করার দাবীও ঐ প্রস্তাবে করা হইয়াছে। অবিলম্বে কঙ্গোর পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার এবং সমগ্র সৈন্যরা যাহাতে কঙ্গোর রাজনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কঙ্গোতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লুমুম্বার মুক্তির কোন ব্যবস্থা করিবেন, একথা বলা কঠিন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কাসাভুবু-মবটু-চক্রকেই কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কাটাঙ্গার সোম্বে সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বীকৃত নয়। তবু সোম্বের বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাদিগকে ধরিয়া সোম্বে-সরকারের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। মবটুচক্র বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছে ও পাইতেছে। বেলজিয়ামরা আবার দলে দলে কঙ্গোয় ফিরিয়া আসিতেছে। কঙ্গোর সহকারী প্রধানমন্ত্রী গিজেঙ্গা কর্তৃক ষ্ট্যানলিভিলেয় গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। লণ্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, গিজেঙ্গার অনুরোধ বিমান বোঝাই করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ষ্ট্যানলিভিলেতে পাঠান হইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কন্‌সিলিয়েশন কমিশন জানুয়ারী মাসে কঙ্গো যাইবেন। তাঁহারা কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও কঙ্গো গৃহযুদ্ধের পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই গৃহযুদ্ধ শুধু গৃহযুদ্ধই থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

নেপালে রাজকীয় ডিক্‌টেটরশিপ্‌—

গত ১৫ই ডিসেম্বর নেপালে আকস্মিকভাবে যে রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল, তাহা একান্তভাবেই অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইবে। ঐদিন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এক সরকারী ইস্তাহার দ্বারা নেপালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়াছেন, পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং স্বহস্তে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস পি উপাধ্যায়, পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদের স্পীকার, প্রাক্তন ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী এম পি কৈরালা, কম্যুনিষ্ট নেতা মনমোহন অধিকারী এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই ভাবে সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহা নেপালেও কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই, বোধ হয় তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সামরিক অফিসার ছাড়া। মন্ত্রিসভা যে এ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও অনুমান করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন একটি যুব-অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, সেই সময় রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর অফিসারগণ তাঁহাদিগকে পদচ্যুতির হুকুমনামা দেখাইয়া গ্রেফতার করিয়া লইয়া যান। গ্রেফতারও বেশ ব্যাপক ভাবেই করা হইতেছে। কেন স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎও তিনি দিয়াছেন। এই কৈফিয়তের মধ্যে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই নাই। যে-দেশেই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া একনায়কত্বের উদ্ভব হয়, সেইখানেই গণতন্ত্র বিলোপ করার পক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, প্রথম নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিধান করিতে এবং দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতে পরিবে বলিয়া যে আশা করা

গিয়াছিল, তাহা চূর্ণ হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে, দল ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয়তা-বিরোধী লোকদের উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘোষণায় তিনি বলিয়াছেন, “গণতন্ত্রের ছদ্মবেশের অন্তরালে এইরূপ অবস্থা চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়াই আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি। কারণ, দেশের শৃঙ্খলা, অখণ্ডতা এবং সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করার চূড়ান্ত দায়িত্ব আমার।” নেপালের রাজার এই সকল অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই। এই অভিযোগ উপস্থিত করা সহজ। এ সম্পর্কে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন যে, মাস কয়েক পূর্ব্বে নেপালাধীশ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, সেখানকার অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন এবং একটা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা নেহেরুজী জানিতেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। নেহেরুজী আরও বলেন যে, ঘটনার সময় ভারতীয় স্থলবাহিনীর সেনাপতি-মণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল থিমায়া দৈবাৎ কাটমাণ্ডুতে উপস্থিত ছিলেন। নেপালী সেনা-বাহিনীর সেনাপতি পদে নিয়োগ দ্বারা সম্মানিত করিবার জন্য নেপালরাজ জেনারেল থিমায়াকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দুই দিন পূর্ব্বে কাটমাণ্ডুতে একটি অনুষ্ঠানে রাজা তাঁহাকে নেপালী বাহিনীর সেনাপতি পদে বরণ করিয়া সম্মানিত করেন। তাহার দুই একদিন পরেই এই ব্যাপার ঘটে। নেহেরুজী বলেন যে, আরও অনেকের ন্যায় জেনারেল থিমায়াও আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব্বে কিছু জানিতে পারেন নাই এবং ব্যাপরটা আকস্মিক ভাবে তাঁহার চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নির্ব্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সে-গুলি যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও রাজকীয় ডিক্‌টেটরশিপ্‌ উহার প্রতিকার—একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই ধরণের অভিযোগ নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক গণতান্ত্রিক দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই উঠিয়াছে এবং কোন কোন দেশে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া ডিক্‌টেটরশিপ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯৫০ সালের পূর্ব্বে নেপালের শাসন ব্যবস্থায় রাণাদেরই ছিল একাধিপত্য। নেপালের রাজা ছিলেন রাণাদের হাতের পুতুল মাত্র। নেপালী কংগ্রেস কৈরালা-ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে রাণা-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উহার উচ্ছেদ করে এবং নেপালের রাজা স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে সর্ব্বপ্রথম নেপাল পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হয় এবং বি পি কৈরলা প্রধান মন্ত্রিরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা অনুন্নত দেশকে উন্নত করিয়া তোলা সম্ভব নয়। তবে, প্রধান মন্ত্রী বি পি কৈরলা নেপালের দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারই প্রথম পর্য্যায় হিসাবে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী দখল করিতেছিলেন। এই সকল জমিদারী প্রায় সমস্ত রাণাদের। রাণারা শুধু প্রভাবশালীই নন, রাজপরিবারের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক-ও আছে। চীনের সহিত সীমান্ত সম্পর্কে শ্রী কৈরলা একটা মীমাংসা করায় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নেপালে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কৈরলা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী দখল করিতে যাইয়া বিপুল বিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালের এই রাজনৈতিক বিপর্যয় উহারই পরিণতি বলিয়া মনে হইলে ভুল হইবে কি? সাধারণ নির্ব্বাচনে নেপালী কংগ্রেস পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কাজেই নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কৈরলা সরকারকে অপসারিত করা সম্ভব ছিল না। নেপালের রাজা নিয়মতান্ত্রিক রাজা হইলেও পুরাপুরি নিয়মতান্ত্রিক রাজা নহেন। শাসনতন্ত্রে তাঁহার অনেক ক্ষমতা রহিয়াছে। সেই ক্ষমতাবলেই তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

আলজেরিয়ায় হত্যাকাণ্ড—

আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও অন্তর্বর্ত্তী কর্তৃত্বশক্তি-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রস্তুতির জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্য-গল ৯ই ডিসেম্বর (১৯৬০) আলজেরিয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই আলজেরিয়ায় যে ভয়াবহ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহাতেই ফরাসী সরকারের আলজেরিয়া-নীতির নগ্ন পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আলজেরিয়ার প্রধান প্রধান সহরে এই ভয়াবহ রক্তারক্তি কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আলজেরিয়ার সমস্যা সমাধানের দাবীতে আলজেরিয়ার অধিবাসীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সকল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীর উপর নিয়মিত ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং নিরাপত্তা-বাহিনী ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। আলজেরিয়া রিপাবলিকের অস্থায়ী সরকারের চেয়ারম্যান ফেরহাৎ আব্বাস বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যে যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রধান প্রধান সহরের আরব অঞ্চলগুলি ফরাসী সৈন্যরা ঘেরিয়া ফেলে এবং সমস্ত অধিবাসীকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার ভীতি প্রদর্শন করে। বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, দাঙ্গায় শত শত আলজেরিয়ান নিহত

এবং হাজার হাজার আলজেরিয়ান আহত হইয়াছে। গত ১২ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে আফ্রো-এশীয়-গোষ্ঠীর বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান ব্রহ্মের উ আউট জানাইয়াছেন যে, গত ৪৮ ঘণ্টায় সহস্রাধিক আলজেরীয় নিহত হইয়াছে। আলজেরিয়ার জনগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে তাহাদের সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে পারে, তাহার জন্ম আফ্রো-এশিয়ার ২২টি দেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও তত্ত্বাবধানে আলজেরিয়ায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। আলজেরিয়া রিপাবলিকের অস্থায়ী সরকারের চেয়ারম্যান ফেরহাৎ আব্বাসও আলজেরীয়দের পাইকারী ভাবে হত্যা করা অবিলম্বে নিরোধ করিবার জন্ম বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট দ্য'গলের উপস্থিতিতেই আলজেরিয়ায় যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেও তাহা সহ্য করা বোধহয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার সফরের শেষ দুইদিন বাতিল করিয়া দিয়া গত ১৩ই ডিসেম্বর প্যারীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট দ্য'গল বলিয়াছেন, "যে সমস্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, শীঘ্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দিকচক্রবালে নূতন আলজেরিয়ার উষার আবির্ভাব হইয়াছে।" ফরাসী সৈন্ত ও নিরাপত্তাবাহিনী কর্ত্তৃক ব্যাপক আলজেরীয়দের হত্যা দর্শন করিয়াও কি ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা তিনি করিতে পারেন, তাহা বিশ্ববাসীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আলজেরিয়ার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারও অন্তর্বর্ত্তী কর্ত্তৃত্ব শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গণভোট গ্রহণের প্রস্তুতির ব্যাপারেই যদি ব্যাপকভাবে আলজেরীয়দের হত্যা করা হয়, তাহা হইলে গণভোট গ্রহণ যে কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। আলজেরিয়া সম্পর্কে গণভোট গৃহীত হইবে জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে। আলজেরিয়ায় ৬ই, ৭ই এবং ৮ই জানুয়ারী তারিখে গণভোট গৃহীত হইবে এবং ফ্রান্সে গণভোট গৃহীত হইবে ৮ই জানুয়ারী তারিখে। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে আলজেরিয়ায় গণভোট গৃহীত না হয়, তাহা হইলে আলজেরীয়রা স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিতে পারিবে না। তিন দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে ভোট গৃহীত হইবে। যখন যে অঞ্চলে ভোট গৃহীত হইবে, তখন সেই অঞ্চলে সৈন্যরা নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। এই নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

জেনারেল দ্য'গল আলজেরিয়ার স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আলজেরিয়ার ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নৈতিক অধিকারও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আলজেরিয়া আলজেরীয়দের, এমন কথাও বলিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। তিনি আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের গঠিত গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে রাজী হন নাই। আলজেরিয়াকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী কর্ত্তৃত্ব শক্তি-গঠন সম্পর্কে তাঁহার নীতি প্রেসিডেন্ট জেঃ দ্য'গল গণভোট দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহিয়াছেন। গণভোটে তাঁহার উক্ত নীতি যদি অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে এই নীতি কার্য্যকরী করিবার পক্ষে তিনি ক্ষমতালাভ করিবেন। 'আলজেরিয়ার অধিবাসীদিগকে আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা স্বাধীন-ভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার দেওয়া এবং ইতিমধ্যে অস্থায়ী কর্ত্তৃত্বশক্তি গঠন করা আপনি অনুমোদন করেন কি',—ইহাই বোধহয় গণভোটের বিষয় হইবে। অর্থাৎ গণভোটের সময় ভোটারদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। ভোটের ফলাফল অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকের ধারণা, দ্য'গল-ই অধিকাংশ ভোট পাইবেন। যদি পান, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবে কি? অনেকে আশঙ্কা করেন, বিদ্রোহীদের ন্যাশন্যাল লিবারেল ফ্রন্ট আলজেরিয়ার মুসলমানদিগকে ভোট না দিবার জন্ম চাপ দিবেন এবং সৈন্যবাহিনী চাপ দিবে বিরুদ্ধে ভোট

দিবার জন্য। কাজেই এই ধরণের গণভোট দ্বারা আলজেরিয়া-সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা অত্যন্ত কঠিন হইবে এবং আলজেরিয়ার অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধেরও অবসান হইবে না।

ইথিওপিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান—

ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সম্রাট হাইলে সেলাসির পতন হইয়াছিল, কিন্তু ৩৬ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত সৈন্যদল বিদ্রোহীদের উপর সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিয়াছে এবং বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হইয়াছে। এই বিদ্রোহ যখন ঘটে, তখন হাইলে সেলাসি স্বদেশে ছিলেন না। তিনি তখন ছিলেন ব্রাজিলে। গত ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আদ্দিস আবাবা হইতে প্রচারিত এক বেতার-বার্ত্তায় ঘোষণা করা হয় যে, ঐ দিন এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে যুবরাজ আসফা ওয়াসেল তাঁহার নেতৃত্বে ইথিওপিয়ায় এক নূতন সরকার গঠন করিয়াছেন। বেতার বার্ত্তায় আরও বলা হয় যে, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও শিক্ষিত যুবকদের সমর্থনে নূতন সরকার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নূতন সরকার দুই দিনের অধিক স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়াছে এবং সম্রাট হাইলে সেলাসি গত ১৬ই ডিসেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। এই বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

সম্রাট হাইলে সেলাসি যখন সুদূর দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্রাজিল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর ভাল ভাল অফিসার এবং সৈন্য যখন সম্মিলিতজাতিপুঞ্জ বাহিনীভুক্ত হইয়া কঙ্গোতে অবস্থিত, সেই সময় এই বিদ্রোহ ঘটে। যুবরাজ আসফা ওয়াসেল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর। তিনি আর কবে সম্রাট হইবেন, ইহা ভাবিয়া পিতার অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন কিনা, বলা কঠিন। এই বিদ্রোহের কাহারা নেতা, তাহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত যুবকরা এই বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল কিনা, কিম্বা বাহির হইতে উহার প্ররোচনা আসিয়াছিল, সে কথাও বলা কঠিন। বিদ্রোহ সম্পর্কে সংবাদ অতি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট হাইলে সেলাসিও প্রাসাদ-বিপ্লবের ফলেই সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।

সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিকের এক পৌত্র লিজ ইয়সু যখন ইথিওপিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার অপর পৌত্র হাইলে সেলাসি হারার প্রদেশের উপ-শাসনকর্ত্তা। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের সময় জার্ম্মাণী ও তুরস্কের সহিত সম্রাট ইয়সুর বন্ধুত্বের খুব বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে তাহা ভাল লাগে নাই। তাহাদের প্ররোচনায় যে প্রাসাদ-বিপ্লব ঘটে, তাহাতেই সম্রাট ইয়সুর পতন ঘটে। সিংহাসনে বসিলেন ইয়সুর কন্যা। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৩০ সালে হাইলে সেলাসি সম্রাট হন। সেই সময় হইতে বৃদ্ধ প্রাক্তন সম্রাট ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ অবস্থায় জীবন কাটাইয়াছেন। ঐ বৎসর কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যুবরাজ ওয়াসেলকে প্রাক্তন সম্রাট ইয়সুর দশা ভোগ করিতে হইবে কিনা, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সশস্ত্র বাহিনী সাম্রাজ্ঞী, যুবরাজ এবং রাজপরিবারের সকলকে মুক্তি দিয়াছে। তাঁহারা নিরাপদে ও কুশলে আছেন।

অশান্ত লাওস—

গত ১৮ই ডিসেম্বরের (১৯৬০) সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমীশক্তি-সমর্থিত দক্ষিণপন্থী জেনারেল ফৌমী নোসাভান সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর দুই দিন পূর্ব্বে ভিয়েনটিয়েন দখল করিয়াছেন এবং প্রিন্স বৌন ওম নূতন সরকার গঠন করিয়াছেন। ক্যাপটেন কংলীর সৈন্যবাহিনীকে ভিয়েনটিয়েন হইতে ৭০ মাইল উত্তরে ভংভিয়েং-এ বিতাড়িত করা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। পশ্চিমীশক্তি সমর্থিত জেনারেল ফৌমীর ভিয়েনটিয়েন দখল তাঁহার একটি বড় রকমের জয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই লাওসের গৃহযুদ্ধের অবসান হইল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। লাওসের বারটি প্রদেশের মধ্যে চারিটি প্রদেশেই গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই যুদ্ধের একদিকে ছিল নিরপেক্ষতাকামী সুভান্না ফুমা সরকারের সৈন্যবাহিনী। সুভান্না ফুমা নিরপেক্ষতাকামী। তিনি পূর্ব্বে আর একবার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে পাথেটলাও বিদ্রোহীদের সহিত আপোষ করার নীতি গ্রহণ করায় মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক চাপে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। গত ৯ই আগষ্ট (১৯৬০) প্রায় ছয় শত অন্যান্য সৈন্যের সহযোগিতায় দ্বিতীয় প্যারাসুট বাহিনীর অভ্যুত্থানের ফলে ভিয়েনটিয়েন তাহাদের দখলে যায় এবং সুভান্না ফুমা পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইয়া সরকার গঠন করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েনটিয়েন লাওসের শাসনতান্ত্রিক (administrative) রাজধানী এবং লুয়াং প্রবাং রাজকীয় রাজধানী। সুভান্না ফুমা ভিয়েনটিয়েন সরকার গঠন করিলেন বটে, কিন্তু লুয়াং প্রবাং ছিল জেনারেল ফৌমী নোসাভানের প্রভুত্বাধীনে। সুভান্না ফুমা জেনারেল ফৌমীর সহিত আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

লাওসে একদিকে সুভান্না ফুমা সরকারের বাহিনী, আর একদিকে জেনারেল ফৌমীর বাহিনী এবং অন্যদিকে পাথেট লাওয়ের সশস্ত্র বিদ্রোহীবাহিনী—এই যে ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধে পরিণত হয়। সংঘর্ষ চলিতে থাকে পশ্চিমী শক্তি সমর্থিত জেনারেল ফৌমীর সৈন্যদের সহিত সুভান্না সমর্থক ও পাথেট লাওয়ের মিলিত শক্তির। শাসনতান্ত্রিক রাজধানী ভিয়েনটিয়েন রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জেনারেল ফৌমী'ই জয় লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লাওসে গৃহযুদ্ধের অবসান হয় নাই, হইবে বলিয়াও মনে হয় না। এই গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু জেনেভা-চুক্তি অনুসারে নিযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক কমিশনকে কার্য্যকরী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি অনুসারে ইন্দোচীনের তিনটি রাষ্ট্র সম্পর্কে কানাডা, পোল্যাণ্ড এবং ভারতকে লইয়া এই কমিশন গঠন করা হয়। গত দুই বৎসর ধরিয়া লাওসে এই কমিশনের কাজ বন্ধ আছে। কমিশনের কাজ আরম্ভ করাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। শুধু বৃটেন ও রাশিয়া সম্মত হইলেই হইবে না। লাওয়াসের সরকার যদি সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে কমিশনের পক্ষে কাজ করা কঠিন হইবে।

জেনারেল ফৌমী কংলীর সৈন্যবাহিনীকে ভিয়েনটিয়েন হইতে বিতাড়িত করিয়া প্রিন্স বৌন ওমের প্রধান মন্ত্রিত্বে সরকার গঠন করিয়াছেন এবং নিজে সহকারী প্রধান মন্ত্রী এবং দেশরক্ষা-মন্ত্রী হইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্য সত্ত্বেও এই জয় কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা বলা কঠিন। সম্মিলিত জাতীয় সরকার গঠন করাই লাওসে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। নিরপেক্ষতাকামী প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফৌমী বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া মীমাংসার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জেনারেল ফৌমীর অভিযানের ফলে সে সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুভান্না ফৌমার নিরপেক্ষতাকামী সরকার নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উত্তর-পূর্ব্ব লাওসের পাথেট লাও কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ সাম নুয়াতে (Sam Neua) যাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই। লাওসে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে যত বিলম্ব হইবে, ততই লাওসের গৃহযুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে।

সৌদীআরব—

সৌদী-আরবের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ফৈজল হয় পদত্যাগ করিয়াছেন, না হয় প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। যাহাই ঘটিয়া থাকুক, তিনি আর প্রধানমন্ত্রী নহেন। সৌদী-আরবের রাজা নিজের হাতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালে রাজা সৌদ তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ আমীর ফৈজলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। ঐ সময় রাজকোষে সংরক্ষিত স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রচলিত নোটের শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ ছিল। রাজ-পরিবারের খরচ যোগাইতেই রাজস্বের শতকরা ১৭ ভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রধানমন্ত্রী আমীর ফৈজল যে নীতি গ্রহণ করেন, তাহার ফলে কারেন্সী রিজার্ভ ২কোটি ৪০লক্ষ ডলার হইতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারে দাঁড়ায়। গত জুন মাসে (১৯৬০) আমীর ফৈজল যখন চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান, সেই সময় তাঁহার অপর ভ্রাতা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই আমীর ফৈজলের সহিত সৌদী-আরবের রাজার মত-বিরোধটা দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং রাজা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিতে থাকেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে উভয়ের মত-বিরোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমীর ফৈজলকে নাসের-পন্থী বলা যায়। সৌদী-আরবের রাজা নাসেরের অনুগামী হওয়া পছন্দ করেন না। তিনি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেও আগের কালের স্বৈরতান্ত্রিক রাজার মত শাসন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। রাজ-পরিবারের ব্যয় হ্রাসের যে নীতি আমীর ফৈজল অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা বাতিল করাও কঠিন হইয়া পড়িবে। প্রজাসাধারণকে কতটুকু অধিকার তিনি দিতে রাজী হইবেন, তাহার উপরেই তাঁহার সাফল্য নির্ভর করিবে।

কম্যুনিষ্ট শীর্ষ-সম্মেলন—

গত ১০ই নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মস্কোতে পৃথিবীর ৮১টি দেশের কম্যুনিষ্টপার্টি এবং কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হইয়া গেল, আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের ইতিহাসে এই ধরণের সম্মেলন এই প্রথম। ইহা বিলুপ্ত কমিণ্টার্ণ বা কম্যুনিষ্ট ইণ্টারনেশন্যালের পুনর্জ্জীবন কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে। ষ্টালিন ১৯৪৩ সালে কমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত কমিনফর্মের অধিবেশনের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। কমিনফর্ম্মের সদস্য সংখ্যা সাত-আটটি পার্টির বেশী ছিল না এবং উহা ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক ব্যাপার। কিন্তু মস্কোতে সম্প্রতি যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাকে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সামগ্রিক সম্মেলন বলিতে পারা যায়। তথাপি উহাকে কমিণ্টার্ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বোধহয় স্বীকার করা যায় না। রাশিয়া কমিণ্টার্ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে না। কারণ, ইহাতে পশ্চিমী-শক্তিবর্গকে প্রবলভাবে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রচারকার্য্যের সুযোগ দেওয়া হইবে। কমিণ্টার্ণের অধিবেশনের সহিত এই সম্মেলনের একটি বিশেষ পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। কমিণ্টার্ণের অধিবেশনে ষ্টালিন যাহা বলিতেন, সকলেই বিনা প্রতিবাদে তাহা মানিয়া লইতেন। মস্কোর কম্যুনিষ্ট শীর্ষ-সম্মেলনে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই প্রকাশ। যে সকল দেশে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত নাই, সেই সকল দেশের কম্যুনিষ্টপার্টির প্রতিনিধিদিগকেও মতামত প্রকাশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত বিরোধের কথা কিছুদিন হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু চীন মনে করে, উহা লেলিনের শিক্ষার বিরোধী। যতদিন ধনতন্ত্রবাদের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য্য, চীন এই মতবাদে বিশ্বাসী। এই বিরোধ কতখানি গভীর তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক, পশ্চিমী দেশগুলিতে এইরূপ গুজব রটিয়াছিল যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে মঃ ক্রুশ্চেভের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছে এবং মেলনকভ পুনরায় রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। অবশ্য এই গুজব

যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। মস্কোর কম্যুনিষ্ট শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশন প্রকাশ্যে হয় নাই। কাজেই সেখানে আলোচনা কিভাবে হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সম্মেলন হইতে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য, এই মতবাদ চীন বর্জ্জন করিয়াছে এবং সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে।

মস্কো ঘোষণা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, ৮১টি দেশের কম্যুনিষ্ট নেতারা সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন হইতে যে আবেদন প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে,—"War is not inevitable. War ean be prevented, peace can be preserved and made secure." অর্থাৎ যুদ্ধ অনিবার্য্য নয়; যুদ্ধ নিরোধ করা এবং শান্তি সুরক্ষিত করা যাইতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও অবশ্য বলা হইয়াছিল—"Let us build up a joint front to combat imperialist preparations for a new war." অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা নূতন যুদ্ধের জন্য যে আয়োজন করিতেছে, তাহা প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিতে হইবে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধ বিশ্বসংগ্রাম দ্বারা নয়, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা দ্বারা মীমাংসা করা উচিত। কোন্ সামাজিক ব্যবস্থা উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা, কারিগরি জ্ঞান এবং সংস্কৃতি অর্জ্জন করিতে পারে এবং জনসাধারণের জন্য জীবনযাত্রার শ্রেষ্ঠমানের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহাই হইবে প্রতিযোগিতার মূল কথা। মস্কো সম্মেলনে রাশিয়ার সহাবস্থান-নীতির যত কঠোর সমালোচনাই করা হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত সহাবস্থাননীতিই জয়লাভ করিয়াছে। এই জয় সাময়িক না স্থায়ী, সে-কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে পূর্ব্বজার্ম্মানীর কম্যুনিষ্ট নেতা হের ওয়াল্টার উলব্রিচ্ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্রুশ্চেভ চীনের উপর অন্ততঃ সাময়িক জয়লাভ করিয়াছেন। মস্কো সম্মেলনে কি কি আলোচনা হইয়াছে, তাহা লইয়া পশ্চিমী জগতে যত জল্পনা কল্পনাই হউক এবং চীন-সোভিয়েটের আদর্শ গত বিরোধের মীমাংসা যদি সাময়িকও হয়, তাহা হইলেও মঃ ক্রুশ্চেভ নূতন মার্কিন প্রেসিডেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার এবং পুনরায় শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পাইবেন।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬০

ঘাম-ঝরা ক্লান্তির কবিতা

সোনালী দত্ত

জীবনের কবি সব এক হ'য়ে এক জাতে,
দেশে দেশে বার বার, যুগে যুগে দিনে-রাতে,
পেশী-ওঠা দুটো হাতে কবিতা লিখে যায়।
ট্র্যাক্টরে কাজ করে, নৌকোর হাল ধরে,
মাটি দিয়ে চাক ভরে; নানাভাবে খেটে শুধু—
একমুঠো ভাত পায়।
রাতে ঝরে জ্যোৎস্না, দিনে জ্বলে সবিতা;
ঘাম-ঝরা ক্লান্তির কবিতা।

ফুল কেন ফোটে ওরা জানে না;
ফোটে তাই জানে শুধু তার, বেশী মানে না।
রোলাঁ বা টেগোরের মতটা না জানলেও,
জানে ভাল বাসতে; উজ্জ্বল তৃপ্তিতে প্রাণ খুলে হাসতে।
ডারুইন্, নিউটন ওরা তো বোঝে না;
জাতি-লীগ পড়ল 'স্যাটো' কেন, গড়ল
না বুঝেই সুখী ওরা, হেতু তাই খোঁজে না।
বোঝে শুধু মায়া-নীড় স্পন্দিত বক্ষে,
শান্তির আলো লাগে ও-অবাক চক্ষে,
পৃথিবীর প্রাণটাকে কাঁধে ওরা বয়ে যায়
মাথা থেকে পায়ে ঝরা ঘাম দিয়ে ভাত পায়।
রাত তাই চাঁদনীর দিনে আছে সবিতা,—
ঘাম-ঝরা ক্লান্তির কবিতা।

যাত্রা থিয়েটার ঃ নাট্যশালা

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

একজন ধনী জমিদারের ছেলে প্রশ্ন করেছিলেন,—থিয়েটারের দরকার কি? উত্তর,—কাব্যের প্রয়োজন কি, সঙ্গীতের প্রয়োজন কি? সকল ললিতকলাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; অপ্রয়োজনের মধ্যেই তার প্রয়োজন। নাট্যশালা উঠে গেলে বুঝতে হবে জাতির জীবনীশক্তি, জাতির সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়েছে।···জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে, সুতরাং জগতের বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে এই যে অনাদরভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য, গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস—নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।···ইংরেজদের দেখাদেখি এই যে ফ্রেমে আঁটা রঙ্গমঞ্চ এর বয়েস শতাব্দী পার হতে এখনও দেরী আছে। অথচ চৈতন্যদেবের জন্মেরও পূর্ব হতে প্রতি বৎসর বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালার দল তাদের নাট্য গাইয়ে বাজিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাঙলা দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভূস্বামীদের অঙ্গনে, মেলায় ও বারোয়ারীর মণ্ডপে কৃষ্ণলীলা ও দেবীমাহাত্ম্যের পালা গেয়ে বেড়াত।···সকল পালারই মর্মের সুর ছিল আত্মনিবেদন।···ট্রাজেডির স্থান যাত্রার পালায় ছিল না। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় গল্পের পরিণামে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হোত।···যাত্রা অভিনয়ের ধরণ ছিল বাঁধা এবং বিশেষ সুর দিয়ে খুব আবেগের সঙ্গে কথা বলা ছিল নিয়ম।···সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং নাট্যের বিষয় মানব-জীবনে দৈবপ্রভাব।

যাত্রা ও থিয়েটারের প্রধান পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য—থিয়েটার হয় মঞ্চের উপর, যাত্রা হয় আসরে। থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী মনে করেন, তাঁরা যে চরিত্রের রূপ নিয়েছেন, ঘটনার স্রোতের মধ্যে দিয়ে সেই চরিত্রের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন, যতক্ষণ তাঁরা রঙ্গমঞ্চে আছেন দর্শকের সঙ্গে তাঁদের যেন কোন যোগ নেই। লোকে দেখছে, দর্শক সামনে রয়েছে, উদ্দেশ্য দর্শকের চিত্তে আলোড়ন তোলা, সবই সত্য কিন্তু অভিনয়ের সময়ে তাদের কাছে দর্শক নেই এটাই মনকে বোঝাতে হয়। এটাকে সম্ভব করবার জন্যেই তাদের দর্শক থেকে আলাদা করে পিছনে পট সাজিয়ে আলোকোদ্ভাসিত মঞ্চের উপর স্থান দেওয়া হয়। যাত্রার কিন্তু সে বালাই নেই। আমি রাজা সেজেছি, আমি যতক্ষণ কথা বলি—ততক্ষণ আমি রাজা। রাজার পোষাক কিন্তু আমাকে দর্শকের সম্মুখেই তামাক খেতে বাধা দেয় না—অবশ্য যে সময়ে আমার বলবার কিছু নেই। এই যে দর্শকের সঙ্গে সোজা বোঝাবুঝি, এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয়, তার কারণ আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছ ঘেঁষে তাদের স্থান। দর্শকের গণ্ডী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন নন'।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বলতে গেলে আমি একরকম আশ্বস্তই ছিলুম যে আমার দিল্লী যাত্রা কোনরকমেই আমাদের নিয়মিত মহড়াকে ব্যাঘাত ঘটাতে সক্ষম হবে না। তা ছাড়া কতটুকুই বা পথ—হ্যাঁ "কতটুকুই" বলব—বিজ্ঞানের অগ্রগতি দূরকে যে ক্রমশঃ নিকট থেকে নিকটতর করে চলেছে, এ সম্পর্কে আজকের দিনে কোন রকম সন্দেহের বা সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে কি? তাই আজ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া আসার সময় ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে চলেছে—হিসেব করে দেখা গেল, কাজ সেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো ফিরে আসা যায়। দিল্লী যাত্রা করলুম। পা বাড়ালুম দিল্লীর দিকে। ইতিহাসের আলোয় চির-উজ্জ্বল ভারতের রাজধানীর দিকে। সেটা ১৯৫২ সাল। মে মাস। তারিখ? তারিখ বোধ করি ২২এ, কি ঐ কাছাকাছিই কোন একটি দিন।

দিল্লী কেন গেলুম, কি জন্যে, কি উদ্দেশ্যে, কি কাজে, গত সংখ্যায় সে বিষয়ে সব তথ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবং ঐ প্রচেষ্টার মধ্যে আমি কেমন করে যুক্ত হয়ে গেলুম, এ তথ্যও এখন আর আপনাদের অজানা নয়। দাদা ফালকের জন্ম-বার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে আমার দিল্লী যাওয়ার যোগসূত্র কোথায়, এ বিষয়েও আপনারা আলোকিত, সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়, আর তা ছাড়া এই পৌনঃপুনিকতা স্বভাবতঃই আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে।

যে উদ্দেশ্যে আমার দিল্লী যাত্রা, সেই প্রচেষ্টা কতদূর কার্যকরী হ'ল বা কতদূর সফল হল বা কতদূর সার্থক হল—মোটের উপর তার ফল কি দাঁড়াল, এ বিষয়েও আশা করি নিশ্চয়ই আপনার মনে কৌতূহল উঁকি মারছে, তবে সেই বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। প্রচেষ্টা রূপই পায় নি। শুনে অবাক হবেন না, হ্যাঁ, প্রচেষ্টা কার্যকরীই হয় নি তো তার সার্থকতা আর অসার্থকতা, এ ক্ষেত্রে তার সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে আর তো কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। প্রচেষ্টাটি যদি রূপ নিত, তা হলে অবশ্যই তার সাফল্য সম্বন্ধে সমালোচনার একটা অন্ততঃ অর্থ হোত। কিন্তু কেন—কেন এই প্রচেষ্টা রূপ নিল না? কি তার কারণ? এত যত্ন, এত ঐকান্তিকতা, এত আয়োজন নিষ্ফলতার মুখ দেখল কেন—এ সম্পর্কে আমার কিছু

বলার থেকে ভারতের স্বনামধন্য সাংবাদিক স্বর্গত দেবদাস গান্ধীর সম্পাদন-ধন্য হিন্দুস্থান টাইমসের মন্তব্য তুলে ধরাই শ্রেয়: বলে মনে হয়, এই মন্তব্যে এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট আলেখ্য পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আজকে আবার দীর্ঘকাল বাদে স্মৃতির টুকরোর পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে এবং প্রসঙ্গের খাতিরে সেই মন্তব্য পুনরুদ্ধৃত করছি—

"A notable visitor to Delhi is Mrs. Sadhona Bose, one of the leading film actress in the country. She came for the Dada Phalkes Anniversary celebration which did not materialize,...Film Star Functions: Series of Confusion Developments: The Sectetary of the Indian Film Festival Committee Mr. Jogeshwar Dayal accompanied by Mr. Radha Raman M. P, and two other members of the Committee met Sadhana Bose in Delhi yesterday and apprised her of the situation arising out of the dissociation of the Committee from the proposed programme of a Star Hocky Match on May 24th and cultural evening on May 25th purported to have been chalked out on behalf of the Committee, in connection with the Dada Phalke Birth day Anniversary....They said certain persons had unauthorisedly used the name of the Committee which had resolved long ago not to hold any function before September next. ...Interviewed after their meeting with Mrs. Bose, Mr. Radha Raman said, on hearing whole story Mrs. Sadhana Bose decided not to take part on the proposed function. She said she was informing the Film Stars in Bombay that they should not come to Delhi in view of the situation that has arisen. Official Action....It is learned that the Chief Minister of Delhi Mr. Brahm Prakash has been apprised of the latest developments and he has asked the Deputy Commissioner to look into the matter....A meeting of the Indian Film Festival Committee will be held today to discuss the whole matter. It will be attended among others by Mrs. Sadana Bose. (By a Staff Correspondent, May 1952)

হিন্দুস্থান টাইমসের মন্তব্য আয়তনে আরও দীর্ঘ ছিল, শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই উদ্ধৃত করলুম। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী বসু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডারে সাহায্যার্থে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্দেশে ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন, দিল্লীতে এই রকম একটি ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা গেল। এবং এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে, সে বিষয়েও তাঁরা আলোকপাত করতে ভোলেননি।

যাই হোক, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সমাধা করে আমি ঠিক তার পরের দিনই বোম্বাই ফিরে এলুম।

একটা বিষয়ে এক গভীর সংশয় এখন আমাকে রীতিমত ঘিরে রয়েছে, তবে সে বিষয়ে আমি একরকম স্থির নিশ্চিত—সাংস্কৃতিক জগতের এই বিভাগটি মানচিত্র থেকে আমার নামটি মুছে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন স্বার্থপ্রণোদিত কেউ কেউ। আমার এ জগতে ব্যাপক জয়যাত্রা তাঁরা সহজ মনে মেনে নিতে পারেননি। কি মঞ্চে, কি পর্দায়, শিল্পী হিসেবে আমার পুনরাগমনকে তাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি, আমার শিল্পসাধনার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি তাঁরা অন্তরে পোষণ করেননি, তাই সংস্কৃতিজগতের এই বিভাগটির মানচিত্র থেকে আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাঁদের এই প্রতিকূল আচরণের কারণ অবশ্য আমার কাছে প্রকাশিত, এই রহস্যের সূত্রসন্ধান করতে করতে তার উৎস আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। সমকালীন ঘটনা নয়, তার বহু আগে থেকেই জনসাধারণের প্রীতির বন্যা আমার উপর দিয়ে প্রবাহিত, প্রাক্ স্বাধীন ভারতে সেই বৃটিশ যুগেও আমার শিল্পসেবা সাগরপার থেকেও সস্নেহ স্বীকৃতিলাভে ধন্য হয়েছে। (কোট ডান্সার) কোন বিশেষ ছাপ ছাড়া আর কোন শিল্পী বিদেশ থেকে এর আগে এত সমাদর পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যা এসেছে, তাকে আমি বিধাতার আশীর্বাদ মনে করেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছি, কেন আসছে এ বিষয়ে কখনই মাথা ঘামাইনি, নিজের কাজ করে গেছি। আর অন্তর দিয়ে চেষ্টা করেছি, যাতে কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। সর্বাঙ্গসুন্দর হল কি হল না—সে নিয়েও কোনদিন মাথা ঘামাইনি—সে বিচারের ভার শ্রদ্ধাসহকারে ছেড়ে দিয়েছি সুবোদ্ধা রসিকসমাজের উপর। যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন আমাকে ভরিয়ে তুলল, আমাকে ধন্য করল, আমাকে পরিপূর্ণ করল—তা আপনা থেকেই আমার কাছে এসেছে—একজন শিল্পী হিসেবে এ কথা আমি দ্বিধাহীন চিত্তেই বলব যে, যে কোন শিল্পীর তথা শিল্পীমাত্রেরই অনুরাগী-গোষ্ঠী থাকে—যেমন থাকে রাজনৈতিক নেতাদের।

এইবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল আমার জীবনে, যার ছাপ কোনদিন আমার মন থেকে মিলিয়ে যাবে না, কারণ তা মিলিয়ে যাওয়ার নয়। "অজন্তা"কে কেন্দ্র করে যে ব্যালের পরিকল্পনা আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল—তার রূপদানের সঙ্কল্প থেকে আমাকে বিমুখীন করে তোলার জন্যে কয়েকজন মহিলা অর্থ দ্বারা কয়েকটি নির্বোধ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে বসলেন। এর কারণ—আমার প্রতি নিছক হিংসা অথচ কে বলতে পারে যে আমার পরিকল্পনা যদি তখন রূপলাভ করত তা হলে তা হয় তো ঐ উৎসবের সর্বাঙ্গীন অকৃতকার্যতাকে একেবারে ঢেকে দিতে পারত—ঐ উৎসবের রূপ যেত বদলে, সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপ পেত সে।

প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, আমার মন কল্পনাপ্রবণ, আমি স্বভাবতঃই কল্পনাশ্রয়ী। কল্পনা আমার সারা জীবনের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে। সুতরাং মহিলাদের এই কার্যাবলীর মূলে যে সর্বৈব হিংসা, আমার মনে হয়, আমার এ ধারণা অমূলক নয়। কয়েকজন ভদ্রলোকও সুযোগ বুঝে তাঁদের

প্রকৃত স্বরূপ তখন উদ্‌ঘাটন করতে পারতেন—তবে এখন আমি অনুভূতির দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি যে, বর্তমানে তাঁরা ঐ ব্যাপারে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি প্রয়োগ করছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অধ্যবসায়ের সীমা পরিমিতি নেই। কিন্তু এই ভ্রুকুটির কাছে আমায় মাথা নত করা চলবে না, আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, আমার নিষ্ঠা, আমার সততা, আমার আন্তরিকতাই আমার শ্রেষ্ঠ মূলধন। জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়া আমার চলবে না। জীবনে কখনও একটানা আস্বস্তি থাকে না, জীবনের পথ সকল সময়েই মসৃণ নয় বন্ধুরও নয়। পথ চলতে গেলে মসৃণতাও আছে, আবার বন্ধুরতাও আছে। আমি যাত্রী, আমি শিল্পের সেবিকা, আমি গতির পূজারিণী, আমার কাছে গতিই জীবন, গতির দৈন্যই আমার কাছে মৃত্যুর নামান্তরমাত্র, আমি জানি জীবনে অন্ধকার পথরোধ করবে—তবে এ ত আমার অজানা নয় যে, ঐ অন্ধকারের অন্ধগুহা অতিক্রম করলেই অনন্ত আলোর জগতের সিংহদ্বার। আমি জানি জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা, নিরাশা পর্বতের আকার নিয়ে চলার পথের সামনে দাঁড়িয়ে, তবে তার পরেই তো অফুরন্ত আশার প্রতিশ্রুতি, আমি জানি রাত্রি যত গভীর নিকষ আঁধার হোক, তার অবসানেই পূর্বদিগন্তকে উদ্ভাসিত করে উদয়রবির প্রদীপ্ত আভা। এই জমাট অন্ধকারকে নিশ্চিহ্ন করে, "চীনের প্রাচীর"কে ধূলোয় লুটিয়ে পাষাণকারার দুয়ার ভেঙ্গে আমি আবার প্রণাম করব আলোকে, প্রণাম করব সূর্যকে, প্রণাম করব জ্যোতিকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গা

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাঙলা ছায়াছবি বর্তমানে জল আর ডাঙার এক্সপেরিমেণ্টে নেমেছে। স্রেফ আউটডোর! যাই হোক, সত্যজিৎ রায় পটভূমি করেছেন ডাঙা—রাজেন তরফদার বেছে নিলেন জল—তাই জলকে কেন্দ্র করে আলোচ্য ছবিখানি তিনি উপহার দিলেন বাঙলাদেশের চিত্রামোদী দর্শকসমাজকে। এই জল-ছবিকে ঠিক যথার্থ ছায়াছবি না বলে উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য ছবি বলে অভিহিত করলেই বোধ করি যথার্থ অভিহিতি হয়। প্রামাণ্য ছবি 'গঙ্গা' জনসমাদর পাবার দাবী পূর্ণমাত্রায় রাখে, তবে ঠিক ছায়াছবি বলতে আমরা যা বুঝে থাকি সে হিসেবে নয়। এই ছবি দেখে আপনি তখনই আনন্দ পাবেন, যখন আপনি ভাববেন যে, বিবিধ বিষয়ের মত জল এবং জলচরদের সম্পর্কে গৃহীত একখানি প্রামাণ্য চিত্রের রজতপটে প্রতিফলন আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। তবু তাল কেটে যায়, একঘেঁয়েমি এসে যায়, আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, প্রামাণ্য ছবির সময়সীমা একরকম নির্দিষ্টই থাকে। সেই সীমা অতিক্রম হয় না। প্রামাণ্য ছবি দশ-পনেরো মিনিট দেখতেই ভাল লাগে, এই সময়টুকু অতিক্রান্ত হলেই যত ভাল ছবিই হোক, দর্শকের তা দেখতে ভাল লাগে না। সেক্ষেত্রে ঐ জাতীয় ছবি দু'ঘণ্টা ধরে দেখতে দর্শকের ভাল লাগতে পারে না। ছবি দেখতে গিয়ে দর্শকমন খুঁজে বেড়ায় বৈচিত্র্য এবং সেই সময় সবচেয়ে ক্রিয়াশীল থাকে দর্শকের চোখ—এই বৈচিত্র্যের পিপাসায় দর্শক চায় দৃশ্যান্তর, চায় পটপরিবর্তন, চায় সংঘাত। কলাকৌশলের দিক দিয়ে গঙ্গা ছবিখানির আসন প্রথম শ্রেণীতে নির্দিষ্ট হলেও, এই প্রধান দিকটি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়—গঙ্গা এদিক দিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য এজন্যে রাজেন তরফদারকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। গঙ্গার মত একটি দুর্বল গল্পকে তিনি যে এতখানি সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন—এতে তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচয় মেলে। তাঁর শিল্পবোধ এবং শিল্পদৃষ্টি প্রশংসনীয়। তবু তা সত্ত্বেও ছবিটি যথাযথ রসোত্তীর্ণ না হওয়ার কারণ তার কাহিনীর প্রাণহীনতা। সেই জন্যেই আবার বলছি, গল্পের দুর্বলতা পরিচালক যতটুকু ঢাকতে পেরেছেন, সেটুকুর জন্যেই নিশ্চয় তিনি সাধুবাদ দাবী করতে পারেন।

ছবির মধ্যে গামলী পাচী একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র, তাকে গল্পে আনা হল, গোড়ার দিকে প্রায় সারা ছবি জুড়েই সে আছে—(জলযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত) তারপর?—চরিত্রটি সম্বন্ধে একেবারে নীরবতা, অতএব একথা বলতে পারি যে, চরিত্রটি অসম্পূর্ণ, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা" চরিত্রটি অপ্রয়োজনীয় বললে বোধহয় ভুল হয় না। যুবক পাঁচু যখন তার স্বরে চীৎকার করে তার দাদাকে ডাকছে তখন সেই ডাকের প্রতিধ্বনি হ'ল মোটে একবার, অথচ ডাক দিয়েছে সে বেশ কয়েকবার, একবার যদি সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হয় তো অন্যান্যবার হ'ল না কেন? নমিতা সিংহকে দিয়ে যে চরিত্রটি অভিনয় করানো হয়েছে—সে চরিত্রটির সার্থকতা কোথায়? তাছাড়া চরিত্রটির যে পেশা ছবিতে বর্ণিত হয়েছে, শিল্পীর চেহারা তার সঙ্গে একেবারে বেমানান।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। সমগ্র দর্শককে তিনি হতবাক করে দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছবির অনেক শূন্যতাকে ঢেকে দিয়েছে। তাঁর পরেই উল্লেখ করব মণি শ্রীমানী এবং সীতা দেবীর অভিনয়। তাদের অভিনয়-নৈপুণ্যও ছবিটিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট করেছে। রুমা দেবীর অভিনয়ও দর্শকচিত্ত স্পর্শ করবে। নিরঞ্জন রায়ও সুঅভিনয় করেছেন। তাঁর শিল্পী-জীবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। অন্যান্য ভূমিকায় স্বর্গত তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, সুমনা ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পিবর্গ অভিনয় করেছেন।

সবশেষে একজনের উদ্দেশে আমরা প্রাণভরা অভিনন্দন উৎসর্গ করি। তাঁর কুশলী হাতের সুনিপুণ স্পর্শ সারা ছবিটিতে ভরে আছে। তিনি আলোকচিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত।

শুন বরনারী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের 'শুন বরনারী' কাহিনীটির মাধ্যমে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রেমোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী, শুন বরনারী তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রূপেই সাহিত্যজগতে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই কাহিনীকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছেন অজয় কর। চলচ্চিত্রের জন্যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হীরেন নাগ। এই কাহিনীকে চিত্ররূপ দিতে গিয়ে লেখকের মূল কাহিনীর অন্তর্নিহিত সুরটি এরা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে কাহিনীর স্বরূপের রূপান্তর ঘটেছে। সুবোধ ঘোষের বিন্যাসে বিশ্লেষণে, দৃষ্টি-ভঙ্গীতে যে হিমু-যূথিকার সৃষ্টি, চলচ্চিত্রে সে হিমু—সে

যূথিকা অনুপস্থিত, চলচ্চিত্রের হিমু-যূথীর সঙ্গে সুবোধ ঘোষের হিমু-যূথীর মিল নেই, তাদের জাত আলাদা। কাহিনীতে হিমু-যূথীর চরিত্রসৃষ্টির পিছনে যে গভীরতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, চলচ্চিত্রের হিমু-যূথীর চরিত্রে সে গভীরতা অবিদ্যমান। গল্প একটি ধনী কন্যা এবং একটি দরিদ্র যুবককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি উচ্চমনা শিক্ষিত পরোপকারী অথচ অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র যুবকের সংস্পর্শে এক আভিজাত্যের গর্বে গর্বিতা, ধনসম্পদশালিনী আধুনিকা বিদুষীর মন কেমন করে পরিবর্তিত হল, কেমন করে অহঙ্কারের বেড়াজাল ভেঙে সত্যিকারের আলোকের সন্ধান পেল, কেমন করে সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে উদারতার আহ্বান পেল—সেই আলেখ্যই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সারা ছবিজুড়ে দর্শক একটি জিনিষ প্রচুর দেখতে পাবেন—রেলগাড়ী। আমরা স্বীকার করছি যে, গল্পের প্রধান ঘটনা রেলগাড়ীতেই ঘটেছিল—তবুও রেলগাড়ীর অংশ আরও কমানো যেত; তাতে ছবির দিক থেকে বিশেষ কোন ক্ষতি হোত না। পাটনায় কণিকাকেই দেখা যাচ্ছে, কণিকা কি সংসারে একা, তার আপনজন বলতে সংসারে কি কেউই নেই? গিরিডিতে যখন সে নরেনের সঙ্গে এল তখনও তাকে একাই দেখা গেল। কাহিনীর নাম 'শুন বরনারী' সুতরাং ছবিতে এই কথাটির মর্যাদা বা গুরুত্ব অনেকখানি, সে সম্বন্ধে চিত্রনির্মাতাদের সম্পূর্ণরূপে অবহিত এবং সচেতন থাকা উচিত। "শুন বরনারী" গানটির সংযোজন এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতা প্রয়োজন। গাড়োয়ান কিংবা দারোয়ানদের মুখে ঐ গান জুড়ে দেওয়া সমর্থন করা যায় না। এর ফলে ছবির মর্যাদা বহুল পরিমাণে কমে গেছে।

অভিনয়াংশে অভিনন্দনযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন উত্তমকুমার (হিমু)। যূথী চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীও আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। যূথীর বাবার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যেমনই বলিষ্ঠ, তেমনই ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত। নরেনরূপী দীপক মুখোপাধ্যায়ও চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, শশাঙ্ক সোম, সুনন্দা দেবী, বনানী চৌধুরী, সুপ্রভা সেন, রাজলক্ষ্মী দেবী, শান্তা দেবী, আশা দেবী প্রভৃতি। ছবিতে রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য গান যুক্ত করা হয়েছে। গেয়েছেন শ্রীমতী সুমিত্রা সেন। বলা বাহুল্য মাত্র, গানটি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

নতুন ফসল

কথাশিল্পী সরোজকুমার রায়চৌধুরীর তিনটি কাহিনীকে একত্র করে "নতুন ফসল" ছবিখানি গড়ে উঠেছে শ্রীদিলীপকুমার সরকারের (স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র) প্রযোজনায়। একটি চাষী পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্প। পারিবারিক সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনাই এই ছবির একমাত্র উপজীব্য। না আছে কোন অভিনবত্ব, না আছে গতি বা বেগ। সারা ছবিটি অলস-মন্থর গতিতে দর্শকের মনে বিরক্তি জোগাতে জোগাতে সমাপ্তির মুখে এগিয়ে চলে। ছবিটি একে দীর্ঘ, তার উপর দর্শকের মনকে ধরে রাখার মত কোন সম্পদই তার নেই। একটি ছবির মধ্যে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করার যে সব সম্পদ থাকে, তার প্রায় সবগুলি থেকেই এ ছবিটি বঞ্চিত! পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র আজ সুদীর্ঘকাল ছবির রাজ্যে জড়িত। বহু ছায়াচিত্র তিনি বাঙলার দর্শক-সমাজকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর এটুকু বোঝা উচিৎ ছিল যে, যুগ ক্রমশই এগিয়ে চলছে, যুগের রথচক্র যথেষ্ট বেগবান, স্থাণুর মত একটি জায়গায় কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এখনকার দিনে আমাদের সর্বতোভাবে সেই অগ্রসরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে—তা না পারলে ঠকতে হবে। নতুন ফসলের মত ছবি বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারত কিন্তু আজকের দিনের দর্শকসমাজকে আনন্দ দিতে এ জাতীয় ছবি অক্ষম। এ ছবির মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা দর্শককে ধরে রাখতে পারে, নিছক পারিবারিক মান-অভিমান সম্বল করে চিত্রনির্মাণের দিন চলে গেছে। যেখানে সৃষ্টিধর্মী কাহিনী সেখানের কাহিনীর মধ্যে মানুষ শুনতে চায় যুগের প্রতিধ্বনি, দেখতে চায় যুগের আলেখ্য, অনুভব করতে চায় যুগের স্পর্শ।

ছবি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনকে অনেকখানি ভারাক্রান্ত করে তোলে নেপথ্য বক্তার কথিকা; তাঁর বলবার ধারা মোটেই শ্রবণ-মধুর নয়, তাঁর বাচনভঙ্গী কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট, ছবির শুরুতেই দর্শকমনে হতাশার সঞ্চার নিঃসন্দেহে ছবির পক্ষে দুর্লক্ষণ। এর নায়িকা একটি গ্রাম্যবালা। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের সিংহদ্বারে পদার্পণ করেছে। অথচ তার আচারে, আচরণে, সংলাপে সে যে পল্লী-কন্যা তা মনেই হয় না। তার মার্জিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে কে বলবে যে, সে একজন চাষীর স্ত্রী, তার দার্শনিক-সুলভ খেদোক্তি শুনে মনে হয়, সে নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন। ছবির শেষে যে যেখানে ছিল সবাই এসে পড়ল (আসার প্রয়োজন থাক চাই নাই থাক), যতগুলি প্রধানশিল্পী ছিল পরিচালক মনে করে করে ঠিক সকলকে এনে হাজির করলেন—তবে বেচারা তারাপদ কি দোষ করল—সেও তো আসতে পারত। শেষের দিকে ছবির ভূগোল রীতিমত অস্পষ্ট বললেই চলে, তাকে অনুধাবন করে হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য।

অভিনয়ে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুপকুমার। এঁদের অভিনয়ই ছবিটির মধ্যে বিশেষ উপভোগ্য। নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ে গ্রাম্যভাব অনুপস্থিত হলেও আন্তরিকতা এবং দরদের ছাপ মেলে। এঁরা ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, নির্মলেন্দু চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, সমরকুমার, রেণুকা রায়, বাণী হাজরা, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, বেলা দেবী আশা দেবী; ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন রাইচাঁদ বড়াল।

শিল্পীর জীবনাবসান

সম্রাটের মৃত্যু হল। এ সংবাদ পৌঁছে গেল দিক থেকে দিগন্তরে। সকলে জানল যে, বহু জনপ্রিয় সম্রাট আজ আর বর্তমান নেই। পঁচিশ বছর ধরে হলিউডের যে সিংহাসন অধিকৃত ছিল তা আজ শূন্য হল। হলিউডের লোকপ্রিয় সম্রাট পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন; রেখে গেলেন গৌরবময় এক ঐতিহ্য। হলিউড তাঁর রাজধানী, রাজ্যের তাঁর বিশ্বজোড়া বিস্তৃতি, তাঁর প্রজা কিন্তু একটিও নেই, আছে অসংখ্য

অনুরাগী—পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—সকল দেশে, সকল সমাজে—তারা ছড়িয়ে আছে সবখানে। এ সম্রাটের মাথায় মুকুট ছিল না, সর্বোচ্চ সংখ্যক gun-saluteএর দ্বারা তাঁকে অভিবাদন জানাতে হোত না। ডেকোরেশান খেতাবের অযথা ভারে তিনি ছিলেন না ভারাক্রান্ত। তিনি রূপদক্ষ, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা। তাঁর নাম ক্লার্ক গেবল। রোমান নোভারো, কোনরাড নাগেল, রুডলভ ভ্যালেণ্টিনো প্রমুখ দিকপালের দল যে ধারার স্রষ্টা, ক্লার্ক গেবল সেই ধারার স্বনামধন্য উত্তরপুরুষ তথা শেষ প্রতিনিধি। হলিউডের চিত্র-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বররূপে তিনি একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশকাল বিরাজিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে ইতিহাস কত এগিয়ে এল, কত মোড় নিল, কত বিচিত্র পরিবর্তনের হল সম্মুখীন, কত পতন-উত্থানের সাক্ষী হয়ে রইল, কত ঘটনার ঘনঘটাকে প্রত্যক্ষ করল—কিন্তু ক্লার্ক গেবল যে গৌরবময় আসনে সম্মানের সঙ্গে সমাসীন ছিলেন, সে আসন থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারে নি, তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তায় কোনদিন এতটুকু মালিন্যের স্পর্শ পড়ে নি। গেবল শিল্পী। তাঁর জীবনের পটভূমি গড়ে উঠল শিল্পদেবতার অসীম অনুপ্রেরণায়। বিবিধ বৈচিত্র্য পূর্ণতা দিল তাঁর শিল্পীজীবনকে। বহুবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ জীবনধারার সঙ্গে গেবল নিজেকে যুক্ত করেছেন আর এই বিভিন্নতার সমন্বয়ে তাঁর জীবনেতিহাস এক অভিনব রূপ পেল।

অসামান্য জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীনকালেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটি ঝরে পড়ল—জীবনে তিনি দিয়েছেনও যেমনি, পেয়েওছেন তেমনি, তাঁর জীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, জীবনের চলার পথের পথিক হিসেবে তাঁকে পথ চলার মূল্য হিসেবে অনেক কিছু দিতে হয়েছে, আবার বিনিময়ে পেয়েওছেন অনেক কিছু যার মূল্যায়ন দু'চারটি বাক্যের সাহায্যে করা অসম্ভব। কিন্তু একটি অভাব তাঁকে সারাজীবন ঘিরে ছিল, যার তীব্রতায় অনেক আনন্দ তিনি প্রাণভরে উপলব্ধি করতেই পারেন নি। সেই অভাব মনের দিক থেকে তাঁকে অনেকখানি শূন্য করে দিয়েছিল। তিনি অপুত্রক—এই অভাব তিনি সারা জীবন তীব্রভাবে অনুভব করে গেছেন। জীবনে তিনি পাঁচবার বিবাহ করেছেন। প্রথম চার পত্নী তাঁর এ অভাব দূর করতে পারেন নি; জীবনসায়াহ্নে শিল্পীর মুখে বহুকাল'পরে এক মিষ্টি মধুর হাসি ফুটে উঠল যখন তিনি শুনলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর পঞ্চম পত্নী তাঁকে সন্তানরত্ন উপহার দিতে চলেছেন। গেবল যেন বহুদিন পরে এক অপরিসীম আনন্দকে নিজের অন্তরের মধ্যে খুঁজে পেলেন। কিন্তু নির্মম নিয়তি অলক্ষ্য থেকে হাসলেন একটু। সন্তান আসছে এইটুকু শুনেই গেলেন গেবল—পুত্রমুখ দেখার সৌভাগ্য তাঁর শেষ অবধি হল না, তাঁর সারা জীবনের অভাব যখন সম্পূর্ণরূপে অবসান হতে চলেছে, ঠিক সেই সময়টিতেই গেবলের জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। নবজাত শিশু যেদিন পৃথিবীর আলোকে প্রথম প্রণাম জানাবে, সেদিন তাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে গেবল আর রইলেন না। নিয়তি তাঁর জীবননাট্যে যবনিকা টেনে দিল। গেবলের অনুরাগীমহলে তথা হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রকেই এ ব্যথা গভীরভাবে স্পর্শ করবে।

ষাট বছর বয়েসে গেবলের মৃত্যুতে হলিউডের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পরিচ্ছেদ ঘটল।

সংবাদবিচিত্রা

ভারতের প্রধানতম সুরসাধক মনস্বী আলাউদ্দীন খান সম্প্রতি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই সংবাদ জনসাধারণ্যে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে, তিনি আরোগ্য লাভ করছেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, বাঙলার গর্ব ও গৌরব এই সাধকশিল্পী সত্বর সম্পূর্ণরূপে নিরাময়লাভ করুন।

বাংলা মুভিসের Padikkatha Methai ছবিটি অভূতপূর্ব জনসম্বর্ধনায় ভরে ওঠে এবং একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে স্বীকৃত হয়। এ কাহিনী শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর "যোগবিয়োগ"কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এ উপলক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙলার প্রখ্যাতনাম্নী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সিনেমাটোগ্রাফ এক্সিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশান অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের স্বনামধন্য পুরুষ শ্রী কে এম মোদী বোম্বাইতে ফিলিপাইনের কনসাল জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেল।

পাকিস্তানের বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীহিমালয়ওয়ালা বেপরোয়া এবং অসতর্ক ভাবে গাড়ী চালানোর ফলে এক টাঙ্গাওয়ালাকে আহত করার অভিযোগে লাহোরের পুলিসের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

মৃত্যুর পূর্বে সাময়িকভাবে যখন ক্লার্ক গেবল আরোগ্যলাভ করছিলেন, সেই সময় অনেকের মত মার্কিণ মুল্লুকের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীআইসেনহাওয়ারও তারযোগে তাঁকে শুভকামনা জানান এবং সামান্য উপদেশও দেন। সেই উপদেশের সারমর্ম হল—চিন্তা কোরো না, রেগে যেও না এবং ডাক্তারের কথামত চল।

কিছুকাল আগে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলার (২৯) রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বর্তমানে তিনি "ক্লিওপেট্রা"য় নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই অসুস্থতার জন্যে সুটিং দীর্ঘকাল স্থগিত ছিল। বর্তমানে রোগমুক্তির পর আবার তিনি কাজে যোগ দিচ্ছেন। আপনি শুনে অবাক হবেন, লিজের এই অসুস্থতা তাঁর স্বামীর মনে, তাঁর আত্মজনের মনে, তাঁর অনুরাগীদের মনে যে পরিমাণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল বীমাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের মনে। লিজের অসুস্থতা যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল তা সত্যিই উদ্বেগ ঘটিয়েছিল তাঁদেরই মনে বোধহয় সবচেয়ে বেশী। এর কারণ—আশা করি, আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না। লিজের সুস্থতার সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চেয়ে তাঁরাই বোধহয় বেশী শান্তি পেয়েছেন, ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সিমন সিনরের (৪০) বিরুদ্ধে ফ্রাগল সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এর ফলে দেশের মঞ্চে, টেলিভিসনে, রেডিও অভিনয়ে আর তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, এক কথায় ফরাসী অভিনয়জগত থেকে তাঁকে নির্বাসিতা করা হয়েছে। এর কারণ আলজিরিয়া সম্পর্কে ফরাসী সরকারের নীতির তিনি প্রতিবাদ করে ফরাসীদের আলজিরীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন।
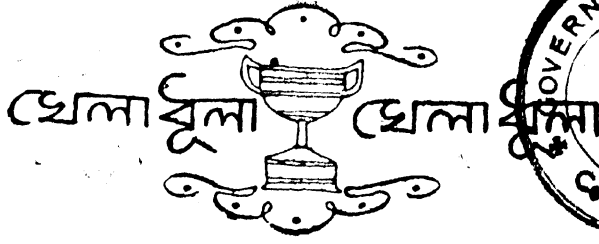
পাক-ভারত টেষ্ট প্রসঙ্গ

প্রথম দু'টো টেষ্টখেলার পর সকলের এই ধারণা হয়েছে যে পাকিস্তান দল সম্পর্কে যেরূপ প্রচারকার্য্য চালান হয়েছিল—আসলে কিন্তু সবই ভুয়ো, দু'টো খেলাতেই প্রমাণ হয়েছে যে পাকিস্তানের কি ব্যাটিং কি বোলিং অতি সাধারণ ধরণের। এঁদের খেলা আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে পড়ে না। প্রথমে ব্যাটিং না পেয়েও দু'বারই ভারত প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হয়েছে। তবে দলে কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় আছেন। কিন্তু তাই বলে এই দল সম্পর্কে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। ভারতীয় খেলোয়াড়রা দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করলে, তাঁদের পক্ষে সাফল্য অর্জ্জন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

বোম্বাই টেষ্টে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সতর্কতামূলক খেলার নীতি গ্রহণের কিছুটা সমর্থন করা গেলেও কানপুর টেষ্টে ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা অযথা অতি ধীরে যেভাবে খেলেছেন, তা সত্যই সমালোচনার যোগ্য। এভাবে খেলায় ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জ্জন করা যেতে পারে; কিন্তু এটা দলগত স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ভারত এই খেলার নীতি পরিবর্ত্তন না করলে টেষ্টে তাদের পক্ষে জয়লাভ করা দুরূহ হয়ে উঠবে। পাকিস্তান দলের বোলিং এমন কিছু মারাত্মক নয় যে ভারতের সারা দিনে পাঁচ ঘণ্টায় দেড় শত রাণ করতে হবে। এভাবে শম্বুক গতিতে খেললে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট তিনটা টেষ্টেও ভারত জিততে পারবে না—এটা সত্যই লজ্জার কথা।

পাকিস্তান দলের খ্যাতনামা ব্যাটস্‌ম্যান হানিফ মহম্মদের করমর্দ্দনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি জলকে যেভাবে ঘোলা করেছেন—তা সত্যই হাস্যকর। করমর্দ্দনের সময় অঙ্গুরীর জন্য হানিফের হাতে সামান্য আঘাত লাগে। একটা মাত্র ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। কিন্তু এর জন্য পাকিস্তানের সংবাদপত্রে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। করাচী ক্রিকেট এসোসিয়েশন মন্তব্য করেছে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে সফর ব্যবস্থা না করাই ভাল।

যে ক্রীড়ামোদী এই করমর্দ্দনের নায়ক—বোম্বাইয়ের শ্রী এ, করিম পত্রযোগে হানিফ মহম্মদকে জানিয়েছেন—"আমার করমর্দ্দনের পশ্চাতে কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না। আপনার অবিস্মরণীয় প্রতিভার প্রতি নিছক আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার বাসনা লইয়াই আপনার সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার ফলে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমি আপনার নিকট দ্বিধাহীনচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" এ থেকে ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। ইহাকে কেন্দ্র করে যেভাবে পাকিস্তানী প্রচার-কার্য্য চালান হয়েছে, তা সত্যই লজ্জার ব্যাপার।

পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ ক্রিকেট খেলার রীতিনীতি সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। কানপুরের টেষ্ট খেলা চলাকালীন ফজল মাঠরক্ষক সীতারামকে সঙ্গে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে "পিচের" কয়েকটা জায়গায় দাগ দেন। এটা ক্রিকেট খেলার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। ভারতীয় আম্পায়ার শ্রীযোশী ও শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ফজলের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। এভাবে পাকিস্তান দলকে লেজে-গোবরে হতে দেখে পাকিস্তানী পত্রিকা "ডন" ভারতের বিরুদ্ধে হুমকী দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ভারতীয় আম্পায়ার শ্রীযোশী ও শ্রীগাঙ্গুলী যদি ফজলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়ে না নেন, তাহ'লে পাকিস্তান বাকি তিনটা টেষ্টে যোগদান করবে না। বজ্জাত পাকিস্তান! পাকিস্তানের কার্যকলাপ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে ভাবিয়ে তুলেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সফরসূচী সম্পর্কে ভারতের ভেবে দেখা দরকার বলে মনে হয়।

ভারতে টেষ্ট খেলা দেখা একটা নেশায় দাঁড়িয়েছে। এবারও খেলার টিকিটের চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। বোম্বাই ও কানপুরের টেষ্টে কালোবাজারে চড়া দামে টিকিট বিক্রী হয়েছে। কিন্তু কলকাতার যেন সবটাতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ দর্শকের ভাগ্যে মাত্র ৩০৫৭ খানা সিজিন টিকিট জোটে। এর জন্য লাইন পড়ে ৩৬ ঘণ্টা আগে থেকে এবং শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ টিকিটই অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য হস্তে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাঙ্গালা ক্রিকেট এসোসিয়েশন ৩০০০ হাজার টিকিট বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। এই টিকিট বিক্রয় হওয়ার পর মহিলাদের এক দল তাঁহাদেরও টিকিট বিলি করার দাবী পেশ করলে সি, এ, বি কর্ত্তৃপক্ষ আরও ৫৭ খানা টিকিট বিলি করার ব্যবস্থা করেন। একখানা টিকিটের জন্য সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের যে ভাবে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয়েছে তা তাঁদের জীবনে বেশ কিছু দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এবার খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। ভারতীয় দল সামগ্রিক ভাবে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য ও দলীয় সংহতির পরিচয় দিয়েছে। নবনিযুক্ত সুযোগ্য অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টারের পরিচালনায় দলের উদীয়মান ও তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবে। তাঁর ক্রীড়াচাতুর্য্যও সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। তাঁর উপভোগ্য ব্যাটিং দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালার সবেধন নীলমণি পঙ্কজ রায়ের অবস্থা সঙ্গীন। তিনি দল থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁর জায়গায় জয়সীমাকে দলভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ব্যাটিং-এ সাফল্য অর্জ্জন করলেও তাঁর খেলার নীতি পরিবর্ত্তন করা দরকার। তাঁর মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে দলগত সংহতিরও প্রয়োজন। পলি উম্রীগড় ও মাঞ্জরেকার বেশ সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। উম্রীগড় আগন্তুক দলের

বিরুদ্ধে প্রথম শত রাণ করেন। খ্যাতনামা খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগ এখনও সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেননি। বোলার হিসাবে দেশাই ও উম্রীগড় খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ "স্পিন" বোলার সুভাষ গুপ্তের বল আগের মতন নেই। ভারতীয় দলের চিরাচরিত ফিল্ডিং-এ ত্রুটী-বিচ্যুতি দেখা গেছে।

পাকিস্তান দলের হানিফ, সৈয়দ আমেদ, ইমতিয়াজ আমেদ, জাভেদ বার্কির ব্যাটিং দেখে সকলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। হানিফ ও সৈয়দ উভয়েই প্রথম টেষ্টে শত রাণ করেন। বোলার হিসাবে মামুদ হোসেন, হাসিব আসান ও নসিমুল গণির যে খ্যাতি আছে, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মহম্মদ ফারুক সম্পর্কে অযথা প্রচারকার্য্য চালান হয়েছে। তাঁর বোলিং তেমন কিছু "ফাষ্ট" নয়। ফজল মামুদের বোলিং-এর আর কিছুই নেই। নিম্নে প্রথম দু'টো টেষ্টের ফলাফল দেওয়া হল :—

প্রথম টেষ্ট—বোম্বাই

পাকিস্তান—১ম ইনিংস ৩৫০ (হানিফ মহম্মদ ১৬০, সৈয়দ আমেদ ১২১ ; এস, পি, গুপ্তে ৪৩ রাণে ৪ উই: ও আর দেশাই ১১৬ রাণে ৪ উই:)।

ভারত—১ম ইনিংস (৯ উই: ডি:) ৪৪৯ (আর দেশাই ৮৫, ভি, এল, মাঞ্জরেকার ৭৩, নরী কনট্রাক্টর ৬২, পি, জি, যোশী নট আউট ৫২, চান্দু বোড়ে ৪১, বাপু নাদকার্নি ৩৪, পলি উম্রীগড় ৩৩ ; মামুদ হোসেন ১২৯ রাণে ৫ উই: ও মহম্মদ ফারুক ১৩৯ রাণে ৪উই:)

পাকিস্তান—২য় ইনিংস (৪ উই:) ১১৬ (ইমতিয়াজ আমেদ ৬৯, সৈয়দ আমেদ ৪১, বাপু নাদকার্নি ৯ রাণে ২ উই:)।

দ্বিতীয় টেষ্ট—কানপুর

পাকিস্তান—১ম ইনিংস ৩৩৫ (জাভেদ বার্কি ৭৯, নসিমুল গণি নট আউট ৭০, সৈয়দ আমেদ ৩২, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস ৩৭, আলিমুদ্দিন ২৪, ইমতিয়াজ আমেদ ২০ ; উম্রীগড় ৭১ রাণে ৪ উই:, আর, দেশাই ৫৪ রাণে ২ উই: ও এস, পি, গুপ্তে ৮৪ রাণে ২ উই:)।

ভারত—১ম ইনিংস ৪০৪ (পি, উম্রীগড় ১১৫, এম, জয়সিমা ৯৯, ভি, এল, মাঞ্জরেকার ৫২, এন, কনট্রাক্টর ৪৭ ; হাসিব আসান ১২১ রাণে ৫ উই: ও মামুদ হোসেন ১০১ রাণে ২ উই:)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস (৩ উই:) ১৪০ (জাভেদ বার্কি নট আউট ৪৮, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস নট আউট ৪৬ ; মুদিয়া ৪০ রাণে ২ উই:)

ক্রিকেটে নূতন ইতিহাস রচনা

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্টে উভয় দলের সম-সংখ্যক রাণ হওয়ায় নাটকীয়ভাবে খেলাটির পরিসমাপ্তি ঘটে। চতুর্থ দিনের শেষে খেলাটি অষ্ট্রেলিয়ার অনুকূলে এসেছিল; কিন্তু পঞ্চম ও শেষ দিনে অপ্রত্যাশিত ভাবে খেলার মোড় ঘুরে যায়। খেলার শেষ সময় প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার শেষ খেলোয়াড় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সম-সংখ্যক রাণে আউট হওয়ায় টেষ্ট খেলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। ইহা সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। প্রথম যুদ্ধের পর টেষ্ট খেলায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম উভয় দলের সমান রাণ। তবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এইরূপ বৈচিত্র্যময় নজীর উনিশ বার ঘটেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলার কথা ক্রীড়ামোদীদের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে খেলার সংক্ষিপ্ত রাণসংখ্যা দেওয়া হ'লো :—

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ ইনিংস—৪৫৩ (জি সোবার্স ১৩২, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬৫, জে সলোমন ৬৫, জি, আলেকজাণ্ডার ৬০, ডব্লিউ হল ৫০ ; ডেভিডসন ১৩২ রাণে ৫ উই: ও ক্লাইন ৫৩ রাণে ৩ উই:)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৫০৫ (নর্মান ও'নীল ১৮১, আর সিম্পসন ৯২, সি, ম্যাকডোনাল্ড ৫৭, এল, ফাভেল ৪৫, এ ডেভিডসন ৪৪, ম্যাকে ৩৫ ; হল ১৪০ রাণে ৪ উই: ও সোবার্স ১১৫ রাণে ২ উই:)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস—২৮৪ (ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬৫, কানহাই ৫৪, জে, সলোমন ৪৭, সি, হান্ট ৩৯ ; ডেভিডসন ৮৭ রাণে ৬উই:)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—২৩২ (ডেভিডসন ৮০, বেনড ৫২ ; ডব্লিউ হল ৬৩ রাণে ৫ উই:)।

পুনরায় কলিকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ প্রসঙ্গ

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম না হ'লেও এ নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ মুখরোচক খবর শোনা যায়। এবার ষ্টেডিয়াম বাস্তবে পরিণত হওয়ার দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বিখ্যাত ইতালিয়ান স্থপতি মি: এ, ভিতেলজ্জি রাজ্য সরকারের অনুরোধে এই ষ্টেডিয়ামের একটা মডেল নির্ম্মাণ করেছেন। সম্প্রতি প্ল্যাষ্টার-নির্ম্মিত মডেলটা কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে। প্রস্তাবিত ষ্টেডিয়ামটি ডিম্বাকৃতি হবে। এলেনবরা কোর্সে প্রায় ২৩ একর জমি জুড়ে ইহা নির্ম্মিত হবে। এই ষ্টেডিয়ামে ৭০ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান হবে। ৩ হাজার আসনের উপরে আচ্ছাদন থাকবে। বাকী জায়গার উপরে কোন আচ্ছাদন থাকবে না। এই ষ্টেডিয়ামে ক্যান্টিন ও অন্যান্য ব্যবস্থাও থাকবে। বিদেশ থেকে আগত ৬০ জন খেলোয়াড়ের বাসোপযোগী ব্যবস্থা রাখা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সম্প্রতি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় সাংবাদিকদের ষ্টেডিয়ামের মডেলটা দেখান। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী ১৯৬১ সালের মে মাসে ষ্টেডিয়ামের কাজ আরম্ভ হবে। দেখা যাক, সত্যিকারের ষ্টেডিয়ামের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হয়।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি মুখের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে।
আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীপি, সাহানা।

কর্ম্মফল

"এখন জিজ্ঞাস্য—অতঃপর কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশ পাকিস্তানকে দিবার ব্যবস্থা কি হইবে ও কবে হইবে? তিনি অবশ্যই বলিবেন—তাহাই ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। কিসের মূল্যে বেরুবাড়ী প্রদান করা হইয়াছে এবং কিসের মূল্যেই বা কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশ দেওয়া যাইবে—তাহা কি জওহরলাল প্রকাশ করিবেন? লজ্জা যখন তিনি জয় করিয়াছেন, তখন আর সঙ্কোচ কিসের? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবহারের আলোচনা করিতেও লজ্জা হয়। শরৎচন্দ্র বসুর নির্ব্বাচনকালে যখন কোন কংগ্রেসী সংবাদপত্রে তাহার সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় উক্তি প্রকাশিত হইলে কোন পত্রের সম্পাদককে গঙ্গার ঘাটে কয়জন লোক উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করে, তখন তিনি নাকি বলিয়াছেন—তিনি অধিকারীর আজ্ঞাবহ—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তিনি আর গঙ্গাস্নানে আসিবেন না। তেমনই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—তিনি প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার সাহায্য করিতে বাধ্য—সেজন্য রাজ্যের লোকের সর্ব্বনাশ হইলেও বিরত হইতে পারেন না। যদি তাহাই হয় তবে যে পূর্ব্বে অনেক আপত্তি করা হইয়াছিল, সে কি বিরাট ধাপ্পাবাজি? বেরুবাড়ীর ব্যাপারে যে—(১) মানচিত্র অস্তর্হিত হইয়াছিল। (২) একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যদিগকে যথাকালে প্রদান করা হয় নাই। (৩) প্রধান সচিব ফতোয়া দিয়াছিলেন—বেরুবাড়ী সমর্পণ যেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরা সমর্থন করেন। এই তিনেই যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন; পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা গত নির্ব্বাচনের কর্ম্মফল ভোগ করিলেন—সন্দেহ নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

পাঞ্জাবী মহিলার সৎসাহস

"পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলনকারী অকালীরা শিখ মহিলাদের মধ্যেও যে প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন তাহাতে যে অনেকটা সাফল্যলাভও করিয়াছেন দেরাদুনের একটি খবর হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। দেরাদুনের শিখ মহিলা সমিতি ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রত্যেক শিখ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ শিখ কর্মচারীকে ডাকযোগে দুই জোড়া করিয়া বালা পাঠাইয়া দিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের ব্যবহারযোগ্য অলঙ্কার—বালাই সদস্যদের উপযুক্ত পুরস্কার। কারণ, তাঁহারা পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলনে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজেদের সদস্যপদ অথবা সরকারী চাকুরী আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। শিখ মহিলাদের মতে শিখ সমাজের এই সঙ্কট সময়ে বিশেষতঃ সন্ত ফতে সিং যখন পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে আমরণ অনশন আরম্ভ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের (সদস্যদের) নিজ নিজ কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। ভারতীয় সংসদের শিখ সদস্যগণ এবং উচ্চপদস্থ শিখ সরকারী কর্মচারীরা মহিলাদের প্রদত্ত বালা হাতে পরিবেন অথবা সদস্য-পদ ও চাকুরী বজায় রাখিবেন স্থির করিয়াছেন সে খবর এখনও প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য পাঞ্জাবী সুবার দাবীদারেরা যে ক্রমেই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রচারকার্য চালাইতেছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, গুরুগোবিন্দ দিবস উপলক্ষে কলিকাতার শিখেরাও পাঞ্জাবী সুবার দাবী সমর্থন করিয়াছেন।"

—যুগান্তর।

সময় থাকিতে

"উদ্বাস্তসমাজের যাঁহারা সব হিসাব খতাইয়া দেখিয়া তবে পা বাড়াইতে চাহেন, অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন স্মরণ করিয়া দেখেন, থালায় পরিবেশিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য কোন নূতন বাসভূমে মেলে না। জঙ্গল সাফ করিয়া পাহাড় কাটিয়া মানুষকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয় নানা দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। অন্য দেশের মানুষ যাহা পারিয়াছে, বাঙালী তাহা পারিবে না? এক্ষেত্রে কাজ ততটা কঠিনও নহে—কর্তৃপক্ষই তাহাদের কাজ অনেকখানি করিয়া রাখিতেছেন। অল্প আয়াসে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সম্ভাবনা বার বার ফিরিয়া আসে না! সে আশঙ্কা এখনই দেখা দিয়াছে। জমি চাষযোগ্য, ইতিমধ্যেই কেরল, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের দৃষ্টি দণ্ডকারণ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। চাষের উপযুক্ত জমি ফেলিয়া রাখা চলে না, রাখিলে তাহা আবার অনুর্বর অনাবাদী হইয়া পড়ে—সমগ্র দেশের প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে তাহাতে জাতীয় ক্ষতি। আজ বাংলার উদ্বাস্তদের অনিচ্ছার সুযোগ অপরে যদি গ্রহণ করে, প্রতিবাদ করার কোন যুক্তি থাকিবে না। সম্ভবত উপায়ও নাই—কেন না, ততদিনে শিবির, 'ডোল' ইত্যাদিও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। পিছনের দরজা বন্ধ, সম্মুখের পথও রুদ্ধ—ভবিষ্যতের সেই ভয়াবহ চিত্রটির কল্পনাও দুঃসহ। বেদখল জমি যে বেহাত হয়, বাস্তহারাদের সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের নিজেদেরই কথাটা ভাল করিয়া জানা। সরকারী পরিকল্পনা একটার পর একটা কতই তো ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু দণ্ডকারণ্যকে তেমনই একটা পরিকল্পনার মত করিয়া কিছুতে দেখা চলে না, কেন না, কেবল উদ্বাস্তসমাজের নয় সমগ্র বাঙালী জাতিরই আশা-আশ্বাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ইহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারতের ক্ষেতমজুর

"কংগ্রেস রাজত্বে যেখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকারী কর্ম্মচারীরাই মরিয়া হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়, সেখানে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা সহজেই বোধগম্য। ভারতে এখনো জমির উপর শতকরা ৭০ জনকে নির্ভর করিতে হয়। দ্রুত শিল্পোন্নতিই এই অবস্থার বদল করিতে পারিত। কিন্তু শিল্পোন্নতির শ্লথ গতিবেগ যেমন ক্ষেতমজুর সমস্যাকে ঘনীভূত করিতেছে, ঠিক তেমনি প্রকৃত ভূমিসংস্কার দ্বারা ভূমিহীনের হাতে জমি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শিল্পোন্নতির পথ সংকীর্ণ এবং গতিবেগ শ্লথ হইতে বাধ্য। তাই ক্ষেতমজুর সমস্যার সমাধানের উপর একাধারে কৃষির উন্নতি ও শিল্পের অগ্রগতি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। লোকসভায় প্রদত্ত রিপোর্ট বর্তমান সরকারের নীতিগুলির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা ভিন্ন দেশ এবং জাতি বিপন্ন। দেশের সমস্ত

শ্রেণী ও সকল দলের গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ মোর্চাই পারে এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে।" —স্বাধীনতা।

জবাই শেষ

"মঙ্গলবার বেরুবাড়ী জবাইয়ের প্রতিবাদে হরতাল হইয়াছে এবং লোকসভায় সেই সময়েই জবাই সমাধা হইয়াছে। নেহরু বলিয়াছেন—বেরুবাড়ী পাকিস্থানে গেলে পশ্চিমবঙ্গের লাভ হইবে। আচার্য্য কৃপালনী জবাব দিয়াছেন—এই মন্তব্য বাঙ্গলার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। নেহরু-নূন চুক্তিতে পাকিস্থানের ষোল আনা লাভ এবং ভারতের আপাত: ক্ষতি শুধু নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে উহা ভবিষ্যতের এক বিরাট বিপদের সূচনা, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইহা দুই দিক দিয়া সর্বনাশের আঘাত আনিবে। বেরুবাড়ী অপহরণ প্রতিরোধে বাঙ্গালীর অক্ষমতা এখানে অবাঙ্গালী প্রাধান্য দৃঢ়তর করিবে এবং পাকিস্থানকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। বাঙ্গালাদেশ হইতে জবরদস্তি করিয়া তাহারা বেরুবাড়ী ছিনাইয়া আনিয়াছে—এই মনোভাব পাকিস্থানকে আরও বেপরোয়া করিবে এবং বাঙ্গলাদেশে যে সমস্ত পাকিস্থানী চর বহু সংখ্যায় রহিয়াছে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসী সদস্যদের দুমুখো কাজের জন্য সারা বাঙ্গলার উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলাদেশ কাহারও সহানুভূতির যোগ্য নহে। এই মন্তব্য অনেকাংশে আমাদের প্রাপ্য হইলেও সবটা প্রাপ্য নয়। বিধানসভায় বিরোধী সদস্যেরা কংগ্রেসীদের পদত্যাগ করিতে না বলিয়া নিজেরা পদত্যাগের দ্বারা উহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চ্যালেঞ্জ করিলে তাহা শোভন হইত এবং আমাদের দুর্নাম কাটিয়া যাইত। কৃপালনীর মন্তব্যে সব প্রদেশের উপর চটিলে আমরা ভুল করিব। দিল্লীতে নিখিল ভারত বেরুবাড়ী সম্মেলনে এম, এস, আনে এবং ব্রজনারায়ণ ব্রজেশ্বর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা যেন, আমরা ভুলিয়া না যাই। কৃপালনীর মন্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলার কথা প্রচারের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

ইট

"পি, ডব্লিউ, ডি'র—সাম্প্রতিক কাজ লক্ষ্য করেছেন কি? লক্ষ্য করেছেন কি ফুটপাথের ক্ষতস্থানে আজকাল ইট বসানো হচ্ছে? এমন কখনো হয়নি। এখন কেন? প্রশ্নটা সাধারণ কিন্তু উত্তরটা অসাধারণ। দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা ইটখোলা আছে—সাধারণের মাঝে ব্যবসা চালাবার জন্যেই। ব্যবসা চলছেও ঠিক। গত বছর মাত্র ১,৪৩,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছিল। এবছর ক্ষতি হবে ২,০০,০০০ টাকা। একথা গত বছরের বাজেটেই লেখা ছিল। ক্ষতির পরিমাণ কম করবার জন্যই সরকারের আর পি, ডব্লিউ, ডির এই যৌথ কারসাজি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে কি? কলকাতার মানুষ চলতে ফিরতে ফুটপাথে বসানো ইট দেখেছে—সে ইট কিনে কেউ বাড়ী তুলতে চাইলে আর কথাই ছিল না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হত ধ্বস্ নেমে। ফুটপাথে সে চান্স নেই। তবে অর্থক্ষতির ধ্বস্ থেকে হয়ত দুর্গাপুর বাঁচতে পারে। কেন না যতই ইট বসানো হোক না কেন টেলিফোন, ইলেকট্রিক ইত্যাদির দৌলতে গর্ত্ত চিরকালই খোঁড়া হবে। সেই সঙ্গে এই নিয়ন্তরের ইটেরও নিশ্চয়ই কাটতি বাড়বে।" —স্বস্তিকা (কলিকাতা)।

ভোটার তালিকা

"১৯৫৮ সালে প্রস্তুত ভোটার তালিকা নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কেননা, এই ভোটার তালিকা অসংখ্য ভুল ও ত্রুটি-পরিকীর্ণ। প্রথমত: সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয়ত: অনেক মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়ত: যাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম সেই অঞ্চলের ভোটার তালিকা হইতে বাদ পড়ে নাই। বিশেষভাবে এই জেলায় উল্লিখিত ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা গিয়াছে। অবশ্য এই ভুল ও ত্রুটির কারণও রহিয়াছে। যে পদ্ধতিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়, তাহাও ত্রুটিহীন নয়। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে অসুবিধা চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করে। মনে হয় ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্ব যাঁহাদের হস্তে অর্পণ করা হয়, তাঁহাদের আবেদন সকলের নিকট পৌঁছায় না। ফলে যাঁহাদের নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের নামও বাদ পড়িয়া যায়। মৃতের বা চিরকালের জন্য স্থানত্যাগকারীর সন্ধান পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। কাজেই ভোটার তালিকা ঠিক মতো সংশোধিত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য শুধু সরকারী প্রচেষ্টাই একটি সুসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রণয়নের পক্ষে যথেষ্ট নয়, যদি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও স্বত:স্ফূর্ত সহযোগিতা তাহার পরিপূরক হিসাবে উপস্থিত না হয়। তবে ইহাও ঠিক যে, জনসাধারণের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগাইবার সরকারী প্রচেষ্টাও মোটেই অপরিসীম নয়।" —বার্ত্তা (বালুরঘাট)।

নির্বিঘ্নে ধানকাটা

"সর্ব্বত্রই যখন ধান কাটার বিরোধ তখন সুতাহাটা থানায় এই বৎসর ধানকাটা মরশুম নির্ব্বিঘ্নে বিনা রক্তপাতেই সম্পন্ন হওয়া একটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। প্রতি বৎসরই এখানে এই ব্যাপার লইয়া কিছু না কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা, গাদিতে আগুন লাগানো, খুন জখম যেন স্বাভাবিক রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সেখ হায়দার আলির অগ্রিম সতর্কতায় গ্রামে গ্রামে গিয়া সভাসমিতি করা এবং এইসব ব্যাপারে উস্কানীদাতা কয়েকজন নামকরা কৃষকনেতাকে উত্তেজনা সৃষ্টির মুখেই গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখায় এই অশান্তিজনক রীতিটির ব্যতিক্রম ঘটে। হায়দার আলি সাহেবের এই কৃতিত্ব শুধু উল্লেখযোগ্যই নহে অন্যত্রও অনুসরণীয়।" —প্রদীপ (তমলুক)

মহানুভবতা

"স্থানীয় মহিষমর্দ্দিনী জ্যোতির্বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানাইতেছেন যে ষোল বৎসরের অনূর্দ্ধ কোন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে আহার ও বাসস্থানসহ বিনাব্যয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। তাঁহার এই মহানুভবতা সত্যই প্রশংসার্হ। দুঃস্থ ব্রাহ্মণ-সন্তানের আবেদন সর্বাগ্রে গৃহীত হইবে।" —ভাগীরথী (কালনা)

অব্যবস্থা

"আমরা স্বাধীন হইয়াছি কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ আজও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না কেন, তাহা তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

রাজশক্তির অদল বদল হওয়াকে স্বাধীনতা বলে না। রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবী ও সুখ-সুবিধার খর্বতা ও তাহা ক্ষুণ্ণ করিবার সকল প্রকার প্রচেষ্টাই স্বাধীনতার পরিপন্থী। একদলীয় রাজনীতি দেশে ভোট সংগ্রহ করিতেছে সত্য কিন্তু দেশে স্বাধীন দেশের মানুষের মর্য্যাদাবোধ আনিতে পারে নাই। আমাদের দেশে আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি। যাহারা তাহা দেখিতে পায় না তাহারা অন্ধ, না হয় মোহগ্রস্ত। এই মোহ হইতেছে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহ। একবার ইহা যাহার স্কন্ধে চাপে তাহার পক্ষে ইহাই হইয়া দাঁড়ায় সার ও সর্বস্ব। আজ আমরা সর্ব্ব ব্যাপারেই তাহা দেখিতে পাইতেছি। সত্য তলাইয়া গিয়াছে, মিথ্যা ও দুর্নীতির সহিত ক্ষমতার দস্ত হাত মিলাইয়া চলিয়াছে, আর সাধারণ মানুষেরও চেতনাবোধ ও সংপ্রকৃতি ক্রুত লোপ পাইতেছে। ইহা বাঁচিবার লক্ষণ নহে। বক্তৃতা শুনিয়া দেশের মানুষ বাঁচিতে পারে না। ইহার জন্য সাধারণ মানুষকে দায়ী অথবা দোষী করা যায় না। ক্ষমতার হাত বদল যদি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত না হয় তবে তাহা সমগ্র মানুষের ও দেশের কল্যাণে আসে না। আমাদের দেশ স্বাধীন অথচ দেশের সাধারণ মানুষ এই স্বাধীনতার মর্ম্ম কতটুকু উপলব্ধি করিতেছে।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

পাকামাথার লড়াই

"কাঁচামাথারা চিরকাল বেহিসাবী, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন, উচ্ছৃঙ্খল। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার হলে ইহারাই, কঠিন প্রশ্নপত্র পাইলে, চেয়ার-বেঞ্চি ভাঙ্গিয়া কর্তৃপক্ষকে অপমান করিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে। রাজনৈতিক বোমাবাজী ইহারাই করে। ইতরভাষা প্রয়োগ করিতেও শুনি বেশীর ভাগ ইহাদিগকেই। কিন্তু কালটা কলি, বোধ হয় ঘোর কলি। সুতরাং এ-কালে অসম্ভব সম্ভব হয়, অঘটন ঘটে নিতান্ত অহরহই। এ-কালে ভারতীয় নাগরিক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হইয়াও, ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য হয়, (পাঠকগণ সম্ভবতঃ নাগা-নেতা ফিজো সম্পর্কে শ্রীনেহেরুর উক্তি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় জানাইয়াছেন, ভারতীয় নাগরিক ফিজোকে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য করিতেছেন)। এ-কালে সমাজবাদের ভাঁওতা দিয়া ধনতন্ত্রবাদ কায়েম রাখা যায় এবং উগ্রতরও করা যায়। যাহার পত্নী-পুত্র নাই তাহার স্কন্ধে পত্নী-পুত্র চাপাইয়া দেওয়া যায়। সুতরাং একালে সব কিছুই হয়, শুধু আমরা 'জানতে পারি না'।"

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদাদান

সম্প্রতি বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়াছেন। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায় ও শিক্ষামানের উন্নতি ঘটিয়া লুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। সরকারী এই প্রচেষ্টা বিলম্বিত হইলেও অভিনন্দনযোগ্য। আয়ুর্ব্বেদ এ দেশের প্রাচীনতম চিকিৎসা। ভারতের আর্য্যঋষিকুল প্রবর্ত্তিত এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান এককালে গৌরবের বস্তু ছিল। দেশীয় গাছগাছড়া এবং বন-জঙ্গল হইতে সংগৃহীত ফল-ফুল ও মূল আদিতে যে মহৌষধি প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা মনুষ্য সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করে তাহা ভারতের অতীত যুগের বহু ঘটনাবলী হইতেই জানা যায়। রামায়ণে যে 'বিশল্যকরণী' ও 'মৃতসঞ্জীবনী'র কথা উল্লেখ আছে, আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার ক্রমোন্নতি ঘটিলে হয়ত একদিন উহার প্রকৃত সন্ধানলাভও সম্ভব হইতে পারে। চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তাগণ চিকিৎসার যে বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—বহুকাল ধরিয়াই তাহা ভারতবর্ষে সমাদৃত ছিল। কালক্রমে ভারতবর্ষ পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীটি ক্রমেই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের সেই লুপ্ত চিকিৎসা প্রণালীটির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিয়াছে। এ জন্ত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও গবেষণাগার এবং চিকিৎসালয় আদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নয়ন সাধিত হইতেছে ইহা খুবই গৌরবের বিষয়। সম্প্রতি সরকারী অনুমোদন লাভে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাটির অধিকতর সম্প্রসারণ ঘটিয়া পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা আমরা আশা করিতেছি।"

—নীহার (কাঁথি)

চিনি-রহস্য

"সরকারী নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও চিনি নিয়া এক আজব খেলা চলিতেছে এবং সেই খেলার চোটে জনগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছেন। কখনও হঠাৎ বাজারে চিনি নাই, যখনও বা থাকে তখন মূল্য থাকে অত্যধিক—সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বর্ত্তমান বাজার দর সহরে ১।৵০-১।০ : মফঃস্বলে তো ২৲ সের! সরকার কর্ত্তৃক চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হওয়ায় জনসাধারণ আশা করিয়াছিলেন, ন্যায্য মূল্যে ভাল ও প্রয়োজনীয় চিনি পাওয়া যাইবে। কিন্তু হায়! সরিষার মধ্যেই বুঝি ভূত! জনসাধারণের গভীর সন্দেহ এই যে, কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সহযোগিতায় জনসাধারণের উপর এক হাত নিয়া যাইতেছেন। চিনির বণ্টন ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য—সাপ্লাই বিভাগের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ সেই ক্ষমতার প্রয়োগ হয় না? কেন চিনির লীলা-খেলার সাপ্লাই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করেন? করিমগঞ্জের জন্যও চিনির মাসিক বরাদ্দ আছে; সেই বরাদ্দ কি আসে না? না আসিয়া থাকিলে তাহার কারণ কি? আর যদি প্রতি মাসে বরাদ্দ আসিয়াই থাকে—তবে চিনির বাজারের এই শোচনীয় অবস্থা কেন? গত মাসে নাকি চিনি বাজারে ছিল না, তাই পাইকারী দর ৪৮৲।৫০৲ উঠিল। ইতিমধ্যে গৌহাটী হইতে ৮ গাড়ী চিনি আসিল। ঐ চিনি কোথায় কি ভাবে বিক্রীত হইল তাহা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে জানিতে দিবেন কি?"

—যুবশক্তি (করিমগঞ্জ)

এক অদ্ভুত লজিক

"গত ১৩ই ডিসেম্বর জেলা লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ও জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক যুগ্মবৈঠকে ঠিক করা হইয়াছে যে যেহেতু সিউড়ি সহরে একটি সরকারী জেলা গ্রন্থাগার আছে, অতএব সিউড়িতে অন্যান্য যে ৫।৬টি গ্রন্থাগার আছে তাহাদিগকে কোন সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে না। সিউড়িতে জুবিলী

গ্রন্থাগার নামক যে বহু পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার আছে তাহাকে সরকার হইতে বাৎসরিক ৪০০৲ টাকা, রবীন্দ্র পাঠাগার ও কিশোর পাঠাগার নামক ২টি গ্রন্থাগারে বাৎসরিক ২০০৲ টাকা করিয়া ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ও ইসলামিয়া গ্রন্থাগার নামক অপর ২টি লাইব্রেরীতে ১০০৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করা হইত। এ বৎসর এই সমস্ত লাইব্রেরীর প্রাপ্য আর্থিক সাহায্যগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতীব পরিতাপের বিষয় এবং নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই আমরা মনে করি।" —সেবা (সিউড়ি)

শোক-সংবাদ

চারুচন্দ্র বিশ্বাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইনমন্ত্রী এবং কলকাতা প্রধান বিচারালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গত ২৩এ অগ্রহায়ণ ৭২ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। চারুচন্দ্রের ছাত্রজীবন গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল, প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এম, এ ও ল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১০ সালে অর্থাৎ ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে আইনব্যবসায়ী হিসেবে ইনি হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং অচিরে যুগপৎ প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভে সমর্থ হন। ১৯৩৭ থেকে ৪৮ সাল পর্য্যন্ত ইনি বিচারালয়ের অন্যতম বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর বিখ্যাত আপীল মামলায় চারুচন্দ্র ছিলেন অন্যতম বিচারক। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত কয়েক মাস ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৯১৭ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এঁর যোগ। ফ্যাকাল্টি অব ল'এর ডীনের আসনেও ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৩৮—৫০)। ১৯৫০ সালে ইনি কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫২ থেকে ৫৭ পর্যন্ত ইনি আইনমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ভারতীয় আইনসমূহের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কলকাতা পৌরসভা ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সঙ্গেও ইনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৩ এবং ৩৬ সালে জেনেভার লীগ অফ নেশানসের সাধারণ পরিষদে ভারতের বিকল্প প্রতিনিধি হিসেবে চারুচন্দ্র যোগদান করেন। হিন্দুকোড য়্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্ট এবং স্পেশাল মারেজ য়্যাক্ট এই দুটি আইনের সঙ্গে সুদক্ষ আইনবিদ চারুচন্দ্র বিশ্বাসের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রসন্নকুমার আচার্য

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-কলাবিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট মনীষী ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য মহাশয় গত ১৫ই অগ্রহায়ণ ৭৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সাহিত্য এবং দর্শন উভয় শাস্ত্রেই ইনি 'ডক্টরেট' লাভ করেন ও শিক্ষাজগতে নিজেকে উৎসর্গীত করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর ডীনের আসনও এঁর অধিকারগত হয়েছে। প্রাচীনভারতীয় স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে এঁর গবেষণা এবং অবদান আন্তর্জাতিক সুধীসমাজে বহুল সমাদরলাভ করেছে এবং "যথেষ্ট মূল্যবান" আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। উক্ত বিষয়ে ডক্টর আচার্য বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত হন। ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যার অতীত এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস অন্বেষণে এবং তার অনুশীলনের কাজে ইনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং প্রভূত শ্রমস্বীকারের পরিচয় দিয়েছেন।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

ভারতীয় দর্শন বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী গত ১৪ই অগ্রহায়ণ ৬০ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। কবি, ভক্ত এবং সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইনি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম কর্ণধার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাম্মিলনীর ভূতপূর্ব সম্পাদক ছিলেন।

সুপ্রভা রায়

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্য স্রষ্টা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্রবধূ এবং দিকপাল সাহিত্যরথী স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের সহধর্মিণী সুপ্রভা রায় গত ১১ই অগ্রহায়ণ ৭০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করার পর অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ইনি যোগ দেন এবং বিদ্যাভবনটি নতুন করে গড়ে তোলেন। সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলনে ইনি অংশগ্রহণ করেন, শিল্পকার্য্য বিশেষ করে চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যবিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁর একমাত্র সন্তান।

কিরণচন্দ্র দত্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গিরিশ অধ্যাপক (১৯৪৭), বিশিষ্ট সাহিত্য ও সমাজসেবী কলকাতার প্রবীণ নাগরিক কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৮৫ বছর বয়সে গঙ্গায় হয়েছেন। ইনি বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য সন্তান। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম একনিষ্ঠ শিষ্য কিরণচন্দ্র বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সদস্য এবং বাগবাজারের বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদামঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। বাগ্মী হিসেবেও ইনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থেরও ইনি রচয়িতা।

ডাঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায়

কলকাতার প্রবীণতম চিকিৎসক ডাঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায় গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৯১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সুদীর্ঘ জীবনের একটি বিরাট অংশ ইনি চিকিৎসা তথা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। গাছ-গাছড়া সংক্রান্ত এঁর গবেষণাদি মূল্যবান। দেশের এবং বিদেশের অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুকাল ইনি "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদন বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেশিনে' শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
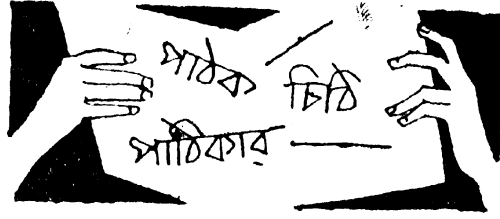
পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার ৪২ পৃষ্ঠায় "আধুনিকা কি সত্যই স্বাধীন" প্রবন্ধে প্রথমে উল্লেখ আছে যে বর্তমান যুগে সমাজে, রাষ্ট্রনীতিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্রই মেয়েদের আবির্ভাবকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের ভিত্তিতে। বর্তমান যুগে যদিও নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, একটু তলিয়ে দেখলে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন যে ইহা করতে গিয়ে মানুষ যুগ-যুগান্তের প্রাকৃতিক নিয়ম ও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রভাবই বেশী—কোন জটিল কাজ পুরুষ ছাড়া কোনদিন হয়নি ও হবে না। তা ছাড়া, পুরুষ ও নারীর পার্থক্য জন্মগত, শরীর ও মনের প্রকৃতিগত। নারীর শরীর পুরুষের ন্যায় কঠিন, শক্তি-সামর্থ্যশালী, কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু নয়, নারীর শরীর কোমল, দুর্বল, কঠোরতা সহনে অক্ষম, পুরুষের মন বিচারশীল, শক্ত, স্বাধীন চিন্তাশীল; নারীর মন নরম, সরল ও স্নেহপ্রবণ। শরীর ও মনের প্রকৃতিগত এই পার্থক্য থাকায় পুরুষের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, নারীর পক্ষে তাহা কঠিন ও অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে নারীর পক্ষে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, পুরুষের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক ও দুঃসাধ্য, পুরুষের পক্ষে ঘরকন্নার খুঁটিনাটি কাজ এবং সন্তান পালন যেমন অসম্ভব, নারীর পক্ষেও তেমনি ছুটোছুটি, ট্রামে বাসে সব সময়ে ইজ্জৎ বজায় রেখে চলাফেরা, পরিশ্রম, কৃষিকার্য, যুদ্ধ, ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি অসম্ভব। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ করে দেখে ত্রিকালজ্ঞ হিন্দুঋষিরা সমাজে নারী ও পুরুষের যথাযোগ্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন এবং নারী ও পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দেননি। প্রাচীনকালের হিন্দু ঋষিরা বাইরের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের জন্যে এবং নারীর কর্মক্ষেত্র ঘরে নির্ধারিত করে গিয়েছেন, কারণ বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীকে ঘুরতে হলে তার পক্ষে সব সময়ে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চলা, সতীত্ব ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য। যারা বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন, তাদের অনেকের অবাধ মিলামিশার ফলে নৈতিক অধঃপতন হতেও দেখা যায়। বাইরের কর্মক্ষেত্রে এসে অনেক সময়ে উচ্চশিক্ষিতা নারীরাও পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেন না এবং ব্যভিচারিণী হয়ে পড়েন। সিংহলের মহিলা মন্ত্রীর কাহিনী যাঁরা পত্রিকায় দেখেছেন, তাঁরা উক্ত কথাকে অসত্য বলে উড়িয়ে দিবেন না মনে হয়। দৈনিক পত্রিকা যাঁরা পড়েন, তাঁরা এইরূপ আরও অনেক ঘটনা নিশ্চয়ই দেখেছেন। যতদিন নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার পায়নি এবং সামাজিক শাসনে হোক্ বা অন্য কারণে হোক্, পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্যে বহির্জগতে আসে নি, ততদিন নারীদের ব্যাপার নিয়ে ঘটনা কমই শুনা যেতো। এই প্রবন্ধের আর এক জায়গায় আছে "শহর ও গ্রাম হতে হাজার হাজার মেয়ে আসছে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে।" এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। বর্তমানে পণপ্রথার চাপে অনেক কুমারী অবিবাহিতা থাকতে বাধ্য হয়। আজকাল পাত্র ও পাত্রের অভিভাবকগণ পাত্রীর স্বভাব চরিত্র, স্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের দিকে ততটা লক্ষ্য করেন না, যতটা লক্ষ্য রাখেন পণের টাকা ও দানসামগ্রীর দিকে। অনেক কন্যার পিতা বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করতে না পেরে দিনরাত অশান্তির আগুনে জ্বলছেন, আবার অনেক কন্যার পিতা কন্যাকে পাত্রস্থা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। যেখানে মেয়েরা শিক্ষিতা এবং মাতাপিতা বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের বিয়ে দিতে পারছেন না, ভরণপোষণেও অসমর্থ, সেরূপ ক্ষেত্রে অনেক মেয়ে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে বের হয়। অনেকে চাকরি পায়, আবার অনেকে শত চেষ্টা করেও চাকরি জুটাতে পারে না। তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে ঐরূপ মেয়েরা পাপের পথ বেছে নেয়। পতিতালয়ে যে শত শত যুবতীদের দেখা যায়, তারা তো ইচ্ছা করে এই পথ বেছে নেয়নি। কিছুদিন পূর্ব্বে কোলকাতার একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেখা গিয়েছে যে শেয়ালদা ষ্টেশনে উদ্বাস্তু মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা চলেছে। যদি উদ্বাস্তু মেয়েদের তাদের দরিদ্র পিতারা বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে বিয়ে দিতে পারতো, তবে উক্ত মেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্যে এইরূপ ঘৃণিত পথ বেছে নিতে হতো না। যতদিন সমাজ থেকে পণপ্রথা উচ্ছেদ না হবে, ততদিন দরিদ্র মাতাপিতাদের পক্ষে তাদের মেয়েদের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে মেয়েরা দলে দলে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে বের হবে, কেউ পথের সন্ধান পাবে, আর যারা ভাল ভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাবে না, তাদের অনেকে কুপথে আয় করতে বাধ্য হবে।

বেশী দিন আগেকার ঘটনা নয়। আমার এক বন্ধু অল্প কয়েকদিনের জন্যে কোলকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় আসে। একদিন সন্ধ্যার সময় সে চৌরঙ্গী এলাকায় ঘুরে ঘুরে কোলকাতা নগরীর দৃশ্য দেখতে থাকে। এমন সময়ে হঠাৎ এক অপরিচিতা যুবতী তাকে চোখের ইসারায় ডাকে, যুবতীটির বয়স ২২।২৩ বছর হবে মনে হয়, চেহারা সুন্দর, দেখলে ভদ্র পরিবারের মেয়েই "মনে হয়, এই ভাবে পূর্বে কোন যুবতী আমার বন্ধুকে ডাকেনি, তাই সে ঐ অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে কৌতূহলবশতঃ চলতে থাকে, পথ চলতে চলতে যুবতীটি প্রথম নানা গল্প করে, মিনিট কয়েক গল্পের পর সে আমার বন্ধুকে এক গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়ার এবং সেখানে দশ টাকার বিনিময়ে দেহদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। বন্ধু চরিত্রবান যুবক এবং সে যুবতীটিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার হুমকি দিলে সে (যুবতীটি) ভয় পায়

এবং অনুরোধ করে যেন পুলিশ না ডাকে, এর পর আমার বন্ধু যুবতীটিকে কুবাসনা ব্যক্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তার বাবা তাকে বিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু ছেলের বাপের ক্ষুধা মিটাতে না পেরে তাকে শেষে টাইপ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেয়, টাইপ শেখার পর সে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্তে কোলকাতা এসে, চাকরির জন্তে অনেক চেষ্টা করেছে, দু'এক জায়গায় ঘুষও দিয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। ইতিমধ্যে বাপ চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করে এবং ছোট ভাইটি একটি সামান্ত বেতনে চাকরি পায়, সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত থাকায় তার বাবা তাকে বিয়ে দিতে পারলো না এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্তে বের হয়ে চাকরিও পেলো না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে এই হীন ব্যবসা সুরু করতে হয়েছে। বন্ধু তার ঠিকানাটি জানতে চাইলো, কিন্তু যুবতীটি লজ্জায় ঠিকানা দিলো না। কথা বলতে বলতে দু'জনেই আবার চৌরঙ্গীতে আসিল, সেখানে বন্ধুর কাছ থেকে যুবতীটি বিদায় নেওয়ার সময় দুঃখ করে বললো, "জীবনে বহু আশা ছিল অন্যান্য নারীদের মত স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসার গড়ব, কিন্তু সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় মনে করলাম টাইপ শিখে চাকরি করব, চাকরি-জীবনে হলেও বিনা পণে জীবন সাথী খুঁজে পাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সেই আশাও পূর্ণ হলো না। ফলে স্বামিপুত্র পরিবৃত একটি সুখনীড়ের যে স্বপ্ন এতদিন দেখে আসছি, তা স্বপ্নই রয়ে গেল, বাস্তবে আর পরিণত হলো না, এখন অন্য উপায় না দেখে বিবেকের বিরুদ্ধে এইরূপ জঘন্যতম কাজ করে যাচ্ছি। স্বামী পুত্র নিয়ে কোন্ নারী রাস্তায় চলতে দেখলে যেন জ্বলে পুড়ে মরি, মনে করি তাদের জীবনই সার্থক ও সুখের, তারা একজনের মনোরঞ্জন করে কেমন সুখে ও শান্তিতে আছে, নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে, তারা তার অধিকারিণী, যৌবনে স্বামী তাদের রক্ষা করছে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র তাদের ভরণপোষণ করবে। আর আমি কোথায় নেমে গিয়েছি, প্রত্যহ কয়েকজন অচেনা পুরুষকে আকর্ষণ করে নিজের কাছে টেনে আনা এবং তাদের কুপ্রবৃত্তি মেটাবার সুবিধে দিয়ে অর্থোপার্জ্জন করা। বার্দ্ধক্যে তো ইহা আর সম্ভব হবে না, তখন আমার কি উপায় হবে ভেবে দেখুন।" মনের আবেগে এই সমস্ত বলতে বলতে তার চোখে জল আসে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, বাধা মানে না। মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "আধুনিকা কি সত্যিই স্বাধীন" প্রবন্ধটির এক জায়গায় আছে স্বামিপুত্র পরিবৃত একটি সুখনীড়ের স্বপ্ন হাতছানি দেয় তাকে (নারীকে) বারে বারে। এই কথাটি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, উক্ত অচেনা যুবতীটির কাহিনী থেকে বুঝা যায়। উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্রও নারী ও পুরুষদের সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, সেগুলোও যে সত্য, তা বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে কষ্ট হবে না আশা করি। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নেই, তা বলা চলে না। তবে সেরূপ ঘটনা বিরল। ইতি—শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য, খারিক জঙ্গল রোড, পো: ভদ্রকালী, জেলা হুগলী।

গ্রাহক গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৬ মাসের জন্ত ৭'৫০ পাঠালাম। কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে নিয়মিত বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন।—Nilima Banerjee, Marwar, (Rajasthan).

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। আমরা বসুমতীর জন্য কত উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করি, তাহা হয়ত আপনারা ধারণা করিতে পারিবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য্য, কোদারমা।

Herewith sending my renewal subscription from Kartick.—Mrs. Amola Mukherjee, Darbhanga.

আগামী এক বৎসরের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—কল্যাণী রায়চৌধুরী, কানপুর।

I have to remit herewith Rs. 15/- being the annual subscription for Monthly Basumati. Kindly arrange for its regular supply.—Govt. Sub-Divisional Library, Seraikela (Singhbhum).

মাসিক বসুমতীর আগামী ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম। নিয়মিত সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Bina Ghosh, Parel, Bombay-12.

A sum of Rs. 15/- being the subscription up to next Aswin is sent herewith.—Deohall Indian Club, Assam.

৭'৫০ নয়া পয়সা ৬ মাসের চাঁদা হিসাবে পাঠালাম। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পাঠাবেন।—শ্রীমতী মিনতি বসু, সম্বলপুর।

এই বছরের কার্ত্তিক থেকে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা ৭'৫০ ন: প: পাঠালাম। মাসিক বসুমতীর উত্তরোত্তর প্রসার কামনা করি।—Bina Dutta, Balasore.

পরবর্ত্তী ছয় মাসের (কার্ত্তিক—চৈত্র) মাসিক বসুমতীর চাঁদা অগ্রিম পাঠাইলাম।—উমা ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা।

Remitting Rs. 15/- for the annual subscription commencing from Agrahayan 1367.—Behar Fire-bricks & Potteries Ltd., Dhanbad.

আগামী বৎসরের অগ্রিম ১৫৲ টাকা মাসিক বসুমতীর জন্ত পাঠাইলাম।—Mrs. Kamala Basu, Colaba, Bombay.

আশ্বিন সংখ্যায় গ্রাহিকা মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে। ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩৬৭ হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—নমিতা সিংহ, পাটনা।

Kindly renew on behalf of the Scottish Church College Library the subscription to the Monthly Basumati for the volume of 1961.—Scottish Church College Library, Calcutta.

আগামী ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইতেছি। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Aparna Sanyal, Hazaribagh.

১৩৬৭ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মোট ছয় সংখ্যা মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ৭৷০ পাঠাইলাম।—Mrs. Purnima Sarker, Jabalpur, M.P.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ ন: প: পাঠালাম (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত)।—Roma Roy, Bombay.

পথের ক্লান্তি

(জলরঙ)

—শ্রীপঞ্চানন রায় অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৯শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৭ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

একজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এসে বলছেন,—

"মা, মাঝে মাঝে প্রাণে এত অশান্তি আসে কেন? কেন সর্ব্বক্ষণ আপনার চিন্তা নিয়ে থাকতে পারি না? পাঁচটা বাজে চিন্তা কেন এসে পড়ে? মা, ছোটখাটো অনেক জিনিষ চাইলেই পাওয়া যায়, পেয়েও এসেছি, আপনাকে কি কোন দিনই পাব না? মা কিসে শান্তি পাব,—বলে দিন, আপনার কৃপা কি কখনও পাব না? আজকাল দর্শন-টর্শনও বড় একটা হয় না। আপনাকেই যদি না পেলুম, তবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? শরীরটা গেলেই ভাল।"

মা—"সে কি বাছা, ও কথা কি ভাবতে আছে? দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ্ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মালমসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে, কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়লো, কোন দিন বা নাই পড়লো, তাই বলে বসা ছেড়ো না।' জপ বাড়িয়ে দাও।"

যোগীনমা—"হ্যাঁ, নাম ব্রহ্ম। প্রথম প্রথম মন একাগ্র না হলেও, হবে নিশ্চয়।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "কত সংখ্যা জপ করবো আপনি বলে দিন মা, তবে যদি মনে একাগ্রতা আসে।"

মা—"আচ্ছা, রোজ দশ হাজার করো, দশ হাজার—বিশ হাজার যা পার।"

সন্ন্যাসী—"মা, একদিন সেখানে ঠাকুরঘরে পড়ে কাঁদছি, এমন সময় দেখলুম—আপনি মাথার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুই কি চাস?' আমি বললুম, 'মা, আমি আপনার কৃপা চাই, যেমন সুরথকে করেছিলেন। আবার বললুম, না মা, সেত দুর্গারূপে, আমি সেরূপে চাই না, এই রূপে।' আপনি একটু হেসে চলে গেলেন। মন তখন আরও ব্যাকুল হল, কিছুই ভাল লাগে না; মনে হল—যখন তাঁকে লাভ করতে পারলুম না, তখন আর আছি কেন?"

মা—"কেন, ঐ যেটুকু পেয়েছ তাই ধরে থাক না কেন? মনে ভাববে—আর কেউ না থাক্, আমার একজন 'মা' আছেন। ঠাকুর যে বলে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষ দিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

সন্ন্যাসী—"যেখানে ছিলুম, তিনি খুব ভক্ত-গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রী এক বড় লোকের কন্যা, খুব খরচ করেন। মাছ খাবার জন্যে আমাকে বড় অনুরোধ করেন। আমি খাই না।"

মা—"মাছ খাবে। খাবার ভিতর আছে কি? মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাকে বেশী বাজে খরচ করতে বারণ করবে। ভক্ত গৃহস্থের টাকা থাকলে সাধুদের কত উপকারে লাগে। তাদের টাকাতেই ত সাধুরা বর্ষাকালে একস্থানে বসে চাতুর্ম্মাস্য করতে পারে। তখন ত সাধুদের ভ্রমণ করে ভিক্ষা করবার সুবিধা হয় না।"

সন্ন্যাসীটি প্রণাম করে নীচে গেলেন। —শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

হনুমানের পাণ্ডিত্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র কর

মহাবীর হনুমান্ অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ... যোদ্ধা, নয়কুশল সচিব ও সুশীল মিত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। এই গুণাবলীর জন্য তিনি যুগে যুগে জগতের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বেদে, দর্শনে, বিশেষতঃ ব্যাকরণে তাঁহার যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা সকলের সুগোচর নহে।

সুগ্রীব যখন মলয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মত্ত-মাতঙ্গবিলাসগামী শরচাপধারী রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দণ্ডকারণ্যে আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার নিমিত্ত চররূপে হনুমানকে প্রেরণ করেন। হনুমান্ ভিক্ষুবেশে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বানররাজ সুগ্রীব তাঁহার সখ্য কামনা করেন। কিষ্কিন্ধ্যার কপিরাজদূত উত্তর-কোশলের রাজকুমারগণের সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাতে আলাপ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত ও বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন :—

"সচিবোঽয়ং কপীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব কাঙ্ক্ষমাণস্য মমান্তিকমিহাগতঃ॥
ত্বমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং বাক্যকোবিদং স্নেহযুক্তমরিন্দমম্॥
নানৃগ্বেদ বিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদ ধারিণঃ।
নাসাম বেদ বিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥
ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্ব্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ॥
অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্।
উরস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যমস্বরম্॥
সংস্কারক্রম সম্পন্নাম্ অদ্রুতামবিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্॥
অনয়া শ্লক্ষ্ণয়া বাচা ত্রিস্থান ব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি॥"

লক্ষ্মণ, আমি যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম ইনি সেই কপিরাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সচিব। ইনি বাক্য-বাগীশ, সুধী, স্নেহশীল ও শত্রুঞ্জয়। তুমি ইঁহার সহিত আলাপ কর। যিনি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, যিনি যজুর্ব্বেদের অর্থ অবগত নহেন, সামবেদে যাঁহার ব্যুৎপত্তি নাই, তিনি কদাপি এরূপভাবে কথা বলিতে সমর্থ হইতেন না। নিশ্চয়ই ইনি সমগ্র ব্যাকরণ বহুধাশ্রবণ করিয়াছেন, কেন না যদিও ইনি বহু বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তথাপি কোন শব্দের অপব্যবহার করেন নাই। বাক্যালাপকালে ইঁহার মুখে চক্ষুতে ললাটে ভ্রুযুগলে কিংবা অন্য সকল স্থানে কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই। ইঁহার অবিস্তর, অর্থসন্দেহরহিত অস্খলিত ও শ্রোতার শ্রবণসুখকর বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত বাক্য মধ্যমস্বর। ইঁহার অদ্রুত অবিলম্বিত কল্যাণময় বচন সংস্কারজননে ও হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ। উরঃ কণ্ঠ ও শিরঃ এই তিনস্থানে অভিব্যক্ত ইঁহার মধুর বচন কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে, উদ্যত-খড়্গ শত্রুও ইঁহার বাক্যে বিমোহিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র "সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।" শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ববিদ্যা ও ষড়ঙ্গবেদ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যখন হনুমানের পাণ্ডিত্য ও ব্যাকরণজ্ঞানের এইরূপ অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়াছেন, তখন সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

যখন অঙ্গদ প্রমুখ কপিবীরগণ শত-যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়া সীতার বার্ত্তা আনিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিল, তখন জাম্ববান্ বানর-বাহিনীকে বিষণ্ণ লক্ষ্য করিয়া "বীর বানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদাংবর" বলিয়া হনুমান্‌কে বহুমান পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং জানকীর অন্বেষণে পাঠাইলেন। হনুমান্ যে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সকলের সুবিদিত ছিল।

মহর্ষি বাল্মীকি উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গে হনুমানের শৌর্য্য, পাণ্ডিত্য ও ব্যাকরণজ্ঞানের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

"পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপসৌশীল্যমাধুর্য্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্য-চাতুর্য্য-সুবীর্য্যধৈর্য্যৈ র্হনুমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে॥
অসৌ পুন র্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্ সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম গ্রন্থং মহদ্ধারয়ন্নপ্রমেয়ঃ॥
সসূত্র বৃত্ত্যর্থং পদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
নহ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে বৈশারদে ছান্দোগতৌ তথৈব॥
সর্ব্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে প্রস্পর্দ্ধতে হ্যয়ং গুরুং সুরানাম্।
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য লোকান্ দিধিক্ষোরিব পাবকস্য॥
লোকক্ষয়েষ্বিব যথান্তকস্য হনুমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ।"

যুদ্ধে পরাক্রম ও উৎসাহ, অর্থনির্দ্ধারণে বুদ্ধি, সুশীলতা, প্রভাব, বচনে মাধুর্য্য, নয়ানয়-পরিজ্ঞানে কুশলতা, বিপদে অক্ষোভ, চতুরতা, স্বরক্ষণে পরপরাভব—এই সমুদায় গুণে ত্রিলোকে কে হনুমানের সদৃশ আছে? অপ্রমেয় কপীন্দ্র সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত ব্যাকরণ মহাগ্রন্থ ধারণ করিয়া অর্থ অবধারণের নিমিত্ত সূর্য্যের অনুগমন করিতেন। অষ্টাধ্যায়িলক্ষণ পাণিনীয় সূত্রে, তাৎকালিক সূত্র বৃত্তিতে সূত্রার্থবোধক অর্থপদবৎ বার্ত্তিকে, পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে এবং তাণ্ডিকৃত সংগ্রহে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্রে পূর্ব্বোত্তর মীমাংসামুখে বেদার্থ নির্ণয়ে এবং পাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাতে, তপঃ আচরণে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতিকেও স্পর্দ্ধা করিতেন। তিনি প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় ত্রিলোক প্লাবনে, কালানলের মত বিশ্বদহনে এবং যমের সদৃশ ত্রিভুবননাশে সমর্থ।

মহর্ষির এই অপরূপ বর্ণনা হইতে হনুমানের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ।

ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ্বর, শাকল্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, আপিশলি ও পাণিনির মত নবম ব্যাকরণ-কর্ত্তা বলিয়াও হনুমানের চিরপ্রসিদ্ধি আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

১

উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার যোগ দীর্ঘ দিনের। পুরাতন প্রীতির স্মৃতি-চিহ্ন এখনও লুকোনো রয়েছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নামের পিছনে। জাতিতে জাতিতে যোগ হয়েছে শিথিল, ভাষায় ভাষায় নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ঘটেছে বিচ্ছেদ...কিন্তু ঐতিহাসিকেরা জানেন, এ বিচ্ছেদের মধ্যেও সম্পূর্ণ বিভেদ ঘটেনি। রাজনীতির কারণ, সংস্কৃতির কারণ, এ বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছে। উড়িষ্যা তোলো বাংলার ধার-ঘেঁসা দেশ, তার ওপর পূর্ব্বমাগধীর এই দুইটি বংশধর—বাংলা ও ওড়িয়া, ঘনিষ্ঠ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। এ প্রীতির বন্ধন শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন ক'রে একদিন অত্যন্ত দৃঢ় হ'য়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব ভাবধারা এবং ব্রজবুলী ভাষার অনুসরণে বাঙ্গালী ও উড়িয়া সহযোগী হ'য়ে উঠেছিল। তাই নূতন ভারতের রাজধানী কেবল কোলকাতা হ'ল না, শাসনসূত্রে ইংরাজের কাছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একই অঞ্চল হয়ে গেল। মাতার স্নেহাঞ্চলে সব শিশু সমান বড় হ'তে পারে কিন্তু শাসনাঞ্চলের ফলে ,কালকাতা একটু বেশী রকম বেড়ে উঠেছিল। রাজধানী কোলকাতা নবসংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। আর নবসংস্কৃতির অমৃত আস্বাদনের জন্য, কলেজাদিতে শিক্ষার জন্য উড়িষ্যা হ'তে কোলকাতায় চলছিল "অবনা-গবনা"। আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যখন ইংরেজী গুরুপ্রসাদী লাভ করে হঠাৎ বড় হ'য়ে উঠল তখন বাংলাকে স্বাভাবিক ভাবেই আদর্শ ক'রে প্রাগ্রসরণের প্রয়াসে আধুনিক উড়িয়ার পদযাত্রা সুরু হল।

বাংলার আসর তখন গরম। সাহিত্যে নূতন জিনিষের আমদানি ...নূতন ভাব, নূতন ভাষা ও ছন্দের হৈ হৈ। আমরা তখন চুটিয়ে নভেল লিখছি, নূতন ধরণের নাটক লিখছি, গদ্যে প্রবন্ধ লিখছি, ছোট গল্প লিখছি। কবিতায় নূতন ভাব আমদানি করছি...লিরিক কবিতার সুরু, এপিকের জোয়ার। ব্ল্যাঙ্কভার্স, সনেটের আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। আর বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য এমন সাহিত্যিক আমরা পেলাম মধুসূদন-বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথে যাঁরা কেবল বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের গৌরব, গর্ব্ব, আদর্শ। এই পটভূমিকায় বাংলা দেশের আদর্শ অনিবার্য্য ভাবে অনুসৃত হ'ল উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলি সাহিত্যে—তার মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্য অন্যতম। বাংলা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধাদিকে একটু অদল বদল ক'রে উড়িয়াতে মৌলিক রচনা বলে চালান হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত উড়িয়া সাহিত্যিক—আধুনিক উড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম—কীর্ত্তিস্তম্ভ কবিবর রাধানাথ রায় একটি পত্রের মধ্যে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট করে লিখেছেন—

"মহাশয়,

পুরাতন বাংলা পুস্তক কিম্বা মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ নেই তাহাকু অনুবাদ ও ঈষৎ রূপান্তরিত করি উৎকলীয় সাধারণ সমক্ষরে মৌলিক প্রবন্ধ বোলি উপস্থাপিত করিবার সুকৌশলরে ... কথিত ওড়িয়া লেখক সিদ্ধহস্ত দেখা যান্তি।" —রাধানাথ গ্রন্থাবলী।

কিন্তু তথা-কথিত ওড়িয়া লেখকেরা কেবল নন, আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অনেকেই তখন এই কাজ করছেন। সেগুলি মৌলিক বলে পরিচিত...আসলে তার মূল বাংলা দেশের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভূমির অবস্তরে। তার সত্য পরিচয় আমরা বিস্মৃত হয়েছি ...আর তার সত্য পরিচয়ে হিন্দী সাহিত্যের অনেকে বিস্মিত ও বিব্রত হবেন। ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিকী করণের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন রাও মধুসূদন—ফকির মোহন—রাধানাথ রায়। রাও মধুসূদন বাংলার দত্ত-কুলোদ্ভব মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত। আবার বাংলার ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর ব্রাহ্মসঙ্গীত গুলির সংগ্রহ "সঙ্গীত মালা"র ভূমিকাতে তিনি জানিয়েছেন যে, 'সঙ্গীত মালা'র সমস্ত সঙ্গীত উড়িয়া ও বাংলা রাগিণীতে রচিত।

কবি—ছোটগল্প লেখক—ঔপন্যাসিক—আত্মচরিতকার ফকির মোহন সেনাপতি (১৮৪৩—১৯১৮) বাংলার নব জাগ্রত আধুনিক সাহিত্যের নিকট গভীর ভাবে ঋণী। তাঁর উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির সুস্পষ্ট অনুসরণ। কোনও কোনও মৌলিক ছোট গল্প বাংলা কোনও কোনও রচনার অনুল্লিখিত রূপান্তর (যেমন ফকির মোহনের "গল্প সল্প" গ্রন্থের "পেটেণ্ট মেডিসিন" গল্পটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অপূর্ব নাটিকা "নিদিধ্যাসন"-এর গল্প রূপান্তর মাত্র)। ফকির মোহনের অপূর্ব্ব "আত্মচরিত" গ্রন্থ ভারতীয় আত্মজীবনীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতেও দুর্ভিক্ষ বর্ণনার সময় ফকির মোহন 'আনন্দ মঠে'র পদচিহ্ন গ্রামের দুর্ভিক্ষ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রে—

"আশ্বিন কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল।...লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়?...গোরু বেচিল, লাঙ্গল-যোয়াল বেচিল, বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল।...খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল।"

—আনন্দ মঠ।

আর ফকিরমোহন লিখেছেন—

"কার্ত্তিক মাস আরম্ভরু লোকে অত্যন্ত নিরাশ হোই পড়িলে।... ধান গাছ গুড়িক শুখি কুটাপরি হোই গলাণি।...দুআর দুআর বুলি বুলি ভিক মাগুথান্তি! কাহা ঘরে চাউল অছি যে ভিক দেব?...চাষী-লোক অবস্থানুসারে প্রথমে কংসা পিত্তল, গোরু গাই, সুনা রুপা যাহা ঘরে যাহা থিলা বিকি বিকি মাঘ ফাগুণ যাএঁ দন্ত কামুড়ি ঘরে পড়ি রহিলে।...তেন্তুলি গছরে কঅঁলিআ পাত্র বাহারিবারু গোটাএ গোটাএ গছরে দশকোড়িএ জন লেখাএঁ চঢ়ি মাক্কড় পরি পত্র সবু খুঁটি খুঁটি খাউথান্তি।"

—(উৎকলর ভীষণ দুর্ভিক্ষ : আত্মচরিত : ফকিরমোহন)

অবশ্য ফকিরমোহন এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের বাস্তব দৃশ্য দেখেছিলেন এবং Famine Commissionএর Reportও পড়েছিলেন মনে করা স্বাভাবিক। তাই এ রচনাটির অংশবিশেষ অনুবাদ বলতে পারি না···তবে 'আনন্দমঠ'-এর পরবর্ত্তী "আত্মচরিত"-এ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুসরণ ঘটেছে মনে করা যেতে পারে।

আধুনিক ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ, 'মহাকাব্য' রচনার ক্ষেত্রে ও কাব্য-ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকাব্য রচনায় যেখানে মধুসূদনের ছায়ানুসারী হেম-নবীন অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেছেন, সেখানে রাধানাথ রায় মধুসূদনের ছায়ানুসরণ ক'রে অর্জ্জন করেছেন অপূর্ব্ব সাফল্য। রাধানাথ রায়ের তিনপুরুষ আগেকার পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালী। তাঁরা উড়িষ্যাতে বসবাস করছিলেন পুরুষানুক্রমে, সুতরাং ওড়িয়া। তাহ'লেও তিনি কোলকাতাতে এসেছেন, বাঙ্গালার কলেজে পড়েছেন, বাংলাদেশে ইস্কুলমাষ্টারী করেছেন, বাংলাতে "কবিতাবলী", "লেখাবলী" লিখেও ফেলেছিলেন, বন্ধুত্বও তাঁর বাংলার লেখকগোষ্ঠীর, নবীনচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে। তাঁর রচনাতে মুগ্ধ হ'য়ে "এডুকেশন গেজেট" (১৮৭১ খৃঃ অঃ, ২৩শে মে) লিখেছিল, "রাধানাথ উড়িষ্যার গৌরব কেতন।" নবীনচন্দ্র সেনও লিখেছিলেন :—

> "বস সখে, প্রীতি-অশ্রু করহ গ্রহণ,
> এস সখে, উড়িষ্যার গৌরব-কেতন।"

রাধানাথ মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্ত্তিত চতুর্দ্দশ অক্ষর পংক্তির অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং এপিকের ধারা সার্থকভাবে উড়িষ্যাতে প্রবর্ত্তন করেন। এঁর 'মহাযাত্রা' মহাকাব্যের সঙ্গে "মেঘনাদবধ" কাব্যের সংযোগ কিরূপ ঘনিষ্ঠ, তা প্রদর্শনের জন্ম নিচে কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

> "পঙ্কজবাসিনি দেবি, উৎকল-ভারতি
> সারিলে, কি কলে, কহ কুরুচূড়ামণি
> শুনিলে যে কালে বীর বার্ত্তাহর মুখে
> প্রভাসে যাদবকুর জ্ঞাতিক্ষয়কারী
> মহাহব··· (প্রথম সর্গ)

মহাযাত্রার উদ্ধৃত কাব্যারম্ভের সঙ্গে "মেঘনাদ বধ" কাব্যারম্ভের সম্বন্ধ কিরূপ, তা 'মেঘনাদবধ' পাঠকদের নিশ্চয়ই স্পষ্ট ক'রে দেখাতে হবে না। আর শুধু কাব্যারম্ভেই নহে অভ্যন্তরেও অনেক ক্ষেত্রে শাব্দিক সাদৃশ্য পর্য্যন্ত লক্ষ্যণীয়। যেমন "মহাযাত্রা"র সপ্তম সর্গে রাধানাথ লিখেছেন :—

> "ফিটিলা সহসা
> ইন্দ্রধনু তোরা দিল্লী তোরণ অগ্রতে
> বজ্রনাদে, সিংহনাদে কম্পাই মেদিনী
> বাহারিলে দলে দলে সে তোরণ মুখু
> অসংখ্য পদাতি, সাদি, আধোরণ, রথী— ইত্যাদি।

(ফিটিলা = খুলিল ; তোরা = মনোহর ; বজ্রনাদে = অশনিনিনাদে ; বাহারিলে = বাহিরিল)।

মধুসূদন "মেঘনাদবধ" কাব্যের নবম সর্গে লিখেছেন :—

> খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি নিনাদে,
> বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণ দণ্ড করে,
> কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
> ··· ··· ···
> পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
> বাজীরাজী সহ গজ ; রথিবৃন্দ রথে
> মৃদুগতি,—"

কবি রাধানাথ রায়ের উপর মধুসূদনের প্রভাব গভীর প্রসারী হয়েছিল। কেবল যে তিনি চতুর্দ্দশ অক্ষরপংক্তিক অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, তা নয় (উপরের উদাহরণ দেখুন), তাঁর মিত্রাক্ষরের খণ্ড কবিতাতেও মধুসূদনের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাধানাথ রায়ের "পার্ব্বতী" [কবিতাটিতে পিতা কন্যাগমন করছেন ইত্যাদি নানা ব্যাপারের জন্ম আমি মাসিক বসুমতী পত্রিকায়, বৈশাখ, ১৩৬৬ "ইণ্টার মিডিয়েট-এ অশ্লীল পাঠ্যপুস্তক" নামে একটি সমালোচনা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে "পার্ব্বতী"র স্থলে দেওয়া যেতে পারে ইণ্টার ছাত্রছাত্রাদের জন্ম আর একটি কবিতা নির্ব্বাচিত করতে অনুরোধ করেন।] কবিতাটিতে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন—

> "ম্রিয়মাণা আহা অম্বুরাশি তলে
> কিংবা বিম্বাধরা রমা।"

পড়তে পড়তে মধুসূদনের "কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে" মনে পড়বে। অথবা মনে পড়বে মধুসূদনের—

> বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
> কাতর প্রবাহ, ঢালে তার অতিক্রমি
> বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
> দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

যখন রাধানাথের "পার্ব্বতী" নিম্নলিখিত অংশ পড়া হবে :—

> দেবি গো, প্রাবৃটে তটিনী যেমনে
> ন পারে বারি সম্ভালি,
> অসম্ভালে হুহুঁ পূর প্রবাহকু
> বেনি কূলে দিএ ঢালি
> দুঃখী সেহি পরি, হৃদে যেবে তার
> বলি পড়ে হৃদ ব্যথা,
> সম দুঃখি জনে হৃদয় ফিটাই
> কহে নিজ-দুঃখ কথা।

এ আলোচনা হ'তে একটি জিনিষ পাঠকদের কাছে স্পষ্ট ক'রে তুলতে চাইছিলাম যে, প্রাক্ রবীন্দ্র যুগে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল। আর ওড়িয়ার ক্ষেত্রে বাংলাকে আদর্শ ক'রে সাহিত্যিক আধুনিকীকরণ কি ভাবে চলছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ওড়িয়া সাহিত্যে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্ম কি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল।

২

সুপ্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের বিস্ময়। বাংলার সীমার মধ্যে সাহিত্যের অসীমতাকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

কালিদাসের পর সমগ্র ভারতব্যাপী কাব্যসাধনার ফলশ্রুতি হলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ আজকের বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর আড়ম্বর যতই চোখ ঝলসানো হোক, কবিগুরুর বিশ্ব কবি স্বীকৃতির পূর্ব্বে লগনে সারা বাংলা দেশই তাঁকে শিরোধার্য্য ক'রে নিতে পারেনি। কিন্তু সবাই না পারলেও অনেকেই পেরেছিল···একটা অনুগামী কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশে। আর বিশ্বকবি স্বীকৃতির (১৯১৩) পূর্ব্বেই বাংলাদেশেই কবিগুরুর যে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা স্বীকৃত হয়েছিল তা নয়, দেশ-বিদেশেও হয়েছিল। তাই ত দেখি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের রবি দত্ত তাঁর Echoes from East and West-এ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করেছেন। ইংরাজী সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক Walter Raleigh ও ১৯১১এর সঙ্কলিত প্রবন্ধগুচ্ছ "Some Authors"-এ কবিদের প্রসঙ্গে "Jewelled ecstasies of Rabindranath Tagore" স্মরণ করেছেন। হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট পত্রিকা "সরস্বতী" পত্রিকার মাধ্যমে কবিগুরুর ধারাপ্রবাহ হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তেই অনুবাদের বা অনুসরণের রূপ ধারণ করেছে। ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের আদর্শানুসরণ হয়েছে।

ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিক পর্য্যায়ের কথা বলা যাক। রামশঙ্কর রায় ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নাট্যরচনায় অগ্রসর হন কটকে একটি বাংলা নাটকের অভিনয় দেখে।··অল্প বয়সে তিনি কবিতার ক্ষেত্রেও পাদচারণা সুরু করেছিলেন। তাঁর অল্প বয়সের কবিতা "প্রেমতরী" (১৮৭৮)··রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের কবিতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় তাঁর Modern Oriya Literature গ্রন্থে (১০৭ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন :—

Ramshankar also tried his hand very early at pure poetry, and his 'Prem-tari' (1878), a 'Gatha' or ballad, has been written in the vein of Rabindranath Tagore some of whose poems had then been published; the story was based on the topic of Goldsmith s 'Hermit ....'

"প্রেমতরী"র কাহিনী-অংশের জন্য রামশঙ্কর রায় মহাশয় গোল্ডস্মিথের কাছে ঋণী হলেও কাব্যরূপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারীদের তিনি অন্যতম··আর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তখনকার বয়স মনে রাখলে বহির্বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম পর্ব্বের প্রধান রবীন্দ্রানুসারীদের মধ্যে আদি কবি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি স্বীকৃতি মিলল ১৯১৩ সালে। আর যাঁরা এতদিন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করছিলেন, যাঁরা এতদিন বিরুদ্ধবাদীদের কাছে হীনযানী ছিলেন, হঠাৎ মহাযানী হয়ে উঠলেন তাঁরা। যাঁরা "সাহিত্য" আর সমাজকে একসঙ্গে পরিচালিত করার সমাজপতিত্ব করছিলেন তাঁরাও সেই গোলযোগে গলাযোগ করলেন। সমগ্রভারতে সাড়া পড়ে গেল, উত্তর হ'তে দক্ষিণে, পূব হ'তে পশ্চিমে রবীন্দ্রানুসরণের ধারাপ্রবাহ দেখা দিল। [আমার প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য" দ্রষ্টব্য] বাংলাদেশের সবুজপত্র গোষ্ঠী এলেন এগিয়ে··তারই প্রতিধ্বনি দেখা দিল ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে। সেখানে দেখা দিল "সবুজ সাহিত্য সমিতি"। কটক-এর বাঙ্গালী ওড়িয়া সাহিত্যিক আর বঙ্গপ্রেমী ওড়িয়া সাহিত্যিক বঙ্গ-কলিঙ্গের মিলন ঘটালেন এই সবুজের গানে। এই সবুজ-সাহিত্য সমিতির মধ্যে নূতন জীবন চেতনা দেখা দিল। তাঁরা রবীন্দ্র প্রমথের ডাকে আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে চাইলেন। ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে 'সবুজ-সাহিত্য' দল সৃষ্টি করল বিস্ময়, সৃষ্টি করল তীব্র নিন্দা প্রশংসা। Contemporary Indian Literature গ্রন্থে "ওড়িয়া সাহিত্য" প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীমায়াধর মানসিংহ যা লিখেছেন এই 'সবুজ সাহিত্য' গোষ্ঠী সম্বন্ধে তা নিম্নে উদ্ধৃত হল (Contemporary Indian Literature edited by Dr. Nagendra : Published by Sahitya Akademi p p. 172-173).

"With the Satyabadi group thus out of the picture, a group of undergraduates at Cuttack came out with some new Literary haberdashery with Bengal trademarks. At that time Tagore was at the peak of his fame and prosperity. It is true that his influence is irrestible, but these youngmen let themselves be swept off their feet with the heady Tagore-wine. Nor did they bring anything really valuable from that great storehouse of wisdom and poetry that is Tagore. They only tried to imitate a few of his sensational non-essential externals such as the rhyme schemes, the apparent lack of logic and consistency and a little obscurantism that we sometimes meet in Tagore's poetry. They styled themselves as 'Sabujas' or 'Greens' imitating the same nomenclature which Tagore and Pramatha Chowdhury had coined and publicised in Bengal at one time as a counterblast to the old and the orthodox in Bengal Society. And like the Bengali 'Sabujapatra' they too had a mouthpiece of their own in 'Yuga Bina' (The Lyre of the Times).

The group was a sensation in Orissa's literary world for about five or six years on account of the novel waves they served, although everybody knew that they were imported stuff without roots in the soil of Orissa. They set up their own publishing firm also. But the group vanished as suddenly as it had risen. The Greens required only a short time to turn yellow. The only writer of the whole group who is still active in Orissa is now busy with text books. Annadasankar Ray had soon changed

over to Bengali. Baikuntha's fiery muse of those days has now deteriorated into production of doggerels.

The Greens, nevertheless, left a deep influence on the younger generations for at least two decades. They made, the Tagore rhyme-schemes stay in Oriya literature, along with the indigenous ones. Many poems of Annadasankar Ray and Baikunthanath Patnaik written in those early days are accepted by all critics as welcome additions to the treasure-house of Oriya literature. In these poems we indeed enter a new world of magic in word music, of new visions of love and beauty and life, and of new imageries, apart from new-fangled rhythmic expressions which sounded strange and outlandish to the ears of the cultured Oriyas attuned to the poetic rhythms of the long line of Poets from Sarala Das to Gangadhar Meher and Nilkantha Das and others whose creations were indigenous products of the soil, true to the idiom of the language and the soul of the people.

The novel, BASANTI, collectively written by the group was once a sensation and had some influence on young novelists coming up soon after. Kalindicharan Panigrahi's novel 'Matir Manisha' (Man of the Soil) written in the hey-day of the group and many of his stories have been widely and deservedly popular..."

—(Oriya Literature : Mayadhar Mansinha)

উল্লিখিত সমালোচনায় সবুজ গোষ্ঠীর পক্ষে বিপক্ষে যে নিন্দা-প্রশংসার বান ডেকে গিয়েছিল তারই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বলা হয়েছে যে, কবিগুরুর কাব্যমদিরাতে বিভ্রান্ত এই সবুজের দল 'really valuable' কিছু আমদানি করেননি, রবীন্দ্রনাথের নিকট হ'তে। তার পরেই সমালোচক বলেছেন, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিকদের উপর এই সবুজেরা কিন্তু গভীর প্রভাব বিস্তৃত করেছিলেন। আর ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে চিরন্তন ক'রে রেখে গেছেন। আর সবুজের মৌলিক কবির মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায় আর বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক চিরকালের দান রেখে গেছেন ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কবি-ঔপন্যাসিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এই গোষ্ঠীর মধ্য হ'তে ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন।

এই সবুজ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা যাক। সবুজ সাহিত্য-সমিতির মধ্যে যাঁরা ওড়িয়া সাহিত্যকে আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবাসী বাঙ্গালী অন্নদাশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র মুখার্জি, শান্তি মুখার্জি, শ্যামাচরণ মুখার্জি, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিশ্চন্দ্র বড়াল। আর নিজ বাসভূম থেকে যাঁরা ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রানুসরণের ধারা-জলে স্নান করতে চেয়েছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহী, হরিহর মহাপাত্র, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, দিব্যসিংহ পাণিগ্রাহী, সচ্চিদানন্দ রাউত-রায়, মায়াধর মানসিংহ, চিন্তামণি মহান্তি প্রভৃতি। এঁরা সকলেই সবুজ সাহিত্য সমিতির মধ্যে কবিতা বা গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। "উৎকল সাহিত্য"-এর বিশ্বনাথ কর এঁদের উৎসাহ আর সহযোগিতা কম দেননি। 'সবুজ সাহিত্য সমিতি'র "সবুজ কবিতা" পঞ্চপুষ্পের ডালি। এতে পাঁচজন কবির লেখা স্থান পেয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়, হরিহর মহাপাত্র, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শরৎচন্দ্র মুখার্জি, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী—এই পাঁচজন কবি। এঁরা "সবুজ"-এর জয়গান করেছিলেন "দেশর সবুজপ্রাণ তরুণ-তরুণীর" প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্য। আর সে সাড়া যে জেগেছিল, পূর্ব্বে উদ্ধৃত ইংরাজিতে সমালোচনার মধ্যে শ্রীমায়াধর মানসিংহ তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার ক'রেছেন।

সবুজ কবিতার সংকলন গ্রন্থটি বিচার করা যাক। এই গ্রন্থটি ("সবুজ কবিতা") এই ভাবে সাজান :—

লেখকের নাম	গুচ্ছ নাম	কবিতাগুলির নাম
(ক) অন্নদাশঙ্কর রায়	চিহ্ন	[প্রলয় প্রেরণা, সৃজন স্বপ্ন, মানসী ও মুঁ ইত্যাদি]
(খ) হরিহর মহাপাত্র	ইঙ্গিত	[থাম যাত্রা, ভগ্ন বীণা, মুঁ ইত্যাদি]
(গ) বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক	প্রভাতী	[আরম্ভ গীত ; যৌবন পূজা ; প্রভাত স্বপ্ন ইত্যাদি]
(ঘ) শরৎচন্দ্র মুখার্জি	স্বপ্ন	[অভিসারিকা ; কবি বন্ধু-প্রতি ইত্যাদি]
(ঙ) কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	মুকুল	[লোহিত ব্যথা ; মধু বিবাহ ; ফগুণ বাঁশী ইত্যাদি]

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্নদাশঙ্কর সর্ব্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশে তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার ও কথাসাহিত্যিক ; উড়িয়া সাহিত্যে তিনি প্রথমতঃ কবি···এবং সে কবিতার মূল্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত "ওড়িয়া সাহিত্যের রত্নকোষে নবসংগৃহীত বহুমূল্য সামগ্রী"।

আজন্ম রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ। ধূলি ধূসর পৃথিবী হ'তে তিনি পলায়ন করেন স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে তাঁর পূর্ব্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ার অন্বেষণে। যাত্রা তাঁর সুদূরে। কোথাও তাঁর হারিয়ে যাবার মানা নেই, কেননা তিনি চঞ্চল, তিনি সুদূরের পিয়াসী। বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী তিনি শুনেছেন। কিন্তু বেদনা-জর্জ্জর পৃথিবী হ'তে পলায়ন ক'রেও কবি মাঝে মাঝে ফিরতে চেয়েছেন এ-দুঃখের জগতে —'কল্পনার' 'বর্ষশেষ' কবিতায়। এই পৃথিবীর মূঢ়··ম্লান··মূক মুখের মধ্যে ভাষা ধ্বনিত করতে চেয়েছেন, 'এবার ফিরাও মোরে' বলে তিনি গান ধরেছেন "চিত্রাতে"। "বলাকা"তেও পৃথিবীর যত পাপ যত মিথ্যা যত মোহ যত প্রবঞ্চনা দূরীভূত ক'রে বীরের সাধনাক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভিলাই সৃষ্টির শেষকথা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েত ও ভারতের মানুষের বন্ধুত্ব ও একতা এবং ভারতের নানা জাতি-উপজাতির কর্মীদের সহযোগিতা ও সহকারিতার মূর্ত্ত প্রতীক এই ভিলাই কারখানার গোড়াপত্তন আরম্ভ হয় বান্দুং সম্মেলনের শুভ বৎসরে এবং বান্দুং সম্মেলনের ঘোষণা করা পঞ্চশীলের ভিত্তির উপরেই ভিলাই কারখানার প্রতিষ্ঠা।

গেল বছর আমি যখন ভিলাই কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম, তার কয়েক মাস আগে কারখানার প্রথম বাত্যাতাড়িত চুল্লীতে লোহার চৌপল উৎপাদন আরম্ভ হয় (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯)। আমি গিয়েছিলাম সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। তারপর ১২ই অক্টোবর প্রথম ইস্পাত চুল্লী থেকে গলিত ইস্পাত বার হয়ে আসে। তারপর বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে। ভিলাই কারখানা আজ উৎপাদন-কৌশলের আধুনিকতা, উৎপাদিকা শক্তি, নিরুপদ্রব উৎপাদন এবং যন্ত্রকৌশলের তালিমা শিক্ষার দিক থেকে ভারতের সেরা কারখানা।

এবার আমি ভিলাই গিয়েছিলাম ভিলাই নির্মাণের শেষ অধ্যায় দেখব বলে। এক জোড়া করে কোক ব্যাটারি ও বাত্যাতাড়িত চুল্লী আজ পুরোদমে চালু। তৃতীয় কোক ব্যাটারী ও বাত্যাতাড়িত চুল্লী কাজের জন্যে প্রস্তুত। খনিজ কাঁচা লোহা ও কয়লার অভাব থাকায় তাদের ইন্ধন জোগানো সম্ভব হচ্ছিল না। ভিলাইএর জোগানদার লৌহখনি রয়েছে মধ্যপ্রদেশের রাজহারা পাহাড়ের গায়ে, কয়লার খনি রয়েছে কর্বায় এবং চুণে পাথরের খনি আছে নন্দিনীতে। এগুলি থেকে এতদিন শ্রমিকরা কায়ক্লেশে ধাতু, কয়লা ও পাথর কেটে তুলত। কিন্তু তাতে ভিলাইএর তিনটি চুল্লীর পেট ভরানো যেতনা। তাই সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এই সব খনি যন্ত্রচালিত করার পরিকল্পনা করেন। গত ৩১শে অক্টোবর রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম যন্ত্রীকৃত রাজহারা লৌহখনির উদ্বোধন করেন। নন্দিনীর চুণে পাথরের খনির যন্ত্রীকরণও হয়ে গিয়েছে। কর্বার কয়লাখনিতেও যন্ত্রের আবির্ভাব হচ্ছে। রাজহারার মত এত বড় যন্ত্রচালিত লৌহখনি এশিয়ায় আর নেই এবং ভারতে এই ধরণের খনি এই প্রথম। রাজহারা থেকে রেলগাড়িতে দৈনিক ১০০০ টন কাঁচা লোহা ভিলাই কারখানাকে খাদ্য জোগাবে। তার মানে বছরে ২৫ লক্ষ টনের মত এবং ভিলাইএর ৩টি বাত্যাতাড়িত চুল্লীর জন্যে বছরে ২৫ লক্ষ টনই দরকার। কিন্তু পরে ভিলাই কারখানা সম্প্রসারিত হয়ে তার উৎপাদনের পরিমাপ যখন ২৫ লক্ষ টন দাঁড়াবে তখন রাজহারা খনিরও সম্প্রসারণ করার দরকার হবে যাতে সেখানে থেকে বছরে ৫০ লক্ষ টন কাঁচা লোহা পাওয়া যায়। আর কর্বা এবং অন্যান্য কয়লাখনি যন্ত্রচালিত করার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতসরকার বাংলার দুর্গাপুরে কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের এক কারখানা তৈরি করছেন সোভিয়েতের শেষতম ৬০ কোটি টাকা ঋণ থেকে এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে। সেই সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে রাঁচিতে একটি ভারি যন্ত্রপাতি নির্মাণের অর্থাৎ কারখানা তৈরি করার কারখানার যা প্রতি বছর একটি করে ভিলাইএর মত বিরাট কারখানা নির্মাণ করার যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদন করতে পারবে। এগুলি তৈরি হয়ে গেলে মূল যন্ত্রপাতির জন্যে ভারতকে আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

ভিলাইএর ২টি রোলিং মিল এবং বাত্যাতাড়িত চুল্লী আমাদের দেশের বাজারে আজ বিলেট ও চৌপল লোহা সরবরাহ করার দিক থেকে সকলের সেরা—এই কথা বলেছেন ভিলাই কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব। শুধু তাই নয়। আমাদের দেশের প্রায় ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে লোহা সরবরাহ করেও ভিলাই কারখানা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে এমনকি জাপান ও ব্রিটেনকে চৌপল লোহা ও বিলেট বিক্রী করে বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করেছে।

"রেল অ্যাণ্ড স্ট্রাকচারাল মিলের" উদ্‌ঘাটনরত শ্রীনেহরু

অথচ এক সময়ে এই ব্রিটেন ছাড়া ভারতের লোহার জিনিষ পাবার কোন উপায় ছিলনা। এক ইনজিনিয়ার একবার কোন এক দেশে মন্তব্য করেছিলেন: ক্যালিফোর্নিয়ার কী আছে যা ইরাকের নেই? রোদ? জল? তেল? এসব তো দুটি দেশেই আছে অফুরন্ত। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা এত সচ্ছল কেন এবং ইরাকীদের অবস্থা তাদের ইডেন-উদ্যানবাসী পূর্বপুরুষদের চেয়ে এত খারাপ কেন? একই প্রশ্ন করা যায় ভারত ও বৃটেন সম্পর্কে। কিন্তু চাকা আজ ঘুরে গিয়েছে উল্টো দিকে, যেমন ভারতের ক্ষেত্রে তেমনি ইরাকের ক্ষেত্রে। ভারতের বিরাট জাতীয় শক্তি আজ জেগে উঠে ঘুরিয়ে দিয়েছে সেই চাকা এবং তার সেই পবিত্র সংগ্রামে সহায়তা করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভিলাই-এ তৈরি লোহা ও ইস্পাতের দৌলতে এরই মধ্যে আমরা ২০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক বিনিময় সঞ্চয় করেছি। রাজহারার কাঁচা লোহা ভিলাইএর চুল্লীতে পুড়ে যে ইস্পাত হয়ে বার হবে, তাই থেকে তৈরি হবে প্রতিবছর ১১০০০০ টন রেলের লাইন, ৯০ হাজার টন "স্লিপার", রেল ইন্‌জিনের বিভিন্ন অংশ, কড়ি বরগা, সেলাইএর কল এবং আরো হরেক রকমের শিল্পজাত সামগ্রী। পণ্ডিত নেহেরু অকটোবর মাসে ভিলাইএর যে আধ মাইল লম্বা "রেল অ্যাণ্ড ষ্ট্রাক্‌চারাল মিল" উদ্‌ঘাটন করলেন, সেটি আমাদের রেলের লাইন, স্লিপার ইত্যাদির অভাব দূর করতে অনেকখানি সাহায্য করবে। অন্য সব জিনিষ তৈরি হবে "মার্চ্যাণ্ট মিলে"। এইসব মিলের বেশির ভাগ কাজই স্বয়ংচালিত। রেল অ্যাণ্ড ষ্ট্রাক্‌চারাল মিলের উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে বাৎসরিক ৩৬৫০০০ টন। মিলের ১১৫২টি মোটর মিলে ৯৫০০০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। মিলটি নির্মাণ করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৬০০০ টন ইস্পাতের কাঠাম ও ১১০০০ টন সাজসরঞ্জাম আমদানী করতে হয়েছে। মার্চ্যাণ্ট মিলটি চালু হবে আগামী জানুয়ারি মাসে তৃতীয় কোক ব্যাটারি ও বাত্যাতাড়িত চুল্লী ও ৬টি ইস্পাত চুল্লীর বাকি দুটি চুল্লীর সঙ্গে সঙ্গে। এই হলেই মূল পরিকল্পনা অনুসারে ভিলাই কারখানা লক্ষ্যোত্তীর্ণ হবে। সেই পূর্ণাবয়ব কারখানা থেকে প্রতি বছর ৭৭০০০০ টন লৌহজাত সামগ্রী বাজারে ছাড়া যাবে।

ভিলাই কারখানার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যান্ত্রিক গোলযোগের কথা কেউ সেখানে কোনদিন শোনেনি। সোভিয়েতের মানুষ তাদের সেরা জিনিষ ভিলাইএ পাঠিয়েছে এবং জটিল যন্ত্রপাতির কোন রহস্যই তারা ভারতীয়দের কাছে গোপন রাখেনি। কাজে কাজেই ভারতীয়রা সেখানে সব কিছু ঠিকমত চালাতে পারে। ভিলাইএর ব্লুমিং মিল স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক কর্মকৌশলের দিক থেকে সারা দুনিয়ায় অদ্বিতীয়।

ভিলাইএর কারিগরী বিদ্যালয়ে আজকাল প্রধানত: ভারতীয় শিক্ষকেরাই ক্লাস নিয়ে থাকেন, এটাও সোভিয়েত সাহায্যের কম কৃতিত্ব নয়।

ভিলাই কারখানার মধ্যে যন্ত্রপাতির সংস্কার ও সমস্ত রকমের বাড়তি যন্ত্রাংশ নির্মাণ করার জন্যে ওয়ার্কশপ খাড়া করা হয়েছে। ফলে কোন কলকব্জা ভেঙ্গে গেলে আর বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। ভিলাই এমন এক পূর্ণাবয়ব মহাশিল্পায়তন যার ব্যবহার ও উপযোগিতা বহুমুখী। কাঁচা লোহা থেকে আরম্ভ করে তৈরি লোহার জিনিষ নামিয়ে দেওয়া ছাড়াও ভিলাই কারখানা ভারতে খনি-শিল্পের যন্ত্রীকরণের যুগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছে, আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, ন্যাপথ্যালেন, বেন্‌জল ইত্যাদি উপজাত রাসায়নিক দ্রব্য এবং সিমেণ্ট, গ্যাস, এমন কি কৃষির জন্য রাসায়নিক সার পর্যন্ত উৎপাদন করছে। এ পর্যন্ত ভিলাই থেকে ১৪ কোটি টাকা মূল্যের এই সব জিনিষ বাজারে গিয়েছে।

ভিলাই কারখানার এই বহুমুখী রূপের মধ্যে নিহিত রয়েছে সোভিয়েত সাহায্যের এক বিশেষ তাৎপর্য। ভারত এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশের পশ্চাৎপদ উৎপাদনের উপায় উপকরণের অভাব। তাই তাদের যদি বৈদেশিক শোষণ ও দয়াদাক্ষিণ্য থেকে মুক্তি পেতে হয়, তাহলে তাদের জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে আধুনিক উৎপাদনশিল্প গড়ে তুলতে হবে যার ভিত্তি হবে উৎপাদনের উপায় উপকরণ শিল্প। সেইভাবে শিল্প প্রসার করতে পারলে তাদের মুক্তি এবং তখনই তারা জাতীয় মূলধন সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করবে। এই লক্ষ্য উত্তীর্ণ হবার পথে যে সাহায্য সবচেয়ে মূল্যবান তা হচ্ছে কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে মূলধন ঋণ দেওয়া।

সোভিয়েতের কাছ থেকে আমরা ঠিক এইরকম সাহায্যই পাচ্ছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটা মুনাফার দিকে দৃষ্টি রেখে কাউকে মূলধন ঋণ দেয় না, স্বদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। প্রখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জন বার্নাল বলছেন:—

সোভিয়েত সাহায্যের লক্ষ্য হচ্ছে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের অর্থনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ন্যূনতম মূলধনের সাহায্যে অধিকতম শিল্পোৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করা। দেশগুলি নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে দেশবাসী ও দেশজ কাঁচামালের সাহায্যে শিল্পপ্রসার করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দায়িত্ব হচ্ছে, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রবিদ্যা দিয়ে তাদের ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করা, যখন তারা নিজেরাই ঐসব যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এই নীতি অনুসারে আজ ৪০০ জন রুশ ইঞ্জিনীয়ার ভারতীয় যুবকর্মীদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে ঘরমুখো হয়েছেন এবং কারখানাটিকে বছরে ২৫ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ করার দায়িত্ব প্রধানত: ভারতীয় কর্মীরাই গ্রহণ করবেন।

নতুন ভারতের নবীনতম জনপদ ভিলাইএ সংলগ্ন হয়ে দেশের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে সারা ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকে আসা নওজোয়ানের দল। ভিলাই ভারতের শুধু নবীনতম শিল্প-নগরই নয়, যুব নাগরিকদের সংখ্যার দিক থেকেও ভিলাই সম্ভবত: ভারতে অদ্বিতীয়।

ভিলাই যৌবনে পা দিয়েছে। এ সহরের পিছনে কোন অতীতের ইতিকথা প্রচ্ছন্ন নেই, নেই কোন মধ্যযুগীয় দুর্গ বা প্রাসাদ। ঝকঝকে তকতকে একতলা ও দুতলা বাসগৃহের সমারোহ। অজস্র আলো আর বাতাস। "সবুজ ফুসফুসে"র অবাধ শ্বাসপ্রশ্বাস। স্কুল, হোটেল, দোকান-পাট, হাসপাতাল, এমনকি একটি সিনেমা পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

গোধূলির ছায়া নেমে আসে ভিলাই নগরের মাথায়। সর্পিল কালো পিচের রাস্তার ওপর সারিবন্দী বিজলী বাতির ঝিকিমিকি। ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার এই তীর্থক্ষেত্র থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সমাগত। মনে হোল, যে যুবকেরা এই ইস্পাত নগরী নির্মাণের প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করার সময় এখানে এসে বাসা বেঁধেছিল, তারা সবাই সেই নির্মাণের ইতিহাসে একটি করে পৃষ্ঠা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রচনা করেছে। কোন বাধা অসুবিধাকে তারা আমল দেয়নি, কারণ ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন তাদের সে সব বাধাবিপত্তি ভুলিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই কষ্ট তাদের সার্থক। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে শিখেছে তারা।

প্রাচীন চীনের ধর্ম্মমত

শ্রীগণেশদাস মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন চীনের ধর্ম্মমত যথাক্রমে তিনটি :—'তাও' (Tao) ধর্ম্মমত, কংকুসিয়স্ মত (Confuciasism) ও বৌদ্ধ মত। এই 'তাও' ধর্ম্মমত মহাপুরুষ 'লাও-ৎ-সে' কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। এই মহাপুরুষ খৃ: পূ: ৬০৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম-গ্রহণের সময় ইঁহার কেশ শুভ্র ছিল বলিয়া ইহাকে "বৃদ্ধ দার্শনিক" (old philosopher) বলে। কথিত আছে ইনি ৭২ বৎসর মাতৃগর্ভে বাস করিয়া বৃদ্ধবয়সে প্রসূত হন। জন্মের সময় ইঁহার কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। ইনি 'চাও' সম্রাটদিগের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া 'হিয়েন-চুর' অরণ্যে বাস করিতেন। এখানে তিনিসেই গিরিপথের রক্ষী 'চোয়ান্-ঈন্' কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া 'তাও-তে-চিং' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ নাকি দুইখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং উহাতে পাঁচ হাজার বাক্য ছিল। এখন এই গ্রন্থে পাঁচ হাজারের অধিক বাক্য আছে। এই মহাপুরুষের জীবনী চৈনিক ইতিহাসবেত্তা 'সে-মা-চিয়েন্' খৃ: পূ: ৮৫ অব্দে রচনা করেন।

এই মহাপুরুষ লাও-ৎ-সে ও তাঁহার জীবনচরিত-লেখক চিয়েনের সময়ের ব্যবধানে 'তাও' ধর্ম্মের বহুগ্রন্থ রচিত হয়; তন্মধ্যে 'চোয়াংসে'-এর গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি খৃ: পূ: ৪র্থ শতাব্দীর লোক ছিলেন। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে মাত্র ৩৩ খানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। এই সকল গ্রন্থে বহু কাহিনী আছে কিন্তু উহা ঐতিহাসিক বলিয়া মনে হয় না। খ: পূ: ৫১৭ অব্দে মহাপুরুষ লাও-ৎ-সে এর সহিত মহাপুরুষ কংকুসিয়স্-এর সাক্ষাৎ হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহা সম্ভব হইতে পারে, কারণ এই দুই মহাপুরুষ সমসাময়িক। 'চোয়াং-চ্যাং-সে'-এর রচিত 'সাই-উ' গ্রন্থ মতে পীত-সম্রাট 'হায়াং-তি' আচার্য্য 'চোয়াং-চ্যাং-সে' এর নিকট 'তাও' ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য গমন করেন। এই আচার্য্য তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে বলেন ও সম্রাট বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে তখন ইনি উক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন। যদি ইহা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্য 'চোয়াং-সে' খৃ: পূ: ২৭ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রমাণিত হন ও 'তাও' ধর্ম্মমত বহু পুরাতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই কাহিনীর কোন ভিত্তি না পাওয়াতে 'তাও' ধর্ম্মমতকে আমরা মহাপুরুষ 'লাওৎ-সে'-এর প্রচারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। এই 'তাও' ধর্ম মত বড়ই আশ্চর্য্য ও রহস্যময়। এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় "তাও" কি তাহা 'তাও-তে-চিং' গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—"সেই তাও যাহা দলিত করা যায় তাহা অব্যয় ও শাশ্বত 'তাও' নয়। সেই নাম যাহার দ্বারা ইহার নাম করা যায় তাহা সেই অব্যয় ও শাশ্বত নয়। ইহার নাম যদিও নাই তথাপি ইহা হইতে আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে। যদি ইহার কোন নাম আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে ইহাকে "সব বস্তুর জননী" বলা যাইতে পারে।" (অনুবাদ মৎকৃত) ইহা হইতে জানিতে পারা গেল যে, 'তাও' অর্থে ঈশ্বর—এই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। 'তাও-তে-চিং' গ্রন্থের অর্থ 'তাও লাভের উপায়'। (অনুবাদ মৎকৃত) সে জন্য 'তাও' কি কি করিলেন তাহা আচার্য্য চোয়াং-চ্যাং-সে এর গ্রন্থ 'থিয়েন-তি-তে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"প্রথম প্রারম্ভে এই বিশ্বে কিছুই ছিল না। সমস্তই শূন্যময় ছিল। এই সময় একতির অস্তিত্বের উদ্ভব হয়। যদিও ইহার অস্তিত্ব ছিল কিন্তু কোন অবয়ব ছিল না। ইহা হইতে সমস্ত বস্তুর উদ্ভব হয়। এই নিরাবয়ব বস্তু বিভক্ত হইল ও অনিরুদ্ধ গতিতে অগ্রসর হইয়া সর্ব্ব বস্তুকে গুণযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করেন। যখন সব বস্তু নির্ম্মিত হইতে লাগিল তখন প্রত্যেক বস্তুকে স্বতন্ত্ররূপ দেওয়া হইল। সেই অবয়ব হইল শরীর, ইহার মধ্যে রহিল আত্মা; এই দেহ ও আত্মাযুক্ত বস্তু বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইল।" (অনুবাদ মৎকৃত) 'তাও' ধর্ম্মমতে ইহাই হইল সৃষ্টি, এইরূপে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হইল এবং এই সমস্তের নিয়ন্তা হইলেন—'তাও'। এই যে সৃষ্টির কথা বলা হইল, ইহা প্রকৃত সৃষ্টি নয়, ইহা ক্রম-বিকাশ বা Evolution. এই যে 'তাও', ইহার আদি কোথায় বা কিরূপে কার্য্য আরম্ভ হইল, ইহা মহাপুরুষ লাও-ৎ-সে অথবা আচার্য্য চোয়াং-সে কিছুই বলেন নাই। এই 'তাও' অনাদি ও স্বতঃক্রিয়াশীল। সেই নাস্তিত্বের সময় সহসা ইহার আবির্ভাব এবং তখন হইতে ইহার সৃষ্টিকার্য্য ইত্যাদি সমস্ত অভাবনীয়। লাও-ৎ-সে এর মতে 'তি' অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ব্বেও 'তাও' বর্ত্তমান ছিলেন। এই 'তাও' এবং 'তি' কতকটা হিন্দু দর্শনের 'পরব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর' এর মত। এর তত্ত্বের আদি ও শাশ্বত অবস্থার নাম 'পরব্রহ্ম' যাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহা পরবর্ত্তী অবস্থায় 'ঈশ্বর'। এখন দেখা গেল, মহাপুরুষ লাও-ৎ-সে 'তাও' বলিতে পরতত্ত্বের শাশ্বত অবস্থা ও 'তি' তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন।

'তাও' ধর্ম্মমতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। কেহ কাহারও উপর নির্ভরশীল নয়, উভয়ই স্বতন্ত্র। 'তাও-তে-চিং' গ্রন্থের মতে জীবন দুই নাস্তিত্বের মধ্যাবস্থা। 'মানুষ জগতে আসে ও জীবিত থাকে। পুনর্ব্বার প্রবেশ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' (তাও-তে-চিং ৫০ অ: অনুবাদ মৎকৃত) 'ইয়াং-সাং-চু গ্রন্থে আছে—'যখন আচার্য্য জগতে আসেন, তখন উপযুক্ত সময় ছিল; যখন প্রস্থান করেন, তাহা আগমনের ফল অর্থাৎ আসিলেই যাইতে হইবে। যখন যাহা সময়মত হয়, তাহা নীরবে মানিয়া লইলে দুঃখ বা উল্লাস হইতে পারে না। প্রাচীনগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবনকে 'তি' অর্থাৎ ঈশ্বর যে রজ্জুতে দোলায়মান রাখিয়াছেন, তাহার ছেদনের নাম মৃত্যু। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু অগ্নি অন্যত্র গমন করে এবং আমরা জানিতে পারি না, কিভাবে উহার শেষ হইল।' (অনুবাদ মৎকৃত) এখন তাও-ধর্ম্মমতে কাষ্ঠ হইল শরীর ও অগ্নি হইল আত্মা। যেমন কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়, সেরূপ মৃত্যুতে শরীর নষ্ট হয়। যেমন কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ হইলে অগ্নি অন্য কাষ্ঠখণ্ডকে দগ্ধ করে, সেইরূপ এক দেহের অবসান হইলে আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে। ইহাই হইল হিন্দুমতে 'জন্মান্তরবাদ।' 'চি-লো' গ্রন্থে আছে—"যখন 'চোয়াং-সে'-এর স্ত্রীর মৃত্যু হইল, তখন 'হুই-সে' তাঁহাকে সমবেদনা জানাইতে গিয়া দেখেন যে, তিনি "বরফের পাত্রে মৃতদেহ রাখিয়া মনের আনন্দে পাত্রটিকে বাজাইয়া গান করিতেছেন। হুই-সে তাঁহাকে বলিলেন যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত

বসবাস করিয়া পুত্রাদি প্রসব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে যদি পরলোকগমন করে, তাহার জন্য অবশ্য বিশেষ শোক করিবার নাই ; তবে এরূপ গীতবাদ্য করা বড়ই অদ্ভুত। চোয়াং-সে বলিলেন, ইহা তাহা নয়। যখন স্ত্রীর মৃত্যু হইল, তখন কি আমার ইহাতে শোক হয় নাই ? কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর জন্মের অবস্থা চিন্তা করিলাম। যখন জন্ম হয় নাই, তখন প্রাণ ত ছিল না, শরীরও ছিল না ; শুধু শরীর নয়, শ্বাস-প্রশ্বাসও ছিল না। সেই তমোময়ী নাস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্ত্তন সুরু হইল। প্রথম হইল শ্বাস, তৎপরে হইল জন্ম এবং জীবন। পরে আবার পরিবর্ত্তন হইয়া মৃত্যু আসিল। এইসব পরিবর্ত্তন হয় যেমন চার ঋতুর পরিবর্ত্তন—বসন্ত হইতে শরৎ, শরৎ হইতে গ্রীষ্ম।" (অনুবাদ মৎকৃত) তাও ধর্ম্মমতে মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র। উক্ত গ্রন্থে আছে "জীবন ও মৃত্যু যেমন দিবা ও রাত্র" [অনুবাদ মৎকৃত]

তাও ধর্ম্মমতে তিনটি বস্তু স্বতন্ত্র যথা আত্মা, মন ও শরীর। আত্মা পবিত্রতা চায় কিন্তু মন এই ইচ্ছা পূরণ করিতে দেয় না। মনকে তিন প্রকার গরল বিপথে লইয়া যায়। এই ত্রিবিধ গরল হইল লোভ, ক্রোধ ও অজ্ঞান। এই ত্রিবিধ গরল হইতে মুক্ত হইতে হইলে মানবকে এই ত্রিবিধ গরলকে সম্যক জানিতে পারা চাই। যখন মানব এই তিন প্রকার গরলকে সম্যকরূপে জানিতে পারিয়া ইহাকে বর্জন করে তখন নাকি জগৎ শূন্যবৎ মনে হয়। এই শূন্যের চিন্তা করিতে করিতে মানব পবিত্র সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন শরীর ও মন উভয়েরই কার্য্য লুপ্ত হয়। বাসনা ক্ষয় করিতে পারিলে সেই তুরীয় অবস্থা লাভ হয়। এই নিষ্ক্রিয়ভাব যখন চিরস্থায়ী হয় তখন মানবের সমস্ত জাগতিক বস্তু আয়ত্তাধীন হয়। সেই অবস্থায় পবিত্রতা ও শান্তি শাশ্বত হয়। এই অবস্থার অধিকারী 'তাও'র ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হিন্দু দর্শনের মতে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখং অস্তি।' এই তাও ভাবপ্রাপ্ত মানব কখনও ইহার প্রকাশ করে না। তাও ভাব না পাওয়ার কারণ ইহা যে মন উন্মার্গগামী থাকে ও আত্মাকে বিক্ষিপ্ত করে ও বাহ্যিক বস্তুতে নিবিষ্ট রাখে। এই বাহ্যিক বস্তুর আকর্ষণের ফলে লোভ হয়। এই লোভ হইতে মোহ ও ক্রোধের জন্ম হয়। ইহাতে কিন্তু বিভ্রম জন্মে। ইহার ফলে মানব দুর্গতি ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করে। সেই তাও সত্য ও শাশ্বত। যে উহাকে জানিতে পারে, সে তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় আত্মা শাশ্বত পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করে। ইহা 'চিং-চ্যাং-চিং' গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

'তাও' ধর্ম্মমতে পাঁচটি রিপু আছে এবং এই রিপু পাঁচটি মানুষের মনে অবস্থিত আছে। যদি কেহ এই পাঁচটি রিপুকে স্ববশে আনিয়া উত্তমভাবে নিয়োজিত করিতে পারে, সে সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হইতে পারে। আকাশের পবিত্র ভাব মানুষের ভিতর রহিয়াছে এবং মানব মন শক্তির উৎস। যখন পবিত্র ভাব মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মানুষ সেই ভাবের দ্বারা চালিত হয়। মানুষের স্বভাব শান্ত ও স্থির। শরীরের স্বভাব চঞ্চল ও গতিশীল। তাও মতে দেহ নবদ্বারযুক্ত। এই নবদ্বার হইল—চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ূ ও উপস্থ। এই নবদ্বারের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ ও মুখ প্রধান। ইহাদের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই নবদ্বার রক্ষা না করিতে পারিলে ইহারা নিজে ধ্বংস হইবে ও শরীর মন উভয়ের দুর্গতির কারণ হইবে।

তাও ধর্ম্মমতে আকাশ, পৃথিবী ও মানব—এই তিনশক্তি বিদ্যমান। যখন এই তিনশক্তি ঠিকভাবে চালিত হয় তখন সব সমভাবে চলিতে থাকে নতুবা এই তিনটির অনৈসর্গিকতার ফলে সব ধ্বংস হয়।

"উ—সু—চিং" গ্রন্থের মতে তাও লাভের প্রথম উপায় সহৃদয়তা এবং সেই জ্ঞান নীরবে থাকিয়া সঞ্চিত করিতে হয়। এই জ্ঞান বিনীতভাবের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। এই সহৃদয়তাকে প্রথম নির্বুদ্ধিতা বলিয়া মনে হয়। এই নীরব অবস্থায় থাকা কথা কহিবার মত কঠিন এবং এই বিনয়ের ভাবকে অপটুতার ন্যায় মনে হয় কিন্তু সে জ্ঞানলাভ করার পর সমস্ত দেহ স্মৃতিলোপ পায়।" [অনুবাদ মৎকৃত] ইহা হইতে জানা যায় যে, তাও ধর্ম্মমতে জ্ঞান লাভের তিনটি উপায়ের এক উপায় বিনয়। মহাত্মা লাও—ৎ—সে তাঁহার 'তাও—তে—চিং' গ্রন্থে জলের সহিত বিনয়ের উপমা দিয়াছেন। 'জল সকলের উপকার করে ইহাই তাহার মহত্ত্ব কিন্তু নির্ব্বিবাদে সর্ব্বলোকের অনাদৃত নিম্নস্থানে বাস করে। অতএব ইহার পন্থা 'তাও'র অতি নিকটবর্ত্তী, পৃথিবীতে জলের মত কোমল ও দুর্ব্বল কিছুই নাই অথচ ইহা অপেক্ষা ভীষণ ধ্বংসকারী কিছুই নাই"। (তাও—তে—চিং অনুবাদ মৎকৃত) 'তাও' লাভের তিনটি উপায়কে তিনটি রত্ন বলা হইয়াছে যথা বিনয়, সদ্ব্যয় ও নিষ্কিঞ্চনতা। 'বিনয় সাহস বৃদ্ধি করে, সদ্ব্যয় দ্বারা উদারতা বৃদ্ধি পায় ও নিষ্কিঞ্চনতার দ্বারা শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ হয়।' (তাও—তে—চিং অনুবাদ মৎকৃত) এই লইল 'তাও' নীতির মূলতত্ত্ব। "কর্ম্ম কর কিন্তু কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিও না, বিষয়ের ব্যবস্থা কর কিন্তু তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, ভোজন করিও, আস্বাদের লোভ করিও না। যাহা ক্ষুদ্র তাহাকে মহৎ ভাবিও এবং কেহ যদি অনিষ্ট করে, তাহার প্রতিদানে দয়াশীল হইও" (তাও—তে—চিং অনুবাদ মৎকৃত)

এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মতে 'ত্রিরত্ন' আছে, যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। বৌদ্ধমতে ইহাকে 'ত্রিশরণ'ও বলা হয়। তবে বৌদ্ধধর্ম্মমতে এই যে 'ত্রিরত্ন', উহা ধর্ম্মের অংগ ও 'তাও' মতে ত্রিরত্ন সাধারণ নৈতিক নিয়মাবলী।

'তাও' ধর্ম্ম অহিংসাত্মক। 'তাও-তে-চিং' গ্রন্থে আছে—অস্ত্রশস্ত্র যতই সুন্দর হউক না কেন, উহারা অমঙ্গলকর ও সকলের নিকট ঘৃণ্য বস্তু। অতএব যাঁহারা 'তাও' জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা হইতে দূরে থাকেন। মহাপুরুষ বামহস্তকে অন্য সময়ে সম্মানার্হ মনে করেন কিন্তু যুদ্ধের সময় দক্ষিণহস্তকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ অমঙ্গলদায়ক এবং মহাপুরুষের ব্যবহার্য্য নয়, কেবল বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। শান্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই শ্রেয়ঃ। অস্ত্রবলে বিজয় কখনও ঈপ্সিত নয়।' (অনুবাদ মৎকৃত)

'তাও' ধর্ম্মের অপর অংগ নিষ্ক্রিয়তা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার নিন্দা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই নিষ্ক্রিয়তা হইতেছে বৈরাগ্য বা বিষয়ে অনাসক্তি। 'তে-চুং-ফু' গ্রন্থে আছে—'হুই-সে' আচার্য্য 'চায়াং-সে'-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষ বাসনা ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে কি ? আচার্য্য চোয়াং-সে উত্তর দিলেন—'হাঁ, সম্ভব। প্রশ্ন হইল,—তবে তাহাদিগকে মানুষ কি করিয়া বলা যায় যাহাদের বাসনা নাই ? আচার্য্য বলিলেন 'সে তাও'র অপরোক্ষানুভূতিতে তাওত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ তাহাকে মানবস্বরূপ দান করে। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল'

—ইহা কি সম্ভব ? আচার্য্য বলিলেন'—তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ মানুষ কোন বিষয় পছন্দ করুক বা না করুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সে তাহার নিজের পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু ঐহিক কোন বস্তুর বৃদ্ধি করে না। যদি ঐহিক কোন বস্তুর বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে দৈহিক কোন কিছু বৃদ্ধি হয় না। আত্মার উন্নতি সাধন কর ও সব বিষয় তাহারই অনুকূল কর' (অনুবাদ মৎকৃত)। পূর্ণজ্ঞানীর লক্ষণ 'তা-চুং-সী' গ্রন্থে বর্ণিত আছে—'প্রাচীনকালে জ্ঞানীর জীবনের প্রতি ভালবাসা বা মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা ছিল। জন্মের সময় তাহার আনন্দও নাই বা মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টাও নাই, জীবনের যে কোন অবস্থায় আনন্দিত থাকেন। তাঁহাদের মৃত্যুভয় নাই বা জন্মান্তরের ভয় নাই। তাঁহারা 'তাও'-র গতিরোধ করেন না। এইভাবে চিন্তামুক্ত হইয়া ইহারা শান্ত ও নিরুদ্বিগ্নভাবে অবস্থান করেন।' (অনুবাদ মৎকৃত) 'তাও' ধর্ম্মমতে অদৃষ্ট সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করে। জন্ম মৃত্যু সমস্ত অদৃষ্টাধীন। তাও ধর্ম্মমতে মৃত্যু পরিবর্ত্তন মাত্র। 'মৃত্যু যেন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গমন. (তাও-তে-চিং)।

তাও ধর্ম্মমতে আট প্রকার আনন্দভোগ বর্জ্জন করা চাই—(১) সুন্দর দ্রব্য দর্শনের আনন্দ, (২) সুস্বর শ্রবণের আনন্দ, (৩) উপকারের আনন্দ, (৪) সংকর্ম্মের আনন্দ, (৫) যজ্ঞাদি কর্ম্মের আনন্দ, (৬) সংগীতের আনন্দ, (৭) সং হইবার আনন্দ, (৮) জ্ঞানলাভের আনন্দ। "মানুষ যদি তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী চলে তবে এই আট প্রকার আনন্দ থাকুক বা না থাকুক তাহাতে তাহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। যদি মানব সেরূপভাবে না চলে তবে এই আট প্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে যাইয়া পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে" ('সাই-উ' গ্রন্থ হইতে)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা হইতে অর্থ করিয়াছেন যে, তাও ধর্ম্ম জ্ঞানার্জ্জনের বিরোধী এবং মানুষকে আদিম অবস্থায় থাকিতে বলে। ইহার উত্তর এই যে, আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে মন বহির্মুখী হয় ও তাহাই নিন্দার্হ। জ্ঞানলাভ করিতে নিষেধ নাই, তবে তাহাতে মনে গর্ব্ব উৎপন্ন না হয়।

'থিয়েন-তাও' গ্রন্থে আছে—"চিন্তাশূন্যতা, শান্তভাব, সৌম্য, আস্বাদে আনন্দ-শূন্যতা, নিৰ্জ্জনপ্রিয়তা, মৌন এবং নৈষ্কর্ম্ম্য 'তাও' জ্ঞানীর লক্ষণ" (অনুবাদ মৎকৃত)। প্রাণায়ামের কথা আছে 'চৌ-ই' গ্রন্থে, ইহা দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়। 'থিয়েন-সে-চ্যাং' গ্রন্থে ভাব-সমাধির কথা আছে। কংফুসিয়স্ একদা 'লাও-তান্ এর' সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং দেখিলেন যে, তিনি স্নান শেষ করিয়া তাঁহার কেশ শুকাইতেছেন। তিনি সেই সময় জড়বৎ হইয়া গেলেন, যেন তিনি ইহলোকে নাই। কংফুসিয়স্ শান্তভাবে অপেক্ষা করিলেন এবং যখন কথা সুরু হইল, বলিলেন—আমার চক্ষু কি অন্ধ হইয়াছিল ? সত্যই কি আপনি আসিয়াছেন ? এখনই আপনার দেহ জীর্ণ বৃক্ষের কাণ্ডবৎ দেখাইতেছিল। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, আপনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন—যেন ইহলোকে নেই কোনো অজানা লোকে গিয়াছেন। 'লাও-তান্' বলিলেন, আমি বিশ্বের আদি অবস্থার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। সেই অবস্থা কি জান ? আমার মন এইরূপ হইয়াছে যে, আমি উহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার জিহ্বা এরূপ জড় হইয়াছে যে, আমি কথা বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু যতদূর পারি তোমায় বলিব। যখন 'ঈন্' স্বরূপে ছিল তখন সমস্ত শীতল ও ভীষণ ছিল। যখন 'ঈয়াং' স্বরূপে ছিল তখন সমস্ত স্পন্দিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। শৈত্য ও ভীষণতা আকাশ হইতে আসিল, স্পন্দন ও বিক্ষিপ্ততা পৃথিবী হইতে আসিল। এই ঈন্ ও ঈয়াং সংযুক্ত হইয়া সামঞ্জস্য আনিল ও জগতের সৃষ্টি হইল। এই সবের উপর একের কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু তাহা কি কেহ দেখে নাই ? বৃদ্ধি ও ক্ষয়, পূর্ণতা ও শূন্যতা, আলো ও অন্ধকার, সূর্য্যের গতি-পরিবর্ত্তন ও চন্দ্রের কলাক্ষয় ও বৃদ্ধি—ইহা প্রত্যহ হয় কিন্তু কিরূপে হয় কেহ জানেনা।" (অনুবাদ মৎকৃত)। এই ঈন্ ও ঈয়াং পুরুষ ও প্রকৃতি কিনা কে বলিতে পারে ? উক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়া পাঠক তাও-ধর্ম্মমত কি প্রকার রহস্যাবৃত ধারণা করিতে পারিবেন।

তাও ধর্ম্মমতে 'তাও'কে জানা যায়না। তাও-তে-চিং গ্রন্থে আছে—"যদি কেহ তাওর কথা জিজ্ঞাসা করে ও কেহ উত্তর দেয়, উভয়েই অজ্ঞ, কারণ সে ও বিষয়ের কিছুই জানেনা।" (অনুবাদ মৎকৃত)। পাঠক তাওর রহস্যের কতক জানিতে পারিলেন। ইহা কি উপনিষদোক্ত 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' নহে ?

তাও ধর্ম্মের অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'আই-শাং' অর্থাৎ কর্ম্ম ও ফল। এই গ্রন্থের মতে মানব সুখ ও দুঃখ নিজেই আনয়ন করে। মানব সংকর্ম্মের ফলে দীর্ঘায়ু ও অসৎ কর্ম্মের ফলে অল্পায়ু হয় ও নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে। প্রত্যেক কুকর্ম্মের ফলে দ্বাদশ বৎসর হইতে ১০০ দিন পর্য্যন্ত আয়ুক্ষয় হয়। ইহাতে সৎ হইবার উপদেশ আছে, যাহা সকল দেশে একই প্রকার। পার্থক্য এই যে, তাও ধর্ম্মমতে সংকর্ম্মের ফলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর হইতে তাও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সুরু হয়। যখন এই প্রাচীনপন্থীরা বৌদ্ধগণের পূজিত প্রতিমা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংঘারাম, বৌদ্ধগণের আচার পদ্ধতি ও নিয়মাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহারা বৌদ্ধগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাও মতাবলম্বীরা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের জন্য মঠ স্থাপন করিলেন, প্রতিমা গঠন করিলেন, যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিলেন এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীদের ন্যায় মস্তকে জটাভার বহন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ চীনদেশে 'ভূতবুদ্ধ' 'বর্ত্তমান বুদ্ধ' ও 'ভবিষ্য বুদ্ধ' রূপে পূজিত হন। চৈনিক বৌদ্ধগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রতিমা গঠন করেন। তাও মতাবলম্বীগণ ও তাঁহাদের যে 'ত্রিরত্ন' অর্থাৎ বিনয়, সমবায় ও নিষ্কিঞ্চনতা, ইহারও তিন প্রকার প্রতিমা গঠিত করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এই প্রত্যেক প্রতিমাকে 'স্বর্গীয় দেব' এই আখ্যা দেওয়া হইল। ইহাদিগকে চৈনিক ভাষায় 'শ্যাং-তি' বলা হয়। এই ত্রিমূর্ত্তির একটিকে 'প্রলয়ের মূর্ত্তি', একটিকে 'লাও-ৎ-সে' এর মূর্ত্তি ও অন্যটিকে তাওর মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তাও ধর্ম্মকে আরও প্রভাবান্বিত করে। তাও মতে পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ ইহলোকেই হয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ হয়, এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তাও মতাবলম্বীগণ বৌদ্ধগণের ন্যায় স্বর্গ ও নরক বাস, পরলোকে বিচার প্রভৃতি বিষয় বিশ্বাস করিতে থাকেন। জন্মান্তরবাদ প্রাচীনকাল হইতে চীনদেশে প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধগণ ইহাকে আরও দৃঢ় করিয়া দেন। তাও মতাবলম্বীগণ অবিবাহিত জীবনযাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। লাও-ৎ-সে ও চোয়াং-সে উভয়েই বিবাহিত ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধগণের প্রভাবে এই চিরকুমার প্রথা স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত হয়। [ক্রমশঃ।

প্রগতির পথে ভারতীয় প্রচার ব্যবসায়

সন্তোষ কুমার দে

পূজা এসে পড়লেই বাজার গরম হয়। শুধু যে কাপড়-জামা জুতো-ছাতার বাজার, তাই নয়, বিজ্ঞাপনের বাজারও গরম হয়। কত নতুন কাগজ প্রকাশিত হয়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি নিয়মিত পত্রিকাগুলিরও পূজা-সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন হয়। এক দল ছোটেন লেখা সংগ্রহ করতে, আর একদল বিজ্ঞাপন। লেখা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ বাংলাদেশে আর যারই অভাব হোক্, লেখকের অভাব নেই। এটা আমাদের দৈন্য নয়, শক্তির পরিচয়। আমরা ভালো ব্যবসায়ী না হতে পারি, আমরা অন্তত: কিছু চিন্তা করতেও কি পারি নে? আর চিন্তা করা অপেক্ষাও কঠিন কাজ, সেই চিন্তার বিষয় অপর লোককে জানানো, সুষ্ঠু ভাষায়, পরিমিত প্রকাশ ব্যঞ্জনায়, সময়োচিত ভাবে জানানো। যা অন্য প্রদেশের লোক সহজে পারে না, হয়ত আমরা তা কথঞ্চিৎ সহজেই পারি। সেটা আমাদের অগৌরবের কারণ নয়।

যাই হোক্, যে কথা বলছিলাম। বিজ্ঞাপনের বাজার পূজা উপলক্ষে গরম হয়। যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন, তাঁরা পূজার সময় কিছু বেশী বিজ্ঞাপন করবার কথা ভাবেন, আর যাঁরা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—তাঁরাও এই উপলক্ষে কিছু বেশী বিজ্ঞাপন আমদানি হওয়ার আশা রাখেন। দেখতে দেখতে বিজ্ঞাপন-ব্যবসায় ভারতীয় আর্থিক উন্নতির একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে যদি আমরা একবার পিছনের দিকে তাকাই তবে মন্দ হয় না!

বিশ পঁচিশ বছর আগের বিজ্ঞাপন-জগতের চেহারাটি চোখের উপর ভাসছে। তখন যাঁরা এই কারবারে আসতেন, তাঁরা কেউ যে এটি পছন্দ করে আসতেন তা নয়, বলতে গেলে দৈবক্রমে এসে পড়েছেন ছাড়া আর কিছু বলবার ছিল না। আইন বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মত বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ের কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠাও (Status) ছিল না। কোন উচ্চ-শিক্ষিত যুবক সহজে এ পথ মাড়াতে চাইতেন না।

খবরের কাগজ তখনও প্রকাশিত হত এবং তাতে বিজ্ঞাপনও নেহাৎ কম থাকত না। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের দাম নির্ধারণ, টাকা আদায় প্রভৃতি বিষয়ে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বড় বড় পত্র পত্রিকা যদিও বা কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, ছোটদের বিপদের অবধি ছিল না। তখনও বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী (Advertising Agency) কিছু কিছু কাজ সুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁদেরও কাজে বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হত। ফলে এই ব্যবসায়ে সর্বদাই একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কা লেগে থাকত।

এই বিশ পঁচিশ বছরে ভারতীয় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ে যে সব উল্লেখযোগ্য উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে, যে সব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—এখানে আমরা তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করছি।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটি
(I. E. N. S.)

১৯৩১ সালে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলির এই সমিতি বিজ্ঞাপন ব্যবসায়কে একটি সুসংবদ্ধ নিয়ম-কানুনের মধ্যে সংগঠিত করেছে। এদের অনুমোদন ব্যতীত কোন বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী আজ আর ব্যাপক ভাবে ব্যবসা করতে পারেন না—আর এদের অনুমোদন পেতে হলে যে সব সর্ত পালন করতে হয়, তাতেই বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীদের বহুভাবে সুসংবদ্ধ ও নিরাপদ করেছে। ভারতীয় বিজ্ঞাপন-জগতে এই সমিতিটির বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে।

নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্রিকা সঙ্ঘ
(All Bengal Periodical Association)

১৯৪০ সালে এই সমিতিটি স্থাপিত হয় এবং যখন কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল তখন সমিতি কাগজ সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন লাভের জন্যও এই সমিতি সফলভাবে আন্দোলন চালায়।

ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র সঙ্ঘ
(The Indian Language Newspaper Association)

১৯৪১ সালে এই সমিতিটি স্থাপিত হয় এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের দাবী বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষ এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পেশ করে।

ভারতীয় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী সমিতি
(The Advertising Agencies Association of India)

১৯৪৫ সালে এজেন্সীসমূহের এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সদস্যদের বহুবিধ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। এখন এটিও একটি বিশেষ প্রাতপত্তিশালী সমিতি। এর সংক্ষিপ্ত নাম A. A. A. I.

এ, বি, সি, (Audit Bureau of Circulation Ltd.)

সংবাদপত্র ও পত্রিকা সমূহের সঠিক প্রচার পরীক্ষান্তে সার্টিফিকেট দিবার জন্য এই সমিতিটি গঠিত হয়। এটিও একটি প্রতিপত্তিশালী সমিতি। সংক্ষিপ্ত নাম A. B. C.। ১৯৪৮ সালে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞাপনদাতা সমিতি
(The Indian Society of Advertisers.)

১৯৫১ সালে বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই সমিতিটি গঠন করেন। এটির সংক্ষিপ্ত নাম I. S. A. এই সমিতি বাজারের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান কাজ করেছে। এটিও একটি প্রতিপত্তিশালী সমিতি।

এড্‌ভারটাইজিং ক্লাব আন্দোলন
(Advertising Club Movement)

১৯৫২ সালে কলকাতায় প্রথম এড্‌ভারটাইজিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ (আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে পৃথক শাখাসহ) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রচার বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকদের সমিতি

(Newspaper Representatives Association)

১১৩৮ সালে বোম্বাইয়ে এবং ১১৫৪ সালে কলকাতায় এইরূপ দুটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা প্রতিনিধিদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য যত্নবান।

এড ভারটাইজিং কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া

(Advertising Council of India)

১১৫১ সালে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, এই সমিতিটি বিশেষ কার্য্যকরী হয়ে উঠবে।

ভারতে বিজ্ঞাপন বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ

ইতিমধ্যে *'Advertising & Selling in India'* নামক একখানি পত্রিকা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়ে অল্পকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতায় *'The Indian Print & Paper'* নামক ত্রৈমাসিকটিতে বিজ্ঞাপন-জগতের খবরাখবর এবং মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের সমালোচনা থাকত। এখন সেই বিভাগ বন্ধ আছে। ১১৫৭ সাল থেকে কলকাতায় *'Advertlink'* নামক একখানি বিজ্ঞাপন বিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্প্রতি ১১৬০ সাল হতে বোম্বাই থেকে *'Admars'* নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তাতেও বিজ্ঞাপন-জগতের খবর থাকে।

এ ব্যতীত মাদ্রাজ থেকে 'Indian Press Year Book' বেরিয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—এখন বন্ধ আছে। একবার 'Advertiser's Vade-Mecum' নামক আর একখানি বার্ষিক পত্রিকা বেরিয়েছিল মাদ্রাজ থেকে। এ বৎসর তার নাম পাল্টে করা হচ্ছে—"The Idian Advertising Year Book", আর I. E. N. S. থেকে একটি বাৎসরিক পুস্তক তাদের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত হয়। কলকাতায় Advertising Club "Format" এবং মাদ্রাজের ক্লাব "The New Horizon" নামে দুটি সুন্দর সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। Newspapers Representatives Association থেকেও একটি চমৎকার বাৎসরিক সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপন বিষয়ক পুস্তকও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে "Advertising & Selling"—R. K. Dhara, "Advertising in India"—J. Mukherji এবং বর্তমান প্রবন্ধকারের "উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন" গ্রন্থখানির নাম উল্লেখযোগ্য।

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট গিল্ড

(Commercial Artist Guild) বা C. A. G.

চিত্রশিল্পীদের একটি বিশিষ্ট সমিতি। এদের বার্ষিক প্রদর্শনী পুস্তিকাখানি চমৎকার হয়।

প্রচার ব্যবসায় সম্মেলন

(Advertising Convention)

১১৬০ সালের মার্চের শেষ তিনদিনব্যাপী কলকাতায় যে Advertising Convention অনুষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যই বিশেষ আশা-আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ভারতবর্ষে এই জাতীয় সম্মেলন এই প্রথম। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রথম অনুষ্ঠানের গৌরব লাভ করেছে বাংলা দেশ। আশা আছে—এখন থেকে প্রতিবৎসর এইরূপ প্রচার ব্যবসায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এই বিশ পঁচিশ বছরে ভারতীয় বিজ্ঞাপন ব্যবসায় গুণ, ব্যাপ্তি ও কার্যকারিতায় যে উৎকর্ষ দেখিয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। মনে হয়—এখন ভারতীয় বিজ্ঞাপনের মান (Standard) পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

প্রতীতি

শঙ্কর রায়

তোমার চোখের নদী
এ-কোন তন্বীরূপ
ভাবে সুরে প্রতীতি—

পাথুরে-পুরাতন কোন
বৈশাখী সৌধের
আরবীয় রীতি।

মসৃণ-মেখলা রুচি
বর্ণহীন ভালবাসা
আর জীবনস্মৃতি যে তোলপাড়

ক'রে কোন কবেকার
ঝরণা হওয়া দেবদারু
বিস্মৃতি-পরাগ-পাহাড়।

অনামিকা-অসবর্ণা
এ-কোন বিদেশী সুর
সিম্ফনী মেলোডি

ধূলোরাঙা রুক্ষমাটি
কোমল প্রেমের রঙ
রূপ নি'ল বেদনাপ্রমাণ।

এখনো ঝাপসা-চোখে—
সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য সে-যে
মিঠে মাটি মননের বাণী।

বেলোয়ারী-বস্তুবাদী :
মৌসুমী বিরহেই
আমি তারে মানি।

চিঠিপত্রে পল্লীদরদী শরৎচন্দ্র

ভাগ্যহীন মানুষের ওপর শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো অপরিসীম। লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে মানুষ আত্মাবমাননায় ক্ষত-বিক্ষত, জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলার সমস্ত উপচার থেকেও যারা পদে পদে কুড়িয়ে বেড়ায় লাঞ্ছনা আর উপহাস, তাদের মাঝেই শরৎচন্দ্র ঠাঁই খুঁজেছেন। তাদেরই অব্যক্ত বেদনাকেই তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

শুধু সাহিত্যের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। বাস্তব জীবনেও তিনি এগিয়ে এসেছেন এই সব সর্বহারা মানুষদের একান্ত সান্নিধ্যে। শহর থেকে দূরে হাওড়া জেলার শেষ প্রান্ত পাণিত্রাসে (সামতাবেড়) রূপনারায়ণ নদের তীরে একদা নির্ম্মাণ করেছিলেন তাঁর বাসভবন। পল্লীর হতভাগ্য মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার জন্যেই হয়ত তিনি বাসা বেঁধেছিলেন এই নিভৃত পল্লীর মধ্যে। পল্লীর নীচতা, দীনতা আর ক্লেদাক্ত অসহনীয় জীবনের মধ্যেও তিনি পরম সত্যকে হয়ত আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। আর সে জন্যে তাঁর গৌরবের সীমা ছিল না। তাই তিনি গর্ব করে ব'লেছিলেন, '···একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে আমি অনেকদিন ধরে অনেক ঘুরেছি। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু কথাটা ঠিক সত্য না হ'লেও একেবারে মিথ্যা বলা চলে না। দেশের নব্বই জন যেখানে বাস ক'রে আছেন, সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি, এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হ'য়ে আছি।' ১

পল্লীগ্রামে বাস ক'রে পল্লী-জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবেই। কেবলমাত্র হতভাগ্য পল্লীবাসীদের দুঃখ, দৈন্যকেই তিনি সাহিত্যের মধ্যে তুলে ধরেননি, এই সব বঞ্চিত ও হতভাগ্যদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝেও তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। অবহেলিত গ্রামের দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও মহামারীতে আক্রান্ত মানুষকে ভয়াবহতার হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন বার বার। এই সব রোগাক্রান্ত মানুষেরা সব চেয়ে বঞ্চিত হয় চিকিৎসা আর পথ্যের সুবন্দোবস্ত থেকে। তাই এই দরিদ্র দেশের চিকিৎসার জন্যে তিনি হোমিওপ্যাথী ওষুধ বিলি করতেন। প্রয়োজন মত নিজের পয়সা দিয়ে তাদের পথ্যেরও বন্দোবস্ত করে দিতেন। সেই সঙ্গে এই সব রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা শুশ্রূষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

পল্লীর এই সব ভাগ্যহীন মানুষের প্রতি তাঁর দরদের সীমা ছিল না। একবার এক চিঠিতে তিনি এদের অসহায়ত্বের কথা দুঃখ ক'রে লিখে জানিয়েছেন, 'দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,—আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলত! দুর্ভাগ্য,—কাবু হইয়া পড়িলাম। (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে।) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকার দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।' ২

এই তো দরদী সাহিত্যিকের প্রাণ! পল্লীর এই রোগাক্রান্ত দুর্ভাগ্যদের প্রতি তদানীন্তন অর্থশালী লোকদের কোন আগ্রহই ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র ইচ্ছে করলেই এই সব অবহেলিতদের ছেড়ে চলে আসতে পারতেন নাসিকা কুঞ্চন ক'রে। তারপর তাঁর সাহিত্যে এদের সম্পর্কে তিনি কপট সমবেদনা জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি পল্লীর এই সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বাস্তব জীবনে তিনি এদের দুঃখ মোচনের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের পল্লীদরদের এমন বহু ঘটনাই ছড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ার পাণিত্রাসে বাড়ী তৈরী সুরু করেন, তখন ১৯২৩ সাল। ঠিক এই বৎসরে গোবিন্দপুর গ্রামে কলেরার মহামারী শুরু হয় এবং সেই মহামারী এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই ১৬২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। সেই সঙ্গে মারা পড়ে প্রায় পঞ্চান্ন জন। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে এক

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: স্বদেশ ও সাহিত্য—পৃঃ ১৩

২। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র—পৃঃ ২০৫

বিভীষিকার রাজত্ব চলতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে মানুষেরা চলে যেতে থাকে অন্যত্র। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এদের পরিচর্য্যার কাজে এগিয়ে আসেন। সম্ভবমত ওষুধ পথ্য সরবরাহ করেন নিজ ব্যয়ে। দেখা যায়, এই নিদারুণ ভয়াবহতার মাঝে শরৎচন্দ্র নিজেকে স্থির ও অচঞ্চল রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি তখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই সাহিত্যিক পদমর্য্যাদায় তিনি নিজেকে বিলাস-ব্যসনে ও সুখনিদ্রার মধ্যে এলিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি বঞ্চিতদের এই অসহায়তার মধ্যে সেবা শুশ্রূষা করাটাকেই জীবনের একটা বড় কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। কতখানি গভীর জীবনবোধ থাকলে তিনি নেমে আসতে পারেন এইসব ভাগ্যহীনদের মাঝে—তা এ থেকেই বোঝা যায়।

শুধু তাই নয়, এই সময়ে এই অঞ্চলে বেশ দুর্ভিক্ষ হয়। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং সবশেষে কাজ পাওয়ার সমস্যা তীব্রতর হ'য়ে ওঠে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে। ঠিক এমনি সময়ে তিনি পানিত্রাসে (সামতাবেড়) বাসভবন নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন। এর ফলে দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা কাজ পেয়ে বাঁচলো এবং তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদও জানিয়েছিল।

গ্রামে থাকাকালীন তাঁর আরও কতকগুলি মহৎগুণ দেখা গেছে। গভীর রাত্রিতে রোগাক্রান্ত কোন পল্লীবাসীর ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারতেন না। বেরিয়ে পড়তেন ওষুধের বাক্স সঙ্গে নিয়ে। তাদের যথাসাধ্য ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতেন। তাই এই অঞ্চলের নীচুতলার মানুষদের কাছে ছিলেন তিনি পরম বন্ধু—সুখ-দুঃখের সাথী। দেশের সাধারণ মানুষকে স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে তিনি ভালবাসতে পেরেছিলেন একান্তই। তাই তো তিনি সাধারণ মানুষদের কাছে বাস্তব জীবনেও একজন দরদী হ'তে পেরেছিলেন। এইজন্যেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'আমায় যে লোকে ভালবাসল তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই, লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কথাগুলো মেলে। মানুষ সত্যি ছোট নয়, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।' ৩

এখানেই ছিল অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। তাই তো শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে নিপীড়িত, অধঃপতিতদের জীবনের করুণ কাহিনীকে এত সুন্দর মূর্চ্ছনায় পরিবেশিত করতে পেরেছিলেন।

রোগ মহামারী ছাড়াও, এদিকে পল্লীর বান-বন্যা ছিল চিরন্তনী নিয়ম। এই সর্বগ্রাসী বন্যায় কত মানুষই যে সম্বলহারা হয়ে পড়তো—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শরৎচন্দ্র এইসব বন্যার্তদের মাঝেও তাঁর মহৎগুণের পরিচয় রেখে গেছেন। সামান্য একটি চিঠির ঘটনা থেকে বোঝা যাবে—তিনি এদের কতখানি দরদ দিয়ে ভালবাসতেন। কোন এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে Tincture Iodine মাখিয়ে Arnica খাবার ব্যবস্থা করে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকা ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।' ৪

শুধু বন্যার্তদের সেবাই নয়, বন্যা রোধের জন্যেও তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিলো না। তিনি এই বিপদমুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাননি। ভীতিপ্রদ মানুষদের সঙ্গে তিনিও বন্যা রোধের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই সম্পর্কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত বোজানো—এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে'।

বন্যার ফলে নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য তিনি আর পাঁচজনের মত একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি। তাই নিজ ব্যয়ে বহুশত টাকার বাঁশ কিনে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের—বাঁশের পিন পুঁতে ভাঙ্গন রোধ করার জন্যে। এ সবের মধ্যেও ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের সেই দরদী সত্বার পরিচয়।

পল্লীসমাজের হিংস্র কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত, তাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দরদ ছিলো প্রাণ-ভরা। এই কারণে গ্রামীন সমাজে মেয়েদের দুর্গতি তাঁকে যে শুধু বিচলিত করেছিলো তা নয়, তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। যে তথাকথিত সমাজ নারীজাতিকে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কোন এক চিঠিতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়। তিনি লিখেছেন, 'দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনই সুবিচার করেনি, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করবো।'

সমাজে ধিক্কৃত হয়েছে যারা, তাদের মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য সকলের সামনে ধরে দেওয়াতেই সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের চরম প্রকাশ। তাই বাস্তবজীবনে শরৎচন্দ্র কোনদিন নারীর প্রতি অসম্মান ও অবহেলা দেখাননি। পাণিত্রাসে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের কাছেও শুনেছি যে, নারীকে তিনি কত সম্মান করতেন! তাঁর লেখার মধ্যেও নারী-সমাজের প্রতি যে দরদ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিলো, বাস্তবক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেই একই ধাতে গড়া মানুষ। দরিদ্র স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসীম। এদের তিনি গোপনে গোপনে অনেক সাহায্য করতেন।

নারীর জীবনের ব্যথা বেদনার কথা তিনি যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এমন আর কজন সাহিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায়? নারীর সতীত্বকে নিয়ে যে সব লেখক কপট আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে, নারীকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, 'যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে, তাদের Idealism ত নেই-ই, realismও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না জানার অহমিকা।' (৫)

মানুষের দুঃখের প্রতিও তাঁর সমবেদনার অন্ত ছিল না। এই সমবেদনা শুধু যে মৌখিক ছিলো, তা নয়। তিনি কার্যতঃ তাদের দুঃখমোচনের জন্যে চেষ্টা করতেন গভীর দরদ দিয়ে। একবার তাঁর দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সরস্বতী-পুজো হয়। এই সরস্বতী-পুজোর অনুষ্ঠান করেন দিদির

(৩) শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ—৩৬৭।

(৪) শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ—২১৭।

(৫) শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ—৩৪২

সম্পর্কিত আত্মীয় তুলসীদাসবাবু। এই সরস্বতী-পুজোর পাঁচকড়িবাবুর দুটি ছাত্রের মধ্যে একটির নেমন্তন্ন হয়। আর যে ছাত্রটি বাদ পড়ে যায়—তার নাম নকুল। নকুল নেমন্তন্ন না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়। শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা জানতে পেরে তুলসীবাবুকে একখানি চিঠি লেখেন, 'তুলু, দুটি ছেলে মুখুজ্জেদের বাড়ীতে পড়তে যায়, একটির হোল নেমন্তন্ন, আর অন্যটি গেল বাদ। আমার ত খাবার নেমন্তন্ন হয়েছে, আমি না হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার Repaesentative.'

এই চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার ক'রে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটা বালকের দুঃখকেও যে কি রকম হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এটা হোল তারই নিদর্শন।

শরৎচন্দ্র একদিকে তাই ছিলেন শিল্পী আর অপরদিকে তিনি ছিলেন পল্লীদরদী। এই জীবনের পায়ে-চলা পথে চলবার সময় বহু মানুষকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন। বাস্তব জীবনেও তাই সময়ে অসময়ে তাদের অসহায়তা থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন বারবার।

বহুদিন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশের সত্যিকারের দুঃখ, আর সমস্যাটা কি? একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি দেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি—এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নাই। যথার্থ ভালবেসেছি। ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষ গুণ ত্রুটি, দলাদলি বা যা কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিষ বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।' ৬

একজন দরদী সাহিত্যিক হিসেবেই এ ঘোষণা তিনি করতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবনকে এমন গভীরভাবে না জানলে একথা কেউ এমন গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারতেন না। তাই কালের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর লেখনী-নিঃসৃত সাহিত্যের আবেদন আজও আমাদের হৃদয়কে ক'রে তোলে করুণরসে সিঞ্চনে সিক্ত। এই জন্যই আগামীকালের সমাজচেতনা-সম্পন্ন মানুষের কাছে সেই সত্যাসত্য বিচারের প্রার্থনা জানিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব-সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি, তা স্থির করার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর।' ৭

—অশান্ত সোম

(৬) শরৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ—২১৪।
(৭) শরৎচন্দ্রের রচনাবলী—পৃঃ ১৮০।

কালিঝোরা বাংলো

শিলাদিত্য

[কালিঝোরা দার্জ্জিলিং জেলায় মহানন্দ 'গেম স্যাঙ্কচুয়ারির' ভিতর পূর্ত্তবিভাগের বাংলো। শিলিগুড়ি থেকে ১১ মাইল।]

নহে তীর্থ বারাণসী যেথায় বরুণা অসি
পুণ্যস্থান দেবভূমি করেছে রচন।
ক্ষুদ্র স্থান তুচ্ছ গ্রাম নগণ্য তাহার নাম
কালিঝোরা বনমাঝে অপূর্ব্ব সৃজন ॥
বঙ্গের উত্তর ভাগে যেথায় প্রহরী জাগে
অনন্ত পর্ব্বতমালা শ্যাম কলেবর।
তিস্তা যেথা কলস্বনা ছুটে চলে একমনা
উর্ব্বর করিতে তুলি বঙ্গের প্রান্তর ॥
কালি নামে ঝোরা ক্ষুদ্রা ক্ষীণা তবু তেজে রুদ্রা
যেথা লভে তিস্তাবক্ষে অনন্ত মিলন।
মহানন্দা মহাবন যেথা উদাসীন মন
মর্ম্মর স্বরেতে করে মধুর কূজন ॥
সেই মধু স্বর্গে গুপ্ত দৃষ্টিভাগে অবলুপ্ত
আছে সুপ্ত কালিঝোরা বাংলোর কুটীর।
একদিকে বৃক্ষছায়া শুধু বনানীর মায়া
অন্যদিকে বেগবান তিস্তার সমীর ॥

নদীজল উতরোল দিনে করে কলরোল
চূর্ণ হয় শিলাখণ্ডে প্রচণ্ড তাড়নে।
মনে মনে ভয় হয় বুঝি দিবে করি ক্ষয়
তীরলগ্ন বনভূমি গম্ভীর গর্জ্জনে ॥
চন্দ্রকিরণের স্পর্শে রাত্রে নদী নাচে হর্ষে
এক চন্দ্রে রঙ্গে-ভঙ্গে লক্ষ করি লয়।
রূপালী নদীর জল ছুটে চলে ছলছল
দিনের সে রুদ্রনদী এ যেন সে নয় ॥
নদীর অপর তীরে শ্যাম গাত্রে উচ্চ শিরে
মেঘের মেখলা পরি উচ্চ গিরিবর।
নিস্তব্ধে দেখিছে নিত্য তিস্তার উচ্ছল নৃত্য
গতিভঙ্গে অপরূপ লাস্যে মনোহর ॥
তিস্তার সুউচ্চ তীরে ছায়া ফেলি নদী নীরে
আছে ক্ষুদ্র শান্তপুরী বাংলো কালিঝোরা।
সুদর্শনা মনোহরা রূপেতে আকুল করা
দেখে আসিলাম সেই স্বপ্নপুরী মোরা ॥

ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রচনা

সূর্য
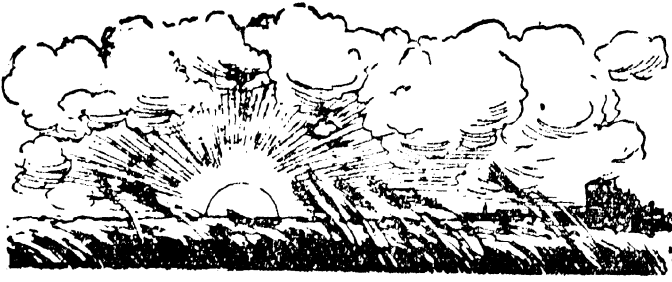
গ, আ, আরিস্তোভ

পৃথিবীর কাছে সূর্যের একটি বিরাট তাৎপর্য রহিয়াছে। যে কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটে, অতীতকালে মানুষ তাহা জানিত না; প্রকৃতির শক্তিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারিত না। অন্ধ বিশ্বাস এবং মিথ্যা ধর্মীয় ধারণার বশবর্তী হইয়া মানুষ ধর্মের ভিতর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা খুঁজিত।

কী ভাবে বসন্তকালে সূর্যকিরণের প্রভাবে প্রকৃতি উজ্জীবিত হইয়া ওঠে, আবার শরৎ এবং শীতকালে যেন প্রাণ হারায়, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, মানুষ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। প্রকৃতির এই সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া মানুষ বহু পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর জীবনে সূর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সূর্যের সাংগঠনিক প্রকৃতি জানিত না বলিয়া, তাহারা ইহার তাৎপর্য যথাযথভাবে নিরূপণ করিতে পারে নাই। তাই প্রায় সকল জাতির নিকটে সূর্য দেবতায় পরিণত হইয়াছে। পুরাকালের অধিকাংশ জাতির নিকট সূর্য ছিল প্রধান দেবতাদের মধ্যে একজন।

সূর্যের সম্মানে মানুষ জমকাল মন্দির নির্মাণ করিয়াছে। স্তব গাথা রচনা করিয়া গাহিয়াছে, সূর্য্যকে পূজা করিয়াছে, প্রচুর নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়াছে।

আমাদের পূর্বপুরুষ শ্লাভেরা সূর্যকিরণ, আলোক, উত্তাপ, বসন্তকাল ও উর্বরতার দেবতা 'ইয়ারিলা' বা 'কুপালা'কে পূজা করিত। প্রাচীন রুশে দেবতা ইয়ারিলার সম্মানে বৎসরের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিনে—কর্কট সংক্রান্তির দিনে (২২শে জুনের কাছাকাছি) এক উৎসবের আয়োজন করা হইত। প্রাচীন বিবাহ-সম্বন্ধীয় আচারে ও গানে এই সূর্যপূজার ছাপ রহিয়াছে।

সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিশরবাসিগণ সূর্য দেবতা আতোন্-এর সম্মানে স্তব পাঠ করিত: 'দিগন্তে তোমার উদয় কী সুষমাময়, হে অনাদি আতোন্! তুমি পূর্ব দিগন্তে উদিত হও, আপন সুষমায় তুমি পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। তুমি সুষমাময়, মহান, প্রোজ্জ্বল, সমস্ত পৃথিবীর উর্ধ্বে। তোমার কিরণ তোমারই সৃষ্ট সকল দেশকে আলিঙ্গন করে, তুমি দূরস্থিত, কিন্তু তোমার কিরণ পৃথিবীপরি...'

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকগণ সূর্য দেবতা 'আপল্লোন্'-এর পূজা করিত। 'মোলখ' ছিল ফোনিসিয়ার অধিবাসীদের সূর্য দেবতা। এক হাজার বৎসর পূর্বে পেরুর (দক্ষিণ-আমেরিকা) অধিবাসীরা সূর্যোদয়কে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতসহকারে অভ্যর্থনা করিত।

প্রাচীনকালের সম্রাটেরা নিজেদের এবং নিজেদের বংশকে বড় করিবার জন্য ঘোষণা করিত যে, তাহারা সূর্যদেবতার বংশধর। চীনদেশের অধীশ্বরগণ "সূর্যসুত" বলিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিত। "ইগর্-এর বাহিনীর কাহিনী"তে রুশীয় সম্রাটগণ "শক্তিমান দাবদ্-দেবতার প্রপৌত্র" বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছে।

এখন সূর্যের সম্বন্ধে এই সকল ধর্মীয় ও বিজ্ঞানবিরোধী ধারণা অতীত হইয়াছে।

সূর্য কী, কী দ্বারা ইহা সংগঠিত, এই পুস্তিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। সূর্যের অন্তর্দেশে এবং বহির্গাত্রে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে, তাহার কথা, সূর্যের আয়তন এবং গতির কথা আপনারা জানিতে পারিবেন। জানিতে পারিবেন ইহার শক্তির উৎসের কথা, পৃথিবীর জীবনের জন্য সূর্যকিরণের তাৎপর্যের কথা এবং ইহার ব্যবহারের বিভিন্ন উপায়ের কথা।

১। সূর্য সম্বন্ধে সমকালীন ধারণা

(১) সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র

প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ ভাবিত যে, পৃথিবী বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে নিশ্চলভাবে স্থির হইয়া আছে, আর তাহার চতুর্দিকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঘুরিতেছে। কিন্তু চারি শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে পোল্যাণ্ডের মহান বৈজ্ঞানিক নিকোলাই কোপার্নিকাস্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী নহে, সূর্যই হইতেছে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র, আমাদের পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে।

এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলির ভ্রমণপথগুলিকে কক্ষ বলে। ইহারা বদ্ধ উপবৃত্ত—টানিয়া লম্বা করা বৃত্তের মত দেখিতে।

পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব গড়ে ১৫০ কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্ব ভূগোলকের ব্যাসের প্রায় ১২ হাজার গুণ বেশী। এই দূরত্ব উড়িতে, ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজের পঁচিশ বৎসর লাগে।

পৃথিবী ৩৬৫¼ দিনে সূর্যের চতুর্দিকে একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। এই সময়ে ইহা মহাজাগতিক শূন্যে প্রায় ৯০ কোটি কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে। সূর্যের চতুর্দিকে নিজের কক্ষপথে চলিতে চলিতে পৃথিবী প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক শূন্যে আমরা মোটামুটি তিরিশ কিলোমিটার দূরে চলিয়া যাই।

কোপারনিক আরও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী কেবল সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত হয় না, নিজের অক্ষের চতুর্দিকেও ঘোরে ; ২৪ ঘণ্টায় [আরও সঠিকভাবে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে] একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। সূর্যের চতুর্দিকে ৯টি বৃহৎ গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো [চিত্র ১]—আবর্তিত হয়। গ্রহগুলি হইতে সূর্যের দূরত্ব এক নয়। সূর্য হইতে বুধ গড়ে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে, শুক্র ১০ কোটি ৮০ লক্ষ, পৃথিবী ১৫ কোটি, মঙ্গল ২২ কোটি ৮০ লক্ষ, বৃহস্পতি ৭৭ কোটি ৮০ লক্ষ, শনি ১৪২ কোটি ৬০ লক্ষ, ইউরেনাস ২৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ, নেপচুন ৪৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং প্লুটো ৫৯১ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি দূরবর্তী গ্রহগুলি অপেক্ষা অধিকতর বেগে আবর্তিত হয় এবং সূর্যের চতুর্দিকে আপন পথ দূরবর্তী গ্রহগুলি অপেক্ষা আরও অল্প সময়ে অতিক্রম করে। সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী গ্রহ বুধ নিজ কক্ষপথে সেকেণ্ডে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হয় এবং সূর্যের চতুর্দিকে একটি পূর্ণ আবর্তন ৮৮ দিনে সম্পন্ন করে। আর সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত গ্রহ প্লুটোর কক্ষপথে গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪.৩ কিলোমিটার এবং সূর্যের চতুর্দিকে নিজের পথ ২৪৯ বৎসরে অতিক্রম করে।

মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। ইহাদের asteroid অথবা গ্রহাণুপুঞ্জ নামে ডাকা হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তু। ইহাদের অনেকের ব্যাস কয়েক দশক কিলোমিটার মাত্র। আমাদের নিকট পরিচিত গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ Ceres ; ইহার ব্যাস ৭০০ কিলোমিটার। আর Hermes Asteroid-টির ব্যাস এক কিলোমিটারের বেশী নহে।
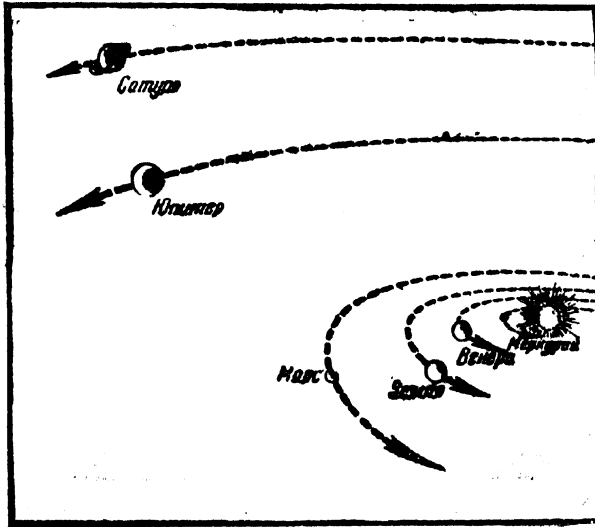
১ নং চিত্র—গ্রহগুলির সূর্য প্রদক্ষিণ কক্ষ

বর্তমানে প্রায় ১৭০০ গ্রহাণুপুঞ্জের কথা জানা আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, ইহাদের সংখ্যা কয়েক সহস্র।

গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ ব্যতীত সূর্যের চতুর্দিকে ধূমকেতু আবর্তিত হয়। ইহারা সৌর জগৎকে বিভিন্ন দিকে ছেদ করিয়া যায়। সূর্যের নিকটবর্তী হইলে ধূমকেতুর ঘনমান অনেকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদের বিরাট বিরাট পুচ্ছ দেখা যায়। ইহাদের দৈর্ঘ মাঝে মাঝে পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্বের দুই-তিন গুণেরও বেশী হয়। এই সময় ইহারা সৌর জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

বিশ্বমণ্ডলে প্রচুর সংখ্যক ধূমকেতু আছে। তবে খালি চোখে ইহাদের অতি অল্প সংখ্যককেই কেবল দেখা যায়।

আকাশে ধূমকেতুর কদাচিৎ এবং অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ও ইহাদের Physical nature প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অতীতকালের মানুষের মনে নানান অন্ধ বিশ্বাসময় ধারণা এবং ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। গীর্জার পুরোহিতেরা ধূমকেতুর আবির্ভাবকে ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য ব্যবহার করিত। তাহারা এই গুজব ছড়াইয়া দিত যে, ধূমকেতু আসন্ন "প্রলয়" এবং প্রচণ্ড দুর্দৈব—যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির পূর্ব লক্ষণ হিসাবে আবির্ভূত হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর আবির্ভাবের জন্য বহু লোক দারুণ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গুজব রটিয়াছিল যে, ধূমকেতুটি পৃথিবীর উপরে একবার পুচ্ছ বুলাইয়া দিবে এবং "প্রলয়" ঘটিবে। ধর্মের সেবকেরা ধর্ম-বিশ্বাসীদের গীর্জায় আসিয়া পাপ কবুল করিতে এবং উৎসর্গ প্রদান করিতে আহ্বান জানাইয়াছিল। ৫ (১৮) মে-র ভিয়েনার সংবাদপত্র লিখিয়াছিল 'অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষভাবে মফঃস্বল অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে অন্নজল জমাইয়া রাখিতেছে। ভয়ে অনেকে আত্মহত্যা করিয়াছে। বহু চাষী প্রলয় ঘটিবে মনে করিয়া নিজেদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে এবং মদ্যপানে মাতিয়াছে।" আমাদের রুশ দেশের অনেক শহরে পথে পথে প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

মে মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে পৃথিবী সত্য সত্যই ধূমকেতুর পুচ্ছ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে কোনো প্রকার দুর্দৈবই ঘটে নাই। ইহা সহজবোধ্য। ধূমকেতুর ভর অতি অল্প এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধূমকেতুর মুণ্ডের নিউক্লীয়সে কেন্দ্রীভূত। ধূমকেতুর পুচ্ছ খুব বেশী রকমের তনুকৃত। তাহার ঘনত্ব আমাদের চতুর্দিকস্থ বায়ু অপেক্ষা অনেকগুণ কম। এমন কি, ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া তারাও দেখা যায়।

(২) সূর্যগ্রহণ

কতকগুলি গ্রহের উপগ্রহ আছে। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ হিসাবে রহিয়াছে চন্দ্র। জ্যোতিষ্কগুলির ভিতরে ইহা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। ইহা পৃথিবী হইতে গড়ে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। চন্দ্রের একটি মাত্র পার্শ্ব সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আছে। ইহার ব্যাখ্যা

এই যে, আপন অক্ষের চতুর্দিকে ইহার ঘূর্ণনকাল এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে ইহার আবর্তনকাল এক।

প্রতিফলিত সূর্যালোকে চন্দ্র উজ্জ্বল। পৃথিবীর দিকে ঘোরানো পার্শ্বটি পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হয় (পূর্ণিমা) অথবা একেবারে অনালোকিত হয় (অমাবস্যা)। চন্দ্রের দৃশ্যমান আকৃতিতে এই এই পরিবর্তনকে (চিত্র ২) চন্দ্রকলা বলা হয়। দুইটি সদৃশ কলার মধ্যবর্তী সময়ের পরিসরকে (যথা, দুইটি পূর্ণিমার মধ্যবর্তী) চান্দ্রমাস বলা হয়। সার্দ্ধ উনত্রিশ (আরো যথাযথভাবে, ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২.৯ সেকেণ্ড) দিনে এক চান্দ্রমাস হয়।

চিত্র ২ হইতে যেমন দেখা যাইতেছে, তেমনি অমাবস্যার সময়ে চন্দ্র সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্য দিয়া যায়। এই সময়ে ইহা মাঝে মাঝে সূর্য এবং পৃথিবীর কেন্দ্রগামী সরল রেখার উপরে আসে এবং সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যগ্রহণ সুরু হয়। যদি চন্দ্রের গতিপথ পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত একতলবর্তী হইত, তবে প্রত্যেক চান্দ্রমাসেই সূর্যগ্রহণ হইত। কিন্তু যেহেতু চন্দ্রের কক্ষের তল পৃথিবীর কক্ষের তলের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, সেহেতু অধিকাংশ অমাবস্যার সময় চন্দ্র পৃথিবী এবং সূর্যের কেন্দ্রগামী সরলরেখাটির উপর কিম্বা নীচ দিয়া চলিয়া যায়, সূর্যগ্রহণ হয় না (চিত্র ৩)।

২ নং চিত্র—চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

সুদূর অতীতে মানুষ সূর্যগ্রহণের যথার্থ কারণ জানিত না। উন্মুক্ত দিবালোকে সূর্যের অপ্রত্যাশিত "অদৃশ্য" হইয়া যাওয়াকে তাহারা অতিজাগতিক শক্তির আবির্ভাব বলিয়া মনে করিত।

বহু দেশে এই বিশ্বাস ছিল যে, গ্রহণের সময় দুষ্ট রাহু সূর্যকে গিলিয়া ফেলে। সূর্যকে "মুক্ত" করিবার জন্য অন্ধবিশ্বাসী লোকেরা গ্রহণের সময় কাঁসর বাজাইত, ঢাক পিটাইত এবং প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিত। এমন কি, কিছুকাল পূর্বেও, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সময়ে তুর্কীর ভীতিগ্রস্ত অন্ধবিশ্বাসী অধিবাসিগণ সূর্যকে অপহরণে উদ্যত শয়তানকে [রাহুকে] তাড়াইবার জন্য বন্দুক হইতে গুলীবর্ষণ করিয়াছিল।

৩ নং চিত্র—পৃথিবী ও চাঁদের সূর্য প্রদক্ষিণ কক্ষের নক্সা

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সেবকেরা জ্ঞানহীন জনসাধারণের ভীতি জীয়াইয়া রাখিত এবং ইহাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিত।

বর্তমানে আমাদের স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্র সূর্যগ্রহণের যথার্থ কারণ জানে। সূর্যের গ্রহণ প্রাণী কিম্বা উদ্ভিদ-জগতের কোনো ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। এখন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মানুষ আগে হইতে প্রতিটি সূর্যগ্রহণের কথা জানিতে পারে এবং ভয় কিম্বা দুশ্চিন্তা লইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে না। বরং প্রকৃতির আশ্চর্য এই ঘটনা নিজ চোখে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া ইহারা প্রতীক্ষা করে।

সূর্যগ্রহণ পূর্ণগ্রাস, খণ্ডগ্রাস এবং বলয়গ্রাস হইতে পারে।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে এবং ভূপৃষ্ঠে চন্দ্রের ছায়া পড়ে। যে হেতু চন্দ্র নিজের কক্ষে ভ্রমণ করে এবং পৃথিবী নিজের অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে, সে হেতু সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া স্থান পরিবর্তন করে, যেন প্রস্থে ২৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটি ফিতা আঁকিয়া চলে। এই সময়ে ভূপৃষ্ঠের অন্তস্থানে [পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছায়াবেষ্টনীর দুই পার্শ্বে] চন্দ্র হইতে অর্দ্ধেক ছায়া পড়ে। এখানে সূর্যের একটি অংশ দেখা যায়। এই অর্দ্ধেক ছায়ার বেষ্টনীর প্রস্থ ৭০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

মাঝে মাঝে সূর্যগ্রহণের সারাক্ষণ পৃথিবীর অধিবাসীদের নিকট হইতে চন্দ্র সূর্যের কেবল একটা অংশকে ঢাকিয়া রাখে এবং ভূপৃষ্ঠে চন্দ্র হইতে কেবল অর্দ্ধেক ছায়া পড়ে। এই সময়ে সূর্যের খণ্ডগ্রাস গ্রহণ হয়।

[ক্রমশঃ

"A young man should read five hours in a day and so may acquire a good deal of knowledge."

—*Samuel Johnson.*

প্রেমিকপ্রবর কীটস

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

প্রেম কি।—

বর্তমান জগৎ এর সদুত্তর দিতে পারবে না। বর্তমান কাল কেন, কোন কালই এর ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারে না। প্রেম, প্রেম করে সারাটা ভুবন যখন দিশেহারা, তখন কোথায় কোন্ কোণে কারও কারও জীবনে প্রেম উদ্ভাসিত হয়েছে, এ জগতে প্রেমের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে প্রকাশও বুঝি একালে নয়, অন্য কোনো কালে ঘটেছে। একাল প্রেম কি তা জানে না। আজ মানুষ বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরতা আর প্রয়োজনীয়তার চক্রে তার ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রিত, আধিভৌতিকতাই তার সর্বস্ব, নগদ বস্তু ছাড়া সে কিছু বোঝে না। মাপ করা দৈহিক ও মানসিক দেনা-পাওনার অঙ্গীকারে প্রেমের পরিচয় মেলে না। বর্তমান সাহিত্য থেকে প্রেম তাই বিদায় নিতে বসেছে, মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক কামনা-বাসনার টানাপোড়েনে প্রেম উধাও হতে চলেছে। অবশ্য চিরকালই দেহগত ও দেহাতীত প্রেমের অস্তিত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা-তর্ক বিচার চলে আসছে, রূপজমোহ ও প্রেমের সীমারেখা নির্ণয় করতে মানুষ নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে। তাই প্রেম কি—বুঝতে হলে এই চিরকালীন বিতর্ক প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে, যে জীবনের মাঝে প্রেম প্রকাশ পেয়েছিল, সেই প্রেম প্রগাঢ় জীবন-গাথার অনুধ্যানই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইংরেজ কবি কীটসের স্বল্প কয়েক বছরের জীবন প্রেমের জলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। দুর্বল রুগ্ন প্রতিষ্ঠাহীন এই কবি মানুষটির জীবনে প্রেম এসেছিল, এই প্রেমই হোল তাঁর জীবন, প্রেম তাঁর জীবনকে যেমন ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছিল, তেমনি মৃত্যুতে ঝরিয়ে দিয়েছিল।

কীটসের আট বছর বয়স। তাঁর বাবার তখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে সেই যে শয্যাগত হলেন, আর উঠলেন না তিনি, একেবারে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর মা আরেক জনকে বিয়ে করলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছিল না। কীটসের যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তিনিও মারা গেলেন। বাপ-মা-হারা কীটস। আর দু'ভাই, এক বোন—টম, জর্জ আর ফ্যানী। এক অ্যাবীর হাতে তাঁদের সামান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। টমকে মৃত্যুরোগে ধরেছিল—মৃত্যুতে বিশীর্ণ ছিল—পরপারের দিন গুণছিল কেবল। কীটস চিকিৎসাবিদ্যায় হাত পাকাতে চাইছিল, কবিতার হাত তো পড়েছিলই। জর্জকে ইংলণ্ডের মাটি ধরে রাখতে পারল না, দেশছাড়া হোল সে, গেল সুদূর আমেরিকায়। বোন ফ্যানী অভিভাবকদের কাছে আছে। তার অভিভাবকরা কীটসকে পছন্দ করেন না। তাই বোনের সাথে যোগাযোগ অল্পই।

১৮১৮ সাল থেকে শুরু করা যাক। জীবনের প্রকাশ চেতনায়। চেতনাহীন শৈশবে জীবনের প্রস্তুতি হতে পারে, কিন্তু জীবনের প্রকাশ ঘটেনা। প্রেম হোল জীবনচেতনার ভাস্বর অভিপ্রকাশ। অমৃত যন্ত্রণার আঘাতে আঘাতে জীবনের তারে তোলে সুরঝঙ্কার।

জর্জ, টম, জন কীটস তিন ভাই। টম রোগে ভুগছে, জর্জ বিদেশে বিদায় নেবার তোড়জোড় করছে, আর জন কীটস কবিতার কথা ভাবছে, চিকিৎসাবিদ্যার কথা ভাবছে, কিন্তু ঠিক কী যে করবে ভেবে পাচ্ছেনা। টমের সান্নিধ্য অসহ্য বোধ হচ্ছে। জর্জ বেশ এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। কীটসও এমনি এক মুক্তির কথা ভাবছে; বন্ধু চার্লস ব্রাউন মুক্তির সুযোগ এনে দিল। স্কটল্যাণ্ডের পথপ্রান্তর—পাহাড় আর হ্রদে ভরা প্রকৃতির এক বিচিত্র শোভা: কবিত্বের লোভনীয় খাদ্য। ব্রাউনের সাথে কীটস স্কটল্যাণ্ডে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন, জর্জও তাদের সঙ্গ নিল। লিভারপুল পর্যন্ত সে তাদের সাথে গেল। সেখান থেকে সে আমেরিকার জাহাজ ধরল। অসুস্থ টম হ্যাম্পষ্টেডে ওয়েল ওয়াকে পোষ্টম্যান ব্যাণ্টলে ও তার স্ত্রীর কাছে থাকল। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগল।

ওদিকে অবিশ্রান্ত ঘোরা—অপ্রচুর ও অনুপযুক্ত খাদ্য—কীটসের স্বাস্থ্য ভেঙে দেয়। জলপথে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। হ্যাম্পষ্টেডে ১৮ই আগষ্ট পৌছেন। ওয়েল ওয়াকে টমের সাথে থাকেন। বিরক্তিকর জীবন, অস্বস্তিকর পরিবেশ। কীটস বেইলীকে তাঁর মনের প্রতিলিপি নির্দেশ করেছেন—

'My love for my brothers from the early loss of our parents and even for (from) earlier misfortunes has grown into an affection passing the love of women.' তিনি এমন এক নারী খুঁজছিলেন—'one among them with a fire in her heart like the one that burns in mine.'

কিন্তু নারীদের সাথে তিনি মেলামেশা করতে পারতেন না। কেন না, নারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব যথোপযুক্ত বলে তিনি মনে করতে পারতেন না। ১৮ই জুলাইয়ের চিঠিতে তাঁর এই মনের কথাই তুলে ধরেছেন।—"You must be charitable and put all this perversity to my being disappointed since boyhood." "Whether Mister John Keats five feet high likes them or not" নারীদের সে সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথাই নেই, একথা জেনে তিনি নিশ্চিন্ত। নিজের সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল—I cannot believe that there ever was or ever could be anything to admire in me especially so far as sight goes—I cannot be admired, I am not a thing to be admired. কবিখ্যাতিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন। বিপুল বিত্তের অধিকারীও নন। রূপ বা স্বাস্থ্যের গর্বও তিনি করতে পারেন না। একজন অতি সাধারণ মানুষ তিনি। আশা ভরসারও বালাই নেই। টম মৃত্যুতে ধুঁকছে। নিজের শরীর কাহিল। ভবিষ্যতের পানে আশাভরা আহ্লাদে তাকানো যাচ্ছে না। অন্ধকার পথহীন জীবনের দিশেহারা অবস্থায় মন মুক্তি খুঁজছে, এক প্রেমাস্পদা সৌন্দর্যময়ী নারীকে কামনা করছে, তার স্বপ্ন ও কল্পনা মনকে ক্ষণিকের তরে বাস্তব জীবনের হতাশা ও বেদনার হাত থেকে রেহাই দিচ্ছে।

যৌবন জীবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ, অন্য তরঙ্গের আসঙ্গলিপ্সা তার স্বাভাবিক প্রবণতায় ও প্রবৃত্তিতেই নিহিত। তাই একটি নারী ও

একটু প্রেম কামনা করা বুঝি এ বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু কীটসের জীবনে কোথায় সে নারী ?

সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হ্যাম্পষ্টীডে থাকাকালে তিনি একজন নারীকে দেখলেন। পরে তাকেই তিনি লিখেছিলেন, "If you should ever feel for man what I did for you at first sight, I am lost." তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বাঞ্ছিত নারীর সন্ধান তিনি পেলেন। তাঁর মনে প্রেমের রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ল। জীবন উঠল ভরে। এই অতি সাধারণ লোকটির জীবন অনন্যসাধারণ এক মহিমা লাভ করল।—"I never knew before what such a love as you have made me feel was ; my Fancy was afraid of it ; lest it should burn me up." প্রেমের দৃপ্ত আগুনে প্রদীপ্ত হবার শক্তি তাঁর কোথায় ? এ কি তাঁকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে না ? তাঁর এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

যাহোক, এই প্রেম তাঁর জীবনে নিয়ে এল প্রচণ্ড জীবন-তৃষ্ণাজনিত এক দুর্জয় আবেগ। এর স্বীকৃতি মিলছে রেনল্ডের কাছে লেখা এক চিঠিতে: 'I never was in love yet the voice, and the shape of a woman has haunted me these two days—at such a time when the relief, the feverous relief of Poetry seems a much less crime—This morning Poetry has conquered—I have relapsed into those abstructions which are my only life—I feel escaped from a new strange and threatening sorrow—and I am thankful for it. There is an awful warmth about my heart like a load of Immortality. Poor Tom—that woman—and Poetry were ringing changes in my senses.—now I am in comparision happy.'

প্রেম কি শুধু কামনা ? এই কামনা চেতনার ভাঁজে ভাঁজে বাসনার আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রাণ ও সত্তাকে ভূমি থেকে ভূমার দিকে নিয়ে যায়। ধূসর মাটিতে আকাশের নীলাঞ্জন প্রলেপ বুলিয়ে দেয় কি প্রেম ? একটি নারী—মনের মত নারী—কামনা, তার সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভ, এবং তার ফলে চিত্তে আনন্দ বেদনার জোয়ার ভাঁটার খেলাই কি প্রেম ? এ কোন নারী—সুন্দর দেহধারী, কামনার মাংসল প্রতিরূপ, না, এক বিশেষ মনসম্পন্ন, রুচিশীলা অপরূপ সত্তা ? দেহে সৃষ্টি করে রূপজমোহ, মন গুণগ্রাহিতা—রূপজমোহ কালক্রমে কেটে আসে, গুণগ্রাহিতা পায় না চিরকালীন নির্ভর। সুতরাং দেহ বা মন থেকে যে প্রেম উপজাত, তা যায় মিলিয়ে। কীটসের নারী ফ্যানী ব্রণ। রূপসী বা অশেষ সুন্দরী ছিলেন না ফ্যানী। তবে কীটস জানতেন "O love adds a precious seeing to the eye." প্রতি প্রেমিকের চোখেই তার প্রিয়া অদ্বিতীয়া। ফ্যানী মোটামুটি নারীসুলভ সৌন্দর্যের অধিকারিণীই ছিলেন। এই সৌন্দর্য কীটসকে আকর্ষণ না করেছিল এমন নয়। তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি: "Why may I not speak of your beauty since without that I could never have loved you ? I could not conceive any beginning of such a love as I have for you but beauty." আর বিশেষ রুচি ও মনসম্পন্ন সত্তার অধিকারী না হলে কোনো নারী তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারত না, "they are trash to me." কিন্তু দেহ ও মনের বিশিষ্টতা-জনিত আকর্ষণ নিয়ে প্রেমের গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না। সে প্রেম ক্ষণিকের। আর যে প্রেম ক্ষণিকের তাকে নিয়ে বিলাস করা চলে, কাব্য করা চলে কিন্তু জীবনযাপন করা যায় না, জীবনের মাঝে তার আসন রচনা করবার আশ্বাস পাওয়া যায় না। প্রেম তোল এক অখণ্ড নারীর পরিপূর্ণ কামনা। সে কামনা সমগ্র জীবনকে জ্বালিয়ে তোলে, উদ্বোধিত ও জাগ্রত করে তোলে, চেতনার ভাঁজে ভাঁজে সত্তার পরতে পরতে আলোক সঞ্চার করে, তার সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দেয়।

কিন্তু এ প্রেম তো সহজে ঘটেনা। কোথায় সে নারী, কোথায় সে পুরুষ, কোথায় তাদের সত্তার এই নিবিড় ও একান্ত পরস্পর পরিচয় ? কত ভুল বুঝবার সম্ভাবনা, অপরিচয়ের শত বাধা, মানসিকতার কত পার্থক্য, 'ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি' বরণ করে নেবার প্রসারতার কী অভাব ! তাই প্রেমের প্রকাশের জন্য চাই বিস্তৃত অবকাশ, নিবিড় সান্নিধ্য, প্রত্যক্ষ মেলামেশার সুপ্রচুর মুহূর্ত।

টমের মৃত্যু ঘটল ১লা ডিসেম্বর। কীটস হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। জীবন থেকে একটা অস্বস্তির ভার যাহোক নেমে গেল। বন্ধু ব্রাউন ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেসে কীটসকে নিমন্ত্রণ করলেন। কীটস সানন্দে ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেসে কিছুদিনের জন্য গেলেন। ওখানে পুরানো বন্ধু ডিল্কিরাও ছিলেন। ব্রাউন আর ডিল্কিদের কাছে ব্রনসের প্রায় গতায়াত ছিল। তাই ব্রনসের সঙ্গে কীটসের আলাপ জমে উঠল। বড়দিনে ব্রাউন ও ডিল্কিরা ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেস থেকে চলে গেলেও কীটস থেকে গেলেন। ফ্যানী ব্রনের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশা কেবল অব্যাহত রইল না, নিবিড় হয়ে উঠল ক্রমে। ফ্যানী ব্রন কীটসের বোনকে তিন বছর পরে এসময়কার স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছিলেন:—

'We dine with (the Dilkes) on Christmas Day which is like most people's Christmas days melancholy enough. What must yours be ? I ask the question in no exultation. I cannot think it will be much worse than mine, for I have to remember that three years ago was the happiest day I had ever than spent, but I will not touch on such subjects for there are much better times and ways to remember them.' এ সময়কার তাদের মেলামেশা সম্পর্কে কীটস লিখেছেন: Miss Brawne and I have every now and then a chat and a tiff.'

এই বড়দিনেই কোনো এক মুহূর্তে কীটস ফ্যানীর কাছে তাঁর সত্তার উপজাত প্রেমের বার্তা নিবেদন করেন। ফ্যানীর স্বীকৃতি মিলতেও বুঝি সেদিন আর দেরী হয়নি। সেই মুহূর্তটি এই দু'জনের জীবনে স্বর্গীয় ক্ষণ। দু'টি সত্তার পরস্পর পরিচয় ও স্বীকৃতিতে জীবনের মূল্য সেদিন লাভ ঘটেছিল তাঁদের। তাতেই তাঁদের জীবন ধন্য হয়ে উঠল। সে আনন্দ—সে অমৃতই হোল এই মানব-জীবনে প্রেমের দান। তিন সপ্তাহ পরে এই আনন্দময় মুহূর্ত

উপলব্ধি করে কীটস লিখলেন "The Eve of St. Agnes" কবিতাটি।

ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন। তাই ফ্যানী ও কীটসের ব্যবধান গেল আরও ঘুচে, তারা হোল নিকটতর। ৩রা এপ্রিল। ডিল্কীরা ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেসে তাদের বাসা ছেড়ে ওয়েষ্টমিনষ্টারে চলে গেলেন। সেই ঘরে এসে উঠলেন ব্রনরা। এখন কীটস আর ব্রনরা হলেন একই বাড়ীর বাসিন্দা। এক ঘর ছাড়া যতটা নিকটতর হওয়া সম্ভব তা-ই হলেন এই প্রেমিকযুগল। পাশাপাশি ঘরে দু'জন থাকেন। এপাশ থেকে ইনি দেয়ালে টোকা দেন, ওপাশ থেকে তার সাড়া আসে। কত কথা, কত আলাপন, "মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি" সমস্ত উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় পরস্পরের কাছে। এতটুকু বাদ থাকে না, থাকে না তিলেক খাদ। তার ওপর বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। তাঁদের জীবনেও আজ বসন্তের মদির পুষ্পিত প্লাবন ডেকেছে। দু'জনে বাগানে বেড়াতে থাকেন। পাশাপাশি। যত খুশী। হৃদয়ের যেমন চাওয়া। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! এর বেশী মানুষ আর কী চাইবে? তাই এই হোল কীটসের জীবনের সোনার দিনগুলি। তাঁর অন্তরতম সত্তা তাই "পুলক মুকুল অবলম্ব বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব।"—'the richness, the bloom, the full form, the enchantment of love after my own heart.' Hyperion এর শেষ canto, The Eve of St. Mark, Androneda Sonnet, La Belle Dane, Ode to Autumn ছাড়া অন্যান্য odeগুলি এসময়ই লেখা। তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সীমাস্বর্গে তিনি উপনীত হন এভাবে।

কিন্তু এরপর এল বিচ্ছেদের দিন। বিরহ প্রেমের গাঢ়তা ও আকর্ষণ পরীক্ষা করে। বিচ্ছেদ প্রেমের মাঝে বৈচিত্র্য এনে দেয়। প্রেমতত্ত্বে বিরহের মহিমা কীর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে বিচ্ছেদ মিলনের ইঙ্গিত দেয় না, যে বিরহ মিলনের প্রগাঢ়তাকে ব্যঞ্জিত করেনা, সে বিচ্ছেদ বা বিরহের মাঝে বঞ্চনার মোহময় কাল্পনিক কোনো আস্বাদ থাকতে পারে, কিন্তু জীবন যায় বরবাদ হয়ে, এবং জীবনক্ষেত্রে তার মূল্য দেবার মত মূঢ় কেউ নেই। তার মূল্য দিতে হয় সারাটা জীবন দিয়েই। প্রতাপ এই মূল্য দিয়েছে, দেবদাস দিয়েছে, চারুদত্ত আধারকার দিয়েছে।

কীটসের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন অ্যাবী। এক মামলা রুজু হয়েছিল তাঁদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে। তাই কীটসের বরাদ্দ টাকা বন্ধ। বন্ধুদের কাছে ধার করেই একরকম দিন কাটছিল তাঁর। বিশেষ করে বন্ধু ব্রাউনের টাকাই হয়েছিল তাঁর সহায়। ব্রাউনের বাড়ীতেই তিনি ছিলেন। এই বাড়ীটা ব্রাউন গ্রীষ্মকালে ভাড়া দিতেন। লণ্ডন থেকে অনেকে বেড়াতে আসত এসময়টা। বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে ব্রাউন বেশ কিছু রোজগার করতেন। ব্রাউনের রোজগারের এটা একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। তাই কীটস ঐ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হলেন। জুনের শেষাশেষি ফ্যানীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করলেন। বিধিবদ্ধ ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে তিনি অস্বীকার করলেন। এ বিষয়ে তিনি সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয়ই দিলেন। ১লা জুলাই শাঙ্কলীনে পৌঁছেই ফ্যানীকে চিঠি লিখলেন:

'As I told you a day before I left Hampstead, I will never return to London if my Fate does not turn up Pam or at least a courtcard.... I must live upon hope and chance.' আরও লিখলেন: Do understand me, my love, in this, I have so much of you in my heart that I must turn rentor when I see a chance of harm befalling you. I would never see anything but pleasure in your eyes, on your lips and happiness in your steps. I would wish to see you among those amusements suitable to your inclinations and spirits; so that our loves might be a delight in the midst of pleasures agreeable enough, rather than a resource from vexations and cares. But I doubt much, in case of the worst, whether I shall be philosopher enough to follow my own lessons; if I saw my resolution give you a pain I could not.'

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ধার করে কদ্দিন চলবে। কী করা যায়? কীটস ভাবতে থাকেন। এডিনবরাতে গিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখা ও চিকিৎসক হওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু এতে টাকার দরকার, যা তাঁর একেবারে নেই; উপরন্তু ফ্যানীর সাথে বিচ্ছেদ। কিংবা, তাঁর যা বিদ্যা আছে, তাতে করে শল্য-চিকিৎসকরূপে ভারতে আসা। এতে টাকার দরকার নেই বটে, কিন্তু ফ্যানীর কাছ-ছাড়া হতে হয় একেবারে। সাংবাদিকদের বৃত্তি গ্রহণ করলেও মন্দ হয় না, কিন্তু কবি মন তাতে উৎসাহ পায় না। ব্রাউনের সহযোগিতায় নাটক লেখা এবং জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী কাব্য-কবিতা রচনা করলে কিছু অর্থ আসতে পারে। তিনি শেষের কাজটিই অবলম্বন করলেন। কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাইলেন, যাতে করে ফ্যানীর প্রতি তাঁর দুর্বার কামনার জ্বালা ভুলে থাকতে পারেন। কিন্তু এই প্রেমই তো সোনার কাঠির মত তাঁর কবিচেতনাকে জাগিয়ে তুলে প্রকাশের পত্রে পত্রে সাজিয়ে দেয়। একে অস্বীকার করা মানে তো কবিচেতনার উৎসকে রুদ্ধ করা। এদিকে জনসাধারণের জন্য লিখতে চান, অথচ জনসাধারণের প্রতি তাঁর অনুকম্পার আর অন্ত নেই। এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে—এই প্রতিকূলতার সংগ্রামে তাঁর অন্তর্লোক বিপর্যস্ত হতে থাকে। এসময়কার মনোভাবটি তিনি বন্ধু টেলরের কাছে ব্যক্ত করেছেন,—"I equally dislike the favour of the public with the love of a woman. They are both a cloying treacle to the wings of independence."

লণ্ডনে গিয়েও তিনি ফ্যানীর সাথে দেখা করেন না। কেন না, আবার তো বিচ্ছেদ ঘটবে। লণ্ডনে গিয়ে সাংবাদিক হতেও তাই আপত্তি।—"I should not like to be so near you as London without being continually with you."

কীটসের হৃদয়ে বিচ্ছেদে বেদনা যেরূপ আঘাত হেনেছিল, ফ্যানী হয়ত ততটা হৃদয়ঙ্গম করেননি। দিন কাটার সাথে সাথে ফ্যানীও কীটসের বিচ্ছেদ মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন। পরস্পরের মাঝে প্রেম যে সঞ্চারিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট বোঝা গেল।

আগষ্টের শেষে কীটসের দুর্ভাগ্য আরও ঘনিয়ে এল। তাঁর একটি ট্র্যাজেডি নাটক অভিনীত হচ্ছিল। তার সাফল্য যে অভিনেতার উপর নির্ভর করছিল, তিনি হঠাৎ আমেরিকা চলে গেলেন। তাঁর রোজগার গেল এক রকম বন্ধ হয়ে। ওদিকে জর্জ আমেরিকায় সমস্ত হারিয়ে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। ইংলণ্ডে যে আসবে তারও পাথেয় নেই। কীটস ফ্যানীর কাছে লণ্ডনে যান। টাকার আশায়। ফ্যানীর সাথে দেখা করেন না—'I love you too much to venture to Hampstead. I feel it is not paying a visit, but venturing into a fire." তাঁদের সম্পত্তির শোচনীয় অবস্থার কথা অ্যাবী ভালো করে বুঝিয়ে দেন। সাংবাদিক হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ১লা অক্টোবর তিনি ডিল্কেকে চিঠি লেখেন লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনষ্টারের কাছে সস্তার একটা বাসা জোগাড় করে দেবার জন্যে। জর্জকে টাকা পাঠাতে হবে, অথচ নিজেরই টাকা নেই। কীটস কিন্তু ভেঙে পড়লেন না, দমে গেলেন না, বীরের মত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। আর ভালোভাবেই বুঝলেন, ও জীবনে আর ফ্যানীকে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই 'Knowing well that my life must be passed in fatigue and trouble, I have been endeavouring to wean myself from you.' তবে আবার এও বোঝেন, 'As far as they regard myself I can despise all events but I cannot cease to love you.'

প্রেমের দুর্নিবার জ্বালা আর বুঝি সহ্য হয় না। প্রেমের দাবীকে অস্বীকার করে জীবনসংগ্রাম করতে গিয়ে কীটস অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন। একজাতীয় নঙর্থক বিদ্রূপাত্মক মনোভাব দেখা দেয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর জর্জকে চিঠিতে লেখেন: "Nothing strikes me so forcibly with a sense of the ridiculous as a man in love. Even when I know a poor fool to be really in pain about it, I could burst out laughing in his face." এ সময়ই প্রেমিকদের চাপল্য অবলম্বন করে বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলি লেখেন। "The Eve of St. Agnes"এর রূপান্তর ঘটান।

মনের সাথে যুদ্ধ করে আর বুঝি পারেন না। ১০ই অক্টোবর তিনি ফ্যানীর কাছে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন, ফ্যানীও তাঁর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁকে দেখে তাঁর চোখ চকচক করে উঠল, সমস্ত সত্তায় আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ হিল্লোলিত হয়ে গেল। কীটস বুঝলেন, "আমি যে তোমার ওগো, তুমি যে আমার।"

নিজের বাসায় ফিরে এসে পরদিন ফ্যানীকে লিখলেন, 'I am living today in yesterday.' দু'দিন পরে ফ্যানীকে আর একখানি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিটি তাঁর মনের চিঠি। তাই তার কিছু অংশ তুলে দেওয়া গেল: 'The time is passed when I had power to advise and warn you against the unpromising morning of my life. My love has made me selfish. I cannot exist without you. I am forgetful of everything but seeing you again—my life seems to stop there—I see no further. You have absorb'd me. I have a sensation at the present moment as though I was dissolving—I should be exquisitely miserable without the hope of soon seeing you. I should be afraid to seperate myself far from you. My sweet Fanny, will your heart never change? My love, will it? I have no limit now to my love. Your note come in just here. I cannot be happier away from you. 'Tis richer than an Argory of Pearls. Do not threat me even in jest. I have been astonished that men could die Martyrs for religion—I have shudder'd at it. I shudder no more—I could be martyr'd for my Religion—Love is my religion—I could only die for that. I could die for you. My creed is love and you are its only tenet. You have ravish'd me away by a Power I cannot resist; and yet I could resist till I saw you; and even since I have seen you I have endeavoured often 'to reason against the reasons of my love.' I can do that no more—the pain would be too great. My love is selfish. I cannot breathe without you.'

না, আর পারা যায় না। দুঃসহ এ বিচ্ছেদ। ১৬ তারিখে ফ্যানীর কাছে আবার ছুটেন। তিন দিন তার কাছে থাকেন। আবার পালিয়ে আসেন তার কাছ থেকে। এ মিলন তো ক্ষণিকের, চিরমিলনের আশা কোথায়? তিনি তাঁর জীবনের দায় ও দায়িত্ব পালন করছেন কোথায়? এভাবে তো চলে না। ফ্যানীর কাছ থেকে চলে এসেই তিনি তাঁকে লিখলেন:—

'On awakening from my three days dream I find one and another astonish'd at my idleness and thoughtlessness....I must be busy or try to be so....I should like to cast the die for love or death. I have no patience with anything else.'

কীটসের জীবনের এপর্ব এভাবে আশানিরাশা, পাওয়া-না-পাওয়া প্রভৃতিও বিবেকের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। প্রেমের এই বহ্নিজ্বালায় তাঁর জীবন জ্বলতে থাকে—এই প্রজ্বলন একদিকে যেমন প্রকাশের জ্যোতিতে হয়েছে উদ্ভাসিত, অন্যদিকে তেমনি তাঁর জীবনকে দিয়েছে নিঃশেষ করে।

'Once again the fierce dispute
Betwixt hell-torment and impassioned day
Must I burn through.'

এসময়কার লেখা হোল—The Cap and Bells, The Day is Gone, Lines to Fanny, Ode to Fanny, I cry your Mercy, ইত্যাদি।

ওয়ালথ্যামষ্টোতে মাঝে মাঝে তিনি বেড়াতে যেতেন। বোনের কাছে। কিন্তু এবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে একবার মাত্র যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড়দিনে যাবেন বলে বোনকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। তার কৈফিয়ৎ হিসেবে লিখেছিলেন, "I am sorry to say, I have been and continue rather unwell.' তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

১৮২০-র জানুয়ারীতে আমেরিকা থেকে জর্জের হঠাৎ আবির্ভাব। অ্যাবীর কাছে অবশিষ্ট যা পাওয়া যায় তা-ই সংগ্রহ করবার আশায়। কীটস নিজের শরীরের কথা চেপে গিয়ে জর্জের কাছে সুস্থ ও আশা-প্রোজ্জ্বল জীবন্তভাবের মুখোশ পরে দেখা দিলেন। তার সাথে ঘুরে ঘুরে শহরের মজলিস ও সামাজিকতায় যোগদান করলেন। জর্জ ২৮শে জানুয়ারী লিভারপুল হয়ে আবার আমেরিকা চলে গেল।

বেশিদিন বিলম্ব হোল না, কিছুদিন পরেই এর ফললাভ ঘটল—৩রা ফেব্রুয়ারী কীটসের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত—'On the night I was taken ill, when so violent a rush of blood came to my lungs that I felt nearly suffocated—I assure you I felt it possible I might not survive, and at that moment thought of nothing but you.'

কীটস তাঁদের অঙ্গীকার ভেঙে ফেলতে চান। কেননা, এ জীবনে আর ফ্যানীকে পাওয়া গেল না। অতএব বিচ্ছেদই ঘটুক। ফ্যানী তাঁর পরমপ্রিয়ের মনোভাব বুঝলেন। এই অসুস্থ ছোট্ট মানুষটির মনোবেদনা। তিনি অঙ্গীকার ভাঙলেন না। কীটস অন্তরের অন্তস্তলে এ চান না। তাই তাঁর অন্তরাত্মা ঘোষণা করে: 'I do not think I could bear any approach of a thought of losing you.' বন্ধু ব্রাউন চান না, ডাক্তারও বলেন, দু'জনের কাছাকাছি থাকা উচিত নয়। ফ্যানীর সঙ্গ কীটসের স্নায়ুতে পীড়ন ঘটায়। তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে। এ তাঁর শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। কীটস ও ফ্যানী তাই ব্রাউনের উপস্থিতিতে কখনো মিলিত হন না। ব্রাউন অনুপস্থিত থাকলে ফ্যানী কীটসের কাছে আসেন। কীটস ফ্যানীর বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে পরম শান্তি লাভ করেন। প্রেমের পরম তৃষায় প্রিয়ার 'নিতুই নব' রহস্যের সন্ধান পান কীটস—'I have vex'd you too much. But for love! Can I help it? You are always new. The last of your kisses was ever the sweetest; the last smile the brightest; the last movement the gracefullest. When you pass'd my window home yesterday, I was filled with as much admiration as if I had then seen you for the first time. You uttered a half complaint once that I only lov'd your beauty. Have I nothing else than to love in you but that? Do not I see a heart naturally furnish'd with wings imprison itself with me? No ill prospect has been able to turn your thoughts a moment from me. This perhaps should be as much a subject of sorrow as joy—but will not talk of that.....Brown is gone out —but here is Mrs. Wylie—when she is gone I shall be awake for you.'

ব্রাউনের বাড়ী গ্রীষ্মকালীন ভাড়া খাটবে—তাছাড়া ফ্যানীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্যে—কীটসকে কেণ্টিস টাউনে পাঠানো হোল। মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সেখানেই তাঁর কাটে। ফ্যানীর কাছ-ছাড়া কীটস, অর্ধ-কীটস। মনে কি নিদারুণ জ্বালা! তারপর জুলাইয়ে শুনতে পেলেন বন্ধুরা তাঁকে ইতালী পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন। তিনি তখনি বুঝলেন—'Tis certain I shall never recover if I am to be so long seperate from you.' কিন্তু কাকেও কিছু বলতে পারেন না। প্রথমতঃ, শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ; দ্বিতীয়তঃ, নিজস্ব অর্থ-সামর্থ্য নেই, বন্ধুদের সাহায্যেই তাঁর দিন কাটছে; তৃতীয়তঃ, বন্ধুদের শুভাকাঙ্খা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই; সর্বোপরি তাঁদের প্রেমের কথা উচ্চারণ করা মানে সাধারণ্যে প্রকাশ করা ও প্রচার হওয়া। তাঁদের প্রেমের কথা সমাজে প্রচারিত হোক, এ তিনি চান না। ফুল যেমন তার গন্ধকে পাপড়ির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে দেয়, তাঁরাও তেমনি তাঁদের প্রেমকে নিজেদের হৃদয়ের মর্মকোষে প্রচ্ছন্ন রাখতে চান। ফ্যানীকে তাই তিনি লিখেছিলেন, Your name never passes my lips, do not let mine pass yours.' কেবল বন্ধু টেলর ও শেলীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, ইতালী যাওয়া মানে তাঁর প্রাণ যাওয়া।

তিনি ইতালী যাওয়ার কথা ভুলে থাকতে চান। একে তো কেণ্টিস টাউনের এই বিচ্ছেদ, তার ওপর ইতালীর সুদূর প্রবাস! চিন্তারাজ্য থেকে এ ভাবনা দূরে থাকুক। মাঝে একবার লে হাণ্ট তাঁকে হ্যাম্পষ্টিডে বেড়াতে নিয়ে আসেন—ওয়েল ওয়াকে একটি বেঞ্চিতে দুজনে পাশাপাশি বসেন। কীটস লে হাণ্টকে বেণ্টলের বাড়ীর কথা—তাঁর ভাই টমের কথা—ফ্যানীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের কথা বলেন একে একে। বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন, জানান, ভগ্নহৃদয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটবে। এ ব্যাপার চরমে উঠে, যখন তিনি জানতে পারেন, ফ্যানীর একটি চিঠি তাঁর হাতে এসে পৌঁছয় নি। খবর পেয়ে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরে কাঁদেন, এবং সেই মুহূর্তে লে হাণ্টের বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন—সোজা চলে আসেন হ্যাম্পষ্টিডে—ফ্যানীর কাছে। সেখানে ফ্যানী ও ফ্যানীর মা অসুস্থ কীটসের সেবা শুশ্রূষা করতে থাকেন। ইংলণ্ডের মাটি ছেড়ে চলে যাবার আগে ক'টা দিন এভাবে প্রিয়া ও প্রিয়ামাতার সাহচর্যে দিনগুলো কাটসের কাটে। সেভার্ণ মিসেস ব্রণকে লিখেছেন: 'I wish many many times that he had never left you.' ...In your care he seems to me like an infant in its mother's arms.' ইতালী গিয়ে তিনি বন্ধুদের কাছে এ ক'দিনের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

ইতালী যাবার কথা শুনে ফ্যানীকে লিখলেন: I am tormented day and night. They talk of my going to Italy. 'Tis certain I shall never recover if I am to be so long seperate from you...' For myself I have been a Martyr the whole time.'

ইতালীর দিনগুলির কথা বলা বাহুল্য। কীটসের জীবনের রক্তক্ষরা সে-সব দিন। ঝরাপাতার মত প্রেমরসের অভাবে তাঁর জীবন ঝরে গেল। প্রিয়ার কাছ থেকে দূরে থেকেও—"My imagination is horribly vivid about her—I see her—I hear her. There is nothing in the world of sufficient interest to divert me from her for a moment." তাঁর একমাত্র বাসনা—"That I could be buried near where she lives?" তাঁর একমাত্র জীবন-বিলাস—"I have two luxuries to brood over in my walks, your loveliness and the hour of my death. O that I could have possession of them in the same moment!" কিন্তু সে আর তাঁর জীবনে হোল না। তাঁর এই একমাত্র বাসনা—ও জীবনবিলাস চরিতার্থ হোল না। স্বদেশ হতে দূরে বিদেশে—প্রিয়ার কাছ থেকে বহুদূরে—শেষ সাক্ষাৎ ও পূর্ণ পাওয়ার সমস্ত আশা থেকে বঞ্চিত হয়ে—মনোবেদনায় আর মর্মজ্বালায় পীড়িত হতে হতে—কীটসের প্রাণ বহির্গত হোল।

প্রেমই যে জীবন—কীটসের মৃত্যুই তার প্রমাণ হয়ে রইল॥

অদ্বৈতের সঙ্গে মিলল হরিদাস। দণ্ডবৎ প্রণাম করল। অদ্বৈত তাকে বদ্ধ করল আলিঙ্গনে।

নির্জনে গঙ্গাতীরে ছোট একটি ঘর বা গোফা তৈরি করে দিল। এখানে বসে তুমি ভাগবতের আর গীতার ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শোনাও।

ভক্তি দশ রকম। এক সাধন-ভক্তি আর ন' রকম সাধ্যভক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত রতি বা প্রেমাঙ্কুর না জন্মায়, ততক্ষণ সাধন-ভক্তি। আর সাধ্যভক্তি রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব আর মহাভাব।

রতি হচ্ছে ভালোবাসার উদয় ঊষা। রতি গাঢ় হলেই প্রেম। শ্রীকৃষ্ণে মনোগতি অবিচ্ছিন্না—অনন্যমমতাই প্রেমভক্তি। প্রেম পরম কাষ্ঠায় পৌঁছে যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তা স্নেহ। স্নেহ গাঢ় হয়ে যখন বক্রতা বা কুটিলতা অবলম্বন করে নবতন মাধুর্য আস্বাদের লোভে, তখন তা মান। মান যখন গাঢ় হয়ে সম্ভ্রম বা সঙ্কোচবোধ বর্জন করে, তখন তা প্রণয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে কঠিন দুঃখও যখন সুখের মত অনুভূত হয়, তখন তা রাগ। রাগ যখন নতুন বৈচিত্রী ধারণ করে প্রিয়কে নতুনতরো অনুভবে আনন্দিত করে, তখন তা অনুরাগ। অনুরাগে মাধুর্যতৃষ্ণার উপনাম নেই। 'তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।' অনুরাগের উৎকর্ষে যখন অশ্রুকম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক চিহ্ন দেহে ফুটে ওঠে, সমস্ত বিধি-নিষেধকে নস্যাৎ করে দেয়, তখন তা ভাব। আর ভাবে যখন প্রিয়মিলনহেতু আনন্দের উন্মত্ততা জাগে, তখনই তা মহাভাব।

আর গীতা কী বলে?

গীতা বলে, মৎকর্মপরমো ভব। আমার প্রীতির জন্যে কাজ করো। শ্রবণ কীর্তন অর্চন-বন্দন করো। যদি তা না পারো, আমাতে যুক্ত হয়ে সর্বকর্মফল ত্যাগ করো। অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে আরো বড় কর্মফলের পরিহার। আর সেই ত্যাগেই পরা শান্তি।

ভগবানের প্রিয় হও।

কে ভগবানের প্রিয়?

যে কাউকে দ্বেষ করে না, সকলের প্রতি যে মিত্রতাভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে সমচিত্ত, যমী, সদানন্দ, সমাহিতচিত্ত ও সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী আর ঈশ্বরে শরণাগত, সেই
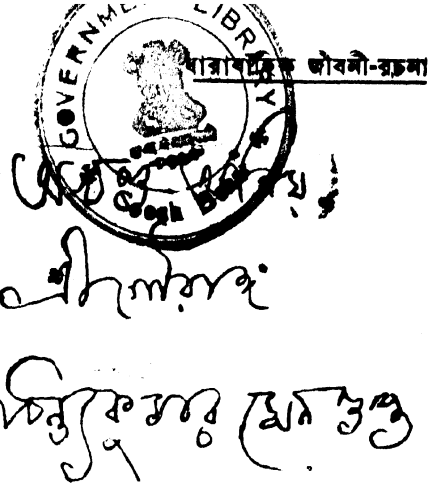
ভগবানের প্রিয়। যে কাউকে উদ্বিগ্ন করে না, বা যাকে কেউ উদ্বিগ্ন করতে পারে না, যার হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, কিছু নেই, যে নিস্পৃহ, অনলস, শুচিসুন্দর ও উদাসীন, যার মন পীড়িত বা ব্যথিত হতে জানে না, বা যে ফল কামনা করে কর্মারম্ভ করে না, সেই ভক্ত, সেই ভগবানের প্রিয়। যে হৃষ্ট হয় না, দ্বিষ্ট হয় না, যে বীতশোক বীতাকাঙ্ক্ষ, শুভাশুভ বিচার করে কাজে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ যার কর্ম পুণ্য বা পাপদ্বারা প্ররোচিত নয়, যার শত্রু-মিত্রে, শীতে-উষ্ণে, সুখে-দুঃখে, মানে-অমানে, নিন্দা-স্তুতিতে সমবুদ্ধি, যে সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমতাভিমান-শূন্য, অথচ যে স্থিরমতি, সেই ভক্তিমানই ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রিয়ত্ব অর্জনে যত্নপর হও।

হরিদাস অদ্বৈতকে বললে, 'তুমি আমাকে কেন রোজ খেতে দিচ্ছ? এখানে প্রকাণ্ড কুলীন-সমাজ, মহা-মহা বিপ্র সব উপস্থিত, আমার মত নগণ্য-নীচকে আদর করতে তোমার ভয় হয় না? কে জানে, তোমার হাতের সেবা নিতে আমারই বোধ হয় অপরাধ হচ্ছে।'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি খেলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের সমান হয়।'

'কী যে বলো।'

'আমি যা করছি, সব শাস্ত্রমত।'

সহজ কথা নয়, অদ্বৈত শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাল হরিদাসকে।

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করাতে নিষেধ আছে শাস্ত্রে। হরিদাস ভক্তিযোগে ব্রাহ্মণাধিক হয়ে উঠেছে। তাই তাকে

তার পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াতে দ্বিধা করল না অদ্বৈত।

কিন্তু অদ্বৈতের আত্মীয়রা রুষ্ট হল। তারা জলস্পর্শ করলে না। কাজে কাজেই সবান্ধবে অদ্বৈতও উপবাসী রইল সেদিন।

পরদিন গিয়ে আত্মীয়দের ফের অনেক অনুনয় বিনয় করল অদ্বৈত। না খাও সিধে নাও, নিজেরা রান্না করে খাও। এ প্রস্তাবে রাজি হল কুটুম্বেরা। কিন্তু আগুন কই? আগুন ছাড়া রাঁধি কি করে?

দারুণ বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। আর সেই বৃষ্টিতে সারা গাঁয়ের আগুন নিবে গেল। শুধু সেই গ্রামে নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামেও। কুটুম্বরা আগুন পেলনা কোথাও। ফলে রান্না করা হলনা। ব্রাহ্মণের দল অভুক্ত রইল। ক্রমে বাড়তে লাগল খিদের তাড়না। একটা কিছু বিহিত না করলে যে মারা যাই।

কুটুম্বেরা বুঝল এ অদ্বৈতের কাণ্ড। তারই প্রভাবে ঘটেছে এ অঘটন। কিন্তু উপায় কী? উপায় নেই, নিয়ে এস গত কালের বাসি ভাত। তাই খাব। খিদের জ্বালা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

সবাইকে নিয়ে অদ্বৈত হরিদাসের গোঁফায় এসে উপস্থিত হল।

সকলে দেখল হরিদাসের গোঁফায় আগুন জ্বলছে মৃৎপাত্রে। গ্রামে সমস্ত আগুন নিবাপিত কিন্তু হরিদাসের আগুন অনির্বাণ।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্যে অদ্বৈত যখন গঙ্গাজল-তুলসীতে পূজা করছে তখন একই উদ্দেশে হরিদাস নামকীর্তন করছে তার গোঁফাতে। অদ্বৈতের হুঙ্কার হরিদাসের কাতরতা। 'দুই জনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।'

একদিন হরিদাস গোঁফায় বসে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্তন করছে, এক পীতজ্যোতি নারী তার অঙ্গনে এসে দাঁড়াল। অঙ্গ-গন্ধে আমোদ হয়ে উঠল দশদিক!

এ নারী আর কেউ নয়, স্বয়ং মায়াদেবী। বহিরঙ্গা মায়া। যার কাজই হচ্ছে জীবকে বিভ্রান্ত করে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের দিকে টেনে নেয়।

আর, ভক্তিই কৃষ্ণ-উন্মুখিনী। ভক্তিই চিত্তবৃত্তিকে টেনে নেয় কৃষ্ণের দিকে। শাশ্বত আনন্দের আকরের দিকে।

এ নিয়ে তর্ক তুলতে চাও। এ তর্কাতীত, চিন্তারও অগোচর। হরিদাসের আচরণও অচিন্ত্য। যা অচিন্ত্য তার নির্ণয় হয়না তর্কে।

'তুমি বন্দনীয়, বরণীয়।' হরিদাসকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললে মায়াদেবী। 'তোমার সঙ্গ করতে আমি এসেছি। রূপে-গুণে তোমার মত অগ্রগণ্য আর কে আছে? দীনে দয়া করাই যদি সাধুস্বভাব হয় তা হলে সদয় হয়ে আমাকে অঙ্গীকার করো। আমাকে অস্বীকার কোরো না।'

যে লাস্যে হাস্যে মুনির ধৈর্যনাশ হয় তাই দেখাতে লাগল মায়া। কিন্তু হরিদাস নির্বিকার। কামকটাক্ষ তাকে কী করবে? সে কৃষ্ণাবেশে ভরপুর।

সেই পুরোনো কথাই বললে ফের হরিদাস। বললে, 'প্রত্যহ আমি এক মহাযজ্ঞ করছি। তার নাম সংখ্যানাম-সঙ্কীর্তন। সে কীর্তন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কাজ করি না। সুতরাং তোমার অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। তুমি দ্বারে বসে শোনো আমার নামধ্বনি। নাম শেষ হলেই তোমার প্রীতিসাধন করব।'

প্রতীক্ষায় তীক্ষ্ণ হয়ে দ্বারদেশে বসল মায়া।

আগের মতই প্রভাত হয়ে গেল রাত্রি। রাত্রিই যদি চলে যায়, মায়া থাকে কী করে?

তিন-তিন দিন ঘুরে গেল মায়া। যে সব হাবভাবে ব্রহ্মারও মন টলে, তাই উদ্ঘাটিত করল। কিন্তু এ সব অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছু নয়। কৃষ্ণ নামাবিষ্ট হরিদাসের মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই।

'আর কতদিন আমাকে বঞ্চনা করবে?' মায়া আহতের মত বললে, 'রাত্রিদিনেও তোমার নাম সাঙ্গ হবে না?'

'কী করব, নিয়ম করেছি, তা ভাঙি কি করে?'

'আশ্চর্য, কত শত দেবতাকে মোহাচ্ছন্ন করলাম, আর তোমার কাছে হার মানতে হল?' মায়া বললে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে। 'তুমি মহাভাগবত. তোমাকে দেখে আর তোমার নাম গান শুনে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। মন এখন কেবল কৃষ্ণ নাম বলতে উৎসুক। আমাকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ করো। দীক্ষা দাও কৃষ্ণ-নামে।'

'এর আর দীক্ষা কী. উপদেশ কী!' হরিদাস বললে. 'শুধু কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন করো।'

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' মায়াদেবী বললে. 'শিবের থেকে রাম নাম পেয়েছিলাম, এখন তোমার থেকে পেলাম কৃষ্ণনাম। রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক।'

মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে করে প্রেমদান॥

তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ। ভগবানের যত নাম আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাম আর কৃষ্ণ। রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক। রামনাম ত্রাণ করে কৃষ্ণনাম পার করে, মানে, প্রেম দেয়। যে মুক্তি চাও সে রামনাম করো আর যে প্রেম চাও সে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। রামনামে শুধু কাশীবাসের ফল আর কৃষ্ণনামে ঋদ্ধিবৃদ্ধির সমাগম। প্রেমের সমুচ্ছ্বাস, অখণ্ড পরমানন্দ। যে কৃষ্ণ নাম করে সে প্রেমবিহ্বল হয়ে কখনো কাঁদে, কখনো নাচে, কখনো গান গায় কখনো বা মূর্ছিত হয় ভূতলে। অশ্রুপাতঃ ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমার্তিবিহ্বলঃ। ক্বচিত্তস্থ মহামূর্ছা মদগুণো গীয় ত ক্বচিৎ।

মায়া দেবী আবার বললে, 'আমাকে সেই কৃষ্ণ-নাম দাও, কৃষ্ণনামই সেবা করব আমি, আমাকে ভাসিয়ে দাও প্রেমবন্যায়।'

কৃষ্ণনামে দেহ সেবো, কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥

মায়া দেবী হরিদাসকে প্রণাম করল। নামরসে যার চিত্ত নিমগ্ন, দেহভোগের প্রলোভন তাকে কী দেবে? ইন্দ্রিয়সুখের চেয়েও তীক্ষ্ণতর নামসুখ। যে নাম পেয়েছে, তাকে কাম আর টলাতে পারে না। নামের কাছে কাম হতমান, নতশির। ব্রহ্মা টলতে পারে, কিন্তু নামনিষ্ঠ নামনিষিক্ত ভক্ত নির্বিচল।

হরিদাস বললে, 'কৃষ্ণকীর্তন করো।'

কৃষ্ণনাম এমনিতেই মধুর, আর, আহা, প্রেমিক ভক্তের মুখে আরো মধুর।

মায়াদেবী নাম-প্রেম চাইবে, তাতে আর বিস্ময় কী। শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন এই নাম-প্রেমের আকর্ষণে।

কিন্তু প্রেমের জন্যে শুধু নাম নয়, সাধুকৃপারও প্রয়োজন। 'সাধুকৃপা নাম বিনে প্রেম নাহি হয়।' সাধুকৃপা সম্বল করে নামাশ্রয়ী হলেই তবে প্রেম মেলে।

মায়া পরাভূত হল। দ্রবীভূত হল নাম-প্রেমে।

ক্ষণকালের জন্যেও গোবিন্দ নামে বিরতি-বিরক্তি নেই, হরিদাস কখনো নাচে, কখনো হাসে, কখনো মত্ত সিংহের মত ডাক ছাড়ে, কখনো উচ্চস্বরে কাঁদে, কখনো বা পড়ে থাকে মূর্চ্ছিত হয়ে। এ সব দেখে কাজীর সহ্য হল না, মুলুকপতির কাছে গিয়ে নালিশ করল। বিহিত করুন।

'যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে?' মুলুকপতি খেপে উঠল। 'নিয়ে এস হরিদাসকে।'

হরিদাসকে ধরে নিয়ে গেল।

হরিদাসের মুখে আর কথা নেই—শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

'কেন, তোমার এই দুর্মতি কেন?' না চটে মোলায়েম সুরেই বললে মুলুকপতি, 'কত ভাগ্যে তুমি যবন হয়েছ, কেন তুমি হিন্দুর আচার পালন করবে? যা বলছি, শোনো, কৃষ্ণ নাম ছেড়ে দাও।'

'ঈশ্বর তো একজনই। যে নামেই ডাকুন, তিনি সাড়া দেন।' হরিদাস বললে মধুরস্বরে, 'কোরাণে-পুরাণে কোনো ভেদ নেই।'

'তবে কৃষ্ণ নাম ছেড়ে আল্লার নাম ধরো।'

'প্রভু যাকে যে ভাব দেবেন, সে সেই ভাবে থাকবে, সেই ভাবে চলবে। আমার কাছ থেকে যদি তিনি কৃষ্ণনাম, হরিনাম শুনতে চান, তবে অন্য নাম বলি কি করে? অন্য নামের আর প্রয়োজন কী?'

মুলুকপতি ঠাণ্ডা হল। সত্যিই তো, যার যেমন খুশি, যার যেমন রুচি, সে তেমনি ডাকবে ঈশ্বরকে। তিনি যেমন প্রেরণা দেবেন তেমনিই তুলতে হবে প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কাজী রাজি হল না। বললে, 'অসহ্য। হরিদাসকে যদি শাস্তি না দেন, তাহলে মুসলমান-সমাজের অপমান হবে। আপনি থাকতে কেউ সইবে না ও অপমান। মুসলমানের মুখে কিসের কৃষ্ণনাম, কিসের হরিনাম?'

'শুনছ?' হরিদাসকে লক্ষ্য করল মুলুকপতি। 'ঐ পাপনাম ছেড়ে দাও। নিজেদের নাম বলো। আল্লা-আল্লা বলো।'

'যা আল্লা, তাই হরি। তিনি যাকে দিয়ে যা বলাবেন, সে তাই বলবে।' বললে হরিদাস।

'যদি হরিনাম না ছাড়ো, তাহলে শাস্তি হবে প্রচণ্ড।' দলের প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হল মুলুকপতি।

'তা হোক।' দৃঢ় অথচ আর্দ্রস্বরে হরিদাস বললে, 'যেমন অপরাধ, তেমনি শাস্তি দেবেন ঈশ্বর।'

'শাস্তি হবে না, যদি হরিনাম ছাড়ো।'

'দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও ছাড়ব না হরিনাম।' নির্বিচল দাঁড়িয়ে রইল হরিদাস।

'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥'

হরিদাস চোখ বুজল। দেখতে লাগল সেই লোচনরসায়ন লীলাকিশোরকে।

'একে বাইশ বাজারে নিয়ে যাও।' হুকুম দিল মুলুকপতি। 'প্রত্যেক বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারো। বেত মেরে মেরে একে শেষ করে দাও।'

'বাইশ বাজার লাগবে না।' কাজী বললে, 'দু তিন বাজার ঘুরলেই বাছাধন অক্কা পাবেন।'

একেক বাজারে নিয়ে যাচ্ছে হরিদাসকে, আর রাজার পাইক বেত মারছে সর্বাঙ্গে। যত মারছে, তত কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি বলছে হরিদাস। আর হরিনামের গুণে এতটুকুও ব্যথা পাচ্ছে না। 'নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ।' নামানন্দে নেই কোনো দেহানুভূতি।

'আহা, আস্তে মারো, অল্প করে মারো।' বাজারের লোকেরা পাইকদের পা ধরে অনুনয় করে। 'বলো, কিছু না হয় টাকাকড়ি দিচ্ছি তোমাদের, হরিদাস ঠাকুরকে ছেড়ে দাও।'

পাইক-পেয়াদারা ছাড়ে না, ব্যায়ামের আরামে মেরে চলে অবিশ্রান্ত।

'তোমরা কেন কাঁদছ, কেন দুঃখ করছ!' শোকার্ত জনতাকে উদ্দেশ করে সান্ত্বনা দেয় হরিদাস। 'যেকালে আমার শরীরে কষ্ট নেই, কেন তোমাদের মনোদুঃখ? সকলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। নামই সমস্ত ব্যাধির আরাম, সমস্ত ব্যথার উপশম। নামই নিত্য আনন্দের খনি। নামেই সর্ব-অনর্থের নাশ, নামেই সর্বশুভোদয়।'

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত-নিস্তার॥

নম্ ধাতু থেকে নাম হয়েছে। নম্ ধাতুর অর্থ নামানো। তাই যা নামায়, নামিয়ে আনে, তাই নাম। কাকে নামায়? ভগবানকে নামায়। শুধু তাই নয়, যে নাম করে তাকেও নামায়। ভগবানকে নামায় তাঁর ধাম থেকে মর্তের ধূলিতে আর ভক্তকে নামায় তার অভিমান থেকে দীনতায়।

নামেই কৃষ্ণবশীকরণী শক্তি, নামের মুখ্য ফলই হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। নাম জড়বস্তু নয়, চিদ্বস্তু। আগুনের শক্তি না জেনেও আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তেমনি নামের শক্তি না জেনেও অক্ষর উচ্চারণ করলেই ভক্তি জন্মায়। নাম থেকেই সে ভগবদ্‌বিষয়িনী বিদ্যা, সর্বপুরুষার্থপ্রদ সাধন।

কলির সাধন একমাত্র হরিনাম। যে একথা মানে না তার উদ্ধার নেই সংসার থেকে। কর্ম, যোগ বা জ্ঞান—এ তিনের প্রয়োজন নেই কলিকালে, একমাত্র হরিনামই উপায়, হরিনামই গতি। যারা কর্মী তারা ফল চায়, যারা জ্ঞানী তারা মুক্তি চায়, যারা যোগী তারা চায় সাজুয্য, আর তুমি যদি প্রেম চাও, তুমি শুধু নামকীর্তন করো। গোবিন্দ-গোবিন্দ বলে ডাকো। দূর থেকে দ্রৌপদী গোবিন্দ-গোবিন্দ বলে ডেকেছিল, সেই ডাক কৃষ্ণের কাছে চিরপ্রবৃদ্ধ ঋণ-রূপে রয়ে গেছে। সে ডাকের স্মৃতি মুছে যায়না কৃষ্ণের হৃদয় থেকে, সে ঋণের কখনো পরিশোধ হয় না।

এত প্রহার তবু প্রাণ যায় না হরিদাসের। যেমন প্রহ্লাদের যায়নি; সমস্ত অসুর আঘাত ব্যর্থ হয়েছে। হরিদাস বরং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছে, 'প্রভু, এরা নির্বোধ, এদেরকে দয়া করো, দুর্গতি থেকে ত্রাণ করো এদের। আমার জন্যেই তো এদের দুর্গতি। তোমাকে ভজনা করে কি আমি অন্যের দুর্গতির কারণ হব?'

বাইশ বাজারে ঘোরাচ্ছে হরিদাসকে, বাইশ বাজারে মারছে, তবু হরিদাস জ্ঞান পর্যন্ত হারাচ্ছে না। বরং হাসছে মৃদু-মৃদু।

'ও কী, তোমার যে কিছু হচ্ছে না!' পাইক-পেয়াদারা অস্থির হয়ে উঠল। 'তাহলে আমাদের কী হবে?"

'তোমাদের কী হবে মানে?' বিস্মিত হল হরিদাস।

'এত প্রহারেও তোমার প্রাণ গেল না। উলটে কাজীর হাতে আমাদেরই প্রাণ যাবে'। পাইক পেয়াদারা হাহাকার করে উঠল।

'আমি বাঁচলেই তোমাদের অমঙ্গল!' হরিদাস বললে, 'তা হলে, দেখ, এই দণ্ডে আমি দেহ ছাড়ছি।'

এই বলে হরিদাস ধ্যানসমাহিত হল, আবিষ্ট-অচেষ্ট দেহে শ্বাসটুকুও রইল না। পাইক-পেয়াদারা ভাবল প্রাণ নেই হরিদাসে।

ধরাধরি করে হরিদাসের দেহ মুলুকপতির কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলল মাটিতে।

শাস্তির চরম হয়ে গিয়েছে। মুলুকপতি বললে, 'একে এখন তবে কবর দাও।'

'তাহলে তো ওর সদগতি হবে।' কাজী আপত্তি করল, 'কবর না দিয়ে ওকে ভাসিয়ে দাও নদীতে। নদীতে ফেললেই ওর দুঃখ অটুট হয়ে থাকবে।

সবাই ধরাধরি করে হরিদাসকে ফেলতে গেল নদীতে। যেই ফেলবে, অমনি হঠাৎ হরিদাস ধ্যানানন্দে নিশ্চল হয়ে বসল জলের মধ্যে। তার দেহে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করলে। কার শক্তি আছে হরিদাসকে আর নড়ায়। বলবস্ত স্তম্ভের মত বসে আছে বিনিশ্চল।

চক্ষের পলকে পাইক-পেয়াদার দল পালিয়ে গেল।

কৃষ্ণানন্দসুধাসিন্ধুর মধ্যে বসে রইল হরিদাস।

সমাধি-অন্তে হরিদাস তীরে এসে উঠল। কৃষ্ণনাম বলতে-বলতে চলে এল ফুলিয়ায়। মুসলমানদের কানে খবর গেল। দল বেঁধে সবাই দেখতে এল হরিদাসকে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল সকলে।

স্বয়ং মুলুকপতি এসে হাজির। যুক্তকরে সসম্ভ্রমে বললে, 'তুমি পীর, তুমি সিদ্ধ, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করো।'

হরিদাস মিলল এসে অদ্বৈতের সঙ্গে।

গোফায় বসে তিন লক্ষ নাম নেয় হরিদাস। 'ক্ষণেকো গোবিন্দনামে নাহিক বিরতি।' নামই সর্বভক্তিসার। নামই হরিলীলাশিখরিণী সুধা। নামই মধুরাদ্ভূতগাঢ়তুষ্ণ। জ্ঞান আর সিদ্ধি তুলাতে তুলিত হয়, কিন্তু প্রেমের তুলনা নেই, কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নেই। প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াং। কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াং।

মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়য়ে অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহিব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানে গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥
আপন মাধুরীগুণে আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কানে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তব নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি যায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম-উন্মাদ॥
যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

বহু লোক এসে সমবেত হয় গোঁফাতে, কিন্তু কেউ দু দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বসতে পারে না। সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে সকলে। ব্যাপার কী? কিছু নির্ণয় করতে পারে না হরিদাস। কই, তার তো কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা নেই।

বৈদ্য এসে বললে, 'গোঁফার নিচে এক মহানাগের বাসা। তারই বিষের জ্বালায় কেউ তিষ্ঠোতে পাচ্ছে না। সাপ নিয়ে বাস করা নিরাপদ নয়।' হরিদাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।'

'হ্যাঁ, তাই চলুন। অন্যত্র গোঁফা তৈরি করে দেব আমরা।' ভক্তদল বললে, 'আমরা এখানে কেউ বসতে পার্চ্ছি না, জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি।'

'কী না কী বলছ, বুঝতে পাচ্ছি না কিছু।' বললে হরিদাস, 'তবে তোমাদের যখন অসুবিধে হচ্ছে, তোমরা যখন অসুস্থ বোধ করছ, তখন ছেড়ে যাব এ জায়গা।'

হরিদাস এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে! তবে আমি আর কিসের লোভে থাকি! গভীর গর্ত থেকে উঠে মহানাগ ধীরে-ধীরে চলে গেল দেশান্তরে।

আর কারু জ্বালা নেই। নামাস্বাদনে নেই আর চঞ্চলতা।

এক ব্রাহ্মণ তেড়ে এল। 'নাম করছ তো করো, কিন্তু চেঁচাও কেন? মনে-মনে জপ করতে পারো না? হরিনাম চেঁচিয়ে বলতে হবে, এ কার শিক্ষা?'

'শাস্ত্রের।' সবিনয়ে বললে হরিদাস, 'উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ। উচ্চস্বরে নাম করলে শতগুণ ফল হয়। যে বলে, সে তো তরেই, যে শোনে, সেও তরে। এমন কি, পশু-পাখি কীট-পতঙ্গও ত্রাণ পায়।'

হরিনামই নিরপেক্ষ সাধন। উচ্ছিষ্টমুখেও নাম-গ্রহণের নিষেধ নেই। নাম অমূকলোকসুলভ। যে কথা কইতে পারে, সেই নাম করতে অধিকারী। নামই সকল ন্যূনতা নিশ্ছিদ্র করে। নাম শুধু ভক্তির জীবন নয়, ভক্তিরাজ্যের মহারাজচক্রবর্তী।

অদ্বৈত হরিদাসকে বললে নিমাইয়ের কথা। নিমাইদর্শনে হরিদাস নবদ্বীপ চলল। [ক্রমশঃ।

শ্রীভূপতিমোহন সেন

[স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে যে সকল সুসন্তান আপন জ্ঞানগরিমায় স্বীয় জননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহার সংখ্যা আজ বিরল। যে দুই একজন কৃতী সন্তান বিগত শতাব্দীর স্মৃতি লইয়া আজও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, শ্রীভূপতি মোহন সেন তাঁহাদেরই অন্যতম। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" জীবনে এই একটি মাত্র মূল মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন দীর্ঘ দিন, পিতৃদেব শিক্ষাবিদ্ এবং অধ্যাপক স্বর্গত রাজ মোহন সেন মহাশয়ের সুমহান আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ভূপতি মোহন সেন ১৮৮৮ সালে ঢাকা জেলার আমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানার্জনের প্রতি ইঁহার অদম্য অনুরাগ। বাল্যকালে পাঠগ্রহণার্থে ইনি ভর্তি হইলেন রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯০৪ সালে উক্ত স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান এবং ১৯০৬ সালে এফ, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আপন প্রতিভার পরিচয় দেন। অতঃপর শ্রীসেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯০৮ সালে

শ্রীভূপতিমোহন সেন

গণিতে প্রথম শ্রেণী, পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়া বি-এস, সি ডিগ্রি লাভ করেন।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, তখনকার দিনে এক সঙ্গে একাধিক বিষয়ে অনার্স লওয়া অনুমোদিত ছিল) অতঃপর শ্রী সেন ১৯১০ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে মিশ্র গণিতে এম, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করিয়া হেমচন্দ্র গোঁসাই স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এম, এস, সি ডিগ্রি লাভ করিবার পর ১৯১১ সালে শ্রী সেন ইংলণ্ডে গমন করিয়া কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে গণিতের প্রথম অধ্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পাইয়া ট্রাইপস লাভ করেন, এবং কিংস কলেজ হইতে ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করেন।

১৯১২ সালে শ্রীসেন গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরীক্ষায়ও ট্রাইপস লাভ করায় বিশেষ সম্মানার্হ 'র‍্যাংলার' উপাধিতে ভূষিত হইয়া বিদেশে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন। ১৯১৪ সালে "On double Surfaces" এর উপর থিসিস লিখিয়া তিনি স্মিথ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৫ সালে শ্রীসেন দেশে ফিরিয়া ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত উক্ত আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ রূপে ছাত্র কল্যাণের প্রতি তাঁহার যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা ইদানিং কালের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! অবসর গ্রহণ করিবার পর পুনরায় শ্রীসেন ১৯৪৫ হইতে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য পিওর ম্যাথমেটিকসের অধ্যাপকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শ্রীসেন তাঁহার এই দীর্ঘ জীবনে জ্ঞানান্বেষণ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল বিষয়ে গবেষণা কার্য্যে রত ছিলেন, তন্মধ্যে (১) "On double Surfaces" (২) Aplicability and defomability of Surfaces. (৩) The kenetic theory of Solids (metals) and partilion of thermal energy (৪) Raw theory of light matter বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শ্রীসেন তাঁহার লাইট এণ্ড ম্যাটার গ্রন্থে মডার্ণ ফিজিক্সকে চ্যালেঞ্জ করিয়া Classical theory of light সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পদার্থ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তাহা স্বীকৃতি না পাইলেও বহির্দেশীয় বহু দিকপাল গণিতজ্ঞগণ তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীসেনের পত্নী শ্রীমতী শান্তা সেন স্বামীর কর্মজীবনে ছাত্রসমাজে যোগ দিয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিবার কালে তদানীন্তন ছাত্রসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিতে সমর্থ হন। শ্রীমতী সেন তৎকালীন বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্বর্গত স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা। শ্রীসেনের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রদ্বয় উভয়েই বিশেষ কৃতী। তন্মধ্যে একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। অপরজন জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু

[কোলকাতার মেয়র ও প্রখ্যাত সলিসিটর]

বড় হতে হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা চাইলে, যে কয়টি গুণ থাকা চাই-ই, সে সকলের কোনটিরই প্রায় অভাব ঘটেনি এই মানুষটির ভেতর। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই ইনি বেরিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও কর্মশক্তি এনে দিয়েছে তাঁকে বহু সম্মানের আসন। উন্নতি-প্রয়াসী যুব বাংলার নিকট শ্রীকেশবচন্দ্র বসু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত বলা চলে নিশ্চয়ই।

১৯০৫ সালের জুন মাসে এই কর্মধন্য কৃতী পুরুষটি জন্মগ্রহণ করেন কোলকাতা মহানগরী বক্ষে। পিতৃদেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সে যুগের একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার। অন্যান্য ছেলের সঙ্গে কেশবচন্দ্রও ভালরকম লেখাপড়া শিখুক, বড় হয়ে উঠুক, এটি চাওয়া ছিল তাঁর গোড়া থেকেই। কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবন পূর্ণতরভাবে গড়ে ওঠবার আগেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। সে সময় সমগ্র পরিবারটিতেই হাজির হয় এসে গভীর শূন্যতা। এরই মাঝে সাহস, উৎসাহ ও শুভেচ্ছা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান মাতা ৺সুশীলাবালা। কেশবচন্দ্র ও তাঁর ভাইগণ এগিয়ে যেতে আবার উদ্যম পান—যাওয়ার লক্ষ্যটিও ঠিক হয়ে যায় সাথে সাথে।

শিক্ষার্থী জীবনের সূচনায় শ্রীবসু ছিলেন ক্যালকাটা একাডেমীর (কোলকাতা) একজন ছাত্র। এখান থেকে পরে তিনি যান কোলকাতারই মর্টণ ইনষ্টিটিউশনে (শ্রীম' প্রতিষ্ঠিত)। ১৯২৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—তারপর চার বছর পড়াশুনো চলে তাঁর স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে (কোলকাতা)। ইত্যবসরে ১৯৩০ সালে তিনি বি, এস, সি পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন এবং পর বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ হ'তে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪ সালে এটর্নিশিপ পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন এবং মর্য্যাদাস্বরূপ লাভ করেন বেল চেম্বারস স্বর্ণপদক। এর পরই সুরু হয় কেশবচন্দ্রের সমধিক সাফল্যময় কর্মজীবনের নতুন অধ্যায়। প্রথমাবস্থায় তিনি ম্যাণ্ডারসন্ ও মরল্যাসন সলিসিটার্স ফার্ম্মে যোগদান করেন। আড়াই বৎসরকাল সেখানে কাটিয়ে তিনি মেসার্স পি, সি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর (বিখ্যাত সলিসিটার্স ফার্ম্ম) একজন সিনিয়র পার্টনার (বর্ত্তমানে স্বত্বাধিকারী) হয়ে যান। অল্পকাল মধ্যেই আইনাবিদ্ হিসাবে তাঁর প্রতিভার বিকাশ পায়—বিভিন্ন মহলে ক্রমেই তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে। কোলকাতা হাইকোর্টের আজ তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী—বাইরেও তাঁর সুনাম রয়েছে যথেষ্ট। লর্ড সভার মামলা প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালে তিনি একবার ইংলণ্ডে যান, আইনজ্ঞ হিসাবে বিশিষ্টতার ছাপ রেখে আসেন সেখানেও।

ছেলেবেলাতেই শ্রীবসু জাতীয়তার ভাব ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। আজও তাঁর ভেতর একটি সুন্দর, সবল স্বাদেশিক মন বিরাজ করছে, একটু মেলামেশাতেই বুঝতে পারা যায়। ১৯৫২ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি বা সমাজ সেবায় যোগদান করেন। সে বছরেই কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোলকাতা পৌরসভার তিনি কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। পৌরসভায় বহু স্পেশাল কমিটি ও সাব কমিটিতে যুক্ত থেকে তাঁকে নিজের গঠনশক্তির পরিচয় দিতে

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু

দেখা গেছে। পৌরসভায় ১৯৫৭ সালে যে নির্ব্বাচন হয়, তাতেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত হন। এর পর ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ এই দুটি বছর পৌরসভার ডেপুটি মেয়রের সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। গোড়ার দিকে কতক কাল তিনি ছিলেন কর্পোরেশন ষ্টাণ্ডিং ওয়ার্কস কমিটির চেয়ারম্যান। ষ্টাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবেও পৌরসভায় তিনি সেবা করেছেন বেশ কিছুদিন। গত জুন মাসে ১৯৬০-৬১ সালের জন্য শ্রীবসু পৌরসভায় সর্বাধিক সম্মানিত মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হন। সেই থেকে মহানগরীর (কোলকাতা) বিভিন্নমুখী কল্যাণ ও অগ্রগতির নতুন দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।

কেশবচন্দ্র আজীবন একজন নিরলস কর্মী ও উদ্যমশীল পুরুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও তিনি বিরক্তি বা অবসন্নতা বোধ করেন না। তাঁর চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য—তিনি নিরহঙ্কার ও নিতান্ত সাদাসিধে। যে কোন কল্যাণ অনুষ্ঠানে যোগদিতে পারলে তিনি আনন্দ পান। শ্রীবসুদের আদিনিবাস ২৪ পরগণার আরবালিয়া গ্রামে—এই গ্রামের সঙ্গে আজও তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। পল্লীর উন্নতি সংক্রান্ত কাজের আহ্বান যখনই এসেছে, সাড়া দিয়েছেন তিনি সাগ্রহে। শ্রীবসুর কাছ থেকে দেশ ও জাতি আরও বহু অবদান পাবে, এই আশা ও দাবী রাখা চলে সহজেই।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ব্ব-মন্ত্রী)

প্রভাতের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে একমনে বসে শুনছিলাম পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের জীবনের ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ১৮৯৮ সালে জলপাইগুড়ি সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আদি পিতৃভূমি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিতগাঁও গ্রাম হলেও সেখানকার সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না,

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বললেই চলে। পিতা স্বর্গত ঈশান চন্দ্র দাশগুপ্ত বহুদিন যাবং জলপাইগুড়ি সহরে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলে সমগ্র পরিবার জলপাইগুড়িতেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মালদহ জাতীয় বিদ্যালয় থেকে বাল্যের শিক্ষা শেষ করে হাওড়া জেলার চিত্রসেনপুর থেকে ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক, ১৯১৮ সালে চাটগাঁ সরকারী কলেজ থেকে আই, এ, এবং ১৯২০ সালে রাজসাহী কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায়ই বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা পাওয়ার ফলে তদানীন্তন সমগ্র দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সংগে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। ছাত্রাবস্থায় মাতৃভূমির মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে অদম্য স্পৃহা বহু কষ্টে জমিয়ে রেখেছিলেন অন্তরে, তার বাহ্যিক প্রকাশ পেল ১৯২০ সালে। ঐ সময়ে শ্রী দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ি থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যোগ দিলেন জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে। এই সময় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত দেশের মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলতে গেলে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের নামই করতে হয় সর্ব্বাগ্রে। জলপাইগুড়ির মিউনিসিপালটিরে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে সম্পর্ক ছিল বহু দিনের। ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত "মুক্তিবাণী" পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, এবং উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্যে সিডিশান চার্জে দেড় বছর এবং মানহানির অভিযোগে ৬ মাসের জন্যে কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে ঐতিহাসিক লবণ-আইন সত্যাগ্রহে যোগদান করে শ্রী দাশগুপ্ত কারাবাস করেন আড়াই বছর। ১৯৩৭ সালে জলপাইগুড়ি থেকে বঙ্গীয় আইন সভায় সর্ব্ব প্রথম সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে জেল ভোগ করেন, পুরো ৪ বছর। ১৯৪৬ সালে জেল থেকে মুক্তিলাভ করে, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত নানারকম গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু একা নন, পত্নী শ্রীমতী অরুণা দাশগুপ্তও। সমগ্র জলপাইগুড়িতে এমন কোন সংস্থা নেই যেখানে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত এবং তাঁর পত্নী জড়িত না আছেন। জলপাইগুড়ি সহরে শিশু-নিকেতন নামে যে সমাজসেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানটি আছে, শ্রীদাশগুপ্তের পত্নী শ্রীমতী দাশগুপ্ত, তার সম্পাদিকা। ১৯৫২ সাল থেকে শ্রী দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন, পূর্ত্তমন্ত্রী হিসেবে। সেই থেকে পূর্ত্ত-বিভাগটির যথাযথ উন্নয়নে তিনি যত্নশীল। শ্রী দাশগুপ্তের সুযোগ্য পরিচালনায় বিভাগটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, কামনা করি।

ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এল, সি

[বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদ্]

সকালে আইন-সভায় বিধান-পরিষদের বিরোধী দলের আসনে বসে যে যৌবনোজ্জ্বল পুরুষ সরকারী কুশাসনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করেন, তিনিই আবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে বসে ছাত্র-ছাত্রী পরিবৃত হয়ে বিজ্ঞানের জটিল সূত্রগুলির সমাধান করেন। একই সঙ্গে জাতির সেবা এবং গঠন এই দুইয়ের সমাবেশ হয়েছে যাদের মধ্যে, ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁদেরই অন্যতম। দেশ-সেবক, বৈজ্ঞানিক ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত ভাণ্ডার-গাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত চুণীলাল চক্রবর্ত্তী তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের অধীনে পুলিশ অফিসার ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী নদীয়া জেলা সহর কৃষ্ণনগর C. M. S. বিদ্যালয়ের বাল্যের শিক্ষা শুরু করে: ১৯৩৭ সালে মেহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পূর্ব্বেই পিতৃহারা হন বালক মণীন্দ্রমোহন। আকস্মিক এই পিতৃবিয়োগে এক চরম আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। তারই মধ্যে পড়শুনা চালিয়ে যেতে হয় পিতৃহারা মনীন্দ্রমোহনকে। সকল রকম বাধা অতিক্রম করে হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে আই, এস, সি এবং ১৯৪১ সালে কলিকাতার

ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্র

নৌকাবিলাস

—দীপক ঘোষ

দৃষ্টিনিক্ষেপ

—অজিত দাস

ভুবনেশ্বর মন্দিরের ভাস্কর্য্য —বিবেক সাহা

—গীতারাণী সিংহরায়

জলপরী

আবেদনের বেদনা — পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
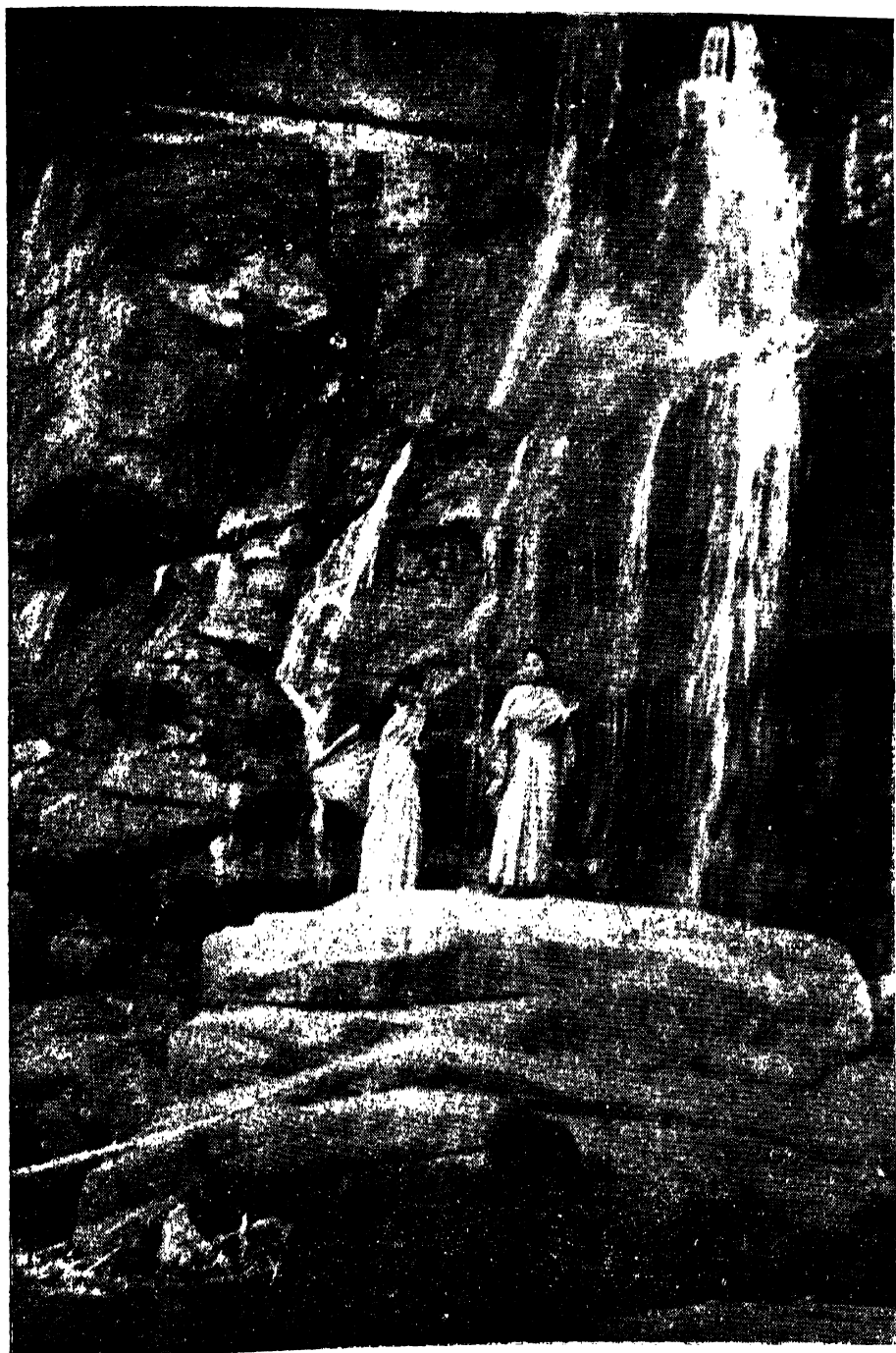
বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এস সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস সি ডিগ্রি লাভ করার পর বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যান ডাঃ চক্রবর্ত্তী। ১৯৫১ সালে ডাঃ চক্রবর্ত্তী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিষ্ট্রিতে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। ১৯৫১ সালে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডাঃ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৬ সালে রীডার পদে উন্নীত হয়ে আজ পর্য্যন্ত এই পদেই বহাল আছেন।

ডাঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী মাত্র বারো বছর বয়সেই যুগান্তর দলের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন, পরবর্ত্তী জীবনে স্বর্গত নেতা হরেন ঘোষ ও মুকুন্দ লাল সরকারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে ফরোওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজও তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় সদস্য। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বিধান পরিষদের সভ্য এবং প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সভ্য, ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটি এবং ভোকেশানাল এবং টেকনিক্যাল এডুকেশান সোসাইটের সম্পাদক ছাড়াও বহু সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের সহ-সভাপতিও তিনি। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর পত্নী শ্রীমতী ভারতী দেবী এম, এ। ব্যক্তিগত সখ বলতে বই পড়া এবং দেশভ্রমণ ছাড়া আর নেই কিছু ডাঃ চক্রবর্ত্তীর। এই স্বল্প পরিসর জীবনে ঘুরেছেন পৃথিবীর বহু দেশ। যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাঃ চক্রবর্ত্তী দেশ ও দশের সেবা করে যাচ্ছেন, তার পরিধি বৃদ্ধি হয়ে দেশ ও দশের কল্যাণ হউক, এই কামনা করি।

নতুন ধরণের গণনা-যন্ত্র

বিশ্বের আজ নানা দেশে বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা চলেছে নানাবিধ। তন্মধ্যে আমেরিকা ও রুশিয়া নিত্য-নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি উন্নত ধরণের গণনা-যন্ত্র বের করেছেন—যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে ইউনিভ্যাক লাক। এর পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণকল্পে সময় প্রয়োজন হয় পাঁচটি বছর। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য ৮০ লক্ষ ঘণ্টায় একটি ডককাল, কুলেটার যন্ত্রে যে হিসাব করা চলে, এই যন্ত্রের সাহায্যে এইটি করা যাবে মাত্র এক ঘণ্টায়। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা এইরূপ দাবী রেখেই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের এ-ও দাবী পারমাণবিক গবেষণার ব্যাপারে একটি বিশেষ কাজে আসবে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণাগারে আলোচ্য গণনা-যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে; এর অভিনবত্ব জানবার ও দেখবার জন্যে কৌতুহল না হয়ে পারে না।

নতুন ধরণের কম্প্যুটিং মেশিন বা অঙ্ক কষার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদ। এই পরিষদের লেলিনগ্রাড শাখার গণিত-গবেষণা-ভবনের কর্ম্মীরা এইটি তৈরী করেছেন এবং যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বেসম—২'। এই যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত জটিল অঙ্কও কষা চলে প্রতি সেকেণ্ডে গড় পড়তা দশ হাজার, এই দাবী রাখা হচ্ছে।

এতদিন রুশ দেশের বিভিন্ন কল-কারখানা ও কর্ম্ম কেন্দ্রে, স্পুট্‌নিক পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে দুইটি গণনা-যন্ত্রই বেশিরকম চালু ছিল—একটির নাম 'বেসম—১' ও অপরটি 'উড়াল'। কিন্তু মহাশূন্যে গবেষণার ব্যাপারে অধিকতর দ্রুত অঙ্ক কষার যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা যায়। ইহারই পরিণতিতে আবিষ্কৃত হয় 'বেসম—২' অঙ্ক কষার অভিনব যন্ত্র। রুশ বিপ্লবের দাবী অনুসারে এই ইলেক্‌ট্রোনিক কম্‌প্যুটি যন্ত্রে পূর্ব্বের তুলনায় দ্রুত গতিতে অঙ্ক কষা সম্ভবপর।

কৃত্রিম কিডনির ব্যবহার

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে মানুষের দেহ-যন্ত্রের কতকগুলো জিনিষ অকেজো বা বিনষ্ট হয়ে গেলেও রদবদল করা চলতে পারছে—যেমন রদবদল চলছে কিডনি বা মূত্রগ্রন্থির। স্বাভাবিক কিডনির স্থলে যান্ত্রিক বা কৃত্রিম কিডনির ব্যবহার পরীক্ষিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে।

একথা বলবার অপেক্ষা রাখেনা, কিডনি বা মূত্রাশয় মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে দেহ থেকে বের করে রক্তকে নিয়মিত শোধিত করাই এর প্রধান কাজ। শরীরের বাড়তি জল প্রস্রাবাকারে এরই মারফত বের হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মূত্রগ্রন্থির সহায়তায় রক্ত পরিশ্রুত হয় দৈনিক প্রায় এক হাজার লিটার।

কিডনি বা মূত্রগ্রন্থির কাজে গোলযোগ ঘটলে শরীরের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। সেজন্য কিডনি বা মূত্রাশয়ের ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নিরাময়ের ব্যবস্থা না করলে নয়। এই চিকিৎসার প্রশ্নেই যান্ত্রিক তথা কৃত্রিম কিডনির ব্যবহারের কথাটি ওঠে—শরীর-বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলে তখন থেকেই।

ক্রমাগত ৩০ বছর ধরে এই গবেষণা চালানো হয় নানা গবেষণাগারে। কুকুর, বানর, খরগোশ, ঘোড়া ভেড়া—এসব পশুর ওপর বিজ্ঞানীরা প্রথমে পরীক্ষা চালান। রোগাক্রান্ত কিডনিকে বিশ্রাম দিয়ে যান্ত্রিক কিডনি মারফত কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং ক্রমে মূল কিডনির স্বাভাবিক কার্য্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার এই চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত মানুষ সাফল্যলাভ করে। একথা ঠিক, এখনও এই যান্ত্রিক মূত্রাশয়ের দ্বারা নিখুঁতভাবে সব কাজ হয় না। তাই পরীক্ষা বিষয়েও গবেষণা চলেছে অব্যাহত ভাবেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর রুশিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতেই এই গবেষণা লক্ষ্য করা যায় বিশেষভাবে। ফুস ফুস ও মূত্রগ্রন্থির কাজ একই সঙ্গে যাতে চালানো যায়, এমন যন্ত্র উৎপাদনের জন্যও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত রয়েছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু

[পূর্ব্বপ্রকাশিতাংশের পর

পনেরো

গ্রাভোমোবিল

"And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them into shapes and gives to airy nothing
A local habitation, and a name."

—*Shakespeare*

"Let us learn to dream, gentleman, and then perhaps, we shall find the truth."

—*August Kekute*

পরের দিন থেকে এগারো জন বৈজ্ঞানিক অর্কেষ্টার এগারোটি সুরে-বাঁধা যন্ত্রের মতোই কাজ আরম্ভ করে দিলেন শংকরের থিয়োরির ওপরে।

কম্পিউটার চলতে লাগল রোজ রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। তা থেকে পাওয়া তথ্যে বোঝাই হতে লাগলো দুটো আলমারী। পাওয়ার-প্ল্যাণ্ট-এর রীম রীম আওয়াজে—বহ্নিবিহংগের পাখার শব্দে দিগন্ত স্পন্দিত হতে লাগল দিনরাত।

পাঁচদিন বাদে রাও ঘোষণা করলে, "রায়, তোমার 'গ্রাভন-থিয়োরি' টিকে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এই দেখ, পদার্থের সংস্পর্শে গ্রাভনের প্রবাহে যে curl বা আবর্তের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা মেলে এই ইকোয়েশনটা থেকে।"

গ্রাভনের মতবাদ দাঁড়িয়ে গেল। পরের সমস্যা উঠল অ্যান্টিগ্রাভিটি নিয়ে। গণিতের সাহায্যে ঠিকমতো বোঝা গেল না যে, বিপরীত আবর্ত সৃষ্টি করতে গেলে কী ধরণের শক্তির প্রয়োজন; সুতরাং পরীক্ষার প্রয়োজন হল।

এ জন্ত দরকার একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র গ্রাভিটির সামান্ত তারতম্য বা অ্যান্টিগ্রাভিটি পরিমাপ করবার জন্ত। স্বামীজির উদ্ভাবনীশক্তি এখানে সমস্তার সমাধানে লাগল। প্রথমে তিনি তৈরী করলেন একটা নূতন ধরণের পেণ্ডুলাম-যন্ত্র। তারপর ছোটো পরিসরে পরিমাপ করবার জন্ত 'গ্রাভিমিটার'-এর 'টরশান্-ব্যালান্সে'-এরই একটা ক্ষুদ্রতর আর সূক্ষ্মতর সংস্করণ তৈরী হল, স্বামীজি আর দত্তগুপ্তের চেষ্টায়।

অন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন শক্তির 'ম্যাগ্নেটিক ফীল্ড' 'ইলেকট্রন্ গান্' থেকে বিদ্যুৎকণার স্রোত, 'ক্লাইষ্ট্রণ' থেকে বিভিন্ন 'ফ্রীকোয়েন্সি'র বিভিন্ন মাপের নানা রকমের রেডিও-তরংগের সমন্বয় করে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ধার করে আনা হোলো দেশের বড়ো বড়ো গবেষণাগারগুলো থেকে।

নানা বিফল প্রচেষ্টার পর একদিন শংকরের বর্ণিত 'ফীল্ড'—শক্তির ক্ষেত্র তৈরী হল। এই 'ফীল্ড'-এর পরিমাপ করবার জন্ম আবার নূতন নূতন উদ্ভাবন করবার প্রয়োজন হোলো। অমল বন্দো, দত্তগুপ্ত, আলিমচান্দানী, সুব্রাহ্মনিয়ন আর স্বামীজি সে কাজে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে দেখা গেল সে 'ফীল্ড'-এর মধ্যে মহাকর্ষের বিপরীত শক্তির ক্ষীণতম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে! সে স্মরণীয় দিনে সারারাত ধরে চলল উত্তেজিত বৈজ্ঞানিকদের নানা রকমের পরীক্ষা।

এই ছোটো শক্তির ক্ষেত্রকে বিস্তার করাটা একটা সমস্যায় দাঁড়ালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শংকর আর প্রোফেসর গোপালাচারি-র একটা বন্য 'আইডিয়া' এ সমস্যাও সমাধান করে দিল। শ্রবণাতীত শব্দ তরংগের জাল অথচ 'ম্যাট্রিক্স' চারধারে তৈরী করে তা থেকে শক্তির বিভিন্ন প্রবাহ প্রতিফলিত করে নির্দিষ্ট দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হোলো। স্বামীজি আর আলিমচান্দানী উদ্ভাবন করলেন কোনো বিশেষ দিকে ইলেকট্রন প্রবাহের শক্তির তারতম্য করবার এক অভিনব ব্যবস্থা। শংকর আর রাও সারাক্ষণ ব্যস্ত রইল 'কম্পিউটার রুম'-এ—মূল অংকের সংগে বিভিন্নভাবে তৈরী ফীল্ডের ফলাফল মিলিয়ে দেখার জন্ত।

কথায় বলে, একটা সাফল্য আর একটা সাফল্যের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে আসে। প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির কাজে প্রমাণ হয়ে গেল এ কথার সত্যতা। যাঁদের বলা হয়েছিল "দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক"—তাঁরাই করতে লাগলেন যুগান্তকারী প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার সপ্তাহে সপ্তাহে। 'ফ্লুইড ডাইনামিক্স', 'ওয়েভ মেকানিক্স', 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল মেকানিক্স'-এ রচিত হতে লাগল নব
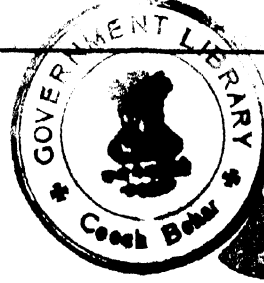
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

নব অধ্যায়। মাত্র তিন মাসের মধ্যে মিঃ জন তৈরী করে ফেললেন একটা নক্সা—ওদের প্রথম অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনের।

নক্সা দেখে শংকরের চক্ষুস্থির! বলে—"করেছ কী হে! আয়তন দেখে মনে হচ্ছে—যন্ত্রের ওজনই হবে প্রায় তিরিশ চল্লিশ টন। কোথায় হবিবুল্লার ছোটো বাক্স আর কোথায় একটা বিরাট যুদ্ধের ট্যাংকের মতো তোমাদের যন্ত্র!"

জন বলে, "তা খোলটারই ওজন হবে বৈকি পঞ্চাশ-বাহান্ন টন। ওর মধ্যে সব যন্ত্রগুলো রাখবার জায়গা তো চাই—তা নইলে তোমার 'ফোর্স ফীল্ড' তৈরী হবে কী করে? তবে আমার মনে হচ্ছে এ যন্ত্রের ক্ষমতাও হবে হবিবুল্লার যন্ত্রের বহুগুণ—একটা ছোটো-খাটো জাহাজও শূন্যে পাঠানো যাবে আমাদের এ যন্ত্রের সাহায্যে।"

শংকর ঘাড় নাড়ে, "নিশ্চয়ই অন্য কোনো সহজ ব্যবস্থা করা যায় 'ফোর্স ফীল্ড' তৈরী করার জন্য। এ নক্সা অচল!"

অন্য বৈজ্ঞানিকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, বলেন, "তাহলে তো আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে!"

শংকর অটল, "দরকার হলে তাই করতে হবে বৈকি। এতো-বড়ো বেয়াড়া বেঢপ গন্ধমাদন নিয়ে জনসমাজে মুখ দেখানো যাবে না।"

শেষে সুমিত্রা শংকরকে বোঝায় "আগে দেখাই যাক এ মডেলে কাজ হয় কি না—তারপর যন্ত্রপাতি আরো সূক্ষ্মতর করলেই চলবে।"

সুমিত্রা আর সহকর্মিদের উপরোধে শংকরকে অগত্যা রাজী হয়ে যেতে হয়।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জন-এর 'প্ল্যান' সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য প্রজেক্ট-এ'র কর্মিদের আর দেশরক্ষা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা বড়ো সভা ডাকা হোলো। সে সভায় হিসেব করে দেখা গেল যে, যন্ত্রপাতি আর উপকরণ সময় মতো সংগ্রহ করতে পারলে তিনমাসের মধ্যেই 'অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিন' তৈরী করা সম্ভব।

* * * *

তারপর সুরু হোলো ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসের এক অভাবনীয় অধ্যায়। দেশরক্ষা বিভাগ ভার নিলেন মালপত্র-যন্ত্রপাতি যোগাড় করার। বিশেষ প্লেনে আমদানী হতে লাগল আমেরিকা ইংল্যাণ্ড রুশিয়া—জার্মাণী—জাপান থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির উপকরণ, ইলেক্‌ট্রনের সৃএর সরঞ্জাম। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্‌, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ভিলাই-রৌরকেলা থেকে আসতে লাগল যন্ত্রের বড়ো বড়ো অংশগুলো। হবিবুল্লার বাড়ীর পেছনে রাতারাতি গড়ে উঠল বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কর্মশালা—অস্থায়ী টিনের 'শেড্‌'-এ। 'ইঞ্জিনীয়ারিং-কোর' থেকে আড়াই শত বাছাই করা কর্মী—তিন 'সিফ্‌ট'-এ কাজ আরম্ভ করলেন সেখানে। সুমিত্রার সুদক্ষ পরিচালনায় আর কৃষ্ণস্বামী-কোলের সহায়তায় মাল সরবরাহ হতে লাগল ঘড়ির কাঁটার সংগে তাল রেখে।

'সিকিউরিটি'-র ব্যবস্থা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকল। বস্তিবিহংগের চারদিকে মাইল খানেক ব্যাস নিয়ে কাঁটাতারের জালের বেড়া দেওয়া হল। রাস্তায় পড়ল 'ব্যারিকেড'—এলো বন্দুকধারী সেপাই-শান্ত্রী। প্রজেক্টের কর্মিদের গতিবিধি হয়ে গেল আরো নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সেজন্য বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে বিশেষ কোনো ওজর-আপত্তি শোনা গেল না এবার।

কেবল শংকর-সুমিত্রার নিত্যকার সাহচর্যের মধ্যে বড়ো বড়ো ছেদ পড়তে লাগল—দুজনের কারোরই এখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই!

* * *

তিন মাস নয়, ঠিক সাত মাস লেগে গেল যন্ত্রটা গড়ে তুলতে। হাজার হলেও দীর্ঘসূত্রতা আমাদের বহুকালের 'ট্রাডিশন'। ফ্যাক্টরী—কলকারখানা সবসময়ে 'প্রজেক্ট'-এর কাজে দ্রুততালে যোগান দিতে পারল না। বিদেশ থেকেও দু' একবার সরঞ্জাম আসতে দেরী হয়ে গেল। ভারতীয় রেলওয়ের 'ওয়াগন' প্রজেক্টের কাঁচামাল বহন করে আটকে গেল কোনো জংসনে—রেলকর্মচারীদের অনবধানতায়। এক অসাধু কন্‌ট্রাক্টরের অনেক জিনিসপত্র ফেলে দিতে হোলো। কোনো কারখানার ফোরম্যান নক্সায় মিলিমিটারের জায়গায় ভুল করে মিটার পড়লেন। তার জন্য কাজ পেছিয়ে গেল প্রায় একমাসের মতো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যই একদিন গড়ে উঠল যন্ত্রদানব। যন্ত্রের সংগঠন আর বিভিন্ন সার্কিটের দিবারাত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে শংকর ও তার সহকর্মীর দল দিনস্থির করে ফেলল যন্ত্রটির পরীক্ষার।

* * *

পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে শংকরের ছিল নিমন্ত্রণ সুমিত্রার ঘরে। সুমিত্রা ওকে বলেছিল, "যন্ত্রের 'ট্রায়াল'-এর আগে তোমার মারাঠি-খানার 'ট্রায়াল'টা হয়ে যাক।"

শংকর বলে, "তাহলে যন্ত্রের উদ্বোধনের সংগে আমাদের উদ্বন্ধন অথবা উদ্বাহবন্ধনটাও সমাধা হয়ে যাক।"

সুমিত্রা বলে, "উঁহু। তা কী করে হয়? প্রথম ধাপটা আগে অতিক্রম করো মারাঠি-খানার অভ্যাস করে। তারপর, ঘোড়ায় চড়তে শেখ, উষ্ণীষ তরোয়াল সব যোগাড় করো। তারপর সেদিনকার ফর্দ অনুযায়ী সবই সমাধা করো। তখন না হয় তোমার আবেদনটা বিবেচনা করা যেতে পারে।"

শংকর বলে—"সংক্ষেপে অথবা শর্ট-কাটে হয় না? আমাদের দেশে কেবলমাত্র কন্ঠিবদল করলেও চলে কিন্তু।"

সুমিত্রা জবাব দেয়, "ওই জন্যই তো বাঙালী ছেলেদের ওপরে এত অবিশ্বাস!"

* * *

ব্যারাকে সুমিত্রার ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে কিন্তু শংকর স্তম্ভিত হয়ে যায়।

দেখে, দুটো ষ্টোভ জ্বালিয়ে সুমিত্রা রান্না করতে বসে গেছে। ফুলকপি দিয়ে গলদাচিংড়ির কালিয়া রান্না হয়েছে—রুইমাছের মুড়ো দিয়ে করেছে ডাল, বেগুণভাজা একটা প্লেটের ওপর সাজানো; আর কোমরে আঁচল জড়িয়ে সুমিত্রা লুচি ভাজতে ব্যস্ত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে শংকর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

সুমিত্রা বলে, "এই দেখ, হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেটা—যেন কোনদিন খাবার জোটেনি।"

শংকর জিজ্ঞাসা করে, "এই বুঝি তোমার মারাঠিখানা? এ সব শিখলে কোথায়?"

সুমিত্রা বলে, "হাঁ গো হাঁ। বাঙালীর আর সব গেছে, একটা জিনিসই হয়েছে সর্বস্বধন—উন্নাসিক অহংকার! তুমি বুঝি ভেবেছ—তোমাদেরই বুঝি এ সব একচেটিয়া? এই দেখ, এটিকে বলে

পুনা-কারি, ওটা ঝিংগার গরগটি, এটা মোহন সম্বরা, ওইটা বাইগণ ভরজবা। আর কড়ায় যা ভাজা হচ্ছে তার নাম সফেদপুরী। যাক আর তর্ক করতে হবে না—হাত ধুয়ে বসে পড় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো।"

* * * *

গুরুভোজনের পর শংকর বেশ জঁাকিয়েই বসে আরাম-কেদারায়। সিগারেট ধরিয়ে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে, "শেষ পর্যন্ত আমার আবেদনটার হোলো কী?"

সুমিত্রা বলে, "আবেদন-নিবেদনের ব্যাপারে অতো অস্থির হলে চলবে কী করে? অনেক ডিপার্টমেন্ট ঘুরে, হেড অফিসে পৌঁছে গেছে—এ খবরটা দিতে পারি। সময় হলেই জবাব পাবে।"

শংকর নাছোড়বান্দা, "সময়টা হবে কবে?"

সুমিত্রা বলে, "কে জানে, হয়তো বা কালই।"

এই পরিহাসের মধ্যে অকারণে ওর গলা ভারী হয়ে ওঠে।

শংকর বলে, "কেন, আজ দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যেত? দেখো না, তাহলে এই গুরুভোজনের পর নিজের ঘরে ফেরবার কষ্টটা করতে হোতো না।"

সুমিত্রার মুখের ভাব লক্ষ্য করে শংকর সভয়ে যোগ করে, "তা বেশ, তা বেশ, কালই।"

শাসনের সুরে সুমিত্রা বলে, "আর একটা কথা, যদি ভেবে থাক যে আমার আতিথ্যের সুযোগ নিয়ে রাত তেরোটা পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে দেবে, সেটি হবে না। আজ রাতেই আমাকে সম্পাদিকার রিপোর্টের একটা খসড়া তৈরী করতে হবে।"

শংকর করুণভাবে বলে, "এতো নিষ্ঠুর কেন তুমি, সুমিত্রা? আমার মতো গোবেচারার ওপরে এতোটুকু মায়া হয় না?"

সুমিত্রা বলে, "ওই মায়া করেই তো ভুল করেছি। নাঃ শংকর! কাল কতো গণ্যমান্য লোক আসবেন—সম্পাদিকার রিপোর্টটা উতরে যাওয়া চাই।"

শংকর পরিহাস করে, "আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কালকের খবরের কাগজের হেড লাইনটা—"পুরুষ নির্যাতন সংঘের সম্পাদিকার জ্বালাময়ী অভিভাষণ! হে ভগিনিগণ, চলো আমরা পুরুষের সংস্পর্শদুষ্ট এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া মংগল গ্রহে গিয়া বাস করি।"

সুমিত্রা কিন্তু পাল্টা জবাব দেয় না এ পরিহাসের। একটু ম্লান হেসে চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, "শংকর, তোমার যন্ত্রে মংগল গ্রহ অবধি পৌঁছানো যাবে?"

শংকর বলে, "এই সেরেছে! আইডিয়াটা তাহলে তোমার মাথায় ঢুকেছে!"

সুমিত্রা বলে "না, পরিহাস নয় শংকর, সত্যই কি গ্রহান্তরে যাওয়া যাবে তোমার যন্ত্রে?"

শংকর বলে, "মংগল কেন, সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যাবে। তবে একটা মুস্কিল আছে। পরমায়ুটা বাড়াবার দরকার মান্ধাতার মতো। কল্পনা করোনা, আমাদের প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীরা একটা বিরাট ব্যোমযানে চেপে চলেছে তারা থেকে তারায়!"

সুমিত্রা বলে "শংকর, একটা প্রশ্ন কিন্তু ওঠে। পৃথিবীর মতো একটা বিরাট বস্তুর বিকর্ষণ থেকে যন্ত্রটা না হয় গতিবেগ পেল, কিন্তু মহাশূন্যে যেখানে কাছাকাছি গ্রহ-তারা কিছুই নেই, যেমন ধরো দুই নক্ষত্রের মাঝখানে যন্ত্রটা চলবে কী করে?"

শংকর উত্তর দেয়, "নিউটনের গতির নিয়মে পৃথিবীর বিকর্ষণে যে গতিবেগ যন্ত্রটা পেল, সেটা নিয়েই চলতে থাকবে আবহমানকাল ধরে। গতিবেগ বাড়াবারও আরো উপায় আছে। যেমন সূর্যের মহাকর্ষের সুযোগ নিয়ে আস্তে আস্তে গতিবেগ বাড়ানো যাবে। ধরো মংগলগ্রহে যেতে হলে 'ফীল্ড'টাকে ইচ্ছামতো বদলে নিয়ে পৃথিবীর বিকর্ষণ, সূর্যের আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ আর মংগলগ্রহের আকর্ষণ একসংগে যোগ করা অসম্ভব নয়।

"তারা থেকে তারায় যেতে হলে একটা সহজ উপায়ে গতিবেগ বাড়ানো যেতে পারে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এসে আমাদের জাহাজে তুলে দেওয়া যাবে এক বিরাট পাল—লিথিয়ামের মতো কোনো হাল্কা ধাতুর। সে পালে লাগবে সূর্যালোকের চাপ—আলোক তরংগের একটা চাপ আছে জানো তো? জাহাজের গতি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, যেমন করে নৌকার গতিবেগ বেড়ে যায় পালে হাওয়ার চাপে। কয়েক মাইল প্রশস্ত পাল ব্যবহার করলে এইভাবে প্রতি সেকেণ্ডে যাট হাজার মাইল ধাওয়া করাও এমন কিছু অসম্ভব নয়।" সুমিত্রার আয়ত চোখে বিস্ময়। "আচ্ছা, সব চেয়ে কাছের তারা—আলফা সেণ্টাওরিতে পৌঁছতে কতোদিন লাগবে, শংকর?"

শংকর বলে, "সেটাই তো মুস্কিল! আলোক-তরংগই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে সময় নেয় সাড়ে চার বছর। সেকেণ্ডে যাট হাজার মাইল করে পাড়ি দিলেও কমপক্ষে চোদ্দটি বছর ঘুরে যাবে এ পথটা পাড়ি দিতে! তার মানে ওখান থেকে ঘুরে আসতে হলে চোদ্দ আর চোদ্দ, আটাশ বছরের মত চাল-চিঁড়ে বেঁধে তবেই রওনা দেওয়া যাবে। তবে জাহাজের আরোহীদের কাছে সময়টা কয়েকমাস কম বলে বোধ হবে। জানোই তো, আপেক্ষিকতাবাদের নিয়মে আলোক-তরংগের গতিবেগের যতো কাছাকাছি পৌঁছানো যায়—আপেক্ষিক সময়টাও কমিয়ে ফেলা যায় ততোই। তবে তেরো বছরও এমন কিছু কম সময় নয়।"

সুমিত্রার জিজ্ঞাস্য, "আচ্ছা, আলোক-তরংগের চেয়েও জোরে যাওয়া চলে না?"

শংকর মাথা নাড়ে, "না সুমিত্রা, অন্ততঃ 'থিয়োরি অব রিলেটেভিটি' থেকে সেটা সম্ভব নয়। হয়তো বা ভবিষ্যতের মানুষ নতুন থিয়োরি গড়বে, নতুন পন্থা বের করবে, মহাশূন্যে আলোক তরংগের গতির সীমা অতিক্রম করতে। হয়তো বা পঞ্চম-ডাইমেনশনে বা অন্য স্পেস্-টাইম-কন্টিন্যুয়ামে সেটা সম্ভবও হতে পারে। আমাদের কল্পনা অতোদূরে পৌঁছায় না যে।"

সুমিত্রার প্রশ্নের শেষ হয় না, "আচ্ছা শংকর, তোমার মহাকর্ষের বিপরীত 'ফীল্ড' তৈরী করতে তো অনেক শক্তির দরকার—মহাশূন্যে অতটা শক্তি মিলবে কোত্থেকে?"

শংকর বলে, "এ শক্তিটা খুবই সামান্য। হিসেব করে দেখেছি প্রথম স্পুটনিকেই আমাদের যন্ত্রের প্রায় আড়াইশো গুণ শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যাপারটা কি রকম জানো? মোটরগাড়ীর চাকাটা বদল করতে হলে একটা 'জ্যাক্'-এর সাহায্যে গাড়ীটাকে ওপরে তুলতে হয়। তাতে তো বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। এটাও অনেকটা সেইরকম। আপাততঃ অনেকগুলো মোটরের ব্যাটারী যন্ত্রটার মধ্যে বসানো হয়েছে ফীল্ডের শক্তি সৃষ্টি করবার জন্য। কিন্তু আলিমচান্দানীর একটা পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে সৌরশক্তি ব্যবহার করার—ওদের

ব্যাটারীর সংখ্যা আরো কমিয়ে ফেলা যাবে। তারপর সেকেণ্ডে সাত মাইল পর্যন্ত গতিবেগ বাড়ানো গেলে সুইচ বন্ধ করে দিলেই হোলো—বাকী রাস্তাটা কোনো বাড়তি শক্তির প্রয়োজন হবে না। তারপরে চেষ্টা করলে হয়তো বা 'কসমিক' পদার্থকণার অমিতশক্তি আহরণ করাও অসম্ভব হবে না।"

সুমিত্রা ছেলেমানুষের মতো বলে, "আমার কিন্তু চাঁদটা দেখবার বড়ো ইচ্ছে।"

শংকর হেসে ফেললে, "সে আশা পূর্ণ হতে বেশী দেরী হবে না। বিয়ের দিন অকারণে পেছিয়ে দিতে তোমার যা তৎপরতা—বোধ হয় আমাদের মধুচন্দ্রই যাপিত হবে চাঁদে গিয়ে।"

সুমিত্রা এবারে দস্তুরমতো লজ্জা পায়, "যত্তো বাজে কথা।"

তারপর প্রসংগটার মোড় ঘুরাবার জন্য বলে, "কিন্তু শংকর, এই পৃথিবীতেই কতোরকম ভাবে আমাদের যন্ত্র কাজে লাগবে, সে কথাটাই ভাবছি। মোটরগাড়ীর ব্যবসায় আস্তে আস্তে উঠে যাবে, সকলেই কিনবে আমাদের যন্ত্র। তার নাম দেওয়া যাক একটা—'গ্রাভোমোবিল'। আমাদের জাতীয় সম্পদ কয়লা বা পেট্রোলিয়ম আর অপচয় করবার প্রয়োজন থাকবে না। ধরো, তুমি কোলকাতা সহরের সৌন্দর্য বাড়াতে চাও, নতুন করে গড়বার জন্য বাড়ী-ঘর আর ধ্বংস করতে হবে না। গ্রাভোমোবিল মোতায়েন করে আস্ত বাড়ী-ঘর সব সরিয়ে দাও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। যাদের বদলীর চাকরী—তাদের নতুন কর্মস্থলে বাড়ী খোঁজার পরিশ্রম করতে হবে না—এক সহর থেকে অন্য সহরে বসতবাটি বয়ে নিয়ে গেলেই হোলো। গ্রীষ্মকালে কোলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই সহরে বড়ো গরম—উঠে চলে যাও দু মাইল ওপরের ঠাণ্ডা বাতাসে, নয়তো গ্রাভোমোবিলে বাড়ী-ঘর নিয়ে চলো—সিমলা, উটি কি সুইজারল্যাণ্ডে। একটা বেঢপ বেয়াড়া পাহাড় রয়ে গেছে সহরের বুক জুড়ে—সে পাহাড়ের মধ্যে 'টানেল' কেটে কতকগুলো গ্রাভোমোবিল লাগিয়ে দাও। পাচার করো সে পাহাড়, পাহাড়ের দেশ হিমালয়ে, অথবা ল্যাণ্ড রিক্লেমেশনের কাজে।"

শংকর হেসে বলে, "বাব্বাঃ, মেয়ের কল্পনাশক্তি আছে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা সুরু করে দিয়েছে! আগে দেখ, কালকের 'ট্রায়াল' সফল হয় কিনা। আমার মনে কিন্তু দারুণ দুশ্চিন্তা, সুমিত্রা। যদি ভুল হয়ে থাকে কোথাও!"

সুমিত্রা বলে, "আহা! তা বলে কল্পনা করতে বাধাটা কোথায়? স্বপ্নটুকু বাদ দিলে তোমাদের যন্ত্রে কী থাকে শুনি? থাকে একটা পর্বতপ্রমাণ ইস্পাতের খোল, কতকগুলো বেয়াড়া বেঢপ যন্ত্রপাতি, মাইলের পর মাইল লম্বা ইলেক্‌ট্রিকের তার, ট্রায়োড টেট্রোড, পেন্টোড ইত্যাদি কত রকমের ভাল্‌ভের আবর্জনা!

নীরস গণিতের ছিবড়ে 'ফ্লুইড ডাইনামিক্‌স্' 'ওয়েভ মেকানিক্‌স্' 'ষ্টোচাষ্টিক প্রসেস-এর অখাদ্য জগাখিচুড়ি আর 'টেনসর-ভেকটর-স্কেলার'-এর দাঁতভাংগা কচকচি!'

শংকর বলে, "তাহোলে তোমার কল্পনার সংগে যোগ করে নাও—বরের আর ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে না—ঘোড়ার বদলে গ্রাভোমোবিল চেপে আসবে বিয়ে করতে। মান হলে স্ত্রী বাপের বাড়ী রওনা দেবে গ্রাভোমোবিলে ঘর-বাড়ী-হেঁসেল চাপিয়ে। অফিস-ফেরতা স্বামী বেচারীর হবে চক্ষুস্থির। তারপর ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে বিষয় সমস্যা—এক ভাই বাড়ী নিয়ে যেতে চায় ভ্যারাগাছি আর এক ভাই, প্যারামারিবো।

"তারপর ধরো, ট্রাফিক পুলিশে; চাকরী থাকবে না, পাসপোর্ট-ভিসার কোনো অর্থ থাকবে না।

"বাঙালী, বাঙালী থাকবে না, মারাঠি, মারাঠি থাকবে না—জগৎটা একাকার হয়ে যাবে। প্রেমে হতাশ হোলে আত্মহত্যা করবার একটা চটকদার উপায় হবে। নির্বাচনের সময়ে দেশের নেতারা সব মাথায় হাত দিয়ে বসবেন—হায় হায় আমার ভোটাররা সব গেল কোথায়!"

ভ্রু-কুঞ্চিত করে সুমিত্রা কিছুক্ষণ ভাবে, তারপরে বলে, "নাঃ শংকর, তুমি বড়ো দুঃখবাদী! এতবড়ো রঙীন কল্পনাটাই মাটি করে দিলে!"

শংকরও পাল্টা আক্রমণ করে, "কিন্তু আমার রঙীন কল্পনা? তার কী হোলো? দুঃখবাদী কে, তুমি না আমি? সত্যি কথাটা স্বীকার করো না কেন?

"সত্যি সুমিত্রা, সেদিনকার শিকদারের যুক্তির চেয়েও অদ্ভুত তোমার বিয়ে-না-করার যুক্তিগুলো। তবু তো শিকদারের যুক্তিগুলো ধরা-ছোঁয়া যায়, কিন্তু তোমার যুক্তিগুলো সবই অশরীরী—ধরা ছোঁয়ার বাইরে!"

সুমিত্রা কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আচ্ছা, কাল একথা বোলো, তাহোলেই বুঝবো শংকর রায় সত্যিকারের মানুষ! আজ রাতের কথাগুলো মনে থাকবে তো?"

শংকর বলে, "বেশ, তাহলে কালই দেখা যাবে। কিন্তু একটা ছোটোখাটো ইংগিত, একটা আভাষও দিতে পারো না আজ? জানোই তো রাতে আমার ঘুমই হবে না যন্ত্রটার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তায়। তার ওপরে কেন অস্বস্তি যোগ করতে চাও?"

উত্তর দেবার সময়ে সুমিত্রার কথায় সামান্য অভিমানের ছায়াও পড়ে—"তোমার কাছে তো যন্ত্রসম্বন্ধে ভাবনাটাই সব চেয়ে বড়ো, তার ওপরে থাকলোই না হয় একটা ছোটোখাটো উদ্বেগ—তুমি টেরও পাবে না।"

শংকর গম্ভীর হয়ে যায়—বলে, "না, তুমি বোঝো না সুমিত্রা। আজ আমার বার বার করে মনে পড়ে যাচ্ছে পুরোণো যুগের সেই চার ব্রাহ্মণের কথা।

"চার ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার পর স্নাতক হয়ে ঘরে ফিরছে। একজন তার মধ্যে লাভ করে এসেছে—যে কোনো জন্তুর অস্থির টুকরো থেকে সমস্ত কংকালটা গড়ে তোলার বিদ্যা; দ্বিতীয় ব্রাহ্মণসন্তান সে কংকালে যোগ করতে পারে রক্ত-মাংস; তৃতীয়জন রূপ দিতে পারে সে জন্তুকে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা আর গায়ের চামড়া ইত্যাদি সংযোগ করে। আর চতুর্থজন দিতে পারে প্রাণ। বিদ্যা নিয়ে বচসা সুরু হোলো এদের মধ্যে—সুতরাং সকলেরই জারিজুরি পরখ করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পাওয়া গেল একটুকরো অস্থি বনের মধ্যে। সে অস্থি কিন্তু এক ভীষণাকৃতি নরখাদক বাঘের। বিদ্যা সকলেরই প্রমাণ হয়ে গেল, কিন্তু প্রাণ কারোরই রইল না।

"আমারও তাই ভয়, সুমিত্রা, কী শক্তি নিয়ে আমরা খেলা করছি, তার স্বরূপ কিছুই জানি না। এ শক্তি মানুষের উপকারে আসবে, কি পরম অনিষ্ট করবে—তাও জানি না। হয় ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের মাথায় তুলে রাখবে এ আবিষ্কারের ফলে, না হয় জন্ম জন্ম আমাদের অভিসম্পাত করবে।

"একটা কথা কিন্তু স্থির জেনো, সুমিত্রা, কাল থেকে আমাদের চেনা জগৎটার পরিবর্তন সুরু হবে। তোমার সেদিনের কথামতো অচেনা আতংক আমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে যেন অসাড় করে দিচ্ছে।"

[ক্রমশঃ

—শিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র পাল।

সরস্বতী-স্তোত্রম্।

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেবং হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্।
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্।
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।

লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।

যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।

— যাজ্ঞবল্ক্য

কি খাই, কি খাই ?

রেবা দেবী

ভালো খাওয়া যে সুস্বাস্থ্য লাভের প্রধানতম উপায় এ কথা জানেন হয়ত সকলেই কিন্তু মানেন কিনা সেটাই সমস্যা। মেয়েরা স্বভাবতঃই খাওয়ার সম্বন্ধে এক ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা দেখিয়ে থাকেন, যেন ওবিষয়ে আগ্রহ থাকাটা যথেষ্ট শোভন নয়, আর তার ফলে প্রায়ই দেখা যায়, নানারকম ব্যাধি আশ্রয় করে তাঁদেরকে অকালে বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, যৌবনের অম্লান কুসুম শুকিয়ে ঝরে যায় বসন্তের পালা শেষ না হতেই।

খাওয়ার প্রতি যথোচিত নজর রাখাটা মেয়ে বা পুরুষ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ সুখাদ্য গ্রহণের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত আছে অমলিন স্বাস্থ্যশ্রী লাভের উপায়; সুখাদ্য বলতে অবশ্য সুরুচিকর খাদ্যই বোঝায় না। কোন কোন খাদ্যে কি পরিমাণ প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ আছে সে সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হয়ে সেই হিসাবে ভোজ্য বস্তু নির্ব্বাচন করাকেই সুখাদ্য গ্রহণ করা বলা চলতে পারে।

কি আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় সে দিকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিমত গ্রহণ করাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুষ্ঠ ব্যবস্থা। ডাক্তাররা বলেন, মানুষের দেহযন্ত্রটি চালু রাখার জন্য কয়েকরকম ভিটামিন যথা এ, বি, সি ইত্যাদি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাই বিধেয়, সাধারণতঃ কাঁচা শাক-শবজী, ফল-মূল ইত্যাদিতেই উপরোক্ত ভিটামিনগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকে সেজন্য এইগুলি কিছু পরিমাণে নিয়মিত গ্রহণ করলে যে শরীর সুস্থ থাকে, শ্রীমণ্ডিত হয় একথা সহজেই বলা যায়।

সাধারণতঃ চল্লিশের পরই মানুষের এই সব ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বিশেষভাবে, তরুণ বয়সে শরীরের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হয় তার ভিতরের শক্তিতেই যাকে চলিত কথায় বলা হয় রক্তের জোর থাকা; একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অবধি দেহ যন্ত্রটি থাকে তার আপন জোরেই কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে তাকে চালাতে হয় বাইরের শক্তির জোগান দিয়েই, সে সময়ই খাদ্যবস্তুও গ্রহণ করতে হয় বিশেষ সতর্ক হয়ে অন্যথায় স্বাস্থ্যের প্রসার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

স্বাভাবিক যৌবন লাবণ্য বজায় রাখতে ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য অতি প্রয়োজনীয়, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্য বহুল-পরিমাণে নির্ভর করে ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য গ্রহণের উপর; পাতিলেবু ও যে কোন রকমের ফলের ভিতর প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। কাঁচা স্যালাড ও কপিতেও এই ভিটামিন থাকে সুতরাং দৈনিক খাদ্য তালিকায় এগুলি স্থান পেলেই একজন প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি পেতে পারেন সহজেই।

দেহলাবণ্য ও দৃষ্টিশক্তি অটুট রাখার জন্য আর যে একটি ভিটামিন আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক সেটি হল ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি এর মতই কাঁচা সবজী ফলমূলে ভিটামিন-এ পাওয়া যায় তাছাড়া দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত অপরাপর বস্তু যেমন—মাখন, ক্রীম ইত্যাদিতেই প্রচুর পরিমাণে এ ভিটামিন পাওয়া যায়, লিভার ও কিডনীতেও এ ভিটামিনের প্রাচুর্য্য থাকে, লিভারকে এই ভিটামিনের ভাঁড়ার-ঘর বলা চলে, সমুদয় খাদ্য থেকে শরীর যে এ ভিটামিন গ্রহণ করে তার সবটাই সঞ্চিত হয় লিভারে এবং সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেহে প্রয়োজন মত।

ভিটামিনএর-প্রধান গুণ হল দৃষ্টিশক্তির জোর বাড়ানো, চোখের জন্য এই ভিটামিনটি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

ভিটামিন বি কে বলা উচিৎ সুখবর্দ্ধক ভিটামিন, কারণ মানুষের প্রফুল্ল থাকতে হলে যে বস্তুটি থাকা অপরিহার্য্য তা হল খাওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য অনেক কিছু অশান্তির জনক আর ভিটামিন-বি এই ক্ষুধামান্দ্যরই যম।

নিউরেসৃথানিয়া, খিটখিটে মেজাজ, স্মৃতিশক্তির দৌর্ব্বল্য—এ সবই বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ভিটামিন-বি-র অনুপস্থিতির উপর।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের অনেকগুলির ভিতরই এই পরম প্রয়োজনীয় ভিটামিনটির দেখা মেলে, বিশেষতঃ ওটমিলে যে কোন রকম বাদামে ও সবুজ মটরশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি থাকে; এই ভিটামিন রক্তহীনতা ও মানসিক অবসাদও দূর করে বলে চিকিৎসকের ব্যাবস্থাপত্রে প্রায়ই এটির উল্লেখ দেখা যায়; ভিটামিন-বির আরেক কার্য্যকারিতা হচ্ছে—এটি কোষ্ঠ পরিষ্কারক। প্রত্যেক মানুষের দেহযন্ত্রটি সচল রাখার জন্য যার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ।

ভিটামিন-ডির উপকারিতা অতি শৈশব হতেই মানুষের শরীরে দেখা দেয়, এই ভিটামিন খাদ্যবস্তুর মাধ্যম ব্যতীতও গ্রহণ করা সম্ভবপর, সূর্য্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, ত্বকের নিকটবর্ত্তী টিসুতে প্রতিফলিত হয়ে শরীরে ভিটামিন-ডির প্রবেশ সুগম করে কাজেই রৌদ্র সেবন এর জন্য বিশেষ ভাবেই প্রয়োজনীয়।

এ ছাড়া ভিটামিন-ডি খাদ্যর মধ্য দিয়া গ্রহণ করা চলে ও ভিটামিন-ডি যুক্ত বড়িও পাওয়া যায় আবশ্যকমত তার ব্যবহারও চলে।

মানুষের জৈবজীবন স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয় যে শক্তির দ্বারা, সেই শক্তি অর্থাৎ যৌন ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য ভিটামিনই এক অবশ্য গ্রহণীয় বস্তু, গম, লেটুসশাক, ডিম ও লিভার এর সবগুলিতেই প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিনের সন্ধান মেলে। সুস্থ স্বাভাবিক যৌন জীবন প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে প্রায় আলো-বাতাসের মতই প্রয়োজনীয় এই ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধির উপর মানুষের কর্ম্মক্ষমতা বাঁচার আনন্দ অনেকটাই নির্ভর করে এবং সেজন্যই ভিটামিনই প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের অবশ্য সেব্য।

মানুষের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই পাঁচটি ভিটামিনই আমরা পেতে পারি। হয় খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে না হয় কয়েকটি বড়ি সেবনে। কথিত আছে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনযুক্ত বড়ি সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন ও সেগুলি সহজ পাচ্য করার জন্য চিনি খেতেন অনুপান হিসাবে বস্তুতঃ তিনি ও তাঁর চিকিৎসকবৃন্দই প্রথম আবিষ্কার করেন যে ভিটামিন পিল সহজে হজম করার জন্য শর্করা অতি প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান আমাদের আজ শিখিয়েছে কি ভাবে চললে সময়কেও পরাস্ত করে রাখা যায়, দেহ-সৌন্দর্য্য অটুট থাকে যা জীবনের এক অনন্য সম্পদ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

৪০

অভিনয় চলল আরো এক ঘণ্টা ধরে। কিন্তু সানিন ও মারিয়া নিকোলায়েভনা আবার মঞ্চ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেদের কথায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আগের বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা চলছিল, কিন্তু এবারে সানিন আগের মত চুপ করে ছিল না। মনে মনে নিজের ওপর ও মারিয়া নিকোলায়েভনার ওপর রাগ হচ্ছিল তার। সে তাকে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বোঝাতে লাগল—যেন এই সম্বন্ধে মহিলাটির কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল! যুক্তিতর্কের অবতারণা করল সে, তাতে মহিলাটি গোপনে অত্যন্ত হর্ষ অনুভব করলেন। যখন তর্ক সুরু হয়েছে তখন বুঝতে হবে সে কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করেছে বা ভবিষ্যতে করতে যাচ্ছে। টোপ গিলেছে সে, হয়ে এসেছে, এবারে পোষ মানবে। তিনিও তর্ক করতে লাগলেন, হাসলেন। তার কথায় একমত হলেন, চিন্তা করলেন, ঝুঁকে পড়লেন—তাদের দুজনের মুখ কাছাকাছি সরে এলো, আরো কাছে, এবারে সে তার চোখ আর ফিরিয়ে নিল না। মারিয়া নিকোলায়েভনার চোখ দুটি তার মুখের ওপর, তার সারা শরীরে যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল, প্রত্যুত্তরে হাসল সানিন, ভদ্রতার খাতিরে···তবু তো হাসল। সে যে শাশ্বত ভাবগুলি, যথা পরস্পরের মধ্যে অকপটতা, কর্তব্য, পবিত্র প্রেম ও বিবাহ নিয়ে আলোচনা সুরু করল তাতে সুবিধে হলো মহিলাটির। সবাই জানে, এই বিষয়গুলি নিয়ে সুরু হলে কি হতে পারে তার পরিণতি।

যারা মারিয়া নিকোলায়েভনাকে ভালভাবে জানতো তারা বলত যখন তার শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকৃতিতে স্নিগ্ধ ও বিনীত ভাব, যাকে বলা যেতে পারে লজ্জার নিষ্পাপ রূপ দেখা যেত—(ভগবান জানেন সে এই নিষ্পাপ রূপটি কোথা থেকে সংগ্রহ করত!)···তখন বুঝতে হবে—অতি বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে সব কিছু।

এখন স্পষ্টতঃই সানিনের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। যদি এক মুহূর্ত মনোনিবেশ করে চিন্তা করার সময় হত তার, তাহলে নিজের প্রতি ঘৃণায় মন ভরে যেতো—কিন্তু চিন্তা করার বা ঘৃণা করার সময় তার মিলল না।

আর তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করলেন সম্পূর্ণভাবে। তার একমাত্র কারণ সে কুৎসিত ছিল না। কে বলতে পারে জীবনে কোন গুণটি পরম লাভ বা পরম ক্ষতিরূপে দেখা দেয়? এবার তার প্রিয়দর্শন চেহারা তার জীবনে দেখা দিল চরম সর্বনাশরূপে।

অভিনয় শেষ হল। মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনকে বললেন, তার গায়ে শালটি জড়িয়ে দিতে, তার রাণীর মত সুন্দর কাঁধে যখন সে নরম ভাঁজগুলো খুলে জড়িয়ে দিচ্ছিল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এবারে বাহুতে বাহু দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে—প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—বক্সের দরজায় প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়েছিল ডনহোফ। ঠিক তার পেছনেই ভীসবাডেনের সমালোচকের অদ্ভুত দেহটি দেখা গেল। সাহিত্য-সমালোচকের মুখটি প্রতিশোধের আনন্দে জ্বল-জ্বল করছিল।

তরুণ অফিসারটি বলল, 'মেডেম, আপনার গাড়ী খুঁজে আনতে দিন আমায়।' তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।' এবারে আদেশের সুরে নিম্নস্বরে বললেন, সানিনের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

ডনহোফ সমালোচকের দিকে ঘুরে রাগতকণ্ঠে বললো, 'গোল্লায় যান। কেন মিছিমিছি আমার পেছন পেছন ঘুরছেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনার ওপর রাগ করে নিরীহ সমালোচকের ওপর তার প্রতিশোধ নিল।

সমালোচকটি 'আচ্ছা যাচ্ছি, আচ্ছা যাচ্ছি' বলে সরে পড়লেন।

মারিয়া নিকোলায়েভনার দারোয়ান বাইরের চত্বরে অপেক্ষা করছিল। নিমেষে গাড়ী এনে হাজির করল—তাড়াতাড়ি উঠলেন তিনি গাড়ীতে। সানিনও তার পেছনে লাফিয়ে উঠল। দরজা বন্ধ হল, মারিয়া নিকোলায়েভনা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

সানিন জিজ্ঞেস করল 'কি হয়েছে, হাসছেন কেন?'

'মাপ করবেন আমাকে···এক্ষুণি মাথায় এল আমার: এখন যদি আপনাকে ডনহোফের সঙ্গে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে নাবতে হয়—আমার জন্য! বেশ হয় তাহলে, তাই না?'

'আপনি কি তাকে খুব ভাল করে চেনেন?'

'ওই ছেলেটি? ও আমাকে খবরাখবর এনে দেয়। আপনি চিন্তিত হবেন না।'

'আমি একটুও চিন্তিত হই নি।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। 'হ্যাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু দেখুন, আপনি অতি চমৎকার লোক, আশা করি আমার শেষ অনুরোধটি পালন করতে অস্বীকার করবেন না। আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি তিন দিন পর। আপনি ফিরে যাচ্ছেন ফ্রাঙ্কফোর্টে, কে জানে আমাদের আর কখনো দেখা হবে কি না।'

'কি অনুরোধ?'

'আশা করি ঘোড়ায় চড়তে জানেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই'।

'আচ্ছা, কাল ভোরে আপনার সঙ্গে আমি সহরের বাইরে যাব ঘোড়ায় চড়ে। চমৎকার ঘোড়ার। ফিরে এসে কাজ মিটিয়ে ফেলব। তারপর যবনিকা। বিস্মিত হবেন না। ভাববেন না

এ আমার অদ্ভুত খেয়াল বা পাগল হয়ে গেছি, হয়ত তাই হয়েছি, শুধু বলুন যাবেন।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার দিকে ফিরে দেখলেন। গাড়ীর ভেতর অন্ধকার ছিল, কিন্তু এই অন্ধকারের জন্যই তার চোখ দুটো আরো চকচক করতে লাগল।

সানিন নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা যাব।'

ঠাট্টা করে বললেন তিনি, 'আমি জানি কেন এরকম দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল আপনার—ভাবছেন: যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। কিন্তু সত্যি বলছি—আপনি খুব ভাল, খুব চমৎকার—আমি আমার কথা রাখব। এই আমার হাত, দস্তানাবিহীন—ডান হাত, যে হাতে লোকে কাজ করে। হাতে হাত দিন, বিশ্বাস রাখুন। আমি যে কি ধরণের নারী সে আমি নিজেই জানি না, কিন্তু আমি অতি অকপট, অতি সাধু, আমার সঙ্গে ব্যবসা করে কাউকে ঠকতে হবে না।'

সানিন নিজেই জানত না কি সে করতে যাচ্ছে, হাতখানি তুলে ধরে ঠোঁটে চেপে ধরল। মারিয়া নিকোলায়েভনা আস্তে আস্তে হাতটি সরিয়ে নিলেন, চুপ হয়ে গেলেন, গাড়ী না থামা পর্যন্ত আর একটি কথাও বললেন না।

তিনি উঠলেন নাববেন বলে। কি হয়ে গেল হঠাৎ? এ কি শুধু সানিনের কল্পনা? না সত্যি সত্যি অনুভব করল সে তার গালে জ্বালাময় স্পর্শ?

সিঁড়িতে সোনালী জরির পোযাকপরা প্রতিহারী তাকে দেখে চার মোমবাতির মোমবাতিদান নিয়ে এল। ওপরে উঠতে উঠতে মারিয়া নিকোলায়েভনা ফিস-ফিস করে বললেন 'কাল'। তার চোখ ছিল নীচের দিকে। আবার বললেন 'কাল'!

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সানিন দেখল টেবিলের উপরে রয়েছে জেম্মার চিঠি। চিঠিটি দেখেই তার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ভয়, পরমুহূর্তেই কিন্তু আনন্দ অনুভব করল, সে হয়ত শুধু নিজের কাছে ভয়কে গোপন করার জন্য। মাত্র কয়েক লাইন লেখা। কাথাবার্তা ভালভাবেই সুরু হয়েছে জেনে সে আনন্দ প্রকাশ করেছে, ধৈর্য ধরে থাকতে উপদেশ দিয়েছে। বাড়ীর সবাই ভাল আছে ও তার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আশা করে আছে, লিখে চিঠিটা শেষ হয়েছে। সানিনের মনে হল চিঠিটা যেন প্রাণহীন মর্মস্পর্শী নয়। কাগজ-কলম নিয়ে উত্তর দিতে বসে আবার সব রেখে দিল। 'কি-ই বা আছে লেখার? কালই তো ফিরে যাচ্ছি—কি হবে লিখে?'

তখনই বিছানায় শুতে গেল, ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। যদি সে জেগে থাকে জেম্মার কথাই মনে আসবে তার। আর এখন জেম্মার কথা চিন্তা করতে সে লজ্জিত বোধ করছিল। বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, কালই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে যাবে ওই উৎকেন্দ্রিক মহিলাটির কাছ থেকে। এ সব অনর্থের কথা ভুলে যাবে।...

দুর্বলচিত্ত লোকেরা যখন নিজেদের সঙ্গে কথা বলে তখন ওজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করে—আর তারপর...পরিণামের কথা চিন্তা করে না।

৪১

এ সব ভাবতে ভাবতেই সানিন ঘুমিয়ে পড়ল। মারিয়া নিকোলায়েভনা যখন পরদিন ভোরে অধৈর্য হয়ে তার দরজায় টোকা দিচ্ছিলেন, তার হাতে ছিল প্রবালের হাতলওলা চাবুক, গাঢ় নীলরং-এর ঘোড়ায় চড়ার পোযাক কাঁধে ফেলা, ঢিলে করে বাঁধা চুলের ওপরে ছোট একটি ছেলেদের টুপি, পিঠের ওপর ফেলা ওড়না, ঠোঁটে বিজয়িনীর হাসি, সে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল তার চোখে, তার সারা মুখে—তখন কি ভাবছিল সানিন তা কেউ বলতে পারে? ইতিহাস তা লিখে রাখে নি।

আনন্দোচ্ছল স্বরে বললেন, 'প্রস্তুত হয়েছেন?'

সানিন তার কোটে বোতাম লাগাল, নিঃশব্দে টুপি মাথায় দিল, মারিয়া নিকোলায়েভনা হাসিভরা চোখে চাইলেন তার দিকে, মাথা নেড়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। সানিনও তার পেছনে ছুটে নেমে এল।

হোটেলের প্রবেশদ্বারে ঘোড়াগুলো আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। তিনটে ঘোড়া—মারিয়া নিকোলায়েভনার ঘোড়া ছিল পাটকিলে রং-এর, মুখ সরু, কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার ঠোঁট, কালো গভীর দুটি চোখ, হরিণের মত পা, একটু রোগা তবু সুন্দর ও দীপশিখার মত উগ্র—সানিনের ঘোড়া ছিল শক্তিশালী প্রশস্ত বক্ষ, কালো রং, একটু মোটাই বলা যেতে পারে। তৃতীয় ঘোড়াটি ছিল সহিসের জন্য। মারিয়া নিকোলায়েভনা লাফিয়ে জিনে চড়ে বসলেন। ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল লেজ ও শরীরের পেছন দিকটা উঁচু করে। কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা স্থির হয়ে বসে রইলেন (খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে জানতেন তিনি)। তার পলোজভের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বাকী ছিল। পলোজভকে ওপরের বারান্দায় দেখা গেল নিত্যসঙ্গী ফেজ পরে। তার ড্রেসিং গাউনের বোতাম লাগান ছিল না, মুখে ছিল না হাসি বরং তার জায়গায় ছিল ভ্রূকুটি—হাতে ছিল বাটিস্টা রুমাল, রুমাল নাড়ছিল। সানিনও তার ঘোড়ায় চড়ে বসল। মারিয়া নিকোলায়েভনা তার চাবুক তুলে পলোজভকে অভিবাদন করলেন, ঘোড়ার গলদেশে কশাঘাত করলেন। ঘোড়া প্রথমে পিছিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, হেঁটে হেঁটে রওয়ানা হল। সারা শরীর তার কেঁপে উঠছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনার পেছন পেছন সানিন তার দিকে চেয়ে চেয়ে আসতে লাগল। তার তন্বী কমনীয় দেহ ঢিলে অথচ সুন্দর ভাবে কর্সেট পরিহিত ছিল। শরীর দুলে দুলে উঠছিল। পেছন ফিরে চোখের ইশারায় সানিনকে ডাকলেন তিনি। সানিন এবার তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

'কি চমৎকার, না!' বললেন তিনি 'বিদায় নেবার আগে আমি বলতে চাই আপনি খুব ভাল লোক ও কখনও আপনাকে এজন্য অনুতাপ করতে হবে না।'

শেষ কথাগুলো বলে মাথা নাড়লেন কয়েক বার, যেন সানিনকে তার যথার্থতা জোর দিয়ে বোঝাতে চাইলেন।

তাকে এত সুখী দেখে সানিন বিস্মিত বোধ করল। শিশুরা যখন খুব তৃপ্তি বোধ করে তখন তাদের মুখে যে ভাব দেখা দেয় মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখেও সে রকম গম্ভীর ভাব দেখা গেল।

নিকটের নগরদ্বার পর্যন্ত ঘোড়া হেঁটেই গেল। কিন্তু বাইরে প্রশস্ত রাজপথে এসে ঘোড়া দুলকি চালে চলতে লাগল। আবহাওয়া

ছিল চমৎকার—গ্রীষ্মের একটি উজ্জ্বল দিন। হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর দিয়ে, তাদের কানে সঙ্গীতের সুর তুলে। তারা ছিল সুখী। তারা এগিয়ে যেতে লাগল যৌবনবেগে, স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন নিয়ে মুক্ত অবাধ গতিতে, প্রতি মুহূর্তে উদ্দাম যৌবনের বেগ যেন বেড়ে যেতে লাগল। মারিয়া নিকোলায়েভনা লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলেন। সানিনও দেখাদেখি তাই করল।

আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন তিনি 'এই জন্যই তো বেঁচে থাকতে হয়। যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তারই সাধন। পেয়ালা ভরে গেছে, আমার জীবনপাত্র উছলে উঠেছে।' হাত এনে নিজের গলায় রাখলেন। 'মনে হয় কি ভালমানুষ আমি! দেখুন কি করুণাপূর্ণ হৃদয় আমার। মনে হয় সারা পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে পারি আমি। না, না, সারা জগতকে নয়—আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে পারি না। রাস্তার এক পাশে এক অশীতিপর বৃদ্ধ মন্থর গতিতে হেঁটে আসছিলেন—চাবুক দিয়ে দেখালেন তাকে। 'অবশ্য তাকে সুখী করতে আপত্তি নেই আমার। এই যে—এটা নাও।' চেঁচিয়ে উঠলেন জার্মাণে, বুড়োকে ছুঁড়ে দিলেন ছোট থলে। ছোট ভারী থলেটি (তখনকার দিনে মানিব্যাগ ছিল না) শব্দ করে রাস্তায় পড়ল। পথিকটি চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মারিয়া নিকোলায়েভনা অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়লেন। ঘোড়াকে কদম চালে ছুটিয়ে দিলেন। সানিন ঘোড়া ছুটিয়ে যখন তার নাগাল পেলো বলল, 'আপনি ঘোড়ায় চড়তে এত ভালবাসেন?' মারিয়া নিকোলায়েভনা আবার আকস্মিক ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন, অন্য কোনরকমে ঘোড়া থামাতে পছন্দ করতেন না তিনি।

'ওর কৃতজ্ঞতা থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমাকে কেউ ধন্যবাদ দিলে আমার সব আনন্দ মাটি হয়ে যায়। জানেনই তো, আমি ওর খাতিরে দান করিনি, নিজের তৃপ্তির জন্য করেছিলাম। কি সাহসে সে আমাকে ধন্যবাদ দেয়? কি বলছিলেন আপনি, শুনতে পাইনি।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম··জানতে চেয়েছিলাম কিসের জন্য এত খুশী আপনি আজ?'

'দেখুন' মারিয়া নিকোলায়েভনা বললেন। আবার হয় তিনি সানিনের কথা শুনতে পেলেন না, নয় তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। 'আমার ভাল লাগছে না, সহিসটা পেছন পেছন ঘুরছে আমাদের। নিশ্চয়ই সবসময় ভাবছে কখন মহোদয়রা দয়া করে ফিরবেন। কি করে ওকে তাড়াই বলুন তো?' চট করে পকেট থেকে ছোট নোটবই বের করে বললেন 'একটা চিঠি দিয়ে ওকে সহরে পাঠাব? না—মনে পড়ছে, ঐ যে সামনে একটা সরাই রয়েছে, মনে হচ্ছে না?'

সানিন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখল—'মনে হচ্ছে'।

'চমৎকার! ওকে ওখানে থেকে বিয়ার পান করতে বলব। আমরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

'কিন্তু কি ভাববে ও?'

'তাতে কি এসে-যায়? আর কিছু চিন্তাই করবে না সে। কেবল বিয়ার পান করবে। সানিন, চলুন। (এই প্রথম তিনি তাকে পদবী ধরে ডাকলেন) এগিয়ে চলুন, দুলকি চালে।'

সরাইতে পৌছে সহিসকে ডেকে মারিয়া নিকোলায়েভনা তার অভিপ্রায় জানালেন। সহিসের পূর্বপুরুষ ছিলেন ইংরেজ, তার মেজাজও ছিল ইংরেজদের মত, নিঃশব্দে হাত উঠিয়ে টুপি স্পর্শ করল, লাফিয়ে জিনে চড়ে বসল, লাগাম ধরে ঘোড়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন—'এখন আমরা হাওয়ার মত মুক্ত। কোথায় যাব আমরা? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম? দেখুন—হাঙ্গেরীর রাজার রাজ্যাভিষেক হচ্ছে যেন—আমিই যেন হাঙ্গেরীর রাজা। (তিনি চাবুক দিয়ে চার দিক দেখালেন) সবকিছুই আমাদের। আমি বলছি আপনাকে—দূরে ওই সুন্দর পর্বতমালা। দেখছেন আর অরণ্য? চলুন সেখানে যাই—পর্বতে যাই—পর্বতে।'

'পর্বতে—যেখানে স্বাধীনতা আছে।'

রাজপথ ছেড়ে মরু, বহুদিনের অব্যবহৃত পথে কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন—মনে হল সেই পথটি সত্যিই পর্বতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সানিন তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

৪২

পথ শীগ্‌গিরই পায়ে-চলা পথ হয়ে শেষে একটি ছোট নালায় এসে হারিয়ে গেল। সানিন ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা বললেন, 'না আমি পর্বতে যেতে চাই। চলুন পাখীরা যেমন সোজা উড়ে যায়, আমরা তেমনি সোজা নাক বরাবর যাই।' এই বলে তার ঘোড়াকে লাফিয়ে নালা পার করে দিলেন। সানিনও তাই করল। নালার পর এল প্রান্তর, প্রথমে শুকনো, তারপর ভিজে, শেষে জলাভূমি; চার দিকেই জল চুঁয়ে উঠছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ইচ্ছে করেই ছোট ছোট জলভরা গর্তে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। হেসে চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আমরা বাচ্চাদের মত খেলা করি, চলুন।'

সানিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জলভরা ছোট ছোট গর্তে শিকার করা কা'কে বলে জানেন?'

সানিন উত্তর দিল 'হ্যাঁ, জানি'—বলে চললেন তিনি 'আমার কাকা কুকুর নিয়ে শিকার করতেন। বসন্তকালে আমি তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতাম। কি ভালোই যে লাগত! আর এখন আমরা—আপনি ও আমি সেরকম শিকার করতে যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন, আপনি রাশিয়ান হয়েও ইটালীয়ানকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। অবশ্য সে আপনি বুঝবেন। এটা কি? আর একটা নালা? হুপ-লা।' ঘোড়া লাফিয়ে গেল, মারিয়া নিকোলায়েভনার টুপি পড়ে গেল। ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ল কোঁকড়ানো চুলের রাশি। সানিন নেমে টুপিটা তুলতে যাচ্ছিল, চেঁচিয়ে উঠলেন—'হাত দেবেন না। আমি নিজেই তুলব ওটা।' জিনের ওপর থেকেই নীচু হয়ে চাবুকের হাতল দিয়ে ওড়না জড়িয়ে ধরে টুপিটা তুলে ধরলেন, মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু চুলগুলো আর খোঁপা করে ওপরে তুলে দিলেন না। ছুটে এগিয়ে গেলেন। সানিনও তার পাশে ঘোড়া কদম চালে চালিয়ে দিল, তার পাশে থেকে নালা, বেড়া পাহাড়ী নদী ডিঙ্গিয়ে কখনও ছোট লাফ দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, উঁচুতে উঠে, নীচে নেমে সব সময় মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখের দিকে চেয়ে। দেখার যোগ্য চেহারা বটে—যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুল।

তার বক্ত অপলকে লোভী চোখ দুটি ছিল খোলা, ঠোঁট দুটি ছিল ঈষৎ উন্মুক্ত. বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। চেয়ে ছিলেন তিনি সামনের দিকে, যেন যা তার নজরে পড়ছিল সব অধিকার করতে চাইছিল তার নির্ভয় আত্মা পৃথিবী, আকাশ সূর্য এমন কি বাতাস পর্যন্ত। জীবনে যেন তার একমাত্র লোভ ছিল অতিক্রম করার মত বিপদ যেন যথেষ্ট ছিল না। জোরে বললেন 'সানিন, এযেন ব্যুরগারের 'লেনোর'এর মত। তফাৎ শুধু আপনি জীবিত মৃত নন, আমিও জীবিত। তার দুর্দমনীয় পাশব শক্তি জেগে উঠেছিল পূর্ণ প্রতাপে। সে যেন তার ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে—অসুররমণী নয়, অর্ধেক দেবতা, অর্ধেক পশু এক তরুণ স্ত্রীদেবতা। গর্বিতা প্রকৃত রাণী যেন তার এই প্রাণময় উচ্ছ্বাস দেখে মূক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

অবশেষে মারিয়া নিকোলায়েভনা রাশ টানলেন ঘোড়ার, ফেনা বেরোচ্ছিল শ্রান্ত ঘোড়ার মুখের দু পাশ দিয়ে। নড়ে উঠেছিল তার শরীর। সানিনের শক্তিশালী কিন্তু ভীষণ মোটা ঘোড়াটি নিশ্বাস নিচ্ছিল আওয়াজ করে।

মারিয়া নিকোলায়েভনা উচ্ছ্বসিত হয়ে নিম্নস্বরে বললেন, 'এই কি আনন্দ নয় ?'

সানিন উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিল 'এই'—তার শিরায় শিরায় রক্ত যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'অপেক্ষা করুন, এই শেষ নয়' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাতের দস্তানাটি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

'আমি বলেছিলাম আপনাকে অরণ্যে নিয়ে যাব, পর্বতে—ওই যে পর্বত।' হ্যাঁ, ঐ যে পর্বতমালা, শিখরে ঘন বন বেষ্টিত, তাদের কাছ থেকে আর মাত্র দু'শ গজ দূরে। 'দেখুন, ওই যে রাস্তা। চলুন এগিয়ে চলি। কিন্তু এবারে ঘোড়াগুলি হেঁটে যাবে। বিশ্রাম দিতে হবে তাদের।'

এগিয়ে গেলেন দু'জন ঘোড়ায় চড়ে। মারিয়া নিকোলায়েভনা মাথার এক ঝাঁকুনিতে সব চুল পেছনে করে দিলেন। তারপর দস্তানার দিকে চেয়ে খুলে ফেললেন। 'আমার হাতে চামড়ার গন্ধ করবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না আপনার—তাই না ?'

মারিয়া নিকোলায়েভনা হাসলেন, সানিনও হাসল। কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাদের ঘনিষ্ঠতা যেন বেড়ে গেল, তাদের বন্ধুত্ব গভীর হল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আপনার বয়স কত ?'

'বাইশ।'

'না, সত্যি ? আমারও বয়স বাইশ। চমৎকার বয়স! দুজনের বয়স যোগ করে দিলেও যৌবন থাকবে। কি ভীষণ গরম হচ্ছে। বলুন তো আমার মুখ কি খুব লাল দেখাচ্ছে ?'

'পপির মত লাল', রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'যদি আমরা বনে যেতে পারি, সেখানে ঠাণ্ডা হবো। পুরানো বন্ধুর মত এই প্রাচীন বন। আপনার কি কোন বন্ধু আছে ?'

সানিন চিন্তা করে বলল—'হ্যাঁ···কিন্তু খুব বেশী নয়। আর কেউই প্রকৃত বন্ধু নয়।'

'আমার প্রকৃত বন্ধু আছে, তবে তারা কেউই বৃদ্ধ নয়। আমার ঘোড়াটি আমার বড় বন্ধু। কি সাবধানে সে আমাকে বহন করে। কি ভালই লাগছে এখানে এসে। সত্যিই কি আমি পরশু প্যারিস যাচ্ছি ?'

প্রতিধ্বনির মত সানিন বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই কি ?'

'ফ্রাঙ্কফোর্ট যাচ্ছেন আপনি ?'

'নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কফোর্ট যাব।'

'আচ্ছা, সুখী হোন আপনি কামনা করি। আজকের দিনটি কিন্তু আমাদের।'

ঘোড়া দুটি অরণ্যে পৌঁছে ভেতরে প্রবেশ করল। চারদিক থেকে দীর্ঘ মধুর ছায়া তাদের আবৃত করল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন 'এ যে স্বর্গীয় সুখ। চলুন আমরা আরো গভীর ছায়ায় যাই।'

ঘোড়াগুলি এবার 'গভীরতর ছায়ার' উদ্দেশে চালিত হল, হেলে-দুলে আওয়াজ করে নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ মোড় ফিরে একটা সরু রাস্তা ধরল এবার। বুনো গাছের ও পায়ের নীচে পচনশীল পাতার গন্ধে ভারী হয়েছিল বাতাস। উঁচু-নীচু জমি থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। রাস্তার দুপাশে ছিল ছোট ছোট টিলা সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত।

'দাঁড়ান' মারিয়া নিকোলায়েভনা বললেন। 'এই মখমলের আসনে বসতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাকে নামতে সাহায্য করুন।'

সানিন ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে এল। তার কাঁধে ভর দিয়ে লাফিয়ে নেমে একটা ঢিপির ওপর বসলেন তিনি। দুটো ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে তার সামনে।

তার মুখের দিকে চাইলেন তিনি! 'কি করে ভুলতে হয় জানেন, সানিন ?'

সানিনের মনে পড়ল কাল গাড়ীতে কি ঘটে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল 'এ কি প্রশ্ন না ভর্ৎসনা ?'

'আমি জীবনে কাউকে ভর্ৎসনা করিনি। আপনি কি তুকতাকে বিশ্বাস করেন ?'

'তার মানে ?'

'মন্ত্র-তন্ত্র। আমাদের রাশিয়ান লোকগীতিতে যা নিয়ে গান আছে।'

সানিন আস্তে বলল—'ও, তাই ভাবছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি তাতে বিশ্বাস করি—আর আপনিও একদিন করবেন'।

সানিন বলল 'গুণ করা ? সব কিছুই সম্ভব। আগে বিশ্বাস করতাম না, এখন করি। এখন আর নিজেকে চিনতে পারছি না।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা কি যেন চিন্তা করছিলেন, পেছন ফিরে চাইলেন।

'জায়গাটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ঐ প্রকাণ্ড বড় ওক গাছের পেছনে চেয়ে দেখুন তো সানিন, ওখানে কি লাল ক্রস দেখা যাচ্ছে ?'

সানিন এক পাশে সরে দেখল—'হ্যাঁ'

মারিয়া নিকোলায়েভনা খুসী হলেন—'ভাল। আমি জানি কোথায় এসেছি আমরা। এখনও পথ হারাইনি। কি আওয়াজ আসছে—কাঠুরে কি ?'

সানিন ঝোপের ভেতর চেয়ে দেখল। 'হ্যাঁ, ওই যে কে শুকনো ডাল ভাঙছে।'

মারিয়া নিকোলায়েভনা বললেন, 'আমার চুল বাঁধা দরকার, ত

না হলে আমাকে দেখে কত কিছু ভাবতে পারে।' টুপি খুলে তার দীর্ঘ বিনুণি দিয়ে খোঁপা বাঁধতে বসলেন। ঘোড়ায় চড়ার ঘন নীল রং-এর পোষাকের ভাঁজ থেকে তার সুন্দর শরীর দেখা যাচ্ছিল। জামার এখানে ওখানে শৈবাল লেগে ছিল।

সানিনের পেছনে হঠাৎ একটি ঘোড়া মাথানাড়া দিলো, আচমকা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল তার—চমকে উঠল সে। তার মনের ভেতর তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, সেতারের তারের মত তার স্নায়ুগুলো টান হয়েছিল। যেন ডাইনীতে ভর করেছে তার ওপর। তার সারা শরীর সমস্ত আত্মা ভরেছিল একটি জিনিষে, এক চিন্তায় এক কামনায়। মারিয়া নিকোলায়েভনা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে।

অবশেষে টুপি পরে বললেন 'বসুন না এখানে? আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ওটা কি?'

অরণ্যে গাছপালা ছাড়িয়ে—হঠাৎ গর্জন শোনা গেল। 'মেঘগর্জন?'

সানিন উত্তর দিল 'মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা! আজ তাহলে ছুটি—ঠিক ছুটির দিন। মেঘগর্জনই সবচেয়ে বড় পুরস্কার নিয়ে এসেছে।' আবার গর্জন শোনা গেল—এবারে আরো জোরে—আরো দীর্ঘস্থায়ী। 'সাবাস! মনে পড়ে ইনিডের কথা কাল বলছিলাম? ওরা ও অরণ্যে ঝড়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের আশ্রয় নেওয়া দরকার।' তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'কাছে নিয়ে আসুন আমার ঘোড়াটা। হাত বাড়ান তো। ঠিক আছে। আমি খুব ভারী নই।'

পাখীর মত লাফিয়ে উঠলেন জিনে। সানিনও ঘোড়ায় উঠে বসল। অনিশ্চিতভাবে বলল সে, 'আপনি কি বাড়ী যাচ্ছেন?'

'বাড়ী?' রাশ টেনে প্রতিধ্বনির মত জোরাল কণ্ঠে বললেন। প্রায় কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিলেন 'আমাকে অনুসরণ করুন।'

পথ ধরে চললেন, লাল ক্রস ছাড়িয়ে গেলেন, সমভূমিতে নামলেন, আবার পর্বতের উদ্দেশে উঁচু পথে চললেন, পথ ধরে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন। কোথায় চলেছেন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল জানতেন তিনি। কোন কথা না বলে, একবারও পেছনে না চেয়ে, সম্রাজ্ঞীর মত এগিয়ে যেতে লাগলেন, সানিন তার পেছন পেছন বাধ্য ও নত হয়ে অনুসরণ করছিল, তার স্পন্দিত হৃদয়ে আর কিছুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। অল্প অল্প বৃষ্টি সুরু হল। ঘোড়াকে জোরে চালিয়ে দিলেন দেখে সানিনও জোরে চালিয়ে দিল। ছোট ছোট দেবদারু গাছের শ্যামল শোভার ভেতর দিয়ে অবশেষে দেখতে পেলো একটি কুঁড়েঘর। তার দেওয়ালে ছোট একটি জাফরিকাটা দরজা, একটা ধূসর ঝলন্ত পাথরের আশ্রয়ের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরটি। মারিয়া নিকোলায়েভনা তার ঘোড়াকে জোর করে ছোট ঝোপের ভেতর চালিয়ে দিলেন, কুঁড়েঘরের দরজার ঠিক সামনে লাফিয়ে নেমে গেলেন ঘোড়া থেকে। ফিস-ফিস করে বললেন 'ইনিয়েস?'

চার ঘণ্টা পর মারিয়া নিকোলায়েভনা ও সানিন সহিসকে সঙ্গে করে ফিরে এল ভীসবাডেনে হোটেলে। সহিসটি তার জিনে বসে ঢুলছিল। মঁশিয়ে পলোজভ, হাতে দেওয়ানকে লেখা চিঠিটি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এল। তার মুখে পড়েছে অসন্তোষের ছায়া। স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইল, চাপাগলায় বলল, 'তুমি কি বলতে চাও আমি হেরে গেছি?'

উত্তরে মারিয়া নিকোলায়েভনা শুধু কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলেন।

সেই দিনই দু' ঘণ্টা পরে তার নিজের ঘরে সানিন দাঁড়িয়েছিল, মারিয়া নিকোলায়েভনার সামনে—চরিত্রহীন পতিত হয়েছে সে।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি তাকে। 'প্যারিসে—না ফ্রাঙ্কফোর্টে?'

'আপনি যেখানে থাকেন সেখানেই যাব আমি, আপনি যেখানে থাকবেন সেখানেই থাকব আমি, যত দিন না আমাকে তাড়িয়ে দেন।' উত্তর দিল সানিন বেপরোয়া হয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে তার হাত দুটি ঠোঁটে ঠেকাল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি তার মাথার ওপর রাখলেন হাত দুটি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আঙুল চালাতে লাগলেন সানিনের সুন্দর চুলের ভেতর। তার ঠোঁটে দেখা দিল বিজয়িনীর হাসি, তার বিশাল চোখ দুটি চকচক করছিল, তাতে দেখা যাচ্ছিল নিষ্ঠুর বিজয়গৌরবের সন্তোষ। বাজপাখী তার শিকারের গায়ে নখ ঢুকিয়ে দিলে এরকম সন্তোষ দেখা দেয় তার চোখে।

৪৩

সানিন যখন তার পড়ার ঘরের নীরবতায় বসে কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন, গার্নেট পাথরের ক্রসটি দেখে তার এই মনে পড়ল। তার অন্তর্দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি একের পর এক ছবির মত ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু যখন তিনি মেডেম পলোজভার কাছে তার এই অবমানিত প্রার্থনার কথায় এসে পৌঁছলেন, যখন তিনি তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন, যখন থেকে তার লাঞ্ছনার আরম্ভ মন থেকে এসব ছবি মুছে দিতে চাইলেন তিনি। আর সহ্য করতে পারছিলেন না। আর কিছু তার মনে পড়ছিল না কি? না, তা নয়। তার মনে আছে, খুব ভাল ভাবেই মনে আছে, কি হল তারপর। কিন্তু এখনও, এত বছর পরও লজ্জা তাকে ঘিরে ধরল। তার ভয় হল দুর্নিবার আত্মগ্লানিতে তাহলে তার মন ভরে যাবে, যদি তিনি স্মৃতিকে চুপ করিয়ে না দেন। কিন্তু যতই তিনি অতীত দিনের স্মৃতিকে চাপা দিতে চাইছিলেন, ততই তারা মাথা তুলছিল। মনে পড়ল জেম্মাকে তিনি মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছিলেন—সে চিঠির জবাব আর আসেনি। তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া, তার কাছে ফিরে যাওয়া—এই প্রতারণা, এই বিশ্বাসভঙ্গের পর—না, না। বিবেক ও মর্যাদাবোধ সে তখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেনি। তা ছাড়া নিজের ওপর আর বিশ্বাস নেই তার—আত্মসম্মান হারিয়েছে; কোন কিছুর জন্য জবাবদিহি করার সাহস তার আর নেই। তার এখনও মনে পড়ে—হায়, কি লজ্জাকর! কি করে সে পলোজভের চাকরকে ফ্রাঙ্কফোর্টে পাঠালো তার সব জিনিষ নিয়ে আসবে বলে, কি ভয়েই দিন কাটছিল তার, কি করে একটি চিন্তা তার সারা দেহ-মন জুড়েছিল—যত শীগ্‌গির সম্ভব প্যারিসে পালিয়ে যাওয়া। মনে এল কি করে মারিয়া নিকোলায়েভনার আদেশে ইপ্পোলিত সিদোরিচের অধীনতা স্বীকার করল সে, ফন ডনহোফের সঙ্গে পূর্বের বিবাদ ভুলে গিয়ে মিত্রতা স্থাপন করল, তার আঙুলে সে দেখতে পেয়েছিল একটি লোহার আংটি—ঠিক এরকম একটি আংটি মারিয়া নিকোলায়েভনা তাকে দিয়েছিলেন। তারপর আরো লজ্জাকর,

হীনতর স্মৃতি জেগে উঠল তার মনে। ওয়েটার তাকে এনে একটি ভিজিটিং কার্ড দিল—তাতে লেখা ছিল পাণ্টালেওন সিপ্লাটোলা, ডিউক অব মডেনার রাজসভার সভাগায়ক। বৃদ্ধটির কাছ থেকে লুকিয়েছিল সে। কিন্তু হোটেলের দালানে তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। এখনও তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন—ধূসর কোঁকড়ানো চুল এসে পড়েছে সামনে—তার পেছনে তার ক্রুদ্ধ রাগত মুখ। বৃদ্ধের চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছিল, সানিনের কানে এল চিৎকার আর অভিসম্পাত; এই কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল···'নিপাত যাও। কাপুরুষ, হীন বিশ্বাসঘাতক!' সানিন মুখভঙ্গী করে, মাথা নেড়ে এ চিন্তার এ ছবির হাত থেকে মুক্তি চাইলেন। কিন্তু এবারেও স্পষ্ট ফুটে উঠল তা মনে—গাড়ীর সামনে সরু বেঞ্চিতে বসে আছে সে। পেছনের আরামদায়ক বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছেন মারিয়া নিকোলায়েভনা ও ইপ্‌পোলিত সিদোরিচ, ভীসবাডেনের রাস্তা দিয়ে দুলকি চালে চারটি ঘোড়া টেনে চলল তাদের গাড়ী প্যারিসের পথে। সানিন ছাড়িয়ে দিল একটি পেয়ার—সেই পেয়ারটি এখন ইপ্‌পোলিত সিদোরিচ খাচ্ছে। মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনের দিকে চেয়ে হাসছেন। ইতিমধ্যেই এই হাসি সানিনের চেনা হয়ে গেছে—সম্রাজ্ঞী তার দাসের দিকে চেয়ে যে হাসি হাসেন।

কিন্তু, হে ভগবান, সহরের কাছেই সহরতলীতে ওই রাস্তার মোড়ে কে দাঁড়িয়ে আছে—ও কি পাণ্টালেওন নয়? আর ও কে ওর সঙ্গে? ও কি এমিলিও? হ্যাঁ, একদিন কি ভক্তিই ছিল তার প্রতি ছেলেটির। এই তো সেদিন তার প্রতি শ্রদ্ধায় তার প্রশংসায় পূর্ণ হয়েছিল ছেলেটির হৃদয়, আর আজ? তার রক্তহীন সুন্দর চেহারা এখন এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে মারিয়া নিকোলায়েভনা পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন—গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই মহৎ বালকটির চেহারায় এখন ফুটে উঠেছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। চোখ দুটি ঠিক তার বোনের মত দেখতে—সানিনের দিকে চেয়ে অগ্নিবর্ষণ করছে, ঠোঁট দুটি বন্ধ আছে, কেবল অপমানসূচক শব্দ উচ্চারণের জন্য মাঝে মাঝে খুলছে।

এখন পাণ্টালেওন হাত বাড়িয়ে কা'কে দেখাচ্ছে সানিনকে? টার্টালিয়াকে আর টার্টালিয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে সানিনকে লক্ষ্য করে ডাকছে এই সং কুকুরটির ডাকেও যেন অসহ্য অপমান মাখানো·····

আর তারপর—প্যারিসের জীবন—লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণা, ক্রীতদাসের মত অধিকার নেই নালিশ জানাবার, ঈর্ষা করার, লাঞ্ছিত অপমানিত জীবনের আরম্ভ···তারপর একদিন পরিত্যক্ত জীর্ণ দস্তানার মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া·····

তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, বিষাক্ত, বিড়ম্বিত জীবন, ক্ষুদ্র চিন্তা, সামান্য ঝামেলা, তিক্ত নিষ্ফল অনুশোচনা ভুলে থাকার নিষ্ফল তিক্ত চেষ্টা এ বেদনা, এ যন্ত্রণা স্পর্শাতীত কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় মৃদু অথচ অন্তহীন—এ যেন গণনাতীত বৃহৎ ঋণ, এক এক বারে এক এক ফার্দিং করে তার পরিশোধ দেওয়ার চেষ্টা···

তার পেয়ালা পূর্ণ হয়ে গেছে—আর নয়। জেম্মা তাকে যে ছোট ক্রসটি দিয়েছিল কি করে এতদিন এটা থেকে গেল, কেন সে এটা ফিরিয়ে দেয়নি? কেন তার আর কখনো এটা চোখে পড়েনি? চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন তিনি, এত বছরের এত অভিজ্ঞতার পরও তিনি আজ পর্যন্ত এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলেন না—কি করে সে জেম্মাকে পরিত্যাগ করেছিল। দরদ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসত তাকে, কি করে সে অন্য একটি রমণীর জন্য যাকে সে কখনও ভালবাসেনি তার জন্য তাকে পরিত্যাগ করেছিল? পরদিন তিনি তার বন্ধু ও পরিচিতদের আশ্চর্য করে দিলেন এই বলে যে তিনি বিদেশ যাচ্ছেন।

সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। শীতঋতুর মাঝামাঝি সানিন পিটার্সবুর্গ ত্যাগ করবেন। এই সেদিন না তিনি একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আসবাবপত্র দিয়ে সাজালেন? ইটালীয়ান গীতিনাট্যের মরশুম এখন—তার টিকিট পর্যন্ত কিনেছেন তিনি আর এই গীতিনাট্যে মেডেম পাটি নিজে গান গাইবেন। বন্ধুবান্ধব পরিচিত মহলে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু মানব-চরিত্রের নিয়মই হচ্ছে, অন্যের ব্যাপারে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না। সানিন যখন বিদেশ যাত্রা করলেন তখন তার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করতে এল মাত্র একজন—একটি ফরাসী দর্জ্জি, তাও একটা বাকী বিলের শোধ পাওয়ার আশায়—কেন না, কালো ভেলভেটের পোষাক পরে যাত্রা সুরু করা মার্জ্জিতরুচির পরিচায়ক।

৪৪

সানিন তার বন্ধুদের বলেছিলেন বিদেশ যাচ্ছেন। কিন্তু খুলে বলেন নি ঠিক কোথায়। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তিনি সোজা ফ্রাঙ্কফোর্টে গেলেন। তখন সর্বত্র রেলগাড়ীর যুগ এসে গেছে, তার দৌলতে তাঁর পৌঁছতে লাগল মাত্র তিন দিন, ১৮৪০ সালের পর তিনি আর ফ্রাঙ্কফোর্টে আসেননি। 'শ্বেত রাজহংসী' এখনও ঠিক আগের জায়গায়ই অবস্থিত কিন্তু এখন তা প্রথম শ্রেণীর হোটেল বলে তার নাম নেই। ফ্রাঙ্কফোর্টের প্রধান রাস্তা সাইলের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি কিন্তু মেডেম রসেলীর বাড়ীর চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না, শুধু তাই নয়, তার খাবারের দোকান যে রাস্তায় অবস্থিত ছিল তারও চিহ্নমাত্র নেই। সানিন সম্মোহিতের মত সব চেনা রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু এখন কিছুই তার পরিচিত বলে মনে হল না, পুরানো অট্টালিকাগুলি সব অন্তর্হিত হয়েছে, নতুন রাস্তা হয়েছে তাদের জায়গায়, সুন্দর প্রশস্ত রাস্তার পাশে সুদৃশ্য প্রাসাদ ও বাগানবাড়ী রয়েছে এখন। যে পার্কে সে জেম্মাকে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছিল তার ঝোপ ও গাছপালা এত বড় ও এত ঘন হয়ে গেছে—ও এত অন্যরকম হয়ে গেছে দেখতে যে সানিন আশ্চর্য হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি সেই পুরোন পার্ক, কি করবেন এখন তিনি? কোথায় ও কি ভাবে খোঁজ নেবেন? ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সহজ কথা নয়, যাকেই জিজ্ঞেস করেন কেউ 'রসেলী' নাম মনে করতেই পারে না। হোটেলের মালিক তাকে সাধারণের পাঠাগারে খোঁজ করতে উপদেশ দিলেন—বললেন সেখানে সব পুরান খবরের কাগজ জমা করা আছে কিন্তু তা থেকে কোন কিনারা পাওয়া যাবে কিনা, সে কথা হোটেলের মালিকও বলতে পারলেন না। নিরাশ হয়ে সানিন হের ক্লুয়বারের খোঁজ করলেন! হোটেল-মালিকের কাছে নামটি সুপরিচিত। সেই অতিভদ্র ব্যবসায়ীটি এক সময় অনেক টাকা করেছিলেন—কিন্তু পরে অনেক লোকসান দিয়ে দেউলে হয়ে বন্দিদশায় কারাগারে মারা গেছেন। এই সংবাদটি অবশ্য সানিনকে একটুও দুঃখিত করল না। যখন তার মনে হতে লাগল সব চেষ্টাই বুঝি বৃথা হয়ে গেল—তখন একদিন ফ্রাঙ্কফোর্ট ডিরেক্টরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে তার চোখে পড়ল ফন ডনহোফের নাম—মেজর হয়ে তিনি

অবসর গ্রহণ করেছেন। তখনই তিনি গাড়ী করে বেরিয়ে গেলেন যদিও তিনি বলতে পারতেন না—এই ফন ডনহোফই তার পূর্ব-পরিচিত ডনহোফ কিনা ও তিনি হলে তার পক্ষে রসেলী-পরিবারের কোন খবর জানা সম্ভব কিনা। কিন্তু যে জলে ডুবে মরতে যাচ্ছে সে খড়কুটো ধরেও বেঁচে থাকতে চায়।

সানিন অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে বাড়ীতে পেলেন। তার চুলে পাক ধরেছে কিন্তু দেখেই চিনতে পারলেন সানিন তার পুরানো শত্রুকে। ফন ডনহোফও চিনতে পারলেন তাকে, তাকে দেখে খুসী হলেন পর্যন্ত—তাকে দেখে তার যৌবন ও যৌবনের গুরুত্বহীন ঠাট্টা-তামাসার কথা মনে পড়ে গেল। তার কাছে সানিন জানতে পারলেন রসেলী-পরিবার বহুদিন আমেরিকায় নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। জেম্মার স্বামী ব্যবসায়ী। ফন ডনহোফের পরিচিত একজন ব্যবসায়ীর আমেরিকায়ও অনেক ব্যবসা আছে। তার পক্ষে তাদের ঠিকানা জানা সম্ভব। সানিন সেই পরিচিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে ফন ডনহোফকে রাজী করালেন —আর কি সৌভাগ্য! ফন ডনহোফ জেম্মার স্বামীর ঠিকানা নিয়ে এলেন! মি. জেরেমী স্লোকাম, ৫০১ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক। কিন্তু এ ঠিকানা ১৮৬৩ সালের।

ফন ডনহোফ চেঁচিয়ে বললেন, 'আশা করছি আমাদের ভূতপূর্ব ফ্রাঙ্কফোর্ট সুন্দরী এখনও জীবিত আছেন আর এখনও নিউইয়র্কে বাস করেন।' এবার নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা সেই রাশিয়ান মহিলাটি যিনি তখন ভীসবাডেনে বাস করছিলেন আপনি তো জানেন মেডেম ফন ব—কন মলোজভ··তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?

'না' সানিন উত্তর দিলেন 'অনেক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তার।'

ফন ডনহোফ চাইলেন তার দিকে—কিন্তু দেখলেন সানিন ভ্রূকুটি করে অন্যদিকে চেয়ে আছেন। দেখে আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

সেই দিনই সানিন নিউইয়র্কে মিসেস জেম্মা স্লোকামকে চিঠি দিলেন। তাতে লিখলেন ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে চিঠি লিখছেন তিনি—ফ্রাঙ্কফোর্টে এসেছেন কেবলমাত্র জেম্মার সন্ধান জানতে। এ চিঠির জবাবের দাবী করেন না তিনি, ভালভাবেই জানেন নিজের কৃত কার্যের জন্য এ অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। তার কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা চাওয়ার মত কোন সুকাজ তিনি করেননি। কেবল আশা করেন, জেম্মা তার বর্তমান সুখের মধ্যে থেকে অনেকদিনই তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছে। হঠাৎ কোন একটি ব্যাপারে অতীতকে মনে পড়ছে তার, সেজন্য চিঠি লিখছেন তিনি। তার নিজের জীবনের খবর দিলেন তাকে—নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ, স্ত্রীপুত্র হীন জীবন। প্রার্থনা করলেন সে যেন বুঝতে চেষ্টা করে কেন তিনি তাকে আবার স্মরণ করেছেন। অপরাধের তিক্ত অনুভূতি এতদিন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি, ক্ষমা চাওয়া হয়নি, মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাকে ক্ষমার অতীত না হয়ে থাকতে হয়। জেম্মার নিজেরও, জেম্মা নিজে যে জগতে বাস করছে নিউইয়র্কের সামান্যতম খবর দিয়েও যেন সুখী করে তাকে।

তার চিঠি শেষ করলেন এই লিখে যে—'আমাকে একটি মাত্র কথা লিখে তুমি তোমার মহান হৃদয়ের উপযুক্ত কাজ করবে।

আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি 'শ্বেত রাজহংসী'তে বাস করছি।' (এই কথাগুলোর তলায় লাইন টানলেন) 'আর বসন্তকাল পর্যন্ত তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব।'

চিঠি ডাকে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পুরো ছ' সপ্তাহ বাস করলেন হোটেলে। ঘর থেকে প্রায় বেরোতেন না, কখনও কারো সঙ্গে দেখা করেন নি। রাশিয়া বা অন্য কোনখান থেকে তাকে চিঠি লিখবে এমন কেউ ছিল না। তাতে তার ভালই হয়েছিল। যদি কোন চিঠি আসে তাহলে আগেই বুঝতে পারবেন কার কাছ থেকে এসেছে চিঠিটি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বই পড়ে কাটিয়ে দিলেন, মাসিক পত্রিকা নয়—ঐতিহাসিক বিরাট বিরাট গভীর তথ্যপূর্ণ বই। এই সব সময় পড়া, এই নীরবতা, এই মুনি-ঋষিদের মত নিঃসঙ্গ জীবন তার পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত ছিল—কেবলমাত্র সেজন্যই তিনি জেম্মার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারতেন কিন্তু সে কি জীবিত আছে না মৃত? সে কি লিখবে?

অবশেষে আমেরিকার ছাপ-দেওয়া নিউইয়র্ক থেকে এল একটি চিঠি। খামের ওপর হাতের লেখা ছিল ইংরেজী ধরণের। তিনি হাতের লেখাটি চিনতে পারলেন না, তাঁর হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হয়ে গেল। চিঠিটা তখনই খুলে সব আশাকে চূর্ণ করে দিতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পর যখন খুললেন প্রথমেই চিঠির তলায় নাম স্বাক্ষরের দিকে চাইলেন—জেম্মা। তার চোখ জলে ভরে এল—সে যে পদবী বাদ দিয়ে শুধু তার নাম লিখেছে তাতেই যেন মার্জনার পরিচয়, ক্ষমার পরিচয় পাওয়া গেল। চিঠির পাতলা নীলচে কাগজের ভাঁজ খুললেন তিনি—একটা ফটো পড়ে গেল ভাঁজের ভেতর থেকে। তাড়াতাড়ি তুলে ধরলেন—বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ যে জেম্মা—ত্রিশ বছর আগে যে জেম্মাকে জানতেন তিনি—এ যে সেই জেম্মা—জীবন্তরূপে দেখা দিয়েছে। সেই চোখ, সেই ঠোঁট, একেবারে সেই চেহারা। ফটোর অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল 'আমার মেয়ে মারিয়ান'। চিঠিটি ছিল স্নেহপূর্ণ সহজ সরল। সানিন যে তাকে চিঠি দিতে ইতস্তত: করেনি বা তার প্রতি বিশ্বাস হারায় নি, সেজন্য জেম্মা সানিনকে ধন্যবাদ দিয়েছে। অবশ্য গোপন করল না তার অন্তর্ধানের পর জেম্মার দিন খুব দুঃখে কেটেছে। তবে তখনই আবার লিখল—সব সময়েই সানিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার সৌভাগ্য বলেই জেনেছে—এখনও সৌভাগ্য বলে মনে করে। কারণ তার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলেই হের ক্লুয়বারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি। তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে যে তার বিবাহ হয়েছে তাতে গৌণভাবে হলেও সানিনই তার কারণ। গত সাতাশ বছর তার স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সুখে ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে। সারা নিউইয়র্কে তাদের পরিবার সুবিদিত। আরো জানাল, তার পাঁচটি সন্তান—চার পুত্র ও একটি অষ্টাদশী কন্যা—শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে তার। তার ছবিই সে পাঠাচ্ছে, কারণ সবাই বলে তাকে দেখতে ঠিক তার মার মত। জেম্মা দুঃখের খবরগুলি শেষে লিখল। ফ্রাউ লেনোর নিউইয়র্কে মারা গেছেন। সেখানে তিনি তার কন্যাজামাতার সঙ্গেই এসেছিলেন, ছেলেমেয়েকে সুখী দেখে ও নাতি-নাতনীকে আদর করে যেতে পেরেছেন। পান্টালেওনও আমেরিকায় আসতে চেয়েছিল কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্ট ত্যাগ করার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আর এমেলিও, আমাদের আদরের অতুলনীয় এমেলিও তার দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। মহান গ্যারিবল্ডির পরিচালিত সহস্র সৈনিকের একজন হয়ে সিসিলিতে গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছে। আমরা আমাদের আদরের ভাইটির শোক এখনও ভুলতে পারছি না কিন্তু চোখের জল ফেলতে ফেলতেও তার জন্য গর্ব বোধ করছি। তার পুণ্য-স্মৃতির জন্য সব সময়ই গর্ব বোধ করব। তার মহান্ অনাসক্ত আত্মা শহীদের মুকুট ধারণেরই উপযুক্ত। তার পর সানিনের নিষ্ফল জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল জেম্মা। ভগবান তাকে শান্তি দিন, প্রার্থনা করল। সবশেষে লিখলো—তাকে আবার দেখতে পেলে সুখী হত সে—তবে দেখা হওয়ার অসম্ভাব্যতা সে বুঝতে পারে।

সানিন যখন চিঠিটি পড়ছিলেন তখন তার মনে কি ভাবের উদয় হল—তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব না। মনের সে ভাবের সে আবেগের বর্ণনা দেওয়ার মত শব্দ কি ভাষায় আছে? কথার চেয়ে আরো অনেক বেশী গভীর, অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী অবর্ণনীয় সে ভাব। তার হৃদয়ের সে ভাবকে প্রকাশ করা যায় একমাত্র সঙ্গীতে।

সানিন তখনই উত্তর দিলেন। বিবাহের ভাবী কনেকে একটি উপহার পাঠালেন। একটি সুন্দর মুক্তার মালায় গার্নেট-পাথরের ক্রস লাগান, তাতে লিখে দিলেন—'মারিয়ানা স্লোকামকে—একজন—একজন অপরিচিত বন্ধু।' খুব দামী হলেও এই উপহারটি দেওয়াতে তার আর্থিক ক্ষতি হল না। তার ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রথম যাওয়ার পর যে ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সে সময়ের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করেছেন তিনি। মে মাসের প্রথমে তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরে গেলেন—কিন্তু বোধ হয় বেশীদিনের জন্য নয়। গুজব শোনা যাচ্ছে, তিনি তাঁর সব ধনসম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন।

বাদেন, বাদেন, ১৮৭১

অনুবাদিকা—আশা দাস।

সমাপ্ত

'Inferiors revolt in order that they may be equal, and equals that they may be superior, such is the state of mind which creates revolution.'

—*Aristotle*

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি
ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

সোনালী মাছ

বিজন ভট্টাচার্য

১৩

বিশ্বতোষ আসবে বলে সন্ধ্যে থেকেই সেজে-গুজে তৈরী হয়ে আছে সতী-সত্যব্রত। পরকে আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করতে হলে নিজেকেও সম্বর্ধনার উপযোগী করে তুলতে হয়।

সত্যব্রতর চাইতে অনেক কম পোষাকে বেশী সেজেছে সতী। ইচ্ছে ছিলো একটু জমকালো করে পোষাক করবে সতী আজ। হাতে চুড়ি পরবে, গয়না পরবে কানে। রুচিমতো অলঙ্কার পবে কপালে দেবে সিঁদূরের ফোঁটা। তারপর নিকষ-কালো জমিনের ওপর রক্ত-লাল পাড়ের আঁচলটা দেহ বেড়ে ছোট্ট একটি ঘোমটা টেনে দেবে মাথায়।

কিন্তু প্রস্তাবটা সত্যব্রতর পছন্দ হলো না। বুঝলো না সত্যব্রত সতীর কথা। তার পছন্দ হলো অন্য বেশ, অন্য পরিধান। ডাকের সাজ-দেওয়া প্রতিমা তার ভালো লাগলো না। তার ভালো লাগলো ওরিয়েন্টাল। ফিকে নীল শিফন আর তার সঙ্গে পেটকাটা থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ। সতীকে না কি ঐ পোষাকে দেখতে হয় চাবুক। কলজে ধড়ফড়িয়ে বুকে আগুন জ্বেলে দেয় পুরুষের। তখন সে চরিত্র যত বড়ই দৃপ্ত হোক না কেন, নতি স্বীকার করতে বাধ্য। পলাশের মত লাল ঠোঁট মানানসই নয়। সত্যব্রত বলে, আলতো করে একটু লিপস্টিক লাগালেই বা দোষ কি?

দোষ নেই ঠিকই। আটকায় রুচিতে। কেমন যেন একটু বাধো-বাধো ঠেকে।

ছেলেবেলা থেকেই এ সব তেমন আসে না সতীর। মনে হয় কেমন যেন সস্তা হয়ে গেল ঠোঁট-মুখ-চোখ।

যে সাজবে সেই দেখবে—একা-একা হ'লে কোন কথা ওঠে না। যে ভাবেই সাজো না কেন মানিয়ে যায়। দু'জন হ'লেই ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন হয়ে যায়। দাম যেমন বাড়ে একদিকে, তেমনি পড়ে যায় অন্যদিকে, যেই যাচাই হয়। রুচির কথা ব্যক্তিগত, আবার ব্যক্তিগতও ঠিক নয়।

তবু সত্যব্রতর কথামতোই সাজল সতী। ইজ্জতের গায়ে দাম লেখা থাকে না। নইলে সত্যব্রত সেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারতো লোকসান না লাভ হলো তার।

হাসলে তো বটেই, কাঁদলেও সতীকে ভাল দেখায়। মুস্কিলে পড়লে চোখ দুটো কেমন অসহায় হয়ে দৃষ্টির সীমানা জুড়ে ভাসতে ——। কিন্তু সত্যব্রতর সে সতীকে চোখে পড়ে না। আঁটসাঁট শিফনে লাল-লাল মাজামুখে পোনিটেল করা চুল বেঁধে মডেলের মতো ভেসে বেড়ায় সতী সত্যব্রতর সামনে—ছাঁটকাট স্ত্রীরূপের সুলভ সস্তা সংস্করণ—সেই ভালো সত্যব্রতর চোখে।

সত্যব্রতর চোখে খুসীর আমেজ। বলে,: এমন সুন্দর মানিয়েছে তোমায়, তা যদি তুমি দেখতে সতী!

: শিউরে উঠতাম বলো?

সতীর কাঁধে আলতো ক'রে হাত রেখে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সত্যব্রত। কানের পাশের চুলগুলো আঙুলের টোকা মেরে উড়িয়ে দিয়ে হেসে বলে—কেন, কেন—শিউরে কেন?—তারপর সে কথাটার কোনই হদিস করে না। নিজের ভাবে কথা বলে যায় সতীর কানের হীরের আলো মুখে ঠিকরিয়ে।

: গীষ্পতিদের বলবার ইচ্ছে ছিলো। এখন দেখছি না বলে ভালই করেছি। চিত্রলেখা জানতে পারলে তোমাকে নিশ্চয় কথা শোনাবে দেখো। অবিশ্যি জানবেই বা কি করে?

: তুমি যদি না বলে বেড়াও।

: কে, আমি? আমি বলব না। আচ্ছা শিরীণ দত্তের ব্যাপারটা কি বলতো? স্বামী তো শুনি অত বড় ইঞ্জিনীয়ার। না কি এক্জিকিউটিভ পোষ্টে গেলেই ঘরের বউ হয়ে যায় সোসাইটি গার্ল।

: কি জানি!

: আসল কথা কি জানো, যুগ যা পড়েছে, তাতে করে একটু চলতা পুরজা হতে হবে। গার্ল ঠিক নয়, লেডি—সোসাইটি লেডিই তো নেই আমাদের দেশে। যাকে বলে celebeity—ট্র্যাডিশানই নেই। সেই যে অঙ্গুলি হেলনে সাম্রাজ্য গড়ছে আর ভাঙছে···

তেমনি অন্তরঙ্গভাবে কাছে দাঁড়িয়ে আঙুলের টোকায় চুল উড়িয়ে আর সতীর কানের হীরের আলো মুখে ঠিকরিয়ে মধ্যযুগের নায়কের ঢং-এ কথা বলে সত্যব্রত।

মিষ্টি হেসে প্রতিবাদ করে সতী। বলে, কি ক'রে? তখনও তো রাজ্যের চেয়ে রাজা বড় ছিল। সাম্রাজ্য ছারেখারে গেলেও রাণী যে সে রাণীই থাকতো। আসনটা ছিলো,—বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে দেখায় সতী।

: এইখানে। এখন তো সে রাজারাণীর বালাই নেই। লড়াইয়ের ঠেকুটা কোথায়, বলো! আমার জন্যে তুমি, কথায় বলছি, সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতে?

: হুঁ।

: কেন বাজে বকছো ? আমি ধর একালের এক রাজ্যের রাণী। তোমাকে ভালবেসে সাম্রাজ্য ভাসিয়ে দিয়ে রাত মাথায় ক'রে অভিসারে যেতাম ?

: কেন নয় ? তুমি কি বলতে চাও হচ্ছে না এমনটি আজ ?

: কোথায় ? তোমার কথামতো অভিসারিকা তো দেখছি শিরীণ দত্ত। পঞ্চাশটা বিউরোক্র্যাটের কাছে তার কমিটমেণ্ট !

: তা বিউরোক্র্যাসি চটালে ইঞ্জিনীয়ার স্বামী কখনও অমন ব্রহ্মার আসনে বসে নয়কে হয় করতে পারে ? ভি, টি, রোডের ওপর বাড়ী তুলেছে দেখেছো ?

: না। তা বলে শিরীণ দত্তের প্রেমের তারিফ করতে হবে ?

: বাঃ, স্বামী রয়েছে। পতিভক্তি তুমি তার অস্বীকার করতে পারো না।

সতী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সত্যব্রত বলে, তা ও-দেশের একজন মেয়ের তুলনায় শিরীণ দত্তের ব্যক্তিত্বও কিছু নয়। তবু বলতে হবে, আছে, একটা 'ষ্টাইল' আছে চরিত্রে।

আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ স্বচ্ছন্দে ঘুরে যায় সতী। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সত্যব্রতর দিকে। দেখে নেয়, বুঝে নেয় মানুষটাকে।

আবার অশান্ত হলো মন। এই সম্বল করেই চলতে হবে? কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে আকাশে। মরা চাঁদ। এই চাঁদ যে সে-ই পূর্ণ চাঁদ, দেখলে সে-কথা মনে পড়ে না আজ সতীর।

আকাশের সীমানা পর্যন্ত শহর। শহরের ওপরে হালকা ধুলো আর ধোঁয়ার এক কুহক। ভানুমতীর চাদরের নিচে গুটিচাপা হয়ে আছে সব কিছু। কাল সকালে পর্দা সরে গেলে দেখা যাবে, হরকিসিমের নতুন নতুন চীজ্—যা ছিল না তাই হয়ে রয়েছে। আর যা ছিল তার কোন পাত্তা নেই। মরবার যার কোন কথা নেই সে রাতারাতি পাড়ি জমিয়েছে, গলা-পচা-মরা আবার প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে। ভানুমতীর এই চাদরের তলায়, সতীর মনে হয়, কারা যেন তিন মাথা এক করে বসে সারাদিনের খতিয়ান মেলাচ্ছে। শলা করে তর্ক করছে তারা আঙুল নেড়ে। গাঁঠ-গাঁঠ কড়া-পড়া আঙুলে সুস্পষ্ট বিরোধ। গলাকাটা, রক্তঝরা, চাপাপড়া মা-মরাদের দল অপেক্ষা করছে কাতারে কাতারে, ওদের হিসেবে কি মিললো না মিললো জানবার জন্যে।

অন্ধকার আকাশে আলো ফেলে কারা? চোখ তুলে তাকায় সতী। সার্চলাইটের আলো চক্রাকারে ঘুরছে এরোড্রোম থেকে। সন্ধানী আলোতে এমন-ও হতে পারে একটা যাত্রিবাহী উড়োজাহাজ ভানুমতীর এই চাদরের তলায় ঢাকা গ্যাংওয়ে দেখতে পাচ্ছে না। দিশি-বিদিশী পঞ্চাশজন আরোহীর প্রাণান্তিক উৎকণ্ঠায় বিদীর্ণ হচ্ছে আকাশ। একটা শিশুর শুধু মৃত্যুভয় নেই। মায়ের বুকে লেপটে দু'খানা কচি হাতে সে মুঠো করে ধরছে জীবনের অমৃতভাণ্ড। হাসছে সে। আর হাসছে পাইলট মুখার্জি। মাত্র বারো ঘণ্টা আগেই হয়তো বিদায় নিয়েছে তার নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছ থেকে। ইলা কি নিনা কি শীলা হবে তার নাম। বিদায়ের প্রাক্কালে হয়তো বা কোয়ার্টারের গেট অবধি এগিয়ে এসেছিল। পাইলট মুখার্জি এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে। তেমনি করেই বিদায় নিচ্ছে হেসে।

হঠাৎ মোটরের তীব্র কর্কশ এক আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পায় **সতী। ব্রেকের শব্দে নয়। বাঁকের মুখে** অসম্ভব গতিবেগে সত্তর **ডিগ্রী কোণাকুণি** মোড় নিয়েছে গাড়াটা! ভারী গাড়ী না হলে নির্ঘাৎ **উল্টে** যেতো এতক্ষণ। এই ম্যানশনে-ই ঢুকছে গাড়ীখানা। হাসি **পায় সতীর। এখানেই** যখন আসবার কথা, তখন অত জোরে এসে **গাড়ী রুখবার কি মানে হয়?** তবু যে ভাবে পার্ক করে রাখল **গাড়ীখানা দশখানা** গাড়ী বাঁচিয়ে, হাত ভালই বলতে হবে! এতক্ষণ **ভেতরে বসে কি করছে লোকটা?** নজর করে দেখে সতী। নাক-মুখ **সরু করে নিরীখ করে** দেখে নিচে। বিশ্বতোষের মতন না? **বিশ্বতোষ-ই। এতক্ষণে এলো** বিশ্বতোষ। ব্যালকনি থেকে সরে **যায় সতী।**

করিডর ধরে ড্রয়িংরুমে পা দিয়ে বিশ্বতোষ প্রথমেই ক্ষমা **চেয়ে নেয় সতীর কাছে।** বলে—:

: এত রাত করে কোন ভদ্রলোক কারো বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে **আসে না। সুতরাং** এই যে দেখছো আমি এসেছি। ধরে নাও **আমি আসিনি। নেমন্তন্ন আমার** বাতিল। আমাকে তোমরা কিছু **অবার করো না। I have forfeited the right to dine with you to-night.** নেহাৎ সতীকে কথা দিয়েছিলাম বলে—

বেশ লাগছিল বিশ্বতোষের কথা। মানুষটাকেও মনে হচ্ছিল **কোথায় যেন একটা সর্তহীন** ছাড় পেয়েছে। সতী আর সত্যব্রত **নির্বাক আনন্দের সঙ্গে** উপভোগ করছিলো বিশ্বতোষের কথাবার্তা। **হঠাৎ কথার মাঝখানে** নিজেকে বোকা ঠাউরে চুপ করে যায় বিশ্বতোষ। **গলা নামিয়ে অনুনয়ের** স্বরে হেসে বলে—

: তা তোমরা আমায় তাই বলে একটু বসতে-টসতে বলো! **রাত হয়ে গেছে বলে কি** চৌকাঠ থেকেই বিদায় দেবে?

খিল-খিল করে হেসে ওঠে সতী। সত্যব্রত হঠাৎ আপ্যায়নের **আতিশয্য দেখিয়ে** সত্যি সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সতীকে ধমকে **বলে—আরে। সত্যিই তো, হাসছো কি!** বসতে বলতে পারছো **না? ছি ছি!**

সতী বলে, নেমন্তন্ন করেছিলাম, আমি না হয় কৈফিয়ৎ-ই **শুনছি বাতিল নেমন্তন্নের,** তা বলে তুমি অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে **কি শুনছ? তুমি বসতে বলতে** পারো না?

গণ্ডগোলে সত্যিই বোকা হয়ে যায় সত্যব্রত। ঢোক গেলে **ত্রস্তে বলে—নিশ্চয়ই** নিশ্চয়ই। বসতে বলবো না মানে? কি **কাণ্ড!**

সোফাসেটি চাপড়ে আচমকা প্রাণস্ফূর্তিতে হাত-পা উৎক্ষেপ করে **দেড় পাক ঘুরে** গিয়ে বলে, : আলবাৎ বসবেন। বসবেন না মানে? **আর রাত! কত রাত?** কি রাত?

হাত ধরে টেনে এনে সোফায় বসিয়ে দেয় সত্যব্রত বিশ্বতোষকে। **সতীও আদিখ্যেতা** করে হেসে বলে: ঠিক হয়েছে। একে তো আসা **হলোই রাত করে।** তার পর আবার নিজে থেকে নেমন্তন্ন বাতিল **করে দেওয়া হচ্ছে! আমরা** কক্ষণো নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নিই না।

সতীর কথা জোর দিয়ে সমর্থন করে সত্যব্রত। বলে: শ্বশুরবাড়ী **বাপের বাড়ী দু' তরফ থেকেই তো প্রথমতঃ** বয়কট হয়ে আছি বিয়ের **পর থেকে, কি বলো সতী?—তার পর চেষ্টা-চরিত্তির করে যদি বা একটি বাজার ধরে-করে আনা গেল, শেষকালে সে-ও রাতের অজুহাত** দেখিয়ে নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—এ **আমরা কখনই** হতে দিতে পারি না।

বদ্ধ ঘরের সবগুলো জানলা-দরজা যেন **হঠাৎ খুলে** গিয়েছে। চাপা একটা গুমোটের পর হাসি-ঠাট্টা কথাবার্তায় **সতীর** মনও এখন বেশ খানিকটা হাল্কা লাগে। সত্যব্রতর কথার **সমর্থনে** সে-ও বিশ্বতোষের পাশে বসে বলে ওঠে, : কখনোই নয়।

একের সহৃদয় কথা অন্যকেও সহৃদয় করে তোলে কথায়-বার্তায়। জমে ওঠে প্রাণের আসর। বিশ্বতোষ **ইচ্ছে করেই খুসমেজাজের প্রশ্রয়** দেয়। সত্যব্রত পানপাত্র ভরতি করে দিয়ে **সৌহার্দের অঙ্গীকার** আদায় করে নেয় বিশ্বতোষের কাছ থেকে।

বিশ্বতোষ বলে—ঠিক আছে ভাই! লড়ে যাও, দেখি কেমন হিম্মৎ। আমি নিজে আবার নতুন করে **কোম্পানী চালু করছি!** টাকা আমার। কিন্তু ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব তোমার। **ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।**

সতী বাধা দেয়—ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি কেন? ওর **ষ্টেকটা কোথায়?**

সত্যব্রতর দিকে চোখ ঘুরিয়ে **কৌতুক করে বিশ্বতোষ।** বলে—কি হে, সতী কি বলছে? **তোমার ষ্টেকটা বল?**

—ষ্টেক?—আকাশ-পাতাল চিন্তা করে সত্যব্রত। **স্থাবর-**অস্থাবর যা কিছু ঘরে আছে দেখিয়ে বলে: **এই আমার বলতে যা** কিছু আছে সব! নিজেকেই তো ষ্টেক করেছি। **আবার কি চাও?**

বিশ্বতোষ হেসে বলে—নিজেকে দেখাচ্ছো, **কিন্তু ও সম্পত্তি তো** already mortgaged ভাই! **মর্টগেজী সম্পত্তির বিনিময়ে** কি কোন কারবার চলে? আরও জবরদস্ত সিকিউরিটি চাই**!**

: কি রকম?

: গুপ্তধন যদি কিছু থাকে তো দেখাও।

: আচ্ছা, সম্পত্তি সমেত **মর্টগেজী যদি সিকিউরিটি দাঁড়ায়,** চলবে?

: ভ্যালুয়েসান কষতে হবে, হিসেবের ব্যাপার! **থাউকো কি** আর অমনি চট করে বলা যায় মুখে?

সতী দুষ্টুমি করে হেসে বলে—**আর ধর যদি তার দাম মোট** ভ্যালুয়েসানের পঞ্চাশ ভাগেরও ওপরে হয়ে যায়?

বিশ্বতোষ গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—তা হ'লে **হর্তা কর্তা বিধাতা** কারবারের, কারো কোন কথাই আর খাটবে না।

লাফিয়ে ওঠে সত্যব্রত—**খাটবে না তো?**

: কক্ষণো না।

: বেশ তাই।

সতীই বিঘ্ন করে। বলে—**কি তাই?**

: সম্পত্তি সমেত মর্টগেজী সেটক্ করবো।

: আচ্ছা।

: হ্যাঁ।

: কিন্তু মর্টগেজী তো রাজী নয়।

: কেন?

: না না, ফাটকা খেলতে রাজী নই। **সতী বিশ্বতোষকে বলে—** আচ্ছা **সম্পত্তি** বাঁচিয়ে ধর যদি **মর্টগেজী নিজেকে সেটক্ করে,** চলবে?

বিশ্বতোষের জবাব করবার আগেই সত্যব্রত বাতিল করে দেয় সতীর কথা—চলবে না, একেবারেই চলবে না। সম্পত্তি জড়িয়েই

মর্টগেজীর কদর। নইলে মর্টগেজী তো একেবারেই সাইফার, কোন দাম নেই তার।

ব্যবসায়িক জগৎটা এত ঘোরানো-পেঁচানো যে যুক্তি করেও থই পায় না সতী কি সত্যব্রত।

বিশ্বতোষই মীমাংসা করে দেয়। হেসে বলে—মর্টগেজ আর মর্টগেজী—পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক হওয়ায় এ সমস্যার আশু কোন সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেন না, একজন আর একজনকে দেখি—

বিশ্বতোষ এক মুঠো হাওয়া ধরে বলে—এমনি করে আঁকড়ে ধরে আছে। ঠিক এমনি!

মর্টগেজ আর মর্টগেজীর অভিন্ন সত্তা তখনও কঠিন অঙ্গীকারে বিশ্বতোষের উৎক্ষিপ্ত দৃঢ়মুঠি থর-থর করে কাঁপছে।

বিশ্বতোষের দমকা হাসির সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতও হেসে গড়িয়ে পড়ে সোফায়।

অনেক রাত! কথাবার্ত্তার সাময়িক বিরতির ফাঁকে আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে আসে! আলো জ্বলছে, তবু অন্ধকারের চাপ অনুভব করা যায়। কেমন যেন একটা ধীর-মন্থর ভাব ঘন হয়ে নেমে এসেছে ঘরের ভিতর। সোফাসেটি ডিকাণ্টারে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে রাত। বাল্বের গায়ে-ও ঘুম জড়িয়ে যায়।

হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে বাইরে। আর একটু পরে মাঝরাত্তির হলে এই হাওয়া-ও মন্থর হয়ে বাড়ীর গায়ে গায়ে জড়িয়ে যাবে।

বাইরের হাওয়ার ঝাপটা লেগে পাখাটা হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে ওঠে। তবু যে যেমন আছে ঠিক সেই মত চুপ করে থাকতেই যেন ভাল লাগে সকলের।

চাঁদের আলো ছাদ গড়িয়ে পোর্টিকোতে ঢেলে ছড়িয়ে গেছে। ঢাকা চাপা ছায়াচ্ছন্ন ফাঁকটিতে নিজের হাতে বাগান করেছে সতী। নানাজাতের অর্কিড, পাম, গুল্মলতা আর পাতাবাহারের সমারোহ সেখানে। দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে শার্সী খুলে যেতেই ঠাণ্ডা বাতাসের সুখস্পর্শ অনুভব করা যায় চোখে নাকে মুখে। বেলফুল আর কাঠগোলাপের গন্ধে ম' ম' করে ঘর। বিশ্বতোষ উঠে গিয়ে দাঁড়ায় চৌকাঠের কাছে। সতী নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায়।—আঃ, সুবাতাস বুক ভরে টেনে খানিকটা স্বগতঃই বিশ্বতোষ বলে ওঠে—ম্যানসনে থেকে-ও সেই তপোবন—সেই জন্যেই তো জঙ্গলে চলে যাই থেকে থেকে।···

···সে এক অদ্ভুত কুহক সতী!

: বেশ লাগে, না?

: কথায় বলা যায় না।

: চলো একবার। অরণ্যচারী মন সত্যব্রতকে খোঁজে—শুনছো?

ঘুমিয়ে পড়েছে কি ঘুমোয়নি সত্যব্রত। সাড়া দেয় না। বিশ্বতোষ বলে—চলো, একবার গেলে দেখবে, পাঁচ বার যেতে ইচ্ছে করবে নিজে থেকেই। তখন আর আমাকে বলতে হবে না।

—ঠিক যাবো।

হঠাৎ গান মুখে নিয়ে উঠে আসে সত্যব্রত। কাচের দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে বলে— বনের গল্প করছো ঘরের ভেতর বসে, ছোঃ!

হেলতে দুলতে খুসমেজাজে পোর্টিকো দিয়ে ছাদে চলে যায় সত্যব্রত। বলে—বাইরে এসো, বাইরে এসো।

সতী বলে—ঠিক আছে, তুমি ঠিক করে ফেল বিশ্বতোষ।

সত্যব্রতর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে এখন গানে পেয়েছে। ছাদের ওপর পামটবের পাশে ফাঁকা গ্যালারীতে বসে গান করে সে আপন মনে।

বিশ্বতোষ হঠাৎ জোর দিয়ে বলে ওঠে,—তা হ'লে চল একবার যাওয়া যাক। আদি ও সর্বশেষ বাসভূমি মানুষের—দেখবে খারাপ লাগবে না। পকেট হাতড়ে বলে সিগারেটটা আবার কোথায় ফেললাম?

বিশ্বতোষের মুখে এসব নতুন কথা। সত্যি এই বিশ্বতোষ কি সেই বিশ্বতোষ? ভাব, ভাষা, সবটাই কেমন যেন বদলে গেছে। এত প্রাণ নিয়ে এত সহজভাবে যে কথা বলতে পারে বিশ্বতোষ! সতীর অভিজ্ঞতায় তার একটি দিনক্ষণেরও নজির নেই। বিশ্বতোষ কথা বলতো যেন মূর্ত্তিমান একজন 'স্নব য্যারিষ্টোক্র্যাট,' আত্মশ্লাঘাস্ফীত এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্তা। বক্তব্য সব সময়ই দুর্ব্বোধ্য, সব সময়ই অসামাজিক। ব্যবহারে শুধু পরের সঙ্গেই নয়, মনে হতো যেন নিজের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে চলেছে। দু'-চারটে কথার পরই আবহাওয়াটা হয়ে উঠতো ক্লান্তিকর, অস্বাস্তিতে হাঁপিয়ে উঠতো প্রাণ। আজকের বিশ্বতোষের সঙ্গে সেই বিশ্বতোষের কিন্তু কোন মিল নেই। অদ্ভুত লাগে সতীর!

বিশ্বতোষের পিছু পিছু ঘরে ফিরে আসে সতী। আগেকার কথার জের টেনে বলে, মানুষের বাসভূমির আদিটা তো বুঝলাম, জঙ্গল। কিন্তু তার সর্বশেষ স্বরূপটা তো বুঝতে পারলাম না?

লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে বিশ্বতোষ বলে, কেন? দুর্ব্বোধ্য তো কিছুই নেই এর ভেতরে? ইতিমধ্যেই তো সভ্য মানুষের দল সব হাঁপিয়ে উঠেছে। বিলেত, আমেরিকা, যেখানেই যাও না কেন, এখন শুনতে পাবে, Back to nature. শ্লোগানই তো পাল্টে গেছে জীবনের! ফ্যাশনি জামা-কাপড়ে পর্য্যন্ত গাছপালা পশুপাখী। হাউইয়ান সার্টে ল্যাণ্ডস্কেপ!

: সেই প্রব্রজ্যা, সেই তপোবন?

: সেই তপোবন।

সতী হেসে বলে, কিন্তু আমরা তো আর সত্যি সত্যি জঙ্গলে যাচ্ছি না বাস করতে?

: আহা, ঐ হ'লো। আজ না হয় কাল যাচ্ছি। পথিকৃৎ হতে আপত্তি কি?

: না, না, আমি এই সবে ঘর-সংসার পেতে বসেছি, সাধ-আহ্লাদ কোন একটা মেটেনি, রাজার ছেলে বেকার হয়ে ঘরে বসে শুধু স্বপ্নই দেখছে, রাজ্য একদিন ঠিক ফিরে পাবে—এ অবস্থায় আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারবো না।

: ঐ তো ঐতিহ্য ভুলে যাচ্ছো। ভয় পেলে কখনও হয়?

: আমি ভয় করি না। কিন্তু ঐ মানুষটাকে নিয়েই হয়েছে আমার মহাচিন্তা।

: মানুষটা তো বেশ ভালই আছে দেখছি।

: না, না, তুমি জানো না বিশ্বতোষ, মন ওর একেবারে ভাল নেই। এই সেদিনই বলছিল, চল যাই, বিলেত চলে যাই আবার।

হতবাক হয় বিশ্বতোষ। বলে, কি বিলেত, আর আমি যে এদিকে সেনের মুখ চেয়ে কোম্পানী গড়ে বসে আছি—

ওরিয়েণ্ট ইণ্ডাস্ট্রীজ ? ইদ্বি দিল্লী হুলুস্থুল করে বেড়াচ্ছি তাই নিয়ে দিনরাত্তির ?

: জানো বিশ্বতোষ, বাবার কাছে সব কথা বলতে আমার লজ্জা করে। অথচ ও যদি একবার গিয়ে বলে—

: কি বলবে ও ? একটা কথা তুমি এখানে ভুল করছো সতী ! তুমি যে কথাটা তোমার বাবাকে চট করে বলতে পারো, সত্যব্রতর পক্ষে সে কথাটা তাঁকে বলা ঠিক···তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না কথাটা—আমি হাসি বলেই বলছি সত্যব্রতর ওখানে কোন সম্মান নেই। কিছু মনে করো না—your father considerd him a Crook and your brother takes him to be a parasite—বল আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন কোন লোক, বিশেষ করে, সত্যব্রতর পক্ষে সেটা কখনও বরদাস্ত করা সম্ভব ? আর তুমিই বা জেনে শুনে সেটা হতে দাও কি করে ?

: অসম্ভব ! সে হতেই পারে না। সেই জন্যে তো বলিনি আমি কোন কথা, বাবাকে শুধু বলিনি না, আর বলবও না।···

বেশ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে আবহাওয়াটা। সত্যব্রত ইতিমধ্যেই গান থামিয়ে উঠে এসে চৌকাঠের কাছে ঠেস দিয়ে কিছুটা শুনে ফেলে আলোচনার। সময় বুঝে বিশ্বতোষ আরও কিছুটা ইন্ধন যুগিয়ে দেয়।

বলে : সে শুধু তুমি কেন ? আত্মসম্মানী কোন মেয়েই স্বামীর সম্পর্কে তা বলতে পারে না।

ঝিমিয়ে ছিল অঙ্গার। ঘৃতাহুতি প'ড়ে দপ করে জ্বলে উঠল এতক্ষণে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে সত্যব্রত সতীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে : দেখতে পাচ্ছো, মিত্রকে শত্রু আর শত্রুকে মিত্র ঠাউরে ছিলে একদিন ! ভাগ্যিস আমি তোমার কথায় সেদিন ভুল করে বসিনি !

সৌহার্দ্দের দীন-হীন দায় কি আজ সত্যব্রতকে এমনি অন্ধ করে ফেলেছে যে সতীর মর্য্যাদারও সে কোন পরোয়া করবে না ? কি সাংঘাতিক ভেদবুদ্ধি ! সতী ভেবে কোন উত্তর খুঁজে পায় না সত্যব্রতর কথার। হঠাৎ কেমন যেন পাণ্ডু-বিবর্ণ হয়ে যায় সতী বিশ্বতোষের সামনে। সত্যব্রতকে বলে—

: শত্রু মিত্র—কি যা তা ব'কছো পাগলের মত ?

: ঠিকই বলছি।

: না ঠিক বলছো না।···তুমি মিত্র হ'লে আমি কোন শত্রুকেই পরোয়া করতাম না। অন্ধ যে জন তার সারথি সূর্য্য হলেও ডাইনে বামে তার সমান অন্ধকার। সত্যব্রত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সতীর দিকে।

বিব্রতবোধ করে তার চাইতে বেশী বিশ্বতোষ। তার চোখে সতী আজ পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে সত্যব্রতর মনের বেদিশা ফ্রেমে। কথাটার পারম্পর্য্যটাই সে না বোবার ভাণ করে বলে, কোন কথায় কি কথা উঠে প'ড়ছে আমি তার কোন মাথামুণ্ডুই পাচ্ছি না।

সতীও সাম্য আনে আলোচনায় সেই যুক্তিতেই। বলে, কি জানি, আমিও না।

সত্যব্রতর অভিনয়ও নিখুঁত হয়। ডিকাণ্টারের একটা সেট সে নিজের মাথায় উপুড় করে বিশ্বতোষকে বলে, স্বর্ণভৃঙ্গার কাঁখে টিসিয়ানের মানসাপ্রিয়া Bachusকে মনে পড়ে বন্ধু ?

বিশ্বতোষ স্মিত হেসে আমেজী গলায় বলে, একটু একটু।

ত্রিধারায় সময় বয়ে যায় অতি চুপে ! হঠাৎ ঘড়ি দেখে শিষ টেনে লাফিয়ে ওঠে বিশ্বতোষ। বলে, এখন দেখবো ব্রহ্মদত্যিরা সব কুকুর হয়ে শুয়ে আছে মাঝরাস্তায়। চাপা পড়লে শুনতে পাবে, অবিকল কুকুরের মত শব্দ করে চেঁচাচ্ছে।

গা ছমছম করে ওঠে সতীর বিশ্বতোষের কথা শুনে। ল্যাণ্ডিং-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, কথাটা সত্যি ?

: শুনতেই পাবে।

বিশ্বতোষ চলে যেতেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সতী। সত্যব্রত ইতিমধ্যেই গা ঢেলে দিয়েছে সোফায়। ভীরু পায়ে এগিয়ে আসে সতী—কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, শুনতে পাচ্ছো ?

বিশ্বতোষের হার্ডসন গাড়ীর তীব্র হর্ণ তখন বড়রাস্তা পার হয়ে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝ রাতে।

[ক্রমশঃ।

আমি লুপ্ততার কাছে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমি লুপ্ততার কাছে আমার ঠিকানা রেখে যাবো
তুমি রাতের আকাশের স্তব্ধতায় আমাকে খুঁজো না।
আমি আমার ভাবনাগুলোকে তোমার ব্যাপ্তিতে ঢেকে যাবো
তুমি তোমার আড়াল দিয়ে আর আমাকে বুঝো না।
আমি নৈর্ব্যক্তিক বেদনার জোয়ারে ভেসে গেলাম
একথার স্বীকৃতি তুমি জানি হয়ত আর পাবে না।
আমি রিক্ততার অন্তর্দাহ চেপে কেন যে হেসে গেলাম
সে সংবাদ তোমার প্রতিষ্ঠার প্রাসাদে যাবে না।
মৌসুমী কোন মেঘ কতটুকু জল বয়ে আনে কবে
এত বড় এ পৃথিবী জান তার করে খোঁজ কি ?
কোন দিন কোন দীপ কারও ঘরে আলো বয়ে আনে যবে
সে দিনের সে কথা বল তার পড়ে মনে রোজ কি ?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

আজকে গাড়ীটাকে মলিভিলার গেটের ভেতরেই ঢুকিয়ে রাখলো হিমাদ্রি। অন্যদিনের মত রাস্তায় রেখে চাবি বন্ধ করে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালো না বাড়ীর ভিতর।

নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতেই যে সে এসেছে। এবার যে তাকে কিছুটা মুখর, কিছুটা স্পষ্ট হতেই হবে। নিজের লাজুকস্বভাব ছেড়ে দৃঢ়পায়ে মাথা উঁচু করে রঞ্জনার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। বলতে হবে আমার উচ্ছ্বাসবিহীন ভালবাসাকে তুমি ভুল বুঝেছিলে রঞ্জনা—তাই আজ আমি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে তোমায় আমার মনের কথা জানাতে এসেছি। আজ আর তুমি আমায় ফিরিয়ে দিও না।

সদর দরজাটা খোলা। কেউ কোথাও নেই। হিমাদ্রি বোধহয় মনে মনে আশা করেছিল আজকে অন্তত পরমেশ বাবু তাকে অভ্যর্থনা করতে নিজে উপস্থিত থাকবেন দরজার কাছে। সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রঞ্জনার কাছ পর্য্যন্ত।

তাই নীচের তলায় কেউ কোথাও নেই দেখে নির্জনতার চেয়ে আশাভঙ্গের বেদনাই বোধহয় তাকে পীড়ন করলো বেশী। শুধু এক ভজহরি ঘুমুচ্ছে সিঁড়ির গোড়াটায় শুয়ে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে এমন অবেলায় ওকে ঘুমুতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায় হিমাদ্রি। ওকে ডেকে বলে—ভজহরি। ও ভজহরি। এমন অবেলায় দরজার সামনে পড়ে এমন করে ঘুমুচ্ছো কেন তুমি? বলি জ্বরটর এলো না কী?

ওর ডাক কানে পৌঁছুতেই কিন্তু ধড়মড় করে উঠে বসলো ভজহরি। বিছানার তলা থেকে কী যেন একটা জিনিস তুলে নিয়ে বিছানাটাকে ঠেলে দিলো এক পাশে। তারপর চোখ রগড়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে দাঁড়ালো হিমাদ্রির সুমুখে—হাত বাড়িয়ে একটা খাম এগিয়ে দিলো তার দিকে। বললে—এই যে দাদাবাবু আপনার চিঠি। সকাল থেকে ভাবছি আপনাকে কী করে পৌঁছে দিই চিঠিটা। বাড়ীতে একেবারে একা রইছি—কিছুতেই তাই পারলুম না চিঠিটা দিয়ে আসতে।

হিমাদ্রি যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। অস্পষ্ট স্বরে বলে—চিঠি? কিসের চিঠি? কে দিয়েছে?

এবার ভজহরি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে। বলসে—দিদিমণি। দিদিমণি দিয়েছেন। কথাটা ভালো করে বলতে পারে না ভজহরি। কোঁচার কাপড়টায় মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে।

এতক্ষণে লক্ষ্য করে হিমাদ্রি, ভজহরিকে আজ বড্ডো শুক্‌নো শুক্‌নোই দেখচ্ছে বটে। সারাদিন তার নাওয়া-খাওয়া কিছুই বোধহয় হয়নি।

একা-একা বাড়ী পাহারা দিতে দিতেই ক্লান্ত হয়ে বেচারা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল এখানে। অন্যমনস্ক ভাবে ওর হাত থেকে চিঠির খামটা টেনে নেয় হিমাদ্রি। বলে—তোমার দিদিমণি কোথায়? বাবুকেও তো—

ভজহরি কাঁদতে কাঁদতেই বলে যায়—ও চিঠি দুটো লিখে রেখে কাল শেষ রাত্তিরে দিদিমণি বাড়ী থেকে চলে গেছেন। কখন যে চলে গেছেন তার কিছু জানতে পারিনি। আজ সকালে ভোরবেলায় দেখি সৌরভীর মা কলতলায় বসে বাসন মাজছে। তাকে শুধোলুম—তোমার দরজা খুলে দিলে কে? ও বললে দরজা না কী ভেজানো ছিল—খিল বন্ধ ছিল না ভিতর থেকে। অথচ দাদাবাবু বিশ্বেস করুন কাল রাতের বেলা আমি নিজে হাতে খিল দিইছি সদর দরজায়। তাই ভয় হোল, কী জানি চোর ঢুকলো নাকি বাড়ীতে। এ-ঘর ও-ঘর দেখে ছুটে গেলুম ওপরে। দেখি বাবু শুয়ে আছেন তাঁর খাটের ওপর। কিন্তু দিদিমণি নেই। আমি এ-ঘর ও-ঘর বারান্দা কলঘর সমস্ত খুঁজেও যখন দিদিমণিকে পেলুম না তখন ভয়ে ভয়ে ডেকে তুললুম বাবুকে। চিঠি দুটো ছিল দিদিমণির মাথার বালিশের তলায়। বাংলা আমি একটু একটু পড়তে জানি দাদাবাবু—তাইতে বুঝলুম ওর মধ্যে একটা চিঠি আপনার আর একটা বাবুর নামে। ভেবেছিলুম বাবুর চিঠিটা বাবুকে দিয়ে আপনার চিঠিখানা আপনার নিকট পৌঁছে দিয়ে আসবো তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু মোটে সেকথা জিজ্ঞাসা করবারই টাইম পেলুম নে দাদাবাবু!

হিমাদ্রি এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল ভজহরির কথাগুলো। এতক্ষণে সে জিজ্ঞাসা করলে—বাবুর চিঠিটা বাবু পড়েছিলেন?

—হ্যাঁ দাদাবাবু। সেই কথাই তো বলতেছি আপনাকে। চিঠিটা পড়েই বাবুর মুখটা যেন কী রকম হয়ে গেল, ছুটে এসে দিদিমণির বিছানার ওপর উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন ছোট ছেলের মত। মাথার চুল ছিঁড়ে দিদিমণির বালিশ বিছানা তচনচ করে দিদিমণিকেই গাল দিয়ে এমন করে কাঁদতে লাগলেন বাবু যে ভয়ে আমি শুধোতেই পারলুম না যে দিদিমণির কী হয়েছে। বাবুর দিকে চেয়ে—আপনাকে সত্যি কথা বলছি দাদাবাবু, নির্ঘাত মনে হচ্ছিল দিদিমণি আত্মঘাতী হয়েছে।

একবার ভাবলুম আপনাকে খবর দিই—কিন্তু বাবুকে এই অবস্থায়

ফেলে যাই কী করে। আবার ভাবলুম, নিজের পাড়াপ্রতিবেশীদেরই খবর দিই একটা। বাড়ীতে এতবড় একটা দুর্যুগ। কিন্তু তাও ভরসা হোল না। শেষে আবার বাবুই বলবেন—সব তাতে তোর এত পণ্ডিত্তির দরকার কি শুনি? যেমন মানুষ তেমনই থাকবি, বুঝলি? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে শেষে চা করে আনলুম এক কাপ। কত করে সাধলুম—বাবু চা খান। চা-টুকু না খেলে শরীল বেতালা হয়ে যাবে। বাবু কিন্তু মুখও তুললেন না। চা-ও খেলেন না। যাকে বলে একেবারে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন দিদিমণির বালিশে।

ভজহরির বিশদ বিবরণ শুনতে শুনতে হঠাৎ হিমাদ্রির ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। একটু চেঁচিয়ে বলে—তারপর কি হল তাই বলো না, শেষ পর্য্যন্ত তিনি কোথায় গেলেন? রঞ্জনার কোন খবরও কী পাওয়া যায়নি সারাদিনের মধ্যে?

ভজহরি বলে—হাঁ দাদাবাবু, খবর একটা এসেছিলো। একটা লোক—তাকে কক্ষনো দেখিনি, নিচে এসে আমায় বললে—বাবু বাড়ী আছেন?

আমি বললুম, বাবুর শরীলটে জুত নেই। এখন দেখা হবে না।

সে বললে, শরীর যতই খারাপ হোক, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। জরুরী দরকার আছে।

কি রকম পুলিশের মতন হেঁকে হেঁকে কথা কইছিল লোকটা ভয়ে ভয়ে গিয়ে বাবুকে এত্তালা দিলুম। তারপর ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলুম বাবুর কাছে। আমার সামনেই সে বাবুকে বললে—দিদিমণি নাকি হাওড়ার ইষ্টিশানে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর বসেছিল চুপ করে। এমন সময় আমাদের বাবুর বন্ধু ঘোষ মশায় কোন রেলগাড়ী থেকে এসে নামে হাওড়ায়। তিনি দিদিমণিকে চিনতে পেরে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দিদিমণি তার কথা শোনেনি। তাই তিনি এই লোকটাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন বাবুর কাছে।

বাবু তো আমাদের খবর পেয়েই তৈরী। কোনরকমে জামাখানা গায়ে গলিয়ে নিয়ে সেই লোকটার পিছু পিছু ছুটে চলে গেলেন হাওড়ার ইষ্টিশানে।

কত বললুম, বাবু নিদেন এক কাপ চা খেয়ে যান। বেন্ধ হয়েছেন, যদি মাথাটা একবার টাউরে ঘুরে যায়—তখন? তা চাকর-নকরের কথা কে শুনছে দাদাবাবু? আমি আর কি করবো? সেই পর্য্যন্তি বাড়ী আগলে বসে আছি যক্ষি হয়ে।

এইবার আপনি এয়েছেন দাদাবাবু! একটা কিছু উপায় করুন। সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছেন বাবু—বড়ো জোর বেলা তখন সাড়ে দশটা কী এগারো হবে। সারাটা দিনমান কেটে সন্ধ্যে হয়ে গেলো এখনও বাড়ী ফেরার নামগন্ধ নেই? একটা খবর পর্য্যন্তি পেলুম না? ও দাদাবাবু! কী ভাবছেন অমনধারা মুখ করে? আমার বাক্যিগুলো কানে যাচ্ছে তো আপনার?

উঁ? হুঁ। যাচ্ছে বৈ কী। সব শুনছি আমি। তাইতো ভাবছি এ কী হোল? রঞ্জনাই বা এমন করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল কেন? আর—

—ঐ তো আপনার হাতের চিঠিটা আপনি ধরেই রইলেন হাতের মুঠোর মধ্যে। ওটা পড়ে দেখেন—তাহলেই তো কিছুটা জানতে পারবেন কোথায় গেল দিদিমণি।

ভজহরির কথায় অন্যমনস্ক হিমাদ্রি যেন সম্বিত ফিরে পায়। সত্যিই তো রঞ্জনা যে তাকে চিঠি লিখেছে। সব চেয়ে সেই চিঠিখানাই তো গুছিয়ে পড়া উচিত ভাল করে।

কিন্তু কেন? কেন এমন করে চিঠি লিখে নিজেকে আড়াল করলো রঞ্জনা? হিমাদ্রি যে অনেক আশা করে এসেছিল আজকে।

আর যদি এ বিয়েতে তার সত্যিকারের অনিচ্ছাই ছিল তবে সে কথা তো একবার মুখ ফুটে সে জানিয়ে দিলেই পারতো হিমাদ্রিকে। সে জন্যে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার তো কোন দরকার ছিল না।

আজও কী হিমাদ্রিকে রঞ্জনা চিনতে পারেনি? হিমাদ্রি যে কোন কারণেই কারুর ওপর জুলুম করতে পারে না এটুকুও কী এখনও বুঝতে বাকী আছে রঞ্জনার?

বৈঠকখানাঘরের তাপের দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাতের মুঠোয় ধরা চিঠিটা খুলে হিমাদ্রি মেলে ধরে নিজের চোখের সামনে।

কিছু দেখা যাচ্ছে না যে—নিবে-আসা দিনের আলোয় সমস্ত অক্ষরগুলোই যেন আবছা বলে মনে হচ্ছে।

সমস্ত সাদা কাগজটা জুড়ে যেন কালিমাখা খানিকটা হতাশার প্রতিফলন লেপে দিয়েছে কে!

ভজহরি যাবার সময় ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে যায় বুদ্ধি খরচ করে।

এইবার দেখতে পাচ্ছে হিমাদ্রি। ভজহরি চলে যেতে সদ্য-পাটভাঙা পাঞ্জাবীটার হাতায় চোখ দুটো মুছে ফেলে। অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে অক্ষরগুলো।

হিমাদ্রি,

জীবনে এই প্রথম আর সম্ভবতঃ এই শেষ তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি আজ।

বাবা শুতে চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ অনেক কিছু চিন্তা করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে তৈরী হয়েছি তোমাকে চিঠি লেখবার জন্যে।

মাথার কাছে ঘড়িটায় এখন দু'টো বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকী।

তোমার উদ্দেশ্যে পত্র রচনার প্রশস্ত সময়ই বলতে হবে। তবুও কেন যে চিঠিটা লিখতে বসে বার বার আমার হাত কাঁপছে, মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, আমি নিজেই তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

কত ঘটনা কত কথা যে একসঙ্গে মাথা তুলে ভিড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আমি কিছুতেই তাদের পর পর সাজিয়ে বলতে পারছি না।

যতবার ভাবছি মন-প্রাণ নিবিষ্ট করে তোমায় একটা গুছিয়ে চিঠি লিখবো ততই যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মনের ভেতর।

অথচ আমায় বলতেই হবে। যেমন করেই হোক তোমাকে জানাতেই হবে। নিজের যে দৈন্যের কথা তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করা আমার সাধ্যের অতীত, তাই এই চিঠির আশ্রয় নিতে হল আমাকে।

এ চিঠির ভূমিকা দেখে তুমি নিশ্চয় ভাবছো, তোমাকে বিয়ে করতে না পারার স্বপক্ষে কয়েকটা যুক্তি দেখানোই এ চিঠির উদ্দেশ্য। না, তা নয়! বিশ্বাস করো, তোমাকে বিয়ে করতে পারি বা না পারি তা নিয়ে পাঁচটা যুক্তির অবতারণা করাটা অবান্তর, তা

আমি জানি। এ চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য তুমি যাতে আমাকে অন্ততঃ একটা বিষয়ে ভুল না বোঝো। বিশেষ করে বাবা তোমাকে বলেছেন—সুজন মারা গেছে। তাই এ ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে তুমি নিশ্চয় ভাববে—আমার মৃতস্বামীর ওপর শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা বশতঃই আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারছি না। দোহাই তোমার, এই ভুলটা আমার সম্বন্ধে করো না। কারণ প্রথম কথা—সুজন মারা যায় নি আর দ্বিতীয় কথা—এত বড় সসাগরা পৃথিবীতে তার চেয়ে বেশী ঘৃণা আজ আর আমি কাউকে করি না। তাই তোমায় মিনতি করে বলছি, আমার সম্বন্ধে এত বড় ভুল ধারণা তুমি মনে রেখো না। সুজনের ভালবাসার আপাতমধুরত্বের লোভে আমি যে একদিন আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলাম সে লজ্জা রাখবার আজ আমার স্থান নেই। তুমি বিশ্বাস করো আজ তোমাকে গ্রহণ করতে পারলে আমি কৃতার্থ হতাম।

কিন্তু তা হয় না। হয় না—তার কারণ তা হতে হলে যে মিথ্যার ওপর আমার জীবনের ভিত্তি রচনা করতে হয়, তা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ওই দেখো যতবার ভাবছি গোড়া থেকে বলবো ততই কেবল শেষের কথাটা আগে বলা হয়ে যাচ্ছে আমার।

প্রথম থেকে বলি—আজ বিকেলে বাবা সদর দরজার কাছে বসিয়ে তোমাকে যে সব কথা বলেছেন, সিঁড়ির উপরের চাতালে দাঁড়িয়ে আমি তার প্রতিটি কথা শুনেছি। আর এ-ও জানি—আমায় নিয়ে সিনেমায় যেতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি আসবে। না এসে থাকতে পারবে না। হয়ত আমি বিধবা জেনে মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসবে, তবু শেষ পর্য্যন্ত সে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে আসবে তুমি। তোমার উদারতা তোমার মহত্ব দিয়ে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করবে আমার দুর্ভাগ্য জীবনের অভিশাপকে। তুমি বলবে—এ আমি কেমন করে জানলাম, তোমার মনের ওপর এতখানি দাবী আমার জন্মালো কেমন করে?

আমি বলবো—অনুভবে। তা যদি না হতো তবে আরও অনেক আগেই আমাদের পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করতে তুমি।

তুমি বলবে—এ অনুভব তোমার ছিল কোথায়?

আমি বলবো—এইবারে তুমি আমার সত্যিকারের দোষটা ধরে ফেলেছো। এই অনুভূতিটাই আমার ছিল না আগে, অনেক দুঃখ অনেক আঘাত পেয়ে তবে হয়েছে। আর সেই জন্যেই ছ'মাস আগেকার আমি, আর আজকের এই আমিতে অনেক তফাৎ।

তোমার চোখের চাউনিতে ভালবাসার যে স্বাক্ষর লেখা আছে, ছ'মাস আগে আমি তার এক বর্ণও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি—একথা সত্যি। কিন্তু আজ তার ভাষা বুঝতে আমার কোন অসুবিধাই হয় না। তাই আজ বিকেলেও যখন তুমি ওপরের ঘরে আমার সাথে বসেছিলে, তখনও তোমার চোখে গভীর সমবেদনার ছায়া দেখে ওই দুর্বলতাটাই বার বার মনে আসছিল আমার। মন বলছিল—আজও আমায় তোমার মনের থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিতে পারোনি তুমি।

···বাবারও তাই ধারণা। আর সেই জন্যেই তাঁর একান্ত বাসনা, আমার ভবিষ্যতের দায়িত্বটা তোমাকে দিয়ে যাবার। তাতে আমার জীবনটাও একটা নিরাপদ প্রতিষ্ঠা পাবে আর তিনিও জীবনের শেষের দিন ক'টায় একটু শান্তি পাবেন। কিন্তু তাঁকে ঐটুকু শান্তিও আমি দিতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, স্নেহান্ধ ওই বৃদ্ধকে ফেলে যাচ্ছি একান্ত নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায়। আমার মত অকৃতজ্ঞ সত্যিই মেলে না। কিন্তু বিশ্বাস করো হিমাদ্রি, সত্যিই এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না আমার।

সুখী হওয়া যেদিন সহজ ছিল সেদিন বাবা সুখী হতে চাননি। চেয়েছিলেন সুখে থাকতে। আমার মতিভ্রমের জন্যেও তিনিই বহুলাংশে দায়ী। তাঁর কাছে অমনতর প্রশ্রয় না পেলে সম্ভবত আমার এমন মতিভ্রমও হতো না।

তাই আজ বাবাকে সুখী করা আমার সাধ্যের অতীত। তবুও তাঁকে এভাবে ছেড়ে যেতে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। মনটা বার বার পিছু টানছে।

তবু যেতে হবে।

তুমি নিশ্চয় ভাবছো—কেন? কোথায় যেতে চাইছি আমি?

বলছি—এত কথাই যখন বললাম তখন তোমার এ দুটো প্রশ্নের উত্তরও আমি দেবো।

প্রথমেই বলি—কারণ, আমাকে একজন চূড়ান্ত প্রতারণা করেছে কিন্তু আমি তোমায় প্রতারণা করতে পারবো না। এখানে থাকলে বাবা আমায় তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবেন। আমার বাবাকে আমি চিনি। তিনি যখন মনস্থির করেছেন তখন আমার কোন কথা তিনি আর শুনবেন না।

ও! আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। যে কথাটা নিজের মনে মনে ভাবতে গেলেও আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

—সুজন আমাকে ঠকিয়েছে। আসলে ও আমাকে বিয়েই করেনি। যা করেছিল তা বিয়ের প্রহসন। সাজানো নাটকের মত। পুরোহিত থেকে সুরু করে শালগ্রামশিলা পর্য্যন্ত তার মিথ্যা। আগাগোড়া সে শুধু অভিনয় করেছে আমার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, দু'জন ধনীর কাছে আমায় বিক্রি করেছে—টাকার লোভে। মানে আমি তোমাকে অল্পকথায় ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারছি না, ওই ধনী দু'জনের নিয়োজিত দূত হয়েই সুজন এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। তারপর দিনের পরে দিন আমার কানে ওই মধুমাখা বিষ ঢেলে আমাকে বশ করে পায়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছিল ঐ শয়তানগুলোর হাতের মুঠোর মধ্যে।

···ওদের হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনতে আমি পারিনি হিমাদ্রি!

নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ দিয়ে আমাকে মূল্যশোধ করে দিতে হয়েছে আমার পথভ্রান্তির। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে আসতে হয়েছে ওদের সেই বাগানবাড়ীতে।

আর—আর শুধু সেই জন্যেই তোমার সংসারে প্রতিষ্ঠা পাবার অধিকার আমার নেই।

বাবা পাঠালেও—তুমি নিয়ে যেতে চাইলেও আমি সেখানে যেতে পারি না। এত বড় মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে—এত বড় অন্যায়টাকে বেমালুম হজম করে অম্লান বদনে আবার অন্যকে ঠকানো আমার সাধ্য নয়।

আর শুধু সাধ্যের কথা নয়। যা আমার পাবার অধিকার নেই তা আমি নেবো কেন?

যেখানে আমার দেবার মত কিছুই নেই সেখানে আমি দু'হাত পেতে নেবো কী করে? শুধু করুণাভিক্ষা করে জীবনধারণ করা

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ আর গৌরব করবার মত কিছুই নেই তা আমি জানি, তবু নিজের এ দীনতা কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

তাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় ছিল—চাকরী নেওয়া। যা হোক একটা কিছু কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করা। আমার বোধহয় তাতে করে তবু সম্মানের সঙ্গে বাঁচবার একটা রাস্তা ছিল আমার জন্মে।

কিন্তু সেখানেও প্রতিবন্ধক আমার বাবা। তাঁর আশঙ্কাও হয়ত কিছুটা সত্যি। আমার মত মেয়েরা চাকরী করতে বেরুলে পদে পদে তাদের বহু বিপদ-বিড়ম্বনার সম্ভাবনা থাকে। তবু আমি জানি, আমার চাকরী করায় বাবার নিজের আপত্তির পরিমাণ যে সব বিপদ-আপদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। তাই এই সম্বন্ধে বাবা নিজেই সবচেয়ে বেশী বিরোধী। আমি বিয়ে করে সুখে জীবন যাপন না করে চাকরী করে—চাকরী নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে দুটি অন্নের সংস্থান করছি—এ চিন্তা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাই চাকরী করতে তিনি আমায় দেবেন না। পৃথিবীর কোন জায়গাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে একা থাকতে উনি আমায় দেবেন না। যেখানেই যাবো ঠিক খুঁজে বার করবেন। আর তারপর আবার শুরু হবে এই বিয়ের পীড়াপীড়ি। তা সে তোমাকেই হোক্ বা যাকেই হোক্। তাই স্থির করলাম—চলে যাবো। যেখান থেকে কেউ আমায় কোনদিন ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বাবা না—তুমি না. এমন কা স্বজনও নয়।

যেখানে আমায় করুণাভিক্ষা করে বাঁচতে হবে না, আবার বিনামূল্যে বিকিয়ে যাবার আশঙ্কাও নেই। ভাবছো—সেটা কোথায়? সেটা ঐ চিমনলালদের বৈঠকখানায়। হ্যাঁ, আমি স্থির করেছি ঐখানেই ফিরে যাবো। নিজের মূল্য আদায় করে নেবো নিক্তির পাল্লায়। ইজ্জতের প্রশ্নটা যখন ঘুচে গেছে তখন মিথ্যে এ শরীরটাকে ভদ্রলোকের জামাকাপড় পরিয়ে তোমার জীবনের পবিত্রতাকে কেন নষ্ট করি?

আর তা'ছাড়া এই স্থূল পদ্ধতিতে মূল্য ধার্য্য করা ছাড়া বেশী মূল্য পাবার মত পুঁজিই যে আজ আর আমার কিছু নেই।

সেদিন অমন করে পালানোটাই ভুল হয়েছিল আমার। তবে এ কথা আমি স্থির জানি—আমার জন্মে ওদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে। আমি ফিরে গেলে ওরা আমায় তাড়িয়ে দেবে না।

আজ এইখানেই ইতি টানছি। তোমায় দেবার মত আমার কিছু নেই—তাই পত্রশেষের সম্ভাষণটাও বাকীই রাখলাম এ জন্মের মত।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, কোথায় যাচ্ছি, সে বিষয়ে বাবাকে বিশেষ কিছু লিখিনি। শুধু ক্ষমা চেয়ে ছোট একটা চিঠি দিয়েছি। তুমিও বাবাকে কিছু বলে তাঁর কষ্ট আর বাড়িও না—এই অনুরোধ।

—রঞ্জনা

চিঠিটা হাতে নিয়ে বজ্রাহতের মত বসে থাকে হিমাদ্রি। এ কী করলো রঞ্জনা? এ যে আত্মহত্যার চেয়েও বেশী শাস্তি দিয়েছে সে নিজেকে।

হিমাদ্রি এখন কী করবে? পরমেশ বাবুই বা গেলেন কোথায়? হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে কী তিনি রঞ্জনাকে ধরতে পারেন নি? অথবা অতো অস্থির মনে যেতে গিয়ে তাঁরই কোন বিপদ হলো পথে-ঘাটে?

নিজের কব্জি-ঘড়িটার দিকে তাকালো হিমাদ্রি। প্রায় আটটা বাজে। রাতও হয়েছে। তবু একবার হাওড়ায় গেলো হিমাদ্রি। এনকোয়ারীতে আর দু'-একজন পুলিশ কনেস্টবল ধরণের লোককে জিজ্ঞাসা করে সন্ধান করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই হল না।

মিছিলের মত ধাবমান এক জনস্রোতের মাঝে কোনখানে এসে একটি মেয়ে দু'-এক ঘণ্টার জন্তে থমকে দাঁড়িয়েছিল—কে তার খবর রাখে?

তাছাড়া সকালের পুলিশ তো বিকেলে ডিউটি দেয় না, তারা জানবে কেমন করে? রাত পৌণে এগারোটা পর্য্যন্ত খোঁজখবর করে বাড়ী ফিরলো হিমাদ্রি।

পরদিন সকালে আবার সমস্ত থানা আর হাসপাতালগুলোয় সন্ধান নিলো ভালো করে। কিন্তু বাপ-মেয়ে কারুরই কোন সন্ধান নেই। মল্লিভিলাতেও দু' বেলায় দু'বার করে হাজির দিতে হয়েছে হিমাদ্রিকে। যদি ওরা ফিরে থাকে। কিন্তু তাই বা ফিরছে কৈ ওরা?

* * * *

পরমেশ বাবু ফিরে এলেন পাঁচ দিনের পরে।

হিমাদ্রি তখন মল্লিভিলাতেই বসে। বৈঠকখানায় বসে ভজহরির সাথে যুক্তি করছিল—আর কোন আত্মীয়ের বাড়ী অথবা পরিচিত জায়গায় সন্ধান নেওয়া যায় কী না।

পরমেশ বাবু ঘরে এসে ঢুকতে হিমাদ্রি আর ভজহরি দুজনেই অবাক হয়ে তাকালো তাঁর দিকে। ক'দিনের মধ্যে কী ভীষণ বিশ্রী হয়ে গেছে পরমেশ বাবুর চেহারাটা! যেন শ্মশানযাত্রীর মত পরিশ্রান্ত আর শুকনো দেখাচ্ছে ওঁকে। পড়ন্তবেলার রোদে কী ট্রেণ থেকে এসে নেমেছেন পরমেশ বাবু? তাই এত কালো দেখাচ্ছে ওঁকে? ক'দিন সময়ে নাওয়া-খাওয়া হয়নি নিশ্চয়, বৃদ্ধমানুষ, তাই কি এতটা কাহিল হয়ে পড়েছেন উনি?

ওঁর উদ্‌ভ্রান্ত গতিবিধির পানে তাকিয়ে আপন মনেই এইসব নানান্ কথা ভাবছিল হিমাদ্রি। তার সবচেয়ে অবাক লাগছিল, পরমেশ বাবুর জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে।

—আচ্ছা সঙ্গে জামা-কাপড় না নিয়ে যাওয়ায় যদি এই এক জামা-কাপড়েই ওঁকে থাকতে হয়ে থাকে তবে না হয় ওঁর জামা-কাপড় এতটা ময়লা হওয়ার একটা যুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অত ছিঁড়লো কী করে ওগুলো? নিজের মনে প্রশ্ন করে হিমাদ্রি অথচ ওঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করতেও যেন সাহসে কুলায় না তার।

গায়ের জামাটা খুলে তাল পাকিয়ে ঘরের এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দেন পরমেশ বাবু। তারপর ধীরে ধীরে একটা কোণার সোফায় বসে পড়েন একান্ত অবসন্ন ভাবে। একটা কোন কথা পর্য্যন্ত বলেন না।

ওঁর বসে পড়ার ভঙ্গীটি ভজহরিকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেয় বোধহয়। সে এক গ্লাস চিনির সরবৎ তৈরী করে আনবার জন্তে ছুটে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে।

হিমাদ্রি কিন্তু ব্যস্ত হয়নি। পরমেশ বাবুর সাথে রঞ্জনাকে না দেখে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে নিতে পারছিল সে।

তাই ভজহরি ঘর থেকে চলে যেতে সে ধীরে ধীরে পরমেশ বাবুর চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়ালো। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলেন তিনি। একটা অসহায় ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে।

হিমাদ্রির মমতা জাগে। তবু সে দ্বিধা কাটিয়ে প্রশ্ন করে—দেখা কি পাননি? রঞ্জনা কি হাওড়া ষ্টেশনে ছিল না? কথার শেষে পরমেশ বাবুর বাহুর ওপর একটা হাত রাখে সে।

ওর করস্পর্শে ভাবলেশবিহীন দুটি চোখ ওর মুখের উপর রাখের পরমেশ বাবু। মাথাটা সামান্ত ঝাঁকিয়ে বলেন—পেয়েছিলাম।

—তবে? তবে কেন একা এলেন আপনি? ওকে কোথায় রেখে এলেন তবে?

আবার বসে থাকেন মাথা নীচু করে পরমেশ বাবু। হিমাদ্রির প্রশ্নের উত্তর দেন না।

প্রশ্ন করেই হিমাদ্রিও বোঝে—বেশী কথা বলার মত শক্তি নেই পরমেশ বাবুর। তাঁর অবস্থা রীতিমত সঙ্গীন। কথা বলতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। উনি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন কিসের ভাবে কিন্তু তবুও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না হিমাদ্রি। নিজের অন্তরের তাগিদে সে অস্থির হয়ে পড়ে। একটু অপেক্ষা করে, একটু ইতস্ততঃ করে নতজানু হয়ে প্রায় পরমেশ বাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে সে। বলে—যে ভদ্রলোক ওকে ষ্টেশনে আটকে রেখে আপনাকে খবর দিয়েছিলেন, তিনিই কি ওকে নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে?

মাথা নেড়ে না জানিয়ে এবার যেন একটু সচেতন হন পরমেশ বাবু। তারপর বলেন—নাঃ, সে সুযোগ আর এলো কোথা? বোস্, আমার অনেক দিনের বন্ধু। চেষ্টা সে যথেষ্টই করেছিল কিন্তু যা কেলেংকারীটা হয়ে গেলো।—

আবার একটু চুপ করে থাকার পর হিমাদ্রির প্রশ্নভরা দুটি চোখের তাগাদায় বলতে সুরু করেন পরমেশ বাবু—এখান থেকে হাওড়ায় গিয়ে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চির ওপর বসে ছিল রঞ্জনা। বহুক্ষণ ওই একভাবে বসে থাকায় একটা কনেষ্টবল ওকে সন্দেহ করে। সে ওকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে—ও কোথায় যেতে চায়। কার সঙ্গে, কোন্ ট্রেণে যাবে ইত্যাদি।

রঞ্জনা কিন্তু ওর একটা কথারও উত্তর দেয়নি। এমন সময় পৌণে ন'টার গাড়ীতে বোস বাইরে কোথা থেকে যেন হাওড়ায় এসে নামে। সে রঞ্জনাকে চিনতে পেরে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে কনেষ্টবলটাকে ভাগিয়ে দেয়। তারপর নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম স্থগিত রেখে মোটঘাট নিয়ে রঞ্জনার পাশে বসে তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভালো'কথায় অনেক বুঝিয়ে জানতে চায় রঞ্জনা কোথায় যাবে। কেনই বা এমন করে এখানে বসে আছে। এ-সব একটা কথারও উত্তর দেয়নি রঞ্জনা। এক ভাবে বসেছিল শক্ত হয়ে।

তখন যেন বাধ্য হয়েই বোস্ আমার কাছে একটা লোক মারফৎ খবর পাঠায়।

আমি যখন গেলাম তখন দু'-চার জন লোক জমে গেছে ওদের চার পাশে।

তাদের মধ্যে আমার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন চমকে উঠলো রঞ্জনা। রাগ করে বলতে লাগলো, আবার এখানেও তুমি এসেছো? কেন? কেন এসেছো? আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? পারবে না তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—পারবে না।

আবার একটু নরম সুরে বলতে লাগলো—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবা, আমাকে যেতে দাও। আমার মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমলেই আমি চলে যাবো। তোমরা ফিরে যাও। আমাকে রেহাই দাও।

যত বলি, তুই কোথায় যেতে চাস বল, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো তোকে। সে সব কথার কোন উত্তরই দেয় না সে।

শেষকালে যখন একটু একটু করে জোর করতে লাগলাম আমি তখন কোন কথার আর জবাব দিল না। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো মাথা নীচু করে। বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন পরমেশ বাবু। ওঁর চোখ-মুখ দেখে কতকটা যেন ভয়ে কাঠ হয়ে রইলো হিমাদ্রি।

বিস্ফারিত নেত্রে নিজের সমস্ত শরীরটা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকেন পরমেশ বাবু—তারপর? তারপরও শুনবে হিমাদ্রি? তারপর আমি যখন তাকে একরকম জোর করেই নিয়ে আসবার মনস্থ করে একটু একটু জোর করতে লাগলাম, তখন সে গুম হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলো বোসকে। আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বোসের গলাটা ধরে ঝাঁকাতে লাগলো, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো ওকে। আর বলতে লাগলো—এই—এই লোকটা—এই লোকটাই আমায় আটকে রাখলো। আবার তোমাকে শুদ্ধ ডেকে আনলো এখানে।

—কেন? কেন? কী জন্যে আমাকে আটকেছো? বলতে বলতে ও বোসকে ঝাঁকাতে লাগলো। আমি আর অন্য দু'-একজন ভদ্রলোক মিলে কোন রকমে বোসকে ছাড়িয়ে দিলাম ওর হাত থেকে। বোস্ তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছে।

—আর রঞ্জনা? তার কী হল? সে যে কত দুঃখে কত বড় আঘাত পেয়ে এমনধারা করেছে, আপনিও কী তা বুঝলেন না? কেন তাকে ছেড়ে দিলেন? যে করেই হোক সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন? তারপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে—

পারলাম না। পারলাম না বাবা। নিজের হাতে তাকে আমি চিরদিনের মত বিদায় করে দিলাম। দু'হাতে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলেন পরমেশ বাবু। যেন নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনাতেই নিজের মুখটাকে লুকুতে চান হিমাদ্রির সুমুখ থেকে।

হিমাদ্রি কিন্তু তাঁকে নিষ্কৃতি দেয় না। নিজের চিরদিনের শান্তস্বভাব ভুলে সে আজ অশান্ত হয়ে গেছে। পরমেশ বাবুকে যে প্রায় ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকে—বলুন কোথায় গেলো সে? চলে গেলো? দেখা পেয়েও আপনি তাকে আটকালেন না? এ কী করলেন আপনি? কেন তাকে যেতে দিলেন? কেন তাকে জোর করেও ধরে আনলেন না?

হিমাদ্রির অতগুলো প্রশ্ন শোনার পরেও কিছুক্ষণ ওই একভাবে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইলেন পরমেশ বাবু।

তারপর এক সময় যখন হাতটা সরিয়ে মুখটা তুললেন, তখন মুখটা ওঁর চোখের জলে ভেসে গেছে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে শুধু বললেন—সে অবস্থাও যে আর ছিল না বাবা। হাজারিবাগ হাসপাতাল থেকে যখন ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি, তখনই ওখানকার ডাক্তারেরা সাবধান করেছিল। বলেছিল—ওর মাথায় যে আঘাতটা লেগেছে সেটা সাংঘাতিক তো বটেই সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী আঘাত লেগেছে ওর মনে। এই গুম হয়ে থাকা ভাবটা না কাটাতে পারলে হয়ত হঠাৎ একদিন ও' ওর স্বাভাবিক চেতনা হারিয়ে ফেলবে। সেই জন্যেই তো আমি অত ব্যস্ত হয়েছিলাম, ওকে একটা স্বাভাবিক জীবন দেবার জন্যে। কিন্তু পারলাম না। খুকীকে আমি কিছু দিতে পারলাম না। ডাক্তারদের সেই সর্ব্বনেশে কথাটাই সত্যি হল শেষ পর্য্যন্ত।

মেডিকেল হেলপ নিয়ে দু'টো কনেষ্টবল সঙ্গে করে নিজে উদ্যোগী হয়ে ওকে মেণ্টাল হস্‌পিট্যালে রেখে আসা ছাড়া আর কোন উপায়ই আমার ছিল না যে

শেষ

চোখে তার অনুনয়

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

চোখে তার অনুনয় দেহ-পর্ণে আবেগ নিটোল
ঝড়ের সঙ্কেত-আঁকা দুরান্তের পটভূমিকায়—
অনাগত উপপ্লব বীজ-মুক্ত রুধির-দীক্ষায়
মৌন মন্ত্রতলে সে-যে রাখে ঘিরে উল্কাবহ্নিদোল!

সে-তাপ সন্তাপ বটে, তাপাক্ত নির্ব্বেশ উতরোল
অহরহ অনাসৃষ্টি-সৃজনের মসৃণ লাভায়!
আছে ভয়,—ভস্মসার—নির্ভয়তা গোপন মুক্তায়—
দু'হাতে কুড়ানো আর হারানোর বিচিত্র কল্লোল!

এ-উৎসার মধুময় অথবা সে বিষের রচনা
প্রত্যহের প্রয়োজনে অনুভূত মনের কোঠায়,
যে-মন ইন্দ্রিয় হ'তে নিরাবৃত ইন্দ্রিয়-অতুল,
তারি সুপ্ত গুপ্ত কোষে যত্নে-ঢাকা অতনু যন্ত্রণা
বৈশাখে শ্রাবণে শীতে চিরন্তনী মঞ্জরী ফোটায়,
প্রেমে যার নিত্য-রূপ অভিষিক্ত বিস্ময়-ব্যাকুল।

চা-বাগানের কুলি

অমর বন্দ্যোপাধ্যায়

—সচা (সত্য) কইছু আইজ্ঞা, সিটু কথা মোর একো মনত নাই।

—কেন রে! কিছু মনে নেই কেন?

—সিটু মোর পুরব-জনমর নিচিনা লাগে—

—সেটা তোর পূর্ব-জন্মের মত লাগে! তোর তখন বয়েস ছিল কত?

—তেতিয়া ময় আছিলু সরু—পাঁচ, সত কি দশও হব পারে।

—ক্যাৎ, তা হলে তখনকার কথা মনে থাকবে না কেন?

—আঁ, দশ ন হব নাকি আইজ্ঞা?

—আমি কি করে জানব রে!

—আপোনি কলে ন হয়, দশ ন হব—

—আমি বললুম, তোর দশ বছর বয়েসের কথা মনে থাকবে না কেন?

—তেন্তে আকোঁ সরু হব লাগে—

—তাই হবে আরো ছোট ছিলি।

এমনি ভাবে তার শৈশবের কথা জানবার জন্যে জেরা করতাম। প্রথম প্রথম আমার সকল প্রশ্ন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার বিস্মৃতির স্তূপ সরে গেল। তুরীয়ার মনে ভেসে উঠল বাল্যের স্মৃতি, জেগে উঠল বাল্যের ব্যথা।

চা-বাগানের কুলি সরবরাহ করে এক-একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। বাংলা-বিহারের প্রান্ত থেকে শুরু করে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নানা দেশে তাদের ঘাঁটি, তাদের কর্ম। সে সব দেশে অসংখ্য সমতল ও পাহাড়ীয়া জাত আছে, যারা চা-বাগানের কাজের উপযোগী। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত সর্দার, কর্মচারী আছে। তারা ঐ সব ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে কুলি-পরিবার সংগ্রহ করে এবং গন্তব্য স্থানে চালান দেয়। এই সব পরিবারভুক্ত হয়ে বহু চুরি করা ছেলেমেয়েও চালান আসে।

তুরীয়ানন্দ চুরি-করা ছেলে। কোন এক পরিবারভুক্ত হয়ে, সাজান বাপের সঙ্গে আসামে আসে। জোড়হাটের এক চা-বাগানে। নামটা তার বাপ-মার দেওয়া নয়, সে যখন কুলি-পরিবার-ভুক্ত হয় তখনকারও নয়। এক বাগান থেকে পালিয়ে কুলিরা যখন অন্য বাগানে যায় তখন নামটা বদলাতে হয়। তা নইলে আগেকার বাগান থেকে তাদের ধরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। এটা কোন জুলুমের প্রথা নয়। অতদূর থেকে এদের আনিয়ে কাজ দেওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সব খরচটি এস্টেট বহন করে থাকে। চুক্তিমত তিন বছর কাজ করার পর আবার তারা বাগানের খরচে দেশেও ফিরে যেতে পারে, বা যেখানে খুসি যেতে পারে। তার আগে নয়। যাই হোক, ছেলেটার সদা-প্রফুল্ল ভাব দেখে কেউ তার নাম রেখেছিল, তুরীয়ানন্দ। তারই সংক্ষেপ তুরীয়া।

ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখে বড়বাবুর মায়া হল। তার বাপকে বলে নিজের বাসায় তাকে রেখে দিল। ওর ওপর একটি শিশুর ভার পড়ল। বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র টিনের অভিভাবক হল। সে বাসায় ওর সমবয়সী ছেলে-মেয়েও ছিল। বেশ ছিল সেখানে। খেলা-ধূলা, মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে বাবুর ছোট ছেলে-মেয়ে দুটোর সঙ্গে ওর বেশ প্রীতি জমিয়ে ওঠে। ছেলের নাম টিন, ওর চেয়ে বছর খানেকের বড়; মেয়ে রানি, এক বছরের ছোট।

শৈশবের সরলতার মধ্য দিয়ে এল কৈশোর। তারপর যৌবনের প্রারম্ভ। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি। বাধাবন্ধহীন জীবন। তার ওপর বয়সের উত্তেজনা।

রানির সঙ্গে ওর প্রীতির সম্বন্ধটা কোন দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল তা বাপ-মা বা কারো চোখে পড়ল না। তা পড়বার কথাও নয়। বিপদ-বিপত্তির সূত্রপাত হয় সমশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাই এক জাতীয় শাসনটা সীমাবদ্ধ থাকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ওপর। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের চোখ কুলিদের ওপর পড়ে না। তাই একদিন চমক ভাঙল, যেদিন রানি আর তুরীয়ার কাণ্ড তাদের চোখে পড়ল!

সেই রাত্রেই তুরীয়া পালাল। তার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হল।

পরদিন সকালে নিজের কথা ভাবতে ভাবতে সে পথ চলছে। তার ক্ষুদ্র জীবনের অতীতের দিনগুলো বার কয়েক ওলট-উপুড় করে নিল। মনে পড়ল প্রথম দিনের কথা—বাবুর সস্নেহের ডাক, তার গায়ে-মাথায় বাবুর স্পর্শ যেন তখনও অনুভব করল। মা'জী হাসতে হাসতে একবাটি মুড়ির সঙ্গে নারকেলছাবা দিয়ে বলেছিলেন—খাও বাবা। টিন ও রানি কৌতূহলী চোখে তার দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তুরীয়ার বিলম্বে তাদের দুজনের চোখেই ফুটে
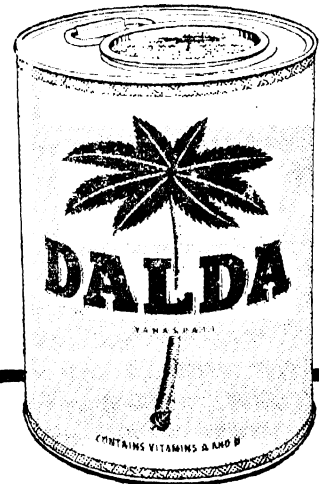
উঠেছিল অনুরোধের ভাষা। টমও যেন নতুন অভিভাবককে চিনে নিল। সে-ও হামাগুড়ি দিয়ে তুরীয়ার হাঁটুর ওপর তার হাতটা রাখল। তুরীয়াও হেসে তার মুখের ওপর চোখ ফেলেছিল। এইটুকু চাউনির মধ্যেই দুজনের সম্পর্ক যেন নির্ধারিত হয়ে গেল। টম তুরীয়ার কোলে উঠে বসল। টমের বাপ-মা আনন্দে হেসে উঠল। তারই ওপর টিম বকশিস দিল তার হাতের রবারের বলটা, রৌনি দিল তার নেকড়ার খরগোস-শাবক। এমন আদর এমন উপহারের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। সে মহা মুস্কিলে পড়ল। কোন দিক সামলাবে!

তুরীয়ার লজ্জা-সঙ্কোচ কাটতে বেশী দিন লাগল না। একদিন সবাই ভুলে গেল যে তুরীয়া অন্য কোথাও থেকে সে বাড়ীতে এসেছে।

বয়সের বিভিন্ন রকমের খেলাধূলোর মধ্যে তারা এগিয়ে চলল। অন্য বাসার ছেলেমেয়েও এসে জোটে। দল বড় হয়। অতএব খেলারও হের-ফের হয়। সেদিন শুরু হল লুকোচুরি খেলা। রৌনি আর তুরীয়া লুকিয়েছে একটা ঝোপের মধ্যে। প্রথমটা ধরা পড়ার ভয়ে দু' জন গা-ঠাসাঠাসি হয়ে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আর আসে না। চোখ দুটো বাইরের দিকে রেখে একটা দুটো করে কথা শুরু হল। হঠাৎ কে যেন কার গায়ের উত্তাপ অনুভব করল। ফিরে তাকাল, গায়ে হাত দিয়ে দেখল। এ বলে ওর গা গরম। কিন্তু দু' জনই কেঁপে উঠল। এতদিন দু' জনের পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল শুধু দুটি নামের মধ্যে। সে-দিন তারা নতুন কিছুর সন্ধান পেল। সেদিন তারা প্রথম জানতে পারল তাদের একজন তরুণ অপরজন তরুণী।

সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ সে কোথায় চলেছে! তার দুটো চোখ বেয়ে নামছে জলের ধারা। অনুতাপদগ্ধ মন মুষড়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

পথটা বড় দুর্গম। এক সাহেবের গাড়ী সে পথে যাচ্ছিল। এই দুর্গম পথে ছেলেটাকে দেখে সাহেবের আশঙ্কা হল, করুণাও হল। গাড়ীটা থমকে দাঁড়াল তার সামনে। পলাতক সে—ভয় পেল। কেউ যেন তাকে ধরতে এসেছে। ছুটে পালাতে গিয়ে সে গাড়ীটার ওপর পড়ে গেল, সাহেব তাকে গাড়ীতে তুলে নিল। সঙ্গে করে নিয়ে গেল ডিব্রুগড়ে, সাহেবের চা-বাগানে। বাগানের হাসপাতালে দিন কয়েক রেখেও দিল।

ভাল হয়ে উঠে মেমসাহেবের প্রশ্নের জবাবে সে জানাল—তার বাপ-মা কেউ নেই; সে কাজের সন্ধানে বেরিয়েছে।

কাজ পেল। সাহেবের ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে সে খেলবে। একটি মাত্র আয়া—কোলের মেয়েটাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তার ওপর দুর্দান্ত ছেলেটাকে সে সামলাতে পারে না। ছেলেটার জন্যে মেমসাহেবেরও অনেক কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

সাহেবের ছেলে জনকে পেয়ে টমকে হারানোর দুঃখ সে কতকটা ভুলেছে। দুরন্ত জন একাই একশো। কিন্তু টিম কই, রৌনি কই? তার বুকের ভেতরটা যেন গ্রীষ্মের রৌদ্রভরা আকাশ, শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করে ওঠে। তবু সে আর বন্ধুত্ব চায় না। এখন থেকে সে সাবধানে থাকবে।

জন বায়না ধরে এদিকে যাবে, ওদিকে যাবে। ছেলেটাকে নিয়ে তাকে যেতে হয় বাবুদের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে। ছেলে-বুড়ো সব এগিয়ে আসে সাহেবের বাচ্চাকে আদর করতে। ওদের বাড়ীতেও ডেকে নিয়ে যায়। তুরীয়ার কত মান! সাহেবের ছেলে থাকে তার কাছে, এমন এক মানীর সঙ্গে বাবুদের ছেলে-মেয়ে ভাব-বন্ধুত্ব না করে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরীয়াকে কথা বলতে হয়।

পোড়া গাছের গোড়া থেকেও অঙ্কুর গজায়। তার শুষ্ক বাসনা জল-বাতাসের স্পর্শে সতেজ হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার আগুন চাপা দেবার চেষ্টা করল অনুতাপের ছাই দিয়ে। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, আবার আগুন জ্বলে উঠল আগুনের খেয়াল চরিতার্থ করতে।

কুলিদের কথা তো সে জানেই, বাবুদেরও জেনেছে। কুলিরা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদেরই সন্দেহ করে থাকে, কুলিরই হোক বা বাবুরই হোক। তবে নিজেদের ছেলেমেয়ের মেলামেশা নিয়ে তারা অতটা মাথা ঘামায় না। তবুও ওদের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে অনেক ঝামেলা আছে। ধৈর্য্য চাই, পয়সাও খরচ হয়। প্রথমে পছন্দ অপছন্দ, তারপর মিষ্টি কথা ও উপহারের ছড়াছড়ি, তার উপর গুষ্টি-গোত্র নিয়ে হাড়িয়ার শ্রাদ্ধ। সাহেবের বাংলোয় তার কাজ, এত সময় সে পাবে কোথা? কুলিমেয়ের কাছে অকস্মাৎ কোন প্রস্তাবও করা চলে না। মানের ভয় নেই তাদের, হাঁউ-মাউ করে রটিয়ে দিতে পারে। বাপগুলোও দুর্দান্ত, খুনে।

বাবুদের মেয়েগুলো ওদের মত গোলমাল করে না। সে বেফাঁস কথাই হোক আর বেসামাল কাজই হোক। কোন উপহারের প্রত্যাশাও তারা করে না। শুধু পছন্দ বা অপছন্দ। বাবুরাও কুলিদের মত দুর্দান্ত নয়। তারা এ বিষয়ে অনেক ধীর-স্থির। তাদের শাসনেও হৈ-হল্লা নেই। মানের ভয় আছে।

চা-বাগানের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আরো সীমাবদ্ধ বাবুদের চলাফেরা। মুষ্টিমেয় সমশ্রেণী, তার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে বাবুদের ছেলেমেয়েরা। অনেক ছেলে কুলিবস্তিতে যায় বন্ধুত্বের সন্ধানে। কুলিদের ছেলেরাও বাবুদের বাসার অনেক কাজ করে দেয়। তাই তাদের অবাধ যাতায়াত সেখানে। তাদের সহজ সরল ব্যবহারে বাবুরা কোন অভিসন্ধি খুঁজে পায় না। অবশ্য অনেক সময় তা থাকেও না। সবই ঘটনাচক্রের খেলা, সুযোগের দুর্ঘটনা, একান্তে মেলামেশার পরিণাম। কত কাণ্ডই না ঘটে এদের অনেকের বিবাহিত জীবন শুরু হবার পূর্বে। তারপরও দেখা যায় বাল্যপ্রীতির রেশ।

নতুন বৃষ্টির সঙ্গে চা-গাছে নতুন পাতা গজায়। বৃষ্টির ঘনঘটা বাড়ে, পাতাও বাড়ে। একটা ডগা ছিঁড়ে নিলে পাঁচটা জন্ম নেয়। দিন-রাত কল চলে। টি-হাউস বাবুরা বড় ব্যস্ত। পালা করে রাত কাটাতে হয় কলঘরে। এক কলঘরিয়া বাবুর বাসায় তুরীয়া জমিয়ে বসল।

টি-হাউস বাবুর আঠারো বছরের অবিবাহিতা মেয়ে আরতী। প্রায়ই মাঝ রাত্রে সে দরজা খুলে দেয়। বৃষ্টিতে ভিজে তুরীয়া সুট করে ঢুকে পড়ে। তাতেও মেয়েটা খুসি থাকতে পারল না। এক রাত্তিরে খুসির প্রাচুর্যে সে ধৈর্য্যহারা হল।

সে বলে বসল—তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, তা নইলে আমি বিষ খেয়ে মরব।

—এনে কুয়া কাম ন করিবি!ময় খুব চেষ্টায় আছু। সাহবর পরা মোর জমা টকাটু লই লব দে। টকাটু পালেই ময় তক্ লই গুচি যাম।—আরতীর কথায় ভয় পেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তুরীয়া বললে।

স্তরগুলো যেন একটির পর একটি করে ভেঙ্গে পড়তে থাকল। কলকাতায় গিয়ে সে কলকাতার দেখা পায়নি। আমার মুখের কথায় কলকাতার সন্ধান পেয়ে সে যেন অবাক হয়ে গেল। সে যেন কি একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথবা কিসের সন্ধান পেয়েছে! হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কলিকাতার পর পাটনা কী-মান দূর?

—বেশী দূর নয়। কেন, পাটনাতেও গেছলি?

—সাহেব! মোর ঘর তো পাটনার ওসরে।

—তোর বাড়ী পাটনার কাছে! কি করে জানলি?

হয় আইজ্ঞা! মোর মনত্ আসিছে; পাটনার দক্ষিণে মোর গাঁও, চারি ক্রোশ যাব লাগে। বাটত এটা ভাঙ্গর বটগছ আছে, এটা তালাও, তিনিটা ইন্দিরাও আছে, ঘরত্ মোর মায় আছে, বাপ আছে—সিঁহতে মোক খুব ভালপায়।

—তারা তোকে খুব ভালবাসে! কি করে জানলি?

—হয়, মোর ঘরত্ আর একো ছোলিমানু নাই। মোর মায় খুব কাঁন্দি আছে।

—তোর মা কাঁদছে! এতদিন হয়ে গেল—

—হয় আইজ্ঞা, কেয়া ন কাঁন্দিব? এইটুক বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

আশ্চর্য! কে তার সামনে আজ কলকাতাকে নতুন করে তুলে ধরলে! কে তার সে দরজা খুলে দিলে যা তার কাছে এতদিন পূর্বজন্মের মত ছিল। কে জাগিয়ে দিলে তার মনে বাল্যের ব্যথা। কতদিন আমার কত প্রশ্ন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ তার জীবনের সমস্ত স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তার মনে জেগে উঠেছে।

তার ঠাকুরদাদা কোন রাজার তামাক সাজত! রাজার কাছ থেকে সে একখানা গ্রাম বকশিস পায়। সেই গ্রামেই তাদের ঘর, ক্ষেত-খামার, প্রজাও আছে। তার বাপের দু-কুড়ি মোষ। বাপের সঙ্গে কতবার সে মোষের গাড়ী চেপে পাটনায় গেছে—ঘি, দুধ, ছানা, মাখম বিক্রি করত—ধান, চাল, ডাল বিক্রি করতে। শহরে যাবার সময় তার মা কত খাবার-দাবার সঙ্গে দিত—ফিরে এলে কত আদর যত্ন করে, হাত-পা ধুইয়ে খেতে বসাত, তাকে কত ভালবাসত।

একদিন বাপের সঙ্গে সে শহরে গিয়েছিল—একলা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তন্ময় হয়ে দোকান-পশার দেখে বেড়াচ্ছিল। একটি লোক মোটর গাড়ীতে বেড়াবার লোভ দেখিয়ে গাড়ীতে তুলে নিল। তার পরই শুরু হল তার নতুন জীবন। তার স্মৃতিভ্রংশের কোন কারণই সে অনুমান করতে পারে না। থেমে থেমে এমন কত কথা সে বলতে লাগল। মাতৃস্নেহরসে বঞ্চিত চোখে-মুখে ফুটে উঠল মাতৃস্নেহ লাভের ব্যাকুলতা।

সাহব! মোক একবার কলিকাতা লই যাব নে? আমার পায়ের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে একান্ত দরদী কণ্ঠে সে অনুরোধ করলে।

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

খুসি হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তার পরা পাটনা?

—হ্যাঁ রে, বড়দিনের সময় নিয়ে যাব। পাটনা কেন, তোর গাঁ পর্যন্ত নিয়ে যাব।

তুরীয়ানন্দ আনন্দে অবসন্ন হয়ে পড়ল।

সে রাত্রে আর কোন কথা হল না। পরদিন সকালে আশ্চর্য হলাম তাকে দেখে। পাশ থেকে কোথাও সে যায়নি। আমার খাটের নিচে, মাটিতে সারাটা রাত শুয়ে ছিল। ডাক শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। চারদিকে চোখ ফিরিয়ে সে অবাক হল! সে যেন কোথায় ছিল, কোথায় এসে পড়েছে! কিছুই যেন চিনতে পারছে না। আমার মুখের পানে সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, ধীরে ধীরে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। ভারাক্রান্ত বুকে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল, ধীরমন্থর গতিতে।

দৈনন্দিন কাজগুলো সে করে গেল বটে, কিন্তু সে যেন একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছে! তার কথায়, তার কাজে তুরীয়ানন্দের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কোন মতে দিনটা কেটে গেলে রাত্রে সে আমার পাশে এসে বসল। তার মনে কত কথা! কিন্তু সেগুলো তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, কোনটাই বেরোবার পথ পাচ্ছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা বুকের মধ্যে চেপে সে যেন স্থির হয়ে বসে আছে।

—কি রে। চুপ করে আছিস কেন?

তার কথা প্রকাশের পথ পেল। অত্যন্ত আগ্রহে সে এক নিশ্বাসে বললে—আইজ্ঞা, বড়দিন পাওতে কি মান পলম আছে?

এই একটি প্রশ্নের মধ্যে তার সকল প্রশ্নের সন্ধান পাওয়া গেল। এখানে তার মুহূর্ত কাটতে চাইছে না, পাটনায় পৌঁছতে আর সবুর সইছে না।

তাকে নিশ্চিন্ত করে বললাম—আজ কলকাতা থেকে একটা জরুরি ডাক এসেছে, কাল কি পরশুই তোকে নিয়ে যাব। তোর মায়ের কাছে রেখে আসব।

এত খুসি, এত আনন্দ কখনো চোখে পড়েনি। আমার পায়ের ওপর তার হাতের চাপে যেন আনন্দ বিচ্ছুরণ হতে থাকল। আমার শরীরের প্রতি রন্ধ্র যেন জেগে উঠল তার মমতার গভীর স্পর্শে।

এখানকার সকল বন্ধন থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ভুলে গেছে—তার এত সখের মাটি-হালের কথা, বড়দিনের পূর্বে এখানকার আয়োজনের কথা, শঙ্খধ্বনির কথা।

তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তার বুকের নিশ্বাস ঘোষণা করছে তার অস্থির মনের কথা। হঠাৎ নিশ্বাসটা যেন কেমন ভাবে কানে বাজল।

সস্নেহে জিজ্ঞেস করলাম—কি রে, কাঁদছিস?

কোন জবাব এল না।

Was Christ a man like us?
Oh; let us try
If we then, too, can be such men as he!

—Mathew Arnold

স্মৃতির অতলে
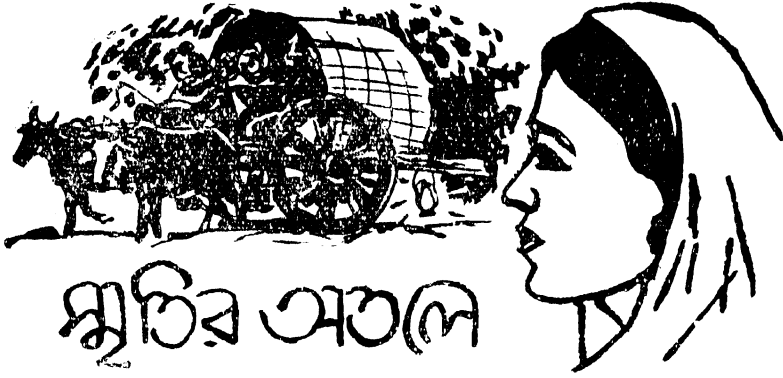
অনিলবরণ ঘোষ

মহা বিরক্তিতে মোটর থেকে নেমে পড়ে সুবীর বোস। রাস্তায় হাঁটু-সমান জল। ইঞ্জিনে জল ঢুকেছে; দু'-তিন ঘণ্টার আগে নামবে না। কলকাতায় কি যে হয়েছে একটুতেই রাস্তায় জল। অতো দাম দিয়ে নতুন গাড়িটা না কিনলেই হ'ত—

কে গো, আমাদের স্বদেশীবাবু নয়?

চমকে সুবীর প্রশ্নকারিণীর দিকে তাকায়। মধ্যবয়স্কা একটি শুষ্ক চেহারার বিধবা ওর দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে। মোটেই চিনতে পারে না সুবীর। তবু ভদ্রতা রাখতে হয়। শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, সব ভাল ত?

আর আমাদের ভাল থাকা! চেনা মানুষরা কেউ ভুলে গেছে, কেউ চিনেও চেনে না আচ্ছা চলি—

হাসিমুখে তার হতাশা ফুটে উঠেছে। ম্লান চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়ে মেয়েছেলেটি চলে যায়।

কিন্তু কে এই মহিলাটি? চেহারা আর জামা-কাপড়ে যথেষ্ট দৈন্যদশা। বর্তমান সমাজে ত গরীবের স্থান নাই! একটা প্রকাণ্ড কোম্পানীর সে কর্মকর্তা। এমন বিধবার ত দেখা মেলেনা গ্র্যাণ্ড, ফিরপো কিংবা অফিসের 'ঠাণ্ডা-গরম' ঘরে।

তবু সুবীর বোস ঘামে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মোছে। ওর কাছে যে অচেনা নয় বিধবাটি, আর চেনা বলেই যে না চেনার ভাণ করতে হ'ল। কারণ সে ভুলে যেতে চায় উত্তেজনায় ভুল করা কয়েকটি বছর। সত্যি সে কয়টি বছরের জন্য ওর আফশোস হয়, দুঃখ হয়। সে ক'টা বছর নষ্ট না করলে বুঝি জীবনে আরও উন্নতি করতে পারত সে।

তখন কতই বা বয়েস, সবে বিশের ঘরে পা পড়েছে। ইংরেজী উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল। আগষ্ট আন্দোলনে মুখর প্রতিটি প্রভাত। দলের প্রায় সবাই পুলিশের হাতে। কলকাতা ছেড়ে সুবীর পালায়। কোথায় সেই গজারী বন আর লালমাটির দেশ ভাওয়াল পরগণা। নানা পথ ঘুরে সুবীর আশ্রয় নেয় জিতেন চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু তার ডেরাতেও তখন পুলিশের হানা চলছে। সুবীরকে নিয়ে বাড়ি ছাড়লেন তিনি।

সমস্ত দিন কর্দমাক্ত পথে হেঁটে একটা ঘাঁটিতে গিয়ে ওরা যখন পৌঁছায়, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। শান্ত সুনিবিড় গৃহস্থবাড়ি। উঠোনে দাঁড়িয়ে একঝাঁক পাতিহাঁসকে খাবার দিচ্ছিল একটি বউ। গায়ের রঙ্ কালো, নিটোল দেহের গড়ন, সব চেয়ে অদ্ভুত তার চোখ দুটি। প্রতিমার মত আয়ত। কাজলের মত কালো, ধারালো ইস্পাতের মত চকচকে।

তাদের দেখে মাথার ঘোমটা টেনে বউটি এগিয়ে আসে। হাসিমুখে বলে, কাদা মেখে দাদা যে এ অসময়ে, কোথা থেকে আগমন?

জিতেনদা' ব্যাগটা নামিয়ে বলে, দু' গ্লাস চা এনে দাও গৌরীদি', জলে-কাদায় ভিজে হাড় জমে যাবার অবস্থা। বর কোথায় তোমার?

—ঘুমুচ্ছে।

—এ অসময়ে ঘুম, কি হয়েছে তার?

চার পাশে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে গৌরী বলে, কাল রাতে দল নিয়ে বেরিয়েছিল, ফিরে এসে অবধি ঘুমুচ্ছে। তা তোমার জামা-কাপড় ছেড়ে দাও, ধুয়ে দিই।

—ধোবার সময় নেই। এখান থেকে ভাত খেয়ে রাত্তিরেই পালাব।

গৌরীর দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরে যায়। বলে, এই এক-মাঠ কাদা ভেঙে এসেই আবার বেরোবে! শরীরটা কি রক্তমাংসের, না লোহার?

—বোন রে, পুলিশ লেগেছে পিছু। আজ রাতের মধ্যেই অন্তত দশ মাইল পাড়ি দিতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গৌরী চলে যায়।

ওদের কথাবার্তায় ঘুম থেকে গৌরীর বর দেবীপ্রসাদ উঠে আসে। অসময়ের ঘুমে মুখ-চোখ ফুলে ঢোল। জিতেনদা'র দিকে তাকিয়ে সে হাসে।

—হাসছো যে বড়, কি ব্যাপার?

—কাল একটা মিলিটারীর ট্রেণ আটকিয়েছিলাম। খুশি যেন চেপে রাখতে পারছে না দেবীপ্রসাদ।

—বাহাদুর বটে, একেবারে মিলিটারীর সঙ্গে পাল্লা লড়তে শুরু করেছ যে!

—ভাল লাগে না দাদা, তোমার ঐ পুলিশদের পিছু লাগতে। বড় ভীতু ওরা, থানায় একটা বোমা ফেললেই কাঁপতে থাকে। তার চেয়ে অনেক মজা ঐ তোমার মিলিটারী ধরে। ট্রেণটা যখন দাঁড়িয়ে গেল, কি বলবো দাদা, চারপাশে যেন গুলীর ফুলঝুরি—

দেবীপ্রসাদের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়

জিতেনদা'। ধীরে ধীরে বলেন, অতো বাড়াবাড়ি ভাল নয় দেবী, নিজেকে হারিয়ে ফেলো না।

গৌরী দু' কাপ চা দিয়ে যায়। দেবীপ্রসাদ চায়ের বায়না ধরে বউয়ের পিছু পিছু রান্নাঘরে উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর পা টিপে টিপে ফিরে আসে সে। জিতেনদা'কে বলে, চুপি চুপি একটু আসুন, এমন মজার জিনিষ দেখাব, যা না দেখালে আমারই আফশোস থেকে যাবে।

দেবীপ্রসাদের পিছু-পিছু জিতেনদা' উঠে পড়ে। সুবীরও তাদের সাথে যোগ দেয়। পেছনের উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে সবাই একটা পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। অঙুলি নির্দেশে দেবীপ্রসাদ দেখায় পুকুরের নুয়ে-পড়া একটা গাছের ডাল। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শক্ত খোঁপা বেঁধে ডালটায় পা ছড়িয়ে বসে গৌরী একমনে মাছ ধরছে। মহানন্দে বঁড়শীতে টোপ পরিয়ে ফেলছে আর তুলছে। প্রতিবার নধর-দেহ রূপালী পুঁটি পুকুরের কালো জলের বুক চিরে ঝলছে উঠছে।

দেবীপ্রসাদ আর হাসি চাপতে পারে না। সশব্দে সে হেসে ওঠে। চমকে যায় গৌরী। পিছন ফিরে দলটিকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানতে গিয়ে ছিপ পড়ে জলে। হাঁটুর কাপড় নামাতে গিয়ে পা হড়কায়। ওর অবস্থা দেখে জিতেনদা' আশ্বাস দেন, তুই বসে বসে মাছ ধর। আমরা যাচ্ছি।

ততক্ষণে গাছের ডাল ছেড়ে নেমে এসেছে গৌরী। স্বামীর দিকে তীব্র ভর্ৎসনার একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ হেনে বলে—বাড়িতে অতিথি এসেছে, কি রান্না হবে, খোঁজ নিয়েছ কখন? আবার হাসা হচ্ছে!

প্রায় আধ-খালুই মাছ নিয়ে তর-তর করে গৌরী চলে যায়।

গরম গরম ভাত, মুচমুচে পুঁটিমাছ ভাজা, ঝাল, ঝোল, খাওয়াটা একটু বেশীই হয়ে যায়। ভরাপেটে দু'চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু কঠিন-কঠোর জিতেন চৌধুরী। মাঝরাতে পথে নামে।

আকাশে ঘন মেঘ। অন্ধকারে দৃষ্টি অচল। কোথায় কাদা, কোথায় জল, কিছুই দেখা যায় না। কিছুটা পথ চলে সুবীরকে একটা ঝোপে বসিয়ে এগিয়ে যায় জিতেনদা'। সামনেই বাজার, পুলিশ রয়েছে কিনা দেখে আসতে হচ্ছে।

বিরসমুখে ফিরে আসেন জিতেনদা'। হাঁটাপথে যাওয়া চলবেনা। পুলিশ ওৎ পেতে আছে।

তাদের ফিরে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত দেবীপ্রসাদ বলে, নৌকো করে দেব?

গৌরী এসে দাঁড়ায়। স্বামীর কথায় প্রতিবাদ করে বলে—নৌকো দিয়ে কি হবে? রাত্তিরে নৌকো দেখলেই যে ধরবে। তার চেয়ে এক কাজ করো—বলতে বলতে সুবীরের কাছে এগিয়ে যায় গৌরী। মুখখানা দেখে ভাল করে। খুশিকণ্ঠে বলে, সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। কেউ এসে এর গোঁফটা কামিয়ে দাও—গোঁফে হাত ঢাকা দিয়ে ভয়ে সুবীর পিছিয়ে আসে কয়েক পা। জিতেনদা' খুশিকণ্ঠে বলেন, ঠিক বুদ্ধি ধরেছিস দেবী, ক্ষুর নিয়ে এসে চট করে এর গোঁফটা কামিয়ে দাও দেখি।

মুহূর্তে দেবীপ্রসাদ ক্ষুর নিয়ে আসে। বিহ্বল সুবীরকে বসিয়ে চড়-চড় করে অতো সখের তাজা গোঁফজোড়া নির্মূল করে দেয়।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে গৌরী নির্দেশ দেয়—তোমাদের ক্লাবঘর থেকে রাজকন্যার পরচুলাটা এনে দাও।

দেবীপ্রসাদ পরচুলা নিয়ে আসে। সুবীর মেয়েছেলে সাজতে কিছুতেই রাজী নয়। জিতেনদা' অনেক করে বুঝিয়ে রাজী করায়। গৌরীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় কিছুক্ষণ পর সুবীরকে আর চেনাই যায় না। ওর সীঁথিতে সিঁদুর দিয়ে মহা গম্ভীরে গৌরী আশীর্বাদ করে! এয়োস্ত্রী হও মা, সতীসীমন্তিনী হও। পরক্ষণেই খিল-খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ক্ষোভে সুবীরের চোখের কোণে টলমলিয়ে ওঠে অশ্রুবিন্দু, কিন্তু নিরুপায়! গৌরীর নির্দেশে জিতেনদা'ও সেজে নেয়। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মুখে মাখে এক খাবলা স্নো, মাথায় দেয় গন্ধতেল, পায়ে পরে চকচকে পাম্প-সু, তার উপর গিলেকরা পাঞ্জাবী ও ধুতিতে তাকে সদ্য বরের মতই লাগে। জামা-কাপড়, বাক্স-বিছানা, এমন কি গয়না দিয়ে পর্যন্ত সাজিয়ে দিচ্ছিল। যদি একটা কিছু হয়ে যায়। সব যে যাবে। অনুযোগ করেন জিতেনদা'।

দুই ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে গৌরী। বলে, আমি কি এটুকুও দিতে পারিনে দাদা, তুমি আমাকে কি ভাবো? ঘাট হয়েছে আমার দিদিভাই!

সুবীরকে শেষ একবার দেখে নেয় গৌরী। ঘোমটায় মুখ ঢেকে ক্ষোভে দুঃখে সুবীর জবুথবু হয়ে বসে থাকে। যেন নবোঢ়া বধূ। বাড়ির গরুর গাড়ি তৈরী হয়। বর-কনে গাড়িতে ওঠে। সুবীরের সীঁথিতে আরও একটু সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যাত্রার অনুমতি দেয় গৌরী। এর পর কয়েক মাস জিতেনদা'র সাথে এ ঘাঁটি সে ঘাঁটি করে বেড়ায় সুবীর। একদিন দেবীপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদ আসে। কোন এক মিলিটারীর তাঁবুতে আগুন ধরাতে গিয়ে আর ফেরেনি সে। কিছুদিন পর জিতেনদা' ধরা পড়েন। আর সুবীর? একাকী এদিক-ওদিক ঘোরাঘোরি করে বাড়ি ফিরে যায়। ভাল ছেলের মত পড়াশুনা শুরু করে। বাপের টাকায় বিলেত যায়, বিলেত থেকেই অফিসার হয়ে ফিরে আসে।

তাই বুঝি পাগলকরা দিন কয়টি আর পাগল মানুষ কয়টির স্মৃতি মন থেকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে অফিসার সুবীর বোস! তাই আজ গৌরী অচেনা!
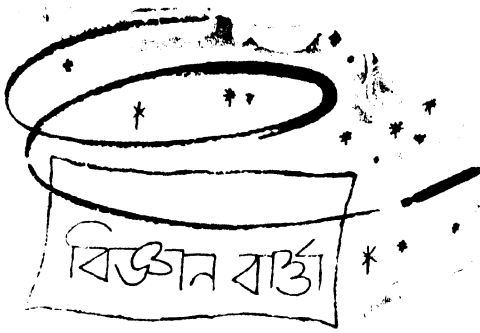
বিভিন্ন দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইন ও আন্দোলন

দিলীপ মালাকার

সব দেশেই এক ভাবনা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। সব দেশেই জনসংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে। তবে সব দেশে এক হারে বাড়ছে না। কোনো দেশে একটু কম, কোনো দেশে সে অনুপাতে হয়ত একটু বেশী। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, বৃদ্ধির হার সাধারণতঃ সব দেশেই ওপরের দিকে। তাই সব দেশেই দেখা দিয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন। কোনো দেশে এই আন্দোলন সরকারীভাবে সমর্থিত, কোনো দেশে বা সে আন্দোলন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চালিত। মোটামুটি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে প্রায় সব দেশেই অল্প-বিস্তর। একমাত্র কয়েকটি কম্যুনিষ্ট দেশ ছাড়া।

সাধারণতঃ আমরা ভারতবর্ষ বা চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেই আঁৎকে উঠি। ভারতবর্ষ ও চীন আয়তনে ছোট দেশ নয়। তাই তার আয়তন অনুযায়ী লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ, ইউরোপে অনেক ছোট দেশের লোকসংখ্যা, যার আয়তনও অনেক ছোট। কিন্তু তাদের লোকসংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে তিন থেকে ছ' গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মাত্র দুই গুণ। তা ছাড়া ইউরোপের লোকসংখ্যা যেই বৃদ্ধি পায়, অমনি বছরে বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় দেশ ছেড়ে যায় আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় বা আফ্রিকায়। ইউরোপের জনসংখ্যা বর্তমানে যা আছে তার সাথে আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আফ্রিকার শ্বেতকায় জনসংখ্যা যোগ দিলে দেখা যাবে যে, ইউরোপের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে বাড়েনি ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, ঠিক সেই অনুপাতে ইউরোপীয়দের মতন ভারতবাসীরা দেশ ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধেনি। তারা ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে। যে ক'জন ভারতীয় ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্যত্র গেছেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষ। এক ইউরোপ হতেই প্রতি বছরে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ লোক বিভিন্ন মহাদেশে চালান যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

উপরন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা হল খাদ্য-বাসস্থান। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদি। তার প্রসার হলে ভারতবর্ষে খাদ্যসমস্যাও মিটবে। শুধু যদি আমরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি আমাদের খাদ্যের জন্যে, তাহলে আমরা বিফল-মনোরথ হবই। সে ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেও খাদ্যসমস্যা মেটাতে পারব না। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণই লোকসমস্যার প্রধান হাতিয়ার নয়। প্রধান হাতিয়ার খাদ্যোৎপাদন। অধিক খাদ্যোৎপাদন নির্ভর করে বিজ্ঞানের ওপর। দৈবগুণ বা আবহাওয়ার ওপর নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ পাদ্রি ম্যালথ্‌স বলেছিলেন যে, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কয়েক গুণ বেশী খাদ্যোৎপাদনের চেয়ে। সুতরাং লোকসংখ্যা কমানই উচিত। মনে রাখতে হবে যে, যে যুগে ম্যালথ্‌স ও কথা বলেছিলেন সে যুগে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়নি। বিজ্ঞানের প্রভাব তখন ছিল অতি ক্ষীণ। ম্যালথ্‌সের সে মত এখন সব দেশে খাটছে না। যেমন রাশিয়ায় ও আমেরিকায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে তার চেয়ে ডবল হারে বাড়ছে প্রতি বছরে খাদ্য। আমেরিকানরা তো প্রতি বছরে উদ্‌বৃত্ত খাদ্য হাজার হাজার টন পুড়িয়ে ফেলছে। এই দুই দেশের খাদ্যোৎপাদন অতি বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে চাষাবাদে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়োগের ফলে। আমি এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে লোকসমস্যা থেকে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে, পরিবার ছোট হলে আর্থিক সমস্যার কিছু সমাধান হবে। তবে ওটাই একমাত্র অবলম্বন নয়। কারণ আর্থিক উন্নতির মানদণ্ড এক এক দেশে এক এক রকমের। সবাই চায় উন্নত মানদণ্ড। সুতরাং আর্থিক উন্নতি না হলে সমস্যা, সমস্যাই রয়ে যাবে।

যাই হোক, জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে কোন দেশে কি রকমের প্রচেষ্টা চলছে তার ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল।

ইউরোপ

জার্মাণী ঃ ১৯৪৫ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র জার্মাণীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের ঝড় ওঠে। ১৯৪১ সালে হিটলারের নাৎসী সরকার আইন বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বন্ধ করে। কিন্তু ১৯৪৬ সালেই পূর্ব-জার্মাণ সরকার নতুন আইন প্রয়োগে পুরোনো আইন বাতিল করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরোপ করে। পশ্চিম-জার্মাণীতে তেমন কোন কেন্দ্রীয় সরকারী আইন প্রবর্তিত না হলেও ১৯৫০ সালে নতুন আইনের বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করে। পশ্চিম-জার্মাণীতে এক একটি প্রাদেশিক সরকারের এক একটি আইন প্রযোজিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে। তবে বেশির ভাগ প্রাদেশিক সরকারই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আইন তো করেছেন, উপরন্তু শহরে শহরে ক্লিনিক খুলেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ কাজে সহায়তা করতে। সরকারী ক্লিনিকের চেয়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিকের সংখ্যাই বেশী।

অষ্ট্রিয়া ঃ অষ্ট্রিয়া যখন জার্মাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন সেখানেও চলে হিটলারী নীতি। মাত্র ১৯৫২ সালে এক নূতন আইন বলে পুরোনো জার্মাণ আইন পরিবর্তিত হয়। এই আইনের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ খুব বেশী প্রসার লাভ করেনি। জার্মাণীর মতন যেখানে সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি অষ্ট্রিয়ায় বিক্রী করা হয় না। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত ও সব জিনিষ বিক্রয় নিষেধ। কিন্তু সোস্যালিষ্ট পার্টি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন তো করেছেনই, উপরন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ক্লিনিকও খুলেছেন।

বৃটেন ঃ জনসংখ্যা সম্বন্ধে প্রথম আন্দোলন তোলেন ইংলণ্ডের ম্যালথাস। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুতহারে এবং সেই বৃটেনে যত লোকসংখ্যা বেড়েছে গত পঞ্চাশ বছরে তত বাড়েনি ভারতবর্ষে বা ফ্রান্সে। কিন্তু সেই বৃটেনে আজও পর্যান্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন আইন চালু হয়নি।

১৯৪৯ সালের জনসংখ্যা সম্বন্ধে রয়াল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত পিতৃত্ব সম্বন্ধে যদি সবিশেষ সজাগ হয় তাহলে বৃটেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

বৃটেনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েসান ১৯৫২ সালে সমস্ত বৃটেনময় ৯৪টি তাদের শাখা-অফিস ও ১১২টি ক্লিনিক খুলে জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তার পরে প্রতি বছরে সে ক্লিনিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বেলজিয়াম ঃ ১৯২৩ সালের সরকারী আইন বলে বেলজিয়ামে সব রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই বন্ধ করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সব আন্দোলনই বে-আইনী সেখানে।

ডেনমার্ক ঃ ডেনমার্কে জন্মনিয়ন্ত্রণ সপক্ষে কোনো আইন না থাকলেও ওখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত বে-আইনী নয়। মহিলা ডাক্তার সমিতির পক্ষ থেকে ডেনমার্কে অনেকগুলো ক্লিনিক চালান হয়ে থাকে। এই সমিতি জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকে।

ফিনল্যাণ্ড ঃ ফিনল্যাণ্ডে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোনো সরকারী আইন নেই কিন্তু গর্ভপাত বে-আইনী নয়। জনসংখ্যা সমিতি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন তো চালায়ই উপরন্তু তাদের আছে বিভিন্ন ক্লিনিক। এই সব ক্লিনিক থেকে দেওয়া হয় সব রকমের সাহায্য।

ফ্রান্স ঃ ফ্রান্সের সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, জনসংখ্যা হ্রাস। তাই ফরাসী সরকারের ১৯২০ সালের আইন বলে সব রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই বন্ধ করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে প্রকৃত কোনো সমিতিই নেই ফ্রান্সে। তবে দু'-একজন খাপছাড়া আন্দোলন করে থাকেন মাঝে মাঝে।

হল্যাণ্ড ঃ হল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তা সত্যি ভয়াবহ! বর্তমানে হল্যাণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে লোকঘনত্ব হল ৩১৬ জন, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তার অর্দ্ধেক। হল্যাণ্ড প্রতি বছরে লাখ খানেক করে পাঠাচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশে। কিন্তু সে দেশে নেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী আইন। তবে ইউরোপে একমাত্র হল্যাণ্ডে ১৯৩৯ সালে খোলা হয় প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক। তারপরে অবশ্য আরও অনেক ক্লিনিকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু সবই বেসরকারী। এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়নি।

ইতালি ঃ ইতালিতে এখনও সেই পুরোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিরোধী আইন চলছে। মুসোলিনির আমলে ফ্যাসিস্ত সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ রোধ করতে আইন করে। সেই আইনের বলে যে কোনো রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনই নিষিদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপে ইতালি দরিদ্র দেশ তো বটেই, তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশ উচ্চ। কেবল মাত্র ১৯৫০ সালে ফ্লোরেন্স শহরে সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আন্দোলন উচ্চারিত হয়। তারপর ১৯৫২ সালে মিলানে প্রতিষ্ঠিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানটির শাখা ছড়াতে থাকে ইতালির অন্যান্য শহরে।

নরওয়ে ঃ ১৯৫২ সালে নরওয়েতে কম করে পনরটি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তার বেশির ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রই সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত। গর্ভপাত যদিও আইনসঙ্গত নয়, তাহলেও বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে ওই আইন কড়াকড়ি নয়।

সুইডেন ঃ সুইডেনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সব রকমের পন্থাই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। অনেক কাল আগে ১৯৩৩ সালে ওখানে স্থাপিত হয় যৌনশিক্ষা-সমিতি। ওই সমিতির তত্ত্বাবধানে সুইডেনে রয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তার সভ্যসংখ্যা হল এক লক্ষ। সুইডেনে গর্ভপাত আইনসঙ্গত। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে সুইডেনে জোরসে।

সুইজারল্যাণ্ড ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সুইজারল্যাণ্ডে কোনো আইন নেই যদিও কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি আইন-বিরুদ্ধ নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নেই ওখানে কিন্তু কয়েকটি ছোটখাট স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অনেক কাল ধরে।

এশিয়া

ঈজিপ্ত ঃ সরকারী ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু ১৯৫২ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী তৌফিক পাশা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আন্দোলন তোলেন। ১৯৫৩ সালে ঈজিপ্ত সরকার লোকসমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানর কাজে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে ও জাতিসংঘের উপদেশ প্রার্থনা করে।

ইস্রায়েল ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোনো আইন তো নেই বরং গর্ভপাত বে-আইনী। এবং আইনভঙ্গকারীর সাজা হয় চৌদ্দ বছরের হাজত বাস। কিন্তু ১৯৫০ সালে তেলআভিব শহরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান জন্মনিয়ন্ত্রণকারীদের শুধু পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইহুদি ধর্মমতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বে-আইনী।

তুর্কি ঃ তুর্কিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন নিষিদ্ধ।

সিংহল ঃ সিংহলে যদিও এখন পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী আইন প্রবর্তিত হয়নি, তাহলেও ১৯৫৩ সালে সিংহল সরকার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসমিতির সাহায্যে কলম্বো শহরে দুইটি জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক স্থাপন করে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও কয়েকটি ক্লিনিক। সেই থেকে ওখানে চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন।

চীন ঃ কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোনো আইন না থাকলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে চীন সরকার। চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেয়ে শিশুমৃত্যু হার সম্পর্কে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যে অনেক আইন তৈরী হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে পুরুষেরা, কিন্তু মেয়েরা তার পক্ষে। তাই চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করছে।

ফরমোজা ঃ ১৯৫৪ সালে ফরমোজায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে ও নতুন আইনের আওতায় আসে। ফরমোজার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক।

হংকং : হংকংএ কোনো সরকারী আইন নেই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে ছ'টি জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক।

ভারতবর্ষ : জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয় সরকারী ভাবে ১৯৫১ সালে। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয় করেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে। ভারতবর্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ও ক্লিনিক সমূহ সবই সরকারী প্রচেষ্টার ফলে। যদিও কোনো বাঁধাধরা আইন কানুন নেই তাহলেও জন্মনিয়ন্ত্রণে কোনো আইনের তরফ থেকে বাধা নেই। এমন কি গর্ভপাতের ব্যাপারেও।

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী প্রচেষ্টা এখনও সুরু হয়নি। তবে একটি সামাজিক দল 'পার্তিয়া ভনিতা রক্ষত' গঠিত হয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চালাতে।

জাপান : ১৯৪৮ সালের নতুন আইনের বলে জাপানে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সব রকমের আন্দোলনই আইনত সমর্থিত হয়েছে। এমন কি গর্ভপাত পর্য্যন্ত আইনত সিদ্ধ।

একমাত্র এশিয়ায় জাপানে যত জন্মনিয়ন্ত্রণ সমিতি ও ক্লিনিক আছে তেমনটি নেই অন্য কোনো দেশে। ১৯৫১ সালের পর থেকে জাপানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সমিতি ও ক্লিনিক সমূহ। এত ব্যাপক আন্দোলন বোধ হয় আর কোনো দেশে নেই।

পাকিস্তান : জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনো সরকারী প্রচেষ্টা তেমন নেই। তবে ১৯৫৩ সালের পর থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে পাঁচ ছ'টি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে।

মালয়-সিঙ্গাপুর : সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সুরু হয় ১৯৪৯ সালে। সরকার প্রতি বছরে প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে ও ক্লিনিকে।

থাইল্যাণ্ড : থাইল্যাণ্ডে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে এবং সে প্রচার সামাবদ্ধ শুধুমাত্র ব্যাংককের একটি হাসপাতালে। উপরন্তু ১৯৫৩ সালে থাই-সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বন্ধ করার জন্তে আইন প্রণয়ন করতে প্রস্তুত হলে সে প্রস্তাব আপাতত স্থগিত থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া : অষ্ট্রেলিয়ায় কোনো সরকারী আইন-কানুন নেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। বরং কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। ১৯৫৩ সাল থেকে ওখানে চলছে অতি ক্ষীণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রচার।

নিউজিল্যাণ্ড : অষ্ট্রেলিয়ার মতন এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী প্রচারকার্য্য চলে না। বরং ১৯৩৬ সাল থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আন্দোলন তো চলছেই, উপরন্তু ব্যাপক ভাবে স্থাপিত হয়েছে সমিতি ও ক্লিনিক সমূহ।

আমেরিকা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র : সরকারী ভাবে কোনো আইন প্রযোজিত না হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে ১৯৪৮ সালের পর থেকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রদেশ ছাড়া সব প্রদেশেই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আইনসঙ্গত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সবশুদ্ধ ক্লিনিকের সংখ্যা হল ৫১৯টি। নিউইয়র্কের 'দি প্ল্যানড্ পেরেন্ট হুড ফেডারেশন অব আমেরিকা' হল জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মুখ্য সংগঠন সমিতি। এরই বিভিন্ন শাখা আন্দোলন ও ক্লিনিক পরিচালনা করে সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে।

কানাডা ও দক্ষিণ-আমেরিকা : কানাডা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন নেই বললেই চলে। কারণ ওই সব দেশে লোকাভাব।

মধ্য আমেরিকা : মধ্য আমেরিকায় পোর্তোরিকো, বারবাডাস, বারমুডা, জামাইকা ও বাহামায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন চলছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ক্লিনিকের কাজ চলে ওখানে নিয়মিত ভাবে।

আফ্রিকা

দক্ষিণ-আফ্রিকা : আফ্রিকায় একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সরকারী ভাবে সমর্থিত। অনেকগুলো সমিতি ও ক্লিনিক পরিচালিত হয় পৌর প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক।

মরণের পায় জীবনের নিবেদন

আইভি রাহা

উৎসবের আনন্দমুখর রঙিন সন্ধ্যায় দুটি পক্ষপুটে—
কত রঙ বর্ণ কত দেহ-আঙিনায় পড়ে বুঝি লুটে।
লীলায়িত তনুখানি যৌবনের দীপ্ত ভঙ্গিমায় ;
কি সে বাণী কি কাহিনী শোনাতে সে চায়—প্রদীপের পায়।
ভালবাসে প্রদীপের মৃদু-কম্পশিখা অভিশাপ-সুপ্ত আছে—
মরণের ইতিহাস আছে ওতে লিখা।

ক্লান্তিভরা অবসন্ন স্তিমিত শরীরে,
উৎসবের ব্যবধান শেষ করে ধীরে—
কি কথা বলিতে চায় দীপশিখা সনে একটি মুহূর্ত মাত্র
টেনে নেয় ভুজ-আলিঙ্গনে।

তিন

চলতি সপ্তাহেরই রবিবারের সন্ধ্যায় দীপংকর শুভজিৎকে নিয়ে শ্যামবাজারে অমরনাথের বাড়ী এসে হাজির হ'ল। অমরনাথের অফিসঘর বন্ধ, নীচেটায় কেউ নেই। বেয়ারাটা ওপরে নিয়ে গেল। খবর দিতে অমরনাথ বসবার ঘর থেকেই ডাক দিলেন। ঢুকে দেখা গেল নন্দিতাও আছে, পিতা-পুত্রীতে গল্প হচ্ছিল বোধহয়। দরজার দিকে ফিরেই বসেছিল, আন্দাজেই বুঝতে পেরেছে শুভজিতের পরিচয়। এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি, অভ্যর্থনার্থে।

দীপংকর পরিচয় করিয়ে দিল, "নন্দিতা দত্ত, ডাঃ শুভজিৎ চৌধুরী—আমার বন্ধু।"

নীরব নমস্কার-বিনিময়।

দরজার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন অমরনাথ, মাথা তুলেও চান নি, দীপংকর ঘরের লোক। তারই কণ্ঠস্বরে নতুন মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হলেন এখন, উঠে দাঁড়ালেন।

শুভজিৎ চিনতে পারল তখনই, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

অমরনাথও একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে এগিয়ে এসে হাত রাখলেন পিঠে, "এস, এস! কত কাল পরে দেখলাম তোমায়! এই তোমার বন্ধু দীপংকর, বলতে হয় এতদিন!"

দীপংকর বিস্ময়-বিমূঢ়।

মৃদু হেসে অমরনাথের কুশল জিজ্ঞাসা করল শুভজিৎ।

অমরনাথের ভাব দেখলে মনে হবে কোন একটা হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েছেন বুঝি, কণ্ঠস্বরে এমনি আনন্দোচ্ছ্বাস। দীপংকর আর নন্দিতার দিকে চেয়ে বললেন, "অনেক দিনের আলাপ ওর সঙ্গে, সবে তখন ও ফরেন থেকে ফিরেছে। তারপর তো—কলকাতায় কি তুমি ছিলে না বাবা?"

শেষ প্রশ্নটা শুভজিতের উদ্দেশ্যে বটে, তবু সে কিছু বলার আগে দীপংকরই উত্তর দিল, "ওর কথা আর বলবেন না, কখন কি খেয়ালে থাকে! শুধু শুধু এই তিনটে বছর বিহারে কাটালে, এবার ফিরল তবু! ডাঃ স্নেহময় ব্যানার্জির চেম্বারে প্র্যাকটিস করছে, ওঁরই হাসপাতালে খুব ভাল চান্স পেয়েছে একটা।"

—"বেশ বেশ, ঘুরে-ফিরে আবার ডাঃ ব্যানার্জির কাছেই ফিরে এলে তাহলে?"

—"তাও মনে রেখেছেন আপনি!" শুভজিৎ হাসল।

অমরনাথও হাসলেন, আত্মপ্রসাদের হাসি। মনে রাখার কৃতিত্বে আনন্দিত।...

চিকিৎসা আর চিকিৎসক নিয়েই নানা আলাপ-আলোচনা চলেছে। ...ডাঃ ব্যানার্জি থেকে প্রসঙ্গটা তাবৎ চক্ষু-বিশেষজ্ঞের দিকে মোড় ফিরেছে কখন।

নন্দিতা একটা কথাও বলেনি। বলবার নেইও কিছু। ওদের আলোচনা যে মন দিয়ে শুনছিল এমনও নয়।...বসে বসে দেখছিল শুভজিৎকে।...লম্বা ঋজু চেহারা...কোথায় যেন মিল আছে দীপংকরের সঙ্গে। তবে দীপংকরের চেয়েও লম্বা একটু, একটু কালোও বোধহয়। ...সোজা হয়ে বসে আছে চেয়ারে অমরনাথের দিকে চেয়ে। দুটো হাত চেয়ারের দু'হাতলের ওপর রাখা।...লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ...তর্জনী আর মধ্যমার একপাশে হলদেটে রংটা বেশ পাকা হয়েই বসেছে। ধূমপানটা অতিরিক্তই চলে তার মানে। দীপংকরকে কিন্তু খুব বেশী সিগারেট খেতে দেখেনি কোনদিন। কি একটা বলছেন অমরনাথ, নন্দিতা শোনে নি খেয়াল করে। স্থির হয়ে বসে তাই শুনছে শুভজিৎ।...সব মিলিয়ে যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি একটা—গম্ভীর, কঠিন দৃঢ়।...শর্মির বাড়ীর দোতলার বসবার ঘরের দেওয়ালে মেহাগিনি কাঠের ব্র্যাকেটে ছোট একটা শ্বেতপাথরের ষ্ট্যাচু আছে। কোন অজানা শিল্পীর হাতে কোঁদা মূর্তি—আকাশের দিকে সে ছুঁড়তে উদ্যত একটা মানুষ...সেই ছোঁড়ার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে তার সর্বাঙ্গে...কাঠিন্যের দৃঢ়তা তার যুক্ত ওষ্ঠের কোণে, তার প্রতিটি মাংসপেশীতে। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় প্রাণস্পন্দন জেগেছে পাথরের গায়ে...প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এবার ওর হাতের গোলা ছুটে গিয়ে আকাশের বক্ষ দীর্ণ করবে। সেই মূর্তিটাকে মনে পড়ছে কেন যেন।

একটু পরেই শর্মিষ্ঠা এল। নন্দিতার সংগেই তারও চোখোচোখি সব আগে, নীরবে মাথা নেড়ে আহ্বান জানাল সে।

অমরনাথ হাসিমুখে বললেন, "শর্মি, দেখ তো একে চিনতে পার কিনা।"

ঘরে ঢুকেই শুভজিৎকে চিনেছিল শর্মিষ্ঠা। বছর তিনেক আগে চার পাঁচ মাস ধরে নিত্য দেখেছে, চিনতে না পারার কোন কারণ ছিল না। তবে এই তিন বছরে যার নামও শোনেনি, হঠাৎ তাকে এখানে দেখলে অবাক হবার কথা বটে। আন্দাজে বুঝছে দৈবাৎ পূর্বপরিচিত ডাঃ চৌধুরীই মিঃ রায়ের বন্ধু।

অমরনাথের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল, নমস্কার করে বলল, "ভালো আছেন?"

হেসে প্রতিনমস্কার করল শুভজিৎ।

অমরনাথ সদালাপী মানুষ। বহুদিন পরে শুভজিৎকে দেখে খুশী হয়েছেন। কণ্ঠস্বরে তারই প্রকাশ।

শর্মিষ্ঠাকে বললেন, "তাই তো বলছিলাম দীপংকরকে তুমি যদি

একবারও বন্ধুর নামটা বলতে, তাহলে নন্দারা না হোক, আমি তো পারতামই চিনতে। অবশ্য তুইও পারতিস বুঝতে, চিনতিস তো।"

মাথা নেড়ে শর্মিষ্ঠা হাসল, "আমার কথা থাক কিন্তু নিজের দর আর বাড়াবেন না মামা। কারো নাম আপনার মনে থাকে নাকি যে ডাঃ চৌধুরীর নাম শুনলেই চিনতে পারতেন!"

সম্মিলিত হাস্যধ্বনিতে অমরনাথের সলজ্জ প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল।

নিজের কাজে উঠে গেলেন একটু পরে।

—"শর্মি, এত দেরী করে এলি যে?"

নন্দিতার প্রশ্ন। শর্মিষ্ঠার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি, "জ্যাঠামশাই এসে পড়লেন যে—এই তো গেলেন, যেতেই চলে এলাম।"

শর্মিষ্ঠার এ হাসি নন্দিতার অনেক দিনের চেনা। দীপংকরও চিনেছে এখন। শুভজিৎ নতুন মানুষ তাই, নাহলে একই কথা মনে পড়েছে আর সবার। দেবাশীষ উপস্থিত নেই, থাকলে এই জ্যাঠামশাই প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চলত। একই কথা ভাবতে ভাবতে একই সঙ্গে চমকে উঠতে হল, শুভজিৎ শর্মিষ্ঠাকে বুনোর কুশল-প্রশ্ন করছে। শর্মিষ্ঠার কুকুরটারও নাম জানে শুভজিৎ।

উত্তর দিতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা সহাস্যে ব্যক্তও করল বিস্ময়টুকু, "আরে তার নামও মনে আছে আপনার! ভালো আছে, অনেক বড় হয়ে গেছে।"

অমরনাথ উঠে গিয়ে অবধি কথাবার্ত্তা জমছে না আর।

দীপংকর ইদানীং এদের মধ্যে অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে, আজ কিন্তু শুভজিতের সামনে অস্বস্তিবোধ করছে কেমন। শুভজিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের আলাদা একটা জগত ছিল, আর কারো স্থান ছিল না তাতে। শুভজিৎ দূরে চলে যেতে তাই প্রথমটায় ভারি ফাঁকা লেগেছিল। তারপর দেবাশীষ এল, হঠাৎ খেলা দেখতে গিয়ে আলাপ।···ক্রমে ঋতুর আবর্ত্তনের মধ্যে নতুন জীবনের আহ্বান এসে পৌঁছোল। সাড়াও দিল দীপংকর।···তার এই নতুন জীবনের রূপটা কিন্তু শুভজিতের অচেনা। দীপংকর কিছুতেই তাই তার উপস্থিতির সংকোচ কাটিয়ে উঠে সহজ হতে পারছিল না। দেবাশীষ থাকলে বোধ হয় এত অস্বস্তি হ'ত না, তার ওপর অমরনাথও উঠে গেলেন, অসহায় লাগছিল।

সবাই চুপ করেই গেছে প্রায়, অস্বস্তিকর আবহাওয়াটুকু শর্মিষ্ঠা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করল, "নন্দার সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে ডাঃ চৌধুরী?"

—"পরিচয় হয়েছে শুধু, আলাপ এখনও হয়নি।"

—"দু'জনে দু'মুখো বসে থাকলে আলাপ আর হবে কোথা থেকে!" দীপংকর প্রায় দেওয়ালের উদ্দেশ্যেই অভিযোগটা ব্যক্ত করল, কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট বিরক্তি।

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল। শুভজিতের ওষ্ঠপ্রান্তেও তারই আভাস, মাঝে পড়ে নন্দিতা অপ্রস্তুত। লাজুক হেসে মুখ নামাল।

শুভজিৎ নীরবে দেখল পলক কয়েক, লাজুক হাসিটুকু ভাল লেগেছে।

মৃদু হেসে আগের মতই শান্ত গলায় বলল, "হবে আলাপ, এত ব্যস্ততা কিসের?"

চকিতে চোখ তুলে তাকাল নন্দিতা। শুভজিৎ তারই দিকে তাকিয়েছিল তখনও, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটুকু তেমনি ধরা। চোখোচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিতে হ'ল আবার।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা বিঁধছে তবু।···শুভজিৎ সব বাধা ঠেলে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখে নিতে চায় যেন।

ফিরতি পথে সম্ভাব্য প্রশ্নটা দীপংকর প্রথমেই করল, "তোর সংগে ওদের পরিচয় আছে দেখে আমি তো তাজ্জব! অমরনাথ বাবু বা শর্মিষ্ঠার নামটাও চেনা মনে হয়নি তোর?"

—"আরে, এ রকম যোগাযোগ কি কল্পনাও করেছি কোনদিন! এখানে ছিলাম যখন, ক'মাস রোজই প্রায় গেছি আই, এন, মজুমদারের বাড়ী। সেখানেই দেখেছি মিঃ দত্তকে, তবে নামটা বোধ হয় শুনিনি। শর্মিষ্ঠা মৈত্রের নামটা শুনে সন্দেহ একবার হয়েছিল, আমল দিইনি—অবশ্য পদবীটা আমি জানতামও না।"

—"মিঃ মজুমদারকে দেখতে যেতিস?"

—"না, না, সে একটি বৃদ্ধা পেসেণ্ট। আই-অপরেশন কেস, কিন্তু প্রতিদিন তাঁর হেড-টু-ফুট এগজামিন করতে হ'ত।"

—"ওরে বাবা, খুব অসুস্থ ছিলেন বল! তুই অপরেশন করেছিলি?"

—"আঃ বলতে দিবি, তবে তো বলব!" শুভজিতের ভ্রূ যুগলে অসহিষ্ণু কুঞ্চন।

একটু চুপ করে থেকে নিজেই শুরু করল,—"ব্যারিষ্টার মজুমদারের সঙ্গে প্রফেসর ব্যানার্জির বন্ধুত্ব ছিল। তখন আমি সবে ওঁর চেম্বারে জয়েন করেছি, ব্যারিষ্টার মজুমদার একদিন এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটিকে নিয়ে এলেন চোখ দেখাতে। বেশ বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্য ভালই, কিন্তু তাঁর ধারণা তিনি দারুণ অসুস্থ এবং অভিযোগ—কেউ সেবা-যত্ন করলে না। চোখ দেখবার সময়টাতেই ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ক্যাটারাক্ট ফর্ম করেছে, ম্যাচিওর তখনও কোন চোখেই করেনি। সে তাঁকে বোঝানোই শক্ত। ক'দিন পরে মিঃ মজুমদার আবার এলেন, ভদ্রমহিলার মাথায় তখন ঢুকেছে চোখ কবে ম্যাচিওর করে যাবে, টের পাওয়া যাবেনা। অতএব ডাঃ ব্যানার্জিকে রোজ তাঁর চোখ এগজামিন করতে যেতে হবে। কাছের ডাক্তারদের দেখতে দেবেন না, চিনে গেছেন তাদের—চোখের ডাক্তার নয় তারা। খালি বলছেন সবাই মিলে শত্রুতা করে আমায় কাণা করে দিলে! পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। প্রফেসরের পক্ষে তো আর রোজ যাওয়া সম্ভব ছিল না—মিঃ মজুমদার বলেনওনি সেকথা, তিনি তো আর পাগল নন! যাই হোক, শেষে প্রফেসর আমায় যেতে বললেন বন্ধুর বিপদত্রাণ করতে, চেম্বার-ফেরৎ রোজ যেতাম। ভদ্রমহিলা তাতেই সন্তুষ্ট।"

—"অপরেশন হল শেষ পর্য্যন্ত?"

—"হ্যাঁ, মাস চারেক পরে বোধহয়। বাড়ীতেই হ'ল, তারপর তো এক দিন যেতে আধ ঘণ্টা দেরী হলে এমন কাণ্ড করতেন আমিই ভয় পেয়ে যেতাম—চোখটা সত্যিই না যায়!"

এক মুহূর্ত্ত থেমে বলল আবার, "সেই তখনই মাঝে মাঝে দেখা হ'ত গৃহস্বামী আর তাঁর বন্ধুর সংগে। কিন্তু উকিলের জেরা করছিস যে আমায়, দু'জনেই কলকাতায় ছিলাম—এতদিন ধরে গেছি, অথচ তোকে বলিনি কিছু হতে পারে না। বেমালুম ভুলে গেছিস তুই!'

ওরা চলে যেতে নন্দিতাও একই প্রশ্ন করেছিল, "কি করে চিনলি রে ডা: চৌধুরীকে ?"

—"মামা মারা যাওয়ার বছর খানেক আগে আমার এক দিদিমা চোখ অপরেশান করাতে এসেছিলেন মনে আছে তোর? মামার জ্যাঠাইমা—ছেলেরা তাঁর দেখত না, মামা এনেছিলেন ?"

—"যাঁর দারুণ রোগ-রোগ ম্যানিয়া ছিল ?"

—"হ্যাঁ রে। তাঁকেই দেখতে আসতেন ডা: চৌধুরী।

—"তখনও এই রকম গম্ভীর ছিলেন নাকি রে?"—নন্দিতার সাগ্রহ কৌতূহল। প্রসংগটা নতুন পথে মোড় নিল।

—হ্যাঁ এই রকমই ছিলেন। তেমনিই আছেন ভদ্রলোক···অবশ্য তিন বছরে পরিবর্ত্তনই বা কি হবে।"

একটুক্ষণ চুপচাপ। শর্মিষ্ঠা ভাবছে কি।···এতদিনের না-ভাবা অতীতের এক অপ্রধান অংশ টুকরো-টুকরো হয়ে মনের পর্দায় ভাসছে বোধহয়।

হাসির আভাস ফুটল মুখে, হঠাৎই বলল, "ভদ্রলোক খুব কুকুর ভালবাসতেন। বুনো তখন ছোট্ট—দেখলেই আদর করতেন, বুনোও ভক্ত হয়ে পড়েছিল বেশ। নামটা এখনও মনে আছে, দেখলি ?'

দেবাশীষ ফিরে এল অল্পদিনের মধ্যেই। কোন খবর দেয়নি, হঠাৎ একদিন বাড়ী এসে উপস্থিত।

একটু পরেই শর্মিষ্ঠা এল। নীচের দালানে নন্দিতার 'ছোট ভাই তাপস আপন মনে কি বকতে বকতে ছুটোছুটি করছে। ফুটবল নেই অবশ্য, পোজটা ফুটবল খেলার।

হাসি পেয়ে গেল দেখে, "কি হচ্ছে রে তপু? মোহনবাগান ভার্সাস ইষ্টবেঙ্গল ?'

বছর বারো-তেরোর ছেলেটা। নন্দিতার চেয়ে অনেকটাই ছোট। দেবাশীষের সঙ্গে সে খেলা দেখে আসে, আর একটা না দেখা পর্য্যন্ত সেটা আপন মনে খেলে যায়।

শর্মিষ্ঠার সাড়া পেয়ে লজ্জিত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, "দাদা আজ এক্ষুণি বাড়ী ফিরল দিদিভাই, জান ? এবার খেলা দেখাটা জমবে।"

শর্মিষ্ঠা চমকেই গেল একটু, সংবাদটা প্রত্যাশা করেনি মোটেই।

—"সত্যি, না কি রে! খবর-টবর না দিয়েই—কি ব্যাপার! দিদি কোথায় ?"

—"ওপরে, সবাই ওপরে। দাদা খেয়ে-দেয়ে চান করতে গেছে।"

শর্মিষ্ঠা তিন লাফে ওপরে উঠে এল। সিঁড়ির সামনে বারান্দাতেই নন্দিতার সঙ্গে দেখা, বোধহয় ওর সাড়া পেয়ে নীচেই নামছিল।

—"দেবু নাকি এসে গেছে রে ?" তপু বললে।

উত্তরে নন্দিতা মাথাটা একটু সবে নেড়ে থাকবে, স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে দেবাশীষ এসে দাঁড়াল।

শর্মিষ্ঠাকে সেলাম ঠুকল একটা, "এই যে শাহাজাদী, বান্দা হাজির, হুকুম ফরমাইয়ে তো।"

শর্মিষ্ঠা শাহাজাদীর ভঙ্গীতেই কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধ হয়, বাধা পড়ল। সুষমা এসে দাঁড়িয়েছেন।

—"শর্মি, দেখেছিস দেবুর কাণ্ড! সবেতেই আদিখ্যেতা! যেই
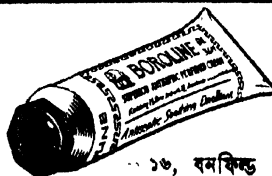
মনে হল যাব, যেতেই হবে, আবার এই দেখ এসে পড়লেন, না একটা খবর, না কিছু।" ছেলের খেয়ালীপনায় বিলক্ষণ চটেছেন বোঝা গেল। রীতিমত বিরক্ত।

দেবাশীষের দিকে চেয়ে শর্মিষ্ঠা হাসছে, নন্দিতাও। অখণ্ড মনোযোগে চুল মুছছে দেবাশীষ।

সুষমা চলে যাচ্ছিলেন নিজের কাজে, শর্মিষ্ঠা ডেকে ফেরালো, "কোথায় যাচ্ছ মামা, এস না বসবে আমাদের সঙ্গে।"

—"আসছি ওদিকটা তদারক করে, দাঁড়া! তোরা বোস গিয়ে।"

ওরা তিনজনে বসবার ঘরে এল।

বসে পড়ে দেবাশীষকে নিরীক্ষণ করে দেখল শর্মিষ্ঠা, "কি ব্যাপার বলতো দেবু, এমন হঠাৎ ফিরলে যে?"

উত্তরে দেবাশীষ হেসে ওদের দু'জনকে দেখিয়ে দিল, "তোমাদের জন্যে মন কেমন করছিল, তাই।"

নন্দিতা মুখ টিপে হাসল সব্যঙ্গে, "দেখিস দাদা, একটু সামলে! আনন্দে না অজ্ঞান হয়ে যাই।"

দেবাশীষ কিছু বলল না। হঠাৎ ঘুরে বসে সমনোযোগে দেখতে লাগল বাইরে। মুখে নির্ভেজাল গাম্ভীর্য্য।

নন্দিতা রেগে গেল, "আবার কি ঢং। মারব টেনে এক চড়।"

দেবাশীষ অবিচলিত তবু। ধীরে ধীরে শর্মিষ্ঠার দিকে চোখ তুলে তাকাল, "তাই তো শর্মি, নন্দা যে ভাবিয়ে তুললে। আমি এতদিন ধরে ম্যানার্স শেখালাম, আর দুদিন পেছন ফিরতেই সব ভুলে গেল! হায়, হায়, এদিকে বিয়ের সব ঠিক, মেয়ে ওদিকে গুরুজনের সংগে এইভাবে কথা বলছে। আমাকে চড় মারবে বলছে, ইঞ্জিনিয়ার সায়েবকে তো তাহলে মেরেই বসবে! কি যে করি!" চিন্তাকুল দেবাশীষ গালে হাত দিল।

নন্দিতা রেগে উঠে চলে যাচ্ছিল, শর্মিষ্ঠা হাসি থামিয়ে ধরে বসালো তাকে।

তার মন রাখতে দেবাশীষকে ধমক দিল, "কি হচ্ছে কি দেবু! সত্যি, এসেই অমনি নন্দার সঙ্গে লাগলে! এদিকে কি হয়েছে শোন। মিঃ রায়ের সেই ডাক্তার-বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল আমাদের—শুভজিৎ চৌধুরী। আমি আর মামা আগেও চিনতাম অবশ্য—বছর তিনেক আগে বড়দিদিমা যখন আমার মামার কাছে ছিলেন তাকে দেখতে আসতেন। তা তোমার ইঞ্জিনিয়ার সায়েব তো তুমি গিয়ে অবধি আমাদের মুখদর্শন করেননি প্রায়, বন্ধুকে নিয়ে তবু ক'বার এলেন, না রে নন্দা?" ভালমানুষের মত মুখ করে নন্দিতার দিকে তাকাল শর্মিষ্ঠা।

নন্দিতা গায়ে মাখল না কথাটা, উত্তরও দিল না কিছু। কিন্তু এ প্রসঙ্গের অবতারণায় চুপ করেও থাকতে পারল না।

দেবাশীষের ওপর রাগ ভুলে বলল, "ডাঃ চৌধুরী যে কি ভীষণ গম্ভীর, তুই ধারণা করতে পারবি না দাদা! আমি প্রথম দিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

সুষমা এসে ঘরে ঢুকলেন, "কার কথা বলছিস রে নন্দা?"

—"ডা চৌধুরীর কথা মা, বড্ড গম্ভীর না ভদ্রলোক, তাই বলছি।"

দেবাশীষ ততক্ষণে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

বলল, "একথা ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের মুখেও অনেকবার শুনেছি। কিন্তু গম্ভীর মানে কি রকম রে? হাসেন না বুঝি মোটেই?"

—"না রে, তেমন নয়, হাসেনও, কথাও বলেন, কিন্তু—মানে—কি বলব—ভদ্রলোক কি রকম আলাদা যেন, সে ঠিক বোঝান যায় না।"

—"আলাপ করতে হচ্ছে তো! আমার যেজায় কৌতূহল হচ্ছে। শর্মি, তুমি কিছু বলছ না যে?"

—"কি বলব ভাবছি।" শর্মিষ্ঠা পা দোলাতে দোলাতে হাসল।" নন্দার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুনে তাক লেগে যাচ্ছে যে আমার! তবে ডাঃ চৌধুরী যে গম্ভীর তাতে সন্দেহ নেই, অসম্ভব গম্ভীর! আমি তো ভেবেই পাই না কি করে মানুষ অমন গম্ভীর হয়ে থাকে! নিছক দাম্ভিকতা কিনা জানি না অবশ্য!"

সুষমা ধমকে উঠলেন, "ও আবার কি শর্মি! না জেনে ও রকম বলছিস যে! প্রথম দিন অবশ্য দেখিনি তার পর তো ক'বারই দেখলাম, সত্যি আশ্চর্য্য লাগে। আহা, বাবা-মা কেউ নেই বেচারির, তাই বোধহয় অমন, দেখে ভারি মায়া হয়।"

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল হো-হো করে, "ও দেবু, তোমার মা-বোন দু'জনেই যে রকম উচ্চ ভাবে কথা বলছে, একটু সাবধানে থেক। ডাঃ চৌধুরীর প্রকৃতিটা গম্ভীর, এই তো ঘটনা! তার কত রকম ব্যাখ্যা করছে এরা দেখ একবার! হ্যাঁ মামী, ডাঃ চৌধুরীর বাবা-মা নেই তো বহুদিন, তুমিই তো জিগেস করে জেনেছ। সেইজন্যে ভদ্রলোক আজও গম্ভীর? তাও কি কখনও হয়? আমার তো মায়ের সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই নেই বাবা! কোনদিন যে কেউ আমার মা ছিল, তাই তো মনে হয় না।"

দু'হাত উল্টে কৌচের পিঠে হেলান দিল, হতাশার ভঙ্গিমা।

সুষমা রেগে বলতে যাচ্ছিলেন কি, তার আগেই ভালমানুষের মত মুখ করে বলল আবার, "তবে হ্যাঁ, তুমি যে মায়ার কথা বললে, সেটা তোমার একেবারে খাঁটি। সেদিনই তো বললে, এত মায়া হ'ল যে 'আপনি' বলবে ভাবতে ভাবতে 'তুমি' বলে ফেললে।"

সুষমা রেগে চড় তুললেন, দেবাশীষ আর নন্দিতা হেসে উঠল।···

রবিবার।

দীপংকরের ওঠার তাড়া ছিল না—একটু আগ ঘুম ভেঙেছে, শুয়ে শুয়ে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু উপভোগ করছিল, অনেক কিছু ভাবছিল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে। এলোমেলো ভাবনা···অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের পরিস্থিতি, ভবিষ্যতের কল্পনা।··এক একবার ভাবছিল উঠে পড়বে, কিন্তু ওঠা হয়ে ওঠেনি।

সামনের দরজাটা খোলাই ছিল।

দেবাশীষ এসে দাঁড়াল দরজার সামনে—নিরীক্ষণ করে একটুক্ষণ দেখল দীপংকরকে—তারপর উচ্চ-কণ্ঠে হাঁক দিল সেখান থেকেই—"সায়েবের নিদ্রাভঙ্গ তো হয়েছে শুনে এলাম নীচে, তা গাত্রোত্থান হবে কি?"

দীপংকর চমকে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

—"আরে, একি আশ্চর্য্য কাণ্ড! এস, এস—কখন ফিরলে?"

দেবাশীষ এসে বিছানারই ওপর বসল, "ফিরেছি কাল সন্ধ্যেবেলা। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে আপনার কাছে চলে এলাম। চলুন—উঠুন—ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।"

"ওরে বাবা, এত তাড়া! কি ব্যাপার? চোখ খারাপ হয়েছে নাকি?"

—"দেখুন, আমায় এ রকম স্বার্থপর বললে এখনি আত্মহত্যা করব আমি—এই সুন্দর প্রভাতে!···আরে উঠুন না মশাই, কি মুশকিলেই পড়লুম!"

আর শুয়ে থাকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে উঠেই পড়ল দীপংকর। উঠতে উঠতে বলল, "আরে তা না হয় উঠলাম। কিন্তু তুমি এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলে কেন বল তো?"

—"কাল ফিরেই যে সব গল্প শুনলাম ওদের কাছে, আমি তো কালই বেরিয়ে পড়ছিলাম, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে—শর্মিরা আসতে দিল না কিছুতেই!"

রবিবার সারাদিনটা বেশীর ভাগই খারাপ কাটে শুভজিতের। অন্য দিন সকাল থেকেই কাজ—হাসপাতালের পর চেম্বার—তার পরও হয়তো কোনদিন বা ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে কাটায় খানিকক্ষণ, সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়—বেশ কেটে যায় দিনটা।···কিন্তু রবিবারগুলো যেন সকাল থেকে বুকে চেপে বসে। দীপংকর অবশ্য বার বার বলে, রবিবার সকাল থেকে ওর কাছে চলে যেতে, কিন্তু প্রতি রবিবার যেতে পারে না শুভজিৎ। বন্ধুর স্বভাব ভাল করেই জানে, বিয়ে হয়ে গেলেও ছাড়বে না—তাহলে তখনও প্রতি রবিবারই যাবার জন্য জোর করবে। সেই ভয়ে এখন থেকেই সাবধান শুভজিৎ, দীপংকরকে রবিবারগুলো সম্বন্ধে নিজের অনুভূতির কথা জানায় না ঘুণাক্ষরেও। তবু কোন রবিবার যখন সারাদিন দীপংকরের বাড়ী কাটিয়ে আসে, অথবা দীপংকর যে রবিবার সকালে ওর মেসে এসে উপস্থিত হয়, ভালই লাগে। শুভজিৎ না বললেও দীপংকর তা বোঝে, কিন্তু রবিবার সকালে অনেক সময় ব্যবসায়-সংক্রান্ত দু'-একজন দেখা করতে আসেন, তাহলে আর বেরোতে পারে না। তবু সামান্য সুযোগও ছাড়ে না, চলেই আসে। আর বিকেলের দিকে তো নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যায়।···

আজও সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম মনে হ'ল—আজ রবিবার। হাসপাতাল-চেম্বার—কোথাও যেতে হবে না। ভাবতেই খিঁচড়ে গেল মনটা।··চা খেয়ে কাগজ পড়ে কাটল খানিকটা সময়। তারপর এক সময় ধীরে-সুস্থে স্নান সেরে এল। ঘরে এসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রিষ্টওয়াচটা দেখল, হাসপাতাল থাকলে এখনও যাবার সময় থাকত, সাড়ে আটটাও বাজে নি।···নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, সারাদিনটা কাটাতে হবে! বিহারে থাকতে ছুটীর বালাই ছিল না—গ্রামান্তর থেকে ডাক্তার দেখাতে রোগী আসত—তারা রবিবার-সোমবারের তফাৎ বুঝত না। সেখানেই ছিল ভালো!···তাও এখানে যদি এর চেয়ে রেসিডেন্‌সিয়াল সার্জেন্টের পোষ্ট পেত তো অনেক ভালো হ'ত!···এতখানি সম্মানে তার দরকার ছিল না কিছু!···

একটা সিগারেট ধরিয়ে একগোছা ডাক্তারি জার্নাল নিয়ে বসেছিল অবশেষে। এমন সময় দীপংকর এল দেবাশীষকে নিয়ে।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "শুভো, এই দেবাশীষ দত্ত, বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই কে? কাল রাত্তিরে ফিরেছে, আজ সকালেই

আমায় ঠেলে তুলে নিয়ে এল তোর সঙ্গে আলাপ করবে বলে। এই আমার বন্ধু দেবু, নাও আলাপ কর এবার।

শুভজিৎ স্মিত হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

দু'টি চেয়ার তার। একটায় জার্নালের স্তূপ রেখে পড়তে বসেছিল, সেগুলো তুলে বিছানায় রেখে দুজনকে দুটো চেয়ার এগিয়ে দিল।

দেবাশীষ তাকিয়ে দেখছিল জার্নালগুলো, "আপনি এতগুলো জার্নাল নেন?"

ঘাড় ফিরিয়ে শুভজিৎও একবার দেখে নিল স্তূপটা, "না, সব আমার নয়, কিছু আমার আছে, কিছু চেম্বার থেকে আনা।"

দেবাশীষ বিস্ময়ে চোখ বড় করল, "ওরে বাবা, এত জার্নাল পড়েনই বা কি করে, সময়ই বা পান কখন?"

শুভজিৎ হাসল একটু, "আর যাই হোক, সময়ের অভাব আমার হয় না, বিশেষ বিহারে থাকতে তো আধিক্যই ছিল।"

—"বাপ্‌রে বাপ! কি করে স্বেচ্ছায় অমন নির্বাসনদণ্ড বেছে নিয়েছিলেন? আমায় কেউ টাকা দিলেও তো আমি যাবার কথা কল্পনাও করতে পারব না।"

আবার একটু হাসল শুভজিৎ, "আমি কিন্তু টাকা পাব বলেই গিয়েছিলাম।"

দীপংকর বার কয়েক জোরে জোরে মাথা নাড়ল সমর্থনের ভংগীতে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সে আর বলতে! টাকার লোভেই তো ভিয়েনা থেকে ফিরেই অত বড় চাকরীটার জন্যে ছুটলি—একা থাকতে হবে-টবে—এসব কেয়ারই করলি না! থলিভরে তাই টাকা আনতেও পেরেছিস!"

এ প্রসঙ্গে রেগে ছাড়া কথা বলে না দীপংকর। আর কথা বাড়ালে আরও রাগারাগি করবে এখনই দেবাশীষের সামনেই। শুভজিৎ চুপ করে গেল।

বালিশের তলা থেকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বার করে ওদের সামনে খুলে ধরল শুধু।···আর দীপংকরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।···

দেবাশীষ সেদিন কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারল না। কথাবার্ত্তা যেটুকু বলল, নেহাৎই চেষ্টাকৃত। দীপংকর হয়তো তার ব্যবহারে কোন তারতম্য লক্ষ্যও করল না, কিন্তু সে নিজের আড়ষ্টতাটুকু ভাল করেই অনুভব করল।···শুভজিৎকে খুব গম্ভীর দেখবে আশাই করেছিল, তবে নিজের চঞ্চলতায় আস্থাও ছিল, ভেবেছিল ওর পাল্লায় পড়লে গাম্ভীর্য্য ভাঙতে দেরী হবে না।···কিন্তু শুভজিতের ঘরে এসে দাঁড়াল যখন, সাড়া পেয়ে বই-এর থেকে চোখ তুলে শান্ত হেসে আহ্বান জানাল শুভজিৎ, দেবাশীষের নিজের চপলতাই স্তব্ধ হয়ে এল যেন।

সুখের কথা, এ আড়ষ্টতাটুকু কাটিয়ে উঠতে দেরী হ'ল না দেবাশীষের। শুভজিতের সঙ্গে সম্পর্কটা অল্পদিনের মধ্যেই অনেকটা সহজ হয়ে এল।···আর শুভজিতের সামনে শর্মিষ্ঠাদের সঙ্গে সহজ ব্যবহারে যে আড়ষ্টতা অনুভব করত দীপংকর, সেটা দেবাশীষ ফেরার পর কেটে গেল ক্রমে।···

বাড়ী ফিরে অবধি ওদের নিয়ে নানা হৈ-হুল্লোড়ের ঝোঁক চেপেছে দেবাশীষের। ওর যখন যা ঝোঁক চাপে তা ঐ রকম—কাজেই কোন ছুটির দিনটাই বাদ যায় না। শর্মিষ্ঠাও তারই মত হুজুগে, সুতরাং দু'জনে এক একদিন এক একটা প্ল্যান করে রাখে। সে হুল্লোড়ের সঙ্গে শুভজিৎকেও যোগ দিতেই হয়। দেবাশীষ ছাড়বার পাত্র নয়—কোন উপায় নেই না গিয়ে।···নিজে না গেলে মেসে এসে ধরে নিয়ে যায়।···সামান্যতম অনিচ্ছা প্রকাশের শুরুতেই হাতজোড় করে বলে, "কেন আর এমন করে মনঃকষ্ট দিচ্ছেন ডক্টর—বাবা আমায় ক্রমেই যেমন কোণঠাসা করে ফেলছেন, তাতে কতদিন আর আপনাদের সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পাব জানি না। যে ক'টা দিন আপনাদের মধ্যে আছি"— অসমাপ্ত বাক্যের রহস্যে আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশের সব সুযোগ করে দেয়। তবু যাবার জন্য উঠতে উঠতে প্রকাশ্যেই হাসে শুভজিৎ। অফিসে তার ওপর অমরনাথের ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব চাপানোর প্রতি ইঙ্গিত করে, এ ধরণের সহস্র খেদোক্তি দিনের মধ্যে শোনা যায় দেবাশীষের মুখে, সবারই চেনা হয়ে গেছে, সমবেদনা কেউই জানায় না।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুটো মাসই হৈ-হৈ করে কেটে গেল। রবিবারগুলো সারাদিন যার মেসে বসে পড়াশুনা নিয়ে কাটত, রাত্রের আগে ঘরে ঢোকবার সুযোগ পায় না সে, এমনই অবস্থা দাঁড়াল।···

দেবাশীষের জ্বালায় একা থাকাই দায় হয়ে উঠেছে।

[ক্রমশঃ।

দেখেই বুঝলুম ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয় ! যাই হোক, শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, ভয় পেলে চলবে না—সাহসের সঙ্গে সেটার সম্মুখীন হতে হবে। মনে মনে এই সঙ্কল্প করে মাঝিকে বললুম, দাঁড়টা নদীর পাড়ে ঝোপের দিকে লুকিয়ে রাখতে। ডিঙ্গিখানা ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী হতে লাগল। এক সময় আমাদের মাঝি হঠাৎ প্রীতিসম্ভাষণ করে উঠল 'মীয়্যারা' ! হাঁ করে আমরা চেয়ে রইলুম। ব্যাপার কি ? 'মীয়্যারা !' আবার ইণ্ডিয়ানদের কণ্ঠ থেকে ভারী গলায় প্রতি-সম্ভাষণ ভেসে এল।

ডিঙ্গিটা আমাদের নৌকার ঠিক পাশেই এসে থামল। এলিস স্বভাবতই ঐ বন্য মানুষগুলোর মুখের চেহারা দেখে পিছিয়ে গেল। তাদের শান্ত স্থির ব্যবহারের মধ্যে ভয় পাবার কিছু ছিল না। তবুও তাদের মুখের চেহারা দেখে কেমন যেন একটা আতঙ্ক হতে লাগল।

টাইগার আমার পাশে এসে আমায় বললে, ওরা আমাদের বন্ধু হিসাবে এসেছে। ওরা হচ্ছে মাকুসিস্ জাতের লোক। আমরা এখন ওদের দেশে এসে পৌঁছেচি। সভ্যজগতের সঙ্গে ওদের মোটেই পরিচয় নেই—এক সময় ওরা রাক্ষস ছিল, মানুষের মাংস খেত। এখন ওরা আর নরখাদক নেই—এখন ওরা ঢের বদলে গেছে। ঐ যে কামান ছোঁড়ার মত শব্দ হচ্ছিল, সেটা কামান ছোঁড়ার শব্দ নয়। ফাঁপা 'মোরা' গাছের উপর লাঠি মেরে ঐ রকম শব্দ ক'রে ওরা বোঝাতে চাইছিল যে, ওদের দেশে শাদারা আর কালারা এসেছে।

মাকুসিসদের বন্ধুত্ব জানানোর পদ্ধতিটা বেশ মজার। প্রথমে ওরা ডিঙ্গিটার উপরে সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর বেশ ভাল করে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ ওদেরই একজন তার হাতের বর্শাটা উপরে তুলে জলের মধ্যে দিলে ছুঁড়ে। বর্শাটা জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। শুধু একটা সরু সুতো তা থেকে ভাসতে লাগল জলের উপর। তারপর সে ঐ সুতোটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল, যে পর্য্যন্ত না বর্শার হাতলটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পৌঁছুল। বর্শাটা যখন সে টেনে তুললে, তখন দেখা গেল তাতে একটা বড় মাছ গেঁথে আছে।

বন্যদের মধ্যে বেশীর ভাগ জাতই এই ভাবে মাছ ধরে থাকে, বিশেষ ভাবে বড় মাছের বেলায় এই বর্শা খুবই কার্য্যকরী হয়। মাছটা হাতে পেয়ে এলিসের আর আনন্দ ধরে না ! ওরাও এলিসের আনন্দ দেখে মনে মনে ভারি খুশি হল। কিন্তু সব চেয়ে খুশি হ'ল ওরা এইজন্যে যে, ওরা ওদের কৃতিত্বটা আমাদের দেখাতে পেরেছে। ওদের উপহারের প্রতি-উপহার স্বরূপ আমরা ওদের একটা গোটা চকলেট দিলুম। সেটাকে ওরা না ভেঙে, গোটাটাই প্রত্যেকে হাতে নিয়ে চাটতে লাগল। এই ভাবেই তারা সবটা চেটে চেটে খেয়ে ফেললে।

খাওয়া শেষ হলে ওরা হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলে। আমরাও ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এক রকম খুশিই হলুম। কারণ, গাইড হিসাবে ওদের আমাদের প্রয়োজনে লাগবে যখন এখানকার আরও নতুন অজ্ঞাত জায়গার সন্ধানে আমরা যাত্রা করব।

ঐ দিন বিকালবেলাতেই আমরা আমাদের তাঁবু খাটালাম। ভেবেছিলুম এলিসের পক্ষে এই ধরণের অস্বস্তিকর দুর্গম যাত্রা কষ্টকর হবে, কিন্তু এখন দেখছি ও খুব খুশিতেই আছে। মনের মধ্যে আতঙ্ক তো নেই-ই, এমন কি কালাদের সঙ্গে এই বন্য পরিবেশে ও বেশ হেসে-খেলেই কাটাচ্ছে।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ দে ভেরী)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

তখনও অন্ধকার হয়নি, কালারা বললে, তারা একটু শিকার করতে বেরুবে। আমি তাদের দু'জনকে দুটো বন্দুক দিলুম। সেই নিয়ে আনন্দে তারা বেরিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ পরে গোটাকতক বেবুন (বড় বানর) মেরে নিয়ে এল। গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে বেবুনের চীৎকার ইতিপূর্বেই আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। বেবুনের মাংসকে কালা আদমিরা 'মিষ্টি মাংস' বলে। সেগুলোকে যখন তারা কাঁধে করে এলিসের কাছে নিয়ে এলিসকে রাঁধবার জন্যে বললে, তখন সে একেবারে মুখ কুঁচকে বলে উঠল, ও সে রাঁধবেও না, খাবেও না। ওরা তখন সেগুলোকে নিজেরাই রাঁধবার জন্যে নিয়ে গেল। এই সময় আমার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। আমি করলুম কি, ওদের কাছ থেকে বেবুনের একটা পা নিয়ে এসে আমাদের যে রাঁধুনী ছিল আমি তাকে সেটা চুপি চুপি রাঁধবার জন্যে দিলুম। আমাদের রাঁধুনীটি সত্যিই খুব ভাল রান্নাবান্না করতে পারত। ওর নাম ছিল মেকাসো।

এলিস খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে সারা মাংস খেতে লাগল। ও ভেবেছিল, কৌটো করে যে মাংস সঙ্গে এনেছি ও সেই মাংসই খাচ্ছে। আমি একটু রহস্য করে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, মাংসটা কেমন লাগছে ? এলিস বললে, চমৎকার ! এ মাংস আরও তো আছে আমাদের সঙ্গে ? বললুম, এ মাংস কৌটোর মাংস নয়। এ হচ্ছে ঐ বেবুনের মাংস। আমার কথা শুনে তার মুখখানা যে কি রকম হয়ে গেল তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। ভয়, আতঙ্ক, বিস্ময়—কি যে ওর মুখে প্রকাশ পায়নি তা বলতে পারি না !

বেশ আনন্দের মধ্যে জঙ্গলের এই জীবন কাটাতে থাকলেও একটা দুশ্চিন্তাকে আমরা ভুলতে পারিনি যে, আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আসবে।

সেদিন হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে ঝড় উঠতেই আমরা তাড়াতাড়ি সব কিছু তাঁবুর মধ্যে তুলে দিচ্ছি, এমন সময় কানে গেল আমাদের গাইডের চীৎকার 'ক্যানাইমা।' সর্ব্বনাশ! যা ভয় করছিলুম আমরা তাই! মৃত ইণ্ডিয়ান ছেলেটার ভাই আসছে প্রতিশোধ নিতে। 'টাইগার'এর দিকে চাইতেই সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐ আসছে। সত্যিই তো! ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা উলঙ্গ লোক আসছে আমাদের দিকে। তার সর্ব্বাঙ্গ লাল আর হলদে রঙ দিয়ে গোল গোল করে কি সব আঁকা। সত্যিই সে এক বীভৎস দৃশ্য! আসতে আসতে কখনও বা এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে পড়ছে, আবার কখনও বা মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। বেশ বুঝলুম ও সুস্থ নয় ওকেও বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ধরেছে।

তখন আমি সকলকে লুকিয়ে পড়বার জন্মে হুকুম দিলুম। যেমন কোরেই হোক ওকে বেঁধে ফেলাই উচিত বলে আমার মনে হ'ল। যদি এখন ও পালিয়ে যায়, তাহলে সমস্তক্ষণ ও আমাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে থাকবে। দেখলুম, ও গুঁড়ি মেরে মেরে আমাদের তাঁবুর দিকেই আসছে। তারপর ও ওর ধনুকটা তুলে ধরে একটা বিষাক্ত তীর ছোঁড়বার জন্যে আয়োজন করছে। আমরাও প্রস্তুত হয়ে ছিলুম।

টাইগার ভীষণ একটা শব্দ ক'রে ওর গায়ের উপর একেবারে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব কালারা ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে ঘিরে ফেললে। মাটিতে পড়ে ও গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। সত্যিই ওর অসুখ করেছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে একটা ইন্‌জেকসন দিতে চাইলুম। ও ভয় পেয়ে গেল এবং বললে যে, ওর ভাই এই ধরণের ওষুধ প্রয়োগের ফলেই মারা গেছে। আমাকে ও ওর যম বলেই মনে করলে।

বনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, ঐ ছেলেটাকে একটা বন্য জন্তু ছাড়া আর কিছুই মনে করা উচিত নয়। কোন একটা বন্য জন্তুকে পোষ মানাতে গেলে, যেমন তাকে আগে বেঁধে ফেলতে হয়, তেমনি ওকেও আমি আগে বেঁধে ফেললুম। তার পর জোর করে ওকে আমি একটা বেশী ডোজের কুইনাইন ইন্‌জেকসন দিয়ে দিলুম। এর পর ওর ভার নিলে এলিস। সেই ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খেতে রাজী করালে।

এর পর দু'দিন আর আমরা কোথাও না বেরিয়ে ওর শুশ্রূষা করতে লাগলুম। ও খুবই তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। আমরা ওর বাঁধা-ছাঁদা সব খুলে দিলুম। ও স্বাধীনতা পেল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা ও চায়নি। ঐ সময় এলিস ওর হাতে একটা ছুরি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল যে, সেটা দিয়ে ও আমাদের মারতে আসে কিনা। কিন্তু সে কিছুই করলে না, শুধু একটু হাসলে। নিজে ভাল হয়ে ওঠার ফলে, ওর মন থেকে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি একেবারে মুছে গিয়েছিল। এখন ও আমাদের বিশ্বস্ত চাকরদেরই একজন হয়ে রয়ে গেল। আসৎ কারিবদের প্রতিহিংসার নীতিতে 'ক্যানাইমা,' তাদের দেশের লোকের কাছে আর ফিরে যেতে পারে না যতক্ষণ না সে তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারছে। আর যদিও সে বিফল হয়ে ফিরে যায়, তাহলে তাকে দলচ্যুত হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এই ছেলেটা আমাদের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে আর ফিরে গেল না।

কয়েক দিন পরে এখানকার ঘাঁটি তুলে আমরা আর একটা নদীতে গিয়ে পড়লুম। সেটা যে কি নদী তা আমাদের জানা ছিল না। একটা নতুন ধরণের জায়গা আমাদের চোখে পড়ল। জঙ্গল থেকে কত যে বড় বড় পাহাড় আমাদের চারিদিকে দেখা যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা নদী-পথে আরও অনেক নতুন নতুন স্থান অতিক্রম করলুম। দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করতে করতে এক জায়গায় এসে আমরা দেখা পেলুম 'মার্কুসিস ইণ্ডিয়ান'-দের।

কারিবদের তুলনায় এরা ঢের বেশী ভয়ঙ্কর ও উদ্ধত এবং তাদের চেয়েও লম্বা-চওড়া। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল। আমাদের এক দোভাষীর মাধ্যমে তাদের জাতের চিকিৎসক 'পিয়াম্যান'-এর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল; শুধু গালগল্প ছাড়া তার সঙ্গে ব্যবসার কথাও হ'ল অনেক। জিনিসপত্রের কিছু কিছু লেনদেনও হ'ল আমাদের মধ্যে।

সে আমাদের বললে যে, আমরা এখন রূপরুনি নদীতে এসে পড়েছি এবং এই নদী ধরে গেলেই এমন ঘন জঙ্গল পড়বে যা পূর্ব্বে আমরা কখনো পাইনি।

আমাদের এই মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ তারা এলিসকে ও আমাকে তাদের 'ক্যালিরি' নৃত্যে নিমন্ত্রণ করলে।

আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তাদের নাচ দেখতে গেলুম। হ্যাঁ, নাচ বটে! সে নাচের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে একখানি আলাদা বই লিখতে হয়। মোটমাট বীভৎস সে দৃশ্য—প্রায়-ন্যাংটা মেয়ে-পুরুষের ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। আমাদের কাছে সে দৃশ্য যদিও খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং আমরা তন্ময় হয়েই দেখছিলুম, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাতের খেলনাগুলো থেকে কি সব যেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে, কাছেই জলন্ত আগুনের আভা লেগে। আমি আর ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে একটা খেলনা দেখবার জন্যে হাতে করে নিলুম। দেখলুম খেলনাটার সমস্তটাই হীরে বসান। অবাক হয়ে ভাবলুম, কোথা থেকে এত হীরে এল—সেই চিকিৎসক লোকটিকে এ বিষয় প্রশ্ন করায় সে স্পষ্ট কিছুই বললে না; শুধু নদীর দিকে আঙুল তুলে বললে—ঐ জঙ্গলের পারে।

ভোরের দিকেই আমরা নৌকা ছেড়ে দিলুম। কিন্তু রূপরুনি নদীর মধ্যে বেশী দূর আর আমাদের যাওয়া সম্ভব হল না। যেখানে এসে এবার আমরা থামলুম, সেখানটা নদীর রূপ ভীষণ ও ভয়ঙ্কর। নিরুপায় হয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই যাত্রা করব বলে স্থির করলুম।

মধ্যে মধ্যে অনেক নৌকাকে আমাদের নদীপথে রেখে আসতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জলপথের সঙ্কীর্ণতার জন্যেও যেমন, তেমনি আবার ঘাঁটি হিসাবেও মধ্যে মধ্যে কয়েকজন লোকসহ এক একখানি নৌকাকে ফেলে আসা পথে রেখে এসেছি আমরা।

এখানেও নৌকা ফেলে রেখে আমরা সবাই পায়ে হেঁটেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলুম। কালাদের আর সঙ্গে নিলুম না।

দিনের পর দিন আমরা চড়াইয়ে উঠতে লাগলুম। এই জঙ্গলটা খুব প্রাচীন বলে মনে হতে লাগল। বেশ কয়েক দিন চলার পর জঙ্গলের ঘনভাব যেন হালকা হয়ে আসতে লাগল। বড় বড় গাছের ঘন অবস্থান আর নেই। মাথার উপরটা আর এখন গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে নেই—একটু একটু সূর্য্যের আলো এসে পড়ছে আমাদের মাথায়। পথ চলতে চলতে রকমারি দৃশ্য চোখে পড়তে

লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম, যেখানে শুধুই তালগাছ—তার চেয়ে আর বড় গাছ নেই বললেই হয়। তারপর আরও যেতে যেতে ছোট ছোট ঝোপ ছাড়া বড় গাছ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝোপগুলোই মাঝে মাঝে আট-দশ হাত উঁচু হয়ে আছে।

অবশেষে, একদিন আমরা একটা পাহাড়ের চূড়ায় এসে পড়লুম। সেখান থেকে যে দৃশ্য দেখলুম, পৃথিবীতে বোধ হয় তার আর তুলনা হয় না! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের আর সবুজের আস্তরণ বিছানো—প্রায় বাট মাইল ধরে শুধু বিস্তীর্ণ মাঠ। আর দূরে দূরে নানা রকমের পাহাড়। মনে হ'ল যেন কোন ক্ষ্যাপা শিল্পী তার নিজের খেয়ালে তাদের তৈরী করেছে।

এলিস নির্নিমেষ মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, "এ কোন স্বর্গ দেখা যাচ্ছে!"

বললুম, বোধ হয় আমি জানি। এই জায়গারই কথা ইণ্ডিয়ানরা গল্প করে—এই জায়গাই সেই জায়গা যার কথা কোনান ডইল তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন। এই সেই 'হারান জগৎ'।

যে জায়গাটায় আমরা এসে পড়েছিলুম তার নাম হচ্ছে 'সাভানা' বা উচ্চভূমি। এটাই দক্ষিণে ষাট মাইল বিস্তৃত হয়ে ঐ অদ্ভুত পাহাড়গুলোর সঙ্গে মিশেছে। বোধ হয় আর কোন শাদা মানুষ এর আগে ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা করেনি, যদিও ঐ 'হারান জগৎ' সম্বন্ধে অনেক রহস্যের কথাই কোনান ডইল লিখেছেন।

এই উচ্চভূমি থেকে ক্রমশঃ আমরা নামতে আরম্ভ করলুম। দেখলুম, কোন এক সময়ে এই জায়গাটা সমুদ্রেরই একটা অংশ ছিল, এখন শুধু ধূ-ধূ করছে মরু।

এই জায়গার অধিবাসীদের নাম 'ওয়াপিশনা'। আমাদের সঙ্গে মাত্র একজন মাকুসিস গাইড ছিল। চলতে চলতে এলিস হঠাৎ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। সে কোথা থেকে একটা ছোট গাছ নিয়ে এল। অনেকটা তালগাছের চারার মত। এরই পাতার মধ্যে বাটির মত কুঁচকান জায়গায় বৃষ্টির জল জমা থাকে। এলিস সেই জল পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করল। ভারী মিষ্টি জল; আর যেমন স্বচ্ছ তেমন ঠাণ্ডা। আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, এই জায়গায় চলতে-চলতে এমনি গাছ আমরা প্রচুর পেয়েছিলুম।

যখন আমরা ওয়াপিশনা গ্রামের পথে চলতে লাগলুম, তখন এলিস এক জায়গায় ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চেয়ে দেখি, একটা মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে। সেদিকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে আমি যা দেখলুম, তাতে আমাকেও চঞ্চল করে তুলল। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! খালি মড়ার খুলি সারি সারি বসান রয়েছে। সাহস ক'রে একটাকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে তুলতে গেলুম, কিন্তু সেটাকে এতটুকুও নড়াতে পারলুম না। আমি তখন বুদ্ধি করে তার চার-পাশে খুঁড়তে লেগে গেলুম—দেখি সেটা উঠে আসে কিনা। যতই খুঁড়ি ততই দেখি হাড়-পাঁজরা—একটা গোটা কঙ্কাল মাটিতে পোঁতা, শুধু তার মাথার খুলির উপর দিকটা দেখা যাচ্ছে। মনে হ'ল এ বোধ হয় সেই 'মৃতের বাগান'—যার গল্প বৃটিশ গুয়েনার সর্ব্বত্রই শোনা যায়। প্রাচীনকালে ইণ্ডিয়ানরা তাদের শত্রুদের জ্যান্ত কবর দিত। এই 'মৃতের বাগানের' সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়।

[ক্রমশঃ।

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চার

রৌদ্র, জল, শৈবাল, কর্দম

মস্ত প্রাসাদ আর প্রমোদবীথিকা দিয়ে সাজানো ফ্রেডেরিক্সবের্গের টিলাতেই কোচোয়ান হান্সকে নামিয়ে দিলো, আর এইখান থেকেই হান্স প্রথম তাকিয়ে দেখলো ছোট এইটুকু কোপেনহাগেনকে। ঝাপসা একটুখানি কুয়াশা-জড়ানো সেপ্টেম্বর মাসের জ্যোতির্ময় একটি সকালবেলা, আর তারই ভিতর ধীরে-ধীরে জেগে উঠলো রাজধানী তার কোণওয়ালা খোঁচাওয়ালা চৌকোচোখা উঁচু গির্জে, মিনার আর দালানকোঠা নিয়ে। সেই ফিকেশ্যামল উদ্ভাস দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো হান্স, 'কী সুন্দর'! এই কথাটাই সে বারে-বারে আউড়ে নিলো মনে-মনে, আর দূরের থেকেই সে যেন সংগোপনে শুনে নিতে পারলো অনুচ্চারিত কোনো-এক প্রতিশ্রুতি, যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এক নিঃশব্দ অভয়বাণী। নগরীর চারপাশে যে দুর্গ-প্রাচীর ছিলো, তাঁর রঙ তখন ছিলো সবুজ—আর তারই পিছনে সরু একটি জলের রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সূর্যের আলোয়। সুইডেন থেকে দিনেমারদের দেশকে আলাদা ক'রে রেখেছে যে-জলস্রোত, এটা হ'লো ওরেসুণ্ড-এর সেই বাঁকা স্রোতের গতিপথ।

ভীষণ ভয় করেছিলো হান্সের, আর কেমন যেন অসহায় লেগেছিলো নিজেকে, যেন বড্ড একা। বাবামশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই তো একলা থাকার অভ্যেস রপ্ত ক'রে নিতে হয়েছে তাকে, সমবয়সী সঙ্গী তো কোনোদিনই জোটেনি, কেবল কয়েকজন বুড়োমতো লোকের উদ্দীপক সান্নিধ্য আর তপ্ত স্নেহ তাকে জীইয়ে রেখেছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোদিনই যেমন তার একাকীত্বের বোধ ঘোচেনি, তেমনি আর কখনো নিজেকে তার এতটা একাও লাগেনি, এখন যেমন লাগলো। কিন্তু কোনো কোনো লোকের ভিতর থাকে অলৌকিক এক বাধ্যতার বোধ, বাইরের কোনো ঘটনা নয়, ভিতর থেকে কোনো এক সংগোপন ও সনাতনশক্তি সব কিছুরই অজ্ঞাতসারে তাদের দুমড়ে নিজের বাধ্য ক'রে রাখে, ক'রে রাখে বশম্বদ ও অনুগত—কিছুতেই তাকে অমান্য করা যায় না; অন্তর্লীন এই নামহীন শক্তিই কুঁকড়ে-যাওয়া অক্ষম শরীরকে চালিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূরের পথে, কখনো কখনো প্রকৃতির আদেশকে পর্যন্ত সে মানে না কিছুতেই; আর এই রহস্যময় শক্তিই হ'লো পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস, যার ভিতর আমরা দৈবের উপস্থিতি লক্ষ্য ক'রে নাম দিয়েছি প্রতিভা। অন্তত বার দশেক এমন হয়েছে যে অন্য কেউ হ'লে ফিরে যেতো, প্রায় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছিলো প্রত্যাবর্তন, কিন্তু দুর্নিবার সেই শক্তি হান্সকে পর্যন্ত জানতে দিলো না কেন সে ফিরে গেলো না। দুই দিন দুই রাত ধ'রে অবিশ্রান্ত চলতে হয়েছে তাকে ঐ দ্বীপমালার ভিতর; নাইবোর্ড, কোরস্যের, স্লাগএলজে, সোর্যে, রোসকিল্ডে—এই সব ছোটো-ছোটো শহরগুলিতে যখন গাড়ি থেমেছে আর অন্যান্য যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঢুকেছে উষ্ণ ও প্রীতিকর সরাইগুলিতে, সে শুধু একা দাঁড়িয়ে থেকেছে বাইরে, মস্ত সেই গাড়ির চাকার পাশে

দাঁড়িয়ে শক্ত ছিবড়েওলা মোটা রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মুখে পুরে দিয়েছে—গরম টাটকা খাবারের স্বাদু সুঘ্রাণ রান্নাঘর থেকে এসে পৌঁছেছে তার কাছে, কিন্তু তবু শুকনো মুখে সে কেবল মায়ের দেয়া বাজে জাতের রুটিই গিলেছে কষ্ট ক'রে, কিছুতেই এমন সাহস হয়নি যে একটি পয়সা খরচ করে।

সবচেয়ে খারাপ হয়েছিলো খেয়া পেরোবার সময়। এখন তো মস্ত সব খেয়া-নৌকা আছে, চালিয়াতি কেতায় তাদের নাম হ'লো 'ফেরিবোট'। মস্ত চওড়া তার ডেক, চোঙের চ্যাপ্টা আর গোল শরীরে লাল আর সাদা রঙ দিয়ে ডোরা-কাটা, সোয়া ঘণ্টার মধ্যে সে পেরিয়ে যায় সেই মস্ত বন্ধনী, যার নাম 'গ্রেট বেল্ট'। কিন্তু ১৮১৯ সালে ভিস্তির মতো ছোট্ট ও বিপজ্জনক একটি নৌকো রওনা হ'তো ধূসর গোধূলিতে, আর সারা রাত ধ'রে পাল তুলে চলতো অন্য তীরের দিকে। আনে মারি যে-ভাবিকথন শুনিয়েছিলেন, মোটেই তা মিথ্যে হয়নি; ভয়ে—বিষম ভয়ে—ভ'রে গিয়েছিলো হান্স, গোটা রাতটাই সে জেগে কাটিয়েছে—কিছুতেই এক করতে পারেনি চোখের পাতা, আর প্রতি মুহূর্তেই দুরু-দুরু বুকে ভেবেছে এই বুঝি ঢেউয়ের ধাক্কায় গোটা নৌকোটাই তলিয়ে গেলো অতলে। শেষকালে যখন নিরাপদেই ৎসীলাণ্ড-এ গিয়ে পৌঁছোনো গেলো, সে তখন এতটাই ভেঙে পড়েছে যে প্রায় যেন আধমরা; ক্লান্ত শ্রান্ত আর পরিত্যক্ত লাগছে নিজেকে, ঝড়ের পরে বিধ্বস্ত বনভূমির মতো করুণ। ধীরে-ধীরে সে গিয়ে নতজানু হ'য়ে বসেছিলো জেটির এক কোণে, বারে-বারে প্রার্থনা করেছিলো ভগবানের কাছে, বিনীত ভরে ভিক্ষা করেছিলো তাঁর করুণা।

তবে সে তো হ'লো গিয়ে হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডেরসেন, কাজেই পথে কারো সঙ্গে বন্ধুতা না-পাতিয়ে খামকাই সে এতটা পথ ভ্রমণ করেনি। ওডেন্সে থেকে কোপেনহাগেনে ফিরছিলো এক স্ত্রীলোক; দাই-গিরি করে সে, সারা পথই স্নেহবশত হান্সকে সে সান্নিধ্য দিয়েছে, বিরক্ত না হ'য়ে একটানা শুনেছে তার বকবকানি—এমন কি শেষ মুহূর্তে জোর করে নিজের ঠিকানাটাও সে গাছিয়ে দিতে চেয়েছে হান্সকে। এখন, এই ঝলমলে সকালবেলায়, হান্সের কিছুতেই বিশ্বাস হ'তে চাইলো না যে এই ঠিকানাটা কোনোকালে তার কোনো কাজে আসতে পারে। অবহেলা ভরে ঠিকানাটা সে খোলামকুচির মতো ফেলে রাখলো পকেটে, তারপর বাণ্ডিল বগলে মস্ত সেই বীথিকার ভিতর দিয়ে অবাক চোখে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললো। লিণ্ডেন গাছের সারি চ'লে গেছে সেই ছায়াভরা পথের দু-পাশ দিয়ে, আর পাতার ফাঁক দিয়ে চৌকো গোল চারকোণা পাঁচকোণা নানা রকম আকারে উঁকি দিচ্ছে স্বচ্ছ সূর্যালোক। সেই ছায়াবীথিই শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে এলো কোপেনহাগেনের পশ্চিম দুয়ারে।

তখনকার দিনে শহরের চার পাশে ছিলো মস্ত প্রাচীর, আর প্রত্যেকটি ফটকে শুল্ক-বিভাগের লোকজন আর সামরিক বাহিনী মোতায়েন থেকে কড়া ভাবে পাহারা দিতো। কে-কে শহরে ঢুকলো তার তালিকা প্রস্তুত করতো তারা জিগেস করতো নাম ধাম আর পেশা, কেন না রাজামশাইয়ের আবার ঐ সব তালিকা দেখতে বেশ ভালো লাগতো। রাজামশাই তালিকা ছাখেন শুনে হান্সের ফুর্তি একেবারে উপচে উঠলো। খুব একটা ভারিক্কি ভঙ্গি করলে সে, যেন তার আগমন সংবাদ যে রাজামশাই অচিরেই পেয়ে যাবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই যে জ্যোতির্ময় একটি দিন তার ঝলমলে আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুললো সেই দিনে—বিশেষ করে আজ কি না সে প্রথম পদার্পণ করতে যাচ্ছে কোপেনহাগেনের রাস্তায় সেই দিন তো অসম্পূর্ণই থাকতো যদি না এর সঙ্গে কোনো রকমে স্বয়ং রাজামশাইয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তো। রাস্তাগুলো ওডেন্সের মতোই, কেবল এখানে শুধু অনেক বেশি চওড়া, আর দালান কোঠাগুলির ভেতরেও কোনো কোনোটি আবার পাঁচ কি ছয় তালা উঁচু। ওডেন্সে তো কেবল একতলা কি দোতলা বাড়ি, কাজেই এই বাড়িগুলোকে সেই তুলনায় ভীষণ চ্যাণ্ডা ব'লে মনে হ'লো। হান্স তো প্রথমটায় এতটাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো যে ড্যাবডেবে চোখে হাঁ করে কেবলি তাকিয়ে থাকলো মস্ত বাড়িগুলোর দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে আবার ভয়ও আছে একটু, যদি ধ্বসে পড়ে তার গায়ের উপর। সে এতটাই আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলো যে খাবার দাবার ও আশ্রয়ের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো—শেষে যখন পেটের ভিতর সাড়ে তিন হাজার ছুঁচোর ডনবৈঠক শুরু হ'য়ে গেলো, যখন মনে হ'লো খিদের চোটে এই সব মস্ত বাড়িগুলো সে আস্ত গিলে ফেলতে পারে, তখন তার মনে পড়লো যে এবার একটা সরাইখানার সন্ধান করাটা তার পক্ষে অনেক জরুরি এবং অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ। ফটক পেরিয়ে শহরে ঢুকেই সে দেখলে এক সরাই, গিয়ে সে অনেক ব'লে কয়ে ব্যবস্থা করলে যে আপাতত তার বাণ্ডিলটা সে এখানে রেখে যাচ্ছে, রাতে ফিরে এসে সস্তা টিলে কোঠায় শোবে—এই ব'লে আবার সে বেরিয়ে পড়লো তক্ষুণি।

রাস্তাঘাটগুলোয় এত ভিড় যে সত্যিই যেন মানুষের মাথা মানুষে খায়, তা ছাড়া হৈ-চৈ হট্টগোলও ভয়ানক একটা রাজধানীর পক্ষে ঠিক যেন তা মানায় না। ঝগড়া মারামারি চ্যাঁচামেচি, ভাঙা গেলাশের ঝনঝনে আওয়াজ, এই সব নানা রকম ভীতিজনক ব্যাপারে চূড়ান্ত হ'লো যখন আর বাঁধা ঘোড়ায় করে সামরিক বাহিনী এসে হাজির হ'লো, এবং আগাপাশতলা মারপিট শুরু করে দিলো। ইহুদির নিয়ে মস্ত এক দাঙ্গার মধ্যখানে নিজেকে আবিষ্কার করলো হান্স অচিরেই। যদি এক্ষুণি রয়্যাল থিয়েটার খুঁজে বের করার একটা অদম্য ইচ্ছে তাকে তাড়া না করতো, তাহ'লে তক্ষুণি সে ছুটে পালিয়ে যেতো তার সরাইখানায়।

সেই সময়ে কোপেনহাগেনে থিয়েটারই ছিলো কেতাদুরস্ত ব্যাপার—বলতে গেলে দিনেমারদের একমাত্র সংস্কৃতিক অবদান। কিন্তু আবার অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখলে তাও নেহাৎ কম গর্বের ব্যাপার নয়। সেই ১৮১৯ সালে ডেনমার্কে এমন এক উন্নত 'জাতীয় নাট্যশালা' ছিলো যার কিনা নিজেরই একদল বেতনভুক অভিনেতা ছিলো—তাছাড়া ছিলো গীতিনাট্যের জন্য গানের দল, ছিলো নিজেদেরই এক ব্যালে নাচের স্কুল আর নর্তক-নর্তকী,—আর সব কিনা চলতো সরকারের খরচে, আর সেখানে কিনা অপেরা, ব্যালে নাচ আর অভিনয় হ'তো নিয়মিত—এবং শুধু কেবল চিরায়ত নাটকই যে অভিনীত হ'তো, তাই নয়, আধুনিক নাটকও প্রায়ই অভিনয় করানো হ'তো। আর এর পৃষ্ঠপোষক যে রাজসভা ও রাজকোষ, এই তথ্যটাই সারা দেশের শিল্পীদের কাছে প্রেরণার কাজ করেছিলো। দেশের সেরা লেখকেরাই শুধু নন, গান যাঁরা লেখেন, ছবি যাঁরা আঁকেন, মঞ্চ যাঁরা সাজান, তাছাড়া অভিনেতা, গাইয়ে ও নাচিয়েরাও যেন চুম্বকের মতো সেই সংস্কৃতি কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু হান্সের কাছে

এই জাতীয় নাট্যশালা শুধু মাত্র এইটুকুই ছিলো না—আরো গভীর কোনো অর্থ সে আবিষ্কার করেছিলো এর অস্তিত্বের পিছনে। তীর্থ-ব্রাজকেরা যেমন ক'রে মন্দিরে যান, তেমনিভাবে সসম্ভ্রমে ও অবনত মস্তকে সে ঢুকলে এই নাট্যশালায়—যখন অনেক চেষ্টার পর সে তার ঠিকানা জোগাড় ক'রে নিতে পারলে, এবং শুধু তাই নয়, ঢুকে ঘুরে-ঘুরে তাকিয়ে দেখলো তার চার পাশে—ভালোবেসে তাকিয়ে দেখলো এমন কি তার দেয়ালগুলোকেও। দেখলো তার কারুকাজকরা কার্ণিশ আর থিলেন, দেখলো মস্ত স্তম্ভ বসানো প্রবেশদ্বার ছুটি, আর ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে প্রার্থনা করলো, ভগবান যেন করুণা ক'রে তাকে সুযোগ ক'রে দেন যাতে সে এখানে অভিনেতা হিসাবে স্থান পেয়ে যায়।

তার রকম-সকম দেখে অবশেষে এক দালাল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে সে কোনো টিকেট চায় কিনা। 'বাঃ, বেশ তো রাজধানীর ব্যবস্থা, বহিরাগতদের জন্য কেমন উদারতা দেখাচ্ছে,' মনে মনে এই কথা ভেবে কৃতজ্ঞ গলায় সে সম্মতি জানালে। দালালটি তাকে বিভিন্ন শ্রেণীর আসনের কথা বুঝিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলে সে কোন শ্রেণীর টিকেট চায়। 'যা আপনার অভিরুচি,' সরলভাবে এই কথা ব'লে হান্স তার হাত পাতলে।

'ভাগ, হতচ্ছাড়া উজবুক কাঁহাকা।' ভীষণ গলায় এই কথা ব'লে লোকটি তাকে ভিতর থেকে বের ক'রে দিলে। এত সুখ আর মোহের আবেশের পর এই কর্কশ কথাগুলি বড্ড ব্যথা দিলো। অশুভ কোনো পূর্বাভাসের মতো যেন এই কথাগুলি তাকে বিদ্ধ ক'রে দিলো—কেমন যেন অলুক্ষুণে ব'লে বোধ হ'লো এই নির্মমতা। মনে হবার কারণও আছে—পরের দিন সে মাদাম শাল-এর বাড়ি যাবে ব'লে ঠিক করেছে, আর সেখানেই তো তার ভাগ্য নির্ধারিত হ'য়ে যাবে। বড্ড মন-মরা হ'য়ে সে ফিরে এলো তার সেই সস্তাভাড়ার নোংরা চিলেকোঠায়।

সেই ঘরেই সে তার প্রসাধন সাঙ্গ করলে পরের দিন। সযত্নে তার ধোয়া কামিজটা খুলে গায়ে দিলো, আর প'রে নিলো সেই স্যুট, যা সে প'রে ছিলো দীপ নেবার সময়, আর থাকলো পায়ের ডিম পর্যন্ত ঢেকে-দেয়া জুতো—এবার অবশ্য পাৎলুনের তলাতেই থাকলো জুতো জোড়া—আর অবশেষে মাথায় দিলে সেই টুপিটা, যা তার চোখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলে দেয়। পোশাক প'রে মনে-মনে একটা স্তোত্র আউড়ে নিলো সে, তারপর ইভেরসেন যে-চিঠিটা লিখে দিয়েছিলো সেটা হস্তগত ক'রে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো!

ফ্ল্যাটবাড়িগুলো কেমনতর হয়, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার ছিলো না; কিন্তু সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই শেষকালে সে নিজেকে আবিষ্কার করলে চওড়া একসারি সিঁড়ির শেষ ধাপে, যা তাকে ঠিক দরজার সামনে পৌঁছে দিলো। ঘণ্টার দড়ি ধ'রে টান দেবার আগে, নিশ্চিত হ'য়ে নেবার জন্যে, নতজানু হ'য়ে ব'সে সে আবার প্রার্থনা করলো ভগবানের কাছে, যাতে এই বিখ্যাত মহিলাটি তাকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হন।

থিয়েটারে মধ্যরাত্রি কাটিয়ে আসতে হ'তো ব'লে মাদাম শাল দেরিতে ঘুম থেকে উঠতেন, অথচ হান্স তার অতিরিক্ত আগ্রহে খুব সকালেই এসে পড়েছে, কাজেই বেচারিকে সিঁড়ির নিচে খানিকক্ষণ কাটাতে হ'লো। কিন্তু সময় কি আর সত্যিই কাটতে চায়? যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ সে দাঁড়িয়ে একা, বিফল ও ব্যর্থ। ঠাণ্ডা সিঁড়ির উপর ব'সে পড়লো সে—ভিতরে-ভিতরে ভীষণ দোটানা চলেছে; আশা আর নিরাশা তার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে, এ-রকমই তার মনে হ'লো, আর এদিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই যেন ক্ষুধার আবির্ভাব ঘটলো।

শেষকালে তাকে যখন ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হ'লো, সে গিয়ে দেখলো, মাদাম শাল তাঁর ড্রয়িংরুমে একটি সোফায় কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছেন। দিনের বেলায় কোনো মহিলাকে সে এ ভাবে শুয়ে থাকতে ছাখেনি কোনোকালে, মস্ত এক ঢ্যাঙা মিনারের মতো বোধ হ'লো তার নিজেকে, যখন সে ঝুঁকে কথা বলবার চেষ্টা করলে। আর তারই ফলে তার উত্তেজনা তাকে অলবড়ো ও অপ্রতিভ ক'রে দিলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে কোনো কেতাদুরস্ত বাড়িতেই ড্রয়িংরুমের দেয়ালে রাজারাণীর ছবি ছাড়া আর কিছু থাকতো না। তবে মাদাম শাল তো ছিলেন এক নম্বর নর্তকী, তাছাড়া অতিরিক্ত জনপ্রিয়, সেই জন্যে তাঁর ড্রয়িংরুমে ছিলো ঝকঝকে সব চেয়ার, যাতে সাটিনের কুশন ঝলমল করছে, আর ছিলো কাচবসানো টেবিল, আর দেয়ালে ছিলো সেই যুগের দামি সব আয়না। গ্রাম থেকে এসেছে হান্স, এই সব দেখেই সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। সব তার বোধ হলো বড্ড বেশি ঝলমলে, তার উপর সাংঘাতিক পলকা। এটা ঠিক যে সে আগে যুবরাজের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে, তার উপর ওডেন্সের ধনী লোকদের বাড়িতেও তার যাতায়াত ছিলো, কিন্তু এ রকম আসবাবপত্র সে আগে কখনো ছাখেনি। লজ্জায় রঙিন হয়ে সে যখন এই আশ্চর্য মহিলাটির সামনে দাঁড়ালো, তখন তার পা কাঁপছে।

মাদাম শাল তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যে তার চোখের ভাষা থেকে বোঝা গেলো হান্সকে তিনি নির্ঘাৎ রাক্ষস ব'লে ভাবছেন। মুখে বললেন যে, তিনি জীবনে ইভেরসেন-এর নাম শোনেননি। হান্সও আগে থেকেই তা জানে, আর সেই জন্যে এই কথাটা তার গায়ে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। তারপর তিনি তাকে কয়েকটা ছোটোখাটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, আর এই সব প্রশ্ন শুনে সে ভিতরে ভিতরে কিছুটা সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে তাঁর কাছে তার পরিকল্পনা ও স্বপ্ন সব খুলে বলতে শুরু করলো। একবার যদি সে নিজের স্বপ্ন সম্বন্ধে বলতে শুরু করে, তাহলে সব যেন মুহূর্তে সহজ হ'য়ে যায়। ভিতরে তার যত কথা ছিলো সবাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তালগোল পাকিয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—এবং তার সব কথা সে শেষ করলো এই ব'লে যে, কোপেনহাগেনে এসে সে যে অভিনেতা হ'তে চাচ্ছে, তার এই পরিকল্পনা সার্থক হ'তে পারে, যদি একমাত্র তিনি দয়া ক'রে তাকে কিছুটা সাহায্য করেন।

হতভম্ব হ'য়ে মাদাম শাল তাকে জিগ্যেস করলেন যে কোন ধরণের ভূমিকায় সে অভিনয় করতে পারবে ব'লে মনে করে! 'যে কোনো ভূমিকা,' তৎক্ষণাৎ হান্সের উত্তর হ'লো, 'আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সিণ্ডেরেল্লা থেকে একটা অভিনয় ক'রে দেখাচ্ছি আপনাকে। জুতো খুলতে পারি তো?' গম্ভীরভাবে সে জিগ্যেস করলে, 'জুতো পায়ে থাকলে বড্ড ভার লাগে চরিত্রদের মতো হালকা পায়ে চলা ফেরা করা যায় না।'

শুধু যে অসহায় বোধ করলেন নিজেকে, তাই নয়, কেমন যেন

একটু উদ্রেও করলো মাদাম শাল-এর। তবু তিনি চুপ করে দেখলেন এই গেঁয়ো ছেলেটির কাণ্ডকীর্তি—পা ঝেড়ে জুতো জোড়া সে খুলে ফেললে নিমেষে, তারপর তাদের এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে, মাথার টুপি খুলে তাম্বুরার মতো ধ'রে বাজাবার ভঙ্গি করতে করতে, নাচ-গান শুরু করে দিলো। রয়্যাল থিয়েটারের অভিনেতারা যখন ওডেন্সে গিয়েছিলো, তখন তাদের সিণ্ড্রেল্লার অভিনয় করতে দেখেছিলো সে। আর সেইজন্যেই সে মনে মনে ভাবলে যে যদি নায়িকার ভূমিকাটা ক'রে দেখায় তাহ'লে মাদাম শাল নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। করলোও তাই, বিশ্রী সব অঙ্গভঙ্গি ক'রে এমন উদ্দামভাবে লাফঝাঁপ শুরু ক'রে দিলে যে আস্ত ঘরটাই কেঁপে কেঁপে উঠলো।

ওডেন্সে যখন ছিলো, সে ছিলো এক আশ্চর্য প্রতিভাবান শিশু, কিন্তু আশ্চর্য, এখানে কিন্তু কোনো হাততালিই জুটলো না তার বরাতে। তার বদলে মাদাম শাল তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন, এবং কঠোর গলায় ব'লে দিলেন যে, জুতো জোড়া প'রে এক্ষুণি সে যদি বেরিয়ে যায়, তাহ'লেই তিনি অনুগৃহীতা হবেন। মাথা নিচু ক'রে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগলো সে, কিম্ভুত মুখটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, আর চিবুক বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। এই চোখের জল দেখেই মাদাম শাল কেমন যেন কষ্ট পেলেন এই ছেলেটির জন্য। নরম গলায় তাকে বললেন যে, মাঝে মাঝেসে এসে যেন এখানে ডিনার খেয়ে যায়, তাহলে তিনি খুশিই হবেন; অনেক দিনেমার বাড়িতেই তখনকার দিনে গরিব ছাত্রদের এই ভাবে পোষণ করা হ'তো। কিন্তু কয়েক রেকাবি খাদ্যের চেয়েও অনেক বড়ো আশা ক'রে এসেছিলো হান্স, কথা বলতে গেলে ভিজে গলা আরো করুণ শোনাবে, তাই সে মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ধপ ক'রে সে ব'সে পড়লো সিঁড়িতে। ভিতরটা কী রকম যেন ফাঁকা আর শূন্য ঠেকছে—যেন একটা গহ্বর ছাড়া ভিতরে আর কিছুই নেই, অথচ একটু আগেও সেখানে ছিলো স্পন্দমান একটি হৃৎপিণ্ড। গলার কাছটা টন টন করছে, কিন্তু সেই গহ্বর থেকে কান্না পর্যন্ত উঠে আসছে না—মুহূর্তে তাকে নিংড়ে, শুষে কে যেন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত ক'রে শুধু ছিবড়েটাই ফেলে দিয়ে গেছে। এখন সে কী করে. সে কথাটা পর্যন্ত ভাবার কথা হারিয়ে ফেলেছে। মনে পড়লো বুড়ো ইভেরসেন তাকে ব'লে দিয়েছিলেন যে মাদাম শাল তাকে কোনো সাহায্য করবেন না। যিনি কিছুটা সাহায্য করতে পারেন, তিনি হলেন রয়্যাল থিয়েটারের অধ্যাপক রাবেক—এই কথাটি ব'লে ইভেরসেন পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে যেন অতি অবশ্য অধ্যাপক রাবেকের সঙ্গে দেখা করে। তার সঙ্গেই দেখা করবে, এই কথাটা মনে মনে ভেবে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো তার আশা, আর হৃৎপিণ্ড—মুহূর্তে সব শূন্যতা অপসৃত হ'য়ে গেলো তার।

দৈব ব'লে যে রহস্যময় ব্যাপারটি আছে তার রসিকতা সব সময় বুঝে-ওঠা দুষ্কর হ'য়ে পড়ে। অধ্যাপক রাবেক তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন সাহিত্যকে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কল্পনা করতে পারেন নি যে সে-দিন যে-ছেলেটি বক্রহংসের পশ্চাদ্ধাবন করতে-করতে অমার্জিত গেঁয়ো ভঙ্গিতে তাঁর আফিসে গিয়ে পড়েছিলো, তার নাম হ'লো হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি হান্সকে জানিয়ে দিলেন যে, কোন ভূমিকায় কে অভিনয় করবে এই বিষয়টা ঠিক করে দেন প্রধান পরিচালক, এবং তিনিই হলেন নতুন ছাত্রদের ভর্তি করার হর্তাকর্তা। সেদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় হবে না, কারণ হান্স অনেক দেরি ক'রে ফেলেছে। এই কথা ক'টি ব'লে তিনিও হান্সকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে ব'লে দিলেন। আস্ত দিনটাই নষ্ট হ'য়ে গেলো, শুধু তাই নয়, তার ফলে ঐ নোংরা চিলেকোঠাটির জন্য আরেক রাতের ভাড়াও কিনা তাকে দিতে হবে। হান্সের মাথায় যেন তৎক্ষণাৎ ভীষণ এক বাজ ভেঙে পড়লো। কিন্তু সম্মানবোধ তার যথেষ্ট প্রখর বলেই কোনো রকমে সে রাবেকের সামনে চোখের জল চেপে রাখলো—কান্নাকাটি করার জন্য সেই নোংরা ছোট্ট চিলেকোঠাটা তো আছেই, যেখানে একা অসহায় সে অনেক চোখের জল ফেলতে পারবে। বাকি দিনটাই তার হতাশায় ভ'রে গেলো।

পরদিন সকালে প্রধান পরিচালকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার চট ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো। ঠাণ্ডাগলায় সেই মস্ত মানুষটি দৃঢ়ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন, 'মঞ্চে তোমাকে মানাবে না—বড্ড রোগা তুমি, চিমশে।'

কিন্তু হ'লে হবে কি, আজ সকালবেলায় মস্ত এক সূর্যকে সে নতুন ক'রে উদিত হ'তে দেখেছে, এবং নতুন ক'রে সাহসও ফিরে পেয়েছে সে—হয়তো মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলো বলেই এই সাহস সে পেয়েছিলো। তার কথায় কোনো রকম ধৃষ্টতা ফুটে উঠুক এটা সে চায়নি, কিন্তু প্রায় স্পর্ধিতই শোনালো তার কণ্ঠস্বর, যখন সে বললে, 'আপনি যদি আমাকে দলে ভর্তি ক'রে নিয়ে মাসে-মাসে একশোটা রিগসডালের বেতন দেন, তাহ'লে শীগগিরই আমি মস্ত নাদুসনুদুস হ'য়ে যাবো।'

ফিরে কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না প্রধান পরিচালক। 'বোকা দেখাবে তোমাকে মঞ্চে, হাস্যকর আর উজবুক,' ছোট্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন তিনি, তার পরেই মারাত্মক এক ছোবল পড়লো হান্সের গায়ে, কেবল শিক্ষিতরাই থিয়েটারে যোগদান করতে পারে।

পারতো তো একছুটে তক্ষুণি হান্স বেরিয়ে যেতো। গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে, যেন কেউ হাজারটা হুল একসঙ্গে বিঁধিয়ে দিয়েছে এইমাত্র। কিন্তু তখন সে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে। তাকে ব্যালে-নাচের দলে ভর্তি করা হবে কিনা, এটা সে জিগ্যেস করলে। মাদাম শাল-এর মতো প্রধান পরিচালকও নির্ঘাৎ তাকে পাগল ব'লে ভাবলেন এবং একেবারে হিমগলায় জানালেন যে, ব্যালের দলে কেবলমাত্র মে-মাসেই নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়, আর তাছাড়া পাঠ্যতালিকায় উত্তীর্ণ না-হ'লে মাইনে দেবার ব্যবস্থা ব্যালের দলে নেই। তারপরেই তিনি প্রবলভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন, আর চাপরাশি এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো।

আবার যখন হান্স স্কোয়ারে এসে দাঁড়ালো, তখন তার সব দুঃসাহস ও স্পর্ধা অন্তর্হিত, নিছকই একটি ভীতু, হতাশ, দুঃখী ছোটো ছেলে আর-কিছুই না সে। পকেট থেকে টাকাকড়ি বের ক'রে হাতে নিয়ে একটি-একটি ক'রে গুণে দেখলো সে; মাটির বানানো শূকরছানার ভিতরে যে-অতুল ধনসম্পদ ছিলো, এখন কেবল কিছু খুচরো পয়সা অবশিষ্ট আছে তার। এই তার সব চেষ্টার ধ্বংসাবশেষ, মোটেই কেউ তার সাহায্য করতে চায় না, সারা জগৎ ও চরাচরই তার বিরুদ্ধে—এই একটি বোধ তাকে, যেন প্রায় ছিঁড়ে ফেলতে

রইলো। সব অবস্থা তার অন্তর্হিত, চ'লে গেছে আত্মবিশ্বাসে আর একরোখা সাহসে। একা সে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, সেই সেপ্টেম্বর মাসের কনকনে হাওয়ায়—ভেঙে-পড়া ভয়-পাওয়া মন-মরা একটি হতভাগ্য বালক।

খুচরো পয়সাগুলির সঙ্গেই পকেট থেকে সেই ছোট্ট চিরকুটটা উঠে এলো, যাতে সেই পথের বন্ধুনী—সেই স্ত্রীলোকটি—নিজের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলো। পথের লোকদের জিগ্যেস ক'রে-ক'রে শেষ পর্যন্ত তারই আস্তানাটি খুঁজে বার করলে সে, আর যখন সেই স্ত্রীলোকটি দরজা খুলে দাঁড়ালো জলভরা চোখে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে, আর কান্না চেপে কোনো রকমে খুলে বললো তার সব ব্যর্থতার ইতিহাস—চিবুক বেয়ে তার জলের ধারা পড়ছে টপটপ ক'রে, সেই অবস্থাতেই সে তার পরামর্শ জিগ্যেস করলো। 'জাহাজ ধরে এক্ষুণি ওডেন্সেয় ফিরে যাও,' স্ত্রীলোকটি বললো তাকে, 'এটাই বোধহয় তোমার পক্ষে একমাত্র সুবুদ্ধির কাজ হবে।' প্রত্যেকে—প্রত্যেকে, কেবল হান্স নিজে ছাড়া, সুবুদ্ধিতে একেবারে যেন ভরপুর—এটাই তার মনে হ'লো। 'তার চেয়ে বরং ম'রে যাবো, তাও ভালো,' একরোখা গলায় ধীরে-ধীরে সে উচ্চারণ করলে, আর এই জেদি কথার বদলে উপহার পেলে কিছু তিরস্কার।

শেষে সে চ'লে এলো তার কাছ থেকে, আবার এসে দাঁড়ালো থিয়েটার স্কোয়ারে। 'ওডেন্সে ফিরে যাও!' অস্থিতে-মজ্জায় একটা জিনিষ সে ভালো ক'রেই জানে যে এই কথার জবাবে সে সত্যি কথাই বলেছিলো। সত্যি, তার চেয়ে বরং না-খেয়ে ম'রে যাবে, প'ড়ে থাকবে এখানকার নোংরা নর্দমায়, তবু সে কিছুতেই ফিরে যাবে না। 'যাবো না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না,' বারে-বারে সেই এই কথা ক'টি উচ্চারণ করলে। এখান থেকেই সে যেন ফর্তিবাজ হাসিমশকরার আওয়াজ শুনতে পেলো। 'এই যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত নাট্যকার যাচ্ছেন! ঠাকুর্দার যোগ্য নাতি বলতে হয়—তেমনি উজবুক, আর পাগল!' মনে হ'লো তার শরীরে যেন অলক্ষ্য থেকে অনেকগুলি ঢিল এসে পড়লো একসঙ্গে। না, ফিরে সে কিছুতেই যেতে পারে না, কিন্তু এখানেই বা কী করবে এখন?

যা সে করলো, তা কেবল হান্স ক্রিষ্টিয়ানের মতো মনোবল থাকলেই করা সম্ভব। সরাইখানায় কত ভাড়া দিতে হবে, সেটা সযত্নে গুণে আলাদা ক'রে রেখে, বাকি পয়সা হাতে নিয়ে সে থিয়েটারে ফিরে গিয়ে সেই রাতের জন্য একটা টিকেট কিনে নিয়ে এলো।

'পৌল-বর্জিনী'র অভিনয় হচ্ছে সে-রাতে এবং যখন পর্দা উঠে গেলো, আশ-পাশের সব কিছু একেবারে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, সে মঞ্চের এই গল্পটির প্রতিটি মুহূর্তে যেন একান্ত ক'রে বাঁচলো। পৌল-বর্জিনীর ভিতর যখন বিচ্ছেদ এলো, সে হু-হু ক'রে এত জোরে কেঁদে ফেললো যে আশে-পাশের সকল দর্শকই ভ্যাবাচাকা খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো স্ত্রীলোক আবার সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বোঝাতে চাইলেন, 'এটা তো নিছকই একটা নাটক—সব অভিনয়—সব কল্পনা—কিছুই বাস্তব নয়। তোমার এত মন-খারাপ করার কারণ নেই।' সসেজ-এর পুরদেয়া একটা স্যাণ্ডউইচ দিলে তারা তাকে, অন্যান্য দর্শকেরাও নিজেদের খাবার থেকে একটু-একটু দিয়ে দিলো। হান্সের তো সুযোগ পেলেই নিজের সম্বন্ধে সাত কাহন শোনানো চাই, তৎক্ষণাৎ সহানুভূতিতে গ'লে গিয়ে সে সব কিছু খুলে বললো তাদের! বললে যে তার এত কান্নাকাটির কারণ আর কিছু নয়, আসলে সেই হ'লো একজন পৌল, আর থিয়েটার হ'লো গিয়ে তার বর্জিনী—এবং তার ভালোবাসায় ধনের সঙ্গে চিরকালের মতো তার বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে আজ। দর্শকদের সকলেরই মর্মস্পর্শ করলো এ-সব কথা, আর তাই আরো বেশি ক'রে মিষ্টি আর ফলমূল দিয়ে তারা তাকে ঠেসে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে সে সামলে উঠলো।

রাতের খাওয়া তো সাঙ্গ হ'লো এই ভাবে, থিয়েটার দেখে ফিরে গিয়ে সে-রাতে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোতেও পারলো সে, কিন্তু পরদিন সকালে সরাইখানার সব টাকাকড়ি চুকিয়ে দেবার পর সে আবিষ্কার করলে মাত্র একটা রিগসডালেরই তার হাতে আছে এখন। সব দেমাক আর গর্ব জলাঞ্জলি দেওয়াই উচিত ব'লে সে সাব্যস্ত করলে; কোনো সওদাগর কি ব্যবসাদারের অধীনে কোনো কাজ পেলে ব'র্তে যায় প্রায়—এ-রকম একটি অবস্থা হ'লো তার। হয়তো কোপেনহাগেনে কোনো-কাজের নবিশী করা ওডেন্সের শিক্ষানবিশী করার চেয়ে আলাদা—এই সব কথা আউড়ে সে মনকে চোখ ঠারবার চেষ্টা করলে। আপাতত সে না-হয় তার কাছেই থাকুক, এই কথা ব'লে দাইটি তাকে নিজের বাড়িতে ঘুমোবার একটি ব্যবস্থা ক'রে দিলে, আর একটি ছুতোরের কাছে সে যাতে নবিশীর কাজ পায়, সে-বিষয়ে তাকে সাহায্যও করলে যথেষ্ট। তখনকার দিনে আবার শিক্ষানবীশদের প্রভুর অধীনে থাকতে হ'তো, কাজ শেখার পরও অনেক দিনের জন্য প্রভুর কাজ না-করলে চলতো না, কাজেই হান্সকে তার দীক্ষা নেবার সময়কার সব কাগজপত্র এবং ওডেন্সে থেকে কোনো পশারওয়ালা লোকের অনুমোদনপত্র আনাবার ব্যবস্থা করতে বলা হ'লো। এই সব কাগজপত্র এসে পৌঁছবার আগেই সেই সূত্রধর—বেশ ভালো লোক সে, তাছাড়া মোটেই কাঠখোট্টা নয়—হান্সকে তার বাড়ি এসে কাজকর্ম করতে অনুমতি দিলে। কিন্তু তাঁতিদের কাছে কাজ শেখার সময় কী হয়েছিলো, সেই অভিজ্ঞতা তখনো তাজা ছিলো হান্সের মনে; কাজেই অন্যান্য শিক্ষানবীশরা যখন খিস্তিখেউড় আউড়ে ঠাট্টামশকরা শুরু ক'রে দিলো, হান্স মুহূর্তে বুঝে নিলে যে সে কিছুতেই এখানে টিকে থাকতে পারবে না—চেষ্টা করতে পারে বটে, কিন্তু তবু কিছুতেই থাকা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। তার চেয়ে বরং—আগার সে মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলে—না-খেতে পেয়ে মরাও অনেক ভালো, এমনিতে শান্ত-শিষ্ট ও সাদাসিধে হ'লে কী হবে, প্রয়োজনের সময় ভীষণ তেজি আর জেদি হ'তে পারে সে সূত্রধরটির কাছে অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে সে কাজ ছেড়ে দিলে।

তাঁতিদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর তার অন্তত মা ছিল যার কাছে সে আশ্রয় পেয়েছিলো; কিন্তু এখন সে একা—একেবারে একা। ঐ দাইটির কাছে যে আর ফিরে-যাওয়া চলে না, এটা সে বুঝতে পেরেছিলো এত ভালো স্বাস্থ্য তার, আর সাংসারিক সুবুদ্ধিও তার এত বেশি যে, হান্সের কথা সে বুঝতে পারবে না—তার এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ তার কাছে নেহাৎই বোকামি ব'লে মনে হবে। অন্য সব লোকে যে-সব জিনিসের মধ্য থেকে মজা পায় সে-সব জিনিসের বেশির ভাগই যে তার রুচিকে আহত করে, এটা কিছুতেই ভালো ক'রে বুঝিয়ে উঠতে পারবে না। খিস্তি শুনলে

তাকে শামুকের মতো মস্ত এক খোলায় গুটিয়ে যেতে হয়—এই কথাটি কি কোনো সাধারণ লোক বুঝতে পারবে? উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে কোপেনহাগেনের রাস্তায় এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এ-কথা ভাবলেই অবাক লাগে যে, এক কালে যে-নগরীর সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দে ব'লে সারা বিশ্ব তাকে সম্মান জানিয়েছিলো, তাকেই কিনা রাস্তায় সহায়সম্পদহীন এক নিঃস্ব ভবঘুরের মতো দিনের পর দিন একলা কাটাতে হয়েছে। হয়তো সে তখন গিয়েছিলো আমালীয়েনবোর্গ-এ, যেখানে চারটে জায়গা একটা বৃত্ত রচনা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্কোয়ারে, যেখানে উজ্জ্বল-নীল আর শাদা কুর্তা-পরা শান্ত্রীরা সব নির্মম দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। এখানেই থাকেন দিনেমার দেশের রাজামশাই, আর সে—হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেন—সেও একদিন এখানে বাস করেছিলো। হয়তো সে তখন ভবঘুরের মতো হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পড়েছিলো সেণ্ট আনা প্লাডস-এ, মস্ত সব শাদা বাড়ি আছে সেখানে, আর উত্তরকালে এরই একটি বাড়িতে সে তার সবচেয়ে ঝলমলে দিন কাটিয়েছিলো। রাস্তা গিয়ে সোজা নেমেছে বন্দরে—হয়তো সে হাঁটতে-হাঁটতে সেই সুন্দর ক্রিস্টিয়ানসাফেন-এ গিয়ে পড়েছিলো, যেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে মস্ত রাজহাঁসের মতো পাল-তোলা জাহাজ, সূর্যাস্তের সোনার প্লাবনে যা অন্য কোনো দিগন্তের আভাস ছড়িয়ে দেয় হাওয়ায়। তারপর কাস্টম হাউস ছাড়িয়ে গেলেই পৌঁছনো যায় লাঙ্গেলিনীতে—সেখানে একলা, উদাসীন, শান্ত একটি পাথরের উপরে রয়েছে জলকন্যাদের ছোটো বোনের মর্মর মূর্তি—সে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে অপলক, যেখানে আকাশ এসে মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। জগতের সব প্রান্ত থেকে লোকেরা যায় তাকে দেখতে, আর প্রায়ই তার হাতে দেখা যায় সদ্য ফুটে-ওঠা ফুলের তোড়া, আর সেই ফুলের রাশির ভিতরেই সে ফুটে ওঠে ফুটফুটে এক জলকন্যা, জগতকে ছেড়ে দিয়ে যে চিরকাল ধ'রে উদাসীন, শান্ত, একলা ভাবে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে।

থিয়েটার নিশ্চয়ই চুম্বকের মতো টান দিতো তাকে, সে ঘুরে-ফিরে বারে-বারে এসে দাঁড়াতো তার সামনে, নিউ হাভেনের এক প্রান্তে যা অবস্থিত ছিলো তখন, এখন যেখানে নাবিকদের দোকান আর সরাইখানায় সবগুলি সন্ধ্যায় জমজমাট ও ঝলমলে। তার অন্য দিকে রয়েছে সার-বাঁধা কতগুলি ঢ্যাঙা মতো বাড়ি, আর তারই তিনটে বাড়িতে ধাতুনির্মিত কাজ-করা ফলকে এই কথাটি লেখা আছে যে, এককালে এখানে হান্স আণ্ডেরসেন থাকতেন। প্রায় সারা জীবনই অশান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে, প্রায়ই বাসা বদলাতে হ'তো—কিছুতেই এক জায়গায় স্বস্তি পেতেন না। হয়তো তখন তিনি গিয়েছিলেন মাছের বাজারে, যেখানে খুব সকালবেলায়, জেলেনীরা এখনো রোজ সবুজ রঙের ঘাঘরা প'রে আর লেস-এর কাজ করা শাদা টুপি প'রে মাছ বেচে। মুণ্ডু কেটে ফেলে যখন ছাল ছাড়িয়ে নেয়া হয় ভীষণ ভাবে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে বাইন মাছেরা—হয়তো তাই দেখে অস্বস্তিবোধ ক'রে তিনি চ'লে যেতেন ফুলের দোকানে, হেইব্রো প্লাডসের যে দোকানগুলি রঙ আর গন্ধ দিয়ে হাওয়াকে আকুল ক'রে দিয়ে তাঁর জন্য ডাক পাঠিয়ে দিতো। ড্র্যাগনের শরীর জড়িয়ে রেখেছে ষ্টক এক্সচেঞ্জের মস্ত দালানটার চোখা চূড়ো, আকাশ ফুঁড়ে শূন্যে উঠেছে নাবিকদের গির্জে হোলমেন্স কিরকের ত্রুশ—এই সব বাড়িগুলোর তলায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন। আর এখন তাদেরই পিছনে শূন্যের দিকে উঠে গেছে রয়্যাল লাইব্রেরির মস্ত বাড়িটা, যেখানে অতুল বৈভবের মতো সমাদরে তাঁর পাণ্ডুলিপি সঞ্চয় ক'রে রাখা আছে।

হয়তো এই সব পথ দিয়ে চলতে-চলতে অনাগত এক ঝলমলে ভবিষ্যৎ দিবাস্বপ্নের মতো ফুটে উঠতো তার চোখের সামনে, কিন্তু নিরুদ্দেশ ভ্রমণ খুব তাড়াতাড়িই ক্লান্ত ক'রে ফ্যালে, আর ভীষণ এক ক্ষুধাকে জাগিয়ে দেয় খাব লে-খাব লে। নিশ্চয়ই তাঁর পাণ্ডুলি কেটে ধুলোয়-রক্তে মাখামাখি হ'য়ে গিয়েছিলো; নিশ্চয়ই ক্রমশ বাণ্ডিলগুলি তার হাতে ভীষণ ভারি হ'য়ে উঠেছিলো; একটু পরেই তো নেমে আসবে ধূসর এক গোধূলি, ছুরির মতো তার পাঁজরায় বিঁধবে চোখা ধারালো ছুরির ফলা, আর নির্বান্ধব, উদ্বাস্তু আর হতাশ সে তয়ে নিশ্চয়ই আরো জীর্ণ হ'য়ে যাবে।

নিশ্চয়ই তখনি নিজের কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়েছিলো তার। তার গানের প্রশংসা তো সকলেই করেছে—এই তথ্যটা তার মনে প'ড়ে গেলো হঠাৎ। শুনেছিলো, সিবোনি নামে এক ইতালীয় গায়ক রয়্যাল থিয়েটারের গানের স্কুলের অধ্যক্ষ। হয়তো সিবোনি তাকে সাহায্য করতে রাজি হবেন। নতুন ক'রে চেষ্টা করবে ব'লে ঠিক করলে হান্স, ফিরিয়ে আনলো আবার তার অহংকার আর দুঃসাহস, কিন্তু যখন আবার তাঁর আস্তানার ঠিকানা জিগেস করলে, তখন নিজের অজান্তেই তার সবগুলি স্নায়ু কেঁপে উঠলো, আর একটা ভয়ের স্রোত যেন কোনো আগতপ্রায় ব্যর্থতার পূর্বাভাস হিসেবে কেঁপে-কেঁপে উঠে গেলো তার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কিন্তু হান্স ক্রিস্টিয়ানের এক শুভদিন সেটা। সিবোনি একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিলেন সেদিন, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়েছেন—সুরকার ভেইজি, কবি বাগগেসেন ও আরো অনেকে। তখনকার দিনে সান্ধ্যভোজ হ'তো চারটে থেকে পাঁচটার ভিতর।

হান্স গিয়ে ঘণ্টা বাজাতেই পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলে। ভীষণ ব্যস্ত সে তখন; 'এখন আর কর্তার সঙ্গে দেখা হবে না', এই কথাটা ব'লে ওঠার আগেই হান্স ঝড়ের বেগে তার কথা শুরু ক'রে দিলে; এবং মাদাম শালও দাইটির বেলায় যেমন হয়েছিলো সব সে এক নিমেষে খুলে বললে তাকে, বললে তার গায়ক হবার উচ্চাশার কথা, মাদাম শাল, থিয়েটারের প্রধান অধ্যক্ষ, অধ্যাপক রাবেক এই সব থেকে শুরু করে তার গোটা জীবনকাহিনীই সে মুহূর্তে উৎসারিত করে দিলো। দাসীটি শুনতে শুনতে এই সান্ধ্য ভোজের কথাটি একেবারে ভুলে গেলো, শেষে যখন সিবোনির অধৈর্য ঘণ্টার আওয়াজ তাকে সচকিত করে দিলো, সে তাড়াতাড়ি হান্সকে এখানে অপেক্ষা করতে ব'লে পর্দা তুলে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হান্সের গোটা কাহিনীটিই সে এত ভালো ক'রে পুনরাবৃত্তি করলে যে, সিবোনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বললেন।

ব্যাখ্যা করে বলার অবশ্য বেশি কিছু ছিলো না। তার পাঁশুটে নীরক্ত শাদা মুখ-চোখ আর সস্তা দামের জামা-কাপড়ের উচ্চকিত দুর্দশাই যথেষ্ট ছাপ ফেলে গেলো। অভ্যাগতরা এতটাই ব্যথিত হ'য়ে পড়লেন যে, কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। একটু পরে সিবোনি গলা ঝেড়ে আস্তে আস্তে তাকে একটি গান গাইতে বললেন;

ধীরে ধীরে হান্সের গলা সুরে ভ'রে গেলো, আর একাগ্র হ'য়ে তাঁরা শুনতে লাগলেন, হাতে সুরাপাত্র ধরা রইলো কিন্তু সবাই পান করার কথা ভুলে গিয়ে এই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। গান শেষ করে সে হোলবের্গের কোনো কোনো দৃশ্য অভিনয় করে দেখালো, উদ্দীপ্ত ভাবে আবৃত্তি করতে লাগলো একের পর এক কবিতা, তারপর হঠাৎ যখন তার মনে প'ড়ে গেলো এখানে সে কেন এসেছে, অমনি সে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ভূরিভোজের আয়োজন ভালোই হয়েছিলো, তা ছাড়া তাঁরা সকলেই হয়তো সহজেই বিগলিত হ'তেন—কিন্তু এ তথ্যটা ভুললে চলবে না যে সমাগতরা সকলেই ছিলেন শিল্পী। এই অদ্ভুত ছেলেটির ভিতর কোথাও যেন এক টুকরো আলোর ফুলকি আছে, এটা তাঁরা সহজেই বুঝে নিতে পারলেন। সিবোনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তাকে গানের দলে ভর্তি ক'রে নেবেন; 'একদিন এই ছেলেটির ভিতর থেকে সার পদার্থ কিছু বেরোবে', বাগগেসেন সোজাসুজি ঘোষণা করে দিলেন কোনো রকম ছল বা কৃত্রিমতা ছিলো না তাঁর গলায়; এমন কি তিনি যখন সেই অজভেজো কদাকার ঢ্যাঙা ছেলেটিকে গম্ভীর ভাবে ব'লে দিলেন যে, 'লোকে যখন হাততালি দেবে, তখন যেন দেমাকি হ'য়ে উঠো না,' তখনো গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'লো না।

কিন্তু চিরকালই হান্সের বিপদ হয়েছিলো ওই হাততালি! একটু প্রশংসা পেলেই বেলুনের মতো ফুলে উঠতো সে—যেন বিস্ফারিত হ'তো। সে রাতে যখন দাসীটি তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো, সে তখন সুখে উল্লাসে আশায় একেবারে আত্মহারা। যাবার আগে দাসীটিকে সে অনুনয় করে জিজ্ঞেস করলে যে সিবোনি তো এই কথাগুলি তাকে বিদেয় করে দেবার জন্যে বলেন নি। 'সত্যিই আমাকে ভর্তি করে নেবেন উনি। তা যদি হয়তো আমি তো সত্যিকার একজন গায়ক হ'য়ে উঠবো—মাইনেও পাবো সেই জন্যে।' মাইনেটা যে তার ভীষণ দরকার এ-কথাটা তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলতেই হ'লো, কারণ মাত্র সাতটা পেনি তখন তার পকেটে। মায়ের মতো এই দাসীটি তার চিবুকে হাত দিয়ে আদর ক'রে ব'লে দিলো, 'কিচ্ছুটি ভেবো না তুমি। কাল সকালবেলায় গিয়ে অধ্যাপক ভেইজের সঙ্গে দেখা কোরো, তাহ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

সে-রাতে ছেলেটির জন্য কী করা হয়েছিলো, তা এই দাসীটি জানতো। পরদিন যখন হান্স অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লো, তখন দেখলো সেই দয়ালু মানুষটি এককালে তাঁকেও দারিদ্র্যের সঙ্গে ভীষণ ভাবে লড়াই করতে হয়েছে, জ্ঞানীর মতো অভ্যাগতদের হৃদয় বৃত্তির কাছে আবেদন জানিয়ে তার জন্য চাঁদা সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। সত্তরেরও বেশি রিগসডালের পাওয়া গেছে হান্সের জন্য, তা ছাড়া আছে সিবোনির দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, সে যদি ভালো ভাবে জার্মান ভাষাটা রপ্ত ক'রে নিতে পারে, তাহ'লে শিক্ষকমশাইটি যে শুধু তাকে পাঠাভ্যাসই করাবেন, তাই নয়, প্রত্যেক দিন তাঁর বাড়িতে সান্ধ্য আহারটিও জোগান দেবেন। 'ভালো একটা থাকার জায়গা ঠিক ক'রে নাও—হৈ-চৈ গণ্ডগোলের ভিতর থেকো না' ভেইজে তাকে ব'লে দিলেন, 'প্রত্যেক মাসে আমি তোমাকে দশ রিগসডালের ক'রে হাতখরচ দেবো।'

মাদাম শাল-এর বাড়ির সিঁড়িতে ব'সে হান্স কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো! এই সুরকারের বাড়ির সিঁড়িতে এসে সে নিজের হাতে চুম্বন ক'রে কৃতজ্ঞ ভাবে তা ভগবানের নামে শূন্যে উঠিয়ে তার প্রণাম জানালো। এখন সে ঠিক জানে, ভগবান তাঁকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। উল্লাসে সে তখন প্রায় মত্ত হ'রে উঠেছে, সব ভার নেমে গেছে তার বুক থেকে, কিন্তু মোটেই সে অবাক হয়নি কিছুতেই। এটা তো জানা কথাই যে, সব কষ্ট সহ্য করার পর নায়ক শেষকালে জিতে যাবেই; কিন্তু তখনো সে জানে না যবনিকা এখনো কম্পমান এখনো তার কষ্টের শুরুই হয়নি; তখনো সে জানে না যে জীবন তাকে নিয়ে যাবে অনেক দূরে। জানতো না ব'লেই এখন সে ফিরে গেলে সে দাইটির বাড়িতে—এই জয়ের পর সে সেখানে ফিরে যাওয়ার যোগ হয়েছে, এই সে ভাবলে আর সেখানে বসেই সে প্রথম চিঠি লিখলো তা মাকে।

[ক্রমশঃ

শীতের চিঠি

সুজাতা ঘোষ

ক্ষমা করো দাদামণি, জবাব দিতে হ'লো দেরী,
দিন-রাত্তির সদাই থাকি লেপ-কম্বল কাঁথা মুড়ি।
শীতের চোটে হয়ে গেছি একেবারে জুজুবুড়ি,
দিনে-রেতে দু'বার শুধু পেটের জ্বালায় বিছানা ছাড়ি।

সকালবেলায় কাকগুলো আর বিছানা ছেড়ে ওঠে নাকো,
ভোর না হতে মুরগীরা আর ডাক ছাড়ে না "কোঁকোর কোঁ কোঁ।"
রাখাল ভায়ার ছুটি এবার গরুগুলো যায় না মাঠে,
গোয়ালঘরেই আগুন পোহায় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে।

সূর্যিমামা থাকেন দূরেই তবুও তিনি জবুথবু,
কেঁপে-কেঁপে কোনোমতে বজায় রাখেন চাকরীটুকু।
চাঁদামামার ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি-কাশি বেজায় ভারি,
তাঁকে আবার হয়ত দিতে সারা রাতই টহলদারী।

ব্যাপারটা কি? হিমালয় কি এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে,
দু'দিন এসে বেড়িয়ে যেও, সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে।
তোমার দেশে গরম কেমন? একটু মোদের পাঠিয়ে দিও।
বিদায় নিলাম, কুশল সর্ব—আমার প্রণাম প্রীতি নিও।

ইতি—তোমার বোন সুজাতা

ভারতের মুক্তির জন্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র সংগ্রাম

শ্রীমতী আশালতা দেবী

ইউরোপে যখন সমরানল প্রজ্বলিত, জার্মেনীর ভয়ে ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি আতঙ্কিত, তখন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রস্তাব করলেন—যেন ইংরেজকে সাহায্য করার পরিবর্তে দেশের ভেতর আন্দোলন করে আরো বিব্রত করে তোলা হয়। কিন্তু মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রের ইংরেজ বিতাড়নের সময়োপযোগী প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন না। তাই মহাত্মাজী ও তাঁর পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মনোমালিন্য হল এবং মনোমালিন্যের ফলে তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। এর পর তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল নির্ভীক হৃদয়ের আপোষহীন সংগ্রামের বাণী—"Freedom knows no compromise." স্বাধীনতা আপোষ মীমাংসা জানে না, স্বাধীনতার মূল্য রক্ত। "Divide and rule" নীতির ধ্বজাধারী অবাঞ্ছিত ইংরেজদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করতে যে রাজনীতি, সেখানে অহিংসার স্থান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কংগ্রেস সে ক্ষেত্রেও অহিংসার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। তাই কংগ্রেস-নেতারা সুভাষচন্দ্রের উক্ত বাণীতে চমকে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রও দেখলেন যে দেশে থেকে কংগ্রেসের বিরোধিতার দরুণ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তিনি কার্যসিদ্ধির জন্যে ভারতের বাইরে যেতে মনস্থ করলেন।

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাপটে সারাটা পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। এমন সময়ে একদিন খবর বেরুল—নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ।

ভারতবাসীরা কি তাদের প্রিয় নেতার হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার কথা সহসা বিশ্বাস করতে চায়? সুভাষচন্দ্র ছিলেন জেলে, সেখানে হলেন অসুস্থ, তারপর করলেন প্রায়োপবেশন। জেলখানা থেকে ইংরেজ সরকার তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে, সেখানে রাখলেন বন্দী করে। দিন-রাত চারদিকে রইল কড়া পুলিশ পাহারা। পালাবার কিছুদিন পূর্ব হতেই তিনি নিজের কক্ষের বাইরে আসতেন না। কেহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত না। এমন কি তাঁর মাতারও পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল। বাইরে থেকে কোনমতে খাবার ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই ভাবে দিন চলে। নিজ ঘরে একাকী থেকে তিনি নিজের মুখের চেহারাও কিছুটা বদল করে নিলেন, দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত মুখখানি নিতান্ত পরিচিত জনেরও চিনতে কষ্ট হত। এই ভাবে তিনি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে একদিন ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। তিনি কোলকাতা থেকে মোটরযোগে যান গোমোতে, সেখান থেকে ট্রেনে পেশোয়ার, সেখান থেকে কাবুলীর বেশে পায়ে চলে চলে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হন কাবুলে। এখানে এসে আশ্রয় পান উত্তমচাদের বাসাবাড়ীতে। এখানেও ইংরেজদের গুপ্তচর কম ছিল না। অতঃপর তিনি কাবুল থেকে গোপনে যান মস্কোতে, সেখান থেকে বার্লিনে। ইটালী ও জার্মেনীর হাতে তখন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। এই ভারতীয় বাহিনীকে তিনি নতুন করে গঠন করেন এবং জার্মাণ সমর-কৌশলী অধিনায়কদের দিয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। বার্লিনে রেডিওতে তিনি একদিন ঘোষণা করেন—"The power that could not prevent me from getting out of India, cannot prevent me from getting in."

এই দিকে ১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর জাপান অতর্কিতে পার্ল হারবার আক্রমণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ইংরেজ ও আমেরিকার বহু ঘাঁটি জাপানের হস্তগত হয় এবং জাপানীদের আক্রমণের আগে অনেক ঘাঁটি থেকে ইংরেজ সেনারা পালিয়ে যায় ঝড়ের আগে শুকনো পাতার মতো। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জাপানের দখলে আসে। বহু ভারতীয় সৈন্য সেই সময়ে পূর্ব-এশিয়ায় বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে মোতায়েন ছিল। বৃটিশ সৈন্য মালয়, সিঙ্গাপুর এবং অবশেষে ব্রহ্মদেশ হতে পশ্চাদপসরণ করায় ভারতীয় সৈন্যগুলো জাপানের হাতে বন্দী হয়। জাপানীরা ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের হাতে সমর্পণ করে। মোহন সিং জাপানে রাসবিহারীকে এই সংবাদ দেন এবং তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠান। রাসবিহারী কালবিলম্ব না করে জাপানে পূর্ব-এশিয়াস্থিত ভারতীয়দের নিয়ে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হল যে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে না। ভারতীয় সৈন্যেরা ভারত আক্রমণ করে অবাঞ্ছিত ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে মাতৃভূমি স্বাধীন করবে, আর জাপান অস্ত্রশস্ত্র, গোলা, বারুদ, বিমান প্রভৃতি দিয়ে বিদেশে গঠিত ভারতীয় বাহিনীকে সাহায্য করবে।

রাসবিহারীর পরামর্শে ১৯৪৩ সালের ২০শে জুন হাসান নামে একজন মুসলমান যুবককে নিয়ে ডুবুরী জাহাজে করে সুভাষচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন জাপানে। চার দিন পরেই টোকিওর রেডিও থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, "সারা জীবনই আমি আপোষহীন সংগ্রাম করেছি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপোষহীন ভাবেই সংগ্রাম করব, তা যেখানেই থাকি এবং যেখান থেকেই পারি।"

এর পর রাসবিহারীর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের

নিয়ে গঠিত আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তা হলেন। সুভাষচন্দ্রের মনোনয়নে সমগ্র বাহিনীতে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। সুভাষ আজাদ-হিন্দ ফৌজের নূতন মন্ত্র দিলেন 'জয় হিন্দ'। এই আজাদ-হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য হল ভারতের মুক্তি সাধন। সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই আনতে হবে স্বাধীনতা; অহিংসার পথে বৈদেশিক শত্রুকে তাড়ানো সম্ভব নয়, ইহা দুর্বলদের নীতি। স্বাধীনতা আপোষ চায় না—India demands revenge. নেতাজী চাহিলেন বীর প্রাণের রক্ত—"Give me blood, I promise you freedom." এই উদ্দেশ্যে গঠিত হল নিম্নলিখিত বাহিনীগুলো :—

১। মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজের নেতৃত্বে "সুভাষ বিগ্রেড।"

২। কর্ণেল ইনায়াৎ কিয়ানির নেতৃত্বে "গান্ধী ব্রিগেড"।

৩। কর্ণেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে "আজাদ ব্রিগেড"।

৪। কর্ণেল গুরু বক্‌স সিং ধীলনের নেতৃত্বে "নেহেরু ব্রিগেড"।

৫। কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে "ঝাঁসির রাণী ব্রিগেড"। এই কয়েকটি বাহিনীই ছিল প্রধান। তাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে আরো বিভিন্ন রকমের বাহিনী ছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতের মুক্তি আনয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতাজীর ডাকে প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান দলে দলে এই মুক্তিফৌজে যোগ দিল—এখানে না ছিল প্রাদেশিকতার বালাই, না ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ জ্ঞান, প্রবল প্রাণের জোয়ারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের যত ভেদবুদ্ধি।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের এবার লক্ষ্য হল দিল্লীর লাল কেল্লা। এই কেল্লায় তখন রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীর নিশান, সেই নিশান নামিয়ে সেখানে উড়াতে হবে ভারতীয় জাতীয় পতাকা। তাই তাদের পথ চলার ধ্বনি হল—"দিল্লী চলো।" নেতাজী বললেন—"There beyond those jungles, beyond those hills beyond those rivers lies our promised land, the land from where we sprang, the soil where shall we return now. Hark, India is calling—India's Metropolis Delhi is calling, three hundred and eighty eight millions of our country men are calling, blood is calling to blood. We have no time to spare. We shall march along the path that our pioneers have built. We shall carve through the ranks of the enemy and if God wills, we will die a marty's death and in our last breath we will kiss the road which will lead our army to Delhi. The road to

Delhi is the road to freedom. CHALO CHALO DELHI CHALO." নেতাজীর এই বাণী অদ্ভুত প্রেরণা সঞ্চার করল ভারতীয় সৈন্যদের বুকে।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে আজাদ-হিন্দ সরকারের দপ্তর সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হল। তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের দিকে অভিযান সুরু হল। মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত শক্তির সম্মুখীন হওয়া সাধারণের কাছে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু স্বদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচাবার মহান্ প্রেরণা নিয়ে যাঁরা এগিয়ে চলেন, তাঁদের সঙ্গে সাধারণ ভাড়াটিয়ে সৈন্যের তুলনা হতে পারে না।

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মসীমান্ত পার হয়ে আসামে প্রবেশ করে। নেতাজী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন—"সর্ব শেষ ইংরেজ ভারত থেকে বিতাড়িত হলে আমাদের যাত্রা শেষ হবে। দিল্লীর জাতীয় ভবনে যেদিন আমাদের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হবে, যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ লালকেল্লায় বিজয় উৎসবে মেতে উঠবে, সেদিন আমাদের যাত্রা শেষ হবে।"

মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ অগ্রসর হয়ে ইম্ফল অবরোধ করেন এবং স্বাধীন ভারতভূমিতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। ১৫ শত বর্গমাইলের অধিক ভারতভূমি আজাদ-হিন্দ ফৌজ দখল করেন। কোহিমা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অনেক স্থান তাঁরা ইংরেজ কবলমুক্ত করেন।

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "মুক্তিযুদ্ধে নেতাজী" নামক কবিতা হতে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম কাহিনীর কিছু অংশ নিয়ে উল্লেখ করা হল :—

• • • •

নেতাজীর নির্দ্দেশেতে বাট হাজার সেনা,
দুর্গম পথে পৌঁছে আসাম সীমানা।
ঘোরতর যুদ্ধ করে আজাদ-হিন্দ দল,
আসামের কিছু অংশ করিল দখল।
মুক্ত অঞ্চলে উড়ে তিন বর্ণে আঁকা,
ভারতের আশাস্থল জাতীয় পতাকা।
বন্দে মাতরম্ ধ্বনি আর দিল্লী চলো রবে,
আকাশ-বাতাস কাঁপে, কাঁপে গিরি সবে।

• • •

সম্মুখ সমরে ইংরেজ হয়ে পরাজয়,
করিল প্রচার সুরু জাপান এগোয়।
ইংরেজের প্রচারেতে হইয়া বিভ্রান্ত,
ভারতের লোক ভাবে ভারত আক্রান্ত।
ভেবেছিলেন নেতাজী তার আগমনে,
দেশেতে করিবে বিপ্লব ভারতীয়গণে।
সীমান্তে আক্রমণ আর ভিতরে বিপ্লব,
ভারতের মুক্তিপথ করিবে সুলভ।
কিন্তু সেই আশা তাঁর হল না সফল,
তদুপরি যুদ্ধকালে ঘটে অমঙ্গল।
নামিল ভীষণ বর্ষা আসাম সীমায়,
যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে পড়ে দায়।
একদিকে চলিতেছে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ,
অন্যদিকে মুক্তিফৌজের খাদ্যাভাব যোগ।
নেতাজীর অগ্রগামী মুক্তি-সেনাগণ,
রণাঙ্গন হতে করে পশ্চাদ্ গমন।
অবস্থা সপক্ষে দেখে ইংরেজগণ,
হৃত স্থান উদ্ধারিতে করে আক্রমণ।

• • •

করিবারে পরামর্শ রাসবিহারী সনে,
নেতাজী বিমানযোগে চলেন জাপানে।
শোনা যায় মধ্যপথে বিমান দুর্ঘটনায়,
আহত সুভাষ বোস হাসপাতালে যায়।
হাসপাতাল হতে পরে সর্বত্র প্রচারে,
নেতাজী সুভাষ বোস নাহি এ সংসারে।
আজও বাঙ্গালীরা ইহা বিশ্বাস না করে,
"নেতাজী আসুন ফিরে," ডাকে প্রতি ঘরে।
খণ্ডিত বিবর্ণ বাংলা মর্মবেদনায়,
ডাকিছে আকুল হয়ে, "আয় সুভাষ আয়"।

এইবার আজাদ-হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার সৈন্য বন্দী হল ইংরেজের হাতে। শাহ নওয়াজ, ধীলন, প্রভৃতি বীর সেনানায়কদের বিচার সুরু হল লালকেল্লায়। ইহার প্রতিবাদে সারা ভারতে আলোড়ন উঠল; ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহ করল, নেতাজীর সহকর্মী মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সেনানায়কদের মুক্তির দাবীতে বড় বড় রাস্তায় মিছিল বের হল। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে বিক্ষোভ দেখা দিল, তাতে ইংরেজ আর অগ্রসর হতে সাহস করল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুক্তি দেওয়া হল। নেতাজীর গঠিত আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতকে মুক্তি দিতে পারেনি, কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতের মুক্তি অর্জনে ইহার অবদান অতুলনীয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রীসুভাষচন্দ্রের বীরত্বের এবং তাঁর গঠিত আজাদ-হিন্দ বাহিনীর ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র সংগ্রামকে আজও অনেকে সমর্থন করেন না। ভারতের চিরাচরিত অহিংসামন্ত্রের ধুয়া তোলে তাঁরা নেতাজীর সংগ্রামকে হিংস্রতার পরিপোষক বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে—বাহুবল ব্যতীত বাক্যবল নিরর্থক, বাহুবলই বাক্যবলকে শক্তিশালী করে তোলে, বাহুবলহীন বাক্যবলে বলীয়ান এই দেশের নেতাদের পৃথিবীর কেউ গ্রাহ্য করছে না। ভারতের আদর্শ অহিংসা ও ক্ষমা। কিন্তু যুগে যুগে এই আদর্শ পশুপ্রবৃত্তির সংঘাতে বিপদগ্রস্ত হয়েছে, অসুরের প্রতাপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সরল, সৎ ও ধার্মিকদের যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেছে ক্ষাত্রশক্তি। ক্ষাত্রশক্তিই রক্ষা করেছে ধার্মিকদের যজ্ঞ, ভারতের আদর্শ। সুভাষচন্দ্র সেই ক্ষাত্রশক্তির জ্বলন্ত প্রতীক।

আজ বাক্যবাগীশ, স্বজাতি ও স্বধর্মদ্বেষী, বিজাতি ও বিধর্মী-তোষণকারী, অহিংসাধর্মাবলম্বী, পরশুরামের মত মাতৃমস্তকচ্ছেদনকারী সন্তানের হাতে ভারত-মায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নেই। আজ দেখা যায়, দুর্নিবার লোভ ভারতবাসীদের হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে আত্মসুখ-পরায়ণ করে তুলেছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি গগনস্পর্শী হয়ে সমগ্র

…র আবহাওয়া বিষদুষ্ট করে তুলেছে। মিথ্যাচারে, ভণ্ডামিতে, …স্কারে সম.জের প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হতে বসেছে। ভারতের এই …নে, ভারত-মায়ের খণ্ডিত অঙ্গকে সংযুক্ত করার জন্যে, পরশুরামের …কে বিতাড়িত করে ভারত-মায়ের ভাবী আরও অঙ্গচ্ছেদের …বনা দূর করার জন্যে, ভারতীয়দের মনের কালিমা ও হীনতা …করার জন্যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে …রতের সামাজিক জীবন সুখ-শান্তিময় করে তোলার জন্যে, ভারতকে …ক্তিশালী ও উন্নত জাতিতে পরিণত করার জন্যে, আর কালবিলম্ব …করে নেতাজীর ভারতে পুনরাগমন একান্ত প্রয়োজন। তাই …জ দিশাহারা বাঙ্গালীরা তথা ভারতবাসীরা উৎকণ্ঠিত মনে …র আগমনের আশায় পথের দিকে চেয়ে আছে। যে ভারতের …াধীনতার জন্যে তিনি ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, ভারতের প্রত্যেকটি নর-নারী আজ তাঁকে ফিরে পেতে চায়। "হে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান নেতাজী, বর্তমানে মেকী স্বাধীনতা ভারতবাসীর জীবন দুঃসহ দুঃখময় করে তুলেছে। তুমি এসে এই মেকী ইংলণ্ডের রাণী মার্কা স্বাধীনতার অবসান করে ভারতকে জাতির জনক ও পৃথিবীর মহামানব মহাত্মা গান্ধীর কল্পিত রামরাজ্যে পরিণত কর। জয় হিন্দ।"

একটি প্রতিভার মৃত্যু

শ্রীমতী মণিয়া হারার

১৮৯০ সালে মস্কো শহরে বরিস পাস্তেরনাকের জন্ম। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন উভয়েই প্রখ্যাত শিল্পী এবং সেই কারণেই পাস্তেরনাক শৈশব থেকেই সাহিত্য-শিল্পের আবহাওয়ায় বড়ো হ'য়ে ওঠবার সুযোগ লাভ ক'রেছিলেন। স্ক্রিয়াবিনের প্রভাবে প্রথমে পাস্তেরনাক সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও, কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি উপলব্ধি করেন যে সাহিত্য-রচনাই তাঁর প্রকৃত আদর্শ। তখন তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আইনশাস্ত্র ছিলো তাঁর অধ্যয়নের বিষয়; হঠাৎ সেই বিষয় ত্যাগ ক'রে তিনি দর্শনশাস্ত্র গ্রহণ করলেন। ১৯১৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "Twin in the Clouds" প্রকাশিত হয়। শৈশবের কোনো এক দুর্ঘটনায় চিরদিনের মতো তাঁর একটি পা নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই কারণেই সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি মুক্তি পান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কয়েক বৎসর উরালস-এর একটি কারখানায় তিনি কাজ করেন। ১৯১৭ সালে মস্কো শহরে ফিরে এসে তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, কিছু ছোট গল্প এবং একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রকাশ করেন।

১৯৩২ সালেই রাশিয়ার একজন অগ্রবর্তী কবি হিসেবে বরিস পাস্তেরনাকের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর নাম বিদেশেও কিছু-কিছু প্রচারিত হ'তে থাকে। এই সময়েই রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের চাপ তাঁর সাহিত্যের ওপর প'ড়তে সুরু করে। ফলে, পাস্তেরনাক অনুবাদ-কর্মে আত্মনিয়োগ ক'রে নিজের জীবিকা অর্জন ক'রতে থাকেন এবং চল্লিশের যুগ ব্যতীত, ষ্টালিনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খুব সামান্যই নিজের মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন।

পেরেডেলকিনোয় লেখকদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসে পাস্তেরনাক সপরিবারে বাস করতেন, প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায়, যেহেতু তাঁর ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে 'বিশোধন'-এ প্রাণ হারিয়েছেন। নিজের বিবেকের সঙ্গে রফা না ক'রেও যে ভয়ঙ্কর যুগগুলিতে তিনি কোনোক্রমে টিকে গেছলেন, সেই যুগগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই পাস্তেরনাক তাঁর উপন্যাস "ডাক্তার জিভাগো"-কে রূপ দেবার পরিকল্পনা করেন। একটি সোভিয়েট পত্রিকা ঘোষণা করে যে পাস্তেরনাক ১৯৫৪ সালের মধ্যেই তাঁর উপন্যাসটি শেষ ক'রবেন।

দু' বছর পরে পাস্তেরনাক তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সোভিয়েট মাসিক-পত্র "নোভিমির"-এ প্রদান করেন এবং একই সময়ে বিদেশে গ্রন্থখানি প্রকাশ করার জন্য ইতালীয় প্রকাশক ফেলত্রিনেল্লীর সঙ্গেও একটি ব্যবস্থা তিনি করেন।

ইতালীয় ভাষায় ১৯৫৭ সালে "ডাক্তার জিভাগো" প্রকাশিত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থখানি এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করলো, আরও বহু ভাষায় অনূদিত হলো এবং অসংখ্য বই বিক্রীত হ'য়ে গেলো।

১৯৫৮ সালে "ডাক্তার জিভাগো"র জন্য পাস্তেরনাককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং পাস্তেরনাকও সানন্দে তা গ্রহণ করেন। এতাবৎ কাল সোভিয়েট প্রেসে এক প্রকার তূষ্ণীম্ভাব দেখা গিয়েছিলো। এই নোবেল পুরস্কার প্রদান ও গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট পত্র-পত্রিকাগুলি মিলিতভাবে পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু করে এবং এই পুরস্কার-গ্রহণে অস্বীকৃত হ'তে তাঁকে বাধ্য করে। এ ছাড়াও, সাধারণ সভা সমিতিতেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর নিন্দাবাদ বর্ষিত হ'তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়।

সাধারণ্যেই পাস্তেরনাককে তাঁর 'পশ্চিমী প্রভুদের' সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। এমন আশঙ্কাও তিনি ক'রেছিলেন যে তাঁকে সম্ভবতঃ রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। সেই কারণেই তাঁর স্বাক্ষরিত দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়, একটি ক্রুশ্চভকে লেখা অপরটি 'প্রাভদা'-কে। উভয় পত্রেই পাস্তেরনাক তাঁর স্বদেশপ্রেমের ওপর জোর দেন এবং এমন মন্তব্যও করেন যে "নোভিমির" তাঁর মতামতের তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হননি। তীব্রভাবে নিন্দিত হ'লেও, পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে আর অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। ষ্টালিনী-আমলে তাঁর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রলে, এই শাস্তিকে একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ব'লে স্বীকার ক'রতেই হবে।

"ডাক্তার জিভাগো" বর্তমান শতকে রাশিয়ার মহত্তম উপন্যাস। রুশ সমাজ-ব্যবস্থার কোনো-কোনো দিক অথবা তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কোনো-কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি পাস্তেরনাক কটাক্ষ ক'রেছেন ব'লে এই অসাধারণ গ্রন্থখানি ততোখানি ধিককৃত হয়নি যতোখানি ধিক্কৃত হ'য়েছে গ্রন্থখানি পাস্তেরনাকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বাক্ষর বহন ক'রছে ব'লে। তাঁর কথানুসারে,—যথার্থ স্বাধীনতার আবহাওয়ায় যে মানুষ বাস করে একমাত্র সেই মানুষই জীবনের গভীরতম প্রয়োজনের বস্তুগুলি লাভ ক'রতে পারে। বাধ্যতা মানবসমাজকে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি দান ক'রতে পারে না এবং শক্তির ওপর, অলৌকিক ভাববাদের ওপর অধিষ্ঠিত কোনো সরকার মানবজীবনের পুনর্গঠনে অথবা ইতিহাস-সৃষ্টিতে সক্ষম তো নয়ই, বরং

তার গতি মানবীয় উদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত করা এবং ইতিহাস যা সৃষ্টি ক'রেছে তকে ধ্বংস করার দিকেই প্রসারিত।

লেখক হিসেবে পাস্তেরনাকের মূল রুশ-সাহিত্যের ধারাবাহিকতার এবং ঐতিহ্যের গভীরেই বিস্তৃত এবং বর্তমান শতকের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্য-আন্দোলনের প্রভাবও তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। তাঁর উপন্যাসের কলাকৌশলে তাঁর দান কবি হিসেবেই। তিনি স্বেচ্ছায় উপন্যাস-রচনার গতানুগতিক কাঠামোটিকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, কারণ সেটি তাঁর কাছে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং নিশ্চল ব'লে মনে হ'য়েছে। চরিত্র, ঘটনা এবং কাহিনীর যে কৃত্রিম অথচ কঠিন পারম্পর্য সাধারণত: উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, তাকেও তিনি ত্যাগ ক'রেছেন। উপন্যাসের শেষ বক্তব্যও তাঁর কাছে বিচারের এমন একটি রায় ব'লে মনে হয়েছে জীবনের প্রতি যা অন্যায়। ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পীরা যেমন আলো আসার জন্যে তাঁদের ছবির প্রান্তরেখাগুলিকে ভেঙেচুরে দিতেন, পাস্তেরনাকও তেমনি জীবনের উদ্দেশ্যগুলিকে তাঁর উপন্যাসে প্রবেশাধিকার দেবার জন্যে রেখাগুলিকে অস্পষ্ট ক'রে দিতেন এবং সঙ্গতির সূত্রগুলিকে যথাসম্ভব দুর্বল ক'রে তুলতেন। তাঁর রচনার মধ্যে তিনি যে ঐক্য এবং গতি দান ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন সেগুলি অনেকটা জীবদেহের অন্তর্নিহিত ঐক্যের মতো। এই গুণেই যতো নগণ্য জিনিষের ওপরেই তিনি লিখুন না কেন, সবই তাদের নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর রূপে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী লতিকা দাস

স্যানাটরিয়াম থেকে

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

সচেতন সংবিৎটা কি-এক যন্ত্রণায়
কুঁকড়ে গেল—ভোঁতা হয়ে গেল।
অসুস্থতার একটা কটু গন্ধ
বুকের পাঁজরে বাসা বাঁধে;
ক্লান্ত-উৎসাহের একটা ধূপছায়া
ভেসে ভেসে ওড়ে—হাওয়ার সংরাগে।

চেতনা রোগী হয়ে গেছে, দেহের সাথে সাথে।
অশান্ত বিশ্বাসের দেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
একটা জিজ্ঞাসার আস্ফালন ওঠে: অসুখ—অসুস্থতা।
···একটা রূপোলী চঞ্চল নদীর পাড়ে স্যানাটরিয়ামটা,
তুহিন বাতাস ছুঁচ-ফুটান যন্ত্রণায়
ছুটে আসে।···যন্ত্রণাটা কিন্তু রূপোলী নদীটার
বুক থেকে আসে মনে হয় না; মনে হয়,
: যন্ত্রণার শরীরের একটা নতুন উপসর্গ—নতুন আক্রমণ!

এদিকে ওদিকে ছড়ান-ছিটান সবুজের আস্তরণ।
নতুন শীতে, কুয়াশার ওড়নাটা দুলছে।
আনমনা স্বচ্ছতায় ছবি দেখছি···
আর, স্মৃতির একটা করুণ যন্ত্রণার
আশ্লেষে নিজেকে বেশী করে রোগী মনে হচ্ছে।

—স্যানাটরিয়ামটা একটা থমথমে
প্রৌঢ়ত্বের ছায়া দিয়ে গড়া।
: দু'টো শালিখ দেয়ালের ছোঁয়া বাঁচিয়ে
সামনের মাঠটায় চরছে।

···সমস্ত বাড়ীটা একটা যন্ত্রণার
আঘাতে স্থির। অসুস্থতার
একটা অপঘাত নিয়ে, আর,
কত কাল বেঁচে থাকব—এ মৃত্যু-পুরীতে!

বসুমতী

শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ

ভুবন ভরিয়া এ কী অপরূপ রূপমেলা,
অয়ি বসুমতি! দিশি দিশি তব লাস্যলীলা!
চাঁদের পীরিতি জ্যোছনাধারায় নেমে আসে
তারার মেলায় আকাশের প্রেম প্রকাশে
ফুলের সুরভি ছড়ায় বাতাসের আকুলতা
কুঞ্জে কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে প্রণয়-বারতা।

কী যাদু নামল আজি দিক্‌দিগন্তে
কী সুধা পশিল সরসের উপান্তে
গানে গানে কী লহরী আজি জাগল,
স্বর্গে মর্ত্যে মিলনরাগিণী বাজল।
নাহি ক্ষয় নাহি লয় নিত্য নব রূপান্তর,
জীবন-প্রবাহ বহে যুগ হতে যুগান্তর।

পত্রালির মর্মর-মাঝে শঙ্খবাণী বাজে
উদয়গিরিভালে সূর্যসারথি ঐ সাজে,
আলোকের অবগাহনে আঁধার দীর্ণ শতধা,
রজনীর সুষুপ্তি হতে জেগে ওঠে বসুধা।
তোমার বীণায় মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের ঝঙ্কার,
আমার ভুবনে তোমার মঞ্জুল অভিসার।

নবান্ন

মধুমিতা সেন

কার ছোঁয়া লাগে আজ আকাশ-বাতাসে
কিসের সুরভিত গন্ধ।
কে যেন শোনায় মিষ্টি কথা—মিষ্টি সুর।

হিমেলী হাওয়ায় কাঁপে
নুয়ে-পড়া আমনের শীষ, দোলে।
কন্যা যেন দেখেছে দয়িত সকম্প সলজ্জ তনু।
পাতা-ঝরা হাহাকার-বার্তা
শীতার্ত কঙ্কালের হাতছানি
নিঃস্ব অতীত নয় নয় অতি দূর।
তবু বর্তমান, কাস্তের ধারে বিদ্যুৎ আজ নবান্ন।

মায়ের ছেলে

(অপ্রকাশিত নাটক)

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ অঙ্ক

২য় দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ

ভূতনাথ, কাশীনাথ

ভূতনাথ। ঘর বাড়ী, সব কাঁপছে, বুঝতে পাচ্ছিসনে ?

কাশীনাথ। আমি তো তখন বললাম—ঘরের চালে ভর করছে, তুই বলিস ভূমিকম্প, ভূমিকম্প হলে শাঁক-ঘণ্টা বাজত না ?

ভূতনাথ। কি জানি ভাই, সেই সন্নিসী বেটা ভারি গুনিন্। গঙ্গেশটা হয়তো আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে ওর কাছে কি মন্তর তন্তর শিখে মন্তর চালান করে দিয়েছে।

কাশীনাথ। আমি তখনই বললাম কাজটা ভাল হল না, কেন বল দেখি তাকে আগুন আনতে পাঠালি ?

ভূতনাথ। আমি কি জোর করে পাঠিয়েছি ? আমি তো বারণ করেছিলাম। ও গেল কেন ? কি রকম নাচতে নাচতে চলে গেল দেখলি তো ?

কাশীনাথ। এই রে সর্ব্বনাশ করলে। ভটচায্যি মহাশয় বুঝি আবার আসছেন।

(ভবদেব ও অপর্ণার প্রবেশ)

ভবদেব। ওখানে কারা ?

কাশীনাথ। আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, আমি আর ভূতনাথ দা।

ভবদেব। তোমাদের ব্যাপারখানা কি আমায় বলতে পার ?

ভূতনাথ। আজ্ঞে না। তবে আমরাও ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।

ভবদেব। তখন তো একবার ভূমিকম্প ভূমিকম্প বলে চিৎকার করে উঠলে। একটু ঘুমিয়েছি আবার সেই চিৎকার। কি মনে করেছ তোমরা, আজ আর কাউকে ঘুমুতে দেবে না ?

অপর্ণা। উনি ঘুমিয়ে ছিলেন, আমার ঘুম আসছে না, আমি তোমাদের গলা পেয়ে ওঁকে ডেকে তুলি।

কাশীনাথ। তা বেশ করেছেন মা, আমরা বড্ড ভয় পেয়েছি, কোনদিন এরকম হয় না। শুলেই যেন মনে হচ্ছে ঘরের চালের উপর কারা যেন নাচছে।

ভবদেব। কারা আবার নাচবে।

কাশীনাথ। ঐ বেলগাছে একজন থাকেন। অনেকবার দেখিছি, আপনি ওসব কথা তেমন আমলে আনলেন না। তাই আপনাকে কিছু বলিনি।

ভবদেব। বেলগাছে কে থাকে ? কোন প্রেতযোনি ?

কাশীনাথ। আজ্ঞে তিনি ব্রহ্মদৈত্য। তবে তিনি যে এরকম নৃত্যগীতপটু তা জানতেম না পণ্ডিত মহাশয় ! তিনি খুব ভদ্র, মাঝে মাঝে মেঘদূতের শ্লোক আবৃত্তি করেন।

ভবদেব। কি বলছো বাতুলের মত।

অপর্ণা। আহা তুমি চুপ কর। তুমি তাঁকে দেখেছ কাশীনাথ ?

কাশীনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজও একবার, তারপরেই আবার, আপনি বসুন মা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আমি সব বলছি।

ভবদেব। তুমি থাম থাম তোমার আর কিছু বলতে হবে না। মূর্খ ! ভূতনাথ, তুমি তো নিজেই একটি ভূত ? তুমিও কি কাশীনাথের মত ব্রহ্মদৈত্যের দর্শন পেয়েছ ?

ভূতনাথ। আজ্ঞে না, মহারাজ !

ভবদেব। মহারাজ মহারাজ কা'কে বলছ ?

ভূতনাথ। আজ্ঞে, আপনাকে।

ভবদেব। আমাকে মহারাজ বলছ কেন ?

ভূতনাথ। আমার কি রকম ভুল হয়ে যাচ্ছে বাবা ! আপনাকে মনে হচ্ছে, আপনি রাজা কমলাকান্ত।

ভবদেব। সন্ধ্যেবেলা ক'ঘটি সিদ্ধি খেয়েছিলে ?

ভূতনাথ। (অত্যন্ত বিনীত ভাবে) বেশী নয় পণ্ডিতমশায়, এক ঘটি। আজ বিজয়া।

ভবদেব। আজ কার্ত্তিকী অমাবস্যা আর তুমি বলছ বিজয়া দশমী ?

ভূতনাথ। আজ্ঞে, আমার সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ভবদেব। আর কি মনে হচ্ছে ?

ভূতনাথ। মনে হচ্ছে, যেন আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। চোখের সামনে সরষে ফুল ফুটছে আর কারা যেন নাচছে আর কে যেন কাকে বিয়ে কচ্ছে আর কারা যেন মল-পায়ে ঝমর-ঝমর করে কোথায় যাচ্ছে, আর পুঁটে ধোপা আর তার ভাই মালি ধোপা কাপড় কাচ্ছে।

ভবদেব। কাপড় কাচ্ছে ?

ভূতনাথ। আর দীনু জেলে আর তার ভাইপো উদ্ধার—বৈড়ের খালে নৌকো ঠেলাঠেলি কচ্ছে, উদ্ধার দীনুকে গালাগাল দিচ্ছে।

ভবদেব। তারপর ?

ভূতনাথ। আর দীনু উদ্ধারের গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, আর আকাশের পাঁচশ নক্ষত্তর পাঁচটা মানুষ হয়ে হাটে গিয়ে বেগুন বিক্রী কচ্ছে।

ভবদেব। থাম, থাম, বেগুন বিক্রী কচ্ছে জড় মূর্খ। কাল থেকে তোমরা লেখাপড়া বন্ধ করবে। মা সরস্বতী রাজ্যের এলাকা পার হয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে। এই সব অর্ব্বাচীন পাষণ্ড এরা ন্যায়শাস্ত্র পড়বে। বানরের যেটুকু বুদ্ধি আর বিবেচনা-শক্তি আছে, তোমাদের তা নাই—চল, যাও, শোওগে।

কাশীনাথ। ঐ আদেশটি করবেন না বাবা! বাকী রাতটুকু আমরা এখানে বসে একটু গল্প করি। ঘরে শুলে ভূতনাথ ঐরকম চিৎকার করবে।

ভবদেব। এই সব কু-শিষ্যের জ্বালায় একদিন দেখছি আমায় আত্মহত্যা করতে হবে। আর সব ছাত্রেরা কোথায়?

কাশীনাথ। আজ্ঞে, তারা সব দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

অপর্ণা। গঙ্গেশ কোথায়? আমি একবার গঙ্গেশকে দেখে আসি।

ভূতনাথ। তাকে আর দেখতে হবে না সে ঠিক আছে, আমরা দুবার ডেকে দেখেছি, উঃ-আঃ করে পাশ ফিরে শুল।

অপর্ণা। তা হোক, আমি দেখেই আসি—আমার মনে ভাল নিচ্ছে না।

ভূতনাথ। আপনার পায়ে পড়ি মা, আপনি যাবেন না। সে আমরা ঠিক ব্যবস্থা করবো।

অপর্ণা। তোমরা গঙ্গেশের কি ব্যবস্থা করবে? আমি একবার গঙ্গেশকে দেখেই আসি—[প্রস্থানোদ্যত।

ভূতনাথ। আজ্ঞে, না না, যাবেন না।

অপর্ণা। কেন, যাব না কেন?

ভূতনাথ। আমি বারণ কচ্ছি মা, আমি আপনার চরণ ধরে মিনতি কচ্ছি মা, আপনি ঘরের ভিতর যাবেন না।

ভবদেব। কেন ঘরের ভিতর কি?

ভূতনাথ। কি জানি ঘরের ভিতর কি তা জানিনা, দোহাই আপনাদের, আপনারা যাবেন না, গেলে বিপদ হতে পারে—নিশ্চয় বিপদ হবে।

অপর্ণা। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি এদের কথার কোন ভাব বুঝতে পাচ্ছিনা।

(অপর্ণা, ভবদেব, মুক্তকেশী ঘরের ভিতর গেলেন)

ভূতনাথ। আর ভাব সর্ব্বনাশ করলে, ওরে কাশী চল ভাই পালিয়ে যাই, পালিয়ে যাই।

কাশীনাথ। দূর পালিয়ে যাবি কোথায়; তার চেয়ে আয় সত্যি কথা বলি—

(নেপথ্যে অপর্ণা। গঙ্গেশ, গঙ্গেশ, কই গঙ্গেশ তো বিছানায় নেই? ভবদেবের প্রবেশ পশ্চাৎ অপর্ণা ও মুক্তকেশী)

ভবদেব! গঙ্গেশ কোথায় ভূতনাথ?

(ভূতনাথ কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিল)

ভূতনাথ। আজ্ঞে—

ভবদেব। ওসব আজ্ঞে প্রাজ্ঞে আমি বুঝিনা। তুমি তাকে মেরেছ, সে রাগ করে চলে গেছে।

কাশীনাথ। আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়, সে ইচ্ছে করে গিয়েছে, এল বলে।

ভবদেব। কোথায় গিয়েছে?

কাশীনাথ। কি জানি, সেটা ঠিক জানা নেই।

ভবদেব। তোমরা তাকে কোথায় পাঠিয়েছ? এ নিশ্চয় ভূতনাথের কাজ—শীগগির বল।

ভূতনাথ। আজ্ঞে আমাদের কোন দোষ নেই। সে ইচ্ছে করে

অপর্ণা। তোমরা বারণ করলে না কেন? তোমরা তো জান আজ সকালে সে একবার রাগ করে চলে গিয়েছিল।

কাশীনাথ। আমি বারণও করেছিলাম।

ভবদেব। আমাদের ডেকে দাওনি কেন?

ভূতনাথ। আজ্ঞে ঐটাই কেমন ভুল হয়ে গেল।

ভবদেব। কতক্ষণ গেছে?

ভূতনাথ। তারপরই ভূমিকম্প হল।

ভবদেব। (রাগিয়া) ভূমিকম্প হ'ল? তুমি অতি অর্ব্বাচীন আর প্রচণ্ড ষণ্ডেশ্বর।

ভূতনাথ। যা বলেন—দোষ করেছি। আমি ক্ষমার অযোগ্য।

অপর্ণা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে। আর ওদের বকলেই বা কি হবে, চারিদিকে লোকজন পাঠাও, খোঁজখবর কর।

ভবদেব। এখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে কোথায় তার খোঁজ করতে যাব বল দেখি? কথায় বোধ হচ্ছে বহুক্ষণ গেছে।

ভূতনাথ! আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবদেব। হ্যাঁ, তা আগে বলতে কি হয়েছিল। জড় গদ্দভ। আর ছেলেটিও অতি বেয়াড়া।

ভূতনাথ। রাত্রি প্রভাত হোক, আমরাই খুঁজে আনবো।

অপর্ণা। প্রাণে বেঁচে থাকলে তবে তো আনবে। (স্বামীর প্রতি) আমি তোমায় তখনই বললাম, আজ ওকে বাইরের ঘরে শুতে দিয়ে কাজ নেই। যা ভেবেছি তাই হ'ল, ওর মা-ই না হয় বেঁচে নেই, আমি তো আজও রয়েছি। আমাদের পাপেই গেল। ছেলে বলে কথা, ছেলের এত অনাদর ভগবান সহ্য করেন না। থাকবে কেন?

ভবদেব। দেখ দেখি তুমি আমায় দুষচ, আমি কি ইচ্ছে করে অনাদর করেছি? আমার এই সব বুড়ো বুড়ো ছাত্রেরা যে এরকম প্রকাণ্ড হনুমান হয়ে উঠেছে তা কি আমি আগে জানি? (ভূতনাথের প্রতি) কোথায় গিয়েছে জান?

ভূতনাথ। আজ্ঞে না।

ভবদেব। নিশ্চয় জান, এখনো বল সন্ধান করার উপায় থাকে তো দেখি সন্ধান করে। আমি জানতে পারবাই। যদি কাল সকালে গঙ্গেশকে পাওয়া না যায় তোমাদের সবাইকে আমি কোতোয়াল ডেকে ধরিয়ে দেব।

(কাশীনাথ, ভূতনাথ নির্ব্বাক)

গান

তুমি কেন এখানে এলে
কার অনুরাগে তুমি বিবাগী হলে
বুঝি ভালবেসেছিলে বেদনা পেলে
নয়ন মুদিয়া তার ধ্যানে বসিলে।
ঘোর তিমির রাতে বিজন বনে
প্রেম অভিসারে হেথা আসে কেমনে
ফিরে গিয়ে দেখ ঘরে কাঁদিছে তোমার তরে
পথ পানে চেয়ে আছে নয়ন জলে
তুমি আসিবে বলে।

৩য় দৃশ্য

ভৈরবঘাট শ্মশান, গঙ্গেশ একা ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে বৈরাগী ও মহামায়া [গভীর সঙ্গীত]

বৈরাগী। দেখছো, গভীর ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত মুখ।

মহামায়া। আহা গঙ্গেশকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

বৈরাগী। বুঝেছি, ওকে তোমার কোলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে, চিন্তা নাই, গঙ্গেশ এখন মায়ের কোলেই আছে।

মহামায়া। তখন কিন্তু বড় ভয় পেয়েছিলে।

বৈরাগী। তাইতো অভয়ার কোল পেয়েছে, আর কোলে বসে আছে বলে এখনো মায়ের অপরূপ মূর্তি দেখেনি।

মহামায়া। মায়ের মুখ কখন দেখতে পাবে?

বৈরাগী। মা যখন কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবেন?

মহামায়া। সেই সময় গঙ্গেশকে আর একবার দেখবো, দেখবো নূতন চোখ পেয়ে কি ভাবে সংসার দেখে।

বৈরাগী। আমিও সেই পরম সময়ের অপেক্ষা কচ্ছি। এখনো বিলম্ব আছে। সিদ্ধির পথ তো সহজ নয়। তবে গঙ্গেশ জন্ম-জন্মান্তরের মহা সাধক, তাই বাজমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই এমন অসাধারণ মনোযোগ।

মহামায়া। আর কোন বিঘ্ন নেই তো?

বৈরাগী। বিঘ্ন থাকবেই, ছেলেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে মা নিজেই তো সাধনার পথে বিঘ্ন আনেন! তবে ভয় নেই, মায়ের দয়ায় গঙ্গেশ সমস্ত বিঘ্ন পার হয়ে যাবে।

(বৈরাগী ও মহামায়াকে আর দেখা গেল না। ভীষণ শ্মশান যেন ফুল্ল কুঞ্জবনে পরিণত হইল, মৃদু সমীরণ ফুলগন্ধ—চিত্তবিমোহন সঙ্গীত।)

(অষ্টসিদ্ধিরূপিণী অষ্টনায়িকার আবির্ভাব ও গান।)

"কিশোর বয়সে কেন শ্মশানে একা
কার লাগি বসে আছ, কে দেবে দেখা।
মেল গো কোমল আঁখি চাহ নয়নে
সুখের কাননে চল ফুলশয়নে
কিসের তরে রয়েছ ধূলির পরে পরাণসখা
অনন্তজীবন যৌবন নিরখি
রতন কাঞ্চন অগণন চাহ যদি
সকলি তোমারে দিব
মরমে আঁকিয়া নিব চরণরেখা"।

গঙ্গেশ। (সমাধি অবস্থায়) মা আপনারা কারা? আমি আপনাদের প্রণাম কচ্ছি। আপনারা আমায় যে সুন্দর প্রলোভন দেখাচ্ছেন, আমি সে সুখ চাই না। আপনারা এ মূর্তিতে আর আমায় দেখা দেবেন না। আমি মিনতি জানাচ্ছি।

(অষ্টনায়িকা রূপ সম্বরণ করিলেন)

(বৈরাগীর আবির্ভাব)

বৈরাগী। গঙ্গেশ!

গঙ্গেশ। গুরুদেব?

বৈরাগী। কি দেখছো?

গঙ্গেশ। মা আমায় ভয় দেখিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন, প্রলোভন দেখিয়েছেন, প্রলোভন জয় করবার শক্তি দিয়েছেন।

বৈরাগী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ?

গঙ্গেশ। আগে কিছু বুঝতে পারিনি। আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি।

বৈরাগী। এখন তুমি কি দেখছো?

গঙ্গেশ। আপনাকে দেখছি আর কিছু দেখছি না।

বৈরাগী। আমি কে?

গঙ্গেশ। আমার পিতা, মাতা সর্বস্ব। আমার জন্ম-জন্মান্তরের ইষ্ট।

বৈরাগী। তুমি কে?

গঙ্গেশ। আমি মায়ের ছেলে।

বৈরাগী। তোমার মা কোথায়, মাকে দেখেছ?

গঙ্গেশ। না গুরুদেব, মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

বৈরাগী। মা তোমার জন্যে কি করেছেন তা বুঝতে পেরেছ আর মাকে দেখতে পাওনি?

গঙ্গেশ। কই না, মাকে তো দেখতে পাইনি?

বৈরাগী। অন্ধ, তুমি যে মায়ের কোলে বসে আছো।

গঙ্গেশ। (চক্ষু মেলিয়া) কই কই আমার মা কই, মা কোথায় মা—মা—মা—

বৈরাগী। (গঙ্গেশকে স্পর্শ করিয়া) এই দেখ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

গঙ্গেশ। (অতি উল্লাসে)

"শিব শিব হৃদয়সরোজ-নিহিত দক্ষিণ চরণী
জয়তি কাপি মে মধুর মধুর হাসিতাননা
দিগ্বসনা লোলরসনা।"

বৈরাগী। আর কি দেখছো?

গঙ্গেশ। কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুনপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা সংসারস্যৈকসারা—

বৈরাগী। আর কি দেখছো?

গঙ্গেশ। ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী, তাল-বেতাল ভৈরব সিদ্ধচারণ মুনি ঋষি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সর্বদেবতা সমস্বরে আমার মায়ের স্তবগান কচ্ছেন।

বৈরাগী। সর্বকামনার যিনি কল্পতরু তিনি তোমার সম্মুখে—কি চাও বল?

গঙ্গেশ। ভক্তি।

বৈরাগী। শুধু ভক্তি? কোন সাংসারিক কামনা তোমার নেই?

গঙ্গেশ। জানি না, বুঝতে পাচ্ছি নে।

বৈরাগী। বিদ্যা?

গঙ্গেশ। মাতৃভক্তির জন্যে যদি বিদ্যার দরকার হয়, সেই বিদ্যা চাই, অন্য বিদ্যা অবিদ্যা।

বৈরাগী। পাণ্ডিত্য, যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা?

গঙ্গেশ। আমি কিছু চাইব না। আমার প্রয়োজন আমি জানি না, মা জানেন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। গঙ্গেশ, আমায় চিনতে পারছ?

গঙ্গেশ। হুঁ।

মহামায়া। বল দেখি, আমি কে?

গঙ্গেশ। তুমি মা।

মহামায়া। তুমি যে মাকে খুঁজছিলে, সে মায়ের দেখা পেয়েছ?

গঙ্গেশ। তুমিও সেই মা—একদিন মুখে যা বলেছিলে এখন দেখছি আমার মা-ই সব মা, বাবা, আমি সব সময় মায়ের এই রূপ দেখতে পাব।

বৈরাগী। যখনই ধ্যান করবে, তখনই দেখতে পাবে।

গঙ্গেশ। তবে দাঁড়াও মা, চুপ করে দাঁড়াও, আমি ভাল করে রূপ দেখি।

(গান)

তুমি এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাক মা
আমি দেখি ও-রূপ নয়ন ভরে,
দেখিতে দেখিতে যেন
(ও-রূপ) আঁকা রয় হৃদ্‌পদ্মসরে॥
আগে দেখি যুগল চরণ
কালো অঙ্গে রাঙাবরণ
ভাবি করি অপহরণ।
(দেখি) বাবা আছেন বুকে ধরে।
(আমার) চুরি করা হলো না কেড়ে নিতে লজ্জা করে
পায়ের উপর পড়ছে মা, মেঘবরণ চুল
কে পূজা করিল তোরে দিয়ে জবাফুল।
অসুরে নাশিতে তোমার এত হল ভুল
দেখিতে পাওনা চোখে
কোলের ছেলের নয়ন ঝরে॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ভৈরবী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ছিন্নমস্তা মাতঙ্গী বগলা কমলেশ্বরী
দিকে দিকে প্রবেশ তোমার দিগ্‌বসনা শুভঙ্করী
(তুমি) একরূপে উদয় হও মা
বহুরূপ সম্বরণ করে।

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ভবদেব সিদ্ধান্তশিরোমণির বাড়ীর প্রাঙ্গণ,
কাষ্ঠাসনে মহারাজ কমলাকান্ত, ভবদেব।

রাজা। আমার সন্দেহ হয় সেই সন্ন্যাসীকে।

ভবদেব। না সন্ন্যাসী নির্দ্দোষ।

রাজা। তবে আপনার কা'কে সন্দেহ হয়?

ভবদেব। আমার কাউকে সন্দেহ হয় না, আমি নিজে সবচেয়ে বেশী অপরাধী, আপনি আমার বিচার করুন মহারাজ। আমি ওকে শাসন করতে গিয়েছিলাম তার ফলেই গৃহত্যাগ করেছে, প্রাণে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে?

রাজা। আপনি অত অধীর হবেন না সিদ্ধান্তশিরোমণি মশায়, আপনারাই উপদেশ দেন 'বিপদি ধৈর্য্যং', আপনার ছাত্রদের সঙ্গে তো তার তেমন সদ্ভাব ছিল না—তাদের উপর আপনার কোন সন্দেহ নেই?

(ভূতনাথের প্রবেশ)

এইদিকে এস—কোন সন্ধান পেলে?

ভূতনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—গঙ্গেশকে পাওয়া গেছে, আপনি বাড়ী চলুন।

ভবদেব। যাচ্ছি। ওঃ, মা জগদম্বা বড় মান রক্ষা করেছেন, কোথায় পাওয়া গেল?

ভূতনাথ। দক্ষিণ পুকুরের ঈশেন কোণে—ন্যায়ালঙ্কারের ভিটেয় একটা নারকেল গাছতলায় একখানা আমগাছের ভাঙ্গা ডাল মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ভবদেব। ওকে ডেকে তুললে কে—তুমি?

ভূতনাথ। হ্যাঁ, আমি সবাইকে বললাম—তোমরা এই দিকে এস। গঙ্গেশকে পাওয়া গেছে, তখন সব্বাই মিলে ওকে ডেকে তুললে।

ভবদেব। পুকুরের পাড়ে, কি করতে গিয়েছিল—তোমাদের বলেছে?

ভূতনাথ। না—ঘুম ভাঙতেই 'মা মা' বলে ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠলো।

ভবদেব। 'মা মা' বলে কেঁদে উঠলো?

ভূতনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবদেব। তোমরা আর কিছু প্রশ্ন করেছিলে?

ভূতনাথ। আমরা কত জিজ্ঞেস করলাম, কোন উত্তর দিলে না।

ভবদেব। আচ্ছা, এখন যাও, নিজের নিজের কাজকর্ম্ম করগে, আমি যখন গঙ্গেশের সঙ্গে কথা কইব, সেই সময় তোমাদের সকলকে ডাকবো।

ভূতনাথ। মাঠাকরুণ আপনাকে বাড়ী যেতে বললেন—

ভবদেব। আমি যাচ্ছি তুমি যাও—[ভূতনাথের প্রস্থান।]

রাজা। আপনার সঙ্গে আমার গঙ্গেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। (রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। সেই চণ্ডাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় মহারাজ!

রাজা। কোন্ চণ্ডাল?

রক্ষী। যাকে আপনি ভূমি আর অর্থ দান করেছিলেন।

রাজা। যাও নিয়ে এস। [রক্ষীর প্রস্থান।

ভবদেব। আপনার এই তামসিক দান নিয়ে আপনার প্রজাদের ভিতর আলোচনা চলছে।

(যজ্ঞেশ্বর চণ্ডাল ও তৎপত্নী দীনতারিণীর প্রবেশ)

যজ্ঞেশ্বর। এই যে ঠাকুর মশায়, মহারাজ প্রাতঃপ্রণাম।

ভবদেব। তুমি কে?

যজ্ঞেশ্বর। আপনি তো আমারে দেখছো—চিনতি পারছো না? গঙ্গেশ ঠাকুরের সাথে মোর খুব পরচে আছে, তিনি মোদের বাড়ী হামেশাই যাওয়া-আসা করে। হেরিয়ে গিয়েল শুনলাম, তা পাওয়া গেছে তানারে?

ভবদেব। হ্যাঁ পাওয়া গেছে। তুমি কি সেই যজ্ঞেশ্বর চণ্ডাল?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এই আমার স্ত্রী, আমরা আপনার কাছে, মহারাজার কাছে এইছি।

রাজা। কি জন্যে? মন্ত্রীমশায় তোমায় একশো বিঘে জমি দেখিয়ে দেননি?

যজ্ঞেশ্বর। তা দিয়েছে। কিন্তু আপনি মোরে মোহর আর জমি কেন দিলে সেইটে আমি জানতে চাই।

রাজা। তুমি গরীব মানুষ সেইজন্যে, তোমার ছেলে মরে গেছে—ফসল নষ্ট হয়েছে, তুমি বুড়ো হয়েছো আর তো পরিশ্রম করতে পারবে না? তোমাদের কষ্ট না হয়।

যজ্ঞেশ্বর। ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব।

রাজা। তুমি নির্ভয়ে কথা বল।

যজ্ঞেশ্বর। দুঃখু-কষ্ট বরাবরই ছেল, ক্ষেতের ফসলও অনেকবার নষ্ট হয়েছে। সেবার আশ্বিনে ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে যায় তোর শীতকাল ঘর বাঁধতি পারিনি—দেনার দায়ে হাল গরু বিক্রী হয়ে গেছে। ১৭।১৮গণ্ডা বয়েস হ'ল রাজা-মশায়, ছেলেবেলা থেকেই দুঃখুকষ্ট পায়ে আসছি, অবিশ্যি ছেলে এর আগে আর মরেনি—আপনিও অনেকদিন তোর রাজা, এ পর্যন্ত আর কখনো তো এরকম দয়া করোনি। আজ আপনি আমায় দয়া করলে কেন?

ভবদেব। সত্যি মহারাজ, যজ্ঞেশ্বর বড় ন্যায্য প্রশ্ন করেছে, আপনি কেন ওকে ওর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করলেন?

রাজা। আমি ঠিক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবো না সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মশায়, আচ্ছা যজ্ঞেশ্বর, তুমি একটু বাইরে যাও, তোমার কথা পরে শুনবো।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা আমি বাইরে আছি। [প্রস্থান।

রাজা। শুনুন কাল ওকে আমি দান করেছি, পরন্তু রাত্রে শয়নের পূর্বে আমি চিন্তা করতে থাকি আমার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে। স্বপ্নে এক সাধুপুরুষ আমায় এই যজ্ঞেশ্বর চণ্ডালের কথা বললেন। আমি কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে কাল একে ভূমি আর স্বর্ণ দান করেছি, আমি কি অন্যায় করেছি শিরোমণি মশায়?

ভবদেব। আপনি বড্ড বেশী স্বপ্ন দেখেন মহারাজ! চণ্ডালের চরিত্রে বৈষ্ণবের কোন কোন স্থির লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন?

রাজা। সে প্রশ্নই আমার মনে ওঠেনি, তবে লোকটি অভাবগ্রস্ত।

ভবদেব। আপনার বহু প্রজাই অভাবগ্রস্ত। আপনিও অভাবগ্রস্ত বলে দান করেননি। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে করে দান করেছেন। অথচ সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কিনা তার প্রমাণ নিলেন না, স্বপ্নের উপর এতখানি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাজযোগ্য আচরণ নয়।

রাজা। আচ্ছা যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডাকি, দেখি ওর কি প্রশ্ন। ওহে কে আছ, যজ্ঞেশ্বরকে এখানে ডেকে দাও।

ভবদেব। আপনার এই অসাত্ত্বিক দানের ফলে আপনার বহু দরিদ্র আর মধ্যবিত্ত প্রজার মনে লোভের সঞ্চার হবে।

(যজ্ঞেশ্বর ও দীনতারিণীর পুনঃপ্রবেশ)

রাজা। যজ্ঞেশ্বর, তোমার কথার উত্তর দেওয়ার আগে আমি তোমায় আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো। আমি তোমায় অত

মোহর দিলাম, জমি দিলাম, তাতে কি তুমি খুশী হওনি ? তুমি আরো কিছু চাও ?

যজ্ঞেশ্বর। (স্ত্রীর প্রতি) ন্যাও ঠ্যালা—শোন্‌ছো গা, আপমি আরো দেবা ?

রাজা। তুমি চাও কিনা বল না ?

যজ্ঞেশ্বর। চাইলি আর কি দেবা ?

রাজা। আরো জমি, আরো মোহর, মস্তবড় অট্টালিকা বাড়ী গরু, দাস, দাসী, ফল-ফলের বাগান, পুষ্করিণী। তুই একটি হাতী কি ঘোড়া পাল্কী দিতে পারি।

যজ্ঞেশ্বর। ওরে বাবা রে হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, শোন্‌চো—

দীনতারিণী। শুনছি তো, রাজামশায় মোদের উপর যদি দয়া হয়ে থাকে এমন তো হয়—তুমি ওবকম কচ্ছ কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। দয়া, এর নাম দয়া, যা দয়া করেছে তার চোটেই পেরাণ বেরোয় বেরোয় হয়েছে। আচ্ছা রাজামশায়, আপনি তো মোদের অভয় দিয়েছ আর একটি কথা তোমারে জিজ্ঞাসা করি, আমি যদি এখন তোমারে তোমার জমি আর মোহরগুনো ফিরিয়ে দিই, তাহলে কি আপনি আমার গর্দ্দানা নেবা ?

ভবদেব। মহারাজ যা দান করেছেন তুমি তা ফিরিয়ে দিতে চাও ?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবদেব। ফিরিয়ে দিতে চাও কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। কাল থেকে এই মোহর আমার কাছে রয়েছে এ আমি ফেলতি পারছি না, রাখতিও পারছি না।

দীনতারিণী। আমি ওনারে বলি, মোহর তুমি না নাও ঘুমোও। উনি কেবল কথা বলছি—কাল রাত্তিরে বকৃতি বকৃতি শ্মশানে চলে গেল, সঙ্গে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। বকৃতি বকৃতি উনি এখন ভয়নক বক্তার হয়ে উঠেছে, নাইনি, খাইনি, ঘুমুইনি।

যজ্ঞেশ্বর। দূর তোর মাগী, ও আবার বলে নাওয়া খাওয়া, রাজার মোহরের গরম কি সোজা গরম ! সেই পুত্তুর শোক টোক ভাল হয়ে গেছে, এখন মাথার ঘিলু টগবগ করে ফোটছে।

দীনতারিণী। তা কাছে রেখেছো কেন ? মোর কাছে দ্যাও না—তাও দ্যাবা না, ঘুমবেও না খাবেও না।

যজ্ঞেশ্বর। তোমার কাছে দিই চোরে ডাকাতে তোমায় মেরে ধরে কেড়ে নিক। রাজামশায় আবার এর উপর অট্টালিকা, পুষ্করিণী, হাতী, ঘোড়া দিতি চায় আমারে—কি আপনি মেরে ফেলবা মহারাজ।

রাজা। বেশ তো চোর ডাকাতের ভয় বলছ, আমি তোমা অট্টালিকা দিচ্ছি। ঢাল-তরোয়ালধারী পাহারা দিচ্ছি আরো মোহ দিচ্ছি, তারা রক্ষা করবে।

যজ্ঞেশ্বর। ঢাল-তলোয়ারয়ালা পাহারা—তারা মোরে আ পরিবারেরে বাড়ীর ভিতর ঢুকতি দেবে না। আপনি ডাকাতে ভয়ে ঘরে ডাকাত পুষতি বলচো বুঝিছি। এই তোমার মোহর রই মহারাজ, আর যেখানকার জমি সেখানেই আছে, মোরা চললাম আর আপনি যদি গর্দ্দানা নেও তো নেও, মুই আর কি করবে বল।

রাজা। তুমি সে বৈরাগীর দেখা পেয়েছিলে ?

যজ্ঞেশ্বর। সেই তো যত নষ্টের গোড়া, আজ আমার পরিবারের কাছে আপনি খাবে বলেছিল, সকালবেলা একটা কুকুর হয়ে আমানি খেয়ে গেল।

রাজা। সন্ন্যাসী কুকুর হয়ে এসেছিল কি করে বুঝলে ?

যজ্ঞেশ্বর। সে আর বোঝা যায় না মহারাজ—হাল-চাল দেখলেই বোঝা যায়। যে যারে ভালবাসে সে তারে দেখলেই চিনতে পারে। মুই তখন ঘুমুচ্ছিলাম, খেয়ে দেয়ে যাবার সময় মোরে ডেকে তুলে মোর মুখির দিকি চেয়ে হাসতি লাগলো।

রাজা। কে, সেই কুকুর ? কুকুর হাসে ?

যজ্ঞেশ্বর। হুঁ হাসে, কাঁদে, কথা কয়। ঠিক মানষির মত।

রাজা। কাল সন্ন্যাসী সেজে এসেছিলেন, আজ কুকুর সাজলেন কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। তা কি আর মুই বলতি পারি মহারাজ, সে তার ইচ্ছে।

রাজা। তুমি তো কিছুতেই মোহর নেবে না ?

যজ্ঞেশ্বর। না ক্ষেমা করবেন।

ভবদেব। তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

(হন্তদন্ত হইয়া মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। (জনান্তিকে) বাবা বাবা, শীগগির এস—মা তোমায় ডাকতে বললে।

ভবদেব। আমি তাহলে এখন আসি মহারাজ !

রাজা। কি হ'ল সিদ্ধান্ত মশায় ?

ভবদেব। ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে মহারাজ ! প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। [প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লাল বস্তুটির সঙ্গে স্নায়ুর বিশেষ একটা যোগ আছে শোনা যায়। লালের মত লাল কিছুর সান্নিধ্যে উত্তেজনা বাড়ে, উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হিমাংশু মিত্রর টকটকে লাল গাড়িটার সামনে এসে পড়লে ধীরাপদর স্নায়ু একটা নাড়াচাড়া খায় কেমন, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ করে সেই গাড়িটা যখন চারুদির বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

আগেও দেখেছে। আগেও তাই হয়েছে।

কিন্তু ফেরা শক্ত। কারণ ড্রাইভারকে ফিরতে বলা শক্ত। লাল গাড়ির একেবারে পিছন ঘেঁষে স্টেশান-ওয়াগনটা থামিয়েছে সে। ধীরাপদ অন্যমনস্ক ছিল। তাছাড়া সামনের দিকে মুখ করে না বসে হাত পা ছড়িয়ে আড়াআড়ি হয়ে বসেছিল। গাড়িটা থামতে ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপরিচিত লালের ধাক্কা।

সাড়াশব্দ না পেয়ে ড্রাইভার পিছন ফিরে চেয়ে আছে। নামা দরকার। ধীরাপদ একটু ব্যস্তসমস্ত ভাবেই নেমে পড়ল। আর একবারও পায়ে হেঁটে চারুদির বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ে এই লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। দেখে নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই আসা বা যাওয়ার কোনোটাই সকলের অগোচরে ঘটেনি। পার্বতী দেখেছিল। চারুদি অনুযোগ করেছিলেন।

আজ আর পায়ে হেঁটে নয়, কোম্পানীর স্টেশান-ওয়াগনে একেবারে জানান দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে সে। এতক্ষণে শুধু পার্বতী বা চারুদি নয়, ওই লাল গাড়ির মালিকও টের পেয়েছেন নিশ্চয়, কেউ এলো। তাছাড়া চারুদির জানাই আছে কে এলো, কে আসবে। ফেরার প্রশ্ন ওঠে না।

...কিন্তু ওই লাল গাড়িটাই এ সময়ে এখানে থাকার কথা নয়। ঘণ্টাখানেকও হয়নি চারুদি টেলিফোন করেছিলেন। তাঁরই তাগিদে আসা। তাগিদটা কিছুটা জরুরী আর কিছুটা অভিমানাহত মনে হয়েছিল ধীরাপদর। আজই যাওয়ার তলবটা কেন জানে না। অভিযোগের কারণ, অনেক দিন যায়নি বা অনেক দিনের মধ্যে একটা খোঁজখবরও করেনি। যাই হোক, এ সময়ে লাল গাড়ি কি তাহলে চারুদিও প্রত্যাশা করেননি? গাড়িটা পাওয়ার ফলে ধীরাপদ অবশ্য একটু আগেই এসে পড়েছে।

বাইরের ঘরে যে অবাঙালী ভদ্রলোকটি বসে, তাঁকে আগেও কোথায় দেখেছিল হয়ত। এই বাড়িতেই কি...। মনে পড়েছে, এই বাড়িতেই চারুদির সেই ফুলের সমজদার, ফুলবিশেষজ্ঞ। অমিতাভ ঘোষকে সঙ্গে করে চারুদি নিজের মোটরে করে যেদিন ওকে সুলতানকুঠি থেকে এখানে ধরে এনেছিলেন, সেই দিন দেখেছিল। বাইরে লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে না থাকলে ধীরাপদ এ-সময় এই লোকের উপস্থিতির দরুণ বিরক্ত হত। এখন নিজের বিমূঢ় অবস্থায় একজন দোসর দেখে খারাপ লাগল না।

লোকটির কোলের ওপর একপাঁজা বিলিতি সাপ্তাহিক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত মনে হল। মুখ তুলে একবার দেখে নিলেন শুধু। ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—আপনি ভিতরে আসুন। অন্দরের দোরগোড়ায় পার্বতী।

ভিতরের দরজা অতিক্রম করে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিধাগ্রস্ত।

মা ও-ঘরে আছেন। পার্বতীর যান্ত্রিক নির্দেশ।

একটা খবর আগে...

ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

উনি নয়, ওঁরা। ধীরাপদ আবারও হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর অভিব্যক্তিশূন্য মুখ দেখে কিছু আবিষ্কার করার উপায় নেই। পার্বত্য ছাঁদে বেলাশেষের মৌন স্তব্ধতার মত। তাও তেমন দেখার অবকাশ হল না, বারান্দা ধরে চলে যাচ্ছে পার্বতী।

সামনের ঘরটা ছাড়িয়ে যাবার আগেই চারুদির গলা ভেসে এলো।

—ধীরু এলো নাকি রে, ভিতরে আসতে বল।

জবাব না দিয়ে পার্বতী আবার ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল শুধু। পুরুষের এই দ্বিধা আর সঙ্কোচ তার কাছে একেবারে অর্থহীন যেন।

পায়ে পায়ে ধীরাপদ ঘরে এসে দাঁড়াল। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন চারুদি। পরনের বেশ-বাস আর মুখের হাল্কা প্রসাধন দেখে মনে হয়, কোথাও বেরুবেন বা এই ফিরলেন কোথাও থেকে। হাতের কাছে বিছানার ওপর একটা ক্যাটালগের মত কি পড়ে।

এসো, তাড়াতাড়িই তো এসে গেছ। খাট ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন চারুদি, গাড়িতে এলে বুঝি, বোসো—

খাটের এক দিকে বসতে বসতে মুখের সপ্রতিভ ভাবটুকুই শুধু বজায় রাখতে চাইছিল ধীরাপদ। কিন্তু সেটা পারা যাচ্ছে না, নিজেই

বুঝছে। সকালে কারখানায় হিমাংশু মিত্রর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনো তো হাত তুলে নমস্কার করেনি, অথচ এখন করে বসেছে। ঘরের মাঝামাঝি আরামকেদারায় গা এলিয়ে হিমাংশু বাবু পাইপ টানছেন, নমস্কারের জবাবে হাত-মাথা একটু নড়েছে কি নড়েনি। মোটা ফ্রেমের ওধারে দু' চোখ পুরোপুরি খোলা মনে হয় না। ধীরাপদর মনে হল, ওর অস্বস্তিটা টের পেয়েছেন বলেই চোখ দুটো বেশি হাসি-হাসি দেখাচ্ছে।

চারুদি আর একটু কাছে এসে দাঁড়িয়ে কিছুটা গম্ভীর মুখে টেলিফোনের অসমাপ্ত অনুযোগটাই আগে শেষ করে নিলেন। তোমাদের ব্যাপারখানা কি, এখানে একটা লোক পড়ে আছি কারো মনেই থাকে না। না ডাকলে বা না তাগিদ দিলে কেউ আসবে না, কেমন ?

তোমাদের বা কেউ বলতে আর কে, সেটা অনুমানে বোঝা গেল। আর কেউ আসে না কেন ধীরাপদর অজ্ঞাত। আসে না তাও এই প্রথম শুনল। এই ক'দিনের কাজের ঝামেলায় চারুদির কথা যে মনেও পড়েনি ধীরাপদর, সেটা ঠিক কিন্তু তার আগে যে ও অসুখে পড়ে ছিল সেটা চারুদিরও মনে নেই বোধহয়।

ধীরাপদর হয়ে জবাবটা হিমাংশু মিত্র দিলেন। ডি ইজ রিয়েলি ভেরি বিজি-ই নাও···।

ফলে চারুদি আগে তাঁকেই শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন যেন— এত ব্যস্ত কিসের, ওকে ভালো মানুষ পেয়ে সকলের সব কাজ ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছ তোমরা ?

জবাব না দিয়ে হিমাংশু বাবু সকৌতুকে ঠোঁটের পাইপটা দাঁতের আশ্রয়ে রাখলেন। চারুদি ধীরাপদর দিকে ফিরলেন আবার, ছদ্ম তর্জনের সুরে বললেন, আমি ও-সব শুনতে চাইনে, তোমার আসল মালিক আমি, মনে আছে তো ? সেটা ভুলেছ কি চাকরি গেল—

হাসতে লাগলেন। ঘরে উনি একা থাকলে জবাব শুনতে হত তাও জানেন বোধ হয়।

হিমাংশু বাবুর রসিকতা আরো পরিপুষ্ট। পাইপটা হাতে নিয়ে ধীরাপদর উদ্দেশে বললেন, তুমি ওঁর চাকরিটা নিরাপদে রিজাইন করে ফেলতে পারো, আমি তোমাকে এর থেকে সম্মানের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে রাজি আছি।

দায়ে পড়েই চারুদিকে চোখ রাঙাতে হল আবারও, দেখো, লোক কাড়তে যেও না বলে দিচ্ছি ! হেসে ফেললেন, তোমার উপর সেই কবে থেকে রাগ ওর জানো না তো। ধীরাপদর মনে হল, ওর উপস্থিতিটা এঁরা যেন একটু বেশি সহজভাবে নিয়েছেন। কিন্তু ধীরাপদর সহজ হওয়া দূরে থাক, এই শেষের ইঙ্গিতে অস্বস্তির একশেষ আরো।

চারুদিও আর বাড়লেন না, ওর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একেবারে চুপচাপ কেন, মুখও তো শুকনো দেখি— বোসো খাবার দিতে বলি। হিমাংশু বাবুর দিকে ফিরলেন, তোমার কথা থাকে তো সেরে নাও, একটু বেরুতে হবে—ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বসে আছেন, আর একবার দেখা দিয়ে আসি।

পার্বতীকে খাবার দিতে বলে বাইরের ঘরের দিকে গেলেন ভদ্রবিশেষজ্ঞকে দেখা দিতে। এইখানে বসে আপাতত জলযোগের ইচ্ছে ছিল না ধীরাপদর, কিন্তু কি জানি কেন বাধাও দিতে পারল না। এখানে তাকে ডেকে এনে কোন্ কথা সেরে নেওয়া হবে সেটা আঁচ করার তাগিদে খেয়ালও ছিল না হয়ত।

হিমাংশু বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত এলো না···ফ্যাক্টরীতে ছিল না বুঝি ?

ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে অবাক আবারও। চারুদি টেলিফোনে তাকেই আসতে বলেছেন, আর কারো নামোল্লেখও করেন নি। সে-কথা না বলে মাথা নাড়ল শুধু, ছিল না।

কাল এসেছিল ?

ধীরাপদ নিরুত্তর।

তার কি উদ্দেশ্য, কি অভিযোগ জানো কিছু ? ক'দিন আসছে না ?

প্রথম জবাবটা এড়িয়ে ধীরাপদ বলল, লাইব্রেরীতে আসেন প্রায়ই···।

নির্জলা সত্যি নয় সেটা হিমাংশু বাবুর ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে বোঝার কথা। লাইব্রেরীতে আসার প্রসঙ্গে আর এক জিজ্ঞাসার দিকে ঘুরলেন তিনি। অনেক দিন ধরেই কি পড়াশুনা নিয়ে আছে শুনছি, আর অ্যানালিটিক্যালএ এসে কি-সব পরীক্ষা-টরীক্ষাও করে নাকি—কি করে, কি পড়ে ?

কি করে ধীরাপদ জানে না, আর কি পড়ে জানতে যাওয়ার ফলে তো সেদিন দ্বিগুণ সঙ্কট নিজেরই। বইয়ের নামটাও মনে নেই। এবারের নীরবতার অর্থও, কি করে বা কি পড়ে সে জানে না।

হিমাংশু বাবুর মুখ দেখে মনে হল, অমিত ঘোষের সম্বন্ধে ওর এই ধরনের কিছু না জানাটা ঠিক আশা করেন না। মুখে অবশ্য সেটা বলেন নি। বলেছেন, আবার কিছু পড়াশুনার জন্য বা দেখাশুনার জন্য বাইরে যেতে চায় তো যেতে পারে—বলে দেখতে পারো !

মন্দ প্রস্তাব কিছু নয়, তবু কি জানি কেন ধীরাপদর ভালো লাগল না খুব। ভালো বোধহয় আর একজনেরও লাগল না। চারুদির। ঘরে ফিরে এসে খাটের দিকে এগোতে এগোতে তিনিও শুনলেন। হিমাংশু বাবুর দিকে তাকালেন একবার তারপর ধীরাপদর পাশে বসে বললেন, গেলে তো ভালই হয়, এখানে বসে বসে শুধু শুধু শরীর নষ্ট—যায় যদি, এবারে আমিও ওর সঙ্গে যেতে রাজি আছি, তাহলে আর গেল বারের মত সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চাইবে না।

অর্থাৎ, অমিত ঘোষ গেলে তিনিও দীর্ঘ দিন বাইরে থাকতে প্রস্তুত। ধীরাপদর ধারণা, কথা ক'টা হিমাংশু বাবুকেই শোনালেন তিনি।

ওদিকে মুখের মোটা পাইপটা হাতে চলে এসেছে। ইজিচেয়ারের হাতলে মৃদু মৃদু ঠুকছেন ওটা। অর্থাৎ, কথা না বুঝলে তিনি নাচার। একটু বাদে ধীরাপদর দিকে ঘুরে বসলেন, ওই সরকারী অর্ডারটার কি হল ?

এসে পর্যন্ত ধীরাপদ যে-ভাবে মুখ বুজে আছে, নিজেরই বিসদৃশ লাগছে। কিন্তু এও মুখ বুজে থাকার মতই প্রশ্ন। বলল, একভাবেই তো আছে, কিছুই হয়নি।

অমিত কি বলে, করবেই না ? বিরক্তির সুর।

কথা হয়নি···

তাকে বলোই নি কিছু এখন পর্যন্ত ? শুধু বিরক্ত নয়, এবারে বিস্মিতও একটু।—কবে আর বলবে, কিছু যদি না-ই হয় চুপ করে

বসে আছ কেন, অর্ডার ক্যানসেল করে দাও। জীবন বাবু কি বলেন, পারবেন ?

এবারেরও যথার্থ জবাব ওই একই, কথা হয়নি। বলল, চেষ্টা করছেন।

মনে-রাখা উত্তর যে সেটা তিনিও বুঝলেন। চেষ্টার ওপর ভরসা না রেখে নির্দেশ দিলেন, কালকের মধ্যেই অমিতের সঙ্গে দেখা করে স্পষ্ট করে জেনে নাও, কি করবে, হবে কি হবে না—কি বলে আমাকে জানাবে। চুপচাপ খানিক, তোমাকে যা বলব ভেবেছিলাম···তোমারও আর সকলের মত তাকে পাশ কাটিয়ে চলার দরকার নেই, সে তোমাকে পছন্দ করে। তাকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, কেউ তার শত্রু নয় এখানে, সকলেই তাকে চায়, সকলেই তার গুণ বোঝে। নতুন সিনিয়র কেমিষ্ট নেওয়া হয়েছে কাজের সুবিধের জন্যে, তার সঙ্গেই পরামর্শ করে নেবার কথা, শুধু অপমানের ভয়েই এরা কেউ এগোতে চায় না তার কাছে। জীবন সোম এসেছেন বলে আপত্তি, হয় তো দেখে শুনে অন্য লোক নিক, আমি তাঁকে পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চে সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু ব্যবসা ব্যবসার মতই চলা দরকার, এইভাবে চলে কি করে ? তাছাড়া, হাসি নেই আনন্দ নেই ধৈর্য নেই—নিজেও তো অসুখে পড়ল বলে ! সুযোগ সুবিধে মত কথাবার্ত্তা কয়ে দেখো, ডোন্ট কীপ হিম অ-ফ।

অমিত ঘোষের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে চলার একটু-আধটু আভাস বড়সাহেব আগেও দিয়েছেন। এ রকম স্পষ্ট নির্দেশ এই প্রথম। ধীরাপদ অনুগত গাম্ভীর্যে কান খাড়া করে শুনেছে। এই জন্যেই আজ এখানে ডেকে আনা হয়েছে তাকে। এর পিছনে সমস্যাটা বড় কি চারুদির মন রাখার দায়টা বড় চকিতে সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিল একটা।

শাড়ির আঁচলটা টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে চারুদি খানিকটা নিস্পৃহ সুরে বললেন, ধীরু হয়ত ভাবছে ভাগ্নেকে এ সব তুমি নিজে না বলে ওকে বলতে বলছ কেন—

হিমাংশু বাবুর বক্তব্য শেষ। আর বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করলেন না। সহজ তৎপরতায় ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরাপদর গোবেচারা মুখের ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হালকা জবাব দিলেন, ওটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর আছে, আচ্ছা বোসো তোমরা—

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালেন, আজ বাড়ির মিটিং-এ আসছ না তো ? তার পর জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই আবার বললেন, থাক কাজ।

বারান্দায় তাঁর ভারী পায়ের শব্দ মেলাবার আগেই চারুদি ঘুরে বসে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কিসের মিটিং ?

ধীরাপদ ফিরে তাকালো।

মেম-ডাক্তারের কাছ থেকে ছেলে আগলে রাখার মিটিং ? চারুদি হাসতে লাগলেন, কি বিপদেই না পড়েছ তুমি !

নিজের স্বচ্ছ-চিন্তার গর্ব কমে আসছে ধীরাপদর। সেও হাসছে

বটে, কিন্তু বিস্ময় কম নয়। বাড়ির মিটিং-এর খবর মানকে দিয়ে থাকাব, ও-বাড়ির সব খবর চারুদি রাখেন। কিন্তু মিটিং-এর আসল তাৎপর্যও তাবলে মানকের বোঝার কথা নয়। ধীরাপদ একেবারে আলোচনার আসরে বসে যা আবিষ্কার করেছিল, চারুদি দূর থেকেই তা জেনে বসে আছেন।

গলায় জড়ানো আঁচলটা আবার কাঁধের ওপর বিন্যাস করলেন চারুদি। সারাক্ষণ এমন মুখ করে বসেছিলে কেন বড়সাহেবের সামনে, ও-রকমই থাকো বুঝি?

ধীরাপদ বলল, না, একসঙ্গে দু'দফা ঘাবড়েছি বলে—বড়সাহেবকে এখানে দেখে, আর চাকরির নতুন দায়িত্ব পেয়ে।

নতুন দায়িত্ব কিসের, আগে জানতে না? চারুদি ভ্রূকুটি করলেন, বড়সাহেব প্রশংসা করলে কি হবে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার কিন্তু ভরসা কমছে।

হেসে গাম্ভীর্য তরল করে নিলেন। গল্প করতে বসলেন যেন তারপর। ধীরাপদর শরীর কেমন আছে এখন, এতবড় অসুখটা হয়ে গেল খুব সাবধানে থাকা দরকার। সেই বউটি কেমন আছে, তোমার সোনাবউদি? বেশ মেয়ে, অসুখের সময় আপনজনের মতই সেবা-যত্ন করেছে, চারুদি নিজের চোখেই দেখেছেন—একদিন ধীরাপদ তাকে যেন নিয়ে আসে এখানে! মেম-ডাক্তারের খবর কী? ধীরাপদর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে এখন? সিতাংশু প্রসাধন-শাখায় চলে গেল, ফলে ধীরাপদর মান-মর্যাদা বাড়ল আরো—মেয়েটা সহ্য করছে মুখ বুজে! না করে করবে কি, সুবিধে বুঝলে অন্যত্র চলে যেত, নিজের সুবিধে ষোল আনা বোঝে—কিন্তু এখানকার মত এত সুবিধে আর কোথায় পাবে!

আলাপটা কড়কড়ে হয়ে ওঠার মুখে চারুদি সামলে নিলেন। ধীরাপদর মনে হল, বাইরের ঘরে ফুলবিশেষজ্ঞটি তাঁর অপেক্ষায় বসে, তাও ভুলে গেছেন। ওদিকে পার্বতীরও হয়ত খাবার দেবার কথা মনে নেই।

তেমনি মন্থর গতিতে আলাপ বিস্তারে মগ্ন চারুদি। অবতরণিকা থেকে অমিতাভ ঘোষ প্রসঙ্গে এসেছেন। ভিতরে ভিতরে ছেলেটা ভালো-রকম নাড়াচাড়া খেয়েছে কিছু আবার একটা, আগে এ-রকম হলে মাসির কাছেই বেশি আসত, এখন আসেই না বলতে গেলে, চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে করে চারুদি হয়রান—কাজের গণ্ডগোলটাই আসল ব্যাপার নয় নিশ্চয়, ও-সব কাজ-টাজের ধার ধারে না ছেলে, কাজ করতে যেমন ওস্তাদ কাজ পণ্ড করতেও তেমনি, শুধু ওই জন্যে মেজাজ দিনকে দিন এমন হবার কথা নয়—ধীরাপদ কি কিছুই জানে না কি হয়েছে? কি হতে পারে? কিছু না?

···অবশ্য মন-মেজাজ ভালো না থাকলে বাতাস থেকে ঝগড়া তোলার স্বভাব ছেলের, তা বলে এতটা হবে কেন—ওই মেয়ে-ডাক্তারই আবার বিগড়ে দিলে কি না কে জানে, কি যে দেখে রেখেছে ওই মেয়ের মধ্যে সে-ই জানে, এতসবের পরেও হাসলে আলো কাঁদলে কালো—সেদিকেই আবার নতুন কিছু জট পাকাচ্ছে কি না··· ধীরাপদ কি কিছুই লক্ষ্য করে নি? কিছু না?

অমিতকে বাইরে পাঠানোর প্রস্তাবটা সত্যিই যেন আবার ধীরাপদ না জানিয়ে বসে তাকে, ও-ছেলে কি বুঝতে কি বুঝে বসে থাকবে ঠিক নেই। এদিকে যেমন একটা কিছু বলে বসে থাকলেই হল, ওদিকেও তেমনি একটা কিছু ধরে বসে থাকলেই হল—চারুদির সবদিকে জ্বালা। ভাগনের সব রাগই সব-সময় শেষ-পর্যন্ত গিয়ে পড়ে মামার ওপর। এবারের রাগে আবার মামার সঙ্গে মাসিকে জুড়েছে। মাসি কি করল? মাসি কারো সাতে আছে না পাঁচে আছে!···অমিত বলে কিছু? ধীরাপদ কি কোনো আভাসও পায়নি? কিছু না?

···কিন্তু এটা চারুদি আশা করেন নি। কণ্ঠস্বরে আশাভঙ্গের সুর। ধীরাপদ যে কিছুই জানবে না, কিছুই লক্ষ্য করবে না কোনো কিছুতে থাকবে না, তা চারুদি আদৌ আশা করেন নি। বরং উল্টো আশা করেছিলেন। দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা, কাউকে আপন ভাবত না, কাউকে বিশ্বাস করত না—মামার আর মামাতো ভাইয়ের আর ওই মেম-ডাক্তারের কোনো লোককেই সে আপন ভাবে না, বিশ্বাস করে না। এর মধ্যে ধীরাপদ আসাতে চারুদি ভারী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—ভেবেছিলেন ছেলেটা এবারে কাজের জায়গায় একজনকেও অন্তত কাছে পাবে, মাথা ঠাণ্ডা হবে। তাই যাতে পায় তাই যাতে হয়, সে-জন্যে চারুদি কম করেন নি—ধীরপদর অজস্র প্রশংসা করেছেন তার কাছে, ছেলেবেলার গল্প করেছেন—শুনে শুনে ছেলে একদিন রেগেই গেছে, তোমার ধীরু-ভাইয়ের মত লোক ভূ-ভারতে হয় না, থামো এখন—আবার নিজেই এক একদিন এসে আনন্দে আর প্রশংসায় আটখানা, তোমার ধীরু-ভাইয়ের বুকের পাটা বটে মাসি, দিয়েছে বড়সাহেবের সামনেই ছোটসাহেবকে টিট করে—ওই অ্যাকসিডেন্টে কে পুড়ে গিয়েছিল, তার হয়ে তুমি কি করেছিলে, তাই নিয়ে কথা—আর একদিন তো এসে রেগেই গেল আমার ওপর, মামাকে বলে ধীরুবাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন—ওই মাইনেয় ওরকম লোক ক'দিন টিকবে!···গোড়ায় গোড়ায় এতটা দেখে চারুদির ভারী আশা হয়েছিল, ছেলেটার বল-ভরসা বাড়বে এবার, মতিগতিও ফিরবে—কিন্তু আজ দেখছেন যে-ই কে সেই আবার, ছেলেটা যে-একা সেই একা—কি হল কেন হল ধীরাপদর জানা দূরে থাক, একটা খবর পর্যন্ত না রাখাটা কেমন কথা!

মুখ বুজে শুনছিল ধীরাপদ। এক-সুরে একটানা খেদের মত লাগছিল। শুধু খেদ নয়, খেদের সঙ্গে অভিযোগ মেশানো। প্রায় স্পষ্টই সেটা। বাইরে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধীরাপদর চকিত বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে কি একটা। চারুদির মুখে আজ এত কথা শোনার পর মনে হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিজের সংযোগ-বৈচিত্র্যের রহস্যটা আবার নতুন করে ভাবতে বসলে নতুন কিছু আলোকপাত হতে পারে।

কিন্তু চারুদির মুখে চোখ আটকালে ভাবতে পারা সম্ভব নয় কিছু। ধীরাপদ ছোটখাট ধাক্কা খেল একটা। চারুদির বেশ-বাসে প্রাচুর্যের লাবণ্য, চারুদির প্রসাধনে পরিতৃপ্তির মায়া কিন্তু চারুদির চোখের গভীরে ও কি? ক্ষুব্ধ হতাশা আর আশার দারিদ্র্য আর আশ্বাসের আকূতি। নিঃস্ব, রিক্ত।

দরজার কাছে পার্বতী দাঁড়িয়ে। খাবার নিয়ে আসেনি, কর্ত্রীকে বলবে কিছু। ধীরাপদর দৃষ্টি অনুসরণ করে চারুদি সচকিত হলেন।

—কি রে?

বাইরের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছেন আপনি আজ আর বেরুবেন কি না।

চারুদি যথার্থই অপ্রস্তুত। —দেখেছ! একেবারে মনে ছিল না, কি লজ্জা! বসতে বল, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। কিন্তু পার্বতী আড়াল হবার আগেই ফিরে আবার ডাকলেন তাকে, হ্যাঁ রে পার্বতী—মামাবাবুর খাবার কই? বিরক্তি আর বিস্ময়, আমার খেয়াল নেই আর ইও ভুলে বসে আছিস?

সবটা শোনার আগে কিছু বলার রীতি নয় পার্বতীর, দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি তার দোষটাই ঢাকতে চেষ্টা করল। আমার এখন খাবার কোন তাড়া নেই, খাবার জন্যে কি আছে, চলো—

তার ব্যস্ততা দেখেই যেন পার্বতী শান্ত মুখে জানান দিল, খাবার আনছি। কর্ত্রীর দিকে তাকালো, আপনি ঘুরে আসুন, মামাবাবু খেয়ে যাচ্ছেন।

পার্বতীর মুখের দিকে চেয়ে চারুদি এক মুহূর্ত থমকালেন মনে হল, তারপরেই এই ব্যবস্থাটাই মনঃপূত হল যেন। তাই দে, উনুন ধরিয়ে করতে গেলি বুঝি? হিটারে করলেই হত···যা আর দেরি করিসনে, আমার আর বসার জো নেই—

একলা খাবার জন্যে বসে খাবার কথা ভাবতেও অস্বস্তি, অথচ এর পর আপত্তি করাটা আরো বিসদৃশ। কিন্তু এই মুহূর্তে চারুদির আবার কি হল! পার্বতী প্রস্থানোদ্যত, সেদিকে চেয়ে হঠাৎ চারুদি কি দেখলেন, কি চোখে পড়ল? ভুরুর মাঝে ঘন কুঞ্চন, দৃষ্টিটা থরথরে। এই মেয়ে, শোন্ তো!

ডাক শুনে ধীরাপদ আরো ঘাবড়ে গেল। পার্বতী আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে আয়।

কর্ত্রীর দিকে চেয়ে শান্তমুখে পার্বতী সামনে এসে দাঁড়াল।

চারুদি উষ্ণ চোখে তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তোর শাড়ি নেই না জামা নেই না মাথার তেল-চিরুণি নেই—কি নেই? ক' ডজন কি আনতে হবে বল?

পার্বতী তেমনি নীরব, তেমনি নির্লিপ্ত। চেয়ে আছে।

চারুদি আরো রেগে গেলেন, সংয়ের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ওই বাক্সবোঝাই জামা-কাপড় এনে উনুনে দিলে তবে তোর আক্কেল হবে, ঠিক দেব একদিন বলে রাখলাম—নিজেকে বাড়ির ঝি ভাবিস তুই, কেমন? ঝি-ও এর থেকে ভালো থাকে, যা দূর হ' চোখের সমুখ থেকে!

আসতে বলা হয়েছিল এসে দাঁড়িয়েছিল। যাবার হুকুম হল, চলে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে ধীরাপদই কাঠ শুধু।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিরুপায় মুখে হেসেই ফেললেন চারুদি। বলে বলে আর পারিনে, বাক্স-ভরতি জামা-কাপড়, অথচ যে-দিন নিজে হাতে না ধরব সেদিনই ওই অবস্থা। তুমি বোসো, না খেয়ে পালিও না আবার—এর ওপর আবার না খেয়ে গেলে আমাকে একেবারে জ্যান্ত ভস্ম করবে, চেনো না ওকে—

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। শাড়ির আঁচলটা বিন্যস্ত করলেন একটু। আমি যাই, ভদ্রলোক এতক্ষণ বসে আছেন, লজ্জার কথা···অমিতের সঙ্গে কি কথা হয় না হয় আমাকে জানিও, আর তুমি মাঝে মধ্যে সময় করে এসো, আসবে তো, নাকি আবার টেলিফোন করতে হবে?

চারুদি চলে গেলেন

চারুদির গাড়ি এখনো ফটক পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। খাবারের থালা হাতে পার্বতী এসে দাঁড়িয়েছে। কর্ত্রীর বেরুনোর অপেক্ষায় ছিল এ রকম মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। মেঝেতে থালা গেলাস রেখে ঘরের আলনা থেকে একটা সুদৃশ্য আসন এনে পেতে দিল, তারপর দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

ধীরাপদর ইচ্ছে করছিল খুব সহজ মুখে ওর সঙ্গে কথা কইতে আর দেখতে। খাবার আনতে সত্যি দেরী কেন হল জিজ্ঞাসা করতে আর দেখতে। চারুদির বকুনি খেয়ে রাগ না করার কথা বলতে আর দেখতে। কিন্তু সহজ হওয়া গেল না। তার থেকে সহজ আসনে এসে বসা। খাবারের দিকে চোখ পড়তে আঁতকে ওঠার সুযোগ পেল। দেখারও।

—এত খাব কি করে?

কিন্তু জবাবে কেউ যদি চলতি সৌজন্যের একটা কথাও না বলে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আরো বিড়ম্বনা।

একটা বাসন নিয়ে এসো, কিছু তুলে নাও।

আপনি খান।

ধীরাপদ যেন ছাত্রাবস্থায় ফিরে এসেছে। সামনে গুরুমশাই

দাঁড়িয়ে, মুখে পরীক্ষাসূচক গাম্ভীর্য। ছাত্র অসহায়, পারছি না মাষ্টারমশায়। গুরুর নির্দেশ, চেষ্টা করো! সেই চেষ্টার মত করেই খাবার নাড়াচাড়া শুরু করল সে। অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন এ বাড়িতে পার্বতী দর্শনের প্রহসনটা মনে পড়ছে। হাঁকাহাঁকি করে বার বার তাকে ডেকে আনার পর পার্বতী মোড়া এনে সামনাসামনি বসতে তবে ঠাণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু আজ তার এই নীরব উপস্থিতিতে ধীরাপদ ঠাণ্ডা হয়েই আসছিল, খাওয়াটা পরিশ্রমের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। অথচ পার্বতীর রান্নার হাত দ্রৌপদীর হাত।

আমি যাই। আপনার অসুবিধে হচ্ছে।

ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ে গেল, সে কি মুখ বুজে ভাবছিল না? সত্য চাপা দিতে হলে ডবল সরঞ্জাম লাগে, ধীরাপদ দ্বিগুণ ব্যগ্র। না না, আমার অসুবিধে কি। একমাত্র অসুবিধে তুমি সামনে থাকলে কিছুটা রুমালে তুলে পকেটে চালান করতে পারছি না, ফেলতে মন চায় না। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না।

এমন স্তুতিতেও পার্বতী-পাষাণে ফাটল ধরানো গেল না। চোখের কালো তারার গভীরে নিমেষের কৌতুক-বাঞ্জনাটুকুও তেমন ঠাওর করা গেল না। বসবে ভাবেনি, কিন্তু দেয়াল ঘেঁষে পার্বতী বসে পড়ল। মূর্তির অবস্থান-ভঙ্গীর পরিবর্তন শুধু।

কেউ কেউ আবোল-তাবোল বকতে পারে, কথা কয়ে শূন্যতা ভরাট করতে পারে। পরিস্থিতি-বিশেষে সেটা কম গুণের নয়। ধীরাপদ শুধু এলোমেলো ভাবতে পারে, ভেবে ভেবে ছোট-শূন্যকে বড়-শূন্য করে তুলতে পারে। আর, দায়ে পড়লে কথার পিঠে কথা কইতে পারে। আপাতত বিষম দায়েই পড়েছে, কিন্তু কথার পিঠ নেই।

পার্বতী এত গম্ভীর কেন? অমিত ঘোষের সামনে যেমন পাথর করে রাখে মুখখানা, আজ সারাক্ষণই তেমনি। তার থেকেও বেশি। ···পার্বতী কি ওকে বলবে কিছু? খাবার আনতে দেরি করল কেন, চারুদিকে অপেক্ষা না করে ঘরে আসতে বলল। চারুদি থমকে তাকিয়েছিলেন ওর দিকে, তারপর কি ভেবে ব্যবস্থাটা অনুমোদনই করেছিলেন যেন।···তারপরেই অবশ্য পার্বতীর বেশ-বাসের দিকে চোখ পড়তে কড়া বকুনি লাগিয়েছেন।

খাবার চিবুতে চিবুতে ধীরাপদ তাকালো একবার। পরনের শাড়ি ব্লাউস সাদাসিধে বটে, কিন্তু অমন তেতে ওঠার মত অপরিচ্ছন্ন কিছু নয়। বরং এতেই ওকে মানায় ভালো। পাহাড়ে বুনো-জঙ্গল শোভা, গোলাপ-রজনীগন্ধা নয়। বকুনি খেল বলে ধীরাপদ ওকে সান্ত্বনা দেবে একটু?···সেটা মন্দ নয়।

হেসে বলল, চারুদির শেষ বয়সে শুচিবাইয়ে না দাঁড়ায়, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি সব একেবারে তকতকে চাই, একটু এদিক-ওদিক হলেই রেগে আগুন।

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে পার্বতী শুনল। তারপর জবাব দিল, আপনি আসছেন জানলেও সাজগোজ করতে হবে আগে কখনো বলেননি।

ধীরাপদ জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালো। অনেকক্ষণ জল খায় নি। কিন্তু জলও যে সব সময়েই তরল-পদার্থ তাই বা কে বললে? গেলাস নামালো।

···অর্থাৎ, আর কারো আসার সম্ভাবনা থাকলে বেশবিন্যাস করতে হয়। তখন না করলে নয়। ধীরাপদর মনে পড়ল, আর একদিন নিজের হাতে পার্বতীর কেশ-বিন্যাস করে দিচ্ছিলেন চারুদি। সেদিনও অমিতাভ ঘোষের আসার কথা ছিল।

ধীরাপদ তাড়াতাড়ি আলাপের প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। খাওয়ার তন্ময়তায় পার্বতীর ওইটুকু জবাব খেয়াল না করাটা এমন কি···। বলল, চারুদির বোধহয় ফিরতে দেরি হবে, ফুলের খোঁজে গেলেন বুঝি।

কিন্তু পার্বতী খেয়াল করাবে ওকে। তেমনি ভাবলেশ-শূন্য, নিষ্পলক। সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, টেলিফোনে খবর পেয়েই ভদ্রলোককে আসতে বলেছেন, আপনি আসছেন মনে ছিল না। বাগান করার সময় অমিত বাবু যে-ফুলের কথা বলতেন সেই ফুলের চারা।

পার্বতী যেন ঘাটের কিনারায় বসে নির্বিকার মুখে ধীরাপদর মনের অতলে টুপটুপ করে কথার ঢিল ফেলছে একটা করে আর কৌতূহলের বৃত্তটা কত বড় হল তাই নিরীক্ষণ করছে চেয়ে চেয়ে। ধীরাপদরও আলাপ চালু রাখার বাসনা। সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, অমিত বাবু ফুল ভালবাসেন বুঝি?

পার্বতী নিরুত্তর। চেয়ে আছে। জবাব দেবার মত প্রশ্ন হলে জবাব দেবে। এটা জবাব দেবার মত প্রশ্ন নয়। কিন্তু ধীরাপদ প্রশ্ন হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা আর করছে না। এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে গিয়ে খাবারের থালার দিকে মন দিয়েছে। নীরবতার অস্বস্তি লাঘবের চেষ্টায় নিজের আবেগভরে হাত-মুখ দ্রুত চলছে আর একটু।

আপনার শরীর এখন ভালো?

মুখ ভরাট, ধীরাপদ তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ খুব ভালো। অসুখের সময় এই পার্বতী তাকে দেখতে গিয়েছিল মনে পড়ল। সেও কম অপ্রত্যাশিত নয়। মুখ খালি করে বলল, অসুখের সময় তুমি এসেছিলে শুনেছি, ঘুমুচ্ছিলাম বলে ডাকতে দাও নি।

আবারও জবাব দেবার মত প্রসঙ্গ পেল বুঝি পার্বতী। পেল না, রচনা করে নিল। ওই নিষ্পলক চোখ দুটোই বলছে আবারও কিছু বলবে। বলল, মা সে-দিন সকালে অমিত বাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কয়ে ভেবেছিলেন উনি আপনাকে দেখতে যাবেন। মার শরীর সেদিন ভালো ছিল না। তাই আমাকে আপনার খবর নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলেন। উনি এলে তাঁকেও নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

একটু আগে চারুদি এই পার্বতীর সম্বন্ধেই মন্তব্য করে গেছেন, চেনো না ওকে। খাওয়া ভুলে সঙ্কোচ ভুলে ধীরাপদ চেয়ে আছে তার দিকে। চেনে না বটে! কেউ চেনে কি না সন্দেহ! অমিত ঘোষের ফোটো অ্যালবামের উন্মুক্ত-যৌবনা পার্বতীকে চেনা বরং সহজ। তার পুরুষ-তৃষ্ণার সামনে বিগত এক সন্ধ্যার সেই প্রত্যাখ্যানের বর্ম-আঁটা পার্বতীকে জানা বরং সম্ভব। কিন্তু একে কে চিনেছে কে জেনেছে?

—চারুদি অমিত বাবুকে ছেলের মতই ভালবাসেন। হালকা মন্তব্যে ধীরাপদর তখনো পাশ কাটানোর চেষ্টা।

পার্বতীর কণ্ঠস্বর আরো ঠাণ্ডা শোনালো। —ছেলের মত ছেলে হলে মায়ের অত ভয় থাকত না।

ধীরাপদ মন দিয়ে খাচ্ছে আবারও।

আপনি এখন কি করবেন ?

ধীরাপদ সচকিত। প্রশ্নটা কানে বিঁধেছে বটে, স্পষ্ট হয়নি। খাবারের থালা থেকে হাত তুলে জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো।

পার্বতী বলল, অমিত বাবুর মন না পেলে মায়ের কাছে আপনার কোনো দাম নেই।

ধীরাপদর মুখও নড়ছে না আর, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। পার্বতী অপেক্ষা করল একটু। কিন্তু সে কি করবে সেই জবাবের দরকার নেই পার্বতীর। পরিস্থিতিটাই তাকে বোঝানো দরকার ছিল। ওদের দুজনের সমস্যা দু' রকমের নয় বলেই যে ও তার কাছে এসেছে সেটাই আগে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার ছিল।

পার্বতী তা ভালো করেই বলেছে, ভালো করেই বুঝিয়েছে। আরো শান্ত, আরো নিরুত্তাপ গলায় সরাসরি তাই নিজের বক্তব্যটাই বলল এবারে। অমিত বাবু এখানে আসা বন্ধ করলেও সেটা আমার দোষ হয়। আমার অন্য জায়গা নেই···মা রেগে থাকলে অসুবিধে। আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে তাঁকে মায়ের কাছে পাঠাতে চেষ্টা করবেন।

ধীরাপদ কখন উঠেছে, মুখ-হাত ধুয়ে কখন আবার সেই খাটেই এসে বসেছে, থালা বাসন তুলে নিয়ে পার্বতী কতক্ষণ চলে গেছে—কিছুই খেয়াল নেই। অন্ধকার থেকে আলোয় আসার রীতি। কিন্তু অন্ধকার থেকে হঠাৎই একটা জোরালো আলোর মধ্যে এসে পড়লে বিভ্রম। চোখ বসতে সময় লাগে।

···বেরুবার আগে চারুদিও তাহলে বুঝে গেছেন পার্বতী ওকে বলবে কিছু। বুঝেই প্রচ্ছন্ন আগ্রহে ফুলবিশারদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন তিনি। আর, বুঝেছিলেন বলেই সমস্ত দিন পরে পার্বতীর ওই অবিন্যস্ত রুক্ষমূর্তি হঠাৎ চক্ষুশূল। পুরুষ-দরবারে রমণীর রঙশূন্য আবেদনের ওপর চারুদির ভরসা কম বলেই অমন তেতে উঠেছিলেন তিনি। পাছে পার্বতীর সেই একান্তে বলাটা রমণীর একান্ত আবেদনের মত মনে না হয় ধীরাপদর, পাছে পরিচারিকার আবেদনের মত লাগে সেটা। পার্বতী যাই বলুক, চারুদির ইচ্ছার অনুকূল হবে যে, তা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। পার্বতী এমন বলা বলবে জানবেন কেমন করে। পার্বতী এ রকম বলতে পারে তাই জানেন কিনা সন্দেহ।

চারুদির একটানা খেদ শুনতে শুনতে যে-চকিত বিশ্লেষণ মনে উকিঝুঁকি দিয়েছিল, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিতে রাতারাতি তাকে এমন সমাদরের আসনে এনে বসানোর এত আগ্রহ আর এত আন্তরিকতার পিছনে চারুদির নিভৃত প্রত্যাশা যেমন স্পষ্ট তেমনি আশ্চর্য ! এতদিনের রহস্যের দরজাটা পার্বতী চোখের সমুখে সটান খুলে দিয়ে গেল।

···অমিতাভ ঘোষ ছেলের মত। ছেলে নয়। চারুদির হারানোর ভয়। এই হারানোর সঙ্গে কোনো আপস নেই চারুদির। কোনো কিছুর না। অমিত ঘোষের মনে ধরবে বলে পার্বতীর বেশ-বিন্যাস আর সাজ-সজ্জার দিকে ঘর দৃষ্টি চারুদির। অমিত ঘোষ ভালবাসে বলে চারুদির ফুলের বাগান আর ফুলের খোঁজ। অমিত ঘোষকে ধরে জানার আশায় চারুদির পার্বতীকে সুলতানকুঠিতে অসুখের খবর করতে পাঠানো। চারুদির যা কিছু আর যত সব অমিতাভ ঘোষের জন্যে।

পার্বতীও। আর ধীরাপদ নিজেও।

অমিত ঘোষের মন না পেলে চারুদির চোখে তার কোনো নেই। পার্বতীরও নেই। ওই অবিচল মূর্তি রমণী-হৃদয়ের ম ধীরাপদ অনুভব করেছে। কিন্তু তবু পার্বতীর কিছু সান্ত্বনা অ তার অন্তস্তলের এই ক্ষুব্ধ অশান্ত আলোড়নে চারুদি যত বড় উপ হোন—উপলক্ষই। তার বড় নন। পার্বতীর নিজস্ব কিছু আছে যা নেবার মত। সেইখানেই আসল যাতনা তার। সে য যত দুর্বহ হোক, নারী-পুরুষের শাশ্বত বিনিময়ের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট।

কিন্তু ধীরাপদর কি আছে ? সে কি করবে ?

···অমিতাভ ঘোষ ছেলের মত। ছেলে নয়। চারুদির হার ভয়।

এই ভয়টাই সে দূর করবে বসে বসে ? এইটুকুতেই তা কিছু আর সব কিছু ?

কি করবে ধীরাপদ ? এইটুকুই বা সে করবে কেমন ?

খানিক আগে পার্বতী জিজ্ঞাসা করেছিল, সে এখন কি করবে। চায়নি, নিজের কথা বলার জন্যে বলেছিল। কিন্তু সেই জব এখন খুঁজছে ধীরাপদ, কি করবে সে ?

ভাবনার দরকার ছিল না। ওপর-অলা চক্রী ভালো।

টেলিফোন হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকেছে। প্লাগ-পয়েন্টে প্লা দিয়ে তার সামনে খাটের ওপর রাখল টেলিফোনটা।—একজন ডাকছেন আপনাকে, নাম বললেন না।

পার্বতীর ঘর ছেড়ে চলে যাবার অপেক্ষায় নয়, আবারও f ধাক্কায় ধীরাপদর টেলিফোনে সাড়া দিতে সময় লাগল দু'-চার ···এখানে আবার কোন্ মহিলা টেলিফোনে ডাকতে পারে ? কার জানা সম্ভব ?

হ্যালো—

আমি ধীরাপদ বাবুকে খুঁজছি। গম্ভীর অথচ পরিচিত যেন।

আমি ধীরাপদ।

আমি লাবণ্য সরকার।

অমন নিটোল ভরাট কণ্ঠস্বর আর কার। ধীরাপদর পাবার কথা। অত গম্ভীর বলেই পারেনি। শুধু গম্ভীর ন রকমের গম্ভীর।

বক্তব্য, ধীরাপদকে এক্ষুনি একবার তার নার্সিং হোমে হবে। বিশেষ জরুরী। হিমাংশু বাবুর বাড়ির রাতের বৈঠকে পাওয়া যাবে ভেবে সেইখানে টেলিফোন করেছিল। হিম এই নম্বরে ডাকতে বলেছেন। নার্সিং হোমে তার এক্ষু দরকার একবার।

ধীরাপদ বিষম অবাক !—আমি তো নার্সিং হোমটা ঠিক ···কিন্তু কি ব্যাপার ?

ড্রাইভারকে বলবেন, সে চেনে। আপনি দয়া করে এ আসুন।

অসহিষ্ণু তপ্ত তাগিদ। ঝপ করে টেলিফোনের রিসিভা রাখার শব্দ।

।। ধারাবাহিক উপন্যাস ।।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৩

সুলোচনার সেদিন মনে হয়েছিল সর্বেশ্বর পাঠক, মিশ্র গোষ্ঠীর কুলগুরু যেন ভয়াবহ এক অভিশাপ হ'য়ে মিশ্রগৃহে এসে আবির্ভূত হয়েছেন।

মঙ্গল আনেন নি, এনেছেন অভিশাপের কালো ছায়া। মিথ্যা মনে হয়নি কথাটা সেদিন সুলোচনার, সত্যিই তার জীবনে অভিশাপের সূচনা এনেছিল।

ব্যাধিগ্রস্ত হরনাথ, শয্যাশায়ী হরনাথ যাই বলুক না কেন, গৃহের অন্যান্য সকলেই যখন একমত, তার কথায় কেউই কর্ণপাত করলো না।

অত্যাসন্ন মকরসংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে গোপালকে বিসর্জনের তোড়জোড় সব চলতে লাগল। কথা হয়েছিল পাড়ারই এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে গোপালকে পাঠান হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলোচনা সে প্রস্তাবে বেঁকে বসল।

সে বললে, দেবতাকে তাঁর দেওয়া জিনিষ যদি ফিরিয়ে দিতেই হয়, দেবতার রাক্ষসীক্ষুধা যদি তার দেওয়া আশীর্বাদটিকেই গ্রাস করে না মেটে তো সে নিজে হাতেই বিসর্জন দিয়ে আসবে তার গোপালকে দেবতার মুখবিবরে। দেবতার গ্রাস নিজ হাতেই সে তুলে দিয়ে আসবে তার গোপালকে।

জগদ্ধাত্রী কথাটা শুনে বললেন, না, না—সে কি করে হবে। বৌমা কি করে যাবেন!

কালীতারাও আপত্তি তোলে কিন্তু সুলোচনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে যাবেই।

অবশেষে রামানন্দই বললেন, ঠিক আছে, বৌমা যখন যেতে চাইছেন, তাই হোক। সেই ব্যবস্থাই কর তোমরা। এবং রামানন্দের আদেশে সেই ব্যবস্থাই হলো।

নবদ্বীপ থেকে একদল যাত্রী যাবে, স্থির হলো সুলোচনাও গোপালকে নিয়ে তাদের সঙ্গেই যাবে।

ব্যাপারটার মধ্যে কাকতালীর কি ছিল কে জানে, গোপালকে সাগরে বিসর্জন দেওয়া স্থির হওয়ার পর থেকেই দেখা গেল, আশ্চর্য—হরনাথ ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হয়ে উঠছে। এবং সাগর যাত্রার দিন দুই আগে যে হরনাথ দীর্ঘদিন ধরে বলতে গেলে শয্যাশায়ী ছিল সে শয্যার উপরে উঠে বসছে।

গৃহে সকলেরই মনে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

কেবল মুখে হাসি টেনে আনলেও সুলোচনার বুকের ভিতরটা কান্নায় গুমরাতে থাকে। গোপালকে নিভৃত রাত্রের শয্যায় বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরে মনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে বলে, ওরে সোনা, কেন এসেছিলি এই হতভাগীর গর্ভে। কেন এসেছিলি এমন রাক্ষসী মায়ের গর্ভে, যে মা পেটের সন্তানকে তার রক্ষা করতে পারে না। পেটের সন্তানকে যে মা সাগরের জলে ভাসিয়ে দেয়।

এমন কি আশ্চর্য, যে হরনাথ মাত্র কিছুদিন পূর্বেও স্ত্রীকে বলেছে, এ হতে পারে না সুলোচনা, সাগরে ওকে তুমি বিসর্জন দিও না, এ দেবতার রোষ নয়, এ আমাদেরই অন্ধ কুসংস্কার—সেই হরনাথই আজ দীর্ঘ দিনের রোগ থেকে ক্রমশ: মুক্তির আনন্দে গোপালকে সাগরে বিসর্জন দেওয়ার কথা আর মুখেও আনে না।

সুলোচনার বুঝতে বাকী থাকে না, আজ স্বামীরও তার তাদের একমাত্র সন্তানকে সাগরে বিসর্জন দিতে আপত্তি নেই। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে সন্তানের প্রতি মমতাও বুঝি মন থেকে আজ তার মুছে যায়। কালীতারা তো বারবারই বলতে থাকে, গাছ বেঁচে থাকলে কত ফল আবার ধরবে, তার জন্য দুঃখ কি।

হরনাথের মনে হয়, সত্যিই তো, কালীতারা তো মিথ্যা বলছে না!

বেশ, তবে তাই হোক। সুলোচনা মনে মনে বলে, গোপালকে সে সাগরেই দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে সুলোচনা যাত্রা করে গোপালকে বুকে নিয়ে অন্যান্য তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে নৌকায়। যাত্রীদের মধ্যে সবাই বয়স্থ এবং বয়স্থা। একমাত্র অল্প বয়েসী বধূ সুলোচনা। যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ভালমন্দর ভার পড়েছিল সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ কুলদাচরণ শাস্ত্রীর উপরে।

কুলদাচরণের বয়স ষষ্টোত্তীর্ণ হলেও দেহের বাঁধন বেশ তখনো অটুট। দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণ। রামানন্দ মিশ্রেরই দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী।

নিজগৃহে একটি চতুষ্পাঠি ও কিছু যজমান, তাইতেই তাঁর সংসার বেশ স্বচ্ছলভাবে চলে যায়। সংসারে একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী জগত্তারিণী। কোন সন্তানাদি হয় নি। ছাত্ররাই তাঁর সন্তানের মত।

কুলদাচরণকে যাত্রার পূর্বে বার বার বলে দিলেন রামানন্দ মিশ্র, বধূমাতাকে যেন সর্বক্ষণ চোখে চোখে তিনি রাখেন। এবং একমাত্র তাঁর ভরসাতেই তিনি তাঁর পুত্রবধূকে যেতে দিচ্ছেন অতদূরের পথ।

কুলদাচরণ মৃদু হেসে বললেন, কোন ভয় নেই তোমার মিশ্র, বধূমাতাকে নির্বিঘ্নেই এনে তোমার গৃহে পৌঁছে দেবো।

দীর্ঘ পথ। পথে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাই পাড়ার শ্রীমন্ত ঘোষালকে সঙ্গে নিয়েছিলেন কুলদাচরণ। দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলে শ্রীমন্ত ঘোষাল। অসুরের মত চেহারাটি যেমন তেমনি দেহের শক্তিও আসুরিক। চিরদিনের ডানপিটে স্বভাব। লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নি। লাঠি খেলে, কুস্তি করে এবং বাঁশী বাজিয়ে দিন কাটে।

বাপ অবিশ্যি স্বনামধন্য একজন পণ্ডিত। রঘুনাথ বেদান্ততীর্থ।

রঘুনাথ বেদান্ততীর্থ অনেক চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে, কিন্তু সক্ষম হন নি।

আট দশটি স্ত্রীলোক নিয়ে কুলদাচরণ মাঝিমাল্লা ও শ্রীমন্তর ভরসায় গঙ্গাসাগর তীর্থের উদ্দেশে তরী ভাসালেন। পথ বড় কম নয়, প্রায় দিন দশেকের পথ।

পথে বিশেষ কোন রকম বিপদ-আপদই দেখা দিল না। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো কুলদাচরণ যখন সাগরসঙ্গমের কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছেন এবং মাত্র একরাত্রির পথ যখন উত্তীর্ণ হতে বাকী। এবং দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল তাঁর অজ্ঞাতেই।

শ্বশুর-গৃহের সকলের প্রতি এবং বিশেষ করে স্বামীর প্রতি একটা প্রচণ্ড অভিমানের বশেই তার গোপালকে নিয়ে সাগর যাত্রার পথে ভেসেছিল সুলোচনা। ঠিক আছে, তার গোপালকে কেউ যখন চায় না, গোপালকে সে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু সাগর-সঙ্গম যত নিকটবর্তী হতে থাকে, মনের মধ্যের সেই প্রচণ্ড অভিমানটা যেন মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে কোথায় ভেসে যায়।

গোপাল বেশ সুলোচনাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে থাকে।

গোপালের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হ'য়ে আসতে থাকে। মনে হতে থাকে, কেন, কেন সে ঐ অন্যায়কে, জবরদস্তীকে মেনে নেবে। দেবতার কাছে সে ভিক্ষা চেয়েছিল একটি সন্তান এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু দেবতা কি সেদিন এক বন্ধ্যা নারীর ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে চিরন্তন তার মায়ের মনটিকে বুঝতে পারেন নি? দেবতা কখনোই এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। এ সবই মানুষের অন্ধ কুসংস্কার।

দেবে না কিছুতেই সে তার গোপালকে, সাগরজলে নিক্ষেপ করবে না। কথাটা যত সুলোচনা ভাবে ততই যেন সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়। দেবে না, কিছুতেই সাগরজলে ভাসিয়ে দেবে না তার নয়নের মণি গোপালকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যারা সঙ্গে এসেছে তারা, যদি জোর করে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় তার গোপালকে—তখন সে কি করবে। অবশেষে হঠাৎ মনে হয় সুলোচনার, সে যদি পালিয়ে যায় গোপালকে নিয়ে কোথায়ও। দূরে, অনেক দূরে। তবে তো আর কেউ জোর করে তার গোপালকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কিন্তু কোথায় পালাবে? চারিদিকে জল আর জল। তাছাড়া এতগুলো মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালাবেই বা কোথায়?

আবার মনে হয় সুলোচনার, জল—তাতে ভয়ের কি আছে! সে তো সাঁতার জানে। গোপালকে বুকে করে সে সাঁতরে কোথায়ও না কোথায়ও গিয়ে উঠতেই পারবে। তারপর কি সে একটা আশ্রয় খুঁজে পাবে না? তাই করবে সুলোচনা।

সুলোচনা স্থির করে সকলের দৃষ্টির অগোচরে পালাতে হলে তাকে রাত্রে কোন একসময় যখন যাত্রীরা সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে তখন সে নিঃশব্দে নৌকা থেকে জলের মধ্যে ভেসে পড়বে।

পড়েছিলও সে রাত্রে সুলোচনা গোপালকে পিঠে বেঁধে নিয়ে জলে ভেসে। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে বুঝতে পারেনি সুলোচনা ব্যাপারটা কত দুঃসাধ্য। একে পৌষের নিদারুণ ঠাণ্ডা, তার উপরে পিঠের উপরে একটা বোঝা নিয়ে সেই ঠাণ্ডা জলে সাঁতরাণ সত্যিই এক নারীর পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এবং সেটা সুলোচনা কিছুক্ষণ সাঁতরাবার পরেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। শুধু জল আর জল আর নিকষ কালো অন্ধকার।

ঠাণ্ডায় হাত পা সুলোচনার ক্রমশঃ যেন হিম-অসাড় হ'য়ে আসতে থাকে। হাত পা যেন আর চলে না। হাপরের মত শ্বাস নিচ্ছে সুলোচনা।

কিন্তু থামলে তো চলবে না। পিঠে বাঁধা যে তার গোপাল রয়েছে।

ইতিমধ্যে গোপাল ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল।

মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে সুলোচনার। অন্ধকার যেন আরো জমাট, আরো ঘনীভূত হয়ে তার দু'চোখের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। পাথরের মতই যেন ভারী হয়ে ক্রমশ: নিশ্চল হয়ে আসছে সুলোচনার হাত পা, শরীর। পিঠের উপরে ঠাণ্ডা জলে ভিজে গিয়ে কাঁপছে গোপাল। তারপর আর মনে নেই কিছু সুলোচনার। সমস্ত চেতনার পরে যেন অন্ধকার নেমে এলো।

পাশ ফিরলো সুলোচনা। আর ক্রমশ: একটু একটু করে লুপ্ত চেতনা, লুপ্ত অনুভূতি ফিরে আসতে থাকে সুলোচনার।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চেতনা ফিরে আসতে থাকে সুলোচনার। ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার পাশ ফেরে সুলোচনা। তারপরই অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাল। অস্পষ্ট ভোরের আলোয় তাকাতে লাগলো সুলোচনা এদিক-ওদিক।

তাকালো, আরো ভালো করে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়লো গোপালের কথা। গোপাল! গোপাল কোথায়। উঠে বসেছে তখন সুলোচনা।

একি! পিঠের সঙ্গে যে শক্ত করে বাঁধা ছিল তার গোপাল। কোথায় গেল গোপাল! গোপাল।

পাগলের মতই যেন ভোরের আলোয় গোপালের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকায় সুলোচনা। গোপাল। কোথায় তার গোপাল। ভিজে কাপড়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়ায় গোপালকে সুলোচনা। কিন্তু কোথায় গোপাল? ভোরের আলোয় চোখে পড়ে আশে-পাশে শুধু ধু-ধু বালিয়ারী আর সামনে জল আর জল।

গোপাল! গোপাল! কেঁদে ফেলে সুলোচনা। কাঁদতে কাঁদতে বালুর উপরে লুটিয়ে পড়ে।

নেই। গোপাল তার নেই। নিশ্চয়ই কোন একসময় বাঁধন আলগা হয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে গোপাল। হতভাগিনী সে জানতেও পারেনি। হায়রে! এত করেও গোপালকে তার সে বাঁচাতে পারল না।

জলের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতই চেঁচিয়ে ওঠে একাকী সুলোচনা। রাক্ষুসী, সত্যি সত্যিই তুই শেষ পর্যন্ত বাছাকে আমার ছিনিয়ে নিলি বুক থেকে। ছিনিয়ে নিলি মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে।

কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো সুলোচনা বালুর উপরেই। ফিরিয়ে দে, ওরে রাক্ষুসী, সর্বনাশী। ফিরিয়ে দে আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দে—।

ব্যাপারটা প্রথমে নৌকার মধ্যে জানতে পেরেছিল সৈরভী। শেষরাত্রের দিকে সহসা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ঠিক তার পাশেই সুলোচনা বা সুলোচনার সন্তানকে না দেখতে পেয়ে সৈরভীই প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে।

সৈরভীর পাশেই ঠিক কয়দিন ধরে সুলোচনা তার সন্তান গোপালকে নিয়ে শুচ্ছিল। নৌকায় ওঠা অবধিই সুলোচনা যেন কেমন গম্ভীর স্তব্ধ হয়েছিল। কারুর সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলতো না। সর্বক্ষণই প্রায় বলতে গেলে ছেলে গোপালকে বুকের মধ্যে নিয়ে বসে থাকত চুপচাপ।

নৌকার মধ্যে দুটি কামরা। একটি বড়, একটি ছোট। বড়টির মধ্যে ছিল মেয়েরা এবং ছোট কামরাটায় থাকতেন শ্রীমন্তকে নিয়ে কুলদাচরণ। যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র সুলোচনা ছাড়া সকলেই বিধবা ও বর্ষীয়সী।

দিনে একবার করে নৌকা কোথায়ও পাড়ে লাগানো হতো। কোনমতে পাড়ে ইট-কাঠের সাহায্যে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নৌকা ছাড়া হতো।

সকলেই একবেলা আহার করে, সাত্ত্বিক মানুষ কুলদাচরণও তাই। বিশেষ তাই কোন অসুবিধা ছিল না। রাত্রে কোথায়ও নৌকা ভিড়াবার প্রয়োজন হতো না।

একমাত্র যাত্রীদের মধ্যে সধবা সুলোচনা, কিন্তু সে একবারই ভাল করে আহার করতো না তো দ্বিতীয়বার।

সৈরভী দেবী সুলোচনাদেরই পাড়ায় থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সুলোচনাকে জানত। অল্পবয়সে বিধবা। কুলীন-কন্যা সৈরভী। দশ বৎসর বয়েসের সময় অকস্মাৎ এক রাত্রে সত্তর বৎসর বয়স্ক এক কুলীনরাজ স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিয়ের পরদিনই প্রত্যূষে স্বামী চলে যায়। তারপর আর চার বৎসর স্বামীর কোন সংবাদও পায়নি, স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা। সংবাদ এলো একেবারে একদিন সন্ধ্যায়—স্বামীর মৃত্যুসংবাদ চার বৎসর পরে।

বিচিত্র জীবন সৈরভীর। কিন্তু আশ্চর্য, তবু সেজন্য সৈরভী কোনদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি বা নালিশ জানায়নি নিজের বিচিত্র ঐ ভাগ্যের জন্য কারো কাছে।

বাপ-মায়ের অনেকগুলি সন্তান এবং তার মধ্যে বোন ছিল ওরা পাঁচজন। তৃতীয়া সে পাঁচ বোনের মধ্যে। একে কুলীন-কন্যা, তার উপরে দারিদ্র্যের সংসার।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পরিচয় তো জন্মাবধিই। নিজের বিচিত্র বিবাহ ও বৈধব্য তাই সৈরভীকে নতুন কোন দুর্ভাগ্যের স্বাদ দিতে পারেনি। তাছাড়া যে স্বামীকে সম্প্রদানের সময় মাত্র বারেকের জন্য স্পর্শ করলো, তারপর বার দুই ঘোমটার আড়াল থেকে বাসরঘরে দেখেছিল মাত্র এবং জীবনে যার সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার দেখাই হলো না, তার মৃত্যু—নারী-জীবনের তার যতবড় শোকাবহ ব্যাপারই হোক না কেন, সে শোক সৈরভীর মনের মধ্যে কোথায়ও যদি দাগ না কাটতেই পেরে থাকে তো সেজন্য সৈরভীকেও কি দোষ দেওয়া যায়?

সর্বাপেক্ষা বড় কথা হচ্ছে সমাজের কুসংস্কারগুলো নিজের জীবনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় সৈরভীর মনের মধ্যে যেন একটা কঠিন ঘৃণার উদ্রেক করেছিল সমস্ত হিন্দু-সমাজ—তার ধর্মাধর্ম, সংস্কার ও বিধিবিধানগুলো। এবং সেই ঘৃণাই সৈরভীর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল নিবিড় একটা মমত্ববোধ অভাগিনী সুলোচনার প্রতি।

সুলোচনার সন্তানকে ধর্মের দোহাই দিয়া ও ধর্মের গোঁড়ামীতে সাগরজলে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে সৈরভী যেন কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ ঐ গোঁড়ামী ও অন্ধসংস্কারের যূপকাষ্ঠ থেকে সুলোচনার সন্তানকে বাঁচাবারও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

ঘুম ভেঙ্গে শেষ রাত্রের দিকে সুলোচনা ও তার সন্তানকে পাশে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল সৈরভী। সত্যি কিন্তু সেটা অন্য কোন কারণে নয়। কেন যেন তার ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল, সুলোচনা

নিশ্চয়ই তার সন্তানসহ জলে কোন একসময় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করেছে।

নৌকার জানালা-পথে মুখ বাড়িয়ে দেখলো সৈরভী, নৌকা পালের হাওয়ায় তর তর করে বহে চলেছে। তাড়াতাড়ি সৈরভী নৌকার কামরার ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কুলদাচরণের খুব প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করে বাইরে এসে নদীর জলে হাত-মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসেছেন। সুলোচনা এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শাস্ত্রী ঠাকুর।

কে? চমকে তাকালেন কুলদাচরণ সেই কণ্ঠস্বরে।

সুলোচনা ও তার ছেলে গোপাল তো নৌকায় নেই।

সেকি!

হ্যাঁ, শাস্ত্রী ঠাকুর। তারা আমার পাশেই শুয়ে ছিল কিন্তু এখন দেখছি তারা নেই।

নেই। নেই অর্থ কি! কোথায় যাবে তারা নৌকার মধ্যে থেকে।

তা বলতে পারচি না। তবে তারা নৌকার মধ্যে নেই।

না, না—এ যে অসম্ভব কথা। তুমি ভাল করে খুঁজে দেখেছো সৈরভী?

দেখেচি।

আর একবার দেখ। নিশ্চয়ই—

না। নেই তারা নৌকায়। তবু বলচেন যখন আর একবার দেখচি। কথাটা বলে সৈরভী নৌকার কামরার মধ্যে আবার গিয়ে প্রবেশ করল। এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসতেই কুলদাচরণ ব্যগ্র কণ্ঠে শুধালেন, কি হলো?

না। নেই—

তবে কোথায় গেল তারা। আর গেলই বা কি করে? আমি যে ব্যাপারটার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারচি না সৈরভী।

আমার মনে হয়—

কি? কি তোমার মনে হয়?

সে নিশ্চয়ই ছেলেকে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা। রাধামাধব। রাধামাধব।

হ্যাঁ, আপনিই বলুন শাস্ত্রী ঠাকুর কোন মা কি তার নিজ সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারে?

কিন্তু সেই জন্যই তো সে এসেছিল —

এসেছিল নয়, বলুন আপনারা তাকে ধর্মের দোহাই পেড়ে ভয় দেখিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসতে বাধ্য করেছিলেন।

না, না—

তা ছাড়া কি! তার স্বামীর অমঙ্গল হবে, সংসারের অমঙ্গল হবে—এই সব সাত পাঁচ বলেই না তাকে আপনারা ভয় দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু সে কথা যাক। এখন আমি মিশ্রের কাছে গিয়ে কি জবাব দেবো বলতো? সে যে আমারই ভরসায় পুত্রবধূকে তার সাগরসঙ্গমে পাঠিয়েছিল। হে মাধব। একি দুর্বিপাকে ফেললে আমাকে। তারপর একটু থেমে কি যেন ভেবে বললেন, কিন্তু তবু—তবু আমাকে ভাল করে অনুসন্ধান করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তারণ মাঝিকে ডাকলেন কুলদাচরণ।

মাঝি তো কুলদাচরণের কথা শুনে অবাক। বললে, সে কি কর্তা, আমরা মাঝ রাত্রে একবার কিছুক্ষণের জন্য নাও থামিয়েছিলাম বটে, জোয়ারের মুখে এবং বাতাস পড়ে গিয়েছিল বলে। কিন্তু সেও মাঝ দরিয়ায়। তারপর তো সমানে বসে আছি হাল ধরে। নৌকায় তারা নেই যখন তখন কোন এক সময় নৌকা থেকে ঝাঁপিয়েই পড়েছে। জোয়ারের টান এখন—

তুমি এক কাজ করো তারণ, পাড় ঘেঁসে চল—। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে চারিদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

কুলদাচরণের নির্দেশমত তারণ মাঝি পাড়ের দিকেই নৌকা টেনে নিয়ে চলল। ইতিমধ্যে নৌকার সমস্ত যাত্রীরাই ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিল।

নানা ধরণের মন্তব্য নানা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। ভোরের আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চারিদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নৌকা তীর ঘেঁসে ভেসে চলল। হঠাৎ এক সময় হাল থেকে তারণ মাঝিই চেঁচিয়ে ওঠে,—কর্তা, ঐ বালুর চরে কি দেখা যায় দেখেন।

কই। কোথায়?

ঐ—ঐযে—আরে—ঐতো আমাদের মা-ঠাকরুণ—

সত্যিই সে সময় চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে উঠেছে সুলোচনা। গোপালই যখন তার জলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তখন কি হবে আর বৃথা জীবন রেখে।

সুলোচনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পায়ে পায়ে জলের মধ্যে নামতে শুরু করে। তারণ চেঁচিয়ে ওঠে, কর্তা, মা-ঠাকরুণ জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছেন যে—।

কুলদাচরণ চীৎকার করে ডাকেন—সুলোচনা! সুলোচনা।

কিন্তু কুলদাচরণের সে ডাক সুলোচনার কর্ণে প্রবেশ করে না। সে নেমে চলেছে তখন গভীর জলের দিকে ক্রমশঃ।

সুলোচনা। সুলোচনা।

কুলদাচরণ ডাকেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাত্রীরাও চীৎকার করে ডাকতে থাকে, সুলোচনা সুলোচনা—

সুলোচনা কিন্তু তবু নেমে চলেছে।

সুলোচনার থেকে নৌকার ব্যবধান তখনও কিছুটা রয়েছে। কুলদাচরণ আর বিলম্ব করলেন না। নৌকা থেকে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঐ সময় সুলোচনাও জলের মধ্যে ডুব দিল একেবারে সঙ্গমের কাছাকাছি বলতে গেলে জায়গাটা। এবে জোয়ার তার উপরে জলের তীব্র স্রোত। বড় বড় ঢেউ। আথালি পাথালি করছে জল।

প্রায় মিনিট কুড়ি জলের সঙ্গে স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে কো মতে তারণ মাঝির সাহায্যে প্রায় হতচেতন সুলোচনাকে নৌক এনে তুললেন কুলদাচরণ। শুইয়ে দেওয়া হলো সুলোচনাে নৌকার পাটাতনে। সব যাত্রীরা এসে চারপাশে ভিড় ক দাঁড়াল।

[ক্রম

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ ও তাল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

বিশ্বজগতের চলমান বস্তুমাত্রেরই এক-এক প্রকার গতি আছে। মানুষ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্যন্ত গতিশীল—অবস্থা ভেদে গতি লঘু অথবা দ্রুত হয়। এই গতি যখন নিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই স-ছন্দ হয়ে ওঠে। মানুষের চলাফেরারও ছন্দ আছে—ব্যক্তিভেদে ও আনন্দ, উল্লাস, অবসাদ ইত্যাদি অবস্থাভেদে তার তারতম্য ঘটে। এই ছন্দ যেমন ব্যক্তি বিশেষের প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দেয়, তেমনি ব্যক্তিভুক্ত সমাজের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গেও পরিচয় ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'যেমন মানুষের আত্মার, তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজ ও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে তা হলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ প্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয় তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেই জন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।"

যুগ যুগ ধরে মানুষ ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তৎসম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে ক্রমবর্ধমান নিপুণতার সহিত সাহিত্যে ও চারুকলায় প্রয়োগ করেছে।

একটি আপ্ত-বাক্য আছে, সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। কথাটি সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে কৃত্রিম উপায়ে স্রোতকে রোধ করেছে। আবার প্রয়োজনের তাগিদেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেকেণ্ড-রূপী সময়ের একটা ন্যূনতম মান (unit) নির্ধারণ করে তার অনুপাতে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বৎসরের সময় পরিমাপের উপায় উদ্ভাবন করেছে। তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও গায়ন-বাদন ক্রিয়ায় সময় পরিমাপের জন্য একটি ন্যূনতম মান নির্ণয় করা হয়েছে। এই ন্যূনতম মানকে বলা হয় মাত্রা। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টি এক একটি তাল গঠন করে। তালে মাত্রাগুলি নির্দিষ্ট ভাগে 'বিভক্ত' থাকে। যে মাত্রা-সংখ্যাগত নিয়মে তালের প্রত্যেক ভাগে মাত্রাগুলি গ্রথিত থাকে, সংগীতের ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় ছন্দ।

সংগীতের ধারা প্রবহমান। গতি যেখানে রুদ্ধ, প্রগতি সেখানে সুদূর পরাহত। আমাদের দেশের ও সমাজের নানা অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগীতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে আমাদের সংগীতে যে-সব ছন্দ ও তাল প্রচলিত ছিল, এখন সে-সব ছন্দ বহুলাংশে অপ্রচলিত হয়ে নতুন নতুন ছন্দ ও তালের উদ্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের সংগীত-ইতিহাসকে যদি তিনটি যুগের অন্তর্গত করা যায়—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ, তা হলে রবীন্দ্রনাথকে শেষোক্ত বর্তমান যুগের সংগীত-স্রষ্টা হিসাবেই গণ্য করতে হয়। যে কারণেই হোক, বর্তমানে ভারতবর্ষে দুটি সংগীত-ধারা প্রচলিত—উত্তর-ভারতীয় সংগীত ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত। আমাদের এতৎ-প্রদেশীয় লোকদের উপর যে উত্তর-ভারতীয় সংগীতের প্রভাবই অধিকতর, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে এই উত্তর-ভারতীয় সংগীতের তালগুলি তাঁর গানে যোজনা করেছিলেন, তবে দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতের তালও তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নি, বলা যায় না। তা ছাড়া, নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছন্দ তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি কাব্যধর্মী। কাব্যধর্মী বলার উদ্দেশ্য এই যে, কবিতা ও গানের ছন্দ বহুলাংশে পৃথক হলেও, উল্লিখিত রবীন্দ্রসংগীতগুলিতে কাব্যানুযায়ী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তেরো ও সতেরো মাত্রার তাল ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে চার মাত্রা থেকে আরম্ভ করে আঠারো মাত্রা পর্যন্ত সব তাল ব্যবহৃত হয়েছে। নীচে তার ক্রমিক তালিকা নির্দিষ্ট ছন্দ, তালাংক ও ঠেকা গানের দৃষ্টান্ত সহ দেওয়া গেল। তারকা-চিহ্নিত ছন্দগুলি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক নতুনভাবে ব্যবহৃত। পূর্বেই বলা হয়েছে তেরো ও সতেরো মাত্রার তাল রবীন্দ্রসংগীতে নেই। বিলম্বিত লয় বোঝাবার জন্য কোনো কোনো স্বরলিপিতে মধ্যমান, বিলম্বিত ত্রিতাল, বিলম্বিত একতাল প্রভৃতি তালকে স্বরলিপিতে হ্রস্বমাত্রায় অর্থাৎ মাত্রা-সংখ্যা দ্বিগুণিত করে দেখানো হয়। সে রকম তালগুলি নিম্ন-তালিকায় সম-মাত্রাতেই লিখিত হল। তালগুলিতে মাত্র একটি করে ঠেকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে সুষ্ঠুভাবে ছন্দ প্রকাশের জন্য একই তালের বিভিন্ন গানে বিভিন্ন প্রকার ঠেকা ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়। মাত্রা ও তালের চিহ্ন আকার মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুযায়ী দেওয়া হল:

চার মাত্রার তাল: ২।২ মাত্রার ছন্দ *

I ‍ ‍ ‍ ‍ । ‍ ‍ ‍ ‍ I

১´ ‍ ‍ ‍ ‍ •

তবলার ঠেকা: I ধা ধিন্‌। না তিন্‌ I

গান: সবারে করি আহ্বান

পাঁচ মাত্রার তাল

ঝম্পক : ৩।২ মাত্রার ছন্দ *

I । । । | । । I
১´ ২

তব্‌লার ঠেকা : I ধি ধি না | ধি না I

গান : দুঃখের বেশে এসেছ বলে

অর্ধ ঝাঁপতাল : ২।৩ মাত্রার ছন্দ

I । । | । । । I
১´ ২

তব্‌লার ঠেকা : I ধি না | ধি ধি না I

গান : দীপ নিবে গেছে মম

ছয় মাত্রার তাল

দাদ্‌রা : ৩।৩ ছন্দ

I । । । | । । । I
১´ •

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধি না | না তি না I

গান : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

২।৪ মাত্রার ছন্দ *

I । । | । । । । I
১´ •

তব্‌লার ঠেকা : I ধি না | ধা ধি ধি না I

গান : শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে

৪।২ মাত্রার ছন্দ *

I । । । । | । । I
১´ ২

তব্‌লার ঠেকা : I ধি না না ধি ধা ধি I

গান ॥ হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

একটানা ৬ মাত্রার ছন্দ *

I । । । । । । I
১´

তব্‌লার ঠেকা : I ধি না না ধি না ধি I

গান ॥ হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে

সাত মাত্রার তাল

তেওরা : ৩।২।২ মাত্রার ছন্দ

I । । । | । । | । । I
১´ ২ ৩

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধি না | ধি না | ধি না I

গান ॥ আনন্দেরি সাগর হতে

পাখোয়াজের ঠেকা : I ধা খেনে নাস্‌ | গ দ্দি | খেনে নাস্‌ I

গান ॥ আজি বহিছে বসন্ত পবন

৩।৪ মাত্রার ছন্দ

I । । । | । । । । I
১´ ২

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধি না | ধি না না ধি I

গান ॥ তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি

আট মাত্রার তাল

কাহার্‌বা : ৪।৪ মাত্রার ছন্দ

I । । । । | । । । । I
১´ •

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধি না তি | না ধি ধা ধি I

গান ॥ আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা

আট মাত্রার যৎ : ২।২।২।২ মাত্রার ছন্দ

I । । | । । | । । | । । I
১´ ২ • ৩

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধিন্‌ | ধা ধাধা ধিন্‌ | না তিন্‌ | ধা ধাধা ধিন্‌ I

গান ॥ যা হবার তা হবে

রূপকড়া : ৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ *

I । । । | । । | । । । I
১´ ২ ৩

পাখো: ঠেকা : I ধাগে তেটে তেটে | তাগে তেটে | কেটে তাগে তেটে I

গান ॥ গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে

তব্‌লার ঠেকা : I ধা ধি না | ধি না | ধি ধি না I

গান ॥ কেন সারাদিন ধীরে ধীরে

নয় মাত্রার তাল

নবতাল : ৩।২।২।২ মাত্রার ছন্দ *

I। । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩ ৪

পাখো: ঠেকা : I ধা দেন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে I

গান ॥ নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

৫।৪ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ) *

I । । । । । । ।। । । । I
১´ ২

তবলার ঠেকা : I ধা ধি না ধি না । ধা ধি ধি না I

গান ॥ ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথভুলে

৩।৬ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ) *

I। । । । । । । । । । I
১´ ২

তবলার ঠেকা : I ধা ধি না । ধা ধি ধি না ধি নাI

গান ॥ ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথভুলে

একটানা ৯ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ) *

I । । । । । । । । । I
১´

তবলার ঠেকা : I ধা ধি না ধি ধি না ধি ধি না I

গান ॥ দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি

দশ মাত্রার তাল

ঝাঁপতাল : ২।৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ০ ৩

তবলার ঠেকা : I ধি না । ধি ধি না । তি না । ধি ধি না I

গান ॥ চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে

পাখোয়াজের ঠেকা : I ধা গে । ধা গে দিন্ । তা কে । ধা গে দিন্ I

গান ॥ তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম

সুর ফাঁকতাল (সুরফাঁক্তা) : ৪।২।৪ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩

ভিন্নরূপ মাত্রা-ভাগ: I । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ০ ২ ৩ ০

পাখোয়াজের ঠেকা : I ধা ঘেড়ে নাগ ধি । ঘেড়ে নাগ । গ দ্দি ঘেড়ে নাগI

গান ॥ বাজাও তুমি কবি, তোমার সংগীত সুমধুর

৫।৫ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ) *

I । । । । । । । । । । । I
১´ ০

তবলার ঠেকা : I ধা ধি ধি না ধি । না ধি ধি না তি I

গান ॥ ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল

এগারো মাত্রার তাল

একাদশী তাল : ৩।২।২।৪ মাত্রার ছন্দ *

I। । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩ ৪

পাখোয়াজের ঠেকা :—

I ধা দেন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে I

গান ॥ দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে

*৩।৪।৪ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ) *

I / / / / / / / / / / / / / / / / /
১´ ২ ৩

তবলার ঠেকা : I ধা ধি না । ধা দি ধি না । ধা ধি তেরে কেটে I

গান ॥ কাঁপিছে দেহলতা থরথর

বারো মাত্রার তাল

একতাল : ৩।৩।৩।৩ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ০ ৩

ত: ঠে: I ধা ধি না । না তি না । কৎ তেটে ধিন্ । তেটে ধিন্ তেটে I

গান ॥ এই করেছ ভালো নিঠুর হে

চতুর্মাত্রিক একতাল : ৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩

ত: ঠে: I ধিন্ ধিন্ না না । ধিন্ না কৎ তে । ধা তেরেকেটে ধিন্ না I

গান ॥ নয়ান ভাসিল জলে

চৌতাল : ২।২।২।২।২।২ মাত্রার ছন্দ

I । । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

পাখোয়াজের ঠেকা :

I ধা ধা । দিন্ তা । কৎ তাগে । দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে I

গান ॥ বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে

চৌদ্দ মাত্রার তাল

আড়া চৌতাল : ২।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ

I । । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩ ৪

পাখোয়াজের ঠেকা :

I ধা গে । ধা গে দিন্ তা । কৎ তাগে দিন্ তা । তেটে কতা গদি ঘেনে I

গান ॥ শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণ ছটা মাঝে

ভিন্নরূপ মাত্রা-ভাগ

I । I
১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০

ষৎ তাল : ৩।৪।৩।৪ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ০ ৩

ত: ঠেকা: I ধা ধিন্ । । ধা গে তিন্ । । না তিন্ । । ধা গে ধিন্ । I

গান ॥ একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা

ধামার : ৩।২।২।৩।৪ মাত্রার ছন্দ

I। । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ০ ২ ০ ৩

পা: ঠেকা : I ধ ঘে টে । ঘে টে । ধা । । গ দি নে । দে নে তা । I

গান ॥ সুধা সাগরতীরে হে এসেছে নরনারী

ভিন্নরূপ মাত্রা-ভাস

১। I । I
১´ • ২ • ৩ •

২। I । I
১´ ২ • ৩

পনেরো মাত্রার তাল

পঞ্চম সওয়ারি : ৪।৪।৪।৩ মাত্রার ছন্দ

I । । । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ ৩ ৪

তবলার ঠেকা : (হ্রস্বমাত্রা)

I ধা । কেটে তাগ্‌ থন্‌ না কেটে তাগ ।
১´

। তে কেটে তাগ দিৎ তা কেটে দিন্‌ তা ।
২

। তাগ তেটে তেটে তাগ্‌ নে ধা কেটে তাগ্‌ । তাগ দিৎ । তাগ দিৎ । I
৩ ৪

গান ॥ আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি

ষোলো মাত্রার তাল

ত্রিতাল : ৪।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ

I । । । । । । । । । । । । । । । । । । । I
১´ ২ • ৩

তবলার ঠেকা :

I না তিন্‌ তিন্‌ না । তেটে ধিন্‌ ধিন্‌ না । ধা ধিন্‌ ধিন্‌ না । না ধিন ধিন্‌ না I

গান ॥ এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা

বিলম্বিত ত্রিতাল

তবলার ঠেকা : I ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা । ধিৎ তাগে তেরেকেটে ধি ।
১´ ২

না তিন্‌ তিন্‌ তা । ধিৎ ধাগে তেরেকেটে ধি I
• ৩

গান ॥ এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে

আড়াঠেকা বা তিলবাড়

ঐ: ঠেকা : I ধি । ধা গি । । ধি তা । । কি । তা গি । । ধি ধা । I
১´ ২ • ৩

গান ॥ এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলি খেলা

মধ্যমান

তবলার ঠেকা : I ধি :ধা গেধিন্‌ । । ধি :ধা গেধিন্‌ । ।
১´ ২

ধি :ধা গেধিন্‌ । । কী :তা গেধিন্‌ I
• ৩

গান ॥ কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু

আঠারো মাত্রার তাল

নবপঞ্চতাল : ২।৪।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ *

I । । । । । । । । । । । । । । । ।
১´ ২ ৩

পাখোঃ ঠেকা : I ধা ধা । ধাগে তেটে দেন্‌ তা । তাগে তেটে দেন্‌ তা—

। । । । । । । । । । । I
৪ ৫

তেটে কতা গদি-ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে I

গান ॥ জননী, তোমার করুণ চরণখানি

রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত তালের এই হল মোটামুটি দৃষ্টান্তের স্থল। তাল ও তালাঙ্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। করতালি দ্বারা মাত্রার সংখ্যাগত ভাগের হিসাব রক্ষা করা হত বলে তালি এবং তালি থেকে তাল শব্দটি উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। তালাঙ্ক অর্থে উক্ত ভাগগুলির গাণিতিক হিসাব বোঝায়। ১´, ২, ৩, • ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তালাঙ্ক নির্দিষ্ট হয়। এই সংখ্যাগুলি প্রত্যেকটি তালের প্রত্যেক ভাগের নীচে বা উপরে বসে। ১´ সংখ্যাটি সমের চিহ্ন। উক্তস্থলে + বা × চিহ্নও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ ২´ সংখ্যাটিও কোনো কোনো তালের সমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। তদনুযায়ী তাঁরা ঝাঁপতাল, একতাল, চৌদ্দ মাত্রার যৎ, ষোল মাত্রার সব তালেই ২´-৩-•-১ এই ক্রমে তালাঙ্ক গণ্য করেন। গানে সর্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁকের স্থানে সম-চিহ্ন বসে এবং তদনুসারে অন্যান্য তালাঙ্কগুলি ব্যবস্থিত হয়। তালে ব্যবহৃত তালাঙ্কগুলির মধ্যে ১´, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা আঘাত ও • দ্বারা অনাঘাত সূচিত হয়। অনাঘাতের স্থানকে ফাঁক বা খালি বলা হয়। সমপদী তালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব তালের প্রত্যেক পদ বা চরণ (ভাগ) পরস্পর সমান, যেমন দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল ইত্যাদি, সে-সব তালের সম-স্থানকে নির্দিষ্ট রাখার জন্য ফাঁক দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এ-সকল তালের ক্ষেত্রে একটানা আঘাত দেওয়া হলে সম-স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। অপরপক্ষে, বিষম তালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব তালের সকল ভাগ পরস্পর সমান নয়, যেমন তেওরা, ফাঁক দেওয়া হয় না। কারণ, ৩।২।২ মাত্রা-ছন্দের তেওরা তালে তিন মাত্রার বড়ো ভাগটি যতবারই ঘুরে আসুক-না কেন, তার প্রথম মাত্রাতেই যে সম, এটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু ২।৩।২।৩ মাত্রা-ছন্দের ঝাঁপতালের অর্ধাংশ ২।৩ মাত্রা-ছন্দ যদিও বিসমপদী কিন্তু বাকি অর্ধাংশ ঠিক সেরূপ ২।৩ মাত্রা-ছন্দ হওয়াতে ঝাঁপতাল বিসমপদী হয়েও এক হিসাবে সমপদী। সেজন্য ঝাঁপতালে ফাঁক ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ ঝাঁপতালকে অর্ধ-সমপদী তাল বলে থাকেন। কিন্তু ঝাঁপতালের ক্ষেত্রে অর্ধ-সমপদী শব্দও প্রযোজ্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুক্তছন্দের গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত আছে, যেগুলি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তালবদ্ধভাবে না গেয়ে মুক্তছন্দে অর্থাৎ 'টেনে টেনে আলাপী ঢঙে' গাওয়ার রীতি আছে। কিন্তু ওই গানগুলিও লয়বিশেষ রক্ষা করে গীত হয়। এই লয় মাত্রার লয়। তালে মাত্রা এককভাবে যেমন লয়বদ্ধ থাকে, তেমনি সমষ্টিগত ভাবেও

লয়ের বাঁধন মেনে চলে। মুক্তছন্দের গানে এরূপ সমষ্টিগতভাবে মাত্রার লয় রক্ষা করার প্রশ্ন না থাকলেও এককভাবে লয় রক্ষা করা আবশ্যক। গানবিশেষে এরূপ গানের লয় সুর অথবা কাব্য এ দুয়ের যে কোনো একটির মাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ বোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেই শিল্পী মুক্তছন্দের রবীন্দ্রসংগীতগুলি ঠিক ঠিক রূপায়ণ করতে সমর্থ হন। তা না হলে লয় ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকেই।

রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ ও তাল সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল মাত্র।

আমার কথা (৭২)

শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ

(বাংলার অন্যতমা সঙ্গীতজ্ঞা)

১১৩২ সাল হতে ১১৩৪ সাল পর্যন্ত ৭।৮ বৎসর বয়সের সুধাকণ্ঠী কুমারী চামেলী বসুই যৌবনে বাংলার সঙ্গীতজগতে আত্মপ্রকাশ করলেন সাবিত্রী ঘোষ নামে। নিজ কৃতিত্বে নিজেকে না হারিয়েই সঙ্গীত-জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীমতী ঘোষ। বাংলার সঙ্গীত-জগতে যে কয়েক জন মহিলা কণ্ঠ সঙ্গীতে জনচিত্তে আসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন, শ্রীমতী ঘোষ তাঁদের অন্যতমা।

শ্রীমতী ঘোষ বললেন : ১১২২ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে ঢাকা সহরে জন্মেছি আমি। পিতা শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন বসুর একমাত্র সন্তান আমি। ছেলেবেলা হতে মায়ের কাছেই সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয় আমার। আমার বয়স যখন ৭।৮ বৎসর তখন থেকেই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করি। ১১৩৪ সালে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের শিক্ষাধীনে হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করি।

বৎসরাধিক কাল হিমাংশু বাবুর সুশিক্ষার গুণে আধুনিক গান ভাল ভাবেই গাইতে থাকি এবং তখন হতেই জনসমাজে আমার নাম আমার অজান্তেই প্রকাশ পেতে থাকে। ঐ সময় হ'তেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা এবং ঢাকা কেন্দ্র হতে ক্রমাগত গান গাইবার আমন্ত্রণ আসতে থাকে। এই সময় থেকেই ভর্ত্তি হলাম সঙ্গীত-সম্মেলনে এবং সৌভাগ্য বশতঃ সাক্ষাৎ পেলাম ৺গিরিজা চক্রবর্তী এবং সুখেন্দু গোস্বামীর মত গুরুজনদের। শিখতে লাগলাম, ধ্রুপদ খেয়াল, ঠুংরী এবং উপাধিও পেলাম "গীতশ্রী"। জীবনের অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত একটানা সঙ্গীতস্রোতের হঠাৎ বাধা পড়লো এসে ১১৩১ সালে। ১১৩১ সালে আমার বিয়ে হলো, আমি সাবিত্রী বসু সাবিত্রী ঘোষ হলাম। ১১৩১ থেকে ১১৪১ সাল পর্যন্ত গানের জগত হতে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম বটে কিন্তু তা স্থায়ী হলো না বেশী দিন। পুনরায় ১১৪২ সালে কাজী নজরুল সাহেবের তত্ত্বাবধানে আবার রেকর্ড করলাম হিজ মাষ্টারস ভয়েস কোম্পানীতে। এর পর হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস কোম্পানী ছেড়ে দিয়ে শিল্পী হলাম হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে এসে শ্রীজ্ঞান ঘোষ, শ্রীদুর্গা সেন, শ্রীকালীপদ সেন, শ্রীযুত শচীন দেববর্ম্মণ, ৺অনুপম ঘটক ও হীরেন বসুর সঙ্গীত পরিচালনায় বহু গান রেকর্ড করি এবং ধারাবাহিক ভাবে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হতে গানও গাইতে থাকি।

গান সব রকমই গেয়ে থাকি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগপ্রধান এবং ভজন গানই আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে। জনসাধারণের খাতিরেই আমাকে আধুনিক গান চর্চ্চা করতে হয় এবং শ্রীযুত হীরেন বসুর সহযোগিতায় অনুপম বাবুর কাছেই আমি আধুনিক গান শিখতে থাকি। অনুপম বাবু ছাড়া আর যাঁদের কাছে আমি আধুনিক গান শিখবার জন্য ঋণী, তাঁদের মধ্যে প্রকাশকালী ঘোষাল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রেডিও রেকর্ড ছাড়া চিত্রেও প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে গান করেছি অনেক।

প্রথম যে চিত্রখানিতে প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে গান করি, তার নাম ছিল "ছদ্মবেশী"। সালটা ঠিক মনে না থাকলেও যতটা মনে পড়ছে ১১৪৩ সাল। এর পর ক্রমে "তপোভঙ্গ", "অভিশপ্ত", "প্রতিধ্বনি", "সঙ্কালী", "মন্ত্রমুগ্ধ", "তুলসীদাস", "কৃষ্ণকাবেরী", "বিল্বমঙ্গল", "বিক্রম-উর্বশী" এবং "দুই বোনে"র নাম এখনো মনে পড়ে। ছোটবেলা থেকে গানের মাঝে ডুবে গিয়েছিলুম বলে পড়াশুনার দিকটা একরকম চাপাই ছিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই যেন পড়াশুনার জন্যে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা মনকে দোলা দিতে থাকতো।

জীবনের ৩৪ বৎসর পর্যন্ত কোন রকমে সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখলেও শেষ রক্ষা করতে পারি নাই। বাধ্য হলাম স্কুলে যেতে এবং পাশও করলাম ম্যাট্রিক ১১৫৭ সালে। ভর্ত্তি হলাম আর্ট-এ'তে আশুতোষ কলেজে এবং ১১৬০ সালে পাশ করলাম আর্ট-এ। পুনরায় ভর্ত্তি হলাম বি-এ ক্লাসে ঐ একই কলেজে এবং বর্তমানে বি-এ ক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যে আমি একজন। বাকী জীবনে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাসনা ছাড়া ৺ভগবানের কাছে বিশেষ কিছু আর চাইবার নাই আমার। যে কয়েকটি কামনা লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চলেছি, তার মধ্যে আমার একমাত্র ছেলে প্রণবের ভবিষ্যৎ-জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা, নিজের পড়াশুনাটুকু শেষ করা, দুইটাই প্রধান। চিরদিনের সাথী গান গাওয়ার নেশা এখনো ছাড়তে পারি নাই এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ছাড়তে পারবো কিনা জানি না। এ ছাড়া রয়েছে জীবনের একমাত্র সখ ছবি আঁকা। সময় পেলেই বসে বসে শুধু ছবি আঁকার আনন্দে ডুবে থাকি।

সাবিত্রী ঘোষ

বার্ধক্যে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

ছন্ম

নন্দাদেবী পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেদিন। অবসান আসন্ন হয়েছে নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল একটি দিনের। চলে যাবার, সরে যাবার মুহূর্তে জ্বলে উঠেছেন সর্বপাপঘ্ন, জবাকুসুম-সঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকর দ্বিগুণতর দীপ্তিতে কলকল্লোলিনী মহাসমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে চির-নিরুত্তর দেবতাত্মা হিমালয় অক্লান্ত প্রহরীর মত অদূরে দণ্ডায়মান 'সেই অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচলে' এসে পড়েছে বেলাশেষের আলো; সে আলো জ্বলজ্বল করছে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির প্রসন্নাননে; সে আলোয় ছলছল করছে 'ভুবন-মনোমোহিনী' এই ভারতবর্ষের 'অনিলাবকম্পিত' অরণ্যের 'শ্যামল অঞ্চলে'। সে আলোয় টলমল করছে 'নীলসিন্ধুজলের' স্নেহ; সেই আলো যার আশীর্বাদ মাথায় করে রাত্রির অতল অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে নদী—নবপ্রভাতের অকূল আলোতে।

এই অপরূপকে দুটি নয়ন মেলে দেখছে সেদিন এক তরুণ বাঙালী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামরিক পূর্তবিভাগের সঙ্গে যুক্ত সে, তখনও জানে না দাসত্ব থেকে প্রভুত্বে, 'সামান্য' থেকে 'অসামান্যে' উত্তীর্ণ হবার কি 'অনন্তমুহূর্ত' আসন্ন হয়েছে সেই এক পরমাশ্চর্য প্রদোষে। মেঘে মেঘে রঙের কুসুম ভুলে অস্তাচলে ঢুলে পড়ার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এক তরুণ সত্তা কোন অনির্বচনীয়ের আভাস পাচ্ছেন কে জানে! প্রতি রোমকূপে এ কিসের রোমাঞ্চ; বুকের মধ্যে কেন শিবের ডমরুধ্বনি; কানে বাজে কার বীণা; নাসিকায় আসে গন্ধে মাতালকরা কিসের পারিজাত-বাস; জিহ্বায় ক্ষরিত হতে থাকে অমৃত নিস্যন্দ; সুধায় ভরে যায় সমস্ত বসুধারা।

হঠাৎ কেঁপে ওঠে তার অন্তরাত্মা, অরণ্যাত্মা দুর্গম পর্বত-কন্দর কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তার নাম ধরে কে ডাকে এই অজানা, এই অচেনা দ্রোণাগিরির নির্জন অন্ধকারে! এ কার কণ্ঠস্বর? ভীষণ চেনা; তবু অচেনা। জন্মজন্মান্তরের জানা; তবু অজানা। এ আহ্বানের কেবল আওয়াজ নেই; আলোও আছে। এ কেবল জিজ্ঞাসা নয়; জবাব। মৃত্যুরোগের শয্যাপার্শ্বে জীবন-আরোগ্যের বুঝি এই ডাক তার! এই দুরন্ত ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় আছে কার? এই ডাকে যে জেগে ওঠে তামসনিদ্রার 'লজ্জাকর' আরাম থেকে আত্মবিস্মৃত কুম্ভকর্ণ। এই ডাকে যে পঙ্গু দুপায়ে হঠাৎ জেগে ওঠে উত্তুঙ্গ গিরি-অতিক্রমের উদ্দাম উপায়: এই ডাকে যে চির-মূক হয় অচির-মুখর!

তবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় তরুণ-অধরে কিছুতেই সাড়া জাগে না; উত্তর দিতে অসমর্থ হয় সে দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়া আকাশের আঁচলে দেখা দেওয়া চুমকির দলের একটি নক্ষত্র যদি এসে পড়ত তার হাতের মুঠোয় সে মুহূর্তে তবুও দ্রোণাগিরির নিঃসঙ্গ অন্ধকার থেকে তার নাম ধরে উঠে আসা এই ডাকে সে যেমন অবাক হয়েছে এমন হতবাক হয়েছে। চলমান মুহূর্তের দল দাঁড়ায় না; নদীর জল বয়ে যায় যেমন বয়ে গেছে সে চিরকাল তরতর করে; অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে অরণ্যে-পর্বতে। বনে বনে গান ওঠে শুধু; 'ওপারে মুখর হলো কেকা ঐ, এপারে নীরব কেন কুহু হায়?'

আহ্বানের কেকা ধ্বনি যদি বা জাগে, সমর্পণের কুহু তবু কেন প্রতিধ্বনি করে না, কে জানে? আবার উচ্চারিত হয় আহ্বান। শ্যামাচরণ? অতল অন্ধকার থেকে অকূল আসে সে ডাক: আকাশে বাতাসে অরণ্যে পর্বতে, তরুণ সেই পূর্ত-কর্মচারীর অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে সে আহ্বান: শ্যামাচরণ। তবু চরণ স্থাণুর মত অচল হয়ে থাকে; এক পাও এগোয় না। এমন সময় আহ্বানের খেয়া বেয়ে এসে দাঁড়ান স্বয়ং আহ্বানকর্তা। বিস্ময়বিস্ফারিত দুটি তরুণ চোখ তাকিয়ে দেখে সময়ের চেয়ে বয়সে পর্বতের চেয়ে মহিমায়, নদীর চেয়ে স্বচ্ছতায় বড় জটার অরণ্যে আবৃত তবু জ্যোতির্ময়, এক আনন পৃথিবীতে এই প্রথম সুশীতল বারির আধার অচল কূপ নিজে থেকে হেঁটে আসে তৃষ্ণার্তের কাছে।

সন্ন্যাসীর আননে ছড়িয়ে পড়ে প্রসন্নতা হাস্যের দীপ্তি; 'শ্যামাচরণ আ গয়া? হ্যাঁ। নিরুত্তর তরুণ আননে পড়তে পারেন অনায়াসে সময়ের সুবার্তা, তিনি সময়ের চেয়েও যিনি প্রাচীন, হ্যাঁ নদী এসে পড়েছে সিন্ধুমুখে; রাত্রির তিমির উপস্থিত ঊষার সম্মুখে; শ্যামাচরণে এসে পড়েছে, রক্তজবা।

তবু ঘোর কাটে নি স্বপ্নাচ্ছন্ন তরুণ চোখে, তাই সন্ন্যাসী অঙ্গুলিনির্দেশ আকর্ষণ করেন তরুণ দৃষ্টির পূর্ত-কর্মচারী শ্যামাচরণ দেখে; পর্বতগুহার অন্ধকারে ব্যাঘ্রাসন, দণ্ড আর কমণ্ডলু। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বিস্মৃত অতীতকে আকর্ষণের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়; শ্যামাচরণ, এসবই যে তোমারই গতজন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসঙ্গী,—দেখো তো চিনতে পার কি না? দেখো তো মনে পড়ে কি না, এইখানে বিগতজীবনে তুমি তপস্যানিরত ছিলে!

শ্যামাচরণ ফিরে যেতে চেষ্টা করেন বিগতজীবনের নানা রঙের দিনগুলোতে কিন্তু কিছুতেই পারেন না গত জন্মের অতীতকে কথা কওয়াতে। বার বার ধাক্কা দেন স্মৃতির বন্ধ দ্বারে; সিংহদ্বার তবু উন্মুক্ত হল কই? শ্যামাচরণকে হঠাৎ ছুঁয়ে দেন সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দকে যেমন একদিন ছুঁয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অহল্যার পাষাণে যেমন পদস্পর্শ করেছিলেন শ্রীরাম। তেমনই

দ্রোণগিরির জনমানবহীন অন্ধকারে রূপকে স্পর্শ করে অপরূপ মুহূর্তে যা ছিলো বিগত জন্মের বিস্মৃতির শব মাত্র সেখানে জেগে ওঠে একের পর এক পূর্বাপর স্মৃতির উৎসব। মনে পড়ে। হ্যাঁ। মনে পড়ে যায় সব পূর্তবিভাগের তরুণ বাঙালী সেই কর্মচারীর। মনে পড়ে, দ্রোণগিরির এই গুহায় বসে ঠিক এর আগের জন্মে অনন্তের আরাধনা শেষ হবার আগেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। মনে পড়ে, এই ব্যাঘ্রাসন, এই দণ্ড, এই কমণ্ডলু, এই সবই তার গত জন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসহচর। আর মনে পড়ে, যিনি আজ আহ্বান করে এনেছেন এখানে অতি প্রবীণ অথচ অতি নবীন সন্ন্যাসীই ছিলেন তাঁর গত জন্মের গুরু। মনে পড়া মাত্র বোঝেন এতকাল ধরে এই সব রক্ষা করে তারই অপেক্ষায় বসেছিলেন বাবাজি মহারাজ। এখন সময় হয়েছে; অসমাপ্ত আরাধনা সমাপ্ত করবার সুসময় হয়েছে সন্নিকট। তাই জীবন তৃষ্ণার্ত করে নিজেই পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনতৃষ্ণার ক্লান্তি মুক্তির জীবন্তরূপ, যাঁর পরিচয়ের পরিমাপ হয় না দেশে কালে, সেই বাবাজি মহারাজ।

নত হলেন শ্যামাচরণ। আর তাঁরই সঙ্গে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে প্রণত হলো যেন প্রাচীন অরণ্য-পর্বত।

আমি জানি। আমি জানি এ কাহিনী পড়তে পড়তেই সংশয়ের ছায়া পড়বে সতর্ক দৃষ্টিতে। তাঁরা বলবেন এ বিশ্বাসের অযোগ্য; অলীক। যাঁরা অতদূর বলতে চাইবেন না স্বভাবের গুণে, তাঁরাও বলবেন, এ বিশ্বাসের বাইরে; অলৌকিক। না। এ অভিজ্ঞতা অলীকও নয়; অলৌকিকও নয়। সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরুক্তি করে যাঁরা বলবেন; দেয়ার আ' মো' থিংগস ইন হেভেন এণ্ড আর্থ, ভান আ' এভা' ড্রেমট অফ ইন ইয়া' ফিলসফি; অথবা এ হচ্ছে সেইরকম অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তাদের উদ্দেশ্যে বলি: না; এ বুদ্ধি, বিদ্যা, অথবা বিশ্বাসের অতীত ব্যাপার নয়। এর চেয়ে লৌকিক এর চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বরং বর্ণনা করা শক্ত।

আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি না। বিবেকানন্দর কথা বলি:

'অবিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কি না। জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই এই ধর্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।' [রাজযোগ]

এবং প্রমাণ দিতে গিয়ে বলছেন:

'উদাহরণস্বরূপ দেখ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে।' [রাজযোগ]

বিবেকানন্দ বলেছেন বলেই একথা 'সত্য' নয়; সত্য বলেই 'একথা' বিবেকানন্দ বলেছেন।

বিবেকানন্দর কথায় অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। আপনার আমার দৈনন্দিন জীবন থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত যা থেকে প্রমাণিত হবে, আমরা যাকে অলৌকিক মনে করি তা আরেকজনের কাছে সম্পূর্ণ লৌকিক। আজকের দিনেও এমন লোক আপনার, আমার সকলেরই জানা, বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁদের ছাত্রজীবনে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া থেকে শেয়ালদার কোনও কলেজে দুবেলা হেঁটে এসেছেন পড়তে; এবং পড়া শেষ হলে, বাড়ি ফিরে গেছেন হেঁটে। আগে আমরাই এতদূর হাঁটা নিজেরা কল্পনা না করলেও, অনেকেই একদা পারতেন এবং এখনও কেউ কেউ পারেন। একথা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের পরের ডিজেনারেশান [জেনারেশন কথাটা ব্যবহার করতে পারলাম না; ক্ষমা করবেন। আমরা যারা বাঙালী তাদের আগে 'জেনারেশান' হতো; এখন 'ডি-জেনারেশান', হচ্ছে।] যখন পাশের বাড়ি যেতে অথবা নিজের বাড়ির এঘর ওঘর করতেও পায়ের বদলে যান্ত্রিক উপায়ে কাজ সারবে তখন হেঁটে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, অথবা হাওড়া থেকে রোজ শেয়ালদার কলেজে যাওয়া আসার বিবরণ শুনলে কি বলবে না যে সে বৃত্তান্ত হয় অলীক নয় অলৌকিক?

বলবে কি না আপনারাই বলুন?

এ প্রশ্ন অথবা সন্দেহ যাদের মনে জাগবে না তাদের মনে আরেকটি জিজ্ঞাসা মাছের মত মাঝেমাঝেই মাথা তুলতে পারে। সেটি হচ্ছে,—কাশীর কথা বলতে বসে শ্যামাচরণের কথা কেন? এ সন্দেহের ফণা যদি কেউ তোলে তাহলে আমার এ ছাড়া যে উত্তর নেই তা হলো: বার্দ্ধক্যে বারাণসী, এহেন ব্যক্তি যদি কেউ থাকে, তার জন্য বিরচিত নয়; অর্থাৎ এর জন্য সেই স্ত্রী বা পুরুষের 'কাপ অফ টি' নয় কিছুতেই। কাশী মানে আমার কাছে কেবল কয়েকটি ঘাট, অসংখ্য মন্দির নয়। এই ঘাটে, এই মন্দিরে যাঁরা দেহকে করেছিলেন দেহাতীতের দেউল, তাঁদের আবির্ভাব ছাড়া কাশীর সব হতো শব মাত্র; তাঁরা এসেছিলেন বলেই কাশী হতে পেরেছে বিশ্বের, বিশ্বনাথের আবির্ভাব উৎসব। এঁদের জীবনেই জ্যান্ত হয়েছেন তিনি; মাটি থেকে হয়েছেন 'মা'-টি। আরোও একটি কারণে এঁদের কথা বলি। আমার কাছে নেপোলিঁও অথবা নেহেরু কেউই কর্মী নয়; আমার কাছে কর্মী মানে রবীন্দ্রনাথ; কবি মানে রামকৃষ্ণ।

নেপোলিঁও সম্পর্কে অতিকথার মাহাত্ম্যে চালু হয়েছে যে তিনি মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোতেন; তাও ঘোড়ার পিঠে। এই শুনে নেপোলিঁও সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে যাদের চোখে ঘুম নেই, আমি তাদের একজন নই। ওই মহাশয় ভদ্রলোক যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেশী ঘুমোতেন; ঘোড়ার পিঠে নয়,—শয্যার বুকে তাহলে এমন কিছু ক্ষতি হ'তো কার? তা না করে, 'রণং দেহি'-র স্বপ্নে চোখের ঘুম উবে যাওয়ায় মস্কোর পথে কয়েক হাজার লোককে তুষার সমাধি দেবার প্রচেষ্টায় তিনি যা করে গেছেন তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবতঃ আজও হয়নি।

আর এই স্বার্থমন্ত্রজয়ন্তের Jobহরলাল। পণ্ডিতজীর প্রান্তরে

অস্তমিত ভারতের দিবাকরকে মণিপুরের প্রান্তে আবার উদিত করবার জন্যে উদ্যত নেতাজী ভারতে পদার্পণ করলে 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই,' এই নিধিরাম সর্দার লাঠি নিয়ে না লড়া পর্যন্ত এঁর ঘুম ছিল না। আজ বেরুবাড়ি পাকিস্তানের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত এঁর ঘুম নেই। ইনি সব সময়ই কাজ করেন : কারণ আরাম হারাম হায়! আরাম হারাম হলে সব সময় কাজ-কাজ,—কামের এই ব্যারাম তবে 'হারামজাদা' হায়!

কর্মী হচ্ছেন কেবল তাঁরাই যাঁরা জীবনকর্মী। যেমন শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

রবীন্দ্রনাথকে যেমন বর্ষার কবি, উপনিষদের কবি, ইত্যাদি নানারকম নামে লেবেলায়িত করার হাস্যকর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার শতবর্ষ পরেও বন্ধ হবার নয় তেমনই জীবনকর্মীকে হঠযোগী রাজযোগী, কর্মযোগী, ইত্যাদি ভূষণে ঘোষণা করবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হবার নয়। কিন্তু এঁদের যোগ, সে হঠ, রাজ, কর্ম অথবা ভক্তি যাই হোক এঁদের যোগ সেই ; বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'—বিশ্বযোগ, বিস্ময়যোগ ছাড়া কিছু নয়। জাগরণে এবং নিদ্রায় এঁদেরই কেবল বিশ্রাম নেই। মানুষকে নিরন্তর 'মান' এবং 'হুঁস' দেবার যোগ চলছে এঁদের ; মানবত্বকে বিশ্বমানবত্বে উত্তীর্ণ করবার উদ্‌যোগ।

মহাভারতের গাণ্ডীবে ছিলো শর ; স্বাধীন ভারতে মাইকে কেবল কণ্ঠস্বর। এরা বিয়োগ করে বেশী ; যোগ করে কম। এরা অকাজ করে বেশী ; কাজ করে কম। যোগ করে, কাজ করেন কেবল তিনিই,—যাঁর শর এবং স্বর,—সবই ঈশ্বর। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা স্পষ্টতই বলেছেন ঈশ্বর-বিস্মৃত ভালো কাজ মন্দ ছাড়া কিছু করে না।

সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বর খুঁজতে বেরোয় যারা তারা ঈশ্বরকে পায় না অনেকেই ; খুঁজে পায়,—কেবল সার দেবার নাম করে ছাই মেখে সং সেজে গৃহস্থকে অভয় দেবার পরিবর্তে ভয় দেখিয়ে কিছু বাগাবার উপায়। শ্যামাচরণ লাহিড়ী সংসারে থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন সার। কাশীতে যেতে হয়নি. এমন যোগী ভারতে আসেনি প্রায়ই। কিন্তু তাঁদের সকলের 'ভাব' কাশীশ্বরের সঙ্গে হলেও, তাঁদের সকলের আবির্ভাব কাশীতে নয়। কিন্তু শ্যামাচরণের দৈহিক আবির্ভাবও কাশীতে ; জীবনের অনেকটাই—বারো মাস বাসও কাশীতে ; এবং কাশীতেই একদা ঘটেছিলো তাঁর তিরোভাব।

তাই কাশীর সঙ্গে সব চেয়ে নিবিড় যোগ 'ক্রিয়াযোগ'-এর কবি শ্যামাচরণের।

কুরু এবং পাণ্ডব-গুরু দ্রোণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একলব্যকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে কেটে নিয়ে,—মহাবীর অর্জুনকে কণ্টকমুক্ত করবার কারণে। দ্রোণগুরুর নির্জন অন্ধকারে শ্যামাচরণের গুরু কিন্তু অপেক্ষা করেছিলেন জন্মান্তর পর্যন্ত। শ্যামাচরণকে একলব্য করবেন বলে নয় ; তাঁকে একলভ্য করবেন বলে। সেই এক যিনি লভ্য হলে সব লোকসান লাভ হয়ে দাঁড়ায় ; বাসনার শব দাহ হয়ে জেগে ওঠে শবাসনার উৎসব।

বাবাজি মহারাজ যখন শ্যামাচরণের বিগতজন্মের সাধনসঙ্গী দণ্ড, কমণ্ডলু ইত্যাদি আগলে অপেক্ষা করছিলেন দ্রোণগিরির নিঃসঙ্গ পর্বতকন্দরে, তখন শ্যামাচরণের থাকার কথা পাঁচশো মাইলেরও বেশী দূরে। কারণ শ্যামাচরণের কর্মস্থল দানাপুর থেকে তিনি বদলী হয়ে আসেন রাণীক্ষেতে এবং রাণীক্ষেত থেকে কয়েক মাইল দূর দ্রোণগিরিতে আসা এই 'বদলীর' অর্ডার না হলে যা অসম্ভব হত, বাবাজি মহারাজের কথায় 'শ্যামাচরণ জানতে পারেন তা বাবাজি মহারাজের ইচ্ছাশক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। নাহলে শ্যামাচরণের পরিবর্তে আসলে সে-সময়ে আসার কথা ছিলো আরেক জনের এবং দ্রোণগিরিতে শ্যামাচরণের দীক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই আবার তাঁর কর্মস্থলে যে শ্যামাচরণকে ফিরে যেতেই হবে তা' বাবাজি মহারাজের বলে দিতে দেরী হয়নি সেদিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই দীক্ষিত শ্যামাচরণকে ফিরে আসতে হয় তাঁর কর্মস্থল দানাপুরে।

কর্মস্থলে শ্যামাচরণের কর্তা বড়সাহেব শ্যামাচরণকে ডাকতেন 'চিদানন্দ বাবু' বলে। এই নামে ডাকবার কারণ শ্যামাচরণের মধ্যে আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাব বিদেশী এবং অন্যধর্মী বড়সাহেবের চোখ এড়ায়নি। তাঁর অধীনে সাধারণ কর্মে নিযুক্ত শ্যামাচরণ যে কত অসাধারণ, তার পরিচয়ও শ্যামাচরণ দীক্ষিত হয়ে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই পেলেন। সে ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখবার মত। কিন্তু সেই ঘটনার আগেই শ্যামাচরণ যে এ জগতের কর্মী হয়েও আরেক জগতের 'কবি' তা অনুভব করতে সাহেবের ভুল হয়নি। শ্যামাচরণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

এবারে যোগী শ্যামাচরণের সঙ্গে পাঠকের বর্ণপরিচয় করানোর কারণে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত ঘটনাটির উল্লেখ করি। দানাপুরে যোগী মহারাজের কর্মস্থানের অধিকর্তা সাদা চামড়া বড়সাহেব একদিন বিষণ্ণচিত্তে বসে আছেন তাঁর ঘরে। সাহেবের স্ত্রী বিলাতে গুরুতর পীড়িত, তাঁর কোনও খবর না পেয়ে দানাপুরে শ্যামাচরণের বড়সাহেব বড় উদ্বিগ্ন। লাহিড়ী শ্যামাচরণ সাহেবকে আশ্বাস দিলেন মেমসাহেবের খবর তিনি এনে দিচ্ছেন একটু বাদেই। সাহেব মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই হাসলেন। লাহিড়া বাবুকে তিনি 'চিদানন্দ বাবু' বলেন,—একথা ঠিক লাহিড়া বাবুকে তাঁর আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাবের জন্যে শ্রদ্ধা করেন একথাও ঠিক। এমন কি ভারতীয় কেউ কেউ 'অলৌকিক' কিছু-কিছু শক্তির অধিকারী,—এও ঠিক। তবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী নিশ্চয়ই কিছু তাঁদের একজন নয়, যে বলতে পারে হাজার-হাজার মাইল দূরের একজনের অসুখের অবস্থার সঠিক বিবরণ। মনে মনে আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও মুখে অনাস্থার ভাব প্রকাশ করলেন না বড়সাহেব।

অফিসের মধ্যে একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে সন্তদাক্ষিত শ্যামাচরণ তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজকে স্মরণ করলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সাহেবকে বললেন : 'ভয় নেই ; মেমসাহেব সুস্থ হয়ে উঠে শীগ্‌গির চিঠি দিচ্ছেন সাহেবকে।' মাত্র এইটুকু বলবার জন্যে ক্রিয়াবান-কবি শ্যামাচরণ শরণ নিলেন অনাদিপুরুষ তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজের। মেমসাহেব যে ভাষায় চিঠি দিচ্ছেন সেই অদৃষ্টপূর্ব পত্রের প্রতিটি অক্ষর ; প্রতিটি কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ পর্যন্ত অবিকল আবৃত্তি করে গেলেন সাহেবের কাছে।

কয়েক দিন পর, সাহেব সেই 'চিঠি' পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্ময়াপ্লুত হলেন ; কিন্তু বিস্ময় শেষ হবার পরও, অশেষ বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল তখনও।

কয়েক দিন বাদে মেমসাহেব নিজেই এলেন দানাপুরে সাহেবের সঙ্গে মিলিত হতে। সাহেব একদিন মেমসাহেবকে নিয়ে এলেন সটান অফিসের মধ্যেই, সকলের সঙ্গে তাদের boss-এরও যিনি বস্,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। শ্যামাচরণের কাছে এসে থেমে গেলেন মেমসাহেব। বলে উঠলেন : 'বিলাতে আমার অসুখের সময়ে এঁকেই আমি একদিন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছিলাম।' এর পর আর মেলাবার প্রয়োজন ছিল না ; তবু দেখা গেল হিসেব করে ঠিক যে তারিখে যে সময়ে শ্যামাচরণ ধ্যানে খবর এনে দেবার জন্যে গুরুর শরণ নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ের সেই তারিখের কথাই বলছেন মেমসাহেব।

মেমসাহেবের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে শ্যামাচরণ শুধু হাসেন।

এ হাসি কেবল বহুবিজ্ঞাপিত দাঁতের মাজনের কল্যাণে মুক্তোর মতো দাঁতে হাসা যায় না। এ হাসি হাসতে পারে,—আত্মার পরমাশ্চর্য আলো এসে পড়ায় হেসে উঠে দলের পর দল মেলে যাঁর জীবন-শতদল,—শুধু সে-ই!

দানাপুরে এসে পৌঁছবার আগেই, দ্রোণগিরিতে দীক্ষার পর, মোরাদাবাদে শ্যামাচরণ আরেকটি আমাদের অনভ্যস্ত ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে অলৌকিক ঘটনা ঘটান। মোরাদাবাদে সেবাড়াতে তিনি দু-একদিন থাকবার জন্যে ওঠেন, সেবাড়ীতেই একদিন কয়েকজন মন্তব্য করলেন যে আজকের ভারতে সত্যিকারের সাধু একজনও নেই। বাবাজি মহারাজের কাছে দিব্যজীবনের পাবকবাণীর স্পর্শে প্রদীপ্ত প্রাণের শিখা শ্যামাচরণ প্রতিবাদ না করে পারলেন না। তিনি রাণীক্ষেতে বাবাজি মহারাজের সঙ্গে সেই পরমাশ্চর্য সাক্ষাতের এবং দীক্ষার চরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার জীবন্ত বর্ণনা দিলেন। তবুও অবিশ্বাসীদের পাষাণে বিশ্বাসের প্রাণসঞ্চার হল না। শ্যামাচরণ লাহিড়া অতঃপর ভারতীয় যোগাভ্যাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হলেন। বললেন, স্মরণ করা মাত্র তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজ এখন সশরীরে উপস্থিত হবেন মুহূর্তের মধ্যে!

শ্যামাচরণকে বাবাজি কথা দিয়েছিলেন তেমন প্রয়োজন হলে শ্যামাচরণ স্মরণ করামাত্র তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে দেখা দেবেন। বন্ধঘরের মধ্যে মাটিতে আসীন শ্যামাচরণের আহ্বানে মর্ত্যশরীরে আবির্ভূত হলেন দ্রোণগিরির অমর্ত্যআভা স্বয়ং বাবাজি মহারাজ। কয়েকজনের সখের কৌতূহল মেটাবার কারণে গুরুকে আহ্বান করায় শ্যামাচরণের ওপর বাবাজি খুসী হতে পারলেন না ; তবে দেখা না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল কই? তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

অবিশ্বাসীর দলের প্রত্যেকের প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চের শিহরণ শ্যামাচরণ যে ঘরে বসে ডেকেছিলেন দ্রোণগিরির গুরুকে সেই বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাধুদের সততায় সন্দিহানদের মনের দরজাও খুলে গেল। সন্দেহের অন্ধকারে এসে পড়ল সত্যের অরুণালোক। সবাই এসে এঁকে শুধু দেখে গেল যে তাই নয় ; স্পর্শ করে গেল দর্শন-স্পর্শনের অতীত যোগী মহারাজ শ্যামাচরণের গুরু বাবাজি মহারাজকে।

অন্তর্ধান করবার আগে শ্যামাচরণের কাছে এবারে তাঁর গুরু তাঁকে আর স্মরণ করতে বারণ করে বলে গেলেন, প্রয়োজন হলে বাবাজি মহারাজ অতঃপর নিজেই উদয় হবেন।

এবং এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সে প্রয়োজন হলো।

লাহিড়ী মশায় সেদিন দৈনন্দিন ভ্রমণে বহির্গত হয়ে দেখলেন, পথের ধারে গাঁজাকাপানোন্মত্ত এক সাধু। দেখে তাঁর মন ধিক্কারে ভরে গেল। এই ধরণের সাধুদের এই অসাধু আচরণই যে প্রকৃত সাধুকেও সাধারণের চোখে অসাধু প্রতিপন্ন করে তা উপলব্ধি করে এদের প্রতি বিরাগ আরও বৃদ্ধি পেল। চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন শ্যামাচরণ। যেতে পারলেন না আর। যা দেখলেন তা তাঁর বুদ্ধির অগোচর। মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখছেন। চোখ মুছে দুহাতে আবার দেখলেন। না। ঠিকই দেখছেন তিনি ; ভুল নয়। সেই গেঁজেল সাধুর পাশে বসে শ্যামাচরণের গুরু স্বয়ং বাবাজি মহারাজ তার লোটাটা দুহাতে মেজে ঝকঝকে করে তুলছেন।

সর্বজীবে যিনি জীবনদেবতার ছায়া দেখতে পান তিনিই যোগী,—শ্যামাচরণ কাঁর গুরুর কাছে এই শিক্ষাই পেলেন।

এই শিক্ষার মধ্যে আমাদের মধ্যে আরেকটি শিক্ষা অনুস্যূত আছে। এখন তার কথা বলি। আমরা যাদের ভণ্ডতপস্বী বলি সত্যিকারের তপস্বী তাকেও ঘৃণা করেন না। গীতা যেমন বলেছেন যে আমাদের বিচারে যেগুলি সৎকর্ম সেগুলি ঈশ্বর-বিস্মৃত হয়ে করলে যেমন অসৎ কর্ম ছাড়া আর কিছু নয় তেমনই মহাজ্ঞানী মহাজনেরা বলে গেছেন ধর্মের ভাণ করাও শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম' করায়। ভণ্ডতপস্বীর জীবনেও ভাণ করতে করতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব কখনও কখনও। হসে মধ্যে

। ছিলো একদিন 'বক-ধার্মিক'; আরেক দিন বকো মধ্যে সে হয়ে দাঁড়াত পারে হংস,—একথা বলেছেন একটি সুন্দর গল্পে,—সিদ্ধজীবন স্বয়ং বামা ক্ষ্যাপা।

শ্যামাচরণকে যেমন একদিন মোরাদাবাদে কয়েকজন দম্ভ করে বলেছিল, আজকালকার সাধু মাত্রই ছাই-মাখা ভণ্ড, আসলে অসাধু; —বামা ক্ষ্যাপাকেও একদিন কয়েকজন ঠিক অনুরূপ ভাষা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলতে চেয়েছিলেন, সাধুর ছদ্মবেশে অসাধুরাই কলিযুগের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বামা ক্ষ্যাপা বললেন : না : তবে শোন—

রাজার বাড়ীতে শৌচাগার পরিষ্কার করতে গেলে এক মেথরের চোখে পড়ে যায় রাণীর অপরূপ রূপ। মেথরের মুখে বাসনার ছায়া পড়েছে দেখে বিচলিত হয় তার স্ত্রী,—সতীসাধ্বী এক মেথরাণী। মেথরের মুখে সে কেবল শুনতে পায় একটি কথা : এমন স্ত্রী, ভাগ্য না হলে হয় না। স্বামীর জন্যে পারে না এমন কাজ মেথরাণীর জানা ছিলো না। তুরন্ত সাহসের ডুপাখায় ভর করে সে রাণীর কাছে আবেদন করে ভুবনমনোমোহিনীরূপে একবার নির্জনে তার স্বামীকে সাক্ষাৎকার দানে স্বীকৃত হতে। বামনের চাঁদে হাত বাড়ানোর স্পর্ধায় রাণী না রেগে বরং অসীম উদারতায় বলেন : তথাস্তু : কিন্তু তোমার স্বামীকে বলো, রাজবাড়ীর সাধুর ছদ্মবেশে এসে বসতে; নাহলে রাণী হয়ে কি বলে তোমার স্বামীর কাছে আমি যেতে পারি? মেথরাণীর মুখে রাণীর প্রস্তাব শুনে রাতের ঘুম ছুটে যায় মেথরের। সকাল না হতেই সাধুর ছদ্মবেশে মেথর গিয়ে বসে রাজবাড়ীর সামনে। নবীন সন্ন্যাসীর সংবাদ রটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। রাজধানীর লোক ভেঙ্গে পড়ে মেথরের পায়ে। গভীর নিশীথে বন্ধ্যা রাণী রাজার অনুমতি নিয়ে দেখা করতে এলেন মেথরের সঙ্গে,—সন্তানের জন্যে বরপ্রার্থনার অছিলায়। মেথর বসে আছে নির্জন রাত্রির নিঃসঙ্গতায়। রাণী এসে দাঁড়ালেন। দু'চোখে দুরন্ত কটাক্ষ। দু'গালে হাসলেই টোল খাচ্ছে। ঠোঁটের ওপর বাঁদিকে ছোট্ট তিল,—সে তিলের জন্যে সমরকন্দ দিতে চেয়েছে কবিরা যুগে যুগে। ভুবনমোহিনী সেই রূপ নিজে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে কামনার জাগ্রত শিখায় সবুজ পোকাকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে।

কিন্তু মেথর তখন আর সাধুর ছদ্মবেশ পরে নেই শুধু; সাধুরও ওপারে চলে গেছে সে। রূপ থেকে অপরূপে উত্তীর্ণ এখন তার কাম 'না' হয়ে গিয়ে জেগেছে অন্য কামনা। রত্নাকর দস্যুর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে সমস্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রত্নের আকার রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকি।

রাণীকে একান্ত পেয়েও, নারীকে পেয়ে নির্জনে, ভণ্ড সন্ন্যাসীর তবু চঞ্চল হয় না আর মন। তার মনে হয় সাধুর ভাণ করাতেই যখন আহবান না করতেই আসে সবাই, আসে স্বয়ং রাণী, তখন না জানি সত্যিকারের সাধু হলে হয়ত এসে দাঁড়াবেন স্বয়ং ভুবনেশ্বরী; এই জগতের যিনি রাজরাণী!

এগল্প রাস্তায় শুধু পাথর ঘেঁটে বেড়ায় যে ক্ষ্যাপা, তার নয়; পাথর ঘাঁটিতে ঘাঁটতে যে পেয়ে গেছে পরশপাথর,—এ কাহিনী কেবল তাঁর মুখেই মানায়; যিনি কেবল ক্ষ্যাপা নন; যিনি স্বয়ং বামা ক্ষ্যাপা।

বামা ক্ষ্যাপার এই গল্পকে যিনি শিষ্যের জীবনে জীবন্ত করে তুলেছেন একদা তিনি স্মরণের অতীত, অতি সুদূরের রাম অথবা কৃষ্ণ নন; তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনার ঘরের লোক, শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতাল শিষ্যর বিরুদ্ধে অভিযোগে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হলে রামকৃষ্ণ একদিন শিষ্যকে ডেকে বলেন : মদ খাস কেন? আমোদের জন্যে ত? তাহলে মদে যে বিষ আছে সেটা 'আমোদের ব্যাঘাত করে যখন, তখন বিষটুকু 'মা'-কে নিবেদন করে দিয়ে শুধু সুধাটুকু নিজে নে না রে!

শিষ্যর গুরুবাক্যে আস্থা অসীম। রোজ পুজায় বসেই মা-কে বলেন : এই সুরার সব বিষটুকু শুষে নিয়ে আমাকে শুধু সুধাটুকু পান করতে দাও। কয়েকদিন পর পর মাকে এইভাবে ভোগ দেখার পর হঠাৎ মনে হয়, এ কি? যাকে 'মা' বলি, বিশ্বাস করি মাটি নয়, আসলে আমার 'মা'-টিই বলে,—তার মুখে ছেলে হয়ে বিষ তুলে দিই কি করে? সুরাপান ত্যাগ করে মাতাল শিষ্য মাতৃনামের সুরাপানে উন্মত্ত হয় মুহূর্তে।

[ক্রমশঃ।

যাযাবর হাঁসেরা

শ্রীপদ্মা গঙ্গোপাধ্যায়

যাযাবর হাঁসেরা
আকাশে মেলে দিল ডানা।
এদেশে এসেছে শীত, নেই শস্যকণা।
ঝরেনা আকাশ হতে সোনাঝরা দিন,
ঝরেনা আলোছায়ার মদিরাময় রাত স্বপ্নলীন।

শুধু তুহিন হিম, ঝরে হিম,
ডানায় জড়ায় ডানা।
তাই যাযাবর হাঁসেরা মেলেছে পাখা।
তরঙ্গরেখায় উড়ে যায়,
দূরে, দূরে, অনেক দূরে।

ক্লান্তি জানে না,
চলেছে অজানা দেশের খোঁজে।
যেখানে আছে শস্য, আছে আশা,
তপ্ত নরম ভালোবাসা।

আছে সোনালী দিন, আকাশ নীল,
জ্যোৎস্নারাত স্বপ্নলীন,
যেখানে নেই তুহিন হিম,
সেই দেশে চলেছে উড়ে,
দূরে, দূরে, অনেক দূরে,
যাযাবর হাঁসেরা।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ইডেনে শীতের দুপুর

শঙ্করীপ্রসাদ বসু যখন কিছুদিন আগে ক্রিকেট সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লিখতে সুরু করেছিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হয়েছিল বাংলায় ক্রিকেট নিয়ে এই ধরণের লেখা সম্ভব এই কথা ভেবে। তাঁর নতুন প্রকাশিত ক্রিকেট-বিষয়ক গ্রন্থ 'ইডেনে শীতের দুপুর' সেই চকিত বিস্ময়কে স্থায়ী করেছে। গ্রন্থটি প্রমাণ করেছে, বাংলায় ক্রিকেট নিয়ে কেবল লেখা সম্ভব তাই নয়, এমন ভাবে লেখা যায় যা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি রচনার সমতুল।

বইটির প্রথম অংশে আছে লেখকের বাল্যের ক্রিকেট-স্মৃতি—ইডেন গার্ডেনে তাঁর দাদার হাত ধরে প্রথম প্রবেশের কাহিনী। স্মৃতিপূর্ণ রসাবিষ্ট ভাষায় ইডেন গার্ডেনরূপ স্বপ্নজগৎ রূপায়িত হয়েছে। তারপরে আছে বিভিন্ন বাঙালী ও ভারতীয় ক্রিকেটারের চরিত্র-চিত্র।—'বঙ্গের পঙ্কজ-রবি' পঙ্কজ রায়, 'সচল অগ্নিগিরি' সুঁটে ব্যানার্জি, 'তরুণ বাসনাশিখা' মুস্তাক আলী, 'সমুদ্র-সন্তান' লালা অমরনাথ, 'বিষণ্ণ আভিজাত্যময়' বিজয় মার্চেন্ট, 'হাজারো সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ' বিজয় হাজারে, 'ভারতের জাতীয় ক্রিকেটার' ভিনু মানকড়, 'উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী' রুসী মোদী, 'খাটো কনস্টানটাইন' রামচাদ, 'সহাস্য সুভদ্র ও সুন্দর' নাড়ু ফাদকার ইত্যাদি। তারপরে আছে গত ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের বিবরণী—তার আশা-নৈরাশ্য, সাফল্য-ব্যর্থতার চমকপ্রদ নাটকীয় কাহিনী। সবশেষে ইডেন গার্ডেনের সঙ্গে নাড়ীর যোগের কথা। বইটির অন্যতম প্রধান গুণ এর ভাষা। এমন দীপ্ত, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ও সরস গদ্য অল্পই দেখা যায়, যে কোনো বিষয়কে গৌরবান্বিত করবার যোগ্য গদ্য। লেখক প্রচুর অজানিত আকর্ষণীয় তথ্য নিপুণ ভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর লেখা কতকগুলি স্কোরের সংকলন না হয়ে উন্মোচন করেছে ক্রিকেটের ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে। যাঁরা ক্রিকেট বোঝেন তাঁদের এ বই ভালো তো লাগবেই, যাঁরা বোঝেন না তাঁরাও বিশুদ্ধ রম্যরচনারূপে একে উপভোগ করতে পারবেন। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। নিঃসন্দেহে বাংলায় লেখা এইটেই ক্রিকেটের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ। ইডেনে শীতের দুপুর—শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম ৩'৭৫।

অভিযাত্রী

সুলেখক নবগোপাল দাস সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু অন্যতম নন বরঞ্চ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁহার 'অভিযাত্রী' উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হয়েছিল তখনই আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলাম। ১৯৪২—৫১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। তবে ইহা নিছক উপন্যাস। ইতিহাস বা জীবনকাহিনী নয়। উপন্যাসটি পাঠ করিয়া মনে হয় যে লেখক ইহাতে যে দশ বৎসরের বাংলাদেশের পটভূমিকায় ছবি এঁকেছেন তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। প্রাক্তন আই, সি, এস ডঃ নবগোপাল দাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত রচনাশৈলীতে কাহিনীটি স্নিগ্ধ এবং মনোরম হয়ে উঠেছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোরম। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ দাম—পাঁচ টাকা।

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তখনকার আরও চার পাঁচ জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিদেশী শোষকের যথেচ্ছাচারের একযোগে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী এক আইনের বিরুদ্ধেই অভিযান ছিল তাঁদের সেদিন, আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ পথে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্কুর সেদিনই প্রথম দেখা দেয়। দেড়শো বৎসর ব্যাপী ভারতের সেই জাতীয় আন্দোলনের এক সুসম ও ধারাবাহিক বিবরণী গ্রথিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভূত শ্রমের সহিত আলোচ্য পুস্তকটি রচনা করে বোদ্ধা পাঠক সমাজের অশেষ উপকার করেছেন, জাতীয় আন্দোলনের একটি প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাব এতদিনে পূরণ হল, আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠে অনেকেরই অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে, বিশেষতঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভিক যুগের সম্বন্ধে আজও আমরা বিশেষ কিছুই জানি না এবং স্বাভাবিক অজ্ঞতা বশতঃই আমাদের মত অনেকেই মনে করে থাকেন যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বুঝি স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম সুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তার অনেক আগেই, আলোচ্য পুস্তকে সে কথা বিশদ ভাবেই বিবৃত করা হয়েছে, জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে গ্রন্থখানির অবদান তাই অতিশয় মূল্যবান। এরূপ একটি মূল্যবান ও প্রামাণ্য পুস্তক রচনার জন্য গ্রন্থকার সমগ্র চিন্তাশীল পাঠক সমাজের ধন্যবাদের পাত্র, আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জাও ভাল। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—দশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

নানার হাতি

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র আজ বিস্ময়কর রূপে প্রসারিত। সাহিত্যের নানান শাখায় নানারকম পরীক্ষা চলেছে, একদল সাহিত্যকার মন দিয়েছেন দেশ বিদেশের সাহিত্যের সাথে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটাবার প্রতি, ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাটি আজ রীতিমতই সমৃদ্ধ। নানার হাতি মালয়ালম সাহিত্যের

—মানস কুণ্ডুচৌধুরী

ত
থা
গ
ত

—[illegible] গুপ্ত

মন্দিরশিল্প (বংশবাটী)

—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, লালচাঁদ বর্মণ

—বিমল ঘোষাল

—অনিল গুপ্ত

॥ শিশু-মহল ॥

—মিসেস জে. বিশ্বাস

—শ্রীমতী রেখা রায়
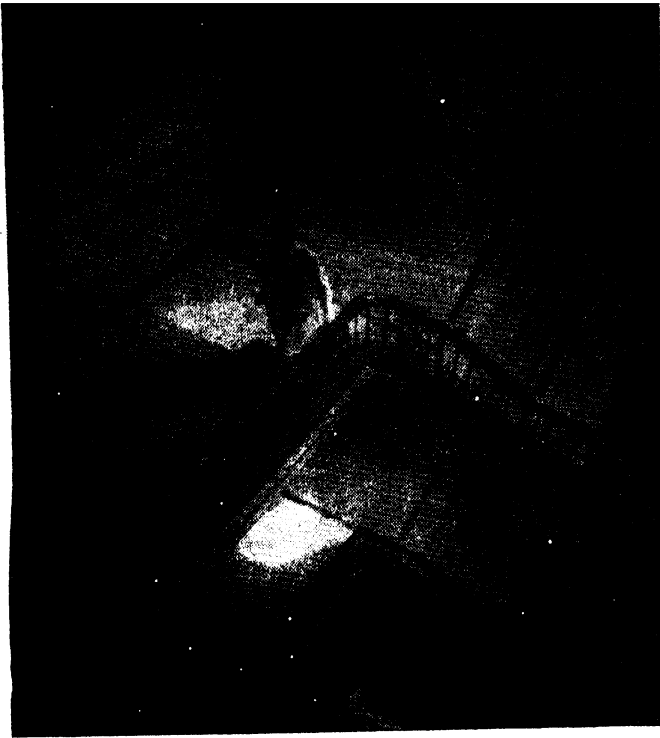
উত্তরণ

—হরেন ঘোষ

—চিত্ত নন্দী

ফুচকাওয়ালা

—অজয় দে

অযান্ত্রিক

এক [শত কথা সাহিত্যিকের রচনার অনুবাদ। ভৈকম মুহম্মদ বশীর মালয়ালম সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরই লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ 'নানার-হাতি' অনুবাদটির নামকরণও হয়েছে মূল গ্রন্থের নামানুসারেই। এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ভাঙ্গন দেখানো হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে পড়তে পড়তে মনে হয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষাগত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের প্রভেদ সত্বেও ভেতরের মূলসূত্র বোধহয় অভিন্ন, যা ঘটেছে দক্ষিণ প্রান্তে তাই ঘটছে পূর্ব উত্তর বা পশ্চিম প্রান্তেও।

ভাষা রীতিনীতি আচার ব্যবহারের বেড়া ডিঙ্গোলেই যে আমাদের ভারতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সহজেই গড়ে উঠতে পারে একটি হৃদ্য সম্বন্ধ, তা সহজেই উপলব্ধি গোচর হয় এ ধরণের অনুবাদের মাধ্যমে, এবং এটাই বোধহয় অনুবাদ গ্রন্থের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা।

আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটির ভাষারীতিও প্রশংসনীয় ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। অনুবাদিকা—নিলীনা আব্রাহাম। ত্রিবেণী-প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা। সি, সাহিত্য অকাদেমী ১৯৬০।

চতুরঙ্গ

অনেক দিন বাদে আবার সৈয়দ মুজতবা আলীর একখানি নতুন বই হাতে পেয়ে খুসী হয়ে উঠবেন তাঁর অনুরক্ত পাঠক-পাঠিকার দল; আলী সাহেবের নিজস্ব মেজাজের পরিচয়ই বহন করে এনেছে আলোচ্য গ্রন্থখানি। সৈয়দ মুজতবা আলীর লিখনশৈলীর নূতন করে কোন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, সরস কথকতাই তাঁর লেখার প্রাণসত্তা, সেই জিনিষটিই পাঠক তাঁর কাছে বেশী করে আশা করেন এবং না পেলে হতাশ হয়ে পড়েন; আলোচ্য গ্রন্থে অনেক দিন বাদে আবার আমরা তাঁর এই বিশেষ ভঙ্গীটির রস আস্বাদন করতে পেরে সত্যই আনন্দিত হয়েছি। মোট একুশটি, খণ্ডরচনা সংগৃহীত হয়েছে 'চতুরঙ্গে' যার প্রায় সবকটিই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে আগেই, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরসতার মিশ্রণের অপরূপ নমুনা সেগুলি, রসের নির্ঝরের তলায় লুকোনো রয়েছে লেখকের বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল পরিচয়, বালির নীচে চাপা পড়া ফল্গু নদীর মতই। বিদগ্ধ পাঠককে বইটি আনন্দ দেবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পরম পিপাসা

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিকার সংখ্যা আজ ও পুরুষের তুলনায় অনেক কম একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়না নিশ্চয়, এক্ষেত্রে কোন ভাল লেখিকার সন্ধান মিললে স্বভাবতঃই পাঠক সমাজে দেখা দেয় খুসীর আভাস; আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্যর নাম অল্পদিন আগেও সাহিত্য রসিকের আসরে প্রায় অপরিচিত থাকলেও আজ তাঁর পরিচিতির জন্য আর অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। অল্পদিনেই ঘটেছে তাঁর যে অগ্রগমন তা সত্যই বিস্ময়কর।

বর্ত্তমান পুস্তকটি মহাশ্বেতার নবতম রচনা, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্যের ভঙ্গীটি এ ক্ষেত্রেও অনুপস্থিত নয়, একটি মধুর প্রণয়োপাখ্যান বিবৃত হয়েছে লেখিকার নিপুণ লেখনীর টানে টানে, চরিত্রগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও ব্যক্তিত্ব প্রকাশক, সহজেই মনে দাগ কাটে, বিশেষতঃ নায়িকা সুজাতার চরিত্রটি রূপায়িত করা হয়েছে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে। বলা বাহুল্য বইটি পড়ে আমরা আনন্দ পেয়েছি। প্রকাশক:—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ, ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

পরশুরামের কবিতা

রাজশেখর বসু বা পরশুরামের নাম, বাংলা সাহিত্যের আকাশে চিরদিন অমর হয়েই ফুটে থাকবে উজ্জ্বল হয়ে ধ্রুবতারার মতই। তাঁর রচিত রসরচনা ও প্রবন্ধাদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহুদিনের কিন্তু এ যাবৎ তাঁর কোন কবিতার রসাস্বাদন করার সুযোগ পাঠকের হয়নি, সে সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য আলোচ্য পুস্তকের প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ। মোট তেরটি কবিতা গ্রথিত হয়েছে আলোচ্য ক্ষুদ্রাবয়ব পুস্তকখানিতে; বলা বাহুল্য তার প্রত্যেকটিই রস রচনা, হাসির কবিতায় রসসাহিত্যিক পরশুরামকে যেন নতুন করে দেখতে পাই আমরা এই রচনাগুলির মাধ্যমে; বলা বাহুল্য তাঁর অননুকরণীয় প্রতিভার ছাপে এরাও বঞ্চিত নয় পড়তে অতিশয় ভালো লাগে এগুলির সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। বইখানির অঙ্গসজ্জা অতি পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২ দাম—দুই টাকা।

ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান

মানুষের জড়জীবন ধারণের নানা প্রকরণ যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয় তাই জড়বিজ্ঞান নামে খ্যাত। আধুনিক যুগে এই বিজ্ঞানের বড় আদর, কিন্তু প্রাচীন ভারতেও যে বিজ্ঞান চর্চ্চা অবহেলিত হয়নি একেবারে প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে। পুরাকালের ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চা ঘটত প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষারই মাধ্যমে; সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তকাদি থেকেই লেখক তাঁর পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করে এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। রচনাটি একাধারে চিত্তাকর্ষকও শিক্ষামূলক এ ধরণের গবেষণা গ্রন্থের প্রাচুর্ভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনায় বলেই আমরা পুস্তকটিকে সাদর স্বাগত জানাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি পাঠে যে আনন্দিত হবেন একথা অনস্বীকার্য্য। বইটির ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান (প্রথম ভাগ) লেখক—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—বুক ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ মূল্য—ছয় টাকা।
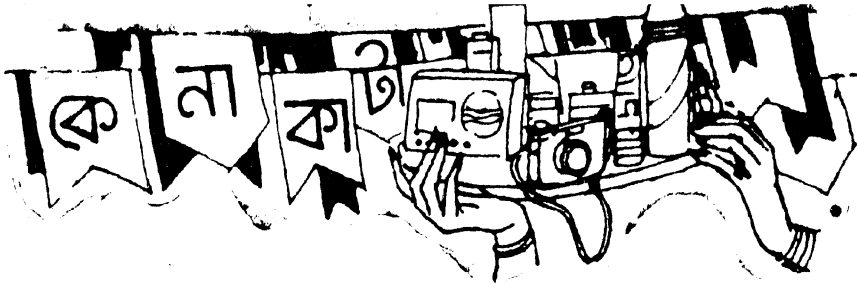
পেশা—মডেল হওয়া

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জন্যে রকমারী পেশাও সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের ভেতর মডেল হওয়াও আজকের দিনে বেশ একটি চলতি পেশা। অনেক নারী, ক্ষেত্র-বিশেষে পুরুষও এই পেশা অবলম্বন করে বেশ অর্থোপায় করছেন। গঠনগত বৈশিষ্ট্য যাদের আছে, দ্বিধা, সঙ্কোচ বা জড়তা যাদের পেয়ে বসে নেই, এ লাইনটিতে তাদের যোগদান সহজ ও সুবিধাজনক বলতে পারা যায়।

মডেল হওয়া বা দেওয়ার রীতিটি মূলতঃ পাশ্চাত্যের জিনিস। জানা যায়, অতীতে পশ্চিমী শিল্পীরা শিল্পচর্চায় তাঁদের পত্নীদের মডেলস্বরূপ ব্যবহার করতেন। ফ্রান্স, ইটালী ও বৃটেনে এই দিকটায় অর্থাৎ মডেলের প্রচলন ছিল বেশি। আর্ট বা শিল্পকলাটা যখন ফটোগ্রাফির পর্য্যায়ে এল, মডেল হিসাবে স্ত্রীদের নিয়োগ করতে থাকেন শিল্পীরা তখন থেকেই। কিন্তু মডেল হওয়াটা সঙ্গে সঙ্গে কোন পেশায় পরিণত হয়ে যায় না। সমাজে নতুন স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে মডেল হতে ইচ্ছুক নারীদের অপেক্ষা করতে হয় বেশ কিছুকাল।

আজকের দিনে মডেল হওয়ার জন্য পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। কমার্শিয়াল আর্ট সৃষ্টির সময় থেকেই কার্য্যক্ষেত্রে মডেলের দামও আপনি বেড়ে যেতে দেখা যায়। মডেল হওয়া আজ সত্যি একটি অভিনব পেশা বলে গণ্য—আর সে-টি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তো বটেই, ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশসমূহেও। পূর্ব্বে শিল্পী-সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ, মডেলের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতো কম। কিন্তু বর্ত্তমান শিল্পায়নের যুগে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের যুগে মডেলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। আগে যেখানে নিতান্ত সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ঘরের স্ত্রীকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করা হতো—এক্ষণে অবশ্য বাইরে থেকেই প্রয়োজনমত মডেল খুঁজে পাওয়া যায়। নারী-মনের একটা সাধারণ ঝোঁক—রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন এবং তাতে করে আনন্দ পাওয়া। মডেল দেওয়ার ভেতর দিয়ে সেই দাবীও মেটাতে পারছেন কেউ কেউ বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

একথা ঠিক, সেদিন অবধিও আমাদের দেশে পেশাদারী মডেল প্রায় পাওয়া যেত না। সিনেমা-লাইনে নারীদের আসতে যেমন অনেক সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গতে হয়েছে, তেমনি পেশাদারা মডেল হবার আগেও। বাধ্য হয়ে গোড়ায় এখানেও শিল্পীদের মডেলস্বরূপ ব্যবহার করতে হয়েছে নিজ নিজ স্ত্রীকেই। কিন্তু আজকের দিনে সভ্যতার অগ্রগতির ফলেই হোক, কি অর্থ নৈতিক কারণেই হোক, এই লাইনে পা বাড়াবার ব্যাপারে যে প্রশ্ন বা সঙ্কোচ ছিল, তা বহুল পরিমাণে কেটে গেছে। ... তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এখানে জনতার ভীড় বাড়ছে বই কমছে না। বিলেতে অনেক বিদ্যালয় রয়েছে—যেখানে মেয়েদের মডেল হওয়ায় রীতিমতো ট্রেনিং বা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কখন কি করে দাঁড়াতে হবে বা বসতে হবে, কিভাবে পা ফেলতে হবে বা হাত রাখতে হবে, চোখ-মুখের ভাব কোন্ অবস্থায় হতে হবে কি, মডেলদের এ সকলই শিক্ষার ব্যাপার। এর জন্য বহু স্থানে বহু মডেল এজেন্সী ও ট্রেনিং স্কুল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত একটি বিবরণ থেকে জানা গেছে, একমাত্র লণ্ডন এলাকাতেই মডেল এজেন্সী হয়েছে ২০টির মতো। সংশ্লিষ্ট স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহ থেকে মডেল হবার জন্যে ব্যস্ত যারা, সেই সব মেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তারপর বিভিন্ন এজেন্সীর সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পসংস্থায় কাজও পেয়ে যায় তারা। সে দেশের এজেন্সী সমূহে হরদম আবেদন আসে ভাবী মডেলদের কাছ থেকে—সপ্তাহে প্রায় শতাধিক। পূর্ব্বাঞ্চলের দেশগুলিতে এখনও অবশ্য এই ব্যবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা লাভ করেনি।

আজকের দিনে বিলেতে একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মডেলের বুনিয়াদী বেতন হচ্ছে ঘণ্টায় দুই গিনি। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন মডেলকে ছবি দিতে হলে ঘণ্টা পিছু তার মিলে থাকে তিন গিনির মতো। বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহে অসংখ্য মডেল এজেন্সী সক্রিয় রয়েছে। এই সব এজেন্সীর রিপোর্ট থেকে দেখতে পাওয়া যায়—আগ্রহশীল ও যোগ্যতাসম্পন্ন বেশির ভাগ মেয়েই মডেল হিসাবে স্থায়ী কাজ পাচ্ছে। কত মেয়েই আজ ফটোগ্রাফিক ষ্টুডিও বা এডভারটাইজিং এজেন্সীগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়—মডেল হিসাবে যদি কাজ মিলে গেলো। একজন ফটোগ্রাফারের হিসাব অনুসারে একমাত্র লণ্ডনেই সর্ব্বসময়ের জন্য (ফুল টাইম) কর্ম্মরত মডেল আছে প্রায় ৫ হাজার।

মডেল হওয়া বা দেওয়ার পেশা যে সব মেয়ে গ্রহণ করতে চাইবে, শ্রম ও যত্ন নিতে হয় তাদের প্রচুর। স্বাস্থ্য ও শ্রী অটুট রাখবার জন্য তারা ব্যস্ত না হয়ে পারে না। এই লাইনের ভাবনার দিক যেটুকু—একজন সফলকাম মডেলেরও মডেল হিসাবে স্থায়িত্বকাল সীমিত—সাধারণতঃ আট বছর থেকে নয় বছর মাত্র। প্রত্যেক মডেলকেই সেজন্য হুঁসিয়ার থাকতে হয়, সময় না যেতেই ঘরে তুলতে হয় সম্ভাব্য সব কিছু পাওনা-গণ্ডা

সেল্‌স্‌ম্যান যিনি হবেন

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিটি স্তর বা বিভাগেই দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ রয়েছে। সেল্‌সম্যানদের লক্ষ্য করেও কথাটি সমান জোর

ষই বলা যায়। সকলের দ্বারা সব কাজ হবে, এমন দাবী বা চ্যাশা নিরর্থক। দক্ষ সেল্‌সম্যান হতে হলেও সকলেই তা পারতে রে না, এর জন্যে কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া চাই।

সেল্‌স্‌ম্যান যিনি হবেন বা হতে চাইবেন, 'ব্যক্তিত্ব' থাকতেই ব তার। যে সংস্থা বা বিপণন ক্ষেত্রে তাকে কাজ করতে হবে, জে তার একটি প্রধান অঙ্গ, কাজের মধ্য দিয়ে এর প্রমাণ তুলে া চাই। ক্রেতা বা গ্রাহকের সামনে বিক্রয়যোগ্য জিনিসটি সাজ়ের জ রাখতে হবে এবং এর বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা বিশ্লেষণ করতে বে বেশ সহজভাবে। সর্ব্বক্ষণ হাসিমুখ, মিষ্টি ব্যবহার, আপ্যায়নের জে ব্যস্ততা—এ জাতীয় গুণ সেলসম্যানদের পক্ষে অত্যাবশ্যক না চলে।

দোকান-পাট বা ব্যবসা সংস্থাসমূহে অনেক সময় একটি আদর্শ লখা দেখতে পাওয়া যায়—আমাদের গ্রাহকরাই আমাদের প্রভু। প্রতিষ্ঠানের সুনাম ('গুডউইল') সৃষ্টি করতে চাইলে এই নীতিটি উপেক্ষা করা ভুল হবে। আবার এখানেও বলতে হয়—নীতি অনুযায়ী কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব থাকছে সেল্‌সম্যানদের ওপর। কারণ, তারাই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র—তাদের আচরণ ও কর্ম্ম-তৎপরতা ক্রেতা ও গ্রাহকদের মনে যে ছাপ রাখবে, সেইটির মূল্যই বেশি। বড় সংস্থাগুলোতে সাধারণতঃ মালিকের সাথে ক্রেতার পরিচয় খুব একটা হয় না, বিক্রেতা (সেল্‌স্‌ম্যান) ও ক্রেতারই যোগাযোগ হয়।

পাকা সেল্‌স্‌ম্যান হবার দাবী রাখলে কয়েকটি বিষয় আগে থেকেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ভাবেই হোক্, ক্রেতা বা গ্রাহক যেন খুশি হতে পারেন। পাঁচটা দিকে নজর থাকলেও সকল ক্রেতার মনেই এই উপলব্ধি জন্মাতে হবে—তাঁর ব্যাপারে সেলসম্যানের যত্ন রয়েছে। এমন সেলসম্যান বা দোকান-কর্ম্মচারীও দেখা যায়, যারা গ্রাহক এলেও তেমন তৎপরতা দেখান না, কোন রকমের দায়ে সারা গোছের কাজ করে চলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা বা অগ্রগতির এইটি বিশেষ পরিপন্থী, ভাবলেই বুঝতে পারা যায়।

আরও কতকগুলো বিষয়ে সেলসম্যানদের দৃষ্টি রেখে চলতে হয় এবং কুশলী সেলসম্যান এ বাদ দিয়ে পারে না। দোকান বা বিপণন কেন্দ্রে কোন গ্রাহক আসা মাত্র তাঁর চাহিদা কি, কোন জিনিসটি তাঁর পছন্দসই হতে পারে, এক দুটি কথাতেই তা বুঝে নেওয়া চাই। বেচা-বিক্রির সময় মেজাজ খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে, আচরণে কোন প্রকার কঠোরতা বা বিরক্তি ভাব প্রকাশ পেলে চলবে না। যত ভাবে সম্ভব ক্রেতা বা গ্রাহককে সম্মান দিয়ে যাওয়াই হবে বিক্রেতা বা সেলসম্যানের একটি প্রধান লক্ষ্য। কোন অবস্থাতেই গ্রাহকদের সঙ্গে অযথা তর্ক-বিতর্ক বা দ্বন্দ্বে যেন আসবার কারণ না ঘটে—সেদিকে সতর্কতা চাই বিশেষ রকম।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে, যে-সেল্‌সম্যান এসব সাধারণ নিয়ম কয়টি মেনে চলতে চায় না, তাদের জীবনে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট যত বেশি জিনিস ধরাতে পারবে এবং যত সহজে পারবে, মালিক বা কর্তৃপক্ষের কাছে তার দাম হবেই। বস্তুতঃ সুদক্ষ সেলসম্যানকে একদিকে যেমন হতে হবে পরিশ্রমী—অন্যদিকে হতে হবে তেমনি বাক্‌পটু ও কর্ম্ম-তৎপর। ক্রেতা বা গ্রাহকদের টেনে আনবার সর্ব্বোপরি একটি আকর্ষণী শক্তি থাকা চাই তার। পক্ষান্তরে যে জিনিষ নিয়ে কাজ কারবার তাকে করতে হবে, তার ভাল মন্দ সবটা সম্পর্কেই তার জ্ঞান থাকতে হবে। অভিজ্ঞ ও কর্ম্মপটু সেল্‌সম্যানের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় অনেকটা। আর একথাও ঠিক, উপযুক্ত কাজ দিলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই।

হস্তশিল্প ও নক্‌সা

যে কোন শিল্প বা নির্ম্মাণ-কাজের ব্যাপারেই আগেভাগে একটা নক্‌সা চাই। হস্তশিল্পের বেলাতেও এইটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। নতুন নতুন উন্নতধরণের নক্‌সা রচনা করে যদি শিল্প-কর্ম্ম করা যায়, তা হলে শিল্পের মানও উন্নত না হয়ে পারে না।

বহির্দেশে ভারতের হস্তশিল্পের সমাদর অতীতকাল থেকেই হয়ে এসেছে। স্বাধীন আমলে হস্তশিল্পের চাহিদা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন, বাইরেও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারী হিসাবেও এইটি দেখতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সুন্দর নক্‌সার গুরুত্বও আগের তুলনায় এক্ষণে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়েছে—সহজেই অনুমেয়।

উন্নতধরণের নক্‌সা রচনার প্রয়োজনের বিষয় ঊর্দ্ধতন মহলে এযাবত বহুভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা ঠিক চুপ করে বসে আছেন, এমনও বলতে পারা যায় না। উচ্চাঙ্গের নক্‌সা রচনার জন্যই সর্বভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষৎ কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে দিল্লী ও ভারতের অপরাপর অঞ্চলে কয়েকটি নক্‌সা কেন্দ্র চালু হয়েছে। দেশে বিদেশের মানুষের শিল্পগত প্রয়োজন ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে এই কেন্দ্রসমূহ কাজ করছেন। নক্‌সা নিয়ে রকমারী পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণাই চলেছে এই সকল কেন্দ্রে অন্ততঃ সরকার এই দাবী রাখছেন। বহুশিল্পী ও ভাবুক মানুষ আজ নক্‌সা নির্ম্মাণ কাজে ব্যস্ত—যাদের চিন্তার সুফল নিয়ে হস্তশিল্প সংস্থা ও উৎপাদক সমবায়গুলো এবং দক্ষ কারিগরগণ নিত্য নতুন জিনিষ তৈরী করছেন। বাজারে লক্ষ্য করলে স্পষ্টই দেখা যাবে, ভারতীয় শিল্পের মান পূর্ব্বের চেয়ে আজ অনেকটা উন্নত হয়েছে—কতকগুলো ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পের সঙ্গেও চলতে পারছে এখন এর পাল্লা।

নক্‌সার উন্নতির সাথে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় হস্তশিল্পের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে জড়িত—এই নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। তারই জন্যে বরং দাবী করা চলে, সরকার বা হস্তশিল্প পর্ষৎ এই নক্‌সা রচনার ওপর আরও জোর দিন, শিল্পীদের পরীক্ষা ও গবেষণা চালাবার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা রেখে অধিক সংখ্যায় নক্‌সা কেন্দ্র স্থাপন করুন সংহত উদ্যম ও ব্যাপক দৃষ্টি থাকলে নক্‌সারও যেমন ক্রমেই উন্নতি আশা করা যায়, তেমনি ধাপে ধাপে হস্তশিল্পেরও প্রতিষ্ঠা হতে বাধ্য।

দেশী রং

শ্রীইন্দুবিকাশ দাশ

ভাল পিয়াশাল কাঠ চেরাইয়ের সময় যে গুঁড়ো পাওয়া য তা দরকার। বেছে নিতে হবে যেন অন্য কিছু না থাকে ঐ গুলিকে পরিমাণ মত জলে ভেজাতে হবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে তা ছেঁকে নিতে হবে। গুঁড়ো জলে সেদ্ধ করলেও রং পাও

হবে। ছেঁকে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে, নীচের তলানি বাদ দিয়ে তাতে পরিমাণ মত আঠা মেশাতে হবে। গঁদের আঠা দিয়ে কাজ করা হয়েছে, অন্য আঠা দিয়ে পরীক্ষা করা হয় নাই। দেখা গেছে, Filter paper দিয়ে ছেঁকে নেওয়ার পর জলের রং আগের মতই থাকে।

ছেঁকে নেওয়ার পর জলটি Tin-Iodine-এর মত দেখতে হয়। তুলি দিয়ে কাগজে লাগালে ছেপে যায় না। প্রথম অবস্থায় রংটি yellow ochre-এর মত হয়। শুকিয়ে একটু ঘন হলে রং হবে yellow ochre-এর সঙ্গে খুব অল্প vandyke brown মেশালে যেমন হয়। আরও একটু শুকিয়ে গেলে রংটির বদল ঘটে, তবে এতে burnt umber-এর আধিক্য দেখা যায়। এই অবস্থায় রংটির মধ্যে আঠাল ভাব (অন্য আঠা ব্যবহার না করেও) আসে। রংটি বেশ উজ্জ্বল। আরও ঘন অবস্থায় রংটি মধুর মত চটচটে হয়ে যায় ও কাগজে লাগানর পর শুকোতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। শুকনো, পাকা চীনেবাদাম বীজের খোসার রংএর মত রং হয় শেষ পর্য্যায়ে। রংগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পর ঘষাঘষিতে ওঠে না বা আঙুলে কোন দাগ লাগে না। খুব ঘন অবস্থায় ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে রংটি কাগজে মোটা পর্দায় লেগে থাকে না।

শুকিয়ে কাদা-কাদা মত হলে ছোট ছোট বড়ি তৈরী করে রেখে দেওয়া চলে। বড়ি জলে দিলেই রং হবে। একবারে শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে গেলে তা পানে-খাওয়া খয়েরের মত দেখতে হয়। ছেঁকে নেওয়ার পর রংকে তুলোয় শুষে শুকিয়ে রেখে দেওয়া যায়।

এ রং দিয়ে জলরঙা ছবি, রংগীন স্কেচ ও মণ্ডপশিল্পের নক্সা কাগজে আঁকা হয়েছে। রংটি স্থায়ী বলে মনে হয়।

খুব পাকা কাঠ থেকে, তৈরী রংএর তুলনায় কম পাকা কাঠ থেকে তৈরী রং উজ্জ্বল হয়। এ কাঠ থেকে তৈরী রংএ চোখা বা কর্কশ ভাব থাকে। এ ভাব কাটিয়ে রংটিকে মোলায়েম করার জন্য তিনটি পরীক্ষা করা হয়েছে। (ক) পাকা, শুকনো বাবলা ফলের খোসার সঙ্গে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ পিয়াশাল কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে আগের প্রক্রিয়ায় রং তৈরী করা হয়েছে। পিয়াশাল কাঠ থেকে তৈরী রংএর মতই হয়েছে। রংটি একটু মোলায়েম। (খ) মঞ্জিষ্ঠা থেঁতো করে তার সঙ্গে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে আগের মতই রং তৈরী করা হয়েছে। রংটির মধ্যে ঈষৎ burnt umber ভাব এলেও তার চোখা ভাব কম। (গ) লোধের ছাল থেঁতো করে তা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে আগের প্রক্রিয়ায় রং তৈরী করা হয়েছে। ঈষৎ হলদে ভাব এসেছে কিন্তু রংটি উজ্জ্বল ও মোলায়েম। উল্লিখিত রং তিনটি কাগজে ব্যবহার করে শুকিয়ে যাওয়ার পর ঘষাঘষিতে ওঠে না বা আঙুলে কোন দাগ লাগে না। ঘন অবস্থায় লোধের ছাল মেশান রংটি বেশ মোটা পর্দায় ও অন্য দুটি অপেক্ষাকৃত কম মোটা পর্দায় কাগজে লেগে থাকে। রংগুলিকে তুলোয় শুষে বা শুকিয়ে বড়ি তৈরী করে রেখে দেওয়া যায়।

কাঠের মিস্ত্রীদের পিয়াশাল কাঠের রং ব্যবহার করতে দেখেছি। কাঠের জিনিস তৈরীর পর যেখানে রংএর কমতি বা খুব ছোট ছোট ফাট থাকে সেখানেও এ রং দিয়ে মাজলে নাকি জিনিসটির finish ভাল হয়।

আমার আট বছরের ছোটদি মিনি, আমার চেয়ে বেশী পছন্দ করে এই রংকে। একটু ঘন অবস্থায় এই রংটি আমার কাগজে আঁকা হিজিবিজির চেয়ে তার কপালের টিপেই নাকি ভাল মানায়। আর এতে বড়দির মহল থেকে না বলে কমকুম নিয়ে এসে ধরা পড়া বা বকুনি খাওয়ার ঝক্কি একেবারেই নেই।

ওর হাসি

শ্বাতাতারা

ও হাসে—
মহুয়ার মাতাল গন্ধের মত
এলোমেলো ঢেউ তুলে—
মনের সঙ্কল্প চুরি কোরে।
এক টুকরো পাতলা ঠোঁটে
জীবনের তৃষ্ণাটুকু নিঃশেষে
হাসি দিয়ে দিয়েছে ভরিয়ে।

ক্ষমা-ঘৃণা-বিদ্রূপের
মসী-লিপ্ত জীর্ণ পাতায়—
ওর হাসি আছে
প্রতি কথার
শুরু থেকে শেষে—
দরদী শিল্পীর মত
তৃপ্তির শেষ তুলি বুলাতে।

ওর হাসি ঝড় তোলে না—
ক্লান্ত ঝড়ের শেষে
আনে শুধু স্নিগ্ধ সতেজ মূর্চ্ছনা।

বিজ্ঞপ্তি

[লেখকের অসুস্থতাবশতঃ এ সংখ্যায় নিয়মিত রচনা "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি" প্রকাশিত হইল না।]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বদলী কলকাতায় না হওয়ায় মনটা একটু মুষড়ে গেল।—বিশেষতঃ বন্দিশালায় পাঠানো মানে যে শীঘ্র মুক্তির আশা নেই,—একথা ভেবে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বন্দিশালার নতুন জীবনের কল্পনা শীঘ্রই মনটাকে নানা সম্ভব-অসম্ভব বিচিত্র চিত্রে আচ্ছন্ন করে ফেললে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেয়াল হল,—বন্দিশালার ফটকের অফিসে তল্লাসীর সময় সমস্ত লেখাগুলো হয়ত আটক করবে—সুতরাং এখানকার সমস্ত লেখাগুলো এখানেই dump করে' যেতে হবে।

ভেবে চিন্তে একটা নতুন ছোট টিনের স্যুটকেশ কিনে আনিয়ে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা লেখা exercise book তার মধ্যে ভরে' চাবি লাগিয়ে হাটের এক সাহা আড়তদারের বাসায় নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললুম, আমার লেখাগুলো আপনার কাছে রেখে যেতে চাই—মুক্তির পর এসে নিয়ে যাবো।—বৃদ্ধ সব শুনে স্যুটকেসটা হাতে করে নিলে,—আমি চাবিটাও দিলুম, এবং বললুম, আমার ছেলে রইলো আপনার কাছে।—(পরে সে স্যুটকেস আর পাইনি)।

তারপর খাওয়াদাওয়া করে রওনা হলুম গরুর গাড়ীতে—সঙ্গে escort চললেন জমাদার বাবু। জলপাইগুড়ি থেকে যে সশস্ত্র পুলিশ দু'জন বদলীর অর্ডার নিয়ে আসছিল, তারাও সঙ্গে চললো।

গাড়ীতে জমাদার বাবুর সঙ্গে গল্প-আপ্যায়নের মধ্যে ত্রে খেলার রেকর্ড ডায়েরীবুকের পাতা দুখানা জমাদারবাবুর হাতে দিয়ে বললুম, ফিরে গিয়ে দারোগা সাহেবকে দেবেন। তিনি কাগজ দুখানা দেখে চমকে উঠে বললেন,—ও মশায়,—আপনি তো সর্বনেশে লোক,—আমাদের সকলেরই চাকরী খেতেন! আমি হেসে বললুম,—চাকরী যেতো দারোগার,—আপনাকে ধমকে ছেড়ে দিতো। জমাদারবাবুর রসবোধ আছে,—তিনি বুঝলেন এবং ফাঁড়া কেটে গেছে দেখেই সন্তষ্ট হলেন।

বহরমপুর ক্যাম্পে পৌঁছেই দেখলুম, যা ভেবেছিলুম, তাই। গেটে একজন পাঠান সুবেদার তল্লাসী নেয়—লেপ-বালিসগুলো পর্য্যন্ত টিপে টিপে দেখে,—একটা ঘরের ভিতর একান্তে নিয়ে গিয়ে একটু সলজ্জভাবে বললে, কাপড়খানা একটু খুলে একবার একটু ঝাড়া দিন। এই হচ্ছে নিয়ম, কড়া হুকুম—আমাদের দোষে নেই—বাবুরা বাঁধানো ছবির পিছনে ভরে চিঠি; নোট প্রভৃতি নিয়ে আসে এবং ধরা পড়ে।

বুঝলুম আমার কাছে ব্যবহার্য্য জিনিস ছাড়া আর কিছুই ছিল না দেখে আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করেছে—নৈলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করতো এবং দরকার হলে জোর করেই করতো—ক্যাম্পের শাসন মিলিটারী শাসন। নমুনা দেখে অনেক কিছু আন্দাজ করলুম।

নতুন মাল এসেছে খবর পেয়ে ভিতরকার ফটকের ভিতর কয়েক জন পাণ্ডা এসেছিলেন,—তার মধ্যে ছিলেন সরস্বতী লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব কর্মী বিপিন চক্রবর্তী—যেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সংক্রান্তি ঠাকুর। তিনি একগাল হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন, এবং তুললেন থার্ড কিচেনে—নিজেদের যুগান্তর-কিচেনে নয়। কারণ আমি দাদা বিদ্রোহী হলেও তাঁদের কিচেনে গেলে আমিই হতুম সিনিয়র এবং লীডার—তাঁর লীডারী মারা যেত। বলা বাহুল্য আমিও স্বস্তি-বোধ করলুম।

বিরাট ক্যাম্প,—ভূতপূর্ব পাগলাগারদ,—প্রকৃত পক্ষে পাগলা জুনিয়ারদের ক্যাম্প—আমাদের পর্য্যায়ের ২।৪ জন আছেন, যাঁরা সিনিয়র।

ওল্ড আর নিউ, দুটো ভাগে বিভক্ত ক্যাম্প,—মাঝে এক উঁচু দেওয়াল,—তার মধ্যের এক প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। আমাদের ওল্ড ক্যাম্পে ৩০০ ডেটিনিউ, আর নিউ ক্যাম্পে ২০০ জন মোট প্রায় ৫০০ ডেটিনিউ। দুই ক্যাম্পেই তিনটে করে কিচেন,—একটা 'যুগান্তর, একটা অনুশীলন, এবং তৃতীয় পাঁচ মিশেলী—যুগান্তর এবং অনুশীলনের কিছু কিছু "রিভোল্ট", কিছু কিছু কমিউনিষ্ট (পার্টিসভ্য নয়), এবং কিছু কিছু বে-ওয়ারিশ non descript অজানা মাল।

পার্টিগুলোর মধ্যে আবার গ্রুপ হিসেবে sub division আছে একটু চাপা, চোরাগোপ্তা ভাবে। সব চেয়ে homogeneous হচ্ছে অনুশীলন—তবু ঢাকা ময়মনসিং বরিশাল প্রভৃতি বড় বড় ঘাঁটির গ্রুপও আছে। যুগান্তরের sub division সব চেয়ে বেশী এবং রকমারি। পার্টি হিসেবে কলকাতা, যশোর-খুলনা, ঢাকা, কুমিল্লা ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি গ্রুপ, নর্থবেঙ্গল যুগান্তর নামক আন্তর্জেলা গ্রুপ, বর্ধমান ডিভিসন গ্রুপ প্রভৃতি, আর কিচেন হিসেবে (যুগান্তর) খাস যুগান্তর পার্টির সঙ্গে আছে বিপিনদার গ্রুপ,

পূর্বদাশ গ্রুপ, ঢাকায় অনিল রায়ের শ্রীসংঘ গ্রুপ, সত্য গুপ্তের বি ভি গ্রুপ, আর চট্টগ্রামের একটা বড় জুনিয়ার গ্রুপ, যারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার সুবাদে নিজেদের অ্যারিষ্টোক্রাট মনে করে, একটু কৃত্রিম গাম্ভীর্য, এবং নাকটা একটু আকাশের দিকে তোলা।

থার্ড কিচেনওগ্রুপ আছে, যদিও সবাই কমিউনিষ্টিক। কমিউনিষ্টিক "রিভোল্ট" হলেও যুগান্তর অনুশীলন চেতনা বজায় আছে, পূর্বদাশের গ্রুপ, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর দল বেশ পৃথক ও compact, বিশেষত তারাই বরাবর থার্ড কিচেনের ম্যানেজারী প্রায় জোর করে দখল করে রেখেছে বলে সকলেই তাদের একটু পৃথক চোখে দেখে। আর কমিউনিষ্ট বলে নিজেদের পরিচয় দেয় যে এক পাঁচ মিশেলী দল, তারাও সকলের থেকেই নিজেদের একটু পৃথক করে রেখে জাত বাঁচিয়ে চলে। তাদের গ্রুপের লীডার (সিনিয়র) ছিলেন নদীয়ার গোপেন মুখার্জি গান্ধীবাদী থেকে কমিউনিষ্ট হয়েছেন ক্রয়েড সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র (হরিনারায়ণ চন্দ্রের ছোট ভাই) প্রমুখ চেলাদের সাংখ্য দর্শন পড়ান নিরীশ্বরবাদ বুঝতে ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়্যালিজম নামক মার্কসীয় দর্শন বোধ হয় যথেষ্ট নয়। তাঁর নাকি একটু জমিদারী ছিল, কিন্তু কমিউনিষ্ট হয়ে তিনি তা বর্জন করেছেন অর্থাৎ ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

এই কমিউনিষ্ট গ্রুপের মধ্যেও একটা সাব গ্রুপ আছে, টাটা কোম্পানীর কলকাতা অফিসের কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান নেতা প্রদ্যোৎ ঘোষ (পিটু বাবু) ছিলেন তার প্রধান।

এর মধ্যে আমি গিয়ে পড়লুম কমিউনিষ্ট বলেই পরিচিত, কিন্তু একা এক পার্টি সব পার্টি ও গ্রুপেই বন্ধু আছে বলে সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব, অথচ সব পার্টি ও গ্রুপের মতনই কমিউনিষ্ট গ্রুপের থেকেও একটু পৃথক থাকি।

আগে দুই ক্যাম্পের মাঝের ফটক খোলা থাকতো এবং দুই ক্যাম্পের ডেটিনিউরাই দুই ক্যাম্পে যাতায়াত করতে পারতো। আমি যাওয়ার আগে সেটা বন্ধ করে ব্যবস্থা করা হয়েছিল,—সকালে এবং বিকালে দুবার দেড় ও দু ঘণ্টার জন্যে ফটক খুলে ওল্ড ক্যাম্পের (আমাদের) ডেটিনিউদের নিউক্যাম্পে বেড়াতে যেতে দেওয়া হত,—কিন্তু নিউ ক্যাম্পের ডেটিনিউদের ওল্ড কাম্পে আসতে দেওয়া হত না।

এর একটা কারণ হচ্ছে, ডেটিনিউদের মধ্যে কিছু কিছু ছোকরা নিজের ক্যাম্পের সিট ছেড়ে রাত্রে অপর ক্যাম্পের বন্ধুদের কাছে শুয়ে থাকতো। গুনতির গরমিল থেকে সেটা ধরা পড়ে, এবং কয়েকজনের কিছু শাস্তিও হয়ে যায়। তারপরে ঐ নতুন ব্যবস্থা করা হয়। যাতায়াতের জন্যে মিনিট দশেক করে গেট খোলা রেখে আবার বন্ধ করে দেওয়া হত—হুইসল বাজিয়ে।

আমি গিয়ে ৩৩ সালের দুটি গল্প শুনলুম—চমৎকার। একটি হল, ৩৩ সালে বহরমপুর বন্দিশালা থেকে যে সব ডেটিনিউ বি এ একজামিন দিয়েছিল, তারা প্রায় সকলেই ভালভাবে পাশ করেছিল—যা নিয়ে বাংলা দেশে "flowers of Bengal" বলে ধন্য ধন্য রব উঠেছিল—সেই একজামিনের বাহার। আর একটি হল,—সুবেদার-হাবিলদারদের নেতৃত্বে শাস্ত্রীবাহিনী কর্তৃক সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে তালা খুলে ডেটিনিউদের গো-বেড়েন করে ঠেঙ্গানো।

একজামিনের হলে বিভিন্ন থানা থেকে দারোগাদের এনে বসানো হয়েছিল invigilator করে—এবং পরীক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে তাঁদের ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি ঘুষ দিয়ে বই প্রভৃতি থেকে "টুকলিফাই" করে প্রশ্নের উত্তর লিখেছে। এলাহি কাণ্ড—প্রশ্নপত্রগুলো জল পরিবেশক "ফালতু"দের হাত দিয়ে ক্যাম্পের ঘরে ঘরে বন্ধুদের (এম-এ, প্রোফেসর প্রভৃতি) কাছে চলে গেল, তাঁরা ছড়মুড় করে উত্তরগুলো লিখে দিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তার copy করে ফেললে আরো অনেকে মিলে, এবং সেগুলো আবার ফালতুদের হাতে পরীক্ষার্থীদের কাছে চলে গেল।

৩৩ সালের দ্বিতীয় গল্পও চমৎকার। একজন মেজাজী ডেটিনিউ এক ফালতুকে একদিন প্রহার করেন ওল্ড ক্যাম্পে। তার জবাবে ফালতুরা দল বেঁধে বাবুদের আক্রমণ করতে চায়, এবং বাবুরা হকি ষ্টিক প্রভৃতি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেন। কাজেই পাগলা ঘণ্টি পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীবাহিনী এসে বাবুদের আক্রমণ করে। লাঠির ঘায়ে কারো হাত, কারো মাথা ভাঙে,—একজনের "দাস্ত খোলসা" হয়ে যায়। ওল্ডক্যাম্পের দিনের বেলার কাণ্ড।

পরদিন নিউ ক্যাম্পের বাবুরা সেই ফালতুকে এমন মার দেন যে, তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সুতরাং আবার শাস্ত্রীবাহিনী এসে পড়ে। বাবুরা পাগলাঘণ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পালিয়ে যান এবং ঘরে ঘরে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা হয় বিকেলে। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার সময় সুবেদার ও হাবিলদারদের নেতৃত্বে বিরাট শাস্ত্রীবাহিনী এসে ঘরে ঘরে তালা খুলে বাবুদের লাঠিপেটা সুরু করে।

একটা ব্যারাকে একলাইনে ১৫টা ঘর—তার তিন নম্বর ঘরে থাকতেন বীরেন ঘোষ (International football player Aryan Club)—এবং ১৫ নম্বর ঘরে থাকতেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। এক নম্বর ঘর থেকে মার সুরু হয়েছিল, এবং ১৫ নম্বর পর্যন্ত যাওয়ার আগেই মার বন্ধ করে শাস্ত্রীরা ফিরে গিয়েছিল, সুতরাং ত্রিগুণাবাবুকে লাঠিপেটা হতে হয়নি।

কিন্তু বীরেন ঘোষের ওপর লাঠির বহর চলেছিল সব চেয়ে বেশী। অন্য ব্যারাক এবং পাশের ঘরে বাবুদের পরিত্রাহি চীৎকারে তিনি তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁদের ঘর খুলে মার সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক শয়তান পাঠান সুবেদারকে একঘুষিতে ধরাশায়ী করেছিলেন। ফলে সমস্ত আক্রোশটা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁরই ওপর, এবং তিনি চারিদিকের লাঠির আঘাত থেকে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে হাত দুটোকে প্রায় Sacrifice করে ফেলেছিলেন। মাথার ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা, এবং তার ওপর দমাদম লাঠি,—হাত দুখানার হাড় ভাঙেনি নেহাৎ শক্ত হাড় বলে। অনেকদিন পর্যন্ত ফুলো, কালশিরে দাগ এবং ব্যথা ছিল।

ছাত্র-যুব নেতা শৈলেন রায় প্রভৃতি তখন সে ঘরে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খাট, টেবিলের নীচে গিয়ে ঢুকেছিলেন। পরে বীরেন ঘোষের অবস্থা দেখে তারা কাকুতি-মিনতি সুরু করে ছিলেন,—বহুত হুয়া, আউর মৎ মারো, মর যায়েগা। বীরেন বাবু বলেন, ডেটিনিউ দেখলুম বটে! "ছোড় দেও বাবা" বলে জোড় হাত করে হাঁপালে, কেউ একটা লাঠি চেপে ধরার চেষ্টা করলে না। যাদের ওপর লাঠি পড়ছে, তারা তো "বাপরে" "মা'রে" "মেরে ফেল্লেরে" বলে চীৎকার করে কাঁদলে। এক ডেটিনিউ লাঠি খেয়ে মেঝের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়েছে, আর এক ব্যাটা তার গুহ্যদ্বারে

লাঠির এমন গুতো দিয়েছে যে, লাঠি ঢুকে গুহ্যদ্বার জখম হয়ে রক্তপাত হয়েছে। তার ঘরের অন্য ডেটিনিউরা দেখলে, কাঁদলে, কিন্তু কেউ বাধা দিলে না, খাটের নীচে থেকে লাঠির গোঁজা খেয়েও কেউ বেরুলো না!

কয়েক বছর পরে বাইরে আসার পরও আমি দেখেছি, সেই ডেটিনিউর গুহ্যদ্বারের ব্যথা এবং রক্তপড়া একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট পায়। এত বড় মারের খবর কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে পারেনি। ক্যাম্পের নিয়ম কানুনে কড়াকড়ি হওয়া ছাড়াও, শান্ত্রীদের সঙ্গে ডেটিনিউদের সম্পর্ক হয়েছিল এমন যে, সুবেদার এক শান্ত্রীর ওপর ভীষণ চটে গিয়ে তাকে গাল দিচ্ছে, "শালা, ডেটিনিউকা বাচ্ছা!" (শুয়ারকা বাচ্ছার বদলে!) আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

আর দেখেছি, বীরেন ঘোষকে দেখেই সুবেদার হাত তুলে সেলাম করে নিঃশব্দে চলে যায়। তাকেই বীরেন ঘোষ ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন। তারা অনেকেই বলতো, ডেটিনিউমে ঐ একঠো হায় শের, আউর সব বিল্লী হ্যায়।

বীরেন ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ২৮ সালে হুগলী বিদ্যামন্দিরে, যখন মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) সেখানে ছিলেন, এবং আমি তাঁর কাছে যেতুম। বীরেন ঘোষ তখন এরিয়ান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়, এবং হুগলী বিদ্যামন্দিরের তরুণদের বক্সিং শেখান। তার পরে ২৯।৩০ সালে তিনি ভূপতিদার সঙ্গে মিলে এক শিশুর ফুড সাপ্লাইয়ের দোকান করেন, এবং সেখানে হয় এক গুপ্ত বোমা পিস্তলের কেন্দ্র। পরে তিনি ৩৭ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ব্যারাকবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হয়ে বহরমপুর বন্দিশালায় আসেন।

নিউ ক্যাম্পে তিন দিকে লম্বা লম্বা ব্যারাক এবং একদিকে ওল্ডক্যাম্পের দেওয়াল—মাঝখানে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। খুলনার একজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় বলাই চ্যাটার্জিও তখন সেখানে ছিলেন, বীরেন ঘোষ ছাড়াও। যারা পড়াশুনা নিয়ে থাকে, তারা ঘরে ঘরেই পড়াশুনা করে। সকালে-বিকালে ঘণ্টা তিনেক ওল্ড-ক্যাম্পের বন্ধুরা নিউক্যাম্পে যায়,—দলের লোক দলের লোকের কাছে যায়। ঘরে ঘরে আড্ডা জমে,—২০।৩০ টা ছোট ছোট দল মাঠে বেড়ায়। হয়ত খেলা দেখে। মাঝে মাঝে দুই ক্যাম্পে ম্যাচ হয়। ফুটবলে নিউ ক্যাম্প শ্রেষ্ঠ।

ওল্ড ক্যাম্পে জায়গা অনেক বেশী। ইষ্ট ব্যারাক—ওয়েষ্ট ব্যারাক নামক বিরাট লম্বা ব্যারাক একদিকে,—তার সামনে বেশ বড় আঙ্গিনার পর একসারি বড় বড় টালির ছাউনী দেওয়া প্রশস্ত ব্যারাক ঘর। ইষ্ট-ওয়েষ্টের মাঝখান দিয়ে এক লাইন ছোটঘর এবং তারপর এক লাইন বড় ঘর উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা লাইন করেছে। সে ঘরগুলোতে ছাত্র এবং পরীক্ষার্থীরা একান্তে পড়াশুনো করে। এরই একদিকে বিরাট ময়দান—ফুটবল খেলা এবং বেড়ানোর জায়গা। আর এক দিকেও টেনিস কোর্ট প্রভৃতি আছে,—এবং তার পর গেটের দিকে বাগান। এক প্রান্তে একটা বেশ বড় টালীর ছাউনীর হলঘর আছে,—**Common room**, তার এক দিকে **indoor game** এর সবরকম ব্যবস্থা আছে, মাঝে মাঝে সভাও হয়। আর একদিকে **Reading room**—প্রশস্ত টেবিলে সংবাদপত্র ও

বিদেশী Journal এর গাদা—অনেকে নিয়মিতভাবে সেখানে পড়াশুনা করে। এমন চমৎকার Reading room আমি কখনো কোথাও পাইনি। নিউক্যাম্পেও এমনি একটা Common room ছিল, এর চেয়ে ছোট।

প্রচুর পাঠ্যবস্তু পেয়ে আমার উপোসী মন নেচে উঠেছিল। আমি হলুম Reading room এর সব চেয়ে নিয়মিত পাঠক। রোজ সকালে এবং বিকেলে পড়তুম,—নোট করতুম,—২।১টা ভাল মাল অনুবাদও করে রাখতুম। যেমন মুসোলিনির লেখা "ফ্যাসিজম"।

সবচেয়ে ভাল একখানা ম্যাগাজিন ছিল আমেরিকার এক প্রগতিশীল মাসিক Living Age এত ভাল বিদেশী ম্যাগাজিন আমি তখন পর্যন্ত আর দেখিনি। ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে "এনসাইক্লোপিডিয়া ইটালিয়ানা" নামক যে এক নতুন অভিধানকোষ প্রকাশিত হয়েছিল,—তার মধ্যে "ফ্যাসিজম" এর ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছিল স্বয়ং মুসোলিনী কর্তৃক। লণ্ডনের "পলিটিক্যাল কোয়ার্টারলি" কাগজে তার authoritative translation (ইংরাজী) বেরিয়েছিল, এবং Living Ageএ সেটা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আমি সেটা বাংলায় অনুবাদ করে রেখে দিলুম।

আমি বহরমপুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিউ ক্যাম্পের ডেটিনিউ বরিশালের অতুল গুপ্ত আর বিক্রমপুরের (পঞ্চসারের) জিতেন দত্ত বলেছিল, তারা পড়াশুনা করতে চায়, আমাকে পড়াতে হবে মার্কসিজম সংক্রান্ত পাঠ্য। তদনুসারে ব্যবস্থা হয়েছিল, সকালে নিউক্যাম্পে গিয়ে ক্লাশ করতুম। ওদের সঙ্গে ২৪ পরগণার শান্তি নামক এক তরুণ এবং গাইবাঁধার ব্রজমাধব দাসও (তিনি বি, এল।) যোগ দিয়েছিল। প্রথম পাঠ্য নির্বাচন করেছিলুম বিনয় সরকারের "পরিবার গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র" (তখনও এঙ্গেলসের বইটা এদেশে চালু হয়নি)—মার্কসীয় সমাজতত্ব, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বইখানা কারো কাছে ছিলনা অর্ডার দিয়ে কিনে আনা হল। তারপর কমনরুমের এক পাশে মাদুর পেতে সেই বইটাই পড়া হল প্রায় এক মাস ধরে। বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যায় সময় লাগতো।

এদিকে ষ্টেলিনের "লেনিনিজম" বইটা (২৬ সালে প্রকাশিত) পেয়েছিলুম, এবং পড়ে, আনন্দে নেচে উঠেছিলুম—বাংলায় অনুবাদ সুরু করে দিয়েছিলুম—গোপনে মশারির মধ্যে। পাঁচ মাস মশারিটা দিনরাত ফেলাই থাকতো, তার মধ্যে বিড়ির তোড়-জোড় এবং বই খাতা নিয়ে আমি রাত্রে এবং ভোরে অনুবাদ করে চলি। পাঁচ মাসে, exercise bookএর সাড়ে ছ'শো পাতা ঠাসা লেখায় সেটা সম্পূর্ণ হল, এবং নিউক্যাম্পের ক্লাশে সেটা পড়া এবং revise করা হয়ে গেল। তারপর চললো সেই সাড়ে ছ'শো পৃষ্ঠা লেখা কপি করা —৫টা গ্রুপের ছেলেরা নিজেদের জন্যে এক একটা কপি করে নিতে লাগলো। লেখাপড়া সম্পর্কে এই উৎসাহ এবং পরিশ্রম ক্যাম্পে একটা নতুন জিনিষ—অবশ্য ইউনিভারসিটির পরীক্ষার পড়াশুনা ছাড়া।

বুখারিনের Historical Materialism বইখানাও ক্যাম্পে পাওয়া গেল—সেটা আমার পড়া ছিল না,—কিন্তু সেটা পড়ানোর তাগিদ এলো। আমি রোজ খানিক করে পড়ে রাখি, এবং নিউ ক্যাম্পের ক্লাসে সেইটুকু পড়াই এমনি করে একসঙ্গে পড়া এবং পড়ানো হয়ে গেল। সারা ক্যাম্পে বই ছিল মাত্র একখানা—গোড়ার দিকটা ময়লা হয়ে "লাট" হয়েছে, আর শেষের দিকটা নতুন আছে। অর্থাৎ কেউই শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারেনি। এ বইটা পড়ার পর ওরা ক্ষেপলো—অন্য পার্টির বই—আমাদের নেই—সুতরাং বইটারই একটা কপি করে নেওয়া যাক। এত বড় খাটুনীর কাজও সারা হয়ে গেল—আমার পরামর্শে ওরা সকলে মিলে যে যখন যেটুকু পারে কপি করে। ময়মনসিংহের সুশীল সেনও যোগ দিলে—পাঁচ হাতের লেখায় মোটা মোটা exercise book বোঝাই করে কাজটা সাঙ্গ হল।

আমি একা এক পার্টি—দল পাকাই না—সেটা সকলেই দেখে, এবং তার ফলে আমার গতিবিধি সর্বত্র—সব দলের সঙ্গে সমান মেলা মেশা। একদলের ছেলে আর এক দলের ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে তাদের দাদারা হুকুম দিয়ে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়,—এই যেখানে রেওয়াজ,—সেখানে কোন দলের কোন দাদাই আমার সঙ্গে দলের ছেলেদের মেলামেশায় আপত্তি করে না। এ ব্যাপারটাকে কমিউনিষ্টরা ভাল চোখে দেখে না, সুতরাং আমাকে দলের লোক মনে করে না —কিছু বলতে পারে না।

'মে' ডে উপলক্ষে হাতে লেখা প্রাচীর পত্রে আমি এক বাণী লিখলুম! কমিউনিষ্টরা অন্যান্য দলের লোকদের এড়িয়ে চলে, বলে, ওরা বুর্জোয়াদের ভাড়াটে গুণ্ডা। আমি লিখলুম, এ মনোভাব ঠিক নয়—বিপ্লবের পথে যারা এসেছে, শেষ পর্যন্ত যদি তারা টিকে থাকে, তাহলে তারা কমিউনিজমের পথই ধরবে। এই নতুন সুর অনেকেরই ভাল লেগেছিল। আমাদের ঘরের একটি ছেলে—পাগলা জীতেন্দ্র

ব্যানার্জি—আমাকে নারানদা বলত, একদিন হঠাৎ "দাদা" বলতে সুরু করলে। আমি রগড় বুঝে বললুম,—আমি ছেলে রিক্রুট করি না—অমুকের কাছে যাও, তিনি খুসী হবেন—"নারাণদা" বলেও যথেষ্ট ভক্তি করা যায়। আমি যেটুকু জানি-বুঝি,—যাকে হাতের কাছে পাব বলে যাব,—তারপর সে যা খুসী করুক, আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

আমাদের ঘরেও একটা ক্লাস সুরু হয়েছিল, তার মধ্যে নর্থ বেঙ্গল যুগান্তর দলের কয়েক জন ছিল। রংপুরের অবনী বাক্চির হয়েছিল ভারি রাগ,—আমি নাকি intellectual superiorityর advantage নিয়ে ছেলে-খারাপ করছি! মুক্তির পর ৩৮ সালে দেখি তিনি একজন কমিউনিষ্ট এবং কৃষক-নেতা!

তাঁদের ঘরে ছিলেন তাঁদের দলের নরেশ চৌধুরী। একদিন তিনি লেনিনিজম বইখানা নিয়ে এসে একটা জায়গা দেখিয়ে আমাকে বললেন,—"এই দেখুন, আপনি যা বলেন, লেনিন তার উল্টো কথা বলেছেন।" আমি আর খানিক পড়ে তাঁকে দেখিয়ে দিলুম, তিনিই ভুল বুঝেছেন,—আমিই লেনিনের কথা ঠিক ঠিক বলি। এমনি ব্যাপার আরো অনেকবার হয়েছে।

তখন অনুশীলন দলের দেবজ্যোতি বর্মণ আমাদের ক্যাম্পে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বাইরে আলাপ ছিল, বোধ হয় আমার "শ্রীভাঁওতা" উপলক্ষে আলাপ হয়েছিল। তখন তিনি আর একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এক বইয়ের দোকান করেছিলেন—National literature—স্বদেশী বই। বোধ হয় তারপরেই গ্রেপ্তার হয়ে ক্যাম্পে আসেন।

আমি তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতুম—বলতুম, লেনিনিজম বইখানা আপনার পড়া উচিত—কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বলতে হলেও কমিউনিজম বোঝা দরকার। তিনি বইটা পড়তে সুরু করেছিলেন।

ওঁদের দলের সুধীর ঘোষের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল, লেনিনের কথা নিয়ে। একদিন তিনি লেনিনের "On Religion" বইটা নিয়ে এসে বললেন,—"এই দেখুন, লেনিন কি রকম সাংঘাতিক কথা বলছেন।" আমি সে-বইটা আগে পড়িনি। আমি বললুম, লেনিনের বক্তব্য নিশ্চয়ই আপনি ভুল বুঝেছেন। তারপর বইটা নিয়ে পড়লুম, মনে মনে হাসলুম, একখানা exercise book নিয়ে তাতে সারা বইটা থেকে (ছোট বই) পর পর গোটা ২০।২৫ কোটেশন সাজিয়ে লিখে বইটা সমেত সেটা তাঁকে দিলুম। তিনি পড়ে দেখে (বইএর সঙ্গে মিলিয়ে) নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেলেন, এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন।

তিনি ছিলেন Science Graduate —B. Sc. তাঁর নাম ছিল ভাইস চ্যান্সেলার। কারণ, ক্যাম্পের যত ডেটিনিউ ছাত্র ছিলেন ইউনিভারসিটির একজামিনের জন্তে পড়াশুনা করতেন তাঁদের জন্তে ইউনিভারসিটির সঙ্গে পত্রালাপ ও বন্দোবস্ত করতেন তিনিই। এ বিষয়ে তাঁর সহকারী ছিলেন তাঁদেরই দলের এক তরুণ ধীরেন দাশগুপ্ত যিনি এখন 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'এর নিউজ এডিটর।

মাঝে মাঝে কমন রুমে সভা করে' বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হ'ত সকল দলের লোকেই সভায় যোগ দিত। এমনি এক সভায় হয়েছিল গোপেন মুখার্জির বক্তৃতা ফ্রয়েড সম্বন্ধে। একদিন ধীরেন দাশগুপ্ত আমার কাছে এসে বললেন, ক্যাপিট্যালিজম বনাম কমিউনিজম এক বিতর্ক সভা হচ্ছে, আপনাকে কমিউনিজম সম্বন্ধে বলতে হবে। আমি বললুম, "আমি সভায় বলতে পারি না, গলা কেঁপে, ঘেমে, সব ভুলে গিয়ে একাকার করবো বেইজ্জৎ হব।" তিনি নাছোড়বান্দা। বললেন, আপনার লেখা প্রবন্ধ পড়ার জন্তে আমরা একটা পৃথক সভা একদিন করবো, কিন্তু এ সভায় আপনাকে বলতেই হবে। সুতরাং গেলুম।

দেখলুম, লেনিনিজম প্রচারের ফলে অ্যান্টি-কমিউনিষ্ট বাবুরা একাট্টা হয়েছে। কমিউনিজমের বিপক্ষে এবং স্বপক্ষে কয়েকজনের বক্তৃতা শুনলুম। তারপর এল আমার পালা। আমি দেখালুম, উভয়দলের কথার মধ্যেই যুক্তির অস্পষ্টতা এবং উদাহরণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে আগাগোড়া। যে প্রশ্নের formulation wrong, সেই প্রশ্নের গম্ভীর ভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টাও ভুল হতে বাধ্য। কয়েকটা প্রশ্নের ভুল, এবং জবাবের দুশ্চেষ্টা ও ঘাটতি দেখিয়ে দিলুম।

তারপর একদিন আমার প্রবন্ধ পড়ার ব্যবস্থা হল। প্রবন্ধটা লিখতে বসে প্রকাণ্ড হয়ে গেল—exercise book এর ১৬ পাতা ঠাসা লেখা—একখানা ছোট বই হতে পারতো। কমন রুমে সভা বসেছে—জন ২৫।৩০ ডেটিনিউ এসেছেন। পড়া সুরু হল। একটু পরেই ২।৪ জন উঠে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ বড় একটা দল নিয়ে তারা ফিরে এলেন। তারপর দফায় দফায় দলে দলে লোক এসে ঘর ভরতি হয়ে গেল। আড়াই ঘণ্টা ঝড়ের মতন হুড়মুড় ক'রে পড়ে' শেষ করলুম। সভাভঙ্গের পর কমিউনিষ্টদলের পিটুবাবুর চেলা অমল মিত্র একান্তে বললেন,—লেখাটা একবার আমায় দেবেন কয়েকদিনের জন্তে? কিছু নোট করে নোব। দিলুম। বুঝলুম, লেনিনিজম নিয়ে যে ঘটা করেছিলুম, তার সাফল্য আশাতীত হয়েছে। পরে দ্বিতীয় একটা ক্লাস ওল্ড ক্যাম্পে সুরু করতে হয়েছিল,—অনুশীলন দলের তারাপদ মুখার্জি, কৃষ্ণ লাহিড়ী প্রভৃতিকে নিয়ে।

নিউ ক্যাম্পে টালার ক্ষিতীশ ঘোষ ছিল—বাদল গাঙ্গুলীদের সাম্যরাজ পার্টির কর্মী—তার কাছে সংবাদ পেয়েছিলুম, তারা আমার

নিষিদ্ধ বই "শ্রীভাঁওতা" মোটাদা'র কাছ থেকে গোপনে একটাকা করে কিনে এনে ৪।৫ টাকায় পর্যন্ত বিক্রয় করেছিল। তার অন্তদলের বন্ধুরা তাকে কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতো, এবং আমার কাছে সে সম্বন্ধে সে কিছু কিছু জেনে নিতো।

এত কাণ্ডের মধ্যে কিন্তু মাঝে মাঝে দাবা খেলা চলতো এক নাগাড়ে ৮।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! পুরানো বন্ধু ঢাকার সুরেন দাস (অনুশীলন দলের) ছিলেন একজন দাবাড়ু। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে এক একদিন তার ঘরে গিয়ে দাবায় বসতুম, এবং বিকালে তার ঘরেই টিফিন খেয়ে রাত ৯টায় তালাবন্দী হওয়ার ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত দাবা খেলতুম। আমাকে সকলেই ভাল বাসতো।

এখানেও কিচেন নিয়ে এক বিভ্রাট বাধিয়েছিলুম। কিচেনের ম্যানেজমেন্ট প্রায় জোর করেই দখল করে রেখেছিল ফরিদপুরের পূর্ণ দাসের রিভোল্ট-গ্রুপ (পঞ্চানন চক্রবর্তীর দল) এবং ম্যানেজমেন্ট ভাল ছিল না। সকলে সিগারেট পায় এবং পায়, আমি এক বাণ্ডিল বিড়ি ও একটা দেশলাই রোজ নিই। আর যারা পান খায়, তারা রোজ কিছু পান পায়। আমাকেও রোজ পান দেওয়া হয় গোটা আষ্টেক ছোট পান। আমার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনেকে একটু আপ্যায়িত করে যান একটা পান খেয়ে। আমার কুলোয় না। আমি গোটা কতক বেশী পান দিতে বললুম ম্যানেজারকে। কিছুতেই দেয় না। শুনতে পাই, খরচে কুলোয় না। তখন একদিন এক চিঠি লিখে দিলুম ম্যানেজারের কাছে, আমি রাত্রে meal খাবো না, তার বদলে আমাকে এক তাড়া করে পান দিতে হবে।

রাত্রে খেতে গেলুম না, দেখি ঘরে ফালতুকে দিয়ে meal পাঠিয়ে দিয়েছে, আর দিয়েছে গোটা ১০।১২ পান। আমি meal ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে আরো পান চাইলুম। সুতরাং লেগে গেল গণ্ডগোল। বন্ধুদের পীড়াপীড়ি গ্রাহ্য না করে উপোস করেই থাকলুম। ম্যানেজারকে লিখে দিলুম আমার রাত্রের meal এর বদলে পান চাই রোজই।

দুই ক্যাম্পে সব কিচেনে হৈ চৈ পড়ে গেল। সুরেন দাস এক তাড়া ঝাড়া পান পাঠিয়ে দিলেন। নিউ ক্যাম্পে তখন শান্তিপুরের মধু গোঁসাই ছিলেন, তিনি এক তাড়া পান পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, আপনার বয়েস এবং সম্মান ভুলে গিয়ে আপনি এমন ছেলেমানুষী করছেন কেন? আমি লিখে দিলুম, আমরা গরীব গেরস্ত লোক, নিজেরা চিরকাল বাজার করে খেয়েছি, কিসে কি হয় জানি। সুতরাং সইতে পারি না!

কয়েকদিনই ঘরে meal আসে, বেশী পানও আসে, আমি meal ফেরৎ দিয়ে আরো পান চাই। সুতরাং আমাদের কিচেনে এমন এক আন্দোলন সুরু হল যে, ওরা management ছেড়ে দিলে। সকলে আমাকে Manager করতে চায়। আমি বললুম, পান আমার ম্যানেজারীর প্ল্যান নয়, আর আমাকে বেইজ্জৎ করার জন্যে তোমাদের প্ল্যানও খাটবে না। সুতরাং একজন "যুগান্তর রিভোল্টকে" ম্যানেজার করা হল। ওরা বললে, কমিউনিষ্ট হলে কি হবে! যুগান্তর দলের লোকতো! কাজেই ম্যানেজারীটা যুগান্তরের হাতেই তুলে দেওয়া হল।

যুগান্তর কিচেনের এক সাব-গ্রুপ ছিল বিপিনদার দলের কয়েকজন ছেলে, এবং তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভরূপে মিটিংয়ে যোগ দিত কানাই দাস (দমদমার)। সে একদিন আমাকে একান্তে ডেকে বললে, আমি তাদের গ্রুপের রিপ্রেজেন্টেটিভ হলে ভাল হয়। আমি তখন তাকে চুপি চুপি বললুম,—আমি বিপিনদাকে ভক্তি করি, এবং তিনি আমাকে ভালবাসেন,—এই সব দেখে তুমি হয়ত মনে করে আছ, আমি বিপিনদার দলের লোক বা চেলা, কিন্তু সেটা তোমার ভুল —আমি বিপিনদার চেলা নই।

এমন করে লীডারীর চান্স ছেড়ে দিলুম দেখে সে খানিক হাঁ করে মুখ পানে চেয়ে থাকলো। তারপর থেকে আমার কাছে সে আর আসতো না।

আবার—অনুশীলনের কৃষ্ণ চক্রবর্তী তখন I. A. পড়ছিল, সে ধরলে, তাকে Civics পড়াতে হবে। কিছুদিন পড়ালুম।

মোটের ওপর, আমার প্রবন্ধ পড়ার পর অনেকের নজর পড়লো আমার ওপর। কারণ প্রবন্ধটা হয়েছিল নতুন রকমের। হেগেলের ডায়লেকটিক্সের সঙ্গে মার্কসের ডায়লেকটিক্সের সম্পর্ক ও তুলনা,—হেগেলের কথা "মানব সমাজের সংঘবদ্ধতার চূড়ান্তরূপ national state এই বুর্জোয়া আদর্শের সামনে মার্কসের আদর্শ "মানব সমাজের সংঘবদ্ধতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি আন্তর্জাতিক জগৎজোড়া কমিউনিষ্ট সমাজ" খাড়া করা প্রভৃতিতো ছিলই,—উপরন্তু কতকগুলো অ-মার্কসীয় বই থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতিও ছিল চমৎকার। এম, সেনের Civics (পাঠ্য) এর মধ্যে একটা কথা ছিল,—

"জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা বোধহয় শুধু রাশিয়াতেই আছে —সেটা তুলে দিয়েছিলুম। Encyclopaedia Britannica থেকে

উদ্ধৃত করেছিলুম, "থার্ড আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থার উদাহরণ Third International"—B. Aর পাঠ্য Politicsএ Gilchrist ভুল বকেছে "মার্কসের সোসিয়্যালিজমটা হচ্ছে evolutionary, revolutionary নয়"—আমি লিখলুম, ওটা Fabian Socialist দের কথা,—মার্কসের বিরোধীদের কথা। এই সব কথায় অনেকে আমাকে রীতিমত পণ্ডিত ভাবতে সুরু করে দিয়েছিল।

পূজো এল ক্যাম্পে পূজো এবং উৎসবের ঘটা লেগে গেল। যাত্রা এবং থিয়েটারও হবে—ডেটিনিউবাবুরাই করবেন। থিয়েটারের ষ্টেজ-ড্রেসও এল। হঠাৎ দেখি, একদল মেয়ে ভাল ভাল শাড়ী পরে, কুলো ডালা মাথায় করে শাঁখ বাজিয়ে "জল সইতে" বেরিয়েছে যেন একটা প্রোসেশন। কারো কাঁকালে ঘড়া, কারো কোলে শিশু। একজনের কোলের শিশুর ন্যাড়া মাথাটা একটু দেখা যাচ্ছে—শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে—মা "চুপ কর" বলে তার মুখে হাত চাপা দিচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা বল্ডিং গ্লাভসকে কাপড় জড়িয়ে খোকা বানিয়েছে। সত্যিকারের আর্ট।"

সুনীল মুখার্জি যুবক, ফরসা ভাল চেহারা জোয়ান ছেলে পড়তো এবং টেনিস খেলতো, সে বোম্বাই শাড়ী পরে' মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে চলেছে—হৈ হৈ ব্যাপার। ৩৮ সালে বেরিয়ে দেখি সেই সুনীল বিহার প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলে না—যেমন অবনী বাকচিত্ত করেছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির standard সম্বন্ধে একটা ধারণা হল।

পূজোর আগে সুশান্ত মাইতি (বেঙ্গল টেকনিক্যালের ছাত্র—বর্তমানে বেলেঘাটায় জুটমিলের ইঞ্জিনিয়ার) নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি করতে এলেন আমার কাছে—লাল কাগজে সোনার জলে ছাপা চিঠি, নৃত্য পর্যন্ত আছে কর্মসূচীর মধ্যে। বললেন, এক হাজার চিঠি ছাপানো হয়েছে, প্রত্যেক ডেটিনিউকে তিনখানা করে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনকে পাঠাবেন নিমন্ত্রণ আমাদের পূজা উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করবেন বলে!

আমি বললুম, সত্যেন মিত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডেটিনিউদের দুঃখের কথা তুললে হোম মেম্বার যাতে এই সোনার জলে নৃত্য ছাপা একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বলতে পারে—Here is how the detenues are kept in Jail and Camps?

তিনি বললেন, কেন? দমদম জেলেওতো আমরা করেছি। সুরেন দাস শুনে বলেছিলেন,—"ঐ C D গুলি B D হইয়াই খাইচে।"

যাই হোক, থিয়েটার হল শরৎ চাটুজ্যের "রমা" (পল্লীসমাজ) এবং বোধ হয় "বামুনের মেয়ে"। আমি পার্ট করেছিলুম বেণী ঘোষাল এবং গোলোক চাটুজ্যের। "নটরাজ" নৃত্য করেছিল একটি ছেলে ভালই। [ক্রমশঃ।

আলেখ্য-সঙ্গীত

মাধবী সেনগুপ্ত

নিস্তরংগ নদীটির ওপর সুস্থিত সেতুটির ছায়া
বেশ লাগে। মঞ্জরীহীন একটা একটা কৃষ্ণচূড়ার শাখা
নুয়ে আছে প্রেমিকের মত। দূরে বসে নিখুঁত বেহায়া
একটি বক। ছবিটির এইটুকু সুনিপুণ আঁকা।
নিরঙ্ এ ছবিটিতে পরিচিত ছবি মনে আসে
কোথায় দেখেছি যেন ঋতুপুষ্ট পাইনের বন,
উড়ন্ত পাখীর গান শুনেছি সন্ধ্যার আকাশে
নির্জন হাওয়ায় কাঁদে প্রপাতের উচ্ছ্বলিত মন।
রোদ-শেষ আকাশের বুকে ওড়ে দীর্ঘপক্ষ মেঘ
সে মেঘের ছায়া দেখি পড়ে আছে অন্তরের বিলে,
দুঃসহ মেঘভার ভেঙ্গে পড়ে হারিয়ে আবেগ
ভুলে গেছি সব নাম আজকের স্মৃতির মিছিলে।
হঠাৎ বর্ষণ সুরু হঠাৎই বর্ষণ শেষ হ'লে
বিস্ময়ে আনন্দ আসে জৈজ্যের দেবদারু-প্রাণে
কত কথা কত গান আঁকা আছে মনের ইজেলে,
সব সুর খুঁজে পাই, খুঁজে পাই বর্ষণের মানে।

প্রেম

জগদীশচন্দ্র দাশ

ধনীর প্রাসাদ হতে
প্রেম নামে ফুটপাথে।
শহরে কে ঘুমায়
পালঙ্ক শয্যায়?
এখানে ফুটপাথ
উদ্বাস্তু দম্পতির
কি নিবিড়
প্রেমের প্রপাত।

তোমরা কি মনে কর প্রেম থাকে লোহার কন্দরে!
প্রেম তো হৃদয়ের হীরে
তোমার আমার প্রেম এ প্রেম সবার
প্রেম নহে বণিকের বাণিজ্য সম্ভার।

আকাশের সেই যে দেওয়াল
ঈশ্বরের প্রেমের খেয়াল।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে উড়িষ্যার শিল্পনিদর্শনের একটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র শ্রীবিমল ঘোষ গৃহীত।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৬৮। মেঘ উন্মত্ত, ঝিম্‌ঝিম্ করে ঝরে পড়ত রসধারা। পথিকহীন পথে রাত্রি নামতেন। তাঁর প্রসাধন যেন আর ফুরোতেই চাইত না। আর সেই রাত্রির বিশালতায় অসহ্য হলেও শ্রীরাধাদি গোকুলকুলাঙ্গনাদের জোর করেই সহ্য করতে হত অনুরাগের বাধা, অন্তরে অন্তরে বহন করতে হত অনিরাকরণীয় আবেগ এবং তাঁদের আক্রান্ত হতেই হত এক নাম-অজানা কামনার ভারে। অতিমাত্রায় পরিপাকের ফলে রস যেমন এক পরিণতি থেকে অন্য এক পরিণামে এসে পৌঁছয় তেমনি পূর্ব্বরাগগন্ধের অমল গন্ধ দীন-হীনতায় বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁদের সেই বাসনাও পরিণত হয়ে যেত এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মধুরতায়। দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী "যোগমায়া" অলক্ষিতে অবস্থান করে সফল করতেন সেই কামনার ভার, তার সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে অখিল-সৌভাগ্য-লীলাবতার চির-পালক শ্রীকৃষ্ণে।

৬৯। কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় এঁর পক্ষে, কারণ, এঁরই কৃপায় একদা নিকৃষ্টা ও ন্যূনা বরাকী "চিত্রলেখা,"—ইন্দ্রাদি দেবগণ যেখানে প্রবেশ করতে পারেন না এমন কারাগার থেকে, যে পথ কয়েক মাসে পার হওয়া যায় সেই পথ ক্ষণিকের মধ্যে নিঃশব্দে লঙ্ঘন করে, এমন কি লোকচক্ষুর দৃষ্টিকেও অতিক্রম করে,—"অনিরুদ্ধ"-কে নিয়ে চলে এসেছিলেন নিজের সাথী "উষা"র কাছে।

৭০। মহাযোগী শ্রীভগবানের এই মহাযোগশক্তিই যে যথাসময়ে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-মঙ্গলের জন্য এক দল কলাবতীকে পতিম্মন্যা করে তুলবে, রূপাকৃতিগুণে অন্য দলকে সেই নারীদের প্রতিবিম্বসমান করে গড়বে, এবং নিত্যসিদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-স্বরূপ রূপ-সৌকর্য্য নিয়ে যাঁরা অবতীর্ণা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবে—অনিয়োজিত-দূতীভাব;···সে বিষয়ে কি অবকাশ থাকতে পারে সন্দেহের? কখনও না। এই সিদ্ধান্ত-বলেই সিদ্ধ হয়ে যায় রাধা-মাধবের কেলি-প্রসঙ্গ। কে কলুষিত করতে পারে সেই প্রসঙ্গকে? বৈদগ্ধ্যাদি কোনো বিলাস বশেরই সে ক্ষমতা নেই।

৭১। ঐ লোকোত্তর কেলি সবিশেষ; এতে কেবল তারতম্য ঘটে সুখের। রসিকনায়ক শ্রীমাধব এবং রসিকনায়িকা শ্রীরাধার এই কেলি-কলায় স্পর্শচাপল্য নেই বয়সের; কারণ এটি নিত্যসিদ্ধ। যাঁদের বিভ্রান্তি ঘুচে গেছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণে রতি পোষণ করেন ···বাৎসল্যরস-মিশ্র অথবা প্রেম-প্রীত, অথবা সন্তস্তন স্তনন্ধয়বৎ। কিন্তু সেই সেই রসে অসাধারণ-ভাবেই বলাধান করে তাঁদের অনুব্রতী স্বভাব; যোগমায়ার মায়া-বৈভবের স্থান নেই সেখানে।

৭২। তাই সেদিন বৃষভানুনন্দিনী আর থাকতে পারলেন না ঘরে। মকরকেতনের চেতনা যেন কার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চায়, যেন তাঁকে পথ দেখিয়ে দেয় ঘরের বাহিরের। বাহির আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন বৃষভানুনন্দিনী। দেখলেন রাত্রি দেবী নেমেছেন, নয়ন-সুখী করা রাত্রি, প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে তিনি যেন আনন্দিত শুভলক্ষণ দিয়ে শোধন করে দিতে চাইছেন।

তবে কি তিনি সৌভাগ্যরসের সঘন বর্ষণে কৃতার্থ করতে চাইছেন রাধাকে? নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে তাঁর সারা অঙ্গে অমন নিবিড়তম তমালমালার মত মেঘমালার শ্যামল সোহাগ কেন? চমকে উঠলেন রাধা। তবে,···এই কি হবে তাঁর প্রথমাভিসার? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন বৃষভানুনন্দিনী। দেখলেন···পথ পড়ে রয়েছে সম্মুখে; শব্দহীন, জনহীন। যোগমায়াই কি তবে দেখিয়ে দিচ্ছেন পথ? মনে হল, তাঁর অনুচরীরা যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকছে। কই, বারণ করে ডাকছে না তো? তবে কি তারা তাঁর এই প্রথমাভিসারের রস-সৌন্দর্য্যের অংশভাগিনী হতে চায়? হয়ত। তারপরেই তাঁর সব যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল। অনৈকা সাহসিকা দূতিকার মত তাঁর চিরানুরক্তিই যেন তাঁর কৃষ্ণকে বশীকরণ করতে করতে তাঁকেও টেনে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। এগিয়ে চললেন নীলনিচোল-চোলী শ্রী-রাধিকা। জড়তার পঙ্কে তিনি প্রথমেই অনুভব করলেন মন্থরতার জন্ম, কিন্তু পরক্ষণেই কোথায় যেন ভেসে গেল তাঁর শঙ্কা! মৃগনাভিলিপ্তা শ্রীরাধা তখন নিজেই জানেন না···কোথায় তিনি চলেছেন:··কোথা থেকে··। সুতীব্র তরলতাকে নিন্দা করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর আর নেই। একখানি ধ্যানোৎপূর্ণ মন তাঁকে ডাকছে, "এস এস, কুঞ্জে এস।" আর সে আহ্বানের উত্তর দিতে জ্ঞানহারার মত আবেশে চলেছে যেন আর একখানি মন,··· সঙ্কেত-নিকেতনে। নবীনের সঙ্গ-সুধারসের সরসতায় যেন সিক্তা হতে হতে অভিসারে চললেন বৃষভানুনন্দিনী। হৃদয়রাজ বুঝি এমনি করেই আকর্ষণ করেন হৃদয়।

চলতে চলতে হিম হয়ে যায় উরু; প্রিয়সহচরীর হাত ধরে ফেলেন তিনি। চোখের জলের ধারায় লুপ্ত হয় পথজ্ঞান। এত কম্পন যে, পাতার মত কাঁপতে থাকে সখীরও হাত! প্রিয়ের গৃহে আসার এত যাতনা···কিন্তু এসেই হায় রে, আবার কেন দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চায় প্রাণ। (১১)

সখীরা মিলে তাঁকে তাড়া দেন, কিন্তু তাড়া দিলেই কি নড়া চলে! যত না যাওয়া—তার চেয়ে বেশী করে ফেরা। উৎকণ্ঠায় দুলতে থাকে অন্তর; তবু বাইরে তাঁর উল্টোশ্রী দেখাবার সে কী বিপুল চেষ্টা। ভালো কথা, বামারাই না হয় স্বভাব-কুটিলা হয়; বলি, নবীনারা তাহলে কী? (১২)

কিন্তু শ্রীরাধার কানের কাছে অন্ত নেই প্রণয়-সহচরীদের প্রার্থনার, আর চাটু গুঞ্জনের। তাঁরা শেষে যেন জোর করেই তাঁকে লুঠ করে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন কান্ত-গৃহে। হায় রে, যেথায় রতিশ্রীর পরিচয়

নেই, আদর কোথায় সেথা মিলনে ? তাই তনুমধ্যা শ্রীরাধা নব্যা সখীরূপে নিযুক্ত করে ফেললেন লজ্জাকে। (১৩)

এবং তাই, পুরোনো সখীরা বলে উঠলেন···"তবে যাই, যাই।"

এবং তাঁরও মন বলে উঠল, "যাই।"

কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর ততক্ষণে ধরে ফেলেছেন পাণি। কী রস আছে কি জানি, হঠাৎ মনের পালে লাগে স্থিতির বাতাস, স্পৃহার মুখে জাগে অনুলাপ, "ওলো, তোরা যাস্‌নে লো সই, যাস্‌নে।" ছোট্ট ছোট্ট ভ্রূভঙ্গের নিষেধে যাওয়া হয় না আর সখীদের; তাঁরা যেন ফিরে পান আশ্বাস, দাঁড়িয়ে যান কেলিভবনের দ্বারে। (১৪)

আর তত:পর কৃষ্ণ দেখতেই থাকেন, আর শ্রীরাধা মুকুলিত করেন তাঁর অরুণাভ দু'নয়ন; কৃষ্ণের স্বাগত-প্রশ্নে ভেসে ওঠে অভিযোগ অনুজ্ঞা, আর রাধা নীরব হয়ে কেবল শোনেন; কৃষ্ণের দক্ষিণপাণি স্পর্শ চায় একখানি বামপাণির, আর রাধা ঘুরে বসেন স্বেচ্ছায়; অথচ কোথাও যেন এতে ত্রাস নেই, মনের ভীরু-গোপনতা নেই, ছল করে সময় কাটানোর স্পৃহা নেই, নেই বৈমুখিনতা এতটুকুও। যে মেয়েরা ভালবাসে, তাদের হৃদয়ের স্বভাবের ধারাই এই। (১৫)

তারপরে নতাঙ্গী যতই কৃষ্ণকে ভেট পাঠাতে থাকেন বিরোধী বাধা, ততই আশ্চর্য্য সেই বাধাগুলোই কৌতূহলের হেতু হয়ে ওঠে কৃষ্ণের। রসিয়ে রাখে দুর্লভ পদার্থ ততক্ষণই, যতক্ষণ না ব্যভিচারী হয় তার দুর্লভত্ব। (১৬)

প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা করেন আলিঙ্গন; কিন্তু ভুরু বাঁকিয়ে তল্প-শয়ন থেকে উঠে পড়ে চলে যাব-যাব করেন বালা। করলেও দয়িতের প্রসন্ন মনে নিত্য-উত্থিত হয়েই থাকেন বালা। অন্ধকার দূর করতে হলে মণির সান্নিধ্যই কি যথেষ্ট নয় ? (১৭)

অতএব এই-হেন অবস্থায় যা ঘটে তাই ঘটল! সখীদের শপথ, শ্রীহরির আবেদন, অনুনয় মন্ত্রণা, ঐশ্বর্য্যবান কন্দর্পের পুষ্পবাণ···যা ঘটাতে পারল না, প্রৌঢ় সখীর মত নৈশ আকাশের কাদম্বিনীই একাকিনী তাঁর সেই বিদ্যুদ্দাম-ঘন-ঘটার কটু-কটাক্ষের আর সেই ক্রোধোর্জ্জিত গর্জ্জিতের শাসন দিয়ে তাই ঘটিয়ে দিলেন, কৃষ্ণের কণ্ঠে পৌঁছিয়ে দিলেন বৃষভানুনন্দিনীকে। (১৮)

১৩। রসের সমারোহ দিয়ে এমন কি মনের সমস্ত আবেগ দিয়েও যে মাননীয়াকে পাওয়া অসম্ভব, সেই পরম দুষ্প্রাপনীয়াকে অকস্মাৎ যেন মুঠোর মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি! এ যেন হঠাৎ হাতে চাঁদ পাওয়ার মত একটি ঘটনা। চাওয়া-পাওয়ার যা বাইরে, মধুকরেও যাকে ঘ্রাণ করতে পায় না, হাত বাড়িয়েও যাকে ছোঁওয়া যায় না, অথচ যার ঘন সৌরভটিকে ঢেকে রাখা অসম্ভব, এ যেন সেই নন্দন-কাননের মন্দারমালিকাকে আলাপহীন পুলকের মধ্য দিয়ে অকস্মাৎ কণ্ঠে পাওয়ার মত একটি ঘটনা! ব্রজরাজ যুবরাজের তাই মনে হল···যেন বলা নেই কওয়া নেই··· পরমাহ্লাদের বেগবতী ধারাকে কে যেন সুধারসধারার মত তাঁর বক্ষে নিক্ষেপ করে দিয়ে চলে গেল। একখানি অকৃত্রিম ভীরুতা বা মিথ্যা ভীতি তাঁর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠকে জড়িয়ে ধরল, আহা বিমর্দ্দিত করল; আর তাঁর সমস্ত সত্তা অকস্মাৎ বশে চলে গেল অলায়াসে। তাই তিনি বুঝতেও পারলেন না, কখন যে তাঁর মিলন-কাঙাল দুখানি অপারগ বাহু অবলম্বনের মত জড়িয়ে ধরেছে বৃষভানুনন্দিনীকে; হারিয়ে গেছে সময়; রস নিয়ে এসেছে আনন্দ-জড়িমা; আর কখন তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে অন্য-জ্ঞান। ব্রজরাজ যুবরাজের এ যেন এক পরমরমণীয় আশ্লেষ-পরিস্থিতি!

১৪। তাঁকে দেখে, কৃষ্ণকে দেখে, সহচরীদের সে কি হাসি! কী কটাক্ষবিক্ষেপের শ্রী! নিজেদের দুঃখগুলোকে যেন হেসে সম্পূর্ণ খণ্ডিয়ে নিলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হল তাঁদের মনোজল্পিত কামনার ফল বুঝি এতদিনে ফলল। তখন তাঁদের সে কী সম্মাননার অপরিমিত ঘটা। সখীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে কী মেঘের গর্জ্জন-গরিমার প্রশংসা! সঙ্কোচ ঘটিয়ে সে কী সম্পূজন! তাঁরা বললেন :—

১৫। "হে মেঘ, হে ঘনরসদ, আপনি ধন্য! রসিক বটে আপনি। আপনার বর্ণমিত্রের সঙ্গে এই নবীনা শ্রেষ্ঠা কমলিনীর মিলন ঘটিয়ে উপযুক্ত কাজই করেছেন। নিজেরও বিস্তার করেছেন মহিমা। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এক হুঙ্কারেই কৃষ্ণকণ্ঠে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছেন রাধাকে। আমাদের ধারণা ছিল শ্রীরাধা আমাদের দুরারাধ্য, এমন কিছু তিনি কোমলা নন। রক্ষা করেছেন আপনি।"

বৃষভানুনন্দিনীর মনে হল, তাঁর হৃদয়ে এসে যেন বিঁধে গেল সখীদের—ছেঁড়া কতকগুলো পরিহাসের প্রাস। বিরক্ত হল ভয়। প্রচণ্ড আগ্রহে তিনি তখন নিজেকে তুলে নেবার চেষ্টা করলেন রস-সমুদ্রের বুক থেকে, কিন্তু কৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় বাহুর অনন্ত আমোদের বেষ্টনী থেকে ছাড়া পাওয়া কি এতই সহজ?

তাঁর কপোল অনুভব করল কৃষ্ণের অজস্র চুম্বন; চিত্রলতার উপবনে তবু একটিও যেন খসল না পাতা, একটিও যেন ভাঙল না অঙ্কুর।

তাঁর নয়ন অনুভব করল কৃষ্ণের অজস্র চুম্বন; তবু সে যমুনার জলে এতটুকুও যেন ধুয়ে গেল না কাজলের শোভা।

তাঁর অধর অনুভব করল কৃষ্ণের সুধাপান; তবু যেন ভক্তিরস-রসিকের হৃদয়ের মত অক্ষত হয়েই রইল যাবকের লালিমা।

তাঁর স্তনযুগ অনুভব করল কৃষ্ণের করকমলের পরামর্শন; সুপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে এ যেন মালা পরিয়ে জল চড়িয়ে পূজা করার

সাধনা। দশন-নখপদ পদবীতে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতই অলক্ষ্যমান হয়ে রইল লাঞ্ছনা।

তাঁর বক্ষঃস্থল অনুভব করল কৃষ্ণের নিবিড় আলিঙ্গন, তবু মালা থেকে ছিঁড়ে পড়ল না একটিও দানা, শুক্তির ভিতরে যেন অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল মুক্তাবলীর মহিমা।

তাঁর কোমলতা অনুভব করল কৃষ্ণের পরিশীলন; কে যেন বিষম বিধুরাকে ধরে দেখিয়ে গেল সাহস, শুধু সাহস।

তাঁর নাভিহ্রদ অনুভব করল কৃষ্ণের স্পর্শন; কে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল তীর্থসলিল ছুঁয়েই।

তাঁর কটিতল অনুভব করল কৃষ্ণের নীবি-মোক্ষণ-প্রচেষ্টা; কিন্তু মোক্ষলাভ কি পরম-দুঃসাধ্য নয়?

৭৬। এবং কৃষ্ণও বৃষভানুনন্দিনীর···না, না,—বচনে অনুভব করলেন নেতিবাদ—সিদ্ধব্রহ্মের সারূপ্য; কটাক্ষ বিক্ষেপণে অনুভব করলেন বিদ্যুৎ-দামের মত উৎপ্লবৈব-লীয়মানতা; পালটি বক্ষ মোহারণীতে অনুভব করলেন উৎসবী নয়নের অশ্রুর নির্ঝর-মহিমা; এবং প্রত্যালিঙ্গনে অনুভব করলেন বর্ষার মল্লিকা-ফুলের মত পয়োধরের অভঙ্গুরতা;

রাধার সমস্ত দেহে তখন সে কি পুলকিত কম্পন···বসন্তের বাতাসের মত! সে কি ঘর্মকণিকার শোভা,···চৈত্র-সূর্য্যের রশ্মির মত! সে কি গলার আওয়াজ যেন এ গলার নয়; দেহ-সায়রের ঢেউ যেন কোথায় ভেঙে ভেঙে যায়!

৭৭। দ্বারোপকণ্ঠে আলীনা হ'য়ে দূর থেকে তাঁদের দেখছিলেন সখীরা। তাঁরা দেখতে পেলেন—কণ্ঠালিঙ্গন করে রয়েছেন কৃষ্ণ, আর তাঁদের প্রিয়সই সঙ্কুচিতা হয়ে রয়েছেন লজ্জার নির্ভরতায়। নূতন বলেই কি যৌবন সইতে পারছে না রসের এই প্রগাঢ়তা? জলজলে চেহারা হলে হবে কি,···প্রিয়সখীতে যেন আর প্রিয়সখী নেই, কি যে ঘটছে কোথায় সে বোধও যেন তাঁর নেই, যেন তাঁকে আলিঙ্গনে মোহিত করে সম্পূর্ণ হারিয়ে দিয়ে বসে আছে একখানা প্রিয়াতিপ্রিয় আগ্রহ।

তাই তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন—

"এই এই দেখ সই, একবার কিশোর-কিশোরীর নবীন প্রেমের কাণ্ডখানা! মনে হচ্ছে যেন মনোভব ঠাকুরই হেথায় আজ নিথর হয়ে গেছেন আনন্দে।" (১৯)

"ওরে সর্বনাশ, আমাদের প্রিয়সখীটির চির-আশা যে ফলতে না ফলতেই ফলের ভারে নুইয়ে দিচ্ছে তাঁর মন-শাখাকে! একে কি সুখ বলবি সই না দুঃখ বলবি? এ যে অসহ্য।" (২০)

৭৮। রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলে যা হয়, রাধার তখন সেই অবস্থা। রণশ্রমে প্রবল বইছে নিঃশ্বাস। করকমল দিয়ে কোনক্রমে ধরে রয়েছেন শিথিল কেশপাশ। মূলধনের মত শ্লথ হয়ে গেছে নীবি। লহরের পর লহর ছিঁড়ে গেছে তাঁর কণ্ঠের মুক্তার মালা কিন্তু তাঁর সেই আলু-থালু রূপ থেকে ফিরে আসতে চায় না কৃষ্ণনয়নের তৃষ্ণা। এগিয়ে আসে কৃষ্ণের মিলন-শেষের পরম প্রণয়। দূর থেকে সহচরীরা দেখেন, সেই প্রণয়ই যেন বেঁধে দেয় রাধার কেশপাশ, পাশ দিয়ে বেঁধে দেয় নীবি, গেঁথে দেয় মুক্তা-হার, পদ্মের মত হাতখানি দিয়ে মুছিয়ে দেয় টস্‌টসে ঘাম, রসের কথায় ভিজিয়ে দেয় তাঁর মন। সখীরা তখন হাসতে হাসতে, নয়ন ভরে দেখতে দেখতে, যেন তাঁর উৎসব দেখছেন মুখে এই হেন ভাব দেখে, কৃষ্ণ কথা কইতে উপস্থিত হয়ে যান তাঁদের সামনে।

৭৯। কিন্তু রাধার মুখে নত হয়ে থাকেন চাঁদ। যেন তিনি দেখতেই চান না অন্য কারোর মুখ। তারপরে যখন ভুরু দুটিকে কুটিল করে থেকে থেকে খেলে যেতে লাগল রাধার কটাক্ষের বিদ্যুৎ, তখন সহচরীরা বললেন—

"চল সই, বাড়ী যাই। রাত এখনও রয়েছে। প্রেমের গুরুর কাছে অত আর উদ্যম ফলিয়ে বক্ষঃ-বন্ধন-রহস্য-শিক্ষার পাঠ নিতে হবে না তোমাকে। শিষ্যা হয়ে আর কাজ নেই। দেরী করিসনে সই, উঠে পড়, প্রেমের বিছানা ছেড়ে।"

সখীদের ভাষায় যতই সজাগ হতে থাকে পরিহাসের হাসি, ততই রাধার চোখ ঘিরে বাঁকতে থাকে মিথ্যে ভ্রূকুটি, অথচ মৃণালের মত হাতখানি ততই নাড়তে থাকে কেশের সুরভি-ঢালা মাল্য, আর তাঁর ততই মনে হতে থাকে···কৃষ্ণের হৃদয়খানি যেন স্তব করছে, রসের ঝর্ণা ঝরিয়ে যেন তাঁর লাবণ্যের স্তব করছে, সে স্তবের যেন শেষ নেই, সে স্তবের যেন বিশ্রাম নেই। নকল ক্রোধের কঠোরতা মিলিয়ে যায় তাঁর নরম-মনের পরম হাসিটিতে, আর সেই অল্প হাসিখানি বলে ওঠে—"তোদের ঐ পোড়া চোখে আমি যেন একটা মায়া-নাটকের খেলার পুতলী হয়ে দাঁড়িয়েছি। না? ওলো সই, আমি কি আজ নিজেই ভাঙলেম আমার স্বাধীনতা? যখনি যা তোরা করতে বলিস, সে বিপথে-ই হোক বা বিশিষ্ট পথেই হোক্, বেদ-বাক্যের মত আমি কি তা করিনি? তাহলে কেন এখন তোরা আমাকে এমন করে মান খুইয়ে বোকা বানাচ্ছিস? কে এখানে নিয়ে এল, কে-ই বা এখানে না এল?"

বৃষভানুনন্দিনীর কণ্ঠ-বীণার ঐ আলাপের কোমলতায় কৃষ্ণের অতৃপ্ত মনখানিও কেমন যেন মেদুর হয়ে গেল সন্তাপচ্ছেদী এক দুষ্প্রাপ্য আনন্দের ঘন-বর্ষণে। তিনি বললেন—

"আপনারা শুভবতী। আপনারা প্রসন্ন হয়েছেন বলেই আমি ডুব দিতে পেরেছি ওঁর অমিয়-নিছনি বাণীর শুভ ধারায়। আপনারা প্রসন্ন হয়েছেন বলেই আমি মুক্তি পেয়েছি অন্তর্দাহের হাত থেকে।"

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ যখন পরিতোষিকের মত··· প্রত্যেক সখীর কাছে···প্রণয়ের প্রমাণ দেখিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন তাঁর আলিঙ্গন, তখন রাধার কায়ায় জাগল আলোড়ন, মানসে হল রসের উদ্বোধন এবং বাক্যে ঝরল পরিহাসের—হোম থেকে সবন করা অমৃতের কণা। তিনি বলে উঠলেন—"এখন তো আপনাদের হৃদয়ের ব্যাধি সারল? আর কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না কাউকে। এমনিটি হলেই, আর ঠাট্টা করাও চলবে না অপরকে।"

মধুরজি! এমনি বাণীই মধুকে রাঙায়।

৮০। সহচরীরাও তখন ভুঞ্জন করছিলেন এক নিরাবরণ আনন্দ ···কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গমের আনন্দ। নিজেদের প্রিয়সখীর সুখটিকে পূর্ব্বেই সমীক্ষণ করেছিলেন তাঁরা। সেই অতীত অনুভূতিটি এখন আবার তাঁদের আত্মানুভূতির মধ্যে হয়ে উঠল বর্ত্তমান। হঠাৎ এই জ্ঞানটি তাঁদের হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় চক্রের ডাক
(Rebid by the opener)

ডাক উদ্বোধন করার সময়ে উদ্বোধনকারীকে চিন্তা করতে হবে খেঁড়ীর কাছ থেকে কিরূপ বদলী ডাক আসা সম্ভব এবং ঐরূপ ডাক এলে দ্বিতীয় চক্রে কি ডাক হবে? এরূপ চিন্তা না ক'রে ডাক উদ্বোধন করলে পরবর্ত্তী চক্রে উদ্বোধনকারীকে অনেক সময়ে নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে দেখা যায় কিন্তু একবার ডাক উদ্বোধন করে খেঁড়ীর বদলী ডাকে ছাড়াও যায় না কারণ হয়ত বা দুইটি ডাকের যুগ্মশক্তিতে গেমও হ'তে পারে। দ্বিতীয় চক্রের ডাকের দ্বারা উদ্বোধনকারী তার নিজ হাতের শক্তি এবং বিভাগ খেঁড়ীকে ঠিকমত জানাতে সক্ষম হ'লে সেটিকেই প্রকৃষ্ট ডাক বলা চলে। ঠিকমত ডাকে পৌছুতে হ'লে প্রয়োজন কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ডাক বিনিময় যাতে করে পরস্পর পরস্পরের হাতের শক্তি পিঠ জয় করবার ক্ষমতা জানতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে Culbertson 4-5 6 Tableটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তালিকানুযায়ী তাসের বিভাগ সাধারণ হ'লে সম্মিলিত শক্তিতে কতগুলি পিঠ জয় করার সম্ভাবনা তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় সহজে। এই তালিকাটি নিম্নরূপ :—

১। ৪ থেকে ৫ ট্রিকে—সাধারণত: একটির ডাকের খেলা করা যায়। অন্তবর্ত্তী তাসের অভাবে সময়ে সময়ে একটি পিঠ কম হয়ে পড়ে।

২। ৫ থেকে ৫½ ট্রিক—নো-ট্রাম্প ডাকে দুটির ডাকের খেলা করার সম্ভাবনা। উঁচুদরের রংয়ের (ইস্কাবন বা হরতন্) ডাকে তাসের মিল হ'লে সময় বিশেষে গেমও হয়ে থাকে।

৩। ৬ ট্রিকে—সাধারণভাবে গেম হয়ে থাকে ইস্কাবন ও হরতন রংয়ের ডাকে। বড় রংয়ের ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাবে নো-ট্রাম্প ডাকেও গেম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

৪। ৬½ থেকে ৮ ট্রিক—৬½ বা কিছু বেশী ট্রিক হ'লেই স্লামের (Slam) গন্ধ পাওয়া যায়; নির্ভর করে সম্পূর্ণ তাসের বিভাগ ও প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রের রোখবার তাসের উপর (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে বিশদভাবে)।

৮ ট্রিক থেকেই বড় স্লামের (Grand Slam) সম্ভাবনা এসে পড়ে, নির্ভর করে প্রথম চক্রে রোখবার তাসের ওপর (Depending on first round controls)।

উপরের তালিকানুযায়ী ডাক অভ্যাস করলে সাধারণত: কোনও অসুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকে না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, উপরন্তু ক'টি ডাকের খেলা করার সম্ভাবনা আছে নিজেদের সেটির আন্দাজ করা যায় এবং বিপক্ষদল ডাকের গণ্ডী পার হ'লে ডবল দিয়ে বেশী খেসারৎ আদায় করা সম্ভব হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে একমাত্র বিভাগের অস্বাভাবিকতা হেতু।

যা হোক্, নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল উপরের তালিকানুযায়ী ডাকের :—

উদাহরণ নং ১। মনে করুন আপনি নিম্নলিখিত তাসে একটি ইস্কাবন ডাক দিয়েছেন :—

ই-টে, সা, ৯, ৮, ২ ; ট্রিকদর ২। হ-বি, গো, ৩ ; ট্রিকদর ½। রু-৭, ২ ; ট্রিকদর ০। চি-সা, ৭, ৩ ; ট্রিকদর ½। মোট ট্রিকদর ৩

ক। খেঁড়ীর ডাক একটি নো-ট্রাম্প। খ। খেঁড়ীর ডাক দুটি ইস্কাবন। গ। খেঁড়ীর ডাক দুটি রুহিতন।

(ক) দুটি হাতের সম্মিলিত শক্তি ৩+(১+থেকে ১½+) (একটি নো-ট্রাম্পের সর্ব্বনিম্ন) ৪½ ট্রিক। ৪½ ট্রিকে মধ্যবর্ত্তী ও সাহায্যকারী তাসের অভাবে সাধারণত: একটি নো-ট্রাম্প বা দুটি ইস্কাবন রংয়ে খেলা হবে কিন্তু খেঁড়ীর হাতে একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী সর্ব্বাধিক শক্তিসম্পন্ন ও ইস্কাবন রংয়ে সাহায্যকারী তাস থাকলে বড় জোর তিনটি ইস্কাবনের খেলা করা সম্ভব হ'তে পারে। মোট ট্রিকদর হচ্ছে ৩+১½+ =৪½+ এবং সেরূপ ক্ষেত্রে দুটি নো-ট্রাম্পের খেলা করাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু উক্ত হাতে রুহিতন রংয়ে বাধাদানের কোনও তাস না থাকায় দুটি ইস্কাবন ডাকই শ্রেয়:। খেঁড়ী এ ডাক ছেড়ে দেবেন কারণ এইরূপ ডাকে কোনও বাড়্‌তি শক্তি জানান হয় না। অপর পক্ষে বিপক্ষ দলের হাতের উচ্চতাসমূল্য বড় জোর ৪ ট্রিকের মত, এটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বিভাগ এবং রংয়ের মিল না থাকলে দুটির ডাকে একটি খেসারৎ দেওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

(খ) একটি বড় রংয়ের ডাককে দুইয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন ১+থেকে ১½+ট্রিক, রংয়ে সাহায্যকারী তাস সমেত এবং কোনও একটি রংয়ের একখানি বা দুখানিমাত্র তাস (Singleton or Doubleton) অথবা ট্রিকদর পূর্ব্ববৎ ১+ থেকে ১½+ট্রিক, ছোট চারখানি রংয়ের তাস এবং অপর একটি রংয়ে একখানি বা দুখানি মাত্র তাস। সম্মিলিত শক্তি ৪½+।

(গ) এক্ষেত্রে ১½+ থেকে ২+ ট্রিক খেঁড়ীর ডাকে সাহায্য থাকলে ভাল হয়। অপরপক্ষে সাহায্য না থাকলে বরঞ্চ খেঁড়ীর ডাকের রংয়ে মাত্র একখানি বা একদম ছুট থাকলেও সময় বিশেষে এরূপ অবস্থায় বাধ্য হয়ে বদলী ডাক দিতে হয়—এরূপ বদলীডাক দিতে গেলে অন্তত: ৪ খানি পিঠ জয় করার ক্ষমতা থাকা চাই। ৪½+ থেকে ৫+ ট্রিক সম্মিলিত শক্তি।

মনে করুন আপনি তাস পেয়েছেন নিম্নরূপ :—

উদাহরণ ১।—ই-সা, বি, গো, ৫—ট্রিকদর ১+ ; হ-টে, ১০, ৯, ৪—ট্রিকদর ১ ; রু-৫, ৩—ট্রিকদর ০ ; চি-সা, গো, ৯—ট্রিকদর ½+ ; মোট ট্রিকদর ৩।

আপনি ডেকেছেন—একটি ইস্কাবন, খেঁড়ী ডেকেছেন—একটি নো-ট্রাম্প ; মোট ট্রিকদর—৩+১½=৪½ নো-ট্রাম্পে একটির-

খেলা এবং রংয়ের ডাকে বড়জোর ছুটির খেলা হতে পারে। সুতরাং পাস দিতে পারেন অথবা বিকল্পডাক ছুটি হরতন দিতে পারেন ছুটি ছোট রুহিতন থাকার দরুণ। পাস দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

উদাহরণ ২।—ই-সা, বি, ১০, ৯, ৮, ২—ট্রিকদর ১; হ-টে, সা, বি, ৫—ট্রিকদর ২+; রু-৭—ট্রিকদর ০; চি-৫, ২—ট্রিকদর ০; মোট ট্রিকদর ৩+।

আপনি ডেকেছেন—১টি ইস্কাবন; খেঁড়ী ডেকেছেন—১টি নো-ট্রাম্প, মোট ট্রিকদর—৩+ ½=৪½+। তাসটি নো-ট্রাম্প ডাকে খেলবার অনুপযুক্ত। ইস্কাবন রংয়ে প্রায় ৮ পিঠ জয় করবার তাস থাকায় চারটির (গেম) খেলার সম্ভাবনা। তিনটি ইস্কাবনের ডাক দিতে পারেন।

উদাহরণ ৩।—ই-টে, বি, ১০, ২—ট্রিকদর ১½; হ-সা, বি, ৫, ৩—ট্রিকদর ১; রু-৩, ২—ট্রিকদর ০; চি-১০, ৮, ৪—ট্রিকদর ০; মোট ট্রিকদর ২½।

ডাক দিয়েছেন—১টি ইস্কাবন; খেঁড়ী ডাক দিয়েছেন ১টি নো-ট্রাম্প মোট ট্রিকদর—৪ (২½+১½)। তাসটিতে অন্তর্বর্ত্তী তাসের ফিরতি ডাকের মত তাসের অভাব হেতু প্রথম ডাক চলে না। ডাক দিলে ১টি নো-ট্রাম্প পর আর ডাক নেই। বড় জোর ডাকের খেলা বা ১পিঠ কম হতে পারে সম্মিলিত শক্তিতে।

উদাহরণ ৪।—ই-টে, বি, ৩—ট্রিকদর ১½; হ-বি, ৭, ২—ট্রিকদর +; রু-বি, ১০, ৭, ৪—ট্রিকদর +; চি-টে, গো, ১—ট্রিকদর ১+; মোট ট্রিকদর ৩+।

খেঁড়ী ডেকেছেন—১টি ইস্কাবন, মোট ট্রিকদর—৬+(৩+৩+) তিনটি নো-ট্রাম্প বা ৪টি হরতন অর্থাৎ গেমের খেলা নিশ্চিত। ডাক হবে গেমে উৎসাহিত ২টি নো-ট্রাম্প।

উদ্বোধনকারীকে ফিরতি ডাকের সময় (Rebid) কতকগুলি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলির মধ্যে নীচেরগুলিই প্রধান :—

১। খেঁড়ীর একের উপর একের ডাকার পর।

২। খেঁড়ী একটি নো-ট্রাম্প দিলে।

৩। খেঁড়ী বাধ্যতামূলক কোন নিম্নদরের রংয়ে ছুটির ডাক দিলে।

৪। খেঁড়ী গেমে উৎসাহপূর্ণ ডাক দিলে।

১। একের-উপর-একের ডাকের পর : একের-উপর-একের ডাকের শক্তির পরিমাপের নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং উক্ত ডাক উদ্বোধনকারীর শক্তি যাচাইয়ের মাপকাঠি, সুতরাং উদ্বোধনকারী অন্ততঃপক্ষে একচক্র (one round) ডাক বাঁচিয়ে রাখতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এই সুযোগে তার হাতের পূর্ণ শক্তি জানিয়ে দিয়ে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করবেন—এইটি হ'ল ডাক বিনিময়ের মূল নীতি। এরপর উদ্বোধনকারীর আর ডাক বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব থাকেনা, যদি না খেঁড়ীর কাছ থেকে নূতন কোন জোরদার (forcing) ডাক আসে। ফিরতি ডাকের সাধারণ পর্য্যায় চারটি, যথা—

(ক) শুধু উদ্বোধনের উপযুক্ত ও কোনও বাড়তি ট্রিক না থাকলে,

(খ) উদ্বোধনের উপযোগিতার চেয়ে কিছুটা শক্তিসম্পন্ন তাস থাকলে,

(গ) একের উদ্বোধনী ডাকের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ বাধ্যতামূলক উদ্বোধনী ডাকের উপযোগী তাস অপেক্ষা সামান্য কম শক্তির তাসে।

প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ উদ্বোধনী একের ডাকের নিম্নতম শক্তির তাসে ফিরতি ডাকের পথ তিনটি যথা (১) সুবিধা পেলে একটি নো-ট্রাম্প ডাকা (২) বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম রংয়ের ডাকের ছুটি বা অন্য নিম্নদরের রংয়ের ছুটির ডাকা (৩) খেঁড়ীর একের ডাককে একধাপ উঁচুতে তোলা। এর কোনটিতেই বাড়তি ট্রিক দেখান হয় না; ২½ থেকে ৩ ট্রিকের তাসে উক্তরূপ ডাক চলে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

উদাহরণ নং ১—ই-টে, সা, ৯, ৫, ২—ট্রিকদর ২; হ-৫, ৩—ট্রিকদর ০; রু-১০, ৭, ৫—ট্রিকদর ০; চি-টে, ৬, ৪—ট্রিকদর ১; মোট ট্রিকদর ৩।

প্রথম ডাক—১টি ইস্কাবন; খেঁড়ীর ডাক—১টি নো-ট্রাম্প। ফিরতি ডাক—ছেড়ে দেওয়া চলে, এক্ষেত্রে ২টি ইস্কাবন শ্রেয়ঃ।

উদাহরণ নং ২—ই-টে, বি, গো, ৩—ট্রিকদর ১½+; হ-সা, ৫—ট্রিকদর ½; রু-সা, গো, ৯, ৫, ৩—ট্রিকদর ½+; চি-৭, ৩—ট্রিকদর ০ মোট ট্রিকদর ৩।

প্রথম ডাক—১টি ইস্কাবন; খেঁড়ীর ডাক—১টি নো-ট্রাম্প। ফিরতি ডাক—ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু দু তাসে হরতনের সাহেব থাকায় বাঁ দিক থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পাবার জন্য ছুটি রুহিতন ডাকই শ্রেয়ঃ।

উদাহরণ নং ৩—ই-৫, ৩—ট্রিকদর ০; হ-টে, বি, ৯, ৩—ট্রিকদর ১½; রু-টে, ৭, ৬, ২—ট্রিকদর ১; চি-বি, ৯, ৩—ট্রিকদর +; মোট ট্রিকদর ২½+।

প্রথম ডাক—১টি হরতন; খেঁড়ীর ডাক—১টি ইস্কাবন। ফিরতি ডাক—১টি নো-ট্রাম্প।

উদাহরণ নং ৪—ই-সা, ৭, ৬, ২—ট্রিকদর ½; হ-টে, বি, ৭, ৫—ট্রিকদর ১½; রু-সা, ১০, ৩—ট্রিকদর ½; চি-গো, ৫—ট্রিকদর +; মোট ট্রিকদর ২½+।

প্রথম ডাক—১টি হরতন; খেঁড়ীর ডাক—১টি ইস্কাবন। ফিরতি ডাক—২টি ইস্কাবন।

উপরোক্ত তাসগুলি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, খেঁড়ীর একের উপর একের ডাক বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া কোন বাড়তি ট্রিক দেখান হয়নি ফিরতি ডাকে।

হাতে কিছুটা বাড়তি শক্তি থাকলে (মাঝারী গোছের) ডাকের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে উক্ত খবরটি খেঁড়ীকে জানান সম্ভব :—

১। খেঁড়ীর একের ডাকের পর অপর ছোটদরের রংয়ের ছুইয়ের ডাক—

	উদ্বোধনকারী	খেঁড়ী	উঃ	খেঁ
প্রথম চক্র	হ-১	ই-১	ই-১	নো-ট্রাম্প-১
দ্বিতীয় „	চি-২		রু-২	

উভয়ক্ষেত্রেই ফিরতি ডাক বাধ্যতামূলক বলা চলে কিন্তু কিছু বাড়তি শক্তি না থাকলে অন্ততঃ ৩+ ট্রিক ছুইয়ের ডাকে তোলা ঠিক নয়। প্রথম উদাহরণ খেঁড়ীর ইস্কাবনের একটি নো-ট্রাম্প ডাক না দিয়ে ছুটি চিড়িতন ডাকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে উক্ত তাসটি নো-ট্রাম্প

ডাকে খেলবার উপযোগিতা কম এবং হাতে উচ্চতাসমূল্য কিছু বেশী অথবা রংয়ের খেলার পক্ষে বেশী উপযোগী এবং রংয়ে খেল্‌লে বেশী পি জয়ের সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইস্কাবন চারতাস এবং চিড়িতন পাঁচতাস হলেই ভাল হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খেঁড়ীর একটি নো-ট্রাম্প ডাকে ছেড়ে দেওয়া চল্‌ত অথচ দুটির ডাক দেওয়া হ'ল কেন? উত্তর প্রায় একই রূপ—কিছু বাড়তি শক্তি ½ f ট্রিকের মত বর্ত্তমান এবং তাসটি নো-ট্রাম্প ডাকে খেলবার অনুপযোগী।

ই-টে, সা, ৯, ৩—(f ট্রিকদর) ২ ; হ-১০, ৭, ২—(f ট্রিকদর) ০ ; রু-গো, ৩—(f ট্রিকদর) + ; চি-সা, বি. ১০, ৮, ৫—(f ট্রিকদর) ১ ; মোট f ট্রিকদর ৩+ ।

তাসটিতে উদ্বোধনী নিম্নতম শক্তি অপেক্ষা কিছু বেশী শক্তি আছে, উপরন্তু নো-ট্রাম্প অপেক্ষা দুটি চিড়িতনের খেলা ভাল হ'বে, সুতরাং দুটি চিড়িতন ডাকে উভয় খবরই খেঁড়ীকে জানান সম্ভব।

ই-টে, বি, ১০, ৩, ২—(f ট্রিকদর) ১½ ; হ-১০, ৯, ৩—(f ট্রিকদর) ০ ; রু-টে, বি, গো, ৫—(f ট্রিকদর) ১½+ ; চি-৭ (f ট্রিকদর) ০ ; মোট f ট্রিকদর ৩+ ।

তাসটিতে f ট্রিকদর মোট ৩+ অর্থাৎ উদ্বোধনী ডাকের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কিছু বেশী অথচ খেঁড়ীর নো-ট্রাম্পে খেলা অপেক্ষা রংয়ে খেল্‌লে বেশী পিঠ জয়ের সম্ভাবনা। সুতরাং দুটি রুহিতন ডাকই শ্রেয়ঃ।

২। খেঁড়ীর একের-উপর-একের ডাক দুটি বাড়ান। এরূপ ডাক দিতে গেলে প্রয়োজন কোনও রংয়ে মাত্র একখানি তাস, খেঁড়ীর ডাকের রংয়ের চারখানি তাস অথবা বড় ছবি সমেত তিনতাস এবং উচ্চতাস মূল্য কমপক্ষে ৩½ f ট্রিক। বাইরেব রংয়ের তাস একক (Singleton) না থাকে দুইখানি (Doubleton) থাকলে দরকার উচ্চতাস মূল্য দ্বারা সেটি পূরণ করা অর্থাৎ অন্ততঃ ½ f ট্রিক বেশী মূল্যের তাস। যেমন :—

ই-বি, ১০, ৭, ৬—f ট্রিকদর ½ ; হ-টে, সা, ৯, ৩, ২—(f ট্রিকদর ২ ; রু-৫—(f ট্রিকদর) ০ ; চি-সা বি, ১০—(f ট্রিকদর) ১ ; মোট f ট্রিকদর ৩½ ।

একটি হরতনের উপর খেঁড়ী একটি ইস্কাবন ডাক দিলে ফিরতি ডাকে তিনটি ইস্কাবন (একটি বাড়িয়ে) ডাক দেওয়া উচিত এরূপ তাসে। তাসটিতে রুহিতনে মাত্র একখানি তাস আছে ও মূল্য ৩½ f ট্রিক। খেঁড়ীর একের-উপর-একের ডাকের উপযোগী নিম্নতম তাসেও ইস্কাবন রংয়ে গেম হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই।

ই-টে, ৭, ৩—f ট্রিকদর ১ ; হ-সা, গো, ৪, ২—f ট্রিকদর ½+ ; রু-টে, সা,গো, ৭, ৫—f ট্রিকদর ২+ ; চি-৩—f ট্রিকদর ০ মোট ট্রিকদর ৩½ ;—।—একটি রু-হিতনের উপর খেঁড়ী একটি হরতন ডাক দিলে উক্ত ডাককে দুটি বাড়িয়ে তিনের ডাকে তোলা উচিৎ এরূপ তাসে তাসটির মূল্য ৩½+, চিড়িতন রংয়ে মাত্র একখানি তাস এবং হরতন রংয়ে বিশেষ সাহায্যকারী ও চারখানি তাস থাকায়।

ই-টে, ৫—f ট্রিকদর ১ ; হ-সা, বি, ৭, ৬—f ট্রিকদর ১ ; রু-টে, সা, বি, ৯, ৮ ; f ট্রিক দর ২+ ; চি-৫, ২—f ট্রিকদর ০ ; মোট f ট্রিকদর ৪+

এরূপ তাসেও একটি রুহিতনের উপর খেঁড়ীর একটি হরতনের ডাক তিনটিতে তোলা দরকার। বাইরে অপর কোনও রংয়ে একক তাস নেই, সেই অসুবিধা দূর করবার দরুণ বাড়তি ½ f ট্রিক বর্ত্তমান এই তাসে।

ই-সা, ৭, ৩—f ট্রিকদর ½ : হ-টে, বি, ৪—f ট্রিকদর ১½ ; রু-টে, সা, বি, ১০, ৮, ২—f ট্রিকদর ২+ ; চি-৭—f ট্রিকদর ০ ; মোট f ট্রিকদর ৪+ ।

এ তাসটিরও উচ্চতাসমূল্য ৪+ f ট্রিক কিন্তু ছিদ্রহীন রুহিতন রংয়ে ছ'খানি, হরতন দুখানি উচ্চতাস ও চিড়িতন মাত্র একখানি তাস থাকায় একটি রুহিতন ডাকের উপর খেঁড়ী একটি হরতন ডাক দিলে উক্ত ডাককে তিনে তোলা খুবই সঙ্গত। খেঁড়ীর কাছে ইস্কাবনের বি, এবং সাহেব সমেত ৫খানি হরতন (মূল্য ১ f ট্রিক) থাকলে গেম করা খুবই স্বাভাবিক।

২। একটির উপর খেঁড়ী একটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলে

উদ্বোধনকারীর তাসের মূল ৪½ f ট্রিক বা কিছু বেশী হলে অথবা ৪½ f ট্রিকসহ প্রায় ছিদ্রহীন চারখানি বা পাঁচখানি নিম্নদরের তাস থাকলে খেঁড়ীর একটি নো-ট্রাম্প ডাককে দুটিতে তোলা চলে। মনে রাখা প্রয়োজন এরূপক্ষেত্রে প্রতি রংয়ে টে, সা, বি'র মধ্যে অন্ততঃ একখানি ছবিতাস থাকা সঙ্গত। যথা :—

ই-টে, বি, ১০, ৫—f ট্রিকদর ১½ ; হ-সা, গো, ৩—f ট্রিকদর ½+ ; রু-টে, গো, ৮, ২—f ট্রিকদর ১+ ; চি-সা, বি,—f ট্রিকদর ১ ; মোট f ট্রিকদর ৪½ ।

একটি ইস্কাবন ডাকের উপর খেঁড়ী একটি নো-ট্রাঃ ডাক দিলে খেঁড়ীকে দুইয়ে তোলা উচিত। এইরূপ তাসে দুটি রুহিতন ডাকের বদলে তাসটি নো-ট্রাম্প দিয়ে উদ্বোধনের উপযুক্ত কিন্তু চিড়িতনের সাহেব, বিবি দুখানি মাত্র তাস থাকায় একটি ইস্কাবনের ডাকই শ্রেয়ঃ।

ই-টে, ২—f ট্রিকদর ১ ; হ-সা, গো, ১০, ৪—f ট্রিকদর ½+ ; রু-টে, সা, বি, ৯—f ট্রিকদর ২+ ; চি-সা, ৯, ৫—f ট্রিকদর ½ ; মোট f ট্রিকদর ৪½ ।

একটি হরতনের উপর খেঁড়ী একটি নো-ট্রাম্প দিলে ডাকটিকে দুই তুলে দেওয়া সঙ্গত, এরূপ তাসে—দুটি রুহিতন ডাকের বিশেষ উপকারিতা নেই। আবার চিড়িতনের একখানি তাস কমিয়ে রুহিতন একখানি বাড়িয়ে দিলে তিনটি নো-ট্রাম্প তুলে দেওয়াও অসঙ্গত মনে হয় না।

একের উপর একের ডাকের পর উ চুদরের রংয়ে দু'টির ডাক

এরূপ ডাকে খেঁড়ীকে প্রকারান্তরে তিনের ডাকে সাহায্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান হয়। সুতরাং তাসটিতে উচ্চতাসমূল্য বা বিভাবগত বেশী পিঠ জয় করবার ক্ষমতা প্রয়োজন। এ রকম ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে ৪ f ট্রিকের মত তাস থাকার দরকার। দুটি রংয়েই জোরালো ডাকের উপযোগী তাস ও বিভাগ ৬-৫ বা ৫-৫ হ'লে [illegible] f ট্রিকেও এরূপ ডাক দিলে বিশেষ ক্ষতিকারক হয় না ; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এরূপ অবস্থায় প্রথম রংটি ছিদ্রহীন (Solid Suit) হওয়া চাই। যেমন :—

উদ্বোধনকারী	খেঁড়ী
ক্ল-১	ই-১
হ-২	

উদ্বোধনকারী	খেঁড়ী
ক্ল-১	নো-ট্রাম্প-১
ই-২	

উপরোক্ত ডাকের উপযোগী তাসের নমুনা নীচে দেওয়া হল :—

ই-গা, ৭—ট্রিকদর ½ ; হ-টে, বি, গো, ১০—ট্রিকদর ১½+ ; ক্ল-টে, সা, বি, ৯, ৬—ট্রিকদর ২+ ; চি-৯, ৩—ট্রিকদর ০ ; মোট ট্রিকদর ৪½।

তাসটির উচ্চতাসমূল্য ৪½ ট্রিক এবং রুহিতন রংটি প্রায় ছিদ্রহীন। সুতরাং উদ্বোধনী ডাক একটি রুহিতন হওয়া উচিত, কারণ খেঁড়ীর কাছ থেকে ১টি ইস্কাবন (বা ছুটি চিড়িতন) ডাক এলে ছুটি হরতন ডাকবার উপযোগী উচ্চমূল্যের ও পিঠ জয় করবার তাস হাতটিতে আছে। একটি নো-ট্রাম্প ডাক এলে ছুটি হরতন (খেঁড়ীর কাছে ৪খানি হরতন থাকতে পারে এই আশায়) অথবা সোজা তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকও চলতে পারে ; একমাত্র প্রতিবন্ধক ছুতাসে ইস্কাবনের সাহেব।

ই-সা, বি, ১০, ৮, ৫—ট্রিকদর ১ ; হ-সা, ৫—ট্রিকদর ½ ; ক্ল-টে, সা, বি, ৫, ৪, ৩—ট্রিকদর ২+ ; চি-০ ; মোট ট্রিকদর ৩½+।

এই তাসটির উচ্চতাসমূল্য মোট ৩½+ মাত্র, কিন্তু রুহিতন রংয়ের তাসে ছিদ্র না থাকায় ইস্কাবন রংয়ে কিছুমাত্র সাহায্য পেলে গেম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইজন্য দ্বিতীয় চক্রে একটি নো-ট্রাম্পের উপর উদ্বোধনকারী ছুটি ইস্কাবন ডাক দিয়ে বেশী পিঠজয়ের ক্ষমতা খেঁড়ীকে জানাতে সক্ষম হবেন। খেঁড়ীর কাছ থেকে ছুটি চিড়িতন ডাক এলেও দ্বিতীয় চক্রে ছুটি ইস্কাবন ডাক দিয়ে উক্তরূপ ক্ষমতা জানান যায়। একমাত্র অসুবিধা হতে পারে খেঁড়ীর কাছ থেকে একটি রুহিতনের ওপর একটি হরতন ডাক এলে। তখন একটি ইস্কাবন ডাকে হাতের পূর্ণক্ষমতা জানান হয় না, উপরন্তু পাঁচখানি তাসে দ্বিতীয় চক্রে ছুটি ইস্কাবন ডাকও বিপজ্জনক হ'তে পারে, কারণ প্রথমেই চিড়িতন খেলে বিপক্ষদল একখানি রং কমিয়ে দিলে খেলা করা শক্ত হয়ে উঠতে পারে, যদি না উপযুক্ত সাহায্যকারী তাস পাওয়া যায় ইস্কাবন রংয়ে খেঁড়ীর কাছ থেকে। এই অসুবিধা কিছুটা দূর হ'তে পারে অবশ্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় চক্রে চিড়িতন রংয়ে রোখবার তাস এবং সামান্য সাহায্যকারী ইস্কাবনের তাস খেঁড়ীর নিকট থাকলেও। যাহোক, এরূপ তাসে খেঁড়ীর কাছ থেকে কিরূপ ডাক আসতে পারে, সেটি ঠিকমত আন্দাজের উপর উদ্বোধনী ডাকের সফলতা নির্ভরশীল। মনে হয় সব দিক চিন্তা করে এইরূপ তাসে একটি ইস্কাবনের উদ্বোধনী ডাকই ভাল। খেঁড়ীর কাছ থেকে ছুটি হরতন ডাক এলে, খেঁড়ীর ডাকে সাহায্যকারী তাস—সাহেব সহ ছুখানি ও রুহিতন রংটি ছিদ্রহীন থাকায় দ্বিতীয় চক্রে রুহিতন তিনটি ডাক খুবই সঙ্গত ত' বটেই, উপরন্তু তাসটি যে আক্রমণাত্মক জাতীয় এবং পিঠজয়ের ক্ষমতা প্রচুর (৭ থেকে ৮ পিঠের মত) এ খবরটি দেওয়া হয়। খেঁড়ীর কাছ থেকে ছুটি চিড়িতন ডাক এলে তিনটি রুহিতন ডাকবার উপযুক্ত উচ্চমূল্যের তাস না থাকায় ছুটি রুহিতন ডেকে খেঁড়ীর পরবর্তী ডাকের অপেক্ষায় থাকতে হবে। বলা বাহুল্য যে, একবার বদলী ডাক হিসেবে ছুইয়ের ডাক দিয়ে খেঁড়ীর পক্ষে নূতন রংয়ের ছুইয়ের ডাকে ছেড়ে দেওয়া স্বাভাবিক নয়। সুতরাং খেঁড়ীর হাতের শক্তি যাচাই করা এরূপ ডাকে খুবই সহজ হয়ে পড়ে। খেঁড়ীর হাতে সামান্য সাহায্য পেলে যথা—ইস্কাবনের টেক্কা ও হরতনের বিবি অথবা তিন বা চারতাসে ইস্কাবনের গোলাম ও হরতনের বিবি থাকলে গেম ত' দূরের কথা, ছোটস্লাম করাও সহজ হয়ে পড়ে।

৩। একের উপর খেঁড়ীর বাধ্যতামূলক ছুইয়ের ডাকেরপর

উদ্বোধনকারীর নিম্নলিখিত পথ খোলা থাকে :—

(ক) পূর্ব্বতম রংয়ের ছুটির বা কম দরের রংয়ের ছুটির ডাক দেওয়া।

(খ) আগের রংয়ের চেয়ে বেশীদরের রংয়ে ছুটি ডাকা।

(গ) ছুটি নো-ট্রাম্প ডাক দেওয়া।

(ঘ) খেঁড়ীর ছুইয়ের ডাক একটি বা ছুটি বাড়ান।

দ্বিতীয়চক্রে আগের রংয়ে ছুটি ডাক দিতে উদ্বোধনকারীর কোনও বাড়তিশক্তি সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না। উদ্বোধনের উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন তাসেই এ ডাক এসে পড়ে কারণ খেঁড়ী ছুইয়ের ডাক দেওয়ার পর উদ্বোধনকারী অন্ততঃ একচক্র ডাকটি বাঁচিয়ে রাখতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আগের চেয়ে কমদরের রংয়ে ছুটি ডাক দিলে অবস্থা অনুরূপই থাকে—হয়ত সামান্য কিছু বেশী ট্রিকের তাস থাকতে পারে তবে সেটি পরিমিত—বড়জোর ২½+ থেকে ৩+ ট্রিকের মধ্যে। কমশক্তিসম্পন্ন তাসে প্রথম ডাকটি চার তাসে এবং দ্বিতীয়টি পাঁচ তাসে হতে পারে আবার ছুটি রংই পাঁচ তাসের হ'লে ২½ ট্রিকেও এরূপ ডাক দেওয়া চলে। যেমন :—

	মোট ট্রিক	উঃ ডাক	খেঃ ডাক	ফিরতি ডাক
১। ই-সা, ২ ; হ-টে, গো, ১০, ৫, ২ ; ক্ল-টে, ১০, ৮. ৬, ৩ ; চি-৬	২½+	হ-১	চি-২	ক্ল-২
২। ই-টে, ৩, ২ ; হ-সা, গো, ১০, ৬ ; ক্ল-সা, বি, ৯, ২ ; চি-৩, ২	২½+	হ-১	চি-২	ক্ল-২
৩। ই-৭, ৩ ; হ-টে, সা, ৫, ৩ ; ক্ল-বি, গো, ৯, ৬, ৩ ; চি-সা, ৯ ;	৩	হ-১	চি-২	ক্ল-২
৪। ই-বি, ১০, ৩ ; হ-সা, গো, ৯,৬ ; ক্ল-টে, সা, ১০, ৫ ; চি-গো, ৪	৩+	হ-১	চি-২	ক্ল-২

ইস্কাবন ও রুহিতনের মধ্যে উপরোক্তরূপ তাসটি বিভক্ত হ'লে একটু বিব্রত হ'তে হয় এই কারণে যে, একটি ইস্কাবনের উপর খেঁড়ী ছুটি চিড়িতনের বদলে ছুটি হরতন ডাকলে রুহিতন ডাকতে হ'লে তিনের ডাকে উঠতে হয় কিন্তু সেরূপ উচ্চশক্তি তাসে না থাকায় বাধ্য হয়ে অনেক সময়ে চার তাসেই ইস্কাবনে আবার ডাক দিতে হয় ; এছাড়া তখন আর উপায় কি ? ছুটি নো-ট্রাম্প ডাকও আত্মঘাতী। আবার দেখুন একটি রুহিতন ডাক দিলে খেঁড়ীর কাছ থেকে ছুটি চিড়িতন ডাক এলে একইরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সুতরাং উদ্বোধনকারীকে সর্ব্বসময়ে দ্বিতীয় ডাকের প্রস্তুতির দিকে বিশেষ নজর রেখে ডাক সুরু করতে হবে।

ক্রমশঃ

পৌষ, ১৩৬৭ (ডিসেম্বর '৬০ জানুয়ারী, '৬১)

অন্তর্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক লোকসভায় সংবিধান সংশোধন ও অঞ্চল সংযুক্তিকরণ বিল উত্থাপন—বিরোধীপক্ষের ব্যর্থ প্রতিরোধ।

বেরুবাড়ী খয়রাতির বিরুদ্ধে বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে কলিকাতা সমেত সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ দিবস পালন।

২রা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত—সারা বাংলা বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটির ঘোষণা।

৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) : আগামী কয়েক বৎসরে ভারতে প্রচুর মূলধন আমদানীর আশা—নয়াদিল্লীতে শিল্প নেতৃ-সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র ভাষণ।

৪ঠা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর) : ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণকল্পে বিপুল পরিমাণে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন—কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স-এর বার্ষিক সভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র দাবী।

'বেরুবাড়ী হস্তান্তর বিল উত্থাপন ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে'—পার্লামেণ্টে হস্তান্তর বিল উত্থাপনকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সদম্ভ ঘোষণা।

৫ই পৌষ (২০শে ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী খয়রাতির প্রতিবাদে সারা বাংলায় সর্ব্বাত্মক হরতাল পালন—জনমত অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের দৃঢ় প্রতিবাদ।

বেরুবাড়ী বলিদান পর্ব্বের যবনিকাপাত—নেহরু-নূন চুক্তি সম্পর্কিত দুইটি বিলই লোকসভায় ভোটাধিক্যে গৃহীত।

৬ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) : 'চীন-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে অফিসার পর্য্যায়ে বৈঠকে ফল হয় নাই'—রাজ্যসভায় বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) : 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এড়াইয়া সরকার কর্ত্তৃক যথেচ্ছভাবে লোক নিয়োগ'—কমিশনের দশম রিপোর্টে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ক্ষোভ প্রকাশ।

৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ীকে বলিদানের আইনগত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ—রাজ্যসভার সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক নেহরু-নুন চুক্তির প্রশংসা।

বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে কলিকাতায় বিক্ষোভ মিছিল—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে এক ঘণ্টাকাল বিক্ষোভ প্রদর্শন।

৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) : বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার উন্নতির জন্য ৫৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা—পরিকল্পনা কমিশনের সহিত আলোচনার পর ভারতের উন্নয়ন কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারিত।

১০ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা—কেন্দ্রের বিরোধিতার ভান করিয়া রাজ্যের প্রতি কপট আচরণ—কলিকাতায় সারা বাংলা বেরুবাড়ী সম্মেলনে তীব্র সমালোচনা।

১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) : কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের প্রেরিত প্রার্থীদের প্রতি মালিকদের উপেক্ষা—পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যায় রাজ্য সরকারের উদ্বেগ।

১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) : 'কঙ্গো ও লাওসের ঘটনাবলীতে বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে'—এলাহাবাদের জনসমাবেশে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

'কেন্দ্রীয় সরকারী ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে ২৯৯ জন রেল কর্ম্মচারী কর্ম্মচ্যুত ও ৬৭৪ জন এখনও সাসপেণ্ড'—কলিকাতার সাংবাদিক বৈঠকে সারা ভারত রেল কর্ম্মী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি।

১৩ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতায় প্রস্তাবিত পূর্ব্বাঞ্চল রাজ্য পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বাতিল—বৈঠক না হওয়ায় আসামের আনন্দ, উড়িষ্যা নিরানন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষোভ।

১৪ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর) : বেরুবাড়ী হস্তান্তর কার্য্য সম্পন্ন করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবার সম্ভাবনা—উভয় রাষ্ট্রের সার্ভে অফিসারদের বৈঠকের পর সীমানা নির্দ্ধারণ—কেন্দ্রীয় আইন সচিব শ্রীঅশোক সেনের সহিত কলিকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দুই দফা বৈঠক।

নাগপুরে বিদর্ভ আন্দোলন সমিতির প্রচণ্ড বিক্ষোভ—পুলিস ফাঁড়িতে অগ্নি সংযোগ ও পুলিশের উপর প্রস্তর বর্ষণ—আন্দোলন সমিতির তিন শত কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) : মান ঠিক রাখিয়া ঔষধের দাম কমাইবার প্রয়োজনীয়তা—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব শ্রী ডি পি কারমারকারের উক্তি।

১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর) : সংসদ ও আইন সভার সকল দল কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কর্ত্তৃক অন্যান্য মন্ত্রী নির্ব্বাচন—লোকসভার স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গারের নূতন প্রস্তাব।

১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬১) : 'রবীন্দ্র-রচনা বিশ্ব-মানবতার মর্ম্মপীড়ার মূর্ত্তরূপ'—বোম্বাই-এ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৮ই পৌষ (২রা জানুয়ারী) : পাঞ্জাবী সুবার প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত পাঞ্জাবের অনশনব্রতী নেতা সন্ত ফতে সিং-এর আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ—সর্দ্দারনগরে (৬৬তম কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল) প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার প্রেরণ।

১৯শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী) : "বৈজ্ঞানিক শক্তির অপপ্রয়োগে সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী"—কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সতর্কবাণী।

২০শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) : দীর্ঘদিন আটক থাকার পর আকালী নেতা (পাঞ্জাব) মাষ্টার তারা সিং-এর মুক্তিলাভ।

কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ভারত ও পাকিস্তানের তৃতীয় টেষ্ট খেলাটিও (ক্রিকেট) অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন।

২১শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী): "কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া জাতিকে নবযুগের দীক্ষা দিতে হইবে"—সর্দারনগরে (গুজরাট) কংগ্রেসের ৬৬তম অধিবেশনের বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী।

২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী): "ক্ষমতার আসন ছাড়িয়া কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান—দীর্ঘকাল ক্ষমতাভোগীদের প্রতি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীএন সঞ্জীব রেড্ডীর উপদেশ—সর্দারনগরে কংগ্রেস অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্নে কংগ্রেস অধিনায়কের মামুলি ভাষণ।

২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী): 'লাওস ও কঙ্গোর পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক'—কংগ্রেসের ৬৬তম অধিবেশনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

২৪শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী): উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রথম জাতীয় কৃষিমেলার উদ্বোধন।

২৫শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পরামর্শক্রমে ২২ দিন পর পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলনের ডিক্টেটার সন্ত ফতে সিংএর (৫০) আমৃত্যু অনশন ভঙ্গ।

২৬শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী): প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়াকে জেলে প্রেরণ—বীমা কোম্পানীর অর্থ আত্মসাতের জন্য কারাদণ্ডাদেশ কার্য্যকরী।

২৭শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী): স্বর্ণ মন্দিরে (অমৃতসর) বিরাট শিখ সমাবেশে আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং লাঞ্ছিত—পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন প্রত্যাহার ঘোষণার জের।

২৮শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অর্দ্ধ লক্ষ রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রতি সেট ৭৫্ টাকা) মুদ্রণের সিদ্ধান্ত—এ যাবত ৪৬ হাজার গ্রাহকের আবেদন পত্র গ্রহণ।

২৯শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): 'তৃতীয় পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক) শেষে ইস্পাত ঘাটতি হইলে সঙ্কট দেখা দিবে'—দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

৩০শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব—দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিবস ব্যাপী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

ভারতের ৮ মাইল মধ্য দিয়া চীন-ব্রহ্ম সীমারেখা চিহ্নিত—ভারত সরকার কর্ত্তৃক চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত সংক্রান্ত মানচিত্রের প্রতিবাদ।

বহির্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর): নেপালে সর্ব্বরকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ—সভা, শোভাযাত্রা ও বক্তৃতা নিষিদ্ধ—রাজা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর কার্য-ব্যবস্থা।

২রা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর): ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলেসেলাসীর পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল—৩৬ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধে রাষ্ট্রের বিদ্রোহী বাহিনী বিধ্বস্ত।

৫ই পৌষ (২০শে ডিসেম্বর): নূতন রুশ বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দ আরও হ্রাসের ব্যবস্থা—মহাকাশ গবেষণার ব্যয় বৃদ্ধি—প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের উপস্থিতিতে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন।

৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর): 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক উন্নয়নে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত'—সুপ্রীম সোভিয়েটে পররাষ্ট্র সচিব মঃ আঁদ্রে গ্রোমিকোর ঘোষণা।

৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর): পশ্চিম আফ্রিকান ঘানা, গিনি ও মালি রাষ্ট্রের ইউনিয়ন গঠন কনাক্রিতে (গিনি) সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টত্রয়ের বৈঠক শেষে ইস্তাহার প্রচার।

১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর): নেপালের রাজা মহেন্দ্রের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রি পরিষদ গঠন—রাজ্যে ১১-দিন ব্যাপী রাজনৈতিক অনিশ্চিয়তার অবসান।

১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর): রাষ্ট্রসংঘকে অবমাননা করিয়া সাহারায় ফ্রান্সের পুনরায় আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা—বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গভীর ক্রোধাগ্নি।

১৪ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর): লাওসের আকাশে সোভিয়েট বিমান হইতে মার্কিণ বিমানে গুলীবর্ষণ—গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মার্কিণ বিমানের ভিয়েনটিয়েনে অবতরণের সংবাদ।

১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর): বেলজিয়ামে সরকার বিরোধী ধর্মঘট ও সংঘর্ষে তীব্রতা বৃদ্ধি—ব্রুসেলস-এর রাজপথে পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের লড়াই।

১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬১): মধ্য লাওসে ক্যাপ্টেন কং লে বাহিনী কর্ত্তৃক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল—ভিয়েনটিয়েন, লুয়াং প্রবাং সহ উত্তর লাওসের সকল সহর বিপন্ন।

১৯শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী): আটলাণ্টিক গর্ভে ভারতীয় মালবাহী জাহাজ 'ইণ্ডিয়ান নেভিগেটর' নিমজ্জিত—১৩ জন ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাবিকের সলিল সমাধি।

২০শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী): কিউবার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন—বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা।

২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী): কাসাব্লাঙ্কায় আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে সম্মিলিত আফ্রিকান সামরিক কমাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত।

২৫শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): আলজিরিয়া সম্পর্কে গণভোটে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের জয়লাভ—দ্য গলের আলজিরীয় নীতির প্রতি সমর্থন আদায়।

২৯শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): থিসভিলে (কঙ্গো) কর্ণেল মবুটুর (সামরিক অধিকর্ত্তা) সৈন্যদের বিদ্রোহ ও আটকাধীন লুমুম্বাকে (পদচ্যুত কঙ্গোলী প্রধান মন্ত্রী) মুক্তিদান—মুক্তিলাভের পরই লুমুম্বা কর্ত্তৃক বিদ্রোহী ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণের সংবাদ।

৩০শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): কয়েক ঘণ্টা মুক্ত থাকার পর প্যাট্রিস লুমুম্বা পুনরায় কারারুদ্ধ—কাটাঙ্গায় (কঙ্গো) রাষ্ট্রসংঘ ও লুমুম্বা ফৌজের মধ্যে লড়াই।

কঙ্গো হইতে শ্রীরাজেশ্বর দয়ালকে (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি) ফিরাইয়া লইতে কঙ্গোলী প্রেসিডেণ্ট কাসাবুবুর দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশোল্ডের নিকট অভিযোগপূর্ণ পত্র।

উপর্য্যুপরি চারিটি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত
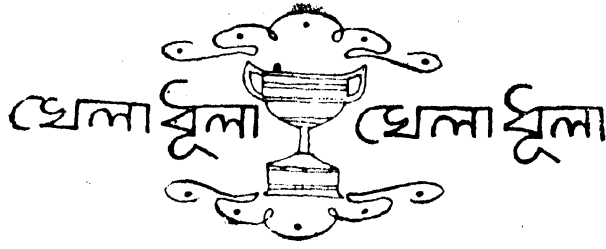
যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। আগের তিনটার ন্যায় মাদ্রাজের ভারত ও পাকিস্তানের চতুর্থ টেষ্ট খেলাটাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই টেষ্ট খেলার গৌরব ভারত দাবী করতে পারে। ভারত এই খেলায় সবচেয়ে বেশী রাণ ৯ উইকেটে ৫৩৯ তোলে। এই কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের রাণ-সংখ্যার রেকর্ড ছিল ৩ উইকেটে ৫৩৭। চান্দু বোড়ে এই খেলায় করেছেন নট আউট ১৭৭ রাণ। এটা পাক-ভারত টেষ্টে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ। ১৯৫২-৫৩ সালে বিজয় হাজারে বোম্বাই টেষ্টে সবচেয়ে বেশি রাণ নট আউট ১৩৬ করেছিলেন। তবে এই সফরে বোম্বাই টেষ্টে হানিফ মহম্মদ ১৬০ রাণ করে হাজারের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছিলেন। এই খেলায় উম্রীগড় অনমনীয় ব্যাটিং করে ১১৭ রাণে আউট হন। এই সফরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটা তাঁর দ্বিতীয় শত রাণ। কানপুরে দ্বিতীয় টেষ্টে তিনি ১১৫ রাণ করেছিলেন। ৪১টি টেষ্ট খেলায় এটা তাঁর নবম টেষ্ট সেঞ্চুরী। এ ছাড়া উম্রীগড়ও বোড়ের পঞ্চম উইকেট জুটীতে ১৭৭ রাণ যোগ হওয়ায় এক ভারতীয় টেষ্ট রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্ব্বে ১৯৫২-৫৩ সালে ত্রিনিদাদে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে উম্রীগড় ও ফাদকার পঞ্চম উইকেট জুটীতে ১৩১ রাণ করেছিলেন।

উম্রীগড়ের সেঞ্চুরী প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। এবারকার মাদ্রাজের টেষ্ট খেলা নিয়ে ৭১টি টেষ্ট খেলার মধ্যে ভারতের ১৮ জন খেলোয়াড় শত রাণের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এর মধ্যে উম্রীগড় সবচেয়ে বেশী নয়টি সেঞ্চুরী করেছেন।

পাকিস্তান এই খেলায় ৮ উইকেটে ৪৪৮ রাণ তোলে। ভারতের বিরুদ্ধে এটা তাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ। পাকিস্তানের এই সাফল্যের জন্ম সৈয়দ আমেদ ও ইমতিয়াজ আমেদের কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। ইমতিয়াজ আমেদ ১৩৫ রাণে ও সৈয়দ আমেদ ১০৩ রাণে আউট হন। ইমতিয়াজ আমেদের ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় ইহা প্রথম এবং সৈয়দ আমেদের ইহা দ্বিতীয় শত রাণ। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্টে সৈয়দ ১২১ রাণ করেছিলেন। এই খেলায় হানিফ মহম্মদ ও ইমতিয়াজের প্রথম উইকেট জুটিতে পাকিস্তানের ১৬২ রাণ—টেষ্ট খেলার ইতিহাসে তাঁদের এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এর পূর্ব্বে কোন টেষ্ট খেলায় তাঁরা প্রথম উইকেট জুটীতে এত অধিক রাণ সংগ্রহ করতে পারেননি।

চতুর্থ টেষ্ট খেলা দেখার জন্ম যাঁরা মাদ্রাজের কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন—তাঁরা আকর্ষণীয় ব্যাটিং দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তবে ভারতের সকল ক্রীড়ামোদীর কাছে বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায় অসহ হয়ে উঠেছে। সকলেই একবাক্যে বলতে সুরু করেছেন—হয় জেতো না হয় হারো। আর কেউ অমীমাংসিত খেলা চাচ্ছেন না। এখন সকলেরই দৃষ্টি দিল্লীর দিকে। এখানেই শেষবারের লড়াই হবে। দেখা যাক—এই টেষ্ট খেলার অবস্থা কি দাঁড়ায়।

রাণ-সংখ্যা

পাকিস্তান—১ম ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ৪৪৮—(ইমতিয়াজ আমেদ ১৩৫, সৈয়দ আমেদ ১০৩, হানিফ মহম্মদ ৬২, ম্যাথিয়াস ৪১, মুস্তাক মহম্মদ নট আউট ৪২; রামকান্ত দেশাই ৬৬ রাণে ৪ উইঃ)।

ভারত—১ম ইনিংস (৯ উইঃ ডিঃ) ৫৩৯—(চান্দু বোড়ে নট আউট ১৭৭, পলি উম্রীগড় ১১৭, কনট্রাক্টর ৮১, জয়সিমা ৩২, মাঞ্জরেকার ৩০; হাসিব আসান ২০২ রাণে ৬ উইঃ)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস (কোন উইকেট না হারাইয়া) ৫১ (সৈয়দ আমেদ নট আউট ৩৮)।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল যুগ্মভাবে বিজয়ী

ডুরাণ্ড কাপ ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। দিল্লীর ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই খেলা দেখা একটা বড় আকর্ষণ। এবারকার আকর্ষণটা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কলকাতার দুটো জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা দল মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এবার ফাইন্যালে মিলিত হয়। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রায় ২৫ হাজার দর্শক মাঠে হাজির হয়েছেন। চির-প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী হবে এ নিয়ে কতই না জল্পনা-কল্পনা। দুইটি দলই বিশেষ শক্তিশালী। কিন্তু এই দুই দলের মিলনে উভয় দলই স্নায়ুযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে পড়ে। কোন দল জয়ী হবে এটা ঠিক করে বলা শক্ত হয়ে উঠে। মোহনবাগান এবার কলকাতার লীগ ও শীল্ড পেয়েছে। গত বারে তারা ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। ইষ্টবেঙ্গল এবার রোভার্স কাপের "রাণার্স-আপ"। বহুদিন পরে তারা ডুরাণ্ড কাপে ফাইন্যালে উঠেছে।

দুই দলের আর একবার ডুরাণ্ড কাপ লাভের কতই না চেষ্টা! তাদের মধ্যে তোড়জোড়ের কোন অভাব দেখা যায় নি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান—প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হ'লো না। মোহন-বাগানের প্রাধান্যই দেখা গেল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সূচনায় ইষ্টবেঙ্গল খেলায় প্রাধান্য প্রকাশ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পেনাল্টীর সুযোগ থেকে অরুণ ঘোষ গোল দিয়ে ইষ্টবেঙ্গল দলকে অগ্রগামী করলো। তাদের আনন্দে বাদ সাধলেন সুযোগ সন্ধানী সেণ্টার ফরওয়ার্ড অমিয় ব্যানার্জ্জী। তিনি মোহনবাগানের পরিশোধমূলক গোলটি করে বসলেন। পরের দিনই দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। মাঠে ভিড়ও হয়েছে ঠিক আগের দিনের মত। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ পুরস্কার বিতরণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। [illegible]

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় অতিরিক্ত সময় খেলা হবে কিনা এই নিয়ে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এইদিন খেলার পুর্ব্বেই ঠিক ছিল যে অতিরিক্ত সময় খেলা হবে না। কিন্তু খেলা গোলশূন্য ভাবে শেষ হওয়ায় একদল দর্শক অতিরিক্ত সময় খেলার দাবী জানাইতে থাকেন। ডা: রাজেন্দ্র প্রসাদ অতিরিক্ত সময় অবস্থান করতে রাজী হন। ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী এবং লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব খেলতে রাজী হয়। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব খেলতে অস্বীকার করে। এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তবে টসে জয়লাভ করায় বিজয়ীর পুরস্কার মোহনবাগান পায় এবং তাহারা প্রথম ৬ মাস ডুরাণ্ড কাপ লাভের যোগ্যতা লাভ করে।

১৯৫৩ সালে মোহনবাগান সর্ব্বপ্রথম ডুরাণ্ড কাপ পায়। এর পর ১৯৫৯ ও এই বৎসর যুগ্ম বিজয়ী হয়ে উপর্য্যুপরি দু'বার ও সর্ব্বসমেত তিনবার ডুরাণ্ড কাপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করে। অপরপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল ১৯৫১ সালে সর্ব্বপ্রথম ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ীর গৌরব অর্জ্জন করে। ১৯৫২ সালে পুনরায় তারা বিজয়ী হয়। এর পর তারা ১৯৫৬ সালে ডুরাণ্ড কাপ পায়। এইবার যুগ্ম বিজয়ী হওয়ায় ইষ্টবেঙ্গল মোট চার বার ডুরাণ্ড কাপ পায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেষ্টে জয়ী

সিডনীতে তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২২২ রাণে অষ্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে। প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়। তৃতীয় টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়ী হওয়ায় বর্ত্তমান টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলার জয়-পরাজয় এই পর্য্যন্ত সমান সমান থাকে।

রাণ-সংখ্যা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৩৩৯ (জি, সোবার্স ১৬৮, এস, নার্স ৪৩, সি, হান্ট ৩৪; ডেভিডসন ৮০ রাণে ৫ উই: ও বেনড ৮৬ রাণে ৪ উই:)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ২০২ (ও'নীল ৭১, সি, ম্যাকডোনাল্ড ৩৪, ম্যাকে ৩১, ভ্যালেনটাইন ৬৭ রাণে ৪ উই:, গিবস্ ৪৬ রাণে ৩ উই:)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস ৩২৬ (এফ, আলেকজাণ্ডার ১০৮, এফ, ওরেল ৮২, সি, স্মিথ ৫৫; ডেভিডসন ৩৩ রাণে ৩ উই:, বেনড ১১৩ রাণে ৪ উই: ও ম্যাকে ৭৫ রাণে ৩ উই:)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ২৪১ (হার্ভে ৮৫, এন, ও'নীল ৭০; গিবস্ ৬৬ রাণে ৫ উই: ও ভ্যালেনটাইন ৮৬ রাণে ৪ উই:)।

কুড়িটি ছোট ষ্টেডিয়াম গঠনের ব্যবস্থা

একটা নয়—দুটো নয়—একেবারে কুড়িটা! ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর থেকে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে যে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২০টি ছোট ষ্টেডিয়াম ভারতের বিভিন্ন স্থানে গঠন করা হবে। এই পরিকল্পনার বিষয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে খেলাধুলা ও স্পোর্টসের প্রসার সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে যাহাতে একটা করে বিরাট ষ্টেডিয়াম গঠিত হয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ও জাতীয় খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সেই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। বড় বড় ষ্টেডিয়াম গঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমানে বড় ষ্টেডিয়াম আর বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। তবে ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাতে সকলে সজাগ হয় সেই জন্য ছোট ছোট ষ্টেডিয়াম গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ভারতের তিনটি রাজ্য বড় বড় ষ্টেডিয়াম গঠন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে ছোট ষ্টেডিয়াম গঠনের কোন সার্থকতা নেই। উহাতে কেবলমাত্র ষ্টেডিয়ামের জনপ্রিয়তাই বৃদ্ধি করা হবে। ষ্টেডিয়াম গঠনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। ভারত সরকার মনে করেন যে পরীক্ষামূলক ভাবে বর্ত্তমানে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি ছোট ষ্টেডিয়াম গঠন করে ফলাফল প্রত্যক্ষ করা হবে।

ভারত সরকারের ষ্টেডিয়াম গঠনের নতুন পরিকল্পনাকে সকলেই স্বাগত জানাবেন। তবে ছোট ছোট ষ্টেডিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নামকরা সহরগুলিতে অন্তত একটা করে বড় ষ্টেডিয়াম গঠনের প্রস্তাবটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রঞ্জী ক্রিকেট হইতে বাঙ্গালার বিদায় গ্রহণ

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যান। এখানে রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালের আসর বসে। বাঙ্গালা ও দিল্লী দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিদিনই মাঠে বেশ দর্শক সমাগম হয়। বহুদিন রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় ক্রীড়ামোদীদের এত বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়নি। মনে হয় এটা টেষ্ট খেলারই ঢেউ। অল্প কয়েকদিন হলো ভারত ও পাকিস্তানের তৃতীয় টেষ্ট খেলা এই মাঠেই হয়ে গেছে।

বাঙ্গালা দলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে দিল্লীর নিকট পরাজিত হয়ে এবারকার মতন রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ কোরতে হয়েছে। দিল্লী দল শেষ সময় বাঙ্গালার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। তৃতীয় দিনের শেষে অবস্থা যা দাঁড়ায় তাতে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাঙ্গালা দলেরই জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কারণ এই সময় দিল্লীর প্রথম ইনিংসের ৩০৭ রাণের প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালার রাণ উঠে ৩ উইকেটে ২৪৮ রাণ। অর্থাৎ বাঙ্গালা চতুর্থ ও শেষ দিনে অবশিষ্ট ৭টি উইকেটে ৬০ রাণ করতে পারলেই প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হবে। শেষ দিনে দুই দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়া সম্ভবপর নয়। ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই খেলার মীমাংসা হওয়া ঠিক। এইরূপ সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও দলের ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য বাঙ্গালা দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শেষ দিনে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঙ্গালা দলের অবশিষ্ট উইকেটগুলি মাত্র ৩৮ রাণ যোগ হয়ে পড়ে যায়।

এই খেলায় বাঙ্গালার পঙ্কজ রায়ের ব্যাটিং ও এস, কুণ্ডুর বোলিং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য হয়। পঙ্কজ রায় ১৫৬ রাণ করে আউট হন। এস, কুণ্ডু ১০৪ রাণে ৮টি উইকেট পান। দিল্লী দলের এই খেলার সাফল্যের কৃতিত্ব সবটুকুই সীতারামের। শেষ দিনে তিনি চমকপ্রদ বোলিং করেন। তিনি ৮৪ রাণে ৬টি উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

বাঙ্গালাকে পরাজিত করার ফলে দিল্লী দল রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে পশ্চিমাঞ্চলের বিজয়ী বোম্বাইয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

রাণ-সংখ্যা

দিল্লী ১ম ইনিংস ৩০৭ (এস, শর্ম্মা ৭৪, গুলসন রাই ৬৬, এম, এম, সুদ ৫৪, ইন্দরজিত সিং ৪২, আর দেওয়ান ৩০ ; এস, কুণ্ডু ১০৪ রাণে ৮ উইঃ)।

বাঙ্গালা ১ম ইনিংস ২৯৭ (পঙ্কজ রায় ১৫৬, এস, এস, মিত্র নটআউট ৪৩, নিমাই ঘোষ ৩৯ ; সীতারাম ৮৪ রাণে ৬ উইঃ)

দিল্লী—২য় ইনিংস ২১০ (ইন্দরজিত সিং ৫১, জি, রাই ৩৭, ভরত আওয়াস্তী ৩৭ ; পারমার ২৩ রাণে ৫ উইঃ ও এ, গিরিধারী ৭১ রাণে ৪ উইঃ)। বাঙ্গালা—২য় ইনিংস কোন উইকেট না হারাইয়া ৩৮।

দিল্লীতে "স্পোর্টস গ্রাম" গঠন

সম্প্রতি নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের সভায় "দিল্লীতে স্পোর্টস গ্রাম" গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই গ্রাম তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

দিল্লীতে জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার দপ্তর

জানা গেছে যে ভারত সরকার সকল জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার দপ্তর দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করছেন। এইজন্য সকল জাতীয় ক্রীড়াসংস্থাকে একজন করে বেতনভুক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বেতনভুক সহকারী সম্পাদক দিল্লীতে থাকবেন। ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর ও কাউন্সিল অব স্পোর্টস যখন কোন বিষয় জানতে চাইবেন—তখনই এই সকল সহকারী সম্পাদক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। এই কর্ম্মকর্তার মাহিনা, ঘরভাড়া, বাসাভাড়া, অন্যান্য খরচ সবই ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর বহন করবেন। যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হলে সরকারের এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে মনে হয়।

রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষাশিবির

জাতীয় চরিত্রের অবনতির জন্য তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে এনে দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা। নৈতিক অবনতি ঘটায় আর কদাচারে দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের কয়েকজন আদর্শবাদী ও প্রগতিশীল দুঃসাহসী যুবক জাতিগঠনে বাঙ্গালার তরুণ সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার বাসনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের কর্ণধার শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিকের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের কর্ম্মধারার মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা-শিবির পরিচালনা একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। প্রতি বছরের মতন এবারও রবীন্দ্র-সরোবরে (লেক ময়দানে) এদের চতুর্দ্দশ বার্ষিক রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা হয়। এবারকার শিবিরের একটা বৈশিষ্ট হলো যে বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতিও এই একই সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করেন। ভারি সুন্দর পরিবেশ। এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁবুনগরী। নামটাও বেশ সুন্দর। একেবারে "ব্যায়ামনগর"। সত্যই নগরই বটে। এখানে কোন কিছুরই অভাব নেই। রন্ধনশালা, ভোজনাগার, স্নানাগার, সভাগৃহ, পাঠাগার, অভিপ্রদর্শনী ও খেলাধুলা প্রদর্শনীর জন্য ষ্টেডিয়াম, চিত্ত বিনোদনের জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ, আর ডব্লিউ এ সি পরিচালিত লেক হাসপাতাল, প্রাথমিক প্রতিবিধান কেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালিত "ডাকঘর"। টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া সঙ্ঘের মহিলা বিভাগের শিল্পসম্ভারে পূর্ণ বিপণি, সঙ্ঘ পরিচালিত ক্যান্টিন ও তৎসংলগ্ন সুন্দর পুষ্পশোভিত ও আলোকমালায় সজ্জিত অঙ্গন। এ হ'লো শিবিরের পারিপার্শ্বিক বর্ণনা। এই "ব্যায়ামনগরে" হাজির হন পশ্চিম-বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় আট শত সুন্দর ছেলেমেয়ে। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা থাকলেও সকলে শিবিরে আসার লোভটা সামলাতে পারেন নি। সারা বছর ধরে শিবিরের এই দিনগুলির জন্য সকলে বসে থাকেন। নয় দিন ধরে এখানকার ছেলেমেয়েদের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল, কুচকাওয়াজ, সমষ্টি ব্যায়াম, ব্রতচারী, প্রাথমিক প্রতিবিধান, কুটিরশিল্প, সমবেত সঙ্গীত ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এবারকার শিবিরের উড়িষ্যা থেকে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে হাজির হন। শিবিরের কাজ আরম্ভ হয় সকাল পাঁচটায় আর রাত্রি সাড়ে দশটায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামরিক ও বেসামরিক ও সঙ্ঘের শিক্ষকরা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এতগুলি ছেলেমেয়েকে অল্পদিনের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে দেখে সব সময়ই মনে হয়েছে, কেন বলা হয়ে থাকে যে বাঙ্গালার তরুণ-সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে? কেবল সমালোচনা করলেই চলবে না। ক'জন দরদী সমাজসেবী এই তরুণ-সমাজের জন্য এগিয়ে এসেছেন? যুবশক্তিকে সুগঠিত করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘ প্রচেষ্টা সার্থকরূপ গ্রহণ করুক, এটাই সকলে আশা করেন।

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতি

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক লিখিতেন এবং তাহার যথাযথ শিক্ষাদান নিজেই করিতেন। কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে গিরিশচন্দ্রকে বাঙলার নাট্যশালা তৈয়ারী করিতে গিয়া রথ ও পথ দুই-ই নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে।

কোন নূতন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্ব্বে তিনি অনেক সময়েই সমগ্র নাটকখানি সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময় শ্রোতারা নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা জীবন্ত ছবির মত দেখিতে পাইত। চরিত্রগত রস, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সমগ্র নাটকের উপর প্রত্যেক চরিত্রের প্রভাব অভিনেতাদিগের সহজেই বোধগম্য হইত। যেমন কোন যন্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অংশেরই কার্য্যকারিতা আছে, তেমনই নাটকীয় প্লটে ছোট বড় সকল চরিত্রেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে। সমগ্র নাটক প্রণিধান না করিলে তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাহার পর গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষতঃ নাটকীয় বড় বড় চরিত্রের অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহা অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শিখাইতেন। যাঁহার কণ্ঠে যেভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার হৃদয়গ্রাহী হয় অঙ্গভঙ্গী বা ভাবের অভিব্যক্তি কোন অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী মুখ ও নয়নের ভঙ্গীতে সুন্দর হয়, সুপরিস্ফুট হয় সেই দিকে তাঁহার খর দৃষ্টি থাকিত। অর্থাৎ অভিনয়কলা বিকাশে যাঁহার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ তাঁহার সেই শক্তি ও সামর্থের যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় – সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহারও মৌলিকতা নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণপটু করিতে তিনি চাহিতেন না। উদাহরণ দিয়া বলি—জগৎ সিংহ শিখাইতেছেন কি আয়েষা শিখাইতেছেন—তিনি পূর্ব্বে এই চরিত্রদ্বয়ের যত প্রকার interpretation হইতে পারে, দৃশ্যের পর দৃশ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে সেই ভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিতেন। পরে তাঁহাদের বলিতেন—এই বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনটা কাহার ভালো লাগিল ? যেরূপ উত্তর পাইতেন—শিক্ষাকার্য্য সেইরূপ ভাবে হইত।

এইরূপে অভিনয়কলার স্বাভাবিক বিকাশে অনুকরণের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের স্ফূর্তি হইত। অভিনয়েও রস সহজেই জমিয়া যাইত। এইভাবে শিক্ষা দিতেন বলিয়া গিরিশচন্দ্রের হাতেগড়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধারা বড় দেখা যাইত না। সামান্য দূত হইতে রাজা ও রাণীর অভিনয় পর্য্যন্ত সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইত। তাঁহার শিক্ষাদানে গঠিত নাটকে কোন মানুষী ধাঁচ থাকিত না। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ছিল একটু সুরেলা—'গ্রেট ট্র্যাজিডিয়ান' মহেন্দ্রলাল বসুর কণ্ঠস্বর ছিল প্রায় সুরবর্জ্জিত। অনেক সময়ে একই ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের এই দুইটি কৃতী শিষ্য তাঁহারই শিক্ষকতায় স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন অথচ উভয়ের অভিনয়েই রসের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে নাই।

শিক্ষাদান কালে যেমন, তেমনই আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র নিজ দলে প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন। এইজন্যই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁহার নূতন নাটকে কোন ভূমিকা পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। অল্প আয়াসে অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের এরূপ সুযোগ ও সুশিক্ষা তাঁহারা আর কোথাও পাইতেন না।

স্মৃতির টুক্‌রো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বোম্বাইয়ে অজন্তা মঞ্চস্থ করার পর আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিলুম, অহেতুক অপেক্ষা নয় এ অপেক্ষার পিছনে কারণ ছিল, আমার পরিকল্পনাকে—যে পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরে আমার অন্তরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে—বাস্তবে রূপায়িত করার অভিপ্রায়েই আমার এই অপেক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যালে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার উদ্যোক্তার দল পরিক্রমা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়ভারের সম্মুখীন হতে আর সাহস করলেন না তাঁরা ভরসা পেলেন না। ভগ্নমনোরথ হয়ে বোম্বাই ত্যাগ করলুম। মন ভেঙে গেল ফিরে এলুম কলকাতায়, মন ভেঙে গেল বটে কিন্তু আশা আমি ছাড়িনি, আশাই মানুষের জীবন। আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আমার স্বপ্ন সফল হল না বটে কিন্তু আমার স্বপ্নতো মিলিয়ে যায়নি। আশাভরা স্বপ্ন আমি চিরকাল দেখে এসেছি, সেই আশার আলোকেই মনে হল বোম্বাইতে থেকে যে অভিলাষ আমার বিফলতায় পর্যবসিত হল, কলকাতায় থেকে হয়তো আমার সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারব। বোম্বাই যা পারেনি কলকাতা হয়তো তাই পারবে, বোম্বাই যেখানে ব্যর্থ কলকাতা হয় তো সেখানে সার্থক হবে।

ফিরে এলুম কলকাতায়। আমার পরিকল্পনা কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করলুম না। মনের মধ্যে রেখে দিলুম, পরিবর্তে যোগাযোগ স্থাপন করলুম ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের শ্রীবাবুলাল চোখানীর সঙ্গে। বাবুলাল বাবু আমার প্রথম প্রযোজক এ কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারি না। তখন তিনি তাঁর "মা ও ছেলে" ছবিটির নির্মাণকার্যে ব্যস্ত, আমি তাঁর ছবিতে অভিনয় করব এই বাসনাটুকু

শুধু তাঁকে জানালুম। বলা বাহুল্য, আমার প্রস্তাব তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। "মা ও ছেলেতে" আমার জন্যে একটি ভূমিকা নির্ধারিত হল। বাবুলাল চোখানী তাঁর প্রযোজিত "মা ও ছেলে" ছবিতে অভিনয়ের জন্যে বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ আমাকে নির্বাচিতা করলেন। এ ঘটনা ১৯৫৩ সালের। তখন ফেব্রুয়ারি মাস। কলকাতায় আমি তখন বালিগঞ্জে আমার মায়ের কাছে আছি। মধুও তখন দু'খানি ছবি নিয়ে খুব ব্যস্ত। ছবি দুটির প্রস্তুতিপর্ব চলছে তখন সমারোহে, একটি শেষের কবিতা অন্যটি বিক্রমোর্বশী। শেষের কবিতায় মধু আমাকে কেটির চরিত্রটি রূপায়ণের ভার দিল। বিক্রমোর্বশীর প্রযোজকও চেয়েছিলেন যে আমি উর্বশীর ভূমিকাটি রূপদানের ভার নিই এবং ছবির নৃত্যাংশ পরিচালনা করি—এই শেষের প্রস্তাবটিই আমি গ্রহণ করেছিলুম কিন্তু প্রথম প্রস্তাবটি আমি গ্রহণ করি নি তার একমাত্র কারণ বোম্বাইয়ে উর্বশীর ভূমিকায় অবতরণ করে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি তার স্মৃতি তখনও আমার মন থেকে মিলিয়ে যায় নি, বোধ করি তা যাবেও না। কোনদিন সেই ভেবেই উর্বশীর ভূমিকা গ্রহণ করতে আমি সাহসী হলুম না অবশ্য ঐ ছবিতে অভিনয় আমি করেছিলুম, উর্বশীর ভূমিকায় যদিও অবতীর্ণা হই নি, অন্য একটি ভূমিকা রূপায়ণের দায়িত্ব আমি নিয়েছিলুম। রাণী ঔশীনরীর চরিত্রটি ঐ ছবিতে আমার দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল। আমার অভিনীত শেষ তিনটি ছবি "মা ও ছেলে", "শেষের কবিতা" ও "বিক্রমোর্বশী"র কাজে ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিক অবধি আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এই তিনটি ছবির কাজ শেষ করার পর অন্য কোন ছবিকে কেন্দ্র করে আমি ক্যামেরার সামনে আর দাঁড়াইনি। আমার চিত্রাভিনেত্রী জীবনের এখানেই আপাতযবনিকা।

মিঃ টি. টুলসান আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু। বহুকাল এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একদিন তাঁর দেখা মিলল, তিনি একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন। মঞ্চে ব্যালে প্রদর্শনের প্রস্তাব। তখন আমি আমার পরিকল্পিত "অজন্তা"র কাগজপত্র তাঁকে দিলুম। তা পাঠমাত্রই তিনি তা গ্রহণ করলেন। আমার স্বপ্ন সফল হল। বোম্বাই যেখানে ব্যর্থ হল কলকাতা সেখানে সফল হল। আমার বহুকালের আশা রূপ পেল। নিউ এম্পায়ারে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৪ অজন্তা মঞ্চস্থ হল। আমার বহু যত্নে লালিত স্বপ্নের বাস্তবে রূপায়ণে ঘটল সেদিন—সে যে কি পরিতৃপ্তি তা কোন ভাষায় ব্যক্ত করব? এই প্রসঙ্গে, একটি ইংরেজী দৈনিক অজন্তা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, এই উদ্ধৃতি আমার মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"Inspired by Rabindranath Tagore's 'Abhisar' Ajanta, a pantominic fantasy staged at Calcutta by Sadhona Bose and her ballet is a story of considerable interest and this colourful story offers obvious scope to the considerable talents of Miss Sadhona Bose, whose artistry is indisputable. There were moments in which the lyrical language of her hands were so eloquent and beautiful that it is difficult to imagine why it was necessary to super impose actual speech, Her short passage of pure dance gave audience of Miss Bose's talents as a classical dancer. But to the classical dance she adds at interpretation all her own, which makes the accepted forms at once more understandable and appreciable. Her personality commands attention even when she merely walks and stage."—

—Statesman 15-1-54.

এবার সমাপ্তির রেখা টানা যাক। স্মৃতির সূত্র ধরে অতীতকে টেনে আনা যায় বর্তমানের আঙ্গিনায়, আবার কালের নিয়মানুসারে বর্তমান অতীতে পরিণত হয়। থেকে যায় শুধু স্মৃতি, এই স্মৃতিই অবলুপ্তির অতল অন্ধকারে আশ্রয় নেয়, যারা কালের ধ্বংসধর্মী বাহুবন্ধনের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারাও বেঁচে থাকে এই স্মৃতির মধ্যে দিয়েই। স্মৃতিই ধরে রাখে অতীতকে। কথার মালা গাঁথতে গাঁথতে দেখছি তার আয়তন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। নাঃ, আর নয়, এবার লেখনী থামানো যাক। জীবন সুখ, দুঃখ, আনন্দে, বেদনা, ঘাত, প্রতিঘাতের সমষ্টি। সব কিছুর সমন্বয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা, এদের একটিকে বাদ দিলেই জীবন অর্থশূন্য বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের বিকাশ। আজকের অলস অপরাহ্নে একমনে আকাশের দিকে চাইতে চাইতে মনে হচ্ছে যেন আমারই ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতির মিছিল চলেছে ঐ মহাশূন্যের উপর দিয়ে আর আমি তার নীরব দর্শিকা মাত্র। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করতে বসলে হয় তো অনেক কিছু পাওয়া যাবে আবার হয় তো অনেক কিছু পাওয়া যাবেও না, তবে এ কথা সত্য—যে সত্যের প্রতিচ্ছবি আমার অন্তরে অনির্বাণ দীপ্তিতে চিরভাস্বর—যে আমি ধন্যা, আমি পূর্ণা, আমি অশেষ সৌভাগ্যশালিনী। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ দর্শকসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরের রূপ নিয়ে অমৃতধারার মত আমার শিরোদেশে হয়েছে বর্ষিত। দর্শক-সাধারণ আমার শিল্প নিবেদন গ্রহণ করেছেন। পরিতৃপ্ত হয়েছেন, আনন্দরসের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন, একজন শিল্পসেবিকার এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? এই স্বতঃস্ফূর্ত শুভকামনাই আমা'র জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, আমার পথ চলার পরম পাথেয়, আমার জীবনে বিধাতার পূত পবিত্র আশীর্বাদের নামান্তর মাত্র, এরাই আমাকে আবার দেবে পথের সন্ধান, এরাই আমাকে দেখাবে আলো, এরাই আমার প্রাণে জুগিয়ে যাবে আশা।

অনুবাদ: কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাপ্ত

মানিক

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে চার্লস ডিকেন্স একটি অমলিন স্বাক্ষর। পৃথিবীর সাহিত্য সমাজে ডিকেন্স এক অমর ব্যক্তিত্ব। অলিভার টুইষ্ট তাঁর অসামান্য সৃষ্টিগুলির অন্যতম। অলিভার টুইষ্টের কাহিনী আজ বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে সুপ্রচারিত, তাই সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ডিকেন্সের এই বিখ্যাত রচনার [illegible]

ভাগ্যনিপীড়িত বালক এর নায়ক। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই দুর্ভাগ্য আর প্রবঞ্চনা তার জীবনের সাথী। জন্মলগ্ন থেকেই যে কেবল পেয়ে আসছে জীবনদেবতার কঠোর অভিশাপ। সৌভাগ্য, শান্তি, নিশ্চিন্ততার স্বাদ যে জীবনে বারেকের তরেও পেল না সেইরকম এক ভাগ্যবিড়ম্বিত বালক মানিক, তারই কাহিনী এই ছবির প্রধান উপজীব্য। সর্বশেষে পঙ্গু পিতামহের সঙ্গে মিলনে তার জীবনের সকল লাঞ্ছনার অবসান। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজলীবরণ সেন। ছবিটিকে সর্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী, উপভোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক করে তুলতে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। মানিকের কাহিনী হৃদয়ধর্মী, এর সারমর্ম অনুভূতিসাপেক্ষ, তা উপলব্ধির বস্তু। এই জাতীয় ছবির বক্তব্য হৃদয়বান মানুষেরই মনে রেখাপাত করে গভীরভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মানিক ছবিটি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুপরিচালিত। পরিচালক যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে গল্পটিকে সাজিয়েছেন, অর্থাৎ কাহিনী গ্রন্থনের কার্যে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় মিলেছে। কোন চরিত্র অস্পষ্ট নয়, চরিত্রগুলির প্রতি যথোচিত সুবিচার করা হয়েছে, চরিত্রগুলির প্রতি পরিচালক যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, সেইজন্যেই তাদের বিন্যাস বা বিশ্লেষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। ছবিটি যাতে একঘেঁয়েমির দোষে দুষ্ট না হয় সেদিকেও পরিচালকের সতর্ক দৃষ্টি অলক্ষণীয় নয়।

পরিচালক সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়েছেন, একখানি পরম উপভোগ্য ছবি তিনি উপহার দিলেন দর্শকসমাজকে তাঁর পরিচালনা অভিনন্দনের দাবী রাখে—এ কথা অনায়াসে বলা যায়—তবে একটি জায়গায় তিনি চরম ব্যর্থতা বরণ করেছেন—এবং এমন একটি বিষয়ে তিনি ব্যর্থতা বরণ করলেন যার গুরুত্ব সমগ্র ছবিতে অনস্বীকার্য। ফকিরচাঁদের চরিত্র সৃষ্টি ব্যর্থ। এই চরিত্রে শক্তিমান অভিনেতার অভিনয় সকলে উপভোগ করেছেন কিন্তু "চরিত্র" হিসেবে ফকিরচাঁদ একটি ব্যর্থতার প্রতীক। জানা যায় যে ফকিরচাঁদও একটি পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত সন্তান। পথে পথে তার জীবন কেটেছে। কালক্রমে সে গুণ্ডায় পরিণত হ'ল এবং একটি দল তৈরী করে তার সর্দার হয়ে বসল এই তার মোটামুটি পরিচয় কিন্তু ছবিতে ফকিরচাঁদ চরিত্রটি যেন প্রমাণ করছে সে রীতিমত সুশিক্ষিত। জীবন দর্শনের প্রতিটি রহস্যের দ্বার কাছে অর্গলমুক্ত, বিশুদ্ধ, অবিকৃত তার উচ্চারণ এ চরিত্র একজন অশিক্ষিত গুণ্ডার সর্দারের নয়।

বালসারার সঙ্গীত পরিচালনা ও দেওজীভাইয়ের চিত্রগ্রহণ প্রশংসার্হ। অভিনয়ে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এক নবাগত বালক। এই চরিত্রে শ্রীমান তৃণাঞ্জন মিত্র অপূর্ব অভিনয় করেছে। সারা ছবিতে বলতে গেলে সে প্রাণ সঞ্চার করেছে। প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকহৃদয় সে জয় করেছে। ফকিরচাঁদের চরিত্রে শম্ভু মিত্র, গণেশের চরিত্রে অমর গাঙ্গুলী এবং নীলি চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র আপন আপন অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, এঁদের সজ্ঞবদ্ধ অভিনয় নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দাবী করার যোগ্যতা রাখে। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, ছায়া দেবী এবং নিভাননী দেবীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই ছবির আর একজন শিল্পীর নাম এখনো করা হয় নি, যাঁর অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা [করার মত ভাষা বিরল—তাঁর নাম ছবি বিশ্বাস, বর্তমান-কালের অভিনয়জগতে একটি বিশেষ নাম। এ ছবিতে তাঁর অভিনয় এককথায় অনবদ্য। আমাদের মনে হয় যে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় এই ছবির মাধ্যমেই দেখা গেল, জীবনে অসংখ্য চিত্রে ও মঞ্চে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর অভিনয় সফলতার স্পর্শে ভরপুর কিন্তু তাঁর এ অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর অন্য কোন অভিনয়ের তুলনা হয় না—তিনবার মাত্র তাঁর আবির্ভাব—একটি সংলাপ নেই, কোনরকম অঙ্গসঞ্চালন নেই, বাক্‌শক্তিহীন, উত্থানশক্তিহীন একটি বৃদ্ধের ভূমিকা তাঁর, কেবলমাত্র অভিব্যক্তি আর দু'-একটি অস্পষ্ট উচ্চারণের সাহায্যে চরিত্রটির রূপ দেওয়ায় যে কতখানি দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন তা অনুমেয় এবং এই কঠিন চরিত্রটির রূপায়ণে আমরা পরম আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করছি যে ছবি বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হয়েছেন। এ একমাত্র তাঁর মতন শক্তিমান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

কেরী সাহেবের মুন্সী

উনবিংশ শতাব্দীর তখন সবেমাত্র অভ্যুদয় ঘটেছে। একটি গৌরবময় শতাব্দীর অপ্রতিহত জয়যাত্রার শুভ সূত্রপাত হ'ল। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর গরিমাময় অবদান স্মরণ করে একে স্বর্ণশতাব্দী আখ্যায় আখ্যাত করলে কোনক্রমে হয় না অত্যুক্তি। নবাবী শাসনের অবসান ঘটে ইংরেজী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তখন বাঙালীর জীবনধারায় এসেছে এক ব্যাপক পরিবর্তন এক নবতম চেতনার সে হয়েছে তখন সম্মুখীন, তার চিন্তাধারায় লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সে এক সর্বৈব পরিবর্তনের যুগ, একটি নতুন সভ্যতা তখন ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে, স্বভাবতঃই চিন্তাধারা ভাব-কল্পনা, ধ্যানধারণাও সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নতর রূপ নিচ্ছে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে কেরী সাহেবের মুন্সী। রচয়িতা শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। একে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন শক্তিমান অভিনেতা শ্রীবিকাশ রায়। নবাবী শাসনের অবসান ঘটিয়ে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজ শুরু করল তার প্রচারকার্য। সে অনুভব করল এদেশে নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এ দেশের মানুষকে নিজেদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা। সেই ভাবধারায় এ দেশের মানুষকে গড়ে তোলারও নিজেদের মহিমার প্রভাব এ দেশের অধিবাসীদের মনে বিস্তার করার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করল। শুরু হ'ল তার প্রচারকার্য। মাধ্যমিকা কই? প্রচারের বাহন কোথায়—এল মুদ্রাযন্ত্র, এল দেশীয় সংবাদপত্র, জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করতে সেদিন এগিয়ে এল নতুন শাসকগোষ্ঠী। শিক্ষার তথা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিমানসে উদ্ভব হ'ল বাঙলা গদ্যের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। এই যুগবিবর্তনের ইতিহাসে যে সব যুগপুরুষদের অবদান অমলিন উইলিয়ম কেরী তাঁদের অন্যতম। তারই মুন্সী রামরাম বসু। এই কাহিনীর তিনিই নায়ক। তাঁরই আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনের বিচিত্র কাহিনী এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। বহুবিধ বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে রামরাম বসুর জীবনের বিকাশ। তাঁর যৌবনকাল থেকে পরিণত বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তৃতি। তাঁকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চরিত্র এই কাহিনীতে স্থানলাভ করেছে তা ছাড়া আরও কয়েকটি চরিত্র আছে যাদের সঙ্গে তাঁর

প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও কাহিনীতে তাঁদের অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়। সতীদাহপ্রথা এই ছবিতে এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সে যুগের কুসংস্কারগুলির প্রতিও (যথা—ক্রীতদাস প্রথা, সতীদাহ প্রভৃতি) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রথাগুলিকে চিত্রিত করার জন্যে অনেকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করতে হয়েছে, কিন্তু এই চরিত্র সংযোজন এত নিপুণতার সঙ্গে ঘটেছে, যার ফলে মূল চরিত্রগুলি কোথাও বিকৃত হয়নি। ইতিহাসের আলোয় বিচার করলে দেখা যায় তাদের বিকৃতি ঘটেনি।

এই যুগসন্ধিকালকে ছায়াচিত্রে অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন বিকাশ রায়। এই বিরাট পটভূমির উপর গঠিত কাহিনীর চিত্রায়ণ কর্মে অভিনন্দনযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে তাঁকে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে—ছবিটিই সেই শ্রম স্বীকারের সাক্ষ্য। সমগ্র ছবিটিতে পরিচালকের আন্তরিক দরদ, নিষ্ঠা ও সহানুভূতির পরিচয় মেলে। এই বিরাট পটভূমির এমন সুষ্ঠু রূপায়ণ যে এক দুরূহ শক্তির দ্বারাই সম্ভবপর এ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দর্শক-সাধারণও দ্বিমত হবেন না। একটি গৌরবময় যুগকে (জাতীয় জীবনের নবগঠনে যে যুগের প্রভাব অনস্বীকার্য) রূপালী পর্দায় সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন বিকাশ রায়। তিনি নিজে শিল্পী। এই রূপায়ণকর্মে তাঁর শিল্পীমনও অনেকখানি সহায়তা করেছে। বহু ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কাহিনীর বিন্যাসভঙ্গী এবং ঘটনা সংস্থাপনরীতি পরিচালকের কুশলতা প্রমাণ করে! কাহিনীর বেগবান গতি বারেকের তরে কোথাও শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নি। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি বিষয় আছে, আছে এ দেশের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা, আছে সতীদাহ, আছে সামাজিক কঠোর অনুশাসনের স্পষ্ট চিত্র, আছে জ্ঞাতি জমিদারের রেষারেষি, আছে জমিদারী লাম্পট্যের নিদর্শন, আছে প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ-বেদনা, আছে তদানীন্তন সমাজের রেখাচিত্র, আছে বাঙলা গদ্যের প্রথম অনুশীলনের ইতিবৃত্ত—পরিচালক ছবিতে এতগুলি বিষয়ের অবতারণা করে খেই হারিয়ে ফেলেন নি বা কাহিনীর মূল সুর কোথাও ব্যাহত হয়নি। বরং এই বিভিন্নতার মধ্যে তিনি বরাবর এক সামঞ্জস্য রেখে গেছেন। তিনি খণ্ড খণ্ড এই অধ্যায়গুলির মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র গঠন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন উৎসর্গ করি।

ছবিতে তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অমিত দে, তন্দ্রা বর্মণ এবং পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই নবাগত, তিনজনেই প্রথম আবির্ভাবে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের তিনজনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁদের অভিনয় সর্বপ্রকার দোষবর্জিত। আমরা এঁদের স্বাগত জানাই! কেষ্টা ও রামরামের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও বিকাশ রায়। দু'জনেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অভিনেতা, এঁদের অভিনয় সৌকর্যে চরিত্র দুটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, এঁদের অভিনয় দর্শককে অভিভূত করে তোলে। প্রধান নারী চরিত্রে দেখা দিয়েছেন মঞ্জু দে। অপূর্ব অভিনয় প্রতিভা তিনি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অভিনয় এ ছবির একটি সম্পদবিশেষ। এঁরা ছাড়া অন্যান্য যাঁরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, [illegible] মুখোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, গৌর শী, কালীপদ চক্রবর্তী, তুলসী চক্রবর্তী, শশাঙ্ক সোম, প্রীতি মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, তাপসী রায়, স্বাগতা চক্রবর্তী, রেবা দেবী, সন্ধ্যা দেবী, শুক্লা দাস, চিত্রা মণ্ডল, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্লোরিয়া ডাউইমটন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

একটি স্বীকারোক্তি

"মানুষ আমাকে যতখানি ভালোবাসে, আমি কিন্তু মানুষকে ভালোবাসি তার চেয়ে অনেক বেশী। অনেক-অনেক বেশী।"—এ উক্তি কার জানেন?—এ উক্তি একজন শিল্পীর, একজন অভিনেত্রীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না এক অভিনয়শিল্পীর, সর্বোপরি এক নারীর। চোখের দৃষ্টি যেন তার অনেক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাতলা ঠোঁটে সকল সময়ে সোনালী রঙের চুল। বয়েস তার ছত্রিশ। নাম তার মেরিলিন মনরো। হলিউডের একটি বিশেষ নাম, হলিউডের চিত্র-জগতে সীমাহীন চাঞ্চল্য জাগিয়েছে এই মেয়ে। তার আবির্ভাবের পর থেকেই নিমেষে করেছে দর্শকচিত্তে স্থায়ী রেখাপাত। এই মেয়েই মেরিলিন মনরো।

তাকে ঘিরে আছেন কয়েক জন সাংবাদিক অদম্য এক কৌতূহল বুকে নিয়ে। উৎসুক সংবাদ-শিকারীদের প্রতিজনের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ধীরভাবে দিয়ে চলেছেন মেরিলিন। গলা কখনো উঠছে, কখনো নামছে, কখনো একটি গানের দুটি কলি গুন্ গুন্ করে গেয়ে ওঠেন কখনো কোন কবির কোন কবিতা থেকে দুটি পংক্তি আবৃত্তি করে ওঠেন, কখনো বা পরম আনন্দে উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। এই রকম পরিবেশেই কোন এক সন্ধ্যায় উপরোক্ত মন্তব্যটি করলেন মেরিলিন। কোন প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তিটি তিনি করলেন, সে প্রশ্ন আমাদের জানা নেই, তবে তাঁর উক্তিটি প্রচারিত হয়েছে সারা বিশ্বে। মেরিলিনের এই উক্তিতেই প্রশ্নবাণ বর্ষণে নিবৃত্তি ঘটেনি, প্রশ্ন গেল তাঁর কাছে—কি ধরণের মানুষ আপনার প্রিয়? মেরিলিন উত্তর দিলেন—যে মানুষ কবি, একটু থামলেন এবার, কি যেন ভাবেন ক্ষণকালের জন্যে তাঁর সংলাপ থেমে গেল কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্যেই—পরমুহূর্তেই বিশদ হলেন মেরিলিন, নিজের উক্তির করলেন বিশদ বিশ্লেষণ, বললেন—কবি অর্থে তাঁকে যে কবিতা রচনা করতে হবে এমন কথা আমি বলতে চাই না এখানে কবি বলতে আমি অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছি। অনুভূতিপ্রবণতা পুরুষকারের একটি প্রধান এবং অপরিহার্য্য লক্ষণ। একজন বললেন—এতো প্রকৃতি গেল। আকৃতি? অর্থাৎ তার শারীরিক গঠন? মেরিলিন উত্তর দিলেন সেটিও উপেক্ষণীয় কোনমতেই নয় অর্থাৎ সেটিও আশানুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মেরিলিনের মতে পুরুষকে অবজ্ঞা করে যাওয়া কোন নারীরই উচিত নয়। একজন প্রশ্ন করলেন—আপনি কি জীবনে কোন পুরুষকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেছেন না কি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন মেরিলিন—না না আমিই তো বললুম—আমি পুরুষকে ভালোবাসি যদিও মেয়েদের বিরুদ্ধে আমার বিন্দুবিসর্গ অভিযোগ নেই বা কোন দিক দিয়ে তাদের প্রতি আমার মনোভাব বিরূপ নয় তা সত্ত্বেও আমি পুরুষ ভালোবাসি।

মেরিলিন মনরো—আমার জীবনের [illegible]

প্রতিটি দিকের পৃথক স্বরূপ, প্রতিটি দিকের এক একটি বিশেষ গন্তব্য। আমাকে আপনারা যা দেখছেন সেই আমার সম্পূর্ণ রূপ নয় এ তার একটি অংশমাত্র। আমার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার সম্পূর্ণরূপ সম্বন্ধে আমি নিজেই অচেতন তাই তা বিশ্লেষণ করতেও আমি অপারগ। আমার আধারে যুগপৎ বিরাজ করছে শিল্পীসত্তা এবং বধূসত্তা আমার শিল্পীসত্তা চায় শিল্প দেবতার বেদীমূলে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিতে আমার বধূসত্তা চায় একটি গৃহকোণ, রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে ভরা, সবার উপরে এক পরম সুন্দরের মধুময় স্পর্শ। আমার মনে হয় এই বধূসত্তাই আমার মনে জন্ম দিয়েছে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসার। মানুষকে যে আমি ভালোবাসি তার উৎস বোধ হয় এই বধূসত্তাতেই।

সংবাদ-বিচিত্রা

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী-প্রসূত কাবুলীওয়ালার চিত্ররূপ শুধু বাঙলাদেশে নয়, বহির্ভারতেও অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে এই ছবিখানি বহুলাংশে সহায়তা করেছে। কাবুলীওয়ালা বর্তমানে বিমল রায়ের প্রযোজনায় হিন্দীতেও চিত্রায়িত হচ্ছে। সহযোগী প্রযোজিকা হিসেবে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী লীলা দেশাই। হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় নামভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বলরাজ সাহনী। ছবিটি বর্তমান বর্ষের জুলাই কি আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ করবে বলে আশা করা যায়।

•   •   •   •

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে, ভারত সরকার একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এই চুক্তির সারমর্ম হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ র-ফিল্মের জন্যে আর বিদেশে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। এ দেশেও র-ফিল্ম তৈরী হবে এবার। উটাকামাণ্ডে নির্মাণশালা তৈরী হবে, এ বিষয়ে ভারতীয় কুশলীদের যথাযথ শিক্ষাদানের জন্যে ফ্রান্স থেকে পঁচিশ জন কৃতবিদ্য ভারতবর্ষে আসবেন। ভারতবর্ষ থেকেও কুড়ি জন শিক্ষার্থী এ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যে বিদেশে যাবেন। এই ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করলে চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই; এবং সব চেয়ে আশা ও আনন্দের কথা এই যে, এ বিষয়েও ভারত এবার আত্মনির্ভরশীল হতে চলেছে।

•   •   •   •

উড়িষ্যাতে ষ্টুডিও নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। উড়িষ্যা সরকার রাজ্যে ষ্টুডিও নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এ বিষয়ে ষ্টুডিও কমিটি নাম দিয়ে উড়িষ্যা সরকার এক কর্মপরিষদ নিযুক্ত করেছেন। এই কমিটি গত ১১এ ডিসেম্বর তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, ভুবনেশ্বরের কাছে একটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ষ্টুডিও নির্মাণ করতে ব্যয় হবে পনেরো লক্ষ টাকা এবং কাজ আরম্ভ করার জন্যে প্রাথমিক ব্যয় বাবদ তাঁরা নির্ধারিত করেছেন সাত লক্ষ টাকা।

•   •   •   •

এতাবৎকাল জাপানের রাজ-পরিবার কোন শিল্পীকে কোন জাপ-সম্রাটের চরিত্র রূপায়ণের অনুমতি দেননি, বর্তমানে এর ব্যতিক্রম ঘটল। এত কাল পরে অভিনয়জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। মেট্রো-গন্ড ইন মেয়ারের "জিজ টু ভ সান" ছবিতে জাপ সম্রাটের চরিত্র রূপায়ণের অনুমতি দিয়েছেন জাপানের রাজপরিবার। প্রখ্যাত অভিনেতা শিন কিদোর উপর অর্পিত হয়েছে এই চরিত্র রূপায়ণের ভার। এই ঘটনায় সুদীর্ঘ কালব্যাপী একটি প্রথার অবসান হল।

•   •   •   •

সিংহলের শ্রেষ্ঠ ছায়াছবিগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে মাসের শেষের দিকে। সিংহলের কয়েকটি প্রধান প্রদর্শক এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, দর্শকের আর্থিক স্বচ্ছলতা যে সময়ে থাকে সেই সময়ে ছবি মুক্তিলাভ করলে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। সিংহলে সরকারী কর্মচারীরা এবং শ্রমিক সম্প্রদায় মাসের শেষের দিকে বেতন বা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন, সেইজন্যেই ঐ সময়ে ছবি মুক্তিলাভ করলে তাকে ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না (অবশ্য ছবির গুণাগুণের উপরেই সব কিছু নির্ভর করে)।

•   •   •   •

হলিউডের উপর এবার খড়গহস্ত হয়েছেন যাজক সম্প্রদায়। তাঁরা চল্লিশ লক্ষ রোম্যান ক্যাথলিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছেন। যাজকদের মতে হলিউড ক্রমশঃই নিকৃষ্ট ধরনের ছায়াছবি উপহার দিয়ে চলেছেন। এই ছবিগুলির সার কিছু নেই, এগুলি যেমনি অসার তেমনিই অন্তঃসারশূন্য আবার তেমনিই অশোভন অশালীন ও অশ্লীল। জাতীয় জীবনে এই ছবিগুলি সকল দিক দিয়েই অস্বাস্থ্যকর। এরা কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় চরিত্রের মান নিম্নগামী করে তুলছে। এই ছবিগুলি সব দিক দিয়ে যথেচ্ছ ব্যভিচারের জয়গান গেয়ে চলেছে। এবং এই ব্যভিচারকেই মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে চলছে। চল্লিশ লক্ষ রোম্যান ক্যাথলিক এই ছবিগুলির সর্বতোভাবে ধ্বংস সাধনের জন্যে সরকারের কাছে জাতীয় দাবী উপস্থাপিত করুন, যাজক-সম্প্রদায় এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।

•   •   •   •

মেট্রো গল্ড ইন মেয়ারের প্রেসিডেন্ট মিঃ ভোগেল ১৯৬০ সালকে এম-জি-এম-এর চল্লিশ বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বছরগুলির অন্যতম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৫৯ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালের তাঁদের আয় শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩১এ আগষ্ট পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেছে যে এম-জি-এম-এর লাভের অঙ্ক ৯, ৫৯৫,০০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত বারো বছরে এমনটি ঘটেনি। মিঃ ভোগেল আশা করেন যে, ১৯৬১ সালে তাঁদের লাভের অঙ্ক ১৯৬০ সালের ঐ অঙ্ককেও অতিক্রম করে যাবে।

•   •   •   •

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, গত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একবার মাত্র এগারো বছরের জন্যে গ্রেট বৃটেনে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল। তিন শ' বছর আগে বৃটেনে এই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাঁর নেতৃত্বে, সেই অলিভার ক্রমওয়েল নামটিও ইতিহাসপাঠকের মন থেকে মুছে যাবার নয়। লণ্ডন থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, ওয়ারউইক প্রোডাকসান ক্রমওয়েলের জীবনী অবলম্বনে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। গ্রেট বৃটেনেই এই চলচ্চিত্র গৃহীত হবে, কেবলমাত্র যুদ্ধদৃশ্যগুলি তোলা হবে যুগোশ্লাভিয়ায়।

লোকাচারী নেহেরু

"রাষ্ট্রের বহু লোককে নানারূপে নাচাইয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল গত ২৩শে জানুয়ারী দিল্লীতে তালকোটরা বাগানে—"রিপাবলিক ডে" ও "লোকনৃত্য" অনুষ্ঠানযুগলের জন্য ক্রমাগত লোকনৃত্যকারীদিগের সহিত সানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানদ্বয় বোধ হয়, একই পর্য্যায়ভুক্ত করা হইতেছে। জওহরলাল নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগের সহিত কেবল নৃত্যই করেন নাই—মালাবদলও করিয়াছেন। মালাবদল কিন্তু অনেক সময় বিপদের কারণ হয়। হয়ত সেইজন্যই to guard against contingencies তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পৌত্র আজিমউশশান ঢাকায় হোলী উৎসবে আবির খেলিলে—বাদশা ঔরঙ্গজেব লিখিয়াছিলেন—"দাড়ীতে আবির মাখা—বাসন্তী কাপড়—তোমার বয়সে এই ব্যবহারের জন্য বাহবা না দিয়া থাকা যায় না।" —দৈনিক বসুমতী।

বেসরকারী প্রচেষ্টা

"জব্বলপুরের কলানিকেতন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টায় বেতারনিয়ন্ত্রিত যাত্রিবাহী বাসের একটি মডেল নির্মিত হইয়াছে, এ সংবাদে সত্যই উৎসাহিত হইবার মত। ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মডেলটিকে চালাইয়াও সাংবাদিকদের দেখাইয়াছেন। ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অন্যদেশবাসী অপেক্ষা কিছু কম আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারী উৎসাহদানের কার্পণ্য অনেক সময়ে সেই বুদ্ধি ও দক্ষতা-বিকাশের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয়ের যে যান্ত্রিক কৃতিত্ব বিদেশে সমাদর লাভ করিয়াছে, দেশের সরকার তাহার প্রতি যথোপযুক্ত বা কোনই সমাদর প্রদর্শন করেন নাই। অথচ দেশবাসীকে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় তৎপর হইতে মৌখিক উৎসাহদানে মন্ত্রী মহোদয়েরা একেবারে মুক্তমুখ। কয়েক দিন আগেই কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই দেশাই বিলিমোড়াতে সি এম সি কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতেও তিনি কারিগরী পটুতা অর্জনের জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ সর্বথাই অনুসরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়েরা মুখে যে পরামর্শ দেন, নিজেরা কাজের ভিতর দিয়া যদি তাহা রূপায়িত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কথার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। দেশবাসীও ঈপ্সিত কাজে অধিকতর উৎসাহবোধ করে। বিজ্ঞানচর্চা ও যন্ত্রবিত্তাশিল্প যে সরকারী সমর্থন ও সাহায্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল সে কথা না বলিলেও চলে। আমরা মনে করি, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রেরা বেতারনিয়ন্ত্রিত-বাসের মডেল তৈয়ারী করিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সরকারী সাহায্য, উৎসাহ ও সমর্থন পাইলে তাঁহারা এ ব্যাপারে অনেক বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সরকারের নিকট হইতে যথাসময়ে তাহা পাওয়া যাইবে কি?" —আনন্দবাজার।

ভারত VS নাগা

"নাগা বিদ্রোহীরা প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে ভারতীয় বিমান বাহিনীর যে পাঁচজন লোককে বন্দী করিয়াছিল, নাগাদের দ্বারা তাহাদের প্রতি [illegible] দুর্ব্যবহারের খবর বাহির হইয়াছে। নাগা বিদ্রোহীরা নাকি পাহাড় ও জঙ্গলের যেখানে যাইতেছে সেখানেই বন্দীদিগকে হাঁটাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, ঠাণ্ডা লাগার জন্য জ্বর, পায়ে ফোস্কা প্রভৃতির ফলে ভারতীয় বন্দীরা দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে। নাগারা নাকি ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর দ্বারা আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচরূপে ভারতীয় বন্দীদিগকে ব্যবহার করিতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই হতভাগ্য বন্দীদের মুক্তির জন্য উপযুক্ত তৎপরতার সহিত চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাত্র কিছুকাল পূর্বে একটি স্থানে প্রায় পাঁচ শত সশস্ত্র নাগাকে বন্দী করিয়া ফেলিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও উপরিতন সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে অকস্মাৎ অভিযান স্থগিত করিয়া দিতে হওয়ায় সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ঠিক করিলেন যে, নাগাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা ছাড়া অন্য উপায়ে বন্দীদের মুক্ত করা যাইবে না। অথচ নাগা অঞ্চলের জনৈক ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের মতে পূর্বোক্ত স্থানে নাগা বিদ্রোহীদের দলকে ধরিয়া ফেলিলে ভারতীয়দিগকে উদ্ধার করা যাইত। ভারত গভর্ণমেণ্টের শিথিল নীতি নাগাদের আস্পর্ধা ও অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি করিতেছে এবং দেখা যাইতেছে, ভারতীয় সৈনিকেরাও ঐ নীতির ফলেই বিদ্রোহীদের হাতে বেশী লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে।" —যুগান্তর।

ডাঃ শ্রীমালীর শিক্ষা

"দেশের গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ডাঃ শ্রীমালীর এই উপদেশ বাহুল্য মাত্র বলিয়াই পরিগণিত হইবে। শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহ যে কী অপরিসীম তাহা দেশের জনজীবনের সঙ্গে যাঁহার বিন্দুমাত্র সংযোগ আছে তাঁহার নিকটই সুবিদিত। বস্তুতঃ এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাধারণ ভাবেই বলা যায় যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ জনগণের আন্তরিক আগ্রহ ও দানের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আজও টিকিয়া আছে। গ্রামবাসীরা শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিয়াছেন কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসী প্রশাসনিক যন্ত্র তাহার প্রতিষ্ঠায় নানা ভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এ অভিজ্ঞতা মোটেই বিরল নহে। সুতরাং সমস্ত বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সুগম করিবার কার্যক্রম যদি প্রকৃতই আন্তরিকতার সহিত রূপায়ণ করা হয় তবে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সহযোগিতার কোন অভাব ডাঃ শ্রীমালী কখনও পাইবেন না। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁহাদের নিজেদের সকল ক্ষেত্রকে ত্রুটিমুক্ত করা।" —স্বাধীনতা

মন্দের ভালো

"গত সপ্তাহে করিমগঞ্জে কাছাড় জেলায় কংগ্রেসকর্মীদের যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবাদি মোটের উপর অনেক ভালো বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। [illegible]

পরিস্থিতিতে যে বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন, উক্ত সম্মেলনে তাহা করা না হইলেও একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, কাছাড়ের কংগ্রেস-কর্মীদের সকলেই আসাম প্রদেশ তথা অসমীয়া কর্তৃত্বের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উদ্‌গ্রীব। সম্মেলনে প্রদত্ত প্রস্তাবগুলির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সমস্ত বক্তৃতাদি হইয়াছে তাহাতে সকলেই দ্বিধাহীন ভাবেই বলিয়াছেন যে, মানুষের মত বাঁচিতে হইলে—কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বর্তমান আসামের সহিত একত্র থাকা আর সম্ভব নহে। সম্মেলনে অনেকেই সংগ্রামশীল মনোভাবসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা এই যুক্তিতে স্থগিত রাখা হয় যে, নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সর্বাগ্রে দূর করা আবশ্যক এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুবিচার পাওয়ার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

চিনি ও সিমেণ্ট

"শহরে চিনি নাই, সিমেণ্টও নাই। বিগত কয়েক মাস যাবৎ চিনি মালদহে আসে নাই। বর্তমান সঙ্কটের আপাত কারণ উহাই। কেহ কেহ বলেন, "দাও লাগা দে"র মত অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্যই এই চিনির 'শুভ সঙ্কট'। নভেম্বরের ৩।৪ তারিখে চিনির "আমদানীকারকরা" (importer) তাহাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (Tender) স্থানীয় জেলা সমাহর্তার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কাগজপত্র জমা দেন, কিন্তু কাহারও কল্যাণীয় কর স্পর্শের গুণে সেই চিনির Tender-গুলি মাসের ২৭।২৮ তারিখে ফাইলের স্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হয়। এই ধরণের Tender এর শম্বুকগতি সঙ্কটের কারণ কিনা কে জানে? ৩।৪ তারিখে জমা দেওয়া Tender ২৭।২৮ তারিখে তাহা ডেসপ্যাচ হইল এ রহস্যের কে উদ্‌ঘাটন করিবে? কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা অথবা গুরুতর অবহেলা ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা তদন্তে আবিষ্কার হওয়া দরকার। হয়ত' কয়েক দিনের মধ্যেই চিনি আসিবে কিন্তু এই ধরণের সঙ্কট কি অপরিহার্য্য ছিল?"

—উদয়ন (মালদহ)

মহানায়কের জন্মদিনে

"অন্ধকার ব্যথাহত ভারতের মাঝে মূর্ত্ত আলোর বন্যা নেতাজী। অধঃপতিত, স্বার্থান্বেষী, দীনতা ও হীনতায় ভরা জাতির প্রাণে মিলনের যে আবেগ দোদুল্যমান, তার হোতা ও বিকাশের পদপ্রদর্শক বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ নেতাজী। নেতাজী শুধুমাত্র গতানুগতিক 'নেতা' শব্দের ধারক নহেন। তিনি মহান্ বিপ্লবী নেতা। তিনি ব্যথাহত মানুষের মুক হৃদয়ের ভাষার ভাষ্যকার, মুকুটহীন রাজা; তিনি সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগধর্মীদের অন্যতম—ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আজ ইতিহাসের বিষয়, তাঁর গাঁথা আজ দিগন্তে প্রতিভাত—মানুষের মনের মাঝে প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় বিকশিত। নূতন করিয়া সে তথ্য প্রচারের নহে। সে তথ্য চিরনূতন, চির অম্লান, চির কীর্তিময়। যুগ যুগ ধরিয়া যৌবনের কল্লোলস্রোত সে জ্যোতিতে আপন পথে খুঁজিতে হইবে। আজ দেশ স্বাধীন, কিন্তু দেশের আকাশ-বাতাস নিপীড়িত মানুষের হাহাকার আর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত। ক্রোরুদ্যমান সেই জনতাকে কে শোনাইবে সান্ত্বনার অভয় বাণী—কে জানাইবে বরাভয়। তাই মানুষ তাকাইয়া আছে মুকুটহীন রাজার সেই শূন্য সিংহাসনের দিকে আর মাঝে মাঝে দিকচক্রবালে নিরীক্ষণ করিতেছে মনে আশার দ্যুতি লইয়া—'ঐ বুঝি মহামানব আসে'। কেহ বলিতে পারে না কবে আসিবে মহাজনমের সেই মহাপুণ্যময় লগ্ন। তবু মানুষ বুক বাঁধিয়া আছে দৃঢ় প্রত্যয়ে।

হে বিজয়ী বীর
নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
বন্ধনভয় কাটো সুকঠিন ঘাতে
তোমারই হউক জয়।"

—বীরভূমবার্ত্তা

কংগ্রেসী দাপট

"কংগ্রেস-সভাপতি কাছাড়ের লোককে ভয় দেখাইয়াছেন যে, কংগ্রেস ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান দেশে নাই যাহাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ হইয়া গত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। আজ যদি দেশের লোক ভবিষ্যৎ অন্ধকার জানিয়াও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চায় তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই থাকিবে না। অবস্থা যখন চরমে চলিয়া যায় তখন প্রত্যেক দেশই সেই বিপদের ঝুঁকি লইয়া থাকে। কাছাড়ের লোকের সামনে এখন আর একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট থাকিতেছে—আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই কথাই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার সহ্য করিবার একটা সীমা কাছাড়ের লোকও দিতে জানে।"

—জনশক্তি (কাছাড়)

জনস্বাস্থ্য রক্ষার নামে প্রহসন

"সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আসানসোল মহকুমা চিকিৎসক-সম্মেলনে সভাপতি ডাঃ হরিনারায়ণ মুখার্জীর ভাষণে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে এই মহকুমার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রহিয়াছে। শ্রী মুখার্জীর রিপোর্টই যে সঠিক, তাহা নহে বরং তদপেক্ষাও আরো ভয়াবহ বলা চলে। রিপোর্টে প্রকাশ, সমগ্র মহকুমায় ১০ লক্ষ লোকের জন্য মাত্র ৮৪ বেডযুক্ত ৪টি হাসপাতাল আছে অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের ইহা অপেক্ষা আর কোন উদাহরণ থাকিতে পারে না। মহকুমায় রেল ও কয়েকটি কারখানার পরিচালনায় কয়েকটি হাসপাতালও আছে, কিন্তু সেগুলি পরিচালন ব্যবস্থাও গলদপূর্ণ বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। আসানসোল মহকুমা রেলপ্রধান হইলেও রেল-কর্তৃপক্ষ আসানসোলে একটি আধুনিক সরঞ্জামাদি সহ কেন্দ্রীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ লইতেছেন না। বার্লিংটন ও ডি, এম, ও হাসপাতাল দুইটি রেল-কর্মচারীর সংখ্যানুপাতে যেমন নগণ্য, তেমনি এই হাসপাতালগুলিও দুর্নীতিতে ভরা। রেল-কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বার্থের প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের এই ঔদাসীন্য নিন্দনীয়। মহকুমার বহু শিল্প কারখানা ও কয়লাখনির শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র কার্য্যতঃ

নাই বলিলেই চলে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে যদি সমগ্র মহকুমার প্রতি কলকারখানা ও খনি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী-গুলিতে এবং অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে তদন্ত চালান হয়, তবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার নামে কিরূপ প্রহসন চলিতেছে তাহা প্রমাণিত হইবে। আসানসোলে একটি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার যে কথা ছিল, তাহাও স্থান নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্বে অনিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান এল, এম, হাসপাতালটিকেই বৃহৎ অট্টালিকায় আধুনিক সরঞ্জামাদি যুক্ত জেলা হাসপাতাল করা অত্যন্ত জরুরী কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা রাজ্য সরকারকে সমগ্র মহকুমার জনস্বাস্থ্যের এই নগ্নরূপটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে বলি। এবং আশা করি আসানসোল মেডিক্যাল এসোসিয়েশনে ৪টি হাসপাতাল সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তৎ[illegible]ক কার্য্যকরী করিতে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

—আসানসোল-হিতৈষী

কুইস্‌লিং

"বিলাতে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় ভারতবর্ষের জনগণ-মন-নায়ক, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে যেরূপ হীনভাবে উপস্থিত ও পরিচিত করা হইয়াছে, তাহা শুধু মাত্র নেতাজীকেই নয় সমস্ত ভারতবাসীকে অপমানিত করার প্রয়াস বলিয়াই আমরা মনে করি। পত্রিকাটিতে শ্রীনেহেরু ও অনীতা বসুর একখানি ছবিতে লাল বর্ডার দিয়া লেখা হইয়াছে—'নেহেরু সকাশে কুইস্‌লিঙ কন্যা। কুইস্‌লিঙ কথাটা হয়ত অনেকেরই জানা নাও থাকিতে পারে। রামায়ণের বিভীষণ রাবণ রাজার বিপক্ষে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করার পর হইতে যেমন যে কোন গৃহশত্রুকে বাঙলাতে ঘরের শত্রু বিভীষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি—গত মহাযুদ্ধ হইতে 'কুইস্‌লিঙ কথাটা' ও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গত মহাযুদ্ধে নরওয়ে ফ্যাসিষ্ট দালাল ডিডকুল (কুইস্‌লিঙ) জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া নিজের দেশকেই জার্ম্মাণীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। সেই হইতেই কুইস্‌লিঙ একটি বিশেষ অর্থ-বোধক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায়—নেতাজীকেও ঐ বিশেষ বিশেষণে আখ্যাত করার মত স্পর্দ্ধা বৃটিশ পত্রিকার আসে কোথা হইতে? নাকি বৃটিশ পত্রিকার এই সম্পাদক এখনও মনে করেন যে, ভারতবর্ষ ইংরেজদেরই দেশ, ভারতবাসী সেখানে ডোমিসাইল, অধিকার পাইয়াছে মাত্র? তাহাদের কি এখনও এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, নেতাজী ইংরেজঅধিকৃত ভারতের মুক্তির জন্য নয় ইংল্যাণ্ডের মাটী ভারতে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, আর নেতাজী ইংল্যাণ্ডের কাছে দাসখতাবদ্ধ একজন নাগরিক—যিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছেন? স্পর্দ্ধিত পররাজ্যলোভী [illegible] ছল-বল ও হীন চক্রান্ত দ্বারা তাহারা সে সমস্ত দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল 'সেই সব দেশের মুক্তিসংগ্রাম তাহাদের "ক্রুসেডের" চাইতে হাজার গুণ পবিত্র সংগ্রাম নয়? পত্রিকার মতের দিকে সাধারণতঃ দেশের মানুষের মতবাদ বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে সেই হিসাবে উক্ত পত্রিকা কি খাস ইংল্যাণ্ডের কথাই প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি? অন্ততঃ এই কথাটুকু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে নেতাজী, নেতাজীই, নেতাজীর তুলনা নেতাজী নিজেই। নিজেদের অন্তর্দাহে মহৎ অমহৎ বলিয়া যতই ঘেউ ঘেউ করা হোক না কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য এবার ঠিক ঠিকই অস্ত যায়।"

—গণরাজ (আগরতলা)।

আতংকগ্রস্ত কর্পোরেশন

"সম্প্রতি স্থানীয় কর্পোরেশন শ্রমিকদের সফল আন্দোলন এবং 'অভিমত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, অবিচার ও পার্টিবাজির সংবাদ প্রকাশ হওয়ার ফলে পৌরকর্ত্তারা এতটা বেসামাল হ'য়ে পড়েছেন যে, শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক নেতার সংগে কোনও পৌরকর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রাখা বন্ধ করার জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিছুদিন আগে 'অভিমতে'র সম্পাদক গোন্দলপাড়া জলকলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেখানকার একজন কর্ম্মচারীর সংগে সাক্ষাৎ করায় হেলথ অফিসারের গোপন সংবাদ (!) অনুসারে কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার জলকলের কেয়ারটেকার, পাম্প এটেণ্ডাণ্ট ও দারোয়ানকে অফিসে ডেকে নিয়ে ডেপুটি মেয়র এবং হেড ক্লার্ক তারক চন্দ্রের উপস্থিতিতে তাঁদের [illegible] সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ক'রতে থাকেন। সেই সময় নানাভাবে তাঁদের ভয় দেখান ও অপমানসূচক ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গোন্দলপাড়া জলকলের গেটে 'NO

Admission' কথাগুলো লেখা নেই এবং জলকলের সীমানার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্স। কাজেই ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তিদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ ক'রতে হ'লে তা জলকলের সীমানার মধ্যেই করার অধিকার কর্ম্মচারীদের রয়েছে। পৌর কর্ম্মচারীদের এই মৌলিক ও স্বাভাবিক অধিকার সংকুচিত করার জঘন্য অপচেষ্টা একমাত্র কম্যুনিষ্ট পৌরকর্ত্তাদের পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে পৌরকর্ত্তাদের মনে এক প্রচ্ছন্ন আতংক। কর্পোরেশনের দালাল 'বাবু-ইউনিয়নে'র বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও শ্রমিক-স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ইতিমধ্যেই বহু কর্ম্মচারী ওই ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করে শ্রমিক ইউনিয়নের এই শক্তিবৃদ্ধি এবং 'অভিমত' পত্রিকায় কর্পোরেশনের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংবাদ পরিক্রমায় আতংকগ্রস্ত হ'য়ে কর্পোরেশনের কম্যুনিষ্ট কর্ত্তারা কর্ম্মচারীদের ভীতি প্রদর্শন, অপমান এবং হয়রানির পথ অনুসরণ ক'রে কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ শাসন ও কর্ম্মপ্রবাহকে একটি লৌহ-যবনিকার অন্তরালে রাখার জন্য সচেষ্ট হ'য়েছেন। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবেই।"

—অভিমত (চন্দননগর)

পণ্ডিতজীর ভুল

"পণ্ডিতজী বাংলা জানেন না সংস্কৃত জানেন না। অনেক বাঙ্গালী ভক্ত আছেন পণ্ডিতজীকে সবজান্তা বলে সকলে মনে করে। পণ্ডিতজী বাংলা মুলুকে শিষ্য ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সময় সময় আসতেন। একদিন এক গ্রামে তাঁর শুভাগমন হয়েছে। এক শিষ্যের বৈঠকখানায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করছে, কয়েকটি শিষ্যও সেখানে সমবেত হয়েছে। যিনি পুস্তক পাঠ করছেন তিনি পড়িলেন—"রামো বচনমব্রবীৎ" উপস্থিত বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে এই বাক্যটির অর্থ কি—এই নিয়ে তর্ক উপস্থিত হলো। এমন সময় পণ্ডিতজী সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল ভক্ত-শিষ্য প্রণাম ক'রে পদধূলি নেওয়ার পর তর্কের বিষয়—"রামো বচনমব্রবীৎ" বাক্যের ব্যাখ্যার ভার পণ্ডিতজী নিলেন তিনি অর্থ করলেন—ইয়ে তো সিধা বাত্ হায়—রাম তো সবকেই জাননা। শিষ্যরা একবাক্যে বলে উঠলো—ভগবান রামচন্দ্র। পণ্ডিতজী—রাম বচনম্। যাঁহা রাম হায়, লছমন্ হায় উাঁহা সীতামায়ী কো রহনা চাহি। মব্রবী হায় তো সীতামায়ী হায়। তিন মূরত এক স্থান মে আবির্ভূৎ হায়। 'রাম বচন মব্রবী'—তো হলো এখনও বাকি এক অক্ষর 'ৎ' (খণ্ড ৎ) শিষ্যগণ গুরুদেব পণ্ডিতজীকে দেখাইল 'ৎ' ইয়া কোন্ দেওতা মহারাজ! অক্ষরটির চেহারা দেখিয়া পণ্ডিতজীর মালুম হলো এতো ঠিক হনুমানের লেজের মতো। তখন তিনি বলিলেন, দেখতা নেহি ইয়ো তো মহাবীর হনুমানজীকা লাঙ্গুল হায়, যাঁহা লঙ্গুল হায় উঁহা খুদ হনুমানজী আবির্ভূৎ হায়। আব ঠিক হোগিয়া রাম লছমন্ সীতামায়ী ঔর হনুমানজী এই চারো মূরত দেওতা। ই ব্যাখ্যা তো সিধা। আব সমঝা? সকলে সম্মতিসূচক মস্তক নাড়িলেন। কিন্তু দুর্ভাগা ভারতের গুরুস্থানে আবির্ভূত হ'য়ে যে লীলা আরম্ভ করেছেন লোক তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান সইতে আর না পেরে পশ্চিম বাংলায় বিধান মণ্ডলী গুরু মহারাজের নির্দ্দেশ না মেনে গুরুদ্রোহী অপরাধে অপরাধী হ'তেও ভয় করে নি। আমাদের পণ্ডিতজী যখন বিভিন্ন বসুর অমর্য্যাদাকর কথা বলিয়াছিলেন কানমলা নাকমলা খেয়ে। তাও শেষ হলো কোন কাহারো বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতজী যখন বেরুবাড়ী পাকিস্থানকে দান করিলেন, পরে যখন শুনিলেন বেরুবাড়ীবাসিগণ একবার বাস্তুহারা হ'য়ে আবার বাস্তুহারা হচ্ছেন। তখন বলেন এটা জানতাম না। কিন্তু ভুল তাঁর কত লোকের সর্ব্বনাশ করলো। তাঁর ভুলে পোঁ ধরিয়া যারা ভুল করিয়া বিলে ভোট দিল। সব যে বেকুব বনে গিয়ে কি বোকা বনে গেলেন পণ্ডিতজী তাদের সর্ব্বনাশ করিলেন। হয়তো তারা আগামী নির্ব্বাচনে ভোট পেতে খুব কষ্ট পাবেন। যদি বলেন কেউ তারা পণ্ডিতজীকে এতোদিনও চিনে নি। তারা গাধার মত ফিউচার প্রস্পেক্টের আশা করে ঠকেছে।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ

শোক-সংবাদ

প্রভাতকিরণ বসু

বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক প্রভাতকিরণ বসু গত ১০ই পৌষ পরলোক গমন করেছেন। কবি হিসেবেও প্রভাতকিরণ যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। শিশুজগতে ইনি 'কাকাবাবু' আখ্যায় সমধিক পরিচিত ছিলেন। অধুনালুপ্ত "ভাইবোন" পত্রিকার ইনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বাঙলাদেশের শিশুলোকে এই পত্রিকা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দৈনিক বসুমতীর শিশুবিভাগের সঙ্গেও একদা তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ছোটদের উপযোগী কয়েকটি উল্লেখনীয় গ্রন্থ তাঁর সৃজনী-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

মুরলীধর বসু

বিগত যুগের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্রিকা "কালিকলম"-এর সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্য ও সাময়িকপত্রসেবী মুরলীধর বসু গত ১০ই পৌষ ৬৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কল্লোল পত্রিকার সঙ্গেও ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করে ইনি যশ ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সম্পাদক হিসেবে বর্তমান কালের বহু শক্তিমান সাহিত্যিককে আপন প্রতিভা স্ফুরণের প্রথম সুযোগ দিয়ে সাহিত্য-জগতের ইনি প্রভূত উপকার সাধন করে গেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
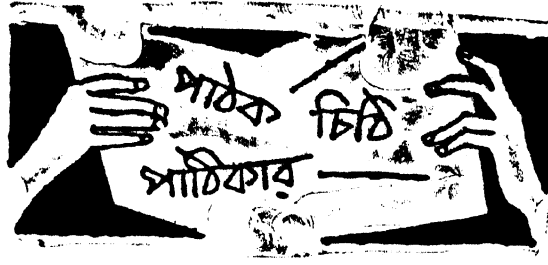
পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন ;—

আপনার মাসিক বসুমতীর আমি নিয়মিত পাঠিকা।—বহুদিন হতে আমাদের বাড়ীতে মাসিক বসুমতী রাখা হয়, এর উত্তরোত্তর যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেখে আসছি তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার; বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সুযোগ্য সম্পাদনার জন্ত আপনার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এ শুধু আমার আশা মাত্র নয় দৃঢ় বিশ্বাস।—গল্প. উপন্তাস যা বসুমতীতে প্রকাশিত হয়ে থাকে তার মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত উপভোগ্য, অন্তান্ত বিভাগগুলিও চমৎকার। প্রসঙ্গত: শ্রীমতী ভক্তি দেবীর "যদি জানতেম"—নামে ধারাবাহিক উপন্তাসখানির কথা বলা যায়, এই লেখিকার সহজ সরল রচনাশৈলী সত্যই আকর্ষণীয়, দু-এক বছর আগের এক পূজা সংখ্যায় খুব সম্ভব দৈনিক বসুমতীতে এঁর 'সন্ধিপূজা' নামে একটি গল্প পড়েছিলেম, চমৎকার লেগেছিল সেটি; বর্ত্তমান লেখাটিও ভাল লাগছে খুব, মাসে মাসে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকি আপনার 'মাসিক বসুমতী'র জন্ত। সুন্দর শোভন গেট্ আপ আপনার কাগজের আর এক বিশেষত্ব, হাতে নিলেই মন খুসী হয়ে ওঠে। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে নতুন উপন্তাস সুরু হল সেগুলিও ভাল লাগল, "সিক্ত যূথীর মালা" নামে এক নতুন লেখিকার উপন্তাস আরম্ভ হয়েছে দেখলাম, নূতন হলেও বড় মিষ্টি হাত লেখিকার। আশা করি আপনি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করে আপনার "মাসিক বসুমতীকে" সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাবেন দিনে দিনে। নমস্কার জানিবেন। ইতি—বিনীতা রেবা দেবী ২০।১ ডোভার লেন বালিগঞ্জ।

শ্রীমতী ভক্তি দেবী রচিত 'যদি জানতেম' নামক ধারাবাহিক উপন্তাসটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। সহজ, সরল, স্বাভাবিক ভঙ্গীতে গল্প এগিয়ে চলেছে। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটকের বিশেষত্বই এই যে, তিনি নতুন লেখক-লেখিকাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। মনে হয়, বর্ত্তমানে লেখিকাও বসুমতীর মারফৎ এবং এই একটি উপন্তাসেই সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। ইতি—

কৌশিক (দাস) ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় সমস্ত ভাষার বর্ণমালা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের ভাষা, নেপালী, ভুটানি, তিব্বতী প্রভৃতির বর্ণমালা, সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে স্বরবর্ণের চিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব সংযোগ প্রভৃতি অন্তান্ত ভাষায় সংস্কৃত হইতে লওয়া হইয়াছে। [illegible] বর্ণমালা ৫০-এর অধিক এবং [illegible] [illegible] ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি লইলে [illegible] টাইপ [illegible] মেসিন তৈয়ারী হয় না, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে টাইপ করিবার মেসিন তৈয়ারী হইতে পারে এবং ভাষাও সোজা হইয়া যাইবে, বর্ণমালা হইতে ২১টি অক্ষর লইয়া একটি বর্ণমালা গঠন করা যায়। স্বরবর্ণের চিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব সমস্তাই বর্জ্জন করা যায় স্বরবর্ণের ৬টি যেমন অ, আ, ই, উ, এ, ও, ও ব্যঞ্জনবর্ণের ২৩টি যথা ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, প্, ব্, ন্, ম্, য্, র্, ল্, ব্, শ্, স্, হ্, ড় ং ঃ ঁ লইয়া এই বর্ণমালা গঠন করিলে খুব সুবিধা হইবে। অক্ষরগুলি যে রকম সেই রকমই নিতে হইবে, স্বরবর্ণের চিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব থাকিবে না। য এর উচ্চারণ য় এবং ব এর উচ্চারণ ওয় করিতে হইবে। চন্দ্রবিন্দুকে উপরে না লিখিয়া সমপংক্তিতে লিখিতে হইবে। ং ঃ ঁ ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জন চিহ্ন দিতে হইবে। ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আল্‌গা করিতে হইলে তাহার নীচে একটি ফোঁটা দিতে হইবে। ব্যঞ্জনবর্ণের বর্গের ২য় ৪র্থ অক্ষর যোগ করিয়া ১ম অক্ষরের ও তৃতীয় অক্ষরের সঙ্গে হ্ যোগ করিলে ২য় ও ৪র্থ অক্ষরের উচ্চারণ হইবে। স্বরবর্ণ দীর্ঘ করিতে হইলে উহা আবার লিখিতে হইবে। ঃ উঠাইয়া দেওয়া যায় হ্ প্রয়োগ করিয়া কিন্তু সংস্কৃতে এর ব্যবহার খুবই হয় বলিয়া উহা রাখা প্রয়োজন। এই রকমভাবে ২১টি অক্ষরেই সমস্ত লেখা যাইবে যদিও চিহ্নাদি ও দ্বিত্ব, ত্রিত্ব বর্জ্জন করাতে টিকশ একটু লম্বা হইয়া পড়িবে যেমন পুর্ণিমা —পটউরনইমআ।

এই বর্ণমালা গ্রহণ করিলে টাইপের জন্ত মেসিন ব্যবহার করা যাইবে। কারণ ইংরেজীতে একটি টাইপরাইটারে ৪১টি চাবি থাকে, দেশীটা ইপরাইটারে ৩০টি চাবিতে বেশী কাজ হইয়া যাইবে। ২১টি অক্ষর ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত ১০টি সংখ্যা এবং গণিতের ও ভাষার ২১টি চিহ্ন ব্যবহার করিলে মোট ৩০টি চাবিই থাকিবে। এই বর্ণমালায় পুস্তক ছাপানোও চলিতে পারিবে। আশা করি, সকলেই এই বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্নতির সাহায্য করিবেন। ইতি—জনৈক পাঠক, ৫৮ নং ফিডার রোড, বেলঘরিয়া।

— গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই —

এস, মুখার্জী, ঘ্যাসিষ্ট্যান্ট ফোরম্যান, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভুসোল (Bhusaul) ই, কে,—বোম্বাই • • জে, সি, সাহা, ঘ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্ট, ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব • • কুরূপমের রাণীসাহেবা, কুরূপম হাউস, ১৫ গোপালপুরম ২য় ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ—৬ • • শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত, ক্যা- শ্রীএন, আর, দাশগুপ্ত, ইন্দকাম ট্যাক্স অফিস, গাজিয়াবাদ, [illegible] ইউ-পি • • শ্রীমতী নীলা ঘোষ, ১২ [illegible] লেন, কলকাতা-১২ • • [illegible]

ভোকানিয়া, অ্যা· জওহর লাইব্রেরী, পোঃ নালা, ভায়া মিহিজাম, (ভিা ষ্ট্রিক্ট এস, পি) ডুমকা * * চিত্তরঞ্জন ভবানী, ১৩ ভবানীপাড়া ষ্ট্রীট, পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া) পশ্চিমবঙ্গ * * Vses. Gosbibliotesia, Inoliteraturi, (01/62/8), Glavpochta, P/ja 964, MOSCOW (U. S. S. R.) * * শ্রীমতী বাসনা মজুমদার, অ্যা, শ্রীএস্, কে, মজুমদার পি-ডব্লিউ-আই (এস, ই, রেলওয়ে) পোঃ চাণ্ডিল, সিংভূম (বিহার) * * শ্রীমতী নির্মাল্য বি, বিশ্বাস, অ্যা, ডক্টর কে, পি, বিশ্বাস, পোঃ শ্রীনিকেতন, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ * * শ্রীমতী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় অ্যা· শ্রীএস, কে, চ্যাটার্জী, বি, এন, চ্যাটার্জী, য্যাণ্ড সন্স; পানবাজার, গৌহাটি, আসাম * * শ্রীমতী বাসন্তী কুণ্ডু, অ্যা· শ্রীশম্ভুনাথ কুণ্ডু, বামনগোলা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার পোঃ মহেশপুর (মালদহ) পশ্চিমবঙ্গ * * শ্রীমতী ভ্রমর বসু, পি, ১১৫ ব্লক 'এফ' নিউ আলিপুর, কলকাতা-৩৩ * * শ্রীমতী ডলি দত্ত, অ্যা· দত্তস মেডিক্যাল ষ্টোর্স, পোঃ ডিব্রুগড়, (আসাম)।

The sum of Rs. 15/- being subscription for the year 1367 B.S.—B. R. Ghose. Manager, Bhulanbararee Colliery, Dhanbad.

I shall be highly glad if you kindly enlist my name in the subscriber's list of Monthly Basumati magazine from Kartick '67 B.S.—Sm. Basanti Kundu, Maheshpur, Malda.

Please send me Masik Basumati from Kartick onwards. A subscription of Rs. 7·50 is sent herewith.—Mrs. Nirmalya Basini Biswas, P.O. Sriniketan, Birbhum.

I am sending Rs. 7·50 as a subscription for "Monthly Basumati" which will cover 6 months from Agrahayan to Baisakh.—Bejoy Kr. Bose, Darrang (Assam).

অগ্রহায়ণ হইতে মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—B. Roy-Choudhury, Namkum, Ranchi.

Annual subscription of Monthly Basumati for the year '61-'62—Sri A. B. Mahanty, Executive Engineer, Sundargarh Division (Orissa).

I have the pleasure to remit herewith Rs. 15/- being the subscription of Masik Basumati from Kartick 1367 B.S. to Aswin 1368 B.S.—Secy, District Library, Purulia.

I am sending Rs. 15/- towards the yearly subscription of Basumati for the year 1961.—Sm. Debi Banerjee, Jodhpur.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক করিয়া লইবেন। কার্ত্তিক মাস হইতে আমার হিসাব লইবেন।—বাসনা মজুমদার (সিংভূম) বিহার।

A sum of Rs. 15/- is deposited herewith as yearly subscription for Masik Basumati.—Sm. Ila Ghose, Bandra, Bombay.

Half-yearly subscription for Monthly Basumati is sent herewith.—Usha Rani Debi, Digboi, Assam.

'মাসিক বসুমতী'র জন্য ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকানগর, বাঁকুড়া।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত করিয়া নিয়মিত ভাবে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Ladhurka Palli Pathagar, Purulia.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—কমলা মিত্র, বোম্বাই-১৮।

(জলরঙ)
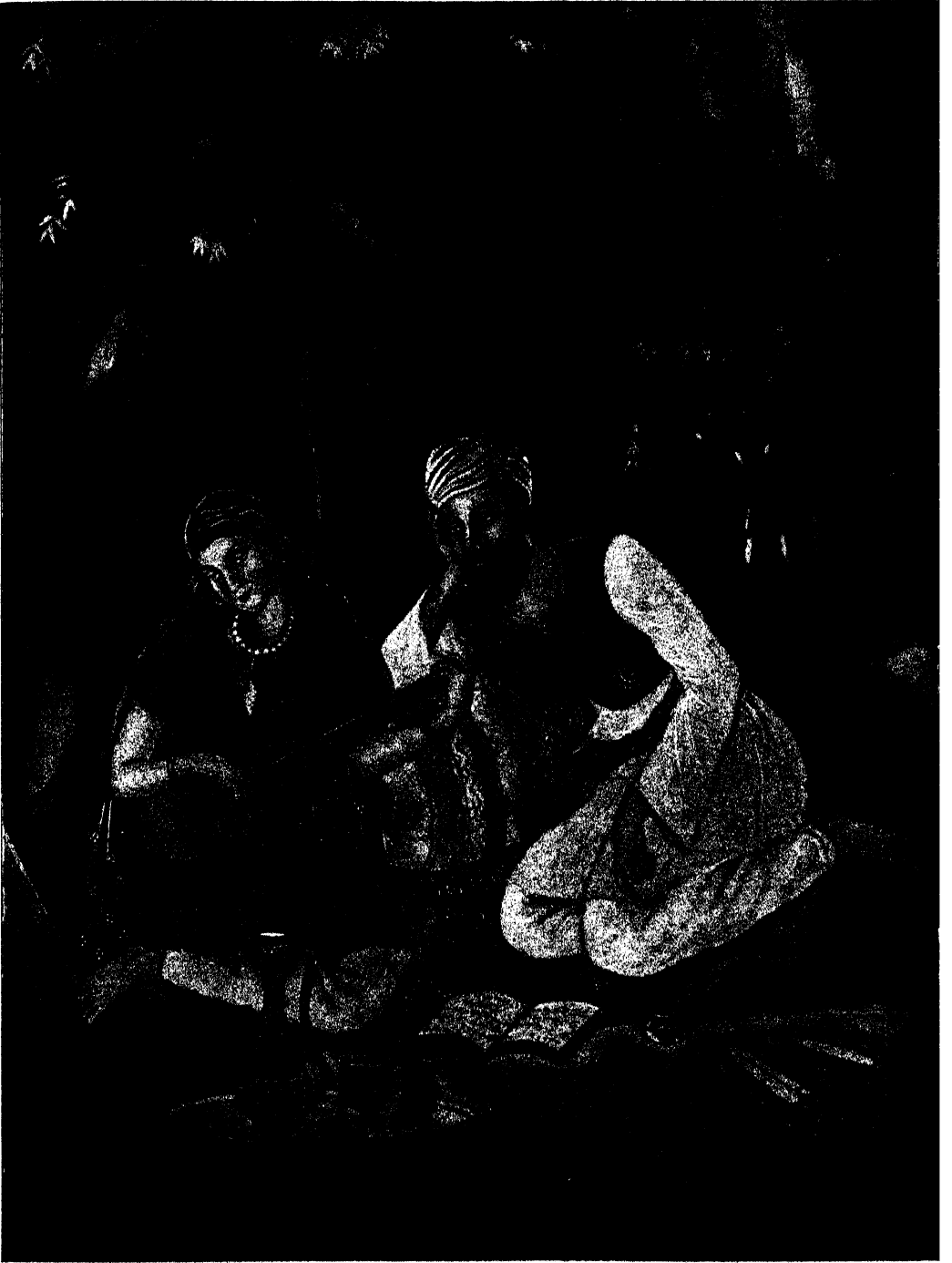
এই মধু রাতে

—সুবোধকুমার সেনগুপ্ত অঙ্কিত

৩৯শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৭ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

আজও মার ওখানে গিয়েছি। মা দেখেই বলছেন, "এসেছ মা, এস।" নবাসনের বৌকে বললেন, "তেলটি এনেছ? দাও ত বৌমা পিঠে মালিশ করে।" বৌ আমাকে দিতে বলায় মা বললেন, "আহা! ও এই সারাদিন খেটে খুটে, ছুটে আসছে, ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। (আমাকে) বস মা, বস। এই ওরা ভাস্করানন্দের কথা বলছিল। আমিও কাশীতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে অনেক মেয়েরা ছিল। তখন মন খুব খারাপ, ঠাকুরের দেহ রাখার পর। সেই বারই বৃন্দাবনে প্রথম গিয়েছিলুম। তা ভাস্করানন্দের ওখানে যখন গেলুম, দেখি—নির্ব্বিকার মহাপুরুষ উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন। আমরা যেতেই মেয়েদের সব বললেন, 'লজ্জা মৎ কর মায়ী, তোমরা সব জগদম্বা, সরম ক্যেয়া? এই ইন্দ্রিয়টা? এর জন্য? এ ত হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যেমন তেমন একটি।' আহা, কি নির্ব্বিকার মহাপুরুষ! শীত গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন।"

তেল মালিশ শেষ হবার পর মা বললেন—"চল, এখন ঠাকুরের বই একটু পড়বে। সরলাটি বোর্ডিংএ চলে গেছে মা, অন্য দিন সে পড়তো।" পড়তে পড়তে সাধনের কথা, দর্শনাদির কথা উঠল।

মা—"এই গোলাপ, যোগীন, এরা কত ধ্যান জপ করছে। [illegible] ভাল। পার্শ্ববর্তী [illegible] (রামবাবুর বৌ, নবাসনের বৌ প্রভৃতি ছিল) এতে মতি হবে।" দর্শনের কথা উঠলে, মা অনেক কথা চেপে গেলেন। সকলের সামনে সে সব বলবেন না বলে বোধ হয়।

নলিনী—"পিসিমা, লোকের কত ধ্যান জপ হয়, দর্শন স্পর্শন হয় শুনি, আমার কিছু হয় না কেন? তোমার সঙ্গে এত দিন যে রইলুম, কই আমার কি হল?"

মা,—"ওদের হবে না কেন? খুব হবে। ওদের কত ভক্তি বিশ্বাস! বিশ্বাস ভক্তি চাই, তবে হয়, তোদের কি তা আছে?"

নলিনী—"আচ্ছা পিসিমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্যামী? আচ্ছা, আমার মনে কি আছে তুমি বলতে পার?" মা একটু হাসলেন। নলিনী আবার শক্ত করে ধরলেন। তখন মা বললেন, "ওরা বলে ভক্তিতে।" তার পর বললেন, "আমি কি মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—(হাত জোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন) আমার 'আমিত্ব' যেন না আসে।"

মার ভাব দেখে হাসি এল, ধরা ছোঁয়া না দেওয়ার ভাণ, আর আমরা ত এক একটি অহঙ্কারে জবা। এ শিক্ষার মর্ম বুঝবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়?

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা [illegible]।

ব্রহ্ম-উপাসক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি
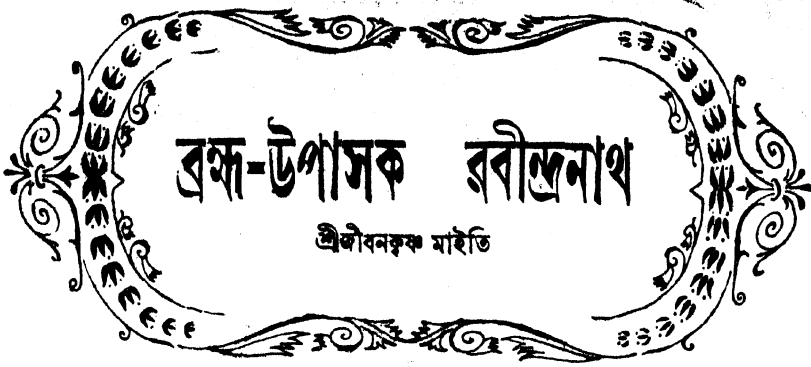
১৯২৭ সাল। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে কথা-শিল্পী "শরৎ-জয়ন্তী" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। একজন সতীর্থ কথাশিল্পীকে নিবেদন জানালেন—আমরা আপনাকে পরিষ্কার বুঝতে পারি, কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রহস্যময় লেখা (mysticism) পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি না, সে সম্বন্ধে আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন। কথা-শিল্পী প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'সত্যিইত তোমরা বুঝবে আমাদের, আমরা বুঝব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে। এত বড় বিরাট পুরুষ তিনি'।

এই কথাগুলি শুনে সেদিন সত্যিই মনে হয়েছিল—কবিগুরু শুধু বিরাট নন—বিরাট মহাসমুদ্র। তিনি কবি, তিনি লেখক, তিনি সাহিত্যিক, তিনি শিল্পী, তিনি সুর-শিল্পী, তিনি গায়ক, তিনি বাদক, তিনি ঐতিহাসিক, তিনি ঔপন্যাসিক, তিনি রাজনীতিবিদ, তিনি সমাজ-সেবী, তিনি সমাজ সংস্কারক, তিনি পথ-নির্দ্দেশক, তিনি ভবিষ্য-দ্রষ্টা, তিনি দার্শনিক।

"অলৌকিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্
অমন্দাশ্চাভি যোগশ্চ কারণং কাব্যসম্পদঃ।"

অলৌকিকী প্রতিভাবলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আলোক প্রাপ্ত, বেদ, বেদান্ত, (উপনিষদ) পুরাণ, তন্ত্র, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসার জটিল সমস্যাসমূহের সহজ এবং প্রাঞ্জল গতি-ভঙ্গিমা,—বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক, তুলসীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গৌরাঙ্গদেব ও মহাত্মা গান্ধীজীর প্রেমের বাণীর ভিত্তির উপর, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে কবিগুরুর সাহিত্য ও কাব্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কবিগুরুর অধিকাংশ লেখার মধ্যে শব্দগত অর্থের সঙ্গে আর একটি কি অর্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেই অর্থটি হচ্ছে, কোনও অজানা জিনিষকে জানবার ইচ্ছা; কোনও চিরন্তন সত্যকে জানবার বাসনা; কোনও অপরূপকে জানবার নির্দ্দেশ; ভূমাকে জানবার সংশয়; সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ (ব্রহ্ম)কে জানবার ব্যাকুলতা। সেজন্য কবিগুরুর লেখা পড়তে বসলে পাঠক ভুলে যায় সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা, সুখ-দুঃখের কথা, এমন কি, জগতে বেঁচে থাকবার লোভও মন থেকে চলে যায়—তাই কবিগুরু বলে উঠলেন—

"এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।"

তখন মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—কিসের লোভ? কার প্রতি লোভ? কেনই বা লোভ?—কবিগুরু গেয়ে উঠলেন—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।"

"—পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে—"

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

"যথা জীর্ণবাস করি পরিহার
করে নর নব বসন গ্রহণ,
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ
করে অন্য নব শরীর ধারণ।"

তখন সহজেই প্রশ্ন জাগে—দুই তিন বৎসরের বলিষ্ঠ শিশু, কুড়ি বাইশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক যখন দেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন কি এইটাই উপলব্ধি হবে—যে তাদের পুরাতন দেহ ত্যাগ করবার সময় হয়েছিল? তাই কবিগুরু গেয়ে উঠলেন—

'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।"

এই পুরাতন দেহত্যাগ ও নূতন দেহ ধারণের মধ্যে সেই চির পুরাতনের (ব্রহ্মের) এবং সেই চিরপুরাতনের মধ্যে সেই চিরনূতনের—সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমেরই ত খেলা চলছে।

আমরা দেহমধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব। আমাদের আত্মা ...

শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। আর মানুষ যখন দেহের সীমারেখা অতিক্রম করে—তখন সে ভূমা, সে শিব, সে সকল দুঃখ, সকল অভাবের উর্দ্ধে।

কবিগুরু ধ্বনিত হয়ে উঠলেন—এটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে মানুষকে তিনটী মানসিক চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত হতে হবে—

১। প্রথম মুক্তি হবে "ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না থেকে মুক্তি"।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে
মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর ভূর্‌
মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি!"

"কর্মেই মাত্র তোমার অধিকার আছে, ফল প্রাপ্তিতে তোমার একেবারেই অধিকার নাই, কর্ম্মের ফল পাইবার আশায় তুমি কর্ম করিবে না, তাই বলিয়া কর্মে যেন অনাসক্তি না আসে।"

তখন প্রশ্ন জাগে—সেটা কি কর্ম হবে? কবিগুরু উত্তর দেন—সেটা হবে—আত্মার জাগরণ।

২। দ্বিতীয় মুক্তি হবে—"অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্তি"।

সংসারে আবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব আমরা, আমাদের বিষয়-বৈভবের চিন্তা আছে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অসুখ-বিসুখের চিন্তা আছে, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর চিত্ত-চাঞ্চল্য আছে, সংসারে লবণ, তৈল, তণ্ডুল, বস্ত্র, ইন্ধনের চিন্তা আছে, আর আছে সবার উপরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতির মাদকতা! এই সবগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে।

তৃতীয় মুক্তি হবে—"প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা থেকে মুক্তি"।

জীবনে কোনও দ্বেষ-হিংসা-প্রতিযোগিতা-পরশ্রীকাতরতা-ঈর্ষা-কালিমা থাকিবেনা। জীবনে "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" হতে হবে।

তখন ঈপ্সিত জয়যাত্রার পাথেয় হবে—"দারিদ্র্যের কঠিন বল" "মৌনের স্তম্ভিত আবেগ," "নিষ্ঠার কঠোর শান্তি", "বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্য!" এই সমাহিত অবস্থায় দিব্য দৃষ্টিতে দেখা যাবে, সাগরের ঢেউ যেমন সাগরের জল থেকে উৎপত্তি, জলের উপরেই তার খেলা এবং জলেই তার লয় প্রাপ্তি, তেমনই কত বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, কত ব্রহ্মা, মহেশ্বর সেই ব্রহ্ম থেকে উত্থিত হয়ে, ব্রহ্মের উপরেই লীলা খেলা করে ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। এই মনোভাব নিয়েই চলেছে ভারত। এজন্য আজ পর্য্যন্ত কোনও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন তাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। কিন্তু আজকালকার দিনে কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে ও অনুকরণে এই মনোভাব ভারত থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করছে এবং শিক্ষাচঞ্চল যুবকদের কেহ কেহ—

"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।"

ঐ শিক্ষাচঞ্চল যুবকদের অনুসরণ করে মাটির সঙ্গে মানুষের যে [illegible] সম্বন্ধ তা ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন, আজ পর্য্যন্ত যে মনোভাব [illegible]

তাই কবিগুরু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—'দারিদ্র্যের যে কঠিন বল', 'মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ', 'নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি' এবং 'বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য' তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আমি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান। অবিরাম জনতার জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। এই দানবীয় ফ্রীডম কোনও কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না। আমাদের ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীগণের নগ্ন চরণ ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে। আর আমরা বর্ষে বর্ষে—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমনভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা,
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥

গান ধরিব। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে,—পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

তিনি কহিবেন,—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম। হাঁ, তিনি আছেন এবং তাঁহাকে পাওয়া গেল—এই কথাটাকে স্বীকার করাকেই বলে ওঁ। যেখানে আমাদের আত্মা 'হাঁ', কে—পায় সেইখানে সে বলে ওঁ।"

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্য ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

'হে অমৃতের পুত্রগণ। যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো, আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।'

তিনি কহিবেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

এই বিরাটেই আমাদের সুখ। ইহার অল্পে আমাদের সুখ নাই। [illegible]

অমৃতত্ব নাই—যাহাতে স্থায়ী শান্তি নাই, সুখ নাই, তা নিয়ে কি হবে ?

"যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম ।"

তিনি কহিবেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কদাচন ।"

'মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পেয়ে ফিরে আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না ।'

'তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে তিনি সমস্ত প্রকাশ করছেন, আর এক দিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।'

"সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎ সকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।"

তিনি—'তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ।।'

'তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।'

আর মানুষের সর্ব প্রধান কর্ত্তব্যের আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মনি সমর্পয়েৎ"
তাই উপনিষদ বলেন—
"যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো মা বিজুগুপ্‌সতে ।।

'যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব ভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।'

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—
'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য
ধীরাযুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ।'

'যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'

ব্রহ্মের চরণে সহজাত আত্মনিবেদনে কবি-গুরুর সাহিত্য ও কাব্য-সম্পদ সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। এবার এ প্রবন্ধে তা নিবেদন করবার চেষ্টা করব।

ফুল ফোটে। সাগরের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে আমিই এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন—

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে ।
তেনৈব জাতানি জীবন্তি
তৎ সংপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি ।"

সেই আনন্দেই সকলের জন্ম, সেই আনন্দেই সকলের লীলা খেলা, সেই আনন্দেই সকলের লয়প্রাপ্তি। আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। অশোক কাননে জনক-নন্দিনী সীতা, হনুমানের হস্তে প্রেরিত শ্রীরামচন্দ্রের আংটি দেখে উপলব্ধি করেছিলেন, পরম ব্রহ্ম অবতার শ্রীরামচন্দ্র আসছেন তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে, তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যে। সেই জন্যেই ত ফুল আমাদের এত ভাল লাগে। এমন কেউ হৃদয়হীন নেই যে ফুলকে ভালবাসে না। কিন্তু ঐ ফুল যে বাণীটী নিয়ে আসে, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, হৃদয় স্পর্শ করে না। সেই ফুল আমাদের বলে,—"ওরে, তোর সোনার সংসার তোর জীবনের সব শেষ নয়, এর বাইরে আছে তোর মুক্তি। সেইখানে তোর প্রেমের সাফল্য, তোর জীবনের চরিতার্থতা।"

"তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিয়া পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়াবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।"

সূচীভেদ্য অন্ধকার। দ্যুলোক, ভূলোক মসীলিপ্ত হয়ে গিয়েছে কাল জমাট মেঘে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত নিয়ে প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঘর, বাড়ী, গাছ, পালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, পশু পাখী মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারদের নিয়ে একটি ঘরে আলো জ্বেলে বসেছ—আর করুণ ব্যাকুলতা জানাচ্ছ—"কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া"; হে ঠাকুর, হে জগন্নাথ, হে মধুসূদন, হে বিপদভঞ্জন, বন্ধ কর তোমার প্রলয়, বন্ধ কর তোমার এই খেলা, বন্ধ কর তোমার এই লীলা। তোমাকে স্মরণ না করে আমার এই দুঃখের রজনী, ঝড়ের রজনী কাটবে কেমন করে? ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত বন্ধ হয়ে গেল। ভোর হয়ে এল, উষাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর তোমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ভোরের আলোতে তুমি খুলে দিলে তোমার দরজা। একরাশ আলো ঢুকে গেল তোমার ঘরে। সেই আলোতে তুমি বাইরে বেরিয়ে এসে হিসাব করতে বসে গেলে তোমার ঘর-বাড়ীর কি ক্ষতি হয়েছে, গাছপালা কি ভেঙ্গেছে, পশু-পাখী কি মরেছে, বন্ধু-বান্ধবদের কি ক্ষতি হয়েছে ইত্যাকার নানা প্রশ্নাদি, নানা সমস্যা তোমার মনের মধ্যে এসে তোমার মনে যে ব্যাকুলতা জেগে উঠেছিল তা তোমার মন থেকে ধুয়ে, মুছে, পুছে পরিষ্কার হয়ে চলে গেল। তুমি সেই ব্যাকুলতাকে স্থায়ী করতে পারলে না, অনন্ত করতে পারলে না, তাকে তুমি eternalise করতে পারলে না। তা দেখে ঠাকুর (ব্রহ্ম) দূরে সরে দাঁড়ালেন। (আগামী বারে সমাপ্য)

"I believe in the incomprehensibility of God."

—*Honore de Balzac.*

দেশের মুক্তি-সাধনায় নজরুল

আজহারউদ্দীন খান্

ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তি সাহিত্যের সোনার-কাঠির স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কারণ সাহিত্য জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী। সাহিত্য-শিল্পকে বাহন করে স্বাধীনতার মন্ত্র দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। পরাধীন ভারতে শৃঙ্খল মোচনের জন্যে বাঙালী যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'সবার আগে লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে'—তার একমাত্র প্রেরণা সে তার জাতীয় সাহিত্য থেকেই পেয়েছিল। চাষী-মজদুর আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন, নারী-প্রগতি, কুটীরশিল্প উজ্জীবন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, অহিংস অসহযোগ—সবকিছুরই আদি প্রেরণা দিয়েছে সাহিত্য, তবেই তা মূর্ত হতে পেরেছে বাস্তব আন্দোলনে। দুঃখের বিষয়, কার্যকে কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যের পশ্চাতে সাহিত্যের এই প্রাণ-সঞ্চারী দান যে কত বড়, তা কেউ মেপে দেখেননি। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়ন করছেন এবং যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেছেন, আত্মত্যাগী লাঞ্ছিতদের পুরস্কৃত করেছেন, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য এ সংগ্রামে কি করেছে, তার অবদান যে কত বড়, শাসন-পীড়িত কণ্ঠেও বাংলা-সাহিত্য জাতীয়জীবনে যে কি উদ্দীপনা উৎসাহের সঞ্চার করেছে, তা কেউ ভেবে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতার ইতিহাস যদি কতকগুলো ঘটনার সংকলন হয়, সে ইতিহাস জাতির জীবনের ইতিহাস হবে না, হবে কতকগুলো শুকনো ঘটনার ইতিবৃত্ত মাত্র। সাহিত্য যেমন আন্দোলনকে জাগিয়েছে, তেমনি আন্দোলনও সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে—বাইরে যখন কর্মের সক্রিয় সংগ্রাম চলেছে, ভেতরে তখন সাহিত্যিকের সৃজনী মনও তারি সঙ্গে পাল্লা রেখে নানা পথে নিজেকে প্রকাশ করে গেছে। কাজেই ইতিহাস লেখা হোক উভয়কে জড়িয়ে—কাউকে ছেড়ে নয়।

আজকের আলোচনায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নজরুলের সাহিত্য কি সাহায্য করেছে সেটুকুই বলা মুখ্য উদ্দেশ্য—সমগ্র ঐতিহাসিক তদন্ত নয়। তবু বক্তব্যের পটভূমির জন্যে আগে থেকে কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে।

অপরের মতের সঙ্গে কতখানি মিলবে জানি না, তবে আমার মনে হয়, স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত স্বদেশী-আন্দোলনের সময় থেকেই; শুধু সূত্রপাতই নয়, সূত্রবন্ধনও। তবে কি গেল শতাব্দীতে শৃঙ্খলমোচনের কোন চেষ্টাই হয়নি? জবাবে 'কিন্তু' দিয়ে বলতে চাই,—হয়েছে। 'কিন্তু' রেখে বলার কারণ হোল যাঁরা সে আন্দোলনের [illegible] হয়েছেন, তাঁরা হয় মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা জমিদার, [illegible] সৌভাগ্যবান হবেন তাঁরা—কাজেই তাকে বুর্জোয়াধর্মী আন্দোলন বলা যেতে পারে। বিদেশী শাসনের আওতায়, বিদেশী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের আকর্ষণে এসে এই শ্রেণী ডেরা বাঁধিতে শুরু করেছে শিল্পাঞ্চলে; ফলে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে দেশের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তাঁদের করার অর্থ ছিল যে, তাঁরাই হচ্ছেন শাসক ও শাসিতের মধ্যে হাইফেনের মত। সেজন্যে স্বাভাবিক কারণে মধ্যবিত্তের সংরক্ষিত স্বার্থ শ্রেণীজীবনের আদর্শকে আঁকড়িয়ে গড়ে ওঠার জন্যে তার সাহিত্যও হয়েছে আকাশ-চারী, বাস্তব-বিমুখ, গণতান্ত্রিক প্রেরণায় ও চিন্তায় দুর্বল। এই প্রতিনিধিদের প্রতিবাদের মধ্যেও রয়েছে নানারকম অসঙ্গতি। যাঁরা জমিদারি-প্রধান ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তাঁরা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে কিংবা বিক্ষুব্ধ কৃষক-শ্রেণীর সংগ্রামে যোগদান করেননি। সে শতকে বড় বড় কয়েকটি সংগ্রাম—যেমন সিপাহীবিদ্রোহ, কোল-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল—তাতে শিক্ষিত বাঙালীর কোন ভূমিকা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক আলোয় যে ইয়ংবেঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা মদের গেলাসে স্বাধীনতা চেয়েছেন, অবশ্য সে স্বাধীনতার মানে ইংরেজ তাড়িয়ে দেওয়া নয়, আর্থিক দিক থেকে মুক্তি নয়, বরং 'ভূবি পেলে খুসী হব, ঘুঁষি খেলে বাঁচব না' গোছের। এজন্যে দেখি জনগণের সংহত জাগরণের কোন নজীর গেল শতাব্দীর ইতিহাসে নেই—স্থানিক ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

আগেই বলেছি, আমাদের তথাকথিত স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা মাথা ঘামিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই বার বার দেখা দিয়েছে দ্বিধা, কুণ্ঠা, সাহসের শোচনীয় দৈন্য। কাজেই বাংলা-সাহিত্য যা প্রধানতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের সাহিত্য—তাঁদের মানস-লোকেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের ছাপ দেখা দেবে, তাতে বিস্মিত হবার কী আছে—বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের দৈন্যই যে তার কারণ। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ করা সাহিত্যিকদের সাহসে কুলোয় নি—মাঝে মাঝে একটু হুমকি দিলেও, পরে এমনভাবে চুপসে গেছেন যে, ইংরেজ-শাসনকে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে তাঁবেদার হতে লজ্জা পাননি। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন কোন কোন লেখক, যেমন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকেই শাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে, ভূমিহীন চাষী-মজুর, বিত্তহীন সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, আধ-জনতার মধ্যে অত্যাচার প্রতিরোধ করার দৃঢ়তা দেখা [illegible]। [illegible] সে যুগে ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর

বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি আরো অনেক সাহিত্যরথী। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যেটুকু দাঁড়িয়েছেন, সেটুকু নির্যাতিত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নয়, বরং আন্দোলনকে মাঝে মাঝে ভর্ৎসিত করেছেন। তাঁদের যে জাতীয়তাবোধ ছিল তা নিশ্চয় ইংরেজের বিপক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, এ স্বপ্নও তাঁরা দেখেননি। ইংরেজী-জানা বাঙালীরা ইংরেজের সঙ্গে মিতালী করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' স্পষ্টই বলে ফেললেন, "ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।···ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে···ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুজন।" ইত্যাদি। কৃষকদের সম্বন্ধে কিংবা চলতি ঘটনার উপর শাসকের বিরূপ মন্তব্য একটু-আধটুও লিখলেও তাঁর মনোভাব ইউরোপীয় মিল, বেন্থাম, রুশো, কোঁৎ প্রমুখদের রচনাবলীর অনুবাদ মাত্র। তিনি কতকগুলো উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের চেহারাকে এমন বিকৃত করে দেখেছেন যে, তাঁর কাছে বর্ণহিন্দুর সংহতি ও পরিপুষ্টিই প্রকৃত দেশাত্মবোধের পরিচয়। তবে ইয়ংবেঙ্গলের যথেচ্ছাচারে যখন দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার ভাব দেখানো হচ্ছে, ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষার বাইরে যে আর কিছু ভাল জিনিষ থাকতে পারে, তা তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। সে সময় বঙ্কিম জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছিলেন, তাতে ত্রুটি যাই থাক—দেশের বিমূঢ় দৃষ্টিকে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে সংস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনতার ছোটখাট মাল-মশলা নিয়ে সাহিত্য রচনা খুব বেশী হয়নি সেদিন; টডের রাজপুত-কাহিনী, হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রাম, মোগল বা পাঠান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাটের দেশাত্মবোধক হিন্দু সামন্তশক্তির প্রতিরোধ-কাহিনী সত্য-কল্পনায় মিশিয়ে উদ্দীপিত ভাষায় বলা হয়েছে প্রচুর—আদর্শবাদী দেশপ্রেম সেদিন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি, বরং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক দূরত্বের ভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল।

গেল শতকের সৃষ্টির মধ্যে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকনা কেন, সেই সৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা সঞ্জীবিত হয়েছি, তারওপর আমাদের আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা ঐসব সত্যে-কল্পনায় মিশিয়ে কাহিনীর দ্বারাই শিক্ষালাভ করেছি। তাছাড়া গেল শতকের সাহিত্য থেকে আরো একটি লাভ হল যে, আমাদের দেশপ্রেম গোড়া থেকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে তৈরী হয়েছে, প্রাদেশিকতা উকি মারেনি।

পরে ইংরেজ-শাসনের আর্থিক শোষণ ক্রমশঃ নব্যবাবুদের পকেট ধরে টান দিল, তখন তাঁরা সুপ্তসিংহের মত জেগে উঠলেন, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আদিগন্ত-ব্যাপী ডাক দিলেন। তখন কিন্তু স্বদেশীযুগ সুরু হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন জেগে উঠল, তাকেই বলা হয় স্বদেশী-আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অগণ্য সহযোগী বাঙলার জনতাকে সংগ্রামী করে তুললেন—এই আন্দোলন থেকেই আদর্শবাদী দেশপ্রেম ক্রমশঃ বাস্তবাদী হয়ে উঠতে সুরু করল। দেশের সামান্যতম ঘটনাকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যিক ব্রত হয়ে উঠল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর আত্মদানের কাহিনী গানে কবিতায় বাঙলার পল্লীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল—শাসকের অত্যাচারের কাহিনী প্রতি লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া হল। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এ ছাড়া বাঙলার যা নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি তা উদ্ধার করে বাঙালীকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। গেলযুগের সাহিত্যের মধ্যে যে দেশপ্রেম ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোকে একত্র করে সেদিনের আন্দোলনের উপযোগী মূল্যায়ন নির্দ্ধারণ করা হলো। যে 'বন্দেমাতরম' বঙ্কিম লিখেছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে, সেই গানকেই ইংরেজ বিতাড়নের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হল। আমরা মধু-বঙ্কিম, হেম-নবীনকে জাতীয়-কবি হিসেবে বরণ করলাম এবং এই আন্দোলনের উত্তাপেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কামিনীকুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদের গান ও কবিতা, অক্ষয় মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীনেশ সেন, নিখিল রায়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। একদিন এসব সাহিত্য জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডে শক্তি সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতাকে নব নব প্রবণতার পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছে এবং এই সাহিত্যের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে বাঙলা থেকে আন্দোলন উৎসারিত হয়ে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত জনতাকে সংগ্রামের পথে চালিত করেছেন রাজনৈতিক নেতারা। আন্দোলনের পটভূমিকায় সাহিত্য না থাকলে বাঙলার ঘুমন্ত শৌর্যকে ভাঙিয়ে নেতারা আন্দোলন আনতে সক্ষম হতেন কি না সন্দেহ!

৩

স্বদেশী-আন্দোলনের পর এল অসহযোগ-আন্দোলন—একটা প্রবল আলোড়নে দেশ টলমল করছে। পরাধীনতার আগুন মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেছে এক দাবদাহের। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণ তখন সক্রিয় সংগ্রামে পা দিতে চলেছেন। বাঙালী জীবনের এই একটা সুতীব্র রাজনৈতিক প্রকাশ আবার বাঙালী স্রষ্টাকে ব্যাকুল করেছে। এই আন্দোলনের সাহিত্য-সারথ্য গ্রহণ করলেন নজরুল ইসলাম— নতুন আশার বাণী নিয়ে করুণ গন্ধঢালা চেতনার পরিবর্তে শোনালেন অগ্নিবীণার ঝঙ্কার—

: আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি,
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি তবে তাও!
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও!
··· ··· ···
মম তূরীয় লোকের তির্যক-গতি তূর্য-গাজন বাজায়!
মম বিষ-নিঃশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায়!

(ধূমকেতু : অগ্নি-বীণা)

সাম্রাজ্যবাদীর কূট চক্রান্তকে ফাঁসিয়ে দিতে দেশকে তিনি আহ্বান করলেন—এক মহান্ কর্তব্যের সম্মুখীন হতে—

: উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
(চল্ চল্ চল্ : সন্ধ্যা)

আমাদের সাহিত্য প্রাণবান্ হয়ে উঠল নতুন ভাবে, নতুন ছন্দে, নতুন ভাষায়। অন্যায়, কুসংস্কার ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্রবীণা বজ্র-ঝঙ্কারে উৎসারিত হল তীব্র ক্ষোভ, পার্লামেন্টারি স্বরাজের ও আপোষকামী দেশীয় রাজনীতির মুখোস ছিঁড়ে ফেললেন কবি।

মানুষের জীবনের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা থেকেই তিনি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। তিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন মানুষের জীবনকে আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি কোনদিন। জীবনের মর্যাদাকে যা কিছু খর্ব করতে চেয়েছে, তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেননি, তেমনি সহ্যও করতে পারেননি সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রবৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতাকে। অত্যাচার অবিচার যেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেখানেই উপনীত হয়েছে তাঁর বজ্রগর্জন। মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম পার্থক্যের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, আর এই পার্থক্যকে যে ব্যবস্থা ও নীতি ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে, সেই সমাজের বিরুদ্ধেই তিনি ধ্বনিত করে তুলেছেন বিদ্রোহের সুর। তাঁর বিদ্রোহের মূলমন্ত্র দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা, রক্ষণশীলতা নয়, অগ্রগতি, ভীরুতা নয়, সাহস। যে জীবন স্থবির নয়, সব সময় চলমান, সে জীবনের জয়গানই তিনি গেয়েছেন। রমা রঁল্যা তাঁর নিজস্ব সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলেছিলেন,—"My activities have always and in every case been dynamic. I have always written for those who are on the move. Life will be nothing to me if it is not movement—straight, ahead, of course!"

নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টিও সেই গতিময় জীবনের স্বীকৃতি—

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
গাহি তাহাদেরি গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।...
(আমি গাই তারি গান : সন্ধ্যা)

তিনি কবিতায় গানে বাঙলার তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তিকে বার বার আহ্বান করেছেন যারা বন্ধন মোচনের জন্যে আত্মপ্রকাশের দ্বারা মরণের মুখে অকুতোভয়ে ছুটে যাবে—

: অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্!
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারি স্তব,
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক দল,
জোর কদম, চলরে চল্ ॥
(অগ্র-পথিক : জিঞ্জীর)

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন, জাতীয়তাবোধের চেতনা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও বিক্ষোভের বহুমুখী চিত্রকে জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে পাই প্রাণধর্মের উচ্ছ্বলতা। দেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে নিজের যোগ রেখেছিলেন বলেই অসহযোগ-আন্দোলনে দেশের শক্তিকে আবার নতুনভাবে জাগ্রত করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে 'ধূমকেতু' কাগজ বের করেন—অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে বজ্রবিষাণ বেজে উঠল। সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করার জন্যে তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। তাঁর একাধিক বই রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হ'ল। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সংগ্রামী জনতার মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেননি। কোন বিশেষ রাজনীতিক মতামতের অন্ধ দাসত্ব তিনি করেননি। তিনি প্রত্যেক দলের হয়েই কাজ করেছেন। মনে হতে পারে তাঁর কোন নির্দিষ্ট রাজনীতিক অভিমত নেই, কিন্তু সে-ধারণা অমূলক এইজন্যে যে, কোন কবি বা সাহিত্যিক নির্দিষ্ট বাঁধা বুলি আওড়িয়ে সমস্ত বিষয়কে একই ছকে ফেলে দিতে পারেন না। যাদের নিয়ে রাজনীতিক দলের কাজ, সেই মেহনতী মানুষকে কবি ভালবেসেছেন, নাইবা তিনি ফরমূলা-মাফিক পথে চললেন। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির যখন সংপৃক্ত ঘটে তখন মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়বৃত্তির চর্চা হয় বেশী। আবার বিশেষ করে নজরুলের মত কবি—যিনি সবকিছুতেই উচ্চকণ্ঠ ও বিচিত্রভাবী প্রগলভ। যখন যেটিকে ধরেছেন, যেমন শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত, গজল গান, সাম্যবাদ প্রভৃতি, তাকেই নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। নজরুল তখনকার রাজনীতিতে এনেছিলেন উন্মাদনা অস্থির চঞ্চল মানসিকতা, স্থিতিহীন উচ্ছ্বাস, জাতির উদ্দীপ্ত আবেগ যা চিন্তার প্রতিবন্ধক হলেও চিন্তার পরে যে কাজ না হলে চিন্তা বন্ধ্যা হয় সেই কাজের পক্ষে কিন্তু অত্যাবশ্যক। মতাদর্শের চেয়ে তাঁর কাছে কাজ করার মূল্য ছিল সর্বোচ্চে। কাজের বেলায় নিজস্ব মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কাজে ফাঁকি দেয়ার যে মনোবৃত্তি আমাদের তথাকথিত নেতাদের রয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত। গোটা বাঙলাদেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি উন্মাদনাময়ী কবিতার সাহায্যে জনগণের জড়তা ভেঙেছেন। বাঙলার যুব ও ছাত্র-সমাজ কবির এমনই অন্ধভক্ত ছিল যে, কোথাও কোনো সভা-সমিতিতে কবি গান গাইবেন শুনলেই হাজারে হাজারে দল বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হত। কবিকে কাঁধে করে নিয়ে নগর পরিভ্রমণ করত। অবস্থার গুরুত্ব দেখে শাসকবর্গ পুলিশ লেলিয়ে কিংবা ১৪৪ ধারা জারি করে সভা মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিত। আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র তিনি তৈরী করে দিতেন আর দেশের নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাধীনতার পথে চালিত করতেন। সচেতন পন্থা নির্ধারণ করার মত মানসিক অবসর তাঁর ছিল না। বায়রন সম্পর্কে গেটে বলেছেন—চিন্তা করতে গেলেই সে বিভ্রান্ত শিশু হয়ে পড়ে। নজরুলের অবস্থাও হয়েছে তাই। মেপে মেপে ওজন করা চিন্তার ধার দিয়ে তিনি পথ চলেন নি।

গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলন আমাদের চেতনাকে বিপ্লবমুখী করেছিল সন্দেহ নেই। যেমন মেদিনীপুরের চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করল, মোপলাদের বিদ্রোহ, শিখচাষীদের বিদ্রোহ কিন্তু যেমনি চৌরীচৌরার রক্তপাত দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই দ্বিধা দুর্বল জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অবিশ্বাস ও বিক্ষোভ নজরুলের কাব্যে সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজীর আন্দোলনের বৈপ্লবিক চেতনা কবিকে মুগ্ধ করেছিল আবার সেই চেতনা যখন শ্রেণী-নেতৃত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল তখন তাকে কবি ভৎর্সনা করেছেন—

: সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!
(সব্যসাচী : ফণি-মনসা)

কংগ্রেস সেদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একছত্র অধিপতি ছিল অথচ তার কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এমনই ত্রুটি ছিল যে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে দেখা দিল অস্থির মানসিক ভাবাবেগ—সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগে-পরে অত্যাচারী কয়েকজন সাহেব ও তাদের সাহায্যকারী এদেশী মানুষ নিহত হল টেরোরিষ্টদের হাতে; এতে শাসকশ্রেণী ভীত হল কিন্তু জনতার মধ্যে এ আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে তারা শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়ই করেছে বেশী। রাজনৈতিক পরাজয়ে অর্থাৎ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের ব্যর্থতায় ভাবছিলাম গণজাগরণের কথা। কিন্তু সে-সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা বা সঙ্কল্প ছিল না। ফলে এক একটি মতবাদ অনুযায়ী এক একটি পথ গজিয়ে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে 'স্বরাজ্য' দল গড়লেন। সেদিন নজরুল ছিলেন অবিশ্বাসী রকমের জনপ্রিয় কবি। দেশবন্ধু তাঁকে দলে নিয়ে এলেন। কিন্তু ফাঁকা ভেজাল পলিটিক্সের বুলি নজরুলের মনঃপূত হল না—দেশের গরীব দীন-দুঃখীদের অভাবমোচন কিংবা তাদের সমতলে নেমে আন্দোলনকে তাদের মধ্যে বইয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না। দেশবন্ধুর মহৎ উদার প্রাণ থাকতে পারে, গরীবদের জন্যে তিনি ভাবতেন কিন্তু তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দেশের দীন-দুঃখীদের সঙ্গে মাখামাখি পছন্দ করতেন না—

: হায় গণনেতা ভোটের ভিখারী, নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে!

ঠিক এই সময়েই গৌরবময় রুশবিপ্লবের চিন্তাধারার অনুপ্রেরণায় ভারতের নতুন পরিস্থিতিকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করার কথা মুষ্টিমেয় নিঃসঙ্গ বুদ্ধিজীবীরা তখন ভাবতে সুরু করেছেন। তাঁদের সঙ্গে নজরুল হাত মেলালেন—দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে এই আত্মনিয়োগ তাঁর কাব্যে খুবই সুস্পষ্ট। শ্রমিক কৃষকদের সম্বন্ধে কবিতাগুলি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক আন্দোলনে কবির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। অর্থাভাবে পার্টির নেতৃবৃন্দ যখন অনাহারে দিন যাপন করছেন, মীরাটে ষড়যন্ত্র মামলা চলছে, তখন কবি বিভিন্ন গানের জলসার আয়োজন করে পার্টি-তহবিলে টাকা তুলে দিয়েছেন। আজ পার্টি সর্বহারা জনগণের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মূলে রয়েছে নজরুলের কবিতা। বাঙলার জাতীয় আন্দোলনকে তিনি সমাজের নীচুতলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। শ্রমজীবি মানুষের রক্ত ও ঘামের মূল্যে বাঁচবার জন্মগত অধিকারকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতেই স্বাধীনতা আন্দোলন মেহনতী মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জীবনের কঠিন মৃত্তিকে থেকে শিকড় তুলে নিয়ে নিস্ফল বিক্ষোভে কাব্যকে শুকিয়ে মারার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেননি। তাঁর সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে এইখানেই পার্থক্য, গুরুতর পার্থক্য। তাঁর কাব্য-সাধনাকে তিনি অনায়াসেই বিপ্লবী রাজনীতির সামিল করতে পেরেছিলেন। তিনি সাহিত্যকে সামাজিক প্রগতির অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলেই বাঙলার বিপ্লবী তরুণ হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে আজাদীর যুদ্ধে। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েও তার কণ্ঠে সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে—

: তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥
(শিকল-পরার গান : বিষের বাঁশী)

৪

বিদ্রোহী কবি নজরুলের মতবাদ ছিল বিপ্লবাত্মক। প্রথম থেকেই তিনি বিপ্লবের পূজারী ছিলেন। 'অগ্নি-বীণার' ছত্রে ছত্রে এই বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তারপরই যখন মহাত্মাজী অহিংসার মাধ্যমে নতুন কর্মপন্থা নিয়ে এলেন, তখন দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করলেন। কবি সমাজ-ছাড়া জীব নন—তিনিও মহাত্মাজীর কর্মপন্থাকে সমর্থন করলেন—

: আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব যাবে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥
(বাঙলার মহাত্মাজী : ফণি-মনসা)

অসহযোগ আন্দোলন মানুষকে সক্রিয় করে তুলল কিন্তু স্বরাজ এনে দিতে সক্ষম হল না। নজরুলও দেখলেন—দাও হাত বলে চাইলেই দাবী পূরণ হয় না, অমানুষিক শাসন ও শোষণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হলে বিপ্লব চাই। তিনি আবার তুলে নিলেন শক্তিশালী লেখনী। তাঁর কণ্ঠেই শুনলাম নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের তীব্র ধিক্কার—

: ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান্ উচ্চ খুব;
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব!
ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়্‌বে এস বেদান্ত!
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত!
থাকতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক!
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্!
সেও-ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত—একাকোহল্!
এবার তোরা সত্য বল্!
(বিদ্রোহীর বাণী : বিষের বাঁশী)

নজরুলের যে সমস্ত কবিতা জনগণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেগুলোকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বিদ্রোহমূলক কবিতা, (খ) দেশভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন

সূচক কবিতা, (গ) পরাধীনতা-জনিত বেদনা-বিহ্বল কবিতা, (ঘ) ব্যঙ্গ-কবিতা।

বিদ্রোহমূলক কবিতা যথা—'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'প্রলয়োল্লাস', 'আত্মশক্তি', 'যুগান্তরের গান', 'ভাঙার গান', 'দুঃশাসনের রক্তপান' ইত্যাদি কবিতায় জাতিকে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন। এই বিদ্রোহমূলক কবিতার মধ্যেই সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী কাটার আহ্বান আছে। 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী' ইত্যাদি কবিতায় হিন্দুসমাজের জড়তা, নীচতাকে আঘাত করে জাগ্রত করতে চেয়েছেন আর 'কোরবানী', 'মোহররম', 'শহিদী ঈদ' প্রভৃতি কবিতায় মুসলমান-সমাজকে সজাগ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম দুনিয়ায় যে মুক্তি-আন্দোলন আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেদিন খেলাফতের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অবমাননায় ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মন যেরূপ বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত হয়েছিল—সেদিনকার আবহাওয়ায় কবি এই বিদ্রোহেরই আহ্বান জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্বদেশে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে, নজরুলের বিপ্লবী কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য।

স্বদেশ বা বিদেশের যখন যে বিপ্লবী নেতা স্বৈরাচারী রাজশাসনের বিরুদ্ধে শোষিত জনশক্তির পক্ষ থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন, নজরুল তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তুরস্কের কামালপাশা, মিশরের জগলুল পাশা, মরক্কোর রীফ সর্দার, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ থেকে শুরু করে অশ্বিনীকুমার, দেশবন্ধু, মহাত্মাজী, আশুতোষ, আরও অনেক জানা-অজানা দেশপ্রেমিকদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পরাধীনতার জন্যে আক্ষেপ ও গ্লানি তাঁর কবি-চিত্তকে উদ্বেল করে তুলেছে। উপরি উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে এই গ্লানির কথা ব্যক্ত করেছেন। যথা—

: 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' হে ঋষি
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।
(চিরঞ্জীব জগলুল : জিঞ্জীর)

হিন্দু-মুসলমান বিরোধে কবির মন ব্যথায় ভরে উঠেছে—

: (ওরে) তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু ডাকাত লুটছে থান।
(তাই) গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙ্গে খায় শেয়ান॥
(মিলন গান : ভাঙার গান)

কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব পরাজয়বার্তায় মুষড়ে পড়েনি, তিনি সব সময়েই জয়ের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—

: (ঐ) বিন্ধ্যগিরি ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা) মেঘ-বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান।
(ঐ)

নির্ভয়ের বাস্তবশক্তি থেকে তাঁর আশাবাদ উৎসারিত, সেজন্যে তাঁর কাব্যে ভয় নেই, নৈরাশ্য নেই, বেদনার ভাববিলাস নেই। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে নজরুল পরাধীনতার মর্মব্যথা ব্যক্ত করেছেন। "চন্দ্রবিন্দু" কবিতাগুলির মধ্যে এই ব্যঙ্গ-প্রধান কবি-মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বর্তমানে তাঁর কাছে শুধু নিষ্পেষণের প্রাণধারণের গ্লানি নয়, তাঁর কাব্য আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মন্ত্রও শোনাবে। তাই বর্তমানের [illegible] ওপর বসে তিনি স্বাধীনতার [illegible]

মানুষের তিক্ত বেদনায় অশ্রুকে ঢেকে রেখে বিপজ্জনক আশাবাদের কোন স্বর্গছবির ওপর তিনি নির্ভরশীল নন। ক্ষমতাভোগী ধনিক-গোষ্ঠী পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে সাধারণ মেহনতী মানুষের জীবনের সুখশান্তিকে স্বার্থের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখতে যখন বদ্ধপরিকর, তখন মানবতাকে সকলের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে, অন্যায় ও পীড়নকে সমূলে ধ্বংস করে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থার দাবীকে জোরদার করার জন্যে বিপ্লবী মানুষের যে দৃপ্ত মিছিল চলেছে, সংগ্রামী জনসাধারণের সহ-যোদ্ধা হিসেবে কবি নজরুলের বিশ্বাসের ছবি তারই মধ্যেই বিধৃত। সে জন্যে দেখি শাসক শ্রেণী ও সমাজপতিদের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শুধু বিদ্রোহ-বিপ্লব আনয়ন করে ক্ষান্ত হননি—অত্যাচারিত নিপীড়িতদের প্রতি বেদনাবোধ থেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তিনি শান্তি ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ স্থাপনের ভৈরব আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ সাম্যবাদ যদিও মার্ক্সীয় সাম্যবাদের বিচারে দোষদুষ্ট, কেন না একদিকে তিনি সাম্যবাদে একান্ত বিশ্বাসী, অন্যদিকে এমন নেতার বন্দনা করেছেন সাম্যবাদের সঙ্গে যাঁদের অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, সেদিন তিনি যে কমরেড বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাঁদের মনের দিগন্তে প্রকৃত সাম্যবাদ কি, সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। আমরা যখন তা জানতাম না, তখন আমাদের নিজের মানুষ নজরুলই জানবেন কি করে?

দেশ বিদেশীশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তবু অত্যাচার নিপীড়ন সমানে চলেছে। মাথাভারী শাসনের টাকা আদায় করা হচ্ছে গরীবের রক্ত শোষণ করে, ঢাক পিটানো হচ্ছে তাদের রক্তশূন্য চামড়ার ঢোল তৈরী করে। যেখানে মানুষ দুটো শাক-ভাতের প্রত্যাশী, সেখানে উজীরে আজম নীল চশমা এঁটে বলছেন ফলমূল খাও। ফ্রান্সের রাণীর সেই 'রুটি না পায় তো প্রজারা কেক খায় না কেন' কুখ্যাত উক্তিকেও যেন লজ্জা দেয়। মানুষের জীবনকে নিয়ে পরিহাস করার এতবড় স্পর্দ্ধা আর কখনও ঘটেছে বলে ত জানা নেই। তাই আজো নজরুলের কবিতার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তিনি যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, তা শুধু সাদার জায়গায় কালোর রাজত্ব নয়, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙাই নয়, সমস্ত-প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত মানুষকে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার আর্থিক স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ বিদেশী শৃঙ্খল মোচনের সাধনা শেষ হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় বাকী। এক সংগ্রামের চারণ কবি হয়েছেন তিনি, আন্দোলনের সঙ্গে নিজেও সেদিন জড়িত ছিলেন। কিন্তু আজ যখন উৎপীড়নের ষ্টীম রোলারে স্বদেশী শাসকশ্রেণী জনতার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে চলেছে, তখন আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁকে আবার আমরা পেতে চাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবি আজ এক বোধশক্তিশূন্য মানসিক অবস্থার সমাধি-শয্যায় দিনের পর দিন অর্দ্ধমৃত জীবন অতিবাহিত করছেন। এ সংগ্রামে তাঁকে ফিরে পাব কিনা জানি না। তিনি বেঁচে থেকেও এ সংগ্রামের অংশীদার হতে পারলেন না—এ দুঃখ মর্মান্তিক, তবুও তাঁকে এগুবার মত প্রেরণা তাঁর সাহিত্য থেকেই পেতে পারি। কবির এই জন্মতিথি দিনে তাঁর কাব্যের আদর্শের [illegible] আপোষহীন সংগ্রামের নিরলস [illegible] [illegible] হোক॥

মানুষ-অমানুষ

সত্যেন্দ্রনাথ বাগচি

পুরাণে সুরাসুরের উল্লেখ আছে। সুর এবং অসুর। দেবতা আর দৈত্য। পুরাণ ভিন্ন এঁদের কোন প্রামাণিক উল্লেখ নেই।

দেবতারা বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তাঁদের পূজা-অর্চনা এখনও টিঁকে আছে। দেবতার দোরে ধর্ণা দিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়—এখনও হয় কি-না জানিনে, কিন্তু ধর্ণার প্রচলন এখনও আছে।

দেব-দৈত্য যদিও গল্পকথায় বেঁচে আছেন—বাস্তবে তাঁদের কোন অস্তিত্ব নেই। সবাই প্রায় কল্পলোকে আশ্রয় নিয়ে বসে আছেন। বুদ্ধিমান হেতু আর অনেক ভালো ভালো কাজ করার জন্য দেবতারা আজও বহু লোকের হৃদয় মন্দিরে আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আশঙ্কা আছে, আর বেশী দিন তাঁদের এ-হেন আশ্রয় না-ও থাকতে পারে। আবার এমন আশাও করা যেতে পারে, এর চাইতে বেশী ভালো ও বেশী জায়গা জুড়ে তাঁদের আশ্রয়স্থান জুটে যেতে পারে। কিছুই সঠিক বলা যায় না।

অসুররা বরাবর সুরদের বাস্তুহারা ক'রে ছেড়েছেন—আজও তার নমুনা দেখা যায়। দেবতারা বারংবার নির্য্যাতন সহ্য করতে করতে এক একবার এমন পাল্টা আক্রমণ করতেন যে, অসুররা সবংশে ধ্বংস হতেন। রিফ্যুজি হয়েও দেবতারা বিন্দুমাত্র ঘাবড়াতেন না। দেবতাদের ধৈর্য্য ছিল, বুদ্ধি ছিল, দেবতাদের অনেক গুণও ছিল।

দেবতারা ছিলেন হৃদয়বান, পরোপকারী উদার। ভক্তদের নানা ভাবে পরীক্ষা ক'রে তাঁদের যথোপযুক্ত সাহায্য বা সার্টিফিকেট দিতেন।

অসুররা ছিলেন ঠিক এর উল্টো, না ছিল তাঁদের হৃদয়, না ছিলেন তাঁরা পরোপকারী না তো উদার। তাঁরা ছিলেন পরম স্বার্থপর। তাই দু'দলে সদাসর্ব্বদা যুদ্ধ লেগেই থাকতো।

শারীরিক শক্তিতে দেবতারা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল ছিলেন—অসুররা ছিলেন মহাশক্তিশালী। দেবতারা ছিলেন বুদ্ধিতে মহাতেজা—অসুররা ছিলেন গোবর-গণেশ। অসুরদের আস্ফালন ছিল গগন-বিদারী।

যুদ্ধে অসুররা দেবতাদের কাছে শেষ অবধি হেরে যেতেন, কারণ অসুরদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি ছিল না। কুবুদ্ধি হয়তো ছিল—কিন্তু সুবুদ্ধি কোন কালেই ছিল না।

যে দেবতারা অসুরদের মহাবৈরী, সেই দেবতাদের কাছেই অসুররা নিজেদের সুদীর্ঘ আয়ু, নিরাপদ জীবন প্রার্থনা করতেন। দেবতাদের নিকট শক্তিশালী অস্ত্র প্রার্থনা করতেন কিংবা দেবতাদের তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের নকল করতেন।

দেবতারা আত্মভোলা ছিলেন—সর্ব্বদাই বর দেওয়ার জন্ত এক পায়ে খাড়া হ'য়ে থাকতেন। আর আত্মসর্ব্বস্ব মহা নিরেট মুণ্ডুবান ছিলেন অসুররা। একখানা নিরেট মুণ্ডু আজও মাঝে মাঝে দেখি। মুণ্ডুখানা রাহুর। বার বার চন্দ্রকে গলাধঃকরণ করেন—বার বার চন্দ্র নির্ব্বিঘ্নে অক্ষত দেহে রাহুকে কদলী প্রদর্শন করেন—কি চমৎকার আর্ট!

চণ্ডালের রাগ এই রাহুর—বার বার হেরেও হারেন না। মহা কলাকার এই চন্দ্রদেব আজীবন চোর চোর খেলে আর কদলী প্রদর্শন করেই কাটাচ্ছেন।—গ্রাসে নেই ত্রাস।

• • • •

এই যুগে সুরও নেই, অসুরও নেই। কিন্তু তাঁদের স্ব-স্ব প্রতিনিধিরা আছেন—তাঁদের স্নেহের গুণনিধিগণ। মানুষ আর অমানুষ।

দেবাসুরে যেমন যুদ্ধ চলতো তেমনি মানুষ আর অমানুষের যুদ্ধও এই যুগে চলছে। অস্ত্রে-অস্ত্রে যুদ্ধ। বাকযুদ্ধ, মনে মনে যুদ্ধ, কত প্রকারের যুদ্ধ।

রাস্তা-ঘাটে মৌখিক আর কণ্ঠবিদারী যুদ্ধ। কাগজে কাগজে লেখন-কৌশল যুদ্ধ।

এঁদের যুদ্ধের ফলাফল দেখে এটা অনায়াসে বলা চলে, এখনও এই পৃথিবীতে অমানুষই প্রবল। মানুষকে তারা গ্রাহ্য করছে না। মানুষের অনেক সুখ-সুবিধাকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে নিজেরা মহা সুখে দিন কাটাচ্ছে।

এটা স্তায় কি অন্তায়, তা' বিচার করবার মত বুদ্ধি অমানুষের থাকবার কথা নয়—আর তা' তাদের নেইও।

ন্তায় আর অন্তায় বস্তু দুটো যে কি তা আজকের পৃথিবীতে কেহ বুঝতে চেষ্টা করেন না। ওটা মহা দুর্কল্পলোক।

ন্তায় অন্তায় কিছুই আজকের পৃথিবীতে নেই,—একথা অনেকেই ধ'রে নিয়েছেন।

অসুররা বার বার সুরদের বাস্তভিটা ছারখার ক'রে বাস্তহারা করেছেন। অমানুষও মানুষদের বাস্তহারা করছে—দেশছাড়া করছে, সবংশে ধ্বংস করছে।

আজকের পৃথিবীতে মাত্র দুটো জাতিই আছে। মানুষ জাতি আর অমানুষ জাতি। অমানুষ মানুষদের নির্য্যাতন করছে :—

জীবিকাহারা—দেশছাড়া—সম্ভ্রমহারা করেও ক্ষান্ত নয়, সর্ব্বহারা করে গগনবিদারী চীৎকারে বলছে, 'হে মানুষ, তুমি অমানুষ হও—নইলে নিস্তার নেই। অমানুষ হ'লেই তুমি মনে-প্রাণে স্বাধীন হ'তে পারবে—যা খুশী তাই করতে পারবে। বিবেক-বুদ্ধি-হারা হ'য়ে যা খুশী তাই কর—তবেই অমানুষ হ'তে পারবে।'

অমানুষকে পূজা কর—তাতেই মোক্ষ লাভ অনিবার্য্য।

• • • •

অমানুষদের রাজত্ব চলছে। কারণ, তারা যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে মানুষদের উপর ছড়ি ঘোরানোর, মানুষ শাসন করবার ক্ষমতা লাভ করেছে। অমানুষের রাজত্ব কতদিন থেকে চলছে? এটা হৃদয় দিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে হিসেব করুন, অনুভব করুন।

অমানুষদের রাজত্বে মানুষ যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে তার প্রমাণ—অনাহারে মানুষের মৃত্যু। গৃহাভাবে মানুষের গাছতলায় আর রাস্তার মাঝে আপন আপন সংসার স্থাপনের করুণ প্রমাণ। আর অমানুষ [illegible]

দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে পড়ছে। শ্রীহীন, গৃহহীন, সম্ভ্রমহীন মানুষ অমানুষের প্রকৃত নির্য্যাতন সহ্য করতে যে কেন আজও টিঁকে আছে, তা বলা কঠিন নয়। মানুষও স্বপ্ন দেখছে, চেষ্টা করছে,—একটা মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার। সুররা যেমন অসুরদের তাড়িয়ে সুরলোক সৃষ্টি করেছিলেন।

অমানুষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে মানুষ ভিক্ষা চাইছে—অমানুষ তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে—এই দৃশ্য সদা-সর্ব্বদা দেখা যায়। অমানুষের লালসার অনলে কত বিত্তহীন, গৃহহীন হতভাগ্য মানুষের কুলবধূ, কন্যা নিজেদের পুড়িয়ে ছারখার করিয়েছে, এখনও করাচ্ছে। এ-সব নতুনও নয় অভিনবও নয়।

তবু অমানুষের অমানুষত্ব এখনও চরমে ওঠেনি, কারণ এখনও অমানুষদের মধ্যেও এমন কি অমানুষের পরিবারেও দু'-একজন মানুষ নেহাৎ ভুলক্রমেই টিকে আছে। যেমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। * * *

অমানুষ ক্রমাগত অমানুষ সৃষ্টি ক'রে চলেছে। অর্থাৎ তারা সদা-সর্ব্বদা তাদের দল ভারী করবার চেষ্টা করছে। রাজত্বটা জীইয়ে রাখতে হবে তো! অনেক লুব্ধ মানুষ অভাবের তাড়নায় নেহাৎ নিরুপায় হ'য়েই অমানুষ হ'য়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীটা যদি অমানুষে ভর্ত্তি হ'য়ে যায়, যদি একটিও মানুষ পৃথিবীতে না থাকেন, তবে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য। অমানুষে অমানুষে যে অমানুষিক কামড়া-কামড়ি হবে, তাতে পৃথিবীটা উল্টে গেলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু তা হবার নয়, এখনও পৃথিবীতে বহু মানুষ আছেন, যাঁদের জন্য আপাতত পৃথিবী ওল্টানো সম্ভব নয়। এখনও মানুষ আশা রাখেন, পৃথিবীতে মানুষের রাজত্ব হবে। মানুষ এখনও পৃথিবীতে অনেক আছেন।

* * * *

রাস্তা-ঘাটে, ডাইনে-বামে সর্ব্বদাই মানুষ আর অমানুষ দু'দলকেই দেখা যায়। কে মানুষ আর কে অমানুষ তা' বুঝতে চেষ্টা করুন।

পদবী থেকে বোঝা কঠিন তার জাত কি।

রায় ব্রাহ্মণ আছেন, কায়স্থও আছেন। চৌধুরী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ মুসলমান সবই হতে পারেন। পাল কায়স্থ কি তেলী, বোঝা যায় কি? তেমনি কে মানুষ আর কে অমানুষ, হঠাৎ দেখে এক নজরে চেনা শক্ত।

গুণ্ডার মধ্যেও মানুষ আছেন, চোর-ডাকাতের মধ্যেও মানুষ আছেন।

আবার পুরোহিত, ডাক্তার, উকিল, বিচারপতি, মন্ত্রী—এঁদের মধ্যেও বিস্তর অমানুষ কিল-বিল ক'রে বেড়াচ্ছেন। আজব এই দুনিয়া!

বড় বড় সাহিত্যিকদের একটা মস্ত বড় গুণ আছে, তাঁরা নিজেরা মানুষ অমানুষ যাই হোক না কেন, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, তাঁরা কে মানুষ আর কে অমানুষ তা' চট ক'রে ধরতে পারেন।

* * * *

ট্রামে, বাসে, রাস্তায় অফিসে যখনই যেখানে ভীড় দেখবেন, সেখানে আপনি একটু চেষ্টা ক'রে খুঁজে দেখুন—সেই ভীড়ে ক'জন মানুষ আছেন—আর ক'জন অমানুষ আছে। কেন খুঁজবেন তা'ও বলে দিতে হবে? বেশ, তার আগে আপনি নিজেই বিচার করুন, নীচের বাক্য দুটো রাস্তা-ঘাটে যত্র-তত্র কেন অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হয়—প্রয়োগ করা হয়:—

১। মানুষ হও—মানুষের মত মানুষ হও।

২। অমানুষ হয়ো না—অমানুষিক অত্যাচার করো না।—লোকটা একেবারে অমানুষ।

লোক গণনায় আপনি "মানুষ না অমানুষ?" এই প্রশ্নটার জন্য একটা 'কলাম' রাখা উচিত আর এই প্রশ্নটার উত্তর উক্ত কলামে দেওয়া প্রয়োজনও হ'য়ে পড়েছে।

* * * *

তারপর?

তারপর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলে একটা মানুষ-মহামণ্ডল গঠন ক'রে কাগজে-কলমে, রাস্তায়-ঘাটে, কণ্ঠে কণ্ঠে, হাব-ভাবে চীৎকার করো:—

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও। অমানুষিক অত্যাচার সইবো না।...

অমানুষ মুর্দাবাদ—

মানুষ জিন্দাবাদ।

পক্ষান্তরে, অমানুষের দল গগনভেদী আস্ফালন করবে, বলবে: মানুষ গোল্লায় যাক্—অমানুষিক পৃথিবী জিন্দাবাদ।

মানুষ মরুক ভাতে—

অমানুষ ভ্রূক্ষেপ করে না তাতে।

শেষ অবধি কাদের জয় হবে—তা তো পুরাণেই আছে। আমি কেন জয়-পরাজয়ের ইতিহাস রচনা ক'রে ফ্যাসাদে পড়ি?

আমার গাঁও

রিয়াজুদ্দিন পাঠান

পথের শেষে বনের দেশে আমার শ্যামল গাঁওখানি
সদাই সেথা গাইছে পাখী বাইছে মাঝি নাওখানি।

শাখায় বসে কোকিল ডাকে আপন তানে মন ভুলে
পাতায় পাতায় ফুল ফোটে গন্ধ বেড়ায় [illegible]।
[illegible]
[illegible]

সবুজ ক্ষেতে বেড়ায় খেতে ধানের পাতা ঢেউ খেলে
দীঘির বুকে ডাহুক ছুটে চমকে উঠে কেউ এলে।
আম-কাঁঠালের বাগানে যে [illegible] তার পাই দেখে
[illegible]।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৮

নিত্যানন্দ আছে শ্রীবাসের বাড়িতে। তার অহর্নিশ বাল্য ভাব। শ্রীবাসকে বাবা ডাকে, মালিনীকে মা। মালিনীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোয়। মালিনীর শুষ্ক স্তনে মুখ দিয়ে দুধ আনে। মালিনী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখে শিশুরূপ, শিশুশক্তি।

নিমাই কত বলে দিয়েছে শ্রীবাসের ঘরে চঞ্চলতা কোরো না, শান্ত হয়ে থেকো। কে কাকে বলছে! তখুনি দিগম্বর হয়ে বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধল নিতাই। লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল আঙিনায়। বাহ্যজ্ঞানের তন্তুমাত্র নেই। একেবারে এক শিশু আত্মভোলা।

নিজের হাতে ভাত মেখে পর্যন্ত খেতে পারে না। তা ছাড়া আহারের বিচার নেই, সময় নেই, স্বাদবিস্বাদ নেই। মা গো, খেতে দে—বললেই হল, আর যা মা দেবে তাতেই নিতাই পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্নান করতে একবার গঙ্গায় নামলে উঠে আসেনা সহজে। আর কতক্ষণ জলে থাকবে, ওঠো, বেলা হল। কে কার কথা শোনে!

তখন নিমাই এসে ডাকে। আর অগ্রাহ্য করতে পারে না। নিমাই এসে কাপড় পরিয়ে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে। মালিনী কাঁদতে বসল।

নিতাই বললে, 'কী হয়েছে?'

'ঘৃতপাত্র চুরি করেছে কাক।'

'দাঁড়াও, আমি বলছি কাককে—' শিশুর সারল্যে আকাশের দিকে তাকাল নিতাই।

'কত কাক উড়ছে, কেটা বাটি নিয়েছে তাকে তুমি চিনবে কী করে?'

'ঠিক চিনব।' শিশুর মতই বিশ্বাস নিতাইয়ের। 'তুমি ভেবো না, তোমার বাটি তুমি ফিরে পাবে।'

উঠোনে কতগুলি কাক বসেছে, তাদেরই একটাকে উদ্দেশ করে নিতাই বললে, 'যা, উড়ে যা, শিগগির আমার বাটি এনে দে।'

কাক তখনই উড়ে গেল আকাশে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ঠোঁটে করে বাটি এনে হাজির। যেখান থেকে নিয়েছিল, ঠিক সেখানেই রেখে দিল কাক।

মালিনী বিস্ময়ে বাক্যহারা। এও সম্ভব নাকি? আরো কত কী সম্ভব!

মালিনী যুক্ত করে স্তব করতে লাগল। 'তুমিই সেই লক্ষ্মণ, তুমিই সেই বলরাম—'

'মা গো, খেতে দে। খিদে পেয়েছে।' নিতাইয়ের শুধু বাল্যভাব।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ঘরে বসে আছে নিমাই। বসে আছে যাতে মা দেখে খুসি হন। মার মন ভরে থাকে।

> যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
> শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
> মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
> লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥

কিন্তু ও কী উৎপাত! হঠাৎ সামনে আঙিনায় নিতাই এসে দাঁড়াল। আর বলা নেই কওয়া নেই দিগম্বর হয়ে গেল মুহূর্তে। ধরল বাল্যভাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া পালিয়ে গেল।

নিমাই বললে, 'এ কী, এ রূপ কেন?'

কী উত্তর দেবে জানেনা নিতাই। বাহ্যজ্ঞান নেই, শুধু বিহ্বল আনন্দে চেয়ে থাকে অনিমেষে।'

'কাপড় পরো।' নিমাই আদেশের সুরে বললে।

অসহায়ের মত তাকাল নিমাই। কী করে কাপড় পরতে হয় তা যেন তার জানা নেই।

নিমাই তখন নিজের হাতে নিতাইকে কাপড় পরিয়ে দিল।

থালায় করে সন্দেশ নিয়ে এল শচী। পাঁচ-পাঁচটা সন্দেশ। শিশুর মত লোভোজ্জ্বল চোখে তাকাল নিতাই। একটা সন্দেশ খেয়ে আর বাকি চারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

'এ কী, ফেলে দিলে কেন?' শচী বললে সকাতরে।

'সবগুলোকে এক থালায় করে একত্র নিয়ে এসেছ কেন?' বললে নিতাই, 'প্রত্যেককে আলাদা থালায় করে নিয়ে এস।'

'ঘরে আর সন্দেশ নেই।' বললে শচী।

'না, আছে।'

'এই পাঁচটিই ছিল। যে কটি ছিল, তুমি আমার বিশ্বরূপ, তোমাকেই এনে দিয়েছি। আর পাব কোথায়?'

'আমি বলছি আছে, পাবে।' হুঙ্কার করল নিতাই। 'ঘরে গিয়ে দেখ।'

ব্যস্ত পায়ে ঘরে গেল শচী। দেখল থালার উপরে ধুলোমাখা চারটি সন্দেশ।

'ধুলো মুছে নিয়ে এস।' বাইরে থেকে নিতাই আবার ডাক ছাড়ল। 'একটি একটি করে আমাকে খাইয়ে দাও।'

শচী হতবুদ্ধি। কোন্ পথ দিয়ে ঘরে এল সন্দেশ?

'নিত্যানন্দ, বাপ, এ কী অঘটন।'

'কিছুই অঘটন নয়' সন্দেশ খেতে-খেতে নিতাই বললে, 'যা ফেলে দিয়েছিলাম, তাই আবার চেয়ে নিলাম।'

আরেকদিন ভক্তদের নিয়ে বসে আছে নিমাই, নিতাই কাছে এসে দাঁড়াল। সহাস্য মুখ, নয়নে আনন্দাশ্রু, বাল্যভাবে জ্যোতির্ময়। 'নদীয়ার নিমাই-পণ্ডিতই আমার প্রভু।' গর্জন করে উঠল।

নিজহাতে নিমাই নিতাইকে সাজিয়ে দিল বসনে, অঙ্গে মেখে দিল দিব্য গন্ধ, গলায় ঝুলিয়ে দিল ফুলমালা। তারপর সামনে আসন করে দিল। নিতাই বসলে নিমাই তার স্তব করতে লাগল।

'নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রস-মূর্তিমন্ত ॥
নিত্যানন্দ পর্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা ॥'

বললে, 'নিতাই, প্রাণে বড় সাধ তোমার একখানা কৌপীন পাই।' বলে নিজেই উদ্যোগ করে আনাল কৌপীন। [illegible] ফালি করে [illegible] অনেকগুলি। [illegible] [illegible]

করল। বললে, 'এ ফালি মাথায় বাঁধো। তা হলেই কৃষ্ণভক্তি নিটুট হয়ে থাকবে।'

প্রভু বোলে 'এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সখী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব-মিত্র ॥
ইহান ব্যভার সর্বকৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥

নিজ হাতে নিতাইয়ের পা ধোয়াল নিমাই। ভক্তদের সে পাদোদক পান করতে দিল। যে পান করে সেই হরিনামরসে মত্ত হয়। নাচে গায়, ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। হুঙ্কার করে ওঠে।

গৌরহরিও হুঙ্কার দিয়ে উঠল। এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিলনা নিতাইয়ের, সেও প্রতিধ্বনি করল। তারপরে দুজনে কৃষ্ণকীর্তনে নৃত্য করতে লাগল। ভক্তরাও যোগ দিল নির্বিচারে। লক্ষ্যও করলনা কে কার গায়ে ঢলে পড়ছে, পায়ের ধুলো নিচ্ছে, গলা ধরে কাঁদছে অঝোরে। লক্ষ্য নেই কে প্রভু কে অনুচর, কে বৈকুণ্ঠের রাজা, কে বা মর্তের পূজারী। নিমাই-নিতাই কোলাকুলি করে নাচছে। পদতালে কাঁপছে পৃথিবী। চতুর্দিকে উঠছে সিংহনাদ। হরিধ্বনিই সিংহনাদ।

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥

নৃত্যশেষে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসল নিমাই। বললে, 'যে নিত্যানন্দকে ভক্তি করবে, জানবে সেই আমার ভক্ত। সকলে তাই নিত্যানন্দের প্রতি অনুরাগী হও। ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্বথায়। তাই নিত্যানন্দের ভজ করো।'

সকলে নিত্যানন্দের জয় দিয়ে উঠল।

নিতাই আর হরিদাসকে ডাকল নিমাই। বললে, 'আমার এক আদেশ তোমরা পালন করো।'

[illegible]

'নবদ্বীপে প্রতি ঘরে গিয়ে ভিক্ষে করো।'

'ভিক্ষে করব ?'

'হ্যাঁ, নাম ভিক্ষা।'

শুন শুন নিত্যানন্দ। শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র-হস্তে সভারে কাটিব॥

আর কথা নেই, প্রভুর আদেশ হয়েছে, চলো যাই, ঘরে-ঘরে দ্বারে-দ্বারে গিয়ে নাম বিতরণ করি।

নামই পাপহারক, পবিত্রকারী। সর্বব্যাধির বিনাশক, সর্বদুঃখের প্রশমক। সর্ব নারকীর উদ্ধার-কর্তা। প্রারব্ধ-সংহারক অপরাধভঞ্জক। সর্বকর্ম পূর্ণকারক। সর্ব বেদাধিক। সর্ব তীর্থাধিক। সর্ব সৎকর্মাধিক। নামই সর্বার্থপ্রদ, সর্বশক্তিমান। জগদানন্দ-জনক। সর্বসেব্য, স্বভাবতই পরম পুরুষার্থ। একমাত্র নামেরই শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তি। নামের মুখ্যফলই প্রেমলাভ।

আর গৌরাবতারের হেতুই নাম প্রচার। "সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার। করাইমু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।"

'ধাতুনাম্ ইব পাবকঃ।' উদ্বর্তনে প্রক্ষালনে সোনার বাইরের মলই নষ্ট হয়, অন্তরমল নষ্ট হয় না। আগুনে বাহ্য ও আন্তর দুই মলেরই নিরসন ঘটে। প্রায়শ্চিত্তে বাইরের পাপ যেতে পারে, কিন্তু পাপবীজ বা পাপবাসনার উচ্ছেদ হয় না। সে উচ্ছেদ একমাত্র নাম কীর্তনে। হরিনামে জননীজঠরপথ লুপ্ত হয়ে যায়, মানুষ আর জন্ম পটলিপিতে প্রবেশ করে না। নামোচ্চারিকা রসনা শুধু বক্তাকেই রক্ষা করে না, ভগবৎখ্যাতি শুনিয়ে সমস্ত জগৎকেই পবিত্র করে। হরিনামেই অরিষ্টের শান্তি, সমস্ত উপদ্রবের নিস্তার, সমস্ত অনর্থের অপগম।

এক কথায়, হরিনামে সর্বসিদ্ধি।

তুমি ঐহিক ধনজন আরোগ্য-সৌভাগ্য চাও, নামাশ্রয় করো। পারত্রিক স্বর্গ-সাফল্য চাও, নামাশ্রয় করো। ত্রিতাপজ্বালার প্রশমন চাও, নামাশ্রয় করো, চিত্তশুদ্ধি বা পাপের উন্মূলন চাও, করো নামাশ্রয়। মোক্ষ চাও, নামাভাসেই মোক্ষ মিলবে। প্রেম চাও, নিরপরাধে নাম নাও। আর যদি বলো, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা, জগদীশ, কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি—হে ঈশ্বর, ধনজন চাই না, কবিতা সুন্দরী চাইনা, জন্মে জন্মে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি দাও—তাহলেও নামাচ্ছন্ন হও। নামই বাঞ্ছাকল্পতরু।

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

নিতাই আর হরিদাসের দুজনেরই সন্ন্যাসীবেশ। দ্বারে এসে দাঁড়ালেই গৃহস্থেরা ভিক্ষে নিয়ে আসে। তখন তারা বলে, 'তোমরা কৃষ্ণ বলো—তোমাদের এই নামধ্বনিটুকুই আমাদের ভিক্ষে।'

কেউ ভিক্ষে দেয়, কেউ দেয়না। নানাজনে নানারকম বলে। বলে, 'তোমরা পাগল হয়েছ বলে কি আমরাও পাগল হব ? আচ্ছা, আজ যাও, দেখি ভিক্ষের ধন আসে কিনা ভাঁড়ারে।'

কেউ কেউ বা চোর বলে, চর বলে, তেড়ে আসে, কাজীর কাছে ধরে নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখায়। আমাদের ভয় কী। আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করছি। যদি কিছু বলবার থাকে, তাঁকে গিয়ে বলো।

একদিন দুজনে যাচ্ছে পথ দিয়ে, দেখল দুটো প্রকাণ্ড লোক মাতাল হয়ে মারামারি করছে। আর পরস্পরের উদ্দেশে কদর্যকটু গালাগাল ছুঁড়ছে। পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে গেছে কৌতূহলী জনতা।

'কিলাকিলি গালাগালি করছে—লোক দুটো কে ?' দর্শকদের একজনকে জিগগেস করল নিত্যানন্দ।

'কে আবার। মায়ের পেটের ভাই।'

'জাত কী।'

'কী আবার। ব্রাহ্মণ।'

'করে কী।'

'কোটালি করত। ইদানী কাজীকে টাকা দিয়ে বশ করে নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে।'

'কী করছে ?'

'কী না করছে ? হেন দুষ্কর্ম নেই যাতে ওদের অরুচি হবে। চুরি ডাকাতি তো করছেই, গৃহস্থের ঘরে আগুন দিচ্ছে। নরহত্যা করতেও পেছপা হচ্ছে না। নির্বিচারে মারল কাটছে, বা বাঁধছে, আ

নয় তাই দিচ্ছে গালাগাল। সমস্ত দেশবাসীর ত্রাস-স্বরূপ হয়ে উঠেছে।'

'চলো যাই ওদের কাছে বলি গে প্রভুর কথা।' নিতাই বললে হরিদাসকে।

'বলবে ?' উৎসাহিত হল হরিদাস।

'ওরা ছাড়া কে আছে এমন সুপাত্র ? যদি পাপী উদ্ধার করতেই প্রভুর অবতরণ, তবে এদের মত পাতকী আর আছে কোথায় ?' নিতাই বললে উদ্বেলকণ্ঠে, 'পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥ প্রভু তো গোপনে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর প্রভাব আজও লোক বুঝতে পাচ্ছেনা বলে উপহাস করছে। প্রভু যদি এখন এই দুই দুরাত্মাকে অনুগ্রহ করেন তবেই তো সমস্ত সংসার পায় তাঁর পরিচয়।'

'চলো, এগোই।'

'এখন যেমন ওরা মদের নেশায় মত্ত আছে, তেমনি যদি নামের নেশায় মত্ত হয়!' নিতায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। 'যদি এদের চোখে জল আসে! যদি কাঁদে একবার গৌর বলে। হরিদাস, যারা আজ ওদের ছায়া স্পর্শ করছে, তারা শুচি হবার জন্যে তখুনি গঙ্গাস্নান করতে ছুটছে। যদি এমন দিন আসে যখন ওদের দর্শনমাত্রই লোকে গঙ্গাস্নানের ফল পেয়েছে বলে অনুভব করবে। যদি এদের মধ্যে চৈতন্য প্রকাশ হয় তবেই তো আমি চৈতন্য-কিঙ্কর নিত্যানন্দ। 'তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস। এ দুইয়েরে করো যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥'

হরিদাস তৃপ্ত চোখে তাকাল নিতায়ের দিকে।

'হরিদাস, তুমি এদের শুভাভিলাষ করো। যখন যবনেরা তোমাকে মারছিল তখনও তুমি তাদের মঙ্গলকামনা করেছিলে। যদি সত্যি এদেরও তুমি মঙ্গলকামনা করো তবে এরাও নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে।'

'তোমার যখন তাই ইচ্ছে,' বললে হরিদাস, 'বুঝতে হবে তাই প্রভুরও ইচ্ছে! আমাকে কেন মিছে ছলনা করছ ? তোমার যখন একবার সঙ্কল্প হয়েছে, প্রভু তা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।'

হরিদাসকে আলিঙ্গন করল নিতাই।

এগোলো দুজনে। পথচারীরা নিষেধ করল। 'ওদের কাছে যেওনা। ওদের সন্ন্যাসী-জ্ঞান নেই, [illegible] বুদ্ধি। যদি কিছু বলতে চাও, দূর থেকে বলো, ওদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পোড়ো না।'

গ্রাহ্য করল না, আরো এগোলো দুজনে। সন্নিহিত হয়ে বললে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।'

> বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
> কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
> তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
> হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥

ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল দু ভাই। আমাদের সামনে এত বড় স্পর্ধা! আমাদেরকে উপদেশ! ধর্ তো ব্যাটাদের।

নিতাই আর হরিদাসের পিছু নিল ডাকাতেরা। নিতাই আর হরিদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল প্রাণ ভয়ে। আথেব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়। রহ-রহ বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥

'তখনই বারণ করেছিলুম।' পথচারীরা উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'এখন সন্নেসীরা কী বিপদে পড়ল বলো তো!'

'সন্নেসী না আর কিছু! ভণ্ড, ভণ্ডের শিরোমণি!' নামবিমুখ পাষণ্ডের দল বলতে লাগল, 'ঠিক হয়েছে, ভগবান ভণ্ডদের উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।'

কিন্তু যারা সদাশয়, এ দৃশ্য দেখে তারা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো।'

'এ যাত্রা প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না।' ছুটতে-ছুটতে বললে নিতাই।

'তোমার জন্যেই আজ নিশ্চিত অপমৃত্যু।' বললে হরিদাস।

'আমার জন্যে ?'

'তাছাড়া আর কী! নইলে মাতালেরে কেউ কৃষ্ণ-উপদেশ করতে চায় ?' হরিদাস হাসতে-হাসতে বললে।

'বা, তুমিই তো বললে সঙ্কল্প পূর্ণ হবার কথা।'

'সব তো আমারই দোষ। কিন্তু যাই বলো, মোটা মানুষ, ছুটতে পারছিনা। এক চঞ্চলের পাল্লায় পড়ে ইহকাল বুঝি গেল।'

'আমি চঞ্চল ?' হাসল নিত্যানন্দ। 'চঞ্চল তোমার প্রভু। নইলে ব্রাহ্মণ হয়ে কেউ রাজ-আজ্ঞা করে ? তুমি নিজের প্রভুর দোষ ধরছনা! চঞ্চল গৌরাঙ্গের হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে, তাই আমার এ [illegible]।'

ছুটছে আর দুজনে 'আনন্দ-কন্দল' করছে।

কিন্তু, হায়, ডাকাত দুটো এখনো পিছু ছাড়ছেনা। কোথায় পালাবে? তোমাদের ধরব তবে ছাড়ব। ঘুচিয়ে দেব কৃষ্ণ নাম।

দুই দস্যু বোলে, 'ভাই। কোথারে যাইবা?
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?
তোমরা না জান এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের-দেখ পাছে॥'

পিছনে তাকাবে এমন সাহস নেই সন্নেসীদের। তারা ছুটছে আর গোবিন্দ-গোবিন্দ বলছে। বলছে, রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ।

এত মদ খেয়েছে, বেশিদূর ছুটতে পারল না দুর্বৃত্তেরা। মদ্যের বিক্ষেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গড়াগড়ি খেতে লাগল।

হরিদাস আর নিতাই থামল এসে বিশ্বম্ভরের সকাশে। বৈষ্ণবমণ্ডলে কৃষ্ণকথায় রত বিশ্বম্ভর তাকাল ওদের দিকে। ওরা তখন বললে সমস্ত কাহিনী।

'কে ওরা দু ভাই?' জিগগেস করল নিমাই।

শ্রীবাস আর গঙ্গাদাস বললে, জগাই মাধাই। হেন দুষ্কার্য নেই যা ওদের অজানা। পাতকের দীর্ঘ পতাকা বয়ে বয়ে ফিরছে।

নিমাই ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এখানে একবার আসুক। ওদের খণ্ড খণ্ড করব।'

প্রভু বলে জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥

'তাই করো। তাইই তো করবে।' নিতাই বললে অনুযোগের স্বরে, 'তোমার বড়াই খুব বোঝা গেছে। স্বভাবে যে ধার্মিক তাকে কৃষ্ণনাম নেওয়ানো সোজা। কিন্তু এ দুই দস্যু, বিকর্ম ছাড়া আর কিছু যারা জানেনা, ওদের মুখে কৃষ্ণনাম আনতে পারো তো বুঝি তোমার মহিমা। আমাকে ত্রাণ করা সহজ কিন্তু জগাই-মাধাইকে যদি ভক্তি দিতে পারো, যদি পাপমুখে আনতে পারো কৃষ্ণনাম, তবেই জানব তুমি পতিতপাবন, পাতকীপাবন। আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এ দোঁহার উদ্ধারের সীমা॥'

নিমাই হাসল। বললে, 'নিত্যানন্দ, তুমি যখন ওদের মঙ্গলকামনা করছ, তখন আর ভয় নেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ওদের কুশল করবেন।'

'ভয় নেই।' অদ্বৈতও হুঙ্কার করে উঠল। 'দু তিন দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাইকে নিয়ে আসব ভক্তগোষ্ঠীতে। দেখবে, তারা আর জগাই-মাধাই নেই, তারাও কৃষ্ণকীর্তনের আনন্দে নিমাই-নিতাই হয়ে উঠেছে।'

গঙ্গাতীরে ঝাড়ি, কিন্তু নগরের এখানে-ওখানে ডেরা বেঁধে শিকার খোঁজে ডাকাতেরা। এবার এসে ডেরা বেঁধেছে নিমাইয়ের পাড়ায়, শ্রীবাসের বাড়ির কাছে।

সবাই ভয়ে তটস্থ। পাঁচজনে একত্র না হয়ে বাইরে বেরোয় না। খুশিমত গঙ্গাস্নান করা উঠে গেল।

শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে, জগাই-মাধাই দেখতে এল, কী ব্যাপার। দেখল দরজা বন্ধ। ভিতরে মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজছে, গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করছে গায়কেরা। কুছপরোয়া নেই। আমরাও নাচব। মদের আবেশে শরীর টলছে, তাতে কী, নাচে তালভঙ্গ হবেনা। মদ্যপানে বিহ্বল, তবু ডাকাত দু-ভাই নাচতে লাগল। তোমরা যদি না ঘুমিয়ে সমস্ত রাত নৃত্য করতে পারো, আমরা কম কী, আমরাও পারব।

ভোরবেলা ভক্তরা গঙ্গাস্নানে যাবে, দরজা খুলে দেখে, বাইরে অদূরে জগাই-মাধাই। ভয়ে পাংশু হয়ে গেল সকলে। নিমাই যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে, তাকে ডাকল দুভাই। বললে, 'এ তোমার কোন্ দল? কী গান গাইলে রাতভোর? মঙ্গলচণ্ডী? না কি ঘেঁটু মনসা? যাই গাও, আমাদের বেশ ভালো লেগেছে।'

নিমাই দাঁড়াতে চাইলনা। দুর্জন সঙ্গ এড়িয়ে দূরে সরে গেল।

'শোনো নিমাই পণ্ডিত,' হাঁক পাড়ল ডাকাতেরা, 'একদিন আমাদের ওখানে তোমাকে গান শোনাতে হবে। আমাদের নিমন্ত্রণ রইল। আসা চাই কিন্তু।'

যে আমাকে ডাকে, তার কাছে আমি না গিয়ে কি পারি?

দ্রুতপায়ে গঙ্গার দিকে চলে গেল নিমাই। আর আরয়াও, যে যে-পথে পেল, পালাল শশব্যস্তে।

আর যে কেউই পালাক, তুমি পালাবে কী করে? মহা-রৌরব থেকেও তুমি উদ্ধার কর। তুমিই যে কৃপার গম্ভীর অপার সমুদ্র। 'কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।'

কোলাশ—অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ভাল্লুক

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

সেদিন ছিল ২রা ফেব্রুয়ারী। দিল্লীস্থ অষ্ট্রেলিয়ান রাজদূতের কাছ থেকে এক সরকারী কেতাবদুরস্ত চিঠি এসে হাজির হ'ল। চিঠির বিষয়বস্তু—"আপনার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া যাবার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে। যেতে হবে উড়ে—দমদম বিমানঘাঁটি থেকে B. O. A. C মারফতে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা ও স্থিতি সুখকর হোক।" এখানে বলে রাখা ভাল, মাস-সাতেক আগে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে আমাকে জানান হয়েছিল যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভারতসরকারের পক্ষ থেকে যোগ দেবার জন্য আমাকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন করা হয়েছে। ব্যবস্থাটা এতদিনে পাকা হ'ল।

যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি হবার পর যাওয়ার জন্য তোড়জোড় গোছগাছ ইত্যাদি পুরাদমে সুরু হোলো। কত কি জিনিষ সঙ্গে নেওয়া দরকার, কিন্তু নেবার উপায় কি? ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, মাত্র ৬৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৩ সের মাল সঙ্গে নিতে পারব একটি ফাইবারের সুটকেশে। গাঁয়ের বামুনপণ্ডিত যেমন নেমন্তন্ন-বাড়ীতে আকণ্ঠ খাওয়ার পরও ছাঁদা বেঁধে নেয়, আমি ও তেমনি সুটকেশের আকণ্ঠ ভরার পর Night Bag ও Brief case এ কিছু কিছু ছাঁদা বাঁধলাম। এমতাবস্থায় সহধর্ম্মিণী তাঁর ধর্ম পালন না করলে বিদেশে আমি যে কত জিনিষের অভাবে ধর্মচ্যুত হ'তাম, তার ইয়ত্তা নেই।

২১শে ফেব্রুয়ারী। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর একটা ট্যাক্সি ডেকে চৌরঙ্গীর B.O.A.C. অফিসে যাত্রা করলাম। [illegible]

[illegible]

স্পষ্ট টের পেলাম যখন চৌরঙ্গীর পথে ট্যাক্সির কাঁচের জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগল।

B.O.A.C. অফিসের সামনে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে মুখ ফেরাতে না ফেরাতেই শ্যেন পাখীর মত ছোঁ মেরে এক ছোকরা আমার সুটকেশটা নিয়ে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এই সুটকেশটার মধ্যেই আমার যথাসর্ব্বস্ব, তাই হন হন করে তার পিছু নিলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি খাকীর পোষাক পরা ছোকরা আর তার বুকের ওপর বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা B. O. A. C.। সুটকেসটা নামিয়ে দিয়ে আমায় দিল এক সেলাম। খুসী হলাম আর তার চেয়ে বেশী হলাম আশ্বস্ত। ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে নগদ একটা আধুলি বেঁচে ছিল—সেটা তাকে বক্‌শিস্ দিলাম। আবার আর এক সেলাম।

মালপত্র যথাসময়ে ওজনান্তে সুটকেসটার গায়ে লেবেল সাঁটা হল। সুটকেসটা যেন জাতে উঠল। ওর মুখে সেদিন হাসি দেখলাম; ভাবখানা যেন কোথায় ছিলাম চৌরঙ্গীর এক দোকানের কোণে সর্ব্বাঙ্গেই ধূলো আর কোথায় এলাম আবার প্লেনে চড়ে কোথায় যাব। সুটকেসের হাসি আপনারা কখনও দেখেছেন কি না জানি না, কিন্তু সে হাসির কথা আমি কখনও ভুলবো না। সুটকেসের

হাসিটা দেখে মনে পড়ে গেল পাড়ার ভট্টাচার্য্যদের ছোটছেলের কথা। পৈতে হওয়ার পর প্রথম যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন সে কোন কথা না বলে তবু হেসেছিল আমার দিকে চেয়ে। এ হাসি আর সে হাসি অনেকটা যেন একরকমের।

ইতিমধ্যে যাত্রী ও তাদের সাথীদের ভীড় জমতে সুরু হয়েছে—কলরব রব আর সিগারেটের ধোঁয়া তার সাক্ষী। সবাই ব্যস্ত সমস্ত। কোন কোন যাত্রীর ভাই বা বন্ধুরা এসেছেন তাঁদের বিদায় জানাতে—কেউবা বিমর্ষ, কেউবা সহর্ষ, আবার কেউ কেউ Illustrated Weekleyর পাতার মধ্যে আত্মস্থ।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। যাত্রীরা নীরবে সারি দিয়ে B.O.A.C গাড়ীতে গিয়ে বসলো। ঘুমন্ত কোলকাতা সহরের বুকের উপর দিয়ে তীব্রবেগে গাড়ী ছুটে চললো দমদম অভিমুখে।

কোলকাতা সহরের এমন নীরব ও শান্তরূপ আর কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। রাস্তাঘাট জনশূন্য, দোকানপাট বন্ধ—সহরবাসী গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। কেবল মাঝে মাঝে এক আধজন পুলিশ পুরীরক্ষী হিসাবে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এক আধটা পানের দোকান এখনও খোলা—পাট বন্ধ করবার উপক্রম করছে—দু'একটা আশ্রয়হীন কুকুর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই শান্ত নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে।

অসংখ্য উঁচু-নীচু রঙীন আলো জেলে দমদম বিমান-ঘাঁটী নিশীথ রাতে জেগে বসে আছে পুষ্পকরথের প্রতীক্ষায়। যেন বহুদিন পরে প্রিয় তার প্রিয়ার কাছে ফিরছে—সুন্দরী প্রিয়া দীপ জেলে উন্মুখ সচকিত হয়ে অপেক্ষা করছে প্রিয়ের পায়ের ধ্বনির—রাতের পর রাত।

B.O.A.Cর গাড়ী এসে বিমানঘাঁটীর সামনে থমকে দাঁড়ালো। যাত্রীরা আবার নামবার জন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এরপর টিকিট, পাশপোর্ট, ডাক্তারী রিপোর্ট ও কাসটামসের পরীক্ষা সুরু হল। যাত্রীরা তাদের সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কাসটামস্ পরীক্ষকদের সঙ্গে বস্তাধস্তির পর পাশপোর্ট পরীক্ষার জন্ত অন্ত আর এক ঘরে গেলাম। একজন বাঙালী ও একজন ফিরিঙ্গি দারোগা পাশপোর্ট পরীক্ষা করছেন। আমার পাশপোর্ট খুলে বাঙালী দারোগার সামনে ধরতেই একগাল হেসে বললেন—"আপনি যে একজন বাঙালী দেখছি।" বলেই কাগজের খাতায় কি সব হজরং যজরং লিখতে সুরু করে দিলেন। আমিও একটু হেসে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ"। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কার্য্য হতে। একটা বিশ্রামঘরে যাত্রীরা সব প্লেনে উঠবার জন্ত অপেক্ষা করছেন: আমিও গিয়ে তাঁদের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লাম। সিগারেটের টিনটা খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সামনে এগিয়ে দিলাম। ধন্তবাদ দিয়ে তিনিও ধূমপানে যোগ দিলেন। ঘরটা বেশ চুপচাপ; কেবল মাঝে মাঝে এক একজন Air-Hostess ব্যস্তসমস্ত হয়ে বুকফুলিয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে যাতায়াত করছেন।

ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়াগামী প্লেন এসে দমদমে হাজির হয়েছে এবং যে সব যাত্রীরা দূর বিদেশ থেকে আসছিলেন, তাঁদের পাসপোর্ট পরীক্ষা সুরু হয়েছে। আমাদের সামনে দিয়ে তাঁরা সারি দিয়ে চললেন প্লেন অভিমুখে। কেউ বা বললেন—Good Morning। এবার আমাদের পালা, যাঁরা দমদম থেকে উঠছেন। সারি দিয়ে গিয়ে প্লেনে উঠলাম। হাস্যময়ী Air-Hostess আমাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধবার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্লেন ঘর ঘর করে শূন্তে উঠতে সুরু করল। Air-Hostess সকলকে চকলেট ও লজেন্স দিয়ে যাত্রারম্ভে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম ৩-৪৫ মিঃ। যতক্ষণ দেখা যায় ঘুমন্ত কোলকাতার সঙ্গে চাক্ষুষ যোগ রাখলাম, তারপর চেয়ারটাকে হেলান করে আলো নিভিয়ে চোখ বুজলাম।

কাঁচের জানলা দিয়ে এক ফালতো সোনালী রোদ এসে মুখে পড়তেই ঘুম্ ভেঙ্গে গেল···ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ৬৷টা। তখনও অনেকে ঘুমন্ত, কেউ কেউ আমার আগেই জাগন্ত আর Air Hostess ও Stuart প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত-সমস্ত। ৭টার সময় ট্রে হাতে Hostess প্রাতর্ভোজ নিয়ে হাজির। চেয়ারের দুই হাতলে একটা কাঠের চৌকো তক্তা লাগিয়ে টেবিল বানান হল এবং তার উপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"Tea or Coffee, with milk?" হেসে বললাম—"Tea with milk." বিস্কুট, রুটি-মাখন, egg ও ham তারপর চা। বেশ খাওয়া গেল—খিদেও পেয়েছিল খুব। খাওয়ার পর উঠে Toilet-roomএ মুখ-হাত ধুয়ে চুল আঁচড়ে এসে নিজের জায়গায় বসে নীচে মেঘের আনাগোনা দেখছি, আবার কাণের কাছে—Do you like any magazine, please? ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। দু'খানা Life পত্রিকা এনে আমার কোলে দিয়ে গেল। ধন্তবাদ দিয়ে Lifeএ আত্মস্থ হ'লাম।

বাস্তব জীবনে এর আগে কখনও মেঘলোকে বিচরণ করিনি। রাবণ-তনয় বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধের কথা হয়ত বা চোখবুজে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু এখন ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ ফিট উপর দিয়ে ভেসে চলতে চলতে চোখ নীচু করে মেঘের আনাগোনা দেখছি। ভেসে যাওয়া কুণ্ডলী পাকানো মেঘলোক দেখে সমুদ্রের ঢেউ-এর কথা মনে পড়ে। ফেনিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে তারা ভেসে চলেছে—আদি নেই, অন্ত নেই। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছি নীচে মেঘলোকের দিকে, হঠাৎ টনক নড়ে উঠল—Tea বা Coffee প্রশ্নে। White Coffee বলে আবার মেঘের খেলা দেখতে লাগলাম। যথাসময়ে সদুগ্ধ এককাপ কফি আর কয়েকখানা বিস্কুট দিয়ে গেলেন Air Hostess। মেঘলোক থেকে কফিলোকে মনঃসংযোগ করলাম। ১০০০ ফিট ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে ব্যোমযান আর তার পেটের ভিতর জনা পঞ্চাশ লোক আরামে বসে চা সিগারেট পান করছে। কোন দৃক্‌পাত নেই, যেন বৈঠকখানায় বসে আছেন সব। বিজ্ঞান তোমার জয় জয়কার। সত্যিই তুমি মানুষকে অমানুষ করে ফেলেছ।

বেলা ১ টায় সময় আমরা সিঙ্গাপুর পৌঁছালাম। প্লেন যখন সিঙ্গাপুরে নামছে তখন নীচের দিকে চেয়ে মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার স্কুলঘরে দেখা পৃথিবীর Relief mapএর কথা। মালয় উপদ্বীপটা যেন একটা সুন্দর গড়া Relief map, সিঙ্গাপুরে নামবার সঙ্গে সঙ্গে পাশপোর্ট ও ডাক্তার রিপোর্ট পরীক্ষা হল। এরপর আমরা B. O. A. Cর গাড়ীতে এক হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলটির নাম Raffles হোটেল।

আমি বাপু সাধাসিধে বাঙালী মানুষ; অত বড় হোটেল দেখেই বুদ্ধি

Great Eastern বা Grand Hotel, কারণ এদের গা ঘেঁসে অনেকবার চলাফেলা করেছি কিন্তু Raffles এদের চেয়ে অনেক বড়। পাঁচ তলা প্রকাণ্ড বাড়ী, একতলার একাংশে BOACর অফিস, নানাবিধ দোকান, মায় money exchanger, খাম পোষ্টকার্ড শুধু আর অপরাংশে Dinning Hall ; এই খাবার ঘরে অনায়াসে ৪।৫ শ লোক বসে খেতে পারে। যাইহোক, আমাদের তিনতলার এক ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হল। ঘরটা Double seated ও চারভাগে ভাগ করা—বসবার ঘর, শোবার ঘর, পোষাক ছাড়ার ঘর, তারপর স্নানের ঘর। শোবার ঘর Air conditioned, বসবার ঘরে ফোন। আমার ঘরের সঙ্গী হলেন আসামের সরকারী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরাম গোস্বামী। ভাবলাম বেশ আরামে থাকা যাবে হোক না একরাত্তির।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়েই খাবার ঘরে ছুটতে হল, কারণ ১টা ৪৫মিঃ পর খাবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এমনি ধারা ঘড়ি ধরে হুড়ুম্ দাড়ুম্ করে খেতে যাওয়া আমাদের সয় না—বেজার হয়ে গিয়ে খাবার ঘরে একটা টেবিলে জায়গা করে নিয়ে মেনুতে (খাদ্যতালিকাতে) মনঃ সংযোগ করা গেল। পাশেই বেঁটেখাটো একজন চীনে Service boy আমার হুকুমের অপেক্ষা করছে—মুখের কথা খসলেই খাবার এসে পৌছাবে। ধপ্ধপে সাদা ডিসে গরম গরম খাবার যখন এসে পৌছল, তখন খাবারের গরম ধোঁয়ায় মনের গরম থপ করে উবে গেল। মেঘলা ভাঙা আকাশে রোদ্দরের মত মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বেশ আরাম করে খাওয়া গেল। চায়ের কাপ তখনও নিঃশেষ হয়নি, হঠাৎ খাবার ঘরে Loud-speaker গর্জে উঠলো—যাত্রীদের মধ্যে যারা সিঙ্গাপুর সহর দেখতে চান, অনুগ্রহ করে ৩টার সময় B O A C অফিসে অপেক্ষা করুন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ২-৪৫ মিঃ। একটা সিগারেট ধরিয়ে একতলার B O A C অফিসে এসে পুরু গদি-আঁটা আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে বসা গেল। আরও অনেকে দাঁড়িয়ে বসে আড় হয়ে অপেক্ষা করছেন—বুঝলাম, সবাই সিঙ্গাপুর সহর দর্শনপ্রার্থী।

টং-টং-টং করে ঘড়িতে তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে এক তন্বী শুভ্রা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী Air Hostess হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাদের গাড়ীতে ওঠবার অনুরোধ জানিয়ে নিজে উঠে বসলেন। গাড়ী ছুটতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে Air Hostess তার টকটকে রঙমাখা রাঙা ঠোঁট দু'খানা নেড়ে সুরু করলেন সিঙ্গাপুরের ইতিবৃত্ত।

ঝকঝকে তকতকে সাগর-ঘেরা ছোট্ট দ্বীপসহর—সিঙ্গাপুর তার বুকের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ী ছুটে চলেছে। সহরের রাস্তায় পশু বা মানুষ-চালিত কোন যানবাহন নাই। যানবাহনের মধ্যে মোটরগাড়ী ছাড়া চোখে পড়ল ট্রলিবাস—দোতলা-বাস কিন্তু ট্রামের মত ইলেক্ট্রিকে চলে। সহরের বেশীর ভাগ লোক চীনে, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি তাদের হাতে। ভারতীয়ও কিছু কিছু আছে—তবে তাদের দু'চারজন ডাক্তার মোক্তার ছাড়া অধিকাংশই কুলী-মজুর আর দরোয়ান। আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এদের শাসন করে।

[illegible] গেল। আমরা [illegible]

গাড়ী থেকে নেমে মন্দিরের মধ্যে গেলাম। বৃদ্ধ চীনা পুরোহিত আমাদের (ভারতীয়দের) দেখে হাসতে হাসতে এসে অভিনন্দন করে সব দেখাতে সুরু করলেন। মন্দিরের মাঝে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তি, প্রায় ২৫।৩০ ফুট উঁচু আর তার চারিপার্শ্বে রঙীন মাটির গড়া বুদ্ধের জীবনকথা লীলায়িত। মাটির গড়া পুতুলগুলি যেন হুবহু কেষ্টনগরে গড়া। আমি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ মাটির পুতুল সব তৈয়ারী করা হয়েছে কোথায় ?" বৃদ্ধ একগাল হেসে সগর্ব্বে বুকের উপর দুটো আঙুল ছুঁইয়ে বললেন—"আর কে, আমিই এসব করেছি।" "আপনি কখনও ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন ?" "হ্যাঁ, ভারতবর্ষে আমি অনেকদিন ছিলাম—সারনাথে—আসুন না আসুন, এই দেখুন—এই কাঠের টুকরোটা আসল বোধিবৃক্ষ থেকে আনা।" বলে কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখা এক টুকরো কাঠের দিকে তাঁর শীর্ণ আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। ভারতবর্ষ বলতে বুড়ো যেন অজ্ঞান, ভারতবর্ষ যেন তার ধ্যান-জ্ঞান—তার বারাণসী—তার ইহকাল, তার পরকাল। দূরে বিদেশের মাঝে দেশের জয়গান, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ দেখলে কোন্ দেশবাসী না আত্মহারা হয় ? বৃদ্ধ-পুরোহিতকে প্রণাম করে কিছু পার্ব্বণি দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আবার সুরু হল এঁকে বেঁকে ছুটে চলা—Hostess-এর ঠোঁট-নাচুনী আর সিগারেটের ধুম বিস্ফুরণ।

গাড়ীর মধ্যে একজন বৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্ট আমেরিকান ছিলেন; সুবিধা পেলেই ঐ অল্পবয়সী Hostess-এর সঙ্গে একটু আলাপ, ঠাট্টা ও রসিকতা করতে ছাড়তেন না। খাবার-ঘরে বুড়োকে দেখেছিলাম এক কোণে আপনমনে বীয়ার-পানে রত। সত্যি বলতে কি, বুড়োর রসিকতার রস সবাই আকণ্ঠ পান করছিলেন—গাড়ীর মধ্যে হাসি-ঠাট্টায় সবাই মসগুল। Hostess মাঝে মাঝে বুড়োর প্রশ্নে রীতিমত বিব্রতা হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু উপায় নেই—হাসিমুখে তাকে সব সহ্য করতে হয়েছিল। "এইখানে জাপানীরা অকথ্যভাবে এদেশের মানুষগুলোকে হত্যা করেছে"—বলে Hostess একটা পোড়া-বাড়ীর দিকে আঙুল দেখালেন। সারা সহর ঘুরে ৫টা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। সহর পরিক্রমায় যে দুটো জিনিষ বিশেষ করে চোখে পড়েছিল—তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, সহরের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা ও দ্বিতীয়—সহরের রাস্তায় সম্পূর্ণ ভিখারী-শূন্যতা।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরে দেশের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতে বসেছি, এমন সময় দোরে কড়ানাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখি, বিলাতী-পোষাকে এক প্রিয়দর্শন ভারতবাসী। নমস্কার করে ভিতরে এসে বসতে অনুরোধ জানালাম। "আমি মিঃ বেজবরুয়া। আসামবাসী। এখানে ওকালতি করি"—বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। আসামবাসী শুনে মনে হল, তিনি নিশ্চয়ই মিঃ গোস্বামীর খোঁজে এসেছেন। মিঃ গোস্বামী তখন স্নানের ঘরে, তাই আমিই ওর সঙ্গে আলাপ সুরু করলাম। কথায় কথায় জানলাম যে, তিনি সস্ত্রীক এখানে থাকেন এবং মিঃ গোস্বামীর খবর পেয়ে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। আমাকেও বিশেষ করে অনুরোধ করলেন, তাই চিঠিপত্র ফেলে ঘণ্টাখানেক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে ঘুরে আসা গেল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চিঠিপত্র লিখে শয্যা নিলাম। কাল ভোরেই আবার যাত্রা সুরু।

[illegible] ঘুম ভেঙে গেল। তখন সবে ৫টা।

ভোরে প্লেন ধরতে হবে বলে হোটেলের চাকর ঘুম ভাঙানো ধাক্কা দিয়ে গেলেও ঘুম আর ভাঙতে চায় না। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে জিনিষপত্র তল্পিতল্পা বেঁধে প্রাতর্ভোজের জন্য খাবার ঘরে যেতে হল, কিন্তু প্রাতর্ভোজ নয় ত—রীতিমত ভোজন; সে কারণ ভোজনান্তে একটু বিশ্রামের অভিলাষ উঁকি মারছিল। কিন্তু তা আবার হবার নয়, কারণ ৬৷৷টায় প্লেন ছাড়বে। যথাসময়ে বিমান-বন্দরে উপস্থিত হয়ে প্লেনে উঠে বসলাম—ঠিক ৬৷৷টা। প্লেনের ঘরঘরাণি আবার সুরু হ'ল। বুঝলাম, উড়তে সুরু করেছে আমাদের উড়োজাহাজ।

১১৷৷৹ টার সময় জাকার্তায় পৌঁছলাম। জাভা—যবদ্বীপ—বরবুদুরের দেশ। জাভার সঙ্গে ভারতের কতদিন থেকে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আজও বরবুদুরের মারফতে তার সিঁথির সিদুর অক্ষয় হয়ে আছে। কিন্তু জাভায় থাকতে পারবো মাত্র এক ঘণ্টা। বরবুদুর দেখতে পাবো না—এই একটা বড় আপশোষ রয়ে গেল। প্লেন যখন জাভায় নামছে তখন প্লেনের জানলা দিয়ে চোখ দুটকে যতদূরে পারা যায় দূরে ছুটিয়ে দিলাম—যদি বরবুদুরের চূড়ো দেখা যায় এই আশায়। প্লেন যেন পাখীর মত যেন কিছু ছোঁ মেরে নেবার জন্য জাকার্তা বিমানঘাঁটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়িয়ে ছুটতে লাগলো। আমরা তল্পি-তল্পা প্লেনে রেখেই বিমানঘাঁটাতে নেমে পড়লাম।

কিন্তু বিমানঘাঁটাতে নেমে কি ছাই নিস্তার আছে? পাসপোর্ট আর ডাক্তারী রিপোর্ট খুলে সারি দিয়ে দাঁড়ালাম। কাস্টমসের দু'জন জাভানীয় কর্মচারী গম্ভীর মুখে পাসপোর্ট-এর ওপর ছাপ মারতে সুরু করে দিল। কাজের মধ্যে ওই ছাপ মারা, আরে বাপু তার জন্য আমাদের এত কষ্ট দিস কেন? আমরা তো খুনে বা পলাতক আসামী নই; হীরা জহরৎ লুকিয়ে নিয়েও যাচ্ছি না। ওরে বাপু, আমরা সাধারণ ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের দল, সারাজীবন বইপত্তর নিয়ে আমাদের কারবার, তবে আমাদের ওপর এত জুলুম কেন? কিন্তু কে কার কথা শোনে? নিয়মের রাজত্ব—সবাইকে নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

ভোগান্তি যা আছে ভুগতেই হবে। ঠিক তাই হল। আধঘণ্টা সারি দিয়ে যন্ত্রণা ভোগের পর রেহাই পেলাম। হাঁফ ছেড়ে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরে বসা গেল। ঘরটা চা, সরবৎ ও মদের আড্ডা বা বিশ্রাম-কক্ষ, আর তারই একপাশে একটা জাভার শিল্পদ্রব্যের দোকান। এই ঘরে সারি সারি নানান দেশের লোক বসে আরাম করছেন। আমরা তাদের দলে যোগ দিলাম। চায়ের কাপ সমাপনান্তে পাশের দোকানে জাভা দেশের শিল্পদ্রব্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সুরু করলাম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, কারণ কাস্টমসের ভূত পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কুটোটিও নাড়তে দেবে না, আর নাড়াতে দিলেও ঝামেলা অনেক।

অধিকাংশই কাঠের তৈয়ারী নানাবিধ খেলনা ও সৌখিন জিনিষ মনোহরণ করে মনোহারী দোকানে শোভা পাচ্ছে। উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ জিনিষগুলো দেখলাম। প্রতিটি জিনিষে জাভার শিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করবার। যুগ যুগ ধরে ভারত তার সঙ্গে যে শিল্পের দেনা-পাওনার হিসাব গড়ে তুলেছিল, আজকের শিল্পে সে হিসাবের নামগন্ধ নেই। বরবুদুরের যবদ্বীপ এখন স্বাধীন জাভা—আধুনিক শিল্প এই পরিবর্তনের সাথী ও প্রতীক।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার প্লেন-এ যাত্রা সুরু হল—এবার লম্বা পাড়ি, নতুন মহাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।

অষ্ট্রেলিয়া সব চেয়ে নতুন মহাদেশ। ছেলেবেলায় ভূগোলের পাতায় এই মহাদেশের সঙ্গে পরিচয় সুরু। জ্ঞান হওয়ার তালে তালে টিনের দুধ ও মাখনের টিনের মারফতে পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হতে সুরু করল···আর আজ চলেছি আরও নিকটতর পরিচিতির প্রয়াসে।

মাথার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কথা ক্রমাগতই ডিগবাজী খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন সুদূর অতীতে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার এত অভেদ্য সম্বন্ধ ছিল। তারপর কালের গতিতে পৃথিবীর ভাঙাগড়ার মাঝে তারা ক্রমশঃই পৃথক হয়ে গেল—মাঝখানে তাদের বিরাট জলরাশি ব্যবধানের সৃষ্টি করল। সম্বন্ধ ঘুচে গেল: আর কে কার খোঁজ খবর রাখে? এক আধ বছর নয়—হাজার হাজার বছর কেটে গেছে—কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখে নি। যে যার ধান্দায় ছিল ব্যস্ত।

১৭৮৩ খৃঃ আমেরিকা স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইংরাজরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ইংলণ্ডের চোর-ছ্যাঁচড়গুলোকে কোথায় পাঠান যায়? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। ব্রিটিশ নৌ-দপ্তরের পুরানো খাতাপত্রে ক্যাপ্টেন কুকের ১৭৭০ খৃঃ অষ্ট্রেলিয়া নামের নতুন মহাদেশের সন্ধান মিলল। আর ভাবনা নেই—পার্লামেন্টে আইন পাশ হল—এখন থেকে যত চোর-জোচ্চর খুনে-বদমাশ আসামীকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠান হোক। তথাস্তু।

১৭৮৭ খৃঃ প্রথম জাহাজ ছাড়ল ইংলণ্ডের বন্দর থেকে আসামী বোঝাই করে। ভাগ্যিস্ ভারতবর্ষের কাছে আন্দামান নিকোবর ছিল। নয়ত ইংরাজরাজ ভারতের যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডপ্রাপ্ত লোকগুলিকে কোথায় পাঠাতেন কে জানে?

সেই থেকে সুরু হল—আসামী-বোঝাই জাহাজের যাতায়াত ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মাঝে। কিন্তু সোনা চুরির অপরাধে যাদের দ্বীপান্তরে পাঠান হ'ল, তাদের হাতেই মরুভূমির দেশ থেকে বেরুলো সোনা। ইংলণ্ডের লোক ত তাজ্জব। সোনার খোঁজে সারা দুনিয়া লুটেপুটে বেড়াচ্ছে আর সেই সোনার খোঁজ বেরুল আজ অষ্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে। ছুটোছুটি পড়ে গেল অষ্ট্রেলিয়া যাবার। রাতারাতি বরাত ফেরাতে কে না চায়—হোক না সে মরুভূমি—হোক না আসামীর দেশ—হোক না সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার। দলে দলে লোভী ইংরাজ ভেসে পড়ল অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে। সেই থেকে এই মহাদেশের সত্যিকার ভাগ্য পরিবর্তন সুরু হ'ল। শতাব্দী ধরে যে সব আদিবাসী অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছিল, তাদের তাড়িয়ে মেরে—কালা অষ্ট্রেলিয়া—সাদা অষ্ট্রেলিয়ায় পরিণত হতে সুরু করল। অতীতের মহাভারতের অংশ আজ মহা ব্রিটেনের অংশে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশঃ শ্রীসম্পদ সৌভাগ্যশালিনী হয়ে উঠতে লাগল।

অষ্ট্রেলিয়া—ভূগোলের পাতায় অষ্ট্রেলিয়া—দুধের টিন ও টিনের মাখনের দেশ অষ্ট্রেলিয়া—চিড়িয়াখানায় দেখা ক্যাঙারুর দেশ অষ্ট্রেলিয়া—ডন ব্র্যাডম্যানের পিতৃভূমি অষ্ট্রেলিয়া—আমি আজ উড়ে চলেছি সেই মহাদেশে। স্বাধীন নয়া ভারত থেকে প্রাচীন মহাভারতে।

[ক্রমশঃ।

ডক্টর গোলাপ চন্দ্র রায়চৌধুরী

[প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার]

আকস্মাৎ দেখলে মনে হবে ইনি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু একটু আলাপেই ধরতে পারা যায়, কোথাও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এঁর অনেকখানি—সাধারণ হয়েও ইনি ঠিক সাধারণ নন। এই স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতার অধিকার নিয়েই ডক্টর শ্রীগোলাপচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় জীবনপথে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসেছেন—সুনাম ও সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হয়ে চলেছে ধাপে ধাপে।

বাল্যকালেই গোলাপচন্দ্রের মনে সঙ্কল্প জাগে—বড় হতে হবে, প্রতিষ্ঠা পেতে হবে, যেমন করেই হোক। আরও এ-ও তাঁর জানা হয়ে যায় গোড়াতেই—সঙ্কল্পটি সিদ্ধির জন্যে সর্ববিষয়ে চাই ভালোরকম লেখাপড়া। ১৯০৯ সালের ২৩শে অক্টোবর বরিশাল সহরে এই মানুষটির জন্ম। এরপর যথাসময়ে পড়াশুনো তাঁর সুরু হয় পিতা ৺মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে। কোন দিক হতেই আবশ্যক যত্ন ও আগ্রহের অভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

বরিশালের নাম-করা স্কুল—পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন-বিদ্যালয়। সূচনায় এই বিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন ডক্টর রায় চৌধুরী। প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি দেন কলকাতার ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে। উদ্যমশীল ছাত্র হিসাবে পরবর্তী চার বছর কাটে তাঁর প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই মহাবিদ্যালয় থেকেই ১৯৩০ সালে তিনি ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ইতিহাস নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে থাকেন। ১৯৩২ সালে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এর এক বছর পরেই বিশ্ববিদ্যালয় ল-কলেজ থেকে আইন পরীক্ষা (ফাইন্যাল) দিয়েও তিনি উত্তীর্ণ হলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়ে।

ছাত্রজীবনে গোলাপচন্দ্রের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন অগ্রজ ৺হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। হেমচন্দ্র ছিলেন একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কারমাইকাল অধ্যাপক। পূজ্যপাদ দাদার চিহ্নিত পথ ধরে গোলাপচন্দ্রও ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। এম্-এ পাশ করবার পরও ইতিহাসশাস্ত্র নিয়েই তাই তাঁকে নিবিড়ভাবে গবেষণা করতে দেখা যায়। 'মেবারের প্রাচীন ইতিহাস' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ রচনা পেশ করে তিনি ১৯৪২ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। চালুক্যদের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখে ১৯৪৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রিতে তিনি ভূষিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিশিষ্টতা সুধীমহলে তখন আপন স্বীকৃতি লাভ করে।

গোলাপ চন্দ্র রায়চৌধুরী

ডক্টর রায়চৌধুরীর কর্মজীবনের অধ্যায়টি (যা শেষ হয়ে যায়নি এখনও) তাঁর ছাত্রজীবনের মতোই প্রোজ্জ্বল। এ যাবৎ যখন যে পদের দায়িত্বভার
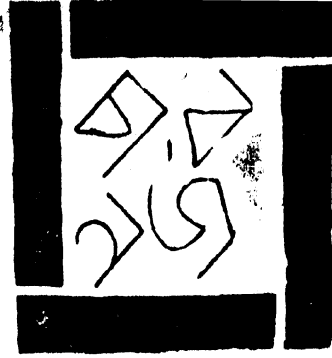
তিনি নিয়েছেন, স্বাতন্ত্র্য ও যোগ্যতার অম্লান স্বাক্ষর রয়েছে সেইখানেই। সর্ব্বপ্রথমে তিনি কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে অধ্যাপকের সম্মানজনক পদে নিযুক্ত হন (১৯৩৬-৪৫)। তারপর তিনি আশুতোষ কলেজে (ভবানীপুর) ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইত্যবসরে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সমাজের কাছে তাঁর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে যায় বহুল পরিমাণে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের (প্রাচীন সংস্কৃতি ইতিহাস) লেকচারার হিসাবে আসন গ্রহণ করেন (১৯৪৮-৫৪)। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য কলেজ সমূহের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন—পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের (ইতিহাস) কাজটিও।

আপন যোগ্যতাবলে ডক্টর রায়চৌধুরী সম্প্রতি নতুন মর্য্যাদায় ভূষিত হয়েছেন—তাঁকে সাগ্রহে মনোনীত করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) রেজিষ্ট্রার। নতুন পদের বিপুল দায়িত্ব সম্বন্ধে এই মানুষটি বেশ সচেতন—এটি লক্ষ্য করবার, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার তিনি বহুদিন থেকে সক্রিয় সদস্য। গত ডিসেম্বর (১৯৬০) মাসে আলিগড়ে যে সর্ব্ব ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল, সেখানে তাঁকে পুরোভাগে দেখতে পাওয়া গেছে। আলোচ্য ইতিহাস-কংগ্রেসে 'প্রাচীন ভারত' শাখার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনিই। শিক্ষাবিদ ও সংগঠক গোলাপচন্দ্র ভবিষ্যতে আরও প্রতিষ্ঠা পাবেন, এই আস্থা ও আশা নিশ্চয়ই রাখা যায়।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ কর

(এলাহাবাদ এ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)

২৪ পরগণা জেলার সোদপুর-বিলকান্দি গ্রামের অধিবাসী সরকারী চাকুরিয়া ৺গোপালকৃষ্ণ কর ও ৺অন্নদাময়ী দেবীর তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রনাথ কর। ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার হাটখোলায় জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ৺হরিদাস কর তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র ও আই, এফ, এর পূর্ব্বতন কোষাধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র নাথ কর তাঁহার অগ্রজ। মাতামহ ৺যদুনাথ মিত্র জেলা-আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। বিহার-ছাপড়ায় প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র

(ছাপড়া কোর্টে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইঁহার 'জুনিয়ার' ছিলেন) এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র—ইঁহারা ভূপেন্দ্রনাথের মাতুল।

ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা এ্যাকাডেমী, সোদপুর হাইস্কুল ও পরে পিতার কর্মস্থল লখনোস্থ এ্যাংলো-সংস্কৃত উচ্চবিদ্যালয়ে পড়িয়া ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাতার অসুস্থতার জন্য দেড় বৎসর পড়া বন্ধ থাকে। লখনৌ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে আই, এস, সি, ও ক্যানিং কলেজ হইতে ১৯১৮ সালে বি, এস, সি পাশ করিয়া তথায় অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ পড়িতে থাকেন, ও অধ্যক্ষ ক্যামেরণের সহায়তায় মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে Student-Demonstrator নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে এম, এ, পাশ করিয়া তিনি তথাকার লেকচারার নিযুক্ত হইয়া কয়েক মাসের মধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের সহঃ অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করিয়া সাড়ে ছয় বৎসর কার্য্য করেন। শেষভাগে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। এলাহাবাদের আইনজীবী ও তথাকার এ, ভি, কলেজের সম্পাদক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে নিজ কলেজ হইতে দেড় বৎসরের ছুটী লইয়া শ্রীকর মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে উহার অধ্যক্ষরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি লখনৌতে ফিরিয়া আসেন। তথায় সদ্যগঠিত আইন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যাপক কর ১৯২৩ সালে এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময় পিতার মৃত্যুতে ইঁহাকে যথেষ্ট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। সংসারে আয়ের অঙ্ক অনির্ধারিত, এই সকল সমস্যাগুলি বিবেচনা করিয়া তিনি মনঃস্থির করেন যে, অধ্যাপনাই শ্রেয়। সেই সময় শ্রদ্ধেয় কবি স্বনামধন্য গীতিকার ও প্রখ্যাত আইনজ্ঞ স্বর্গগত অতুলপ্রসাদ সেন শ্রীকরকে আইন-ব্যবসায়ে সর্ব প্রকার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথের অন্তরে যুবজনোচিত আদর্শ ও পার্থিব প্রয়োজনের সংঘাত দেখা দিল। পিতার ইচ্ছা ও নিজের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আইন পেশার—তদুপরি অতুল প্রসাদের মুক্ত মনের আহ্বান। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "মাষ্টার অব ল" পরীক্ষায় উদ্যোগী হন। যোগাযোগ হয় বিশ্বখ্যাত আইনজ্ঞ ডঃ রাধা বিনোদ পালের সহিত—তাঁহার পরামর্শে অদম্য উৎসাহে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল—অধ্যাপক-ব্রত গ্রহণে। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল প্রচুর গ্লানি, অতুল প্রসাদের আহ্বান, পিতার ইচ্ছা ও নিজ বাসনাকে দমিত করার জন্য।

ছাত্রাবস্থা হইতে শ্রীকর অতুল প্রসাদের সহিত পরিচিত। তখন অতুল প্রসাদ তথাকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কার্য্যকরী ভাবে যুক্ত। মানুষ হিসাবে অসাধারণ ছিলেন তিনি, বাঙ্গালীর অসুবিধা, অভাব, অভিযোগ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন। বাঙ্গালীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার বাড়ীতে নানা মজলিস্ বসিত, সকলের অবারিত দ্বার সেখানে। বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান করা, মেধাবী বাঙ্গালী ছাত্রদের যোগ্য স্থানে নিয়োগ, দুঃস্থ বাঙ্গালী পরিবারকে সাহায্য, এ সমস্ত দেখিয়াছেন ভূপেন্দ্রনাথ অতুল প্রসাদের সান্নিধ্যে আসিয়া। বহির্বঙ্গের সেই "অসাধারণ বাঙ্গালী"র কথা বলিতে বলিতে শ্রীকরের কম্পিত কণ্ঠস্বর আমার নিকট ধরা পড়ে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি লখনৌ ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ এ, বি, কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার কলিকাতা 'বার'-এ যোগদানের ইচ্ছা থাকিলেও কলেজ-সমিতির বিশিষ্ট সদস্যদের অনুরোধে তিনি নিবৃত্ত হন। তেত্রিশ বৎসর উক্ত পদে থাকার পর গত জুলাই মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে অধ্যক্ষ কর ১৮ বৎসর লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের, ১০ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের, উহার এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, উহার ছাত্র-কল্যাণ সংস্থা, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, 'ভারতরত্ন' কার্ভে প্রতিষ্ঠিত পুনা মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, উত্তরপ্রদেশ 'অডিওভিজুয়াল' বোর্ড, উত্তর-প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, এলাহাবাদে অধ্যক্ষ সভা প্রভৃতির সহিত জড়িত আছেন বা ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় Pedagogy ইনঃ সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীকর নানারূপ খেলাধূলা করিতেন এবং বর্তমানে কয়েকটী ক্রীড়া-সংস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ রবীন্দ্র সাহিত্য বাসরের সভাপতি, নবগঠিত ঠাকুর-শত-বার্ষিকী সমিতির সদস্য ও নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য ও কিছু কাল উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শেফালিকা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী কর একজন বিদুষী মহিলা ও উত্তরপ্রদেশের কয়েকটী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্তা আছেন।

ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ বরাট

(মধ্যপ্রদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক)

চিকিৎসাশাস্ত্র ও মানবসেবাব্রত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকের কর্ম্মজীবনে অর্থকরী চিন্তা সেবা-মনোভাবকে আচ্ছন্ন করে রাখে; ইহার ব্যতিক্রম বাংলাদেশে আছে; কিন্তু বহির্বঙ্গের সুদূর জব্বলপুর সহরে পরিচয় হল এক বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে—যিনি নিজগুণে প্রদেশের জন-মানসে স্থায়ী চিহ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। কারণ অনাথ, আতুর, আর্ত্ত ও অক্ষমের অসুস্থতার অজুহাতে দর্শনী গ্রহণ করা—তিনি বরাবর অন্যায় বলে মনে করে এসেছেন। ইনি হলেন কেবলমাত্র জব্বলপুর জিলার নহে—মধ্যপ্রদেশের প্রথম সারির অন্যতম সুখ্যাত রোগবিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ বরাট।

স্বর্গগত চিকিৎসক রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বরাট ও ৺জ্ঞানদা দেবীর অষ্টম সন্তান (তৃতীয় পুত্র) সত্যচরণ ১৯০১ সালের ১লা আগষ্ট জব্বলপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাসস্থান হল বর্দ্ধমান জিলার কুমারপাড়া গ্রাম। পিতা সি, পি, গভর্ণমেণ্টে সিভিলসার্জেন ছিলেন, এবং অবসর গ্রহণের পর জব্বলপুর সহরের নানা উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উহার প্রতিদানে স্থানীয় অধিবাসীরা ও পৌরসভা সহরের একটী প্রধান পথ ৺সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত করে রেখেছেন।

সত্যচরণ ১৯১৯ সালে কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২১ সালে কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই, এস, সি

পাশ করেন। অধ্যবসায়ী পিতার ন্যায় চিকিৎসক হওয়ার বাসনা তাঁহার অন্তরে বাল্যকাল হ'তেই সুপ্ত ছিল, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক পরলোকগত বিভূতি ভূষণ বরাটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' তিনি ১৯২১ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। পাঁচ বৎসর পরে সেখান থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সেস্থলে তিন বৎসর যুক্ত থাকেন। ইহার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থ যখন বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন, তখন পিতার মৃত্যু হয়। ফলে, তিনি জব্বলপুরে ফিরে আসেন ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। স্থানান্তরে বদলী হওয়ায় তিন বৎসর পরে তিনি পদত্যাগ করে ১৯৩২ সালে উক্ত সহরে স্বাধীন পেশা আরম্ভ করেন।

জনসেবা তাঁহার আদর্শ হওয়ায় তিনি প্রথম থেকেই কঠোর পরিশ্রম ও চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাদি নিয়মিত পড়তে থাকেন। আজও উহা অব্যাহত আছে—তজ্জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্ব শেষ তথ্য সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। সেই কারণে প্রদেশের অধি[illegible] চিকিৎসক তাঁহার নিকট আসিয়া বহু উপদেশ ও পরামর্শ নিয়ে থাকেন। স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজ থেকে সদ্য উত্তীর্ণ ছাত্ররা এক বৎসর তাঁর নিকট শিক্ষানবিশী করে থাকেন। এজন্য ডাঃ বরাটের মধ্যে নেই দ্বিধা—নেই বিরক্তি—নেই অসন্তোষ,—নেই অহমিকা। অন্তদিকে, অসমর্থ অসুস্থ ব্যক্তিদের নিরাময় করে তোলার দায়িত্ব যেন তাঁর! দেখেছি, প্রত্যহ সকাল ও বিকাল—কতশত রোগী 'চেম্বার'-এ উপস্থিত—বরাট সাহেবের সুচিকিৎসায় তাঁরা রোগমুক্ত হতে চাহেন—কারণ, তিনিই ত তাঁদের আশা-ভরসা। এঁদের মধ্যে বহু থাকেন সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব—অনেকে থাকেন নিম্নমধ্যবিত্ত, অল্প সংখ্যকই পুরা 'দর্শনী' দিতে সক্ষম। কিন্তু ডাঃ বরাট ত অর্থ-প্রত্যাশী নন, যতটুকু পেলেন ততটুকু সানন্দে গ্রহণ করেন, যাঁর কাছ থেকে এক পয়সা মেলে না, তাঁরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন সমদরদী হয়ে। তজ্জন্য চিকিৎসক সত্যচরণের হৃদয়ে নেই ক্ষোভ, নেই দুঃখ, নেই হা-হুতাশ। তাঁর অন্তরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে আছে, আর্ত্ত-আতুরের জন্য সহৃদয়তা, অনুকম্পা ও সেবাব্রত আর সর্ব্বোপরি এক আত্মভোলাভাব! তাঁর পেশা আরম্ভের প্রথমদিকে পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকদের বঞ্চিত না করার জন্য তিনি বাঙ্গালী রোগী দেখতেন না। কিন্তু একদিন এক অসহায়া বাঙ্গালী রমণী তাঁর অসুস্থ স্বামীকে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন ডাক্তার বরাটকে। তিনি ত অটল। শেষে শ্রীমতী বরাটের উৎকণ্ঠায় সত্যচরণ উক্ত রোগীর ভার গ্রহণ করে তাঁহাকে নিরাময় করে তোলেন। পরে তিনি স্থির করেন যে, বাসিন্দা হোক আর বহিরাগত বাঙ্গালী হোক —বিনা 'দর্শনী'তে তিনি তাদের চিকিৎসা করবেন, এবং আজও তিনি পালন করে চলেছেন তাঁর সেই পন্থা।

দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দিকে—এই কথা জানা মাত্র চিকিৎসক সত্যচরণ প্রাক্-স্বাধীনতাকালে জব্বলপুরে প্রতিষ্ঠা করেন "সুরেন্দ্র নাথ টি, বি, হাসপাতাল"।

কেবল মাত্র বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসাবে নয়, অন্যান্য নানাবিধ সদ্‌গুণের জন্য শাসকমহল কয়েকবার আহ্বান জানান ডাঃ বরাটকে প্রাদেশিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগে সাহায্য করার জন্যে—সরকারের অন্যতম পরামর্শদাতারূপে। কিন্তু তিনি এ আহ্বানে সাড়া দিতে

ডাক্তার শ্রীসত্যচরণ বরাট

অক্ষম হন, কারণ তাঁর ধারণা যে, বে-সরকারী চিকিৎসক হিসাবে তিনি দেশ ও দশের সুখ দুঃখ, অভাব-অসুবিধা যতটা অনুভব করতে সক্ষম, কোন সরকারী পদাধিকারী হিসাবে তা অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সংযোগ রক্ষা করা হয়ত ঘটে উঠবে না।

ডাঃ বরাট স্থানীয় রোটারী ক্লাবের সর্ব্ব পুরাতন সদস্য ও তিনবার ঐ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। সমাজ শিক্ষা সমিতির সভাপতির পদও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়া তিনি মধ্যপ্রদেশ সমাজ কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান, মেডিক্যাল এসোঃর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও স্থানীয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতির তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

ছাত্র-জীবন থেকে তিনি ফুটবল ও টেনিস খেলায় পারদর্শী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি 'ব্রীজ' খেলায় এক বিশিষ্ট স্থান-অধিকারী। তিনি প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়নসীপ (ব্রীজ) লাভ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধূলার প্রসার ও প্রচারে তিনি অগ্রণী।

১৯৩৫ সালে ময়ূরভঞ্জ দেশীয় রাজ্যের ফরেষ্ট-অফিসার পরলোকগত নেপালচন্দ্র গুপ্তের বড় মেয়ে শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। শ্রীমতী বরাট স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন। ডাঃ ও শ্রীমতী বরাটের সম্মিলিত চেষ্টায় একটী সুন্দর গ্রন্থাগারের ও একটী নয়নাভিরাম উদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের নেপিয়ার রোডস্থ গৃহে।

বঙ্গের বাহিরে যে সমস্ত বাঙ্গালী বাসিন্দা আছেন—তাঁরা বঙ্গ শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিও সমভাবে গ্রহণ করবেন—এই আশাই ডাঃ বরাট করে থাকেন। তাঁর পুত্রকন্যাদেরও তিনি সেইভাবেই গড়ে তুলছেন।

ডক্টর শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস

(অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ও কমার্স বিভাগের প্রধান-অধ্যাপক)

গৌরসাহা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি ৺অক্ষয় কুমার দাসের পৌত্র ও শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণকান্ত ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাস পূর্ব্ববঙ্গের একজন শিক্ষিত ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হতেন। মাতা ছিলেন পরলোকগত পিয়ারীলাল দাস এম, এল, সির কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দুমতী দাস।

কৃষ্ণকান্ত ঢাকা পোগোজ স্কুল হইতে ১৯৩০ সালে প্রবেশিকা, জগন্নাথ কলেজ হইতে আইকম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, কম পাশ করিয়া ১৯৩৫ সালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ভর্ত্তি হন। ১৯৩৮ সালে তথা হইতে অনার্স বি, কম হইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন ও ঐ বৎসর নারায়ণগঞ্জের ৺সুরেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী চপলারাণীকে বিবাহ করেন। লণ্ডনে পড়ার সময় তিনি লাস্কি, লায়োনেল° রবিন্স, ভেরাএন্সটি আরণল্ড প্লাণ্ট প্রভৃতি শিক্ষকদের সহিত পরিচিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন ও পারিবারিক ব্যবসায় দেখাশুনা করেন। পরবৎসর দিল্লীর কলেজ অব কমার্স-এর লেকচারার ও হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন হিসাবে আসিয়া ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। পরে তিনি পুনরায় মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে যোগদান করেন। সেইসময় উক্ত কলেজে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্যে এক গোলমালের সূত্রপাত হয় এবং শেষোক্তরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসেন। কৃষ্ণকান্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করায় চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন; কিন্তু আদালতে উত্থাপিত মামলার রায়ে অধ্যাপক দাস জয়লাভ করেন। ডিক্রী পাওয়া সত্ত্বেও কলেজের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট-টাইম লেকচারার হিসাবে কার্য্য করেন। দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে চলিয়া আসেন—১৯৪৯ সালে বিভাগীয় প্রধান হন—১৯৫০ সালে তথাকার ফ্যাকাল্টি অব কমার্সের ডীন নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সালে আমেরিকার অন্তর্গত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Business School) হইতে অধ্যাপক দাসকে একটি বৃত্তি দেওয়া হয়; ফলে তিনি চারবৎসর তথায় অবস্থান করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে তাঁহাকে স্থানীয় ফ্যাকাল্টির সদস্য করা হয় ও রিসার্চ ফেলোসিপ দেওয়া হয়। "American Enterprise working outside country specially in India"—এই গবেষণামূলক তত্ত্বের জন্য হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ সালে তাঁহাকে Doctor of Comercial Scince (D. C. S) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডক্টর শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস

এশিয়া মহাদেশ হইতে একমাত্র ডঃ দাস উক্ত 'ডক্টরেট' পাইয়াছেন। ইহা বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গর্ব্বের বিষয়। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গ্রীষ্মের ছুটীতে (জুলাই-অক্টোবর) জ্ঞানপিপাসু ডঃ দাস অক্সফোর্ড BALLIOL Collage এ অধ্যাপক টি, বালোগ (Balogh) এর নিকট "ভারতের আর্থিক সমস্যা" সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উহা সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি পুনরায় ছয়মাসের জন্য তথায় যাইবেন এবং D. Phil উপাধির জন্য থিসিস্ দাখিল করিবেন।

আমেরিকাতে থাকার সময় তিনি CHASE National Bank এর সহিত একবৎসর যুক্ত থাকিয়া Investment, Industrial & Financial Analysis সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ডক্টর দাস "Management News" এরও সম্পাদক। ১৯৫৬-৫৯ সাল পর্য্যন্ত "Indian Journal of Commerce"-এর সম্পাদনা করেন, এবং তিনি বলেন যে, আমেরিকায় পড়িতে যাওয়ার সময় Study-leave পাওয়ার বিষয়ে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ ভি, এস, কৃষ্ণন্ তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন এবং একবার আমেরিকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। ডক্টর দাস অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে Management education উন্নীত করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী সংস্থা তজ্জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। যাহারা চাকুরীজীবী নহে—ব্যবসায় লিপ্ত নহে—বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—তাহাদের Master of Business Administration হিসাবে গড়িয়া তোলাই অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তথা ডক্টর কৃষ্ণকান্ত দাসের উদ্দেশ্য।

"Only a novel...in short, only some work in which the greatest powers of the mind are displayed, in which the most thorough knowledge of human nature, the haphiest delineation of its varieties are conveyed to the world in the best chosen language."

—*Jane Austen.*

সূর্য
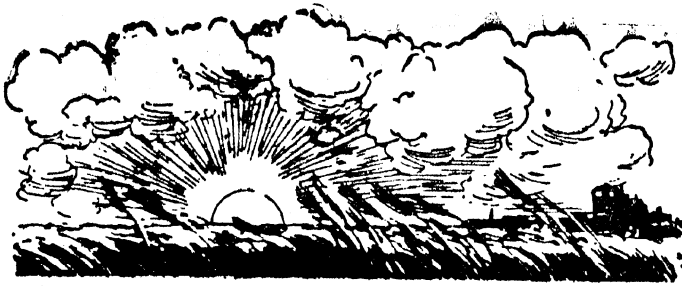
প, আ, আরিস্তোভ

প্রত্যেক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ খণ্ডগ্রাস গ্রহণের মত সুরু এবং শেষ হয়, কারণ চন্দ্র নিমেষে সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে পারে না। প্রথমে ইহা ক্রমাগত সূর্যের অধিকতর অংশ ঢাকিতে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া না ফেলে ততক্ষণ গ্রহণ খণ্ডগ্রাস হয়। যখন চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে, কেবলমাত্র তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সুরু হয়। তবে ইহার পরেও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছায়াবেষ্টনীর উভয় পার্শ্ব দিয়া দুইটি অর্দ্ধ ছায়া-বেষ্টনী সঞ্চারিত হইতে থাকে [চিত্র ৪]। সেখান হইতে গ্রহণ খণ্ডগ্রাসের মত দেখায়। তাহার পর চাঁদ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আসিতে আসিতে, সূর্য হইতে যেন হামাগুড়ি দিয়া নামিতে থাকে—
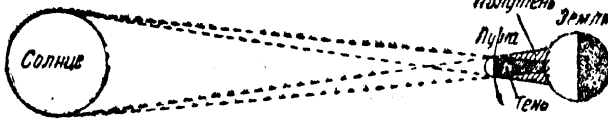
চিত্র নং ৪—গ্রহণের নক্সা

পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শেষ হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে সূর্যের আরো বেশী অংশ দেখা যায়—খণ্ডগ্রাস গ্রহণ থাকে।

পূর্ণগ্রাস গ্রহণ এক হইতে তিন, কচিৎ আট মিনিটব্যাপী দেখা যায়, খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখা যায় দুই-এক ঘণ্টা পর্যন্ত।

যদি অমাবস্যার সময়ে চন্দ্র আমাদের হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে [সুতরাং সাধারণ আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়] এবং ঠিক ঠিক পৃথিবী এবং সূর্যের কেন্দ্রগামী সরলরেখার উপরে অবস্থিত হয়, তবে গ্রহণের সময়ে চন্দ্র সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে পারে না। তখন চাঁদের চতুর্দিকে উজ্জ্বল চক্রাকার একটি চক্র [Rim] দেখা যায়। এইরূপ গ্রহণকে বলয়গ্রাস গ্রহণ বলা হয়।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ একটি অত্যন্ত সুষমাময় দৃশ্য। উজ্জ্বল দিন অন্ধকারলীন রাত্রিতে রূপান্তরিত হয়, আকাশে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখা যায়। এই সময়ে চন্দ্র দ্বারা আবৃত সূর্যের চতুর্দিকে একটি ফিকে গোলাপী বেষ্টনী দেখা যায় এবং তাহার উপরে থাকে রূপালী উজ্জ্বলতা—সূর্যের করোনা।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দল গঠিত হয়। ১

১ সূর্যগ্রহণের বিশদ বিবরণের জন্য সরকারী টেকনিক্যাল প্রকাশ-ভবনের 'জনগণবোধ্য বিজ্ঞানগ্রন্থমালায়' পুস্তিকা সূর্যগ্রহণ [অধ্যাপক ভ. ভ. ভোরু-ভর্গ্যান্তেভ] দ্রষ্টব্য।

সর্বশেষ সূর্যগ্রহণ, যাহার ছায়াবেষ্টনী সোভিয়েৎ ইউনিয়নের একটি বিশাল অঞ্চল দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন হইয়াছিল। গ্রহণের পূর্ণগ্রাসের অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রলম্বিত হইয়াছিল ক্লাইপেদ্ [লিথুয়ানিয়ান্ এস, এস, আর] শহরের নিকট। ইহা ১৪১ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ৎবিলিস্, তাস্ কেন্দ্, খার্ কোভ, আলমাআতা এবং অন্যান্য শহর হইতে অভিযাত্রীদল আসিয়াছিল। পর্যবেক্ষণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য সরলতম যন্ত্র হিসাবে সাধারণ জানালার সার্সির কাচ কাজে লাগানো যায়। তাহাকে ব্যবহারের আগে ধোঁয়া লাগাইয়া কালো করা দরকার।

কালি যাহাতে উঠিয়া না যায়, সেই জন্য কাচের ধোঁয়া-লাগানো পাশটি অন্য একটি পরিষ্কার কাচ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দরকার এবং তাহারা যাহাতে সরিয়া না যায়। তাহার জন্য একটা কিছু দিয়া ইহাদের আটকাইয়া রাখা দরকার। খালি চোখে গ্রহণ দেখা চোখের পক্ষে সাংঘাতিক।

বিজ্ঞানের কাছে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করার বিরাট তাৎপর্য আছে। পূর্ণগ্রহণের সময়ে সূর্যে এমন সব জিনিস লক্ষ্য করা হয়, সাধারণ অবস্থায় যাহাদের পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। যথা, এই ভাবে সূর্যের আবহ পর্যবেক্ষণ করা হয়; সূর্যগ্রহণের ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্রের ভ্রমণকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কখন সূর্যগ্রহণ হইবে, তাহা জ্যোতির্বিদগণ বহু বৎসর পূর্বেই অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। যেমন, সকলেই সঠিকভাবে জানে যে, মস্কো এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে দেখা যাইবে এমন সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ২১২৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, অর্থাৎ মোটামুটি ১৭০ বৎসর পরে হইবে।

৩। সূর্যের আয়তন ও ভর

সূর্য আমাদের নিকট ছোট আকারের বলিয়া মনে হয়। সূর্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, তাহাপেক্ষা প্রায় ৪০ গুণ দূরে অবস্থিত প্লুটো হইতে দেখিলে সূর্যকে আরো ছোট বলিয়া মনে হইবে। ইহার যথার্থ আয়তন কত?

সূর্য একটি বিশাল জ্যোতিষ্ক। তাহার আয়তন আমাদের পৃথিবীর ঘনমানের ১,৩০০,০০০ গুণেরও বেশী। সূর্যের ব্যাস

১,৪০০,০০০ কিলোমিটার। ইহা পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ বড়। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, চন্দ্র এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব ৩৮৪০০০ কিলোমিটার। যদি চাঁদ হইতে পৃথিবীর দূরত্বের দ্বিগুণ ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট একটি গোলক কল্পনা করা যায়, তবে ইহার আকার সূর্যের সমান হইবে [চিত্র ৫]।

সূর্য এবং পৃথিবীর তুলনামূলক আকার আরো স্পষ্টভাবে কল্পনা করার জন্য নিম্নবর্তী তুলনাটি আনা যাক। একটি পাত্রে প্রায়
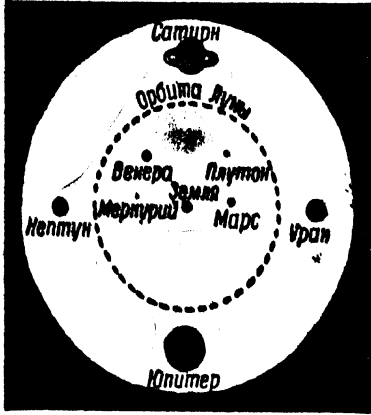
চিত্র নং ৫—সূর্যের সহিত গ্রহগুলির আয়তনের তুলনা। শাদা চক্রটি সূর্যের আয়তনের প্রতীক।

এক লক্ষ তিরিশ হাজার গমের দানা রহিয়াছে। যদি আমরা দশ পাত্র গম স্তূপাকারে ঢালি এবং তাহার নিকটে একটি গমের দানা রাখি তবে স্তূপের ঘনমান এবং আলাদাকরা দানাটির ঘনমানের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহা পৃথিবী এবং সূর্যের আকারের সম্পর্কের মত।

সূর্য এবং পৃথিবীর ভরের সম্পর্ক ভিন্ন প্রকার।

যদি জলের ঘনত্বের সঙ্গে সূর্য এবং পৃথিবীর গড় ঘনত্বের তুলনা করা হয়, তবে দেখা যায় যে, সূর্যের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় দেড়গুণ এবং পৃথিবীর গড় ঘনত্বের চারগুণ কম। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের ৩৩০,০০০ গুণের বেশী। পৃথিবীর ওজন প্রায় ৬,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন। যদি সূর্যের ওজন টনে প্রকাশ করিতে হয়, তবে একটি সংখ্যা পাওয়া যাইবে, যাহা একটি দুই এবং সাতাশটি শূন্য ধারণ করে।

৪। সূর্যের উষ্ণতা এবং অন্তর্দেশের সংগঠন

এই কিছুদিন পূর্ব্বেও গত শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ হার্শেল জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, সূর্য একটি শীতল গোলাকার বস্তুপিণ্ড। ইহা পৃথিবীর মত প্রাণি-অধ্যুষিত এবং মেঘের দুইটি স্তর দ্বারা আবৃত। বাহিরের স্তরটি উত্তপ্ত এবং উজ্জ্বল এবং ভিতরকার (বাহিরের স্তরটির নীচে স্তর) স্তরটি ঘন এবং শীতল। তাহা তাপ এবং উজ্জ্বল আলো হইতে সূর্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

আরো পরে এই মত প্রচারিত হইয়াছিল যে সূর্য একটি অগ্নিময় জ্বলন্ত গলিত ধাতুপিণ্ড।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে সূর্য একটি অত্যুত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তুপিণ্ড। ইহার পৃষ্ঠদেশে উষ্ণতা প্রায় ৬০০০° সেণ্টিগ্রেড এবং কেন্দ্রস্থলে উষ্ণতা ২ কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

কেন্দ্রের দিকে সূর্যের উষ্ণতা বাড়িতে থাকে বলিয়া সূর্যগোলকের প্রান্তদেশে কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা উজ্জ্বলতা কম। ইহার কারণ এই যে, সূর্যগোলকের প্রান্তদেশে কেবলমাত্র সূর্যের উপরের স্তর দেখা যায়। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দূরদর্শন যন্ত্রে সূর্যের পৃষ্ঠদেশের উজ্জ্বলতার অসমতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সূর্যের কেন্দ্রাংশের বস্তু প্রচণ্ড চাপের অধীনে রহিয়াছে বলিয়া ইহার ঘনত্বও অত্যন্ত বেশী। এই ঘনত্ব পৃথিবীতে আমাদের নিকট পরিচিত, সমস্ত বস্তুর ঘনত্ব অপেক্ষা বহুগুণে বেশী।

সূর্যের কেন্দ্রের বস্তুর এই বিপুল ঘনত্ব কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পরমাণুর সংগঠন মনে করা দরকার।

প্রতিটি পরমাণু একটি নিউক্লীয়স্ এবং তাহাকে পরিবেষ্টনকারী ইলেকট্রণ দ্বারা গঠিত। নিউক্লীয়স্ পরমাণুর কেন্দ্রাংশ আর ইলেকট্রণগুলি তথাকথিত ইলেকট্রণীয় আবরণ গঠিত করে। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর তাহার নিউক্লীয়সে কেন্দ্রীভূত। এই নিউক্লীয়সের আয়তন পূর্ণ একটি পরমাণুর অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ কম।

সূর্যে যেমন উচ্চ তাপমাত্রা রহিয়াছে, সেই অবস্থায় পরমাণু তাহার ইলেকট্রণীয় আবরণ হারাইয়া ফেলে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশেই, যেখানে উষ্ণতা ৬০০০° সেণ্টিগ্রেড—কিছু পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেকট্রণ নাই। সূর্যের কেন্দ্রের ব্যাপারে, যেখানে অসাধারণ উচ্চ তাপ বর্তমান এবং তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড—সেখানেও পরমাণুগুলি প্রায় পুরাপুরি ইলেকট্রণহীন। ইলেকট্রণ এবং পরমাণুর নিউক্লীয়স্ এই অবস্থায় পরস্পর নির্ভরশীল থাকে না। নিউক্লীয়সের চতুর্দিকে ইলেকট্রণীয় আবরণ এখানে আর থাকে না বলিয়া নিউক্লীয়স্গুলির মধ্যে দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হইতে পারে। এই কারণে সূর্য এবং তারকাগুলির কেন্দ্রস্থ সমস্ত বস্তু অত্যন্ত নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। সূর্যের কেন্দ্রাংশে যে বিপুল ঘনত্ব বর্তমান, ইহাই তাহার কারণ।

সূর্যের বস্তু মূলত: বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলের সামান্য মিশ্র। সূর্যে জটিল বস্তু থাকিতে পারে না, তাহারা বিয়োজিত হইয়া যায়।২ দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা জানি যে, জলীয় বাষ্প উচ্চ উষ্ণতায় ইহার সংগঠক জলযান এবং অম্লযানে বিয়োজিত হইয়া যায়।

৫। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের সংগঠন

সূর্য এমন চোখ-ধাঁধানো আলো দেয় যে, তাহার দিকে খালি চোখে তাকানো চলে না। দ্রুত দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কেবল বিশেষ ধরণের চশমা বা ধোঁয়া-লাগানো কাচের ভিতর দিয়াই সূর্যের দিকে তাকানো যায়। এইরূপ পর্যবেক্ষণে সূর্য আমাদের নিকট সর্বত্র একরূপ বলিয়া মনে হয়। ইহার পৃষ্ঠদেশের কোনো প্রকার

২ সূর্যের কলঙ্কময় প্রদেশগুলির পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নয়। তথায় উষ্ণতা তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সূর্যের সাধারণ পৃষ্ঠের উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম।

সাংগঠনিক বিশেষত্ব বা তাহার উপরে কোনো বস্তুর সঞ্চলন আমরা দেখিতে পাই না।

আসলে কিন্তু সূর্য এই প্রকার নহে। সূর্যের সুবিস্তৃত একটি আবরণ—আবহ আছে। তাহা সূর্যের চারিদিকে বহু সহস্র কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সূর্য কঠিন নহে—গ্যাসীয় বস্তু বলিয়া সূর্যের পৃষ্ঠদেশের এবং আবহের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহে রহিয়াছে। সূর্যের আবহের সংগঠন অসমসত্ত্ব। ইহা অনেকগুলি স্তর দ্বারা গঠিত।

সূর্যের সর্বনিম্ন স্তর ফোটোস্ফীয়ার (গ্রীক শব্দ 'ফোটোস্'-এর অর্থ আলোক এবং 'স্ফীয়ার'-এর অর্থ গোলক) পর্যবেক্ষণ করার সময় আমরা ফোটোস্ফীয়ারটিই দেখি, সূর্যের অধিকতর গভীর স্তরগুলি আমাদের নিকট দৃশ্যমান নহে। ফোটোস্ফীয়ার হইতেই মূলতঃ সূর্যের প্রায় সমস্ত আলোকশক্তি বিকীরিত হয়।

ফোটোস্ফীয়ারের ঠিক উপরিস্থিত এবং তাহার সঙ্গে আংশিকভাবে মিশ্রিত সূর্যের আবহের স্তরকে reversing layer বলা হয়। ইহার বেধ কয়েক শত কিলোমিটার।

Reversing layer স্তরের অব্যবহিত উপরে সংলগ্ন ক্রোমো-স্ফীয়ার, অর্থাৎ গ্রীক হইতে অনুবাদে অনুরঞ্জিত স্তর। ইহা সূর্যের পৃষ্ঠের উপরে ১৪ সহস্র কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত এবং ইহা সূর্যের আবহের সর্বাপেক্ষা তমুকৃত অংশ। এই অঞ্চলে গ্যাসীয় পদার্থের অত্যধিক পরিচলন সংঘটিত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে (বিশেষ ব্যবস্থাসহ) পর্যবেক্ষণ করিলে ইহা প্রজ্বলন্ত বনভূমির কথা মনে করাইয়া দেয়। সূর্যগ্রহণের সময় ক্রোমোস্ফীয়ার একটি সংকীর্ণ গোলাপী বা লালচে রঙের বলয়ের আকার ধারণ করে; এই বলয় সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া থাকে।
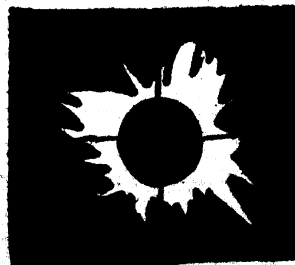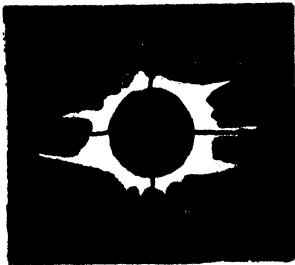
ক্রোমোস্ফীয়ারের আরো উপরে সূর্যের করোনা বিস্তৃত; পূর্বে কেবলমাত্র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে করোনোগ্রাফ নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে পর্যবেক্ষণ করা যাইত। ১১৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি বিশেষ যন্ত্র—বহির্গ্রহনিক করোনোগ্রাফ—নির্মাণের ফলে জ্যোতির্বিদগণ প্রত্যেক মেঘমুক্ত দিনে বায়ু বেশ স্বচ্ছ থাকিলে, সূর্যের করোনা পর্যবেক্ষণ করিবার সম্ভাবনা পাইবেন।

করোনার আকৃতির নানা প্রকারের হয় (চিত্র ৬)। আকৃতি (প্রধানতঃ) সূর্যের উপরে কলঙ্কের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে।

৬। সূর্যের পৃষ্ঠে কী সংঘটিত হয়

সূর্যের পৃষ্ঠদেশের সংগঠন দানাদার (চিত্র ৭)। দানাগুলি সাধারণ পশ্চাদপটে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই ডিম্বাকৃতি হয়। দানার ব্যাস সোভিয়েৎ বিজ্ঞানী আ, প, গান্স্কির নির্ণয় অনুসারে গড়ে ৭০০ হইতে ১০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। প্রত্যেক দানা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তিন মিনিটের মত বর্তমান থাকে। তাহার পরে ইহা অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ইহার স্থলে নূতন একটি উপস্থিত হয়। দানার এই অদৃশ্য এবং আবির্ভূত হওয়া সূর্যের ফোটোস্ফীয়ার-এর অসমসত্ত্বতা এবং তাহার বস্তুর সদাসচলতার সহিত সংশ্লিষ্ট।

সূর্যের পৃষ্ঠের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার উপরে বিচ্ছিন্ন কালো কালো পরিসর রহিয়াছে। ইহাদিগকে সূর্যের কলঙ্ক বলে (চিত্র ৮)। ইহারা মধ্যে মধ্যে বিশাল আকৃতি প্রাপ্ত হয়—১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট হয়। অধিকতর উজ্জ্বল সাধারণ পশ্চাদপটে ইহারা আমাদের নিকট কালো বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাদের উষ্ণতা সূর্যের পৃষ্ঠের উষ্ণতা অপেক্ষা কম—প্রায় ৪৫০০° সেণ্টিগ্রেড। প্রথম দৃষ্টিতে কলঙ্কগুলিকে প্রায় স্থির বলিয়া মনে হয়, ইহাদের আকৃতি এবং মাপ মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ধীর গতিতে পরিবর্তিত হয়। কার্যতঃ, ইহারা বস্তুর বিপুল ঘূর্ণি প্রকৃতির সঞ্চলন; এই সঞ্চলন সেকেণ্ডে প্রায় দুই-এক কিলোমিটার বেগে সংঘটিত হয়। পৃথিবীতে অনেক কম গতিবেগ (সেকেণ্ডে ৩০-৪০ মিটার) এমন ঘূর্ণী ঝড়ের সৃষ্টি করে, যে বাড়ী প্রভৃতি ভাঙিয়া যায়। এই কথা মনে রাখিলে তবে সূর্যে ঘূর্ণীপ্রকৃতির সঞ্চলনের কী প্রচণ্ড শক্তি তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে।

প্রতিটি কলঙ্ক বা কলঙ্কের গোষ্ঠী চিরন্তন সৃষ্টি নহে, এক স্থানে কলঙ্ক অদৃশ্য হইয়া যায়, অন্য স্থানে নূতন একটি আবির্ভূত হয়।

সূর্যের পৃষ্ঠে কলঙ্ক অসমভাবে আকীর্ণ। বিষুব-রেখার (সূর্যের গোলককে উত্তর এবং দক্ষিণ—দুইটি গোলার্ধে বিভাজক রেখাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে) নিকটে ইহারা সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে জড় হয়।

কলঙ্কের সংখ্যাও স্থির নহে। ইহা একবার বাড়ে, একবার কমে। বহুসংখ্যক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গড়ে প্রত্যেক একাদশ বৎসরে একবার ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। তাহার

চিত্র নং ৬—বিভিন্ন রূপের সৌর জ্যোতির্মণ্ডল।

পরে সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। সর্বাপেক্ষা কম কলঙ্কের সময় এমন দিনও হয়, যখন সূর্যের পৃষ্ঠে কলঙ্ক একেবারে দেখাই যায় না।

চিত্র নং ৭—সূর্যপৃষ্ঠের কণিকাকার গঠন।

কালো কালো কলঙ্কের এবং সূর্যে তাহাদের সঞ্চলন পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্য সর্বত্র এক বেগে ঘোরে না। সূর্যের বিষুবরেখার উপরে ঘূর্ণনকাল ২৫ দিনের সমান আর ৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে ২৭ দিনের কাছাকাছি।

চিত্র নং ৮—সৌর কলংক।

সূর্যের পৃষ্ঠে বিরাট বিরাট আগুনের মত রক্তবর্ণ নানান খামখেয়ালী আকারের উদ্গমও দেখা যায়। ইহারা তথাকথিত Protuberance. মাঝে মাঝে তাহারা সূর্যের পৃষ্ঠের উপরে পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত উত্থিত হয়। Protuberanceগুলি অত্যুত্তপ্ত প্রোজ্জ্বল বস্তু (জলজান, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য) দ্বারা গঠিত। এই বস্তুগুলির সঞ্চলনের বেগ মাঝে মাঝে সেকেণ্ডে ৫০০ হইতে ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। বাহ্যিক আকৃতি, গতি ও অন্যান্য গুণের বিচারে protuberanceগুলি নানা দলে বিভক্ত হইয়া যায় (চিত্র ৯)।

পুলকোভ-এর জ্যোতির্বিদ ড. প. ভিয়াজানিৎসিন্-এর অনুসন্ধান অনুসারে Protuberanceগুলির উষ্ণতা সূর্যের reversing layer-এর উষ্ণতার নিকটবর্তী এবং প্রায় ৫০০০° সেন্টিগ্রেড।

যে কোনো সময় Protuberance পর্যবেক্ষণ করা যায়। ইহার জন্য বিশেষ ধরণের Optical instruments এবং বিশেষ ধরণের colour light filters ব্যবহার করা হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্য এবং ইহার করোনার ছায়া একটি কালো গোলকের দ্বারা একেবারে আবৃত হইয়া যায়।

যাহাদের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও সূর্যের উপরিভাগে তথাকথিত facula ও flocculi পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সূর্যের পৃষ্ঠের সাধারণ পশ্চাৎপটে অধিকতর উজ্জ্বল গঠনকে facula

চিত্র নং ৯—সৌর অগ্নিশিখার আলোকচিত্র।

বলে। ইহাদের প্রধানতঃ সূর্যগোলকের ধারে দেখা যায়। faculaর ঊর্ধ্বাংশকে flocculi বলা হয়। faculaর উষ্ণতা তাহাকে পরিবেষ্টনকারী ফোটোস্ফিয়ারের উষ্ণতার চেয়ে প্রায় ১০০০ সেন্টিগ্রেডে বেশী।

Facula ও flocculiকে বেশীর ভাগ সময় সূর্যের কলঙ্কগুলির নিকটে দেখা যায়, তবে মাঝে মাঝে এই গঠনকে আলাদা ভাবেও দেখা যায়।

[ক্রমশঃ।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এই রোমান্টিক আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর। তাঁর "প্রলয়প্রেরণা" কবিতায় মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের অনুপ্রসারণ লক্ষ্য করি।

তিনি বললেন—

"ঝঞ্ঝা বায়ু! ঝঞ্ঝা বায়ু,
ডাক মোতে প্রলয় আহবে,
মৃচ মূক ধরা বক্ষে
মাতিবি মুঁ সোল্লাস তাণ্ডবে।
মোতে কর বংশী তব—
বজাইবি ভৈরবী রাগিণী,
ঝঞ্ঝা রাণি! মো সঙ্গীতে
মিশু তব কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিঅ,
দিঅ মোতে অনন্ত জীবন,
কণ্ঠে মোর বজ্রবাণী
নেত্রে মোর প্রলয় দীপন।"

স্পষ্টতঃই এখানে অন্নদাশঙ্কর শেলির 'পশ্চিমা ঝড়ের গান' ও রবীন্দ্রনাথের "বর্ষ-শেষ"-এর গানে গলা দিয়েছেন। শেলি ঝড়ের কাছে প্রেরণা চেয়েছিলেন···নিজেকে সেই ঝড়ের বীণা করতে চেয়েছিলেন ("Make me thy lyre,) আর রবীন্দ্রনাথও নিজেকে করতে চেয়েছেন বীণা, করতে চেয়েছেন শঙ্খ। রুদ্র শঙ্খের রন্ধ্রে ঝড়ের ফুংকার দিয়ে তুলুন "অভ্রভেদী মঙ্গলনির্ঘোষ"। কবি অন্নদাশঙ্করও বাঁশীর মত বাজতে চেয়েছিলেন, তুলতে চেয়েছিলেন "ভৈরবী রাগিণী"। চেয়েছিলেন অনন্ত জীবন, কণ্ঠে বজ্রবাণী। কারণ তিনি যত অন্যায়, যত পাপ দূরীভূত করতে চান। ভস্মীভূত করতে চান—

যেতে পাপ, যেতে মিথ্যা,
যেতে মোহ, যেতে প্রবঞ্চনা,
ধর্ম নামে, নীতি নামে,
জাতি নামে যেতে আবর্জনা
বৈষম্যর ভেদরেখা,
ভণ্ডতার যেতে আচ্ছাদন
দুর্ব্বলর হাহাকার,
পীড়িতর মরম বেদন।

রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন যে, তিনি বিদূরিত করাতে চান :—

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ···
—(৩৭ সংখ্যক কবিতা : বলাকা : রবীন্দ্রনাথ)

'প্রলয় প্রেরণা'তে কবি অন্নদাশঙ্কর মনে করেছিলেন যে, তিনি প্রলয়ের ঝড়, চৈতন্যের আগুন। এমন অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের হ'লেও রবীন্দ্রনাথ যে অন্য-রোমান্টিক একথা কবিগুরু স্বয়ং স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবম্বিধ স্বীকারোক্তি আমরা অন্নদাশঙ্করের মধ্যেও পাই। "প্রলয় প্রেরণা" অপেক্ষা প্রণয় প্রেরণা তাঁর লীলাক্ষেত্র। প্রলয়ের গান যা তিনি গেয়েছিলেন, তা সত্য নয়···তা আকস্মিক। তাঁর আকস্মিক আত্মবিশ্বাস হয়েছিল যে—

"ঝটিকা মুঁ—বহি যিবি
দেশ 'পরে, যুগর উপরে,
অনল মুঁ—বহি যিবি
নির্জীবে, স্থবিরে, অকাতরে"

কিন্তু তাঁর আন্তরিক আত্মবিশ্বাস হ'ল যে, তিনি ঝড়ও নহেন, আগুনও নহেন। তাই "সৃজন স্বপ্ন" কবিতায় বললেন :—

"শুনিব যদি শুন গো রাণি
সে মুহে মোর মরম বাণী
সে মুহে মন কথা মো।
যে গীত দেলি সেদিন গাই
সে গীতে মোর হৃদয় নাহিঁ
নাহিঁ সে গীতে ব্যথা মো।
গোপন করি কি হেব, প্রিয়া
মুহেঁ মুঁ ঝড় মুহেঁ মুঁ নিআঁ
মুহেঁ মুঁ শমশান গো।"

"আজি এ শুভ শারদপ্রাতে" এখানে প্রলয়ের গান বৃথা—

"প্রলয় কথা প্রলাপ সম
শুভুছি আনি শ্রবণে মম
কি হেব কার বিনাশে ?" *

---

* ধ্বনির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি—
[মাত্রা সংকেত (৫ + ৫ + ৫ + ৩)]—
"নিশীথে বারি-পতন-সম
ধ্বনিছে মম শ্রবণে"
ও অন্নদাশঙ্করের [৫ + ৫ + ৫ + ৩]—
"শুভুছি আনি শ্রবণে মম
কি হেব কার বিনাশে"
পংক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কারণ কবি জানেন—

"জানিলি মনে—মুহেঁ মুঁ বীর
সমর মদে—চির মদির ;
মুহিঁ স্বপন বিলাসী"

তাই কবি পলায়নী-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের মত সুদূরের দিকে যাত্রা করেন। কারণ এই বেদনায় বিদীর্ণ পৃথিবীতে তাঁর অন্তরের স্বপ্ন সফল হচ্ছে না। তাই পালিয়ে যাবেন তিনি দূরে···সুদূরে···স্বপন লোকে···গোপন পুরে গ্রহতারকা এড়িয়ে সেই যৌবনের লীলা-ভূমে চিরবসন্তের দেশে, যেখানে মলয়ের বাতাস চিরকাল বইছে ··কুসুমকেতু উড়িয়ে। মেঘদূতের অলকাপুরীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথমা প্রিয়াকে পাবার জন্ম মানস অভিসার যেমন করেছিলেন, তেমনি অন্নদাশঙ্করও বলেন :—

এ লোকে মোর বাসনা জল
ব্যর্থ বৃথা সিনা সকল .
এ লোকু ষিবি পলাই।
ষিবি পলাই দূরে সুদূরে
স্বপন লোকে গোপন পুরে
গ্রহ-তারকা এড়াই।
যউবনর ঝরণা কূলে
মলয় যহিঁ নিয়ত বুলে
কুসুমকেতু উড়াই।

—স্বজন স্বপ্ন : অন্নদাশঙ্কর

অন্নদাশঙ্করের প্রলয় ভাবনার দৃপ্ত ধ্বনি প্রণয়লীলা-মাধুর্য্যের ক্ষেত্রে কোমলকান্ত পদাবলী হয়ে এল। "মানসী ও মুঁ" কবিতায় কবিপ্রকৃতির রোমাণ্টিক আকুলতা চমৎকার রূপ পেয়েছে। নারী চাইছে নীড়, নর চাইছে আকাশ। কবি বলেন, আকাশ আমায় ডাকছে, ডাকছে বাতাস "বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী বাজিয়ে"··· এ অবস্থায় ঘরে কি মন থাকে ?

"আকাশ ডাকে ডাকে
বতাস আখে পাখে
বজাএ মুরলী গো
মুরলী সুদূরের"

* * *

পুরুষ চিত্ত কহে,
"ঘরে কি মন রহে ?"
রমণী প্রাণ ঘরে,
তরাসে থর থর।

—মানসী ও মুঁ : অন্নদাশঙ্কর

অন্নদাশঙ্করের কবিচিত্ত রোমাণ্টিক···তিনি যৌবনস্বপ্নের কবি। এ উপলব্ধি তাঁর অন্তরের যে, একবার যৌবন চলে গেলে আর ফিরে আসেনা···অন্তরের বৃথা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই মাথা খুঁড়ে মরে যাবে। বাইরের জগতের কোনও কিছুই নষ্ট হয়না···অন্তরের বাসনা অন্তরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বেদনা বাইরের নয়, বেদনা অন্তরের। কবি বলেন :

জগতে হজেনা কিছি
হজে জীবনে
যাহারে বেদনা ন'াহি
বেদনা মনে।'
বৃথা বিধুর পরাণপুরে
মুরে বাসনা—
আহা যউবন ঝরে গেলে
আউ আসে না।

—যউবন ঝরে গেলে আউ আসেনা : অন্নদাশঙ্কর

"এবারের মত বসন্ত গত জীবনে"র দুঃখ রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। * অন্যত্র "পরীমহল : উত্তরা"তে কবি এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন :—

"পুর্ণিত আসিব ফেরি ফাল্গুনী জোছনা
যুগে যুগে নিশি হেব শোভনা।
সবুত রহিব, আহা ন থিবি মুঁ একা গো!
এ মধু ধরণী মোর থরটিএ দেখা গো।
মরমে মুরুছি মরে কামনা! —পরীমহল : উত্তরা

এ বেদনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কি অনুপম ভাবেই না ধরা পড়েছে। রোমাণ্টিক অন্নদাশঙ্কর বাস্তবের কঠোর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ম মাঝে মাঝে গান ধরেছেন আবার রবীন্দ্রনাথের মত। রঙ্গময়ী কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরতে চেয়েছিলেন সংসারের কর্মক্ষেত্রে ('এবার ফিরাও মোরে')···সেই ভাব-ভাষা ও ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত অন্নদাশঙ্করের "কমল বিলাসী'র বিদায়" নামে সনেটগুচ্ছ নির্মিত কবিতা। সেখানে তিনি বলেছেন :—

নিষ্ঠুর বাস্তবরণে আসিছি আহ্বান।
থাঅ মুগ্ধা প্রণয়িনী, স্বপ্নালসা বাণী ;
কমল বিলাসী কবি মাগই মেলাণি ;
আজি মুঁ ভুলিবি সোতে ঢালি দেবি প্রাণ।
শত স্বরে ডাকে বিশ্ব, ডাকে গ্রহতারা,
ডাকে মোতে অনন্ত জলধি কলরোল ;
কেমন্তে রহিবি, কহ, স্নেহর এ কারা—
কক্ষে অলস স্বপন বক্ষে হোই ভোল ?

* * *

বীণাপাণি
কবিতা কমলবন্ধু দিঅ গো মেলাণি।

—কমল বিলাসীর বিদায়। অন্নদাশঙ্কর

রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে'র মহাপয়ারে (১৮ অক্ষর) যা বলেছিলেন তারই অনুসরণে এই (১৪ অক্ষরের) সনেটগুচ্ছে কবি মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা ধ্বনিত করতে চান 'উৎপীড়িত নিরুদ্ধ কণ্ঠে স্ফুরি উঠু দৃপ্ত বাণী'। রবীন্দ্রনাথের মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নেচে

---

* অন্নদাশঙ্কর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও এড়িয়ে যেতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ পরীদের প্রবল প্রেরণাবশে "সবুজ পরী" "জর্দাপরী" ইত্যাদি নানা পরীদের জয়গান গেয়েছেন। অন্নদাশঙ্করও শ্বেতপরী, কনকপরী, সবুজ পরী, গোলাপী পরী, আসমানী পরীদের নিয়ে পরীমহলের কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

মেচে সত্যকে ধ্রুবতারা ক'রে প্রাগসরণের মত অন্নদাশঙ্কর বলেন,
'ধ্বংসের হিল্লোলে বাত্যাসম নাচিবি মুঁ ছন্দহীন ছন্দে'।

৩

রোমান্টিক কবিদের কাছে শেলি ও রবীন্দ্রনাথ প্রিয় হ'তে বাধ্য। বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক 'শেলি'র দ্বারা অনুপ্রাণিত, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অন্নদাশঙ্করের কবিতায় শেলির পশ্চিমা ঝড়ের গান শুনেছি ···বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের মধ্যে আমরা শেলির প্রেমদর্শনের (Love's Philosophy) অনুসৃতি লক্ষ্য করি। শেলি বলেছিলেন—

The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?
—Love's Philosophy : Shelley

রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তের যে বিশেষ ছন্দে "সোনারতরী"র "তোমরা ও আমরা" কবিতা রচনা করেছেন (মাত্রা—৬+৬+২) সেই ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সবুজ কবি বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক বলেন—

গন্ধ যে সনে মলয় সমীরে মিশে
তটিনী যে সনে সাগরকু যাএ বহি
যে সনে জোছনা শ্যামপ্রান্তরে মিশে
তুমরি পরাণে মিশি যিব আজি সহি।

কবি এখানে শেলির প্রথম পংক্তিগুলির সঙ্গে প্রত্যন্ত অংশের 'And the Moon-beams kiss the Sea' পংক্তিটির মিলন ঘটিয়ে রূপান্তর ক'রে উল্লিখিত অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠনাথের রচনা মৌলিক ও সুন্দর হয়েছে, তা কেবল অনুবাদে পর্য্যবসিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের নিম্নোদ্ধৃত চমৎকার কবিতাংশটি দেখা যাক—

জীবনটা কি খালি আকুল নয়নরে চাহিবা
কুটীরে একা বসি বিফল গীতি নিতি গাইবা।
পাগল বেশ সাজি
ক্ষিপ্ত ঘন আজি
উদাসে কহি যাএ যাহাকু খোজু সে তো কাহিঁবা।
সকল ভুলি আস পাগল গীতি আজি গাইবা।
—নববর্ষা সঙ্গীত : বৈকুণ্ঠনাথ

বর্ষার মেঘমন্দ্রিত অন্ধকারে বিরহ-ব্যাকুল চিত্তের অপূর্ব্ব বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র "নদীপথে" থেকে পরবর্ত্তী কালের অনেক চমৎকার কবিতার উপহার দিয়েছেন। কি চমৎকার—

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম বিশ্রাম হারা।
বারেক থেমে আসে'
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

আর এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে মনে পড়ে তার চোখ দুটি—

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বারে বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড় মড়,
আকাশ করে হাহাকার
মনে পড়িছে আঁখি তার।
—নদীপথে : সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথের ভাবের দ্বারা প্রভাবিত একথা উল্লিখিত কবিতা (বৈকুণ্ঠনাথের "নব বর্ষাসঙ্গীত") প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় ঠিক হবেনা··· কারণ বর্ষার দিনের এ অনুভূতির কথা কালিদাসের মেঘদূতের সময় থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে মেঘালোকে সুখীরাও আনমনা হয়ে যায়, বিরহীদের কথা আর কি বলবার। তবে ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা নিশ্চয়ই পাঠকের মনে আসবে। বৈকুণ্ঠনাথের কবিতাটির পংক্তিগুলি সাতমাত্রা মূল পর্ব্ব ও তিন মাত্রায় অতি পর্ব্ব যোগে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' হ'তেই এই ধরণের মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় যেমন—

যেমন কালো মেঘে | অরুণ আলো লেগে |
মাধুরী ওঠে জেগে | প্রভাতে।

রবীন্দ্রনাথের ৬।৬।২ এই ধরণের ছয় মাত্রা পর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ও দুই মাত্রার অতি পর্ব্বিক মিলনজাত পংক্তির কবিতার উদাহরণ :—

আমরা বৃহৎ | অবোধ ঝড়ের | মত
আপন আবেগে | ছুটিয়া চলিয়া | আসি।
বিপুল আঁধারে | অসীম আকাশ | ছেয়ে
টুটিবারে চাহি | আপন হৃদয় | রাশি।
—তোমরা এবং আমরা : সোনারতরী : রবীন্দ্রনাথ

[কবিতার ঐ অংশে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল]

এবম্বিধ ৬।৬।২ মাত্রা সংকেতের ত্রি-পর্ব্বিক পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা বৈকুণ্ঠনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত "গন্ধ যে সনে | মলয় সমীরে | মিশে" ইত্যাদি।

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক রচিত আর একটি চমৎকার কবিতা নিচে উদ্ধৃত হ'ল। কবিতাটি "কবি প্রেয়সী" শিরোনামে উৎকল সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে "সবুজ কবিতা" সংগ্রহে "সমাধিস্মৃতি" নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'ভুল ভাঙ্গা'র ছন্দের ন্যায়।

প্রিয়তম কেতে	প্রয়াস করিছি	তুমরি কবি	৬+৬+৫
গাহিব সে গীত	লেখিব বোসি সে	মোহন ছবি।	৬+৬+৫
পারি নাহিঁ আগো	পারি নাহিঁ যবে	৬+৬
নিতি নিতি গ্লানি	অবজ্ঞা ভবে	৬+৬
নিরাশারে তুলি	নিক্ষেপিছি গো	যাইছি দ্রবি	৬+৬+৫
প্রিয়তম কেতে	প্রয়াস করিছি	তুমরি কবি।	৬+৬+৫

—সমাধিস্মৃতি : বৈকুণ্ঠনাথ

আর রবীন্দ্রনাথের "ভুলভাঙা" দেখুন :—

বুঝেছি আমার	নিশার স্বপন	হয়েছে ভোর।	৬+৬+৫
মালা ছিল তার	ফুলগুলি গেছে + রয়েছে ডোর।	৬+৬+৫
নেই আর সেই	চুপি চুপি চাওয়া,	৬+৬
ধীরে কাছে এসে	ফিরে ফিরে যাওয়া,	৬+৬
চেয়ে আছে আঁখি	নাই ও আঁখিতে	প্রেমের ঘোর।	৬+৬+২
বাহুলতা শুধু	বন্ধন পাশ	বাহুতে মোর॥	৬+৬+২

—ভুলভাঙা : মানসী : রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্করের যে কবিতাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দের অনুসরণ অতি স্পষ্ট। যেমন—

(ক) ১৮ অক্ষরের মহাপয়ার—ঝঞ্ঝা বায়ু! ঝঞ্ঝা বায়ু, ডাক মোতে প্রলয় আহবে (অন্নদাশঙ্কর) তুলনায় রবীন্দ্রনাথের—"এবার ফিরাও মোরে" "সমুদ্রের প্রতি"।

(খ) মাত্রাবৃত্ত : মাত্রাসংকেত ৫+৫ | ৫+৫ | ৫+৩

যেমন "শুনব যদি, শুন গো রাণি" ইত্যাদি। এতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার ও হ্রস্বমাত্রার (তিনমাত্রার) একটি পর্ব্ব আছে। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে বারি | পতনসম | ধ্বনিছে মম | শ্রবণে"।

(গ) সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্ত। যথা :—

"আকাশ ডাকে ডাকে" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্ত "প্রভাত সঙ্গীত"-এর "হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি" ছন্দে নানাভাবে বিবর্ত্তিত রয়েছে।

॥ ৪ ॥

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অন্নদাশঙ্কর ওড়িয়াতে রবীন্দ্রানুসারী কবিতা রচনা করবেন এতে বিস্ময়ের কোনও কারণ হয়ত নেই···কিন্তু অনেক বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এটি হয়ত বিস্ময়ের খবর হবে যে, আধুনিক উড়িষ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এককালে কবিতা রচনা করেছিলেন, এবং শ্রীমায়াধর মানসিংহ মহাশয় সে-সকল কবিতার বিশেষ কাব্যমূল্য স্বীকার না করলেও আমাদের কয়েকটি কবিতা নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। প্রথমতঃ, কবিতাগুলি নিছক পদ্য নয়, কবিতা। দ্বিতীয়তঃ, "সবুজ কবিতা"র সম্পাদক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর আলোচনা সবুজ সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে বাদ দেওয়া চলে না। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দের ধারানুসরণের প্রোজ্জ্বল উদাহরণরূপে বর্ত্তমান আলোচনায় ঐগুলির বিশেষ মূল্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ হ'তে বিদায় নিয়ে পৃথিবীর আনন্দ-বেদনার মধ্যে জীবনের সার্থকতার কথা বলেছিলেন। স্বর্গে স্নেহ নেই, প্রেম নাই, প্রাণ নেই, তাই দুঃখের পৃথিবীর দৈন্যের মাঝখানে জননীর স্নেহভরা কোলে, প্রেয়সীর আলিঙ্গনে, শঙ্কিত স্নেহে অনুরাগে তাঁর পূর্ণ পরিতৃপ্তি। কবি বলেছিলেন :—

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান,
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি·····

তাই তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

—স্বর্গ হইতে বিদায় : চিত্রা : রবীন্দ্রনাথ।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর চমৎকার "পুরীমন্দির" কবিতার কোনও কোনও অংশে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের দ্বারা কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন দেখা যাক। যদিও কালিন্দীচরণের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র তবুও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ প্রতিধ্বনিত ক'রে তিনি বলেন :—

পুরীমন্দির : কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী

বইকুণ্ঠ নাহিঁ ভল লাগে
এ মর্ত্ত্য ভুবন
মো স্নেহ সদন
এ ধরণী
সুখমণি।

* * *

লভিয়াছি যে সম্পদ এ মর জীবনে,
মিলই সে কেবে কেউঁ অমর ভুবনে।
এ জীবনে লভিছি যে নিধি
তুচ্ছ করি দিএ স্বর্গ সিদ্ধি ;
ভোগি থাকু তাহা
বেল নাহিঁ আহা,
কিবা লোড়া
স্বর্গ যোড়া।
এ ধরার সুখ দুঃখ স্নিগ্ধরূপ সুন্দর কুৎসিত
অতি আদরের মোর, এ জীবনে অতি পরিচিত
কেতে আশা কেতে মোর আকাঙ্ক্ষার ধন
ছাড়ি সবু ন লোড়ই স্বরগ ভুবন,
জননীর অমৃত সেনেহ
লালিত করই এ যে দেহ
আশিষ পিতার
কল্যাণ আধার
এতে প্রাণ
এতে দান।

কেবল রবীন্দ্রনাথের ভাব বা ভাষা নয়, ছন্দও এখানে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' পয়ার ছন্দের সম্প্রসারিত রূপ। সেখানে পংক্তির অক্ষর সংখ্যা চতুর্দশ। এখানেও "লভিয়াছি যে সম্পদ এ মর জীবনে" ইত্যাদি পংক্তি চতুর্দশ অক্ষরে। রবীন্দ্রনাথের ১৮ অক্ষরের মহাপয়ার এ কবিতার অন্যত্র "এ ধরার সুখ দুঃখ" ইত্যাদি অংশে অনুকৃত। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দের অসমপংক্তিক মিত্রাক্ষর ছন্দের অকারণ অবারণ চলার (যাকে এক ধরণের প্রবহমান পয়ার বলা যেতে পারে) দ্বারা গঠিত "একথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর সাজাহান" ইত্যাদি চরণের ছোট বড় আকৃতির পংক্তিভূমক স্তবকের জন্য হিন্দীতে নাম হয়েছে "রবর ছন্দ" বা "কেঁচুবা ছন্দ"। এই ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে এই কবিতাংশটি ওড়িয়াতে কালিন্দীচরণ রচনা করেছেন।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত হিন্দী খড়ী বোলী কবিতা খরী বোলী কবিতা হয়েছে বলে আমি অন্যত্র মন্তব্য করেছি (আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান : প্রথম খণ্ড), ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধেও এবম্বিধ কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে তৎসম শব্দপ্রধান কোমলকান্ত পদাবলী রচনার ধারা দেখা দিয়েছে ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। প্রাগাধুনিক ওড়িয়া কাব্যের সঙ্গে এর গভীর পার্থক্য। আধুনিক

কালের নন্দকিশোর বল, গঙ্গাধর মেহের, নীলকণ্ঠ দাস প্রমুখের সঙ্গেও এ-সকল কবিতার যতখানি যোগ, বাংলা কবিতার সঙ্গে তার থেকে অনেক বেশী। হিন্দী সাহিত্যের যুগান্তকারী কবি নিরালা-জী সম্বন্ধে যেমন অভিযোগ করা হয় যে, ইনি অনেক ক্ষেত্রে নাগরী অক্ষরে না-হিন্দী কবিতা রচনা করেছেন, ওড়িয়া সাহিত্যের অনেক আধুনিক কবি সম্বন্ধেও এ অভিযোগ করা হয়। তাঁরা ওড়িয়া অক্ষরে বাংলা কবিতার অনুসরণ করেছেন ভাবে, ভাষায়, ছন্দে। 'সবুজগোষ্ঠী'র গভীরতর প্রভাবের ফলে আমরা এখনও এমন কবিতা পাচ্ছি, যার পাশে ওড়িয়া কবি দীনকৃষ্ণ দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ, সারলা দাস, নন্দকিশোর বল প্রভৃতির স্থাপন করলে বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে আর স্পষ্ট হয়ে উঠবে বাংলার সঙ্গে যোগের কথা।

কালিন্দীচরণের আর একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন !

"অস্তগামী রবিসম নিবিড় এ অন্ধকার মুখরে,
চালিছি মুঁ গোধূলির শীর্ণক্লান্ত ক্ষীণ মমুখরে।
শীকর পবন মোর লাগে গণ্ডে লাগে ভাল দেশে
চালিছি মুঁ আজি নিরুদ্দেশে।"

—সন্ধ্যালোকে : কালিন্দীচরণ

সবুজগোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রাক্ষরে রবীন্দ্র-প্রভাবের যে সূত্রপাত হয়েছিল, তা গদ্য-কবিতার ছন্দেও পরবর্তী ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা অতি আধুনিক বিনোদচন্দ্র নায়কের "নীলচন্দ্রর উপত্যকা" হ'তে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :—

"তলে
আউ তলে
ইউকেলিপ্‌টসর ঘনীভূত ছায়া
তার তলে জনহীন উপত্যকা।..."

এমনি ক'রে রবির আলো বাংলার সাহিত্য-গগন হ'তে বহির্বঙ্গীয় সাহিত্যকে আলোকপ্লাবিত করেছে।

জাপানী বসন্তসেনা গেইশা

মনোরম হ্রদের উপকূলে প্রশস্ত সুন্দর সজ্জিত গৃহ, জাপানের নিজস্ব স্থাপত্যের অননুকরণীয় শিল্পসুষমায় মণ্ডিত সে ভবন, কাঠ ও কাচের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়; প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আমরা সমবেত হয়েছি। আমাদেরই সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করেছেন আধুনিক জাপানের কোন কোটিপতি। চারদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত আছে অনেক আয়োজন, অনেক আকর্ষণ, তবু তারই মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ল প্রজাপতির মতই রঙীন তাদেরই মত সুন্দর এক দল তরুণীর উপর। আধুনিকতম ফ্যাসান-সম্মত বেশ-ভূষায় তারা যেন ঝলমলিয়ে দিচ্ছে সমস্ত পরিবেশটিকে। প্রথমে ভেবেছি, এরাই বোধহয় আধুনিক জাপানের সম্ভ্রান্ত পুরমহিলা, কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হতে হল না বেশী দেরী। শুনলাম তারা কুলবধূ নয় জনপদবধূ, জাপানের পুরাতনী গেইশার নূতন সংস্করণ।

গেইশা যুগ যুগ ধরে জাপানে একদল নারী—এই নামেই চিহ্নিতা হয়ে আসছে। নৈতিকতায় শিথিল কিন্তু বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল গেইশা, স্বাধীনা বহুবল্লভা, পুরুষের মনোরঞ্জন করাই তার কৌলিক পেশা। ক্লান্ত পুরুষের অবসর বিনোদন করাই তার ধর্ম, ধর্মপত্নী সে নয়, সে শুধুই নর্মসঙ্গিনী। গেইশা নারীর প্রধান উপজীবিকাই ছিল নৃত্য-গীত, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হতো কলানিপুণা ও শিল্পরসিকা, প্রাচীন যুগের ভারতেও এ ধরণের নারীর দেখা মেলে বারাঙ্গনা হলেও যাদের সমাজে এক বিশেষ স্থান ছিল, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই যাদের মূল্যায়ণ করা হত সেদিন। গেইশাও ঠিক সেই ধরণেরই সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে আসছে জাপানে, বহুদিন হতেই গৃহস্থের নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মে গেইশার উপস্থিতি অপরিহার্য্য। পুরস্ত্রীরাও তাদের কলানৈপুণ্যকে সাদর স্বীকৃতি জানিয়েছেন বরাবর, সাধারণ পণ্যা নারী বলে অবহেলা না করেই। যুগের পর যুগ ধরে জাপানের শিল্প, জাপানের সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক বজায় রেখে এসেছে গেইশারাই কুলক্রমে।

বারাঙ্গনা হলেও গেইশা তাই অপাংক্তেয় নয় জাপানের সমাজ-জীবনে। আজ জাপানের নব জাগরণের দিনে গেইশারও ঘটেছে রূপান্তর, উচ্চশ্রেণীর গেইশা রমণী আধুনিক উচ্চশিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে, পৃষ্ঠপোষক ধনীর অর্থে বহু তরুণীই আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র প্রেরিতা হয়ে থাকে। সদ্য ক্যালিফোর্ণিয়া ফেরৎ একটি মেয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গেই এসব তথ্য আমি জানতে পারলাম।

গেইশাদের মধ্যেও স্তরবিভাগ আছে। খুব সাধারণ নিম্নস্তরের পণ্যাস্ত্রীর জীবন যাপন করে প্রায় চল্লিশ হাজার নারী। বিশেষ বিশেষ এলাকায় বাস করে; যদিও অপর সব দেশের মত জাপানেও সম্প্রতি এদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হয়েছে তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে সে আইন যে কতটা কার্য্যকরী হবে, সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহল গভীর সন্দেহ পোষণ করেন।

নৈশ প্রমোদাগার ও পানশালায় নিযুক্ত আছে বহু গেইশা যুবতী—যাদের মধ্যে অনেকেই এভাবে অর্থোপার্জ্জন করে নিজেদের উচ্চশিক্ষার খরচ ও ভরণ-পোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে অন্য কোন ভদ্র জীবিকার সংস্থান যাতে করতে পারে এই উদ্দেশ্যে।

আর আছে অতিশয় সুশিক্ষিতা কলানিপুণা ও অতি আধুনিকা একদল গেইশা যুবতী, উচ্চশ্রেণীর প্রমোদাগারগুলিতে প্রচুর অর্থব্যয়ে যাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট ধনী ও মানীর আসরেই শুধু তারা গিয়ে থাকে প্রচুর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, যাদের সঙ্গ কামনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অবাস্তব স্বপ্নবিলাস মাত্র।

জাপানে আজও পুরুষের প্রমোদসঙ্গিনী হয় গেইশাই, স্ত্রী নয়; আর আধুনিক জাপানের শিক্ষিতা কুলমহিলাও এতে প্রতিবাদ করে না, জাপানী গৃহবধূ এখনও স্বাভাবিক বলেই মনে করে স্বামীর গেইশা-সঙ্গ-কামনাকে, সে আজও মনে করে ঘরের সীমিত পরিধিতেই বুঝি তার অনস্বীকার্য্য একাধিপত্য—বাইরে নয়।

কিন্তু আধুনিকা গেইশা প্রস্তুত নয় সইতে এতটুকু তার জন্য প্রতীক্ষা, তার জন্য নয় সঙ্কোচ, একজনের শূন্য স্থান অবিলম্বে অন্যজনের দ্বারা পূরণ করাই তার ধর্ম, অপেক্ষা সে করে না।

প্রাচীন চীনের ধর্ম্মমত

শ্রীগণেশদাস মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

প্রাচীন চীনদেশের অন্য ধর্ম্মমতের নাম 'কংফুসীয় ধর্ম্ম।' এই ধর্ম্মমত মহাপুরুষ কংফুসিয়স-এর নামানুযায়ী কথিত হয়। কংফুসিয়স খৃ:-পূ: ৫৫০ অব্দ হইতে খৃ:-পূ: ৪৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি অদ্যাবধি চীনদেশে দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইনি জীবিতাবস্থায় চীনদেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাবৃত্তের প্রচার করিয়া অমর হইয়া আছেন। ইঁহার প্রচারিত বাণী ইঁহার পরবর্ত্তী কালে 'মেনসিউস' (খৃ:-পূ: ৩৭০ অ:) এবং 'মু—সে' (১১৫০ খৃ:-অ:) প্রচার করিয়া চীনদেশকে অমূল্য জ্ঞানের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। কংফুসিয়স নিজেকে নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতেন না। তিনি বলিতেন যে, তিনি প্রাচীন মত সকলকে বিদিত করাইয়াছেন মাত্র। কংফুসিয়স সম্ভবত: নিজে কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তিনি শিষ্যমণ্ডলীর নিকট প্রাচীন ধর্ম্মমত ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিতেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থ চীনদেশে পরম পবিত্র গ্রন্থরূপে সম্মানিত হইতেছে। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ 'মু—কিং'। ইহাতে প্রাচীন চীনের ইতিহাস বর্ণিত আছে। তবে এই ইতিহাস গ্রন্থে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, ইহা ১৭০০ বৎসরের ইতিবৃত্তের সংগ্রহ মাত্র।

অন্য গ্রন্থখানির নাম 'সি-কিং'। ইহাতে প্রাচীনকালের গাথা-সমূহ রহিয়াছে। ইহাতে ৩০৫টি গাথা রহিয়াছে। এই গাথাগুলি খৃ:-পূ: ১৭৬৬ হইতে খৃ:-পূ: ৫৮৬ অব্দ-এর মধ্যে রচিত হয়। এই গাথাগুলির মধ্যে কতক 'শাং' রাজবংশের সময় ও কতক 'চৌ' রাজগণের সময়ে রচিত হয়। এই গ্রন্থ চার খণ্ডে বিভক্ত যথা— 'কোয়ো ফ্যাং', 'হিয়াও-ইয়া', 'তা-ইয়া' ও 'শুং'।

কোয়ো ফ্যাং-এর ১৫টি খণ্ড আছে ও ১৬০ খানি গাথা আছে। সব গাথাগুলি নাতিদীর্ঘ। এগুলি 'চৌ' সামন্তরাজ্যের রীতিনীতি ও ঘটনাবলী বিষয়ক। 'হিয়াও-ইয়া' ৮টি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ৭৪টি গাথা আছে। এই সব গাথা সমবেত রাজগণের সম্মুখে গীত হইত যে গাথা সেই বিষয়ক। 'তা-ইয়া'তে ৩টি খণ্ড আছে এবং ৪০টি গাথা আছে। এই গাথার মধ্যে ৩১টি 'চৌ' সম্রাটদিগের যজ্ঞের সময় গীত হইত। অবশিষ্ট ৯টির মধ্যে ৪টি 'লু' রাজ্যের সামন্তের ও ৫টি 'শাং' সম্রাটদিগের যজ্ঞে গীত হইত।

কংফুসিয়সের অন্য গ্রন্থের নাম 'হিয়াও-চিং' বা স্নেহধর্ম্ম। কথিত আছে যে, এই গ্রন্থ মহাত্মা কংফুসিয়স স্বয়ং রচনা করেন। ইহাতে মাতাপিতার স্নেহ, দেবপুত্র বা সম্রাটের স্নেহ, সামন্ত রাজগণের স্নেহ, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের স্নেহ, নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের স্নেহ, সাধারণ ব্যক্তির স্নেহ, ত্রিশক্তির স্নেহ ইত্যাদি কিরূপে লাভ করা যায় তাহার সম্বন্ধে নীতি-উপদেশ আছে।

অন্য গ্রন্থের নাম 'লি-চিং'। এই গ্রন্থখানি বিরাট। ইহা ৪৬টি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রাচীন চীনের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বিবরণ, প্রাচীন চীনের আচার-পদ্ধতি, কংফুসিয়সের ধর্ম্মের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থপাঠে প্রাচীন চীনের সমাজপ্রথা রীতিনীতি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 'প্রাচীন চীনের সামাজিক প্রথা' শীর্ষক অধ্যায়ে এই গ্রন্থবর্ণিত-বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কংফুসিয়স মতের অন্য গ্রন্থের নাম 'ঈ-চিং'। এই গ্রন্থকে কংফুসিয়স অত্যন্ত সম্মানের সহিত দেখিতেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে ৬টি করিয়া সরলরেখা আছে ও সেই রেখাযুক্ত যে চিত্র তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। এইরূপ আশ্চর্য্য বিষয়-যুক্ত গ্রন্থ কোথাও নাই। এই সরল রেখাগুলি প্রত্যেক অধ্যায়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে অঙ্কিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও বিভিন্ন রহস্যের ইঙ্গিত করিতেছে। এই প্রকার ইহাতে ৬৪টি অধ্যায় আছে ও সেরূপ ৬৪ প্রকার বিভিন্ন ৬টি সরলরেখাযুক্ত চিত্র আছে ও তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই গ্রন্থ খৃ:-পূ: দ্বাদশ শতাব্দী হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে আবার পরিবিষ্ট Appendix বলিয়া ৮টি খণ্ড আছে। এইরূপ সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার চীনদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল।

এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত কংফুসিয়স ধর্ম্মের আরও ৪টি গ্রন্থ আছে। প্রথম "লুন্-উ" অর্থাৎ আলোচনার গ্রন্থ। ইহাতে প্রধানত: মহাত্মা কংফুসিয়স্ ও তাঁহার শিষ্যগণের আলোচ্য বিষয় রহিয়াছে। দ্বিতীয় মেন্‌সিয়সের গ্রন্থ। ইনি মহাত্মা কংফুসিয়সের পর একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া বিদিত। "তৃতীয়—স্যাং-সি"-এর গ্রন্থ। ইনি মহাত্মা কংফুসিয়সের পৌত্র। চতুর্থ "চুং-উং। শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থ "লী-চিং" হইতে গৃহীত।

উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, কংফুসিয়স্‌এর প্রচারিত ধর্ম্মমতে জগতের কারণ দুইটি বস্তু—চৈতন্যশক্তি ও নিষ্ক্রিয় জড়বস্তু। ইহারা উভয়ে অনাদি এবং এক অন্যের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। আদি চৈতন্যশক্তি (ইয়াং) ইহাকে আকাশরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ও আদি উপাদানকে পৃথিবী বলা হইয়াছে। ইহারা এক অন্যের সংসর্গে আসিয়া আদি উপাদানকে প্রভাবান্বিত করিয়া সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই সৃষ্টির কারণ। যেহেতু আদিশক্তি আকাশরূপে বিদ্যমান, সেইজন্য আকাশ ও তাহাতে অবস্থিত সূর্য্য ও তারাগণ চীনবাসীর উপাস্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় হইল পৃথিবী আদি উপাদানের প্রতীক। আকাশ হইল প্রাণশক্তি এবং ইহাই সমস্ত জগতে জীবনশক্তি দান করে। 'লু-চিং' গ্রন্থে আছে 'আকাশ ও পৃথিবী সমস্ত জগতের পিতা-মাতা।' [অনুবাদ মৎকৃত]

সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানব কেবলমাত্র হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া সে আকাশ ও পৃথিবী, উর্দ্ধ ও অধ: এই উভয়ের যোজকরূপে বর্ত্তমান। যতদিন মানব তাহার অক্ষুণ্ণ নৈতিক বলে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং স্বীয় কর্ম্মপটুতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আয়া আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় জনক ও প্রতিপালক হইয়া থাকিবে, ততদিন সমস্ত যথানিয়মে ফলিতে থাকিবে, কিন্তু কোন মানুষ নৈতিকশ

হইবে, সেদিন হইতে বিশ্ব যথানিয়মে চলিতে পারিবে না। ফলে, বিশ্বের সর্ব্বত্র নিয়মের ব্যতিক্রম সংঘটিত হইবে।

কংফুসিয়স ধর্ম্মমতে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার কোন স্থান নাই। সাধারণভাবে সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ অনন্ত নীল আকাশ বিশ্বশক্তির প্রতীক রূপে পূজিত হইত। সেই ধর্ম্মমতে বিশ্বসৃষ্টির কোন কাল নাই—আদি বস্তু অর্থাৎ আকাশ এবং উপাদান অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছে। "বিশ্ব কাহারও দ্বারা সৃষ্ট বা সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না" ইহা কংফুসিয়ান কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে কংফুসিয়ানগণ অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করিতেন।

চৈনিক ঋষিগণ প্রচারিত 'আদিশক্তি' ও 'আদি উপাদান' সাধারণের বোধগম্য হইল না। সাধারণে নানাপ্রকার দেবতার উপাসনা আরম্ভ করিল। এই দেবতাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়(১)—(১) আকাশের দেবতা (তিয়েন্‌সিন্) (২) পৃথিবীর দেবতা (তি-কি) (৩) মৃত আত্মীয়গণের আত্মা (জিন্-কুই)। আকাশের দেবতা যথা—সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ, মেঘ, বাতাস, বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা। পৃথিবীর দেবতা যথা—পর্ব্বত, মাঠ, নদী, বৃক্ষ ও বৎসরের দেবতা। মৃত ব্যক্তির আত্মার মধ্যে সম্রাটগণের আত্মা, ঋষিগণের আত্মা, পুণ্যাত্মা ও পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার পূজা হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এই সব দেবতাগণ মানুষের শুভ করিয়া থাকেন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

মহাত্মা কংফুসিয়স্ পরলোকে আত্মার অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক মত ব্যক্ত করেন নাই। এই ধর্ম্মমতে স্বর্গভোগ ইত্যাদির কোন কথা নাই। পুণ্যাত্মাগণ মৃত্যুর পর আকাশরূপে অবস্থান করেন এবং জগতে মানবের স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকেন। এইজন্য উক্ত ধর্ম্মে স্বর্গরাজ্য ও তাহার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। এই ধর্ম্ম সাধারণভাবে প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা।

এই ধর্ম্মের মতে মানব আকাশ ও পৃথিবীর যোজক ও সেই সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদিও মানবের দেহ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আদি উপাদানে গঠিত, তথাপি আদিচৈতন্য সত্তা মানবের মধ্যে স্পষ্টভাবে বিকাশিত হইয়াছে। সেই মানবমন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মভাবের উৎস। সেইজন্য নাকি মানব স্বভাবতঃ সৎ ও হিতাহিত বিচার-বুদ্ধিবলে সৎকার্য্যে প্রণোদিত হয় এবং সন্দেহস্থলে পূর্ব্বকালের আচরিত পন্থা গ্রহণ করে। মহাত্মা কংফুসিয়স্ মনের স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তাঁহার মতে তদ্দ্বারা মানব উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। এই ধর্ম্মমতে রাষ্ট্রের নিয়ম পালনই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কারণ এই রাষ্ট্রই শৃংখলাযুক্ত বিশ্বের প্রতিচ্ছবি।

এই ধর্ম্মমতে পাপের শাস্তি ইহলোকেই ভোগ হয়—কারণ প্রত্যেক পাপকর্ম্ম জগতের শৃংখলা নষ্ট করে, যেহেতু পাপকর্ম্ম প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। সেই পাপের ফল যে কর্ম্মকর্ত্তা, সে ত ভোগ করিবেই ও তৎসংগে সমস্ত জগতের ক্ষতি সাধিত হয়। মানবের সুখ ও দুঃখ মানব সংগে করিয়া আনে না—উহা মানবের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ। প্রাচীন চীনে এই বিশ্বাস ছিল যে, পাপকর্ম্মের ফলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূকম্পন প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। এই পাপকর্ম্ম—যাহার ফলে এই সব অনর্থ ঘটিয়া থাকে, তাহা হয়ত রাজার নিজকৃত পাপ বা প্রজাগণের পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপ। সেজন্য প্রজারা নৈতিক নিয়ম পালন করে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য। 'সু-কিং' গ্রন্থের মতে—যে কর্ম্মকে জনমত সুকর্ম্ম বলে, তাহা পুণ্যকর্ম্ম ও যাহাকে কুকর্ম্ম বলে, তাহা পাপকর্ম্ম; কারণ মানব-বাক্য দেবতার বাক্যের প্রতিধ্বনি। আদিচৈতন্য তাঁহার বাণী মানবের মনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করেন।

এই ধর্ম্মমতে খৃষ্টানদিগের মত রবিবার নাই বা পূজাপার্ব্বণাদি নাই। চৈনিকগণ একাদিক্রমে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। সেই কর্ম্মজীবনের মধ্যে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কর্ম্মের বিরতি ছিল না। ইহাদের মন্দির বলিতে মহাপুরুষগণকে স্মরণ করিবার মিলনস্থান, কিন্তু সেখানে পুরোহিতের স্থান নাই। চীনদেশে প্রত্যেকে ধর্ম্মকর্ম্মের সমান অধিকারী, কেবল সুশৃংখলার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ এইরূপ সম্মিলিত উপাসনা পরিচালনা করিতেন। চৈনিকগণ চার ঋতুতে চার বার অর্ঘ্যদান করিতেন। তাহার উদ্দেশ্য, আকাশের আশীর্ব্বাণী ভিক্ষা। সেইসব যজ্ঞে সম্রাট নিজে পৌরোহিত্য করিতেন। প্রধান অর্ঘ্যদান সম্রাট নিজে করিতেন, কারণ তিনিই প্রধান পুরোহিত। সম্রাট নিজের গৃহেও নিজের পিতৃপুরুষকে অনুরূপ অর্ঘ্যদান করিতেন। প্রাচীন চীনদেশে পিতৃপুরুষের উপাসনা ধর্ম্মের অঙ্গরূপে পরিগণিত ছিল। ইহাই জাপানে 'সিন্টো' ধর্ম্ম (Shintoism) আখ্যালাভ করিয়াছে।

প্রাচীন চীনদেশের তৃতীয় ধর্ম্মমত—বৌদ্ধধর্ম্ম। এই বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত হয়। এরূপ কথিত আছে যে, খৃঃ-পূঃ ২১৮ অব্দে মৌর্য্যসম্রাট অশোক ভারতবর্ষ হইতে প্রচারক প্রেরণ করেন—তাঁহারা চীনসম্রাট কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন এবং অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখাইয়া কারামুক্ত হন। পরে খৃঃ পূঃ ১২১ অব্দে এক চৈনিক সেনাপতি 'হো-কিউ-পিং' হুনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ফিরিবার সময় বুদ্ধদেবের এক স্বর্ণ-প্রতিমা সঙ্গে লইয়া আসেন। এরূপ কথিত আছে যে, ৬৮ খৃঃ অব্দে 'হান্'-বংশীয় সম্রাট 'মিং-তি' একটি হেমবর্ণের মনুষ্যকে স্বপ্নে দেখেন ও পরে সভাসদ্‌গণের নিকট জানিতে পারেন যে, উনিই বুদ্ধদেব। ইঁহার দুইজন দূত ভারতবর্ষে প্রেরিত হন ও তাঁহারা 'কাশ্যপ মাতঙ্গ' ও 'ধর্ম্মরত্ন' নামে দুইজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এই সমস্ত কাহিনীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় অব্দে ভারতবর্ষের 'কুষাণ' সম্রাটদিগের নিকট হইতে প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ চীনদেশে নীত হয়। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে চীনসম্রাট-দিগের সভায় বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও গৃহস্থ-ভিক্ষুদিগের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। (২) মিং-তিএর স্বপ্নসম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, সে সময় চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। কাশ্যপ ও ধর্ম্মরত্ন সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, যেহেতু চৈনিক ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীতে ইঁহাদের কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ রহিয়াছে। ইঁহারা চীনের রাজধানীতে প্রথম চৈত্যবিহার নির্ম্মাণ করেন। ১৪৭ খৃঃ অব্দে 'সক' 'প্রচারক' 'লোকক্ষেম' চীনদেশে আসেন ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গ্রন্থ 'মহাযান' মতবাদীর গ্রন্থ। লোকক্ষেম ১৮৮ খৃঃ-অব্দ পর্য্যন্ত অনুবাদ-কার্য্য করেন। ইঁহার শিষ্য 'চে-কিয়েং'

---

(১) Introduction to the Seienee of Relegion by F. Maxmuller, Lecture III. P138.

(২) India & China—by Dr. P. C. Bagchi.

'নাং-কিং' নগরে থাকিয়া ২৫২ অব্দ হইতে ২৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত শতাধিক বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাহার মধ্যে ৪৯টি আজও বিদ্যমান আছে। ইঁহারা সকলে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন। এই শিবাও 'শক' জাতিভুক্ত ছিলেন। ইনি দক্ষিণ-চীনে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সমস্ত শকজাতায় প্রচারকদিগের মধ্যে 'ধর্ম্মরক্ষ'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ও ইনি ভারতবাসী। ইনি ৩৬টি ভাষাবিৎ ছিলেন। ২৮৪ অব্দে ইনি চীনযাত্রা করেন। ইনি প্রায় ২০০ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। ১৪৮ খৃঃ অব্দে পারস্যদেশীয় নৃপতি 'লোকোত্তম' ভিক্ষুবৃত্তি লইয়া চীনদেশে আসেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও চীনদেশে আসিয়া কাশ্যপ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিহারে বাস করিতেন। ইনি বহু বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করেন। ইঁহার চৈনিক নাম 'নান্-চ-কাও'। (৩) অন্য একজন পারস্যদেশীয় চীন সম্রাটের অশ্বারোহী বাহিনীর নায়ক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হন। তিনিও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। দেখা গেল যে, 'শক' প্রচারকগণ প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ অনূদিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন রূপ দান করেন।

অন্য পারস্যদেশবাসী সোগডিয়গণ উক্ত 'পার্থিয়'গণের ন্যায় চীনে বৌদ্ধমত প্রচারে সাহায্য করেন। সোগডিয়গণ (Sogdians) প্রাচীন পারস্যবাসী। এই সোগডিয়গণের মধ্যে 'সেং-হুই' খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে নানকিং নগরে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিখ্যাত প্রচারক 'কুমারজীব' চৈনিক সেনানী 'ল-কুয়াং' কর্ত্তৃক চীনদেশে নীত হন। কুমারজীবের পিতার নাম কুমারায়ণ। এই কুমারায়ণ পামীরের পথে চীনদেশে আসেন ও তাহার রাজের 'রাজগুরু' হন। তাহার রাজকুমারী তাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হন ও ইঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ কুমারজীব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা ভিক্ষুণী হইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। কুমারজীবের শিক্ষা হয় কাশ্মীরে ও বৌদ্ধশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র 'কাশগড়ে' যাহা এখন তুর্কিস্থানের অন্তর্গত। ইনি ৪০১ অব্দে চীনদেশে আসেন ও ৪১৩ অব্দ পর্য্যন্ত প্রচারকার্য্য করেন। এই ১২ বৎসর যাবৎ ইনি চীনদেশে বিরাট প্রচার কার্য্য করেন। ইনিও মহাযান মতবাদ প্রচার করেন। ইঁহার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ-কৃত 'সূত্রালংকার' শাস্ত্র ও 'বুদ্ধচরিত' বা 'ফো-শো-হিং-সাং-চিং' প্রসিদ্ধ; নাগার্জ্জুন 'দশভূমি বিভাগ শাস্ত্র', বসুবন্ধু-কৃত 'শতশাস্ত্র ও হরিবর্ম্মণ-কৃত 'সত্যসিদ্ধি শাস্ত্রও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে 'ফো-সো-হিং-সাং-কিং' গ্রন্থ ব্রহ্মরক্ষিত কর্ত্তৃক অনূদিত হয় ও কুমারজীব এই চৈনিক-অনুবাদ-সংশোধিত করেন। এই কুমারজীব একজন বোধিসত্ত্ব ছিলেন। এই কুমারজীব কৃত 'ব্রহ্মজাল সূত্র' মহাযানবাদিগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ৪৩৩ অব্দে তাহার ভিক্ষু 'মোক্ষল' প্রসিদ্ধ মহাযান গ্রন্থ 'পঞ্চবিংশতি সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা' সংস্কৃত হইতে চীনভাষায়-অনুবাদ করেন।

খৃষ্টীয় ১৩ শতাব্দীতে 'তাও' ধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধদিগের-বিহার নিজেদের মন্দির বলিয়া দাবী করেন। তখন মোগল দিগ্বিজয়ী বীর চেংগিস খাঁ জীবিত ছিলেন ও চীনদেশের বহু অংশে তখন তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান। বৌদ্ধগণ তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। চেংগিস খাঁ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন বটে তথাপি সম্রাট হিসাবে নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা হইবে বলিয়া নিজের পৌত্র মাংগু খাঁকে বিচারের ভার দিলেন। ১২৫৪ অব্দে ৩০শে মে তারিখে রাজধানী কারাকো-রমে সভা আহূত হইল কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে ১২৫৮ অব্দে সম্রাট কুব্লাই খাঁ সমস্ত-"তাও" ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে সভায় আমন্ত্রণ করিলেন। এই সময় বৌদ্ধগণের পক্ষে ছিলেন তিব্বত হইতে আগত 'শাক্য' পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র 'ফাংপা'। এই সভায় বিচারে 'তাও' ধর্ম্মাবলম্বী-গণের পরাজয় হয় এবং তাও ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। তাহাদিগের মন্দির ও সম্পত্তি বৌদ্ধগণকে প্রত্যর্পণ করা হইল। সম্রাট কুব্লাই খাঁ বৌদ্ধধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন। 'তাও'বাদী গ্রন্থের মধ্যে যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ছিল, তাহা দগ্ধ করাইয়া দিলেন। ভিক্ষু 'ফাংপা'কে কুব্লাই খাঁ নিজের রাজগুরু নিযুক্ত করিলেন ও ইনি সমগ্র চীনদেশে বৌদ্ধগণের প্রধান পুরোহিত হইলেন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে প্রসিদ্ধ 'চৈনিক ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীর' নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হয় ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষা হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ইনি ১২৮০ অব্দে ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (৪)

চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ম্মা, সিংহল ও শ্যামে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। চীনদেশে 'বোধিসত্ত্ব'কে দেবতার স্থান দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। এই বৌদ্ধধর্ম্মে 'ত্রিমূর্ত্তির' উপাসনা প্রচলিত আছে। ত্রিমূর্ত্তি হইল 'বুদ্ধ', 'ধর্ম্ম' ও 'সংঘ'। চীনদেশে বুদ্ধদেবকে 'অমিতাভ' রূপে উপাসনা করা হয়। অমিতাভ একটি সংস্কৃত ভাষার বাক্য। ইহার অর্থ 'অনন্ত আলোক'। চীনের বৌদ্ধপুরোহিতগণ অবিবাহিত থাকেন ও নিরামিষাহারী। এই অমিতাভের উপাসনা পবিত্র বারি, পুষ্প, বস্ত্র, প্রদীপ ও ধূপ ধুনা দ্বারা করা হয়। পূজার সময় পুরোহিতকে উপবাসী থাকিতে হয়। মৃতদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান এই উপাসনার অংশস্বরূপ।

চীনদেশে 'শূং' বংশের রাজত্বকালে 'চু-হি' (১১৩০—১২০০ খৃঃ অব্দ) নামে এক দার্শনিক মহাত্মা 'কংফুসিয়স' মতের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীন চীনে 'জড়বাদ' প্রবর্ত্তন করেন।

(৩) India & China by Da. P, C. Bagchi

(৪) India & China by Dr. Bagchi.

"Books are keys to wisdom's treasure ;
Books are gates of lands of pleasure ;
Books are paths that upword lead ;
Books are friends, Come let us read."

—*Emilie Poulsson.*

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৮১। তারপরে বিভাবরী বিভা-বরীয়সী হলেন। হয়েও 'বামা' হয়েই রইলেন; ত্রিযামার তখনো শেষ যামের কিছু বাকি ছিল, তাই সদোষা হলেন; হয়েই সুন্দর একটি নাম কুড়িয়ে পেলেম, ···'দোষা'। কেন পেলেন? যেহেতু সেই সহচরীবৃন্দকে তখন অবসাদত্বের ভিতর দিয়ে প্রিয়সখীকে নিয়ে,···চলে যেতে হল কৃষ্ণভবন থেকে রাধাভবনে।

৮২। ভোর হল বিভাবরী।

সখী শ্যামা এলেন। বিভা-বরণীয়া তিনি। এসেই তিনি বীক্ষণ করলেন রাধার মধ্যে···অন্তভাব। দেখেই তাঁর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়, অথচ অধরে খেলে গেল হাসির-কিরণে-ধোওয়া একটি কোমলতা। এবং শ্যামার সেই ভাব দেখে অধোমুখী রাধারও বিধুর হয়ে গেল হৃদয়। শ্যামাও বুঝতে পারলেন, তাঁর নিজের কপালে নেই, নবীন ও রমণীয় একক কৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গের মিলন-মাঙ্গল্য। তাই তাঁরা না হয়েই প্রশ্ন তুললেন—

৮৩। "সই, হঠাৎ আমাদের দেখে এত লজ্জার কারণ কি? এ লজ্জা তো সাধারণ লজ্জা নয়। অত বেশী লজ্জা মানুষেরো যে অনুভূতির বাইরে।

তুমি তো সই কলা-কলাপ-পণ্ডিতা, এমন পৃথিবী-নাচানো লজ্জাই বা কেমন ক'রে গ্রাস করে তোমার হৃদয়?

তোমার অঙ্গের অলস বলনা প্রকাশ করে দিচ্ছে তোমার অবসাদ; ম্লান হয়ে ক্ষাণ হতে বসেছে দু-বাহুর মৃণাল; রস ফুরিয়ে গেছে যেন অধরে; গালের পাতা কাঁপছে; এ আবার কি আরম্ভ করলে, সই?

তোমাকে আজ দেখাচ্ছে কেমন, জানো? যেন নতুন লতায় বাত ধরেছে; পদ্মের নতুন ডাঁটিটাকে যেন নুইয়ে দিয়েছে হাতী; যেন কাঁপছে নবমালিকার কোমলতা···মাতাল ভ্রমরের পদভরে।

চিরদিন যাকে চেয়েছ, সুদুর্লভ এমন কি কাউকে তাহলে পেয়েছ? তবে কি সত্যিই ভালবাসায় পড়েছ? আমরা যেখানে নেই, সেখানে কেমন করে ফল ফলায় সই, ভাগ্যের কল্প-লতা?"

৮৪। শ্যামার এই স্পর্দ্ধিত প্রণয়-প্রশ্নটিতে আর কিছু থাক বা না থাক, বেশ কিছু ছিল সাদর-সাহস আর সাধুবাদ। আর সবজান্তার কাছে ছল করে লুকিয়েও কিছু লাভ নেই। তাই প্রেম-চঞ্চলা রাধা অঞ্চল দিয়ে মুখখানি ঢেকে, আদর-ভরা মুচকি হাসির বিস্ময় হেনে বললেন—

"অমন করে শ্যামা, দু'চোখে পদ্ম ফুটিয়ে তুই তাকাসনে। আমি কি জানি সই, যে বলবো···কোথায় ছিলেম, কোথায় গেলেম,··· কোথায় চলেছে সে পথ,···তাঁর পাশে কে আমাকে নিয়ে গেল··· কেমন করে আমি পৌঁছুলুম, মিললুম,···কি ঘটে গেল আমাতে···!

আমিই যদি জানতেম তা'হলে সই, তুমি কি তা জানতে না?

যেখানে সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অভাব, মনের ব্যাপার সেখানে কেমন করে পৌঁছয়, তাই ভাবি সে কি আমার স্বপ্ন? জেগে কি দেখেছিলুম?···

সে কি ইন্দ্রজাল? তাও তো সই চিরস্থায়ী নয়।···

সে কি তবে আমার সুদীর্ঘ ভ্রান্তি? কামনার মেঘে উড়ে চলা?···

সে কি তবে ব্যাধি নিজন এক সুখ? না ব্যাধি? না জ্বর? কিংবা না, না, আর ···

কিন্তু সে আমার গলিয়ে দিয়ে গেল হৃদয়, সে আমার মূর্চ্ছা ঘটিয়ে দিল মনের।"

৮৫। এবার পরিহাস যেন হেসে হেসে নেচে উঠল শ্যামার বাণীতে। বললেন—

"শ্যাম-কমলের নয়ন-জোর! যা বলেছিস্ ভাই ঠিকই বলেছিস্! তাই বলছিলুম কি···কেলিকলা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-কৌশলটিকে এক-দিনেই তো আর রপ্ত করা সম্ভব নয়! অতএব দেখছি আপনার তো কিছুই রপ্ত করাও হয়নি। যদি বিজ্ঞতমা হবার সাধ হয়ে থাকে, তা'হলে সখী, বিলাস-গুরুর কাছ থেকে একটু যত্ন করে ফিরে ফিরে পাঠ নিন্!"

৮৬। সৌভাগ্য-সারাধিকা শ্রীরাধিকা তখন পরিহাস-তরঙ্গিতা ও রঙ্গিতা শ্যামার অনুকরণে, তথা আরো মিষ্টি করে বললেন—

"সখার আমার মুখের বালাই যাই! ···এর পরে সই, তাঁর পাশে আর আমি···যাব না। আমার উচিৎ, দূর থেকে তাঁকে আমার নয়ন-পথের পথিক করে রাখা।···তাই বলছিলুম কি, আপনিই না হয় তাঁর কাছ থেকে ফিরে-ফিরে পাঠ নিন্, তারপরে··· আমি বড় ভুলে যাই···আপনার পাণ্ডিত্যই আমার মনের রসদ যোগাবে।"

৮৭। বলতে বলতে, পরিহাসের সঙ্গে সঙ্গে চলকে উঠতে লাগল রাধার হাসির জ্যোৎস্না, এবং সেই জ্যোৎস্নার শুভ্রতায় যেন স্নান করে উঠল বচন-বতীর অধর। প্রতি অক্ষরে এবার লালিত্য ফলিয়ে ললিতা তখন তাঁর ভাষণ দিলেন—

"রসপাঠ-বিষয়ে অমন সুন্দর একটি উপদেশ দিয়ে আপনি সুনিশ্চিত উচিৎ কাজই করেছেন। প্রথম যিনি শিষ্যা হন তিনিই এ-স্থলে পাঠে ভঙ্গ দিয়েছেন। এখন অন্য শিষ্যা কেমন করে পাঠ নিতে যাবেন?···অতএব আমাদের ক্ষীণ-কটি প্রিয়সইটিকে এঁকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিলাসগুরুর কাছে যাওয়াই বিধেয়, আর পাঠ নেওয়া উচিৎ দীর্ঘকাল ধরে।"

৮৮। এমন সময়ে অকাল বন্যার মত সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন নন্দিনী। কটুরস যেন উথলে উঠছে তাঁর মুখে। তাঁকে দেখেই চকিত হয়ে উঠলেন সকলে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ললিতার। "ক্ষীণ-কটি প্রিয়-সইটিকে এঁকে সঙ্গে নিয়ে"···ইতি ভাষণ দিতে দিতে শেষের দিকটায় অন্তস্থান বেগে "সেই গুরুর আরাধনা করা বিধেয়"···ইতি পাঠ তিনি পড়ে গেলেন।

৮৯। পাঠের কণ্ঠস্বর শুনে মুখরা নন্দিনী ঠায় দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন মুখ লাল হয়ে গেছে সকলের। বিড় বিড় করে মনে মনে কী যেন বকলেন। তারপরে তাচ্ছিল্যে চালে বললেন—

"ললিতা! কি শেখাচ্ছ?"

ল। "গুরু-আরাধনা।"

নন। "প্রথম যিনি শিষ্যা হন,—ইত্যাদির তাহলে অর্থ কি?"

ল। অর্থাৎ, গুরুজন যেটুকু উপদেশ দিয়েছিলেন, সেইটুকু গ্রহণ করেই ইনি প্রথম পাঠে ভঙ্গ দেন। কিন্তু সে উপদেশ একলা পালন করা অসাধ্য। তাই এঁকে সঙ্গে নিয়ে পাঠ নিতে যাওয়াই স্থির হচ্ছিল।

১০। নন। ললিতা! তোমার অধুনা পরলোক দেখবার বড্ড সাধ হয়েছে বুঝি?

শ্যামা বলে উঠলেন,—"বাল্যকাল থেকেই ইনি পর-লোক দেখতে নেচেই আছেন···। তা, 'অধুনা'···বলছেন কেন?"

১১। নন। শ্যামা, তুমি কি জান না এঁরা সবাই শ্যামানুরাগিণী হয়েছেন?

শ্যামা। ঐ দেখ! এ তো সুপ্রসিদ্ধ কথা। সেই ছেলেবেলা থেকে এঁরা সকলেই তো আমার অনুরাগিণী।

নন। শ্যামা, সর্ব্বদাই দেখছি এঁদের সকলেরই ছলা-কলা··· কৃষ্ণপক্ষপাতী।

শ্যামা। তাও কি কখনও হয়? কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের কলাগুলি সর্ব্বদা তো এত বিচিত্র হয় না, বর্ণ-ভাস্বর হয় না,···সারগামের স্বরগুলো থেকে বেরিয়ে আসা অস্ফুট মূর্চ্ছনার মত?

নন। শ্যামা, এঁরা সকলেই কৃষ্ণ-পথ ধরেছেন।

শ্যামা। এখানে···কৃষ্ণ পথ কোথায়? সে কালো আগুনের পথ একদিনই তো কেবল কালিয়দমনের রাত্রে জেগে উঠেছিল।

১২। নন। শ্যামা, আমায় পরীক্ষা করছ? তাহলে ভাল করে শোনো। এঁরা পীতাম্বরের অনুরাগিণী হয়েছেন।

শ্যামা। অমন না ভেবে চিন্তে বলবেন না কথা। এতো প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। এঁরা তো সকলেই নীলাম্বরী আর অরুণাম্বরী শাড়ীই ভালবাসেন।

নন। শ্যামা, ব্রজরাজতনয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় এঁরা যে নানান রকমে আবদ্ধা হয়েছেন, তা বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

শ্যামা। নিতান্ত বাজে কথা। ব্রজের কোনো রাজত দ্রব্যের উপর এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই এঁদের, যে তাও আবার নিতে যাবেন।

১৩। নন। তোমাদের ঐ মনোহরিণ হরিটি মন হরণ করেছেন এঁদের।

শ্যামা। এখানে আবার হরিণ এল কোত্থেকে? বলি ও বাক্য-সখী, অত আর বাক্যি দিয়ে চেটে চেটে রসের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে কাজ নেই। দয়াটি করে থামুন।

১৪। নন। শ্যামা, তোমারই রসের পাণ্ডিত্যে জ্বলে যাচ্ছে আমার মন। বলি এমন তো দেখিনি আগে, আজ তবে বৈলক্ষণ্য দেখছি কেন রাধার শরীরে?

শ্যামা। যে দেবতার মাথায় প্রথমবর্ণহীন একটি শশিখণ্ড বিরাজ করে, তিনিই সৌভাগ্যদান করে থাকেন এই হরিণীনয়নাটিকে। ইনি ব্রতী হয়েছেন তাঁরই আরাধনায়। ফুলের মত কোমল গা তাই হয়েছে ম্লান।

১৫। নন। কোথায় সে দেবতা?

শ্যামা। অজ্ঞ! তিনি অধুনা সাধুভাবে মনোমধ্যে হয়েই রয়েছেন। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, অন্য কিছু আশঙ্কা করে বসবেন না যেন।

১৬। এই রকমের আলাপের মধ্য দিয়ে সময়টি যখন রসময় হয়ে উঠেছে, তখন চন্দ্রজয়ী বদন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন চন্দ্রাবলি। তাঁর সঙ্গে এসেছেন সমবয়সী নবানুরাগিণী কিশোরীর যূথ। রাধার পাশে বসে চন্দ্রাবলি যখন রং ফলিয়ে ব্যাখ্যান করে যেতে লাগলেন—কেমন করে পাঠ নিতে হয় কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের মিলনরঙ্গ-মঙ্গলের,—তখন সমস্ত সঙ্কোচ নশ্যাৎ হয়ে গেল, কলাবতী কমলমুখীদের, কুল জাতি শীল ইত্যাদি কিছুরই আর অপেক্ষা রইল না, অক্ষয় আমোদে ডুবে গিয়ে বিবিধ বিকার ঘটতে লাগল রসময় সময়টিরই, এবং তিনি হয়ে উঠলেন মধুর-রসময়।

১৭। বর্ষণ-মেদুর এই রকমেরি রসময় সময়ে যিনি রসিক, যিনি কলাকলাপ-কোবিদ, সেই তিনি আমাদের ব্রজপুর-পুরন্দর-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ রসিকাদের হৃদয়ে···কামতন্ত্র-মতে ছড়িয়ে দেন তাঁর ভালবাসার পরাশান্তি।

১৮। এবং এই বর্ষাকালে যতক্ষণ না সন্ধ্যায় গোদোহন আরম্ভ হয় ততক্ষণ তিনি গুরুজনদের নিকটেই থাকেন, মাতা পিতা ইত্যাদির গৌরব হয়েই থাকেন। আর গোঠ থেকে ব্রজে ফেরার সময়ে প্রতিদিন প্রাণ-শোভা বন্ধুদের নিয়ে বন থেকে গৃহে ফেরেন তিনি। পার হয়ে যায় বর্ষাকাল।

৯৯। বিশ্ব-সৌভাগ্য শ্রীভগবানের এইভাবে চলে বর্ষাবিলাস। কিন্তু জলভরা মেঘেদের আর সীমা থাকে না দুঃখের। "কই, আমাদের তো কেউ সৈব্য করছে না!" এই দুঃখে তাঁরাও যেন সারা আকাশ থেকে সরে পড়েন।

১০০। অমনি শরৎ-বধূর টনক্ নড়ে। সত্যিই তো, আসন্ন হয়েছে তাঁর নিজের সেবার সময়। "তাহলে···এই বৃন্দাবনেই তাঁকে সেবা করা আমার উচিৎ"···উৎকণ্ঠায় উৎসুখী হয়ে ওঠে তাঁর মন।

আর অমনি চতুর্দ্দিকে হাঁ করে সারস্বে ডাক দিয়ে ওঠে সারসেরা, জল-থই-থই দীঘিতে আনন্দে ঘুরে বেড়ায় পাখীর ঝাঁক, এবং সীমন্তিত হয়ে যায় সিক্ত পথের বর্ষণ-শেষ পঙ্কিলতা। প্রকাশ পান শরৎবধূ।···ঝলমলে একখানি অনুরাগের যেন সুখ-সায়র! তিনি এগিয়ে এগিয়ে আসেন; আর তাঁর চরণে প্রৌঢ়ামোদ-মেদুর দুটি হংসের মত ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে হংসক-নূপুর। তিনি আসেন; আর তাঁর কাঞ্চীতে বাজতে থাকে সারসদের কলকূজন। তিনি আসেন; আর যেই তাঁর দুনয়নে দল মেলে নীলপদ্ম,—

১০১। অমনি,—

নভঃস্থলের ধুয়ে চলে যায় ঘন পাঁক;
সুজনের মনের মত সুপ্রসন্ন হয় সলিল;
কাশের গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হয়ে ওঠে
উত্তমশ্লোক কবিদের শ্লোক।

আর অমনি,—

নিশার শানে চেপে ঝকঝকে ধারালো হয়ে ওঠেন চাঁদ;
গা মেজে স্নান সেরে ফেলেন নক্ষত্ররা; বিকসিত ছাতিম গন্ধে এলিয়ে পড়েন রনশ্রী।

আর অমনি,—

দ্যু-রমণী তপস্বিনী হয়ে যান; বর্ষণের অভাবে কোথায় যেন তাঁর হারিয়ে যায় সরাগ ভাব এবং মান; আর তাঁর শাদা মিহি শাড়ীখানির মত আকাশে ভাসতে থাকে শুভ্র মেঘের শ্রেণী।

১০২। এমন কি, বর্ষাসখীর বিরহে রঙ্গিনী তরঙ্গিনীদের ব্যাহত হয় রস-প্রাচুর্য্য। তাঁরা রূপান্তরিত হয়ে যান ছোট্ট ছোট্ট নদীতে, চর বেরিয়ে পড়ে···শীর্ণ দেহে হাড়ের মত। এত স্বচ্ছ-সলিলা হয়ে যান যে মনে হয় তাঁদের দেহের বাইরে যেন বেরিয়ে এসেছে তাঁদেরি শুদ্ধ হৃদয়ের বৃত্তিগুলি!

১০৩। সুললিত-রেখা ঐ তরঙ্গিনীদের তীরে তীরে বেড়াতে বেড়াতে দেবতাদের বাণী-দেবীটিরও অসম্ভব হয়ে পড়ে শরৎলক্ষ্মীর তদানীন্তন সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা। তিনি অবাক হয়ে কেবল চেয়ে থাকেন, আর দ্যাখেন···কেমন করে মদমত্ত কলহংস, সারস, চক্রবাক, কুরর, বক, কারণ্ডব প্রভৃতি পাখীদের চরণ-চিহ্ন ছবি এঁকে চলেছে সৈকতে সৈকতে; কেমন করে অমল কমল কহ্লার আর হল্লকদের 'হল্লীশক'-নৃত্যের উপদেশ দিতে দিতে পেশল হয়ে উঠছেন সমীরণ, কেমন করে মন্থর হয়ে পড়ছেন তরঙ্গের শীকর-স্নেহে, তারপরে জনমন মন্থিত করে কেমন করেই বা তিনি আবার পরাগ-শীকরের দক্ষিণাটি হস্তে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছেন তাঁর নাটকীয় প্রবেশ-নমস্কৃতি।

১০৪। শোভার বৈলক্ষণ্য নিয়ে শরৎবধূ যখন উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে, তখন আকাশে মেঘ নেই দেখে বনপ্রান্তে পৌছে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপরে খেলা, কেবল খেলা,···ধেনুদের অনুসরণ করা খেলা, সাথীদের সাথে নিয়ে রঙ্গচাপল্য খেলা। সে খেলার বেগ দেখে আনন্দের আবেগে তাঁদেরি দিশেহারা হয়ে পড়বার কথা যাঁদের প্রাণ কৃষ্ণানুরাগের মঞ্জুলতায় মেদুর, অতএব যাঁরা তাঁর অতীব নিকটের। কিন্তু ঐ যাঁরা তরুবীথিকার লতা-বিতানের বলাকা-হাসা পথ ধরে ধরে চলেছেন, সেই শ্রীমতী অবলাদের কিন্তু মনে হল শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে খেলতে খেলতে সঁপে দিয়ে গেলেন···কন্দর্প। হঠাৎ বদলে গেল তাঁদের চোখের দেখা। তাঁরা দেখলেন:—

বৃন্দাবনের বনপ্রান্তে শ্রীনন্দকিশোর দাঁড়িয়ে আছেন। কদম্বের বিনোদ মাল্য বিনোদ-বিনোদ দুলছে। নৃত্যোন্মত্ত-ময়ূর-ছন্দে মাথায় তাঁর শিখি-শিখণ্ড বাঁধা। কষিত স্বর্ণকেও হার মানায় এমন বিদ্যুৎবর্ণ তাঁর বসন। চতুর্দ্দিকে তাঁর একটি বিশেষ আলোর বিকিরণ। আর তার মধ্যে মুরলী য়া বাজাচ্ছেন তাঁর মুরলী। তাঁরা দেখলেন:—

সেই ধ্বনির স্তনিত-পরম্পরা দিকে দিকে নাচিয়ে দিচ্ছে মদির ময়ূরদের মণ্ডলীগুলোকে, আনন্দ-পীড়িত করে তুলছে পশু পাখীদের সকলকে, গিরিকন্দর থেকে বেগে বইয়ে দিচ্ছে নির্ঝর, বাড়িয়ে দিচ্ছে অম্ল জল!···হঠাৎ মুরলী থামল। এবার তার সুর বাজল বিলম্পদে। সেই ধ্বনির দীর্ঘ মীড়ে,···পাতা কাঁপানো থেমে গেল তরুদের, স্থগিত হয়ে গেল নদী-প্রবাহ, ভরানদী ভাসিয়ে দিল চর, আর কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের শ্যামলতা মিশে গেল প্রকৃতির পান্নায়।

বাঁশীর ধ্বনি শুনে আবার কি ঐ ফিরে এলেন রসিক বর্ষাকাল? আর আসতে না আসতেই···রসময় শ্রীনন্দকিশোর, আশ্চর্য্য, ঋতু-সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন বর্ষায় শরতে!···কটাক্ষের বাণ এমন ক্ষেত্রেই তো ছুঁড়তে হয়, শ্রীমতী অবলারাও তাই ছুঁড়লেন,···কৃষ্ণকে যেন কুটলেন। [ক্রমশঃ।

প্রেম মোর সূর্য্যরশ্মি সম

(Rupert Brooke-এর "The great Love" অনুসরণে)

প্রেম মোর সূর্য্যরশ্মি সম পরিব্যাপ্ত সারা বিশ্বময়,
স্তুতিগানে তার সার্থক করেছি দৃপ্ত যৌবনের দিবা।
ধরিত্রীরে বাসিয়াছি ভালো, শৈল হ'তে অণুপরমাণু,
সমুজ্জ্বল শুভ্র পানপাত্রে সুরঞ্জিত সুনীল রেখায়।
ইন্দ্রধনু আঁকা লঘুপক্ষ লক্ষপরী ধূলি-কণিকায়;
আর আর্দ্র জীর্ণ গৃহছাদ কম্পমান আলোকশিখায়।
অণুরাশি প্রাণশক্তিময়, নিত্য নব সুখাদ্য পানীয়,
আকাশের ছায়াপথ আর ইন্দুলেখা, সফেদ তারকা।
ক্রন্দসীর মেঘচ্যুত নীর—মুক্তাসম পুষ্পের অন্তরে,
সূর্য্যমুখী, চম্পাকলি আর তেজোদীপ্ত সূর্য্যের সৌরভ।
জোছনার মহুয়া-মদিরে চকোরের তন্দ্রাময়ী নিশা,
যাহা দেখি বেসে ফেলি ভালো যৌবনের জয়যাত্রা-পথে।
শ্রান্তিহর দুগ্ধফেননিভ বিছানার স্নিগ্ধ আস্তরণ,
কম্বলের স্পর্শসুখ যেন পুরুষের প্রণয়-চুম্বন।
ঊর্দ্ধে নীলা ইথারের বুকে ভাসমান শুভ্র মেঘরাশি,
কম্পমান তড়িৎ-আবেগে যন্ত্রাগার,—চক্ষুর আরাম।
শীতের আশীর্ব্বাদ—উষ্ণ জলধারা, কোমল-পালক,
পরিত্যক্ত নারীঅন্তর্বাস চিত্তে মোর সঞ্চারে পুলক।
কবরী সুরভি সাথে স্পর্শসুখময় প্রিয়ার অঙ্গুলী,
পুষ্পিতা-লতিকা আর রোমাঞ্চিত তৃণাঙ্কুর দল।
সংখ্যাহীন প্রিয়নামে কত ডাকিয়াছি, বাসিয়াছি ভালো—
গিরি, নদী, বন, উপবনে, কাকচক্ষু-স্বচ্ছ সরোবরে।
উচ্চ হাসি, সাইরেন বাঁশী, ধরিত্রীর বিরাট গহ্বর,
শান্তির মধুর বাণী শুনে ত্বরা ভুলে যাই দৈহিক বেদনা।
বাষ্পাবেগে থর থর কাঁপে চিত্তহারী দীর্ঘ রেলগাড়ী,
নয়নে আনন্দ দেয় আরো তরঙ্গের সফেন মুকুট।
লৌহ, অভ্র, অয়স্কান্ত মণি, আর্দ্র কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্তূপ,
হিম গিরি, মোহনিদ্রাঘোর, পদচিহ্ন শিশিরার্দ্র তৃণে।
বনস্পতি, ঘাসপাতি, চেরী, গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত-দ্রাক্ষাফল,
তেপান্তর, রেখাদিগন্তর, নৃত্যপরা ক্ষীণাঙ্গী তটিনী।
সবারেই বাসিয়াছি ভালো যাহা কিছু নেত্রে দিল ধরা,
সুন্দরের সর্বগ্রাসী প্রেমে পরিতৃপ্ত বুভুক্ষিত কবি।
প্রেমিকের প্রার্থনার শক্তি নাহি তবু নিয়ে যেতে সাথে—
পৃথিবীর কামনার ছন্দ ছবি গানে,—মৃত্যুর ওপারে।
কৃষ্ণা এক রাতে শেষ নিশ্বাসের সাথে নিঃস্ব করি মোরে
শ্রান্তির সাগরগর্ভে লুপ্ত হয়ে যাবে ধরণী সুন্দর!

অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণেন্দু চাকী

বিজ্ঞানভিক্ষু

[পূর্ব্বপ্রকাশিতাংশের পর]

ষোল

অসীমের সুর

"A star is no greater than a violet ; gravitation is a force that cannot transcend love. But it is all one, beginning in the dust and reaching up into persons who can appreciate and create beauty, a constantly changing whole. And it doth not yet appear what these shall be.

– *Maynard M. Metcalf*
Scientific Monthly, June 1934.

ভোর ছটার সময় থেকেই হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর চতুঃসীমায় সশস্ত্র মিলিটারি পুলিসের পাহারা বসে গেছে। রাস্তা আটক করেছে ট্রাফিক-পুলিসের দল।

হবিবুল্লার বাড়ির সামনে 'লন'-এ বসানো হয়েছে 'রিইনফোর্সড কংক্রীট'-এর একটা চাতাল, তার ওপরে মোটা লোহার বরগার 'ক্রশ্ বীম', এর ওপরে রয়েছে যন্ত্রটা। দেখতে জাহাজ-বাঁধা 'বয়া'র দৈত্যকায় সংস্করণের মতো। যন্ত্রটার চারদিকে রয়েছে 'পোর্ট-হোল'-এর মতো কতকগুলো মোটা কাঁচের গোলাকৃতি জানালা। ওপরে চূড়ার ওপরে বেতারের 'অ্যান্টেনা'। তিয়াত্তর টন ওজনের চাপে বরগার নীচে 'কংক্রীট'-এর চাতালে ফাটল ধরে গেছে।

সকাল সাতটা বেজে আটাশ মিনিট। যন্ত্রটার একদিকে কংক্রীটের চাতালটা থেকে কিছু দূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চার-পাঁচ সারি চেয়ারে অভ্যাগতেরা বসেছেন। মাঝখানে একটা মঞ্চ, তাতে বসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, আর দেশরক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সাধনা বিভাগের মন্ত্রীরা! অভ্যাগতদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সিকিউরিটি'র চালুনিতে ছাঁকাই করে। বলা বাহুল্য, বেসরকারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়া হয়েছে এ অনুষ্ঠান থেকে। সভার মধ্যে ইউনিফর্মের প্রাচুর্য্য, সামরিক বিভাগগুলোর প্রতিনিধির সংখ্যাই সেখানে বেশী। এ ছাড়া নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের, আর মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে।

যন্ত্রের সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছেন, প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির এগারো জন বৈজ্ঞানিক। এঁদের একটু পেছনে যন্ত্রের দু'পাশে তিন সারিতে বসেছেন দেশরক্ষা বিভাগের আড়াই শত কর্মী—যাঁরা যন্ত্রটিকে গড়ে তুলেছেন।

কৃষ্ণস্বামী ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের ওপরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। কাঁচা শরতের প্রভাত—নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ ছড়ানো।

সভার সকলকে যথারীতি সম্ভাষণের পর কৃষ্ণস্বামী অল্প কয়েকটি কথায় সভার উদ্বোধন করলেন, তারপর শংকর রায়কে অনুরোধ করলেন, যন্ত্রটির 'ডিমনস্ট্রেশন' সুরু করতে।

শংকর এগিয়ে গেল মঞ্চের ওপরে—হাতে একটা ছোটো রেডিও-ট্রান্সমিটার। সেটা রাখল রাষ্ট্রপতির সামনে টেবিলে। তারপর দু'চার কথায় 'গ্রাভিন-থিয়োরি' আর যন্ত্রটার স্বরূপ সম্বন্ধে ভূমিকার পর রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করল 'ট্রান্সমিটারের সুইচ'-টেপার জন্য।

ট্রান্সমিটার যন্ত্র থেকে রেডিও-তরংগের সৃষ্টি হল, সে তরংগ ভেসে এল যন্ত্রের অ্যান্টেনা'য়। তার অন্তর থেকে শোনা গেল ডাইনামোর মৃদু গুঞ্জন, তারপর একটা 'সাইরেন'-এর শব্দ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হোয়ে মিলিয়ে গেল। যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের নিদ্রাভংগ হল! যন্ত্রটা সহসা নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে উঠে গেল শূন্যে। প্রায় দশ বারো ফুট ওঠার পরে শংকর সে ট্রান্সমিটার যন্ত্রে আর একটি সুইচ টিপে দিলে। যন্ত্রটা তখন দাঁড়িয়ে গেল শূন্যে। কয়েক মিনিট পরে তৃতীয় সুইচের সাহায্যে যন্ত্রটিকে আবার ধীরে ধীরে নীচে নামানো হোলো। বরগার ওপরে যন্ত্রটি নেমে যাবার পর শংকর ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দেয়। সাইরেনের শব্দ আবার শোনা যায়, সে শব্দ ক্রমে খাদে নেমে মিলিয়ে যায়। তারপর চারিদিক নিস্তব্ধ।

এবার উঠলো করতালির রোল—দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে।

করতালির শব্দ মিলিয়ে যেতে কৃষ্ণস্বামী আরম্ভ করলেন—

—চিত্ত নন্দী

নারী
সেকাল ও একাল

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

—দীপালী রক্তচৌধুরী

আমি সুদূরের পিয়াসী

—অজিত দাস

মাটির মেয়ে —মণু বসাক

এক ঝাঁক পায়রা

—রথীন রায়

"আজ আপনারা চোখের সামনে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, সারা দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকদের এটা কল্পনারও বাইরে। মাত্র আটমাস আগে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল যে, 'অ্যান্টিগ্রাভিটি' অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এই এগারো জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। তারই সংগে এঁরা সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞানের এক নূতন শাখার। যেখানে পন্থা ছিল না, এরা সেখানে করে নিলেন নূতন পথ।

"নিউটন পূজ্য হয়েছিলেন মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করে। আর এঁরা আবিষ্কার করেছেন গ্রাভিটি ও অ্যান্টিগ্রাভিটির নূতনতর নিয়ম। জগতে বিজ্ঞানসাধনায় এঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে নিউটন—আইনষ্টাইনদের পাশেই। প্রকৃতপক্ষে, আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিন—আজ ডাঃ রায় আর সহকর্মিদের চেষ্টায় পুনর্জন্ম হল সত্যিকারের ভারতীয় বিজ্ঞানের। এ অবদান আমাদের নিজস্ব।

"এ আবিষ্কারের তাৎপর্য বোঝাতে গেলে—বলতে হয় ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার বর্তমান অবস্থার কথাটা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ম আমরা ভারতের কোণে কোণে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাগার তৈরী করেছি। দরিদ্র দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থে বিদেশ থেকে আধুনিকতম বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আমদানী করে সে সমস্ত গবেষণাগার ভরিয়ে তুলেছি। দেশের সেরা বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিয়ে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেছি। কিন্তু ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যে, এতো ব্যবস্থা করেও দেশের বিজ্ঞান-সাধনার আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। যে প্রতিমা গড়ে তুললাম এত সাধে, বহু সাধনায়—সাজসজ্জা উপচার উপকরণ সবই সংগ্রহ করলাম—কিন্তু কই, প্রতিমা তো প্রাণ পেলো না! কিছু প্রগতি যে না হয়েছে, এমন কথাও সত্য নয়—অনেক বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের সুধীসমাজে তো অপাংক্তেয় বা অনাদৃত নয়। কিন্তু মন তো ভরে ওঠে না! কোথায় সেই স্ফুলিংগ, যা থেকে আমাদের ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা হবে?

"আমাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয়—বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সর্বকাজে নিয়োগ করার দায়িত্বভার যাঁদের ওপরে ন্যস্ত—দেশবাসীর সামনে দাঁড়াতে মাঝে মাঝে তাঁদের কুণ্ঠাবোধ হয়। অনেক সময়ে হয়তো বিনা প্রয়োজনেই সাফাই গাইতে হয়—মাত্র কয়েক বছর তো গেলো, এতো অল্প সময়েই যেটুকু অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে—আমাদের পক্ষে সেটাই কি যথেষ্ট নয়? Morale খাড়া রাখবার জন্ম আমরা পরস্পর-পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিই; সামান্ত উন্নতি কিছু দেখলেই খেতাব বিতরণের সুপারিশ করি। কিন্তু এ আত্মতুষ্টি ক্ষণিকেরই—মনের অন্তঃস্থলে আমরা ভালো করেই জানি যে, যে আবিষ্কারকে আমরা অভাবনীয় বলে পুরস্কারে ভূষিত করলাম, বিদেশে সে রকম আবিষ্কার হাজারে হাজারে হচ্ছে।

"এই অবস্থার কারণটা কী? আমরা কিসে কম—ইউরোপে—আমেরিকায় অধিকাংশ বড়ো বড়ো গবেষণাগার থেকে পাওয়া যায় কোনো না কোনো ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদ। অক্সফোর্ডে-কেমব্রিজে, বার্লিনে-হার্ভার্ডে আমাদের ছাত্রেরা করে এসেছে যুগান্তকারী আবিষ্কার। প্রতিভার ক্ষেত্রে আমরা জগতের যে কোনো জাতির সমকক্ষ। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে আমাদের জাতীয় ল্যাবরেটরিগুলো এমন কি, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী—জগতের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগারের সংগে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও দেশে প্রফেসর সি, ভি, রমণের মতো বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা এতো কম কেন? শুধু তাই নয়, ভারতে কোনো গবেষণাগারে কি পাওয়া যায় এমন কোনো বিজ্ঞানসাধকের সন্ধান—যাঁর রমণের সমকক্ষ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে—পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে?

"অপেক্ষাকৃত তরুণ বৈজ্ঞানিকদের অভিযোগ অনেক! জাতীয় সরকারের অন্যান্য অনেক বিভাগের মতো 'ব্যুরোক্রেসী'র ভূত এখনো রয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে। উপযুক্ত বেতনের অভাব; পদোন্নতি হতে দেরী হয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের—সে পদোন্নতির প্রধান কারণ কৃতিত্ব নয়—একমাত্র কারণ, উপরওয়ালার মৃত্যু—অবসরগ্রহণ আর পদোন্নতি। সব সময়ে সমবিচার করা হয় না সমান কৃতিত্বসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে। বেতনের বহু রকমের মান রীতিমতো বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি করেছে অনেক গবেষণাগারে। বহুক্ষেত্রে ওপরওয়ালার সংগে নীচের তলার কর্মিদের একমাত্র বন্ধনটা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসের। দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে আর বিভিন্ন গবেষণাগারের সংগে কেন্দ্রস্থলের সম্পর্কটাও অনেকটা অহি-নকুলের—অডিট-ফাইনান্সের। খেতাব বিতরণের সময়ে কখনো কখনো রামের কৃতিত্বের জন্ম তার মনিব শ্যামের ভাগ্যেই খেতাবটা মেলে—অচলায়তনের অমোঘ নিয়মে।

"অতিরঞ্জিত হলেও এ সমস্ত অভিযোগের আংশিক সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জাতীয় সরকার এ সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত এবং আমাদের তরফ থেকে একাগ্র চেষ্টাও চলেছে অচলায়তনের ব্যবস্থার যথাসম্ভব সংশোধন করার জন্ম। কিন্তু সমস্যাটা ব্যাপক জাতীয় জীবনের নানা শিরা-উপশিরার মধ্যেও এ ব্যাধি সঞ্চারিত। তাই হয়তো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সময় লাগবে অনেক।

"কিন্তু এ সমস্ত কারণের নজীর তুলেও দেশের বিজ্ঞান-সাধনার প্রাণহীনতা সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না। পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিকদের সমাদর ও সুযোগ লাভ হয়েছে অতি অল্পদিনই। কিন্তু যুগান্তকারী আবিষ্কার করে এসেছেন তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—অবিশ্রান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও। কোপারনিকাস-গালিলিও ব্রুনোকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, তার সংগে ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকদের আজকের এ অসুবিধাগুলোর তুলনাই করা চলে না।

"ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের এ আংশিক অকৃতকার্যতার মূলে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আর সমাজবিধানের 'ট্রাডিশন'। উৎকট বর্ণাশ্রমের ধারাটা যদিও আমাদের সমাজ থেকে মিলিয়ে যাবার পথে, সেই সংস্কার রয়ে গেছে আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। আমাদের কলাস্থাপত্যে, ভাস্কর্য-বিজ্ঞানে তার প্রভাব আজও অক্ষত হয়ে আছে। পণ্ডিতের বংশধর পণ্ডিত হবে, সূত্রধরের ছেলে সূত্রধর আর রাজার কুমার হবে রাজা—এ ধারার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চিন্তাধারার গতানুগতিকতার পরিবর্তন হতে অনেক দেরী।

"বিশ-ত্রিশ বছর আগে আমাদের সমসাময়িক বিজ্ঞানের ছাত্রেরাও এমনি বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছিলেন প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে—বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করে। দেশের লোক আশা করত এবার ভারতীয় বিজ্ঞান আবার জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। কিন্তু বিশ ত্রিশ বছর পরে আজ দেখা যাচ্ছে কী? আমাদের অনাবশ্যক

পদার্থবিজ্ঞানী যিনি বিলাতে ত্রিশ বছর আগে তামার স্ফটিকের ওপরে যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন—আজও তিনি সেই স্ফটিক নিয়েই ব্যস্ত। প্রথমে তামার স্ফটিক থেকে আরম্ভ করেন, পরে রূপোর স্ফটিক আর আজ হয়তো লোহার স্ফটিক নিয়ে তিনি একই ধরণের কাজ করে চলেছেন। একটু বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া যায়—আমাদের পদার্থবিজ্ঞানী কোন্ ধাতুর স্ফটিক নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন আর পাঁচ বছর পরে!

"আমাদের যুগের রাসায়নিক কোনো ফুলের রং নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, বিদেশের কোনো খ্যাতনামা রসায়নবিদের সংগে—আজও তিনি অন্য এক ফুলের রং-এর রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। বিদেশে যে রসায়নবিদ এঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, অনেকদিনই কৌতূহল মিটিয়ে ফেলেছেন ফুলের রং সম্বন্ধে। 'ষ্টেরয়েড', 'অ্যালক্যালয়েড' 'কার্বোহাইড্রেট্' ইত্যাদির তত্ত্বানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে এই বিদেশী বৈজ্ঞানিকের চিরতরুণ-প্রতিভা এগিয়ে চলেছে জীবনের উৎস সন্ধানে।

"পরবর্তী জেনারেশনে আবার কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এঁর পাদমূলে বসে শিখে এলেন 'ষ্টেরয়েড' 'অ্যালক্যালয়েডে'র কাজ। আজ থেকে বিশ বছর পরে এঁরাও করে যাবেন সেই 'ষ্টেরয়েড-অ্যালক্যালয়েড' সম্বন্ধে গবেষণা! এমনিভাবেই চলতে থাকবে গড্ডালিকাপ্রবাহ জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে—যুগের পর যুগে গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি! 'স্পেশালাইজেশন'-এর দেশীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে একই কাজ বার বার করার ক্ষমতা, আর অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থ হচ্ছে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি!

"বিজ্ঞান আমরা সৃষ্টি করছি না—কেবল আমদানী করেই চলেছি। ধনী লোকেদের মধ্যে যেমন এককালে রেওয়াজ ছিল প্রতি বছরেই নতুন মডেলের মটোরগাড়ী আমদানী করা। আমরা জ্ঞানলাভ করছি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে, যন্ত্রপাতি আনাচ্ছি বিদেশ থেকে, এমনকি বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলোও আমাদের আমদানী করতে হচ্ছে বাইরে থেকে! ভেবে দেখুন তো, বিজ্ঞানে অগ্রণী পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে কোথাও কী গড়ে উঠেছে এমনিভাবে বিজ্ঞানসাধনার ধারা?

"শুধু বিজ্ঞান কেন, ললিতকলার দিকেই একবার তাকিয়ে দেখুন; সেখানেও দেখতে পাবেন ওই একই অবস্থা। ফরাসী দেশ থেকে একজন নামজাদা চিত্রকর কিছুদিন আগে ভারত পরিভ্রমণ করে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভারতের বহু খ্যাত ললিতকলার নিদর্শন দেখা। বিদায়ের দিনে এক ভোজসভায় আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার ভ্রমণ সার্থক হয়েছে তো?' গভীর নৈরাশ্যের সুরে তিনি বললেন যে, আধুনিক ভারতে তিনি আর্ট-এর চিহ্নবিশেষ দেখতে পেলেন না। তবে তাঁর মজুরী পুষিয়ে গেছে প্রাচীন ভারতের অজন্তা-ইলোরা-তাঞ্জোর-কোনারক ইত্যাদি পরিভ্রমণ করে। আর্ট বলে যে বস্তু আমাদের জনসাধারণ সমাদর করে—বিদেশে সেটার নাম কর্মদক্ষতা। এই কর্মদক্ষতার অপূর্ব নিদর্শন পেয়েছেন তিনি গ্রামে গ্রামে। কিন্তু আর্ট বলতে যে নূতন সৃষ্টি বোঝায়, তার বিশেষ সন্ধান মিলল না। বাজারে যা বিকোয় চিত্রকলা-ভাস্কর্য বলে—হয় তা ইলোরা-অজন্তার ধারার অপটু অনুকরণ, না হয় বিদেশের কোনো খ্যাতনামা শিল্পীর 'ষ্টাইল'-এর পুনরাবৃত্তি।

"সংগীতের বেলাতেও তাই। রাগ-রাগিণীর লৌহ-কঠিন বর্ণাশ্রমে সারগমের অমোঘ নিয়মে আমরা সংগীতের ছক এমন করে বেঁধে রেখেছি যে, সেখানে নতুন ধারার আশা করাটাই বৃথা। অতএব সংগীতকে চটকদার করতে আমদানী করতে হয় ল্যাটিন-আমেরিকা কি হলিউড থেকে বস্তাপচা সুর রুম্বা-ট্যাংগো রক্ এণ্ড' রোল্-হুলাহুপের খেলোমদ। ক্লাসিকাল যা রাগপ্রধান সংগীত বিজ্ঞসমাজে রসোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চাই যোড়শ কি অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরের কাঠামো। এমনি করে অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছি সংগীতজ্ঞের সৃষ্টির ক্ষেত্র।

"এমন কি আমাদের বহুখ্যাত সাহিত্যেও গতানুগতিকতার আভাষটা বেশ স্পষ্ট। দেশের সৌভাগ্য যে, কয়েকজন বড়োদরের সাহিত্যিক একেবারে চর্বিতচর্বণের অভ্যাস থেকে সে সাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বহুদিন গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অক্ষম অনুকরণ আজও চলেছে সর্বভারতীয় সাহিত্যে।

"জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই ট্রাডিশন চলেছে অব্যাহত। সিনেমার পর্দায় কোনো গল্প হয়তো জনপ্রিয় হয়ে উঠল—সে কাহিনীই বিভিন্ন নাম নিয়ে দেখা দেয় বারে বারে বছরের পর বছর ধরে।

"এর মূলে আছে কী? অন্য দেশের সংগে আমাদের তফাতটা কোথায়? অনুসন্ধান করলে মেলে এই অপ্রিয় সত্য যে, স্বকীয়তা বা 'ওরিজিনালিটি'র আমরা একেবারেই প্রশ্রয় দিই না। সন্তান-সন্ততিদের এই শিক্ষাটাই দিয়ে থাকি—'দেখো, আমরা চির-জীবন ধরে এই নীতি, এই ধারা, এই আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছি, জগতে এটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পথ—আর পথ নেই।' কিন্তু কোনো পিতা কি সন্তানকে এ কথা বলবেন, 'আমাদের সময়কার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে এই পথটা শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল। সে জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে তোমাদের যুগে। দেখো তো, তোমাদের বৃহত্তর জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে পূর্ণতর করবার, প্রকৃষ্টতর করবার কোনো পথ বের করে নিতে পারো কি না?'

"স্কুল কলেজের শিক্ষাতেও ওই একই অবস্থা। ছাত্রদের সামনে আমরা ধরে দিয়েছি নানা রকমের আদর্শের কাঠামো। তাদের বলা হয়,—'বড়ো বড়ো লোক এ সমস্ত নীতি জগতে প্রচার করে গেছেন, কায়মনোবাক্যে এগুলো পালন করে চলবে। গান্ধীজীর মতো হও, রবীন্দ্রনাথের মতো হও, তিলকের মতো হও, সুভাষচন্দ্রের মতো হও।' কোনো শিক্ষক কী কোনোদিন কোনো ছাত্রকে এ প্রশ্ন করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বর্ষার রূপ প্রকাশ করেছেন; দেখো তো তুমি বর্ষার কোনো নূতনতর রূপ কল্পনা করতে পারো কী না?"

"আমাদের গতানুগতিক আদর্শবাদটাও গড়ে উঠেছে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে—কোনো 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' লক্ষ্য তার নেই। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শবাদ আমাদের এগিয়ে দেয় না অগ্রগতির পথে, উপরন্তু প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নিজস্ব কল্পনাশক্তি আর উদ্ভাবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশের পথে। যে স্নায়ুমণ্ডলী, মস্তিষ্ককোষ, শিরা-উপশিরা, নাসিকাগ্রন্থির সমন্বয়ে হয়েছিল গড়া রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র-গান্ধীজীর মহামানবতা, সে সমন্বয় আবার গড়ে তোলা হয়তো প্রকৃতির পক্ষেও সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও সেটা আবার গড়ার কাজে হাজার হাজার বছর লাগে। বস্তুতঃ এই গতানুগতিকতার ধারার মধ্যে যে কী

করে এই মহামানবদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল, ভাবতেই বিস্ময় লাগে !

"আমাদের ছাত্রদের পক্ষে তাই গান্ধীজীর দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেটুকু পারল সে করল, বাকী ফাঁকটা ভরিয়ে দিল সিনেমার নায়ক নবকুমারকে আদর্শ করে। এখন এই অসম্পূর্ণ গান্ধীজী আর অর্ধসম্পূর্ণ নবকুমারের অকেজো সংমিশ্রণ দিয়ে আমাদের কিছু লাভ হবে ? ভারতীয় জীবনে কোন কাজে লাগাব আচার্য জগদীশচন্দ্র আর খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের অপটু অনুকরণের সংযোগ ! গৃহস্থালীর ব্যবস্থা কী করে পূর্ণতর করে তুলবে সাবিত্রী, সরোজিনী নাইডু আর অভিনেত্রী যদুবালার বিস্বাদ জগাখিচুড়ী ! 'আইনষ্টাইনের মতো হওয়া আর 'আইনষ্টাইনের মতো নূতন আবিষ্কার করা'-এ দুটো আদর্শের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত—আমরা সে কথাটা উপলব্ধি করি না। শিক্ষার্থীকে কেউ কোনোদিনও বলে না,—'তুমি অদ্বৈত শর্মা। তোমার মধ্যে সংহত রয়েছে বিপুল শক্তি। সে শক্তিটার বিকাশ করে তোলো নিজের প্রণালীতে—নিজের চেষ্টাতে। রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়েছিলেন এমনি করেই। দেখো তো তুমি আরো বড়ো হতে পারো কি না ?'

"এই পটভূমিকায় শংকর রায় আর তাঁর সহকর্মিদের আবিষ্কার যুগান্তরের সূচনা করেছে। এ প্রজেক্টের সম্ভাব্যতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সর্বদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত মহা-মানব আইন-ষ্টাইনের মতবাদ—'প্রিন্সিপল অফ ইকুইভালেন্স'। সে মতবাদকে এঁরা যাচাই করেছেন, নিরপেক্ষভাবে সংস্কারমুক্ত মনে ট্রাডিশনের বাঁধন ছিন্ন করে। তারপরে সে মতবাদের এঁরা পরিশোধন করেছেন নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে—হোক না তা বিংশশতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের থিয়োরি। তার ফলেই তো সম্ভব হোলো এই অভাবনীয় আবিষ্কার।

"প্রজেক্ট অ্যান্টিগ্র্যাভিটির সাফল্যে দেশবাসীর আনন্দের আরো অনেক কারণ আছে। রুশ ও মার্কিণ বৈজ্ঞানিকেরাও একরকমভাবে পৃথিবীর মহাকর্ষ বিজয় করেছে। সে জয় আসুরিক শক্তির—আমাদের জয় কৌশলের। স্পুটনিকের দল ভীমবেগে আকাশে উঠেছে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতেই। আমাদের গ্রাভোমোবিলের শক্তির ক্ষয় নেই মহাকর্ষের সীমা ছাড়ালেও—সূর্যকিরণের শক্তি আহরণ করে, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সুবিধামতো সমন্বয় করে বিনা আয়াসে সেটা চলতে থাকবে গ্রহ থেকে গ্রহে তারা থেকে তারায়। আমাদের জাতীয় শান্তির নীতির সংগে কোথাও যেন এর একটা মিল আছে।

"আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টিগ্রাভিটি বিরাট পরিবর্তন আনবে ভারতীয় জনসমাজের চিন্তাধারায়, সমাজবিধানে, সাহিত্যে-রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের গমনাগমন হবে সহজ। জাতীয় সম্পদ কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের অপব্যয় যাবে কমে। অসীম ক্ষমতা হবে আমাদের করায়ত্ত। চাঁদে, শুক্রগ্রহে, মংগলগ্রহে পড়বে ভারতবাসীর পদচিহ্ন—হয়তো বা এ বিষয়ে আমরাই হয়ে যাব অগ্রণী। হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত না করেও সামরিক শক্তিতে আমরা হবো অজেয়।

"আজকের এই অ্যান্টিগ্র্যাভিটি মেসিনে অনেক কিছুই রয়ে গেছে স্থূল ও অসম্পূর্ণ। বস্তুতঃ এর অন্তর্নিহিত মূল সূত্রগুলোই সংগ্রহ করতে লাগবে বহুবর্ষের সাধনা। এই এগারো জন বৈজ্ঞানিক গড়ে তুলবেন 'গ্রাভন' সম্বন্ধে গবেষণার এগারোটি ধারা। নূতন বিজ্ঞানের শাখার জন্ম হয়েছে ভারতে—'গ্রাভনিক্স্'। জগতসভায় আমরাই রইলাম অগ্রণী গ্রাভনিক্স্-এর অনুশীলনে। ভারতীয় শিক্ষালয়ে আবার আসবে ছাত্রেরা দেশ-দেশান্তর থেকে এই নূতন বিজ্ঞানের পাঠ নিতে—যেমন আসতো শিক্ষার্থীর দল ভারতের এক অতীত গৌরবের যুগে দুর্গমপথ পার হয়ে নালন্দায়, তক্ষশীলায়।

" 'গ্রাভন'-এর মতবাদ প্রভাবিত করবে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে। 'কসমোলজি', 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্স', 'অ্যাষ্ট্রনমি', 'ষ্টেলার ডাইনামিক্স্'-এ গ্রাভন আনবে বিপ্লব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর এক নূতনতর রূপ ধরা পড়বে মানুষের দৃষ্টিতে। তরংগের থিয়োরি—আপেক্ষিকতাবাদ নিউক্লীয়ার ফিজিক্স—রসায়ন-গণিতে আসবে যুগসন্ধি ঘনিয়ে। আসুন, সর্বজগতের বিজ্ঞান সাধনার ভাগ্য নিয়ন্তাদের সংগে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিই।"

একে একে প্রজেক্টের সব কর্মিদের মঞ্চের ওপরে ডেকে কৃষ্ণস্বামী তাঁদের পরিচয় দিলেন আর অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারে তাঁদের প্রত্যেকের দানের ব্যাখ্যা করলেন। সর্বাগ্রে শংকর রায় আর সব শেষে ডাক পড়লো সুমিত্রার।

সুমিত্রার পরিচয়ের ভূমিকায় কৃষ্ণস্বামী বলেন—"সব শেষে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই এই প্রজেক্টের জনয়িত্রী এবং ধাত্রীস্বরূপা, মূর্তিমতী প্রতিভা ডাঃ সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে। এ পরিকল্পনায় ডাঃ দেশপাণ্ডের পোষাকী ভূমিকা ছিল সম্পাদিকা ও মনোবিজ্ঞানীর—কিন্তু আসলে ইনিই ছিলেন প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির প্রাণস্বরূপা। ডাঃ রায়ের অভাবনীয় মননশক্তি, ডাঃ কালেশ্বর রাওএর অসাধারণ গণিতের জ্ঞান—অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব দান যেমন এ যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছে, ডাঃ দেশপাণ্ডে তেমনি করেছেন এ প্রজেক্টের মূল পরিকল্পনা ও রূপায়ন। বস্তুতঃ ইনি না থাকলে সামনের ওই যন্ত্রটির অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকত না। তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে, এ অভাবনীয় আবিষ্কারের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান যদি কারো প্রাপ্য থাকে, তবে ডাঃ সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকেই সে সম্মান দেওয়া উচিত। সভার শেষে ডাঃ দেশপাণ্ডে আপনাদের শোনাবেন এ প্রজেক্টের সম্পূর্ণ ইতিহাস।"

কৃষ্ণস্বামী আসন গ্রহণ করলেন।

শংকরের মনে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় ! সুমিত্রা এমন কী করেছে যার জন্য ওকে এতোটা প্রশংসা করা যায় ? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছেনা কি ?

মনে হঠাৎ একটা অন্ধ ঈর্ষা জেগে ওঠে। কিন্তু শংকর সেটাকে অবদমিত করেই সকলের সংগে করতালিতে যোগ দেয়।

অতিথি-অভ্যাগতদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পালা এবারে। তাতে অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন যে, তাঁর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় এতটা অভিভূত কখনো হননি—তিনি উপলব্ধি করছেন যে, ভারতে তাঁর জন্ম সার্থক হয়েছে। তিনি আর সম্মানিত অতিথি দুএকজন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, জাতীয় সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক এই এগারোজন বৈজ্ঞানিককে। জাতীয় প্রফেসারের পদ গ্রহণ করবার জন্য এঁদের আমন্ত্রণ জানানো হোক। তৃতীয় পরিকল্পনার 'বাজেট' থেকে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরির পাশে আরো দশটি ল্যাবরেটরী গড়ে

তুলে এগারোটি ল্যাবরেটরীর পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হোক এঁদের ওপরে। এঁরা জাগিয়ে তুলুন দেশের কোণে নতুন জীবনের সাড়া। গ্রাভোমোবিল তৈরী করার জন্ম বিশাল কারখানার পত্তন করা হোক।

এমনি করে চলল অভ্যাগতদের ভাবোচ্ছ্বাসের পালা বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

শংকরের কাণ যেন বধির হয়ে গেছে—এত প্রশংসাবলীর কোনোটাই তার মর্মে পৌছায় না। অধীর হয়ে সে অপেক্ষা করে সম্পাদিকার অভিভাষণের জন্ম। সুমিত্রার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। এক দুর্বোধ্য ম্লান হাসির আড়ালে সুমিত্রা আত্মগোপন করে রয়েছে।

সবশেষে তার পালা এলো। ধীরপদে উঠে যায় সুমিত্রা মঞ্চের ওপরে। অবিন্যস্ত দু-একটি চুল সন্তর্পণে সরিয়ে দেয় কপালের ওপর থেকে। শংকরের মনে হয় যেন সুমিত্রার মুখখানা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে সকালের আলোয়।

মাননীয় অতিথিদের সকলকে সুমিত্রা করলো অভিবাদন আর প্রথামতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তারপরে প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির সহকর্মিদের সম্বোধন করে বক্তব্য বলে যায়,—

"প্রথমেই আমার সহকর্মিদের একটা ভুল সংশোধন করে দিতে চাই। তাঁদের একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, সামনের ওই যন্ত্রটা ছাড়াও আগে একটা অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিন তৈরী হয়েছিল। সে ধারণা মিথ্যা। সর্বপ্রথম অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের গৌরবটা আপনাদের—আর কারো নয়!"

শংকর উৎকর্ণ হয়ে শোনে। কী বলতে চায় সুমিত্রা? ওর কথার তাৎপর্য কী? তবে কি, শিকদারের কথাটাই সত্য?

"আমার মূল বক্তব্যে আসবার আগে এ অনুষ্ঠানের আর একটা কাজ বাকী রয়ে গেছে। এই প্রজেক্টে ছিলেন একজন কর্মী, যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের সাহায্য করে গেছেন। তাঁর সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

সভার এককোণ থেকে শোনা গেল গুঞ্জন। ভীড়ের মধ্য থেকে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে যে মূর্তি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালো, তাকে দেখে সকলেই চমকে ওঠে। হবিবুল্লা না? হাঁ, হবিবুল্লাই তো! সে মূর্তি যে শংকরের অন্তরে গাঁথা হয়ে রয়েছে! ভুলবার তো কথা নয়! প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতেই একটা চাপা উত্তেজিত কোলাহল ওঠে প্রজেক্টের বৈজ্ঞানিকদের মধ্য থেকে।

হবিবুল্লা বিনীতভাবে জ্ঞাপন করল,—'হাঁ, আমিই হবিবুল্লা খান। তবে আপনাদের কল্পনার হবিবুল্লার সংগে আমার পার্থক্য রয়ে গেছে অনেক। আমার জীবনের যে কাহিনী আপনারা জেনেছেন, তার একটা বড়ো অংশ সত্য, কিন্তু কিছুটা মিথ্যা। সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা হচ্ছে আমার 'অ্যান্টিগ্রাভিটি' আবিষ্কার।

'এ বাড়ী ও ল্যাবরেটরী আমিই গড়ে তুলেছিলাম 'ইলেক্ট্রনিক্স্'-এ নূতন ধরণের কাজ আরম্ভ করবার জন্ম। খান কোম্পানীর রেডিওর কারখানা সম্প্রসারণ করবার সময় কম্পিউটার তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 'অ্যানালগ কম্পিউটার'-'ডিফারেন্সিয়াল অ্যানালাইজার' আর অন্য দু'একটি সহকারী ইউনিট আমার নিজের হাতের তৈরী। আর কতকগুলো যন্ত্রও আমিই তৈরী করেছিলাম। কিন্তু আমার ল্যাবরেটরী এখন সমৃদ্ধ করেছে দেশরক্ষা বিভাগের অনেক যন্ত্রপাতি। আমার গ্রন্থাগারও পুষ্ট করেছে তাঁদেরই সংগৃহীত অনেক বই। এই বাড়ী আর ল্যাবরেটরী আমি দান করেছি জাতীয় সরকারকে মহাকর্ষ আর মহাশূন্য সম্বন্ধে গবেষণার কাজে। আপনাদের এ প্রজেক্টে যৎসামান্য সাহায্য করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

'আরো কয়েকটি রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে দিলে ভালো হয়। টিমারপুরের অগ্নিকাণ্ড অবশ্য দৈব দুর্ঘটনা। কিন্তু মিসেস আহমেদ ও তাঁর শিশুপুত্র আমার বৈমাত্রেয় ভগ্নী ও ভাগিনেয় নিরাপদেই আছেন। আসলে অগ্নিকাণ্ডের সময় এঁরা বাড়ীতেই ছিলেন না। খবরের কাগজে আমার ও তাঁদের যে মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেটা রিপোর্টারের ভুলে। আমরা ইচ্ছা করেই এ ভুল সংশোধন করি নি। এই ভুলও হয়তো আপনাদের কিছুটা সাহায্য করেছে।

'সলিম এখন ইংল্যাণ্ডে, লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র সে।

'আর একটা কথা, আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ। হয়তো কিছুটা কর্মদক্ষতা লাভ করেছি যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে। কাহিনীর হবিবুল্লার যে বিরাট প্রতিভা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, আসল হবিবুল্লার মধ্যে আছে বড়োজোর তার একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। ব্যবসায়ে আমার সাফল্য, 'মার্কেট-রিসার্চ' আর কতকগুলো নির্ভুল আন্দাজের ফলেই। ভাগ্যও সহায় হয়েছিল আমাদের খান কোম্পানীর সম্প্রসারণের দিনে।

'আমার বাকী জীবনের কাহিনীটা মোটামুটি সত্য—কিন্তু তার থেকে জায়গায় জায়গায় অনেক ঘটনা বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন যন্ত্রপাতি তৈরী ছাড়াও আমার আর একটা নেশা আছে, সেটা হচ্ছে বনৌষধি আর ভেষজ দ্রব্য সংগ্রহ করা। পৃথিবীর অনেক দুর্গম জায়গায় ভ্রমণ করেছি এই কারণেই। আমার জীবন-কাহিনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয় নি।"

শংকরের মাথার মধ্যে স্পন্দন সুরু হয়ে গেছে। সুমিত্রা তার সংগে এতো বড়ো প্রতারণা করলো! তার চোখ জ্বালা করতে সুরু করে।

সুমিত্রা তখন বলে চলেছে নির্ঝরের স্রোতের মতো।

'আমার সহকর্মিদের তা হলে অভিনন্দন জানাতে পারি। অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনের প্রথম পরিকল্পনা আর সৃষ্টির কৃতিত্বটা তাঁদের!'

এবার সুমিত্রার পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শংকরের মুখের ওপরে, সম্মোহিত শংকর শুনে যায়।

"'একটা মিথ্যা প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করেছি বলে কোনো অনুশোচনা আমার নেই। সত্য মিথ্যার প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কারণ প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটি পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নয়; মূল প্রজেক্ট-টা হচ্ছে ফলিত মনোবিজ্ঞানের। যদি কারো মনে এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকে, সে ধারণা আমি ভেঙে দিতে চাই।

"এ পরিকল্পনার জন্ম হয়েছিল প্রায় দু'বছর আগে। একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীর বাড়ীতে এক চা-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হই। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশরক্ষা বিভাগের দু'একজন নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিক, চীফ অফ ষ্টাফ আর কয়েকজন

উচ্চপদস্থ সামরিক বিভাগের কর্মচারী। সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সাধনা-বিভাগের মন্ত্রীও উপস্থিত হলেন কিছুক্ষণ পরে। নানা কথাবার্তার পর প্রসংগ উঠল দেশের বিজ্ঞান-সাধনার ধারার সম্বন্ধে। প্রশ্নটা উঠেছিল—দেশে সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের এতো অভাব কেন? ভারতে প্রতিভাবান্ ছেলের তো অভাব নেই। পাশ্চাত্য-দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কষ্টিপাথরে সে উজ্জ্বল প্রতিভা ধরা পড়ে। অথচ দেশের মাটিতে তা বন্ধ্যা হয়ে যায় কেন?

"উত্তরে অনেকের কাছ থেকে শোনা গেল নানারকমের মত, অনেক রকমের মামুলি মন্তব্য। দেশের স্কুল-কলেজে নিয়মতান্ত্রিকতার অভাব, ব্যুরোক্রেসী, সুযোগের অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো কত কী!

"সেদিন আমি কতকগুলো কারণের উল্লেখ করি, প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী এই সভায় অতি চমৎকারভাবে সেগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আমার মতামত সেদিন একটা তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল; কারো পেয়েছিলাম সমর্থন, কারো বা বিপক্ষতা। সেদিন সবচেয়ে জোরালো সমর্থন পেয়েছিলাম অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামীর কাছে।

"আলোচনাটা শেষে দাঁড়ালো এই রকমের—মন্তব্য আর সমালোচনা তো করা খুবই সহজ, সকলেই তা করতে পারেন, কিন্তু এ অবস্থার থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় আছে কি?

"এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম, এই রকম কোনো এক প্রজেক্টের কথা, অন্ততঃ একটা ছোটোখাটো পরীক্ষা করে দেখার কথা। ভুল বুঝবেন না, অ্যান্টিগ্রাভিটি সেদিন ছিল সকলের কল্পনার বাইরে।

"স্বপ্নেও সেদিন ভাবতে পারিনি চায়ের টেব্‌লে আমার কথা এঁদের মনে আলোড়ন তুলবে, আর তা থেকে সুরু হবে এই বিরাট পরিকল্পনা!

"কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করলাম যে, প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী সেদিনকার আলোচনা ভুলতে পারেন নি, তাঁর সংগে দেখা হলেই সেদিনের কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হত। এই রকমভাবে আমাদের নিতান্ত ঘরোয়া আলোচনা ও তর্কের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনাটা দানা বাঁধতে থাকে। অবশ্য সেদিন আমার সেটা বোঝার সাধ্য ছিল না।

সেই চা-পার্টির মাস চারেক পরেই এক জরুরী অধিবেশনে হঠাৎ ডাক পড়াতে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। সেদিন প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী বললেন যে, তিনি একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন আমার 'আইডিয়াগুলো কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করার। হবিবুল্লা খান, তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক কয়েকবছরের জন্য ভারত ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন ইলেক্ট্রনিক্‌স্-এর ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টায়। তাঁর বিরাট বাড়ী আর অতি আধুনিক ল্যাবরেটরী জাতীয় সরকারকে দান করতে চান পদার্থ-বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য। সেই ল্যাবরেটারীকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিকল্পনা রূপায়িত করা যেতে পারে। দেশরক্ষা বিভাগের নেতাদের রয়েছে বিশেষ উৎসাহ এ সম্বন্ধে—কাজেই অর্থবল ও লোকবলের অভাব হবে না। এ ছাড়া রকেট-নির্মাণ, ওপরের স্তরের বায়ুমণ্ডলী আর মহাশূন্য সম্বন্ধে গবেষণার কাজে আগামী বছরের বাজেটে একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে সংক্রান্ত যে কোনো একটা সমস্যার ওপরে পরিকল্পনা গড়ে তুললে সবদিক থেকেই সুবিধা হয়।

"আমি সেদিন যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলাম—নানা ওজর-আপত্তি তুলে পেছিয়ে যেতে চাইলাম। কল্পনাও করতে পারিনি—আমার এক সন্ধ্যার প্রগল্‌ভতার ফলে চায়ের পেয়ালায় এত বড়ো তুফানের সৃষ্টি হবে—আর আমাকেই এগিয়ে দেওয়া হবে সে ঝড়ের মুখে! কিন্তু প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীকে আপনারা সকলেই জানেন, কোনো আইডিয়া তাঁর মগজে একবার আশ্রয় গ্রহণ করলে, কারোরই নিস্তার পাবার উপায় থাকে না।

"সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন আমার যা কিছু বিদ্যা ছিল সবই পুঁথিগত। দেশে ফিরে শিশুদের মনের গঠন সম্বন্ধে পরীক্ষা করার জন্য দু-একটা ছোটো-খাটো পরিকল্পনার সংগে আমি জড়িয়েছিলাম। এতবড়ো প্রজেক্টের ভার নেবার না ছিলো সাহস—না ছিলো অভিজ্ঞতা! কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রণে ভংগ দিতে অহমিকায় বেধে গেল।

"তারপর উঠলো প্রশ্ন—কোন্ সমস্যার সমাধানে দেশের বৈজ্ঞানিকদের আহ্বান করা হবে? এখন সেদিনকার সংবাদপত্রে ছিল রুশদেশের নবতম 'স্পুটনিক'এর কাহিনী। কিছুক্ষণ বচসার পর সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হোলো 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'র কথা।

"প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী কিন্তু আবার বলেছিলেন যে, অ্যান্টিগ্রাভিটি কি সম্ভব হবে? তার চেয়ে অন্য কোনো সমস্যার কথা ভাবা যাক—অন্ততঃ যার সমাধানের কোনো সম্ভাবনা আছে—যেমন নূতন ধরণের 'রকেট-ফুয়েল'। আমি সেদিন বলেছিলাম—না, অ্যান্টিগ্রাভিটিই থাক। যে সমস্যার সমাধান সাধারণভাবে সম্ভব, সে সমস্যায় তো আমাদের থিয়োরিগুলোর একটা অগ্নিপরীক্ষা হবে না!"

"এইবারে তৈরী করা হল রংগমঞ্চ। হবিবুল্লাই এ কাজে এলেন অগ্রণী হয়ে প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে। আমাদের জন্য অনেক অসুবিধা তিনি সহ্য করেছেন। প্রবাসে থেকেও তাঁর গতিবিধি ছিল নিয়ন্ত্রিত। কারণ তাঁর মৃত্যুসংবাদটা ছড়িয়ে দিতে হয়েছিল তাঁরই পরিচিত লোকজনের মধ্যে। মনে প্রাণে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েও তাঁর বদান্যতা আর সহানুভূতির প্রতিদান দেওয়া যায় না। এইভাবে এক কল্পিত ঘটনার সৃষ্টি করা হোলো যে, হবিবুল্লা অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভবপর করেছেন।"

"এখন সমস্যা দাঁড়ালো হবিবুল্লার মৃত্যু আর অ্যান্টিগ্রাভিটি মেসিনের ধ্বংস কী ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে আপনাদের সামনে দেখানো যায়। আমাদের অন্য একটি 'প্ল্যান' ছিলো এ সম্বন্ধে। কিন্তু দৈব সহায় হোলো আমাদের টিমারপুরের অগ্নিকাণ্ডে। ওই বাড়ীরই একটা ফ্ল্যাটে বাস করতেন হবিবুল্লার ভগ্নী তাঁর শিশুপুত্র নিয়ে। হবিবুল্লার ভগ্নীপতি মিঃ আহমেদ বর্মার বাসিন্দা। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় ইউরোপের দিকে। তাই বছর খানেকের জন্য মিসেস আহমেদকে দিল্লীতে বাস করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে অগ্নিকাণ্ডের সময় তাঁরা টিমারপুরের ফ্ল্যাটে ছিলেন না, ছিলেন হবিবুল্লার বাড়ীতেই।

"অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ যখন টেলিফোনে পাওয়া গেল, আমরাও তখন হবিবুল্লার বাড়ীতেই, প্রজেক্ট সম্বন্ধে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলছিল। টিমারপুরে ওই অঞ্চলে হবিবুল্লার এক বন্ধু ছিলেন আর একটা বাড়ীতে, তিনিই সংবাদটা দেন। খবর পেয়ে একজন ক্যামেরাম্যানকে সংগে করে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। ওই ঘটনার ফিল্ম তোলা হল। মিসেস আহ্‌মেদ ও তাঁর শিশুপুত্রের ছবি

আর হবিবুল্লার শূন্যে ওঠার দৃশ্যটা তার সংগে 'সুপারইম্পোজ' করে নিখুঁতভাবে ফিল্মটা 'এডিট' করা হোলো। তার পরের ঘটনা আপনারা সবই জানেন।

"আপনারা অনুযোগ করবেন, এ মিথ্যাচারের প্রয়োজন কি ছিল? আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করছি, ভারত সরকার যদি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতেন, 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'র মতো কোন অসম্ভব ব্যাপারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গবেষণায়, নিজেদের কাজ ফেলে আপনারা রাজী হতেন কি? মোটা বেতনের প্রলোভনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো রাজী হয়ে যেতেন। কিন্তু সে গবেষণার ফল কী পাওয়া যেত? অ্যান্টিগ্রাভিটির নামে 'জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' আর 'ইউনিফায়েড ফীল্ড থিয়োরি'-র চর্বিতচর্বণ চলতো আর পরবর্তী বিশ বছর ধরে ল্যাবরেটরী থেকে বেরোতে থাকত আইনষ্টাইনের দুরূহ ইকোয়েশনগুলোর দুরূহতর আর দুরূহতম ব্যাখ্যা! 'ম্যাথেমেটিকাল' অ্যাবষ্টাকসন্-এর অভ্রভেদী দুর্গম শিখরে সকলে উঠে বসে থাকতেন!

"আমাদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে, দেশের আবহমানকাল ধরে চলতি গতানুগতিকতার ধারাটার পরিবর্তন করতে হলে, আমাদের আত্মবিস্মৃত আইনষ্টাইনদের জাগিয়ে তুলতে গেলে, দরকার বড়ো রকমের একটা নাড়া! জোরালো ঔষধ ছাড়া এ ব্যাধিতে কাজ হবে না। সেজন্য আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হোলো যে, অ্যান্টিগ্রাভিটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে আবিষ্কার সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানের জগতে অজ্ঞাতকুলশীল এক তরুণ, যাঁর নাম পাওয়া যায় না বিজ্ঞানের কোন জার্নালে। এর ফলে আঘাতটা লাগল আমাদের বিজ্ঞানসাধকদের উন্নাসিক আত্মম্ভরিতায়।

"মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে 'কণ্ডিশন' করা। সত্যমিথ্যার প্রশ্ন নেই এর মধ্যে। গণিতে বা পদার্থবিজ্ঞানে যেমন আপনারা 'পশ্চুলেট্' করেন, হবিবুল্লার আবিষ্কারটা হয়ে দাঁড়ালো এই রকমের একটা 'পশ্চুলেট্' গ্রাভন আছে কি নেই—বর্তমান বিজ্ঞানের পক্ষে এর কোনোটাই প্রমাণ করাটা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তার অস্তিত্ব আপনারা ধরে নিয়েছেন, 'পশ্চুলেট' করেছেন অ্যান্টিগ্রাভিটির সমাধান করতে। একবার 'পশ্চুলেট' করলে ফাঁকি দেবার উপায় নেই, শেষ ইকোয়েশন পর্যন্ত সে 'পশ্চলেট' টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের 'পশ্চলেট'-টাও করা হোলো এমনভাবে যে, কোথাও কোনো ছিদ্র না থাকে। শেষদিন পর্যন্ত সেটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। তাই তো এতো আড়ম্বরের প্রয়োজন হয়েছিল! অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটী থাকলেও চলতো না!

"আমরা তাই ধরে নিলাম অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব বলে। হবিবুল্লার লাইব্রেরীতে আমরা যোগ করে দিলাম 'লেভিটেশন' আর যাবতীয় বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয়ের নানারকমের বই। বই সাজানোর শৃংখলা নষ্ট করে গ্রন্থাগারে সৃষ্টি করা হল' পরম বিশৃংখলার একটি 'র‍্যাণ্ডম' বিন্যাসের, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাট একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করা—যে বিজ্ঞানের বাইরেও বহু জিনিষই আছে, যেগুলোর খবর বিজ্ঞানসাধক রাখার দরকার মনে করেন না। অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কার করতে হলে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের জানা সূত্রগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকলেই চলবে না, অজানার মধ্যেও সন্ধান করতে হবে। বস্তুতঃ, হবিবুল্লার লাইব্রেরীর অনেক বই-এর সংগে মহাকর্ষের কোনো সংযোগই নেই। এই বইগুলো হচ্ছে 'সিমবোলিক্', গোলমালের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য।

হবিবুল্লার জীবনকাহিনীতে কতকগুলো জানা অংশ বাদ দেওয়া হোলো। তার পরিবর্তে ভরে দেওয়া হোলো 'আনসার্টেন' বা অনিশ্চয়তা। তার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতার মধ্যে দেওয়া হোলো এ প্রজেক্টের মূল প্রতিপাদ্য আর কতকগুলো অর্থহীন 'র‍্যাণ্ডম' কথার টুকরোর বিন্যাস। এ রকমভাবে আওয়াজের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেওয়া গেল।

"খাঁটি আওয়াজ বা গোলমালের মতো বিস্ময়কর জিনিস জগতে আর কিছুই নেই। মানুষের আবহমানকালের যতো কিছু কথা, যতো গান, সবই খুঁজে পাওয়া যাবে আওয়াজের মধ্য থেকে। তাই তো আজ পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত আর মনোবিজ্ঞানের একত্র সমাবেশ হচ্ছে আওয়াজের অনুশীলনে। এমন 'র‍্যাণ্ডম' ব্যবস্থা—এমন চমৎকার বিশৃংখলা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

"এই আওয়াজের সংগে যোগ করলাম কড়া নিরাপত্তা-ব্যবস্থা। প্রজেক্টের বৈজ্ঞানিকদের মনে ফুটিয়ে তোলা হোলো একটা ধারণা যে, যথাসম্ভব শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান না করতে পারলে জাতীয় দুর্দিনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কর্মিদের মনে জাগিয়ে তোলা হোলো দেশাত্মবোধ, আর লাগানো হোলো একটা বিষম তাড়া—একটা 'আর্জেনসী'।

"এর ফল আমরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কতো নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করতে হয়েছে আমাদের গ্রাভোমোবিলের রূপায়ন করতে তার সঠিক হিসেব আমার জানা নেই। তবে এই উপলক্ষে আমার সহকর্মিরা সতেরোটি প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার করেছেন—এইটুকুই জানি। এগারো মাসে সম্ভব হয়েছে এগারো বছরের কাজ!

"আমন্ত্রিত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেবল একজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে আমরা ফাঁকি দিতে পারিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রফেসর শিকদার এ প্রজেক্ট থেকে পদত্যাগ করে চলে গেছেন। একমাত্র তিনিই প্রায় আসল ব্যাপারটার কাছাকাছি পৌছেছিলেন। এমনকি, একদিন সন্ধ্যায় আমাদের কিছুটা উদ্বেগের কারণ হয়েছিল প্রফেসর শিকদারের গভীর বিশ্লেষণ। সেদিন কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন ডা: শংকর রায় তাঁর প্রখর যুক্তি দিয়ে। ডা: রায় অবশ্য জানতেন না প্রজেক্ট-এর আসল রূপ। আর একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রফেসর শিকদার আমাদের সাহায্যই করে গেছেন। অ্যান্টিগ্রাভিটিতে তাঁর দৃঢ় অবিশ্বাসই জাগিয়ে তুলেছিল অন্য কর্মিদের মনে গভীরতর বিশ্বাস। সেদিন সন্ধ্যায় প্রফেসর শিকদার অচল অবস্থার সৃষ্টি না করলে, আবিষ্কারের লগ্নটাও হয়তো যেতো পেছিয়ে।"

শংকরের আবার চোখ জ্বালা করতে থাকে। মাথায়ও সুরু হয়েছে একটা অস্বস্তিকর আলোড়ন। কিন্তু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে সে শুনে যায়।

"এ প্রজেক্টে আশাতীত সাফল্যলাভ করা গেছে আপনাদের মতো প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য পেয়ে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু, ভেবে দেখুন, 'অ্যান্টিগ্রাভিটি' ছাড়াও অন্য যে কোন সমস্যা কেন্দ্র করে পরিকল্পনা গড়ে তুললেও, প্রায় একই

রকমের ফল পাওয়া যেতো। দেশবিদেশের বড় বড় সমস্যা যার কোনো মীমাংসা আজও পর্যন্ত হয়নি—যেমন ক্যানসার, জন্মনিয়ন্ত্রণ, দীর্ঘজীবন লাভ, মানুষের অপরাধ-প্রবণতা, বন্যানিয়ন্ত্রণ, 'করোশন'—পৃথিবীর জলহাওয়াতে ধাতুর বিনাশ—সবকিছুই এই প্রণালীতে মীমাংসা করা যেতো—অন্ততঃ এগুলোর সমাধান সম্পর্কে নতুন মত, নতুন পথের সৃষ্টি হোতো। কথাটা এতো জোর গলায় বলতে পারছি তার কারণটাও খুব জটিল নয়। এটা নিহিত আছে আবিষ্কারের মনস্তত্ত্বের মধ্যে।

"আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—শিশুশরতের প্রভাতে আজ যেখানে খণ্ড খণ্ড মেঘের সমারোহ। ওই মেঘটাকে দেখতে উটের মতো; ওপাশের ওটা একটা বিরাট ভালুকের আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমকোণের মেঘটা দেখে মনে হচ্ছে যেন ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র ওটা। আমরা উট দেখেছি, ভালুকও দেখেছি, আর ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের সংগে আমাদের পরিচয়টাও অনেকদিনের। অজস্র মেঘের সমাবেশের মধ্যে ওই তিনটি মেঘের খণ্ড চিনে-নিচ্ছি অতি সহজেই। যাঁদের উট, ভালুক বা ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই, তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না এমন করে চিনে নেওয়া। যেমন আমাদের কোনো ধারণা হয় না মধ্যের ওই পুঞ্জীভূত বড়ো মেঘটার আকৃতির। মনে করুন, শুক্রগ্রহের কোনো কল্পিত অধিবাসী এই সভায় উপস্থিত। এখন শুক্রগ্রহে কল্পিত এক জানোয়ার ঘুরে বেড়ায় নাম 'জন্তুতর' যার আকৃতি ওই মাঝের বড়ো মেঘটার মতো। সুতরাং আমাদের কল্পিত সেই শুক্রগ্রহের অধিবাসী মেঘটার রূপ উপলব্ধি করবেন জন্তুতরের প্রতিকৃতিতে। আমাদের ভালুক বা উট তাঁর কাছে অর্থহীন।"

"মেঘলেশশূন্য তারাভরা রাতে আকাশে আমরা দেখি সপ্তর্ষিমণ্ডল। পশ্চিমদেশের অধিবাসী সেই একই রাশিকে চেনে 'গ্রেট বেয়ার' বলে। এমনি রয়ে যায় স্থান-কালের দৃষ্টিভংগীর ভেদ। সূর্যের আলো সাধারণতঃ আমরা দেখি সাদা, কিন্তু অতসী কাঁচের সাহায্যে বা রামধনুর মধ্যে দেখা যায় সাত রংএর অপরূপ বর্ণচ্ছটা।

"প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছেন তার সম্পদ ওই মেঘগুলোর মতোই। গোছানো কি অগোছালোভাবে সে প্রশ্ন নিরর্থক। সুসংবদ্ধ বিন্যাস-অবিন্যাস, শৃংখল-বিশৃংখলা, 'অর্ডার-ডিস্অর্ডার', 'সিমেট্রি-অ্যাসিমেট্রি', 'প্যারিটি-ডিসপ্যারিটি'—সবই তো মানুষের মনগড়া। আমরা দেখতে চাই ইতস্ততঃ ছড়ানো সম্পদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা, একটা শৃংখলা। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই—কোনটা হয়তো কাছেই আবার কোনোটা হয়তো শত আলোকবর্ষের কল্পনাতীত ব্যবধানে। এ গুলোকে আমরা একসংগে বিন্যাস করি, কেবলমাত্র দিগদর্শনের সুবিধার জন্যই।"

"প্রকৃতির সম্পদগুলোর মধ্যেও আমরা অন্বেষণ করেছি একটা নিয়ম, একটা 'প্যাটার্ণ', তা না হোলে সে সম্পদগুলোর কোনো অর্থই আমাদের কাছে হয় না। যখন খুঁজে পাওয়া গেল একটা নিয়ম সে সম্পদগুলো সংঘবদ্ধ করবার, শ্রেণী বিভাগ করবার—তখনি গড়ে ওঠে আমাদের থিয়োরি, দর্শন আর বিজ্ঞান। সে নিয়মের মধ্যে যেগুলো পড়ল না, সেগুলো রয়ে যায় নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক হয়ে।

"বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে মহামানবের ধারার মধ্য দিয়ে—হেরোডোটাস থেকে আর্কিমিডিস, অ্যারিষ্টটল্ থেকে গ্যালিলিও, নিউটন থেকে আইনষ্টাইন। এক একজন দিকপাল বের করলেন নূতনতর নিয়ম। আমাদের জানা সম্পদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকলো। এমনি করেই আজ আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বিজ্ঞানের এই অবিশ্বাস্য জটিল শাখা-প্রশাখায়। আবিষ্কারের ধারা চলেছে অপ্রতিহত দ্রুততর তালে, অজানা সম্পদ সার্থক হয়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

"কিন্তু আবিষ্কারের মূলে আছে কি? অনেক গবেষণা হয়েছে এ নিয়ে, অনেক বই লেখা হয়েছে নানা ভাষায়। মতদ্বৈধ আছে যথেষ্ট এ সম্বন্ধে। এক দলের ধারণা হচ্ছে প্রত্যেক বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মূলে আছে কোনো দৈব ঘটনা, কোনো আশাতীত সৌভাগ্য। উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করা হয় আর্কিমিডিসের আবিষ্কার, নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম উদ্ঘাটন, পেনিসিলিনের আবির্ভাব। আর এক দলের মত হচ্ছে সব আবিষ্কারের মূলেই রয়েছে কঠোর, একনিষ্ঠ তপস্যা।

"আশ্চর্যের কথা এই, শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধেই এতো জল্পনা-কল্পনা। এতো প্রশ্ন তো ওঠে না সাহিত্য-ললিতকলার উৎস সম্বন্ধে। কেউই বিশেষ মাথা ঘামান না আজ এই নিয়ে যে, বড়োদরের সাহিত্যিক কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেন কী করে, মহাকাব্য রচিত হয় কোন্ সূত্র থেকে, কোথা থেকে আসে লিওনার্দোর মোনালিসার রূপ আর প্রেরণা। সকলের সব হয়ে এসেছে এক্ষেত্রে একই রকমের। বড়ো সৃষ্টির উপকরণ দুটো-একটা প্রতিভা আর একটা প্রেরণা।

"সাহিত্য-ললিতকলার ক্ষেত্রে যে কথা চলে, বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রেও সে কথা চলবে না কেন? বস্তুতঃ বিজ্ঞানের বড়ো আবিষ্কার, যুগান্তকারী মহাকাব্যের রচনা আর নতুন আর্ট সৃষ্টির মূলে কোথাও পার্থক্য নেই। আবিষ্কার যদি দৈব ঘটনা হয়, তবে সাহিত্য কলা আর সংগীতকেও বলতে হবে দৈব ঘটনা। আর বড়ো আবিষ্কারের মূলেও পাওয়া যাবে প্রতিভা আর প্রেরণা।

"প্রতিভার কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই, কারণ প্রতিভার উৎস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু প্রেরণা আসে কোথা থেকে? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—সাধারণ দৃশ্যমান জগৎ থেকেই আসছে সে প্রেরণা। তার মূলে থাকে অতি সাধারণ ঘটনা—যেগুলো নিয়তই ঘটছে সর্বজন সমক্ষে।

"আষাঢ়ের মেঘ দেখে কালিদাস রচনা করলেন—মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন বর্ষামংগলের। কিন্তু মেঘের নানা রকমের রূপ তো আমরা দেখে আসছি আবহমান কাল ধরে। ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে অভিভূত হয়ে কবি রচনা করেছিলেন প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কিন্তু ব্যাধের পক্ষীবধ তো কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়!

"তাহলে বড়ো সৃষ্টির প্রেরণার উৎসের সন্ধান করতে হয় আবার রচয়িতার মধ্যে। প্রতিভা তো দরকারই কিন্তু তার সংগে প্রয়োজন অন্য একটা জিনিস—মনের একটা বিশেষ অবস্থা।

"গ্রীষ্মশেষের কোনো সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তানসেনের মনের মধ্যে হাজার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তাই সৃষ্টি হোলো এক নূতন মল্লারের। তানসেনের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বীণা ছিল সেদিন সুরে বাঁধা, মেঘগর্জনের অগণিত শব্দতরংগের মধ্যে একটি পলাতক তরংগ তুললো সে বীণায় ঝংকার।

'পল্লীর উন্মুক্ত প্রান্তরে খেলা করছে বন্ধনহীন বায়ু। উত্তর ব্রিটানীর দূর পাহাড়ের শ্যামল বনানীতে জাগলো মর্মর। সেই মর্মরধ্বনি ঝংকৃত হোল বীতোফেনের মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, 'নিউরন—অ্যাহ্বান'-এর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। বেজে উঠলো, বাঁশি, ক্লারিনেট, বেহালা, চেলো, হর্ণ টিম্প্যানি, সিম্বাল আর জয়ঢাক—সৃষ্টি হোলো অমর পালটোরাল সিম্ফনি'। এ সব যন্ত্রের সুর তো বনের মর্মর থেকে আসে নি—অর্কেষ্ট্রার সুর যে বাঁধা ছিল সেদিন বীতোফেনের কানে কানে, মগজের কোষগুলোর মধ্যে।

'অবগাহনের সময় জলের ধারার শব্দে যে গান গুন গুনিয়ে ওঠে আমাদের কণ্ঠে—সেটা তো জলের ধারার সুর নয়।' সুর যে রয়ে গেছে আমাদের মনে! সারগমের পর্দা'টা হয়তো পাওয়া গেলো জলের ধারা থেকে কিন্তু সুরের অভিব্যক্তি হচ্ছে মন থেকে।

'নিউটনের মনেও ছিল একদিন এই অর্কেষ্ট্রা সুরে বাঁধন। আপেল পড়ার ঘটনা মনের তন্ত্রীতে করল আঘাত—গ্রাভিটেশন এর ছন্দের হোলো আবিষ্কার। বড়ো বড়ো আবিষ্কারের ইতিহাস ভালো করে অনুশীলন করলে পাওয়া যাবে এই একই ধারা। আবিষ্কর্তার স্নায়ুমণ্ডলীর অর্কেষ্ট্রা সুরে বাঁধা থাকা চাই, সে অর্কেষ্ট্রার মধ্যে থাকা চাই প্রয়োজন মতো সব রকমের বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ, আবহাওয়াটাও থাকা চাই অনুকূল। তবেই না, বাইরের জগতের কোনো অকিঞ্চিৎকর আলোড়ন ধ্বনিতে তুলবে সে অর্কেষ্ট্রাতে সুরের মূর্ছনা!

'এ প্রজেক্টের কর্মিদের মনের অর্কেষ্ট্রায় যোগ করা হোলো নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র—বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্য দিয়ে, খাঁটি আওয়াজ সৃষ্টি করে আগেকার 'প্যাটার্ণ' নষ্ট করে দেওয়া হোলো; সেই গোলমাল থেকে বেঁধে দেওয়া গেলো নতুন সারগমের পর্দা; সৃষ্টি করা হোলো আবিষ্কারের আবহাওয়ার। সে অর্কেষ্ট্রায় ঝংকার তুললো যমুনার জলে ভাসমান সামান্য ফুলের পাপড়ী। সুর যদি নাও উঠতো সেদিন, বহির্জগতের আর একটা এমনই তুচ্ছ ঘটনা হয়তো সুর জাগাতো এই বাঁধা যন্ত্রের সমাবেশে। অ্যান্টিগ্রাভিটি হয়তো সম্ভবপর হোতো আর এক কল্পনাতীত উপায়ে! কে জানে হয়তো বা মহাকর্ষের শত শত ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে, তার মধ্যে দশ বিশটায় মিলেও যেতে পারে অ্যান্টিগ্রাভিটির সন্ধান!

'শুক্র গ্রহের কল্পিত সেই জন্তুতরের স্বরূপটা দেখানো হোলো পৃথিবীর মানুষকে। আকাশের ওই অর্থহীন পুঞ্জীভূত বিরাট মেঘটাকে চিনে নেওয়া গেলো। আপনাদের মনের বেতার যোগ করে দেওয়া হোলো সূক্ষ্মতর তরংগ ধরবার একটা সার্কিট। তার ফলে 'ডায়েল' নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করতেই সহসা ভেসে এলো দূরান্তের সংগীত!

"এই হচ্ছে প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির মনস্তত্ত্বের ইতিহাস! জগতের সব কিছু বড়ো আবিষ্কারের, মানুষের বৃহত্তম সৃষ্টির ইতিকথা!"

সুমিত্রার বক্তৃতার শেষে উপস্থিত অভ্যাগতেরা যন্ত্রটিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। উন্মত্ত করমর্দনের পালা সুরু হয়ে গেছে প্রজেক্টের কর্মিদের সংগে মান্য অতিথিদের।

শংকরের মনে হোলো, আর একমুহূর্তের জন্যও এই সভাস্থলে থাকলে তার দমবন্ধ হয়ে আসবে। স্তুতিবাক্য-প্রশংসা-করমর্দনের অনুভূতি কিছুই তার অন্তরে প্রবেশ করে না। সকলের দৃষ্টির অগোচরে কোন ফাঁকে সে বেরিয়ে পড়ল, হবিবুল্লার বাড়ীর সীমানা পার হয়ে লাল কাঁকরের পথে। কিছু দূরে কয়েকটি মিলিটারি ট্রাক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রজেক্টের কর্মিদের ব্যবহারের জন্য। তারই একটায় উঠে চালককে অনুরোধ করলো, তাকে সোজা ব্যারাকে নিয়ে যেতে।

[ক্রমশঃ।

ভ্রমর

বংশীধারী দাস

সমস্ত আকাশে, মেঘে প্রসন্ন হলুদ, লাল রং
ছড়িয়ে যখন সূর্য দেখা দিল দিগন্তের কোলে
সেই মুগ্ধ ভোরে সে-ও হল মেঘ, আকাশের মতো
প্রসন্ন সূর্যের রং তারও মনে পড়ল গলে' গলে'।

কুঁড়ি থেকে ফুলগুলি ফুটিয়ে তোলার যন্ত্রণায়
অধীর আবেগে সুখে কেঁপে উঠল যেমন ফাল্গুন
তেমনি সে-ও কেঁপে উঠল মুগ্ধ, সুখী হাওয়ার সংরাগে
হৃদয়ে ভ্রমরও একটা ক'রে উঠল মৃদু গুন্-গুন্।

পায়ে-পায়ে বেলা বাড়ল, প্রচণ্ড রৌদ্রের খর দাহ
গ্রীষ্মের পাঁজরে জ্বলল, জ্বরে পুড়ল পৃথিবীর বুক,
পায়ে-পায়ে পথ হল দীর্ঘতর, এবং হৃদয়ে
ধিকৃত লাঞ্ছিত সেই ভ্রমরও লুকালো তার মুখ।

সন্ধ্যার আকাশে ফের লাল রং ছড়ালো সূর্যটা—
এ তো শুধু রং নয়, ভ্রমরের লাল রক্তচ্ছটা।

সে আসে

গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিম্পন-আঁকা সিঁড়ি, ঘটে-ঘটে আমের প্রশাখা
দু-পাসারি শাড়ী-রাঙা সারি বেয়ে সে আসে, সে আসে,
পদ্মপাতে পা রেখে, পা রেখে,—মধু-মাতোয়ারা পাখা
প্রজাপতি-মন কী রঙীন স্বপ্ন মেলে সে যে আসে
এতো সাধ, এতো আশা বেয়ে বেয়ে সে আসে সে আসে!

অঘ্রাণের শুক্লা রাত হিম-হিম কুয়াসা-ছড়ানো
চোখের কাজলে তার মধুমায়া বুকে ভালোবাসা
লক্ষ্মীমন্ত চুলে-চুলে এয়োতির কামনা-জড়ানো
পদ্মপাতা পায়ে-পায়ে সে যে আসে মধুমুখী আশা
সে আসে, সে আসে, তার কী আশ্চর্য বুকে ভালোবাসা!

নবান্নে ভরাবে ঘর শাঁখায়-সিঁদূরে-দীপে-ধানে
তার স্বপ্ন-মেলে-রাখা আঁচলের যৌবনের গানে
কাজল-লতার মতো কালো তার চোখে মধু ছেয়ে
সে আসে, সে আসে, সে যে আমাদেরি লক্ষ্মীমতী মেয়ে!
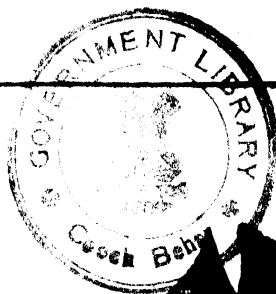
উৎসবের ঔজ্জ্বল্যে

উজ্জ্বল পরিবেশে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার
বাসনা সকলের-ই। আর লাবণ্যময়ীর
ঔজ্জ্বল্য একান্তভাবে তাঁর ঘন সুকৃষ্ণ কেশদামে।
আনন্দ-উৎসবে ও রূপসাধনায় লক্ষ্মীবিলাস
তার শতাব্দির ঐতিহ্য নিয়ে
সদাসর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

মায়ের ছেলে

(অপ্রকাশিত নাটক)

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম অঙ্ক

২য় দৃশ্য

ভিতর-বাড়ীর প্রাঙ্গণ—অপর্ণা, মুক্তকেশী, সিদ্ধেশ্বরী ও ভবদেব।

অপর্ণা। মা কাশীতে যেতে চাচ্ছেন।

ভবদেব। কাশী ?

অপর্ণা। হ্যাঁ তুমি ব্যবস্থা করে দাও, উনি এখানে থাকবেন না।

সিদ্ধেশ্বরী। থাকি কি করে বলতো বাবা ? বলে যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। কার মুখ চেয়ে থাকবো ? নিজের পেটের মেয়ে বরাতের দোষে সেই পর হয়ে গেল।

অপর্ণা। থাক্ মা আর ওসব কথা তুল না। আমার পাঁচ জনের সংসার। কতলোক আসে যায়, পাঁচ কথা বলে। সকলের সব কথায় কান দিলে আমারই চলে না। তুমি কেবল খুঁৎ ধরবে। আমি কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবো, তার চেয়ে তুমি কাশী যাও মা।

সিদ্ধেশ্বরী। তাই যাব মা যাব। ভয় নেই তোমার সংসারে আর থাকছিনে। আমি অতি বড় নিঘিন্নে তাই এতদিন আছি। এমনি বরাত, দুটি না তিনটি না একটি পেটের মেয়ে সে-ও পর হ'ল।

ভবদেব। ব্যাপারখানা কি হয়েছে সেটা আমি শুনতে পাব, না শুধু কাশী যাবার ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে ?

সিদ্ধেশ্বরী। লোক সন্তান কামনা করে কেন ? তুমি তো বাবা মা সরস্বতীর বরপুত্তুর, সব শাস্ত্র তোমার কণ্ঠস্থ, পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূষ জল পাবে বলে তো ? তোমার শ্বশুরকে তোমরাই এক গণ্ডূষ জল দেবে আর তো কেউ নেই।

ভবদেব। ঠিকই তো। টীকা ব্যাখ্যা বিচার বাদ দিয়ে আসল ঘটনাটি কি তোমরা কেউ বলতে পাচ্ছ না।

অপর্ণা। ঘটনাটা আবার কি ? গঙ্গেশটা চিরকেলে ঠোঁটকাটা জানই তো। ও খেতে বসেছিল, আমি ওর পাতে একটা মাছের মুড়ো এনে দিই, মুড়োতে মাছের চেয়ে হাড়-গাড়-কাঁটাই তো বেশী থাকে, ও আমায় ঠাট্টা করে বললে "মামীমা আমি গঙ্গেশ, আমি তো গঙ্গা নই." তারপর কি বলেছিলিরে, ওই তো গঙ্গেশ রয়েছে—বলনা বাপু, আমার সব কথা মনেও থাকে না। সে রাগের কথাই নয় হাসির কথা। মা তাতেই রেগে উঠলেন, বলে "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।"

(গঙ্গেশের প্রবেশ)

বলতো, গঙ্গেশ কি বলিছিলি আর একবার বলতো বাবা ?

গঙ্গেশ। থাক সে কথা আর মামার শুনে কাজ নেই, মামীমা। উনি হয়তো দিদিমার মত চটে উঠবেন (জনান্তিকে) মামা অরসিক কিনা, তেমন রসবোধ নেই তো—

ভবদেব। আমার নামে কিছু বললে যেন—

অপর্ণা। যা বলুক না কেন। সব কথায় তুমি কান দিতে যাও কেন ?

ভবদেব। যাক ও কথা যাক। মাছের মুড়ো পাতে দিলে তুই তোর মামীকে কি বলে ঠাট্টা করেছিলি ?

গঙ্গেশ। আমি বললাম "মামীমা আমি গঙ্গেশ, আমি তোমার গঙ্গা নই যে তোমার এই পিতৃ-অস্থিগুলি আমায় সমর্পণ করলে ?"

ভবদেব। এটা হাসির কথা।

সিদ্ধেশ্বরী। বল বাবা তুমি তো মহাপণ্ডিত, তুমি বিচার করে বল।

ভবদেব। আপনার রাগ হবার কথা মা। মাছের কাঁটা মুড়ো তখনো তোর পাতে রয়েছে তুই খাচ্ছিস। সেই জিনিষকে তুই অবলীলাক্রমে তোর মামীমার পিতৃঅস্থি বললি। উপমা হলে না হয় বুঝতাম তত দোষ হত না, এটা যে একেবারে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। এক বস্তুতে অন্য বস্তুসত্তা আরোপ।

গঙ্গেশ। দোষটা কি হ'ল তাই আমায় বল না।

ভবদেব। দোষটি কি হল তুমি বুঝতে পারবে না। আগে অলঙ্কারশাস্ত্র পড়, উৎপেক্ষা অলঙ্কার বোঝ।

গঙ্গেশ। তারপর ?

ভবদেব। তুমি একটি আস্ত গরু 'ব তো নয়।

গঙ্গেশ। (ঈষৎ উত্তেজিত) আমি গরু ?

ভবদেব। গরু ছাড়া আর কি ?

গঙ্গেশ। আমাতে গরুর কি লক্ষণ দেখলে তুমি ?

ভবদেব। তোমাতে গরুর সমস্ত লক্ষণগুলিই রয়েছে।

গঙ্গেশ। (উত্তেজিত হইয়া) তাহলে একটু শিং নাড়ি মামা—আমায় গরু বললে তো তুমিও বলে যাও না মামা—তুমিও গরু ;

ভবদেব। আরে গেল যা—এটার আস্পর্দাও তো কম নয়, তুই আমায় গরু বলিস ?

গঙ্গেশ। একশো বার বলবো। আমি গরু হলেই তুমি গরু হবেই—ও আর প্রমাণ করবার দরকার হবে না—

কিং গবি গোত্বমুক্তা গবি গোত্বং
চেদ্ গবি গোত্বমনর্থকমুক্তং।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্।

ভবদেব। হ্যাঁরে গঙ্গেশ, এ তুই কি বললি ? তোর মুখ দিয়ে একি শ্লোক বেরুল ?

গঙ্গেশ। কেন মামা, তুমি আশ্চর্য হচ্ছ কেন ? আমায় গরু

বললে তোমাকেও যে গরু হতে হয় সেই কথাই বলছি। আমার কথা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তুমি তো নৈয়ায়িক পণ্ডিত, তুমি বিচার কর।

ভবদেব। তুই শ্লোকটি আর একবার বল্‌তো ?

গঙ্গেশ। (গঙ্গেশ পুনরায় শ্লোক বলিল)

ভবদেব। এ তো মূর্খের কথা নয় পরম নৈয়ায়িকের যুক্তি, তুমি এ শ্লোক কোথায় পেলে ?

গঙ্গেশ। তোমার তো সব শ্লোক জানা। তুমি বল এ শ্লোক কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

ভবদেব। কোন প্রাচীন শাস্ত্রে এ শ্লোক নেই। তুমি বল এ কার রচনা।

গঙ্গেশ। তা আমি জানি না।

ভবদেব। তুমি কার কাছে শিখেছ ? এর অর্থ জান ?

গঙ্গেশ। অর্থ তো অতি সহজ, মাত্র দুটি কথা গো এবং গোত্ব। গোত্ব কিনা গোধর্ম—গরুর লক্ষণ সে গরুতেই থাকে। যে গরু নয় তাতে গোধর্মও নেই। যদি কেবল গরুতেই গোত্ব থাকে, তোমার উক্তির কোন অর্থ হয় না। আর যদি যে গরু নয় তাতে তুমি গোত্ব কিনা গোধর্ম আরোপ কর, তুমি নিজেও সেই গোপদবাচ্য হবে। আমিও গরু তুমি ও গরু।

ভবদেব। তোমার কে শিখিয়েছে ?

গঙ্গেশ। কে শিখিয়েছে জানিনা মামা।

ভবদেব। কাল রাত্রে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

গঙ্গেশ। রাত দুপুর পর্য্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপেই ছিলাম।

ভবদেব। রাত দুপুরের পর কি ঘটনা ঘটে ?

গঙ্গেশ। ভূতনাথদা আমায় আগুন আনতে বললে।

ভবদেব। তামাক খাবার জন্যে ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ।

ভবদেব। পাষণ্ড বেল্লিক, তুমি কোথায় আগুন আনতে গিয়েছিলে ?

গঙ্গেশ। ভূতনাথদার দোষ নেই। ভূতনাথদা, কাশীনাথদা আমায় বারণ করেছিল—আমি ওদের বারণ না শুনে ভৈরবঘাট শ্মশানে গিয়েছিলাম।

অপর্ণা। ওদের তামাক খাওয়ার আগুন আনতেই তো গিয়েছিলি, কি দস্যি ষণ্ডামার্ক ছাত্র তোমার। এই কচি ছেলেকে আগুন আনতে শ্মশানে পাঠালে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

গঙ্গেশ। ওদের দোষ নেই মামীমা। কে যেন আমাকে ভৈরবঘাট শ্মশানে টেনে নিয়ে গেল।

অপর্ণা। তারপর ? তারপর কি হলো ?

গঙ্গেশ। আর আমি মুখ দিয়ে বলতে পারবো না মামীমা, সে স্বপ্ন কি সত্য, কি পরমসত্য—গুহ্যতমসত্য আমি তা জানিনা।

ভবদেব। শ্মশানে কিছু দেখেছিলে ?

গঙ্গেশ। (অতি উল্লাসে যেন সেই রূপ আবার দেখিল)

শব-শিব-হৃদয়-সরোজ-নিহিত দক্ষিণচরণা
জয়তি কাপি সা মধুর মধুর হসিতাননা দিগ্বসনা
লোলরসনা—

ভবদেব। তুমি দেখেছিলে ? গঙ্গেশ, তুমি দেখেছিলে মা তোমায় আকার ধরে দেখা দিয়েছেন ?

গঙ্গেশ। আমি মায়ের সেই ত্রিভুবন-আলোকরা কালোরূপ দেখিছি। আমার মনের অন্ধকার ঘুচে গেছে। সে কালোরূপে আমার নয়ন ভরে গেছে, হৃদয় মন ভরে গেছে। মুখের হাসি দেখেছি, মায়ের চোখের অমৃতদৃষ্টি দেখেছি, গলায় মুণ্ডমালা দেখেছি, বামকরে কৃপাণ, সদ্যশ্ছিন্ন অসুরশির থেকে রক্তধারা ঝরছে। দক্ষিণে বরাভয়, চরণে নৃত্যছন্দ, যার আঘাতে মরণ জীবন্ত হয়ে ওঠে, শব শিব হয়ে চরণধ্যান করে, আমি দেখেছি। আমি সেই চরণ দেখেছি।

ভবদেব। কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণি, গঙ্গেশের মুখে আজ একি ভাষা, গঙ্গেশের কণ্ঠে একি সুর, বুঝি মা বীণাপাণি গঙ্গেশের রসনায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

অপর্ণা। গঙ্গেশ গঙ্গেশ বল বাবা আবার বল, সে রূপ কেমন, মা কেমন—মা কি সত্যিই কালো ?

গঙ্গেশ। মা আমার সদা রূপের আধার। এ সংসারে যেখানে যত রূপ আছে, সব রূপ এক করলেও সে গুণাতীতের গুণের অন্ত পাওয়া যায় না। মা আমার সর্ব্ব বয়সের কল্পতরু। মা আমার কালোবরণ কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? হ্যাঁ, মা আমার কালো, যেখানে যত কালো দেখেছ, সব কালোর উপর কালো, অমাবস্যার তামসী নিশি, প্রথম আষাঢ়ের নিবিড় জলদদাম, নীল সরোবরের রাশি রাশি নীলপদ্ম, শরৎ-আকাশের গাঢ় নীলিমা, মহা সমুদ্রের অগাধ অনন্ত নীল জল। আর তো আমি মুখে কিছু বলতে পারবো না মামীমা ? যা বলবার ছিল বলেছি, তবু কিছুই বলা হ'ল না।

অপর্ণা। তবু বল গঙ্গেশ আবার বল্। আমি রূপের কথা শুনতে চাইনে। সে কি সত্যিই মা, না দশজনের দেখাদেখি তুইও মা বলে ডাকছিস ?

গঙ্গেশ। দশ জনের মাকে আমি চিনিনে, আমি জানি আমার মা। এই তো আমার মা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমিই তো সেই মা। মা তো আলাদা আলাদা হয় না। সব মা-ই আমার মা। (মুক্তকেশীর প্রতি) এস, এস মুক্তকেশী মা, আমার সামনে দাঁড়াও। (সিদ্ধেশ্বরীর প্রতি) কোথায় মা সিদ্ধেশ্বরী তুমি এস মা, কেন অমন মুখ ম্লান করে দাঁড়িয়ে আছ, আমি অপরাধ করেছি তাই আমার উপর রাগ করেছ, কতবার কত অপরাধ করেছি সব অপরাধ ক্ষমা করেছ—আজও ক্ষমা করবে। আমি মায়ের ছেলে, আমি তো অপরাধ করতে ভয় পাইনে। তুমি অভয় দিয়েছ, তাই অপরাধ করতে সাহস পাই, জানি ক্ষমা পাব, আদর পাব, চরণ পাব, কোল পাব।

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁরে গঙ্গেশ—তুই কি সেই গঙ্গেশ ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ আমি সেই গঙ্গেশ। তুমিও সেই মা, মা সিদ্ধেশ্বরী, আর তোমার শিব চুরি করবোনা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবেনা। তুমি আমায় সিদ্ধি দিয়েছ, তুমি আমায় কথা শিখিয়েছ, আমি তোমার কাছে বলেছি। তোমরা আমার সামনে দাঁড়াও। আমি তোমাদের চরণপূজা করি। ও মা অপর্ণা, তুমি অন্নপূর্ণারূপে আমায় অন্ন দিয়েছ, মুক্তকেশী তুমি এলোকেশে খেলা করেছ আমায় স্নেহ দিয়ে ধন্য করেছ, মা সিদ্ধেশ্বরী, তোমার কল্যাণে আমি সিদ্ধবিদ্যা পেয়েছি।

গান

জয় জয় জয় জয় বিজয় ভৈরবী ভবদারা
জয় তারা জয় তারা জয় তারা জয় তারা।

জয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল জলদদাম গলিতকান্তিধারা
জয় চরণাম্বুজচুম্বি চতুর-কুন্তল-কুল-ভারা।

মুক্তকেশী। মা আমি সবাইকে ডেকে আনি, গাঁয়ের লোকেরা আসুক, গঙ্গেশকে দেখুক।

অপর্ণা। তারা আপনিই আসবে, যে শুনবে সেই আসবে !

মুক্তকেশী। তা হোক আমি যাই। [প্রস্থান।

ভবদেব। গঙ্গেশ বাপ আমার, জানিনা জন্ম-জন্মান্তরেরও কোন সাধনায় তুই এক মুহূর্তে মহাবিদ্যার সিদ্ধি লাভ করলি ? আমি চিরদিন তোকে তিরস্কার করেছি, আজ তুই আমায় তিরস্কার কর। আমি পাণ্ডিত্যের অভিমানে অন্ধ হয়ে পথ হারিয়েছি। তুমি আমায় হাত ধরে নাও, আমায় পথ দেখিয়ে দাও বাবা !

অপর্ণা। নাও, নাও, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ওকে ওরকম করে মিনতি করছ কেন ? ও যদি কিছু পেয়ে থাকে তোমাকেও দেবে, আমাকেও দেবে।

গঙ্গেশ। আমি আর কি দেবো মা, তুমি দিয়েছ তাই পেয়েছি, তুমিই তো দাও মা, আর কে দেবে ? (ভবদেবের প্রতি) দাঁড়াও বাবা, আজ একবার ভিখারী হয়ে। আমার মা অন্নপূর্ণার কাছে "দেহি দেহি" বলে ভিক্ষা চাও, তুমি যা চাইবে তাই পাবে। কল্পতরুর তলায় দাঁড়িয়ে তুমি ফলের জন্যে ভেবো না। বল তোমার কি ফল চাই। কি চাও তুমি ? যশ, অর্থ, মানসম্ভ্রম, পাণ্ডিত্য না মাতৃভক্তি ?

(রাজা কমলাকান্ত, যজ্ঞেশ্বর চণ্ডাল, দীনতারিণী, ভূতনাথ, কাশীনাথ, মুক্তকেশী প্রভৃতির প্রবেশ)

রাজা। এ সব কি শুনছি শিরোমণি মশায় ?

ভবদেব। আমি এখনো কিছু বুঝতে পারিনি মহারাজ, আপনি নিজের চোখে দেখুন।

গঙ্গেশ। (দীনতারিণীর হাত ধরিয়া) এস এস মা দীনতারিণী ! এস বাবা যজ্ঞেশ্বর, তুমি উপস্থিত থেকে আমার প্রাণ যজ্ঞে পূর্ণ কর।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি বাবাঠাকুরের দেখা পেয়েছ ?

গঙ্গেশ। তুমিও পাবে বাবা !

যজ্ঞেশ্বর। আমায় বোধহয় ফাঁকী দিলে।

গঙ্গেশ। ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়। যাবার জায়গা নেই বাবা। আসতেই হবে। আমার দীনতারিণী মা একবার ডাকলেই, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যিনি যেথানে আছেন—সবাইকে আসতেই হবে।

যজ্ঞেশ্বর। যা বলেছ বাবা, ডাকলে আসে আবার কখনো কখনো না ডাকলেও আসে। বুঝেছ ? যাই হোক বাবা, আমি বুঝতে পারছি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এবার দেখা হলে একবার মোদের কথা তেনারে বল।

গঙ্গেশ। হ্যাঁ যজ্ঞেশ্বর বাবা, তোমার ভীমরতি ধরেছে নাকি, এরকম তালকানার মত কথা বলছ কেন ? আমার দীনতারিণী মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন, তাঁকে কিছু না বলে, তুমি আমায় বলছ কেন ? আমি কে ? আমার কি সাধ্য ?

যজ্ঞেশ্বর। তুমি আবার দীনতারিণী মা কারে বলছ ?

গঙ্গেশ। এই তো আমার মা। মা দীনতারিণী।

যজ্ঞেশ্বর। আমার পরিবার ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ ইনিই সেই আদ্যাশক্তি।

রাজা। গঙ্গেশ, তুমি সত্য বলছ এই চণ্ডালিনীকে তোমার আদ্যাশক্তি বলে মনে হচ্ছে ?

গঙ্গেশ। মহারাজ, আমায় পরীক্ষা করছেন ?

রাজা। না আমি পরীক্ষা করছি না, আমি অজ্ঞান, জানতে চাই।

গঙ্গেশ। আমার চণ্ডালিনীকে আদ্যাশক্তি বলে মনে হচ্ছে না মহারাজ, আপনারই আদ্যাশক্তিকে চণ্ডালিনী ভ্রম হচ্ছে।

রাজা। ইনি আদ্যাশক্তি ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ ইনি আদ্যাশক্তি, ইনি আদ্যাশক্তি, ইনি আদ্যাশক্তি, ইনি আদ্যাশক্তি। এই সংসারে যেখানে নারীমূর্ত্তি যত আছেন, সবই সেই এক আদ্যাশক্তি, সবই পাষাণী মা। মহারাজ, আপনি অজ্ঞান জনিত অপরাধে অপরাধী, সন্দেহ জনিত অপরাধে অপরাধী, আপনি মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করুন। (দীনতারিণীর প্রতি) মা তুমি এই অজ্ঞান মহারাজকে ক্ষমা কর। যদি আমরা কেউ কখনো এক মুহূর্তের জন্য তোমায় চণ্ডালিনী মনে করে থাকি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা কর মা ! পূর্বজন্মে তোমার ভজনা করিনি, তাই জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। যখন গর্ভে ছিলাম, বার বার সঙ্কল্প করেছি সংসারে গিয়ে তোমায় ভুলব না। ভূমিষ্ঠ হয়ে সব ভুলে গেছি। তুমি মায়ার বাঁধনে বেঁধেছ, তুমি অবস্তুকে বস্তুবোধ করিয়েছ, এককে বহু জ্ঞান করিয়েছ, এ তোমার কেমন খেলা !

ভবদেব। জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং, নিত্যানন্দোদয়াশাং নিগমকলময়ীং নিত্যলীলোদয়াঢ্যাম্। মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমাভতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈ, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥

কমলাকান্ত। রাগদ্বেষপ্রমত্তকলুষযুততনুঃ কামভোগপ্রলুব্ধঃ কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমাতরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ ॥

ভবদেব। রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরশকৃপাণঃ পাংশুলঃ পাকচেতাঃ নিদ্রালস্যপ্রসক্ত স্বজঠরভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা ॥

উভয়ে। কিং তে পূজাবিধানং কঃ চ মনুজপনং সানুরাগঃ কঃ চাস্থা। ক্ষন্তব্যো মে ঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥

গঙ্গেশ। হে সর্বমঙ্গলময়ী, আমার নয়ন-মন হতে তোমার বহুরূপ সম্বরণ কর। শুভঙ্করী মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ মুনিঋষি, সিদ্ধচারণ, প্রাচীন রাজন্যবর্গ সার্থকাকার মহাত্মগণ, হে জননী, তোমার কল্যাণময়ী মাতৃরূপের উপাসনা করে জন্মজন্মান্তরের কলুষ হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন, তুমি আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ পূজাপদ্ধতি শিখিয়ে দাও।

(বৈরাগী ও মহামায়ার প্রবেশ)

গঙ্গেশ। (মহামায়াকে আসিতে দেখিয়া)

অপর্ণা দীনতারিণী মুক্তকেশী মহামায়া।
সার্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সিদ্ধেশ্বরী মাতৃমাতা ॥

বৈরাগী। বাঃ বাঃ একেবারে চাঁদের হাট বাজার।

যজ্ঞেশ্বর। এস, এস বাবাঠাকুর, তবু ভাল তুমি এসেছ !

বৈরাগী। (দীনতারিণীর প্রতি) তোমাদের কাউকে বাড়ীতে না দেখে তোমাদের খোঁজে এখান পর্য্যন্ত আসতে হ'ল, চল মা বাড়ী চল, আমায় পান্তা-আমানি খেতে দেবে।

যজ্ঞেশ্বর। আর পান্তা-আমানি, সকালবেলা নিজে কুকুর সেজে খেয়ে গেলে। এখন চাইলে কোথায় পাবে ?

বৈরাগী। কে কুকুর সেজেছিল ?

যজ্ঞেশ্বর। কে আবার সাজবে, যে বলে সেই। আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবা না। ছিটে-মন্তর দিয়ে সরে পড়েছ।

বৈরাগী। আরে এ বুড়ো কি বলে গঙ্গেশ !

যজ্ঞেশ্বর। গঙ্গেশ ঠাকুর তোমার কথার উত্তর দেবে ? ওকে তো পাগল করে দিয়েছ। তা নয় দিয়েছ দিয়েছ, এ বুড়ো পণ্ডিত, এদেশের রাজা, সব ভারিক্কে ভারিক্কে মানুষ, গঙ্গেশের দেখাদেখি এদের কাণ্ড দেখেছ বাবাঠাকুর !

বৈরাগী। এঁরা কি কচ্ছেন ?

যজ্ঞেশ্বর। কি আর করবেন সবাই মিলে আমার পরিবারকে মা বলে ডাকছেন, আমার পরিবারের স্তব-স্তুতি কচ্ছেন। আর কি করবেন।

বৈরাগী। তোমার পরিবার কে ? তোমার পরিবার কে ?

যজ্ঞেশ্বর। আমার পরিবার গো, যাঁরে এই মাত্তর তুমি মা বলে ডাকলে। যার কাছে পান্তা-আমানি খেতে চাইলে ?

বৈরাগী। উনি তোমার পরিবার ?

যজ্ঞেশ্বর। মোর তো সেই রকম জানা ছেল।

বৈরাগী। (স্পর্শ করিয়া) আমার চোখ দিয়ে ওঁকে একবার ভাল করে দেখ। বেশ ভাল করে দেখ উনি কে ?

যজ্ঞেশ্বর। (দীনতারিণীর সম্মুখে নতজানু হইয়া) একি ভেল্কি দেখাও বাবাঠাকুর। এতদিন ধরে কা'কে কি ভেবেছি।

তুমি কালী তুমি তারা তুমি উমা শিবরাণী
তুমি দুর্গা ছিন্নমস্তা ভৈরবী তুমি ভবানী
মাতঙ্গী বগলা তুমি পাগলিনী ধূমাবতী
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি বৃদ্ধা মাতা পুত্রবতী।

ভূতনাথ। হ্যাঁ গঙ্গেশ ! আমরা কিছু দেখবো না ? তোমরা কি দেখছো কি বুঝছো, আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের বুঝিয়ে দাও ভাই। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ।

গঙ্গেশ। সময় হলে আপনিই বুঝবে দাদা !

কাশীনাথ। (বৈরাগীর প্রতি) বাবা তোমার প্রসাদে এই চণ্ডাল যোগদৃষ্টি লাভ করলে। আর আমরা ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও এই অমৃত-সিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু তরঙ্গ দেখে চলে যাব ? অমৃতের প্রসাদ পাবনা ?

বৈরাগী। (স্পর্শ করিয়া) তোমরা যাকে চণ্ডাল মনে কচ্ছ সে তো চণ্ডাল নয়। তোমরা যাদের সামান্য মানব-মানবী মনে কচ্ছ, তারা তা নয়।

কাশীনাথ। এরা কারা ?

বৈরাগী। বিশুদ্ধ শুদ্ধ-চৈতন্য অমৃত-সাগর বুদ্বুদ্ মহামায়ার অংশ, কোথাও বা স্বরূপে কোথাও বা পুত্ররূপে।

কাশীনাথ। আমরা সবাই তাঁর পুত্র।

বৈরাগী। নিজের চোখে দেখে বোঝ তুমি।

মহামায়ার যাগ।
লাগ, লাগ লাগ,
লাগ ভেল্কি লাগ, সভাজুড়ে লাগ।
কালীদাস পণ্ডিতে কয়, যা দেখেছ সেটা নয়
মেয়ে মেয়ে নয়, ছেলে ছেলে নয়
গাছ পালা জল মাটী যা চোখে সামনে রয়
তা ঠিক তেমনটি নয়।

গঙ্গেশ। আমার মায়ের রূপ ত্রিভুবনময়—

বৈরাগী। তোর মায়ের স্বরূপ কেমন, আমাদের একবার শুনিয়ে তোমার মধুর কণ্ঠে শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞান রসময় হোক।

গঙ্গেশ। (অপর্ণার প্রতি) মা তুমি আমার কণ্ঠে ভাষা দাও, আমি তোমার মহিমা বর্ণনা করবো।

অপর্ণা। তথাস্তু, বল বাবা তুমি যা বলবে তাই সত্য হবে।

গঙ্গেশ। জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বস্থানে আমি, আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি, মা ছাড়া কিছুই নেই। তপনে আমার মায়ের প্রভাব শক্তি, গগনে তাঁর মহিমাকেন্দ্র মার চন্দ্রিকা। অণুতে অণিমা, পবনে বেগশক্তি, দহনে দাহিকা জলে শীতলতা, মধুরে মাধুরী, মা আমার কাশীতে অন্নপূর্ণা, বৃন্দাবনে যোগমায়া কাত্যায়নী, বিষ্ণুলোকে বৈষ্ণবী, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী, বৈকুণ্ঠে রমা, শ্মশানে শ্মশানেশ্বরী মহাকালী, কৈলাসে গৌরী, উমা শঙ্করী।

বৃন্দাবনে যাঁর নামে শ্যামের বাঁশী সাধা
গোলোকধামে মা আমার রাসেশ্বরী নিত্য রাধা
জীবনে জীবনীশক্তি মৃত্যুরূপা মরণ কালে
পরের বুকে চরণ দিয়ে নাচেন শ্যামা তালে তালে।
অনন্তরূপিণী মা আমার বহু রূপেলীলা কচ্ছেন।

ভবদেব। (বৈরাগীর প্রতি) ঠাকুর, তুমি কে জানি না প্রশ্ন করবার সাহসও নেই, গঙ্গেশের একি অবস্থা ? এই অশিক্ষিত ক্ষুদ্র বালক সর্বশাস্ত্রাতীত পরম জ্ঞান কেমন করে লাভ করলে ?

বৈরাগী। শাস্ত্রে তো এ অবস্থার কথা আছে শিরোমণি মশায় ! কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে মানুষের মহাবিদ্যা লাভ হয়। আপনার গঙ্গেশ মহাভাগ্যবান, নিজ বিদ্যার অধিকারী, গঙ্গেশ যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা মুনী-ঋষিদেরও কাম্য। গঙ্গেশের চোখে এ সংসার আর মায়ার সংসার নয়, মায়ের সংসার।

রাজা কমলাকান্ত। দেখুন সিদ্ধান্ত মশায়, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। আপনার গঙ্গেশ হবেন আমার রাজ্যে আদর্শ সংসারী।

গান

বড় মজার খেলাঘর
আমি অন্ধি-সন্ধি পাইনে খুঁজে
গড়েছে কেমন কারিগর।
ঘরে নবদ্বারে নয়টি দ্বারী
নিশানধারী চলন ভারি করে পায়চারী
শুধু কর্ত্তা কোথায় শুধাইলে
বলে জানি না খবর।
এ-ঘরের ঘরণী যিনি
নাম শুনি তাঁর মহামায়া
কৈলাসেতে শিবের বামে
কাশীধামে স্বর্ণকায়া।
এখন তিনি থাকেন ঘরে শ্মশানে মশানে
কোন রাঙা বসন পরে
ওঁকে আনতে ঘরে চরণ ধরে
ঘর ছেড়েছেন ভূতেশ্বর
সেই অবধি ভূতের বাসা হয়েছে এ-ঘর।

সমাপ্ত

ঘুম

সুব্রতকুমার পাল

অনেক মনীষী বলেছেন—"যিনি ঘুম আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" সত্যিই মানুষের কর্মব্যস্ত জীবনে ঘুম আশীর্বাদস্বরূপ। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হ'য়ে যখন শিথিল দেহটাকে আলগোছে শয্যার ওপর এলিয়ে দিই তখন ধীরে ধীরে চোখের পাতায় মায়ার কাজল পরিয়ে দিয়ে ঘুম নামে। জাদুকরী স্পর্শে শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু ঘুম পায় কেন? অনেকের মনেই হয়তো এ প্রশ্ন জাগে কিন্তু কোন সদুত্তর না পেয়ে অনেকেই নিদ্রাকে জন্ম-মৃত্যু-জরার মত প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ (natural phenomenon) হিসাবে গণ্য করেই ক্ষান্ত হ'ন। সুকুমারমতি শিশুগণ নিদ্রাকে কোন অশরীরী "ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি"র স্নেহের দান বলে মনে করে। কিন্তু ঘুমতত্ত্বেরও যে শারীরবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই শিশুর মতই অজ্ঞ। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে আমি ঘুমের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

তবে ঘুমিয়ে পড়া যত সহজ, ঘুমতত্ত্ব কিন্তু ততটা প্রাঞ্জল নয়। এবং মধ্যাহ্নের সুখনিদ্রার মত তৃপ্তিদায়কও নয়। ঘুমের কারণ বিশ্লেষণ নিয়ে বহু গুরুগম্ভীর গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। ঘুমের রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা শারীরবিদ্ বিভিন্ন তত্ত্বের (theory) অবতারণা করেছেন। কোনো তত্ত্বই পরিপূর্ণরূপে এবং পরমরূপে গ্রহণীয় হয়নি। অবশ্য তুলনামূলক বিচারে রুশবিজ্ঞানী পাভলভের (Pavlov) তত্ত্বটিই শ্রেষ্ঠ।

ঘুমতত্ত্ব নিয়ে প্রথম দিকে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের অনেকের মতে মস্তিষ্কে রক্তচলাচলের স্বল্পতাই ঘুমের মূলীভূত কারণ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন কার্য পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কে পৃথক পৃথক কেন্দ্র আছে। এই সব স্নায়ুকেন্দ্রের সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। শরীরের অন্যান্য অংশে এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের স্রুতি রক্ষা করার জন্যও মানব-মস্তিষ্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। অত্যধিক পরিশ্রমে সেই রক্ত-পরিচালন কেন্দ্রটি স্তিমিত হয়ে পড়লে মস্তিষ্কে রক্তচলাচলের পরিমাণ অতিশয় কমে যায়। ফলে মস্তিষ্কের অন্যান্য সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্রই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র থেকে যথাযথ প্রেরণা না আসায় শরীরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। একটি আলস্য এবং অবসাদের স্রোত শরীরের ওপর দিয়ে যেন বয়ে যায়। ফলে আমরা ঘুমোবার ইচ্ছা অনুভব করি।

গুরু আহারের পর যে একটা আলস্যমদির ঘুমের আমেজ লাগে তার কারণ খাদ্য পরিপাক এবং শোষণের জন্য পাচনতন্ত্রের কার্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। সেজন্য অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়। কোনো বিশেষ সময়ে শরীরের মোট রক্তের পরিমাণ যেহেতু অপরিবর্তনীয় সুতরাং পাচনতন্ত্রের দিকে অতিরিক্ত রক্তচালিত হলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল অনেক হ্রাস পায়। যথাযথ রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং সেই অবসাদই অভিব্যক্তি লাভ করে আমাদের নিদ্রালুতার মধ্যে।

ইদানীন্তন কালের কোনো কোনো শারীরবিজ্ঞানীর মতে ঘুম মস্তিষ্কের বিশেষ একটি কেন্দ্রের উত্তেজন বা অবদমনের ফলে ঘটে। ইকোনোমো (economo) এবং তৎসহযোগিগণ বলেন যে, এই কেন্দ্রটি একটি ঘুমকেন্দ্র (sleep centre)। এই কেন্দ্রের স্নায়ুকোষগুলিকে উত্তেজিত করলে ঘুম আসে। পক্ষান্তরে এরা যদি অবদমিত হয় তাহলে ঘুমের পরিবর্তে আত্যন্তিক উত্তেজনা এবং নিদ্রাহীনতার লক্ষণ দেখা দেয়। এই ঘুমকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) "টিউবার সাইনেরিয়ম্" (tuber cinereum) নামক অঞ্চলে অবস্থিত। হেস্ (Hess) নামা জনৈক বৈজ্ঞানিক বিড়ালের মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রকে বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা উত্তেজিত করে তৎক্ষণাৎ ঘুম আনয়নে সক্ষম হন।

বিশ্ববিখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ র‍্যান্সন্ (Ranson) ঘুমকেন্দ্র অপেক্ষা জাগরণকেন্দ্রের (waking centre) অবস্থিতিতেই অধিক বিশ্বাসী। এই কেন্দ্রটির কাজ হচ্ছে মস্তিষ্কের অন্যান্য কেন্দ্রের ওপর অহরহ উত্তেজনা-প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণীকে জাগিয়ে রাখা। কিন্তু অত্যধিক ক্লান্তি কিংবা অন্য কোন কারণে এই জাগরণ-কেন্দ্র নিস্তেজ হয়ে পড়লে আর যথাযথরূপে উত্তেজনাস্রোত পাঠাতে পারেনা। ফলে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও ঝিমিয়ে পড়ে এবং ঘুম আসে। র‍্যানসনের মতে এই "জাগৃতিকেন্দ্র" মস্তিষ্কের "হাইপোথ্যালামাস্" (hypothalamus) নামক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। এই কেন্দ্রকে অপারেশন দ্বারা অপসারিত ক'রে র‍্যান্সন দেখেন যে পরীক্ষাধীন প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগ্রস্ত হয়। মানব-মস্তিষ্কের "হাইপোথ্যালামাস" অঞ্চলটি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ব্যাধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব রোগে রোগীর আত্যন্তিক নিদ্রালুতা দেখা যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাগরণ-কেন্দ্রই সাধারণত প্রাণীকে জাগিয়ে রাখে এবং এই কেন্দ্রের সাময়িক অবসাদ বা কর্মবিরতিই ঘুমের মৌল কারণ।

তথাপি ঘুম ও জাগরণের মধ্যে কোন্‌টি জীবদেহের স্বাভাবিক অবস্থা সে বিষয়ে শারীরবিদ্‌গণ এখনও একমত হতে পারেননি। একদল মনে করেন, ঘুমকেন্দ্রের উত্তেজনাই ঘুমের কারণ। অপর দলের মতে, জাগরণকেন্দ্রের অবদমনই (inhibition) ঘুমের মূল কারণ। এতদ্ভিন্ন, একদল উদার মধ্যপন্থী স্নায়ুবিজ্ঞানী ঘুম এবং জাগরণ উভয় কেন্দ্রের অবস্থিতিতেই বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতানুসারে ঘুমকেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে জাগরণকেন্দ্রকে অবদমিত করলে ঘুম পায়; পক্ষান্তরে, জাগৃতিকেন্দ্র উদ্দীপিত হয়ে ঘুমকেন্দ্রকে অবদমিত করলে আমরা জেগে উঠি।

ঘুমতত্ত্বের স্নায়ুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পন্থা ত্যাগ করে ঘুমের রাসায়নিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেছিলেন কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক। এঁরা বলেন, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বা অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক বস্তুর অতিরিক্ত-পরিমাণ সঞ্চয়ই ঘুমের কারণ। এই নিদ্রাজনক বস্তু

কারো মতে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (lactic acid), কারো মতে হিপ্নোটক্সিন্ (hypnotoxin), আবার কারো মতে "ব্রোমোহরমোন্" (bromohormone)। সাম্প্রতিক কালের খুব কম ব্যক্তিই এই রাসায়নিক তত্ত্বে (chemical theory) বিশ্বাসী।

প্রখ্যাত রুশবিজ্ঞানী পাভ্‌লভ ঘুমতত্ত্বের যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঘুমকে তিনি "আভ্যন্তরীণ অবদমনের" ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। এই "আভ্যন্তরীণ অবদমনবাদ" (theory of internal inhibition) পাভ্‌লভেরই নিজের আবিষ্কৃত তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি সম্যক্ বুঝতে হ'লে পাভ্‌লভের বিখ্যাত "সাপেক্ষ প্রতীবর্ত" (conditioned reflex) সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। কয়েকটি পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করবো।

কোনো কুকুরের সামনে মাংস রাখলে তার মুখ থেকে লালাক্ষরণ হতে থাকে। এটি একটি সহজাত ক্রিয়া। মাংসদর্শনে লালাক্ষরণ ব্যাপারটা অন্য কোনও বিশেষ অবস্থার ওপর নির্ভর করেনা। যে কোন জাতের কুকুর যে কোন অবস্থাতেই মাংস দেখলে এমনি লালাক্ষরণ করবে। এইরূপ সহজাত ঘটনাকেই পাভ্‌লভ গুরুগম্ভীর করে বলেছেন "অনপেক্ষ প্রতীবর্ত" (unconditioned reflex) অর্থাৎ যে ক্রিয়া অবস্থাবিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়। এখন যদি মাংস দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ঘণ্টা বাজানো হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন পুনরাবৃত্ত করা হয় তাহলে একদিন দেখা যাবে খাবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো খাদ্য দেওয়া না হলেও শুধু ঘণ্টাধ্বনির ফলেই লালাক্ষরণ হচ্ছে। একেই পাভ্‌লভ "সাপেক্ষপ্রতীবর্ত" (conditioned reflex) বলেছেন।

আবার ধরুন, ঘণ্টা বাজানো এবং খাবার দেওয়ার মাঝখানে উচ্চৈঃস্বরে গ্রামোফোন বাজানো হ'ল। তাহলে দেখা যাবে, গ্রামোফোনের তারস্বর চীৎকার পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে আহারে মনোনিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং কুকুরটি আর লালাক্ষরণ ক'রে সাড়া দিচ্ছে না। কিংবা সাড়া দিলেও লালার পরিমাণ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এর তাৎপর্য এই যে, এতদিনের চেষ্টায় যে "প্রতীবর্তক্রিয়া" (Reflex) স্থাপিত হয়েছিল তা হয় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে অথবা তার তীক্ষ্ণতা অনেক কমে গেছে। কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রতীবর্তক্রিয়া যখন কোনো কারণে অন্তর্হিত বা মন্দীভূত হয় তখন সেই মন্দীভবনের ঘটনাকেই বলা হয় "অবদমন" (Inhibition) অবদমনের কারণটা যখন বাহ্য তখন তাকে বলা হয় "বহিরাঙ্গিক অবদমন" (external inhibition) যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে গ্রামোফোনের বিকট শব্দে কুকুরের লালাস্রাব বন্ধের ব্যাপারটা একটি বহিরাঙ্গিক অবদমনের উদাহরণ। এই অবদমন আভ্যন্তরীণও (internal) হতে পারে; আভ্যন্তরীণ অবদমনের কারণ পরীক্ষাধীন জীবের মস্তিষ্কের গভীরে নিহিত। আমাদের পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে যে ঘণ্টাটির নিনাদ দ্বারা "সাপেক্ষ প্রতীবর্ত স্থাপিত হয়েছে, তার চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর নাদবিশিষ্ট কোন ঘণ্টা যদি বাজানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে শেষোক্ত শ্রেণীর ঘণ্টার নিনাদে কুকুরটি লালাক্ষরণ দ্বারা সাড়া দিচ্ছে না। নাদের লয়গত তারতম্য এখানে অবদমনের কারণ এবং কুকুরটি সেই তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের সহায়তায়। এইজন্যই এই শ্রেণীর অবদমনকে আভ্যন্তরীণ অবদমন বলা হয়েছে। ঘুমও মনীষী পাভ্‌লভের মতে এরূপ আভ্যন্তরীণ অবদমনের ব্যাপার।

গুরুমস্তিষ্কের সবচেয়ে বাইরে যে ধূসরবস্তুর (grey matter) রয়েছে সেই অঞ্চলে মানবদেহের নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যের পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ অবস্থিত। নানা জটিল কারণে গুরুমস্তিষ্কের অবদমন ঘটে। এবং তৎসঙ্গে ধূসরবস্তুরে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহও অবদমিত হওয়ায় দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ শ্লথ হয়ে পড়ে। এই অবদমন শুধু ধূসরবস্তুর বা গুরুমস্তিষ্কেই সীমিত থাকে না, সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের ওপরই ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তৃত অবদমনের সামগ্রিক ফল ঘুমের আবির্ভাব। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মস্তিষ্কের কিছু সংখ্যক পরিচালন-কেন্দ্র অবদমনের আওতায় না পড়ে ঘুমের সময়ও সতেজভাবে কার্য করতে থাকে। যথা, শ্বাসকেন্দ্র, রক্ত পরিচালন-কেন্দ্র প্রভৃতি। অনেকেই হয়ত দেখেছেন যে, ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোয়, অনেক সৈনিক ঘুমের ঘোরেই মার্চ করেন, বহু ব্যক্তি ঘুমের ঘোরেও অত্যন্ত সজাগ থাকেন। এ সবের বৈজ্ঞানিক কারণ এই যে, ঐ সব কার্যের চালক-কেন্দ্রগুলো ঘুমের সময়েও অবদমিত হয় না।

মস্তিষ্কের অবদমন একাধিক কারণে ঘটতে পারে। অতিশয় ক্লান্তির জন্য ঘুমিয়ে পড়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। আবার তন্ময় হয়ে গান কিংবা বাজনা শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতাও অনেকের নিশ্চয়ই হয়েছে। মৃদু আরামদায়ক স্পর্শ অনেকক্ষণ ধরে পুনরাবৃত্ত হলে ঘুমের আমেজ আনে। বিরক্তিকর পাঠ বা একঘেয়ে বক্তৃতা মস্তিষ্ককে স্তিমিত করে ঘুম আনে। আশঙ্কা হচ্ছে, আমার এই নীরস প্রবন্ধ পড়তে পড়তে অনেক পাঠকের ঘুমের উদ্রেক হবে। পাভ্‌লভ আরও একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেন। ঘুম প্রতীবর্তের (conditioned reflex) পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণার সময় তিনি একটি কুকুরকে গবেষণাগারে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, কুকুরটিকে ঐ ঘরে আনলেই অথবা ঘুম পাড়াবার ওষুধপত্র এবং যন্ত্রপাতির আয়োজন সুরু করলেই সে অকাতরে নিদ্রামগ্ন হ'ত। সাজানো গোছানো বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিলে আমাদেরও কী ঘুমভাব আসে না? আর যাঁরা মার্ফিণ ইনজেকশন নিয়ে ঘুমোতে অভ্যস্ত তাঁদের যদি মার্ফিণ বলে শুধু জলও ইনজেকশন দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা যথারীতি ঘুমিয়ে পড়বেন। কফি বা চা খেলে সহজে ঘুম আসে না; এর কারণ, উক্ত পানীয়দ্বয়ে ক্যাফেন্ (caffeine) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। ঐ ক্যাফেন অবদমন প্রতিরোধ করে বা অবদমনের গতি কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ঘুমপাড়ানি (soporific) ওষুধগুলি এই অবদমনকে ত্বরান্বিত করে সত্বর ঘুম আনে।

আশা করি সবাই দেখেছেন যে, একটি বিশেষ সময়ে তাঁদের ঘুম পায়। যিনি রোজ রাত ১০টায় ঘুমাতে অভ্যস্ত, ঠিক ১০টাতেই তাঁর ঘুমভাব আসে। পাভ্‌লভ এই বহু উপলব্ধ ব্যাপারটিকে "সময়-নিয়ন্ত্রিত প্রতীবর্ত (time-conditioned reflex) বলে অভিহিত করেছেন।

ওপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হ'ল তা বহুযুগের অভিজ্ঞতায় লব্ধ। এই সব পুরাতন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই পাভ্‌লভ তাঁর বিখ্যাত সূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সত্যেন্দ্র আচার্য

রেলফলকের অনুগামী টেলি-তারের বুক থেকে একটা মাছরাঙা কি হরিয়াল উড়ে গেলে যেমন অসমছন্দে কাঁপে অনেকক্ষণ তারগুলো, ওমনি সংগতিহীন স্থৈর্যে, সারা প্লাটফরমটা ইতস্তত মাড়িয়ে মাড়িয়ে, প্রান্তসীমার ঢালু জমিটার ওপর নিজেকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে তিরিক্ষি গলায় ক্যাটাগরি বি'র ষ্টেশনমাষ্টার সুব্রত সেন চীৎকারকরে ওঠে—ডাউন পঞ্চান্ন ক্লী···য়া···র ?

কেবিনম্যান বুড়ো জাহাঙ্গীরের তুবড়ে-যাওয়া গালের অনেকখানি জুড়ে বিরক্তির ছাপ প্রকট হয়ে ওঠে। ঘড়ঘড়ে গলায় বুড়ো জাহাঙ্গীর চীৎকার করে ওঠে, হুঁ, ক···র···ত্তা।

ক্যাটাগরি বি'র ষ্টেশনমাষ্টার সুব্রত সেনের ঠিক বিশ্বাস হয় না। আরো একটু শক্ত করে দাঁড় করায় নিজেকে। সমস্ত শিরা-উপশিরাকে আরেকটু সচেতন করিয়ে আবার চীৎকার করে, ক্লি··য়র ?

হুঁ সুবর মাষ্টার। কেবিনম্যান বুড়ো জাহাঙ্গীর এবার একটু মোলায়েম উত্তর দেয়। ক্যাটাগরি বি'র ষ্টেশনমাষ্টার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস তোলে। চোখ-থৈ-থৈ খুশীতে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসে নিজের কোয়ার্টারে। এঘর ওঘর অনাবশ্যক ঘুরঘুর করে—এক ঘরে থপ করে ঢুকে দুটো নিশ্চল চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ে।

দুটো ডাগর চোখ নিবদ্ধ তাকায়। সুব্রত সেন অনড় বসে থাকে। জানলার বাইরে ডাউন পঞ্চান্ন এক ঝাঁক ধোঁয়ার কিছুটা এঘরে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালায় ষ্টেশনের দিকে। উঠে দাঁড়ায় সুব্রত। তারপর লিকলিকে হাত দুটো অক্টোপাশের মত ধীরমন্থর এগিয়ে দেয়। ডাগর চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত হয়। সুব্রত একঝলক নাটুকে হাসি হাসতে হাসতে ষ্টেশনের দিকে মিলিয়ে যায়।

বুড়ো জাহাঙ্গীর কত বার শুনিয়েছে সুব্রতকে, আমি কেমন এই বয়েসেও শক্ত বল ত সুবর মাষ্টার ? কত জীবনের ট্রেণ পারাপার করে আজ এই লোহার ট্রেণ পাশ করাই, তা জানো সুবর মাষ্টার ?

এত শক্ত বুড়ো জাহাঙ্গীরের নির্দয় হৃদয়টার কোন অলিগলি ঘুরে তবু একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস উঠে আসে। লোহার ট্রেণ পাশ করানো বুড়ো জাহাঙ্গীর লোহার ট্রেণ পাশ করালেও তবু চুপ করে মুহূর্তের জন্যে।

আর ঠিক সেই ফাঁকেই যেন সুব্রতর পাগলামীটা আরো একটু [illegible]। অপ্রকৃতিস্থ দুটো লাল টকটকে চোখ সুব্রত যেন তুলে ধরে ঘূর্ণীফলের মত জাহাঙ্গীরের নিষ্প্রভ চোখ দুটোয়। টলতে টলতে কেবিনের গোল ঘড়িটার দিকে তাকায়, তেমনি এদিক-ওদিক অনাবশ্যক তাকিয়ে সুব্রত বলে, জানো জাহাঙ্গীর, গ্লাসে যখন মদ ঢাললুম, মদের সে অলস ফেনায় পাশাপাশি দুটো মূর্তি যেন ভেসে উঠলো। আমি কিন্তু ঠিক চেয়ে আছি। চোখ বুজোইনি—

সুব্রত সেন টলতে টলতে জাহাঙ্গীরের চোখের দিকে তাকায়। বলে, জানো জাহাঙ্গীর, আমি কিন্তু ঠিক চেয়েছিলুম। তারপর কী দেখলুম জানো ? হঠাৎ একটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, আরেকটা রইল ভেসে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় সুব্রত সেন। বলে, দশ টাকা বাজি, বলত, কে ভাসলো, আর কে সেই মিলিয়ে গেল ?

লোহার ট্রেণ পাশ-করানো বুড়ো জাহাঙ্গীরের নির্দয় হৃদয়টা তবু মুহূর্তের জন্যে মোচড় দেয়। টেলিফোনের লম্বা চোঙাটা কানে ঠেকিয়ে গোল ঘড়ির কাঁটা দুটোয় একবার আড়চোখে তাকিয়ে জাহাঙ্গীর বলে, সুবর মাষ্টার, ডাউন পঞ্চান্ন কীল্লী নেই হ্যায়।

একরকম উর্দ্ধশ্বাসে টলতে টলতে কেবিনঘরের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে পড়ে সুব্রত সেন। তেমনি হাঁফাতে হাঁফাতে প্লাটফরমটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটে যায় নিজের কোয়ার্টারে। তারপর থপ করে ঘরটায় ঢুকে পড়ে দুটো ডাগর চোখের দিকে নিবদ্ধ তাকিয়ে আবার তেমনি নাটুকে হাসি হেসে ওঠে।

কেবিনের ঘুলঘুলির ভেতর থেকে চোখ ছড়িয়ে সুব্রতর জীবনের এই ·গতিবিধিটুকু লক্ষ্য করতে কেমন যেন ভয় পায় বুড়ো জাহাঙ্গীর। আর ততই বদ্ধ আক্রোশে জাহাঙ্গীর বাপান্ত করে এই ডাউন পঞ্চান্নটাকেই।

সে বার পুজো অবকাশের সংগে নিজের পাওনা ছুটিটা আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে এই ডাউন পঞ্চান্নেই চক্রবাকপুরে বেড়াতে এল সুব্রত। উপরি-উপরি খান ছয়েক চিঠি দিয়েছিলেন এক দূরসম্পর্কীয়ের ঠাকুমা। কিন্তু সুব্রত যখন এল, ঠাকুমা তখন পুরোপুরি অন্ধ। ঠাকুমা আক্ষেপ করলেন, তোকে কাছে পেয়ে দেখতে পাব না বলেই বোধহয় বেঁচে আছি রে সুবু—

সুব্রত প্রণাম জানালে। আশীর্বাদের জন্যে যে হাতটা মাথায় তুলেছিলেন ঠাকুমা, সেই হাতটা দিয়েই ডেকে উঠলেন, কই গেলি রে হতভাগী, এসে নমস্কার কর।

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

সুব্রত বিস্মিত হল। বলল, কা'কে আবার ডাকছো নমস্কারের জন্যে ?

কা'কে আবার ? অন্ধ চোখ দুটোয় অপুত্রক ঠাকুমা হকচকিয়ে সারা দুনিয়াটাকে একবার যেন যাচাই করতে চাইলেন। তারপর আন্দাজে সুব্রতর মাথায় হাত রেখে বললেন, কা'কে জানিস না ?

ততক্ষণে একটা আশ্চর্য কুৎসিত আর অদ্ভুত চেহারার যুবতী মেয়ে ঠিক ঠাকুমার পিঠের ওপর মুখ রেখে জুল-জুল চোখে সুব্রতর সুন্দর চেহারাটাকে জরীপ করছে। ঠাকুমা ঝুলে-পড়া ঠোঁট দুটোয় আবার অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন, হতভাগী নমস্কার করতে বললুম, না ?

হেঁট হতেই সুব্রত বাধা দিলে। কিছুটা বিব্রত আর বিস্ময়ে সুব্রত গুনগুনিয়ে বলল, না না না, নমস্কার, নমস্কারের কী মানে আছে ?

সেই কুৎসিত আর বীভৎস চেহারার মেয়েটা এবারে আরো একটু কাছে সরে এল। হেঁট হতেই তাড়াতাড়ি সুব্রত বাধা দিয়ে হাত দুটো ধরে ফেললে। কাছাকাছি আলাপের মত কিছু কথা না পেয়ে বলল, কী নাম তোমার ?

সংগে সংগে কুৎসিত মেয়েটার মুখটা আরো কেমন বীভৎস হল। ঠাকুমার ন্যুব্জ পিঠটায় আবার তেমনি মুখ লুকোলো।

ঠাকুমা সেই ঝুলে-পড়া ঠোঁট দুটোয় উচ্চারণ করলেন, ও কি আর কথা বলতে পারে রে ভাই ?

সুব্রত আবার বিস্মিত তাকালো। সে গুমোট অবস্থাটাকে আরো কিছুট লঘু করবার জন্যে ইতস্তত তাকিয়ে বলল, তুমি কথা বলতে পারনা বুঝি ?

সেই কুৎসিত চেহারার চোখ দুটো আবার সেই আষাঢ়-আকাশের মত থমথমে হল ! তেমনি পিঠে মুখ লুকোলে। কিছু বলল না।

ঠাকুমার কথায় মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। ঠাকুমা অন্ধ চোখ দুটোয় দেয়ালের গায়ে স্পর্শ দিয়ে ভেতরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ইসারায় সুব্রতকে বসতে বলে বললেন, আগে বোস, বলছি সব।

এক পশলা বৃষ্টির মত, এক প্রহর রাত নেমেছে তখন চক্রবাকপুরের পাহাড়ে শরীরটায়। পাহাড়চূড়ার পুবালী হাওয়ায় ঠাকুমা ভালো করে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দিলেন ! তারপর সেই অন্ধ চোখ দুটো আন্দাজে সুব্রতর চোখে তুলে ধরে বললেন, সে বার কুম্ভে গিয়ে ওকে আমি ট্রেনের ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছি, জানিস সুবু ?

সুব্রত চুপ। শীতের পুবালী হাওয়া এক ঝলক হঠাৎ ঘরে ঢুকে আরো যেন বিব্রত করে দিলে সুব্রতকে। ঠাকুমা বললেন, ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তা সে ঈশ্বরই বোধহয় বলতে পারেন। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সব নেমে গেছে। হকচকিয়ে শুধু তাকিয়ে রয়েছে পোড়ারমুখী। হতভম্ব হয়ে উঠে বসলাম। হাত বাড়াতেই কচি ঠোঁট দুটোয় ককিয়ে উঠলো। সেই যে মাসখানেকের পোড়ারমুখীকে বুকে তুলেছি, এই ষোলটা বছর আজো সেই বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি।

ঠাকুমা চুপ করলেন। সুব্রত তাকালো শীতের হাওয়া-ঠাসা জীর্ণ ঘরটার নোনাধরা ইটগুলোর আঁজর-পাঁজরে। ঠাকুমা আবার চীৎকার করে উঠলেন, হল রে পোড়ারমুখী ?

ভীত-কাতর চোখ তুলে এ ঘরে এসে দাঁড়ালো মেয়েটা। ঠাকুমা বললেন, যা সুবু, যা কিছু খেয়ে নিগে যা। আক্ষেপ করলেন ঠাকুমা, চোখ দুটো যদি জ্যান্ত থাকতো, তোকে একবার চোখভরে দেখে নিতুম রে সুবু, একবার চোখভরে দেখে নিতুম।

সুব্রত মেয়েটির পিছু পিছু এ ঘরে এল। এই অল্প সময়ে আশ্চর্য গুছিয়ে কতরকমের খাবার তৈরী করেছে মেয়েটা। সুব্রত আবার আলাপের জন্য বলল, তোমাদের বুঝি খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছিল ?

মেয়েটি চুপ।

তোমাকে খুব কষ্ট দিলুম, না ?

মেয়েটার চোখ দুটোয় আবার তেমনি ঘনঘটা ঘনিয়ে এল।

অপ্রস্তুত হল সুব্রত। লজ্জাবিনম্র চোখ দুটোয় সুব্রত তাকালো সে কুশ্রী মুখটায় দিকে। অনেকক্ষণ তাকালো সুব্রত। তারপর আর কিছু না বলে, হাতের কাজে মনোযোগ দিলে।

ঠিক পরের দিন ঠাকুমা বললেন, সুবু, তোকে একটা অনুরোধ করব, তুই বোধ হয় রাখবি না, না রে ?

সুব্রত চুপ। মেয়েটি লঘুপায়ে এ-ঘরে এসে ঠাকুমার ন্যুব্জ পিঠটায় মুখ রাখলো। ঠাকুমা আন্দাজে সুব্রতর দিকে হাত বাড়িয়ে সুব্রতর হাতটায় গায়ের সমস্ত শক্তি ঝরিয়ে চাপ দিতে চাইলো।

অনড় বসে অপলক তাকালো সুব্রত মেয়েটার চোখ দুটোয়। সে কুশ্রী মুখটায় ঠাকুমার কী-এক নিরাকার মাতৃস্পর্শে আশ্চর্য সৌন্দর্য আর সুষমায় ভরে উঠছে। ওদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে ঠাকুমার কোটরগত বিবর্ণ চোখ দুটোয় তাকালো সুব্রত।

জীর্ণ ঘরটায় পাহাড়ছোঁয়া পুবালী হাওয়া একরাশ শীতের প্রগল্‌ভতা। উত্তর-জানলায় চোখ রাখলে দূরে সাঁওতালের কাজল-কালো সারি। ঠাকুমার বিবর্ণ চোখ থেকে চোখ সরিয়ে উত্তর-জানলায় চোখ রাখলো সুব্রত।

লাশকাটা ঘরের একঝাঁক নিঝুম নিস্তব্ধতা ঘরটার নোনা ইটগুলোর ভগ্ন আঁজর-পাঁজরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঠাকুমা সে ঘরটার আঁজর-পাঁজরে বারকতক আন্দাজে তাকালেন। তারপর আবেগসিক্ত আরেকটা চাপ দিয়ে বলে উঠলেন, রাখবি না, না রে সুবু ?

সুব্রত নিজের আশীর্ষ আঙুলগুলোয় ঠাকুমার শীর্ণ কব্জিটাকে বন্দী করলো। বলল, নির্ভয়ে তোমার অনুরোধ বলতে পারো ঠাকুমা !

নির্ভয়ে ? ঠাকুমা প্রায় আঁতকে উঠলেন। ঝুলেপড়া ঠোঁট দুটো থির-থির কাঁপলো বারকতক। সে ঘরের বন্দী শীতালু হাওয়ার গায়ে এক ঝলক অট্টহাসি ছুড়ে দিলেন ঠাকুমা।

চমকালো মেয়েটা। সুব্রতও। ঠাকুমা গলাটাকে একটু পরিষ্কার করলেন। বললেন, সেই সে বুকে তুলেছি, আজো কিন্তু বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বইবার ক্ষমতা আর কদ্দিন ? ঠাকুমা চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললেন।

সুব্রত চুপ। ঘরের ভগ্ন ইটগুলোর আঁজর-পাঁজরে একরাশ শীতের প্রগল্‌ভতা। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকলেন ঠাকুমা। তারপর সে লাশকাটা ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভংগ করে বললেন, আমার মৃত্যুর পরে ওকে কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে রেখে দেবার বন্দোবস্ত করে দিবি ভাই ?

ঠাকুমার কোটরগত চোখ দুটোয় পাতাল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে

ফোঁটা কয়েক আবেগাশ্রু বেরিয়ে এল। কুৎসিত মেয়েটা তেমনি নির্বিকার বসে থাকে। সুব্রত উত্তর-জানলায় সাস্তালের কাজল-সারিতে চোখ রাখলো।

ঠাকুমা লোলচর্মের শীর্ণ-শুভ্র বাহুটা তুলে সে পাতালের চুয়োনো লবণাক্ত জলটা মুছে নিলেন। বললেন, যদি জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে তো বলিস—

ঠাকুমা চুপ করলেন। সে কুৎসিত চেহারার বোবা মেয়েটার চোখ দুটোয় আষাঢ়-আকাশের ঘনঘটা ঘনিয়ে এল। ঠাকুমা একটা দীর্ঘশ্বাস তুললেন! সে লাশকাটা ঘরের সান্দ্র নিস্তব্ধতায় বললেন, নির্ভয়ে তোর অপুত্রক ঠাকুমার নাম বলে দিস।

ন্যুব্জ পিঠটার মুখ লুকিয়ে মেয়েটা এবার ফুঁপিয়ে উঠলো। লোলচর্মের শীর্ণ-শুভ্র বাহুটায় মেয়েটার মাথায় চাপ দিলেন আন্দাজে। আন্দাজে বিবর্ণ চোখ দুটোয় তুলে ধরবার চেষ্টা করলো।

সেই উত্তর-জানলার সাস্তালের শরীর থেকে চোখ সরিয়ে আয়ত চোখ দুটো ঠাকুমার চোখে তুলে ধরলো সুব্রত। তেমনি আশীর্ষ আঙুলগুলোয় আবার ঠাকুমার শীর্ণ শুভ্র বাহুটা বন্দী করলো। বলল, ঠাকুমা জীবনে বোধ হয় কোনোকিছু আব্দার করিনি কোনদিন। একটা জিনিষ চাইব দেবে?

ঠাকুমা চুপ। তেমনি ন্যুব্জ পিটটায় মুখ গুঁজে সে কুৎসিত চেহারাটা তখনো ফুঁপিয়ে উঠছে। সে উত্তরের জানলা দিয়ে আরেকবার সাস্তালসারিতে চোখ বুলিয়ে বলল, ওর সংগে আমার বিয়ে দেবে ঠাকুমা?

বিয়ে? আঁতকে উঠলেন ঠাকুমা। অন্ধ চোখ দুটোর একবারের জন্যে অন্ততঃ দৃষ্টিটা ফিরে পেতে চেষ্টা করলেন। অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন, বিয়ে?

হ্যাঁ। পৌরুষদীপ্ত উচ্চারণ করলো সুব্রত।

তার পর যে ডাউন ৫৫টা সুব্রতকে একদিন নামিয়ে দিয়েছিল চক্রবাকপুরে, আবার পক্ষকাল পরে সুব্রতকে ফিরিয়ে আনলো সুব্রতর এলাকায়।

সুব্রত নেমেই কেবিনের দিকে ছুটে গেল। বলল, জাহাঙ্গীর, দেখবে এস, কেমন বউ এনেছি ঘরে।

নিশ্চয়ই আনবে সুবর মাষ্টার! কান থেকে টেলিফোনের লম্বা চোঙাটা কী এক নিষ্ফল আক্রোশে ছুড়ে ফেলে বলল, জীবনের ষ্টেশনে শুধু এক্সপ্রেস হয়ে ঘোরাঘুরি করবে, ওই রেলওয়ে ইস্কুলের কাকচক্ষু মাষ্টারনী মেয়েটা, এ যেন দেখে দেখে এই শিগনালারের কাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে সুবর মাষ্টার!

বেশ যখন ছাড়বে তখন ছাড়বে, এখন তোমাকে ছাড়ছিনে আমি। তুমি দেখবে তো এস।

প্রায় টানতে টানতে সুব্রত টেনে আনলো জাহাঙ্গীরকে। কোয়ার্টারে ঢুকে জাহাঙ্গীর কেমন হকচকিয়ে গেল। বলল, এ কে?

কে আবার? সুব্রত আলুথালু চুলগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, আমার বিয়ে-করা বউ রে জাহাঙ্গীর! তোর আমার মত ও একজন মানুষ রে জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গীর সে কুৎসিত চোখ দুটোর কাতরতা বুঝে ফেলে বলল, তা ভালই হল বউমণি। সুবরবাবু বড় একলা ছিল। তুমি বউ হয়ে এলে, তবু দোসর হল একটা।

দুর্মর লজ্জায় কেমন যেন বিব্রত হল সেই জাহাঙ্গীর আর সুব্রতদের দলের কুৎসিত মেয়েটা। ততক্ষণে হাইহিলের টকাটক শব্দ তুলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে রেলওয়ে স্কুলের কাকচক্ষু মাষ্টারণী।

সুব্রতর আপাদমস্তক একবার জরীপ করে তেমনি জানলা দিয়েই জাহাঙ্গীরকে বলল, মেয়েটা কে রে জাহাঙ্গীর ?

আজ্ঞে সুবরবাবুর বউমণি।

কি ? না শোনার ভংগিতে কাকচক্ষু আবার তেমনি ভেতরে তাকালো।

বউমণি আমাদের ! সুবরবাবুর বউমণি গো দিদিমণি ! জাহাঙ্গীর আরেকটু জোর গলায় বললে।

হাইহিলের টকাটক শব্দ তুলে কাকচক্ষু ভেতরে এল। যেমন করে আজগুবি জিনিষের প্রতি কৌতূহলী তাকায় মানুষ, তেমনি বিস্মিত তাকালো। তারপর সুব্রতর দিকে চোখ তুলে বলল, কে এ ?

বউ। নির্বিকার উত্তর দিলে সুব্রত।

বউ ? সুব্রতর কথাটাকেই লুফে নিয়ে উচ্চারণ করলো কাকচক্ষু। লিপষ্টিকের ছোপলাগা লাল ঠোঁট দুটোয় হি-হি করে হেসে দুলে হাসলো অনেকক্ষণ। তারপর সেই লাল টকটকে ঠোঁট দুটোয় আগুন ঠিকরোলো, তুমি বুঝি বউ ?

বিধৃত বধূলজ্জায় ঘোমটাটা আরেকটু নামিয়ে দিলে মেয়েটা। হাসিতে ফেটে পড়লো লাল ছোপলাগা কাকচক্ষু মাষ্টারণী। বলল, উঃ, কী লজ্জা গো তোমার ? অথচ দেখে তো মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে অনেক আগেই শিখে গেছ। আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো কাকচক্ষু।

ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে সুব্রতর দিকে তাকালো কাকচক্ষু। তেমনি ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে খিল-খিল করে রাঙা ঠোঁট দুটোয় অলস্ত হাসলো এক ঝলক। বলল, চলো জাহাঙ্গীর।

ওরা চলে গেলে সুব্রত উঠে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করে লম্বা ঘোমটাটাকে একেবারে খুলে দিলে সুব্রত। ঠাকুমার শীর্ণ-শুভ্র বাছুটার মত মেয়েটার দেহটাকে এই প্রথম বন্দী করে বলল, যে যাই বলুক, আমি তো জানি তুমি আমার বউ।

ভয়-থমথম ডাগর চোখ দুটোয় আষাঢ়ের পশলা নেমেছে ততক্ষণে। সুব্রত তারি একটা ডাগর ফোঁটা মুছে দিয়ে বলল, ও হল আমাদের রেলওয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, মানে প্রধান শিক্ষিকা। তারপর আরো একটু আলতো চাপ দিয়ে বলল, ওকে কিন্তু ভয় কোরো না, এঁ্যা ?

কিন্তু এই ষোলটা বর্ষার স্যাঁতসেঁতে জীবনে, ওই দুটো কাকচক্ষু যেন ভয় করবার জন্যে এই প্রথম একরাশ ভয় করার পঙ্গপাল ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তেমনি অলস, অসহায় বন্দী অবস্থায় জীবনের এই প্রথম বোধ হয় কিছু দুটো কথা বলবার চেষ্টা করলো মেয়েটা।

তোমার মনের কথা আমি বুঝি। সুব্রত আরেকটু আলতো চাপ দিলে। আবার তেমনি জলে ভরে উঠলো মেয়েটার চক্ষু দুটো। সুব্রত আবার তেমনি কয়েকটা ডাগর ফোঁটা ঝরিয়ে দিয়ে বলল, চুপ করো কেঁদোনা।

জীবনের প্রথম প্রহরটায় সত্যিই কাঁদতে হয়নি মেয়েটাকে। কিন্তু জীবনের সুচিন্তিত পানপাত্রে ভাললাগার আশ্বাসটুকু উবে গিয়ে যদি অবসাদের তলানিটুকু স্তূপীকৃত হয়, সে পাত্র কোন মাতালকেই বা খুসী করতে পারে ?

ফলে, যে কুশ্রী মুখটার ঠাকুমার কী এক নিরাকার বায়ুস্পর্শে রূপের রোশনাই ঝলসাতো, সে কুৎসিত মুখখানাকে যুদ্ধশেষের ছাউনির মত আরো বীভৎস, আরো বিষময় করে তুললে।

সেদিন শেষ রাত্তিরের দিকে গুডস্ট্রা পাশ করিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে সুব্রত আবার গর্জে উঠলো। তোমার সংগে মেলা-মেশা বা অঙ্গ স্পর্শ করতে আমার ঘেন্না করে। কী এক বদ্ধ আক্রোশে বিছানাটা টান দিয়ে মেঝোতে ছুঁড়ে দিলে সুব্রত। বলল, তুমি যে মানুষ জাতের কেউ কোনদিন ছিলে না, এ যদি আগে জানতে পারতুম, তবে ঠাকুমাকেও গুলী করতে ছাড়তুম না।

ভয়থমথম ডাগর কালো চোখে হকচকিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে কুৎসিত মেয়েটা। আলোটা নিবিয়ে দিলে সুব্রত। নিবোতে নিবোতে বলল, পাপের যত অন্ধকার তা এই একটা আলোয় ঢাকে না কি ? জ্বললে বরং গা-টা রিরি করে।

সকালের ঝরা শিশিরের গায়ে হাইহিলের টকাটক শব্দ তুলে প্রধান শিক্ষিকা সুব্রতর ঘরে এসে দাঁড়ালো।

করুণ-কাতর চোখ দুটোয় বোবা মেয়েটা অলক্ষ্যে বার বার তাকালো প্রধানার আঁটো-সাঁটো শরীরটায়। সুন্দর টকটকে রং। দুটো পাতলা ঠোঁটের শরীর জুড়ে রাত্তিরের বাসি লালের ফিকে আলিম্পন। দুটো কাজল কালো ভোমরা ডাগর চোখ। কী সব কথার গুঞ্জন নিয়ে দুটো ভোমরা যেন উড়তে উড়তে দুটো চোখে হঠাৎ থমকে গেছে। তারি ওপর দুটো প্রশস্ত ভুরুর রামধনু। টিয়া ঠোঁটের জংলী শাড়িটায় তখনো যেন রাত্তিরের কী একটা অলস-আবিল গন্ধ।

বিমুগ্ধ তাকালো মেয়েটা। অমনি পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের থ্যাবড়া মুখ, ভুটিয়া চিবুক, কয়লা-কালো দেহের রংটাকে অনুভব করতে চাইলো বার বার। প্রধানা হাসি হাসি ঠোঁটে এদিকে তাকাতেই চোখোচুখি হয়ে গেল। তারপর একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলো, আঃ মর, কোনো ভব্যতা শেখায়নি তোকে যারা জন্ম দিয়েছিল ! যদি বা একটু এলুম ইস্কুলের পথে, একটু যে চা দিতে হয়—তাও কেউ শেখায়নি সুব্রত ?

কে শেখাবে বল ? সকালের উঠিউঠি সূর্যটায় চোখ রাখবার চেষ্টা করে সুব্রত বলল।

কেন ? তিনকুলে কেউ ছিলনা নাকি ?

কুল ! সুব্রত একটা ঢোক গিললে। রাস্কোর আবার ট্রেয়ারীঃ ? ও তো বেজন্মা, তেমনি সকালের সূর্যে চোখ আটকে নির্বিকার বলল সুব্রত।

তারি অবকাশে ধুমায়িত দু'কাপ চা নিয়ে কাঠপুতুলের মত নিশ্চল এসে দাঁড়িয়েছে কুৎসিত মেয়েটা। রাত্তিরের বিনিদ্র চোখ দুটোয় ক্লান্তির রক্তলেখা। রাত্তিরের কী এক অদৃশ্য আগুনে পুড়ে পুড়ে আরো এক পোঁচ কালির আস্তর উঠেছে মুখটায়।

সুশ্রী মুখটা এদিকে ফেরালো প্রধানা। বলল, মাফ করবেন। কোনো বেজন্মার হাতের চা খেয়ে জাত দিতে আমি রাজী নই।

সকালের এক ঝলক রোদ্দুর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে কুৎসিত মেয়েটার। চা-এর কাপে ধোঁয়ার উষ্ণ উচ্ছ্বাস। তেমনি কাঠপুতুলের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো মেয়েটা।

দাঁড়ালি যে ? প্রধানা গর্জালো। তারপর সুব্রতর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার গর্জে উঠলো, যা বলছি সামনে থেকে—

ঠিক তার মিনিট কুড়ি পরেই হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলো লোহার ট্রেণ পাশ করানো বুড়ো জাহাঙ্গীর। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সুবর মাষ্টার এ্যাক্সিডেণ্ট !

এ্যাক্সিডেণ্ট ? তড়িৎস্পৃষ্টের মত টান হয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাটাগরি বি'র সুব্রত সেন। আবার উচ্চারণ করলো, এ্যাকসিডেণ্ট ?

তিনজনে ছুটলো কেবিন-ঘরের দিকে। কিছু কোলাহল। কিছু ব্যস্ততা। কী এক নির্বেদ মুখোস এঁটে ক্যাটাগরি বি'র সুব্রত সেন সামনে এসে দাঁড়ালো।

রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে সুব্রত ফিরলো কোয়ার্টারে। টকাটক শব্দ তুলে প্রধানা সামনে এসে দাঁড়ালো। উৎসুক চোখে প্রধানা জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার কি বলল সুব্রত ?

বলল ? প্রধানার কথাটাই চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলো সুব্রত। বলল, বোধহয় বাঁচবে না।

বাঁচবে না ? প্রধানা অস্ফুট উচ্চারণ করলো। তারপর ঘাড় দুলিয়ে বলল, যে যাবে তাকে যেতে দাও সুব্রত। তার জন্যে দুঃখ করা আত্মপীড়ন মাত্র।

জাহাঙ্গীর যেন এই ক'টা মুহূর্তেই আরো কিছুটা বুড়ো হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়ালো। দুপুর সূর্যের প্রখর ঝাঁঝ কোয়ার্টারে। রেলকলকে। জাহাঙ্গীর ধরা গলায় ডাকলে, সুবর মাষ্টার খাবে চলো।

বহু সাধ্যসাধনার পর জাহাঙ্গীর ব্যর্থ হয়ে নিঃসঙ্গ ফিরে এল কেবিনঘরে। আর ঠিক তার ঘণ্টাখানেক পরেই টলতে টলতে কেবিনঘরে ঢুকলো সুব্রত। সরাসরি বলল, জানো জাহাঙ্গীর, গ্লাসে যখন মদ ঢাললুম, সে মদের অলস ফেনায় পাশাপাশি দুটো মূর্তি যেন ভেসে উঠলো। আমি কিন্তু ঠিক চেয়ে আছি। চোখ বুজোই নি।

মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার বলে, আমি কিন্তু ঠিক চেয়েছিলুম, কিন্তু কী দেখলুম জানো ? হঠাৎ একটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, আরেকটা রইল ভেসে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় সুব্রত সেন। বলে, দশ টাকা বাজি, বলতো, কে ভাসলো, আর কে সেই মিলিয়ে গেল ?

তুমি মদ খেয়েছ সুবর মাষ্টার ? লোহার ট্রেণ পাশকরানো বুড়ো জাহাঙ্গীর তেমনি ধরা গলায় উচ্চারণ করে।

মদ ? খেয়েছি। জড়িয়ে জড়িয়ে নির্বিকার উচ্চারণ করলো সুব্রত সেন।

আর কিছু বলল না বুড়ো জাহাঙ্গীর। গোল ঘড়িটায় একবার কটাক্ষ করে টেলিফোনের লম্বা চোঙাটায় একবার মুখ ঠেকালো। সিগন্যালের চকচকে হাতলটায় হাত দিতেই টলতে টলতে আরো একটু কাছে সরে এল সুব্রত। তেমনি টলতে টলতে উচ্চারণ করলো, কী হল জাহাঙ্গীর ?

এ্যাকসিডেণ্ট। জাহাঙ্গীর সিগন্যালের হাতলটায় চাপ দিয়ে একটা ঘড়াং শব্দ তুলে বলল।

প্রায় লাফিয়ে ওঠে সুব্রত। কী বললে, এ্যাকসিডেণ্ট ? তেমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল কোয়ার্টারে। জাহাঙ্গীরও ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারে এল। সিগন্যালের চকচকে হাতলে চাপ দিয়ে লোহার লোহার ঘড়াং শব্দ করা শক্ত বাহুটার জড়িয়ে ধরে জাহাঙ্গীর বলে, সুবর মাষ্টার, আমি মিথ্যে বলেছি। তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমি মিথ্যে বলেছি সুবর মাষ্টার।

অলক্তক চোখ দুটোয় উদাস তাকায় সুব্রত। জাহাঙ্গীর আস্তে আস্তে আস্তে ধরে শুইয়ে দেয়। মাথায় আলতো আঙুল চালাতে চালাতে লোহার লোহার ট্রেণ পাশকরানো বুড়ো জাহাঙ্গীর কেমন যেন স্থবির হয়ে যায়।

পরের দিন টকাটক শব্দ তুলে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো প্রধানা।

হকচকিয়ে তাকালো সুব্রত। কী সুন্দর, কী সুষম মুখশ্রী প্রধানার। দুটো পাতলা ঠোঁটের শরীর জুড়ে রাত্তিরের বাসিলালের ফিকে উচ্ছ্বাস। দুটো-কালো ভোমরা-ডাগর চোখ। কী সব কথার গুঞ্জন নিয়ে উড়তে উড়তে দুটো ভোমরা যেন দুটো চোখে হঠাৎ থমকে গেছে। তারি ওপর দুটো প্রশস্ত ভুরুর রামধনু। টিয়া-ঠোঁটের জলো শাড়িটায় রাত্তিরের বাসি বাসি কি একটা মিষ্টি গন্ধ। কী একটা অনুভূতিতে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলল সুব্রত।

আশ্চর্য্য সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ। জীবনে বোধ হয় এমনি একাত্মবোধ করেনি কোনদিন সুব্রত। কী এক অনুভূতিতে তেমনি চোখ দুটো বুজিয়ে থাকলো।

তবু শক্ত করে বুজিয়ে রাখা চোখ দুটো কে যেন কত ছোট্ট একটা ধাক্কায় খুলে দিলে তক্ষুণি। সুব্রত তাকালো। খুসী-খুসী চোখে জাহাঙ্গীর বলল, বউমণি বেঁচে যাবে সুবর মাষ্টার, ডাক্তার বললে।

বললে ? প্রধানা লালের বাসি ছোপলাগা ঠোঁট দুটোয় উচ্চারণ করলো।

আবার চোখ বুজলো সুব্রত।—একটা কুশ্রী কয়লা-কালো মুখ। দুটো ভুটিয়া ঠোঁটে অভিমান জমে জমে আরো যেন পুরু হয়েছে। ঝুলে-পড়া ড্যাবরা চোখ দুটো অপমানের নির্মম আঘাতে আঘাতে ঠাকুমার চোখের মত পাতালের দেশে মুখ লুকোতে চাইছে।

চোখ দুটো বুজিয়ে অনড় অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলো সুব্রত। তার পর ধীর-মন্থর বিছানায় উঠে বসলো। অস্ফুট বলল, বাঁচবে জাহাঙ্গীর ?

বাঁচবে সুবর মাষ্টার ! জাহাঙ্গীর আবার উচ্ছ্বসিত উচ্চারণ করে।

বাঁচবে ? প্রধানা উৎকণ্ঠিত উচ্চারণ করলো।

সত্যিই বেঁচে একদিন ফিরে এল মেয়েটা। সে কুৎসিত চেহারাটার আচমকা তাকালে আতঙ্কে আঁতকে উঠতে হয়। কপালের ওপর থেকে নাকের দিকে ঝুলে এসেছে গোখরো সাপের লকলকে জিভের মত সেলাইএর একটা দগদগে দাগ। বাঁ কুনুই পর্যন্ত খেসারত গেছে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে। আর পা দুটো আগেই লোহার দুটো বিবদাঁত ছিঁড়ে নিয়েছে।

ওই হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মদের মাত্রা আরেকটু চড়িয়ে দেয় সুব্রত। আবোল তাবোল অযথা কী সব বকে চলে। কিন্তু যদিও মাতাল হওয়ার অভ্যাসটা ক্রমশঃ দূরীভূত হল, তবু কী এক জটিল সন্দেহের পাহাড় অটল দাঁড়িয়ে থাকলো। ঠিক ওই ডাউন পঞ্চান্নর উপস্থিতির মিনিট কয়েক আগে ছুটতে ছুটতে প্লাটফরমের প্রান্তসীমায় এসে শক্ত করে দাঁড় করায় নিজেকে। কেবিনঘরের দিকে তাকিয়ে তারপর চীৎকার করে ওঠে—ডাউন পঞ্চান্ন ক্লীয়ার ?

ফিরে এসে ঐ বীভৎস হাত পা হীন আর সেলাইএর দগদগে দাগ আলা-কুৎসিত দেহটায় বিস্ফারিত তাকায় অপলক।

দূর আকাশের দিকে চেয়ে হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটা চুপচাপ শুয়ে থাকে। সুব্রত বলে, তোমাকে আমি খুব কষ্ট দিই না ?

আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে সুব্রতর চোখে তাকায় মেয়েটা। লিকলিকে লোভী বাহুটা অক্টোপাসের মত বাড়িয়ে দেয় সুব্রত।

কুঁকড়ে যেন বুকের ভেতর তালগোল পাকিয়ে যায় হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটা। সুব্রত কোলে করে বারান্দায় আনে মাঝে মাঝে। টেলিতারের বুক থেকে একটা মাছরাঙা কি হরিয়ালের চকিত উড়ে যাওয়া দেখায়। দেবদারুর রুগ্ন ডালে দুটো শঙ্খচিলের দিকে চেয়ে ফেলে সুব্রত পরিহাসের ছলে ওর চোখ দুটোয় চাপা দেয়।

আবার তেমনি কুঁকড়ে ওঠে চেহারাটা। সুব্রত বুকের ভেতর তালগোল পাকিয়ে হাত-পা হীন দেহটাকে তুলে এনে বিছানায় ধপাস করে শুইয়ে দেয়। কচ্ছপের মত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে চেহারাটা। তারপর ইতি-উতি এদিক-ওদিক ইতস্তত তাকিয়ে হাসতে হাসতে দরজাটা বন্ধ করে সুব্রত।

শাণ্টিংএর একটা প্রমত্ত ইঞ্জিন ষ্টেশনে ইন করে। ভক ভক করে এক ঝলক উষ্ণ ষ্টিম ছড়ায় দুটো লাইনের ফাঁকে। অবসাদগ্রস্ত অলস চোখদুটোয় জানলাটা খুলে দিয়ে দুরন্ত হাওয়ায় একটা পূর্ণতার নিঃশ্বাস তোলে সুব্রত। সেই হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটা তেমনি কচ্ছপের মত চিৎ হয়ে অনড় শুয়ে থাকে।

কী একটা কাজে এসে দরজায় দুটো টোকা দিয়ে জিভ কেটে ছুটে পালায় জাহাঙ্গীর। সুব্রত দরজা খোলে। ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারের বাইরে আসে। বলে, জাহাঙ্গীর শোনো।

টকাটক শব্দ তুলে প্রধানা কত কথার গুঞ্জনভরা চোখ দুটোয় সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনকার জন্তে অন্তত সুব্রত বোবা হয়ে যায়।

ইঞ্জিন হন্টের পোড়া কয়লার স্তূপে চোখ রেখে বলে, তুমি সুখী হতে পেরেছ সুব্রত ?

বোবা-বোবা চোখে সুব্রত কয়লার স্তূপে তাকায়। একটা নিকষকালো কাক স্তূপের ওপর নিজের মনে ঘুর ঘুর করে।

লাইন ক্লীয়ার সেই দূরের সিগন্যালে। কোন উপায়ে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে কেবিনের দিকে ছুটে পালায় সুব্রত।

তারপর লোহায় লোহায় ঘড়াং শব্দ করে লাইন দেয় জাহাঙ্গীর। সুব্রত সে কয়লার স্তূপ থেকে চোখ সরিয়ে সিগন্যালে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, জানো, জাহাঙ্গীর, তোমার শীগগিরি দাদু হবে কিন্তু—

দাদু ? লোহার ট্রেণ পাশকরানো বুড়ো জাহাঙ্গীর উচ্ছ্বসিত হয়। দাঁতে দাঁত চেপে বুড়ো জাহাঙ্গীরের স্টেশন মাষ্টার তড়বড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছুটে পালায়।

টকাটক শব্দ তুলে ফিরতি পথে আবার সামনে আসে প্রধানা। হাতখানা আবার তেমনি ধরে ফেলে। আবার ওমনি ছাড়িয়ে নিয়ে সুব্রত উর্দ্ধশ্বাসে পা চালায় কোয়ার্টারে।

জাহাঙ্গীরের কথায় সুব্রত আজকাল প্রাণ খুলে হাসে। নিজের হাতে সেই হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটাকে পরিচর্যা করে। সাজ-গোজ করায়। নিজের হাতে চুল আঁচড়িয়ে অপটু হাতের মসৃণ বেণীটাতে বন যুঁই গুঁজে দেয়। নিতান্ত শিশুদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে কাচপোকা ধরে। নিজের হাতে টিপ বানিয়ে কপালে বসিয়ে দেয়।

বেণীতে বন-যুঁই গোঁজা হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটা হেসে ওঠে। সুব্রতও। হাসি থামায় কুৎসিত মেয়েটা। আরো জোরে হেসে ওঠে সুব্রত। দু' হাতে চোখ চাপে মেয়েটা। দু' হাতে খুলে দেয় সুব্রত।

দিন দিন ওজন বাড়ছে হাত-পা হীন বীভৎস চেহারাটার। সুব্রত কাজে অকাজে অপলক তাকিয়ে থাকে। আর তাকলেই ওই বীভৎস দেহটার ওজনের মত কী এক অবসাদের গুরুভারে মনের দাঁড়িপাল্লায় একদিকটা অনেকখানি ঝুলে পড়ে। লোহার ট্রেণ পাশকরানো জাহাঙ্গীরের কেমন ভয়-ভয় করে। জাহাঙ্গীর অনাবশ্যক আগের মত হাসাতে চেষ্টা করে। না-হাসির মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দুটো সুন্দর চোখের তারায় তাকাবার জন্তে আকুলি বিকুলি করে সুব্রত।

সেদিন ডাউন পঞ্চান্নটা পাশ করানোর সময় সুব্রত ব্যস্তভাবে কেবিনে ঢুকলো। বলল, জাহাঙ্গীর, তোর বউমণির ছেলে হবে। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি : পঞ্চান্নটা পাশ করানোর বন্দোবস্ত করে যাস কিন্তু।

লোহায় লোহায় ঘষে ঘড়াং শব্দ তুলল জাহাঙ্গীর। আবশ্যকীয় আর করণীয় কাজগুলো সেরে সোজা হাসপাতালে এল।

হাসপাতালের একফালি বারান্দায় শঙ্খচিলের বিবর্ণ ইচ্ছার মত এক চিলতে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে। সেই রোদ্দুরটুকু মাড়িয়ে মাড়িয়ে সংগতিহীন স্বৈর্যে উদ্ধত পায়চারী করছে সুব্রত। জাহাঙ্গীর সামনে দাঁড়াতেই আরো যেন উদ্বিগ্ন হল। পায়ের উদ্ধত গতিটাকে আরো একটু বাড়িয়ে দিলে। টকাটক শব্দ তুলে প্রাধানা সামনে এসে দাঁড়ালো।

উদ্বেগভরা মুখটায় প্রধানার উপস্থিতিতে একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধতা ফুটিয়ে তুলল সুব্রত। পায়ের উন্মত্ত গতিটা মুহূর্তে সংযত হয়ে গেল। তেমনি সুরেলা কণ্ঠে প্রধানা ডাকলো, সুব্রত !

স্থবির দাঁড়ালো সুব্রত। স্থির। প্রধানার সুশ্রী মুখটায় তাকালো অপলক। উদ্বেগভরা দুটো চোখে ছুটে এলো সার্জন বোস।

সুব্রত বাবু—

সে সুন্দর মুখটা থেকে চোখ সরিয়ে তাকালো সুব্রত। সার্জন বোস মাথা নীচু করলেন। লোহার ট্রেণ পাশকরানো বুড়ো জাহাঙ্গীর চীৎকার করে উঠলো, কী হল ডাক্তার বাবু?

সার্জন বোস চোখ তুললো। আই এ্যাম সরি সুব্রত বাবু! একটু থামলেন সার্জন বোস। আপনার স্ত্রীর পেলভিস্ যা ছোট, তাতে স্বাভাবিক ভাবে সন্তান বাঁচানো নয়। আর সন্তান পেতে হ'লে—

সার্জন বোস কেমন যেন হোঁচট খেলেন বলতে গিয়ে। একটা অনাবশ্যক ঢোক গিলে বললেন, সন্তান পেতে হলে আপনার স্ত্রীকে কিন্তু হারাতে হবে।

তেমনি স্থির দাঁড়ালো সুব্রত, চোখ-উপছানো খুশীতে আরো একটু কাছে সরে এল প্রধানা। জাহাঙ্গীর চোখের জলটা গোপন করবার চেষ্টা করলো।

নার্স ছুটে এল। কী একটা উত্তেজনা সার্জন বোসের চোখ দুটোয়। ব্যস্ততা দেখালেন সার্জন বোস। বলুন সুব্রত বাবু, বলুন কা'কে চান?

কা'কে চায়? সুব্রত আবার তাকালো প্রধানার সুন্দর চোখ দুটোয়। দুটো ঠোঁটের শরীর জুড়ে লালের স্নিগ্ধ জৌলুষ। দুটো কাজলকালো ভোমরা কত কথার যেন গুঞ্জরণ নিয়ে উড়তে উড়তে দুটো চোখে হঠাৎ থমকে গেছে। তারি ওপর দুটো প্রশস্ত ভুরুর রামধনু। টিয়া-ঠোঁটের সেই জংলী শাড়িটায় কী একটা অলস-আবিল গন্ধ।

বলো? প্রধানার ঠোঁট দুটো একটু যেন নাচলো।

চোখ বুজলো সুব্রত।—কপাল থেকে নাকের দিকে ঝুঁকে-আসা সেলাই-এর দগদগে দাগওয়ালা একটা বিশ্রী মুখ। হাত-পা হীন কী বীভৎস, একটা অকর্মণ্য মাংসপিণ্ড। তারি ওপর একটা থ্যাবড়া মুখ। দুটো ভুটিয়া চিবুক। আর জৌলুষ হীন নিষ্প্রভ ড্যাবরা দুটো চোখ।

সার্জন বোস ব্যস্ত পায়ে আলতো ধাক্কা দিলেন। বলুন সুব্রত বাবু, স্ত্রী না ছেলে? কী?

বলো? প্রধানার সুন্দর চোখ দুটো যেন আরো সুন্দর হলো।

সে সুন্দর চোখ দুটোয় আবার অপলক তাকালো সুব্রত। তাকিয়ে তাকিয়ে বললে, স্ত্রী—

শঙ্খচিলের বিবর্ণ ইচ্ছার মত এক চিলতে রোদ্দুর ফালি বারান্দায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাড়িয়ে মাড়িয়ে সার্জন বোস ঢুকে গেল থিয়েটারে। মাড়িয়ে মাড়িয়ে ওদিকে সরে গিয়ে ডাউন পঞ্জাবের এক ঝাঁক ধোঁয়ার চোখ রাখলো প্রধানা। মাড়িয়ে মাড়িয়ে লোহার ট্রেণ পাশকরানো বুড়ো জাহাঙ্গীর আরো একটু সরে এল। লোহায় লোহায় ঘড়াং শব্দ করা শক্ত বাহুটায় সুব্রতকে বন্দী করে, খুশী-চোখে ডাকলো, সুবর মাষ্টার—

—উঁ।

বন্ধুকে

["To a friend"—*Boris Pastarnak*]

আমি কি জানি না
দুঃখের সমুদ্রে হাতড়ে চলেও অন্ধকার
চিরন্তন আলোর স্তরে উঠতে পারে না?
আমি কি হৃদয়হীন
মুষ্টিমেয় অকর্মণ্যের চেয়ে
অগণিত মানুষের স্বার্থে
কি আমার কাছে মহার্ঘতর নয়?

পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প
কি আমারো ব্যক্তি-মান ময়,
তার পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে
কি আমার ভাগ্য অসম্পৃক্ত?
তবু আমার অস্তিত্ব—
আমার অনুভূতির ভবিতব্য কি?
পুঞ্জীভূত জড়তার চেয়েও আমি স্থবিরতর।
নান্যঃ পন্থা।

আজ শক্তিমান সোভিয়েটের প্রভাবিত যুগে
যখন প্রবল ভাবাবেগই প্রতিষ্ঠা পায়—
বৃথাই তারা কবির জন্য আসন শূন্য রাখে;
আর সে আসন যদি অপূর্ণ না থাকে
তবে তা ভয়াবহ।

অনুবাদ:—গোবিন্দ ভট্টাচার্য

নব ভারতের স্রষ্টা

লীনা মুখোপাধ্যায়

ওগো নব ভারতের স্রষ্টা,
তব বিধান
কত বার মাথা পেতে লব,
বল, আর কত বার কত বার উদ্বাস্তু হব?
বাঙালীর প্রাণের কোন দাম নাই,
যত যায় তত ভাল যত কমে যায়!

নারীর সতীত্ব যায় যাক্
যাক্ শিশুপ্রাণ
কোন ক্ষতি নাই
বেঁচে থাক শুধু তব রাজসিংহাসন।
তাই তুমি নীরব দ্রষ্টা।
ওগো নব ভারতের স্রষ্টা
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি
ইতিবৃত্ত-কথা?

তাই দুর্বৃত্তের হয় না বিচার
ভেজালের হয় না প্রতিকার
দলীয় স্বার্থ করিতে সংরক্ষণ
খ্যাতি ল-ভ তারা হয় পদ্মভূষণ।

ক্ষুধার্ত জনগণ শুধু ঘোরে ফেরে
ঘাংলা কুকুরের মত।
তব বলাবল স্বার্থান্বেষী বকধার্মিকের দল
স্বরূপ সকল ভাষণ দেয় বাহির করিয়া দন্ত।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

চরিত্র-পরিচয়

অনাদি ভাদুড়ী	—	মানগড়ের ষ্টেশন-মাষ্টার
মহীতোষ	—	অনাদি ভাদুড়ীর পুত্র
মালতী	—	অনাদি ভাদুড়ীর কন্যা
বীরেশ রায়	—	মানগড়ের জমিদার
সুজাতা	—	বীরেশের ভগ্নী

বেদে-বেদেনীরা, পুলিশের ইন্সপেক্টর, বৃন্দাবন (জমাদার) ইত্যাদি।

ইন্দিরা	—	বীরেশ রায়ের স্ত্রী
নটবর	—	বীরেশ রায়ের ভৃত্য
পদ্ম	—	বীরেশ রায়ের বাড়ীর ঝি
রবীন বোস	—	ব্যারিষ্টার
নরেন রায়	—	উকিল
হেম মল্লিক	—	সরকারী উকিল
উদয়ের মা	—	মানগড়বাসিনী পাগলিনী

বিচারক, জুরীগণ, পেশকার ইত্যাদি।

দৃশ্য-পরিচয়—মানগড় রেলওয়ে-ষ্টেশনের সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। সারি সারি রেলিং-দেওয়া ষ্টেশনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে এবং রেলিংয়ের ওপাশে প্ল্যাটফর্মের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার উপরে একটি বড় পাথরে বড় করে খোদাই করা লেখা—"মানগড়"। প্রাঙ্গণের একপাশে ষ্টেশন-মাষ্টারের লাল টালির ছাদের বাড়ী—রেলওয়ে কোয়ার্টার। এবং তার ওপাশে ছোট ছোট আরও দু'খানা একই ধরণের বাড়ীর খানিকটা দেখা যায়—সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারদের বাসস্থান। ষ্টেশন-মাষ্টারের বাড়ীর পাশেই প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—গোড়াটি বেশ চওড়া ভাবে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। প্রাঙ্গণটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—চারিদিকে খুঁটি পুঁতে উপরে টাঙ্গানো হয়েছে একটি সামিয়ানা। প্রাঙ্গণের অপর পাশে লাল বাঁধানো রাস্তা—ষ্টেশন থেকে মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে গ্রামে।

প্রকৃতি-পরিচয়—অপরাহ্ণ—শরৎকাল। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন, তাই বটগাছটি ছায়া করে আছে সমস্ত প্রাঙ্গণ।

পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মহীতোষ বটগাছের নীচে বাঁধানো বেদিটির উপর বসে উপুড় হয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখছে—নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে। চোখে মাঝে মাঝে লাগাচ্ছে ছোট একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তার সামনের সামগ্রীগুলো কতক কতক দেখা যাচ্ছে—কি যে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মহীতোষকে দেখে মনে হয়—সুদর্শন যুবক, গায়ের বর্ণ গৌর।

প্রবেশ করলেন অনাদি ভাদুড়ী—পরিধানে খাটো একটি ধুতি, গায়ে ফতুয়া, হাতে হুঁকা। মুখের দিকে চাইলেই প্রথমে চোখে পড়ে,—কাঁচা-পাকা প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ এবং কাঁচা-পাকা বড় বড় ভুরু। হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, বেশ ফর্সা গায়ের রং।

ভাদুড়ী। (একটু দূর হতে) আরে তুই এখানে! যা-যা জলখাবার খেয়ে আয়। মালতী চায়ের জল চাপিয়েছে।

(মহীতোষ কোনও কথা বলল না)

ভাদুড়ী। (হুঁকো টানতে টানতে আরও একটু কাছে এগিয়ে) ও কি! তুই আবার ঐ সব করছিস্! যত রাজ্যের ব্যাঙ টিকটিকি ধরে ধরে কেটে কেটে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

(মহীতোষ কোনও কথা বলল না, নিজের কাজেই ব্যস্ত।)

ভাদুড়ী। (এসে কাছে দাঁড়িয়ে) এই জ্যান্ত জীবগুলোকে ধরে ধরে কাটিস—তোর মনেও কি একটু লাগে না? ঘেন্নাও করে না একটু?

মহীতোষ। এ সব তুমি বুঝবে না বাবা!

ভাদুড়ী। অন্যায় করেছি তোকে ডাক্তারী পড়িয়ে। মনটা একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

(মহীতোষ থেকে বেশ খানিকটা দূরে বসলেন)

মহীতোষ। তাই বা ভাল করে পড়ালে কৈ? মেডিকেল কলেজে পড়াতে পারলে না—মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করলাম—কি তার মূল্য? আজ ছ' মাসের উপর বেকার বসে আছি—একটি পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরী জুটল না।

ভাদুড়ী। হবে রে হবে। ডাক্তাররা উপোস করে মরে না। ক্রমে হবে।

মহীতোষ। ক্রমে হবে বলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা ত আমার স্বভাব নয়—সে তোমরা পার।

ভাদুড়ী। কি করবি রে? ভাগ্য ত না মেনে উপায় নেই?

মহীতোষ। ভাগ্য! নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করে নিতে হয় বাবা! ভাগ্য বলে তারাই চুপ করে বসে থাকে, যাদের প্রাণে শক্তি নাই—যারা দুর্ব্বল।

ভাদুড়ী। তা বেশত, তুই নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে নে না। কেউ ত বাধা দিচ্ছে না।

মহীতোষ। তা ত নেবই। কিন্তু বাবা! আমার প্রথম বাধাই তুমি।

ভাদুড়ী। কি রকম? আমি তোর জীবনে বাধা—কি যে বলিস!

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট-লিঃ • কলিকাতা-১০

মহীতোষ। একটা সোজা প্রশ্ন করি। কেন তুমি আমাকে মেডিকেল কলেজে পড়াওনি ? আমি লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল ছিলাম —তুমি জান ?

ভাদুড়ী। আরে কি বলে! আমি যে গরীব—গরীব ষ্টেশন-মাষ্টার, মেডিকেল কলেজে পড়াবার সাধ্য কি আছে আমার!

মহীতোষ। কেন—কেন তুমি গরীব হলে? ষ্টেশন-মাষ্টারীই না হয় করছ—কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টাররা ত এক একজন কম রোজগার করে না। নন্দাপুরের ষ্টেশন-মাষ্টার ত এর মধ্যে দুখানা বাড়ী করে ফেলেছে—ছেলেকে বিলেত পাঠাবে শুনছি। জান ত সবই।

ভাদুড়ী। তুই তার সঙ্গে আমার তুলনা করিস না। সে অত্যন্ত অসৎ লোক—নামকরা ঘুষখোর।

মহীতোষ। আর তুমি সৎলোক, ঘুষ খাওনি—কিন্তু তাতে কার কি উপকার হয়েছে ? হয়ত তোমার চাকুরীতে আর একটু উন্নতি হবে।

ভাদুড়ী। আমি নিজের কাছে নিজে খাঁটি—সেইটেই আমার কাছে সব চেয়ে বড় কথা।

মহীতোষ। ঘোর স্বার্থপরের মত কথা বললে বাবা!

ভাদুড়ী। (অবাক হয়ে) কি রকম ?

মহীতোষ। নিজেকে রাখলে খাঁটি—ভাবছ নিজের পরলোকের সিঁড়ি বাঁধাচ্ছ শ্বেতপাথরে, কিন্তু যারা অসহায় শিশু হয়ে তোমার মুখ চেয়ে এল এ জগতে, তাদের করলে সর্ব্বনাশ। স্বার্থপরতা নয় ?

ভাদুড়ী। (মহীতোষের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে) সে কি কথা!

মহীতোষ। এই আমার অবস্থাই দেখ না। আমাকে যদি তেমন করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলতে পারতে—আমার মধ্যে এমন শক্তি ছিল যে আমি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে নতুন আবিষ্কারে জগতকে চমকে দিতে পারতাম। শুধু চমকে কেন—জগতের কত বড় উপকার হত, তুমি হয়ত বা ধারণাই করতে পার না এই যে আমি কাটাকুটি করি—আমার ভিতর থেকে ঠেলে আসে অন্তঃপ্রেরণা—একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করবার। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা —কোথায়ই বা সে আবহাওয়া, কোথায়ই বা সে সরঞ্জাম। আমি যে গরীব ষ্টেশন-মাষ্টারের ছেলে—একটা পঞ্চাশ টাকার চাকুরী পেলেই যেন বেঁচে যাওয়া উচিত আমার।

ভাদুড়ী। (কেমন একরকম ভাবে মহীতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে) কি সব বকিস তুই ?

মহীতোষ। আজ গোটাকয়েক কড়া কথা তোমাকে শোনাব বাবা। তুমি আমার কেন—তুমি মালতীরও সর্ব্বনাশ করেছ।

ভাদুড়ী। আমি! মালতীর—সর্ব্বনাশ করেছি—আমি!

মহীতোষ। নিশ্চয়! মালতী শুধু অসাধারণ সুন্দরী নয়, অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তুমি ওকে লেখাপড়া শেখালে না, ভাল করে দেশের দশের সামনে ফুটে উঠবার সুযোগই দিলে না ওকে। ওর প্রাণশক্তি ছিল অসাধারণ, দিলে খর্ব্ব করে। কোনও রকমে অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দশ বছর বয়স হতে না হতে দিলে জুড়ে সংসারের ঘানিতে। তের বছর বয়স হতে না হতে কোনও রকমে পার করলে একটা বিয়ে দিয়ে—একটা অস্বাস্থ্যকর পাড়াগাঁয়ে, মুখ্যু ছেলের সঙ্গে! এক বছর যেতে না যেতে হল বিধবা—

ভাদুড়ী। (দাঁড়িয়ে উঠে—হাত-পা একটু কাঁপছে) সে-ও আমার অপরাধ—আমার অপরাধ। (গলার স্বরে কম্পন)

মহীতোষ। বাবা! অত অস্থির হয়ো না—কথাগুলো একটু ভেবে দেখ।

ভাদুড়ী। হব না! হব না! তুই কি বললি! কি বললি!

মহীতোষ। (ভাদুড়ীর কাছে গিয়ে একখানা হাতের উপর হাত রেখে) বাবা—

ভাদুড়ী। (হাত সরিয়ে নিয়ে) ছুঁস না—তুই আমাকে ছুঁস না।

মহীতোষ। (পিতাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে কাছে বসে) বাবা! মালতীকে তুমি যে কতখানি ভালবাস, আমি তা জানি। মালতীর বৈধব্য যে তোমার বুকে শেলের মত বিঁধে রয়েছে—আমি কি তা জানি না ? তাই ও কথার একটু আভাসেই তোমার বুকে ব্যথা টনটন করে ওঠে—সেটাও আমি বুঝি—কিন্তু—(ভাদুড়ী মশাই ধুতির খুঁটে নিজের চোখ মুছতে লাগলেন) বাবা! আমার একটা কথা রাখ। যা হয়েছে, হয়েছে। বীরেশ রায়ের সঙ্গে মালতীর বিয়েতে তুমি আর অমত করো না। (ভাদুড়ী নীরব) সব দিকটা ভেবে দেখ বাবা! বীরেশ রায় প্রকাণ্ড জমিদার—মানগড়ের রাজবংশ। মালতী বাকি জীবনটা মহাসুখে থাকবে—কত কাজ করতে পারবে দেশের দশের। (ভাদুড়ী নীরব) নইলে কি চিরকাল আমাদের গলগ্রহ হয়ে একমুঠো অন্নের জন্য দাসী-বাঁদীর মতন সংসারের একপাশে থাকবে পড়ে ?

ভাদুড়ী। কিন্তু—(জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ করলেন)

মহীতোষ। এর মধ্যে 'কিন্তু' নেই বাবা! বলবে সতীনের ঘর; তাতে কি হয়েছে। সে কালের রাজা-রাজড়াদের একাধিক স্ত্রীর অভাব ছিল না। বীরেশ রায়ও ত রাজা। অর্থের দিক দিয়ে, সামর্থ্যের দিক দিয়ে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করবার অধিকার ও যোগ্যতা আছে তার। সতীনের ঘর—সামান্য একটু ভাবপ্রবণতা মাত্র। এর মধ্যে কোনও যুক্তি নেই।

ভাদুড়ী। কিন্তু—ওর অদৃষ্টে স্বামী সইবে না।

মহীতোষ। (একটু হেসে) এ কথার কি কোনও মূল্য আছে বাবা! তুমিই ভেবে দেখ।

ভাদুড়ী। জানিস ত, তোরই কথায় আমি আবার ওর বিবাহ দিতে রাজী হই। ভেবেছিলাম—বিদ্যাসাগর মশাই ত মুখ্যু ছিলেন না—তিনি যখন বলেছেন, তখন বিধবা বিবাহে কোনও দোষ নেই। ঠিকও হল সব—সইল কি ?

মহীতোষ। ও সেই কথা! তা রমেনের সঙ্গে বিয়ে হয়নি ভালই হয়েছে। তুমি ত বীরেশের সঙ্গে বিয়েতে এক রকম রাজী হয়েছিলে বাবা—এমন সময় রমেন সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার হয়ে এল মানগড়ে। তার সঙ্গে কথা বলেই ত তুমি মত বদলালে। তুমি ত জান বাবা—সে বিয়েতে আমার একেবারেই মত ছিল না। তুমি ত জোর করে সব ঠিক করলে। আমি ত বরাবরই বীরেশ রায়ের সঙ্গে বিয়ের কথাই বলেছি।

ভাদুড়ী। আ—হা! রমেন বড় ভাল ছিল। তার সঙ্গে বিয়ে হলে মালতী সুখী হত। বেশ মানাত দুটিতে।

মহীতোষ। এইখানেই ত তোমার সঙ্গে আমার মেলে না।

রমেন ছিল সামান্য একটা অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার—কি হত মালতীর জীবন। সেই দুবেলা সংসারের হাঁড়ি ঠেলা আর কতকগুলো ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে ওঠা। না হত তাদের ভাল খাওয়া-পরাবার সংস্থান, না হত তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবার সামর্থ্য—

ভাদুড়ী। আরে—মনের শান্তির দিকটা তুই ভাবিস না।

মহীতোষ। মনের শান্তি! দারিদ্র্যের চাপে মনের শান্তি থাকে না বাবা!

(ভাদুড়ী নীরব)

মহীতোষ। থাক ও কথা। রমেন ষ্টেশনে খুন হল—তা তুমিই বা কি করবে, মালতীরই বা কি অপরাধ?

ভাদুড়ী। মালতীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক না হলে রমেন কখনও খুন হত না—মালতীর অদৃষ্টেই খুন হয়েছে। মালতীর অদৃষ্টে স্বামী নেই। কই এতদিন ত কখনও মানগড় ষ্টেশনে ডাকাতি বা খুন হয়নি?

মহীতোষ। তোমাদের অদৃষ্টবাদী লোকদের নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। এরাই জীবনটাকে এগুতে দেয় না। দেয় বাধা।

(দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ কিছু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।)

মহীতোষ। ঐ বীরেশ রায় শিকার করতে করতে এই দিকেই আসছেন। (দু হাত দিয়ে পিতার দু হাত ধরে)—বাবা! তুমি মত দাও। কতবার তোমাকে বলেছি—এতে মালতীর মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। আমার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সমস্ত ভার নিচ্ছেন বীরেশ রায়। এক হাজার বিঘা জমি লিখে দেবেন—বড় লেবরেটারী করে দেবেন আমার জন্য—বিদেশ থেকে দামী দামী যন্ত্রপাতি আনিয়ে। আমাকে বিলেত পাঠাতেও রাজী। এ সব যে করছেন—শুধু মালতীকে বিয়ে করার জন্যই নয়। অন্য কারণও আছে বাবা। শুনলে তুমি খুসীই হবে। এমন সুযোগ, তুমি বাপ হয়ে নিজের একগুঁয়েমীতে ছেলেমেয়েদের সমস্ত ভবিষ্যৎ দেবে মাটি করে?

ভাদুড়ী। আমি জানি না। আমি জানি না। মালতী যদি সতীনের ঘর করতে চায়—আমার কি। আমার কি।

(এমন সময় দূরে দেখা গেল—এক হাতে চা ও আর এক হাতে একটি বাটি নিয়ে মালতী ঘরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। শুভ্রবসনা—সত্যই অসাধারণ রূপবতী! শুভ্র সুঠাম দেহে লীলায়িত ভঙ্গী, সুন্দর মুখে বড় বড় কালো দুটি চোখ, বিষাদভরা অথচ উজ্জ্বল। ভাদুড়ী মশাই গম্ভীর ভাবে উঠে ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন)।

মালতী। (মহীতোষের কাছে এসে) এই নাও 'চা'। গরম মুড়ি এনেছি তেল মাখিয়ে।

(মহীতোষ চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। মুড়ির বাটি রাখল পাশে)।

মালতী। ও কি! তুমি আবার ঐ-সব কাটাকুটি করছিলে? হাত ধুয়ে নাও। দাঁড়াও জল নিয়ে আসি।

মহীতোষ। কিছু দরকার নেই রে। তুই বোস।

মালতী। ঐ হাতে মুড়ি খাবে কি করে—ঘেন্না করবে না?

মহীতোষ। আমার ঘেন্না-টেন্না নেই—জানিস ত। আর আমি ত ঠিক হাত লাগাইনি।

মালতী। (হেসে) আচ্ছা দাদা! আমাকে কেবলই বাবা ও রকম গম্ভীরভাবে উঠে গেলেন কেন? আবার তুমি বাবাকে রাগিয়েছ বুঝি?

মহীতোষ। ঠিক রাগাইনি—কিন্তু খোঁচা দিয়েছি। খোঁচা না দিলে ত কাজ হয় না?

মালতী। কেন তুমি বাবাকে ও রকম কষ্ট দাও দাদা? এই বুড়ো বয়সে—মা নেই—সব্বাদিক দিয়ে বাবার মনটাকে বাঁচিয়ে চলাই ত আমাদের উচিত।

মহীতোষ। কিন্তু বাবার মনটাকে বাঁচিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ করার কি কোনও সার্থকতা আছে?

মালতী। জানি আমি তোমার ও-সব কথা। কিন্তু বাবার মনে কষ্ট দেওয়া—আমি তা কিছুতেই সইতে পারি না। তখন বাবার মুখের দিকে চাইলে—আমার চোখে আসে জল।

মহীতোষ। আরে তুই মিথ্যে ভাবিস না। ও সব মনঃকষ্ট ক্ষণিকের। আমার উপর নির্ভর কর—সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বাবার মুখেই কি রকম হাসি ফোটে দেখিস।

(মালতী নীরব)

মহীতোষ। বীরেশ রায়ের সঙ্গে তোর বিয়েতে বাবা একরকম নিমরাজী হয়েছেন আজ। এইবার সব ঠিক করে ফেলতে হবে—তাড়াতাড়ি।

(মালতী নীরব)

মহীতোষ। এখন তোর উপর সব নির্ভর করে। তুই যেন আমার বাবাকে বিগড়ে দিস না। তোকে নিয়েই আমার ভয়।

মালতী। ভয় নেই। আমি তোমার জীবনের পথে কাঁটা হব না।

মহীতোষ। শুধু আমার কেন—তোর নিজের দিকটাও।

মালতী। ও কথা থাক। জানি সব—কিন্তু হিসেব থেকে আমাকে বাদই দাও না—লোকসান ত নেই!

(এমন সময় দেখা গেল মাঠের দিক দিয়ে বীরেশ রায় এগিয়ে আসছে। হাতে বন্দুক, পরিধানে ঘোড়ায় চড়ার পোষাক। কোমরে বেল্ট—গুলীভরা, গায়ে হাতকাটা সার্ট। লম্বা-চওড়া চেহারা—গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বেশ বড় একখানা মুখ—চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। বীরেশ রায়কে দেখেই মালতী উঠে ধীর পদক্ষেপে চলে গেল ঘরের দিকে।

এগিয়ে আসতে আসতে বীরেশ রায় বারে বারে চাইল সেই দিকে।)

মহীতোষ। (একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে) এই যে আসুন রাজাসাহেব!

বীরেশ। (এগিয়ে এসে বসল) না আজও তোমাকে হরিয়াল খাওয়াতে পারলাম না।

মহীতোষ। কি পেলেন?

বীরেশ। প্রায় দু' ঘণ্টা ত ঘুরলাম মাঠে মাঠে—গোটা চারেক ঘুঘু ছাড়া কিছুই জুটল না। একটাও হরিয়াল দেখলাম না। হরিয়াল ছিল—খবর দিল লোকটা—কিন্তু এমন জায়গায়, যেখানে এগুনো অসম্ভব। আলের উপর দিয়ে যেতে হয়—বেজায় কাদা।

মহীতোষ। তা হোক, পরে একদিন হবে। হরিয়ালের মাংস খাইনি কি না—

বীরেশ। খাওয়াব তোমাকে শীঘ্রই একদিন।

মহীতোষ। শুনুন, মস্ত খবর আছে। বাবা শেষ পর্য্যন্ত একরকম মত দিয়েছেন।

বীরেশ। (চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল) এ্যাঁ?

মহীতোষ। হ্যাঁ। (মুখে মৃদু মৃদু হাসি)

বীরেশ। কিন্তু তোমার বোন? তিনি আবার কোনও গোলমাল করবেন না ত?

মহীতোষ। না—মালতী আর আমার বিরুদ্ধে কখনও যাবে না। সে ত বুদ্ধিমতী, অনেক দিনই বুঝেছে। রমেন মানগড়ে আসার আগে যখন একথা উঠেছিল, আমি ত ওকে একরকম নিমরাজী করিয়েছিলাম। মনে নাই আপনার? রমেন এসেই ত সব গোলমাল হয়ে গেল। তাও ত আমার কথায়ই চিঠি লিখলে রমেন মুখার্জ্জীর কাছে। আমার উপর তার আস্থা অগাধ।

(এমন সময় বটগাছের পিছনে একটি ঝোপের আড়ালে একটি রমণী মূর্ত্তি দেখা গেল। একবার যেন উঁকি দিয়েই নিজেকে লুকিয়ে ফেললে।)

বীরেশ। তুমি তোমার বাবাকে বলেছ ত যে ছেলেপুলে হল না বলেই আমি আবার বিয়ে করতে চাই? মানগড়ের রাজবংশ রক্ষা করতে হবে ত?

মহীতোষ। সে কথা ত অনেক আগেই বাবাকে বলা হয়েছে।

(এমন সময় দূরে একজন রেলওয়ে [illegible]—উর্দ্দিপরা—ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।)

মহীতোষ। এই বৃন্দাবন! বৃন্দাবন। বড়বাবুকে বল রাজাসাহেব এসেছেন। বড়বাবু ষ্টেশনে। (বীরেশের প্রতি) আপনি আজই প্রস্তাব করে বাবার সঙ্গে কথাটা পাকা করে নিন। দেরী করা ঠিক হবে না।

বীরেশ। (মৃদু হেসে) কোনটা প্রস্তাব করব? তোমার সঙ্গে সুজাতার না আমার সঙ্গে?

মহীতোষ। আমার ব্যাপারে ত কোনও বাধা নেই, শুনলে ত বাবা ভীষণ খুসী হয়ে উঠবেন।

বীরেশ। তা বটে! তোমার ব্যাপারে বাধা ত শুধু আমার দিক দিয়ে। (মৃদু হেসে) তবে দিন দিন যে রকম পাগল হয়ে উঠছ মহীতোষ বাবু—আমার বাধাটা কাটিয়ে ফেলতে পারলে তোমার দিক দিয়ে আমি বাঁচি।

মহীতোষ। (একটু ভেবে) আমার মনে হয়, দুটো প্রস্তাবই একসঙ্গে করুন। বাবা তাহলে সহজেই মত দিয়ে দেবেন।

বীরেশ। তা নয়। আগে বাধা কাটিয়ে নেওয়া ভাল—নইলে বাবার ধাক্কায় হয়ত দুটোই যাবে পণ্ড হয়ে।

মহীতোষ। যা ভাল বোঝেন।

বীরেশ। কবে তোমার বাবা মত দিলেন?

মহীতোষ। আজই—এই একটু আগে।

বীরেশ। (একটু ভেবে) তাহলে আজ থাক। দু'-একদিন যেতে দাও।

মহীতোষ। বেশ। তবে বাবা যখন একবার মত দিয়েছেন, মালতীর দিক দিয়েও যখন আর কোনও গোলমাল নেই—বাবা আর মত ফেরাবেন না। এখন ত আর হাতের কাছে রমেন মুখার্জ্জী নেই?

বীরেশ। হ্যাঁ, ভাল কথা। পুলিশ আর কিছু কিনারা করতে পারলে না?

মহীতোষ। (মুখে মৃদু হেসে) ছাই! পুলিশ কি কখনও সত্যি আসামী ধরে? এ ত প্রায় মাস তিনেক হয়ে গেল—ছ' মাস আগে পদ্মপোতা ষ্টেশনে যে ডাকাতিটা হয়ে গেল, পুলিশ কি তার কিনারা করতে পেরেছে আজও? শুধু শুধু ষ্টেশনের ওপারের, ঐ মাঠের, বেদে ও বেদেনীদের কতগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে মাস দুই আটকে রাখল।

বীরেশ। পরশু দিন ত তাদের ছেড়ে দিয়েছে।

মহীতোষ। হ্যাঁ, তাই ত আজ এই উৎসব—হরেকিষণ মাড়োয়ারীর কাছ থেকে সামিয়ানা চেয়ে এনে টাঙ্গানো হয়েছে। বেদে-বেদেনীদের নাচ-গান হবে। বাবা ত একদিকে অসম্ভব ছেলেমানুষ—ওদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, খালাস হয়েছিস, নাচ-গান কর। দেখবেন না—নাচ-গানের সময় বাবার হাসি, হাততালি আর মাথা দোলানো।

বীরেশ। আমার আর আসা হয়ে উঠবে কি?

মহীতোষ। না, না, আসবেন। বাবা খুব খুসী হবেন আপনি এলে।

বীরেশ। আচ্ছা, আসব। কখন সুরু হবে?

(এমন সময় ভাদুড়ী মশাই ষ্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এলেন—হুঁকো হাতে। বীরেশ উঠে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে ভাদুড়ী মশাইকে নমস্কার করল।)

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বিজন ভট্টাচার্য

১৪

ভালবেসে যে এত নিগ্রহ, আগে সে কথা জানতো না সতী।

বিয়ে হবার আগে, এ জগতে যে চিত্রগুলো দেখে নি সতী জীবনে অথচ অতি সুন্দর বলে মনে ভেবেছে, বিয়ের পর সতী ভেবেছিল, জীবন বুঝি বা সেই-রকমই হবে। যেমন সতী কোনদিন কাশ্মীর যায় নি। অথচ শুনেছে, সেটা নাকি মর্ত্তেই এক স্বর্গ—ভূস্বর্গ। শুনেছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা নাকি সেখানে নৌকোতেই থাকে, নৌকোতেই ভাসে, নৌকোই তাদের ঘরবাড়ী।

পূর্ণিমার সময়ে সেই সরোবর, সেই নৌকো, সেই প্রেম—সবটা মিলিয়ে যত সুন্দর, বিয়ের পর সতীর মনে হয়েছে তার জীবনও বুঝি বা তত সুখেরই হবে।

কাশ্মীরের হ্রদে শুধু এই নৌকোবিলাসই নয়, মানস সরোবরে শুনেছিল সতী মরাল-মরালীরা নাকি পাশাপাশি ভেসে একজন আর একজনকে দেখে মুগ্ধ হয় যখন জলক্রীড়া করে। বিয়ের পর সতী ভেবেছে, জলকেলি যদি বা না সম্ভব হয়, সত্যব্রতর দিকে সে-ও ঠিক তেমনি অনিমিখ চেয়ে থাকতে পারবে। কখনও কোন ক্লান্তি আসবে না সে দেখায়। কিন্তু বিয়ের অনেক দিন পর মনে হচ্ছে সতীর জীবন বুঝি বা তত সুখের কোনদিনই নয়। মনে মনে যা ভাবা যায়, বাস্তবে তা সত্যি হয় না কখনও। বরং বাড়তি সুখের অলস কল্পনায় ক্ষতি স্বীকার করতে হয় শেষটায়।

তাই স্থির কতকগুলো মোটামুটি সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে সতী মনে মনে। যেমন সত্যব্রত তাকে ভালবাসবে ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই তার মত করে। সতী যে ভাবে আশা করে অপেক্ষা করে থাকে, সেই মতো কোনদিনও নয়। মনের রঙ-এ রঙ মিলিয়ে মিথ্যেই সতী ভেবেছিল এতদিন।

কিন্তু সত্যব্রত সতীকে যে ভাবেই ভালবাসুক না কেন, সতীর কিন্তু তাতে কোন ব্যতিক্রম হবে না। সত্যব্রতকে সতী ভালবাসবে ঠিক আলো-হাওয়া খু্ঁ র মতই—অফুরাণ সহজ ভাবে। আরও মনে মনে ঠিক করে সতী, এ কথা সে কোনদিনও সত্যব্রতকে বলতে যাবে না। যা কিছু হবার কথা ছিল অথচ হলো না জীবনে, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মনে মনে পুষে রাখবে শুধু এই অভিমানটুকু।

সত্যিই এমন হবার কোন কথা ছিল না। পূর্ণতা আবার কে কবে পেয়েছে? একটা মানুষ কি কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়? সে সুন্দরের নজীর কোথায় সৃষ্টিতে? চাঁদের চেয়ে ফুল সুন্দর, শিশু সুন্দর। কিন্তু সেই শিশু, সেই ফুলেও যে কলঙ্ক নেই, সে কথা কে বলবে?

হেরে গিয়ে ফুঁসে উঠে জিততে চায় সত্যব্রত—এমন ঘটনা বহুবার দেখেছে সতী। দেখে-শুনে হাসি পেয়েছে তার। কে দেখতে চেয়েছে মিথ্যে সেই পরাক্রম? সংগ্রামী তবু পরাহত একটা মানুষ কি সতীর কাছে কম শ্রদ্ধেয় হতো? বোঝাবে কে তা সত্যব্রতকে?

যে আশ্বাসে প্রাণ নেই, শুধু মৃত্যু আছে অগণন, সে আশ্বাস চায় না সতী জীবনে।

সত্যব্রত বলে, শিরিন দত্ত কি শালিনীর সঙ্গে যখন তুমি কথা কইবে, তখন পারিবারিক জীবনের শুচিতা আর তার শৃঙ্খলা নিয়ে কোন কথা ব'লো না। বুঝতে পারো না, যাদের প্রতিষ্ঠা আছে সমাজে, আজ-কাল তারা তোমার ঐ সব কথা শুনতেও চায় না। ও সব প্রশ্ন হচ্ছে দুর্ব্বলের। ছোট হ'তে হ'তে যাদের চোখে দুনিয়াটা আজ এই এতটুকখানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের ইতিহাস বহু বিচিত্র! তার পরিসর আরও বড়। সেখানে ভাল মন্দ সুন্দর কুৎসিত সব একাকার হয়ে গেছে।

সেদিন হোটেলে রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিলাম। তুমি গীষ্পতির কে না কে এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলে মুখ ঘুরিয়ে! একটু পরেই দেখলাম উঠে গেল রঘুবীর সিং শিরিন দত্তদের আড্ডায়। কোণের টেবিলে সে শিরিন দত্তর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে লাগলো। অথচ তুমি জানো, এই রঘুবীর সিং-এর একটা কথায় গোটা উত্তর-ভারত ওঠে-বসে। ব্যবসায়ী মহলে তার এমনি প্রচণ্ড দাপট। কেন উঠে যায় রঘুবীর সিং তোমার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে—আমায় বলতে পারো? হিম্মত চাই, বুঝলে? ধরে রাখতে হলেও হিম্মত দরকার।

সত্যব্রতর মুখের পানে অবাক হয়ে তাকিয়ে তার নতুন ভূমিকার পাঠ শোনে সতী।

একদিন না, এই রকম বহুদিন, বহু ব্যাপারে—পার্টিতে কি বাড়ীতে, ঘরে কি বাইরে, বহু জনের মাঝখানে কি নিজ্জন একান্তে, জানতে পেরেছে সতী, যে সত্যব্রত তাকে ভালবাসবে নিশ্চয়ই; কিন্তু একান্তই তার মত করে। সম্মান যেমন দেবে তেমনি অসম্মান করতেও দ্বিধা করবে না এতটুকু।

এত জেনেও তবু স্থির হয়ে থাকে সতী এক বিশ্বাসে—সত্যব্রতকে জড়িয়েই সার্থক হবে সে। এমনও তো হতে পারে,

এই দেখাটাই সবটুকু নয় সত্যব্রতর। আপাত অবিবেকী এক বিশৃঙ্খল ব্যক্তিসত্তার গভীরে যে কোন সৃষ্টিপ্রাণ নেই, শুধু বালি আর বালি—একটা অঙ্কুরোদ্গমও সম্ভব হবে না সেখানে কোনদিন, এ কথা কে জোর করে বলবে? জলদান করতে তো কোন মানা নেই প্রস্তরশৈলে।

১৫

বিশ্বতোষের সঙ্গে পিতা অমিয়নাথের বেশ কিছুদিন দেখাশোনা হয়নি। বিষয়সম্পত্তি ওদারক আর কোলিয়ারী বিজনেসের গুরু দায়ভার একলা বিশ্বতোষের ওপর না রেখে, বড়জামাই ও মেজোজামাই-এর হাতে তুলে দিয়ে অমিয়বাবু ছিলেন ছোট মেয়ে যশোধারার কাছে কালিম্পং-এ। নিশ্চিত সুখশান্তির আশ্বাস দিয়ে যশোধারার স্বামী প্ল্যান্টার নরেন ভাদুড়াই বাঙ্গা জিতে নিয়ে আসেন শ্বশুর মশাইকে।

অমিয়বাবুও দেখলেন, কি কলকাতা, কি আসানসোল, থাকলেই অশান্তি, শুনলেই উত্তেজনা। তার চেয়ে ধুলোধোঁয়ার রাজ্য থেকে একেবারে সুদূর হিমালয়ে চলে যাওয়াই প্রশস্ত। নরেনের বিস্তীর্ণ গোলাপ-বাগানের মাঝখানে বাঁদুরে টুপী পরে বসে তিনি শুধু 'ওজোন' নেবেন আর কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখবেন প্রাণ ভ'রে। চিঠি লিখতে সময় বৃথা যায়, বড় বড় জরুরী টেলিগ্রামে পিতার সঙ্গে কুশল-বিনিময় করে বিশ্বতোষ। লেখে, শীত চলে যাবার মুখে একটা কামড় দিয়ে যায়। যেন সতর্ক থাকেন অমিয়নাথ। ওষুধ আর স্পেশাল ব্র্যাণ্ডের কফি পাঠান হলো। উত্তরে অমিয়নাথ শুধু লেখেন কোন কিছুই যেন over doing না হয়!

শীতের পর গ্রীষ্ম পড়াতেও ভালই ছিলেন অমিয়বাবু। হাঁটাহাঁটি করছিলেন গোলাপবাগানেই নাতির হাত ধরে। বৃদ্ধবয়সেও গালে আপেলের রং লেগেছিলো। সোমবারও তার পেয়েছে বিশ্বতোষ, যে যশোধারা, ভোম্বল, বাবু আর বাবা গ্যাংটক থেকে বেড়িয়ে ফিরেছেন নির্বিঘ্নে। হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, তার বোল ঘণ্টা বাদে এক টেলিগ্রাম—come sharp father seriously ill.

দুঃসংবাদটা শুধু বিশ্বতোষই পায়নি। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মকুশলী নরেন ভাদুড়ীর উদ্যোগে নিউজ এজেন্সী মারফং তড়িঘড়ি চারিয়ে গিয়েছে খবর সংবাদপত্রের জগতে। ফলে টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত শোকাগত ট্রাঙ্ককল, ফোন ও টেলিগ্রাম বিব্রত করেছে বিশ্বতোষকে। সকাল না হতেই বিশ্বতোষ বড়দাদাবাবু কিঙ্কর সান্যালের সঙ্গে স্পেশাল প্লেনে রওনা হয়ে গেছে বাগডোগরা। বেলা এগারোটায় কালিম্পং পৌঁছে দেখে সব শেষ হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ গোলাপবাগান সংলগ্ন চাকাচত্বরে শুয়ে আছেন পিতা অমিয়নাথ। কালিম্পং-এর লাল শাদা সব গন্ধহীন গোলাপ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে শবাধারে।

অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকে বিশ্বতোষ অমিয়বাবুর পায়ের কাছে। জীবনের একমাত্র শ্রদ্ধের অন্তরঙ্গ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নীরবে অশ্রুমোচন করে।

শেষ দেখাটা সম্ভব হলো না বলে প্রথমটায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে নিজেকে মনে হয় বিশ্বতোষের। মনে হয় দারুণ একটা ফাঁকিতে পড়ে গেছে সে।

বিশ্বতোষের জীবনে সমস্ত বঞ্চনা পূরণের প্রয়াসে অমিয়নাথ একাধারেই হতে চেয়েছিলেন তার পিতামাতা। আগে না বুঝলেও পরে সেটা বুঝেছিলো বিশ্বতোষ। জেনেছিলো, যে তার সমস্ত অস্তিত্বের ওপর ছায়া ফেলে আছে এক রাহুগ্রস্ত চাঁদ। কর্ণ নয়, তবু এক কর্ণেরই মতন—মাকে সে মা বলে পরিচয় দিতে পারবে না। এই অবমাননার সতত কুহেলা বিস্তারকে সূর্যের মতো দূরে সরিয়ে রাখতেন পিতা অমিয়নাথ। আজ, পিতার মৃত্যুতে বিশ্বতোষের মনে হলো সত্যই তাকে হীনবল নিঃসহায় রেখে রেখে সেই সূর্য অস্তমিত হলো। গাঢ় কালো এক তমিস্রায় ডুবে গেল তার বিশ্বসংসার।

কিছুদিন কাটলো দারুণ এক বিভ্রান্তির মধ্যে। একটা ট্রাষ্টিবোর্ড গঠন করবার পরে এ্যাটর্নী দত্ত-সেন ফার্মের সঙ্গে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির যথাযথ বিলি বন্দোবস্ত করতেই কাটলো অনেক দিন। বড়দাদাবাবু কিঙ্কর সান্যাল থেকে দূর সম্পর্কের রিফউজী পিসীমা পর্যন্ত কাউকেই বঞ্চিত করা হলো না। গোপন কতকগুলো দান-ধ্যান ছিলো অমিয়নাথের। নথিপত্র ঘেঁটে সেগুলোও উদ্ধার ক'রে বিশ্বতোষ ট্রাষ্টির বিবেচনার জন্যে দাখিল করলো। অজ্ঞাতকুলশীল রাধাঘাটের কোন এক বিধবাকে পাঁচ টাকা ক'রে বৃত্তি দিতেন অমিয়নাথ। খোঁজ ক'রে যদিও সেই বৃত্তির কার্যকারণ নির্ণয় করা গেল না, তবু বিশ্বতোষের পরামর্শ মতো বহাল রইলো সেই বৃত্তি। নাতি-নাতনীরা ছিলো অমিয়নাথের নয়নমণি। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এ্যাটর্নী দত্ত-সেন ফার্মকে কড়াপাহারা রাখা হলো নাবালক স্বার্থ সংরক্ষণের খবরদারীতে। হাতভরতি করে ছাপিয়ে দেওয়া হলো ছোট মেয়ে যশোধারাকে। নরেন ভাদুড়ীর মহাশোকও মহামূল্যে সম্মানিত হলো ট্রাষ্টির বিবেচনায়। কর্মিতকর্মা নরেন্দ্রনাথ ভেতরে থাকলে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দিকটা ছাড়াও বৃহত্তর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হবে। আর স্বোপার্জিত নয় বলে বিশ্বতোষ তার নিজের অংশের সমস্ত টাকা কোম্পানীর ঘরে এমন সর্তাধীনে বিনিয়োগ করে রাখলো যে প্রয়োজনে সে ডিভিডেণ্টের টাকাতেও হাত দিতে পারবে না। পৈতৃক ঋণও সে পরিশোধ করে দিয়ে রায়-মুখার্জি কোম্পানীর যাবতীয় শেয়ারপত্র লালচাঁদ পুণচাঁদ প্রমুখের নামে হস্তান্তর করে। সব দিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে সুসংহত হলো বিশ্বতোষ।

অনেক দিন পরে নিজেকে বড় হালকা বোধ হলো বিশ্বতোষের। আর কোন দায় নেই, দায়িত্বই নেই। নিজের সঙ্গে নিজের বাজীটা এবার হয়তো ল'ড়ে নেওয়া যেতে পারে।

আয়নায় দেখে নিজেকে মনে হয়, ফটো ফ্রেমে বাঁধাই করা এক ট্র্যাজিডি নাটকের নায়ক যেন সে। অভিনয়টাই এখন থেকে তাকে জানিয়ে তুলতে হবে নিখুঁত ভাবে দুর্বার এক ক্লাইম্যাক্সের দিকে।

নায়কেরই পাঠ। নাটকের পাতা খুলে পাঠ মুখস্থ করতে বসে বিশ্বতোষ। প্রবঞ্চিত এক দেউলিয়া উত্তরাধিকারের নাম ভূমিকা। ছত্রে ছত্রে মেলোড্রামা। অথচ নাটকের আঙ্গিকে চরিত্র কথনও মেলোড্রামাটিক নয়। এই যা এক বৈশিষ্ট্য চরিত্রের।

মরমী অভিনেতার মত বুকের ভেতর মুখ গুঁজে অভিনয়ের ভাষা খুঁজতে থাকে বিশ্বতোষ।

প্রদোষকাল। শুরুতেই অমিয়নাথের প্রাসাদকক্ষ। প্রফুল্লনলিনী উৎকর্ণা হ'য়ে অপেক্ষা করছেন। পার্শ্বে ল-সন্ন্যাসী ব্রজ পদক্ষেপে

অন্নদা রায় প্রবেশ করছেন প্রফুল্লনলিনীর ঘরে। চমকে উঠলেন অমিয়নাথ।

চমকালো বিশ্বতোষ। চমকালো, কিন্তু বড় বেশী উচ্চকিত হয়ে গেল অভিনয়। আরও কাছে, রাশ টেনে অভিনয় করতে হবে তাকে। চোখ দুটো হঠাৎ অত বড় বড় করে চাইলে চলবে না। চোয়ালের হাড়ে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা থাকবে ঠিকই। কিন্তু সেটা হবে নেহাৎই একটা পরুষ অভিব্যক্তি প্রতিহিংসার হাড়িকাঠটা মুখের চামড়ার ওপর অতটা প্রকট হয়ে দেখা যাবে না। আর সবার আগে দৃষ্টি। দৃষ্টি অমন শাণিত কখনই নয়। প্রত্যক্ষ কোন ছুরিই লুকিয়ে থাকবে না ও চোখে। ভাসা-ভাসা দুই নীলোৎপলের নীচে লুকিয়ে লুকিয়ে চারিয়ে নিয়ে যেতে হবে নাগিনার একটি বিষদাঁত। চূড়ান্ত কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্তে সেই মুক্তা-শুভ্র বিষদন্ত প্রেমের প্রতিভাস বলে প্রতীয়মান হলে আরও চমৎকার হবে অভিনয়।

মুখটাই নুয়ে পড়েছিল অবসাদে। নিজের হাতেই থুতনিটা ঠেলে তুলে ধরে বিশ্বতোষ।

১৬

এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোম্পানীর কাজ পুরোদমে চালু হয়ে যাবার কথা, দু' মাস হতে চললো এ পর্য্যন্ত তার সংগঠনটা যে কি হবে তাই ঠিক হলো না। অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের জন্ম বিশ্বতোষকেও ঠিক দায়ী করা যায় না। কেন না, অমিয়নাথের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিশ্বতোষ এতই বিব্রত ছিল যে অন্য কোন দিকে সে আর নজরই দিতে পারে নি।

তবু ব্যবসায়ী মহলে একটা কথা ওঠে যে, ভাবী কোম্পানীর অন্যতম কর্মকর্ত্তা হিসেবে বিশ্বতোষ শেষ পর্য্যন্ত সত্যব্রতকেই মনোনীত করেছে। এক ব্যবসায়ের সূত্র ধরে এ নিয়ে কারবারী মহলে পরে যখন পাঁচটা কথা উঠছে, তখন সত্যব্রতও সে কথার কোন প্রতিবাদ করে না। বরং সেই সূত্রে দু'-দশটা নরম-গরম বুলি আউড়ে প্রতিপন্ন করে যে গুজবটা আদৌ মিথ্যে নয়। এক কথায় পাঁচ কথা উঠে পড়ে। বিভাগীয় এজেন্সী আর কমিশনের প্রশ্ন নিয়ে বড় বড় দালাল আর উমেদার এসে দেখা করে সত্যব্রতর সঙ্গে। এক কথায় পাঁচ কথা তুলে সত্যব্রতকে কবুল করতে হয় সব বড় প্রতিশ্রুতির। লম্বা-চওড়া চৌকোস কথাবার্ত্তা, তার দামও বড় কম নয় ব্যবসা-জগতে। তারপর সব কথা ঘরে বসে হয় না। হোটেল বার-ই প্রশস্ত জায়গা সে সব কথা বলার। আর তাতে করে খরচও হয়ে যায় সত্যব্রতর বেশ কিছু। নিজের না থাকলেও সতীর আছে। সেই টাকাই নয়-ছয় করে খরচ করে সত্যব্রত। সতীকে বলে, এখন চালবার সময় ঢেলে যাও। পরে দেখো আমি তোমার সমস্ত টাকা সুদসমেত উশুল করে দেবো।

টাকার মুখ জীবনে সতী অনেক দেখেছে। কাজেই সত্যব্রতর কথায় খুব একটু উল্লসিত হয় না। সত্যব্রতর কথার উত্তরে একটু করুণ হেসে বলে, কি জানি, আমি ভাবলাম বুঝি বা তুমি আমার সমস্ত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে বিদেয় করে দিচ্ছ।

তা কি কখনও হয় সতী! সতীর কাঁধে হাত রেখে গদগদ হয়ে সত্যব্রত বলে, এই ভাখ না, রাত্রে আজ আবার এটর্নী মিঃ দত্তকে

ডিনারে নেমন্তন্ন করেছি। বাড়ীতে তোমার আপত্তি, তাই হোটেলেই কথাবার্ত্তা বলতে হবে। বেশ কিছু টাকার ধাক্কা। গাঁট থেকেই দিতে হবে, এখন কি আর করবো ? বিশ্বতোষ যে কবে আসবে আর কি করবে। জানি না কি হবে।

কি আবার হবে, সত্যব্রতকে আশ্বাস দিয়ে বলে সতী,—একটা তো কিছু করতেই হবে বিশ্বতোষকে। দেরী হচ্ছে, নিশ্চয়ই আটকে পড়েছে বিশ্বতোষ—কোন জরুরী কারণে। বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করা তো আর কম ঝামেলার কাজ নয় ?

: আমি ভাবছি এতে করে আবার তার নিজস্ব পরিকল্পনা বানচাল না হয়ে যায়। পরামর্শদাতার তো অভাব নেই সংসারে ? বিশেষ করে বিশ্বতোষের ছোট ভগিনীপতি নরেন ভাদুড়ী মশাইকে বিশ্বাস নেই কোন।

: আত্মবিশ্বাসটাই বড় কথা জানো সত্যব্রত ! নইলে সত্যি কথা বলতে গেলে, বিশ্বাস আমি তোমায় বিশ্বতোষকেও করতে বলি না।

: বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় সতী ! যুগটাই পড়েছে কেমন যেন লটারীর। টেক্ তো আছেই, সেই সঙ্গে কপালের প্রশ্নও অনেকখানি।

: ভাবছো কেন ? স্ত্রী-ভাগ্যে রাজ্যলাভ,—কথাটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে যাবে বলতে চাও ?

সতীর কথায় সান্ত্বনা আছে অনেক। সত্যব্রত হেসে বলে, রাজ্য ফিরে পাবার আশা রাখি না সতী ; শুধু লক্ষ্মীলাভ হলেই যথেষ্ট মনে করবো। আদর করে বলে, লক্ষ্মী অর্থাৎ টাকা, আর যে লক্ষ্মী সে তো আমার আছেই। ঘরেই বাঁধা আছে।

সত্যব্রতর মিষ্টি কথায় গলে কাদা হয়ে যায় সতী। ভাবে, তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই হয়তো বিভাগ হয়েছেন দেবী। সত্যব্রতর হাতে ভরসা করে ঝাঁপিটা ঠিক তুলে দিতে পারছেন না ক্ষীরোদসম্ভবা হয়েও।

* * * *

আজ আসবে কাল আসবে করে আরও দিন পনেরো পর অবাধ বাণিজ্যের সনদ হাতে করে, বিশ্বতোষ একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। কথাবার্ত্তা হাবভাব আচরণ তেমনিই সপ্রতিভ। সংসার অঘটন কিছু হয়েছে বলেও চেহারায় কিছু লেখাজোখা নেই। বরং চিক্কণতা আরও বেড়েছে দেহকান্তিতে। স্বাস্থ্যসম্পদ উছলে পড়ছে বুদ্ধিদীপ্ত চোখে-মুখে। সতীকে দেখেই প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে সত্যব্রতর কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সর্বপ্রথম। বলে, সত্যব্রতর কিন্তু যাই বলো সতী একটা খবরবার্তা নেওয়া উচিত ছিল ইতিমধ্যে। যে দু মাস দেখা নেই লোকটার সঙ্গে, মানুষটা মরলো, না বাঁচলো, কি হলো—একটা খবর পর্য্যন্ত নেই !

সতী অবাক হয়ে বলে, কেন টেলিগ্রাম তুমি পাওনি আমাদের ?

: আরে সে তো একটা ফর্মালিটি, তাড়া-তাড়া টেলিগ্রাম আর চিঠিপত্রের মাঝখানে না হয় দু' লাইন লিখে সামাজিকতা করেছিলে। আমি বলছি অন্য কথা। কাজকর্মের এদিকে কি হলো, না হলো, লোকেই বা কি বলছে টলছে সত্যব্রতর কাছ থেকে আমি সেই ধরণের খবরবার্ত্তা আশা করেছিলাম। এদিকে এসে তো শুনি বাজার খুব গরম। আজ পার্টি, কাল ডিনার, পরশু লাঞ্চ—সেন তো শুনলাম খুব একটা হৈচৈ বেধে গিয়েছে।

সতী সায় দিয়ে হেসে বলে, সত্যিই এমন একটা বিশ্রী অবস্থা না, কথা আর কথা, শুনলে মনে হবে কি না একটা ব্যাপার হচ্ছে যেন। রাত একটা, রাত দুটো—আলোচনাই হচ্ছে বাইরের ঘরে। মাঝখানে আমুভাই আর ভগবানদাস একদিন এসেছিলেন। জোর পার্টি হলো। অল্প জায়গার মধ্যে আমি আবার একটু 'বুফে'-র বন্দোবস্ত করলাম। খুব বাঘ সিংহি আর গণ্ডার মারা হলো—আসাম আর ইষ্ট পাকিস্তান, অন্ধ্র আর মাদ্রাজ নিয়ে 'সাদার্ণ জোন' শুনছিলাম একটু একটু। এত কথা, এত কাজ অথচ আসল কর্মকর্ত্তার দেখা নেই।

: আবার কি, এবার তো এসে গেছে আসল কর্মকর্ত্তা, কাজকর্ম সুরু হয়ে যাবে এবার। কি করবো, কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ বাবা গেলেন মারা। বিষয়-সম্পত্তির মোটামুটি বিলিব্যবস্থা করে আসতে আসতে—বুঝতেই পারো কি ঝামেলা।

: তা আর নয়, এসো, চলো ভেতরে বসবে চল। এক্ষুণি এসে পড়বে সত্যব্রত।

: কি বেরিয়েছে বুঝি ! খুব কাজের লোক হয়েছে সেন দেখছি !

: এখনই এই, পরে না জানি কি হবে। এর ভেতরেই তো আমার পাঁচ-ছ' হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বললে বলেন, সুদ সমেত লিখে দিচ্ছি কাগজ আন।

বিশ্বতোষ হেসে খুন। বলে, সত্যব্রত তা হলে খুব সলভেণ্ট পার্টি হাত করেছে বলো ! কই আমায় কিছু টাকা দিও তো সতী !

: বেশ তো। কত চাই বলো না ? ঘাবড়াই নাকি ?

সতীর কথার তারিফ করে বিশ্বতোষ বলে, এই তো অন্নদা রায়ের মেয়ের মত কথা। বেশ, জানা রইল।

: সুদের হারটা আমার কিন্তু ভাই একটু চড়া হবে।

: ঠিক আছে তাই দেবো। হুণ্ডি কেটো সই করে দেবো।

সতী হেসে বলে, ঠিক ঠিক হুণ্ডি। হুণ্ডি কেটে ধার দিতে হবে। কথাটা মনেই পড়ছিল না আমার।—এখন বল, গরম একটু কফি খাবে ? তুমি খেলে আমিও একটু খাই।

: বিলক্ষণ বিলক্ষণ।

নিকুঞ্জ মাইতিকে ডেকে কফি আনতে বলে সতী।

লতা-পাতা-ঘেরা ছাতের বারান্দায় দু'খানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সতী বিশ্বতোষের মুখোমুখি।

বিশ্বতোষ কাজের কথা পাড়ে। বলে, নরেন ভাদুড়ী মশাইয়ের সঙ্গে আমার কথা একরকম পাকাপাকিই হয়ে গেছে সতী যে, সত্যব্রতকে আমি কোম্পানীর ভেতরে ওয়াকিং পার্টনার করে নিচ্ছি।

বিশ্বতোষের কথায় একটু অবাক হয় সতী। বলে, ওয়ার্কিং পার্টনার করে নেবে, সত্যব্রতর ইনভেস্টমেন্ট-টা কি ?

: ইনভেষ্টমেণ্ট, নিশ্চয়ই থাকবে ইনভেষ্টমেণ্ট। বিজনেসে 'ক্যাপিটালটাই কি সব সময় বড় কথা ? সত্যব্রতর কর্ম্মক্ষমতার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। সেনকে আমার দরকার।

: সে তুমি বুঝবে। আমি বলছিলাম অন্য কথা।

: কি কথা ?

: বলছিলাম, টাকা-কড়ি, কোম্পানী, ইত্যাদি সবটাই তো বৈষয়িক ব্যাপার ? এর ভেতরে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা জড়ানো কি ঠিক হবে ? কথাটা মনে এলো বলেই খোলাখুলি বলছি তোমায়। কিছু মনে করো না।

: না না ঠিকই বলেছ। কিন্তু সম্পর্কহীন এক অজ্ঞাতকুলশীলকে ডেকেই বা আমি কোম্পানীতে নেব কোন ভরসায়? সেটা বলো আর দেখ সতী, ব্যবসায়ীর ছেলে আমি। আর কিছু বুঝি না বুঝি, ব্যবসাটা ঠিক-ই বুঝি। ভাদুড়ী যে ভাদুড়ী, তিনি পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করেন। সুতরাং চালে আমি কখনও ভুল করি না। অংশীদার না করে নিলে সত্যব্রতই বা খাটবে কেন কোম্পানীর জন্যে? আর চাকরী, সে তো ইচ্ছে করলে আর পাঁচটা জায়গায়ও চাকরী করতে পারে কিছু অর্থের বিনিময়ে। আমার কোম্পানীতে খাটতে যাবে কেন? তার স্বার্থটা দেখতে হবে না আমার? সুতরাং পদক্ষেপে কোন ত্রুটি বার করতে পারবে না তুমি। ঠিকই করেছি। এখন কাজের কথা হচ্ছে নরেন ভাদুড়ী মশাই কাল সন্ধ্যে কি পরশু সকালে কলকাতা আসছেন সমস্ত ব্যাপারটা ফয়শালা করতে। তার আগে সত্যব্রতর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার। জরুরী কতকগুলো আলোচনা আগেই সেরে ফেলতে চাই। কিন্তু সত্যব্রত তো দেখছি—ঘড়ি দেখে বলে বিশ্বতোষ, একটা বেজে গেল আর কখন ফিরবে বাড়ী? ফোনে পাওয়া যেতে পারে না?

: কোথায় আছে কি করে জানবো?

এক্ষুণি এসে পড়বে আর কি!

: এলেই ভাল। যা হোক স্কিমটা তোমায় কেমন লাগলো শুনি?

: ভালই তো।

বিশ্বতোষ সতীর দিকে তাকিয়ে বলে, খুব ভালো হবে। এইটাই আমি চেয়েছিলাম।

কথা না বলে শুধু চুপ করে বসে থাকলে সতীর চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে বিশ্বতোষের কখন। এই চোখ তখন আর আগেকার চোখ নয়। দৃষ্টিটাও কেমন যেন নিজেরই মনে হয় বিশ্বতোষের ধরা পড়ে যাবার মত রঙীন রঙীন। সতী হয়তো না বুঝেই চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু বিশ্বতোষ তখন ভাবে অনেক কথা;—কি হতে পারতো আর কি হয়ে গেল অবহেলে অনায়াসে চোখের ওপর। কাজের কথার মাঝে মাঝেই এই ছন্দপতন, তাও আবার কথায় নয়, নম্রনেত্রপাতে। সতী ঠিক খেই ধরতে পারে না। সরল ভাবেই প্রশ্ন করে, আমায় কিছু বলছিলে?

বলবারই কথা। আজ এই কথাটাই বলা যাবে না। কোম্পানী ছেড়ে ইমারত গড়া যাবে কথায়, সেটার ওপর কথা সাজিয়ে অশান্তর কোন কিছুও হয়তো সম্ভব করা যাবে কিন্তু সামান্য এই কথাটারই অর্থ করা যাবে না।

সতীর প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বতোষ চট করে তখন সত্যব্রতকে টেনে আনে কথাচ্ছলে। বলে, কি অমন ভাবছো? সামান্য দেরী করছে সত্যব্রত আর এমনি উন্মনা হয়ে গেলে?

: না না।

: আমি নিজের চোখে দেখলাম সতী তুমি না বলতে পারো না।

বিশ্বতোষের কথায় মনে মনে কিন্তু খুশী হয় সতী। সত্যব্রতর সম্পর্কে ঠিক এতটা সতর্কতাই আশা করে সতী বিশ্বতোষের কাছ থেকে। তবু কুহক ছড়াবার এমন একটা নেশা মুহূর্তের জন্যে পেয়ে বসে সতীকে। হোক মিথ্যে, তবু বেশ লাগে কুহকিনী হতে। মনের মুকুরে ছায়া ফেলে নারী হয় রহস্যময়ী। ঠোঁট টিপে হাসে

সতী দুর্জ্ঞেয়। যে হাসি দেখতে পাবে কিন্তু ধরতে-ছুঁতে পাবে না বিশ্বতোষ।

হাসছো যে ? প্রশ্ন করে বিশ্বতোষ।

নিজেরই মন। অথচ খেই হারিয়ে ফেলে সতীও। বুঝতে পারে না কেন হেসেছিল কখন কেমন। বলে, কৈ, না তো !

রহস্য সৃষ্টি করছে সতী। ছোট একটি আবর্ত্ত সৃষ্টি করেই হারিয়ে ফেলছে নিজেকে।

মাকড়সার জাল। ঊর্ণনাভের শঙ্কা নেই কোনো কিন্তু পতঙ্গের নিঃশঙ্ক হবার অবকাশ নেই এতটুকু। বিশ্বতোষ এগিয়ে যায় নিজেরই অজ্ঞাতে।

এমন কিন্তু ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে, প্রতিভাসে ব্যক্ত করা যায় নিজেকে। বিশ্বতোষও সতীর মতো করে হেসে বলে, তা হলে হাসনি ?

সতী কিন্তু হেসেই প্রতিবাদ করে বিশ্বতোষের কথায়। বা রে, কখন হাসলাম !

চপল হলেও দুটো কথা এখানে মানিয়ে যেতো বেশ। সতীও হয়তো কিছু মনে করতো না। কিন্তু বিশ্বতোষ চুপ করে থাকে একটা তন্ময়তার মুখোস টেনে।

নিষ্প্রাণ পতঙ্গে কৌতুক জমে না জানে। তাই সতী হয়ে ওঠে কৌতুকময়ী। কটাক্ষ করে বলে, কাঁদতে বারণ আছে জানি। হাসতেও মানা কর বিশ্বতোষ ?

: বুঝলাম না।

: বুঝতে না চাইলে আর বোঝাই কি করে !

: না না, হাসতে মানা করি মানে,—কথাটা ঠিক ঠিক বুঝলাম না।

: কেন ? সহজ কথা। কথায় বলছি, ধর কেউ যদি আমার সামনে দুঃখে পড়ে কাঁদে, আমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না সেটা। কারণ তার দুঃখ তখন আমাকেও বিব্রত করবে।

: অত্যন্ত স্বাভাবিক।

: কিন্তু তার হাসি ? হাসিটা কিন্তু আমাকে তেমনটি বিব্রত করবে না। বরং তার হাসি আমার খুশীর কারণ হবে। ঠিক না ?

: খুব গোলমেলে প্রশ্ন সতী !

: কেন, গোলমালটা কোথায় ?

: গোলমালটা হচ্ছে এই যে, ধর যদি সে কান্নাটা চেপে রেখে তার বদলে শুধু হাসে, তবে সে হাসি তো তার কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক হতে বাধ্য সতী। কান্না যদি বা সহ্য করা যেতে পারে, তার হাসি অসহ্য।

: সত্যি বলছো ?

সতীর কথায় কোথায় যেন একটা দাহ আছে। ঠিক বুঝতে পারে না বিশ্বতোষ।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যেন একটা সাপ বেরিয়ে পড়েছে চোখের সামনে। ধরা পড়বার আগে চতুর একটা কুণ্ঠায় অস্বস্তি বোধ করে সতী। আমতা-আমতা করে বলে, না না, এ তুমি কি একটা বললে বিশ্বতোষ ! তা-ও কি কখন হয় ?

কথা চাপতে গিয়ে আরও বিব্রতবোধ করে সতী। বিশ্বতোষ স্পষ্ট বুঝতে পারে, কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথায় অতর্কিতে হাত দিয়ে ফেলেছে সে।

উঠে যাচ্ছিল। হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয় বিশ্বতোষ। অনুনয় করে বলে, আপত্তি থাকলে নিশ্চয়ই অনুরোধ করবো না। কিন্তু এখানে আমি যে দাবীতে আসি-যাই,—বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক···অবিশ্যি জানি না তুমি তার কতটা স্বীকার কর—

: কি আশ্চর্য্য বিশ্বতোষ, এ বিষয়ে কেন প্রশ্ন তুলছ ?

: কিন্তু প্রশ্ন না থাকলে এত কুণ্ঠারই বা অবকাশ কোথায় সতী ? তুমি আমায় বল কি হয়েছে।

: কি আবার হবে ? ও কিছু নয়।

: তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো। ভালো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সতী মুখ নামিয়ে। বিশ্বতোষ কিন্তু তখনও উত্তরের অপেক্ষা করে আছে সতীর মুখ চেয়ে। দু' দু'বার চেষ্টা করেও মুখ তুলতে পারে না। তিনবারের পর লজ্জা ভেঙ্গে বলে, কি জানো, এখন দেখছি অনেক কথাই জানতাম না বিশ্বতোষ। সেই ভালবাসলাম, বিয়েও করলাম কিন্তু সুখ-শান্তি যে কি জিনিষ, তা নিজেও জানলাম না, পরকেও দিতে পারলাম না। এক এক সময় মনে হয়, সত্যব্রত আমাকে বিয়ে করেই ভুল করেছে। ও যা হতে পারতো আর করতে পারতো—আমি নিজে তো কোন কাজেই লাগছি না ওর। কোন সাহায্যই করতে পারছি না।

: কি, তুমি কি করতে চাও আর করতে পার, সেটা তো বুঝতে হবে। বললেই তো আর হলো না···

: দ্যাখ বিশ্বতোষ, এক একটা মানুষ, এক এক প্রকৃতির। আমি যা তা তুমি নও। তুমি যা তা আমি নই। প্রকৃতিই বলো আর স্বভাবই বলো, ও চট করে বদলায় না। আমি যখন সত্যব্রতকে বিয়ে করেছিলাম তখন, শুধু তখন কেন, এখনও,—আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন চাহিদা ছিল না সত্যব্রতর কাছে। যেটা ছিল সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রত্যেক মেয়েই তার স্বামীর কাছে সেটা আশা করে। বাড়তি কিছু না। কিন্তু সত্যব্রতকে দেখেছি, অপেক্ষা করে। আমার মুখ চেয়ে কেন যেন নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে। অথচ আমি তার এ বিশ্বাসের শতাংশের একাংশও পূরণ করতে পারছি না। জবাবদিহি অবিশ্যি সে কোনদিনই করে না। কিন্তু বিশ্বতোষ, তুমি হয়তো বুঝতে পারবে, নিজের কাছে আমি তো জবাবদিহি হয়ে আছি।

বিশ্বতোষ হাসে রহস্য করে। বলে, গোটাটাই চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার। কঠিন অনুরাগের কথা। আমি কি বলবো !···

বিশ্বতোষের কথায় রাগ করে সতী। বলে, তুমি হাসছো বটে কাব্য করে কিন্তু সত্যি সত্যি জীবনে কি অত কাব্য আছে বিশ্বতোষ ?

সত্যব্রতকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি নেহাৎ থাকতে দিয়েছো তাই, নইলে সাড়ে পাঁচ শ' টাকার ফ্ল্যাটবাড়ীতে থাকবার তোমার কোন দরকার নেই ! পার্টি, লাঞ্চ আর ডিনার দিতে হয় কোম্পানী দেখে। মাঝখান থেকে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া আমার সামান্য টাকাটা নয়-ছয় করে খরচ করবার তোমার কোন দরকার ছিল না। তুমি তাও খরচ করে ফেললে।

নেহাৎই পারিবারিক কথা। জীবনযাত্রায় খটকা লেগেছে, তাই সত্যব্রতর নামে নালিশ করছে সতী বিশ্বতোষকে বন্ধু মনে করে। সতীর কথা শুনে হাসি পায় বিশ্বতোষের। বলে, আহা কোম্পানীর

খাতে যে টাকাটা তুমি বলছো নয়-ছয় করে খরচ করেছে সত্যব্রত, সে টাকার দায়িত্ব তো কোম্পানীই নেবে। তুমি কেন দিতে যাবে সে টাকা? সুতরাং টাকার ব্যাপারে সত্যব্রতর বিরুদ্ধে তোমার কোন চার্জই থাকতে পারে না সতী! আর বাড়ীওলা যদি ভাড়াটের কাছ থেকে টাকা না নেয়, তো তার দায়িত্ব সত্যব্রতর হতে পারে না। সুতরাং এ চার্জও তোমার বরবাদ হয়ে গেল। আর কি নালিশ আছে বলো?

বন্ধুপ্রীতির এইটুকু প্রতিশ্রুতিই আপাতত সতীর কাছে যথেষ্ট মনে হয়। হেসে বলে, এ তোমার পক্ষপাতিত্বের কথা। এমন জানলে আমি নালিশই করতাম না।

: বাঃ, নইলে ফয়সালা করবো কি করে? কথায়-কথায় সময় কেটে যায়। অন্তরঙ্গ কথাবার্ত্তার ফলে আপাত লাভ হয় দুজনেরই। এ ওর আলো চুরি করে পরস্পরকে দেখতে চেষ্টা করে।

এখন কি করে কি করতে হবে, তার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় বিশ্বতোষের কাছে। পাহাড়ের মায়া, অতি কাছে মনে হলেও পাহাড় এখনও অনেক দূরে। উঠে পড়ে বিশ্বতোষ। সতীর পিঠে মৃদু করাঘাত করে বলে, সত্যব্রত নিশ্চয়ই আজ জাঁদরেল কোন মক্কেল পাকড়েছে, তাই দেরী করছে ফিরতে। আজ আর দেখা হলো না।

সতীও এগিয়ে যায় সঙ্গে। মিষ্টি হেসে বলে, কোথায় যাবে?

: এখনও একটা আস্তানা যখন রয়েছে, যাব বাড়ীই যাব। ভাল কি আর লাগে! এত দিন তবু বাবা ছিলেন। আকর্ষণ ছিল একটা। এখন গিয়ে দেখবো, অত বড় বাড়ী, একেবারে খাঁ-খাঁ করছে চারদিক।

: আর তার ভেতরে একা-একা। আমি হলে একটি দিনও থাকতে পারতাম না।

: তুমি একটি দিনও থাকতে পারতে না, কিন্তু আমার বেলা তো কোন আপত্তি করছো না?

বিব্রত বোধ করে সতী। অপ্রস্তুত হেসে বলে, আপত্তি করলে তুমি শুনবে?

বিশ্বতোষও পরিহাস করে বলে, আপত্তি আন্তরিক হলে নিশ্চয়ই শুনতাম। কিন্তু তুমি তো দেখছি তার আগে থেকেই বলে দিচ্ছ—আপত্তি করলেও শুনো না তুমি। তাই না?

গালে হাত দিয়ে অবাক মানে সতী। বলে, ও মা, কি খারাপ লোক! আমি বুঝি তাই বললাম!

মধুর হেসে বিদায় জানায় সতী বিশ্বতোষকে হাত নেড়ে, আর বলে যে সত্যব্রত ফিরে এলেই সে সব ঘটনাগুলো হুবহু রিপোর্ট করবে।

বিশ্বতোষ চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সতী। সত্যিই অনেকগুলো কথা, যা নাকি এমনিতে সে কোন দিনই বলতে পারতো না, কথায় কথায় বলে ফেলেছে আজ। সত্যব্রত শুনলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে তার ওপর। কেন না, সতীকে দিয়ে সে এই কথাগুলোই বিশ্বতোষকে জানাতে পরোক্ষে চাপ দিচ্ছিল এত দিন। আজ একটি নিভৃত অন্তরঙ্গ মুহূর্তের চূড়ান্ত সুযোগ নিয়েছে সে।

সমস্ত কথাটা ভেবে প্রথমটা বেশ একটা সোয়াস্তি 'এলো' মনে সতীর। কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ একটা অভিমান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মনের গভীরে। ক্ষোভ আসে এই কথা ভেবে, যে এই ধরণের কোন কথা সে একমাত্র সত্যব্রতকেই বলতে পারে। সত্যব্রতর অনুরোধে সেই সব কথাগুলো সতীকে যে আজ আর কারো কাছে বলতে হবে, তা সে ভাবতেও পারে নি কোন দিন।

সতীর হঠাৎ মনে হলো, সে যেন আজ এতে করে অত্যন্ত ছোট হয়ে গেল। অকিঞ্চিৎকর হয়ে কুটোগাছটার মতই তলিয়ে গেল খর্ব্ব হয়ে।

১৭

হেড অফিস ক্লাইব বিল্ডিং। হালফ্যাসানের কায়দা-দুরস্ত অফিস। রিসেপসনিষ্ট টাইপিষ্ট মেমসাহেব। চোগাচাপকান আঁটা উর্দ্দিপরা চাকর-বেয়ারা হুজুরে হাজির।

পর পর দুখানা হলঘর পেরিয়ে বিশ্বতোষ আর সত্যব্রতর বসবার ঘর। এত কাছে তবু দুজনে কথাবার্ত্তা যা হয় টেলিফোনে। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যখন ন'টা তখন রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রাত্যহিক শুভ সম্ভাষণটা সেরে নেয় বিশ্বতোষ। বিশ্বতোষই টেলিফোন করে। সত্যব্রত ঠিক টাইমে হাজির হয়ে অপেক্ষা করে সেই টেলিফোনের। এইটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে।

নরেন ভাদুড়ীর পুরোনো অফিস নতুন করে ঢেলে এমনিতরো অনেকগুলো রেওয়াজ ইতিমধ্যেই চালু করেছে বিশ্বতোষ। আইন ভাঙলে চাকরী যাবে। কিন্তু রেওয়াজের বেচাল হলে অফিস হাসবে। দুটোই গর্হিত।

সতীর মারফতে সত্যব্রত যা যা আশা করেছিল, সব কিছুই মঞ্জুর করেছে বিশ্বতোষ। চোদ্দ শ' টাকা মাইনে বাদেও বাড়ী গাড়ী বাবদ আরও ছ শ' টাকা বাড়তি য়্যালাউন্স পাবে সত্যব্রত। বিশ্বতোষের থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বতন্ত্র বাসস্থানের স্বপ্নও সার্থক হয়েছে সতীর এত দিনে।

কোম্পানীর অংশীদার হয়ে মাস-মাইনে নিলে আইনের ফ্যাকড়া উঠে পড়ে। তাই বোর্ড অব ডিরেক্টরস মহলে সাব্যস্ত হয়েছে যে মাইনে বাবদ সত্যব্রত যে টাকাটা নেবে, সেটা তার শেয়ারের টাকা থেকে ছাঁটকাট হয়ে ডিভিডেন্ট খাতে জমা হয়ে যাবে।

নরেন ভাদুড়ী প্রথমে এ বিষয়ে একটা আপত্তি তুলেছিলেন। পরে বিশ্বতোষের তদ্বিরে আইনগত ব্যাপারে ছোট একটা কিন্তু রেখে নিমরাজী হয়ে মতামত দিয়েছেন। মিটিংএ বিশ্বতোষ জোর দিয়েই বলে, সত্যব্রতকে তার দরকার। সত্যব্রতর পারিবারিক খানদান

আর অভিজ্ঞতা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতিতে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হবে। বিশেষ করে অন্নদা রায়ের কোম্পানীর সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে চলতে হলে অন্নদা রায়ের জামাইকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাবার দরকার আছে।

বিশ্বতোষের কথায় শক্তির চাইতে আন্তরিকতাটাই বেশী প্রকাশ হয়। নরেন ভাদুড়ী আর খুব একটা আপত্তি করেন না। বলেন, বেশ, যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু ম্যানেজার হিসেবে মাইনে নেবেন সত্যব্রত, সেই টাকার কিন্তু সামঞ্জস্য হলো না। অর্থাৎ দাঁড়াল এই যে কোম্পানীর লাভ হলেই ঐ টাকাটা সামঞ্জস্য করা সম্ভব হবে। নইলে 'এডজাষ্ট'ই করা যাবে না। কিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবে?

পাকা লোক নরেন ভাদুড়ী। কথা বলে আটঘাট বেঁধে। বিশ্বতোষকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেন, যা হোক ব্যাপারটা তোমার মাথায় থাকলেই হলো। আমি এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছুই বলতে চাই না। সত্যব্রতকে সামনাসামনি সালিশী মেনে বলেন, এখানে কিন্তু দেখুন ভাই আমি রেখে ঢেকে কোন কথা বলবো না। কেন না, ব্যাপারটির গুরুত্ব যেমনি আপনার তেমনি আমার,—কোম্পানীর ব্যাপার।

সত্যব্রত নরেন ভাদুড়ীর কথায় সম্পূর্ণ একমত হয়েই সায় দেয় নিশ্চয়। অনিশ্চিত একটা অবস্থার ভেতরে নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী যশোমতী টাকাটা লোন হিসেবে দেবার একটা প্রস্তাব আনেন।

টেবিল চাপড়ে সায় দেন নরেন ভাদুড়ী। বলেন, এটা হতে পারে। কিন্তু লোন কথাটায় সত্যব্রত প্রত্যক্ষ আপত্তি করে। কথাটা বিশ্বতোষেরও ভাল লাগে না। তার হিসেব নিকেস সাব্যস্ত হয় অন্য খাতে, ভিন্নভাবে। সে ভাবে, বাধ্যবাধকতার দড়িটা এক্ষেত্রে তার হাতে এত ছোট হয়ে যাচ্ছে যে, সে ঠিক বাঁধতে পারবে না সতীকে। যশোমতীর কথায় সে-ও আপত্তি করে। শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হয়, দু' শ টাকা করে ছ' জন ডিরেক্টর তাদের মাসিক এলাউন্স-এর টাকা সত্যব্রতর খাতিরে আগামী পাঁচ বছরের ভেতরে নেবেন না। ষোল শ' টাকার মধ্যে বার শ' টাকা এই ভাবে উশুল হয়ে গেলে বক্রী আট শ' টাকার দায়ভার নেবে বিশ্বতোষ নিজে। নরেন ভাদুড়ী যুক্তি দিয়ে সত্যব্রতকে বলেন, দেখুন ভাই, কিন্তু কিছু মনে করবেন না। জানবেন, এর দ্বারা আমি আপনাদের কোম্পানীর উপকারই করলুম। কেন কি, ম্যানেজার হিসেবে এই সব কাজ-কারবার টাকা কড়ির কৈফিয়ৎ আপনাকেই দিতে হবে একদিন। প্রশ্ন উঠলে গবর্ণমেণ্টের ঘরে আপনাকেই সমস্ত টাকার হিসেব দাখিল করতে হবে। সুতরাং এই ব্যবস্থাই সব দিক দিয়ে সুপ্রশস্ত হলো। কেন মিছে ঝামেলার ভেতরে যাবেন?

সত্যব্রত নরেন ভাদুড়ীর যুক্তি বোঝে। রাজী হয়ে যায় নতুন প্রস্তাবে।

বিশ্বতোষ খতিয়ে দেখে, এখন যে দড়িটা হাতে এলো তার দৈর্ঘ দূর থেকে সতীর বালায় জড়াবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও প্রয়োজনে তা তেমন শক্ত না-ও হতে পারে। এ যেন বর্ত্তাল শেষটায় এসে নিছক একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতায়। সে বাধ্যবাধকতার দাম কি? এ রজ্জুতে সত্যব্রতর কোন দিনই সর্পভ্রম হবে না। সতীও ভয় পাবে না।

ভয় না পেয়ে ভরসা কোথায় বিশ্বতোষের? কিন্তু এখন আর এ সব কথা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। নরেন ভাদুড়ী ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সংসারে সব কিছুর দাম তিনি সব সময় আর্থিক মূল্যে নিরূপণ করে থাকেন। ঘুণাক্ষরেও এ কথা যদি প্রকাশ পায় যে তাঁর ব্যবসা নিয়ে বিশ্বতোষ শেষবারের মত ফাটকা খেলতে নেমেছে, তা হলে সমস্ত সম্পর্ক তিনি এখনই ছিন্ন করে চলে যাবেন। কোন দিন আর মুখদর্শন করবেন না বিশ্বতোষের। অতএব সব কিছুর সমাধান এখনই যদি নাই হয়, অপেক্ষা করে থাকতে হবে বিশ্বতোষকে। পরেই জড়াবে, পাকে পাকে জড়াবে।

নরেন ভাদুড়ী রেগে গেলে কি রকম সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন, সে কথা মনে করে ডিরেক্টরস বোর্ডের মিটিং-এ বসেই বিশ্বতোষ হো-হো করে হেসে ওঠে।

নরেন ভাদুড়ী প্রস্তাবটির সমর্থনের অপেক্ষায় বসে ছিলেন বিশ্বতোষের মুখ চেয়ে। বলেন, কি হাসছো যে? প্রস্তাবটি তোমার মনঃপুত হলো না বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে সমঝে যায় বিশ্বতোষ। ভয় পাবার অবশ্য কোনই কারণ ঘটে না। বিশ্বতোষ হাসতে হাসতেই বলে, সামান্য একটা ব্যাপার, অথচ আইনগত এত ফ্যাকড়া আর বাধা…

একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্বতোষের এই ধরণের হালকা মনোভাবের কোন মানে খুঁজে পান না নরেন ভাদুড়ী। বলেন, না না, সামান্য ব্যাপার তুমি কা'কে বলছিলে? তুমি তো না জেনে না শুনে ফাঁসাচ্ছিলে ভদ্রলোককে আমি বলবো। কোম্পানীর ডিরেক্টর ম্যানেজার হতে পারেন। অথচ তিনি মাইনেও নিচ্ছেন, ডিভিডেণ্টও খাচ্ছেন—এটা ঠিক উচিত হবে না। সত্যব্রতকে লক্ষ্য করে বলেন, কিছু না, ওঁর-ই একটু মুস্কিল হতো আর কি! উনি কি কৈফিয়ৎ দিতেন? সুতরাং কাজ করবে দশ দিক বেঁধে, আটঘাট বাঁচিয়ে। নাও সই কর।

হাসতে হাসতে নিজের নাম সই করে দেয় বিশ্বতোষ।

রিজেণ্ট পার্কের নতুন বাড়ীতে সে দিন অনেক রাত অবধি ফুর্ত্তি হয় তিন জনে। হুইস্কি খেয়ে সত্যব্রত লনে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে গান গায় একা একা। আর ঘরে বিশ্বতোষকে সতী বাজিয়ে শোনায় পিয়ানো। ঝঞ্ঝা আর করকাপাত ঠাসা থাকে সে সিমফনিটাতে।

[ক্রমশঃ]

In the nightmare of the dark
All the dogs of Europe bark
And the living nations wait,
Each sequestered in its hate.

—*W. H. Auden.*

অতিথি

আলব্যার্ কাম্যু

বিত্তালয়ের শিক্ষক দেখতে পেল, দু'জন লোক তার দিকে ওপরে উঠে আসছে। এক জন ঘোড়ায় চড়ে, আরেক জন পায়ে হেঁটে। যে উঁচু পথটা পাহাড়ের গায়ে তৈরী স্কুলের দিকে চলে গিয়েছে, সে-পথ তারা এখনও ধরেনি। বিস্তীর্ণ, উঁচু, মরু-মালভূমির ওপর দিয়ে, পাথর আর বরফের ভেতর দিয়ে খুব কষ্ট ক'রে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঘোড়াটা হোঁচট খাচ্ছিল—ক্রমশঃ ঘোড়াটাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না বটে কিন্তু তার নাসারন্ধ্র-নিঃসৃত বাষ্পরাশি স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছিল। তাদের ভেতর এক জন অন্তত দেশটাকে জানে। যে পথটা কয়েক দিন ধরে সাদা, নোংরা আবরণের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সেই পথ তারা অনুসরণ করছিল। শিক্ষক হিসেব করে দেখল যে, আধ ঘণ্টার আগে তারা পাহাড়ে এসে পৌছবে না। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পুল-ওভারটা খুঁজতে সে স্কুলের ভেতর ঢুকে গেল।

বিত্তালয়ের শূন্য হিমকক্ষটা অতিক্রম করে যায়···ঘরটিতে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর চার রঙের খড়ি দিয়ে আঁকা ফরাসী দেশের চারটি নদী সাগরের দিকে ব'য়ে চলেছে আজ তিন দিন ধরে। অক্টোবরের মাঝামাঝিতে প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছে। আট মাস অনাবৃষ্টি এবং রুক্ষতার পর বৃষ্টি হয়েও আবহাওয়ার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। মালভূমির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রাম থেকে যে কুড়ি জন ছাত্র পড়তে আসে স্কুলে, তারাও আসতে পারছে না। ভাল আবহাওয়ার জন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়। স্কুল-ঘরের সংলগ্ন আরেকটা ঘরে দাক্র্য থাকে। কেবল এই ঘরটাকেই সে গরম করে রাখে। ঘরের সামনে থেকে মালভূমির পূর্বদিকটা দেখা যায়। ঘরের একটা জানলা পশ্চিম দিকে খোলা। যে জায়গা থেকে মালভূমিটা ক্রমশঃ নীচু হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে, সেই জায়গাটা স্কুলের পশ্চিম দিক থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে অদূরে বেগুনী রঙের পর্ব্বতমালাকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেই রয়েছে মরুভূমির প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত।

শরীরটাকে একটু গরম করে যে জানলা দিয়ে দাক্র্য প্রথম দু'জন মানুষকে দেখতে পেয়েছিল, সেখানে ফিরে এল। তাদের আর দেখতে পাওয়া গেল না। ওরা নিশ্চয়ই পাহাড়ে ওঠবার পথ ধরেছে। মেঘ ছেয়ে ফেলেছে আকাশকে। দিনের আলোর ভেতর তীব্রতা নেই একটুও। বেলা দু'টোর সময় মনে হচ্ছে যেন দিনের শুরু হয়েছে। এ অবস্থা বরং ভাল কিন্তু তিন দিন ধরে যে রকম পুরু বরফ পড়ছিল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর আর দমকা হাওয়া যে রকম ভাবে স্কুল-ঘরের ডবল-দরজাকে ধাক্কা দিচ্ছিল তা অসহনীয়। দাক্র্য তার ঘর থেকে বের হত না, শুধু ছোট্ট একচালা ঘরটাতে যেত মুরগীগুলোকে দেখতে আর কয়লা আনতে। সুখের বিষয়, উত্তরদিকের সবচেয়ে কাছের গ্রাম থেকে তাজিজের লরীটা এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দু'দিন আগেই রসদ পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। গাড়ীটা আবার আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসবে। দাক্র্যর ঘরের ভেতর যে গমের বস্তাগুলো পড়েছিল, সেগুলো দিয়ে বসবার ব্যবস্থাও করা যায়। ছাত্রদের ভেতর যে পরিবার উক্ত আবহাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ভেতর গমের বস্তাগুলি বিতরণ করবার জন্ত শাসনকর্ত্তারা পাঠিয়েছেন। বলতে গেলে প্রত্যেক পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ তারা সবাই খুব গরীব। দাক্র্য রোজ ছোটদের ভেতর তাদের বরাদ্দ খাত্ত ইত্যাদি বিতরণ করত। কারণ সে জানত যে এই দুর্দ্দিনে তাদের বড্ড অভাব। এক বছরের খাত্ত-শস্ত জমিয়ে রাখতে হত। ফরাসী দেশ থেকে গম নিয়ে জাহাজ এসেছে। সবচেয়ে দুর্দ্দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এই দুর্দ্দশা ভোলবার নয়। মাসের পর মাস এই বিস্তীর্ণ মালভূমি রৌদ্রদগ্ধ হয়েছে—মাটি একটু একটু ক'রে কুঁকড়ে গিয়েছে। প্রতিটি পাথর পায়ের তলায় ধূলোর মত গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে—হাজার হাজার মেষ মারা পড়েছে···কয়েক জন মানুষও এখানে সেখানে সকলের অজ্ঞাতসারে মারা গিয়েছে।

এই দুঃখ-দুর্দ্দশার ভেতরে দাক্র্য ধর্ম্মযাজকের মত বাস করত তার হারিয়ে-যাওয়া বিত্তায়তনে। অল্পেই সে খুসী। তার ঘরের দেয়ালগুলো মসৃণ নয়, বসবার সোফাটা সঙ্কীর্ণ। সাদা কাঠের একটি টেবিল রয়েছে—নিজস্ব কুয়ো এবং সাপ্তাহিক খাত্ত ও পানীয় আসত তার জন্ত। কঠোর জীবনযাত্রার ভেতরেও এই সব নিয়ে নিজেকে সে রাজা-মহারাজার মত মনে করত। কিন্তু অতর্কিতে শুরু হল তুষারপাত আর বিরামহীন বর্ষণ। এই দেশে বাস করা কঠিন ব্যাপার। দাক্র্য কিন্তু বাইরের জগতে বাস করাকে অনুভব করে নির্ব্বাসিতের মত থাকা—কারণ সে জন্মেছেই এই দেশে।

শিক্ষক স্কুলের সামনে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। দু'জন লোককে দেখা গেল পাহাড়ের অর্দ্ধেকটা উঠেছে। অশ্বারোহীকে সে অনেক দিন থেকেই চেনে—পুলিশ বালদুচ্চি। এখন তার বয়স হয়েছে। বালদুচ্চি একজন আরবদেশের লোককে বেঁধে নিয়ে আসছিল। দড়ির এক প্রান্ত তার হাতে আর অপর প্রান্ত দিয়ে বাঁধা হয়েছে বন্দীকে। বালদুচ্চি এগিয়ে চলেছে আর বন্দী-আরব তাকে অনুসরণ করছে। তার হাত দুটো বাঁধা আর মাথাটা নীচের দিকে।

পুলিশ দারুকে অভিবাদন করলে সে কোন জবাব দিল না। নিরিবিলিমনে দেখছে দারু বন্দী-আরবকে। গায়ে আলখাল্লা, পায়ে ফিতে-দেয়া স্লীপার পায়ের সঙ্গে বাঁধা। পুরু উলের মোজায় পা-টা ঢাকা। মাথায় কাপড়ের ছোট টুপী। তারা এগিয়ে আসছে। বালদুচ্চি সাবধানে ঘোড়াটাকে চালাচ্ছিল যাতে বন্দী আঘাত না পায়। কাছে এলে সে চেঁচিয়ে বলল—"এল্ আম্যার থেকে এখানে, এই তিন কিলোমিটার পথ আসতে এক ঘণ্টা লাগল।" দারু কোন জবাব দিল না। খর্ব্বাকৃতি স্বাস্থ্যবান সে। পুরু পুল-ওভার গায়ে দিয়ে ওদের পর্ব্বতারোহণ দেখতে থাকে। বন্দী-আরব একবারও মাথা তুলে চায়নি। তারা কাছে এসে পাহাড়ের সমতল ভূমিতে নামলে দারু তাদের অভিবাদন করে বলল—"ভেতরে এসে শরীরটাকে গরম করে নাও।" বালদুচ্চি দড়িটা হাতে নিয়েই অতিকষ্টে ঘোড়া থেকে নামল। শিক্ষকের দিকে তাকাল···তার খোঁচা-খোঁচা গোঁফের ভেতর দিয়ে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কালো কপালের নীচে ছোট ছোট চোখ দুটিও গভীর ও কালো। মুখের চারিদিকে বার্দ্ধক্যের রেখা। দারু লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে একচালা ঘরে নিয়ে গেল। অতিথিরা স্কুলের ভেতর তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই সে ফিরে এল। দারু ওদের তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। "স্কুলে যে-ঘরটাতে ক্লাশ হয় আমি সেটা গরম করছি। সেখানে আমাদের বেশ আরাম হবে"—বলল দারু। যখন আবার সে তার ঘরে ফিরে এল, দেখতে পেল বালদুচ্চি কৌচের ওপর বসে রয়েছে। যে দড়িটা দিয়ে আরবদেশী মানুষটিকে বাঁধা হয়েছিল সেটা সে খুলে দিয়েছে। বন্দী উনুনের কাছে উবু হয়ে বসে রয়েছে। হাত দুটো কিন্তু বাঁধা রয়েছে। টুপীটা সে একটু পেছনে সরিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টি তার জানলার দিকে। দারু শুধু তার নিগ্রোদের মত প্রকাণ্ড ও মসৃণ ঠোঁট দুটোই দেখতে পেল। নাকটা কিন্তু সোজা। চোখে উত্তেজনার ভাব। টুপীটা পেছনে সরিয়ে দেওয়াতে অপ্রশস্ত কপালটা দেখা যাচ্ছে। শরীরের চামড়া পুড়ে গিয়েছে এবং ঠাণ্ডাতেও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে একটু। সে যখন মুখ ফেরাল তখন দারু লক্ষ্য করল যে তার মুখে কেমন একটা অস্বস্তি আর বিদ্রোহের ভাব।

"এই পাশ দিয়ে চলে যাও। আমি তোমাদের জন্য পুদিনা-পাতা দিয়ে চা তৈরী করে নিয়ে আসছি।" বলল দারু।

"ধন্যবাদ। শুধু শুধু আবার পরিশ্রম।" বালদুচ্চি বলল। বন্দীকে উদ্দেশ্য করে আরবী ভাষায় সে আবার বলল—"তুমিও এস।"

বন্দী আস্তে আস্তে উঠল। বাঁধা হাত দুটো সামনে রেখে স্কুলের ভেতর গেল।

চায়ের সঙ্গে দারু একটা চেয়ারও নিয়ে এল। বালদুচ্চি ছাত্রদের প্রথম বেঞ্চির উপরেই বসে পড়েছে। বন্দী-আরব প্লাটফর্মে হেলান দিয়ে শিক্ষকের টেবিল আর জানালার মাঝখানে অবস্থিত উনুনের দিকে মুখ করে বসেছে। চায়ের গেলাসটা এগিয়ে দিতে গিয়ে বন্দীর বাঁধা হাত দুটো দেখে দারু একটু ইতস্তত করে বলল—"এখন বোধ হয় বাঁধনটা খুলে দেওয়া যেতে পারে।"

"নিশ্চয়ই, ওটার দরকার শুধু রাস্তায় চলবার সময়।" বালদুচ্চি [illegible]

মেঝেতে চায়ের গেলাসটা রেখে দারু বন্দীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁধন খুলতে লাগল। বন্দী-আরব নীরবে দেখতে থাকে। বন্ধনমুক্ত হয়ে ফোলা হাত দুটো রগড়ে চায়ের গেলাসটা নেয়··· তাড়াতাড়ি ঢোকের পর ঢোক গিলতে থাকে গরম পানীয়টা।

"বেশ, কিন্তু তোমরা এ-রকম ভাবে কোথায় চলেছ?" জিজ্ঞেস করে দারু।

"এখানেই।" চায়ের ওপর থেকে গোঁফটা একটু সরিয়ে জবাব দেয় বালদুচ্চি।

"তোমরা কি এখানেই শোবে?"

"না। আমি এল্ আম্যার-এ ফিরে যাচ্ছি আর তুমি এই সঙ্গীটিকে ত্যাঁগীতে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সেখানে তার জন্য লোকেরা অপেক্ষা করছে।" বালদুচ্চি দারুর দিকে তাকিয়ে হাসে···হাসিতে বন্ধুত্বের প্রীতির ভাব ফুটে ওঠে।

"কি বলছ তুমি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

"না বাবা। এই ত হুকুম।"

"হুকুম? আমি···" দারু ইতস্ততঃ করে···বুড়োকে আঘাত করতে চায় না সে।···শেষে বলে—"এসব তো আমার কাজ নয়।"

"তার মানে? যুদ্ধের সময় লোকে সব কাজই করে।"

"তাহলে আমি যুদ্ধ-ঘোষণা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব।"

বালদুচ্চি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"বেশ। আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে আর তুমিও এতে জড়িত।

লোকেরা আসন্ন বিদ্রোহের কথা বলাবলি করছে। এক অর্থে, আমরাও সব প্রস্তুত।"

অর্থহীন ভাবে তাকিয়ে থাকে দাক্স।

"শোন বাবা। আমি তোমায় ভালবাসি, ব্যাপারটা তোমায় বুঝতে হবে।" বলতে থাকে বালচুন্তি, "আমরা বিশ জন লোক এল আম্যার-এ—সেখানে আমাদের অনেক জল খোঁজা করতে হবে আর সেই জন্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, এই জেব্রাকে তোমার হেপাজতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে। ওকে সেখানে রাখা যায় না। গ্রামের লোকেরা ক্ষেপে গিয়েছে—তারা ওকে ধরতে চায়। কাল-এর ভেতরেই তুমি লোকটিকে ট্যাগী-তে নিয়ে যাবে। ট্যাগী বিশ কিলোমিটারও দূর হবে না, আর তোমার মত পালোয়ানের ভয়ের কিছু নেই। তার পরে তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তুমি তোমার ছাত্রদের নিয়ে আবার সুখের জীবন ফিরে পাবে।

দেয়ালের পেছনে ঘোড়ার ডাক এবং খুরের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দাক্স জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে। বেলা অনেক হয়েছে। তুষারসমাচ্ছন্ন মালভূমির ওপর সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। যখন সমস্ত বরফ গ'লে যাবে তখন আবার সূর্য্যের তাপে এই কঙ্করময় পার্ব্বত্য অংশটি দগ্ধ হবে। দিনের পর দিন আকাশ থেকে এই নির্জন বিস্তীর্ণ এলাকায় অগ্নিবর্ষণ শুরু হবে—মনে হবে না কখনও কোনও মানুষ এখানে বাস করে।

"কি করেছে ও?" বালচুন্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে দাক্স। বালচুন্তি মুখ খোলবার আগেই আবার সে প্রশ্ন করে—"ও কি ফরাসী বলতে পারে?"

"একটা শব্দও না। এক মাস ধরে ওকে খোঁজা হচ্ছে। কয়েকজন লোক ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। পিসতুত ভাইকে খুন করেছে সে।"

"ও কি আমাদের বিরুদ্ধে?"

"আমার মনে হয় না। তবে কিছুই জানা যায়নি।"

"কেন সে খুন করল?"

"আমার মনে হয় পারিবারিক কোন কারণে। একজন আরেক জনের কাছে কিছু ধান ধার করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। মোট কথা দা' দিয়ে ভাইকে ও ভেড়ার মত এমনি ক'রে কেটেছে—জিক্।" বালচুন্তি নিজের গলাটা কাটবার ভঙ্গীতে দেখায়। বন্দী-লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছিল তাদের। হঠাৎ ভীষণ রাগ হল দাক্সর এই লোকটির ওপর এবং শুধু এই লোকটিই নয় যারা শয়তান, প্রচণ্ড ঘৃণা যাদের ভেতর, তাদের মূর্খতার জন্য দাক্সর তাদের ওপরেও রাগ হল।

উনুনের ওপর একটা পাত্রে চা গরম করা হচ্ছিল। দাক্স আবার বালচুন্তিকে খানিকটা চা ঢেলে দিল। একটু ইতস্তত করে বন্দী আরবকেও চা দিল। সে মহাউৎসাহে দ্বিতীয় বার চা খেতে থাকে। চা খাবার জন্য হাত দুটো ওপরে তুললে দাক্স বন্দীর কৃশ কিন্তু পেশীবহুল বুকটা দেখতে পেল তার আলখাল্লার ভেতর দিয়ে।

"ধন্যবাদ, এবার আমি পালাই।" বালচুন্তি বলল। সে উঠে পকেট থেকে একটা দড়ি বের করে বন্দীর দিকে এগিয়ে গেল।

"কি করছ তুমি?" অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করে দাক্স।

[illegible]

"ও-সবের দরকার নেই।"

বুড়ো পুলিশ ইতস্তত করে বলে—"তোমার যা খুশী। অস্ত্র-শস্ত্র আছে ত তোমার কাছে?"

"শিকারের বন্দুক আছে আমার কাছে।"

"কোথায়?"

"ট্রাঙ্কের ভেতর।"

"ওটা তোমার বিছানার কাছে রাখা উচিত।"

"কেন? আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই।"

"তুমি একটা পাগলা। যদি ওরা তেড়ে আসে? আমরা কেউই নিরাপদ আশ্রয়ে নেই।"

"আমি নিজেকে রক্ষা করব। ওদের আসতে দেখলেও খানিকটা সময় পাব।"

বালচুন্তি হাসতে থাকে। শাদা গোঁফে ঢাকা পড়ে যায় ততোধিক শাদা দাঁতগুলো। বলে সে—"তুমি সময় পাবে! তাই ত বলছিলাম যে, বরাবর দেখেছি তুমি একটা পাগলা। তাই জন্যেই ত তোমাকে এত ভালবাসি! আমার ছেলেও এই রকম ছিল কিনা!" কথা কইতে কইতে তার রিভলভারটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলে—"এটা রাখ। আমার দুটো অস্ত্রের দরকার নেই।"

কালো রঙের টেবিলের ওপর রিভলভারটা ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল। পুলিশ তার দিকে মুখ ফেরালে শিক্ষক চামড়া আর ঘোড়ার একটা গন্ধ পায়।

হঠাৎ দাক্স বলে—"শোন বালচুন্তি, এ-সব ব্যাপারই আমার বিচ্ছিরি লাগছে, বিশেষ করে তোমার সাবধান-বাণী। আমি বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব না। দরকার হলে আমাকে মারতে পার কিন্তু ও আমি পারব না।"

বৃদ্ধ পুলিশ বেশ গাম্ভীর্য্যের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে বলে—"তুমি বোকামী করছ। আমারও এসব ভাল লাগে না। একজন লোকের দাড় বাঁধা—এত বছর হয়ে গেল তবু এটা ধাতস্থ হয়নি—আর তাছাড়া একটু লজ্জাও তো করে। তাই বলে ওদের যা খুশী তা-ই করতে দেওয়া চলতে পারে না।"

"আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব না।" আবার বলে দাক্স।

"বাবা, আবার বলছি এটা হুকুম।"

"বেশ, বলে দিও আমি তোমাকে যা বললাম। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব না।"

বালচুন্তি চিন্তা করবার চেষ্টা করে, শেষে বলে—"তুমি যদি তোমার নিজের ইচ্ছাতে আমাদের ছেড়ে দিতে চাও আমি তাদের কিছুই বলব না। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বন্দীকে তোমার হেপাজতে ছেড়ে দিয়ে আসতে, আমি তা পালন করলাম। তোমাকে একটা কাগজ সই করতে হবে।"

"কোন দরকার নেই। আমি অস্বীকার করব না যে তুমি বন্দীকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়েছ।"

"দুষ্টুমী কর না। আমি জানি যে তুমি সত্যি কথাই বলবে। তুমি এখানেই থাকবে এবং একজন মানুষও বটে কিন্তু তবুও তোমাকে সই করতে হবে, এই-ই নিয়ম।"

দাক্স দেরাজটা খুলে ছোট্ট চৌকো বেগুনী রঙের কালীর [illegible]

বার করে। লাল কাঠের পেন্-হোল্ডার' থেকে 'সারজেণ্ট-মেজর' কলমটা তুলে নিয়ে সই করে।

পুলিশ বেশ যত্ন ক'রে কাগজটা মুড়ে তার ব্যাগের ভেতর রাখে। দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে।

"আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" দারু্য বলে।

"না, আর ভদ্রতা করবার দরকার নেই। তুমি আমায় অপমান করেছ।" তাকিয়ে দেখে বালচুস্থি বন্দী-আরব একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুঃখে মনটা ভ'রে যায়, দরজার দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে বলে—"আচ্ছা বাবা, আসি।" সশব্দে দরজাটা তার পেছনে বন্ধ হয়ে যায়! জানলার সামনে দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। বরফের ভেতর তার পা আটকে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে উঠেছে, মুরগীগুলোও ডাকছে। একটু পরেই বালচুস্থি ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে জানলার সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। পাহাড়ী পথ ধরে এগোতে থাকে সে, প্রথমে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপরে ঘোড়াটা। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না সে। একটা ভারী পাথর আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়বার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দারু্য বন্দীর কাছে আসে। সে তখনও একই জায়গায় রয়েছে।

"অপেক্ষা কর।" বন্দীকে আরবী ভাষায় এই কথাটা বলে সে তার নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের চৌকাঠটা পেরিয়ে যাবার সময় মত বদলে টেবিলটার কাছে যায়। রিভলভারটা নিয়ে পকেটে রাখে, তারপর পেছনে না তাকিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

অনেকক্ষণ সে সোফার ওপর শুয়ে রইল। গভীর নীরবতা নেমে আসে চারদিকে। যুদ্ধের পর যখন সে প্রথম এখানে আসে তখন এই নীরবতা তার কাছে পীড়াদায়ক ছিল। যে পাহাড়টা মরুভূমি আর উঁচু মালভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে সেই পাহাড়ের পাদদেশের একটি সহরে সে কাজ চেয়েছিল। ঐ তো পাহাড়গুলো দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। উত্তরদিকে সবুজ আর কালো পশ্চিমে গোলাপী অথবা বেগুনীরঙের পাহাড় চির-গ্রীষ্মের সীমানা নির্দেশ করছে। আরো উত্তরদিকে মালভূমির ওপর একটি জায়গায় সে চাকুরি পেল। প্রথম প্রথম শিলারাশিপূর্ণ এই ভূখণ্ডের অখণ্ড নীরবতা দারু্যর কাছে দুর্বিষহ মনে হত। সববটি চারভাগের তিনভাগই পাথরে ভর্তি, এ-মরুভূমিতে কোন ফসলই হয় না।

দারু্য উঠে বসল। যে ঘরে ক্লাশ হয় সেখান থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসছে না। বন্দী-আরব যে পালিয়ে আসতে পেরেছে এ-কথা চিন্তা করতেই দারু্য খুশী হল। ঐ তো বন্দী ওখানে রয়েছে। টেবিল আর উনুনের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই অবস্থায় তার পুরু ঠোঁট দুটো দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে অপ্রসন্ন, একটা বিরক্তির ভাব তার মুখে।

"এস।" দারু্য তাকে বলে। বন্দী উঠে দারু্যকে অনুসরণ করে। শিক্ষক বন্দী-আরবকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে জানলার নীচে টেবিলের কাছে চেয়ারটা দেখিয়ে দেয়। বন্দী দারু্যর দিকে তাকাতেই চেয়ারটাতে বসে পড়ে।

"তোমার খিদে পেয়েছে?"

"হ্যাঁ।" জবাব দেয় বন্দী।

দারু্য দুটো আসন পাতে। ময়দা আর তেল দিয়ে চাপাটি তৈরী করে। গ্যাসের উনুনটা জ্বালে। চাপাটি ভাজতে ভাজতে ছুটে যায় একচালা ঘরটাতে, চীজ, ডিম, কিছু খেজুর আর টিনের জমাট-বাঁধা'-দুধ আনতে। চাপাটি ভাজা হয়ে গেলে জানলার ধারে রাখে একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য। জমাট-বাঁধা দুধটাতে একটু জল দিয়ে গরম করে শেষে ডিমগুলো ফেটিয়ে অম্লেট তৈরী করে। নড়া-চড়া করতে করতে হঠাৎ ডান দিকের পকেটের ভেতর রিভলভারের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। বাটিটা মাটিতে রেখে যে ঘরে ক্লাশ হয় সেই ঘরের টেবিলের দেরাজের ভেতর রিভলভারটা রেখে আসে! রাত হয়ে এসেছে। বন্দীকে পরিবেশন করে সে বলে—"খাও।"

বন্দী এক টুকরো চাপাটি ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি মুখের ভেতর পুরে দেয় কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মুখ একদম নড়ে না আর।

"তুমি?" জিজ্ঞেস করে সে।

"তোমার পর আমিও খাব।"

তার পুরু ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়—একটু ইতস্তত করে আবার স্বচ্ছন্দে খেতে থাকে। খাওয়া হয়ে গেলে বন্দী-আরব দারু্যর দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে সে—"তুমিই কি বিচারক?"

"না, আমি তোমাকে কাল অবধি রাখব।"

"কেন তুমি আমার সঙ্গে খাচ্ছ?"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

বন্দী চুপ করে থাকে। দারু্য উঠে বাইরে যায়। একচালা ঘর থেকে ক্যাম্প-খাটটা নিয়ে এসে টেবিল আর উনুনের মাঝখানে তার খাটের পাশে পেতে দেয়। এক কোণে প্রকাণ্ড স্যুটকেশটা টেবিলের কাজ করছিল। তার ভেতর থেকে দুটো চাদর বের ক'রে ক্যাম্পখাটের ওপর বিছিয়ে দেয়। নিজের খাটের ওপর বসে পড়ে—আলসেমি লাগে। আর কিছু করবার নেই। এই লোকটিকে এখন লক্ষ্য করতে হবে। প্রচণ্ড রাগে আরক্ত মুখটা কল্পনা করতে করতে বন্দীর দিকে চেয়ে থাকে দারু্য। কিন্তু কল্পনা করতে পারে না সে। ও শুধু দেখে বন্দীর জন্তুর মত মুখটাতে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টি—আবার কখনও তা বিষাদমাখা।

"কেন তুমি তাকে খুন করেছ?" এই রূঢ় প্রশ্নে বন্দী বিস্মিত হয়।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ লে ভেরী)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এলিসের পক্ষে এ-দৃশ্য স্বভাবতই খুব ভয়াবহ। তাই যত শীঘ্র পারলুম আমরা মৃতের বাগানের সীমানা ছেড়ে এলুম। খানিকটা যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল অনেকগুলো ষাঁড় খুব ছুটছে—কোথা থেকে যে তারা এল তা আমরা বুঝতে পারলুম না। আরও বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে আমরা একটা গ্রাম পেলুম। দেখলুম, প্রায় এক শ' কুটির ঐ গ্রামের মধ্যে। সব কুটিরগুলির চাল হচ্ছে তালগাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া আর দেওয়াল হচ্ছে মাটির। প্রত্যেক কুটিরের সামনেই একটা করে ষাঁড় রাখবার খোঁয়াড় রয়েছে।

আমাদের দলে জিনিসপত্র অনেক থাকায় ভাবলুম, এখানকার লোক সঙ্গে নিলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু আমাদের দোভাষীই দলপতির সঙ্গে কথা ক'য়ে বুঝিয়ে দিলে যে, এখন ওদের শস্য কাটবার সময়। মেয়েরা সব শস্য কাটতে ব্যস্ত। ওদের পুরুষরা কেউ কাজ করে না—তারা একটা সামান্য জিনিসও বয় না। তবে ষাঁড়ের ব্যবস্থা দলপতি করে দিতে পারে এবং তার ব্যবস্থা সে করেও দিলে। আমাদের সঙ্গেই গরুর গাড়ির চাকা ছিল, তাই দিয়ে এখানকার কাঠ যোগাড় করে আমরা কয়েকখানা গাড়ি তৈরী করলুম। কিন্তু গাড়িতে ষাঁড় জোতার ব্যাপার নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। যাই হোক, অনেক কষ্টে তাদের শেষ পর্য্যন্ত পোষ মানান গেল। আমরা সবসুদ্ধ চল্লিশটা ষাঁড় নিলুম। আর ওখানকার পথে আমাদের সঙ্গে আসতে জনকতক ইণ্ডিয়ান ও তাদের প্রত্যেকের তিন জন করে স্ত্রী রাজী হ'ল। ফলে, আমাদের দলটি বেশ বড় হ'ল তা বলাই বাহুল্য। তবে এতগুলি লোক এক সঙ্গে থাকায় আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটতে লাগল, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান দলপতির কাছে আমাদের দোভাষীর মারফত এদেশের লোকের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারের কথা শুনতে শুনতে এলিস ও আমার পথের কষ্ট একেবারেই মনে হচ্ছিল না।

পথ চলতে চলতে এক সময় দেখি, জনকয়েক স্থানীয় জংলী লোক একটা ষাঁড়কে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেললে। ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞাসা করায় দলপতি বললে যে, ঐ ষাঁড়টার চামড়া থেকে দাড় তৈরী করে ওরা একটা বাঘ মারবে স্থির করেছে। কিছুদিন ধরে সাভানার এই গ্রামগুলিতে একটা বাঘ ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করেছে। দূরে ঐ যে একটা ছোট নদীর মত দেখা যাচ্ছে, ওখানে বাঘটা রোজই জল খেতে আসে। ওরা ওটাকে শিকার করার জন্যেই এই দাড় তৈরী করছে। এখানে বাঘ শিকার করার জন্যে কেউই বন্দুক ব্যবহার করে না—কায়দা করে দড়ি দিয়েই বাঘ মারে।

দড়ি দিয়ে বাঘ শিকার? এ তো কখনও শুনি নি, তাই এলিস ও আমি দু'জনেই শিকার দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম। দলবল সহ নানা পথ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন আমরা নদীর কাছ বরাবর এসেছি, তখন দেখি, খানিকটা দূরে বাঘটা সত্যি সত্যিই জল খাচ্ছে। জনকতক স্থানীয় জংলী লোক ছুটে গিয়ে তাড়া দিতেই সে যেমন পালাতে যাবে, অমনি দু'জন ইয়া ষণ্ডা-মার্কণ্ড লোক প্রায় কুড়ি হাত দূর থেকে দু'দিকে দাঁড়িয়ে, দড়ির একটা ফাঁস এমনভাবে তার গলার মধ্যে ছুঁড়ে দিলে যে সে আর পালাতে পারলে না—আটকে গেল গলায় ফাঁস পড়ে। অদ্ভুত তাদের টিপ ও হাতের কায়দা! দু'দিকে দু'জনেরই গলায় ফাঁস না ফস্‌কে একেবারে পলায়মান বাঘের গলায় যে ঠিক-ঠিক গিয়ে পড়বে তা সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! তারপর ভীষণ টানাটানি, দাপাদাপি আর চীৎকার শব্দ চলতে লাগল।

অবাক হয়ে এই উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার নজর পড়ল নদীর জলের দিকে। তখন আমরা নদীর ধারে এসেই দাঁড়িয়েছিলুম। একটু ভাল করে চেয়ে দেখি, নদীর স্বচ্ছ জলের মধ্যে টুক্‌রো-টুক্‌রো টিন পড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা দেখবা মাত্র আমার মন থেকে শিকার দেখার উত্তেজনা নিমেষে মুছে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি নদীর জলে নেমে একটা পাত্রে খানিকটা জল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলুম—এর মধ্যে হীরে, লোহা বা সোনা জাতীয় কিছু আছে কিনা।

কিন্তু বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। তা হোক। তবে এ থেকে যে কিছুই লাভ হয়নি তা বলব না। এক দিক থেকে বেশ বড় লাভই হয়েছিল।

আমাদের ঐরকম করে জল নিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে, স্থানীয় জংলীরা খুবই হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। শেষে তাদের দলপতি আর থাকতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি এই জল নিয়ে কি দেখছি? ওকে বোঝাবার জন্য আমরা এক শিশি-ভরতি হীরে ওর চোখের সামনে ঢেলে দেখালুম। ওটা দেখে দলপতিসহ ওরা সকলে মিলে আরও জোরে খিল-খিল করে হেসে উঠল। ওরা যে এর সন্ধান জানে, তা ওদের হাসি থেকেই বেশ বোঝা গেল।

তখন আমি ওদের দলপতিকে খুব তোয়াজ করতে লাগলুম। প্রথমটা ও কিছুই বলতে চাইলে না, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। শেষে ও আমাদের দোভাষীর মারফত আমাকে বললে যে, তুমি আগে আমাকে কি দেবে বল, যদি আমি তোমাকে তোমার মাথার মত বড় একটা জিনিস দেখাই?

আমি তার উত্তরে বললুম যে, আমি তোমাকে আমাদের একটা বন্দুক দেব।

তখন সে দূরের সেই অদ্ভুত পাহাড়গুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐখানে যাও, পাবে।

দারুণ উত্তেজনা বুকের মধ্যে চেপে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আমরা পথ চলতে লাগলুম।

যতই ঐ পাহাড়গুলোর দিকে এগুতে লাগলুম, ততই একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল—ওগুলো সত্যিকার পাহাড়, না আগ্নেয়গিরি? কিন্তু এ সন্দেহ দূর করার জন্যে আমায় বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না।

সেদিন আমাদের বিশ্রামের দিন। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকাল হয়ে এসেছে, তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ এলিসের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। সে পাহাড়গুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে আমায় বললে, ঐ শোন! চেয়ে দেখ!

এলিসের কথামত কান খাড়া করে শুনতে লাগলুম আর সামনের দিকে দেখতে লাগলুম। একটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল, জমিটাও যেন একটু নড়ে উঠল, আর দূরে আকাশের দক্ষিণে হঠাৎ সব কালো হয়ে গেল।

ঠিকই তো! এই তো সেই বহু-কথিত বিস্ময়কর দক্ষিণ আমেরিকার আগ্নেয়গিরির দেশ—যেখানে রাতারাতি নদী পাতালে চলে গিয়ে, সকালে মরু হয়ে প্রকাশ পায়—যেখানে এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গিয়ে, আবার নতুন হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। এই তো সেই হারান জগৎ, 'লষ্ট ওয়ার্ল্ড'!

কত দিনে ওখানে যাব! ধৈর্য্য যেন আর তিলেকের জন্যেও সবুর সইতে চাইছে না! এমনি মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে আমরা সাভানার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলুম। সামনেই পাহাড়ের বিস্তৃত ঘন অরণ্য। আমাদের গাড়িগুলো সব এখানে ফেলে রেখে, শুধু জন্তুগুলোর উপর আমাদের জিনিসপত্র চাপিয়ে নিলুম।

সবে মাত্র একটা রাত্রি আর একটা দিন কেটেছে! চোখের সামনে সৌন্দর্য্যের সে কি সমারোহ! সে সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করব, এমন ভাষা আমার নেই। বোধ হয় শিল্পীর তুলি ব্যতীত সে সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়! 'হারান জগৎ' তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠল। সারি সারি পাহাড়ের চূড়া—মাথার উপর নিবিড় অরণ্য। মাঝে মাঝে উপত্যকা ঢেউ খেলে গেছে—কোথাও তার মধ্যে থেকে নির্ঝরিণী নেমে এসেছে। সমস্ত জায়গাটা যেন একটা কুয়াশার মধ্যে ঢাকা। একে নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনীই যে রচিত হয়েছে! চিরদিন যে রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মানুষের কল্পনার মধ্যে বাস করেছে—আজ সে সত্যি-সত্যিই আমাদের চোখের সামনে!

পথে আমাদের ওয়াপিসানা গাইডরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। শুধু তাদের একজন মাত্র ছিল, যে ওয়াই-ওয়াই জাতির সঙ্গে তাদের নিজেদের জাতের ব্যবসা কি ভাবে চালান যায়, সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাত। এই লোকটি আমাদের সামনের এই বিস্ময়কর দৃশ্য সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল ছিল। এর দলের লোকেরা কথাবার্ত্তার মধ্যে যে লুপ্ত জাতির কথা ইঙ্গিত করেছিল, আমি বুঝলুম এই ওয়াই-ওয়াইরাই বা শ্বেত ইণ্ডিয়ানরাই সেই লুপ্ত জাতি।

শ্বেত-ইণ্ডিয়ান নামে সত্যিই কোন জাত ছিল না—এটা নিছক গল্প-কথা, এ রহস্য সেদিন পর্য্যন্ত রহস্যই হয়ে ছিল, এর কারণ, তাদের কথা পূর্বে জানা গেলেও, বহুকাল আর তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তারা যেন হঠাৎ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সম্প্রতি বৃটিশ সীমানা কমিশনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এ জাত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এক সময়ে যারা সমগ্র আমেজোনিয়ান উপত্যকাটি শাসন করত, আজ সে তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

এদের সঙ্গে আমাদের যেদিন চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল, সেদিন এলিস ও আমি দু'জনেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। এই ওয়াই-ওয়াই জাতির পুরুষরা যেমন লম্বা তেমন সুশ্রী—বোধ হয় উচ্চতায় কেউ ছ'ফিটের কম নয়। তাদের মুখের চেহারা অতি সুন্দর। মেয়েদের চেহারা যেমন সুন্দর, তেমন ফর্সা তাদের দেখতে। এদের নীতিবোধও খুব সূক্ষ্ম। তবে সাজপোষাকের বিশেষ কোন বালাই নেই মেয়েপুরুষ দু'জনেরই।

এরা এসেছিল আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের গ্রামে নিয়ে যেতে। দেখলুম, আমাদের মালপত্র ওদের মেয়েরাই বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তুলে নিলে—পুরুষরা নিলে না। তার কারণ এ কাজ মেয়েদের—পুরুষদের নয়। পুরুষরা কোন মাল বয় না।

এলিস কিন্তু এ নিয়মটি মোটেই ভাল বলে স্বীকার করে নিতে পারলে না। মেয়েরা সারা দিন খাটবে আর পুরুষরা তার সব রোজকার ভোগ করবে—এ কেমন কথা! কিন্তু এর চেয়েও বড় অভিজ্ঞতা এলিসের তখনও বাকী ছিল। এদের দু'জন দলপতি, একজনের নাম কাতান, আর একজনের নাম ওলিভান—এদের সঙ্গে তর্ক করে সে প্রায় ক্ষেপে যাবার মত হ'ল। এলিসের খুব সাধ হয়েছিল ওর ব্যাগের মধ্যে ওর নিজের যে সব ভাল ভাল পোষাক আছে তা থেকে কতকগুলো ও ওদের মেয়েদের উপহার দেবে, কিন্তু দলপতিরা কিছুতেই তাকে তা দিতে দেবে না। তারা বলে, মেয়েরা যতক্ষণ পোষাক না পরে, ততক্ষণ তারা খুব ভাল থাকে, কিন্তু যেই তারা পোষাক পরে অমনি তাদের মাথার মধ্যে আজগুবি সব চিন্তা জাগে।

বহু দিন পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে এই হারান-জগতের পরিবেশে আমাদের সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তারপর আবার আমরা এগুতে লাগলুম।

আমরা গভীর থেকে গভীরতর গিরিপথের মধ্যে দিয়ে চললুম এগিয়ে। এমনি যেতে যেতে একটা নদীর খাড়ির কাছাকাছি এসে যেমন আমরা উপস্থিত হয়েছি, অমনি আমাদের ওয়াপিশনা দোভাষী খুব উত্তেজিত ভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐ খাড়িটার মধ্যেই হীরে আছে।

নদীর জলে সূর্য্যের আলো পড়ায় সত্যিই সেখানটা খুব চকচক ঝকমক করছিল। মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত নদীর উপরটাতেই হীরকের একটা গালিচে পাতা আছে! কিন্তু এমনি বরাত! তা যে হীরক নয়, তা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিপন্ন হয়ে গেল। আসলে সমস্ত নদীটাই স্ফটিক মণির টুকরোতে বোঝাই হয়ে আছে।

ভাগ্য প্রসন্ন না হলেও, হতাশাকে আমি মোটেই প্রশ্রয় দিলুম না। কারণ, এ জায়গাটতে রক্তবর্ণ মণির প্রাচুর্য্য দেখে, ধাতুবিদ্যার দিক থেকে, আমি মনের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলুম।

এলিস সেখানকার জলে নেমে গেল, তারপর হীরে আর সোনা বাছবার ছাঁকুনি বার করলে। আমরা দু'জনে তখন তাই নিয়ে মেতে উঠলুম। শুধু মেতে ওঠাই নয়, গভীর গবেষণায়ও লেগে গেলুম বলতে পারা যায়।

ওয়াই-ওয়াই নেতাদের একজন আমাদের জলের মধ্যে মেবে এই ভাবে কাজ করতে দেখে, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলে ফেললে, ঐ যে বনের মধ্যে উঁচু জায়গাটা রয়েছে ওটাই হল সোনার রাজত্ব, তবে কেন আমরা হীরের জন্যে এত কষ্ট করছি এখানে?

তার কথা শুনে আমরা খুবই অবাক হয়ে গেলুম এবং তার কাছ থেকে সমস্ত হদিস নেবার জন্যে নেটিপেটি হয়ে তার খোশামোদ করতে লাগলুম। আপ্যায়িত হয়ে সে বললে যে, ঐ পাহাড়ের উপর দিকে একটা সোনার হ্রদ আছে। আর ওখানকার পাহাড়গুলো সব সোনাতে ভরা। ঐ হ্রদের তীরে গেলে সোনার আভায় তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঝকমক করবে। এত যখন সোনা পাবে, তখন হীরের আর কি দরকার। আসলে হীরের চেয়ে সোনার মূল্য ওদের কাছে অনেক বেশী। হীরেকে ওরা স্ফটিক পাথরের সামিলই মনে করে থাকে এবং পাহাড়ের এই চূর্ণগুলির কোন মূল্যই দেয় না।

এ কি স্বপ্ন, না সত্যি? তবে কি স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের বিশ্বাস মিথ্যে নয়। সত্যিই কি তবে এইখানেই কোথাও সেই হারানো 'এলডোরাডোর' সন্ধান পাওয়া যাবে! এত দিন যে ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে কত মানুষ কত দুঃসাধ্য অভিযানে যাত্রা করে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, জীবন হারিয়েছে, সেই স্বর্ণভাণ্ডার 'এলডোরাডোর' সন্ধান কি আমি পাব? (আগামী বারে সমাপ্য)।

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ

কাগজের নৌকো

চেনাশুনো যে-ই ছিলো ওডেন্সের, তাকেই হান্সের চিঠি দেখালেন আনে মারি। 'দেখলে তো', গর্বে তাঁর গলা কেঁপে গেলো, 'এক হপ্তাও হয়নি কোপেনহাগেনে গেছে, অথচ এর মধ্যেই হান্সের ভবিষ্যৎ একেবারে তৈরি হ'য়ে গেছে—এখন তো ধাপে-ধাপে কেবল সোনার সিঁড়ি পেরোতে হবে।' কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার পথ এত সোজা নয়, মোটেই খাঁজ-কাটা সিঁড়ি উঠে যায়নি উপরের দিকে, বরং তা কোনো পাহাড়ে-ওঠার চেয়েও দুরারোহ; একটি চুড়ো জয় ক'রে নেবার পরেই আরেকটি চুড়ো এসে চোখে পড়ে, আর সেই চুড়োয় উঠবার আগে আবার নতুন ক'রে নেমে যেতে হয়—নেমে যেতে হয় নিচে, সমতলে, তার পরে আবার আরম্ভ করতে হয় একেবারে গোড়া থেকে।

সিবোনি ছিলেন উদ্দীপ্ত শিক্ষক, উপরন্তু সহৃদয়; প্রায়ই তিনি হান্সকে অল্প-স্বল্প অর্থ সাহায্য করতেন। 'ফূর্তি কোরো এই টাকা দিয়ে', এই সুশ্রীমন্ত ইতালিয়ানটি প্রায়ই তাকে এ-কথা বলতেন, তা ছাড়া নিজের বাড়িতেও তার সমাদর করতেন মাঝে-মাঝে; কিন্তু সে বারে শীতকালটি ছিলো ঠাণ্ডা আর নিষ্ঠুর। মাত্র একজোড়াই জুতো হান্সের; যখন তা জীর্ণ হ'য়ে ছিঁড়ে গেলো, তালিতেও যখন আর কুলোয় না, তখন তাকে একেবারে আক্ষরিক ভাবেই জল-কাদা-বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হ'তো। ফল হ'লো এই যে, ঠাণ্ডা লেগে তার সর্দি হ'লো, আর গলা ভেঙে ব'সে গেলো একেবারে। সিবোনি তাকে নরম ক'রে বললেন বাস্তব তথ্যের মুখোমুখি হ'তে; গায়ক সে কোনোকালেই হ'তে পারবে না—সে-রকম ধাতই তার নয়; বরং সে যদি ওডেন্সে ফিরে গিয়ে কোনো ব্যবসা শেখে, তাহ'লেই আখেরে ভালো করবে—এই কথাই তাকে তিনি ব'লে দিলেন।

'ওডেন্সে আর ব্যবসা'—প্রত্যেকেই তাকে বারে-বারে এই দুটো কথা বলেছে; শেষের দিকে এই কথা দুটো শুনলেই অসহায় ক্ষোভে সে ভরে যেতো। এখনো তো সে রূপকথার অপরাজেয় নায়ক, কেউ বা কোনো-কিছু—কোন কিংখাবের জুতো কি সোনা-রূপোর কাঠি—নিশ্চয়ই তাকে এই দুপরামর্শের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে দেবে। তার মনে প'ড়ে গেলো কর্নেল গুল্ডবের্গের কথা, যিনি ওডেন্সেয় তার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে যুবরাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সত্যি তো, তাঁর একজন ভাই থাকেন কোপেনহাগেনে, এবং কোথায় যেন অধ্যাপনা করেন তিনি, আর সর্বোপরি তিনি একজন কবি।—কবি! কবিতা লেখেন! এবার নিশ্চয়ই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে তার প্রতি, কেন না না-হ'লে এই কবিতা লেখার কথা তার মনে পড়বে কেন? তৎক্ষণাৎ হান্স অধ্যাপক গুল্ডবের্গকে চিঠি লিখে দিলো; উত্তরে তাকে বলা হ'লো, অমুক দিন এসে দেখা ক'রে যাও।

অনেক, অনেক বছর টাকাকড়ির দিক দিয়ে তাকে দারিদ্র্য মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু আজীবনই তার বন্ধুভাগ্য ছিলো সম্পদের মতো; যেন কোনো জাদুবিদ্যা জানে সে, এত সহজে সে লোকজনের মর্ম স্পর্শ ক'রে দিতে পারতো। অধ্যাপক গুল্ডবের্গ এমনিতেই ব্যস্ত মানুষ, অতিরিক্ত খাটেন—এত বেশি খাটেন যে প্রায়ই নিজের শক্তির সীমা ছাড়িয়ে যান; তিনি তাকে দিনেমার আর আলেমান ভাষা শেখাবার দায়িত্ব নিতে রাজি হ'লেন; তার চিঠি থেকে এটাই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো যে, হান্স এমন কি, নিজের মাতৃভাষাটুকুও শুদ্ধভাবে লিখতে জানে না। কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেলো হান্স. কিন্তু আবার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের ঝকমারি পোয়াতে হবে—এই কথাটা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো; কাজেই সে গেলো ডালেন-এর সঙ্গে দেখা করতে। ডালেন কেবল যে নিজেই মস্ত নাচিয়ে, তা-ই নয়, অন্য অনেককেই নাচ শেখান তিনি, ছোট্ট মতো একটা স্কুলও বসিয়েছেন ওই উদ্দেশ্যে; উপরন্তু নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে নানা ভাবে। হান্স গিয়ে তাঁর দলে ভর্তি হবার কাতর আবেদন জানালো।

প্রথমটা তো বেশ মজাই লাগছিলো ডালেন-এর—হান্সের পা ফেলার ভঙ্গি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো, শিশু যখন হাঁটতে শেখে, তখন যেভাবে পা ফেলে অনেকটা সেই রকম; কিন্তু শেষটায় সব দেখে-শুনে তাঁকে রুষ্ট হ'তেই হ'লো। যে-সব ছোটো, ছেলে, ঢঙে

স্কুলে ভর্তি হ'তে আসে, তাদের সঙ্গে আসে শিক্ষক কি অভিভাবকেরা। বাবা-মাও আসেন কখনো কখনো, এসে প্রশংসা করেন নন্দনের, যাতে চোখে পড়ে তাঁর ছেলে, এইজন্যে কম চেষ্টা চলে না। আর এই ঢ্যাঙা ছেলেটি একেবারে একা চ'লে এসেছে তাঁর কাছে, কেউ নেই সঙ্গে, আর ছেলেটির মুখ-চোখ থেকে সেই ভাবটাই ফুটে বেরোচ্ছে ভিখারিণীর ছেলেমেয়েদের মুখচোখে যা দেখা যায়। ছেঁড়া জুতো, গোড়ালির কাছটায় কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া, পুরোনো একটা আঁটো কোট, মাপে ছোটো হয়; নোংরা জামাকাপড়, আরও কিছুদিন গায়ে দিলে গন্ধ ছড়াবে—এরাই হান্সের হয়ে সব কথা ব'লে দিলো; ক্ষুধা কি অর্থাভাব—এই সব কথা একবারও উচ্চারণ করেনি হান্স, তার তখন মনেই নেই ও সব তুচ্ছ ব্যাপার. কেবল নাট্যশালার স্বপ্নে সে মুখর ও উন্মুখর হ'য়ে আছে; নাট্যশালাই সব চেয়ে জরুরি তার কাছে, ভীষণ দরকারী, ওই তার প্রাণ, ওই তার লক্ষ্য; যে যে নৃত্যশালায় ভর্তি হ'তে চাচ্ছে, তা তো কেবল এই কারণেই যে ভালোভাবে শিখতে পারলে পরে একদিন নাট্যশালার সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে পারবে। নাচ শেখাটা তার লক্ষ্য নয়, পথ, একটা উপায় মাত্র। তীব্র তার অনুরাগ আর সততা ডালেন-এর মন গলিয়ে দিলো, তিনি তাকে ভর্তি করতে রাজী হলেন।

বিজয়গর্বে, ভারিক্কিভাবে হান্স ফিরে এলো অধ্যাপক গুল্ডবের্গের কাছে। পুঁথি-পড়া বিদ্যের চাইতে আরো বেশি আকর্ষণকারী ইন্দ্রজালের সন্ধান নিয়ে এসেছে সে—এখন কি আর মাটিতে তার পা পড়ে।

আগেই তাঁকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, নাচ যারা শেখে তাদের জন্য কিন্তু কোনো রকম জলপানি কি বৃত্তির ব্যবস্থা নেই, কাজেই যতদিন তোমাকে শিখতে হবে, ততদিন তোমাকে খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু নিজেই উপার্জন ক'রে নিতে হবে—বেঁচে থাকতে হবে তো তোমাকে, টিকিয়ে রাখতে হবে তো শরীর। গুল্ডবের্গ তার জন্য চাঁদা তুলে দিলেন, কিন্তু তার জন্য হান্স নিজেই আবেদনপত্রটি রচনা করেছিলো। বেশ নিশ্চিন্তভাবেই এই ব'লে সে শুরু করেছিলো: 'প্রয়োজন আমাকে কিছুকালের জন্য আমার ভাগ্যকে মানব জাতির মহান বন্ধুদের হাতে ন্যস্ত করতে বাধ্য করেছে, কেননা আমার মনে হয় অভিনয়কলার সঙ্গে আমার কোন গভীর আত্মীয়তা আছে, যেন আমি জন্মেছি কেবল থালিয়ার সেবা করার জন্য··অন্ত সব বড়ো বড়ো বুলিগুলো কিন্তু একটু পরেই একেবারে বদলে গেলো। অনতিবিলম্বেই আবেদনপত্রের ভাষা হ'য়ে এলো চাপা, গভীর ও ও অকৃত্রিম—আর তাতে ফুটে উঠলো সাংসারিক সুবুদ্ধি ও সত্যপরতা। যতদিন না পুরোদস্তুর একজন অভিনেতা হ'য়ে উঠছি, ততদিন আমি ব্যালে নাচের দলে থাকতে পারবো ব'লেই আশা করছি··কেবল জুতো আর মোজাই চাই আমি, তাই আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবো। আমি··ছোট্ট অঙ্কের একটি মাসোহারাও প্রার্থনা করছি, যতদিন না নিজে উপার্জন করতে পারছি, কেবল সেই ক'টা দিনের জন্যই। যাতে এই পরনির্ভর সময়ের পরিমাণ ছোটো হ'য়ে আপ্রাণ খাটবো আমি, এই কথা দিচ্ছি।'

এই আবেদনপত্র পড়ে লোকে কিন্তু সাড়া দিলো সত্যি সত্যি। অধ্যাপক জেইজে পর্যন্ত; কিছু অর্থসাহায্য করলেন, আর তাই তো আবার হান্সের জন্য ভাঁড়ার গেলো। এই জন্য ...

তার ক্ষমতায় আস্থা পোষণ করেন, এই বোধটি তাকে আনন্দিত ক'রে কিন্তু যখন সিবোনির দুই দাসী এসে তাকে নিজেদের বেতনের এক অংশ দিয়ে গেলো, হান্স তখন যে শুধু কৃতজ্ঞতাতেই ভ'রে গেলো, তা নয়, বিনতিতেও সে পূর্ণ হ'য়ে গেলো একেবারে; এদের সকলের কাছে সে দায়ী—এত সব শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার প্রতিদানে আপ্রাণ না খাটলে সে ঋণ শোধ করবে কী ক'রে, আর কী ক'রেই বা মর্যাদা দেবে তাদের।

সিবোনি যখন তাকে শেখাতেন, হান্স তখন থাকতো পুরোনো একটা ভাঙাচোরা তোবড়ানো বাড়িতে, ৮ নম্বর ডোলমেন্সগাডে। শহরের এমন অংশে সেই বাড়ীটা, যে পাড়ার খুব একটা সুনাম নেই, বরং নষ্ট পাড়াই বলা যায় তাকে। এমন কি, হান্সের কাছেও ওই রাস্তাটা অদ্ভুত ঠেকতো; রঙ-করা মুখ নিয়ে মহিলারা দাঁড়িয়ে থাকেন সবগুলি জানলায়, আর অসময়ে গভীর রাতে বিশ্রী চেহারার সব অতিথিরা এসে হাজির হয়। গোড়ার দিকে মেয়েদের কেউ কেউ—ঝলমলে সাজপোষাক প'রে তীব্র ঝিমঝিমে, নেশা-লাগা সুগন্ধি ছিটিয়ে দিয়েছে তারা সর্বাঙ্গে—তাকে হাতছানি দিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে ডাক দিতো, আর লজ্জায় সংকোচে টুকটুকে হ'য়ে উঠতো হান্স; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাকে দেখতে-দেখতে মেয়েরা অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে তাকে আর বিরক্ত না ক'রে একা থাকতে দিতো। হান্সের বাড়িউলির বাসায় অল্পবয়সী একটি মেয়ে থাকতো, এক বুড়ো ভদ্রলোক আসতেন তার কাছে, মেয়েটি বলতো তিনি নাকি তার বাবা। নম্রভাবে দরজা খুলে ভদ্রলোকটিকে ভিতরে আহ্বান করতো হান্স। অনেক বছর পরে, কোপেনহাগেনের এক ঝকঝকে ড্রয়িংরুমে, মস্ত এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো; নানা খেতাব ও রাজকীয় সম্মানে তিনি একেবারে ভরপুর। অবাক হ'য়ে হান্স দেখেছিলো ইনি আর-কেউ নন, সেই বালিকাটির 'বাবা'। 'বাবা'টি তাকে চিনেছিলেন কিনা, এই রহস্যময়টি বেশ লাগে। বাড়িউলির পাশেই অব্যবহৃত একটি ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরে থাকতো হান্স; সাড়ে-মাপের একটা আলমারির মতো ঘরটা, কিছুতেই তার চেয়ে বড়োসড়ো নয়—কোনো জানলা নেই ঘরে, শুধু দরজার পাল্লায় ছোটো ঝাঁঝরি-ঘুলঘুলি যাতে হাওয়া আসতে পারে ভিতরে। ঘরটা এতই ছোটো যে যখন সে ঘরে থাকতো তখন একমাত্র চেয়ারটিকে রাখতে হ'তো বিছানার উপর।

তা বাড়িউলি যখন হান্সের নতুন ধনরত্নের কথা শুনতে পেলো—সম্ভবত হান্স নিজেই ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত ক'রে এইসব সম্পদের কথা তাকে ব'লে দিয়েছিলো—তখন বাড়িউলি তাকে রাখবার জন্য একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে গেলো, যাকে বলে নাছোড়বান্দা। 'আস্ত একটা তক্তাপোশ দেবো তোমাকে,' বাড়িউলি তাকে বললে, 'ভাবো, কোনটা ভালো?' হান্স তোৎলাতে শুরু ক'রে দিলো। আমতা-আমতা ক'রে বললে যে এতদিন ধ'রে সে কেবল আস্ত একটা ঘরের স্বপ্ন দেখেছে—সত্যিকার একটা ঘর—এটাই ছিলো তার একমাত্র উচ্চাকাঙ্খা। 'এটা ঠিক যে ঐ ঘরটা খুবই ছোট্ট,' বাড়িউলি তাকে বললে, 'কিন্তু তোমাকে আমি রান্নাঘরেও বসতে দেবো, তাছাড়া এখানে তুমি একেবারে নিরাপদ, কোনো ঝক্কিঝামেলা পোয়াতে হবে না।' জানলে যে তাকে চা, জোগাবার আর

বাড়িউলিদের সম্বন্ধে এমন সব বিভীষিকা-সিরিজ শুনিয়ে দিলে যে হান্সের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোপেনহাগেনের সর্বত্রই নাকি ঐ-সব ডাইনি আর রাক্ষসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন হান্স নিজেই ভেবে দেখুক যে তার প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য কি না; হান্স তো ভয়ে এতটাই কুঁকড়ে গেলো যে ঐ বিভীষিকা-সিরিজ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুনয় ক'রে এখানেই থেকে যেতে চাইলো। তৎক্ষণাৎ সোনালি সুযোগটাকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে নিলে বাড়িউলিটি। একটা কথা তাকে সে স্পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলে যে নিদেন কুড়িটি রিগসডালের মাসিক ভাড়া না-দিলে সে তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

অধ্যাপক গুল্ডবের্গ আবার তাকে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। 'এর বেশী তুমি কিছুতেই দিতে পারবে না,' পই-পই ক'রে হান্সকে তিনি ব'লে দিয়েছিলেন। হান্স অনুনয় ক'রে মিনতি ক'রে বাড়িউলিকে বললো আরেকটু ভাড়া কমাতে, নিদেন ষোলোটি রিগসডালের নিশ্চেই হান্সকে যেন তিনি আশ্রয় দেন—না-হয় একটু কৃপাই করলেন তাকে, তাছাড়া এর বেশি আর-এক কানাকড়িও তার দেবার সাধ্য নাই। তবে বাড়িউলি কেবল মুখঝামটা দিয়ে বললে যতক্ষণ না সে আগাম কুড়িটা রিগসডালের পাচ্ছে, ততক্ষণ হান্সের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে-গোল্লায় কি ডাইনিদের রাজ্যে, তাতে তার কিছুই এসে যায় না—এই বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

একলা ঘরের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও হান্স কান্না চেপে রাখতে পারলো না। বুক ফেটে যাচ্ছিলো তার দুঃখে, যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, সেই জায়গাটায় যেন মস্ত একটা ফাঁকা গহ্বর হাঁ ক'রে আছে। চোখের জলে তার গাল ভেসে গেলো। সোফার উপরে বাড়িউলির স্বামীর একটি মস্ত ছবি ঝুলছিলো, হান্স গিয়ে, শিশুর মতো নিজের চোখের জলে আঙুল ভিজিয়ে, সেই মৃত মানুষটির চোখ ভিজিয়ে দিলো, আর ভিজে গলায় ফিস-ফিস ক'রে বললে যে তিনি তো স্বর্গে আছেন, অনুভব করুন তিনি কেমন লোনা তার চোখের জল, আর কৃপা ক'রে স্ত্রীর মন একটু দ্রব করে দিন। হয়তো এরই জন্য, বা হয়তো বাড়িউলিটি নিজের ঘরে গিয়ে ভালো করে ব্যাপারটাকে ভেবে-চিন্তে দেখেছিলো—মোট কথা, কিসের জন্য তা জানা না-গেলেও, বাড়িউলি আবার ঘুরে এসে বললে যে, আচ্ছা, তবে তা-ই হোক, হান্স যখন বলছে যে কুড়ি রিগসডালের দিতে তার কষ্ট হবে, তখন না হয় ষোলোটি কড়কড়ে মুদ্রাই দিক, হান্সকে দেখে তার এক বাৎসল্য উথলে উঠেছে যে সে না-হয় একটু ত্যাগই স্বীকার করলো। মোদ্দা কথাটা কিন্তু এই যে, ভেবে-চিন্তে সে বিচক্ষণ ভাবেই বুঝতে পেরেছিল এই বোকা ছেলেটিকে নিংড়ে এর বেশি টাকা কিছুতেই বের করা যাবে না—কাজেই যথা লাভ।

এ-কথা ভাবতেও আমাদের মন বিষাদে ভ'রে যায়, যখন দেখি হান্স তারপরে হাঁটুগেড়ে ব'সে সসম্ভ্রমে তার হাতে চুমো খেলো, আর দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন ধ'রে তাকে ভাবলে তার শুভানুধ্যায়ী ব'লে।

যত ইতর, নোংরা ও ভয়ংকর লোকের সঙ্গে হান্সের দেখা হয়েছে যে তার কোনো লেখাজোখা নেই। নীচ বলতে যা বোঝায় অনেকেই ছিলো হুবহু তা-ই। কেউ কেউ আবার, এমন কি গোটা রাজধানীর আতঙ্ক। তার উপর কত যে দুর্দশায় পড়েছে সে জীবনে, তারও কোনো সীমা নেই। যে-পথ দিয়ে শেষকালে সেই সোনালি লক্ষ্যে সে পৌঁছেছিলো, তার মোড়ে মোড়ে ছিলো কাঁটাঝোঁপ আর ফণিমনসার রাজত্ব, কাঁকড়া-বিছে আর ওই জাতীয় যত-সব হিংস্র পোকামাকড় আছে, সবাই যেন অলক্ষ্যের কোনো অদৃশ্য সংকেতে, তার পথেই ভিড় জমিয়েছিলো। কিন্তু তবু কোনো দিন জালে-পড়া মাছির মতো নিদারুণ দুর্দশাকে যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেনি। সব দুরবস্থা ও দুঃখের মধ্যেও সে বজায় রেখেছে তার বিশ্বাস, শিশুর মতো অবিচল সেই বিশ্বাস শুধু যে জীবনের প্রতি তাই নয়, সকলকে সে বিশ্বাস করতো, সব মানুষকে, প্রাণীকে। তার প্রাণের মূল জায়গাটিই যেন এই বিশ্বাস—ভবিষ্যতের জগৎ তার প্রতি মুগ্ধ-বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় তাকিয়েছিলো, সেই প্রতিভাই যেন এই বিশ্বাসেরই রাজকীয় উপহার। এই বিশ্বাসই তাকে রক্ষা করেছে সব কিছু থেকে, এটাই যেন তার রক্ষাকবচ, তার অভয়পত্র, তার মন্ত্রপড়া ধর্ম। সে যেন তার সেই ছোট্ট মেয়েটি যে দেশলাই বিক্রী করতো; বাইরে ব'সে আছে সে কালো ঠাণ্ডা বরফ-পড়া পথের উপর, আর জ্বালাচ্ছে একটার পর একটা উশখুশে বারুদ-ভরা কাঠি, আর সেই ছোট, কেঁপে-ওঠা আলোর ভিতর দিয়ে তাকাচ্ছে অন্য জীবনের প্রতি, অন্য ভুবনের এক জীবন—ঝলমলে, লোভনীয়, লাবণ্যে-ভরা, তার স্বপ্ন, তার সত্যিকার প্রাণ, সব মন্ত্র পড়া অন্তরাল তুলে দিলে যা দূরের থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে বারে বারে ডেকে পাঠায়।

'শীতে তার ছোটো হাত দুটি প্রায় জ'মে গেছে। ঠিক কথা, একটা দেশলাইয়ের কাঠি বার ক'রে দেয়ালের গায়ে ঘষলেই তো হয় তবেই তো সে হাত-পায়ে সেঁক দিয়ে গরম করতে পারে। তার আঙুলগুলো হিমে ভারি হ'য়ে বেঁকিয়ে আটকে গেছে, সহজে নড়তে চায় না, নাড়তে গেলে মনে হয় হাড়ের জোড়গুলি বুঝি চট করে খুলে আসবে। আস্তে আস্তে আঙুলগুলো সে সোজা করে নিলে, তারপর বাণ্ডিল থেকে একটা কাঠি বার করে জ্বালালো। ফ ফ ফ—ভোঁওনা! দপ করে জ্ব'লে উঠলো আগুন, সুন্দর উজ্জ্বল সোনালি আগুন, গরম আগুন, উষ্ণ তাপ, হাত দিয়ে সে আড়াল করছে। ছোট্ট মোমবাতির মতো ছোট্ট আগুন! সত্যি তখন মেয়েটির মনে হ'লো, সে যেন ব'সে আছে সুন্দর ঝকঝকে সাজানো একটা ঘরে, ব'সে ব'সে আগুন পোয়াচ্ছে। জোরে জ্বলছে ঝকঝকে আগুন—আর, কী আরাম! আরে—ঐ যাঃ,—গেলো তো ছোট্ট আগুনটুকু নিভে, মিলিয়ে গেলো তার গরম ঘরের আরাম; শুধু ধরা রয়েছে পোড়া কালো কাঠিটা তার আঙুলে।

আর-একটা কাঠি বার ক'রে সে দেয়ালের গায়ে ঘষলো। আলো পড়লো দেয়ালে, তারপরে দেয়ালটা যেন আস্তে আস্তে কাচের মতো স্বচ্ছ হ'য়ে এলো, চকচকে হ'তে-হ'তে সে যেন দূরে স'রে গেলো, আর পর্দা উঠে গেলো আলোর টানে; সে দেখতে পেলো ভিতরটা। কী মস্ত ঘর! ঐ যে টেবিলটা ধবধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা, তার উপর ঝকঝকে রূপোর থালাবাসন সাজানো—আর মাঝখানে গোল রূপোর থালায় আস্ত একটা হাঁস, এইমাত্র রোস্ট ক'রে আনলো, এখনো ধোঁয়া উঠছে, পেটটা আপেল আর শুকনো প্লাম-ফলে ঠাশা। তারপর—আরে এ কী! হাঁসটা যে টেবিল থেকে নেমে এলো, থপথপে পায়ে চলতে লাগলো মেঝের উপর দিয়ে, তার বুকের দু'ধারে ছুরি আর কাঁটা বিঁধে রয়েছে। চলতে-চলতে সেই সে চ'লে এলো ছোট্ট মেয়েটির কাছে, অমনি দপ

ক'রে জ্ব'লে উঠেই নিবে গেলো দেশলাই। তার সামনে শুধু সেই মোটা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা দেয়াল গ্যাঁট হ'য়ে দাঁড়িয়ে। আর একটা কাঠি জ্বাললে মেয়েটি। আর অমনি দেখতে পেলো, সে যেন ব'সে আছে অপরূপ একটা ক্রিসমাস-গাছের নিচে,—আর একটা ক্রিসমাস-গাছ সে দেখেছিলো সওদাগরের বাড়ির কাচের দরজা দিয়ে—কিন্তু এটা তার চেয়েও বড়ো, তার চেয়েও সুন্দর! জ্বলছে হাজার চিনে লণ্ঠন সবুজ ডালে-ডালে—প্রত্যেকটি চিনে-লণ্ঠনের গায়ে নানারঙের নানাধরণের ছবি আঁকা—ও-রকম ছবি সে যেন কোনোদিন কোনো দোকানে দেখেছিলো। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলে তাদের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটা নিবে গেলো। চিনে-লণ্ঠনগুলি যেন পাখা মেলে উড়ে গেলো অনেক, অনেক উঁচুতে। ঐ তো তারা আকাশের তারা হ'য়ে গেছে। একটা খ'সে পড়লো আগুনের লম্বা ল্যাজ আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে।

তা হ'লো হান্সের নিজেরই উজ্জ্বল ঝলমলে সোনালি কল্পনা যা—তাকে রক্ষা করেছে সব বিপদ ও বিড়ম্বনা থেকে। যা তাকে অক্ষত নিয়ে এসেছে খ্যাতির চূড়োয়, পাদপ্রদীপের আলোয়, ঠিক যেমন ভাবে এই বিষাদে-ভরা ছোট্ট দেশলাইউলিটিকে তা দিয়েছিলো স্বর্গের শান্তি। 'মেয়েটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে গরম হ'তে চেয়েছিলো,' মেয়েটির মৃতশরীরের আশ-পাশে পোড়া কাঠিগুলোকে প'ড়ে থাকতে দেখে লোকেরা বলাবলি করেছিলো, কিন্তু হান্স আরেকটি পংক্তি যোগ ক'রে দিয়েছিলো তার পরে: 'কেউ জানতে পেলো না কী সুন্দর সব ঝলমলে দৃশ্য দেখতে পেয়েছে মেয়েটি, আর কোন দিব্য দেশে সে গিয়ে পৌঁছেচে এখন।'

যত দেশলাইয়ের বাক্স ছিলো তার, পরের মাসগুলোয় সবগুলো তাকে ব্যবহার করতে হয়েছিলো। তার বাড়িউলি সেই রান্নাঘরেই বেলেল্লা অভ্যাগতদের সমাদর করতে নিয়ে আসতো, অথচ গোড়ায় সে কিনা বলেছিলো যে হান্স ইচ্ছে করলে সেখানে ব'সে-ব'সে আরাম করতে পারে। কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে, সন্ধ্যে ছ'টার আগেই তাকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে বিছানায়, কেননা রান্নাঘরে নিরঙ্কুশ চলেছে নষ্টামি, আর সেই অবস্থায় সেখানে ব'সে থাকা এমন কি দেবদূতের পক্ষেও অসম্ভব। তাতে অবশ্য সে কিছুই মনে করতো না। আছে তো তার একটি মোমবাতি, একটা রেকাবিতে রাতের খাবার, আর বই—কল্পনার সেই বিশ্ব, যেখানে তার মুক্তি। তাছাড়া নিজেই সে আরেকটি পুতুলের নাটাশালা বানিয়ে নিয়েছিলো, বাড়িউলির কাজে-অকাজে সাহায্য ক'রে যে-কয়েকটা পয়সা সে বখশিস পেতো, তা-ই দিয়ে সে কিনে আনতো ছোটো-ছোটো পুতুল, সাজাতো তাদের মখমল আর রেশমের টুকরো-টাকরায়, আর ঐ সব টুকরো-টাকরা জোগাড়ের জন্যই মাঝে মাঝে গিয়ে হাজির হ'তো কাপড়ের দোকানে।

জামা-জুতোর জন্য এক কপর্দকও থাকতো না তার; ঐ যোলোটা রিগসডালের জোগাড় করাই কী প্রাণান্তকর হয়রানির ব্যাপার, তার উপর আবার পোষাক-আশাক! প্রত্যেক মাসে গুল্ডবের্গ তাকে দিতেন দশটি মুদ্রা, ভেইসে দিতেন আরো কিছু, কিন্তু হ'লে হবে কী, তাতেই চলে না। গির্জের দীক্ষা দেবার সময় যে-ছোট্ট মেয়েটি তাকে লাল গোলাপ উপহার দিয়েছিলো, তার সঙ্গে আবার হঠাৎ একদিন দেখা হ'য়ে গেলো হান্সের; কথায়-কথায় শুনলো মেয়েটি নাকি কোপেনহাগেনে এসেছে, কাজেই উৎসাহের সঙ্গে তক্ষুণি সে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো; এটা সে ভালো ক'রেই জানতো যে এমন হরবোলার পোষাক প'রে ও-রকম একটা ধনীবাড়িতে যাওয়া যায় না, বড্ড বেখাপ্পা ঠেকায় তা, চোখে লাগে—এত বেমানান, কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভীষণ ইচ্ছে হলো তার, ভাবলো মেয়েটি নিশ্চয়ই তাতে কিছুই মনে করবে না, আর তাহ'লেই তো হ'লো। না-হয় জামা-জুতো তার তালি আর পা ট্রিতে কিম্ভুতই—কিন্তু তাতেই বা কী? সেদিনকার সেই ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু এখন দস্তুরমতো এক রূপসী তরুণী—কুমারী ট্যেঙের লুণ্ড তার নাম, যাকে বলে পুরোদস্তুর এক মহিলা! এই ব্যাপারটা চিরকালই হান্সের কাছে রহস্যময় ঠেকেছে—মেয়েরা কী ক'রে এত চট ক'রে বড়ো হ'য়ে যেতে পারে? দেখা হতেই হান্স মগ্ন হ'য়ে এই বিষম রহস্যটা ভাবতে শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, তার আন্দাজে মোটেই কোনো ভুল হয়নি, সত্যি তাকে দেখে মেয়েটি খুব খুশি হ'য়ে উঠলো। মাসি আর বন্ধুদের সঙ্গে হান্সের আলাপ করিয়ে দিলে সে। তাদেরও খুব ভালো লেগে গেলো হান্সকে—অন্য একটা জগতের ইঙ্গিত পেলো তারা তার ভিতর; হাত-পা নেড়ে ছটফটে ভাবে সরল ভঙ্গিতে সে যা বলে, কোথাও একটুকু ভেজাল নেই তাতে। সারাক্ষণ নকল খুশি আর মিথ্যে প্রশংসা শুনে-শুনে তাদের প্রায় পাগল হ'য়ে যাবার জোগাড় হয়েছিলো, এরই মধ্যে হান্স তাদের দিলে সুন্দর ও সতেজ একটি জীবনের খবর, যেখানে এখনো লোকেরা আন্তরিক। তার গল্প আর কবিতার ভাণ্ডারও তাদের খুব মজা দিলে, আর সে-সব আবৃত্তি করতে-করতে দিব্য ও দীপ্ত এক আগ্রহে এমন ভাবে সে ভ'রে ওঠে যে তাকে ভালো না বেসে তাদের উপায় রইলো না। ফলে হ'লো কি, এক-এক ক'রে প্রত্যেকেই হান্সকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেললো। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই হান্স কোপেনহাগেনের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের আড্ডায় পরিচিত হ'য়ে গেলো। প্রায়ই তারা তাকে ছোটো-ছোটো উপহার দেয়, যা তার কাজে লাগে—আর ট্যেঙের লুণ্ড তার গয়নাগাটি কেনার টাকা থেকে বেশ একটা অংশ দিয়ে দিলো তাকে, 'তোমাকে কিন্তু নিতেই হবে, হান্স। না হ'লে আবার তার মন খারাপ হ'য়ে যাবে।'

লোকের কাছ থেকে সাহায্য নেবার বেলায় হান্স কিন্তু খুব বাস্তবিক, যতটুকু তার দরকার ঠিক ততটুকুই সে নিতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সে কিছুতেই নেবে না। দারিদ্র্যের সব কোপ আর খোঁচাই তার জানা, সে জানে কত ছোটখাটো তিক্ত ও নির্মম দুঃখ মেনে নিতে হয় গরিব হ'লে, কিন্তু তবু লোভ ছিলো না তার একটুও, কিছুতেই লোলুপ হ'তে শেখেনি সে। 'হ্যাংলামি করা উচিত নয় কোনো কবির,' উত্তর জীবনে এই কথা সে লিখেছিলো একবার, তার সঙ্গে আরো বলেছিলো, 'আর অনাহারেও থাকা উচিত নয় তার!' আর এই দুটি কথার মধ্য দিয়ে সে জীবনযাত্রাটি ফুটে বেরোয়, ঠিক সেই ভাবেই জীবন ধারণ করতো। এক রাজার গল্প সে বলতো প্রায়ই, সেই-যে এক অসুস্থ রাজা ছিলেন, যাঁকে বলা হয়েছিলো যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোকটির জামা গায়ে দিলেই তিনি সেরে উঠবেন; তা, শেষকালে যখন সবচেয়ে সুখী লোকটিকে পাওয়া গেলো, তখন দেখা গেলো যে তার কোনো জামা-ই নেই।

বাধ্য হ'তে হয়েছে হান্সকে, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের

কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে বারে বারে। যেই শুনতে পেলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকটি আসলে ফিন-এর এক চাষির ছেলে, তক্ষুণি তার বুকের ভিতর সাহস এলো, গিয়ে সে দেখা করলে তাঁর সঙ্গে, আর অচিরেই দেখা গেলো গ্রন্থাগারিকটি তাকে যে-কোনো বই নিতে দিয়েছেন, 'অবশ্য তোমাকে কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দিতে হবে, আর খুব সাবধান, দেখো যেন কোনো-রকমে নষ্ট না-হয়'। বইয়ের জন্য হান্সের তীব্র একটি খিদে ছিলো ছোটো থেকেই, এখন যোগ্য সময় বুঝে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এখন তার চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে গেলো কথকতার একটি নতুন দিগন্ত, সে হাতে পেলো স্যর ওয়াল্টার স্কটের মস্ত উপন্যাসের তর্জমাগুলি, আর যেন তারই ভিতর দিয়ে নিজেই গিয়ে পৌঁছলো স্কটল্যাণ্ড নামক একটি ছোট্ট দেশে, পাহাড়ে-ভরা শ্যামল দেশ একটি, আর অল্পদিনের মধ্যেই তা যেন তারই একটি অংশ হ'য়ে উঠলো। বাস্তব জীবনেও জগৎ যে ধীরে ধীরে তার সব দুয়ারগুলি খুলে দিয়ে তাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিচ্ছিলো সংগোপনে। অধ্যাপক গুল্ডবের্গ এটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে নিক্তিমাপা পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে লেগে-থাকা তাঁর ছাত্রটির পক্ষে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার, কোনো রসকষই সে পাবে না এর ভিতর থেকে, বরং ভিতরটা যেন একেবারে শুকিয়ে যাবে; সেই জন্যই এক বৃদ্ধ অভিনেতাকে অনেক ব'লে-ক'য়ে নাটক পড়াবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ক'রে দিলেন: 'এতে যদি হান্সের মনে উদ্দীপনা জেগে ওঠে।' আর এবার খুব গম্ভীরভাবেই মন-প্রাণ দিয়ে পাঠাভ্যাস করতে শুরু করলে হান্স; প্রথমে তাকে দেয়া হ'লো বিদূষকের ভূমিকাগুলি শিখে নিতে, কিন্তু মোটেই তা তার মেজাজের সঙ্গে খাপ খেলো না; শেষে সে নিজেই একদিন ব'লে ফেললে সে তাকে কোরেগিয়োর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেয়া হোক, সেই মস্ত চিত্রকরের বিষণ্ণ জীবনটি তাকে যেন ভিতর থেকে টানে, তা-ই হয়তো সে ওই ভূমিকায় সফলও হ'তে পারে। 'কিন্তু নাটকের নায়ক আবার কখনো ঢ্যাঙা আর রোগা হয় না কি, হয় না কি অমন চিমশে দেখতে?' বৃদ্ধ অভিনেতাটি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানিয়ে ব'লে উঠলেন। ভিতরে ভিতরে ভীষণ ক্ষুণ্ণ হ'লো হান্স, যেন কোনো ক্ষত স্থানে লবণ ছিটিয়ে দেয়া হ'লো। কিন্তু তবু দিন-রাত ধ'রে ওই ভূমিকাটি নিয়েই সে প'ড়ে থাকলো কিছুকাল, তারপর সেদিন সে গোটা নাটকটি তাকে আবৃত্তি ক'রে শোনালো, তার গলার স্বরের উত্থান-পতন ও অন্তলীন আবেগের তাপ ও স্পন্দন সেই বৃদ্ধ অভিনেতাটিকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। 'না, এটা মানতেই হয় যে, বোধ তোমার আছে, অনুভূতির তীব্রতা রয়েছে প্রচুর', তিনি বললেন, 'কিন্তু অভিনেতা তুমি কোনো কালেই হ'তে পারবে না। কী যে তুমি হবে, তা কেবল এক ঈশ্বর জানেন।' তারপর একটু ভেবে তিনি আরো বললেন, 'তোমার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক'রে লাতিন ব্যাকরণ শিখে নেয়া উচিত।'

শেখো, শিখতে থাকো, শিখে নাও। করো পাঠাভ্যাস, নাও উপদেশ, কণ্ঠস্থ করো লাতিন ব্যাকরণ। কী আশ্চর্য, চিরকাল ধ'রে এই কথাগুলোই কি তাকে বারে-বারে শুনে যেতে হবে? প্রত্যেকে যেন চক্রান্ত চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে, একের পর এক সকলেই যে তাকে এই কথাটি ব'লে দিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই এর ভিতরে গোপনে লুকিয়ে আছে কোনো বিরুদ্ধ মন্ত্রণা—যেন সবাই যুক্তি ক'রে তার বিরোধিতা করতে চাচ্ছে। ওডেন্সে থেকে আসার সময়ে পথে যে-যাত্রীটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিলো, তার ছেলে লাতিন শিখেছিলো; যাত্রীটির পরামর্শ নিতে গেলো হান্স। অমনি মাথা নেড়ে তাকে বলা হ'লো, 'লাতিন হ'লো ভীষণ খরুচে ভাষা—শিখতে হ'লে অনেক টাকা বেরিয়ে যায় জলের মতো।' তা যাত্রীটি এ-কথা বললে কি হবে, অধ্যাপক গুল্ডবের্গ এমনকি তারও একটা সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এবার অবশ্য বেজায় গর্বের ভঙ্গিতে, গলার স্বর ভারিক্কি ক'রে, লোককে বলা যাবে যে 'আমি লাতিন শিখছি;' কথাটা বলতেই কেমন একটা রাজকীয় মেজাজ আসে, কিন্তু অচিরেই লাতিন ব্যাকরণ তার কাছে কঠিন ঠেকলো, শুধু কঠিনই নয়—প্রতিকূল ও বিতৃষ্ণ। তার মনে হ'লো সে বরং অভিনয়কলা শিখলেই ভালো করবে,—তার শিক্ষকটি অবশ্য ব'লে দিয়েছেন যে অভিনেতা হওয়া তার বরাতে নেই, তবু সেই অসম্ভবের সাধনাও এর চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপক ও সতেজ।

দুর্ভাগ্য বশত সবাই কিন্তু একই কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে। তখন কোপেনহাগেন ছিলো বেশ ছোট্ট একটি নগর, আর হান্স ইতিমধ্যেই নিজেকে এতটাই জাহির ক'রে ফেলেছিলো যে, সকলেই যেন তাকে চিনে নিয়েছিলো। লোকেরা এই অদ্ভুত নাছোড়বান্দা একরোখা ছেলেটির কথা বলাবলি করতো নিজের সঙ্গে; আর কুমারী ট্যেগুের লুণ্ডের সহায়তায় রাজকন্যার একটি সখীর সঙ্গেও তার দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো, রাজবাড়ির ছোট্ট একটি বসার ঘরে একদিন তার ডাক পড়লো, আমন্ত্রণ পেয়ে সে গিয়ে ভিতরে ঢুকতেই রাজকুমারী এসে একবার তাকে দেখা দিয়ে গেলেন; বেশ মজা লাগলো তার ছেলেটিকে দেখে; তাকে গান গাইতে বললেন তিনি, বললেন আবৃত্তি ক'রে শোনাতে, তার পরে হান্সের সব কৃতিত্বই স্বচক্ষে অভিনিবেশ সহকারে দেখে তাকে দশটি রিগসডালের উপহার দিলেন তিনি, আর দিলেন একটা ঝুলিভর্তি ক'রে মিষ্টি আর ফলমূল। এত সব উপহার পেয়ে হান্স তো রীতিমতো ঘাবড়েই গেলো; সেখানেই সব খেয়ে ফেলার সাহস তার হ'লো না, অর্ধেকটা সে নিয়ে এলো তার বাড়িউলির কাছে—কেননা, হান্স কোথায় গেছে, তা সে ভালো ক'রেই জানতো।

রাজকুমারী এবং অন্যান্য বন্ধুজনেরা তাকে বললেন, রাজার কাছে একটি বৃত্তির জন্যে আবেদন জানাতে। ষষ্ঠ ফ্রেডেরিক তখন ডেনমার্কের রাজা, প্রজাদের সব আবেদন তিনি নিজে পড়েন, নিজেই সব খুঁটিনাটির খোঁজ রাখেন এবং নিজেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে হুকুমনামায় শীলমোহর ক'রে দেন। হান্সের মতো বিনত'ও দীন কিশোরের আবেদনপত্র পর্যন্ত তিনি নিজেই পড়লেন। আবেদন-পত্রটি লিখতে গিয়ে হান্স তার সব শুভানুধ্যায়ীদেরই সাহায্য নিয়েছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও নাট্যশালার অধ্যক্ষের কাছ থেকে একটি বিবৃতি চেয়ে পাঠালেন রাজা। বিবৃতি যা এলো, তা উগ্রভাবেই তার প্রতিকূল। তাতে বলা হ'লো যে, 'হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেনের মোটেই কোনো গুণ নেই, তা ছাড়া দেখতেও সে কদাকার; তার নাচ, গান, অভিনয়—কোনোটাতেই কোনো আশা নেই। কাজেই তাকে সাহায্য করার কোনোই মানে হয় না—ওসব তার

হবে না। এই বিবৃতি অনুযায়ীই কাজ করা হ'লো ; বাতিল হ'য়ে গেলো তার আবেদন।

কিন্তু মঞ্চের উপরে সে গেলোই একদিন। ব্যালে-নাচের স্কুলে নাচ শেখে তো সে ; এক রাত্তে তাকে বলা হ'লো যে সব ছাত্রকেই ভিড়ের দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করতে হবে, তাদের সকলকেই, এমন কি তাকে সুদ্ধ।

এই প্রথম বার নিজের পোষাক সম্বন্ধে সে সত্যিকার ভাবনায় পড়লো ; দীক্ষা নেবার সময়ে যে কোট পরেছিলো এখনো কোনোরকমে তাকে মাপসই ব'লে চালিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু তারও তো নানা জায়গাতেই ছোটো-বড়ো কতকগুলি ফুটো রয়েছে, ওদিকে ওয়েস্টকোটটা আবার এত আঁটো হয় যে কিছুতেই সোজা হ'য়ে বুকটান করে দাঁড়ানো চলে না, কেন না, তাহ'লে আবার পাৎলুন আর ওয়েস্টকোটের মাঝখানটার উদরের কিছু অংশ বেরিয়ে পড়বে ; তার উপর সেই বিখ্যাত টুপিটা এখনো তার চোখের উপর এসে পড়ে। হান্স আণ্ডেরসেনের কাছে এ-সব হ'লো নিছকই কতকগুলি বাধা মাত্র, কিন্তু তাই ব'লে পোষাক নেই ব'লে এই সুযোগটা তো আর হেলায় হারানো চলে না, সত্যিকার—একেবারে অকৃত্রিম মঞ্চের উপর দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে সে, সেই সুযোগ কি আর সামান্য পোষাকের খাতিরে নষ্ট করে দেয়া চলে? কাজেই মঞ্চের উপরে যখন সে গেলো, তখন সকলের পিছনে নিজেকে ঢেকে রাখলে, যাতে তার ওই হাস্যকর পোষাক দর্শকদের চোখে না পড়ে। কিন্তু ঘটনাচক্র বাধ সেধে বসলো—এড়াতে চাইলেই কি আর সব সময় এড়ানো যায়? হঠাৎ গায়কদের মধ্য থেকে একজন, তার আবার রসিক ব'লে দারুণ নামডাক—তার হাত চেপে ধরলো, তারপর হিড় হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে এলো পাদপ্রদীপের সামনে, একেবারে ঝলমলে আলোয়, আর চেঁচিয়ে বললো, 'দিনেমার দর্শকদের কাছে তোমাকে উপস্থিত করাবার গৌরবটা আমাকেই দাও।' ছুটে মঞ্চের উপর থেকে পালিয়ে গেলো হান্স, আর দৌড়ুতে দৌড়ুতেই অনুভব করলে যে স্বাভাবিক ভাবেই তার চিবুক বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

তারপরেই সহৃদয় ডালেন ছোট্ট একটা ভূমিকা দিলেন তাকে একটি ব্যালেতে ; রচনাকার ছিলেন তিনি স্বয়ং, ফলেই দিতে পারলেন তাকে। তাও ভূমিকাটা আর কতটুকুই বা! কয়েকটি ভবঘুরে লোকের কথা ছিলো ব্যালেটাতে, ঘুরে-ঘুরে যারা খেয়াল-খুশিমতো খাপছাড়া গান গেয়ে বেড়ায়। এই ভবঘুরে গায়কদের ভিতরেই হান্সকে নেয়া হ'লো, কিন্তু অবশেষে এই প্রথম সে ছাপার হরফে নাম দেখলো নিজের ; 'ভবঘুরে গায়ক—আণ্ডেরসেন!' ব্যালে-নাচের প্রোগ্রামটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ালো সে দিনের পর দিন ; রাত্তে বিছানায় শুয়ে কাগজটার ভাঁজ খুলে মোমবাতির মিটমিটে আলোয় নিজের নাম ভাখে, কী আশ্চর্য, তার নাম কি না ছাপার হরফে বেরুলো! তার মনে হ'লো অমরতা কা'কে বলে সে যেন মুহূর্তে জেনে ফেলেছে, এখন তো নরলোক থেকে সোজা সে চ'লে গেছে সুরলোকে, যেখানে অমরগণ ঘুরে বেড়ান। আর, সত্যিই, সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু এখনো রয়েছে ওডেন্সের জাদুঘরে, আরেকটা প্রোগ্রামও আছে সেখানে ঠিক এরই মতো, তবে সেটার উপরে অভিনেতাদের বিষয়ে নানা রকম মন্তব্য তিনি করেছিলেন হিজিবিজি হাতের লেখায়—তার মধ্যে একজন আবার পরে ডেনমার্কের সবচেয়ে নামজাদা অভিনেতৃরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি হলেন যোহানে হাইবের্গ। এই দ্বিতীয় প্রোগ্রামটা এখন আছে কোপেনহাগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'বদান্যতার শিশু' আসলে কিন্তু তা-ই ছিলো হান্স। তাকে নির্ভর করতে হ'তো অন্যলোকের দানশীলতা ও অনুকম্পার উপর ; আর শুধু তা-ই নয়, ভয়ানক কষ্টে কাটতো তার জীবন—আরাম যাকে বলে কোনোদিনও সে তাকে চোখেই ভাখেনি ; উপরন্তু ছিলো বাড়িউলির কড়া ব্যবহার, যে তাকে বারে বারে জালাতন ক'রে দিতো। তবু, এত সব সত্ত্বেও, সেই সব কষ্টের দিনেও হান্স নিংড়ে নিংড়ে বের করে নিয়েছে সুখের ফোঁটা, পরম সুখের মুহূর্ত এসেছে তার জীবনে ; তারই মধ্য থেকে সে নিষ্কাষিত করে নিয়েছে প্রাণবন্ত প্রফুল্লতা, ফুটিয়ে তুলেছে উল্লাসের ফুল, যার প্রতিটি পাপড়িতে সঞ্জীবনী সুগন্ধ জড়িয়ে আছে। বয়েস তার কম, আছে সে কোপেনহাগেনে, আর এই তো একমাত্র পথ, যে-পথ দিয়ে গিয়ে একদিন সে দাঁড়াবে গিয়ে সূর্যাস্তের সমুদ্রতীরে, যেখানে রশ্মিজ্বলা দিগন্তের ঘণ্টা বেজে উঠে তাকে অন্য ভুবনের সংকেত জানিয়ে দেবে। 'ভুল পথে চলছিনা', এই বোধটাই তাকে প্রফুল্ল ক'রে রাখতো সব সময়। ফ্রেডেরিক্সবের্গে একদিন গিয়েছিলো রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে, ফিরে এসে রাজবাড়ির চারপাশের প্রমোদবীথিকায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালো সে একা-একা ; দু'বছর পরে আবার সে শ্যামল গ্রামদেশে ফিরে যেতে পারলো যেন—এই তো তার চারপাশে ধীরে ধীরে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে বসন্তের গন্ধ-ভরা জ্যোতির্ময় একটি সকালবেলা, তরুণ বীচগাছের মুকুলগুলি পাপড়ি মেলে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে, কচি সবুজ একটি আভা সব দিগন্তে, ঝর্ণা আর ছোটো-ছোটো স্রোতের ছলছলানি—সব যেন তাকে উৎসাহে আর উল্লাসে ভরে দিলে, যেন তার হৃৎপিণ্ডের উপর ঝ'রে-ঝ'রে পড়লো প্রাণের ফোঁটা, আর তা অধীর ভাবে শুষে নিয়ে আবার সেই হৃৎপিণ্ড সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠলো। রক্তের ভিতর তার গান জেগে উঠলো ; জড়িয়ে ধরলো সে তরুণ একটি গাছকে, ডালেপালায় ফুল ফুটিয়ে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে তার বাহু মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন গাছটি ; চুমো খেলো সে তার গায়ে, আর গান গাইতে শুরু ক'রে দিলো চেঁচিয়ে।

'পাগল নাকি তুমি?' কাঠখোট্টা একটা কর্কশ গলা প্রায় ধমকে উঠলো যেন। বাগানেরই এক মালি সে, আর তাকে দেখেই হান্স আঁৎকে উঠলো, আর-কোনো কথা নয়, সোজা ছুটে গেলো সে বাগানের বাইরে, কিন্তু কিছুই, কিছুই কেড়ে নিতে পারলো না তার মুগ্ধ উল্লাসকে, হঠাৎ যা তাকে এই সকালবেলাটিতে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে।

ডালেন-এর বাড়িতে যেতে খুব ভালো লাগতো তার ; সেখানে তার ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা জামা দেখে কেউ-কিছু মনে করে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করে না। তার সরলতাকেও কেউ উজবুকমুখো ব'লে ভাবেনা কেউ, বরং সেই বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা তো তাকে দেখলেই খুশিতে লাফিয়ে উঠে স্বাগত জানায়। সবচেয়ে ছোটদের জন্য মাঝে-মাঝে সে নিয়ে আসতো তার পৌত্তলিক নাট্যশালাটি, আর আনতো কাগজ কেটে-কেটে সুন্দর ছবি, যে সব ছবি বানাতো সে, সেই সব। তার শিশুবন্ধুরা সে-সব এত যত্ন ক'রে সংগোপনে রক্ষা করেছিলো যে এখন তাদের অনেকগুলিই জাদুঘরে সাজানো র'য়ে গেছে।

ব্যাঙ্ক-স্কুল থেকে তাদের নাম কাটিয়ে দিতে সন্তুষ্ট হই হয়েছিলো ডাকিম-গ্রন, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েই হ'লো একদিন; তাঁর কিন্তু তখনও একবোঝা জেদির মতো থিয়েটারের টানে পাগল হয়ে আছে। ইতিমধ্যে তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্যভাবে আগেকার আটকো ফিরে পেয়েছে, আর এটা খেয়াল করে এবার সে গেলো গানের ইস্কুলের শিক্ষকমশাইয়ের কাছে, এবং যথারীতি আঠার মতো লেগে থেকে একদিন সে গির্জের গায়কদলে যোগদান করবার অনুমতি পেয়ে গেলো। গির্জেতেই থিয়েটারেও সে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে গেলো। কিন্তু সে-সব ভূমিকা যে মোটেই জুলজুলে সাফল্য ঝলমল ক'রে উঠলো না, তা, এমন কি, সে-ও বুঝে নিতে পারলো। একবার তাকে একটি ডাকাতপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিলো; খাঁটির মতো ক'রে মাথার চুল বেঁধে দীর্ঘ শিখায় রূপান্তরিত করা হ'লো, আর পরনে থাকলো গোলাপি রংয়ের আঁটো জামা; এতো কাহিল আর রোগা দেখালো তাকে যে পরের বার যখন সে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো, তিনি তাকে বললেন যে, সেদিন তাকে থিয়েটারে একটা ঝলসানো বেড়ালের মতো দেখাচ্ছিলো।

মস্ত সব লোকদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে বসার আশ্চর্য একটি ক্ষমতা ছিলো তার, আর তার ফলে অনেক উপকৃত হয়েছিলো সে। কালক্রমে একদিন রাবেকদের সঙ্গে তার ভাব হ'য়ে গেলো, দিনেমার দেশের সারস্বত-সমাজে যদি কারো আধিপত্য তৎকালে থেকে থাকে তো সে রাবেকদের। প্রথম যেদিন দেখা হ'লো রাবেক তার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না, কিন্তু শ্রীমতী রাবেক বেশ সহৃদয়ভাবে সহানুভূতির সঙ্গে হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেন নামক বালকটির গল্প ও কবিতা শুনলেন। এখন থেকে সে মুখে মুখে ছড়া কাটতো না, এমন কি গল্পগুলো পর্যন্ত সে লিখে ফেলতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো, আর নিজের সেই সব রচনা কাউকে যদি প'ড়ে শোনাবার সুযোগ পেতো তো অক্লান্তভাবে একের পর এক কেবল সে শুনিয়েই যেতো। একদিন শ্রীমতী রাবেক তার হাতে একটা ফুলের তোড়া তুলে দিলেন, তার পর প্রায় স্বর্গের দেবীর মতো প্রসন্নভাবে তাকে বললেন, এই তোড়াটা তাঁর একজন মহিলাবন্ধুর কাছে পৌঁছে দিতে হবে,—'আসলে কোনো কবি নিজের হাতে তাঁকে ফুলের তোড়া দিচ্ছেন, এতেই আমার বন্ধুটি খুশি হ'য়ে যাবে'।

হান্স আণ্ডেরসেনের মনে হ'লো এইমাত্র সে যেন আগুনে ঝাঁপ খেয়ে পড়লো। এই প্রথমবার কেউ তাকে 'কবি' বলে সম্বোধন করলে। মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে শ্রীমতী রাবেকের হাতে চুমো খেতে ইচ্ছে করলো তার। তৎক্ষণাৎ, অতি সঙ্কটে, তার ব্যথাভরা চোখ দুটি টলটলে জলে ভ'রে গেলো আর পরক্ষণেই চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল—এত আনন্দ হ'লো তার যে সেই চাপেই তার বুক যেন কোনো অনির্দেশ্য ও অস্পষ্ট কষ্টে ভ'রে গেলো; কিন্তু এবার আর চোখের জলের জন্য একটুও লজ্জা করলো না তার। হঠাৎ এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে সে যেন দেবতার এক নির্দেশ আবিষ্কার করে নিলে, যেন দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা দিলে তাকে এই কথাগুলি; মুহূর্তে সে বুঝে নিলে কী তাকে করতে হবে অতঃপর, কী তার ভবিষ্যৎ। লিখতে হবে তাকে, লিখে তাকে অমর হ'তে হবে। কবিতাই হ'লো সেই কাগজের নৌকো, যাতে চ'ড়ে তাকে পাড়ি দিতে হবে দূরের সমুদ্র। ঝড় উঠবে, উঠবে তুফান আর রাগি হাওয়া, সমুদ্র কেঁপে উঠে পাঠিয়ে দেবে পাগল ঢেউ, গিলে খেতে চাইবে তাকে রাগের বশে, কিন্তু তবু হার মানলে চলবে না, শক্ত হাতে ধ'রে থাকতে হবে হাল, আর ধীরে ধীরে সব কিছুর মধ্যে অবিচল থেকে দিগন্তের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার ছোট্ট, অস্থির, সুন্দর কাগজের নৌকোটি।

[ক্রমশঃ।

কোন এক সৈনিকের গান

[কবিতাটি ইংরাজী কবিতার ছায়াবলম্বনে]

সুজিতকুমার নাগ

কামান বুলেট বন্ধু ভাই
এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই
প্রাণ চায় শুধু প্রাণ নিতেই
ছারখার করি বুলেটেতেই।

ধুপ ধুপ করি পা চালাই
'আমি জীবনের শান্তি চাই'
আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াই
কখনো কখনো বোমা ছড়াই;
যদি বা কখনো মুক্তি পাই।
যারে পাই আমি তারে জানাই
'আমি জীবনের শান্তি চাই'।

এই বনপথ সবুজ ঘাস
কার ফেলে গেছে দীর্ঘশ্বাস।
তবু প্রাণ চায় শান্তি চায়
আর 'পে আকাশে যুদ্ধ হায়।

ওপরে শুধু কি নীলাকাশ?
মাটিতে যাদের দীর্ঘশ্বাস।
কি জানি কেন যে মুক্তি চাই
মুঠো মুঠো করে গুলী চালাই।

এখানে রয়েছে মম শিবির
দূরে যেন দেখি স্নেহ-নিবিড়
যদি বা কখনো মুক্তি পাই
'আমি জীবনের শান্তি চাই।'

ধারাবাহিক উপন্যাস

রাণু ভৌমিক
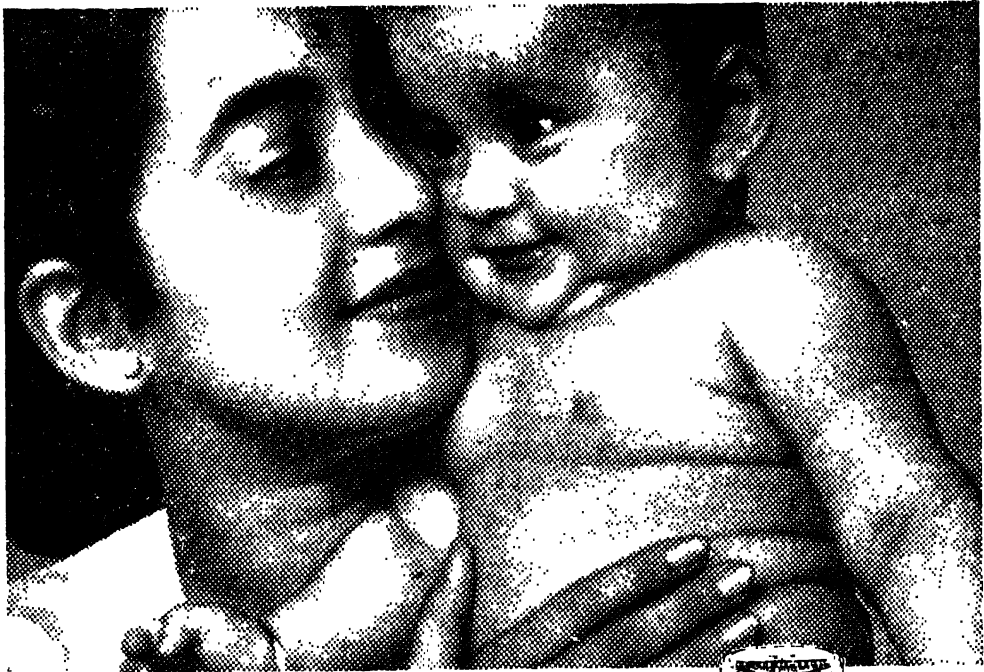
অখিল বসু পুলিশ-কর্মচারী, সাধারণ নামের নিতান্তই সাধারণ একটি লোক। গৃহজীবনে অপরাপর পাঁচজনের মতই ডাল, ভাত, মাছের ঝোল খান। কোন কোনদিন বা মাংস, চাকুরীজীবনে উর্ধ্বতনদের উপদেশ শুনে এবং অধস্তনদের আদেশ দিয়ে সময় কাটান। অবসর সময়—খানিকটা আড্ডা, খানিকটা সিনেমা এবং বাকীটা কেটে যায় অলসতায়। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটি।

এ-হেন সাধারণ লোকের জীবনেও লাগে অসাধারণত্বের ছোঁয়াচ। এক সন্ধ্যায় তিনি চিঠি পেলেন একটি। আর চিঠিটা পড়বার পরেই পৃথিবী আশ্চর্যভাবে বদলে গেল তাঁর চোখে। প্রত্যহের বন্ধন ছিঁড়ে সেই সন্ধ্যারহস্যের অবগুণ্ঠনের আবরণের আড়াল থেকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। অখিলবাবুর মনে হল, বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে আকাশ, জল, মাঠ, মাটি। না, ঠিক বদলান নয়, কি যেন একটা অন্য রং লেগেছে তাদের গায়ে। তারা তেমনি আছে, তবু তারা তা নয়।

তেমনি বদলে গেছেন অখিল—নতুন রং। লাগল চোখে। সামনে জ্বলে উঠল আলো।

কি আশ্চর্য সেই চিঠি!

প্রিয়বরেষু,

প্রতি রাত্রে আমি তোমাকে চিঠি লিখব, দিনের উজ্জ্বল আলোর সেই চিঠি এগিয়ে যাবে—সর্বাঙ্গে ডাকপিয়নের ছাপ নিয়ে আর প্রতি সন্ধ্যায় তুমি পাবে সেই চিঠি।

তুমি আমাকে চেন না। চেনবার দরকারও নেই। কোন চিঠিতেই থাকবে না পরিচয়ের এতটুকু স্বাক্ষর। যাদের চেনাতে চাই তাদের চিনলেই সার্থক হয়ে উঠবে এই চিঠিগুলি।

তুমি আমাকে চেন না। আমি জানি, চিনতে তুমি চাও-ও না। কিন্তু যদি কখনও চিনতে চাও তবে একটু ভেবো—শুধু একটু ভেবো আমার কথা। শ্রাবণ-সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে ভেব—বর্ষার অবর্ষিত সিক্ততায় যখন আকাশ ম্লান হয়ে থাকে, ছোট ছোট তারাগুলি দেখা যায় না, তখন পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল একক তারাটির দিকে তাকিয়ে ভেবো আমার কথা—আমাকে চিনতে পারবে। রাত দুপুরে ঘুমভাঙা চোখে তাকিও কোণে রাখা রজনীগন্ধার গুচ্ছের দিকে—আঁধারঘেরা সেই অম্লান শুভ্রতা বলে দেবে আমার পরিচয়।

তুমি আমি ছাড়া আর কেউ যদি এই চিঠিগুলি পড়ে সে কিংবা তারা হয়তো জানতে চাইবে আমার পরিচয়। কিন্তু, তাদের সেই কৌতূহল মেটাবার দায় নেই আমার। তবু ভাবতে ভাল লাগছে, অনেক লোক ভাবছে আমার কথা। জানতে চাইছে আমি কে? কিন্তু, কোনদিনই তারা চিনতে পারবে না আমাকে—এ রহস্যের অবগুণ্ঠন হবে না উন্মোচিত।

আমি জানি, তুমি আমার পরিচয়ের কথা ভাবছ না। তুমি ভাবছ, হঠাৎ কেন লিখছি এ চিঠি।

কেন?

তোমার পথ আমার পথ আজ এক হয়ে মিশে গেছে। তুমি যাকে বিদ্যুতের আলোতে পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছ তাদেরই আমি চিনতে চাইছি অন্তর-আলোকে। তুমি তাদের দেহকে শাস্তি দিতে চাইছ, আমি প্রকাশ করতে চাইছি তাদের মন। ক্ষতবিক্ষত দেহের আড়ালে ছোট এক টুকরো মন লুকিয়ে আছে, কারো বা তাও নেই তবু সেই মনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।

পথে পথে যে সকল মেয়ে শিকার খুঁজে ঘুরে বেড়ায়, পথচারিণী সেই সব পতিতাদের তুমি আটকে রাখবার, শাস্তি দেবার ভার পেয়েছ। এ তোমার ওপরওয়ালার আদেশ। সমাজের কল্যাণের জন্য, সমাজের এই সব দূষিত ক্ষতকে দূরে রাখবার কর্তব্য তোমার।

মানবদেহের শিরার মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে কত শত শত পথ। আর সেই পথে অভিসারে চলেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারী। রক্তের ধারার মত অবিরাম সেই গতি কি করে জানবে কোন কণিকা শ্বেত কোনটা বা লোহিত?

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা যায়। কিন্তু সে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তোমার নেই। পুলিশের চাপরাশ পরে তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ কয়েদী। মানুষের মনের খবর কোথায় পাবে?

কে পতিতা? বলতে পার কে পতিতা নয়? তুমি যে বাড়ীতে কাজ করছ তারি পাশে আর একটি এমনি প্রকাণ্ড বাড়ী। ফিকে হলদে রং প্রতি চার বছর অন্তর বাড়ীটাতে নূতন রং দেওয়া হয়, তাই পুরানো হয়েও প্রায় নতুনের মত আছে বাড়ীটা। ঐ বাড়ীটারই চারতলার একটা ফ্ল্যাট। মাসে চারশো টাকা ভাড়া। সেখানে ফার্নিচারই আছে কয়েক হাজার টাকার। একটি সোফা সেটের দামে একটি পরিবারের সংসার চলে যায় এক বছরের। সেখানেই থাকেন

মিসেস দে। মুক্তো-বসানো গয়না, বব্ড্ চুল আর খাঁটি প্যারিসীয়ান মেক-আপ। দেখে মনে হবে, স্বর্গের ইন্দ্রাণী। কিন্তু, একটু নেড়ে চেড়ে নাও—ইন্দ্রাণীর খোলস থেকে আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়বে এবং তার সঙ্গে মনোরমার কোন তফাৎ নেই। মনোরমার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—যাকে তুমি গড়ের মাঠের কোণে ধরেছিলে—হাঁ, ধরবার-সঙ্গত কারণ তোমার ছিল টর্চ জেলে অত্যন্ত.......

যাক্, সে কথা। মনোরমার কাছে তুমি পেয়েছিলে মাত্র পাঁচটি টাকা। সে কেঁদে বলেছিল এই-ই সে পেয়েছে। যে জন্ত সে লজ্জা, ভয়, মান, সম্মান এবং দেহকে বিসর্জন দিয়েছে এক কুৎসিত, অপরিচিত ব্যক্তির নিকট। সেই মেয়েটির সঙ্গে কোন তফাৎ নেই এই মিসেস দে'র। দুজনেই...

থাক, ওদের কথা পরে হবে। পুরো এক একটি সন্ধ্যা ব্যয় করবো ওদের পেছনে। এক একটি চিঠি—এক একটি চরিত্র। যে মেয়েগুলি শুধু দেহের রেখায় রেখায়িত হয়ে আছে তোমার কাছে—এই চিঠির লেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তারা। প্রাণসঞ্চার হবে দেহে। কাজেই এখন থাক মিসেস দে আর মিনতির উপাখ্যান।

মিসেস দে'র কথা তুললাম শুধু এইটুকু তোমাকে বোঝাবার জন্ত যে, পতিতাবৃত্তি শুধু তোমাদের দেওয়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিশেষ স্থানে গণ্ডিবদ্ধ নেই—এ ছড়িয়ে আছে সমগ্র পৃথিবীতে।

শুধু আজ নয় যুগে যুগে, কালে কালে।

কা'কে তুমি বলবে পতিতা? আমি আবার প্রশ্ন করছি। বলতে পার কে পতিতা নয়? ঐ দেখ, কুমারী কুন্তী পুত্রকে জলে বিসর্জন দিয়ে ধীরপায়ে গৃহে প্রত্যাগতা। দেখতে পাচ্ছ, পঞ্চস্বামীর এক স্ত্রী দ্রৌপদীকে? আরও এগিয়ে যাও। রামায়ণের যুগে কি বলবে তুমি বালি-সুগ্রীব স্ত্রী তারা, রাবণ-বিভীষণ পত্নী মন্দোদরী আর পাষাণী অহল্যাকে?

তবু তো আজও লোকে বলে :—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা: স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম॥

এই পাঁচ কন্তার নাম স্মরণ করলে মহাপাতক নাশ হয়।

তবে? কোন স্পর্ধায় তুমি শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছ মিনতি, বেলা, রেখা, চামেলা ইত্যাদিদের? এদের অসতীত্বের নির্মোক খুলে নাও, দেখবে এরা কত ভাল। কত কঠিন প্রয়োজনের তাড়নায় এরা বাধ্য হয়ে অসতী হয়েছে।

এদের কথাই আমি লিখব—আর লিখব তাদের কথা প্রেমের ভুল পথে চলে, কিংবা প্রবৃত্তির বিকৃত রুচিতে যারা নেমে এসেছে এ পথে...আর হ্যাঁ, তাদের কথাও লিখব যাদের নাগাল তুমি কোনদিনই পাবে না। প্রাসাদের উঁচুতলায় অধিবাসিনী মিসেস দে'র মত কয়েকটি নারী। আজ এখানেই ইতি।

প্রথমেই আমি বলবো অনামিকার কথা। অনামিকা ওর নাম নয়। এই নাম আমি-ই দিয়েছি।

সন্ধ্যার রক্তরাগ যখন মুছে যায়, হঠাৎ একসঙ্গে জলে উঠে চৌরঙ্গীর আলোগুলি, যেন সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে হেসে উঠলো নিদ্রিতা রাজকুমারী, তখনই, কিছুক্ষণের জন্ত চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার

মোড়ে দাঁড়িও। অনেক কিছুই দেখতে পাবে। দেখবে অপেক্ষমান গাড়ীর সারি অন্ধকারে বিচিত্রদেহ জীবের মত দাঁড়িয়ে আছে। এপাশে যত অন্ধকার ওপাশে তত আলো। আর, সেই আলোতে অবগাহিত হয়ে কুরূপ স্বরূপ হয়ে উঠছে—সুন্দর হচ্ছে সুন্দরতর। কত লোক, কত ভীড়, কত আনন্দ, কত হাসি!

একটুক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে, একটি ওপাশের জনতা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। দুপাশে সাদা দাগ দেওয়া কালো পথ। সেই পথ পেরিয়ে ও এসে দাঁড়ায় এদিকে আলো থেকে অন্ধকারে। গাড়ীগুলি পরিত্যক্তের অবহেলা বুকে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায় এই পথচারিণী নারী।

ট্রাফিকের নীল আলো জ্বলে ওঠে। সেদিকে একবার তাকিয়ে ও চলে সামনের দিকে। তীরের মত ঋজু ওর দেহ, শান্ত দৃঢ় কমনীয় মুখ, বিষণ্ণ কালো চুল, উদাস কঠিন পদক্ষেপ—আর দুটি পাথরের চোখ।

পাথরের চোখ! কি কঠিন! কি নীরব! কি শান্ত। কোন যুগের—কত আগের এই চোখ দুটি। তারপর কত পরিবর্ত্তন এসেছে পৃথিবীতে—বদলে গেছে আকাশ, বাতাস, মাঠ, মাটি। কিন্তু চিরন্তন কঠিন হয়ে রইল ঐ দুটি চোখ।

কিন্তু, পাথরে কি আগুন থাকে? ওর চোখে আলেয়ার আগুন। যে আগুন সৃষ্টি করে না ধ্বংস করে।

প্রতিদিন এমনিভাবে এগিয়ে যায় ও দুধারে সাদা দাগে ঘেরা কালো পথে। একটু পরেই ওকে অনুসরণ করতে থাকে লোক—এক বা একাধিক।

ব্যস। আর নয়। ঐখানেই দাঁড়িয়ে পড় তুমি। শুধু দেখ, কি ভাবে ওরা ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে।

এমনি ভাবেই রোজ দাঁড়িয়ে থাকতাম দেখতাম, ঋজুদীর্ঘ একটি দেহ কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন দিকে না হেলে কি ভাবে মিলিয়ে যায়। ওকে দেখতে ভাল লাগতো তাই দেখতাম। নইলে, কোন কৌতূহল ছিল না ওর সম্বন্ধে। জানতে চাইনি ওর জন্ম-কাহিনী, শৈশব-বিবরণ, যৌবন-কামনার ক্লেদাক্তময় ইতিহাস। কল্পনাও করতে চাইনি কি হবে ওর ভবিষ্যতে! কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা ভোগ করবে প্রৌঢ়ত্বের ধূসর বেলায়। কখন এগিয়ে আসবে ক্লান্ত-করুণ মৃত্যু।

একদিন জানতে চাইলাম। রহস্যভেদ করতে চাইলাম রাত্রি-রূপিণী পৃথিবীর মত এই নারীর। ও চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বসে রইলাম পুকুরপাড়ের মেটে রংয়ের স্মৃতিস্তম্ভটির পাশে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না—হঠাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে ঢং ঢং সুরালো সুরের রং মাখিয়ে দেয় সময়ের পায়ে···

মধুর আবেশে চোখ বুজে আসে। চোখ বুজবার আগে একবার ভাল করে তাকাই আর তখনই আবেশ টুটে যায়—এক তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকার যেন ছুটে আসছে। কালো আঁধারপথে কালো শাড়ী পরে ফিরে আসছে অনামিকা।

কিন্তু, এই কি অনামিকা? কোথায় তার সেই উদ্ধত ভঙ্গী! দু পাশের সাদা দাগে একটুও না হেলে যে পথ চলে।

ওর প্রতি পদক্ষেপে হতাশা আর অবাক হয়ে চেয়ে দেখি পাথরের চোখে জল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি আমি। মাত্রানুযায়ী ব্যবধান রেখে দাঁড়াই ওর পেছনে।

একবার শুধু মুখ একদিকে হেলিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়। তার পরে সোজা চলতে থাকে।

পেরিয়ে যাই চৌরঙ্গীর আলোকিত সুন্দর পথ। পেরিয়ে যাই ধর্মতলার জনতা। পেরিয়ে যাই প্রশস্ত একটু ঢিমে আলোয়-ঘেরা ঘুমের আলোয় ভরা চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

বৌবাজারের নোংরা রাস্তা পেরিয়ে সঙ্কীর্ণ এক গলির মুখে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কোথায় যাচ্ছি আমি? আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি! বলো কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী!

সোনার তরী নয় নিতান্তই জীর্ণ শীর্ণ এক পণ্যতরী। আর, পারের খবরও আমি জানি। ঐ তো কালো আঁধারের পটভূমিকায় কালো একটি দ্বার। তার গায়ে ঝুলছে লক্ষ লক্ষ তালা। যুগযুগান্ত থেকে কত লোক কতভাবে সেই দ্বার খুলবার প্রয়াস করেছে। কিন্তু, কখনও উন্মোচিত হয়নি এই নারীদের হৃদয়দুয়ার। আজ আমি আবার সেই চেষ্টাই করছি—দেখি কি হয়।

ঢুকবার মুখেই একটা ডাষ্টবিন। কিন্তু ডাষ্টবিনে কেউ ময়লা ফেলে নি। সমস্ত নোংরা স্তূপীভূত হয়ে আছে চারপাশে। মিটমিটে গ্যাসের আলো। স্যাঁৎসেঁতে গলি। সেই গলির শেষ প্রান্তে থাকে অনামিকা।

মরচে-ধরা তালায় ঝনঝন শব্দ, ক্লান্ত পদক্ষেপ আর নিঃশব্দ একটি ছায়া। অনামিকার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকি। এতক্ষণে অনামিকা প্রথম কথা বলে, বসুন।

তক্তপোষের উপর সাদা ধবধবে চাদরঢাকা বিছানা। পাশে একটা সাদা টেবিলক্লথ পাতা টেবিল—টেবিলের উপর কাচের গ্লাশ ঢাকা দেওয়া এক কুঁজো জল। সমস্ত ঘরে আর কিছুই নেই—এমন কি দেয়ালে একটি ক্যালেণ্ডারও নেই।

আর কিছুর প্রয়োজনই বা কি? পিপাসা মেটাবার জন্য রয়েছে পানীয়—আসঙ্গ পূরণের জন্য শয্যা। তৃপ্তি না হোক প্রয়োজন তো মিটবে।

অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি আমি। পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও বিরাগ জমাট আঁধারের মত ঢেকে আছে তার মুখে। হঠাৎ সে মৌন নিঃশব্দ পদে বিছানায় উঠে বসে। আহ্বান জানায় ইঙ্গিতে।

—না। বলি আমি।

—না! বিস্মিত-বিরক্ত কণ্ঠ ওর।

দ্বিধা না করে মুঠো খুলে ঘামে-ভেজা দুটি কাগজ ওকে দিই। সামান্য দু টুকরো কাগজ—যা একটা বিশেষ ছাপ পড়ে অনন্য হয়ে উঠেছে। যা ওকে দেবে ক্ষুধায় অন্ন, বিপদে আশ্রয়, নগ্নতায় আচ্ছাদন।

নোট দুটো ওর হাতে দিতে আগুন জ্বলে ওঠে। বলে, আমি ভিখারী নই। আমি—

—তুমি কি? বিদ্রূপভরা প্রত্যুত্তর আমার।

—আমি ব্যবসায়ী।

—ব্যবসা?

—হ্যাঁ। অন্য মূলধন আমার নেই, তাই দেহকেই ব্যবহার করছি মূলধনরূপে, ইস্পাতকঠিন কণ্ঠ ওর।

একটু থেমে আক্রোশভরে বলে, দান করে যদি দাতা সাজবার ইচ্ছে

থাকে তবে চলে যান পথে। ফুটো পয়সা ছড়িয়ে দিন—দেখবেন কত উলঙ্গ, অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভিখারী জুটবে আপনার চারি পাশে। শুষে নেবে সেই দয়াধারা। মনে জাগবে আত্মপ্রসাদ।

আত্মপ্রসাদ! হাসি আমি। মনে মনে বলি, তাই কি তুমি পাচ্ছ না? তোমার এই অহমিকাই বিচ্ছিন্ন করেছে তোমাকে। দেহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে দেখছে দেহের যন্ত্রণা, দেহের মরণ।

—হাসছেন কেন? সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করে ও।

—দেহ সম্বন্ধে তোমার কি সংস্কার?

—দেহ সম্বন্ধে আমার কি সংস্কার! যন্ত্রচালিতার মত উচ্চারণ করে। আর যাই হোক এই ধরণের কথা আশা করেনি ও।

—হ্যাঁ। গম্ভীর কণ্ঠে বলি, কেন এই মন্তব্য করলাম তা পরে বলবো। এখন শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সকলের কাছ থেকেই টাকা নাও, তবে আমার কাছ থেকে নিতে কি আপত্তি?

—কারণটা আগেই বলেছি, অনামিকা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, আমার আহ্বানে সাড়া দেননি আপনি। তাই আমি বুঝতে পারলাম আপনার এখানে আসবার উদ্দেশ্য ভিন্ন—হয়তো আপনি জীবনকে দেখার উদ্দেশ্য মেটাতে এসেছেন কিন্তু আমার সময়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

—ভেবে নাও যে সেই সময়ের ক্ষতিপূরণই আমি করছি। দান হিসেবে কেন নিচ্ছ?

—ভেবে নেব? চিবিয়ে চিবিয়ে ও বলে, ভেবে আমি কোন জিনিব নিই না। আমি উচিতমূল্যে জিনিষ বিনিময় করি। আমি ব্যবসায়ী—কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী নই। আর সামনে আয়না থাকলে বুঝতে পারতেন কেন আমি দান ভেবেছি। শুধু দান নয় তাচ্ছিল্যভরা দান।

—সামনে আয়না থাকলে? বিহ্বল-কণ্ঠে আমি বলি।

—তাহলে দেখতে পেতেন কি অপরিসীম ঘৃণা ও অসীম আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল আমার আহ্বানে। ঘৃণা···পরিপূর্ণ নির্জলা ঘৃণা।

ওকে বাধা দিয়ে বলি, তোমার ধারণা ভুল। ঘৃণা করি না আমি তোমাকে। ঘৃণা করি এই পারিপার্শ্বিককে—এই চিরন্তন রীতিকে। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরতম ও পবিত্রতম কাজ—যাতে উপ্ত রয়েছে সৃজনের মহান আনন্দ, বিরাট বিপুল উদ্যম, বিষাদঘন বেদনা, তাকে আহ্বান জানাবো এই বিরক্তি-বিদ্বেষ-ভরা মনে। সৃজনকে আহ্বান করবো ধ্বংসের ক্ষেত্রে—

আমার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অনামিকা বলে, তবে কেন এসেছেন?

—এসেছি, তোমাকে পেতে নয়, তোমাকে জানতে। সংক্ষেপে ওকে এই কথা বলি। মনে মনে বলি, এসেছি গ্রুচারিণী, রাত্রি-রূপিণী হে নারী, তোমার হৃদয় অন্বেষণে। বার বার কল্পনার অলস নয়নে যে নারীর আত্মাকে দেখেছি, পেয়েছি, হারিয়েছি।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপরে, আমি আবার বলি, এসেছি তোমাকে পেতে নয় তোমাকে জানতে। কিন্তু, তোমার দেহ-বোধ এত প্রবল যে দেহের দুয়ার ভিন্ন অন্ত কোন পথই খোলা নেই।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। মৃদু-মধুর স্বাভাবিক হাসি। সেই হাসির দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, অন্তর-বাতায়ন মুক্ত কর।

—কি সুন্দর কথা বলেন আপনি! ও বলে।

—কি সুন্দর বোঝ তুমি? উত্তর দিই আমি।

তারপরে ধীরে ধীরে খুলে যায় অন্তর-দুয়ার। সেইদিন, সেই মুহূর্তেই নয়—অনেক অনেক দিন পরে। জানতে পারি অনামিকার কথা।

দূর থেকে মনে হয়েছিল অনামিকার কথা বুঝি বিশেষ একটি মেয়ের কথা। ওর ঋজু দেহে পাথরের মত কঠিন চোখে যেন একটা ছাপ ছিল—স্বতন্ত্রতার ছাপ। আজ দেখলাম ওর অন্তর আর পাঁচটি মেয়েরই মত। অনামিকার কথা যে কোন নারীর অন্তরের কথা—একটি নারীর ঘর বাঁধতে চাওয়ার ইতিহাস।

সেই সে কোন জলাজঙ্গল ভরা নগণ্য একটি গ্রাম। সেখানেই জন্মেছিল অনামিকা। বাবা ওর দিনমজুর। দিনগত রোজগার, খরচও দিনে দিনে। দিনের শেষে ফেরার পথে চাল ডাল কিনতো—রোজগারের পরিমাণ অনুসারে মাছ, তরকারী। রাত্রিতেই রান্না করে খেত ওরা—বাসিভাত পরদিন।

অনামিকার মা ছিল স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় সে একগাদা শুকনো কাঠ নিয়ে বাড়ীতে ঢুকতো। আঁচলে থাকতো লাউ, কিংবা বেগুন সিম। কখনও কিছু থাকতো না। কিন্তু শুকনো কাঠের বোঝা সব সময়ই নিয়ে আসতো সে। স্বামী ফেরবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রান্না শেষ—ওর রান্নার ক্ষিপ্রকারিতায় অবাক হয়ে যেত পাড়ার লোক।

স্বামীকে কখনও সে এক পয়সা সঞ্চয় করতে বলে নি। অবশ্য ও বললেই কি আর ওর স্বামী শুনতো? তা নয়। তবু, বলে থাকে তো সব মেয়েরাই। কিন্তু সে স্বভাবই ছিল না ওর। স্বামীর চেয়ে আরও অনেক বেশী যাযাবর মনোবৃত্তিসম্পন্না ছিল ও। ঘরের চাল ফুটো, দাওয়া ভাঙ্গা। তাতেই পরম আনন্দে বাস করতো সে। কোন অসন্তোষ কিংবা আকাঙ্ক্ষা ছিল না তার মনে। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করতে বসতো। স্বামী ফিরলেই হাসিমুখে হাত থেকে জিনিষপত্র নিয়ে রান্না চাপিয়ে দিত। রান্না করতে করতেই ওদের মধ্যে হাসাহাসি গল্প চলতো। কথাকাটাকাটি কিংবা রাগারাগি কেউ কখনও শোনে নি।

পরদিন সকালে উঠে বাসি ভাত স্বামী-কন্যাকে দিয়ে সে বের হতো পাড়া সফরে। আবার দিনের শেষে একবোঝা শুকনো ডালপালা নিয়ে ফেরা—এই তার প্রত্যেক দিনের রোজনামচা।

প্রতিবেশিনীরা কেউ যদি বলতেন, এ তোদের কেমন ব্যবহার? দিনমজুরের রোজগার আজ আছে কাল হয়তো থাকবে না—কিছু কিছু করে রোজ জমাতে পারিস না? যদি কোনদিন কাজ না পায় তবে কি করবি?

একগাল হেসে অনামিকার মা উত্তর দিত, ভগবান জোটাবেন।

ভগবান ও স্বামীর উপর অখণ্ড বিশ্বাস রেখে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত অনামিকার মা। বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করে রাখবার দিকে নজর ছিল না তার। নজর ছিল না নিজের দেহের দিকে।

এই রকম বাবা-মা'র মেয়ে হয়ে একদম বিপরীত স্বভাব হল অনামিকার। দৈত্যকুলেই প্রহ্লাদের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই ওর গোছানো স্বভাব। বিয়ে-বিয়ে খেলার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন সব ফেলে ছড়িয়ে চলে যেত ও গুছিয়ে রাখতো সব। একটুকরো জিনিসও ফেলে দিত না। প্রতিবেশীরা পরিহাস করে ওর নাম দিয়েছিল গিন্নী। পাড়ার বয়োবৃদ্ধারা বলতেন, হাঁ, উড়ুনচণ্ডীর মেয়ে লক্ষ্মীরাণী।

বেরুবার সময় রোজই ওর মা বলতো, চল আমার সঙ্গে।

—না, আমি খেলব। উত্তর দিত অনামিকা।

—একা-একা কি খেলবি? অবাক হয়ে বলতো ওর মা।

—এখন একা খেলছি, পরে আরও আসবে।

বিরক্ত হয়ে ওর মা চলে যেত আর গাছের তলায় ছোট উনুন, মাটির হাঁড়ি-কড়া নিয়ে ভাত-তরকারী রান্না করতে বসতো সেই মেয়েটি। পুরানো আমগাছের তলাটা পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে নিয়েছিল সে। ছোট ডুরে শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজে লেগে যেত। কত কাজ—এক মুহূর্ত অবসর নেই। এই ঝাড়ছে, এই গোছাচ্ছে, এই রাঁধছে।

একা খেলতে হতো না, অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে জুটতো ও বাড়ীর পটলি, ঝণ্টু, হরু, গোপাল।

পটলি রোজই এসে ঝগড়া করতো অনামিকার সঙ্গে, তুমি রোজই বৌ হবে কেন? একদিন ননদ হও।

কিছুতেই রাজী হতো না অনামিকা। অন্যান্য বিষয়ে সে মৃদুমধুর এবং বিনীত হলেও এই একটা বিষয়ে সে স্থিরসঙ্কল্প। শেষটা ওর নামই হয়ে গিয়েছিল বৌ।

যখন আরও একটু বড় হলো খেলাঘর গেল ভেঙে। কিন্তু, সেই খেলাঘরের স্বপ্ন বাসা বাঁধলো মনে। নিজেদের ছোট ঘরটিকে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে রাখতো অনামিকা। উঠোন ঝেঁটিয়ে সমস্ত নোংরা সরিয়ে দিত বহুদূরে—গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিত। একটা পবিত্র ঝকঝকে ভাব ঘিরে থাকতো সমস্ত বাড়ীটাকে। বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে প্রতিবছরই কিনতো নানা আকারের নানা রংয়ের পুতুল, চিত্রবিচিত্র কলস, রঙীন পাখা। তাকের উপর ঝেড়ে পুঁছে সাজিয়ে রাখতো। পেতলের কলসটিকে মেজে মেজে সোনার মত উজ্জ্বল করে ফেলেছিল। জল ভর্তি করে সেই কলস এনে বারান্দায় রেখে দিত ঢেকে। উঠোনের কোণে ছোট তুলসীচারাটি এতদিন পড়েছিল অনাদৃত হয়ে—অনামিকার বাড়ী ফিরে কোনরকমে কাপড়ের সলতেতে তেল লাগিয়ে একটু আগুন লাগিয়ে মাটিতেই নামিয়ে দিত। নমস্কার করে মাথা তুলতে না তুলতে নিবে যেত সে প্রদীপ।

সেই তুলসীতলা মাটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধিয়ে দিল অনামিকা। সাদা ধবধবে মাটি জ্যোৎস্না রাত্রে দেখাত উজ্জ্বল শ্বেতপ্রস্তরের মত। চারিপাশে বুনে দিল লাল, নীল, হলদে নানা রঙের সন্ধ্যামালতী ফুল। টুকরো পাথরের মত ঝকঝক করতো ফুলগুলি। বেল আর রজনীগন্ধা থেকে ভেসে আসতো মিষ্ট গন্ধ। অনামিকার বাবা হেসে বলতেন, মেয়ে আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

এও যেন এক খেলা। অন্ততঃ তাই ভাবতো ওর বাবা মা।

মাঝে মাঝে অনামিকা বেড়াতে যেত রায়বাড়ীতে। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ওরা। ধনী নয় সম্পন্ন। একান্নবর্তী পরিবার। প্রকাণ্ড উঠোনের চারিপাশে ঘর। কতকগুলি ঘরের টিনের ছাউনি, দেয়াল ও মেঝে সিমেণ্ট বাঁধান। কয়েকটি ঘরের টিনের চাল, ছিটের বেড়া আর মাটির মেঝে। মাটির মেঝেগুলিই যেন সিমেণ্ট বাঁধানোর মত ঝকঝক করতো। উঠোনে কিছু না কিছু শস্য সব সময় মজুত থাকে। লোকজনের আনাগোনা, নতুন শস্যের গন্ধ, কৃষাণদের বচসা, বধূদের হাস্য পরিহাস, কর্তাদের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ সব মিলে যেন এক একক সৌন্দর্য। গরু, বাছুর, ছাগল, বেড়াল প্রয়োজনীয় পরিজনের মতই আসছে যাচ্ছে। নিকানো পরিষ্কার বারান্দায় একরাশ পেতল-কাঁসার বাসন উপুড় করা রয়েছে। রৌদ্রের আলোতে সেগুলি সোনার মত ঝকঝক করছে। ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চার পাঁচজন মিলে কুটনো কুটছে—থালায় থালায় কোটা তরকারী—পান-রসসিক্ত মুখের আদেশ নির্দেশ, সকলের ব্যস্ততা, শিশুদের উল্লাস ও ক্রন্দন সব মিলে বাড়ীটা যেন রূপকথার রাজ্য। অন্ততঃ তাই মনে হতো অনামিকার কাছে। সে দাওয়ায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকতো—আর একদৃষ্টে দেখতো এই অপরূপ মায়ার খেলা। বাড়ীর বৌরাও এই শান্ত মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে ভালবাসতেন। নিজেরা যখন জলখাবার খেতেন ওকে কিছু দিতেন। মাঝে মাঝে দু-একটা কাজের ফরমাসও করতেন। ওকে বলতেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। অমন মায়ের এমন মেয়ে।

বাড়ী ফিরেও রায়বাড়ীর কথাই ভাবতো অনামিকা। ঐ বাড়ীর বৌ হওয়াই তার জীবনের স্বপ্ন সাধনা। কবে সেও ঠিক এমনিভাবে রায়বাড়ীর বৌদের মত ব্যস্ত পায়ে ছুটোছুটি করবে। শাশুড়ীর অযৌক্তিক আদেশ নিয়ে আলোচনা করবে নিজেদের মধ্যে, গোপন পরিহাস চাপা হাসিতে মুখ রাঙিয়ে ঝনাৎ করে চাবীর গোছা পিঠে ফেলে ব্যস্ত পায়ে অসমাপ্ত কাজ তুলে নেবে।

শ্রীচাঁদ, নিত্যানন্দ, নিরঞ্জন নিজেদের ছোট বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগত না তার। তাই দিনের অধিকাংশ সময়ই রায়বাড়ীতে কাটিয়ে আসতো সে। একটা বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে এসেছিল ওবাড়ী থেকে। কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে বাচ্চাটাকে এত বেমানান দেখালো যে পরদিনই সে বাচ্চাটা ও বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে এল।

ওর মা অবাক হয়ে বলে, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এলি কেন? বেশ তো ছিল।

কোন উত্তর দেয় না অনামিকা।

—কি রে কথা বলছিস না কেন?

—কি বলবো?

—বেড়ালের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এলি কেন?

—ছেড়ে না দিলেও পালিয়ে যেত। এই শূন্যপুরীতে কেউ থাকতে পারে না কি?

কথার ধরণে এবং মুখের ভাবে অবাক হয়ে ওর মা তাকিয়েছিল ওর দিকে। চিন্তার কয়েকটি রেখা ফুটে উঠেছিল মুখে। রাত্রে স্বামীকে বলেছিল, মেয়ের বিয়ে দাও।

—সে কথাও শুনতে পেয়েছিল অনামিকা। একই ঘরে শুতো তারা। অনামিকা ও মা একটি খাটে অপর খাটে বাবা। তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পেল মা বলছে, অনামিকার বিয়ে দাও।

—কেন? প্রশ্ন করছিল ওর বাবা।

—মেয়ের মন যেন উড়ু-উড়ু। বিয়ে না দিলে কেলেঙ্কারীতে পড়বে!

—দূর। যত সব বাজে কথা। কথাটা উড়িয়ে দিল ওর বাবা।

জীবনে এই প্রথম মায়ের মতকে মেনে নিল অনামিকা। মনে মনে স্বীকার করলো, মায়ের বুদ্ধি আছে। সত্যই তার মন উড়ে যাচ্ছে অনেক দূর দেশে। বড় একটা বাড়ীর ছোট একটি বউ। কিন্তু কে তাকে নিয়ে যাবে কল্পনার সেই দেশে? কোথায় সেই রাজপুত্র? যে রাজপুত্র আসবে মাথায় টোপর পরে হাতে নিয়ে ফুলের মালা?

বাবা মায়ের কথাটা উড়িয়ে দিল বলে বাবার ওপর রাগ হলো। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হ'ল, বাবা, আমি জেগে আছি। আমি সব শুনেছি। আমি বিয়ে করব।

কিন্তু, মনে যা ভাবা যায় মুখে তো তা বলা যায় না? কাজেই অনামিকা চুপ করেই রইল। শুধু সেদিন-ই নয় দিনের পর দিন।

বিয়ের কোন চেষ্টাই করল না ওর বাবা। মায়ের তাগিদ, প্রতিবেশীদের উপদেশ সবই নীরবে উপেক্ষা করত প্রকৃতপক্ষে, তার খুব ইচ্ছে ছিল অনামিকার খুব ভাল বিয়ে দেবে। কিন্তু, যতটা সাধ ছিল তার শতাংশের এক অংশও সাধ্য ছিল না। পাছে কেউ সেই অক্ষমতাকে উপহাস করে সে জন্যই খুব জোরের সঙ্গে বলত, অনামিকার বিয়ে দেব না। ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ঘরে বলতো, অনামিকার বিয়ে দেব রাজার ঘরে।

ওর মা ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে উত্তর দিত, হ্যাঁ দিনমজুরের মেয়ে হবে রাজার ঘরের বৌ। মিনসের আশা কত?

কিশোরী অনমিকা কিন্তু বাবার কথা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করতো। ওর তখন যা বয়স সে তো বিশ্বাস করবারই বয়স। কল্পনার চোখে ও রাজার ঘরের বৌ হয়েছে। রাজার ঘরকে তার রায়বাড়ীর মত-ই মনে হতো—তবে আরও ঐশ্বর্যময়। সকলের সুখ সুবিধের ব্যবস্থা করে ব্যস্ত পায়ে সে ছুটোছুটি করছে প্রশস্ত অঙ্গনে। চারিদিক থেকে সবাই ডাকছে তাকে—বৌমা, বৌদি, দিদি, কাকীমা। দুপুরের কাজ শেষ হলে সকলে মিলে হাসি গল্পে একসঙ্গে বসে খাওয়া। দুপুরে সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সেইরকম এক দুপুরে রায়দের বাড়ীতে গিয়েছিল অনামিকা। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। নিস্তব্ধতার এত সৌন্দর্য্য! তারের শুকনো কাপড়গুলি হাওয়ায় উড়ে এদিক ওদিকে দুলছে। উঠোনে শুকোচ্ছে বীজধান, সারা বৎসরের তুলে রাখা কলাই; এঁটো বাসন জড়ো হয়ে একপাশে পড়ে আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু পায়রাগুলির বকম বকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে মাকে ফাঁকি দিয়ে আমবাগানের ছায়ায় লুকোচুরি খেলছে। এই দৃশ্যটি অনেকদিন তার মনে ছিল—নিজের নিরানন্দ গৃহে দুপুরের রোদ যখন অসহ্য হয়ে উঠতো তখন সে কল্পনায় দেখতো এই ছবি।

এমনি এক দুপুরে রায়বাড়ী থেকে বেরুবার পথে থমকে দাঁড়ালো অনামিকা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ যুবক। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ওর মুখটি লালচে হয়ে উঠেছে আর সেজন্যই বোধহয় এত অসহায় ও করুণ দেখাচ্ছে।

—শুনুন, ছেলেটি বলে, রায়দের বাড়ীটা কোথায় জানেন?

—হ্যাঁ জানি। উত্তর দেয় অনামিকা, সেখান থেকেই তো এলাম।

—আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন?

—চলুন। অনামিকা পথ দেখিয়ে অগ্রসর হয়।

—আপনি ও বাড়াতে কেন যাচ্ছেন? চলতে চলতে প্রশ্ন করে সে।

—আমি ওদের আত্মীয়—বেড়াতে এসেছি। ছেলেটি উত্তর দেয়।

তারপরে অনেক কথা হয়। অনামিকার নাম জানতে পারে ছেলেটি—অনামিকাও জানে, ছেলেটির নাম রতন। কলকাতায় ব্যবসা করে। কর্তাদের সম্পর্কে ভাগনে হয়।

অনামিকার কল্পনার রাজপুত্র রূপ নিল এই সহরের ছাপমারা নবাগতে। প্রথম দর্শনেই কিশোরা অনামিকা ওকে ভালবেসে ফেলল। রায়েদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে যায় পথ। অনামিকার শুধু মনে হতে থাকে এই পথ যদি না ফুরাতো, যদি অনেকক্ষণ ধরে সে এই ভাবে রতনের পথপ্রদর্শিকা হয়ে যেতে পারতো। সেদিন রতনের কি মনে হয়েছিল, তা সে জানে না।

পরদিন ভোরবেলাতেই দেখা হয়ে যায় অনামিকার সঙ্গে। কতকগুলি ফুল আঁচলে বেঁধে বাড়ীর দিকে ফিরছিল অনামিকা। রতন বোধ হয় বেরিয়েছিল প্রাতর্ভ্রমণে। রতন-ই ডেকে কথা বললো। হয়তো সে দেখেছিল অনামিকার চোখের মুগ্ধতা। তাই সাহস করলো।

—কোথায় যাচ্ছেন? প্রশ্ন করে রতন।

—বাড়ী। সংক্ষেপে উত্তর দেয় অনামিকা।

—চলুন। আপনাদের বাড়ীতে যাই।

—সে কি! চমকে ওঠে অনামিকা। ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। যদি সত্যই রতন তাদের বাড়াতে যায়—দেখতে পায় তাদের শ্রীহীন গৃহস্থালী! সে বড় লজ্জার কথা। না, না, অনামিকা কিছুতেই তা সহ্য করতে পারবে না।

—চলুন না, ওদিকটায় যাই। ওদিকে চমৎকার একটা জলা আছে। যাবেন? রতনের মন অন্য দিকে নেবার জন্য বলে অনামিকা।

রতন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়।

সেই ভোরের মিষ্টি রাঙা আলোতে, গাছের ছায়াঢাকা পথে যেতে যেতে অনামিকার মুখের দিকে তাকায় রতন। অনামিকাও ঠিক তখনই তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই রতন চোখ সরিয়ে নেয়। অনামিকাও। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে অনামিকা তাকিয়ে দেখে রতন ঠিক তাকিয়ে আছে তার দিকে। এবারে দুজনেই হেসে ফেলে। সেই চোখ আর হাসিতে কেটে যায় অপরিচয়ের কুয়াশা। গল্প করতে সুরু করে ওরা।

জলার জল ঘন নীল। সেই মনোরম প্রভাতে জলের বুকে হাঁসের খেলা, পাড়ের ঘন আমবনে কোকিলের ও ঘুঘুর ডাকে চঞ্চলা হয়ে ওঠে অনামিকা। কথা বলতে বলতে সব কথাই কখন বলে ফেলে—তার বর্ত্তমান দুঃখের কথা, তার স্বপ্নের কথা।

—তাহলে তো আপনাকে শীগগিরই বিয়ে করতে হবে? পরিহাসভরা কণ্ঠে বলে রতন।

—হ্যাঁ। বিয়ে আমি করবই। কিন্তু, বাবা-মা'র স্থির করা বিয়ে করবো না। সে বিয়ে করে ঠিক এমনি ভাবেই জীবন কাটাতে হবে।

—আসলে আপনার রায়বাড়ীর কোন ছেলেকে বিয়ে করতে ইচ্ছে। হেসে বলেছিল রতন।

প্রতিবাদ করে নি অনামিকা। তার কিশোর মনে সবই সম্ভব মনে হয়েছিল। রায়বাড়ীর ছেলে কেন রাজপুত্রকে বিয়ে করাও অসম্ভব নয় তার কাছে। কিন্তু, রাজপুত্রের চেয়ে রায়বাড়ীর ছেলেই তার কাছে কাম্যতর।

তারপর, রোজই দেখা হত। এ ক'দিন অনামিকা একবারও রায়েদের বাড়ী যায় নি। ওর কি রকম লজ্জা করতো। ভয়ও হতো। মনে হতো সকলের সামনে সে রতনের দিকে তাকাতে পারবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে ওর মনের কথা।

বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে যেত—ওরা বসেই থাকতো। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অনামিকা গম্ভীর ভাবে বলেছিল, বেড়াতে যাই, তাই রাত হয়। মা আর প্রশ্ন করে নি। সন্দেহও জাগে নি তার মনে।

একদিন চারিদিকে যখন ঠাণ্ডা অন্ধকার নেমে এসেছিল, সন্ধ্যাতারাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল অনামিকা, রতন ডাকে, অনামিকা!

অনামিকা চমকে তাকায়। তাকিয়েই চুপ করে যায়। রতনের মুখে কি যেন ছিল যা চাঁদের আলোতেও চোখ পড়ে অনামিকার। নূতন ধরণের একটা ভাব। ভাল লাগে অনামিকার। সে তাকিয়েই থাকে।

—অনামিকা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

পৃথিবী, আকাশ, মাঠ, মাটি আনন্দে নাচতে থাকে অনামিকার চারিপাশে। রতনকে দেখে অবধি তো এই স্বপ্নই দেখছে অনামিকা। রতনকে দেখার আগেও এই স্বপ্নই দেখেছে। তাহলে স্বপ্নও সত্যি হয়! কথা বলতে পারে না সে।

রতন ওকে জড়িয়ে ধরে। টেনে নেয় অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের দিকে। একটা বুনো ঝোপের পাশে। আর···

ভালো লাগে—খুবই ভালো লাগে—ভয় হয়—আর ভয় হয় বলেই যেন আরও ভালো লাগে—

এই ভাবেই রতনের যাবার দিন এগিয়ে এল। ওদের কথা আগেই ঠিক হয়েছিল—কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। এখানে বিয়ে করা অসম্ভব। রায়বাড়ীতে এখন জানাতে পারবে না রতন।

পরবর্তী জীবনে অনামিকার মনে হয়েছে প্রথম থেকেই সুন্দর অভিনয় করেছিল রতন। তখন এমন ভাব দেখাতো যেন কাউকে কিছু না বলে এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে অনামিকাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করবে? নিরুপায় হয়েই এভাবে চোরের মত কাজ করতে হচ্ছে।

যেদিন ওদের যাবার কথা তার আগের দিন স্বভাবতঃই অনামিকার মন খুব খারাপ হয়েছিল। ভয়ও হচ্ছিল। রতন যেন তা বুঝেই বলে, নাই বা গেলে?

—কি? কি বলছ? চমকে তাকিয়েছিল অনামিকা।

—না, আমি বলছিলুম কি, আর কয়েকটা দিন না হয় চুপ করে থাকো, তারপরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। হয়েই যাবে একরকম ব্যবস্থা। এভাবে অচেনা জায়গায় যেতে তোমার নিশ্চয়ই ভয় হচ্ছে।

—ভয়? অনামিকা কথা বলে না।

—অবশ্য, কণ্ঠস্বর পাল্টে রতন বলতে থাকে, ভালবাসলে ভয়ের কোন প্রশ্ন আসে না। আমার সঙ্গে যাবে তাতে ভয়টা কিসের? স্বর্গ, নরক, যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। তবে কিনা, মেয়েরা কোনদিনই যথার্থ ভালবাসতে পারে না।

ভালবাসার অপবাদে অনামিকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথম যৌবনের প্রথম ভালবাসা। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে বসে যে, সে কতটা ভালবাসে।

—তর্ক করে কি আর ভালবাসা প্রমাণ করা যায়? কাজে প্রমাণ করতে হয়, রতন বলেছিল।

—যাঃ আমি তো একবারও বলিনি যে যাব না? তুমি-ই তো বলেছ?

—আমি বলছি, তোমার দিকে চেয়ে। তোমাকে ভালবাসি বলে! তোমাকে নিয়ে যেতেই তো আমি চাই, তোমাকে না নিয়ে গেলে আমার জীবনের সব সুখ চলে যাবে, তবুও বলছি তোমার কষ্ট হলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব না—এটুকু ত্যাগ আমি ভালবাসার জন্য করতে পারি—ইত্যাদি অনেক কথা রতন বলেছিল—আর অনামিকার মনে হয়েছিল না যেতে চাওয়ার কথা মনে মনে ভাবাও ভারি অন্যায় হয়েছে।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

—কোম্পানীর সঙ্গে নার্সিং-হোমের কোনো সম্পর্ক নেই, মেডিক্যাল-হোমের প্রথম দিনের আলাপে রমেন হালদার বলেছিল, ওর মালিক মিস সরকার আর ছোটসাহেব—ইকোয়াল পার্টনারস!

লাবণ্য সরকারকে ভালো মত চেনাবার উদ্দীপনায় চপল গাম্ভীর্যে বক্তব্যটা আরো খানিকটা ফাঁপিয়েছিল সে। বলেছিল, মস্ত মস্ত ঘরের ফ্ল্যাট, একটা মিস সরকারের বেডরুম, তু-ঘরে চারটে বেড, আর একটা ঘরে বাদবাকি যা-কিছু। মাস গেলে তিন শ' পঁচাত্তর টাকা ভাড়া—মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের কোয়ার্টার প্রাপ্য বলে ভাড়াটা কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়। আর, সেখানে আলমারি-বোঝাই যে-সব দরকারী পেটেণ্ট ওষুধ-টষুধ থাকে তাও কোম্পানী থেকে নার্সিং-হোমের খাতে অমনি যায়, দাম দিতে হয় না—খুব লাভের ব্যবসা দাদা, বুঝলেন?

এতখানি বোঝাবার পর হাসি চাপতে পারেনি, হি-হি করে হেসে উঠেছিল রমেন হালদার!

এতদিনের মধ্যেও লাবণ্য সরকারের নার্সিং-হোম সম্বন্ধে ধীরাপদ এর থেকে বেশি আর কিছু জানে না। জানার অবকাশও ছিল না। আজ এই ভাবে সেখানে তার ডাক পড়তে রমেন হালদারের প্রথম দিনের তরল উক্তি মনে পড়ল। মনে হল, মেডিক্যাল-হোম আর ফ্যাক্টরীতে লাবণ্য সরকারকে যতটা দেখেছে তা অনেকটাই বটে, কিন্তু সবটা নয়। ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দেবার পর ধীরাপদর এই কৌতূহলের মধ্যেই তলিয়ে যাবার কথা।

তা হল না। এমন অপ্রত্যাশিত আহ্বান সত্ত্বেও নিজের অগোচরে কৌতূহল মনের পর্দার ওধারেই ঝাপসা হয়ে থাকল। থেকে থেকে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে সে লাবণ্য সরকার নয়, পার্বতী। পার্বতী কি সত্যিই তার কাছে চেয়েছে কিছু? সত্যিই কি আশা করে কিছু? তার ওপর কর্ত্রীর নির্ভরতা দেখেছে, বড়সাহেবের আস্থা দেখেছে, আর সমস্তা যাকে নিয়ে হয়ত বা তারও প্রসন্নতার আভাস কিছু পেয়েছে—আশা করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে মনের কথা ব্যক্ত করার মত যে মেয়ের নাগালের মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ কোথাও নেই। পার্বতী যা চেয়েছে বা যে আশার কথা বলেছে তার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু ছিল না। তবু কি জানি কেন, ধীরাপদ নিঃসংশয় নয় একেবারে। আর কেনজাই

মনে হয়েছে, পার্বতী নিজেই হাল ধরতে জানে। উলের বোনা হাতে সামনে শুধু মোড়া টেনে বসে চীফ কেমিষ্টের মত অসহিষ্ণু লোকটাকেও বশ করতে পারে।···আজকের এই অভিনব ব্যাপারটাও অবলার নিছক তুর্বল নির্ভরতার আশাতেই নয়। তার সমস্ত ক্ষোভের পিছনেও কোথায় যেন নিজস্ব শক্তি আছে একটা!

এই নীরব শক্তির দিকটাই আর কার সঙ্গে মেলে যেন।···সোনাবউদির সঙ্গে।

ভাবনাটা এর পর কোন দিকে গড়াত বলা যায় না, গাড়িটা থামতে ছেদ পড়ল। ড্রাইভার বাঁয়ের বাড়িটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানালো গন্তব্যস্থানে এসেছে। বার তুই হর্ণও বাজিয়ে দিল সে।

ধীরাপদ নেমে দাঁড়াল। রাত করে তেমন ঠাওর না হলেও রমেন হালদারের বর্ণনার সঙ্গে মিলবে মনে হল। হর্ণের শব্দ শুনে লাবণ্য দোতলার বারান্দার রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ভালো না দেখা গেলেও স্পষ্টই চেনা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতে বলল ড্রাইভার, দোতলায় ফ্ল্যাট।

দোতলায় উঠতে উঠতে দেখল লাবণ্য সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্য মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ আসুন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি চিনতে কষ্ট হয়েছে?

ধীরাপদ হেসে জবাব দিল, না, ড্রাইভার চেনে মনে ছিল না।

বাড়িটা ধীরাপদরও না চেনাটা ইচ্ছাকৃত যেন। কিন্তু লাবণ্য মুখে সে কথা বলল না। আসুন।

বারান্দা ধরে আগে আগে চলল। ওদিক থেকে একজন নার্স আসছিল। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল সে। সামনেই বসার ঘর। রমেন হালদারের কথা মিলছে। বড় ঘরই। বসার পরিপাটি ব্যবস্থা। তু'দিকে ঝকমকে তুটো বড় আলমারি। একটাতে বই, অন্যটাতে ওষুধ।

বসুন। গম্ভীরমুখে সে নিজেও সামনের একটা কুশনে বসল।

এই বাড়িতে প্রথম দিনের অভ্যর্থনা ঠিক এ রকম হবার কথা নয়। কিন্তু ধীরাপদ এই রকমই আশা করেছিল। অসুখের পরে অফিসে জয়েন করা থেকে এ পর্যন্ত সহকর্মিনীর বিদ্বেষের মাত্রা যে দিনে দিনে চড়ছে সেটা তার থেকে বেশি আর কে জানে! সব শেষে এই সরকারী ওষুধ সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা। মাথায় ওপর চেপে বসেছে একেবারে। এ দিনের সেদিনের সেই বাক-বিনিময়ের

দায়ে দায়ে না পড়লে আর তার মুখ দেখত কি না সন্দেহ। আজকের দায়টা কি ধীরাপদ জানে না? দায় যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, নইলে এভাবে বাড়িতে ডাকত না। কিন্তু আগ্রহ সত্ত্বেও এসেই জিজ্ঞাসা করতে পারল না, মুখ দেখেই মনে হয়েছে সমাচার কুশল নয়।

কিন্তু লাবণ্য সরকার একেবারেই আপ্যায়ন ভুলল না তা বলে। নির্লিপ্ত মুখে সেই কর্তব্যটা করে নিল আগে। চা খাবেন?

ন, এই খেয়ে এলাম। অন্তরঙ্গ অতিথির মতই ধীরাপদ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল একবার। পিছনের দরজা দিয়ে আর একটা প্রশস্ত ঘর দেখা যাচ্ছে। আরো একথা বলল, আপনার ফ্ল্যাটটা তো বেশ!

এভাবে ডেকে পাঠানোর হেতু না জানলেও প্রথমেই অনুকূল আবহাওয়া রচনার চেষ্টা একটু, আপসের চেষ্টা।

কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ফ্ল্যাটের স্তুতি পদ্মপাতায় জলের মত একদিকে গড়িয়ে পড়ল। একখানা পা আর এক পায়ের ওপর রেখে আঁট হয়ে বসার ফাঁকে লাবণ্য তাকে দেখে নিল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ও বাড়িতে তো কেউ নেই শুনলাম, চা কে খাওয়ালে, পার্বতী?

লাবণ্যর গাম্ভীর্যের ফাটলে বিদ্রূপের আঁচ। পার্বতীকে ভালই চেনে তাহলে, ভালই জানে। ধীরাপদর কেন জানি, ভালো লাগল হঠাৎ। বলল, শুধু চা! যে খাওয়া খাইয়েছে, হাঁসফাঁস অবস্থা। চমৎকার রাঁধে, ওর রান্না খেয়েছেন কখনো?

লাবণ্য তেমান ওজন করে জবাব দিল, খেয়েছি, তবে হাঁস-ফাঁস করার মত করে খাইনি কখনো। পার্বতী জুলুম করে খাওয়াতে জানে, তাও এই প্রথম জানলাম।

আরো ভালো লাগছে। এবারে লাবণ্যকে শুদ্ধ ভালো লাগছে ধীরাপদর। আর বলেন কেন, যাবার আগে আপনার থেকে ওষুধ চেয়ে নেব ভেবেছি।

ওষুধ কতটা দরকার স্থির চোখে তাই যেন দেখছে লাবণ্য সরকার। বলল, পার্বতী টেলিফোনের খবরটা আপনাকে দিতে চায়নি, আমি কে কথা বলছি, কেন ডাকছি জিজ্ঞাসা করছিল। অত খাওয়ার পরে আপনার বিশ্রামের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানোর ইচ্ছে ছিল না হয়ত। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যেই থামল দুই এক মুহূর্ত।—আমারও ছিল না, নেহাৎ দায়ে পড়েই আপনাকে কষ্ট দিতে হল।

এই দায়ের প্রসঙ্গ একেবারে না উঠলে ধীরাপদ খুশি হত। কিন্তু কতক্ষণ আর এড়ানো যায়! বলল, কষ্ট আর কি। কিছু একটা বিশেষ কারণে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেটা যেন এতক্ষণে মনে পড়ল।—কি ব্যাপার···জরুরী তলব কেন?

ঠাণ্ডা গলায় লাবণ্য তক্ষুণি জবাব দিল, আপনাকে একজন পেসেন্ট দেখাবার জন্য।

ধীরাপদ অবাক! এমন দায়ের কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চকিতে অমিতাভ ঘোষের কথাই মনে হল প্রথম। তার কি হয়েছে, কি হতে পারে? কিন্তু লাবণ্য আর কিছু না বলে চেয়ে চেয়ে খবরটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে শুধু।

··আমাকে পেসেন্ট দেখাবার জন্যে··কে?

আসুন। লাবণ্য উঠে দাঁড়াল।

তাকে অনুসরণ করে হতভম্বের মত ধীরাপদ পিছনের ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরের একদিকের বেড খালি, অন্যদিকের বেডটায় পেসেন্ট একজন। কিন্তু অমিত ঘোষ নয়ত···একটি মেয়ে···কে? ধীরাপদ হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না কে, গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, বিছানার সঙ্গে মিশে আছে, ঘুমিয়ে আছে। রক্তশূন্য, বিবর্ণ।

কে···! ধীরাপদ এগিয়ে এলো আরো দু'পা। তার পরেই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন একেবারে। লাবণ্য স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। ধীরাপদ বিমূঢ় বিস্ময়ে রোগী দেখছে।

বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার পর অবশ স্নায়ু যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে একটু একটু করে, তেমনি হ'ল। স্মৃতির অন্ত্র-তন্ত্র দগ দগিয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

বীটার রাইস! বীটার রাইস! বীটার রাইস!

ধীরাপদ চক্রবর্তী, তুমি একদিন ছেলে পড়াতে আর কবিরাজি ওষুধের আর আস্তাকুঁড়ের বইয়ের আশা-জাগানো আর কামনা-তাতানো বিজ্ঞাপন লিখতে আর জল গিলে আর বাতাস গিলে কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে আর চোখে যা পড়ত চেয়ে চেয়ে দেখতে! শুধু দেখতে। তোমার সেই দেখার মিছিলে এই মেয়েটাও এসেছিল একদিন, তারপর আরো অনেক দিন।···এই সেদিনও, যেদিন রেস্তোরাঁয় বসে তুমি ওর খাওয়া দেখছিলে আর তার গরাসে গরাসে তোমার বাসনার গালে চড় পড়েছিল একটা করে।···বীটার রাইস···বাংলা হয় না···না হওয়ার জ্বালা জুড়িয়েছে বোধহয়, নইলে একদিন না একদিন হত বাংলা।

কিন্তু আশ্চর্য, এই মেয়ে এখানে এলো কেমন করে! পৃথিবীটা এত গোল!

চিনলেন? যতটা দেখবে ভেবেছিল, লাবণ্য সরকার তার থেকে বেশি কিছুই দেখেছে।

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ মেয়েটার দিকে তাকালো আবারও, তারপর লাবণ্যর দিকে।

—ও ইনজেকশনে ঘুমিয়েছে, এখন উঠবে না। অর্থাৎ, রোগিনীর কারণে চুপ করে থাকার দরকার নেই। তবু কি ভেবে লাবণ্য নিজেই বসার ঘরের দিকে এগোলো আবার, যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো শুধু। তাৎপর্য, দেখা হয়ে থাকে তো আসুন এবার—

ফিরে আগের জায়গাতেই এসে বসল ধীরাপদ। কিন্তু একটু আগের সেই লোকই নয়। আক্রোশভরা চোখে লাবণ্য তার এই হতচকিত অবস্থাটা মেপে নিল একপ্রস্থ। প্রবলের একটা মস্ত দুর্বল দিক অনাবৃত দেখার মত।

মেয়েটার নাম কী?

কি নাম মেয়েটার! জানত তো···সোনা রূপো হীরে মার্কা···

কাঞ্চন।

কাঞ্চন কী? লাবণ্য যেন কোণঠাসা করছে তাকে।

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, জানে না। লাবণ্যর বির্দ্রপভরা গাম্ভীর্য আর উষ্ণ জেরার সুরটা চোখে পড়ল, কানে লাগল। আবারও একটা নাড়াচাড়া খেয়ে সচেতন হল সে। ওকে জড়িয়েই কিছু একটা

ঘটেছে, আর সেই কারণে টেলিফোনে প্রায় চোখ রাঙিয়ে তাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে জবাবদিহি করার জন্যে।

নিজেকে আরো একটু সংযত করে নিল আগে। সবই জানতে বাকি, বুঝতে বাকি। শান্ত মুখে এবারে সেই জিজ্ঞাসা করল, এই মেয়েটা আপনার এখানে এলো কি করে?

এই পরিবর্তনটুকুও লাবণ্য লক্ষ্য করল বোধহয়, বলল, ফুটপাথের কোন্ ল্যাম্প-পোস্টের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অমিত বাবু গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, দেখতে পেয়ে দয়া করে তুলে এনে এখানে দিয়ে গেছেন। আর, হুকুম করে গেছেন সেবাযত্ন করে সারিয়ে তোলা হয় যেন। খারাপ জাতের অ্যানিমিয়া, অন্য রোগও থাকতে পারে, কিন্তু সে-সব অত ধৈর্য ধরে শোনার সময় হয়নি তাঁর।

শোনার আগ্রহ ধীরাপদরও কমে আসছিল। রোগের নাম শোনার পরেও। খাদ্যের অভাবে আর পুষ্টির অভাবেই সাধারণত: ওই রোগ হয় শুনেছিল। মেয়েটার ক্ষুধার সে দৃশ্য অনেকবার মনের তলায় মোচড় দিয়েছে, কিন্তু আজ দিল না। জিজ্ঞাসা করল, আমাকে আপনি কি জন্যে ডেকে এনেছেন?

লাবণ্য সোজাসুজি চেয়ে রইল একটু! চোখের তারায় আর ঠোঁটের আভাসে চাপা বিদ্রূপ। বলল, অসুখ তো কারো হুকুমে সারে না, মন্ত্রগুণেও নয়। চিকিৎসা করতে হলে পেসেণ্ট সম্বন্ধে ডাক্তারের কিছু খবরাখবর জানা দরকার—সেই জন্যে। অমিত বাবু কিছু বলতে পারলেন না, শুনলাম আপনিই জানেন শোনেন······

আঁচড় যেটুকু পড়বার পড়ল।

কিন্তু ধীরাপদর মুখ দেখে বোঝা গেল না পড়ল কি না। অমিত ঘোষ কি বলেছে বা কতটা বলেছে আপাতত তাও জানার আগ্রহ নেই।

কি খবর চান বলুন—

রোগিনীর খবর সংগ্রহের জন্যে তাকে ডেকে আনা হয়নি ভালই জানে। একটা নগ্ন বিড়ম্বনায় হাবুডুবু দেতে দেখবে সেই আশায় ডেকেছে। ওকে লাগামের মুখে রাখার মতই মস্ত এক অস্ত্র হাতে এসেছে ভেবেছে। তার বদলে এই নির্লজ্জ দম্ভ দেখে তপ্ত শ্লেষে লাবণ্য বলে উঠল, কেমন রাঁধে, খেয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা হয় কি না, এই সব খবর—

হাসা শক্ত, তবু হাসতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। বলল, যে-অসুখের নাম করলেন, রাঁধা বা রেঁধে খাওয়ানোর সুযোগ তেমন পেয়েছে বলে তো মনে হয় না।

ধৈর্য ধরে আরো একটু দেখে নিল লোকটাকে, তারপর অসহিষ্ণু চোখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, ও-রকম একটা মেয়েকে অমিত বাবু চিনলেন কি করে?

ধীরাপদর মনে হল, বিদ্বেষের এ-ও হয়ত একটা বড় কারণ। এ-রকম মেয়েকে অমিত ঘোষ চেনে, শুধু চেনে না,—অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে রাস্তা থেকে তুলেও আনে। ভিতরটা হঠাৎই কি এক অকরুণ তুষ্টিতে ভরে উঠেছে ধীরাপদর। নির্লিপ্ত জবাব দিল, আমিই একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলাম।

ও! ধৈর্যের বাঁধ টলমল, তবু সংযত সুরেই বলল, মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থাও তাহলে আপনিই
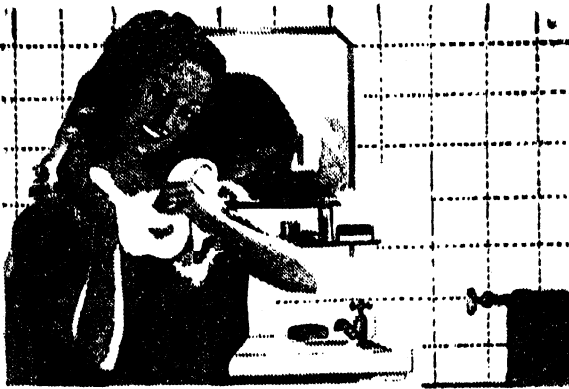
করুন, এ রকম পেসেণ্ট একটা দিনের জন্যেও এখানে থাকে সেটা আমার ইচ্ছে নয়।

বুদ্ধিমতী হয়েও এমন অবুঝের মত কথা বলবে ভাবেনি ধীরাপদ। রাগের মাত্রা টের পাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে যথার্থই তুষ্ট এবারে, কিন্তু সে তুষ্টি প্রীতিসিক্ত নয় আদৌ। খানিক আগের সেই ভালোলাগা আর অন্তরঙ্গ আপসের বাসনায় কালি ঢালা হয়ে গেছে। ধীরাপদর সরাসরি চেয়ে থাকতেও বাধছে না আর, নিজের অগোচরে দু চোখ দৃষ্টিভোজের রসদ খুঁজছে।

বলল, আপনি ডাক্তার, আপনার রাখতে অসুবিধে কি, আমি তো বুঝছি না।

একেবারেই বুঝছেন না, কেমন? শুধু শ্লেষ নয়, ঘৃণার সুরও স্পষ্ট।

ধীরাপদ সত্যিই বুঝে উঠছে না বলে বিব্রত আর বিড়ম্বিত যেন। মাথা নাড়ল। না। কোম্পানীর কোয়ার্টার, বেড খালি আছে, ওষুধও বেশির ভাগ হয়ত কোম্পানী থেকেই পাওয়া যাবে···আপনার রাখতে এমন কি অসুবিধে?

লাবণ্য স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত। এই সুবিধে পায় বলেই ইঙ্গিতটা অসহ্য। এতকাল এ নিয়ে ঠেস দেবার সাহস কারো হয়নি। নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব দখলের ওপর অতর্কিত স্থূল ছোবল পড়ল যেন একটা। ঘরের শাদাটে আলোয় প্রায়-ফর্সা মুখখানা রীতিমত ফর্সা দেখাচ্ছিল এতক্ষণ। বর্ণান্তর ঘটতে লাগল।

আপনি কি এটা ঠাট্টার ব্যাপার পেয়েছেন?

তেমনি শান্ত মুখে ধীরাপদ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন?

ধৈর্য গেছে, লাবণ্য ঝলসে উঠল, এখানে এসব নোংরা ব্যাপার কেন আমি বরদাস্ত করব?

বরদাস্ত না করতে চাইলে যিনি এনেছেন তাঁকে বলুন, আমাকে কেন ডেকেছেন?

যিনি এনেছেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে খবর দিতে বলেছেন।

চোখে চোখ রেখে ধীরাপদ থমকালো একটু, অমিত ঘোষ কি বলতে পারে আর কতটা বলতে পারে অনুমান করা শক্ত নয়। তাকে দেখিয়ে দেওয়া বা খবর দিতে বলাও স্বাভাবিক। মেজাজ থাকলে ঠাট্টাও করে থাকতে পারে কিছু। নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, লোক ডেকে আবার রাস্তায়ই রেখে আসতে বলুন তাহলে—

ওই ঘরে মেয়েটার শয্যাপাশে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকটার অমন হতভম্ব বোবা স্তব্ধতা নিজের চোখে না দেখলে এই সাদা-সাপটা জবাব শুনে লাবণ্যর খটকাই লাগত হয়ত। কিন্তু যা দেখেছে ভোলবার নয়। বিষম ঝাঁকুনি খেতে দেখেছে আচমকা, তারপর বিস্ময়ে পাথর হয়ে থাকতে দেখেছে কয়েকটা মুহূর্ত। লাবণ্য চেয়ে আছে। উদ্ধত নির্লিপ্ততার আড়ালে অপরাধ-চেতন দুর্বলতার ছায়া খুঁজছে।

—অর্থাৎ, ওই মেয়েটাকে আপনি জানেন স্বীকার করতেও আপত্তি, আর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই, কেমন?

ধীরাপদ কুশন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আপনি যতটা ভাবছেন ততটা জানি স্বীকার করতে আপত্তি আর দায়িত্বটাও আপাতত আমার থেকে আপনারই বেশি।

কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ি নেমে সোজা ষ্টেশান ওয়াগনে উঠেছে। রাগে নয়, ভয়ে নয়—নিজের ওপর আস্থা কমে আসছিল। ঘরের অত সাদা আলোয় লোভের ইশারা ছড়ানো ছিল। লাবণ্যর বিরাগের ফাঁকে ধীরাপদর চোখে সেদিনের মত সেই গ্রাসের নেশা ঘনিয়ে আসছিল। গাড়িতে ওঠার পর নিজের ওপরেই যত আক্রোশ তার। দরদের একটুখানি সরু বুনোনির বাঁধন এত কাম্য কেন? সেটা না পেলেই প্রবৃত্তির আগুন অমন ধকধকিয়ে উঠতে চায় কেন?···লাবণ্য কোন সময় বরদাস্ত করতে চায় না ওকে—না চাওয়ারই কথা। ওকে অপদস্থ করার চেষ্টা সর্বদা—ভাবলে তাও অস্বাভাবিক নয় কিছু। লাবণ্যর চোখে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, তার পাশাপাশি ওর অবস্থানটাই বড় বেশি স্থূল বাস্তবের মত। তার প্রতিষ্ঠার অভিসারে সুলতান কুঠির ধীরাপদ চক্রবর্তীর আবির্ভাব ভুঁইফোড় প্রহরীর মতই অবাঞ্ছিত।

ড্রাইভার কোনো নির্দেশ না নিয়েই গাড়ি ছুটিয়েছে। এবারের গন্তব্যস্থল সুলতান কুঠি, জানা আছে। একরকম জোর করেই ধীরাপদ ওই আলো-ধোওয়া শাদা ঘরের লোলুপ তন্ময়তা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো। পাশের ঘরের রোগ-শয্যায় অচেতন ওই পথের মেয়ের রক্তশূন্য পাংশু মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠছে! আজও তার পরনে চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি আর গায়ে কটকটে লাল ব্লাউস ছিল কিনা ধীরাপদ দেখেনি। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা ছিল। মুখেও কোনো প্রসাধনের চিহ্ন ছিল না, জলের ঝাপটায় উঠে গিয়ে থাকবে। নিঃসাড় কচি একটা মুখ শুধু···করুণ আবেদনের মত বিছানায় মিশে আছে।

ধীরাপদর বুকের কাছটা মোচড় দিয়ে উঠল কেমন। গভীর মমতায় অন্তস্তলের সব আলোড়ন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে আর একজনের প্রতি শ্রদ্ধায় অনুরাগে মন ভরে উঠছে। সব জেনেও মেয়েটাকে পথের থেকে নির্দ্বিধায় তুলে এনেছে, অমিত ঘোষ তুলে আনতে পেরেছে। সে-ই পারে। ধীরাপদ পারত না। শুধু তাই নয়, সেবা-শুশ্রূষায় মেয়েটাকে সারিয়ে তুলতে হুকুম করে গেছে লাবণ্যকে। ধীরাপদর কেমন মনে হচ্ছে, গ্লানির গর্ভবাস থেকে মেয়েটার মুক্তি ঘটল।

হঠাৎ কি ভেবে ড্রাইভারকে আর এক পথে যেতে নির্দেশ দিল সে।···ভাবছে গলিটা চিনবে কি না। সেই কবে একদিন অন্ধকারে এসেছিল। একটা খবর দেওয়া দরকার, ছোট ছোট কতকগুলো ভাই-বোন আছে শুনেছিল, আর বাপ আছে···চোখে ছানি। খবর না পেলে সমস্ত রাত ধরে প্রতীক্ষাই করতে হবে তাদের।···অন্নদাত্রীর প্রতীক্ষা, জঠরের রসদ জুটবে কি জুটবে না, সেই প্রতীক্ষা।

কিন্তু যত এগোচ্ছে তত অস্বস্তি। আলো শুষে নেওয়া সেই অন্ধকার গলিটা ঠাওর না করতে পারলেই যেন ভালো হয়। সেই ভালোটা হবে না জানা কথা, একবার দেখলে ভোলে না বড়। একটা বাস্তবের ঝাপটায় হঠাৎই যেন মোহভঙ্গ হয়ে গেল আবার। কোথায় চলেছে সে। সেখানে গিয়ে কার কাছে কি বলবে? ধীরাপদ লোকটাই বা কে?···তা ছাড়া, দেহের বিনিময়ে পেটের অন্ন সংগ্রহ করতে হয় যাকে, সেই মেয়ে সময়মত ঘরে ফিরল কি ফিরল না সে-জন্যে কোন্ বাবা ভাই-বোনেরা উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে! এক

রাত দু' রাত না ফিরলে বরং তাদের আশার কথা, বড় দরের শিকার লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কথা !

গলিটা পেরিয়ে গেল। ধীরাপদ বড় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। নিজের পাগলামী দেখে নিজেরই হাসি পাচ্ছে।···চেষ্টা করে অমিত ঘোষ হওয়া যায় না।

পরদিন ধীরাপদর অফিস-ঘরে অমিতাভ ঘোষ নিজেই এসে হাজির। আজ এর থেকে বেশি কাম্য আর বোধহয় কিছু ছিল না।

ধীরাপদর আসতে একটু দেরি হয়েছিল। এসে শুনেছে, বড়সাহেব আজও সকালে এসেছিলেন। এসে তাকেই ডেকেছিলেন, তাকে না পেয়ে মিস সরকারের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে গেছেন। অন্ত দিন হলে ধীরাপদ লাবণ্যর ঘরে খবর নিতে ঢুকত। আজ গেল না। সে-ই আসে কিনা দেখা যাক। তেমন জরুরী হলে আসবে।

টেবিলে অনেক কাজ জমে। গত দু'দিন বলতে গেলে কিছুই করেনি। কিন্তু ফাইলে মন বসছিল না। বড়সাহেবের কথা ভাবছিল না, লাবণ্যর কথাও না। ভাবছিল অমিতাভ ঘোষের কথাই। আজকের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। এখানে হোক, বাড়িতে হোক, যেখানে হোক দেখা করবে। কিন্তু কোথায় যে পাবে তাকে সেটাই সমস্যা।

সিগারেট মুখে হড়বড়িয়ে তাকেই ঘরে ঢুকতে দেখে ধীরাপদর আনন্দের অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ছিল প্রায়। সামলে নিল, ফাইলে চোখ আটকে প্রায় নিস্পৃহ আহ্বান জানালো, আসুন—

আসতে পারে জানাই ছিল যেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে নিয়েছে, মুখ আজ আর থমথমে গম্ভীর নয়।

শব্দ করে চেয়ার টেনে বসতে বসতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, ব্যস্ত খুব ?

—খুব না। একটা ফাইল ঠেলে দিয়ে আর একটা ফাইল হাতের কাছে টেনে নিয়ে তাকালো। এতদিনের একটানা গাম্ভীর্য একেবারে তরল হয়েছে বলে মনে হল না। মেঘের ওপর কাঁচা রোদের মত ওই গাম্ভীর্যের ওপর একটুখানি কৌতুকের আভাস চিকচিকিয়ে উঠেছে। ধীরাপদর কাছে ওটুকুই আশ্বাসের মত।

চেয়ারের হাতলের ওপর দিয়ে এক পা ঝুলিয়ে দিয়ে অমিত ঘোষ আরাম করে বসল। তুষ্ট মিভরা ছটফটে খুশির ভাব একটু। হাতের কাছে মনের মত কিছু পেয়ে গেলে ছোট ছেলে যেমন সাময়িক ক্ষোভ ভোলে, অনেকটা তেমনি। লঘু ভ্রূকুটি। আমাদের এখানকার মহিলাটির সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছে ?

আজ ? না আজ হয়নি। কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা ধীরাপদ আন্দাজ করেছে। কাল দেখা হয়েছিল।

কাল কখন ?

দুপুরে অফিসে, তারপর রাত্রিতে—

রাত্রিতে কখন ? চেয়ারের হাতল থেকে পা নামিয়ে অমিত ঘোষ সকৌতুকে সামনের দিকে ঝুঁকল।

আপনি ওই মেয়েটাকে রেখে যাবার খানিক পরেই হয়ত··· আমাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

অমিতাভ হাসতে লাগল। কাউকে মনের মত জব্দ করতে পারার তুষ্টি। কিন্তু ধীরাপদর মনে হল, স্মৃতির ভাণ্ডারে পুঁজি করে রাখার মত সেটুকু। হালকা আনন্দে সে তাকেই ধমকে উঠল, আপনি অমন টিপটিপ করে বলছেন কেন ? কি হল, ক্ষেপে গেছে খুব ?

যাওয়ারই তো কথা—

দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কি বলে, মেয়েটাকে রাখবে না ?

ঠিক সেভাবে বলেননি—

তবে ?

তবের জবাব দেওয়ার ফুরসত হল না। তার আগে দুজনারই দরজার দিকে চোখ। লাবণ্য সরকার। ঠাণ্ডা নিরাসক্ত আবির্ভাব। এক নজর দেখেই ধীরাপদর মনে হল, ঘরে আর কে আছে জেনেই এসেছে।

কাম ইন্ ম্যাডাম! ছদ্ম গাম্ভীর্যে অমিত ঘোষের দরাজ আহ্বান, উই আর্যার জাষ্ট ওয়েটিং ফর ইউ—তোমার কথাই হচ্ছিল। পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

জবাবে লাবণ্য নির্লিপ্ত চোখে তাকালো শুধু একবার। অর্থাৎ, প্রতীক্ষার জন্যে ব্যস্ত নয় সে, শোনার জন্যেও ব্যগ্র নয়। মন্থরগতিতে টেবিলের সামনে এসে ধীরাপদর দিকে আধাআধি ফিরে দাঁড়াল। —মিঃ মিত্র সকালে আপনার খোঁজ করছিলেন।

কেন খোঁজ করছিলেন শোনার আগে ধীরাপদ বসতে বলতে যাচ্ছিল। কি ভেবে বলল না। বললেও বসবে না, যা বলতে এসেছে তাই বলবে শুধু। ধীরাপদ নীরব, জিজ্ঞাসু।

অ্যানিভারসারির প্রোগ্রাম করতে বলে গেলেন আমাদের, তারপর আলোচনায় বসবেন।

অমিত ঘোষের সিগারেট ধরানো হল না, উৎফুল্ল মুখে বাধা দিয়ে উঠল, আমাদের বলতে আর কে ? হু এল্স ?

লাবণ্য তার দিকে ঘাড় ফেরাল, দেখল একটু।—আপনি নয়।

আই নো, আই নো, বাট হু এল্স—ধীরুবাবু ? পুরু লেন্সের ওপর চপল বিস্ময় উপচে পড়েছে, ও-সব প্রোগ্রাম-টোগ্রাম তো এত কাল ছোটসাহেবের সঙ্গে বসে করতে, সে আউট এখন ? একেবারে বাতিল ?

মুখের দিকে চেয়ে লাবণ্য চুপচাপ শুনল আর উচ্ছ্বাস দেখল। তারপর ধীরাপদর দিকে ফিরে ধীরেসুস্থে বড়সাহেবের দ্বিতীয় দফা নির্দেশ পেশ করল।—মিঃ মিত্র আজ সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন না, কাল সকালেও ব্যস্ত থাকবেন, কাল অফিসের পর তাঁর পার্সোন্যাল ফাইল নিয়ে আপনাকে বাড়িতে দেখা করতে বলে গেছেন, বিশেষ দরকার—

অমিতাভ ঘোষের উচ্ছ্বাসের জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু এটুকু জবাবের মতই। প্রোগ্রাম তাকে যার সঙ্গে বসে করতে হবে সে মানুষ কোন্ দরের, বড়সাহেবের নির্দেশ জানিয়ে পরোক্ষে সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যেন। হিমাংশু মিত্রর এই পার্সোন্যাল ফাইলের খবর সকলেই জানে। তাঁর বাণী, তাঁর ভাষণ, তাঁর সভা-সমিতির বিবরণ, তাঁর চ্যারিটি, তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, ব্যবসায়ের নীতি এবং আদর্শ প্রসঙ্গে তাঁর বহুবিধ মন্তব্য, তাঁর প্রসঙ্গে খবরের কাগজ আর কমার্স জার্ণালের মন্তব্য, তাঁর বাণিজ্যকেন্দ্রিক নিবন্ধ—এক কথায় ছাপার অক্ষরে তাঁর কর্মশীলতার যাবতীয় খুঁটিনাটি তারিখ মিলিয়ে যে-ফাইলে সাজানো সেটাই পার্সোন্যাল ফাইল। সে-ফাইল এখন ধীরাপদর হেপাজতে। সেটা নিয়ে বাড়িতে যেতে বলার একটাই উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত প্রচারের নতুন কোনো প্রেরণা জমজমাট রচনার বুনটে বেঁধে দিতে হবে।

চকিতে ধীরাপদ অমিতাভর দিকে তাকালো একবার, একটু আগের হাসিখুশির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আভাস।

লাবণ্য নির্বিকার। জীবন সোম আপনার খোঁজ করে গেছে, বিশেষ কথা আছে বলছিলেন। মনে পড়ল বলে বলা গোছের খবর এটা।

ফস করে দেশলাই জ্বালার শব্দ। অমিতাভ সিগারেট ধরিয়ে বিরক্ত-বিচ্ছিন্ন মুখে ধোঁয়া ছড়াতে লাগল।

সময় বুঝে বড়সাহেবের নির্দেশ জানাতে আসা প্রায় সার্থক। জীবন সোমের খোঁজ করে যাওয়ার বার্তায় কোম্পানীর সমূহ সমস্যার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কাজটাও সুসম্পন্ন। পরিতুষ্ট গাম্ভীর্যে লাবণ্য ধীরে-সুস্থে এবারে অমিতাভ ঘোষের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। কাল রাতে আপনাকে আমি দু'বার টেলিফোন করেছিলাম। একবার ন'টায়, একবার এগারোটায়—

রাত তিনটেয় করলে পেতে। গম্ভীর প্রত্যুত্তর। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল বোধহয় দু'বার টেলিফোনটা অফিস সংক্রান্ত কোনো তাগিদে নয়। টেলিফোন করার মত একটা জুতসই গণ্ডগোল সে-ই নার্সিং-হোমে পাকিয়ে রেখে এসেছে। আর, সেই সমাচার জ্ঞাপনের আনন্দেই আজ এ-ঘরে ঢুকেছিল। ছেলেমানুষের মতই দু'চোখ উৎসুক হয়ে উঠল আবার, কেন—ওই মেয়েটি আছে কেমন ?

সেরে উঠে এতক্ষণে ছুটোছুটি করছে বোধহয়।

লাবণ্যর নিরুত্তাপ ঠেসের জবাবে অমিতাভ হেসে উঠল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলে উঠল, রোগিনী না হয়ে রোগী হলে করত, এতক্ষণে হার্টফেল করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করছিলাম—

বাক-বিনিময় উপভোগ্য। কিন্তু খানিক আগেই উপভোগের মেজাজ গেছে ধীরাপদর। এমন কি, এই একদিন ঠিক এই সময়টিতে মহিলাটির পদার্পণ সুবাঞ্ছিত মনে হয়নি। বড়সাহেবের নির্দেশ শোনাতে আসা আর জীবন সোমের খোঁজ করার খবর জানাতে আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেছে। টেলিফোনের হেতু জানা বাকি।

ঈষৎ রূঢ় গলায় লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাননীয়া পেসেন্টের প্যাথলজিক্যাল টেষ্টগুলো সব কে করিয়ে আনবে ? ওটা হাসপাতাল নয় যে পেসেন্ট ফেলে এলেই চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে—সে-সব দায়িত্ব কে নেবে ?

অম্লান-বদনে অমিতাভ তৎক্ষণাৎ ধীরাপদকে দেখিয়ে দিল। বলল, উনি। মাননীয়া পেসেন্টের ওপর আমার থেকে ওঁর প্রেম বেশি, মায় চিকিৎসার খরচপত্রসুদ্ধ তুমি ওঁর নামে বিল্ করে দিতে পারো।

এ-রকম কিছু একটা সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল বোধ হয়। উনি বলতে কাকে বলছে ঘাড় ফিরিয়ে লাবণ্য তাই যেন দেখে নিল একবার। তপ্ত শ্লেষে নিটোল কণ্ঠস্বর ভরাট শোনালো আরো। আপনার কথায় বিশ্বাস করে কাল রাতে ওঁকেই ডেকে দায়িত্বের কথা বলতে গিয়েছিলাম। দায়িত্ব নেওয়া দূরে থাক, উনি ওই পেসেন্টকে চেনেন বলেও মনে হল না।

অমিত ঘোষের এবারের চাউনিটা বিস্ময়মুক্ত নয়। একেবারে অপ্রত্যাশিত। এতক্ষণ মুখ বুজেই ছিল ধীরাপদ, একটি কথাও বলেনি। কিন্তু আর চুপ করে থাকা গেল না, অমিত ঘোষের এই

চাউনির পরেও চুপ করে থাকাটা কাপুরুষতার সামিল। লাবণ্য সরকার প্রকারান্তরে কাপুরুষই বলেছে তাকে। তার এতক্ষণের পুঞ্জীভূত তাপের মুখটা সে-ই গোটাগুটি আলগা করে দিয়েছে এবারে। অন্যথায় লঘু সংযমের মুখোশ অটুট রেখে যে-কথাগুলো বলে বসল, তা এই অফিস-ঘরে বসে অন্তত বলার কথা নয়।

লাবণ্যর চোখ দুটো নিজের দিকে ফেরাবার জন্যেই ধীরাপদ প্রায় হাসিমুখেই হাতের এধারের ফাইল দুটো তুলে নিয়ে একটু শব্দ করে টেবিলের ও-ধারে রাখল। অর্থাৎ কিছু একটা বলতে যাচ্ছে, সেই প্রস্তুতির ঘোষণা।

লাবণ্য ফিরে তাকালো।

—আমি তো চিনি না বলিনি, বলেছি আপনি যতটা চিনি ধরে নিয়েছেন ততোটা চিনি না। থামল একটু, চোখে চোখ রাখল।—আমার স্বভাব-চরিত্র জানার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে সেই আশা পেলে শুধু মুখে বলা নয়, একেবারে সাক্ষী-প্রমাণ এনে নিজের জন্যে খানিকটা সুপারিশ করতে রাজি আছি আমি।

কতক্ষণ লাগে কথাগুলো কানের পর্দায় গন্‌গনিয়ে উঠতে আর তার প্রতিক্রিয়া সর্বাঙ্গে শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়তে? কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার, মেডিক্যাল-হোমের ডাক্তার, নার্সিং-হোমের হাফ-মালিক লাবণ্য সরকারের সময় লাগল একটু। সময় লাগছে।

দৃষ্টি-দহনে কারো মুখ ঝলসে দেওয়া সম্ভব হলে ধীরাপদর মুখখানা অক্ষত থাকত না হয়ত। লাবণ্য ঘর ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে সেই জলন্ত দৃষ্টি একবার অমিতাভ ঘোষের মুখের ওপরেও বুলিয়ে দিয়ে গেল।

অমিতাভ হেসে উঠেছিল। সে চলে যেতে উৎফুল্ল আনন্দে ধীরাপদর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, ওই জন্যেই আপনাকে মাঝে মাঝে ভালো লাগে আমার—

কিন্তু ধীরাপদর হাসলে চলবে না এখন, এ-সুযোগ গেলে অনেকটাই গেল। হাতে হাত ঠেকানোর বদলে গম্ভীর মুখেই কলমটা এগিয়ে দিল সে।—লিখে দিন, আপনার সার্টিফিকেট খুব দরকার এখন। তারপর খোলা কলমটা বন্ধ করতে করতে সাদাসিধে ভাবে বলল, আপনার ব্যবহার মাঝে মাঝে আমার প্রায় অসহ্য লাগে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সূচনা যে এটা, অমিত ঘোষ ভাবতে পারেনি। খুশির উদ্দীপনায় চোখ পাকিয়ে তরল প্রতিবাদ জানালো, ওই মেয়েটাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছি বলে? কি অবস্থায় পড়ে ছিল জানেন?

জানি। সে-জন্যে নয়।

অমিতাভ ঘোষ থমকালো একটু, সপ্রশ্ন চাউনি। ঈষৎ অপ্রসন্নও। অবাঞ্ছিত আলোচনার সূত্রপাত—বুঝেছে।

লোহা পিটবে তখন, গন্‌গনে গরম যখন।

কিন্তু ধীরাপদ কার হয়ে হাতুড়ী হাতে নেবে প্রথম—হিমাংশু মিত্রর না চারুদির না পার্বতীর? অবকাশও একবারের বেশি দু'বার পাবে বলে মনে হয় না। কোম্পানীর সমস্তটাই গলায় কাঁটা আপাতত, ওই কাঁটা নেমে গেলে মোটামুটি একটা বড় দুশ্চিন্তার অবসান। পরের কথা পরে ভাববে।

শান্ত মুখে বলল, আর তিন-চার দিন বাদে গভর্নমেন্ট অর্ডার সাপ্লাইয়ের ডেট, তাদের কোনো খবর দেওয়া হয়নি—ওই তারিখেই তারা মাল ডেলিভারি চাইবে। আপনি আমাকে [illegible] করছেন কেন?

[illegible]

হোক বা না হোক আপনার কি আসে যায়? এর মধ্যে আপনি কে? হু আর ইউ?

আমি কে, আপনার মাসিকে সেটা জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আপনার বিরাগভাজন হয়ে এখানে যে আমি একদিনও টিকে থাকতে পারি না, সেটা আর কেউ না জানুক তিনি জানেন।

দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মত লাগতে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে অমিতাভ মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। নিজের অগোচরে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে উঠে এসেছে।

বক্তব্য বিশ্লেষণের ধার দিয়েও গেল না ধীরাপদ। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির তাগিদ মাত্র, সেটা হয়ে উঠেছে। আরো শান্ত, কণ্ঠস্বর আরো গম্ভীর। অথচ অসুখের পর কাজে এসে টের পেলাম, আপনার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করেছি এ-রকম সন্দেহও আপনার মনে এসেছে—

টেবিল চাপড়ে অমিত ঘোষ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে ধমকে উঠল, যাট হু আর ইউ? আপনি ষড়যন্ত্র করার কে?

প্রয়োজনে তেমনি ধীর কঠিন জবাবটা আপনিই যেন নির্গত হয়ে গেল ধীরাপদর মুখ দিয়ে। কেউ যে না সেটা আপনিই ভাবতে পারছেন না কেন? মিঃ মিত্রকে একজন অভিজ্ঞ সিনিয়র কেমিষ্ট আনার পরামর্শ দিয়েছিলাম কোম্পানীর সুবিধের জন্যে আর সব থেকে বেশি আপনার সুবিধের জন্যে—সেটা আপনি একবারও ভাবলেন না কেন? আপনার সঙ্গেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করে নেওয়ার কথা, অসুখে পড়ে যেতে হল না···একটা দিনের জন্যে আপনিও এলেন না। তবু আমার ধারণা ছিল আপনিই সব থেকে খুশি হবেন।

ধীরাপদ অভিনয় কখনো করেনি, কিন্তু সত্যের এমন নিখুঁত অপলাপ করতে গিয়ে মুখের একটা রেখাও বিচলিত হল না তার। অমিতাভ ঘোষ হতভম্ব, বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। অস্ফুট বিস্ময়, সিনিয়র কেমিষ্ট আপনার পরামর্শ মত আনা হয়েছে?

আহত ক্ষোভেই ধীরাপদ নিরুত্তর যেন।

উদ্‌গত রাগে পুরু লেন্সের ওধারে অমিতাভর চোখ দুটো ছোট হয়ে আসছে। তার পরেও আপনি আমাকে একথা জানাননি কেন?

জানাতে গিয়েছিলাম, আপনি এসেছেন শুনেই লাইব্রেরিতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে ছিলাম—আপনি আমাকে অপমান করে চলে গেছেন।

ইউ ডিজার্ভড মোর। কে আপনাকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে বলেছিল? হু লোল্‌ড ইউ? অসহিষ্ণু রাগে গলার স্বর দ্বিগুণ চড়া। আপনার জন্যে ক'জনের সঙ্গে মিছিমিছি দুর্ব্যবহার করতে হয়েছে জানেন? ডু ইউ নো?

—আর কার সঙ্গে করেছেন জানি না, আমার সঙ্গে যে করছেন দেখতেই পাচ্ছি।

রাগে চনমনিয়ে এবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অমিতাভ ঘোষ, চোখের দৃষ্টিতে আর এক পশলা আগুন ছুঁড়ে ট্রাউজারের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট গুঁজতে গুঁজতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ, দুর্ব্যবহার আর বোঝাপড়া এর পর ভালো হাতেই করবে সে।

ধীরাপদ চেয়ারের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে নিস্পন্দের মত বসে রইল খানিক। হাঁপ ধরে আসছিল। কিন্তু বসা হল না। উঠে আস্তে আস্তে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

না। ব্যর্থ হয়নি।

যেন ফিলাডিং থেকে নেমে [illegible] আঙিনা পেরিয়ে লোকটা [illegible] চলেছে।

[ক্রমশঃ।

সিক্ত যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

৪

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' প্রথম বর্ষণ শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে। তখন থেকে সারা রাত ধরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে, ঘুমে-জাগরণে তারই শব্দ, তারই স্পর্শ জড়িয়ে ছিল। ক্ষান্তবর্ষণ সকাল, মেঘ কাটেনি তবু। শুভজিৎ হাসপাতালে বেরোবার জন্য তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল, উঠতে বেলা হয়ে গেছে অনেক। রাস্তায় বেরিয়ে আজই একটা বর্ষাতি কিনে ফেলবার সাধু সংকল্প করে ফেলল তারপর।

অপরেশনের দিন আজ। ও, টি, থেকে বেরোতে বেলা হয়ে গেল অনেক। হাউস সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নীচে নেমেই শুনল—টেলিফোন আছে তার।

রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে সাড়া এল, "আমি দেবাশীষ বলছি।" মাঝে মাঝে কোন দরকার হ'লে দেবাশীষ বা দীপংকর ফোন করে তাকে হাসপাতালে, চেম্বারেও। এবং দরকার মানে শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রেই কোন নতুন হুজুগের সংবাদ জ্ঞাপন। আজও শুভজিৎ সেই অনুমানই করেছিল। ফোন আসার খবর পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কর্রিডোর পার হয়ে আসতে আসতে ভাবছিল কোন ধরে সেই কথাই বলবে।

দেবাশীষের কণ্ঠস্বর শুনে বলা আর হল না, বিস্মিত হয়ে বলল, "গলা এত ভার কেন? চেনাই যাচ্ছে না যে!"

ওধারে হাসির শব্দ, "তা জেনেই তো পরিচয় দিয়ে শুরু করলাম। কাল ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে একটু। যাকগে, শুনুন—আমি ভীষণ মুশকিলে পড়েছি, শর্মির জ্বর হয়েছে।"

—"তাই নাকি? কবে থেকে?"

—"ঈশ্বর জানেন! বোধ হয় কাল রাত্তির থেকে। আপনি ওকে একবার দেখুন ডক্টর, প্লীজ।"

—"এ আর এমন বেশী কথা কি? কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা কেন? যে কোন ডাক্তারকে কল্ দিলেই তো হত!"

—"আরে মশাই, ডাক্তারকে কল্ দিয়ে এনে কি নিজেকে দেখাব? শর্মি না দেখালে! তাই তো ভেবে-চিন্তে প্ল্যানটা বার করলাম—একটু অভিনয় করতে হবে। বাড়ী তো চেনেন, গিয়ে ভাব দেখাবেন যেন হঠাৎ এলেন—ধরুন বললেন, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই। আর ডাক্তার মানুষ, চোখ-মুখ দেখেই জ্বর হয়েছে বুঝতে পারবেন, এ আর বেশী কথা কি! বুঝলেন না?"

—"হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমি তো আজ সন্ধ্যের আগে ফ্রি নই ভাই—হসপিটাল থেকে সোজা চেম্বারে যাব, ডাঃ ব্যানার্জিকে কথা দেওয়া আছে। রেকর্ড-বুকের কাজ আছে।"

দেবাশীষ তখন মরিয়া, শুভজিৎ রাজী হয়েছে, এই যথেষ্ট।

—"হোক সন্ধ্যে, ওতে কিছু হবে না। হয় তো সামান্যই জ্বর, ছেড়েই যাবে।"

তবুও কেন যে এত ব্যস্ততা দেবাশীষের, সে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থামল শুভজিৎ, "তোমরা যাবে না?"

—"আরে না, না! শর্মি বলেনি জ্বরের কথা, ভুবনদা'কে চেনেন তো—সে ফোন করেছিল লুকিয়ে। আমি আর যাব না ডক্টর, আর নন্দা আর মা তো মামারবাড়ী—জানেও না কিছু।" মুহূর্ত্ত খানেক বিশ্রাম। "—ভাবছেন তো এত লুকোচুরি কেন। পরে বলব, এখন সময় নেই। ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট থেকে বলছি আমি, বাবা কোর্টে। অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি, অপরেশন করে ছিলেন···রোজ ক'টা রুগীর চোখ কাটেন মশাই? ছাড়লুম ডক্টর, বাবা এসে পড়লে ভাববেন এখানেও আড্ডা দিচ্ছি! চেম্বার ফেরৎ যাবেন—অতি অবশ্য।"

ফোন ছেড়ে দিয়ে শুভজিৎ বেরিয়ে এল।

শর্মিষ্ঠার জ্বর হওয়ায় দেবাশীষের মুশকিলই বা কেন, ডাক্তার দেখাতে শর্মিষ্ঠার আপত্তিই বা কিসের, কিছুই তেমন বোধগম্য হ'ল না। কারণ কিন্তু ছিল দুটোরই।

গত কাল বিকেলের দিকে শর্মিষ্ঠা লাইব্রেরী-ঘর থেকে বেরোল যখন, তখনই শরীরটা ভার-ভার লাগছিল। ভাবল একটু শুলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হ'ল না, বরং সন্ধ্যে অবধি শুয়ে থেকে বিরক্তি ধরে গেল। সব ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে পড়ল তখন, শ্যামবাজারে চলে এল। এসে শুনল অমরনাথ-সুষমা কোথায় বেরিয়েছেন, তাঁদেরকেও দেখতে পেল না। নন্দিতার ঘরে নন্দিতা ছিল, বই পড়ছিল বসে বসে। সাড়া পেয়ে দেবাশীষ এল নিজের ঘর থেকে।

দেখা গেল মুডে আছে, মেজাজ খুশ। "শর্মি, আজ কি করা যায় বলতো?"

—"কিছু না, বসে গল্প করব। শরীরটা ভাল নেই, বিচ্ছিরি লাগছিল বলে চলে এলাম।"

দেবাশীষ ব্যঙ্গভরে হাসল, "এই যে সেদিন সবার সামনে ডাঁট মারলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল বলে, আর আজই—এই নিয়ে বড়াই কর?"

সেই থেকে শুরু। দেবাশীষের বোধ হয় শর্মিষ্ঠাকে ক্ষেপাবার ঝোঁক চেপেছিল, সুতরাং তর্কটা আর থামল না।

আকাশ কালো হয়ে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে নন্দিতা [illegible] বিরক্ত [illegible] উঠল, "[illegible]

কি যে তোরা ঝগড়া করিস! আজ প্রথম বৃষ্টি পড়ছে, আমার তো ইচ্ছে করছে ভিজি।"

দেবাশীষ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, "বেশ তো চল! শর্মি, তুমি?"

—"নিশ্চয়, চল।" শর্মিষ্ঠাও উঠল।

নন্দিতা অবাক। কথার কথা বলেছিল, এমন পরিণতি হবে ভাবেনি। বাধা দিতেও চেষ্টা করল অনেক, "কি রে, তোরা কি পাগল হয়ে গেলি? সন্ধ্যেবেলা ভিজবি মানে? শর্মি, কি হচ্ছে কি? চুল শুকোবে কি করে? এই না বলছিলি শরীর খারাপ?"

কিন্তু ঠেকানো গেল না! ছাদে উঠে সেই কাপড়ে সেই বাঁধা চুলে শর্মিষ্ঠা ভিজল দেবাশীষের সংগে। নন্দিতাকেও নামাবার চেষ্টা করেছিল দু'জনে, নামেনি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনকে শাসিয়েছে, সুষমারা ফিরলেই বলে দেবে। তবু প্রথমটায় যে বিরক্তি ছিল, বেশীক্ষণ থাকেনি তা, ওদের হৈ-হৈ, হাসিতে তার হাসিও মিশেছে।

প্রচণ্ড গরমের পর প্রথম বারিধারা মধুর লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু মিনিট পাঁচ-সাত পরে নেমে এল যখন, শর্মিষ্ঠার অন্ততঃ কাঁপুনি ধরে গেছে। বাইরে অবশ্য প্রকাশ পেতে দিল না, ভিজে কাপড়-জামা বদলে ভিজে চুল খুলে এসে বসলও বটে, কিন্তু একটু পরেই চলে এল। শরীরটা বড় খারাপ লাগছিল।

পরদিন ঘুম ভাঙল জ্বর নিয়ে। চোখ-মুখ জ্বালা করছে, মাথা তুলতে ইচ্ছে করছে না, এত ভার। ভাবল, ডোবালে দেখছি, মানসম্ভ্রম আর রইল না। ভুবনের হৈ-হৈ করা স্বভাব, ডাক্তারকে অবধি ডাকতে দিল না তাই, ওদের বলে দেয় যদি।

তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিল ব্যাপারটা, "এ আবার জ্বর নাকি, বেলায় ছেড়ে যাবে। দুটো এনকোসিন্ টেবলেট কিনে আন দেখি!"

বেলায় জ্বর ছাড়ল না বটে, শর্মিষ্ঠা আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই অবকাশে শ্যামবাজারে একটা ফোন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করল ভুবন। অসুখ-বিসুখ দেখলে তার ভয় করে, আর শর্মিষ্ঠার কপালে হাত দিয়ে দেখছে রীতিমত জ্বর, এর পর যদি বেশী কিছু হয়? অবশ্য বাড়ীর ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে তো ভুবন নিজেই পারে, কিন্তু শর্মিষ্ঠার জেদের সংগে পেরে উঠে না সে। নিজেই ঝপ করে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে সাহস হল না। তার চেয়ে ভাল শ্যামবাজারে জানিয়ে দেওয়া চুপি চুপি, তারা যা করে করবে।

সুতরাং কানেক্সনটা শোবার ঘর থেকে লাইব্রেরী-ঘরে এনে ফোনটা জয়েন করল ভুবন।

কি উপলক্ষ্যে তাপসের স্কুলের ছুটী। সেই সুযোগে নন্দিতা তার তাপসকে নিয়ে সুষমা বহুদিন পরে বাপের বাড়ী গেছেন সকালে। রাতে ফিরবেন। অমরনাথ স্নান করতে গেছেন। দেবাশীষ স্নান সেরে তৈরী, অমরনাথ এলে একসংগে খেয়ে, তাঁর সংগেই বেরোবে। ফোন সে-ই ধরল।

ভুবন বলল, "দিদির বেশ জ্বর হয়েচে দাদাবাবু, ডাক্তার ডাকতে দিচ্চে নে। আপনাদের ফোন করাতেও মানা, দিদি ঘুমুচ্চে, তাই লুকিয়ে করচি। জানেন তো জেদ—কি যে হ'ল জানি নি।

কি যে হয়েছে, দেবাশীষ ভাল করেই বুঝল। হার স্বীকার করবার পাত্রী নয়, জ্বরের খবরটা তাই চেপে যেতে চায়। কিন্তু ভুবন জো

চেপে রাখার পাত্র নয়, কাজেই কিছু একটা করা দরকার। নইলে শর্মিষ্ঠার জ্বর হয়তো আজই ছেড়ে যাবে, কিন্তু মা কি বাবার সংগে দেখা হলেই ভুবন বলবেই কথাটি, এবং তখন দেবাশীষ শুনেও কিছু করেনি জানলে প্রলয় ঘটবে। এক্কে তো নন্দিতা বৃষ্টিতে ভেজার কথাটা বলে দিতে ঝাড়া দু' ঘণ্টা বকেছেন মা। কালকের দুর্বুদ্ধির জন্ত আফশোষ হচ্ছে, ভাল উৎপাতে পড়া গেল। মায়েরা কেউ নেই বাড়ীতে, তাহলে না হয় মরিয়া হয়ে বলেই দিত। অবশ্য ডাক্তারকে কল দেওয়াটা সমস্যা নয় কিছু, কিন্তু শর্মিষ্ঠার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তার ডাকলেই যে দেখাবে এবং দেখালেই যে ওষুধ খাবে, এ আশা মিথ্যে।

মনে মনে এত কিছু ভাবলেও মুহূর্ত্ত পরেই ভুবনকে জবাব দিয়েছে, "ভুবনদা, শর্মিকে বোল না কিছু, আর ফোনও করতে হবে না, ব্যবস্থা করছি বিকেলের মধ্যে।

মুখে বললেও কি করবে ভেবে পেল না। এক, হয় অমরনাথকে বলা। কিন্তু কোর্টের ভাবনায় তন্ময় হয়ে আছেন এখন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে উক্ত প্রসংগটা বিসদৃশ লাগছে কেমন। নিজের অপরাধবোধটা বিশেষ করেই বাধা দিচ্ছে। কাল বৃষ্টিতে ভেজার কথা শুনেও হাসছিলেন বটে, বকুনির অনেকখানি অংশ তাই তাঁরই ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তবু সমীহ বা ভয় একটু করলে দেবাশীষ অমরনাথকেই করে। মা'র বকুনি অংগাভরণ মাত্র, তাঁকে হলে তখনই বলে দিতে পারত, বলি-বলি করেও অমরনাথকে বলা হ'ল না। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে অফিসে এসে পৌছোল যখন, তখন প্ল্যান একটা স্থির করে ফেলেছে, ডাঃ চৌধুরীকে ফোন করবে একটা, অনুরোধ করবে একবার শর্মিষ্ঠাকে দেখে আসতে। ভদ্রলোক যদি রাজী হ'ন, তাহলেই প্ল্যানটা সাক্সেসফুল হয়। একে তো ভদ্রতার প্রশ্ন আছে, তাতে যা ব্যক্তিত্ব ভদ্রলোকের, শর্মি মুখের ওপর না বলতে পারবে না।

চেম্বার থেকে শুভজিৎ বাড়ী এল। বছর তিনেক আগে ক'মাস এ বাড়ীতে নিত্য এসেছে, কিন্তু এবার কলকাতায় এসে নতুন করে আলাপ হবার পর একবারও আসেনি, আজই প্রথম। বিকেল থেকে দেবাশীষের আশায় নীচে বসেছিল ভুবন। বেল বাজানো মাত্রই দরজা খুলল। ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে একগাল হাসল তারপর।

তৎপর, সশ্রদ্ধ অভিবাদন। শর্মিষ্ঠার কাছে পুরোনো ডাক্তারবাবুর আগমন-সংবাদ পেয়েছিল, বুঝেছে দেবাশীষ তাকেই পাঠিয়েছে।

সন্তুষ্ট। খাতির করে নীচের বসবার ঘরে বসিয়ে ওপরে খবর দিতে গেল।

সারাদিন শর্মিষ্ঠার ঘুমিয়ে কেটেছে।

বিকেলের দিকে শুয়েছিল জেগেই। সন্ধ্যা হয়ে এল যখন, জোর করে উঠে পড়ল। জ্বরটা না ছাড়ুক, কমেছে বোধ হয়। আঁট করে চুলটা বেঁধে, কাপড়টা বদলে ভাল লাগল বেশ। নন্দিতাদের মামার বাড়ী যাবার কথা কালই শুনে এসেছে। ভালই হয়েছে, আজ নিশ্চয় জ্বরটা ছেড়ে যাবে, তাহলে ওরা আর টেরও পাবে না যে জ্বর হয়েছিল। কেবল ভুবনদা'কে সামলে রাখা দরকার, বলে না দেয়।

একটা গল্পের বই নিয়ে বসবার ঘরে এল। বাসনা ছিল ডিভানে শুয়ে শুয়ে পড়বে, মাথার যন্ত্রণায় সাধ্যে কুলোলো না সেটা। ভুবন যখন শুভজিতের আগমন সংবাদ দিতে ঘরে ঢুকল, তখন শর্মিষ্ঠা ডিভানের ওপরই চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

খবরটা শুনে বিস্ময়ে উঠে বসল একেবারে, ভ্রূ-কুঞ্চনেও তারই প্রকাশ, "একা" ?

ভুবন নিরীহ ভাবে মাথা নাড়ল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আসবার কারণটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

সচেতন হয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল পরক্ষণেই, "ও ভুবনদা', কই আন ডেকে! কি মুশকিল, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

ভুবন চলে যাবার পরও অবাক হয়ে বসে রইল একটু। এই অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ কি হতে পারে, ভাবতে চেষ্টা করল।

সময় নেই ভাববার। পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি।

শুভজিৎ লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকে নমস্কার করল।

প্রতি-নমস্কার করল শর্মিষ্ঠা, "বসুন"।

বসতে বসতে শুভজিৎ নেহাৎ সাধারণ ভাবেই ভগ্ন কণ্ঠস্বরের কারণ অনুসন্ধান করল। করা স্বাভাবিক যা, সকালে দেবাশীষকেও করেছে যেমন। বসে নিশ্চিন্ত হয়ে, উত্তর পাবার আগেই গৃহকর্ত্রীর আপাদমস্তক দেখে নেবার অবকাশ পেল যেন, বিস্ময়-গম্ভীর প্রশ্নে সেই ভাবই ফুটল, "কি ব্যাপার! আপনার কি শরীর ভাল নেই না কি ?"

হাসছে মনে মনে। সে যে এমন জেনে না জানার ভান করতে পারে, শর্মিষ্ঠা বোধ হয় তা ভাবতেও পারবে না।

পারলও না, মনে মনে বিব্রত হয়ে শর্মিষ্ঠা লজ্জিত হাস্যে মাথা নাড়ল, "এই একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে।"

দেবাশীষের অনুরোধে শুভজিৎ রোগী দেখতে এসেছিল বটে, স্থিরনিশ্চয় ছিল এটা তার নিছক খেয়ালীপণা। দেখে বুঝেছে না জেনেও দেবাশীষ সকারণেই ব্যস্ত হয়েছিল। হাতটা বাড়িয়ে দিল, "দেখি পালস্‌টা ?"

যেন নেহাৎ হাস্যকর কিছু বলে ফেলেছে, অন্ততঃ শর্ম্মিষ্ঠার হাসি দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, "আরে, পাগল নাকি? সামান্য জ্বর হয়েছে কি হয়নি—"

হাতটা তেমনই প্রসারিত, শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে আছে শুভজিৎ। নীরব অপেক্ষা।

শর্মিষ্ঠা নিরুপায়। ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়ে অপ্রতিভ ভাবে হাসল, "নিন, দেখুন।"

নাড়ী দেখে, একটা চামচে আনিয়ে শুভজিৎ গলাটাও দেখল। বলল, "টনসিলটা ইরিটেটেড হয়েছে—একটু ওষুধ দিলে খাবেন ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। খাব না কেন, কি মুশকিল।" শর্মিষ্ঠা অপ্রতিভ আবারও। মনে মনে ভাবল, না খেয়ে আর করি কি! এ ভদ্রলোক কি আর আসবার দিন পেলেন না!

ট্রেতে চা-খাবার নিয়ে ভুবন এল। খিদেটা নির্ভেজাল, শুভজিৎ অনুরোধ মাত্রই খেল। ভাবল শুধু, এ রকম খাওয়াটা বিপজ্জনক, অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। এমনই [illegible]

যখন যায়, তখনও। মুখে বলে না কিছু সেখানেও, এখানেও চুপ করেই রইল, মনের ভাবনাটা মনেরই এক পাশে রইল পড়ে।

প্রেসক্রিপসন নিয়ে ভুবন ওষুধ আনতে গেছে।

শুভজিৎ একবার ভাবল উঠে পড়ে। কিন্তু চিকিৎসা করতে তো আসে নি যে প্রেসক্রিপসন করেই উঠে পড়বে। একটা সুবিধে' তবু, এতক্ষণ পরে শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না আর কেন এসেছে সে।

কিছু একটা বলা দরকার। "এত ঠাণ্ডা লাগালেন কি করে—এই গরমে? স্টেথিস্কোপ তো নেই সংগে, নাহলে থরোলি পরীক্ষা করা দরকার ছিল।"

সন্ত্রাসে শর্মিষ্ঠা চোখ বড় করল—"রক্ষে করুন, কিছু দরকার নেই।"

—"যাক্‌গে, সে তো হচ্ছেও না এখনই, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগল কি করে?"

এড়ানো গেল না আর। প্রত্যুত্তরে মরিয়া হতে হ'ল তাই, "ঐ দেবুর জন্যে! কাল বললাম আমার শরীরটা ভাল নেই, তবু চ্যালেঞ্জ ক'রে বৃষ্টিতে ভেজালে আমায়।"

দেবাশীষের এত গরজের কারণটা পরিষ্কার হ'ল এতক্ষণে। উত্তরে শুভজিৎ কিছু বলতেও যাচ্ছিল বোধ হয়, হাঁফাতে হাঁফাতে বুনো এসে ঢুকল। শোবার ঘরে শর্মিষ্ঠাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এ ঘরে এসেছে। কিন্তু আদর করা হল না, স্থির চোখে শুভজিৎকে দেখছে, ল্যাজ নাড়ল পরিচিতের ভংগীতে। শুভজিৎ হেসে একবার ডাকল যেই, ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'কাঁধে দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে চেটে ভিজিয়ে দিল সর্বাংগ।

শর্মিষ্ঠা হাসছে, "দেখছেন কি রকম চিনেছে আপনাকে? নইলে আদর ও সহজে কাউকে করে না।"

ভুবন ওষুধ আর জল নিয়ে ঢুকছিল, বুনোর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। "দেখছ দিদি, বুনো আমাদের কেমন বুঝেচে ডাক্তার বাবু এলেন বলেই ওষুধ পড়তে পেল তোমার পেটে—চোখ পাকিয়ে না বলতে পারলে নে তুমি!"

শর্মিষ্ঠা অপ্রস্তুত, বিশেষতঃ শুভজিতের সামনে বলে! ঐ ছোট্ট কথাটুকুতেই ভুবনের সংগে অনেক রাগারাগি-বকাবকির গোপন ইতিবৃত্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মন্তব্য শুনে শুভজিৎ হাসছে তার ওপর। লজ্জিত ভাবে শর্মিষ্ঠাও যোগ দিল।

আনন্দের ঝোঁকটা সামলে বুনো হাঁফাচ্ছে শুভজিতের সামনে বসে পড়ে। পুত্রের স্মৃতিশক্তিতে শর্মিষ্ঠা গর্বিত।

শুভজিৎ একটু হাসল, "এতক্ষণ দেখিনি তো, কোথায় ছিল?"

—"শুয়েছিলাম বলে একবার ঘর থেকেও বেরোয়নি, বিকেলে জোর করে তাই বেড়াতে পাঠিয়েছিলাম।"

যাবার জন্য উঠল শুভজিৎ, "শুধু শুধু বসে আছেন আমার জন্যে! —না, না, সঙ্গে যেতে হবে না।"

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল। শর্মিষ্ঠা সংগে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়েছে, ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াতে হ'ল।

"আপনি যেন বলে দেবেন না আমার জ্বর হয়েছে।"

শর্মিষ্ঠার মুখে একটু লজ্জিত হাসি। মৃদু হেসে মাথা নাড়ল

[illegible]

করেই বাধিয়েছেন, জ্বরটা বোধ হয় ছেড়ে যাবে—কিন্তু কাল সকালেই সুস্থ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, ধরা পড়ে যাবেনই।"

কথাটা সত্যই চাপা রইল না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনায় চাপা সম্ভবও ছিল না, বিশেষ করে এ রকম ঘনিষ্ঠতা যেখানে। বেশ কয়েক দিন ভুগতে হল। তবে দেবাশীষেরও গলা ধরে গেছে শুনে আর কোন খেদ নেই।

সদম্ভে বলেছে, "সুস্থ থেকেও দেবুর গলা ভাঙল, আর আমার শরীরটা তো খারাপই ছিল।" অর্থাৎ জ্বর হয়েছে এ আর বেশী কথা কি! স্বস্তির নিঃশ্বাস। স্বাস্থ্যের কথা তোলার মুখ নেই আর দেবাশীষের।

সুষমাকে সাক্ষী মেনেছিল। তিনি জবাবে বলেছেন, "দেবু তোমায় কি বলবে জানি না, আমার কিন্তু দুজনেরই কান ধরে দুটো থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছে করছে।"

··শর্মিষ্ঠা সুস্থ হয়ে উঠতে সমস্ত ঘটনাটা একটা হাসির গল্প হয়ে দাঁড়াল। যেদিন প্রথম সবাই একত্রিত হল শ্যামবাজারে, সেদিন এ সব কথা নিয়েই হাসাহাসি হচ্ছিল। ভুবনের কৃপায় দেবাশীষ আর শুভজিতের ষড়যন্ত্রের কথাটাও প্রকাশ হয়ে গেছে।

শর্মিষ্ঠা ক্ষুব্ধ, "ডাঃ চৌধুরী, আপনিও ঠকালেন?"

—"ঠকালাম কই? আপনি তো জিগেস করেন নি কেন গেছি।"

দেবাশীষ বলল, "বরং আমায় বল শর্মি, আমার কাছে কেমন ঠকেছ তুমি।"

দীপংকর গম্ভীর, দৃষ্টিটা স্থির রেখেছে ঘূর্ণমান পাখাটার দিকে। "যাই বল দেবু, শুনেছি ব্যস্ত হয়ে মানুষ অনেক উদ্ঘট কাণ্ডও করে

বসে, কিন্তু সর্দি-জ্বর হলে আই-স্পেশালিষ্টকে কল্ দেওয়াটা ম্যাক্‌সিমাম।"

সমবেত হাস্যধ্বনির মাঝেই রান্নার তদারক সেরে সুষমা এসে বসলেন।
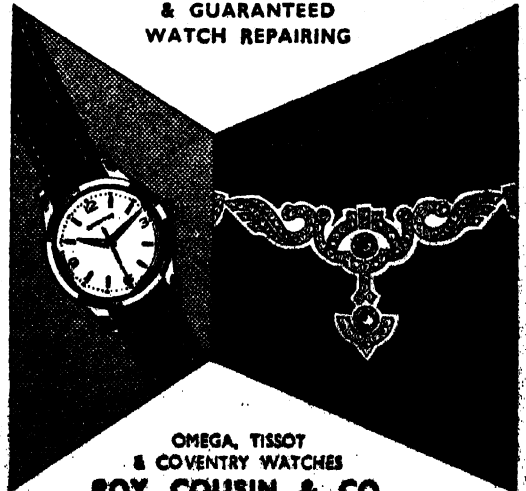
"শর্মি, শরীর খারাপ লাগছে না তো, আজই প্রথম বেরোলি?"

শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে হাসল, "পাগল নাকি? কোথায় শরীর খারাপ?"

সুষমা রেগে গেলেন, "না মা, তোমার তো শরীর খারাপ হতে জানে না! বিষ্টিতে ভিজে ঢং দেখাচ্ছিলে একটু।

"এতেই তুমি এত রাগ করছ মা, শর্মি তো এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে।" নন্দিতার মন্তব্য। বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ নয়, মায়ের অতীত-স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার খুলতে। সে আলোচনা কৌতুকোদ্দীপক, এ আসরে জমবে ভাল। ক্যাল্‌কুলেশনে ভুল হয়নি, সুষমা সায় দিলেন তৎক্ষণাৎ।

দীপংকর আর শুভজিতের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন, "ও যে কি ছিল, তোমরা ধারণা করতে পারবে না! আরও ওর মামার জন্তে—একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ! এখন তো তিনি গিয়ে শান্ত হয়ে গেছে তখন কি রকম ছিল! মোটর চালাতে শিখেই বললে, মামা আমি একা মোটর নিয়ে ক'দিন বেড়িয়ে আসব।

'বেশ তো মা যাও!'

মেয়ে অমনি চলল। আমি ভয়ে কেঁদে মরি। আমার কান্নাকাটিতে সেই দিনই দুপুরে ওর মামা আর ইনি মোটর নিয়ে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা রাস্তা থেকে ধরে আনলেন—একটা গাঁয়ে খাবারের দোকানের সামনে রাস্তায় পাতা বেঞ্চিতে বসে উনি খাবার খাচ্ছিলেন! দেখে ওর মামাও অবাক, 'এ কি রে! রাস্তায় খাবার খাচ্ছিস! সঙ্গে বিস্কুট-টিস্কুট আনিস নি?'—'না মামা, তাহলে আর নতুনত্ব হবে কি করে!' তবু ঐ যা মামাকেই একটু মানত, বলতেই এক কথায় ফিরে এল।"

শর্মিষ্ঠা হেসে বলল, "এই যে বললে মামী, মামা মারা যেতে আমি শান্ত হয়ে গেছি, আবার বলছ মামাকেই যা মানতুম!'

সুষমা ধমকে উঠলেন, "ত্যাখ, তর্ক করিস নি। তোর কথা ভাবলে তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না!"

একটুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন যেন। আসল শ্রোতা দুটিকে সাক্ষী মানলেন আবার, "তোমরাই বল না বাবা, যাই হোক ভাগ্যবল যে রাস্তাতেই পাওয়া গেল তাই, যদি দেখতে না পেত! যদি গুণ্ডার হাতে পড়ত! এখনও ভাবলে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়!"

শর্মিষ্ঠা হাসতে লাগল, "না মামী, গুণ্ডারা আমায় ধরত না!"

—"না তোমায় কি তারা ধরতে পারে! তোমার শরীর খারাপ হতে জানে না, তোমার বিপদ হতে পারে না—তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ এসে জন্মেছ!"

—"স্ত্রীলিঙ্গ কর মা, বল প্রহ্লাদিনী!"

দেবাশীষের মন্তব্যে সুষমা অন্ততঃ কান দিলেন না।

…"তাও সেবার যদি দেবুও সঙ্গে থাকত তো একটু ভরসা হত। তা দেবুর তখন ক'দিন পরে পরীক্ষা। ঐ মেয়ে যে আমার কত জ্বালা দেখিয়েছে কি বলব! মন্দাকে দিয়ে এ সব জ্বালা কোনদিন হয়নি। শর্মির মাথায় যদি একবার ঢুকল কিছু করবে তো করে তবে ছাড়বে।…হাসছিস শর্মি! আর এই হতচ্ছাড়া ছেলে ওকে নাচায়। তোমাদের আর কি বলব, দেবুর সঙ্গে বাজী রেখে ও রেস কোর্সে গিয়ে ঘোড়ার ওপর বাজী ধরে রেস খেলেছে!"

শুনে দীপংকর সোজা হয়ে বসল, "এঁ্যা, বলেন কি কাকীমা!" শর্মিষ্ঠার দিকে চাইল, হেরেছিলেন না জিতেছিলেন!"

"—হেরেছিলাম, বলাই বাহুল্য!" শর্মিষ্ঠা হাসছে।

—"সেও মামা থাকতে?" দীপংকরের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

"—আরে না না। জ্যাঠামশাই তখন কোথায়! এ ত এই সেদিন।" দেবাশীষ উত্তরটা দিল। "হয়েছিল কি, সংস্কার নিয়ে তর্ক করতে করতে বলেছিলাম খুব তো বলছ মনের জোর থাকলেই কাটানো যায় সংস্কার। পার একা গিয়ে রেস খেলে আসতে?—তাই গিয়েছিল। মা কথাটা কাউকে বলতে দেননি, তাই শোনেননি! ও:, মা বোধ করি মাসখানেক কথা বলেন নি দু'জনের সঙ্গে!"

দীপংকর ক্ষণকাল শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে চেয়ে রইল, "যাক্ মামা মারা যেতে আপনায় শান্ত হওয়ার একটা নমুনা পাওয়া গেল বটে!"

হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে আরও একটা মাস কেটে গেল।

ছুটির দিনে প্রায়ই বেড়াতে যাওয়া হয়। আর যেদিন অমরনাথের ঝোঁক চাপে সেদিন তাস খেলেই সারাদিন কেটে যায়। শুভজিৎ কোনদিনই তাস খেলায় অভ্যস্ত নয়, রংগুলো চিনত, এইমাত্র। এখন নেশা ধরে গেছে তারও। খেলা হয় টোয়েনটি-নাইন—অমরনাথের আজকাল শুভজিৎকে জুটি না পেলে চলে না। ও পক্ষে বসে দেবাশীষ আর দীপংকর। নন্দিতা আর শর্মিষ্ঠা অধিকাংশ সময়ই দর্শক, মানে খেলোয়াড় চারজনেই উপস্থিত থাকলে। যতক্ষণ খেলা হয়, ততক্ষণ ওরাও দেখে খেলা, কোন সময় উঠতে চাইলেও উঠতে দেন না অমরনাথ, আর দেবাশীষ তো হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। নন্দিতা অমরনাথের দলে আর শর্মিষ্ঠা দেবাশীষের দিকে, এই নিয়মটাই চালু হয়ে গেছে। বসে বসে খেলা দেখে, আর নিজের দলের লাল-কালো ছক্কা দুটো খোলা-বন্ধ করে সময়মত! নন্দিতার এর ওপর আরও কাজ আছে একটা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে টেবিলের তলা দিয়ে দেবাশীষ আর দীপংকরের হাতের তাস বদল না হয়ে যায় শর্মিষ্ঠার সক্রিয় সহযোগিতায়।

তাস খেলাটা শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। ছুটির দিনের পরের দিনটাই কাজের দিন। অমরনাথের শরীর ভাল নয়। বেশী রাত অবধি তাস খেললে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে, ঘুম আসতে চায় না। সবারই খেয়াল থাকে সেটা, শুধু তাঁর নিজের ছাড়া। তাই সবাই খেলাটা সেদিনের মত বন্ধ করবার অনুরোধ জানালেও, খেলার ঝোঁকে তিনি শুনতে চান না কিছুতেই। ধমকে থামিয়ে দেন সবাইকে, জোর করে খেলেন। তখন সুষমা এসে হাল ধরেন, রাগারাগি বকাবকি করে অমরনাথকে তোলেন খেলা থেকে। অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন অমরনাথ।

তাসখেলার সমাপ্তিটা প্রায় প্রতিদিনই এমনি করেই হয়।

[ক্রমশঃ।

বাঙলায় কন্ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

খেঁড়ীর বদলী ডাক দুটির ওপর দুটি নো-ট্রাম্প দিতে হ'লে দরকার অন্ততঃ ৪ থেকে ৪½ ট্রিকের মত তাস। ৩½+ ট্রিকেও এরূপ ডাক দেওয়া চলে থেঁড়ীর ডাকে বিশেষ সাহায্যকারী এবং না-ডাকা রং দুটির রোখবার তাস (অন্ততঃপক্ষে একটিতেও বিবিসমেত দুখানি, অথবা গোলামসহ তিনখানি বা চারখানি ছোট) থাকলে। অনেক সময়ে বাঁদিকের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে প্রথম খেলা এলে একটি পিঠ বাড়বার সম্ভাবনা থাকলেও এরূপ ডাক দিতে হয়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

১নং। ই-টে, গো, ১০, ৭=১+ ; হ-১০, ৯, ৫, ৩=০ ; রু-টে, সা, ৫=২ ; চি-সা, বি=১। মোট ট্রিকদর ৪+। উদ্বোধনীর ডাক—ই-১ ; খেঁড়ীর ডাক—চি-২ ; ফিরতি ডাক—নো-ট্রাম্প-২ ; খেঁড়ীর দুটি হরতন ডাক এলে হ-৪ ডাক দেওয়া উচিত। এরূপ ডাকের আলোচনা পরে করা হয়েছে।

২নং। ই-টে, বি=১½ ; হ-সা, বি, ১০, ৮=১ ; রু-গো, ৮, ৬, ২=+ ; চি-টে, গো, ৫=১+ ; মোট ট্রিকদর ৪। উদ্বোধনীর ডাক—হ-১ ; খেঁড়ীর ডাক—চি-২ বা রু-২ ; ফিরতি ডাক—নো-ট্রাঃ-২।

৩নং। ই-সা, ৯, ২=½ ; হ-টে, সা, বি, ৪, ৩=২+ ; রু-সা, ১০=½ ; চি-গো, ৯, ৩=+ ; মোট ট্রিকদর ৩½। উদ্বোধনীর ডাক—হ-১ ; খেঁড়ীর ডাক—চি-২ বা রু-২ ; ফিরতি ডাক—নো-ট্রাম্প-২। ইস্কাবন ও রুহিতনের সাহেব থাকায় এবং হরতন রংয়ের প্রায় ছিদ্রহীন পাঁচখানি তাস থাকায় নো-ট্রাম্প ডাকে গেম আশা করা যায়।

৪নং। ই-টে, বি, ৯=১½ ; হ-সা, বি, গো, ৫, ২=১+ ; রু-সা, গো, ৯=½+ ; চি-টে, ৫—১ ; মোট ট্রিকদর ৪½। এ তাসটি নো-ট্রাম্প দিয়ে উদ্বোধন করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কিন্তু হরতনে ডাকের উপযোগী তাস থাকায় হ-১ ডাকই ভাল।

নিম্নরূপ তাস থাকলে খেঁড়ীর একের উপর একের ডাক দুইয়ে তোলা চলে :—

ক) খেঁড়ীর রংয়ের চারখানি—কোনও বাড়তি ট্রিকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

খ) খেঁড়ীর রংয়ের তিনখানি অন্ততঃ বিবিসমেত—তুরুপের সুযোগের জন্য বাইরের কোনও রংয়ের একক তাস (Singleton), অন্যথায় অন্ততঃ ½ ট্রিক বেশী।

	ট্রিকদর	উঃ ডাক	খেঃ ডাক
১। ই-টে, ৫ ; হ-৭, ৬, ৫, ৩ ; রু-টে, বি, ১০, ৬, ৩ ; চি-৬, ২।	২½	রু-১	হ-১
২। ই-সা, ৯, ২ ; হ-টে, ৭, ২ ; রু-সা, বি, গো, ৪, ২ ; চি-১০, ৪।	২½+	রু-১	ই-১
৩। ই-১০, ৮, ৭, ৩ ; হ-সা, ৫, [illegible]	[illegible]	চি-১	রু-১

উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় চক্রে জোরদার ডাক
(Strong rebid by opener)

এরূপ ডাকের পরিস্থিতি চার প্রকারের :—

১। প্রথম উঁচুদরের রংয়ের (ইস্কাবন ও হরতন) একের পর দ্বিতীয় চক্রে একটি বাড়িয়ে ডাক (Jump rebid in major suit).

২। একের ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাককে বাড়িয়ে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক (Jump raise of a negative No-trump).

৩। একের উপর একের ডাকের উত্তরে লাফিয়ে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক (Jump rebid in three trumps).

৪। দ্বিতীয় চক্রে নূতন রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক (Jump rebid in a new suit) এই পর্য্যায়ে পড়ে, কিন্তু কিছুটা পার্থক্য এই যে, এরূপ ডাক এককালীন ডাকের আমলে পড়ে (Falls in the category of Pre-emptive bidding) এবং তাসটি সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক বিপক্ষদলের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা ও স্ল্যামের সম্ভাবনা কম।

১। দ্বিতীয় চক্রে উঁচুদরের রংয়ে একটি বাড়িয়ে ফিরতি ডাক দেওয়ার সাধারণ অর্থে বোঝায় যে উক্ত রংয়ে প্রায় ছিদ্রহীন ৬ থেকে ৭ খানি রং, ৩ থেকে ৪ ট্রিক এবং নিশ্চিত পিঠ জয় করবার ক্ষমতা আটটি। ৮½ থেকে ৯½ পিঠ জয়ের ক্ষমতা থাকলে উক্ত তাসে দুটি লাফিয়ে অর্থাৎ গেমের ডাক দেওয়া যেতে পারে। পাঁচখানি রংয়ের তাসেও উক্তরূপ একটি লাফিয়ে ডাক দেওয়া চলে কিন্তু সেক্ষেত্রে পিঠ জয় করবার শক্তি থাকা দরকার অপর রংয়ের তাসে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

ই—সা, বি, ১০, ৮, ৫, ৪, ৩। হ—সা, ৫, ৩। রু—২। চি—টে, বি।

ই—সা, ২। হ—সা, বি, গো, ৯, ৩, ২। রু—টে, গো, ৫। চি—সা, বি।

ই—সা, বি, ৩। হ—টে, সা, বি, ৫, ২। রু—টে, ৭। চি—বি, ৩, ২।

উঃ ডাক—ই, ১। খেঃ ডাক—নো-ট্রা ১, চি, ২ বা রু, ২। ফিঃ ডাক—ই, ৩। ট্রিকদর—৩। পিঠ জয়ের ক্ষমতা প্রায় ৮।

উঃ ডাক—হ ১,। খেঃ ডাক—ই ১, নো-ট্রা ১, চি বা রু ২। ফিঃ ডাক—হ ৪। ট্রিক দর—৪+। পিঠ জয়—৮ থেকে ৮½।

উঃ ডাক—১। খেঃ ডাক—ই ১, নো-ট্রা ১, চি বা রু ২। ফিঃ ডাক—হ ৩। ট্রিকদর—৩½+। পিঠ জয় প্রায় ৮।

উপরোক্তরূপ একটি বা দুটি ডাক বাড়িয়ে ডাক দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, এরূপ ডাক পাবার পর খেঁড়ীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে কোনওরূপ অসুবিধা থাকে না। [illegible] ৩ [illegible] তাস দ্বিতীয় চক্রে [illegible] ডাক পাবার পর খেঁড়ীর বোঝবার [illegible] [illegible] প্রায় আট পিঠ [illegible]

ক্ষমতা আছে এবং বলী ডাকের (Responder's bid) উচ্চতার থাকারও সম্ভাবনা। সুতরাং নিজশক্তি (পিঠ জয়ের ক্ষমতা) যোগ করে তিনি ধারণা ক'রে নিতে পারেন ক'টি ডাকের খেলা হ'তে পারে দুটি হাতের মিলিত শক্তিতে। উচ্চতাস মূল্য না থাকলে খেঁড়ী ছেড়েও দিতে পারেন ঐরূপ ডাকে, কারণ ডাকটিকে পুণ গেমে উৎসাহপূর্ণ (Not absolute game forcing) ডাক বলা চলে না, অপর পক্ষে উচ্চতাস মূল্য বেশী থাকলে গেম পার হ'য়ে স্লামে পৌঁছোতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ২নং তাসে উদ্বোধনকারী হঃ ৪ ডাকের দ্বারা খেঁড়ীকে জানাতে সক্ষম হন যে, প্রায় ৮ থেকে ৯ পিঠ জয় করবার মত শক্তি তাঁর নিজ হাতেই আছে, সুতরাং খেঁড়ীর পক্ষে অতঃপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিশেষ অসুবিধা থাকে না। অনেক সময়ে এরূপ ডাকের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়।

২। একের ডাকের জবাবে খেঁড়ী নো-ট্রাম্প ১ ডাক দিলে উদ্বোধনকারীর পক্ষে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের খেলা করতে হলে দরকার প্রায় পাঁচ ট্রিকের তাস অন্তর্বর্ত্তী তাস সমেত (with fillers) এবং সব কটি রংয়ের রোখবার তাস (Stoppers in all Suits)। ৩ থেকে ৩½ ট্রিক সাধারণতঃ দরকার হয় তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের চুক্তির খেলা করতে। খেঁড়ীর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী নিম্নতম উচ্চতাসমূল্য অর্থাৎ ১+ ট্রিক থাকলে পাঁচ ট্রিক থাকা প্রয়োজন তিনের খেলা করতে। কিছুটা কম হ'লেও চলে কোনও রংয়ের প্রায় ছিদ্রহীন (nearly solid) পাঁচতাস থাকলে। নীচে এরূপ ডাকের উপযোগী কয়েকটি নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

১নং। ই-টে, সা, ১০, ৩=২ ; হ-টে, বি, ২=১½ ; রু-সা, ৭=½ ; চি-সা, বি, ১০, ৮=১ ; মোট ট্রিকদর ৫।

২নং। ই-সা, বি, ১০, ৯=১ ; হ-টে, গো, ৯=১+ ; রু-টে, সা, বি, ৬=২+ ; চি-বি, গো, ৪=½ ; মোট ট্রিকদর ৫।

৩নং। ই-টে, বি, ৭=১ ; হ-টে, সা, বি, ১০, ৫=২+ ; রু-টে, গো, ৩=১+ ; চি-বি, ১০, ২=+ ; মোট ট্রিকদর ৪½+।

৩। একটি ডাকের উপরে খেঁড়ীর অন্য রংয়ের একটি ডাকের পর উদ্বোধনকারী তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বরূপ ; উপরন্তু দরকার খেঁড়ীর রংয়ের উপযুক্ত সাহায্যকারী তাস বিনা অপর দুটি রংয়ে অন্ততঃ দুবার রোখবার তাস। যথা :—

১নং। ই-সা, ৯=½ ; হ-সা, ১০, ৯, ৩=½ ; রু-টে, সা, গো=২+ ; চি-টে, বি, গো, ৫=১½ মোট ট্রিকদর ৫। উদ্বো ডাক—হ-১ ; খেঁঃ ডাক—ই-১।

২নং। ই-সা, বি, ৫=১ ; হ-বি, ১০, ২=+ ; রু-টে, সা, বি, ৯=২+ ; চি-টে, বি,=১½ ; মোট ট্রিকদর ৫। উঃ ডাক—রু-১ ; খেঁঃ ডাক—হ-১।

৩নং। ই-বি, গো, ৩=½ ; হ-সা, বি, ১০=১ ; রু-টে, সা, ৯, ৭=২ ; চি-টে, বি, ৫=১½ ; মোট ট্রিকদর ৫। উঃ ডাক—রু-১ ; খেঁঃ ডাক—ই-১।

৪। একটির উপর একটি রংয়ের ডাকের পর উদ্বোধনকারী নিশ্চিত জেম আছে তাসে জানাতে হলে নূতন আর একটি রং বাড়িয়ে ডাক দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে উচ্চতাসের অপেক্ষা পিঠজয়ের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে উদ্বোধনকারীর হাতে। কতকটা লোকেরা তাদেরও এরূপ ডাক চলে, সে ক্ষেত্রে অপর দুটি রংয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় চক্রে রাখবার মতন তাস থাকা দরকার। নিয়মমাফিক আট থেকে নয় পিঠ জয় করবার মত শক্তি থাকা প্রয়োজন। খেঁড়ীর উচিৎ গেমে না পৌঁছান পর্য্যন্ত এরূপ ডাক বাঁচিয়ে রাখা। এরূপ বাঁচিয়ে রাখাকালীন খেঁড়ীর রংয়ের সাহায্যকারী তাস থাকলে প্রথম সুযোগেই জানালে সুবিধা হয় উদ্বোধনকারীর পক্ষে ; অন্যথায় নিজের ডাক চালাতে পারেন বা তিনটি নো-ট্রাম্প ডেকে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সাহায্য দেওয়ার তাসের অভাব জানিয়ে যে উদ্বোধনকারীর উপর ডাকের নিষ্পত্তি করবার ভার দিতে পারেন (খেঁড়ীর ডাক পর্য্যায়ে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।) উদাহরণ :—

১ নং। ই-টে, ৫=১ ; হ-টে, বি, গো, ১০, ২=১½+ ; রু-× ; চি-সা, বি, গো, ৯, ৮, ২=১+ ; মোট ট্রিকদর ৪। উদ্বোধনী ডাক—হ-১ ; খেঁড়ীর ডাক—ই-১, বা নো-ট্রা-১ ; ফিরতি ডাক—চি-৩।

২ নং। ই-সা, ২=½ ; হ-টে, সা, বি, ৫, ২=২+ ; রু-৭=০ ; চি-টে, সা, ১০, ৮, ৪=২ ; মোট ট্রিকদর ৪½+। উদ্বোধনী ডাক—হ-১ ; খেঁড়ীর ডাক—ই-১ ; ফিরতি ডাক—চি-৩।

৩ নং। ই-সা, ৫=½ ; হ-টে, সা, বি, ৬, ৫, ২=২+ ; রু-টে, সা, ১০, ৩, ২=২ ; চি-৭=০ ; মোট ট্রিকদর ৪½+ ; উদ্বোধনী ডাক—হ-১ ; খেঁড়ীর ডাক—ই-১ ; ফিরতি ডাক—রু-৩।

একটির উপর একটি উঁচুদরের রংয়ের ডাককে চারে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় কতকগুলি তাসে। অনেকে এরূপ ডাককে দুর্ব্বল হাতের সীমাবদ্ধ ডাক (limit game bid) বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। উদ্বোধনকারী একটি ইস্কাবনের ডাকের পর আর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়, কারণ একের উপর একের ডাকের নিম্নতম ট্রিক ১+ থাকলেই গেম অনিবার্য্য বোধ করেন তিনি। খেঁড়ীর হাতে উপযুক্ত বাইরের রংয়ের প্রথম রোখবার তাস থাকলে তিনি স্লামের চেষ্টা করতে পারেন, নচেৎ নয়। মনে সাধারণতঃ প্রশ্ন জাগে যে, যখন ডাক বিনিময়ের দ্বারা সকল সংবাদ জানবার রাস্তা খোলা, তখন এরূপ ডাকের উপকারিতা কি? আছে বৈ কি, কয়েকটি বিশিষ্ট ধরণের তাসে যেখানে খেঁড়ীর একটি ডাকের পর গেম নিশ্চিত অথচ বাইরের রংয়ে প্রথম চক্রে বাধাদানের ক্ষমতা কম, সেরূপ ক্ষেত্রেই এই প্রকারের ডাক প্রযোজ্য। সুতরাং একটি ফিরতি ডাকের দ্বারা এতগুলি খবর দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন মনে করুন নিম্নলিখিত তাসে একটি রুহিতনের ডাকের উপর খেঁড়ী একটি ইস্কাবন ডেকেছেন। সুতরাং গেম লেখা ও ডাক দেওয়া আপনার পক্ষে অপরিহার্য্য :—

১নং	২নং	৩নং
ই-সা, বি, ৯, ৮	ই-বি, গো, ১০, ২	ই-গো, ১০, ৫, ৪, ২
হ-টে, ২	হ-বি, ২	হ-৭
রু-সা, বি, গো, ৬, ৩	রু-টে, সা, বি, ৪, ২	রু-টে, সা, বি, ৪
চি-সা, বি	চি-সা, গো	চি-সা, বি, ৩

উদ্বোধনকারী খেঁড়ীর ফিরতি ডাক
(Rebid by Responder)

একের উপর একের ডাকের পর ½ থেকে ১+ ট্রিক পর্য্যন্ত

বিষয়ে, সুতরাং উদ্বোধনকারীর ফিরতি ডাকের পর প্রকৃতশক্তি কিরূপ জানাবার সুযোগ ঘটে। তখন উদ্বোধনকারীর খেঁড়ীর পথ খোলা থাকে প্রধানতঃ তিনটি :—

১। পাস দেওয়া বা উদ্বোধনকারীর দুটি ডাকের মধ্যে একটিকে মনোনীত করা।

২। নিজের রংয়ের ডাকে বা নো-ট্রাম্প শক্তি অনুযায়ী ডাক দেওয়া।

৩। উদ্বোধনকারীর ডাকে শক্তি অনুযায়ী সাহায্যকারী ডাক দেওয়া।

১। উদ্বোধনকারী একটির-উপর-একটি ডাকের পর একটি নো-ট্রাম্প, প্রথম ডাকের রংয়ে বা উঁচুদরের রংয়ে দুটি ডাকলে বোঝা যায় যে উদ্বোধনকারীর উচ্চতাসমূল্য ২½ থেকে ৬ ট্রিকের মধ্যে, সুতরাং খেঁড়ীর কর্তব্য সাধারণতঃ নিম্নরূপ :—

ক) ১½ ট্রিকের কাছাকাছি শক্তিসম্পন্ন তাসে পাস দেওয়া। দো-রংয়া (two suiter) তাস হলে দ্বিতীয় রংটি দেখাবেন উদ্বোধনকারীর ফিরতি একটি নো-ট্রাম্পের পর। নচেৎ উদ্বোধনকারীর দুটি ডাকের মধ্যে পছন্দসই ডাকে ছেড়ে দেবেন বা ডাক দেবেন।

খ) দ্বিতীয়বার ডাক দেবার উপযোগী তাসে নিজের রংয়ের দুটির ডাক দেবেন—এক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রায় দু ট্রিকের মত উচ্চতাস মূল্য।

গ) দু ট্রিকের বেশী মূল্যের দ্বিতীয়বার ডাকবার উপযোগী উঁচুরংয়ের তাস থাকলে উক্ত রংয়ের তিনটি ডাক দেবেন।

ঘ) দু ট্রিকের মত বা কিছু বেশী শক্তির তাস (অন্তর্বর্তী তাস সমেত) উদ্বোধনকারীর ডাকের রং ছাড়া অন্য তিন রংয়ের উপর বিভক্ত থাকলে দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দেবেন।

ঙ) প্রায় উদ্বোধনের উপযোগী শক্তিসম্পন্ন তাসে অর্থাৎ ২½ ট্রিক বা কিছু বেশী দরের তাস থাকলে উদ্বোধনকারীকে গেমে উৎসাহিত করবার জন্য নূতন রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক দেবেন অথবা তাসের বিভাগানুযায়ী সোজা তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক দেবেন।

পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল :—

১নং। ই-সে, বি, ৫, ৪, ২ = ১½ ; হ-গো, ৩ = + ; রু-৭, ৭, ৪ = × ; চি-৭, ৫, ৩ = × ; মোট ট্রিকদর ১½।

২নং। ই-টে, ৮, ৭, ৫ = ১ ; হ-গো, ২ = + ; রু-সা, ১০, ৮, ৪, ৩ = ½ ; চি-৬ = × ; মোট ট্রিকদর ১½ +।

৩নং। ই-সা, ১০, ৮, ৯, ২ = ½ ; হ-৭, ৪, ২ = × ; রু-টে, ৭, ৩ = ১ ; চি-৭, ৪ = × ; মোট ট্রিকদর ১½।

৪নং। ই-সা, বি, গো, ৯, ২ = ১+ ; হ-৭, ৩ = × ; রু-সা, ৯, ২ = ½ ; চি-বি, ১০, ৩ = + ; মোট ট্রিকদর ২।

উঃ ডাক—হ-১ ; খেঁ: ডাক—ই-১ ; উঃ ফিঃ—নো-ট্রা-১, রু-২, চি-২ ; খেঁ: ফিঃ—পাস।

—হ-১ ; —ই-১ ; —নো-ট্রা-১ ; রু-২।

—হ-১ ; —ই-১ ; —নো-ট্রা-১ বা রু-২।

—পাস।

উদ্বোধনকারীর ফিরতি ডাক দুটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—হ-১ ; —ই-১ ; —নো-ট্রা-১ ; —ই-২।

৫নং। ই-টে, ৯, ২ = ১ ; হ-সা, গো, ১০, ৯, ২ = ½+ ; রু-বি, ৫ = + ; চি-১০, ৭, ৩ = × ; ট্রিকদর ২।

উঃ ডাক—রু-১ ; খেঃ ডাক—হ-১ ; উঃ ফিঃ ডাক—নো-ট্রা-১ ; খেঁঃ ডাক—হ-২।

দুটি হাতের মিলিত শক্তি ৪½ + থেকে ৫ ট্রিক। দুটি হরতনের খেলা হওয়ার সম্ভাবনা।

৬নং। ই-সা, বি, গো, ৯, ৩ = ১+ ; হ-বি, ৭ = + ; রু-সা, ১০, ৭, ৩ = ½ ; চি-বি, ৯, ২ = + ; ট্রিকদর ২+।

উঃ ডাক—হ-১ ; খেঁঃ ডাক—ই-১ ; উঃ ফিঃ ডাক—হ-২ ; খেঁঃ ডাক—ই-৩।

মিলিত শক্তি ৫ থেকে ৫+ ট্রিক। হ-বি ও ইস্কাবনে প্রায় ছিদ্রহীন গেমের সম্ভাবনা।

৭নং। ই-সা, গো, ১০, ৪ = ½+ ; রু-বি, ৯ = + ; রু-বি, ৬, ৫ = + ; চি-টে, ১০, ৯, ৫ = ১ ; ২+।

উঃ ডাক—রু-১ ; খেঁঃ ডাক—ই-১ ; উঃ ফিঃ ডাক—নো-ট্রা-১ খেঁঃ ডাক—নো-ট্রা-২।

এটিতেও মিলিত শক্তি ৫ থেকে ৫+ ট্রিক। নো-ট্রাম্প গেমের সম্ভাবনা, সাহায্যকারী তাস থাকায়।

৮নং। ই-সা, ৭ = ½ ; হ-টে, বি, ৭, ৬, ৪ = ১½ ; রু-গো, ৪ = + ; চি-টে, গো, ১০, ৬ = ১+ ; ট্রিকদর ৩+।

উঃ ডাক—রু-১ ; খেঁঃ ডাক—হ-১ ; উঃ ফিঃ ডাক—নো-ট্রা-১ খেঁ ডাক—চি:-৩।

মিলিত শক্তি প্রায় ৬ ট্রিকের মত, সুতরাং গেম নিশ্চিত।

একের উপর একের ডাকের পর উদ্বোধনকারী দ্বিতীয় চক্রে বেশী দরের (Higher-ranking) ডাক দিলে খেঁড়ীর কর্তব্য নিম্নরূপ :—

১। ১+ ট্রিকের কম দরের তাস থাকলে পাস দেবেন বা উদ্বোধনকারীর প্রথম ডাকে ফিরিয়ে দেবেন।

২। ১½ ট্রিক বা সামান্য বেশী দরের তাস (দ্বিতীয় রংয়ে সাহায্যকারী তাস সমেত) হ'লে পরে ডাকটি একটি বাড়িয়ে দেবেন।

৩। ২ ট্রিক শক্তিসম্পন্ন তাসে গেম আশা করা যায়। না-ডাকা রংয়ে রোখবার মত তাস ও বিভাগ নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী হ'লে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক দেবেন।

উদ্বোধনকারীর রু-১ ডাকের উপর একটি ইস্কাবন ডাকের পর দ্বিতীয় চক্রে উদ্বোধনকারীর হ-২ ডাক দিলে খেঁড়ীর ফিরতি ডাক কিরূপ হবে দেখান হল নিম্নলিখিত উদাহরণে :—

১। ই-সা, ১০, ৫, ৪, ২ ; হ-৭, ৪, ৩ ; রু-গো, ২ ; চি-সা, ৫, ৩ ট্রিকদর ১+ ডাক হবে পাস।

২। ই-বি, গো, ৯, ৭ ; হ-৫, ৩ ; রু-গো, ৫, ৪ ; চি-সা, ১০, ২ ; ট্রিকদর ১+ ; রু-৩ (অথবা প্রথম চক্রেই ই-১ বদলে রু-২)

৩। ই-সা, গো, ১০, ২ ; হ-বি, ৫ ; রু-গো, ৭, ২ ; চি-বি, ১০, ৯, ৬ ; ট্রিকদর ২ ; নো-ট্রা-৩।

৪। ই-সা, গো, ৯, ৫ ; হ-বি, ৬, [illegible] ; রু-[illegible] ; চি-১০, [illegible] [illegible] ট্রিকদর [illegible] ; [illegible]।

ডাক হয়েছে নিম্নরূপ :—

প্রঃ চক্র—উঃ হ-১ ; পূঃ পাস ; দঃ হ-১ ; পঃ পাস।

দ্বিঃ চক্র—হ-৩ বা ই-৩ বা নো-ট্রা-২ পাস ?

উত্তরের খেলোয়াড়ের উচ্চতাসমূল্য খুব বেশী এবং ছটি হাতের মিলিত শক্তিদ্বারা তিনি গেমের আশা রাখেন। তাঁর একার হাতে প্রায় ৮ থেকে ৯ পিঠ জয় করবার ক্ষমতা আছে।

দক্ষিণের খেলোয়াড় কিরূপ তাসে কি ডাক দেবেন, নীচে দেখান হ'ল :—

১। ১½ ট্রিকের কম, উদ্বোধনকারীর ডাকে সাহায্যকারী বা মধ্যবর্তী তাসের অভাবে পাস দেবেন।

২। ১½ অথবা কিছু বেশী শক্তি ও খেঁড়ীর ডাকে সাহায্যকারী তাস থাকলে, ডাকটিকে বাঁচিয়ে রাখা কর্ত্তব্য গেমে পৌঁছান পর্য্যন্ত।

কয়েকটি নমুনো তাস, যথা :—

১। ই-সা ১০, ৫, ৩ ; হ-বি, ৬, ২ ; রু-৫, ৪ ; চি-সা, গো, ট্রিকদর ১½ ; উঃ ২য় চক্রের ডাক হ-৩ ; দক্ষিণের ডাক হবে হ-৪।

২। ই-বি, গো, ১০, ৭, ২ ; হ-বি, ৩ ; রু-সা, ৯, ৩ ; চি-গো, ১০, ৪ ; ট্রিকদর ১½ ; উঃ ২য় চক্রের ডাক ই-৩ ; দক্ষিণের ডাক হবে ই-৪ ;

৩। ই-সা, গো, ১০, ৩ ; হ-বি, ৫, ৩ ; রু-১, ৭, ৪ ; চি-বি, গো, ১০ ; ট্রিকদর ১½ ; উঃ ২য় চক্রের ডাক নো-ট্রা ২ ; দক্ষিণের ডাক হলে নো-ট্রা-৩।

উদ্বোধনকারীর রংয়ের একটি ডাকের উপর খেঁড়ীর বাধ্যতামূলক ছটির ডাকের পর উদ্বোধনকারীকে ছটি নো-ট্রাম্প ডাক দিতে গেলে দরকার ৩½+ থেকে ৪+ ট্রিক, আগেই একথা বলা হয়েছে। এরূপ ডাকের পর খেঁড়ীর দ্বিতীয় চক্রে কিরূপ তাসে কি ডাক হ'বে নীচে দেখান হ'ল। মনে করুন উদ্বোধনকারীর হ-১ ডাকের উপর খেঁড়ীর রু-২ ডাকের পর ফিরতি ডাকে উদ্বোধনকারী ডেকেছেন নো-ট্রাম্প ২। দক্ষিণের খেলোয়াড় রু-২ ডাকের নিম্নতম শক্তির তাস থাকলে পাস দেবেন। অন্যথায় ডাক হবে :—

১। রুহিতন রংয়ে টে, সা, বি, গো, এর মধ্যে ছখানি ছবি সমেত পাঁচ বা ছ'তাস এবং ডাকের বাইরের রংয়ের টেক্কা থাকলে নো-ট্রা-৩।

২। উদ্বোধনকারীর রংয়ে সাহায্যকারী তাস সমেত ২ ট্রিক দরের তাস ডাকলে খেঁড়ীর ডাকে ৩টি (গেমে উৎসাহপূর্ণ)

৩। ১ ট্রিক সমেত ছ'খানি বা ১½ সমেত পাঁচখানি রুহিতন থাকলে রু-৩।

উদাহরণ যথা :—	ট্রিকদর	ডাক হবে
১। ই-টে, ৭ ; হ-১০, ৮ ; রু-সা, গো, ১০, ৮, ৭, ২ ; চি-১০, ৫' ৩।	১½+	নো-ট্রা-৩
২। ই-সা, গো, ৯ ; হ-সা, ৫ ; রু-টে, গো, ৯, ৬, ৩ , চি-১০, ৯, ২।	২½	নো-ট্রা-৩
৩। ই-১০, ৫ ; হ-বি-৮, ৩ ; রু-টে, বি, ১০, ৪, ২ ; চি-সা, ৬, ২।	২½	হ-৩
৪। ই-গো, ৮, ২ ; হ-৬, ২ ; রু-টে, বি, ৫, ৪, ৩ ; চি-৮, ৭, ৪।	১½+	পাস

৪নং তাসে খেঁড়ীর ডাকে সাহায্যকারী তাসের অবর্ত্তমানে এবং ট্রিকদরটি একটি রংয়ে (রুহিতনে) সীমাবদ্ধ থাকায় উদ্বোধনকারীর একটি হরতন ডাকের উপর ছটি রুহিতন ডাকা অপেক্ষা একটি নো-ট্রা ডাকাই উচিৎ।

উদ্বোধনকারী ও খেঁড়ীর ডাক বিনিময়ের সাধারণ নিয়মের সারাংশ।

উদ্বোধনকারী (প্রথম চক্র First round)

১। একটি রংয়ের ডাক (১২ থেকে ১৪ পয়েন্ট)

(ক) অন্ততঃ ২½ ট্রিক — ৫ তাস

(খ) " ৩ " — ৪ "

(গ) " ২+ " — ৬ "

(প্রতি ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ½ ট্রিক থাকা দরকার বাইরের একটি রংয়ে এবং অন্ততঃ ৪ পিঠ জয়ের ক্ষমতা)

খেঁড়ী (First round প্রথম চক্র)

১। একটির উপর একটির ডাকের সাধারণ নিয়ম :—

(ক) উঁচুদরের রংয়ের ৪ তাসে—১½ ট্রিক (৭ পয়েন্ট)

(খ) " " ৫ তাসে—১+ ট্রিক (৫ থেকে ৬ পয়েন্ট)

(গ) " " ৬ তাসে—½ থেকে ১ ট্রিক (৪ পয়েন্ট)

(ঘ) একটি নো-ট্রাম্প—১+ থেকে ২+ ট্রিক (৬ থেকে ১০ পয়েন্ট)

বিঃ দ্রষ্টব্য। একটি নো-ট্রাম্প ডাকে উঁচুদরের একটি ডাকের পক্ষে উপযুক্ত তাসের অভাব বোঝা যায়, উপরন্তু জোরদার ডাক বাঁচিয়ে রাখবার সম্ভাবনা কম বোঝায়।

২। বাধ্যতামূলক রংয়ে ছইয়ের ডাক (নীচুদরের রংয়ে) :—

(ক)	ছ' তাসে ··· ১½ ট্রিক	১০ থেকে ১৮ পয়েন্ট
(খ)	পাঁচ তাসে ··· ২ "	
(গ)	চার তাসে ··· ২½ "	

৩। উদ্বোধনকারীর উঁচুদরের ডাক একটি বাড়ান। (৬ থেকে ১০ পয়েন্ট)

(ক) কোনও রংয়ের তাস একক—তিনখানি ডাকের রংয়ের তাসে

(খ) " " ছখানি তাস—চারখানি ঐ

অধিকন্তু ১ ট্রিক বা কিছু বেশী।

(গ) ১½ থেকে ২ ট্রিক—সাধারণ সাহায্যকারী রংয়ের তাসে।

৪। উদ্বোধনী উঁচুদরের ডাক ছটি বাড়ান (১০ থেকে ১৭ পয়েন্ট)

(ক) ৫ খানি রংয়ে ··· ২+ ট্রিকে

(খ) ৪ " " ··· ২½+ "

বিঃ দ্রঃ—প্রথম ক্ষেত্রে ১+ ট্রিক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১½+ ট্রিক রংয়ের বাইরের তাসে হওয়া দরকার।

উদ্বোধনকারীর ডাক (প্রথম চক্র opening bid 1St. Rd

খেঁড়ীর ডাক (প্রথম চক্র Respond bid 1st. Rd)

৫) নীচুদরের ডাক ছটি বা বেশী বাড়ান (৮ থেকে ১০ পয়েন্ট)

ক) একের ডাক তিনে তোলা—১½ থেকে ২½ ট্রিক

খ) একের ডাক চারে তোলা—১ থেকে ২+ ট্রিক

বিঃ দ্রঃ—উভয় ডাকের উদ্দেশ্য বিপক্ষদলের ডাকে বাধা সৃষ্টি করা ও সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রংয়ের তাসের সংখ্যাধিক্য জানান। প্রথম ডাকে

সাধারণতঃ উদ্বোধনকারীকে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাকে গেমে প্ররোচিত করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি প্রযুক্ত হয় আরও দুর্ব্বল তাসে বিভাগের অসাধারণতা হেতু।

৬। রংয়ের একটি ডাকের উপর দুটি নো-ট্রাম্প ডাক (১৩ থেকে ১৬ পয়েন্ট)

ক) সাধারণ বিভাগে—৩ থেকে ৩½ ট্রিকে।

খ) ২½ ট্রিকেও চলে উদ্বোধনকারীর ডাকের রংয়ে সাহায্যকারী তাস সহ (অন্ততঃ দুতাসে বিবি বা তিনতাসে গোলাম) একটি নীচুদরের প্রায় ছিদ্রহীন পাঁচতাস ও অপর দুটি রংয়ের রোখবার মত তাস থাকলে।

৭। একটির উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বেশী ডাক (অন্যূন ১৮ পয়েন্ট)।

ক) রংয়ের ডাকের বিশেষ সাহায্য থাকলে—৩ থেকে ৩½ ট্রিক।

খ) অন্যথায় (নিজের রংয়ে)—৪ থেকে ৪½ ট্রিক।

৮। একটির ডাকের উপর তিনটি নো-ট্রাম্প (১৬ থেকে ১৮ পয়েন্ট)।

এরূপ ডাকের ক্ষেত্র বিরল। প্রযুক্ত হয় ৪ ট্রিকের মত তাসে। ৩½ ট্রিকেও সময়ে সময়ে চলে উদ্বোধনী ডাকের বিশেষ সাহায্যকারী তাস থাকলে। ডাকের বিশেষত্ব এই যে, এক ডাকে তাসের দর ও বিভাগ উদ্বোধনকারীকে জানান সম্ভব। উদ্বোধনকারীর তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প ডাকের পক্ষে অনুপযুক্ত হ'লে তিনি রংয়েই খেলতে পারেন বা শক্তি বেশী থাকলে আরও অগ্রসর হ'তে পারেন।

উদ্বোধনকারীর ডাক প্রথম চক্র (Opening Bid)

২। একটি নো-ট্রাম্প ডাক (Opening one No-Trump)

ক) ডাকের বা ফিরতি ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাবে, ৪-৪-৩-২ অথবা ৪-৩-৩-৩ বিভাগে···৩½ থেকে ৪ ট্রিক (১৬ থেকে ১৮ পয়েন্ট)

খ) নিম্নদরের রংয়ের উচ্চতাস সমেত পাঁচখানি সহ ৫-৩-৩-২ বিভাগে, সকল রংয়ের রোখবার তাস থাকলে···৩½ ট্রিক (১৬ পয়েন্ট)

খেঁড়ীর ডাক প্রথম চক্র (Responses to opening Bid)

১। ক) ১½ বা কম ট্রিকের সম-বিভাগ তাসে অর্থাৎ ৪-৩-৩-৩ অথবা ৪-৪-৩-২ বিভাগে পাস (Pass) দেওয়া উচিৎ।

খ) অসম-বিভাগে অর্থাৎ ৫-৫-৩-০, ৫-৫-২-১, ৬-৫-১-১ ইত্যাদি তাসে বিশেষতঃ উচ্চতাসমূল্য কম হ'লে, ১ থেকে ১½ ট্রিকের মত তাসে, নো-ট্রাম্প ডাকে উদ্বোধনকারীকে কোনও রূপ সাহায্য সম্ভব না হ'তে পারে কিন্তু রংয়ের ডাকে ঐরূপ দুর্ব্বল তাসেও কতকগুলি পিঠ জয় করা যেতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত রংয়ের ডাকে খেলার প্রচেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গ) ২ ট্রিক তাসে গেমের সম্ভাবনা থাকে, এবং ২½ ট্রিকে গেম সুনিশ্চিত বলা চলে।

ঘ) ২½ ট্রিক তিন রংয়ে বিভক্ত (১০ পয়েন্ট) ২ ট্রিকে, ৬খানি নীচুদরের ভাল সমেত তিনটি নো-ট্রাম্প।

ঙ) ২½ বা কিছু বেশী ট্রিক সহ ডাকের উপযুক্ত কোন রংয়ের ৫খানি তাসে—গেমে উৎসাহদানকারী উক্ত রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক (one jump bid)

চ) ছয় খানি উঁচুদরের রংয়ের তাসে, ২ ট্রিক বা সামান্য কমে—গেম ডাক অর্থাৎ ৪এর ডাক।

খেঁড়ীর ডাক—দ্বিতীয় চক্র (Rebid by opener)

৩। একের-উপর-একের রংয়ের ডাকের পর

ক) ½ ট্রিক বা সামান্য বেশী-প্রথম ডাকের দুটি-বা নীচু দরের ২ টির ডাক (প্রায় দোরংয়া তাসে)

খ) পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীদরের রংয়ে দুটির ডাক—এক্ষেত্রে খেঁড়ীকে একপ্রকার জোরকরে তিনের ডাকে সাহায্যের আহ্বান জানান হচ্ছে—দরকার প্রায় ৩½ ট্রিকের মত তাস, ৪ খানি রং বা ৩ খানি রং দুটি ছবি সমেত এবং বাইরের কোন একটি রংয়ে মাত্র একখানি তাস। কোনটির ব্যতিক্রমে ৪ ট্রিকের মত তাস।

গ) প্রথম ডাক একটি বাড়িয়ে ডাক

খেঁড়ীর ডাক একটি বাড়িয়ে ডাক

খেড়ীর একটি ডাকের উপর দুটি নো-ট্রা

এরূপ ডাকের জন্য প্রয়োজন প্রায় ৩ ট্রিকের এবং ৮ পিঠ জয় করবার তাস।

খেঁড়ীর ডাক—দ্বিতীয় চক্র (Rebid by responder)

১০। উদ্বোধনকারী প্রথম ডাকের বা নীচু দরের দুটি ডাক দিলে

ক) ২ ট্রিকের কম হ'লে···পাস

খ) ২ ট্রিকের মত তাসে···নিজ রংয়ে ফিরতি ডাক (দুয়ে)।

গ) ২ ট্রিক সম-বিভাগ (১১-১২ পয়েন্ট)···দুটি নো-ট্রাম্প।

ঘ) ২+ ট্রিক উঁচুদরের রংয়ে গেমে উৎসাহদানকারী ডাক অথবা সোজা গেমের ডাক।

১১।

ক) ১+ ট্রিকে পাস দেওয়া বা আগের ডাকে ফেরৎ দেওয়াও চলে।

খ) ½ বা কিছু ট্রিকে নিজের ডাক খেঁড়ীর ডাক (চার তাসে) বাড়ানো চলে।

গ) ২ ট্রিক না ডাকা (unbid suit) রংয়ে রোখবার তাসে অন্ততঃ বিবি, ১০ তিন তাসে, দুটি নো-ট্রাম্প ডাক হ'বে।

১২।

ক) ১½ ট্রিক তাসে উদ্বোধনী রংয়ে বিশেষ সাহায্যকারী তাস বা চারখানি রংয়ের অভাবে পাস দেওয়া যায়।

খ) ১½ ট্রিক এবং উদ্বোধনী ডাকে সাহায্যকারী তাসে ২টি নো-ট্রা বা উদ্বোধনী ডাকটি বাড়িয়ে ৩টি করা যায়।

গ) বেশী ট্রিকে নিজের ডাকে অগ্রসর হওয়া যায়।

উদ্বোধনকারীর ২য় চক্রের ডাক

৪। একটি রংয়ের ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প ডাকের পর।

ক) ৩½ ট্রিকের মত সম-বিভাগ তাসে পাস দেওয়া উচিৎ।

খ) ৩½ ট্রিকের মত তাসে অসম বিভাগে (Unbalanced

প্রথম ডাকের দুটি (ছ'তাসে হ'লে ভাল) অথবা কমজয়ের অপর রংয়ে দুটির ডাক।

গ) ৪½ ট্রিকের তাসে, প্রায় সকল রংয়ে উঁচু বা মাঝারী তাসে ২টি নো-ট্রাঃ।

ঘ) ৪+ থেকে ৪½+ ট্রিকে উঁচু রংয়ের ডাক।

i) ৮টি পিঠজয়ের ক্ষমতায়—তিনটির ডাক।

ii) ৮½ থেকে ৯ পিঠজয়ের ক্ষমতায়—চারটির (গেমের) ডাক।

৫। একটি রংয়ের ডাকের উপর কমজয়ের রংয়ে দুটির ডাকের পর।

ক) পাস দেওয়া চলেনা কোনও মতে।

খ) মাত্র উদ্বোধনের উপযুক্ত শক্তিতে বাধ্যতামূলক আগের ডাকের দুটির ডাক।

খেঁড়ীর দ্বিতীয় চক্রের ডাক

১৩। ক) ১½+ থেকে ২ ট্রিকের মত তাসে (৯-১০ পয়েন্ট) উদ্বোধনী ডাকে সামান্য সাহায্যকারী তাসে দুটি নো-ট্রাম্প।

খ) অভাবে পাস বা দুটির মধ্যে পছন্দমত ডাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ক) ১½+ ট্রিকে (৭ থেকে ৯ পয়েন্ট)—৩টি নো-ট্রাম্প।

খ) কমে পাস দেওয়াই ভাল। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে অতি দুর্ব্বল হাতে নূতন রংয়ে তিনের ডাক।

১৪। ক) ২ ট্রিক বা কমে, উদ্বোধনী ডাকে সাহায্য দেওয়ার বা নিজ রংয়ে পুনরায় ডাকবার ক্ষমতার অভাবে পাস।

খ) প্রায় ২ ট্রিকের মত তাসে, বাইরের অপর রংয়ের মাত্র একখানি তাস ও খেঁড়ীর রংয়ের ৩ খানি তাস অথবা বাইরের কোনও রংয়ের দুখানি ও খেঁড়ীর রংয়ে চারখানি তাসে—খেঁড়ীর রংয়ের ডাক তিনটি।

উদ্বোধনকারীর ২য় চক্রের ডাক

(গ) নীচুদরের দুটির ডাক—২½ থেকে ৩½ ট্রিক (উঁচুদরের ডাক ৪ তাসে এবং পরের ডাক ৫ তাসে হতে পারে)

(ঘ) দুটি নো-ট্রাম্প—৩½ থেকে ৪½ ট্রিক (১৬-১৮ পয়েন্ট)

(ঙ) নীচুদরের দুইয়ের ডাককে তিনে তোলা প্রয়োজন ৩½ বা কিছু বেশী ট্রিকের তাস সহ রংয়ে বিশেষ সাহায্যকারী তাস।

খেঁড়ীর দ্বিতীয় চক্রের ডাক

১৫। (ক) ২ ট্রিকে উদ্বোধনকারীর প্রথম ডাকে দুটি বা পাস।

(খ) ২+ থেকে ২½ ট্রিকে দ্বিতীয় রংয়ে বিশেষ সাহায্যকারী তাস সমেত প্রায় ৫ পিঠ জয়ের ক্ষমতায় দ্বিতীয় ডাকের তিনটি। (সাধারণতঃ উদ্বোধনকারীকে ৩টি নো-ট্রাম্প ডাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ ডাক হয়)

১৬। (ক) নিম্নতম (১½ থেকে ১½+) শক্তিতে পাস।

(খ) ২+ বা কিছু বেশী ট্রিকে ৩টি নো-ট্রাম্প অথবা উঁচুদরের রংয়ে ৩টির ডাক।

(গ) ২+ ট্রিক সহ খেঁড়ীর ডাকে উপযুক্ত সাহায্যে খেঁড়ীর ডাকের তিনটি ডাক। এরূপ ডাক সাধারণতঃ গেমে উৎসাহকারী।

(ঘ) ১ থেকে ১½ ট্রিক অন্ততঃ ছ' তাস নিয়ে ডাক তিনটি। এরূপ ডাক দুর্ব্বল ডাকের পর্য্যায়ে পড়ে। (উপযুক্ত সাহায্য ও বাইরের রংয়ে রোখবার তাস থাকলে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক দিতে পারেন উদ্বোধনকারী)

১৭। (ক) ২ ট্রিক তাসে উদ্বোধনকারীর উঁচুদরের তিনের ডাক অথবা উদ্বোধনকারীর সাধারণ সাহায্যকারী তাসে তিনটি নো-ট্রাম্প।

(খ) অন্যথায় পাস। বিশেষ ধরণের বিভাগ ছাড়া নীচুদরের রংয়ে ৪টি বা ৫টি ডাকা উচিৎ নয়।

উদ্বোধনকারীর ২য় চক্রের ডাক।

চ) নীচুদরের দুইয়ের ডাকের পর নূতন রংয়ে বাধ্যতামূলক তিনের ডাক। প্রয়োজন প্রায় ৪ ট্রিকের মত তাস। ৩½ ট্রিকেও খেঁড়ীর রংয়ে সাহায্যকারী তাস অথবা উচ্চতাস সহ দুটি রংয়ে বিভাগ ৫-৫ হ'লেও এরূপ ডাক চলে।

খেঁড়ীর ২য় চক্রের ডাক।

১৮। ক) ১½ বা সামান্য বেশী ট্রিকে ৬ তাসে নিজ রংয়ে তিনটির ডাক।

খ) ২ থেকে ২+ ট্রিকে প্রথম ডাকে সাধারণ সাহায্যকারী তাস সহ ৩ ডাকা রংয়ে রোখবার ক্ষমতায় ৩টি নো-ট্রা।

গ) ২ থেকে ২+ ট্রিকে—উঁচুদরের রংয়ে সাহায্যকারী তাস থাকলে উক্ত রংয়ে তিনটির ডাক। এরূপ ডাক সাধারণতঃ গেমে উৎসাহদানকারী।

ঘ) অন্যথায়—পাস।

[ক্রমশঃ।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

কুয়াশা

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের নবীনতম সংস্করণ।

গল্পের নায়ক স্মৃতিবিভ্রমের মাধ্যমে কেমন করে আস্বাদ পেলো শুভ্র সুন্দর সমাজজীবনের, তাই এই স্বল্পপরিসর উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নিপুণ ভাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জাতশিল্পী—সহজ সুরে গভীর কথা বলেন তিনি, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনবদ্য লিখনশৈলীতে মানুষের মনের গোপন কত আশা-আকাংখা যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আলোচ্য কাহিনীর নায়ক যুবক প্রত্যোৎ ছিল এক সাধারণ অপরাধী, হঠাৎ স্মৃতিভ্রংশ ঘটে তার ফলে আপন অতীতকে সম্পূর্ণ ভাবেই ভোলে সে, এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হয় সে, এই অবস্থায় দরিদ্র এক নবলব্ধ বন্ধু-পরিবারের মায়ায় কেমন করে জেগে ওঠে তার প্রাণসত্তা লুপ্ত মনুষ্যত্ব, তাই বর্ণিত হয়েছে বালির আঁচড়ের অতি সূক্ষ্ম টানে টানে।

কালিমাময় অতীতের স্মৃতি যেদিন আবার ফিরে এল সেদিন প্রত্যোৎ আর এক মানুষ, প্রেমের আলোয় রাঙা তার এই নতুন জগতে পদক্ষেপের আগে অবিচলিত মনে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এগিয়ে যায় সে বীরের মতই। কলঙ্কমলিন অতীত জীবনের অধ্যায় কুয়াশা-ঢাকা দিনের মতই নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় তার নবজাগ্রত চিত্তের অরুণালোকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অতুলনীয় ভাবা বইটির এক বিশেষ সম্পদ, আমরা এই সুন্দর উপন্যাসটি হাতে পেয়ে আনন্দ পেয়েছি এবং তা অকুণ্ঠেই স্বীকার করি। প্রচ্ছদ শোভন, অঙ্গসজ্জা যথাযথ। প্রকাশক—বাকসাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯ দাম—তিন টাকা।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

ভগবান রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ অন্যতম। যে তরুণ তাপসের দল জীবনের বোধনলগ্নে সমন্বয়গুরু রামকৃষ্ণের অভয়চরণ-ছায়ায় শরণ লাভ করে সেই যুগগুরুর কাছ থেকে জীবনের প্রকৃত দীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করে'ধন্য হন, অখণ্ডানন্দ তাঁদেরই অন্যতম। ঠাকুরের অমৃত আদর্শে সারা দেশকে উদ্বুদ্ধ করার পুণ্যব্রত যাঁরা অবলম্বন করেন অখণ্ডানন্দের স্থান তাঁদেরই মধ্যে। ঠাকুরের প্রত্যক্ষশিষ্যরূপে স্বামী অখণ্ডানন্দও আজ ঘরে ঘরে পূজিত। অগণিত নরনারী তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করে তাদের প্রাণের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণাম। এই মহান পুরুষের পুণ্য জীবনের পবিত্র কাহিনীসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে স্বামী অখণ্ডানন্দ দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থে সেবাব্রতী পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দের সমগ্র জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী বহু অভিনব তথ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের, মায়ের, বিবেকানন্দের এবং মিশনের সম্বন্ধেও নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সারা গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের প্রজ্ঞানময় চিত্তের এক স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ইতিহাসমূল্যও অপরিসীম। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের এক আনুপূর্বিক ইতিহাস এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। এই গ্রন্থ রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক সাহিত্যের তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থটি ঘরে ঘরে সমাদৃত হোক, আমরা সর্বান্তঃকরণে এই কামনাই করি। প্রকাশক—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন কলকাতা-৩। দাম—চার টাকা মাত্র।

মনে রেখ

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তার যে বিভাগটি নিয়ে আজ নিঃসন্দেহে গর্ব করতে পারে তা হল তার ছোট গল্প, শক্তিমান কথাশিল্পিবৃন্দের প্রতিভার স্বাক্ষরে সাহিত্যের এই শাখাটি আজ বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ; আলোচ্য গ্রন্থটিও তারই স্বীকৃতি। প্রবোধকুমার সান্যাল আজ স্বনামধন্য আপন বৈশিষ্ট্যে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম—এই কথাশিল্পী প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতিমান হলেও ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও যে পুরোধা হিসাবেই বরণীয়, "মনে রেখ" তারই এক প্রামাণ্য দলিল। খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্রায়ণের ভঙ্গীতে গল্পগুলি পরিবেশিত হয়েছে, প্রবোধকুমারের শাণিত উজ্জ্বল ভাষারীতি এগুলির এক অমূল্য সম্পদ, ভাষা যেন বেগবতী ঝরণার মতই কাহিনীকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে ভাবের অতল সমুদ্র-সৌন্দর্য্যের গভীরে। জীবনবোধের স্পন্দনে রণিত বিষয়বস্তু লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষরবাহী—আর সে জীবনবোধ যে কত বলিষ্ঠ কত প্রাণময়, কাহিনীগুলির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে তারই পরিচয়, পড়তে পড়তে পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয় সে প্রাণময়তা লেখকের দুর্বার লেখনীর মাধ্যমে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতে কি অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা বক্তব্যকে প্রাণবাহী করার কি অনবদ্য ভঙ্গী! সার্থক ও নিপুণ এক শিল্পকার্য্য, যার সুষমায় রসাবিষ্ট হয় মন, যার সৌকর্য্যে চমকিত হয় প্রজ্ঞা। পরিণত লেখনীর এই অনবদ্য সৃষ্টি যে রসপিপাসুকে প্রকৃত আনন্দ দিতে সক্ষম, একথা অনস্বীকার্য্য। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। মনেরেখ—প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রাণী পালঙ্ক

বর্তমান বাঙলার শক্তিমান লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ অনায়াসে করা চলে। সুখ্যাতঃ নাট্যকাররূপে তিনি প্রখ্যাত হলেও উপন্যাস রচনাতেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত, "রাণী পালঙ্ক"ই

আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। এক হৃদয়গ্রাহী কাহিনী অবলম্বন করে এই উপন্যাসটিতে তিনি রূপ দিয়েছেন অভূতপূর্ব দক্ষতা সহকারে। ঘটনা-সংস্থাপনে ধারারক্ষায় এবং চরিত্রচিত্রণে তিনি প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সমগ্র উপন্যাসটি লেখকের বৈশিষ্ট্যবান দৃষ্টিভঙ্গীর এবং সজীব চিন্তাধারার পরিচয় বহন করছে। সারা উপন্যাসটিতে লেখকের দরদী ও সহানুভূতিশীল মনের স্বাক্ষর সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। লেখকের বক্তব্য পাঠকচিত্তে চিন্তার খোরাক জোগায়। গ্রন্থটির আবেদন পাঠকমনে রেখাপাত করতে অসমর্থ হয়। প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

উন্মোচন

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে লেখনী ধারণ করে যাঁরা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর আসন তাঁদেরই মধ্যে। তাঁর বহুজন-আদৃত সাহিত্যসৃষ্টিগুলির মধ্যে উন্মোচন অন্যতম। ঊনচল্লিশ বছর বয়স্কা এক বিধবার জীবনের একটি বিশেষ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। বিধবা মানসীর জীবনে দেখা দিল এক অধ্যাপক। একদিকে কুড়ি বছরের ছেলে গৌতম অন্যদিকে অধ্যাপক এই দুয়ের মধ্যে কার আকর্ষণ মানসীর জীবনে অপরিহার্য রূপ নিল, সেই কাহিনীই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে লেখিকা জীবনের এক বিশেষ দিকের দ্বারোন্মোচন করলেন। জীবনের এক জটিল অধ্যায় এই গ্রন্থে লেখিকা চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থটি তাঁর সৃজনীশক্তির অন্যতম মুখ্য পরিচায়ক বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা বহন করে। জীবনের এই অধ্যায়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লেখিকা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির গতি শ্লথ নয়, যথেষ্ট বেগবান, বর্ণনভঙ্গীও মনোরম। কাহিনীবিন্যাসেও লেখিকা আশানুরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি। প্রকাশক—মহাদেবচন্দ্র বসু, সরস্বতী গ্রন্থালয়, ১১৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

শ্রীমতী

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অধুনাতম একটি রচনা। লেখক পাঠক-সমাজে অপরিচিত নন, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যাঁরা খ্যাতি ও জনসমাদর ভোগ করেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম। সহজ ভাবে গভীর কথা বলাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, আলোচ্য উপন্যাসটিও সেই বিশিষ্টতারই ধারা বহন করছে। অন্তরের ঐশ্বর্য্য যে অর্থ সম্পদের চেয়ে অনেক বড় অনেক শ্রেয়, একথা মনে-প্রাণেই জানত শ্রীমতী—তাই তার নিজের জীবনে যেদিন এ প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠল যে, প্রেম বড় না ঐশ্বর্য্যের বিলাসের পরিচিত আবেষ্টনে ঘেরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করাই শ্রেয়: সেদিন দৃঢ়পদে প্রেমের ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে যেতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না তার। মানুষের অন্তর-সম্পদের পাশে অর্থের দম্ভ যে কত অকিঞ্চিৎকর, তা প্রমাণ হয়ে গেল পলকের মধ্যেই, শুচিশুভ্র সেই অন্তর-সৌন্দর্য্যে ঝলমলিয়ে উঠল শ্রীমতী আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে। ঝুটো আভিজাত্যের মুখোসের আড়ালে বসে অসহায় ভাবেই মনুষ্যত্বের এই স্বীকৃতি দেখলেন, উপলব্ধি করলেন আর দুজন মানুষ শ্রীমতীরই পিতামাতা, উভয়ে চরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁরা পরাজিত। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দর হয়েই ফুটে উঠেছে শ্রীমতীর জবানীতে, লেখকের বক্তব্য সহজেই পাঠকের মনকে ছুঁতে পারে, বইখানি আমাদের ভালই লেগেছে, একথা সানন্দে স্বীকার করি। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, অন্যান্য আঙ্গিকও সুন্দর। প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

সোহো-স্কোয়ার

জনপ্রিয়তার দুর্লভ অধিকার ভোগ করেন যে আধুনিক সাহিত্যিকার তাঁরই নাম সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বস্তুতঃ তাঁর বইয়ের অনুরাগী পাঠক-সমাজ ব্যাপ্তিতে বড় ছোট নয়, প্রিয় লেখকের এই নতুন উপন্যাসখানি তাঁদের আনন্দই দেবে। লেখকের অন্যান্য বহু রচনার মতই আলোচ্য গ্রন্থের পটভূমিও বিদেশ, কিন্তু বিষয়বস্তু বিদেশী নয় বরঞ্চ বলা যায় সর্বদেশীয়, কারণ নারীমাংসকে পণ্য করে যে অমানুষের দল আজ টাকার থলি ভরিয়ে নিচ্ছে তাদের জাল পাতা সর্বত্র, কোন বিশেষ দেশে আজ আর তাদের গতিবিধি আবদ্ধ নেই। এমনই এক অমানুষ ধনীর পাপচক্রে পড়ে একটি সরল সুন্দর মেয়ের জীবনে নেমে এল কেমন করে ব্যর্থতার কৃষ্ণযবনিকা ললিত গতিতে সেই কাহিনীই শুনিয়েছেন লেখক।

ঐশ্বর্য্য ও আরামের লোভে নিজের অন্তরাত্মাকে বিক্রয় করেছিল তরুণী নীতা, তার সে ভুল ভাঙল যেদিন, সেদিন কিন্তু ফেরার পথ ছিল না আর, নিজেকে ধ্বংস করেই ভুলের মাশুল গুণে দিল সে। হারিয়ে গেলো সে আরও অনেকের মতই সর্বনাশের অতলে নিশ্চিহ্ন হয়েই, একটি কুসুমকলি ফোটার আগেই ঝরে গেল।

নিপুণ হাতে আরাম বিলাসের প্রতি আধুনিক মানুষের অত্যধিক আকর্ষণের কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক, বইখানির বিষয়বস্তু আজ সত্যই এমন এক সামাজিক সমস্যা, যা নিয়ে ভাববার অনেক কিছুই আছে। লেখকের ভাষা সরল ও সাবলীল। বইটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

আরও কথা বলো

আধুনিক কালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয় জন মহিলা পদক্ষেপ করেছেন আপন শক্তির স্বাক্ষরে চিহ্নিত হয়েই, বীণা রায় তাঁদেরই অন্যতমা। প্রথম আত্মপ্রকাশের সময়েই যে লেখনী চমক লাগিয়েছিল একদিন আজও যে তার জয়যাত্রা চলেছে অব্যাহত গতিতে—লেখিকার সদ্যপ্রকাশিত এই উপন্যাসটি পাঠ করলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ ঘটবে বাংলা সাহিত্যানুরাগিবৃন্দের। বর্তমান সাহিত্যের প্রিয় বিষয়বস্তুই বেছে নিয়েছেন লেখিকা শহর কলিকাতার অতীত জীবন, তবে অতীতকে যে আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে তা একাধারে রোমাণ্টিক ও অভিনব। একটি আধুনিকা তরুণীর জাতিস্মর স্মৃতির রোমন্থনের মাধ্যমে পুরোনো কলিকাতার বনিয়াদী ধনী সমাজের নানা পাপ ও দুর্বলতার কাহিনী বুনেছেন লেখিকা, তাঁর ভাবাসমৃদ্ধ বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, আর সেজন্যই পাঠকের মন

সমাধিস্তম্ভ, জয়পুররাজ

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দেওয়ানী খাস (দিল্লী)

—সুবীর রায়চৌধুরী

আগ্রাহুর্গ — মোনা চৌধুরী
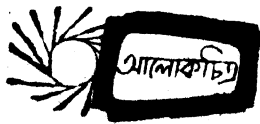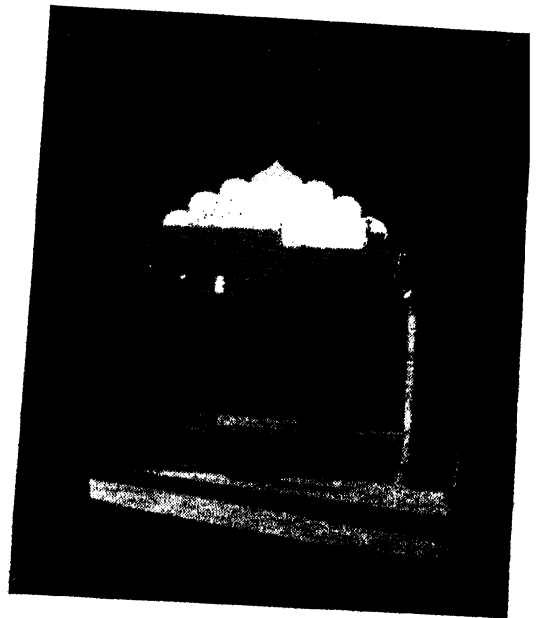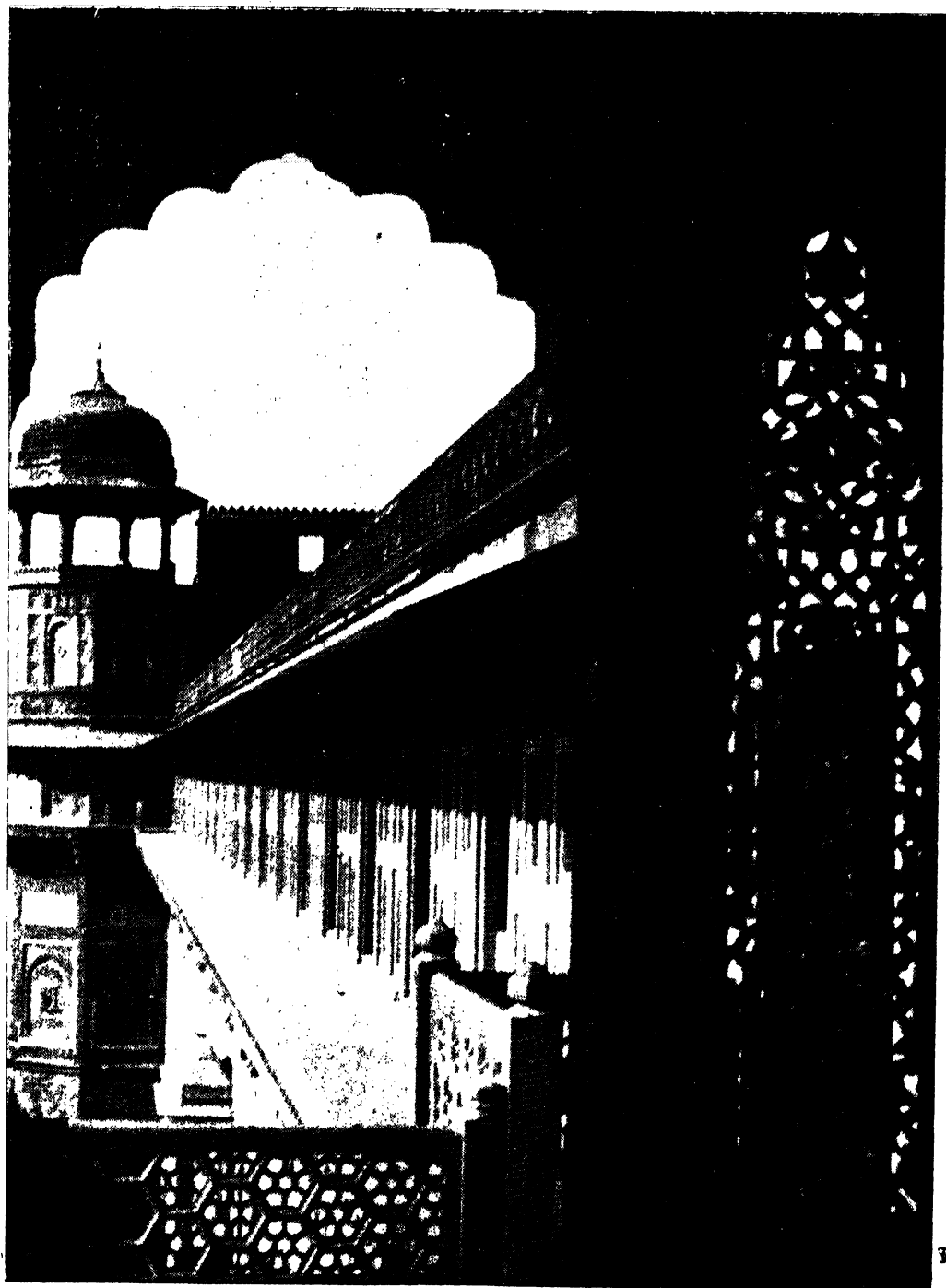
—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

প্র

স্তু

তি

—চিত্ত নন্দী

—অনিল কর্মকার

জীবনের উৎস

—আশুতোষ সিনহা

হারিয়ে যায় পাঠ্যবস্তুর মাঝখানে সহজেই। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে জীবনকে দেখেন লেখিকা, সে পরিচয়ে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতই আলোচ্য পুস্তকটিও চিহ্নিত; বীণা রায় আজ সাহিত্যের আসরের মুষ্টিমেয় পুরোধা মহিলা সাহিত্যিকগণের অন্যতমা। মনে হয় কোন বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা জীবনের নানা বৈচিত্রের প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ সত্যিকার সাহিত্যিকের অপর নামই তো জীবনশিল্পী। বইটির প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—দু টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

জোয়ার-ভাটা

আধুনিক কথাসাহিত্যের আসরে সমরেশ বসু আজ পরিচিতই শুধু নন, জাতসাহিত্যিকের স্বীকৃতিধন্য, তাঁর আধুনিকতম প্রকাশিত পুস্তক এই গল্পসংগ্রহ। মোট সাতটি গল্প চয়িত হয়েছে আলোচ্য সংগ্রহে যার সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছে কোন না কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকায়।

লেখক মননশীল শিল্পী। তাই তাঁর গল্পের আবেদন মানব-হৃদয়ের অতল অতলান্তিকে, কত গভীর ইঙ্গিত কত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে গল্পগুলির ছত্রে ছত্রে যা পাঠককে ভাবায়, চিত্তকে ভরিয়ে তোলে অজানা ঔৎসুক্যে।

"বিবরমুক্ত" গল্পটিতে বিকলাঙ্গ এক যুবকের আকুল মর্মবেদনাকে রূপ দিয়েছেন লেখক অসীম নিষ্ঠায়, মনে হয়, এই গল্পটিই বোধ হয় আলোচ্য সংগ্রহের শ্রেষ্ঠতম গল্প।

শক্তিমান কলমের রেখায় যে ছবিগুলি ফুটেছে তার প্রত্যেকটিই যে সমভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা না গেলেও প্রত্যেকটিই যে জীবনধর্মী, একথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

বইখানি পাঠক-সমাজে আদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, অন্যান্য আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা—৯ দাম—তিন টাকা।

অন্তরাল

কথাসাহিত্যের আসরে লেখক নবাগত নন, বস্তুত: আজকের দিনের লেখকবৃন্দের ভিতর জনপ্রিয়তার দুর্লভ অধিকার যাঁরা ভোগ করেন সুধীরঞ্জন তাঁদেরই অন্যতম, সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত একথা সহজেই বলা চলে। আলোচ্য গ্রন্থখানি এঁর সদ্য-প্রকাশিত এক উপন্যাস, কন্যার মঙ্গলের জন্য আপন মাতৃত্বের অভিমান পর্য্যন্ত যে ত্যাগ করা যায় অমিতা চরিত্রটির মাধ্যমে তারই এক মহিমাময় ছবি এঁকেছেন লেখক নিপুণ হাতে, কন্যার মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই কামনা করেনি অমিতার মাতৃহৃদয় আর সেজন্যই বছরের পর বছর আত্মজার পরিচারিকারূপে নিজের পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব হয়নি তার পক্ষে, শেষে তার করুণ পরিণতি বেদনাবিধুর করে তোলে পাঠক-হৃদয়কে অত্যন্ত সহজেই। চরিত্রগুলির মানসিক ঘাত প্রতিঘাতকে স্বচ্ছভাবে বিকশিত করে তুলেছেন লেখক স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায়, তাঁর ভাষারীতি সাধারণ হয়েও সুন্দর; বইটি পড়তে পড়তে কোথাও ঠেকতে হয় না পাঠককে, কোন জটিলতার ভারে

ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না মন। আমরা পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। লেখক—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিকা—ইলা বসু, কৃষ্ণকলি ১৪৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ দাম—তিন টাকা।

বই পড়া

কয়েকটি ছোট ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি "বই পড়া।" গল্প উপন্যাস যে পরিমাণ লেখা হয়ে থাকে, বলাই বাহুল্য অপেক্ষাকৃত নীরস সাহিত্যকর্ম বলেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের আজও ঘটেনি ততদূর পুষ্টি, আলোচ্য গ্রন্থটি সেক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন। লেখক চিন্তার জগতে বিচরণ করে তাঁর মানস ভ্রমণের চিত্রগুলি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে, সে চিত্রগুলির কিছু প্রয়োজনীয় মূল্যবান কিছু বা অদরকারী অনাবশ্যক—তবু তার কোনটিই ব্যর্থ নয়। কারণ, মনোজগতে বিচরণ করার দরজা হিসাবেই পাঠকের কাছে তার মূল্য আর একথা তো সত্যই যে, দরজা যেমনই হোক না কেন প্রবেশ করাটাই মুখ্য। লেখক প্রারম্ভিক প্রবন্ধটিতে নিজেই বলেছেন যে বই সকলেই পড়ে কিন্তু উপভোগ করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই, আর পড়াটাই আসল পাথেয়, আনন্দোপভোগের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর, বিভিন্ন ধরণের রচনা আমরা পাঠকরা নিত্যই পড়ে থাকি কিছু ইচ্ছায় কিছু বা অনিচ্ছায়, তবু জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি আত্মোপলব্ধির দ্বারা তাতেই হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। চিন্তাশীল ও সাধারণ পাঠক উভয়েই যে উপকৃত হবেন এমন একটি গ্রন্থ হাতে পেয়ে, একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। আমরা এই প্রবন্ধ-সংকলনটির সাফল্য কামনা করি। বইটির ছাপা বাঁধাই ও অন্যান্য আঙ্গিক এক কথায় সুশোভন। বই পড়া—সরোজ আচার্য, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

Dissentient Report

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে আজও তাঁর দেশবাসীর মনে রয়ে গেছে গভীর সংশয়। যদিও ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ মহল থেকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নাকি যথাযথ অনুসন্ধান করেছেন এ বিষয়ে এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে বিমান দুর্ঘটনায়। সরকারী মহলের এবম্বিধ ঘোষণা সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থে নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু তারই এক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বিস্তর সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উদ্ধার করে তিনি জানিয়েছেন যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার ফলে নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি তিনি জীবিত আছেন এবং বর্ত্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আত্মগোপন করে আছেন। স্বমতের পরিপোষক হিসাবে সুরেশচন্দ্র বসু কিছু মূল্যবান চিঠি-পত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, কয়েকটি ফটোগ্রাফও এতে আছে যা তাঁর রচনায় প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য। নেতাজী জীবিত কি না, এ সম্পর্কে সংশয় আমরা সকলেই পোষণ করি বটে, কিন্তু অন্তর থেকেই কামনা করি যেন তিনি একদিন সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে আবার ফিরে আসেন তাঁর অগণিত অগণ্য দেশবাসীর মাঝে; এই আশায় আমরাউন্মুখ

উজ্জ্বলতর করে তুলবে আলোচ্য গ্রন্থখানি, সুরেশচন্দ্রের এই রচনার সার্থকতা সেখানেই। আমরাও লেখকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি "শতং জীবতু সুভাষ"। পুস্তকটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন ও শোভন। Dissentient Report by Sureshchandra Bose. Non-Official Member. Netaji Enquiry Committee, Published by S. C. Bose. P. O. Kodalia, Dist. 24-Parganas. Price—Rupees Six.

রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে যে একটি বিশেষ মর্য্যাদার অধিকার দিয়েছে, একথা তো সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু তবু একথাও বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে হলে শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রাধিকার দিতে হয় তাঁর সংগীতকেই। বাংলা ভাষা তথা বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব যতদিন রবীন্দ্র-সংগীতও ততদিন বাঙ্গালীর মর্মে প্রবেশ করেছে এই সংগীত। তাই একথা বলা হয়ত অতিশয়োক্তি নয় যে, রবীন্দ্র-স্মরণের সবচেয়ে দামী অর্ঘ হল তাঁর সংগীতের প্রচারে ও প্রসারে। রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্ত্তির এই স্মরণীয় ক্ষণে তাঁর সংগীত সম্বন্ধে এ ধরণের একখানি প্রামাণ্য ও তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশ করে লেখক সমগ্র রবীন্দ্র-সংগীত-অনুরাগীজনেরই আনন্দ বর্ধন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-সংগীতকে সুষ্ঠু ও বিধিবদ্ধ ভাবে গ্রথিত করে, শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সহজবোধ্যতায় পরিবেশন করা হয়েছে। লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রসংগীতের দক্ষ শিল্পী, অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন তাই মূল্যবান করে তুলেছে তাঁর এই রচনাটিকে, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীর পক্ষে বইটি এক অমূল্য সম্পদ বলেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে আগাগোড়া, রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ রূপটি সামগ্রিক ভাবেই ধরা পড়ে পাঠকের কাছে আর সেজন্যই এই সংগীতের মর্মস্থলে পৌছুতেও বিলম্ব হয় না তাঁর। রবীন্দ্র-সংগীত-অনুরাগী মাত্রই যে আলোচ্য গ্রন্থটিকে সাদর স্বাগত জানাবেন, এ আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি; এরকম একটি পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। বইটির অঙ্গসজ্জা অতি সুন্দর, শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত মনোরম প্রচ্ছদটি এর আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তোলে। লেখক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, প্রকাশক—কালি-কলম, কলিকাতা, পরিবেশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-১২ দাম—সাড়ে তিন টাকা।

Profi'e in ourage,

—John Kennedy

য়্যামেরিকার রাষ্ট্রনায়কের আসনে আজ যিনি অধিষ্ঠিত তাঁর নাম জন কেনেডি। এই নামটি আজ শুধু মার্কিণ মুলুকে সীমাবদ্ধ নয়, অনেক সাগর পেরিয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশে এই নাম আজ সুপ্রচারিত এবং সুপরিচিত। চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির খ্যাতি কেবল রাজনৈতিক জগতকে কেন্দ্র করে নয়, একজন প্রতিভাবান অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ বলেও তিনি সমাদৃত। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞান সুধীমহলে যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে কেনেডির এই গ্রন্থটি রচিত, তখন তিনি অন্যতম সেনেটার। পূর্ববর্তীদের কীর্তিকলাপকে এই গ্রন্থের মধ্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। য়্যামেরিকার কয়েক জন পূর্বকালীন সেনেটারের কর্মবিবরণীই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তদানীন্তন সেনেটারদের কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন—ফলে তাঁর লেখনীর দ্বারা সেগুলির প্রতি এক নব ভাবা আরোপিত হয়েছে। এই কর্মকীর্তিকে আজকের জনসাধারণের দরবারে অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন জন কেনেডি। প্রসঙ্গক্রমে য়্যামেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি নিখুঁত চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে। য়্যামেরিকার সরকারী নীতি শাসন-স্বরাষ্ট্রনীতি কালের প্রভাবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হতে থাকে, যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়, তারই ছায়াপাত হয় তার রাষ্ট্রব্যবস্থায়—এই উক্তিটিই যেন নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থে। গ্রন্থটি কেনেডির চিন্তাশীল মনের স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর এবং উদার ভাবধারার পরিচয় বহন করে। 'গ্রন্থটি চিত্রশোভিত, গ্রন্থের নামকরণও যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রকাশক ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস।

Twelve inventions that changed the world

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদানও অনস্বীকার্য। সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে কাব্য-সাহিত্য-ললিতকলার মত বিজ্ঞানের অবদানও অল্পমূল্যের নয়। জগতের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আশীর্বাদের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সাফল্যলাভ জগতের বৃহত্তর কল্যাণের নামান্তর মাত্র। বিজ্ঞানীদের কর্মসাফল্য বিশ্বের অন্ধকার ঘুচিয়েছে, জড়তা মোচন করেছে। এনেছে গতি, এনেছে বেগ, দেখিয়েছে পথ, দিয়েছে আলো। বিজ্ঞানানুশীলনে য়্যামেরিকার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভারত-প্রমুখ বিশ্বের যে ক'টি রাষ্ট্র বিজ্ঞানচর্চায় বিজয়লক্ষ্মীর জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছে য়্যামেরিকাও তাদের অন্যতম। এই গ্রন্থে য়্যামেরিকার বারোটি চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কাহিনীগুলি বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক নির্বিশেষে সকলকেই আকর্ষণ করবে। কাহিনীগুলির মধ্যে আবিষ্কার সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস নিখুঁত আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। আবিষ্কারকদের সম্বন্ধেও প্রচুর আলোচনা গ্রন্থে বিদ্যমান। কয়েকটি চিত্র সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি হয়েছে। সহজ, সরল ভাষায় অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে দুরূহ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির বিশ্লেষণে লেখক (বা লেখকবৃন্দ) প্রভূত দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের অনেক অনেক জটিলতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক দুর্বোধ্যতার অবসান ঘটায়। এ প্রসঙ্গে লেখক (বা লেখকবৃন্দ) নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। গ্রন্থটি রচনা করে তিনি (বা তাঁরা) বহুজনের উপকারসাধন করলেন, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়। প্রকাশক—ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সার্ভিস।
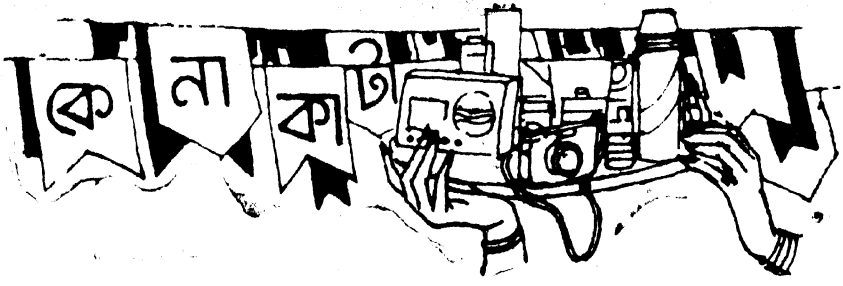
চুলের যত্ন—কয়েকটি কথা

মানুষ-মনের একটা সাধারণ তাগিদ বলা চলে—নিজেকে সুন্দর দেখা ও দেখানো। নারীদের এদিকটায় দৃষ্টি আরও বেশি বললে বোধ হয় ভুল হবে না। তাই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এত সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন-সামগ্রীর সৃষ্টি ও আমদানী হয়েছে। কিন্তু একটি কথা—দৈহিক পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্যের দাবী রাখলে চুলের সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে হবে না। চুল হচ্ছে মানুষের রূপশ্রীর একটি স্বাভাবিক প্রকাশ—যার জন্যে এর ওপর বিশেষ যত্ন না নিলেই নয়।

নারীদের কেশসজ্জা ও কবরী রচনার দিকে বিশেষ ঝোঁক আজকের দিনের নয়—যুগ-যুগান্তকাল থেকে এইটি চলে এসেছে। অবশ্য সৌন্দর্য্য বাড়াতে হলে, চুল ভালো রাখতে হলে চুলের নিয়মিত যত্ন চাই-ই। চুলের স্বাভাবিক রং যাতে বিনষ্ট না হয়, অকালপক্কতা যেন দেখা না দিতে পারে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এইদিকে সতর্কতা নিতে হবে। প্রত্যহ সযত্নে চুল আঁচড়ানো, মাঝে মাঝে মাথায় সাবান দেওয়া—যাতে করে ধুলো ময়লা থেকে চুলের গোড়াগুলো মুক্ত থাকতে পারে, স্নানের সময় যথানিয়মে তেল মাখা, এ সব অভ্যাস চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে অপরিহার্য্য বলতে পারা যায়।

কি নারী কি পুরুষ—প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে চুলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা একটি সমস্যা-স্বরূপ। পুরুষদের বেলায় কিছুদিন বাদ বাদই চুল ছাঁটাই-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু মেয়েরা তাদের মাথায় কেশদাম যত বিলম্বিত হবে, ততই খুশি। এক শ্রেণীর লোক অবশ্য দেখতে পাওয়া যায়, যারা মাথায় চুল রাখার পক্ষপাতীই নয়। তাদের প্রসঙ্গ অবশ্য এক্ষেত্রে আলোচনা করতে যাওয়া হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ চায়, চুল থাকুক আর সেটি থাকুক দীর্ঘদিন দেহশ্রীর পরিপূরক হিসাবে।

চুলের সৌন্দর্য্য শুধু অক্ষুণ্ণ রাখাই নয়, আরও বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞানসম্মত রকমারি কেশতৈল আজকের বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। স্মরণাতীতকালেও দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদীয় মতে নানা জাতীয় কেশতৈল তৈরী হতো—অবশ্য সেযুগে অভিজাত মহলেই ছিল এ সকলের ব্যবহার। কিন্তু এখনকার সময়ে যে কোন ভেষজ কেশতৈলেরই ব্যাপক প্রচলন রয়েছে স্ত্রী-পুরুষ সকল মহলেই। এ দেশের মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল, সি, কে সেন এণ্ড কোম্পানীর জবাকুসুম তৈল, দে'জ মেডিক্যালের কেয়ো কার্পিন, এম, এল বসু এণ্ড কোম্পানীর লক্ষ্মীবিলাস, হিমকল্যাণ ওয়ার্কসের হিমকল্যাণ কেশতৈল প্রভৃতি বলতে গেলে ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল তেলের ব্যবহারে উপকারিতা আছে বলেই জনপ্রিয়তাও হয়েছে এতখানি, এ নিঃসন্দেহ।

অল্প বয়সে চুল পাকতে থাকলে যেমন সৌন্দর্য্যের হানি ঘটে, ব্যাধি হয়েছে বলেও ধরা হয়, তেমনি যখন তখন চুল উঠতে থাকলেও খারাপ, এ-ও একটি ব্যাধিই বলতে হবে। কেন এমনটি হচ্ছে, কি করে অগ্রে এ রোধ করা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার আগেভাগেই। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন হলে ঔষধ বা প্রতিষেধক তৈলাদি ব্যবহার করতে হবে। মাথায় অকালে টাক পড়লেও শ্রী নষ্ট হয়—সেক্ষেত্রেও প্রতিকার চেষ্টা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়। চুলে যে কলপ ব্যবহার করা হয়, তা চুলের সৌন্দর্য্য বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ থেকেই। আজকাল অনেক তৈল জাতীয় জিনিস বের হয়েছে—পাকা চুল কালো করতে, টাক পড়া রোধ করতে সে সব সক্ষম বলে দাবী রাখা হয়। এই সকল ব্যবস্থা অনুসরণে যে সুফলও পাওয়া যায়, বহুক্ষেত্রে এ পরীক্ষিত হয়েছে।

বেচাকেনা ও গ্যারান্টিপত্র

বাস্তব জগতে বেচাকেনা চলেছে হরদম—এক পক্ষ বিক্রি করছে, কিনছে অপর পক্ষ। এর ভেতর সততার নিদর্শন হিসাবে ক্রেতা বা গ্রাহককে অনেক ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া হয়। রেজিষ্ট্রীকৃত চুক্তি বা দলিলের মতো এইটির আইনগত মূল্য না থাকলেও রীতি হিসাবে এ চলতি আছে।

মূল্যবান জিনিষপত্র কিনতে যেয়ে মালিক বা বিক্রেতা-সংস্থার নিকট গ্যারাণ্টিপত্র দাবী করা মোটেই অসঙ্গত নয়। ব্যবসায়ের সুনাম চাইলে, প্রতিষ্ঠানের সততার প্রমাণ দিতে হলে এতে আপত্তি তোলারও কারণ থাকতে পারে না। এমন ফার্ম বা ব্যবসা-সংস্থা দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা চাইবার আগেই গ্যারাণ্টিপত্রটি ক্রেতার হাতে তুলে দেন। অবশ্য যে-কোন কাজকারবারের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটাই বড় কথা। সততা ও বিশ্বাসের কোন বালাই না থাকলে গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া-নেওয়া সবই অর্থহীন বলতে পারা যায়।

চুক্তি হলে যেমন চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা করা চাই, দলিলকে যেমন চিরকুট বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, তেমনি মূল্য দেওয়া উচিত আলোচ্য গ্যারাণ্টিপত্রের। বিক্রয় করা পণ্য যদি সত্যই ঘোষিত মানের না হয়, কোথাও যদি এর ত্রুটি বেরিয়ে যায়, গ্যারাণ্টি অনুসারে তা রদবদল বা ফেরত নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এইখানেও যেন একটি চুক্তিই ছিল, মালিক বা ব্যবসায়ীর চিন্তাধারা হতে হবে এমনি। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে উপযুক্ত জিনিস পাওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার রয়েছে ক্রেতা বা গ্রাহকের। কার্য্যক্ষেত্রে এই সুযোগ বা অধিকার ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তবু গ্যারাণ্টিপত্র আদায় করার নিয়মটি অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

লেখা ও লেখার প্রচার

শুধু লিখে যাওয়া—সে লেখা প্রচার পেল কি না পেল, দৃক্পাত নেই, এমন লোক অন্ততঃ আজকাল বিরল। সকলেরই প্রায় ইচ্ছা হয়,

নিজের নিজের লেখাটি ছড়িয়ে পড়ুক, বাইরের দশ জনের কাছে এর মূল্য স্বীকৃত হোক। এক্ষেত্রে ভাল লেখক, খারাপ লেখক, পুরাতন লেখক বা নতুন লেখক, পরস্পরের মনের কাঠামোর একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বলতে গেলে প্রত্যেকেরই এইটি কাম্য যে, আপন লেখক-পরিচিতি লেখকমহলে কোন না কোন ভাবে স্থায়ী হোক।

অবশ্য একথা ঠিক, যে-কোন কাজের বেলাতেই বাহবা কুড়োতে পারলে কাজে উৎসাহ আসে। লেখকরাও যদি লিখে দেখলেন বাজারে দাম পাওয়া যাচ্ছে, লেখা ছড়িয়ে পড়ছে তাদের দুরান্তর অবধি, এর মাধ্যমে উত্তম বাড়বেই। লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক শুধু গড়ে তোলা নয়, মজবুত করে নেবার সূত্রটিও এইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট দুটি পক্ষের কেউ কাউকে ছেড়ে পারে না—দুইএর ভেতর গরমিল হলেই গোলমাল, উভয়েরই প্রচার ও পসার নষ্ট।

এই জিনিসটি পরিষ্কার যে, লেখককে যেমন প্রকাশক পেতে হবে, প্রকাশককেও পেতে হবে লেখক। লেখক-প্রকাশক যেখানে একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠী, সেখানকার কথা অবশ্য আলাদা। যারা শুধু লিখতেই পারেন টাকা খরচ করে সেই লেখা প্রকাশের সঙ্গতি যাদের নেই, তারাই প্রকাশকের সন্ধান করে বেড়ায়। উদীয়মান লেখকদের অনেকেরই মনে এই আশঙ্কা থাকে, কি জানি হয়তো প্রকাশক মিলবে না। কিন্তু প্রকাশককেও যে ভালো লেখকের জন্যে তাক করে থাকতে হয়, এ স্বীকার করতে হবে। শুধু পর্য্যাপ্ত টাকাকড়ি থাকলেই তো হলো না, বাজারে আশানুরূপ কাটতি হবে এমন লেখা খুঁজে পেতেই ব্যস্ততা থাকে প্রকাশকের। লেখা সত্যি দামী ও সময়োপযোগী হলে কোন না কোন ভাবে তা প্রচারের রাস্তা মিলে যায়, অন্ততঃ আজকের দিনে এ ভরসা রাখা চলে। একেবারে নতুন লেখকদের এই জন্যে হয় তো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়—এ নিশ্চয়ই অস্বাভাবিকতার পর্য্যায়ে পড়ে না।

লেখার প্রচার ও দাম প্রাপ্তির ব্যাপারে লেখক ও প্রকাশকের চিন্তা ও কর্মসূচীর যদি মিল হয়, তবেই ভালো। অনেক স্থায়ী সাহিত্যকর্ম্ম এমন যৌথ পরিকল্পনায় সম্ভব হয়েছে, এইটি পরীক্ষিত। পরস্পরের কারো মনেই সন্দেহ বা দ্বিধাভাব যেন না থাকতে পারে, সেদিকে উভয় পক্ষেরই নজর থাকা দরকার। প্রকাশক যেমন সেভাবে ভাববেন এবং ভেবে অর্থ বিনিয়োগ করবেন, লেখকেরও তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই, ছাপিয়ে বের হলে লেখা যথাসম্ভব কাটতে হবেই। আর নিজেই যদি নিজের লেখার মূল্য দিতে না পারলেন, সেই অবস্থায় কোন লেখক প্রকাশককে বিব্রত করতে পারেন না। আবার, লেখকের ওপর টেক্কা মারবার মনোভাব যদি কোন প্রকাশকের দেখা গেলো, সে-ও কিন্তু নিতান্ত দুঃখের। পূর্ব্বেই বলতে চাওয়া হলো—লেখক-প্রকাশক সম্পর্কটি উন্নততর হওয়া চাই—যে সম্পর্কের উৎস হবে সততা ও বিশ্বাস। আপন লেখার যথোচিত প্রচার ও মূল্য পাবার তাগিদ থেকেই লেখক পেতে চান প্রকাশককে। অপরদিকে প্রকাশকও দাবী রাখেন যোগ্য লেখক ও রসোত্তীর্ণ লেখা সংগ্রহ করতে হবে। গৌণ লক্ষ্য যা-ই থাকুক, মুখ্য লক্ষ্য এখানে অর্থোপার্জ্জন ও মুনাফা বৃদ্ধি। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লেখক-প্রকাশক সম্পর্কটি উভয়ের স্বার্থেই রীতিমত ভালো থাকা দরকার।

একটানা লিখেই যাওয়া হবে, অথচ লেখা প্রচার পাওয়ার প্রয়োজনবোধ নেই, এমন লেখক ক'জন পাওয়া যাবে? বিশেষতঃ প্রচারই যদি না পেলো, কতকগুলো লেখা লিখেই বা লাভ কি, এই ধরণের প্রশ্নও অবান্তর নয়। লেখা ও লেখার প্রচার পাশাপাশি হয়ে চলা চাই। নেশা থেকেই লিখতে হবে বটে, কিন্তু পেশার অর্থাৎ লিখে অর্থ রোজগারের বাস্তব প্রয়োজন অস্বীকার করলে হবে না। লেখা ছাপা যেমন হতে হবে, ছাপিয়ে কিছু যেন পাওয়াও যায় (আজকাল এই সুযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে), সেই দিকে নজর রাখলে ক্ষতি নেই।

আয়বৃদ্ধি করতে হলে

সংসার-জীবনে যে ভাবেই থাকতে চাওয়া হোক, টাকা-পয়সা বাদ দিয়ে হয় না। অর্থ থাকলে তবেই নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের প্রশ্ন উঠে। পৈতৃক সম্পত্তি বা লটারীর টাকা সকলের ভাগ্যেই জুটে না, বেশির ভাগ লোককেই খেটে খেতে হয় এই দুনিয়ায়। অর্থোপায়ের দুটি প্রধান রাস্তা—এক চাকরি, দ্বিতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রথমোক্ত পন্থায় রোজগার স্বভাবতঃই সীমিত—শেষোক্ত পথ ধরে আশাতীত আয়বৃদ্ধিও সম্ভবপর। চাকরির পথে আয় বাড়াতে হলে চাকরিতে উন্নতি যাতে হয় কিংবা উপযুক্ত চাকরি যাতে পাওয়া যায়, সময় থাকতেই সেইটি দেখতে হবে।

কিন্তু, এক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্ট, অর্থোপায় ও আয়বৃদ্ধির জন্যে মূলতঃ চাই উত্তম। যারা ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না, ছকে কাটা জীবন-যাপনেই যাদের আগ্রহ বেশি, চাকরির লাইনটা তাদেরই পছন্দসই। অপর শ্রেণীর দাবী—টাকা-পয়সা খাটিয়ে টাকা-পয়সা বাড়ানো, শ্রম স্বীকার ও ঝুঁকি নিয়েও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ। সীমাবদ্ধ আয়ের ভেতর তারা আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়, অর্থোপায়ের নতুন নতুন উপায় খুঁজে পেতে তাদের একটা ব্যস্ততা থাকে।

এ স্বীকার করতে হবে, প্রচুর আয় বা ধনসম্পদ পেতে চাইলে চাকরির বাঁধাধরা পথে সেইটি সাধারণতঃ হবার নয়। পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে অন্য রাস্তায়—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে যেয়ে। সবাই সব লাইনের অবশ্য উপযুক্ত হয় না। ব্যবসায়ে নেমেও প্রতিটি লোকই উন্নতি করতে পারবে, এমন দাবী অচল। এর জন্যে কতকগুলো বিশেষ গুণ আগে থেকেই থাকা দরকার, আর আর গুণ বা ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হয় প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে।

ব্যবসায়ে ভালোভাবে দাঁড়াবার জন্যে—আশানুরূপ অর্থোপায় ও আয়বৃদ্ধিকল্পে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় সূত্র স্মরণ রাখতেই হবে। উত্তমপ্রয়াসী পুরুষের বাজারের দিকে সজাগ দৃষ্টি চাই, বলতে গেলে সব সময়ই। কোন্ জিনিসের চাহিদা কখন কি পরিমাণ বাড়ছে-কমছে, পণ্য-মূল্য কোন্ মুহূর্ত্তে ওঠা-নামা করছে কতটা এবং সেইটি কেন, এ সকল বিষয়েই ওয়াকিবহাল না থাকলেই নয়। আর কোন্ কোন্ পথে আয় বাড়ানো যেতে পারে, নিবিড়ভাবে পর্য্যালোচনা করতে হবে এই নিয়ে। যেখানে আবশ্যক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে দ্বিধা করলে চলবে না। অর্থবিনিয়োগের পূর্ব্বেই কী করতে যাওয়া ইচ্ছে এবং প্রত্যাশিত সমস্যার জন্যে কি ভাবে কি করা প্রয়োজন, সঠিক ধারণা চাই। উপযুক্ত মুনাফা ও আয়বৃদ্ধি হবেই, এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলে মূলধনের অভাব থাকলে সাময়িক ঋণ নেওয়াও অসঙ্গত নয়, অর্থনীতিবিদ্‌দেরই এই অভিমত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

অসঙ্গত সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে

আশা দাস

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। ঠিক তেমনি বাঁধাধরা নিয়মে কোন স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী হাতের শাঁখা ভেঙ্গে নোয়া খুলে সাঁথির সিঁদুর মুছে থান কাপড় পরে নিরামিষ রান্নাঘরে খান। অবশ্য বাংলাদেশ জুড়ে স্থানভেদে এই আচার-অনুষ্ঠানের সামান্য প্রকারভেদ আছে। তবে মোটামুটি সাধারণ নিয়মগুলি সকলেরই জানা। এই নিয়মটি আমাদের অস্থিমজ্জায় এমন করে মিশে ছিল যে, এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারে তা ভাবতেও পারতাম না। তার কিছু পরে দেখলাম, অনেক বিধবাকে কালপাড় কাপড় পরতে দেওয়া হচ্ছে। এটাতে তাদের অবস্থা একটু উন্নত হ'লো কিনা জানি না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার চোখে থানের চেয়ে কালপাড় কাপড় অনেক বেশী কুৎসিত মনে হয়। তাতে সব হারানোর ভাবটা যেন আরো বেশী করে ফুটে ওঠে। তবে এর একটা ভাল দিকও ছিল, কারণ বর্ত্তমানে কালে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই কালপাড়ের পরিবর্তে একমাত্র লাল রং ছাড়া সবুজ, হলদে, নীল, বেগুনী ইত্যাদি সব রং-এর পাড়েরই কাপড় পরছেন। এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

এবারে খাওয়ার কথায় আসা যাক। বাঙ্গালী যেমন তেলে-জলে মানুষ, তেমনি আর একটি কথা আছে—বাঙ্গালী মাছে-ভাতে মানুষ। সেই বাঙ্গালী মেয়েই যখন বিধবা হয় তখন তা'র মুখ থেকে মাছ কেড়ে নেওয়া যে কত বড় নিষ্ঠুরতা ও অসঙ্গত আচরণ, তা অনুভব করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমরা বিধি-নিষেধের গুণে হারিয়ে ফেলেছি। তবে সম্প্রতি শুনছি, অল্পবয়সে কারুর স্বামিবিয়োগ হলে তাদের মাছমাংস খেতে দেওয়া হচ্ছে। তবে এদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীতে মেয়েরা বিধবা হলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার মাছ খান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম মাংস খাওয়া বারণ।

মেয়েদের পক্ষে স্বামীর মৃত্যু জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে বর্তমানে সব কুমারীদের বিয়ে হওয়াই সমস্যা। সে ক্ষেত্রে অল্পবয়স্ক বিধবাদের মধ্যে একজনের বিয়ে হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই বিধবাদের আবার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহিত জীবনের সকল সুখের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই আয়ের পথ বন্ধ হয়, শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, পুরুষ-অভিভাবক-শূন্য হয়। এতগুলি দুর্ভাগ্যের উপর আমিষ খাওয়া এবং রঙ্গীন শাড়ী পরা বন্ধ করে তাদের শারীরিক ও মানসিক পীড়ন করার যথেচ্ছাচার সমারোহ চলে।

আমি স্কুলে-কলেজে পড়েছি। কিন্তু সলজ্জে স্বীকার করছি, হিন্দুধর্মশাস্ত্র বেদ উপনিষদ ইত্যাদি এবং সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। বিধবাদের খাওয়া-পরার এই যে নিষেধ এর উৎপত্তি কখন কি ভাবে হয় এবং যখন হয়েছিল তখন এর প্রয়োজন ছিল কিনা কিছুই বলতে পারি না। কিন্তু আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আজ এইটুকু বলতে চাই—আহার এবং সাজপোষাকের নিষেধগুলির সত্যিকারের কোন সার্থকতা নেই। মাথায় সিঁদুর, হাতের শাঁখা নোয়া এগুলি সধবার চিহ্ন। অতএব বিধবা হলে পর কেবল এগুলির ব্যবহার বর্জিত হলেই যথেষ্ট। রঙ্গীন শাড়ীই পরবেন এবং যেমন আগে খাচ্ছিলেন তেমনি খাবেন। আজকাল অনেক মেয়েই অফিসে চাকরী করেন। চাকুরে মেয়েদের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ বিধবারা। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গনে এবং অর্থনৈতিক কারণে আজ বিধবা মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ভার বহন করেন। পুরুষদের সঙ্গে একই ট্রামে-বাসে ভীড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। সকলেই স্বীকার করবেন, এটা সেকালের বাঙ্গালী সমাজরীতির একটি বিচ্যুতি। সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন এমন একজনকে বলতে শুনেছি, "সাদা কাপড় পরে প্রত্যেক মাসে বিশেষ একটি সময় বড়ই কষ্ট হয়।" যাঁরা সর্বদা রঙ্গীন শাড়ী পরেন তাঁদের যদি হঠাৎ সাদা শাড়ী পরতে হয় তাহলে অসুবিধাটি বুঝতে পারবেন। তাছাড়া সাদাকাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়, ফর্সা রাখা ও ময়লা হলে পরিষ্কার করাও বেশী কষ্টসাধ্য। অবশ্য এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলার আছে—বিধবা ছাড়াও অনেক মেয়েই তো সবসময় সাদা কাপড় পরেন। এ সম্বন্ধে বলার মত কোন যুৎসই যুক্তি পাচ্ছি না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর কি স্ত্রীকে সারাজীবন দাগী আসামী সেজে থাকতে হবে? অপরিচিত একজন রাস্তার লোকও দেখে বুঝতে পারবে ও করুণা করবে? থান বা কালপাড় সাদা সাড়ী পরলে মনের উপরও তার প্রতিক্রিয়া হয় এবং বিধবার মনকে আরো স্পর্শকাতর, আরো নিঃস্ব ও রিক্ত করে তোলে।

এখন এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে সংসার খরচ চলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে এমটি বিধবার রোজগারে। তাঁরা পরিবারের অন্য লোকদের মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ জোগাবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করবেন কিন্তু নিজেদের এগুলি থেকে বঞ্চিত রাখবেন—তাঁদের স্বামীকে তাঁরা হারিয়েছেন এই অপরাধে? তাছাড়া চাকুরীজীবি বিধবাদের আমিষের হেঁসেল বাঁচিয়ে একটু ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করাও প্রায়ই সমরাভাবে হয় না। যাঁদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন নিরামিষ রান্নার পৃথক ব্যবস্থা তুলে দিলে কত ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আগেকার দিনে মেয়েদের মুখ ফুটে বিদ্রোহ করার উপায় ছিল না।

কারণ তাঁরা আর্থিক ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু সেদিন গেছে বা চলে যাচ্ছে বলা যায়। যিনি বিধবা হলেন তিনি নিজে না বলতে পারেন তাঁর নিকট-আত্মীয়দের তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। মনে ইচ্ছে থাকলেও বিধবারা বলতে সঙ্কোচবোধ করেন, গ্লানি বোধ করেন। কিন্তু মাছ-মাংস না খেলেই যে পরলোকগত স্বামীর আত্মার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা দেখানো হয়, এত বড় অবাস্তব ফাঁকা বুলিও কি বিশ্বাস করতে হবে ?

চীনদেশের মেয়েদের আগে পা বেঁধে দেওয়া হতো ছোটবেলায়, যাতে বড় হয়েও তাদের পা ছোট থাকে। বাঙ্গালী বিধবার প্রতি নির্মম ব্যবস্থা চীনদেশের এই অমানুষিক প্রথার প্রায় সমতুল্য। চীনামেয়েদের সৌভাগ্য—আজ তারা এই নিষ্ঠুর প্রথার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েরা কবে নিষ্কৃতি পাবে জানি না। বাংলার সমাজসেবিগণ এবং সরকার এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। অবশ্য আইন করে কোন কুপ্রথা দেশ থেকে রাতারাতি তাড়িয়ে দেওয়া যায় এরূপ মনে করাও দুরাশা।

তবে অনেকেই হয়ত এ প্রথাকে মোটেই খারাপ মনে করেন না! কিম্বা খারাপ মনে হলেও অমান্য করার মত মনে জোর পান না। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বিধবারা রঙ্গীন শাড়ী পরলে ও মাছ খেলে হিন্দুধর্মের আর কি রইল? উত্তরে এই বলতে পারি, অসহায় বিধবাদের ওপরই কি হিন্দুধর্ম সংরক্ষণের ভার? গত একশো বছরের প্রকৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হিন্দুধর্ম যথেষ্ট সহনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মত যথেষ্ট উদারতা এই ধর্মের আছে। সত্তর-আশী বছর আগে মুসলমানদের কারখানায় তৈরী পাউরুটি, বিস্কুট ও বরফ লেমোনেড খাওয়া হিন্দুদের রীতি-বিগর্হিত ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ফিরে এসে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করলে জাতিচ্যুত হতে হতো। সে সময় এক বাঈজী শ্রেণী ছাড়া বাঙ্গালী মেয়েরা কোন সেলাই করা পোষাক যথা ব্লাউজ সায়া ইত্যাদি ব্যবহার করতেন না, জামা গায়ে দেওয়া তখন অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় ছিল। সেকালের সাহিত্যে এ সবের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে কাজেই এখন বিধবারা যদি কুমারীর মত পোষাক পরেন, আমিষ আহার করেন—হিন্দুধর্ম নিশ্চয়ই রসাতলে যাবে না।

শোনা যায়, বিধবাদের পোষাকে ও আহারে 'সংযম' নাকি তাদের যৌনচেতনাকে উত্তেজিত না করার সহায়ক। এ কথা সমর্থন করে কেউ কেউ হয়ত সংস্কৃত শ্লোক বর্ষণ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমানে বাঙ্গালী শিক্ষিত চাকুরীজীবী মেয়েদের একটি বড় অংশ সারাজীবন কুমারী থাকেন। তাঁদের যৌনচেতনাকে দমন করার জন্য যদি আমিষ আহার বর্জন করার প্রয়োজন না হয়, তবে বিধবাদের বেলাই বা সে নিয়ম খাটবে না কেন? নিম্নশ্রেণীর বিধবারা মাছ খান। তাঁদের ও উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের জীবনের যৌনদিকের মধ্যে চোখে পড়ার মত কোন পার্থক্য নেই। স্বামী বিদেশে থাকেন এবং বছরে মাত্র কিছুদিনের ছুটিতে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে পারেন অথবা কোন কারণে বনিবনা না হওয়ায় মহিলারা স্বামিগৃহ ও সেই সঙ্গে শাঁখা-সিঁদুর, নোয়া ত্যাগ করেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অনেক পুরুষ আজীবন অবিবাহিত থাকেন অথবা স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন না। আজকাল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে গড়পড়তা বিয়ের বয়স পিছিয়ে গেছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর বিয়ে হয়। এসব ক্ষেত্রে কি সংযমের প্রয়োজন নেই? এই সংযমের জন্য তো আমিষ আহার বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেই? ভারতবর্ষে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য প্রায় সব জাতিই অল্পবিস্তর নিরামিষাশী। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তো বিধবাদের যৌনচেতনাকে দমন করার জন্য বিশেষ আহারের ব্যবস্থা নেই? তাদের নিরামিষাশী সধবারা কি যৌন-উত্তেজনা বোধ করেন না? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হয়েও বিধবা-বিবাহ আইনানুমোদিত করে গেছেন। সেই তুলনায় বিধবার আহার ও পোষাকের সংস্কার তো তুচ্ছ ব্যাপার।

এই যে বিধবার মনকে নানা বাধা-নিষেধের বন্ধনে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা, এর পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে প্রথম চাই সহানুভূতিশীল মন। শুনেছি, এ বিষয়ে মেয়েদের দিক থেকেই নাকি প্রবল আপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনা আসে। শাশুড়ী, ননদ, জা, বোন, ভাজ ইত্যাদি এবং প্রতিবেশিনীরা তো আছেনই।

সুদীর্ঘ-প্রচলিত অবিচারের বিরুদ্ধে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দরকার। বাংলা দেশের মেয়েদের কাছেই আমার আবেদন। বিধবা-মেয়ের লৌহ-শৃঙ্খল মুক্ত করার দায়িত্ব সমগ্র নারী-সমাজের।

সন্ধি

শিপ্রা দত্ত

প্রতিদিনের মত সেদিনও প্রাতর্ভ্রমণে এসেছিলেন পুণ্যব্রত রায়। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার পর অবসর গ্রহণ করে, জীবনের সায়াহ্নে পুণ্যব্রত রায় তাঁর একক জীবনের শেষ ক'টা বছর অতিবাহিত করবার জন্য রাঁচীর প্রাক্তন সরকারের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল 'নেতারহাটে' এসে তাঁর কর্মহীন, ক্লান্তিহীন জীবনের নীড় রচনা করেছিলেন। চিরকালের অভ্যাস সেই প্রাতর্ভ্রমণ এই বৃদ্ধাবস্থাতেও ত্যাগ করতে পারেননি। তাই নেতারহাটের পালামৌ ডাকবাংলোতে রোজই একবার তিনি যান—সূর্য্যোদয়ের অপরূপ শ্রী দর্শন করতে। পুরীর সমুদ্রতটে, দার্জ্জিলিং-এর "টায়গার হিল"-এ যেমন বহু জনসমাগম হয় সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনার্থে,—তেমনি পালামৌ ডাকবাংলোর আঙ্গিনায় সমবেত হয় বহু দেশী, বিদেশী —ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম উষার আলোর রেণু ছড়িয়ে পড়া পূবাকাশের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করতে। সবার প্রথম পুণ্যব্রত রায় আসেন—আবার সবার শেষে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করে মন্থর গতিতে ফিরে যান তাঁর "প্রজ্ঞাভারতী-কুঞ্জে।"

সেদিন ছিল মহাষ্টমী। বহু প্রবাসী ভ্রমণকারীর দল পুজার ছুটিতে এসেছে নেতারহাটে বেড়াতে! সবাই একে একে সূর্য্যোদয়ের পর যে যার "ক্যামেরা" বা "কার" নিয়ে চলে গেল! পুণ্যব্রত রায় প্রতিদিনের মত ফিরে চলেছেন। দু' পাশে পাইনের ঝাড় বা পাইনের বন। অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা তার! কয়েক দল সেই পাইনবনে ঢুকে পাইন-ফুল চয়নে ব্যস্ত। নিস্তব্ধ প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠেছে বিদেশীদের আনন্দোচ্ছল হাস্য-কৌতুকের স্পর্শে। প্রকৃতির বুকেও যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। চকিতে পথপার্শ্বে সেই কোলাহল-মুখরিত যুবক-যুবতী ও শিশুদের দিকে একবার দৃষ্টি পড়ে পুণ্যব্রতর।

আবার আপন মনে হেঁটে চলেন আনমনে। হয়ত বিগত যৌবনের স্মৃতি নাড়া দিয়েছিল। পুণ্যব্রত রায়ের ধ্যানমগ্ন মনকে সজাগ করে দিল একটি শিশুর কান্না। দেখলেন, দূরে পাইনবনে একটি ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শিশুটির বয়স বছর তিন হবে। পুণ্যব্রত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন শিশুটির কাছে। বহু প্রশ্নেও শিশুর পিতা-মাতার নাম ঠিকানা শিশুর থেকে জানতে পারলেন না। শুধু একটি কথা শিশু বলতে পারলো—নাম তার "কৃষ্ণ।"

নূতন এক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল পুণ্যব্রত রায়। যে বন্ধনে নিজেকে একদিন মায়ের সংস্কারের জন্য আবদ্ধ করতে পারেননি, তাই মা'র শত অনুরোধ উপরোধকে অভিমানের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে চিরকুমার পুণ্যব্রত ব্রততীর প্রতি একাগ্রতা দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু ব্রততী তার একনিষ্ঠা দেখাতে পারেনি। তার সব অনুনয় ব্যর্থ হয়ে গেছে তার অভিভাবকদের শাসনে। পরন্তু ব্রততীর কোন খবরই রাখেনি পুণ্যব্রত। অধ্যাপনাকেই জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন। দু'হাতে উপার্জ্জন করেছেন ও ব্যয় করেছেন ছাত্রদের কল্যাণার্থে। শেষ সম্বল নিয়ে তিনি এসেছেন নেতারহাটে। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণকলির অভিভাবকদের কোন সন্ধানই শেষ অবধি পাওয়া যায়নি, যদিও এজন্য বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে পুণ্যব্রতকে। আবার নাতনী সম্পর্ক পাতিয়ে শেষ বয়সে কৃষ্ণকলিকে উপলক্ষ্য করে সংসার চালাতে সুরু করলেন। এ যেন ভগবানের কি এক লীলা!

পনর বছর দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয়েছে। কৃষ্ণকলি এখন তন্বী, সুন্দরী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী। দাদুই কলির একমাত্র বন্ধু। অভিভাবক পরামর্শদাতা। একটি যুবতী ও একটি বৃদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত মিল! একদিন কলেজ হতে ফিরে কলি বলল, "দাদু, জান আজ ক'দিন ধরে তোমার বয়সী এক ভদ্রলোক আমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে থাকে। আমার ভারী খারাপ লাগে।"

হেসে উত্তর দিলেন পুণ্যব্রত—"নাতনীটিকে ভাগিয়ে নিতে আসেনি তো দিদি! বুড়ো বয়সে জালে পড়লি। আবার জাল ছিঁড়ে পালাবি না তো? জালে যদি পড়তেই হয় তবে নূতন, সজীব, প্রাণবন্ত কোন জালে পড়িস দিদি! আমার মত ফুটো, নড়বড়ে পুরানো জালে পড়ে কোন লাভ নেই, কি বলিস?"

"দাদুর সব কিছুতেই ঠাট্টা। কিন্তু সত্যি বলছি তোমায়—আজও যদি দেখি ভদ্রলোক অমন ভাবে আমার কলেজে যাবার পথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকেন—তবে কিন্তু বেশ কড়া কথা বলে দেবো। তুমি কিন্তু এজন্য রাগ করতে পারবে না।"

"ছিঃ ছিঃ দিদিভাই, কারো মনে আঘাত দিতে নেই। না জানি

কোন আকর্ষণে ভদ্রলোক তোর দিকে ছুটে যায়। হয়ত তোর মত তাঁর কোন আত্মীয়া আছেন বা ছিলেন অথবা তোকে দেখে তাঁর ভাল লেগেছে। তিনি তো তোর কোন ক্ষতি করেননি। বেশ তো, তুই বরং আজ তাকে ডেকে আনিস আমাদের বাসায়। তখনই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। কখনও না জেনে কারুকে আঘাত করিস না দিদি!"

"আজ কিন্তু সত্যি আমি তোমার নাম করে তাঁকে ডেকে আনবো।"

"বেশ—তাই ডেকে আনিস।"

অপরাহ্ণে পুণ্যব্রত রায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণকলির আহ্বানে তাঁর একাগ্রতা ভঙ্গ হয়। নিজের প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পুণ্যব্রত উত্তর করলেন, "দিদিভাই, এর মধ্যে আজ অত জোয়ার এসেছে কোথা হ'তে ?"

"দাদু, এই দেখ কা'কে ধরে এনেছি।"

"দাদুর নাম শুনে পুণ্যব্রত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে এল দরজার সামনে। অপরিচিত আগন্তুককে দেখে সহাস্যে বললেন, "নমস্কার, দিদিভাই এর পাল্লায় যখন পড়েছেন—তখন শীগগির আর নিষ্কৃতি পাবেন না।"

"নমস্কার, আপনার নাতনীর সঙ্গে আমার নাতনীর এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। তাই প্রথম দিন যখন তাকে দেখলাম—এত বছর পর তবু মন বিশ্বাস করতে চাইছে না যে কৃষ্ণা আমার নেই" বলতে বলতে বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হয়ে উঠে।

"বেশ তো আমার কৃষ্ণকলিকেই আপনার কৃষ্ণা মনে করে নিন্। এতদিন আমি ছিলাম কলির অদ্বিতীয় দাদু—আজ হ'তে আপনিও হ'লেন তার দ্বিতীয় দাদু" ? বলে পুণ্যব্রত রায় কৃষ্ণকলির উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বললেন "কই দিদিভাই, দাদুদের খাবার দে। তোর পরিচারক পরিচারিকারা সব গেল কোথায় ?"

ক্রমেই নবপরিচিত বৃদ্ধের সঙ্গে পুণ্যব্রত রায় ও কৃষ্ণকলির সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এল স্নেহময় বাবুর। তিনি একদিন পুণ্যব্রত রায়ের হাতে একটা আংটি দিয়ে বললেন—"কৃষ্ণা দিদির বিয়ের সময় যদি উপস্থিত থাকতে না পারি—এটা আমার আশীর্ব্বাদস্বরূপ তাকে দেবেন"।

আংটি হাতে নিয়ে পুণ্যব্রত রায় চমকে উঠলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যেন যৌবনের চঞ্চলতা ব'য়ে গেল তার জরাগ্রস্ত মনে। নিজেকে সংযত করে পুণ্যব্রত বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ আংটি কার ?"

"আমার স্ত্রীর আংটি। তিনি এটা কখনও হাতছাড়া ক'রতেন না। যাবার দিনে তিনি আমাকে বলে গেলেন—'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কৃষ্ণা আমাদের ছেড়ে যায়নি। সত্যি যদি তার সন্ধান পাও, তবে তাকে এটা দিও আমার আশীর্ব্বাদস্বরূপ। এবং এটা যেন সে কখনও নষ্ট না করে—এটাই আমার অনুরোধ, তাকে জানিও'।"

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপত্তি না থাকলে জানাবেন কি কেন আপনার স্ত্রীর এই অমূল্য সম্পদ তিনি তার ছেলে বা পৌত্রকে না দিয়ে হারানো নাতনীর কাছে দিয়ে গেলেন ?"

"বিয়ের আগের থেকে এই আংটিটি আমার স্ত্রীর হাতে ছিল। একমাত্র ছেলেকে তিনি যত্নের সঙ্গে মানুষ করেছিলেন। নিজের পছন্দমত বিয়েও দিয়েছিলেন। বউমা আমার বড়ই লক্ষ্মী ছিল। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সহ্য হ'ল না। কৃষ্ণার জন্ম দিয়ে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গেল। সেই হ'তে কৃষ্ণা আমার স্ত্রীর কাছেই মানুষ হচ্ছিল। ছেলে আবার বিয়ে করল। সংমার ঘরে আমার স্ত্রী কৃষ্ণাকে যেতে দেননি। কিন্তু এক ছুটিতে নূতন বউমা এসে অনেক আবদার করে কৃষ্ণাকে তাদের সাথে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল। স্ত্রী এ প্রস্তাবে রাজী হননি। আমিই এক রকম জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিলাম এই বলে যে, 'কৃষ্ণাকে তার মা'কে চিনতে দাও। তুমি আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো না। এখন হ'তে মা-মেয়ের মধ্যে প্রাচীর তুলে রাখলে কি করে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণাকে ছেড়ে দিলেন। ক'দিন পর খবর পেলাম—আমার ছেলে বেড়াতে যায়নি। বউমা তার ভাই-এর সাথে বেড়াতে গেছে। এ খবর পাওয়ার পর হ'তে আমার স্ত্রীর চোখে ঘুম ঘুচে গেল। তিনি যেন সর্ব্বদা কি এক অশুভ খবরের প্রত্যাশা করতেন প্রতি মুহূর্ত্তে। সেই অশুভ বাণী বহন করে সত্যি এল টেলিগ্রাফ-পিয়ন। খবর এল গৌতমধারা দেখতে গিয়ে তিন বছরের শিশু পড়ে যায়। বর্ষার উদ্দাম স্রোতে সেই শিশু নিমেষে কোথায় ভেসে যায়—তা কেউ জানে না। তার সলিল-সমাধি ঘটেছে গৌতমধারায়। স্ত্রী আমার পাষাণের মত স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। এর কিছুদিন পরেই ছেলে এল কৃষ্ণার মা'র গয়না নিতে—যে-সব গয়না এতকাল কৃষ্ণার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রী বার বার আমাকে বলতেন—'আমার মন বলছে কৃষ্ণা আমাদের ছেড়ে যায়নি। এরাই কৃষ্ণাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কৃষ্ণার মা'র এত গয়না হাত করবার জন্য। কারণ কৃষ্ণার মা ছিল ধনীর একমাত্র মেয়ে। তাই তার গয়নাও ছিল বহুমূল্যের। সেদিন স্ত্রীর কথার আর প্রতিবাদ করিনি। যদিও একটা সন্দেহে মন ব্যথায় ভ'রে উঠেছিল। ছেলের আচরণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।"

"কৃষ্ণার খোঁজ করেননি ?"

"যা'র মা নিজের সামনে মেয়ের সলিল-সমাধি ঘটেছে বলে বলেছে,—সেখানে কোথায় কৃষ্ণার খোঁজ করব ? শুধু তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি আমরা দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আমাদের শূন্য মনের কন্দরে কন্দরে।"

"কত বছর আগের ঘটনা এটা ?"

"তা প্রায় পনর বছর আগের ঘটনা।"

"কৃষ্ণার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল কি—যা দিয়ে আপনি তাকে চিনতে পারতেন।"

"হ্যাঁ, তার বাঁ পায়ের উরুতে একটা বড় কাল দাগ ছিল। এটা তার জন্মদাগ।"

"আপনার স্ত্রী গত হয়েছেন কত কাল ?"

"কৃষ্ণার শোকেই তিনি চলে যান—সেই বছরই।"

"যদি কিছু মনে না করেন, আপনার স্ত্রীর নামটা জানতে পারি কি ?"

"ব্রততী—কেন আপনি কি তাঁকে চিনতে পেরেছেন ?"

"হ্যাঁ ব্রততী আমার প্রতিবেশীকন্যা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল। যাক্, ব্রততীর আদরের নাতনীকে যে ভগবান

আমার কাছেই পাঠিয়েছিলেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার কৃষ্ণকলিই আপনার কৃষ্ণা—পনর বছর আগে এই নেতারহাটে এক ·পাইনবন হ'তে তাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। কৃষ্ণকলির বাঁ-পায়ের উরুতেও এমনি একটা দাগ আছে" বলে তিনি ডাক দিলেন "কলি, এদিকে আয় তো দিদি।" কৃষ্ণকলি গিন্নীর মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলল—"কি হ'ল দাদু তোমার? আজ নূতন দাদুকে আমি নিজে রান্না করে খাওয়াবো বলে নেমন্তন্ন করেছি—আর তুমি বার বার ডেকে আমার রান্নার দেরী করে দিচ্ছ?"

উচ্চহাস্যে পুণ্যব্রত বললেন, "তোর নূতন দাদু আজ নয় কেবল—আজ হ'তে রোজ তোর রান্না খেতে পাবেন। আজ তোর পুরানো দাদুকেই শেষ রান্না খাইয়ে যা দিদিভাই।"

"তোমার হেঁয়ালী আমি কিছু বুঝি না দাদু! তুমি আবার কোথায় চললে? বানপ্রস্থ নিয়েই তো এই জঙ্গলে এসে বসেছো?"

"তবে শোন"—বলে তার জীবনের সব কাহিনী একে একে পুণ্যব্রত বাবু তাকে বলে বললেন—"এবার আমার ছুটি বোন।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে কৃষ্ণকলি এই কাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেকে সংযত করে হেসে বলল—"ছুটি বললেই ছুটি তোমার মিলবে না। আমি তোমার কাছেই থাকবো। তবে আগে ছিলে তুমি একা। এখন হয়েছো দুই দাদু। যে মা-বাবার কাছে আমি মৃত—তাদের কাছে আমি আর ফিরে গিয়ে তাঁদের সুখের নীড়ে অশান্তি ডেকে আনতে চাই না। তোমরা দুজন এখানে থাকবে—আমি তোমাদের যত্ন করব। দিদাকে দেখতে পেলাম না—এই আমার দুঃখ রয়ে গেল।"

স্নেহময় সস্নেহে কলির মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"তুই দিদি, আমার মনের কথাই বলেছিস। যিনি তোকে জীবন দান করে এত যত্নে সন্তানস্নেহে এত বড় করে তুলেছেন—তাঁর কাছ থেকে তোকে আমি ছিনিয়ে নিলে ভগবান যে আমায় শাস্তি দেবেন। সেই ভাল দিদি, আমরা দুই বুড়ো থাকবো—তুই আমাদের জরা দেহ-মনে সজীব প্রাণের উৎস হয়ে থাকিস—এটাই হল আমাদের দুই বৃদ্ধের সঙ্গে তোর সন্ধিপত্র।

সাহিত্য শ্লীল না অশ্লীল?

বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক সাহিত্যকার প্রকাশক ও সম্পাদককে যে বিষয়টি রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে, তা হচ্ছে সাহিত্যের নৈতিক মানদণ্ডটি প্রকৃত পক্ষে কি করে নির্ণয় করা যায়। বস্তুতঃ এটা সাহিত্যব্যবসায়ীর সামনে আজ যে একটা বড় সমস্যা হয়েই দাঁড়িয়েছে একথা অনস্বীকার্য্য।

সাহিত্য শ্লীল বা অশ্লীল পদবাচ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে যাঁদের উপর বলা বাহুল্য, তারা প্রায়শঃই হয়ে থাকেন এমন একদল লোক সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান অতিশয় সীমিত। যাঁদের ভিতর অধিকাংশেরই সামান্যতম সাহিত্যবোধও নেই, সাহিত্যানুরাগ তো বহুদূরের কথা। আরও মুস্কিলের কথা এই যে, কোন রচনা শ্লীল বা অশ্লীল বলে পরিগণিত হওয়া সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে বিচারকর্ত্তার মেজাজ-মরজির উপর। একজন্যই যখন সাধারণ অপরাধীর মতই সাহিত্যকে দাঁড়াতে হয় বিচারালয়ের সামনে, তখন কখনও ঘটে তারঅব্যাহতি কখনও ঘটে না। কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালের মাশুল যোগাতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁরাই—সাহিত্য শুধু যাঁদের জীবনই নয় জীবিকাও।

সাহিত্যকে দুর্নীতির তকমা এঁটে দিয়ে তার আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয় অতি সহজেই, এবং একজন্যই কোন রচনা প্রকাশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রীতিমত দুশ্চিন্তা ভোগ করে থাকেন। সাহিত্যব্যবসায়ীকে এই অপমৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে হলে চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন, অযথা হস্তক্ষেপের অধিকার যদি কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আমরা রেখে দিই তা হলে সাহিত্যের দুনিয়ায় বিপ্লব অনিবার্য্য। সাহিত্য শ্লীল না অশ্লীল, একথা বিচারের ভার এমন মানুষের উপরই থাকা উচিত, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁর একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে, অন্যথায় বিচার-বিভ্রাট ঘটাও অনিবার্য্য।

এমনও দেখা যায়, আজ যে রচনা অশ্লীল বলে গণ্য, কয়েক বছর পরে তাই সৎসাহিত্যের অন্যতম নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তবে তার বিচার করে কে?

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য শ্লীল না অশ্লীল, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই, কলুষিত দৃষ্টি আর নিষ্কলুষ দৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে নীতির প্রশ্ন। শিল্পীর চোখে নগ্না নারীমূর্ত্তির সুষমাটুকুই শুধু ধরা পড়ে, বিকৃতমনার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার নগ্নতাই শুধু।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যৌন সম্বন্ধীয় কোন রচনাকেই শুধু দুর্নীতি সুনীতির কাঠগড়ার তলায় পড়তে হয় যেন দুনিয়ায়, তা ছাড়া আর কোথাও নীতির বালাই থাকতে নেই, চুরি ডাকাতি জাল-জুয়োচুরির নিকৃষ্টতম রচনা কখনও অশ্লীল বলে পরিগণিত হয় বলে শোনা যায় না। শুধু যা কিছু স্পর্শকাতরতা ওই একটি বিষয়েই নিবদ্ধ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে। কোন খোলাখুলি আলোচনা চলবে না, তা হলেই সমূহ সর্বনাশ, সব বুঝি গেল-গেল ভাব।

এই শুচিবায়ুতার হাতে প্রকৃত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকেও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বহুবারই; জেমস্ জয়েশের বিখ্যাত 'ইউলিসিস্' গ্রন্থটিকে যেদিন অশ্লীল বলে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার অপচেষ্টা করা হয়েছিল সেদিন বিচারকারী আদালত মত প্রকাশ করেছিলেন যে কোন পুস্তকের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তা দুর্নীতিমূলক প্রমাণ করা সমুচিত নয়; রচনার সামগ্রিকতার উপরই শুধু তার নীতি নির্ভরশীল।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের আইন এখনও কোন রচনার অংশবিশেষ বা কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র থেকেই তার নীতি আহরণ করে থাকে—যার ফলে বহু সুন্দর সাহিত্যকর্মকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়; অপর পক্ষে বহু নিকৃষ্ট রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পায় সগৌরবে। সাহিত্য শ্লীল বা অশ্লীল, তা নির্দ্ধারিত হতে পারে একটি মাত্র তুলাদণ্ড দ্বারা—সে তুলাদণ্ড হল কি সে বলতে চায় সেটাই; এই বক্তব্যই একমাত্র বস্তু যার দ্বারা আমরা বিচার করতে পারি সমগ্র সাহিত্যকর্মটিকে, বলতে পারি সেটি শ্লীল না অশ্লীল। সত্য শিব ও সুন্দর এই তিনের প্রকাশ করাই সাহিত্যের ধর্ম—এর মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে চলবে না; তবে জীবনের প্রধানতম এক সত্যকে সে অস্বীকার করবে কি করে, কোন মুখে?

সত্যধর্মচ্যুত সাহিত্যই শুধু দুর্নীতিমূলক—এই আখ্যা পাওয়ার অধিকারী।

সামগ্রিক রচনার আবেদন যেখানে জীবনধর্মী সেখানে যে কোন আঙ্গিক যে কোন বিষয়বস্তুই গৃহীত হোক্ না কেন, তা সৎসাহিত্য-পদবাচ্য হতে বাধ্য।

নীলকণ্ঠ

সাত

'ইয়ে' মল্লিকের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম কাশীতে হোটেলে জায়গা পাবার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার কারণে ; আগে বলেছি। চিঠি নিয়ে গিয়ে ভালোই করেছিলাম। পুজো পেরিয়ে গেলেও পুজোর ছুটি তখনও অনেকেরই পেরোয়নি। তাদের ছুটোছুটি অব্যাহত তখনও ; দু'দিন কাশী ; দু'দিন লখনউ ; কয়েক দিন হরিদ্বার হ'য়ে তবে কলকাতায় ফিরবে বেশীর ভাগ। কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটি তখন রবি ঠাকুরের সোনার তরীর মত বলতে চায় কেবলই : ঠাঁই নাই ; ঠাঁই নাই। ইয়ে মল্লিকের চিঠিতে যার নামে চিঠি তার নামই ভুল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শাপে বর হলো। হোটেলের রকে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়ে মল্লিকের ভুল-নাম দেবার কল্যাণে আলাপ তাঁর রেকমেণ্ডেশানে অনেক বেশী কাজ হবার কথা যে হোটেলে জায়গা পাবার পর তা জেনেছিলাম ; ভদ্রলোক হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যতম অংশীদার। সেই সময়ে ঝগড়া চলেছিলো হোটেলের অবাঙালী অংশীদারের সঙ্গে। নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে যেতে চাইছিলেন ভদ্রলোক। অবাঙালী অংশীদার গায়ে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে থোক টাকা হাতে তুলে দিয়ে যাবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্তরে অপার করুণা বাঙালীর প্রতি একজন অবাঙালীরও আজ ভারতবর্ষে আছে এমন দুর্ণাম অবাঙালী যাদেরকে তাদের পরম শত্রু মনে করে সেই বাঙালীও দিতে পারবে না। আসল কথা বাঙালী ভদ্রলোক চলে গেলে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল গ্র্যাণ্ড সেল-এ উঠবে। তাই সময় কাটাচ্ছিলেন অবাঙালী মহাপ্রভু। প্রথমে গায়ে হাত বুলিয়ে আরও কয়েকটা দিন কাটাতে পারলে পরে মাথায় হাত বুলিয়ে নামে মাত্র টাকায় হোটেলের অংশ বাগিয়ে নিয়ে বাঙালীকে বার করে দিলে, বাঙালীরা ততদিনে যে ভুলে যাবে যে, এ হোটেল একদিন বাঙালীর ছিলো এবং এখন অবাঙালীর, এ ধারণা আসাম এবং বেরুবাড়ীর পরও অনেক বাঙালীর কাছে নতুন শোনালেও, বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে এই অবাঙালী স্পেকুলেশান অনেক দিনের এবং প্রায় অব্যর্থ রকমের কারেক্ট স্পেকুলেশান।

বাঙালী সেই ভদ্রলোকের আসল নাম কিন্তু কাশীর অনেকেই হয়ত তাঁর আসল নাম আজও জানে না। ভদ্রলোক কাশীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড়বাবু। এই ডাকনামেই তাঁর নামডাক। বড়বাবু,—এই এক নামের মহিমা এমন সারা কাশী জুড়ে যে একডাকে সাড়া না দেবে এমন অবাঙালী একজনও নেই ; এমন বাঙালীও এক-আধজনের বেশী নয়। বড়বাবুকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিন কেন জানিনে ছবির হেমিংওয়ে বলে মনে হয়েছিলো অবিকল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সজারুকণ্টকে আবৃত আননের মধ্যে বাঘের মতো জ্বলজ্বলে 'দুটো দারুণ বড় চোখে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ছায়া। নিদারুণ ভিরাইল সে তা একনজরেই চেনা যার যার নজর আছে তার কাছে তো বটেই ; যার নজর নেই তার কাছেও হয়তো। লম্বা চওড়া, অতিপুরুষ বড়বাবুর বুকের ছাতি তার দুর্জয় মনেরও প্রতীক। চোখে নেশার রক্তিম ছটা কখনও ছাড়ে না। মুখে মুহুর্মুহু গাঁজার টান সিগারেটের অনির্বাণ কলকেয়। সুখটানের সঙ্গে ভক ক'রে ধোঁয়াছাড়ার বহর মেল ট্রেনের নিঃশ্বাস-উদ্গীরণের মতই। আশপাশ কিছুক্ষণের জন্যে কালোয় কালো। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা প্রায় সময়ই। ওপর গায়ে ফতুয়া সম্বল। তার ফোকর দিয়ে লোমের বনবন থেকে আলোর গাছপালায় উঠে দাঁড়াবার। কণ্ঠস্বর গণগণে হৃদয়ের উত্তাপে গমগমে ; চড়া পর্দায় ভাবে। এক কথায় আজকের পরিভাষায় সভ্য মানুষ নয় অর্থাৎ তাদের একজন নয় যারা যা বলে তা বিশ্বাস করে না বলে এবং যা বিশ্বাস করে তা বলে না বলেই কেবলমাত্র সভ্য।

বুনো, জংলী এই বড়বাবু কাশীতে প্রথম এনেছে সাইকেল-রিক্সা যার সংখ্যা এখন কাশীতে মানুষের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। কাশীতে মধ্যবিত্ত মানুষদের আহার ও বাসস্থানের সুলভ ব্যবস্থার মূলেও বড়বাবু। কাশীর যেটিকে 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' বলছি সেটির খাবারের ব্যাপার তদারক করতেন ব্যক্তিগত ভাবে এই বড়বাবুই। এখন আর করেন না ; যেদিন করতেন সেদিনকার সুনাম-এর বেগ কমে এলেও, গতি এখনও থামেনি। তারই জোরে যে হোটেলে উঠলাম তার চাকা আজও চলছে ; কিন্তু যে চালাল এই চাকা সে আজ চাকার নীচে ভাগ্যচক্রের আবর্তনে। তার জন্যে কোন বাঙালীর কাশীতে এতটুকু মাথাব্যথা আছে মনে করলে বর্তমান বাঙালী চরিত্রের পরিচয় ভুলে যেতে হয়। বিশ্বপ্রেমে অধুনা উদ্দীপিত বঙ্গসন্তান মানুষ হতে গিয়ে আড়াই কোটিতে ঠেকেছে। অবিলম্বে মানুষ হবার বদলে আবার বাঙালী হবার দিকে মন না দিলে কেবল বেরুবাড়ী থেকে নয়, সব বাড়ী থেকেই তাকে বেরুতে হবে। যে উপায়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে পরিণত সেই একই অপূর্ব উপায়ে পশ্চিমবঙ্গেরও আর কোনও অস্থান-কুস্থান হতে বেশী দেরী হবে না কিন্তু। উদ্বাস্তুদের যারা বাঙাল জানে ঘেন্না করছে বাঙালী [illegible] করতে পারছে না আজও তারা জানে না যে শরীর [illegible]

হাত বাদ গেলে বেহাত হলে কেবল হাতের নয় শরীরের ক্ষতি! পশ্চিমবঙ্গের তালপুকুরে এই হতভাগ্যদের ঘটি ডুবতে দেরী নেই আর। আসামে যার বর্ণপরিচয় হয়নি, বেক্কবাড়ীতে তার বোধোদয় হবে এমন আশার মর্মাতিগ তামাশায় আর যেই উন্মত্ত হোক, আমি হইনে। হইনে তার কারণ আমি রবীন্দ্রনাথ নই। রবীন্দ্রনাথ হলে বলতে পারতাম: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। রবীন্দ্রনাথ এই বলে বলি; 'বন'-মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা অনেক বড় পাপ।

এ-হেন বড়বাবুকে হোটেলে একদিন বলেছিলাম: ইনসাইড কাশীর রিয়াল চেহারা দেখতে চাই। বলেই মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম; কেন বলতে গেলাম। তখন রাত দশটা; কিন্তু হোটেল কলকাত'র বাঙালীতে যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশী গমগম করছে। বড়বাবু হাঁক পাড়লেন: রহমৎ? রহমৎ আসবার আগেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; আপনার কত নম্বর ঘর? সাতাশ তো? আমাকে হাঁ, না, বলবার ফুরসৎ না দিয়েই সদ্যো আগত রহমৎকে বলেন বড়বাবু আজ হোটেলকে শুনিয়ে; রহমৎ, সাতাশ নম্বরকা সাহাব একঠো মেয়েমানুষ মাঙতা। হোটেল সুদ্ধ লোক দেখি বারান্দায় হাজির মুহূর্তে। এই এক মজা দেখেছি; কাশী টু ক্যালক্যাটা—সর্বত্র।' সব চেয়ে জনশূন্য, সব চেয়ে নির্জন পৃথিবীতে, একজন পুরুষের সঙ্গে সেই একজন মহিলা দেখা সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত। রাতের যে অন্ধকার গড়ের মাঠে একা বসতে ভয়ে কাঁপে সব চেয়ে দুঃসাহসী বুক। সেখানেও একজন 'খোঁপা' কি 'বিণুনী' গিয়ে বসুক একজন 'ধুতি' কি 'ট্রাউজার'-এর পাশে, আশে-পাশে দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠতে ভুঁইফোঁড়ের দল। ছারপোকার মত; মশার মত; রাণীকে দেখতে কেরাণীর পঙ্গপলের মতো এরা কোথা থেকে বেরোয় এবং কোথায় প্রস্থান করে কে বলবে।

বারান্দার মঞ্চে উপস্থিত সেল্প-ষ্টার্ভর্ডরা প্রস্থান করলে; হেসে বিদায় নিলে রহমৎ,—বড় বাবুকে সবিনয়ে বলি; মেয়েমানুষ নয়; মানুষ দেখতে এসেছি কাশীতে। একজন সাচ্চা মানুষ মেয়েমানুষ, কলকাতা টু কাশী এক, সে 'মেয়েমানুষের বাসা আপনি বলছেন; তার জন্যে কাশী আসার মতো বয়স বা পয়সা কোনটারই প্রাচুর্য নেই আমার। আমাকে কাশীতে এমন একজন মানুষ দেখাতে পারেন, যাঁর জন্যে কাশীতে মরা নয়,—বাঁচার মানে হয়—

'পারি'; নির্দ্বিধান্বিত উত্তর আসে বড়বাবুর মুখ থেকে; কাল সকাল দশটায় এসে আমার ঘরে টোকা দেবেন। নিয়ে যাবো। কাশীতে তেমন মানুষ একজনেই আছেন। এখনও পর্যন্ত আছেন। বটে; তবে আর কতদিন আছেন, কে জানে!

কার উদ্দেশ্যে যুক্তকর উঠে যায় প্রণামের ভঙ্গীতে বড়বাবুর, জানিনে। তিনি যিনিই হন, তিনি যে 'সবা'-র 'রাম'-নাম উচ্চারণের উদ্দীপনা জোগাবার জাদু জানেন,—বড় বাবুর কণ্ঠস্বরের আর্দ্র তার এবং নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করবার মধ্যেই তার প্রমাণ, সূর্যমুখীর মধ্যে সূর্য যাচ্ঞার মতোই সুস্পষ্ট।

আমার হাতও আমার কপালে ঠেকল আমার অজ্ঞাতসারেই।

পরের দিন সকাল সাড়ে দশটায় বেরুনো গেলো গোধূলিয়া থেকে সাইকেল-রিক্সায়। ভাড়া দু আনা, যাত্রী দু জন; আমি আর বড়বাবু! সোনারপুরা অঞ্চলে গিয়ে নামলাম বড় রাস্তায়। তারপরই গলির

গোলকধাঁধা। যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেখান থেকে একা আবার হোটেলের ডেরায় ফিরে আসা অসম্ভব। দরজার কড়া নাড়তে খুলে গেল দড়িবাঁধা খিল দোতলা থেকে টান দিতেই। এই খিল খোলা এবং বন্ধের ব্যাপারটি কাশীর সব চেয়ে নিজস্ব জিনিষ। ওপর থেকেই দড়ি টানলে তবে খিল খোলে। এই, আর একটুখানি জায়গা ওপেন সব বাড়ীতেই; সেখানটা জাল দিয়ে ঘেরা,—বাঁদরের উৎপাত থেকে বাঁচবে। খিল খুলতে অবারিত হলো যে পথ সে পথ পাতালের থেকে উঠেছে স্বর্গে। দোতলার স্বর্গে ওঠবার সিঁড়ি কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের চেয়েও অন্ধকার। সিঁড়ির ছাদ এত নীচু যে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিলো আমাকে যে আমি বাঙালী; আজকের মোসাহেবদের ভারতে মাথা উঁচু করবার উপায় নেই। করবার চেষ্টা করলেই অবাঙালী বাধা। কাশীর সিঁড়ির ছাদের মতই মুহূর্তে হিট ব্যাক করবেই!

স্বর্গ এবং মর্ত্তের মাঝখানে সেই প্রেতলোকের অন্ধকার সিঁড়িতে যখন ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছি সেই সময়েই ওপর থেকে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি হোলো। ঘণ্টার মতোই গোল গোল নিটোল কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো প্রশ্ন; কে রে? বড়বাবুর উত্তর উঠে গেলো ওপরে আমরা ওপরে গিয়ে পৌঁছবার আগেই: 'আমি দিদিমা।' 'কে,—বড়?'—বোঝা গেল প্রশ্নকর্ত্রী কণ্ঠস্বরেই চিনেছেন আগন্তুককে। ততক্ষণে ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি দুজনেই। ঘরের ভেতরে দিনের প্রথমালোকেও অন্ধকার দূর হয়নি পুরো! তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন যিনি তাঁর গায়ের রঙ এই অতিবৃদ্ধ বয়সের সূর্যকে লজ্জা দেয়। প্রথম দর্শনে কাশীর দিদিমা সম্পর্কে আমার ধারণা পরে পরিবর্তিত হয়েছিলো; গায়ের রঙ নয়,—রং-এর গায়েই কে যেন রামধনুর রং ছিটিয়ে দিয়েছে। এ রং গায়ের নয়; এ রং সেই মনের,—সেখানকার রঙ্ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারুর কারুর বেলায় মুছে না গিয়ে নতুন করে খোলে।

দিদিমাকে প্রণাম করে বড়বাবু বলেন: এই আমার দিদিমা—

দু' পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলি: আর আমার কাশীর দিদিমা!

কাশীর দিদিমা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন: এ কে রে?

বড়বাবু জবাব দেন: কাশীতে মানুষ দেখতে এয়েছেন; তাই নিয়ে এলাম তোমার কাছে; কাশীতে আমার মতে একটাই মানুষ আছে—

ভেবেছিলাম কাশীর দিদিমা নিশ্চয়ই বিনয় প্রকাশ করে বলবেন, 'কি যে বলিস,'। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেনই না কাশীর দিদিমা; বললেন: 'ও? লেখে বুঝি?' কাশীর দিদিমার কথায় চমকে উঠি; মুখ-পড়তে জানেন নাকি? আমি তো বটেই; কাশীর দিদিমা যার কাছে কাশীর একমাত্র মানুষ,—সেই বড়বাবু পর্যন্ত সে আজকের চেয়ে একটু বেশীই, হতবাক হয়েছেন, বোঝা যায় তাঁর পরের প্রশ্নে। বড়বাবুও যে একটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তা প্রকাশ হয়ে পড়ে অতঃপর তাঁর কথাতেই: কি করে বুঝলে দিদিমা,—যে ইনি লেখেন?

কাশীর দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেন প্রশ্নের পিঠ-পিঠ উত্তর: লেখক না হলে এত বোকা আর কে আছে যে মানুষ দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে কাশী আসবে?

কাশীর দিদিমা যে সত্যিই কাশীর দিদিমা সেই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিলো আমার।

অনেক পরে অবশ্য মনে পড়েছিলো আরও অনেকের কথা। দেশে বিদেশে এমন শিক্ষিত মূর্খ অনেক, যাদের মুখে প্রায়ই শুনি, গল্প লেখার জন্যে দেশ দেশান্তর না করলে লেখক হওয়া যায় না। পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করে যারা তাহলে তারাই যে পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হতো, এ কথা কিন্তু তাদের মুখে শুনি না। বালজাক যে প্রায় ঘরে বসেই, বাড়ীর বাইরে পা না বাড়িয়েই এমন গল্প লিখেছেন যা দ্বিতীয়বার আর কারুর কলম দিয়ে বেরুলো না আজও, একথাও অবশ্য শুনি না তাদের মুখে। গল্প লেখবার জন্যে যার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় সে বালজাক নয়; সে বড় জোর সমারসেট মম।

এবং আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁর কথা মনে না পড়ে পারে না, তিনি হচ্ছেন ইথেল মানিন। সমারসেট মম্ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কনফেশনস্ এণ্ড ইম্প্রেসানেসে তিনি বলেছেন: 'One would have thought that anyone who knew as much about human nature as the author of The trembling of a leaf, The painted veil, and the sacred Flame, would have seen through the fallacy that travel broadens the mind or is of any value in creative work...

কিন্তু ইথেল মানিন ইথেল মানিন। বিপুল তাঁর পড়াশুনো, বিস্তর তাঁর বুদ্ধি। কিন্তু কাশীর দিদিমা? তিনি কেমন করে জানলেন যে জীবনের গল্প হচ্ছে ছাই-চাপা আগুন; প্রতি সংসারেই তার অস্তিত্ব আদ্যন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত। জীবনের গল্পের জন্যে দেশে দেশে, দেশে বিদেশে যেতে হয় না। বরং প্রতি সংসারে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। পেলেও পাইতে পারে অমূল্য রতন! জীবনের গল্পের চেয়ে কোন রতন আর অধিক অমূল্য!

আমাদের দেশে কয়েক শ্রেণীর আরও শিক্ষিত আরও ইডিয়ট আছে যারা প্রায়ই বলে, শুনি, আমাদের জীবনে তেমন থ্রিল কই? থোড়বড়ি-খাড়া, খাড়াবড়ি-থোড় এই জীবনে গল্প কোথায়। গল্প আছে ওদের জীবনে। নায়িকাকে নিয়ে উড়ো জাহাজে করে পালাচ্ছে অতিনায়ক; আর নায়ক সাবমেরীনে ফলো করছে তাকে। কি থ্রিল ভাবুন একবার? এডগার ওয়ালেশ অথবা না বলে এর বাঙলা অনুবাদে যে থ্রিল সে থ্রিল জীবনের থ্রিল নয়। জীবনের গল্পকার যে সে এর জন্যে দুঃখ করে না; তার দুঃখ তার নিজের, তার কাছের জীবনকেও যথেষ্ট না-দেখার দুঃখ; তাই তার মুখে শুনি—

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির-বিন্দু।'

কাশীর দিদিমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনের প্রথম কথাটা ভুলিনি; আর মনে আছে প্রথম দিনের শেষ কথাটা। চলে আসবার উদ্দেশ্যে প্রথম দিন যখন আবার পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছি: আবার দেখা হবে,—তখনও কাশীর দিদিমা বিনয় করেননি, বলেননি যে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, যা বলা এই সভ্যসমাজের, ক্রম ক্যাল টু কাশী এক দস্তুর; বরং তার পরিবর্তে বলেছিলেন, 'দেখা হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো।'

পৃথিবী জুড়ে মনে রাখার মতো কথা এত বার এত লোক বলেছে যে তা দিয়ে সম্ভবতঃ ত্রিভুবন জুড়ে দেওয়া যায়। বুদ্ধির ভিড়

অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে আরম্ভ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' পর্যন্ত কথামৃতের তো কথাই নেই ; অনেক বাজে কথাও কেবল বার বার বলে বলে শেষ পর্যন্ত কাজের কথা বলে চলে গেলো। যেমন আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই। যার অসম্ভব বলে কিছু নেই, তার সম্ভব বলে কিছু আছে কি? নিজের উন্মাদনা চরিতার্থ করবার কারণে লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচার লক্ষ্য থেকে চ্যুত করে। যুদ্ধের উপলক্ষে বলি দেওয়া অসম্ভবের পায়ে এ এক আমাদের মতো ক্লীব দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবলমাত্র যিনি বীর সেই নেপোলিওর পক্ষেই সম্ভব,—আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, সত্যিই অসম্ভব। এমনই আরেক নির্বোধ-উক্তি হচ্ছে, আরাম হারাম হ্যায়। যে আরাম করে না সে কাজও করে না। যার আরাম নেই, তার কাজ নেই, কাজের ব্যারাম আছে কেবল।

কিন্তু কাশীর দিদিমার এই, 'হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো ;' একথার আর মার নেই। সংসারে থেকে একথা সে প্রতিপদক্ষেপে বলতে পারে সে-ই কেবল 'সব' ত্যাগ করে সার-কে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। এ-কথা কাশীর দিদিমার স্বরচিত নয় নিশ্চয়ই ; অন্যের মুখ থেকে এসেছে তাঁর সম্মুখে। তবুও। তবুও, কাশীর দিদিমার মুখেই একথা সাজে ; অন্যলোকের মুখে লাঠি বাজে। তাঁর মুখে শুনলে মনে হয় না অন্যের কথা। অনেক কথা ভুলিয়ে দেয় এই অনন্য কথাটি।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে কাশীর দিদিমা আসবার এবং ঢোকবার মুহূর্তে দুটি অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্যে আরেকটি স্মরণীয় কথা বলেন। সেটি একটি প্রশ্নের উত্তরে কাশীর দিদিমা ব্যক্ত করেন। প্রশ্ন করেন তিনি এক সময়ে : কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন করেছ? জবাব দিই : না। কাশীর দিদিমার ব্যবহার আবার উল্টোপথ ধরে। লোকে কাশী এসে বিশ্বনাথ না দেখলে রাগ করে ; কিন্তু একি আশ্চর্য স্ত্রীলোক, কাশীর দিদিমা! শুনে খুশী হন : ভালো করেছ ; খুব ভালো করেছ। বিশ্বনাথ দর্শন না করে। লোকে চোখ তৈরী হবার আগেই হড়বড় করে কাশীশ্বরসন্দর্শনে যায় ; কাজেই তার দেখা হয় কিন্তু বিশ্বনাথ দর্শন হয় না। কাশীতে এসে প্রথম যাকে দেখবে তিনি হলেন সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামী।

আমি বলি : কিন্তু ওতো ত্রৈলঙ্গর মূর্তি, ত্রৈলঙ্গ নয়—

কাশীর দিদিমা উত্তর দেন : 'চোখ না থাকলে,—মূর্তি ; চোখ থাকলে দেখবে,—স্বয়ং বিশ্বনাথ ওখানে মূর্ত। তবে তাঁকেই দেখব, প্রথম!'—বলে চলে এলাম।

কাশীর দিদিমার কাছ থেকে প্রথম দিন হোটেলে ফেরার পথে আরেকটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়,—যারও দ্বিতীয় নেই। আসাম এবং বেরুবাড়ীর পর বিশেষ করে আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা অমূল্য। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। হোটেলে ফেরার পথে রাস্তার ওপর রকে বসে একজন মালাই ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে দেখি। লোকটার স্বাস্থ্য চেয়ে দেখবার মতো। বাইসেপ এতো উঁচু যে হাতের আঙুল কাঁধ ঠেকে না। তার সামনে দণ্ডায়মান বাড়িওলা স্বয়ং ; তুলে দেবার চেষ্টা করছে সে মালাইওলাকে বহুদিন। ওই রক সংলগ্ন আর সব ঘরকে তুলে দিয়েছে ; পারেনি কেবল মালাইওলাকে। মালাইওলা অন্যদিন হয়ত কথাই বলে না ; আজ নেমে এলো নীচে। এসে মালিকের সব কথা শোনবার পর মালাইওলা হঠাৎ নরম গলায় বললো : হাম এক বাত বাৎলাই?—অর্থাৎ আমি একটা কথা বলি এবার? বললে এমন সুরে যেন রাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণের বাঁশি বাজছে! বলে, সেই একই স্বরে মালাইওলা তার বক্তব্য পেশ করে : আদালত তুমার হো ; ঘর তুমার হো ; আইন ভি তুমার হো ; পুলিশ তুমার হো, লেকিন,—অর্থাৎ আদালত, ঘর, আইন, পুলিশ সব তোমার, কিন্তু—! লোকটা থামে ; আর কয়েক মুহূর্তের সে কি সাসপেন্স! যেন হিচককের ছবির চরম মুহূর্তের বর্ষণের আগে কয়েক মোমেন্টের লাল। তারপর সেই বাইসেপওলা হাত যার কারণে আঙুল কাঁধে ঠেকে না,—মালাইওলা সেই হাত শূন্যে তুলে গর্জন করে ওঠে : লেকিন, আবি এইসা মার মারে—!

যখনই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে আসামের মতো ঘটনা ঘটে তখনই আমার মালাইওলার কথা মনে পড়ে। কাশীর সেই মালাইওলা। হিংসা খারাপ জানি ; কিন্তু নির্বীর্যের অহিংসার চেয়ে বোধ হয় ভালো। তাছাড়া রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হবারই কেবল প্রয়োজন আছে যে তা নয় ; বাল্মীকি থেকে রত্নাকরও হতে হয় কখনও কখনও যে ; মরা মরা বলতে বলতে যেমন রাম-রামরাজ্যে তেমনই রাম-রাম বলতে বলতে তেমনই কখনও কখনও প্রতিবাদের মার-মার আওয়াজ করা চাই।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	২৪৲
ষাণ্মাষিক "	—	১২৲
প্রতি সংখ্যা "	—	২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	—	৭·৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	—	২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	—	১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	—	১·৭৫

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজোর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, অনুশীলন পার্টির কানাই রুদ্রের সেতারবাদন শুনলুম চমৎকার। চমৎকার স্বাস্থ্য, জোয়ান ছেলে, দুবেলা রীতিমত ব্যায়াম করে, আর সেতার সাধনা করে—পড়াশুনোয় মন নেই। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার সাথীদের সঙ্গে কয়েকদিন আমার ক্লাসে যোগ দিয়েছিল। তারপর আর আসেনা দেখে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললে,—"আমার বোঝা হইয়া গেছে,—আর কাম নাই,—আমি এবার জিগামু—গো, বিপ্লব-স্বাধীনতা যে করবা, সে কাগো লেইগ্যা ?" বড় ভাল লাগলো—একটু স্কুল-পালানো টাইপ, কিন্তু চমৎকার ছেলে। মুক্তির পর অন্নচিন্তা নিয়ে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছে, সেতার হয়ত শিকেয় উঠেছে,—কিন্তু ভাবলে মনটা পীড়িত হয়—সেতারে সে ওস্তাদ হতে পারতো—একজন সত্যিকারের শিল্পীর প্রতিভা অন্নচিন্তায় চাপা পড়ে গেল।

বেশ বড় একদল ডেটিনিউ ছিল, ছোকরা বাবু, যারা দিনরাত শুধু খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ এবং বাবুয়ানী নিয়েই থাকতো। বারোমাস এক জায়গায় আটক,—অথচ প্রত্যেক হপ্তায় একগাদা করে কাপড় ধোপাকে দিয়ে কাচায়—মশারিটা পর্যন্ত! আমার মশারিটা এক নাগাড়ে পাঁচ মাস ফেলা ছিল, তারপরে একবার কাচিয়ে টাঙিয়ে যে তুলে রেখেছিলুম, আর ফেলিনি। কিন্তু ওরাই রটিয়েছিল, আমি বারোমাস মশারি ফেলে বাস করি। সে বদনাম আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাই।

ওই সব বাবুদের কেউ কেউ গ্রামোফোন কিনেছিলেন,—এবং রাত্রে ঘরে বন্ধ হওয়ার পর সেগুলোর খেল সুরু হ'ত। সময় সময় হয়ত ঘরের তিন দিকে তিনটে গ্রামোফোনে তিন গায়ক-গায়িকার তিনখানা রেকর্ড একসঙ্গে চলতে সুরু করতো—হয়ত কীর্ত্তন, কালোয়াতী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত—খাঁটি পাগলাগারদ! শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল প্রায় একশোখানা গান—কোনোটার ছ'আনি, কোনোটার চার আনি, কোনোটার বা দু'আনি। এক একদিন আমার মাথায় খুন চড়ে' যেত'—আমি পাশের ঘরের গ্রামোফোনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলার গান চালাতুম, তাদের কালোয়াতীর সঙ্গে আমার কীর্ত্তন—বাউল—রবীন্দ্র সঙ্গীত! যারা পড়াশুনো করে বা ঘুমোতে চায়, তাদের যন্ত্রণার একশেষ। এক এক দিন ক্ষেপে গিয়ে আমি আমার যাত্রার গানের জুড়ীর গানের টক ছাড়তুম—

একবার এসে দেখ হে নাথ আমার কপাল ভেঙেছে
জগৎ আঁধার করে' আমার অভিচাঁদ আজ অস্ত গেছে—

* * * *

কিম্বা—বল পাণ্ডবনাথ আমার অভিচাঁদ
গেছে কোন দেশে ত্যাজিয়ে জীবন
বাছার অন্বেষণে কৃতান্ত ভবনে
সুদূর গমনে যাবগো এখন—ইত্যাদি

* * * *

ফরিদপুরের সুধীর সেন ছিলেন নিউক্যাম্পের বাসিন্দা, নিজেকে কমিউনিষ্ট বলে থাকেন—বীরেন ঘোষ, সত্য গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ (ওঁরাও এখন কমিউনিষ্ট—এবং সত্য গুপ্ত সাংখ্যদর্শন পড়ে—বর্ত্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির মাসিক পত্রিকা "পরিচয়"-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) —আমার "লেনিনিজমের" অনুবাদের একটা কপি তিনি অদৃশ্যকালীতে লেখা সুরু করেছিলেন, বাইরে পাচার করার মৎলবে। একটু বেশী সেণ্টিমেণ্টাল লোক। একদিন আমি কি একটা বিষয় নিয়ে একটু বকাবকি করেছিলুম, বিকেলে গিয়ে শুনি সারাদিন খায়নি, এবং অদৃশ্যকালীর লেখা খাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছে!

৩৮ সালে মুক্তির পর খোঁজ নিয়ে দেখি, তিনি "অ্যাডভান্স" প্রেসের ম্যানেজারী করেছেন। কাগজ উঠে যাওয়ার পর প্রেসের ছাপার ব্যবসাটা চলছিল, কিন্তু ভগ্নদশা। সুধীর সেন ছিলেন জে, সি, গুপ্তের শ্যালক—মিসেস গুপ্তের জ্ঞাতিভাই—সেই সুবাদে চাকরী।

কেমন চলছে, জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন,—"সেকথা আর জিগাইয়েন না"। অনেক দুঃখের কথা বলেছিলেন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতেন ভাড়া-করা ঘরে। আমি বলেছিলুম, তবু যা হোক একটা হিল্লে হয়েছে তো? সংসার যখন আছে, দড়ি ছেঁড়া চলবে না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ বীরেন ঘোষের কাছে শুনলুম, সুধীর সেন আত্মহত্যা করেছেন! মনটা বিষাদে ভরে গেল।

এই ৩৪ সালেই বিখ্যাত ভূমিকম্প হয়, যাতে বিহার প্রদেশটা সব চেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে বলা হয় বিহার-ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে ব্যাপক সংযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থা হয়েছিল তবু তার মধ্যে অস্পৃশ্যদের প্রতি অবহেলা

প্রকাশ পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তদুপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেন, অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের জন্য ভগবানের দেওয়া শাস্তি এই ভূমিকম্প! (আমরা মাঠে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্পের নাচন দেখেছিলুম)।

মহাত্মার বিবৃতি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে এমন ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। "গুরুদেবকে" বিচলিত দেখে ঘাবড়ানো দূরে থাক, মহাত্মাজী আরো জোরে আরো গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, এ ভূমিকম্প অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য ভগবানের দেওয়া শাস্তি!

তিনি সত্যের অবতার—সত্য নিয়ে পরীক্ষা করেন—তিনি সত্যিই কথাটা বিশ্বাস করতেন? অনেকে হয়ত তা স্বীকার করবেন না, এবং বলবেন, এটা সুবিধাবাদের একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সে কথাই কি ঠিক? তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম মানতেন এবং প্রচার করতেন, পায়খানায় বসেও গীতা পড়তেন, আত্মশুদ্ধির জন্যে অনশন এবং প্রার্থনা করতেন, দিশেহারা হলে অনশন ও প্রার্থনার দ্বারা অন্তরে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করতেন, এসব কথা তো ভুলে গেলে চলবে না?

অস্পৃশ্যদের নেতারা, মহাত্মাজির ভক্ত রাও বাহাদুর এম সি রাজা থেকে মহাত্মাজির বিরোধী ডক্টর আম্বেদকর পর্যন্ত—সবাই বলতেন, বর্ণাশ্রম বা চাতুর্বর্ণ মেনে অস্পৃশ্যতা বর্জন হয় না, cast থাকলেই outcastও থাকবেই, সুতরাং মহাত্মাজির অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্ল্যানটা হচ্ছে নোঙর ফেলে নৌকো বাওয়া।

বস্তুত সেই কারণেই তাঁর সব প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং বড় বড় stunt এতকাল ব্যর্থই হয়ে এসেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা বর্জন না করলে স্বরাজ হবে না—তাঁর বর্ণহিন্দু ভক্তেরা সেকথা তো গ্রাহ্য করেইনি,—৩১ সালেও তারা বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ এবং গুজরাটের বেনেরা খদ্দর পরে' "মহাত্মা কি জয়" বলে অস্পৃশ্যদের মিছিলের ওপর লাঠি চালিয়েছে। খদ্দরের ব্লাউস-শাড়ী পরে' গাছকোমর বেঁধে গান্ধীভক্ত লেডি মাথায় বিঁড়ে বেঁধে ময়লার টব মাথায় নিয়ে চলেছেন, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু এতবড় stuntও ব্যর্থ হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ১০ বছর পরে মহাত্মাজি সুর পালটে বলতে সুরু করেছেন, স্বরাজ পেলেই আমরা এ সমস্যার সমাধান করে' ফেলতে পারবো।

৩১ সালে বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় যখন মহাত্মাজি ঐ কথা বলছেন, তখন আম্বেদকর, শ্রীনিবাসন প্রভৃতি অস্পৃশ্য নেতারা (রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের প্রতিনিধি) বলছেন, যখন হিন্দুরাজা স্বাধীন ছিল, তখন যারা আমাদের কুকুরেরও অধম করে রাখার পাকা ব্যবস্থা করেছে, তারা স্বরাজ পেলে আমাদের মানুষের অধিকার দেবে, এত বড় ধাপ্পাবাজিতে অস্পৃশ্যেরা ভুলতে পারে না।

সে সময় ভারতের বিশেষত বঙ্গে-মহারাষ্ট্র-গুজরাটের বিভিন্ন কাগজে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, সোস্যাল রিফর্মার প্রভৃতিতে অস্পৃশ্যদের উপর বর্ণহিন্দুদের দৈনন্দিন রকমারি অত্যাচারের ফিরিস্তি ছাপা হ'ত এবং সেগুলো আবার বিলেতের কাগজে পুনর্মুদ্রিত হ'ত। মহাত্মা [illegible], বিলেতের কাগজগুলো ভারতের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করছে, এবং তার প্রতিবাদে অস্পৃশ্য নেতারা এবং ভারতের ঐ সব কাগজ বলতো মহাত্মাজিই অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করছেন বিলেতে।

অস্পৃশ্যদের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের দোহাই দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা অস্পৃশ্যদের খৃষ্টান হতে বলতো, মুসলমানেরা বলতো, মুসলমানধর্ম গ্রহণ কর। বর্ণহিন্দুরা বলতো, অস্পৃশ্যতা নিছক হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপার, তার মধ্যে কংগ্রেসের নাক ঢোকাবার কোন অধিকার নেই, কারণ কংগ্রেস নানা ধর্মাবলম্বীদের যৌথ সংগঠন। বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি তখন ছিলেন পার্শী নেতা মিষ্টার নরীম্যান, তিনি সৎ ও বিবেকবান—তিনি সত্যিই গণ্ডগোলের মধ্যে নাক গলাতে আসতেন না, যদিও মানবিক ও নাগরিক অধিকারের কথা তাঁকে বলতেই হত। অস্পৃশ্যদের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের বিরাট ফিরিস্তি আছে কে টি সানজানা (পার্শী) কর্তৃক লিখিত Cast and out cast নামক বইয়ে (কংগ্রেসের এবং গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ এবং বিশদ বিবরণ)।

বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের সময়েই—৩১সালে ভারতে সেন্সাস বা লোকগণনা চলছে। বর্ণহিন্দুরা বলছেন, লোকগণনায় হিন্দুদের "জাত" লেখা বন্ধ করে শুধু "হিন্দু" লেখার ব্যবস্থা করা হোক। তার প্রতিবাদে আম্বেদকর প্রভৃতি অস্পৃশ্য নেতারা বলছেন—অস্পৃশ্যদের সেন্সাস থেকে উড়িয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের এই জুয়াচুরী প্ল্যান অস্পৃশ্যদের সর্বনাশের জন্যই করা হয়েছে। এ জুয়াচুরী চলবে না। অস্পৃশ্যদের প্রত্যেকটি মানুষের "জাত" সেন্সাসে লিখতে হবে, যাতে অস্পৃশ্যদের সেন্সাস সঠিকভাবে হয়। তাদের সংখ্যা কেউ বলেন চার কোটি, কেউ বলেন ছয় কোটি। সেন্সাসে এসব বিবাদের অবসান হাওয়া চাই। এবং তাদের সংখ্যার অনুপাতে আগামী শাসন সংস্কারে তাদের পৃথক নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা ব্যবস্থাপক সভায় থাকা চাই।

বিলাতে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের এই দাবী বানচাল করার জন্য মুসলমানদের বলেছিলেন, তোমরা এই পৃথক নির্বাচনের দাবী ছেড়ে joint electorate এর পক্ষে দাঁড়াও, আমি তোমাদের (জিন্নার) ১৪ দফা দাবী মেনে নোব। তারা রাজী হয়নি। এরই পর ম্যাকডোনাল্ডের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হয় এবং অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। তারই ফলে হিন্দুদের "সংকৃতি"

নাশের অজুহাতে,—অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অনশন সুরু করেন—আমরণ অনশন।

এ অজুহাত মুসলমানদের ক্ষেত্রে খাটে না বলে 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' নিঃসাড়ে মেনে নেওয়ার মৎলবে কংগ্রেস ঘোষণা করলে তার "না গ্রহণ, না বর্জন" নীতি। কার্যত গ্রহণ করার ক্ষেত্র তখন ছিল না, সুতরাং নিখরচায় "না গ্রহণ" নীতি ঘোষিত হল। "নাবর্জন" নীতি ঘোষণা করে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হল। ভবিষ্যতের নির্বাচনে দেখা গেল, ম্যাকডোন্যাল্ডের রোয়েদাদ কংগ্রেস বেমালুম গ্রহণ করেছে।

যাই হোক,—অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদে মহাত্মাজি যখন আমরণ অনশন সুরু করলেন, তখন সারাদেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো এবং সকল বড় বড় নেতা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সঙ্কল্পে অটল। এবার তিনি না মরে ছাড়বেন না বুঝে অস্পৃশ্য নেতারাও—এম সি রাজা, আম্বেদকর প্রভৃতি—তাঁর কাছে ছুটে এলেন। বিলাতে যখন অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে ক্যাচাল চলছিল, তখন গান্ধীভক্ত এম সি রাজা বলেছিলেন, মহাত্মাজি চমৎকার লোক,—কিন্তু "Beware of Gandhi the politician"—রাজনৈতিক নেতা গান্ধী সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থেকো। আম্বেদকর বলেছিলেন, গান্ধীজি অস্পৃশ্যদের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা দূরে থাক, সৎ শত্রুর কাজও করেন নি—"He was not even an honest foe" সেই রাজা এবং সেই আম্বেদকর পুণা প্যাক্টে রাজী হয়ে মহাত্মাজিকে মরণপণ থেকে বাঁচালেন। অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি-সংখ্যা গোটাকয়েক বাড়িয়ে দিয়ে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় তাদের রাজী করানো—এই হল পুণা প্যাক্টের মোদ্দাকথা।

কিন্তু প্যাক্টের ফলাফল দেখে এই সব অস্পৃশ্য নেতাদের আক্কেল গুড়ুম হতে বেশী দেরী লাগলো না। সারা দেশে সর্বত্রই স্থানীয় নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরাতন, অভিজ্ঞ অস্পৃশ্য নেতাদের বাদ দিয়ে অর্বাচীন অস্পৃশ্য কংগ্রেসীদের প্রার্থিরূপে মনোনীত করা হতে লাগলো। রাজা, আম্বেদকর প্রভৃতি নেতারা এদেখে নিজেদের দুর্বলতা ও বেকুফীকে ধিক্কার দিয়ে অনেক আফশোষ করেছেন, এবং রাজা আফশোষ করতে করতেই মরেছেন।

পুণা প্যাক্টের এই ইতিহাস ও পরিণতির কথা আম্বেদকরের মুখেই শোনা যায় ১৯৪৪ সালে, যখন কলকাতায় তপশিলীজাতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানানো হয় (বড়লাটের পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ার জন্য?)—যে সভায় বাংলার মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল সভাপতিত্ব করেছিলেন। (See Cast and Outcast by G. E. Sanjana—Page 7)

পুণা প্যাক্টের ফলাফল সম্বন্ধে রাও বাহাদুর এম সি রাজার মুখ থেকেও এক মনোহারী গল্প শোনা গেছে। ১৯৪২ সালে সার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে এক নো-পার্টি কনফারেন্স আহূত হয় এবং রাজাসাহেব সাপ্রু কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু রাজা সাহেব সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে লেখেন, (ঐ—৭-৮ পৃঃ)—

"যে সম্মেলনে ডেপুটি মহাত্মা রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সে সম্মেলনে আমি যোগ দিতে পারি না। অন্যান্য সম্প্রদায় ও পার্টির নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে এই যে, এঁরা আমাদের সহযোগিতা চান নিজেদের কোনো মৎলব হাসিল করার জন্যে, এবং তারপর আমাদের বর্জন করেন—এমন কি আমাদের প্রগতির পথে কাঁটা দেন। পুণা প্যাক্টের কথাই ধরুন। আমরা যুক্ত নির্বাচনে রাজী হলুম,—আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস আমাদের সমাজের নেতাদের বাদ দিয়ে ইলেকসনের জন্যে আমাদের সমাজের সাধারণ লোকদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে ডাক দিলেন এবং লোভ দেখালেন, তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচনপ্রার্থী মনোনীত হবে, এবং তারা বর্ণহিন্দুদের ভোট পাবে। এর ফলে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক পার্টি দুর্বল হয়ে গেল।

"কংগ্রেসের এই অপকর্মের ফল ১৯৩৮ সালে কদর্যরূপে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। তখনও বর্ণহিন্দুরা আমাদের মন্দির প্রবেশের অধিকার দেয়নি। আমি কংগ্রেসী ব্যবস্থাপক সভায় এক টেম্পল-এণ্ট্রি বিল উপস্থাপিত করি। কিন্তু ভোটাভুটির সময় দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পার্টি-শৃঙ্খলার নামে নির্দেশ দেওয়ার ফলে ৩০ জন অস্পৃশ্য সদস্যের মধ্যে ২৮ জনই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে, যদিও আমি বিল উপস্থাপিত করার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলুম। মহাত্মাজির কাছে ব্যাপারটা বললে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, রাজাগোপালাচারীর ওপর বিশ্বাস রাখুন—তাঁর মতন বন্ধু অস্পৃশ্যদের আর কেউ নেই।"

(৬০।৬১ সালেও মন্ত্রী জগজ্জীবন রাম হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা বর্জনে আহ্বান করেছেন।)

যাই হোক,—৩২-৩৩-৩৪ সালে আমরা এসব কথা জানতুমও না বুঝতুমও না—কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাণ্ডকারখানার মধ্যে কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের অমোঘ শক্তি দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম, এবং বার বার মনে হচ্ছিল, কমিউনিজম ছাড়া আমাদের দেশের, সমাজের, জীবনের বিপুল সমস্যার সমাধানের আর কোনো পথ নেই।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ভারতে কিষাণ-মজুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। মস্কোর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামের ১১ জন সদস্যের অন্যতম এম এন রায়কে চীনের কমিউনিষ্টদের ২৭ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাংহাইয়ে জেনারেল চিয়াংকাইশেক কর্তৃক হাজার হাজার শ্রমিক নিহত হওয়ার জন্য দায়ী করে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সমগ্র প্রাচ্যের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যে প্রতিনিধি (বোরোডিন) চীনে অনেক দিন থেকে কাজ করছিলেন সেই বোরোডিনই চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির হঠকারিতা ও ব্যর্থতার জন্য দায়ী। কিন্তু এসব বাদবিতণ্ডার কথা এখানে অবান্তর। মোট কথা, তৃতীয় আন্তর্জাতিক কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের কমিউনিষ্টরাও এম এন রায়কে বর্জন করেছিল। তিনি বোধ হয় ২৯ সালে ভারতে এসেছিলেন গোপনে, কারণ ২৪ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামীরূপে তখনও তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট ঝুলছিল। বোধ হয় ৩০ সালে তিনি ধরা পড়েন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে কানপুরে মামলা হয়, এবং বোধ হয় ৩২ সালে তিনি ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভরদশা এবং বিলেতের রাউণ্ড
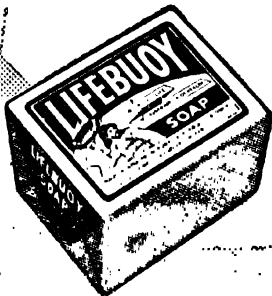
লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!
আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম!
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে!
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।
LIFEBUOY
SOAP
L. 17-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

টেবল কনফারেন্সে মহাত্মাজি কর্তৃক ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দরবার দেশে এমন নিরুৎসাহের সৃষ্টি করেছিল যে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গুপ্ত সংগঠক এম এন রায়ের ডিফেন্সের জন্তে যেন সারাদেশে একটা নতুন উৎসাহের জোয়ার এসেছিল। খাঁটি স্বাধীনতাপন্থী হজরৎ মোহানীকে প্রেসিডেণ্ট করে এক ডিফেন্স কমিটী গঠিত হয়েছিল, এবং নানাস্থানের বহু বড় বড় আইনজীবী কানপুরে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু এম এন রায় তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ কতকগুলো আইনের বই চেয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন সাহায্য নেননি,—এবং নিজেই নিজের ডিফেন্স করেছিলেন। তাঁর তর্ক-যুক্তি এবং সওয়াল-জবাব সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, এবং তিনি মুক্তির পর সেই ডিফেন্সের বিবরণ এক ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে মীরাটের কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মামলা শেষ হয়েছিল এবং অনেক আসামীর জেল হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় ৩৩ সালে কলকাতায় কমিউনিষ্টদের এক সারা ভারত কনভেনশন হয়েছিল (ঠিক মনে নেই) এবং সেখানেই প্রথম বিধিবদ্ধভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়; ৩৪ সালে নিখিল ভারত কিষাণসভাও সংগঠিত হয়, বোধ হয় বিহারের কিষাণ নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী (?) প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৩৪ সালে বিলাতে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীতে ৩৫ সালের শাসনবিধির প্রাথমিক খসড়া আলোচিত এবং গৃহীত হয়। কয়েকজন ভারতীয় "প্রতিনিধি" সাক্ষীগোপালরূপে উপস্থিত থাকেন মাত্র। রেসাড্ আগাখাঁ এবং স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রু খসড়ার কিছু কিছু পরিবর্তন দাবী করে এক দরখাস্ত পেশ করেন, কিন্তু সেগুলোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী খসড়াটাকে প্রায় যথাযথভাবেই পাশ করে। যদি বা ২।১ জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে, সেগুলো হয় আরো বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। আর চার্চিল এবং প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন থিয়েটার করে চলেন। চার্চিল বলেন—সব ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে—আর বল্ডুইন বলেন, আমরা যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, না দিয়ে উপায় কি?

এদিকে পাটনায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় কংগ্রেসের জাহাজটে নতুন উৎসাহ সঞ্চারের আর কোন উপায় না দেখে পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ স্বরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বোধ হয় ডক্টর আনসারীর নেতৃত্বে ৩৪ সালের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সে নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা (২০ সালের মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা অনুযায়ী) ছিল দেশের জনসংখ্যার শতকরা একজন মাত্র। তখন সারাদেশে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যাও কমতে কমতে সাড়ে চার লাখে নেমেছে।

৩৪ সালের জুন মাসে কংগ্রেসের উপর থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এবং জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

অক্টোবরে বম্বেতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সেই প্যাণ্ডালে প্রথম কিষাণ সভার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মহাত্মাজী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে হরিজনসেবায় মনোনিবেশ করেন।

ওদিকে হিটলার ভার্সাই চুক্তি অমান্য করতে স্বরু করে দিয়েছে। রাইন নদীর তীরে খানিকটা জায়গা সামরিক-বাহিনীবিহীন (de-militarised) করে রাখার ব্যবস্থা ছিল ভার্সাই চুক্তিতে, যাতে জার্মাণী-হঠাৎ কোনো দিন আবার ফ্রান্সের ওপর চড়াও করতে না পারে। ৩৪ সালে হিটলার হঠাৎ একদিন সেই রাইনল্যাণ্ডে সসৈন্য অভিযান করে দখল করে বসলো। এটা তার পরবর্তী প্ল্যানের প্রস্তুতি। ভার্সাই চুক্তিতে সার প্রদেশের শাসনভার ১৫ বছরের জন্তে এক আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে দেওয়া হয়েছিল, এবং বলা হয়েছিল, ৩৫ সালে এক গণভোটের মারফৎ সারের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত হবে—জনগণ ইচ্ছা করলে সারের শাসনভার আবার জার্মাণীর হাতেই চলে যেতে পারবে। রাইনল্যাণ্ড দখল তারই প্রস্তুতি। ৩৫ সালে গণভোটে সার আবার জার্মাণীর হাতেই চলে যায়।

জাতিসংঘের ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে যুদ্ধ এড়ানোর পন্থারূপে নিরস্ত্রীকরণের একটা নামকে-ওয়াস্তে চেষ্টা চলেছিল, মাঝে মাঝে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনও বসছিল, অথচ কোনো কাজ হচ্ছিল না। ৩৪ সালের শেষে বৃটিশ প্রতিনিধি হেণ্ডারসনের সভাপতিত্বে শেষ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসে, এবং নিঃশেষে বানচাল হয়ে যায়—হিটলারের মতিগতি দেখেই। সুতরাং ৩৫ সালে বৃটেনে নতুন সশস্ত্রীকরণের (armament programe) কর্মসূচী গৃহীত হয়—৫ বছরের কর্মসূচী।

হিটলারের পার্টির নাম নাজি বা নাৎসী—National Socialist. জার্মাণীর সোসিয়্যালিষ্ট পার্টি কমিউনিষ্ট বিরোধী সকল দেশেরই মতন—কিন্তু তারাও সব দেশের সোসিয়্যালিষ্ট পার্টির মতন ধনিকদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে, এবং বলে, অন্তত প্রধান শিল্পগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকদের কব্জা থাকা ঠিক নয়,—সেগুলোর মালিকানি রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত। হিটলারের এ সোসিয়্যালিজমের ওপরও সমান বিরাগ। তাঁর সোসিয়্যালিজমটা ন্যাশান্যাল। তার স্বরূপ প্রকট হল তাঁর লেবার ডিক্রীতে। তাতে বলা হল, অতঃপর তাঁর রাজ্যে কলকারখানার মালিকরাই হবেন শ্রমিকদের লীডার—মালিকের আদেশ মজুরদের নেতার আদেশরূপেই মেনে চলতে হবে।

অর্থাৎ ন্যাশান্যালিজম মানেই কমিউনিজমের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ। তাই কমিউনিষ্ট শাস্ত্রেও বুর্জোয়া ন্যাশান্যালিজম সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সারা দুনিয়ার শোষিত শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে একজাতি—শোষিত জাতি। এই হল প্রোলেটারিয়্যান ইণ্টার ন্যাশান্যালিজমের মোদ্দা কথা।

সুতরাং হিটলার সোসিয়্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিরোধীদের মেরে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রেখে, সমগ্রজাতির তরুণীদের তাঁর নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করে, সমগ্র জার্মাণীজাতির ভার্সাই-সন্ধির প্রতি স্বাভাবিক বিরাগের ওপর সমগ্র জাতিটাকেই নাজী বানিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকেও নজর দিয়েছিলেন।

নাজী-পর্যটক পৃথিবীর দিকে দিকে ধাওয়া করেছিল,—তাদের লক্ষ্য ছিল প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ, এবং সম্ভাব্য শত্রু ও মিত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন। আমেরিকার Living Age পত্রিকায় এমনি তিনজন নাজীর সফরের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল,

ক্যাম্পে আমি সেটা পেয়েছিলুম। তাতে তাঁরা মস্কো-ভ্লাডিভোষ্টক রেলভ্রমণ উপলক্ষে লিখেছিলেন,—৬০০০ মাইল দীর্ঘ এই single line রেলপথ তখন double line হয়ে গেছে, এবং তার দুধারে মাঝে মাঝে, সাইবিরিয়াতে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ২।১টা শিল্পকেন্দ্র এত বড় সহরে পরিণত হয়েছে, এত বড় বড় বাড়ী তৈরী হয়েছে,—"যার তুলনা চলে নিউইয়র্ক সহরের সঙ্গে।"

আর একটা ম্যাগাজিন থেকে খবর পেলুম,—মস্কো-ভ্লাডিভোষ্টক রেলের যে শাখা মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে ডাইরেনে গেছে, সেই Chinese Eastern Railwayটা ছিল রুশিয়ার আর এবং চীন সরকারের যৌথ সম্পত্তি,—সোভিয়েট সরকার নামমাত্র মূল্য নিয়ে রুশিয়ার অধিকারটা চীনের কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। এতে তাদের লাভই হয়েছে, কারণ, প্রথমত ঐ রেলওয়ের লাইন এবং Rolling stock পুরোনো হয়ে ঝড়ঝড়ে হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয়তঃ, এতে চীন-জাপানের গণ্ডগোলে তাদের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাও এড়ানো হয়েছে।

আর একটা কাগজে পেলুম, হিটলার ইউক্রেনের দিকে অঙ্গুলি নির্দে'শ করে' বলছেন, আমাদের হাতে পড়লে আমরা ওদেশে সোনা ফলাতে পারতুম। আর ষ্টেলিন বলছেন, আমাদের Potato Patchএ নাক ঢোকাতে এলে আমরা ডাণ্ডা মেরে Swinish Snout থেঁতো করে দেবে। তখন হিটলার "লেবেনস্রাম" বা হাত-পা ছড়ানোর জায়গার দাবী সুরু করেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রাক্তন জার্মাণ কলোনিগুলোর কথাও তুলেছেন।

নাজী পার্টি তরুণদের নৃশংসতা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, ছোট ছোট জীবন্ত পশু-পক্ষী ধরে টুকরো টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলা, আর ইহুদীদের ওপর অত্যাচার চলে ভবিষ্যতের প্ল্যানের রিহার্সাল হিসাবে। নাজীসুলভ নৃশংসতার একটা নমুনা একদিন ক্যাম্পে দেখা গেল। আমাদের ওল্ড ক্যাম্পে তিনশো ডেটিনিউ, কিচেনও তিনটে। মাসে একবার করে feast হয় প্রত্যেক কিচেনে। মুরগী খাওয়ার জন্যে ৪০।৫০টা পর্যন্ত মুরগী আসে। ফালতুরা বঁটি নিয়ে বসে, আর পা-বাঁধা মুরগীগুলোকে ধরে ধরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে মুণ্ডগুলো কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এক সঙ্গে সারা উঠোন জুড়ে মাথাকাটা মুরগীগুলো ঝটপট করে' এক বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে একদিন অনুশীলন দলের এক নিরীহ বারীনবাবু একটা মোরগকে ধরে' তার ডানা দুটো টেনে ছিঁড়ে ছেড়ে দিলেন, আর সেটা পরিত্রাহি চীৎকার এবং ঝটপট করতে লাগলো।

মার্কসের Capital বইখানার একটা পপুলার এডিসন বেরিয়েছিল,—ছোট সাইজের দুটো ভল্যুম—অনেকেই সেটা কিনেছিল, আমিও কিনেছিলুম। ক্যাম্পের পণ্ডিত অফিসারদের বোঝানো হয়েছিল, ওটা ইকনমিক্সের বই। পরে কলকাতার আই বি অফিস থেকে বইটা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হঠাৎ একদিন দেখি, আমাদের ঘরের পাগলা বীরেন ব্যানার্জি সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে একখানা এক্সারসাইজ বুক হাতে করে গম্ভীর ভাবে বেরুচ্ছে। পড়তে যাচ্ছে। কয়েকদিন একভাবে যাতায়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? একটু সবিনয় লজ্জার ঢংয়ে বললে, পিটুবাবু অমল মিত্রের ঘরে ক্যাপিট্যালের ক্লাস করেন আমি জয়েন করেছি।

ক্যাপিট্যালের ক্লাসে জয়েন করলে কমিউনিষ্ট হতে হয়, সুতরাং বীরেন কমিউনিষ্ট হয়েছে। আর কমিউনিষ্ট হওয়ার ফল শ্রমিকপ্রেম, —সুতরাং বীরেন মধু অভাবে গুড়ের মতন ফালতুদের নিয়ে পড়েছে। ঘরের ফালতুরা বাবুদের কাছ থেকে সব জিনিসই পায়, সুতরাং বীরেনের টার্গেট হল বাইরের এক ফালতু,—যে জিনিস পত্রের সাপ্লাই নিয়ে আমাদের ঘরে আসতো।

বেশ লম্বাচওড়া জোয়ান, পাঞ্জাবী হিন্দু গোয়ালা। কলকাতার সওদাগর পটীতে খাটালে চাকরী করতো, কি এক মারামারির মামলায় জেল হয়েছে। লোকটা বে-পরোয়া সাহসী, স্পষ্টবাদী এবং মারকুটে। ক্লায়নিষ্ঠও বটে। ফলে জেলে সে বহুবার মারামারি করে' সবরকম শাস্তি পেয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে এসে পড়েছে।

বীরেন তাকে পিসিমার মতন সুরে বাবা-বাছা বলে ডাকে, তার জন্যে খাবার রেখে দেয় রোজই,—নিষ্ঠার সহিত নতুন কমিউনিষ্ট-ধর্ম পালন করে চলে। একদিন আমাদের ঘরের তরুণ চৌধুরী (রংপুর যুগান্তর দল) তাকে নিয়ে পড়লেন, যখন বীরেন ঘরে নেই। কোন্ বাবু কেমন লোক? আমি অরুণবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে বললে, —"একদম ঠাণ্ডা,—গৌ কা মাফিক!" কাজেই প্রেমানন্দে অরুণবাবু আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—এবং সে বেমালুম বলে দিলে,
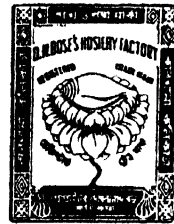
—"ভঁইস কা মাফিক—হরবখত লড়াইকা ওয়াস্তে তৈয়ার হায়। বোধহয় সে আমাকে চেঁচামেচি করে' তর্ক করতেই দেখতো।

তার পর তুজনে যখন বীরেনের কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে বেমালুম বলল,—"দেখ পড়তা তো আচ্ছা-ই, বাকি কেয়া মালুম, দিলমে কেয়া হায়।"—বোঝা গেল, আদিখ্যেতাটা তার মালুম হয়েছে।

৩৪ সাল শেষ হয়ে গেছে। সরস্বতী পূজোর হুড়-হাঙ্গামাও কেটে গেছে দোল এল—আমাদের ওল্ড ক্যাম্পেই কম সে কম তুশো নওজোয়ান তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছে সক্কাল বেলা থেকেই—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় রং গোলা হয়েছে—লাল-নীল আবীর, সোনালী-রূপালী তেল রং বড় বড় আলু কেটে গাধার ছাপ গাদা গাদা সংগ্রহ করা হয়েছে—দল বেঁধে বেঁধে হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি, হল্লা চলেছে—পাগলা গারদ নাম সার্থক হয়েছে।

বাবুরা রোজ ঘটা করে স্নান করেন, তুবেলা সাবান মাখেন। শীতকালে বিকেলে সাবান মাখাটা কমেছে। আমার কিন্তু স্নান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কমনক্রমে লেখাপড়া করতে করতেই বেলা হয়ে যায়,—খাবার ঘণ্টা পড়ে,—স্নান না করেই গিয়ে খেতে বসি, বদনাম রটে গেছে, স্নান করি না।

সুতরাং একদল পাগল আমাকে চেপে ধরে হোলী সুরু করে দিলে। মুখে ও মাথায় একদিকে সোনালী, আর একদিকে রূপালী তেল রং বড় বড়ে করে মাখিয়ে দিয়ে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে ফেলে দিলে এক রংয়ের চৌবাচ্চার মধ্যে।

ছাড়া পেয়ে চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়িয়ে বীরদর্পে ঘোষণা করলুম, মনে করেছ, এইবার আর স্নান না করে উপায় নেই?—স্নান, নেহি করেগা।

ঘরে এসে একখানা কাপড় আর তেলের বোতল নিয়ে বসলুম। মাথায় এক খাবলা তেল দিয়ে ডলে' ডলে' মাখি, তার পর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলি। বারকয়েক এই প্রসেস চালিয়ে সব তেল রং তুলে ফেললুম। তারপর বারকয়েক মাথায় মুখে ভাল করে সাবান মেখে ধুয়ে ফেললুম। পরিষ্কার হয়ে গেল। কাপড়-জামা জুতো ছেড়ে ফেলে ভিজে গামছা দিয়ে ভাল করে সর্বাঙ্গ মুছে ফেললুম। ঘরের ভেতরেই সব কাজ সারা হল,—স্নান না করে' ওদের হারিয়ে দিলুম—ওরা হার স্বীকার করলে।

এর পর হঠাৎ একদিন তুপুরে ফরিদপুরের ডেটিনিউ সুরাজ বাবু এসে মৃত্ হাস্য সহকারে খবর দিলেন,—ফরিদপুরের আই বি ইনস্পেক্টর প্রবোধ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ইণ্টারভিউ হয়েছে, এবং মজুমদার জিজ্ঞাসা করেছে, মার্কসিজমের ক্লাস কেমন চলছে? বললেন, ওরা সব খবরই রাখে।

বিকালে নিউক্যাম্পে যেতে সুধীর সেন বললেন, আপনি দেউলী যাচ্ছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কাছেই খবরটা আগে এল? তিনি বললেন, তাম্‌সা নয় ফরিদপুরের আই বি ইণ্টারভিউ করতে আসছিল মার্কসিজমের ক্লাস সম্বন্ধে কইয়া গেছে। আমি বললুম, তাহলে দেউলী নয়,—সম্ভবত ফরিদপুরেই যাচ্ছি। মার্কসিজমের ক্লাসের খবর ফরিদপুরের আগে নিশ্চয়ই কলকাতায় গেছে, এবং ওরা সম্ভবত তাদেরই কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছে। না হলে ওরা interested হ'ত না।

আমার আন্দাজই ঠিক হল। কয়েক দিন পরেই অর্ডার এল, আমায় ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি থানায় অন্তরীণে যেতে হবে। সে এক ম্যালেরিয়ার ডিপো—আমাকে শাস্তি দেওয়া!

লেনিনিজমের অনুবাদ এবং নোটের খাতাগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে, আমি বললুম, আমি ওগুলো গেটে বিসর্জন দেওয়ার দায়িত্ব নোব না—ওগুলো এখানেই থাক্ যারা পড়বে, তারাতো এখানেই এসে জমেছে এবং আরো আসবে। এত পাঠক বাইরে কোথায় পাব? বইটাতো ছাপা হবে না! এত বড় বই, কে ছাপবে? কে এত টাকার ঝুঁকি নেবে?

সুধীর সেন বললে, যাওয়ার সময় একটা বাণী লিখে দিয়ে যান। বললুম, মন্দ নয়। তার খাতা নিয়ে লিখে দিলুম, "ভারতের কোটি কোটি গোলামের মুক্তি চাই বলেই আমি বিপ্লবী এবং কমিউনিষ্ট—কমিউনিজমই একমাত্র পন্থা। অন্য পন্থা নেই।" নাম সই করলুম নখিঝেড়ফ (knock his head off)

[ক্রমশঃ।

তুমি আমার

মানস রায়-চৌধুরী

তুমি আমার স্বপ্নে পাওয়া ছবির ফিকে রঙ
ভোর-বেলায় একটু করে ওপারে লাগে রোদ
পুরোন টিলা কুয়াশা ভেঙে বাড়ায় শাদা মুখ
পুরোহিতের গলার মত শান্ত আলোড়ন।

মন্দিরের চুড়োয় শ্বেত পতাকা জুড়ে নীল
ভালবাসায় এসো সবাই এমনি কাছে ডাকা,
সাঙ্কেতিক আকাশ যেন, তাকালে লঘু মেঘ
মনে পড়িয়ে দেয় তোমার মুখের কালো তিল।

এরি মধ্যে কেমন করে জাগিয়ে তোলো শোক?
একটা ক্ষত ছিল অতল বহুকালের নিচে
তার ওপরে পাতা ঝড়েছে সময়ে ওড়া হাওয়া
মিলিয়ে দেয় চিহ্নগুলি যত গভীর হোক!

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৪

সুলোচনা চোখ মেলে তাকাল। সৈরভীর চোখ দুটো আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে বলে, চেয়েছে চেয়েছে—

সুলোচনার সমস্ত দেহটা থর-থর করে কাঁপছে তখন। শাস্ত্রী ঠাকুর বলেন, একটা কম্বল এনে চাপা দাও ওর গায়ে।

সৈরভী তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে একটা কম্বল এনে সুলোচনাকে ঢেকে দেয় বেশ করে।

ক্রমশঃ তখন সকালের রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করে উঠেছে। কম্বলটা চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুলোচনা আবার চোখ বুজেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল।

শাস্ত্রী ঠাকুর তখন সৈরভী ও অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভিজে জামা-কাপড়গুলো ওর গা থেকে খুলে শুকনো কিছু ওকে পরিয়ে দেওয়া দরকার। দেহেও কিছু আগুনের তাপ দিতে হবে। তোমরা ওকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যেতে পার?

কথাটা বলে শাস্ত্রী ঠাকুর সকলের মুখের দিকে তাকালেন কিন্তু দেখা গেল সে ব্যাপারে কারোরই যেন কেমন উৎসাহ একমাত্র সৈরভী ব্যতীত দেখা গেল না।

পৌষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে পর্যন্ত যেন কাঁপুনী ধরাচ্ছে।

শাস্ত্রী ঠাকুর প্রথমটায় কি করবেন যেন ভেবে পান না। তার পর বোধ হয় একটু ইতস্তত করেই মনস্থির করে ফেললেন, বললেন, সর দেখি তোমরা—সর—

সকলে একটু সরে গেল, যারা অচৈতন্য সুলোচনার চারপাশে তখন ভিড় করে ছিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে পরম স্নেহে অতঃপর শাস্ত্রী ঠাকুর জ্ঞানশূন্য সুলোচনার শিথিল সিক্ত দেহটা বুকে তুলে নিয়ে নৌকার কামরার ভিতরে প্রবেশ করে, কাষ্ঠ-পাটাতনের 'পরে শুইয়ে দিলেন।

সৈরভী সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। কুলদাচরণের কাণ্ড দেখে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যেন হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। সোমত্ত বৌকে কোথাকার কে এক নিঃসম্পর্ক পুরুষ বুকে করে তুলে নিল, ব্যাপারটা তাদের কাছে সত্যিই কল্পনার অতীত! কারো মুখ দিয়ে কোন সাড়া বের হয় না। কুলদাচরণ কিন্তু যেন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। সৈরভীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ওর ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কিছু পরিয়ে দাওতো সৈরভী!

কথাটা বলে কুলদাচরণ কামরার বাইরে আবার চলে গেলেন। মাঝীরা তখনো নৌকা নোঙর করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারণকে নৌকা ছাড়বার নির্দেশ দিলেন এবারে কুলদাচরণ। তারণ নৌকা ছেড়ে দিল।

ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যেই নৌকা গঙ্গাসাগরে এসে নোঙর করল। সুলোচনা তখন নৌকার মধ্যে প্রবল জ্বরে বেহুঁস। সুলোচনার জ্ঞান ফিরল চার দিনের দিন, সন্ধ্যার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথে।

সৈরভী মাথার কাছে বসেছিল সুলোচনার। এই কয় দিন সে সুলোচনার শিয়রের ধার থেকে কোথায়ও ওঠে নি। এমন কি দূরের পথ পাড়ি দিয়ে যে সাগর-সঙ্গমে স্নান করে অক্ষয় পুণ্য লাভের জন্য সে সঙ্গমে এসেছিল, সে স্নান পর্যন্ত করে নি।

নৌকার কামরার মধ্যে যে আলো জ্বলছিল সেই ম্লান আলোর ও আবছা আঁধারে নৌকার কামরার ভিতরটা যেন থমথম করছিল।

সুলোচনা চোখ মেলে তাকাল। সুলোচনাকে তাকাতে দেখে সৈরভী তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে ডাকে, সুলোচনা!

কে?

আমি সৈরভী।

একটু জল।

সৈরভী তাড়াতাড়ি ছোট একটা ঘটিতে করে জল এনে একটু সুলোচনার মুখে ঢেলে দিল। জলটা গিলে সুলোচনা আবার চোখ বুজলো। তারপর আবার মধ্য রাত্রে সুলোচনা চোখ মেলল। সৈরভী তখন তার শিয়রের পাশে একই ভাবে বসে রয়েছে।

সৈরভী!

কি?

গোপাল! সুলোচনার চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে। সে বলে, গোপাল, আমার গোপালকে বাঁচাতে পারলাম না সৈরভী!

সৈরভী সুলোচনার চোখের কোল দুটো সযত্নে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, ছিঃ কাঁদে না। চুপ কর।

কিন্তু তোমরা কেন আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচাতে গেলে? কেন আমাকে মরতে দিলে না? কেন—কেন?

কত জন্মের পাপের ফলে মেয়ে হয়ে জন্মেছো। আত্মহত্যা করে কেন আবার নতুন করে পাপ বাড়াবে?

কিন্তু সুলোচনা, বেঁচেই বা আমার কি লাভ হবে?

ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে? ভগবান যদি দেন তো আবার গোপাল আসবে তোমার কোলে।

না, না—আর আমি চাই না। আর আমি চাই না। আমি, আমি রাক্ষসী। আমার কাছে যেন আর কেউ না আসে।

গোপালকে আমি খেয়ে ফেলেছি; তাকেও হয়ত খেয়ে ফেলবো। না, না—আর আমার কাউকে চাই না। কাউকে না—

ভায়লা কিছুতেই আর নাওয়ে থাকতে চাইল না। একপ্রকার জিদ করেই রোজারিওকে নিয়ে এসে সাতগাঁয়ে গীর্জার ধারে এমানুয়েল যে ছোট বাড়িটা তৈরী করেছিল সেই বাড়িতেই উঠলো বাচ্চাটা বুকে করে।

দিন দশেকের মধ্যেই কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে রোজারিও। প্রথমে ভেবেছিল রোজারিও কিছু দিন এখন সে সাতগাঁয়েই থাকবে ভায়লাকে নিয়ে। কিন্তু চিরদিন দরিয়ায় যে মানুষটা জলে ঝড়ে রৌদ্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে ডাঙ্গা বন্দরে তার মন টিকবে কেন? একবার যাদের রক্তে দরিয়ার নেশা ধরেছে মাটি তাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তাই বুঝি দশ দিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে রোজারিও।

মন তার উড়ু-উড়ু করে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আবার মনে পড়ে তার সেই ইবলিশের বাচ্চা ডি' সুজার কথাটা। আরো মনে পড়ে ঐ ইবলিশের বাচ্চাটার তার ভায়লার প্রতি দৃষ্টি আছে।

তাছাড়া ভায়লা, ভায়লাকেই বা বিশ্বাস কি? দেহে তার যেন যৌবন আজো অটুট। ঘাঘরা ফুলিয়ে ভারী নিতম্ব দুলিয়ে ভায়লা যখন পাশ দিয়ে চলে যায় মনে হয় যেন ভায়লার সর্বদেহে এখনো যৌবন-মদিরা উপছে পড়ছে।

তার নিজেরই বুকের ভিতরটা তখন কেমন ঝিম্-ঝিম করে তা ডি' সুজার যদি করেই তো দোষ দেবে সে কাঁকে। আর ইদানীং যেন সেই ভয়টাই একটা ভূতের মত কাঁধে চেপে বসেছিল রোজারিওর। তাইতেই আরো সাতগাঁয়ে চলে এসেছিল রোজারিও ভায়লা বলাতেই তাকে নিয়ে এবং আসার সময় নাওয়ের সকল ভার সকল দায়িত্ব ঐ ইবলিশের বাচ্চা ডি' সুজার হাতেই তুলে দিয়ে এসেছিল।

এ যেন কতকটা ঘুষ দেওয়া। নাওয়ের কর্তৃত্বটা ডি' সুজার হাতে তুলে দিয়ে ভায়লাকে যেন তার ক্ষুধিত গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা রোজারিওর। কিন্তু ডাঙ্গার মাটিতে দশটা দিনও গেল না, রোজারিওর কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি তাকে পীড়ন করতে থাকে।

মনটা কেমন বিশ্রী ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। দূর, দূর জলের মানুষ, দরিয়ার মানুষ ও, কোনো ডাঙ্গায় কখনো বাস করতে পারে! এর চাইতে দরিয়া ঢের ভাল। এমন কি ভায়লার আকর্ষণ, নেশাটাও যেন ঝিমিয়ে আসে।

দরিয়ার নেশার কাছে ভায়লার নেশাটা যেন কেমন পানসে মনে হতে থাকে রোজারিওর। তাছাড়া সাতগাঁয়ের বাড়িতে পা দেওয়া অবধি ভায়লার যেন দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠেছে।

কোথাকার কার একটা কালো কুচ্ছিৎ ছেলে ভায়লা সর্বদা তাকে নিয়েই ব্যস্ত।

লাস্যময়ী রঙিলা ভায়লা যেন ঐ ছেলেটাকে পেয়ে রাতারাতি ভারিক্কী এক মায়ে পরিণত হয়েছে। চোখের সেই বিলোল কটাক্ষ নেই, ঠোঁটের কোণে সেই মদির হাসি নেই, চলনে নেই সেই নৃত্য লাস্য, হঠাৎ যেন বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে ভায়লার।

যে যৌবন-মদিরা তার সর্বদেহ দিয়ে উপছে পড়ে প্রৌঢ় রোজারিওর চোখে সেদিনও নেশা ধরিয়েছে, সে যেন অকস্মাৎ ঝরে শুকিয়ে গিয়েছে।

কেবল ভায়লার ছেলে আর ছেলে। ছেলের নামও রেখেছে ভায়লা এক বিচিত্র অদ্ভুত নাম। পর্তুগীজ পরিচিত নাম নয়। হেঁদুর নাম। সুন্দরম্।

সুন্দরম্ আবার নাম হয় নাকি। আপত্তি জানিয়েছিল রোজারিও, ও আবার কেমন নাম!

কেন খুব ভাল নাম তো।

যাক্ গে মরুকগে। যা খুশি নাম রাখুক ভায়লা তার ছেলের। রোজারিওর কোন মাথা-ব্যথা নেই কিন্তু রোজারিও নাও ছোড় এই ডাঙ্গায় আর যেন থাকতে পারছে না। কথাটা সেদিন রোজারিও রাত্রে ভায়লাকে বলেই ফেলল।

তুই তাহলে থাক ভায়লা তোর ছেলেকে নিয়ে এখানে—

ভায়লা ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘরের মধ্যে ঘুম পাড়াচ্ছিল। রোজারিওর কথাটা কানে যেতেই সে ঘুরে দাঁড়াল, আর তুই—

আমি!

হ্যাঁ—

আমি ভাবছি নাওয়ে ফিরে যাবো।

কেন?

কেন আবার কি। মরদ বাচ্চা হাত-পা গুটিয়ে আর কতদিন বসে থাকবো?

তার মানে আবার তুই লুঠতরাজ শুরু করবি।

তা করতে হবে বৈ কি।

কিন্তু কেন?

বাঃ টাকার দরকার নেই বুঝি?

টাকা তো অনেক আছে—

ও টাকা ফুরাতেই বা কত দিন।

আগে ফুরাক—

ফুরাবে। ওতো দু'দিনেই ফুরিয়ে যাবে।

সে ভাবনা তোকে না ভাবলেও চলবে।

না, না—আমি এমন করে বসে থাকতে পারবো না।

না, তোর আর নাওয়ে ফিরে যাওয়া হবে না।

তবে কি তোর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকব? বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই কথাগুলো বলে রোজারিও।

ভায়লাও একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হলো না, দরজায় ধাক্কা পড়লো।

কে

ক ান্। বাইরে থেকে জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডি'ক্রুজের গলা বলে মনে হচ্ছে—রোজারিও বলে।

তাই তো মনে হচ্ছে। ভায়লা জবাব দেয়।

রোজারিও উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ডি'ক্রুজ টলতে টলতে এসে ঘরে ঢুকে থপ্ করে ওদের সামনে বসে পড়ল। ঘরের আলোয় ডি'ক্রুজের দিকে তাকিয়ে রোজারিও ও ভায়লা দুজনাই যেন চমকে ওঠে। ওর সমস্ত পোষাক রক্তে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।

এ কি ডি'ক্রুজ, কি হয়েছে? উদ্বেগাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে রোজারিও

ডি' সুজা। কোনমতে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে ডি'ক্রুজ।

কি! কি হয়েছে।

ডি'ক্রুজ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে।

একটু জল।

একটা তামার পাত্রে জল এনে রোজারিও ডি'ক্রুজের মাথাটা হাঁটুর প'রে তুলে নিয়ে কোনমতে ওর গলায় খানিকটা জল ঢেলে দিল। কিন্তু গিলতে পারল না জল ডি'ক্রুজ। তার কষ বেয়ে জলটা গড়িয়ে পড়ল।

ডি'ক্রুজ, ডি'ক্রুজ—

আমাকে—ছোরা মেরেছে ডি'সুজা—কোন মতে কথাটা বলে ডি'ক্রুজ, তারপরই তার মাথাটা টলে পড়ে রোজারিওর হাঁটুর উপরে।

ডি'ক্রুজ! ডি'ক্রুজ—

কিন্তু ডি'ক্রুজের আর সাড়া পাওয়া গেল না। তার কষ বেয়ে খানিকটা রক্ত-মিশ্রিত গাঁজলা বের হয়ে এলো। পাথরের মতই কিছুক্ষণ বসে রইলো রোজারিও ডি'ক্রুজের মৃতদেহটা কোলে করে, তার পর একসময় ধীরে ধীরে ডি'ক্রুজের মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রোজারিও উঠে দাঁড়াল।

সমস্ত মুখটা তখন তার পাথরের মত শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে ভায়লা। রোজারিওর ঐ মুখের সঙ্গে যে বিশেষ ভাবে পরিচিত ভায়লা। মানুষ রোজারিওর ও মুখ নয়, দানব রোজারিওর ঐ মুখ।

দেওয়ালে ঝোলান ছিল গুলীভরা গাদা পিস্তল সমেত ভারী চামড়ার মোটা কোমরবন্ধটা রোজারিওর। এগিয়ে গিয়ে রোজারিও সেই কোমরবন্ধটা নামিয়ে তখন কোমরে আঁটতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি ভায়লা এগিয়ে আসে রোজারিওর দিকে।

কোথায় যাচ্ছিস এই রাত্রে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় রোজারিও ভায়লার মুখের দিকে।

ভায়লা বলে, না, তোকে আমি যেতে দোবো না।

ভায়লা!

চাপা গর্জন করে ওঠে রোজারিও।

না, কিছুতেই না, তোকে আমি যেতে দেবো না।

বাঘের মতই যেন থাবা দিয়ে ভায়লার কাঁধটা ধরলো রোজারিও মুহূর্তের জন্য, তারপরই একটা হ্যাঁচকা টানে রোজারিও ভায়লাকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

সেই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে নিজেকে সামলাতে পারে না ভায়লা। তাছাড়া সুন্দরম্ বুকের মধ্যে ধরা ছিল তার। পড়তে পড়তে নিজেকে সাম্‌লে নেয়।

কিন্তু ততক্ষণে রোজারিও ঘরের বাইরে অন্ধকারে পা দিয়েছে।

তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ভায়লা, রোজারিও—

রোজারিও এক লাফে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছিল। মেঘে ঢাকা আকাশটা আচম্‌কা একটা বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক হানে।

ভায়লা আবার চিৎকার করে ওঠে, রোজারিও ফিরে আয়, ফিরে আয়।

সুন্দরম্ বুকের মধ্যে কেঁদে ওঠে ভায়লার। [ক্রমশঃ।

শেষ দিনে যেন আসে

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার এ-ঘরে পিদিম জ্বলে না কেন
কেন বইগুলো ধুলোয় গিয়েছে ভরে?
ক্যালেণ্ডারের প্রথম পাতাটি আজো
চৈত্রী-হাওয়ায় বার বার কেন ওড়ে?
ঊর্ণনাভেরা কড়িকাঠটিতে বসে
জাল বুনে চলে প্রতিদিন একটানা।
ভাবে মনে মনে বুঝি এই ঘরটিতে
ভাঙবে না কেউ নিভৃতের আস্তানা।
হাতে সিগারেট এক ফালি সরু ধোঁয়া
ছুটে পথ খোঁজে খোলা জানালার দিকে।
অনেক নিরুত্ত প্রশ্নের উত্তরে
জবাব পাই না নিজেকেই চিঠি লিখে।

তবু পুলকের অপূর্ব শিহরণে
শীর্ণ এ' ঠোঁটে হাসি জাগে এক ফালি।
মনের কুঞ্জে মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে
গুন্ গুন্ করে সুর ধরে চৈতালী।
পার্বতী ফিরে আসবেই এটা ঠিক
কান্নায় তার স্নাত হবে দেবদাস।
ধুলোভরা এই ছোট ঘরটির বুকে
ধরা পড়ে থাক পুরাতন অবকাশ।
এর বেশি কিছু জানতে চেও না কেউ
বুক ভরা থাক কান্নার ইতিহাসে।
না জ্বলুক দীপ মুঠো মুঠো ধুলো থাক
শুধু পার্বতী শেষ দিনে যেন আসে।

মানভূমের লোকসংগীত

ঝুমুর লোকসংগীত। এর পরিধি মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, বীরভূম ও রাঁচীর কিছুটা অংশে। এই পরিধি-চক্রের সন্নিকট ভূমি যেমন বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমাঞ্চল ঝুমুরের রেশটি টেনে এনেছে। প্রচলনের ব্যাপকত্ব, সাধারণ জনের বোধগম্য ও লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হয়, ঝুমুরের উৎসভূমি নিছক মানভূম—মানভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমাঞ্চল। ঝুমুরগুলির ভাষা মানভূমেরই ভাষা।

বাংলার সীমানা ইতিহাসে দেখি, এর প্রসারণ ও সংকোচনের অনেকগুলি অধ্যায় আছে। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'(১) দেশ পরিচয় অধ্যায়ে বৃহৎ বাঙলার পশ্চিম সীমা আলোচনায় বলা হয়েছে, 'বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমায় মানভূম জেলা, বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত, অথচ এই মানভূম—প্রাচীন মল্লভূমি মানভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমা নাই—সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই দিকের প্রাচীন বাঙলার সীমা।' কিন্তু স্মরণীয় যে, বাঁকুড়া তখনও বনভূমি। বিগত সাঁওতাল বিদ্রোহের পর মানভূমের প্রত্যন্ত প্রদেশের ঘন বনগুলির ডালপালা কাটা হয়েছে ও সূর্যালোক মৃত্তিকা চুম্বন করেছে। ঘন বনানীর নিভৃত মননে ঝুমুরগানগুলি অধুনা পুরুলিয়া জিলারই মর্মে মর্মে গ্রথিত।

পশ্চিম-বাঙলার এক প্রান্তে আজও দাঁড়িয়ে আছে আপন মহিমায় মানভূম। রাজনৈতিক সীমারেখার দ্বারা তাকে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করলেও মানভূম তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের মাধ্যমে আজও চিরপরিচিত। লোকসংগীত এই জেলার বৈশিষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সংগীত বিভিন্ন পাল-পার্বণে ঋতুর পর্যায়ক্রমে গাওয়া হয়। সাধারণ পরিবারের দুঃখদীর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি আর বিরহ-মিলনের ক্ষীণতম প্রয়াস আপন অন্তরের মাঝ দিয়ে ঝুমুরিয়াগণ প্রকাশ করেন। এই ঝুমুর মানভূমের অন্যতম প্রধান লোকসংগীত।

বর্ত্তমানে অনেকে একথা স্বীকার করতে চান না যে, একদা মানভূমেরই উষরভূমির উপর 'এই ঝুমুর লোকসংগীতরূপে চারদিকে ছড়িয়েছিল। কালক্রমে নানান খাতের মাঝ দিয়ে ঝুমুর সংগীতে বা সংগীতেরই একটা অঙ্গরূপে মর্যাদার আসন দাবী করল। যদি এটা নিছক 'সংগীতদামোদর' বর্ণিত 'ঝঙ্খড়া' রাগই হয় তবে রসশাস্ত্রোক্ত ও সংগীতশাস্ত্রোক্ত ক্রম অনুসারে অন্যান্য সংগীতেরই ন্যায় বাঙলার চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু আজ কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট ভাষা বিশিষ্ট সুরে একটা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের মাঝে বিভিন্ন ভাবধারায় ঝুমুররূপে দাঁড়িয়ে আছে। এর পরিধিচক্র অতি ক্ষুদ্র। এর স্বরূপ ও সুর এখনও বহুজন-অজ্ঞাত।

সংগীতের সুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্থান ও কাল নির্বাচিত। যা কেবলমাত্র ওস্তাদ মহলেই গীত হয়, তা রাগপ্রধান খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি। মনোজ্ঞ শ্রোতাই সেখানে প্রয়োজন। আধুনিক সংগীতের চলন খোলাখুলি ঠুনকো সভায় আর জলসায় প্রীতিবাসরে—কিন্তু ঝুমুরকে সংগীতের মুখোস পরিয়ে ঐ সমস্ত স্থানে ছেড়ে দিলে কি যে প্রতিক্রিয়া হবে জানি না, কিন্তু বনবিচিত্রা এই মানভূমের গ্রাম-প্রান্তে, মাঠে, গোঠে নিঃসঙ্গ বাগাল বা নাচনিশালের রসিক-নাগরের মুখে এই সংগীত এমন একটা ভাব প্রকাশ করে যা সুরধ্বনির পরিবর্তে ভাববিহ্বলতায় অপূর্ব-সৌন্দর্য সম্ভোগ করে। এ ঝুমুর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে প্রাণকে আকুল করে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমি কতকগুলি শ্রেণীর দ্বারা এদের মধ্যে লোকসংগীত হিসাবে ঝুমুরের স্থান দেখাব। যে সমস্ত ঝুমুর আজও একই ভাবে চলে আসছে আধুনিকতাকে উপেক্ষা করে, তাদের মধ্যে দাঁড়কালিয়া, নাচনিশালিয়া, ভাদরিয়া আর টিপসি গিদাং অন্যতম। অন্যদিকে করম, টুসু, ভাদু, কাড়াখুঁটা, গরুখুঁটা আর ছাতা। তৃতীয় পর্যায়ে আছে সতীপরব, খাদি পিটা এবং ভেজা বিন্দা। বর্ত্তমানে বহুল প্রচলিত লোকসংগীতে ঝুমুরের বিশেষ শাখায় রাজনৈতিক গণচেতনাও আবিষ্কার করছে। এটা হ'ল কেবল বৎসর পরম্পরাগত স্থূল দৃষ্টির একটা টুকরো কাঠামো। বস্তুর দিক দিয়ে ঝুমুরগুলির আর এক রূপ আছে। সে রূপে একদিকে তত্ত্বগত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা—শিব-উমার গান (যা গাজনে, ধর্মপূজায় প্রচলিত) আর খনার বচনের মত শাকসব্জী বিষয়ক, ফসল ফলান বিষয়ক, এর আরও দুটি মৌলিক প্রভেদ আছে—কতকগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আর কতকগুলি নিছক কাঁচা রসের। যার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের যৌনলিপ্সার প্রাধান্যই বেশী। যুবতী-জনচিত্তের সরলতম প্রকাশও এই ঝুমুরের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। লোকসংগীতের সহজ সংজ্ঞা যদি Folk songs are best defined as songs which are current in the repartory of a folk group. Whatever the sources, however it is oral circulation, that is the the best general

---

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়। (বইটি মুদ্রণকালে মানভূম বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল)

criterion of what is a folk song" (২) তা হলে ঝুমুর-গানগুলিকে অনায়াসেই লোকসংগীত বলা চলে।

জীবনের গভীর থেকে গানের কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তাই এতে কবিত্ব করার বা অলঙ্কার সম্ভারের ক্ষীণতম প্রয়াসও অনুপস্থিত। সহজ প্রসাদ গুণে জীবনের সুখ-দুঃখময় যাত্রাপথটির চিহ্ন এঁকে এই গান ঋতুপর্যায়ক্রমে উৎসব ভূমিতে, নির্জনে দিনে রাতে গীত হয়। এই সমস্ত গান কবে রচিত হয়েছে বলা যায় না। ভণিতা থাকায় আর ভাষার দৌলতে কোন কোন ক্ষেত্রে এই অখ্যাত পল্লীতে যে সমস্ত বৃদ্ধ দু-একজন জীবিত আছে, তাদের কাছ থেকে কিছুটা হদিস মেলে। সমস্ত মানভূমের জীবনচক্রে এর মূল জড়িয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনের শৈলপথে বার বার প্রতিহত ভবুও সংগ্রামশীল এই ঝুমুরের কথা-কলি। একটা ছন্দ চাই—একটা সুর চাই। মানুষের কাছে এর একান্ত প্রয়োজন। যার সারা জীবন স্পন্দিত সাংসারিক কর্মব্যস্ততায়, যার দ্বারা সে সর্বদা পরিব্যাপ্ত সেটাকেই সে ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন ছন্দে লয়ে নিত্য সৌকুমার্যের মাধ্যমে ভাবের রশ্মিপাত করে দেখতে চায়। তাই ঝুমুরের মধ্যে জীবনের ঐকতান ঝঙ্কৃত। আমাদের এই অখ্যাত গ্রামের অ-নামা কবির দল গ্রাম ছেড়ে কখনও কোন সূত্রে বাহিরে আসেনি।

লোক-গীতি বলেই ঝুমুরের পরিবর্তন এমনভাবে সাধিত হয়েছে যে, বর্তমানে এর মধ্যে মার্জিত রুচিবোধ নিছক কোলকাতার ভাষাকে আশ্রয় করেছে। যেমন—

কেন রে তুই এলি একা যমুনা পুলিনে।
যমুনার জলে শ্যাম বিরহে মরিলে॥

মানভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ঝুমুরের যে রূপ পাওয়া যায় তা লোকসংগীতের রূপ। উপরে যে ভাগ দেখান হল এই সমস্ত ঝুমুরের রচয়িতাগণ সম্পূর্ণ ভাবে এই অঞ্চলেই বাস করেছিলেন। কোনরূপ যোগসূত্র পুরুলিয়া শহরের সঙ্গে তৎকালে ছিল না। তারা আপন অঞ্চলেই আপনাদের জীবন 'আড়ানা কাবিয়াতে (৩) কিম্বা গরুবাগালি করে কাটিয়েছিল। এদের মধ্যে বিশিষ্ট ঝুমুর রচয়িতা দীনা তাঁতী, দুর্যোধন, নরোত্তম, রামকৃষ্ণ, ভবপ্রীতা অন্যতম। ছোট বড় অনেক ভাবুক কবি ভাববিহ্বলতায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্ব রস ঝুমুরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, তারা কোনক্রমেই কোনও দিন 'উজ্জ্বলনীলমণি' বা 'সংগীতদামোদর'। কিম্বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করেননি। তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর অর্দ্ধশিক্ষিত কিম্বা কেবল অক্ষরজ্ঞান মাত্র তাঁদের ছিল। কোন বৈষ্ণব মহাজনদের প্রভাব এদের মধ্যে ছিল না কারণ একদিকে দুরূহ বাধা বনবিচিত্রা অখ্যাত পল্লী অন্যদিকে পাহাড় নদ-নদী-নালার বন্ধুর প্রভাব, রেলপথ নাই, পায়ে চলার পথও ছিল না সব স্থানে। আদিম অরণ্য-পুরুষ বলেই সভ্যতার আলো ছিল এদের নিষ্প্রভ। অনন্ত সিং, মদনমোহন, গৌরাঙ্গ বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত সুইসা, হেঁসোহাতু আর তোড়াং-এর অধিবাসী ছিলেন। দীনা তাঁতীর নিবাস ছিল ইচাগড় থানার সিরুং গ্রামে। এঁরা সবাই ছিলেন ভাবুক কবি।

বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় এদিক ওদিক প্রচুর ছড়িয়ে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ঝুমুর। যদি সংগ্রহ করা হয়, যদি পর্যায়ক্রমে সাজান হয় তবে ঝুমুরের মধ্যেও মান, অভিসার, মাথুর, প্রার্থনা, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি পাওয়া যাবে। দীনা তাঁতীর 'বাঁশী' পালায়—

১। প্রধান গোপীর নাম
বাঁশী বাজাইল শ্যাম
বাঁশী শুনিল যে যার ঘরে।
পশিল গোপীর প্রাণে
অবশ মদন বাণে
আর দিল ধরিলে না ধরে
বাঁশী শুনিল যে যার ঘরে।

আর—

২। মধুর মুরলী তানে মন নাহি মানা মানে
আনমনে তারি ধ্যানে দিন যায়
সজনী লো দিন যায়।
এ বাঁশরী কাকে যারে ঘরে সেকি রইতে পারে
কুলনাশা বাঁশী সবার কুল মজায়।

এই দুটো ঝুমুর বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম' আর 'কেনা বাঁশী বায়ে বড়াই' পদ দুটির সঙ্গে অপূর্ব ভাব-সাদৃশ্য ঘটিয়েছে। বৈষ্ণব মহাজনদের মতো তাহারাও নিজেদের সখারূপে, দাসীরূপে, রাধারূপে কল্পনা করেছে। মোহ, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা,

২। বাংলার লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য উদ্ধৃতি হইতে গৃহীত।

৩। আড়ানা কাবিয়া —দিনমজুরী

উন্মাদ, মৃত্যু প্রভৃতি দশ দশার কথাও পাওয়া যায় এই ঝুমুরের মধ্যে। এটা যে জন্মগত প্রতিভার বলেই বৈষ্ণবীয় প্রভাবে মন উন্মাদ হয়েছিল একথা অস্বাভাবিক নয়। ভাবুক কবির অন্তর হতে এমনি করেই ঝুমুর প্রকাশ হয়েছে। যার ভাব ভাষা এমন সহজ ও সরল যে সেখানে কবিত্ব করার ক্ষীণতম প্রয়াসও অনুপস্থিত। লোকমুখে এই সব ঝুমুর বহুদিন ধরে বহুক্রোশ জুড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ভবপ্রীতার 'স্বপ্নেদর্শন' ঝুমুরটি অপূর্ব—

আজি স্বপ্নে হেরি হরি আমি দ্বিগুণ বিরহে মরি
সে ঘটনা কহিব কেমনে।
মরি মরি চমকি ভাঙ্গিল ঘুম মধুর বচনে। ইত্যাদি।

নরোত্তমার আক্ষেপানুরাগ—

শ্যাম বিরহানলে পুড়িছে যখন
নিভে না বড় দিইছে যাতন
জ্বলে উঠে সারাখণ।

ভাববৈচিত্রে এ ঝুমুর একটা বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজন অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আবার—'ছুঁইও না ছুইও না বঁধূ ঐখানে থাক' পদটির সঙ্গে ঝুমুরের—

ছাড় ছাড় হরি জোড় হাথ করি
পথ মাঝে ই কি কর রঙ্গ
ছুঁইও না শ্যাম
ছুঁইলে কাল হবে অঙ্গ।

ইত্যাদি অপূর্ব সাদৃশ্য দেখিয়েছে। অন্যদিকে নিরক্ষর দুর্যোধনের ঝুমুর গোবিন্দদাসের পদের মতই ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—"ভজন পূজন আত্মনিবেদন" ভাবে। তার রচনায় পাই—

প্যারীর বান্দা মোরা কি চ্যায়ে দেখিস তোরা
দশম দশাতে তাই ঠেকিল গো॥

* * * *

নামের আস্বাদে যদি বাঁচিবেক গো।
বিধি সাধিল গো।

ইচাগড় থানার উদয় কবি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তাঁর ঝুমুরে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের একটা পূর্ণরূপ আছে, যা সামাজিক আচার দ্বারা প্রকাশিত, যা জ্ঞানী লোক মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটিকে উপলব্ধি করতে পারবেন—যেমন :—

ঘোলে জল ঢালে দিলে ননী উঠাইয়ে লিলে
কাজে তুমি দাগাবাজ, নামে রসরাজ।
মুখখানি রস করা সে ত ফান্দেরি চারা
হৃদয়টি বিষের জাহাজ, নামে রসরাজ।

উত্তরপাড়া সঙ্গীত-চক্রের ৫ম বার্ষিক সঙ্গীত-সম্মেলনে ভাষণ দান করিতেছেন—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাম হইতে দক্ষিণ :—বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী (প্রধান অতিথি); হুগলী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমেনন (সভাপতি); শ্রীরামপুরের এস্, ডি, ও, প্রভৃতি। পিছনে দণ্ডায়মান :—সঙ্গীত-চক্রের সম্পাদক শ্রীবদ্রীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাজা দিয়ে মজা দেখ শিশু সনালি পক
উদয় কয় এই তুমার কাজ ॥

এ সমস্ত ঝুমুর ছাড়াও আরও অনেক ঝুমুর আছে যা লোকসংগীত ভিন্ন অন্য কোনও পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। 'অহিরা' ও 'টিপসি গিদাং' এর মধ্যে অন্যতম। কার্তিক মাসে কাড়াঘুটা, গরুখুটা হয়, সেই সময়ে মানভূমে কাড়া ও গরুর শিঙে তেল দেওয়া হয়। আর নিত্যকার রাত্রিযাপন হয় এই সমস্ত গৃহপালিত পশুকে জাগিয়ে রেখে। বিরাট বাজনা আর বিচিত্র চিৎকারে তখনকার রাত্রিগুলি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানব-পশুকেও জাগিয়ে তোলে। এমনি ভাবে তারা দিনে বাড়ী বাড়ী ঘোরে ভিক্ষা করতে—মুখে লেগে থাকে কবিগানের মতো অহিরা গীতি।

যেমন :—

অহিরে এখনে ত নে ত ভালা সের ভরি ধান
চলি যাব ত্বসর ত্বয়ার ॥
ধান ত দেলে ভালা স্থপ ভরি ভরি ?
তেল বিনা মন নাহি পায়।
অহিরে·········॥ ইত্যাদি ॥

নাচনি শালিয়ার ঠুমনি নাচের ঝুমুরের মধ্যে দেখতে পাই জগতে যা কিছু তুচ্ছ জিনিষ আছে সবারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিরাট চঞ্চলতা। ঠিক আত্মকাহিনীর মতো—যেমন :—

ঝিঙ্গা ফুল বলেরে ভাই ঝাঁটি ধারে বাসা
মাইয়্যা ছ্যাল্যা তুলতে গেলে লাগে বড় আশা
ভাই হে বিদেশী বন্ধু।
ঝিঙ্গা ফুল ছুঁইও না ছুঁইও না ভাই হে বিদেশী বন্ধু।
সজনা ফুল বলে রে ভাই সকল ফুলের হেলা
আমাকে ডাকেরে ভাই টানাটানির বেলা—
হে বিদেশী বন্ধু···॥

কবির অন্তরকে দুঃখ-দীর্ণ জীবনের সংসার-চক্র এমনি করিয়া পারিবারিক বিষয়কে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এতে সংগীত-ধর্মটাই বড় নয়, এটা সাধারণ দুঃখ জীবনের গভীর থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে পড়েছে। কবিত্ব করার শক্তি সেখানে নেই। নাম না জানা অজ্ঞাত কবির রচনা আজও মানভূমের গ্রামে-গ্রামান্তে ধ্বনিত হচ্ছে।

মানভূমের পাল-পার্বণ সমন্বিত ভাদু, টুসু, করম ইত্যাদি পরবগুলি পৌষের খর শীতে, বরষার খর ধারায় লোকসংগীতের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। সমাজচিত্রের একটি জীবন্ত আলেখ্য মুখে মুখে এমনভাবে প্রচারিত হয় যার মধ্যে কত না-জানা কবির অবদান রয়েছে। আজও উৎসবভূমি রঞ্জিত হয়ে উঠে এই গ্রাম লোকগীতির ঝর্ণাধারায়। এর বহুল প্রচলন ও হৃদয়গ্রাহিতার গুণে আজ রাজনীতির বাহন হয়ে উঠেছে ভাদু, টুসু, করম পরবের ঝুমুর লোকগীতি। তাই আজ আর 'টুসু মণি কলাই চুনি দাড়কা মাছের ডাহনা'কে পাওয়া যায় না—পরিবর্তে আজ—

১। বিহার আইনে
টুসু তোর পুজা নাই কোনখানে। শুনতে পাই।
কিম্বা ২। মাতৃভাষা প্রাণের ভাষারে
ও তুই মারবি তোরা কে তারে।
৩। মন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে লারবি তাজ দেখাই। শুনতে পাই।

জগতে তুচ্ছতম বস্তুগুলির মধ্যে যুবতী-অলঙ্কার অন্যতম। ঝুমুরের মাধ্যমে মানভূমেরই অশি... পল্লীবালা তাই বুড়া বরকে বরণ করতে অস্বীকার করে। আবার ভা... বিজ্ঞানের পথে একই সঙ্গে গ্রাম্য নারীর হৃদয় টুকরা হয়ে যায়। তাই জগতের কাব্য-জিজ্ঞাসায় এরই অভিব্যক্তি আজও দেখা যায়। পুরুল্যা থেকে মলমলের চাদর কিনে আনলে সে চাদর হাওয়ায় উড়লে অভিমানিনী নায়িকা তা ধরবে না। ভালবাসার সঙ্গে তখন ডিহে দেখা হলে সে আর কথা বলবে না—আজ যদি ডিগ্‌দা গিদাং শব্দে রেলগাড়ী চলে তবুও না। কথা বলবে না বলে কিই বা তার আয়োজন। এই গুলির চারুত্ব নষ্ট হয় যদি টুকরো টুকরো প্রকাশ করা যায়—তাই এদের তিন চারটে একসঙ্গে দিয়ে লোকগীতির ধারাকে দেখালুম—যেমন—

১। বুড়া বরে কোন শাঁখাব
বরং বেগুণ গাছে টাঙ্গাব।
২। একটা নাকে দুটা নাকছাবি
তুই ঘর করবি না বাহরাই যাবি।
৩। পুরুল্যার মলমল চাদর গায়ে লাগালে
ধরব না—
ডিগদা গিদাং রেলগাড়ী চলে।
হায় ভালবাসা—
যেমন ডমন ডিহে হয় দেখা
যার ল্যাগে বিচ্ছেদের কথা
জিউটা গেলে কাড়ব না
ডিগদা গিদাং রেলগাড়ী চলে।

মানভূমের লোকসংগীত এমনি ভাবে ঝুমুরের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র-পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করছে। এর মধ্যে ছড়ার ছন্দ বিচিত্র নৃত্যের অপূর্ব মহিমাকে ঝলসে দেয়। সানাহাই বাজনায় ঢোল মাদলে বাতাসে বাতাসে উঠে তরঙ্গ, কালক্রমে এই তরঙ্গলহরীর আভাসে সংগীতের মুখোশ ভারে কোন কোন লোকের অন্তরে ঝুমুর সংগীত হয়েই পড়ে রইল। এর মধ্যে যে একটা বিরাট লোকগীতি হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল সেকথা আর মনেও আসে না তখন। সংগীতশাস্ত্রোক্ত কোন কথাই যে ঝুমুর রচয়িতারা জানতো না তা অবশ্য স্বীকার্য। তারা কেউই ছিল না সংগীতজ্ঞ। পরে হয়ত বা সংগীতজ্ঞদের হাতে এর মধ্যে তালমাত্রা যুক্ত হয়েছে, তাই বলে একে সংগীত বলা যায় না—ঝুমুর মানভূমের নিজস্ব সম্পদ—এই ঝুমুর সংগীত নয়, এ নিঃসন্দেহে লোকসংগীত।

—নন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন ৮২৯০১—মৃণাল চক্রবর্তীর গাওয়া দুখানি আধুনিক গান—"মন কি যে চায়" ও "কথা দাও।"

এন ৮২১০২—"তুমি শুধু একবার" ও "তোমার কাছে এলাম"—বাসবী নন্দীর আধুনিক।

এন ৮২১০৩—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পল্লীগীতি "নালিশ নাই মোর" ও "ও সোনা বন্ধুরে।"

"নতুন ফসল" বাণীচিত্রের তিনখানি রেকর্ড এন ১১০১৭, এন ১১০১৮ ও এন ১১০১৯—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিণ্টু দাশগুপ্ত।

এন ১১০২০, এন ১১০২১, এন ১১০২২ ও এন ১১০২৩ রেকর্ডে "পঙ্কতিলক" ছবির গানগুলি গেয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে, গীতা দত্ত ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল

এইচ ১১২৪—দেবব্রত বিশ্বাস দুখানি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন—"যেতে যেতে একলা পথে" ও "আকাশ ভরা সূর্য তারা।" এইচ ১১২৫—দেবব্রত বিশ্বাস গেয়েছেন আরও দুখানি স্বদেশী গীত—"দেশ ভেঙ্গেছে তাই বলে" ও "তোরা যে জাত বাঙ্গালী।" এইচ ১৮৭০ রেকর্ডে হীরালাল সরখেল গেয়েছেন দুখানি পুরাতনী দেহতত্ত্ব "দিবা অবসান হলো" ও "যতো দিন যায়।" এইচ ১১২২—ভগবৎ ভারতী শান্তিলতা দেবীর—ভক্তিমূলক কথকতা দেবী-মাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী।

কলম্বিয়া

জিই ২৫০২৮—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান—"আমার মিলন তিমির চাঁদিনী" ও "দাঁড় ছুপ ছুপ।"

জিই ২৫০২৯—নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের গাওয়া নজরুল গীতি—"রাঙা মাটির পথে গো" ও তুসু গীতি—"চল তুসু চল খেলতে যাব।"

জিই ২৫০৩০—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত কণ্ঠের গান—"শোন শোন এই রাত" ও "তরী ভেসে যায়।"

জিই ৩০৪৬০—"স্মৃতিটুকু থাক" বাণীচিত্রের গান গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, নির্মলা মিশ্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রভৃতি।

আমার কথা (৭৩)

শ্রীমতী রমা অধিকারী

সংসার যাহার পেশা কিন্তু সঙ্গীত যাহার নেশা—শ্রীমতী অধিকারী তাহাদেরই অন্যতমা। শ্রীমতী অধিকারী বলেন—শিল্পানুরাগের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে অতি শৈশবকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল। আমার পিতা ৺কমলেন্দু লাহিড়ী, ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শান্তিপুর নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ৺নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী মহাশয় আমার পিতামহ ছিলেন। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺নির্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় আমার কাকা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমার পিতার মাতুল ছিলেন। মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ উভয় দিক দিয়াই আমার পিতা যে শিল্পানুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা

শ্রীমতী রমা অধিকারী

উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বর্তাইয়াছিল। আমি পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ৺রামাচরণ বাবু, তারাপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পিগণকে আমার অতি শৈশবকাল হইতেই আমাদের বাড়ীতে গান গাহিতে শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি।

১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে আমার জন্ম হয়। আমার কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথম বলিতে হয় যে নাচ, গান, বাজনা ও লেখাপড়া সব বিষয়েই আমার শৈশব হইতেই প্রচুর অনুরাগ ছিল। নৃত্য, সঙ্গীত চর্চা ও অঙ্কনে আমি শিশুকাল থেকে পারদর্শিনী হয়ে উঠি। 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' স্কুলের নৃত্যশিক্ষক শ্রীভূপেন ঘোষ মহাশয়ের কাছে আমি প্রথম নৃত্য শিক্ষা করি এবং পরে সঙ্গীত-সম্মিলনীতে শ্রীমতী অমলাশঙ্করের নাচের ক্লাশে ভর্ত্তি হই। তারপর পারিবারিক আপত্তিতে বার বৎসর বয়সে আমাকে নৃত্যশিক্ষা ত্যাগ করিতে হয়। ইহার মধ্যে আমি বহুবার ষ্টেজে নৃত্যে সুনাম অর্জন করি। সুবিখ্যাত এস্রাজ-বাদক শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আসেন। তখন আমার দশ-এগার বৎসর বয়স। সেই সময়ে আমি তাঁর কাছে বংশীবাদন শিক্ষা করি এবং Albert হলে All Bengal Music Competitionএ বাঁশী বাজাইয়া প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করি। কিন্তু বাঁশীতে গলা খারাপ হইবে অথবা কোনও অসুখ হইতে পারে, এই দুর্ভাবনায় আমার পিতা বাঁশী বাজান বন্ধ করিয়া দেন।

ইহার পর সতের বৎসর বয়সে আই, এ, পাশ করিবার পর আমার বিবাহ হয়। আমি ছাত্রীজীবনে কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি নাই। এবং ১৯৫০ সালে বি, এ, পরীক্ষায় Distinctionএ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হই। বিবাহের পর স্বামীর কর্ম্মোপলক্ষে আমি কিছু কাল কানপুর ও পাটনায় অতিবাহিত করি এবং আমার স্বামীর সঙ্গীতানুরাগ বশত বহু বিখ্যাত শিল্পীর নিকটে ভজন ও গজল শিক্ষা করি। ভাগ্যচক্রে জীবনে আমাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে—তাই সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং সঙ্গীতকেও অনেকটা অর্থকরী বিদ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এগার বৎসর বয়সে আমি Radioতে গান করি। তাহার পর আমাকে কিছুকাল শান্তিপুরে থাকিতে হয় এবং তখন সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ থাকে।

আমার চাকুরী-জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আবার সঙ্গীতের চর্চ্চা সুরু করি। Bengal Music College হইতে ১৯৫৪ সালে I. M. C. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করি (বাংলা গানে) এবং ১৯৫৭ সালে 'গীতপ্রভা' উপাধি লাভ করি। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অতীনলালের রামলীলা নৃত্যনাট্যে আমি একযোগে গান ও commentary করিয়াছিলাম এবং চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার গান গাহিয়াছিলাম। বিশ্ব-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের 'রামলীলা' ছায়ানাট্যে আমি গান ও commentary দেবার জন্য আহূত হয়েছিলাম কিন্তু চাকুরী করার জন্য আমি পাকাপাকিভাবে যোগদান করতে পারিনি। আমি কিছুদিন শান্তিদেব ঘোষের এক ছাত্রের নিকটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করি। সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শৈলেশ দত্তগুপ্ত তাঁহার জীবনের শেষ কয়েকটি বছর আমাকে গান শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আমি "মৈমনসিংহ-গীতিকা" নামক একটি নির্মীয়মান চলচ্চিত্রে গান গাহিবার জন্য selected হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমার সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমানে আমি একজন বেতারশিল্পী। আমি বেতারে অভিনয় করিয়া থাকি। শৈশব হইতে আবৃত্তি ও অভিনয়ে আমি নৈপুণ্য অর্জন করি। আবৃত্তি ও অভিনয় আমি আমার স্বর্গীয় কাকা ৺নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নিকট শিক্ষালাভ করি। আমাকে চিত্র পরিচালক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিউথিয়েটার্স প্রযোজিত 'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে চান। কিন্তু আমাদের পরিবার অত্যন্ত 'রক্ষণশীল' বলে আমি রাজী হতে পারিনি। আবৃত্তিতে আমি কোথাও কোনও প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি নাই।

আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান অরূপরতন একজন বেতারশিল্পী (১৫ বৎসর) তাহার সেতারে গভীর অনুরাগ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার যে সঙ্গীতানুরাগ প্রতিকূল অবস্থার জন্য সার্থক হইতে পারে নাই—শ্রীমান অরূপের মধ্যে যেন তাহা সার্থক হইতে পারে।

কবিতা

কার্তিক ঘোষ

আজিকে অক্লান্ত মন বিষণ্ণ রাতের শ্বাস লেগে
তবুও আমার ঘরে কবিতার ছন্দ আছে জেগে।
দ্বারেতে ক্ষুধিত বন্ধু অনাহারে চিৎকার করে
শুধুই কবিতা আছে আর কিছু নেই মোর ঘরে।
প্রসন্ন দিনের শেষে বিষণ্ণ রাতের পালা শুরু
চপলা মেঘের মতো হৃদয় করিছে দুরু-দুরু!
অনেক আশার পাখী উড়ে গেছে রাত অবসানে
তবুও জেগেছি আমি অনাহূত পাখীদের গানে।
রয়েছে কবিতা শুধু—তা' নিয়ে আমার মন ভরে
ক্ষুধিত বন্ধুকে দিলে সেও নিজে উপহাস করে।
আমার অশান্ত মন কবিতায় শান্ত হয় জানি
বন্ধুকে বাঁচানো দায় কবিতা কি তার জলপানি?
ক্ষুধিত চাহে না ছন্দ অন্ন তার পেট ভ'রে চাই
তার কাছে অন্ন ছাড়া কবিতার মূল্য কিছু নাই।

শেঠ মাণিকচাঁদের ফার্ম্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে।)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১১	১২	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র
মীরণ সাহ	আমীর তৈমুর সাহেব কেরান	সাহ আলম বাদসাহ

(দস্তখত লাল কালিতে)

মহম্মদ মইনুদ্দীন আলমগীর শানী ফারখ সাএর বাদসাহ গাজী ফার্ম্মান আবুল মজঃফর।

১১২৫
মহম্মদ ফারখ সাএর, পুত্র আজিমুশ্বান, আবুল মজঃফর মইনুদ্দীন আলমগীর শানী বাদসাহগাজী সন আহদ।

এই জয় ও মঙ্গলযুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মাণিকচান্দ, এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মাণিকচান্দ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক এবং হুজুর আলি হইতে তাগিদ জানেন। ইতি তারিখ ৮ জিলহজ্জ। তৃতীয় সন জলুস।

(পরপৃষ্ঠার লেখা)

যিনি মহামান্য রাজ্যের ন্যাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বাসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্যের ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি তরবারী ও লেখনী পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, যিনি সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই মিনুদ্দৌলা বাহাদুর জাফর জঙ্গ শেপা সালারের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)

মহম্মদ ফারখ সাএর বাদসাহ গাজী খালা দুল্লাহ শেপা সালার, ইয়ার বাওফা ফিদরি কুতবল মুল্ক এমিনুদ্দৌলা সৈয়দ আবদ খাঁ বাহাদুর জাফর জঙ্গ।

জগৎ শেঠ মহাতপচাঁদের ফার্ম্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১২	১৩	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র
মীরণ সাহ	আমীর তৈমুর সাহেব কেরান	জাহান সাহ

(দস্তখত লাল কালিতে)

আহম্মদ সাহ বাহাদুর পুত্র মহম্মদ সাহ মজাহেদ্দীন সাহেবে কেরান শানী বাদসাহ গাজী।

আহম্মদ সাহ বাহাদুর, পুত্র মহম্মদ সাহ, আবুল নাসীর মজাহেদ্দীন, সাহেবে কেরান শানী, বাদসাহ গাজী সন এক।

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের জগমান্ত ও জগদ্বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মহাতাব রায় বিশ্বাস ও গৌরবের মূলধনস্বরূপ জগৎ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে জগৎ শেঠ মহাতাব রায় লেখেন। এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ইতি তারিখ ২৭ জেলহজ্জ।

বঙ্গাধিকারী শিবনারায়ণের ফার্ম্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১১ পুত্র মীরণ সাহ — ১২ পুত্র আমীর তৈমুর সাহেব কেরান — ১ পুত্র সাহ আলম বাদসাহ

২ পুত্র আলমগীর বাদসাহ

৩ পুত্র সাজাহান বাদসাহ

৪ পুত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহ

৫ পুত্র আকবর বাদসাহ

৬ পুত্র হুমায়ুন বাদসাহ

৭ পুত্র বাবর বাদসাহ

৮ পুত্র উমর সেখ সাহ

৯ পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ সাহ

১০ পুত্র সুলতান মহম্মদ মির্জা সাহ

আবুল ফত্তেহ নাসীর উদ্দীন মহম্মদ সাহ, পুত্র জাহান সাহ বাহাদুর সাহেবে কেরান বাদসাহ গাজী।

(দস্তখত লাল কালিতে)

ফরমান আবুল ফতেহ নাসীর উদ্দীন মহম্মদ সাহ, পুত্র জাহান সাহ বাহাদুর, সাহেবে কেরান বাদসাহ গাজী।

এক্ষণে মহামান্ত আদেশপত্রে প্রকাশ পাইল যে, অর্দ্ধ সুবাবগন কাননগো কর্ম্ম ৺দর্পনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় তস্ত পুত্র শিবনারায়ণ দুই লক্ষ টাকা নজর ও তস্ত পিতার নিকট যাহা পাওনা ছিল, প্রদান করায় পিতার স্বরূপ বাহাল থাকে। আর নিয়মানুসারে কার্য্যকরতঃ চাষ, আবাদবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত পরিশ্রম করে। আর সুপথগামী থাকিয়া সরকারের ধনবৃদ্ধির কার্য্যে ত্রুটি না করিয়া কোন প্রকারের জুলুম বিজ্ঞপ্ত না করে, এবং জুলুম ও ক্ষতির নিকট না যায়। আর বাটারারের সেরেস্তা যে পরিমাণে নিযুক্ত আছে, সন সন জাবিদা নজরমত সরকারী দফতরখানার দাখিল করিতে থাকে। আর প্রজাগণকে স্ত্রী ও বাজি বাধিয়া প্রতি সন ৫০ হাজার টাকার নজর হুজুরে ও বক্রী বিমজ্জন কিস্তিবন্দী তথাকার সুবার নিকট দিতে থাকে। উচিত যে, বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা জায়গীরদার, করোরীগণ শিবনারায়ণকে অর্দ্ধ সুবাবগনার কাননগো জানিতে থাকেন। আর প্রতি সন নূতন সনন্দ তলব না করেন। আর জমীদার, মণ্ডল ও প্রজাগণ সুবা মজকুর উপরোক্ত কাননগোর কথা ও পরামর্শে যাহা সরকারের লাভের পক্ষে থাকে তাহার বাহির না হয়। ইতি সন জলুস ৭ সফর।

(পরপৃষ্ঠার লেখা)

যিনি মহামান্ত রাজ্যের স্থাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয় সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি প্রাধান্ত ও আদেশ বিষয়ে ক্ষমতাবান, যিনি রাজধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি সাম্রাজ্যের অবলম্বনস্বরূপ, রাজ্যের বিশ্বস্ত আদেশদাতা, বিচারপতি, যিনি দিগ্বিজয়ী, রাজ্য ও ধনের বন্দোবস্ত-কারী, ভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পথপ্রদর্শক, সম্রাটের মনোনীত বন্ধু, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী ও সৈন্তগণের পরিচালক, যিনি

(মোহর)

ফিদ্‌বী মহম্মদ সাহ বাদসাহ গাজী জুমলতুল মুল্ক মহারুল মহান, এতমাতুদ্দৌলা কামর উদ্দীন খাঁ বাহাদুর নসরত জঙ্গ।

উচ্চপদস্থ মন্ত্রিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মহামান্ত আমীরগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, যিনি তরবারি ও লেখনী-পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকা উন্নয়নে সমর্থ, যিনি উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সম্রাটের নিরপেক্ষ উজীরসমূহের মধ্যে বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি সমস্ত রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি দরবারের বিশ্বাসী, সেই কামরুদ্দীন হোসেন বাহাদুর নসরত জঙ্গের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

মহারাজা নন্দকুমারের পত্র

১

শ্রীশ্রীহরি শরণম্।

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় ভায়া চিরঞ্জীবেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ আগে তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে প্রাণ রক্ষা পাইতেছে পরং সকল সমাচার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার দ্বারায় পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবা। অন্ত চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই নাসাগ্রে প্রাণ হইল কষ্টোঁহং যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব তবে যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি সে কেবল তোমার রোকা খোসবাগে পাইয়াছিলাম সেই ক্রমে জীবিত আছি সংপ্রতি যদি আমার প্রাণরক্ষা করা থাকে তবে পত্র পাঠ করিবামাত্র শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের নিকট তুমি এবং শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দীননাথ সামন্ত ও

শ্রীরামকান্ত মজুমদার সকলে যাইয়া শ্রীযুক্ত সেখ হিদাতুল্লা জিউকে তাগার লিখন করিয়া পাঠাবা এই ধারাতে যে নন্দকুমারের ভাই ও উকিল সকলে এইখানে এক রকা করিয়া শ্রীযুক্ত ৺সাহেবের পরওয়ানা করিয়া পশ্চাৎ পাঠাইবে সম্প্রতি নন্দকুমারকে তসৃদি না দিবে যদি এরূপ লিখন নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌছে তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে নতুবা বাজ হইলে এ জন্মের মতন বিদায় হইলাম ইহা নিশ্চয় জানিবা যদি দুর্ভাগ্যবশত বাগহানিতে ঠেকিয়াছি তবে কমোবেশেতে তথাতে রক্ষা করিবা আমি তথায় পৌছিয়া তাহার জায়দাদ করিয়া দিব অতএব এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল ইহা মকর্‌রর জানিবা নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোমদাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা করিবা এ বিষয় এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা আমার দিব্য দিব্য আর এক পত্র আমি শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মজুমদারকে লিখিলাম ইহা তাঁহাকে দিবা এবং লিখনের জওয়াবও সে জিউকে লিখন লইয়া রাতি বিরাতি এথা পাঠাইবা ইহাতে যদি কদাচিৎ গাফিলি কর তবে আমার হত্যার ভাগী হইবা এবং আমার অনাহুত অপমৃত্যু হইবে ইহা নিশ্চস নিশ্চস জানিবা আর সেখানে যে যে বড় মানুষ মুরুব্বী আছেন তাঁহাদিগের নামের ফর্দ্দ পাঠাই তাহাতে ওয়াকিব হইয়া যেখানে যেমত ধারায় হয় সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিবা তোমাকে যে পুনশ্চ পুনঃ লিখি সে অধিক কেবল অতিক্রমে লিখিলাম শ্রীযুক্ত ৺মহাশয়কে আমার সমাচার নিবেদন লিখিবে এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত কেবলকৃষ্ণ রায় ভায়াকে আমার জবানী আশীর্ব্বাদ অনেক অনেক লিখিবে অধিক কি লিখিব ইতি তারিখ ৩১ শ্রাবণ।

কাসীদরা যেমন তথায় পৌছে তাহার সমাচার লিখিবা এবং যে সময় বাহির হয় সে সময়ের সমাচার লিখিবা ও অতিশীঘ্র মজুমদারের লিখন সমেত এ কাসীদ জোড়িকে রাহি করিবা যদি পার ২৷৷০ আড়াই টাকা আড়কাট কাসীদকে তথায় দিবা ইতি।

ইং বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিননাথ সামন্ত জিউ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মজুমদার জী প্রণামা নিবেদনঞ্চ ও পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ সকল সমাচার মূল পত্রে জ্ঞাত হইবে এ যাত্রা যেরূপে রক্ষা হয় তাহা করিবা রাতি বিরাতি সমাচার লিখিবে প্রথমতঃ পত্র পাঠমাত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের দ্বারা সুচেষ্টা করিয়া তাহার লিখন রাতি বিরাতি নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌছে তাহা করিবা তেসরা রোজ লিখন না পৌছিলে আমি মারা পড়ি এখানে কেহ জিজ্ঞাসিবার পাত্র নাই অতএব মজুমদারের লিখন রাতি বিরাতি পাঠাইবা আমার দিব্য আমার দিব্য যেখানে যে বিহিত চেষ্টা করিবা, জমাদারকে সেলাম কহিবা অবশ্য ইতি।

ইং পরম বন্দনীয় শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর চরণেষু তথা মহামহিম শ্রীযুক্ত শতজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জীউ দণ্ডবৎ প্রণামা ও নমস্কারা নিবেদনঞ্চ আগে সকল সমাচার মূলপাত্রে জ্ঞাত হইয়া যে যে বিষয় লিখিলাম চিত্ত দিয়া করিয়া করিয়া পাঠাইবেন ইহাতে গৌণ হয় তবে আমার নামে হাত ধুইবেন ইহা নিকর্ণ জানিয়া যে বিহিত তাহা করিবেন নাগাদি ৩রা ভাদ্র যাহাতে সকল জওয়াব আইসে তাহা করিবেন নিবেদন ইতি।

সন ১১৭৮ সাল
২৯ পৌষের খত। ১

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তুঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁএর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক ৩ তুমি শ্রীযুত মেষ্ট্র মেদলটীন

২

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রতিক্ত চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺
দুই প্রতিমার ২ স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে
এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাঞি দাখিল হইলে
তাঁহার চলন মাফিক ব্যবহার হবেক শ্রীযুত মিষ্টর মেদলটীন সাহেবকে
জে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোঁদ না দিয়া
মহর করিয়া পাঠাইলাম পাট করিয়া গোঁদ দিয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে
দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিয়া স্থির
রাখিবা কিমধিক ইতি

১। মহারাজ নন্দকুমারের এই পত্রখানি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় ও গুরুদাস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। পত্রে ২৯শে পৌষ তারিখ আছে। কিন্তু সাল লেখা নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবংশের দপ্তরে এই পত্রখানি আছে। তাহার শিরোভাগে ১১৭৮ সালের ২৯শে পৌষের খত বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতেছে। সে সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ হয় নাই। রাজা গুরুদাসও নিজামতের দেওয়ান হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করেন।

২। গুহ্যকালী ও গৌরীশঙ্কর নামক প্রতিমাদ্বয়। এই দুই প্রতিমা আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। রাজা জগৎচন্দ্র বর্ত্তমানে কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ, ইনি মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা। মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্মানীর সহিত জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয়। মহারাজ নন্দকুমার গুরুদাসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করায় জগৎচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধ হন। এমন কি অবশেষে মহারাজের প্রধান শত্রু মোহনপ্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া জগৎচন্দ্র মহারাজের বিরুদ্ধে সেই জালকরা মোকর্দ্দমার অনেক কার্য্যও করিয়াছিলেন। মহারাজ অনেক স্থলে জগৎচন্দ্রের বিরুদ্ধভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে তাহা আরও পরিস্ফুট হইতেছে।

সাহেবের ৪ নিকট জাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও সুনিবে যথন জেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথা ক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায় শয়ং জানাইতেছেন ক্রিহার স্থানে বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায় ৫ লিখিয়াছেন ফীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফা ৬ তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিতেছেন এবং কটুকথা কহিয়াছেন এ কেমত ধারা ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল এ কারণ আমি এক খত হাজি মুস্তফাকে লিখিলাম এবং তাঁহার বিশয় মেস্তর মেদলটান সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখি লাম কহিবে পঁহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ক্রিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে ইহার সহিত অন্যমত ব্যবহার না করেন দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কালীনাথ রায় আজিতক পঁহুচিয়াই থাকিবেন শ্রীশ্রী৺ঠাকুরাণি রটন্তির দিবস মন্দিরে স্থাপন করাইবে ৭ তাঁহার সঙ্গে জা জাওর সকলের গিয়াছে পঁহুচিয়া দেয়া ইবে তুমি আপনার লইবে ৭ সাত মণ ভাল গঙ্গাজলি গহমের কারণ মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীচৈতন্যনাথের ৮ পলওয়ারে কালীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওয়ারে পাঠাইয়া দিবে। যাতায়াতে নিজ মঙ্গলাদি বার্ত্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে কিমধিকং ইতি তারিখ ২১ পৌষ রবিবার রাত্রেই ডাকে বাহি হইল। *

৪। মেস্তর মেদলটান— মিষ্টার মিডলটন। মিডলটন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের চীফ ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই পত্র লেখার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ রেজা খাঁ বিচারার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত রেজা খাঁর ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আগমনের পূর্ব্বেই রেজা খাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়নের জন্য হেষ্টিংসকে আদেশ দেন। হেষ্টিংস কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে মিডলটনের সহিত যে পরামর্শের কথা লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা রেজা খাঁ ঘটিত কোন বিষয় হইবে। অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে পারে।

৫। নন্দকুমারের জাল করা অভিযোগে লালা ডোমন সিংহ নামে এক ব্যক্তি মহারাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। লালা ডোমন রায় ও লালা ডোমন সিংহ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না।

৬। হাজি মুস্তফা সায়র মুতাক্ষরীণ নামক ফার্সী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। ইনি একজন ফরাসী। ইঁহার পূর্ব্ব নাম রেমণ্ড পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাজি মুস্তফা উপাধি ধারণ করেন। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইনি জীবিকার জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অনুকম্পায় মুর্শিদাবাদে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি কার্য্য তাহা ইনি স্বয়ং গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। এই পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ইনি ফীলখানার দারোগা হইয়াছিলেন। মুস্তফা মুর্শিদাবাদ হইতে পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

৭। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জন্মভূমি ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এক ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুহ্যকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালী মূর্ত্তির সহিত গৌরীশঙ্কর মূর্ত্তিও উক্ত মন্দিরে স্থাপিত হয়। রটন্তী তিথিতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আজিও প্রতি বৎসর রটন্তীতে ধূমধামে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণের পর মহারাজের দুর্ঘটনা ঘটায় তদ্বংশীয়েরা আর মন্দির সম্পূর্ণ করেন নাই। উক্ত মন্দির ও দেবতার সহিত নানারূপ প্রবাদ বিজড়িত আছে। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আকালীপুরের মন্দির মহারাজের একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। এই পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় পত্রখানি ঐতিহাসিকগণের নিকট যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮। এই চৈতন্যনাথ মহারাজের জালকরা মোকর্দ্দমায় তাঁহার পক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

* এই পত্র কয়খানি স্বর্গত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ মুর্শিদাবাদ কাহিনী হইতে গৃহীত।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রটি রামকিঙ্কর সিংহ কর্ত্তৃক গৃহীত।

প্রশান্ত চৌধুরী

কাদা লাগবেই। গঙ্গার ধারের পাড়া দিয়ে হাঁটবে, অথচ কাদা লাগবে না পায়ে, এ আবার কেমনধারা কথা ?

সেই কাদা-পথের ধারেই মন্দিরটা।

মায়ের নাম শীতলা।

তেল-সিঁদুরে টকটকে রাঙা মায়ের প্রকাণ্ড মুখ। নাকের দুদিকে রগ পর্যন্ত ওঠানো মস্ত একজোড়া রূপোর চোখ আবছা আলোতেও জ্বলজ্বল করে। তাতে মাকে ভীষণ দেখায়, ভয়ঙ্কর দেখায়, রাগী দেখায়। তাই তো লোকে মাকে সমীহ করে, ভয় করে, ভক্তি করে ;—যাওয়া-আসার পথে দু-একটা নয়া পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে পেন্নাম ঠোকে।

মায়ের ঐ বিশাল ভয়ঙ্কর মুখটুকুই শুধু দৃশ্য। তারপরেই টকটকে লাল রঙের ঝুটো-জরির আঁচলা-দেওয়া বেনারসী শাড়ির যে ছোট্ট ঝালরটি ঝুলছে, তার আড়ালে মায়ের সমস্ত দেহটাকে কল্পনা করে নেওয়া নিতান্তই অসম্ভব হলেও তারই তলা থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এসেছে একজোড়া রূপোর পা। তা না হলে ভক্তজন ভেট চড়াবে কোথায়। ফুল ছুঁড়বে কোথায়? পাদোদক পান করবে কেমন করে?

সেই বেনারসী শাড়ির আড়ালের ডানদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন একটি জীবের মুণ্ডু, যাকে শিয়াল বলে চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হত না, যদি না তার মাথার উপর মস্ত মস্ত লম্বা কান থাকত একজোড়া। এবং সেই মস্ত কান দুটোর জন্যেই বাধ্য হয়েই তাকে গাধা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মা এখন দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। উই-ধরা সবুজ রঙের কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার ধারে ল্যাজ গুটিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমুচ্ছে একটা বেড়াল। দেয়ালে টাঙানো ঢাকটার ওপর চুপচাপ স্থির হয়ে শুয়ে আছে একটা টিকটিকি। হাঁড়িকাঠ বসাবার মাটির জায়গাটুকুতে গোটাকতক বড় ডেয়ো পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করছে শুধু। আর সব চুপচাপ, শান্ত। রোদ্দুরটাও বেহুঁশ-জ্বরের রোগীর মতন এক জায়গায় আচ্ছন্নের মতন পড়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে।

শীতলামন্দিরের সরু পাথর-বাঁধানো চাতালটায় চিৎ হয়ে শুয়ে শ্যামাপদ পূজারীও চোখে একফালি ঘুম আনবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে; কিন্তু কোথা থেকে চকচকে সবুজ রঙের একটা মাছি এসে কেবলই উড়ে উড়ে বসছে তার ঠোঁটে। হাত নেড়ে ঠোঁটের উপর থেকে মাছি তাড়াতে গিয়ে হাতের জ্বলন্ত বিড়ির ছাই চোখে ফেলেছে শ্যামাপদ; মাছি মারতে গিয়ে নিজের মুখে চড় কষিয়েছে বোকার মতন। মাছি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে আবার এসে বসেছে ঠোঁটের উপর।

শ্যামাপদ আবার হাতনাড়া দিলে। মাছিটা আবার উড়ে পালাল। শ্যামাপদ দেখতে পাচ্ছে তাকে। উড়ে গিয়ে তফাতে বসল একটু। তারপর একেবারে ঢাকের চামড়ার উপর। টিকটিকিটা তেড়ে এল। মাছি আবার উড়ল। গোল হয়ে ঘুরল। উঁচুতে উঠল। শিকলে ঝোলানো ঘণ্টাটার উপরে গিয়ে বসেছে এবার।

কী করছে ওটা ওখানে? খাচ্ছে, না বমি করছে? শ্যামাপদ শুনেছে, ওরা খাবার পরেই বমি করে।

শ্যামাপদ নিজেও।

খাবার পরেই রোজ গা গুলোয় ওর। আঁচাতে গিয়ে তাই ও' গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে প্রতিদিন। যা খায়, উঠে আসে তার বেশিরভাগটাই। তবু পেটে মোচড় দেয়।

আজও বমি করেছে। করবে না কেন? পুজোর ফল কে আর বাছাই করে ভাল জিনিসটি দিচ্ছে বল? হাজা-গলা কলা আর ভেমো-ধরা বাটা চিনি, এই দিয়েই তো পুজো দিচ্ছে সকলে। বড়জোর দু-টুকরো শশার কুচি। যোগযাগ পাল-পার্বণের দিনে একসঙ্গে জমে গেল হয়ত পঁচিশ-ছাব্বিশটা কলা, কিছু বেশিই শশার টুকরো, খানকতক চিনি-ময়দার গুঁজিয়া ;—রেখে-ঢেকে তাই দিয়েই তো শ্যামাপদকে তিন দিনের জলযোগ সারতে হবে গো।

কাজেই টাটকা ফল আর জুটছে কি করে বল? এবং এসব খাওয়ার পর বমি করা ছাড়া উপায়ই বা কি বল?

আজ কে একজন দু-কোয়া কাঁঠাল দিয়ে গিয়েছিল মা শীতলাকে।

দু-দিনের বাসি নেয়ো কাঁঠালের কোয়া। একটু হড়হড়ে হয়ে উঠেছিল, মুখের দিকে খয়েরি রঙ ধরেছিল। তা হোক! মিষ্টি ছিল বেশ। মাছিটা কি সেই কাঁঠাল-কোয়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকেই বার বার শ্যামাপদর ঠোঁটে এসে বসেছিল উড়ে উড়ে?

ঝোলা-ঘণ্টার উপর থেকে উড়ে গেল মাছিটা। উড়ে গেল বাইরের দিকে। নীল আকাশ। কড়া রোদ্দুর। অভ্রের মতন চিকচিক করছে আকাশটা। মাছিটা সেই আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কি ও' পথ চিনে শ্যামাপদর ঠোঁটের উপর ফিরে আসতে পারবে? বোধ হয় না। নিশ্চয়ই না।

শ্যামাপদ নিশ্চিন্তে চোখ বুজল এবার। মাছি এসে বসেনি, তবু কিন্তু ঠোঁট দুটোয় কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগছে বলে মনে হচ্ছে তার। ডান হাতে ঠোঁটটা চুলকে নিয়ে পাশ ফিরল শ্যামাপদ।

আর পাশ ফিরতেই ঘুম।

শুধু শ্যামাপদই নয়, এদিকের সবক'টা মন্দিরের চাতালেই ঘুমোচ্ছে এখন পূজারী বামুনের দল। বিকেল হতে না হতেই উঠবে আবার। মুখ-হাত ধুয়ে কোষাকুষি আর তাম্রকুণ্ডটাকে সামনে নিয়ে বসবে ভক্তজনের অপেক্ষায়।···

দেশগাঁয়ে নদীর দিকে যত এগোও ততই বাড়তে থাকে ঝোপঝাড়। কলকাতার পথ দিয়ে ভাঙ্গা-বন্দরের দিকে মুখ করে গঙ্গার কাদা-মাখা পথের দিকে যত এগোও, ততই বাড়বে মন্দির।

বাড়তে বাড়তে শেষকালে একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি। শনিমহারাজের মন্দিরে আর শেতলা মায়ের মন্দিরে, জগন্নাথ আর মাকালীতে, শিব আর ষষ্ঠীঠাকরুণের মন্দিরে গলাগলি একেবারে। ভক্তজন পথে দাঁড়িয়ে পেন্নাম ঠুকলে স্বয়ং শনিমহারাজ এবং শেতলা ঠাকরুণও চট করে বুঝে উঠতে পারেন না যে, পেন্নামটা ঠিক কার পাওনা!—জগন্নাথের চন্নামেত্তরের আশায় পথে দাঁড়িয়ে হাত পাতলে তোমার হাতে যে সহসা মাকালীর খাঁড়া-ধোওয়া জল বিতরিত হবে না, এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন!—শিবের নামে ধুতরো ফুল ছুঁড়লে সেটা ষষ্ঠীঠাকরুণের পাদপদ্মে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার প্রবলতর সম্ভাবনা!

মন্দিরে-মন্দিরে যেমন গলাগলি, মন্দিরের ভটচাজে-ভটচাজেও তেমনি। আষাঢ়ের রথের সময় ষষ্ঠীর মন্দিরের ভেলভেটের পর্দা জগন্নাথের মন্দিরের দরজায় বাহার দেয়। ফাগুন-চোতের বসন্ত রোগের ঋতুতে জগন্নাথের মন্দিরের মস্ত কোষাকুষিটা শেতলামন্দিরের এক্সট্রা চন্নামেত্তর সাপ্লাইয়ের কাজে সাহায্য করে।

মাকালীর মন্দিরের নতুন জোয়ান পুরুতঠাকুর তারাদাস শর্মা আপত্তি জানিয়েছিল একবার। বলেছিল, মাকালীর মন্দিরের লাল শালুর চাঁদোয়া জগন্নাথের মন্দিরে টাঙাতে দোষ কেন? তোমরা হলে গিয়ে বোষ্টম, আর আমরা হলুম গিয়ে শাক্ত।

শুনে জগন্নাথের মন্দিরের তেকেলে বুড়ো নকুল ভটচাজ আদর করে তারাদাসের চিবুকে নাড়া দিয়ে বলেছিল, তাক্ত রে, বাজারেও ঢুকিসনি নাকি কখনো? বলি, মাছের বাজারে পাশের দোকানের ইলিশ মাছের তাজা রক্ত দিয়ে বাসি কাৎলা মাছের কাটা-টুকরো রাঙাতেও কি দেখিসনি বাবা কোনদিন? পাশাপাশি থেকে ব্যবসাপত্তর করতে গেলে এ-ওকে সাহায্য করতে হয় বৈ কি বাবা। নৈলে কি ব্যবসা করা চলে? আর শাক্ত বৈষ্ণবের কথা বলছিস?

বলেই ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে পান-দোক্তার ছোপধরা জিভ নেড়ে নেড়ে গেয়ে উঠেছিল বুড়ো,—

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপবো আমি শ্যামের নাম।
মা হল মোর মন্ত্রগুরু
ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।

এর পর কালীমন্দিরের তারাদাসের আর আপত্তি হয়নি সিন্দুক খুলে জগন্নাথ-মন্দিরের বুড়ো নকুল ভটচাজের হাতে কালীমন্দিরের লাল শালুর চাঁদোয়া বের করে দিতে।

মন্দিরে মন্দিরে এই ভালবাসাটা, এই সম্প্রীতির ভাবটা বিশ বছর আগেও কিন্তু ছিল না এমন।

ষ্টিমার যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ, কে ফার্স্টকেলাসের যাত্রী, কে নিচুকেলাসের যাত্রী, ভাগাভাগির আর অন্ত ছিল না। ষ্টিমার ডুবতে বসল যখন, তখন সবাই এক জোট, ভাই-বেরাদার।

এদেরও এখন তাই। ডুবতে বসেছে তো।

এক কালে দেহে এদের মাছিটি বসলে পিছলে যেত। আজকাল চুপসে গেছে সব। দেবদ্বিজে আর ভক্তি নেই কারুর এই ঘোর কলির কলকাতায়।

তাই ভর দুপুরে রোদটা যখন সামনের পিচের রাস্তাটাকে চটচটে করে তোলে,—ঠেলাগাড়ির গাড়োয়ানগুলো ছায়া খুঁজে নিয়ে পেতলের কানাউঁচু পল্কা থালায় ছাতু মেখে খায় আর ঘামে,—

কালো কালো মোষগুলো পথের ধারে হাইড্রেন্টের ঘোলা জলে মোটা শেঠজীদের মত আড় হয়ে শুয়ে হাঁফায় আর সাদাসাদা ফেনা ঝরায় মুখ দিয়ে,—সেই তখন গঙ্গাজলে, ভেজা পচাফুল আর বেলপাতাগুলো সরিয়ে প্রণামীর পয়সাগুলো তুলে মন্দিরের ঝাঁপ ফেলে অবেলায় চারটি ভাত মুখে দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে শোয় ওরা নিজের নিজের মন্দিরের এক চিলতে ছোট্ট চাতালে। শুয়ে শুয়ে সামনের বহুদিনের সাবেকী মোনাধরা থামওয়ালা বিরাট বাড়িটার ইট-বেরকরা দেয়ালে হিন্দি সিনেমার বিজ্ঞাপনের মস্ত ছবির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে জলন্ত বিড়ি ওদের দেকারদা পুড়ে যায় আঙুলের ফাঁকে।—টানতে ভুল হয়ে যায় বেবাক্।

ভুল না হয়ে যায় কোথায়?

পেটকাটা টাম্‌টাম্ ব্লাউজ আর টাইট প্যান্ট্‌লুন পরে তিন-তিনটে মাংসালো মেয়েছেলে যদি হুলাহুপ্ নাচে,—তা' সে হোক্ না ছবিতেই,—তাহলে সামান্য ঐ বিড়ির কথা কি কারুর মনে থাকে রে বাপু?

বাড়িটার বালি-খসা দেয়ালে বছরখানেক থেকে পড়ছে হিন্দি সিনেমার বিজ্ঞাপনের মস্ত মস্ত ছবি। একটার পর একটা। সবেতেই মেয়েছেলে থাকে। আর, মেয়েছেলেগুলোকে নাচের ভঙ্গিতে এমন লোভনীয় দেখায়! টান্‌টান্ পোশাকের বাঁধন ঠেলে ফুটে ওঠে ওদের মাংস। ওদের ভরপুর স্বাস্থ্য, ওদের ভরপুর যৌবন।

শীতলামন্দিরের শ্যামাপদর বৌটার যদি অমন স্বাস্থ্য হত, তাহলে কি সে মরতো অমন এক দিনের বাহ্যেবমিতে?

বিয়ে যখন করেছিল শ্যামাপদ, তখনই তো বৌটা খ্যাংরাকাটি। বিধবা শাশুড়ী বলেছিল, বিয়ের জল পড়লেই মোটা হবে।—ছাই হল! বরং তিনটে মরা ছেলে বিইয়ে আরো শুকিয়ে গেল। খ্যাংরা কাটি থেকে খড়কে কাঠি!

যতদিন খ্যাংরাকাঠি ছিল, ততদিন মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসত তবু। খড়কেকাঠি হয়ে ইস্তক কেবল খিটখিট। ঐ খিটখিট করতে করতেই একদিন হ্যাংলামী করে পুজোয়-পাওয়া তেরটা কাঁঠাল-কোয়া একা একা খেয়ে বাহ্যেবমি করে মরে গেল বৌটা।

শ্যামাপদও আজ দু-কোয়া কাঁঠাল খেয়েছে। মাত্র দু-কোয়া। খাওয়ার পরে গলায় আঙুল দিয়ে বমিও করে নিয়েছে। তবু পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে কেন?

মাছিটা আবার এসেছে উড়ে। সেই মাছিটাই। নিশ্চয়ই সেই মাছিটা। নৈলে রোদ চিক্‌চিক্ আকাশ থেকে উড়ে এসে অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা সটান একেবারে শ্যামাপদর ঠোঁটের ওপর এসে বসল কেন?

নাঃ, ঘুমোতে দেবে না আজ মাছিটা।

শ্যামাপদ তাকাল আবার সামনের সেই বড় বাড়ির দেয়ালের গায়ে লাগানো সিনেমার মস্ত ছবির দিকে।

মেয়ে তিনটে হাসছে। হাসতে হাসতে হাত দুটোকে ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে। কী নিটোল হাত! নিটোল হাত, নিটোল বুক, নিটোল উরু। শ্যামাপদর বৌটা যদি অন্তত এক রাতের জন্যেও অমন হতে পারত!

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যামাপদ।

বড় বাড়ির দেয়ালে লাগানো বিজ্ঞাপনের হিন্দি ছবির নাম 'লটারী।'

ঘইসিঁড়ি দিয়ে উঠে দেড়শো বছরের প্রাসাদের বালি-খসা বিরাট থামের গায়ে ওরা ছক্ ঠুকে লাগিয়ে দিয়ে গেছে হিন্দি সিনেমার বিজ্ঞাপনের চট-এ আঁকা মস্ত রঙীন লোভনীয় উত্তেজনাকর ছবি,—'লটারী।'

লটারী ছাড়া আর কি?

এ-অঞ্চলের ঐ দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো চাউস-চাউস বাড়িগুলোর পত্তনীতেও তো তাই ছিল। ঐ লটারীই।

ইংরেজরা গঙ্গার পুরনো জাহাজঘাটায় নেমে চাইলে দোভাষী, তুল করে সবাই এসে হাজির করলে ধোপাকে। সেই ধোপা ইংরেজের দোকলজের পড়ে জোরাত্তিরে লক্ষপতি হয়ে গেল। লটারী নয়?

পলাশীর যুদ্ধের আগে যাট টাকা মাইনের মুচ্ছিগিরি করত যারা, যুদ্ধের পর দেখা গেল তারা সব রাজা মহারাজা হয়ে বসে আছে। কেউ মাতৃশ্রাদ্ধে ন' লক্ষ টাকা খরচ করছে, কেউ বা বেড়ালের বিয়েতে ফুটকড়াই করে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। লটারী বলাই নিরাপদ।

এমনি করেই তো একদিন বাঁশি থেকে, সাতগাঁ থেকে, ভদ্রেশ্বর থেকে, চুঁচড়ো থেকে, দণ্ডিরহাট থেকে, বাতাসী বাগাটি আকনা থেকে কলকাতায় ছুটে এসে লটারী ধ'রে কেউ হলেন দেওয়ান, কেউ মুচ্ছুদ্দি, কেউ আফিঙের থানাদার, কেউ খাজনার তহশীলদার, কেউ ভূমিমালের দালাল, কেউ বা কুলি সরবরাহের পাণ্ডাঠাকুর।

কলকাতা দখল করতে গিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে অনেক বাড়িঘর পোড়াতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তার ক্ষতিপূরণের টাকাও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একশোটা পোড়া-বাড়ির ক্ষতিপূরণের টাকা যদি দশটা বাড়ির মালিকের হাতে গিয়ে জমা হয়,—তাহলে কুটিরের প্রাসাদ হতে আর লাগে কতক্ষণ বল?

এই সব লটারী-জেতা ভাগ্যবানদের দৌলতেই তো কলকাতায় বড় বড় থামওয়ালা প্রাসাদ উঠল, বড় বড় উঠানে বড় বড় ঠাকুরদালান হল, দুর্গাপুজোয় বাঈনাচ হল, দেশী গানে বিলিতি বাজনার গৎ জোড়া হল, পুজোবাড়িতে সাহেবসুবোদের নেমন্তন্ন হল, টানাপাখা দুলল, কবির লড়াই বুলবুলির লড়াই হল, তরজা-পাঁচালী হাফ আখড়াইয়ের আসর বসল,—সন্ধ্যেয় বিলিতি মদের ফোয়ারা ছুটল।

পাঁচ পয়সার ফার্সি আর তিন পয়সার ইংরিজি,—মগজের মনিব্যাগে এই রেস্তই যথেষ্ট বোধ করতেন যাঁরা;—বাউরিকাটা চুল, দাঁতে মিশি, গোঁফে মোম, ফিনফিনে কালাপাড় ধুতি, কেমব্রিকের বেনিয়ান, গলায় চুনটকরা উড়ানি আর পায়ে বকলস দেওয়া চীনে-বাড়ির জুতো নিয়ে নটবর বেশে যাঁরা বাঈজীবাড়ি নিশিযাপন করতেন; দিনে যাঁরা ঘুমোতেন, দুপুরে বুলবুলির লড়াই দেখতেন, বিকেলে ঘুড়ি আর পায়রা ওড়াতেন, সন্ধ্যেয় কর্ণেট বাজাতেন;—খড়দা আর ঘোষপাড়ার মেলায় কিংবা মাহেশের স্নানযাত্রায় যাঁরা নৌকোয় বারাঙ্গনা নিয়ে ফুর্তি করতে গঙ্গায় তরী ভাসাতেন; আজ সেযুগের সেই ভাগ্যবান কলকাত্তাই বাবুর দল হারিয়ে গেছেন, হেরে গেছেন।

হারিয়ে গেছেন জনারণ্যে। হেরে গেছেন এযুগের নতুন লটারীতে।

তাই তো আজ তাঁদের সেই সাবেকী নোনাধরা প্রাসাদের নিচের

তলার বিহারী গয়লার নোংরা খাটাল, ঘুপসি ছাপাখানা, গমভাঙাই কল আর ডাইংক্লিনিং বসেছে। বসেছে বরফের ডিপো আর ছুটকো সবজীর বাজার, কয়লার আড়ৎ আর তেলেভাজার দোকান।

উত্তর কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর চওড়া রাস্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে কেউ যদি গড়িয়ে যেতে পারে বরাবর পশ্চিম দিকে, তাহলে সেই পুরনো সাবেকী কলকাতার গন্ধ পাবে সে নাকে। গন্ধ পাবে সেই কলকাতার, যে কলকাতায় ফ্যালমাউথ বন্দর থেকে প্রথম বাষ্পজাহাজ এসে নোঙর করল আঠারশো পঁচিশ সালে, বোস্টন থেকে প্রথম বরফ এল আঠারশো তেত্রিশে, আর প্রথম রেলগাড়ি ধোঁয়া ছাড়ল আঠারশো পঞ্চান্নয়।

সত্যি সত্যি লটারী করেই তো একদিন সাজানো হয়েছিল সেই কলকাতাকে। আঠারশো পঁচিশ সাল সেটা। সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাঙালব্যাঙ্কে বিক্রি হল একশো টাকা দামের লটারীর টিকিট। সেই লটারীর টাকা আর সামান্য চাঁদায় টাকায় কলকাতা উঠল সেজে।

বড় বড় সব নর্দমা হল, লালদিঘির মত সব পুকুর কাটা হল, কলের নল দিয়ে গঙ্গার জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছল, গ্যাসের আলো হল, খিদিরপুরে লোহার পোল হল, নতুন নতুন খাল কাটা হল, অক্টারলোনীর মনুমেণ্ট হল, নিমতলা থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গঙ্গার ধারে তিন-তিনটে পাকা শ্মশান তৈরী হল, নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হল কতসব।

সেসব রাস্তা শুধু সেদিনের সব লালমুখো সাহেবদের নামেই হয়নি, হয়েছে তাদের মুদির নামে, সারেঙের নামে, খোপানীর নামে, খানসামার নামে, মিস্ত্রিরির নামে। হয়েছে সেই বাঈজীর নামে, যে তাদের মন ভোলাত;—সেই ওস্তাগরের নামে, যে তাদের পোষাক বানাত;—সেই দপ্তরীর নামে, যে তাদের হিসেবের খাতা বাঁধাত।

আর হয়েছে তাঁদের নামে, লালমুখোদের নেকনজরের লটারীতে যাঁরা তেরাত্তিরে লক্ষপতি হয়ে উঠেছিলেন।

সেদিনের নাম-লটকানো পথঘাটের বেশিরভাগই আর নেই। কোথাও পথটাই গেছে লুপ্ত হয়ে, কোথাও বা শুধু নামটা।

ভারতবর্ষের সিংহ যেমন এখন লোপ পেতে পেতে গির-এর জঙ্গলে কোণঠাসা হয়ে আছে সামান্য কিছু, সেযুগের রাতারাতি লক্ষপতি হওয়া ভাগ্যবানদের নাম-লাগানো রাস্তাগুলোও তেমনি লোপ পেতে পেতে আজো উত্তর কলকাতার গঙ্গার কাছ বরাবর কোণঠাসা হয়ে টিঁকে আছে কিছু কিছু। টিঁকে আছে সেই সাবেকী কলকাতার স্মৃতির তালি-দেওয়া জীর্ণ শতচ্ছিন্ন বালাপোষটাকে গায়ে জড়িয়ে।

ওপথে নোনাধরা পুরনো থামওয়ালা বাড়ির পাশে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে হাল্-ফ্যাশানের নতুন ঝকঝকে বাড়ি,—দোক্তার ছোপধরা কালচে দাঁতের পাশে ধবধবে নতুন বাঁধানো দাঁতের মতোই। ওপথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাবে কোন্ বনেদী বাড়ির বাগানের সাবেক-কালের ফোয়ারা সরকারী পিচের রাস্তার তেমাথার পথে বসেও পুরনো অভ্যাসে জল কুলকুচো করছে এখনও। রিপভ্যান্ উইঙ্কলের মতন ও বোধহয় এখনো টেরও পায়নি যে, মাঝখানে ষাট-সত্তর বছর পার হয়ে গেছে কোন্ ফাঁকে। ওপথে হাঁটতে হাঁটতে তোমারও মাঝে মাঝে ভুল হবে। মনে হবে, তুমি বুঝি সেযুগের কলকাতায় ফিরে গেছ। মনে হবে, এখনি বুঝি তোমার পাশ দিয়ে পাল্‌কি চলে যাবে একটা, ভাল কাবা আর বাঁধা-পাগড়ি আঁটা বাবুরা হেলতে দুলতে চলে যাবেন সামনে দিয়ে, চতুর্দোলায় চেপে ষোলো বছরের বর যাবে ইহুদী সখীর হাতের চামরের হাওয়া খেতে খেতে, গঙ্গাযাত্রায় শোভাযাত্রা চলে যাবে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে।—তোমার মনে হবে, এ পথের আনাচে-কানাচে একটু কান পেতে দাঁড়ালেই বোধহয় এই মুহূর্তে শুনতে পাওয়া যাবে সেদিনের পেয়ারাওয়ালীর গান,—

> মনের মতন মন যদি পাও
> প্রাণ সঁপ ধন তারে।
> এক শঠের সঙ্গে করে প্রীত
> মজবে ধনী ফেরে।।

শুনতে পাওয়া যাবে, মাতালের গুন্‌গুনানি,—গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে-এ-এ-এ!

শুনতে পাওয়া যাবে, সেযুগের পাঠশালার পড়ুয়াদের সমস্বর চীৎকার,—

> ডে মানে দিন আর নাইট মানে রাত।
> উইককে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত।।
> পমকিন লাউকুমড়া, কুকুম্বার শশা।
> ফিল্‌জফার বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান চাষা।।

এ-অঞ্চলের পথে হাঁটতে হাঁটতে সাবেকী ভাঙ্গা বাড়ির পোড়ো বাগানের মাঝখানে আজও দেখতে পাবে শ্বেতপাথরের বিদেশিনীকে;—স্খলিত বসনপ্রান্তটিকে কোনক্রমে ধরে রেখেছে বুকের নিচে। দেড়শো বছরে তার বসন খুলি-খুলি করেও খোলেনি, উঠি-উঠি করেও ওঠেনি বুকের উঁচুতে।

ভঙ্গি তার একই আছে, শুধু পরিবেশটা বদলেছে। চারপাশে

ফুলের সৌরভের বদলে এসেছে আজ কাঁচা কাঠের গন্ধ।—বাগানটায় আজকাল কাঠের গোলা বসেছে একটা।

পুরনো দিনের মতই দর্শকের লোভী দৃষ্টি আজও গিয়ে পড়ে ঐ শ্বেতপাথরের বিদেশিনীর দেহের উপর। কিন্তু সে-দৃষ্টির নিচে আজ আর সেযুগের গোঁফ-পাকানো কাইজারী-গোঁফের কাপ্তেনী নেই, আছে শুধু কাঠের গোলার মিস্তিরিদের ঝাঁটা-গোঁফের হ্যাংলাপনা।

পাঁচু মিস্তিরি কাঠ চিরতে চিরতে বলে,—কাপড়টা যদি রাখবি তো পুরো রাখ, খুলবি তো পুরো খোল্;—ছেনালী করিস কেন প্রাণ?

কাঠ-চেরাই যন্ত্র করাতের ওদিকের হাতলের জোগানদার হরিদাস মিস্তিরি তার সামনের দুটো দাঁতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে কেমন কায়দায় চিক্ করে খানিকটা থুতু ফেলে বলে,—যা বলেছিস মাইরি! কাঠঘষা রাঁদা যদি পাথরের ওপরেও চলত, তাহলে ঐ আধখসা কাপড় এতদিনে কবে চেঁচে উড়িয়ে সাফ করে দিতুম শালা আমি।

কাঠের রাঁদা পাথরে চলে না বলেই আছে।

সংসারে এমনি ভাবেই তো টিকে থাকে কতকিছু; টিকে আছে আজো অনেক জিনিস। কাঠের র্যাদা পাথরে চললে এতদিনে কবে সব উড়ে সাফ্ হয়ে যেত!

কিন্তু সেকথা থাক, পথের কথা হোক।

এ পথে চলতে চলতে এমন সব মুড়িমুড়কির দোকানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, যেখানে তেল-চপ চপে কালো কুচকুচে কাঠের বারকোষে আজও দেখতে পাওয়া যেতে পারে দেড়শো বছর আগেকার ভাজা ফুলুরি আর ডালবড়া, পেঁয়াজী আর আলুর চপ; দোকানের দরজার চৌকাঠের মাথা থেকে ঝুলতে দেখা যাবে পচা কলার কাঁদি আর লর্ড কর্ণওআলিস সাহেবের আমলের তেল-ছড়ানো বিবর্ণ তিনখণ্ডি চাকা।

চুমকি-জরির কল্কা চাই? গিল্টির গয়না, বলবেয়ারিং ডাইস্, হিমালয়ের আসল শিলাজতু? রূপোর খাড়ু, পায়ের ঝাঁঝর, গলার হাঁসুলী? জ্যামেকা সালসা চাই? বেবী সিনেমা, পকেট প্রেস, পিতলের পিক্‌লু বাঁশী?—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ চাই? বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র, অদ্ভুত কোকশাস্ত্র, প্যাটেণ্ট ঔষধ শিক্ষা?—সাঁওতালী বশীকরণতন্ত্র খুঁজছেন? পবনবিজয় স্বরোদয়, হঠযোগপ্রণালী, জাতক-চন্দ্রিকা?—যাত্রার বই চাই? ভাড়া-করা সখীর ব্যাচ?—এ অঞ্চলের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সবকুছ মিল যায়েগা।

হানাবড়া, তিলকুটো আর জিভেগজা আজও পাবে এ-অঞ্চলে। নলে ফুঁ দিয়ে নরম তলতলে কাঁচ থেকে ফুকো শিশি আজও এ-অঞ্চলেই তৈরী হয়। বিয়ের শোভাযাত্রায় আসিটিলিন গ্যাসের আলোর গেট এখানেই পাবে আজও। রুদ্রাক্ষের মালা কিংবা সন্ন্যাসীদের জটা বলো, হুঁকো বলো, ল্যাম্পো বলো, পাশার ছক বলো, সচিত্র গোলকধাম বলো,—এ অঞ্চলের গলিঘুঁজি দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে যাবে সব কিছুই।

সচিত্র গোলকধাম খেলার খেলুড়ীদের মতই এ অঞ্চলের গোলক-ধাঁধার পথের পথিকদের পক্ষে ঊর্ধ্বগমনের সম্ভাবনাও যত, নিম্নপতনের আশঙ্কাও ঠিক ততই। পাঁচ কড়ায় শৌণ্ডিকালয়ে, এবং সাত কড়ায় আরো কোন বিশেষ আলয়ে পতনের ফাঁদ পাতা আছে এখানেও ঠিক ঐ সচিত্র গোলকধামের মতই। আর, সেখানে যাইলে নির্ঘাৎ 'সেই নরককুণ্ডে' পতন, এক চিৎ না হইলে যেখান হইতে ঘুঁটি বাহির হইবার উপায় নাই!

[ক্রমশঃ।

মিছিলের গল্প

আবদুল মজিদ

মিছিলে নিঃসঙ্গ আমি। সহচরী কুমারীর মুখ
লাবণ্যের অবয়বে আত্মসুখী, মন্ত্র উচ্চারণ
সন্নিকটে তারা জ্বলে নির্বিকার নীলাভ্রের চোখ
মধুমেলা দেহ জুড়ে' যৌবনের উর্ম্মি আবেদন
অহর্নিশ। আমাতে যে প্রীতিভিক্ষু রাঙা মধুকর
প্রবাহিত রঙ্গালয়ে উষ্ণতায় প্রমত্ত, উদ্দাম
গুপ্তপথে ধমনীর, বন্যমনে পূর্ণিমার ঝড়;—
এ অসহ্য ভালোলাগা নীলনেত্রে বিশ্ব অভিরাম।
এইক্ষণে লিপি পেলে নিরক্ষর চোখের ইশারা
ফুলে ফুলে অপরূপ মত্ত মন, প্রতীক্ষার নীলে
অভাবিত স্বর্গ ফোটে নৈঃসঙ্গের গোবি কি সাহারা
পক্ষান্তরে ধূলিঝড় উপেক্ষার প্রবল নিখিলে
রুদ্ধশ্বাস করে তোলে, পৌরুষের কি যে অসম্মান—
সুমেরুর সহচরী সে রমণী তুষার নিধান।

প্রত্যাশিত

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সে এক আশ্চর্য দিন।

আকাশ নির্মেঘ নীল, চারদিকে জাফরানী রোদ,
সবুজ বেত আর গুলঞ্চের ঝোপে ঝোপে
হাল্‌কা ডানা মেলে ফড়িংএরা ওড়ে—
বনে বনে ভয়হীন হরিণীর স্বাচ্ছন্দ্য বিহার।

মাঠে মাঠে সোনার ফসল
বাতাসে পিঠে-পায়সের গন্ধ—
নদীর কিনারে নৌকো
বৌ-ঝিরা বাড়ি ফেরে;
ময়ূরকণ্ঠী, গয়না, ডিঙ্গি—আরও কতো নাম,
আর উদাত্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বেজে ওঠে
মাঝি-মাল্লাদের অক্লান্ত ভাটিয়ালী গান।

সে এক আশ্চর্য দিন:
সে এক প্রত্যাশার স্নিগ্ধ সকাল।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

লুমুম্বা হত্যার পর—

কঙ্গোর জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, কঙ্গোর জাতীয় সংহতির প্রতীক প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করা হইয়াছে। এই হত্যা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কঙ্গোতে বেলজিয়ম ও অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রেরই উহা পরিণতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও এই হত্যার দায়িত্ব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট কাসাভুবু, মবোটু, শোম্বে প্রভৃতি মনে করিয়াছিল লুমুম্বাই তাঁহাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পথে প্রধান অন্তরায়। তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিলেই কঙ্গোতে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাই জানিতেন, লুমুম্বাকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া শুধু কঙ্গোতেই আবদ্ধ থাকিবে না, কঙ্গো আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। সেইজন্যই দুইজন সহকর্ম্মী সহ কাটাঙ্গার বন্দিনিবাস হইতে মিঃ লুমুম্বার পলায়ন এবং উপজাতীয়দের দ্বারা পলায়নপর লুমুম্বা এবং তাঁহার সহকর্ম্মিদ্বয়ের হত্যার গল্প প্রচার করা হইয়াছে। প্রথমে পলায়ন কাহিনী প্রচার, তারপর যে মোটরগাড়ীতে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া, কিন্তু লুমুম্বার কোন সন্ধান না পাওয়া, তারপর উপজাতীয়দের দ্বারা তিনি নিহত হওয়ার কাহিনী বেশ কৌশলপূর্ণ উপায়ে প্রচার করা হইয়াছে। বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কাসাভুবু বা শোম্বে লুমুম্বার হত্যার জন্য দায়ী নহেন। কিন্তু বিশ্ববাসী তাঁহাদের এই কাল্পনিক কাহিনীকে বিশ্বাস করে নাই, করাও সম্ভব নয়। লুমুম্বা একবার পলায়ন করিয়াছিলেন লিওপোল্ডভিলেস্থিত তাঁহার বাসভবনের বন্দী অবস্থা হইতে। পাঁচ দিন পরে আবার তাঁহাকে বন্দী করা হয়। লিওপোল্ডভিলে প্রদেশের থিসভিলে সৈন্যদের মধ্যে যখন বিদ্রোহ হইয়াছিল তখন আর একবার তিনি পলায়নের ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সূত্র ধরিয়াই যে তাঁহার হত্যাকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই কাটাঙ্গার বন্দিনিবাস হইতে তাঁহার পলায়নের কাহিনী প্রচার করা হইয়াছিল, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কি ভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিহত হওয়ার কাহিনী প্রচার করা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনা গত ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কঙ্গোর সমস্যা সমাধানের ভিত্তি সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনার উদ্দেশ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতেছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল কঙ্গোর বিভিন্ন দলের সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করা, বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটান, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা, ব্যাপক ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং সম্ভব হইলে এই গবর্ণমেণ্টে মিঃ লুমুম্বাকেও গ্রহণ করা। ইতিমধ্যে কাসাভুবু এক নূতন চাল চালিলেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) তিনি মবোটুর সামরিক শাসনের অবসান, ভাঙ্গিয়া দেওয়া পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্যকে লইয়া অস্থায়ী সরকার গঠন এবং যোসেফ ইলিওকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, একথা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ইহার চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কাটাঙ্গা হইতে লুমুম্বার পলায়ন কাহিনীর বোমা বর্ষিত হইল। লুমুম্বার পলায়ন কাহিনী ঘোষণা করা যেন কাসাভুবুর ঘোষণারই অপেক্ষা করিতেছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী অধিক রাত্রিতে তথাকথিত কাটাঙ্গা সরকার ঘোষণা করেন যে, কাটাঙ্গার রাজধানী হইতে ২২০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রাম্য কারাগারে প্রেরণ করিবার সময় দুইজন শান্ত্রীকে কাবু করিয়া লুমুম্বা এবং তাঁহার সঙ্গিদ্বয় একটি কাল ফোর্ড সিডান গাড়ীতে পলায়ন করিয়াছেন। এই কল্পিত কাহিনী বিশ্বব্যাপী গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করে। 'পলায়নের সময় গুলী করা হইয়াছে' এই গল্প প্রচারের উদ্দেশ্যে, পলায়ন কাহিনী সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই আশঙ্কা সকলের মনেই জাগ্রত হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আপোষ কমিশন (conciliation commission) কারাগারে লুমুম্বার সহিত সাক্ষাতের জন্য কয়েক বার চেষ্টা করিয়াও অনুমতি পান নাই। উল্লিখিত ঘোষণার পরের দিন (১০ই ফেব্রুয়ারী) আফ্রো-এশীয় দশটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট এক পত্র দেন। ঐ পত্রে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের সমস্ত সম্ভাব্যপন্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। পত্রে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় যে, লুমুম্বাকে হত্যা করা হইয়াছে। ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে কাটাঙ্গার সরকারী কর্ম্মচারীরা ঘোষণা করেন যে, লুমুম্বা যে মোটরে চড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা উক্ত গ্রাম্য কারাগার হইতে ৪৫ মাইল উত্তরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু আরোহীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

লুমুম্বা নিহত হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারী। কাটাঙ্গার আভ্যন্তরীণ দপ্তরের মন্ত্রী এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া ঘোষণা করেন যে, যে-গ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহারা যাইতেছিলেন সেই গ্রামের উপজাতীয়রা লুমুম্বা এবং তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে। সকলে যে আশঙ্কা করিয়াছিল এই ঘোষণা তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিল। কিন্তু কবে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে? অনেক পূর্ব্বেই যে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে এক মাস পূর্ব্বে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা আশঙ্কা করিয়াছেন।

এই আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য কাসাভুবু লুমুম্বাকে থিস্‌ভিল কারাগার হইতে কাটাঙ্গায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সতর্কতার সহিত বন্দী করিয়া রাখাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কাটাঙ্গায় তাঁহাকে হত্যা করা। কোন্ গ্রামে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে, তাঁহাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করা হয় নাই। যে গ্রামে লুমুম্বা ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় নিহত হইয়াছেন সেই গ্রামকে আট হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া কাটাঙ্গার আভ্যন্তরীণ দপ্তরের মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন। লুমুম্বা হত্যা যে পূর্ব্বপরিকল্পিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড কঙ্গোতে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত আফ্রো-এশীয় প্রস্তাব তাহা নিরোধ করিতে পারিবে কি না সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই প্রস্তাবে কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ রোধের শেষ উপায় হিসাবে প্রয়োজন বোধে বলপ্রয়োগ করিতে কঙ্গোস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে এই নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে যে, কঙ্গো হইতে অবিলম্বে বেলজিয়াম্ ও অন্যান্য বৈদেশিক সামরিক ও অর্দ্ধসামরিক লোকদিগকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কম্যাণ্ডের অধীন নহে এইরূপ রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং ভাড়া করা প্রত্যেকটি সৈন্য অপসারিত করিতে হইবে। মিঃ লুমুম্বা এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মীর মৃত্যু সম্পর্কে সত্বর ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রক্ষণাধীনে কঙ্গোলী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, কঙ্গোলী সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন, উহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং দেশের রাজনীতি হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করার নির্দ্দেশও প্রস্তাবে আছে। আপাত দৃষ্টিতে প্রস্তাবটি ভালই মনে হয়। কঙ্গোর সমস্ত সৈন্যকে নিরস্ত্র করিবার অছিলায় যদি লুমুম্বাপন্থী সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হয়, তাহা হইলে কঙ্গোর সমস্যা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।

রাশিয়া বনাম হ্যামারশিল্ড—

মস্কোর ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডের অপসারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন ও কঙ্গো হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবী সমর্থনের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট এক পত্র দিয়াছেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য নেতাকেও তিনি এইরূপ চিঠি দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপার লইয়া এখন বিতর্ক আরম্ভ হইলে কঙ্গো ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপার উপেক্ষিত হইবে। মঃ ক্রুশেভ মিঃ হ্যামারশিল্ডের অপসারণের যে-দাবী করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ হ্যামারশিল্ডের বিরুদ্ধে যদি অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হয় তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কত জন সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়া যাইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। যে-সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তিবিরোধী তাহারা সকলেই মিঃ হ্যামারশিল্ডের বিরুদ্ধে ভোট দিবে ইহা আশা করা সম্ভব নয়। তবে রাশিয়া মিঃ হ্যামারশিল্ডের উপর নানা চাপ দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল ট্রাইগভি লীর কথা অবশ্যই মনে পড়িবে।

কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের পর রাশিয়া মিঃ লীকে বয়কট করে। রাশিয়া সেক্রেটারী জেনারেলকে উপেক্ষা করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্টের নামে চিঠিপত্র দিত। অবশেষে প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯৫৩ সালে মিঃ লী পদত্যাগ করেন। রাশিয়ার চাপই ইহার কারণ কি না সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেলের অপসারণ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে নাই। মিঃ হ্যামারশিল্ড পদত্যাগ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে রাশিয়া তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারে। কঙ্গোতে মিঃ হ্যামারশিল্ডের ভূমিকাই রাশিয়ার প্রধান সমালোচনার বিষয়। বন্দী লুমুম্বার হত্যার দায়িত্ব হইতে রাশিয়া মিঃ হ্যামারশিল্ডকেও মুক্তি দেয় নাই। হ্যামারশিল্ডের ভূমিকা সম্পর্কে বলিতে গেলে ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "আমি দুই মাস আগে মিঃ হ্যামারশিল্ডের নিকট মবোটুর বে-আইনী সৈন্যদের বেতনের টাকা কোথা হইতে আসে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাই নাই।" শোম্বের ইউরোপীয় বাহিনীর সৈন্যদের মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন দিতে হয়। এই টাকা কে যোগায় তাহা প্রেসিডেণ্ট নক্রুমাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে জানিতে চাহিয়াছেন। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকায় পরিচয় কি ইহার মধ্যেই পাওয়া যায় না?

ইংলণ্ডের রাণীর ভারত ভ্রমণ :—

ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং তাঁহার স্বামী ডিউক অব এডিনবরা ভারতে ২৩ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরের শেষে গত ২রা মার্চ্চ (১৯৬১) ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পাকিস্তান ও নেপালে ভ্রমণ-ও করিয়াছিল। রাজদম্পতীর ভারত ভ্রমণের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই সংবাদপত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী তাঁহারা নয়াদিল্লীতে পৌঁছেন। ভারতে তাঁহারা জয়পুর, আগ্রা, উদয়পুর, আহমেদাবাদ, দুর্গাপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই এবং বেনারস পরিদর্শন করেন।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারত পরিদর্শন প্রসঙ্গে ১৯১১ সালে তাঁহার পিতামহ রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এবং পিতামহী রাণী মেরীর ভারতে আগমনের কথা অবশ্যই মনে পড়ে। তাঁহাদের করোনেশন দরবার বা অভিষেক উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারে তাঁহাদের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। কিন্তু নয়াদিল্লীর কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না। তাঁহাদের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে ৪৫ বর্গমাইল ভূমির উপর তাঁবুর এক বিরাট সহর নির্মিত হইয়াছিল। এই দিল্লীর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিত এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করেন। দরবারের তিন দিন পর ১৫ই ডিসেম্বর (১৯১১) তিনি নয়াদিল্লীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই দরবার উপলক্ষে যে বিপুল

জাঁকজমকের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব। উহার জন্ত ব্যয়ও হইয়াছিল প্রচুর। এই দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী রাজকীয় মুকুট ও পোষাক ধারণ করেন। ভারতীয় রাজন্য পরিবারবর্গ হইতে দশ জন এই সকল বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দশম হুসার্স এবং ইম্পিরিয়েল কোডেট করপস রাজা রাণী দরবার স্থলে যাওয়ার সময় তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। তোপধ্বনি করা হয় ১০১ বার। রাজারাণীর সম্মুখ দিয়া ভারতীয় রাজা ও নবাবদের এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা গিয়াছিল এবং উহা পরিচালন করিয়াছিলেন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী যে অবস্থার মধ্যে ভারত পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইয়াছে। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আসিয়াছিলেন এই স্বাধীন ভারতে।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে, কাজেই ভারতের রাণী হিসাবে তিনি ভারতে আসেন নাই। কিন্তু তাঁহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সহিতও তাঁহার ভারত ভ্রমণের তুলনা করা যায় না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও এবং প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইলেও বৃটিশ কমনওয়েলথের একজন সদস্য। রাণী এলিজাবেথ কমনওয়েলথের প্রধান বা মুকুটস্বরূপ। সুতরাং অন্য রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন একথাও বোধ হয় বলা যায় না। তাঁহার ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে সমারোহ ও ব্যয়বাহুল্য কম হইয়াছে, এমন কথাও বলা সম্ভব নয়। রাণী এলিজাবেথ যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে-জনসমাগম হইয়াছিল তাহা মঃ ক্রুশেভকে দেখিবার জন্য জনসমাগম অপেক্ষা বিপুলতর কিনা এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তী লোকসভায় বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের রাণীর ভারতে আগমন উপলক্ষে ভারত সরকারের ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হওয়া লজ্জার বিষয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন ইহা অতিশয় উক্তি। ব্যয় কত কোটি টাকা হইয়াছে, তাহা কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর শ্রীমহান্তী বলেন, "An impression that India could be still be dominated by the British should not be created." ইহাতে শ্রীদেশাই আরও চটিয়া যান, বলেন যে, লোকসভায় কোন সদস্য যেমন খুসী কাজ করিতে পারেন না। তাঁহার এইরূপ ক্রোধের কারণ কি এবং উহা দ্বারা কি বুঝা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে—যে-দেশে লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে-দেশে এই ধরণের সমারোহ এবং ব্যয়বাহুল্য শোভা পায় কি ?

বিদেশে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি—

গত ৩রা মার্চ্চ স্কটল্যাণ্ডের ঘাণ্ডব্যাঙ্ক হইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, চারিটি 'কেনো' এবং একটি ডিঙ্গির একটি ছোট নৌবহর মার্কিণ পোলারিস সাবমেরিন ডিপো জাহাজ 'প্রোটিউসকে' (Proteus) 'হোলিলচে' প্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত হইলে বৃটিশ নৌবাহিনী এবং পুলিশ লঞ্চ উহাদিগকে প্রতিরোধ করে। ফলে এই ক্ষুদ্র নৌবাহিনী ডুবিয়া যায়। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ইঁহাদের সকলেই ইংরেজ এবং তাঁহাদের বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসর। প্রোটিউসের প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া তাঁহারা শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, এই অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রতম নৌযুদ্ধের ঘটনাটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। যে সকল তরুণ 'কেনো'ও ডিঙ্গি লইয়া প্রোটিউস জাহাজের হোলিলচে প্রবেশে বাধা দিতে গিয়াছেন তাঁহারা পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহী। হোলিলচে নয়টি পোলারিস্ অস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিনের পরিচালক জাহাজ হিসাবে 'প্রোটিউস' আসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে গত অক্টোবর মাসে মার্কিণ ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত পোলারিস সাবমেরিনের ঘাটি হোলিলচে স্থাপনের আভাস বৃটিশ সরকার দিয়াছিলেন। গত নবেম্বর মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, সাবমেরিনগুলিতে দেড় হাজার মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থাকিবে। স্কটল্যাণ্ডের হোলিলচে পোলারিস সাবমেরিন ঘাঁটি স্থাপনের এবং পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন জন্য বারট্রাণ্ডরাসেল সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছেন।

গত চারি বৎসরে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে যে, বৃটেনে মার্কিণ ঘাঁটি রাখার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। সোভিয়েট রাশিয়া এই ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার বোমারু বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে উড়িবার আগেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম আঘাত সহ্য করিয়া ফিরিয়া আঘাত করার সামর্থ্যের গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মাণের উন্নতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও হইয়াছে। পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত সাবমেরিণের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। নূতন অন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে 'মিনিটম্যান।' উহা ছয় হাজার মাইল দূরের বস্তুকেও আঘাত করিতে পারে। এই অস্ত্র দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই পৃথিবীর যে-কোন স্থানে আঘাত হানিতে পারা যায়। এই নূতন ক্ষেপণাস্ত্র যে বিদেশস্থ মার্কিণ ঘাঁটিগুলির গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) মার্কিণ সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় যে-সকল সামরিক ঘাঁটি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে সে-গুলি তুলিয়া দিবার জন্য মার্কিণ দেশরক্ষা দপ্তর মুখ্যত আমেরিকা মহাদেশের ঘাঁটিগুলির অবস্থা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অন্যান্য বৈদেশিক ঘাঁটিগুলিকে পরীক্ষার আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিদেশে যে-সকল মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি আছে সে-গুলির যদি আর কোন সার্থকতা না থাকে তাহা হইলে তুলিয়া দেওয়াও অসম্ভব নয়। তবে রাতারাতি ঘাঁটিগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নেই। এই ঘাঁটিগুলির জন্য বহু দেশ মার্কিণ সাহায্য পাইতেছে। ঘাঁটিগুলি তুলিয়া দিলে এই সকল দেশ মার্কিণ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। এই প্রশ্ন ছাড়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ঘাঁটিগুলি সমস্তই তুলিয়া দিবে ইহাও স্বীকার করা কঠিন।

গত ১৯৫৮ সালের জুন মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা ছিল ৮৪০টি। ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৭৭২টিতে দাঁড়াইয়াছে। সামরিক ঘাটির সংখ্যা যে ক্রমশঃ কমাইয়া আনা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন,

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিদেশে যে-সকল মার্কিণ ঘাঁটি আছে সেগুলি সমস্ত গুটাইয়া ফেলা হইতে পারে। মার্কিণ সামরিক শক্তির ক্ষতি না করিয়া যদি এই সকল ঘাঁটি তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ার চারিদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে সামরিক লহর গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাই আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। দূরপাল্লার নূতন ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু সামরিক সুবিধাই দিবে না, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও উহাকে কাজে লাগাইতে পারিবেন। বিদেশ হইতে সামরিক ঘাঁটিগুলি তুলিয়া দেওয়া রাশিয়ার নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে অন্যতম প্রধান দাবী। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এখন স্বচ্ছন্দে এই দাবী মানিয়া লইতে পারিবেন। নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার পথে একটি প্রধান অন্তরায় দূর হইবে। অবশ্য তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া এই দুইটি দেশের সীমার মধ্যে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রগুলি আবদ্ধ থাকিবে। তাহাতেই নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা মিটিয়া যাইবে, বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া এই দুই বৃহৎ শক্তি মিলিয়া ছোট ছোট পরমাণুশক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলিকে আরও শক্তিশালী না হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ হইবে না। শুধু দুই শক্তি মিলিত ভাবে কিম্বা পরস্পর বিরোধী পৃথিবীব্যাপী বিভীষিকা সৃষ্টি করিবে মাত্র।

আলজেরিয়া যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি—

আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ ছয় বৎসর চারিমাস সংঘর্ষের পরে শান্তি আলোচনার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। গত জানুয়ারী (১৯৬১) মাসে 'আলজেরিয়া-আলজেরিয়ানদের' এই নীতি সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ত গল আলজেরিয়া ও ফ্রান্সে যে গণভোট গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনিই সর্বাধিক ভোট পাওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার মুসলমানদের মধ্যে শান্তির জন্য আলোচনাই ব্যাপক ভাবে সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই গণভোট ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, আলজেরিয়ার অধিকাংশ মুসলমানই এফ এল এনের অর্থাৎ আলজেরিয় মুসলমানদের 'নেশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্টের'ই সমর্থক। আলজেরিয়ার গ্রামাঞ্চলে সৈন্যদের সাহায্যে মুসলমান ভোটারদিগকে ভোটকেন্দ্রে আনা সম্ভব হইলেও গণভোট বয়কট করিবার জন্য অস্থায়ী আলজেরিয়া সরকারের নির্দ্দেশ প্রায় পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালিত হইয়াছে। কিন্তু অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফারাৎ আব্বাস এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ত্যগলের মধ্যে অনেক বিষয় গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। সেইজন্যই উভয়ের মধ্যে সত্য কোন চুক্তি হওয়া সম্ভব কি না তাহা নির্দ্ধারণের জন্য আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। জেনারেল ত্যগল টিউনিশিয়ার প্রেসিডেণ্ট বোরগুইবাকে প্যারীতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলজেরিয়ার অস্থায়ী সরকার টিউনিশিয়াতেই অবস্থিত। প্রেসিডেণ্ট বোরগুইবা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এফ এল এনকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহা হইলেও বোরগুইবা আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নরমপন্থী এবং পশ্চিমীশক্তিবর্গের প্রতিও তিনি অনুকূল।

আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি আলোচনার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে সেই সময় ফরাসী সরকারের পদস্থ কর্মচারীরা আলজেরিয়া যুদ্ধে ক্ষয় ক্ষতির যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই অতি ভয়াবহ। এই ঔপনিবেশিক সংঘর্ষে এক লক্ষ আশী হাজার হইতে দুই লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। নয় হাজার ফরাসী সৈন্য নিহত এবং ২২ হাজার ফরাসী আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের বোমা ও গুলীতে ১,১০০ জন ইউরোপীয় নিহত হইয়াছে। ফরাসী সরকারের হিসাব অনুযায়ী গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত দেড়লক্ষ বিদ্রোহী নিহত হয়। ফ্রান্সের সমর্থক ১৩ হাজার মুসলমানকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে। বিদ্রোহীদের তহবিলে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ফ্রান্সে ৩ হাজার আলজেরীয় মুসলমানকে গুলী করিয়া কিম্বা গলা কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছে। বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য ফ্রান্সে ও আলজেরিয়ায় ২২ হাজার মুসলমান জেলে আছে এবং ৩০ হাজার মুসলমানকে শিবিরে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছে। গৃহহীন হইয়াছে ২০ লক্ষ মুসলমান। আলজেরীয় যুদ্ধের জন্য ফরাসী করদাতাদিগকে দৈনিক আনুমানিক এক কোটি নয়া ফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ ষ্টার্লিং ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে। তবে এই ব্যয় সম্পর্কে কোন সরকারী হিসাব পাওয়া যায় নাই। আলজিরিয়ায় স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ ১৯৫৪ সালের ১লা নবেম্বর।

ঝিল্লী

(*American* কবি **M. Cane**-এর *Crickets* কবিতার মূলানুবাদ)

ঘরমুখোপ্রাণ, বিদায়ী দিন,
স্বর্ণাভ আলো ক্রমমলিন।
দূরে আবছায়া যে প্রান্তর,
সেখানেতে বাজে,
অদৃশ্য কোন যন্ত্রস্বর।
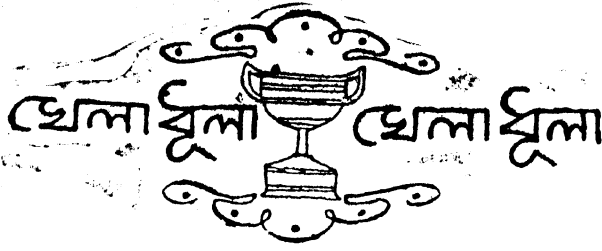
হেমন্ত রাত কারখানায়,
কোন কর্ম্মঠ শিল্পী শ্রমিক;
তাঁত বুননের গান শোনায়!

অনুবাদক—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার্ভিসেস দলের সর্ব্বাধিক পদক লাভ

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ সম্প্রতি জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সার্ভিসেস দল সর্ব্বাধিক পদক লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। গুজরাট, বিহার ও উড়িষ্যা কোনই পদক লাভ করতে পারে নি। বাঙ্গালা অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক ভাল ফলাফল প্রদর্শন করেছে। বালকদের ১১০ মিটার হার্ডলসে বাঙ্গালার এস, দস্তিদার তৃতীয় স্থান এবং ১০০ মিটার দৌড়ে বাঙ্গালার কে-সাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান। মহিলাদের উচ্চ লম্ফনে বাঙ্গালার জি, ব্রাউটন ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি লাফাইয়া প্রথম স্থান 'লাভ করেন। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে বাঙ্গালার এম হকিন্স তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। বর্শা নিক্ষেপে বাঙ্গালার এ, রিচসন দ্বিতীয় স্থান পায়। ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ে বাঙ্গালার মহিলা দল দ্বিতীয় স্থান পায়। বালকদের ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ে বাঙ্গালাদল দ্বিতীয় স্থান পায়। বালকদের উচ্চ লম্ফনে বাঙ্গালার বি, তালুকদার ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি অতিক্রম করে প্রথম স্থান পায়, খ্যাতনামা এ্যাথলীট মিলখাসিং ৪০০ মিটার দৌড়ে সহজেই জয়লাভ করে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

এবার ম্যারাথন দৌড়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—তাতে পরিচালকমণ্ডলীকে দোষারূপ করতে হয়। এই দৌড়ে সার্ভিসেস দলের লালচাঁদ ২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫৬.২ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম স্থান পান। তবে এই দৌড়ে তাঁকে দু'বার অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। দৌড়ের নির্দ্দিষ্ট পথে একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রশিংয়ের গেট বন্ধ থাকায় প্রতিযোগীদের উহা লাফিয়ে পার হতে হয় এবং প্রথম আড়াই মাইল দৌড়াবার পর হঠাৎ ধরা পড়ে যে প্রতিযোগীরা ভুল পথে দৌড়াচ্ছেন। এই অবস্থায় তাঁদের থামিয়ে দেড় ঘণ্টা পরে পুনরায় নতুন করে ষ্টার্ট দেওয়া হয়। জাতীয় প্রতিযোগিতায় এইরূপ অব্যবস্থা সত্যই দুঃখের বিষয়।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সার্ভিসেস	১৮	১৪	৬
মহারাষ্ট্র	১৩	৪	৪
পাঞ্জাব	৫	৮	১২
উত্তর প্রদেশ	৫	৩	৫
বাঙ্গালা	৪	১৩	৮
দিল্লী	৩	৬	৭
মহীশূর	০	২	৩
মাদ্রাজ	২	১	৫
কেরল	১	১	২
রাজস্থান	০	১	২
অন্ধ্র	০	১	০
মধ্যপ্রদেশ	০	০	১

অমরনাথের সাহায্যকল্পে প্রদর্শনী ক্রিকেট

পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফর শেষ করে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের সাহায্যকল্পে এক বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েসনের সভাপতির দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বোম্বাই দলের অমরনাথ অধিনায়কত্ব করেন। খেলাটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ফলে পাকিস্তান ভারত সফরে কোন খেলায় হারেও নি ও জেতেও নি।

এই খেলায় প্রবীণ চৌকস খেলোয়াড় ভিন্নু মানকড় ও লালা অমরনাথের ব্যাটিং ও বোলিং দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান ১ম ইনিংস ৩২০ (ইস্তিখাব আলম ১৪, জাফর আলতাফ ৬৩, মুস্তাক মহম্মদ ৩৪, মহম্মদ মুনাফ ৩০, দেশাই ৫৬ রাণে ৩ উইঃ, মানকড় ১১৩ রাণে ৩ উইঃ ও অমরনাথ ৪১ রাণে ২ উইঃ)।

বি, সি, এ, সভাপতির দল ১ম ইনিংস (৫ উইঃ ডিঃ) ৩৩২ (আর স্ফূর্ত্তি ১১৯, এস, অধিকারী ৫০, এস, মুস্তাক আলি ৪১, সরদেশাই ৩৯, এল, অমরনাথ ৩৭, মামুদ হোসেন ৫৮ রাণে ২ উইঃ ও ইস্তিখাব আলম ৭৩ রাণে ২ উইঃ)।

পাকিস্তান ২য় ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ২৩৭ (মুস্তাক মহম্মদ ৬২, ইজাজ বাট ৪৯; মানকড় ৮৭ রাণে ৫ উইঃ)।

বি, সি, এ, সভাপতির দল ২য় ইনিংস (৭ উইঃ) ২১৭ (পলি উম্রীগড় ৭৯, মানকড় ৪২, ইঞ্জিনিয়ার ৩৫; ইস্তিখাব আলম ৮৫ রাণে ৫ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া দলের "রাবার" লাভ

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি টেষ্ট খেলায় উভয় দল একটা করে জয়লাভ করে এবং দুটো খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। পঞ্চম ও শেষ টেষ্টের উপর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করায় এই খেলার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাণ সংখ্যা :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ২৯২ (জি, সোবার্স ৬৪, জে সলোমন ৪৫, পি, ল্যাসলি ৪১, আর, কানহাই ৩৪, সি, হান্ট ৩১; মিশন ৫৮ রাণে ৪ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—৩৫৬ (সি ম্যাকডোনাল্ড ৯১, আর সিম্পসন ৭৫, পি বার্জ ৬৮, পি সোবার্স ১২০ রাণে ৫ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস ৩২১ (এফ, আলেকজাণ্ডার ৭৩,

সি, হার্ট ৫২, সি, স্মিথ ৩৭, জে, সলোমন ৩৬; আর, কানহাই ৩১ ; ডেভিডসন ৮৪ রাণে ৫ উই:)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৮ উই:) ২৫৮ (আর, সিম্পসন ৯২, পি, বার্জ ৫৩, এন, ও'নীল ৪৮ ; এফ, ওরেল ৪৩ রাণে ৩ উই: ও ভ্যালেনটাইন ৬০ রাণে ৩ উই:)।

রেলওয়ে দলের উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার সাফল্য

ত্রয়োদশ বার্ষিক জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। রেলওয়ে দল জাতীয় ভারোত্তোলনে ৮৩ পয়েণ্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ফলে তাহারা বর্দ্ধমান শীল্ড-বিজয়ী হয়েছে।

এবার একাদশ বার্ষিক "ভারতশ্রী" দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার গতবারের বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সত্যেন দাস এবারেও "ভারতশ্রী" আখ্যা লাভ করেছেন। এবার সর্বপ্রথম "ভারতকুমার" দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রবীন গোস্বামী "ভারতকুমার" খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বারেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার গৌরব অর্জ্জন করেছে।

খেলা-পরিচালকমণ্ডলীকে আয়কর হইতে অব্যাহতি

ভারত সরকারের প্রচারিত বাজেট থেকে প্রকাশ যে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি খেলার পরিচালকমণ্ডলীকে আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য খেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এই আয়কর থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের বিশেষ লাভ হবে। কারণ বোর্ডের বৈদেশিক ভ্রমণে বেশ কিছু আর্থিক লাভ হয়ে থাকে।

মিলখা সিং-এর সামরিক বিভাগের চাকুরী ত্যাগ

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাথলীট মিলখা সিং সামরিক বিভাগের চাকুরী ত্যাগ করেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি ১৯৫৩ সালে সাধারণ সৈনিক হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরে জমাদার পদে উন্নীত হন। তবে তিনি সামরিক বিভাগ ত্যাগ করিলেও প্রতিযোগিতা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন না।

ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়

ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরুষ বিভাগে বোম্বাইয়ের সুধীর থ্যাকার্সে, মহিলা বিভাগে রেলওয়ের মীনা পরাণ্ডে এবং জুনিয়ার বিভাগে মহীশূরের বি সাইকুমার এক নম্বর খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন। নিম্নে ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা প্রদত্ত হলো : পুরুষ—(১) এন, কে থ্যাকার্সে (বোম্বাই) (২) কে, নাগরাজ (রেল) ও জে, এম, ব্যানার্জ্জী (রেল) (৩) জি, পি, হালজানহার (রেল) (৪) বলরাজ মেহেরা (দিল্লী) (৫) কে, রামকৃষ্ণ (হায়দ্রাবাদ (৬) জি আর দেওয়ান (বোম্বাই) (৭) হ্যারি (বাঙ্গালা) (৮) ভি রামচন্দ্র (মাদ্রাজ) (৯) অশোক মাসার্নী (দিল্লী)।

মহিলা—(১) মীনা পরাণ্ডে (রেল) (২) উষা সুন্দররাজ (মহীশূর) (৩) উষা আয়েঙ্গার (বাঙ্গালা) (৪) জে ডি'সুজা (বোম্বাই) (৫) শকুন্তলা দত্ত (বাঙ্গালা) (৬) রাসেল জন (রেল) (৭) ইন্দিরা আয়েঙ্গার (বোম্বাই) (৮) এল রঙ্গনাথন (মহীশূর)।

জুনিয়র—(১) বি সাইকুমার (মহীশূর) (২) এন, ও, সাহা (বোম্বাই) (৩) এস আর এন মূর্ত্তি (মহীশূর) (৪) ভি, ভি, মাড়নানী (বোম্বাই) (৫) গিরিশ চোকশী (গুজরাট)।

আমেরিকান শিক্ষক ফ্ল্যানাগ্যাল

উচ্চ লম্ফনের বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টিকারী জন টমাসের শিক্ষক এড ফ্ল্যানাগ্যাল সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা এ্যাথলেটিকসে তাদের সুনাম রাখতে পারবে না।

তিনি বলেছেন যে, আমেরিকার এ্যাথলেটিকসের পরিচালকরা সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন মাত্র একটা দেশ। এছাড়া আরও দেশ তো আছেই। টোকিও অলিম্পিকে জার্ম্মাণ, জাপান, রাশিয়ান ও আরও অনেক দেশের এ্যাথলীটের সঙ্গে আমেরিকার এ্যাথলীটদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

বাউল সঙ্গীত

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীদের উক্তি

ফিরে যাও ত্রিভঙ্গ (কালো অঙ্গ) রাধার কুঞ্জে আর এসো না,
রাই আমাদের মান করেছে, কালো হেরবে না।
(ওগো !) যে ফেরে ধবলীর সনে, সে কী নারীর মর্ম্ম জানে ?
এমন রাখাল জানলে মোরা প্রেম করতাম না।
(ওহে !) যাও হে, চন্দ্রাবলীর কাছে, আর কী রাই-কমলে মধু আছে ?
এখানে এলে প্রভাতে, লজ্জা হ'ল না ?

ও শ্যাম, যেখানে পোহালে নিশি,
সেখানে বাজাও গে বাঁশী
এখন (শুধু) মিছে দেখাও হাসিখুশি—প্রাণে সহে না।

—শ্রীমুকুন্দলাল বেরা (সংগৃহীত)।

রায়বাহাদুর

রায়বাহাদুর উপাধিধারী এক বৃদ্ধ কাহিনীর একটি বিশিষ্ট চরিত্র, বয়স আনুমানিক ষাট, সংসারে একটিমাত্র নাতনী ছাড়া খুব নিকটজন বলে কেউ আছেন বলে বোঝা যায় না, সমগ্র কাহিনীটি মূলতঃ রায়বাহাদুরকে কেন্দ্রীভূত করে রূপ নিয়েছে। ঘটনাচক্রে রায়বাহাদুরের এবং তাঁর নাতনীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল এক শিক্ষিত চৌখষ যুবকের। ছেলেটি রায়বাহাদুরের কাছে একটি কর্মে নিযুক্ত হ'ল, ক্রমে ক্রমে ছেলেটি এবং মেয়েটি ক্রমশঃই পরস্পরের অনেকখানি কাছে এসে পড়ে, একদিন সমস্ত দূরত্বের শেষ হয়ে যায়, কখন যে অজান্তে দু'জনে দু'জনকে আপন হৃদয়খানি উপহার দিয়ে ফেলেছে তা তাদের নিজেদেরই জানার অগোচরে। তারপর নানাবিধ ঘটনার প্রবাহে কাহিনী এগিয়ে চলে, সর্বশেষে মিলনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি।

গঠনে, আঙ্গিকে, বিন্যাসে রায়বাহাদুর ছবিখানি সকল দিক দিয়ে বোম্বাই ছবির ছাপ বহন করেছে, একমাত্র সংলাপ ছাড়া ছবির সর্ব অঙ্গে বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের ছাপ সুপরিস্ফুট। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে সুদীর্ঘকাল তিনি চিত্ররাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিচালনার দিক দিয়ে সারা ছবিটির কোথাও এতটুকু নৈপুণ্যের বা প্রতিভার পরিচয় মেলে না। বোম্বাই মার্কা নাচ-গান যোগ করে ছবিটিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে তার ফলে ছবিটি দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনে কিছুমাত্র সমর্থ হয়নি অধিকন্তু দর্শকচিত্তে এনেছে বিরক্তি। কাহিনীর মধ্যে গভীরতা নেই। চিত্রনাট্যও দুর্বল ও দোষযুক্ত। হাসির ছবি হলেই তার মধ্যে যে গভীরতা থাকবে না এ জাতীয় ধারণা যেমনই অযৌক্তিক তেমনই ভ্রান্তিপূর্ণ। হাসির ছবি মানেই অগভীরতা এবং অবাস্তবতার সমন্বয় নয়। গভীরতা এবং বাস্তবতা বর্জন করে যথার্থ হাস্যরসের সৃষ্টি কখনও সম্ভবপর নয়।

আনন্দকিশোর মুন্সী রচিত 'রায়বাহাদুর' এর বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার, জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মালা সিন্‌হা, রেণুকা রায় প্রভৃতি। নামভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয়ও উপভোগ্য হয়েছে।

সাধক কমলাকান্ত

সাধকদের লীলাভূমি ভারতবর্ষ। যুগে যুগে এই ভারতের পুণ্য মৃত্তিকাকে ধন্য করেছে যুগনিয়ন্তাদের পবিত্র পদরজ। কালে কালে ঈশ্বরের সাধকপুত্রদের শুভ আবির্ভাবে ধরায় ধ্বান্তনাশ হয়েছে, সর্বপ্রকার অসুন্দর, কুটিলতা, গ্লানি বিদূরিত হয়েছে, অখণ্ড সত্য, ন্যায় ও আনন্দের হয়েছে প্রতিষ্ঠা। সাধক কমলাকান্ত এই সাধক-পুরুষদেরই অন্যতম। যাঁদের সাধনার আলোকচ্ছটায় দেশের অন্ধকার দূর হয়েছে, দেশের আধ্যাত্মিক চেতনা অভিনব রূপ নিয়েছে, সকল সংশয়ের অবসান ঘটেছে পুণ্যপুরুষ কমলাকান্ত তাঁদেরই একজন। পলাশীর প্রান্তরে দেশের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হওয়ার অল্পকাল পরেই কমলাকান্তের আবির্ভাব এবং পরবর্তী আনুমানিক বাহান্ন, তিপ্পান্ন বছর পর্যন্ত তার নরদেহে পৃথিবীতে অবস্থান। ইতিহাসের মাপকাঠিতে শাক্তপদাবলীকার হিসেবে রামপ্রসাদের পরেই কমলাকান্তই উজ্জ্বলতম নিদর্শন। কমলাকান্তের [illegible]

হয়ে বহুজনের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে! ছবিটি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব মিত্র, (দীর্ঘকাল যাবৎ যিনি ছায়াছবির রাজ্যে যুক্ত)। ছায়াছবি হিসেবে সাধক কমলাকান্ত আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। দুর্বল চিত্রনাট্য ও দুর্বল পরিচালনা এই দুইয়ের যোগাযোগ ছবিটিকে সকল দিক দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কোন জীবনী অবলম্বন করে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াসী হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার, এই বিভিন্নতার মধ্যেই একটি যোগসূত্র বিদ্যমান, তখন সেই যোগসূত্রটির দিকে লক্ষ্য রেখেই এগিয়ে যেতে হবে, বহুর মধ্যেই একের বিকাশ। দর্শকের সামনে আলোচ্য জীবনটিকে সকল দিক থেকে নিখুঁত বিশ্লেষণের সাহায্যে তুলে ধরতে হবে—সেইখানেই জীবনীচিত্রহিসেবে ছবি সার্থক। পরিচালক গল্পটিকে সাজাতে পারেন নি, কাহিনী গ্রন্থনে ব্যর্থতাবরণের চিহ্নই সুপরিস্ফুট। বিভিন্ন কলাকুশলীরাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি।

ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জাতীয় একাধিক চরিত্রে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই সব চরিত্রে তিনি যে ধরণের অভিনয় করে থাকেন—এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সেই গতানুগতিক অভিনয়, কোন নতুনত্ব নেই। সাধক জননীর চরিত্রে ছায়াদেবীর নির্বাচন যথাযথ হয় নি। নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, স্বর্গীয় শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজু ভাওয়াল, শিশির মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ধীরাজ দাস, পতাকী মুখোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী, শান্তা দাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় করেছেন।

কমলাকান্তের বাবার নাম মাধহরি এবং মায়ের নাম শঙ্করী, অথচ ছবিতে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে মহেশ্বর এবং মহামায়া বলে, মহারাজা তেজচন্দ্রকে তেজেশচন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

চিত্রপরিচালকের সংজ্ঞা

—বব ফেকার

'চিত্রপরিচালক'—কি তাঁর কাজ, ছবির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কি ভাবে গ্রথিত, কি কি বিষয়ে তাঁর কতখানি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—চলচ্চিত্রের আজকের এই বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রার দিনে চিত্রামোদীর [illegible]

এই প্রশ্নের উদয় মোটেই অস্বাভাবিক নয়, জনজীবনে আজ চলচ্চিত্রের বিপুল প্রভাব, লক্ষ লক্ষ লোক আজ চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষণা করে চলেছেন সে ক্ষেত্রে চিত্রপরিচালক সম্বন্ধে মনে কৌতূহল জাগা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে বিরাট পটভূমি সৃষ্টি করে অনেক কিছু বলার দুঃসাহস না করে অল্প কথার মধ্যে সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে হয়। তাঁকে কি করতে হয়, কি তাঁর কাজ, কি তাঁর করণীয় তা বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়—সংক্ষেপে বলা যায় যে গল্পটিকে ছায়াছবিতে পরিণত যিনি করেন সামগ্রিক ভাবে তিনিই পরিচালক। রূপালী পর্দায় গোটা গল্পটি প্রতিফলন ঘটাবার দায়িত্ব তাঁর। চিত্রপরিচালকের সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সাধনা—দীর্ঘকালীন নিরবচ্ছিন্ন এক সাধনা। জীবনের বোধনলগ্ন থেকে পরিচালক হবার স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে, চিন্তাধারাকে সেইভাবে প্রবাহিত করতে হবে, এ এক কঠোর পরীক্ষাসাপেক্ষ, সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে যিনি পারবেন তিনিই হবেন চিত্রপরিচালক হিসেবে যোগ্যতম, নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিমান। এই গুরুদায়িত্ব বহনে তিনিই হবেন সক্ষম, এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার সুষ্ঠ রূপায়ণে তিনিই হবেন সফলকাম!

আমার নিজের কথায় আসি, গেনসৃবাগ ষ্টুডিওতে আমি প্রথম যোগ দিই—তবে পরিচালক হিসেবে নয়, মুখ্যশিল্পী হিসেবে নয় কলাকুশলী হিসেবে নয়—তবে কি হিসেবে—জেনে রাখুন—দ্রষ্টা হিসেবে। ষ্টুডিওতে দ্রষ্টা হিসেবেই সেখানে আমার প্রথম যোগদান। ষ্টুডিওর কাজ যথারীতি এগিয়ে চলত আমি একটি কোণ থেকে চুপচাপ প্রত্যক্ষ করতুম নির্বাক অবস্থায় দেখে যেতুম চলচ্চিত্র গ্রহণ কার্য। লক্ষ্য করতুম তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে কেমন করে পরিচালক শিল্পীকে নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে শিল্পী অভিনয় করছেন, কেমন করে চিত্রকর সেই অভিনয়কে ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে ধরে রাখছেন বিভিন্ন কুশলীর দল কিভাবে তাঁদের করণীয় কাজ করে চলেছেন—খুঁটিনাটি কোনকিছুই আমার সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না, বাড়ী ফিরে এসে আপন মনে সমস্ত জিনিষটি নিয়ে চিন্তা করতুম, তাকে বিশ্লেষণ করতুম, তার সমালোচনা করতুম মনে মনেই, তার পর ভাবতুম আমি পরিচালক হলে এই অংশ কিভাবে পরিচালিত করতুম, চিত্রনাট্যের কেমনতর রূপ দিতুম কোন দিক থেকে ক্যামেরার শট নেওয়াতুম। এমনি করে আমার মনের মধ্যে কল্পনার এক সুবিস্তৃত রাজ্য গড়ে উঠত, ঘুম এসে আমাকে সেই রাজ্য থেকে সরিয়ে নিত।

যুদ্ধের সময় আমার আহ্বান এল সেনাবাহিনী থেকে, কিছুকাল পরে আমি আর্মি কিনোমাটোগ্রাফ ইউনিটে যোগ দিলুম। তার পর পদোন্নতি ঘটল জীবনে। সম্প্রদায়টির কর্তা এরিক র‍্যাঙ্কলার আমাকে "সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মস"গুলির পরিচালক করে দিলেন।

১৯৪৬-এ আমার জীবনে কর্মবিরতি এল। কিছুকাল বাদে এরিক র‍্যাম্বলার আবার আমাকে সুযোগ দিলেন। তাঁর অক্টোবার নাইট-এর পরিচালনভার আমায় দিলেন। আরো পরবর্তীকালে এ নাইট টু রিমেম্বার এবং টাইটানিকের পরিচালকরূপে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়।

পরিচালককে একমুখীন হলে চলবে না, গোটা ছবিটির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাঁকে সদাসর্বদা সচেতন থাকতে হবে, ছবির মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যা তাঁর জানার বাইরে। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয় তাঁকে পুরোপুরিভাবে জানতে হবে, শব্দ, আলো সম্পাদনা, সঙ্গীত সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সবার শেষে একটি কথা বলি, চিত্র পরিচালকের আর একটি মূলধন চাই—সেটি ভালোবাসা। গভীর ভালোবাসা—চলচ্চিত্রের প্রতি, কেবলমাত্র শিল্পসৃষ্টি হিসেবেই নয় ব্যবসা হিসেবেও।

অভিনয়কলা ও য়্যাকাডেমী পুরস্কার প্রসঙ্গে

—সিলভিয়া সিমস

বিদেশের যে সকল স্বনামধন্যা অভিনেত্রী জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থা হয়েছেন সিলভিয়া সিমস তাঁদের অন্যতমা, সারা বিশ্বে এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, দর্শক দরবারে তিনি অপরিচিতা নন। সিলভিয়া সিমস শুধু অভিনেত্রী হিসেবেই প্রখ্যাতনাম্নী নন তাঁর গল্প করার খ্যাতিও সংশ্লিষ্ট মহলে সুবিদিত, সঙ্গী হিসেবে তিনি এককথায় অপূর্ব। সুন্দর সুন্দর গল্প করে সমস্ত আসর জমিয়ে রাখার দক্ষতায় এঁর সমকক্ষ সংখ্যায় খুবই কম।

এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি সিলভিয়ার জীবনী নয়, কয়েকটি বিষয়ে এঁর মনোভাব বা ধারণা এই রচনাটির মাধ্যমে আমাদের পাঠক-পাঠিকার সামনে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি—

অভিনেত্রী সিলভিয়া সিমসের অন্যান্য বিষয়ক সমস্ত খ্যাতি মূলতঃ কিন্তু অভিনয়কেই কেন্দ্র করে, কেন না সাধারণ্যে অভিনেত্রী হিসেবেই তিনি পরিচিতা, অভিনয় জগতই তাঁকে সর্বসাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, কিন্তু অভিনয়কলা সম্বন্ধে তিনি যে মনোভাব পোষণ করেন তা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন···অভিনয়কলা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন কলাবিদ্যার তালিকায় অভিনয়কলার নাম উল্লেখিত হওয়া উচিত সবার নীচে অভিনয়কলাকে তিনি কোনক্রমেই প্রাধান্য দিতে নারাজ। কারণ অভিনয়কলাকে কেন্দ্র করে কলাবিদ্যার গুরুত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টার স্বপক্ষে কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পান না। তিনি বলেছেন, আমরা কেবলমাত্র অপরের সৃষ্টিকে মূলধন করে কাজ করে যাই; এতে আপন কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ কতটুকু? সিলভিয়া বিবাহিত, তবে তাঁর স্বামী কোন চিত্র পরিচালক নন, এমন কি রাজনীতি জগতের সঙ্গেও তাঁর কোন যোগ নেই তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ। কোন অভিনেতাকে স্বামিরূপে গ্রহণ করতে সিলভিয়া আদৌ সম্মত নন। তাঁর মতে অভিনয় করতে করতে মন অভিনয়প্রবণ হয়ে ওঠে তাঁর ভালবাসা যে অভিনয় নয়—এ বিষয়ে তিনি সংশয়মুক্ত হবেন কি করে—এখানে আমাদেরও এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আসে সিলভিয়া নিজে অভিনেত্রী, তাঁর ভালবাসা সম্বন্ধে এখন তাঁর স্বামী যদি অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহলে সিলভিয়া নিজে সেক্ষেত্রে কি করবেন? য়্যাকাডেমী পুরস্কার অস্কার প্রভৃতি বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেছেন একটি কথায় তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন···মিনিংলেস অর্থাৎ অর্থহীন।

ইংল্যাণ্ডে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যয় কত?

ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ঐ দেশের রঙ্গমঞ্চের অবদানের কথাও কারুর অজানা নয়। ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ

বহুপঠিত উপন্যাসের অনবদ্য চিত্ররূপ

বসুশ্রী, বীণা ও অন্যান্য বিলাসবহুল
চিত্রগৃহে দেখুন

সম্বন্ধে পৃথিবীর আগ্রহ ও কৌতূহল অসীম। ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ বিষয় আমাদের আলোচ্য। ঐ দেশের রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় অসংখ্য তথ্য, বিবরণ ও ইতিবৃত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করেছে। ইংল্যাণ্ডের কোন মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াসী হলে তার জন্যে কত ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়—সে সম্পর্কেও অনেকের কৌতূহল কিছু কম নয়। আমরা সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি তালিকা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরছি :—

দৃশ্যপট এবং সাজসরঞ্জাম	—	১৩০০ পাউণ্ড
ওয়ার্ডরোব	—	৭০০ "
মহড়ার দক্ষিণা	—	৬০০ "
প্রচার	—	৩০০ "
ষ্টেজ	—	৪৫০ "
দৃশ্য পরিকল্পনাকারী	—	২৫০ "
আলোকসম্পাত	—	২৫০ "
পরিচালককে অগ্রিম দেয়	—	১০০ "
নাট্যকারকে	—	১০০ "
বিবিধ ব্যয়	—	৩০০ "
সঙ্গীত বাবদ	—	৪৫০ "
জরুরী প্রয়োজনার্থে মজুত	—	২০০০ "

অঙ্কগুলি যোগ করলে দেখা যায় তার পরিমাণ ছ হাজার আট শো পাউণ্ড। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের কোন মঞ্চে নাটক প্রযোজনা করতে যিনি অগ্রণী হবেন তাঁর হাতে তখন অন্তত: সাত হাজার পাউণ্ড থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সংবাদবিচিত্রা

প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক তপন সিংহ আগামী সেপ্টেম্বারের শেষ ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করবেন বলে জানা গেল। দীর্ঘকাল আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুমাস তিনি য্যামেরিকায় থাকবেন এবং তাঁর পরিচালিত দু'খানি ছবি য্যামেরিকায় প্রদর্শিত হবে। প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীসিংহ ইণ্ডো-য্যামেরিকান সোসাইটির মোশান পিকচার কমিটির চেয়ারম্যান।

ভারত সরকার বোম্বাইয়ের ফিল্ম য্যাডভাইসারি বোর্ডের কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠন সাধিত করেছেন বলে এই মর্মে ১১ই ফেব্রুয়ারির ইণ্ডিয়া গেজেটের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে। এই নবগঠিত কমিটির সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সার্সের রেজিক্যাল অফিসার (পদাধিকারবলে) এম, এ, রাজাক, ডি, এন, মার্শাল, ডা: ডি, জি, ব্যাস, জি, সি, ব্যানার্জী, ধি, ডি, ভারুচা, ডা: ডি, ভি, বল এবং শ্রীমতী লীলা যোগ, বোম্বাইস্থিত সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সার্সের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে এই কমিটিরও চেয়ারম্যানরূপে মনোনীত হয়েছেন।

উড়িষ্যা মোশান পিকচার্স য্যাসোসিয়েশান এবং উড়িষ্যা সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায় স্থির হয়েছে যে ভুবনেশ্বরে নির্মীয়মান ষ্টুডিওগুলির স্বত্বাধিকারী হবেন সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই। জানা গেল যে ষ্টুডিওগুলির অর্ধাংশের স্বত্বাধিকারী থাকবেন সরকার এবং অর্ধাংশের স্বত্ব উপভোগ করবেন জনসাধারণ।

ব্রিটেনের গ্রানাডা টেলিভিসন কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে টেলিভিসনের মাধ্যমে চারখানি ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য চিত্র দর্শক সাধারণ্যে উপহার দিয়েছেন। এই উপলক্ষে একদল কলাকুশলী ভারতে আসেন এবং সাড়ে চার হাজার মাইল ঘুরে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। চারখানির মধ্যে প্রথমটি কলকাতার আধুনিক জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছে। ছবিটি গত ২৩শে জানুয়ারী প্রদর্শিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি গৃহীত হয়েছে ভারতীয় শিক্ষাধারাকে তৃতীয়টি বর্তমানযুগের ভারতীয় গ্রাম এবং চতুর্থটি ভারতে নানাধর্মের সমন্বয় এবং বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে।

নয়াদিল্লী থেকে জানা গেল যে চাইল্ড ফিল্ম সোসাইটির উদ্দেশে ধর্মগুরু পোপ এক বাণী প্রেরণ করেছেন। পোপ বলেছেন—যে "এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টা নি:সন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং এঁদের প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করুক এই কামনা আমি সর্বান্তঃকরণে করি।"

স্যার উইনষ্টন চার্চিলের অভিনেত্রীকন্যা সারা চার্চিল (৪৭) কবি হিসেবেও সুনামের অধিকারিণী। বর্তমানে তিনি রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন বলে জানা গেল। এ-উপলক্ষে সারা তাঁর নিজস্ব নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেছেন জেরোম ষ্টেজ য্যাণ্ড স্ক্রীণ প্রোডাকসানস লিমিটেড। তাঁর পরিচালক প্যাট্রিক ডেসমণ্ড জানিয়েছেন—আমি মনে করি সারা এক আশ্চর্য প্রতিভা এবং আমার কাছে সারা সবদিক দিয়ে অতুলনীয়া তাঁর পরিকল্পনা সার্থক হলে মঞ্চশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে সারা এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের একটি প্রসিদ্ধ রচনাকেই নাট্যরূপ দিয়ে চলেছেন তবে এখন আমি লেখক বা তাঁর রচনার কোনটিরই নাম প্রকাশ করব না। সারার সঙ্গে প্যাট্রিকের পরিচয় হয় দু'বছর আগে।

সুন্দরী ক্লিওপেট্রার জীবনকাহিনী অবলম্বন করে যে চলচ্চিত্র গড়ে উঠছে সে সংবাদ ইতোমধ্যেই সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য সে সংবাদটি সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ছবিটির মুখ্য আকর্ষণ নাম ভূমিকায় দেখা যাবে সুন্দরী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলারকে (গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী যিনি উনত্রিশ বছর পূর্ণ করে তিরিশে পদার্পণ করলেন)। ছবিটিকে নির্মাণকালে কিন্তু নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একাধিক সমস্যা তার গঠনকার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পরিচালক-সমস্যা সেগুলির অন্যতম। বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে একটি সংবাদ ঘোষিত হয়েছে যে ছবিটির নতুন পরিচালকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন জোসেফ ম্যানকিউই। "সাডেনলি লাষ্ট সামার" ছবিটিও ইনিই পরিচালনা করেছিলেন এবং এলিজাবেথ টেলারও এই ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন।

য্যাকাডেমী পুরস্কারবিজয়ী 'বেন হুর' ছবিটি দর্শকসমাজে যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, আশা করি, সে বিষয়ে এদেশীয় দর্শকরাও পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এই ছবির নায়িকা এস্থারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হায়া হারারীত। হায়া ইস্রায়েলের মেয়ে। ইস্রায়েলেও এই ছবি মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকচিত্ত জয় করে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। 'বেন-হুরের' নায়িকা-চরিত্রের নামানুসারে এখানকার একটি প্রধান প্রেক্ষাগৃহের নাম রাখা হয়েছে 'এস্থার'। ছবিটি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, এই ঘটনাই তার প্রধান সাক্ষ্য।

অন্তর্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) : নয়াদিল্লীতে পূর্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের দাবী—'বিভেদমূলক মনোভাব ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম দিতে হইবে।'

দণ্ডকারণ্যে না গেলে ডোল বন্ধ—পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী আরও ৩৭২টি উদ্বাস্তু পরিবারের উপর সরকারী নোটিশ জারী।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) : 'কানাডা-ভারত পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর ভারতের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ'—ট্রম্বেতে আণবিক রি-অ্যাক্টরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) : ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চল বিনিময়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন—ফিরোজপুর জেলা সমান্তরাল ১২৬ মাইল দীর্ঘ সীমারেখার রদবদলের সহিত মোট ১০৩টি গ্রাম জড়িত।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) : 'সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই'র উক্তিতে (ভারত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের জন্য চীনের সহিত বিরোধ জাগাইয়া রাখিয়াছে এইরূপ উক্তি) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ক্ষোভ—পাকিস্তানের সহিত চীনের সীমান্ত আলোচনার প্রস্তাবেও বিরক্তি প্রকাশ।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) : বর্দ্ধমানের কালনা মহকুমাভুক্ত একটি গ্রামে পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত ও ২ জন আহত—পুলিশের সহিত সশস্ত্র কৃষক জনতার সংঘর্ষ।

এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত কাঠামো নির্দ্ধারণ—খসড়া পরিকল্পনায় মোট ৭৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) : রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (৩৪১ কোটি টাকা) লক্ষ্য স্থির রাখা হইবে—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) : ভারত সফর উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ (ডিউক অব্ এডিনবরা) সহ নয়াদিল্লী আগমন—পালাম বিমান-ঘাঁটিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে প্রায় ১৫ লক্ষ নর-নারীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) : কলিকাতার আকাশে কুড়ি বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব পঙ্গপাল বাহিনী—তিন ঘণ্টা অবস্থানের পর আকাশপথেই পশ্চিম দিকে প্রস্থান।

বর্দ্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত—কয়েকটি জরুরী প্রস্তাব গ্রহণ—শ্রীজ্যোতি বসুর স্থলে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) : দেশের সর্বত্র সাড়ম্বরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৫তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন—কলিকাতার ময়দানে বিরাট গণসমাবেশে কুমারী অনীতা বসুর (নেতাজী-কন্যা) ভাষণদান।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) : নাগাভূমির জন্য নূতন প্রশাসনিক সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক নাগাভূমি নিয়ন্ত্রণ আইন জারী।

'প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণের কোন অভিপ্রায়ই এই মুহূর্ত্তে নাই—নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর উক্তি।'

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) : ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত—প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅমলকুমার শাহর পদ্মশ্রী উপাধি লাভ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) : ২৫ লক্ষাধিক নর-নারী সমাবেশে রাজধানীতে (নয়াদিল্লী) সাড়ম্বরে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একাদশ বার্ষিকী পালন—ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপসহ রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন—কলিকাতায় প্রাণহীন পরিবেশে প্রজাতন্ত্র বার্ষিকী উদ্‌যাপন।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) : বর্ত্তমান বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাধিক পরিমাণ চাউলের (৫৩,৭৬,২৫৯ টন) উৎপাদন হইয়াছে—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন সচিব শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ঘোষণা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) : কেরাণী সৃষ্টির বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি কঠোর কটাক্ষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তের মন্তব্য।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) : শিবসাগর নাগা পাহাড় সীমান্তে নাগাদের আক্রমণের সংবাদ—গুলীবর্ষণে ১জন সীমান্ত রক্ষী সৈন্য নিহত ও দুই জন আহত।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) : পাক্ প্ররোচনায় ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র—আম্বালায় অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্ত্তৃক তিন জন আসামীর সাত বৎসর এবং একজনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

চীনা মানচিত্রে ভূটানের তিন শত বর্গমাইল স্থান দাবী—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে ভূটানের মহারাজার ক্ষোভ প্রকাশ।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের (৭৪ বৎসর) পরলোক গমন।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : রাজ্যপালের (শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) ভাষণকালে বিরোধী পক্ষ কর্ত্তৃক আইন সভায় (পশ্চিমবঙ্গ)

যুক্ত'বৈঠক বর্জন—বেরুবাড়ী সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদে তুমুল বিক্ষোভের সূচনা।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুইটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ—বেরুবাড়ী সম্পর্কে মন্ত্রিসভার ভূমিকায় বিরোধী সদস্যদের বিক্ষোভের দ্বিতীয় পর্যায়।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী): আয়ুর্বেদের প্রসারে নগণ্য সরকারী প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজ্য আয়ুর্বেদ বিলের কঠোর সমালোচনা।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী): জব্বলপুর সহরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ—পাশবিক অত্যাচারের ফলে কলেজের ছাত্রীর (হিন্দু) মৃত্যুর জের—হাঙ্গামা দমনে সৈন্যবাহিনী তলব।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী): আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা দাবী—করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা গণ-সম্মেলনের প্রস্তাব।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের চরম ব্যর্থতা—বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণের কঠোর সমালোচনা।

২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী): প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক দিল্লীতে চতুর্দ্দশ বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনের উদ্বোধন—শতাধিক দেশ হইতে পর্য্যবেক্ষক ও প্রতিনিধি দলের যোগদান।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী): জব্বলপুরে পুনরায় হাঙ্গামা ও পুলিশের গুলীবর্ষণ—এযাবৎ ১৭ জন নিহত ও ৪০ জন আহত।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): ফরাক্কায় বহু আকাঙ্ক্ষিত গঙ্গা ব্যারেজের কাজ আরম্ভ—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তরে বিধান সভায় রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) সেচ-সচিব শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): বিধান সভায়পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের অনাস্থা প্রস্তাব ১৫৩-৭৯ ভোটে অগ্রাহ্য।

দশ লক্ষ গণনাকারীর সহায়তায় দেশব্যাপী (ভারত) লোকগণনা আরম্ভ—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-সচিবকে দিয়া আদমসুমারীর কাজ সুরু।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে ভূপালে বস্তারের মহারাজাকে (প্রবীণচন্দ্র ভঞ্জ দেও) গ্রেপ্তার—আপত্তিকর কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া মধ্যপ্রদেশ সরকারের অভিযোগ।

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): জম্মু ও কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব চীন কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য—সীমান্ত সম্পর্কে চীন-ভারত কর্ম্মচারী পর্য্যায়ের আলোচনার বিবরণ প্রকাশ।

বহির্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী): নিউইয়র্ক উপকূলের অনতিদূরে মার্কিণ ভাসমান রাডার ঘাঁটি 'টকসাস টাওয়ার' নিমজ্জিত—ঝড়ের মুখে দুর্ঘটনায় ২৭ জন কর্ম্মীর সলিল সমাধি।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী): আমেরিকার বাজেটের শতকরা ৫৮ ভাগ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কর্ত্তৃক মার্কিণ কংগ্রেসে বাজেট (১৯৬১-৬২) পেশ।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী): কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট কাসাবুবুর অনুরোধে আটক বন্দী মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা (প্রাক্তন কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী) থিসেভিলে শিবির হইতে এলিজাবেথভিলে স্থানান্তরিত।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী): বিশ্বশান্তির জন্য নূতন যৌথ উদ্যম চালাইবার ব্যাকুল আহ্বান—কমুনিষ্ট শক্তিবর্গের নিকট সদ্যক্ষমতাপ্রাপ্ত মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির অনুরোধ জ্ঞাপন।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী): সিংহলের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশে তামিল ভাষাভাষীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—সরকারী ভাষা হিসাবে সিংহলী ভাষার প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদ।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী): ক্যারবিয়ান সাগরে পর্ত্তুগীজ জাহাজ 'স্যান্টামেরিয়া'য় বিদ্রোহ—গতিরোধ করার জন্য সশস্ত্র মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার প্রেরিত।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী): 'চোরাকারবারী ও মুনাফা-শিকারীদের নির্ব্বাসিত করা হইবে'—পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খানের সতর্কবাণী।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী): কঙ্গোর ওরিয়েণ্টেল ও কিভু প্রদেশ অবিলম্বে ছাড়িয়া আসিতে ফরাসী, বেলজিয়ান ও ডাচ বাসিন্দাদের প্রতি স্ব স্ব সরকারের নির্দ্দেশ।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী): নূতন মার্কিণ প্রেঃ জন কেনেডির সহিত রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের 'শীর্ষ বৈঠক' নিশ্চিত—মার্চ্চ মাসে সোভিয়েট সরকার পুনরায় রাষ্ট্রসংঘে উপস্থিতির সম্ভাবনা।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী): লাওসে প্যাথেট লাও দলের সহযোগিতায় সরকারী বাহিনীর সাফল্য—প্রতিবিপ্লবীদের হাত হইতে আর একটি অঞ্চল (হিয়েন পোমট) উদ্ধার।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী): করাচীতে ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপ—বিমানঘাঁটিতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী): সিংহলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ—বিনা ক্ষতিপূরণে দখলের সরকারী বিল পাশ।

ব্রাজিল সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক স্যান্টামেরিয়া জাহাজ দখলের সংবাদ।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী): অতিকায় সোভিয়েট স্প্যুটনিককে মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণের সংবাদ—উৎক্ষিপ্ত স্প্যুটনিক হইতে মনুষ্য কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়ার দাবী।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী): 'যতদিন প্রয়োজন বিদেশে মার্কিণ সৈন্য রাখা হইবে'—নূতন মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির ঘোষণা।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): কঙ্গোতে ইলিও'র নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত—প্রেসিডেন্ট কাসাবুবুর ঘোষণা।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): দুই জন সহকর্ম্মী সহ কঙ্গোর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বার বন্দীশিবির হইতে পলায়ন—কাটাঙ্গা সরকারের প্রাথমিক ঘোষণা।

ভূমধ্যসাগরের উপর সোভিয়েট প্রেসিডেন্টের (মঃ ব্রেজনেভ) বিমানের দিকে ফরাসী জেট বিমানের গুলীবর্ষণ—ফ্রান্সের নিকট রুশ সরকারের তীব্র প্রতিবাদ।

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক শুক্রে আন্তঃগ্রহ রকেট উৎক্ষেপ—মহাকাশ বিজয়ের পথে আর এক দফা বিস্ময়কর অগ্রগতি।

দিল্লী Vs. করাচী

"আয়ুব খাঁন গর্ব্বোদ্ধতভাবে বলিয়াছেন—পাকিস্তান তথায় সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু—(১) খুলনায় ও দৌলতপুরে যাহারা নিহত হইয়াছে ও যাহাদিগের গৃহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে, তাহারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? (২) করাচীতে স্বামী নারায়ণের মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু— (ক) গুরু নানক-মন্দিরে দুর্ব্বৃত্তরা সব জিনিষ নষ্ট করিয়াছে। (খ) ঐ স্থানে আরও কতকগুলি গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের সংবাদদাতার গৃহ আক্রান্ত ও সংবাদদাতা আহত হইয়াছেন। আহত সাংবাদিককে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। (গ) আক্রান্ত গৃহগুলির মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত ও অন্যান্য দ্রব্য নষ্ট করা হইয়াছে। (ঘ) একটি গৃহে মহিলারা ও বালকবালিকারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে "ভেণ্টিলেটারপথে" ঘরে জ্বলন্ত নেকড়া ফেলিয়া তাহাদিগকে দ্বার খুলিতে বাধ্য করা হয় এবং তাহাদিগের সব মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করা হইয়াছে। ইহাই যদি পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ রক্ষার নমুনা হয়, তবে সে সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলাই ভাল। অবশ্য তুলনায় সমালোচনা করার কোন কারণ বা সার্থকতা নাই। তবে আমরা পণ্ডিত জওহরলালকে বলিব—সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত করিয়া (অথচ ঐ হিসাবে অধিবাসী বিনিময়ে অসম্মত হইয়া)—জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিয়া লইয়া—তোষণনীতির দ্বারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। আজ যে তিনি করাচীর ব্যাপারের গুরুত্ব হ্রাস চেষ্টায় তাহা প্রতিক্রিয়া বলিতেছেন, তাহারই বা কারণ কি? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়—ক্রিয়া বন্ধ না করিতে পারিলে প্রতিক্রিয়া কিরূপে রোধ করা সম্ভব হইতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে আবার উপদ্রব দেখা দিয়াছে। কবে যে তাহা নিবৃত্ত হইবে, তাহাই বলা দুষ্কর।"

—দৈনিক বসুমতী।

অদ্ভুত বাজেট

"তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে অতিরিক্ত কর দ্বারা ১৬৫০ কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১১০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অর্থসচিবকে বার্ষিক গড়ে ২২০ কোটি টাকা নূতন কর আদায় করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে তিনি এবার ৬১ কোটি টাকারও কম করভার বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার কারণ দ্বিবিধ। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের রাজভাগ শেষ তিন বৎসরে ব্যয় করার কথা; সুতরাং ১৯৬২-৬৩ সাল পর্য্যন্ত ততটা দুশ্চিন্তা নাই। দ্বিতীয়তঃ আগামী বৎসর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে জনসাধারণের উপর নূতন করের দুর্বহ বোঝা চাপাইয়া কোন সরকারই ভোটদাতাদিগের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে চাহেন না। এই কারণেই অর্থসচিব এবার ছিটেফোঁটা কর বৃদ্ধির পর ক্ষান্তি দিয়াছেন। নির্বাচনপর্ব শেষ হওয়ার পর করদাতাগণ ভবিষ্যৎ কর প্রস্তাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

—যুগান্তর।

কারচুপি

"মাত্র জনকয়েকের অভিযোগ নহে—বহু জনের। মাত্র কয়েকটি এলাকার ঘটনা নহে—নানা স্থানের। ভুরি ভুরি বিবরণ ও প্রমাণাদি

প্রতিদিন আসিয়া জমা হইতেছে, সংবাদপত্রে তাহার সামান্যই বাহির হয়, যৎসামান্যই ধরে। গত বৎসর হাঙ্গামার প্রথম পর্বে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনা একটি বৃহৎ সর্বনাশ ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাস দিয়াছে এবং পরে যখন সমস্তটাই প্রকটিত হইয়া পড়িল, তখন দেখা গেল আমাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সেই লজ্জাকর অধ্যায়ের জের আজও মেটে নাই। তাহার স্মৃতি আছে, আসামের নানা জনপদের বিধ্বস্ত কুটিরে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরে শিবিরে। ইতিমধ্যে আবার নূতন এক জটিলতা দেখা দিয়াছে। আদমসুমারি প্রায় শেষ হইতে চলিল, কিন্তু প্রাপ্ত বিবরণ হইতে আশঙ্কা হয়, ন্যায়ের মর্যাদা সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কারচুপি চলিয়াছে। অতীতে ভারতের প্রান্তবর্তী এই রাজ্যে অসমীয়াভাষীদের অদৃষ্টে জুটিয়াছে নিগ্রহ। তাহাদের বর্তমান বিড়ম্বিত: বাকী যেটুকু ছিল, লোকগণনায় এই দশসালা বন্দোবস্তের কল্যাণে তাহা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ১৯৫১ সনের আদমসুমারির রিপোর্টের প্রসাদে অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ হইতে উনপঞ্চাশ লক্ষের মগ্‌ডালে লাফ দিয়াছিল। এবার বুঝিবা আকাশ স্পর্শ করে! তা করুক, যাহারও শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা কাতর নহি, তবে অনসমীয়াভাষীদের কী দশা ঘটিবে তাহা লইয়া ভাবনার কারণ আছে বটে। মরিয়াও যাহারা মরে নাই, ভিটামাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, এবার প্রমাণাভাবেই তাহারা নিতান্ত অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহাই সাংখ্যতন্ত্র—অর্থাৎ সাংখ্যতন্ত্রের নব্য সংস্করণ, কিন্তু ইহার মধ্যে ন্যায় বা নীতি বলিয়া কিছু নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব কী—কোন অভিযোগই তো তাঁহাদের অগোচর থাকার কথা নয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নেহেরু ও U. N. O.

"হ্যামারশিল্ডকে শ্রীনেহরুর অহেতুক সমর্থন ভারতের মানুষকে শুধু বিস্মিত নয়, ক্ষুব্ধ না করিয়া পারে না। কারণ এই হ্যামারশল্ড শ্রীদয়ালের রিপোর্টগুলিকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সবাই জানে শ্রীদয়ালের ভূমিকা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল। সেই দয়ালের রিপোর্টগুলিও যদি মার্কিণ অনুচর হ্যামারশল্ড অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আপরাধের মাত্রা কি। তাহারপরও এই ব্যক্তিটিকে সমর্থন করিতেই হইবে? কেন, কী এমন দায় পড়িল। লুমুম্বাকে রক্ষা করিয়া লুমুম্বার স্মৃতি এবং কঙ্গোর স্বাধীনতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা যায় না। নিরস্ত্রীকরণের কথা যে ভাবে শ্রীনেহরু টানিয়া আনিয়াছেন তাহা আরো হাস্যকর। জাতিসঙ্ঘকে মার্কিণ কবল হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্গঠন করিতে পারিলেই বিশ্বশান্তিরক্ষা এবং নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রাম অগ্রসর হইতে পারে। বর্তমান দুনিয়ায় যে সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির তিন প্রকারের রাষ্ট্রগোষ্ঠী রহিয়াছে জাতিসঙ্ঘের পরিচালনায় তাহাদের প্রত্যেকের সমান

অধিকার থাকিলে ভারতের মত দেশেরই তো সুযোগ এবং সুবিধা বাড়িবে। শ্রীনেহরু জাতিসঙ্ঘ হইতে ফিরিয়া নিজেও পুনর্গঠনের একটা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন কেন দ্বিধা এবং আশঙ্কা। জাতিসঙ্ঘের পরিচালনায় তিন রাষ্ট্রগোষ্ঠির সমান অধিকার থাকিলে আজ কঙ্গোর সমস্যা সমাধানে কতক্ষণ সময় লাগে? জাতিসঙ্ঘের সেই সাংগঠনিক রূপ থাকিলে আজ লুমুম্বাকেও প্রাণ দিতে হইত না এবং কঙ্গোর স্বাধীনতা এবং বিশ্বশান্তিও আজ এমনভাবে বিপন্ন হইতে পারিত না।" —স্বাধীনতা।

আয়ুব খাঁর প্রতিবাদ

"জব্বলপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আয়ুব খাঁর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ মধ্যপ্রদেশের একজন মুসলমান নেতা করিয়াছেন। লোকসভাতেও একজন মুসলমান সদস্য জব্বলপুরের ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা এই হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী। উভয়েই একটি জায়গায় পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। যে মুসলমান নরপশু দুইটার অপরাধ এই ঘটনার জন্য দায়ী তাহাদের নিন্দা একজনও করেন নাই। বিচারে অপরাধী প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকে নিরপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—এই নীতিবাক্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। জুরীর বিচার বলিয়া একটি বস্তু আছে এবং সেই জুরীর সংখ্যা এবং বিচারক্ষেত্র সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। যে পশু দুইটার কাহিনী সারা ভারতের লোক জানিয়াছে, জব্বলপুরের ছাত্র প্রতিনিধিগণকে হাজতের সামনে নিয়া গিয়া যে জানোয়ারদের দেখানো হইয়াছে, আদালতে তাহাদের বিচারের আগেই সমাজ দণ্ড দিতে পারে। যে সমাজ এত বড় জঘন্য অপরাধীদের নিন্দায় কুণ্ঠা বোধ করে, সেই সমাজের উপর সকলের বিশ্বাস টলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। মুসলিম সমাজের উপর যে অবিশ্বাস দীর্ঘদিন যাবৎ সঙ্গত কারণে পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা দূর করা সহজ নয় ইহা ঠিক, কিন্তু তার আন্তরিক চেষ্টা দেখিলে হিন্দু সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আবার বিশ্বাস করিবে। ইন্দো-মুসলিম সম্পর্কে ইতিহাসে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে যে, হিন্দু প্রশান্ত মহাসাগরের মতোই উদার।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

পৌরনির্ব্বাচন

"পৌরসভার আগামী নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন দলের সাথে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমস্ত বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা প্রায় সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। সত্যি যদি সে চেষ্টা সার্থক হয়, তবে পৌর এলেকার চারটি ওয়ার্ডেই বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী দলের পরাজয় সুনিশ্চিত প্রায়। সম্মিলিত বিরোধী শক্তির প্রায় নিশ্চিত জয়ের উজ্জল সম্ভাবনার লক্ষণ দেখিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠি বা ব্যক্তিরা পৌরক্ষমতা দখলের আশায় প্রয়োজন ও ক্ষমতারিক্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবিলে বিরোধী শক্তির ঐক্যের পক্ষে এই ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থই সবচেয়ে বড় বাধা হইবে। বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের পৌরসভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস, একদিকে পৌরবাসীর সুবিধাদানে অক্ষমতা, ব্যর্থতা আর ঔদাসীন্য, আর একদিকে ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রয়োজনে পৌরক্ষমতা, অর্থ, সম্পত্তি ও কর্ম্মচারীর জঘন্য অপব্যবহার, অপব্যয় আর অপচয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই সাধারণ নাগরিক ও করদাতারা পৌরকর্তৃত্ব পরিবর্ত্তনের জন্য আগ্রহশীল। জনগণের এই আগ্রহ উপলব্ধি করিয়া বিরোধী শক্তিসমূহ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে মাত্রাহীন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিলে জনগণ কখনই তাহা সহ্য করিবে না। বর্ত্তমানে পৌর কর্তৃত্ব অধিকারী কংগ্রেস দলের অক্ষমতা সম্পর্কে জনগণের মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু শুধুমাত্র পরিবর্ত্তনের খাতিরে ক্ষমতা বদলকেও জনগণ সামান্যতম মূল্য দিবেন না। সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী নাগরিকদের সামনে পেশ করিয়া ক্ষমতা পরিবর্ত্তনের কথা বলিলে নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিবে।" —বীরভূম।

শিক্ষায় ব্রাহ্মস্পর্শ

"উচ্চতর শিক্ষা কাহারা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন, তাহা বিবেচনার সময় কেবলমাত্র কোন্ বিভাগে কে উত্তীর্ণ হইলেন তাহাই বিবেচ্য হওয়াও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। উচ্চতর কোন্ শিক্ষা শিক্ষার্থী লাভ করিতে চান তাহাতে যে যে বিষয় শিক্ষণীয় হইবে সেই সেই বিষয়ে শিক্ষার্থী কিরূপ নম্বর পাইয়াছেন, তার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত বলিয়া মনে হয়। বিভাগ নির্ভর করে গড়পড়তা সকল বিষয়ের নম্বরের উপর, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সেই গড়পড়তা নম্বরের উপর যে বিভাগ, তার উপর কম গুরুত্ব দিয়া বিষয় নির্ব্বাচনের উপর গুরুত্ব দিলে ভাল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি যে মুখ্য দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা হইল মানুষ গড়িয়া তোলার শিক্ষা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণের সময় হইতে ইট চূণ সুরকী ইত্যাদি আমদানী করিয়া যথেষ্ট বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা মিথ্যা নয়, বইয়ের বোঝা একান্ত অসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাও অনস্বীকার্য্য, মানুষ গড়িয়া তোলার শিক্ষক ও শিক্ষণ ব্যবস্থা যাহা মুখ্য হওয়া উচিত ছিল তার উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। যতদিন ইহা উপেক্ষিত থাকিবে ততদিন দেশে যথার্থ শিক্ষিত নাগরিক মোটেই মিলিবে না। দেশকে বিবেকানন্দের যুগে যাইতে হইবে, যদি কল্যাণ কাম্য হয় শিক্ষার মাধ্যমে।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শিক্ষালয়

"বাংলা দেশে একটি কথা আছে—'আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল' অর্থাৎ ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে গেলে এই দাঁড়ায়, বাড়ীতে চাষের সমস্ত প্রকার সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও যে চাষ করে না তাহার দুঃখ কোন দিনই দূর হয় না। আমাদের মহকুমার সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুইটি রাজ কলেজ ও বিনোদমঞ্জরী বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। প্রকাণ্ড বাড়ী, সাজ-সরঞ্জাম, অর্থ, অধ্যাপক সব কিছুই আছে। নাই কেবল প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ। এই সংখ্যায় ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যক্ষের নিকট স্থানীয় ব্যক্তিদের যে ডেপুটেশন গিয়াছিল সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল। এক বিরাট মহকুমার উচ্চশিক্ষার সুযোগ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে মহকুমার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ সুবিধার অভাবে সাধারণ পাশ কোর্সে ডিগ্রী লাভ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকার করিতেছে। মহকুমা বিদ্যালয়গুলিতে হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে 'কৃষি' দেওয়া হইতেছে,

অথচ ঝাড়গ্রামের কলেজ হইতে 'কৃষি' তুলিয়া দেওয়া হইল। কমার্সের ব্যবস্থা নাই, হইবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে আর্টস, সায়েন্সের সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা কোন রকমে অশিক্ষিত নামটা দূর করিতে পারে এই কলেজের মাধ্যমে তাহার বেশী নয়। বিনোদমঞ্জরীরও সেই অবস্থা। হাইয়ার সেকেণ্ডারী, কিন্তু সায়েন্সের বালাই নাই মহকুমার ছাত্রীদের বিশেষ কোন বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহকুমার সহর ছাড়া অন্য কোথাও পৃথক বালিকা-বিদ্যালয় নাই। মফঃস্বল অঞ্চলের বহু অভিভাবক হোষ্টেলের স্থানের অভাবে তাহাদের মেয়েদের পড়াইতে পারিতেছে না।"

—নির্ভীক।

অনাহারে মৃত্যু

"পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার আলোচনা কালে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে দুইটি পরিকল্পনার শেষেও রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি, জিনিষ অগ্নিমূল্য, চোরাকারবার ও বেকার সমস্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব অভিযোগের উত্তরে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে—এই রাজ্যে অনাহারে একটি লোকেরও মৃত্যু হইয়াছে এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। তিনি কি পুত্রহন্তা পিতার বিচারে হাইকোর্টের বিচারপতির মন্তব্য শোনেন নাই কিম্বা পাঠ করেন নাই? অবশ্য খাদ্যমন্ত্রী সকল সময় এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন।" —জনমত (জলপাইগুড়ি)

ক্যানেল কর

"বর্দ্ধমান জেলার চাষীদের উপর থেকে কি হারে ক্যানেল কর আদায় করা হইবে, তাহা লইয়া মতভেদের দরুণ তিন বছর যাবৎ ক্যানেল কর আদায় স্থগিত আছে। একর-প্রতি ৫৲ টাকা হারে জলকর দিতে কৃষক সাধারণ সম্মত আছে। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ ৭৷৷৹ টাকা হইতে ১২৷৷৹ টাকা পর্য্যন্ত উচ্চ হারে কর ধার্য্য করিতে নাকি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ যেন ভাঙ্‌বে, তবু মচকাবে না।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

দায়িত্ব কাহার?

"মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবসে দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, দেশ স্বাধীন হইবার পর লাটসাহেবের দিন গত হইলেও জনসাধারণের ইংরাজ আমলের ন্যায় অফিসারদের লাটসাহেব জ্ঞানের অভ্যাস যায় নাই এবং দেশের মালিক হইয়াও প্রত্যেক ব্যাপারেই তাদের অফিসারদের নিকট দরবার করিতে দেখা যায়। এই অভ্যাসের মধ্যে পণ্ডিতজী গণতন্ত্রের সঙ্কটেরও সন্ধান পাইয়াছেন। গণতন্ত্রের পক্ষে আত্মবিশ্বাসের অভাব যে বিপজ্জনক এই সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রশ্ন হইল তের বৎসর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কেন আজ এই সঙ্কট, পণ্ডিতজী কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ইহা ভবিষ্যৎ ভারতের আশার চিত্র নয়, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইংরাজ শাসন নাই কিন্তু কায়া না থাকিলেও আইন কানুনের মধ্যে ছায়া এখনও বিরাজ করিতেছে। অফিসারদের নিকট যাহারা ধর্ণা দিয়া থাকে তাহারা সখ করিয়া দেয় না, অবস্থার চাপেই দিতে হয়। এখনও বহু নিয়োগে গেজেটেড অফিসারের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে না পারিলে চাকুরির যোগ্যতা থাকিলেও দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় না। এই প্রশংসাপত্র সংগ্রহে কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই ভাল করিয়া জানে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের এমন ব্যবস্থাও আছে যাহার ফলে অফিসারদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া জনসাধারণের অন্য উপায় থাকে না। নির্ব্বাচনের সময় দেশের মালিকানা বিভিন্ন দলের প্রচারপত্রে জনসাধারণের থাকিলেও ভোটের পর তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু ভোটের অধিকার দান করিলেই গণতন্ত্র হয় না। সেই অধিকার রক্ষার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা না হইলে গণচেতনা আসিবে কোথা হইতে?"

—সমাধান (হুগলী)।

বিদ্যালয়ের সেসন

"বর্ত্তমান বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই এবার বিদ্যালয়গুলির সেসন আরম্ভ হইতেছে। কিছু কিছু উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ফল ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কতকগুলি বিদ্যালয় এই মাসের শেষের দিক হইতে স্কুলের পড়া সুরু করিতেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইয়াছে প্রাথমিক ছাত্রেরাও এখন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্ত্তি হইবে। কাজেই সামগ্রিকভাবে স্কুলের সেসন ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই সুরু হইতেছে। এখন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের পালা। এ সময় নূতন পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ে সাধারণের আর্থিক দুর্গতির সীমা থাকে না। স্কুলগুলিতে যাহাতে অযথাভাবে পাঠ্যপুস্তকগুলি পরিবর্ত্তন করা না হয় সে বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।" —নীহার (কাঁথি)।

ডাঃ রায়ের সই চাই

"সিউড়ী 'টাউনহলে' সুরেন বাবুর প্রতিকৃতি উন্মোচনকালে ডাঃ রায় জনৈকা মহিলাকে তাঁহার স্বাক্ষর দান করেন। কিন্তু জনৈক ছাত্র উক্ত বিষয়ে বঞ্চিত হন। ডাঃ রায় বলেন, মহিলাটি গান গাহিয়াছিল তুমি গান জান? উক্ত প্রশ্নে ছাত্রটি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। এবার সরস্বতী পূজায় যে সব গান শুনিয়াছি তাহারই একটি গান উক্ত ছাত্রটির গাওয়া উচিত ছিল।" —বীরভূমবার্ত্তা।

কয়লা কাঁহা মিলি

"কিছুদিন হইতে এখানে জ্বালানী কয়লার বিশেষ অভাব হইয়াছে। কোন ডিলারের ডিপোতে এক ওয়াগন কয়লা আসিলেই খরিদ্দারের ভিড়ে নিরীহ জনগণের ও পর্দানশীন মহিলাগণের উহা

সংগ্রহ করা ভীষণ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। জ্বালানী অভাবে বহু লোকের দু'বেলা রান্না হইতেছে না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বণ্টন বিষয়ে অটল। প্রত্যেক ডিপোর মালিককে বলিতে শোনা যায় যে ১০০ মণ রিজার্ভ রাখিয়া বিক্রয় করিবার হুকুম আছে। দিন কয়েকের মধ্যেই উক্ত রিজার্ভ ষ্টক কোথায় উড়িয়া যায় তাহার পাত্তা পাওয়া যায় না। নাই নাই-এর বাজারে কয়লার গুঁড়া ত দূরের কথা ডিপোর আধ হাত মাটি ও ঘর ভাঙ্গা রাবিশ মাটিও নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে—

"হাস কাঁস সুত্তা পাত্তা
মিছরী ভাও বিকায়।"

অর্থ—মিছরীর মধ্যে সুতো, কাঁস ও পাতার টুকরা থাকে, তাহাও মিছরীর দরে বিক্রয় হয়।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

বিদেশীদের জন্য ভিসা মঞ্জুর

"গত বৎসর নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে প্রবেশের জন্য ২৬,৩৪১ জন বিদেশীকে ভিসা মঞ্জুর করা হয়। উহাদের মধ্যে ১৩৯১০ জন পর্য্যটক, ২৯০৬ জন ব্যবসায়ী ও ১৭৬৯ জন ছাত্র। বিদেশীদের মধ্যে ১১,১৯৭ জন মার্কিণ, ৭৪০ জন আফগান, ১৪৫২ জন ফরাসী, ১০৬৮ জন ইতালীয়, ৫২৭ জন ইরাণী, ৪৩৭ জন পর্তুগীজ, ৭৫১ জন রুশ ৫৬১ জন সুইস ও ৫৩৪ জন থাই। ১৯২০ সালের ভারতীয় পাশপোর্ট আইন ও উহার অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী অনুসারে ভারতে প্রবেশার্থী সকল ব্যক্তিকে ভারতের জন্য বৈধ পাশপোর্টে ও ভিসা ও ট্রানসিট ভিসা সঙ্গে রাখতে হয়। পাকিস্তানের ও সিংহলের নাগরিক এবং মিশনারি ও আয়র্ল্যাণ্ডের নাগরিক ছাড়া কমনওয়েলথভুক্ত সকল দেশের নাগরিকের সঙ্গে ভারতে প্রবেশের বৈধ পাশপোর্ট থাকিলে তাঁহাদের ভিসা প্রয়োজন হইবে না।"

—গণরাজ (আগরতলা)

শোক-সংবাদ

মায়া রায়

বাঙলার যশস্বী অভিনেত্রী শ্রীমতী মায়া রায় গত ২রা মাঘ রাঁচী সেন্ট্রাল নার্সিংহোমে ৬০ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম জন—যিনি অভিনেত্রী হিসেবে রূপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। অভিনয়শিল্পী হিসেবে ইনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারিণী হন এবং মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নটীর পূজা এবং মায়ার খেলায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও চিত্রপরিচালক শ্রীযুক্ত চারু রায়ের সহধর্মিণী।

মাসিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

২। প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম—মেড়িয়া। পোঃ—আকনা। জেলা—হুগলী

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—প্রাণতোষ ঘটক। ভারতীয় নাগরিক। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯।

৫। মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। ২৫।৪এ, অনাথ দেব লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-৩৭। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯। কুমারী প্রণতি দেবী। ২৫।৪এ, অনাথ দেব লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-৩৭। কুমারী উৎপলা দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

তারিখ
১-৩-১৯৬১।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
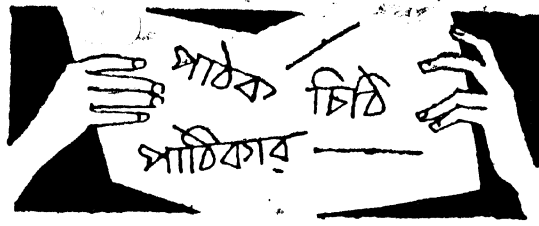
পত্রিকা-সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার একজন হিসেবে সর্বাগ্রে আপনার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আজকের দিনের জাতীয় জীবনে মাসিক বসুমতীর আসন কোথায়, সে সম্বন্ধে নতুন বিচারের অবকাশ নেই, কারণ জাতীয় জীবনে মাসিক বসুমতীর আসন আজ স্বিবীকৃত এবং সে আসন আপনার অতুলনীয় সম্পাদনার গুণে অটল। শুধু বাঙলাদেশ বললেই সবটুকু বলা হয় না—এতবড় বিশাল এই ভারতবর্ষ এই—গোটা দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে কত যে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে তার সীমাসংখ্যা নেই কিন্তু এ কথা শুধু আমার মত একজন নগণ্য পাঠিকা কেন যে কোন বিদগ্ধ সুধীব্যক্তিই মেনে নেবেন যে মাসিক বসুমতীর সমকক্ষ তাদের একটিও নয়। নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করে যাওয়ার মধ্যে সম্পাদকের কৃতিত্ব নেই বা তার কর্তব্য সেখানেই শেষ নয়—অন্তঃসারশূন্য যারা তারা কেবলমাত্র অঙ্গসজ্জা বা বাইরের রঙচঙ দেখিয়ে কালের দরবারে টিকে থাকতে পারে না, সেখানে টিকে থাকবে মাসিক বসুমতীর মত ঐতিহ্যবান পত্রিকা। কালের কষ্টিপাথরে বসুমতীর মূল্যায়ণ যথাযোগ্যই হবে। মাসিক বসুমতীর সারবত্তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে যুগ যুগ ধরে—জাতীয় জীবন গঠনের গুরু দায়িত্বও সাময়িকপত্র হিসেবে মাসিক বসুমতী অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করে আসছে, এবং আমাদের কারোরই অজানা নয় যে এর মূলে আপনার স্পর্শ কোথায় এবং কতখানি এবং আপনার অবদানের গুরুত্ব এবং সম্পাদক হিসেবে সেইখানেই আপনার অসামান্য শক্তির পরমাশ্চর্য নিদর্শনের স্বাক্ষর।

আজ-কাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছুকালের মধ্যে, অনেকগুলি নতুন নতুন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল, নিয়মিতভাবে এদের প্রকাশ চলছে যথারীতি কিন্তু রসজ্ঞ এবং সুবোদ্ধা পাঠকসাধারণ কিছুতেই মাসিক বসুমতীর সঙ্গে একাসনে তাঁদের স্থান দিতে পারেন না, আমাদের মনের মণিকোঠায় বসুমতীর প্রদীপ্ত স্বাক্ষর, সেখানে আর কারো স্থান নেই—কি করে থাকবে—বসুমতীর যে ভাবে মনের খোরাক জুগিয়ে চলছেন তাঁরা তো তা পারছেন না—বসুমতীর বস্তু-সম্ভারের সঙ্গে তাঁদের বস্তু-সম্ভারের গুরুত্বের দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মাসিক বসুমতীতে যে সব রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে—তাঁদের রচনাগুলি কোনক্রমেই উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একটি আধারের মধ্য সর্বসাধারণের মনোমত বস্তুগুলি সাজিয়ে দেওয়ায় আপনার নৈপুণ্য অসাধারণ। পাঠক-পাঠিকা হিসেবে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে এরকম অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হলেও মাসিক বসুমতীর প্রচার কিছুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত হবে না এবং মাসিক বসুমতীর বিক্রী একটি কপর্দকও কমে নি—আশা করি তা আপনারও অজানা নয়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত বাঙলা কথা বারংবার মনে আসছে—মুড়ি ও মিছরির দর কখনো সমান হতে পারে না। কারণ মুড়ি মুড়িই আর মিছরি মিছরিই—এর মধ্যে কোন ভুল নেই। মহাকালের দরবারে সেই সম্পাদকই অমর হয়ে থাকবেন। যিনি পত্রিকার মাধ্যমে রসপিপাসু মনের চাহিদা মেটাবার মন্ত্র জানেন, জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকার মন সচেতন করে তোলেন এবং নতুন প্রতিভাকে সরস্বতীর আঙ্গিনায় আসনলাভের সুযোগ করে দেন, এ প্রসঙ্গে বার বার আপনার নামই মনে আসছে। সশ্রদ্ধ নমস্কার নিন। ইতি—নিবেদিকা—চিত্রা দেবী, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯

সবিনয় নিবেদন,—

দীর্ঘকাল ধরে মাসিক বসুমতীর আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। বাঙলা দেশের এবং বাংলা দেশের বাইরেও এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাঙালী মহলে যে বাঙলা সাময়িক পত্রটি আজ বিপুল শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে সমাসীন—তার নাম মাসিক বসুমতী, এ আমার একলার ধারণা নয়, এ ধারণা বহুর, এ বহুজনের সম্মিলিত ধারণা। সম্পাদক হিসাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে যাওয়া আজ ধৃষ্টতার নামান্তর। আপনাকে অভিনন্দন জানাবার আজ ভাষা নেই, তাছাড়া আমার মতে, মামুলী অভিনন্দনাদির থেকে আজ আপনি বহু ঊর্ধ্বে। আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী আরও পরিপূর্ণতার স্পর্শ পাক, এ আমার অন্তরের কামনা। বসুমতী প্রতি মাসে যে ভাবে আমাদের মনের পুষ্টি এনে দেয়, মনকে ভরিয়ে তোলে মনের সামনে অনেক জীবনের অজানা রহস্যের চাবিকাঠি তুলে ধরে সে সব বিচার করলে মাসিক বসুমতীর কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। একমাত্র বুকভরা ভালোবাসা আর অন্তর-জোড়া শুভকামনা ছাড়া বসুমতীকে আর আমরা কি দিতে পারি, তবে এ ঋণ শোধের দুঃসাহস বা স্পর্দ্ধা বলে মনে করবেন না এ অনুরোধটুকুও জানিয়ে রাখলুম।

এবার একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কর্মব্যস্ত মানুষ আপনি—আপনার সময়ের দাম অনেকখানি—তবু তারি মধ্যে একটুখানি সময় যদি এই চিঠিটির প্রতি দেন তো উপকৃত হই। মাসিক বসুমতী পাঠক-পাঠিকার ঘরে ঘরে যে পূজা পেয়ে থাকে সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা প্রতি ছ'মাস অন্তর সংখ্যাগুলি বাঁধিয়ে রাখি, কিছুকাল পরে দেখা যায় কাগজগুলি বিবর্ণ হয়ে আসে অর্থাৎ সাদা কাগজে হলদের চিহ্ন ফুটে ওঠে, আরও কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে দেখা যায় যে কাগজগুলি জীর্ণ

হয়ে আসে, ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, এত মূল্যবান উপকরণ যে পত্রিকায় থাকে সেগুলি যদি যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত করা না যায় তা হলে বড়ই দুঃখের বিষয়। মাসিক বসুমতী প্রতিটি মূল্যবান প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনাদি মনে দাগ কেটে যায় এবং বহুজনকে সেগুলি নানাভাবে উপকৃত করে, সেইজন্যেই প্রতিটি মাসিক বসুমতীই এককথায় আমাদের অর্থে জনসাধারণের অপরিহার্য এবং তাদের সংরক্ষণও আমাদের দেশবাসী হিসেবেও অন্যতম প্রধান কর্তব্য—অতএব ছাপার কাগজের দিকে যদি একটু দৃষ্টি দেন একটু অন্য জাতীয় কাগজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তা হলে আর আমাদের চিন্তার কোন কারণ থাকে না।

বসুমতী কেবলমাত্র সাহিত্যপ্রিয়দের মনোরঞ্জন করে না, সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, রঙ্গমঞ্চ, ছায়াচিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য-বাদ্য প্রভৃতি এতগুলি অনুরাগীদের সমান আনন্দদান করে মাসিক বসুমতী। প্রতিটি বিষয়ক ফিচার যেমনই তথ্যপূর্ণ, তেমনই সুপরিবেশিত একটি সাময়িক পত্রে এতগুলি দিককে যথাযথভাবে তুলে ধরা অল্প শক্তির সাধ্য নয়। মাসিক বসুমতীর ফিচারগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই মূল্যবান এবং গুরুত্বসমৃদ্ধ। আর এই বিভিন্নতার সমাবেশে মাসিক বসুমতীকে আপনি এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছেন। পরিশেষে, মাসিক বসুমতীর উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সর্বতোভাবে কামনা করি। বিনীত অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লী।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

ডাঃ শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এস (১) আসাম। * * * শ্রীমতী রত্না দাশগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। * * * লাইব্রেরীয়ান লেডী শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেন, নিউ দিল্লী। * * * শ্রীমতী লীলা মৌলিক, রোম, ইটালী। * * * বারীন্দ্রকুমার পাল, মেদিনীপুর। * * * নিমাইচাঁদ দাস, বীরভূম। * * * সুরেন্দ্রনাথ দাস, মেদিনীপুর। * * * এ, মুখার্জ্জী, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ। * * * শ্রীমতী গীতা রায়, গঙ্গারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর। * * * শ্রীমতী সুধারাণী সেন, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা। * * * নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বাধিকারী, শিলেট, পাকিস্তান * * * বি, কে ভট্টাচার্য্য, পি এইচ, ডি; পি আর এস, অন্টারিও, কানাডা * * * শ্রীমতী ব্রজবালা দত্ত, ডিব্রুগড় আসাম * * * প্রধান শিক্ষক খান সাহেব অবোধ জুনিয়ার বেসিক স্কুল, রুদ্রনগর ২৪-পরগণা * * * শম্ভুচরণ সাহা, টিটাগড়, ২৪-পরগণা * * * সেক্রেটারি নারেঙ্গা পল্লীমঙ্গল সমিতি, কোয়ারপুর বর্দ্ধমান * * * কে, সি, ভকত, শঙ্করদা, সিংভূম * * * শ্রীমতী মমতা লাহিড়ী পাথরদিহি ধানবাদ * * * কালীপদ ভট্টাচার্য্য, পাতালেশ্বর, বারাণসী * * * এস, কে সেনগুপ্ত, কোলাবা, বোম্বাই * * * এ, কে, পণ্ডিত শ্রীকাকুলাম, এ, পি, * * * ডাঃ সুখময় বসু, এম, বি, বি, এস নাদগাঁও, মহারাষ্ট্র * * * কে, আর, এ, এ পি পি সেন, বোম্বাই * * * সেক্রেটারি সুভাষ লাইব্রেরী, আথাঙ্গী, মেদিনীপুর।

ছয় মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠালাম।—শ্রীমতী শোভনা সেন, জয়পুর, রাজস্থান।

Sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of the magazine which will continue from Agrahayana 1367 B.S.—A. G. Pal, Cachar, Assam.

Half-yearly subscription of Monthly Basumati is sent herewith.—Supdt. M. R. Bangur Sanatorium, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। Miss Lakshmi Sinha, Ranchi.

পৌষ ১৩৬৭ হইতে এক বৎসরের 'মাসিক বসুমতী'র মূল্য পাঠালাম।—Sri Mamata Lahiri, Dhanbad.

Renewal fee for monthly Basumati from Pous. —J. R. Sen, Darjeeling.

Subscription for monthly Basumati is sent herewith. Please enlist us as subscriber of the journal.—Gulandar B. B. Jr. High School, West Dinajpur.

Subscription for one year is sent herewith. Please send the Masik Basumati from February '61 and oblige.—M/s. S. K. G. W. Shram Kalyan Kendra.—Singbhum.

I herewith remit my annual subscription of Rs. 15/- for monthly Basumati.—Mrs. Santi Lahiri, Bombay-1.

আগামী ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম—কমলা ব্যানার্জ্জী, পূর্ণিয়া।

বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতীর আরও উন্নতি কামনা করি।—রমা দত্ত, নিউদিল্লী।

Remitted Rs 7·50 being the half yearly subscription of your esteemed monthly.—Headmaster, Panchanandapur H. E School, Malda.

আপনাদের মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। এক বছরের গ্রাহক করিয়া পত্রিকা পাঠাইবেন—উদয়ন পল্লীপাঠাগার পশ্চিম দিনাজপুর।

Remitted herewith Rs. 15/ being the annual subscription of your monthly Basumati—Kazal Sen Gupta, Kalahandi, Orissa.

এতৎসহ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক বৈশাখ হইতে সংখ্যাগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Pritikana Sen Gupta—Cachar.

মাসিক বসুমতীর অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী অমলা দেবী, শ্রীরামপুর, হুগলী।

আগামী ৬ মাসের জন্য ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম।—Sm. Juthika Mitra, B. A. Cuttack.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৬ মাসের ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম। দূরে এসেও বসুমতীর মায়া কাটাতে পাচ্ছি না, এত সুসমৃদ্ধ পত্রিকাও আর দেখি না।—সুব্রতা ব্যানার্জ্জী, বোম্বাই।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৯শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৭ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা মিলিয়া জয়রামবাটী যাই। সঙ্গে একজনের একটি অল্পবয়স্ক পুত্রও ছিল। সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলাম। ছুটির সময় অল্প বলিয়া উক্ত মঠে থাকিবার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সেই রাত্রিতেই জয়রামবাটী রওনা হইলাম। পথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভীষণ অন্ধকার। পথ ঘাট কাদা জলে পূর্ণ। এই সব দুর্যোগ অতিক্রম করিতে করিতে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাদের পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সে রাত্রে মাকে আর কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। পরদিন সকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে যাইলাম তখন মা এই সকল শুনিয়া আমাদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি-জল-কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ। এই ভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়, গোঁ ভরে চলা ভাল নয়।"

আমরা বলিলাম, "মা, তোমাকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল, তার উপর ছুটিও অল্প তাই অত তাড়াতাড়ি।"

মা—"তোমাদের ত এরূপ ইচ্ছা হবেই, কিন্তু এতে আমার কষ্ট হয়।"

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধানা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা সুধীরাদিদি তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। এই দিন দুপুরবেলা মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, সুধীরা তোমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যাবে। খুব সাবধানে যেও। ওর গাড়ী তোমাদের দুই গাড়ীর মধ্যে রেখো। তোমরা আমার আপনার জন, আমার ছেলে।"

আমি—"হাঁ নিব বই কি। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনি ভাবে নিব।"

রাত্রিতে আহারের সময় মা আমাদের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই ছোট ছেলেটির দীক্ষার কথা উত্থাপন করায় মা বলিলেন, "এখন ছেলেমানুষ, হেগে ছোঁচাতে পারে না (৭।৮ বছর বয়স) এখন কি দীক্ষা হয়? ছেলেটি ভক্ত, বেঁচে থাক্। ভক্ত দাস হোক্।" আমাকে বলিলেন, "ওর ভাত মেখে দাও।"

আমি কথায় কথায় বলিলাম, "মা, আমরা যার তার খাই—এতে কোন হানি হয় কি?"

মা—"শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে ঠাকুর বিশেষ নিষেধ করতেন, ওতে ভক্তির হানি হয়। সকল কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনা হয় বটে, তবু তিনি শ্রাদ্ধান্নটি খেতে নিষেধ করতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করবো?"

—পরদিন বৈকালে প্রায় ২টার সময় মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। মা আলু থালু ভাবে মাটিতেই বসিয়া আছেন। ঐ বৎসরেই উহার কিছু দিন পূর্ব্বে দামোদরের ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বন্যায় লোকের কি খুব কষ্ট হচ্ছে?" খবরের কাগজে ও লোকমুখে যাহা জানিয়াছিলাম তাহাই বলিতে

লাগিলাম। মা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, জগতের হিত কর।" মায়ের এই কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার এই বিরাট বিগ্রহের সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়া বাহির বাটীতে আসিব বলিয়া প্রণাম করিতেই শুনি—মা আপন মনে বলিতেছেন, 'কেবল টাকা, টাকা, টাকা।" মায়ের মুখে "টাকা, টাকা"—শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মা বোধ হয় আমার ভিতর ভাবের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। অমনি মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না বাবা, টাকাও দরকার এই দেখনা কালী (মামা) কেবল টাকা, টাকা করে।"

১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে (২৪শে) সপরিবারে মাকে দর্শন করিতে 'উদ্বোধনে' গিয়াছি। পরিবারের হাতে কিছু মিষ্টি ছিল। শ্রীযুক্তা গোলাপমা উহা অন্যদিন ঠাকুরকে দিবেন ভাবিয়া উঠাইয়া রাখিতেছিলেন। মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না গো, না, বৌমা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে তা এ বেলাই ঠাকুরকে দাও, এতে বৌমার কল্যাণ হবে।" পরদিন প্রত্যুষে পরিবার মায়ের নিকট গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আমাকে বলিল, "আজ মা আমাকে কত কৃপা করেছেন, জীবনে চিরকাল তা আনন্দ দিবে। বেলা নটা দশটার সময় মা, তিন পয়সার মুড়ি ও কড়াই ভাজা আনিয়ে আঁচলে নিয়ে মাটিতে বসে দু চারটি করে নিজ মুখে দিচ্ছিলেন ও এক মুঠো, এক মুঠো করে আমাকে দিচ্ছিলেন—'বৌমা খাও।' জীবনে অনেক ভাল জিনিষ খেয়েছি, কিন্তু আজকের ঐ মুড়ি খাওয়ার আনন্দের তুলনা মিলে না। দুপুরে আমাকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বল্লেন। এবং তাঁর বিছানাপত্র ঝেড়ে রোদে দিতে বললেন। এই সব ছোটখাট সেবা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আজ আমার সঙ্গে এই কথাবার্ত্তাও হয়েছে—আমি বলেছিলাম, "মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দিই।"

মা—"হাঁ ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দেবে। তিনি সুক্ত খেতে ভালবাসতেন।"

আমি—"ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেব কি ?"

মা—"হাঁ, তাঁকে মাছ দেবে। ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে নিবেদন করবে।" মা জিজ্ঞাসা করলেন,—"ছেলে, মাছ খায় কি ?"

আমি বললুম, "হাঁ, খান্।"

মা—"খাবে বৈকি, খুব খাবে।"

কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, "মা, এই যুদ্ধে দেশব্যাপী হাহাকার লোকের কত কষ্ট, অন্ন বস্ত্র দুর্ম্মূল্য।

মা—"এতেও ত লোকের চৈতন্য হয় না।"

আমি—"মা, এই যুদ্ধে কি আমাদের ভাল হবে ?"

মা—"ঠাকুর যখনই আসেন, তখনই এইরূপ হয়ে থাকে। আরও কত কি হবে।"

ঐদিন বৈকালে আমি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম, মা সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে রাত্রে অন্ধকারে বৃষ্টিতে জয়রামবাটী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আবার তিরস্কার করিলেন, "গোঁ ভরে চলা ভাল নয়।"

আমি—"না আর যাব না।" মা বোধ হয় এ কথায় বুঝিলেন আমি আর জয়রামবাটী যাইব না। অমনি বলিয়া উঠিলেন, "যাবে বই কি। বাবা তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে।" পরিবারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বউ মা, তুমি ওকে দেখো, এই ভাবে যেন না চলে।"

*　　*　　*　　*

১৯১৭ খৃঃ, দুর্গা পূজার ছুটিতে 'উদ্বোধনের' বাটীতে আমি ও আর একটি গুরুভ্রাতা (যতীন) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। আমরা মায়ের জন্য দুইখানি বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলাম। বস্ত্র দুইখানি মায়ের শ্রীচরণ প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ, তোমাদের কাপড় দেওয়া কেন ?" উভয়ে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলাম, "মা, তোমার ধনী ছেলেরা তোমাকে দামী কাপড় দেয়। তোমার গরীব ছেলেরা এই মোটা কাপড় নিয়ে এসেছে। তুমি উহা গ্রহণ করে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। শুনিয়াই সস্নেহে মা বলিলেন,—"বাবা এই আমার গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ।" এবং বস্ত্র দুইখানি সযত্নে হাত পাতিয়া লইলেন। মা দাঁতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন—'যার দাঁতের বেদনা হয় নাই, সে দাঁতের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না'।"

*　　*　　*　　*

১৯১৭ খৃঃ রাঁচীতে ঠাকুরের উৎসবের পূর্ব্বে মাকে পত্র লিখিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম যাহাতে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন—"তোমাদের পত্র পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। তোমাদের এই সকল সৎকার্য্যের সহায় তিনি নিজে। তার জন্য তোমাদের ভয় ভাবনা কি।"

*　　*　　*　　*

১৯১৯ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়রামবাটীতে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করলে তিনি শুনেন কি, আর তোমার নিকট না বলে ঠাকুরের নিকট বললে হয় কি ?"

তদুত্তরে মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যদি সত্য হন, শুনেনই শুনেন।"

এবার আমি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "যদি দিনের বেলা বলে গরুর গাড়ী না পাই, তবে কোতুলপুর হতে হেঁটেই বিষ্ণুপুর যাব, মা।"

মা বলিলেন, "বাবা, শরীরটাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? গাড়ী পাবে।" মায়ের কথা ঠিক হইল। গাড়ী পাইলাম। ইহাই দেহাশ্রিত মাকে আমার শেষ দর্শন। —শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

"Go, sir, gallop, and don't forget that the world was made in six days. You can ask me for anything you like, except time."

—*Nepoleon Bonaparte*

জনগণ

দিব্যদর্শী

প্রতি বৎসর জগতের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি হারে বাড়ন্ত হয়ে এখন মোট ৩১০ কোটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ দানা না বাঁধলে এই কিলবিল পিলপিল মনুষ্যগোষ্ঠি ১৯৬২ সনে ৪০০কোটির নিশানা ডিঙিয়ে যাবে।

জন্ম-মৃত্যু হিসাবের খাতায় খরচার চাইতে জমার অঙ্কটাই একটু বেশী। মা-ষষ্ঠী যা কৃপা করেন এবং যমরাজ যা রাহাজানি করেন সেটা বছরের শেষে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যায় মা ষষ্ঠীর দিকটাই একটু বেশী ঝুলে পড়েছে।

বছর-বছর এই জমার ভাগ জমে-জমে এমন দাঁড়াতে পারে যে একদিন দেখা যাবে সকলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পারছেনা, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রাত কাটাচ্ছে। এবং দশজন খাচ্ছে ত' আর পাঁচজন ঠাঁ-ঠাঁ উপোস দিচ্ছে। তখন পালা করে খাওয়া শোয়া দরকার হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবীর চারভাগ জল, শুধু একভাগ মাটি। সেই একভাগ মাটি আবার জলের উপরেই ভাসছে। সেই মাটির উপর বেশী চাপ-টাপ পড়লে খানিকটা খসে ধ্বসে গুলে যেতে পারে। সকল দিক খতিয়ে দেখলে একটা বেহদ্দ বিষম বেয়াড়া সমস্যা। ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে এই বিশ্বজন-গোষ্ঠি যেপথে চলেছে সেপথে ভারত একটু খুঁড়িয়ে লেঙ্গচিয়ে হাঁটছে। নরওয়ে সুইডেন হলাণ্ডে গড়পরতা পুরুষের আয়ু ৭৪, স্ত্রীলোকের ৭১। কিন্তু ভারতের স্ত্রীপুরুষের গড়পড়তা আয়ু মোটে ৩২ বছর; এতেই খাওয়া—পরার যোগান দিতে ভারত সরকারের হেঁচকি উঠে যায়, অনাটন মুখভেংচি মারে। বিশাল বিরাট বিপুলা বেচারী ভারতমাতার কিলবিল সন্তান সংখ্যা যদি ঐরকম একপাল বুড়ো খোকাখুকির দলে ভারী হতো তবে কিরকম বিতিকিচ্ছি বেসামাল ব্যাপার দাঁড়াত, ভাবলেও মাথা বনবন করে। বেঁচে থাকো বাবা বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, ঝুলে থাকো ভারতমাতার আঁচল ধরে। বরং আরও একটু হাত চালিয়ে কাজ করে যাও। শনি-মঙ্গলবারে ত্র্যহস্পর্শ অমাবস্যার পুজো পাবে।

দুনিয়ার কোটি-কোটি লোকের পথের বাঁকে এই যে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বিপদ হাঁ করে, থাবা তুলে, ওঁৎ পেতে বসে আছে সেদিকে কার হুঁশ নেই। আছে শুধু কয়েকজন সমাজসেবী বৈজ্ঞানিক অথবা চিন্তাশীল লোকের, যারা পরের জন্য মাথা ঘামায়, নিজের বুঝ বোঝেনা। কি করে এই পরিস্থিতি বাগে আনা যায় তার হদিস আলোচনার জন্য এক মহাসভার আয়োজন হল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা সহরে। গোটা দুনিয়ার বেবাক দেশের প্রতিনিধিগণ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে সেখানে হলেন জড়ো। তাদের পিছু নিলেন একপাল সাংবাদিক।

প্রথমদিনের অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন মঙ্গোলিয়ার ফুটান বাটোর। বেজায় পণ্ডিত, বেজায় পয়সাওয়ালা, কিন্তু সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন। ন্যাড়া মাথা, কোমরে একফালি কম্বল, ভেড়ার দুধ ছাড়া আর কিছুই খাননা।

প্রথমে ভাষণ দিলেন ইউনাইটেড ষ্টেটসের ফাদার্স'ন মার্লাটন। ত্রিশবছরে তার দেশে পরিবার নিয়ন্ত্রণের ফিরিস্তি কপচিয়ে, নিজেদের ঢাক ড্যাং—ড্যাং করে বাজিয়ে মাতব্বরি চালে সকল দেশকে তিনি শলা দিলেন এবিষয়ে খুব কড়াক্কড়ি ব্যবস্থা চটপট চালু করতে, নইলে এই জটিল অবস্থা আরও কুটিল হবে।

নাইজিরিয়ার ৎ-সম্বে জুজুম্বা বললেন—আফ্রিকা মহাদেশে জন্মের হার ফি-বছরে শতকরা ৪৫ আর মৃত্যুর হার বহুৎ কমে যাচ্ছে। সাদা জাতের আসার আগে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরত। সাদারা আনলো ভিটামিন, এ্যান্টিবায়োটিক ভ্যাক্সিন, এক্সরে, রেডিয়াম, ব্লাডব্যাঙ্ক, শরীরের কলকব্জা মেরামতির ছুড়ি, কাঁচী, সাঁড়াশী, চিমটে। তাতেই হয়েছে এই কাণ্ড। সাদারা জঙ্গল কেটে বাঘ, সিংহ, হাতী, সাপ, মশা, কাঁকড়া-বিছেকে তফাতে হটিয়ে রেখেছে। আসতে দাও এদের কাছে পিঠে, ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওষুধ-পত্তরের বাক্স-টাক্স, কুলুপ এঁটে দাও হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদনে। আমাদের ঘর আমরাই সামলাব।

থাইল্যাণ্ডের সুবন্নো পুন্ফল জানালেন—তার দেশে জন্মনিরোধ অভিযান চালু হয়ে বানচাল হয়ে গেল। প্রথমটায় জন্মহার নীচের দিকে না নেমে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। ফলে ঘাবড়িয়ে গিয়ে ছুঁড়ী-বুড়ী কেউ এখন ওদিক মাড়ায় না। মুস্কিলের কথা এই যে গরমের দেশে মেয়েরা বড় জল্দি জল্দি ফলন্ত হয়।

লাল চীনের চ্যাং-চ্যুং-চ্যাং কুদে চোখ পিট-পিট করে সুরু করলেন—আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি বটে, কিন্তু পরিবার নিয়ন্ত্রণে চীনের কোনও মাথা-ব্যথা নাই। চীনের লক্ষ্য তার জনসংখ্যা হুস হুস করে ফাঁপিয়ে তোলা, টুঁটি টিপে কমান নয়। এশিয়ায় এখনো অনেক দেশে জনসাধারণ গরু-ছাগলের মত দিন গুজরান করছে, আর তাদের জুতোর তলায় পিষে রেখেছে একমুঠো পাজী নচ্ছার লোক টাকার জোড়ে। সেই সেই দেশে মুক্তি ও প্রগতির বাণী নিয়ে যাওয়ার গুরুভার দায়িত্ব ও মহান কর্ত্তব্য একমাত্র চীনের এবং সেই মুক্তি ফৌজে যোগান দিতে চাই দেদার লোক। চীন সরকার এজন্য ভাবছেন নওজোয়ানদের বোনাস ও সোমত্ত মেয়েদের দাদন বরাদ্দ করবেন' যাতে জনবৃদ্ধি কার্যে তাদের উৎসাহ বেড়ে যায়।

সিকিম ভোটান ও নেপালের সদস্যরা শংকিত হয়েএকযোগে চেঁচিয়ে-প্রতিবাদ করলে সভাপতি ফুটান বাটোর টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে ফতোয়া দিলেন—এ সভার আলোচ্য বিষয় সমাজনৈতিক কোনও রাজনৈতিক মত জাহির করা চলবে না।

চ্যাং-চ্যুং চ্যাং একটু গুম খেয়ে পুনরায় সুরু করলেন—আমার বক্তব্য এই ছিল যে আমাদের প্রাণ-প্রিয় কমরেড মাও-চাও এর নবযুগ পত্তন হবার আগে চীনের জন্মহার ধাঁ-ধাঁ করে পড়ে যাচ্ছিল। তার কারণ আফিঙের নেশা। সাম্রাজ্যের বাঘকে

যেমন আফিঙ্গ খাইয়ে আলসে অকেজো অথর্ব্ব ঝিমু-ঝিমু করে রাখা হয়, তেমন সাম্রাজ্যবাদী দুষমনরা তাদের কায়েমী স্বার্থের পেট মোটা করতে ছলে-বলে শতকরা পঞ্চাশজন চীনাপুরুষকে আফিঙের মৌতাত ধরিয়েছিল। বক্সার যুদ্ধের আসল কারণ কে না জানে?

ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড মার্ডারমোর, অষ্ট্রেলিয়ার স্যার কাওয়ার্ড ফক্স, ফ্রান্সের পিয়ারে জুইন একজোটে হল্লা করে উঠলেন। সভাপতি পুনরায় চ্যাং-চ্যুং-চ্যাংকে সাবধান করে দিলেন—রাজনৈতিক চুকলী একদম চলবে না। রাগে টং হয়ে চ্যাং চুপ করে বসে পড়লেন।

তিব্বতের লামা রিম্পোচে থণ্ডুপ দাঁড়াতেই চীনের অন্যতম প্রতিনিধি চু-চুং-লিং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন—স্বাধীন তিব্বতের প্রতিনিধি আমার পাশেই হাজির রয়েছেন, ফেরার দালাই লামার ঐ ভাড়া-করা দালালকে চাঁটি মেরে বার করে দেওয়া হোক।

ভারতের বিষ্ণু মেনন অহিংস ভাবে তার চেয়ারের হাতলে একটি জবর ঘুষি মারতেই রাশিয়ার ব্লাডিমির পপোভপ মেননের একটু কাছে ঘেঁষে সিগারেটের ডিবাটি এগিয়ে ধরে বললেন—উত্তর মেরুতে বরফের চাষে জন্মানো তামাক দিয়ে তৈরী, একটা চেখে দেখুন না? যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাক্সিম তুডোভিক মেননের মুখে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। সভাপতি আবার হুড়ো দেওয়ায় চীনের প্রতিনিধিরা দুপ-দাপ পায়ে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয়দিনের অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন সৌদী-আরবের আল-বিন-রসুল-উস্‌মল-হিদায়েৎ-ফিদায়েৎ খান। নামের বহরেই বোঝা যায় তিনি একজন কেউকেটা ব্যক্তি। তিনশ বেগম নিয়ে তিনি ঘর করেন, ছেলেমেয়ের সংখ্যা সাত কুড়ি পাঁচ, ঘোড়া ও উট আছে অগুণতি।

প্রথম বক্তার সুযোগ পেয়ে লামা রিম্পোচে থণ্ডুপ আরম্ভ করলেন—জগতের কোনও দেশেই নাই এমন সব তাজ্জব আবিষ্কার তিব্বতের কোন কোন প্রাচীন মঠে সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে, জগতের এই বর্ত্তমান সঙ্কটে তা কিছু কিছু জনহিতে ফাঁস করা যেতে পারে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানের দৌড়ে তিব্বত অনেক পিছিয়ে আছে, এটা নেহাৎ নিছক বুঝবার ভুল। তিব্বত অনেক আগেই বহু ক্ষেত্রে কদম-কদম এত এগিয়ে গিয়েছিল যে তাকে এখন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে একটু দম নিতে।

আমেরিকার জেকব জবরষ্টাইন, জার্মাণীর কাউণ্ট লডেনবার্গ, রাশিয়ার বোরিস কাটানেক প্রভৃতি নামজাদা বৈজ্ঞানিক সদস্যরা বলে উঠলেন—ফুঃ?

লামা থণ্ডুপ এদের আমল না দিয়ে বলে চললেন—এমন একটি গাছের শিকড় আছে যা বেঁটে খচ্চরের দুধের সঙ্গে খেলে পুরুষ বারো বছরের খুটোতে আজীবন আটকা পড়ে থাকবে। সে আর বড় হবে না, বাবা হবে না।

ব্রেজিলের ডন মুচ্‌টাসিও হো-হো করে হেসে বললেন—ইনস্যানিটো অ্যাডলিবিটো (বেহদ্দ পাগল)। সভাপতি আল-বিন-রসুল-উস্‌মুল-হিদায়েৎ-ফিদায়েৎ খান বোধহয় স্প্যানিশ ভাষা বুঝতেন না, নতুবা মুচটাসিও ধমক খেতেন।

লামা বলে চললেন—প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরুষ যদি বারো বছরের পুঁচকে হয়েই জীবন কাটায় তবে ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা ভারী-ভারী মাল টানা-টানি আপিস, কাছারি, এ-সব চলবে কী করে? কিন্তু নারী কি সত্যই অবলা দুর্ব্বলা কাঁচকলা? তা মোটেই নয়। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মেয়েরাই সব কাজ করে, পুরুষরা চা কফি খায়, বসে বসে তামাক ফোঁকে, তাস পেটে।

স্যালভাডরের সমাজব্রতী নারী সদস্যা লিলিয়ানা ললোভিনা তার হেঁড়ে-গলা চড়া করে বললেন—সে সব পুরুষকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করা উচিত। রাশিয়ান ও চৈনিক প্রতিনিধিগণ করতালি দিয়ে ললোভিনার তারিফ করলেন।

লামা বলে চললেন—এই অশ্চর্য্য শিকড় মেয়েদেরও খাওয়ান যেতে পারে। তারাও বারো বছরের পুঁচকি হয়ে অজন্মা হয়ে থাকবে, বাচ্চা—কাচ্চা পয়দা করতে পারবে না।

মাতৃত্বের এই অপমানে ললোভিনার পায়ের রক্ত সরাৎ করে মাথায় চড়ে গেলো। তিনি একপাটি জুতো লামার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। তাক ফস্‌কিয়ে জুতোটি জাপানের সানাফুজি তানাকুচির মাথায় দড়াম করে গিয়ে পড়লো তিনি "অমিডা" "অমিডা" (অমিতাভ বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ) বলে ডুকরে উঠলেন। ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটলো।

লামা তাড়াতাড়ি তার ঝুলি থেকে একটা শুকনো পাতা নিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে দিতেই তানাকুচির রক্তস্রাব ও ব্যথা দুই-ই-চটপট বন্ধ হলো। ললোভিনা উঠে গিয়ে তানাকুচির হাত ধরে গালে চুমো খেয়ে ক্ষমা চাইলেন। সভাপতি খান সাহেব সদস্যদের, বিশেষত নারী সদস্যাদের মেজাজের লাগাম বাগে রাখতে অনুরোধ জানালেন।

এই রক্তারক্তি ঘটনায় লামা নিরস্ত হলে পরবর্ত্তী বক্তা পোলাণ্ডের উলিনেস্কি জোড়ভেস্কি উঠে দাঁড়ালেন। হাতীর মত হোঁৎকা, ষাঁড়ের মত গলার আওয়াজ, শাপের মত কুতকুতে চকচকে চোখ তার প্রস্তাবের সারমর্ম এই যে শিশুরা যদি জন্মাতে চায় ত' জন্মাক। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে কী হবেনা সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে মা-বাবাকে। কোনও পরিবারেই একটির বেশী সন্তান পুষতে না দিলে জনসংখ্যা সহজেই আয়ত্বে রাখা যাবে। এমন সব উপায় আছে যে শিশুরা বুঝতেই পারবেনা যে তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে।

ভারতের কুলবতী মুন্সী, পাকিস্থানের বেগম রোশেনারা, ফ্রান্সের মাদাম কোঁশে, স্পেনের সেনোরা জুয়ানা, জাপানের চেরী আরিগাতো, কিউবার ফিদেলা ক্রিশ্চিয়ানা, মিশরের সুরাইয়া বেনগাজী প্রভৃতি মহিলা সদস্যগণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

জোড়ভেস্কি গলা আরও একহাত চড়িয়ে বললেন—প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে অন্তত একটি মন্দির, গির্জ্জা বা মসজিদ থাকবে সরকারের এক্তিয়ারে, বিষাক্ত গ্যাসের চৌবাচ্চা সারি সারি বসানো থাকবে সেখানে…

"খুনে" "খুনে" "জহ্লাদ" "শয়তান" ইত্যাদি ধি-ধিক্কারে সভাগৃহ ফেটে পড়তে লাগলো। হৈ-চৈ ডামাডোলে সেদিনকার সভা পণ্ড হলো।

তৃতীয় দিনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন ভারতের বোম্বাইলাল পাঞ্জাবরাও অযোধ্যাপ্রসাদ শাস্ত্রী। নিখিলভারতের একটি সুস্পষ্ট

ছবি এই নামের ভিতরেই প্রতিভাত রয়েছে। কিন্তু কু-লোকে বলে ইহার দেহে দেশী রক্তের চাইতে বিদেশী রক্তই বেশী।

প্রথম বক্তা রাশিয়ার পপোভপ অতি মোলায়েম স্বরে আরম্ভ করলেন—রাশিয়ার জনগণের ও নেতাগণের একমাত্র কাম্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থান। বিশ্ব জন-নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই ভিন্ন। যদিও মোক্ষম মোক্ষম মারণাস্ত্র তারা আবিষ্কার করেছে তবু বিনাশ ও ধ্বংসের পথে তারা কোনও সমস্যার সমাধান চায় না যদি পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের পেছনে লাগতে না আসে। চন্দ্রগ্রহে রাশিয়ার পতাকা আগেই উড়েছে, এখন আর তিনটি গ্রহ তাদের হাতে এসেছে, কাজেই স্থানাভাব ও খাদ্যাভাবের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হিসাব করে দেখা গিয়েছে মোট ১৬০০ কোটি লোককে সেখানে যায়গা দেওয়া যেতে পারে।

সভার একদিকে উঠলো গুঞ্জন, অন্যদিকে চুপচাপ।

আমেরিকার ষ্ট্যানলী ষ্ট্রেঞ্জফেলো তার সাড়ে ছয় ফুট দেহটি নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—আমাদের কী নেওয়া হবে?

পপোভপ একগাল হেসে জবাব দিলেন গায়ের রং পোষাকের ছাট কিংবা রাজনৈতিক ছাপ দেখা হবে না। শুধু মাথাপিছু ৩০০০ হাজার রুবল ভাড়া নগদ জমা দিলেই উড়ো জাহাজে পার করা হবে। মালের মাশুল আলাদা। তবে একটা কথা এই যে সেখানে দলাদলি জোট পাকানো আর মুনাফাবাজী চলবে না।

ভারতের হরিদাস নাগ, ব্রহ্মের মং-বা-থিন, কাম্বোডিয়ার শিরিধম্মো, সিংহলের বিক্রেসুবিয়া, জাপানের হামা মাৎসু একযোগে জিজ্ঞাসা করলেন—চাল পাওয়া যাবে ত? ভাত না পেলে আমরা যে সব টেঁসে যাবো।

পপোভপ ভরসা দিলেন—আলবৎ। আমাদের কৃষিবিদরা ও-সব গ্রহের মাটি খুঁটে-খুঁটে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পরীক্ষা করেছেন। খুব সরেস চাল জন্মানো যাবে, তবে···

অধীর উদ্বেগে জনকয়েক বলে উঠলেন—'তবে'টা কী সাফ করে বলেই ফেলুন না? ধোকা বা ধাপ্পা দেবেন না মশাই।

পপোভপ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন ওখানে গরু নাই। এখান হতে নিয়ে গেলেও ওখানকার জল হাওয়া খেয়ে এত সেয়ানা হয়ে উঠবে যে দুধ দেবে না।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বক্তাকে অনুরোধ জানালেন—সদস্যরা সবাই নিশ্চয় শুনতে চান আপনারা এই সমস্যার কোনও সুরাহা করতে পারবেন কি না। দুধ না পেলে বাচ্চা-কাচ্চারা খাবে কী? এই ধরুন না, আমি নিজে দিনে বারো কাপ চা খাই না হলে মাথা টিপ-টিপ করে, পেট গুড়-গুড় করে।

উপস্থিত সবগুলি সাদা কালো হলদে ও তামাটে বর্ণ হাত উঁচু হলো এই প্রশ্নের সমর্থনে, কেবল স্কটল্যাণ্ডের গর্ডন ম্যাকনামারার হাত পকেটেই গুটনো রইল। ভোটোমিটারের কাঁটাটি ঘুরে গিয়ে ফল বেরোলো—১৭৩ জন প্রশ্নটির স্বপক্ষে, একজন নিরপেক্ষ।

ম্যাকনামারা এক লাফে দাঁড়িয়ে জানালেন—চা, কফি, কোকো, কোকোকোলা না হলেও আমার দেশের লোকের চলবে কিন্তু হুইস্কি বা বিয়ার না হলে যে টাস-টাস করে মরে যাবে।

পপোভপ ম্যাকনামারার টাঁসটেসে ভুড়িটার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্য সবাইকে আশ্বাস দিলেন—ভাইসব, ঘাবড়াবার কারণ নাই। এই পৃথিবীতে যেমন পেট্রোলের খনি আছে, ওসব গ্রহেও তেমনি মাটির তলায় এক রকম সাদা তরল পদার্থ দেদার রয়েছে, হাজার-হাজার বছরেও শেষ হবে না। স্বাদ দুধের মত, পোষ্টাই, সহজে নষ্ট হয় না। বলতে গেলে দুধের চেয়ে ঢের ভালো। তবে হুইস্কি ও বিয়ারের তেষ্টা মেটানো সম্বন্ধে এখনও মাথা ঘামানো' হয়নি।

এমন সময় ফিলিপাইন সরকারের এক ভার-ভারিক্কি কর্ম্মচারী পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে একটি শীল-মারা বড় খাম দিলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি নাকের ডগা থেকে চশমাটি খুলতে খুলতে মাইকে তিনটি টোকা দিয়ে সভাকে সম্বোধন করলেন—মাননীয়া সদস্যাগণ ও মাননীয় সদস্যবৃন্দ, একটি বিশেষ জরুরী ঘোষণা আছে। বড়ই দুঃসংবাদ। রাশিয়া আমেরিকা আক্রমণ করেছে, ইংলণ্ড আমেরিকার পক্ষে এবং চীন রাশিয়ার পক্ষে নেমে গিয়েছে। রাশিয়ান বোমার ঘায়ে লণ্ডন, মাঞ্চেষ্টার, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রায় ছাতু-ছাতু। আমেরিকান বোমার ঘায়ে মস্কো, লেনিনগ্রাড, পিকীং, সাংহাই টুকরো-টুকরো।

সভাস্থলে একটা ঘুষো-ঘুষির উপক্রম হলে ভারতের প্রতিনিধিরা হাতে-হাত শিকলি বেঁধে দুদলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সামাল দিলেন। তারপর সকলে ছুট দিলেন যার যার হোটেলে, নিজ-নিজ দেশে ফিরবার ফিকিরে। খাঁ-খাঁ শূন্য সভামণ্ডপে কেবল ভারতীয় দল শান্তি ও মৈত্রী কামনায় সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করলেন—

> হিংসায় উন্মত্ত পৃথী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব···
> দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি···
> শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
> করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।

হারানো-প্রাপ্তি

শ্রীমতী রায়

কত ভাগ্যে এসেছিলে
গিয়েছো চলে,
হোক্ শূন্য দশ দিশি
ভাসি আঁখি জলে
পাইনু বিমর্ষ মানি
মৌন তোমার বাণী,

পাথেয় হইল চিহ্ন
নিঃস্বের অঞ্চলে।
পায় নাই কেহ আহা?
যাহা তুমি দিলে,
হারানু কি যে হায়?
বুঝাব কি বলে?

ভারতের বাজার দর—অতীতে ও বর্ত্তমানে

শ্রীমতী আশালতা দেবী

বর্ত্তমানে আমরা পরিবারের লোকজনের দু'বেলা আহারের সামগ্রী ও পড়বার বস্ত্র জোটাতে হয়রানি হচ্ছি। এর কারণ হল বর্ত্তমান যুগের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের লোভের ফলে এই মূল্য বৃদ্ধি রোধেরও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে এই দেশে জিনিসপত্র খুবই সস্তা ছিল, ফলে দেশের প্রত্যেকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারত। আর প্রাচীন যুগে ব্যবসায়ীরা লোভী ছিল না বলে দীর্ঘকাল যাবৎ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস একই মূল্যে বিক্রী হত।

আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে চাউলের মূল্য ছিল প্রতি মণ এক আনা। কৌটিল্যের সময় হতে সুরু করে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই দর প্রচলিত ছিল। জিনিসপত্র খুবই সস্তা ছিল বলে ভারতের দরিদ্রতম লোকটি পর্যন্ত সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারত এবং ভারতবাসীদের আয় ব্যয়েরও তখন সমতা ছিল।

কৌটিল্যের আমলে এই দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কিরূপ ছিল, তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

চাউল	প্রতিমণ	৫	তাম্রপণ	বা এক	আনা
তৈল	"	৪১	"	বা প্রায় ৮	আনা
ঘৃত	"	৬০	"	বা — ১২	আনা
ডাল	"	৬	"	বা প্রায় এক	আনা
লবণ	"	২	"	বা প্রায় ½	আনা
চিনি	"	৪৮	"	বা প্রায় ১০	আনা
কাপড়	প্রতিখানি	১	"	... ...	...
"	৫ খানি	৫	"	বা এক	আনা

ইহার প্রায় দেড় হাজার বছর পরে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চাউলের দর সমানই ছিল, কিন্তু ডাল, তৈল ঘৃত, লবণ ও চিনির দর অর্দ্ধেক কমে গিয়েছিল।

মজুরির নিম্নলিখিত তালিকা হতে হিন্দু রাজত্বে গরীব লোকের আয়ের হার কিরূপ ছিল বুঝা যায়।

সংবাদবাহক	বেতন মাসিক	৪১	তাম্রপণ	বা প্রায়	১০	আনা
ভৃত্য	" "	৩৪	"	বা "	৭	"
দ্বারবান	" "	২০	"	বা "	৪	"
ঝাড়ুদার	" "	২০	"	বা "	৪	"
রাখাল	" "	৩৪	"	বা প্রায়	৭	"

হিসাব করলে দেখা যায় যে, ভারতের সাধারণ লোকেরও ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী ছিল।

মুসলমান রাজত্বে চাউল ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে দেশবাসীর আয়ও বেড়েছে। মোগল আমলে দেশের সম্পদ দেশেই থাকত, বাইরে যেত না। মুসলমান শাসকেরা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নি। আর তখনকার ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি করে নিজেদের লাভবান ও দেশবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছে করত না। ফলে মোগল আমলেও ভারতবাসীরা খাদ্যাভাবে ও বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায়নি।

মহম্মদ তোগলোকের শাসনকালে ইবন বটুটা নামে জনৈক মুসলমান পরিব্রাজক বাংলায় আসেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বর্ত্তমান যুগের টাকার হিসেবে নিম্নলিখিত রূপ ছিল :—

চাউল	প্রতিমণ	⁄১৫	(সাত পয়সা)
তিল তৈল	"	।৶১০	আনা
ঘৃত	"	১।৶০	"
চিনি	"	১।৶০	"
বড় মুরগী একটি		৲৫	(এক পয়সা)
বড় ভেড়া	"	।০	আনা
উৎকৃষ্ট বস্ত্র ১৫ গজ		২৲	টাকা

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে জিনিসপত্রের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

চাউল (ভাল)	প্রতিমণ	৬০	দাম	বা	৸৶০	আনা।
চাউল (মোটা)	"	২০	"	"	।৵০	"
ডাল	"	২৭	"	"	৸⁄১০	"
ঘৃত	"	১৫৮	"	"	৫৲	টাকা
লবণ	"	২৪	"	"	৸০	আনা
চিনি	"	১৮২	"	"	৫।৶০	আনা।

আলিবর্দ্দীর আমলে অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে, ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার মুর্শিদাবাদের বাজার দর ছিল নিম্নরূপ :—

বাঁশফুল চাউল (উৎকৃষ্ট)	টাকায়	১ মণ ১০	সের।
চাউল (মোটা)	"	৭ মণ ২০	"
তৈল	"	— ২৪	"
ঘৃত	"	— ১০।০	"

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় চাউলের দর ছিল টাকায় ২ মণ ২০ সের হতে ৩ মণ পর্যন্ত।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও আয়ের যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় যে দেশবাসীরা ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী করত; এমন কি নিতান্ত দরিদ্র লোকও তার আয়ের দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারত। আলিবর্দ্দীর আমলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ইংরেজ প্রবেশ করেছে মাত্র, তখনও শিল্প জীবন বিধ্বস্ত হয়নি। বাংলার সুতী ও রেশম বস্ত্রশিল্প তখন বাঙ্গালীর আয়ের দ্বিতীয় প্রধান পথ। কৃষির ওপর সর্বস্ব নির্ভর তখন আরম্ভ হয়নি।

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে ভারতে চাউলের দর এক টাকা মণ ছিল।

১৮১০ সালের কাছাকাছি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য ছিল নিম্নরূপ :—

উত্তম চাউল	প্রতি মণ	১।০	আনা
মোটা চাউল	"	১৲	টাকা
অরহর ও মুগ ডাল	"	১।।০	"
তৈল	প্রতি সের	৵০	আনা
ঘৃত	"	।৶০	"
মোটা ধুতি	এক জোড়া	৸০	"

আর সেই সময়ে সাধারণ বাঙ্গালীদের আয় ছিল নিম্নরূপ :—

সাধারণ শ্রমিক	দৈনিক	৵০	আনা
বুদ্ধিমান শ্রমিক	"	৶০	"

ছুতার মিস্ত্রী	মাসিক	৬৲ টাকা
পিতল কাঁসার কর্মকার	„	৪৸৵০ আনা
তাঁতী	„	৩৲ টাকা

১৮৩০ সালের কাছাকাছি ভারতে সস্তা বিলেতী কাপড় অধিক পরিমাণে আমদানী হতে থাকে। ফলে এই দেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের কৃষির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য শিল্পগুলোও নষ্ট হয়ে এই দেশবাসীদের অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কর বৃদ্ধি, আয় হ্রাস এবং উহার সহিত দেশের সম্পদ প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে বিদেশে রপ্তানি, এই সব বিবিধ কারণের ফলে বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারণে এবং বৃটিশ জাতির সম্পর্কে এসে এই দেশের ব্যবসায়ীরাও চালাক ও লোভী হয়ে পড়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে চলে। তবে ১৯৩৭ ইংরেজী সালে পর্যন্তও দেশের জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ভেতরে ছিল এবং আয়-ব্যয়ের সমতা তখনও নষ্ট হয়নি। আমার শ্বশুর ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একখানি হিসাবের খাতা হতে ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কিরূপ ছিল, তার একখানি তালিকা এবং তার পাশাপাশি বর্তমানের মূল্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

দ্রব্য			১৯৩৭			১৯৬১
ভাল চাউল	১৯৩৭ খৃঃ	প্রতি মণ	৩৷০	—১৯৬১ খৃঃ	প্রতি মণ	২৫৲
মুগ ডাল	„	„ প্রতি সের	৴১৫	„	„ প্রতি সের	৸৵০
আলু	„ „	„	৻১৫	„ „	„	৷০
বেগুণ	„ „	„	৻৫	„ „	„	৷/০
বড় কাঁঠাল	„ „	১টি	⁄১০	„ „	১টি	২৲
সুমিষ্ট ও বড় আকারের আম	„	„	৻১৫	„ „	„	৷৵০
নারিকেল (বড়)	„	„	৻১৫	„ „	„	৷৷০
ঘৃত (খাঁটি)	„	„ প্রতি সের	২৷৷০	„	„ প্রতি সের	১০৲
সঃ তৈল	„ „	„	৷৵০	„ „	„	২৷৷০
চিনি	„ „	„	৶১০	„ „	„	১৵০
ইলিস, রুই ইত্যাদি ভাল মাছ	„ „	„	৷০	„ „	„	৩৷৷০
খাঁটি দুধ	„ „	„	⁄১০	„ „	„	১৲
ছাতা	„ „	১ খানি	১৷০	„ „	১ খানি	৮৲
সাধারণ ধুতি	„	„	১৲	„ „	„	৭৲

উক্ত মূল্য-তালিকা বাংলার একটি নির্দ্দিষ্ট পল্লী অঞ্চলের একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশে তথা ভারতে ঐ হারেই যে তখন জিনিসপত্র বিক্রী হত বলা চলে না। তবে মোটামুটি উল্লিখিত মূল্য অনুযায়ী এবং জায়গা বিশেষে উক্ত মূল্যের সামান্য তারতম্যে এই দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যেতো। উপরে উল্লিখিত তালিকার বাইরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সস্তা ছিল এবং পরিবারের লোকজনের ভরণ পোষণ করতে তখনও গৃহস্বামীদের ঋণ করতে হত না।

মোটকথা হিন্দুরাজত্ব, মুসলমান রাজত্ব এবং বৃটিশ রাজত্বের ১৯০০ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য দেশবাসীদের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরেই ছিল এবং দরিদ্র লোকেরাও দুইবেলা পেট ভরে খেতে পারত। দেশবিভাগের কিছুকাল আগে থেকে জিনিষপত্রের মূল্য ক্রমগতিতে বাড়তে থাকে এবং বর্ত্তমানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে।

এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্যে দেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছে, হিন্দুসমাজে নারীরাও অভাবের জ্বালায় তাদের প্রাচীন আদর্শ ও লজ্জা ত্যাগ করে চাকরির সন্ধানে বের হয়েছে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের নরনারীরা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুপথে এগিয়ে চলেছে। এখন জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, দেশে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে মূল্য বাড়ছে। কিন্তু ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বেও দুই হাজার বছর যাবৎ ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমে বেড়েছে, বরং তখন দেশে "পরিবার পরিকল্পনা" চালু হয়নি বলে এবং বর্ত্তমানের মত অতীতে হিন্দু মেয়েদের বহির্জগতে গিয়ে চাকরি করা, অধিক বয়স পর্যন্ত বা সারাজীবন অবিবাহিতা ও নিঃসন্তান থাকার ঝোঁক না থাকায়, বর্ত্তমান যুগের মত প্রাচীন যুগে বিবাহিতা হিন্দু রমণীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সন্তান জন্ম রোধ পাপ মনে করত এবং ভারতকে অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখার জন্যে ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে মুসলমানদের সমান হারে সন্তান উৎপাদন হিন্দু পুরুষ ও রমণীর প্রয়োজন মনে করত বলে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ত।

প্রাচীনযুগের ভারতীয়েরা বর্ত্তমান যুগের লোকদের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ আহার করতে পারত। বর্ত্তমানে যেখানে একজন লোক একবেলায় গড়ে একপোয়া চাউল খায়, অতীতে সেখানে অনেক লোককে একবেলায় একসের চাউলের ভাতও খেতে দেখা যেতো। এই সমস্ত সত্ত্বেও এই দেশে এক টানা দুই হাজার বছর যাবৎ খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্য দেশবাসীদের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরেই ছিল এবং ভারতের সাধারণ লোকের আয়ও পরিবারের লোকজনের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধি দেশের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। ইহার আরও অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে—বর্ত্তমান যুগের ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফার জন্যে লোভে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকা, পূর্বের মত বর্ত্তমানে গৃহস্থদের নিজের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে পরিবারের প্রয়োজন মত ফসল উৎপাদনের অনিচ্ছা, চাষের কাজকে অনেকের অবজ্ঞার চোখে, দেশে বিভাগের ফলে এক দেশের বাড়তি মাল অন্য জায়গায় প্রেরণের অসুবিধা ইত্যাদি অন্যতম।

সুতরাং বর্ত্তমানে দেশের দ্রব্যাদির মূল্য রোধের ব্যবস্থা না হলে, কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা না হলে এবং ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফার লোভ না কমলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দ্বিগুণ হয়ে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের নরনারীরা দলে দলে না খেয়ে মারা পড়বে।

আশা করি দেশের চিন্তাশীল ও হিতকামী জনসাধারণরা এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন এবং "পরিবার পরিকল্পনার" সঙ্গে কৃষির উন্নতি ও বর্তমান বাজার দর বাড়তে আর না থাকে, [illegible]

উদাসীন তারাপদ

শ্রীমতী সাধনা কর

"একদিন বড়দিদি কহিলেন—'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল'।"

এই হচ্ছে কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। বাধাহীন চিরন্তন 'অপদার্থ' কিশোর বালক, নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যত জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল ঘুরে বেড়ায়, নিজের মনের মতো পাঠ খুঁজে পায় না। স্কুলের পাঠ নিতে চায় না, বড়োদের স্নেহ শাসন কোন কিছুকেই স্বীকার ক'রেনা, নিজের মতো চলতেই ভালোবাসে এবং বড়দের সকলেই যার সম্বন্ধে খেদ করে বলেন 'আমাদের সকল আশাভরসা নষ্ট হয়ে গেল, ও আর মানুষ হল না।' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতে জীবনের এ অংশটার বর্তমান নেই আছে কেবল ভবিষ্যত, আর সেই ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য সকলের সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! 'মায়ের চোখ পর্যন্ত সতর্ক, নিষ্করুণ: অন্য পরে কা কথা'। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে সকলে মিলে ছেঁকে ধরেন—"মায়ের প্রথম সম্ভাষণ—'না, এ ছেলের যদি কিছু হয়—মাষ্টার এসে গেল, এখনও তোর ঘুমের ঘোর কাটল না?'

নেপথ্যে কাকার তাগাদা, 'উঠল, বৌদি, তোমার আদুরে গোপাল? খুব আস্কারা দাও, ভবিষ্যতটি চিবিয়ে খাও ছেলের…'

একটু পরে দাদা তাগাদায় আসিয়া উঠানে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।…বলিলেন 'এখন আবার ঐ এক কাঁড়ি কোলের কাছে নিয়ে বসেছ তো? খাও, কিন্তু ও ঘুঘনি খাওয়া হচ্ছে না শৈলেন, নিজের ভবিষ্যত খাওয়া হচ্ছে, শর্মা এই বলে রাখলে।"

রবীন্দ্রনাথও, সকলের মতে, এ বয়সে 'শৈলেনের' মতোই নিজের ভবিষ্যতকে নিজে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। স্কুল শিক্ষক গৃহশিক্ষক দাদারা অনেকেই নানাভাবে তাঁর একটা ভদ্র সমাজের উপযুক্ত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, ফল হয় নি। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনো মতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমার-সম্ভব পড়াইতে লাগিলেন।' দাদারা তো শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ভৎ‍‌র্সনা করা পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন,—সাধে তাঁর বড়দিদি অমন খেদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারতেন—'ভদ্র সমাজের বাজারে' তাঁর দর কমে যাচ্ছে; তবু তিনি যে-বিদ্যালয় জেলখানা ও হাসপাতালের মতো, তার ঘানিতে নিজেকে জুড়তে পারলেন না। আমরা চাই প্রচলিত বিদ্যালয়ের ঘানিতে জুড়ে নিয়ম-বদ্ধ শিক্ষা দিতে। অসংখ্য বিভিন্ন প্রকৃতির কিশোরকে এক ছাঁচে ফেলে সমাজের ভদ্ররূপে ঢালাই করে নিতে—বালকের আপন স্বভাব অনুযায়ী গড়তে নয়। অর্থাৎ যে বালক আঁকতে পারে তাকে শিখতে হয় বিজ্ঞান, যে গাইতে বাজাতে ইচ্ছুক তাকে করে তোলা হয় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র আর যে হয় তো সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তার হবার শক্তি নিয়ে আসে সে কি না অফিসার হয়ে বসে কলম পেশে। 'ছেলেটা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর লেখা কবিতা ছেলেটা বুঝতে পারে না, দুষ্টুমি করে পাতাগুলো কেটে রেখে দেয় বলে মাষ্টার দুঃখ করে গেলেন, নালিশ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোঝেন ছেলেটাকে। ওই ছেলেটার মনের মতো করে তিনি লিখতে পারেন নি বলেই সে তাঁর লেখাকে অনাদর করে। জানেন—ও যে-জীব জগতকে ভালোবাসে, পোকামাকড় নেড়ী কুকুর, কোলা ব্যাঙ, তাদের কথা ওর মতো করে লিখলে 'ও ছাড়তে পারত না'। কিশোরের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে এমনি শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সেটা ছাড়তে পারবে না, আপনা থেকে গ্রহণ করবে। আমাদের তো সে শিক্ষা দেবার রীতি জানা নেই, তাই আছে কেবল বকুনি ও নিরাশা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সকলে যখন হাল ছেড়ে নিরাশ হয়ে খেদ করছিলেন, তিনি কিন্তু তখন সত্যি সত্যি আপন ভবিষ্যত খাচ্ছিলেন না, আপন স্বভাব ও মনের ধর্ম অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যত তৈরী করছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল বন্ধন-অসহিষ্ণু উদাসীন এক কিশোর—চির চঞ্চল এবং সুদূরের পিয়াসী।

সে প্রচলিত কোন শিক্ষাকেই মেনে নিতে পারলে না, গ্রহণ করলে নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষা—শৈশব থেকে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁর কবি মনের বিকাশ ঘটল। পৈতে হবার পরে বছর খানেক মহর্ষিদেবের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে এমন একটি বিশিষ্ট শিক্ষা পেলেন যার মূল কথা হচ্ছে সত্যকে ও শোভনকে বাইরে থেকে নয় অন্তর থেকে গ্রহণ করা। আর ছিল বাড়ির আবহাওয়া থেকে বিচিত্র বিষয়ের রস সংগ্রহ। সাহিত্য শিল্প দেশানুরাগ পত্রিকা-সম্পাদনা করা—সবই তাঁর বাড়ির আবহাওয়া থেকে সহজ স্বাভাবিক আনন্দে পাওয়া; জোর করে বাইরে থেকে চাপানো নয়। তখনকার দিনের রুচিশীল সঙ্গীতিবান সাহিত্যরসিক সঙ্গীত পাগল বহু লোকের খুব কাছে

আসতে পেরেছিলেন বাড়ির মধ্যে থেকেই। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্নেহ ও উৎসাহ লাভ করেছিলেন—জীবনস্মৃতির পাতায় পাতায় তাঁদের কথা লেখা আছে। সমাজ-সংসার আত্মীয় স্বজন সকলের বহু-চেষ্টা শাসন তিরস্কার হতাশা বেদনা সব ব্যর্থ করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবল গ্রহণ করলেন মনের স্বাভাবিক শিক্ষাকে।

'মানুষ' হবার সব পথ নিজেই রুদ্ধ করে দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন—একটিমাত্র পথ সে তাঁর কবিতা লেখা। জীবন স্মৃতিতে আছে—'বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই—কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে-লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্‌বুদ্‌রাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল।' তাঁর কবিতাও তখন বাড়ির লোক বা বাইরের কারুর কাছেই কিছুমাত্র মান-মর্যাদা পায় নি, উৎসাহও পায় নি। 'কবিত্বশক্তি' সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মানলাভের পক্ষে আমার এই একটিমাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারও কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না,—তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।'

বাইরের কোনো বন্ধনে নয়, রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছিলেন নিজের মনের বন্ধনে।

জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তার মধ্যে আবার শৈশব-কৈশোরই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। আত্মজীবনীতে নিজের এই অদ্ভুত অপূর্ব কৈশোরটিকে এঁকে রেখেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, একটি চিরন্তন মুক্ত-প্রকৃতি সমাজ-সংসার উদাসীন সংগীত—মুগ্ধ বালক-চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টি করে অমর করে রেখে গেছেন—সে উদাসীন তারাপদ। সে মানব-সংসারে 'অতিথি', বিশ্ব-জননীর ক্ষ্যাপা ছেলে এবং সে যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, এ কথা বললে ভুল বলা হয় না। 'অতিথি' গল্পে তারাপদর আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণনা পড়া মাত্র এ সত্য ধরা পড়ে।

'গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে।' এ তো হুবহু পনেরো ষোলো বছরের রবীন্দ্রনাথের ছবি। তাঁর তারাপদর স্বভাব। 'হরিণ শিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত।'

এ নিতান্তই রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রকৃতি বর্ণনা ভিন্ন আর কিছু নয়। তারাপদর সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন—'কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত।'

নিজের সম্বন্ধে এমনি বর্ণনা আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে—শৈশব থেকে বন্ধন-অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ। আমৃত্যু নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। ভিতরের চাঞ্চল্যই তাঁকে বেশি দিন একস্থানে থাকতে দেয়নি, এমন কি একঘরে অবধি নয়। একসময় তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা—গোরুর গাড়ি চড়ে 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত ভ্রমণ করবেন; শিলাইদহ পতিসর রাজসাহী পাবনা প্রভৃতি—অঞ্চলে পদ্মাবক্ষে বোটে করে বেড়িয়ে তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতির মনোরম বৈচিত্র্য ও সুর-মাধুর্যই তাঁকে তারাপদর মতো পাগল করেছে। 'সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে,'—জলস্থল প্রকৃতির এই উন্মত্ত গতিবেগ কেবল তারাপদকেই ঘর-ছাড়া বন্ধন-মুক্ত করেনি, ক্ষণে ক্ষণে রবীন্দ্রনাথকেও প্রবল বেগে আকর্ষণ করেছে। তিনি তাই মনের আনন্দে গেয়ে উঠছেন—

হা রে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দে রে
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।

এই চির-মুক্ত আপনা-ভোলা কৈশোরের কোনো বয়স নেই, পরিণতি নেই, শাশ্বত আনন্দময়-সত্তায় সে নিত্য বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথের পরিপক্ব ঠাকুর্দা তাই বালকদলের সঙ্গে গান গেয়ে বেড়ান—

'আমরা নূতন প্রাণের চর
থাকি পথে-ঘাটে নাই আমাদের ঘর।'

বলেন— 'আমাদের পাকবে না চুল গো
মোদের পাকবে না চুল।'

শরৎচন্দ্রের কিশোর 'শ্রীকান্ত' এবং 'ইন্দ্রনাথ'-ও রবীন্দ্রনাথের এই আসক্তি-শূন্য প্রকৃতিরই প্রতিরূপ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু'র মধ্যেও এমনি একটি কল্পনা-প্রবণ প্রকৃতি-পাগল কিশোরের দেখা মেলে। রবীন্দ্রনাথ 'উদাসীন তারাপদ'কে সৃষ্টি করে নিজেকে এবং ভারতের গীত-পাগল মুক্ত-বন্ধ বাউল প্রকৃতিকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে রেখে গেলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ব্রহ্ম-উপাসক রবীন্দ্রনাথ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি
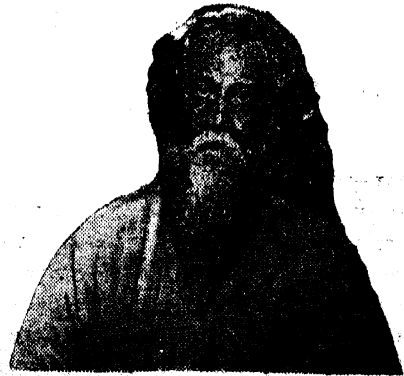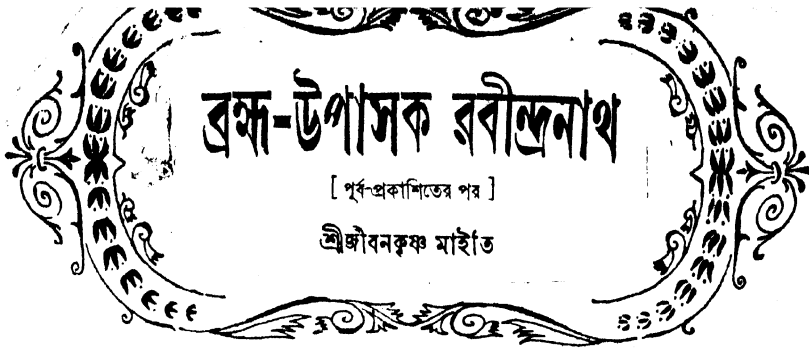
তখন কবিগুরু ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলেন এটা ত অস্বাভাবিক নয়। তুমি কে : যে তুমি তাঁকে ডাকবে : তিনি তোমায় ডেকে না নিলে তোমার আর তাঁকে ডাকা হয় না, তিনি তোমায় স্মরণ করিয়ে না দিলে তোমার আর তাঁকে ডাকা মনে থাকে না, তিনি তোমার চৈতন্যের একটা দিক স্পর্শ না করলে তোমার সংশয়ের বেদনা ত জাগে না। সংশয়ের বেদনাই ত আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। প্রসবের বেদনা না উঠলে ডাক্তাররা প্রসূতি সমন্ধে যেমন ভয় পান, তেমনি মনে সংশয়ের বেদনা জেগে না উঠলে ব্রহ্মা আরও অধিক ভয় পান। তাই কবিগুরু বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে ব্রহ্মের চরণে গভীর ব্যাকুলতা জানালেন—নিবেদন জানালেন—

"যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু।
দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনদিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝংকারে
দয়া করে তুমি ক্ষণেক দাড়ায়ো
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর,
বজ্র বেদনে জাগায়ো আমায়
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনও দিন তোমার আসনে
আর কাহারও বসাই যতনে
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেও না কভু"

ঠাকুর—সংসারের তীব্র জ্বালায় যদি আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ থাকে, যদি তোমাকে আমি ডাকতে ভুলে যাই যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যের তাড়নায় তোমার আসনে আর কাহারও বসাই, তাহলে হে প্রভু—তুমি আমার হৃদয় দুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে—আমাকে তোমায় পাওয়ার ব্যাকুলতায় ভরিয়ে দাও।

যে ব্যাকুলতা নিয়ে তোমারই জয়গান ঘোষণা করে সূর্য, চন্দ্র দিন রাত্রির সৃষ্টি করছে, যে ব্যাকুলতায় নদী সমুদ্রে জোয়ার ভাটার খেলা চলছে, যে ব্যাকুলতা দিয়ে প্রকৃতি দেবী নব নব পত্র, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হয়ে পৃথিবীকে নয়নাভিরাম করে তুলেছে ও তোমার অসীমত্বকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং জীব জগতের জীবন ধারণের রসদ জুগিয়ে চলেছে—সেই ব্যাকুলতা, তুমি আমার প্রাণে জাগিয়ে দাও প্রভু।

"বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়—
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।"

তখন সহজাত ভয় জেগে উঠে—সংসারে আবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব আমরা। সংসারের চিন্তায়, সংসারের তাড়নায় আবার ত মন থেকে সেই ব্যাকুলতা চলে যাবে। তাই কবিগুরু গেয়ে উঠলেন ব্যাকুলতা জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে তাঁর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ ও স্থান পাওয়ার প্রার্থনা জানাতে হবে।

"গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে—
কত সুখের খেলায় কত
নয়ন জলে হে।
ধরা দিয়ে দাও না ধরা,
এস কাছে, পালাও ত্বরা,
পরাণ কর ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।
গান গাওয়ালে এমনি করে
কতই ছলে যে,
তব সুরের লীলাতে মোর
জনম যদি হয়েছে ভোর
চুপ করিয়ে রাখো এবার
চরণ তলে হে।
গান গাওয়ালে চিরজীবন!!
কতই ছলে যে।"

তুমি তাঁর চরণ তলে স্থান প্রার্থনা করেছ। এখন তোমার মনে তাঁর চরণ তলে স্থান প্রার্থনায় গর্ব জেগে উঠেছে। শিক্ষার গর্ব জেগে উঠেছে। অহং-এর গর্ব জেগে উঠেছে। তাই কবিগুরু প্রার্থনা জানালেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে

সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

আমার সকল অহঙ্কার, আমার আমিত্ব নয়ন জলে ডুবিয়ে দিয়ে এখন আমার "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" করে দাও প্রভু। আমার অন্তর উজ্জ্বল করে দাও, নির্মল করে দাও, সুন্দর করে দাও, অমৃতত্বে ভরিয়ে দাও প্রভু।

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।"

চিত্ত চাঞ্চল্য লুপ্ত হয়ে এখন তোমার মন সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের চরণে সমাহিত হয়েছে।

"শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে
যদাস্থাস্যতি নিশ্চলা
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্
তদাযোগম অবাপ্স্যসি।"

"বেদবাণীর দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন একাগ্রতায় স্থির হইবে ও অচল থাকিবে তখনই তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ কর্মযোগ করিতে পারিবে।"

তখন তুমি দিব্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করবে "ক্ষুদ্রকে লইয়া বৃহৎ, সীমাকে লইয়া অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি, প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি—সেইখানেই দেখি সীমার মধ্যে সীমা নাই।"

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

আরও গেয়ে উঠলেন—

"ভাব পেতে চায়, রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি একার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। এর তুলনা মেলে না। এ যেন বিষমের উক্তির নির্য্যাস।

"একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

তাই কবিগুরু প্রার্থনা জানালেন—

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়ার মাঝে।"

তখন তুমি পরিষ্কার উপলব্ধি করবে, তিনিই সব, তুমি কিছুই না। তিনি তোমায় যেমন বলাবেন তুমি তাই বলবে। তিনি তোমায় যেমন করাবেন তুমি তাই করবে।

"কী বলিতে চাই, সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।"

তুমি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে উপবেশনে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্ব্বদাই তাঁরই খেলা অনুভব করবে। ভোরের আলোতে যখন পথে বেরিয়ে পড়বে—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
প্রভাত হল যেই কী জানি হল একী
আকাশ পানে চাহি কী জানি কারে দেখি।"

তখন তুমি দেখবে তিনি শুধু আলো। শুধু আলো। শুধু আলো। তাঁর ছায়া নাই, তাঁর কায়া নাই। আমার মধ্যেই তাঁর ছায়া, আমার মধ্যেই তাঁর কায়া; আমার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ, আমার মধ্যেই তাঁর বিকাশ; আমার মধ্যেই তাঁর লীলা, আমার মধ্যেই তাঁর খেলা—

"তোমার আলোয় নাই ত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া।
হয় সে আমার অশ্রু জলে
সুন্দর বিধুর।"

সেই আলো দেখে তাঁর সম্বন্ধে গান করবার ইচ্ছা জেগে উঠবে, ও তাঁর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার বাসনা জেগে উঠবে—

কবিগুরু গেয়ে উঠলেন তখন তোমার মুখে কথা ফুটবে না, কণ্ঠে সুর আসবে না, তাঁকে তুমি উচ্ছিষ্ট করতে পারবে না।

"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।"

বরং তুমি তখন প্রার্থনা জানাবে

"যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।"

"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই
অন্তর গ্লানি সংসার ভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।"

তাই কবিগুরু গেয়ে উঠলেন প্রত্যেকে যুগ যুগান্তরের উচ্চতম কার্য্যকলের শক্তি জাগে জীবন পট শেষ করে যেয়ে চলেছে সেই আলোর দিকে—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥

ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবন ধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয়
সে আজকে নয়।
কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয়
সে আজকে নয়।"

এখন তোমার সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য লুপ্ত হয়ে গেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের খেলা, যে সভা তুমি বসিয়েছিলে তোমার জীবনে—তাহা লীন হয়ে গিয়েছে। সাধনার বলে তুমি এখন নিজের স্বরূপ এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে প্রেমসাগরে ডুব দিয়েছ। তাই কবিগুরু নিবেদন করলেন—

"সভা যখন ভাঙবে তখন
শেষের গান কি যাব গেয়ে।
হয়তো তখন কণ্ঠ হারা
মুখের পানে রবে চেয়ে।"

"এতদিন যে সেধেছি সুর
দিনে রাতে আপন মনে
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা
সমাপ্ত হয় এ জীবনে
এ জনমের পূর্ণ বাণী
মানসবনের পদ্মখানি
ভাসাব শেষ সাগর পানে
বিশ্ব গানের ধারা বেয়ে।"

তোমার জয় যাত্রার পথে এখন আর কোনও বাধা নাই। মনের সমস্ত চাঞ্চল্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আছেন কেবল তুমি—আর তিনি। তাই কবিগুরু গেয়ে উঠলেন—

"এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসাযাওয়া—
ওরে প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া,
জানি নে আর ফিরব কি না
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চলরে ঘাটে কলস খানি
ভরে নিতে।।

এবার চলে গেল তোমার জগৎ, চলে গেল তোমার অহং, ডুবে গেল তোমার অনুভব শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, চিন্তা শক্তি। তুমিই তিনি—তিনিই তুমি। তুমি সমাধিস্থ হয়ে গেলে। কবিগুরু আনন্দে গেয়ে উঠলেন—

"এ কি সুন্দর শোভা। কি মুখ হেরি এ
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয় নাথ
প্রেম উৎস উথলিল আজি
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী
কী ধন তোমারে দিব উপহার।।

আর প্রার্থনা জানালেন
"বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবারবেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।"

প্রভু, তুমি আমার এই সমাধি ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে আর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে, মরজগতে ফিরিয়ে দিও না। আমায় তুমি এইখানেই শেষ করে দাও। আমি যেন এই মরজগতে আর ফিরে না আসি প্রভু।

ওঁ ইতি ব্রহ্ম।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ

"ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।
ওঁ"

আধুনিক প্রেমের ট্রাজেডি

সুধাংশু চৌধুরী

আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'প্রেমতত্ত্ব' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, জানিনে সেটা কার কেমন লেগেছে। তার ভেতর দিয়ে চিরশাশ্বত প্রেমের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধের সুরটা একটু বেসুরাই। তার কারণ, বর্তমানে যতই আমরা আধুনিক যুগের মধ্যে উঠে আসছি ততই শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা সবার কাছে সুসভ্য বলে পরিচয় দিচ্ছি। কিন্তু এই সুসভ্য নারী-পুরুষের সম্পর্কটা যে পর্যায়ে নেমে আসছে বা এসেছে, তার রূপটা যেমন কদর্য তেমনি নারকীয়। আধুনিক যুগের এ নারকীয় প্রেমের পরিণতি দেখে স্বভাবতই আমাদের মনে করবার কথা এই যে, আমরা সভ্যতার আলোকে দীপ্ত হচ্ছি, না কি অধঃপতনের দিকে নেমে যাচ্ছি?

প্রেম জীবনের দুর্লভ বস্তু। প্রেম যৌবনের ধর্ম। প্রেম কর্মপ্রেরণার ইন্ধন। সাত্ত্বিক প্রেমের পুণ্যপূত স্পর্শে মানুষের মন হোয়ে উঠে সুকুমার নির্মল। প্রেম মানুষকে আপন করে। দেশকে আপন করে। কিন্তু আধুনিক যুগের হাওয়া প্রেমকে দিন-দিন যে চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর সত্যিকারের প্রেমের মূর্চ্ছনাটা কোথায়?

খবরের কাগজের 'আইন-আদালতে'র কলমটা আজ-কাল এক শ্রেণীর পাঠকের খুব ইণ্টারেষ্টিং পাঠ্য-বিষয় হোয়ে উঠেছে। প্রায় বন্ধুকেই দেখি, যারা খবরের কাগজ খুলে প্রথমেই আইন-আদালতের পৃষ্ঠাটা খোলেন। আশ্চর্য, প্রায় দিনই একটা-না-একটা খবর আছেই। কোন কোন দিন একাধিকও থাকে। হেডিংগুলোও মন্দ নয়—'বিবাহের নামে ফুসলাইয়া পলায়ন' 'পাশবিক অত্যাচার' 'নাবালিকার উপর ধর্ষণ'—এমনি পর্যায়ে কত বিচিত্র ঝুড়ি ঝুড়ি ঘটনার ঘনঘটা। এসব ছাড়াও যে পর্যায়ে দেখা যায়, কোন মেয়ের সংগে কোন ছেলের ভালোবাসা হলো। সে ভালোবাসা দানা না বাঁধতেই মেয়েটির ওপর পাশবিক অত্যাচার করে প্রেমিকের পলায়ন। তার ফলে—অর্থাৎ ভালোবাসার পরিণতির ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। ডাক্তারের পরীক্ষা। তার পর আইন-আদালত। ফলাও করে কাগজে তার ইতিহাস। তা ছাড়া আজকালকার পিতামাতাও যে কন্যাদের পাশবিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার জঘন্য দৃষ্টান্তও আজ বিরল নয়।

এমনি নানা ধরণের ঘটনা প্রায় নিত্যদিনকার ব্যাপার হোয়ে উঠেছে আজ-কাল। এর ফলে আমাদের সভ্যতার মুখোশটা দিন-দিন ঢিলা হোতে বসেছে। এ ব্যাপারে অশিক্ষিতের চেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই অভিযুক্ত হন বেশি। তবে বড়ো ধরণের রুই-কাতলা হলে তো জাল ছিঁড়েই ফসকে যান। ক'দিন ধরে বোটানিক্যাল গার্ডেনের 'মধুচক্র'কে নিয়ে কাগজে তো খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। মধুচক্রের অন্তরে যাঁরা অর্থাৎ—যে আই, সি, এস; আই, এ, এস এবং বড়ো বড়ো গেজেটেড অফিসাররা অভিযুক্ত হোয়েছেন, তার ভেতর দিয়েও কি বোঝা যায় না আমাদের সমাজ আজ কত বড়ো অবক্ষয়শীল স্থান হোয়ে দাঁড়িয়েছে? তা ছাড়া সংসারকে বাঁচাবার জন্য বর্তমানে অনেক শিক্ষিত মেয়েকে অফিসে ছুটতে হচ্ছে, তাদের অনেকেরই প্রতি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অশোভন আচরণ এবং কুরুচিপূর্ণ ইংগিতের কথাও খবরের কাগজ মারফৎ আজ আমাদের কাছে অজানা নয়। এর ভেতর থেকে কি বোঝা যায় না, আজ কত নীচে নেমে যাচ্ছে আমাদের সমাজ—আমাদের মনোবৃত্তি? দিন দিন কত অধঃপতন ঘটছে নারী পুরুষের পবিত্র সম্পর্কের? সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, যার ভেতর সংযম আর আদর্শের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সে সৃষ্টির পেছনে রয়েছে স্রষ্টার ঐকান্তিক ভালোবাসা, আজ কি সেই জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের এই অধঃপতন ঘটছে? সৃষ্টি কি ব্যর্থ হতে চলেছে?

আজ ড্রেনে, পায়খানায়, আস্তাকুঁড়ে, পথের ধারে ছড়িয়ে আছে কত পিতৃমাতৃ-পরিচয়-হীন সদ্যোজাত জীবন্ত-মৃত শিশু। কেউ হয়তো গাড়ীর সংগে পিষ্ট হোয়ে যাচ্ছে কেউ ময়লার সংগে চলে যাচ্ছে ভাগাড়ে, কেউ পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলতে না মেলতেই চিরদিনের মতো নির্মমভাবে বিদায় নিচ্ছে পৃথিবী হতে, এ সব কি প্রেমের নামে পাশবিকতার জলন্ত স্বাক্ষর নয়? একটা জীবন সৃষ্টি করতে আমরা পারিনে, কিন্তু একটা জীবনকে নষ্ট করতে আমাদের এতটুকুও দ্বিধা হয় না। হায় রে সুসভ্য মানুষ! অবৈধ সন্তানের পিতা কলংকের ভয়ে গর্ভবতীকে ফেলে হচ্ছেন অন্তর্দ্ধান, মা সমাজের মধ্যে নিজের আত্মসম্মানকে বজায় রাখবার জন্য নিষ্পাপ শিশুকে দিচ্ছেন বিসর্জন। সৃষ্টি আজ আমাদের কাছে এতোই লাঞ্ছিত, এতোই পদদলিত! কিন্তু মানুষ কি কখনো ভাবে, আমি সৃষ্টির, না কি সৃষ্টি আমার?

এমনি লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত কত নিষ্পাপ শিশু, আমাদের অবৈধ প্রেমের ফুল হোয়ে পর্দার অন্তরালে লয় হোয়ে যাচ্ছে। সে সহস্র শিশুর ভেতরেও হয়তো একদিন বরেণ্য নেতা, কবি, শিল্পীর জন্ম হতো, কিন্তু তারা কিছুই হলো না, হলো শুধু অপাঙক্তেয়। এই যে অবৈধ প্রেমের অজস্র নমুনা—এ সব দেখলে, এ সব ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়, কিন্তু এজন্য দায়ী কে? আমরা। আমরা আজ সভ্যতার মুখোশ এঁটেছি। উপযুক্ত পণ না দিলে মেয়ের বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে আমরা নারাজ, আবার সময় সুযোগে অবৈধ ভাবে মেয়েটির সর্বনাশ করতেও ছাড়ছিনে। স্কুল-কলেজে—মাঠে-ময়দানে সব সময় তাদের পেছু নিচ্ছি। লেক-পার্কে সিনেমা হাউসে গিয়ে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় গিয়ে নভেলিং ঢংয়ের প্রেমের ভণিতা করে প্রেমসাগরে ডুব দিচ্ছি। প্রেমের প্রলাপ বকতে কারো চেয়ে কেউ কম নয়। সবাই যেন এ ভূমিকাটি রপ্ত করে রেখেছেন জীবনের চরম মুহূর্তের জন্য, তার ফলে জীবন এগিয়ে চলেছে সোনালী রঙ্গমঞ্চ আকাশের দিকে। শেষে মনের আকাশেও রঙ লাগে। তারপর আকাশে আকাশে ঘর্ষণ খেয়ে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েন। মাঝখানে একটি অমূল্য জীবনই নষ্ট, সেখানের সমাজে মান-সম্মান রক্ষা করাটাকেই বড়ো কথা এবং বাঞ্ছনীয় ভাবে। সেখানে কেন বিমুক্ত প্রেমের এই

ভণিতা ? এ কি ব্যভিচার নয় ? এ যে পরম সত্যের অপমান। পরম প্রেমের চরম নির্যাতন। স্বর্গীয় প্রেমকে কলংকিত করবার নিছক হীন প্রচেষ্টা।

আধুনিক যুগের সে ভয়াবহ প্রেমের ও নারী-পুরুষের বিশৃংখল জীবনের একটা বেদনাবিধুর কাহিনী আমরা পাই চির-অমর কথাশিল্পী কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের 'Kreutzer Sonata' নামক জগৎ বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে। অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় দুঃখ করে যার নামকরণ করেছেন 'এ যুগের অভিশাপ।' এর মাধ্যমে—এ প্রেমের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সম্বন্ধটা দিন দিন হীন হতে হতে চলেছে। এতে প্রেমিক যেমন দায়ী প্রেমিকাও কোন অংশে কম নন। পুরুষকেই বলি, ভালোবাসা যদি করলে তবে সুখেদুঃখে বাসাও গড়তে পারতে। ভালোবাসার অজুহাতে একটা জীবনকে তলিয়ে দেবার কোন অধিকারই নেই তোমার। আর নারীকেও বলি, তোমার মধ্যে যখন প্রেমের ফুল ফুটলো, ফলও যখন ধরলো, তখন সে ফলটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করলে কেন ? কলংকের ভয়ে ? কলংকের ভয় যদি তোমার মধ্যে থাকে তবে, নিশ্চয়ই তুমি পারতে ভারতের সনাতন রীতির মর্যাদা রক্ষা করতে। অন্তরের পবিত্র প্রেম দিয়েই যদি দানবকে ভালোবাসতে পারলে, তবে 'জাবালা' হতে পারলে না কেন ? অন্তত: 'সত্যকাম' তো তোমার সারাজীবনের সঞ্চয় হতো ! তুমি যে নারী, নারী হয়ে জন্মেছ যখন সমস্ত দুঃখই তোমাকে সহ্য করতে হবে—সমস্ত কলংকই তোমাকে বুক পেতে নিতে হবে। না হলে কেমন করে তুমি দানবের মধ্যে নারী হবে ? ওটাই তো তোমার শ্রেষ্ঠত্ব। ওটাই তো তোমার নারীজীবনের সম্বল।

কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই। সভ্যতার বাধে। শিক্ষার নাড়ীতে টান পড়ে। তবু স্বতঃই মনে আঘাত লাগে আধুনিক যুগের এই প্রেমের পরিণতির কথা ভাবতে বসলে—চাক্ষুষ দেখলে। মাঝে মাঝে মন বলে ওঠে, ভালোবাসা অপরাধ নয়। নারী পুরুষকে ভালোবাসবে—পুরুষ নারীকে ভালোবাসবে, এ যে সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম। প্রত্যেকটি জীবনের মধ্যে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়। তাই একটি পুরুষ তার জীবনের সমস্ত বাসনা—সৌন্দর্য ও উপলব্ধি দিয়ে একটি নারীকে আপন করবে—নারীও তার জীবনের সব মধুরতা দিয়ে একটি পুরুষকে আপন করবে এতো শাশ্বত রীতি। পবিত্র এষণা। মধুর আকুতি। এতে পাপ নেই—এতে অপরাধ নেই—এতে নেই কোন মলিনতা। এতে ফোটে সার্থক সৃষ্টিরই যথার্থ রূপ। এ রীতি সর্বকালের—সর্বদেশের—সর্বজীবনের। কিন্তু আপন করতে করতে গিয়ে যদি কামনার বহ্নিই ধিকি-ধিকি করে জ্বলে—একটা ব্যগ্র প্রবৃত্তিই যদি হাঁ করে থাকে, তাকে কি বলবো প্রেম ? তাকে কি বলবো ভালোবাসা ? এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তির সংগেই যদি মিটে যায় চাওয়া-পাওয়ার সব স্বাদ, তবে তাকে কি বলবো ভালোবাসা ? নাকি এটা ভালোবাসার নামে ব্যভিচার !

আগেকার দিনে সিভিল ম্যারেজ ছিলনা বটে তবে গন্ধর্ব মতে বিয়ের রীতি ছিল। কালীঘাটে বিয়ের রীতিটা ছিলনা বোধ হয়। সিভিল ম্যারেজটাকে গান্ধর্ব বিয়েরই নব-সংস্করণ বলা চলে। কিন্তু সে গান্ধর্ব বিয়েতে ভালোবাসার নামে ব্যভিচার ছিলনা। ছিল দুটি মনের মর্মমুকুরে একটি মিলিত জীবনের পবিত্র একাত্মতা। রাজার ছেলে হোয়েও একটা গরীবের মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, ধনীর দুলালীকেও ভালোবাসতে পারে একটি গরীবের ছেলে। কিন্তু অর্থের মাপকাঠিতে যেখানে আজ দাঁড়িয়েছে ভালোবাসার রীতি বিচার, আর যেখানে নায়িকার পরিজন জিজ্ঞেস করেন, 'কি যোগ্যতা আছে তোমার আমার মেয়েকে ভালোবাসার'—সেখানের জীবনে সেখানের সমাজে ভালোবাসার মূল্যই বা আর কতটুকু ? ভালোবাসাটা কি অর্থের মাপকাঠিতে ভর দিয়ে আসে ? নাকি অন্তরের মাপকাঠিতে ভর দিয়ে আসে ? অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে একমাত্র অর্থকেই দেখেছি। তাই এ বক্তব্য বিষয়।

সমাজের আর একদিকে যদি নজর ফেলি, এবার দেখতে পাবো, যারা এক ভোগের জীব। নারীর মূল্যটা তাদের কাছে শুধু এক পাত্র সুরা ছাড়া আর কিছু নয়। সুরার নেশা কেটে গেলে সাকিরও অস্তিত্ব বিচার করবার সময় থাকে না, নতুন সুরের ব্যঞ্জনা এসে মনকে মাতিয়ে তুলে। তাদের কাছে সাকী আর সুরার কোন তফাৎ নেই। সাকীর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। সাকী তাদের কাছে নেশার ইন্ধন—কাচের পেয়ালা। ভাঙলে নতুন আসে। তাই খবরের কাগজে প্রায় দেখি, বিয়ের নাম করে, ভালোবাসার অজুহাতে একটি জীবনের হাসি-আনন্দকে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে এদের এতটুকুও বাধে না। চরম দুঃখ নির্যাতনের মধ্যে তখন প্রেমিকাকে নাবতে হয় পথে। ভালোবেসে সে চেয়েছিল জীবনে পুরুষ ও প্রকৃতির শাশ্বত রূপকে রূপায়িত করতে। দুটি মানুষ হবে। সুখে দুঃখে সংসারের এই পটভূমিতে রচনা করবে একটি সুখের নীড়। হাসি-অশ্রুর লীলায়িত প্রবাহে ওরা পরস্পরকে আপন করবে। সে আপন-করা ভালোবাসার মধ্যে থাকবে জীবনের আদর্শ। সে আদর্শের মধ্যে দিয়ে তারা পৃথিবীকে ভালোবাসতে পারবে। তাদের দুটি জীবনের মধ্যে সে সৃষ্টির মুকুল এসে তাদের বন্ধনকে আরো নিবিড় করবে, তাকেও সকল আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলবে। কিন্তু তার সমস্ত আশার সমস্ত ভালোবাসার প্রতিদানে পেলো সে চরম তিক্ততা। ভালোবাসার অন্তর মথিত সুধায় সে হতে পারলোনা সুধাময়ী, হলো কলংকিনী। তার বুকের রক্তধারা নিঙড়ে যে এলো—যার আবির্ভাব হলো পৃথিবীর মাটিতে তখন তার পিতৃ-পরিচয় দেবার মতো প্রেমিক আর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া গেল না। আত্মমর্যাদার পৃথিবীতে তখন নতুন সুযোগ এঁটে বসেছেন সে প্রেমিক পুরুষ। আর সে পিতৃপরিচয়হীন সন্তান হলো সভ্য যুগের একটা অবাঞ্ছিত জীব—একটা নির্মম কলংক। সে মুহূর্তে সমাজ আর সংসারকে বাঁচাতে গিয়ে সে প্রেমিকাকে করতে হলো আত্মহত্যা, নয়তো সন্তান বিসর্জন, নয়তো কোন এক অন্ধকার গলির বিষবাষ্পে অবতরণ। সেখানের বাতাস পুঞ্জ পুঞ্জ কলংকের বার্তা বহন করে ডানা মেলে শূন্য আকাশে। সে অন্ধকার গলিতে কত জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, কত প্রাণ ডুকরে ডুকরে কেঁদে মরছে। ধূলায় লুঠোচ্ছে সতীত্বের আলোধন্ত জীবন। এখানে শুধু দেহের বেসাতি—মনের বেসাতি নেই। কুল-মান-সমাজ রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য কত অমূল্য জীবন আজ এ গলির বুকে কেঁদে কেঁদে মরছে তার হিসেব আর কে রাখে। দিনের পর দিন হয়তো বেড়েই যাবে এর সংখ্যা, এর প্রতিকারও হয়তো হবে না কোনদিন। এই প্রেমের জীবনে নারী কলংকিনী আজন্মের কলংকিনী যেন, পুরুষ তার

পৌরুষ নিয়ে সাত্ত্বিক শুদ্ধ। এখানের কলংকিনীরা আলোর পৃথিবীতে আসতে ভয় পায়। অন্ধকার গলিই ওদের সর্বহারা জীবনের অন্ধকার জীবনের আস্তানা।

এই যে প্রেমের পরিণতি, এর জন্য দায়ী কে? আধুনিক প্রেমের এ কি সব চেয়ে করুণ ট্র্যাজেডি নয়? এ কি ভালবাসার চরম পাওয়া?

অভিজ্ঞতা হয়তো আমার প্রচুর নয়, বয়েসটা যেমন কাঁচা, অভিজ্ঞতাও হয়তো তেমনি। কিন্তু এ তরুণ বয়সের গোড়াতেই এমনি অসংখ্য ঘটনা দেখেছি শুনছি। যার কথা ভাবতে গেলে আমাদের চরম সভ্যতাকে স্বীকার করতে বাধে। অন্তরে আঘাত পাই। প্রেমের এ নির্বাণ পরিণতির মধ্যে আমাদের গুরুজনেরও একটু-আধটু দোষ-ত্রুটি থাকে। তেমনি মাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি:

বর্ধমানের কোন একটা সুসভ্য গ্রামের এক অভিজাত গোস্বামী-বংশের একটি ছেলের সংগে একটি কাছেরই গোস্বামী-পরিবারের মেয়ের সংগে সদ্ভাব হয়। ছেলেটি যেমন সুশ্রী তেমনি শিক্ষিত এবং নম্র স্বভাবের, মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী এবং মধ্যমশিক্ষিতা। তারা উভয়ে যখন বুঝতে পারলো তারা পরস্পরকে আন্তরিক ভালোবাসে এবং বৃহত্তম জীবন-ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে কামনা করে, তখন হিতৈষী বন্ধুর মারফৎ কথাটা দু পক্ষের অভিভাবকদের কানে তুললো। ছেলে পক্ষের অভিভাবক তো কথাটা শুনেই তেলে-বেগুনে চটে গেলেন। কিছুতেই তা হতে পারে না। অসম্ভব! দ্বিতীয়—গোস্বামীতে গোস্বামীতে বিয়ে হয় না। আর এদিকে কন্যাপক্ষ আধুনিক যুগের কথা ভেবে তেমন ওজর-আপত্তি তুললেন না। যেখানে বৈধ ভালোবাসা সেখানে বৈধ ভাবে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া ভালোবাসার প্রকৃত আঘাত হয়তো জীবনটাকে নষ্ট করতে পারে—করে।

ছেলেটি বাপের সুদৃঢ় অমতের কথা শুনে উধাও হলো। গুরুজনরা যুগান্তরের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণার কলমে বিজ্ঞাপন দিলেন অমুক ফিরে এসো, তোমার জন্য মা শয্যাগত, বাবা অসুস্থ, আত্মীয়-স্বজন শোকাকুল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি ইত্যাদি। আসলে ছেলেটি গ্রামেই ছিল, তবে জীবন্ত নয়, মৃত। গ্রামের বড়ো পুকুরটার তার পচা দেহটা ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। তারপর হৈচৈ। এই যে একটা অমূল্য জীবন নষ্ট হোয়ে গেল এর জন্য দায়ী কে?

আর একটি ঘটনা বলির। মাস তিনেকের জন্য কোনও কার্যোপলক্ষে বালি ঘোষপাড়ার কাছাকাছি একটা গ্রামে আমাকে থাকতে হোয়েছিল। সেখানে এক 'সাহা'-পরিবারের এক শিল্পী বন্ধুর সংগে আমার আলাপ হয়। সে শিল্পী বন্ধুর সংগে একজন কাছেরই গায়িকা ব্রাহ্মণ-কন্যার সংগে ভালোবাসা হয়। উভয়ের সরকারী আইন মতে বিয়ে হয়। রেজেষ্ট্রী বিয়ের ব্যাপারটা তারা গোপন রেখেছিল। এবং নিজেরা নিজেদের বাড়িতে বাস করছিল। ছেলেটির অবস্থা খুবই ভালো। নিজেও যথেষ্ট উপার্জন করে এবং সমাজের পরোপকারী বলে তার যথেষ্ট খ্যাতিও আছে। কিন্তু এদিকে গোপন বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রইল না, প্রকাশ হোয়ে পড়লো। প্রকাশ হতেই জানা গেল, মেয়ের বড়ো ভাই-ই বিয়ের একজন সাক্ষী। তিনিই এই বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হলে কি হবে, মেয়ের কাকা-জেঠারা (বাপ নেই) জনতে ঘোষণা করলেন, এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। এ অসবর্ণ বিয়েকে তারা স্বীকার করেন না। তাই মেয়েকে তারা নতুন করে বলাতে চেষ্টা করলেন এবং রাজি করাতে চেষ্টা করলেন, "এ বিয়েতে তোর মত ছিল না, তোকে বিয়ে করতে বাধ্য করিয়েছে।" কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না, কারণ মেয়ে পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কা। সে কিছুতেই তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে পারলো না। মেয়ে নিজের সম্বন্ধে সচেতন। মেয়ের দৃঢ়তা দেখে মেয়েকে কলাকৌশলে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হলো। এর ফলে হলো কি দুটি বিবাহিত জীবনই যখন প্রাপ্তবয়স্ক তখন আইনে তাদের কিছুই করতে পারবে না। মাঝখানে তাদের দাম্পত্য-জীবনে একটা অশান্তির বীজ ছড়ানোই হলো। মিলন হলেও তাদের পূর্বের মতো সহজ-সরল হতে সময় লাগবে, হয়তো বা সে সহজিয়া রূপটা ফিরে না-ও আসতে পারে। আর যদি মিলন না-ও হয় কোনক্রমে, তবে দুটো জীবনই নষ্ট হোয়ে গেল। দুটি জীবনের স্বপ্নে-গড়া সৌধ নিমিষের মধ্যে ধূলিসাৎ হোয়ে গেল। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সমাজও দায়ী আমাদের গুরুজনরাও দায়ী। আজ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাত-সম্প্রদায় ভুলে মানুষ মানুষেরই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেখানে এ বাধার প্রাচীর কেন? সেখানে কি উচিত নয় বর্তমান যুগের অস্তিত্ব দিয়ে নিজেদের সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলা? জাতের হানাহানি ছেড়ে মিলিত প্রচেষ্টায় নবজীবনের উৎস রচনা করা। আজ যেটার মধ্যে এতো বাধা-বিঘ্ন, আগামী কাল সেটা হয়তো হবেই বাধাবিঘ্নহীন। যখন হবে—যখন হতে চলেছে—যখন দ্রুত তার গতি—যখন তাকে ঠেকানো যাবে না তখন কি আমাদের উচিত নয় সে পথকে বাধামুক্ত করা? এর ফলে হয়তো সমাজের অনেক ব্যভিচার আর আত্মহত্যা লাঘব হবে। হতে পারে।

এমনিতর কত শত খুঁটি খুঁটি ঘটনায় ঘনঘটা উল্লেখযোগ্য। যা কোনদিন কাগজে ছাপা হয় না। কাগজে আর কত ছাপবে? কত আর জমাবে এই ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী? অবৈধপ্রেমের কাহিনী আত্মহত্যার কাহিনী! কোলকাতা হাওড়া—সাঁত্রাগাছি এমনি কত কত জীবনকে নষ্ট হতে দেখেছি। কেউ প্রেম করে মরছে কেউ অবৈধ প্রেম করে মরছে। এ সব ঘটনাতে যেন আর নতুনত্ব নেই—নিত্যদিনের ব্যাপার হোয়ে উঠেছে। তাই আধুনিক ভালোবাসার প্রেমিকদের সম্বন্ধে একটু কাব্য করতেও ইচ্ছে করে—

> ভালোবাসা কি চিজ জানা আছে কারো কি?
> রঙ টা কেমনতরো বলতে ভাই পার কি?
> ভালোবাসার মায়াজালে জড়িয়েছ অনেকে
> বুঝেছ কি দেখে?
> বুঝেছ কি স্বাদ?
> টক—মিষ্টি—ঝাল—নোন্তা কি তার আস্বাদ?
> লাল—নীল—হলুদে কি কালো আঁধার না আলো?
> জলের মতো তরল কি মধুর গাঢ়তা
> কেমনতরো ভালোবাসা জানা আছে তা?
> বুকে বুকে ঠেকালে কি স্বাদ পাওয়া যায়—
> মাঝখানে নাকি বাড়ে শুধু ব্যথাটাই?...

ব্যথাটা বাড়ছে কি কমছে সেটা আজ-কাল কারো অবিদিত নয়। কিন্তু এই ভালোবাসার জন্ত তো সর্বেন্দ্রিয় প্রখর মানুষের জন্ম নয়। সাত্ত্বিক জীবনের ভেতর দিয়ে সাত্ত্বিক প্রেমকে বরণীয় করাই তো

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের ধর্ম। তাই বলতে হয় বুকে বুকে ঠেকালেই প্রেমের সব উপলব্ধি হয় না। প্রেমের উপলব্ধি অন্তরে। অন্তরেরই প্রেমই একদিন মানুষকে পাগল করে—মানুষের জীবনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে।

এই যে প্রেম, এই যে প্রেমের ব্যভিচার, এর জন্য দুঃখবোধ করে কয়েক সপ্তাহ আগে, চিত্তরঞ্জনে স্বামী স্বরূপানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সে বক্তৃতার ভেতর তিনি বর্তমানের নারীপুরুষের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আগেকার দিনে আজকের মতো ভালোবেসে বিয়ে হতো না, বিয়ের পর ভালোবাসা হতো। বিয়ের পরই স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে চিনতো। তার ভেতর দিয়েই তারা সুখে-দুঃখে সংসার করেছেন। তাতে ব্যভিচারের কোন প্রশ্নই উঠতো না। বর্তমান যুগে সিভিল ম্যারেজের সৃষ্টি হোয়েছে—তার মধ্যে মাননীয় নেতা নেহেরু আবার 'ডাইভোর্স'-এর কানুনটাকে টেনে এনেছেন। অর্থাৎ স্বামীর সংগে বনিবনা না হলে পরিত্যাগ করতে পারা যাবে। কিন্তু এটা কি ভালোবাসার আদর্শ? এটা কি নারী-পুরুষের চিরন্তন প্রকাশ? ভালোবাসা করে বিয়ে করছে করুক, তাতে বরং আনন্দের কথা এই যে, পরস্পরকে বিয়ের পূর্বে জানতে পারলো. চিনতে পারলো। তাতে কারো মনে কোন আক্ষেপ থাকে না। কিন্তু এর মধ্যে আবার ডাইভোর্স কেন?

যেখানে মন দেয়া-নেয়ার পর বিয়ে—সেখানে আবার পরিত্যাগের প্রশ্ন উঠে কেন? আর পুরুষ যদি খারাপই হয় শেষ বিচারে, তবে তুমি নারী হোয়ে তাকে সৎপথে আনতে পারো না? তা নইলে যে তোমার নারীজন্মই বৃথা। মনে করেছ ডাইভোর্স করে মনের মতো আর একজনকে বেছে নেবে, নেবার আগে তোমার সতীত্ব যাবে তলিয়ে, যা পড়ে থাকবে তা নারীত্ব। সে নারীত্ব দিয়ে যাকে তুমি জয় করতে পারলে না—আর একজনকে তুমি কেমন করে জয় করবে? করলেও যে তুমি সুখী হতে পারবে না, কারণ একটা অনুশোচনা যে নিয়তই তোমাকে দংশন করবে। পুরুষেরও কি উচিত নয় স্ত্রীকে সৎপথে পরিচালিত করা? স্ত্রীকেই যদি তোমার ভালোবাসা-প্রেম দিয়ে জয় করতে না পারলে সেখানে তোমার পৌরুষ কোথায়? আর একবার বিয়ে করে? আপনাকে যেখানে জয় করতে পারলে না, সেখানে পরকে জয় করার পৌরুষ বৃথা। তাই বলি, ভালোবাসো, প্রেমে বলি হও। যে ভালোবাসা দিয়ে তুমি অন্যকে জয় করতে পারছো না সে ভালোবাসা দিয়ে একজনকে বলো, আমার প্রাণের চেয়ে তোমাকে আমি ভালোবাসি—সেটা হবে ভুল, কারণ মানুষ নিজের চেয়ে কোনদিন কাকেও বেশি ভালোবাসে না। নিজের রোগযন্ত্রণার নিজেই কষ্ট পাও, যাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাস সে কিন্তু কষ্ট পায় না। সে তোমার কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করে মাত্র। তাই আগে নিজেকে ভালোবাসতে শেখো, তবে পরকে ভালোবাসতে শিখবে। সে ভালোবাসা দিয়ে অজেয়কেও জয় করতে পারবে। তখন ব্যভিচারের কোন প্রশ্নই উঠবে না মনের মধ্যে। এটাই জীবনের চরম আদর্শ। এটাই ভারতের সনাতন রীতি।

এই তো গেল ভালোবাসার রীতি, এবার ভালোবাসার বিকৃতির স্বরূপটা কেমন করে আজ আমাদের অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটাও বলি। অতঃপতনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে, চলচ্চিত্রের রগুদার ছবিগুলো আর সিনেমা-পত্রিকাগুলো। এরা দিনে দিনে ধ্বংসের বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী ছবির পরিচালকও নন আবার সিনেমা-পত্রিকার সম্পাদকও নন। সেন্সর বোর্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে ছবি আমাদের চোখের পর্দায় ভাসে, তা যদি অশ্লীল হয় তার জন্য দর্শক মাত্রই প্রতিবাদ করতে পারে কিন্তু করছে কে? আমরাই তো তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। যেখানে অর্থাৎ যে ছবিতে লেখা থাকে শুধু 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' সেখানে ভীড় করে অপ্রাপ্তবয়স্করা। যে ছবি দর্শনে আমাদের রুচিতে বাধে, সভ্যতায় আঘাত হানে, সমাজের ক্ষতি করে, সেই ছবি দেখবার জন্য, তার টিকিট সংগ্রহের জন্য আমরা লাইন দিচ্ছি ভোর পাঁচটা থেকে। ঘরে হাঁড়ি ডন টানুক ক্ষতি নেই—ছবিটা না দেখলেই নয়। সুতরাং এই অরুচির দিকেই যখন আমাদের ঝোঁক, তখন পরিচালক ব্যবসার খাতিরে, অধিক অর্থের জন্য সে ছবি বের করবেই। মুনাফার জন্যই যখন ব্যবসা তখন সেই বা পেছিয়ে আসে কেন? যারা প্রতিবাদ করবার মানুষ তারা তো সে রগুদার ছবির মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক। সুতরাং আর পরিচালকের দোষ দিয়ে লাভ কি?

সিনেমা-পত্রিকায় ক্ষেত্রেও এই ধরণের উক্তি প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন শুনি, 'সিনেমা-পত্রিকাগুলো দেশের আর মান-মর্যাদা রাখলো না। নানা ঢংয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি দিয়ে পাঠক-পাঠিকার অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাটা খাচ্ছে।' কিন্তু যিনি এই তিক্ত মন্তব্য করলেন, তাঁর হাতেও একটা সিনেমা-পত্রিকা এবং বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে বিশেষ ছবিতে চোখ বুলাতেও তাঁকে দেখা যায়। সুতরাং কে কার কথা শুনবে? সিনেমা-পত্রিকায় বিভিন্ন মুডের ছবি দেখার জন্য আমরাই আগ্রহী। আমরাই সম্পাদককে অনুরোধ করছি, অমুক সংখ্যায় অমুকের ছবিটা ছাপালে বাধিত হবো। আমরাই পত্রিকার পাতায় পাতায় বিভিন্ন ধরণের প্রেমের প্রশ্ন, হাল্কা ভালোবাসার প্রশ্ন করছি। দুনিয়ার যত বাজে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি জমা হচ্ছে সম্পাদকের টেবিলে। এই রুচিহীন পাঠকের এই অভিরুচিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পাদককে মেনে নিতে হয়, না হলে যে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি। সুতরাং এর জন্য হতভাগ্য সম্পাদককে দায়ী করে আর কি লাভ? বাধ্য হয়েই তাঁকে সংস্কৃতির নামে বিকৃতির ফিরিস্তি দিতে হয়।

রঙ দুনিয়ার এই রগুদার ছবি দেখে দেখে যারা প্রেমতত্ত্বের অ-আ জানতো না, আজ তারা প্রেমতত্ত্বের ব্যাপারে স্পেশালিষ্ট। এঁচোড়েই যেন পেকে বসে আছে। প্রেমের বাজারে ছোট-বড়ো-মাঝারি সব আজ একদর। দস্তুরমতো সবাই প্রেমিক-প্রেমিকা। কারো চেয়ে কেউ কম্‌তি নয়। সাহিত্যিক যদি তার নায়ক-নায়িকার প্রেমের ভূমিকায় এসে সম্বোধনের বা প্রসংগের অবতারণা করতে কূল-কিনারা না পান, তবে এদের কাউকে ডাকলে প্রেমের খৈ ফুটিয়ে দেবে। এই রগুদার প্রেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়ে মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ে নায়িকা যখন ভেসে উঠেন—তখন দেখেন যে তার মধ্যে আর কিছু নেই, সব ফেঁসে গেছে। তখন বাধ্য হোয়ে অন্য পথ বেছে নিতে হয় রুচি হিসেবে। হবু নায়িকা হবার আশায় কত জন যে গাবুবাবুদের হাতে হেস্ত-নেস্ত হোয়েছেন—হোচ্ছেন তার খানিকটা নমুনা নীলকণ্ঠের 'অন্ত ও প্রত্যন্তে'র পাতায়ও আছে।

আর কি দেখি ? প্রায়ই খবরের কাগজ মারফৎ দেখতে পাই—কোন কলেজ বা স্কুলের ছাত্রীর প্রতি ছেলেদের অশোভন ইংগিত—অশ্লীল ব্যবহার ইত্যাদি। এ-ও প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে কি প্রমাণ হয় না, শিক্ষার উচ্চমার্গে উঠতে উঠতে নিজের অজান্তে কত নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি ? যে সংযম, একাগ্রতা, সাধনা ও নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আমরা শিক্ষার আলোকে দীপ্ত, তার এই পরিণতি কি প্রশংসনীয় ? জীবনের মহৎ আদর্শকে আমরা দিন দিন এ ভাবে হারাতে বসেছি। অথচ সগর্বে আমরা বলতে লজ্জা পাই না, আমরা কত উন্নত—কত কালচার্ড। আমরা যখন দেশের স্বপ্ন, তাহলে কি এই ভাবেই আমরা আমাদের স্বপ্নকে রূপায়িত করবো ?

আর কি দেখি ? দেখি ফাংশান বা জলসায় আধুনিক আর আধুনিকাদের ভীড়—ঢলাঢলি। উভয় পক্ষই চায়, সাজ-পোষাকের ভেতর দিয়ে নিজেদের জাহির করতে। আকৃষ্ট করতে। কিন্তু তার ফলে কি হয় ? কেউ কেউ আকৃষ্ট হন বৈ কি। ফলে তরল প্রেমও জাগে এবং অচিরে তার গরলও উঠে আসে। সে গরল যখন সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে নায়কের নো-পাত্তা। নায়িকার আধুনিক রুচিজ্ঞান বেশী হলে আধুনিক পথই বেছে নেন এবং জীবনের সর্বশেষ হিসেবের খাতায় যখন লাভ-লোকসানের হিসেবটা টোটেল দেন, তখন দেখেন লাভ যা হোয়েছে তা জিরো এবং লোকসানটা বলাই বাহুল্য।

আর কি দেখি ? যাঁরা ভালোবেসে বিয়ে করে সুখী হননি—হতে পারেননি তাঁদের দেখি। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামি-স্ত্রী হয়তো উভয়েই চাকরী করেন। স্ত্রীকে হয়তো পুরুষ মহলেই চাকরী করতে হয়। স্বামী যদি কোনদিন রাস্তায় বা অন্য কোথাও স্ত্রীকে স্ত্রীর অফিসের কোন তরুণ ভদ্রলোকের সংগে হেসে হেসে কথা বলতে দেখেন তখন স্বামীর অবস্থা শোচনীয়। সেই থেকেই মনে একটা কাঁটা ফুটে থাকে। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখেন। তার ফলে স্বামি-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নেমে আসে অশান্তি। বনিবনা হয় না প্রায়ই। স্বামীর এ ছোট মনের পরিচয় পেয়ে স্ত্রীর মনেও অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠে। স্বামীর সম্বন্ধে যে সু-কাব্য রচনা করেছেন মনে মনে মুহূর্তের মধ্যে তা মিথ্যা হোয়ে গেল। ফলে যেটা কোনদিন কল্পনাতীত অবিশ্বাস্য অসম্ভাব্য সময়ে সময়ে তাই হোয়ে ওঠে। এটা অবশ্য নারীপুরুষ দুয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব এবং প্রযোজ্য। এখানে কি দেখি, যেখানে দুটি মন মহৎ ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে মহত্তর হলো, সেখানে আবার এ অবিশ্বাসের ধুকপুকানি কেন ? সেখানে স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করেনা, স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করেনা সেখানে আবার কোন দেশী ভালোবাসা বাসা বাঁধলো ? তাকে কি প্রেম বলবো ?

পুরুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম প্রচেষ্টায় যেখানে সৃষ্টির এ অনন্ত বিভব, সেখানে যদি পুরুষ হোয়ে উঠে ব্যভিচারী অবিশ্বাসী নারী হোয়ে উঠে বিশ্বাসঘাতিনী ব্যভিচারিণী সেখানে সার্থক সৃষ্টির উৎস কোথায় ? অনাদিকাল থেকে স্রষ্টা আমাদের মধ্যে রোপণ করেছেন প্রেমের বীজ। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের বন্ধনে বন্দী হোয়ে নতুন জগৎ রচনা করবে। সময়ে পুরুষ এসে দাঁড়াবে নারীর পাশে, নারী এসে দাঁড়াবে পুরুষের পাশে। মনের সংগে মনের—প্রাণের সংগে প্রাণের যে মিল তার মধ্যেই ভালোবাসার পরম লগ্নের অবস্থিতি। কিন্তু ভালোবাসার গোড়াতেই যদি থাকে পুরোপুরি ফাঁকি, তবে কেমন করে একে অন্যকে আপন করবে ?

অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, কোথাও কি মহৎ প্রেমের জন্ম হচ্ছে না ? হচ্ছে। কিন্তু অনেকের মধ্যেই যে অবৈধ প্রেমের জন্মই বেশি—দৃষ্টান্তই বেশী। সুতরাং যেটা বহু, অথচ কম হওয়া উচিত, সেখানে বহুটাকে নিয়েই আমার আলোচ্য বিষয়। তাদের নিয়েই আমার আলোচনা, যাঁরা শেষ পর্যন্ত দুঃখ করে বলেন—

'সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু
অনলে দহিয়া গেল'—

তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জীবনের এ চরম মুহূর্তে আমাদের সে মহৎ ও আদর্শ জীবনযাত্রার প্রয়োজন। তা নয় কি ?

আজ আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীন যুগের পটভূমিকায় কুসংস্কার আর আব্রুকে পরিত্যাগ করে নারী এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের পাশে পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে নারীর পাশে। আজকের দিনে এমনটার প্রয়োজন ছিল। তা হোয়েছে। আনন্দেরই কথা। এর ভিতর যদি কোন বিশেষ পুরুষ কোন বিশেষ নারীকে ভালোবাসে বা কোন নারী যদি কোন বিশেষ পুরুষকে ভালোবাসে, পরস্পর পরস্পরের চোখে সুন্দরের চিরন্তন রূপে মুগ্ধ হয়, তার ভেতর তো কোন অন্যায় বা অপরাধ থাকতে পারে না ? সে যে সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু ভালোবাসার নামে ব্যভিচার মহাপাপ। অন্তর না দিয়ে মুখের বুলিতে মধুর হাসিতেই কি সাত্ত্বিক প্রেমের জন্ম লাভ হয় ? এই সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা বাণী উল্লেখযোগ্য—

'মনে কি করেছ, বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে ?'

(নারীর উক্তি)

সুতরাং আমাদের এই ভাবধারার জন্ম লাভ করা উচিত নয় কি ? প্রেম যেখানে সত্য, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ যেখানে অটুট, সেখানে সে সত্যকে যথার্থ ভাবে ভাবা। এ বোধটুকু যদি আমাদের জন্মে তবে নিছক প্রেমের অজুহাতে সৃষ্টির মধ্যে কোনদিন আমরা অনাসৃষ্টির বীজ ছড়াবো না। আর অসংখ্য কলংকেরও জন্ম হবে না। মানুষও আর পশুত্ব প্রাপ্ত হবে না।

প্রেমকে মহৎ অন্তঃকরণ দিয়ে ভাবার মধ্যে পরম তৃপ্তি আছে। সুতরাং জীবনে আত্মবিশ্বাস নিষ্ঠা এবং সংযমের প্রয়োজন। তাহলে আমাদের দাম্পত্য বা প্রেমের জীবনে কোন কলুষতাই আসবে না, আসতে পারে না। তা হলে সুখ-দুঃখে প্রেমময় জীবন অটুট থাকে। এবং ট্রাজেডিরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। সে মধুর জীবনের মুহূর্তগুলো আনন্দের প্রস্রবণ বহে আনবে। লক্ষ লক্ষ হাসি হোয়ে ঝরে পড়বে জীবনের মুহূর্তেরা। তার ভেতর দিয়ে সৃষ্টিও সার্থক এবং পুরুষ ও প্রকৃতির জীবনও ধন্য। তাই নয় কি ?

"Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely."
—*Lord Acton*

শ্রীপরিতোষমাণিক্য সেনগুপ্ত

জগদীশচন্দ্রর জীবনের প্রতি ধাপে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে কোন যুক্তির অবতারণা ছিল না—তাঁহার কর্মের মধ্য দিয়া আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই স্বদেশপ্রেম তাঁহার যৌবনারম্ভে কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছাইয়া দেন তাঁহারই পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগদীশচন্দ্র বি-এ পাশ করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তৎকালীন এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের পুত্র আই-সি-এস প্রভৃতি পরীক্ষা দিয়া উচ্চপদ লাভের জন্য উৎসাহী হইবেন, তাহাতে অশ্চর্যের কিছু ছিলনা। কিন্তু পিতা ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি নিজে সরকারী চাকুরে হইলেও তাঁহার পুত্রও এই গতানুগতিক চাকুরীতে আসিবে তাহা তিনি চাহিতেন না। তাঁহার মতে, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার মধ্যে কিছু সম্মান থাকিতে পারে, অর্থোপার্জনেও কৃতিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু ইহাই শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম নহে।

পুত্রকে বলিলেন, 'ভারতবর্ষ বিজ্ঞান সাধনায় সবার পেছনে, মেধাবী ও সঙ্গতিবান ছাত্রদের এ বিষয়ে তপস্যা করা উচিত—ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা কর্তব্য।'

পিতার অভিপ্রায়ই রক্ষিত হইল, জগদীশচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস' ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস-সি উপাধি লইয়া স্বদেশে ফিরিলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা লইয়া গবেষণায় মগ্ন হইলেন।

গবেষণার ফল ফলিল, নূতন নূতন যুগান্তকারী তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। সেই তত্ত্বকে তিনি মাতৃভাষায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ ছিল তখন উদ্যমহীন, অকর্মঠ—ঘোর অন্ধকারের দেশ; নিজের প্রতি আস্থা ছিলনা আমাদের দেশবাসার। সেইজন্য বিদেশে যাচাই না করিয়া, বিদেশের প্রসংসাপত্র না পাইলে তাহার মূল্যায়নে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন।

ঐ সময়ের বিবরণ জগদীশচন্দ্রের লেখা হইতে পাওয়া যায়, তিনি লিখিতেছেন, 'আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশামাত্র।'

এই অবহেলা বা মূর্খতার জন্যই বিজ্ঞান বিষয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা বা তত্ত্ব-স্বীকারের মঞ্চ এই দেশে তৈরী হইতে পারে নাই এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীকে বিদেশের দুয়ারে ধর্ণা দিয়া মরিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নিজের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় যুক্তিস্থাপন করিতে হইয়াছে। 'অব্যক্ত' বই-এর শুরুতেই তাই আচার্যদেবকে গভীর আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লেখেন,···'বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে; সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয়ত এই জীবনে দেখিত না।'

তাই বলিয়া তিনি জাতির আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-স্রোতের আভাষ দেখিতে পাইয়াছিলেন, মুমূর্ষুর মধ্যেও তিনি জীবিতের জীবন দেখিয়াছিলেন। তাহার নজীর মিলে 'নবীন ও প্রবীণ,' প্রবন্ধে, তিনি লিখেন—'যে মুমূর্ষু সেই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে; যে জীবিত তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে; যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।'

কারণ—

'দেহের মৃত্যু-ই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংস-ই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।'

বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম র‍্যামসে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে সমাদর করিলেও ভারতের জ্ঞানযুগের সূচনা দেখিতে পান নাই। বৃটিশ রক্তের সাম্রাজ্যবাদী অহঙ্কারেই তিনি অন্ধ হইয়া

ভারতীয় প্রতিভার ব্যাপ্তিকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল ; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।'

জগদীশচন্দ্রের চোখের সম্মুখ দিয়া ভারতের জীবনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে—তাহা তিনি প্রত্যয়ের চোখে দেখিয়াছেন, তিনি কি করিয়া এই অপবাদ সহ্য করিবেন ? সদর্পে উত্তর দিলেন, 'আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিবে।'—সত্যানুসন্ধানী জগদীশচন্দ্রের দৃপ্ত ঘোষণা অচিরে সত্য, সত্যই সফল হইল।

আসল কথা, পরাধীন ভারতের গৌরব ইউরোপীয়েরা কোন মতে-ই সহ্য করিতে পারিত না, কালো-আদমীকে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হইত, ঘৃণা করিত। যাহার ফলে, ভারতের উন্নয়ন লক্ষ্য করিতে-ই তদানীন্তন ভারত-সরকার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে—'শিক্ষা-বিষয়ক ডেপুটেশনে ভারত সরকার বিলাতে পাঠাইতে রাজী নহে, কারণ, ভারতীয়গণ কখন-ও বিজ্ঞান গবেষণায় মনঃসংযোগ করে নাই।'

ভারতের এই অপমান অধ্যাপক বসু নীরবে সহ্য করেন নাই। প্রতিবাদ জানান, 'এরূপ উদাসীনতা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নহে।'

এই অবজ্ঞা শুধু অধ্যাপক র‍্যামসের নয়, ভারত সরকারের নয়—সারা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের। স্যার জগদীশের কীর্তিতে স্তম্ভিত হইয়া তাহারা আর সামলাইতে পারে নাই ; তাহাদের চক্রান্ত, হিংসা, দ্বেষের নগ্ন স্বরূপ প্রকট করিয়া তুলিল। এ বিষয়ে প্রচুর দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, ওয়েলার ও স্যাণ্ডার্সন সাহেব। ওয়েলার সাহেব আবার আরো এক কাঠি সরেস। তিনি জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ চুরি করিয়া নিজের নামে চালাইয়া দেন!

তখনকার আবহাওয়ার সংবাদ লেডি অবলা বসুর বিবরণ হইতে জানা যায়। তাহা হইতেই উপলব্ধি করা যায়, ভারতের সুনাম রক্ষার জন্য বিজ্ঞানাচার্যকে কত কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

লেডি বসু লেখেন—'আমরা দূর হইতে ইউরোপকে সমুদয় সদ্‌গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুই তিন বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যাহা পাওয়া যায়, আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে। এখানে Scientific menদের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ, তাহা শুনিয়া অবাক হই।'

স্বদেশের সম্মানের জন্য এমন কঠোর সাধনার মন্ত্র জগদীশচন্দ্র কোথা হইতে পাইলেন ? এই বীজমন্ত্রের মূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁহার বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান-সমরে উৎসাহিত করিয়া বিলাতে চিঠি লিখিলেন, 'য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতে-ই ফিরিবো না।···ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন।'

পাশ্চাত্যের অবজ্ঞা, শ্বেতাঙ্গের কটাক্ষকে বাড়িয়া ফেলিয়া বীরদর্পে কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া চলার জন্য ঐ পত্রেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না—তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্বর রং-চং বসন-ভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।'

জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগ্রাম বন্ধুর স্বপ্ন রক্ষা করিয়াছে—নব ভারতের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।

তাহার দৃষ্টান্ত পাই সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণের জবাবে জগদীশচন্দ্রের এক বাণী হইতে। ভারতের বহুমুখী মানসিক শক্তির উৎকর্ষের কথা তিনি তাহাতে জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ১৯৩১ সনের ১৪ই এপ্রিল আচার্যদেবকে টাউন-হলে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। তখন মেয়র ছিলেন দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র বলেন, 'আজ ভারতবর্ষ তাহার বহুমুখী মানসিক শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা জগতের জাতিসঙ্ঘে একটি সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছেন। এক বৃহত্তর শক্তি এই পুণ্যভূমির সন্তানদের অগ্রগতির পথে চালিত করিতেছে, ভবিষ্যতের বৃহত্তর শক্তি এই পুণ্যভূমির সন্তানদের অগ্রগতির পথে চালিত করিতেছে, ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারতের গঠনে তাহাদিগকে জ্বলন্ত বিশ্বাসে উৎসাহিত করিতেছে,।'

যে অগ্নির শক্তি ভারতকে অগ্রগতির পথে আলো দেখাইয়াছিল তাহা ভারতেরই নিজস্ব মহাশক্তি। সেই অগ্নি জগদীশচন্দ্র পাইয়াছিলেন। বিলাত হইতে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ডাঃ বসুর একটি পত্রে সেই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, '···আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দু-সন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।'···

যুগদীপ্তি রবীন্দ্রনাথও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা ভারতের হৃদয়ে স্থায়ী করিয়া দিবার জন্য, দিকে দিকে বিস্তার করিবার জন্য বন্ধুকে লেখেন, 'যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না—তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে।'

বন্ধুকে জগদীশচন্দ্র নিরাশ করেন নাই। তাঁহার জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সারা জীবনের স্বদেশপ্রেম এই মন্দিরের প্রতি ধূলিকণার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লেখেন—'কেবলমাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন করতে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্যসাধনা—এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ—তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাহিরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার

মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেখের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা করেছ।'

আচার্য বসুর দেশপ্রেম শুধু দেশকে বিজ্ঞান-গৌরব করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিও তাঁহার অন্তর আকুঞ্চিত ছিল। নতুবা তিনি তখনকার স্বরাজকামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের খবর রাখিতেন না। তপস্বী বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক বিশেষ রাখেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠির মারফৎ সে সংবাদ তাঁহার কাছে পৌছিতে দেখা যায়। যিনি তাঁহার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিনি 'আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খবর' দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮ সনে কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের পর হইতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জগদীশচন্দ্রকে চিঠিতে বর্ণনা দিয়েছেন, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা 'বন্দে মাতরম' 'ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।'

স্বদেশের আকর্ষণ মাঝে মাঝে আচার্যদেবকে পাগল করিয়া তুলিত, বিদেশ হইতে ফিরিবার জন্য তিনি উতলা হইয়া পড়িতেন। দেশে ফিরিলে বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাঘাত হইতে পারে, এমন কি উদ্দেশ্য অপূর্ণও থাকিয়া যাইতে পারে, তাহা তিনি জানিতেন। তবু দেশের মাটিতেই ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।'

দ্বিজেন্দ্রলাল একদা ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে অনেক গানও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে জগদীশচন্দ্রই তাঁহাকে উপদেশ দেন এবং তিনি তাহা কার্যে পরিণত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এক পত্রাংশে তাহার উল্লেখ আছে। তিনি লেখেন, 'ধন্য পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।'

ইহার পরই দ্বিজেন্দ্রলাল বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' গানটি রচনা করেন এবং আরো বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হন।

জগদীশচন্দ্রের 'অগ্নিপরীক্ষা' নামে স্বদেশপ্রেমের ঐতিহাসিক গল্পের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

এই গল্পের মূলঘটনা তিনি নেপাল সীমান্তে ভ্রমণকালে সংগ্রহ করেন এবং নিজের সুললিত ভাষায় স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টি প্রখরোজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তোলেন।

জেনারেল গিলেস্পির নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী নেপালের অন্তর্গত কলুঙ্গা দুর্গ আক্রমণ করে। অমিত বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন বলভদ্র থাপা ও তাঁহার অনুগামিগণ। প্রবল যুদ্ধের পর কলুঙ্গা দুর্গের পতন হইল, কিন্তু নেপালীদের স্বদেশপ্রেমের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শত্রুপক্ষ ইংরেজও মুগ্ধনেত্রে দেখিল। সেই বিস্ময় ইংরেজ প্রস্তর-ফলকে খোদাইয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আজও তাহা কলুঙ্গার সন্তানের দেশসেবার সাক্ষ্য দিতেছে :—

'আমাদের বীর শত্রু কলুঙ্গা দুর্গাধিপতি বলভদ্র
এবং তাহার অধীনস্থ বীর সেনা
যাঁহারা রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন
এবং
আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া
একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—
সেই বীরগণের স্মরণার্থ
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।'

একটি প্রার্থনা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

উৎসবের দীপগুলি একে একে নিবাও নীরবে
আকাশে উড়ায়ে দাও ঘনকালো পতাকা নিযুত।
সুতীব্র শোকের ছায়া শ্রাবণের ঘনকৃষ্ণ মেঘের মতন
পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ছুটে যাক হ'য়ে ভগ্নদূত।

সকলে অবাক হয়ে ব্যগ্র হ'য়ে করিবে জিজ্ঞাসা ;—
"এ শোক কিসের জন্য ? কেন এই আর্ত হাহাকার ?"
অঙ্গুলি নির্দেশে শুধু দেখাইব লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী
নারীত্বের অপমানে বক্ষ সিক্ত করে বসুধার।
নীরব হস্তিনাপুরে নপুংসক ধৃতরাষ্ট্র, বসি
কপট শান্তির বুলি মৃদুহাস্যে করে উচ্চারণ
অহিংসার মন্ত্র—মুখে অগণিত শবের উপরে
লোলুপ শকুন সম নৃত্য করে ক্ষিপ্ত দুঃশাসন।
মহাকবি বেদব্যাস, ক্ষমা কর অর্বাচীনে তুমি
ধৃতরাষ্ট্র নপুংসক এ কথায় করিও না ক্রোধ।

গান্ধারীর প্রতিবাদ কই ? কোথা ? শুনিতে পাইনা ;
লীলাময় কৃষ্ণ কই ? পশুত্বের কোথা প্রতিরোধ ?
শ্রাবণের স্বর্ণশস্য পড়ে আছে প্রতিটি প্রান্তরে
অগ্নিদগ্ধ লক্ষ গৃহে উঠিতেছে পুঞ্জীভূত ধূম।
পাশব ক্ষুধার গ্রাসে অগণিত পাণ্ডবেরা আজ
আতংকে আকুল কুন্তী রাত্রি জাগে ভুলে গেছে ঘুম।
দ্বৈপায়ন এই চাই, এই শুধু কর আশীর্বাদ
হয় যেন ঘৃণ্য ক্লীব শাসকের শাসনের শেষ।
দুঃশাসন বক্ষ-রক্তে পাণ্ডবেরা পুনর্বার যেন
রঞ্জিত করিতে পারে সর্বহারা পাঞ্চালীর কেশ।

সৌখীন টুরিষ্টের চোখে স্যাংচুয়ারী

শ্রীঅখিলরঞ্জন ঘোষাল

রাত্রি প্রায় তিনটে হবে। ঘুম-ঘুম চোখে উঠে বসলাম বিছানায়। টেবিলে ঘড়ির এলার্ম বেজে চলেছে একটানা। মশারির মধ্যে চাপা অন্ধকার জড়িয়ে আছে। বিছানা ত্যাগ করে ঘড়িকে চুপ করাব সে ক্ষমতা নেই। কারণ ডুয়ার্সের ওই শীতে লেপের মত অমন আরামদাত্রীকে উপেক্ষা করতে মন চাইছিল না। ডিসেম্বরের শীতে কাঁপতে কাঁপতে তবু উঠতে হল। মনে মনে ভয় ছিল, সময়মত গাঙ্গুলীদা'র আস্তানায় উপস্থিত না থাকলে জীবনের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে বাদ পড়তে হবে। তাই একদিকে হি-হি করে কাঁপছি, অন্যদিকে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। সেই অবস্থায় হাত-মুখ ধুয়ে আমি ও আমার বন্ধু রওনা হলাম।

ডা: গাঙ্গুলী হলেন হাসিমারা টি-এষ্টেটের জনপ্রিয় ডাক্তার। দেহের অসুখ ছাড়াও ভদ্রলোক সন্ধান রাখতেন মনের আনন্দের। তাই ডাক্তারী-বিদ্যার অবসরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন শিকারে, খেলাধুলায়, পিকনিকে। এই অমায়িক ডাক্তার ডুয়ার্সের গেম এ্যাসোসিয়েসনের সেক্রেটারী। আমরা বলতাম গাঙ্গুলীদা'। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁর বাসায় এলাম। এখান থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হবে জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারীতে। শীতের কনকনে রাত্রে চল্লিশোত্তর গাঙ্গুলীদা'র গৃহিণীপনা দেখছিলাম। পাকা গৃহিণীর মত চা করে খাওয়ালেন। বেশ বুঝলাম এই শীতে বৌদিকে কষ্ট দিতে তিনি নারাজ। এমন সময় ডা: পাল ও স্বামিজী এলেন। খড়্গপুরের স্বামিজী এসেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে। ডুয়ার্স এলাকায় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী প্রচার করার জন্য। ভারতবর্ষের বহু দুর্গম স্থানের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। স্যাংচুয়ারী তিনি দেখেননি, তাই এমন সুযোগ তিনিও হাতছাড়া করতে চান না।

কিছুক্ষণ পর ট্রাক এল। আমরা পাঁচ জন উঠলাম। প্রত্যেকেই যথাসম্ভব শীতবস্ত্র এনেছি কিন্তু তবু শীতের কামড় অসহ্য লাগছিল। তখন বোধ হয় শুক্লাতিথির পালা চলছিল। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারার মাঝখানে অসহিষ্ণু চাঁদ। ট্রাক চলছিল উঁচু নিচু অসমান রাস্তা দিয়ে। হাসিমারা ষ্টেশন অতিক্রম করে ট্রাক চলল। অব্যবহৃত এরোড্রাম ছাড়িয়ে আমরা নীলপাড়া ফরেষ্ট রেঞ্জে এলাম। সরকারী ব্যবস্থায় সংরক্ষিত বন। বিরাট বিরাট শাল, মেহগিনি, শিমুল গাছ নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে কুলিকামিনদের ছোট ছোট বস্তি। নীলপাড়া ফরেষ্ট পেরিয়ে গাড়ি চলল। সেই নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যে ট্রাকের শব্দ ছাড়া অন্য কিছু শোনা যাচ্ছিল না। প্রত্যেকেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে আছি। স্বামিজী গল্প বলছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প। অরণ্যে পর্বতে সর্বত্রই মানুষ আছে তার হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ নিয়ে। মানুষের মত বনের পশুরাও এই সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কখনো কখনো তাদের মধ্যে এই সব প্রবৃত্তি এত প্রকট ভাবে দেখা দেয় যা দেখে মানুষ পর্যন্ত বিস্মিত হয়।

গাঙ্গুলীদা' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই ভাখ হরিণ!'

ট্রাকের হেডলাইটে দুটো হরিণ বিদ্যুৎ বেগে ছুটে পালাল। তখনও গাড়ি চলছিল। কারণ, জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারী আরো কিছুদূর। আমার বন্ধু তো হরিণ দেখে আনন্দে আত্মহারা! বনের সম্পদ বনে দেখতে কত সুন্দর লাগে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আরো কিছু দূর যাবার পর গাড়ী থেমে গেল। আমরা নেমে পড়লাম ট্রাক থেকে। এখান থেকে জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারী আরম্ভ। এবার হাতীর পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু হবে। গভীর অরণ্যে মোটরের পথ নেই এবং পায়ে চলাও নিরাপদ নয়। পশুদের রাজ্যে পশুর সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদিক দিয়ে হাতীই প্রকৃত বন্ধু। কষ্টসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এই বিরাট জন্তুটি ছাড়া অরণ্য-ভ্রমণ মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া বন্যজন্তুদের আক্রমণ থেকে অনেক সময়ে এরাই রক্ষা করে মানুষকে। স্যাংচুয়ারী যাত্রায় তাই হাতী না হলে এক পা চলা যায় না।

হাতী তখনও আসেনি। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। সেই শুক্লাতিথির মুহূর্তে আকাশে শেষ রাত্রির চাঁদ যেন বারে বারে স্বয়ম্বরা হচ্ছিল। একই অংগের এত রূপ গভীর অরণ্যও বুঝি নিতে পারছিল না। চারিদিকে রূপোলী আলোর রমশাল। আকাশের এক প্রান্তে পরিশ্রান্ত শুকতারা, অন্যদিকে যৌবনক্ষরা চন্দ্রমা।

হাতী এল ঠিক সময়ে। মাহুতের নির্দেশে হাতী অভিবাদন জানাল শুঁড় তুলে। হাতীর পিঠে উঠলাম সবাই। স্বামিজী উঠলেন অবশেষে। হাতী চলছিল গজেন্দ্রগমনে—ছেলেপুলে এবং সেই সংগে আমরাও। ভোর রাত্রে এই ভাবে অরণ্যযাত্রা মন্দ লাগছিল না। জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারীর ভিতর দিয়ে তখন চলেছি। গভীর বন শান্ত, মৌন। মাঝে মাঝে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ তখন শেষ রাত্রের বাসর-জাগা বধূর মত। ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। বিরাট বিরাট শর, বেত, নলখাগড়া গাছ প্রতিমুহূর্তে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। হাতী শুঁড় দিয়ে পথ পরিষ্কার করে চলেছে। রাত্রির শেষ আর ঊষার পদক্ষেপ। আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে প্রকৃতির চোখে তখন ঘুমের আবেশ। যেন ঘুম-চোখে সেইমাত্র কোন মেয়ে উঠে বসেছে। সম্মুখে সহস্র বাহু

মেলে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়। তার পিঠ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছেন সূর্যদেব।

নদী এল। পাহাড়ী নদী, নাম তোর্সা। তিস্তারই সহোদরা বোধহয়। প্রবল স্রোতে রাশি রাশি নুড়ি, পাথর ভেসে চলেছে। স্রোতস্বিনী আনন্দে, উচ্ছ্বাসে কলস্বিনী। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্যকে প্রাণভরে দেখলাম। কী সীমাহীন তার রূপ, কী নয়নাভিরাম সেই সৌন্দর্য! প্রশান্ত-গম্ভীর সেই আরণ্যক পরিবেশের একদিকে ভয় ও বিপদ, অন্যদিকে অপার, অসীম রূপলাবণ্য। ভয়ঙ্কর আর সুন্দর পাশাপাশি মিলেমিশে বাস করছে।

খুব সাবধানে নদী পার হল হাতী। নদী পার হয়ে উঠলাম জঙ্গলে। গভীর নিচ্ছিদ্র অরণ্য। হাতীর পিঠে বসে টুকরো টুকরো গল্প হচ্ছিল। স্বামিজী বললেন এক হস্তিনীর প্রেমের কাহিনী। স্বাদে ও গন্ধে সে কাহিনী সত্যিই অনবদ্য। এই সময় আমরা মাহুতের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। মাহুতের নাম কাঞ্চি ভোলাই। জাতিতে নেপালী। কিন্তু উত্তর-বাংলায় বাস করার জন্য বাংলা ভাষা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে।

বন্ধু হঠাৎ বলে বসল, 'আচ্ছা হাতীর নাম কি?'

মাহুত বলল, 'বাবু এটা পুরুষ-হাতী। নাম লক্ষ্মীপ্রসাদ।'

নাম বলার সংগে সংগে হাতী গর্জন করে সাড়া দিল। কিন্তু লক্ষ্মীপ্রসাদের ডাকে প্রথমটা সবাই ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল হয়তো কোন হিংস্র জন্তুর দেখা পেয়ে হাতী গর্জন করেছে। পরে অবশ্য মাহুতই সেই ভয় ভেঙে দিল। তোর্সা নদীর ধারে আমরা অনেক বন্য জন্তুর পায়ের ছাপ দেখলাম। তার মধ্যে বন্য হাতী, গণ্ডার, বাঘ ও হরিণই প্রধান। আহারপর্বের শেষে এই সব জন্তুরা জল খেতে আসে নদীতে। বিশেষ করে ভোরের দিকে অনেক জন্তুদের দেখা পাওয়া যায়। বেলা বাড়বার সংগে সংগে এরা গভীর বনে লুকিয়ে পড়ে। তখন এদের দর্শন পাওয়া কঠিন। এ ছাড়া ভোরের ঠাণ্ডায় হাতীও খুব বেশি পরিশ্রান্ত হয় না।

ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্লভ বন্য জন্তুদের বেপরোয়া শিকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই বিশেষত: স্যাংচুয়ারীর সৃষ্টি। একসময় ভারতবর্ষে যেসব পশুপক্ষী প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত কালক্রমে তাদের বংশ ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। সিংহ, গণ্ডার, বাঘ এসব হিংস্র পশুদের মানুষ নির্মম ভাবে হত্যা করেছে এবং এদের সংগে দুর্লভ নিরীহ প্রাণীদেরও বাদ দেয়নি। ভারতবর্ষে সিংহ প্রচুর ছিল, এখন একমাত্র সৌরাষ্ট্রের গির অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি স্থানে এদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে। গণ্ডারের বংশও দ্রুত লোপ পাচ্ছিল, কিন্তু সময়মত সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে এদের বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র উত্তরবংগ ও আসামেই গণ্ডারের বাসস্থান। গণ্ডার সাধারণত ভিজে মাটি ও ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি ভালবাসে। উত্তর-বংগের জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারী এবং আসামের কাজিরং স্যাংচুয়ারী গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়াও এইসব স্যাংচুয়ারীতে আছে—নানা ধরণের পাখী। সাধারণত: এই দুটি স্যাংচুয়ারী হিমালয়ের কাছাকাছি থাকার জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য 'হিমালয়ান বার্ড' এখানে বাসা বাঁধে। জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারীতে আমরা ধনেশ পাখী, প্যারেল বার্ড এবং কাকাতুয়া দেখতে পেয়েছি। আসলে, শিকারের উপদ্রব না থাকলে এই সব পশুপক্ষী স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। এমনও দেখা গেছে, নির্ভয়ে এরা মানুষের কাছাকাছি পর্যন্ত এসেছে। অতি অল্প দূরত্বের মধ্যে বনের এই সব জন্তুদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেখা গেছে।

উত্তরবংগে দুটি স্যাংচুয়ারী—জলদাপাড়া ও গরুমারা। জলদাপাড়া প্রায় ছ'মাইল বিস্তৃত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্যাংচুয়ারীদের মধ্যে অন্যতম। ডুয়ার্সের এই এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পশুপক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারীতে গণ্ডারের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া হাতী, বাঘ, হরিণ, বুনো মোষ এখানে আছে। গরুমারা স্যাংচুয়ারী শিলিগুড়ি থেকে নেমে যেতে হয়। এটি বহু পুরানো এবং প্রথম থেকেই রেষ্ট হাউসের ব্যবস্থা আছে। জলদাপাড়ায় বনের মধ্যে তৈরী হচ্ছে 'টুরিষ্ট লজ'। সবকিছু শেষ হয়ে এসেছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে বিশ্রামাগার। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং অরণ্য দেখার সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পাওয়া যাবে। শুনলাম, দক্ষিণা বাবদ জন-পিছু লাগতে পারে ১০-১৫ টাকার মধ্যে। ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবে এই রেষ্ট হাউস বা টুরিষ্ট লজ। এই টুরিষ্ট লজের ছাদের ওপর তৈরী হয়েছে অবজারভেটরী। অর্থাৎ রাত্রে এখান থেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে কিম্বা ঘনিষ্ঠ আলাপের মধ্যে আপনি জীবজন্তুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারেন। আর ক্লান্ত হলে বিছানায় এসে আশ্রয় নিতে পারেন। এর নাম হল অরণ্যের রাত্রিনিবাস।

বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে তখন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাতীর পিঠে দুর্বল কয়েকটি মানুষ। আত্মরক্ষার জন্য মাহুতের কাছে রয়েছে সিঙ্গল ব্যারেলের এক বন্দুক। সেইটুকুই আমাদের ভরসা। কিন্তু ইতিমধ্যে বনের রাজা যদি গর্জন করেন তবে নির্ঘাত হাতীর পিঠ থেকে দু'-একজন পড়বে। মনে মনে সকলেই একবার দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করেছিলাম। জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় গাছের গায়ে টিন প্লেট নির্দেশ দেওয়া আছে। এইগুলোকে বলে 'স্পটেড এরিয়া'। অর্থাৎ এখানে জন্তুরা সচরাচর আসে এবং নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। কতকগুলো জায়গায় মাটিতে লবণ ছড়িয়ে দেওয়া আছে গণ্ডারের জন্য। গণ্ডার এইসব স্থানে আসে এবং লবণ ও মাটির স্বাদ গ্রহণ করে। অনেক সময় বাচ্চাদের সংগে মা-গণ্ডার গড়াগড়ি খায়, খেলা করে।

মাহুতের মুখ থেকে শুনলাম, বনের মধ্যে সবচেয়ে বিপদের সূত্রপাত করে হিংস্র বাঘ এবং বুনো হাতী। এই দুটি জীবই বিপজ্জনক। তবে দিনের বেলায় বাঘ দেখা যায় না, অন্যান্য পশু চোখে পড়ে। সবই নির্ভর করে কিন্তু ভাগ্যের ওপর। ভাগ্য বললাম এইজন্যে যে, অনেকে ঘন্টার পর ঘন্টা স্যাংচুয়ারী চষে বেড়িয়েছেন অথচ একটি কাঠবিড়ালীরও দেখা পাননি। এমন কি দ্বিতীয়বার পরিদর্শনেও বিফল মনোরথে ফিরে এসেছেন। আবার কেউ কেউ প্রথমবারেই কৃতকার্য হয়েছেন। প্রচুর জীবজন্তু তাদের ভাগ্যে জুটেছে। তাই স্যাংচুয়ারীতে পশুদর্শন অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।

আমরা পাঁচজন হাতীর পিঠে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছি। জঙ্গল এত ঘন যে হাতীর রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল চলতে। নল, বেত ও শর গাছে চারিদিক আচ্ছন্ন। আমাদের গা-হাত-পা কেটে গিয়েছিল। তবু উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। একটা জঙ্গল

ইতিমধ্যে ঘোরা হয়ে গেছে। দু'-একটা ময়ূর, কাকাতুয়া ছাড়া অন্য জন্তু চোখে পড়েনি। সকলেই মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। হয়তো এ যাত্রা নিষ্ফল গেল। ট্রাকে আসতে আসতে সেই যা দুটি হরিণের দেখা পেয়েছিলাম। তারপর একদম ফাঁকা। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সকলের মাঝখানে বসেছিল। নির্ভয়ে সে বলে বসল, 'বাঘ-টাগ তো কিছুই দেখা গেল না। লোকের কাছে কি কেবল হরিণের গল্প করব?'

গাঙ্গুলীদা' বললেন, 'বাঘ এলে শুধু দেখা করেই যাবে না, সংগে করে নিয়ে যাবেও একজনকে।'

স্বামিজী বললেন, 'বাঘের দরকার নেই, জলদাপাড়া যেজন্য বিখ্যাত তারই প্রমাণ হোক।'

আমাদের মন ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। টুকরো টুকরো আলাপের মাধ্যমে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু সব কিছুর মাঝে মাহুতের দৃষ্টি ছিল সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু। হাতীও মাঝে মাঝে বিরক্তবোধ করছিল একটানা পরিশ্রমে। ঠিক এই সময় মাহুত ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বাবু কথা বলবেন না!'

আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকালাম মাহুতের দিকে। মাহুত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, 'ওই দেখুন!'

বিরাট একটা মা-গণ্ডার তার ছোট বাচ্ছাকে নিয়ে কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের লক্ষ্মীপ্রসাদ বুদ্ধিমান। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর আছে। একটি গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দে, বিস্ময়ে আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম সেই অরণ্যচারী বিশাল জন্তুটিকে। বাচ্ছার দিকে সব সময়ে নজর ছিল মা-গণ্ডারের। মাঝে মাঝে দু'টো কান খাড়া করে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ধরে আমরা নানাভবে দেখলাম ওদের। ওই গভীর অরণ্যেরমধ্যে কাছাকাছি দুটি জন্তুকে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। বোধ হয় শিকারের নিষিদ্ধ এলাকা বলেই এতটা নির্ভর হতে পেরেছে। মাহুতের কাছ থেকে শুনলাম, বাচ্ছা কাছে থাকার জন্য বড় গণ্ডারটি পালিয়ে যেতে পারছে না এবং এই সময় যে কোন মুহূর্তে বড় গণ্ডার আক্রমণ করতে পারে হাতীকে। চিড়িয়াখানায় গণ্ডার দেখেছি ইটের পাঁচিল দেওয়া ঘেরা জায়গার মধ্যে। এখানে দেখলাম সেই একই প্রাণীকে এক বিচিত্র আরণ্যক পরিবেশে। স্যাংচুয়ারীর সার্থকতা এইখানে।

এবার ফেরার পালা। লোকে বলে অরণ্য, ভীষণ ভয়ঙ্কর,! সে কথা অবশ্য সত্যিই। কিন্তু এ কথাও ঠিক, অরণ্য ভয়ঙ্কর না হলে অত সুন্দর হত না। বিপদের মধ্যেই তো উল্লাস, রোমাঞ্চময়তা! যার দৃষ্টি আছে, সাহস আছে সেই পারে ভয়ঙ্করের মধ্যে থেকে অনিন্দ্যসুন্দরকে আহরণ করতে। জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারীতে আরও কিছুক্ষণ ঘুরলাম। অন্য জীবজন্তু বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। তবে বাঘ, হরিণ, বুনো হাতীর পায়ের ছাপ দেখে প্রতিমুহূর্তেই তাদের আগমন আশা করেছি। সকাল আটটা নাগাদ সূর্যদেব ক্ষমাহীন হয়ে উঠলেন। এদিকে লক্ষ্মীপ্রাসাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। বেচারী আমাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। কাঁটা গাছের জন্য তার শরীরের বহু জায়গায় কেটে গেছে। কিন্তু তবু একান্ত প্রভুভক্তের মত সে সারাক্ষণ আমাদের পাঁচজনকে পিঠে বহন করেছে। স্যাংচুয়ারা দেখার মূলে যদি কারও কাছে ঋণী থাকতে হয় তবে লক্ষ্মীপ্রসাদের নাম আগে করতে হবে।

পাহাড়, বন ও নদী মিলে বাংলা দেশের যে আরণ্যক সৌন্দর্য আছে তা ক'জন বাঙালী জানে? নিছক দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বছরের শেষে আমরা ছুটে বেড়াই অন্যদেশে। অথচ ঘরের দিকে ফিরে চাই না একবারও। নিজেদের ঘরে যে বিপুল ঐশ্বর্য আছে তার খবর ক'জন রাখি? বাংলা দেশের দুটো স্যাংচুয়ারী এখনও বহু বিদেশীর কাছে লোভনীয় কিন্তু বাঙালীর কাছে বোধহয় এখন ও ভয়ঙ্কর ও ভীষণ!

আমার বন্ধু কেকা

বিনতা মুখোপাধ্যায়

তোমার সাথে যখন দেখা হল
আমার তখন বন্ধু কেহ নাই,
হাত বাড়িয়ে নিলাম তোমায় টেনে
বুকের মাঝে দিলাম করে ঠাঁই।
ভালবাসার তৃষ্ণা অনেক ছিল
তবু তোমায় হয়নি ভালবাসা,
পাবার আগেই হারিয়ে গেলে তুমি
মনের আশা রইল হয়ে আশা।

সুরের মাঝে লুকিয়ে থাকে গান
অভিমানে নীরব হল বুঝি,
তবুও তার মন না মানে মানা
বন্ধুকে তাই বেড়ায় খুঁজি খুঁজি।
এই হৃদয়ের শান্ত সাগর তীরে
বন্ধু অনেক আসবে যাবে কত,
তুমিই শুধু আসবে নাকো ফিরে
বিদায় নিলে চিরদিনের মত।

সাগর থেকে যায় না জানি কেন
নদীর লেখা চিহ্ন কোথাও নাই,
বিচ্ছেদের শূন্য আকাশতলে
তোমায় যেন আপন করে পাই।

॥ শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ॥

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, আমাদের ছাত্ররা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ মারা হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। তার ফলে হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে, সেটার উপর দাগ দিয়ে দেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোদেনষ্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আঁস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। বৃটিশ ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্রগিরি তো করেচিই—সেই স্কুলের বাইরে একটা বড় আঙিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটী—সেখানেই আমাদের ভারতীয় দরবার, সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্য। সাউথ-কেনসিংটন স্কুল অফ আর্টসের ফোঁটায় গৌরব নেই। বরং তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্যাদা করা হয়।

এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মত লেখা থাকবে যে তারা ইংরেজ গুরুমশায়ের চেলা। এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিষ্ট যদি দৈবী শক্তির অসম্মান করতে সমর্থ হয় তা হলে তার উপরে কখনো ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে।

—রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তোর উপহারটি পেয়ে খুব খুসি হলুম সুন্দর হয়েছে। প্রকৃতির বুকের মধ্যে যে হেঁয়ালি আছে তাই নিয়েই আমার কারবার। আমার জন্মদিনে তারই ছবিটি সঙ্গত হয়েছে। ইতি—

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তুই যে ফোটো পাঠিয়েছিস সেটা পেয়ে আমি খুব খুসি হলুম। এ ছবির কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমার ১৪-১৫ বছরের ছাব—এ আর কারো কাছে নেই।

বিলাতে যাব তোকে আমার ঠিকানা নিশ্চয়ই দেব, তোর কাছ থেকে ছবির কার্ড পেলে খুস হব—এমন কার্ড পাঠাস যাতে বিলেতে তোর যশ রটে যায়। সেখানে তুই যাবার আগে তোর পরিচয়টা যেন ভালো করে হয়।

এই ছবিটার কাজ হয়ে গেলে তোদের ফিরিয়ে দেব। ইতি—

২৩এ মাঘ ১৩১৮

তোর রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

পূর্বেই লিখেছি এখানে তোর ঘর ঠিক হয়ে গেছে। ঘরকন্নার জিনিষপত্র এনে ফেললে কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য প্রধান আসবাবটিকে আনতে ভুলিস নি—এখানে আমার একটি নাতবৌ আছে, জুটি হবে। অধিকন্তু ন দোষায়। আসছে শনিবার এখানে গভর্ণর আসছে। তার আগে তোর আসা চাই। যখন গভর্ণর কলাভবন দেখতে আসবে তখন কলানাথকে খাড়া করতে না পারলে সে দেখবে কি? এই বেলা তুই এসে কলাভবনটিকে ভালো করে সাজিয়ে নে, শীঘ্র আয়—একটুও দেরি করিসনে, এখানে কুইনাইনের আয়োজন রাখব। তোর জিনিষপত্র প্যাক করার ভার কোনো যোগ্য লোকের উপর দিস, এসব কাজ আর্টিষ্ট মানুষের যোগ্য নয়। কলাপ্রিয় হনুমান আর্টিষ্ট ছিল, সেতু নির্মাণে তার পরিচয় সে গন্ধমাদনও বহন করেছিল কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে মাল চালান করতে সে কখনই পারত না এই কথা মনে রেখে শীঘ্র চলে আয়—মাল শুদ্ধ পিছনে টেনে আনার চেষ্টা করলে কিষ্কিন্ধাকাণ্ড বেধে যাবে সে চুকতে অনেক দেরী। ইতি—

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোর চিঠি পেয়েছি, বিদ্যালয়ের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এইবার আরো অনেক বাড়বে। ওখানে তোর কাজ খুব লঘু। বলতে গেলে কিছুই নেই। বোলপুরে তুই বিনা ব্যাঘাতে নিজের কাজ ও মনের উন্নতি করতে পারবি এই লক্ষ্য করেই আমি ওখানে তোকে টেনেছি। বস্তুত: ওখানে তুই তোর নিজের কাজ করছিস, যদি তোকে মোটা মাইনে দিই তাহলে সেটা যে কেবল বিদ্যালয়ের উপর ভার চাপানো হবে তা নয় সমস্ত শিক্ষকদের কাছেই অসঙ্গত ঠেকবে। সকলেই মনে করবে আত্মীয় বলে তোকে আমি বিদ্যালয় থেকে পালন করছি। তাদেরও দাবী যখন বাড়বে আমি তখন তার জবাব দিতে পারব না। তাই বলছি ওখানে যা পাচ্ছিস সেটা তোর কাজের বেতন মনে করিস না ওটা ভাতার মত। তারপর ওখানে তুই অখণ্ড অবসরে যে সব ছবি আঁকবি নিশ্চয় ক্রমশ: তার দ্বারা তোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারবে।

এখানে বড় উপকার পাচ্ছি বদরিকাশ্রমের যাত্রীরা এখানো ফেরেনি তারা খুব আনন্দে চলেছে খবর পেয়েছি তারা এতদিনে নিশ্চয়ই ফেরবার পথে।

তোর ছবি এগোচ্ছে শুনে খুশী হলুম। তোর বাবা-মাকে আশীর্ব্বাদ দিস। —রবিদাদা।

কল্যাণীয়েষু,

প্যারিসে, বার্লিনে আমার ছবির সম্পর্কে সেখানকার প্রধান কাগজে নামজাদা চিত্র-বিচারকদের হাতে যে অকুণ্ঠিত প্রশংসা পেয়েছি তার মধ্যে পিঠ থাবড়ানো স্কুল মাষ্টারি ছিল না। Paul Valeryর নাম শুনেছিস কি না জানিনে। তিনি বলেছিলেন Your pictures will be a lesson to our artist সেখানকার আর্টিষ্টদের কাছে এমন কথাও শুনেছি You have done what we attempted to reach and have failed, আমার শিল্প সমাদরের কথা ভাবিসনে, যাও বা পেয়েছি এদেশের কারো কাছ থেকে ভিখ মাগবার দরকারই হবে না। ইতি—২রা বৈশাখ ১৩৪৫ রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত ছবিতে দেখলুম তোর ক্যামেরা আমার মাথা খেয়েছে এটা অন্যায় হল।

তোর মেয়ের নাম রাখ 'রোচনা।' এক ফারসি প্রতিশব্দ 'রোশেনারা' অর্থাৎ যে মেয়ে আলো করে দেয়। ছবি দেখে মনে হল নামটা সার্থক হবে।

আজ ভোরের বেলায় দেখা গেল হিমালয়ের ধ্যানের উপর থেকে মেঘাবরণ সরে গেছে, আকাশ শুভ্র এবং শান্ত প্রকাশমান। কিন্তু গৃহস্থের চক্ষু তখনো খোলেনি। ইতি—২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

কাঠিয়াড় থেকে ফিরে এসে নানা হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলুম তাই তোকে চিঠি লিখতে পারি নি। ওখানে বেশ জমিয়ে বসেছিস শুনে খুব খুশি আছি। তোর দরবারে সশরীরে একবার হাজির হব মনে সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছিলুম বলে এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠল না। আর কোন এক সময় দেখা যাবে।

কলাভবনের আদর্শ তৈরী করবার প্রস্তাব করেছিস, সে তো ভালই ঠেকছে। কিন্তু আমরা খুব বেশী ব্যয়সাধ্য ইমারৎ তৈরী করিয়ে Endowmentএর টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করি নে। যে টাকাটা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের কলাভবনকে চিরস্থায়ী করতে পারব এইটেই আনন্দের বিষয়। তারপর ক্রমে ক্রমে Building এবং অন্যান্য আসবাব বাড়ানো যাবে। ইতিমধ্যে তোর architectকে দিয়ে একটা খসড়া তৈরী করিয়ে যদি পাঠাস তো বেশ হয়।

তোদের ওখানে crafts শেখাবার জন্যে কাউকে পাঠাবার প্রস্তাব করে দেখব। আমার মনে হয় যারা craftsman তাদেরই ঘরের ছাত্র পাঠালে বেশী কাজ হবে। যারা artist তাদের সহজে এ কাজে মন বসে না।

কনকলক্ষ্মীকে আমি বোধহয় জানি। তাঁকে পেলে ভালোই হয়। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থাতো ভালো নয়। বছরে বিশ হাজার টাকাই 'নাজাই' হয়। কোন মতে ভিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা পুষিয়ে আসছি। কিন্তু আমি তো আর পারিনে, বড় মাইনে দেওয়া কিছুতেই আমাদের সাধ্যায়ত্ত হলনা।

তোদের বোধহয় গ্রীষ্মাবকাশ বলে পদার্থ আছে। সেই সময়টা এখানে একবার করে এসে তোদের কলাসম্মেলন করে যাস। ক্রমে যেন দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িস নে। ইতি—১০ই জানুয়ারী ১৯২৪

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, জানতুম তোর একটা ভালো রকমের কিছু হবে। তা হল। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। যাই হোক, বলে রাখছি যখন লখনউ জেলার আম পেকে উঠবে তখন তোর এই ফললোলুপ দাদাকে খবর করিস।

তোকে একটা ছবির বিষয় দিচ্ছি। এঁকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস। অন্ধকার পথ, একটি মেয়ে চলছিল, বিপরীত দিক থেকে মশাল হাতে পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে, মেয়েটি তার অবগুণ্ঠন দুই হাতে তুলে ধরেছে, পুরুষ মশালের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আকাশে ধ্রুব তারা।

ভালো করে এঁকে দিস—দরকার আছে, দাম চাস দাম দেব। ছবির নাম পরিচয়, অতুলকে* আশীর্বাদ জানাস। রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

যদি তোর গ্রীষ্মের ছুটি থাকে আর এ অঞ্চলে আসতে পারিস তো যুগলরূপ দেখার ইচ্ছে রইল। লখনউ পর্য্যন্ত ছুটে যাবার সামর্থ্য নেই। এখনো আমার চলাফেরা বন্ধ। ১লা বৈশাখ আসছে—সে উপলক্ষে কাল শান্তিনিকেতনে যেতে হবে।

সেই ছবিটার আয়তন কি হবে জিজ্ঞাসা করেছিস, ছোট হোক বড় হোক কিছুই যায় আসে না কিন্তু বেশী দেরি করিস নে। তুই তো শুধু চিত্রী নোস, তুই তো কবিও। সেই জন্যে তোর তুলি দিয়ে তুই রসই ঝরে, তাই কবি যখন ছবি চায় তখন তোর শরণাগত হতে হয়।

সেদিন চিঠিতে যে বর্ণনা করেছিলুম, সেই অনুসারে আঁকতে পারিস কিম্বা পথের মধ্যে রাত্রি শেষ হয়ে যেতেই মেয়েটির পিছনে সূর্য্য উঠল, আর পুরুষ পথিক তার মশালটা ফেলে দিল, এমনও করতে পারিস আঁকবার পক্ষে যেটা ভালো হয় সেইটেই অবলম্বন করিস। ইতি—১১ই এপ্রিল ১৯২৫।

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তোর ছবির অপেক্ষায় ছিলুম, তোর রচনা শেষ হয়ে গেছে শুনে ভারি খুসি হয়েছি। এ ছবি আমি তোর প্রণামী বলেই গ্রহণ করব কিন্তু এর গতি হবে পশ্চিম মহাদেশে—সেখানে এর নিশ্চয় আদর হবে সেজন্যে চিন্তা করিসনে। কলাসরস্বতী তাঁর চরণ-রাগ-রক্তিমায় তোর সকল ভাবনা, সকল কল্পনাকে চিরদিন রঞ্জিত করে রাখুন এই আমার আশীর্বাদ। ছবিটি শান্তিনিকেতনেই পাঠিয়ে দিস।

এখন তো তোর গ্রীষ্মের ছুটি। একবার কিছুদিন এখানে এসে কাটিয়ে যা না। আমি বোধ হয় কোথাও নড়ব না, যে পর্য্যন্ত আমার সমুদ্রপারের লগ্ন না আসে।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে আমার ডায়েরীতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু লিখেছি। পড়ে দেখিস। ইতি—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২। রবিদাদা

* স্বনামধন্য গীতিকার কবি অতুলপ্রসাদ সেন।

কল্যাণীয়েষু,

তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। যখন হাতে এল তখন cousins আমার কাছে বসেছিলেন, তাঁরও ভালো লেগেছে। তোর তুলির টানে একটি যে সৌকুমার্য আছে এটিতেও তা প্রকাশ পেয়েছে, য়ুরোপে এটিকে নিয়ে যাব।

শরীরটা কিছুকাল ভাল ছিল না, এখন একটু শুধরেছে। যাচ্ছি য়ুরোপে ১৫ই মে তারিখে।

আর্ট সম্বন্ধে সেই বক্তৃতাটা অনেকখানি বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলুম। তারা ওটা ওদের বুলেটিনে ছাপবে। তাই তোদের দেওয়া হল না।

যদি উৎসবে এখানে আসতে পারতিস খুব খুশি হতুম। তোর পদ পাকা হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তোরা সকলেই আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করিস। ইতি—২৫এ বৈশাখ ১৩৩১।

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোর নাটিকা ভাল লাগল কিন্তু জানাবার ফুরসুৎ নেই। আমি পড়েছি নিজের ঋতুরঙ্গ নিয়ে। তার নাচ-গান-বেশভূষা, আয়োজন উপকরণের অন্ত নেই। এই নিয়ে ও ৪০ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে এবং একমাথ' ভাবনার বোঝা নিয়ে কাল চল্‌ছি কলকাতায়। তোর কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছে রইল—কিন্তু কে কাকে দেখে?

Bake এবার জাভা, বালি থেকে অনেক ছবি ও বিবরণ সংগ্রহ করে এনেছে। তার ইচ্ছা তাই নিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বক্তৃতা করে অর্থ উপার্জন করে। জিনিষটা খুবই interesting এবং ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষভাবে উপাদেয়। তোর আর্ট বিভাগ থেকে যদি ওকে ডাকিস তাহলে জাভা, বালির সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার যোগ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারে। ভেবে দেখিস। তোদের গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস। তিনি Preside করে একটা ধুমধাম করতে পারেন। আর সময় নেই।

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

মহাত্মাজি এখানে আছেন তাই অত্যন্ত ব্যস্ত। তোর ছোট ছবিখানি সুন্দর হয়েছে। যথাস্থানে, যথাভাবে, যথাসময়ে পৌঁছে দেব। নিজে লোভ সম্বরণ করলুম। (জুন ১৯২৫)

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত আমার গান চুরি করেচিস, বেশ করেচিস—কেউ ভুলেও মনে করবে না সে গান তোর রচনা—ফাঁকি দিয়ে নোবেল প্রাইজ পাবি—সে আশা নেই। তোর নাটিকার খবর পেয়েছি কিন্তু এখনো আমার গোচর হয় নি—মাসিকপত্রের পাত-পাড়া হ'লে পরিবেশন হবে, তখন আস্বাদ করা যাবে। যদি ভাল লাগে তা হলে কবুল করব না—আমার ব্যবসায়ে তুই পসার করবি এ আমার সইবে না স্পষ্ট বলে দিলুম।

ভাটখাণ্ডেকে নিশ্চয়ই ডাকব কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক চাই—নইলে তিনি নিয়ম বেঁধে দিলেও নিয়ম চলবে না। যেমন করে পারিস ভাটখাণ্ডেকে বলে একজন শিক্ষক আমাকে জুটিয়ে দিস। ক্রিস্টমাসের ছুটিতে এখানে যদি আসতে পারিস খুসি হব। ইতি ১২ই কার্তিক ১৩৩৪

তোর রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, অতি উত্তম কথা, পিয়ার্সনের ছবি হাসপাতালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

তোরা এখনও ডাকাডাকি করছিস—কিন্তু পাখির ডানা ভেঙে গেছে। ভ্রমণ মনে মনেই চলে। এমন অবস্থায় যাদের দেহ সচল তাদেরই উচিত দর্শন দিয়ে যাওয়া। আজকাল মাঝে মাঝে কলমকে কাব্য থেকে চিত্রে চালনা করছি। তাতে যা উৎপন্ন হচ্ছে তাকে বলা যেতে পারে 'চিত্তির'। অর্থাৎ তোদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

অতুলকে বলিস আশ্রমে শরৎকাল তার শুভ্র আসন বিছিয়ে বসেছে, যদি এদিকে ছুটি যাপন করতে আসেন তবে দেবে-মানবে মিলে তাঁর অভ্যর্থনার চেষ্টা করা যাবে।

তোর রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, এখানে সাঁচীর কীর্তি দেখে খুবই খুসী হয়েছি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল। সাঁচী দেখা হ'ল তোকে দেখা হ'ল না এইটে দুঃখ। ফেরবার পথেও তোদের আভাস পাওয়া যাবে না। কাল ফিরে চললুম ইটার্সি দিয়ে। এই বর্ষাকালটা পথে পথে মাটি করতে চাই নে। ইতি ২১এ জুলাই ১৯৩১

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোর রাজার নাট্যলীলা ভাল লাগল। আধবুমের স্বপ্নের মত ছবি ফুটে উঠেছে। তোর লেখা কাব্যের বদলে আমার আঁকা একখানা ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছবিটার নাম 'তেরিয়া'। চিঠির কাগজ সামনে পড়েছিল আঁচড় কাটতে কাটতে ঐ চেহারাটাকে খুঁচিয়ে তুলেছি।

আমেরিকার এক্‌জিবিসান থেকে আমার ছবিগুলো দেশে ফিরেছে। বোম্বাইয়ের কাষ্টম হাউস কাপালিকের হাতে পড়েছে। কিছু রক্ত বের করে তবে ছাড়বে। রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

এতদিন পরে আমার সেই তেরিয়াকে ভদ্রসমাজে তোর পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছিস, এটাতে ভদ্রসমাজ যদি আপত্তি না করে তো আমার আপত্তির কারণ নেই। অভ্যর্থনার এ রকম আয়োজন যে তার ভাগ্যে ঘটবে একথা তার সৃষ্টিকর্তা কোনদিন ভাবেননি।

ইতিমধ্যে আমি গিয়েছিলুম বোটে। ভালো লেগেছিল। অনেক পূর্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল মনে। এমন সময় ধরল ইনফ্লুয়েঞ্জায় ফিরিয়ে আনলে ডাঙায়। একটু খাড়া হয়ে উঠলেই ছুটতে হবে বোম্বাই। সামনে কর্তব্য-পরম্পরা গিরিশৃঙ্গের মালার মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো একে একে পার হয়ে কবে যে পথের শেষে আরাম করে বসতে পারব জানিনে। যথাসাধ্য কাজ সংক্ষেপে করতে চেষ্টা করি, যা উদ্বৃত্ত থাকে সেই বোঝাতেই শিরদাঁড়া বেঁকে যায়।

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তোর প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। প্রতিভার সাধনা কোন্ পথে চলে হঠাৎ বোঝা যায় না, প্রথমটা লাগে ধাঁধা, তারপরে দেখা যায় একটা কোথাও পৌঁছে সে আপনার তাৎপর্য্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে বার বার এ ঘটনা হয়েছে।

প্রতিভার পাগলামী সৃষ্টিপ্রণালীর অঙ্গ। যখন মনে করেছি বাঁধাপথ পাওয়া গেছে, সে পথ ছাড়া গতি নেই, তখন হঠাৎ দেখি উচ্চৈঃশ্রবা চার পা তুলে ছুটে চলেছে যেদিকে পথে চিহ্ন পড়ে নি। এদিকে আমরা হৈ হৈ চীৎকার করি, সহিসকে গাল পাড়ি, হাওয়ায় সাঁই সাঁই রবে চাবুক আস্ফালন করি কিন্তু দেবতার ঘোড়া আপন চলার দ্বারা নতুন পথ বের করে, নতুন ঐশ্বর্য্যের পথ।

সকল প্রকার সৃষ্টিরই ইতিহাস এই অনাসৃষ্টির রাস্তা দিয়েই। তাই তাড়াতাড়ি কিছু বলতে সাহস হয় না। আমার কলম যখন প্রথম চলেছিল, হেম বাঁড়ুজ্যে পথ ডিঙিয়ে গেল তার পরেও কণিকার—বলাকার বাঁক বদলাতে লাগল আজও কি পাকা রাস্তা ঠিক করতে পেরেছি। ইতি—

রবিদাদা

৩১-এ ডিসেম্বর ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, আর একটু হলেই তোর চিঠির অন্ত্যেষ্টিসংকার হোত আমাদের রান্নাঘরে। যেহেতু আজকাল আমি কাগজপত্রের মোড়ক খুলি নে, বনমালী নিয়ে যায় চুলো ধরাতে, দৈবাৎ যখন আহারের পর আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে হজমের কাজে নিযুক্ত ছিলুম এমন সময় তোর প্রেরিত মোড়কের উপর চোখ পড়ল। তাতে তোর ঠিকানাটা দেখে ঘোমটা খুলে দেখলুম তোর বাণীকে।

আমার বিচিত্রিতা তোদেরই ভালো লাগবে বলেই এত যত্ন করে খরচ করে ছাপিয়েছি। বাজারে আজকাল ছবি দেওয়া বই অনেক বেরিয়েছে। শ্যালীর বিবাহ উপলক্ষে লোকে সেগুলো কেনে অজস্র দাম দিয়ে—পছন্দও করে। ভয় ছিল—সেই বাজারে বিচিত্রিতাকে রওনা করতে—মনোমত হবে কি না এখনো নিশ্চিত বোঝবার সময় আসে নি—আরো একখানা বইয়ের মত ছবি ও কবিতা জমে আছে। বিচিত্রিতার ভাগ্যের পরিচয় পেলে তারপর যদি উৎসাহ পাই তখন তাকে অন্তঃপুর থেকে বের করব—এইরকম সঙ্কল্প করেছি।

তুই যে পত্রপাখায় কাব্যচিত্রলেখা উড়িয়ে দিয়েছিস দেখে খুসী হলুম। লখনউয়ের নবাব পায়রা ওড়াবার খেলা করত তার কথা মনে পড়ল। তুমি লখনউয়ের রাজচিত্রী তোমার মগজে পায়রার খোপ একটা একটা করে চিত্র পারাবত ওড়াবে এটা সেই নবাবী কায়দার মত দেখাচ্ছে। নলরাজা উড়িয়েছিলেন হংস, সেটা পৌঁছল দময়ন্তীর ঘরে। এ খেলার বয়েস তোমার গেছে দময়ন্তী আছেন পাশে, দমন করবার বিদ্যে তাঁর অবিদিত নেই।

উদয়শঙ্কর আঙ্গিক নৈপুণ্য আয়ত্ত করেছে, আছে তীরে এখনো রূপসাগরে ডুব মারেনি। কোনদিন হয়তো সৌভাগ্য ঘটবে তখন অরূপরতন নিয়ে আসে যদি বাহবা দেব। তাসের দেশ নাটকের মহলা দিতে ব্যস্ত আছি।

—রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, যথাস্থানে ফিরে এসে তোর লাক্ষারঞ্জিত চিত্রাভাস পেয়েছি। বর্তমানে সে আমার টেবিলে লেখা সামগ্রীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এক যবনিকা থেকে অন্য যবনিকার চলেছে যে সমস্ত উঁকিমারার দল, মনে হচ্ছে তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরের যাত্রী—সব সব যবনিকার ভিতর দিয়ে তারা একটু কিছু দেখতে পায়, অনেকখানি দেখতে পায় না। ইতি—১৩ই জুলাই ১৯৩৪ রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোর লাক্ষাচিত্র খুব ভাল লাগল। অনভ্যস্ত চোখে যারা দেখবে তাদের ধাঁধা লাগবে। রেখার অন্তরে অন্তরে যে বেগটা, যে ঝোঁকটা আছে সেটা অনুভব করবার বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতা চাই।

আমার ছবি নিশ্চয়ই এতদিনে পেয়েছিস। বিশেষ কিছু নয়। আমি কোমর বেঁধে আসি নে। হঠাৎ ফালতো সময় এবং ফালতো কাগজ হাতে পেলে রংচং দিয়ে যা হয় একটা কিছু গড়ে তুলি।

তোর কলাবতী কন্যাকে* আমার আশীর্বাদ জানাস।

রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

বানান সংস্কার পড়লুম। তিন 'স'য়ের মধ্যে মূর্দ্ধন্যকে রক্ষা করার অর্থ বুঝিনে। 'শ' বাংলা উচ্চারণে ব্যবহার করা হয় বাকি দুটো হয় না। 'জ' এর বদলে 'য' ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। বাংলায় অভ্যস্ত 'য'কে আমরা বর্গীয় 'জ' এর মতই উচ্চারণ করি। অন্তঃস্থ 'য' এর উচ্চারণ বাংলায় নেই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলাদেশে কামালপাশার আবির্ভাব যদি হয় তবেই বর্তমান প্রচলিত বানানের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা হবে না। রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তোর প্রেরিত সচিত্র 'ওমরখৈয়াম' পেয়ে খুসি হলুম। ছবিগুলি রেখার সুনিপুণ সৌকুমার্য্যে ভাবের ওমরখৈয়ামী আবহাওয়ায় মনোরম হয়েছে। বইখানি গুণীসমাজে সমাদর লাভ করবে। ইতি—

১৫ই নভেম্বর ১৯৩৫—রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

তোর 'খেয়ালিয়া' পেয়েছিলুম। আছে, আমার গ্রন্থভাণ্ডারে। তোর রেখাঙ্কন আমার ভালোই লাগে। এবারেও ভালো লেগেছিল। বয়সের জীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রের ধারা এসেছে মরে তাই প্রাপ্তি সংবাদ ইত্যাদি কর্তব্য সর্বদা ত্রুটি ঘটে। ভুলে যাই।

তোদের প্রদর্শনীতে সাহায্য করার ভার আমি তো নিতে পারিনে। আমি সংসারের পারে নেই বন্ধীকে অনুরোধ করে দেখিস। রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

৪১টা বেজোড় বছর। তোরা ৫০ বছরের জন্যে অপেক্ষা করিসনে কেন? আশীর্বাদ পেকে ওঠে জুবিলি বছরে উপযুক্ত সময়ে ঝুড়ি নিয়ে আশীর্বাদের কল্পবৃক্ষমূলে হাজির হোস, পরিপক্ব ফল থেকে বঞ্চিত হবিনে।

—রবিদাদা

[ক্রমশঃ।

---

* যশস্বিনী শিল্পী শ্রীমতী অতসী বড়ুয়া। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়ার সহধর্মিণী।

২৯

রাত হয়েছে। নগর ভ্রমণ করে ফিরছে নিত্যানন্দ, জগাই-মাধাই হুঙ্কার করে উঠলো : 'কে ?'

'আমি অবধূত।'

'অবধূত ?' নাম শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মাধাই। যে কলসা করে মদ খাচ্ছিল তারই ভাঙ্গা একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নিত্যানন্দের মাথায় ছুঁড়ে মারল সজোরে।

নিত্যানন্দের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

নিত্যানন্দ স্মরণ করতে লাগল গোবিন্দকে। গৌরহরিকে।

সে তো জেনে-শুনেই এসেছে এ অঞ্চলে। যদি পাপাত্মাদের উদ্ধারের সুযোগ হয়। যদি সমল লোহা কষিত কাঞ্চন হয়ে ওঠে।

একবার মেরে তৃপ্তি নেই মাধাইয়ের। সে আবার আরেক টুকরো ভাঙ্গা-কলসী দিয়ে মারতে চাইল নিতাইকে।

মাধাইয়ের দুহাত চেপে ধরল জগাই। ব'লে, 'বিদেশী সন্ন্যেসীকে মেরে সুখ কী ? কী লাভটা হবে তোর ?'

নিতাইয়ের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। বললে, 'আমাকে যে মেরেছে এ আমার সহের বাইরে নয়, কিন্তু তোমাদের এই দুর্গতিই আমার অসহ্য। মুখে হরিনাম বলো। তার গুণে আমার এই যন্ত্রণার নিবারণ তো হবেই, তোমাদেরও দুঃখ মোচন অনিবার্য।'

মাধাই এ সব ফাঁকা কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু জগাইয়ের শাসন সে লঙ্ঘন করবে এমন তার সামর্থ্য নেই।

ভক্তেরা কেউ কেউ গিয়ে নিমাইকে খবর দিলে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়ল নিমাই। নিতাইয়ের অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে এ তার সহনাতীত যন্ত্রণা।

স্বচক্ষে দেখে ক্রোধে লেলিহান হল নিমাই। উচ্চস্বরে ঘন ঘন ডাকতে লাগল চক্রকে।

সুদর্শন চক্র তখুনি আবির্ভূত হলো শূন্যে। ছুটে চলল জগাই-মাধাইয়ের দিকে।

তেমনি চক্র এসেছিল দুর্বাসাকে দগ্ধ করতে।

দ্বাদশীব্রত ধারণ করেছে অম্বরীষ। ব্রত শেষে পারণের উপক্রম করছে, দুর্বাসা এসে অতিথি হল। রাজর্ষি তাকে যথোচিত সৎকার করে নিমন্ত্রণ করল ভোজনে। দুর্বাসা স্নান করতে গেল যমুনায়। দ্বাদশীমধ্যে পারণ না করলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, আর অর্ধ মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট, তবু ফিরছেনা দুর্বাসা। ধর্মসঙ্কটে পড়ে অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। ব্রাহ্মণরা বললে, জলমাত্র পান করে ব্রত সাঙ্গ করো, কেননা একমাত্র জলপানকে ভোজন ও অভোজন দুই-ই বলা হয়েছে। রাজর্ষি অচ্যুতকে স্মরণ করে জলপান করল। আর সেই মুহূর্তেই ফিরে এল দুর্বাসা। দেখ ধর্মব্যতিক্রম! অতিথিকে আহার করাবার আগেই নিজে ভোজন করেছে। দাঁড়াও সমুচিত শাস্তি দিই। বলে নিজের মাথার জটা ছিঁড়ে কালানলতুল্য কৃত্যা নির্মাণ করে অম্বরীষের দিকে নিক্ষেপ করল। অম্বরীষ যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। যদি রক্ষা করতে হয়, আমি যার ভক্ত আমি যার ভৃত্য, তিনি করবেন।

বিষ্ণু পাঠিয়ে দিলেন সুদর্শন। দাবানল যেমন অরণ্যস্থ সরোষ সর্পকে দগ্ধ করে তেমনি চক্র কৃত্যাকে দগ্ধ করল নিমেষে। তাতে নিরস্ত হলনা, উদ্ধতশিখ অগ্নির মত দুর্বাসার পিছে ধাববান হল। সুমেরুর মহাগুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল দুর্বাসা, সেখানেও আবির্ভাব চক্রের। দশ দিকে, আকাশে, সাগরে, বিবরে, পাহাড়ে যেখানে যায় সেখানেই সেই দুষ্প্রধর্ষ সুদর্শন। দুঃসহ হরিচক্র থেকে আমায় রক্ষা করুন, স্বর্গে গিয়ে ব্রহ্মা ও শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করল। তারা কেউই নড়লনা, শুধু বলল, যাঁর চক্র তাঁর শরণাপন্ন হও।

ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠে উপনীত হল দুর্বাসা। হে বিশ্বভাবন, হে অনঞ্জন, আমি অপরাধ করেছি,

আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণুপাদমূলে লুটিয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ।

ভগবান বললেন, আমি ভক্তাধীন, সুতরাং আমি পরবশ, অস্বতন্ত্র। তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার ভক্তরা আমার হৃদয়, আমিও তাদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেনা, আমিও তাদের ছাড়া আর কাউকে জানিনা। যারা আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে আমি তাদেরকে কী করে ত্যাগ করি? সুতরাং যার দরুণ এই দুর্বিপাক উপস্থিত হয়েছে তাকে গিয়ে ক্ষান্ত করো। তেজ সাধুজনের প্রতি প্রযুক্ত হলে প্রহর্তারই অনিষ্ট ঘটে। যাও, দেরি কোরোনা, অম্বরীষকে তুষ্ট করলেই বিপৎ-শান্তি হবে।

অম্বরীষের পায়ে গিয়ে পড়ল দুর্বাসা। আমাকে ক্ষমা করো।

অম্বরীষ তখন সুদর্শনের স্তব শুরু করল :

হে সুদর্শন, হে সর্বাস্ত্রঘাতী, হে অচ্যুতপ্রিয়, এই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে রক্ষা করো। তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম, তুমিই সুনৃত বাক্য, তুমিই ঈশ্বরের পরমসামর্থ্য। তুমিই অখিলধর্মসেতু, বিশুদ্ধতেজা, জাগ্রত জগৎ-ত্রাণ। খলব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্যেই ভগবান গদাধর তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। অতএব আমাদের কুলের সৌভাগ্যের কথা ভেবে এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল করো, তাই আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ বলে মনে করব। যদি দান করে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি, স্বধর্মপোষণ করে থাকি, তবে এই দ্বিজের বিপদ দূর হোক। যদি সর্বাত্মা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন তা হলে এই বিপ্র বিপন্মুক্ত হোক।

রাজার স্তবে শান্ত হল সুদর্শন। অস্ত্রাগ্নিতাপ থেকে দুর্বাসা পরিত্রাণ পেল।

আমি অপরাধী, তবু তুমি আমার কল্যাণচেষ্টা করলে। দুর্বাসা বিনম্র হল : এই অদ্ভুত মহত্ত্ব ভক্ত ছাড়া আর কার সম্ভব? যারা ভগবানকে বশীভূত করেছে তাদের দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কী আছে? রাজন, আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না করেও আমার প্রাণ রক্ষা করলে, তোমার মত দয়ালু আর কোথায়?

প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা ভোজন করতে বসল।

ভক্তরক্ষার জন্যে দুষ্কৃতকে নিধন করবার জন্যে আবার এল সেই সুদর্শন। এখন ভক্ত শান্ত হলেই ক্ষান্ত হয় চক্র।

নিতাই আকুল হয়ে উঠল। নিমাইকে বললে, 'তুমি যদি এদের বধই করো তবে আর উদ্ধার করবে কি করে?'

নিমাই স্থির হয়ে রইল।

'এ দুটি প্রাণী আমাকে ভিক্ষে দাও।' নিতাই বললে আর্ত হয়ে, 'এদের দিয়ে তোমার নামের গরিমা দেখাই।'

'আমার নাম!'

'তোমার নাম যে দীনবন্ধু পতিতপাবন অনাথশরণ তা প্রমাণ করি।'

'কিন্তু তোমার কপালে যে রক্ত।'

'ও কিছু নয়। বিশেষ লাগেনি আঘাত। ব্যথা কিছুই পাইনি সত্যি।' মিনতি করতে লাগল নিতাই। 'ওরা আমাকে আসলে মারতে চায়নি, শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিল। যদি অনিচ্ছায় কেউ আঘাত করে তবে তার কি ক্ষমা নেই?'

তবু নিমাই কোমল হয়না।

তখন নিতাই বললে, 'তুমি এদের দণ্ড দিতে পারো না যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।'

'জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে? সে কি?' নিমাই বিস্মিত হল।

'মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসীখণ্ড দিয়ে মারবার উদ্যোগ করে তখন জগাই তার হাত ধরে বাধা দেয়। বলে, বিদেশী সন্ন্যেসীকে বৃথা মেরে তোর লাভ কী?' নিতাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল; 'তাইতেই তো মাধাই আরো জখম করতে পারেনি আমাকে।'

মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিন্তু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥

'বলো কি?' সহাস্য নয়নে তাকাল গৌরহরি। পরে জগাইকে সম্বোধন করে বললে, 'হ্যাঁরে জগাই, মাধাইয়ের হাত থেকে তুই বাঁচিয়েছিস আমার নিত্যানন্দকে? তবে তো আমি তোরই হলাম' বলে সেই অস্পৃশ্য পামর, নৃশংস দস্যুকে গাঢ়বাহুতে আলিঙ্গন করল। 'কৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। নিত্যানন্দকে বাঁচিয়ে তুই যে আমাকে কিনে নিলি।'

জগাইয়ের প্রতি এ উদার প্রসাদ দেখে বৈষ্ণবমণ্ডল হরিধ্বনি করে উঠল।

জগাইয়ের বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥

জগাই প্রভুর পায়ে পড়ল।

'তোর প্রেমভক্তি হোক।' আশীর্বাদ করল গৌরহরি। 'উঠে চোখ মেলে ছাখ আমাকে।'

জগাই দেখল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নিমাই পা রাখল তার বুকের উপর।

> প্রভু বলে জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
> সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥
> চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
> জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
> দেখিয়া মূর্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
> বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্যগোসাঞি॥

তখন মাধাই ছুটে গিয়ে নিমইয়ের পা ধরল। বললে, 'প্রভু, আমার কী হবে? আমি কার কাছে যাব? আমরা দু ভাই একসঙ্গে পাপ করলাম, আর তুমি জগাইকে উদ্ধার করবে আর আমাকে ত্যাগ করবে, একি উচিত হবে তোমার?'

> দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
> অনুগ্রহ কেনে, প্রভু, হয় দুই ভাগ?

নিমাই বললে, 'তোর ত্রাণ নেই, তুই আমার নিত্যানন্দের অঙ্গ রক্তাক্ত করেছিস। আমার চাইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।'

> মো হইতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
> তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥

'তাহলে আমার নিষ্কৃতি হবে কিসে?' মাধাই কাঁদতে লাগল।

'আমার ভক্তের নিকট যারা অপরাধী তাদের অপরাধ আমি খণ্ডন করতে পারিনা' বললে নিমাই, 'একমাত্র ভক্তই পারে তা মার্জনা করতে। সুতরাং তুমি নিত্যানন্দকে গিয়ে তার রক্তপাতের বিনিময়ে দে তোর অশ্রুপাত।'

মাধাই গৌরাঙ্গের চরণ ছেড়ে নিত্যানন্দের চরণ ধরল।

নিমাই বললে, 'এবার ইচ্ছে করলে তুমি ক্ষমা করতে পারো মাধাইকে।'

নিতাই হাসল, বললে, 'তুমি আমার গৌরব বাড়াবার জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে বলছ। তোমার কৃপাশক্তিতেই তো আমার ক্ষমা। আমি তো কখনই ক্ষমা করে বসে আছি। আমার সমস্ত সুকৃতি মাধাইকে দিচ্ছি, যত অপরাধ সব আমার, মাধাইয়ের দায় নেই। এবার প্রভু, তুমি কৃপা কর।'

> নিত্যানন্দ বোলে প্রভু, কি বলিব মুঞি।
> বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুঞি॥
> কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত
> সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত॥
> তোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই—।
> মায়া ছাড় কৃপা কর, তোমার মাধাই॥

'তবে আর কী! মাধাইকে কোল দাও। ও ও সফল হোক।' আদেশ করল গৌরহরি।

ভূলুণ্ঠিত মাধাইকে তুলে নিয়ে নিমাই তাকে আলিঙ্গন করল। ফলে তার দেহে প্রবেশ করল নিত্যানন্দ। সর্ব বন্ধনের মোচন হয়ে গেল মাধাইয়ের।

> বিশ্বম্ভর বোলে যদি ক্ষমিলা সকল।
> মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥
> প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
> মাধাইর হৈল সর্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
> মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
> সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥
> হেনমতে দুই জনে পাইলা মোচনে।
> দুইজনে স্তুতি করে দুইর চরণে॥

তখন বিশ্বম্ভর বললে, 'তোরা শোন, শুনে রাখ। কোটি কোটি জন্মে তোদের যত পাপ আছে, সব দায় আমার। তোদের মুখেই এখন থেকে আমি খাব, তোদের দেহেই আমার বসতি হবে। নিত্যানন্দ ঠিকই বলেছে, তোদের ছুঁলে যারা গঙ্গাস্নান করত, এখন তোদের স্পর্শকেই তারা গঙ্গার সমান মনে করবে।' বৈষ্ণবদের দিকে তাকাল গৌরহরি। 'এ দু ভাইকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো, এদের সঙ্গে কীর্তন করব।'

বৈষ্ণবেরা ধরাধরি করে জগাই মাধাইকে নিয়ে এল প্রভুর বাড়ি।

কপাট পড়ল বাইরে। অভ্যন্তরে বসল বৈষ্ণবসমাজ। বিশ্বম্ভরের দুই পাশে নিত্যানন্দ আর গদাধর। সামনে অদ্বৈত। চারপাশে পুণ্ডরীক, হরিদাস, গরুড় পণ্ডিত, রামাই, শ্রীবাস আর গঙ্গাদাস। বক্রেশ্বর পণ্ডিত আর চন্দ্রশেখর আচার্য। আর, সকলের সামনে সর্ব অঙ্গে কম্প আর রোমহর্ষ নিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর অঝোরে কাঁদছে জগাই-মাধাই। মাধব আর জগন্নাথ।

চৈতন্যশক্তি কে বোঝে? দুই দস্যুকে দুই মহাভাগবতে রূপান্তরিত করেছে। দুর্ধর্ষ পাষণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগলিত-বিনীত।

তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায় ॥

কৃপা-বিতরণে কৃষ্ণের কি পক্ষপাতিত্ব আছে? না, তা নেই। পরমকরুণ কৃষ্ণ সকলের জন্যেই তাঁর করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যার যেমন প্রবণতা, যার যেমন যোগ্যতা, সে সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিচ্ছে। সূর্যরশ্মি সকল কাচেই পড়ছে, কিন্তু যে কাচের মধ্যস্থল স্থূল তাতেই রশ্মি সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে—এমন কি, কোনো দাহ্য বস্তু তাতে রাখলে তা দগ্ধ হয়ে যায়। অন্য কাচে এমনটি হয় না। রশ্মিতে পক্ষপাতিত্ব নেই, কাচেরই গুণাগুণের তারতম্য। মেঘ সর্বত্রই সমান ধারায় বর্ষণ করে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, কোনো ক্ষেত্রে বা কণ্টক। মেঘে পক্ষপাতিত্ব নেই, শুধু ক্ষেত্রের চরিত্রের ইতর-বিশেষ। সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ গীতায় অর্জ্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ: আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নেই প্রিয়ও নেই কিন্তু যারা ভক্তিভরে আমাকে ভজনা করে তারা আমাতেই অবস্থান করে আর আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। এটা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়, এটা ভক্তির বস্তুগত শক্তির প্রভাব।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। এ অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা। ভগবান স্বরূপতঃ সমদর্শী, দ্বন্দ্বাতীত। কিন্তু জীব যখন ভক্তিসিক্ত হয় তখন সে বিশেষ করে ভগবানকে আকর্ষণ করে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত হলে ভগবানও ভক্তে আসক্ত হন। এ ভক্তির কৃতিত্ব, ভগবান যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ। ভক্তির যেখানে ভগবদ্‌বশীকরণী শক্তি সেখানে ভগবান কী করবে, পতিভির্ভর্তা প্রভুসাথী হতেই হবে। স্ফটিক যেমন নির্মল তেমনি আছে, তুমি তার কাছে রক্তজবা রাখলে সে রক্তাভ, নীলপদ্ম রাখলে সে নীলাভ। স্বরূপে স্ফটিক রক্তও নয় নীলও নয়। দুগ্ধপোষ্য সরল শিশুকে স্নেহ দেখালে সে হাসবেই, রূঢ়তা দেখালে সে ক্রুদ্ধ হবে, বিমুখ হবে। স্বরূপশুদ্ধ শিশুর মনে রাগও নেই অনুরাগও নেই। তোমার যেমন ভাব তারও তেমনি প্রত্যুত্তর। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। আমি যদি ভালোবাসি আমাকে কি না ভালোবেসে পারবেন? আমি যদি তাঁর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করি, তিনি আমাকে কৃপা না করে যাবেন কোথায়?

জগাই-মাধাই দুজনে গৌরাঙ্গসুন্দরকে স্তুতি করতে লাগল। চৈতন্যচন্দ্রের আদেশে দুজনের জিহ্বায় এসে বসল সরস্বতী।

নানা অবতারে নানা পাপী উদ্ধার করেছ, কিন্তু আমাদের দুই পাতকীর উদ্ধারই অদ্ভুততম। আমাদের উদ্ধারেই অজামিল-উদ্ধারের মহত্ত্বও অল্প হয়ে গেল। অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনে চারজন বিষ্ণুদূত এসেছিল আর আমরা রক্তপাত করা সত্ত্বেও তুমি নিজে এসে উপস্থিত হলে। তোমার মহিমা, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ, সব তুমি গোপন করে রেখেছিলে, এখন সমস্ত ব্যক্ত হয়ে উঠল। এর নামই বোধহয় 'নির্লক্ষ্য উদ্ধার'।

পাপ অনুতাপানলে গলে গলে পড়তে লাগল অশ্রু হয়ে। জগাই মাধাই কাঁদছে আর বন্দনা করছে।

নির্লক্ষ্যে তারিলে ব্রহ্মদৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥

বৈষ্ণবেরা বললে, 'এ দুই মদ্যপ দস্যু যে স্তুতি করছে এও তোমারই কৃপা।'

'এরা আর মদ্যপ নয় দস্যু নয়, এরা আমার সেবক।' বললে নিমাই, 'সকলে মিলে এদের অনুগ্রহ করো। যার কাছে যত এদের অপরাধ আছে সব প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করো। যেন আর কোনো জন্মে আমাকে এরা না ভোলে।'

জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের পায়ে গিয়ে পড়ল।

'জগাই মাধাই, তোমরা নিরপরাধ হলে, কিন্তু জেনো এ সমস্তই আমার নিত্যানন্দের প্রসাদ। আর ভয় নেই,' গৌরহরি অভয়ঙ্কর হাসি হাসল: 'তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করলাম।'

দেখতে-দেখতে গৌরাঙ্গের সোনার অঙ্গ কালো হয়ে গেল।

দুই জনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ॥

চতুর্দিকে হরিধ্বনি পড়ে গেল। তারপর সুরু হল কীর্তন। জগাই-মাধাই মহানন্দে নাচতে লাগল, বলতে লাগল হরিবোল। ঘরের ভিতর থেকে বধূসঙ্গে শচীমাতা দেখতে লাগল কৃষ্ণাবেশের উল্লাস। দুই দস্যুকে দুই মহাভাগবতে পরিণত করে পদ-সহ নাচছে গৌরাঙ্গ। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছে।

'যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥'

নৃত্যকীর্তনান্তে সকলে মিলে গঙ্গায় গেল জলকেলি করতে। গঙ্গাস্নানের শেষে তীরে উঠে গৌরহরি সকলকে মালা-প্রসাদ-চন্দন দিল। আর নিজের গলার মালা জগাই-মাধাইকে উপহার দিল।

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয় ॥

চৈতন্যকৃপায় জগাই-মাধাই পরমধার্মিক হয়ে গেল। উষাকালে নির্জনে গঙ্গাস্নান সেরে প্রত্যহ দু লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করে। নিরবধি কৃষ্ণ বলে কাঁদে আর পূর্বের হিংসার কথা ভেবে অনুক্ষণ নিজেদের ধিক্কার দেয়। আবার চৈতন্যকৃপা স্মরণ করে, হিংসুক না হলে কি পেতাম গৌরচন্দ্রকে? পেতাম কি কৃষ্ণরস? হতাম কি কৃষ্ণের দয়িত? আবার এ জীবাধমকে প্রভু কৃপা করলেন সে কথা ভেবে আবার ক্রন্দন।

নিত্যানন্দকে নিভৃতে দেখে মাধাই তার পায়ে গিয়ে পড়ল। 'তোমাকে আমি মেরেছি, আমার কী গতি হবে? যে বিগ্রহে কৃষ্ণ শয়ন বিহার করে সেই অঙ্গে আমি রক্তপাত করেছি, আমি কোথায় যাব?'

নিতাই তাকে তুলল ধুলো থেকে। হাসিমুখে বললে, 'শিশুপুত্রে মারলে কি বাপ দুঃখ পায়? তোমার প্রহার সেই শিশুপুত্রের স্পর্শের মত। শোনো তুমি আমার প্রভুর অনুগ্রহভাজন, অতএব আমার চোখে তোমার আর দোষ নেই, তুমি নিষ্কলুষ।'

আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥
যেজন চৈতন্য ভজে সে-ই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥

মাধাই বললে, 'প্রভু, আরেক কথা। অনেক জীবের হিংসা করেছি, তারা কারা চিনি না। চিনতে পারলে জনে জনে চরণে পড়ে ক্ষমা চাইতে পারতাম। এখন আমি কী করব, দয়া করে উপদেশ দিন।'

নিতাই বললে, 'গঙ্গাঘাটের সেবা কর, মার্জন কর, ক্ষালন কর। গঙ্গার সেবাই সর্ব অপরাধ-ভঞ্জনী। লোকে সুখে স্নান করবে আর তোমাকে আশীর্বাদ করবে। তুমি নম্র হয়ে সকলকে নমস্কার করবে আর অপরাধের ক্ষমা চাইবে। তা হলেই সমস্ত অপরাধ ধুয়ে যাবে তোমার।'

গঙ্গাঘাট "সজ্জ" করতে লাগল মাধাই। যে কেউই স্নান করতে আসে মাধাই দণ্ডপ্রণাম করে আর বলে, 'জ্ঞানে-অজ্ঞানে যত অপরাধ করেছি, মার্জনা করুন। কৃষ্ণ আপনার ভালো করবেন।'

মাধাই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদে আর সকলে আনন্দে গোবিন্দ-গোবিন্দ বলে।

'যাই বলো, নিমাই পণ্ডিত কীর্তি রাখল।' ইতর জনে বলাবলি করে, 'দুর্জনেরা নিন্দা করে বটে কিন্তু নিমাই সামান্য মানুষ হলে জগাই-মাধাই কি সন্ন্যেসী হয়ে যায়?'

জগাই স্থির হয়ে বসে জপ করে আর মাধাই কোদাল হাতে ঘাট তৈরী রাখে। তোমরা দু' ভাই গৌর-নিতাই। আমরা দু' ভাই জগাই-মাধাই।

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ। শচীনন্দনঃ হরিঃ।

আর হরিশব্দের একটি অর্থ যখন সিংহ তখন শচীনন্দন হরি অর্থ চৈতন্যসিংহ।

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥

সিংহের গর্জন শুনে যেমন হাতি পালায় তেমনি চৈতন্য-হুঙ্কারে পাপতাপ অদৃশ্য হয়। ভক্তিবিরোধী কর্মের নাম কল্মষ। চৈতন্য-হুঙ্কারে কল্মষও নষ্ট হয়ে যায়। আর যে গুহায় সিংহ বাস করে সে গুহায় হাতি আসেনা। তেমনি যে হৃদয়ে চৈতন্য স্ফুরিত হয়েছে সে হৃদয়ে ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসনাও অন্তর্হিত।

অত এব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥

ভগবানের বহু গুণের মধ্যে করুণাই জীবনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসেতু। ভগবান শুধু রসিকশেখর হলে জীবের লাভ কী, যদি না তিনি পরমকরুণ হন? এই করুণার মধ্যেই ভগবানের অনুভব। আর এই করুণা গৌর-নিতাইয়ে বেশি অভিব্যক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনের সঙ্গে গৌর-নিতাইয়েরও ভজন করো।

তাঁরা দু ভাই কৃষ্ণ-বলাই।
তোমরা দু ভাই গৌর-নিতাই ॥
আর, আমরা দু ভাই জগাই-মাধাই ॥ [ক্রমশঃ।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

[স্বনামধন্যা সাহিত্যিক ও দেশকর্ম্মী]

বাঙালী নারী-সমাজের একটি উজ্জ্বল রত্ন শ্রীসরলাবালা সরকার। বাইরে এঁর যে পরিচিতিটি রয়েছে—ইনি একজন স্বনামধন্যা সাহিত্যিক ও দেশকর্ম্মী। কিন্তু আরও একটি বড় পরিচয়—খাঁটি বৈষ্ণব, খাঁটি মানুষ একজন ইনি, যেমনটি নিঃসন্দেহে খুব দুর্লভ। শুধু ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে নয়, দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনেও এঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য করা যায়—ইনি যতই সহজ, সরল, ততই বুঝি সুন্দর ও অনুকরণযোগ্যা।

এই আদর্শ মহিলা গোয়ারি-কৃষ্ণনগরের কাঁঠালপোতায় জন্মগ্রহণ করেন ১২৮২ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫), বৃহস্পতিবার। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই-ই সমাজে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে ছিল সেদিনেও। পিতা ৺কিশোরীলাল সরকার ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট—আইনজ্ঞ হিসাবে সেযুগে খ্যাতি ছিল তাঁর যথেষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর ল বক্তৃতা' করার সাদর আমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন। পিতামহী রাসসুন্দরী দাসীর নামও সমাজে ছড়িয়েছিল—'আমার জীবন' (আত্মজীবনী) সৃষ্টির মাধ্যমে ইনি এই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপরদিকে সরলাবালার মামা ছিলেন অমৃতবাজারের স্বনামধন্য মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। সাহিত্যিক ডাঃ সরসীলাল সরকার ছিলেন তাঁর আপন অগ্রজ।

শ্রীযুক্তা সরকার যে পরিবারের বধূ, সমাজে সেই পরিবারটিরও বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। ১২৯৪ সালে ৺মহিমচন্দ্র সরকারের (এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এর সঙ্গে যাঁর নামটি আজও সংশ্লিষ্ট আছে)

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার
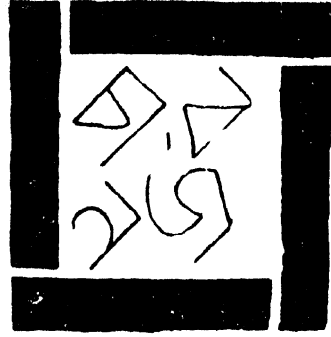
পুত্র শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু একটি যুগও পার হলো না, ১৩০৫ সালে একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে নিয়ে তিনি বিধবা হলেন। সরলাবালারই সুযোগ্য জামাতা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীঅশোককুমার সরকার এঁর পরমপ্রিয় দৌহিত্র।

প্রথম জীবন থেকেই শ্রীযুক্তা সরকারকে দেশসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। পরলোকগত ডাঃ সরসীলাল এই ব্যাপারে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যোগান। বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের ওপর যখন চরম পুলিসী নির্য্যাতন চলে, সরসীলাল ও সরলাবালা—এই দুইটি ভাই বোন ছিলেন সে সময়ে আত্মগোপনকারী সন্ত্রাস আন্দোলন কর্ম্মীদের নিশ্চিত আশ্রয়-স্থল। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কত শত যুবক সরলাবালার কাছে মাতৃস্নেহ পেয়েছেন, সে ইতিহাস আজও অলিখিত রয়েছে। বাংলার বিপ্লবী নায়কদের মধ্যে বাঘা যতীন, এম্, এন্, রায় প্রমুখ অনেকেই সেদিনে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরই নিকট। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ আত্মগোপন অবস্থাতেই এই মহীয়সী নারীর স্নেহপাশে স্থান পান এবং তখন থেকেই তিনি তাঁর পুত্রপ্রতিম হয়ে ওঠেন। শ্রীযুক্তা সরকার স্বদেশী আমলে অনেক স্থলে এগিয়ে যেয়ে পিকেটিংও করেছেন—অপর দেশকর্ম্মীদের নিকট যা নিতান্ত প্রেরণার বস্তু ছিল।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সরলাবালা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবেন, গোড়া থেকেই এইটি বেশ প্রতীয়মান হয়। পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই পক্ষ থেকেই স্বদেশসেবার ন্যায় সাহিত্যের ব্যাপারেও তিনি প্রেরণা পান। তাঁর বরেণ্য স্বামীও এ সকল বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, এ-ও জানতে পারা যায়। সাহিত্যকর্ম্মে রাজনারায়ণ বসু, তারাকুমার কবিরত্ন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—এঁদের কাছ থেকেও তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা কিছুমাত্র কম পাননি।

শ্রীযুক্তা সরকারের বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর, সে-সময়েই তাঁর প্রথম রচনা ছাপিয়ে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে আজও অবধি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী স্তব্ধ হয়নি কোন কালের জন্যে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিচিত্র রচনা তিনি লিখেছেন যা আজও লিখছেন। তাঁর বহু গল্প (স্বনামে ছদ্মনামে লেখা) কুন্তলীন পুরস্কারলাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করবার—কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছদ্মনামে) যে

বছর 'মন্দির' গল্প লিখে কুন্তলীন প্রথম পুরস্কার পান, সরলাবালা পেয়েছিলেন সে বছর ওর দ্বিতীয় পুরস্কার। কিছুদিন আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে সরোজিনী বক্তৃতা করেন এবং তাঁর পরিবেশিত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ পেলে বিভিন্ন মহলে ভূয়সী প্রশংসা পায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—প্রবাহ (কাব্য), নিবেদিতা (জীবনী), চিত্রপট (গল্প), কুমুদনাথ (জীবনী), অর্ঘ্য (কাব্য), হারানো অতীত (স্মৃতিকথা), গল্প সংগ্রহ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (স্যার যদুনাথের ভূমিকা সম্বলিত রচনা)। দেশ ও জাতিকে তিনি আরও নতুন কিছু উপহার দিয়ে যাবেন, এই আশা আমরা রাখব।

ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্]

ঐতিহাসিক পরিবারে খ্যাতিমান ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটবে, এ তেমন বিচিত্র নয়। কিন্তু তবুও ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরীর মাঝে রয়েছে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ। একজন ইতিহাসবিদ্ হিসাবেই নয়, শিক্ষাবিদ্, ক্রীড়াবিদ্ ও সাহিত্যকার হিসাবেও এই মানুষটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দেশ-বিদেশের সুধীমহলে তাঁর আসন পাকাপাকি হয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকে এই কারণেই।

ডক্টর রায়চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি সহরে যদিও জন্মগ্রহণ (১৯০০ সালের ৫ই জানুয়ারী) করেন, কিন্তু আসলে তাঁর পুণ্য পিতৃভূমি নোয়াখালিরই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ করপাড়া গ্রাম। এই রায়চৌধুরী-পরিবারটি বাংলার একটি সুপ্রাচীন বনেদী জমিদার-পরিবার। বিরাট পরিবারের প্রশস্ত সুন্দর পরিবেশে মাখনলালের জীবন গড়ে উঠবার সুযোগ পায় গোড়া থেকেই। পূজ্যপাদ পিতা ৺মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী ছিলেন সেযুগের একজন নামকরা আইনজ্ঞ। বাপ-মায়ের ছোট ছেলে হিসাবে মাখনলাল পরিজনবর্গের স্নেহ-যত্ন স্বভাবতঃই যথেষ্ট পরিমাণে পান। তাঁর প্রারম্ভিক পড়াশুনো হয় নোয়াখালির রাজকুমার জুবিলী হাই স্কুলে। ঐ স্কুল থেকেই ১৯১৭ সালে তিনি বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ভর্ত্তি হন যেয়ে ঢাকা কলেজে—দু'বছর বাদে আই-এ পরীক্ষাতেও তিনি যথারীতি উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু বি, এ পরীক্ষা দেবার দেওয়ার সময় হলো, তখনই একটা গোলমাল বাধে।

সেটি ছিল ১৯২১ সাল—সারা দেশ জুড়ে তখন গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন। যুবক মাখনলালের বিদ্রোহী মনও গৃহকোণে পড়ে থাকতে চাইল না—তাই তাঁকেও দেখা গেলো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কলেজ-কর্তৃপক্ষ কিন্তু তা বরদাস্ত করলেন না—তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। এক্ষণে কি করা যায়, পরীক্ষা না দিতে পারলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে মাখনলাল সচেতন। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি ঢাকা থেকে চলে আসেন কলকাতায়। স্যার আশুতোষের সস্নেহ দৃষ্টিতে পড়ামাত্র পরের বছর (১৯২২) ইতিহাসে বি-এ অনার্স পরীক্ষা দেবার সুযোগ তাঁর মিলে যায়। কিন্তু পরীক্ষার আসনে বসতে হবে তাঁকে কলকাতায় নয়, কুমিল্লায়। যথারীতি পরীক্ষা দিলেন তিনি বটে, কিন্তু অনার্স নয়, শুধু পাস কোর্সে। ব্যাপার আর কিছু নয়। অনার্সের প্রশ্নপত্রই নির্দিষ্ট দিনে কুমিল্লা গিয়ে পৌঁছল
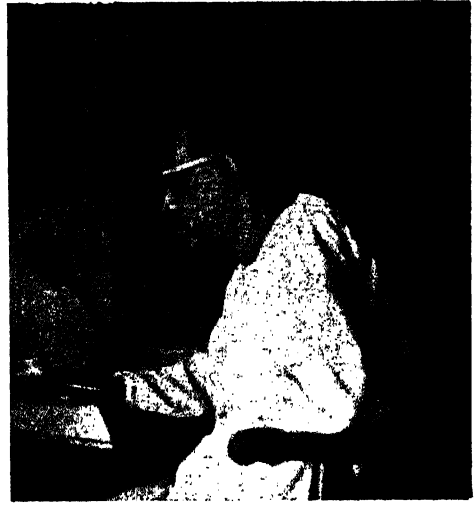
ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

না। মাখনলালের মনের ওপর এই কারণে স্বতঃই একটা বিষণ্ণতার রেখাপাত হয়—যদিও তিনি পাস কোর্সে ডিষ্টিংশন-এ বিশ্ববিত্তালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এগিয়ে যেতে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সঙ্কল্প যাঁর কঠিন, তাঁকে সত্যি আটকে রাখবে কে? প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস বিষয় নিয়েই ডক্টর রায়চৌধুরী এম-এ পড়তে সুরু করে দেন। দু'বছর বাদে পরীক্ষা দেবার পর ফলাফল যখন বের হলো, দেখা গেলো তিনি প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এগিয়ে যাবার পথ এক্ষণে প্রশস্ত হয়ে গেল তাঁর অনেকখানি। ইত্যবসরে তিনি আইন পরীক্ষাতেও সফলতালাভ করেন এবং তারপরই পাটনা কলেজে গিয়ে লেক্‌চারারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ই স্যার যদুনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার তাঁর সুযোগ মিলে। বহুবিশ্রুত ঐতিহাসিকের কাছাকাছি থেকে ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা-আলোচনার ধারাটি তিনি সহজেই আয়ত্ত করে নেন।

নানা বৈচিত্র্যে মাখনলালের কর্ম্মজীবন গড়ে উঠতে থাকে এইখান থেকেই। অল্পদিন বাদে তিনি বি-ই-এস্ হয়ে রাজশাহী কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু ঐ পদটিকে পরে এস্-ই-এস্ করে দেওয়া হলে প্রতিবাদস্বরূপ কাজে ইস্তফা দিয়ে দেন তিনি। এবারে (১৯২৬) যোগদান করেন যেয়ে তিনি ভাগলপুর টি-এন্-জে কলেজে। এখানে তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, সেই সময়ই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক খোদাবক্সের অধীনে থেকে তিনি পি-আর-এস্-এর জন্য যে থিসিস্‌খানি ('দীনইলাহি'), লেখেন পরীক্ষকমণ্ডলীর নিকট এবং মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ হবার পর বাইরে পণ্ডিতমহলে তা বিশেষ সমাদরলাভ করে। ১৯৩৪ সালেও তিনি তাঁর সফল গবেষণার মর্য্যাদাস্বরূপ মওয়াত স্বর্ণপদক পান। তিন বছর বাদে বারাণসীর ওরিয়েণ্টাল কলেজ থেকে শাস্ত্রী উপাধিতে তিনি ভূষিত হন।

১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগ

খোলা হলে সেখানে অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডক্টর রায়চৌধুরীর ডাক আসে। এখানে যোগদানের দু' বছর বাদেই ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে তিনি চলে যান কায়রো-এ আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিনে 'Music in Islam' (ইস্‌লামে সঙ্গীত) লিখে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তৎসময়ের তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ভগবদ্‌-গীতার আরবী ভাষায় অনুবাদ। বিশ্বে এইরূপ উদ্যম এর আগে কখনও হতে দেখা যায়নি, যার জন্যে বাংলা সরকার ও হায়দ্রাবাদের নিজাম উহা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁকে এর পর অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেশনের সভ্যরূপে তিনি প্যালেষ্টাইন, ইস্রায়েল, লেবানন, সিরিয়া, আম্মান এবং আরব দেশ ভ্রমণ করেন। বছর খানেক বাদেই তাঁর মিশর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বৃহৎ তিন খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। মোঘল আমলে 'রাষ্ট্র ও ও ধর্ম্ম' (State and Religion in Mughal India) শীর্ষক নিবন্ধ লিখে ১৯৪৯ সালে তিনি ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হন এবং তাঁর সম্মানের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। 'আরবী সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব' শীর্ষক গ্রন্থ (ইংরেজী) রচনা করে ১৯৫৩ সালে তিনি স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এর পূর্বে ১৯৪৮ সালে গ্রিফিথ পুরস্কার লাভের মর্য্যাদাও তিনি পেয়ে যান আর সেটি 'মিউজিক ইন ইসলাম' শীর্ষক অমূল্য রচনার জন্যে।

ডক্টর রায়চৌধুরী বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৯৫০ সালে আবার যোগদান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। আপন যোগ্যতা প্রদর্শন করে ১৯৫৭ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের আসন অলংকৃত করেন—আজও ঐ আসনেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে।

শুধু ইতিহাস বিষয়েই নয়, ডক্টর রায়চৌধুরী সাহিত্যের অন্যান্য দিকেও বহু গ্রন্থ লিখেছেন, যেগুলিতে তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর স্পষ্ট বিদ্যমান। রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সমালোচনা, জাহানারার আত্মকাহিনী, শরৎ সাহিত্যে পতিতা, বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী, আরব শিশুর কাহিনী, —এ সকলই সাহিত্যিক মাখনলালের সাহিত্য শিল্পকর্মের স্থায়ী নিদর্শন হয়ে আছে। তাঁর 'ভারতবর্ষ পরিচয়' নামক ইতিহাস গ্রন্থ বহুল প্রচারিত ও বহু তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত Romance of Afganistan একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। 'Egypt in 1945' নামে যে গ্রন্থখানি তাঁর অপর একটি কীর্ত্তিরূপে স্থান পেয়েছে, উহার Introduction লিখেছেন মিশরের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা নাহাস পাশা এবং Preface লিখেছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু।

এই সকল গুণের অধিকারী হওয়া ছাড়াও মাখনলাল এককালে একজন মস্ত ক্রীড়ানুরাগী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। আই, এফ, এ, ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি বহু বার খেলেছেন এবং খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর সুনামও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া বিভাগের তিনিই অধ্যক্ষ এবং সেদিন অবধিও তাঁকে ক্রীড়ানুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীর তিনি সৈনিক ছিলেন এবং গুলী চালনায় তাঁর হাত ছিল খুব টিপসই। সমাজসেবার ক্ষেত্রেও ডক্টর রায়চৌধুরীকে অগ্রণী দেখা গেছে বহু প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে। মুঙ্গের ভূমিকম্পের সময় দুর্গত সাহায্য কমিটির তিনি ছিলেন সম্পাদক। বিহারের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা ছিলেন সেই কমিটির সহসম্পাদক। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনগুলিতেও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পাশে থেকে তাঁকে সেবাকার্য্যে ব্রতী দেখা গেছে।

১৯৪৬ সালের নারকীয় দাঙ্গার দিনে রায়চৌধুরী-পরিবারে গভীর দুঃখের ছায়া নেমে আসে। নোয়াখালিতে মাখনলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী ছিলেন হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। অতর্কিত নৃশংস আক্রমণে গ্রামের (করপাড়া) বাড়ীতে একদিনেই তিনি ও পরিবারের আরও ২১ জন নিহত হন। দারুণ শোকভারে ভারাক্রান্ত হলেও ডক্টর রায়চৌধুরী মনোবল হারিয়ে ফেলেন নি সেদিনে। কলকাতায় থেকে সেই শোচনীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার দিনে তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর আরও সব গুণের সঙ্গে সেইটি যুব-সমাজের নিকট আজও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

[অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র কলেজ]

কলিকাতার যে কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক আপন জ্ঞান গরিমায় ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন অধ্যক্ষ ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু তাঁহাদের অন্যতম। ডঃ বসু বাংলা ১৩০৩ সালের (ইং ১৮৯৬ সালের ১৫ই আগষ্ট) বর্দ্ধমান জেলার চকদীঘির নিকটবর্ত্তী জামালপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পাঁচ বছর বয়সে ইনি নিজ গ্রাম জ্যোগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসেন। ডঃ বসু আট বৎসরকাল (১৯০৫—১৯১৩) ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৩ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ স্কুলের 'আশুতোষ রৌপ্যপদক' ইনি পান, কারণ গণিতে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন। তৎপরে স্কটিশ চার্চ কলেজে চার বছর আই-এস-সি ও বি-এস-সি অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (প্রত্যেকটিতে প্রথম বিভাগে) প্রেসিডেন্সি কলেজে দুই বৎসর 'ফলিত-গণিত' অধ্যয়ন করেন। ১৯২০ সালে প্রথম বিভাগে এম-এস-সি পাশ করিয়া ইনি ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর (অধুনা 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র ডাইরেক্টার) অধীনে পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণা আরম্ভ করেন Ghosh Research Scholar হিসাবে।

ইহার এক বছর পরে স্বর্গত ডঃ মেঘনাদ সাহা জার্মানী হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে ইনি স্যর আশুতোষের নির্দেশ মত ঔপপত্তিক প্রাকৃতবিজ্ঞানে (theoretical physics) তাঁহার অধীনে গবেষণা করিতে থাকেন। ১৯২৩ সালে ডঃ সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যাওয়ায় এবং ১৯২৪ সালে স্যর আশুতোষের মৃত্যু হইলে ইনি বড়ই বিপন্ন হন, ইঁহার রিসার্চ স্কলারশিপ বন্ধ হইয়া যায়, এবং ইনি মফঃস্বলে অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ডঃ বসু বেশীর ভাগ স্বাধীনভাবেই গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৩ সালে ইনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট থিসিস্ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্যর আশুতোষ স্বর্ণ পদক' লাভ করেন। সেই সময়কার একখানি গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ স্যর আশুতোষ London Mathematical Societyতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ডঃ বসু বাঁকুড়া Wesleyan কলেজে গণিতাধ্যাপক ছিলেন। এখানে অনার্স কোর্সের ছয়খানি পেপারের মধ্যে চারখানি পেপার ইনিই পড়াইতেন। এখানে ইঁহার পাঁচবৎসর কর্মসময়ের মধ্যে তিন বৎসর বি, এস্‌সি পরীক্ষায় ঐ কলেজের পর-পর তিনজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-অনার্স পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। সে সময়ে ইঁহার অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম হওয়ায় ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অস্থায়ী লেকচারারের পদ প্রাপ্ত হন। এখানে দুই বৎসর কাজ করিবার পর তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন, এবং ১৯৩৩ সালে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। অদ্যাবধি ইনি এই কার্যে ব্রতী আছেন।

বাঁকুড়ায় থাকাকালীন ইঁহার গবেষণা কার্য বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু স্বর্গত ডক্টর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সব গবেষণা করিতেছিলেন তাহাতে ইনি কিছু-কিছু সাহায্য করেন। ঢাকায় অস্থায়ী কাজ চলিয়া যাইবার পরক্ষণে ইনি জর্মাণীর 'ডচে অ্যাকাডেমি' (Deutsche Akademic) প্রদত্ত একটি ফেলোশিপ' পাইয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক নানা প্রতিবন্ধকহেতু তিনি সে 'ফেলোশিপ' প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তরঙ্গ-বিজ্ঞান' (Wave Mechanics) বিষয়ে 'থিসিস্' দিয়া ডি, এস্‌সি উপাধি লাভ করেন (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ)। মিউনিকের অধ্যাপক জমেরফেল্ড, এডিনবারার অধ্যাপক ডারুইন ও কেমব্রিজের অধ্যাপক ফাউলার তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই ইঁহার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় লেকচারার থাকা কালে তিনি অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংযুক্ত হইয়া আসিতেছেন, এবং অধুনা নবপ্রতিষ্ঠিত চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের অনুরোধে গত ১৯৪৭ সাল হইতে গণিতের অধ্যাপকরূপে ও কলেজপরিচালন কার্যে আংশিকভাবে নিযুক্ত আছেন। ইনি ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ ও বি-এসসি (পাস ও অনার্স) এবং এম-এ ও এম-এসসি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অধ্যাপনায় প্রায় ৩২ বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সময়াভাবে তাঁহার গবেষণা কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Physical Colloquium, Bose Institute ও Calcutta Mathematical Societyর বিশিষ্ট সভায় ইনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত সর্বসমেত ২৫টি তত্ত্বপূর্ণ সন্দর্ভ য়ুরোপ ও ভারতের ৮টি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি ডঃ বি, ডি, নাগচৌধুরী (অধুনা, য়ুনিভার্সিটির প্রাকৃত বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক) ও অন্য একটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (অধুনা বিশ্বভারতীর উপাচার্য) সহযোগিতায় সম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। গত ১৯৫৪ সালে ইনি যখন Asansol কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্যর K. S. Krishnan এর প্রস্তাবে ইনি এলাহাবাদের National Academyর ফেলো নির্বাচিত হন। এই সেদিন পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি 'সাহা পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির রিপোর্ট' সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন।

বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কিত আংগিক গবেষণার বাহিরেও ইঁহার দৃষ্টি প্রসারিত। সাধারণ নরনারীর মনোরঞ্জক সহজবোধ্য সন্দর্ভ লিখিয়া ইনি আনন্দ পাইয়া থাকেন। অবসরমত বহু নিবন্ধ ইনি গত ৪০ বৎসর কাল (কলেজে পাঠ্যাবস্থা হইতে) লিখিয়া আসিতেছেন। এগুলি নানাবিষয়ক। ইহাতে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম, দেশীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, কলা, চরিতকথা, রাষ্ট্রতন্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণিত আছে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিবং, গৌড়ীয়, শ্রীসুদর্শন, অমৃতবাজার পত্রিকা, সায়েন্স এণ্ড কালচার, বিশ্বভারতী Quarterly ও বিভিন্ন কলেজ ম্যাগাজিনে এবং মফঃস্বলের পত্রিকায় ও সাপ্তাহিকে ইঁহার কমবেশী ৬০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্কুল ও কলেজের পাঠ্য ছয়খানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি ইংরাজীতে বহু প্রবন্ধ লিখিতেন। এক সময়ে ঐ পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে প্রশংসাজ্ঞাপক চিঠি দিয়াছিলেন,—"Your articles are illuminating and are much appreciated by our readers..."। সে প্রায় ৩০ বৎসর আগেকার কথা।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ও কলাবিষয়ে ইনি কিছু চর্চা করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে ক্লাসিকাল সংগীতও ইনি সাধনা করেন। যন্ত্রসংগীত অপেক্ষা কণ্ঠসংগীতেই ইনি অনুরক্ত হন। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের স্বর্গত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ইনি কিছুদিন সেতার শিক্ষা করেন। পশ্চিমবংগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় তাঁহার গুরুভাই ছিলেন। এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটির সংগীতাধ্যাপক গোয়ালিয়র-ঘরাণার পণ্ডিতজী রঘুনাথ একনাথ ও ঢাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ স্বর্গত মহম্মদ হোসেন ইঁহার কণ্ঠসংগীতের

ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

গুরু ছিলেন। ইনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি সবরকম সংগীত-পদ্ধতিই শিক্ষা করিয়াছিলেন। গত ১৯৫১ সালে ইনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইবার পর হইতে চিকিৎসকের কথামত সংগীতচর্চা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারের মধ্যে এই কলাবিদ্যা খানিকটা সংক্রামকরূপে দেখা দিয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী

[মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনারেল]

প্রথম সাক্ষাতে ভদ্রলোক জানালেন, "গরীবের ছেলে—কোনরকমে দাঁড়িয়েছি—বর্তমান পদ পেয়েছি।" কথাগুলো বলার সময় দেখি যে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে। প্রতিদিন তিনি শতকাজের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট রাখেন। অথচ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নিরাশ করেন না। দেখে-শুনে বুঝতে পারি যে অধ্যবসায়, সততা ও কর্মনিষ্ঠা হল এঁর মূলমন্ত্র—যার ফলে আজ বহির্বঙ্গে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে আমরা পেয়েছি শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী মহাশয়কে।

৺নিত্যরঞ্জন অধিকারী ও পরলোকগতা সরোজবাসিনী দেবীর পুত্র মনোরঞ্জন ১৮৯৭ সালের ১লা নভেম্বর বারাণসীধামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সে তিনি মাকে হারান। স্বগ্রাম ছিল ফরিদপুর জিলার মহিষাকুড়। এক শত বৎসর পূর্বে ঠাকুরদাদা তাঁহার কাকীমার নিকট ৺কাশীধামে আসেন এবং ঠাকুরদাদা সেখানে বসবাস সুরু করেন। নিত্যরঞ্জন বাবু জয়পুর ও যোধপুরে চাকুরী করিতেন। মাতামহ ছিলেন এলাহাবাদ নিবাসী ৺রামকমল চক্রবর্তী। বাবা মারা যাওয়ার পর মনোরঞ্জন বাবুর কাকা মধ্যপ্রদেশ পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৺সত্যরঞ্জন অধিকারী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীঅধিকারী রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও বারাণসীর বিদ্যালয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে তিনি কাশী বেঙ্গলীটোলা হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। তথাকার সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে এক বৎসর আই, এস, সি, পড়িয়া নাগপুরে চলিয়া আসেন এবং স্থানীয় মরিস কলেজ হইতে ১৯১৪ সালে ইণ্টারমিডিয়েট ও ১৯১৭ সালে এলাহাবাদ মুইর সেন্ট্রাল কলেজ হইতে বি, এস, সি পাশ করেন। পরে নাগপুরের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার সময় স্থানীয় মরিস কলেজে এম, এ ও আইন অধ্যয়ন করেন। ১৯২০ সালে আইন-স্নাতক হইয়া তথায় আইন ব্যবসায় লিপ্ত হন। শ্রীঅধিকারী দুই বৎসরে তথায় সুবিধা করিতে না পারায় ওয়ার্ধা জিলার আরবী তহশীলে (মারাঠাভাষী অঞ্চল) চলিয়া যান ও একাদিক্রমে ১৫ বৎসর অবস্থান করেন। ১৯৩৬ সালে নাগপুর জুডিসিয়াল কমিশনার কোর্ট হাইকোর্টে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীঅধিকারী হাইকোর্ট 'বার'এ যোগদান করেন। নাগপুর শহরে স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসুর নানারূপ অবদানের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

আরবী তহশীলের কোর্টে থাকার সময় তিনি বহু মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হইতেন। নাগপুরে ১৯৪২ সালে তিনি সরকারী কাউন্সেল হিসাবে নয়—সরকার-নিযুক্ত আইনজীবী হিসাবে আগষ্ট আন্দোলনের অনেকগুলি মামলা পরিচালনা করেন। ইহা ছাড়া বিখ্যাত চিমুর মামলায় সরকার পক্ষে—অস্থি (Asthi) মামলায় আসামী পক্ষে—চন্দা (Chanda) জিলার বনবিভাগীয় মামলায় (২টি সরকারী ও ২টি আসামীপক্ষ) —ছুঁইখাদানী (খয়রাগড়) গুলীবর্ষণ মামলায় ১৯৫২-৫৩ সালে সরকারী পক্ষে সিনিয়র কাউন্সেল হিসাবে—'৫৭ সালের রায়পুর গুলীবর্ষণ মামলায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সালে ছিন্দওয়ারাতে (Chhindwara) নিউটন-চিকলী কয়লাখনিতে জলপ্লাবন হইয়া ৬২ জন মারা যায়। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী ভি, আর, সেন তখন কমিশনার হিসাবে উক্ত দুর্ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হন। ইহাতে খনিমালিক ও ম্যানেজারের পক্ষ হইতে শ্রীঅধিকারী প্রধান আইন-উপদেষ্টা (Senior Counsel) ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি ডেপুটি এ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল-এর পদ প্রদত্ত হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৫৯ বৎসর।

ছাত্রবয়সে টেনিস, বিলিয়ার্ড ও ফুটবল খেলায় তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি বহুদিন কলেজ টিমের ফুটবল অধিনায়ক ছিলেন। বর্তমানে প্রচুর পুস্তকপাঠে ও ব্রিজ (তাস) খেলায় তিনি অবসর বিনোদন করেন।

মনোরঞ্জন বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ প্রশান্তকুমার অধিকারী এম, আর, সি, পি আমেরিকাস্থ ডেট্রয়েট ষ্টেট মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহার জামাতা ডাঃ রণেশ চক্রবর্তী এফ, আর, সি, এস কলিকাতা সুখলাল কারণানী হাসপাতালের অন্যতম সার্জেন।

শ্রীঅধিকারীর সহিত আলোচনায় জানা যায় যে বহির্বঙ্গের বাসিন্দা বাঙ্গালীদের জীবনধারা কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে—তৎপ্রদেশীয় লোকেদের সহিত সুষ্ঠুভাবে মিলামিশা করতে হবে—নিজ মাতৃভাষা ভিন্ন স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষা আয়ত্ত করতে হবে।

শ্রীঅধিকারী নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরাজী, মারাঠী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ।

শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী

ভারত-ভাস্করম্

ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

[রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক রবীন্দ্র-জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সংস্কৃত নাটকের একটি দৃশ্য। ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত]

[অলঙ্কার দান প্রকরণ]

(স্থান—বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রম। কাল—১৯০১ খৃষ্টাব্দ। মধ্যাহ্ন। রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র বসু, কবিপত্নী মৃণালিনী)

(শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র বসুর সঙ্গে চিন্তাক্লিষ্ট কবির প্রবেশ)

রবীন্দ্রনাথ। (স্বগত)—

বহুকাল ধরি' যেই আশারাশি
বিরাজিত মম মনে।
তারে রূপ দিতে মিলিত আশ্রমে
যে সুধী শিক্ষকগণে।
সেই সবাকারে যদি নাহি দিই
গ্রাসাচ্ছাদনও হেথা।
কোনজন তবে "নিকেতনে" রবে
সহি তীব্র মনোব্যথা।

(শিক্ষকের প্রতি)

রবীন্দ্রনাথ। ভদ্র! আমি অতিশয় দুঃখিত যে, আপনাদের সামান্যমাত্র পরিশ্রমিকও যথাসময়ে দিতে পারছিনা। আপনাদের ন্যায় নিঃস্বার্থজনদের দুঃখনিবারণ ভগবান নিশ্চয়ই করবেন।

অবিনাশচন্দ্র। (সঙ্কোচে)—আমাদের দুর্গতি, বিশেষ করে, সংসার পরিচালনার দুঃখ আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিরা অনুমানও করতে পারেননা! আমাদের অনাহারক্লিষ্ট সন্তানদের ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করে হবে; পরিবার-প্রতিপালনে অসমর্থ জনদের উচ্চাশা কে'ই বা ভাল বলে? বস্তুতঃ—

দারিদ্র্য-দহন নিঃশেষে শোষণ
করে গুণার্ণবচয়।
অগ্নিদাহান্তরে ভস্ম থাকে পড়ে
দারিদ্র্যে কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথ। (সখেদে) সে যা হোক! শিক্ষকমহাশয়! আগামী কাল নিশ্চয় আপনি আপনার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবেন, এবং দুঃখভারও লাঘব করতে পারবেন। কেবল একটি দিন মাত্র অপেক্ষা করুন।

অবিনাশচন্দ্র। আচ্ছা তাই হোক। আগামী কাল আমি পুনরায় এই সময়ে আসব। যেন নিরাশ না হই।

রবীন্দ্রনাথ। আচ্ছা, তাই হবে।

অবিনাশচন্দ্র। আমি এখন তবে আসি। [প্রস্থান।

রবীন্দ্রনাথ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) হায়! কি কঠোর এই জগৎ!

আদর্শপথানুসরণ কামনা
আকর্ষিছে মম হৃদি-প্রাণ-মন।
নিবারিছে তায় আর্থিক ভাবনা
উদ্বেগ ব্যাকুল সমগ্র জীবন।

হের—

মেঘচ্ছায়ে লুপ্ত কনক-কিরণ
উপলঘাতে স্তব্ধ তটিনী-ধারা।
রুদ্ধদ্বারে বদ্ধ বায়ু প্রবাহন
সমভাবে চিত্ত মম পথহারা।

(ব্যাকুল ভাবে)

জানি না কিইবা ঘটবে! বোলপুরের ন্যায় এরূপ জনবিরল পল্লী অঞ্চলে কেই বা আমাকে অর্থ ধার দেবে?

দারিদ্র্য-জ্বলন দহেনি জীবন
কোনোদিন কোনোকালে।
আজি অকস্মাৎ সকলি নস্যাৎ
বিষমদশা অকালে।
বিপদ বারিধি তরাবে কে বিধি
বিনা ত্রিলোক সহায়।
প্রাণ মন ভরি' তাঁরে শুধু স্মরি
এ'ত, হায়, তাঁরি দায়।"

(চিন্তা করে) কিন্তু এও ত হয় জগতে—

ঘনতমো ভেদ করি' অপরূপ রূপ ধরি
পূর্ণশশী সহসা উদিত।
ভুবন আলোকময় দূরিত আঁধার ভয়
হরষিত বিশ্বজন—চিত।

অবশ্য, আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই এরূপ সুখ নেই।

[পিতৃদত্ত "ভবতারিণী" এবং কবিদত্ত "মৃণালিনী" নামধারিণী কবি পত্নীর ত্বরিৎবেগে প্রবেশ]।

মৃণালিনী। (স্বগত—সোদ্বেগে)

প্রিয়তমানন কেন শোকঘন
কেনরে আজ মলিন।
মধুমাখা হাসি গরল বিনাশী
কোথায় হল বিলীন।
কেন বজ্রপাত ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
নির্মল নীল গগনে।
সূর্য-গ্রহণ কেন অকারণ
আজিকে ভিন্ন লগনে।

(প্রকাশ্যে) বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। আর বিলম্ব কিসের? তোমাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে কেন?

রবীন্দ্রনাথ। (সচকিতে) ভাই ছুটী! আমি দ্বারকানাথের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র—আমাকে ত পূর্বে আর কোনোদিন অর্থাভাবে পড়তে হয়নি। কিন্তু কি করে আশ্রম চালাব, সেই চিন্তায় আজ আমার হৃদয় ব্যাকুল, দুঃখেরও অবধি নেই। আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থ, এবং পিতৃপ্রাপ্ত ধন আমি এ জন্য ব্যয় করছি। তথাপি, আমার দায় ক্রমশঃ গুরুতর থেকে গুরুতম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আর, মৃণালিনি! তোমার জন্যই ত আমি জীবনধারণ করছি। তোমার স্বাস্থ্যও ত রন্ধনাদি গুরুকার্যের জন্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। তা' সত্ত্বেও, আমি ত কারোই মঙ্গলসাধন করতে পারছি না। হায়, অধন্য আমার জীবন!

মৃণালিনী। নাথ! তোমার কিসের দুঃখ? আমি জীবিত থাকতে, কে তোমাকে দুঃখ দিতে পারে? দেখ—

মহীরুহ দৃঢ়মূল প্রকাণ্ড-কাণ্ডবহুল
ঝঞ্চাবাতে নয় জর্জরিত।
প্রবাল-প্রস্তররাশি প্রচণ্ড তরঙ্গ নাশি'
কণামাত্র না হয় চূর্ণিত॥

তোমাকে দুঃখ দিতে পারে, এরূপ শক্তি কার? মহর্ষির পুত্রের কি কোনোদিন ধৈর্যহানি হতে পারে?

যা হবার হোক মোর,
নেই তাতে ক্লেশ।
তোমার জীবনে যেন,
না থাকে সে লেশ॥
দিবাকর ম্লান হলে,
নলিনী শুকায়।
এই ত বিধির বিধি,
অন্যথা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ। কবিপ্রিয়ে! আমার মন কবিদের মতই স্পর্শকাতর। সে ত অগাধজলসঞ্চারী রোহিত-মৎস্যের ন্যায়ই স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী ও অন্তর্বিহারী। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকতে হলে, জলের বাইরের পুরু ভস্মাচ্ছাদিত মৎস্যের মতই তা' ছটফট করে।

মৃণালিনী। নাথ! মৃণালিনীর হৃদয় ভাস্কর! আমার সাধকশ্রেষ্ঠ পতি যে সংসার ভারে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন, এ'কথা কি করে' বিশ্বাস করি? তুমিই ত আমাকে একদিন স্বয়ং লিখেছিলে, যে, তোমার পায়ে বিছে কামড়ালে, তোমার যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছিল, তখন তুমি সেই কষ্টকে বাইরের জিনিষ বলে' অনুভব করতে চেষ্টা করলে; ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে তেমনি করেই তোমার পায়ের কষ্ট দেখতে লাগলে; আশ্চর্য ফলও পেলে; শরীরে কষ্ট হতে লাগল, অথচ মন ক্লিষ্ট হল না; এবং ঘুমুতেও পারলে।

রবীন্দ্রনাথ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাঃ! বেশ সুন্দর কথাই ত তুমি আজ আমাকে মনে করিয়ে দিলে! ভাই ছোট বৌ! তোমার কি বুদ্ধি!

মৃণালিনী। বস্তুতঃ, সুখ বা দুঃখ ত কেবল ক্ষণস্থায়ী, কেবল ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বস্তুই মাত্র বলে আমার মনে হয়।

মম প্রাণপতি অতি মহামতি
দেহাত্ম প্রভেদ জ্ঞাতা।
জাগতিক ক্লেশ করেনা প্রবেশ
তাঁর মনে, হে বিধাতা॥
এ দুঃখনিচয় তুচ্ছ সুনিশ্চয়,
তথাপি তার কারণ।
জানিতে আকুল ভাবনা ব্যাকুল
মোর দীনহীন মন॥

সত্যই, আজকের সেই ক্ষণিক দুঃখের কারণ কি?

রবীন্দ্রনাথ। দেবি কবি প্রিয়ে! পরম কল্যাণী। শোন তবে! আমার পরম স্নেহ ভাজন একজন আশ্রম শিক্ষক আমাকে অর্থের জন্য উদ্ব্যস্ত করছেন। সে জন্য—

হঠাৎ প্রতিজ্ঞা আমি করেছি অকালে,
তাঁর প্রাপ্য অর্থ দেব রজনী পোহালে।
দীনহীন পল্লীমাঝে পাব কোথা ধন?
সেই ভেবে মোর আজি আকুলিত মন॥

মৃণালিনী। (সহাস্যে) আহা! এই কি কেবল তোমার কষ্টের কারণ? এ ত, এমন কি, 'ক্ষণিক দুঃখ'—এই নামেরও যোগ্য নয়—যেহেতু এ' একেবারেই দুঃখই নয়। এই শিক্ষকের বেতন দান বিষয়ে তুমি ক্ষণমাত্রও চিন্তা করো না।

রবীন্দ্রনাথ। (বিস্মিত ভাবে) সে কি কথা? তা হলে, অর্থ-সংগ্রহ এবং তা' থেকে তাঁর বেতন দান হবে কি করে?

মৃণালিনী। (উৎফুল্ল ভাবে) হবে গো হবে; নিশ্চয়ই হবে। তোমার চিন্তা কি, সে চিন্তা আমার। শোন নিশীথিনীর অলঙ্কার যেমন কেবল শশী, মৃণালিনীর অলঙ্কার তেমনি কেবল রবি। অন্য স্বর্ণালঙ্কারে আমার আর প্রয়োজন কি? নাথ! শোন—

দুষ্কর সুকর হয় সাধা বুদ্ধি বলে,
ধীরমতি তুমি কেন বিষাদ-কবলে?
অলঙ্কাররাশি এই দেহভার রূপ,
বিক্রয় করিলে পাবে অর্থ অনুরূপ॥

(সমস্ত অলঙ্কার খুলে' কবির পায়ে রেখে)

(করুণ ভাবে)—হে মৃণালিনীর রবি রশ্মি। তোমার শ্রীচরণে আমার এই দীনহীন অর্ঘ্য! সানুগ্রহে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর।

রবীন্দ্রনাথ। (সবেগে দূরে সরে গিয়ে)—না না, কিছুতেই না; এ হতেই পারে না।

মৃণালিনী। (শান্ত ও দৃঢ় ভাবে) এ হবেই হবে। এ অলঙ্কার তোমার, আমার ত নয়। আমার অর্ঘ্য আমি ফিরিয়ে নেব কি করে?

রবীন্দ্রনাথ। (চিন্তিত, বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান)।

মৃণালিনী। এতে ত দুঃখের কারণ কিছুই নেই। আর শোন, আমাদের এই আশ্রমে যাঁরা যাঁরা আসছেন, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য আমাদের অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হবে।

আরো দেখ—

অধ্যাপক বর্গতরে
রেখো না ক্ষোভ অন্তরে।

বিধিসৃষ্ট নয় করে
সমান কি পঞ্চাঙ্গুলি ?
মোর "শান্তিনিকেতনে"
বাস করে কত জনে
সমান হবে কেমনে
প্রাণ প্রিয়জনগুলি ?
দুঃখ তাতে কিবা আর
মঙ্গল হোক সবার
কামনা এ' অনিবার
আর অন্য চিন্তা ভুলি।

রবীন্দ্রনাথ। (আবেগ ভরে)—
ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ মম।
বাক্য করে শত্রুতা পরম।
মৃণালিনী! তব অর্থ-শ্রমে।
বিরাজিত আনন্দ আশ্রমে।
(মৃণালিনীর প্রতি সপ্রেমে)

দেবি! কি অনুপম তোমার এই লক্ষ্মী মূর্তি! দেখ—
আশ্রমমন্থন কালে যে কালকূট অকালে
সমুত্থিত হেরি অকারণ।
নীলকণ্ঠ রূপে, হায়, পান আজি করি তায়
সে শকতি করি না ধারণ।
কিন্তু তুমি মৃণালিনী দেবী কমলবাসিনী
সাগরোত্থা সুধাভাণ্ডকরা।
নিত্যকল্যাণদায়িনী পীযূষরসবর্ষিণী
আনন্দরূপা পরাৎপরা।

পুনঃ—
সমীরণস্পর্শাবেশে ধূম্রজাল যায় ভেসে'
বর্ষাধারা ধূলি করে সিক্ত।
নবীন-পল্লবদাম করে নয়নাভিরাম
শাখাদল শুষ্ক, শীর্ণ, রিক্ত।
সেই মত মৃণালিনি! নবীন প্রাণদায়িনী
ধূম্র-ধূলি তুমি কর দূর।
আর আনো সঙ্গে করি' ছড়াও অঞ্চল ভরি'
বসন্তের বিভা ভরপুর।

(সক্ষোভে)

কিন্তু আমি ত কোনোরকমেই তোমার শ্রমলাঘব করতে পারছি না। তোমার গুরুশ্রমক্লিষ্ট বদনমণ্ডল দেখে আমার মন হাহাকার করে' উঠছে।

মৃণালিনী। আমি ধন্য হলাম। কিন্তু, নাথ! কেন তুমি সেজন্য অকারণে ক্ষুব্ধ হচ্ছ? এ'ত আমার ব্রত, আমার সার্থকতা, আমার প্রাণ!

রবীন্দ্রনাথ। (করুণভাবে) মৃণালিনি! তুমিই ত কেবল রবীন্দ্রের জীবনকারণ! সূর্যের যেমন বিভা, তেমনি তুমিই ত আমার আলোক, আমার আনন্দ, আমার সর্বস্ব। অতুলমনোবৈভবশালিনী তুমি জগতে কার না গরিমা মহিমার কারণ? দেবি! অনির্বচনীয় তোমার মাহাত্ম্য! সত্যই :—

মাতৃস্নেহ-সুধারস
বঞ্চিত এ জন।
আজীবন দুঃখপূর্ণ
ছিল মোর মন।
কিন্তু, হের, বিধাতার
করুণা পরম।
একাধারে মাতা জায়া
লভেছে অধম।
আনন্দস্বরূপা তুমি
মঙ্গলদায়িনী।
পরিবার ও আশ্রম
পালনকারিণী।
আমি ও আমার যা কিছু
জগতে আছে।
বিধৃত রয়েছে তব
স্নেহসুধা মাঝে।

মৃণালিনী। আমি ধন্য হলাম।

রবীন্দ্রনাথ। শতদলরূপা অতি অপরূপা
তুমি মম মৃণালিনী।
আশ্রমোল্লাসিকা শ্রেষ্ঠ কুসুমিকা
সার্থকনামধারিণী।
কর্মভক্তিজ্ঞান তপস্যাসাধন
ত্যাগ সেবা বিহারিণী।
শান্তা সুশোভিনী কান্তা সুমোহিনী
স্বসৌরভবিলসিনী।
ব্রহ্মপদাশ্রয়া মহর্ষিচিত্তজয়া
নিখিল-ভুবন-নন্দিনী।
"ভবতারিণী" রূপিণী "মৃণালিনী" স্বরূপিনী
রবীন্দ্রচিত্তমধুধারিণী।

মৃণালিনী। (প্রণাম করে)—আমি তোমার
জন্মজন্মান্তরের শ্রীচরণদাসী।
অসার্থকনামা আমি
মৃণালিনী দীনা।
পুষ্পমাঝে ক্ষুদ্রতমা
সুগন্ধবিহীনা।।
তুমি মহাজ্যোতির্ময়
নিত্যালোকসিন্ধু।
পরকৃপাভরে মোরে
দিলে এক বিন্দু।।
সে আলোকে বিকশিত
জীবন আমার।
প্রপূরিত মহানন্দ
অমৃতে অপার।।
(উভয়ের প্রস্থান)।

অনুবাদিকা—ডঃ রমা চৌধুরী।

মানগড়ের মামলা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

মহীতোষ। বাবা, রাজাসাহেব জিজ্ঞাসা করছিলেন—কখন নাচ-গান সুরু হবে। উনি আসবেন।

ভাদুড়ী। বেশ বেশ। এই সাতটার গাড়ী চলে গেলেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে। বেশ নাচে, বেশ গায়। আপনি ত দেখেননি কখনও—

বীরেশ। না।

ভাদুড়ী। তা হলে নিশ্চয় আসবেন।

বীরেশ। ওদের কি সকলকেই ছেড়ে দিয়েছে—না দু'-তিন জনকে এখনও আটকে রেখেছে?

ভাদুড়ী। না ছেড়ে দিয়েছে সবাইকেই। পুলিশের কাণ্ড। শুধু শুধু ওদের ধরে নিয়ে উৎপাত করলে। আমি তখনই বলেছিলাম আরে ওদের দ্বারা কি এ কাজ সম্ভব—এ পাকা হাতের কাজ যে! ওরা নিরীহ, অত্যন্ত নিরীহ—এই মাস তিনেক হল ওরা এসেছে, দেখি ত আমি দুবেলা ষ্টেশন থেকে। হয়ত কারও হাঁসটা, কারও মুরগীটা, এদিক ওদিক থেকে সরায়—কিন্তু এরকম ডাকাতী, এরকম খুন পিঠে ছুরি বসিয়ে। সোজা জিনিষ সোজা ভাবে পুলিশ কি দেখতে জানে?

(এমন সময় ষ্টেশনে সাতটার গাড়ী আসার ঘণ্টা হল)

ভাদুড়ী। ঐ সাতটার গাড়ী এসে পড়ল।

বীরেশ। (হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ঠিক সময়েই এলো। একটুও লেট হয়নি।

ভাদুড়ী। আজকাল গাড়ী ত রাইট টাইমেই যায়—লেট বড় একটা হয় না।

(ঘন ঘোর শব্দে মহাসমারোহে সাতটার গাড়ী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। ঘুমন্ত মানগড় ষ্টেশন হঠাৎ যেন জেগে উঠল মহা কলরবে। ফেরীওয়ালার চীৎকার, যাত্রীদের হাঁক-ডাকে হয়ে উঠল মুখর। কিন্তু সমস্ত কলরব তলিয়ে দিয়ে শোনা গেল একটি স্ত্রীলোকের তীব্র চীৎকার)।

(স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর)

উদয়—বাবা উদয়—উদয়!

মহীতোষ। এই রে—পাগলীটা আবার এসে জুটেছে।

(স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর)

(ষ্টেশনের অপর দিক হতে)

উদয়—উদয়—বাবা উদয়।

ভাদুড়ী। তাইত দেখছি—মাঝে তিন-চার দিন ছিল না। আবার এসো—বেচারা ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

(স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর)

উদয়—বাবা উদয়—উদয়!

(ক্রমে যেন কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙ্গে গেল। ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা—সশব্দে ট্রেণ দিল ছেড়ে)।

বীরেশ। কি ব্যাপার?

মহীতোষ। ও একটা পাগলী। ছেলে ট্রেণের দুর্ঘটনায় মারা গেছে—সেই যে সে বার, মাস তিনেক হল, দুটো ষ্টেশন আগে চক্রপুরে কলিশন হল সেই কলিশনে—

(স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর)

(ক্রন্দনের সুরে) উদয়—বাবা রে। উদয়—

বীরেশ। তা ওকে বলা হয়নি ওর ছেলে মারা গিয়েছে?

ভাদুড়ী। আমি ওকে বুঝিয়েছি। কিন্তু ও বিশ্বাস করে না। ওর বিশ্বাস, ওর ছেলে সদর থেকে ডাউন গাড়ীতে ফিরে আসবে। তাই ডাউন গাড়ীর সময় ষ্টেশনে এসে চেঁচিয়ে ছেলেকে ডাকে—

মহীতোষ। ছেলে সদরে মিস্ত্রীর কাজ করত কি না। যে ট্রেণে দুর্ঘটনা হল, সেই ট্রেণে আসার কথা ছিল—

(স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর)

(ক্রন্দনের সুরে) বাবা গো—উদয়! উদয় রে!

বীরেশ। তা কতক্ষণ এরকম চেঁচাবে?

ভাদুড়ী। এখুনি থেমে যাবে। আবার পরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবে, সকলকে বলে বেড়াবে—ছেলে পরের গাড়ীতেই আসছে।

বীরেশ। ষ্টেশনেই থাকে না কি?

ভাদুড়ী। না। ঐ রাতটা ষ্টেশনেই পড়ে থাকে লোকাল এবং দুটো ডাউন গাড়ীই ত রাত্রে। ভোরবেলা চলে যায় গ্রামে।

বীরেশ। মানগড়েই বাড়ী?

ভাদুড়ী। না—বাঁদরবনিতে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে—

বীরেশ। তা আপনি ওকে ষ্টেশনে থাকতে দেন কেন?

ভাদুড়ী। আহা—বেচারা। একমাত্র ছেলে। ঐ পাগলামীটুকু নিয়েই ত বেঁচে আছে। ওটুকু গেলেই যাবে মরে।

মহীতোষ। শুধু কি থাকতে দেওয়া? বাবা রোজ রাত্রে ওকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন।

ভাদুড়ী। হ্যাঁ—মালতী মা নিজের হাতে খাওয়ায় রোজই—

বীরেশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) হুঁ।

ভাদুড়ী। আমি যাই—ষ্টেশনে যাই—বেদেদের খবর পাঠাই। আপনি রাজাসাহেব কিন্তু নিশ্চয়ই আসবেন—বেশী দেরী করবেন না।

(ভাদুড়ী মশাই ষ্টেশনের দিকে এগুলেন)

বীরেশ। (মহীতোষের দিকে তাকিয়ে) এ পাগলীর কথা তুমি আমাকে কখনও বলনি ত ?

মহীতোষ। ওর কথা আর কি বলব !

বীরেশ। মাঝে তিন-চার দিন ছিল না। কোথায় ছিল কিছু খবর নিয়েছ ?

মহীতোষ। পাগলের ব্যাপার ! ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে।

বীরেশ। (চলিতে চলিতে) আচ্ছা আমি চললাম।

মহীতোষ। নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু।

(বীরেশ রায় গ্রামের পথে চলে গেলেন।)

(বটগাছের পিছনে ঝোপের ওদিক থেকে এগিয়ে এল একটি তরুণী —বয়স বাইশ-তেইশ হবে। দীর্ঘ দেহে ভরা গড়ন—উজ্জ্বল শ্যামলা। মুখশ্রী সুন্দর—চোখ দুটি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। পরিধানের বসনের পারিপাট্য এবং পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাথায় ঘন কালো কেশ।—দীর্ঘ নয়, ঘাড়ের কাছে ছোট করে ছাঁটা। থোকা থোকা গুচ্ছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুখখানিকে রয়েছে ঘিরে—মুখের লাবণ্য যেন দিয়েছে বাড়িয়ে)

মহীতোষ। (আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, একগাল হেসে এগিয়ে) এই যে সুজাতা, কখন এলে ?

সুজাতা। মালতী কোথায় ?

মহীতোষ। আছে ঘরে। কলকাতা থেকে এলে কখন ? তোমার দাদা ত এতক্ষণ ছিলেন—কই। কই ! তোমার আসার কথা কিছু বললেন না ত ?

সুজাতা। আমি মালতীকে চাই—আমার বেশী সময় নেই।

মহীতোষ। এ কি, তোমার কি হল ? দুটো কথাও কি আমার সঙ্গে কইবে না ?

সুজাতা। মালতীকে ডেকে দিন।

(এমন সময় ভাদুড়ী মশাই ষ্টেশনের দিক থেকে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে সুজাতাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে এগিয়ে এলেন)

ভাদুড়ী। এই যে সুজাতা মা ! কখন এলে মা—কবে ?

সুজাতা। কাল রাত্রে কাকাবাবু ! (ভক্তিভরে প্রণাম করল)

ভাদুড়ী। তা ভাল আছ ত মা ?

সুজাতা। হ্যাঁ। কাকাবাবু !

ভাদুড়ী। তা 'তোমাকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়। বড় আনন্দ হয়।

সুজাতা। আপনি আমাকে খুব স্নেহ করেন কি না।

ভাদুড়ী। যাচ্ছি। আমি এখনই মালতীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(ভাদুড়ী মশাই বাড়ীর দিকে এগুতে এগুতে চেঁচিয়ে ডাকলেন 'মালতী ! মালতী !' ভাদুড়ী মশাই বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। মালতী ঘর থেকে এগিয়ে এল।)

মালতী। (মৃদু হেসে কাছে এসে) কখন এলে ভাই ? গলা শুনেই সন্দেহ হয়েছে। বাবার এত আনন্দ—নিশ্চয়ই সুজাতা এসেছে।

সুজাতা। (একগাল হেসে মালতীর হাত দুটি ধরে) চল, তোমাদের ঘরে গিয়ে বসি।

মালতী। এইখানেই বস—ফাঁকায়। ঘরে বড্ড গুমোট।

(সুজাতাকে নিয়ে বাঁধানো বেদিটির উপর বসল। মহীতোষও একটু দূরে বেদিটির উপর বসতে যাচ্ছিল)

সুজাতা। (মহীতোষের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে) আপনি যান। আমাদের কথাবার্তায় আপনার কোনও প্রয়োজন নেই।

(মালতীর মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মহীতোষ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জিনিষগুলি গুছিয়ে নিয়ে, ধীরে চলে গেল ঘরের দিকে—মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন।)

মালতী। (ঈষৎ হেসে) মান-অভিমানের পালা চলছে বুঝি ?

সুজাতা। কিসের আবার মান অভিমান !

মালতী। তবে ? সে বার যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছিলে তখন ত দেখেছি—

সুজাতা। থাক ও কথা, অন্য কথা বল।

মালতী। যাক, কখন এলে ?

সুজাতা। কাল রাত দুটোর গাড়ীতে। পূজোর ছুটি হয়ে গেল ত ?

মালতী। ছুটি কত দিন—এক মাস ?

সুজাতা। ছুটি অবশ্য এক মাস—কিন্তু আমার ত আর ক্লাশ নেই। সামনে নভেম্বরেই যে এম-এ পরীক্ষা।

মালতী। ও ! খুব পড়াশুনার চাপ বুঝি ? তাহলে গরমের ছুটিতে তোমাকে যতটা পেয়েছিলাম—এবার আর তা হবে না ?

সুজাতা। (সে কথার জবাব না দিয়ে, হাসিভরা মুখে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে) মুখখানা দেখছি জলভরা তালশাঁসের মতন হয়ে আছে। ব্যাপার কি ?

মালতী। (ঈষৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) ব্যাপার আর কি ! কোনও ব্যাপারেই আমার আর ঠাঁই নেই।

সুজাতা। তার মানে কি ? তোমাকে নিয়েই ত সব ব্যাপার।

মালতী। তা হতে পারে। কিন্তু কোনও ব্যাপারে যখনই নিজের ঠাঁই নিয়েছি বেছে—ঘটেছে অনর্থ।

সুজাতা। তাই বলে তোমার নিজের ঠাঁই অপরকে তুমি দেবে ছেড়ে ?

মালতী। দেখি, যদি তাতেই সুফল ফলে। (এমন সময় ভাদুড়ী মশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলেন মালতীদের দিকে। সুজাতা মালতী দুজনেই উঠে দাঁড়াল।)

ভাদুড়ী। বস—তোমরা বসে গল্প কর। একটা কথা শুধু বলতে এলাম। মালতী ! মা সুজাতাকে যেন নাচ-গান না শুনিয়ে ছেড়ে দিও না।

সুজাতা। কিসের নাচ-গান ?

মালতী। ঐ যে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে—একটু পরেই বেদে-বেদেনীদের নাচ-গান হবে, ওখানে।

সুজাতা। কিন্তু কাকাবাবু, আমি ত বেশীক্ষণ থাকতে পারব না, আমার যে সামনেই এম. এ পরীক্ষা।

ভাদুড়ী। ও—এম, এ পরীক্ষা। এম, এ—তবে ত হবে না। অনেক পড়াশুনা করতে হয় যে। তবে থাক তবে থাক।

(ভাদুড়ীমশাই ষ্টেশনের দিকে দু'-চার পা এগিয়েই—আবার ফিরে এলেন।)

ভাদুড়ী। মালতী! মা সুজাতাকে কিছু জলখাবার খাইয়ে দিও। না খাইয়ে ছেড় না যেন। (আবার ষ্টেশনের দিকে দু'-চার পা এগিয়েই ফিরে এলেন।)

ভাদুড়ী। মালতী! ষ্টেশনে মুরলীর দোকানে খুব ভাল পান্তুয়া করে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুজাতা। কাকাবাবু! আপনার পাঠানো পান্তুয়া না খেয়ে আমি যাব না।

(ভাদুড়ী ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন)

মালতী। (একটু হেসে) বাবা তোমাকে কি ভালই বাসেন!

সুজাতা। তা জানি। তাই ত ভয় পাই। একেবারে খাঁটী লোক কিনা—ওঁর ভালবাসার ভার বইবার যোগ্যতা কি আমার আছে? (একটু চুপ করে থেকে) যাক্ ও কথা—একটা কথা তোমাকে শুধাই, কেন এত রূপ নিয়ে জন্মেছিলে—বলতে পার?

মালতী। ভগবান যদি থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে ঐটেই যে আমার প্রথম প্রশ্ন।

সুজাতা। আমি জবাব দিচ্ছি। ভগবান ও রূপ নিজেই উপভোগ করতে চান—তাই অপরের ভোগে ঘটান অনর্থ। বিলিয়ে দাও নিজেকে তাঁর চরণে, কাঁদ রাধিকার মত তাঁর প্রেমে।

মালতী। (আশ্চর্য্য হয়ে) তোমার মুখে এ কথা?

সুজাতা। জান ত, কলকাতায় আমি আমার পিসেমশায়ের বাড়ীতে থাকি, তিনি এটর্ণি। তাঁর বাড়ীতে কীর্ত্তন হয় প্রায়ই। কীর্ত্তনে রাধিকার কথায় আমার খালি মনে পড়ে তোমাকে।

মালতী। তোমার পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি।

সুজাতা। আর না হয়, চল আমার সঙ্গে কলকাতায়—আমি তোমার লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করে দেব। জান ত আমি সাবালিকা হয়েছি—বাবার উইল অনুসারে আমি এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক। সে টাকাও রয়েছে পিসেমশাইয়ের কাছে—দাদার হাতে নয়।

(মালতী নীরব)

সুজাতা। এ রূপ কখনই অন্যের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তৈরী হয়নি। সতীনের ঘর করবার জন্য কখনই তোমাকে গড়েননি বিধাতা।

(মালতী নীরব)

সুজাতা। (মালতীর হাত দুটি ধরে) শুনলাম তুমি মত দিয়েছ—সত্যি? সত্যি? বল আমাকে—

মালতী। আমি মতামতের বাইরে থাকতে চাই সুজাতা! তুমিও আমাকে আর জ্বালিও না—দুটি পায়ে পড়ি। ও কথা ছেড়ে দাও।

সুজাতা। কখনই না। আসার পর থেকে সমস্ত দিন দেখেছি বৌদির চোখের জল। দাদা তোমার কাছে আসতে আমাকে বারণ করেছেন—ছুঁতো দিয়েছেন—আমি বড় হয়েছি, গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ালে বংশের মর্য্যাদাহানি হয় কিন্তু সত্যিকারের কারণ আমি ত জানি। দাদাকে তোমরা না চিনলেও—আমি চিনি। মানিনি দাদার কথা। আজ একটা বোঝাপড়া করে যাবই তোমার সঙ্গে।

মালতী। (আয়ত নয়ন দুটি দিয়ে সুজাতার মুখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে) কি তুমি জানতে চাও?

সুজাতা। তোমার মনের সত্যিকারের কথাটি।

(মালতী নীরব)

সুজাতা। বল—বল।

মালতী। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

সুজাতা। খুব বুঝতে পারব, জবাব দাও আমার প্রশ্নের—সত্যি রাজী হয়েছ?

মালতী। রাজী লোক তখনই হয়—যখন তার প্রাণে ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে। আমার প্রাণে ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই।

সুজাতা। কথা ঘুরিও না মালতী! বড় কথায় ছোট কথা চাপা দিও না।

মালতী। চাপা দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই, বলেছি ত তুমি বুঝবে না।

(এমন সময় ষ্টেশনের একটি জমাদার শালপাতা ঢাকা দেওয়া একটি পাত্রে পান্তুয়া নিয়ে এল ষ্টেশন থেকে)

বৃন্দাবন। বড়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

সুজাতা। আচ্ছা রাখ ঐখানে।

(বৃন্দাবন পাত্রটি মালতীর পাশে রেখে চলে গেল)

সুজাতা। বল—বল—বল আমাকে সব—

মালতী। (যেন আপন মনে) গভীর রাত্রে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠেছিল আকাশে। সমস্ত রাত ঘুমুই নি—আকুল প্রাণ নিয়ে লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম ষ্টেশনে বলতে—আমাকে ভুল বুঝো না, ও চিঠি মিথ্যে, ও চিঠি ফাঁকি—

(মালতীর গলা যেন চেপে গেল)

সুজাতা। চিঠি?

মালতী। বাবা যখন ওঁর সঙ্গে বিয়ের কথা বললেন—চোখ তুলে ওঁর দিকে চেয়ে দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করলাম—আমি রমণী—বিধাতার জগতে আমারও প্রয়োজন আছে। নিজের কাছে নিজের মূল্য হয়ে উঠল সোণা। আড়াল থেকে বারে বারে চেয়ে দেখেছি—চাওয়ার যেন তৃপ্তি নেই, শেষ নেই। ঐ ষ্টেশনেই ত উনি ঘুরে বেড়াতেন। ঐখানেই ত ছিল ওঁর কাজ।

সুজাতা। তারপর?

মালতী। একদিন হল চোখাচোখী। চোখ আমি নামিয়ে নিইনি সুজাতা—নিতে পারিনি। প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিলাম—সেই গভীর চোখের নিবিড় আকুলতা।

সুজাতা। বল—চুপ করলে কেন?

মালতী। ওঁর সঙ্গে বাবা যখন বিয়ে ঠিক করলেন—কয়েকটা দিন—আমার জীবনের কয়েকটা দিন—আমি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছিলাম একটা অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণে। ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

সুজাতা। কিন্তু চিঠি—কিসের চিঠি?

মালতী। দাদা ত বরাবরই ও বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন—অনেক বুঝিয়েছিলেন আমাকে—আমি শুনেও শুনিনি। শেষ পর্য্যন্ত দাদা বলে বসলেন—ও বিয়ে হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন, সবদিক

দিয়ে এ রকম বৃথা জীবন তিনি আর বহন করতে রাজী নন। চমকে উঠলাম, দাদার তখন যা মনের অবস্থা হয়ত তাই করে বসতেন।

সুজাতা। ছিঃ ছিঃ!

মালতী। (একটু হেসে জলভরা দুটো চোখ সুজাতার দিকে তুলে) দাদাকে ভুল বুঝ না। দাদার ও কথার পিছনে সত্যিই একটা মর্ম্মান্তিক ব্যথা ছিল—আমি তা জানতাম।

সুজাতা। কিসের ব্যথা?

মালতী। দাদা যে তোমাকে কি পাগলের মতন ভালবাসেন—হয়ত তা তুমি ঠিক এখনও বোঝনি সুজাতা! আমার ও বিয়ে হলে দাদা যে তোমাকে পান না।

সুজাতা। এ কথার মানে? (মুখ ঈষৎ আরক্তিম হয়ে উঠল)

মালতী। (মাথা নীচু করে) তোমার বড় ভাই যে শুধু এক সর্ত্তে তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন—

সুজাতা। হুঁ। তোমরা ভাব কি? আমি আমার দাদার হাতের একটা পুতুল না কি?

মালতী। (আবার একটু হেসে) তুমিও যে প্রয়োজন হলে প্রাণের জোরে বড়ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার—এ খবরটিও আমার দাদার জানা ছিল না ভাই!

সুজাতা। কিন্তু চিঠি কেন লিখলে?

মালতী। দাদা বললেন—বাবাকে বলে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে। রাজী হইনি। বলেছিলাম—বাবাকে মুখ ফুটে আমি বলতে পারব না। কি উৎসাহে কি আনন্দে বাবা বিয়ের জোগাড় করছিলেন—আমি ত দেখেছি।

সুজাতা। তারপর?

মালতী। দাদা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে দিয়ে ওঁকে একখানা চিঠি লেখালেন—এ বিয়েতে আমার একেবারেই মত নেই, এ বিয়ে না ভেঙ্গে দিলে সর্ব্বনাশ ঘটবে—এই সব।

সুজাতা। তুমি লিখলে চিঠি?

মালতী। সেই সময় প্রবাসী পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—ত্যাগের মধ্যেই মহত্ত্ব, ভোগের মধ্যে নয়। কি যে আমার হল জানি না মনে হল—সবই আমার ভোগের নেশা। দাদার জন্য ত্যাগই না হয় করি।

সুজাতা। হুঁ।

মালতী। দাদার হাতে চিঠি দিয়েই হু হু করে কেঁদে উঠল প্রাণ। ত্যাগের গর্ব্বে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম—হল না। ক্রমে মনে হল মিথ্যা—মিথ্যা—আমার শুভদৃষ্টি মিথ্যা হয়ে গেল।

সুজাতা। ঠিকই ত।

মালতী। আট দশ দিন গেল, আমি কিছুতেই সইতে পারছিলাম না। মনে হল, ওঁর কাছে মিথ্যা হওয়ার কি অধিকার আছে আমার। আমাদের ভাগ্য-দেবতাকে এমন করে ঠকাবার পাপ আমার কিছুতেই সইবে না—ওঁরও কি সইবে?

সুজাতা। চুপ করলে কেন? বল?

মালতী। গভীর রাতে চাঁদ উঠেছিল—চাঁদের দিকে চেয়ে আমি

আর থাকতে পারলাম না। সমস্ত জগৎ ঘুমন্ত, উনি শুধু একা জেগে ষ্টেশনের ঘরে—নাইট ডিউটি। ছুটে চলে গেলাম ষ্টেশনে, সন্তর্পণে ঢুকলাম ঘরে।

সুজাতা। বল। তারপর?

(মালতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল)

সুজাতা। (মালতীর হাত দুটি ধরে) কি হল মালতী?

মালতী। (নিজেকে সামলে নিয়ে) যা দেখেছিলাম—চেয়ারে বসে আছেন, মাথাটা কাত হয়ে পড়ে আছে সামনের টেবিলে—পিঠে বিরাট জখম। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত শরীর—

(মালতী চুপ করল। সুজাতা নিজের মনে যেন কি ভাবতে লাগল।)

মালতী। (কিছুক্ষণ পরে) সুজাতা! মিথ্যা হয়েই রইলাম চিরদিন। রোজই রাত্রে গভীর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি—আমি মিথ্যা, আমার ইচ্ছে মিথ্যা, আমার অনিচ্ছা মিথ্যা—কোনও মূল্য নেই, কোনও মূল্য নেই—

সুজাতা। এর পরে তুমি আর একজনকে বিয়ে করার কথা ভাব কি করে?

মালতী। (বিষাদভরা চোখে, মৃদু হেসে) তুমি এখনও বুঝলে না?

সুজাতা। শোন, তোমাকে বলি। দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, আমি কিছুতেই হতে দেব না।

মালতী। শুধু জেনে রেখ—ভয় নেই আমাকে দিয়ে কারও কোনও ভয় নেই।

(এমন সময় দেখা গেল ষ্টেশন থেকে ভাদুড়ী মশাই এবং আরও প্রায় দশ বারো জন লোক—একজনের হাতে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো, ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন।)

সুজাতা। (তাড়াতাড়ি উঠে) আমি এবার চলি—

মালতী। (উঠে) গান শুনবে না?

সুজাতা। না।

(চলতে আরম্ভ করে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে) ওমা!

পান্তুয়া মুখে ফেলে দি। কাকাবাবুকে আমি ফাঁকি দিতে পারব না।

মালতী। দাঁড়াও, এক গ্লাস জল আনি।

সুজাতা। না—না জল বাড়ী গিয়ে খাব—দাও।

(মালতী পাত্রটি ধরল। সুজাতা দুটি পান্তুয়া তাড়াতাড়ি মুখে ফেলে দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।)

মালতী। (সঙ্গে চলতে চলতে) অন্ধকার হয়ে গেছে—একলা যাবে কি করে? সঙ্গে আলো দিয়ে লোক দি।

সুজাতা। ভেব না। এই মোড়েই মুদীর দোকানে আমি পদ্মকে বসিয়ে রেখে এসেছি। আলোও আছে তার সঙ্গে।

(প্রস্থান)

(মালতী ধীর পদক্ষেপে চলে গেল ভাদুড়ী মশাই লোকজন নিয়ে এগিয়ে এলেন। গান বাজনার আসর হল সুরু। ক্রমে আরও লোকজন এসে জড় হল। কিছুক্ষণ পরে বীরেশ রায় এলেন—পরিধানে শুভ্র ধুতি ও পাঞ্জাবী। কিন্তু মহীতোষ এল অনেক পরে।

বেদে-বেদিনীদের নৃত্য ও গান বাজনা বেশ জমে উঠেছে—এল ন'টার গাড়ী ষ্টেশনে ঘন ঘোর রবে।

ষ্টেশন থেকে শোনা গেল সেই চীৎকার উদয়—বাবা উদয়—উদয় রে!—

গাড়ী ছেড়ে চলে গেল। নৃত্যগীত বেশ চলেছে। হঠাৎ একটা হুইসিলের শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল পুলিশ। নৃত্যগীত হঠাৎ গেল থেমে।

(ইন্সপেক্টার এগিয়ে এলেন ভাদুড়ী মশাইয়ের দিকে)

ইন্সপেক্টার। আপনি—আপনি ভাদুড়ী—ষ্টেশন মাষ্টার?

ভাদুড়ী। আজ্ঞে হাঁ। বসুন। গান শুনতে এলেন বুঝি?

ইন্সপেক্টার। না, আমাদের কর্তব্য বড় কঠিন। মাপ করবেন। আপনার বাড়ীখানা তল্লাসী করতে বাধ্য হচ্ছি।

ভাদুড়ী। আমার বাড়ী? কেন? কেন?

ইন্সপেক্টার। আপনার কন্যা মালতী কোথায়?

ভাদুড়ী। মালতী! মালতী! ঘরে আছেন—ঘরে—

ইন্সপেক্টার। তাঁকে একবার ডাকুন।

ভাদুড়ী। মালতীকে। এত লোকের মধ্যে কেন? কেন?

ইন্সপেক্টার। কি করব—কর্তব্য!

ভাদুড়ী। (অস্বাভাবিক চীৎকার করে—গলায় একটু কম্পন) মালতী মা!—মালতী মা—(শুভ্রবসনা মালতী এসে দাঁড়াল দরজার কাছে স্থির ধীর)

ইন্সপেক্টার। আপনি মালতী দেবী? (মালতী ঈষৎ মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ।)

ইন্সপেক্টার। মাপ করবেন—আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি—রমেন মুখার্জ্জীর খুনের অপরাধে। [ক্রমশঃ।

রাণু ভৌমিক

কালিঘাটে বিয়ে করে বস্তীর একটি খোলার ঘরে বাসা বাঁধলো ওরা। পাশের ঘরের ভাড়াটে রতনের বন্ধু। সে তাকে দেখাশোনা করতে পারবে। অন্তত অনামিকাকে তাই বোঝাল রতন। বিশেষত সে যখন রাত্রে থাকতে পারছে না।

দিন পনের বেশ কেটে গেল। রতন রীতিমতো আসে যায়। উপহারসামগ্রীও কয়েকটা কিনে নিয়ে এল। তবু অনামিকার ভালো লাগে না। যে বধূজীবনের স্বপ্ন সে দেখেছিল এ তো তা নয়। কোথায় সেই প্রশস্ত অঙ্গন? ধান, কলাই, যবের মিষ্ট গন্ধ, বধূদের ব্যস্ত পদক্ষেপ ভৃত্যদের কোলাহল, শিশুর চীৎকার। সকালে উঠেই কোনরকমে স্নান খাওয়া সেরে নিতে হবে—তারপর অখণ্ড অবসর। অবশ্য ধীরে ধীরে ওর ভালো লেগে আসছিল। বিকেলের দিকে রতন ওকে প্রায়ই বেড়াতে নিয়ে যেত, কোনদিন সিনেমা। মহানগরীর উদ্দাম কলকোলাহল, ব্যস্ত জীবনযাত্রা দেখতে খুবই ভালো লাগতো ওর। ভিড়ের মধ্যেই যেতে ও চাইতো। যে ব্যস্ত সুন্দর জীবনের ছবি ছিল তাকেই অনুভব করতো এই জনতায়। সিনেমায় গিয়ে আরও ভালো লাগতো। নায়ক নায়িকার হাসি, প্রেম, ভালোবাসায় একাত্ম হয়ে যেত সে।

এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন রতন এলো না। সারাদিন ওর প্রতীক্ষা করলো অনামিকা। ভাবলো, রাত্রে আসবে। যদিও রতন রাত্রে কখনও আসে না—তবুও নিরাশার সময় সবই সম্ভব মনে হয়। রাত্রে অনামিকা ভালভাবে ঘুমুতে পারলো না—ওর কেবলই মনে হতে লাগলো রতন দরজা ধাক্কাচ্ছে। সকালে প্রথমেই রতনের বন্ধুর খোঁজ করতে গেল সে। তালা বন্ধ। বন্ধুও নেই। পরদিনও রতন আসে না। অস্থির হয়ে ওঠে অনামিকা। বিকালের দিকে স্থির করে সে নিজে যাব।

যদিও রতন তাকে ঠিকানা দেয় নি কিন্তু রতনের ঠিকানা সে জানত। রতনের নোটবুকে ঠিকানা লেখা ছিল। রতন জানতো না যে অনামিকা লেখাপড়া জানে গ্রামের স্কুলে উচ্চপ্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছে—সে নিশ্চিন্তমনে নোটবুক রেখে স্নান করতে গিয়েছিল। অনেক ঠিকানায় ভর্তি নোটবুকটা। প্রথমেই রতনের নাম ছিল। পুরো নাম নয়। প্রথম পাতার মালিকের নামের জায়গায় সংক্ষেপে লেখা ছিল—R. ঠিকানায়—১৫, বুদ্ধ ওস্তাগর লেন। লিখে রেখেছিল অনামিকা মেয়েলী কৌতূহলে। আজ তা কাজে লাগলো।

অনামিকাদের ঘরে অনেক ভাড়াটে। একটি ভাড়াটের ছেলের সঙ্গে খুব ভাব ছিল অনামিকার। ওদেরই একটা ছেলে আসতো ওর কাছে তাকে ডেকে বলে, প্রকাশ, তুই বুদ্ধ ওস্তাগর লেন চিনিস।

—হাঁ চিনি। কেন? প্রশ্ন করে প্রকাশ।

—আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?

—পারব। কেন যাবে?

—এই এমনি বেড়াতে। একজনদের বাড়ী।

বুদ্ধ ওস্তাগর লেনে ১৫ নং বাড়ী অনামিকাদের বাড়িরই মত। একতলা, ইঁট, বালি খসে পড়া দেয়াল। সামনেই দুটো ঘর। প্রকাশকে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে কড়া নাড়ে অনামিকা।

দরজা খুলে দেয় একটি বাঙালী বধূ। বয়স বেশী নয়—অনামিকার চেয়ে কিছুটা বড় হবে সর্বাঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অযত্নের ছাপ। খোলা চুলগুলি ময়লা। গায়ে খড়ি উড়ছে। প্রশ্ন করে, কি চান?

—এখানে রতনবাবু থাকেন? একটু ইতস্তত করে অনামিকা জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ থাকেন। কিন্তু উনি তো এখন বাড়ীতে নেই। আপনার কি দরকার?

"উনি" ধক করে কথাটা কানে লাগে অনামিকার। আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এমন, সময় আরও দুটি ছেলেমেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কি মা? কার সঙ্গে কথা বলছ?

—তোদের বাবা কোথায় গেছেন জানিস'

—না তো। ছেলে মেয়ে দুটি উৎসুক চোখে দেখতে থাকে অনামিকাকে।

—কি দরকার বলে যান আমি ওঁকে বলবো।

—আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। বলেই অনামিকা দ্রুত পায়ে চলে যায়।

তাহলে রতন বিবাহিত। বসে বসে ভাবতে থাকে অনামিকা। প্রকাশ দু একটি প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে চুপ করে গেছে। তাহলে রতন বিবাহিত। মিথ্যে বিয়ের অভিনয় করেছে তার সঙ্গে। হিন্দুদের পীঠস্থান কালী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেখেলা করেছে।

দেবতা দাঁড়িয়ে দেখেছেন প্রতিবাদ করেন নি। এই কি জাগ্রত দেবতা? এরি দুয়ারে মাথা কোটে পৃথিবী?

কিন্তু কেন রতন এরকম করলো? কি করেছিল সে রতনের? শুধু ভালবেসেছিল।—এইজন্যই এত বড় শাস্তি রতন তাকে দিল। ভালবাসা কি তবে অপরাধ? ভালবাসা অপরাধ, লোককে বিশ্বাস করা বোকামী, দেবতার সাক্ষীর কোন মূল্য নেই—আঠারো বছর বয়সে এ কি অভিজ্ঞতা হলো তার। এই কি পৃথিবীর রূপ?

কন্ডাক্টার সামনে এসে দাঁড়ায়—টিকিট। অনামিকা টিকিট কাটে···হয়তো, রতন তাকে সত্যই ভালবেসেছিল···ভালবাসার জন্য অনামিকাও তো কি না করেছে। তার মা বাবা···' অনামিকার চোখ ফেটে জল আসতে চায়—কলকাতায় এসে পর্যন্ত সে জোর করেই মা বাবার কথা মনে আনে নি—আজ দুচোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে—

পাশে বসে থাকা মহিলা অবাক হয়ে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

—না তো। কাঁদছি না। চোখ মুছে নিজেকে সামলে নেয়·····সমাজ, সংসার, নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে ত্যাগ করে এসেছে এই ভালবাসার জন্য। মিথ্যেকথা বলেছে বাবা মাকে, যে বাবা মা নিঃস্বার্থভাবে তাকে শুধু ভালবেসেছিলেন। একমাত্র সন্তান হয়ে তাঁদের দিয়েছে কঠিন আঘাত। এত তীব্র এত বিশ্বগ্রাসী তার ভালবাসা।

রতনের ভালবাসাও তাকে বাধ্য করেছে মিথ্যাচারণ করতে। এ সেই সর্বগ্রাসী ভালবাসার অপরাধ। এ রকম অনেক কাহিনীও তো পড়েছে অনামিকা ভালবাসার জন্য কেউ অপরকে হত্যা করছে আবার ভালবাসার জন্য সর্বস্বত্যাগ করছে। রতনের বিয়ের পর, ছেলে মেয়ে হবার পর অনামিকার সঙ্গে দেখা হওয়াটা রতনের দোষ নয়—কুটিল নিয়তির চক্রান্ত। তবে রতন তাকে জানাতে পারতো—সেটাই রতনের অপরাধ। অপরাধ নয় দুর্বলতা রতন পারেনি তাকে দেখে তাকে ভালবেসে পাছে তাকে ছাড়তে হয় এই ভয়ে এই অন্যায়টুকু করেছে। এই অন্যায় ক্ষমা করবে অনামিকা। চিরদিন রতনকে ভালবাসবে সে। চিরদিনই রতনের দুর্বলতাকে সইয়ে নেবে নিজের গভীর ভালবাসায়।

কিন্তু তার স্বপ্ন। বিশৃঙ্খল পরিপূর্ণতার মধ্যে তার সেই ব্যস্ত বধূবেশী মূর্তি?

সে নিজেই রূপ দেবে তার স্বপ্নকে। বৎসরে বৎসরে সন্তান আসবে তার কোলে। ছেলেরা বড় হবে আসবে পুত্রবধূ-নাতি-নাতনী। মেয়েরা বড় হবে বিয়ে দেবে তাদের, ভিন্ন বাড়ীতে চলে যাবে তারাও আসবে নাতি-নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে। চাঁদের হাট ভেঙে পড়বে উঠোনে। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বৃদ্ধা অনামিকা তাকিয়ে থাকবে একদৃষ্টে। এই সব তারই সৃষ্টি। এই আনন্দের কণা, সৌন্দর্য কণা সবই তার। সে·····

—দিদি, এখানে নামতে হবে। চমকে তাকায় অনামিকা। হ্যাঁ, এখানেই নামতে হবে। ঐতো তাদের বাড়ীর পাশের বড় বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে—এখানেই নামতে হবে তাকে।

হয়তো রতন এতক্ষণ এসেছে তার কাছে। যদি নাও এসে থাকে তবে তাকে ডেকে আনাবে অনামিকা। বলবে, আমি তোমার সব কথা জানতে পেরেছি আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। আমার ভালবাসা তোমার অপরাধের চেয়ে অনেক বড়। আমি ঘর বাঁধতে চেয়েছি আমাকে ঘর বাঁধতে দাও।

—রতন আসেনি। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে যখন অনামিকা রতনের বন্ধুর কাছে খোঁজ করতে যাবে ভাবছে এমন সময় বন্ধুই এসে ঘরে ঢোকে।

—অনামিকা, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। প্রথমেই বলে ও।

—কি?

—কাল তোমাকে রতন এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইবে তুমি যেয়ো না।

রতনের বন্ধুর বক্তব্য অনামিকার কাণে পৌছায় না। সে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, কি বললেন? কাল ও আসবে।

—হ্যাঁ। আসবে তো নিশ্চয়ই। নইলে তোমাকে নিয়ে যাবে কি করে?

—কোথায় নিয়ে যাবে?

—এই যে বললুম। তুমি এত অন্যমনস্ক কেন? ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইবে কিন্তু তুমি যেয়ো না।

অনামিকা নিজের চিন্তার অনুসরণেই বলে, এ কয়দিন ও আসেনি কেন?

—এমনি। ভ্রূ কুঁচকে জবাব দেয় রতনের বন্ধু।

—এমনি নয়। আমি জানি কেন আসেনি? সবই জানি আমি।

—কি জান তুমি?

—জানি ও বিবাহিত।

—বিবাহিত? হঠাৎ রতনের বন্ধু জোরে হেসে ওঠে, বিবাহিত। সে তো ওর জীবনের খুব সামান্য জানা। বলতে গেলে, কিছুই না।

—খু-ব···সা···মা···ন্য···জা···না। তবে আর কি জানতে হবে।

—আরও অনেক কিছু জানতে হবে, ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বন্ধু বলে, জানতে হবে রতন মেয়েদের দালাল। জানতে হবে, রতন তোমাকে দিয়ে ব্যবসা করতে চায়।

—না, না, কখনও না, চেঁচিয়ে বলে অনামিকা, রায় বাড়ীর ছেলে কখনও ও রকম হতে পারে না।

—রায়বাড়ীর ছেলে? ও নিজেকে 'রায়' বলে পরিচয় দিয়েছে নাকি তোমার কাছে।

—ও ত রায়বাড়ীর ছেলে নয়?

—ও তো সাহা।

—ও রায়বাড়ীর ছেলে নয়? বিহ্বল কণ্ঠ অনামিকার।

—না। রায়বাড়ী কোনটা? তোমাদের গ্রামে যে বড় তালুকদার বাড়ীটা ছিল সেটার কথা বলছ।

—হ্যাঁ। সেখানে ও কেন যেত?

—একই উদ্দেশ্যে। ব্যবসা।

—ব্যবসা? কি?

—তোমাকে কথা বোঝাতে বড় সময় লাগে। কি ব্যবসা তুমি বুঝতে পার না। কর্তাদের বিলাসের উপকরণ জোগাত এবং সে বিলাসের উপকরণ সজীব এবারে বুঝলে।

স্থাণুর মত বসে থাকে অনামিকা। পৃথিবী ঘুরছে অন্ধকারের দিকে দাঁড়িয়ে আছে অনামিকা। অন্ধকার-অন্ধকার—চারিদিকে

অব্যর্থ লক্ষ্য

—অনিল কর্ম্মকার

সূর্য্যাস্ত

—অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
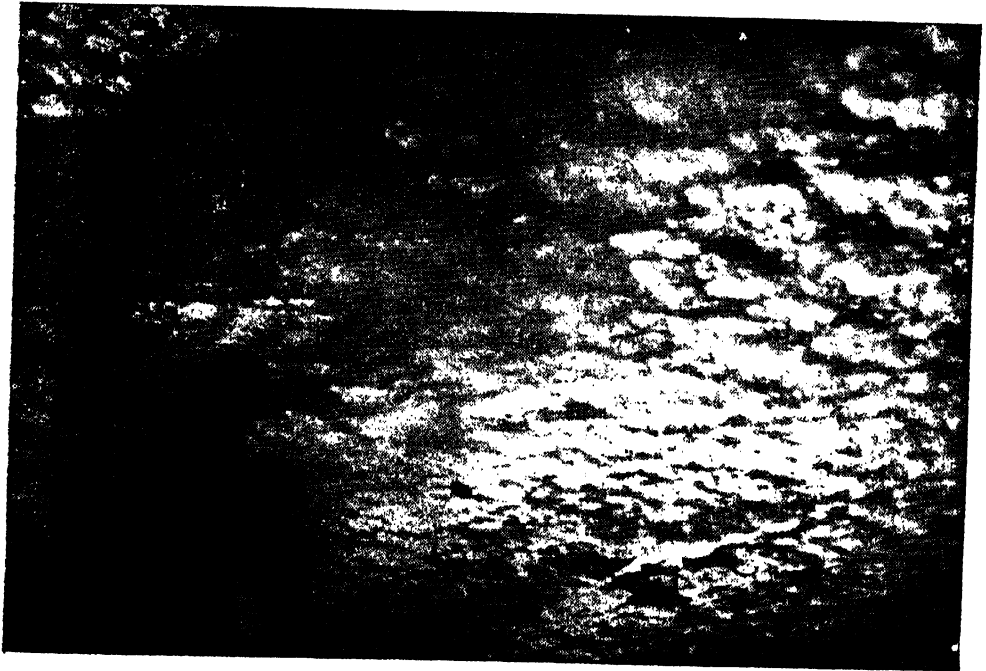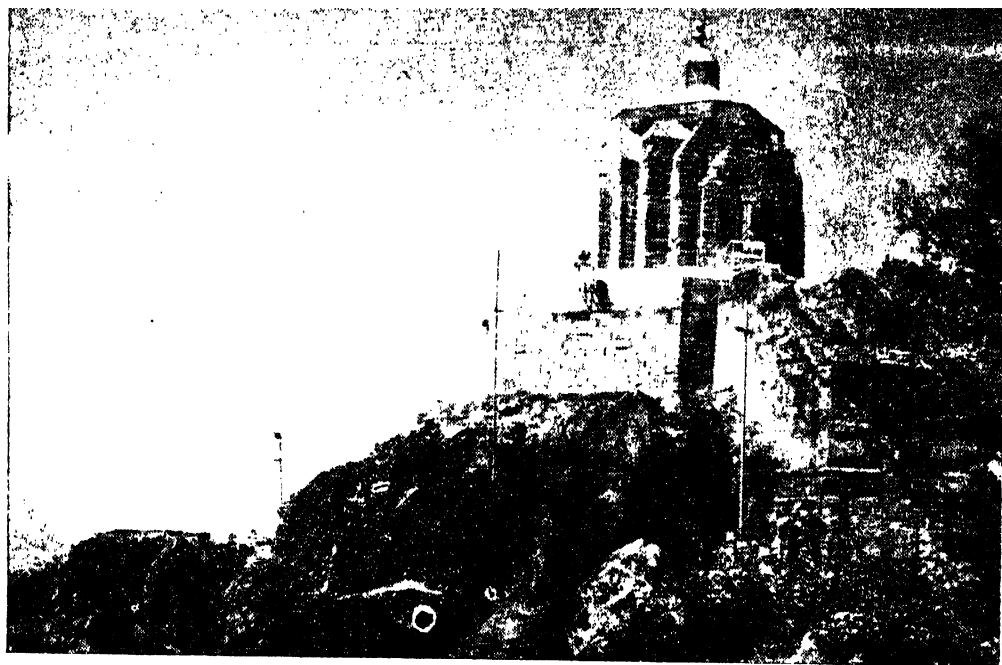
শ্রীশঙ্করাচার্য্য-মন্দির (শ্রীনগর) —নীতিন সেন

কাশ্মীর —কালীগোবিন্দ সান্যাল

সোহাগ —বিমল ঘোড়

নেহেরু পার্ক (ডাল হ্রদ, কাশ্মীর) —নীতিন সেন

সদ্যস্নাতা — মন্টু বসাক
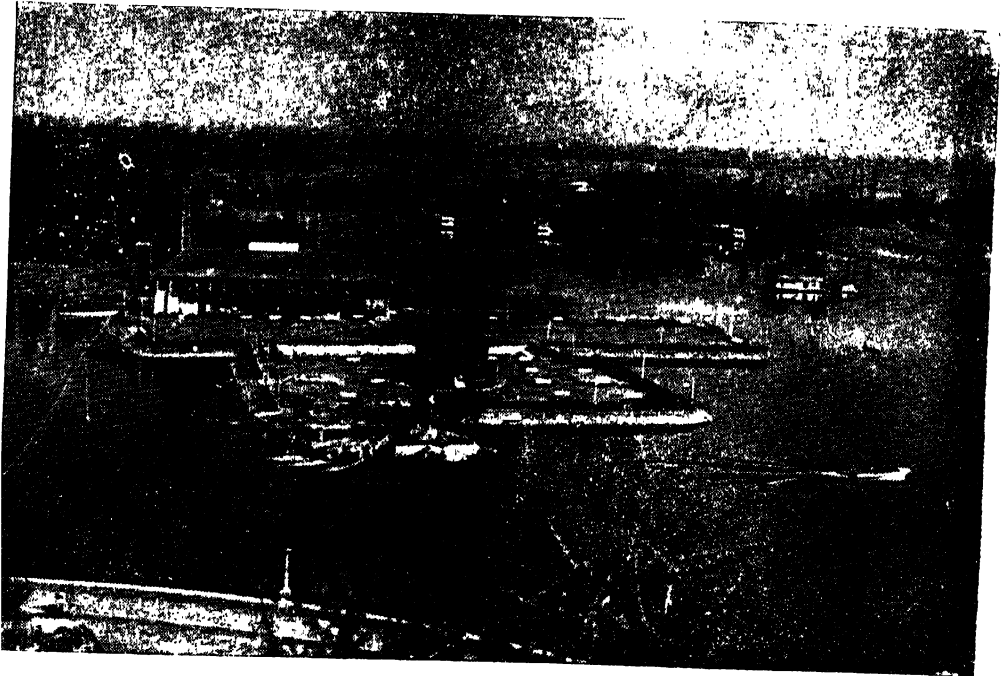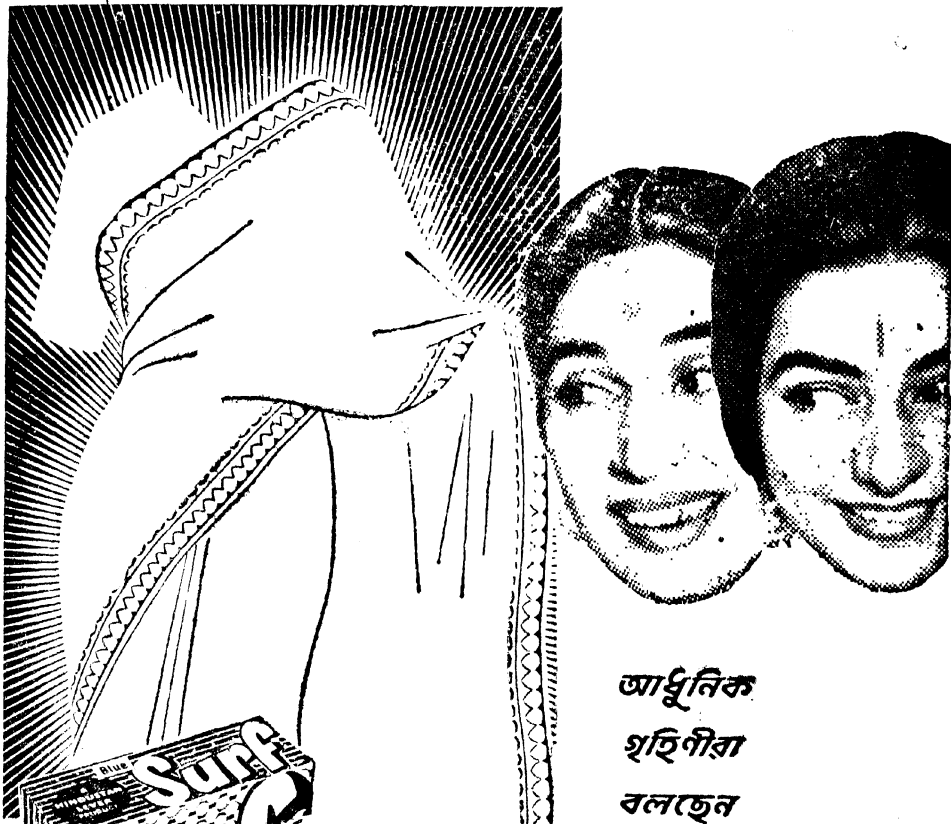
বাড়ীর সব কাপড় জামা সার্ফে কাচুন। সার্ফে সাদা কাপড় জামা ধবধবে ফরসা হবে। সার্ফে কাচা রঙীন কাপড় ও কত ঝলমলে হয়। সার্ফে কাচতেও কোন ঝামেলা নেই। শুধু ময়লা কাপড় সার্ফ-জলে চোবানো, রগড়ানো আর ধুয়ে ফেলা। ব্যস! সার্ফের দেদার ফেনা মূহূর্ত্তে কাপড়ের লুকোনো ময়লাও টেনে বার করে আনে। হাজার হাজার আধুনিক গৃহিণীর মতো আপনিও ধূতি, সার্ট, শাড়ী, ব্লাউজ, ফ্রক-জামা, তোয়ালে চাদর—এক কথায় রোজকার সব কাপড় চোপড়ই বাড়ীতে সার্ফে কাচুন। কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে!

নীল সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU.11-X52 BO

গভীর অন্ধকার—সেখানে একা অনামিকা দাঁড়িয়ে আছে আর অনুভব করছে পৃথিবী ধীরে ধীরে ঘুরছে। এঁকে বেঁকে কি জোরে ঘুরছে পৃথিবী আর তারই বুকে দাঁড়িয়ে আছে অনামিকা। একবার পড়ছে একবার উঠছে কিছু দেখতে পাচ্ছে না—কিছু বুঝতে পারছে না—রায়বাড়ী কর্তারা···বধূদের হাসিমুখ···আর···বাস্তব···স্বপ্ন···

—তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পার যে আমি কি উদ্দেশ্যে তোমাকে এত কথা বললুম? অন্ধকারের মধ্য থেকেই কথাগুলি কানে এসে বাজে।

চোখ মেলে তাকায়। নিজের ছোট ঘর আর সামনে বসে আছে রতনের বন্ধু।—হ্যাঁ, আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি কেন এসব কথা বললেন? মৃদু গম্ভীর অনামিকার গলা।

—আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। রতনের বন্ধু বলে।

শান্ত চোখে তাকায় অনামিকা।

—আমি তোমাকে ভালবাসি।

শান্ত চোখে ঘৃণার বিদ্রূপ খেলে যায়। চিবিয়ে চিবিয়ে অনামিকা বলে, ভালবাসা?

—হ্যাঁ। ভালবাসি। ব্যগ্র ব্যাকুল রতনের বন্ধুর কণ্ঠ। অবশ্য তোমার পক্ষে এখন ভালবাসার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আমি তো রতনের মত নই।

ভালভাবে তাকিয়ে দেখে অনামিকা। না, এ রতনের মত নয়। রতন সুশ্রী—একে কুশ্রীই বলা যায়। বেঁটে, কালো। মুখময় বসন্তের দাগ। খুব সহজ ভঙ্গীতে সত্য কথা বলে। যেজন্য সব কথাই রুক্ষ শোনায়। রতনের বিপরীত। রতনের কণ্ঠে এমন একটা মিষ্টি আবেশ—আলস্যজড়িত ভঙ্গী থাকে যে অত্যন্ত খারাপ কথাও ওর মুখে মিষ্টি শোনায়। চেহারা, কণ্ঠস্বর, কথা কোনদিক দিয়েই এ রতনের পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু চোখদুটো—চোখ দুটো ওর অপূর্ব—কি গভীর আর কি সরল—ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকালে পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

—আমি তোমাকে ভালবাসি—আমরা ঘর বাঁধবো—

ভালবাসা···ঘরবাঁধা···বিয়ে···সন্তান চিরদিন যা স্বপ্ন ছিল অনামিকার। আবার, সেই স্বপ্ন রূপ ধরে আসছে সামনে···মনটা নরম হয়ে গলে যেতে চায়···

কিন্তু, যা দেখে অনামিকা স্বপ্ন দেখেছে তাই যে মিথ্যে। মিথ্যে রায়বাড়ীর বৌদের মুখের হাসি—মিথ্যে কর্তাদের দরাজ গলায় ডাক—তার চেয়ে অনেক সত্য রাঁতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে···।

—না, ঘর আর আমি বাঁধবো না। কাট কাটা কথা অনামিকার।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

—রতনও তো এই কথা বলেছিল।

—আমি তোমাকে বিয়ে করব?

—রতনও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

—সে তো মিথ্যে। আমি তোমাকে সত্যি বিয়ে করবো। রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়ে—যেখানে মিথ্যে কথা বললে আমার জেল হয়ে যাবে।

—সত্য মিথ্যা? বিদ্রূপভরে বলে ওঠে অনামিকা ভালবাসা কথাটাই প্রচণ্ড এক মিথ্যা।

—তাহলে, তুমি কি সর্বনাশের পথে যাবে?

—সর্বনাশ! হেসে ওঠে অনামিকা, সর্বনাশ আবার কি? এরি জন্যই তো এত কাণ্ড। ঘর ছেড়ে এসেছি কি একজনের ঘোমটা-টানা বৌ হয়ে থাকতে নাকি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রতনের বন্ধু। সে চোখের দিকে তাকাতে পারে না অনামিকা। গম্ভীর ভাবে বলে, এবারে আপনি যান।

পরদিন রতন আসে, একদিন না আসতে পারার জন্য কৈফিয়ৎ দেয়—অনামিকার জন্য কি ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল তাও সবিস্তারে বলে—হাসিমুখে সব কথা শুনে যায় অনামিকা। বন্ধুর বাড়ীতে যাবার প্রস্তাবেও সহজে রাজী হয়ে যায়।

বড়লোক—যথেষ্ট বড়লোক রতনের কথিত সেই বন্ধু। রতন কিন্তু সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশে। পাশাপাশি বসে গল্প করে। বেয়ারা ট্রেতে করে কি যেন পানীয় এনে দেয়—ওরা আস্তে আস্তে চুমুক দেয়—

—দেখুন, অনামিকা হঠাৎ বলে ওঠে, আমাকে যে টাকা দেবেন তা আমার হাতে দেবেন—ওর হাতে দেবেন না ও বড় বেশী দালালী কেটে নেয়।

রতনের মুখ সাদা হয়ে যায়। হাত ছলকে লাল পানীয় পড়ে যায় নীচে। অনামিকা ওই কথা বললো। নিজের কাণে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না তার।

রতনের অবস্থা দেখে হাসি পায় অনামিকার। এ কথা তার মুখে আশা করা দূরে থাক স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি রতন।

—রতনবাবু হয়তো আমার কথা শুনে রাগ করছেন, কিন্তু কি করবো। কয়েকবার এমনি অভিজ্ঞতা হলো তো—তাই বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে।

অনামিকা দেখলো, গৃহকর্তা ঘৃণা ও বিরক্তি ভরা চোখে রতনের দিকে একবার তাকালো এক মিনিট ভ্রূকুঁচকে কি যেন ভাবলো—তারপর সরে বসলো একটু। এ বাড়ী থেকে রতনের পাতা তাহলে উঠলো।

সেই সুরু হলো এখনও তাই চলছে। কাহিনী এইবারে শেষ করে অনামিকা। আমি চৌরঙ্গীর আলো ঝলমল রাস্তা দিয়ে চলতে ভালবাসি। আলো থেকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাই, মনে হয়, নিজের জীবনেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই ভাবেই দিন চলে যায়। বেশ আছি, ভাল আছি, পেট ভরে খেতে পাচ্ছি—শোবার জন্য নরম বিছানা—খুবই ভাল আছি কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কিন্তু কোনদিন একটি লোকের কাছে দুবার যাই না পাছে আবার ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখি।

লক্ষ্মীকে তুমি চেন। মনে আছে ওকে একদিন ধরেছিলে রাস্তায়—পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়েছিলে তুমি ওকে। সেদিন তুমি কি ভেবেছিলে তা আমি জানি—ভেবেছিলে এরকম যার চেহারা তাকে আর যাই হোক ব্যাভিচারিণী নারী বলে অপমান করতে পারি না।

সার্থকনামা মেয়ে এই লক্ষ্মী। ওর সৌন্দর্যে দীপ্তি নেই আছে

অপরূপ কমনীয়তা। ক্ষীরোদসাগর মন্থন করে সত্যই যেন লক্ষ্মী উঠেছে। দুধে আলতা ওর গায়ের রং টানা টানা চোখ, কালো চুলে প্রকাণ্ড খোঁপা। একাধিক সন্তানের জননীর মত মোটা স্থূল থপথপে শরীর—সেই স্থূলতাও লাবণ্যমণ্ডিত—তাকে দেখে মন টানে কিন্তু চোখ টানে না—ভাল লাগে পেতে ইচ্ছে হয় না।

বৌবাজারের নোংরা রাস্তা দিয়েই প্রায় ও হাঁটে। ওর হাঁটার ভঙ্গীটা কুৎসিত। থপথপিয়ে ব্যাংএর মত চলে ও। বড় বড় ভাষাহীন চোখে এদিক ওদিকে তাকায়। পথচারী দু চারজন ওকে ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়ে যায়। তবুও রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলে দুলে চলে ও। নিজেকে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত করে না। কতদিন এমন হয়েছে যে লোকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। রীতিমতো লেগেছে ওর। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে তবু সরে যায়নি বা চলবার ভঙ্গী বদলায়নি।

যে কোনদিন সন্ধ্যা সাতটার পর তুমি বৌবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চমকে উঠবে। পাঁচমিশালী জনতার মধ্যে লক্ষ্মীকে চোখে পড়ে গেছে তোমার। দেখেছ তার চূর্ণকুন্তলে সিঁদুরের রেখা, কপালে জলজলে টিপ। স্বামী সৌভাগ্যবতী উত্তর তিরিশা। এক মধ্যবিত্ত ঘরের কল্যাণী গৃহবধূ। তুমি অবাক হবে ভাববে এই মহিলা কেন এভাবে লক্ষ্যহারার মত হাঁটছে। কৌতূহলী হয়ে ওর পেছনে পেছনে তুমি যেতে থাকবে। একটু পরেই তোমার মনে হবে লক্ষ্য একটা আছে—কিন্তু সেই লক্ষ্যটা অস্পষ্ট কি যে তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আরও এগিয়ে গেলে বুঝতে পারবে। ততক্ষণে ও তোমার দিকে তাকিয়েছে। খুব স্থূল একটা ইসারা। চট করে ঘুরে একটা সরু গলিতে ঢুকে গেল। তুমিও ওর পেছনে পেছনে গেলে। ছোট নোংরা একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকছে ও। কি করবে ভেবে তুমি হয়তো একটু ইতস্তত করছ—রেষ্টুরেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও একবার তোমার দিকে তাকাল। আবার সেই ইসারা।

এবারে, দ্বিধা না করে তুমি ঢুকে পড়বে! সামনেই ছোট পর্দায় ঢাকা কেবিন। সেই কেবিনে ময়লা টেবিলের দুপাশে দুজন মুখোমুখী বসবে। বয় এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে যাবে। শুধু দু কাপ চা।

দু'কাপ চা আনা এবং খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই প্রয়োজনীয় কথা শেষ হয়ে যাবে। দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে একটা রিক্সা ডাকবে তুমি। তুমি হয়তো সঙ্কোচে কিংবা মনে না থাকার দরুণ ডাকতে চাইবে না—ও নিজেই তোমাকে বলবে—একটা রিক্সা ডাকুন।

রিক্সাতে পাশাপাশি ঘেষাঘেঁষি বসে তোমার মনে হবে ওর দেহের পেশীগুলি যেন বড় বেশী শিথিল।

বাড়ী ওর কাছেই—পৌঁছতে দেরী হবে না। নোংরা আবর্জনাময় গলি এবং ততোধিক নোংরা সিঁড়ি দিয়ে তুমি ওপরে উঠে যাবে। ব্লাউজের সেফটিপিনে লাগান চাবি দিয়ে দরজা খুলবে ও।

বেশ বড় ঘর। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। একপাশে খাট পাতা—ধবধবে বিছানা। কোণে একটা ছোট চৌকীর ওপর কাঁসার বাসন—সোণার মত ঝকঝক করছে। একটা জালের আলমারীর মাথায় চায়ের সরঞ্জাম গোছানো। ওপাশে একটি ছোট খাট—তাতে বছর চারেকের একটি ছেলে আর বছর দুয়েকের একটি মেয়ে ঘুমুচ্ছে।

ঘরের পরিচ্ছন্নতায় তোমার মন তৃপ্ত হবে। এতক্ষণ রিক্সাতে
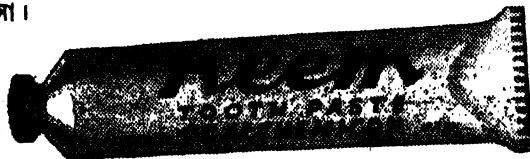
এসে যে বিরক্তিটুকু লাগছিল তা কেটে যাবে। পরক্ষণেই কোণের দিকের ছেলেদুটিকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বোকার মত বলবে, তোমার ? ও হেসে উত্তর দেবে, হ্যাঁ।

তুমি অবাক হয়ে ভাববে,—এই ঘরে—এই ছেলেমেয়েদের সামনেই ···কি। তার মধ্যে ছেলেটি তো বেশ বড়।

ভাবতে ভাবতেই তুমি জুতো খুলেছ—লক্ষ্মী সামনে পাপোষ এগিয়ে দিয়েছে তাতে পা মুছে বিছানার বসেছে তুমি।

লক্ষ্মী তোমাকে এক গ্লাস জলে এনে দিল। জলটা দেখেই মনে হলো যে তেষ্টা পেয়েছিল। খেয়ে দেখলে জল নয় সরবৎ।

—ভারী চমৎকার সরবৎ তো। তুমি না বলে পারলে না।

—হ্যাঁ। আমি তৈরী করে রেখে গিয়েছিলাম। উত্তর দেয় ও।

চমকে উঠলে তুমি। তাল কেটে গেলে যেমনি চমকে ওঠে শ্রোতারা। এ সরবৎ বিশেষভাবে তোমার জন্য তৈরী হয়নি। এ শয্যা বিশেষভাবে তোমারই বসবার জন্য পরিষ্কৃত হয় নি। দৈবাৎই তুমি এসে গেছ।

মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাকিয়ে দেখ লক্ষ্মী হাতপাখা নিয়ে তোমাকে হাওয়া করছে। ওকি হচ্ছে ? বাধা দাও তুমি।

—গরম লাগছে তো আপনার, আমাদের ঘরে ত পাখা নেই। লক্ষ্মী উত্তর দেয়—কেন আপনার ভালো লাগছে না ? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে সে।

তুমি বলতে যাচ্ছিলে, ভালো তো লাগছে, কিন্তু তোমার কষ্ট হচ্ছে যে···কিন্তু তুমি চুপ করে যাও। ভয় হয়, লক্ষ্মী হয়তো উত্তরে বলবে, আমি না, কষ্ট কিসের ? আমি তো রোজই করি।

এ উত্তরে আবহাওয়ার সুর কেটে যাবে চেষ্টা করেও আর সে সুর তুমি আনতে পারবে না।

লক্ষ্মীর দুঃখের কাহিনী তুমি শুনলে। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের বধূ সে। শ্বশুরের জীবিত কালে নিজেদের পাকাবাড়ীতেই থাকতো ওরা। স্বামী ব্যবসা করতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেল। স্বামী কোথাও কাজ খুঁজে পান নি। সবই অদৃষ্ট। তাই বাধ্য হয়ে লক্ষ্মীকে আজ এই কাজ করতে হচ্ছে।

বলতে বলতে লক্ষ্মীর চোখে জল এসে যায়। রুদ্ধস্বরে বলে, আমার ইচ্ছে হয় যদি একটি মাত্র লোক পেতাম যিনি সারাজীবন ভরণপোষণ করতে পারেন। রাস্তায় বেরুতে এত খারাপ লাগে।

তুমি তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর, লক্ষ্মীকে আজীবন সাহায্য করবে। অবশ্য তোমার ক্ষমতাও বেশী নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব—এর সাহায্য তুমি করতে যদি না···

হ্যাঁ, যদি না···

যাক, সে কথা পরে বলবো।

আরও অনেক কথা হয় তোমার লক্ষ্মীর সঙ্গে। ও তোমাকে একদিন রেঁধে খাওয়াবার ইচ্ছে প্রকাশ করে—খুব ভালো লাগে তোমার এক ঘণ্টাতেই পরম আত্মীয়তা গড়ে ওঠে ওর সঙ্গে।

রাত হয়—তুমি বিদায় নিয়ে চলে আস। পরদিন যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ও তোমাকে সাতটার আগে যেতে বারণ করে।

নির্দিষ্ট সময়ে পরদিন তুমি যাও। আবার, সেই সরবত আর হাতপাখা। নানারকম গল্প হয়। মনে হয় গল্পটাই যেন মুখ্য—যে উদ্দেশ্যে তোমরা মিলিত হয়েছিলে তা নিতান্তই গৌণ। সেদিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে যায়। শুধু একটা কথা তুমি খেয়াল কর না—করলে মনে খটকা লাগতো—তুমি যখন প্রশ্ন করেছিলে, তোমাকে এ লাইনে প্রথম কে নিয়ে এল—লক্ষ্মী উত্তর দেয় নি। মুখটা ওর কালো হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করলে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতো, সব প্রশ্নেরই যে এত হাসিখুসী উত্তর দিচ্ছে সে হঠাৎ এই সাধারণ কথায় মুখ ফিরিয়ে নেয় কেন ?

এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়। তারপর, একদিন যেদিন তোমাকে মাংস রেঁধে খাওয়াচ্ছে লক্ষ্মী (অবশ্য মাংসটা তুমিই কিনে দিয়েছিলে) মেজেয় আসন পেতে বসে তুমি আরাম করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছ—দরজা খুলে কেউ ঘরে ঢুকলো। নিতান্ত সাধারণ একটি লোক। কালো রং, বেশ ভালো স্বাস্থ্য। ঢুকতেই তুমি বুঝতে পার ও লক্ষ্মীর স্বামী। লোকটি তোমার দিকে একবার তাকায়—রাগ করে নয় বেশ সহৃদয় প্রসন্নতার সঙ্গেই তাকায়। তবু তুমি কি রকম অস্বস্তি বোধ কর। লক্ষ্মী হেসে বলে, আমার স্বামী। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, ইনি বিজয়বাবু।

বিজয় হ্যাঁ, বিজয় নামই তুমি বলেছিলে লক্ষ্মীকে।

লক্ষ্মীর স্বামী কোন কথা না বলে আর একবার তোমার দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টি। তোমার আর খেতে ইচ্ছে হয় না—খাবার পাতে পড়ে থাকে—মনে হয় উঠে পড়তে পারলে তুমি বাঁচ।

লক্ষ্মী তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কথা বলে যায়। তুমি মাংস খেতে চেয়েছিলে তাই—খেয়ে তুমি কি পরিমাণ ভাল বলেছ—তুমি কত ভাল লোক ইত্যাদি···।

লক্ষ্মীর স্বামী এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে থাকে—একটি কথাও বলে না। তুমি দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে পড়। বিদায় নিয়ে তুমি যখন যেতে উদ্যত হয়েছ তখন হঠাৎ ও মাথা তুলে বলে, আর একটু বসুন না। এত তারা কিসের ?

কথাটা কিছুই নয়। কিন্তু···কি অদ্ভুত টান আর বিকৃত সুর—তুমি চমকে উঠবে—কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাবে তোমার—অকারণে তোতলামি করে বলবে, না, না' এই তো অনেক রাত হয়ে গেছে।

একবার চকিতে ওর দিকে তাকাবে দেখবে ও তোমার দিকেই চেয়ে আছে—সেই অদ্ভুত চাউনি, চোখ ফিরিয়ে নেবে তুমি—হাতপা কেমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, বুকটা উঠছে শিরশিরিয়ে—

লক্ষ্মীর দিকে চাইবে না তবু ওর মুখটা চোখে পড়বে—শুকনো ফ্যাকাসে মুখ নীচু করে বসে আছে ও—ভীষণ কিছু একটার যেন প্রতীক্ষা করছে—

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে চাইবে তুমি—ভুলে জুতো উল্টো পরবে—আবার জুতো ঠিক করে পরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রতিজ্ঞা করবে আর কখনও এখানে আসবে না···।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পাবে চাপা তীক্ষ্ণ একটি আর্তনাদ। তবে কি লক্ষ্মীর স্বামী ওকে মারছে। কিন্তু আঘাতের কোন শব্দ তুমি পাও নি—এমন কি একটা ভর্ৎসনাও নয়—

রাস্তায় বেরুতে গিয়েই তুমি আবার একটা আর্তনাদ শুনবে—এবারে আরও তীক্ষ্ণ, আরও করুণ ও অসহায়। মৌন পৃথিবী যেন অত্যাচারের নির্মম পীড়নে আর্তনাদ করে উঠলো প্রতিবেশীদের জানালাগুলি খুলে গেছে—কিন্তু কেউ এগিয়ে যায় না—

তুমিও ফিরে যাবে না। এমন কি একবার মুখ তুলেও তাকাবে না লক্ষ্মীর জানালার দিকে। মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে দ্রুত পায়ে চলে যাবে তুমি, মনে মনে একবার বলবে, ব্রুট।

সেরাত্রে ভালো ঘুম হবে না তোমার। খেতে ভালো লাগবে না। তোমার স্ত্রী কিংবা মা ব্যগ্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে তোমার অক্ষুধা সম্বন্ধে। তুমি উত্তর দেবে না। আর কোন কারণে নয়—কথা বলতে ভাল লাগবে না—তাই।

সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার থেকে থেকে তোমার কানে বাজবে। অসহায় চীৎকার তুমি তো অনেক শুনেছ—কিন্তু এই যে চীৎকার তোমারি মত এক পুরুষের হাতে নারীর—যে পুরুষ স্ত্রীর দেহবিক্রীত অর্থে শুধু মাত্র ক্ষুধা মেটায়, লজ্জা নিবারণ করে না নেশা করে—সেই পুরুষের পশুবলের হাতে একটি নারীর নিপীড়িত আর্তনাদ।

অনেকদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীকে এক তীক্ষ্ণ বেদনাবোধের সঙ্গে মনে থাকবে তোমার। যতটা সম্ভব বৌবাজারের রাস্তা পরিহার করে চলবে। লক্ষ্মীর স্মৃতি রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে এসে নিদ্রাকে উৎপীড়িত করে তুলবে।

তারপর ধীরে ধীরে সহনীয় হয়ে উঠবে বেদনাবোধ। তুমি বন্ধুদের কাছে লক্ষ্মীর গল্প বলবে। সমস্বরে লক্ষ্মীর স্বামীকে নিন্দে করবে—বৌবাজারের দিকে অকারণেই বারবার যাবে—

এসব দিনও চলে যাবে। তুমি একেবারেই ভুলে যাবে লক্ষ্মীকে। শুধু একটা ক্ষীণ স্মৃতি কিংবা তাও না···।

তুমি যদি লেখক হও তবে লক্ষ্মীকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে—তাকে তুলে দেবে পতিব্রতার চরম আদর্শে। তুলনা করবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর সঙ্গে। গল্পচ্ছলে বলবে সেই নারীর কাহিনী, যে নিজে দাসীবৃত্তি করে স্বামীর বারবধূগমনের অভিলাস তৃপ্ত করেছিল। স্বামীকে আঁকবে নীচ স্বার্থপর রূপে। নিজেকেও রেহাই দেবে। তোমার কাপুরুষের মত পালিয়ে আসার ছবি হুবহু অঙ্কিত করবে।

কিন্তু তুমি যদি সেইদিন তখনই না চলে আসতে, যদি লক্ষ্মীদের বাড়ীর উল্টোদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া আলোর গ্যাসপোষ্টটার পেছনে দাঁড়াতে—তবে···

হ্যাঁ, তবে অনেক কিছু না ঘটলেও কিছু একটা ঘটতো। তখন তুমি গল্প লিখলে তোমার গল্প সহজসরল গতিতে ওপরে উঠে নীচে নেমে আসতো না—আঁকাবাঁকা হতো তার রেখা—ক্রশ চিহ্ন আর প্রশ্নবোধক অব্যয়।

তুমি শুনতে, খানিকটা পরে চীৎকার থেমে গেল। শুধু একটা চাপা গোঙানী। না, এ তোমার মনের ভুল। গোঙানীর আর্তনাদ এতদূর থেকে শোনা যায় না।

তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে সিগারেট ধরাতেও ভুলে যাবে। কিছুক্ষণ পর সচকিত হয়ে তুমি যখন সিগারেট বার করতে যাবে তখনই দেখবে···।

হ্যাঁ, তখনই দেখবে লক্ষ্মীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে একটি লোক মাথা নীচু—ঘাড়টা ভুইয়ে পড়েছে বুকের উপর—পদক্ষেপ অসম—

ভালোভাবে তাকিয়ে দেখবে, লোকটি লক্ষ্মীর স্বামী।

কোনদিকে তাকবে না ও। তোমার পাশ দিয়ে যাবে তবু দেখতে পাবে না তোমাকে। মূর্তিমান হতাশা ও অব্যক্ত যন্ত্রণার মত চলে যাবে ও।

এতক্ষণ তোমার রাগ হচ্ছিল—ভাবছিলে ওকে সামনে পেলে টুঁটি টিপে ধরবে—কিন্তু, এখন ওকে দেখে অন্যরকম একটা মনোভাব হয়—রাগটা যে কোথায় তলিয়ে যায় তুমি বুঝতে পার না—

একটুখানি অপেক্ষা করে তুমি ওর পিছুপিছু যেতে থাক।

খানিকটা দূরে একটা ছোট পার্ক। সেখানে, সবচেয়ে অন্ধকার কোণে বসে ও। তুমি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।

আকাশে একাদশীর চাঁদ ছিল। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছিল সব কিছু। হঠাৎ মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দেয়। অন্ধকার কোণ আরও অন্ধকার হয়ে ওঠে। সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে তোমরা যেমনি ছিলে তেমনি দুজনে স্থির হয়ে থাক।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ মেঘমুক্ত হয়। আর, ঠিক তখনই ও মুখ তুলে তাকায়। চাঁদের আলোকে তুমি পরিষ্কার দেখতে পাবে ওর চোখে জল।

জল! তুমি চমকে তাকাবে। চোখের জলের কথা তুমি ভাবতেই পারনি।

এই নীচ, নিষ্ঠুর লোকটির তবে হৃদয় আছে? মেঘে চাঁদ ঢেকে যায়। আবার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে তুমি ধীরে ধীরে ওর পাশে গিয়ে বসবে। ওর গায়ে নোংরা ঘামের দুর্গন্ধ। মুখে দেশী মদের তীব্র গন্ধ! তবু তুমি ওর গা ঘেঁসে বস। এমনভাবে বস যেন তোমার দেহ ওকে স্পর্শ করে।

শুধু স্পর্শ করে থেক ওকে—প্রশ্ন করো না, বাধা দিও না। জানতে পারবে এক আশ্চর্য কাহিনী।

কলকাতার এক বড়লোকের বাড়ী। দু' পুরুষে ধনী। তাই আভিজাত্য নেই, অভিমান আছে। কমলার কমল পদ্ম বাধা পড়েনি, তাঁর পেঁচাটাই মুখ কালো করে চীৎকারে শুধু বাড়ী নয় পাড়াটাই মাথায় করে রাখে।

সেই বাড়ীরই তৃতীয় পুরুষ এই সীতাংশু দত্ত। এইটুকু বয়স থেকেই দেখে আসছে ওদের বাড়ীর টাকার ঝনঝনানি বড্ড বেশী, মায়ের অলঙ্কার আর অলঙ্কারের গল্প দুই-ই সমান চকচকে।

ওর বাবা মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করেন না। যথেষ্ট মাইনে দেন চাকরকে তবু একটি লোকও টেঁকে না। যে দু'একটি টিঁকে যায় তারা মানুষ নয় পশু—পশুরও অধম। ভারবাহী পশুর মতই নীরবে কাজ করে তারা, তেমনি ধরনের স্বভাব, অত্যাচারে এক বার আর্তনাদ করে উঠে—কিন্তু ভেঙে পড়ে না কিংবা পালিয়ে যায় না।

এমনি চাকরের কাছে মানুষ হয়েছিল সীতাংশু। মানুষ হয়েছিল বলা ভুল—বলা উচিত বড় হয়েছিল। যে লোকটি ওকে সারাদিন রক্ষণাবেক্ষণ করতো তাকে ও করতো ঘৃণা। তবু তারি হাতে ওকে খেতে হতো, সে ওকে চান করিয়ে পোষাক পরিয়ে দিত, রাত্রে ঘুম পাড়াত। মা, বাবার সঙ্গে শুতো না সীতাংশু আলাদা ঘরে থাকতো চাকরটা ঘুমাতো মেজেতে।

মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে জানালায় দাঁড়িয়ে সীতাংশু দেখতো, বাবাকে লোকজনেরা ধরে নামাচ্ছে গাড়ী থেকে, বাবা গালাগালি দিচ্ছেন উচ্চকণ্ঠে, কখনও বা বমি করছেন। ও অবাক হয়ে ভাবতো, বাবা এত রাতে কোথা থেকে আসেন! শিশু মন খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠতো—চাকরটাকে প্রশ্নও করেছিল একদিন। তাতে সে এমনভাবে চমকে উঠে জিভ কেটেছিল যে, ওর কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল।

চাকরদের কাছে থাকবার দরুন খুব অল্প বয়সেই ও পান বিড়ি খেতে শিখেছিল। ক্লাশ ফাইবে পড়বার সময় বন্ধুদের নিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত। ক্লাস এইটে উঠে প্রকাশ্যেই।

পড়াশুনা হলো না ওর। ঐ ক্লাস এইট পর্যন্তই সীমা। কিন্তু, তা নিয়ে মনে কোন দুঃখ ছিল না সীতাংশু কিংবা ওর বাবা-মায়ের।

মা তো ওকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন—বাবার সঙ্গে দেখাই হতো না—কাজেই বুঝতে পারতো না বাবা ওকে কি রকম ভালবাসতেন।

বিকেলে সেজে গুজে বাবা গাড়ীতে বেরিয়ে যাচ্ছেন, বাবার এই চেহারাই তার মনে আছে। আর মনে আছে, তখন ওর ভীষণ ইচ্ছে হতো জানতে যে বাবা কোথায় যান। বিকেলের সুসজ্জিত বহির্গমন এবং রাত্রের বিপর্যস্ত প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য না করতে পেরে অনেকদিন তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে।

অবশ্য এ রহস্যের সমাধান করতে তার দেরী হয় নি এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে সে নিজেই ঐ পথের পথিক হয়েছে। অনেকদিন এমন ভয় হয়েছে বাবা ছেলেতে বোধহয় দেখা হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে ওর বিয়ে হয়েছে। লক্ষ্মী অপরূপ রূপসী (সীতাংশুর বাবা মা-লক্ষ্মীকে খুব সুন্দরী মনে করতেন) ও একগাদা গয়না ও যৌতুক নিয়ে এল। লক্ষ্মী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। নিজের সাধ্যের বাইরে খরচ করে ওর বিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাবা।

প্রথম সন্তান, কাজেই খুব আদুরে ছিল। বিশেষত ঠাকুমা'র। লক্ষ্মীর ছোটরা সবাই ছেলে কাজেই ওর বাবার মনে বিশেষ চিন্তা ছিল না এরকম একটা ভাল সম্বন্ধ তিনি যেভাবে পারলেন ধার করেও লক্ষ্মীর বিয়ে দিলেন।

ফুলশয্যার রাতেই প্রথম লক্ষ্মীকে দেখল সীতাংশু। বিয়েরদিন ও ও লক্ষ্মীকে দেখে-ই নি। বিয়ে হয়েছিল অনেক রাতে। নেশার ঘুমে জড়ানো ছিল সীতাংশুর চোখ। কোনরকমে বিয়ে শেষ হতেই বাসরঘরে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষ্মীকে দেখে ভালই লাগল। দুধে আলতা গোলা র তাতে আলতার ভাগই বেশী, গাল দুটো টুকটুকে লাল, টানা টানা প্রতিমার মত দুটি চোখ। ওকে সাজিয়ে দিয়েছিলও প্রতিমার মত করে মাথায় সোনার মুকুট, কানে বিরাট ঝাপটা, গলায় অনেকগুলি অনেক রকমের হার, হাতে কব্জি থেকে কনুই অব্দি চুড়ি, ব্রেসলেট, বাজুতাসা, তাবিজ, আর্মলেট আরও কতকি।

তখন ও এত থপথপে মোটা ছিল না। অল্প বয়সে ওর সেই মেদ ওর দেহে এনে দিয়েছিল একটা পেলব স্নিগ্ধতা। জহুরীর চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সীতাংশু। যেমনি ভাবে পাড়ায় গিয়ে মন স্থির করবার আগে দেখে। তুলনাও করল মনে মনে। সে যে দেখেছে তার অনেকের তুলনায় নিষ্প্রভ। যাক্, তবু·····

এই সময় লক্ষ্মী মুখ তুলে তাকাল। আর·····

এই পর্যন্ত বলে সীতাংশু চুপ করে থাকবে অনেকক্ষণ।

তুমিও কোন কথা বল না। হঠাৎ তোমার দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করবে, আচ্ছা, আপনি তো ওকে দেখেছেন বলুন তো ঠিক বলছি কিনা?

নীরব থেক তুমি।

একটু পরে ও নিজেই আবার বলবে, ও যখন মুখ উঁচু করে তাকায় তখন ওর মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে আর সেই অসহায় ভাব দেখলে, হাঁ সেই অসহায় ভাব দেখলে মনে মায়া হয় না, করুণা জাগে না, বরঞ্চ একটা বিরক্তি মিশ্রিত ঘৃণা—ইংরাজিতে যাকে বলে Loathing তাই জেগে ওঠে। ওর মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয় না—দয়া, মায়া, মমতা কিছুই বোধ হয় না, শুধু মনে হয় ও সরে যাক—সরে যাক আমার সামনে থেকে—মনে হয়, পৃথিবী থেকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম ঐ মুখটা·····

তখনও নীরব থাকবে তুমি। কিন্তু, মনে মনে সায় দেবে ওর কথার।

দুহাতে মুখ ঢেকে ও কিছুক্ষণ বসে থাকবে। তারপর, নিজেই আবার তুলে নেবে কথার সূত্রে।

[ক্রমশঃ।

একটি আধুনিক আইসল্যাণ্ডীয় কবিতা

(সিগুরদুর মাগনুসোন)

তোমার স্পর্শ
বেদনাবিদ্ধ করেছিল আমার অন্তর,
কারণ তা উৎসারিত হয়েছিল এমন এক হৃদয় থেকে
যার প্রেম ছিলনা অবারিত।
আমার অঙ্গুলিশীর্ষ একটি সত্যের উপর দিয়ে ঘুরে এল
যাকে দেখার সাহস আমায় হয়নি,
এবং আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, দুটি নির্জন শিশু—
শহরের ছায়ায়,
হাতের অঞ্জলিতে এক নিষ্প্রাণ সত্যকে ধারণ করে।

তারপর আমরা সেই সত্যের কাছ থেকে
পালিয়ে গেলাম
এবং রাত্রির অন্ধকারে ধুয়ে ফেললাম
আমাদের হাত।
কিন্তু দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে
যে শোণিত স্রোত,
সে প্রাচীন ছায়াগুলোকে আহ্বান করে আনে সত্যের সঙ্গে
আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখবার জন্যে।

অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রশান্ত চৌধুরী

২

এ অঞ্চলের অনেকেই পথ হারিয়ে এসে পড়ে ঐসব নরককুণ্ডে। সমস্ত রাতের অসংযম আর অত্যাচারের পর সকালে উঠে ওদের ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে, কান্না পায়। প্রতিজ্ঞা করে,—এই শেষ, আর নয়, এবার ভাল হবে। পুনর্বার সংসারক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দান চালে ওরা। দৃষ্টি ওদের থাকে উর্দ্ধমুখেই। গোলোকের দিকে লক্ষ্য রেখেই চালে কড়ি। কিন্তু কখন এক সময় আবার শৌণ্ডিকালয় মারফৎ পুনঃ নরককুণ্ডে পতন হয় ওদের।

শীতলামন্দিরের ঐ শ্যামাপদ পুজারীও রাতের বেলা প্রায়ই এসে পড়ে ঐ নরককুণ্ডের সোহাগী দাসীর ঘরে।

ডালপটির পাশে ঐ যে পাঁপড় তৈরীর কারখানা, তার পাশে পবন দাসের তেলেভাজার দোকান, সেই তেলেভাজার দোকানের ওপরেই সোহাগী দাসীর টিনের চালার ঘর।

একটা গামছা কোমরে, আরেকটা গামছা বুকে জড়িয়ে পবন দাসের তেলেভাজার দোকানের উনুনের ধারে বসে মুড়ি ভাজে যে বুড়ি, সেই হল সোহাগীর মা। সোহাগী যখন ছোট ছিল, সোহাগীর মা তখন থাকত দোতলায়। বুড়ি হয়ে সে নেমেছে মুড়ির দোকানে, সোহাগী উঠেছে ওপরে। একদিন সোহাগীকেও নামতে হবে নিচে, ভাজতে হবে মুড়ি; সোহাগীর মেয়েটা একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে।

সোহাগীর ঘরের দেয়ালে কালীয়দমনের পট আছে একটা। গঙ্গাচান সেরে ভিজে কাপড়ে পটের সামনে দাঁড়িয়ে সোহাগী জোড় হাতে বলে,—ঠাকুর, মেয়ে বড় হয়ে এই দোতলার ঘরে উঠবার আগে যেন মিত্যু হয় আমার। নিচে নেমে মুড়ি ভাজবার আগে যেন আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেয় শ্যামাঠাকুর।

শ্যামাপদ বলে, কেন রে সোহাগী? মরতে চাস কেন? বুড়ি হবি, মেয়ে বড় হবে, তোর সেবা করবে, যত্ন করবে, এ তো সুখের কথা।

সে কথা শুনে নিজের একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠার দিনগুলোর ছবি চোখের সামনে এমনি ভেসে ওঠে সোহাগীর। সোহাগী শিউরে ওঠে।......

...ফ্রক ছেড়ে যেদিন প্রথম শাড়ি ধরলে সোহাগী,—মা দিল কানে মন্তর! কী কুৎসিত তার ভাষা, কী জঘন্য তার অর্থ!......

...তারপর সুরু হল ট্রেনিং। কত লাথি ঝাঁটা কিল চড় খেয়ে শায়েস্তা হতে হয়েছিল সেদিন সোহাগীকে। কত আতঙ্কে কত রাত জাগতে হয়েছে তাকে। কত কান্নায় কত রোমশ কর্কশ পা ভেজাতে হয়েছে তাকে ঐ একটু একটু করে বেড়ে ওঠার বয়ঃসন্ধির দিনগুলোতে।...

চাঁপা নাম্নী নিজের ঐ একরত্তি সরল অনভিজ্ঞ মেয়েটা যেদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবে, সোহাগীকেও তো সেদিন তার মায়ের মতই কুৎসিত মন্ত্র দিতে হবে মেয়ের কানে!...শুনে সেদিন শিউরে উঠবে চাঁপা; পালাতে চাইবে, কাঁদবে। তখন মারতে হবে সোহাগীকে। দরজা বন্ধ করে ঠ্যাঙাতে হবে মেয়েকে, কাঁদাতে হবে মেয়েকে। কাঁদিয়ে আর ঠেঙিয়ে, পুড়িয়ে আর পিটিয়ে কাঁচা বাঁশ থেকে পাকা লাঠি বানাতে হবে। তারপরে একদিন দিনক্ষণ দেখে মেয়েকে দোতলার ঘরে তুলে দিয়ে নামতে হবে নিচে।...

তার আগে মরতে চায় সোহাগী; মরে বাঁচতে চায়। আর, সেইসঙ্গে প্রাণপণে চায়, মেয়েটাও মরুক।

এই তো সেদিন ওই ওধারের আড্ডিবাবুদের বাড়ির দশ বছরের মোটাসোটা সুন্দর মেয়েটা কলেরায় মরে গেল। রাস্তার খাবার খায় না, আসল ঘিয়ের ফুলকো লুচি খায়, টাটকা মাছের ঝোল খায়, বাড়ির গোরুর দুধ খায়; তবু তার কলেরা হল। আর রাস্তার ধূলোবালি কুড়িয়ে খেয়েও সোহাগীর মেয়েটার কিছু হয় না কেন?

একদিন সোহাগীর সঙ্গে গঙ্গাবঘাটে চান করতে এসে ডুবে যাচ্ছিল মেয়েটা। মাঝিরা দেখতে পেয়ে টেনে তুললে। সোহাগীর মা বললে সোহাগীই ঠেলে দিয়েছিল চাঁপাকে গভীর জলের দিকে। সত্যি নয় সেকথা। কিন্তু মেয়েটা সেই থেকে সোহাগীকে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। দিদিমার কাছে মুড়ির দোকানেই থাকতে চায় বেশিক্ষণ।

ওর দিদিমা বলেছে, গলার বিছে হার বেচে চাঁপাকে গান শেখাবে, নাচ শেখাবে। তখন ওর দৌলতে একদিন ওদের দোতলার ঘরের

দেওয়ালে ডিস্টেম্পারের রঙে ফুল-লতাপাতা আঁকা হবে, মেঝেতে চকচকে লাল সিমেন্ট হবে, আঙুরপাতার নক্সাতোলা বড় বোম্বাই খাট হবে।

সেদিন আসবার আগে সোহাগী মরতে চায়। মরে বাঁচতে চায়।

শ্যামাপদ বলে—ভাবছিস কেন তুই সোহাগী, তোর মেয়ে পড়াশুনো করে বড় হয়ে একদিন নার্স হবে। লোকের সেবা করবে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। সৎপথে থেকে তোকে খাওয়াবে, তীর্থধর্ম করাবে।

ম্লান হেসে সোহাগী বলে,—সে তো স্বপ্ন গো ঠাকুর।

শ্যামাপদ বলে,—স্বপ্ন নয় রে, তুই দেখে নিস।

সোহাগীরা আর সব দেবতাকে তেমন খাতির করুক আর নাই করুক, শেতলা ঠাকরুণের প্রতি ওদের অগাধ ভক্তি। ঠাকরুণ রাগ করলেই রক্ষে নেই যে আর! মুখের চামড়ায় এইসান্ শিল ফুটোনো ফুটে দেবেন যে, ব্যবসায় লালবাত্তি জ্বালতে হবে!

শ্যামাপদর মন্দিরে তাই ওদের হামেশাই আনাগোনা।

পুজোয়-পাওয়া তেরটা মজা কাঁঠালের কোয়া একা খেয়ে যেদিন শ্যামাপদর সেই খিটখিটে লোভী বৌটা মলো, সেদিন কি জানি কি ভেবে সোহাগী সান্ত্বনা দিয়েছিল শ্যামাপদকে। বলেছিল,—তুমি শাস্ত্র-জানা বামুন-পণ্ডিত মানুষ, তোমাকে আর আমি নতুন কথা কী শোনাব ঠাকুর। মানুষ এলে মানুষ তো যাবেই একদিন। এর তো আর করবার নেই কারুর কিছু। সিঁদূর নিয়ে নোয়া নিয়ে ড্যাঙডেঙিয়ে বৌ সগ্গে গেল তোমার কোলে মাথা রেখে, এ তো সুখের কথা। কাঁদছ কেন ঠাকুর?

শ্যামাপদ সেদিন কান্না থামিয়ে চেয়েছিল কিছুক্ষণ সোহাগীর মুখের পানে।

তারপর অনেক রাতে বৌকে পুড়িয়ে এসে শ্যামাপদ যখন অন্ধকারে একলা চুপচাপ বসেছিল মন্দিরের পিছন দিকের রোয়াকে,—ঐ সোহাগী এসে বলেছিল,—বাতাসা ভিজোনো জল এনেছি একটু। আমার হাতের জল খাবে?

জল খেয়েছিল শ্যামাপদ।

তারপর থেকে গঙ্গাস্নানের ফিরতি পথে রোজই একবার করে আসতে লাগল সোহাগী। শ্যামাপদর সামান্য কটা বাসন মেজে দিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে যেতে লাগল! ক্রমে ক্রমে দুপুরে কখন কোন্ ফাঁকে এসে শ্যামাপদর গামছা-গেঞ্জিটায় সাবান দিয়ে যায়, শ্যামাপদর উড়ানিটায় রিপু করে রাখে। একদিন শ্যামাপদর ডালের তলা ধরে যাচ্ছিল, সোহাগী উপায় না দেখে নিজের আঁচলের কাপড় দিয়ে ধরে উনুন থেকে নামিয়ে দিলে হাঁড়ি।

এমনি করে একটু একটু করে পায়ে পায়ে দিনে দিনে কাছে এগিয়ে এল সোহাগী। একটু একটু করে কেমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। তারপর থেকে—

অনেক রাতে,—যখন সোহাগীদের পাড়াটা একেবারে নিঝঝুম হয়ে যায়, কুকুরগুলো ঝিমিয়ে পড়ে, চাটের দোকানটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়,—তখন চুপিসাড়ে শ্যামাপদ আসে সোহাগীর ঘরে। তখন আর থাকে না কেউ। শেষ লোকটার ফেলে যাওয়া সিগারেটের খালি প্যাকেট কিংবা দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটিকে পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলে দিয়েছে তখন সোহাগী। তার জীবিকার এতটুকু চিহ্ন থাকতে দেয়নি কোথাও। ঘুমন্ত মেয়েটাকে দিদিমার কাছ থেকে তুলে এনেছে নিজের ঘরে। শুইয়েছে বিছানায়।

শ্যামাপদ আসে। বসে। সোহাগী ভাত বাড়ে। নিজে খায়। শ্যামাপদকে খাওয়ায়। একটুখানি জিরে আর গোলমরিচ বাঁটা দিয়ে আলু-কাঁচকলার হাল্কা ঝোল রেঁধে রাখে সোহাগী শ্যামাপদর জন্যে। কোনদিন বা চারা পোনার টুকরোও থাকে তাতে এক-আধটা। তেল-লঙ্কা-মশলা শ্যামাপদর পেটে সয় না।

শ্যামাপদ রাত্রে আসে, ভোরবেলা ফিরে যায়। ফিরে সোজা গিয়ে ডুব দেয় গঙ্গার ঘাটে। ডুব দিতে দিতে ভাবে, শেষ কোথায় এই জীবনটার? আবক্ষ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে শ্যামাপদ তাকায় চারিদিকে। দু-পাশের দুই শ্মশানঘাট থেকে চিতার ধোঁয়া ওঠে আকাশে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে শ্যামাপদ হয়তো কোথাও খুঁজে পায় তার জিজ্ঞাসার উত্তর। ভিজে গামছায় পিঠ ঘষতে ঘষতে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে,—আছে, আছে, শেষ আছে।

নিজের বাবাকে মনে করবার চেষ্টা করলেই শ্যামাপদর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মূর্তিমান একটা লোকের ছবি! মানুষটার কেশলেশহীন তেল-চকচকে ছোট্ট মাথা, কোটরগত জ্বলজ্বলে চোখ, নস্যের ছোপ-লাগা লম্বা বাঁকা নাক, পাৎলা চোকো চোয়াল, গাঁটওলা লম্বা গলা, রোমহীন সরু এতটুকু বুক; সবুজ শিরার আঁকিবুকি কাটা টাইট করে ফোলানো গোল পেট, লিকলিকে বেতের মতন হাতের আঙুল,—সবকিছুর ভিতর দিয়েই ফুটে বের হত উদগ্র লালসা!

জ্যালজেলে লালপাড় দেনো-ধুতির ভেতর দিয়ে বাবার পায়ের অস্বাভাবিক বড় বড় হাঁটু দুটো দেখা যেত পরিষ্কার। সেখানকার চামড়া কি বিশ্রী কোঁচকানো! রাতের বেলা তেল মালিশ করতে করতে মায়ের হাতটা যখনই বাবার হাঁটুর কাছে আসত, শ্যামাপদর গা শিরশির করত কেমন।

যজমান-বাড়ির কাটা ফলগুলোকে কী আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় নিঃশেষ করে ফেলত বাবা! আর তখন, বাবার মুখ চোখ সব কেমন যেন দানবের মতন হিংস্র হয়ে উঠত যেন। মা কতদিন শ্যামাপদকে বলেছে,—তুইও যা না। এইবেলা একসঙ্গে বসে খেয়ে নে ফল। নৈলে পরে আর থাকবে না এক টুকরোও। যায়নি শ্যামাপদ। ওর ওপরের এবং নিচের আর নটা ভাই বাপের চারপাশে গোল হয়ে বসে ভাগ বসাত কাটা ফলে। বালক শ্যামাপদ তক্তাপোষের ওপর গোঁজ হয়ে বসে থাকত। ঐ অবস্থায় বাবার পাশে বসতে কেমন যেন ভয় করত তার, ঘেন্না করত তার।

ঐ ঘেন্না বাড়তে লাগল ক্রমে। শেষকালে একাদশতম সন্তান প্রসব করতে গিয়ে রক্তহীনতায় মারা গেল যখন মা, শ্যামাপদ পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে পালানো আর শীতলামন্দিরের পুরুত হয়ে ওঠার মধ্যে বছর ছয়েকের ফাঁক। সেই ফাঁকের ইতিহাসটা নিতান্তই মামুলি।

ভোরবেলা স্নানের ঘাটে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে পিঠ রগড়াতে রগড়াতে সেই বৈচিত্র্যহীন ছ-বছরের ঘটনাকে মনে করবার কোন উৎসাহ বোধ করে না শ্যামাপদ।

স্নান সেরে ভিজে-কাপড়ে পায়ে হেঁটে ফেরী ষ্টিমারের টিকিটঘর পেরিয়ে, মেয়েদের স্নানের ঘাট পেরিয়ে, শ্মশান ছেড়ে, মালগাড়ির

বেললাইন পার হয়ে শ্যামাপদ প্রতিদিন দাঁড়ায় এসে ঠানদিদির দোকানঘরের সামনে। সেখানে প্রত্যহ গরম দুখানি জিলিপি বরাদ্দ তার। ব্রাহ্মণকে জল খাইয়ে তবে জলগ্রহণ করে ঠানদি।

সারাটা দিন শীতলামন্দিরে কাটিয়ে রাত্রিবে সোহাগী দাসীর ঘরে যাওয়া আবার। আবার ভোরবেলা গঙ্গাস্নান। এইভাবে দিন কেটে চলে শ্যামাপদর।

একেক দিন মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত কচি মেয়েটার নিষ্কলঙ্ক সরল মুখের দিকে তাকিয়ে খেইহারা সমস্যাগুলো যখন সোহাগীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে, তখন নিদ্রিত শ্যামাপদকে নাড়া দিয়ে সে ব্যাকুল প্রশ্ন করে,—বলো না গো, বলো না, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কী?

শ্যামাপদ বলে,—ঠানদি আমায় কথা দিয়েছে, তোর মেয়ে আরেকটু বড় হলেই তার ইস্কুলে পড়ার খরচ দেবে ঠানদি। ইস্কুলে পড়ে তোর চাঁপা জানবে সব, বুঝবে সব, মানুষ হবে সে। ভাবছিস কেন তুই।

ঠানদি কে?

হাসালে বাপু তুমি।

ঠানদিকে চেনে না, ঠানদির দোকান চেনে না, এমন মনিষ্যি একটিও নেই এ-অঞ্চলে।

ব্যাসল্ট পাথরের কালো ইট-বাঁধানো রাস্তার ওপর এক দিকে কাঠগোলা; আরেকদিকে হিন্দুস্থানীর পানের দোকানের চাপে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে আছে যে একটি গুহার মতন অন্ধকার ঘুপসি দোকানঘর, তার মধ্যে একটু ঠাহর করলেই তুমি দেখতে পাবে ঠানদিকে।

আচ্ছা ঠিক এক ঠাহরেই তুমি দেখতে পাবে না তাঁকে।

প্রথমেই তোমার চোখে পড়বে মুড়ো একগাছি ঝাঁটা;—ওটা ঠানদির রসনার প্রতীক। তারপরেই চোখে পড়বে অনেককালের পুরনো সুঁড়িতে জড়ো করা টাটকা নতুন ছোট ছোট গাঁজার কলকে;—ওগুলো এ-দুনিয়া সম্বন্ধে ঠানদির ধারণার প্রতীক। তারপরেই চোখে পড়বে কাঠের বাক্সয় স্তূপীকৃত করা এমন একরাশ চাবি, যা দিয়ে তামাম দুনিয়ার কোনো কুলুপই খোলা যাবে না কোনদিন;—ওগুলো কি ঠানদির ব্যর্থজীবনের প্রতীক?

কে জানে!

কিন্তু তারপরেও দেখতে পাওয়া যাবে না ঠানদিকে। দেখা যাবে ঝুনো নারকেল আর কাচা ডাব, গুলিসুতো আর ছোবড়ার দড়ি, বিড়ির বাণ্ডিল আর পানের গোছা।

তারপরেই কি ঠানদি?

না। তারপরে আছে একটি কাঠের আলমারি। সে আলমারি যার হাতের তৈরী সে আর ইহজগতে নেই। প্রাণপক্ষী তার অনেকদিন আগেই উধাও হয়ে গেছে দেহপিঞ্জর ছেড়ে।

মিস্তিরি মশাইয়ের প্রাণপক্ষী উড়ে গেলেও আলমারির কাঠের পক্ষীদুটি অটুট আছে আজও। ঠানদি বলে ওদুটো ময়ুর; শ্যামাপদ বলে প্যাঁচা। মোটকথা পাখি।

সেই জোড়া-পাখির মুণ্ডু থেকে একটি দড়ি টান করে বাঁধা আছে দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে। সেই দড়িতে ঝোলানো আছে রুমালের মাপের ছোট ছোট নতুন কোরা গামছা। শ্মশানযাত্রীদের কাজে লাগে।

আর আলমারির মধ্যে?

তার তাকে তাকে ছোট ছোট পেতলের বাটিতে সাজানো আছে সোনার কুচি, রুপোর কুচি, কাঁসার কুচি,—আরো কত কী যে টুকিটাকি দ্রব্য, বাইরে থেকে তার পুরো হদিস করা মুস্কিল।

তারপরেই কি ঠানদিকে দেখা যাবে?

হ্যাঁ।

গলা বাড়িয়ে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে ঐ আলমারির গায়ে পিঠ দিয়ে উল্টোদিকে মুখ করে যাকে প্রকাণ্ড জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচোতে দেখা যাবে,—তিনিই ঠানদি।

একটা পান খাব ঠানদি,—ব'লে যেই তুমি বসবে দোকানের সামনে পাতা বরফ-রাখার প্যাকিং বাক্সটার ওপরে, অমনি জাঁতিটাতি রেখে সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসে পানের চিলতেয় চুন লাগাতে লাগাতে তোমার দিকে একটুও না তাকিয়ে মুখ নিচু করেই ঠানদি বলবে,—কে হয়?

তুমি বলবে, পাড়ার লোক; তেকেলে বুড়ো।

—বয়েস?

—উননব্বুই।

এইবার তাকাবে ঠানদি তোমার মুখের দিকে। বলবে,—জাত কি?

—কায়স্থ।

—বৌ আছে?

—তিরিশ বছর আগেই গেছেন তিনি।

—আহা, সতীলক্ষ্মী ভাগ্যিমানী! তা হয়েছিল কি বুড়োর?

—গেল মঙ্গলবার দিন লুকিয়ে শেলপো থেকে চুরি করে বাসি মালপো খেয়েছিলেন। তাইতেই পেট ছেড়ে দিলে।

—আ মরণ! সাদা পান না গুণ্ডি-দোক্তা?

—দোক্তা।

তোমাকে পান-দোক্তা দিয়ে পয়সা গুণে নিয়ে চুন-খয়েরের ছোপলাগা লালচে রঙের ভিজে কাপড়ের টুকরোয় হাত মুছে আবার ঠানদি বসবে জাঁতি নিয়ে সুপুরি কুচোতে। কুচোতে কুচোতেই বলবে,—ঘি বল, তিল বল, আতপ চাল বল, গামছার টুকরো বল, সাতকুচি সোনা কিংবা আটখানা কড়ি বল, চাবি বল, উত্তরী বল,—স-ব রাখা আছে তোমাদের জন্যে। দরকার হলে বোলো।

তুমি বলবে,—আমি তো ঠিক জানি না এসব। পাড়ার লোক হিসেবে এসেছি। কি লাগবে, না লাগবে বুড়োর নাতিদের জিজ্ঞেস করে আসি।

এই বলে চুন-লাগানো পানের বোঁটাটাকে জিভের ডগায় শেষবারের মতন ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়াবে তুমি।

ততক্ষণে তোমার দেখা হয়ে গেছে ঠানদিকে।

বয়স কত? বলতে পারবে না, ধরতে পারবে না, আন্দাজ পাবে না কিছু। যারা বলে ষাট, তারাও ঠিক হতে পারে; যারা বলে একানব্বুই তারাও ঠিক হতে পারে। শ্মশানের ধোঁয়া লেগে লেগে এ-অঞ্চলের বাড়িঘরের রঙ যেমন চাপা পড়ে গেছে, ঠানদির বয়েসের হিসেবটাও বুঝি চাপা পড়ে গেছে তেমনি। মাথার সাদা চুলগুলোতেও

শ্মশানের দেয়ালের মতই ছোপ লেগেছে ধোঁয়ার। অনির্বাণ চিতাগ্নির আঁচ লেগে লেগে শরীরের রসকষ সব শুকিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেচে যে, দোকানের দরজায় ঝুলিয়ে রেখে ঠানদির পায়ের বুড়ো-আঙুলের ডগায় একটা দেশলাই-কাঠির আগুন ধরিয়ে দিলে বিড়ি-ধরানো দড়ির মতই ঠানদি বোধ হয় গুমিয়ে গুমিয়ে সমানে জ্বলতে থাকবে অমন ছিল-তুচ্ছার।

চিরদিনই কিন্তু অমনটা ছিল না ঠানদি। নিশ্চয়ই ছিল না। শৈশব—কৈশোর—যৌবনের কত গলি কত রাজপথ পার হয়ে বার্দ্ধক্যের জীর্ণ পারঘাটে এসে পৌঁছুতে হয় মানুষকে, ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয় ওপারের দিকে। ঠানদিকেও হয়েছে নিশ্চয়ই। পার হতে হয়েছে কত গলি, কত রাজপথ।

সে পথে কি ছিল? কে ছিল?

ঠানদির নিজেরই ভুল হয়ে যায় আজকাল।

ঐ যে ওধারে গঙ্গার কিনারে বাজপড়া শুকনো নিমগাছটা পাতাটাতা সব খুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ,—ওটাও কি চিরকাল অমন ছিল নাকি?

একদিন ওর ডালে ডালে পাতা ছিল, বোঁটায় বোঁটায় ফুল ধরত, ফল ধরত, বাতাসে ওর আগাডালের চিকন কচি পাতাগুলো ঝিরঝিরিয়ে কাঁপত, ওর শাখায় শাখায় পাখি বসত, তারা গান গাইত, ঘর বাঁধত। আজ ওটা সবকিছু খুইয়ে এমন হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মনে হয়, কাঠের গোলার কাঠ কুঁদে কুঁদে ওটা কোন ছুতোর মিস্তিরির তৈরী নকল গাছ নয় তো?

ঐ দেউলে নিমগাছটার যে একদিন যৌবন ছিল, তার সাক্ষী অনেক মিলবে এ-অঞ্চলে। কিন্তু ঠানদির যৌবনের সাক্ষী? এ—অঞ্চলের কোথাও নেই তেমন মানুষ।

স্নানের ঘাটের ঐ যে প্রৌঢ় বাইধর শতপথি,—তেলচিটে প্যাকিংবাক্সের সিংহাসনে বসে কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে স্নানার্থীদের কাপড়জামা মনিব্যাগ চশমা জুতো ঘড়ি-আংটি আগলায়, পুণ্যকামী ভক্ত বারবণিতাদের কপালে এঁকে দেয় চন্দনের পদচিহ্ন,—শ্যামাপদ পূজারী কৌতূহলী হয়ে একদিন শুধিয়েছিল তাকে,—হাঁ ঠাকুর, তুমি তো অনেককালের মানুষ। এঘাটে বসে আছ কতোকাল হবে?

বাইধর শতপথি ভাঙা আরসিটাকে মুখের কাছে এগিয়ে এনে শিরাবহুল শীর্ণ হাতে নিজের কপালে তেলকফোঁটা কাটতে কাটতে বললে,—ঐ ডেথ রেজিস্টারি ঘরের পুরোনো চিত্রগুপ্তবাবু যে-বছর ঐ নিমডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মলো, সেই বছর বাবা আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে সেই যে দেশে গেল, ফিরল না আর। সেই থেকে বসে আছি এখানে। সে কি আজকের কথা?

শ্যামাপদ উৎসাহিত হয়ে বললে,—ঠানদির যৌবন দেখেছ তুমি তাহলে নিশ্চয়ই?

বাইধর শতপথি ঘাড় নেড়ে বললে,—না।

ঘাড় নাড়ার ফলে কপালের চন্দনচিহ্নটা বেঁকে গেল। সেটাকে মুছে নতুন করে চন্দনের ছাপ আঁকতে আঁকতে বাইধর বললে—আমি

দেখেনি বটে, কিন্তু ঠানদির যৌবন দেখেছিল যে, এমন মানুষকে দেখেছি।

শ্যামাপদ অধীর কণ্ঠে শুধায়,—কে সে ঠাকুর? কে সে? বাইধর বললে,—নামটা পেটে এসেও মুখে আসছে না। য—দিয়ে নাম। ঐ ন্যাড়া নিমগাছের গুঁড়ির কাছে খোদাই করা আছে এখনো নামটা।

শুনে ছুটে গেল শ্যামাপদ নিমগাছের গুঁড়ির কাছে। ফিরে এসে বলবে,—য তো নয়, শ-দিয়ে বরং নাম একটা কোঁদা আছে গাছের গুঁড়িতে;—শশিকান্ত।

হাঁ হাঁ, তাই তো, তাই তো শশিকান্তই তো বটে। ভুল হতে যাচ্ছিল বাইধরের। শশিকান্তই তো ছিল তার নাম।...

ঐ নিমগাছের গোড়ায় মোড়া একটা চট, চাপা দিয়ে শশিকান্ত শুয়ে-বসে থাকত চোপরদিন। দাড়ি কামাত না, চুল ছাঁটত না, দাঁত মাজত না—বুনো-বুনো ঘোলা-ঘোলা চোখে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। ঠানদি দুবেলা ভাত ঢেলে দিত ওর কুড়িয়ে-পাওয়া চটা-ওঠা কলাইয়ের গামলায়,—তাই খেয়ে চুপচাপ পড়ে থাকত ঐ গাছতলায়।

একদিন একটা ছুতোর মিস্তির গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে উঠল না আর। তার যন্ত্রপাতির চটের থলিটা পড়ে রইল কতদিন ঘাটের ধারে ভাঙ্গা ইটের খাঁজে—নজরে আনলে না কেউ। একদিন কী খেয়ালে সেই যন্ত্রপাতি সব তুলে নিলে ঐ শশিকান্ত। তুলে নিয়ে খুটখাট করে এটা ওটা বানাতে লাগল আপনমনে। কাঠেরগোলা থেকে টুকরো-টাকরা কাট কুড়িয়ে এনে কেমন সব পুতুল বানাতো চেঁছেছুলে। মায়ের হাত ধরে ছেলেমেয়েরা গঙ্গা নাইতে এলে সেই পুতুল দিত তাদের। দিয়ে আনন্দ পেত।

ছেলেমেয়েরা ওর হাত থেকে পুতুল নিত না কিন্তু কোনদিন। শশিকান্তর চেহারা দেখে ভয় পেত ওরা। কাছে আসত না। দূরে কোথাও মাটির ওপর পুতুল বসিয়ে রেখে শশিকান্ত দূর থেকে ইসারায় পুতুলটাকে তুলে নিয়ে যেতে বলত। দুঃসাহসী কোন বালক ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি এগিয়ে ছো মেরে পুতুলটা তুলে নিয়েই এক ছুটে মায়ের আঁচলের তলায় নিরাপদ আশ্রয়ে যেত পালিয়ে। শশিকান্তর জীর্ণ কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠত তখন ম্লান হাসির আভা।

কিন্তু তেমন দুঃসাহসী ছেলে ক'জনাই বা মিলতো। শশিকান্তকে কাঠের পুতুল নিয়ে আসতে হতো তাই বাইধরের কাছে। বাইধরের কাছে পুতুল গচ্ছিত দিয়ে বলতে হতো,—ঐ যে মাদুলি-গলায় রোগা-রোগা ছেলেটা মাথা মুছছে দাঁড়িয়ে, কিংবা ঐ যে ডুরে-শাড়ি নাকে-নোলক কচি মেয়েটা পেন্নাম করছে অশথগাছকে,—পুতুলটা ওকে দিও তো ঠাকুর। আমি আড়ালে যাচ্ছি।

এমনি করেই তো বাইধরের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ হয়েছিল শশিকান্তর। একদিন শশিকান্ত বললে,—বাইধর, তোমাকে কেমন সুন্দর একটা ডালাওলা বাক্স করে দিই ভাখো।

তা' দিয়েওছিল। চমৎকার বাক্স। সে বাক্স বাইধরের দেশের ঘরে আছে।—ঠানদির ঘরে ঐ যে একটা জোড়া-পাখির নক্সা কাটা চ্যাপটা আলমারি আছে, ওটাও তো সেই শশিকান্তরই হাতের তৈরী।

ঐ আলমারিটা ঐ নিমগাছের তলায় বসে অনেক পরিশ্রমে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল শশিকান্ত। গঙ্গারঘাটের নিয়মিত স্নানার্থী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাল দাম দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন আলমারিটা। শশিকান্ত রাজি হয়নি।

ওর ইচ্ছে, ঠানদি ওটা নেয়। সে ইচ্ছে শশিকান্ত কতদিন কতভাবে কতজনার মারফৎ প্রকাশ করেছে ঠানদির কাছে।—রাজি হয়নি ঠানদি।

ঠানদিও নেবে না, শশিকান্তও দেবে না আর কাউকে। রোদে জলে আলমারিটা পড়েই রইল ঐ গাছতলাতেই। পড়ে পড়ে নষ্ট হতে লাগল।

সে বছর গ্রীষ্মকালে, কে জানে কেমন করে, ঠানদির হলো কলেরা। হাসপাতালের গাড়ি এসে নিয়ে গেল ঠানদিকে। বন্ধ রইল ঠানদির দোকান।

হঠাৎ একদিন নিশুতি রাতে শশিকান্তর চীৎকার শুনে সবাই পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে দেখলে—ঠানদির দোকানের পিছনের দোরটা ভাঙ্গা, জিনিসপত্র কিছু কিছু ছড়ানো, আর সেই ছড়ানো জিনিসের মাঝখানে ভাঙ্গা দোরের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে শশিকান্ত, পিঠে তার ছোরা বেঁধানো। জায়গাটা রক্তে লাল।

শশিকান্ত অতিকষ্টে গোঙাতে গোঙাতে বললে,—একটা চোর এসেছিল কাঠের গোলার পিছনের পাঁদাড় দিয়ে, কিছু নিয়ে যেতে পারেনি।

হাসপাতালের গাড়িতে শুয়ে শুয়েই মরে গেল শশিকান্ত। শরীরে ছিল না তো কিছু। অতখানি রক্তক্ষয় সইতে পারলে না।

হাসপাতালে ঠানদিকে এসব জানানো হয়নি কিছু। ফিরে এসে শুনলে সব মাসখানেক পরে। শুনেই নিমগাছতলায় ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। যে আলমারিটাকে শশিকান্ত এতদিন কিছুতেই নেওয়াতে পারেনি, সেই আলমারিটাকে ঠানদি লোক লাগিয়ে তুলে আনলে দোকানে। তারপর বাইধরকে ডেকে বললে,—তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি ঠাকুর, সামনের একাদশীর দিন বারোটি বামুনকে খাওয়াতে হবে ওই নিমগাছতলায়।

ঐ সেই শশিকান্তই শুধু দেখেছিল ঠানদির যৌবন। সেই শুধু জানত ঠানদির যৌবনের নাম। সে-নাম সে খোদাই করেও রেখেছিল ঐ নিমগাছের গোড়ায়, নিজের নামের ঠিক পাশটিতে। ম-দিয়ে সুরু সেই নামের;—মেনকা।

এ-অঞ্চলের আর সবাই ঠানদিকে ঠানদি বলেই জানে।

[ক্রমশঃ।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা! তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটী কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

নিউক্লিয়াসের শক্তি

গোপাল ভট্টাচার্য

আমরা জানি না, যে 'আণবিক শক্তি'র কথা প্রতিদিন বলি তার কোন অর্থই হয় না। আণবিক শক্তি কথাটাই অত্যন্ত হাস্যকর। এমন কি ইংরেজীতে যে atomic energy বলে কথাটা প্রচলিত আছে সেটার ঠিক ঠিক অর্থ বোঝায় না। বহু বিজ্ঞানী তাই atomic energy কথাটা ব্যবহার করতে চান না। ইংরেজী এ্যাটম কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পরমাণু। অণু কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ molecule। molecular energy বা molecular bomb বলে ইংরেজী কোন কথা দুনিয়ায় আজও পর্যন্ত শোনা যায় নি। তবে আশ্চর্যের কথা তার প্রতিশব্দ দুটি (আণবিক শক্তি ও আণবিক বোমা) এই ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা বাংলা দেশে আজও চালু রয়েছে। পরমাণবিক শক্তি বললে ইংরেজী এ্যাটমিক এনার্জী কথাটির ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ বলা হয়।

এখন পরমাণু জিনিষটা কি? পরমাণু হচ্ছে কোন মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট এমন অংশ যেটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এক গ্রাম হাইড্রোজেনে ৬৩০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০ সংখ্যক পরমাণু আছে। এক একটি মৌলিক পরমাণু এক এক রকম হয়ে থাকে, প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস (পরমাণুর প্রাণকেন্দ্র)। সাধারণ ভাবে বলা যায় এই পরমাণুর প্রাণকেন্দ্রে আছে কিছু সংখ্যক ধনাত্মক তড়িৎ সম্পন্ন কণিকা যার নাম হচ্ছে প্রোটন আর কিছু সংখ্যক তড়িৎশূন্য কণিকা যার নাম হচ্ছে নিউট্রণ। নিউট্রণ ও প্রোটনের ভর প্রায় এক। নিউট্রণ ও প্রোটনের ভরকেই পরমাণবিক ভর বলে। নিউক্লিয়াস ঘিরে বেশ কিছুটা দূরে কিছু ধনাত্মক কণিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব কণিকার নাম হচ্ছে ইলেকট্রন। প্রতি পারমাণুবই প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। তাই সাধারণ অবস্থায় প্রতিটি মৌলিক পদার্থই তড়িৎ শূন্য।

প্রতিটি মৌলিক পদার্থের গুণাবলী নির্ভর করে তার প্রোটনের সংখ্যার ওপর, পরমাণবিক ভরের ওপর নয়। পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যাকে বলে পরমাণবিক সংখ্যা। একই পদার্থের পরমাণবিক ভর বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তার পরমাণবিক সংখ্যা একই হতে হবে। যদি কৃত্রিম উপায়ে কোন পরমাণুর প্রাণকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই পরমাণু অন্য এক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে। ১৯১৯ সালে বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড কৃত্রিম উপায়ে আলফাকণা দিয়ে নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আঘাত করে অক্সিজেনের সৃষ্টি করলেন। নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন করে তার থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই পরমাণবিক শক্তি বলে। বলা উচিত nuclear energy অর্থাৎ 'নিউক্লিয়াসের শক্তি।'

খুব অল্প সংখ্যক ভারী ও জটিল পরমাণু যেমন ইউরেনিয়ামের প্রাণকেন্দ্রে উপযুক্ত গতি ও আকৃতি সম্পন্ন প্রক্ষেপ্তি যেমন নিউট্রন যদি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে প্রাণকেন্দ্র যে শক্তির বাঁধন দিয়ে নিউট্রন ও প্রোটনকে একত্রিত করা আছে, সেটা ছিঁড়ে যায় এবং সেই প্রাণকেন্দ্রের ছিন্নভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে ক্ষিপ্রগতিতে যায়। এর ফলে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'বিভাজন' (fission)।

প্রাণকেন্দ্র থেকে যে অংশগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলির অধিকাংশ হচ্ছে ছোট ছোট অন্যান্য পরমাণুর প্রাণকেন্দ্র। সেগুলি সুবিধে মতো ইলেকট্রন নিয়ে সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের পরমাণু গঠন করে। কিছু কিছু আছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, তাদের মধ্যে তড়িৎশূন্য নিউট্রন এবং ধনবিদ্যুৎ সম্পন্ন প্রোটন উল্লেখযোগ্য। এই নিউট্রন এমন গতিতে বেরিয়ে আসতে পারে যাতে করে দ্বিতীয় একটি পরমাণুর কেন্দ্রে বিভাজন ঘটতে পারে। এমনি করে এক শৃংখল বিক্রিয়া সুরু হয়ে যায় (chain reaction)।

বিভাজনের ফলে যে সব অংশ পাওয়া যায় সেগুলি সংগ্রহ করে যদি একত্রিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে সংগৃহীত পদার্থের মোট ভর অবিভাজিত প্রাণকেন্দ্রের ভরের চাইতে কম। তাহলে ধরে নিতে হয় কিছু পদার্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। পদার্থের যে ভরটুকু (mass) ধ্বংস হয়ে গেছে বললাম সেটি আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে। এই সমীকরণে E দিয়ে বোঝান হয় শক্তিকে, m দিয়ে ভরকে এবং c দিয়ে আলোর গতিবেগকে। আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০,০০০ সেণ্টিমিটার। একগ্রাম পদার্থকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে সেই পরিমাণ শক্তি পেতে হলে দু'কোটি টন কয়লা পোড়াবার প্রয়োজন হবে। অবশ্য বিভাজন বিক্রিয়ায় পরমাণু কেন্দ্রের ভরে এক হাজার ভাগেরও কম কমে। তার দাপটও কম নয়।

যখন নিউক্লিয়াসের এই বিক্রিয়া চলতে থাকে তখন আরেক ধরণের শক্তি বিকিরিত হয়—এই বিকিরণ অনেকটা রঞ্জনরশ্মির মতো। কিন্তু তার চেয়ে অনেক শক্তি সম্পন্ন এবং ধাতুর মোটা দেয়ালের ভেতর দিয়েও এই রশ্মি চলাফেরা করতে পারে। এই রশ্মি অত্যন্ত ক্ষতিকর, নাম গামারশ্মি। এর চেয়েও ক্ষতিকর হচ্ছে ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন নিউট্রণ।

সে নিউক্লিয়াসের শৃংখল বিক্রিয়া দ্বারা পরমাণবিক বোমা তৈরী করা হয়। সেই নিউক্লিয়াসের শৃংখল-বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা প্রচুর শক্তি মানুষের বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে লাগাতে পারি। এই কাজটি প্রথম করা হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কাজ করা হচ্ছে, এমন কি ভারতবর্ষেও। ভারতবর্ষে (ট্রম্বে) দুটি পরমাণবিক চুল্লী বর্তমানে

কাজ করছে। দ্বিতীয় চুল্লীটির উদ্বোধন হয়েছে সম্প্রতি। কানাডা এবং ভারতবর্ষের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এই চুল্লীটির নাম সি, আই, আর (Canada India Reactor)।

একথা মনে করা অত্যন্ত ভুল হবে যে, যে কোন পদার্থের পরমাণুতেই শৃংখল বিক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন দুটি মাত্র পদার্থ যাদের নিউক্লিয়াসে এই বিভাজন বিক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে একটি ইউরেনিয়াম অপরটি থোরিয়াম। দুটি পদার্থই তেজস্ক্রিয়, তার অর্থ হলো এই যে পদার্থ দুটি সব সময়ই আলফা, বিটা, গামা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে নিজেদের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। যেমন ইউরেনিয়াম পরিবর্তিত হতে হতে রেডিয়াম হচ্ছে, এই রেডিয়াম পরিবর্তিত হতে হতে হয়ে যাচ্ছে সীসে। ইউরেনিয়ামের মধ্যে একমাত্র ইউরেনিয়াম—২৩৫ (U-235 অর্থাৎ যে ইউরেনিয়ামের পরমাণবিক ভর ২৩৫) বিভাজন বিক্রিয়ার যোগ্য। কিন্তু এই U-235 দিয়ে এমন ধরণের পরমাণু তৈরী করা সম্ভব যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তারা বিভাজন বিক্রিয়ার যোগ্য। পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন নতুন ধরণের পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে সৃষ্টির কথা এককালে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতো কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। নতুন পরমাণু সৃষ্টি করা আজকের নিউক্লিয়ার সায়েন্সের দৈনন্দিন কাজ। এই সব নতুন মৌলিক পদার্থের মধ্যে বিশেষ করে দুটি প্লুটোনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম—২৩৩ বিভাজন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। U-235 U-238 কে প্লুটোনিয়ামে পরিবর্তিত করে। U-233 তৈরী হয় থোরিয়াম থেকে। এমনি করে থোরিয়ামের যে সব বড়ো বড়ো খনি পৃথিবীতে রয়েছে তার থেকে শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে ইউরেনিয়ামের তুলনায় থোরিয়াম অনেক বেশী রয়েছে।

নিউক্লিয়াসের শক্তির ব্যবহার যন্ত্র শিল্পে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুরু হয়ে গেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষেও রিয়্যাক্টরের (পরমাণবিক চুল্লী) সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আইসোটোপ তৈরী কাজ সুরু হয়েছে। যে সব পরমাণুর পরমাণবিক ভর বিভিন্ন অথচ পরমাণবিক সংখ্যা (প্রোটনের সংখ্যা) একই তাদের প্রত্যেককে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এবং ক্যানসার প্রভৃতি রোগে চিকিৎসার জন্য বিশেষ কাজে লাগে।

ক্লান্তি দূর করতে হলে

দৈনন্দিন গৃহকর্মে যে শ্রম নিয়োজিত হয়, মেয়েদের পক্ষে তাই পর্য্যাপ্ত না নয় এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থালীর কর্মে অবসাদগ্রস্তা হয়ে পড়েন মেয়েরা ও প্রতিষেধক স্বরূপ বিশ্রাম ভোগ করতে চান নিদ্রার আশ্রয়ে, অথচ নিদ্রাভঙ্গেও ফিরে পান না স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, গা ম্যাজ ম্যাজ করে মেজাজ বিগড়ে থাকে ফলে মানসিক স্থৈর্য্যেরও অভাব ঘটতে দেখা যায় প্রায়ই কারণ একথা তো অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য যে দেহের গতির সাথেই সমতা রক্ষা করে মনের স্বাস্থ্য সর্ব্বদা।

গভীর ঘুমের মধ্যেই নিহিত থাকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের সকল সম্ভাবনা আর এই প্রগাঢ় সুষুপ্তি শুধু আসতে পারে তখনই সমস্ত যখন দেহ জুড়ে নামে এক অখণ্ড মধুর ক্লান্তি। এজন্যই শুধু কোন বিশেষ অঙ্গসঞ্চালনে দেহের প্রয়োজন মেটে না তাকে দিতে হয় এমন কোন শ্রম সাপেক্ষ কাজ যার দ্বারা অবসাদিত হতে পারে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি।

নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন তাই সকলেরই আছে। কোন খেলা ধূলা বা অন্য কোন রকম অভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই ক্লান্তি আহরণ করা গেলে সেটাই সব চেয়ে কাম্য কারণ সে ক্লান্তি আসে আনন্দরসে জারিত হয়ে যাতে দেহের সঙ্গে মন ও লাভ করে পূর্ণ তৃপ্তি ফলে বিশ্রাম ক্ষণটুকু হয়ে ওঠে উপভোগ্য। গৃহকর্মে প্রায়শঃ যে অঙ্গটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় তা হাত; কল্যাণীর কল্যাণ হাতের ছোঁয়ার ছোট ছোট তুচ্ছ কর্মগুলিও ভরে ওঠে এক নতুন মহিমায়, এ কথা বলতেও ভাল শুনতেও বেশ; কিন্তু হাত ছাড়াও কল্যাণীর আর আর যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তারা বেকার থাকার ফলে শারীর স্বাস্থ্যের ঘটে যথেষ্ট ক্ষতি, যার প্রভাব পড়ে গোটা মানুষটারই উপর।

দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন ব্যায়াম যে অবশ্য প্রয়োজনীয় একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে সাধারণ কোন ব্যায়ামরীতিই অনুসরণ করা কর্তব্য, না আনন্দদায়ক কোন খেলাধূলার আশ্রয় নেওয়া উচিত?

কোন খেলাধূলার মাধ্যমে ব্যায়ামচর্চ্চা করতে পারলে সেটাই যে অধিকতর কাম্য, একথা বোধহয় স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। কারণ তাতে দেহের সঙ্গে মনেরও যোগ থাকে আর সেজন্যই তার কার্য্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

সাঁতার, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা ও নৃত্যের অভ্যাস দ্বারা মেয়েরা সহজেই দেহচর্চ্চা ও আনন্দোপভোগ করতে পারেন।

প্রধানতঃ মেয়েদের কথা বলা হচ্ছে বলেই পুরুষের ব্যায়াম করার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন দ্বিমত ঘটবে না, কারণ শরীর চর্চ্চার প্রয়োজন যে তাঁদের মেয়েদের চেয়ে কিছু মাত্র কম নয় বরং বেশীই একথা তো অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য এবং তার আয়োজন ও তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর।

শরীর চালনার প্রয়োজন সব মানুষেরই আছে কিন্তু সে প্রয়োজন যে সব ক্ষেত্রে এক নয় কারণ সকলের দেহই এক ধাতুতে গঠিত নয়, একথা কিন্তু সব সময়েই মনে রাখা বিধেয় না হলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়াও বিচিত্র নয়, ঠিক যেটুকু প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিশ্রমে সুফলের চেয়ে কুফলই হয় বেশী।

শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ব্যায়াম করতে পারলে আপনি শুধু অবসাদ ও ক্লান্তির হাত থেকেই মুক্তি পাবেন না আপনার দেহ হয়ে উঠবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর দিনে দিনে সম্পূর্ণ করে খুঁজে পাবেন নিজেকে নিজের মাঝেই।

পাঁচ

এমনি একদিন তাসখেলার শেষে শর্মিষ্ঠা বাড়ী ফিরল।

মোটর থেকে নামল যখন, ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটার ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে। রাত আজ বিশেষ হয়নি, অমরনাথের শরীর অসুস্থ, সুষমা খেলতে দেননি রাত অবধি।

অভয়পদ গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো, "দিদি, গাড়ী তুলে দিই?"

এগোতে এগোতেই শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

গেটটা খোলাই ছিল। ছোট চাতালটুকু পেরিয়ে পালিশ করা কাঠের বড়, ভারি দরজাটা বন্ধ। বাঁ হাতে কলিংবেলটা টিপে দিয়ে সারা গাড়ী গাইতে গাইতে আসা গানটারই একটা কলি আবার গুনগুনিয়ে উঠল।

ভুবন দরজা খুলে দিল। "এলে! এই ভাবছিনু একটা ফোনই করি না হয়। ইদিকে যে তোমার জ্যাটামশাই এসে বসে আচেন হাপিত্যেশে।"

—"কখন এলেন?"

—"খুব বেশীক্ষণ নয় অবিশ্যি। নেমন্তন্ন সারতে সারতে এয়েচেন তো! মুখ আঁধার করে বসে আচেন দোতলায়—তুমি নেই দেখে।"

শুনতে শুনতেই বার কয়েক মাথা দুলিয়েছে শর্মিষ্ঠা! মনে মনে একটা কিসের প্রস্তুতি!···

জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "অর্থাৎ এবার সম্মুখ সমরে- অগ্রসর হতে হবে, তথাস্তু। ভুবন দা, ওরিয়েণ্টাল বাম্‌টা খুঁজে রেখ, মাথাটা ধরে ওঠার সম্ভাবনা।"

দোতলার সিঁড়িতে পা দিয়ে থমকে একবার দাঁড়াল···মাথাটা দোলালো আবারও, পূর্বচিন্তারই রেশ টেনে। একটা করে সিঁড়ি টপকে উঠ্‌তে উঠ্‌তে থেমে যাওয়া গানটার একটা লাইন মুক্ত-কণ্ঠে গেয়ে উঠল হঠাৎ, "···দিনে-রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই···"

দোতলার বসবার ঘরে অপেক্ষারত ইন্দুভূষণ মৈত্র নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন, দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালেন একবার।

শর্মিষ্ঠা ঘরে ঢোকা মাত্র বুনো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। গাড়ীর হর্ণ পেয়ে অবধি উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, তবু ঘরে বাইরের লোক বসে, একা রেখে ছুটে নেমে যেতে পারেনি অন্যদিনের মত। ইন্দুভূষণ এসেছেন, তখন আটটাও বাজেনি। সেই থেকে ইন্দুভূষণের সামনে কুমীরের মত লম্বা হয়ে শুয়েছিল বুনো, সামনের পা দুটোর ওপর মুখটা রেখে অপলক নেত্রে পাহারা দিচ্ছিল ইন্দুভূষণকে। সেই থেকে দৃষ্টির সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন ভদ্রলোক। দু'একবার অধৈর্য হয়ে ওঠে পড়তেও গেছেন···বুনো নড়েনি, কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়েছে—গররর্। ভাবার্থ, এসেছ যদি তো চুপ করে বসে থাক মনিব আমার যতক্ষণ না ফেরে, উঠে যাওয়া হবে না। ইন্দুভূষণ আসতে ভুবন এঘরে এনে বসিয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছে চা দেবে কি না। অসম্মতি জানাতে সেই যে চলে গেছে, আর দেখা মেলেনি। বুনোর ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকতেও পারেননি, কে জানে কুকুরটা তাতে রেগে উঠবে কি না!···মেজাজী মানুষ, এমন নজর-বন্দী হয়ে বসে থেকে রাগে ফুঁসছিলেন। এ বাড়ীর কোন লোকটারই কি কোন আক্কেল-বিবেচনা থাকতে নেই! কুকুরটা পর্য্যন্ত তালে তাল দিয়ে চলছে। এতবার আসছেন যাচ্ছেন, হারামজাদা কুকুর তবু তাঁকে বাড়ীর লোক বলে চিনল না!

বুনোর সমস্ত ভারটা সয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন, প্রথম ধাক্কাতেই শর্মিষ্ঠা পিছিয়ে গেল দু'পা, আদর সামলে এগিয়ে আসতে সময় লাগল একটু।

এসে প্রণাম করল, "কখন এলেন জ্যাঠামশাই?"

ইন্দুভূষণ প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলেন আজ অন্তত: কোন মতেই রাগারাগি করবেন না, শুভকাজে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন, শান্ত ভাবেই করে আসবেন। ভাইঝির দিকে চেয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা শক্ত মনে হচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে—পরণে একখানা নীল মাদ্রাজী শাড়ী, উজ্জ্বল গৌর মুখে স্মিত হাসি। ভেবে দেখলে, ভাবটা বেশ শান্তই, তবু ঐ লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারায় একটা গোপন ঔদ্ধত্যের আভাস। আজ বলে নয়, শর্মিষ্ঠার দিকে চাইলেই সব মিলিয়ে একটা গর্বোদ্ধত মূর্তিই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে আর রাগে সর্বাংগ জ্বলে যায়।

তবু আজ উত্তরটা সংযত কণ্ঠেই দিতে চেষ্টা করলেন, "খুব বেশীক্ষণ নয়। মনেই করলাম তুমি কি আর বিকেলে বাড়ী থাকবে, তাই দেরী করেই এলাম—তা ফিরতেও দেখছি তোমার রাত হয়।"

মুখে একটুখানি তিক্ত হাসি ফুটেছে, সংযমের চেষ্টাও আছে যদিচ। সেটুকু ভাল করে দেখে নিয়ে শর্মিষ্ঠা সহজ ভাবে মাথা হেলালো, "তা হয়। আজ তো বরং বেশ তাড়াতাড়ি ফিরেছি।"

—"ও! তা এত কি কাজ তোমার জিগেস করতে পারি?"

সামনে সোফাটায় বসতে বসতে মাথা নীচু করে শর্মিষ্ঠা ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু গোপন করল। ইন্দুভূষণের বাড়ীতে সবাই তাঁর ভয়ে কম্পমান, সেই জন্যই যেন কণ্ঠে আরও একটু বেপরোয়া সুর আনল, "কাজ কোথায়? সে সব কিছু নয়—এই একটু আড্ড-টাড্ডা দিয়ে বেড়াই আর কি।"

এর পর আর রাগের প্রকাশটা ঠেকানো গেল না, "লজ্জা করে না তোমার! অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত আড্ডা দিয়ে বেড়াও, আবার গর্ব করে বলছ? আশ্চর্য্য!"

শর্মিষ্ঠার হু'চোখ ভরা বিস্ময়, "আড্ডা দিই যখন, তখন স্বীকার করতে লজ্জা কি বলুন? আমাদের বাসন-মাজার ঝি যেমন—স্বামী বেদম নেশাখোর, তাতে লজ্জা নেই—কিন্তু কেউ যদি কথাটা বলেছে তো রক্ষে নেই। কেঁদে কেটে অনর্থ বাধাবে।"

প্রকাশ্যেই হাসছে, তবু এরপরও রাগ দমন করবারই চেষ্টা করলেন ইন্দুভূষণ। "ছ্যাখ শর্মিষ্ঠা বাজে তর্ক করলেই কোন কথার মীমাংসা হয় না। কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও তো সোজাসুজি, তুমি কি এইভাবেই সময় কাটাবে? বিয়ে করবে না স্থির করে ফেলেছ?"

—"হঠাৎ একথা এল কেন?"

—"তাহলে সেরকম কিছু স্থির করনি বলছ?"

—"কিছুই বলিনি, আপনিই ভেবে নিচ্ছেন সব কিছু।"

—"ছ্যাখ, কথার মার-প্যাঁচে জব্দ করতে চেও না। তোমার মামা মারা গিয়ে অবধি তোমারই ভালর জন্যে এই হু'বচ্ছর ধরে বিয়ের কথা বলে আসছি। সংসারী হওয়া তোমার একান্ত দরকার—তাই বলা, নইলে আমার কি!"

ইন্দুভূষণ থেমেছেন একটু, বোধহয় দম নিতে। পরবর্তী অংশটা শর্মিষ্ঠা আন্দাজ করতে পারে—হিন্দুনারীর আদর্শ বিষয়ক বক্তৃতাটা এবারই শুরু হবে বোধহয়। সেই অপেক্ষাতেই ছিল, ইন্দুভূষণ আজ সেদিক দিয়ে গেলেন না কিন্তু। হয়তো বাড়ী ফেরবার তাড়া ছিল, সারাদিন ঘুরে অফুরন্ত এনার্জীতেও কিঞ্চিত টান ধরেছিল হয়তো বা। সোজা পথেই এগোলেন।

—"তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। আগেও বহুবার বলেছি, আবার বলছি তুমি রাজী হলে এখনও আমি তোমার বিয়ের চেষ্টা করে দেখতে পারি—একটি ভাল পাত্রও হাতে রয়েছে। আমার নিকট আত্মীয়—শালার ছেলে। আমার শ্বশুর বাড়ীর বংশ পরিচয় আর নতুন করে কি দেব, ডাকসাইটে ঘর জানই তো। তা জমিদারী যাবার আগেই বাপ তার ব্যবসা ফেঁদে গুছিয়ে নিয়েছে, বুদ্ধিমান লোক। ছেলেটি চমৎকার, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঐ একটিই ছেলে আর যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, তেমনি বিষয় বুদ্ধি—বাপের ব্যবসা সব সেই দেখাশোনা করে। ওখানে বিয়ে হলে আর কোনদিকে দেখতে হবে না তোমার, দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারবে।"

ইন্দুভূষণের কণ্ঠস্বরটা মোলায়েম বেশ, জবাবের আশায় তাকিয়ে আছেন। উত্তর একটা কিছু দেওয়া দরকার।

—"গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তো এখনও বেড়াচ্ছি, স্বচক্ষেই দেখছেন।"

ইন্দুভূষণ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "আমি কি জানি না মনে কর। বিষয়সম্পত্তি থাকলেই ঝামেলা। তাই তো এতবার বলছি বিয়েথা করে সব দায়িত্ব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও।"

শর্মিষ্ঠার ভ্রূ দুটির মাঝে ছোট্ট একটি ভাঁজ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, "ঝামেলা আমার কিছু নেই জ্যাঠামশাই। থাকেও যদি, সেজন্যে একজন এফিসিয়েণ্ট কর্মচারীই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে দরকার হ'লে জানাব—সন্ধানে থাকলে দেবেন।"

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফিয়ে উঠলেন ইন্দুভূষণ, "তুমি কি মনে করেছ বলতো! মতলবটা কি তোমার?" সযত্ন-রক্ষিত ধৈর্য্য বাঁধ ভেঙেছে এবার, রাগের মাত্রাধিক্যে আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। রাগের মাথায় টেবিলটা চাপড়েছেন সজোরে, সে শব্দে বুনো ধড় মড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল, শর্মিষ্ঠার পায়ের কাছে শুয়েছিল এতক্ষণ। কাণদুটো খাড়া, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ইন্দুভূষণের মুখে নিবদ্ধ।

শর্মিষ্ঠা তার মাথায় একটা হাত রাখল। শান্ত হবার ইংগিত।

একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বুনো শুয়ে পড়ল পূর্ববৎ।

ইন্দুভূষণ শান্ত হয়ে সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বসেছেন।···

শর্মিষ্ঠা হাসি চাপছে।···

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।···

—"দিদি, খাবার দেওয়া হয়েছে।" দরজার সামনে ভুবন।

শর্মিষ্ঠা উঠে পড়ল, "চলুন জ্যাঠামশাই, খেয়ে নিই। রাত হয়ে গেছে। আজ থাকবেন তো?"

নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ ছুঁড়ছে জানে। ইন্দুভূষণ এখানে থাকা মানে আজ আরও অনেকক্ষণ এবং কাল সারা সকাল এই একই প্রসংগের পুনরাবৃত্তি। সেই কথাকাটাকাটি আর ঝগড়া, সেই তাকে লুকিয়ে চাকরদের কাছ থেকে তার গতিবিধি, তার পরিচিত মহলের খবর সংগ্রহের প্রয়াস—অসহ্য। তবু এ প্রশ্নও করতে হয়। সৌজন্যের দায়।

কিন্তু ইন্দুভূষণ আজ তাকে রেহাই দিলেন। "না, আমায় ফিরতেই হবে আজ, গুরু দায়িত্ব রয়েছে মাথায়। গাড়ীটাকে কতকগুলো কাজে পাঠিয়েছি, ফিরলেই চলে যাব।"

খাবার টেবিলে খেতে ইন্দুভূষণের আপত্তি। তিনি এলে মাটিতে আসন পেতে খাবার দিতে হয়। এবারও দেওয়া হয়েছে তেমনি।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করার পর ইন্দুভূষণ মুখ খুললেন, "আসল কথাই বলা হয়নি এখনও। বিশে শ্রাবণ বীণার বিয়ে। ভগবানের কৃপায় বেশ ভাল একটি সম্বন্ধ পেয়েছি, একটিমাত্র ছেলে, অগাধ পয়সা। খরচও করতে হচ্ছে প্রচুর, নইলে অবশ্য ভাল সম্বন্ধ মিলবেই বা কেন বল। বীণাকে চিনলে না তো!···নিজের বংশের কাকেই বা চেন!···আমার ন'মেয়ে।···তা তুমি তো বাড়ীর মেয়ে, কাজ তো তোমরাই তুলে দেবে—নেমন্তন্ন আর কি করব। তা এই উপলক্ষ্যে চল না ক'দিন থেকে আসবে, বাপের বাড়ীটা তো ভুলেই গেলে।

শর্মিষ্ঠা অবাক। প্রস্তাবের আকস্মিকতায় যত না, ইন্দুভূষণের আগ্রহ দেখে ততই।···একথা মাথায় আসেনি কোনদিন। এখনই উত্তর দেওয়া সহজ নয় কাজেই।

তবু উত্তর একটা কিছু দিতেই হয়। যাবার একটা আন্তরিক ইচ্ছে থাকার এবং সুবিধা করতে পারলে নিশ্চয়ই যাবার মামুলি উত্তরে উত্তরটা এড়ালো আপাততঃ।

আরও বহুবার অনুরোধ করে বিদায় নিলেন ইন্দুভূষণ। আর মাত্র পনেরো ষোল দিন আছে হাতে। নানা কাজের ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে হবে, আর আসতে পারবেন বলে মনে হয় না—শর্মিষ্ঠা যেন নিশ্চয়ই যায়, না হলে বড় দুঃখ পাবেন ইন্দুভূষণ।

তিনি চলে যেতে দোতলায় নিজের শোবার ঘরের সামনে দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় এসে একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল শর্মিষ্ঠা। শ্রাবণ মাস। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। এলোমেলো বাদলা হাওয়ার দেহ-মন জুড়িয়ে দিল, আরামে চোখ বুজলো শর্মিষ্ঠা।

···নানা চিন্তা ভীড় করে এল মাথায়।···

পনেরো বছর আগে ইন্দ্রনাথ যখন শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠার বয়স সাত। তারও মাস ছয়-সাত আগে শর্মিষ্ঠার মা মারা যেতে ইন্দ্রনাথ খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বারাসাতে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিষ্টার নিজের পেশা নিয়েই মেতেছিলেন, ভাগনীর দিকে মনোযোগ দেবার কথা ভাবেননি। এই ছ'-সাত মাসের মধ্যে দু' একবার খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন অবশ্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।···ক'টা মাস শর্মিষ্ঠার অযত্ন আর অবহেলায় কেটেছিল, কোথাও এতটুকু স্নেহচ্ছায়া ছিল না, আশ্রয় মেলেনি কোথাও।

একান্নবর্তী পরিবার। জ্যাঠাইমা বাড়ীর গিন্নী। তিনি সেই বিরাট পরিবারের দায়-দায়িত্ব সামলে নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেবারই সময় পেতেন না বিশেষ। মা-মরা দেওরঝিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বুকে তুলে নেবার মত উদারতার অভাবও ছিল একটু।···তবু নাকি মেয়েটারই মুখের দিকে চেয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দেবরকে রাজী করিয়েছিলেন আবার বিয়ে করে সংসারে মন দিতে। অবশ্য রাজী করাতে বেগ পেতে হয়েছিল, এমন কথা বোধ হয় তাঁরাও বলতে পারতেন না।···এক পরিচিতের মুখে খবরটা শুনে ইন্দ্রনাথ ছুটে এসেছিলেন। শর্মিষ্ঠার দেহে অযত্নের ছোপটা পাকা হয়ে বসেছে ততদিনে, ইন্দ্রনাথের মত আত্মভোলা লোকেরও চোখ এড়ায়নি তা। রগচটা মানুষ, আর ইন্দুভূষণের তো কথাই নেই। ঝড় উঠেছিল বাড়ীতে। শর্মিষ্ঠাও বুঝেছিল সেদিন তাকেই কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হচ্ছে বড়দের আলোচনা-স্রোত। হঠাৎ-পাওয়া গুরুত্বে রোগা মুখের ডাগর দুটি চোখ তুলে বোবা-বিস্ময়ে তাকিয়েছিল।

ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভালো কথা, শান্তিভূষণ বিয়ে করে করুক, মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাই।"

ইন্দুভূষণের ঘোর আপত্তি ছিল। অভিজাত আপত্তি। মৈত্র বাড়ীর মেয়ের মামার বাড়ী মানুষ হওয়ার প্রস্তাব অসম্মানজনক। ভগবানের কৃপায় ছেলেমেয়ের অভাব নেই বাড়ীতে, তার একটা ভুগে ভুগে মরে গেলেও ক্ষতি হবে না তেমন, কিন্তু সযত্ন-লালিত আভিজাত্যের দম্ভে আঘাত না লাগে।

শান্তিভূষণ অন্য প্রকৃতির লোক। ইন্দ্রনাথের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার সাহস ছিল না। উপরন্তু, অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবটি দৈব-অনুগ্রহ বলেই মনে হ'ল। মেয়েটার দায়িত্ব এড়াতে পারলে নবোত্তমে দ্বিতীয়পক্ষকে নিয়ে সংসার-নদীতে তরণী ভাসানো সহজ হবে অনেক। আরও একটা কথা ছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর তেজী স্বভাবটা ভোলেননি, শান্তিভূষণ কেন, এ বাড়ীর কেউই কোনদিন নোয়াতে পারেননি তাঁকে। মেয়ের সংগে যোগাযোগ বিশেষ না থাকলেও বুঝেছিলেন তাকে নিয়েও দুরূহ সমস্যা দেখা দেবে। এখনই এ বাড়ীর সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগেও কচি মাথাটা তার নুইয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ইন্দ্রনাথের প্রস্তাবে তাই বেঁচে গেলেন ভদ্রলোক। ইন্দুভূষণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে কাগজে-কলমে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে মেয়েকে দান করলেন। করে মহান দাতার মতই আনন্দ পেলেন।

···মনভরা আতংক আর চোখভরা কৌতূহল নিয়ে শর্মিষ্ঠা মামার হাত ধরে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত পিতৃগৃহের বাইরে এসে দাঁড়াল।···

কলকাতায় জীবনটা একেবারে গোড়া থেকে শুরু হ'ল যেন। জাঠতুত বোনদের নামের সংগে মিলোনো নামটাও অতীতের মতই খসে পড়ল, 'শর্মিষ্ঠা' নামটা ইন্দ্রনাথের দেওয়া।

আত্মভোলা প্রকৃতির লোক, ব্রিফের কাগজের মাঝেই আত্মনিমগ্ন থাকতেন ইন্দ্রনাথ। শর্মিষ্ঠার প্রতি সচেতনতার অভাব ঘটেনি তা বলে। অফুরন্ত স্নেহ দিয়ে বশ করেছেন তাকে, গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। পড়িয়েছেন, দেশে-বিদেশে বেড়াতে নিয়ে গেছেন, গাড়ী চালাতে শিখিয়েছেন। দায়িত্ব ফেলে দিয়ে দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য করে তুলেছেন।

দীর্ঘ তের বছর কোন যোগাযোগ ছিল না বারাসাতের সংগে। কেউ কোনদিন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি তার জন্য। কেউ অর্থে জ্যাঠামশাই, বাবা, কাকা। আর কে করবে? মৈত্র বাড়ীর এঁরা কর্ত্তা যখন, এঁরা ছাড়া সে বাড়ীর আর কারো কোন অস্তিত্বই নেই। তা সেই কর্ত্তারা আগ্রহ প্রকাশ করা ছেড়ে দিয়ে, দায়সারা একটা কুশল সংবাদও নেননি কোনদিন। তথাপি ব্যারিষ্টার ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞানকে যে বিচারপতিরাও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, সেটা অর্থহীন ছিল না অবশ্যই। তারই সহায়তায় বুঝতে পেরেছিলেন শর্মিষ্ঠার বাবা-কাকার পক্ষে এই নির্লিপ্ততা যতটাই স্বাভাবিক, জ্যাঠামশায়ের পক্ষে ততটাই অস্বাভাবিক। অভিজাত দম্ভে সেই আঘাতটা ভোলেননি। নাহলে মাসে অন্ততঃ একবার ভাইঝির কুশল সংবাদ নেবার কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ঘটত না। তবু এও জানতেন তাঁর অবর্ত্তমানে ইন্দুভূষণ অন্ততঃ এখানে এসে অভিভাবক হয়ে বসবার চেষ্টা করবেনই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অকালেই ভেঙেছিল, সময় থাকতেই শর্মিষ্ঠাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাই সত্যই অসময়ে মারা গেলেন যখন, শর্মিষ্ঠা তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।···

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আবার। হাওয়ার ঝাপ্‌টায় ছাট আসছে এক একবার ইজিচেয়ার অবধি···শর্মিষ্ঠা তবু ওঠেনি। গত দুটো বছরের কথা ভাবছে শুয়ে শুয়ে।

ইন্দ্রনাথ মারা যেতে ইন্দুভূষণের প্রত্যাশিত আগমন যখন ঘটল, শর্মিষ্ঠা অবাক হয়নি। শুধু সতর্কতার আবরণে ঢেকেছিল নিজেকে।

ভাইঝিকে চিনতে অভিজ্ঞ ইন্দুভূষণের সময় লাগেনি, বুঝেছিলেন বশ করা সহজ হবেনা। নিজের অবস্থা সে ভাল করেই জানে, ইন্দুভূষণের উপদেশমত চলবার পাত্রী নয়। কিন্তু ভাইঝির প্রতি কর্ত্তব্য করতে এসেছিলেন অনেক আশা নিয়ে।···জমিদারী গেছে সরকারের হাতে, ক্ষতিপূরণের তারিখ অনিশ্চিত কালের গর্ভে বিলীন এখনও। অথচ নিজেদের ঠাট বজায় রেখে চলতেই হবে! আর যে কোন অবস্থায় কলকাতায় এমন একটা ঘাঁটি থাকার সুবিধে অনেক। আশাহত হননি তাই কোনমতেই, অনেক রকমে চেষ্টা করেছেন। অনেক বুঝিয়েছেন।

—"দেখ মা, তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে, সবই বোঝ। তোমার মামা যখন গতই হলেন, একা থাকা তোমার আর উচিত নয়। কলকাতা সহর, কত রকম যে বিপদ চারপাশে—"

—"একা কই জ্যাঠামশাই। ভুবনদারা রয়েছে সবাই, ড্রাইভার অবধি এখানে থাকে। আপনি অকারণে ভাবেন না।"

শর্মিষ্ঠার চোখের অবুঝ বিস্ময় দেখেও ইন্দুভূষণ টলেন নি, "তুমি বললেই কি ভাবনা যাবে মা। শুধু চাকর-বাকরদের মধ্যে রয়েছে, এটাই তো সব থেকে দৃষ্টিকটু।"

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠেছিল, যেন এর চেয়ে ছেলেমানুষী কথা কোনদিন শোনেনি।—"আমার কোন আচরণটা কার দৃষ্টিতে কটু ঠেকছে, সেই ভেবে চলতে গেলে যে মিলার এণ্ড হিজ সনের অবস্থা হবে জ্যাঠামশাই।"

উত্তরের কাঠিন্যটুকু ইন্দুভূষণ নিঃশব্দেই হজম করলেন, চোরের মায়ের কান্নার মত। ভাইঝির আচরণটা তাঁর দৃষ্টিতেও কটু কিনা জানান নি যখন, অপমানিত বোধ করবার পথ নেই।

এক টুকরো উচ্চাংগের হাসিতে মুখের আর সব ভাব ঢাকা দিলেন বরং, "তা বলে কি সমাজকে উপেক্ষা করা চলে! প্রতিবেশীদের কথাটাও তো চিন্তা করতে হয় বই কি!"

—"এখন সমাজের শাসন-টাসন ব্যাপারগুলো হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্যাঠামশাই। আর প্রতিবেশীর কথা' যদি বলেন, কলকাতায় কেউ কারো খোঁজ রাখে না—আর আমার তো ওসবের বালাই নেই দেখছেন। এ পাশে রাস্তা, ওপাশে পার্ক, সামনের ঐ নতুন বাড়ীটায় ফার্ম হয়েছে একটা।"

তর্কাতর্কিতে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। প্রস্তাবনা শেষ করে বিষয়-বস্তুতে এসে পৌছোন হয়ে ওঠেনি। দুর্বিনীত মেয়েটাকে কি করে আয়ত্তে আনবেন ভাবতে ভাবতে বিষয়ী ইন্দুভূষণের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে রাত্রে।

সোজাসুজি প্রসংগটার অবতারণা করেও দেখেছিলেন, "বড় একা থাকতে হয় তোমায়, যখনই আসি দেখে খারাপ লাগে। অথচ কলকাতা ছেড়ে আমার কাছে গিয়ে থাকতে বলতেও তো পারিনে—এমন ফারনিস্‌ট বাড়ী। তা তোমার ভাইরা কেউ কেউ এসে থাকতে পারে, এখানে থেকেই পড়াশুনা করবে না হয়—তোমার গোটাকতক কথা বলার লোক হয় তাহলে।"

মাছ টোপ গেলেনি, বরং মনে মনে হেসেছিল, "একা থাকতে আমার কিছু অসুবিধে হয় না, সংগী-বন্ধুরও অভাব নেই। মিথ্যে উতলা হবেন না।"

এরপরও চেষ্টা করেছিলেন ইন্দুভূষণ, কিন্তু কোনমতেই সুবিধা করতে পারেননি।

এমনি করে পুরো দুটো বছর কেটেছে। ইন্দুভূষণ ক্রমেই অধৈর্য্য এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, আর সেই সংগে তাঁর স্বরূপটা আত্মপ্রকাশ করেছে বারবার। প্রথম প্রথম মজা পেত শর্মিষ্ঠা, কথার মার প্যাঁচে জ্যাঠামশায়ের নব নব পদ্ধতি বিফল করে দিতে পারার আনন্দে নিজের মনেই হাসত পরে। আত্মপ্রসাদের হাসি। ক্রমশঃ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কৌতুকানুভূতি নির্বাপিত। ইন্দুভূষণের অফুরন্ত উদ্যমে হতচকিত হতে হয়েছে। আপাততঃ তাঁর আগমনটা ভীতিপ্রদ, প্রাথমিক ভদ্রতার আবরণটা অনেকখানিই তিনি উন্মোচিত করে ফেলেছেন এতদিনে।

সম্প্রতি এক নতুন চাল চেলেছেন। শর্মিষ্ঠার বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন এবং নিজের এক শ্যালক পুত্রকেই আদর্শ পাত্র বিবেচনা করছেন বর্তমানে। ছেলেটি বড় ভাল, বেশ ভয় ভক্তি করে। এ বিয়ে দিতে পারলে শর্মিষ্ঠাকে আয়ত্তে আনা সম্ভব বলেই তাঁর ধারণা।

ইন্দুভূষণের কোন ঘুঁটির চালটা অহেতুক নয়। যতই নিগূঢ় হোক, কারণ এক, একাধিকও বা, থাকেই ঠিক। অনেক ভেবেও শর্মিষ্ঠা তার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর এই আগ্রহের কারণটা অনুধাবন করতে পারেনি কিছুতেই। আজ শ্যালকনন্দনের গুণ ব্যাখ্যা শুনে সে রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল। ঘণ্টা কয়েকের বিনিময়ে আজ তাই অনেকদিন পরে ঝুলিতে তার তিক্ততার বদলে কৌতুকই জমেছে। তর্ক করে আজ ক্ষেপিয়ে তুলেছিল ইন্দুভূষণকে, জানে এই উদ্ধত, ভংগীটাই তাঁর সব চেয়ে অসহ্য।

আজ কিন্তু ইন্দুভূষণ সব রাগ ভুলে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বিস্মিতই হয়েছে, উত্তর দিতে গিয়ে বিব্রতবোধও যে করেনি একটু তা নয়। এখনও শুয়ে শুয়ে ভাবছিল হঠাৎ বারাসাতে গিয়ে থাকবার অবধি নিমন্ত্রণ ইন্দুভূষণ করে গেলেন কেন। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শর্মিষ্ঠাকে বশ করা সম্ভব মনে করেন নাকি?···ভাবতে ভাবতে একটা নতুন কথা মনে এল, শ্যালকপুত্রটি কি আর পিসতুত বোনের বিয়েতে আসবে না! চার-চক্ষের মিলনের সেই চিরপুরাতন পদ্ধতিটাই বেছে নিলেন তাহলে! নতুন কোন পরিকল্পনা আর মাথায় এল না!

···যাবে নাকি?···ঘুরে আসবে ক'দিন?···শ্যালক-তনয়টিকে দেখে আসবে একবার? পরখ করে আসবে, কত বিষয়-বুদ্ধি ধরে সে?

···কিন্তু এতো নেহাৎ কল্পনা-বিলাস নয়, যেতে যে সত্যি ইচ্ছে করছে!

মন বলছে, ঘুরেই আসি না, দেখি কত শক্তি ধরেন ইন্দুভূষণ মৈত্র যে নিজের ডেরায় পুরে ফাঁদে ফেলে বশ করবেন।

কিন্তু সত্যি বলতো, ইন্দুভূষণকে চ্যালেঞ্জ করার কথাই ভাবছ শুধু, আর কিছু নয়।

না, নিজেকেই তুমি ঠকাচ্ছ শর্মিষ্ঠা, আসলে মনটা তোমার নিজের অজ্ঞাতেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে! যে পিতৃগৃহ পনেরো বছর আগে ছেড়ে এসেছ, যার কথা অসংলগ্ন ক'খানা ছবির মত মনে পড়ে শুধু তাকেই আজ এই নিমন্ত্রণের সুযোগে জেনে নিতে চাও তুমি, চিনে নিতে চাও সে সংসারের মানুষগুলোকে। তাদের সংগে যে তোমার রক্তের সম্পর্ক!

বিয়ের আগের দিন বিকেল বেলা শর্মিষ্ঠা সত্যিই মোটরে বারাসাত রওনা হ'ল। ক'দিন নিজের মনে অহোরাত্র আলোচনা করে অবশেষে যাওয়া স্থির করে অমরনাথদের জানিয়েছিল। শর্মিষ্ঠার সংগে এঁটে উঠতে কোনদিনই পারেন না অমরনাথ, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবু হঠাৎ শর্মিষ্ঠার কয়েকদিন বারাসাতে বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাবে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত বুদ্ধি চিরদিনই আসে, আজ নতুন নয়। ইন্দ্রনাথ থাকতে তো বটেই, মারা যাবার পরও এই দু'বছরে অনেক উদ্ঘট প্রস্তাব সে করেছে, কিন্তু এটা যেন চূড়ান্ত মনে হ'ল। তবুও অমরনাথের যুক্তি, সুষমার বকাবকি, দেবাশীষ-নন্দিতার হাসি-ঠাট্টা—কিছুতেই টলানো গেল না তাকে।···বারাসাত বই তো আর সুন্দরবনে যাচ্ছে না। সুযোগ পাওয়া গেল যখন, জায়গাটা দেখেশুনে আসতে দোষ কি? কি করবে কি ওরা? সে কি ছেলেমানুষ, না কি ওরাই বাঘ-ভাল্লুক!

··তারপর একদিন গোছগাছ করে নিয়ে সত্যাই বেরিয়ে পড়ল। বেলগেছিয়া ছাড়িয়ে এসে অভয়পদ স্পীড দিয়েছে গাড়িতে।···দমদম এসে গেল···এয়ারোড্রোমের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে এয়ারোড্রোমটা চোখে পড়ে···প্লেন দাঁড়িয়ে আছে একটা।···আকাশ আজ পরিষ্কার, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই।··· রোদ পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু বর্ষা কালের বেলা শেষ হবে হবে করেও হয়নি, আলো আছে একটু। দুধারে বড় বড় গাছের সারি··· এদিকটা ফাঁকা অনেকটা। নাগরিকতা বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে এখনও, গ্রাস করবার নেশায় মুখ-ব্যাদন করেনি।···ছায়াচ্ছন্ন যশোর রোডে কোথাও কোথাও তাই নির্জন বনপথের শোভা।

অভয়পদর পাশে বসে আছে ভুবন, ভাবটা সুগম্ভীর। ভুবন চটেছে, নিদারুণ চটেছে শর্মিষ্ঠার অবিমৃশ্যকারিতায়। কদিন আগে শর্মিষ্ঠা যখন তাকে ডেকে বলল, একটা বাক্স বের কর ভুবনদা, জ্যাঠামশায়ের নেমন্তন্নটা রক্ষে করে আসি, ভুবন এমন করেই তাকিয়েছিল যেন সুন্দরবনের বাঘ ধরে আনবার হুকুম হয়েছে তার ওপর।

অতঃপর রাগারাগি, ঝগড়া। ভুবনের বহুবিধ আশংকা শর্মিষ্ঠা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। অবশেষে ভুবন বলেছে, "হাজার হোক সেটা শত্রুপুরী, বলা কি যায় কিছু! ধর যদি আমাদের খাবারে বিষ মিষিয়ে দেয় তখন?"

—"সত্যিই তো, এটা তো আমার মনে হয়নি এতক্ষণ!"

শর্মিষ্ঠার গম্ভীর ভাব দেখে ভুবন আশান্বিত হয়েছিল, "তবেই ত্যাখ! ওসব জায়গায় আমাদের যাবার কি দরকার দিদি!"

এবার শর্মিষ্ঠা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল, "সে তো ঠিকই! অন্তত: তোমার আর গিয়ে কাজ নেই ভুবনদা আমি একাই ঘুরে আসি।"

রাগে বাক্যস্ফূর্তি হয়নি প্রথমটার, তারপর শর্মিষ্ঠার সামনে দু'হাত নেড়েছিল ভুবন, "আর কত অপমান করবে! তার চেয়ে সোজাসুজি বল না তোকে আর পুষতে পারচিনি, দেশে যা!"

ষ্টোর রুমের উদ্দেশ্যে সবেগে প্রস্থান অতঃপর।

এই ভুবন শর্মিষ্ঠার আবাল্য পরিচিত। সদা-জাগ্রত প্রহরায় থাকে শর্মিষ্ঠার গায়ে আঁচড়টি না লাগে। শর্মিষ্ঠা বড় হতে ইন্দ্রনাথের সংগে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, কিন্তু যে শর্মিষ্ঠাকে তিনি জেদ করে নিয়ে এসেছিলেন, তার সংগে আজকের শর্মিষ্ঠার কোথাও কোন মিল ছিল না। সেদিন তারও যত ছিল ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংকোচ, ইন্দ্রনাথেরও তত ছিল তার সম্বন্ধে অস্বস্তি। শিশুকে আপন করবার উপায় জানতেন না ইন্দ্রনাথ, তাঁর তৃষ্ণার স্তূপে শিশু-রঞ্জক কোন গল্পের স্থান ছিল না।···আর শর্মিষ্ঠা ছিল ভীত, সঙ্কুচিত···মামাকে বলবার কোন কথা খুঁজেই পেত না সে, শুধু অহেতুক ভয়ে চোখ দুটো ভরে আসতে চাইত।···সেদিন সেই ছোট্ট শীর্ণ মেয়েটি যার কাছে নির্ভর আশ্রয় আর সস্নেহ আশ্বাস পেয়েছিল, সে এই ভুবন, ইন্দ্রনাথের খাস বেহারা। প্রথমদিনেই মনিবের ঝি রাখার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে শর্মিষ্ঠার সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।···

টানা রাস্তা ধরে গাড়ী ছুট্‌ছে জোরে···হঠাৎ চমকে শর্মিষ্ঠা নড়ে-চড়ে বসল, "ও অভয়দা, তুমি যে আর থামছ না! শুনেছিলাম তো এই যশোর রোডের ওপরই বাড়ী, ছাড়িয়ে এলে না তো! জিগেস কর না রাস্তার কাউকে।"

অভয়পদ সগর্বে হেসে ভুবনকে সাক্ষী মানল, "শুনছ ভুবন, রাস্তার লোককে মৈত্র বাড়ী কোথায় জিগেস করতে হবে!···হ্যাঁ দিদি, সাহেব যখন আসতেন—আপনাকে নিতে এলেন যেদিন—গাড়ী চালাই কি আমি! সে বাড়ী ভুলে গেছি?"
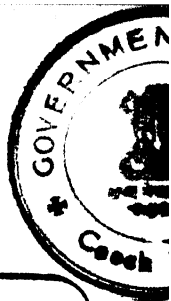
[ক্রমশঃ

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১০৫। তার পরে আর একদিন ;—

চাঁচর চিকুরে,···বর্হাবতংসের চারু চঞ্চলতা,

শ্রবণকুণ্ডলে,···কর্ণিকাফুলের উত্তেজিত কম্পন ;

অঙ্গে···স্বর্ণ-কপিশ অম্বর,

আজানু···বৈজয়ন্তী মাল্যের পঞ্চবর্ণময় হিল্লোল,

নটরাজশ্রী শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করছিলেন বৃন্দাবনের প্রান্তে। (৩০)

তিনি নাচছিলেন, আর নাচতে নাচতে চরণকমল দিয়ে ধরার বুকে আঁকছিলেন অঙ্কুশের পদ্মের বজ্রের ছবি। এমন সময় নাচতে নাচতে আঁকতে আঁকতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁর অধর-কিশলয়ের অগ্রভাগটিকে অচঞ্চল বেণু-ধারণের আধার করে নিয়ে বিস্তার করলেন তাঁর মালবশ্রী রাগিণীর শরৎকালীন আলাপ। অপূর্ব্ব সে প্রগাণ। (৩১)

বংশীখানিকেও বলিহারি। বিম্বাধর আর অরুণ করাঙ্গুলির কান্তি-প্রবাহে এত পূর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি, যে উদরের আর অন্তরের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর পক্ষে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল সে প্রগাণ-প্রবাহ। সে প্রবাহে কোথায় যেন ভেসে চলে গেল মালবশ্রী। দেখতে দেখতে দিগন্ত উৎপূর্ণ হয়ে উঠল বংশীর নব সৃষ্টি···মূর্ত্তিমতী রাগমালায়। (৩২)

মুরলীর রন্ধ্রটিকেও বলিহারি। শ্রীকৃষ্ণের সঘন চুম্বনে বিভোর হয়ে রমণী-মুখের সাদৃশ্য লাভ করে ফেললেন তিনি। দন্তের কিরণ বিলিয়ে হাসতে লাগলেন মৃদু। তাঁরও যেন ফুর ফুর করে কাঁপতে লাগল অধরের পল্লব। (৩৩)

১০৬। আর সত্যিই আশ্চর্যও বটে মুরারির এই মুরলী।

সরন্ধ্রা হয়েও তিনি কি নীরন্ধ্রা হয়ে যান

মধুপতির মুখরাগের বহু আমোদে ?

কঠোরা হয়েও তিনি কি রসপূর করে তোলেন

কাঠের মত কঠোর অন্তরকেও ?

না চুপ করে থেকে তিনিই না চুপ করিয়ে দেন

পশু পাখী ইত্যাদি বিশ্বকে ?

নিজে বংশ-জাতা হয়েও তিনিই না ব্যাকুল

করে দেন সদ্বংশজা বধূদের ? (৩৪)

শূন্যা হয়েও মুরারির সেই মুরলী স্বয়ং এখন চালিয়ে বেড়াতে লাগলেন সিদ্ধা রাগ-রাগিণীদের এক পাবের বাঁশের বাঁশী হয়েও প্রকাশ করতে লাগলেন অনেক পর্ব সুরের ; ধরে রইলেন অস্ফুট মধুর নাদগুলির রসময়তাকে।

বলিহারি যাই এই বাঁশের বাঁশীটির। তিনি ব্যাকুল করেন বিশ্বজগৎ, তাঁকে আনন্দে নিথর করে দেন, আবার সমুল্লসিতও করে [illegible] তাঁকে। (৩৫)

এই বাঁশরীর মধুর অস্ফুট কলনাদ স্বচ্ছবিলাসে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিভুবনে, প্রবেশ করে অন্তঃশ্রোত্রে, পীড়িত করে তোলে বিশ্ব-তনু। এত সহজ এত মধুর, তবু এই কলনাদই ছড়িয়ে দেয় নানান্ আকারের রস। সে রস কখনও বিতরণ করে পীযূষ, কখনও বিষ। (৩৬)

অতএব জয়ধ্বনি কর ; সেই শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির জয়ধ্বনি কর। এই আশ্চর্য। নিধান বেণুধ্বনির অনুচ্চ আহুতিতেই দ্রুত স্তম্ভিত হয় অম্বু ; পাহাড় গলে ; যে গাছ শুকিয়ে গেছে, আমূল উন্মূলিত হয়ে গেছে তাতে পাতা গজায় ; যে মুনিরা ব্রহ্মানন্দ-লয়ে পৌঁছে গেছেন তাদেরও উচাটন হয় মন। (৩৭)

১০৭। আস্বাদনীয়দের মধ্যে এই সু-প্রথমটির মাধুর্য্য অনুভব করতে করতে আনন্দে যেন মাতাল হয়ে পড়ল, অতএব যেন সর্ব্বসন্তাপ খণ্ডিয়ে ফেলল, অতএব যেন স্থাবর হয়ে গেল যা কিছু অস্থাবর। এমন কি ব্রজপুরের ভিতর-মহলের শ্রেষ্ঠা সীমন্তিনীরাও যূথে যূথে স্থাবর হয়ে গেলেন। অগণ্য শোভায় ঝলক দিয়ে উঠল তাঁদের অনুরাগের ঐশ্বর্য্য, আর তারপরেই তাঁদের মধ্যে নেমে এল শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যধনটিকে ধ্যান করবার সৌশীল্য। তাঁদের সকলেরই তুল্য-বাসনা, তুল্য-আস্থান। তাই তাঁদের সকলেরি শাখায় হঠাৎ যেন নীড় বেঁধে বসল একটি পরম সৌহার্দ্য। তাঁরা সকলেই হৃদয়ে অনুভব করলেন আলিঙ্গন, মানসে অনুভব করলেন বিকার। তারপরে তাঁরা সকলেই সেই দিন-শেষের বংশীধ্বনিটিকে উদ্দেশ করে, আনন্দোত্থ ভাষায়, পদার্থভূত-শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করতে করতে গেয়ে উঠলেন,—

কী আর কহিব মোরা !···

যারা নয়নধারী

তাদের নয়নের ভাগ্যেরে বলিহারি !···

তারা দেখেছে—

রাম আর দামোদরকে তারা দেখেছে,

বৃন্দারণ্যে বিহার করতে তারা দেখেছে

গোচারণের রাখাল-জোড়া রে।

নয়ন-কোণে ভাবের দোলা

তরঙ্গিত কৃপার লীলা

আনন্দকে তুঙ্গে তুলেছে ;···

তারা দেখেছে।

ঐ বাঁশরী, ঐ বাঁশীর ধ্বনি

ধরার যত মানুষ ছিল

তাদের ধৈর্য্য ধুনেছে ;···

তারা দেখেছে।

ও রূপের আলোর কি হয় চুরি রে ?

গোচারণের ঐ দুটি নয়ন-চোরা রে। (৩৮)

চন্দ্রক দুটি চুম্বিছে চূড়া

বিলসে বিলোল মালিকা

প্রতি বরাঙ্গে উজ্জ্বল ভূষণ

উলসে অলকা তিলকা।

ও সই,

দুটি নটবর রঙ্গে নেমেছে

নয়নে মাতন জেগেছে ;···

তারা দেখেছে। (৩৯)

গাইতে গাইতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন,—

…"তাঁরা ধন্যা, যাঁরা কেবল দৃষ্টি দিয়ে দূর থেকে এঁর মুখপদ্মটি দেখেছেন ;…তাঁরা ধন্যতরা, যাঁরা কেবল সেই পদ্মটিতে মিঠি দিয়েছেন,…আর ওরে সই, তোর মুখ দেখলে দিন ভাল যায়,…সেই অধর,…মুরলীকার পীত শেষ সেই অধরটি যাঁরা পান করেছেন, তাঁদের কথা আর বলিসনি তাঁরা ধন্যতমা। (৪০)

…ও মুরলী, ধন্যা তুমি ধন্যা ; শ্যাম তোমাকে পান করেছেন বার বার। তাঁর দশন-জ্যোৎস্নায় তুমি দিগ্ধা হয়েছ, তুমি ধন্যা। স্নিগ্ধা হলে তুমিই মণিত-মণিত করো কল-কূজন, আর ব্যাপিনী হলেই নিতান্ত চঞ্চল করে তোলো বন-ভুবন ; তুমি ধন্যা।" (৪১)

১০৮। …"আর ঐ দশনাবলীরই বা কী নিরূপণ করব আভি রূপ্য ? পাকা পাকা ছোট ছোট একরাশ দাড়িমের দানা যদি একটি রক্ত পদ্মের মাঝখানে স্থান পায়, কিংবা যদি একছড়া কুরুবিন্দ-ফুল হঠাৎ ঢুকে পড়ে বাস করে চাঁদের পেটের ভিতরে, তাহলে কোন রকমে একটু উপমা দাঁড় করানো যায় এঁর ঐ দন্ত-পংক্তির।" (৪২)

একদল সীমন্তিনী এবার একটু ঈর্ষ্যার ভান করে বললেন,—

…"বড্ড সাহস বেড়েছে বাঁশরীর। কৃষ্ণাধর পান করবার একমাত্র অধিকার রয়েছে পরকীয়াদের (সাক্ষাত্যেন গোপীনাং)। কিন্তু তাও পান করেছেন বাঁশরী। তারপরে সৌভাগ্যের রথ এমন ছুটিয়ে দিয়েছেন যে বিনি-যতনে রতনটি এখন স্বয়ং তাঁর সামনে এগিয়ে এগিয়ে আসছেন।" (৪৩)

…কী অধরই না পান করেছে বাবা মুরলী ! রসের শেষ কণাটি, ঐ দেখ সই, মিশছে গিয়ে নদীতে। ফোটা পদ্মের রোমাঞ্চ ফুটে উঠছে নদীগুলোর গায়ে। থামের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে রুদ্ধ প্রবাহ। আর ঐ দেখ সই, তরুরা কাঁদছে,…ঝরাচ্ছে ফুলের মধুর নয়ন জল।" (৪৪)

আর এক দল সীমন্তিনী বৃন্দাবনের ঐ প্রদেশটুকুর মৃত্তিকারও জয় দিয়ে উঠলেন। জয় দেবেন না ? কৃষ্ণের চরণ চিহ্নে ও মাটির বুক যে পত্রলতায় মত ছেয়ে রয়েছে ; বংশীধ্বনির অমৃতরসে বুকের ভিতর খানা যে তার ভিজে রয়েছে ; ও মাটির রোমে রোমে যে ফুটে উঠেছে যবাঙ্কুরের মত অজস্র হর্ষ। জয় দিয়ে উঠলেন তাঁরা। (৪৫)

আর একদল সীমন্তিনী বলে উঠলেন,—

"আমাদের মত লোকের পক্ষে বৃন্দাবনের মহিমা বুঝে ওঠা ভার। মুরারির একটি মুরলীর ধ্বনিতেই আশ্চর্য্য, ময়ূরদের লাস্য-বিলাস থেমে গেল, নিস্পন্দ হয়ে গেল তরুলতা, খুন হয়ে গেল বাতাস ? (৪৬)

…কী দুশ্চর তপস্যাই না করেছে সই, মৃগীরা। বাঁশুরিয়ার মুখ ওরা দেখছে তো দেখছেই। অমন যে ওদের সুন্দর চোখ, তাও আর সুন্দর বলে ওদের মনে হচ্ছে না। (৪৭)

…ওলো সই, সৌভাগ্য বটে ঐ কৃষ্ণসারীটির। দুই কৃষ্ণসারের বৌ হলে কি হবে, কৃষ্ণকেই সার করেছে অসার নয়নের। মুরলী-ধ্বনির মধু-ধারা ঝরে পড়েছে কৃষ্ণের মুখ-পদ্ম থেকে, আর ভয় নেই, ডর নেই ও বৌ পান করেই চলেছে মৌ, আশ্চর্য্য। (৪৮)

…আর তাও বলি, বেণু-ধ্বনি লোপাট করেছে বিমান-বনিতাদেরও মান, ওঁদের বিরে রয়েছেন ভালবাসিয়ে পতিদের দল ; কিন্তু থাকলে কি হবে ? কাণ্ডটি একবার দেখেছ ? লীলাভরে বাঁশের বাঁশরী বাজাচ্ছেন কৃষ্ণ আর ওঁরা তা দেখছেন, মুহুর্মুহুঃ ধৈর্য্য হারাচ্ছেন, মূর্চ্ছো যাচ্ছেন।(৪৯)

…স্বর্গ থেকেও ধৈর্য্যের প্রলয় ঘটছে দেবীদের। শিথিল নীবী, কবরী খসা। কোথায় এঁরা নন্দন-বনের ফুল ঝরাবেন, তা নয় সব ভুলে গিয়ে ঝরিয়ে চলেছেন নয়ন-জল। (৫০)

…আহা যব খেতে খেতে উৎকণ্ঠায় থেমে গেছে ধেনুরা। ঐ দেখ সই, ওদের দাঁতে লেগে রয়েছে এখনও আধ খাওয়া অঙ্কুর। ওরা কান খাড়া করে রয়েছে, চোখ ফুটিয়ে রয়েছে চিত্রার্পিতের মত। ওরা যেন শ্রুতির আধারে ধরে নিচ্ছে বেণুধ্বনিটিকে আকাশঝরা অমৃতের ধারার মত। (৫১)

আর এক দল সীমন্তিনী যেন এক অদ্ভুত প্রেমোদয় দেখে স-শীৎকার বলে উঠলেন,

"ওরা চুক চুক করে টানছেও না ওদের দুধের বাঁট, ছাড়ছেও না আবার একেবারে ; বাছুরগুলো গলার নীচেও নামাচ্ছে না দুধের ঢোক্। আর সখি, নৈচিকী গাভীদের দশা দেখেছ, কোথায় যেন তাদের হৃদয় ভেসে গেছে বাঁশীর তানে ; আর আশ্চর্য্য, অসীম একটি স্নেহ যেন সশরীরে এসে, ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওদের স্তনের ক্ষীর ; আর তাই পান করে সুখী হচ্ছেন ধরা। (৫২)

…আর ঐ দেখ সই, ওরাও…ঐ পাখীরাও বাঁশী শুনেছে, নয়ন দিয়ে রূপামৃত পান করেছে। ওরা এখন আবার ঐ রসের অনুভূতির বিলাসে চোখ বুঁজে ধ্যান করতে বসেছে।…বদ্ধ-মৌন মুনিদের মত। (৫৩)

ওদের স্পন্দন নেই, ক্রন্দন নেই, অন্য দর্শন নেই, অন্য শ্রবণ নেই, আহারে রুচিও নেই, কেবল রোমাঞ্চিতের মত ওরা ডানা কাঁপাচ্ছে আনন্দে, আর বেণুধ্বনিটির গ্রহণ করছে পরমাস্বাদ।" (৫৪)

আর এক দল সীমন্তিনী বিস্ময়ে বলে ফেললেন,—"ঐ দেখ সই, চক্রবাক আর হংসমিথুনের নক্সা-পাড় চেলীগুলোও খসে পড়ল নদীদের। মুরলী-নিনাদের আঘাতে ওঁদের অপস্মারে ধরল নাকি? বেরিয়ে পড়েছে সৈকতনিতম্ব,···ফেনায় ফেনা···আবর্ত্তে আবর্ত্তে ভিম্মি যাচ্ছেন ঘন ঘন। হল কি? (৫৫)

···আর ঐ শৈবলিনীদের রকম দেখ। ওঁদের তরঙ্গের হাতে পদ্মের অঞ্জলি! বাঁশীর তানে খুসিতে ভরে উঠেছে ওঁদের মন। শীকর-রসের পাদ্য বিরচন করে ওঁরা বহুমান দেখিয়ে শীতল করছেন কৃষ্ণের দুটি চরণ-কমল। (৫৬)

···আর ঐ মেঘটিকে দেখ। বাঁশী শুনে ওঁর যেন আর চেতনা নেই। তা সত্ত্বেও শরৎ-সূর্য্যের উত্তাপটাকে ঢেকে দিয়ে কৃষ্ণের মাথার উপর বেচারী ছত্রায়িত করে দিয়েছেন নিজের দেহ। যে পথে কৃষ্ণ চলেছেন সেই পথেই তিনি ভেসে চলেছেন। কৃষ্ণ মেঘবরণ বলেই তাঁর সাথে এত মৈত্রীর বিভাবনা মেঘের। (৫৭)

···নিসর্গ-বন্ধু মেঘ ছিটিয়ে দিচ্ছেন, কর্পূর-পুর পরমাণুর মত হিমজলের কণিকা, তারপরে কৃষ্ণের বাঁশীর তানের অনু-গান করতে করতে লাঘব করে দিচ্ছেন তাঁর গোচারণের পরিশ্রম।" (৫৮)

এমন সময় সীমন্তিনীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বমুখ্যতমা তিনি বলে উঠলেন,—"আহা, ঐ দেখ সই, কচি কচি ঘাসের উপর ঝরে রয়েছে,··· বল্লভতমাটির কুচ-কুঙ্কুম। পদারবিন্দ থেকে···"

এই পর্য্যন্ত বলেই তিনি থেমে যান। ভাবেন, তাঁরও মিলনের আসন্ন হয়েছে লগ্ন। সখীরা পাছে তাঁর মনের গতি ধরে ফেলে, তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন,—

"ঐ কুঙ্কুম কুড়িয়ে নিয়ে পুলিন্দ-সুন্দরীরা বুকে মাখছেন, মুখে মাখছেন। ওঁরা ধন্যা, ওঁরা ধন্যা। কেমন সজল হয়ে উঠেছে দেখ ওঁদের চোখ।" (৫৯)

তারপরেই আবার বললেন—

"সকলেরই কামনা···তাঁরি মধুরিমা। সে মাধুর্য্যের ঘরে ঢুকতে হলে অধিকারী অনধিকারী নিয়ে ভেদের কথা ওঠে না। ঠিকই হয়েছে; ঐ পুলিন্দ-সুন্দরীদের নয়ন যে ওতে ডুবেছে···তা ঠিকই হয়েছে। প্রেমের প্রকাশের এইই তো পথ। (৬০)

···আর এই গিরি গোবর্দ্ধন···যিনি প্রতি বেলায় তাঁকে তাঁর খেলায় উপযোগী কন্দ, কন্দর, জল, ফল, ধাতুরাগ জুগিয়ে ভজনা করে চলেছেন,···তিনিও সই ঐ দেখ, মাধবের লীলাসখা হয়েছেন, ভাগবতোত্তম দাস হয়েছেন। (৬১)

···তাঁর আশ্রয় যাঁরা নেন- সখি, তাঁদের উপরেই ঢলে পড়ে কৃষ্ণের কৃপা, কৃষ্ণ তাঁদের বিস্তার করে দেন প্রীতি,···এ তো তন্ত্রের প্রামাণ্য কথা। যাঁরা সাধন করতে চান শ্রেয়:, তাঁরা যদি যোগাও হন, তিনি সহায় না হলে, তাঁদের পক্ষে শ্রেয়: সাধন অসম্ভব।" (৬২)

১০১। এই নবতায়, এই অতিমানবতায়, বলবান একখানি অনুরাগের দাক্ষিণ্যে নিজেদের পরম ধন্যা বলে বিবেচনা করতে লাগলেন ধন্যাদি কুলকন্যারা। ফুটন্ত কুঁড়ির মত তাঁদের প্রত্যেকেরি কণ্ঠে ফুটে উঠল উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা হবে না? তাঁদের ঐ তিনি-টি যে কুলক-ত্রায়বিৎ বিজ্ঞদেরও গোচরের বাইরে।

তারপরেই তাঁরা কেমন যেন একটি লজ্জার নিভৃত বেগে অভিভূতা হয়ে পড়লেন। তারপরেই হঠাৎ এক আবেগের হিল্লোল বইল তাঁদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ে। এবং জন্মজন্মান্তরের যেন এক প্রবল ভালবাসায় তাঁরা সকলেই সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে বলতে লাগলেন,—

"হরির বংশীধ্বনিটি সই অসীম ক্ষমতা রাখে। ওর মন্ত্র,···স্বভাব ফিরিয়ে দেয় বস্তুর। ঐ বাঁশীর ডাকেই সচেতন নিশ্চেতন হয়, অচেতন পায় চেতনা। (৬৩)

১১০। ···"আর ঐ দেখ সই, স্তম্ভিত হয়ে গেছে···স্নেহে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে···হরিণেরা, গাভীরা, পাখীরা, নদীরা, মীনেরা, পাহাড় পর্ব্বত গাছ মাটি···সব। (৬৪)

···"কৈশোরে যে বংশীর কলধ্বনিটিকে অভ্যাস করেছিলেন কালিয়দমন, বল তো সই, এমন কোন্ কেলিমতী কুলীনা রয়েছেন যিনি নিবারণ করতে পারেন কালকূটের মত করাল সেই কালান্তক কলধ্বনিটিকে? ঐ বাঁশীই সই কুলের কলঙ্ক-কীল। (৬৫)

১১১। ···"ওলো সই, তোরা স্মরণ কর তোদের সেই চিরদিনের মহোৎসবী ব্রজরাজনন্দনকে। সত্যিই কি তাঁর হৃদয়খানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে ফুলবাণের আঘাতে? সত্যিই কি তিনি কেঁপে উঠেছেন বেণু-গানের গর্ব্বে? যাই হোক আর তাই হোক, আমাদের হৃদয় যে এদিকে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আর তাও বা হয় কি করে? হৃদয়ের প্রভু কি কখনও হৃদয়কে পোড়ান? ওলো সই, সেই গহন-সুন্দরকে তোরা স্মরণ কর, সৌন্দর্য্যে আলোর আলো করে তিনি বনতলে এসেছেন।"

পুর-সীমন্তিনীরা তখন যে যাঁর আশ মিটিয়ে স্মৃতি-পটোদিত শ্রীকৃষ্ণের আরম্ভ করে দিলেন রূপ-ব্যাখ্যান। পা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না সেই মঙ্গল-কাব্যে।

প্রথমা। কী সুন্দর···দীর্ঘ ঘন-কুঞ্চিত কেশপাশ। কী সুন্দর··· লতানো ভ্রূ···আননে। কী অলক, কী উন্নত নাসা।

দ্বিতীয়া। আর সই, তাঁর ঐ কপালটিকে ভবিষ্যুক্ত করে, দেখেছিস, কেমন ধীরে ধীরে ঘুরছে ভোমরা-চুল। না জানি কোন অঘ্রাণে ঘ্রাণ বিলোবে ও পদ্ম? (৬৬)

তৃতীয়া। আচ্ছা সই, মাধুরী সায়রে যেটিই পড়ে, সেটিই কি টেনে নেয় মধুরের গুণ? হবেও বা। অমন যে অমন গরুর পা-বাঁধা দড়ি···তাও পাগের সীমানায় বাঁধলেন মুরারি,···তাও ডুবল···মরি মরি সৌন্দর্য্যেরই সায়রে। (৬৭)

চতুর্থী। আহা কী সুন্দর গোল গোল দুটি গাল। না হয় একটু নীচুই হয়েছে। তাই তো ঐ গালে এসে লাগছে···নাচ, মকর-কুণ্ডলের উল্লাস-ভরা নাচ। আহা, যাঁরা ধন্যা, তাঁরাই তো ঘটা করে পুজো করেন সেই গোল গোল গাল দুটিয়,···তাঁদের তাম্বুল-সিক্ত অধরের বাঁধুলি ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে। (৬৮)

পঞ্চমী। ওঁর বুকের পাটাখানা দেখেছ?— শ্রীবৎসের উপর কৌস্তুভ; কৌস্তুভের উপর বনমালার সৌন্দর্য্যভার। কি মালাই না মানিয়েছে। সারা বুক জুড়ে যেন জ্বলেছে। অমন বুকের কপাট খুলে এমন কোন মেয়ে আছেন বলো যিনি না ঢুকতে চান অন্তরে? (৬৯)

ষষ্ঠী। দুটি ভুজ···পাশে পড়ে রয়েছে।··মনে হচ্ছে যেন মনোভব এক জোড়া মাতাল নাগ-যুবকের রূপ ধরে শুঁড় দিয়ে উদ্ধার করতে চাইছেন নীচের দুটো জানুর লাবণি। বলি সই, এমন কোন

ললনা রয়েছেন যাঁর হৃদয়-তড়াগে হঠাৎ না আলোড়ন আনবে··· ঐ দুটি? (৭০)

সপ্তমী। বলন বটে ত্রিবলীর! বেড়ে রয়েছে কোমর। কী সরু অথচ কী তেজী। সই, একটু একটু করে ও কোমর কাঁপছে। আমাদের মনের মাঝখানটাকেও কাঁপাচ্ছে! যে নিজে কৃশ, পরকে কৃশ করাও কি তার স্বভাব? (৭১)

অষ্টমী। নাভি তো নয়, লাবণ্য-কল্পতরুর যেন কোটর। সেই কোটর থেকে একদল সূক্ষ্ম ভ্রমরের মত ছুটে বেরিয়ে ওঁর হৃদয় পর্য্যন্ত দৌড়ে যাচ্ছিল উন্মুখ রোমাবলি, ঢালতে ঢালতে কালিমা। কিন্তু ওলো সই, হায় রে,···সেই ভোমরাই কি না কালসাপ হল, আর উল্টে আমাদেরি হৃদয় কি না দংশাল! (৭২)

নবমী। ওঁর পা-দুখানি বড় নিন্দুক। রাঙা কমলের রূপেরও কি না নিন্দে করে? শুনি, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশের চিহ্নও কি না ওঁর শোভা বাড়াতেই উদয় হয়েছেন। ওলো সই বল্ তো কবে,···ঐ মঞ্জীর-মণির উল্লাস-লাগা ওর আঙুলগুলি···কবে আমাদের ভূষণ হবে···বাজবে বুকের সীমানায়? (৭৩)

১১২। উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত-প্রাণা গোপ-কন্যারা এই ভাবে অনুরাগের মোহনতায় কোন রকমে শরতের দিনগুলিকে কাটিয়ে দিতে দিতে যদিও হা-হুতাশের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছলেন হেমন্তের হেম-দ্বারে, তবুও এতটুকুও ক্ষীণ হল না তাঁদের উৎসাহ আর অসমসাহসিকতার দুর্বার গতিবেগ।

১১৩। দেখতে দেখতে অঘ্রাণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, কপিশবর্ণ পিশঙ্গবর্ণ হয়ে উঠল শালিধান্যের কত্র মঞ্জরী; কহলার-গন্ধি অল্প অল্প জল জমে রইল তাদের মূল-দেশে; আর সেই জলটুকুর লোভেই যেন নুয়ে পড়ল মঞ্জরী। পরিষ্কারভাবে নিড়িয়ে-ফেলা বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রগুলিতে ধূমলবর্ণ ধারণ করল···যব আর গোধূমের মিলিত-মাধুর্য। মধুর হয়ে উঠল ধরাতল···গুচ্ছ গুচ্ছ কুস্তুম্বুর ধান্যের পাল ঘিরে ফুটে ওঠা মৌরী ফুলের সুকোমল সুন্দরতায়। প্রত্যেকটি বাস্তু-ভূমিতে বাস্তু-শাকের সে কী সুস্নিগ্ধ সমারোহ। আর দিকে দিকে, ইক্ষুক্ষেত্রের সে কী তেজস্বিনী শোভা।

শস্য-সম্পত্তির প্রথম প্রাচুর্য্য নিয়ে যখন উদয় হলেন ঋতু হেমন্ত, তখন স্বভাব-সিদ্ধা গোপকন্যাদের অন্তরেও জেগে উঠল কৃষ্ণভাবসিদ্ধি বিষয়ে সাধকের অপরিমিত অভিমান প্রীতি। তাঁরা তখন সকলে মিলে আরম্ভ করে দিলেন "উমা সেবন" ব্রত; এবং প্রত্যেকেই সঙ্গোপনে সঙ্কল্প করলেন, "গোপনাথ তখন যেন আমাদের পতি হন।"

ইতি রাধা-নব-সঙ্গমো নাম একাদশঃ স্তবকঃ। [ক্রমশঃ।

গাছকে একটি বিচ্ছিন্ন পত্র

শেখ আব্দুল জব্বর

কী শ্রোতব্য
সংক্ষিপ্ত কাহিনী!
শোন
আর বেড়ে উঠবার সবুজ আগুন নেই
শরীরে
নেই মহারণ্যে গান শোনবার সূচীমুখ ঠাঁই
রাত্রির জোনাকি জোছনার আলো নিয়ে
আর পাবেনাক ওই
বিশাল শরীরে
হিমসিক্ত, স্নাত, গাঢ় সবুজ রঙে ওষ্ঠ প্রান্ত,
যার স্পন্দন
মসৃণ হাওয়ার মতো তোমার শরীর
পুলকিত গানে ভরে দিত।

আজ আমি ছিন্নমূল
মাটি কিম্বা তোমার শরীর থেকে,
আচম্বিতে কাল যে বৈশাখী-রাত্রি এনেছিলো,
রাত্রি ভোর ধ্বংসের কারণ যে
ঝড়, সে এক ধূসর ডানার সুদক্ষ ঈগল
তীক্ষ্ণ ঠোঁটে ছিঁড়ে নিয়ে
আমাকে তোমার থেকে
মহাকাশে অবিরাম ডানার ঝাপ্‌টা মেরে ক্লান্ত,
আরো ক্লান্ত, আরো ক্লান্ত করে দিত।

রিফিউজি

শ্রীঅমূল্যচরণ মাইতি

নীড়হারা পাখী দুটো কেঁদে কেঁদে ফিরে—
শুধু ওরা মাথা কুটে মরে,
ভেঙ্গে গেছে নিদারুণ ঝড়ে আজ বাসা—'কাঁচা ঘর খাসা'।
ধূসর শুক্‌নো ঘাস, খড় কুটো, কাঠিগুলো উড়ে,
ঝড়ের ঝাপ্টা লেগে কোথা গিয়ে পড়ে—
কে দেবে ঠিকানা তার কোথা সেই ছোট কচি নীড়—!
—অনাবিল চির শান্তির।
আজ নাই,—নাই—নাই ঘর—
দু'দিন আগেও ছিল কতো নির্ভর,
যেখানে সেদিনও ওরা বসে ছিল কাছাকাছি অতি:
নিবিড় ডানায় ঢেকে আনন্দেতে কাটাতো যে কতো দিবারাতি;
ওই তো সকালে ওরা দিয়েছিল শিস—
আকাশে-বাতাসে সেই প্রার্থনায় ভরে দিয়ে দিশ
এখন গভীর ব্যথা মাথা কুটে মরে—
পাখী দুটো কেঁদে কেঁদে ফিরে।

একটুকু সে নীড়ের খড়কুটো পড়েছিল কোথা যেন শিরিষের পাশে—
নীড়ের আস্বাদ চেয়ে তাই ওরা খুঁটে খুঁটে কি যেন কি আশে!
মিছেমিছি শুধু: কোথা শান্তি, কোথা সেই মধু!
নিথর দৃষ্টিটা ফেলে তাই ওরা চেয়ে থাকে, যেন উদাসীন—
আকুল প্রাণের ভাষা দিগন্তে বিলীন—
—জানেনা নিষ্পাপ পাখী রিফিউজি ওরা,—
নিষ্ঠুর প্রকৃতি হাতে নীড় হারা—ওরা সর্বহারা।

বিজ্ঞানভিক্ষু

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

সতেরো

চিরন্তনী

"You can't win."

—Anon.

শংকরের বাক্স-বিছানা গোছানো শেষ হয়েছে। এমন সময়ে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো সুমিত্রা। শংকর আপন মনে খাতাপত্র হাতব্যাগে ভরে যায়—একবার তাকিয়েও দেখে না।

রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বলে, "তা হলে দেখছি, আমার উত্তর তুমি শুনতে চাও না।"

শংকর ভারী গলায় বলে, "থাক। উত্তর দিলে সেটাও হবে অভিনয়, তোমার মনস্তত্ত্বের আর একটা প্রজেক্ট।"

সুমিত্রা করুণভাবে বলে, "শংকর, আমার কোনো উপায়ই ছিল না তোমায় বলার। একবার স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখো—তুমি যদি ঘুণাক্ষরেও এ-প্রজেক্টের স্বরূপ জানতে, তাহোলে কি এত বড়ো আবিষ্কার সম্ভবপর হোতো? তুমি জানো না, শংকর, কী তপস্যা আমাকে করতে হয়েছে নারীজীবনের সবচেয়ে বড়ো কাম্য দূরে সরিয়ে রাখতে। বোঝো না তুমি কী হতাশায় কী আতংকে আমার দিন কাটত, শুধু তোমাদেরই সাফল্যের মুখ চেয়ে?"

শ্লেষের সুরে শংকর বলে, "আমার সাফল্য, না, তোমার? মিথ্যা কথা বলে তো লাভ নেই, সুমিত্রা। তোমাকে করেছিলাম সরল মনে বিশ্বাস—বুড়ো শিকদারকে প্রায় বহিষ্কৃত করে দিয়েছি এ-প্রজেক্ট থেকে। এর জন্য তোমার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারো?"

শংকর এবার ঘুরে দাঁড়ায় সুমিত্রার দিকে, তারপর বলে—"জানো সুমিত্রা, শিকদারের কী অবস্থা আজ? 'নার্ভাস ব্রেকডাউন'-এর ফলে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে। তোমার মনে এতোটুকু করুণা হোলো না অতোবড়ো প্রতিভাটাকে চিরতরে অকেজো করে দিতে—সামান্য একটি খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য?"

সুমিত্রা বোঝাতে চেষ্টা করে—"তুমি কি মনে কর, সে জন্য আমার কোনো দুঃখবোধ নেই? কেন বৃথা অভিমান করছ, শংকর, আর একবার ভেবে দেখ শিকদারের লড়াই তো সত্যের সংগে! নিজেরই গড়া লোহার বেড়ায় ক্ষত বিক্ষত হলেন তিনি। এর জন্য দায়ী তাঁর সংস্কার। তোমার তো দোষ কিছু ছিলই না—আমারও দোষ নেই।

"শিকদারের নাম তালিকায় ওঠে কেবলমাত্র প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীর আগ্রহেই। আমি আপত্তি তুলেছি। বলেছিলাম—যে বৈজ্ঞানিকের প্রধান উপজীব্য অপরের ছিদ্রান্বেষণ, তিনি কি আবার নূতন করে ভাবতে পারবেন? কৃষ্ণস্বামী বলেছিলেন যে দুএকজনের দরকার কল্পনার রাশ টেনে রাখবার জন্য—একটা 'চেক'—আর 'ব্যালান্স'-এর ব্যবস্থা থাকাও দরকার।"

শংকরের মনে কোন যুক্তিই রেখাপাত করে না—"কিন্তু সুমিত্রা, আমার নিজের কাছে অপরাধী হোয়ে থাকব যে চিরকাল—নিজেদের দায়িত্ব যতো জোর গলায়ই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি না কেন? বৃথা তর্কে লাভ নেই সুমিত্রা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই নাও আমার পদত্যাগপত্র। কৃষ্ণস্বামীর সংগে দেখা করার সময় নেই। এটা তাঁকে দিও।"

সুমিত্রা বিহ্বলা হয়ে বলে, "আজ তোমার জয়গান দিল্লীর কোণে কোণে; রাত্রে হয়েছে উৎসবের আয়োজন প্রধানতঃ তোমাকেই অভিনন্দিত করবার জন্য। আর তুমিই কিনা পদত্যাগ করবে?"

শ্লেষের হুল শংকরের কণ্ঠে, "সামান্য একজন পদার্থবিজ্ঞানীর থাকাতে বা না থাকাতে কী আসে যায়, তোমাদের অনুষ্ঠানে? দরকার হলে গণ্ডায় গণ্ডায় আমার মতো গিনিপিগ পাবে তোমার মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য। না হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হয়ে বাকী জীবনটা চর্বিত চর্বণ করলাম—কিন্তু সেটাও তো এই সোনার খাঁচায় প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকার চেয়ে ভালো।"

শংকর কষাঘাতের ওপর কষাঘাত করে যায়, "আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি তুমি ভারত সরকারের যতো খেতাব আছে লাভ করো; মানুষকে অমানুষ বানাবার যা কিছু পরিকল্পনা আছে তোমার, সবই সাফল্যমণ্ডিত হোক একটার পর

একটা করে! কিন্তু আমাকে রেহাই দাও—এখন পথ ছাড়ো, আমার গাড়ীর সময় হয়ে এসেছে।"

শংকর বিছানা বাক্স কাঁধে ফেলে দীর্ঘপদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শংকরের পদত্যাগপত্র হাতে করে।

[এই বন্ধনীর মধ্যের অংশটুকু রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা বাদ দিলেই ভালো করবেন কারণ মূল কাহিনীর সংগে এ সমস্ত কচকচির কোনো সম্বন্ধ নেই।

গল্পটা এখানে শেষ করে লেখক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ভাবলেন কোনোরকমে আর্ট বজায় রাখা গেল। কিন্তু ঘরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলে, লেখকের 'আন্সার্টেনটি প্রিন্সিপল' যাঁর প্ররোচনায় 'সার্টেনটি'-তে পরিণত হয়, গৃহের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কড়া নির্দেশে আবার কলম ধরতে হোলো।

কিন্তু কলম ধরলেই তো আর চলে না—সামনে এখন বিষম সমস্যা—লেখক আর্ট বাঁচাবেন না 'থার্মোডাইনামিক্স?'

কথাটা একটু ভেঙে বলা যাক।

'থার্মোডাইনামিক্স'-এর চারটে নিয়ম আছে (কারো কারো মতে তিনটে)। অনেক রকম ভাবে এ নিয়মগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া চলে। পদার্থবিজ্ঞানে—এক রকমের সংজ্ঞা পাওয়া যায়—আর রসায়ন—জৈব রসায়নে আর এক রকমের অন্ধহস্তী ন্যায়। থার্মোডাইনামিক্স-এর নিয়মগুলো বলে দিচ্ছে আপনার কারিকুরি সীমা। সব কটাই এর মধ্যে নেতিবাচক। একজন পদার্থবিজ্ঞানী হতাশ হয়ে চারটি নিয়মের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—

১। "You can't win."

২। "You can't even break even."

৩। "Things are going to get lot worse before they get any better."

৪। "Who said things are going to get better?"

বিজ্ঞানের মার্জিত ভাষায়, এ গুলোর অর্থ—

আমাদের নতুন শক্তি সৃষ্টি করবার সাধ্য নেই। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে শক্তি মজুত আছে (আইনষ্টাইনের $E=mc^2$এর নিয়মে বস্তুর শক্তি) সে শক্তি ভাঙিয়েই চিরকাল আপনাকে খেতে হবে। কিন্তু এই শক্তির ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। যে শক্তিটা কাজে লাগানো সম্ভব, তার তহবিল আস্তে আস্তে কমে আসছে। আর একটা মোক্ষম কথা—সর্বত্রই শৃংখলা ভেঙে বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে। একদিন আসবে, যেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পড়ে থাকবে চরম বিশৃংখলা—জড় ও জীবের হবে পরম নিলয়।

আপনারা ভাবছেন, এ তত্ত্বকথার সংগে আমাদের আসল গল্পের সম্বন্ধটা কি? লেখকের মাথাই কী খারাপ হোলো শেষে?

একটু সবুর করুন—লেখক আসছেন সে কথায়।

সমস্যাটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স্ এর দ্বিতীয় নিয়ম নিয়ে। সর্বত্রই শৃংখলা ভেঙে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে বিশৃংখলার 'অ্যানথ্রোপোমরফিক্' ডেফিনিশন ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার লেখার টেবল সম্বন্ধে আপনার গৃহলক্ষ্মীর যে মতামত, তার ওপরে ভিত্তি করেই আমাদের বিশৃংখলার 'ডেফিনিশন'।

'থার্মোডাইনামিক্স্'-এর অভিধানে বিশৃংখলার নাম হচ্ছে 'এনট্রপি'। 'এনট্রপি'র অবশ্য আরো সংজ্ঞা আছে—যেমন যে তাপকে কোনো কাজে লাগানো যায় না।

এখন ধরুন একটা বাক্সের একধারে আপনি কতকগুলো কালো বল রাখলেন অন্য ধারে কতকগুলো লাল বল। বাক্সটা বন্ধ করে কষে নাড়া দিলে কী হবে? লাল বল কালো বলের সংগে মিশে গেছে—শৃংখলার বদলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে—আমাদের ভাষায় 'এনট্রপি' বেড়ে গেছে। বাক্সটা না খুলে হাজার নাড়া দিলেও আবার লাল বল আর কালো বল সবগুলো আলাদা করা যাবে না।

কিংবা ধরুন—গরমের দিনে মিছরির সরবতের কথা। এক ধারে রয়েছে মিছরির স্ফটিকদানা—কী অপরূপ তার কারুকার্য! আর একদিকে রয়েছে ঠাণ্ডা জল এক গ্লাস টলটলে, কাকচক্ষু! দুটো একসংগে মেলালেন মিছরির স্ফটিকের অমন চমৎকার শৃংখলা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। 'এনট্রপি'র উন্নতি হয়েছে।

শংকর রায়। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। নেগেটিভ 'এনট্রপি'র হিমালয়ে চূড়া—('পজিটিভ' এনট্রপির অতলস্পর্শী গহ্বর) দৈনন্দিন অভ্যাসে তার নিয়মতান্ত্রিকতা না থাকলে কী হবে, তার স্বকীয় একটা ছন্দ আছে—হোক না তা অমিত্রাক্ষর।

ধরুন, সুমিত্রার সংগে তার মিলন শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। লাল বলের সংগে কালো বল মিশেছে। মিছরি স্ফটিক মিশেছে এক গ্লাস জলের মধ্যে! কী হোলো? 'ডিসট্রাকশন'—'ডিফর্মেশন'—'ডিসরগ্যানাইজেশন,'—'ডিস্রাপশন'—'ডিসল্যুশন'—'ডিসর্ডার'—যতো ডি-র ছড়াছড়ি। এনট্রপির ক্রমোন্নতি, বিশৃংখলার মেদস্ফীতি!

আর সুমিত্রা! মিলনের পাঁচবছর—দশবছর পরে কোথায় থাকবে তার নিজস্ব ছন্দশৃংখলা! টেবলের ওপরে ফিকে নীল রঙের ঢাকা মলিন হয়ে গেছে। তার ওপরে রয়েছে স্ফীতকায় টেক্সটবই ইতস্তত: ছড়ানো—"ম্যাগ্নেটোহাইড্রোডাইনামিক্স" "সলিড ষ্টেট ফিজিক্স," "কোয়ান্টাস ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স্"। আর সিগারেটের ছাই। আর কাগজের টুকরো, চিরকুট কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং মার্কা দুর্বোধ্য ইকোয়েশন তাতে! দেরাজের ওপরে ফুলদানীতে মরশুমী

ফুলের গুচ্ছ কোথায় গেল ? অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে সে ফুলদানী—দুরন্ত শিশুদের মাতামাতিতে ! এনট্রপি বেড়ে গেছে !

এখানে আপনারা একটা প্রশ্ন তুলবেন জানি। বিবর্তনের ফলে দেখা যাচ্ছে—যে প্রাণীজগতের ধাপে ধাপে 'এনট্রপি' কমেই আসছে—অর্গানাইজেশনের জটিলতা আর শৃংখলা বেড়ে চরমে পৌচেছে মানুষে এসে। অথচ থার্মোডাইনামিক্স্-এর নিয়মে তো তা বেড়ে যাওয়ার কথা। তবে কি থার্মোডাইনামিক্স্-এর নিয়ম খাটছে না ?

না সার, ব্যাপারটা সোজা নয়। মানুষ নিজের শৃংখলা বাড়িয়ে চলেছে আশপাশের সমস্ত কিছুর শৃংখলা ধ্বংস করে। প্রাণধারণের জন্য আহার করতে হবে, নিঃশ্বাস নিতে হবে। সেখানে আহার্য্য দ্রব্যের শৃংখলা আকস্মাৎ করেই মানুষের এই ক্ষণিকের উন্নতি !

অথবা ধরুন, জীবজগতের বিবর্তন আমাদের গ্রাভলের স্রোতে আবর্তের মধ্যে দেখা যায় যে স্রোত বিপরীত দিকে চলেছে—যদিও আসল বড় নদীটা অনিবার্য ভাবে বয়ে চলেছে শৃংখলার তুষার ধবল পাহাড় থেকে বিশৃংখলার মহাসাগরের দিকে ;

'থার্মোডাইনামিক্স্'এর নিয়ম অমোঘ। এনট্রপির ঋণ একদিন শোধ দিতেই হবে। আজ না হোক শত কোটি বছর পরে !

আর একটা কথা, ভেবেছেন ভেক ধারণ করলেই বুঝি থার্মোডাইনামিক্স্-এর পেয়াদা এড়াতে পারবেন। সে গুড়ে বালি। বিয়ে করলেও এনট্রপির বৃদ্ধি বাতবৃদ্ধির মতোই। বিয়ে না করলেও তাই। আর্ট বাঁচুক, সাহিত্য বাঁচুক বা প্রাদেশিকতা বাঁচুক সেটা কোনো কথাই নয়।

দেখা গেল, উপরোক্ত মন্তব্যগুলোতে গৃহের সেই অধিষ্টাত্রী দেবীর বিশেষ আপত্তি। সংসারে তাঁর হাড় মাস কালি হয়ে গেলেও এ কথা তিনি মেনে নেবেন না যে মিলনটা একটা 'ডিসর্ডার'। ইস্কুল কলেজে তিনিও থার্মোডাইনামিক্স্ দু এক পাতা পড়েছেন। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী কিনা তাই তিনি বলেন যে মিলিত জীবনটা হচ্ছে একটা হায়ার ফর্ম অফ অর্ডার ! তাছাড়া আরও একটা যুক্তি আছে তাঁর নড়বার চড়বার স্বাধীনতাটাও একটা মাপ 'এনট্রপি'র। যেহেতু তাঁর স্বাধীনতা (এখানে লেখকের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না—তাস, দাবা, পাশা অনেক কিছুতেই যে লেখক জলাঞ্জলি দিয়েছেন সংসারের ভৈরবীচক্রে পড়ে এটা তাঁর মনেই আসেই না) খর্ব হয়ে গেছে অতএব 'এনট্রপি'ও কমে গেছে।

তাঁর এ সমস্ত দার্শনিক স্বপ্নবিলাসে আর একটা আপত্তি আছে তবে সেটা অবৈজ্ঞানিক। লেখকের কোনো আক্কেল নেই। বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে থার্মোডাইনামিক্স্ ঢুকিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কলুষিত না করলে কি চলতো না ? পাড়ার ডেঁপো রকবাজ ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হোলো একটা অস্ত্র ! বুড়োবয়সে এ ভীমরতিই বা কেন ?

আসলে তাঁর আক্রোশটা হচ্ছে বিয়োগাংক সমাপ্তি ওপরে। মেয়েদের ভালো লাগতে হলে গল্পটা কেবল মিলনাত্মক হলেই চলবে না, নায়ক-নায়িকাকে একেবারে গৃহস্থ করে ছাড়তে হবে। এ সম্বন্ধে দেখা গেল স্থানীয় মহিলা সমাজ একমত। "Democracy is an oppression by majority."

—এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে লেখককে আবার কলম ধরতে হোলো।

আপনি কী করতেন ?

আপনি জানেন এর উত্তর ? বিরহটা সুখের না মিলনটা সুখের ? কোনটা আর্ট আর কোনটাই বা তার বিচ্যুতি ?

আর সাহিত্যকে কলুষিত করার কথা যদি তোলেন ভেবে দেখুন তো কতো ভেজালই মিশে গেছে সে সাহিত্যের মধ্যে। আর এ বইখানা যে সাহিত্য সে কথাই বা কে বললে ? সত্যিকারের সাহিত্যিক মূল্য এ উপন্যাসের প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। মিশলোই না একটু থার্মোডাইনামিক্স এই লন্তির মধ্যে। আর রকবাজ তরুণদের কথা ? লেখকের মনে পড়ে তাঁর নিজের বিবর্তনে রকবাজ জীবনের মধু-স্মৃতি। কী এমন আসে যায় যদি আজকের ছেলেগুলো বৈজ্ঞানিক খিস্তি খেউর করে ?

ভদ্রমহিলার প্রথম আপত্তিগুলোর কিন্তু চট করে জবাব দেওয়া চলে না। ওটা 'অ্যাষ্ট্রনমি'র 'টু-বডি' 'প্রব্লেম্।' পরিবার বৃদ্ধি হলে 'মালটি বডি প্রব্লেম্' আর সমাজে বাস করতে গেলে 'মালটি-মালটিবডি প্রব্লেম্' হয়ে দাঁড়ায়। শেষে 'স্টেলার ডাইনামিক্স'এ সন্ধান করতে হবে উত্তর। পাওয়া যাবে কি ?

da Rochefoucoult দিয়েছিলেন কিন্তু একটা মোক্ষম উত্তর—

"Marriage can be happy, but never delicious"

বন্ধুবর ডাঃ—দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। পাণ্ডুলিপিটা শেষ করে মন্তব্য করেন "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বইখানার দর্শনে বনসাংকর্য এসে যাচ্ছে যে !"

লেখক উত্তর দেন, একটা 'গ্যাজেট' তৈরী করবার জন্যই এত ধ্বস্তাধ্বস্তি। তৈরী হল গ্যাজেট, চুকে গেল ল্যাটা। এখন ফিলসফির ধার কে ধারে ?"

কিন্তু প্রশ্নটা তলিয়ে দেখবার মতো।

সত্যি কি খাঁটি 'ফিলসফি' বলতে কি কিছু আছে জগতে ? সব রকমের ফিলসফি'র জগাখিচুড়ী দিয়ে মানুষ তৈরী হয়েছে।

কোনোদিন বৈরাগ্যের ঘরসীমায় কোনো বিষাদ মন মুহূর্তে করেননি ডেভিন হিউমের মতো আর্ত ক্রন্দন ?

"Who am I, or what ? From what cause do I derive my existence, and to what condition shall I return ? whose favour shall I court, and whose anger must I dread ? What being surround me ? And on whom have I any influence, or who have any influence on me ? I am confounded with all these questions, and begin to fancy myself in the most deplorable condition imaginable, Inviron'd with the deepest darkness and utterly depriv'd of the use of every member and faculty.

আবার যখন জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে ওঠে—আত্মবিশ্বাসে স্ফীত হয়ে যায় বুকখানা তখন আপনার ফিলসফি টমাস রীডের—

"...The notion of the present existence, and the belief that what we perceive or fell does now

exist...the notion of a mind and the belief of its existence.” এই হচ্ছে সার কথা !

তার পর ছাত্র বা পুত্রস্থানীয় যারা, কি অধস্তন কর্মচারী এদের শাসন করবার সময় আপনি পুরোমাত্রায় wittgensteinist.

“If a question can be put at all it can also be answered”

কোন ফিলসফিটা নেই আপনার মধ্যে ?

বার্কলের 'আইডিয়ালিজম্', কান্ট-এর 'ট্রান্সেণ্ডেণ্টালিজম,' লাইবনিৎস-এর 'স্পিরিচুয়ালিজম্,' লক-এর 'এম্পিরিসিজম' হেগেল-মার্কসের 'ডায়ালেকটিক্‌স্' কলিংউডের 'হিষ্টোরিসিজম'—সব। তার ওপরে পড়েছে পলস্তরা—জঁা পলসাতরের অস্তিত্ববাদের (existentialism) উইটগেনষ্টাইন আয়ারের—লজিক্যাল পজিটিভিজমের। ওর ওপরে আছে ব্র্যান্সার্ড-করজীবস্কির 'সাঙ্কেতিক লজিক', আর আলেকজান্দার হোয়াইটহেড কারনাপের 'ধেঁায়াবাদ'! এতেই শেষ হয়নি। তার পরও এই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মধ্যে রয়েছে অমুকের গাঁজাবাদ, তমুকের ঘোড়ার ডিম বাদ, কারো বা ডুমুরের ফুল বাদের ছোলাভাজা মটর ভাজা।

খাঁটি ফিলসফিটা কোথায় ?

হস্তরেখা বিচার বিশ্বাস করেন আপনি ? একেবারেই কি করেন না ? মেনে নিচ্ছি যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তার নেই। কিন্তু একটুও কি করেন না ? দেখুন ধরা পড়ে গেলেন তো !

আমাদের সকলের মগজেই হবিবুল্লার লাইব্রেরীর অবস্থা !

আজকের পদার্থ বিজ্ঞানী বিশ্বাস অবিশ্বাসের উর্দ্ধে। সবই তারা বিশ্বাস করেন আবার সবতাতেই তাদের অবিশ্বাস। হাইসেনবার্গের 'আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল' আর আইনষ্টাইন—মিলনে রাদারফোর্ডের 'রিলেটিভিটি থিয়োরি' পদার্থবিজ্ঞানের সব কিছুই চর্বণ শেষ করে এখন দর্শনকে গ্রাস করতে চলেছে। বোর—রাদারফোর্ডের পরমাণু তো ধেঁায়ায় মিলিয়ে গেছেই—এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই ধারার ব্যংগ করবার জন্ত এক মার্কিণ ইঞ্জিনিয়ার অনেক দুঃখেই spiral universe বলে এক কসমোলজির পত্তন করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা কিছুটা শুনুন।

“Each ultimote (=the “ultimate unit” of the universe) is simultaneously an integral part of zillions of other plane units and thus is its infinite all plane velocity and energy subdivided into zillions of finite planar quotas of velocity and energy.”

খুবই প্রাঞ্জল, না ?

লেখকের এক বন্ধু কোয়াণ্টাম মেকানিক্‌স্-এর পাঠ নিতে গিয়েছিলেন ওদেশে। প্রথম ছ'মাস বেশ আনন্দের সংগেই কাটলো গণিতের কায়দাগুলো রপ্ত করতে। তারপর হোলো মুস্কিল। বন্ধু যুক্তিবাদী ব্যক্তি—যে কায়দাগুলো শিখলেন তার অর্থ বুঝতে চাইলেন। কিন্তু সাধারণ গণিতের নিয়মে এগুলোর অর্থ করতে বেশ অসুবিধা হয়ে পড়ল। তারপর বছরখানেক ওয়েভ মেকানিক্‌স্ না বুঝে ব্যবহার করার পর বন্ধুটির বুদ্ধি খুলে গেল। তিনি 'কোয়াণ্টাম মেকানিক্‌স্' বুঝে ফেললেন। অর্থাৎ তিনি বুঝে ফেললেন যে ওর মধ্যে বোঝবার মতো কিছুই নেই।

'কজালিটি' ডিটারমিনিজম্'—কার্য কারণবাদ তো বহুদিন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু কজালিটি বাদ দিলেও চলে কী করে ?

আর আমার এডিংটন একটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছিলেন এ সম্বন্ধে। আপনাদের মনে আছে ছেলেবেলায় সেই সংখ্যা-মনে-করাও খেলা ? একটা সংখ্যা আপনি মনে করলেন তারপর অনেককিছু যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে উত্তর থেকে আসল সংখ্যাটাই বাদ দিয়ে দিলেন। এখন যে সংখ্যাটা আপনি মনে করেছিলেন সেটাই হচ্ছে 'কজালিটি !'

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর হ্বালডেনের ভাষায় “To the scientist. the term “absolute reality' has no meaning.”

কিন্তু, 'গ্যাজেট' তো তৈরী হচ্ছে, মশায়, এ ধেঁায়ার থেকে !

* * * *

বন্ধুবর ডাঃ ম—বহুদর্শী, বিচক্ষণ লোক সুমিত্রার মেঘতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করলেন “যদি দেখা যায় কাল সকালে আকাশের দুটো মেঘ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ধারণ করেছে ? প্রোবাবিলিটির নিয়মে তা তো অসম্ভব নয় ! কী এলাহি ব্যাপার হবে ভেবে দেখুন তো ?”

লেখক বলেন, “আমেন !”

* * * *

সুমিত্রার শব্দতত্ত্বে যদি বিশ্বাস না হয়, তবে বিকেলের দিকে একবার লেখকের বাড়ীর দিক থেকে ঘুরে যাবেন। বেশী নয়, বাইরের রকে গুটি ছয়েক সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে লেখকের বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যায়। এদের সকলের বয়স আটের নীচে, রকবাজীর মুককাট অবস্থা এদের (এখানে মুক মানে মূক নয়)।

একদিন ভোরবেলায় উঠে পিতামহ ব্রহ্মা নাকি হাই তুলতে গিয়ে একটা আওয়াজ করে বসেছিলেন। সে আওয়াজ থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আপনার আমার যতো যন্ত্রণার সূত্রপাত। লেখকের যন্ত্রণা উপন্যাস খানা লিখতে হচ্ছে, আর আপনার—সেটাকে পড়তে হচ্ছে।

* * * *

কী আপনার হাই উঠছে যে। আগেই লেখক সাবধান করে দিয়েছিলেন এগুলো বাদ দিয়ে যান তখন শুনলেন না তো। লেখকের আর কী, দরকার হলে পাতার পর পাতা এই রকমের পেঁয়াজী ছেড়ে যেতে পারেন।

ওদিকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুখ ভার করে বসে আছেন। কথা বন্ধ। তাই এখানেই যবনিকা টানতে হোলো।

ও হাঁ, আমাদের গল্পটার কী হোলো। ওর তো অনেক রকম শেষই আছে একটা কিছু আন্দাজ করে নিন না। দিল্লী থেকে কোলকাতা তো বেশী দূর নয়—মাত্র একদিনের পথ রেলে, আর তিন ঘণ্টার পথ প্লেনে ! তাতে আপনাদের মন ভরে না ? আচ্ছা তবে শুনুন। কোথায় যেন শেষ হয়েছিল ? হাঁ মনে পড়েছে—

“শংকর বিছানা বাক্স কাঁধে ফেলে দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়।

সুমিত্রা বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে শংকরের পদত্যাগপত্র হাতে করে।”]

[আগামী বারে সমাপ্য।

ফ্রিডরিশ গেরষ্টেকার

জার্মাণ লেখকের পরিচয়

[ফ্রিডরিশ গেরষ্টেকার হামবুর্গের জনপ্রিয় অপেরা-গায়কের পুত্র। ১৮১৬ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৭২ সালে ঘটে এঁর দেহান্তর। ছেলেবেলা থেকেই পিতার মত ভবঘুরে জীবন এঁর প্রিয় হয়ে ওঠে। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৩৭ সালে গেরষ্টেকার আমেরিকা যান। শিকারীর ব্যাগ ও বন্দুক নিয়ে সারা যুক্তরাজ্য চুঁড়ে বেড়ান।

অতঃপর বাড়ির জন্য ব্যাকুলতা বোধ করায় ১৮৪৩ সালে জার্মাণীতে ফিরে আসেন এবং তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খুব সমাদৃত হয়। এরপর তিনি একান্ত ভাবে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মাঝে চার বার ইনি পৃথিবী পরিভ্রমণেও বাহির হন এবং অনেকগুলি ভ্রমণ-কাহিনী ও ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক উপন্যাস রচনা করেন। এর মধ্যে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'গেরমেলসহাউজেন' গেরষ্টেকারের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান বলে স্বীকৃত। পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় এরই বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হল।—অনুবাদক]

১৮৪—সালের শরৎকাল। মারিজফেল্ট-ভিশটেল হাউজেন পাকা সড়ক ধরে মন্থর গতিতে নিশ্চিন্ত মনে চলেছে একজন তরুণ যুবক। যুবকের পিঠের উপরে ঝুলানো একটি ব্যাগ, হাতে একখানি সুদৃশ্য লাঠি। দেখেই মনে হয় যারা হাতের কাজের শিক্ষানবিশীর জন্য ঘুরে বেড়ায় যুবক সে-শ্রেণীর লোক নয়। তার ব্যাগের সঙ্গে আটকানো চামড়ার সুন্দর পোর্টফলিও দেখে বুঝতে দেরী হয় না যে, সে একজন আর্টিষ্ট। মাথার একদিকে হেলানো বড় বর্ডার দেওয়া কালো হাট, লম্বা সুন্দর কোঁকড়ানো চুল, কোমল মসৃণ নবোদ্ভিন্ন ঘন শ্মশ্রু, কালো ভেলভেটের কোট সবটাতেই আর্টিষ্টের পরিচয় পরিস্ফুট। সকালের রৌদ্রের জন্যই বোধ করি সে-কোটের বোতাম লাগায়নি তাই দেখা যাচ্ছিল কোটের নীচের শাদা শার্টটি—কালো রঙের সিল্কের রুমাল দিয়ে তার গলার সঙ্গে জড়ানো। মারিজফেল্ট থেকে মাইল খানেক যাওয়ার পরেই পাশের গাঁয়ের গির্জার ঘণ্টার আওয়াজে সে থমকে দাঁড়ালো—লাঠির উপর ভর রেখে কান পেতে ঘণ্টার শব্দ শুনতে লাগল। নির্জন মাঠের উপর দিয়ে ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আজ তার কাছে বড় মধুর বোধ হচ্ছিল। শব্দ বেশ খানিকক্ষণ আগে থেমে গেছে, কিন্তু তবুও সে স্বপ্নাবেশজড়িত চোখে চেয়ে আছে টাউনুস পাহাড়ের পানে। এই পাহাড়ের ওধারে ছোট্ট একখানি গ্রামেরই ত সে ছেলে—বাড়িতে রয়েছে তার মা ও বোনেরা। তাদের কথা মনে পড়ায় তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। যা'ক শীঘ্রই সে নিজেকে সামলিয়ে নিল। যেদিকে তার বাড়ি হ্যাট খুলে সেই দিক লক্ষ্য করে একটা নমস্কার জানিয়ে লাঠিগাছি আবার শক্ত ক'রে ধ'রে সে তার গন্তব্যপথে প্রফুল্ল মনে পা বাড়ালো।

একঘেয়ে পথ—রোদও বেশ তেতে উঠেছে, রাস্তায় ধূলোও খুব বেশী কাজেই সে সদর রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বা বাঁয়ে কোনও একটা ভাল পায়ে চলা পথের খোঁজ করছিল। কিছুদূর যেতে ডাইনে একটা পথ নেমে গেছে দেখল কিন্তু কেন যেন এ পথে যেতে তার মন সরল না। অগত্যা বড় সড়ক ধরেই সে এগোতে থাকল। অবশেষে একটা পাহাড়ি ঝরণার কাছে সে এসে পড়ল। ঝিরঝির ক'রে স্বচ্ছ নির্মল জল বেয়ে যাচ্ছে—কাছেই পুরাতন পাথরের সেতুর ধ্বংসাবশেষ। ঝরণাটা পেরিয়ে ঘাসের ভেতর দিয়ে গিয়েছে পাহাড়তলীর দিকে একটা সরু পায়ে চলার পথ। তার মনে পড়ল, এই সেই সুন্দর ভেরা উপত্যকা—ছেলেবেলায় ভূগোলের বইতে সে এর কথা পড়েছে। বড় একখণ্ড পাথরের উপর উঠে লাফ দিয়ে সে ঝরণাটি পার হল। তার পর সদ্য ঘাস-কাটা মাঠের উপর অ্যালডার গাছের ছায়ায় ছায়ায় হৃষ্টমনে দ্রুত পা চালিয়ে এগোতে থাকল। ভবঘুরের মত নতুন নতুন জায়গা দেখবার জন্যই ত তার যাত্রা।

একটু হেসে নিজের মনেই সে বলতে থাকল—এখন একটা মজার কথা এই যে কোথায় চলেছি, তা কিছুই জানা নেই। মাইলপোষ্টের বালাই চুকে গেছে—মাইলপোষ্ট মানুষের চিন্তাধারাকে বাধা দেয়—কারণ গন্তব্যস্থান এখনও এত দূরে জানলে মানুষ ভড়কিয়ে যায়। তারপর স্থানের দূরত্বও যে এতে সঠিক লেখা থাকে তা-ও নয়। যাক এই পথে চলে বুঝতে পারব মাইলপোষ্ট না থাকলেও লোকে কি করে একস্থান থেকে অপর স্থানের দূরত্ব টের পায়।

চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব—তা হবেই বা না কেন?—আজ যে রবিবার। চাষীরা লাঙলের পেছনে বা শস্যবাহী গাড়ীর সঙ্গে সপ্তাহভোর দৌড়িয়ে ক্লান্ত থাকে—এদিনে তাই তারা বড় একটা বাইরে বেরোয় না। বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে সাজগোজ ক'রে গির্জায় যায়। সেখান থেকে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে সরাইখানার টেবিলের নীচে পা ছড়িয়ে দিয়ে করে বিশ্রাম—হুঁ সরাইখানা! কথাটি মনে পড়তেই সে ভাবল এই গরমের মধ্যে এক গেলাস বিয়ার হলে খাসা হ'ত। কিন্তু তা যখন মিলবার সম্ভাবনা দেখছিনা তখন অগ্যতা এই ঝরণার জল খেয়েই তেষ্টা মেটানো যাক।

এই বলে সে ব্যাগ, হ্যাট খুলে রেখে—পিছল পাথরের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঝরণার নিকট নেমে আঁজলা ভ'রে মনের সুখে জলপান করল। জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ব্যাগের কাছে আসতেই তার চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত ধরনের কুঁজো গুঁড়ি উইলো গাছের উপর। পোর্টফোলিও খুলে কাগজ পেনসিল বের করে অভ্যস্ত হাতে তাড়াতাড়ি সেটির ছবি এঁকে নিল। তারপর ধীরে সুস্থে সব গুটিয়ে নিয়ে, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হ্যাট মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অজানা পথে যাত্রা শুরু করল।

পথ চলতে চলতে যেখানেই একটা কিম্ভুতকিমাকার ওক, অ্যালডার বা উইলো গাছ অথবা পাথর তার চোখে পড়ছে সে তার ছবি এঁকে নিচ্ছে। বেলা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় সে একটু জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল যাতে ক'রে সামনের কোনও গাঁয়ে পৌঁছে সে দুপুরের খাবার খেতে পারে। ঘণ্টা খানেক এইভাবে চলার পর ছোট্ট পাহাড়ে নদীর ধারে পুরোনো এক পাথরের উপর একটি কৃষককন্যা বসে আছে দেখতে পেল। পাথরটার চেহারায় বুঝা যাচ্ছিল,বহুকাল আগে এর উপর কোন মূর্তি বসানো ছিল। সে যেদিক থেকে আসছে মেয়েটি একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে আছে। একটা গাছের ঝোপ সামনে পড়ায় মেয়েটি তাকে দেখতে পায় নাই—মেয়েটিকে সে কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছে। নদীটির ধার দিয়ে এগিয়ে ঝোপটি পেছনে ফেলতেই মেয়েটি তাকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে হর্ষসূচক একটা শব্দ ক'রে তার পানে ছুটে এল।

আমাদের তরুণ আর্টিষ্ট আর্ণলড অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখল—অদ্ভুত ধরণের অথচ কৃষক কন্যাসুলভ সুন্দর পোষাকে সজ্জিতা অপরূপ সুন্দরী সপ্তদশী তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে। আর্ণলড স্পষ্ট বুঝতে পারল মেয়েটি অপর কারো প্রতীক্ষায় ছিল এবং তার এই আনন্দের অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যে নয়। মেয়েটিও যে মুহূর্তে তার ভুল বুঝতে পারল তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভস্বরে বলে উঠল—"কিছু মনে করো না পথিক, আমি—আমি ভেবেছিলাম···।"

যুবক হেসে বলল—"হাঁ, বুঝেছি—তোমার প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় ছিলে নিশ্চয়ই? কিন্তু কি ফ্যাসাদ, তার বদলে একজন অপরিচিত বেরসিক লোক এসে তোমার সামনে হাজির হ'ল!"

একটু থমথম খেয়ে মেয়েটি বলল—"কি যে বলছ তুমি? বিরক্ত হব কেন তোমার উপর? তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই বড় আনন্দিত হয়েছি।" আর্ণলড এতক্ষণে এই সাধারণ কৃষককন্যার অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল—"তা, তোমার আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নয় কি?—অবশ্য আমি সেই ভাগ্যবান্ হবার সুযোগ পেলে—তোমায় এক মিনিটও বৃথা অপেক্ষা করতে হ'ত না!"

সপ্রতিভ ভাবে তরুণী জবাব দিল—"তুমি দেখি বড় অদ্ভুত কথা বলছ। যদি তার আসবার হ'ত নিশ্চয়ই সে আসত। হয়ত তার অসুখ করেছে—কিংবা মরেই গেছে!" শেষের কথাগুলি সে জড়িত কণ্ঠে এবং হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উত্থিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল।

"অনেকদিন তার খবর পাওনি, বুঝি?"

"হাঁ, অনেক দিনই বটে!"

"তার বাড়ি কি অনেক দূরে?"

"দূরে?—তা দূর বৈ কি?—বেশ খানিকটা পথ এখান থেকে। বিশপরডায়!"

আর্ণলড বলে উঠল—"বিশপরডা? হাঁ, আমি ত সম্প্রতি সেখানে এক মাস ছিলাম। ও গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গেই ত আমার আলাপ হয়েছে। তা, বল দেখি' তোমার সেই তার নামটি কি?"

তরুণী সলজ্জ ভাবে জবাব দিল—"হাইনরিশ, হাইনরিশ ফলগুট—বিশপরডার মোড়লের ছেলে।"

বিস্মিত হয়ে আর্ণলড বলল—"তা, বিশপরডার মোড়লের হাঁড়ির খবর আমি জানি—তার নাম ত বয়েরলিং—ফলগুট নামে সাড়া গাঁয়ে ত কাউকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।"

বিষণ্ণ ভাবের মধ্যে একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে তরুণী বলে উঠলো—"তুমি কি আর সেখানকার সব লোককেই ভাল ক'রে চেন?"—এই বলতে তরুণীর মুখাবয়ব আরো কমনীয় হয়ে উঠলো।

আর্টিষ্ট বলতে লাগল—"এই পাহাড়টির ওধারেই ত বিশপরডা—এখান থেকে বড় জোর দু'ঘণ্টার পথ মাত্র।"

"কিন্তু তবুও ত সে এলোনা?—আমায় এত করে কথা দিয়েছিল"—আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তরুণী বলল।

আর্ণলড তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—"তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আসবে—কারণ তোমার মত সুন্দরীকে কথা দিয়ে যদি কেউ কথা খেলাপ করে তবে তার হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়া বলতে হবে—আর তোমার হাইনরিশ সেরূপ নয় নিশ্চয়ই।"

তরুণী দৃঢ়কণ্ঠে বলল—"না, আর দেরী করা চলে না। দুপুরে খাবার সময় বাড়ি না ফিরলে বাবা বড় বকাবকি করবেন।"

"তোমাদের বাড়ি কোথায় ?"

"ঐ যে নীচে পাহাড়তলীতে। গির্জার ঘণ্টা শুনছ—ঐখানে।"

আর্ণল্ড কান পেতে শুনল—শব্দটা কিন্তু বেশী দূরের ব'লে মনে হ'ল না ? তবে আওয়াজটা যেন ভাঙা ভাঙা এবং বেশ একটু কর্ণকটু লাগল। সে দিকে চাইতেই লক্ষ্য করল ঘন একটা কুয়াশা সমস্ত উপত্যকাটা যেন ঘিরে রয়েছে।

আর্ণলড একটু হেসে বলল—"তোমাদের ঘণ্টাটা বোধ করি ফেটে গেছে তাই শব্দটা এমন বেখাপ্পা শুনাচ্ছে।"

উদাসভাবে তরুণী জবাব দিল—"হাঁ, ঘণ্টাটি অনেকদিন হয় ফেটে গেছে—তবে সময় পাওয়া যাচ্ছে না—তারপর টাকাপয়সার ও অভাব সে কারণে ওটি নতুন করে ঢালাই ক'রে নেওয়া যাচ্ছে না। তারপর ঢালাই-কাররাও ত এদিকে বড় একটা আসে না। তবে ঘণ্টার শব্দের মানে যখন আমরা বুঝি তখন এই ভাঙাটাতেই আমাদের একরকম করে চলে যাচ্ছে—অসুবিধা আর তেমন কই ?"

"তোমাদের গাঁয়ের নাম ?"

"গেরমেলস্ হাউজেন।"

"ওখান থেকে ভিশটেল হাউজেনে যাওয়া যাবে ত ?'

"হাঁ, সহজেই যাওয়া যাবে।—হেঁটে যেতে আধ ঘণ্টার মত লাগে—তাড়াতাড়ি গেলে আরও কম সময়েই পৌঁছানো যায়।"

"তা হ'লে চলো লক্ষ্মীটি, তোমাদের গাঁ হয়েই যাওয়া যাক। তোমাদের গাঁয়ের সরাইখানাতেই দুপুরে খেয়ে নেব' খন।"

"হাঁ, আমাদের সরাইখানা খুউব ভাল"—এই বলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেউ আসছে কি না দেখবার জন্য সে আবার পেছন ফিরে চাইল।

"সরাইখানা খুব ভাল হ'তে পারে বলে ত আমার ধারণা নেই।"

"অবশ্য চাষীদের পক্ষে খুব ভাল বৈ কি ?"—বলতে বলতে সে ধীরে ধীরে যুবকের পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর পথে যেতে যেতে বলল—"হাঁ, চাষীরা সারাদিন খেটেখুটে এসে সন্ধ্যায় সরাইখানাতে ঢোকে এবং ঘরের কাজ থাকলেও সেদিকে নজর না দিয়ে অনেক রাত অবধি সরাইখানাতে বসিয়েই কাটিয়ে দেয়।"

"কিন্তু আমার ত আজ কাজের তাগাদা নেই।"

"হাঁ, শহুরে লোকের কথা স্বতন্ত্র—তাদের কাজও আছে ভারী আর কাজ নষ্ট হবার ভাবনাও আছে ঢের! চাষীরাই ত রয়েছে তাদের মুখের গ্রাস জোগাবার জন্য।"

আর্ণলড হেসে জবাব দিল—"সত্যিই কি তাই ? আমরাও খাটি, তবে সে খাটুনির দাম যে সব সময় পাই তা নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে খাটুনির দাম বুঝবার বা দিবার মত লোকেরই নিতান্ত অভাব। কিন্তু চাষীরা যা করে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল তারা পেয়ে থাকে।"

"কিন্তু তোমায় দেখে ত মনে হয় না, যে তুমি কোনো কাজ জান ?"

"কেন মনে হয় না ?"

"তোমার ঐ নরম তুলতুলে হাতই ত তার প্রমাণ।"

আর্ণলড ঈষৎ হেসে বলল—"তা হলে এখনই তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি কাজ জানি আর কেমন ভাবে তা করি। আচ্ছা, ঐ লিলাক গাছের নীচের সমতল পাথরটার উপর বস দেখি ?"

"বসে কি করতে হবে বল ?"

ব্যাগ খুলে কাগজ পেনসিল বের করতে করতে তরুণ আর্টিষ্ট বলল—"আরে, বসই না ?"

"কিন্তু আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে যে !"

"পাঁচ মিনিটেই শেষ করব—আমার খুব ইচ্ছা, তোমার স্মৃতি আমি সঙ্গে নিয়ে যাই—আশা করি তোমার হাইনরিশ এতে কিছু মনে করবে না !"

"আমার স্মৃতি ? তুমি বেশ লোক, দেখছি !"

"আমি তোমার ছবি নেব।"

"তুমি তা হলে আর্টিষ্ট ?"

"হাঁ।"

"খুব ভাল কথা। আমাদের গাঁয়ের গির্জার ছবিগুলো পুরণো, রং চটে দেখতে বিশ্রী হয়ে পড়েছে। তোমাকে দিয়ে সেগুলো ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে'খন।"

অ্যালবাম খুলে তরুণীর কমনীয় মুখের ছবি আঁকতে আঁকতে আর্ণলড জিজ্ঞাসা করল—"তোমার নাম ?"

"গেরট্রুড"

"তোমার বাবা কি করেন ?"

"তিনি গাঁয়ের মোড়ল। তা, তুমি যখন ভাল চিত্রকর তখন তোমার আর সরাইখানাতে উঠে কাজ নেই—আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতেই চল—সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর বাবার কাছে তোমার যা বলবার আছে বলবে।"

আর্ণলড হেসে বলল—"ও, তুমি গির্জার ছবির কথা বলছ ?"

গম্ভীর ভাবে গেরট্রুড বলল—"নিশ্চয়ই ! যতদিন ইচ্ছা তুমি আমাদের কাছে থাকবে—অনেক, অনেক দিন—যতদিন না আমাদের আবার দিন হয় এবং গির্জার ছবিগুলোও ঠিক করা না হয়।"

তরুণ চিত্রকর ক্ষিপ্র হস্তে ছবি আঁকতে আঁকতে অন্যমনস্ক ভাবে বলল—"থাক সে সব কথা পরে হবে'খন। কিন্তু তাতে তোমার হাইনরিশ রেগে যাবে না তো ? আমি যদি অনেকদিন তোমাদের বাড়িতে থাকি, আর প্রায়ই তোমার সঙ্গে বসে গল্প গুজব করি ?"

"হাইনরিশের কথা বলছ ? সে আর আসবে না "

"আজ না আসুক কাল তো আসতে পারে ?"

একটু বিচলিত ভাবে গেরট্রুড জবাব দিল—"আজ রাত্রি এগারটার মধ্যে যদি না আসে তবে আর তার আসার সম্ভাবনা নেই—যতদিন না আবার আমাদের দিন হয়।"

"তোমাদের দিন ? হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না ত ?"

তরুণী শুধু অপলক দৃষ্টিতে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চাইলে কোনও জবাব দিলে না। এক খণ্ড চলমান মেঘের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বসে রইল—মুখে তার খেলে যাচ্ছে যুগপৎ হর্ষবিষাদের ছায়া স্বর্গীয় সৌন্দর্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। আর্ণলড একাগ্র মনে সেই ছবি তুলে নিচ্ছিল তার নিপুণ হাতে অন্যদিকে তার খেয়াল ছিল না আদপেই। বেশী সময় নেয়নি সে ছবি আঁকতে। তরুণী সহসা উঠে দাঁড়াল জোর রোদ দেখে মাথার উপর একখানি রুমাল ফেলে বলল—"আমার আর দেরী করা চলে না দিন এত ছোট—আর বাবা মা বসে আছে আমাদের প্রতীক্ষায় বাড়িতে।"

ইতিমধ্যে আর্ণলডের ছবি আঁকাও এসেছিল শেষ হয়ে। সে আর দু'একটি নিপুণ টানে কাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদি এঁকে গেরট্রুডের সামনে ছবিখানি ধ'রে জিজ্ঞাসা করল—

"দেখ দেখি, তোমার মত হয়েছে নাকি?"

ভীতচকিত ভাবে গেরট্রুড বলে উঠল—"বাঃ, আমিই তো!"

আর্ণলড সহাস্যে বলল—"তুমি ভিন্ন আর কে হবে?"

আর্ণলডের দিকে চেয়ে একটু সলজ্জ ভাবে গেরট্রুড বলল—"তা হ'লে ছবিটি তোমার নিজের কাছে রাখতে চাও?"

আর্ণলড উত্তরে বলল—"নিশ্চয়ই! যখন আমি তোমার কাছ থেকে দূরে, বহুদূরে চ'লে যাব তখন আমি এই ছবির দিকে চেয়ে তোমার কথা মনে করব।"

"কিন্তু বাবা কি অনুমতি দিবেন?"

"তোমার ছবি আমি দেখব—আমি তোমার কথা ভাবব, এতে তাঁর বাধা দেবার কি থাকতে পারে?"

"না, কিন্তু তুমি যে এ ছবি সঙ্গে করে বাইরের জগতে নিয়ে যাবে!"

আর্ণলড নরম স্বরে বলল—"লক্ষ্মীটি, এতে তিনি বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু এ ছবিখানি আমার কাছে থাকুক, এটা তোমার যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র!"

ঈষৎ চিন্তা ক'রে তরুণী বলল—"আমার?—না! তবুও বাবাকে একটিবার জিজ্ঞাসা করা ভাল।"

তরুণ চিত্রকর বিস্ময়-বিরক্তি মিশ্রিত সুরে বলল—"তুমি দেখছি একটা বোকা মেয়ে! কত কত রাজকন্যারা পর্য্যন্ত নিজেদের ধন্য মনে করে যদি কোনও আর্টিষ্ট তাদের ছবি নিতে চায়—এতে তোমার ত কোনো ক্ষতি হচ্ছে না!—যাক অত জোরে ছুটো না, লক্ষ্মীটি, তা হ'লে আমার আর তোমার সঙ্গে যাওয়া বা খাওয়া হয়ে উঠবে না। এর মধ্যেই গির্জার ছবির কথা ভুলে গেলে নাকি?"

"হাঁ, সেই ছবির কথা!"—বলে তরুণী থমকে দাঁড়াল। যুবকও কাগজ পেনসিল গুটিয়ে ব্যাগে ভ'রে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার পাশে এসে পড়ল—তারপর জোরে জোরে পা ফেলে দুজনে গাঁয়ের দিকে চলল।

ভাঙা ঘণ্টার আওয়াজ শুনে গ্রামটি যত দূরে বলে আর্ণলড ভেবেছিল—আসলে কিন্তু ঐ গ্রাম তার চেয়ে অনেক কাছে। দূর থেকে যেটা অ্যালডার-ঝোপ বলে মনে হচ্ছিল, সেটা দেখা গেল কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা সারি সারি ফলের বাগান। গাঁয়ের উত্তর এবং পূর্বদিকে বিস্তৃত মাঠ—অনতিউচ্চ গির্জা এবং গাঁয়ের সব বাড়িই ধোঁয়া লেগে লেগে কালো পাঁশুটে রঙের চেহারা। একটু এগোতেই একটা ভাল রাস্তায় গিয়ে তারা পড়ল—রাস্তার দু'ধার দিয়ে ফলের বাগান। সারাটি গাঁয়ের উপর জমাট হয়ে আছে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দূর থেকেই আর্ণলড এটা লক্ষ্য করেছিল—এখন সে এটা আরো স্পষ্ট দেখতে পেল। আর এই ঘন ধোঁয়া ভেদ ক'রে হলদে রঙের কেমন একটা অস্বাভাবিক চেহারার রোদ এসে পড়েছে পুরনো ধূসর রঙের বহুদিনের ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর ছাদের উপর। আর্ণলডের সে দিকে নজর দিবার বেশী ফুরসৎ ছিল না, কারণ গাঁয়ের প্রথম বাড়িটার কাছে আসতেই গেরট্রুড সন্তর্পণে তার হাত নিজের গাঁটের মধ্যে নিয়ে পরবর্তী রাস্তা ধ'রে জোরে চলা শুরু করল। তরুণীর হাতের উষ্ণ-স্পর্শ স্বাস্থ্যবান্ তরুণ চিত্রকরের সারা দেহে পুলকের বিদ্যুৎ বইয়ে দিল—সহসা তার দৃষ্টি পড়ল গেরট্রুডের চোখের উপর। কিন্তু তরুণী দৃষ্টি বিনিময়ের পরিবর্ত্তে নতমুখে মাটির পানে চোখ রেখে চলেছে—যত তাড়াতাড়ি সে বাড়ি পৌঁছতে পারে সে জন্য। অবশেষে আর্ণলডের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল আশপাশের লোকেদের উপর। অনেকেই তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারও মুখে কথা নেই—অপরিচিত দেখেও কেউ তাকে অভিবাদন বা কুশল জিজ্ঞাসা করছে না। সবাই যেন বোবার মত স্তব্ধ, নীরব। বড় বড় শহরে অবশ্য কেউ কারো দিকে বড় একটা চায় না কিন্তু গাঁয়ে ত এরূপ ব্যাপার সে কোথাও দেখেনি। এমন কি তরুণীকেও কেউ অভিবাদন বা জিজ্ঞাসাবাদ করছেনা। ঘরগুলো খড়ের ছাউনি—বহুদিন তাতে হাত পড়েছে বলে মনে হ'ল না। ঘরের মটকাগুলি অদ্ভুত ধরণের—সীসা এবং কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত। আজ রবিবার কিন্তু কোনও বাড়িরই জানালাগুলি কেউ পরিষ্কার করেনি। সীসার ফ্রেমগুলিও মাজাঘসার অভাবে জং ধরে গেছে—আলো প'ড়ে সেগুলো চক্চক্ করছিল।

তারা রাস্তা দিয়ে চলেছে—আর পাশের দু'একটি বাড়ির জানালা খুলে সুন্দরী তরুণী বা বর্ষীয়সী মহিলা তাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে। লোকেদের চালচলন কোবাস পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গাঁয়ের তুলনায় যেন সম্পূর্ণ পৃথক। তার পর সর্বত্রই একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা। দেখে শুনে

অস্বস্তিকর বোধ হওয়ায় আর্ণলড তার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করল—"তোমাদের এখানে রবিবার কি এত কঠোর ভাবে পালন করে যে পরস্পর সাক্ষাৎ হলেও লোকে অভিবাদন করা দূরে থাক, কোনও সাড়া পর্য্যন্ত দেয় না? যদি দু'-একটি কুকুর বা মুরগী না ডাকত তা হ'লে ত একেবারে প্রেতপুরী বলেই মনে হত!"

শান্ত ভাবে গেরট্রুড জবাব দিল—"দুপুরে খাবার সময় লোকের কথাবার্তা বলার মত মেজাজ বা ফুরসুৎ নেই—আজ সন্ধ্যায় কিন্তু এর ঠিক উল্টোটিই দেখতে পাবে।"

আর্ণলড বলে উঠল—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—অন্ততঃ ছেলেমেয়েরাও ত রাস্তায় খেলা করবে? দেখে শুনে আমার ত যেন কেমন কেমন লাগছে; বিশপরডাতে কিন্তু লোকেরা রবিবার সারাদিনই নেচে-গেয়ে কাটায়।"

গেরট্রুড একটু নীচু গলায় বলল—"ঐ যে আমাদের বাড়ি!"

আর্ণলড স্মিত মুখে বলল—"এই দুপুরবেলা খাবার সময় তোমাদের বাড়িতে উঠা কি ভাল দেখাবে? তোমার বাবা কি মনে করবেন বুঝতে পারছি না—তার চেয়ে বরং তুমি আমাকে সরাইখানা দেখিয়ে দাও, না হয় আমায় ছেড়ে দাও—আমি নিজেই সরাইখানা খুঁজে বের করব'খন। কারণ গাঁয়ের গির্জার পাশেই সাধারণতঃ সরাইখানা থাকে—কাজেই গির্জের চূড়া লক্ষ্য করে গেলেই সরাইখানা পেয়ে যাব।"

গেরটড ধীরভাবে জবাব দিল—"তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের গাঁয়েও গির্জার পাশেই সরাইখানা। যাক সে কথায় কাজ নেই—আমাদের বাড়ি যেতে তোমার আপত্তি কেন? আমাদের দু'জনের মতই ত রান্নাবান্না করা আছে—কাজেই তোমার আদর আপ্যায়নের অভাব হবে ব'লে ভয় করো না। আমাদের জন্যেই ত ওঁরা অপেক্ষা করছেন বাড়িতে!"

"তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, মানে? ও বুঝেছি, তুমি তোমার এবং হাইনরিশের কথা বলছ? হাঁ, গেরট্রুড! যদি তুমি আজ তার জায়গায় আমায় নিতে রাজী থাক, তা হ'লে আমি তোমার কাছেই থেকে যাব—যতদিন না তুমি বিরক্ত হয়ে আমায় তাড়িয়ে দাও।"

প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রাণের থেকে একথাগুলি অস্ফুট স্বরে বলে সঙ্গে সঙ্গে গেরট্রুডের হাতে একটু জোরে চাপ দিল—। এতে গেরট্রুড একটু থমকে দাঁড়িয়ে তার বড় বড় চোখে ঈষৎ গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,—"এগুলি কি তোমার প্রাণের কথা?"

অপরূপ সুন্দরী তরুণীর রূপে মুগ্ধ আর্টিষ্ট বলে উঠল,—"প্রাণের কথা বৈ কি?"

গেরট্রুড কথার আর জবাব না দিয়ে চলতে থাকল—মনে হ'ল সে যেন এই কথাই ভাবছে। ইতিমধ্যে তারা একটা উঁচু বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রশস্ত পাথরের সিঁড়ি নীচে থেকে উঠে বাড়ির উঠানে গিয়ে ঠেকেছে—সিঁড়ির দুধারে লোহার রেলিং। এবার আগের মত সলজ্জ সপ্রতিভ স্বরে গেরট্রুড বলল,—"প্রিয় অতিথি! এই আমাদের বাড়ি। যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার সঙ্গে চলে এস। তোমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সাথী পেয়ে বাবা খুবই গর্বিত ও আনন্দিত বোধ করবেন।" [ক্রমশঃ।

মূল জার্মান থেকে অনূদিত—ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

দংশন

[Heinrich Heine-র জার্মান কবিতা অবলম্বনে]

পুরানো স্বপন জাগে পুনরায়,
নবীন রাতের তারা আকাশে,
আমরা দুজন বসি গায়-গায়—
কুঞ্জে দোলন লাগে বাতাসে।

বদ্ধ হলাম এক পণে ফের,
চুমায় চুমায় উঠি হাসিয়া,
পাছে ভুলে যাই প্রতিজ্ঞা এর—
তুমি হাতে দিলে কী দংশিয়া!

দিব্য তোমার চাউনি চোখের
শুভ্রতা দাঁতে কতো বিরাজে,
শপথ-ই তো একা দামী ছিল ঢের—
দংশন কেন ইহার মাঝে?

অনুবাদক—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
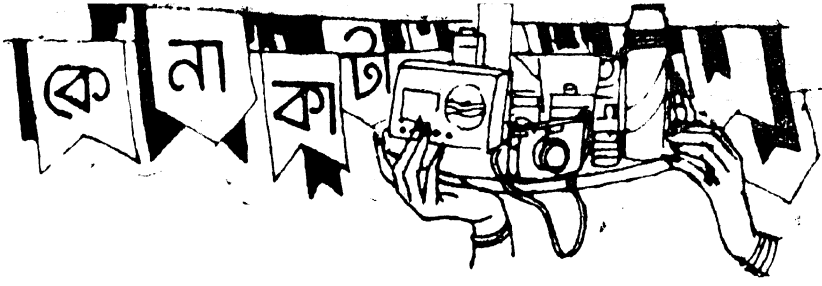
ফ্লোরিসেণ্ট

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প উন্নয়ন খাতে এই বছরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারত সরকারের ১৯৬২ সালের বাজেটে অনেকেই হতাশ হয়েছে অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা ঘাটতি হিসাবে দেখানো হয়েছে, তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। প্রয়োজন বশত: ছোট করে বাজেটের বরাদ্দ দেখাচ্ছি—

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের ১৯৬১—৬২ সালের বাজেটে রাজস্বখাতে ৯৬২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা আয় ও ১০২৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। ফলে ঘাটতি হবে ৬০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী অবশ্য এই ঘাটতির টাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর চাপিয়ে আগামী বছরের ঘাটতি পূরণ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৪১টি দ্রব্যের ওপর বাণিজ্যশুল্ক ও ১৪টি দ্রব্যের ওপর নতুন উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। এ সব করেও কিন্তু ঘাটতির টাকা সেই ৬৪ কোটিতে থাকবে।

১৯৬১—৬২'র আথিক বছরে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এই বছর বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ-শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত ১১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। আয়কর ও কর্পোরেশন করের পরিমাণও ৬ কোটি টাকা বাড়বে। রেলওয়ের কাছ থেকে রাজ্য সমূহকে যাত্রী-কর বাবদ বণ্টনের জন্য আরও ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। চলতি বছরের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণও ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেড়ে ৪০ কোটি টাকা হবে।

সে যাই হোক, দেশের উন্নয়নে আর্থিক হিসাবের উঁচু নীচু সব দেশেই হয়ে থাকে। মোটের ওপর নতুন পাওয়া স্বাধীন ভারতের আর্থিক বাজেটে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। উন্নয়নে বাধা পড়লেই আশঙ্কার কারণ ঘটে, নচেৎ উৎপাদন যাতে ক্রমশ: বাড়তে পারে তার দিকেই আজ সকলের চেষ্টা করা উচিত।

আনন্দের কথা, ইস্পাতের উৎপাদন এবারে খুব বেড়েছে—১৯৬০ সালে দেশে ২২লক্ষ টন পাকা ইস্পাত উৎপন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, ১৯৬১ সালে এর পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টনে বেড়ে যাবে।

কাজেই বৈদেশিক রাষ্ট্র ভারতের সাথে যে ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত ভারী শিল্পের উৎপাদনে যেমন সফলতা লাভ করবে তেমন ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের অগ্রগতিতেও পিছিয়ে পড়বে না।

শোনা যাচ্ছে যে আগামী বছরে ৪২১ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। পি এল ৪৮০ তহবিল থেকে ৯৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। আথিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারত শিল্প উন্নয়নের জন্যই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশ যারা আজ বড় হয়েছে, তারা সকলেই এই শিল্প উন্নয়নের দ্বারাই উন্নত হয়েছে। কাজেই ভারতের এই সামগ্রিক উন্নয়নে যদি অল্পবিস্তর টাকার ঘাটতি হয়ে থাকে তার জন্যে চিন্তা না করে যাতে ঐ ঘাটতিকে পূরণ করা যায় তারই জন্যে আজ বিশেষ করে অবহেলিত শিল্পগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

এরকম একটি শিল্পের কথাই আলোচনা করছি—প্রায় ১৯০২ খৃঃ অব্দে আমেরিকার 'ওয়েষ্টিং হাউস' ফ্লোরিসেণ্ট ফিটিংস আবিষ্কার করে। রঙ-বেরঙের এই আলোর উৎপত্তিতে সারা পৃথিবীতেই চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ক্রমশ এই বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন চালু হয় প্রায় সমগ্র দেশেই।

ভারতেও আজ এই আলোটির সাথে সকলেই পরিচিত—ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত সফরেও রাত্রে আলোকসজ্জায় পথ-ঘাট সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। এই 'ফ্লোরিসেণ্ট ফিটিংস' দিয়েই রাত্রির অন্ধকার দূর করা হয়। কাজেই এই শিল্পটির চাহিদা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কলকাতার নামকরা কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আজ এই শিল্পটির উদ্বোধক। এরাই একচেটিয়া করে রেখেছে। এই শিল্পটির উদ্বোধনে বাঙালীর বহু লোকের কর্ম সংস্থান হতে চলেছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে বাজারে এই সব বড়
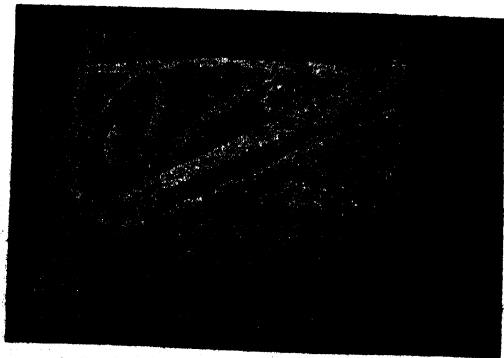
বড় কোম্পানীগুলি এই শিল্পের কাঁচামাল সরকারী দপ্তর হতে কন্ট্রোল দরে বরাবর পেয়ে আসেন—ফলে এদের পক্ষে মাস সরবরাহের দরের তারতম্য ঘটানো সম্ভব ও সহজ।

ওদিকে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বাজার হতে অতিরিক্ত মূল্যে এই সব কাঁচামাল কিনে এই শিল্পটির উৎপাদন করে চলেছেন। কিন্তু বাজারের বড় বড় কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। সম্প্রতি কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে 'ফ্লোরা' নামক একটি ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠান দেখলুম। এর অন্যতম বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনিশীথ চক্রবর্ত্তীর সাথে আলাপ করে জানতে পারলুম যে মোটামুটি কাঁচামাল হিসাবে প্লাষ্টিক সিটস, আয়রণ এবং জি-আই-সিটস ও ফ্লোরিসেণ্ট টিউবস্ এই শিল্প উৎপাদনের জন্য দরকার। এই কাঁচামালগুলি কন্ট্রোল দরে পাওয়ার ব্যবস্থা হলেই এই সব ছোট্ট প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচতে পারে। বহু ছেলে-মেয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিতে একসময় কাজ করেছে কিন্তু কাঁচা মাল পাওয়ার অসুবিধায় আজ কারখানাটা মৃতপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মহুয়া' ও "মিতালী" দুজন মহিলা কর্মীর সাথেও আলাপ করলাম—এরাও দুঃখ করে বলছিল যে বহু মেয়েকে এরাই কাজে ঢুকিয়েছে—তখন বাজারে মাল পাওয়া যেত। পরিশ্রম এতে বিশেষ হয় না—সূক্ষ্ম কাজ। কেবল প্লাষ্টিক চাদরকে এক করে ফিট করাই এই মেয়েদের কাজ ছিল। 'মহুয়া' 'মিতালী' আশা রাখে যে সরকার নিশ্চয়ই এই সব শিল্পীদের সহযোগিতা করবে। তবে তারা জানাতে চায় তাদের অসুবিধাগুলি।

মেয়েরা যে কয়েকটি মেশিনে কাজ করছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—জিগশ, হিটিং চেম্বার, ইলেকট্রিক ওয়েল্ডীং, গ্রাইণ্ডার, ছোট মোটর কয়েকটি, বল প্রেস, বব পলিশ, ড্রিল স্ক্রু ফরডার, প্রো-পেণ্টিং ও ১২" ব্যাণ্ড-স্ব মেশিন একটি।

বাস্তবিক এদের এই আবেদনে আজ সরকারকে এগিয়ে আসতে হবেই। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলি যে কারণে বড় বড় কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না সেই সব কারণগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে। শ্রীচক্রবর্ত্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এখনো প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু হাজার হাজার "মহুয়া" ও "মিতালীর" দুঃখের যে বেদনা সেদিন দেখে এলাম তা সত্যই মর্মস্পর্শী!

এদের জন্যই অবিলম্বে সরকারের সহানুভূতি ও করুণা প্রয়োজন। তবেই এদের হাসিমুখ আবার দেখতে পাওয়া যাবে। কর্মচাঞ্চল্যে আবার এই প্রতিষ্ঠানটি জেগে উঠবে। সেদিনের কামনাই করি।

—শ্রীশচীপতি রায়।

বিড়ির পাতা

পাকিস্থানের সহিত সাম্প্রতিক যে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকার পণ্য বিনিময়ের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হলো তন্মধ্যে দেখা যায় ভারত পাকিস্থানকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের সিমেণ্ট ও বিড়ির পাতা সরবরাহ করবে। এই ২টি পণ্যের কোন্ খাতে কত টাকা অথবা জিনিসের পরিমাণ সংবাদপত্রে লেখা না থাকলেও বিড়ির পাতায় যদি ভারতের ঘরে ২ বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকাও আসে একটি গাছের পাতার মাধ্যমে, তবে ব্যাপারটি কি উল্লেখযোগ্য নয়? তাই আজ এই নগণ্য বিড়ির পাতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিপিবদ্ধ করা যাক।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান নদীমাতৃক দেশ। ওখানে নৌকা ডিঙ্গী ছাড়া যাতায়াতের উপায় নেই এবং এই নৌকা ডিঙ্গীর মরণকাঠি জিয়ন কাঠি আলকাতরা। তেমনি চাষীপ্রধান দেশও ওটা। চাষীরা, মাঝিমাল্লারা, নাবিকরা এক কথায় শ্রমিকরা সুউচ্চ মূল্যের সিগারেটের নেশায় আয়াস পাননা। তাঁরা চান মৃদু নেশা যুক্ত গুড়ক অথবা বিড়ি। সাজ সরঞ্জামের বাহুল্যতার জন্য চলতি পথে অথবা কাজের সময় গুড়ুক অচল। কাজেই বিড়িই ধূমপানের একমাত্র উপাদান যার অঢেল ব্যবহার আছে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে।

আলকাতরার মত বিড়ির পাতা পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়না, হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ প্রথমটির জন্য চাই কয়লার খনি এবং দ্বিতীয়টির জন্য চাই প্রচুর কেন্দ গাছের বাগান, কিন্তু এর একটিও পাকিস্থানে নেই। কাজেই এই দুটি জিনিস পাকিস্থানে উৎপন্ন হওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও নেই। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে এই দুটি জিনিস না নিয়ে পাকিস্থানের উপায় নেই। বাণিজ্যিক চুক্তিতে দেখা যায় পাকিস্থান দিবে ভারতকে ৪৩ প্রকারের জিনিস এবং অপর দিকে ভারত দিবে পাকিস্থানকে ১০৭ প্রকারের জিনিস। সংখ্যার তারতম্যটা প্রণিধানযোগ্য।

ভাগাভাগির পর থেকে পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া পর্য্যন্ত এই পণ্য দুটি জল, স্থল, আকাশ দিয়ে কালবাজারের মারফৎ পাচার হয়েছে পাকিস্তানে, ভারত যে শুল্কের দিক দিয়ে কতটা লোকসান দিয়েছে এই ২ বৎসর এই পণ্যের বাণিজ্যিক খতিয়ান দেখলে তার একটা হদিস পাওয়া যাবে। যে বিড়ির পাতার এক বাণ্ডিল কলিকাতায় ৪৲—৪৷৷০ টাকা কালবাজারের কৃপায় তার মূল্য দাঁড়িয়েছিল ঢাকায় ৫০৲—৫৫৲ টাকা এবং চট্টগ্রামে ৬০ টাকার উর্দ্ধে। যে বিড়ির এক বাণ্ডিল ছিল ৵০ এখনও তার মূল্য ।৵০ পাকিস্তানের বিড়ি দুষ্প্রাপ্য, কাজেই দুর্মূল্য।

বিড়ির পাতা হ'তে বিড়ি তৈরী একটা বড় রকমের কুটীরশিল্প। এই শিল্প গড়ে উঠেছে ১৯৩০-৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর সিগারেট বয়কট আন্দোলন থেকে। বেকারদের একটি কর্ম্ম-সংস্থান হয়েছে এতে। যারা বিড়ি তৈরীতে কুশলী তারা দৈনিক ৪৷৫ টাকা উপায় করেন। মেয়েরাও ঘরে বসে অবসর সময় বিড়ি বাঁধেন। আমি একটি ভদ্রঘরের বধূকে সংসারের রান্নাবান্না ও ছেলেমেয়ে দেখার কাজ করার পরেও দৈনিক ২ হাজার বিড়ি তৈরী করতে দেখেছি। বহু স্ত্রী-পুরুষ এই শিল্পের দ্বারা জীবিকার সংস্থান করেন।

এই বিড়ির পাতাগুলি কলিকাতায় আসে মাদ্রাজ, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা থেকে। এগুলি বাণ্ডিল হিসাবে বিক্রয় হয়। এক বাণ্ডিলের ওজন ⁄৪ সের—⁄৪৷ সের যার দাম কলিকাতায় ৪৲ টাকা ৪৷০ টাকা অর্থাৎ টাকায় এক সের। পাকিস্থানে এক এক বাণ্ডিলের মূল্য ৩৫ টাকার কম নেই। কাজেই কালবাজার যে চলবেই তাতে আর বিচিত্র কি?

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলায় পতিত ডাঙ্গা জমির পরিমাণ মোটামুটি এইরূপ:—

বাঁকুড়া—৮৪০০০ একর
বর্দ্ধমান—১৪০০০ "

বীরভূম—১৬০০০ একর
মেদিনীপুর—১২০০০ "
মুর্শিদাবাদ—২২০০০ "

এই সব পতিত জমিতেও বহু কেন্দ গাছ জন্মে থাকে। কেন্দ গাছগুলি অনেকটা গাবগাছের মত। ফলগুলি গাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। মরসুমে বাজারে বাজারে উহা বিক্রয় হয় এমন কি কলিকাতায়ও পাওয়া যায়; ফলগুলি ছোট হলেও সুমিষ্ট। এই গাছের কাঠই সুবিখ্যাত আবলুশ কাঠ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানে নাম হলো Diospyros melanoxylon উড়িষ্যাতে বলে কেন্দু পাতা এবং এই নামটিই বাংলার কেন্দ পাতা নামে চলতি হয়েছে। ২।৪টি গাছ বড় হলেও সাধারণতঃ গাছগুলিকে ৩।৪ ফুটের বেশী বড় হতে দেওয়া হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পাকা ধান ঘরে আনার আগে এই গাছগুলি মাটি সমান করে কেটে ফেলা হয় ধানসিদ্ধ কি খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানির জন্য। তাঁরা খবর রাখেন না যে কত টাকার সম্পত্তি শুধু অজ্ঞতার জন্য তাঁরা নষ্ট করে ফেলছেন। কারণ এই কেন্দ গাছের পাতাই ত বিড়ির পাতা।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ঐ গাছের গোড়া থেকে আবার (coppice বা নবশাখা) গজিয়ে ওঠে। আবার কাটা হয়। এইভাবে চলে আসছে বৎসরের পর বৎসর। এই কেন্দ গাছের কচি পাতাগুলি যদি তাঁরা সংগ্রহ করে রাখতে পারতেন তবে তাঁরা সেরে ৮০—১০ টাকা উপায় করতে পারতেন। ৬০০ পাতায় এক সের হয় অবশ্য শুকনা পাতায়। পাতা সংগ্রহ করার পর গাছগুলি কেটে ফেললে তাঁদের জ্বালানির অভাব হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু কচি পাতাগুলিকে বিড়ির পাতার উপযুক্ত করতে হ'লে একটু কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হবে। মার্চ্চ মাসের প্রথমে কেন্দ গাছের গুঁড়ী থেকে নূতন গাছ গজিয়ে ওঠে এবং তাতে ফুটে উঠবে লালপাতা। এই পাতাগুলিকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কেটে ফেলতে হবে আবার মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে অথবা এপ্রিল মাসের প্রথমে আর একবার নবজাত লালপাতাগুলি কেটে ফেলুন। "মে মাসের প্রথমে নূতন লালপাতা তামাটে রং ধরার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলুন। এইগুলি বিড়ির উপযুক্ত পাতা। এই ব্যবস্থা না করলে পাতাগুলি শক্ত হয়ে যাবে বিড়ি বাঁধার সময় ভেঙ্গে যাবে। তারপর আর লালপাতা কাটার দরকার নেই। জুন, জুলাই, আগষ্ট মাসে নূতন পাতা তুলে নিন বাণ্ডিল করে শুকিয়ে নিন্ এবং বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠান। ছোট ছেলেমেয়েরা কি সাঁওতাল বধূরা এই পাতা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু মার্চ্চ মাস থেকে শেষ সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ যাতে ঐ বাগানে যেতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওরা কচি পাতা পেলে খেয়ে নেবে। এই উপায়ে বৎসরের পর বৎসর বিড়ির পাতার ব্যবসা চলবে। গাছগুলি কেটে দিলে ওটা ঠিক চা গাছের মত আর বাড়বে না। বড় হতে দিলে পাতা সংগ্রহ করা কি সম্ভব হতো?

এই জেলাগুলির ডাঙ্গা জমিতে স্বভাবজাত কেন্দ গাছের অভাব নেই। বাঁকুড়া জেলার মুশুনিয়া পাহাড় কেন্দ গাছের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। সরকারী বনবিভাগ একে নামমূল্যে কেন্দ পাতা সংগ্রহ করার জন্য লিজ দিয়া থাকেন। অন্যান্য পাহাড় ও ডাঙ্গাগুলিতে এই উপায়ে কেন্দ পাতার চাষ চলতে পারে।

চাষীদের উপরি আয়ের এটা একটা সহজ পথ। গ্রামীন অর্থ উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পাকিস্থানের সহিত স্থায়ী বাণিজ্য বিস্তারে কয়লার মত এ আর একটি পণ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই বিড়ির পাতা চাষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

—দীপিকা সরকার

তোমাকে ভয়

রুনু মুখোপাধ্যায়

তুমি বলেছিলে শ্রদ্ধা হারাব,
অথচ তোমার শ্রদ্ধা হারাতে কতো ভয়
মনে হয়: তোমার শ্রদ্ধা যেন ঘাসের ডগায় কেঁদে হয়েছে সঞ্চয়।

অন্যকে ভালবাস তুমি
তবুও আমার সংগে অব্যক্ত ঐ আধো-আধো প্রেম
মেঘ ও রোদ্দুরের মতো কথা করে লেন-দেন,
অথচ নীতির দায়ে বলা না রয়ে যায়
বাতাসে বাতাসে কাঁদে উদাসী প্রণয়।

আমাকে বাস না ভাল,
কিংবা তাবার নিটোল মালায় করো না সংগোপন
এবং একান্ত হয়ে হওয়া নিবিড়
তবু আমার কথা জেনে ফেলেছ বলে
আমার প্রান্তর দিয়ে হেঁটে চলে যাও
দু'পায়ে সবুজ গুচ্ছ যাও দলে দলে।

তাই এ ব্যভিচারী মন আবার নোতুন মোহে উদ্বেলিত হয়
যখন নোতুন মেয়ের চোখে আলো এঁকে দেয়
তুমি বলো শ্রদ্ধা হারাব
তোমার অনুকম্পার বদলে ঈর্ষার বীজ হতে
জাগা কালো অভিসম্পাত পাব;
আমারও হয় ভয় তোমার অভিসম্পাতে যদি হয়ে যাই ক্ষয়?

মন ও মানসী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

মানসীর মাথা থেকে এখনও পর্য্যন্ত চিন্তাটা গেল না। রাত প্রায় কম নয়। এতক্ষণে সমস্ত বাড়ির লোক ঘুমে অচৈতন্য। রাস্তা-ঘাটও এক বিষণ্ণ স্তব্ধতায় মৌন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দু'-একজন পথচারীর পদশব্দ শুনতে পায় মানসী আর প্রহরীর মত পাহারারত রাস্তার কুকুরটাও এ সময় কেমন উতলা হয়ে ওঠে। বিশ্রী একটা শব্দ করতে থাকে ক্রমাগত। চিন্তামগ্না মানসীর কানে মহরমের বাজনার মত কানে তালা ধরিয়ে দেয়। অসহ্য হয়ে শেষে রাস্তাধারের জানলাগুলো বন্ধ করে দেয় সশব্দে।

তারপরও কোথায় যেন তার হাঁফ ছাড়ার তৃপ্তি। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আবার সে চিন্তায় ডুবে যায়। আজকে কলেজ থেকে এসে অবধি অজন্তার কথাগুলো ভুলতে পারেনি সে। শত কাজের ফাঁকেও সেই একই চিন্তার উন্মাদনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। কলেজে ইকনমিক্স-এর ক্লাস অফ থাকায় মেয়েরা আসর জমিয়েছিল—কমনরুমের এক ধারে। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। তারই প্রস্তুতি চলেছে সবাইয়ের মনে। বেশীর ভাগ পড়াশোনার আলোচনা। মানসীও আজ যোগ দিয়েছিল ওদের মধ্যে। অন্যদিন এর ব্যতিক্রম থাকে। একটু নিরালায় বসে এই সময়টা ওরা অর্থাৎ অজন্তা আর মানসী গভীর আলোচনা চালায় যত কিছু সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। ঐতেই, ওদের কাছে আশ্চর্য্য এক তৃপ্তি! সেই অজন্তাই আজ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল এদের দল থেকে। খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মানসীকে এক ধমক—বলি, ব্যাপার কি? বে-রসিকের দলে আবার ভিড়েছো?

মানসী খানিকটা হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে, পরে বলেছিল—সামনে পরীক্ষা, সে খেয়াল আছে? গতবারে তো স্রেফ গাড্ডু জুটেছে, আর এবারে কি হবে, একটু ভেবে দেখো।

অজন্তা হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল—রাখো তোমার পরীক্ষা। হ্যাঁ, যে খবরটা শোনাবো বলে তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলাম সেইটেই বলছি। বলেই সে বসে পড়েছিল। পাশে মানসীও। সোৎসাহে অজন্তা বলেছিল—ভেরী ইনটারেষ্টিং ম্যাটার। অবশ্য তোমার ঐ প্রিয় সাহিত্যিক জয়দেবকে নিয়ে। ভদ্রলোক শুধু ছদ্মনামেই লেখেন না, বাড়িতেও বসে থাকেন পর্দার আড়ালে। একেবারে চোস্ত পর্দানসীন। শেষ করেই অজন্তা সশব্দে হেসে উঠেছিল।

মানসী প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়ে শেষে সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিল—তার মানে?

আর মানে কেন, বলেই অজন্তা মুখ বিকৃতি করলে, পরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করেছিল—যা রিয়্যাল ফ্যাক্ট, তাই তোমাকে বলছি। শোন তাহলে, 'মিলনতীর্থ' প্রকাশনীর যিনি মালিক—তিনি হলেন গিয়ে আমার সেজবৌদির আপন মামা—সেই কৈলাস মামার কাছেই শুনলাম ব্যাপারটা। উনি একখানা ছোটগল্পের সংকলন বার করেছেন, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে। তার মধ্যে জয়দেবেরও লেখা নেওয়া হয়েছে। ঐ বই-এর শেষ স্তম্ভে একটা সাহিত্যিক-পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে। তাতে প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজেদের পূর্ণ পরিচিতিসহ ফটো পাঠিয়েছেন, কিন্তু জয়দেব তার কোন পরিচিতির বিবরণ পাঠাতে রাজি হন নাই।

এই পর্যন্ত বলে অজন্তা থামলে পরে মানসী বলেছিল—এমনই ব্যাপার? তারপর?

অজন্তা আবার বলতে শুরু করেছিল—পুরোটা শুনেই নাও। শেষে তিনি নিরুপায় হয়ে জয়দেবের বাড়িতে গেলেন কিন্তু তিনি দেখা করলেন না, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিয়ে জানালেন—তিনি আজ পর্যন্ত কারুরই সঙ্গে দেখা করেন না—কোন কিছু জানাতে হ'লে তিনি আড়ালে থেকেই জানাবেন। কৈলাস মামা প্রথমটায় নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করেছিলেন, পরে শুনলেন যখন—তিনি বাইরের লোকের সংগে কখনই সাক্ষাৎ করেন নি, তখন উনি অনুরোধ করে

পাঠালেন—আর কিছু না জানান তিনি অন্ততঃ তাঁর জন্মস্থান—জন্মতারিখ আর সাহিত্যিক-জীবনের খানিকটা বিবরণ যেন পাঠান। তাহলেই কাজ হবে। কারণ আজকে পাঠক-সাধারণ তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর মত নাকি এমনি আরও অনেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন। আর খবর নিয়েও কৈলাস মামা জেনেছেন, এতবড় সাহিত্যিককে কারও চাক্ষুষ দর্শন করবার সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এতবড় একজন রসিক লেখক হয়ে সামান্য চাক্ষুষ দেখা দিয়ে—সব স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা করতে যিনি ভুলে যান, তিনি কি করে, সারা দেশের লোকের মন জয় করলেন, সেইটেই আশ্চর্য্য লাগছে! অথচ ওঁকে দেখবার জন্যে কে-না উৎসুক হয়ে আছে? শেষ করে অজন্তা খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল।

হঠাৎ মানসী প্রশ্ন করে উঠেছিল—হাঁা রে, ওঁর বয়স কত রে?—

বয়স আর কত হবে? হিসেব মত জানা গেছে—গোটা তিরিশ। কিন্তু এই অল্প বয়সে লিখে নাম করাটাও যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি অত্যাশ্চর্য্য তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ!

বলেই অজন্তা মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি বল, তাই নয় কি?

মানসী ততক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ, অস্বাভাবিক বৈ কি, তবে ও সম্বন্ধে আমি একমত। কেন না ওঁর অন্তরালে থাকাটাই ওঁর আপন ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট পরিচয়। আর উনি হয়তো নিছক আত্মপ্রচারে উৎসাহী নন বলেই, নিজেদের এই বৈশিষ্টকে বজায় রাখবারই চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, একেই শ্রদ্ধা করা উচিত—প্রত্যেকের, শুধু লেখক বলে নয়, মানুষ বলে।

শেষ করে মানসী একটু চিন্তামগ্ন হয়ে গিয়েছিল। অজন্তাও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল ভেবেছিল—খবরটা জানিয়ে বেশ একটু হাসির খোরাক জুটবে কিন্তু মানসীর ভাবান্তর দেখে, প্রথমটায় বিস্মিত, পরে বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিল।

তবু সে ভাবটাকে কাটিয়ে নিয়ে একটু হাল্কা হাসির রেশ টেনে অজন্তা বলেছিল—দেখিস বললাম বলে ভাবিসনি, তোর প্রিয় সাহিত্যিকের নিন্দে করলাম। তোর অনুরাগী পাঠিকা না হলেও, জানবে তাঁর লেখা আমি কম পড়ি না।

মানসী বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল—কি বলছিস্ তুই, শুধু শুধু কেন তাঁর নিন্দে করতে যাবি? তা ছাড়া জানবি—ওঁর যারা নিন্দে করে তারা নিতান্তই বেয়াদপ আর বে-রসিক! আর একটা কথা জেনে রাখিস, নারীর অত বড় দরদী সাহিত্যিক ঐ একজনই। 'জয়দেব' তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যে নারীকে সুন্দর করে তুলেছেন, আর বড় করেছেন তাঁর সে হৃদয়ের মহত্বকে। অন্ততঃ আমরা অর্থাৎ নারীজাতির পক্ষে এ-সব শোভা পায় না।

ব্যস, এই পর্য্যন্ত বলেই—মানসী সোজা উঠে দাড়িয়েছিল। এর পরে কেউই কারও সংগে কথা কয়নি। কিন্তু অজন্তা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—মানসীর কথাগুলোতে তারই প্রতি—কটাক্ষের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। শেষে নিজেই বুঝেছিল মানসী, সাহিত্যকে ভালবাসতে গিয়ে সাহিত্যিককেও ভাল বেসে ফেলেছে। তাই জয়দেবকে কারও সামনে সমালোচনায় বড় করে তুলতে চায় না।

তাই অজন্তা নিজেই আর কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু মানসীর মনে সব কিছুকে চাপা দিয়ে একটা জিনিসই গুমরে গুমরে উঠছে। সেটা মুখে প্রকাশ না করলেও মানসী তার মন দিয়েই অনুভব করেছে—অজন্তার কথাগুলোই তার সব মূল।

কলেজ থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এসে, ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছে সে। বাড়ি এসেও শত কোলাহলের মধ্যেও চাপা পড়েনি সেটা। তার পর থেকে সমস্তক্ষণই সে একটানা ভেবে চলেছে। নিজেও এই নির্জন ঘরখানায় বসে—ভাবনাটা দ্রুত লয়ে বেড়ে চলে—তার অনুভূতির শিরায় শিরায়। সেই সঙ্গে একটা অসহ্য যন্ত্রণাও ধীরে ধীরে অনুভূত হয়—হৃদয়ের ক্ষুদ্ধ ধাপে ধাপে। কোথায় যে ব্যথা, আর কিসের যাতনায় সে এমন করে, অস্থির হয়ে উঠেছে। সে অন্তর-রহস্য এক মানসীই জানে। তা একান্তই তার মানস সুন্দরী সেই নিঃশব্দ গোপন আরাধনা। তার এই প্রখর রূপ যৌবন মন সেই একই উদ্দেশ্যে সঞ্চিত হয়ে চলেছে—কেবল একজনকেই ঘিরে, তাকেই শুধু কল্পনা করে। জীবনের সবচেয়ে বড় কঠোর নিয়মকে মেনে নিয়ে সে নিজেকে কঠিন করে ফেলেছে বাইরের অসংখ্য দৃষ্টির সামনে।

এ ছাড়া বুঝি তার কোন উপায়ই ছিল না. সকলের চোখে বিস্ময় আর সবাইয়ের মনে আতঙ্ক। মানসী দিনে দিনে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বাইরের সকল যোগাযোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চলেছে রায়বাহাদুর সোমনাথ বাবুর ঐ একমাত্র মা-মরা মেয়ে মানসী। মানসীর বি-এ পরীক্ষা শেষ হলেই মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে, তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁরই বন্ধুপুত্র রমেনের মত সুযোগ্য পাত্রকেই তিনি নির্বাচন করে রেখেছেন। কিন্তু মানসীর মনের খবরটা হয়তো তিনি জানতেন না, নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিও ভেবে কূল পেতেন না, কি তার উপায়!

মানসী এই সময় ভাবতে গিয়ে কেমন করে যেন হেসে ফেলল। আবার পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল। চিন্তাটা তখনও খোঁচাচ্ছে। মানসী জানে—সব ভুল আর মিথ্যে ধারণা ওদের। তার এত রূপ আর যৌবনকে তপস্বিনীর মত আগলে নিয়ে যার উদ্দেশ্যে সে এগিয়ে চলেছে, সে তো বাবার মনোনীত পাত্র রমেন নয়, সে যে মানসীরই মানসপটের মানসপ্রিয়। মন থেকে যার সৃষ্টি, মানসী তাকেই চায়, চায় না সে সমাজের গড়া ভালবাসাকে। বন্ধন দিয়ে যার সৃষ্ট, সে তো মনের চাহিদা নয়—মানুষেরই সৃষ্টি করা প্রেম। তাই বিবাহ দিয়ে যা আরম্ভ, তার অনেক পূর্বেই মানসী পেয়ে গেছে তা। সেই 'চাওয়া-পাওয়ার মানসপ্রিয়টি যার রূপ নিয়ে তার সামনে ধরা দিয়েছে, মানসী তাকে চিনে ফেলেছে। হ্যাঁ, এমনি এক রূপ, এমনি এক দরদে-মাখা মন।

মানসী তাকেই চায়—তাকেই যে ভালবেসে ফেলেছে এমন করে। তাকে পাবার জন্যে তার এই নীরব আরাধনা। গোপন সাধনা। মানসী জানে আর বেশী দিন নয়। সাক্ষাতের শুভ মুহুর্ত্তটা বুঝি সমাগত। বি-এ পরীক্ষার আগে তাকে ওসব কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে। সমস্ত কথা সে সামনে গিয়ে বলবে! কিন্তু একি! সব যে ওলোট-পালোট হয়ে গেল! একটা দ্বিধা এসে মানসীকে প্রতিমুহূর্তে—পিছিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ সে উতলা হয়ে উঠেছে—কাতর হয়ে পড়ছে—কেমন এক অসহায়

ব্যথায়। মানসী ভাবতে লাগল অন্তরালে সে মুখ ঢেকে থাকে—কা'কেও ধরা দেবে না—শুধু একজনের কাছে। শুধুমাত্র একটি মুহূর্তের জন্যে? মানসী সেই একটি মুহূর্তের জন্যেই একটিবার মাত্র, দৃষ্টির বিনিময়ে শুধু একটি কথাই বলবে—"তোমাকেই ভালবাসি।" তাহলে সে যে সুযোগ মুহূর্তের জন্যে ব্যাকুল আগ্রহে অধীর হয়ে আছে, আজ কি সে সমস্ত মিথ্যে হয়ে গেল?

মানসী নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল—না না, সব ভুল। সব মিথ্যে ভাবনায় সে গুমরে মরছে। সে জানে—তার মানসপ্রিয়কে। ফিরিয়ে সে দিতে পারে না। মানসীর মনের বার্তা একটিবারও কি তার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয়নি? স্বপ্নের ঘোরে, মানসী একবারও কি ভুলে দাঁড়ায়নি তার শিয়রের পাশে? কিংবা কল্পনার অন্তঃপুরে, মানসীর অনিন্দ্য রূপ দেখে একটি বারের তরেও কি সে চমকে ওঠেনি? মনে হয়নি তার, তারই মানসী প্রিয়া,—মানসী?

না না সব ভ্রান্তি, তার ভাবনাটাই অমূলক। মনেরই নিছক ধারণা! মানসী মনকে এক মুহূর্তে শক্ত করে ফেলল। কল্পনার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনল। ফিরে এল সে বাস্তবের চেনা আর চিরন্তন অনুভূতির মাঝে। বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল—ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে বই-এর আলমারিটা খুলে ফেলল। ওপর তাকেই তার প্রিয় বইগুলো থরে থরে সাজান রয়েছে। তা থেকে সব বেছে একখানা বই নামিয়ে নিলে। গ্রীণ রঙের মলাটের ওপর সাদা-কালোয় মেশা—নামটা জ্বল-জ্বল করছে। মানসী জোরে জোরে পড়ল—"নারীর প্রেম।" বাঃ কি সুন্দর নামটা। নিজের মনেই সে তারিফ করতে থাকে। শুধু ঐ নামটার মধ্যেই জয়দেব তাঁর সমস্ত বইখানারই সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন। কেন জানি এই মুহূর্তে তার এই বইখানা পড়তে বেশী ইচ্ছে করছে? যেখানে হতাশ প্রেমিকার বেদনার দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছে। আত্মনিবেদনের সেই অপূর্ব অভিব্যক্তি! নিঃশব্দ কান্নার পাহাড় যেন সেখানে জমা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রেমিকা তার অপরিচিত প্রেমিককে চিঠি লিখে চলেছে—"তোমাকে দেখিনি, তোমাকে চিনি না। শুধু নামটা শুনেছি। আর তাতেই ভালবেসেছি তোমাকে। এত ভালবেসেছি যে, তোমার সব কিছুই আমার কাছে অতি-পরিচিত হয়ে উঠেছে। এতদিন অপেক্ষা করেও, যখন তুমি এলে না তখন এই মৃত্যুপথযাত্রীর চিঠিটা তবু পোড়ো। তাহলে সেই কথাটাই জানবে তুমি আমারই, ওগো তুমি আমারই, আর কারও নয়।"

মানসী আর ভাবতে পারে না—এতক্ষণে চোখের কোলে যে জল জমে উঠেছিল—সেটা ঝরে পড়ল বইখানার ওপর। বইটা আর পড়া হয় না। তেমনি ভাবেই তুলে রেখে দিয়ে আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে সব ব্যথা ভুলতে চাইল। সে, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। একটা অস্পষ্ট আঁধারের জমাট রূপ ক্রমশঃই মিলিয়ে যায়। স্বচ্ছ আলোয় ফুটে ওঠে—কালির অক্ষরে, 'বাহাত্তর একের বি'—অজন্তার কাছ থেকে নেওয়া ঠিকানা। চেঁচিয়ে কয়েক বার উচ্চারণ করলে মানসী, হ্যাঁ, ঠিকই আছে ঐ ঠিকানায় এখুনি একখানা চিঠি লিখতে হবে তাকে, মনে যেটুকু দ্বিধা আর সংশয় রয়ে গেছে তা থেকে সে নিষ্কৃতি নেবে।

মানসী তাকে কতখানি ভালবাসে, তাকে ছাড়া সে কাউকে পেয়ে জীবনে সুখী হতে চায়না, সে কথাটা সে বার বার করে লিখবে। দরদে ভরা মন যার, সেই বুঝবে মানসীর মনকে। মন যার আছে সে বুঝতে পারে আরও একটা মনকে। মানসী সাইকোলজি পড়ে। মনোবিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তার পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় একান্তই, তা মনোগত। যে মনটা দিয়ে মানসী আরও একটা মনেরও খবর পেতে পারে। সেই মনের একই অপূর্ব অনুভূতি মানসী জানে সে নিশ্চয়ই জানে, তারই মনের আরও একটা অংশ সেই 'মন'। একই সুরে, একই ছন্দে একই সত্তায় গড়ে ওঠা—সেই অদ্ভুত দু'টি মনের সম্বন্ধ। নারী আর পুরুষ। একই চাহিদায় উন্মুখ হয়ে ওঠা দুটি মন। সেই অদ্ভুত মন দুটিকে—মানসী কাছে টেনে আনতে চায় অপূর্ব সেই মোহিনী শক্তির আকর্ষণে সেই চিরন্তন সুরের ঝঙ্কার—তোমাকে ভালবাসি। শুধু এই দুটি মাত্র শব্দে। অজানা বিরহিণী প্রিয়ার বার্তাকে সে চুপে চুপে পাঠাবে সেই অদেখা অপরিচিত প্রেমিকের কাছে। চির-পরিচয়ের স্পর্শ বোলানো—বার্তাকে তার বুঝে নিতে কষ্ট হবেনা যে ঐ তারই মনের কথা। তারই মত, আর ও একটি তৃষ্ণার্ত মনের—সেই নিঃশব্দ বেদনার কান্না রয়েছে তাতে মাখানো। সেইখানেই তুমি মানসীর সার্থকতা—সুন্দর হয়ে উঠবে। আর সেই সুন্দরতম—তার জীবনকে করবে পূর্ণতর।

মানসী লিখতে বসল—তার নামে ছাপা প্যাডের ওপর, প্রথম সম্বোধনের জায়গায় লিখল—মানসপ্রিয়, তার পর কি লিখবে। মানসী আর নতুন করে ভাবল না। কলমের মুখে ছড়িয়ে পরল—অদ্ভুত সব কথার রাশি। তার মূল সুরে সেই একই শব্দের ঝঙ্কার! "ভালবাসি ভালবাসি।" সেই সুর কখন থেমে গিয়েছিল সে টের পায়নি। নিতান্ত বেসুরের মত ক্রমাগত কড়ানাড়ার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে—দরজাটা খুলতে—দেখা হয়ে গেল বাবার সংগে। এত বেলা পর্য্যন্ত মেয়েকে ঘুমতে দেখে তিনি নিজেই নেবেছিলেন ডাকতে।

মানসী একটু লজ্জিত সুরে বলল—কাল অনেক রাত হয়েছিল কিনা—

বাধা দিয়ে রায়বহাদুর বললেন—ওঃ বুঝেছি, পরীক্ষা পড়া করতে রাত জাগতে হয়েছে,—তা ভাল। মনে করেছিলাম—শরীর বুঝি খারাপ টারাপ হোল। শেষ করেই তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে বললেন—আজকের কাগজে বড় মজার খবর বেরিয়েছে—ভাবলাম—মানুকে এই সংগে বলে আসি। তা তুমিই না হয় কাগজখানা পড়ে দেখো। বলে তিনি কাগজখানা এগিয়ে দিলেন। কাগজখানা হাতে নিয়ে মানসীর দৃষ্টি প্রথম লাইনে চমকে গেল—"পুরুষ ছদ্মবেশী, নারী সাহিত্যিক?"

তার পরের লাইনগুলো সে গড় গড় করে পড়ে গেলো—রায়বাহাদুর একটি বিশেষ জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়ে সকৌতুকে বললেন—ঐ জায়গাটা একটু চেঁচিয়ে পড়তো মানু, আর একবার শুনি। এতক্ষণে মানসীর মনের অবস্থা কি রূপ নিয়েছে—মানসীর মনোবিশ্লেষকই জানে। তথাপি মানসী স্থির অটল হয়েছিল। বাবার কথায় সম্বিৎ পেয়ে রুদ্ধকণ্ঠে মানসী পড়তে লাগল—"আন্তর্জাতিক" ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় যিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি প্রকাশ্য সভায় নিতে এলেন, তিনি হলেন—আজকের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—'জয়দেব' ছদ্মনামে পরিচিতা—শ্রীমতী মালবিকা সেন।
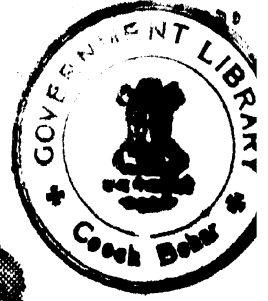
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ দে ভেরী)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

হ্যাঁ, সে সন্ধান ঠিকই আমি পেলুম। দূর থেকে দেখলুম সেই যুগ-যুগের সঞ্চিত স্বর্ণখনি ও ঐশ্বর্য্যের অবস্থানের দৃশ্য। প্রথমেই নদীর জলে স্ফটিকের চূর্ণ, চড়াই আর পাহাড়ের গায়ে-গহ্বরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হীরক ও বিচিত্র মূল্যবান পাথরের রাশি আমাদের বিহ্বল করে দিল। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের কি মূল্য এই 'ওয়াই-ওয়াই'দের কাছে? ঐশ্বর্য্য দিয়ে যদি ভোগ না হয়, তার যদি কোন বিনিময়-মূল্য না থাকে, তাহলে সাধারণ পাথর আর হীরেতে, সোনা আর মাটিতে তফাৎটা কি? এখানেও তেমনি এই সোনা, হীরে বা অন্যান্য খনিজ পদার্থের কোন দ্রব্যমূল্য নেই। মূল্য যেটুকু আছে তা হচ্ছে তাদের চকচকে ঝকঝকে রূপের জন্য। হারানো-জগতের লোকেরা এর কোন মূল্যই বোঝে না। কিন্তু প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদ স্তূপাকার করে রেখেছে এই নিভৃত কন্দরে, জঙ্গলাকীর্ণ ভূস্তরের গর্ভে। তবে হীরের চেয়ে সোনার কিছুটা মূল্য দেয় এরা এইজন্যে যে, তা দিয়ে কিছু বানানো যায়।

এখানে পৌঁছে মনে মনে বেশ গর্ব্বই অনুভব করছিলুম আমরা। এলিসও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। হঠাৎ সে বলে বসল, এর পর মৃত্যু হলেও আমার ক্ষোভ নেই।

উত্তরে আমি বললুম, তোমার ক্ষোভ না থাকলেও, ব্যক্তিগতভাবে এতে আমার যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ আছে। তুমি সঙ্গে না থাকলে এই হারিয়ে যাওয়ার দেশে এসে পৌঁছানো আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না। এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ তুমিই আমায় প্রেরণা যুগিয়ে এসেছ।

মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল এলিসের মুখ।

আশ্চর্য্য হবার কথা, বিহ্বল হবার কথাই। আমরাই এই প্রথম সভ্য জগতের শ্বেতকায় জাতি এখানে এলুম। এ আবিষ্কার নিঃসন্দেহে যে গৌরবের তা আপনারা যারা এই কাহিনী পড়বেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন।

স্বপ্নের মত এই বিচিত্র বিস্ময়কর পরিবেশে আমরা রয়ে গেলুম দু'দিন। যেদিকে তাকাই সেদিকেই বিস্ময় আর বিস্ময়। আরো এগিয়ে যেতে হবে আমাদের,—আরো এগিয়ে যাব আমরা স্বপ্নময় বিস্ময়ের রাজ্যে। কিন্তু এ যে স্বপ্ন নয় তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যখন আমরা এখান থেকে তল্পিতল্পা তুলে এগুতে লাগলুম। 'সাভানার' শেষ সীমানার পর্ব্বতগুলি অতিক্রম করতে পারলে যে উপত্যকায় আমরা পৌঁছব তারই নাম 'গার্ডেন অফ ডেথ।' দীর্ঘ ষাট মাইল বিস্তৃত এই শুষ্ক-কঠিন ভূভাগ। দিগন্তব্যাপী সমুদ্র যেন ম'জে শুকিয়ে এখানে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আকাশচুম্বী যে সব ছোট-বড় পর্ব্বতশৃঙ্গ এখানের আশে-পাশে দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে, সেখানে কোথাও তৃণশস্যের ছায়া পর্য্যন্ত নেই।

ওয়াপিদানা অধিবাসীদের গ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকে একমাত্র আমাদের সঙ্গে যে মাকুসিস গাইডটি ছিল, সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল আমাদের।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম আর পথ অতিক্রম। চড়াই ভেঙে ওঠা খুব কষ্টসাধ্য হলেও আমরা একটা চূড়ায় এসে পৌঁছলুম দিন দুয়ের মধ্যে। সেই চূড়ার নীচে একটু নেবেই একটা ছোট গহ্বর আমার নজরে পড়ল। সেই গহ্বরের মধ্যে কি যেন সব চকচক করছে, ঝকমক করছে। আমি সেখানে একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে লক্ষ্য করলুম। তার পর যন্ত্রপাতি সমেত তার মধ্যে নেবে দেখি একটা বিরাট স্ফটিকের চাঁই। খানিকটা টুকরো উদ্ধার করলুম তার থেকে। আমাদের সঙ্গে যে কয়জন লোক ছিল, তারা এ ব্যাপারে হাসাহাসি করতে লাগল এই সব পাথর নিয়ে আমি বোঝা বাড়াচ্ছি দেখে।

এখন পাহাড়ের আর একটি শৃঙ্গ পার হলেই আমরা উপত্যকায় এসে পড়ব। এই শৃঙ্গে উঠতে উঠতে আরো বহু বিচিত্র পাথরের সন্ধান মিললো। মূল্যবান ওপেল পাথরও পেলুম কয়েক জায়গায় বেশ খানিকটা। গার্নেট তো ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। তবে পাইরোপ জাতীয়দেরই এখানে পাওয়া গেল বেশী। এরা গার্নেট জাতীয়দেরই একটি অংশ।

এলিস তো এই সব পাথর কুড়োতে কুড়োতে তার ব্যাগের বোঝা বেশ ভারী করে ফেললে। কিন্তু হীরে কোথায়? যে হীরকের উৎস-সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি, নদীতে বহু জায়গায় দেখেছি যাদের চূর্ণ রূপ, আসলে তারা কি এখানকার পাহাড়ে-মাটিতে জন্ম নেয়, অন্য কোনখানে—আরো, আরো অনেক দূরে, আমাদের গতিবিধির বাইরে এদের জন্মভূমি?

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গমের মত আওয়াজ আসছিল যে পাহাড়গুলির দিক থেকে, সেই দক্ষিণাঞ্চলকে পরিত্যাগ করে আমরা চলেছিলুম পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে। কিন্তু তবুও, তখনও একটা চাপা আওয়াজ মধ্যে মধ্যে কানে আসছিল। বিশেষ করে পাহাড়ের উপর দিকে যতই আমরা উঠছিলুম, ততই আওয়াজের তীব্রতা বাড়াচ্ছিল। তাছাড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীও ঢেকে রেখেছিল ওদিকের আকাশ। কুয়াশার মত ভেসে আসছিল তারা শূন্যপথে। আমাদের পাহাড়ের নীচের দিকটাও ছিল কুয়াশায় ঢাকা।

এবার 'সাভানা'র শেষ সীমানার পাহাড়গুলি অতিক্রম করে আমাদের নীচে নামার পালা। দলবল সুদ্ধ আমরা নীচের দিকে

নামবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। মালবাহী বলদদের দিয়ে নীচে নামবার অসুবিধা থাকলেও, তা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হ'ত কিন্তু সঙ্গের কয়েকজন নীচে নামতে আপত্তি জানাল। আমাদের গাইড ও দোভাষীটি বললে যে, ওদের ধারণা কোন মানুষের ওখানে যেতে নিষেধ আছে এবং ঐ মৃতের উপত্যকায় নেমে কেউই কোন দিন আসতে পারেনি। ঐ উপত্যকায় সারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের আকর স্বর্ণ ও হীরকের নদী একই সঙ্গে বয়ে এসেছে স্বর্গ থেকে। ভীষণাকার দৈত্য-দানবরা আগলে আছে ঐ মহামূল্য ভূভাগ। মৃত্যু অনিবার্য জেনে তারা কি করে নামবে ঐ উপত্যকায় ?

মাকুসিস গাইডের মুখে ওদের কথা শুনে আমিও যে একেবারে ভয় পেলুম না তা নয়, কিন্তু তবুও জীবন-মরণের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মরণ-ভয়কে জয় করে আমি সঙ্গের ওয়াপিশনাদের বললুম, আমরা দু'জনে যদি এই দীর্ঘদিনের ভয়াবহ নদীপথ ও জঙ্গল অতিক্রম ক'রে এসেও এখানে নামতে রাজী হতে পারি, তা হলে তোমরা এই দেশীয় লোক হয়েও এ অবস্থায় আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কাপুরুষের কাজ।

শেষ পর্য্যন্ত ওদের অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে খাবার-দাবার ও সাজ-পোষাকের প্রলোভন দেখিয়ে চার জনকে আমি রাজী করালুম। বাকী চার জনের পাহাড়ের উপরেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল। বলদগুলিও মালপত্র নিয়ে তারা এখানেই থাকবে আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত।

এ ব্যাপারে এলিসও যেন কেমন ভড়কে গিয়েছিল। সে বললে, নীচের কিছুই যখন দেখা যাচ্ছে না, সারাক্ষণই যখন 'মিষ্টে'-এ ভরা আছে চারিদিক, তখন আর নেই বা গেলুম আমরা ওখানে। ওখানে নেবে আবার যদি আমরা পথ হারিয়ে ফেলি, অথবা ঐ উপত্যকা থেকে উঠতে না পারি, তা হলে সকলেরই জীবনান্ত ঘটবে এবং এতদিনে, এই কষ্ট করে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তাও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এই সঙ্গে।

এতদিন পরে এই শেষ মুহূর্ত্তে মহিলাটি যে আর একবার ভয়ে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে আমার আর বাকী রইল না। আমি তার হাতে একটু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে শুধু এই কথাই বললুম, কয়েক দিন আগেই তুমি যে বলছিলে, 'এখন মরলেও বোধ হয় ক্ষতি নেই।'

তবু অত্যন্ত নির্ভীকই বলতে হবে এলিসকে। শেষ পর্য্যন্ত সে রাজীই হয়ে গেল।

আমরা ও আমাদের সঙ্গে বলিষ্ঠ কুলিদের চার জন গোঁজ মুখ করে নামতে লাগল। প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছিল, তারা যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ী পথ বলে কিছুই নেই এখানে। নিজেদের চেষ্টাতেই পথ করতে করতে তিন দিনের দিন নীচে আমরা কুয়াশার একটা স্তরের মধ্যে এসে পড়লুম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেল। পাশের মানুষকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সকলেই আমরা পরস্পরের হাত-ধরাধরি করে নামতে লাগলুম। তা ছাড়া কোমরের সঙ্গে দড়িও বাঁধা ছিল অনেকের। দলের সকলেই যেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচটা যে বড় বড় টর্চ্চ ছিল, সেইগুলোকে জ্বালতে জ্বালতে আমরা কুয়াশার স্তরটা অতিক্রম করলুম। আস্তে আস্তে আবার পরিষ্কার হয়ে গেল খানিকটা। আর আধ মাইলটাক পথ পেরুলেই আমরা সমতলভূমিতে পদার্পণ করতে পারব।

এক জায়গায় বসে প্রাতরাশের পর্ব্ব সেরে নিলুম আমরা। রাত্রি কাটিয়েছিলুম উপরের আর এক জায়গায়। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে একটিও কোন মারাত্মক জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

নীচের সমতলভূমি সম্বন্ধে নানা কথা চলতে লাগল জংলীদের পরস্পরের মধ্যে এবং আমরা কেউই যে আর ওখান থেকে ফিরতে পারব না, এইটাই ছিল তাদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

আবার একটা মেঘের স্তর পড়ল নীচের দিকে। একেবারে সাদা রঙের মেঘ এটা। তুলোর স্তরের মত বিছিয়ে আছে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। আমাদের মাকুসিস গাইডটি বললে যে, খুব উপর থেকে এটাকেই মরুভূমির মত মনে হয়। এই মেঘের স্তর আর পরিষ্কার হয় না কোন দিনও এবং এই রহস্যময় রোমাঞ্চকর ধোঁয়ার রাজ্যের মধ্যেই আছে সোনার খনি আর হীরের নদী।

ভূত, দৈত্য, দানা বা দেবতা, শয়তান, যাই থাক,—সোনার খনি আর হীরের নদী ওখানে থাক বা না থাক, তাতে আর কিছুই এখন এসে-যায় না আমাদের। কারণ তখন আমরা সেই সাদা মেঘের স্তরের মধ্যে এসে পড়েছি। হাতড়ে হাতড়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে খুব সাবধানে নামতে লাগলুম সকলে। একটা আশ্চর্য্য রকমের গন্ধ আমাদের নাকে আসতে লাগল। নিশাদল বা গন্ধক পোড়ালে যে রকম গন্ধ বেরোয়, এখানের গন্ধটা প্রায় সেই রকম। লাইমষ্টোনও পাহাড়ের গায়ে মধ্যে মধ্যে যদিও দেখেছি আমরা, কিন্তু পাহাড় থেকে সমতলে নেমে ছোট বড় লাইমষ্টোনের ছড়াছড়ি নজরে পড়ল।

সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলি একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপর দিকে বেশ খানিকটা উঠে গেল। সত্যিকার স্বপ্নলোক বলতে যা বোঝায়, তা এতক্ষণে আমি নিজে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করলুম। সামনের অনেকটা জায়গা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের দোভাষীটি বললে, সত্যিকার মৃত্যুর হাত থেকে এখানে কারো রেহাই নেই। এখান থেকে আর খানিকটা গেলেই সেই স্বর্গ-নদীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আমাদের। যার এক তীরে সোনার চড়া আর অপর তীরে হীরের স্তূপ।

শুনতে কথাটা রূপকথার আজগুবী গল্পের মত মনে হলেও, আমি নিজের চোখেই সব দেখলুম। শুধু আমি নয়, এলিসও বাদ গেল না এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে।

ঐ স্বর্গ-নদীর ধারে যেতে অন্য কেউই সাহস করল না। নদীর পাড় থেকে প্রায় দু'শো হাত দূরে, তারা মালপত্র নিয়ে বসে রইল। এলিস ও আমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলুম সেই নদীর ধারে। সমতলভূমিতে হাঁটতে মোটেই কষ্ট হয় না, যত হয় পাহাড়ে উঠতে। সত্যিই নদীর ধারে এলুম আমরা। বেশ চওড়া নদী প্রবলভাবে ব'য়ে চলেছে। একেবারে খরস্রোতাই বলা যায় তাকে। চড়ার ধারেই আমরা বসে পড়লুম একটু। একটা স্বর্গীয় অনুভূতি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে আমাদের মনের মধ্যে এসে স্থান নিয়েছে তখন। কেউই কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারছিলুম না। হঠাৎ আমিই পাশ থেকে খড়িগুঁড়োর মত খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে দেখি, সোনার

চিকচিক করছে। আরো মাটি, আরো মাটি এখান-ওখান থেকে তুলি আর দেখি। শুধু সোনায় ভরা সে মাটি।

হঠাৎ এই সময় এলিস বললে,—'কিন্তু এক কণাও এই সোনা এখান থেকে তুমি নিতে পারবে না। কারণ ওয়াপিশানা গ্রামের এক বৃদ্ধা নাকি তাকে বলেছিল, এখানকার সোনা বা হীরে কেউ নিলে তার আর নিস্তার নেই—কোনদিনই বংশ থাকোন তার। দোহাই তোমার, এই অনুরোধটুকু রাখ।'

আমি বললুম, 'আমি তো হীরের উৎস-সন্ধানী, সোনায় আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হীরে কই?'

হীরে তো এপারে নয় বন্ধু, হীরে নদীর ওপারে। সেখানে খাওয়ার আর কোন উপায় নেই। উত্তরে এলিস বললে।

সেই কথাই বলেছিল বটে সবাই। এই নদীর এক পাড় সোনায় ঢাকা আর এক পাড়ে হীরে।

হীরে-পাড়ে আর পাড়ি দেওয়া হ'ল না আমাদের। স্বর্ণ-নদীকে প্রণাম করে, সোনা বা হীরে এক কণাও ওখানকার মাটি থেকে না নিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলুম।*

সমাপ্ত

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়

মধ্যরাতের সূর্য

আগে কেবল একবার মাত্র হান্স আণ্ডেরসেন তার জীবনের লক্ষ্যকে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে দেখেছিলো। যখন ওডেন্সের বিশপমশায়ের আইবুড়ো বোনটি কবিদের কথা বলতে বলতে শ্রদ্ধা ও বিনতিতে ভরে গিয়েছিলেন, ঠিক তখনি যেন সব পর্দা স'রে গিয়েছিলো তার সামনে থেকে, কে যেন বুঝতে পেরেছিলো কী তার হওয়া উচিত—এতটাই তখন আলোড়িত হয়েছিলো তার মন। যেন দেবতার ডাক শুনেছিলো সে তখন, এমন এক পরিমল এসেছিলো পবনে। দেবতার ডাক—এই কথাটার ভিতরে হয়তো আতিশয্য রয়েছে একটু। 'শিল্পীও ঠিক অন্য সকলেরই মতো,' এই কথাই তো লোকে বলে; আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনো পুরোহিত যেমন ঈশ্বরের আহ্বান শুনে সাধারণ জীবন থেকে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হ'য়ে পড়েন, তাঁকে যেমন দুঃখ পেতে হয় সকলের হ'য়ে, বিসর্জন দিতে হয় নিজের প্রাণ—কোনো কবিও ঠিক তেমনিই। কেননা, একজন কবির ভিতর কান কথা বলে, মুখ শুনে নেয় সব ধ্বনি, জাগর বুদ্ধিই তিলে তিলে জন্ম দেয় স্বপ্নের কুহক; তার ভিতর সুষুপ্তি সব কিছুকে উন্মোচিত ক'রে দেখিয়ে দিয়ে যায়; পুতুল আর ছায়া—তারাই সব দেখে; আর সৃষ্টি সম্ভব হয় অক্ষমতা ও শূন্যতার প্রবল তাপে। কবিত্ব নামক হিংস্র ও রক্তখোর ডাকিনীটি যারই উপর ভর করেন, আজীবন তার জন্ম আর শান্তি নেই। হান্স হয়তো এত সব তখন ভাবেনি, কিন্তু এটা তো বুঝতে পেরেছিলো যে, এরই ভিতর লুকিয়ে আছে অলোকসম্ভব সম্মান। এখন সে দেখতে পেলো যে চিরকাল সে এই অলৌকিকের টানেই ছুটে বেরিয়েছে—যখন সে অ্যাপ্রন প'রে বেড়াতো তখন থেকেই সে কবিতার দিকে ঝুঁকে ব'সে আছে; কবিতার ডাকেই সে সাড়া দিয়েছে যখন থিয়েটারের হাণ্ডবিল জমাতো, যখন সে লিখেছিলো 'কড আর পার্চমাছ' লেখা বলতেই নাট্যশালার কথা মনে হ'তো তার—নাটক ছাড়াও যে অন্য অনেক কিছু রচনা করা যায়, তা সে ভুলেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু এবার যেন ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠলো দূরের ঘণ্টা, আর তাকে প্রবলভাবে সাড়া দিতেই হ'লো সেই ঝনঝনে সংকেতে।

ছটফটে সে সব সময়েই; একবার যা মাথায় ঢুকলো, যতক্ষণ না তা শেষ করছে, ততক্ষণ যেন আর একটুও স্বস্তি নেই। যেন জ্বরের ঘোর এসে আচ্ছন্ন করলে তাকে, এত তাড়াতাড়ি সে লিখতে শুরু ক'রে দিলো, আর পুতুল-নাচানো নাটক নয়, একেবারে সত্যিকার নাট্যমঞ্চের জন্যই লিখছে—এ-কথাই সে ভাবলে মনে মনে। গর্বে সে ভ'রে গেলো, যখন একদিন একটি আস্ত নাটক নিয়ে গিয়ে শ্রীমতী রাবেকের সঙ্গে দেখা করতে পারলো।

'কিন্তু তুমি যে ইঙ্গেমান আর ওয়েলেনশ্লেগের-এর নাটক থেকে আস্ত সব সংলাপ ঢুকিয়ে ব'সে আছো।' দিনেমার দেশের দুজন বিখ্যাত কবির নাম ক'রে, শ্রীমতী রাবেক প্রতিবাদ জানিয়ে উঠলেন।

'দিয়েছি তো—কী আশ্চর্য সুন্দর ওই অংশগুলি' নির্বিকার গলায় এই কথা বলে হান্স তার নাটক পড়ে শোনাতে বসে গেলো।

উদ্দীপক মহাকাব্য আর নাটক লিখেছিলেন ওয়েলেনশ্লেগের, আর ইঙ্গেমান তখন একজন বন্য রোম্যান্টিক। হান্সের অনুরাগ তো প্রায় যেন অসীমের উদ্দেশেই নিবেদিত হয়ে গেলো। আরেকজন মস্ত লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ হলো তাঁর প্রতি, তিনি হলেন হ্রোরগেডি—এই নম্র অথচ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক পরে তাঁর সেরা বন্ধুদের একজন হয়ে উঠেছিলেন, আর পরে, তিনিই প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন যে রূপকথার ছলে বিশ্বের উদ্দেশে হান্স কোন অমৃতবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন।

ততটা বিখ্যাত না-হ'লেও আরো অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু পেয়েছিলো সে; তাঁদের ভিতর একজন হলেন ইয়ুরগেনসেন, তিনি ছিলেন ঘড়িনির্মাতা; তাঁর মা-ও হান্সকে খুব ভালোবাসতেন; এই মহিলাটিই তাঁকে শুনিয়েছিলেন কর্ণেই আর রাসীন-এর কথা উপরন্তু হান্সের লেখার প্রশংসাও তিনি করেছিলেন, বলেছিলেন, একদিন হয়তো ওয়েলেনশ্লেগের-এর চেয়েও ভালো লিখবে হান্স।

তার বয়স তখন মাত্র ষোলো। এত সব কথা যেন নেশা ধরিয়ে দিলো তার রক্তে, লেখাপড়ায় অবহেলা ক'রে সে নিজেকে একেবারে পুরোপুরি কবিতা আর নাট্যশালার উদ্দেশে নিবেদন ক'রে দিলো। ছোট্ট একটা ঘরের ভিতর ব'সে-ব'সে ধূসর গোধূলিবেলায় লাতিন ব্যাকরণের তত্ত্বকথা আবৃত্তি করার চেয়ে নাট্যশালার আকর্ষণ অনেক বেশি ঠেকলো তার কাছে; তার উপর যদি ড্রয়িং-রুমের মহিলাগণ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন, তখন সম্পূর্ণভাবে

* এই কাহিনী 'আমেরিকান উইক্‌লী'র রবিবাসরীয় সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বহু চিত্র সহযোগে। ঐ বছরেই উইলিয়ম লে ভেরী Brazilian—Guiana Expedition পরিচালনা করেন।

তারই উদ্দেশে আত্মনিবেদন ক'রে দেয়া ছাড়া আর উপায় কী? কোরাস-গায়কদের একজন ব'লে নাট্যশালার ষ্টলের পিছনে জমির উপর যে বসবার জায়গা আছে সেখানে তার জন্য একটি আসন বিনামূল্যে সংরক্ষিত ছিলো, ফলে আর কিছুতেই লোভ সংবরণ ক'রে ওঠা গেলো না; কিছুদিন পরেই দেখা গেলো, কোনো সন্ধ্যেতেই বাড়ি থাকে না সে—নাটক দেখতে চ'লে যায়।

তখন যেন এক অনিশ্চিত ও জ্বরাতুর দিন কাটাতো হান্স, যার স্থান স্বাভাবিকতার পরপারে। মরীয়ার মতো নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে হ'তো তাকে, সব অসংগতি ও গরমিল ও ঢাকবার জন্য খুঁজতে হ'তো তীব্র কোনো উপায়, কোনো কোনোদিন যে কিছুই তার পেটে পড়েনি, এই তথ্যটা না-হয় সে চাপা দিয়ে রাখতে পারতো, কিন্তু তার জামা-কাপড়কে লুকোবার কোনো উপায়ই ছিলো না। একদিন, গ্রীষ্মবেলার এক গরম দিনে, কারো দেয়া একটা নীল কোট চাপিয়ে সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিলো। কোটটা ভালোই, কিন্তু হ'লে কি হবে, তার গায়ের মাপে নয়, মস্ত বড়ো—বিশেষ ক'রে বুকের কাছটা তো অনেক বড়ো; একেবারে গলার বোতামটা আটকে দেবার পরেও সামনের দিকে মস্ত এক বস্তার মতো খানিকটা অংশ ঝুলে প'ড়ে থাকলো; নাট্যশালার পুরোনো হ্যাণ্ডবিল আর প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে সে সেই ফাঁকা জায়গাটা ভ'রে দিলো, তার ফলে মনে হ'লো সে যেন মস্ত কোনো মহিলা, এত উঁচু হ'য়ে গেলো তার বুকের কাছটা। শিশুর মতো সরল ভঙ্গি ক'রে সে মনে মনে ভাবলে যে, কেউ নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করবে না। নির্বিকার ভাবে ড্রয়িংরুমে গিয়ে হাজির হ'লো সে—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সবাই তাকে জিগেস করতে লাগলো তার বুকে কী হয়েছে। এত ফুলে আছে কেন বুক? আর এত গরম পড়েছে, অথচ সে কিনা বোতামগুলো সব আটকে রেখেছে।

রমণীয় অথচ অদ্ভুত কতগুলি মুদ্রাদোষ ছিলো তার, সেইজন্যে সব সময়েই তাকে কিম্ভূত দেখাতো, কিন্তু এখন তাকে জামার হাতার ছেঁড়া জায়গাটা কি জুতোর শুকতলায় মস্ত গহ্বরটা ঢাকবার জন্যে অদ্ভুত সব ফন্দিফিকির বের করতে হ'লো—দিলে একপায়ের জুতো আরেকপায়ে ঢুকিয়ে, কব্জির নিচে আঙুলের ডগা অবধি নামিয়ে দিলে হ'তো—এমনি সব যত কিছু।

উপরন্তু ভীষণ একটা কুসংস্কারও ছিলো তার—নববর্ষের দিনে যা করবে, তা-ই তাকে করতে হবে সারা বছর ধ'রে, এটা সে ভয়ানক ভাবে বিশ্বাস করতো। সম্ভবতঃ পানেমারিরই কোনো একটা কুসংস্কারের ছাপ এটা। সেই রাতে নাট্যশালার দুয়ার যথারীতি বন্ধ—কেবল এক রাতকানা দরোয়ান ছিলো পাহারায়; লুকিয়ে তার পাশ দিয়ে আলগোছে ভিতরে ঢুকে পড়লো হান্স, ধুলোবালিভরা বারান্দা, সিঁড়ি আর বাতিল দৃশ্যপটের গুদোমঘর পেরিয়ে একেবারে মঞ্চের উপর। কোনো মঞ্চ ফাঁকা প'ড়ে থাকলে যেমন হয়, কনকনে ঠাণ্ডা আর ভুতুড়ে যেন; ভূতপ্রেতের কথা মনে প'ড়ে গেলো তার, মনে প'ড়ে গেলো তাঁদের কথা একদা যাঁরা এখানে ছিলেন,—বিস্মৃত অভিনেতা, স্তব্ধ গায়ক, নিশ্চল নর্তক—একদা ঠিক তারই মতো স্পন্দমান ছিলো যাঁদের বুক, উইংসের আড়াল থেকে তাঁরাই যেন তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে; অশরীরী সেইসব আত্মাগণ এই মুহূর্তে অন্ধকারের ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন বারে বারে; ডালেনে-এর ওখানে যখন সে নাচ শেখে, তখন যে-সব ছেলেমেয়ে তারই মতো সেখানে আসা-যাওয়া করে তেমনি জেদী, একরোখা আর আশাবাদী নাচিয়েদের চঞ্চল ও মৃত্যুপর শরীরের কথা মনে প'ড়ে গেলো তার—এখন কোনো শরীরই নেই তাদের। ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, শিরদাঁড়া বেয়ে ধীরে-ধীরে উঠে গেলো কনকনে একটা শিহরণের স্রোত, আর যেন অন্ধকার বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা তাকে তার জঠরে পুরে নিলে। কিন্তু তবু সে বুক বাঁধলো সাহসে; অভিনয় করবার জন্যেই তো এসেছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই সে দাঁড়ালো মঞ্চের উপর, টান-টান হ'য়ে, কান পর্যন্ত গুণ-টানা ধনুঃশরের মতো আধিজ্যতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু একটি লাইনও তার মনে পড়লো না, বরং দপদপ ক'রে উঠলো কপালের শিরা, ফুলে উঠলো রক্তের চাপে, উত্তেজনায় বুকের শব্দ বেড়ে গেলো অনেক, কিন্তু তবু কিছুতেই মনে পড়লো না তার। নতজানু হয়ে ব'সে পড়লো সে, জোরে দ্রুতগলায় দেবতার স্তব আবৃত্তি করলে সে অতঃপর, আর তারপর বেশ ভালো লাগলো, মুক্তি পেলো সে ঘূর্ণিতোলা অস্বস্তির হাত থেকে, যেন সব ভার নেমে গেলো বুক থেকে, আর তার মনে হ'লো কোনো ভূমিকায় অভিনয় করার চেয়েও অনেক ভালো হ'লো এটা, অনেক বেশি সুবুদ্ধি ও সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যাপার হ'লো যেন, আর সেই বছরে যে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে সে কথা বলতে পাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই তার রইলো না। কেবলমাত্র নাটকই তার পাঠ করা উচিত। লোকে যা বলে বলুক, তাতে কোনো কান না দিলেই হ'লো, কোনো মন না দিলেই হ'লো লাতিন ব্যাকরণে।

আর তারপরেই অধ্যাপক গুস্তবের্গ একদিন সচমকে আবিষ্কার করলেন যে ওই সব মূল্যবান ক্লাশে সে নিয়মিত হাজিরা দেয় না, তার উপর পড়াও করে না মন দিয়ে। তিনি সন্দেহ করলেন যে তাঁর ছাত্রটি যেন কোনো দায়িত্ব নিতে পাচ্ছে না এই পাঠাভ্যাসের, লাতিন ব্যাকরণ যতটা অভিনিবেশ দাবি করে তার অতি সামান্য অংশও সে দিচ্ছে না তার প্রতি, আর এতটা অকৃতজ্ঞ কোনো ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। হান্স ক্রিষ্টিয়ানকে সাহায্য করার জন্য তিনি অনেক করেছেন, এমনকি নিজের কাজকর্ম থেকে সরে এসেছেন, অনেক জরুরি বিষয় ত্যাগ করে তাকে পড়াবার জন্য সময় করে নিয়েছেন তিনি, আর সর্বোপরি তার তরফ থেকে নিজেই তিনি অনেকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, নানা রকম আব্দার করতে গিয়েছেন। অন্য সকলের চেয়ে হান্সের উপর অনেক বেশি বিশ্বাস ছিলো তাঁর—আর হয়তো শ্রীমতী ইয়ুরগেনসেনেরও অবস্থা ছিলো ততটা—কিন্তু এখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন, সব অবস্থা হারিয়ে যেতে লাগলো তাঁর, আর রাগও হ'লো ভীষণ। যথারীতি অনেক অশ্রুপাত ও প্রতিশ্রুতি ব্যয় করে হান্স এবারকার মতো মার্জনা চাইলো অনুনয় করে, কিন্তু—হয়তো নাট্যশালার প্রভাব তার উপর এতটাই পড়েছিলো যে, নাটকীয়তার চূড়ান্ত করে ছাড়লো সেদিন, বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেললো। 'আমার সামনে আর প্রহসন করতে হবে না,' রাগে ফেটে পড়ে অধ্যাপক বলে উঠলেন। হান্সের কাছে কি সত্যিই প্রহসন ছিলো না, কিন্তু অধ্যাপক কিছুতেই তার কথা শুনতে চাইলেন না। 'তোমার টাকার মধ্যে এখনো তিরিশটি রিগসডালের সবচেয়ে রক্ষা করে রেখেছি আমি। যতদিন না তা শেষ

হচ্ছে, ততদিন তুমি এসে প্রতি মাসে দশ রিগসডালের ক'রে নিয়ে যেতে পারো। তার পরেই তোমার সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ চুকেবুকে যাবে।' শেষকালে এই কথা ব'লে হান্সকে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলেন তিনি, একেবারে তার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

প্রতিটি, প্রতিটি রাতে একলা ঘরে রুদ্ধ স্বরে ভগবানকে জিগেস করেছে হান্স, 'বলো, কবে আমার শুভদিন আসবে? বলো, আমার ভালো দিন কি তাড়াতাড়ি আসবে না?' কিন্তু ভগবানের করুণা থেকে সে যেন বিচ্যুত হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে; এখন কিনা নিজেরই দোষে সে তার প্রিয়তম অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষককে হারিয়ে বসলো।

যত চাঁদা ওঠানো হয়েছিলো তার জন্য, তিন মাসের মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেলো। কোরাসের গায়কদের তখন নামেমাত্র মাইনে দেয়া হ'তো, আর তারই ফলে এমন এক অনাহার ও উপবাসের দিন মস্ত বুনো জানোয়ারের মতো বিকট হাঁ ক'রে তাকে গিলে ফেলতে এলো, যাকে সে কোনোকালেই ছাখেনি। ১৮২২ সালের শীতকালটা সে যে কী ক'রে কাটিয়ে দিলে তা সে নিজেই জানে না। দুপুরবেলায় শ্রীমতী ইয়ুরগেনসেন ভাবতেন সে বুঝি তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে খেতে গেছে; অথচ সে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে পার্কে ঢুকে পড়তো, ব'সে থাকতো একটা বেঞ্চির উপর, কোনোদিন হয়তো শক্ত, ছিবড়েওলা রুটির টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মুখে দিতো—যদি অবশ্য আগের দিনের বরাদ্দ থেকে রুটির কোনো টুকরো বাঁচিয়ে রাখা যেতো—কোনোদিন আবার তাও জুটতো না বরাতে। বারে-বারে উঠে দাঁড়াতো বেঞ্চি থেকে, হাত পা নেড়ে আড়মোড়া ভাঙতো, মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে গরম ক'রে নিতো ঠাণ্ডায় জ'মে যাওয়া শরীর, আর ঠিক তার পরক্ষণেই আবার তাকে ব'সে পড়তে হ'তো—অনাহার তাকে এতটাই দুর্বল ক'রে তুলেছিলো। কিন্তু কোনো কোনো আস্ত দিন অনাহারে কাটিয়ে দিলে কি হবে, প্রচণ্ড চেষ্টা করতো সে নিজের দুঃখ-দুর্দশা ঢেকে রাখবার জন্যে; এত সব দুঃখকষ্ট জ্বালার মধ্য দিয়ে তবু প্রাণপণে তীব্রভাবে এগিয়ে যেতে চাইতো সে, যেন তার আস্ত শরীরটা টান-টান হ'য়ে কোনো দিগন্তরের ঘণ্টাধ্বনির অপেক্ষা করছে, যেন এরই ভিতর দিয়ে জেদি, একরোখা, তেজীয়ান টিনের সেপাইয়ের মতো অবিচল লেগে থাকলেই শেষকালে একদিন সে জিতে যাবে। ঠাণ্ডায় আঙুলগুলিতে কালশিটে প'ড়ে গেছে, রক্ত যেন জ'মে গেছে ভিতরে, কলম ধরতে পর্যন্ত অসুবিধে হয়। তবু এই অবস্থার ভিতরেই সে আস্ত একটি নাটক লিখে ফেললে: 'ফিসেনবের্গ-এর দস্যু'—মায়ের কাছে ছোট্টবেলায় ছেলেভুলোনো গল্প শুনেছিলো একটা, নিছকই একটি লোককথা—তারই উপর নির্ভর ক'রে এই নাটকটা সে রচনা ক'রে উঠলো। নাটকটাকে ভালো ভাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে নকল করিয়ে নেবার মজুরিটা দিলেন টোয়েণ্ডর লুণ্ড, তারপর আশায় যখন অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠছে, এই রকম একটি মুহূর্তে সে নাটকটি রাজকীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

অল্প দিনের মধ্যেই নাটকটা ব্যুমেরাং-এর মতো তার কাছে ফিরে এলো, সঙ্গে একটা চিঠি আছে—যা প'ড়ে বোঝা যায় যে, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ মোটেই অবিবেচক ও হৃদয়হীন ছিলেন না।

নাটকের রচয়িতার প্রতি: '১৬ জুন, ১৮২২

'ফিসেনবের্গ-এর দস্যু' নামক নাটকটি মঞ্চের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী, সেই জন্যে নাটকটি লেখকের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। যে সম্পাদকমণ্ডলী নাটকটি বিচার করেছেন, তাঁরা কেবল এই কথাটুকুই নাট্যকারকে জানাতে চাচ্ছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির যে পরিচয় নাটকটির প্রত্যেক পাতায় ছড়িয়ে আছে, জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও তার দ্বারা এমন কোনো কিছু রচনা করতে পারেন না, যা শিক্ষিত লোকের পাতে দেওয়া যায়। এই ইঙ্গিত থেকে যদি এই কিশোরটি উৎসাহিত হ'য়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে শিক্ষা ব্যাপারে মনোযোগী হয়, তাহ'লে এই বিচারসভা অত্যন্ত তৃপ্তি পাবে। যে জীবিকা সে অর্জন করতে চাচ্ছে, লেখাপড়া না জানলে কিছুতেই সেই জীবিকা সে তো গ্রহণ করতেই পারবে না, উপরন্তু কালক্রমে তার দুয়ার চিরকালের মতো তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে।

হোলস্টাইন, রাবেক, ওলসেন, কোলিন।'

এই পত্রের পাঠোদ্ধার ক'রে প্রথমটায় হান্স ক্রিস্টিয়ান তো কেবল যে হতাশায় ভ'রে গেলো তাই নয়, উপরন্তু তার মনে হ'লো গোটা জগৎই যেন তার বিরোধী—যেন ইচ্ছে ক'রে পৃথিবী তাকে আহত করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপরেই আস্তে-আস্তে সে অন্য সব কিছুর সঙ্গে এর সম্বন্ধ সূত্রটি আবিষ্কার ক'রে নিলে—উন্মোচিত হ'য়ে গেলো অন্তর্লীন সেই নিহিত পরামর্শটি, আবাল্য যা তার বন্ধুদের কাছ থেকে সে শুনেছে। ওডেন্সেয় কর্নেল গুল্ডবের্গ তাকে বলেছিলেন সে যেন যুবরাজের কাছে স্কুলে পড়ার সুযোগ প্রার্থনা করে; প্রধান অধ্যক্ষ যে বলেছিলেন 'শুধু-কেবল শিক্ষিত তরুণেরাই নাট্যশালায় যোগদান করতে পারে,' তাও তার মনে প'ড়ে গেলো; মনে প'ড়ে গেলো অধ্যাপক গুল্ডবের্গ আর তাঁর দিনেমার ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার কথা; বুড়ো অভিনেতা ও লাতিন ব্যাকরণের কথাও মনে পড়ে যেতে দেরি হলো না। যেন চারদিকে ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে লুকিয়েছিলো তারা, এখন সুযোগ বুঝে সবাই একসঙ্গে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেললো, এগিয়ে এলো তার উপর লাফিয়ে পড়বে ব'লে—এতকাল সে প্রাণপণে যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছে, এবার আর তার হাত এড়িয়ে যাওয়া অসাধ্য ঠেকলো তার কাছে—অনিবার্য, কিছুতেই আর তাকে ঠেকানো যাবে না—'শেখো, জানো, লেখাপড়া করো' এই উপদেশটিকেই এবার তাকে মেনে নিতে হবে।

কিন্তু কেমন ক'রে? সুযোগ কোথায় তার? খরচ পাবে কোথায়? আর ঠিক যেন তাকে আরো গভীর হতাশার অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যই তাকে কোরাসের দল থেকে নাম কাটিয়ে দেয়া হ'লো।

পরে অনেক বার হান্স আণ্ডেরসেনকে একটা প্রশ্ন করা হ'তো—কী ক'রে তিনি এত-সব বিরোধিতার মধ্যেই লড়াই ক'রে যাওয়ার মনোবল ও দুঃসাহস পেয়েছিলেন। উত্তরে কিছুই বলেন নি তিনি—হয়তো বলতে পারতেন যে, তাছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিলো না—নির্বাচনের কোনো সুযোগই ছিলো না। ছোট্ট দেশলাইওয়ালির দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দুঃসাহস, মনোবল, অস্তিত্বের প্রতি আস্থা, আর জয়ের কল্পনা—এরাই ছিলো তার উপর্যুপরি বারুদমাখা কাঠি—তার প্রাণ ধারণের উপকরণ। এবার এই হতাশা

আর ক্ষুধাই তাকে নতুন একটি বিয়োগবিধুর নাটক লিখতে বাধ্য করলো, তার নাম হ'লো 'আলফ,জোল'।

খুব তাড়াহুড়ো ক'রে লেখা এই নাটকটি। তাড়াহুড়োর পরিমাণটা কী রকম, তা বোঝা যাবে ক্যাপ্টেন হবুলফের বহুকথিত গল্পটি থেকে। ক্যাপ্টেন হবুলফ নৌ-বাহিনীতে কাজ করতেন; সেক্সপীয়রের নাটক তর্জমা ক'রে মস্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। একদিন হঠাৎ হান্স আণ্ডেরসেন প্রায় ভূতের মতো তাঁর ঘরের দরজায় এসে হাজির। কোনো কথা নেই বার্তা নেই, অচেনা হবুলফকে হান্স ব'লে উঠলো, 'আপনি তো শেক্সপীয়র অনুবাদ করেছেন, তাই না? এত ভালো লাগে আমার শেক্সপীয়রকে। কিন্তু আমি নিজেও একটা ট্রাজেডি রচনা করেছি। প'ড়ে শোনাবো আপনাকে?' উত্তরের কোনো অপেক্ষা না ক'রেই জোব্বার পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের ক'রে আনলো সে, তারপর পাণ্ডুলিপির প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে প'ড়ে শুনিয়ে দিলো। হবুলফের যেমন মজা লেগেছিলো খুব, তেমনি আবার রাগও হয়েছিলো ভীষণ। তাঁরও মনে হ'লো, এই ট্রাজেডির রচয়িতাটি নিশ্চয়ই দিনের পর দিন অনাহারেই কাটাচ্ছে; তাড়াতাড়ি তিনি তাকে এখানেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিতে অনুরোধ করলেন—কিন্তু বালকটি অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প'ড়ে চললো।

নাটকের শেষদিকটা হবুলফকে বেশ আকৃষ্ট করলো; আবার তাকে আসতে বললেন তাঁর কাছে। 'আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। আরেকটা ট্রাজেডি লেখা হ'লেই আপনাকে এসে শুনিয়ে যাবো', উত্তর দিলে হান্স ক্রিষ্টিয়ান।

'তাতে তো অনেক দিন সময় লাগবে', হবুলফ মন্তব্য করলেন।

'মোটেই না। পনেরো দিনের মধ্যেই আরেকটা লিখে ফেলতে পারবো আমি', হান্স ক্রিষ্টিয়ান তাঁকে জানিয়ে দিলো।

হান্সের অন্য সব লেখার চেয়ে এই 'আলফ,জোল' নাটকে একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছিলো। তাকে বলা যায় স্বকীয়তা, তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার সেরা লেখার অন্যতম গুণ যা। হাস্যকর রকম গড়ন নাটকটির—নাটকই হয়নি মোটেই, নানা জায়গায় ঝুলে পড়েছে, শিথিল, ন্যাগবাগে. কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রাণের তাপে দপদপ করছে তা, রক্তমাংসের ছটফটানি পর্যন্ত অনুভব করা যায় প্রতি মুহূর্তে। যে-ই শুনতে রাজি হ'লো, তাকেই সে প'ড়ে শোনালো রুদ্ধশ্বাসে, আর কেউ-কেউ নাটকটি শুনে সত্যিই তার ক্ষমতায় মুগ্ধ, বিস্মিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ, বিচলিত ও বিমূঢ় হ'য়ে পড়লো।

হান্সের সহৃদয়—আশ্চর্য তাঁরা—বন্ধুদের একজন এক পত্রিকার সম্পাদক খুঁচিয়ে উস্কে দিয়ে 'ফিসেনবের্গ-এর দস্যু' নাটকের একটি দৃশ্য প্রকাশ করার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। লেখক হিসেবে নিজের নাম যখন ছাপার অক্ষরে দেখলো সে, তখন নিজেই নিজের নামের প্রেমে প'ড়ে গেলো। থিয়েটারের প্রোগ্রামে নিজের নাম দেখেও এতটা বিচলিত সে হয়নি। সারা রাত সে জেগেই কাটিয়ে দিলো, কতবার যে পড়লো ওই মুদ্রিত দৃশ্যটি তার কোনো সীমা থাকলো না, পড়লো বার-বার। তাকিয়ে রইলো তার দিকে অপলকে, আদর করলো বারে-বারে ওই কাগজটিকে, আর হৃৎপিণ্ড এক আকুল স্পন্দনে ভ'রে গেলো যেন—যেন ওই ধ্বকধ্বকে শব্দ দিয়ে সে বিশ্বজগৎ ভরিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিছুকালের মধ্যেই সব লেখাকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে প্রকাশ করবার মতলব জেগে উঠলো তার মাথায়—'কিশোর উদ্যম' এই নাম দিয়ে বই বের করলে কেমন হয়, এ-কথাই সে ভাবলো কেবল। ঠিক করলো যে উইলিয়ম ক্রিষ্টিয়ান ওয়াল্টার ছদ্মনাম গ্রহণ করবে সে। উইলিয়মটা ধার করা হ'লো শেক্সপীয়র থেকে, ক্রিষ্টিয়ান তো নিজের নামেরই অংশ, আর ওয়াল্টার হ'লো গিয়ে স্যর ওয়াল্টার স্কটের নামের ভগ্নাংশ।

'না, না, মোটেই অহংকার নয় এটা,' ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালো সে বন্ধুদের। 'ভালোবাসা—শুধুই ভালোবাসা শেক্সপীয়র আর স্কটকে আমার ভালো লাগে—তাছাড়া নিজেকে তো ভালোবাসিই।' রাজকন্যা সাহায্য করলে কি হবে, মাত্র কয়েকজন খদ্দের পাওয়া গেলো বইটার এবং মুদ্রাকরটি লোকশান দিলে অনেক। কিন্তু এত সব খবর জানার আগেই হান্স ক্রিষ্টিয়ান অনেক দূরে চলে গেছে।

শ্রীমতী ইয়ুরগেনসেন অনেক বলে-কয়ে গির্জের একজন পাদ্রিকে 'আলফজোল' বিষয়ে আকৃষ্ট ক'রে তুলেছিলেন। তিনি রাবেকের কাছে নাটকটা পাঠিয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন; রাবেক যাতে নাটকটা পড়ে দেখেন, এইজন্য ব্যক্তিগত ভাবে একটি চিঠি লিখে অনুরোধও জানালেন তিনি; আরো বললেন, নাট্যশালার অন্যান্য পরিচালকেরাও যেন দয়া ক'রে এটা পাঠ করে দেখেন। সেই সঙ্গে হান্স ক্রিষ্টিয়ানকে তিনি বললেন যে, সে যেন গিয়ে পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিটির সঙ্গে নিজেই দেখা করে; এই পরিচালকটি আর কেউ নয়, ষ্টেট-কাউন্সিলার ইয়োনাস কোলিন; এই কথা শুনে হান্স তার পুরোনো জামা কাপড়কে ধোপদুরস্ত ক'রে নিয়ে দীনহীনভাবে ব্রেডগ্যাডেতে গিয়ে হাজির হ'লো—কোলিন এখানেই থাকতেন—এবং যে বাড়ি কালক্রমে পরে তাঁর আপন-বাড়ি হয়ে গিয়েছিলো।

মস্ত এক কাঠের বাড়ি কোলিনের—অনেক জায়গা। কাঠের অলিন্দ থেকে সামনের দরজা দেখা যায়, সামনে লনের উপর মস্ত এক লিণ্ডেন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আশে-পাশে ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলা করছিলো হয়তো—পরে যাদের নিজের সন্তানের মতোই আপন করে নিয়েছিলো সে—হয়তো ছিলো এডুয়ার্ড, টিয়োডোর, গোটলীব, আর লুইজি।

ইয়োনাস কোলিনের ছবি দেখে মনে হয় শান্ত, কঠোর ও নির্ভীক লোক—মস্ত চওড়া কপাল, দীর্ঘ খাড়া নাসিকা উঁচিয়ে আছে, জলজলে চোখের দৃষ্টি যেন মুহূর্তে বুক ভেদ করে যায়, আর মুখের ভেতর অসাধারণ এক আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে আছে—অটল এবং অবিচল, অথচ সহৃদয়। হান্সের পোশাক দেখেই অন্যরা মজা পেতো—কজির কাছে তিনটে পিন লাগানো, জোড়াগুলির কাছে তালি বেরিয়ে আছে, নানারকম ও নানা রঙের দাগ ছড়িয়ে আছে ইতস্তত; তিনি কিন্তু এই সবের দিকে কোনো দৃক্‌পাতই করলেন না, মোটেই মজা লাগলো না তাঁর, কিন্তু সব কথাই তিনি মন দিয়ে শুনলেন। কঠিন সব মন্তব্য করলেন একের পর এক, শুকনো আর্দ্রতাবর্জিত, আর 'আলফজোলে'র কথাই তুললেন না ভুলেও। অন্যরা নাটকটির এতই প্রশংসা করেছিলো যে হান্স অন্তত একটু সহৃদয় ও সপ্রশংস মন্তব্য শুনতে পাবে ব'লে আশা করেছিলো। বিরক্তি বোধ করলো সে, উত্তেজিত হ'য়ে গেলো ভিতরে ভিতরে; শত্রুর মতো মনে হ'লো তার কোলিনকে—'বন্ধু হ'লে কি কেউ এমন করে?' এখানে সে কোনো সহানুভূতিই যে পাবে না, এই তার মনে হ'লো বারে-বারে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই নাট্যশালার পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে ডাক এলো তার কাছে

—সে যেন গিয়ে অমুক দিনে দেখা ক'রে আসে। বেয়ারা তাকে যে ঘরটায় পৌঁছে দিয়ে গেলো, চার জন পরিচালকই ব'সেছিলেন সে-ঘরে। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো সে, বুকের ভিতর তুমুল তোলপাড় চলেছে, যেন আশা আর নিরাশা থেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাবে।

কী আশা করেছিলো সে, তা সে বলতে চাইবে না নিশ্চয়ই; কিন্তু অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে সংগোপনে এই কথাই সে ভেবেছিলো তবে হয়তো—হয়তো 'আলফজোল'কে গ্রাহ্য করবেন এঁরা, অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত করবেন। লোকে তো প্রশংসাই করেছে নাটকটার—আর তাছাড়া পরিচালকেরাই বা হঠাৎ এমনভাবে ডেকে পাঠালেন কেন? হয়তো নাট্যশালার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে সে এবার—যেমন অন্য অনেক নাট্যকারকে নিয়মিত মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কি আর তার হবে? হয়তো এই নাটক পড়েই তার ক্ষমতায় আস্থা জেগেছে এঁদের, এঁরা ভাবে কোনো নতুন নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করবেন; তাহলে তো খুবই ভালো—কিছু টাকা সে অগ্রিম নিতে পারবে বায়না হিসেবে। ঠোঁট শুকিয়ে গেলো, গলার ভিতর যেন শুকনো বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে, যেমন ভাবে মরুভূমি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে প'ড়ে শ্যামলতাকে গ্রাস ক'রে নেয়; স্পন্দনে ভ'রে উঠেছে বুক, উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ—এইরকম রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে যা যা হয় লোকের, সবই হ'লো তার; চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে প্রতীক্ষায়—আর এমন সময় রাবেক বলতে শুরু করলেন।

তৎক্ষণাৎ 'আলফজোল'-এর পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেয়া হ'লো তাকে।

'নাটকটা,' নম্র, ভদ্র গলায় রাবেক বললেন, ঠিক "দস্যু"র মতো—মঞ্চের উপর একটুও মানাবে না।' হান্স আণ্ডেরসেনের প্রায় সকল জীবনীকারেরই এই সাক্ষাৎকারের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে কোলিনেরই নাম করেছেন—কিন্তু এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন উদাসীন,—শীতল ও অনুত্তেজিত রাবেক। 'আলফজোল' প'ড়ে অন্য সব পরিচালকদের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন তিনি:

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২২

আণ্ডেরসেনের "আলফজোল"কে নাটক হিসেবে দেখলে সহজেই রায় দিয়ে দেয়া যায়। কেবল কথা আর কথা—কথার বন্যা ছাড়া আর কিছুই নয় এটা; নাটকীয় সংঘাত ব'লে কিছু নেই, নেই কোনো পরিকল্পনা কি গৃহিনীপণা, চরিত্রগুলি মোটেই দানা বাঁধেনি—শুধু স্মৃতি আর স্মৃতির দ্বারা বিধুর কথাবার্তা। তাছাড়া আছে এহ্বান্ড আর ওরেলেনশ্লেগের-এর প্রভাব; আইসল্যাণ্ড আর নতুন আলেমান—দুই ভাষার মিশ্রণ; দৈনন্দিন জীবনের সব কথাবার্তা আর জীর্ণ, পচা সব ব্যবহৃত মিল; সংক্ষেপে, মঞ্চস্থ করার একেবারেই অনুপযোগী।

অপর পক্ষে, যদি এই কথাটি বিবেচনা করতে হয় যে, এই নাটকটি যার লেখা সে মোটেই লেখাপড়া জানে না, জানে না কী ক'রে সুসংগতভাবে লিখতে হয়,...ব্যাকরণ সম্বন্ধে যার কোনোই ধারণা নেই, এবং সর্বোপরি যার মাথায় ভালো-মন্দ সব আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের মতো এলোথেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, এবং কোনো-কিছু না ভেবেই চোখ বুজে যে তার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে, তখন সব সত্ত্বেও ঝিলিক দেখা যায় আলোর, দেখা যায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ,—আর তখনি, তখনি মনে হয় একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়, নিয়মিত সাহিত্যিক আবহাওয়ায় থাকলে সুবিহিত ভাবে লেখাপড়া শিখলে, এই অদ্ভুত বালকটির মগজ কী জিনিস উপহার দেয় জগৎকে। জানি না, আমার অন্যান্য অধিকতর ক্ষমতা ও প্রভাবশালী সহযোগিবৃন্দ তার জন্য কোনো রকম রাজকীয় কি অন্য কোনো জাতের বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না যাতে সে লেখাপড়া করতে পাবে। হয়তো লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে নিয়মিত সাহায্য করলেই বেশি ভালো হবে, আর সেই ক্ষেত্রে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারলে আনন্দিত হবো। তবে এ-কথাটি মানতেই হবে, তার বিষয়ে কিছু করা উচিত আমাদের—এ-বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত, কোনো সন্দেহই নেই। আরসেই জন্যেই আমার সহযোগিগণ যদি ভালো ভাবে তাকে পরীক্ষা করে তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে সাহায্য করেন, তাহ'লে অত্যন্ত বাধিত হবো। —রাবেক।'

পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েই হান্স প্রবল হতাশায় ভ'রে গেলো। এর পরে তাকে কী বলা হবে, সব যেন মুখস্থ বলতে পারে—এই তার মনে হ'লো। এখন তাকে নির্ঘাৎ এ-কথাই বলা যাবে, আঠার মতো লেগে থেকে এ-ভাবে আর যেন সে তাঁদের জ্বালাতন না করে, বরং সে যেন ফিরে যায় ওডেন্সেয়—গিয়ে যেন কোনো ব্যাবসার কাজ শিখে নেয়। এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই সে যেন বর্ম প'রে নিলো—একেবারে গুটিয়ে গেলো নিজের ভিতর—ঠিক যেমন ভাবে শামুকেরা খোলার ভিতরে লুকিয়ে পড়ে ভয় পেলে। কিন্তু রাবেক যা বললেন, তা শুনে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলো সে—প্রথমটায় তো বুঝতেই পারলো না কী তাকে বলা হচ্ছে।

নাটকটির ভিতর সত্যিকার প্রতিশ্রুতি দেখা গেছে একটু; রাজহাঁসের বাচ্চা ব'লেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখনো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না—এই কথাই বললেন রাবেক। এখন হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন যদি মনোযোগ সহকারে গভীর ভাবে পড়াশুনো করে, তাহ'লে হয়তো একদিন সে তেমন নাটক রচনা করতে পারবে, যা দিনেমার দেশের মঞ্চে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে অভিনীত হবে। আস্ত মঞ্চটাই স্তব্ধ হ'য়ে আছে, যেন আলপিন পড়ার ছোট্ট শব্দটুকুও শোনা যাবে; আর তারই ভিতর রাবেক ধীরে ধীরে স্পষ্ট গলায় এই কথাগুলি তাকে ব'লে দিলেন। এইবার যেন কথাগুলির গভীর ও গুরুতর মর্মার্থ হান্সের কাছে পৌঁছতে পারলো—রক্তের ভিতর ঢেউ আর আবর্ত তুলে দিলে যেন তারা—উদ্দীপনায় তাকে ভরিয়ে দিলে। এতটা উদ্দীপ্ত সে এর আগে কখনোই হয়নি,—এখন যেন মুহূর্তের মধ্যে সে বুঝে নিতে পারলে তার আরাধনার মঞ্চের জন্য নাটক রচনা করতে গেলে কী ভীষণ প্রস্তুতির দরকার হয় তার আগে—বুঝতে পারলে লেখক হবার দায়িত্ব কী, লেখক হওয়া বলতে কী বোঝায়। গ্রামে সেই বিশপমশাইয়ের আইবুড়ো বোনটির কথা তাঁর হৃৎপিণ্ডকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো; শ্রীমতী রাবেক যা বলেছিলেন, তা আরো গভীরে পৌঁছেছিলো—কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, এই কথাগুলির ভিতর গন্ধের কাঠির মতো একেক ফোঁটা সুগন্ধি ঝরে ঝরে পড়লো যেন, ঝিম ধরিয়ে দিয়ে গেলো তার সর্বাঙ্গে, কাঁটা দিয়ে উঠলো আস্ত শরীরটাই। যে স্বপ্ন সে রোজ ছাখে, ফুলিয়ে তোলা, কাঁপিয়ে তোলা, কল্পনা-জলীয় ও কৃত্রিম, তার ইচ্ছে অভিলাষ দিয়ে বাজিয়ে তোলা,—এই কথাগুলো তো তেমন-কোনো স্বপ্নের ভিতরকার সংলাপ নয়—এটা যে বাস্তব, রক্ত-মাংসে থরথর করছে, ছোঁয়া যায় ধরা যায় অনুভব করা যায়!

দীনতার একটু নতুন বোধ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিলো, কেঁপে উঠলো সে থরথর ক'রে, আর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো, গাল বেয়ে-বেয়ে টপ-টপ ক'রে ঝ'রে পড়লো তার তালিমারা পটিওলা জামায়। সহজেই দরদর ক'রে চোখের জল বেরিয়ে আসতো তার—এবার কিন্তু তা নয়, মোটেই সহজে বেরোলো না তারা; কান্না চেপে রাখতে গিয়ে মনে হ'লো বুকের ভিতর মস্ত এক হাঁ-করা গহ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই—আর এটাই হ'লো উৎস, যেখানে থেকে ধীরে-ধীরে এলো চোখের জল, তার গাল বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়লো!

ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কোলিন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন, কপালের ভাঁজে ভাবনার রেখাগুলি ফুটে উঠলো একে-একে, কিন্তু রাবেক চটপট তাঁর কথাগুলি ব'লে নিলেন। বললেন যে, পরিচালকগণ হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেনের পড়ার খরচ বহন করবেন, ষ্টেট-কাউন্সিলার কোলিন নিজে রাজাকে বলবেন তার হ'য়ে; সত্যিই, তাকে স্কুলে পাঠাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, এটাই একমাত্র করণীয় ব'লে তাঁদের মনে হয়েছে।

স্কুল! বিপুল সেই দিব্যদৃষ্টির পরে এই কথাগুলি যেন চপেটাঘাত করলো তার গালে! হান্স শুধু তাকিয়ে থাকলো রাবেকের দিকে—বিস্ময়ে তখন তার কথা বলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। স্কুল! কিন্তু সে হ'লো গিয়ে একজন নাট্যকার, তার উপর বয়স কত—তাও তো হিসেব করতে হয়; সতেরো বছরে পড়েছে সে কিছুদিন আগে—এই বয়েসে ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বেরোয়! মুহূর্তের জন্য তার মনে হ'লো এঁরা তাকে ঠাট্টা করছেন না তো! কিন্তু মুখ-চোখে তো ভীষণ গম্ভীর ভাব ফুটে উঠেছে—সে কী বলে, তা শোনার জন্যে উৎসুক তাকিয়ে আছেন তাঁরা তার দিকে।

বেচারা হান্স ক্রিষ্টিয়ান কোনো কথাই বলতে পারলেন না—কী যে বলা উচিত, তা-ই যে ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলো না। সম্প্রতি এই কথাটা যে জেনে ফেলেছে তাকে পড়াশুনো করতেই হবে, করতেই হবে পাঠাভ্যাস ও বিদ্যার্জন, 'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' কিন্তু সে ভেবেছিলো তার ভিতর একটা মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকবে—মস্ত একটা ভারিক্কি চালের ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলো সে—ঘরভর্তি কেবল বই আর বই, আর তাকে পড়াবেন দেশের জ্ঞানীগুনী কোনো অধ্যাপক, বেশ সুন্দর রোম্যাণ্টিকভাবে রাত জেগে-জেগে পড়া করবে সে! কিন্তু তার বদলে এখন কিনা তারা স্কুলের কথা তুললেন! স্কুল মানেই তো ছোটো ছেলেমেয়ে, শ্লেট-পেন্সিল, নোটবউ আর খাতা, ক্লাসঘর। লাল হ'য়ে গেলো সে যেন তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় আর ক্ষোভে ভ'রে গেলো এইমাত্র; তার সর্বস্ব—ঢ্যাঙা মস্ত শরীর, 'আলফজোন্সের' প্রতিশ্রুতি, তার অভিজ্ঞতা—এটা তো ঠিক যে, সে কিছুদিন কোরাস আর ব্যালে-নাচের দলে কাজ করেছে—আর এই তিন বছর ধ'রে একা কেবল নিজের মনোবলের ওপর নির্ভর ক'রে কাটিয়েছে এই মস্ত শহরে, নাট্যশালায় বিনামূল্যে নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছে, কোপেনহাগেনের ঝকঝকে সব ড্রয়িংরুমে স্বাগত হয়েছে সবসময়েই, কাঁপাগলায় কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছে নিজের; তার পরেই হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে এই সত্যটা উদ্ভাসিত হ'য়ে গেলো যে, এ-সবই আয়োজনীয় ব্যাপার, মূল থেকে বিচ্যুত ও বিতাড়িত, আসল ব্যাপারটার থেকে অনেক দূরে স'রে আসা। সবচেয়ে জরুরি হ'লো সেই কথাগুলিই যা হৃৎপিণ্ডকে শিখার মতো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে—এখন সবগুলি কথা আবার স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো যেন তার সামনে 'নাট্যশালা কেবল শিক্ষিত তরুণদেরই গ্রহণ ক'রে থাকে।' 'প্রাথমিক শিক্ষাও শৃঙ্খলার প্রভাবে জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পক্ষেও কোনো সৃষ্টিশীল রচনা অসম্ভব।...কথাগুলি যে কোনোটিই মিথ্যে নয়, বরং একেবারে খাপে-খাপে মিলে গেলো, তাই যেন সে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে পারলে। এই কথাগুলির মোটেই কোনো নির্দয়া লুকিয়ে নেই, কেন না মর্মান্তিক হ'লেও এগুলি উপকারী সত্য; আর এই কথাটি বুঝতে পেরেই নতুন এক কৃতজ্ঞতার বোধে সে ভ'রে গিয়ে বিনীত সম্ভ্রমে পরিচালকদের প্রতি তাকালো।

এই সব বিখ্যাত লোকেরা মোটেই কৌতুক করছিলেন না, ভীষণ ভাবে ভাবছিলেন তাঁরা হান্সের জন্য, রীতিমতো উত্যক্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন; যেন তারা আবছাভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে সে হ'লো রাজহাঁসেরই বাচ্চা, এখন কেবল বিশ্রী হাঁসের ছদ্মবেশ জোর ক'রে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর; তার প্রতিভাই তাঁদের ভিতরে একটা উশখুশে ভাব জাগিয়ে তুলেছিলো, জাগিয়ে দিয়েছিলো তাঁদের বিবেককে। উপরন্তু ওই প্রতিভাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যেই তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করছেন, চাঁদা তুলছেন, নিজেরা চাঁদা দিচ্ছেন। আর সে হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেন—সে কি জানে না যে টাকাকড়ির মতো স্থূল ও বাস্তব জিনিসটি কী ভীষণ জরুরি, কী প্রবল তার মূল্য এই জগতে? আর এর বদলে কী তাঁরা চাচ্ছেন তার কাছে? অনেক,—প্রায় সব কিছুই। সব আশা বিসর্জন দিতে হবে তাকে; যা সে লাভ করেছিলো সব ত্যাগ ক'রে দিতে হবে; ত্যাগ করতে হবে উপার্জিত সব সুযোগ-সুবিধাগুলি; তার গর্ব, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা; এবং সব ছেড়ে-ছুড়ে আবার কেঁচে গণ্ডূষ ক'রে নতুন ক'রে, একেবারে গোড়া থেকে তাকে আরম্ভ করতে হবে। প্রায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলো সে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন বিবশ হ'য়ে আসছিলো; এরই ভিতর কোনো রকমে ছোট্ট কয়েকটি কথা ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠে তাদের প্রস্তাবে সে স্বীকৃতি জানিয়ে দিলো।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে যেন গিয়ে কোলিনের সঙ্গে দেখা করে, এই তাকে বলা হ'লো। প্রত্যেকে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন, তার হাতে চাপ দিয়ে তাঁদের আস্থা ও প্রীতি জানালেন, এবং একটু পরেই সে আবার বাইরে এসে স্কোয়ারের ভিতর দাঁড়ালো। তিন বছর আগে ঠিক এখানেই কোনো রকমে টলতে-টলতে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে—কে, একজন রাবেক তখন বিশ্রীভাবে ব্যবহার করেছিলেন ব'লে চুপসে গিয়েছিলো তার ভিতরটা। আর এখন কিনা সেই রাবেকই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তার সুকুমার হাতটি, অনেকক্ষণ নিজের হাতে ধ'রে রেখে জানিয়েছেন তাঁর প্রীতি শ্রদ্ধা ও আস্থা।

কিন্তু যা সে ভেবে রেখেছিলো, তার ছোটো-ছোটো আশা আর আস্থা আর অহংকার—সব, সব এখন কালো অন্ধকার কেড়ে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে। আর তারই ভিতর, মধ্যরাতে সেদিন যেমন সে সূর্যের রশ্মি দেখেছিলো তার ঘরের জানলা দিয়ে, তেমনি ভাবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, প্রাণের কোন টান এলো যেন তার কাছে। অনেক, অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে সে—কিন্তু আর কতদূর তাকে যেতে হবে? এটুকু সে জানে যে, এখানেও সে আর থাকবে না, এখান থেকেও একদিন তাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? কোনখানে? আর কোনখানে?

[ক্রমশঃ।

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

রেবা হাতে জড়িয়ে জড়িয়ে কার্নিশের উপর থেকে শাড়ীখানা তুলে কার্নিশের উপর দেহ-ভার রেখে চুপ করে দাঁড়ায়। কয়েক দিন ধরে একই চিন্তা তাকে বিকারের মত পেয়ে বসেছে—এমন কেন হয়? শীতাংশুর মহান আদর্শ তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। সে ভালবেসেছিল শীতাংশুকে। দিন-রাত্রে প্রতিটি মুহূর্তে সে শীতাংশুকে নিয়ে রচনা করেছে স্বর্গ। যখনই সে ভিন্ন কিছু ভাবতে গেছে, ধাক্কা খেয়েছে, তিলে তিলে দুঃখ পেয়েছে, আড়ালে লুকিয়ে বসে কেঁদেছে।

শুধু কি মিথ্যে আশংকা? বাস্তবও তাকে বড় কম পীড়ন করে নি। মা-বাবা চান নি শুধু আদর্শের সংগে তাঁদের আদরের একমাত্র দুহিতার বিয়ে দিতে। কল্পনার রাজ্যে ফুরফুরে হাওয়ায় যারা পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় তারা আদর্শ নিয়ে দিন কাটাতে পারে, কিন্তু সবাই উন্মত্তের মত ঐ আদর্শ-মরীচিকার পেছনে ছুটতে চায় না, রেবার মা-বাবাও চান নি। তাঁরা চেয়েছিলেন, ভাবীকালের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল কোন ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে। একজন নাম-গোত্র-পরিচয়হীন সাহিত্যসেবী সাংবাদিকের সংগে নয়।

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সে জয়ী হয়েছিল। শীতাংশুর প্রাণ-খোলা হাসি, তার চাল-চলন, জীবনযাত্রা করেছিল রেবাকে দুঃসাহসী, কিন্তু আজ কোথায় গেল সেদিনের সেই শীতাংশু? কোথায় গেল তার ভালবাসা? আজ কেন সে তাকে সহ্য করতে পারে না? প্রতিটি কথায় কেন সে অমন করে বিরক্ত হয়ে ওঠে? যে মুখ, সমস্ত জৌলুষটা উদ্ভাসিত হাসিতে মাখামাখি থাকতো, সে মুখে আজ হাসির রেখা, চোখে খুশীর রেশটি পর্যন্ত নেই কেন? না, সেদিনের সব কিছুই ছিল শীতাংশুর অভিনয়, কিন্তু রেবা বিশ্বাস করতে পারে না—সে অত ছোট, হীন, প্রতারক হতে পারে। আর তাকে প্রতারিত করেই বা শীতাংশু কি পেয়েছে? কোথাও কোন স্বার্থের গন্ধ না থাকলে, মানুষ কি একেবারে শুধু নিরর্থক নিজেকে ছোট করতে পারে? পারে না।

তবে কি বাইরের কর্মজীবনে এমন কিছু ঘটেছে যা নিংড়ে শীতাংশুর ভেতরের সবটুকু সজীবতা বের করে নিয়েছে? তার বেদনা পলে পলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকে কালো করে তুলেছে, তবু তার সুমহান আদর্শ তাকে তার দুঃখের কণামাত্র ভাগ রেবার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে কথঞ্চিৎ হাল্কা করতে দেয়নি। শীতাংশু ভুল করেছে, এই লুকোচুরি তার একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। স্বামীর নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বেদনার ভার অজানিত আশংকায় রেবাকে আরো বহুগুণ ব্যাকুল করে তুলেছে। আর একথা তো শীতাংশুর কাছেও অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। সে হয়ত ভেবেছে তার লুকান লুকানই রয়ে গেছে, প্রভাতের সূর্যালোকে রাত্রের সবটুকু আঁধার যে অপসৃত হয়েছে তা সে ভাবতেই পারেনি।

অত্যন্ত জটিল একটা বিষয়ের কার্য-কারণ সূত্র মিলিয়ে তার সম্পূর্ণ স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই রেবা ভারি খুশী হয়ে উঠলো। এক নিমেষে হাল্কা হলো তার সমস্ত চিত্ত, বুকের উপর থেকে নেমে গেল একটা জগদ্দল পাষাণ-ভার। অনেক দিন পরে সে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সংগে বুক ভরে নিল নিঃশ্বাস, তার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটা দিন ছাড়া ইতিপূর্বে এত বেশি সুখ সে আর কখনো অনুভব করেনি।

শীতাংশুর প্রকৃত অবস্থাটার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে করুণা মমতায় কাতর হয়ে এলো তার চিত্ত, ছলছল করে উঠলো চোখ। না বুঝে সে কত না অবিচার করেছে শীতাংশুর উপর, ভারি করে দিয়েছে তার বেদনার ভার। ভ্রান্ত বিপরীতমুখী চিন্তার স্রোত মানুষকে যে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে কতখানি অধোগতির মধ্যে নিক্ষেপ করে সে কথা স্পষ্ট হতেই সে নিজের কাছেই নিজে নিতান্ত ছোট হয়ে গেল।

একটা শংকাক্লিষ্ট মন নিয়ে রেবা নেমে এলো নিচে। একবার ঘড়িটার দিকে চেয়ে লেগে যায় কাজে। বুকটার মধ্যে কেমন যেন দুরু দুরু করে এত বড় অবিচারের পর সে কেমন করে, সহজভাবে গিয়ে শীতাংশুর সামনে দাঁড়াবে? কি বলেই বা স্খালন করবে তার পাপ?

কাজ ফেলে মাঝে মাঝে উঠে এসে চেয়ে দেখে ঘড়িটা, যদিও সে ভাল করেই জানে, শীতাংশু রাত আটটার পূর্বে কোনদিন ফেরে না। আধ ঘণ্টা পূর্বে ছ'টা দেখে গিয়ে তার মনে হয় অনেকটা সময় তো কেটে গেছে, নিশ্চয় এতক্ষণে আটটা বাজতে চলেছে, হয়েছে শীতাংশুর আসার সময়। এসে ঘড়িটার দিকে চাইতে প্রথমটা তার মনে হয় ওটা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে, এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখে সত্যি সেটা চলছে কি না। দেখে বিস্মিত হয়—এতক্ষণে মাত্র ৩৫ মিনিট হলো। ব্যস্ত হয়ে ফিরে যায় ফেলে-আসা কাজের কাছে। কতক্ষণ পরে আবার আসে ঘড়ি দেখতে। এমনি করে কাটে যতক্ষণ না কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসতে পারে।

শীতাংশু ফেরে আটটার কিছু পরে। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলে: একটু চা হবে?

শীতাংশু অন্যদিন এমন কথা বললে রেবা বলতো: কোন্ দিন না হয়ে থাকে? কিন্তু আজ তা বললো না। বললো: লক্ষীটি তুমি মুখ-হাত ধুয়ে পড়ার ঘরে যাও, জল চাপান আছে আমি এক্ষুণি চা করে নিয়ে আসছি।

রেবা চা-খাবার হাতে করে ঘরে ঢুকে দেখে, শীতাংশু প্রশস্ত হাতের তালুতে মাথা রেখে টেবিলের উপর কাত হয়ে আছে। কেমন একটা আলোড়নে হু-হু করে ওঠে রেবার মন। একটা মানুষ দিনের পর দিন এমনি ভাবেই অতি সংগোপনে বহন করে চলেছে, একটা বেদনার গুরুভার, কিন্তু তার জন্যে আর অভিযোগ অনুযোগ কিছু নেই। রেবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে শীতাংশু-চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য।

ধীরে ধীরে চায়ের কাপ, খাবারের ডিশটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে রেবা চেয়ারের পেছনের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় কপাল থেকে ব্যাক-ব্রাশ করা চুলের উপর। অনুযোগের সুরে বলে: মানুষ তার আপন জনের কাছে প্রকাশ করে নিজের বেদনার ভার লাঘব করে, তুমি কি তাও চাও না?

শীতাংশুর কাছে হঠাৎ এত সব কেমন যেন বাড়াবাড়ি ঠেকে। মুখ তুলে বললো: তুমি তো জান আমি অভিনয় একেবারেই পছন্দ করিনে, সেটুকু কি আমার সংগে না করলেই নয়?

তিল তিল করে হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ-বেদনা দিয়ে গড়া মিনার—স্বপ্নসৌধের মত রেবার পলকে চূর্ণ হয়ে যায়। জ্বালা করে ওঠে বুকের ভেতর। তিক্ত কণ্ঠে বলে: আমার সবটাই তোমার কাছে মঞ্চ-অভিনেত্রীর মত ঠেকে, না? রাগে অভিমানে তার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে অশ্রু। সে আর কোন কথা খুঁজে পায় না। অভিমানের দুর্দমনীয় ক্রোধ চাপতে এক রকম ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

শোবার ঘরের দরজায় খিল দিয়ে, সে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে বিছানার উপর। ছোট মেয়েটির মত কাঁদতে থাকে ফুলে ফুলে। আজ তার আত্মসম্মানে যত বড় আঘাত লেগেছে, এত বড় আঘাত সে পূর্বে কখনও পায়নি, আজকের মত এমন করে কাঁদেওনি কোন দিন।

বিবাহিত জীবনে সে সুখী হয়নি। একদিনের জন্যেও পায়নি এতটুকু শান্তি। কিন্তু তা বলে এমন করে তার ভিত্তিমূলসহ ছিন্ন করে ইতিপূর্বে কেউ তাকে অযত্নে যত্র-তত্র ফেলে যায়নি।

অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে, কান্নার ভেতর দিয়ে নিজেকে কিছিৎ শান্ত করে উঠে এসে দাঁড়ায় জানালার উপর। অল্প পরে পাশের ঘরের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে দশটা বাজলো। চমকে উঠলো রেবা। একটা অত্যন্ত সত্য কথা তার কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শীতাংশু ঠিক বলেছে সে অভিনেত্রী বৈ আর কি? এই তো দশটা বাজলো, শীতাংশুর খাওয়ার সময় হলো, সে যাবে তাকে ভাত দিতে, নিজেও গিলবে গোগ্রাসে কতকগুলো, তারপরে এসে পড়বে এই ঘৃণিত শয্যায়।

একবার মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবার ভাবে, ঘরের কথা এমন ভাবে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তো নিজেদের ছোট করা ভিন্ন আর কিছুই হবে না? সে বেশ ভাল করেই বোঝে এমন ভাবে আর যাই হোক, দীর্ঘজীবন কাটান চলবে না। কিন্তু দেখতেও পায় না কোন বিকল্প ব্যবস্থা। বীতশ্রদ্ধায় ভরে ওঠে গ্লানিমাময় জীবন।

ভাত গুছিয়ে শীতাংশুকে ডাকে খেতে। তাকে খাইয়ে দিয়ে নিজে তার কিছুই স্পর্শ করে না, যেখানকার যা সেখানে তেমনি পড়ে থাকে, কোন রকমে ঘরে তালা-চাবিটা বন্ধ করে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়খানা বদলে, একটা মাদুর হাতে করে কার্তিক মাসের হিমে ওঠে গিয়ে ছাদে। শুয়ে থাকে নিঃশব্দে আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে, থাকতে থাকতে চিন্তা-ভাবনা আর কিছুই থাকে না, ভিজে কাপড়ের মত হেমন্তের উন্মুক্ত অম্বরতলে নেতিয়ে আসে দেহ-মন। এমনি ভাবে যে তার কতক্ষণ কেটেছে, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না, যখন ঘুম ভাঙলো, তখন ভোর হয়েছে, কাঁচা শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত ছেঁড়া-খোঁড়া ভাবে লাল হয়ে উঠেছে পূর্বাকাশ।

রেবা নেমে এলো নিচে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলো, গত রাত্রে সে দরজা যেমন করে ভেজিয়ে রেখে গিছলো, তেমনিই ভেজান রয়েছে, ভেতরের বিছানাতেও যে কেউ শুয়েছিল তা মনে হলো না, সেটি রয়েছে অক্ষত, মশারি রয়েছে তোলা। রেবার বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, শীতাংশু এ ঘরে শুতে আসেনি। শীতাংশু পূর্বেও অনেক দিন পড়ার ঘরের ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। বইখানা হাতে ধরা কিংবা আধখোলা ভাবে রয়েছে বুকের উপর, আলোটা জ্বলছে রাক্ষুসে হাঁ করে। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সে তাকে তুলে এনেছে ঘরে।

রেবা পড়ার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে অতি সন্তর্পণে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো, শীতাংশু পড়ে ঘুমোচ্ছে। তবে অন্যদিন এ ঘরে শুয়ে ঘুমানোর থেকে আজকের ঘুম, একেবারে ভিন্ন। এ যে অনিচ্ছায় ঘুম নয়, সচেতন ভাবে আলো নিবিয়ে, বই গুছিয়ে ঘুমান, তা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না। এ লোকটার বুকেও যে ব্যথার একটা গুরুভার চেপে আছে, তাকে দুঃখ দিয়ে, সে নিজেও যে দুঃখ পায়, এ সত্য যথেষ্ট স্পষ্ট হলেও রেবা নিজের মধ্যে এতটুকু অনুকম্পা খুঁজে পায় না।

আর সেখানে অপেক্ষা না করে সে নির্জীব যন্ত্রের মত গিয়ে সুরু করে দিনের কাজ। অন্য দিনের মত চা করে আর ঘিয়ে-ভাজা মুড়ি নিয়ে গিয়ে ডাকে শীতাংশুকে।

শীতাংশু উঠে চা খেয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে করে যায় বাজারে। রেবা চড়ায় রান্না।

সকালের সময়টা চলে ঘড়ির কাঁটার দ্রুত লয়ে। বাজার থেকে ফিরে শীতাংশু গুণা-গুণতি ক' মগ জল মাথায় ঢেলে, কোন রকমে কতকগুলো নাকে-মুখে গুঁজে বেরোয়। আজও তেমনি নীরবে বাজার থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে গেল।

রেবা কাজকর্ম চুকিয়ে, পড়ার ঘরে এসে ঢোকে সময় কাটাবার মত

একখানা বইর খোঁজে। সেলফের এতাক-ওতাক করে টেবিলের উপর এসে পেল একখানা ঝকমকে এবারের পূজো সংকলন। বইখানা ইতিপূর্বে তার নজরে পড়েনি। কাজেই নতুন একখানা অপঠিত সংকলন, নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে তার সময় কাটাবার পাথ্য নির্বাচিত হতে এতটুকু বিলম্ব হলো না। সেখানা হাতে করে ঢুকলো এসে শোবার ঘরে।

একটা দু'টো করে পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখ পড়লো শীতাংশুর লেখা "অপারেশন" গল্পটির উপর।

দু'টো পৃষ্ঠা শেষ না হতেই রুদ্ধ আবেগে রেবার যেন দম আটকে আসতে লাগলো, বাতাসটা মনে হতে লাগলো অসম্ভব ভারি। এক নিঃশ্বাসে গল্পটা শেষ হলে সে যেন বাঁচলো।

গল্পটা শেষ করে সে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলো শেষ পাতাটির দিকে। গল্পটা যেন শেষ হয়নি, আরো আছে, না থাকলে মালতী বাঁচবে কেমন করে—সে নিজেই বা ?

শীতাংশু লিখেছে :

সুনীল তার ছোট বোন নীলিমার বিয়ে দিল হাইকোর্টের টাইপিষ্ট সুরজিতের সংগে। ক'দিনের মধ্যেই সে জয় করে নিল শ্বশুরালয়ের সবার মন। তার মত চা করতে, পান সাজতে, ছেঁড়া রিপু করতে, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে মালতী (সুরজিতের বোন) পারে না। এসব ব্যাপারে মালতীর পূর্বগৌরব একেবারে ম্লান হয়ে গেল।

এ পরাজয়কে সহজ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়ার মত উদারতা মালতীর ছিল না। সে সময়ে-অসময়ে মিথ্যে পাঁচ কথা নীলিমার নামে বলতে লাগলো। হিটলারী রাজনীতি ছিল—বার বার একই মিথ্যে বলতে লাগলে, লোকে একসময় না একসময় তাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। সমস্ত পরিবেশটা গেল পাল্টে। নীলিমা সবার চোখেই হয়ে উঠলো বিশ্রী কুৎসিত।

নীলিমা একদিন দাদার কাছে বেড়াতে এসে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা জানিয়ে বললো : ওদের মধ্যে তুমি আর আমাকে ঠেলে পাঠিও না, আমি তোমার ঘাড়েও বোঝা হয়ে চেপে থাকতে চাইনে। তুমি আমার জন্যে বরং এমন কিছু একটা দেখে দাও যাতে আমার দু'টো উদর-অন্নের সংস্থান হয়—এর বেশি আমি আর কিছুই চাইনে।

ক'দিন পরে সুরজিত এলো নীলিমাকে নিতে। ও কিছুতেই যাবে না। সুনীল অনেক করে বুঝাল। বললো : উত্তেজনার মাথায় কিছুই করতে নেই। তুই আজ এখন না গেলে ওরা অসন্তুষ্ট হবে—কি দরকার ওদের এখন চটানোর ? বরং আমি একটু ধীর-স্থির ভাবে দেখি কি ভাবে তুই এখানে স্থায়িভাবে থাকতে পারিস। তা যে ক'দিন না হচ্ছে আমি নিয়মিত তোর ওখানে যাতায়াত করবো, দরকার হলে আসবো নিয়ে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমা স্বামীর সংগে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায়। শনি-রবিবার ছাড়াও অন্য ছুটিছাটা পেলেই সুনীল যায়, এমনি করে কেটে গেল অনেকগুলো দিন।

এই যাতায়াতের মধ্যে কখন যে মালতীর সংগে সুনীলের বিয়ের কথা উঠেছে তা সে নিজেও জানতো না। কিন্তু যখনই সে জেনেছে, তখনি এতটুকু দ্বিধা না করে লুফে নিয়েছে প্রস্তাবটা। আশা করেছিল, এই বিয়ের ভেতর দিয়ে নীলিমার জীবনে পড়বে একটি শান্তির প্রলেপ। তা ছাড়া একবাক্যে মালতীকে লুফে নেওয়ার মত রূপবতী, গুণবতী সে ছিল না। কিন্তু সুনীলের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিকট ঘৃণায় ভরে উঠেছে তার মন। নেমে এসেছে এক অস্বীকৃতির ব্যবধান।

নিরাবলম্ব জীবনটা মালতীর হয়ে পড়ে সম্ভাবনা-হীন।

একটা ক্ষুদ্র গল্পের দর্পণে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ জীবনের এক নিখুঁত প্রতিফলন রেবাকে পলকের মধ্যে নিঃসহায় করে দিল। এ মালতী যে, সে নিজেই, কিন্তু সে তো সত্যিই তার বড় মামীর (শীতাংশুর বোন) জীবনটি এমন করে নষ্ট করে দিতে চায়নি। সে চেয়েছিল তাকে একটু ধকা খাওয়াতে, সম্রাজ্ঞীর উচ্চাসন একটু খাটো করে দিতে। বড় মামীর সম্পর্কে তার মনে একটা ঈর্ষার ভাব ছিল ঠিক, তবে সে তার জন্যে এত বড় অভিসম্পাতের কথা তো কস্মিন কালেও ভাবেনি ? তার অপরিণামদর্শিতা যে এত বড় একটা অঘটন ডেকে এনেছে, একথা মনে হতেই সে নিজের উপর অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

মানুষের চরিত্র সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বুঝবেন—ভবিষ্যৎ নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা-মণ্ডিত এমন জীবন কতখানি অবর্ণনীয়। রেবার অবস্থাও বর্ণনাতীত। অনেক কিছু ভাবতে গিয়ে সে সব এমন ভাবে জড়িয়ে ফেললো, যেন কোনটারই কোন উদ্দেশ্য নেই, নেই আদি-অন্ত। সবই যেন তার সেই মুহূর্তের জীবনের মত বিশৃংখল। হঠাৎ ঘরের আলো নিবে বা জ্বলে আলো-আঁধারের যে বিরোধটা নিমেষে প্রকট করে তোলে, তেমনি বিরোধের মধ্যে দিয়ে কাটলো রেবার সারাটা দিন।

সন্ধ্যের'পর শীতাংশু ফিরলে রেবা চা-এর কাপটা তার টেবিলে রাখতে রাখতে বললো—একজনের কু-কর্মের ফল অন্যজন কেন ভোগ করবে ? নিরপরাধীর বহু লাঞ্ছনার কথা আমরা জানি, এখানে আবার কেন তার পুনরুক্তি ঘটবে ? আমার একান্ত অনুরোধ, আমার পাপের বোঝা তুমি একলা আমাকে বহন করতে দেও।

শীতাংশু নীরবে কিছুক্ষণ রেবার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো : বোঝা খালি করা মুখের কথা নয়, বহন করাও।

বেদনায় করুণ হয়ে উঠলো রেবার চোখ দুটো।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

নাজমা বাঈ

শ্রীনীলিমা সমাজদার

সারা দিন গাড়ী চালিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যেতেই ডেরায় ফিরল ইদ্রিস মিঞা। ঘোড়া দুটোকে গাড়ী থেকে খুলে আস্তাবলে নিয়ে বেঁধে দিলো। সকালের ঘাসগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দিল সে। মাটির গামলাটাতে দেখে নিলো জল আছে কি না! তারপর ঘোড়া দুটোর গায়ে আদর ভরা হাত বুলিয়ে বলে উঠলো—খাঃ, তোদের আজকের মতো ছুটি—আমারও—

ঘরে এসে কেরোসিন তেলের ল্যাম্পটা জ্বালালো। সেই আলোতেই একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে পড়লো নোংরা তেলচিটে বিছানাটার ওপর। ট্র্যাক থেকে পয়সাগুলো বার করে গুণলো একে একে। নাঃ, মন্দ রোজগার হয়নি আজকে। ঘোড়া দুটোর কালকের খোরাকী বাদ দিয়ে তার কাছে থাকছে সাড়ে চার টাকা। কাল কিছু ছোলা খাওয়াতে হবে ঘোড়া দুটোকে। দুটো টাকা বিছানার তলায় রেখে ঘরের দোরে একটা সস্তা হালকা তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লো ইদ্রিস মিঞা।

শরীরটায় বেশ ব্যথা হয়েছে তার। একটু বেশী করে তাড়ি খেতে না পারলে চলবে না। এগিয়ে চললো তাড়িখানার দিকে। তাড়িখানায় একে একে লোক জমতে সুরু হয়েছে। তাড়িওয়ালা আব্বাস সেখ ইদ্রিসকে দেখে বললো—আজ যে খু-উব ফজিরে দেখছি মিঞা? চোখের একটা কুৎসিত ইসারা করলো আব্বাস।

: আজ যাবো একটু নাজমার কাছে। তাড়াতাড়ি আমার মালটা দাও দিকি।

হাসলো আব্বাস। ইদ্রিসকে তাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললো—একটু সমঝে চলো মিঞা—মেয়ে জাতটা জোঁকের জাত!

হাসলো ইদ্রিসও। আরে—স আর বলতে! ইদ্রিস খুব হুঁসিয়ার, তাছাড়া তার পেটে মিঠে পানী পড়লে তো তামাম আক্কেল মগজে আসে।

নেশার পর একটা সিগারেট খাওয়া তার প্রতিদিনের অভ্যাস। পানের দোকানে গেলো, একটা মুসৃকী-কিমাম দেওয়া পান আর এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে নিলো তার থেকে। তার পর একটা হিন্দী গানের কলি গেয়ে উঠলো—চুপে চুপে খাড়ে হো——

পথে দেখা হলো নিয়ামতের সাথে। সেলাম আলেকুম ইদ্রিস চাচা—কি খবর?

: ওয়ালেকুম সালাম ভাই! যাচ্ছি-একটু—নাজমার নামটা উহ্য রইলো, ইংগিতে বুঝিয়ে দিলো শুধু।

: তোমায় নাজমা বাঈ একটু বাড়াবাড়ি করছে চাচা! একটু সাবধান করে দিও।

: কেন কি ব্যাপার? শুধালো ইদ্রিস

: ব্যাপার আর কি? আমাদের ইউসুফ আজ-কাল ঘন ঘন যাতায়াত করছে আর কি?

রাগে ফেটে পড়লো ইদ্রিস: উ শালাকো হম্—

বাধা দিলো নিয়ামত—সামলে চাচা, সামলে। অত রাগলে হয় না। হুঁসিয়ারীতে কাজ আদায় করতে হয়। শোন বলি, ইউসুফের বিবিটা—।

ব্যস্ ব্যস্! আর বলতে হবে না—হন্ হন্ করে এগিয়ে যায় ইদ্রিস।

গানের আসর বসেছে নাজমার ঘরে। ঘাঘরা পরে নাচছে নাজমা বাঈ। চার পাশে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা নেশায় মসগুল·····ইদ্রিসকে দেখতে পেয়েই নাচ থামালো নাজমা। আও জী বালম্ মেরী··বলে এগিয়ে এলো তার দিকে—ইদ্রিস একটা মিঠা পান নাজমার মুখে পুরে দিলে। মাথাটা একটু নীচু করলো নাজমা··আজ এতো সকালেই?

ইদ্রিসও বসে পড়লো ওদের সাথে আসরে। শুধু বললো—হ্যাঁ। তুই নাচ··আর একবার কুর্ণিশ করে নাচ আরম্ভ করলো নাজমা। হিন্দী গান সুরু করলো নাচের সাথে।

রাত হতে বিদায় নিলো একে একে সব্বাই। ইদ্রিসই শুধু রইলো। বাদকেরাও একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। ইদ্রিস নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে। নাজমা এলো ওর পাশে—বললো—ঘরে যাবে না মিঞাজান?

ইদ্রিস উঠে স্খলিত পায়ে জড়িয়ে ধরলো ওকে। নাঃ আর আমি যাবো না বিবি—তোকে ছেড়ে আমি আর যাবো না। চল তুই আমার ডেরায়।

কৌশলে নিজের বাঁধন মুক্ত করে নাজমা বললো—তোর যে এখনো নিকা করবার সময় আসেনি ইদ্রিস, আর রোজগারও তোর তেমন কিছুই নয়। আমাকে আরো কিছু কামিয়ে নিতে দে।

ইদ্রিস বললো—তুই ইউসুফকে অত আস্কারা দিস না নাজু—আমার দিল্ ফেটে যায়। শালা নেমকহারাম নিজের বিবি ছেড়ে দিয়ে—

হাসলো নাজমা। বললো, কে বললো এসব কথা? তা ছাড়া ইউসুফ তো আসে না আমার কাছে?

—ঝুট বলছিস নাজমা।

—খোদা কসম ইদ্রিস, বিশ্বাস কর। আমি তোকেই চাই। অনেক রাত হলো, চল কিছু খাবি না ?

—কিছুই খাবো না আমি, বা তুই খেয়ে নে।

আহার সেরে নাজমা এলো আবার ইদ্রিসের কাছে। বললো, রাত্তে এখানে থাকলে তোর বদনাম হবে। কথা উঠবে। কাল ফজরে তুই বেরুবি কি করে ?

ইদ্রিস বললো : ফজিরের আগেই বেরিয়ে পড়বো। আজ তোর কাছে থাকতে দে নাজমা ! আজ আমি বড় বেদম হয়েছি।

ইদ্রিসের ক্লান্ত শরীরে হাত বুলোতে বুলোতে নাজমা বলে—নিয়ামতের সাথে ইউসুফের ঝগড়া হয়েছে—তাই বোধ হয় তোকে বলেছে ও কথাগুলো। ইউসুফের বিবিকে নিয়ে কথা উঠেছে। সে নাকি তালাক দেবে বিবিকে। আর নিয়ামত সেই সুযোগই খুঁজছে।

ইদ্রিস নাজমাকে জড়িয়ে ধরলো—আমাদের নিকাও তো মসজিদে গিয়ে হবে। তোর ছেলেটাকে আর অন্যের ঘরে রাখতে হবে না আক্রামকে। সে থাকবে তারই এই নয়া বাপজানের কাছে। আর তোকেও আর তাওয়াইফের মত থাকতে হবে না।

আবেশে ঝুঁকে পড়ে নাজমা ইদ্রিসের রোমশ বুকে। একটা পুলিশ এসে দোরে ধাক্কা দেয়। ছাড়াছাড়ি হয়ে শোয় ওরা। কনেষ্টবলের ধাক্কা বেড়ে চলে, সুব্যবস্থা করার জন্য একটা বাক্স খোলে নাজমা।

ভোরের আগেই বেরিয়ে যায় ইদ্রিস। আস্তাবলে এসে ঘোড়া দুটোকে আদর করে। কতকগুলো শুকনো ঘাস গাড়ীটার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ঘোড়া দুটো গাড়ীতে জুড়ে দেয়। তারপর বিড়ি ধরিয়ে ইষ্টিশানের পথে এগোয়।

ব্যাপারটা অবশ্য গোপন থাকে না। মহল্লার সকলেই জানতে পারে কথাটা যে ইদ্রিস নাজমার ঘরে রাত কাটিয়েছে। ইদ্রিসের অবর্তমানে পাড়ার দু-চার জন বেশ রসালো করে রটিয়েছে ঘটনাটা। এর জন্য দণ্ড দিতে হবে ইদ্রিসকে। না দিলে মহল্লা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। নাজমার ঘরে নাচ-গান বরদাস্ত হয়—কিন্তু তাই বলে রাত কাটানো! ইদ্রিসকে তাই দণ্ড দিতে হবে। পরদিন তাড়িখানাতেই শুনলো খবরটা ইদ্রিস। ওকে মজলিসে যেতে হবে মাতব্বরের কাছে।

মাতব্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ইদ্রিস। নিয়ামত পান খাওয়া নোংরা দাঁত বের করে আকণ্ঠ হাসি হেসে বললো, চাচা সময়ে চলতে জানে—

ইদ্রিস জিজ্ঞাসা করলো কেন, কি ব্যাপার ?

মোল্লা সাহেব সব কসুরের কথা আলোচনা করে ফরমান জারি করলেন। ইদ্রিস বাধা দিয়ে বললো—কেন, নাজমা বিবিকে আমি নিকাহ করবো। দুদিন পরে ও আমার আপনা বিবি হবে।

মোল্লা বললেন—নিয়ম মাফিক নিকাহ হতে এখনো ঢের দেরী। সুতরাং নাজমাকে এখনো সেই বিবির মর্যাদা দেওয়া যায় না। ও এখনোও তাওয়াইফ—অতএব তোমায় জরিমানা দিতেই হবে ইদ্রিস মিঞা !

—নিয়ামত প্রশ্ন করলো—নিকাহটা কার সাথে হবে শুনি ? তোমার সাথে নাকি চাচা ?

—আলবৎ আমার সংগে। বললো ইদ্রিস।

দেহের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে নিয়ামত বললো—ইনসা আল্লাহ।

চটে উঠলো ইদ্রিস—চোপ রও বেয়াদপ, বে সরম্-বেল্লিক ! গর্দান নিয়ে নেব এক্ষুণি !

নিয়ামত ঝাঁপিয়ে পড়লো ইদ্রিসের ওপর। সব্বাই ছাড়িয়ে দিলো দুজনকে। দুজনেই মনে মনে ফুঁসতে লাগলো। দণ্ডের টাকা দিয়ে হন্ হন করে চলে গেলো ইদ্রিস।

ইদ্রিস আজ প্রায় ক'দিন থেকে ঘরে পড়ে। গাড়ী নিয়ে বেরুতে পারেনি। ওষুধ-পথ্যে সব পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। নাজমাকে একবার দেখার জন্য মন কেমন করছে ওর। তাছাড়া টাকার জন্যও দরকার নাজমাকে। নাজমা ছাড়া কে আর টাকা দেবে ওকে ? রুস্তম মিঞার মেয়ে চাঁদবিবিকে দিয়ে ডেকে পাঠালো নাজমাকে। বলতে বললো টাকা না পেলে বাঁচবে না ইদ্রিস।

এলো তো না-ই নাজমা, টাকাও দিল না। বলে পাঠালো টাকা তার নেই। ক্ষুণ্ণ হলো ইদ্রিস। ঔরৎ জাতটাই বেঈমান। একে একে ইদ্রিসের যা ছিল সবই সম্বল—আর কানে আসতে লাগলো নাজমার কীর্তি কলাপ।

নিয়ামতের সংগে আজকাল খুব মেতেছে নাজমা। এমন কি ওদের নিকাহের দিন পর্যন্ত ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। যেদিন ইদ্রিসের সাথে নিকা হবার কথা ছিলো ঠিক সেই দিনই হবে নিয়ামতের সঙ্গে। আকুল হয়ে ডাকতে লাগলো ইদ্রিস আল্লাহকে—আমাকে ভালো করে দাও খোদা তাল্লাহ।

রমজানের রাত্তে নিকা হবে ওদের। মহল্লার সব্বাই জানে। নিয়ামতও মস্ত দাওয়াত দেবে সকলকে। ইদ্রিসকেও নিমন্ত্রণ করেছে সে। আর দুদিন পরেই রমজান। ইদ্রিসের একে একে কত কথাই মনে পড়তে থাকে, নিকার সময় একটা ভালো শাড়ী দিতে হবে আমাকে কিন্তু···দিতে হবে ভেলভেটের নাগরা জুতো প্রতিদিনের আয় থেকে সঞ্চয় করছিলো টাকা, খেটে ছিলো অবিশ্রান্ত তাইতো পড়লো অসুখে। ওঃ ! আর মাত্র দুদিন পর তার নাজমা হবে নিয়ামতের বিবি। থাকবে পর্দার ভেতরে। মুখ দেখলে হবে গুনাহ···বুকটা চেপে ধরলো ইদ্রিস মিঞা। ঐ শালার নিয়ামত। নিয়ামত শালা, কুত্তাটাই অপমান করেছে আমাকে, জোর করে নিকা করছে তার নাজমাকে। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নিচ্ছে নিয়ামত। তাকেও নিতে হবে। উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে তাকেও।

রমজানের দিন। গত বৎসরের জামা আর পায়জামা বার করে পরলো ইদ্রিস। মাথায় পুরানো ফেজটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরে নিলো। ছেঁড়া তালিমারা জুতোটাকেই পরিষ্কার করে পায়ে দিলো—আর ধারালো ছুরিখানা গুঁজে নিলো জামার নীচে। ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে। আজ তার নাজমায় নিকা—আজ রমজান।

নিকাহ পড়ানো হয়ে গেছে—আনুষ্ঠানিকভাবে সব কাজই সম্পন্ন। সকলে খেতে বসেছে। নিয়ামত নিজেই তদারক করছে মেহমানদের। ইদ্রিসকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানায় নিয়ামত। এসো চাচা ইদমোবারক হো—শরীর ভালো তো—

ম্লান হেসে ইদ্রিস বলে, হ্যাঁ তা বহুৎ ভালোই ভাইজান।

খাওয়ার পর কোলাকুলি সেরে সব্বাই যে যার বাড়ী চলে গেলো। ইদ্রিসও বাড়ী যাবার জন্য এগিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রইলো ঐ বাড়ীতেই।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলো নাজমাকে। দামী শালোয়ারের উপর দামী দোপাট্টা দিয়েছে গায়ে—বেশ মোটা গয়না পরেছে···পায়ে লাল নাগরার ওপর সোনালী কাজকরা। কাশ্মীরী কাজ। আঃ নাজমাকে ঠিক বেহেস্তের পরীর মতই মানাচ্ছে, হয়তো অপেক্ষা করছে নিয়ামতের—

দোরগোড়ায় অন্ধকারে চুপচাপ এসে দাঁড়ালো ইদ্রিস। খুশীর নেশায় মশগুল। নিয়ামত আকুলভাবে এসে নাজমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলো। নাজমাও অপেক্ষা করছিলো তার—সে-ও জড়িয়ে ধরলো নিয়ামতকে, দুজনেই আনন্দে আত্মহারা—এমন সময় পিছন দিক থেকে ইদ্রিস তার ছোরাটা বসিয়ে দিলো নিয়ামতের বুকের পাঁজরে—একটা চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো নিয়ামত—সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো পাড়ার সকলে।

খুনী বলে নাজমাই গ্রেপ্তার হলো। কেননা, সকলেই জানতো নাজমা ভালোবাসে ইদ্রিসকে। কোন কথাই বলতে পারলো না নাজমা। সেসনের বিচারে দ্বীপান্তর হলো নাজমার—সে রাতে আর বাড়ী ফিরলো না ইদ্রিস—কোথায় গেলো কেউ জানে না, ইউসুফ ঘোড়া দুলীকে নিয়ে যাবার দিন দেখলো আস্তাবলের বাতার সাথে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মরে আছে ইদ্রিস—মাংসগুলো পচে পচে পুঁজ ঝরছে।

সেবাগ্রাম দেখে এলাম

শ্রীমতী শান্তি সেন

যখন বিদেশ বাস সমাপ্ত করে দেশে ফিরতে মন চায়, সেই বয়সে যেতে হোলো ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দেশ ছেড়ে দূর বিদেশে। নিরুপায় হয়েই গ্রহণ করতে হোলো প্রবাস-জীবন। নামকরা নগরের সুখ-স্বাচ্ছন্দেও মনে পেলাম না কোনও শান্তি। মন আকুল হয়ে থাকত সেই নিজ গৃহখানির জন্য। বিশাল নগরীর জনারণ্য যেন বড় অসহনীয় মনে হোতো। কয়েক বছর পরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি সহরে এসে পড়লাম ঘুরতে ঘুরতে। মহানগরীর সব সুবিধাই পেলাম অথচ এর নির্জ্জনতা মনকে মুগ্ধ করল। গৃহছাড়া ব্যাকুল মন যেন এই নির্ম্মল প্রশান্তির স্নিগ্ধতায় জুড়িয়ে গেল।

এখানে এসে আমার স্বামীকে মাঝে মাঝে কাছাকাছি কতকগুলো মহকুমা সহর পরিদর্শনে যেতে হোতো। আমিও অনেক সময় তাঁর সঙ্গিনী হতাম। একবার এই রকম কয়েকটি জায়গায় যাওয়া ঠিক হোলো। শুনলাম যে তিন-চারটি জায়গায় যাব, তার মধ্যে ওয়ার্দ্ধাতেও যেতে হবে।

যে সহরে আমরা আছি সেখান থেকে ওয়ার্দ্ধার দূরত্ব খুবই কম।

এখানে এসে পর্য্যন্ত ওয়ার্দ্ধায় গিয়ে সেবাগ্রাম দর্শন করবার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, কারণ সেবাগ্রাম আজ পুণ্যতীর্থ হয়ে আছে মহাত্মাজীর পূত পদধূলিস্পর্শে।

মহাত্মাজীর প্রতি শিশুকাল থেকেই গভীর শ্রদ্ধা ছিল আমার মনে। মনে পড়ে ছোটবেলায় আমার বাবা আমাদের পড়ে শোনাতেন ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'গান্ধীজী'।

"দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী কি লিখিস হিজিবিজি
নগরীর পথে রোল ওঠে শোন, গান্ধিজী ! গান্ধিজী ! !

* * * *

কৃষাণের বেশে কে ও কৃশতনু কৃশানু পুণ্যছবি
জগতের মাঝে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি।"

এই অপূর্ব্ব ছন্দময় কবিতা সেই বালিকা বয়সেই মনকে এমন গভীর ভাবে নাড়া দিত যে ঐ অত বড় কবিতা মুগ্ধ হয়ে বসে শেষ পর্য্যন্ত শুনতাম। আজও মনে পড়ে আমার পিতার সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব আবৃত্তি।

"আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান
পিতারও আদেশে করে নাই যারা আত্মার অপমান।
পূজনীয়া যার মহারাণী মীরা চিতোরের বীণাপাণি
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি সে রাজরাণী।"

তখন একথার অর্থ বুঝবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আজ তাঁর জীবনে আমাদের দেখায় যে সেই সত্যনিষ্ঠ পুরুষ সত্যিই জীবনে কখনও আদর্শচ্যুত হননি। জীবন-পণ করেছেন তবু সত্যপথ থেকে, ন্যায়ের পথ থেকে কেউ তাঁকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। আপন মহিমায় তিনি ছিলেন দীপ্ত, তাই ভারতের জীবনাকাশে তিনি চিরদিন বিরাজ করে গেলেন ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে।

মহাত্মাজী জাতির জনক। জাতির জীবনে তাঁর দান যে কত বড় সম্পদ সে কথা সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁকে বুঝতে গেলে কূল পাই না। শুধু জানি তিনি মহামানব। তাঁর নীতি শিক্ষা ও আদর্শে তিনি দেবতুল্য। তাঁকে না বুঝে বা না জেনেও যেন তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হয়ে আসে।

অনেক বছর আগে একবার যখন তিনি সোদপুরে এসেছিলেন সেই সময় তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রার্থনা-সভায় দেখেছিলাম সেই মহামানবকে, অপরূপ শিশুর মত সারল্যপূর্ণ ছিল সেই হাসিমুখখানি। চিরজীবনের মতন মনে গাঁথা হয়ে আছে সেই অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি।

তাই আজ এত দিন পরে যখন সুযোগ এল সেবাগ্রাম দেখবার তখন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। মহাত্মাজীর পুণ্যস্পর্শ-ধন্য সেবাগ্রামকে দর্শনীয় তীর্থস্থান বলেই মনে করে এসেছি চিরদিন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদের যাত্রা সুরু হোলো। প্রথমে প্রায় একশ' মাইল দূরে একটি ছোট সহরে গেলাম। সেখান থেকে আরও দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গায় যেতে হোলো। এবং এমনি একটি ছোট জায়গা থেকে আমরা একদিন সকালবেলায় ওয়ার্দ্ধায় রওনা হলাম।

শুনলাম, এখান থেকে যাট মাইল হবে ওয়ার্দ্ধার দূরত্ব। মোটর ছুটে চলেছে। চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম সেই মহাপুরুষেরই কথা। কৃশকায় ছোট একটি দুর্ব্বল মানুষ ছিলেন, কিন্তু কি অপরিসীম শক্তি ছিল তাঁর মনে! জীবনে অন্যায়ের কাছে মাথা তিনি কখনও নত করেননি। বিলাস-ব্যসনের স্রোতের মধ্যে বাস করেও তিনি ছিলেন কটিবাসধারী সন্ন্যাসী। নীলকণ্ঠের মতন কত গরল তাঁকেও পান করতে হয়েছিল, তাইত তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে অমৃতলোকে বিরাজ করছেন।

মনে পড়ে গেল সেই সর্ব্বনাশা দিনের কথা—যেদিন এ যুগের খৃষ্ট হয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ। বহু যুগের ওপার থেকে যেন মনে ভেসে উঠল সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা। সেই ভীষণ এক জানুয়ারীতে, যেদিন হঠাৎ চতুর্দ্দিকের রেডিও থেকে হয়েছিল সেই নিদারুণ সংবাদের ঘোষণা! তিনি নেই, নির্ম্মম ভাবে সেই শিশুর মতন সরল মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছে, এ যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল সেদিন। বার বার বলছিলাম মনে মনে এ কখনো সত্য হতে পারে না।

তবু সেই অঘটনই ঘটেছিল। পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিনের জন্য কলঙ্কের কালিমায় কালো হয়ে রয়ে গেল।

আজ এতদিন পরেও সে দিনের কথা ভাবলে মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। দেশ যা হারিয়েছে সে ক্ষতি পূরণ বুঝি আর কখনও হবে না।

পথ শেষ হয়ে এল। আমরা ওয়ার্দ্ধায় পৌঁছে গেলাম। ওখানকার সার্কিট হাউসে থাকবার ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছিল। সুন্দর সার্কিট হাউসটি। যেমন বাড়িখানি তেমনি চমৎকার বাগানবাড়ির সামনে। পৌঁছাতে আমাদের বেশ বেলা হয়ে গেল। অত বেলায় আবার খাবার তৈরী করিয়ে খেতে দেরী হয়ে যাবে, তাই আমরা ঠিক করলাম ফল খেয়েই দুপুরের খাওয়া সেরে নেব। আমাদের সঙ্গী একজন ভদ্রলোক পাকা পেঁপে, কলা, পেয়ারা, আপেল প্রভৃতি কয়েক রকম ফল নিয়ে এলেন। বেশ ভালই লাগল এই নতুন রকমের খাওয়া। ঠিক হোলো বেলা পড়লে আমরা সেবাগ্রাম দেখতে যাব।

আমাদের সঙ্গে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন। এই ফলমূলের খাবার দুপুরে খাওয়া তাঁর মোটেই পছন্দ হয়নি। আমি তাঁকে বললাম যে অহিংসা যাঁর নীতি তাঁর আশ্রমে যাচ্ছি বলে তিনিই আজ আমাদের অহিংস নীতি পালন করালেন বোধ হয়। কারণ না হলে এত বেলায় এসে পৌঁছাব কেন? তাড়াতাড়ি এলেই ত যথাসময়ে মনের মতন লাঞ্চ করতে পারতেন।

ঠিক গোধূলির পুণ্যক্ষণে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেবাগ্রাম আশ্রমে। সূর্য্যের শেষ কিরণ সম্পাতের ম্লান আলোয় মনে হোলো আশ্রমটি যেন নিবিড় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোনও দিকে একটি লোক দেখতে পেলাম না।

আশ্রমের এমন পরিত্যক্ত ও নির্জ্জন রূপ দেখব, এ আমাদের কল্পনায় ছিল না। ভেবেছিলাম, সমারোহের অভাব হলেও একেবারে জনমানব-শূন্য হবে না। কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হোলো শেষ পর্য্যন্ত কি দরজা থেকেই ফিরে যেতে হবে নাকি?

কাটল খানিকক্ষণ। প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় একজন লোকের দেখা পেলাম। কোন দিক দিয়ে গেলে মহাত্মাজীর ঘরখানি দেখা যায় জিজ্ঞাসা করাতে সে গান্ধিজীর ঘরটি দেখিয়ে দিল দূর থেকে। আমরা অগ্রসর হলাম সেই দিকে! সে লোকটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। ঘরের প্রবেশপথের একটু আগেই একটি বড় গাছ দেখিয়ে বলে দিল—এই গাছটি 'বাপুজীর নিজের হাতে

বাগান। দেখলাম, একখানা কাঠের বোর্ডও সেই গাছটির গায়ে ঝুলান আছে। অন্ধকারে ভাল করে পড়া না গেলেও বুঝলাম যে তাঁর স্বহস্ত-রোপিত যে এই বৃক্ষ সেই কথাটিই তারিখ সহ লেখা রয়েছে। গাছটি ছাড়িয়েই ছোট মাটির ঘরখানি। আমরা বাইরে জুতা খুলে রেখে মন্দির-দর্শনার্থীর মতন সেই পবিত্র গৃহে প্রবেশ করলাম। লণ্ঠন হাতে এক বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। তিনিই আমাদের সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন।

পরিপাটি করে গোছান ও সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে ঘরখানি রাখা হয়েছে। ভূমিতে তাঁর শয্যাটি সুবিন্যস্ত করে বিছান। দেখে মনে হয় যেন এখনও বুঝি এ শয্যা ব্যবহৃত হয়। বিছানার এক পাশে ছোট কাচের দরজা দেওয়া আলমারীতে তাঁর ব্যবহৃত অনেক ছোট-খাট জিনিষ রাখা আছে। অন্য পাশে একখানা আসনের সামনে একটি ছোট কাঠের ডেস্ক রয়েছে। শুনলাম, মহাত্মাজীর সেক্রেটারী ওখানে বসে মহাত্মাজীর কাছ থেকে তাঁর আদেশ নিয়ে কাজ করতেন।

একটি উঁচু জায়গায় একখানি সাধারণ বেতের মোড়া সযত্নে রক্ষিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-মোড়াটির বিশেষত্ব কি? শুনলাম এই মোড়াটি Sir Straford Cripps এর মতন বিশিষ্ট অতিথিরা এলে তাঁদের বসতে দেওয়া হোতো। এবং তাঁরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ সামান্য আসনে বসতেন।

ঐ মোড়াটি ছাড়া কোনওখানে কোনও একটি আসবাব নেই। ঘরের একটি কোণায় সেই বিখ্যাত অভিযানের দণ্ডটি দেখলাম। মহাত্মাজীর সঙ্গী সেই লাঠিখানিও যেন তাঁর পুণ্যজ্যোতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে, এমনি সুন্দর পবিত্র ভাবে কাচের শো-কেসে লাঠিখানি সাজান আছে। তাঁর ব্যবহৃত পাদুকাটিও সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই পাদুকার সামনে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করলাম সেই মহামানবকে।

গৃহ-সংলগ্ন তাঁর স্নানাগারটিও দেখলাম। সুন্দর করে গুছিয়ে স্নানাগারটিও রাখা হয়েছে। শুনলাম, তাঁর স্নানের ঘর ও উঠোন পর্য্যন্ত সবই পরিষ্কার করতেন তিনি নিজের হাতে। যে ঝাড় দিয়ে তিনি ঘরটি ঝাড়ু দিতেন সেখানি পর্য্যন্ত একপাশে যত্ন করে রাখা আছে। স্নানাগারের পাশেই ছোট একখানা ঘরে সরু লম্বা কাঠের একখানা বেঞ্চের মতন দেখলাম। আমাদের গাইড বললেন, এখানে শুয়ে তিনি তেল মালিশ করতেন।

ঘুরে ঘুরে বার বার সেই মাটির ঘরখানি দেখলাম। 'প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিঙ্কিং' কথাটি পাঠ্যপুস্তকেই পড়েছিলাম, আজ এই ঘরে ঢুকে সে কথাটির তাৎপর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলাম। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে যিনি রাজরাজেশ্বর ছিলেন বাইরে যাপন করতেন তিনি কি অনাড়ম্বর জীবন! ভোগবিলাস কামনা-বাসনার কত উর্দ্ধে তিনি ছিলেন—না হলে এমন জীবন কেউ কি গ্রহণ করে স্ব-ইচ্ছায়? এই ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যিই তিনি ছিলেন যেন সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথ শঙ্কর।

ঘরখানি দেখে চলে আসছি, এমন সময় আমাদের প্রদর্শক একখানি মোটা খাতা বার করে বললেন, আমাদের সবাইকে নিজের নিজের নাম লিখে দিয়ে যেতে। আমরাও যে যার নাম লিখে দিলাম। দেখলাম কত বিভিন্ন ভাষায় কত নাম লেখা আছে।

বাইরে এসে শুনলাম, একটু পরেই প্রার্থনাসভা হবে। রোজই সন্ধ্যার খানিকটা পরে প্রার্থনা-সঙ্গীত হয়। পাশেই একটি আশ্রম আছে এঁদেরই পরিচালিত, সেই আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে গান করে যায় প্রতিদিন।

প্রার্থনা-সভায় যোগ দেব বলে অপেক্ষা করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের গাইড এসে বললেন যে এখানকার যিনি অধ্যক্ষ, শ্রীচিমনলালজী, তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই কি না। আমরা শুনে তখুনি গেলাম তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

শ্রীচিমনলালজীকে দেখে অশীতিপর বৃদ্ধ বলেই মনে হয়—যদিও তাঁর সঠিক বয়স কত তা জানি না। তাঁরও ঘরখানি মাটির, তবে তিনি দেখলাম একখানি খাটিয়ার উপর শুয়ে আছেন। আমরা ঘরের সামনের দাওয়ার উপরে উঠে দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাবছিলাম তাঁর বিশ্রাম ভঙ্গ করা ঠিক হবে কিনা—কিন্তু আমাদের মিলিত পদশব্দে বোধ হয় তাঁর তন্দ্রাভঙ্গ হয়েছিল। তিনি বিছানার উপরে উঠে বসে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কয়েকখানি আসন খাটিয়ার পাশে ছিল। তাই বিছিয়ে নিয়ে আমরা মাটিতে বসলাম।

তিনি বললেন, মহাত্মাজীর অনেক দিনের সঙ্গী ছিলেন তিনি। আমরা মহাত্মাজী সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন তাঁকে করতে লাগলাম। তিনি বেশ খুসীমনেই সব কথারই উত্তর দিলেন। পরিশেষে বললেন যে গান্ধিজীর আদর্শের দিন আজ আর নেই। আজকের পৃথিবী চায় শুধু 'বোমার'। গান্ধিজীর যুগে যে সব মানুষ মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করেও কর্ত্তব্যে অটল ছিলেন, আজ ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন বিলাসী ও ক্ষমতাপ্রিয়। স্বার্থের কাছে আজ আদর্শবাদের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বললেন, তাইত সেবাগ্রাম আজ জনহীন প্রান্তরে পরিণত। কে আর আসবে এখানকার এই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে। রিক্ত বিষণ্ণতায় বৃদ্ধের স্বর করুণ হয়ে উঠল।

ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলছিল, অথচ আসবার সময় পথে বৈদ্যুতিক আলো দেখে এলাম। প্রশ্ন করলাম, আশ্রমে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই কেন? চিমনলালজী বললেন, মহাত্মাজী এই সামান্য আলোর বিলাসটি অবধি পছন্দ করতেন না, তাই এখনও তাঁর সেই ইচ্ছাই প্রতিপালিত হচ্ছে। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এমন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাও যে এখানকার দিনে সম্ভব, এ যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হতে লাগল।

প্রার্থনা-সঙ্গীতের সময় হয়ে এসেছিল। আমরা এই একনিষ্ঠ আদর্শবাদী বৃদ্ধকে প্রণাম করে বাইরে এলাম। খোলা আকাশের নীচে মাঠের উপরেই সতরঞ্চি বিছান হয়েছে। সবাই সেখানে এসে বসলাম। মাথার উপরে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রলেখা। অদূরে প্রদীপ জ্বলছে কয়েকটি। এই আলো-আঁধারের মাঝে ছাত্র ও ছাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত সুরু হোলো। কিন্তু বড় নিরাশ হলাম গান শুনে। এমন পরিবেশ এবং অপরূপ নাম-গানের কথা, তবুও মনে হোলো প্রাণহীন কণ্ঠ সব। যেন সুর তাল লয় বজায় রেখে যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলেছে।

প্রার্থনাসভা শেষ হোলো। নিত্যকর্ম সমাপনান্তে সকলেই স্বস্থানে ফিরে চলে গেল। পরিত্যক্ত আশ্রমে অপরিসীম শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল। পাষাণী অহল্যা যেমন যুগ-যুগান্ত ধরে প্রতীক্ষা

করেছিলেন শ্রীরামের পাদস্পর্শে উদ্ধার হয়ে নবজীবন লাভ করবার জন্য, এ আশ্রমও তেমনি প্রতীক্ষা করে আছে কবে আবার এক মহাপুরুষের চরণস্পর্শে ধন্য হয়ে তার নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে।

অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আমাদের অনেক দূরে ফিরতে হবে। চিমনলালজীও প্রার্থনাসভায় এসেছিলেন। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম। আমাদের গাড়ী একটু দূরে ছিল। তিনি একজন লোককে বলে দিলেন আলো দেখিয়ে আমাদের গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে।

আনন্দিত মন নিয়ে সেবাগ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। মনে হতে লাগল সত্যিই বোধ হয় আজকের পৃথিবীতে সততা ও সরলতার দিন শেষ হতে চলেছে, তাই আশীর্বাদ আজ ক্রমশই তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার মোহে হিতাহিত বিচার করবার ইচ্ছাও যেন লোপ পেতে বসেছে। অর্থ ও প্রতিপত্তির প্রভাবেই আজ জীবনের মানদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে।

তবু মনে হয়, এ বিকৃত রুচির প্রভাব থেকে ভারতবাসী একদিন মুক্ত হবেই। বহু সাধকের সাধনা-সমৃদ্ধ পুণ্যভূমি এই ভারত কি কখন মহৎ আদর্শচ্যুত হতে পারে? মহাত্মাজীর সাধনা ও বাণী কখন ব্যর্থ হবে না। সাময়িক যে বিস্মৃতি আজ এসেছে, সেই বিস্মৃতি অন্তে আবার আসবে নতুন এক যুগ, নতন সব মানুষ। তারাই আবার মহাত্মাজীর আদর্শ গ্রহণ করে দেশকে দেবে নব রূপ। শীতের অন্তে আসে বসন্ত, তেমনি এই দুর্দ্দিনের পরেও আবার আসবে সুদিন।

নারীর মর্যাদা

সরোজপ্রভা কর

যুগের পরিবর্তনে সবকিছুই পাল্টাচ্ছে হু-হু করে। চমকাবার কথাই বটে! মেয়েদের উঁচিয়ে ধরা দাবী দেখে। তাঁরা পুত্রের সমকক্ষ পিতার সম্পত্তির অংশীদার হলেন আইনের জোরে। বিয়ের বাজারে কিন্তু তাঁরা সমান হলেন না। দেওয়া নেওয়া ঠিক মতই চলছে। কালো বাজারে সব কিছু মাৎ করে দিচ্ছে। হিন্দু কোর্ডবিলও ত আটপৌরে নয়। ও বাক্সবন্দী রইল দামী বেনারসীর মত। এ্যাসেম্বলির মেম্বাররা তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এই পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েরাও গর্বে ফুলে ওঠেন। তারা কিসে নেই,—দারোগা, এটর্নি সভানেত্রী, আরও যে অনেক আছে। নেই কেবল মেসিনগানে।

সত্য কি হল, ধামা চাপা রইল। মিথ্যেই প্রকট হয়ে উঠছেও, উঠবে। সেই কথার কিছু আলোচনা করব। কিন্তু এ-ও পাটি নিয়ে। তা বলে বলশেভিক বা সোসালিষ্ট না হোক্‌ মানুষ ত বটে, সে হল মেয়ে আর পুরুষ। যেখানে আইন হল, সেখানে আইনের ক্ষমতা নাই। তা হলে এটা কি অন্ধকার যুগ! শিক্ষিতা নারীরা সচেতন কৈ? বাবার বাড়ীর ভারী গহনায় ও মোটাপণের টাকায় তিনি সমাদর লাভ করেন শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতির নিকট। ঝি-ও মেজবৌদির কাজটা আগে করে দেয়। তার বাবা তত্ত্ব পাঠায় ভাল। মায় ঝি, চাকর পর্যন্ত পেট পুরে মিষ্টি খায়। তার বাবা যদি এখন দু'মিনিটের জন্য মেয়ের বাড়ীতে পদার্পণ করেন, সে এক হৈ চৈ ব্যাপার। কত রান্না, কত মিষ্টি আনার ব্যাপার আরম্ভ হয়। আর তার ছোট জা সীমার অবস্থা শুনুন। অপরূপ সুন্দরী, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ। রূপ থাকলে কি হবে রূপেয়ার অভাবে তার বর জোটাতে পারেনি তার পিতা। চাকুরী করছে সীমা। তার ব্রীড়াময় আয়ত আঁখি ও দুধে-আলতা গায়ের রং, সুডৌল চিবুক দেখে ছেলে ত পাগল। মা ও পরে বাবাকে ধরল তাকে বিয়ে করতে না পারলে সুইসাইড করবে। সীমাকে বাগাতে চেয়েছিল ছেলেটি। ইচ্ছা, লভম্যারেজ করবে। কিন্তু এ খালি বাইরেই রূপসাই নয়. নারীত্বের শিখরে অধিষ্ঠিতা এ মেয়ে, তাই সীমার বাবার খোসামোদ ও মেয়ের মতামত তাকে সংগ্রহ করে রীতিমত সামাজিক অনুষ্ঠানের পর তাকে আনতে হল। মা জগন্মাতার মত তার নিজের আলয়ে। কিন্তু তার দারিদ্র্যের জন্য সে এখানে নির্যাতিতা, মায় ঝি,-চাকর পর্যন্ত। এক স্বামীর সোহাগেই সীমা টিকে আছে। তবে এটা কি হল! তার চরিত্র, তার উচ্চশিক্ষা, রূপ সব ভেস্তে গেল বরপণ ও তার যোগ্য আসবাবের জন্য? এ কি অপমানের চূড়ান্ত নয়? আজ এই ভুল যদি উচ্চশিক্ষিতারা না শোধরায় তবে নারীকুলের একটা দিক ধ্বংসের পথে যাবে। পথে, পার্কে তাই সস্তামেয়েদের যৌবন টাকা দিয়ে কেনা যায়। হায় নারী! এই অধঃপতন! তোমরা না নিবারণ করলে কে করবে?

এখানে পিতা-ভ্রাতার কথা নয়। পুরুষ ও নারীর কথা। এই অপমানের চূড়ান্ত মীমাংসায় না এলে জাতীয় জীবন গভীর তমসায় আবৃত হবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান আসুন, আনন্দের ঢেউয়ে চেপে সেই হাসির রাজ্যে যেখানে চিরবসন্ত জাগরুক। রূপ হলেই সেখানে রূপেয়ার অভাব নেই। নারীত্ব-অভিমানিনী মেয়েটি দায়ে পড়ে নাবলো ছবি মহলে। শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণীর আজ মাতৃত্বের আসন সুদূর-পরাহত। এতে রাষ্ট্র কানা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা অবিবাহিতা রয়ে যাচ্ছেন। তাদের সন্তানরাই জাতের ভিৎ পোক্ত করবে। সংখ্যায়ও আমরা কমে যাচ্ছি এক এই নারীর অবমাননায়, ফলে সব দিক দিয়ে বাংলা ও বাঙালী অবনতির পথে। খাঁটি প্রণয় ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। কামনা মুছে ফেলার নয়, এ হল বিধিদত্ত দান। ব্যভিচারের স্রোত যেভাবে বইছে সেটা বাস্তবিক তলিয়ে দেখবার বিষয়। মাতৃ-আসনের উপযুক্ত মেয়েরা যদি মা না হতে পারে তবে অচিরাৎ বঙ্গ ও বাঙালী কুপকাৎ। মর্যাদাসম্পন্ন মায়েরাই উপযুক্ত দেশ-কাণ্ডারী সৃষ্টি করতে পারেন। আজ মনীষীদের পদধ্বনি যেন একেবারে থমকে আসছে। দুর্যোগ আর দুর্নীতির প্রচণ্ড আগমনে ধরণী থরহরি। অধিকাংশ বারের টেবিলে সুরার মতই নারীর প্রয়োজন মনে করেন! বধূজীবনে প্রবেশ করবার সুযোগ থাকলে একটি মেয়েরও পদস্খলন হত না। পদস্খলিতা নারীর স্থান চিরদিন ধূলায়। এখন নারী শুধু স্বামি-শ্বশুরের পণ্য নয়, বাজারের পণ্য। নেপথ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করলে কলঙ্কময়, নারীর জীবন যে কত শোচনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা দেখা যায়, অধঃপতিত সমাজ একেবারে ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে! এর চলমান গতিকে রোধ করবার জন্য নারীকে নারীর জন্য নেমে আসতে হবে। বিনাপণে বিনা যৌতুকে নারী যদি বধূজীবনে প্রবেশ করবার অধিকার পায়, তবেই এর মীমাংসা হয়ে যাবে।

বিজয় ভট্টাচার্য

১৮

অর্থ, যশ আর প্রতিপত্তি, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এ ছাড়া আর বড় একটা কিছুর দরকার করে না। নাম তখন এমনিই ছড়ায় মুখে মুখে। তার সঙ্গে গুণ থাকলে তো কথাই নেই। এমন কি দোষগুলোরও তখন অন্য মানে হয়। অসৌজন্য প্রকাশ করলে তখন লোকে আর অভদ্র বলে না। বলে, দৃঢ়চেতা। প্রবঞ্চকতা করলে শঠতা না বলে লোকে তখন বলে, ছলনা করছেন মিঃ সেন।

সত্যব্রত দেখে আর হাসে। সাফল্যের স্বর্ণতোরণ যে এত অনায়াসে খুলে যাবে সামনে, সত্যব্রত তা কল্পনাও করে নি। প্রথমটা অবাক হতো। থেকে থেকেই চমক লাগতো। কিন্তু যশোলাভ আর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ক্রমে এই কথাটাও তার মনে দৃঢ়মূল হলো, যে এ সব কিছুই তার যেন পাওনা ছিল। সমাজ-সংসার এতদিন তাকে শুধু প্রবঞ্চনা করছিল।

রক্তে পরাক্রম আগে থেকেই ছিল। সেই নীল রক্ত এবার জেহাদ ঘোষণা করল প্রতিষ্ঠা পেয়ে। লোভ, আর তার সঙ্গে দুরন্ত একটা ক্ষোভ, দুটো মিলে-মিশে দুর্মদ হয়ে উঠল ব্যক্তিত্ব। পুরোনামের তখন আর দরকার করে না। এস, সেনই তখন যথেষ্ট দাপটের। সেন সাহেব বলতেই সকলে একডাকে চেনে।

কোম্পানীর কাজকর্ম আর নতুন ব্যবস্থাপনা দেখে খুসী হন নরেন ভাদুড়ী। সরকারী বেসরকারী এমন সব উচ্চতন মহল থেকে ওরিয়েণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ সম্পর্কে অনুসন্ধান আসে যে, শুনে তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। সত্যব্রত সেন এসে যে নিঃসন্দেহে সুনাম বাড়িয়ে যাচ্ছে কোম্পানীর, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

কোম্পানী ভাঙিয়ে মানুষ বড় হয়—এই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। এখন দেখছেন মানুষ ভাঙিয়েই কোম্পানী বড় হয়ে যাচ্ছে। দেশের গণ্ডী ছাপিয়ে সুনাম তার ছড়িয়ে পড়ছে বিদেশে। টেলিফোনে তিনি সত্যব্রতকে উদ্দেশ করে বিশ্বতোষকে সম্বর্দ্ধনা জানান। বলেন, না হে, ছোকরার এলেম আছে বলতে হবে। রেলওয়ে বোর্ডের এণ্ডারসন সাহেব পর্য্যন্ত সে দিন ওরিয়েণ্টের প্রোডাকসন সিষ্টেমের তারিফ করে অনেক কথা বলছিল। মনে হচ্ছে এ বছরের টেণ্ডারগুলোও লেগে যাবে।

নরেন ভাদুড়ীর সন্তোষে আশ্বস্ত বোধ করে বিশ্বতোষ! কেন না, ভবিষ্যতে সত্যব্রতকে কোম্পানীতে নেবার দিক থেকে তার ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতা নিয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠবে না; নরেন ভাদুড়ীর সপ্রশংস মন্তব্যের উত্তরে একটু গর্ব্ব করেই সে জানায়। সংসারে লোক চেনবার চোখ একা নরেন ভাদুড়ীর ছাড়া যদি আরও কিছু লোকের থেকে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই ভাদুড়ী মশাইয়ের। বিশ্বতোষের কথা শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রাণখোলা হাসির বান ডাকান নরেন ভাদুড়ী। বলেন, তা তুমি এখন সে কথা বলতেই পারো ভাই হলপ করে। তবে আমারও যে একটা পছন্দ আছে, সে কথা কিন্তু তুমি একবারও বলছো না।

বিশ্বতোষ ঠিক বুঝতে পারে না নরেন ভাদুড়ীর কথা। বলে, সত্যব্রতকে কোম্পানীতে নেবার ব্যাপারে আপনার তো অমতই ছিল জানি।

নরেন ভাদুড়ী সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলেন, আরে ও-সব তো হলো তোমার কাজ, তুমি করবে। ম্যানেজারী কে করবে না করবে কোম্পানীর সে তো আমার দেখবার দরকার নেই। আমার হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর! সে বিষয়ে আমার পছন্দ আছে কি না বলো?

চালটা খানিকটা স্থূল হলেও দূরে বসে এক গুলীতে দুই বাঘ মারেন নরেন ভাদুড়ী। তবু ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রথম অধ্যায়ে কর্ম্মী ও তার কাজের তারিফ করলে কর্ম্মকর্ত্তাদের নিঃসন্দেহে দর বেড়ে যাবে, এই বিশ্বাসে তিনি এতগুলো কথা বলেন।

দর সত্যব্রতর সত্যিই বেড়ে গেছে। আয়েসী এক রাজার দুলাল ব্যবসায়িক জগতের ঘোরপ্যাঁচ আর কূটবুদ্ধির সঙ্গে যে এতটা পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে, বিশ্বতোষেরও সেটা কল্পনার বাইরে। তাই সে-ও ইতিমধ্যে নিজের কাজের অনেকটা দায়িত্বই সত্যব্রতর ওপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে। এক প্রয়োজনীয় দলিলপত্রে সই করা ছাড়া কোম্পানীর পক্ষে যাবতীয় কাজ এখন সত্যব্রতই করে। ছ'টার পর বিশ্বতোষ অফিসে কোনদিনই থাকে না। অথচ বাড়ী ফিরতে সত্যব্রতর রোজই আটটা-নটা হয়ে যায়। এসে হয়তো দেখে কোনদিন সতীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে বিশ্বতোষ! সিনেমা বা হোটেলে, নিকুঞ্জ তার কোন সন্ধানই দিতে পারে না। পার্টি সেরে রাত্রে বাড়ী ফিরে শোনে সতী জরুরী কোন তার পেয়ে হঠাৎ জব্বলপুর রওনা হয়ে গেছে সত্যব্রত। এমন কি, বিশ্বতোষও সে খবরের বিন্দু-বিসর্গ জানে না। খবর শুনে অবাক হয় বিশ্বতোষ। বলে, ছিল বটে একটা প্রোগ্রাম জব্বলপুর যাবার, কিন্তু সেটা এত তাড়াহুড়ো না করে আসছে সপ্তাহেও তো যেতে পারতো সে।

তার পরের দিনই সত্যব্রতর এক টেলিগ্রাম আসে সতীর কাছে। জব্বলপুর থেকে জানাচ্ছে যে জরুরী কতকগুলো কারণে সে জব্বলপুর থেকে এলাহাবাদ ও পাটনা হয়ে পনেরো তারিখ নাগাদ কলকাতায় ফিরছে। তিন দিনের জায়গায় ছ' দিন হয়ে গেল, অথচ মানুষটার যেন কোন বিকার নেই! এর পর এলাহাবাদ কি পাটনা থেকে তার করে সত্যব্রত যে তাকে আবার জানাবে না যে ফিরতে তার আরও ছ' দিন দেরী হবে, তারই বা বিচিত্র কি? কাজ আর কাজ, কাজ ছাড়া আর অন্য কোন কথাই নেই সত্যব্রতর মুখে।

আগে আগে একজনের আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই কত কত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ইদানীং দিন-রাত্রে কখন-সখনও যদি একবার ছেড়ে দু'বার দেখা হয় তো অন্তরঙ্গতার আঁচ অনুভব করে না সতী। সতীর জীবনে এ-ও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। হয়তো সতীর একাকীত্বটা বোঝে বলেই বিশ্বতোষকে পাঠিয়ে দেয় সে মাঝে মাঝে। বিশ্বতোষ আপনা থেকেই সৌজন্যবোধে এসে সতীকে সঙ্গদান করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যাই হোক, যে ফাঁক সে ফাঁকই থেকে যায়। সত্যব্রত ফিরে না আসা পর্য্যন্ত জনারণ্যে বসেও একা-একা থাকে সতী। এক এক সময়ে বিশ্বতোষের সাহচর্য্যটাই যেন অসহ্য ঠেকে সতীর। বিশ্বতোষ এসে কুশলবার্ত্তা নেয়, সেটুকু পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। নেহাৎ বন্ধুত্বের দয়া আর সামাজিক বাধ্যবাধকতার খাতিরে জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে বসে থাকতে হয় সতীকে।

তবু সত্যব্রত যে একটা নিশানা পেয়েছে জীবনের, কাজেকর্মে যখন আবার উৎসাহ এসেছে তার নতুন করে; তখন এ দুঃখ কিছু নয় সতীর। বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক আবেগ উচ্ছ্বাসের দিনগুলোর পর ইদানীংকার জীবনটা যেন সত্যিই আলোবাতাসহীন হয়ে উঠেছিল। লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই যেখানে, সেখানেও যেন মনে হয়েছিল অবিশ্বাস এসে বাসা বেঁধেছে। উচ্চকিত না হলেও একজন আর একজনকে কানে কানে যেন বলতে শুনেছিল—মনে রেখো, ভেঙে যাবে স্বপ্নের নীড় এই পরিপূর্ণ সোয়াস্তির জীবনে তোমার। নিজের কানেই শুনেছে সতী এই কথা। চোখেও যা লক্ষ্য করেছে সে-ও এই অলিখিত নির্দ্দেশেরই প্রেতরূপ। তবু ছায়া কখনই কায়া ধরে না, এই ছিল তার বিশ্বাস। সুতরাং আজ যদি জীবনের তাগিদে বিচ্ছেদ আসে সাময়িক, কষ্ট হয় সতীর, সে দুঃখ সে হাসিমুখেই মেনে নেবে। শান্তির জীবনে সে অশান্তির চেয়ে অশান্তির জীবনে এই যন্ত্রণাটুকু সব সময়ই কামনা করে সে। তিন দিনের জায়গায় তাই ছ'দিন, ছ' দিনের জায়গায় না হয় বারোটা দিনই একা থাকবে সে। কিছু এসে-যাবে না সতীর।

ট্যুর থেকে ফিরে এলো সত্যব্রত দিন পনেরো পর কলকাতায় শেষটায় পাটনা থেকেও কলকাতা ফেরা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশ্বতোষের জরুরী এক তারবার্ত্তা পেয়ে পাটনা থেকেই তাকে চলে যেতে হয় বোম্বাই। বোম্বাই হয়ে তবে কলকাতা ফিরছে সে।

খবরটা আগেই পৌঁছে গিছল অফিসে। তাই বিশ্বতোষ আগে থেকেই বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিল। সাদর সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে সে নিয়ে আসে সত্যব্রতকে রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে। সতীর হাতে সমর্পণ করে বলে, এই নাও সতী দিয়ে গেলুম। ছ' দিনের ভেতরে আর অফিসে যেতে দিও না। স্রেফ বিশ্রাম নিক শুয়ে পড়ে।

প্রায় দেড় লাখ টাকার কাজ করে এসেছে সত্যব্রত মাত্র চারটে ষ্টেশন ঘুরে। সেনের তখন অন্য কদর। পরের দিন অফিসে গেল না ঠিকই। সতী জোর করে শুইয়ে রাখলো বিছানায়। কিন্তু অফিসই দেখা গেল বাড়ীতে উঠে এসেছে পরে। বেলা দুটো নাগাদ এলো বিশ্বতোষ। ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে বিকেল হতে না হতে এলো আম্বুভাই প্যাটেল, রঘুবীর সিং আর ভগবানদাস লোহার। পুরুষ মানুষ যে পুরুষ মানুষের গালে অতখানি আসক্তি নিয়ে চুমু খায়, সতী জীবনে এই প্রথম দেখলো। বিলেত থেকে সদ্য-আনা লাইটার সমেত একটা সিগারেট-কেস সত্যব্রতর হাতে তুলে দিয়ে ভগবানদাস সত্যব্রতকে জড়িয়ে ধরে এক ঘর লোকের সামনে গালে এক চুমু। বন্ধুভাবের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু সামনাসামনি সতীর সে দিন এমন লজ্জা করেছিল! সবাই গদগদ হলো আনন্দে, কিন্তু সতীর কান আর ঘাড় লাল হয়ে রইল লজ্জায় অনেকক্ষণ। চোখ তুলে সে আর কারো মুখের দিকে চাইতেই পারলো না।

তারপর থেকেই রিজেন্ট পার্কের বাড়ী জমজমাট্। রোজই আড্ডা, রোজই ড্রিঙ্কস। এক হুইস্কির বিল মেটাতেই সংসার খরচের টাকায় টান পড়ে যায় সতীর। আট পেগের পর বেসামাল হয়ে পড়লে দুই বগল দুদিক থেকে চেপে ধরে সত্যব্রত আর বিশ্বতোষ ভগবানদাসকে ড্রইংরুম থেকে নিয়ে আসে বেডরুমে। সত্যব্রতর কথামত ভগবানদাসের খুঁটের কাপড় আবার সতীকেই ঢিলেঢালা করে দিয়ে নাইকুণ্ডলীতে ভিজে তোয়ালে চেপে ধরতে হয়।

বিজনেস বাড়ছে, টাকা আসছে হাতে সত্যব্রতর চারদিক থেকে। প্রথম প্রথম অসুবিধে সহ্য করেও সতী কথা বলে না একটি। কিন্তু পরে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল পরিবেশ। বাইরের বাড়ীর সঙ্গে ভেতরের বাড়ীর যেন কোন ব্যবধান নেই। ড্রইংরুম থেকে গ্লাস হাতে করে উঠে এসে আম্বুভাই বেডরুমে বসে সতীর সঙ্গে গল্প করে।

মেজাজী মানুষ আম্বুভাই ড্রইংরুমের চড়া আলো আর হট্টগোল সব সময় বরদাস্ত করতে না পেরে মাঝে মাঝেই উঠে আসে এই রকম। স্বল্প আলোকে নেয়ারের জলচৌকিখানায় চুপ করে বসে সতীর সঙ্গে ঘরকন্নার কথা বলে। বাঙ্গালা আর গুজরাটের কৃষ্টিগত মিল কোথায় আর বৈষম্যই বা কোথায়, কতটুকু, আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলে,—সতীর মন্দ লাগে না শুনতে। কিন্তু রাত বারোটার পর, যখন ঘুমে চোখ ভেঙে আসে সতীর, পিঠের শিরদাঁড়াটা কনকন করে বসে থাকতে থাকতে, তখন সত্যিই আর কিছু ভাল লাগে না। সতীর অসুবিধেটা বুঝেও সত্যব্রত যেন চোখ বুঁজে থাকে ইচ্ছে করে। কথা বললে বলে, তুমি তো শুয়ে পড়লেই পার ঘুম পেলে? অত রাত অবধি বসে থাকবার তো তোমার কোন দরকার নেই?

সতী বলে, হৈ-হাঙ্গামা আর বিজনেস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাগুলো বাড়ীর বাইরে হতে পারে না? এত রাত অবধি বাড়ীতে হট্টগোল আমার ভাল লাগে না। আর শরীরটাও তো ইদানীং আমার ভাল নেই তুমি জানো! লোক আসলেই কথা বলতে হয়, দু'দণ্ড বসতে হয় ভদ্রতার খাতিরে, শুয়ে পড়ো না কেন বললেই তো আর শুয়ে পড়তে পারি না! এটা-সেটা পাঁচটা প্রয়োজন

তোমার, নিকুঞ্জ একা কি করবে? রাত একটার সময় হঠাৎ হঠাৎ তোমার খেয়াল হলো ভেটকি মাছের ফ্রাই খাবো। ভগবানদাস বলবে, পকৌড়ি লাও। কি করে'হবে? আমার যেন কেমন মাথা ঘোরে বাপু।

সতীর কথায় বিব্রত বোধ করে সত্যব্রত। খুসী হয়ে বলে, মাথা ঘোরে অথচ রাত একটা অবধি ফ্রাই ভাজবে তুমি আমার কথায়, এ তো কোন কাজের কথা হলো না? মাথা ঘুরলে তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। আমুভাই আর ভগবানদাসকে তা বলে তো আর আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবো না? আর শরীর খারাপ, মাথা ঘোরা,—এ সব কথা গোপন করে রাখলে আমিই বা বুঝবো কি করে?

সত্যব্রতর কথায় দুঃখ পায় সতী। এ সব কথা তার কাছে অন্ততঃ গোপন থাকবার কথা নয়। অভিমান করে বলে, সব কথাগুলোই তোমার জানা কথা। হাত গুণে তোমাকে বুঝতে হবে এমন তো কোন কথা নয়? সব ব্যাপারেই আমার হয়ে কথা, আমি আর তোমাকে কত বলবো বল?

ক্ষুণ্ণ হয় সত্যব্রত সতীর কথায়। বলে, সব ব্যাপারেই কি তোমার হয়ে তোমাকে কথা বলতে হচ্ছে? নার্সিংহোমে সিট বুক করবার কথা ছিল, ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বতোষ কালই টাকা'জমা দিয়ে আসবে।

অবাক হয় সতী। বলে, বিশ্বতোষের কাছে আবার তুমি নার্সিং-হোমের কথাটা বলতে গেলে কেন? নার্সিংহোম, তাও বিশ্বতোষ ব্যবস্থা করে দেবে? আগে জানলে আমি নিজেই যেতাম।

সত্যব্রত যেন যুক্তি পায় না সতীর কথায়। বলে, না সব ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন বুঝি না। ডাঃ নিয়োগী হচ্ছেন বিশ্বতোষের বন্ধু লোক। অত বড় একজন 'গায়নো'—ক'জন সুবিধে পাচ্ছে বলো? বলবো না কেন বিশ্বতোষকে? এত কথা বলতে পারলাম আর সামান্য নার্সিংহোমের কথাটাই—

: আমি মনে করি তুমি না বললেই ভাল করতে। যাকগে, যা বলেছো বলেছো! কিন্তু আমি তো মনে করছি নার্সিংহোমেই যাবো না।

: কেন?

: কেন কি? মাসের মধ্যে পনেরো দিন তুমি থাকবে বাইরে। আজ মাদ্রাজ, কাল দিল্লী,—কার ভরসাতে আমি সেখানে যাবো বলো?

: নার্সিংহোমই তো ভরসা, নার্সিংহোমে অতগুলো টাকা দিয়ে যে যায় লোকে—

: না সে যারা যায় তারা যাক। আমি নার্সিংহোমে থাকতে পারবো না। আর নার্সিংহোম তো দু-এক সপ্তাহের জন্য। তারপর? কোথায় উঠবো আমি? ঐ অবস্থায় এখানে সম্ভব নয় তুমি জানো?

—বেশ তো কোথায় তোমার সুবিধে হয় বলো?

—আমি মনোহরপুকুরের বাড়ীতে যাবো। হাজার হলেও মা আছেন সেখানে। নিজের শরীরের কথা ছেড়ে দিলেও বাচ্চার ধকল কে সামলাবে অন্য জায়গায়? নার্স আর আয়া—আমার কাউকে বিশ্বাস নেই।

—বেশ তাই ব্যবস্থা করো। তবে একটা কথা—যখন-তখন আমি কিন্তু সেখানে যেতে পারবো না তুমি ডাকলেই।

—প্রয়োজনবোধ না করলে যেও না। আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না।

—বেশ, বিশ্বতোষকে আমি তাহলে বারণ করে দেবো'খন। তাহলে কবে তুমি যেতে চাও মনোহরপুকুর?

—দেখি, এই সপ্তাহেই কি সামনের সপ্তাহে। বেশী দেরী করবো না।

—দেরীই যদি না কর তো আমার আড্ডাটাই বা ভাঙছো কেন এখানে? তুমি জানো সখ করে আমি রোজ হুইস্কি খাই না। উদ্দেশ্য না থাকলে ভগবানদাসকে অন্ততঃ আমি বেডরুমে ঢুকতে দিতাম না।

—বুঝলাম, কিন্তু বেডরুম পর্য্যন্ত ঢুকতে দিতে হয় ভগবানদাসকে, তেমন কোন উদ্দেশ্য না থাকলেই কি সমীচীন হতো না?

—না, হতো না।

—কি জানি! আমার কিন্তু ভয় হয়, তুমি বড্ড বেশী ঝুঁকি নিচ্ছ।

—তা ঝুঁকি না নিলে লাভটা হবে কোত্থেকে? আমার ঘরে বয়ে কোনদিন টাকা দিয়ে যাবে না বিশ্বতোষ। অসুবিধে হলো যে ঠিক এই সময়টাতেই তুমি আবার আটকে পড়লে। নইলে কতকগুলো বিষয়ে আমি অনায়াসে তোমার ওপর ভরসা করতে পারতুম।

—এখনও এমন কিছু আটকে পড়িনি যে ভরসা করে তুমি আমাকে দুটো কথা বলতে পারবে না। কি ব্যাপার কি?

ব্যাপার? কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ বিস্মিত হয়ে যায় সত্যব্রত। বলে, সব ব্যাপারটা খুলে বলতে গেলে এখন অযথা তুমি বিব্রত বোধ করবে। আর তোমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় দুশ্চিন্তা করাটাও অত্যন্ত অন্যায় হবে। একটা কথা তুমি শুধু জেনে রাখো যে, বিশ্বতোষের মতি-গতি আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্রলোভন আমি ঠিক বলবো না! কেন না কোম্পানীর লাভ-লোকসানের ব্যাপারে আমিও একজন অংশীদার। সে যদি বিশ্বাস করে আমার ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকে তো অন্যায় কিছু করেনি। কিন্তু আমার এখন এই ভাবনা যে কেউ কি সত্যিই এতটা অপরের ওপর ছেড়ে দেয় বিশ্বাস করে? না কি পরীক্ষা করছে আমাকে বিশ্বতোষ?

—তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো কি দেখে বিশ্বতোষের? আর পরীক্ষাই বা মনে হচ্ছে কেন তোমার?

—টাকা, সতী অনেক টাকা। আমি ইচ্ছে করলে এখন অনেক কিছু করতে পারি। অনেক কিছু—তাই ভাবছি—বিশ্বতোষ কি ভগবান? না,—

অক্টোফোটোর একাধিক পোজের মত অনেক কম্পোজিশনই মনে পড়ে সতীর সত্যব্রতর সম্পর্কে বিশ্বতোষকে জড়িয়ে। বন্ধু বিশ্বতোষ, পৃষ্ঠপোষক বিশ্বতোষ, গুণগ্রাহী বিশ্বতোষ, নার্সিংহোমে সন্তানসম্ভাবিতা সতী—সেখানেও বিশ্বতোষ। রাজদ্বার থেকে শ্মশান অবধি—শুধু বিশ্বতোষ আর বিশ্বতোষ।

মনটা যেন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে সতীর। বলে, না না, ভগবান না হলে ক্ষমা নেই, তেমনভাবে তুমি জড়াবে কেন নিজেকে? বিশ্বতোষ তোমার অকৃত্রিম বন্ধু হতে পারে কিন্তু স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে সে যে শত্রু হয়ে উঠবে না কোন দিন এ গ্যারান্টি তুমি কখনই পেতে পারো না।

সত্যব্রত শোনে সতীর কথা চুপ করে। একটু পরে কটাক্ষে হেসে বলে, টাকাও কি কোন গ্যারান্টি নয়? স্রেফ টাকা? অনেক টাকা? সত্যব্রতর কথায় সাত রাজার ধনের সন্ধান পায় সতী। বলে—কত টাকা?

—ধর তোমার যত টাকা।

—আমার বাবার কত টাকা আছে তা আমি নিজেই জানি না।

বল কত টাকা! পঞ্চাশ হাজার টাকা? এক লক্ষ টাকা?

—কি হবে অত টাকা দিয়ে?

—কি হবে না তাই বলো! এক লক্ষের বেশী তো দেখলাম ভাবতেই পারলে না। শিরিন দত্ত কি দময়ন্তীর মত ভাবতে পারো না?

সতী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সত্যব্রতর মুখের দিকে। উৎকণ্ঠায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। সত্যব্রতকে মনে হয়, যেন একটা জ্যান্ত মূর্ত্ত লোভ। তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শুষে নিচ্ছে মুহূর্তে।

টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে বেজে থেমে গিয়েছিল। আবার বাজতে সুরু করে এতক্ষণে। টেলিফোন ধরতে চলে যায় সত্যব্রত।

সতীও শুনলো টেলিফোন-রিং। যাত করে খানিকটা পাগলা-ঘণ্টির মত, বা কোন ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার মত, দূর থেকে যার শব্দ শুনলে মনে হবে, ছারখার হয়ে গেল বুঝি সব কিছু আগুন লেগে কোথাও, কোনখানে।

১৯

সতীর হলো ছেলে, আর বিশ্বতোষ সেই আনন্দে বারো শ' টাকা দামের একটা ঘড়ি দিয়ে লাজুক পিতা সত্যব্রতর মুখ দেখলো। সেলোফোন পেপারে মোড়া রঙবাহারী সব সাজ-সরঞ্জামের বাণ্ডিল গাড়ী ভরতি করে নিয়ে গেল ইসমাইল সতীর কাছে। আম্মুভাই পাঠালো চমৎকার একখানা চিত্রবিচিত্র গুজরাটী বেবিকট আর এক প্রস্থ পালঙ্কের বিছানা। নরেন ভাদুড়ী হাতে করে কিছু পাঠালেন না। কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ থেকে নবজাতককে অভিনন্দিত করে খবরের কাগজে আধ পাতা বিজ্ঞাপন দিলেন ফলাও করে। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের এই অভিনব পন্থা দেখে চমৎকৃত হলো সবাই।

সব চাইতে সার্থক মনে করলেন নিজেকে অন্নদা রায়। কিছুদিন ধরেই একটা অবলম্বনের কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। এতদিন পর তাঁর মনে হলো পেয়ে গেলেন যেন সেই অবলম্বন।

পুজোর সময় বোনাস দেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে বিতণ্ডা ছিল অনেক দিনের। কিন্তু বিশে সেপ্টেম্বর দিবা পাঁচটা ছত্রিশ সেকেণ্ড গতে সমস্ত বাদ-বিসংবাদের যেন অকস্মাৎ অবসান হয়ে গেল। একেবারে একসঙ্গে ছ'মাসের বোনাস পেয়ে গেল গোটা অফিস-ষ্টাফ। প্রতিনিধিস্থানীয় একদল শ্রমিকনেতা আবার এক ঘরোয়া বৈঠক করে অন্নদা রায়ের নাতির হাতে একটা রূপোর লাটাই কিনে দিয়ে এলো উপহার হিসেবে। মানপত্রের শেষে মনস্কামনা জানালো, প্রতি বছর নতুন নতুন নাতির মুখ দেখুন অন্নদা রায়, আর ফি বছরই হাত ভরে বোনাস দিন কারখানার মেহনতী মানুষদের।

ভেঙ্গে পড়েছিলেন অন্নদা রায়। আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। জীবন নিরর্থক হয়ে যেতে যেতে যেন আবার অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল পড়ন্ত বেলায়। নতুন করে আবার মানে খুঁজতে লাগলেন অন্নদা রায় সব কিছুর।

টেলিফোনে সুখবরটি আগেই পৌঁছে দিয়েছিলেন অন্নদা স্বর্ণলতিকার কাছে। রোজই আশা করছিলেন যে কোন সময় এসে পড়বেন বেয়ান। বোকার মত নাতি হওয়া নিয়ে খানিকক্ষণ হাসাহাসি মাতামাতি করা এক স্বর্ণলতিকার সঙ্গেই সম্ভব। এ আনন্দ আর কেউ জানবে না, আর কেউ বুঝবে না। কিন্তু স্বর্ণলতিকার দেখা নেই। স্ত্রী আর মেয়ের কাছে বেয়ান এলেন না, নাতির মুখ দেখলেন না বলে অস্থির হয়ে উঠলেন অন্নদা। একটা ছেড়ে দশটা নাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে বলে আদর করতে লাগলেন নবজাতকের। আর প্রাণের টান থাকলে যেমন হয় আর কি, সব কথাতেই নাতিকে জড়িয়ে নিয়ে সেই কথাটারই বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। যেমন কমলকামিনী একটা জরুরী কাজের কথা জিজ্ঞেস করে বলছিলেন, বেলঘরে থেকে নাদুভাই টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করছেন যে বিকেল চারটে নাগাদ চটকলের ডাইরেক্টরস্ মিটিং-এ মিঃ রায়-এর পক্ষে থাকা সম্ভব হবে কি না! কিন্তু অন্নদা রায় তাঁর উত্তরটা অবধি স্ত্রীকে জানাচ্ছিলেন পরোক্ষে নাতির সঙ্গে কথা বলে বেয়াড়া বিহ্বল আহ্লাদে। বার বারই বলছিলেন, বলে দাও আমি আমার দাদুভাই-এর কাছে থাকবো, যাবো না মিটিং-এ, আমার দরকার নেই মিটিং-এ, দাদুভাই আর আমি মিটিং করতে যাবো না বেলঘরে। কমলকামিনীর প্রশ্নের উত্তরে নাতির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বার বারই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে সুর করে। নেহাৎ দিদিমা, তাই বরদাস্ত করেন কমলকামিনী অন্নদার এই স্নেহান্ধ অপলাপ। দাদুভাই শুনলে নিশ্চয়ই বলতো বুড়ো বয়সে একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে অন্নদা রায়ের।

মধুপুরে থাকতেই নাতি হওয়ার খবর পান স্বর্ণলতিকা। অন্নদা রায়ের চিঠি তাঁকে আরও বিব্রত করে তুলল। কাজকর্ম ফেলে রেখে তিনি অগত্যা কলকাতা ফিরে এলেন নাতির মুখ দেখতে মনোহরপুকুরের বাড়ী। সঙ্গে মাঙ্গলিক ফুল-বেলপাতাসহ শ্বশুরকুলের কুলপুরোহিত জনার্দন ঠাকুর রাশি-নক্ষত্র গণনা করে হীরাচুনীপান্নার একখানা নবরত্ন কবচ লালসুতোয় হাতে বেঁধে গণ্ডী দিয়ে গেলেন। জনার্দন ঠাকুর কোন অমঙ্গল ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেবে না নবজাতকের। নয়নভরে মুখ দেখলেন নাতির স্বর্ণলতিকা। মধুর হেসে বললেন, এমনি পদ্মপলাশলোচন আর ঐ রকম টেপা ঠোঁট ছিল ওর ঠাকুরদাদার, জানো বৌমা! স্বর্ণলতিকার স্বামীকে চাক্ষুষ দেখে নি সতী। শ্রীরামপুরের বাড়ীতে স্বর্ণলতিকার ঘরে শুধু একখানা ছবিতে দেখেছিল একবার। তাও ভাল মনে নেই সতীর। তবু শাশুড়ীর কথায় সায় দিয়ে সতী তাকিয়ে থাকে সন্তানের মুখের দিকে।

দিন-রাত্রি সমান জেগে আছে দুই চোখ সতীর। তবু এ দেখার যেন নিবৃত্তি নেই। এ যেন এক মুকুরে দুই জনকে একসঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা। মুখের হাসি না মেলাতেই বিস্ময় ফুটে ওঠে সতীর চোখে। ঠোঁট করছে দেখুন, ঠোঁট করছে দেখুন? শাশুড়ীকে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে ছেলের ভাবভঙ্গী দেখায় সতী, অপরূপ কিছু যেন। স্বর্ণলতিকার চোখেও সতীর স্নেহমুগ্ধ চোখের ছায়াপাত হয়।

মিষ্টি হেসে স্বর্ণলতিকা চিবুক ছুঁয়ে অবাক মানেন,—ও মা ! এ যে কথা বলতে চাইছে গো বৌমা ! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। শিশুর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে ইচ্ছে করেই বড় বড় চোখ পাকিয়ে থেকে থেকে অবাক হয়ে যাওয়া। টলমল স্বখাত সলিল। ডুবে ভেসে যায় যেমন আনন্দ।

ভাবভঙ্গী দেখে কার চরিত্র পেয়েছে শিশু, তা নিয়েও তর্ক ওঠে। ক্ষোভমিশ্রিত কান্না শুনে শিশুর, স্বর্ণলতিকা বলেন, দাদুর মেজাজই পেয়েছে বটে ! কোন রকম অসুবিধে হলে আর রক্ষে নেই। মানুষ করতে ধকল আছে বৌমা !

স্বর্ণলতিকার কথা শুনে মনে মনে কিন্তু খুসী হন অন্নদা। ভাবেন, ধ্বজা ধরে রাখবার মত তা হলে অন্ততঃ একজন সৈনিকও পাওয়া গেল শেষটায়। হেসে বলেন, যা বলেছেন বেয়ান ! এখন যদি মুখ রক্ষে করে এক নাতি।

স্বর্ণলতিকা রসিকতা করে হেসে বলেন, তা পারবে। এখনই গলার যা জোর দেখছি বেয়াই মশাই !

: তা সে পারুক আর চাই নাই পারুক, চেঁচাক। চেঁচালে লাংস-এর জোর বাড়বে।

স্বর্ণলতিকা হাসেন। বলেন, জোরটা যে ঠিক কোথায় বাধলে এরা ঠিক ঠিক বাঁচবে বেয়াই মশাই, বলা বড্ড শক্ত।

অন্নদা রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন স্বর্ণলতিকার কথা শুনে। একটু পরে বলেন, সাংঘাতিক একটা বিতর্কের বিষয় আপনি হঠাৎ উত্থাপন করে ফেলেছেন বেয়ানঠাকরুণ ! কিন্তু আমি এখন ও সব চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিইছি। আমার এখন সোজাপথ। নাতি হয়েছে, আনন্দ করছি এখন আমি। আমার মত চোখ-কান বুঁজে আপনি আনন্দ করতে পারেন না ?

আপনার মত করে কি আর পারবো ? স্বর্ণলতিকা হেসে হেসে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পান নাতির।

নিষ্পাপ দিব্যকান্তি শিশু স্বর্ণলতিকার চোখে চোখ রেখে যখন দৈবাৎ হেসে ফেলে তখন সত্যিই ভুলিয়ে দেয় সব-কিছু। অন্নদা রায় হঠাৎ যে কেন অতটা প্রগল্ভ হয়ে উঠেছেন বুড়ো বয়সে তার কিছুটা হদিস পান স্বর্ণলতিকা।

প্রাণের আহ্লাদে আবোল-তাবোল কথা বলতে বলতে ঘরের এয়ারকনডিসণ্ড মেশিনটা বন্ধ করে দেন অন্নদা রায়। সতীকে বলেন, আবার উসখুস করলে ব'লো চালু করে দেবো। কি জানি, যদি আবার ঠাণ্ডা লাগে দাদুভাই-এর।

দাদুভাই-এর সূত্র ধরেই সত্যব্রতর কথাটা উঠে পড়লো। স্বর্ণলতিকার কাছে অন্নদা অভিযোগ করেন, আমি বড় আহত হয়েছি, জানলেন বেয়ান ! এক মাসের ওপর হয়ে গেল অথচ বাবাজী একবার দেখতেই এলেন না ছেলেকে ! ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না !

স্বর্ণলতিকার কথা বলার আগেই সতী অন্নদার কথার জবাব দেয়। বলে, তুমি ভুল করছো বাপী ! আমি জানি, সে সাউথ ইণ্ডিয়া গেছে, নেই কলকাতায়। নইলে সে নিশ্চয়ই আসতো।

কোথায় সাউথ ইণ্ডিয়া ! সতীর কথার প্রতিবাদ করে অন্নদা বলেন, চেম্বার-অব কমার্সের মিটিং-এ আমি পরশুদিনও তাকে কলকাতায় দেখেছি। আব্দুভাই-এর সঙ্গে গাড়ী করে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয় সতী। কারণ ইসমাইলের হাতচিঠিতে সাত দিন আগে সত্যব্রত সেই কথাই সতীকে জানিয়েছিল। বলে, কই আমাকে তো তুমি বল নি সে কথা ?

বিব্রত বোধ করেন স্বর্ণলতিকা। বলেন, আমি তো মাঝখানে কলকাতাতেই ছিলাম না বেয়াই মশাই ! তারপর খোকা আসে নি, আপনার মুখে এই নতুন শুনলাম আমি। সে কেন আসে নি, তার আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।

স্বর্ণলতিকার কথায় ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে। ব্যাপারটা তাই পরিষ্কার করে দেন অন্নদা। বলেন, না না আপনাকে বলছি। মানে কথাগুলো আমি আপনাকে কোন অভিযোগ করে বলছি না। আপনারই ছেলে, আপনারই বউ, আপনারই নাতি। আমি তো মেয়ের বিয়ে দিয়েই দায়মুক্ত হয়েছি। আমার সঙ্গে আর কতটুকু সম্বন্ধ। এখন এদের মঙ্গলামঙ্গল সে তো আপনাকেই দেখতে হবে।

স্বর্ণলতিকা খানিকটা বিব্রত বোধ করেন। বলেন, সমীচীন যা হয় তা ছেলে বউ-ই করবে। এবিষয়ে আমি কি বলব বলুন ?

সতী স্বর্ণলতিকার মনের ভাবটা বুঝতে পারে। ছেলের সম্পর্কে একটা আহত অভিমান বরাবরই সতীকে এই স্নেহময়ী মহিলাকে সতীর কাছ থেকে দূরে দূরে ঠেলে রেখেছে। আজ এক মুহূর্ত্তে সে বাধা অপসারিত হতে পারে না। সতীর স্পর্শকাতর মনে স্বর্ণলতিকার আহত মনখানিতে সূক্ষ্ম একটা বেদনা জড়িয়ে জড়িয়ে কাঁপে। সত্যিই তো ! সত্যব্রতর ভালবাসা এই রকমই। তাকে যারা ভালবাসে তাদেরকে সত্যব্রত এমনিধারাই হেলাফেলা করে। নইলে স্বর্ণলতিকার এ-হেন মনোবেদনার কোন কারণ ঘটতো না। সত্যব্রতর জন্যেও আবার দুঃখ হয় সতীর।

সময় হলো। স্বর্ণলতিকা এলেন বিদায় নিতে—চলি বৌমা ! আবার ফিরতে হবে সেই শ্রীরামপুর। ঘুমুচ্ছে বুঝি নাকি ?

—হ্যাঁ। শাশুড়ীর মুখ ছুঁয়ে সতীর চোখ গিয়ে পড়ে ছেলের ওপর। নিষ্পাপ শুচিশুভ্র একখানা কচি মুখ। কিন্তু স্বর্ণলতিকা দেখেন সতীকে। সতী আরও সুন্দর। ঢলঢল কাঁচা সোনার প্রতিমার মতো সুপ্রসন্ন এক মাতৃমূর্ত্তি। দূর থেকেই আশীর্বাদ করেন।

—বেঁচে-বর্তে সুখে থাক।

—একটু দাঁড়ান।

টিপ করে একটা প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় সতী। চোখ দুটো ছলছল করে। স্বর্ণলতিকা আরও একটু মঙ্গল কামনা করলে সতী হয়তো কেঁদেই ফেলে দিত। বলে—নাতিকে সব সময় আপনি আশীর্বাদ করবেন কিন্তু মা !

স্বর্ণলতিকার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠবার আগেই আরও যা যা বলবার বলে শেষ করে সতী।

—বাপীর কথায় আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। বাপীরও দুঃখ হয়েছে কি না ? আসলে কি জানেন মা ? বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—আপনার ছেলে—আজ পর্যন্ত সে কারুরই নয়। আপনি বলেই বলছি কথাটা, সে নিজেই তার খেয়াল খুসীর মালিক। অথচ সে যে কত অসহায়—

সত্যব্রত সম্পর্কে স্বর্ণলতিকারও সেই একই মনোভাব। সতী যে সত্যিই ভালোবাসে সত্যব্রতকে, সে কথা বুঝতে বাকি থাকে না স্বর্ণলতিকার। এই প্রথম কাছে টেনে নেন সতীকে স্বর্ণলতিকা

বলেন—একই জ্বালা, একই বেদনা মা! অথচ আমার ছেলেকে তো আমি চিনি। আসলে কি জানো? উচ্ছৃঙ্খলতা এদের রক্তে রক্তে। তোমার শ্বশুরকে নিয়েও আমার ঠিক একই জ্বালা ছিল সারাজীবন—ওরা না জানে শান্তি পেতে, না জানে শান্তি দিতে। অথচ যে অশান্ত অবস্থা মন-প্রাণের প্রসারতা আনে এদের অশান্তি সে গোত্রের নয়। অদ্ভুত একটা ট্র্যাজেডি সতী। তোমার শ্বশুরও ছিলেন! বলা যায় এক মধ্যযুগের নায়ক। ভিক্টোরিয়ান যুগেরও আগের। সময়ে হয়তো বলবো একদিন।

—রিজেণ্ট পার্কে গেলে পরে একদিন আসবেন মা!

—সতু বললেই যাই।

—আমি নিয়ে আসবো।

—বেশ তো!

রাত হয়ে গেছে। সতী একটু এগিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মন্থর সুস্থির পদক্ষেপে মোটা কার্পেটে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে রাজমাতার মতো চলে যান স্বর্ণলতিকা হলঘর পেরিয়ে। চরণচিহ্ন কোথাও রইলো না। তবু সতী দেখলো ধন্য হয়ে গেল পথ।

এমনিতে বেশ কাটছিল দিনগুলো। গুজরাটী রংবাহারী দোলনায় শুয়ে দাদুভাই পাখীর ভাষায় কথা কইতো আর তার উত্তরে অনর্গল প্রাণবন্ত প্রলাপে ঘর ভরিয়ে ফেলতেন অন্নদা বাবু। তৃতীয় পক্ষের কাছে দুর্বোধ্য হলেও একের ভাষা অপরের কাছে অবোধ্য ছিল না। কিন্তু দাদুভাই-এর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় হলো।

মন ভালো নেই অন্নদা বাবুর। সতী চলে গেলেই একলা হয়ে যাবেন। কথা বলবার থাকলেও শোনবার কোন কান থাকবে না। এত অল্পসময়ের মধ্যেই যে দাদুভাই ছাড়া আর সব কিছুই বৈচিত্র্যহীন ও বিস্বাদ বোধ হবে তা ভাবতেও পারেননি অন্নদা বাবু।

সতীর মনটাও ছল-ছল হয়ে রয়েছে। একটু নাড়া লাগলেই যেন অভিমানী মূর্চ্ছনায় বেজে উঠবে। পাঁচ মাস হয়ে গেল সত্যব্রত একটি বারও এল না। খবরবার্তা যা কিছু লেনদেন হলো, তা চিঠিতে ফোনে, ইসমাইলের হাতের ছোট ছোট চিরকুটে।

মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে জিনিষপত্র গুছিয়ে তৈরী হয় সতী। বিকেল নাগাদ ইসমাইল আসবে তাকে নিয়ে যেতে।

অন্নদা বাবুর মনেও মেয়ের জন্তে বড্ড লেগেছে। দাদুর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে! রিজেণ্ট পার্কের বাড়ীতে তো তিনি যেতে পারবেন না!

সতী বাবাকে বলে—আর একটু বড় হোক। টুটুনকে আমি ঠিক তোমার কাছে রেখে যাব। এখন তো তুমি রাখতে পারবে না?

—কেন পারবো না? খুব পারবো। ওখানে তো তুমি ওয়েটনার্স রাখবে? আমিও তাই করবো।

—কক্ষণো না। কি যে বল বাপী!

কমলকামিনীর মনে পড়ে হ্যাঁ। আজ-কাল এই হুজুগ উঠেছে বটে। আজ কেন? চিরদিনই ছিলো। বলেন—না না। খবরদার ওসব ক'রো না। গীষ্পতির বৌ পত্রলেখা নাকি এই পথ ধরেছে। গীষ্পতি আবার মায়ের দুধ, আর সেই নার্সের দুধ ল্যাবরেটরীতে ক্লিনিক্যাল টেষ্ট করিয়ে তবে—

বিব্রত বোধ করে সতী। বলে—থাক না মা, অতো আজে বাজে কথা? দেখতো টুটুনের বাথটবটা কোথায় রাখলাম?

খবর পেয়ে বারবারাও চারটে নাগাদ বিদায় জানাতে আসে ননদকে। বারবারা ইদানীং মনোহরপুকুরের বাড়ীতেই থাকে। শুভময় থাকে চটকল সংলগ্ন কোয়ার্টারে। দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি। মতান্তর থেকে মনান্তর। মাঝখানে গিয়ে পড়লেন অন্নদা বাবু। শুভময় এখনই ডাইভোর্স জাতীয় একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। শুভময় যে মানুষ হিসেবে ধীরস্থির স্থিতবুদ্ধি এই সব পরিচয়পত্রের প্রয়োজন আছে। চটপট ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে শুভময়ের পক্ষে সেটা ভাল হবে না। অতএব মনান্তরের অধ্যায়ে অন্নদা বাবু উপযাচক হয়ে মধ্যস্থ হলেন। বারবারাকে বললেন—বেশ তো কিছুকাল নয় আমার অতিথি হয়েই থাকো। তার পর শ্বশুরকেও যদি কোনদিন মনে করো স্বামীর মতই ছোটলোক, স্বার্থবাদী, তখন না হয় চলে যেয়ো বিলেতে।

বিলেতের কূল ভেঙে বিদেশে এসে সংসার করবার সখ মিটে গিয়েছে বারবারার; সে জানে হোমে ফিরেও পাঁতি পাবে না এখন। অপেক্ষায় আছে, অন্নদা বাবুকে ধরে 'এমবাসি'র ভেতর যদি নির্ভরযোগ্য একটা চাকরিতে ঢুকতে পারে। কিংবা কোন ভালো ফার্ম-এ।

প্রায় এক বছর হতে চললো। বাড়ীতেই আলাদা স্যুইট, আলাদা বন্দোবস্ত। দশজনকে দেখে শুনে ইদানীং চোখ খুলছে কমলকামিনীর। সম্পত্তি আর টাকাকড়ির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে সাধ্বী
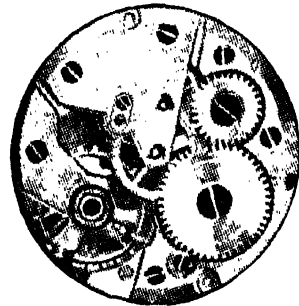
সেই সাধ্বী সেজেই তালে তাল দিয়ে চলবেন অন্নদা রায়ের সঙ্গে। তারপর দুঃস্বপ্নের অন্তে তাঁরও এক স্বপ্ন আছে। বোনের ননদ-ঝি সুস্মিতার সঙ্গে শুভময়ের বিয়ে দিয়ে সংসার পাতবেন তিনি।

সতীকে অনেক কথাই বলে ফেলেন কমলকামিনী। বলেন,—গত এপ্রিলে তোর বাপীর সঙ্গে ঘুরেও এলো বিলেত। কি মনে ক'রে ফিরলো কে জানে। তোর বাপী শুধু বলেন ছেলের পাপ ঘাড়ে ক'রে টানতে হচ্ছে। এমন জোবাজোরি করলে পরে ইউ কে-র অফিসে ইজ্জৎ থাকবে না। আচ্ছা বেশ, থাকবি তো থাক না কেন,—না হাজার বায়নাক্কা। এই চাই, সেই চাই! ওঁরও বলিহারী যাই! পার্টি ডিনারেও ওকে টেনে নিয়ে যান। বলেন বেচারার মনটা দেখতে হবে তো? বলিসুনি সতী, দেখে শুনে আমি একেবারে—

কমলকামিনীর চোখেও এক অশান্ত কামনা। সতীর কেমন যেন মনে হয়, এ বাড়ীর দক্ষিণ খোলা বারান্দায় এত বাতাস বইছে অথচ সে বাতাসে যেন কোন প্রাণের আশ্বাস নেই। এ বাড়ীর মানুষগুলোও যেন শান্ত হ'তে ভুলে গিয়েছে। ভাল লাগে না সতীর! এখানে নেই, রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে নেই। শান্তি কোথায় গেল? এত অশান্তিই বা এলো কোথা হ'তে? তার পর ছেলের মুখের ওপর সতীর নজরটা এসে আটকে যায়। প্রজাপতির মতো আলতো পায়ে ব'সে ফুলের মতো মুখখানা দেখে। এইখানে শান্তি আছে। এ আশ্বাস কেউ কেড়ে নিতে পারবে না সতীর কাছ থেকে।

চারটে বেজে গেছে। তবু এখনও এলো না গাড়ী। উদ্বিগ্ন হয় সতী। ব্যবহারিক জীবনের সবটাই তার এমনি এলোমেলো রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে। নেই সে নিজে আজ কয় মাস। ঘরসংসার যে কি পরিমাণ অগোছালো হয়ে রয়েছে, তা অনুমান করতেই ভয় হয়। সেই ঘরদোরে ছেলেকে নিয়ে ওঠে কেমন ক'রে, সতী সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে? সত্যব্রতর কাছ থেকে কোন বিবেচনাই কি সে আশা করতে পারে না? আয়াকে বলে—ঠিক আছে, আমি একাই যাবো।

কমলকামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠেন। অন্নদা অগত্যা আঠারো মাইল স্পীডের প্যাকার্ড গাড়ীটা জুড়তে বললেন। বললেন—আমি নিজেই যাবো পৌঁছে দিতে।

চুনোটকরা ধাক্কা দেওয়া মিহি শান্তিপুরী বেরুল। সেই ধুতি পরে বাঙালীবাবু সেজে দাদুভাইকে পৌঁছুতে যাবেন অন্নদা বাবু। বাবা তৈরী হ'লেই রওনা হবে সতী। যাত্রাকালে মার সামনে ব'সে সতী রূপোর থালা থেকে মিষ্টি ভেঙে খায়। সাঁথি-লোহায় সিঁদুর ছোঁয়ানোর শুভ অনুষ্ঠান অন্তে প্রণাম করে মাকে।

এমন সময় ইসমাইল গাড়ী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলো। সঙ্গে একখানা হাতচিঠি—বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে ৭ই বৈশাখের আগে কোন শুভকর্ম নেই। নবজাতকের মুখ চেয়ে সতীকে অগত্যা ৭ই পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে মনোহরপুকুরের বাড়ীতে।

অপ্রত্যাশিত এই চিঠি। অন্ততঃ সত্যব্রতর মানসিক সংগঠনের কথা ভেবে এই চিঠির কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তবু এই এক টুকরো কাগজ মনের কোন এক দুর্বল স্থানে ঘা দেয় সতীকে। হয়তো ছেলের শুভাশুভের দিকে তাকিয়ে নাস্তিক মানুষটা আস্তিক হয়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত। নিজের জীবনে যে সব শুভসম্ভাবনা অবস্থা-বৈগুণ্যে সুদূরপরাহত হয়ে গেছে, ছেলের জীবনে সেই সব সম্ভাবনার সার্থকতা কামনা করেই সত্যব্রত হয় তো পাঁজি-পুঁথির বিধান লঙ্ঘন করছে না। সতীর যেমন, ছিরিছাঁদ নেই, রোজ শত চাঁদ বাতিল করে দিচ্ছে সে একক চাঁদের দিকে তাকিয়ে, সত্যব্রতরও হয়তো তেমনি কিছু হয়েছে। সাধ-আহ্লাদের এই সব কথা মিথ্যে হলেও সত্যি মনে করে খুসী হয় সতী শেষটায়।

যাত্রা স্থগিত থাকে ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত। [ক্রমশঃ।

মাছ কি মস্তিষ্কের খাদ্য?

বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগেও বহু ব্যক্তি অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে থাকেন—বিশেষতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে তাঁরা একান্তই উদাসীন।

আমি এমন একজনকে জানি যিনি উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার সময় সর্বদাই দুটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যান রক্ষাকবচ হিসাবে, যার কোন ব্যবহারিক মূল্যই নেই।

বহু স্ত্রীলোক বিশ্বাস করেন যে, কোন গর্ভবতী মহিলা যদি আতঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করেন—তা হলে গর্ভস্থ শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল একথা তাঁদের বোঝানো আপনার বা আমার পক্ষে কিন্তু একেবারেই সম্ভব নয়।

বহু-প্রচলিত একটি আধুনিক মতবাদ এই যে, মানুষের রক্তের চাপ তার বয়সের সহিত আর এক শত যোগ করলে যা হয় তাই থাকা সঙ্গত অর্থাৎ আপনার বয়স যদি চল্লিশ বছর হয় তবে একশো চল্লিশ আপনার পক্ষে যথাযথ রক্তের চাপ; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়; বস্তুতঃ রক্তের চাপের সঙ্গতি অসঙ্গতি নিরূপিত হতে পারে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শরীরের ও মনের অবস্থার উপরই। একজনের পক্ষে যা ঠিক অপরের পক্ষে তা ভুল হওয়া বিচিত্র নয় একেবারেই। সাধারণতঃ বয়সের সঙ্গে রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘটে থাকে যদিও এই বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট হার নেই।

আরেকটি ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল, তা হচ্ছে শরীরের মেদ হ্রাস করার জন্য বিশেষ কয়েকটি খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা আরেক কথায় বিশেষ কয়েকটি খাদ্য বর্জনের প্রয়োজনীয়তা। অবশ্য একথা ঠিক যে, কয়েকটি খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ পদার্থ কম থাকায়, মেদবহুল ব্যক্তির পক্ষে সেগুলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তবু একথা কি সত্য নয় যে, এখনও এমন কোন বিশেষ খাদ্য আবিষ্কৃত হয়নি যা একজন স্থূলকায় মানুষকে দিতে পারে কৃশতনু? বহুদিন পূর্বে জার্মাণীর এক দার্শনিক পণ্ডিত প্রচার করেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে মৎস্য অতি উপকারী খাদ্য কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে মৎস্যের শরীরে ফস্‌ফরাসের সন্ধান পাওয়া যায়, মস্তিষ্কেও যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অতএব দুয়ে আর দুয়ে চারের মত সহজেই যেন বলে দেওয়া যায়, মৎস্য মস্তিষ্কের পক্ষে একটি উপকারী ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে না, কোন বিশেষ ধরণের খাদ্যবস্তু যে মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়, এই অভিমত এখন আর প্রচলিত নয়, সুতরাং এই সব মিথ্যা ধারণার কবলমুক্ত হতে পারাতেই মানুষের সত্যকার মঙ্গল নিহিত আছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩

গোটা ফ্যাক্টরীর স্নায়ুতে একটা অপ্রীতিকর টান ধরে ছিল অনেক দিন ধরে। সেটা গেল।

সময় পেলে নিচে ওপরে রোজই দুই-একবার টহল দেয় ধীরাপদ। পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব যত না, তার থেকে বেশি, দেখতে ভালো লাগে বলে। আজকের এই নিঃশব্দ উদ্দীপনা আর নিশ্চিন্ত কর্মতৎপরতার সবটাই চোখের ভুল নয় বোধহয়। সকলেরই সব থেকে বড় স্বার্থটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। রুটির যোগ। তাই অশুভ কেউ চায় না। তবু ধীরাপদর ধারণা, ওই টান-ধরা স্নায়ুর উপশম-বোধের সবটাই সরকারী অর্ডার সাপ্লাইয়ের ফাঁড়া কাটল বলেই নয়। হন্তদন্ত হয়ে আজ হঠাৎ আবার যে লোকটা গিয়ে কাজে লেগেছে, সে চীফ কেমিষ্ট—সে অমিতাভ ঘোষ।

সিনিয়র কেমিষ্ট জীবন সোম এক ফাঁকে ওপরে উঠে এসেছিলেন। হাসি-ভিজানো মুখের বিড়ম্বনাটুকু স্পষ্ট। মিঃ ঘোষ তো আজ ওই কাজটা টেক্-আপ করলেন দেখছি···

ধীরাপদ হালকা জবাব দিল, এখানে থাকলে অমন হামেশা ছাড়তে দেখবেন আর টেক-আপ করতে দেখবেন।

···শুনেছি, তবু এবারে সবাই একটু ঘাবড়েছিল মনে হল। কিন্তু নিজে তিনি নিঃসংশয় নন একেবারে, জিজ্ঞাসা করলেন, এ ক'দিনের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে মনে হয়?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ হাসিমুখে মাথা নাড়ল। মনে হয়।

কিন্তু কাজটা শেষ হবে কি হবে না, সেটা তাঁর সমস্যা নয়। এসেছেন নিজের সমস্যা নিয়ে। এখন আমি কি করি বলুন দেখি, দ্বিধা কাটিয়ে নিজের প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন তিনি, আমার সম্বন্ধে আপনি একটু বুঝিয়ে বলেছিলেন ওঁকে?

সেদিন এই বুঝিয়ে বলার আবেদন নিয়েই এসেছিলেন ভদ্রলোক। তিনি নিজে কোনো ষড়যন্ত্র করে এখানে ঢুকে পড়েননি, তাঁকে কাজ ছাড়িয়ে আনা হয়েছে—সেইটুকু চীফ কেমিষ্টকে বুঝিয়ে বলা। তাকে ক বোঝানো হয়েছে সেটা বলা চলে না, ধীরাপদ ঘুরিয়ে জবাব দিল, তিনি বুঝেছেন মনে হয়।

এ-রকম পরিস্থিতির ফলে ভদ্রলোকের খানিকটা দুরবস্থা বটেই। আরো একটু অন্তরঙ্গ নিষ্পত্তির সুরে ধীরাপদ বলল, আমার বিশ্বাস, কয়েকটা দিন গেলেই আপনি ওঁর ডান হাত হয়ে পড়বেন একেবারে, তখন দেখবেন আপনাকে ছাড়া ওঁর একটা দিনও চলছে না।

আশ্বাসটা ইঙ্গিতশূন্য নয় একেবারে। অল্পবয়সী চীফ কেমিষ্টের মন বুঝে চলার ইঙ্গিত। জীবন সোম তেমন খুশি বা আশ্বস্ত হতে পারলেন না বোধহয়।

বারান্দায় যাতায়াতের পথে আর সিঁড়ির কাছে লাবণ্যর মুখোমুখি হয়েছে বার দুই। অটল গাম্ভীর্য সত্ত্বেও সেই মুখে বিস্ময় আর কৌতূহল একেবারে অপ্রচ্ছন্ন নয়। অর্ডার সাপ্লাইয়ের এই গণ্ডগোলে মানসিক ধকলটা তার ওপর দিয়েই বেশি গেছে। তত্ত্বাবধান-প্রধানা হিসেবে একবারের নাম স্বাক্ষরের মজাটা অমিতাভ ঘোষ ভালো হাতে বুঝিয়ে ছেড়েছে। মনে মনে আজ হাঁফ ফেলে বেঁচেছে হয়ত। কিন্তু ওই ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি তার কাজে গিয়ে লাগার রহস্য অজ্ঞাত। ···জানা যেতে পারে যার কাছ থেকে সেই লোকের সঙ্গে বাক্যালাপের বাসনা চিরকালের মতই গেছে যেন। স্থির গম্ভীর, ঈষৎ-চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপে যতটা আঁচ করা যায়।

আপাত-সমস্যাটা এত সহজে মিটে যেতে ধীরাপদরই সব থেকে খুশি হওয়ার কথা। অথচ ভিতর থেকে খুশির প্রেরণা নেই কিছুমাত্র। একটা দুশ্চিন্তার অবসান, এই যা। সমস্ত দিন একরকম মুখ বুজেই কাজ করে গেল সে। কাজও ঠিক নয়, এক-একটা ফাইল নিয়ে কতক্ষণ কাটিয়েছে ঠিক নেই। এখনো অনেক ফাইল জমে।

পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। অফিস এতক্ষণে ফাঁকা নিশ্চয়। লাবণ্যও চলে গিয়ে থাকবে। পাঁচটার ওধারে পাঁচ মিনিটও থাকে না ইদানীং। হিমাংশু বাবু ছেলেকে বিকেলের বৈঠকে আটকানোর পর থেকে ধীরাপদ সেটা লক্ষ্য করেছে। পাঁচটার পরে দুই একদিন এসে সিতাংশু মুখ কালো করে ফিরে গেছে।

আজও সন্ধ্যার আসর নেই মনে পড়তে ধীরাপদর ওঠার তাগিদ গেল। নিচে অমিতাভ ঘোষের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসবে কিনা ভাবল। পর মুহূর্তেই সে-ইচ্ছে বাতিল করে দিল, আজ আর না। কি আছে দেখার জন্য, একদিকের পুরনো ফাইল ক'টা হাতের কাছে টেনে নিল। কিন্তু তাও ভালো লাগছে না।

ওগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখতে গিয়ে চোখ পড়ল মেডিক্যাল-হোমের রমেন হালদারের ফাইলের ওপর। ছেলেটার প্রমোশনের অর্ডার হয়ে

আছে অনেকদিন, অথচ একটা খবরও দেওয়া হয়নি। ধীরাপদর ভিতরটা সক্রিয় হয়ে উঠল একটু, সেখানেই যাবে। ছেলেটার তারুণ্যের তাপ শুকোয়নি এখনো···ভালো লাগে। ভালো লাগে এমন কিছুই খুঁজছিল এতক্ষণ।

দরজা ঠেলে বাইরে আসতে সামনে আ-ভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালো যে-লোকটা, সে তানিস সর্দার। ফুটন্ত লিভার এক্সট্রাক্ট অ্যাকসিডেন্টের নায়ক। ঘা শুকোলেও বীভৎস পোড়া দাগগুলো এ জীবনে মিলাবে না। খাকী হাফপ্যান্ট আর হাফ-শার্টের বাইরে যেটুকু চোখে পড়ে তাই শিউরে ওঠার মত।

ভালো আছ?

জী। লোকটা বাঙালী না হলেও পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, হুজুরের তবিয়ত কেমন এখন?

ভালো। ওর ছুটি-ছাটার ফয়সলা আগেই হয়ে গেছে, অপেক্ষাকৃত লঘু মেহনতের কাজে লেগেছে এখন। নিজের প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যে ধীরাপদ খোঁজ নিল, কাজ-কর্ম করতে অসুবিধে হচ্ছে না তো এখন?

মাথা নাড়ল, অসুবিধে হচ্ছে না। নিজের সুবিধে-অসুবিধের কোন কথা বলতে যে আসেনি সেটা ধীরাপদ তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল। এসেছে অন্য তাগিদে, হৃদয়ের তাগিদে! প্রকাশের পথ না পেলে পুঞ্জীভূত কৃতজ্ঞতাবোধও বেদনার মতই টনটনিয়ে ওঠে বুঝি। এ-ক'দিনের চেষ্টায় সামনা-সামনি আসতে পেরেছে যখন, মুখ বুজে ফিরে যাবে না। গেলও না। ধীরাপদকেই বরং মুখ বুজে শুনে যেতে হল। শুধু অন্তরের কৃতাঞ্জলি নয়, সেই সঙ্গে কোনো একজনের উদ্দেশে খেদও একটু। হুজুরের দয়াতে ওর প্রাণ-রক্ষা হয়েছে। নিজের দোষে ফুটন্ত লিভার এক্সট্রাক্টের ভ্যাট ওলটানো সত্ত্বেও বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা হয়েছে। অত টাকা লোকসানের পরেও তার চাকরিটা পর্যন্ত যায়নি, উল্টে হাল্কা কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। তানিস সর্দার অন্য কোম্পানীতেও কাজ করেছে, কিন্তু এ রকম আর কোথাও দেখেনি। শুধু ও কেন, কেউ দেখেনি। এখানেও দেখত না, শুধু হুজুরের দয়ায় দেখল। ও দেখল, সকলে দেখল। কিন্তু সেই হুজুরের এমন শক্ত বেমার গেল অথচ ও একবার গিয়ে তাকে দেখে আসতে পেল না। মেম-ডাক্তার কিছুতে ঠিকানা দিল না। তাদের ধারণা, ওরা মেহেনতী মানুষ বলে এত নির্বোধ যে জীবনদাতারও ক্ষতি করে বসতে পারে। ঠিকানা পেলে ও আর ওর বউ গিয়ে হুজুরকে দূর থেকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে আসত, একটি কথাও বলত না। ওর বউ হুজুরের জন্য কালী-মায়ির কাছে ফুল দিয়েছে আর ও দোয়া মেঙেছে—এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে ওরা।

বিব্রত বোধ করছে ধীরাপদ। অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষের এই ক'টা অতি সাধারণ কথাতেও আবেগের কাঁটাটা অমন সর্বাঙ্গে খচখচিয়ে উঠতে চায় কেন? ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু হেসে নিরস্ত করা গেল না তাকে। এক ক্ষোভ নতুন ক্ষোভের দোসর। নতুন ক্ষোভ নয়, স্তুতির ওধারে পুরানো ক্ষোভই নতুন করে চাড়িয়ে উঠল আবার। যেমন, ছোটসাহেব আর মেম-ডাক্তারের সঙ্গে কত ঝগড়া-ঝাঁটি করে চাকরি রাখা হয়েছে—সেটা তানিস সর্দার জানে। সকলেই জানে। ওদের কেউ মানুষ বলে ভাবে না, যেটুকু সুবিধে এখন পাচ্ছে ওরা সেও কার দয়াতে পাচ্ছে সেও সকলে ওদের খুব ভালো করেই জানে। হুজুরের দিল এত বড় বলেই কেউ তার সঙ্গে বিবাদ করে সুবিধে করতে পারবে না—খোদ বড়সাহেবের ছেলে হয়েও ছোটসাহেবকে তো অন্যত্র সরে যেতে হল। মেম-ডাক্তারও যে হুজুরের কাছে জব্দ হবে একদিন তাতে ওদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। চীফ কেমিষ্ট ঘোষ সাহেব আর হুজুরের দিলের কাছে যারা শত্রুতা করতে চায় তারা সকলেই কুঁকড়ে যাবে একদিন।

কোথা থেকে কি এসে পড়ল দেখে ধীরাপদ অবাক! এই একজনের খেদ থেকে গোটা ফ্যাক্টরীর মেহেনতী মানুষদের নাড়ির হদিস পেল যেন। কি ভাবে ওরা? কি আলোচনা করে?··· ছোটসাহেবকে সরে যেতে হয়েছে, মেম-ডাক্তারও জব্দ হবে একদিন, ওর আর অমিত ঘোষের দিলের কাছে কারো শত্রুতা টিকবে না··· এই ভাবে ওরা, এই আলোচনা করে, এই আশা করে! ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সর্দারের চিকিৎসা আর চাকরির ব্যাপারে মেম-ডাক্তার অন্তত কোনো বাধা দেয়নি বলবে ভেবেছিল। কিন্তু সব শোনার পর আলাদা করে কিছু বলা হল না।

—এ সব বাজে খবর তোমাদের কে দেয়, আর এ নিয়ে তোমরা মাথাই বা ঘামাও কেন? প্রচ্ছন্ন অনুশাসন, এখানে কারো সঙ্গে ঝগড়াও নেই, শত্রুতাও নেই—তুমি নিজে বরং এবার থেকে নিজের সঙ্গে শত্রুতাটা একটু কম করে কোরো, অমন হড়বড়িয়ে কাজ করতে যেও না, একেবারে তো শেষই হতে বসেছিলে—

আগের উক্তি বিশ্বাস করেনি। পরের অনুশাসনে কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত আবারও। মাথা নেড়ে অস্ফুট জবাব দিল, না হুজুর, আর অমন কাজ করব না···।

রাস্তায় এসেও ধীরাপদ সবিস্ময়ে ভাবছিল, ওর আর অমিত ঘোষের সঙ্গে অপর হুজুর-হুজুরাণীর একটা বিরোধ চলেছে—এই ধারণাটা সকলের বদ্ধমূল হল কেমন করে? ধীরাপদর হাসিই পেল, এই বঞ্চিত মানুষদের সাদা-সাপটা উপলব্ধির জগৎটা আলাদাই বটে। কিন্তু এই আলাদা জগতের নিরক্ষর এক-জোড়া মেয়ে-পুরুষের কাছ থেকে আজ তার প্রাপ্তি ঘটেছে কিছু। অক্লেশে দুই জগতের সমস্ত ব্যবধান ঘোচানোর মত কিছু। সর্দারের ওই বউটার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করছে। ধীরাপদর অসুখ ভালো হওয়ার কামনায় ইষ্ট-পায়ে ফুল দিয়েছে, সর্দারও প্রার্থনা করেছে। ওরা যা করেছে, হৃদয়ের দিক থেকে ধীরাপদ ওদের জন্যে কি তার থেকে খুব বেশি কিছু করেছে?

হঠাৎই কাঞ্চনের কচি মুখখানা উঁকিঝুঁকি দিল মনের তলায়। রাজপথের অভিসারিকা নয়, অস্তিত্বের সংগ্রামে ঝলসানো অসহায় এক মেয়ে রোগশয্যায় ধুকছে। রোগশয্যাও জুটত না। তাদের মত ওই একজন নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে শেখেনি বলে জুটেছে। শেখেনি বলেই তাঁকে ফুটপাথ থেকে তুলে আনতে পেরেছে। আর ধীরাপদ কি করেছে? স্তুতি-নিন্দার বাষ্প-বুদ্বুদে স্নায়ু চড়িয়ে একরকম অস্বীকারই করে এসেছে।

একটু আগের সেই আবেগ ফিরে যেন ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে। ফলে সমূহ গন্তব্যপথটা বদলালো।

গতকাল রাত্রিতে এলেও আজ দিনের বেলায় নার্সিংহোমটা চিনে নিতে কষ্ট হল না। লাবণ্য সরকার আছে কি নেই এ চিন্তাটা মন

থেকে ছেঁটে দিয়েছিল। তবু নেই শুনে স্বস্তিবোধ করল একটু। সেই নার্সটিই রোগিণীর শয্যার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে।

আগের দিনের মতই শাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। রক্তশূন্য শাদাটে মুখ, শিয়রের টেবিল-ফ্যানের অল্প হাওয়ায় কপালের কাছের থরথরে চুলগুলি মুখের ওপর নড়াচড়া করছে।

আজ জেগে আছে। ঘাড় ফেরাল।

এক নজরে চিনতে পারার কথা নয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তার পর চিনল। চিনে কোনো অব্যক্ত রহস্যের হদিস পেল যেন। তারপরেও চেয়েই রইল। অপরিসীম এক শূন্যতার বিবরে শুধু দুটো চোখ, শুধু নিস্পন্দ চাউনি একটা।

তার পর চাদরে ঢাকা সর্বাঙ্গে চেতনার সাড়া জাগল আচমকা, শূন্য চোখের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে উঠতে লাগল। চাদরের তলা থেকে শীর্ণ দুই হাত বার করে কপালে ঠেকাতে গিয়ে ঈষৎ কাত হয়ে সেই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ধীরাপদ নির্বাক। ও কি জীবনে আর কাঁদেনি! বেসাতির মাশুল না মেলায় হতাশায় গড়ের মাঠের অন্ধকারেও কাঁদতে দেখেছিল এক রাতে। কিন্তু সেটা এই কান্না নয়। এ কান্নায় শুধু কেঁদে কেঁদে নিজেকে লুপ্ত করে দেবার তাগিদ, লুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে উদ্ধার করার তাগিদ।

ধীরাপদ বোবার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছে। তার পর নিজের অগোচরে এগিয়ে এসে কখন একটা হাত রেখেছে তার মাথায়, হাত-ঢাকা মুখের ওপর থেকে অবিন্যস্ত চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছে। গভীর মমতায় অস্ফুট আশ্বাসও দিতে চেষ্টা করেছে একটু, ভয় কি··· ভালো হয়ে যাবে।

কান্না বেড়েছে আরো, দুই হাতের মধ্যে আরো জোরে মুখ গুঁজে দিয়েছে···আর মাথা নেড়েছে। ভালো হওয়াটাই একমাত্র আশা নয়, ওই জীবনে ওটুকু কোনো আশ্বাসই নয়। ধীরাপদ জানে। কিন্তু কি বলবে সে, কি আশ্বাস দেবে?

অনেকক্ষণ বাদে শান্ত হল। গায়ের ওই চাদরে করেই ছোট মেয়ের মত চোখ-মুখ মেজে-মুছে নিল। তারপর তাকালো তার দিকে। সব কিছুর জন্যেই কৃতজ্ঞ, এইভাবে কাঁদতে পেরেও।

কিন্তু ধীরাপদর এটুকু প্রাপ্য নয়। ভুলটা ভেঙে দেবার জন্যেই শাদাসিধে ভাবে বলল, আমার এক বন্ধু তোমাকে ও-ভাবে দেখতে পেয়ে তুলে এনেছেন···তাঁকে একদিন তোমার কথা বলেছিলাম।

দৃষ্টির ভাবান্তর দেখা গেল না তবু। তুলে আনার থেকে বলাটাই বড় যেন, যে তুলে এনেছে তার থেকে যে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সেই বড়। সেই বড়র অবিশ্বাস্য আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে তাকেই দেখছে।

তোমার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?

জবাব এলো পিছন থেকে, নার্স জানালো, কর্ত্রীর নির্দেশে সে ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছে···যদিও পেসেণ্ট বলছিল খবর দেবার কিছু দরকার নেই।

নার্স কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ধীরাপদ টের পায়নি। একটা অনুভূতির জগৎ থেকে পুরোপুরি বাহ্য জগতে ফিরে এলো। নির্লিপ্ত উপদেশ দিল কাঞ্চনকে, এঁদের কথা শুনে চোলো, কান্নাকাটি কোরো না—। ইচ্ছে ছিল বলে, সে আবার এসে দেখে যাবে। বলল না। বলা গেল না।

কৃতজ্ঞতা কুড়োবারই দিন বটে আজ।

তানিস সর্দার আর তার বউ কৃতজ্ঞ। কাঞ্চন কৃতজ্ঞ। মেডিক্যাল-হোমের রমেন হালদারও।

যদিও প্রমোশনের খবরটা সে আগেই পেয়েছে। রোগী দেখতে দেখতে ডক্টর মিস সরকার সদয় হয়ে হঠাৎ সেদিন ডেকেছিলেন তাকে। খবরটা জানিয়েছিলেন। আর ও-জায়গায় কাজ তো সে করছেই। তবু দাদা আজ নিজে এসেছেন তাকে জানাতে, কম ভাগ্যের কথা নাকি!

রমেন হালদারের মুখে খুশি ধরে না।

অনতিদূরের একটা রেস্তরাঁয় দু পেয়ালা চা নিয়ে বসেছিল দু জনে। ধীরাপদই তাকে এখানে ডেকে এনে বসেছে। দোকানের মধ্যে সকলের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ক'টা কথা আর বলা যায়। অবশ্য খবরটা দিয়েই চলে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে রোগীর আর খদ্দেরের ভিড়ে মেডিক্যাল-হোম যেমন জমজমিয়ে ওঠার কথা তেমনটি দেখল না। খদ্দেরের ভিড় অবশ্য কিছু ছিল, কিন্তু অন্য দিকটা খালি। রোগী ছিল না। আর, তাদের ডাক্তার লাবণ্য সরকারও ছিল না।

এ-রকম ব্যতিক্রমের দরুণই যে রমেনের সঙ্গে দু-দশ মিনিট গল্পগুজব করার ইচ্ছে হয়েছিল, ঠিক তাও নয়। দোকানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের মুখে-চোখে এক ধরণের গাম্ভীর্য দেখেছে। ওপরঅলার আগমনে নিম্নতনদের কর্মতৎপর গাম্ভীর্য নয় ঠিক। বড়দের কোনো কাণ্ড দেখে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলেও ছোটরা তারপর যে-ভাবে গাম্ভীর্যের প্রলেপ চড়ায়, অনেকটা তেমনি। দোকানে ঢুকেই রোগী আর ডাক্তারের দিকটা শূন্য দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ধীরাপদ কর্মচারীদের এই নীরব অভিব্যক্তিটুকু উপলব্ধি করেছে। সকলেই ধরে নিয়ে থাকবে, সে মহিলাটির খোঁজেই এসেছিল। তাও যে পুরোপুরি ঠিক নয়, ধীরাপদ পরে বুঝেছে।

তার কথা মত রমেন হালদার মিনিট দশেকের ছুটি নিয়ে এসেছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। জেনারেল সুপারভাইজারের তলবে বাইরে আসবে খানিকক্ষণের জন্যে, কাউকে বলা-বলির ধার ধারে না। তবু, দাদা বলেছে যখন, বলেই এসেছে। আর বাইরে এসেই দাদার সৌজন্যের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। ছুটি চাইতে ম্যানেজার নাকি মুখে আর বলে উঠতে পারেননি কিছু, তাঁর গোল চোখ আরো গোল হয়েছে—মাথা নেড়েছেন শুধু। এক দাদা ছাড়া ওপরঅলাদের কেই বা অত সম্মান করে তাঁকে হালকা আনন্দে এর পরেও রমেন হালদার স্তুতির জাল বিছালো খানিকক্ষণ ধরে,—দাদার কত সুনাম কত খাতির সর্বত্র, দাদাই জানেন কি না সন্দেহ। ফ্যাক্টরীর কেউ না কেউ তো হামেশাই আসছে দোকানে—একটা নিন্দের কথা দূরে থাক, দাদার সুখ্যাতি ধরে না। অত গুণ না থাকলে বড়সাহেবকে বশ করা চাট্টিখানি কথা নয়—

স্তুতির উদ্দীপনায় মুখে ধীরাপদ এখানে আসার হেতুটা ব্যক্ত করে ফেলেও রেহাই পেল না। প্রমোশনের খবর পেয়েছে, কিন্তু রোগী দেখতে দেখতে ঘরে ডেকে নিয়ে নেকনজরী চালে খবর দেওয়া আর দাদার মত একজনের নিজে এসে বলে যাওয়া

কি এক ব্যাপার নাকি! দাদা এইজন্তে এসেছেন—শুধু এই জন্তে! রমেন হালদার হাওয়ায় ভাসবে না তো কি?

হাওয়ায় ভাসার ফাঁকে ধীরাপদই জিজ্ঞাসা করল, মিস সরকারকে দেখলাম না যে···তিনি আজ আসেননি?

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদল। নতুন হাওয়ায় নতুন ধরণের উদ্দীপনা। —এসেছিলেন। এসেই চলে গেছেন। খবর রাসিয়ে ভাঙতে জানে রমেন হালদার, বলল, মিস সরকারের খোঁজে মেডিক্যাল-হোমে একে একে অনেক গণ্যমান্ত লোক এলেন আজ—

দোকানের কর্মচারীদের চাপা গাম্ভীর্যের কারণ বোঝা গেল। তাকেও সেই গণ্যমান্তদের শেষ একজন ধরে নিয়েছে।

রমেন হালদারের প্রগলভ গাম্ভীর্যে তরল মজার আমেজ এখন। না, মিস সরকারের খোঁজে সর্বপ্রথম যে এসেছিল শুনল, সেই নামটা ধীরাপদ আদৌ আশা করেনি। অমিতাভ ঘোষ। লাবণ্য সরকার নিয়মিত রোগী দেখা শুরু করার খানিকক্ষণের মধ্যেই নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করে চীফ কেমিষ্ট এসে হাজির। দোকানে ঢোকেননি, বাইরে গাড়িতে বসেই মিস সরকারকে খবর দিতে বলেছে। মিস সরকার ধীরেসুস্থেই গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে সরাসরি রোগীপত্র বিদায় করে দিয়ে আবার গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। আজ আর ফিরবেন না, ম্যানেজারকে তাও জানিয়ে গেছেন।

রমেন হালদার হাসছে। হাসির তাৎপর্য স্পষ্ট। মিস সরকারের খোঁজে আসা গণ্যমান্তদের হিড়িকে একমাত্র চীফ কেমিষ্টেরই জিত।

তারপর?

তার পরের আগন্তুক অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। ছোটসাহেব সিতাংশু মিত্র। তিনিও গাড়িতেই এসেছিলেন, তবে গাড়ি থেকে নেমে তিনি দোকানে ঢুকেছিলেন। আর দোকানে ঢুকে মিস সরকারকে না দেখে অবাক হয়েছিলেন। প্রথমে অবাক পরে গম্ভীর। অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের গাড়িতে বেরিয়ে গেছেন শুনে আরো গম্ভীর। এত গম্ভীর যে রমেনের ভয় ধরে গিয়েছিল। ভাবছিল, ঠাস করে তার গালে বুঝি বা চড়ই পড়ে একটা! সেই সামনে ছিল, তাকেই তো বলতে হয়েছে সব—মিস সরকার কখন এলেন, কখন গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন—

ধীরাপদরও হাসি সামলানো দায় হচ্ছিল এবার। কাজিল অবতার একেবারে। কিন্তু এর পর কে? সিতাংশু মিত্রর পরের গণ্যমান্ত আগন্তুকটি কে? ধীরাপদ নিজে?

না। সর্বেশ্বর বাবু। প্রায়-আশাহত বিপত্নীক ভগ্নিপতিটি। তাঁর গাড়ি নেই, ট্যাক্সিতে এসেছিলেন। রমেনের ধারণা গাড়ি থাকার মতই অবস্থা, নেই ইনকামট্যাক্সের ভয়ে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে ওর সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে বিরসমুখে, ট্যাক্সিতেই চলে গেছেন আবার। ছোট ছেলেটা সকাল থেকেই ব্যামোয় কাতরাচ্ছে, ইচ্ছে ছিল মাসিকে ট্যাক্সিতে তুলে চট করে দেখিয়ে নিয়ে আসবেন একবার—হল না, মন খারাপ হবারই কথা···তা কার সঙ্গে বেরিয়েছেন মিস সরকার, আর তাঁর আগে কার গাড়ি অমনি ফিরে গেছে, তাও শুনেছেন। খোঁজ খবর করছিলেন বলে রমেন বলেছে।

বিশ্লেষণ শেষ করে মুখখানা যতটা সম্ভব সহানুভূতিতে শুকনো করে তুলে জানালো, ভদ্রলোকের ছেলেপুলেগুলো আজকাল আগের থেকেও ঘন ঘন ভুগছে দাদা। একটু থেমে আবার বলল, অনেক দিন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্তে নেমন্তন্ন করেছেন, গেলাম না বলে আজও দুঃখ করছিলেন, গেলে ভালো-মন্দ খাওয়াবেন বোধহয়···একদিন যাব দাদা?

ধীরাপদ হেসেই ফেলল। বলল, না।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির আবেগে রমেনেরও টেবিলে মুখ থ বড়ে পড়ার দাখিল।

রমেনকে বিদায় দিয়ে অন্তমনস্কের মত ধীরাপদ কতক্ষণ ধরে শুধু হেঁটেই চলেছে, খেয়াল নেই। আজকের যা-কিছু ঘটনা আর যত কিছু খবর, তার মধ্যে ঘটনা আর খবর শুধু একটাই। মেডিক্যাল-হোমে এসে অমিতাভ ঘোষের লাবণ্য সরকারকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া। নিভৃত মন নিজের অগোচরে শুধু ওই একটা ঘটনা আর খবরই বিস্তার করছিল এতক্ষণ ধরে।

ধীরাপদ সচকিত। ঈর্ষা করতে ঘৃণা করে। এটা ঈর্ষা নয়। নিজের অসম্পূর্ণতার ক্লান্তির মত। ক্লান্তই লাগছে বটে। সত্তার বল্গায় তেজী ঘোড়ার মত কতগুলো প্রবৃত্তি বাঁধা যেন। কোনোটা আগে ছুটছে কোনোটা পিছনে পড়ছে। যে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে টেনে নিয়ে আসছে, যে পিছিয়ে পড়ছে তাকে ঠেলে দিচ্ছে। আজীবন এই সামঞ্জস্যের শাসন সম্বল আর শ্রান্তি সম্বল।

"···যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত, তখন যেন বক্ষে পাই এমন পত্নী, কোলে তার শিশু।"

জ্বালাতন! হেসে ফেলে ভুরু কোঁচকালো ধীরাপদ। কিন্তু ভুরু কুঁচকে জ্বালাতনের মায়া এড়ানো গেল না একেবারে। ভাবতে ভালো লাগছে, কোথা থেকে কেমন করে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে। ভিতরে ভিতরে ঘর-মুখি তাগিদ একটা, ঘরের তৃষ্ণা। কিন্তু ঘর কোথায়? সুলতানকুঠিতে?···যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত···

ধীরাপদ হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। তবু থেকে থেকে ওই সুলতানকুঠিই আজ কেমন টানছে তাকে। রোজই তো ফেরে সেখানে। হিমাংশু মিত্রর সান্ধ্য বৈঠকের দরুন বা অন্ত যে কারণেই হোক, ফিরতে বেশ রাত হয় অবশ্য। ফিরতে হয় বলে ফেরে, ফেরার তাগিদ কখনো অনুভব করে না। আজ করছে। সেখানে ধীরাপদর ঘর নেই বটে, কিন্তু ঘর তো আছে।

আর সোনাবউদি আছে।

যখন ফিরব আমি সন্ধ্যায় আপন কুটীরে, অস্ত-রবি-রঞ্জিত···

রমণী পণ্ডিতের কোণা-ঘরে নয়, তার একটু আগে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের দাওয়ার মাঝামাঝি একটা হারিকেন জ্বলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে জনাকতক লোক প্রায় নিঃশব্দে জটলা করছে মনে হল। শিকদার মশাই আর রমণী পণ্ডিতও আছেন।

এদিকের ঘরের দরজা দিয়ে আধখানা পিঠ আর গলা বার করে গণুদার বড় মেয়ে কিছু একটা রসাস্বাদনের চেষ্টায় সেই দিকে চেয়ে ঝুঁকে আছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরাপদও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। এত দূর থেকে অনুমান করা গেল না।

ঘরের তালা খুলতে খুলতে মেয়েটার তন্ময়তা ভঙ্গ করল, উমারাণীর লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখা হচ্ছে?

উমা চমকে ঘাড় ফেরাল, তারপর ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দাঁড়াল।—ও, ধীরুকা তুমি···আজ এত সকাল সকাল চলে এলে যে?

খট করে যেন সোনাবউদির গলার স্বরটাই কানে লাগল তার। ধীরাপদ মনে মনে অবাক, এই মেয়েও ওই রকমই হবে নাকি! বলল, তোর জন্যেই তো, আয়···।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। এক কোণে হারিকেনের আলোটা ডিম করা। টান করে বিছানা পাতা। দেয়ালের ধারে তার রাতের খাবার ঢাকা। এরই মধ্যে সোনাবউদি খাবার ঢেকে রেখে গেছে ভাবেনি। দিনের বেলায় অফিসে লাঞ্চ খায়, রাতে এই ব্যবস্থা। অসুখের পর থেকে এই রকম চলছে। গণুদার মত সোনাবউদি কোনো প্রস্তাবও করেনি, অনুমতিও নেয়নি। ব্যবস্থাটা করেছে শুধু। ঘরের দুটো চাবির একটা চাবিও সেই থেকে তার কাছেই। খাবারটা আগে ঢেকে রাখত না, ধীরাপদর সাড়া পেলে দিয়ে যেত। কিন্তু ফিরতে আজকাল রাত হচ্ছে বলে ও নিজেই জোরজার করে এই ব্যবস্থা করেছে। ভয় দেখিয়েছে, এই ব্যবস্থা না হলে সে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে।

সোনাবউদি রাজী হয়েছে, কিন্তু ফোড়ন দিতে ছাড়েনি। বলেছে, যে-মুখ দেখে আসেন তারপর যে আমার মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না, সেটা বেশ বুঝেছি।

এমন কি, রাতের আহারের দরুন এ-পর্যন্ত কিছু টাকাও তার হাতে দিয়ে উঠতে পারেনি। সসঙ্কোচে চেষ্টা করেছিল একদিন, একটা খামে টাকা পুরে এগিয়ে দিয়েছিল, এটা রাখুন—

হাত না বাড়িয়ে সোনাবউদি খামটা খানিক দেখেছে, তারপর ছদ্ম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে, কি আছে ওতে, গোপন পত্রটত্র কিছু?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল।

কি আছে ওতে, টাকা?

বাঃ, দিতে হবে না? ধীরাপদ জোর ফলাতে চেষ্টা করেছিল।

নিশ্চয় দিতে হবে, সোনাবউদি গম্ভীর, কত দিচ্ছেন?

বলে উঠতে পারেনি কত।

সোনাবউদি জবাবের অপেক্ষা করেনি, বলেছে, দাঁড়ান হিসেব করি কত দিতে হবে। চারখানা রুটি ধরুন তিন আনা, আর মাছ-তরকারী যা জোটে বড় জোর সাত আনা—মোট দশ আনা, তিরিশ দিনে তিনশ আনা। কত হল?

টাকা দিতে গিয়ে মনে মনে গালে চড় খেয়ে ক্ষান্ত হয়েছে ধীরাপদ। সোনাবউদি বলেছে, হিসেব যা হল আপনার কাছেই থাক আপাতত, দরকার মত চেয়ে নেব।

দরকার যে কোনদিনই হবে না সেটা ধীরাপদর থেকে ভালো আর কে জানে। মনে মনে দুঃখও হয়েছে একটু, কিন্তু এ-নিয়ে আর জোর করতে পারে নি কোনদিন। ছ'শ টাকা মাইনে গত বছরের মুখে সাত শয় দাঁড়িয়েছে—সামনের দশম বার্ষিকীর উৎসবে আরো বেশ মোটা বাড়বে মনে হয়। কিন্তু যে হাত পেতে টাকা নিলে সব থেকে আনন্দ হত মনে, সে হাত গুটিয়ে আছে বলেই অত টাকা এক-একসময় বোঝার মত লাগে ধীরাপদর। ব্যাঙ্কে কম জমল না এ-পর্যন্ত···।

ঘরে ঢুকে ধীরাপদ জামাটা খুলে র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখছিল, উমারাণী বিছানার একধারে বসতে বসতে গম্ভীর মুখে ব্যক্ত করল, বসে গল্পসল্প করার মত সময় বিশেষ নেই তার, কাল ইস্কুলের এক-গাদা পড়া বাকি।

ধীরাপদ অবাক, স্কুলে ভর্তি হয়েছিস? কবে?

উমারাণী ততোধিক অবাক। বা রে! সেই কবেই তো, তুমি জান না পর্যন্ত! অনুযোগ ভরা মন্তব্য, তুমি কি কিছু খবর রাখো আজকাল আমাদের, কেবল চাকরিই কচ্ছ—

সত্যিই খবর রাখে না। এমন কি উমার দিকে চেয়েও ধীরাপদর মনে হল ও একটু বড় হয়েছে, মাথায় বেড়েছে, আগের থেকেও পাকাপোক্ত হয়েছে। এখন মনে পড়ল, তার অসুখটার সময়েও দুপুরের দিকে উমার সাক্ষাৎ পায়নি বটে। সুযোগ পেলেই এসে জ্বরো-বিছানায় গড়াবে ভেবে ধীরাপদও ঘরে ডাকেনি।

বিছানায় বসে ধীরাপদ উমারাণীরই মন যোগাতে চেষ্টা করল প্রথম। কোন্ স্কুলে পড়ছে, কোন্ ক্লাসে পড়ছে, স্কুলটা কোথায়, কখন যায়, কখন ফেরে, কি-কি বই—যাবতীয় সমাচার শোনার আগ্রহ। তার শোনার আগ্রহ থেকে উমারাণীর বলার আগ্রহ কম নয়, কিন্তু বইয়ের প্রসঙ্গে এসে বাবার বিরুদ্ধে তপ্ত অভিযোগ তার। বই তো অনেক—ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্য প্রকৃতি-পাঠ অঙ্কন-প্রণালী—এর ওপর সব বিষয়ের একগাদা খাতা—কিন্তু আজ পর্যন্ত অর্ধেক বইখাতাও কেনা হয়নি তার, বাবা গত মাসে বলেছে এ-মাসে কিনে দেবে আর এ-মাসে বলছে সামনের মাসে হবে। ইস্কুলের দিদিরা ছাড়বে কেন? রোজই বকে প্রায়, এক-একদিন ঘণ্টা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে—কিন্তু বাবার হুঁস নেই। বাড়িতে এসে বললে মা বাবার ওপর রাগ করে উল্টে ওর পিঠেই দুমদাম বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা, বলে, ঝি-গিরি করগে যা, পড়তে হবে না।

দুচোখ পাকিয়ে যে-ভাবে বলল উমারাণী, হেসে ফেলার উপক্রম। সেই সঙ্গে এইটুকু মেয়ের দুর্দশা ভেবে রাগও হয় দুঃখও হয়। কিন্তু ধীরাপদ কিছু বলার আগেই বলার মত আর একটা প্রসঙ্গ পেল উমারাণী। আর একটু কাছে ঘেঁসে ফিসফিসিয়ে বলল, মা আজকাল আরো কি ভীষণ রাগী হয়ে গেছে তুমি জানো না ধীরুকা—মুখের দিকে তাকালে পর্যন্ত থপরিয়ে কাঁপুনি—আর বাবার দিকে এমন করে চায় একেবারে যেন ভস্ম করে ফেলবে, এক-একদিন মনে হয় বাবাকেও বুঝি ঢুঁ'ঘা দেবে। আর বাবাটাও কেমন ভীতু হয়ে গেছে আজকাল, আগের মত ঝগড়া করার সাহস নেই, হয় মুখ বুজে থাকে নয় পালিয়ে যায়—

ধীরাপদ নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। এইটুকু মেয়ে এই কথাগুলো শুধু শোনার দোসর হিসেবেই শোনালো না তাকে। বাবা মায়ের বিবাদ-কলহ অনেক দেখেছে, কাঁচা মনে এর ছাপ পড়ার কথা নয়। কিন্তু পড়ছে, অশুভ ছায়া পড়ছে, কারণ না বুঝলেও এতবড় অসঙ্গতি ভিতরে ভিতরে ত্রাসের কারণ হয়েছে, পীড়ার কারণ হয়েছে। নইলে, এই দুর্লভ অবকাশে ওই মেয়ের এতক্ষণে গল্পের বায়নায় অস্থির করে তোলার কথা তাকে।

ধীরাপদ উমারাণীর নিজস্ব সমস্যাটাই সমাধানের আশ্বাস দিল চট করে। বলল, আচ্ছা কাল সকালে তোর বুকলিষ্ট আর খাতার লিষ্ট আমাকে দিস—অফিস ফেরত সব এসে যাবে, কেমন?

উমারাণী মহাখুশি। সত্যি বলছ ধীরুকা?

ধীরাপদর চোখের কোণ দুটো শিরশিরিয়ে ওঠে কেন, আবারও মনে হয় কেন সে ঘর-ছাড়া হয়ে পড়েছিল? মাথা নাড়ল সত্যি। মেয়েটার মন ফেরানোর জন্মেই তারপর জিজ্ঞাসা করল, তা উমারাণীর পড়াশুনার এত চাপ সত্ত্বেও দরজায় দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে কি দেখা হচ্ছিল?

সঙ্গে সঙ্গে উমারাণী দু'চোখ গোল করে তার কোল ঘেঁসে বসল প্রায়। একটা বিস্মৃত উত্তেজনা নতুন করে ফিরে এলো যেন। —ও মা, তুমি জান না বুঝি! ভচ্চাসমশাই যে মর-মর!

ধীরাপদর ভিতরটা ছাত করে উঠল। উমারাণীর সাদাসাপটা উক্তি থেকে যা বোঝা গেল তার মর্ম, বিকেলের দিকে কুয়োপাড়ে বসে কাশতে কাশতে ভটচায মশাই হঠাৎ দু'হাতে বুক চেপে শুয়ে পড়েন, তারপর অজ্ঞান, তারপর মর-মর।

ধীরাপদ তক্ষুণি উঠে গেছে খবর নিতে। দাওয়ায় হারিকেন জলছে শুধু, বাইরে কেউ নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াআড়ি দরজা পর্যন্ত মস্ত একটা ছায়া পড়েছে, সেই ছায়া দেখেই হয়ত ভটচায মশাইয়ের বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন। তাঁরও বয়েস হয়েছে। ধীরাপদর সঙ্গে এতকালের মধ্যে মৌখিক দু'-চারটে কথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

খবর শুনল। জ্ঞান ফেরেনি। আর ফিরবে তেমন আশাও দেন না ডাক্তার। বিকেলে রমণী পণ্ডিতই ডাক্তার নিয়ে এসেছেন, তাঁরা দু'ভাই রোজকার মত মফঃস্বলে স্কুল করতে চলে গিয়েছিলেন, রাতে এসে শুনেছেন। খুব উপকার করেছেন পণ্ডিতমশাই, ডাক্তারের জন্যে ছোটাছুটি করেছেন, ওষুধ-পত্র এনে দিয়েছেন। নামকরা ডাক্তার না হলেও এম, বি, পাস ডাক্তারই—তাঁরা বাড়ি ফিরে আবারও তাঁকে আনিয়েছিলেন, কিন্তু সময় ঘনালে ডাক্তার আর কি করবে···

ফিরে এসে ধীরাপদ চুপচাপ কদমতলার বেঞ্চ-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল খানিকক্ষণ। ভদ্রলোকের জীবনী-শক্তি শুকিয়ে আসছে লক্ষ্য করেছিল কিন্তু এত শীগগির শেষ ঘনাবে ভাবেনি। ইচ্ছে করছিল, ভিতরে গিয়ে দেখে একবার। বিব্রত করা হবে ভেবে বলতে পারেনি।···সে এখন আর সুলতানকুঠির একজন নয়, গণ্যমান্য একজন। সেটা এখন আর এখানে ভুলতে পারে না কেউ। শুধু অনুগ্রহ করে এখানে আছে। আলাপ থাক না থাক, ভটচায মশাইয়ের ছেলেও অতি সম্ভ্রমভরে কথাবার্তা কইলেন —অসুখের খবর নিতে গেছে তাইতেই কৃতজ্ঞ যেন।···সুলতান কুঠির সঙ্গে ধীরাপদর নাড়ির যোগ গেছে, এখানে রমণী পণ্ডিত বরং আপন জন।

খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসেও ধীরাপদ আশা করছিল সোনাবউদি আজ হয়ত আসবে একবার। মেয়ে এ ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছিল সেটা না জানার কথা নয়। কিন্তু সোনাবউদির ছায়াও দেখা গেল না। খেতে খেতে ধীরাপদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সোনাবউদির এত অন্তর্দাহের হেতু প্রায় দুর্বোধ্য।· মেয়েটার ওই বই ক'টাই বা এ পর্যন্ত কেনা হল না কেন? গণুদার গাফিলতি না সংসারের টানাটানি? মাইনে তো আগের দ্বিগুণেরও বেশি পায় গণুদা···মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছে অবশ্য, আর দিনকালও দিনে দিনে চড়ছে—আগুন দাম সবকিছুর। তাহলেও এমনটা হবার কথা নয় আদৌ··· তবু, মেয়েটার বই না জোটার উৎপীড়ন বিঁধছে থেকে থেকে, বিনা মাস-হারার এই রাতের আহার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না।

খাওয়ার রুচি গেল।···ধীরাপদর ঘর নেই। সোনাবউদির ওই ঘরের সে কেউ নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যখন, কদমতলার বেঞ্চিতে একাদশী শিকদারের দু'খানা বাংলা কাগজ পড়া শেষ। কাগজ দুটো একপাশে সরিয়ে রেখে একা-একা হুঁকো টানছেন। এতকালের ওই বেঞ্চির দোসর আর হুঁকোর দোসর চলতি, যতটা ম্রিয়মাণ দেখবে ভেবেছিল ভদ্রলোককে, ততটা মনে হল না ধীরাপদর। রোগীর সকালের অবস্থা বলতে গিয়ে অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন তিনি। অবস্থা এক রকমই, জ্ঞান হয়নি, আর হবে বলেও মনে হয় না তাঁর, এবারে বোধ হয় যাবার ডাকই পড়ল। কাল অত রাতেও ধীরাপদ খবর নিতে ছুটে গিয়েছিল সে কথাও শুনেছেন।···সোনার টুকরো ছেলে, কারো বিপদ শুনলে সে কি ঘরে বসে থাকবে নাকি! না, শিকদার মশাই সেটা একটুও বেশি মনে করেননি। শুধু ভেবেছে, দাদার জ্ঞান আর হবে না হয়ত, কিন্তু হলে শান্তি পেতেন একটু··· সমস্ত জীবন তো কারোই ভালো চোখে পড়ল না কিছু, যাবার সময় সকলের মুখেই ভালো দেখে যেতে পারতেন।

শিকদার মশাই তাকে বসতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ধীরাপদ কাগজ নিয়ে ঘরে চলে এলো।

স্নান করে রোজ সকাল ন'টার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে পড়ে। নইলে বাসে ভিড় হয়ে যায়। ধীরাপদ ডাক্তার আসার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু এদিকে সাড়ে ন'টা হতে গেল।

ইতিমধ্যে বার দুই ভটচায মশাইয়ের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে দুই-একটা কথাও হয়েছে। ধীরাপদ বড় কোনো ডাক্তার এনে দেখানোর কথাটা বলি বলি করেও বলে উঠতে পারেনি। শেষ বারে ঘর থেকে বেরিয়ে রমণী পণ্ডিতকে দাওয়ায় দেখতে পেল। ঘরের তালা বন্ধ করছিল, পাশের ঘর থেকে গণুদা বেরুলো। রাতে কখন বাড়ি ফিরেছে ধীরাপদ টের পায়নি। এখন অফিসেই চলেছে মনে হল।

মুখখানা শুকনো শুকনো। ধীরাপদকে দেখে থমকালো একটু। বেরুবে নাকি···?

দেরি হবে একটু, আপনি যান। একসঙ্গে এগোবার ইচ্ছে ছিল হয়ত, পা বাড়িয়ে গণুদা দুই একবার ফিরে ফিরে দেখল ওকে। কিন্তু ধীরাপদ একেবারে বাজে কথা বলেনি, দেরি একটু হবে। রমণী পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলবে, ফিরে এসে উমার কাছ থেকে বুকলিষ্ট চেয়ে নেবে। মেয়ে ভুলেই বসে আছে বোধহয়।

কাছে এসে কথা বলার আগে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদ হঠাৎ চমকেই উঠল। এই সুলতানকুঠির সঙ্গে সত্যিই কতদিন যোগ নেই তার! পণ্ডিতের কালো মুখে যেন কুড়ো উড়ছে, চোয়ালের হাড় উঁচিয়েছে, চোখ দুটো বসা, দেহ শীর্ণ হয়েছে। রমণী পণ্ডিত হঠাৎ যেন বুড়িয়ে গেছে। রোগীর কথা বলার আগে ধীরাপদ তাঁর খবরই জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার অসুখ করেছিল নাকি?

রমণী পণ্ডিত উঠে দাঁড়ালেন। নিষ্প্রভ চোখে আশার আমেজ। —না, অসুখ আর কি···

নালন্দার একটি স্তূপ

—বিবেক সাহা
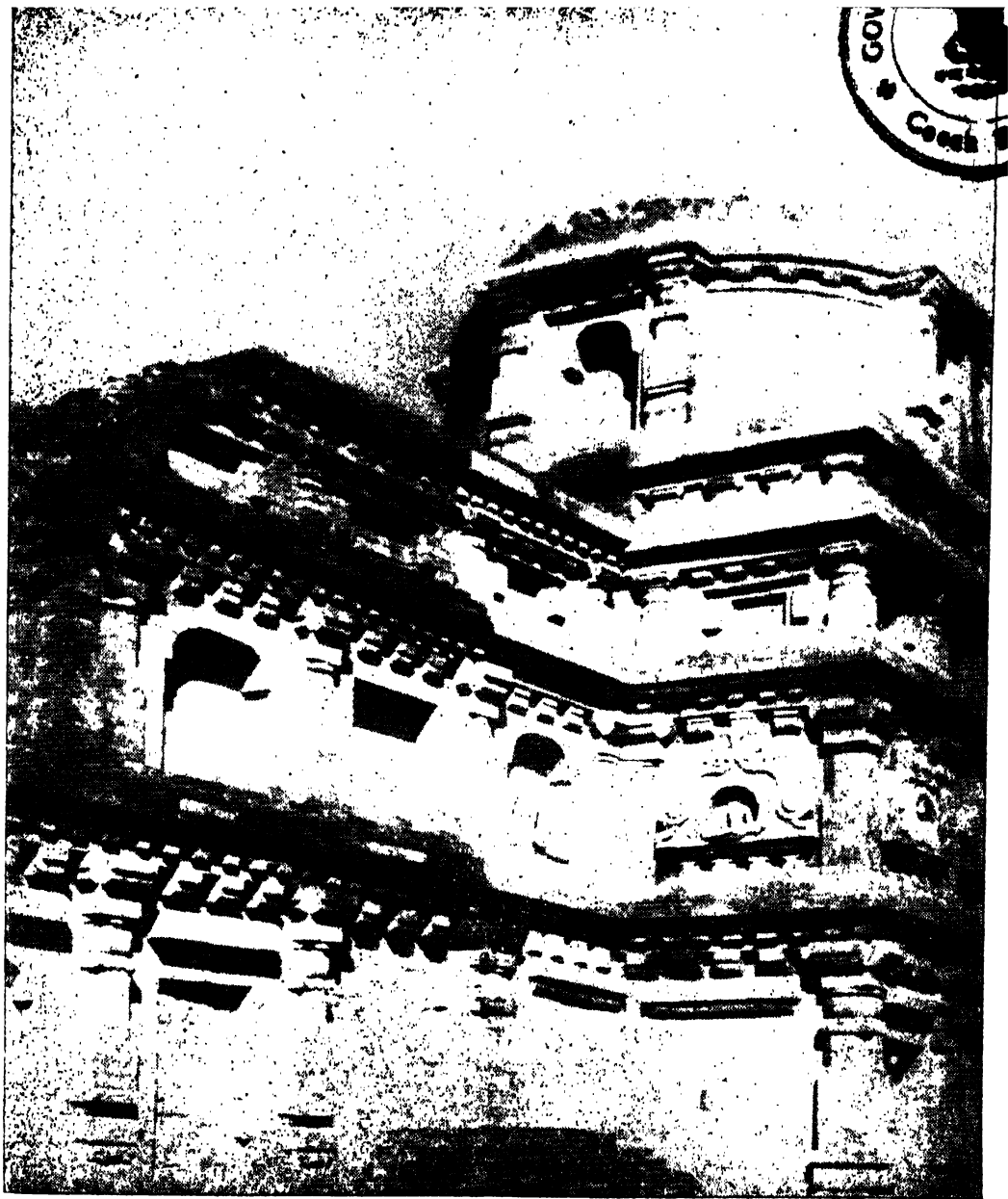
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

পুষি

—আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

পরিকল্পনা

—নিমাইরতন গুপ্ত
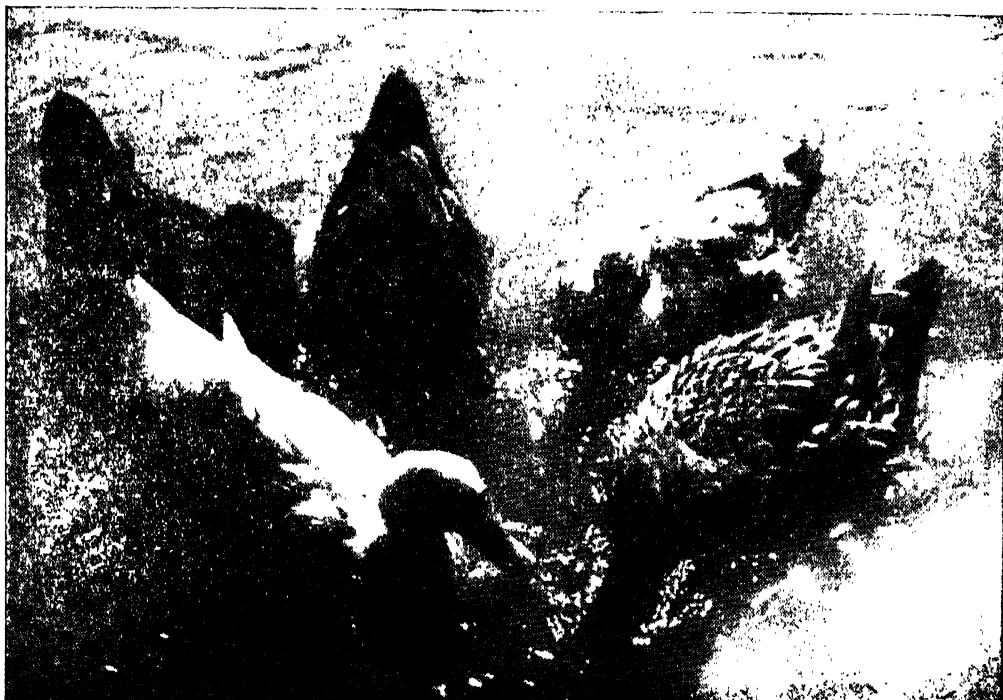
খুকু

—ভবেশ ঘোষ

জননী

—দীপক চাকলাদার

নিভৃতক্ষণে —আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

অর্থাৎ, অসুখ না হোক, শুনলে দুঃখের কথা শোনাতে পারেন কিছু। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার তো এখনো এলেন না দেখছি।

পণ্ডিত ঠোঁট উল্টে দিলেন। আসবেন। রাজঘরে এলেও প্রাপ্তিযোগ তো অর্দ্ধেক, নিজের সময়মত আসবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ধীরাপদ বড় ডাক্তার এনে দেখানোর কথাটা তাঁকেই বলে গেল। ছেলেদের সঙ্গে আর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখতে বলল, যদি দরকার মনে করেন তাঁরা, রমণী পণ্ডিত যেন তাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন—সে ব্যবস্থা করবে, আর ফীয়ের জন্যেও ভাবতে হবে না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকবে, তার মধ্যে যেন টেলিফোন করেন।

রমণী পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন। চোখে আশার আলো ধকধকিয়ে উঠেছে আরো। যিনি যেতে বসেছেন তাঁর প্রতি মমতা হৃদয়ের পরিচয় বটে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে আধমরা হাল যার, সে কি একটুও অনুকম্পার যোগ্য নয়? ধীরাপদর মনে হল, সেই আকুতিটাই এবারে প্রকাশ করে ফেলবেন তিনি।

অফিসের তাড়া দেখিয়ে পালিয়ে এলো।

গণুদার দরজার কাছে এসে উমাকে ডাকতে সে বেরিয়ে এলো। মুখখানা আমসি।

বুকলিষ্ট কই?

উমা কান্না চেপে মাথা নাড়ল শুধু। ধীরাপদ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছে, কিন্তু বুঝেও তেতে উঠল হঠাৎ। কি হল, বই চাই না?

উমা সভয়ে ঘরের ভিতরে তাকালো একবার, তার পর মৃদু জবাব দিল, মা বলল আনতে হবে না।

ও। ধীরাপদ বড় বড় দু'পা ফেলে এগিয়ে গেল। মাত্র দু' পা-ই। থামল আবার, তেমনি সবেগেই ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। ভিতরের চিলতে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে সোনাবউদি রাঁধছে। বাইরের একটা কথাও কানে যায়নি যেন।

ধীরাপদ ধীর গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিল, আজ থেকে রাতে আমার খাবার রাখার দরকার নেই, আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসব।

জবাবে সোনাবউদি খুন্তি থামিয়ে একবার তাকালো শুধু। কানে গেছে এই পর্যন্ত। আদৌ না খেলেও যায় আসে না যেন। হাতের খুন্তি নড়তে লাগল আবার।

উমার বিহ্বল মূর্তির দিকে একবারও না তাকিয়ে হনহনিয়ে ধীরাপদ সুলতানকুঠির আঙিনা পেরিয়ে গেল। ভিতরে কি রকম দপদপানি একটা, যতটা বলে এলে আক্রোশ মেটে তার কিছুই বলা হয়নি।···ওই সুলতানকুঠিতেই ফিরবে না আর, বলে এলে হত।

থমকালো একটু, ঈষৎ ব্যস্তমুখে গণুদা ফিরে আসছে। চললে? বিব্রত প্রশ্ন গণুদার।

নিরুত্তরে পাশ কাটানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গণুদা সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। একটা পথ ভেঙে আবার ফিরতে হল, ইয়ে—আজ আবার ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম দেবার শেষ দিন। সকালে বলে রেখেছিলাম, দেয়নি—গেলেও দেবে কি না কে জানে···যে মেজাজ। গণুদা ঢোক গিলল, স্ত্রীর মেজাজের ভয়ে মুখখানা শুকনো। তোমার সঙ্গে আছে নাকি, রাতে বাড়ি এসে দিয়ে দিতাম, এখন আবার···

কত?

গণুদা আশান্বিত, প্রিমিয়াম তো পঞ্চাশ টাকা, তোমার সঙ্গে কত আছে···অফিস থেকেও কিছু যোগাড় করে নিতে পারি।

পার্স বার করে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গণুদার হাতে দিয়ে ধীরাপদ হনহনিয়ে এগিয়ে চলল আবার। তার জন্যে অপেক্ষা করল না বা ফিরেও দেখল না। জ্বালা জুড়িয়েছে একটু। এক বেলার জন্যে হলেও টাকাটা ওর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।···সোনাবউদি জানবে। [ক্রমশঃ।

আমি আর আমাকে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমি আর আমাকে,
আমার মাঝে লুকিয়ে রাখবো না।
নিত্য ও প্রত্যহ আমি এই অন্তর্দাহ চেপে;
পুঞ্জিভূত বেদনার ব্যাপ্তির প্রগাঢ়তা বাড়িয়েছি।
আমি তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও
আমার অন্তর্নিহিত আগামী প্রয়াসকে
আমার আড়াল দিয়ে,
আর ঢেকে রাখব না

আমার বোধের প্রবাহ ধারায়
কোন অশ্রুমুখী নদীর নীরবতার স্পন্দন শুনেছ?
আমার ভীরুতার নির্লিপ্ততায়
কোন স্বপ্নপিয়াসু মিথুনের অবরুদ্ধ ক্রন্দন
শুনতে পাও?
নিত্য আমি এই প্রাচুর্য্যের পশরা সাজিয়ে
তোমায় সাজিয়ে চলি আমার অন্তরীক্ষে
বল আর কতদিন?

তোমার এই নৈঃশব্দময় সঞ্চারণ
আমায় শুধুই বিহ্বল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে চলে।
তোমার এই নির্বাক উজ্জ্বলতা
আমায় শুধুই বিষণ্ণ বিস্ময়ের দিকে ঠেলে দেয়।
আমি আর আমাকে,
আমার আবরণে ঢেকে রাখব না।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

সন্ধ্যা ৬টা। প্লেন এসে থামলো ডারউইন হাওয়া-বন্দরে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে—মেঘে ঢাকা আকাশ বেশ অন্ধকার আর তার ওপর ভারি গুমোট গরম।

আমাদের দলের মধ্যে একা আমিই দেশীয় পোষাকে। আর সবাই বিলাতী সাজে এসেছেন। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই মহাদেশের অধিবাসীরা হয়ত অনেক বিদেশী দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এর আগে কিন্তু তাদের সবাইকে দেখেছেন সাহেবী পোষাকে। সেজন্য আমি তাদের কাছে নতুন।

প্লেন থেকে নেমে কাষ্টমস্ অফিসের পথে যাবার সময় কানে ভেসে এল আশে-পাশের লোকের ফিস্‌ফিসানি। "কোন আজব দেশের লোক আমি?" এই হল তাদের ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনার বিষয়বস্তু।

অষ্ট্রেলিয়া তার কূপমণ্ডুকতা বজায় রাখার জন্য খুব কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছে—এদেশে ঢোকবার দরজাগুলিতে। ডারউইন উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম দরজা, সেজন্য এখানে বিশেষ করে আমাদের স্বাস্থ্য ও জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একে একে **B. O. A. C.**-র গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। তার মাঝ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল হোটেল অভিমুখে। অন্ধকারে ঠিক আন্দাজ পেলাম না, তবে মনে হ'ল ঘন জঙ্গলের সরু পথ। দুধারে ইউক্যালিপ্‌টাসের বন। হোটেলে মাত্র একঘণ্টা থাকতে পারবো—তার মধ্যে হাত-মুখ ধোয়া, রাত্রের খাওয়া, চিঠিপত্র লেখা—যাকে বলে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। কাজের তাড়াতাড়িতে রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি। পাখার তলায় বসেও নিস্তার নেই। ঘণ্টাখানেক পর আবার হাওয়া-বন্দরে ফিরে এলাম। আধঘণ্টার মধ্যে প্লেন আবার নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে উড়তে সুরু করলো সিডনী অভিমুখে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনী সহরের নামডাক আছে—রাজনগর হিসাবে। ইংলণ্ড থেকে প্রথম বন্দিবাহী জাহাজ এই সিডনীতেই এসেছিল, সে কারণ নিউ সাউথ ওয়েলসের পত্তন সেই সময় থেকে সুরু। ১৭৮৮ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী সেই প্রথম জাহাজ নোঙর করার তারিখ আজও অষ্ট্রেলিয়াবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে "পত্তনী দিবস" হিসাবে স্মরণ করে।

কেনবারার দৃশ্য

সকাল ৭টায় সিডনী হাওয়াবন্দরে এসে পৌছালাম। নামার পরই নামমাত্র কাষ্টমসের কসরৎ হ'ল, কারণ ডারউইন বন্দরে প্রথম ও আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হয়েছে। তবে এখানে এক ফিরিস্তি দিতে হল পাশপোর্ট সাক্ষী করে—কতদিন অষ্ট্রেলিয়ায় থাকবো, থাকার উদ্দেশ্য ইত্যাদি। কাঠগড়ার বন্দীর মত যখন এই সব সেরে বেরিয়েছি তখন আবার আর এক হাঙ্গামা। আমার স্যুটকেশে কিছু আমলকী শুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার সহধর্ম্মিণী অষ্ট্রেলিয়ায় মুখশুদ্ধি হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। কাষ্টমসের মহামানবগণ কি করে সেই প্যাকেটটা খুঁজে বার করে প্রশ্ন সুরু করলেন—"মশায়, এগুলো কি গাছের বীজ?" "গাছের বীজ হতে যাবে কেন—এক রকম ফল শুকিয়ে ছোট ছোট করে কাটা।" আমলকীর ইংরাজী নামটা ছাই মনে এলো না। সাহেব তো যেন বিশ্বাস করতে নারাজ—হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছেন। গত্যন্তর না দেখে আমি প্যাকেটটা সাহেবের সামনে খুলে গোটাকতক মুখে দিয়ে কড়কড় করে চিবিয়ে সাহেবকে বললাম—"দেখুন না, দেখুন, খেয়ে দেখুন। ভারি সুস্বাদু" এতক্ষণে আশ্বস্ত হলেন কাষ্টমস সাহেব। প্যাকেটটা আমার হাতে ফিরৎ দিয়ে একটা শুকনো "Sorry" বলে অন্য কাজে মন দিলেন। আমিও বাঁচলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় মিঃ বোম্যানের সঙ্গে দেখা। মিঃ বোম্যান কমনওয়েলথ শিক্ষা দপ্তরের লোক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এসেছেন হাওয়া বন্দরে।

"আমি বোম্যান" বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার উদ্দেশ্যে। আমি হাতে হাত মিলিয়ে আমার এবং আমার সঙ্গীদের পরিচয় দিলাম। "আশা করি যাত্রা সুখকর হয়েছে আপনাদের।" "আজ্ঞে হ্যাঁ," "ধন্যবাদ আসুন, আপনাদের জন্য সরকারী গাড়ী রাখা আছে" কথা কইতে কইতে দুজনে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম।

মালপত্র সব নিজেদের বইতে হল। অষ্ট্রেলিয়ায় এই এক মহাবিপদ। কুলী পাবার উপায় নেই। গাড়ীতে মালপত্র তুলে রাখার পর মিঃ বোম্যান আমাদের ভবিষ্যৎ সফর ও কার্য্য তালিকার এক ছাপান ফিরিস্তি আমাদের হাতে হাতে দিলেন। গাড়ী ছাড়ল।

মোটর গাড়ীর চালক আমাদের বর্ণ ও বেশ থেকে আমরা ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কথায় কথায় শুনিয়ে দিলেন যে গত যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন লাগলো আপনার আমাদের দেশ?" "বেশ ভাল, তবে বড় গরম। অষ্ট্রেলিয়া কেমন দেখছেন?" উত্তর দিলাম—"বেশ ভাল তবে বড় ঠাণ্ডা।" বোধ হয় বুঝতে পারলেন আমি গরমের উত্তরে ঠাণ্ডা বলেছি তাই তিনি চুপ করে গেলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ী এসে এক বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। এই বাড়ীতে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র থাকেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে এখানে আসা। গাড়ীতে যাবার সময় সিডনী সহরের একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। আমাদের দেশে যারা দার্জিলিং কালিম্পং ইত্যাদি hill station দেখেছেন তাঁরা চোখ বুজে এই সহরের একটা আন্দাজ করতে পারেন। তবে সহরটা আকারে অনেক বড় এই যা। পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচু নীচু বাড়ী—তার মাঝ দিয়ে চওড়া রাস্তা—দু'ধারে প্রায়ই ফুলের বাগান। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার চারদিক। এই পরিচ্ছন্নতা আমাদের চোখে খুব ভাল লাগল।

যে বাড়ীতে আমরা এসেছি সেটা এক দ্বিতল ছাত্রাবাস। বিভিন্ন দেশ হতে আগত ছাত্রবৃন্দ এখানে থাকেন। আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার আগেই দুজন ভারতীয় ছাত্র (একজন সিন্ধি ও অপরজন এলাহাবাদবাসী) এসে আমাদের সাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

কাঠের বাড়ী। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। সামনে একটু ফুলবাগান। প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ করার পর আমরা সবাই মিলে বাকী সময়টা চিড়িয়াখানা দেখে কাটাবার জন্য রওনা হ'লাম। চারটার সময় আমাদের আবার উড়ে কেনবারায় যেতে হবে।

সিডনীর চিড়িয়াখানার নাম Toranga Park Zoo সহরের উত্তরদিকে বেশ খানিকটা উঁচু জায়গার ওপর। চিড়িয়াখানার আশেপাশের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নীচে ছড়ান সহরটা বেশ সুদৃশ্য। খাঁচার বালাই নেই খুব বেশী—বেশ প্রশস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জন্তু জানোয়ারদের রাখা। সেদিন ছিল রবিবার। তাই এখানে খুব ভীড়। কর্মক্লান্ত সহর থেকে দলে দলে লোকজন এখানে এসে রোদে বোসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ছোট ছেলে মেয়েরা হৈ চৈ করে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরাও Zoo gardenএর এক খাবার দোকানে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।

অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ জন্তু হিসাবে কাঙ্গারু, কোয়ালা, এমু ও লায়ার পাখীর জায়গাগুলো ভাল করে দেখা হল।

কাঙারু হরেক আকারের, প্রকারের ও রংএর আর কোয়ালা জীবটি একটু অদ্ভুত রকমের। দিনরাতের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটায় সে গাছের ডালে। নড়ন চড়ন নেই যেন গাছের ডালে কাঁটাল ফলে আছে। কোয়ালা ভালুকের জাত তবে আকারে অনেক ছোট। ছোটদের খেলনা "Teddy Bear"এর হুবহু প্রতিচ্ছবি। একমাত্র ইউকেলিপটাসের পাতা খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। ইউকেলিপটাসের পাতার রসে নাকি নেশা হয় তাই সারাদিন এরা এমন ঝিমিয়ে থাকে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মা-কোয়ালাদের গায়ের সঙ্গে আঠার মত আটকে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

অষ্ট্রেলিয়ার বন্য কুকুর বা ডিঙ্গো (Dingo) আকারে অনেকটা আমাদের দেশী কুকুরের মত কিন্তু এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। অনেক চেষ্টা করেও এদের পোষ মানান সম্ভব হয় না।

এমু হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার উটপাখী। প্রায় অসট্রিচের মত দেখতে লম্বা গলা, লম্বা ঠ্যাং, পাখা আছে কিন্তু উড়তে পারে না। আর লায়ার পাখীকে অষ্ট্রেলিয়ার ময়ূর বললে অত্যুক্তি হয় না। লম্বা লেজ তাতে নানান রংয়ের বিচিত্রতা এবং ময়ূরের মত লেজ তুলে মাঝে মাঝে নাচতে সুরু করে। লায়ার পাখীর আর এক বিশেষ গুণ এই যে তারা অপর পশুপাখীর ডাক হুবহু নকল করতে পারে।

চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে আরও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। বিদেশে সত্যই ভারতবাসীকে ভাল লাগে—কেমন যেন একটা আঁতের টান জেগে ওঠে। দেখা হলেই মুখে হাসি ফুটে ওঠে পরস্পরের, একটা আপন আপন ভাব। কিন্তু ফিরে এসে দেশের মাটিতে পা দিলেই আবার পর পর ভাব গজিয়ে ওঠে। কে যেন গেয়েছিলেন—'পর দেশে আপন আপন আর আপন দেশে পর।' গানের কথাটা খুব সত্যি। সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে এলে বেশ বোঝা যায়।

এইবার আমাদের অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী কেনবারায় যাবার পালা। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে কয়েক দিন আগে পাঁচ জন গ্রন্থাগারিক একই উদ্দেশ্যে এসে সিডনীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একসঙ্গে আমরা সবাই কেনবারা উদ্দেশ্যে ওড়বার জন্য সিডনী বিমান-ঘাঁটিতে বিকাল ৪টা নাগাদ উপস্থিত হলাম।

১৯০০ খৃ: অষ্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানীর স্থান নির্ব্বাচন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান দুইটি নগরী—সিডনী ও মেলবোর্ণের মধ্যে রীতিমত রেষারেষি সুরু হয়ে গেল—কে রাজধানীতে পরিণত হবে। অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার বুদ্ধিমানের মত উপরোক্ত দুই শহরের মাঝামাঝি এক জায়গায় কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—১৯০৮ সালে। এই হল অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী কেনবারা। সিডনী সহরের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৯৪০ বর্গমাইল স্থান কেন্দ্রীয় সরকারের খাস শাসনে আনা হল রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য। বিখ্যাত মার্কিনী স্থপতি ওয়ালটার বার্লি গ্রিফিন এই নগরীর পরিকল্পনা করেন। কেনবারা নামটি ইংরাজী নাম নয়; অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দেওয়া নাম। কেনবারা শব্দের অর্থ মিলনক্ষেত্র। বন্য অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এদের দেওয়া নাম আজ সার্থক হয়েছে। কেনবারা আজ সত্যই সর্ব্বজাতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হ'তে চলেছে।

আকাশপথে সিডনী থেকে কেনবারা মাত্র ১৪৮ মাইল। আমরা বিকাল ৪টার সময় যাত্রা করে ৫টা বাজার কয়েক মিনিট আগেই পৌছে গেলাম। হাওয়া-বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন—কেনবারা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় সরকারের

পার্লামেন্ট হাউস : কেনবারা

পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ম্মচারী ও আরও অনেক। প্রায় সবশুদ্ধ ১০জন। প্লেন থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে এক তুমুল উত্তেজনা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা হাওয়া-বন্দর ছাড়িয়ে মোটরে সরকারী হোটেলের দিকে যাত্রা সুরু করলাম। তখনও সন্ধ্যা ঠিক হয়নি; পড়ন্ত সূর্য্যের আলো তখন চারদিকের পাহাড়ের মাথায় মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে। উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী ছুটে চললো—সহরের দিকে।

শেষে এসে ঢুকল হ্যাভলক হাউসে—সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বিশেষ হোটেলে। এইভাবে আমাদের ও ফিলিপাইন গ্রন্থাগারিকদের থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছে। গাড়ী থেকে নেমে যে যার মালপত্র নিজে বয়ে নির্দ্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যেতে হল—কারণ কুলীর পাঠ অষ্ট্রেলিয়ায় নেই বললেই চলে। ছোট ছোট জাহাজের কেবিনের মত ঘর—একজনের থাকার মত যথেষ্ট। ঘরের মধ্যে বেসিন ও আসবাবের মধ্যে একখানা স্প্রিংএর খাট, একটা ওয়ার ড্রোব একটা ডেস্ক ও একখানা চেয়ার। সারিবদ্ধ এরকম ঘরের পর ঘর—৫।৭ খানার পর পর এক একটা Toilet ও স্নানের ঘর।

অষ্ট্রেলিয়ায় গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত কঠিন—বিশেষ করে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে, সেজন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা যাঁরা সরকারী বাড়ী পাননি তাঁরা এই হোটেলে থাকেন—সপুত্র পরিবার। আমাদেরও রাজঅতিথি হিসাবে এই হোটেলে থাকতে দেওয়া হ'ল। হোটেলের কর্ম্মীরা (স্ত্রীপুরুষ) সাধারণতঃ নয়া অষ্ট্রেলিয়ান অর্থাৎ যাঁরা জার্ম্মাণী, ইটালী, প্রভৃতি দেশ থেকে সবেমাত্র এসেছেন এদেশে পাকাপাকিভাবে থাকবার জন্য।

হ্যাভলক হাউসের কর্ম্মীদের উচ্চ-নীচ কাজের জন্য মর্য্যাদার কোন ভেদাভেদ আমাদের চোখে পড়েনি। Dignity of Labour অর্থাৎ "শ্রমের মর্য্যাদা" কথাটা বহুকাল শুনেছি কিন্তু আমাদের দেশে তার কোন প্রকাশ দেখিনি। আজ তার স্বরূপ চোখে পড়ল। আমাদের দেশে ট্যেক্সি-ড্রাইভার বা হোটেলের কর্ম্মীদের সাধারণতঃ
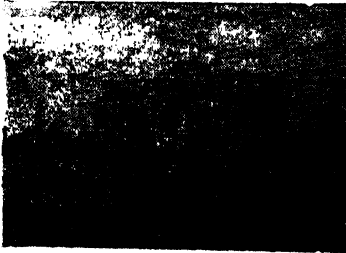
জাতীয় গ্রন্থাগার। কেনবারা

আমরা একটু যেন ঘৃণার চোখে দেখি কিন্তু এদেশে দেখলাম সবাই সমান। কোন লোক কোন কাজকে উঁচু ভাবে না। কাজ এদের কাছে কাজই। তার কোন প্রকার ভেদ নেই—সেজন্য কোন লোক কোন কাজকে উঁচু বা নীচু ভাবেন না—সবাইয়ের সমান মর্য্যাদা। অষ্ট্রেলিয়ার মত পৃথিবীর কোন দেশে বোধ হয় শ্রমের মর্য্যাদাকে এমন সার্থক করে তুলতে পারেনি। প্রাচ্যের কথা বাদই দিলাম; পাশ্চাত্যের ইংলণ্ড আমেরিকায় ও শ্রম অনুযায়ী মর্য্যাদার তারতম্যের রূপ বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

কেনবারা খুব সুপরিকল্পিত ছড়ান সহর, অনেকটা আমাদের নয়া দিল্লীর মত। সহরের কেন্দ্রস্থল সিভিক সেনটার, এখানেই যত দোকান-পাট, পোষ্ট অফিস ও ইউনিভারসিটি কলেজ। হেভলক হাউস সিভিক সেনটার থেকে খুব কাছে মিনিট পাঁচেকের পথ মাত্র।

অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী কেনবারায় সুরু হল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গ্রন্থাগারিক সম্মেলন। সেদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি স্যার জন লেথাম—কেনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সভাকক্ষে টকটকে লাল মুখের উপর সাদা চুল নিয়ে স্যার জন প্রাচ্যের গ্রন্থাগারিকদের অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে জানালেন সাদর সম্ভাষণ। বয়সে প্রবীণ হলেও স্যার জনের আশা আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নবীন এবং এই গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের সকল দায়িত্বভার ও উৎসাহ তাঁর। দেশের শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করেছেন বলেই বৃদ্ধ স্যার জনের এই গ্রন্থাগারিক সম্মেলন আহ্বানে এত আগ্রহ ও উৎসাহ। স্যার জনের মত লোককে দেখলে বোঝা যায় যে আজকাল জগতে অষ্ট্রেলিয়া মাথাচাড়া দিচ্ছে কেন।

এর পর অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী (মিঃ কেসীর অনুপস্থিতিতে) মি হ্যাসলাক সম্মেলনের তাৎপর্য্য কি সামান্য কয়েক কথায় বুঝিয়ে বললেন এবং বক্তৃতা শেষে ভারতের রাষ্ট্রদূত দিলীপ সিংহজীকে কিছু বলার আহ্বান জানালেন। সাত ফুট লম্বা, চোখা নাক-চোক, ছিপছিপে গড়ন বিলাতী পোষাকে বক্তৃতামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ভারতের রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ সিংহজী। এর আগে তাঁকে কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। অল্প কথায় হাস্যরসের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রদূত প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে শেষ করলেন। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলে নিয়েছিলেন যে লম্বা বক্তৃতা দেওয়ার দোষে তিনি দুষ্ট। মাত্র কয়েক দিন আগে কেনবারা থেকে ৫০ মাইল দূরে এক সভার বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বক্তৃতার মাঝপথে তিনি দেখলেন যে শ্রোতাদের চোখে-মুখে চাঞ্চল্যের ভাব, আবার কেউ কেউ দ্রুতবেগে সভাকক্ষ ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাবলেন হয়ত বা বক্তৃতা বেশী লম্বা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরে তিনি টের পেলেন যে আশে-পাশে কোথায় জঙ্গলে আগুন লেগেছিল—তাই এই চাঞ্চল্য। একথা জেনে তিনি আশ্বস্ত হন।

সভা শেষে পানীয় ভোজের মারফতে সভামণ্ডপে উপস্থিত সবার সাথে আলাপ আলোচনা ও পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

[ক্রমশঃ।

"Man, however well behaved,
At best is only a monkey shaved."
—*W. S. Gilbert*

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

মাটির গন্ধ

রামপদ বাবু প্রবীণ সাহিত্য-শিল্পী, কোনরূপ-প্লট বা টেকনিকের মারপ্যাঁচ ব্যতীতই একদিন তিনি পাঠককে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্তরিকতাই তাঁর সাহিত্য কর্মের মূলসূত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সেই আন্তরিকতা জীবন বোধে সমুজ্জ্বল হয়েই ধরা দিয়েছে তাঁর এই নবতম উপন্যাসটিতে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের পটভূমিই তিনি এযাবৎ বেছে নিয়েছেন তাঁর শিল্পকর্মের ক্যানভাসরূপে। আলোচ্য পুস্তকে তিনি যাদের এনেছেন তারা কিন্তু আর এক জাতের। বাঙ্গলার প্রাণসত্তা যারা বজায় রেখে আসছে পুরুষানুক্রমে, সেই কৃষিজীবি সম্প্রদায়ই এর পাত্র-পাত্রী। বাঙ্গলার কৃষকের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, তার সহজ সরল জীবন যাত্রার একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছবিই ফুটে ওঠে পাঠকের মানসে, মরমী কথাশিল্পীর লেখনীর মাধ্যমে। চাষীর প্রাণ ভরে থাকে মাটির গন্ধে, মাটিই তার ইষ্ট, মাটিই তার স্বর্গ, দিনের পর দিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে চাষী কাজ করে মনের আনন্দে, চোখে তার সোনার ফসলের স্বপ্ন। হলধর মোড়লের জবানীতে লেখক বাঙ্গলার চাষীর এই মর্ম কথাটিই ব্যক্ত করেছেন অতি সুন্দর ভাবে। বন্যায় সর্বহারা হয়েও চাষী হলধর সরকারী ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ করেনি। মাটি মায়ের বুকের সম্পদ শ্রমের দ্বারা অর্জন করাকেই সে জানত একমাত্র কর্ত্তব্য বলে, সর্বনাশের অন্ধকার দিনে তাই একটু ভেঙ্গে না পড়ে নতুন আশায় ঘর বাঁধতে ছুটল সে। বন্যা তাকে গৃহহীন করেছে সত্য কিন্তু ভূমিহীন তো করেনি। গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধ ভরা কাহিনীটি সহজেই মনকে স্পর্শ করে। লেখকের ভাষা ও বিষয় সহজ ও সরল, আমরা বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি একথা সহজেই স্বীকার করি। ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য চার টাকা মাত্র।

এক দুই তিন

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চমক লাগিয়েছিলেন একদিন শংকর, পাঠকমনে যে প্রত্যাশা তিনি সেদিন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন আজও রয়েছে তা অটুট হয়েই। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই তরুণ কথাশিল্পীর সর্বাধুনিক এক গল্প সংগ্রহ। মোট তিনটি গল্প গ্রথিত হয়েছে এতে। প্রথম গল্পের টেকনিক অভিনব, নায়িকার অদৃশ্য উপস্থিতিতে এর পটভূমি আচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট পীড়নে অকালে লোকান্তরিতা তরুণী নীলিমার ব্যথা বেদনা হাসি গানে অনুরণিত কাহিনী সহজেই পাঠক মনে দোলা দেয়, নায়িকা প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত নেই অথচ তারই অলক্ষ্য ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সমগ্র রচনাটি, এ যেন ঠিক অস্তমিত সূর্যের সোনা জড়ানো নীল আকাশ, এক অনন্ত সুন্দরের আত্ম বিলোপের আভায় সমুজ্জ্বল রূপময়ী জগৎ। কল্যাণী গৃহবধূ চরম প্রয়োজনের দিনে প্রিয়তমের কল্যাণ কামনায় কেমন করে সর্বনাশের বেড়া আগুনে পুড়ে মরতে পারে অসঙ্কোচে। নীলিমার চরিত্র কথনে সেই কথাটিই বলতে চেয়েছেন লেখক। গল্পটির করুণ উপসংহার সহজেই বেদনার্ত্ত করে তোলে মনকে। অপর দুইটি গল্পের একটিতে এক বিদেশিনী নারীর আন্তরিক পতিপ্রাণতা ও অপরটিতে এক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মননশীল হৃদয়বেদনা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যশ মান অর্থ সমস্তের শিখরে পৌঁছে একদিন সুধাময় দেখলেন এসবের বিনিময়ে তাঁর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবণ মনকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। স্রষ্টা শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে তার জায়গায় যে বেঁচে আছে সে আর পাঁচজন মানুষের মতই এক স্থূলমনা বৈষয়িক। আত্মোপলব্ধির যন্ত্রণায় জর্জরিত সুধাময়ের মানসিক ঘাত প্রতিঘাত অতি কুশল কলমে এঁকেছেন লেখক, মনের গহন অন্ধকার প্রদেশেও সহজ গতিবিধি তাঁর, আর তারই পরিচয়ে সমুজ্জ্বল তাঁর রচনা। লেখকের ভাষা সরল ও সুন্দর, সহজেই বক্তব্যকে হৃদ্য করে প্রকাশ করে। বইটির আঙ্গিক নূতনত্বের দাবী করতে পারে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শংকর, প্রকাশক—বাক্‌সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা আট আনা।

রূপবতী

মনোজ বসু প্রধানতঃ রোমান্টিক শিল্পী, তাঁর সাহিত্য কর্মে এযাবৎ যে সুরটি মৌল হয়ে ধরা দিয়েছে তা হল রোমান্টিক আইডিয়ালিজমের, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন আদি রিপু বা মানুষের জৈব বৃত্তিই 'রূপবতী'র মূল 'বিষয়বস্তু। আলোচ্য কাহিনীর নায়িকা এক অসামান্যা রূপবতী কন্যা, সরল সহজ এক গ্রাম্য তরুণী রাধারাণীর জীবনে রূপই হয়েছিল সব সর্বনাশের মূল। এই রূপের অভিশাপে কেমন করে তিলে তিলে পুড়ে মরলো একটি নিষ্পাপ শুচিশুভ্র নারীসত্তা অপরূপ ভঙ্গীতে তাই বিবৃত করেছেন লেখক। ভাগ্য বিড়ম্বিতা রাধারাণী জীবনে না পেল সুখ না পেল শান্তি কারণ তার প্রধান ও একমাত্র অপরাধ সে অসামান্যা সুন্দরী, পুরুষের লুব্ধ চোখ তাই তাকে রেহাই দেয়নি কোথাও। সেই লুব্ধতার মূল্য দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে গেল রাধারাণী ভদ্র গৃহবধূর নীড় বাঁধার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। হতাশার গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল একটি নিষ্পাপ মেয়ের জীবন। কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতি বেদনা বিধুর করে তোলে মনকে। আমাদের দেশে মেয়েদের এই সমস্যা নতুন নয়

অসহায়া অনাথা কোন স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই আত্মীয় গৃহে পরান্নে প্রতিপালিতা হয়ে থাকে, যেখানে তার না থাকে কোন সম্মান আর না থাকে কোন অধিকার। এই একান্ত পরমুখাপেক্ষিতার ফলেই বক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে উঠতে চায় তখন বাধা দেওয়ার কোন শক্তিই খুঁজে পায়না সে নিজের মাঝে। বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করতে হয় তাকে ভাগ্যের হাতে। পুরুষের কুৎসিত জান্তব লোভের বলি হয়ে বেঁচে থাকার অপরিসীম গ্লানি ভোগ করছে অসংখ্য ভাগ্যহীনা দিনের পর দিন মুখ বুজে আজও। সমাজের এই দুরপনেয় লজ্জারই ইতিহাস মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে শক্তিমান কলা শিল্পীর কলমের টানে টানে। মনোজ বসুর আঙ্গিক তাঁর একান্ত নিজস্ব, সরসোচ্ছল ভঙ্গীতে হৃদয়দ্রাবী কথা বলেন তিনি, তাই যা বলেন সেটা মনকে ছুঁতে পারে সহজেই। আলোচ্য আখ্যানে ও সেই বিশেষ রীতি বজায় রয়েছে আগাগোড়া, রাধারাণীর বিড়ম্বিত জীবনের বেদনায় মথিত হয় হৃদয়মন। শুধু একটা প্রশ্ন জাগে মনে বিষয়বস্তুকে ফোটাতে গিয়ে লেখক কি মর্বিড হয়ে পড়েননি একটু। নিষ্করুণ হয়ে যাননি কি মাত্রাতিরিক্ত রূপেই? অমানুষের মিছিলে একটিও মানুষের দেখা না পেয়ে মন যেন কেমন বিকল হয়ে যায়, মনে হয় নবকান্ত চরিত্রটির উপর আর একটু সুবিচার তিনি করতে পারতেন অনায়াসেই। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—মনোজ বসু। প্রকাশক—শ্রীঅশোককুমার সরকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

পুস্তকের তালিকা—১৯৬০

'বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা', এতদিনের এক সমূহ অভাব দূর করলেন। আলোচ্য তালিকাটিতে সভার সভ্য সব প্রকাশকগণেরই প্রকাশিত পুস্তকসমূহের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে যার ফলে পাঠক সমাজ বিশেষ ভাবেই উপকৃত হবেন। এরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক তালিকা প্রকাশের জন্য সভার নিকট সমগ্র পাঠক ও পুস্তক ক্রেতার পক্ষ হতে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তালিকাটি নিখুঁত ও প্রামাণ্য, এর অঙ্গসজ্জাও অতি সুন্দর। প্রকাশক—বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭।

নতুন স্বাদ

সাহিত্যক্ষেত্রে লেখক অপরিচিত নন, অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকগণের সামনের সারিরই একজন তিনি। বর্তমান গ্রন্থের নামেই শুধু নয় বিষয়বস্তুতেও এক নতুন স্বাদ এনেছেন তিনি। লেখকের মূল বক্তব্য, অতীন্দ্রিয় জগতের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয়। তিনি বলতে চেয়েছেন সংশয়মার্গ অপেক্ষা বিশ্বাসমার্গ অনেক শ্রেয়, একটি আধুনিকা যুক্তিবাদী মেয়ে কেমন করে যুক্তিহীন বিশ্বাস ও ভক্তির পথ অবলম্বনে ফিরে পেল তার অন্তরের স্থৈর্য্য, প্রাণের শান্তি, মনোরম একটি গল্পের মাধ্যমে তাই শুনিয়েছেন লেখক। সমগ্র কাহিনীটি বিবৃত করা হয়েছে কয়েকটি পুরোনো চিঠির দ্বারা, উপন্যাসের এই টেকনিক যে অভিনবত্বের দাবী করতে পারে একথা অনস্বীকার্য্য। লেখকের ভাষা সহজ ও সুন্দর কাহিনীটি স্বচ্ছন্দে বয়ে গিয়েছে ভাষার সহযোগিতায়, পাঠককে কোথাও খেতে হয় না অসঙ্গতির হোঁচট এবং পাঠ করে মন ভরে ওঠে তৃপ্তিতে বইটি সম্বন্ধে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় কথা। বইটির অঙ্গসজ্জা রুচিস্নিগ্ধ। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

শতবর্ষের শতগল্প (প্রথম খণ্ড)

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংকলন ও সংগ্রহ গ্রন্থের ছড়াছড়ি লক্ষ্যণীয়, এ ধরণের গ্রন্থে পাঠকরা বিনাশ্রমে বিশেষ ভাবে যে আনন্দলাভ করেন তা বৈচিত্র্যের। একখানি মাত্র বইয়ে বহু লেখকের রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁদের সেই দিক থেকে বিচার করতে হলে সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনস্বীকার্য্য। আলোচ্য পুস্তকখানি এক বৃহদাকার গল্প-সংগ্রহ, শুধু মাত্র গল্প-সংগ্রহ না বলে এখানিকে বাংলা ছোট গল্পের এক ধারাবাহিক ইতিহাস বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। বাংলা ভাষায় শতবর্ষ ধরে যেসব গল্প লেখা হয়ে আসছে সংকলয়িতা দুটি খণ্ডে তার এক সংহত রূপ দিতে প্রয়াসী, আলোচ্য খণ্ডটিই প্রথম, এতে বাংলা ভাষার প্রথম যুগের লেখক থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কয়েকজন লেখক-লেখিকার গল্প স্থান লাভ করেছে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতায়। মোট পঞ্চান্নটি গল্প আছে এতে, সংকলনকার্যে গ্রন্থকার যে বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন বইটি পড়লে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, বস্তুতঃ এমন একখানি মূল্যবান সংগ্রহ বোধ হয় কমই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। গল্পের আঙ্গিক আজকের দিনে যে রূপ নিয়েছে, বলা বাহুল্য অতীতে তা ছিল না। কিন্তু তার যে প্রাণসত্তা তা মূলতঃ একই, জীবন ও সমাজের নানা দিক নিয়ে সেদিনের গল্পকার যা ভেবেছেন আজকের কথাসাহিত্যিক ও তাই ভাবেন শুধু দেশ কাল ভেদে সেই ভাবনাই প্রকাশ পায় পরিবর্ত্তিত রূপে। তাই তখনকার গল্পে প্রতিফলিত হয় তৎকালীন মানুষের জীবনধারা এখনকার গল্পে ধরা দেয় আজকের মানুষের পথ চলার কাহিনী। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাসাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে, আলোচ্য সংগ্রহের গল্পগুলি পড়লে একথা সহজেই বোঝা যায়, একশো বছর আগের বাংলার মানুষ, বাংলার সমাজ কি ছিল তার একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মায় পাঠকের মনে। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে দেশ কাল ভেদে মানুষের রূপও রীতির আমূল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তার মূল সত্তা থাকে অবিকৃত। তাই তখনকার কাহিনীর রসে মজতে আধুনিক পাঠকের বাধে না একটুও কারণ রসের উৎস যে চিরকাল একই জায়গায় মানুষেরই আপন মনের গহনে, যে মনের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ অনাদিকাল থেকে একই রকম বৈচিত্র্যবাহী। সংগ্রহটির আঙ্গিক শোভন ও সুন্দর। এরূপ একটি মূল্যবান সংকলন উপহার দেওয়ার জন্য সংকলয়িতা পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। সম্পাদক—সাগরময় ঘোষ, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—পনেরো টাকা।

বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি গবেষণা পুস্তক, বাংলা সাহিত্যে আদি হতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সরসতা দেখা দিয়েছে প্রভূত শ্রম স্বীকার করে লেখক তার একটি ধারা বিবরণী প্রকাশ করেছেন। মানুষের অনুভূতির জগতে প্রধান দুই শক্তি হল সুখ ও দুঃখ স্মরণাতীত কাল হতেই মানুষ সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে এ জিনিষ তার সহজাত এর জন্য কোন প্রয়াস তাকে করতে হয়নি কোনদিন। এই স্বভাবসিদ্ধ মানব প্রকৃতিকে অনুসরণ করেই তার সৃষ্ট সাহিত্যেও এই দুইটি বিষয়ে প্রবণতা দেখা দেয় প্রথমাবধিই। মানুষ আনন্দে হাসে তাই সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষকে হাসানোর উপাদান তার ভিতর প্রকাশিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য আদিতে সে হাস্যরস প্রধানতঃ স্থূল ভঙ্গীতেই পরিবেশিত হত, কারণ সে যুগের মন সব বিষয়ের মোটা দিকটা গ্রহণেই অভ্যস্ত ছিল। আজকের দিনের পরিশীলিত মানসে সেদিনের রসিকতা ভাঁড়ামীর নামান্তর মাত্র, আজকের বিদগ্ধ মানুষকে হাসানোর জন্য চাই অনেক সূক্ষ্ম অস্ত্র তবু হাসির তাগিদ তাদেরও কিছু কম নয় আর সেজন্যই সাহিত্যে হাস্যরস বা সরস সাহিত্যে সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আজও রয়ে গেছে অপরিবর্ত্তিত। সাহিত্যের এই অন্যতম প্রধান দিকটি নিয়ে আলোচ্য পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, আদি যুগের গ্রন্থাদিতে হাস্যরসের কি ভূমিকা ছিল এখনই বা তা কি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হওয়া যায় পুস্তকটি পাঠ করলে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি সহ এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। আধুনিক যুগের সরস সাহিত্যস্রষ্টা ও তাঁদের সৃষ্টিরও এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় এতে। মোটের উপর সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা তার প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থখানিকে প্রামাণ্য বলে অভিহিত করা যায় স্বচ্ছন্দেই। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। লেখকের ভাষা সম্পূর্ণ বিষয়োচিত। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—চৌদ্দ টাকা।

মিত্রা

নতুন উপন্যাস "মিত্রা"। লেখিকা শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্তা সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠিতা আর মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তো অতি-পরিচিতা। বছর কয়েক আগে বসুমতীর পাতাতেই "মিত্রা"র ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছিল। জনচিত্তজয়ের অনেক প্রমাণ দিয়েছিল সে তখনই। তবু তখন-পাওয়া হালকা-ভারী প্রশংসা লেখিকাকে অহমিকায় আচ্ছন্ন করে ফেলেনি, তার প্রমাণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তিনি "মিত্রা"কে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করেছেন। মিত্রার মধ্যে তাই এমন একটা ঐক্য, এমন একটা দৃঢ়তা ফুটেছে যা আজ-কাল সাহিত্যে দুর্লভ হয়ে উঠছে ক্রমেই, বললে অত্যুক্তি হবে না। উপন্যাসখানি নায়িকা মিত্রাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মিত্রার তেজস্বিতা, মিত্রার বিদ্রোহ, মিত্রার মনের দ্বন্দ্ব—মিত্রাই "মিত্রা"র প্রাণ। কিন্তু লেখিকা বোধহয় আরও বেশী মমতা দিয়ে গড়েছেন শমিতকে। শমিতের পরিচয়, শমিতের তেতলার নির্জন ঘরখানি, শমিতের উদাত্ত গলার গান, কমলার সংগে তার মধুর সম্পর্কটুকু—সবটুকু নিয়ে শমিত একটা পরিপূর্ণ মানুষ, শমিত একটা বিশেষ কিছু। শমিতের অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখিকা এমনই সূক্ষ্ম তুলির হালকা টানে ফুটিয়েছেন যে বহুক্ষণ পর্য্যন্তই পাঠকের কাছে তা কেবলমাত্র অনুভববেদ্য, বাহ্যিক প্রকাশ নেই কোথাও।

লীলাকান্ত বোধ করি লেখিকার সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টি। বিরাট ধনীর সন্তান, শিক্ষিত, সুশ্রীও। এমন হাসতে পারত কারণে অকারণে যে সব ভুললেও তার সে হাসি ভোলেনি মিত্রা। তবু তাকে ভালবাসা যায় না কিশোরী মনের সবটুকু পবিত্রতা নিয়েও, শুধুমাত্র স্থূলতার বাধা পর্বতের আড়াল সৃষ্টি করে।

"মিত্রা" শুধু আঘাত-সংঘাতে, আনন্দে-বেদনায় গড়া নায়িকা মিত্রার কাহিনী নয়, "মিত্রা" আমাদের পরিচিত সমাজের লেখাচিত্র। মিত্রার শ্বশুরবাড়ীর বৃহৎ পরিবারের যে চিত্র লেখিকা এঁকেছেন, আমাদের অনেকেরই চেনা গণ্ডীতে অল্প-বিস্তর ইতরবিশেষে তেমন একটা পরিবারের খোঁজ পাওয়া যাবে। আর তেমন পরিবারের বাসিন্দাদের মধ্যে রাণীর দেখা যেমন মেলে, জয়ন্তী, পিসীমার দেখাও তেমনি পাওয়া যায়। স্বর্ণময়ী, শৈলনন্দিনীও বিরল নন মোটেই, বরং যে কোন একান্নবর্তী পরিবারেই একতা আজও যেটুকু বজায় আছে, তা এঁদেরই জন্যে, এঁরাই বাঁধন। লেখিকা সূক্ষ্মদৃষ্টির কারিগরিতে এর পাশাপাশি এঁকেছেন মিত্রার মামার বাড়ীর পরিবারটিকে—ধনী নন, অভিজাত নন, চাকুরিজীবী ভাইদের ছিমছাম ফিটফাট সংসার। আধুনিকতার প্রতীক, বিলাসের ভার নেই, সৌখীনতার ঔজ্জ্বল্য আছে আর সৌমীকে মানায় সেখানেই। শ্বশুরবাড়ীর আরাম-বিলাস আর মামার বাড়ীর আনন্দ-পরিবেশ—মিত্রা তাই দোটানায় পড়ে যায়।

লেখিকা স্বল্প কথায়, হাল্কা তুলির টানে এমন বহু গভীর চিত্র এঁকেছেন যা মনোহর। কৈশোরের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটা মেয়েকে যখন বিয়ের মানে বুঝতে হয় প্রাণহীন দেহ-ভোগের উপচার হয়ে, বছরগুলো যেখানে নতুন এক একটা অনাকাংখিত মাতৃত্বের দায় সূচনা করে আসে, সে মেয়েটার মন ও দেহের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে আর? যে তিক্ততায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরিয়েছিল মিত্রা, সে তিক্ততা থেকে রেহাই মেলেনি তবু। সমবয়সী গায়ত্রীর মাথার উজ্জ্বল সিঁথি, স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যে যত মাদকতা থাক, মিত্রার পরিবেশ, মিত্রার জীবনের গতি তার ধারে-কাছেও যেতে দেবে না···মিত্রার রেহাই মিলেছে লীলাকান্তের মৃত্যুতে, "মিত্রা" সেখানেই প্রস্তাবনা শেষ করে মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেছে। মিত্রার বৈধব্যের সূত্রপাত হতে লেখিকা প্রতিটি ধাপ গড়ে তুলেছেন নিপুণ হাতে। মৃতের বাড়ীতে দলে দলে সহানুভূতি জানাতে আসা আত্মীয়ের দল, হা-হুতাশ কিন্তু তাদের জীবিতদের ঘিরে—সে এক দৃশ্য···ক'টা মাসের ব্যবধানে রুগ্ন, রক্তশূন্য দেহটা স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে পুষ্ট হয়ে উঠেছে কোন মন্ত্রবলে—সামনের আয়নায় তারই প্রতিফলন···বারান্দার বসে পুজোর সলতে পাকাতে পাকাতে নিঃশব্দে পুত্রশোকের বেদনায় কেঁদে চলেছেন স্বর্ণময়ী···সামনে দিয়ে চলে যেতে সংকোচে পা উঠল না মিত্রার—সে এক দৃশ্য। এমন আরও অনেক ছোট বড় চিত্রের সমাবেশে মূল্যবান হয়ে উঠেছে উপন্যাসখানি। তারই মধ্যে আসছে মিত্রার জীবনে নতুন ছন্দ, ধীরে, অতি ধীরে—নিঃশব্দ চরণে। তারই পরিণতিতে "মিত্রা"র পরিসমাপ্তি। একটা যুগকে শ্রদ্ধা জানানোর সংযত পরিকল্পনায় লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা সার্থক হয়েছে। মিত্রার প্রকাশক—টি, এস, বি, প্রকাশন। মূল্য চার টাকা।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৫

প্রায় এক মাস পরে নবদ্বীপে আবার ফিরে এলো গঙ্গাসাগর-তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে সুলোচনা। ফিরে এলো বটে কিন্তু সে যেন সম্পূর্ণ অন্য এক সুলোচনা।

এক মাসের মধ্যে যেন তার বয়েসটা দশ বছর এগিয়ে গিয়েছে। পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখ—দু চোখে অসহায় শূন্য দৃষ্টি এবং একেবারে যেন বোবা! শুধু কি তাই, মাথার রগের দু'পাশের চুল পর্য্যন্ত পেকে গিয়েছে। গৃহে প্রবেশ করে যথারীতি সুলোচনা গুরুজনদের পদধূলি নিল কিন্তু কারো সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বললে না।

ইতিমধ্যে ঐ এক মাসে সুলোচনার স্বামী হরনাথ সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং একটু একটু করে তার পূর্বস্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি ফিরে পেয়েছিল।

সুলোচনাদের নৌকা যখন নবদ্বীপের ঘাটে এসে লাগে হরনাথ তখন গৃহে ছিল না। পিতার টোলে ছাত্রদের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিল।

গৃহে স্থানাভাব বশতঃ এবং কিছুদিন যাবৎ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রামানন্দ নিজ গৃহের কিছু দূরে অন্য এক গৃহে আর একটি টোল স্থাপনা করে পুত্র হরনাথের 'পরেই সেই টোলের ভার অর্পণ করেছিলেন।

হরনাথের অসুস্থ অবস্থায় সে সেখানে যেতে না পারায় রামানন্দকেই দুদিক বজায় রাখতে হতো কিন্তু পুনরায় হরনাথ সুস্থ হয়ে ওঠায় সেই কয়েক দিন ধরে টোলের ছাত্রদের শিক্ষাদান শুরু করেছিল।

দ্বিপ্রহরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে হরনাথ শুনলো সুলোচনারা গৃহে প্রত্যাগমন করেছে।

বাড়ির বধূ সুলোচনা, তখনকার দিনে দিবাভাগে স্বামি-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। তথাপি আহারে বসে হরনাথ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায় কিন্তু যাকে একটিবার দেখবার জন্য তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘোরা ফিরা করে তার ছায়াও সে দেখতে পায় না।

সত্যি কথা বলতে কি, সুলোচনা গোপালকে নিয়ে সাগরে বিসর্জন দিতে যাবার পর থেকেই তার মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ অহরহ যেন তাকে পীড়ন করতে থাকে।

কুৎসিত স্বার্থের একটা ক্লেদাক্ত গ্লানি যেন কোথায় তার মনের মধ্যে পীড়া দিতে থাকে। মনে হয়, সুলোচনার কাছে যেন সে অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে।

বহুবার তাই মনে হয়েছে সুলোচনা ফিরে এলে কেমন করে সে তাকে মুখ দেখাবে। সুলোচনা ফিরে এসেচে এবং গোপালকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে কথাটা শোনার পর থেকেই সেই পীড়নটা যেন তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং যত রাত হতে থাকে এবং সুলোচনার সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তটা ঘনিয়ে আসতে থাকে কি একটা অস্বোয়াস্তিতে যেন হরনাথ ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে।

রাত্রে আহারাদির পরই হরনাথ শয়নগৃহে প্রবেশ করতে পারে না। সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বহুক্ষণ সেখানে বসে থাকে। অনেক রাত্রে হরনাথ গৃহের আঙিনায় এসে যখন প্রবেশ করল, গৃহের সকলেই তখন নিদ্রাভিভূত।

সমস্ত গৃহ নিঝুম, স্তব্ধ। কোথায়ও কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু হরনাথ দেখতে পায় তার শয়ন ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। চোরের মতই যেন নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল হরনাথ নিজ শয়ন কক্ষের দ্বারে।

কক্ষের দ্বার ভেজান ছিল। তবু বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে একসময় আলতো ভাবে দরজার কপাটে আঙুল দিয়ে ঠেলতেই কপাট খুলে গেল।

হরনাথ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করল এবং প্রবেশ করেই আবার যেন থমকে দাঁড়াল।

খোলা জানালার সামনে পিছন ফিরে প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে ছিল সুলোচনা। স্বামীর পদশব্দে সে ফিরে দাঁড়াল। কক্ষের মধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল।

সেই দীপালোকে হরনাথ অদূরে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর দিকে তাকাল। সুলোচনা। ঐ কি তার স্ত্রী সুলোচনা? পরিধানে চওড়া লাল পাড় শাড়ী। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা তোলা। ঘোমটার দু'পাশ দিয়ে রুক্ষ তৈলহীন চুলের গোছা বক্ষের দু'পাশে নেমেছে। কপালে বড় সিন্দুরের কোঁটা এবং সীঁথিতে সিন্দুর।

দু'জনা দুজনার দিকে অপলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর ধীরে ধীরে সে পাষাণ প্রতিমা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে হরনাথের পায়ের সামনে

ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই হরনাথ বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই হাত বাড়িয়ে সুলোচনাকে স্পর্শ করতে যায়।

সুলোচনা—

কিন্তু তার পূর্বেই নিঃশব্দে ঈষৎ সরে দাঁড়িয়েছে সুলোচনা। মৃদুকণ্ঠে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করে, না—

সুলোচনা।

না, তুমি—তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

সুলোচনা।

না। আমার দেহের পাপ, আমার সংস্পর্শে পাপ, আমার নিঃশ্বাসে পাপ—

পাপ! কি বলচো তুমি সুলোচনা?

হ্যাঁ—এ পাপ শরীর আর তোমাকে স্পর্শ করতে দেবো না। সন্তান হত্যার পাপ আমাকেই একা বহন করতে দাও।

পাপ! কে বললে—সাগরজলে সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে তুমি দেবতার মানত পালন করেছো—পুণ্য।

না, না—সুলোচনা আরো দূরে সরে দাঁড়ায়। ক্ষমা করো তুমি আমাকে। কথাটা বলে সুলোচনা আর দাঁড়াল না। ঘরের বাইরে পা বাড়ায়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে হরনাথ। পথ রোধ করে দাঁড়ায় সুলোচনার—সুলোচনা!

হ্যাঁ, তোমাদের কাছে যা মানত—আমার কাছে তা হত্যা।

হত্যা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—হত্যা—হত্যা ছাড়া সাগরে নিজের শিশুসন্তানকে বিসর্জন দেওয়া আর কি বলতে পারো। দেবতার কাছে মানত পালন নয়, ওটা হত্যা—মহাপাপ করেছি আমি। আর তার প্রায়শ্চিত্তও আমিই করবো।

কথাগুলো বলে শান্ত দৃঢ়পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সুলোচনা। আর ঘরের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো হরনাথ। বাকী রাতটুকু হরনাথ তারপর পায়চারি করেই কাটিয়ে দেয়।

পরের দিন রাত্রে আর শয়নকক্ষেই এলো না। কক্ষের দরজা খুলে রেখে হরনাথ বৃথাই অপেক্ষা করলো। কিন্তু তৃতীয় রাত্রে হরনাথ কেবল স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষাতেই কাটাতে পারল না, গভীর রাত্রে একসময় সুলোচনার অনুসন্ধানে কক্ষের বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

মাঘের প্রচণ্ড শীতে হাড়ে কাঁপুনী ধরায়। এই প্রচণ্ড শীতে কোথায় গেল সুলোচনা! এদিক-ওদিক তাকায় হরনাথ কিন্তু কোথায়ও দেখতে পায় না সুলোচনাকে।

খুঁজতে খুঁজতে হরনাথ আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। বিরাট আঙিনাটা যেন মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

আশ্চর্য! কোথায় গেল সুলোচনা?

আঙিনা অতিক্রম করে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই হরনাথের নজরে পড়লো খিড়কীর দুয়ারটা হা-হা করছে খোলা।

এত রাত্রে খিড়কীর দুয়ার খোলা কেন?

বিস্মিত হরনাথ খিড়কীর দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। খিড়কীর দুয়ার পার হয়ে কাছ হাতেকও নয় গঙ্গা। গঙ্গার ঘাটে যে বিরাট ঝোড়া নিমের গাছটা তারই নীচে বাঁধানো বেদীটার উপরে হরনাথের নজরে পড়ে একটি ছায়ামূর্তি। ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আবছা সেই ছায়ামূর্তি দেখা যায়।

কে! কে ওখানে?

হরনাথ দ্রুত এগিয়ে যায় ঘাটের দিকে এবং কয়েক পা অগ্রসর হতেই হরনাথ বুঝতে পারে, সেই ছায়ামূর্তি কোন নারীর। কিন্তু মাঘের এই প্রচণ্ড শীতে কে বসে ঐ নারী এই মধ্যরাত্রে গঙ্গার ঘাটে!

আরো একটু অগ্রসর হবার পর হরনাথের সেই নারীমূর্তিকে চিনতে কষ্ট হয় না।

সুলোচনা।

এবারে একেবারে পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ায় হরনাথ।

কিন্তু সুলোচনার কোন হুঁশ নেই। প্রস্তর মূর্তির মতই সে বসে আছে।

সুলোচনা!

কে!

ঘরে চল সুলোচনা!

ঘরে?

হ্যাঁ।

না।

চল সুলোচনা ঘরে চল।

যেতে পারি এক সর্তে।

বল সুলোচনা, কি তোমার সর্ত?

তুমি আবার বিবাহ করবে বল?

বিবাহ! কি বলচো তুমি!

হ্যাঁ, এই গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে যদি তুমি কথা দাও যে তুমি আবার বিবাহ করবে, তবেই তোমার ঘরে আমি যাবো।

সুলোচনা।

বল।

তুমি আমার স্ত্রী বর্তমান থাকতে আবার আমি বিবাহ করবো? না—না—তা হয় না তা হতে পারে না।

কেন হতে পারবে না? আমার শ্বশুরকুলের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না—না—এ হতে পারে না।

কে বলেছে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। আবার তো আমাদের সন্তান হতে পারে।

কিন্তু তার তো আর সম্ভাবনা নেই।

কে বলেছে সম্ভাবনা নেই?

না নেই—আমার দিক থেকে তার আর কোন সম্ভাবনাই নেই—

সুলোচনা।

না। আমি তো বলেছি, তোমাকে আর আমি স্পর্শ করতে পারবো না।

তার মানে আমার সঙ্গে তুমি আর কোন সম্পর্কই সত্যি সত্যি রাখবে না এই কি তুমি বলতে চাও সুলোচনা!

হ্যাঁ। শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় সুলোচনা।

হরনাথ যেন বোবা হয়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দই আর যেন নির্গত হয় না। অখণ্ড একটা

স্তব্ধতা যেন থমথম করতে থাকে। একটানা গঙ্গাস্রোত বয়ে চলে কেবল। অনেকক্ষণ পরে হরনাথ মৃদু কণ্ঠে ডাকে সুলোচনা!

বল।

সত্যিই কি এই তোমার মনের কথা?

হ্যাঁ।

বেশ। তবে তাই হবে—

প্রতিজ্ঞা করো।

প্রতিজ্ঞা করলাম। তুমি যা বলছো তাই হবে। এবার ঘরে ফিরে চল।

চল।

দু'জনে অতঃপর ফিরে এলো গৃহে।

কিন্তু কথাটা কে বলবে? হরনাথও বলে না, সুলোচনাও বলে না। দু'জনে এক ঘরে রাত্রি যাপন করে কিন্তু পৃথক শয্যায়। এমনি করেই এক মাস কেটে যায়।

অবশেষে একদিন সুলোচনাই কথাটা কৌশলে কালীতারার কাছে সন্ধ্যার সময় গাত্র মার্জনা করতে এসে উপাপন করে, তোমার ভায়ের আবার বিয়ে দাও দিদি—

ও আবার কি কথা? কালীতারা বলে।

ঠিকই বলছি দিদি। শোন, একটা কথা কয় দিন ধরেই তোমাকে বলবো বলবো ভাবছিলাম।

কি কথা রে বৌ!

গঙ্গাসাগরের পথে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, শাস্ত্রী ঠাকুর তোমাদের বলেননি?

কি?

গোপালকে নিয়ে নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম।

সে কি?

হ্যাঁ—সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখন হাত-পা শিথিল হয়ে ডুবে যাচ্ছি তখন এক মুসলমান মাঝি আমাকে বাঁচায়—

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ। এ দেহ মুসলমানদের স্পর্শে কলঙ্কিত হয়েছে—এ দেহ তো আর দেবতার ভোগে লাগতে পারে না?

হরনাথ, হরনাথ এ কথা জানে? কালীতারা রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্নটা করে ভ্রাতৃজায়াকে।

জানে। তাই বলছিলাম দিদি, তোমার ভাইয়ের আবার বিবাহ দাও। তোমার দাদাকেও আমি বলেছি আবার বিবাহ করবার জন্য—তিনি—

কি, কি—বলেছে সে?

সে বিবাহ করতে স্বীকৃত।

তারপর তোর? তোর কি অবস্থা হবে?

কি আমার হবে! দয়া করে যদি তোমরা স্থান দাও তো এ বাড়িতে থাকবো, নচেৎ—

নচেৎ?

মা গঙ্গা তো আছেন।

কিন্তু মুসলমানস্পৃষ্টা কুলবধূ তুই যে এই ভাবে সংসারে প্রবেশ করে অমঙ্গল ঘটালি এর কি হবে? বাবা জানতে পারলে—

তাই তো আমি মনে মনে স্থির করেছি, শ্বশুর মশাইয়ের কাছে অকপটে সব প্রকাশ করে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি তিনি দেন সেই প্রায়শ্চিত্তই মাথা পেতে নেবো।

কালীতারা যেন চমকে ওঠে। বলে, না, না—জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক এই পাপ এই অমঙ্গলের কথা বাবা একবার জানতে পারলে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করবেন।

কালীতারা মিথ্যা বলেনি। ব্যাপারটা এখন একবার তার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামানন্দ মিশ্রর কানে উঠলে এই নদীয়া সমাজে আর কারোই কথাটা জানতে বাকী থাকবে না এবং যার ফলে সারা সমাজে একটা বিশ্রী ঢি ঢি পড়ে যাবে। তার চাইতে যা আজ পর্যন্ত গোপন আছে তা গোপনই থাক।

প্রায়শ্চিত্ত যা কিছু করার তা গোপনেই করে যাবে।

অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক ঐ কালীতারা। যে পাপের প্রায়শ্চিত্তর জন্য অন্য সময় হলে কালীতারা একটা হুলস্থুল বাধিয়ে তুলত সেই কালীতারাই এখন স্বার্থের জন্য সেই পাপকেই চাপা দিয়ে গেল।

সুলোচনা আবার প্রশ্ন করে, তা হ'লে কি হবে দিদি?

সে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। যা ব্যবস্থা করবার আমিই করবো। তুই কেবল ঠাকুরঘরে প্রবেশ করবি না আর—

সুলোচনা কালীতারার মুখের দিকে তাকাল।

দাদাকে—দাদাকে স্পর্শ করিস না।

সুলোচনার চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে।

সেই জলভরা দুটি চক্ষু কালীতারার মুখের দিকে তুলে বলে, সাগর থেকে ফিরে এসে আজ পর্যন্ত ছুঁইনি আর ছোঁবো না—যত দিন বেঁচে থাকবো।

পারবি?

পারবো। পারবো। তুমি তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করো দিদি—

ব্যবস্থা আমি করবো। কালীতারা মৃদু কণ্ঠে বলে।

কথাটা বলে কালীতারা আর দাঁড়াল না। গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে গৃহের দিকে চলে গেল। আর সেই সন্ধ্যার ছায়া-ঘন গঙ্গার তীরে সহসা বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে কালীতারা, মা গঙ্গা, ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো। তোমার কূলে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলেছি—কিন্তু আর যে এ অভাগিনীর উপায় ছিল না মা, উপায় ছিল না।

সপ্তাহ কাল মধ্যেই মিশ্রগৃহে সাড়া পড়ে গেল, হরনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চলেছে কৃষ্ণনগরে। মেয়েটি সুলক্ষণা—আয়ুষ্মতী।

[ক্রমশঃ।

"When a dog bites a man, that is not news, because it happens so often. But if a man bites a dog, that is news." —*John B. Bogart*
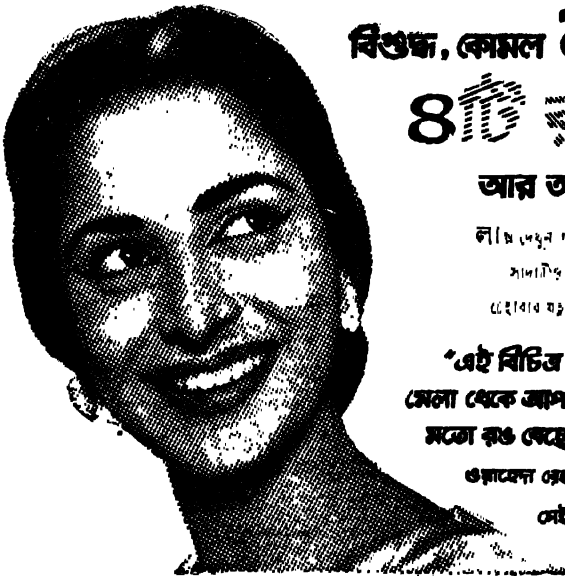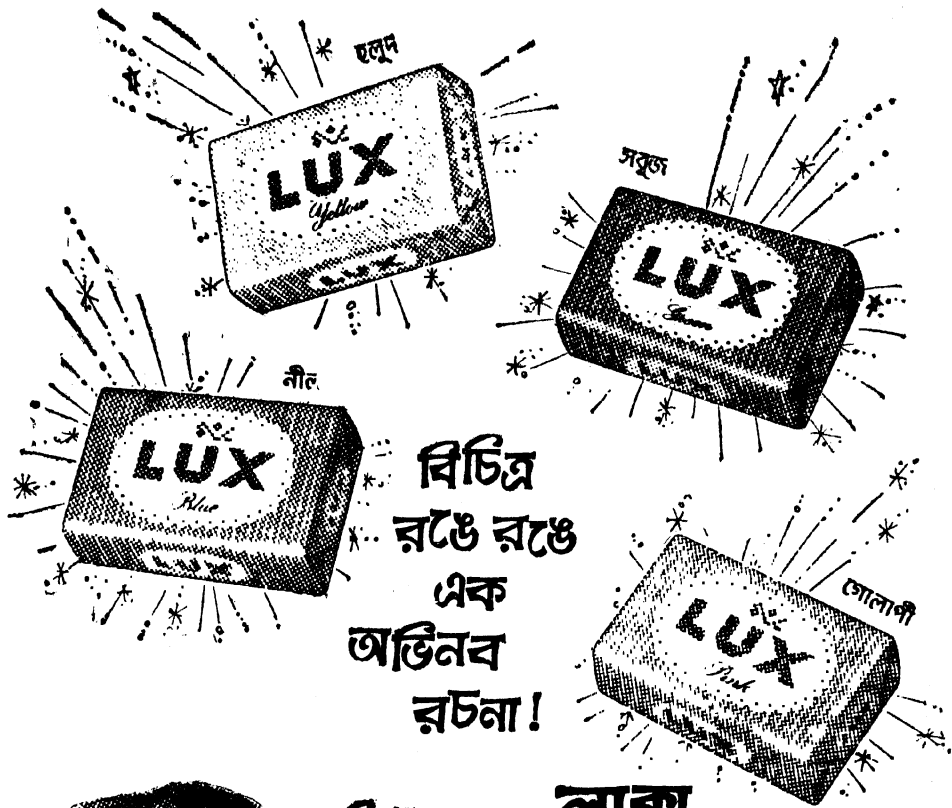
হলুদ
LUX
Yellow
সবুজ
LUX
নীল
LUX
Blue
গোলাপী
LUX
Pink
বিচিত্র
রঙে রঙে
এক
অভিনব
রচনা!
বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
বিচিত্র বরণ আর মানানসই রঙীন মোড়ক!
প্রতিটিই আপনার অতি প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—
নিতে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।
"এই বিচিত্র রঙের
মেলা থেকে আপনার মনের
মতো রঙ বেছে নিন!"
ওয়াহেদা রেহমানও
সেই কথাই বলেন
LUX
LTS.61-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
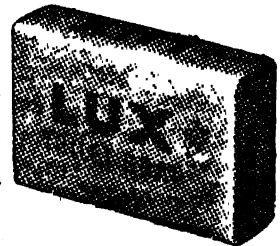
রবীন্দ্রসংগীত ॥ গায়কের গুণ ও দোষ

ধ্বনির মাহাত্ম্য সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমাদের কণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি উদ্ভূত হয় তা আমরা ব্যবহার করি ভাব-প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এই ভাব-প্রকাশ হয় দুই রূপে—ভাষায় ও গানে। মানুষ প্রথম যখন আবিষ্কার করল যে তার কণ্ঠস্বরে ভাষা দ্বারা ভাব-প্রকাশ করা ছাড়াও আর একটি গুণ বিদ্যমান, যাকে বলা হল সুর—সেই সময় থেকে মানুষের গায়কপদবাচ্য হওয়া পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে গায়ক শব্দের অর্থ অতি সাধারণ লোকও জানেন। কিন্তু কি কি গুণ থাকলে এবং কি কি দোষ থেকে মুক্ত হলে সত্যিকারের গায়ক হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে রাগসংগীতের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও তেমনি বিস্তারিত বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

গায়কের প্রত্যক্ষ গায়ন-ক্রিয়ার দুটি দিক আছে। তার মধ্যে একটি হল নিজস্ব সাধনার দিক এবং অপরটি হল সেই সাধনালব্ধ ফল কণ্ঠের সাহায্যে পরিবেশনের দ্বারা রসসৃষ্টির দিক। উত্তরোত্তর অধিকতর নিপুণতার সহিত রসসৃষ্টি করার অধিকার অর্জনের জন্য গায়ক জীবনব্যাপী সাধনা করেন। এই সাধনায় তিনি গুণের অধিকার অর্জন ও দোষ বর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকলে তবেই রসসৃষ্টিতে তাঁর যথার্থ অধিকার জন্মে। কারণ, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে গুণের প্রভাব বা দোষের ছায়া পড়েই।

আমাদের প্রাচীন সংগীতাচার্যদের মধ্যে শার্ঙ্গদেব অন্যতম। তিনি তাঁর বিখ্যাত সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে উত্তম গায়কের কতকগুলি লক্ষণ বা গুণ বর্ণনা করেছেন। যথা :

> হৃদ্যশব্দঃ সুশারীরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ ॥
> রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ।
> প্রবন্ধগাননিষ্ণাতো বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ ॥
> সর্বস্থানোত্থগমকেষ্বনায়াসলসদ্‌গতিঃ
> আয়ত্তকণ্ঠস্তালজ্ঞঃ সাবধানো জিতশ্রমঃ ॥
> শুদ্ধচ্ছায়ালসাভিজ্ঞঃ সর্বকাকুবিশেষবিৎ।
> অনেকস্থায়সঞ্চারঃ সর্বদোষবিবর্জিতঃ ॥
> ক্রিয়াপরো যুক্তলয়ঃ সুঘটো ধারণান্বিতঃ।
> স্ফূর্জন্নির্জবনো হারিরহঃকৃদ্ভজনোদ্ধুরঃ ॥
> সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈর্গীয়তে গায়নাগ্রণীঃ।

উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে উত্তম গায়কের লক্ষণ হিসাবে ক্রমান্বয়ে এই তেইশটি গুণের উল্লেখ আছে। হৃদ্যশব্দ, সুশারীর, গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ, রাগ-রাগাঙ্গ-ভাষাঙ্গ-ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদ, প্রবন্ধগাননিষ্ণাত, বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ, সর্বস্থানোত্থগমকেষ্বনায়াসলসদ্‌গতি, আয়ত্তকণ্ঠ, তালজ্ঞ, সাবধান, জিতশ্রম, শুদ্ধচ্ছায়ালসাভিজ্ঞ, সর্বকাকুবিশেষবিৎ, অনেকস্থায়সঞ্চার, সর্বদোষবিবর্জিত, ক্রিয়াপর, যুক্তলয়, সুঘট, ধারণান্বিত, স্ফূর্জন্নির্জবন, হারিরহঃকৃৎ, ভজনোদ্ধুর ও সুসম্প্রদায়। এই লক্ষণগুলি সম্বন্ধে উক্ত ক্রমানুযায়ী আলোচনা না করে আমরা প্রথমে (ক) রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে যেগুলি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য সেগুলি সম্বন্ধে এবং পরে (খ) অবশিষ্টগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ক—

১। হৃদ্যশব্দ—মনোহর কণ্ঠের অধিকারী ॥ যে-কোনো দেশের যে-কোনো ধারার সংগীতের জন্য মনোহর কণ্ঠের প্রয়োজন। মনোহর কণ্ঠ বলতে শুধু শ্রুতিমধুর কণ্ঠই নয়, সুরেলা কণ্ঠও বটে।

২। সুশারীর—উত্তম 'শারীর' যুক্ত ॥ সুশারীর—তার সপ্তকে অনায়াস-গতিক্ষম, অনুরণনযুক্ত, সুমধুর, মনোরঞ্জক, গাম্ভীর্যাদিযুক্ত কণ্ঠ। এই গুণাবলীর কতকাংশ স্বভাবজ এবং অধিকাংশ সাধনা-লব্ধ। স্বভাবজ গুণাবলীও যে সাধনা দ্বারা উৎকৃষ্টতর হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩। আয়ত্তকণ্ঠ—যিনি স্বাধীন ভাবে কণ্ঠস্বর প্রয়োগে সক্ষম ॥ এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। প্রত্যেক গায়কের কণ্ঠকে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত জোর দিয়ে কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করা যেমন ক্ষতিকর, আবার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠকে চেপে গাওয়াও হানিজনক। উভয় ক্ষেত্রেই কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা ও স্থায়িত্ব নষ্ট হতে বাধ্য।

৪। তালজ্ঞ—তালে কুশল ॥ রবীন্দ্র-সংগীতের ক্ষেত্রে তালের এই কুশলতা সর্বপ্রকার তালেই আয়ত্ত করা বাঞ্ছনীয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গায়ক দাদ্‌রা, কাহারবা প্রভৃতি সহজ তালের গান পরিবেশন করেই কৃতিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন। তাতে শ্রোতৃসাধারণের পক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত তাল সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৫। সাবধান—সাবধানী। 'সাবধান' শব্দটি উল্লেখ করার বিশেষত্ব এই যে, গায়ক গানের সুর, তাল, লয়, বাণী ইত্যাদির বিশুদ্ধতা রক্ষায় সতর্ক থেকেও গানের দ্বারা রস-সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবেন।

৬। জিতশ্রম—গানে যাঁর ক্লান্তি নেই। এই গুণটি আয়ত্ত করতে হলে নিয়মিত সাধনার প্রয়োজন। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে

দেখা যায়, এক-এক জন গায়ক একই আসরে কত দীর্ঘসময়ব্যাপী সংগীত পরিবেশন করেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র-সংগীতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, গায়ক অল্প কয়েকটি গান গেয়েই 'আর পারছি নে' 'গলা ধরে গেল' বলে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেন। এটা যে নিয়মিত সাধনার অভাব, সন্দেহ নেই—কোনো দিন গলার অসুস্থতা ঘটলে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

৭। সর্বদোষ-বিবর্জিত—সব দোষ থেকে মুক্ত। বলতে পারা যায়, সব দোষ থেকে মুক্ত হলে তো চুকেই গেল, এটা তো সোজা কথা। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে—গানে দুষ্টতা আসে কিসের থেকে। প্রধানত গানের সুর-তাল-লয়-বাণীর অশুদ্ধতা থেকে। তা ছাড়া, গায়কের পরিবেশন রীতি, পরিবেশনের স্থান, কাল ও পাত্র ও (শ্রোতা) তৎসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

৮। ক্রিয়াপর—গানক্রিয়ার অভ্যাসে তৎপর। এ বিষয়ে বিস্তার অনাবশ্যক। অভ্যাসে তৎপর না হলে কোনো দেশের কোনো কালের কোনো সংগীতই আয়ত্ত করা যায় না।

৯। যুক্তলয়—বিভিন্ন প্রকার লয়-প্রয়োগে নিপুণ। গতি নির্দিষ্ট না হলে যেমন গম্যস্থানে পৌঁছনো সম্ভব হয় না, তেমনি গানের যথানির্দিষ্ট লয় রক্ষা না করলে রস-সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

১০। ধারণান্বিত—উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী। রবীন্দ্র-সংগীতের পক্ষে এই গুণের অধিকার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সংগীতের সংখ্যাধিক্য হেতু, অনেক গানের সুরের পরস্পর নিকট-সাদৃশ্য হেতু এবং সূক্ষ্ম অলংকরণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য 'ধারণান্বিত' না হলে গীতি-রূপ রক্ষা করা কঠিন।

১১। হারিরহকৃৎ—যাঁর গানের প্রভাবে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হন। মুগ্ধ করার জন্য গায়কের সুকণ্ঠ ও পরিবেশন-ক্ষমতা যেমন প্রয়োজন, মুগ্ধ হওয়ার জন্য শ্রোতৃগণের গ্রহণ-ক্ষমতারও তেমনি প্রয়োজন।

১২। সুসম্প্রদায়—উত্তম গুরুপরম্পরাশীল। রবীন্দ্রসংগীতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব দেখা যায়। যেহেতু অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের সুর সৌভাগ্যবশত: স্বরলিপি-বদ্ধ হয়ে রক্ষিত হয়েছে, সেই স্বরলিপির জ্ঞানকে মাত্র সম্বল করেই উত্তম গুরুপরম্পরা-শীলতার প্রয়োজন যে অস্বীকার করা যায় না, এ কথা বোদ্ধা ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করবেন। তা ছাড়া, এরূপ ধারণা ভারতবর্ষের চিরাচরিত সংগীত-চিন্তার বিরোধী।

সংগীত-রত্নাকরে উল্লিখিত গায়কের গুণাবলীর মধ্যে পূর্বালোচিত বারোটি গুণ রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। অবশিষ্ট বারোটি গুণ রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগযুক্ত না হলেও বিশেষ ভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

১৩। গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ—গানের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়ায় কুশল।

১৪। রাগ-রাগাঙ্গ-ভাষাঙ্গ-ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদ—রাগ, রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানবান।

১৫। প্রবন্ধগাননিষ্ণাত—প্রবন্ধগানে নিপুণ।

১৬। বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ—নানা প্রকার আলাপের তত্ত্বে কুশল।

১৭। সর্বস্থানোত্থগমকেষনায়াসলসদ্গতি—অনায়াসে মন্দ্র, মধ্য ও তারস্থানব্যাপী গমক প্রয়োগে সক্ষম।

১৮। শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞ—যিনি শুদ্ধ, ছায়ালগ্ ইত্যাদি রাগভেদ জানেন।

১৯। সর্বকাকুবিশেষবিৎ—সর্বপ্রকার কাকু-বিশেষজ্ঞ।

২০। অনেকস্থায়সঞ্চার—বহু রাগের প্রয়োগে সমর্থ।

২১। সুঘট—স্বর, বর্ণ ও তাল যথাযোগ্য ভাবে সংযোজন করতে সক্ষম।

২২। স্ফূর্জন্নির্জবন—'নির্জবন' নামক বিশেষ রাগাবয়ব যথাযথ প্রয়োগক্ষম। নির্জবন—যে রাগাবয়বের সরল, সুমধুর ও রাগবাচক স্বর ক্রমশ: সূক্ষ্মতর হয়।

২৩। তজনোদ্ভব—রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে অভিজ্ঞ।

এই তো গেল গুণের কথা। এবার গায়কের দোষ-প্রসঙ্গে আসা যাক। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে গায়কের পঁচিশ প্রকার দোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, যথা—

> সংদষ্টোদ্‌ঘৃষ্টসূৎকারিভীতশঙ্কিতকম্পিতাঃ।
> করালী বিকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্ভটাঃ॥
> ঝোম্বকস্তুম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ।
> বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থানভ্রষ্টোঽব্যবস্থিতাঃ॥
> মিশ্রকোঽনবধানশ্চ তথান্যঃ সানুনাসিকঃ।
> পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গায়না নিন্দিতা মতাঃ॥

এই শ্লোকগুলিতে গায়কের পঁচিশটি দোষ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ আছে, যথা—১। সংদষ্ট। ২। উদ্‌ঘৃষ্ট। ৩। সূৎকারী। ৪। ভীত। ৫। শঙ্কিত। ৬। কম্পিত। ৭। করালী।

৮। বিকল। ৯। কাকী। ১০। বিতালা। ১১। করভ। ১২। উদ্ভট। ১৩। ঝোম্বক। ১৪। তুম্বকী। ১৫। বক্রী। ১৬। প্রসারী। ১৭। নিমীলক। ১৮। বিরস। ১৯। অপস্বর। ২০। অব্যক্ত। ২১। স্থানভ্রষ্ট। ২২। অব্যবস্থিত। ২৩। মিশ্রক। ২৪। অনবধানক। ২৫। সানুনাসিক। এই পঁচিশটির মধ্যে বাইশটি দোষ রবীন্দ্র-সংগীতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য। প্রথমত সেই বাইশটি দোষের অর্থানুসন্ধান করা যাক। তার মধ্যে অধিকাংশগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই রবীন্দ্র-সংগীতের নিত্যনৈমিত্তিক পরিবেশনের ক্ষেত্রে দোষগুলির সন্ধান পাবেন।

১। সংদষ্ট—যিনি দাঁত চিবিয়ে গান করেন।

২। উদ্‌ঘৃষ্ট—যিনি রসহীন ভাবে চীৎকার করেন।

৩। সূৎকারী—গাওয়ার সময় যিনি অবাঞ্ছিত আওয়াজ করেন।

৪। ভীত—যিনি ভীতভাবে গান করেন।

৫। শঙ্কিত—যিনি গাওয়ার সময় অনাবশ্যক তাড়াহুড়া করেন।

৬। কম্পিত—গাওয়ার সময় যাঁর শরীর ও কণ্ঠস্বর কম্পিত হয়।

৭। করালী—অতিরিক্ত হাঁ করে ভয়ানক ভাবে যিনি গান করেন।

৮। বিকল—যাঁর কণ্ঠস্বর ঠিক-ঠিক শ্রুতিস্থানে পৌঁছয় না। এ বিষয়টি রবীন্দ্র-সংগীত-অনুশীলনকারিগণের বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কারণ কণ্ঠস্বর ঠিক-ঠিক শ্রুতিস্থানে না পৌঁছলে গীতি-রূপ খর্ব হয়, যার অনিবার্য ফল রসভঙ্গ।

৯। কাকী—যাঁর কণ্ঠ কাকের মতো কর্কশ।

১০। বিতালা—বেতালা।

১১। করভ—যিনি ঘাড় অতিরিক্ত উঁচু করে গান করেন।

১২। উদ্ভট—যিনি মুখ বিকৃত করে গান করেন।

১৩। ঝোম্বক—যিনি গলা ফুলিয়ে গান করেন।

১৪। তুম্বকী—যিনি গাল ফুলিয়ে গান করেন।

১৫। বক্রী—যিনি ঘাড় হেলিয়ে গান করেন।

১৬। প্রসারী—যিনি হাত পা ছড়িয়ে গান করেন।

১৭। নিমীলক—যিনি চোখ বুজে গান করেন। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলতে পারেন চোখ বুজে গান করলে গানের ভাব প্রকাশের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানে গায়ক কর্তৃক পরিবেশিত গানের ভাব সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী না হলেও অন্ততঃ আংশিক শ্রোতৃমণ্ডলী সর্বতোভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন সেখানে গায়ক চক্ষু নিমীলন করে ভাবরাজ্যের স্বতন্ত্র কোষ্ঠে চলে গেলে শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব।

১৮। বিরস—যাঁর গান নীরস।

১৯। অব্যক্ত—যাঁর বাণী (উচ্চারণ) অস্পষ্ট।

২০। স্থানভ্রষ্ট—যাঁর কণ্ঠ তিন সপ্তকের ঠিক ঠিক স্বরস্থানে পৌঁছয় না। গায়কের পক্ষে এর চাইতে বড়ো দোষ বা অপরাধ আর নেই। সোজা কথায় যাকে বলা হয় বেসুরো গাওয়া। প্রত্যেকটি স্বরের প্রয়োগেই এ বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যক।

২১। অব্যবস্থিত—যিনি সুশৃঙ্খলভাবে গাইতে পারেন না।

২২। সানুনাসিক—যিনি নাকি-সুরে গান করেন।

অবশিষ্ট তিনটি দোষ রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত না হলেও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ, কণ্ঠস্বর ঠিক ঠিক স্বরস্থানে না পৌঁছলে এবং একই অধিবেশনে পরিবেশিতব্য গানের নির্বাচন সুষ্ঠু না হলেই এই-সব ত্রিদোষজ সমস্যা উদ্ভূত হয়।

২৩। অপস্বর—যিনি বর্জনীয় স্বর প্রয়োগ করেন।

২৪। মিশ্রক—যাঁর গায়নে শুদ্ধ ছায়ালগ আদি রাগ মিশ্রিত হয়ে যায়।

২৫। অনবধানক—গাওয়ার সময় যথাক্রম বিকাশে যাঁর লক্ষ্য থাকে না।

এ পর্যন্ত আমরা শার্ঙ্গদেব কর্তৃক সংগীত-রত্নাকরে উল্লিখিত গায়কের গুণ ও দোষের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীত-গায়কের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে যে-সব দোষের সন্ধান মেলে অতঃপর তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। এই চর্চার ক্ষেত্রে সর্বদাই যে-কথাটি মনে জাগরূক রাখা উচিত, সেটি হল রবীন্দ্রসংগীত-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ।

এই আদর্শ রক্ষিত হয় শিক্ষা-ক্ষেত্রে ও পরিবেশন-ক্ষেত্রে। শিক্ষা-ক্ষেত্র সম্পর্কিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বহির্ভূত। সেজন্য পরিবেশন-ক্ষেত্র সম্পর্কে দু-চার কথা বলব।

বর্তমানে বহু গায়ক-গায়িকা নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁদের কি আদর্শ হওয়া উচিত? মূল সুরকারের মনমেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের নিজের মনের ও 'গাওনে'র তারগুলি নিখুঁত ভাবে বেঁধে নেওয়াই আদর্শ হওয়া উচিত।

সামান্য দোষত্রুটিগুলি বাদ দিলেও রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশনের অনেক ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান দোষ প্রকট হয়ে পড়ে, যথা—আনুষঙ্গিক যন্ত্র-নির্বাচনের দোষ, স্বরের গুণধর্ম সম্বন্ধে সততা ও গান নির্বাচনে সুবিবেচনার অভাব।

যে কয়টি বিশেষত্বের গুণে মানুষের কণ্ঠস্বর সংগীতের স্বর-রূপে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হল অনুরণনশীলতা। ভারতীয় সংগীতের পূর্বাচার্যগণ এমন সকল আনুষঙ্গিক যন্ত্র নির্বাচন করে গেছেন, যার সঙ্গে সহযোগিতার ফলে কণ্ঠস্বরের এই অনুরণনশীলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে অনুষঙ্গের উদ্দেশ্যে এই পন্থাকেই বরণ করেছিলেন। কিন্তু এই পন্থাকে বর্জন করা সংগীত তথা রবীন্দ্র-সংগীতের পক্ষে হানিজনকও বটে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগৌরবের বিষয়ও বটে।

স্থানভেদে, উচ্চারণভেদে ও গতিভেদে স্বরে যে পরিবর্তন হয়ে ধ্বনির মাহাত্ম্য প্রকাশ করে তাকে স্বরের গুণধর্ম বলে। রবীন্দ্র-সংগীতে স্বরের এই গুণধর্ম বাণীর অর্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গায়ক-গায়িকাকে গানে এই বিষয়টি ঠিকভাবে পরিস্ফুট করতে হলে সংগীতের জ্ঞান যেমন প্রয়োজন, তেমনি সাহিত্যিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন। তা না হলে স্বরের মৃদুতা ও প্রবলতার জন্য গানের বাণীর ভাবের যে জীবন্ত রূপ ধারণ করবার কথা তা অচেতন বা অর্ধচেতন থেকে যায়।

বর্তমানকালের কয়েকটি মাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠান শুনলেই শ্রোতাগণ উপলব্ধি করবেন যে অধিকাংশ শিল্পী পরিবেশনের জন্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা তাল ও লয়ের রবীন্দ্র-সংগীত নির্বাচন করে থাকেন। অবশ্য এরূপ গান প্রস্তুতির জন্ত অভ্যাস ও পরিশ্রম কম করলেই চলে। কিন্তু তাতে সাধারণ শ্রোতাদের এরূপ ধারণা হয় যে, সব রবীন্দ্রসংগীতই বুঝি হাল্কা তাল ও লয়ের। এই কারণে তাঁরা এ রকম গান শুনতেই অভ্যস্ত হয়ে যান। আবার শিল্পী মনে করেন, যেহেতু শ্রোতাগণ উক্ত রূপ গানই শুনতে ভালোবাসেন, অতএব তাই গাওয়াই সমীচীন। কিন্তু সংগীতশিল্পের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্পী প্রধান কর্তা হলেও পরিবেশনের ক্ষেত্রে রস-সৃষ্টিতে শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই ন্যূনাধিক দায়িত্ব আছে। সমঝদার শ্রোতার তীক্ষ্ণ সমালোচনায় শিল্পী যেমন নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হন, শ্রোতাও নিজের গুণগ্রাহিতার মান উন্নয়নে শিল্পীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারেন। সেজন্ত শিল্পীর কর্তব্য হওয়া উচিত সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত-সৃষ্টির সঙ্গে শ্রোতার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। তা আপাতত কিছু অসুবিধে বোধ হলেও সে অসুবিধে অনিবার্য নয়। মনে রাখতে হবে।

'সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে! আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না।

'একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সঙ্গে যোগ সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

'এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।'১

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আমার কথা (৭৪)

শ্রীমতী মাধবী ব্রহ্ম

বাংলার সঙ্গীতাকাশে যে কয়েকজন মহিলা-শিল্পী স্বীয় খ্যাতিতে জাজ্বল্যমান শ্রীমতী মাধবী ব্রহ্ম তাঁহাদের অন্যতমা। অসময়ে বাড়ীর দরজায় আঘাত করতেই হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন শ্রীমতী ব্রহ্ম। আচরণ যে কতো ভদ্র এবং ব্যবহার যে কত মধুর হতে পারে তারই প্রমাণ পেলাম এক মুহূর্তে। ভূমিকা না করেই জানালাম আগমন উদ্দেশ্য। অভ্যর্থনা করে বসালেন শ্রীমতী ব্রহ্ম, বলতে লাগলেন স্বল্পপরিসর জীবনের ইতিবৃত্ত।

শ্রীমতী ব্রহ্ম বলেন 'ইংরেজী ১৯৩৩ সালে এই মহানগরীর বুকেই জন্মেছি আমি। ছোটবেলা হতেই এক বাঁধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে আমাকে। স্বর্গত পিতা কুমুদ ঘোষের চিকিৎসক হিসাবে প্রচুর পসার ছিল বলে আর্থিক অনটন কোন দিনই আমাদের জীবনে দেখা দেয় নাই। জন্মের পর হতেই যাদের সঙ্গে আমাদের রোজ দেখা হতো তাঁদের কেউ গানের মাষ্টার, কেউ নাচের মাষ্টার কেউ বা পড়াবার মাষ্টার। সারাক্ষণ মাষ্টার আর মাষ্টার। মাষ্টার ছাড়া যেন জগতে আর আমাদের কেউ ছিল না? প্রথমে ঘুম থেকে উঠেই যার মুখ দেখতাম তিনি নাচের মাষ্টার। ভোরবেলা ১ঘণ্টা করে তাঁর কাছে নাচ শিখতে হত। নাচ-শেখার পর মুহূর্তেই হাজির হতেন পড়ার মাষ্টার, পড়ার মাষ্টারকে বিদায় করে স্কুলের মাষ্টার, স্কুল-মাষ্টারকে খুসী করে বাড়ীতে ফিরে আবার গানের মাষ্টার। মাষ্টার মাষ্টার করে কান্না পেয়ে যেতো। অথচ প্রতিবাদ করারও উপায় ছিল না।

বাধ্য হয়ে প্রথম জীবনে নাচের উপরই বেশী জোর দিতে লাগলাম। প্রহ্লাদ দাসের কাছে নিয়মিত ভাবে নাচ শিখতে লাগলাম। জীবনের ২০ বৎসর পর্যন্ত নাচ শিখে অল বেঙ্গল, অল ইণ্ডিয়া আয়োজিত বহু কম্পিটিশানে নেচে প্রথমও হলাম। সব রকম নাচই প্রায় নাচতাম, কিন্তু তার মধ্যে ভারতনাট্যম এবং কথাকলির স্থানই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নাচ আর গান প্রায় এক সংগেই চলতে লাগলো। সকালে নাচ বিকেলে গান। শ্রীযুত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার মাকে গান শেখাতেন, তিনিই আবার আমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁর কাছে প্রথমে ক্লাসিক গান শিখতে আরম্ভ করি। আট-নয় বৎসর পর্য্যন্ত ক্লাসিক শেখার পর খেয়াল ঠুংরি আরম্ভ করি। আমার বয়স যখন

শ্রীমতী মাধবী ব্রহ্ম

১ বিচিত্র প্রবন্ধ

চৌদ্দ-পনের বৎসর তখন ৺সুধীরলাল চক্রবর্ত্তীর কাছে আধুনিক গান শিখতে আরম্ভ করি। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সুধীরলাল অকস্মাৎ মারা যাওয়ায় শ্রীযুত জ্ঞান ঘোষের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করি। গান শেখার ব্যাপারে আমার কোন নির্দ্দিষ্ট রুচি ছিল না। ঠুংরি, খেয়াল, রাগপ্রধান ও ভজন কীর্ত্তন সব গানই এক সংগে শিখতে লাগলাম। বারো-তের বৎসর বয়সে অল ইণ্ডিয়া রেডিওয় অডিসান দেই এবং বেতারশিল্পী হিসাবে মনোনীতও হই। আধুনিক, ঠুংরি, কীর্ত্তন এবং ভজন সব গানেরই অডিসান দেই এবং বেতারে সকল রকম গানই গাইতে থাকি।

নাচ-গানের মধ্যে ডুবে থাকলেও স্কুলের পড়া বন্ধ হয় নাই একদিনের জন্যেও। যথাকালে ম্যাট্রিক এবং আই, এ পাশ করে ভর্ত্তি হলাম বি, এ ক্লাশে। কিন্তু বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই আমার বিয়ে হয়ে গেল বলে বি, এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে উঠে নাই। নাচ ছেড়ে দিলেও গান ছাড়তে পারিনি আজও, বিয়ের পর আর নাচা সম্ভব কি না জানি না তবে দু বছরের ছেলে সঞ্জয়কে নিয়েই এতো ব্যস্ত থাকতে হয় যে নাচতো দূরের কথা গানেরই সময় করে উঠতে পারি না। জীবনে যে কয়েকখানা রেকর্ড করেছি তার সব ক'খানাই হিজ মাষ্টারস ভয়েস কোম্পানীর। সবগুলি গান মনে না থাকলেও "মন পবানের নাইয়া" গানখানি আজও মনে পড়ে। রেকর্ড ছাড়া ছায়াছবিতেও গান গেয়েছি কয়েক খানি সবগুলো মনে না থাকলেও "পথ হারার কাহিনী", "মর্য্যাদা", "বসন্ত বাহার", "নষ্টনীড়" প্রভৃতি বইয়ের নাম বেশী মনে পড়ে। আমার গানের জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। ১৯৫৪ সালে আমি তার কাছে শিষত্ব গ্রহণ করে গানের জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করেছি। বর্ত্তমানে আমার আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, স্বামী ডাঃ ব্রহ্ম, দুই বৎসরের ছেলে সঞ্জয় আর গান এই কয়টি নিয়েই জীবন কাটছে এবং কাটাতেও চাই।

কুমারী মালঞ্চ সেন

এ বৎসর বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত All India P & T Competition-এ কুমারী মালঞ্চ সেন কথক নৃত্যে এক অনবদ্য

নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সকল লোককে বিমোহিত ও আনন্দ দান করিয়াছে। কুমারী মালঞ্চ সেন এতদ্ব্যতীত বোম্বাই, লাক্ষ্ণৌ, কটক, পাটনা ও কলিকাতায় বিভিন্ন Conference এ নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছে। কুমারী মালঞ্চ সেন শ্রীমতী জয়কুমারীর প্রধানা ছাত্রী ও শ্রীমনোরঞ্জন সেন এডভোকেট মহাশয়ের একমাত্র কন্যা।

একটি নিটোল গভীর ঘুম

নিদ্রাহীনতার অভিশাপ মানুষের পক্ষে নূতন নয়, বহু যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ একে ভোগ করে আসছে। লড়াই করেছে এর সঙ্গে বার করেছে এর প্রতিষেধক বহু গবেষণা ও চিন্তার দ্বারা। দেশভেদে, কালভেদে, নিদ্রাহীনতা বা ইনসমনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করে এসেছে মানুষ—আজও যা চলেছে অব্যাহত গতিতে। তেরোকী জাতীয় ইণ্ডিয়ানরা ঘুমপাড়ানি ছড়ার দ্বারা নিদ্রাকর্ষণের প্রয়াস পেতো, চৈনিক সাধু সে ক্ষেত্রে সুগন্ধি প্রধূমিত চায়ের ব্যবস্থা করতেন, তবে সব চেয়ে বিচিত্র ছিল ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত নৃপতি হেনরী দি এইটথের অভ্যাস, মদ্যপানে লুপ্তচৈতন্য হয়ে পড়ে, তবেই তিনি পেতেন নিদ্রাহীনতার অভিশাপের হাত হতে রেহাই।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান আমাদের অনেক সহজ পথে এর সমাধান করার পথ সুগম করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসকের মতে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয্যা আশ্রয় করা সুনিদ্রার পক্ষে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ও পালনীয় অভ্যাস। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয্যায় গমন করা ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষয় ও সুনিদ্রা সঞ্চারের সহায়ক] যেমন শয়নকক্ষের সজ্জা, আবহাওয়া ইত্যাদি; শয়নকক্ষ রুচিসম্মত ও আরামদায়ক ভাবে সজ্জিত করা উচিত—যদি ঘুমোনোর পূর্ব্বে বই পড়া কারুর অভ্যাস থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থাদি থাকা সঙ্গত—ঘরের বায়ু চলাচল যাতে অব্যাহত থাকে, সেদিকেও সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মুক্ত বাতাস গভীর নিদ্রা সঞ্চারে সহায়তা করে। শয্যাও আরেকটি প্রয়োজনীয় বস্তু, অত্যধিক কঠিন বা অত্যধিক কোমল শয্যা কোনটিই ভাল নয়, মাঝারী ধরণের শয্যাই সুনিদ্রার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। শয্যার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শয্যা আশ্রয় করার ঠিক পূর্ব্বে কিছু বলকারক পানীয় গ্রহণ করা সঙ্গত, তাতে ঘুম ভাঙ্গার পর ক্লান্তি বোধ কম হয়; রাত্রে কিছুটা শরীর চালনা করাও একটি নিটোল ঘুম লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

সুনিদ্রা মানুষের পক্ষে শুধু কাম্যই নয়, অতি প্রয়োজনীয়ও বটে। সুতরাং সেটি লাভের জন্য আপনার এই সব নির্দ্দেশগুলি পালন করাই উচিত, আর একটি কথা, নিদ্রাহীনতাকে ভয় না করলে তা কখনই ব্যাধিস্বরূপ ঘাড়ে চাপতে পারে না, যাই হোক না কেন, নিজের মনের জোর অটুট রাখতে পারলে এই অভিশাপ কখনই আপনাকে কাবু করতে পারবে না; স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রাহীনতাকে অস্বীকার করতে পারলে একদিন দেখবেন, ঘুমের দেবতার আশীর্ব্বাদ আপনার উপর নেমে এসেছে; প্রত্যহ তাঁর উপহার আপনার কাছে আসছে; একটি নিটোল গভীর ঘুম।

বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

আট

তলস্তয়ের গল্পের নায়ক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগেই, সূর্যদেব বসবার আগেই পশ্চিমাকাশের পাটে, জমি জিতেছিলো দৌড়ে অঢেল। কিন্তু জীবনের সন্ধ্যা যে তার অনেক, অনেক আগেই অপরাহ্ণ থেকে গড়িয়ে গিয়েছিলো সায়াহ্নে, জীবনসূর্যে নির্বাপিত হয়েছিলো প্রাণের অগ্নি; সে হতভাগা যখন তা জানতে পেলে তখন সে আরও যা জানতে পারল অথচ কাউকে জানাতে পারলো না, তলস্তয় তাঁর হয়েই তা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের দেহ কবরে দিতে যে সাড়ে তিন হাত জমির মাত্র দরকার হয়,—সব মানুষই সেই সাড়ে তিন হাতেরই জমিদার হতে পারে মাত্র। তার বেশী নয় এক ছিটেরও; অথবা এক তিল নয় কমেরও। মানুষের দেহটারই মাপ সাড়ে তিন হাত। এই দেহ ছাড়াও মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে কোনও দেশে, কোনও কালে যার কোনও পরিমাপ নেই। দেহের মাপ আছে, মৃত্যু আছে; প্রয়োজন আছে তার তাই সাড়ে তিন হাত জমির। আত্মার পরিমাপ নেই; তার মৃত্যু নেই; অতিরিক্ত এই সাড়ে তিন হাতের অতিরিক্ত সে তাই।

কিন্তু ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে যখন কাশীর গঙ্গায় তাঁর দেহাবসান হলে সমস্ত শহর পরিক্রমার পর গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার আগে শেষ দেখার জন্যে খোলা হলো শবাধার,—তখন দেখা গেল ত্রৈলঙ্গের দেহও সেই আধারে নেই। অর্থাৎ দেখা গেল যে তাঁকে দেখা গেল না। মানুষ মাত্রেরই আত্মা মৃত্যুঞ্জয়। ত্রৈলঙ্গের দেহও মৃত্যুকে জয় করেছিলো জীবনে। দেহেও তিনি ছিলেন দেহাতীত। তাঁর দেহ সাড়ে তিন হাতের চেয়ে বেশী ছিলো আর এক হাত। লম্বায় সাড়ে চার হাত এই মানুষ সেই অতিরিক্ত আর এক হাত দিয়েই অতিরিক্ত মৃত্যুকে দেখে নিয়েছিলেন এক হাত।

এই 'সাড়ে চার হাত' মানুষকেই দেখতে গেলাম কাশীর দিদিমার কথা মতো সর্বাগ্রে।

কাশীর দিদিমা কেবল ওই টুকুই বলেননি; আরও বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন যে: 'লৌকিক শরীরে তোমরা যাকে অলৌকিক বল, তার এমন আশ্চর্য প্রকাশ আশ্চর্যের চেয়েও একটু বেশী। শাস্ত্রে মানুষের যেসব অবস্থা হতে পারে বলে বলা হয়েছে ত্রৈলঙ্গকে না দেখলে বোধ হয় বলতাম মানুষের অমন অবস্থা হতেই পারে না।' ত্রৈলঙ্গের দীক্ষিত শিষ্যের কথা বলতে পারি না; তাঁর অন্তের শেষ নেই, বলতে পারি। কাশীর দিদিমা ভক্ত নন; 'ভক্তি'। ত্রৈলঙ্গের 'ভক্তি'র প্রতিমূর্তি কাশীর দিদিমা।

কাশীর দিদিমা বাড়িয়ে বলেননি। আলোয়-অলোয়, রাগে-অনুরাগে, মেঘে-রৌদ্রে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শীতে-গ্রীষ্মে, জলে-ডাঙায়, আভরণে-অনাবরণে, জীবনে-মরণে এমন সমদৃষ্টি, এমন বিষম অভিজ্ঞতার তুলনা নেই কাশী কাঞ্চী, কোথাও!

ভগবানের সব চেয়ে কাছে থাকে যে ভক্ত, ভগবান থেকে সে থাকে সব চেয়ে দূরে,—এর প্রমাণ পেতে অনেক দূরে যেতে হবে না; কলকাতা থেকে যেতে হবে কাশী। ত্রৈলিঙ্গ বলতে 'কাশী'-র মুখ দিয়ে লাল পড়ে; চোখ দিয়ে ভক্তির মৃদু অশ্রু. জোড়করে ওঠে কপালে, লোম দাঁড়িয়ে ওঠে গায়ে; শরীর কাঁপতে থাকে কাশীর। কিন্তু কাশীতে যাদের দীর্ঘকাল ধরে বাস নয় কেবল, যে কোনও উপলক্ষ্যে নির্জলা উপবাস, তাদের অনেককে জিজ্ঞেস করুন; ত্রৈলিঙ্গর আসন কোথায় কাশীতে; দেখবেন তাদের অনেকের মুখই বড় করুণ; তাদের অনেকেই একাশিতে পড়েও, শুধু শুধুই এ-কাশীতে পড়ে আছেন। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যেখানে বসে মাটির নয়, 'মা'-টির আরাধনা করে গেছেন; সেখানে আজও তার অপূর্ব কৃষ্ণবর্ণ 'সাড়ে চার হাত' মূর্তি বিরাজমান তার খবর দিতে পারবেন না।

পারবেন কি করে? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো দেশ-বিদেশ জুড়ে জন্মোৎসব পালিত হয় না কোথাও। হবে কেমন করে? জন্ম-মৃত্যুর দুয়েরই তিনি অতীত; যাঁর আদি নেই; নেই অন্ত,—তিনি অনাদি এবং অনন্ত, কোন্ বিশেষ তিথি হবে তাঁকে স্মরণ করার যোগ্য,—তিথির অতীত. এ পৃথিবীতে সেই 'অ'-তিথির। পারবেন কি করে? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো রচনাবলী নয়; তাঁর যে কেবল 'অহং'বলি!

একটা কথা একটু আগেই যে বলেছি, কাশীতে অনেকেই সচল কাশীশ্বর কোথায় বসে আছেন 'মূর্তি' হয়ে এখনও তা জানেন না,—মাফ করবেন, তার মধ্যে আপনাকে ধরিনি আমি। এই বসুমতী হরেকরকমের রসের এবং রসদের আয়োজন সত্ত্বেও যদি আপনি নেহাৎই এই প্রতিক্রিয়াশীল রচনার পাঠক হন, এবং আপনি দৈবাৎ যদি হন কাশীর লোক, তাহলে জানবেন আপনি আমার লক্ষ্য নন। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে কি না। আপনি ছাড়া আরও যে লক্ষ লক্ষ লোক আছেন কাশীতে

তাঁরাই আমার উপলক্ষ্য। আরও একটা কথা। আপনি যদি পাঠক না হয়ে পাঠিকা হন; লোক না হয়ে কাশীর স্ত্রীলোক,—তাহলে শুধু মাফ না,—বিশ্বাস করবেন,—আপনাকে আমি অমন কথা বলতেই পারি না। বরং তার বদলে যা বলতে পারি তা হচ্ছে ত্রৈলিঙ্গর আসন কোথায় আপনি ছাড়া আর কে জানে? ক'লকাতা থেকে কাশী কোনও একজন লোক আরেকজন লোকের মত নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের কলকাতা টু কাশী তো বটেই, ত্রিলোক জুড়ে স্ত্রীলোক সর্বত্র আদি ও অকৃত্রিম এক। কাজেই, আপনি যদি পাঠিকা হন তো, আপনি কাশীতে পদার্পণ না করলেও ত্রৈলিঙ্গর আসন তো বটেই, যাঁর আদি এবং অন্ত নেই বলেছি, তাঁরও আদ্যন্ত সব জানেন আপনি, এ কথা যে না জানে তাঁর তুল্য হতভাগা আর কে? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে; ঘরবাড়ী আছে। পাঠিকাকে কিছু বললে আমি জানি, তখন আর বাড়ী নেই, তখন আছে শুধু বেরুবাড়ী!

বেণীমাধবের ধ্বজার কাছে নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট; আর তার অনতিদূরেই ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সমূর্তিক আসন আশ্রম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটের ওপরেই একদিন দাঁড়িয়েছিলো স্মরণের অতীত এক কালের অবিস্মরণীয় সাক্ষী বিন্দুমাধবের মন্দির। কাশীখণ্ড বলছেন, অগ্নিবিন্দু নামে এক সাধকের স্তবে কাশীধামে আবির্ভূত মাধব প্রীত হয়ে বলেন, যতদিন কাশীর নাম আছে, ততদিন তোমারও নাম রইবে আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বিন্দুমাধবকে তাই হিন্দুরা উত্তরবাহিনী গঙ্গায় অবগাহন করে উঠে প্রণাম করতেন। বিন্দু এবং মাধবের নাম করতেন, প্রণাম করতেন একসঙ্গে।

সেদিনকার কাশীতে বিন্দুমাধবের প্রস্তরনির্মিত জয়ধ্বজাই ছিলো সব মন্দিরের চূড়ো ছাড়িয়ে। তার পর এলো ঔরংজেব। হিন্দুমন্দিরের উন্নত শিরকে অবনত করবার ব্রতয় বিব্রত করে তুললো বিন্দুমাধবকে। ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাঁর ধ্বজা, বানালো মসজিদের মিনারেট। কিন্তু তবুও কাশীর কাছে, কাশীবাসীর কাছে তাঁর পরিচয় আজও অপরিবর্তিত। বেণীমাধবের ধ্বজা বা মাধোজীকা ধরারা। বিন্দুমাধবের অস্তিত্ব এখনও এর কাছেই নবনির্মিত এক মন্দিরে অব্যাহত।

এরই অনতিদূরে কাশীর সচল বিশ্বনাথের অচলায়তন।

ত্রৈলিঙ্গর মূর্তি ছাড়াও এখানে তাঁর আরাধ্যা দক্ষিণা-কালিকার মূর্তি বিরাজমান। সেই মূর্তি যাঁকে ওপর তলায় রেখে নীচের তলায় বসতেন ত্রৈলিঙ্গ। ভক্ত প্রশ্ন করেছিলো: আপনার 'মা' ওপর তলায় তো আপনি সেখানে সাধনায় না বসে, নীচের তলায় এখানে বসে কেন। ত্রৈলিঙ্গ বললেন: যা ওপরে গিয়ে দেখে আয় তো 'মা' কোথায়? ভক্ত ওপরে গিয়ে দেখে, মাতৃমূর্তি সেখানে নেই!

'আমাকে'-ই পুজো করে যে তার 'মা-কে' পাওয়া যায় বাইরের মন্দিরেই শুধু; আর আমাকে নয়, 'আমাকে'র মধ্যে মাকে যে পুজো করে তার মা থাকে যে মনের মন্দিরে। তাকে খুঁজতে একতলা-দু'তলা করতে হবে কেন?

অনেক সিঁড়ি বেয়ে তবে নেমে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ত্রৈলিঙ্গের আশ্রমে তাঁর ভয়ঙ্কর অভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে। নাম করতে হয় তাঁর। কোন্ নাম জানি না; ত্রৈলিঙ্গ, না ত্রৈলঙ্গ না তৈলঙ্গ। সেক্সপীয়ারের মতো বলতে জানি না, নামে এসে যায় না। কারণ নামে এসে যায়। গাঁদাকে মেরিগোলড বললে যখন জগতে সর্বত্রই ছ'-পয়সা থেকে ছ'-আনায় ওঠে দাম, তখন নামে এসে যায় না বলি কেমন করে? কিন্তু সেজন্যে নয়, নামে সত্যি এসে যায়। আমি বলছি বলেই একথা সত্য নয়; সত্য বলেই আমি একথা বলছি! নাম দ্বারাই সব; নামহারা শুধু শব।

যাঁরা ত্রৈলঙ্গর আসল নাম কি ছিলো তাই নিয়ে উত্তেজিত হতে ভালোবাসেন, ত্রৈলিঙ্গর এই জীবনকাব্য তাঁদের জন্যে নয়। বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহন, নাকি ডেভিড হেয়ারের গায়ে ক'টা তিল, ক'টা আঁচিল ছিলো, কটাক্ষ করে ব'লছি না এই নিয়েই যাদের মাথাব্যথা এ জীবনকাব্য তাদের জন্যে নয়। কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হলেও আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা জীবনচরিত নয়; একটি জীবন্ত চরিত্র।

ত্রৈলিঙ্গ, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, এঁদের এক নাম ছিলো না, অনেক নাম ছিলো। কাজেই এক নাম করলে অনেক নাম করা হয়; অনেক নাম করা হলেও সেই 'এক'-এর নামই করা হয়। অনেককে প্রণামের মধ্যে সেই 'এক'-কে প্রণাম করা; এক-কে প্রণাম করার মধ্যেই হয় অনেককে প্রণাম করা।

তাই বলতে পারব না, ত্রৈলিঙ্গ না তৈলঙ্গ; তিনি দেড়শো বছর ছিলেন কাশীতে, কিম্বা পঁচানব্বই বছর পর্য্যন্ত। আমি যে নামে প্রণাম করছি ত্রৈলিঙ্গকে, সে নাম, কাশীর দিদিমার কথা ধার করে বলি, সেনাম-ধাম ঠিক হলে ভালো; না হ'লে আরও ভালো।

বাঙলা এগারশো আট সাল। নেপালের সেনাপতি গুলি মেরেছেন বাঘকে। বাঘের গায়ে গুলি লেগেছে; জখম হয়েছে: কিন্তু মরেনি। বিকট আর্তনাদে বনভূমি কাঁপিয়ে সে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে এক সাধুর পায়ে। পায়ে পায়ে একটু বাদেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে নেপালের সেনাপতি। থেমে গেছে নিঃশঙ্ক সাধুর সামনে গৃহপালিত পশুর মতো চোখ বুঁজে নিঃশঙ্কতর সেই শার্দুলকে বসে থাকতে দেখে। তার হাতের উদ্যত বন্দুক নেমে এসেছে নিজের অজান্তে। চির উন্নত শির নত হয়েছে কখন, সাধুর পায়ে হয়েছে প্রণত, সে নিজেও জানে না! তার বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে অবারিত হয় এক অদৃষ্টপূর্ব জগতের সিংহদ্বার সাধুর মেঘমুক্ত দিনের আকাশে সূর্যালোকের চেয়েও সহস্রগুণ দীপ্ত হাসিতে। সে হাসিকে দিয়ে সাধু একথাই বলতে চেয়েছিলেন সেদিন যে গহন অরণ্যের আদিম হিংস্রতম নরখাদকও নিরুপায় হলে লুটিয়ে পড়ে মানুষের দুপায়ে-ই, যদি নর দেখতে পায় সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।

মানুষের মধ্যে চৈতন্য আবির্ভূত হলে বনপরিক্রমায় বাঘ এবং বলদ দুই হয় মানুষের বনসঙ্গী! কারণ তখন নারায়ণ যে নরের মনোসঙ্গী। এর চেয়ে লৌকিক আর কিছু হতে পারে না,—এই 'অলৌকিক' অঘটনের মতো!

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে লোক বলছেন, হিংস্রকে হিংসা কোর না; সিংহও তার হিংসা ভুলে যাবে;—সেই লোকই, আবার হাতীকে নারায়ণ জ্ঞান করে শুয়ে পড়লেও হাতী যখন বিশ্বাসীকে পায়ের তলায় পিষ্ট করছে, তখন বলছে: মাহুত-নারায়ণের বারণ না শোনার ফলেই এমন দুরবস্থা হয়েছে,—এ কেমন কথা? তার উত্তরে বলি; এ কেমন

নয়, এই কেবল এক মাত্র কথা। অর্থাৎ সকলের জন্যে নয় সব কথা। যার সাজে তার সাজে অন্যলোকের লাঠি বাজে। মুখে রামকৃষ্ণ মনে রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করলে রামও না; কৃষ্ণও না; রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার তো বাঁচাবার ক্ষমতাই নেই।

লোকে বলে, স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই সবই যদি সেই বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষের ইচ্ছেয় হয়, তাহলে পুরুষকারে যদি কিছুই না হয়,—তাহলে তো পুরুষ মানুষের ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়, সেই একমাত্র 'পুরুষই' তাহলে খাওয়াবেন, পরাবেন। জিব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি,—এ মনে করে ঘরে যে সত্যিই শুয়ে থাকতে পারে তাকে নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু যারা বলে তারা কেউ পারে কি সত্যিই ঘরে শুয়ে থাকতে? দ্রৌপদী যতক্ষণ বিবস্ত্র হবার লজ্জায় বস্ত্রের খুঁট চেপে ধরেছিলেন ততক্ষণ দেখা দেননি শ্রীকৃষ্ণ। যেই দুই হাত তুলে দিয়েছেন মাধবের দিকে, দিকে দিকে অমনই দেখা দিয়েছে বস্ত্রের পর বস্ত্রের সম্ভার। দুর্যোধন মায়ের সামনেও হতে পারেননি নিঃসঙ্কোচ; উরুর আবরণ করেননি উন্মুক্ত। উরু ভঙ্গেই কুরুরাজ ভঙ্গ হয়েছেন তাই!

আগুনের মধ্যে গুণাতীতকে দেখে যে প্রহলাদ সে নরকে স্পর্শ করে এমন বৈশ্বানর কোথায়? জিব দিয়েছেন যিনি তিনি আহার দেবেন; ঠিকই। কিন্তু জিব দিয়েছেন তিনি চাইলেই জিবে গজা দেবেন, এমন বিশ্বাস করলে হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হতেই হবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যখন শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতে পারলেন না, একবার নয়, বারবার তিনবারই ব্যর্থ হলেন, তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন জেনেও, বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে, তখন বিবেকানন্দকে বলেছিলেন: 'যা, আজ থেকে তোর মোটা ভাত-কাপড়ের ভাবনা হবে না!' ইচ্ছে করলেই তিনি পোলাও কালিয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু করেন নি।

করেননি, তার কারণ রাজা জনকের যা সাজে অন্য লোকের পক্ষে তা যে বিপজ্জনক এ যিনি জানেন শুধু তিনিই হতে পারেন রাম এবং কৃষ্ণ; ইদানীং রামকৃষ্ণ।

লোকে আরও বলে; স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই যে সবই যখন তাঁর ইচ্ছের হয় তখন আর পাপ-পুণ্য কি; স্বর্গ-নরক কেন? যতক্ষণ তোমার পাপ-পুণ্য বোধ আছে ততক্ষণ আছে স্বর্গনরক। পাপ-পুণ্য দুয়েরই যখন শূন্য বোধ হবে তখনই কেবল স্বর্গ-নরক নেই; নেই জন্ম-জন্মান্তর। বিবেকানন্দ সম্পর্কেই কেবল রামকৃষ্ণ বলেছিলেন: ওর কোন কিছুতেই কিছু পাপ নেই! রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ যা করলে সাজে তা যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় করলেও যে ঠিক হবে, এমন কথা অন্যে বললেও, যতদূর জানি, রামকৃষ্ণ বলেন নি। বলে জাননি বলেই তো জানি তাই!

তাই ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে, মুখে নারায়ণ, মনে নগদ 'নারায়ণ বললে বাঘ এসে আশ্রয় নেবে না মার্জারের মতো পায়ের কাছে। কিন্তু শার্দূলের মধ্যে দুলে উঠতে দেখবে সিংহবাহিনীকে, শুধু সেই যে ৺কালীর গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলতে পারেন: গঙ্গোদকং! কালীর গায়ে তা ছিটোনো কেন,—এ জিজ্ঞাসার জবাবে যিনি বলেন: 'পূজা'—এ এক তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

নেপালের সেনাপতির গুলি-লাগা বাঘ যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলো বেড়ালের মতো, সেই সাধুই আরেক সময়ে বসেছিলেন প্রয়াগে। সন্ধ্যার সময়ে 'গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া' সঞ্চারে 'ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে' এল দেখে রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ সেই সাধুকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এলেন। সাধু হাসলেন। সেই প্রসন্ন বন্ধুর মতো মেঘমুক্ত দিনে আকাশের হাসি। দূরে অঙ্গুলী সংকেত করলেন সাধু। প্রলয়মদির জলে যাত্রী-নৌকা তার শেষ নিঃশ্বাস গুণছে। রামতারণের পলক পড়বার আগেই অন্তর্হিত হলেন সাধু। ডুবন্ত নৌকা ভেসে উঠল জলের ওপর। তীরের দিকে ছুটলো তরী তীরের বেগে।

নৌকা থেকে নিরাপদে সবাই নামবার পর সবাই অবাক হয়ে দেখলো,—সুদীর্ঘ সাড়ে চার হাত এক কৃষ্ণ জ্যোতি নেমে যাচ্ছেন নৌকা থেকে। সবায়ের মনে প্রশ্ন, নৌকায় তো ইনি ছিলেন না; ইনি কে? রামতারণেরই কেবল প্রশ্ন নেই। সে তার উত্তর পেয়ে গেছে; সব প্রশ্নের যা শেষ উত্তর,—তিনি কে?

এই সাধুই মূর্তির মধ্যে মূর্ত বিশ্বনাথকেই প্রথম দর্শন করতে গিয়েছিলাম কাশীতে। কাশীতে পা দিয়ে অচল বিশ্বনাথের আগে গিয়েছিলাম সচল বিশ্বনাথের কাছে। কাশীতে যদি কোনও পাপ করে থাকি তা ওই একটিই; কাশীতে যদি কোনও পুণ্য অর্জন করে থাকি তাও ওই একটি।

কাশীর বিশ্বনাথ কে, বিশ্বনাথের মন্দিরে যিনি তিনি, না বিশ্বের যত অনাথের মনের মন্দিরে যাঁর বাস সেই ত্রৈলিঙ্গ?—এর উত্তর স্বয়ং বিশ্বনাথ ছাড়া আর কে জানে?

মুক্ত পুরুষের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের সাক্ষ্য হচ্ছে, জড়বৎ, শিশুবৎ, উন্মাদবৎ আচরণ লীলা করবে যাঁর মধ্যে তিনিই কেবল যথার্থ মুক্তপুরুষ। ত্রৈলিঙ্গ ছাড়া শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার জীবন্ত কোনও সাক্ষী নেই। রামকৃষ্ণ তাই এঁকে দেখে বলেছিলেন: দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। রোদে বালি এমন তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য? সেই বালির ওপরই শুয়ে আছেন।

কাশীর দিদিমা বলেছিলেন, শাস্ত্রে যা যা বলেছে, মানুষের কেমন সব অবস্থা হতে পারে বলে, তা যদি ত্রৈলিঙ্গ এসে দেখিয়ে না দিতেন, তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম সব শাস্তর ওই গঙ্গার জলে।

বলেছিলাম, মনে আছে, সে কি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষে বিশ্বাস বেশী? না। কাশীর দিদিমা ব্যাখ্যা করেছিলেন: যে শাস্তর শুধু বলে, অন্তরের মতো যা প্রমাণ করে না তার অভ্রান্তি, সে শাস্তর হিন্দুর শাস্ত্র নয়।

হিন্দুর সেই কালজয়ী শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা ওই ত্রৈলিঙ্গ। এই ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সাংসারিক নাম ছিলো, শিবরাম। কাশীর অচল বিশ্বনাথ হচ্ছেন শিবলিঙ্গ। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যিনি তিনি শিব থেকে হয়েছিলেন ত্রিলিঙ্গ। [ক্রমশঃ।

ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রচনা

সূর্য
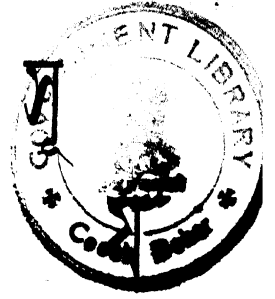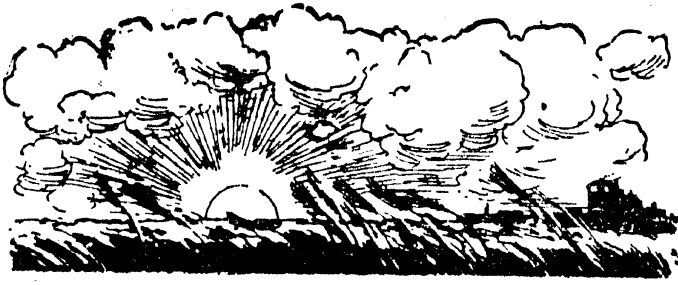
গ, আ, আরিস্তোভ

কি করিয়া সূর্যের রাসায়নিক সংযুতি জানা গিয়াছে

কি করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা দূরস্থিত তারকারাজির এবং সূর্যের মাপ, গতি এবং তাহা অপেক্ষাও বড় কথা তাহাদের রাসায়নিক সংযুতি নির্ণয় করিতে পারিলেন? কি করিয়া তাহাদের কেন্দ্রে এবং পৃষ্ঠে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলিকে জানিতে পারিলেন? দেখুন, জ্যোতির্বিদেরা তো আর জ্যোতিষ্কে যাইতে পারে না? আন্তর্নৈহারিক শূন্য অতিক্রম করিতে এইরূপ একটি উড্ডীয়নের যন্ত্র যদি থাকিতও, তবু মানুষ সূর্য পর্যন্ত যাইতে পারিত না। সূর্যের কিরণের ক্রিয়ায় মানুষ ও তাহার যন্ত্রটি সূর্যের পৃষ্ঠদেশে পৌছাইবার বহু পূর্ব্বেই অবধারিত ভাবে জ্বলিয়া যাইত।

একমাত্র আলোকরশ্মিই আমাদের সূর্য এবং তারকারাজির সঙ্গে 'সংযুক্ত' করে। সুতরাং জ্যোতিষ্কের অধ্যয়ন প্রধানতঃ আলোকরশ্মির অধ্যয়নে পর্যবসিত হয়। ইহারা জ্যোতিষ্কগুলির উষ্ণতা, রাসায়নিক সংযুতি এবং সঞ্চলনের বেগের বিষয় বিবৃত করে।

যে গ্রহগুলির নিজস্ব আলোক নাই, তাহারা সূর্যের যে আলোক প্রতিফলিত করে, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করা হয়।

জ্যোতিষ্কের অধ্যয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় হইতেছে বর্ণালী বিশ্লেষণ।[১]

উজ্জ্বল আধার হইতে আগত শ্বেত আলোকরশ্মি বিভিন্ন প্রকারের সাতটি বর্ণের রশ্মির দ্বারা গঠিত। যদি আলোকের একটি সংকীর্ণ ফালিকে স্বচ্ছ কাচের প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তবে ইহার পূর্বতন পথ হইতে বাঁকিয়া যায় এবং নিজের সংযুতির অংশগুলিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রিজমে প্রবেশ করা শ্বেত আলোকের পরিবর্তে আমরা রামধনুর সমস্ত রঙে সংযুত একটি আলোকের পেন্সিল দেখিতে পাই।

লোহিত হইতে বেগুনী পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণ বর্ণালীতে একটি বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে থাকে।

অত্যুত্তপ্ত কঠিন এবং তরল পদার্থ হইতে আগত আলোর বর্ণালী অবিচ্ছিন্ন একটি দাগ। ইহা সমস্ত বর্ণ ধারণ করে। অত্যুত্তপ্ত গ্যাসের বর্ণালী অন্য প্রকার দেখায়। এই বর্ণালী পৃথক পৃথক রেখা দ্বারা গঠিত। রেখাগুলি ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে কৃষ্ণবর্ণ পরিসর দ্বারা পৃথকীকৃত থাকে। ইহাদের line spectrum বলে। প্রত্যেকটি গ্যাস সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট বর্ণের রশ্মি বিকীরণ করে, যে রশ্মি কেবলমাত্র সেই গ্যাসের স্বকীয়। সূর্যের বর্ণালী আমাদের নিকট নিরবচ্ছিন্ন মনে হয়। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ দেখায় যে ইহা বহু কালো রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। যিনি সর্বপ্রথম এই রেখাগুলিকে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিকের নাম অনুসারে ইহাদের 'ফ্রাউন্‌হোফার' বলা হয়।

অত্যুত্তপ্ত উজ্জ্বল বাষ্প এবং গ্যাসের মধ্য দিয়া আলোক কি ভাবে অতিক্রম করে! পদার্থবিদেরা যখন তাহা অধ্যয়ন করিলেন, তখন সূর্যের বর্ণালীর কালো রেখাগুলির প্রকৃতিকে অনুমান করা সম্ভব হইল। দেখা গেল যে, প্রত্যেক গ্যাস বা বাষ্প অত্যুত্তপ্ত অবস্থায় যে রশ্মি বিকীরণ করে, সেই রশ্মিগুলিকেই শোষণ করিয়া লয়।

কালো কালো রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ বর্ণালীকে শোষণাতিক্রান্ত বর্ণালী বলে। কী কী গ্যাস রশ্মির আগমনপথে বর্তমান ছিল শোষণাতিক্রান্ত বর্ণালী দ্বারা তাহা বিচার করা যায়।

সূর্যের বর্ণালী একটানা নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু সূর্যের কেন্দ্র হইতে আগত রশ্মিগুলি যখন তাহার গ্যাসীয় আবরণের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে—যে গ্যাসগুলি নিজেরাও অত্যুত্তপ্ত, কিন্তু সূর্যের পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা কম উত্তপ্ত—তখন রশ্মিগুলির একটি অংশ শোষিত হইয়া যায়। এই সময় ঠিক সেই রশ্মিগুলিকে শোষণ করা হয়, যাহারা গ্যাসগুলিরই দ্বারা বিকীরিত হয়। ফলে সূর্যের বর্ণালীর সেই সেই স্থানগুলিতে কালো কালো শোষণরেখা উপস্থিত হয়!

বৈজ্ঞানিকেরা সূর্যের শোষণজাত বর্ণালীস্থিত সমস্ত কালো দাগের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পৃথিবীর রাসায়নিক মৌলগুলির অত্যুত্তপ্ত বাষ্প যে রেখা উৎপন্ন করে, তাহার অবস্থানের সহিত এইগুলির তুলনা করা হইয়াছে। এইভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে কী কী বস্তু সূর্যের আবহের সংযুতিতে রহিয়াছে।

মেন্ডেলীয়েফ-এর তালিকার রাসায়নিক মৌলগুলির মোট ৬৪টি এখন সূর্যে পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে মনে করা হয় যে ভর অনুসারে সূর্য শতকরা ৫০ ভাগ জলযান এবং ৪০ ভাগ হিলিয়াম দ্বারা গঠিত। অন্য সকল মৌল সর্বসমেত শতকরা দশভাগ আছে।

এই ভাবে আমাদের অপেক্ষা দূরস্থ জ্যোতিষ্কগুলিও সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অধিগম্য। ইহাদের Physical/... সাংগঠনিক প্রকৃতির বিষয় জ্যোতির্বিদগণ বহু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাইতে পারেন।

১। বর্ণালী বিশ্লেষণের বিশদ বিবরণের জন্য সরকারী টেকনিকাল প্রকাশভবনের 'জনগণবোধ্য বিজ্ঞানগ্রন্থমালা'-র পুস্তিকা 'আলোকরশ্মি কী বলে' (স. গ. সুভোরোভ) দ্রষ্টব্য।

২। তারকার রাজ্যে সূর্য

১। সূর্য আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারকা

সূর্য তারকাগুলির একটি। যে তারকাগুলিকে আমরা আকাশে দেখি তাহাদের প্রত্যেকে আমাদের সূর্যের অনুরূপ এক একটি সুবিশাল জ্যোতিষ্ক।

সূর্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে রহিয়াছে যে তাহা হইতে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন আলোকরশ্মি সাড়ে আট মিনিটে পৃথিবীতে পৌঁছায়। অন্যান্য তারকা আমাদের নিকট হইতে বেশ দূরে অবস্থিত, এই হেতু ইহারা আমাদের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিটমিটে বিন্দু বলিয়া মনে হয়।

আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী Centaur/...তারামণ্ডলে অবস্থিত তারকা প্রোক্সিম্ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব অপেক্ষা ২৭০ গুণ বেশী। এই তারকার আলোকরশ্মি চারি বৎসর তিন মাসে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোকবৎসর এবং parsec দ্বারা দূরত্ব মাপা হয়। এক বৎসরে আলোক যত দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে তাহাকে এক আলোকবৎসর বলে। এক parsec ৩২৬ আলোকবৎসরের সমান। এক আলোকবৎসর সাড়ে নয় f ট্রিলিয়ন কিলোমিটারের বেশী (আরো সঠিকভাবে ৯,৫৪০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার)। সুতরাং পৃথিবী হইতে centaur/...তারামণ্ডলের প্রোক্সিম্ তারকাটির দূরত্ব ৪০ f ট্রিলিয়ন কিলোমিটারের বেশী।

যদি আমাদের সূর্য centaur/...তারামণ্ডলের প্রোক্সিম্ তারকার স্থানে থাকিত, তবে তাহাকে একটি উজ্জ্বল তারকার মত দেখাইত। আর যদি উহা ৫০ আলোকবৎসর দূরে অবস্থিত হইত, তবে আমাদের নিকট অনুজ্জ্বল শক্তিহীন প্রায় নজরে পড়ে না এমন একটি ক্ষুদ্র তারকার মত দেখাইত।

যে তারকাগুলিকে আমরা খালি চোখে দেখি, তাহারা আমাদের নিকট হইতে ১০ হইতে ১০০০ আলোকবৎসর দূরে রহিয়াছে।

অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীণ যন্ত্রের দ্বারা কয়েক কোটি আলোকবৎসর দূরে অবস্থিত তারকাগুলিকে জ্যোতির্বিদেরা দেখিতে পারেন।

২। অন্যান্য তারকার মধ্যে সূর্য

তারকাগুলি আলোক, উজ্জ্বলতা (আলোকদায়িকা) ঘনমান, ঘনত্ব এবং উষ্ণতায় বিভিন্ন প্রকারের।

আমরা সর্বত্র তারকার পরম উজ্জ্বলতা নির্দেশ করি। আমাদের নিকট হইতে ১O Parcec দূরে থাকিলে তারকাগুলি যে রকম উজ্জ্বল হইত, সেই উজ্জ্বলতাকে পরম উজ্জ্বলতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যভাবে বলিলে, পরম উজ্জ্বলতা তারকাগুলির যথার্থ উজ্জ্বলতা, যেখানে দূরত্বের প্রভাব বাদ চলিয়া যায়।

জ্যোতির্বিদগণ তারকাগুলিকে 'দৈত্য' এবং 'বামন' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। উজ্জ্বলতা এবং আলোক অনুসারে সূর্য তথাকথিত 'হলুদ বামন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে তারকাগুলি উজ্জ্বলতায় সূর্যকে কয়েক দশক বা আরো বেশী গুণে অতিক্রম করিয়া যায় তাহাদের দৈত্য বলা হয়।

বামন তারকা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। দৈত্য তারকা কচিৎ দেখা যায়।

লক্ষ্য করা দরকার যে, একমাত্র উজ্জ্বলতার দ্বারা তারকাদের প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন তারকা আছে, যাহারা বিরাট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত 'শীতল' এবং সেহেতু কম উজ্জ্বল। এবং অন্যদিকে এমন তারকা আছে যাহারা ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু উচ্চ উষ্ণতাবিশিষ্ট এবং সেহেতু অতি উজ্জ্বলতাসম্পন্ন। সুতরাং কোন তারকার প্রকৃত আয়তন নির্ণয় করিবার জন্য শুধুমাত্র উজ্জ্বলতা জানিলেই চলে না, উষ্ণতাও জানা প্রয়োজন (বর্ণালী অনুসারে ইহা নির্ণয় করা যায়)।

তারকাগুলির মধ্যে উজ্জ্বলতার পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, swan (লেবেদ) তারামণ্ডলস্থিত নীল তারকা Denebola সূর্য অপেক্ষা দশ সহস্র গুণ বেশী উজ্জ্বল। বৃশ্চিক তারামণ্ডলস্থিত তারকা আন্তারেস-এর পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা সূর্যের উষ্ণতার অর্দ্ধেক, কিন্তু বৃহৎ আকারের জন্য ইহা তবুও আমাদের সূর্য অপেক্ষা তিন সহস্র গুণ বেশী উজ্জ্বল। 'জলোতাইয়া বাবা' Dorado তারামণ্ডলের তারকা S-কে (এস-কে) আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকা বলিয়া গণ্য করা হয় [ইহাকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দেখা যায়]। একমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা গেলেও এই তারকাটি সূর্য অপেক্ষা ৪ লক্ষ গুণ উজ্জ্বলতর, সূর্য এক বৎসরে যত আলোকশক্তি বিকীরণ করে, ইহা এক মিনিটে প্রায় ততটা আলোকশক্তি বিকীরণ করে। যদি আমাদের সূর্যের উজ্জ্বলতা S—তারকার মত হইত, তবে পৃথিবীতে উষ্ণতা ৭০০০° সেণ্টিগ্রেড অবধি উঠিত। এইরূপ উষ্ণতায় পৃথিবী বাষ্পে রূপান্তরিত হইত।

অসাধারণ উজ্জ্বল তারকাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতায় লক্ষ লক্ষ গুণে নিকৃষ্ট তারকাও প্রচুর আছে। কাজেই, আমরা বলিতে পারি যে আমাদের সূর্য উজ্জ্বলতায় তারকাজগতে এক মধ্যম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ঘন ফল (volume) অনুসারেও তারকাগুলির মধ্যে পার্থক্য কম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'উত্তরফল্গুনি' তারকাটি ঘনমানে সূর্য অপেক্ষা ৬৪ হাজার গুণ বড় আর আন্তারোস্ তারকাটি উত্তরফল্গুনি অপেক্ষা ১৭OO গুণ বড়। কিন্তু আন্তারোস্ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তারকা নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত তারকা VV cepheus ঘনমান অনুসারে আন্তারোস অপেক্ষা বেশ বড়। ইহা আমাদের সূর্য অপেক্ষা ১০০ কোটি গুণ বড় [চিত্র ১০]। যদি সূর্য এত বড় হইত, তবে একেবারে নেপচুনের কক্ষ পর্যন্ত পরিসরকেই দখল করিয়া লইত।

সূর্যের অপেক্ষা অনেকগুণে ক্ষুদ্র তারকাও আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ভান্-মা আনোনা তারকাটি মাপ অনুসারে পৃথিবীর অপেক্ষাও ছোট। আবার পৃথিবী ঘনমান অনুসারে সূর্যের অপেক্ষা ৩ লক্ষ গুণ ছোট। যদি ভান-মা আনোনাকে একটি পপির বীজের রূপে মনে মনে কল্পনা করা যায়, তবে এই স্কেল-এ আনতারোস একটি পাঁচতলা বাড়ীর মত হইবে, আর সূর্য হইবে একটি বাদামের মত।

কাজেই মাপ অনুসারেও সূর্য তারকা-জগতে একটি মধ্যম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গড় ঘনত্বের তুলনায়ও তারকাগুলির মধ্যে অত্যন্ত বেশী প্রভেদ

পরিলক্ষিত হয়। তথাকথিত 'শ্বেত বামনদের' ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহার আদর্শ প্রতিনিধি শ্বেতবর্ণের একটি ক্ষীণ তারকা। ইহা সিরিউস-এর উপগ্রহ। এই তারকাটির আমড়ার আকারের বস্তুর পরিমাণ প্রায় এক টন। কাসিওপেইই তারামণ্ডলস্থ শ্বেত বামন কেইপোরার—যাহা ঘনমানে পৃথিবী অপেক্ষা ১২৫ গুণ ছোট—ঘনত্ব জলের ঘনত্বের ৩ কোটি ৬০ লক্ষ গুণ বেশী। যদি এই তারকার বস্তু দ্বারা একটি দেয়াশলাইয়ের বাক্স পূর্ণ করা হয় তবে ইহার ওজন হইবে প্রায় এক হাজার টন।

শ্বেত বামনদের বিপুল ঘনত্বের কারণ এই যে ইহাদের ভিতরে পরমাণুর নিউক্লীয়স্ পরস্পরের সহিত প্রায় সন্নিহিত হইয়া আছে। অত্যন্ত উচ্চচাপে বর্তমান তথাকথিত degenerated gas...দ্বারা এই তারকাগুলি গঠিত।

বর্তমানে ৫০টিরও বেশী শ্বেত বামন আবি ত হইয়াছে।

অন্যদিকে দৈত্যসদৃশ তারকাগুলির ঘনত্ব অত্যন্ত কম। তাহাদের বস্তু অত্যন্ত তনুকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দৈত্যসদৃশ আন্তারেস্ এত তনুকৃত যে নিজের বিপুল আকৃতি সত্ত্বেও ইহার ভর সূর্যের মাত্র ৪০ গুণ বেশী। দৈত্য তারকা VV cepheus অসাধারণ রকমের তনুকৃত। সমুদ্রের জলোচ্ছাসের উপর বায়ুর ঘনত্ব অপেক্ষা ইহার ঘনত্ব ২৫০ গুণ কম।

আমরা জানি যে সূর্যের গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্ব অপেক্ষা ১,৪ গুণ বেশী। কাজেই, সূর্য এই ব্যাপারেও তারকা-জগতে মাঝামাঝি স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।

ভর অনুসারে তারকাগুলি কম প্রভেদসম্পন্ন। তারকাদের ভর হয় সূর্যের ভরের কয়েক দশক গুণ বেশী না হয় তাহা অপেক্ষা ছয় সাত গুণ কম হইতে পারে। তাই, অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র মাপ ...রও ভান্-মানানেন তারকাটির ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা সামান্য একটু কম; কারণ তাহার বস্তুর ঘনত্ব অসাধারণ রকমের বেশী।

উষ্ণতা ... তারকাগুলির প্রভেদ প্রচুর। তারকাগুলির পৃষ্ঠে উষ্ণতা দুই-তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লোহিত অবধি পৌঁছায়। আর শ্বেত তারকাগুলির পৃষ্ঠে ইহা ২৫ হাজার এবং ততোধিক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। এমন তারকাও আছে, যাহাদের পৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রায় ১ লক্ষ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

সূর্য হলুদ তারকাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহার পৃষ্ঠের উষ্ণতা, আগেই বলা হইয়াছে, ৬ হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কাজেই উষ্ণতার তুলনায়ও ইহা তারকা-জগতে মধ্যম স্থান অধিকার করিয়া আছে। সূর্য সব দিক দিয়াই সাধারণ।

৩। সূর্যের সঞ্চলন

সূর্য ছায়াপথ (galactic) নামক বৃহৎ তারকাপ্রণালীর একটি সমকালীন বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে ছায়াপথে প্রায় ১২০ মিলিয়ার্ড তারকা রহিয়াছে।

নির্মল রাত্রিতে ম্লান রজতবর্ণ একটি পরিসররূপে আমরা যাহা পর্যবেক্ষণ করি, সেই milky wayকে ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা পুণ্যবানদের স্বর্গে যাইবার উজ্জ্বল পথ বলিয়া মনে করে। এখন আমরা জানি যে ইহা ছায়াপথের একটি অংশ। ইহা প্রচুরতারকা দ্বারা গঠিত।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছায়াপথ আপন কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘোরে। কেন্দ্রটি নিজেই একটি বহু তারকার সমাহার।

অন্য সমস্ত তারকার সহিত সূর্য ও ছায়াপথের ঘূর্ণনে অংশ গ্রহণ করে। সূর্য এবং তাহার 'পরিপার্শ্বস্থ' অধিকাংশ তারকা ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে সেকেণ্ডে ২৩০ কিলোমিটার বেগে ঘোরে। সঞ্চলনের এইরূপ অসাধারণ বেশী বেগ হওয়া সত্ত্বেও সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি পূর্ণ আবর্তন প্রায় ২০ কোটি বৎসরে সম্পন্ন করে। আমাদের জ্যোতিষ্কটি লীরা এবং হারকিউলিস্ তারামণ্ডলের দিকে সরিয়া যাইতেছে। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহও মহাশূন্যে একটি spiral Curve/...এর পথে এই প্রচণ্ড দৌড়ে অংশ লইয়াছে।

মাঝে মাঝে শুনিতে হয় যে সূর্যের সহিত অন্য তারকার সংঘর্ষ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ভীতি অমূলক। সূর্যের "পরিপার্শ্ব" এত 'সুপরিসর' যে শূন্যের এই অংশের তারকাগুলির মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব প্রায় ১০ আলোক বৎসর, অর্থাৎ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। সুতরাং অন্য কোনো তারকার সহিত সূর্যের সংঘর্ষ ঘটিবার কোন ভয় নাই।

৩। সৌরশক্তির উৎস

১। সূর্যের আলোক ও তাপ বিকীরণ

কোটি কোটি বৎসর যাবৎ মহাজাগতিক শূন্যে সূর্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং আলো ছড়াইতেছে।

হিসাব করা হইয়াছে যে প্রতি মিনিটে সূর্যের পৃষ্ঠ হইতে মহাজাগতিক শূন্যে পাঁচ কোয়াড্রিলিয়নের বেশী (কোয়াড্রিলিন হাজার হাজার মিলিয়ার্ডের সমান) বৃহৎ ক্যালোরী তাপ বিকীরণ হইতেছে (এক কিলোগ্রাম জলের উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ তাপ দরকার, তাহাকে এক বৃহৎ ক্যালোরী বলে)।
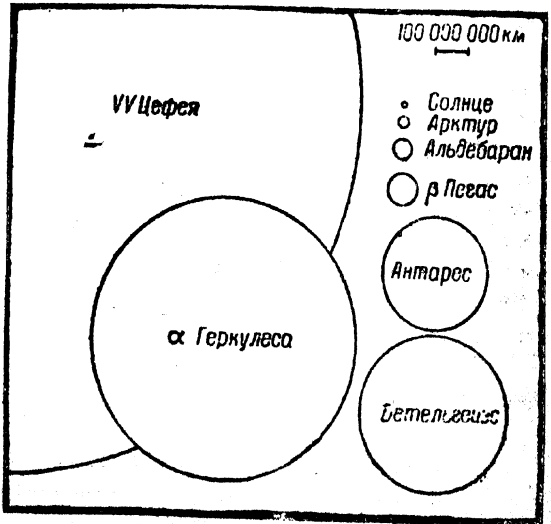
চিত্র নং ১৪—সূর্য ও বৃহৎ নক্ষত্রগুলির আয়তনের তুলনা

সূর্যের সমস্ত পৃষ্ঠ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি বিকীরিত হয়, তাহা পাইতে হইলে পৃথিবীর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির চুল্লীতে প্রতি সেকেণ্ডে এত পরিমাণ কয়লা পোড়াইতে হইবে যে তাহা সমস্ত পৃথিবীতে এই জ্বালানীর সঞ্চয়কে বহু গুণে ছাড়াইয়া যাইবে।

বিকীরণশীল শক্তি হারাইতে হারাইতে সূর্য অপরিহার্যরূপে নিজের ভর কমাইয়া ফেলে। প্রতি সেকেণ্ডে ইহা ওজনে চল্লিশ লক্ষ টনেরও বেশী কমিয়া যায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হয়: সূর্য কি দীর্ঘস্থায়ী হইবে?

পৃথিবীর অতীত ও পৃথিবীস্থ জীবন অধ্যয়ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত কোটি কোটি বৎসরে সূর্যের বিকীরণের তীব্রতা প্রায় পরিবর্তিত হয় নাই। সূর্যের বিকীরণের শক্তি মাত্র অর্দ্ধেক কমিয়া গেলেই আমাদের গ্রহের পৃষ্ঠদেশে উষ্ণতা শূন্যের বেশ নীচে নামিয়া যাইত। আর ইহা পৃথিবীর প্রাণী এবং উদ্ভিদকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইত।

সূর্যের ভর এত বিপুল যে বিকীরণের জন্য ইহার ক্ষয় বেশ বেশী মনে হইলেও, এইরূপ প্রকাণ্ড দেহের তুলনায় ইহা তুচ্ছ। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়াছেন যে আরো বহু মিলিয়ার্ড বৎসর সূর্য এই একই রকম ভালভাবে আমাদের গ্রহকে উত্তপ্ত এবং আলোকিত করিতে থাকিবে?

কোথা হইতে সূর্য শক্তি আহরণ করে?

২। কিছুকাল পূর্ব্বে অবধি কাহাকে সৌরশক্তির উৎস বলিয়া মনে করা হইত?

পূর্বতনকালে অনুমান করা হইত যে, সূর্যের উষ্ণতা রক্ষিত হয় দহনের ফলে। সূর্যের অভ্যন্তরে এই দহনকার্য অবিরাম চলিয়াছে। কিন্তু সূর্যের তাপ বিকীরণের তীব্রতা সর্বদা এক সমে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি মাসে পাথুরে কয়লার প্রায় বিশটি এমন চাঁই পোড়ানো প্রয়োজন হইত যাহাদের প্রত্যেকটি আকারে ভূগোলকের কম হইত না। হিসাব করা হইয়াছে যে সূর্য যদি নিজেই সম্পূর্ণরূপে পাথুরে কয়লায় গঠিত হইত, তবে এইরূপ কয়লার গোলক ৩ হইতে ৪ হাজার বৎসরে পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইত।

সূর্যের তাপবিকীরণের উৎস বলিয়া দহনের অনুরূপ কোন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে গণ্য করা কি সম্ভব? দেখা যাইতেছে, যায় না। দহন হইতেছে অম্লজানের অণুর সহিত দহমান বস্তুর অণুর পারস্পরিক বিক্রিয়া এবং তাপ উদ্গীরণ সহকারে নূতন অধিকতর মিশ্র অনুগঠন। দহনের ফলে এক ধরণের অণু ধ্বংস হইয়া যায় আর অন্য প্রকার অণু গঠিত হয়। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, উচ্চ উষ্ণতায় সূর্যে বিমিশ্র অণু গঠিত হইতে পারে না।

সূর্যে দহন না চলার আরও একটি কারণ এই যে, বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা যায় সূর্যে অম্লজান অতি অল্প।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত উল্কাপিণ্ড মতবাদ পেশ করা হয়। এই মতবাদ অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল শক্তির ক্রিয়ায় সূর্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে; সেকেণ্ডে ৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে প্রচুর পরিমাণ উল্কা এবং ধূলিসদৃশ বস্তু আসিয়া পড়ে। এই বস্তুর বলশক্তি (mechanical energy) তাপে রূপান্তরিত হইয়া দৃশ্যতঃ সৌরতাপের প্রধান উৎ হিসাবে কাজ করে।

বর্তমান কালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উল্কাপিণ্ড মতবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ। এত বেশী পরিমাণ উল্কাপিণ্ডের প্রয়োজন হইত যে সূর্য লক্ষণীয়ভাবে তাহার আকৃতিতে বড় হইয়া যাইত। বাস্তবে এই রকম কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং এই উপায়ে সূর্যের বিকীরণ এবং তাহার পৃষ্ঠদেশের উচ্চ উষ্ণতা রক্ষা করা যায় না।

পরবর্তী কালে চাপ সূর্যের আয়তন হ্রাস মতবাদ দেখা দিল। এই মতবাদ অনুসারে সূর্যের ভরের এক অংশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইহার কেন্দ্রের অভিমুখে বেগে ধাবিত হয় এবং ইহাদের বলশক্তি তাপে রূপান্তরিত হইয়া সৌরশক্তির ব্যয় বহন করিতে এমন কি সূর্যের উষ্ণতা বর্দ্ধিত করিতে পারে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্যে উচ্চ উষ্ণতা রক্ষা করিতে হইলে ইহার ব্যাস প্রতিবৎসরে ৩০ মিটার কমিয়া যাইত। ফলে, এক শত বৎসরে তিন কিলোমিটার কমিয়া যাইত। এই ভাবে পাওয়া যায় যে সূর্যের বয়সের সীমা এবং সেহেতু পৃথিবীস্থ জীবন ২ কোটি বৎসর অতিক্রম করিত না। যাহা হউক, সমকালীন বিজ্ঞানের তথ্য ইহার বিরোধী। খননকার্য সাক্ষী দেয় যে পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশ ছেদবিহীন ভাবে কোটি কোটি বৎসরকালব্যাপী ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এই কালপরিসরে সূর্যের বিকীরণের তীব্রতা প্রায় পরিবর্তিত হয় নাই। যদি ২ কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের বিকীরণের তীব্রতা সমকালীন তীব্রতার চারগুণ হইত, তবে তৎকালীন সাগর এবং মহাসাগরের জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইত এবং পৃথিবীতে জীবনধারণ অসম্ভব হইত।

কতকগুলি রাসায়নিক মৌলের তেজস্ক্রিয় বিয়োজন * আবিষ্কারের পরে সৌরশক্তির তেজস্ক্রিয় মূল অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে তেজস্ক্রিয়তাও সূর্যের অকল্পনীয় পরিমাণ বিকীরণ সরবরাহ করিতে পারে না। সবাই জানে যে, রেডিয়াম অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিয়োজিত হয়। কাজেই সূর্য যদি সম্পূর্ণরূপে রেডিয়াম দ্বারা গঠিতই হইত তবে ১৬০০ বৎসরের মধ্যে ইহার অর্দ্ধেক বিয়োজিত হইয়া যাইত এবং তাহার ফলে 'রেডিয়ামময় সূর্যের' বিকীরণের তীব্রতা দ্রুত কমিয়া যাইত। [ক্রমশঃ।

* তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আরো বিশদ বিবরণের জন্য সরকারী টেকনিকাল প্রকাশ-ভবনের "জনগণবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থমালা"র পুস্তিকা 'তেজস্ক্রিয়তা' (ক, ব, জাবোরেন্‌কো) দ্রষ্টব্য।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বাঙালী-কন্যার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীকমল মুখোপাধ্যায়।
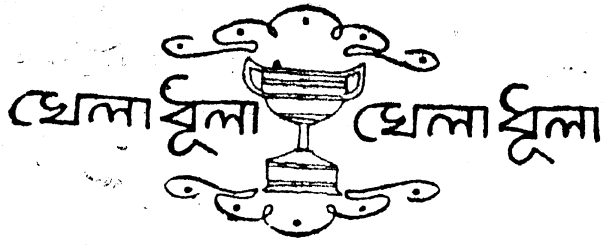
নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান

আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে ভারতে একটা আন্তর্জ্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হবার সম্ভাবনা আছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যদি এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হয়—তাহলে এই প্রতিযোগিতা নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে আলোচনার জন্ম দিল্লী হকি এসোসিয়েশনের এক সভাও সম্প্রতি হয়ে গেছে এবং তারা ভারতীয় হকি ফেডারেশনকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছে। প্রকাশ যে, এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্ম গ্যারান্টি হিসাবে প্রচুর অর্থ দাবী করা হয়েছে। দিল্লী হকি এসোসিয়েশন সেইজন্ম সার্ভিসেস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড ও রেলওয়ে কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে একত্রে মিলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করবে বলে ঠিক করেছে। দিল্লীতে আন্তর্জ্জাতিক হকি এসোসিয়েশনের অধিবেশনের সময়ই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সর্ব্বসমেত ছয়টি রাষ্ট্রের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে। আশা করা যায় যে ভারত এইরূপ একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সুযোগ পাবে।

রাজ্য স্কুল গেমসের পরিসমাপ্তি

সম্প্রতি কলকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ মাঠে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রাজ্য স্কুল গেমসের আসর বসে। উত্তর কলকতা, মধ্য কলকাতা, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, ২৪-পরগণা, মালদহ, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হাওড়ার সর্ব্বসমেত ১২৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। এর মধ্যে ৩১ জন ছাত্রী থাকে। এবার ছাত্রী বিভাগে দু'টি রেকর্ড হয়। ডিসকাস নিক্ষেপে মেদিনীপুরের মীনা দে ৫৩ ফুট ১ ইঞ্চি ছুঁড়ে নতুন রেকর্ড করেন। ১৯৫৮ সালে ২৪-পরগণার নমিতা ঘোষ ৪৮ ফুট ৪½ ইঞ্চি ছুঁড়ে এ বিষয়ে রেকর্ড করেছিলেন। বর্শা নিক্ষেপে হাওড়ার দেবিকা হাজরা ৬৩ফুট ১০ ইঞ্চি ছুঁড়ে ১৯৫৮ সালের উত্তর কলকাতার সবিতা দাশ গুপ্তের পূর্ব্ব রেকর্ড (৬৩ ফুট ১½ ইঞ্চি) ভঙ্গ করেন। এছাড়া ছাত্রীদের ১০০ মিটার দৌড়ে দক্ষিণ কলকাতার শ্রীপর্ণা ঘোষ দস্তিদার ১৩'৮ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে ১৯৫৭ সালের হুগলীর নীলা দত্তের রেকর্ডের (১৩'৮ সেঃ) সমান করেন। এবার ছাত্ররা কোন বিষয়ে রেকর্ড করতে পারেন নি।

এবার মেদিনীপুর ২৩ পয়েন্ট পেয়ে ছাত্র বিভাগে ও ১৩ পয়েন্ট পেয়ে ছাত্রী বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

মার্চ্চ মাসে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রচণ্ড গরমের জন্ম ছাত্র ও ছাত্রীদের কষ্টভোগ করতে হয়। প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচালকদের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যখনকার খেলাধূলা সেই সময়েই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে সম্পাদক মহাশয় তাঁর বিবরণীতে জানিয়েছেন যে স্কুল সেশন পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রতিযোগিতাটি দেরি হয়েছে। যাহা হউক, বহুদিন পরে এরূপ একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্ম পরিচালকমণ্ডলী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

স্কুল ক্রিকেটে দক্ষিণ কলিকাতার সাফল্য

পশ্চিম বঙ্গ স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সুপরিচালনায় আন্তঃ জেলা স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের কথা থাকলেও বর্দ্ধমান শেষ পর্য্যন্ত হাজির হয়নি। দক্ষিণ কলকাতা স্কুল দল এবারও প্রতিযোগিতা জয় করেছে এবং যাইক্কালে দ্রুত হারে রাণ তোলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে কাইক্কালের প্রতিযোগী দু'টি দল দু'ঘণ্টা করে ব্যাট করার সময় পায়। এই দু'ঘণ্টার সুযোগে দক্ষিণ কলকাতা ৭ উইকেটে ২২৩ রাণ ও উত্তর কলকাতা ৪ উইকেটে ১৩৮ রাণ তোলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ কলকাতা ১৯৫৭ সালেও উত্তর কলকাতাকে পরাজিতকরেছিল।

এবার দক্ষিণ কলকাতার সাফল্যের মূলে ছিল দলের অধিনায়ক রবীন মুখার্জ্জীর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। তিনি ১৮টি বাউণ্ডারী ও ৫টি ওভার বাউণ্ডারী মেরে ১৩৮ রাণ করেন। উত্তর কলকাতার অম্বর রায়ের ব্যাটিংও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য হয়। তিনি ৬১ রাণে অপরাজিত থাকেন।

এরূপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বাঙ্গালা ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার দিকে একটু দৃষ্টি দিলে এই রাজ্যের ক্রিকেট খেলা উন্নত হবে।

রাণ-সংখ্যা

দক্ষিণ কলকাতা—৭ উইঃ ২২৩ (রবীন মুখার্জ্জী ১৩৮, এ, দাশ গুপ্ত ৩৫, কে, সেন ২৬; এম, মান্নি ৪৫ রাণে ৪উইঃ ও অম্বর রায় ৪৮ রাণে ৩ উইঃ)।

উত্তর কলকাতা—(৪উইঃ) ১৩৮ (অম্বর রায় নট আউট ৬১)।

কলিকাতায় জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান

কলকাতার ইডেন উদ্যানে পশ্চিমবঙ্গ সাইক্লিষ্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। ২৩ বছর পরে কলকাতায় জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতার আসর বসায় এখানকার ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। এখানে বাঁধ ট্র্যাক না থাকায় তৃণাচ্ছাদিত সমতল ট্র্যাকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিযোগীদের বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

পাঁচদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১০ মাইল ও ৪৩ মাইল রোড রেস দুটি কেল্লার চারপাশে রাস্তা ধরে চলে। এবারকার প্রতিযোগিতায় অন্ধ্র-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাট, দিল্লী, পশ্চিম বাঙ্গালা, রেলওয়ে ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দিনে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রতিযোগিতাটির সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে বলা চলে।

এবার মহারাষ্ট্র সর্ব্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। টিমসমূহের পাঁচ চক্কর ল্যাপ রোড রেসে (প্রায় তেইশ মাইল) বাঙ্গালা জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। বাঙ্গালা দলের এই সাফল্যে পি, সি, বসাক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেণ। তাঁর কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালা দলের সাফল্য সম্ভবপর হয়েছে, বললে অন্যায় হবে না। নিম্নে পদকের খতিয়ান দেওয়া হলো :—

সিনিয়র

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	প:
মহারাষ্ট্র	৩	৩	১	৩৪
রেলওয়ে	০	১	৪	২৭
বিমান বাহিনী	১	১	১	১৫
বাঙ্গালা	১	০	০	১০
বিহার	১	০	০	৫
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	১	০	০	৫

জুনিয়র

উত্তর-ভারত	২	০	১	১১
মহারাষ্ট্র	১	১	১	৯
মহীশূর	০	১	১	৪
বাঙ্গালা	০	১	০	৩

মহিলা

মহারাষ্ট্র	২	২	০	১৬
বাঙ্গালা	০	০	২	২

রেলওয়ে চতুর্থ বার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান

এবার হায়দ্রাবাদে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসে। সকল রাজ্য দলই অংশ গ্রহণ করে। বাঙ্গালা প্রথম খেলাতেই পরাজিত হয়। এবার ফাইন্যাল খেলাটি একদিনে মীমাংসা হয়নি। পুনরনুষ্ঠিত খেলায় রেলওয়ে দল ২—১ গোলে শক্তিশালী পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করে রঙ্গস্বামী কাপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। রেলওয়ে দল ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গত বছর তারা সার্ভিসেস দলের নিকট পরাজয় বরণ করেছিল। এবার নিয়ে রেলওয়ে দল চারবার এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করে।

ডেভিস কাপ টেনিসে ভারতের সাফল্য

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইন্যালে ভারত ৫-০ খেলায় থাইল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। ফাইন্যালে ভারত জাপান ও ফিলিপাইনের বিজয়ী দলের সঙ্গে খেলবে।

এবারকার ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎলাল অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের খেলা দেখে সকলেই খুসী হয়েছেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হ'লো :—

সিঙ্গলস্

জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত)—৬-৪, ৬-৩ ও ৬-৪ সেটে এস, কারলাককে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

রমানাথ কৃষ্ণান (ভারত)—৬-০, ৬-৩ ও ৬-১ সেটে সেরি চারভেচিন্দাকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত)—৬-১, ৩-৬, ৬-১ ও ৭-৫ সেটে চারুচুত্তাকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎলাল (ভারত)—৬-৪, ৭-৫ ও ৬-২ সেটে এস, কারলাককে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

ডাবলস্

রমানাথ কৃষ্ণান ও প্রেমজিৎলাল (ভারত)—৬-০, ৬-২ ও ৬-১ সেটে এস, কারলাক ও সিরি চারুচন্দকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

অষ্ট্রেলিয়া টেনিস দলের কলিকাতায় প্রথম টেষ্ট খেলা

বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৮ই, ৯ই ও ১০ই এপ্রিল কলকাতায় সাউথ ক্লাব লনে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া টেনিস দলের প্রথম "টেষ্ট" খেলা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় বব হিউইট, ফ্রেড ষ্টোন; কেন ফ্লেচার ও নিউকম্ব। আশা করা যায় যে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের এই মিলন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উপভোগ্য হবে এবং টেনিস অনুরাগী দর্শকরা উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখার সুযোগ পাবেন। অষ্ট্রেলিয়া দল দিল্লীতে দ্বিতীয় টেষ্ট ও মাদ্রাজে তৃতীয় টেষ্ট খেলায় যোগদান করবে।

প্যাটার্সনের খেতাব অক্ষুণ্ণ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা এফ, প্যাটার্সন বিশ্ব হেভি ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ফিরতি লড়াইয়ে সুইডেনের ই জোহানসনকে পনের রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের ষষ্ঠ রাউণ্ডে নক আউটে পরাজিত করে তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্যাটার্সন ও জোহানসনের এটি তৃতীয় মিলন। প্রথমবার জোহানসন ও দ্বিতীয়বার প্যাটার্সন জয়ী হয়েছিলেন।

"There is no such thing as moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all."

—*Oscar Wild*

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে দিন ক্যাম্প থেকে অন্তরীণের পথে রওনা হলুম তার আগের দিন বিকালে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে বিদায় নেওয়ার সময় পেয়েছিলুম। আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিচ্ছেদ-ব্যথাও উঁকি মারছিল—আবার কবে দেখা হবে, দেখা হবে কি না, কেউ বলতে পারে না। রওনা হওয়ার সময় বন্ধুর দল ফটকের কাছ পর্যন্ত এসে বিদায় দিলে। ফটক পার হয়ে বাইরে এসেই মনটা অতীতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উধাও হয়ে ছুটলো ভবিষ্যতের দিকে।

Internment Order এর বয়ান এমন যে পুলিস ইচ্ছা করলেই Order violate করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু এতদিন সরকারী নীতিই এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না, যাতে পুলিস খুসীমত সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু ৩৪ সালের Suppression of Terrorism এর যুগে গভর্ণমেণ্টও যেমন কড়া হয়েছে,—পুলিসও তেমনি খুসীমত সুযোগ নিতে সুরু করেছে। অনেক জায়গায় অনেক ডেটিনিউ ঐ Order violate করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছে—কাগজে প্রায়শই এরকম নতুন নতুন কেসের খবর দেখা যায়।

তার ওপর ফরিদপুরের পুলিস সুপার তখন কুখ্যাত দোহা সাহেব। দারোগা একটু ভদ্রলোক বা ভীতু হলে অবস্থাটা সহনীয় হবে, না হলে সব সময় কোমর বেঁধে সাবধান হয়ে চলতে হবে। সে এক যন্ত্রণা বিশেষ।

যাই হোক, ফরিদপুরে এসে S. P.-র অফিসে হাজির হলুম। S. P.-র দেখাই পেলুম না—মনে হল ওরা দেখাদেখির ধারই ধারে না। তাঁর Confidential Clerk এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মিঃ প্রসার, তিনিই কাগজপত্র ঠিক করে দেন, এবং সব কাজই মুখস্থ মত চলে। আমার সঙ্গে বাক্যালাপে প্রথমেই তিনি বললেন,—"আমিও কমিউনিষ্ট!" আমি বললুম, "তাই নাকি? Good news." লোকটা কিন্তু পাজি নয়—পরে দেখেছি। তিনি আমাকে "জমা" করে নিয়ে পুলিস ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ইন্সপেক্টরও দেখা দিলেন না।

সেখানে দুদিন থাকতে হল—যে ছোট দারোগা আমাকে রেজেকাঁদিতে নিয়ে যাবেন, তিনি মফঃস্বলে তদন্তে গিয়েছেন। একজন A. S. I. (I. B). আমার কাছে থাকলেন—অল্পবয়স এবং শিক্ষিত—আলাপে মনে হল, পাজি টাইপের লোক নয়। নামটা বোধ হয় বিনয় চ্যাটার্জি।

দুদিন বাদে ছোট দারোগা অমিয় গুহ এসে আমাকে নিয়ে চললেন রেজেকাঁদিতে—দুজন কনেষ্টবলও চললো। ট্রেণে রাজবাড়ী পর্যন্ত এসে "দেড় মাইলটাক" মেঠো পথে হেঁটে যেতে হবে। গরুর গাড়ীতে গেলে ঘুরে যেতে দেরীও হবে, আর যন্ত্রণাও কম হবে না। তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবত এই যাত্রাপথের একটা ভালোরকম T. A. Bill দারোগাবাবু মারবেন। এ লোকটা পাজি টাইপের। বললে, "ওখানেও নেহাৎ জামাই আদরে থাকবেন না।' ঝগড়াঝাটির ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে সটকাটই করলুম।

মাঠের মধ্য দিয়ে আল ধরে চলেছি, পথ আর ফুরোয় না—তিন মাইলের কম মনে হল না। লটবহর বয়ে নিয়ে চলেছে কয়েকটা লোক, গাড়ী-রাস্তায়—তারা আমাদের আগেই পৌঁছে গেল। সন্ধ্যার আগে মাঠে নেমেছি,—গ্রামে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সীমানায় এক বড় খালের মতন মরা নদী—চন্দনা—সামান্য জল আছে—শুনলুম বর্ষাকালে নদী রীতিমত নদীতে পরিণত হয়, বড় বড় নৌকো যায়। কয়েকখানা বাঁশ-বাঁধা অস্থায়ী পুলের উপর দিয়ে টলমল করতে করতে নদী পার হয়ে ঠিকানায় পৌঁছে গেলুম। কাছেই নদীর ধারেই আমার ডেরা এবং আর একটু তফাতে নদীর ধারেই থানা।

থানায় জমা লিখিয়ে বাসায় এলুম। একটু নাবা জমির ওপর এক হাত উঁচু পোতার উপর, ৭ ফুট টিনের দোচালা এবং দর্মার বেড়া দেওয়া পাশাপাশি তিন কামরা ঘর। একটাতে চট্টগ্রামের ননী চৌধুরী আগেই এসে আস্তানা গেড়েছে, দ্বিতীয় কামরা আমার। ঘরে একটা তক্তপোষ একটা টেবিল ও চেয়ার আছে,—আর একদিকে বাঁশের মাচা, জিনিসপত্র রাখার জন্যে। পাশের দিকে আর একটু উঁচু পোতার উপর ঐ রকম টিনের তিন খুপরী রান্নাঘর। পিছন দিকের কোণায় সমতল জমির ওপর মাচা বেঁধে টিনের খুপরী—পায়খানা। নীচে একটু কুয়ো কাটাও হয়নি—জলে স্থলে একটি ছোট নরক হয়ে আছে। ঘরের বাইরে রোয়াক নেই,—বাসার চৌহদ্দীর বেড়াও নেই। অবাক কাণ্ড! তবু ননীকে পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ করলুম। চাটগাঁর ছেলে। ননীর কাছে শুনলুম, ঘরের জন্যে সরকারী বাজেট ছিল ৮০০ টাকা—স্থানীয় লোকেরা বলে ৩০০ টাকা খরচ করে কন্ট্রাক্টর (রাজবাড়ীর লোক)

পেয়েছে ৪০০ টাকা,—বাকি অর্ধেক টাকা দারোগা মেরেছে। এই নাকি মফঃস্বলের সরকারী কন্‌ট্রাক্টরীর রেওয়াজ।

পায়খানার পাশে একটা প্রকাণ্ড উঁচু ঢিপি আছে। সেটাকে কেটে ঘরের পোতা করলে ভালই হত, কিন্তু তাতে হাত বিশেক দূর থেকে মাটি বইতে হবে বলে, তা না করে ঘরেরই সুমুখ এবং পিছন থেকে এক এক কোদাল মাটি কেটে ঘরের পোতা তৈরী করা হয়েছে। ফলে ঘরের চারপাশের জায়গাটা নদীর ধারের রাস্তার চেয়ে নীচু হয়ে গেছে, বর্ষাকালে জল জমবে। এক চোটেই বুঝতে পারলুম, কেমন রাজ্যে এসে পড়েছি।

দারোগা আহমদ হোসেন সেকেলে দারোগা—মূর্খ, ভীতু, ধূর্ত এবং পাঁড় ঘুসখোর। পাঁচটি মেয়ের পর সম্প্রতি একটি খোকা হয়েছে। এক কিশোর আছে চাচাতো ভাই,—প্রকৃতপক্ষে চাকরের মতন। এক বৃদ্ধ মৌলবী সাহেব আছেন মামাশ্বশুর, অন্নদাস, মেয়েদের পড়ান। বড় মেয়েদের ইংরাজী পড়ায় ননী। দারোগা তাকে একটু স্নেহ করে,—সে দারোগার বাসা থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে পড়ে আসে। তাতেই সন্তুষ্ট—চোরের রাত্রিবাস লাভের মতন।

ছেলেটি ভাল চেহারাও সুন্দর, স্বভাবও সুন্দর—হাসিমুখ অথচ ধীর ও গম্ভীর। বাইরে আই, এ পড়তো—পড়াশুনোয় মনও আছে, কিন্তু উপায় নেই। আমার কাছে কিছু বই আছে দেখে বললে, আপনার কাছে পড়বো। তার কাছে একখানা ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ছিল—ধর্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ ও কমলাকান্ত। সেটা চেয়ে নিয়ে আমি দিনকতকের খোরাক সংগ্রহ করলুম। খাওয়ার ব্যবস্থাও হল একসঙ্গে। গাঁয়ের এক কায়স্থ বৃদ্ধ আছে combined hand ঠাকুর চাকর। ননী allowance এর পঁচিশ টাকার প্রায় সবটাই তার হাতে তুলে দেয়, তার বদলে সে ওকে দুবেলা দুটো ভাত আর চা খাওয়ায় তার খুসী অনুসারে। ননী কিছু দেখেও না, বলেও না। লোকটা পাজি ও নোংরা। রান্নাঘরের সামনেই বাসন মাজে এবং ঘরের সামনেটাই একটা নোংরা আঁস্তাকুড় করে রেখেছে। দু-একদিন পরেই আমার সঙ্গে খেচাখেচি লাগলো।

কয়েক দিন পরে একদিন তাকে ধমক দিয়েছি,—সে তেড়ে-ফুড়ে বললে আমি কাজ করবো না। আমিও বললুম, এক্ষুনি বিদেয় হও। বলে সত্যিই তাকে বিদেয় করে দিলুম। ননী ঘাবড়ে গিয়ে বললে, রান্নার কি হবে? চাকরতো পাওয়া যায় না। আমি বললুম, তুমি জলটা এনে দিলে আমিই সব করবো।

কয়েক দিন সেই ব্যবস্থাই চললো। একটা মুসলমান ছোকরা ছিল, সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বাবুদের ফাইফরমাস খেটে বেড়াতো—লোকে বলতো পাগল। তাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিই, দু'-চারটে পয়সা দিলেই সে ড্যাম-গ্ল্যাড। কিন্তু ৩০ দিন এমন করে চলে না। খোঁজ নিয়ে জানলুম, আগে এক মুসলমান চাকর ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকে বলে তার থাইসিস আছে। সে সব কাজ করতো এবং রাঁধতো।

তাকে ডাকলুম; সে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, ময়লা "চিরকুট" কাপড় পরা, এবং একটা ময়লা পাতলা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়ানো। জিজ্ঞাসা করলুম, লোকে যে বলে তোমার থাইসিস আছে, সত্যি? সে নিঃশব্দেই ঘাড় নেড়ে জানালে না। বললুম, কাজ করতে পারবে? আবার সে নিঃশব্দেই ঘাড় নেড়ে জানালে হ্যাঁ, পারবে। নাম তার ইব্রাহিম।

মনে হল, খেতে না পেয়েই লোকটার এই দশা হয়েছে। বললুম, বেশ, আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। বলে তাকে একখানা কাপড় ও একটা গেঞ্জি দিয়ে বললুম, এইগুলো পরে ময়লা কাপড় ছেড়ে ফেল। একটা সাবান দিয়ে বললুম বাড়ী গিয়ে ওগুলো কেচে দিও। সে সেগুলো নিয়ে "বাড়ী থেকে ঘরে আসছি" বলে চলে গেল এবং মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে এলো, মাথায় একটু তেল-জলও দিয়েছে। আর মুখ-চোখের ভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন,—যেন আশা আর উৎসাহে তাজা হয়ে উঠেছে। একটি ঝকঝকে বদনাও নিয়ে এসেছে দেখে মনে হল যেন পরিষ্কার স্বভাবের প্রতীক।

কায়েত বুড়ো রান্নাঘরটাকে সর্বরকমে নোংরা করে রেখেছিল, আমি কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলুম। ইব্রাহিম চট করে কিছু মাটী মেখে নিয়ে উনুন মেরামত করে ফেললে এবং সারা ঘরটা নিকিয়ে পরিষ্কার করে ফেললে। আমার আন্দাজই ঠিক, স্বভাব পরিষ্কার না হলে, আমার বলার অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকেই এটা করতো না। তার পর রান্নার কড়া এবং সব বাসন নদী থেকে মেজে পরিষ্কার করে নিয়ে এল, এবং কুটনো-বাটনা রান্নায় লেগে গেল। মাইনে ঠিক হল, পাঁচ টাকা।

আমার ভরসায় ননীরও ভরসা হয়েছিল,—কিন্তু পাশেই পোষ্ট অফিস এবং মুসলমান পোষ্ট মাষ্টারের বাসা—তিনি দেখে বললেন, "সর্বনাশ! ওর যে থাইসিস আছে।" আমি হেসে বললুম,—"আমার ওষুধে ভাল হয়ে যাবে।" তিনি চেপে গেলেন।

দেখতে দেখতে ইব্রাহিম রেঁধে খাইয়ে দিলে। একটু দূরের টিউবওয়েল থেকে বালতি করে স্নানের জলও এনে দিয়েছে,—মানা শোনেনি। কাজের লোকও বটে,—রাঁধেও মন্দ নয়।

আমার অবাক লাগলো। ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলুম,—লোকে কেন বলে, তোমার থাইসিস আছে? সে আস্তে আস্তে মাটির দিকে চেয়ে বললে,—"বাবু,—গাঁয়ের লোক কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। একটু জমি আছে, তা থেকে যা পাই, খেতে কুলোয় না—একটা মেয়ে আছে,—বছর দশেকের,—তার মাও আছে। এখানে কাজ করে একটু ভাল ছিলুম,—লোকের পছন্দ হয় না। একটু জরজাড়ী হলেই বলে থাইসিস।

বুঝলুম। আমাদের খাইয়ে দাইয়ে সে বাসন মেজে, ঘর নিকিয়ে, খেয়ে বাড়ী যায়,—মেয়ের জন্তে একটু-একটু তরকারি নিয়ে যেতে বলে দিয়েছি—ভারি আনন্দ তার। ২।৩ ঘণ্টা পরেই আবার এসে চা খাওয়ায়—রান্না করে,—রাত্রে আমাদের শোওয়ার পরে বাড়ী যায়,—আবার ভোরেই আসে। একেবারে নিশ্চিন্ত হলুম।

বেলেকাঁদি গ্রামটা দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে লোক-বসতি,—আর এক অংশে হাই স্কুল, খেলার মাঠ, জমিদারের নায়েবের দপ্তর ও বাড়ী, সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, পোষ্ট অফিস, থানা ও হাটখোলা। গ্রামের এই দুই অংশের মাঝে আছে একটা খাল,—তার ওপরে ছোট কাঠের পুল আছে। প্রথম অংশটাতে আমাদের প্রবেশ নিষেধ—আমাদের দিনের বেলার চৌহদ্দী ঐ দ্বিতীয় অংশ, এবং রাত্রে—সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত—বাসার চৌহদ্দীর মধ্যে আটক।

পোষ্ট অফিস ও থানার মধ্যে হাটখোলা আমাদের বাসা থেকে ২০০ হাতের মধ্যে। হাটের দু দিন (সপ্তাহে) হাটে বাঁওড়া ...

রোজ ছবেলা থানায় হাজিরা দেওয়া ছাড়া আমি প্রায় ঘর ছেড়ে বার হই না। ননী একটু ঘোরাফেরা করে, বিকালে খেলার মাঠে বেড়াতে যায়। একটুখানি খোলা জায়গার তিন দিকে মোট ৮।১০ খানা দোকান মুদী, ময়রা দর্জির দোকান—এই হচ্ছে হাটখোলা। ভাল খাবার স্রেফ পাওয়া যায় না। হাটে কিন্তু মাছ, ডিম, দুধ বেশ সস্তা—বিশেষত ডিম আর দুধ। ডিম পয়সা পয়সা, এবং দুধ তিন বা চার পয়সা সের। পালেপার্বণে পাঁচ পয়সাও হয়। আমি হাটের দিন ৫।৭ সের দুধ কিনে ঘরে ছানা কাটিয়ে একটু চিনি দিয়ে পাক করে রেখে দিতুম—চায়ের সঙ্গে তাই খেতুম দুজনে। ইব্রাহিমও একটু বাড়ী নিয়ে যেত।

যাই হোক, ননীর বাড়ী থেকে চেষ্টা চলছিল,—অল্প দিনের মধ্যেই তার Home internmentএর order এসে গেল—সে চলে গেল। তার বঙ্কিম গ্রন্থাবলীখানা চেয়ে রেখে দিলুম।

একা একা লেখাপড়াই বা কি করা যায়। capital বইটা বাংলায় অনুবাদ করতে সুরু করেছিলুম। বড় কঠিন কাজ,—কেউ কখনো চেষ্টা করেনি। প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা অনুবাদ করে হাঁপিয়ে গিয়েছিলুম। কাজকর্ম কিছুই নেই—কোণার টিবিটার মাটি কেটে ঘরের চারপাশে ফেলা শুরু করলুম। মানা না শুনে ইব্রাহিমও ঝুড়ি নিয়ে এল মাটি বইতে। বলে, আমি এখন গায়ে বেশ জোর পেয়েছি! কিছুদিনের মধ্যে বাসার চারিদিক চৌরস করে ফেললুম।

এর মধ্যে হঠাৎ আর এক ডেটিনিউ এসে পড়লো,—বহরমপুর ক্যাম্প থেকেই—বিমল গুহ—২২।২৩ বছরের জোয়ান—ননীর চেয়ে একটু বড়। অনুশীলন "কিচেনের" লোক। আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাদের একজন লীডার সুরেন দাসের সঙ্গে আমাকে দাবা খেলতে দেখতো—সুতরাং খোলা মনেই আমাকে নারানদা বলে আলাপ করলে। সে '৩৪ সালে camp থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরেছিল। পড়াশুনো এবং সব কিছু জানবার-বোঝবার ঝোঁক ছিল—right spiritএর মানুষ। দুজনের সংসার দিনকতক বেশ চললো। ষ্টেটস্‌ম্যান (দৈনিক) এবং সঞ্জীবনীর (সাপ্তাহিক) গ্রাহক হয়েছিলুম—তাই নিয়ে পড়া এবং আলোচনায় বেশ খানিক সময় কাটতো। সে এক বেহালা এনেছিল, সকাল-সন্ধ্যায় সাধতো। বিকালে দারোগা এবং পোষ্টমাষ্টারের বাসার ছেলেদের সঙ্গে দাড়িবাঁধা খেলাও করতো। আমার মাঝে মাঝে রাস্তায় এক চক্র ঘুরে আসা ছাড়া diversionএর আর কোন উপায় ছিল না।

কনেষ্টবলদের ব্যারাকে দুপুরবেলা একটা তাসের আড্ডা বসতো, জমাদার সুশীল মণ্ডল, বক্সী, হাওলদার সাহেব খেলতো,—আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতুম, এবং শেষ পর্যন্ত খেলায়ও যোগ দিয়েছিলুম।

হাওলদার সাহেব হিন্দুস্থানী,—আধা-বাংলায় কথা কয়,—বেশ মানুষ—আমাদের সম্বন্ধে একদিন বললে,—"আরে ভাই, এ লোক তো সন্ত হায়। আরে হাঁ,—ইনকা তপস্যা হায় দেশকা সুধার।" গৌরবর্ণ, মাথায় টাক,—যেন গৃহস্থবাড়ীর বুড়ো কর্তা।

জমাদার সুশীল মণ্ডল উকীল যোগেন মণ্ডলের জ্ঞাতি-ভাই, যিনি পরবর্তী কালে পাকিস্থানের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। ৩৫।৩৬ সালে নমঃশূদ্রদের নেতা ছিলেন বিরাট মণ্ডল—যিনি পরে কংগ্রেসী এমএলসি হয়েছিলেন। সুশীল মণ্ডল লোকটা ছিল অহংকারী এবং একটু

পাজি টাইপ। সে মাঝে মাঝে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করতো, ইসারায় বুঝিয়ে দিত, দারোগা মফঃস্বলে গেলে সে থাকতো থানার বড় হাকিম—যেন সে ইচ্ছা করলেই আমাদের নামে ডায়েরী লিখে আমাদের জব্দ করতে পারে। আমি মনে মনে ভাবতুম,—সবুর কর ঠাকুর,—তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার ব্যবস্থা আমিই করবো।

আসার পরই আমি পায়খানার কুয়ো সম্বন্ধে রাজবাড়ীতে ইনস্পেক্টরের কাছে কনট্রাক্টরের নামে রিপোর্ট করেছিলুম। ফলে হঠাৎ একদিন দারোগা সাহেব একদল মেথর নিয়ে এসে একটা কুয়ো খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাল দরখাস্ত লেখার বিদ্যে দেখলে লোকে একটু সমীহ করে।

ঘরের বারাণ্ডা এবং চালের সম্বন্ধেও লেখালিখি শুরু করেছিলুম। একদিন ইনস্পেক্টর এলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ করে কাজটার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। একদিন থানায় ছিলেন,—বেশীর ভাগ সময়টাই আমার ঘরে আড্ডা মেরে কাটালেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মানুষ ভাল, মনে হল দারোগা সাহেবকে কিছু মিঠে-কড়া বচন শুনিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কনট্রাক্টরকে সঙ্গে নিয়ে দারোগা সাহেব এলেন। মাল-মশলার ফর্দ তৈরী হল এবং কয়েক দিন পরেই আমাদের দুঘরের সামনে বারাণ্ডা এবং চাল তৈরী হয়ে গেল।

তৃতীয় ঘরটা যেমন ছিল, রয়ে গেল। সে ঘরের পরবর্তী ইতিহাস চমৎকার। সে কথা পরে আসবে।

দু জনের ৫০৲ টাকার সংসার—সচ্ছল অবস্থা, সুতরাং ইণ্ডিয়ান রিভিউ (মাসিক) এর গ্রাহক হলুম। কাগজপত্রগুলো পড়ার সময় প্রধান ও জ্ঞাতব্য কথাগুলোতে টিক মারি,—কিছু কিছু কোটেশন একটা খাতায় লিখে রাখি, একটা খাতায় ২।১টা বিষয় অনুবাদও করে রাখি, আর একটা খাতায় ভাল প্রবন্ধগুলোর নাম ও তারিখ লিখে রাখি, বুক রিভিউ পড়ে' ভাল বইয়ের নাম প্রভৃতিও লিখে রাখি। এমনি করে বেশ খানিক সময় কাটাই।

বিমল গুহকে বলে দিয়েছিলুম, দারোগার সঙ্গে কখনো হেসে কথা ব'লো না—ভদ্র ভাবে কথা ব'লো, কিন্তু গম্ভীর থেকো। জোয়ান ছোকরা ডেটিনিউদের গম্ভীর মুখকে ওরা ভয় করে। আমি বয়স্ক বলে আমিই আমাদের তরফ থেকে কথা কই, লেখালিখি করি, তবু ওরা ভরসা রাখে, আমি বেতালা বা সাংঘাতিক কিছু করে বসবো না, এবং ছোকরা ডেটিনিউকেও একটু কণ্ট্রোলে রাখবো। ফলে ওরা নিজেরাও একটু বিবেচনা করে চলে।

চলছিল এমনি ভাবেই, কিন্তু বিমলচন্দ্রের মতিগতি একদম বদলাতে সুরু করলো। দারোগার এক জ্ঞাতিভাই ছোকরা এল,—ম্যাট্রিক পড়ে। দারোগার অনুরোধে বিমল বাবু তাকে পড়াতে সুরু করলে। আমার দাবা নিয়ে তার সঙ্গে দাবা খেলে, কিন্তু আমার সঙ্গে খেলতে চায় না—বলে অত মাথা ঘামাতে পারবো না। ক্রমে এমন হল যে, পারত পক্ষে আমার কাছেই আসে না।

এপ্রিল মাস এল। হঠাৎ এক অর্ডার এল, আমাদের দিনের বেলায় area কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছিল মোট সিকি বর্গ মাইলের মতন, এখন হল ৩০০—১০০ গজের মতন—নদীর ধারের এক ফালি জায়গা বাঁশের পুলের একদিকে মুসলমানদের নমাজের জায়গা ও মসজিদ,—আর একদিকে সাবরেজেস্ট্রী অফিস, আমাদের বাসা, পোষ্ট অফিস, হাটখোলা এবং থানা [illegible] নদী এবং অপর দিকে হাটখোলার পিছন দিকের।

শুধু তাই নয়। রাত্রে কনেষ্টবল এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে সাড়া নিয়ে যাওয়া শুরু করলো—দাগী দেখার মতন। অভাবনীয় কাণ্ড। সুতরাং বিমল বাবু আবার আমার দিকে একটু ফিরলো।

দুজনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে' স্থির করে ফেললুম,—পঞ্চম জর্জের রাজত্বের সিলভার জুবিলী আসছে,—কাগজে তার তোড়জোড়ে খবর বেরুচ্ছে,—সম্ভবতঃ কিছু ডেটিনিউ ছাড়বে,—এবং তারই পরীক্ষা সুরু করেছে। এই উৎপাতগুলো মুখ বুজে সয়ে যেতে পারলেই হয়ত ছাড়া পাবো।—গরজের হিসাব।

কিন্তু দেখতে দেখতে জুবিলী পার হয়ে গেল। কাগজে খুঁজি, কোথাও ডেটিনিউ ছাড়ার কোন খবরই নেই। সুতরাং এই আশা ভঙ্গের পর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একটা লড়াইয়ের জন্যে কোমর বাঁধিতে লাগলুম। এমন সময় হঠাৎ একদিন থানায় দারোগার কাছে শুনলুম গোয়ালন্দের ডেটিনিউ রোহিণী বড়ুয়া দারোগাকে এক দা'য়ের কোপে সাবাড় করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবস্থা বদলে গেল, দারোগার বজ্জাতি বন্ধ হল। রোহিণী বড়ুয়া এক দা'য়ের কোপে অনেক ডেটিনিউয়ের অনেক যন্ত্রণার অবসান করে দিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসি গেল। আজ তার কথা ক'জনের মনে আছে?

রাজবাড়ী থেকে ইন্‌স্পেক্টর বাবু এলেন। গোয়ালন্দের ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন,—"মাথা গরম ছোকরা, দারোগা তার একটা দরখাস্ত ফেলে রেখেছিল—মা'র অসুখ, দেখতে যাবার ছুটী চাই—আরে বাবা, ছুটী কি দেয় গভর্ণমেণ্ট? চাটগাঁর ছোকরা, ক্ষেপে গিয়ে দারোগার ওপরই গায়ের ঝাল মেটালো।"

আমি বললুম,—"হয়ত It was the last straw on the camel's back,—দিনের পর দিন হয়ত তার জীবন দুর্বহ করে' তোলা হয়েছিল। সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি। আমাদের এই দারোগা সাহেবের কথাই ধরুন না কেন? আমি বহুকাল থেকে বহুবার বহু জায়গায় ডেটিনিউ হয়ে বাস করেছি,—এমন কাণ্ড কখনো শুনিনি যে, রাত্রে দাগী দেখার মতন করে কনেষ্টবলেরা ডেটিনিউয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সাড়া নিয়ে যায়। উনি একগাদা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করেন, ওনার সেটা বিবেচনা করে চলা উচিত নয়?" দারোগা চুপ্‌সে গেল।

তারপর areaর কথা তুললুম। দারোগা সাহেব তখন মুখ খুললেন—বললেন,—"কি করবো, ওপরের হুকুম।" আমি বললুম,—"ওপরের তারা চেনে, আগের আর পরের চৌহদ্দী? কতটুকু বা ছিল, আর কতটুকু হল? সবই আপনার কেরামতী।" ইন্‌স্পেক্টর বাবু বললেন, "আমি গিয়ে former area restore করতে লিখে দোব, সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না।" কিছু দিন পরে পূর্বচৌহদ্দী আবার মঞ্জুর হয়ে ছিল।

এর পর রাত্রের অত্যাচার বন্ধ হল, দারোগা সাহেব হেসে কথা সুরু করলেন, এবং ক্রমে প্রায় "My dear" হয়ে উঠলেন। বিমল বাবুর মতিগতিও আবার বদলে গেল। আমার সঙ্গে [illegible] সম্পর্কই নেই। এই ভাবে কাটলো অক্টোবর মাস পর্যন্ত। [illegible]

চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা ভাল। সুতরাং একদিন নির্বিবাদে দুজনের হাঁড়িও পৃথক করা হল।

ইতিমধ্যে বর্ষাকাল পার হয়ে গেছে। বিশ্রী বর্ষায় চারি দিকে জল-কাদার মধ্যে ঐ ঘরে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটতো কেমন করে' তা গদ্যে না শুনে কবিতাতেই শুনুন।

বর্ষা-মঙ্গল—বর্ষা+অমঙ্গল

শ্রাবণের প্রায় শেষ, ভরা বরষা
আকাশ না হতে চায় মোটে ফরসা।
হরদম ঝমঝম বৃষ্টির ধূম
থেকে থেকে মেঘ ডাকে গুড়ুম গুড়ুম।
ষাঁড়ের মতন গলা যত কোলা ব্যাঙ
দল বেঁধে ডাক ছাড়ে গ্যাংগোর-গ্যাং।
শিয়ালের আস্তানা ডুবেছে জলে—
ঝোপে ঝাপে ঘোরে তারা সদলবলে।
দিনের বেলায় ডাকে হুক্কা-হুয়া।
ভিজে কাঠ, জ্বলেনাকো, কেবলি ধুঁয়া।
মাঠঘাট জলে ডোবা, উঠোনে কাদা
গরুগুলো দিন রাত গোয়ালে বাঁধা।
মাছ তরকারি হাটে কিছু না পেয়ে
পেট ফুলে জয়ঢাক খিচুড়ী খেয়ে।
ঘরের কানাচ ঘিরে হল জঙ্গল
বড় বড় জোঁক ফেরে বেঁধে দঙ্গল।
পথে ঘাটে ঘোরে ফেরে বড় বড় সাপ
রূপ দেখে আত্মারাম করে বাপ-বাপ।
কেঁচো আর কেন্নোয় বারাণ্ডা ভরা
চিমটের চিমটিতে ফুরোয় না তারা।
কুনো ব্যাঙ ঘরে আছে গোটা দুই চারি
কখন্ বা ঢোকে সাপ, সেই ভয়ে মরি।
খাটের পায়াটা ঘিরে ধরিয়াছে উই
এই ঘরে দিনরাত উঠি-বসি-শুই।
কাপড় শুকোয় নাকো ঘরের ভেতর
জুতোগুলো ভিজে ভিজে হয়েছে গোবর।
বাদলায় গলে' জল হয়ে গেছে নুন
সিলিংয়ের কাঁচা বাঁশ থেকে ঝরে ঘুণ।
দেশলাই জ্বলেনাকো, এ বড় বালাই!
বিড়িগুলো নিভে যায়, কতই ধরাই।
রগীর পাল আর বেরাল-কুকুরে
পান্ত-ফেলা ভাত খায় ভাগাভাগি করে'।
সবার দুঃখ বুঝি বুঝেছে সবাই
নেহাৎ ঝগড়া-ঝাঁটি করেনাকো তাই।
চাষার আনন্দ বটে মাঠ পানে চেয়ে
ঘরে বসে ভেজে কিন্তু তার ছেলেমেয়ে।
ছোট্ট মাঁয়ে একা নেয়ে ছেঁড়া পাল তুলে
ভিজে যায় জল ছেঁচে নিঙড়ে চলে।
চলিতু জল হাওয়া থাকে না জীবন
তাই ভেবে আপাতত প্রাণ আছে ধান।

সুখেদুখে গড়া এই জগৎটা দাদা
গোলাপেতে কাঁটা, আর বর্ষায় কাদা।

যাই হোক,—অক্টোবরেই খবর পাওয়া গেল, আর একজন ডেটিনিউ আসছে। বিমল বাবু মাঝের রান্নাঘরে পৃথক হাঁড়ি কেড়েছিল, এবং এক পৃথক ছোকরা চাকর রেখেছিল। সে খবর শুনে সড়াক করে তৃতীয় খুপরীতে রান্নাঘর সরিয়ে নিয়ে গেল,—কিজানি, যদি বে-পার্টির লোক আসে, এক পাশে সরে' থাকাই ভাল!

এর পর একদিন রাত দশটায় হিজলী ক্যাম্পের এক মূর্তিমান বিপ্লবী বেলেকাঁদি পৌঁছে গেলেন। নাম অনিল বাকচি। বিমল বাবু তখন ঘুমিয়েছে, আমি জেগে আছি, ইব্রাহিমও আছে। সুতরাং আমি উঠে কর্তার এবং escort officer এর খাওয়ার ব্যবস্থা করলুম। ইতিমধ্যে বিমল বাবু উঠেছে এবং দুই কর্তায় আলাপ সুরু করেছে।

ওদের খাওয়াদাওয়ার পর আবার দুজনে আলাপ সুরু হল, এবং রাত দুটো পর্যন্ত আলাপ চললো। এক পার্টির লোক!

অনিল বাবুর বাপ ছিল পুলিস—নর্থবেঙ্গলের লোক—এখন তিনি মৃত। ওর এক ভাই সম্প্রতি এই ফরিদপুরেই I. B. Training নিয়ে গেছে। এ হেন অনিল বাবুর স্বদেশী হাঙ্গামায় আসা, এ যেন দেবতার ছলনা।

দ্বিতীয় দিন সকালেও অনিল বাবু আমার কাছেই খেলে এবং রাত্রে বিমলবাবুর সঙ্গে আর এক দফা পরামর্শ করে' আমার কাছে একসঙ্গে Joint messing এর প্রস্তাব করলে। আমি চক্ষুলজ্জায়
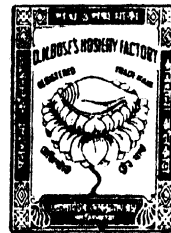
আর "না" বলতে পারলুম না। দুই চাকর নিয়ে Joint messing এর ব্যবস্থাই হল।

আসল ব্যাপার এই যে, এই কয়দিনে বিমল বাবু সংসারের ঝঞ্ঝাট খানিক বুঝেছে। অনিল বাকচি বাবু-লোক,—চেহারা এবং পোষাক ফিটফাট করতেই তার মনোযোগ এবং সময়ের সবখানিই খরচ করতে হয়। এ অবস্থায় সকল ঝক্কি আমার ওপর চাপিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো আর কানাকানি করা নিয়েই ওরা থাকতে চায়। সেটা দুদিনেই বোঝা গেল।

আমার একাই দিন কাটে,—শুধু সন্ধ্যার পর বাইরে একটু বসলে ওদের সঙ্গে একটু গল্পসল্প হয়। অনিলের মুখে ফ্রয়েড ছাড়া প্রায় কথাই নেই। আর আছে বেহিসেবী চালিয়াতী। বিদ্যের দৌড়, ক্যাম্পে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরেছে, বয়েস ২৪।২৫,—২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারী করেছে, সেই বোধহয় স্বদেশী হাঙ্গামায় হাতে খড়ি। তারপর দমদম জেল এবং ক্যাম্পে বিভিন্ন দলের দাদারা টিপেটুপে তেএঁটে করে ছেড়ে দিয়েছে। অনুশীলন দলে কথাটাই হয়ত মিথ্যে, বিমল বাবু অনুশীলন দলের লোক, এটা বুঝেই হয়ত তাকে ভোগা দিয়েছে, তার ওপর দাদাগিরী খাটাবে বলে।

তার কথাবার্তা শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ভেবে পাই না। "সাত বছর জেলে কাটলো—বাড়ীর খবর জানি না। ২৮সালে arrest করে জলপাইগুড়ীর আই, বি অফিসার জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা অনিলবাবু, আপনি ২৭ সালে কেন অন্য Provinceএ গিয়েছিলেন বলুন তো?" ভাবখানা হচ্ছে, তিনি এমন একজন important লোক যে অনুশীলন পার্টি ২৭ সালেই তাঁকে অন্য Provinceএ কাজে পাঠিয়েছিল। অথচ তখন তাঁর বয়েস, হিসেবমত ১৬।১৭ বছর!

কথায় কথায় অনুশীলন দলের লীডারদের নাম করে' সে বিমল বাবুকে বলে,—আমি যদি এটা করি, অমুক কি বলবে,—যদি ওটা করি তমুক কি ভাববে?—অর্থাৎ উনিও একজন লীডার এবং বিমল বাবুর দাদা-স্থানীয়।

সে যে একজন বড় গাইয়ে-বাজিয়ে লোক,—সেটা দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। গান শুনে দেখা গেল, আজও তার তালমাত্রা জ্ঞান হয়নি। গান সম্বন্ধে আমি যে আনাড়ী, এটা সে "কমনসেন্সের" জোরেই ধরে নিয়েছিল,—আর বিমল বাবুকে সাগরেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। বিমল বাবুও মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন বেহালা নিয়ে প্রাণপণে তার সব চেয়ে রপ্ত একটা ভাল গৎ বাজিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিলে যে, সেও নেহাৎ আনাড়ী নয়। এমনি করে লজ্জা ভাঙ্গার পর ক্রমে বিমল বাবু ওকে নিয়ে নির্মমভাবে রগড় সুরু করলে। বেহালায় একটা করে সুর বাজায়, আর ওকে জিজ্ঞাসা করে,—কি সুর? ও বলতে পারে না, না হয় ভুল বলে। তখন বিমল বাবু বলে দেয়, আর ও নিজের জানা একটা সুর ভেঁজে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করে। আমি মজা দেখি।

একদিন মস্কো-ভ্লাডিভোষ্টক রেল লাইনের দৈর্ঘ্যের কথায় অনিল বললে, "চার হাজার মাইল আমরা কয়েকজন বন্ধুমিলে বাড়ী থেকে পালাবার মৎলব করেছিলুম—তখন ম্যাপে দেখেছিলুম!"

সেই দিন থেকে আমি ওর নাম রাখলুম বিরিঞ্চি বাবা—বিমল বাবুও হেসে সায় দিলে।

এক টুকরো ভাল গল্প বলতে ভুলে গেছি। অক্টোবরের (৩৫) আগে যখন দারোগা সাহেব হয়েছেন "My dear"—এবং বিমল বাবুর সঙ্গে আমি "ভিন্ন" হয়েছি,—তখন একদিন হঠাৎ দারোগাসাহেব এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে এসে একগাল হেসে বললেন, "আমার নতুন জামাই। বি-এতে স্কলারশিপ পেয়ে এখন এম-এ পড়ছে। সৈয়দ বংশের ছেলে। পড়ার খরচ আমিই দিচ্ছি। আপনারা আছেন শুনে দেখতে চাইলে, তাই নিয়ে এসেছি আলাপ করিয়ে দিতে। ইকনমিক্সের ছাত্র, নাম আবদুল হালিম।

দারোগা সাহেব বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন,—টেরই পাইনি, এখন চিড়িয়াখানা দেখাতে এনেছে জামাইকে। তিনি বিদ্যায় এবং বংশে জামাইয়ের চেয়ে নীচু সুতরাং ভাল বংশের বিদ্বান্ জামাই পেয়ে এত খুসী হয়েছেন যে, হুঁসই নেই, কত বড় আইনবিরুদ্ধ কাজ করছেন। ডেটিনিউরা স্কুল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, এদিকে দারোগা নজর রাখবে, এই হল সরকারী হুকুম। মনে মনে হাসলুম, তাঁকে ঘাল করার একটা অস্ত্র হাতে রইলো।

যাই হোক, আদর করে বসিয়ে একটু চা খাওয়ালুম এবং আলাপ সুরু করলুম। দারোগা সাহেব তাকে রেখেই ফিরে গেলেন। পড়াশুনোর কথা থেকে অর্থনীতির আলোচনা সুরু হল। হালিম বললে, "পলিটিক্যাল ইকনমি হচ্ছে ক্যাপিট্যালিষ্ট ইকনমি—মার্কসের থিওরী তার মৌলিক ভিত্তিই উড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল ইউনিভারসিটির এম, এর অর্থনীতিতে মার্কসের "ক্যাপিট্যাল" একটা রেকমেণ্ডেড বই—পড়তে হয়।"

বলতে বলতে সে উৎসাহ সহকারে আমাকে মার্কসের অর্থনীতির মূল কথা বোঝাতে সুরু করে দিলে। বুঝলুম, ছোকরা মার্কসের ভক্ত, এবং চুপ করে তার কথা শুনে বুঝলুম, তার ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়নি। শেষে আমি মুখ খুললুম, এবং তার বোঝার ঘাটতি কিছু দেখিয়ে দিলুম।

ছেলেটা সত্যিই ভাল। সে বুঝলো, মানলো, এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,—"আমি আরো ২।১ জায়গায় ডেটিনিউ দেখেছি—আমার নানাও দারোগা—মার্কসিজম বোঝে, এমন ডেটিনিউ দেখিনি।" কথাটা বেশ লাগলো। রাত্রে আবার আসবে বলে চলে গেল, কিন্তু এল না। শেষে অনেক রাতে দরজায় টোকা শুনে উঠে দেখি মূর্তিমান্ হাজির! বলে, বউকে বলে এসেছি, কেউ জানবে না,—এখানেই গল্প করবো সারারাত, তারপর ভোর রাতে উঠে চলে যাবো!

অবাক কাণ্ড! এবং সত্যিই আমাকে অবাক করলে। আমার ভক্ত হয়ে গেছে। সারারাত আমার বিছানায় শুয়ে হাজারো রকমের গুরুতর বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা—আমিও বহুকাল এত আনন্দ পাইনি।

ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব Sir John Strachyর বিখ্যাত বই Theory and practice of socialism তখন [illegible] বেরিয়েছে, এবং প্রথম চালান ভারতে আসার পরই "custom Ban" করা হয়েছে। সে বইখানা আমি হালিমের কাছেই পেয়ে পড়ে' নিয়েছিলুম।

যাই হোক,—বিরিঞ্চি বাবার কল্যাণে বেলেকাঁদি এক চমৎকার চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছিল। সরকারী আজব চিড়িয়াও এসে জুটেছিল। সুতরাং আমি নিয়মিত ভাবে ডায়েরী লেখা শুরু করলুম—"চিড়িয়াখানার ডায়েরী।" তার ভূমিকায় লিখলুম—

চিড়িয়াখানায় নানা প্রকারের জীবের সংগ্রহ থাকে,—কোনোটা চমৎকার, কোনোটা বা চমকপ্রদ—কোনোটা হাস্যরস, কোনোটা বা বীভৎস রসের উদ্রেক করে। পারিপার্শ্বিক নানা ভাবোদ্দীপক জীবের সমাবেশের মধ্যে বীভৎস জীবগুলোর বীভৎসতা সহনাতীত হয়ে উঠতে পারে না। এমন কি, সমগ্র পরিবেশের harmonyর মধ্যে তার অবদানটুকুও উপভোগ্য হয়।

আমাদের Detention campগুলোকে এমনি স্বদেশী চিড়িয়াখানা বলা চলে।

আর এক রকমের ছোট ছোট যাযাবর চিড়িয়াখানা নিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মেলায় মেলায় ঘোরে। তাতে থাকে দু'-চারটে অদ্ভুত বা ভয়ঙ্কর জীব মাত্র। লোকে শুধু ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখে—হয়ত একটা মাত্র কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার দেখার জন্যেই লোকে পয়সা খরচ করা সার্থক মনে করে।

আমাদের Village Internment campগুলোকে অনেক সময় এই রকম ছোট চিড়িয়াখানার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

বাজিয়াকান্দি এমনি একটা চমৎকার ছোট চিড়িয়াখানা। এর চমৎকারিত্ব দিন দিন এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে, এর বর্ণনা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অধীন এই চিড়িয়াখানার একটি সামান্য জীব।

*　　*　　*　　*

এই চিড়িয়াখানার ডায়েরী লিখতে লিখতে আমার মন-মেজাজের অবস্থা কেমন হয়েছিল, শেষাংশে ২।৪ লাইনে তার পরিচয় আছে।

"মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে স্রেফ রগড় দেখ আর আনন্দ কর—ব্যস্। চলুক—যেমন চলছে—যতদিন না সব "মাঠময়" হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপস্বরূপ আমি যেন সর্বদা চিৎ হয়ে পড়ে থেকেই এ আনন্দ উপভোগ করতে পারি। উঠছিও না, নড়ছিও না, যতদিন না বিধাতাপুরুষেরা পশ্চাদ্দেশে পাদপদ্মাঘাত সহকারে বিদায় দিয়ে বলে—ভাগ শালা।"

[ক্রমশঃ।

প্রতিধ্বনি

জুলফিকার

এখানে ঘাসের মায়া নিবিড় কোমল।
পাশে ঘন বন, ছায়া নির্জন।
অনেক, অনেক পথ পার হয়ে এসে,
ক্লান্ত দেহ চাহে বিশ্রাম।
চেয়ে দেখি ফেলে-আসা গ্রাম,
হাতছানি দেয় দূর থেকে,
আকাশের কোলে মাথা রেখে।

দূরে জাগে শুভ্রশির পাহাড়ের সারি,
দিগন্ত ফলকে আঁকা প্রশান্ত স্বপন।—
রেখে গেছে পদচিহ্ন হরিণের দল,
ত্রস্ত চপল,
ঝরণা জলের ধারে ভিজে মাটি পর,
—অলস প্রহর।
পাইন আর বার্চ পাতা বিকেলের রোদে,
কচি হাসি হাসে।
স্তব্ধতা ঘুমায় আশে-পাশে।
নীলচে ঘাসের ফুলে প্রজাপতি তোলে চঞ্চলতা।
বুনো ঝাউ-ডালের আড়ালে,
ভীরু চাঁদ উঁকি দেয়, বধূ লাজনতা।

বাতাসে ঘুমের ছোঁয়া,
মায়ের বুকের মত ঘাস।
স্তব্ধ হেথা সময়ের শ্বাস।
মনের মমতে জাগে এ নীরব বাণী—
সহজেতে এগিয়ে দেয় তুমি বুকে আমারই প্রতিধ্বনি।

সবুজ শ্যামলী

মঞ্জু দাশগুপ্ত

সবুজ শ্যামলী
নামে আর বেশে
মিলেছে, মিশেছে ঠিক।
টুনকো কাচ নয়, পান্নাকে করেছে কর্ণভূষণ—
সস্তা সুতী নয়, রেশমী সবুজ পরিধানে
মুর্শিদাবাদী যার নাম।
সবুজ পশমী থলে ভুবনের সজ্জা নিয়ে,
ঢাকা আছে স্ফটিকের চাকচিক্য আভরণে
চরণ-কমল ভংগী তাও সবুজে মোড়া
ধন্য শ্যামলিমায়।

সবুজ শ্যামলী তুমি
নগণ্যতার পথ তোমার নয়।
দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনে যাকে দেখি
রিক্ত, সিক্ত, জীর্ণ পরিধানে,
ছিন্ন চটির ঘর্ষণে যার ধূসর কলঙ্ক লেখা হয়
তুমি তার কেউ নও, সে তোমার আত্মীয় নয়।

সবুজ শ্যামলী তুমি
অহঙ্কারের সজ্জা তোমার
হঠাৎ যাবে ঘুচে—বলবে এসে চুপি চুপি
নগণ্যতার মানুষটিকে—
"মোহের বাঁধন গেছে কেটে
এবার হলাম প্রকট, হলাম নগ্ন
গ্রহণ করে এত কর আমায়
সত্য তুই সবুজ শ্যামলিমায়"।

বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উদ্বোধনী নো-ট্রাম্প ডাকের উপর খেঁড়ীর ডাক (Responses to one No-Trump)

নো-ট্রাম্প ডাকদারের খেঁড়ীর অবস্থা অনেক সুবিধাজনক। কারণ তিনি জানেন যে উদ্বোধনকারীর তাসের বিভাগ নো-ট্রাম্প জাতীয়, উচ্চতাসমূল্য ৩½ থেকে ৪+ এবং ডাক ও ফিরতি ডাকের উপযোগী তাসের অভাব তাঁর হাতে। খেঁড়ী আরও জানেন যে প্রতিটি রংয়েরই ছবি তাস আছে এবং মোট ছবি তাসের সংখ্যা আটটির কাছাকাছি। সুতরাং খেঁড়ীর পক্ষে নিজ হাতের শক্তি অনুযায়ী গেম হওয়া সম্ভব কি না বা কয়টি নো-ট্রাম্পের খেলা হ'তে পারে ধারণা করা সহজ হ'য়ে পড়ে। যেমন, মনে করুন উদ্বোধনকারী ৩½ বা ৪ ট্রিকে একটি নো-ট্রাম্প ডাক দিয়েছেন। সুতরাং সম বিভাগে অন্তর্বর্ত্তী তাস সমেত গেম করার জন্ম প্রয়োজন যথাক্রমে ২½ ও ২ ট্রিকের তাস। ২ ট্রিকের কম তাসে উপযুক্ত মিলের তাস ছাড়া (fillers) গেম করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত হিসাবানুযায়ী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় :—

১। ১½ ট্রিক বা কম দরের সমবিভাগ তাসে···পাশ দেওয়া উচিত। মনে রাখা প্রয়োজন বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া নো-ট্রাম্প ডাক বাঁচিয়ে রাখবার দরকার হয় না।

২। ২ ট্রিক (৮-৯ পয়েন্ট)···২টি নো-ট্রাম্প ডাক দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। ২½ ট্রিক বা কিছু বেশী দরের তাসে (১০-১৪ পয়েন্ট) ···৩টি নো-ট্রাম্প ডাকের খেলা করার পূর্ণ সম্ভাবনা।

একটি নো-ট্রাম্পের ডাকের উপর রংয়ের দুটির ডাক

একের-উপর-একের ডাকের মত নো-ট্রাম্প ডাকের উপর দুটি ডাকের উপর দুটি রংয়ের ডাকও উদ্বোধনকারী অন্ততঃ এক চক্র বাঁচিয়ে রাখবেন আশা করা যায়। এরূপ ডাকের প্রণালী সাধারণ ভাবে নিম্নরূপ :—

১। ২ থেকে ২½ ট্রিকের অসম-বিভাগে ৫ তাসের উঁচু দরের রংয়ের দুটির ডাক বাঞ্ছনীয়। (উদ্বোধনকারী উক্ত রংয়ে সাহায্য করলে রংয়েই গেম ডাক হবে। দু'টি নো-ট্রা ডাক দিলে ৩টি নো-ট্রা ডাক হবে।

২। ২ থেকে ২½ ট্রিকে উচ্চমূল্যের দুটি রংয়ে ৪-৪ বিভাগে প্রথমে ধরে ছোট রংটির দুটি ডাক হবে, সাহায্য পেলে উক্ত রংয়েই গেম ডাক হবে। (উদ্বোধনকারী তৎসত্ত্বেও নো-ট্রাম্পে খেলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নো-ট্রাম্পেই খেলতে হবে।)

৩। নোট্রাম্পের উপর নীচু দরের দুটির ডাক সাবধানবাণী বলে গণ্য করা যেতে পারে। এরূপ ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় যখন খেঁড়ীর তাস নো-ট্রাম্প ডাকে খেলবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—হাতে প্রবেশের তাসের অভাবে নো-ট্রাম্পে কোনও রূপ সাহায্য নাও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু রংয়ের ডাকে খেলতে পারলে ৩ বা ৪ খানি পিঠ জয় করার সম্ভাবনা থাকে। আবার আর এক প্রকারের তাস পাওয়া যায় উচ্চতাসমূল্য খুব বেশী না হলেও উঁচুদরের রংয়ে দ্বিতীয়চক্রে ডাক এলে গেম করাও সম্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও পূর্ব্বোক্ত রূপ নীচুদরের রংয়ে দুটির ডাক কার্য্যকরী হ'তে দেখা গেছে বহু সময়ে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

১নং		২নং		৩নং	
ই-সা, ১০, ৯, ২	—½	ই-সা, বি, ৪, ৩	—১	ই-গো, ৯, ৮, ২	—+
হ-টে, ৭, ৫, ৩	—১	হ-বি, ১০, ৭, ২	—+	হ-১০, ৮, ৬, ২	—×
রু-৩	—×	রু-বি, গো, ৪, ৩	—½	রু-×	—×
চি-গো, ১০, ৯, ৫	—+	চি-৭	—×	চি-সে, সা, ৫, ৪, ২	—২
	১½+		১½+		২+

১নং তাসে ট্রিকদর মাত্র ১½+ এবং একটি নো-ট্রাম্প ডাকে সাধারণতঃ পাস দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু বিভাগের বিশেষত্ব হিসাবেও দুটি উচ্চদরের রংয়ের চারখানি করে তাস থাকায় উক্ত রং দুটির মধ্যে যে কোন একটির ডাক দ্বিতীয়চক্রে এলে গেমের আশ' থাকায় দুটি চিড়িতন ডাক খুবই কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা। ২নং তাসে অনুরূপ কারণে দুটি রুহিতন ডাক দেওয়া যায়। ফিরতি ডাক দুটি নো-ট্রাম্প এলে পাস দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ৩নং তাসটিও ১ ও ২নং তাসের প্রায় অনুরূপ কিন্তু চিড়িতন রংয়ে উচ্চতাসসহ পাঁচখানি এবং ট্রিকদর ২+ থাকায় দ্বিতীয়চক্রে দুটি নো-ট্রাম্প ডাক এলে তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে।

নীচের তাসগুলিতে নো-ট্রাম্প ডাকে কোনওরূপ সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই অথচ সংখ্যাধিক্য হেতু রংয়ের ডাকে দুটির এমন কি তিনটি ডাকের খেলা করা যেতে পারে। সুতরাং প্রথমে দুটি এবং প্রয়োজনবোধে পরে তিনটির ডাক দিতে হবে রংয়ের।

	ট্রিকদর
১। ই-বি, ১০, ৯, ৮, ৭, ৩ ; হ-গো, ৬ ; রু-বি, ৫, ৪ ; চি-১০, ২	½+
২। ই-১০, ৫, ৮ ; হ-বি, গো, ৯, ৬, ৫, ৩ ; রু-৪ ; চি-৭, ৫, ৩	½
৩। ই-৭, ৩ ; হ-বি, ৯, ৬, ৪, ৩ ; রু-গো, ১০, ৫, ৪, ২ ; চি-৩	½
৪। ই-গো, ৯, ৮, ৪, ৩, ২ ; হ-৭, ৪ ; রু-৭, ৩, ২ ; চি-৫, ৪	+

১নং তাসে ডাক হবে প্রথম চক্রে ই-২। উদ্বোধনকারী দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলে দ্বিতীয় চক্রে ডাক হবে ই-৩। এরূপ ডাকে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে (Sign off)। আর উদ্বোধনকারী ই-র উপর ই-৩ ডাক দিলে ছেড়ে দিতে হবে। ২নং তাসে কোনওরূপ শক্তি নেই, নো-ট্রাম্প ডাকে সাহায্য করবার অথচ হরতন রং... ৪ পিঠ জয় করতে পারা যায়। সুতরাং দুটি হরতন ডাক দি... অপেক্ষা করতে হবে খেঁড়ীর দ্বিতীয় ডাকের জন্ম। দ্বিতীয় চক্রে...

নো-ট্রাম্প বা অপর কোনও ডাক এলে তিনটি হরতন ডাক ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ইহা সুনিশ্চিত যে, নো-ট্রাম্প বা অপর কোনও ডাকে খেলা অপেক্ষা হরতন রংয়ে বেশী পিঠ জয় করা যাবে। এরূপ তাসে উদ্বোধনকারী নো-ট্রাম্প ডাকে বিশেষ কোনওরূপ সাহায্য পাবেন না অপর পক্ষে হরতন রংয়ে সংখ্যাধিক্য হেতু বেশী পিঠ জয় করা যাবে। ৩নং তাসে উচ্চমূল্য মাত্র ½ ট্রিক কিন্তু অসম-বিভাগ হেতু এবং হাতে প্রবেশ করবার তাস না থাকায় নো-ট্রাম্প ডাকে খেলবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সাধারণ হিসাবে, নো-ট্রাম্প ডাকের উপর কোনও ডাক চলে না কিন্তু দুটি রংয়ের মধ্যে (হরতন বা রুহিতন) যেটি উদ্বোধনকারীর সহিত ভাল ভাবে মিলে যাবে সেই রংয়ে বেশী পিঠ জয় করা যাবে নো-ট্রাম্প ডাক অপেক্ষা সুতরাং প্রথম চক্রে ডাক হওয়া উচিত ২-২। উদ্বোধনকারী নো-ট্রাম্প দুটি ডাক দিলে পরের চক্রে ডাক দিতে হবে রু-৩। এক মাত্র বিবেচক খেঁড়ীর সহিত খেলার সময়ে এরূপ ডাক দেওয়া সঙ্গত ; নচেৎ বিপর্য্যয় ঘটবার অপেক্ষায় ১টি নো-ট্রাম্প ডাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ভুল বোঝাবুঝির ফলে এরূপ ডাকে বিপর্য্যয় ঘটতে দেখা যায় অনেক সময়ে। ৪নং তাসে কোনওরূপ শক্তি নেই অথচ বেশ উপলব্ধি করা যায়, নো-ট্রাম্প ডাকের চেয়ে ইস্কাবন রংয়ে বেশী পিঠ জয় করার খুবই সম্ভাবনা। কিন্তু উপায় কি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ? দুটি ইস্কাবন ডাক দিলে অথবা বেশী ডাকে উঠে ডবল খেয়ে বা বিনা ডবলেই বেশী খেসারৎ দিতে হবে। কিন্তু নো-ট্রাম্প বিপক্ষদল ডবল দিলে ই-২ ডাক দেওয়া সঙ্গত।

নো-ট্রাম্পের উপর খেঁড়ীর একটি বাড়িয়ে ডাক

(one jump bid over No-trump)

এরূপ ডাক গেমে উৎসাহদানকারী ডাকের পর্য্যায়ে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, রংয়ের উদ্বোধনী ডাকের চেয়ে নো-ট্রাম্প উদ্বোধনী ডাকে গেমে উৎসাহিত করতে খেঁড়ীর কম ট্রিক প্রয়োজন হয়। কারণ খেঁড়ী নিশ্চিত জানেন যে উদ্বোধনকারীর তাসের সর্ব্বনিম্ন ট্রিকদর ৩½। সুতরাং ২½ ট্রিক দর সহ ডাক দেওয়ার উপযুক্ত উঁচু দরের রংয়ে গেম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

যেমন :—

		ট্রিকদর	ডাকহবে
১।	ই-সা, বি, গো, ৫, ৩ ; হ-২ ; রু-টে, ৭, ২ ; চি-বি, গো, ৩, ২	২½+	ই—৩
২।	ই-সা, ৭, ২, হ-টে, ৫, ৩ ; রু-৭ ; চি-টে, বি, ১০, ৬, ৪, ২	৩	চি—৩
৩।	ই-সা, বি, ৫ হ-৬, ৪, ২, রু-টে, ১০, ৫, ৪, ২ ; চি-সা, ২	২½	নোট্রা—৩

১নং তাসে ২½+ ট্রিক ইস্কাবন রংয়ে উচ্চতাস সহ ডাকের উপযোগী পাঁচখানি তাস এবং অসম বিভাগের দরুণ নো-ট্রাম্প অপেক্ষা রংয়ে খেলা নিরাপদ। দুটি হাতের সম্মিলিত শক্তি অন্ততঃপক্ষে ৬+ ট্রিক (৩½+২½)। সুতরাং ইস্কাবন রং-এ গেম সুনিশ্চিত। এখবরটি প্রথম সুযোগে জানাবার উদ্দেশ্যে তিনটি ইস্কাবন ডাক হবে। ২নং তাসে নিম্নতম সম্মিলিত শক্তি ৬½+ সুতরাং গেমের প্রকৃত ঘাটতি না থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট তাসে থাকলে স্লাম হ'তে পারে। সুতরাং ঐরূপ তাসে জোরদার (forcing) ডাক ডাকের প্রয়োজনীয় সংখ্যা থেকে একটি বাড়িয়ে চি-৩ ডাক দিয়ে গেম উৎসাহিত করা উচিত। ৩নং তাসে সমষ্টিগত উচ্চতাস মূল্য ৬ থেকে ৬½+ ; সুতরাং নোট্রাম্পের গেম হওয়া স্বাভাবিক। এই তাসটিতে মাঝারী তাসের অভাব ও হরতনে কোনও রোখবার তাস না থাকায় বেশী কিছু আশা করা যায় না এবং নীচুদরের (রুহিতন) ডাকের কোনও অর্থ হয় না। অতএব সোজা নো-ট্রাম্প তিনটি ডাক হবে।

আবার এমন কতকগুলি তাস পাওয়া যায় যেগুলিতে উদ্বোধনী একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপর বেশীদরের রংয়ে গেম হওয়া খুবই স্বাভাবিক অথচ তাসটির উচ্চমূল্য দর সামান্য বা কিছুই নেই। এরূপ তাসে দুইয়ের ডাক দিয়ে দ্বিতীয় চক্রে চারের ডাক অথবা প্রথমচক্রে গেমে উৎসাহপূর্ণ একটি বাড়িয়ে ডাক কোনটিই চলেনা কারণ উদ্বোধনকারী অনুরূপ দরের তাস খেঁড়ীর নিকট পাওয়া যাবে মনে করে শ্লামের আশায় আরও উঁচু ডাকে পৌছন তখন খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ তাসে সোজাসুজি গেমের ডাক (৪টি ইস্কাবন বা ৪টি হরতন) দেওয়া যায়। এই ডাকের অর্থ এই যে তাসে বিপক্ষ দলের ডাক বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কিছু নেই—কিন্তু খেঁড়ীর নো-ট্রাম্প ডাকের পর তাসটিতে উক্ত রংয়ে ৫½ থেকে ৬টি পিঠ জয়ের আশা করা যায়। বিপক্ষদলের ডাকে ডবল দিতে হলে উদ্বোধনকারীকে দিতে হবে এবং উক্ত রংয়ের পিঠ একটিও পাওয়া না যেতে পারে এইরূপ চিন্তা করে। যথা

		উচ্চমূল্য দর	ডাক হবে
১।	ই-১০, ৯, ৮, ৬, ৫, ৪, ২ ; হ-সা, ৪ ; রু-৫, ৩, চি-৭, ৬	½	ই—৪
২।	ই-বি, ৩, ২ ; হ-১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ২ ; রু-৫ ; চি-৩	+	হ—৪

১নং তাসে ইস্কাবন রংয়ে ৪ থেকে ৫ পিঠ ও হরতনে ১ পিঠ মোট ৫ পিঠ জয়ের আশা করা যায় এবং ২নং তাসে হরতন রংয়ে ৬ পিঠ জয় করা স্বাভাবিক। সুতরাং একটি নো-ট্রাম্পের পিঠ জয়ের ক্ষমতা ৪ থেকে ৫ ধরে নিয়ে সোজাসুজি গেমের ডাক ছাড়া আর কোনওরূপ ডাক চলে না ঐরূপ তাসে।

নীচুদরের রংয়ে, রুহিতন বা চিড়িতনে, সোজাসুজি ৪ বা ৫টির ডাকের প্রশ্ন সচরাচর ঘটে না কিন্তু ঘটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অন্ততঃ পক্ষে ৬½ থেকে ৭ পিঠ জয় করবার মত তাস। মনে করুন উদ্বোধনকারীর খেঁড়ী তাস পেয়েছেন রুহিতন বা চিড়িতন রংয়ের বিবি কি গোলাম বড় ৯ বা ১০ খানি তাস এবং আর বাকী তাসগুলি সবই ছোট। এরূপ তাসে সোজাসুজি ৫টির ডাক দেওয়া যায় যে কোনও অবস্থায়। উভয়বিধ ডাকই (উঁচুদরের ৪টির এবং নীচুদরের ৫টির) খেঁড়ীর এককালীন ডাকের পর্য্যায়ে পড়ে এবং উপকারিতা একেবারে নেই একথা বলে চলে না। দেখা গেছে যে একটি হাত নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী সমবিভাগের এবং অপর একটি হাত অস্বাভাবিক অসম বিভাগের হলে বাকী দুটি হাতও অসম বিভাগের হতে পারে। এরূপ ঘটে প্রায় শতকরা ৫৫ বার এবং ঐসময়ে এককালীন ডাক দিয়ে মুখ বন্ধ না করলে বিপক্ষদল বিভাগের সুযোগ গেম করতে বা অল্প খেসারৎ দিয়ে গেম বন্ধ করতে

সক্ষম হয় কিন্তু ডাক উঁচুতে উঠে গেলে ততটা ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।

নো-ট্রাম্প উদ্বোধনকারীর ফিরতি ডাক

আগেই বলা বলা হয়েছে যে, রংয়ের একটির উপর একটি ডাকের মত একটি নো-ট্রাম্পের উপর খেঁড়ীর ডাক এক চক্র বাঁচিয়ে রাখা উদ্বোধনকারীর উচিত কিন্তু এরূপ বাঁচিয়ে রাখা তার পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। যা হোক, উদ্বোধনকারীর ফিরতি ডাকের সাধারণ প্রথা নীচে দেওয়া হল :—

খেঁড়ী দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলে

উদ্বোধনকারীর পক্ষে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা হয়ে পড়ে একটু শক্ত—যখন তার উদ্বোধনী ডাক নিম্নতম অর্থাৎ ৩½ ট্রিক হয়। খেঁড়ীর পক্ষে দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা ১½ থেকে ২ + ট্রিকের তাস। খেঁড়ীর তাস ১½ বা ২ ট্রিকে হ'লে সম্মিলিত শক্তি দাঁড়ায় ৫ থেকে ৫½ ট্রিক এবং সাধারণতঃ দুটি নো-ট্রাম্পের বেশী খেলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু খেঁড়ীর কাছে উক্ত ডাকের উপযোগী সর্বাধিক অর্থাৎ ২+ ট্রিক অন্তর্বর্তী সাহায্যকারী তাস সমেত থাকলে (with strong intermediates) তিনটি নো-ট্রাম্পের খেলা হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু জানবার উপায় কোথায়? একরূপ আন্দাজেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুই-এর পরে তিনটি নো-ট্রাম্পের ডাক আপনা হতেই এসে পড়ে। এর মূলে রয়েছে গেম বোনাসের লোভ নন্‌-ভালনারেবল অবস্থায় ৩০০ এবং ভালনারেবল অবস্থায় ৫০০। অনেক সময়ে খেলাও হয়ে যায় কিন্তু তার সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ২৭ বার এর বেশী নয়। একবার ভেবে দেখেছেন কি, এরূপ একটি বেশী ডাকের জন্য কত পয়েন্ট লোকসান হয় দৈনন্দিন? সংখ্যাতত্ত্বে ও খেলা পর্য্যালোচনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সীমারেখা পার হয়ে গেম বোনাসের প্রলোভনে একটি করে খেসারৎ দিয়েই দল হারে অধিক, বিপক্ষদল ভাল খেলে জেতে কম। একটি এরূপ দানে লোকসান হয় প্রায় ২২০ পয়েন্ট ভালনারেবল অবস্থায় এবং ১৭০ পয়েন্ট নন্‌-ভালনারেবল অবস্থায়। দুটির খেলা হলে অর্জিত হ'ত ১২০ পয়েন্ট (৭০+৫০ পার্ট গেমের বোনাস) পরিবর্তে দিতে হয় খেসারৎ যথাক্রমে ১০০ বা ৫০। খেঁড়ীদের মধ্যে পরস্পরের উপর আস্থা স্থাপন ও নিয়মানুগ হলে এর একটা বৃহৎ অংশ বাঁচান সম্ভব, একেবারে পূর্ণমাত্রায় না হলেও নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করলে কিছুটা লোকসান কমান সম্ভব হতে পারে :—

১। কেবলমাত্র ৩½ ট্রিক, ছবিতাস (টে, সা, বি, গো, ১০) সংখ্যা আটটির কম এবং কোনও একটি রংয়ে রোখবার তাসের অভাবে খেঁড়ীর ২টি নো-ট্রাম্পে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

২। ৩½ ট্রিক ছবিতাস আটখানি চার রংয়ে বিভক্ত থাকলে ...৩টি নো-ট্রাঃ ডাক দেওয়া যেতে পারে।

৩। ৩½ ট্রিক, ছবিতাস ৭ বা ৮ বিভাগ ৪-৪-৩-২, তন্মধ্যে চার তাসের একটি রং ইস্কাবন বা হরতন হলে ফিরতি ডাক তিনটি নো-ট্রাম্পের পরিবর্তে উক্ত রংয়ে তিনটি ডাক দিয়ে খেঁড়ীর উপর ডাক শেষ করবার ভার দেওয়াই ভাল। খেঁড়ী নিম্নতম শক্তিতে এ ডাক ছেড়ে দিতে পারেন অথবা শক্তি ও বিভাগানুপাতে তিনটি নো-ট্রা বা চারিটি ইস্কাবন ডাক দেবেন এই আশায়।

একটি নো-ট্রাম্পের উপর খেঁড়ী তিনটি নো-ট্রাম্প বা উঁচু দরের চারটির ডাক দিলে উদ্বোধনকারীর করণীয় কিছুই থাকে না। উভয় ক্ষেত্রেই স্লামের সম্ভাবনা নিতান্তই কম যদি দু'জনের ডাক নিয়মমাফিক হয়ে থাকে। উদ্বোধনকারীর প্রথমেই চিন্তা করা দরকার যে খেঁড়ী অন্য কোনও ডাক না নিয়ে হঠাৎ গেমের ডাক দিলেন কেন? চিন্তা করলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে নো-ট্রাম্পের বেলায় তার তাসের বিভাগ প্রায় নো-ট্রাম্পের উপযোগী, ডাক নেবার মত কোনও তাস নেই (যদি থাকে সেটি নীচু দরের রংয়ে) এবং উচ্চতাসমূল্য ২½ থেকে ৩ ট্রিকের মাঝামাঝি। রংয়ের ডাকের বেলায় খেঁড়ীর তাসের উচ্চমূল্য বড় জোর ২ ট্রিকের মত এবং পিঠ জয় করবার ক্ষমতা (তুরুপ সমেত) বড় জোর ৫ থেকে ৬। হাতটিতে বিপক্ষ দলের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা নিতান্তই অল্প। এরূপ ডাক কতকটা এককালীন (Pre-emptine) পর্য্যায়ের—সুতরাং স্লামের কোনরূপ আশা করা যায় না।

(রংয়ের দুটির ডাক)

একটি নো-ট্রাম্পের উপর রংয়ের দুটি ডাকের শক্তির ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় প্রথম চক্রের খেঁড়ীর ডাক কিরূপ শক্তিসম্পন্ন জানবার উপায় থাকে না। সুতরাং উদ্বোধনকারীর কর্তব্য অন্ততঃ ঐরূপ ডাককে বাঁচিয়ে রেখে খেঁড়ীর শক্তি নির্দ্ধারণ করা। দ্বিতীয় চক্রে ডাক বাঁচিয়ে রাখাকালীন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রথা অবলম্বন করলে নিজ হাতের প্রকৃত শক্তি বিভাগ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ দেবার সুযোগ ঘটে এবং এরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে খেঁড়ীর পক্ষে কর্তব্য নির্দ্ধারণের পথ সুগম হয়। প্রথাগুলি মূলতঃ নিম্নরূপ :—

(১) দুইয়ের ডাকের মধ্যে পেলে চার তাসে উঁচু দরের ইস্কাবন বা হরতন) রংয়ে ফিরতি ডাক দেওয়া চলে অভাবে দুটি রুহিতন ডাকও দেওয়া যায়। এরূপ ডাকে কোনও বাড়তি শক্তির প্রয়োজন হয় না। যথা—

	খেঁড়ীর ডাক	ফিরতি ডাক হবে
১।	ই-টে, বি, ৭ ; হ-সা, গো, ১০, ৩, রু-সা, ৯, ২ ; চি-বি, ১০, ৫	চি বা রু-২ হ—২
২।	ই-সা, ১০, ৭ ; হ-বি, গো, ৯, ২ ; রু-টে, বি, ৯, ৫, চি-টে ৭	চি-২ হ বা রু—২

(২) ডাকের উপযোগী সর্ব্বোচ্চ বা কাছাকাছি শক্তিতে খেঁড়ীর রংয়ের টে, সা, বিবির মধ্যে দুখানি সহ তিন তাস, টে বা সা সমেত চার তাস থাকলে উঁচুদরের রংয়ে চারটির ডাক দেওয়া চলে।

(৩) সর্ব্বোচ্চ বা কাছাকাছি শক্তিতে খেঁড়ীর ডাকের রংয়ে টেক্কা, সাহেব বা বিবির মধ্যে দুখানি তাস থাকলে উঁচুদরের রংয়ে তিনটি ডাক হবে। খেঁড়ী নিজশক্তি অনুপাতে স্থির করবেন কি তিনটি নো-ট্রাম্পে না চারটির ডাকে খেলবেন—ছাড়া চলে না এ ডাকে।

এরূপ ডাক বিশেষ কার্য্যকরী হয় নীচু দরের রংয়ের বেলায়। মনে করুন, খেঁড়ীর তাস সাহেব বড় ছখানি বা সাতখানি এবং আর কিছু শক্তি নেই। এরূপ ডাক এলে ছখানি বা সাতখানি পিঠ

রংয়ে পাওয়া যাবে এবং আর দুই বা তিনখানি পিঠ অন্যত্র পাওয়া যেতে পারে আশায় তিনি তিনটি নো-ট্রাম্প ডাক তুলে দিতে পারেন।

খেঁড়ীর তিনটি নো-ট্রাম্প বা উঁচু দরের রংয়ের চারটি ডাকের পর উদ্বোধনকারীর আর বিশেষ করণীয় থাকে না। খেঁড়ী ঝুঁকি না নিয়ে বিশেষ কারণ বশতঃ গেম দেখে ঐরূপ ডাক দিয়েছেন। উঁচু-দরের তাস থাকলে নিয়মমাফিক ডাক দিয়ে উঠতেন, ঐরূপ ডাকের কোনও প্রয়োজন হত না।

উদ্বোধনী ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাক—বিশেষ শ্রেণীর ও জোরদার

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের সাধারণ নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। এখন ঐগুলি ছাড়া কয়েকটি ডাকের বিশেষ পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল নীচে।

১। প্রয়োজনের একটি বাড়িয়ে ডাক (one jump bid)

২। বাধ্যতামূলক বা ততোধিক ডাক (compulsory bid at higher level)

৩। একটি নো-ট্রাম্প ডাক (one no trump)

৪। বিপক্ষদলের ডাকে ডবল (Informatory double)

উদ্বোধনকারীর ডাকের পর পরবর্ত্তী খেলোয়াড়ের পক্ষে অনেক সময়ে আক্রমণাত্মক ডাকে একটি বাড়িয়ে ডাক (light game forcing) অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। ডবল দিয়ে ডাক আদায়ের চেষ্টা (Informatory double) এরূপ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ ডাকের একটি চক্র তাতে ফসকে যেতে পারে। যেমন ধরুন শক্তিসম্পন্ন দো-রংয়া তাস, এ রকম তাসে দুটি রংয়ে ডাক দিয়ে কোনটির খেঁড়ীর সাহায্য পাওয়া যাবে জানা প্রয়োজন, সে সময়ে একচক্রে ডাক ফসকে গেলে দুটি, রংয়ের ডাক দেওয়ার নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে পড়ে। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে একটি আক্রমণাত্মক শ্রেণীর খেঁড়ীকে জানাবার উদ্দেশ্যে প্রথম সুযোগেই আক্রমণ সুরু করাই শ্রেয়ঃ এবং অধিক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায় দেখা গেছে।

এ রকম ডাকে ঝুঁকি যথেষ্ট এবং ফাঁদে পা পড়বারও সম্ভাবনা আছে। সে রকম অবস্থা এড়াবার জন্য নিয়মমত পন্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

১। প্রায় ৩২ ট্রিক সহ দোরংয়া তাসে উঁচু দরেরটি আগে ও সুবিধা পেলে কম দরেরটি পরে সাধারণতঃ উঁচু দরের (ইস্কাবন বা হরতন) ডাকে এরূপ ডাক বিশেষ কার্য্যকরী।

২। শক্তিশালী এক রংয়া তাসে ইস্কাবন বা হরতন রংয়ে। সর্ব্বসমেত ৭ থেকে ৮ পিঠ জয় করবার তাসে এরূপ ডাক চলে।

৩। উচ্চ তাসসহ সর্ব্বসমেত ৮ পিঠ জয় করবার ক্ষমতায় নীচু দরের (রুহিতন বা চিড়িতন) রংয়ে এরূপ ডাক সাধারণতঃ খেঁড়ীকে নো-ট্রাম্পে উৎসাহিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নীচে এরূপ ডাকের উপযোগী কয়েকটি নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

	ট্রিকদর	উঃ ডাক	ডাক হবে
১। ই-সা, খি, গো, ৯, ৫ ; হ-টে, বি, গো, ৫, ২ ; রু-সা, ৩ ; চি-৫	৩½	রু-১	ই-২
২। ই-টে, সা, ১০, ৮, ৬ ; হ-সা, গো, ২ ; রু-২ ; চি-বি, ৭, ২	৩½	রু-১	ই-১
৩। ই-৮ ; হ-টে, সা, ১০, ৮, ৬, ৫, ৪ ; রু-টে, বি, ৩ ; চি-৪, ২	৩½	রু-১ বা চি-১	হ-২
৪। ই-বি, ৫ ; হ-টে, ৭ ; রু-সা, বি, গো, ৯, ৮, ৭, ২ ; চি-সা, ৪	৩+	হ-১	রু-৩
৫। ই-৭, ৩ ; হ-সা, ১০ ; রু-বি, ৬ ; চি-টে, সা, বি, ১০, ৮, ৭, ৩	৩	ই-১	চি-৩

১নং তাসের ট্রিক মূল্য ৩½ এবং উদ্বোধনী রুহিতন ডাক হওয়ায় এবং উক্ত রংয়ের দুতাসে সাহেব থাকায় তাসটির পিঠ জয়ের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক কারণ ইস্কাবনের টেক্কা বা হরতনের সাহেব বিপক্ষ দলের হাত থেকে তাড়াবার আগে রংয়ে কাবু হ'তে হবে না। যাইহোক তাসটিতে প্রায় ৮ থেকে ৯ পিঠ জয় করবার ক্ষমতা আছে এবং দুটি রংয়ের মধ্যে যে কোনটির সামান্য সাহায্য পেলে গেম হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ২নং তাসেরও ট্রিকদর ৩½ কিন্তু পিঠ জয়ের ক্ষমতা কম থাকায় ই-১ ডাকই বাঞ্ছনীয়। বাঁচাবার ক্ষমতা থেঁড়ীর থাকলে গেমের সম্ভাবনা প্রচুর। অনেকে এইরূপ তাসে থেঁড়ীর কাছ থেকে ডাক আহ্বানের জন্য "ডবল" (Informatory double) অনুমোদন করেন কিন্তু ডাক বিশেষ যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না এই কারণে যে বাধ্যতামূলক ভাবে ডাক আদায় ক'রে বেশীদূর অগ্রসর হবার ক্ষমতা তাসটিতে নেই। মনে করুন "ডবল" দেওয়ার ফলে থেঁড়ী দুটি চিড়িতন ডাক দিলেন আপনি উপরোক্ত তাসের অধিকারী হ'য়ে দুটি ইস্কাবন ডাকতে হ'ল দ্বিতীয় চক্রে। থেঁড়ীর পক্ষে অতঃপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বড় অসুবিধায় পড়তে হয় অথচ দেখুন কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট ছবি তাস থেঁড়ীর কাছে থাকলে চারটি ইস্কাবনের খেলা করা খুবই সহজ হ'য়ে পড়ে। যথা ই-বি বা চারখানি ছোট, হ-বি ও চি-সা ও গো অর্থাৎ ১+ ট্রিকের তাস। সুতরাং একটির উপর একটি ডাক দিতে হবে এই আশায় যে থেঁড়ী যদি স্বেচ্ছায় ডাকটিকে বাঁচাতে সক্ষম হন তাহলে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ ঘটে না। মনে রাখা দরকার যে একের উপর একের ডাকের ক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃত। ৩নং তাসে রু-১ ডাকটি ডাইনের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আসায় তাসটির পিঠ জয়ের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং হরতন রংয়ের তাসের বিভাগ স্বাভাবিক হ'লে ৯ পিঠ জয় সুনিশ্চিত। সুতরাং একটি ডাক বাড়িয়ে দুটি হরতন ডাক ত' চলতেই পারে মতান্তরে দ্বিতীয় চক্রে বিপক্ষদলের কাছ থেকে ইস্কাবনের ডাক আসতে পারে এই বিবেচনায় এককালীন চারটি হরতনের ডাক সমর্থনই করেন। কিন্তু উদ্বোধনকারীর ডাক চি-১ হ'লে কেবলমাত্র হ-২ ডাক হবে কারণ তখন আর রুহিতন প্রথম খেলা হলে বাড়তি পিঠ পাবার সম্ভাবনা সেটি কমে যায়। ৪নং ও ৫নং তাসে একটির উপর একটি বাড়িয়ে রু-৩ ও চি-৩ ডাকের প্রধান উদ্দেশ্য প্রায় আটটি পিঠ জয় করবার ক্ষমতা জানান এবং সাথে সাথে থেঁড়ীকে প্রলুব্ধ করা। বিপক্ষ দলের ডাকের রংয়ে রোধবার মত তাস ও অন্য রংয়ের কিছু তাস, মোট দর ১½ ট্রিকের মত থাকলে গেম আশা করা যায় নো-ট্রাম্পে। [ক্রমশঃ।

রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতিকুমার

রূপময় ধরণীতে অন্য এক মহারূপকায়
হে মহান শিল্পী তুমি অনন্তের পটভূমিকাতে ;
অন্তহীন সে ক্যানভাসে বিকশিত আশ্চর্য্য সত্তায়
রূপে রঙে রসসিদ্ধ পূর্ণায়ত অখণ্ড শোভাতে ;

তোমার হৃদয়মন স্বপ্নময় রূপ অলকায়
শব্দ স্পর্শ গন্ধময় জ্ঞান প্রেম প্রজ্ঞার আলোকে
কী এক বিস্ময়কর রূপ দেখি মহাকল্পনায়
রূপাতীত বোধাতীত কালাতীত দ্যুলোক ভূলোকে।

সবিস্ময় দৃষ্টিপাতে অপলক নিত্য চেয়ে আছি
যদি কিছু স্বাদ গন্ধ স্পর্শ পাই আনন্দ সত্তায় ;
সেই অপার্থিব রূপে দুই চোখ ভরে আজি যাচি
হে মহান শিল্পী তব বোধ বোধি ধ্যানমগ্নতায়,

নিত্য ব্যর্থতার কান্না দুঃখ দৈন্য কতো যে অভাব
তারি মধ্যে শুদ্ধ-পূত পুণ্যময় তব আবির্ভাব।

আনন্দ সঙ্গীত

শ্রীবীথিকা পাল

আজ, হাসিল আকাশ উতলা বাতাস কাহারি তরে,
সেই যে বিশ্বকবি ভারত-রবি তাহারি তরে।
আজ, নূতন করিয়া পঁচিশে বোশেখ এসেছে ফিরে,
তাই কি রে আজ বিজন-বনানী জাগিছে ধীরে ?

আজ, প্রকৃতি সেজেছে বাঁশরী বেজেছে মোহন সুরে,
তোমারি বারতা ছড়ায়ে পড়েছে ভুবন জুড়ে।
মোরা এনেছি মালা বরণডালা তোমারি তরে,
আজি সাগর তব বন্দনা গায় পুলক ভরে।

আজ মৌমাছিকুল গন্ধে আকুল আপন-হারা,
আজ গাহিছে পাখী বহিছে নদী পাগল-পারা।
আজিকে শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গলধ্বনি উঠিছে জাগি,
ও আমার, হৃদয় হরণ তরুণ তপন তোমারি লাগি।

তোমারই বাণী বেঁধেছে সবার পরাণখানি,
আজিকার দিনে জানাই তোমারে প্রণামখানি।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ ত্যাগ—

গত ৮ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ (১৯৬১) পর্য্যন্ত লণ্ডনে যে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া গেল সে-সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ ত্যাগ। অনেকেই হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, ৩১শে মে তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার পর তাহার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার আবেদনটি গতানুগতিক ভাবেই অনুমোদিত হইবে, উহা লইয়া কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রি-সম্মেলনে ঝড় উঠিবে না। প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বা রিপাবলিক হওয়াটা যে কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার অন্তরায় নয় তাহার যথেষ্ট নজীর আছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের 'এপারথিড' (apartheid) বা কোণঠাসা নীতিই তাহার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার প্রধান অন্তরায়। এই বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির কঠোর সমালোচনা বিগত কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষেও হইয়াছে, তবে আলোচনাটা হইয়াছিল ঘরোয়া ভাবে। উক্ত আলোচনায় মালয় ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রীই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবারে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কোণঠাসা নীতি সম্পর্কে সমালোচনা যে কঠোরই হইবে তাহার আভাষ পূর্ব্বাহ্নে একেবারেই পাওয়া যায় নাই একথা বলা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ভেরউর্ড বর্ণ-বৈষম্যমূলক কোণঠাসা নীতিকে শুধু তাঁহাদের ঘরোয়া বিষয় বলিয়াই দাবী করেন নাই, নির্লজ্জভাবে উহাকে 'good neighbourbliness' বলিয়াও দাবী করিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু লণ্ডনে পৌছিলে এসম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "I should not like to be Dr. Verwoerd's neighbour." বৃটিশ কমনওয়েলথের অশ্বেতকায় সকল প্রধান মন্ত্রীই দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গ সরকারের কোণঠাসা নীতির বিরোধী। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন ছাড়া কমনওয়েলথের আর কেউ বর্ণ বৈষম্য নীতি সমর্থন করে, একথা বলা যায় না। তবু প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার আবেদন মঞ্জুর হইবে, এই আশাই শুধু পোষণ করা হয় নাই, তাহার জন্য বিপুল ভাবে চেষ্টাও করা হইয়াছিল। কিন্তু ১২ই মার্চ্চ তারিখেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল বর্ণ বৈষম্য নীতি লইয়া প্রবল ঝড় উঠিবে। বস্তুতঃ সমালোচনার ঝড় এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ডাঃ ভেরউর্ড প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার আবেদন প্রত্যাহার করিলেন।

পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হওয়ার পর তাহার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার প্রশ্ন যখন বিবেচিত হয় তখন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, এই ধরণের প্রত্যেকটি ব্যাপারেই 'মেরিট' (merit) বা যোগ্যতা দ্বারা বিচার করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আবেদনটিও যোগ্যতার মাপকাঠিতেই বিচার করিবার ব্যবস্থাই যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কোণঠাসা নীতি সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথের সদস্য রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই, একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান আশা করিয়াছিলেন যে, কোণঠাসা নীতি এবং প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার প্রশ্ন পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথে রাখিবার জন্য চেষ্টা কম করিয়াছেন, একথা বলা যায় না। তিনি একটি কমনওয়েলথ চার্টার তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই চার্টারটি অত্যন্ত সহজ এবং সরল। উহাতে বলা হইয়াছে, "We accept the principle that apartheid is inconsistant with membership in the Commonwealth of Nations."

কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের সকলকেই এই চার্টারে স্বাক্ষর করিতে হইবে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানও প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথে রাখিবার জন্য তিনি একাধিক 'ফরমূলা' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ ফরমূলাটি এইরূপ:

(১) প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবে।

(২) কোণঠাসা (apartheid) নীতির বিরুদ্ধে দশজন প্রধান মন্ত্রী যে প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে। এবং

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথে রাখায় বর্ণবৈষম্য নীতি যে মানিয়া লওয়া হয় নাই, একথারও উল্লেখ থাকিবে।

শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখিবার জন্য মিঃ ম্যাকমিলান যে 'ফরমূলা' বাহির করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল অশ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীদের জন্য নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ভেরউর্ডের একগুঁয়েমির জন্য। প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার আবেদন বিনাসর্ত্তে মঞ্জুর করিতে হইবে, এই দাবী হইতে তিনি এক তিলও বিচ্যুত হইবেন না, ইহাই তাঁহার অনমনীয় জেদ। ডাঃ ভেরউর্ড যদি এই ফরমূলা মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে আফ্রো-এশীয় প্রধান মন্ত্রীরাও যে উহা সানন্দে গ্রহণ করিতেন, ইহা মনে করিলে বোধহয় ভুল হইবে না। আফ্রো-এশিয় কোন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের এই ফরমূলায় আপত্তি করিয়াছিলেন কিম্বা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কমনওয়েলথে থাকিলে কমনওয়েলথ ত্যাগ করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তবু একটি অসমর্থিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দক্ষিণ

আফ্রিকা যদি বর্ণবৈষম্য নীতি সংশোধন করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঘানা হয়ত কমনওয়েলথ ত্যাগ করিবার কথা বিবেচনা করিতে পারে। লণ্ডনস্থ ঘানার হাইকমিশনারকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "That is a contingency which has not arisen." মিঃ ম্যাকমিলানের ফরমূলা ডাঃ ভেরউর্ড মানিয়া লইলেও উহার অর্থ ইহা দাঁড়াইত না যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বর্ণবৈষম্য নীতি প্রত্যাহার করিবে। এইরূপ অবস্থায় কমনওয়েলথের অ-শ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরা কি করিতেন তাহা বুঝিবার পথ স্বয়ং ডাঃ ভেরউর্ডই বন্ধ করিয়া দিলেন, প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথে গ্রহণ করিবার আবেদন তিনি প্রত্যাহার করিলেন। ডাঃ ভেরউর্ড যদি আবেদন প্রত্যাহার না করিতেন এবং ম্যাকমিলান ফরমূলা যদি সকলেই মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে সম্মেলনের ইস্তাহারে একদিকে থাকিত দক্ষিণ আফ্রিকার কোণঠাসা নীতির নিন্দা, আর একদিকে থাকিত দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথের সদস্যপদে বহাল থাকার ঘোষণা। ব্যাপারটা কি সত্যই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইত না, অত্যন্ত ভণ্ডামী বলিয়া মনে হইত না?

আগামী ৩১শে মের পর দক্ষিণ আফ্রিকা আর বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য থাকিবে না। ভবিষ্যতে আবার কোনদিন দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভের সম্ভবনা দেখা দিবে কি না সে কথা অনুমান করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ ত্যাগ এবং প্রজাতন্ত্রী আয়ারের কমনওয়েলথ ত্যাগ ঠিক এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। ১৯৪৯ সালে আয়ার কমনওয়েলথ ত্যাগ করে। বৃটিশ সরকার যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের বিভাগ রহিত করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে আয়ার কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকিত। আজ যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের দুই অংশ একত্রিত করিয়া ফেডারেশন গঠন করা হয়, তাহা হইলে আয়ার আবার কমনওয়েলথে প্রবেশ করিতে রাজী হইতে পারে। ইহা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরাজ বর্ণবৈষম্য নীতি-পরিত্যাগ করিবে, ইহা আশা করা অসম্ভব। অবশ্য অশ্বেতকায় রাষ্ট্রগুলি যদি কমনওয়েলথ ত্যাগ করে তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথে পুনঃপ্রবেশ খুবই সহজসাধ্য হইবে। কোণঠাসা নীতি লইয়া কমনওয়েলথ সম্মেলনে যে তীব্র বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহাতে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড নিরপেক্ষতাই অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু সম্মেলনে যে কোণঠাসা নীতিকে কঠোর ভাষাতেই আক্রমণ করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রুঢ় ভাষাও প্রয়োগ করা হইয়া থাকিবে। ডাঃ ভেরউর্ড এতখানি প্রত্যাশা অবশ্যই করেন নাই। কমনওয়েলথে থাকা তাঁহার পক্ষে অসহই হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫ই মার্চ (১৯৬১) কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের পরে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীদের বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সরকারের পক্ষে যে মতামত পেশ করিয়াছেন এবং ইউনিয়ন সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে-আভাষ দিয়াছেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবেও দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথে থাকার আবেদনপত্র প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ডাঃ ভেরউর্ড কমনওয়েল ত্যাগ করিবেন, তবু বর্ণ-বৈষম্য নীতি ত্যাগ করিবেন না। অশ্বেতক প্রধান মন্ত্রীদের নিকট হইতে বর্ণবৈষম্যনীতির তীব্র সমালোচ তিনি শুনিয়াছেন। অধিকাংশ শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীও বর্ণবৈষ নীতি সমর্থন করেন নাই। ইহা কি তাঁহার পক্ষে কম দুঃখে কথা! ১৮ই মার্চ্চ লণ্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলিয়াছে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকজন যে ধরণের ভাষ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 'hostile and vindicative." তাঁহাদে নাম তিনি বলেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন কানাডার দৃষ্টিভঙ্গী অপরিণত (immature)।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ ত্যাগে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস অস্বস্তিবোধ না করিয়া পারেন নাই। ব্যাপারটা তাঁহার কাছে অত্যন্ত 'unhappy affair.' বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি মনে করেন ঘরোয়া ব্যাপারের জন্য যদি কোন সদস্যকে কমনওয়েলথ হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ভবিষ্যতের অপ্রীতিকর সম্ভাবনা চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। মিঃ মেঞ্জিসের মনে 'হোয়াইট অষ্ট্রেলিয়ান পলিসি'র কথাই যে জাগিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোণঠাসা নীতি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'It is as much a matter of domestic policy in South Africa as Australia's migration policy is a matter for us.'

অষ্ট্রেলিয়ার 'হোয়াইট অষ্ট্রেলিয়ান পলিসি'র কোন পরিবর্তন হয় নাই। অশ্বেতকায়দের অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়িভাবে বাস করিতে না দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য। উহা আর এক ধরণের বর্ণবৈষম্য নীতি। কমনওয়েলথের অশ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীদের দৃষ্টি এইদিকে এখনও পড়ে নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে ভবিষ্যতে পড়িতে পারে এবং তাঁহার অবস্থা ডাঃ ভেরউর্ডের মত হওয়াও বিচিত্র নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ হইতে বাহিরে আসায় পৃথিবীতে একঘরে হইয়া পড়িবে, এতখানি দুরাশা আমরা করি না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহযোগিতা তো পাইবেই। আফ্রিকা মহাদেশেও মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন এবং পর্ত্তুগীজ আফ্রিকাও তাহার সহিত সহযোগিতা করিবে। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করিবার কথা বিবেচনা করিতেছে। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দিক হইতে একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কা ডাঃ ভেরউর্ড করেন না। এই প্রসঙ্গে ভেরউর্ড সরকারের বিরোধী একটি অস্থায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার গঠনের যে আয়োজন চলিতেছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই সরকার কায়রো কিম্বা আফ্রিকার অন্য কোন দেশের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে পাঁচটি আফ্রিকান ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের মিলিত প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড সাউথ 'আফ্রিকান ফ্রণ্ট' উক্ত সরকার-গঠনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা ইউসুফ দাদু উহার প্রধানমন্ত্রী এবং প্যান আমেরিকানিষ্ট কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য মিঃ নানা মাহোমো হইবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রই এই সরকারকে স্বীকৃত দান করিবে, ইহা আশা করা খুবই স্বাভাবিক। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে

বর্ণ-বৈষম্যনীতি দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপার একথাও আর বলা চলিবে না।

লাওস সঙ্কট—

লাওস আকস্মিক ভাবে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বিস্ফোরণ ঘটাইবার আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে। 'আকস্মিক ভাবে' কথাটা বলার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। গত ডিসেম্বর (১৯৬১) মাসে মার্কিণ সামরিক সাহায্য-পুষ্ট ফুমি নোসাভান যখন কংলের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া ভিয়েনটিয়েন দখল করেন এবং বৌন ঔমের প্রধান মন্ত্রিত্বে সরকার গঠন করিলেন, সুভান্না ফুমাও কাম্বোডিয়ায় চলিয়া গেলেন, তখন সিয়াটো কাউন্সিলের বৈঠকে লাওসে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে লাওস সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহও প্রকাশ করা হইয়াছিল। এমন কি বৌন ঔম সুভান্না ফুমার সঙ্গে সহযোগিতা করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সরকারকে আইনসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকার করিলে আন্তর্জ্জাতিক কমিশনকে লাওসে কার্য্যকরী করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। ভিয়েনটিয়েন দখল করায় ফুমি নোসাভান এবং সিয়াটো শক্তিবর্গের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু গত কয়েক মাসে লাওসের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, শুধু সামরিক সাহায্য দিয়া সিয়াটো শক্তিবর্গ তথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।

সিয়াটো শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে লাওস সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিবার কারণ জার সমতলভূমি এবং জিয়েন খুনাং প্রদেশ হইতে সুভান্না ফুমার সমর্থক সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইতেছে না। অধিকন্তু উত্তর লাওসের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ চৌরাস্তা জালা ফুকুন তাহারা অধিকার করিয়াছে এবং মেকং নদীর তীর ধরিয়া তাহারা ভিয়েনটিয়েনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভিয়েনটিয়েন রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা ভাবিয়া বৌন ঔম সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুত: লাওসের কয়েকটি সহরেই মাত্র তাঁহার সরকারের আধিপত্য আছে। তাহাও বুঝি আর থাকে না। সিয়াটো শক্তিবর্গ বৌন ঔম সরকারকে স্বীকার করেন। এইজন্য এই সরকারকে রক্ষা করিবার সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা। সুভান্না ফুমা কয়েকজন মন্ত্রিসহ লাওস হইতে কাম্বোডিয়ায় চলিয়া গেলেও তিনি দাবী করেন তাঁহার সরকারই লাওসের আইনসঙ্গত সরকার। কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গও সুভান্না ফুমা সরকারকে লাওসের আইনসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই এই সরকারের অনুরোধে সামরিক সাহায্য দিবার অধিকার তাহাদের আছে। লাওসকে নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত করাই সমস্যা সমাধানের উপায়। কিন্তু কোন সরকারকে লাওসের আইনসঙ্গত সরকার বলিয়া গ্রহণ করা হইবে ইহাই প্রধান প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে লাওসে শান্তি স্থাপিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে বৃটেন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করার যে প্রস্তাব করিয়াছিল সুভান্না ফুমা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন যদি বৌন ঔম সরকারের সহযোগিতায় কাজ করেন, তাহা হইলে উক্ত সরকারকেই আইনসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মদেশ ও কাম্বোডিয়া সহ তিন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কমিশন গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল বৌন ঔম সরকারের পক্ষ হইতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উক্ত প্রস্তাব সমর্থনও করিয়াছিল। একই কারণে সুভান্না ফুমার পক্ষে এই প্রস্তাব সমর্থন করা সম্ভব হয় নাই। কাম্বোডিয়ার রাজা চৌদ্দশক্তির সম্মেলন আহ্বানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই প্রস্তাবে সাড়া দেন নাই। বৃটেন লাওস সমস্যা সমাধানের জন্য রাশিয়ার নিকট এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। এই প্রস্তাব তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায় যুদ্ধ বিরতির জন্য আবেদন জানান হইবে এবং এই প্রস্তাবে সাড়া পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কার্য্যকরী করা হইবে। উক্ত কমিশন যুদ্ধ বিরতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিলে লাওসের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে।

সম্প্রতি সিয়াটো শক্তিবর্গের পররাষ্ট্র সচিবদের যে সম্মেলন ব্যাঙ্ককে হইয়া গেল তাহার প্রাক্কালে এই দাবী করা হইয়াছিল যে, ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে রাশিয়া যদি উত্তর না দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ককে সিয়াটো সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে। রাশিয়ার উত্তর তখনও পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু প্রাভদা পত্রিকা এইরূপ আভাস দিয়াছিল যে, কয়েকটি সর্ত্তে রাশিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে। এই আভাসের কোন প্রতিক্রিয়া সিয়াটো সম্মেলনের উপর হইয়াছে কিনা তাহা অবশ্য বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্টদের সহায়তায় লাওস দখলের জন্য সামরিক অভিযান যদি অব্যাহত ভাবে চলিতেই থাকে, তাহা হইলে সিয়াটো সংস্থা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা কি ধরণের হইবে গৃহীত প্রস্তাবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মরিস কুভ দ্য মারভিল সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, লাওস সম্পর্কে কোন যৌথ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সিয়াটোর অষ্ট সদস্যের মধ্যে আবার নূতন

করিয়া পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইবে। কি পদ্ধতিতে এই পরামর্শ করা হইবে সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, সে-রকম অবস্থা যদি দেখা দেয়ই তখন দেখা যাইবে। লাওসের গৃহযুদ্ধে সিয়াটো শক্তিবর্গ প্রত্যক্ষভাবে সামরিক হস্তক্ষেপ করে ফ্রান্স তাহা চায় না। লাওসে ফ্রান্সের কোন স্বার্থ আর নাই। যুক্তরাষ্ট্রও লাওসকে দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত করিতে চায় না। তবু ব্যবস্থা গ্রহণের ত্রুটি করা হইতেছে না। পাছে লাওসের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এই আশঙ্কায় গত ২৩শে মার্চ একখানি মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ এবং কয়েকখানি ডেষ্ট্রয়ার হংকং হইতে অজ্ঞাত স্থলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। হেলিকাপ্টার, পরিবহন ব্যবস্থার জন্য এক স্কোয়ার্ডন জেট বিমান ও অন্যান্য সমর-সম্ভার উক্ত এলাকায় প্রেরণ করা হইতেছে। এই অজ্ঞাতস্থল যে লাওসের নিকটবর্তী সাগর ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জেনেভা চুক্তি (১৯৫৪) অনুযায়ী লাওসে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ কিম্বা সামরিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। এই জেনেভা চুক্তির প্রতিক্রিয়াতেই সিয়াটো চুক্তি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান্ গবর্ণমেণ্ট ১৯৫৫ সাল হইতেই লাওস সরকারের সৈন্যবাহিনীর বেতন, পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া আসিতেছে, মার্কিণ সামরিক সৈন্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে। মার্কিণ সরকারের পক্ষে যুক্তি এই যে, লাওস সরকারের ন্যায়সঙ্গত অনুরোধেই উহার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সামরিক সাহায্য দিতেছে। কাজেই উহা জেনেভা চুক্তির বিরোধী নহে। কিন্তু সুভান্না ফুমি যখন প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন (১৯৫৫-৫৬) তখন এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়া ফুমি নোসাভানকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। মার্কিণ অর্থনৈতিক চাপে সুভান্না ফুমি সরকারের পতন ঘটে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট কেনেডী লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং লাওস সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসারই পক্ষপাতী। সোভিয়েট রাশিয়া বরাবরই লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার পক্ষপাতী। নিরপেক্ষ সরকার কি ভাবে গঠিত হইবে, ইহাই প্রশ্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বৌন ওম সরকারই নিরপেক্ষ। আবার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিতে সুভান্না ফুমাই নিরপেক্ষ। ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা যদি হয় এবং লাওসকে যে-সকল সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে যদি দেওয়া হয় তাহা হইলে লাওসে শান্তিপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে উহার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে রাশিয়া আপত্তি করিলে সমস্যা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।

কঙ্গো পরিস্থিতি—

কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি যে-ভাবে কার্য্যকরী হইতেছে তাহার ফলে অখণ্ড কঙ্গোর পরিবর্তে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) যে নূতন নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন, তাহাতে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিবার এবং কঙ্গোলী বাহিনীকে পুনর্গঠন করিবার ক্ষমতা কঙ্গোস্থিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে দেওয়া হইয়াছে। কাসাভুবু এবং শোম্বে এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের এই নির্দ্দেশ যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী করিবারও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার প্রথম ফল হইয়াছে এই যে, কঙ্গোলী বাহিনী জাতিপুঞ্জ সৈন্যদের মাতাদি ও বানানা বন্দর হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কঙ্গোলী সৈন্যদের হাতে জাতিপুঞ্জ সৈন্যদের (সুদানী সৈন্যবাহিনী) এই পরাজয়ে কঙ্গোলী বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ইহা মনে করা সম্ভব নয়। নূতন নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে-ব্যবস্থা করা উচিত ছিল তাহা না করাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী এই অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। অতঃপর মাতাদি বন্দর পুনর্দখলের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করিয়া লিওপোল্ডভিলেতে কাসাভুবুর সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার ব্যবস্থা করা হইল। অবস্থা বুঝিয়া কাসাভুবু জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে মাতাদিতে প্রবেশের অধিকার দিবার অপমানজনক সর্ত্ত দাবী করিলেন। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি জাতিপুঞ্জ বাহিনী এবং কঙ্গোলী বাহিনী যৌথ ভাবে দখল করিবে এবং জাতিপুঞ্জ বাহিনীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবে কঙ্গোলী সৈন্যরা এই দুইটি দাবী অন্যতম। শেষ পর্য্যন্ত কাসাভুবু অবশ্য সর্ত্তের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মনে হয় যেন, জাতিপুঞ্জের প্রতি কাসাভুবু বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।

কঙ্গো সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার মালাগাসীর রাজধানী টানানারিভে কাসাভুবু, শোম্বে, কলঞ্জী এবং আরও কয়েক জন কঙ্গোলী নেতার সম্মেলন। মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে এই সম্মেলন হইয়াছে। গত ১১ই মার্চ্চের সংবাদ প্রকাশ, এই সকল নেতারা স্থির করিয়াছেন, 'ইউনিটারী' কঙ্গো গঠন করা সম্ভব নয় এবং উহা কার্য্যকরীও হইবে না। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁহারা কঙ্গো সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার মূল কথা এই যে, প্রত্যেক রাজ্য তাহার স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব বজায় রাখিবে, তবে একজন কেন্দ্রীয় প্রেসিডেণ্ট অবশ্যই থাকিবেন এবং বিভিন্ন স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় প্রতিষ্ঠান বা জেনারেল এসেম্বলী থাকিবে। এই এসেম্বলী লিওপোল্ডভিলে অবস্থিতে থাকিবে। উহা নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরিচালিত হইবে বিশেষ আইন দ্বারা। ইহা যে কঙ্গোকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সম্মেলন সম্পর্কে একটি প্রধান কথা মিঃ গিজেঙ্গা এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। কঙ্গোর এক তৃতীয়াংশের অধিক অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি টানানারিভে সম্মেলনে গৃহীত কঙ্গোর কনফেডারেশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে নিযুক্ত সালিশ কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে কঙ্গোর অবস্থার জন্য বেলজিয়মকেই দায়ী করা হইয়াছে। তাঁহারা অবিলম্বে বেলজিয়ানদের অপসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। কঙ্গোর পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিয়া আইন সঙ্গত গবর্ণমেণ্ট গঠনের সুপারিশও তাঁহারা করিয়াছেন। সালিশী কমিশন এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসাভুবুর নিযুক্ত ইলিও সরকারের আইনসঙ্গত ভিত্তি নাই, কারণ এই গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অতঃপর কি করিবেন, কি ভাবে কঙ্গোর এই নূতন সমস্যার সমাধান করিবেন

সমস্ত বিশ্ববাসী আগ্রহের সহিত তাহা লক্ষ্য করিবে। কাসাভুবু-ইলিও-র প্রতিনিধি মিঃ কার্ডোমো ইলিও সরকারকে মানিয়া লওয়ার এবং টানানারিভে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়াছেন। সালিশ কমিশনের রিপোর্ট যদি জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করেন তাহা হইলে মিঃ কার্ডোমোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। আবার এই অনুরোধ রক্ষা করিলে কঙ্গোকে ছিন্ন বিছিন্ন করা হইবে এবং প্রমাণিত হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা।

উত্তর রোডেশিয়া—

মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। দক্ষিণ রোডেশিয়া, উত্তর রোডেশিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ডকে মিলিত করিয়া এই ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ রোডেশিয়া ছিল বৃটিশ উপনিবেশ এবং উত্তর রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড ছিল বৃটেনের 'প্রোটেক্‌টোরেট' বা আশ্রিত রাজ্য। যে-ভাবে এই ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই ফেডারেশনে শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্বই কায়েম করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ফেডারেশনটি আফ্রিকায় আর একটি 'দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন' হইতে চলিয়াছে। মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন গঠিত হওয়ার সময় হইতে উত্তর রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। গত ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে 'দক্ষিণ রোডেশিয়া আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস,' 'উত্তর রোডেশিয়া আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস' এবং 'নিয়াসাল্যাণ্ড আফ্রিকান্‌ কংগ্রেস' নিষিদ্ধ করা হইলে এই অসন্তোষ প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। আফ্রিকানরা স্থানীয় শ্বেতাঙ্গদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অজুহাত তুলিয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আফ্রিকানদের উপর নৃশংস নিপীড়ন চালাইয়াছিল। এ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য 'ডেভ্‌লিন কমিশন' গঠিত হইয়াছিল। এই কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকানরা শ্বেতাঙ্গ হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এই অভিযোগ সত্য নহে।

মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন যখন গঠিত হয় তখন এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, এই ফেডারেশনের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের মধ্যে পুনরায় বিবেচনা করা হইবে। তদনুসারে বৃটিশ সরকার গত বৎসর লর্ড মঙ্কটনের সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্টে যদিও মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সুপারিশ করা হয় নাই, তথাপি একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আকারে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনকে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। মঙ্কটন কমিশন ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা ফেডারেশন নামটাই সহ্য করিতে পারিতেছে না। সাত বৎসর শ্বেতাঙ্গদেশের শাসনে বাস করিয়া তাহারা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইজন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইলে অঙ্গরাজ্যগুলিতে ফেডারেশন হইতে পৃথক হইবার অধিকার দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিশন এই সুপারিশ করেন যে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্ব্বিশেষে সকলকে ভোটাধিকার দিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। মঙ্কটন কমিশনের রিপোর্টে মধ্য আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরাও যে এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাও নয়।

মোটামুটি ভাবে মঙ্কটন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়াসাল্যাণ্ডকে একটা শাসনতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। উত্তর রোডেশিয়া সম্পর্কে লণ্ডনের আলোচনা বৈঠকে স্যার রয় ওয়েলেনস্কির দলের পক্ষে কেহই যোগদান করেন নাই। বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর এক শ্বেতপত্রে উত্তর রোডেশিয়া সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্বেতপত্র উত্তর রোডেশিয়ার আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে তিন প্রকার ভোটার-তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। একটি উচ্চ সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটার তালিকা, দ্বিতীয়টি নিম্ন আর্থিক সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটার তালিকা এবং তৃতীয়টি দুই ভোটার-তালিকার মিলিত ভোটার তালিকা বা 'নেশন্যাল রোল।' আইন আইন পরিষদে ৪৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ১৫ জন প্রথম ভোটার তালিকা, ১৫ জন দ্বিতীয় ভোটার তালিকা এবং ১৫ জন নেশন্যাল রোল হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় আইন পরিষদে আফ্রিকানদের সংখ্যাই বেশী হইবে। এই ব্যবস্থায় আইন সভায় আফ্রিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে, একথা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। তবু স্যার রয় ওয়েলেনস্কী এই শ্বেতপত্রের প্রস্তাবে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দলের (ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি) পাঁচ মন্ত্রী এই শ্বেতপত্রের

প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন এবং পাঁচ হাজার ইউরোপীয় টেরিটোরিয়েল সৈন্যকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যদিও পরে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যার রয় ওয়েলেনস্কী বলেন যে, কঙ্গো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই সৈন্য সজ্জিত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উত্তর রোডেসিয়ার রাজধানী লুসাকায় পরিবর্ত্তী যে আলোচনা হইবে তাহাতে যোগদান সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, উহাতে যোগদান করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের ভিত্তিটা যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয় তবে আলোচনা চলিতে পারে না বলিয়া তিনি জানান।

উত্তর রোডেশিয়ার ইউনাইটেড নেশন্যাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টির প্রেসিডেন্ট মি: কেনেথ কাউণ্ট গত ৬ই মার্চ্চ নাইরবিতে এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর রোডেশিয়ায় বহু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গকে অস্ত্রসজ্জিত করায় যে কোন সময়ে হাঙ্গামা বাধিতে পারে এবং উহার ফলে তাঁহার জাতির হাজার হাজার লোকের জীবন নাশ হইবে। তিনি বলেন যে, স্যার রয় ওয়েলেনস্কী যদি শ্বেতাঙ্গদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাহা হইলে আফ্রিকানরা অহিংস পন্থায় উহার বিরোধিতা করিবে। তিনি আরও বলেন, "When we are in action he will regret it"

এঙ্গোলায় বিদ্রোহ—

আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। গত ১৯৬০ সালে আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে বেলজিয়ম কঙ্গোর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেও খিড়কী পথে পুনরায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শুধু পর্ত্তুগাল এখনও তাহার আফ্রিকাস্থিত সাম্রাজ্য ছাড়িতে রাজী নয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ আফ্রিকার পর্ত্তুগীজ অধিকৃত দেশগুলিতেও ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। গত ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) মাসে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত এঙ্গোলার রাজধানী লুয়াণ্ডায় বিদ্রোহের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন হেনরিক গ্যালভাও যখন সত্তর জন সশস্ত্র যাত্রীর সাহায্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরে পর্ত্তুগীজ জাহাজ সান্তা মেরিয়ার কর্তৃক গ্রহণ করেন তখন তাঁহার মনে এই আশা ছিল যে এই জাহাজ দখলের প্রতিক্রিয়ায় পর্ত্তুগালে অথবা আফ্রিকাস্থিত পর্ত্তুগালের কোন একটি উপনিবেশে বিদ্রোহ দেখা দিবে। তাঁহার আশানুযায়ী তেমনটি না ঘটিলেও সান্তা মেরিয়ার আত্মসমর্পণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এঙ্গোলার বিদ্রোহ ঘটে।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) বিদ্রোহীদের দ্বারা লুয়াণ্ডার অসামরিক জেল এবং নিরাপত্তা পুলিশের ব্যারাক আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, আক্রমণকারীদের সংখ্যা ১৫০ জন হইতে হইতে ১৮০ জন। ইহাদের মধ্যে বাহিরের লোকও আছে অনেক। এই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হইলেও গত ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে এবং লিসবন হইতে প্যারাসুট সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, উল্লিখিত হাঙ্গামায় ৩০ জন নিহত এবং ৫৩ জন আহত হইয়াছে। গত ১০ই ফ্রেব্রুয়ারী আবার জেলখানা আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় আরও সাতজন আফ্রিকান নিহত ও সাতজন আহত হইয়াছে।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাপ্টেন গালভাও চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ঔপনিবেশিক ইন্স্পেক্টর ছিলেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে, এঙ্গোলার অবস্থা ক্রীতদাসত্বের অবস্থা অপেক্ষাও খারাপ। এই অপরাধে তাঁহার চাকুরী যায়, তাঁহাকে গ্রেফ্তার ও নির্ব্বাসিত করা হয়। উহার ফলে যে বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহারই পরিণতি ক্যাপ্টেন গালভাও কর্ত্তৃক সান্তা মেরিয়া জাহাজ দখল। পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ়হস্তে আঙ্গোলার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আন্দোলন দমিত হয় নাই। গত ১৯শে মার্চ্চের সংবাদে উত্তর এঙ্গোলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবীদের হানার কথা জানা যায়। একটি খামারে যে ১৮জন ইউরোপীয় ছিল বিপ্লবীরা তাহাদের সকলকেই হত্যা করিয়াছে বলিয়া পর্ত্তুগীজ সংবাদপত্র 'দিয়ারো পপুলারে' উল্লেখ করা হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে রহিয়াছে এঙ্গোলা জনতা ইউনিয়ন। এঙ্গোলার এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে উহার সদর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এঙ্গোলার অবস্থা ক্রমশ: ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে। নিরাপত্তা পরিষদে এঙ্গোলায় শাসন সংস্কার দাবী করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সিংহল, লাইবেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের সহিত একসঙ্গে এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছিল।

ভগ্নবীণা

মহালক্ষ্মী দত্ত

যতই তা'রে বাজাও না
সে বাজবে বেসুরে—
ওরে আমার ভগ্নবীণা
তার-ছেঁড়া সে রে।

শুকনো পাতায় বসন্ত হায়
নবীনতা ফেরায় না
ঝরাফুলে ভোরের শিশির
তরুণতা জাগায় না।

হৃদয় যখন হয় গো প্রবীণ
বাহির রূপেও হয় না নবীন
বসন্তেই ডাকে কোকিল
শীতে কভু ডাকে না।

সেক্সপীয়ার ও বক্স-অফিস

আভন নদীর তীর। যাত্রীর বিরাম নেই। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে-লাখে। চতুর্দিক থেকে এসেছে সর্বশ্রেণীর, সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্বশাখার নরনারী, এক কথায় আবালবৃদ্ধবনিতা, এসেছে একটি মাত্র মানুষের আকর্ষণে কিন্তু মানুষটি নবদেহে বর্তমান নেই—তাও আবার তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন হাল আমলে নয়—তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। আভনের তীরবর্তী ষ্ট্রাটফোর্ড অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহন করছে তাঁরই পুণ্যস্মৃতি। আজ থেকে প্রায় চার'শ বছর আগে এই মানুষটির অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল সমগ্র ইয়োরোপখণ্ড। শুধু কাব্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের নাট্য-সম্পদের ইতিহাসেও ইনি এক অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর নাট্যসম্ভারে ইনি আরোপ করলেন এক অভাবনীয় অভিনবত্ব, জগতের নাট্যশাস্ত্রের এক বিরাট ঐতিহ্যের স্রষ্টা তিনি। উইলিয়াম সেক্সপীয়ার তাঁর বিশ্ববন্দিত নাম। সর্বকালের, সর্বসমাজের এই প্রণম্য স্রষ্টার দেহাবসানের পর পৃথিবীর বুকের উপর অনেকগুলো বছরের তথা প্রায় সাড়ে তিনটে শতাব্দীর ঝড় বয়ে গেছে, কালের অমোঘ নিয়মানুসারে ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে বারংবার। তবু আজও আভন এবং ষ্ট্রাটফোর্ড প্রাপ্যসম্মান থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত নয়। বিশ্বনাট্যের ইতিহাসে সেক্সপীয়ারের আসন টলাতে পারল না কেউ।

রঙ্গামোদীদের মনে আজকের দিনেও সেক্সপীয়ারের প্রভাব সম্পর্কে একটি আলেখ্য অঙ্কনের উদ্দেশ্যেই মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। আশ্চর্যই লাগে ভারতে যে, এতগুলো বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের রূপান্তর ঘটল, কত সমাজ আবর্তনের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন রূপ পেল কত দেশ নগর, জনপদ হ'ল আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন কিন্তু সেক্সপীয়ারের নাটক প্রথম দিনটি যে সমাদর পেয়েছিল আজও তার সেই সমাদর, যুগের জনাগ্রসরণের সঙ্গে এ এক অদ্ভুত তাল দিয়ে চলা, তাই তার জনপ্রিয়তা আজও অটুট। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আজও যে কোন নাট্যকারের পক্ষে রীতিমত শক্ত ব্যাপার। রঙ্গামোদীদের কাছে 'বক্স-অফিস' শব্দটি খুবই পরিচিত, তাঁদের কাছে এই শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আজও সেক্সপীয়ার একজন 'বক্স-অফিস হীট' এ বললেও সব বলা হয় না কিছু কথা অকথিত থেকে যায় এ ক্ষেত্রে তিনি একজন 'বক্স-অফিস সুপার হীট।'

লণ্ডনে যে সময় বল্‌ডে গেলে সমস্ত থিয়েটারের বিক্রী মন্দা হয়ে আসে, থিয়েটারগুলো যে সময় কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখে সেই সময়ে সেক্সপীয়ারের নাটক য্যাণ্টনি য্যাণ্ড ক্লিওপেট্রার জয়যাত্রা অপ্রতিহত। তার বিক্রীর অঙ্ক কমায় সাধ্য কার? দর্শকের পৃষ্ঠপোষণায় সে তখন ঝলমলিয়ে উঠছে। প্রেক্ষাগৃহে তখন তিলধারণের স্থান নেই। হ্যামলেট এবং অল ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েলের অভিনয়ও অভাবনীয় সাফল্যের স্পর্শে ভরপুর। শুধু কি থিয়েটার? সিনেমাই বা কম যায় না কি? এমনিতেই তো টেলিভিসনের প্রাদুর্ভাবে সিনেমার চাহিদা কিছু কম হয়েছে তা সত্ত্বেও সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার যখন ছায়াছবির রূপ নিয়ে রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করল আপনি হয় তো শুনে অবাক হবেন যে মাত্র দু' হপ্তা সময়ের মধ্যে মোট ষাট হাজার লোক ছবিখানি দেখেছে, তা হলে দেখুন দৈনিক চার হাজার লোক ছবিটি দেখেছে। 'কো ভাদী' (Quo Vadis) ছবিখানি যা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে মুক্তিলাভের দিন থেকে, পাঁচ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতেই দেখা গেল যে, 'জুলিয়াস সীজার' ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তার পাঁচগুণ বেশী লাভ করেছে। হ্যামলেট ছবিখানির কল্পনাতিরিক্ত সাফল্যলাভের স্মৃতি আশা করি কারোর মন থেকেই মুছে যায়নি।

লণ্ডনের গণ্ডী অতিক্রম করে এবার বাইরের দিকে চোখ ফেরান যাক। দেখা যাক, কবির জন্মস্থান ষ্ট্রাটফোর্ডে কি হচ্ছে, সেখানকার হালচাল কি রকম? সেখানে ষ্ট্রাটফোর্ড মেমোরিয়াল থিয়েটারে যদি আসন সংগ্রহ করতে চান তা হলে তো আপনাকে রীতিমত ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাঁরা জায়গা দিতে পারেন না, দর্শককে। চাহিদা বুঝুন একবার।

মহাকবি সেক্সপীয়ারের বক্স-অফিস গৌরব শুধু মাত্র রঙ্গজগতকেই কেন্দ্র করে নয়, প্রসঙ্গটা যখন উত্থাপিত হয়েছে তখন সে সম্বন্ধে আরও কিছু বেশী বলার লোভটা সম্বরণ করা যাচ্ছে না। সেক্সপীয়ার পরিবারের বাড়ীগুলি এখন সেক্সপীয়ার ট্রাষ্টের পরিচালনাধীনে প্রতি বছর পৃথিবীর পঁচাশীটি দেশ থেকে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার লোক এই তীর্থ দর্শনে এসে থাকেন, এঁরা শুধু জন্মস্থানটুকুই দেখে থাকেন, মহাকবির স্মৃতিবিজড়িত অন্যান্য বাড়ীগুলিও যাঁরা দেখে থাকেন তাঁদের সংখ্যা দু' লক্ষেরও বেশী। প্রতিটি ভবনের প্রবেশমূল্য দেড় শিলিং এবং প্রতি পাঁচ জন হিসেবে সাড়ে চার শিলিং। এই ভাবে যে অর্থ উপার্জিত হয় তার এক অংশ ব্যয়িত হয় বাড়ীগুলির যথাযথ তদারকীর জন্যে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন বাবদ এবং মেরামত বাবদ, এবং অন্য অংশ ব্যয়িত হয় মহাকবি সম্বন্ধীয় গবেষণা বাবদ বৃত্তি ইত্যাদিতে। এই তীর্থপথিকদের সমাগমে স্বভাবতঃই স্থানীয় হোটেল, পানশালা, দোকানহাট ইত্যাদি মরশুম লেগে যায়, তারা তখন যে প্রচুর লাভ করে সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে সেক্সপীয়ার বলে কেউ ছিলেন না। ও নাম কাল্পনিক আবার কেউ বা ফতোয়া দিয়েছেন যে, যে সেক্সপীয়ার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, লেখাগুলি অপরের লেখনীজাত। অজস্র যুক্তিতর্কের নিষ্ফল অবতারণা, চুলচেরা বিশ্লেষণের বৃথা সমারোহ আবশ্যকহীন প্রশ্নোত্তরের অযথা বর্ষণ—কিছুই পারল না আভনের তীরে তীরে শ্রদ্ধাবনত লক্ষ যাত্রীর পদচিহ্ন মুছে ফেলতে। আজও ষ্ট্র্যাটফোর্ডের পবিত্র ধূলি প্রতিটি যাত্রীর শিরোদেশে স্থান লাভ করে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে।

চিত্রপরিচালক ডেভিড লীন প্রসঙ্গে

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কেউ বললেন অবিশ্বাস্য, কেউ বললেন অভিসন্ধিমূলক রচনা, কেউ বললেন—যতটা শোনা যাচ্ছে অতটা নয়, মোটের উপর খবরটা কিন্তু বেশ একটা সাড়া তুলে গেল। কিন্তু খবরটা প্রচারিত হল আবার, আর খবরটা যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণ করলেন তাঁরাই যাঁদের কেন্দ্র করে খবরটা রূপ পেয়েছে। হ্যাঁ, তাঁরা স্বীকার করেছেন যে এর মধ্যে কোথাও তিলমাত্র মিথ্যা নেই, সম্পূর্ণ সত্য। এ জাতীয় ঘটনার অবশ্য নতুনত্বও কিছু নেই—এ দেশের অসংখ্য ছেলে সাগরপারের কন্যাকে গৃহলক্ষ্মীর সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছে, আবার এ দেশের অনেক মেয়ে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে বিদেশীর গলায়, শেষোক্তদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করলেন লীলা, মারাঠী মেয়ে লীলা বরমাল্য দিল ইয়োরোপীয় ডেভিড লীনকে। স্বার্থকনামা চিত্রপরিচালকের মধ্যে যার স্থান নির্দিষ্ট। ব্রীজ অন দি রিভার কোয়াই ছবিটি পরিচালনা করে সারা জগতে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরই স্ত্রী হলেন ভারতনন্দিনী পরম সুদর্শনা লীলা দেবী, বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। লীনের বয়েস পঞ্চাশ কি ষাট বোঝবার উপায় নেই, তবে পঞ্চাশের নীচে বলে তো মনে হয় না।

ডেভিড জন্মেছেন ক্রয়ডানে। চিত্রপরিচালক হিসেবে যাঁর জগৎজোড়া সুখ্যাতি, চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর বাড়ীর মনোভাব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী। লীনের অভিভাবকরা কোনদিনই চলচ্চিত্রকে সুচোখে দেখেন নি। লীন ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়ার অনুমতি আমাকে দেওয়া হোত না, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আমার একটা অন্তরের আসক্তি বরাবরই ছিল, সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও এ কথা কিন্তু আমি একবারও ভুলি নি যে ঐ আমার আসল পথ ঐ পথ অবলম্বন করেই আমাকে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে।

স্কুলে পড়ার সময় আলোকচিত্রে হাত পাকালেন লীন। আলোকচিত্রের নানাবিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করলেন, রীতিমত অনুশীলনের ফলে ক্রমে তিনি দক্ষ আলোকচিত্রী হয়ে উঠলেন। আঠারো বছর বয়সে শহরে এলেন য়্যাকাউন্টেন্সি পড়তে। রঙ্গজগতে রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনো তখন সম্রাট, লোরিয়া সোয়ানসন, বাষ্টার কিটন, হ্যারল্ড লয়েড প্রভৃতি তখন এক একটি পরমোজ্জ্বল নক্ষত্র। এক আত্মীয়া আবিষ্কার করলেন পড়ার টেবিলে য়্যাকাউন্টেন্সি সম্পর্কিত বইগুলির পরিবর্তে ছায়াচিত্র সম্পর্কিত বইগুলির প্রাধান্যই যেন বেশী। উৎসাহ দিলেন লীনকে ছবি যদি ভাল লাগে তাহলে ঐ লাইনেই যাও না কেন। বাবারও মত বদলালো অবশেষে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে গোটা বাড়ীর মনোভাব এখন অনেক সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে এল।

'ক্ল্যাপার বয়' হিসেবে ষ্টুডিওতে যোগ দিলেন লীন, এতো দূরের কথা সামান্য একজন চা-বাহক হিসেবেও ঢুকতে তিনি নারাজ ছিলেন না। তারপর শব্দবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লীন সেদিকে আকৃষ্ট হলেন। গ্যামণ্ট সাউণ্ড নিউজের তিনি সম্পাদক হলেন (১৯৩০) প্রতি সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড বেতনে। ছবি পরিচালনার আহ্বানও এল একদিন—কিন্তু লীন প্রত্যাখ্যান করলেন সে আহ্বান এবং একবার নয় পর পর কয়েক বার। লীনের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এল তখনই যখন তিনি নোয়েল কোয়ার্ডের সান্নিধ্যে এলেন। কোয়ার্ড লীনের সম্মেলনের ফলে চিত্রজগত পেল—ইন উইচ উই সার্ভ, লীন মুক্তকণ্ঠে বলেন কোয়ার্ডই আমার সমস্ত সফলতার মূল। আমার জীবনে তাঁর আসন কোনদিন টলবার নয়, তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমি কতদূর কি করতে পারতুম সে সম্পর্কে আমি নিজেই মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি। দিস হ্যাপি ব্রীড, ব্লিথ স্পিরিট, ব্রিফ এনকাউণ্টার, প্যাশানেট ফ্রেণ্ডস, ম্যাডেলিন প্রভৃতি ছবিগুলি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং এদের প্রত্যেকটিই পরিচালক লীনের পরিচালন প্রতিভার প্রকাশক। দি সাউণ্ড বেরিয়ারও লীনকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। ব্রীজ অন দি রিভার কোয়াইএর তো কথাই নেই।

১৯৬০ সালে লীলা-লীনের শুভপরিণয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। লীলার আগে লীনের স্ত্রী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী য়্যান টড (৪৮)।

সাথীহারা

এক যাযাবর সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। একটি যুবক ও একটি যুবতীর প্রেমপর্ব, আপাত বিচ্ছেদ ও সর্বশেষে নানা ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে তাদের মিলনে গল্পের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। যে জাতীয় ছবিগুলির জন্যে বাংলাছবির মান নীচের দিকে নামতে থাকে, যাদের জন্যে বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের মর্য্যাদাহানি ঘটে সাথীহারা নিঃসন্দেহে তাদেরই অন্যতম। এত অন্তঃসারশূন্য অবাস্তব গল্পকে টেনে-টেনে দীর্ঘ করে দর্শকচিত্তে প্রতি মুহূর্তে বিরক্তি উৎপাদন করা হয়েছে। গল্পের মধ্যে না আছে পরম্পরা বা আছে বৈচিত্র্য, না আছে বাস্তবতা। এই গল্পের চিত্রায়নকে চিত্রসৃষ্টি না বলে যা বলা চলে তার নাম অনাসৃষ্টি। গল্পটির বিস্তারে ক্ষমতার দানতাই যথেষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। অসারতার জন্যেই বিন্দুমাত্র আবেদন জানাতে সক্ষম হয় না দর্শকচিত্তে। ফলে দর্শকমনে কোন রেখাপাতই করতে সমর্থ হয় না সাথীহারা ছবিটি। এই জাতীয় ছবিগুলির জন্যই যে বাঙালা ছবি (যার গৌরব বিশ্বব্যাপী) যে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুবোদ্ধা দর্শকসাধারণের কাছে আশা করি সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কাহিনীর বিন্যাসেও বিন্দুমাত্র দক্ষতার পরিচয় মেলে না। ছবিটির সর্ব্ব অঙ্গে অপটু হাতের স্পর্শ বিদ্যমান। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সাথীহারা ছবিটি একটি সামগ্রিক ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ছবির নায়ক-নায়িকা যাযাবর। তাদের উপযোগী সংলাপ রচনা এক হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারা কখনও বলছে হিন্দী ভাঙা বাঙলা কখনও কখনও বলছে সাঁওতালী ভাঙা বাঙলা—অর্থাৎ সংলাপের মধ্যে কোন সমতা নেই। মজার ব্যাপার এই যে তারা যখন গান গাইছে তখন গানের কথাগুলি পরিষ্কার বাঙলায়। আগাগোড়া ছবির মধ্যে কয়েকটি শহুরে চরিত্রও আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু সেই চরিত্রগুলিও স্রষ্টার অক্ষমতার পরিচায়ক। চরিত্রগুলির মধ্যে না আছে কোন সামঞ্জস্য, না আছে কোন সঙ্গতি, না আছে কোন আবেদন। তার উপর এই যাযাবর নাগরিক দুটি ভিন্নধর্মী জীবনধারাকে পাশাপাশি রূপায়িত করার প্রচেষ্টা এক 'হ—য—ব—র—ল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও মালা সিনহা, প্রথম জনের অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে, গীতা দে, তমাল লাহিড়ী দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপদান করে দর্শকসাধারণের প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছেন। তরুণ কুমার ও কাজরী গুহ ছবির দুটি প্রধান ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন কিন্তু চরিত্র দুটির প্রতি রীতিমত অবিচার করা হয়েছে, তাদের যথাযথ প্রকাশই তো ঘটে নি। অবশ্য শিল্পীদের অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এঁরা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, আশা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ ব্যর্থ ছবির অন্তঃসারশূন্য কাহিনী এবং দুর্বল চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ফণী মজুমদার এবং ছবিটি পরিচালিত হয়েছে সুকুমার দাশগুপ্তের দ্বারা।

সংবাদবিচিত্রা

পাঠক-পাঠিকার অজানা নেই যে, শিল্পী-দম্পতি ষ্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার এবং জিন সিমন্সের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়েছে। বর্তমানে জিন (৩২) পরিচালক রিচার্ড ব্রুকসের (৪৯) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেল। ষ্টুয়ার্ট-জিনের বিবাহ স্থায়িত্বলাভ করেছিল দশ বছর।

• • • •

সাম্প্রতিককালে সারা হলিউডে সবচেয়ে বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন দুজন শিল্পী। তাঁরা হচ্ছেন এলিজাবেথ টেলার (২৯) আর ডেবি রেণল্ডস (২৯)। এই আলোড়নের সূত্রপাত একজনকে কেন্দ্র করে। এই একজন হচ্ছেন এডি ফিসার (৩৩)। লিজের তৃতীয় স্বামী "Around the world in 80 days" খ্যাত মাইক টডের মৃত্যুর পর লিজ এডির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন। এডির স্ত্রী ডেবি এতে বিশেষ আঘাত পান। এই আঘাতের ফলে তিনি এক বেপরোয়া নিয়মহীন, শৃঙ্খলাবর্জিত জীবন বেছে নেন এবং চিত্রজগতে একমাত্র আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে তাঁর পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে নানারকম সংবাদ শোনা যেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে হ্যারি কার্ল, বব নিল, গ্লেন ফোর্ড, জ্যাক পার এবং আরও বহুজনের নাম উত্থাপিত হয়। বর্তমানে এই জাতীয় সকলপ্রকার জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটেছে। ডেবি ধনকুবের হ্যারি কার্ল (৪৭) এর সঙ্গেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন।

• • • •

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে সারা বিশ্ব আজ এগিয়ে চলেছে। জগতজোড়া আজ ব্যাপক আয়োজন। বাঙলার এই বিরাট গর্বে আজ পৃথিবীর যেন সমান অধিকার। মার্কিণ মুলুকেও ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সেখানে শতবার্ষিকী উদযাপন ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। ভূমিকালিপিতে একজন ভারতীয় অভিনেত্রীর নামও দেখা গেল। প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী পূর্ণকুমারী (৫১) 'রাজা' নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন।

শক্তিমান অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য বাঙলার তথা ভারতের প্রথমশ্রেণীর চিত্রনায়কদের আজ অন্যতম। শুধু বাঙলা দেশেই নয় বোম্বাইয়ের চিত্রজগতও তাঁকে সাদরে বরণ করেছে এবং তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। বাঙলা দেশের মতই বোম্বাইও তাঁর দ্বিতীয় ভবন হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে মহীশূর তাঁকে আকর্ষণ করেছে। চিত্রগ্রহণের জন্যে সাময়িক ভাবে তাঁকে সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরের চমৎকার আবহাওয়ার এবং মনোরম পরিবেশ শিল্পীকে মুগ্ধ করেছে। ব্যাঙ্গালোরেই তিনি স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন।

• • • •

সারা ভারতের চিত্রজগতে অশোককুমার বাঙলার গর্ব ও গৌরব এ সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শিল্পী আজ পঁচিশ বছর ধরে চিত্রজগতে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করে আছেন এবং সেই আসন থেকে তাঁকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা এখন কারোর নেই। এই পঁচিশ বছরে শিল্পী হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয় নি। আমরা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে তাঁর পুত্র শ্রীমান অরূপও বেজুবান ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। এই নবীন শিল্পীকে চিত্রজগতে স্বাগত জানিয়ে কামনা করি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশ সেবার কাজে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হোন।

• • • •

ভারতের তথ্য ও প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর কেশকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে বর্তমানে ভারতবর্ষে টেলিভিসনের প্রচলন কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাঁর মতে ভারতে টেলিভিসন প্রচলনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিরাট বাধা বিদ্যমান তিনি বলেন যে দেশে টেলিভিসন প্রচলনের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা গেছে যে ঐ বাবদে এখন ঐ অঙ্ক ব্যয় করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

• • • •

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ডিরেকটার্স য়্যাসোসিয়েশান বোম্বাইয়ের চিত্র পরিচালকদের এবং তাঁদের সহকারীদের পারিশ্রমিকের একটি নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন অঙ্ক ধার্য করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিচালকদের জন্যে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা অথবা মাসিক পাঁচশ টাকা সহযোগী পরিচালকদের জন্যে এককালীন আড়াই হাজার টাকা অথবা মাসিক আড়াইশ' টাকা, এবং অন্যান্য সহকারীদের এককালীন দেড় হাজার টাকা অথবা মাসিক দেড়শ' টাকা স্থিরীকৃত হয়েছে।

• • • •

একটি ইতালীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের চিত্রায়ণের স্থান হিসেবে সিংহলকে নির্বাচিত করেছেন। ছবিটির নাম বার্মিজ হীপ হিসেব

করে দেখা গেছে ছবিটির নির্মাণ বাবদ ব্যয় হবে সর্বসমেত তিরিশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। একটি সিংহলী যুবক ও একটি সিংহলী যুবতীকে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হবে এবং হাজার হাজার সিংহলবাসী অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন। কলম্বো থেকে পনেরো মাইল দূরবর্তী নিগোম্বোয় চিত্রায়নকার্য্য অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

* * * *

ভগবান বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে জাপানে একটি ছায়াছবি গড়ে উঠছে। ছবিটির নামকরণ করা হয়েছে শাক্য। ছবিটি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া হচ্ছে, জাপানের শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীর দল শাক্য ছবিটির বিভিন্ন বিভাগের ভার নিয়েছেন। যশোধরার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন ফিলিপাইনের এক অভিনেত্রী। তিনি আপন দেশে যথেষ্ট সুনাম ও জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। পর পর দু'বছর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে তাঁর নিজ দেশ তাঁকে সম্মানিতা করেছে। তাঁর নাম সেরিতো সোলিস (Cherito Solis)। মে মাসের গোড়ার দিকে তিনি টোকিওতে আসবেন এই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। জাপানী ভাষায় তাঁর সংলাপ 'ডাব' করা হবে।

* * * *

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা স্যার য়্যালেক গিনেস সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে টোকিওতে এসেছিলেন। বর্তমানে তিনি 'মেজরিটি অভ ওয়ান' ছবিটিতে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ। ঐ অভিনয়ের জন্যেই তাঁর জাপান আগমন। জাপানে এসে এই দেশের আচার আচরণ বিভিন্ন প্রথাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভই তাঁর জাপানে আগমনের মূল উদ্দেশ্য।

* * * *

অটোগ্রাফ সম্পর্কে জাপানে একটি বিশেষ প্রথার প্রচলন আছে। সেখানে নিয়ম হচ্ছে যে স্বাক্ষরটি নেওয়ার পর স্বাক্ষরকারীকে আপন নাম ও ঠিকানা লিখে দেওয়া স্বাক্ষর সংগ্রাহকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও শিষ্টাচার তবে এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এই নিয়ম কেবলমাত্র অভিনয়শিল্পীদের প্রতিই প্রযোজ্য। অভিনেত্রী বার্বারা রাষ (৩৫) জাপান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে দেখা গেল যে তাঁর ঝুলিতে তেইশ শ' নামের একটি তালিকা রয়েছে। অর্থাৎ এখানে এইভাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে জাপানে থাকাকালীন বার্বারাকে মোট তেইশশটি অটোগ্রাফ খাতায় স্বাক্ষরদান করতে হয়েছে।

সৌখীন-সমাচার

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 'শ্রীভারতহৃদয়ারবিন্দম্' নামক সংস্কৃত নাটকটি নবদ্বীপে সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছে। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন ডক্টর চৌধুরীর সহধর্মিণী স্বনামধন্যা ডক্টর রমা চৌধুরী। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস ফদিকার, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শমিতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং রত্না গোস্বামী।

* * * *

সুর সম্রাট তানসেনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনী অবলম্বন করে কোন্নগরের বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা নবনাট্য পরিষদ একটি নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকসাধারণের কাছে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন যাদব ভট্টাচার্য। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তপন বসু, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * *

সুখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাড়াটে চাই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন শান্তি সঙ্ঘ। সমর ঘোষের পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করলেন শম্ভু সেন, নীহার দাস, তরুণ চক্রবর্তী, রমেন ঘোষ, সুপর্ণ সেন, বিমল দাস, গৌতম মজুমদার, সত্যেন ঘোষ ও অশোক সরকার প্রভৃতি।

* * * *

কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমিতি আলিবাবা নাটকটি সগৌরবে মঞ্চস্থ করলেন। জিৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সুবল চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চট্টোঃ নিরঞ্জন সমাজপতি, বিশ্বনাথ ঘোষ, জীবন মজুমদার, সুধীর সরকার, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, অশোক ঘোষাল, মোহিত বসু, লীলাবতী দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শেফালি দে, বীণা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন।

* * * *

রঙবেরঙ গোষ্ঠীর প্রযোজনায় "সমুদ্র থামে না" নাটকটি সমারোহে মঞ্চস্থ হল। বর্তমানকালে বাঙলাদেশে যে সকল নাট্য প্রতিষ্ঠান নাট্যকলার সেবায় ও শ্রীবৃদ্ধিতে যত্নবান রঙবেরঙ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। সমুদ্র থামে না নাটকটি রচনা করেছেন মণীন্দ্র মজুমদার। অভিনয়াংশে ছিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, সলিল দত্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, সুভাষ রায়, বাণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, তারক ধর, বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায় এবং শোভা মজুমদার।

* * * *

কালচারাল সেমিনারের সদস্যরা সমর মুখোপাধ্যায়ের আশার পুতুল নাটকটি মধুমিতার পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছেন। রূপায়ণে ছিলেন সুনীল দত্ত, সনৎ ঘোষ, পাহাড়ী ঘোষ, আলোক মুখোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, অজিত সান্যাল, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গদাধর মণ্ডল, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, মিনতি মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও মিত্রা মুখোপাধ্যায়।

ফাল্গুন, ১৩৬৭ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, '৬১)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী): গত দুই মাসে ভারতের উত্তর সীমান্তে অজ্ঞাত পরিচয় বিমান কর্তৃক দুই বার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২রা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): কঙ্গোর বৈধ প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার নারকীয় হত্যাকাণ্ড ভারতসহ বিশ্বের সর্ব্বত্র ধিক্কার ধ্বনি—কলিকাতা, দিল্লী ও ভারতের অন্যান্য স্থলে বিভিন্ন মহলের তীব্র প্রতিবাদ।

৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): ১৯৬১-৬২ সালের ভারতীয় রেলওয়ে বাজেটে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত—যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুলের হার অপরিবর্ত্তিত—রেলওয়ে সচিব শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক লোকসভায় বাজেট পেশ।

৪ঠা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতায় প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের (৭৪) জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা মহানগরীতে রাণী এলিজাবেথের বিপুল সম্বর্দ্ধনা—দমদম হইতে রাজভবন পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথের দুই পার্শ্বে অপেক্ষমান অগণিত নর-নারীর হর্ষোৎফুল্ল অভিনন্দন—বিমান ঘাঁটিতে রাজ্যপাল (শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) ও মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক রাণী ও ডিউককে (ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ) অভ্যর্থনা।

৬ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী): নাগাভূমির নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্বোধন—আসাম রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশের সমক্ষে অন্তর্ব্বর্ত্তী শাসন পরিষদের (৪২ জন সদস্য সমন্বিত) সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

৭ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): প্যাট্রিস লুমুম্বার (কঙ্গোর প্রথম বৈধ প্রধান মন্ত্রী) হত্যা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রস্তাব।

৮ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১—৬২ সালের বাজেটে প্রায় নয় কোটি টাকা ঘাটতি—রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ।

৯ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী): উড়িষ্যায় কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন শাসনের অবসান—২১ মাস পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব কর্তৃক পদত্যাগপত্র পেশ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক ভারতকে আরও ৬০ কোটি টাকা ঋণ দান—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১০ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী): আফ্রিকার মহান্ জাতীয় নেতা (কঙ্গোর প্রথম প্রধান মন্ত্রী) মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীর দুঃখ প্রকাশ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় শোক প্রস্তাব গৃহীত।

১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): 'কঙ্গোয় বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণের নিশ্চয়তা পাইলে ভারত যোদ্ধ, সৈন্য প্রেরণ করিবে'—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কঙ্গো সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১২ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): মাদ্রাজ রাজ্যের নূতন তামিল নাম 'তামিল নাড়ু' ইংরেজীতে প্রচলিত 'মাদ্রাজ ষ্টেট' নামই বহাল রাখার ব্যবস্থা।
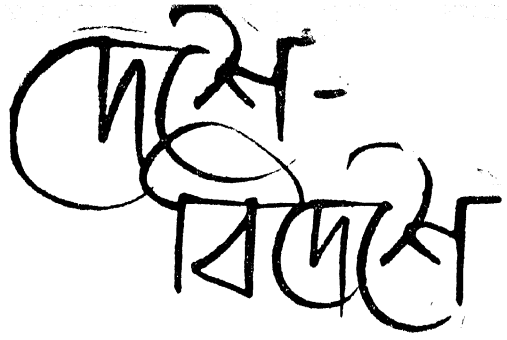
১৩ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী): উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন—রাজ্যের কোয়ালিশন (কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ) মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া পড়ার জের।

১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী): এন, এফ রেলপথে ল্যামডিং—বদরপুর শাখায় চলন্ত ট্রেণে নাগা বিদ্রোহীদের গুলীবর্ষণ—দুইখানি নৈশ প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলাচল স্থগিত।

১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): এক হাজার বৎসর বাদে পুরীতে গোবিন্দ দ্বাদশী মেলার অনুষ্ঠান—পাঁচ লক্ষাধিক তীর্থ-যাত্রীর সমুদ্র স্নান ও জগন্নাথদেব দর্শন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, এম-এস-সি ও এম-কম পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর (থার্ড ক্লাশ) বিলোপ—বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত।

১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী): পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক ১৯৬১-৬২ সালের বাজেট পেশ—নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া প্রায় ৬১ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব।

কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রের ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ—সরকার পক্ষ হইতে লোকসভায় তথ্য পরিবেশন।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ): কলিকাতায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের রাতারাতি মূল্য বৃদ্ধি—খোলা বাজার হইতে কোন কোন জিনিস উধাও—বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিক্রিয়া।

'ভারতে সফর ও লব্ধ সম্বর্দ্ধনায় বৃটেন-ভারত মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হইল—২৩ দিবসব্যাপী সফরান্তে বিদায়ের প্রাক্কালে বৃটিশ রাণী এলিজাবেথের দিল্লী হইতে বেতার বাণী।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ্চ): বেরুবাড়ী হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয়—পুনরায় পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হইবে না—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ): '১৯৬৬ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের চাহিদা মিটানো সম্ভব হইবে'—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কৃষি সচিব শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ঘোষণা।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ): কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীতে তিন হাজার যোদ্ধ, সৈন্য প্রেরণে ভারত রাজী—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষণা।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ্চ): প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাংবাদিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (৬৮) কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতির

আমূল পরিবর্তন দাবী—রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতির অভিযোগ ও পরিকল্পনাহীন অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) : দীর্ঘ রোগভোগের পর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের (৭৩) জীবনাবসান—সারা ভারতে সপ্তাহব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক উদ্‌যাপনের সরকারী ব্যবস্থা।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত রেলের কিষেণগঞ্জ কাটিহার শাখায় তেলতা ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনায় ১২জন নিহত ও ৩৯জন যাত্রী আহত।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ) : উড়িষ্যা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন লোকসভায় অনুমোদিত—বিরোধী কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সংশোধন প্রস্তাব সমূহ বাতিল।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) : বিগত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে লোক সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ বৃদ্ধি—১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটি নির্নীত।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় দুর্ভিক্ষ খাতে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের দাবী গৃহীত। 'খাদ্য সম্পর্কে—দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই'—খাদ্য ও ত্রাণসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আশ্বাসবাণী।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : 'টাকার জোরে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করা যাইবে না'—কংগ্রেসকে লক্ষ্য করিয়া দমদম বিমানঘাঁটিতে শ্রীসি, রাজাগোপালাচারীর (রাজাজী) মন্তব্য।

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ) : কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে মালবাহী সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ—সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া হুঁসিয়ারী।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : শান্তি সংস্থাপনের কাজে সহায়তার জন্য ভারতীয় যোদ্ধ সৈন্যদের প্রথম দলের কঙ্গো যাত্রা।

বহির্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী) : কাটাঙ্গার গ্রামে দুইজন সঙ্গী (প্রাক্তন মন্ত্রী) সহ আটকাধীন পদচ্যুত কঙ্গোলী প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত—এলিজাবেথভিল হইতে সংবাদ ঘোষণা।

মহাশূন্যে স্পুটনিক হইতে শুক্রগামী সোভিয়েট রকেট উৎক্ষেপ—মহাশূন্য জয়ে রাশিয়ার নূতন অধ্যায়ের সূচনা।

৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী) : কঙ্গোলী-নেতা লুমুম্বার হত্যার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবামাত্র কঙ্গোর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি—দুইজন বেলজিয়ান খুন—লিওপোল্ডভিলস্থ বেলজিয়াম দূতাবাস আক্রান্ত।

৬ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : রাজা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নেপালে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন—নেপালের জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ঘোষণা।

লিওপোল্ডভিলস্থ রাষ্ট্রসংঘ দপ্তরের সংবাদ অনুসারে বেলজিয়ান অফিসারের গুলীতেই কঙ্গোর পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুমুম্বার জীবনলীলা সাঙ্গ।

৭ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : কঙ্গোর শৃঙ্খলা রক্ষার্থ শুধু আফ্রিকানদের লইয়া একটি নূতন রাষ্ট্রসংঘ কমাণ্ড গঠনের দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কজোল্ডের নিকট ঘানা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কোয়ামে নক্রুমার সাত দফা প্রস্তাব।

৮ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : কঙ্গোর লুমুম্বা সরকারের আরও ছয় জন মন্ত্রীকে হত্যা—লিওপোল্ডভিল হইতে বাকোয়াঙ্গায় স্থানান্তরের পর ফাঁসিদান—রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে সেক্রেটারী হ্যামারস্কজোল্ড কর্ত্তৃক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ।

১৩ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী) : করাচীস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের উপর পাকিস্তানী জনতার প্রবল হামলা—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ—পাক সরকারের নিকট ভারতের প্রতিবাদ—প্রতিবাদ লিপিতে দূতাবাস বিধ্বস্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দাবী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) নিকট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের পত্র—রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কজোল্ডের পদচ্যুতির দাবী সমর্থনে আহ্বান।

১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী) : খুলনায় (পূর্ব্ব পাকিস্তান) দুর্বৃত্তদলের আক্রমণে ৫ ব্যক্তি নিহত—করাচীতে হিন্দুমন্দিরে উচ্ছৃঙ্খল জনতার হানা—পুলিশের গুলীতে একজন নিহত।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ) : একাধিক বিবাহে ইচ্ছুক পাকিস্তানী মুসলমানদের পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হইবে, নতুবা দণ্ডভোগ—পাক সরকার কর্ত্তৃক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ) : পূর্ব্ব পাকিস্তানের সৈদপুরেও (রংপুর জেলা) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ২০ জন হতাহত—সারারাত্রিব্যাপী কারফিউ জারী।

নিকট ভবিষ্যতেই মহাকাশে মানুষ প্রেরণ সম্ভবপর হইবে—সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহের 'জনক' অধ্যাপক লিওনিদসেদভের দাবী।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) : আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে এই পর্য্যন্ত দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি—দৈনিক এক কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়া ফ্রান্সের (দ্যগল শাসিত) দেউলিয়া হইবার উপক্রম।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : লণ্ডনে ১৮ দিনব্যাপী কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) কর্ত্তৃক আলোচনার উদ্বোধন।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ) : কুকুর ('চেকমুশকা') সহ সোভিয়েট মহাকাশ যানের নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন—রুশ বিজ্ঞানীদের চতুর্থ পরীক্ষার সাফল্য।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ) : পর্ত্তুগীজ আঙ্গোলার সঙ্কট বিশ্ব বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিবে—রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ ভ্যালেরিন জোরিনের সতর্কবাণী।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : কঙ্গোতে নূতন কনফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠনের সিদ্ধান্ত—বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ যোসেফ কাসাবুবু নয়া রাষ্ট্রেরও প্রেসিডেণ্ট হইবেন—তানানারিভে সর্ব্বদলীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠকের পরিসমাপ্তি।

গিনিতে স্বর্ণ ও হীরক-শিল্পের জাতীয়করণ—প্রেসিডেণ্ট সেকোউ টৌরে কর্ত্তৃক আদেশনামা জারী।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : ভারতস্থ নেপালী নেতাদের প্রতি নেপালের রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের ঘোষ—ডাকামাত্র দেশে ফিরিতে হইবে, অন্যথা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

পররাষ্ট্র বিভাগের ব্যয়

"লোকসভায় পররাষ্ট্র বিভাগের জন্য ব্যয় মঞ্জুর করাইবার সময় প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন—যে ভারতের সম্বন্ধে অন্যায় আচরণ করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া—অনুতপ্ত হইয়া চীন হয়ত ভারতের সীমান্তে অধিক স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল হয়—আজ সহসা এই সম্ভাবনার কথা বলা হইবে কেন? "বুক ফুলিয়াছে কার সোহাগে?" সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের রাণী ভারতে আসিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছেন; সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর ধনিকবাদের দেশ আমেরিকা কি এমন আশা দিয়াছেন যে, "আমি সহায় আছি"? কিন্তু দাদার ভরষার যে অনেক সময় বামে ছুরি হয়, তাহাও মনে রাখা প্রয়োজন। কম্যুনিষ্ট চীন কি ভারতে অনধিকার প্রবেশের পরে সহসা ধর্ম্মের ভাবে প্রভাবিত হইয়া অনুতপ্ত হইবে? রাজনীতিতে অনুতাপের স্থান নাই। থাকিলে জওহরলাল মিশচয়ই কাশ্মীরে ও বেরুবাড়ীতে যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতেন। যখন দিল্লীতে জওহরলাল চীনের অনুতপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে কিন্তু তাঁহার তুষ্টি সাধনে আগ্রহশীল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কর্তারা কামারকুণ্ডুতে আর সব স্থানের কথা না বলিয়া (হিন্দুদিগের সাহানুভূতি লাভের আশায়?) চীনের বদরীনাথ দাবীর উল্লেখ করিয়া "শান্তির অস্ত্র" চীনের আক্রমণ ও আচরণ কঠোর-ভাবে প্রতিহত করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা কি বেতারে জওহরলালের নিকট হইতে কোন নির্দেশ লাভ করেন নাই? ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিন্দুর তীর্থের জন্য এই আশঙ্কা কি বিস্ময়কর বোধ হয় না? রাণীক্ষেতও ত বদরীনাথের অতি নিকটেই নহে। ওদিকে রাশিয়ার যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেই বা কি করা হইবে? রাশিয়ার নিকট হইতেও ত ভারত অল্প সাহায্য গ্রহণ করে নাই ও করিতেছে না। তবে জওহরলাল বলিয়াছেন, ভারতের পররাষ্ট্র নীতির জন্য সে রাশিয়ার শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছে। তাহা কি ভারতকে প্রকৃত অবস্থায় অবহেলা করাইবার জন্য নহে ত?"

—দৈনিক বসুমতী।

ডি-ভি-সি-র গলদ

"ডি-ভি-সি-র বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থার যে অনিয়ম দেখা দিয়াছে, তাহা গুরুতর। সংবাদে প্রকাশ, বিগত কয়েকদিন ডি-ভি-সি যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়াছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা তাহা অনেক কম। বিদ্যুতের অন্যতম ক্রেতা কলিকাতা-বিদ্যুৎ-সরবরাহ কর্পোরেশন নাকি ইহার ফলে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ডি-ভি-সি-র বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী বিভিন্ন ইউনিটে যান্ত্রিক গোলযোগ বর্তমান। তা ছাড়া, এই সংস্থাটির জেনারেল ম্যানেজার সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নতুন গোলযোগের আশঙ্কাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সেরূপ গোলযোগ দেখা দিলে যে অনেক ক্রেতার সরবরাহেই টান পড়িতে পারে, জেনারেল ম্যানেজারের উক্তিতেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা যে-সব ত্রুটির ইঙ্গিত দিতেছে, অবিলম্বে তাহার সংশোধন আবশ্যক। অন্যথায় যে অবস্থা আরও উদ্বেজনক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশে এখন শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। বিদ্যুতের চাহিদাও সেই সঙ্গে বাড়িতেছে। এমতাবস্থায় যদি বিদ্যুতের সরবরাহে টান পড়ে, তবে খুবই ক্ষোভের কথা।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দ্রব্যমূল্য

"কংগ্রেস দ্রব্যমূল্য সম্পর্কীয় সাব কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই বলেন, দেশের দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি আতঙ্কজনক নয়। খাদ্য ও অত্যাবশ্যক সব জিনিষের মূল্যহার স্থিতিশীল করার জন্য উক্ত সাব কমিটি গঠিত হয়। মন্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য হইতেই বোঝা যাইতেছে কমিটির কার্যপ্রণালী কতখানি বাস্তব জ্ঞানের উপর স্থাপিত বা তা কিরূপ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করিতেছে! ত্রিশ টাকা চাউলের মণ, চার টাকা মাছ-মাংসের সের, ঘী আটা, তেল তিন টাকা, আটা বারো আনা, চিনি এক টাকা সের, সেই দেশে, যে দেশে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বেকার এবং উপার্জনশীলদেরও মাথা-পিছু গড় আয় দেড় টাকা—ইহার পরও যাঁহাদের মতে দ্রব্যমূল্য আতঙ্কজনক নয়, তাঁহাদের আতঙ্ক উৎপাদন করার মতো ব্যাপার নিশ্চয় পৃথিবীতেই নাই। রুটির অভাব শুনিয়া প্রজাদের যিনি কেক খাওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহার ধারা দেখিতেছি আজও শেষ হয় নাই।"

—যুগান্তর।

গ্রন্থাগার সমস্যা

"সদ্যসমাপ্ত পঞ্চদশ গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল্য খুব বেশী। স্বাধীনতা লাভের পরও পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার-জগতে মোটামুটি চারটি শক্তি কাজ করিতেছে—সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। সরকারের শক্তিই প্রধান, প্রবল ও মূল শক্তি। কিন্তু প্রথম দুইটি পরিকল্পনার পর যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলে কম বলা হয়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং সরকারী সাহায্যকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা সারা রাজ্যে ১৫০৮; উহাদের মোট পুস্তকসংখ্যা ২, ১৪৮; ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা ৪,১০০ এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২০০ মাত্র। বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আজও গোড়াপত্তন হয় নাই, কর্মীদের বেতন নামমাত্র, পারস্পরিক সহযোগিতা নাই, বেসরকারী গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ নাই। এদিকে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একান্ত অভাব; কলিকাতাতে পর্য্যন্ত এই গ্রন্থাগার নাই। জনপরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহ নিদারুণ অর্থাভাবে নিমজ্জিত। যে গ্রন্থাগার আন্দোলন সমগ্র রাজ্যের সামগ্রিক সংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রশ্নের সহিত জীবন-মরণ বন্ধনে জড়িত তাহার নিদারুণ সংকটের সমাধানের দুঃসাহসী উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অগ্রসর হইয়াছেন আমরা তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি সরকার, জনসাধারণ এবং দলমত নির্বিশেষে সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতো ভাবে তাঁহাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করিবেন।"

—স্বাধীনতা।

হত্যার পর

"নেহরু-একনায়কত্ব বেরুবাড়ী বলিদানের উন্মাদ আগ্রহে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টে বেরুবাড়ী বলিদানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। সে মামলা নাকচ হইতেছে। বেরুবাড়ী বলিদান শুধু দুঃখকর নয়—লজ্জাকর। দেশের বুকে এক ঘৃণ্য দুরভিসন্ধির কলঙ্ক-জনক দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল। চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও নীতিহীনতার এই উদাহরণ বহু উচ্চারিত গণতন্ত্রের পক্ষে পরিহাস মাত্র। গণতন্ত্রের কণ্ঠ যেখানে বিবিধ উপায়ে রুদ্ধ হয়, গণদাবীকে যেখানে কৌশলে ব্যর্থ করা হয়, সেখানে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি মেহাৎ ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেরুবাড়ী বলি দিয়া উৎসাদির মানুষগুলির গতি কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিং-এ থানা-সেনে আলোচনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতাধারীদের যাহা লাভ হইবে পত্র-পাঠ তাহার সম্পত্তির জন্য পাকিস্তান ছুরি শানাইতেছে। ভারতের ভাগ্যে শুধু উদ্বাস্তুর বোঝা। যে হতভাগ্যেরা দেশ বিভাগের ষড়যন্ত্রে একদা ভিটা-মাটি-চ্যুত হইয়াছিল, বেরুবাড়ী বলিদানের ফলে আর একবার তাহারা বাস্তুচ্যুত হইল। একবার বাস্তুহারা হইয়া বড় আশায় তাহারা ভারতের বুকে ঘর বাঁধিয়া সুখের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। শুধু মাত্র ভারতে বাস করিবার জন্য, ভারতের বাতাসে নিঃশ্বাস লইবার জন্য, ভারতের মাটিতে মৃত্যুশয্যা রচনার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা দিনের পর দিন পাকিস্তানীদের সীমান্ত হামলা প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের সর্ববিধ অসহযোগিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানী অত্যাচারে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। প্রতিদিন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করিয়া কেবল মাত্র আত্মশক্তির প্রভাবে বেরুবাড়ীর মাটি আঁকড়াইয়া থাকিয়াছে। বহু পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলাইয়াছে। যে মাটির সঙ্গে আর একবার তাহাদের নাড়ীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, যে মাটির সঙ্গে তাহাদের গায়ের ঘাম ও চোখের জল মিশিয়াছিল, দুর্ভাগাদের শিথিল মুঠি হইতে আবার তাহা দূরে সরিয়া গেল।" —স্বস্তিকা কলিকাতা)

পুরবাসী ও পৌরপিতা

"নির্বাচন যুদ্ধ সমাপ্ত। অতঃপর অল্ডারম্যান মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের মাধ্যমে পৌর সভায় নব-নির্বাচিত পৌর পিতাদের দায়িত্বের পালা সুরু। এই সহরের নাগরিক জীবন আজ বিপন্ন, বিপর্যস্ত। পরিশ্রুত জলের ন্যূনতম সরবরাহ নাই, রাস্তাঘাটগুলি শুধু অপরিচ্ছন্ন নহে, অব্যবহার্যও। নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ একান্ত উপেক্ষিত। অযোগ্যতা আর অব্যবস্থা নাগরিকদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অথচ গত চার বৎসরে প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই পৌর পিতাগণ দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অজুহাতের অভাব কখনই হয় না। কঙ্গো, লুমুম্বা ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যে সব নাটকের অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে লজ্জায় নাগরিকগণের মাথা কাটা গেলেও পৌর পিতাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নাই। কলিকাতা আজ পৃথিবীর জনবহুল সহরগুলির অন্যতম। অথচ নগর-পরিকল্পনার আধুনিকতম সুযোগ হইতে এই সহর বঞ্চিত। কলেরা বা বসন্তের মত একান্ত প্রতিরোধ্য ব্যাধিও প্রতি বৎসর নাগরিকদের বিপুল অংশকে মৃত্যুর কোলে টানিয়া লয়। ভ্রমণ বা খেলাধূলায় স্থান দুর্লভ, চেহারায় নাই কোন শ্রী। পৃথিবীর অন্য যে কোন উল্লেখযোগ্য সহরের তুলনায় সব দিক হইতে এই সহরের দীনতায় নাগরিকগণ লজ্জিত। এই লজ্জা অপনোদনের মুখ্য দায়িত্ব পৌর প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচক দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দলীয় রাজনীতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থে প্রভাবিত হইলে নাগরিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং নব নির্বাচিত পৌরপিতাদের সাদর আহ্বান জানাইয়া তাঁহাদিগকে আপন কর্তব্যে কঠোর হইতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

—জনবাণী (কলিকাতা)।

মারাত্মক ভূমিকা

"প্রত্যেক স্বাধীন দেশে সরকার পক্ষের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি বিরোধী পক্ষেরও ভূমিকা আছে। বিরোধীপক্ষ, সরকারের যেসব নীতি দেশ ও সমাজের কল্যাণ বিরোধী তথা জাতীয় স্বার্থবিরোধী, সরকার পক্ষকে সেই নীতি কার্য্যকরী করিতে বাধাদান করেন এবং তাহাদের সাফল্য সংশ্লিষ্ট দেশ ও সমাজের কল্যাণোদ্দেশক। ব্রিটেনে এই দুই ভূমিকাই যেরূপ দেশের কল্যাণকে মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া পুরোভাগে রাখে, অন্য কোন দেশে এই ভূমিকা এত সুস্পষ্ট নহে। এজন্য ব্রিটেনের বিরোধী দলনেতা প্রধানমন্ত্রীর মতই জনগণের শ্রদ্ধালাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ আমাদের দেশে দুই ভূমিকাই বিচিত্র। স্বাধীন দেশ বলিয়া, প্রশাসনিক দায়িত্ব যাঁহারা জনগণের কল্যাণে গ্রহণ করেন, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে দলীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে পর্য্যবসিত করিয়া, জনগণের বিনিময়ে মুষ্টিমেয়র কল্যাণ সাধন করেন। এখানে বিরোধীদলের মুখ্য ভূমিকা সরকারের ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া তোলা ও প্রতিকারের দাবী করা। বিরোধীদলের ভূমিকা এই নহে যে, তাহারা সরকারের ত্রুটিগুলি ও যে নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবেন আবার তাহাদের অনুসৃত নীতিদ্বারা অন্যভাবে তাহাই অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলীয় স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধন করিবেন। যে দেশে বিরোধীদল এরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন, সে দেশের জনগণের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত অন্ধকার। এ দেশে সে অবস্থাই অবশ্য বিদ্যমান, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

দণ্ডকারণ্যে বাঙালী

"দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্ত্তৃপক্ষের সভাপতি শ্রীসুকুমার সেন বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের শিবিরগুলি হইতে যদি উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে না যায় তবে যথাসম্ভব সত্বর খয়রাতী বন্ধ করিতে হইবে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যে সুযোগ আসিয়াছে তাহারা আজ যদি তাহা গ্রহণ না করে তবে ভবিষ্যতে এই সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—ইহা দেখা যাইতেছে যে বৎসরের পর বৎসর পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে অলসভাবে দিন কাটাইবার ফলে উদ্বাস্তুদের কর্মশক্তি ও কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাইবার মনোভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং এই কারণেই তাহারা দণ্ডকারণ্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে সাহস করিতেছে না। শ্রীসেনের বক্তব্যের কিছুটা সত্য কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে তাহাদের মনোবল নষ্ট হইত না। তাহা ছাড়া দান খয়রাতী করিয়া কোন প্রকারে সমস্যা চাপা দিতে দিতে সরকারই আজ তাহাদের কিছু করিয়া বাঁচিবার তাগিদ নষ্ট করিয়াছে। আজ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত—এই সকল

যাহাতে দণ্ডকারণ্যে গিয়া চাষ আবাদ করিয়া পুনরায় মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)।

পেটের জ্বালা

"ডাঃ অনুপম রায় পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন। নিজ সন্তানকে এবং স্ত্রীকে নাইট্রিক অ্যাসিড পান করিয়ে পরপারে বিদায় দেওয়ার পর নিজেও বিদায় নিয়েছেন। তিনি নাকি তাঁর যথাসর্বস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করেছেন। তাঁর শবদাহ করবার জন্য নাকি এত লোক জমেছিল, তার সংখ্যা গোনা নাকি সাধ্যের অতীত। বাঙ্গালীরা কি করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইতে হয় তাহা জানে। রাজ্যেশ্বর রামদাস আসাম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ক্ষুধার জ্বালায় নিজ পুত্রকে আছড়াইয়া মৃত্যুর মুখে পাঠাইতে দ্বিধা করে নাই। জজ-সাহেব তাহাকে ফাঁসি না দিয়া ১০ বৎসরের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু আসামী রায় দানে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "সাহেব আমায় ফাঁসি দাও, সাহেব আমায় ফাঁসি দাও।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

অদ্ভুত মনোভাব

"রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর পূর্ব্বেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ পরিচালনার দাবী উঠিয়াছে। দাবীটা যে যুক্তিসঙ্গত সেই সম্পর্কে দেশপ্রেমিক মাত্রেরই দ্বিমত হইবার কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত লজ্জার সহিত উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না, ১৩ বৎসর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও সভা-সমিতিতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া পাণ্ডিত্য জাহিরের অভ্যাস এখনও যায় নাই। যদিও এই সকল সভা সমিতির বক্তা ও শ্রোতা সকলেই বাঙ্গালী। এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন কবে ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা এই ব্যাপারে সরকারের সমালোচনায় মুখর, তাঁহাদের যখন সভা সমিতিতে বিদেশী ভাষার বক্তৃতা করিতে দেখা যায় তখন এই প্রশ্নই দেখা দেয়, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'।"

—সমাধান (হুগলী)।

সু-শাসনের কেলেঙ্কারি

"জীবের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ খাদ্য। সেই খাদ্য যে মানুষের তুলনায় অতি কম, তা না। বৃদ্ধি করিলে মানুষ খাবে কি? এ ভাবনা না ভেবে যারা গগনভেদী তের তলা বাড়ীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যস্ত এঁদের প্রকৃতির লোকদের "পিরামিড বিল্ডার" বলে। মাঝ সমুদ্র হ'তে মাছ ধরে লোককে মাছ খাওয়াবে বলে ইউরোপ হতে মাছ ধরা জেলে ও জাহাজ এনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ যারা করে তাদের পরের ধনে পোদ্দারী দেখে এক ঝি-এর কথা মনে পড়ে হাসি পায়। ঝিকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—দিদি তুমি যদি অনেক টাকা পাও তবে কি কর? সে উত্তর দিয়েছিল —তখন আমি কলসী নিয়ে হেঁটে জল আনবো না। আমার ঝিয়ের কোলে চড়ে সোনার কলসীতে জল আনবো। কিছুদিন আগে খাদ্যের নীতিতে ব্যর্থ হয়ে খাদ্যমন্ত্রীকে আড়ালে রেখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর আদর্শেঅক্ষমতা স্বীকার ক'রে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানুষ শিকারে মন দিয়ে পশ্চিম বাংলা বিশেষতঃ কলকাতা-হাওড়ায় কীর্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এঁরা স্বাধীনতার পর সার কেলেঙ্কারীর অপরাধীকে, জীপ কেলেঙ্কারীর আসামীকে মোটা মোটা মাহিনার পদ দিয়ে পুরস্কৃত করে কেলেঙ্কারীকে আরও কলঙ্কিত করিতে ইতস্তত করেন নি। হালে প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় সংবিধান অমান্য করিয়া পাকিস্থানকে বেরুবাড়ী পরগণা দান করে পুণ্য অর্জ্জনে পশ্চিম বাংলার বিধানমণ্ডলী কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া এখনও যে দান বজায় রাখিবার জেদ ধরিয়া পশ্চিম বাংলার মুখ্য-মন্ত্রীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন, তবুও এই দানকর্ম্ম সমাপ্ত হয় নাই।"

—ত্রিপুর সংবাদ।

লাল জলের ব্যবস্থা

"পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে চারটি মদের ভাটি নির্ম্মাণ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। প্রথমেই কল্যাণীতে এই মহৎ কার্য্য সুরু হইবে। এখানে দৈনিক ছয় হাজার বোতল বীয়ার নামে মদ্য তৈয়ারী হইবে। পৌরসভাগুলিতে যেরূপ পানীয় জলের অভাব সরকার যদি এই সকল উৎকৃষ্ট পানীয়, পৌরসভা-গুলিকে সরবরাহ করেন তবে নাগরিকদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় এবং নাগরিকরা দিন দিন যেরূপ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছে অন্ততঃ তাহাদের মতি গতির মোড় ফেরে।"

—জি, টি, রোড।

শোক-সংবাদ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ডক্টর শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গত ৪ঠা ফাল্গুন ৭৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত রঙপুর অতুলচন্দ্রের জন্মস্থান। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ, পরীক্ষায় অতুলচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। বি-এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল রঙপুরে আইন ব্যবসায় করার পর কলকাতায় এসে আইন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে এক তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সমর্থ হন। আইন কলেজে অধ্যাপকের আসনে অতুলচন্দ্রকেও দশ বছর যাবৎ সগৌরবে সমাসীন থাকতে দেখা গেছে। আপন সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে অতুলচন্দ্র সবুজপত্রের নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখে অতুলচন্দ্র সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন। এঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাসমূহ এঁর যুগপৎ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। চিন্তানায়ক অতুলচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "তিনি নিজের চিন্তের জোরে নিজের মত করেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ করে প্রকাশ করতে পারেন··· চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নতুনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।" ইনি নিখিল বঙ্গ আসাম আইনজ্ঞ সম্মেলনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যশাখার (১৯৩৮) এবং একদা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মানাত্মক 'Doctor of Laws' উপাধি দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতুলচন্দ্রের রচিত সারগর্ভ গ্রন্থগুলির মধ্যে কাব্যজিজ্ঞাসা, শিক্ষা ও সভ্যতা, সমাজ ও বিবাহ, প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতুলচন্দ্রের প্রয়াণে বাঙলার সংস্কৃতির জগতে এক নিকষপাথর পতন ঘটল।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাঙলার প্রখ্যাত নাট্যকার ও বাঙলার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় গত ২১শে ফাল্গুন ৬৯ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রাম শচীন্দ্রনাথের জন্মস্থান। রংপুর জেলা স্কুলে তাঁর প্রথম পাঠগ্রহণ। কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কলেজে দেশপ্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্করের ছাত্ররূপে শচীন্দ্রনাথ যোগ দেন। এই সময় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেন ও দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিজের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করে তৎকালীন বিপ্লব আন্দোলনে শচীন্দ্রনাথ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষালাভান্তে কলকাতায় কবিরাজী ব্যবসায় শুরু করেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরণায় সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন, কালক্রমে দক্ষ সাংবাদিকরূপে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। আত্মশক্তি নবশক্তি, ঘরে বাইরে, বৈকালী, বিজলী প্রভৃতি সাময়িকপত্রগুলি তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা সহকারে সম্পাদনা করেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক গৈরিক পতাকা বাঙলার রঙ্গমঞ্চে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল। জীবনের এক বিরাট অংশ তিনি দেশের নাট্যজগতের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কর্মে অতিবাহিত করে নাট্যজগতের ইতিহাসে অমরত্বলাভ করেছেন। রক্তকমল, জননী, তটিনীর বিচার, স্বামি-স্ত্রী, আবুল হাসান, ধাত্রীপান্না, নর দেবতা, কালোটাকা, বাঙলার প্রতাপ, সুপ্রিয়ার কীর্তি, প্রলয়, নার্সিং হোম, সংগ্রাম ও শান্তি প্রভৃতি নাটকগুলি তাঁর অসংখ্য নাট্যসৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরূপে ইনি চীন, রাশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ঐ পরিষদের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় 'নৃত্য-নাট্য সঙ্গীত আকাদামীর' অন্যতম সদস্য ছিলেন। শচীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু বাঙলার নাট্যজগতে এক বিরাট অভাব সৃষ্টি করল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার গত ২১শে ফাল্গুন ৭৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁর অন্যতম সহাধ্যায়ী ছিলেন। ১৯১১ সালে ইনি ব্যারিষ্টাররূপে হাইকোর্টে যোগদান করে যথেষ্ট যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের এবং সিটি কলেজের লেকচারারের আসনে সমাসীন ছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গে সিনিয়ার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল এবং য্যাডভোকেট জেনারেলের (অস্থায়ী) দায়িত্বভার অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। বিচারপতি রূপে হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণের পর ইনি শিল্প আপীল আদালতের চেয়ারম্যানের কর্মভার গ্রহণ করেন।

অনিলকুমার দাশ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভারতের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, বাঙলার গৌরব ডক্টর অনিলকুমার দাশ গত ৬ই ফাল্গুন ৫৭ বছর বয়সে হায়দরাবাদে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সৌরকলঙ্কের গতি ও সৌর বিস্ফোরণের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিনব চিন্তাধারা প্রসূত মতবাদ একদা সমগ্র জগতের বিজ্ঞানমহলে অভূতপূর্ব বিস্ময় সঞ্চার করেছিল, বিজ্ঞানসাধক এই বাঙালীর চিন্তাধারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মনে সেদিন চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। ইনি নিজামিয়া মানমন্দিরের ডিরেক্টর এবং কোদাইকানাল মানমন্দিরের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কৃতিত্বে এবং অবদানে কোদাইকানালের মানমন্দির বর্তমানকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানমন্দিরগুলির তালিকায় উল্লেখিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৬০ সালে ইনি পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন এবং জার্মাণী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতাদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন।

শিবপ্রসন্ন মিশ্র

প্রসিদ্ধ ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্রের গত ৫ই ফাল্গুন মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিরোধান ঘটেছে। শ্রীসতীনাথ মিশ্রের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। বর্তমান ভারতের বিশিষ্ট ধাত্রীবিশারদদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, তাঁর সমগ্র ছাত্রজীবন ছিল প্রতিভার আলোয় উজ্জ্বল। এম, আর, সি, ও, জি পরীক্ষায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এফ, আর, সি, ও, জি (লণ্ডন) পরীক্ষাতেও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। প্রথমে রেসিডেন্ট সার্জনরূপে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন পরে ঐ কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক এবং ভিজিটিং সার্জনের সম্মানলাভ করেন। রামকৃষ্ণ শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানেরও তিনি অন্যতম ভিজিটিং সার্জেন ছিলেন। এবং তিনি রিলিফ ওয়েলফেয়ার কোরেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। এ ছাড়া জনহিতকর অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডাঃ মিশ্র সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ডাঃ মিশ্র তাঁর দরদী মন, সহানুভূতিশীলতা ও অন্তরের উদারতার জন্যে সর্বসাধারণ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনে সমর্থ হন। ডাঃ মিশ্রের অকালমৃত্যুতে দেশের চিকিৎসাজগতে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল।

সুরেশচন্দ্র তালুকদার

প্রবীণ ব্যবহারজীবী সুরেশচন্দ্র তালুকদারের গত ৬ই ফাল্গুন ৮১ বছর বয়েসে জীবনাবসান হয়েছে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রভূত নৈপুণ্য সহকারে আইনজগতের সেবা করে এবং তার সমৃদ্ধিসাধন করে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও ইনি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সম্মেলনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে এঁর উৎসাহ এবং অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
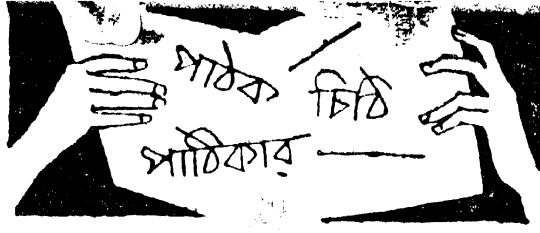
পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সালের মাঘ সংখ্যার অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ বিভাগের একটি প্রবন্ধ "অসঙ্গত সামাজিক প্রথা" প্রবন্ধে বলা হ'য়েছে যে, বিধবার উপর অত্যাচার, নিঃসঙ্গিনী অবস্থায় ঘরের মধ্যে বন্দী তথাকথিত আহার, বিহার, বসন ও ব্যসনের যে কড়াকড়ি ও বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে তা আজকের যুগে এটা হচ্ছে কুসংস্কার। নারী শিক্ষার যখন প্রসারতা লাভ করেছে তখন এই কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে না কেন? আমি বুঝতে পারছি না যে, এই প্রবন্ধে তিনি কি সামাজিকতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর এই প্রবন্ধখানি আমার মনে হয় পাঠক ও পাঠিকার অন্তরে একটি গভীর চিন্তার রেখা ফেলবে তা বলা বাহুল্য। তবুও আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা মনে এসেছে তাই লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার বক্তব্য বিষয় কার কাছে কিরূপ রূপ নেবে তা বলতে পারিব না। অনাদিকাল ধরে যে সত্য প্রমানিত হ'য়েছে তাকে যুক্তি ও তর্ক দিয়ে মূলোচ্ছেদ করা বড় শক্ত। শিক্ষায় যদি নৈতিকচরিত্র গঠন বা মনের অবস্থাকে সুস্থ ভাবে পরিচালিত না করে যদি তার বিপরীত ফল দেয় তা হলে সে শিক্ষার প্রসারতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতা লাভ করে আমরা যা পেয়েছি এবং যা হ'য়েছি সে সম্বন্ধে কিছু বলব না, বলব শুধু এইটুকু সামাজিক প্রথাকে এই ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ঠিক হবে না হিন্দুধর্মের কি ছিল, আর কি আছে সেটা একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে। দিনের পর দিন যা সর্বসমক্ষে ঘটছে তা আর রাতের অন্ধকারের অপেক্ষা রাখে না। এখানে একটু বলে রাখা দরকার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় ১৩৬৭ সাল ৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে সংগ্রহখানি আছে তাতে বেশ বোঝা যায় স্বাধীন শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে ওটা একটা অঙ্গ বিশেষ। তাই ভাবছি আমার এই অবতারণার কোন অর্থ হবে কি? নিষ্ঠুর নিয়তি! যে সামাজিক প্রথা আবহমান কাল হতে চলে আসছে তাকে শিক্ষার বুলি দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যাবে না। আজ এই প্রথাটুকু আছে বলেই সমাজের কিছু না কিছু কল্যাণকর কার্য্য তথা মানব সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় আছে। "সাদা কাপড় পরে মাসের এক সময়ে বড় কষ্ট হয়" উক্তিটির মধ্যে যাই থাকুক খুব একটা গুরুত্ব নেই, কারণ যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, যে নারী বহির্জগতের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠ তাকে আমার বলবার মত কিছু নেই, কারণ সেখানে সধবা বা বিধবার প্রশ্নই থাকতে পারে না, কোনদিন তিনি বিধবা হবেন না এটা বলা যায়। যে হিন্দু নারী পতিব্রতা তার বেলায় কি হবে? তিনি কি আসবেন এই হীন যুক্তির মধ্যে? হিন্দু বিধবা নারীরা সত্যাগ্রহ করবেন না বা সামাজিক প্রথা (বিধবা নারীর উপর যা প্রযোজ্য) নিয়ে সরকারের দরবারে আকুল আবেদন নিয়ে দাঁড়াবেন না। যা হচ্ছে তাই হবে বলে মনে হয়। আহার বিহারে সংযম খুব প্রয়োজন ও বিধবাদের একটা প্রধান অঙ্গ অবশ্য যাঁরা মানেন, কারণ এতে যৌনচেতনাকে উত্তেজিত করে এমন কি একদিন তিনি হয়ত ভুলেও যেতে পারেন তিনি বিধবা আর জীবনে আসবে একটা বিশৃঙ্খলতা। কুমারী ও বিধবা এক পর্য্যায় পড়ে না তা অতি সাধারণ—লোকের কাছে সহজেই অনুমেয়। বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলেই সব কিছুর মীমাংসা হয়। অহঙ্কারে সব রসাতলে যায়। কথায় আছে সীতা সাবিত্রীর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কিন্তু কোথায় আজ সেই বাংলাদেশ! হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে যদি প্রকৃত হিন্দু বিধবারা ধর্মের নামে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অন্যদেশে সামাজিক প্রথা কি আছে তাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে আজ বাংলাদেশে বিধবা মেয়েদের উপর নতুন কিছু করাটা খুব বুদ্ধিমানের পরিচায়ক হবে না। তিনি যেন নিজের উপর বিচার করে অর্থাৎ নিজে যেটা ভাল বুঝি সেটা অন্যের উপর চালানো যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তিনি বাংলার মেয়েদের কাছে আরো উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসুন তাতে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। ইতি—শ্রীমতী কল্যাণী সরকার। পোঃ—উলুবেড়িয়া, গ্রাম—লতিকপুর, জিলা—হাওড়া।

প্রতিবাদ

মহাশয়, বিগত পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'বিপ্লবের সন্ধানে' প্রবন্ধের মধ্যে এক স্থানের এক মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই মন্তব্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে আমারও মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত হতে পারে ভেবে আমি এ সম্বন্ধে সত্যকার ঘটনা বিবৃতি করেছি। আশা করি আপনার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করে বাধিত করবেন। উক্ত প্রবন্ধে লেখক নারায়ণ বাবু বহরমপুর বন্দিশিবিরে ঘরে ঢুকে শান্ত্রীদের বেপরোয়া রাজবন্দীদের উপর প্রহার সম্বন্ধে লিখেছেন: "ছাত্র-যুব নেতা শৈলেন রায় প্রভৃতি তখন সে ঘরে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খাট টেবিলের নীচে গিয়ে ঢুকেছিলেন।" নারায়ণ বাবু প্রকৃত ঘটনা চাক্ষুষ দেখেন নি। তিনি সেই সময় বন্দিশিবিরে ছিলেন না। নিজের মুখেই তিনি বলেছেন। তিনি পরে গল্প শুনেছেন। ইহা নিছকই গল্প, সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম। শান্ত্রীরা বীরেন বাবুকে প্রহার করতে সুরু করলে "তাঁরা" সকলে খাট টেবিলের নীচে আশ্রয় নেন নি। আমরাও ঘরে সেই সময় বীরেনবাবুসহ ছয় জন ছিলাম। তন্মধ্যে মাত্র এক জন—তদানীন্তন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভ্য—খাটের নীচে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। আমি বীরেন বাবুর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর মাথায় লাঠি পড়তে আরম্ভ করলে আমি এগিয়ে দু-হাত তুলে লাঠি ঠেকাতে যাই। একটা প্রচণ্ড লাঠির ঘা আমার বাঁ হাতের তালুর উপর পড়ে তালুর দুটি হাড় ভেঙ্গে দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে পিঠে এক প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। তারপর এক শান্ত্রী আমাকে লাঠি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জানলার ফাঁকের ভিতর চেপে রাখে। হাতের তালুর

হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় আমাকে এক মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হয়। মুড়াগাছার গোপেন মুখার্জ্জির পাশের সিটেই এক মাস কাটাই। বীরেন বাবু, শান্তিপুরের মধু গোঁসাই অথবা ডঃ ত্রিগুণা সেনকে জিজ্ঞেস করলেই নারায়ণ বাবু সত্য ঘটনা জানিতে পারতেন। আমিও তাঁহার অপরিচিত নই, আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারিতেন। উক্ত মন্তব্যে ভুল ধারণা ও মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং তাহার সম্ভাবনা দূর করবার জন্য দয়া করে এই সত্য বিবরণ ছেপে বাধিত করবেন। বিনীত শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় ২৩, ল্যান্সডাউন প্লেস কলিকাতা।

সুভাষণেষু,

মহাশয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি আরম্ভ করছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি "মাসিক বসুমতী" পত্রিকাটির গ্রাহিকা। পত্রিকার সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, একথা বলা বাহুল্য। যাকে ভাল লাগে, তার আশাপথ চেয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। নিত্য-নতুন রূপ-রস-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত "মাসিক বসুমতী" আমাকে বিহ্বল করছে। ভালো লাগে বলে বলছি না সমসাময়িক বাংলা পত্রিকার মধ্যে আপনার সুরুচি সম্পাদিত, নিত্যনতুন সৃষ্টির পরিবাহক মাসিক বসুমতী জোনাকীর আলোর কাছে সূর্য্যের আলোর মতন। সুস্থ মনের পরিচয় সেখানেই পাওয়া যায়, যেখানে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি অম্লান থাকে। বেশী প্রশংসায় আপনাকে ছোট করব না। "হবিবুল্লার মেসিন", "অখণ্ড অমিয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ", "সিক্ত যূথীর মালা", "সোনালী মাছ", "বার্দ্ধক্যে বারাণসী" ভীষণ ভাল লাগছে। নীলকণ্ঠকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। "সাহিত্যিক কৌতুকী" বন্ধ করলেন কেন? মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্যের লেখা যত শীঘ্র পারেন দেবার চেষ্টা করবেন। যদি ধারাবাহিক রচনা হয়, খুবই ভাল হয়। ভদ্রমহিলার লেখনী বলিষ্ঠ শক্তির পরিচয় দেয়। নীহাররঞ্জন গুপ্তের "তালপাতার পুঁথি" অসম্ভব ভাল লাগছে। মনে হয় যদি শেষ না হয় খুব ভাল হয়। সুলেখা দাশগুপ্তার লেখা আবার যেন বসুমতীতে দেখতে পাই। "নিষিদ্ধ এলাকার" ছদ্মনামধারী লেখকের নাম যদি পারেন পরে জানানোর চেষ্টা করবেন। চিঠি শেষ করছি দুটি অনুরোধ দিয়ে। "আমার কথা" শীর্ষকে যদি মার্গসঙ্গীত শিল্পীর পরিচয় বেশী দেন ভাল হয়, অবশ্য শিল্পী বাংলার বা বাংলার বাইরের হলেও আপত্তি নাই। বসুমতীকে ভালবাসি বলেই এই দাবী করতে পারলাম। পরিশেষে, আপনাকে ও অন্যান্য সহকর্মীদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং বসুমতীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আপাততঃ এখানেই লেখনী বন্ধ করলাম। ইতি, বিনীতা—ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আসরুদ্দিন সরকার, কালীকোন্দর, মালদহ *** ডাঃ জে, বি, অধিকারী, ধলগ্রাম, যশোহর *** ডাঃ কে, অধিকারী, মজঃফরপুর, বিহার *** কিরণকিঙ্কর মাইতি, মেদিনীপুর *** শিক্ষা নিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কলানবগ্রাম, বর্দ্ধমান *** কমল রায়, ইমামদিপুর, ২৪ পরগণা *** সুনীলবরণ দাস, কাছাড়, আসাম *** টি, এল, বড়ুয়া, চট্টগ্রাম *** শ্রীমতী প্রতিভা দে, শিবসাগর, আসাম *** প্রিন্সিপ্যাল, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা *** উপেন্দ্রনাথ টুডু, বাঁকুড়া *** আর, এন, বসু, সিমলা, জয়পুর, রাজস্থান *** সেক্রেটারি, খাবংসরভাঙ্গা, কুচবিহার, *** প্রোঃ এন, কে, ব্যানার্জ্জী, লুধিয়ানা *** হেড মাষ্টার, লোয়াদা হাই স্কুল, মেদিনীপুর *** এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচিন *** অরুণকুমার সেন, পশ্চিম জার্ম্মাণী *** শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত, খোয়াই, ত্রিপুরা *** হেড মাষ্টার ঝাকরা হাই স্কুল, মেদিনীপুর *** শ্রীমতী রেণুকা ব্যানার্জ্জী, লালুক, আসাম।

Subscription to Masik Basumati for 6 months from Magh 1367 B.S. onwords.—Moubhandar Club, Ghatsila.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য '৬৭ মাঘ মাস হইতে আরম্ভ ৭'৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sub-Postmaster, Chittaranjan.

Remitting herewith the annual subscription of Basumati (monthly) for the period from Baisakh to Chaitra 1368 B.S.—Indian Statistical Institute, Giridih.

মাঘ হইতে মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Please find herewith Rs. 15/- towards annual subscription for monthly Basumati.—I. S. Club, Nonoi Tea Estate, Assam.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম। মাঘ সংখ্যা হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—সীমারাণী বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি।

Rs. 15/- only for monthly Basumati for 1 year from Magh 1367 B.S.—Government Primary Training School, Krishnanagar, Nadia.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করি। ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম। দয়া করে কার্ত্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহিকাভুক্ত করে নেবেন এবং শীঘ্র পত্রিকা পাঠাবার ব্যবস্থা কোরবেন।—গীতা পাণ্ডে, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর।

Remitting Rs. 15/- being subscription for one year.—Sm. Shovana Basu, Sriniketan, (Birbhum).

Sending herewith Rs. 15/- as subscription of M Basumati.—Anil Kumar Das, Murshidabad.

আগামী বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী, গোয়ালপাড়া, আসাম।

I am sending herewith the annual subscription for 1368 B.S.—Anita Biswas, Tripura.

আমি আপনাদের পুরাতন গ্রাহিকা। পুনরায় ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। মাঘ হইতে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—জয়শ্রী মুখার্জ্জী, দিল্লী।

আগামী মাঘ মাস থেকে ৬ মাসের জন্য ষাণ্মাসিক গ্রাহক-মূল্য ৭'৫০ পাঠাইলাম।—অপূর্ব্বকুমার সাহা, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

(জলরঙ)

"নমিয়া বুদ্ধে ....."

—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত অঙ্কিত
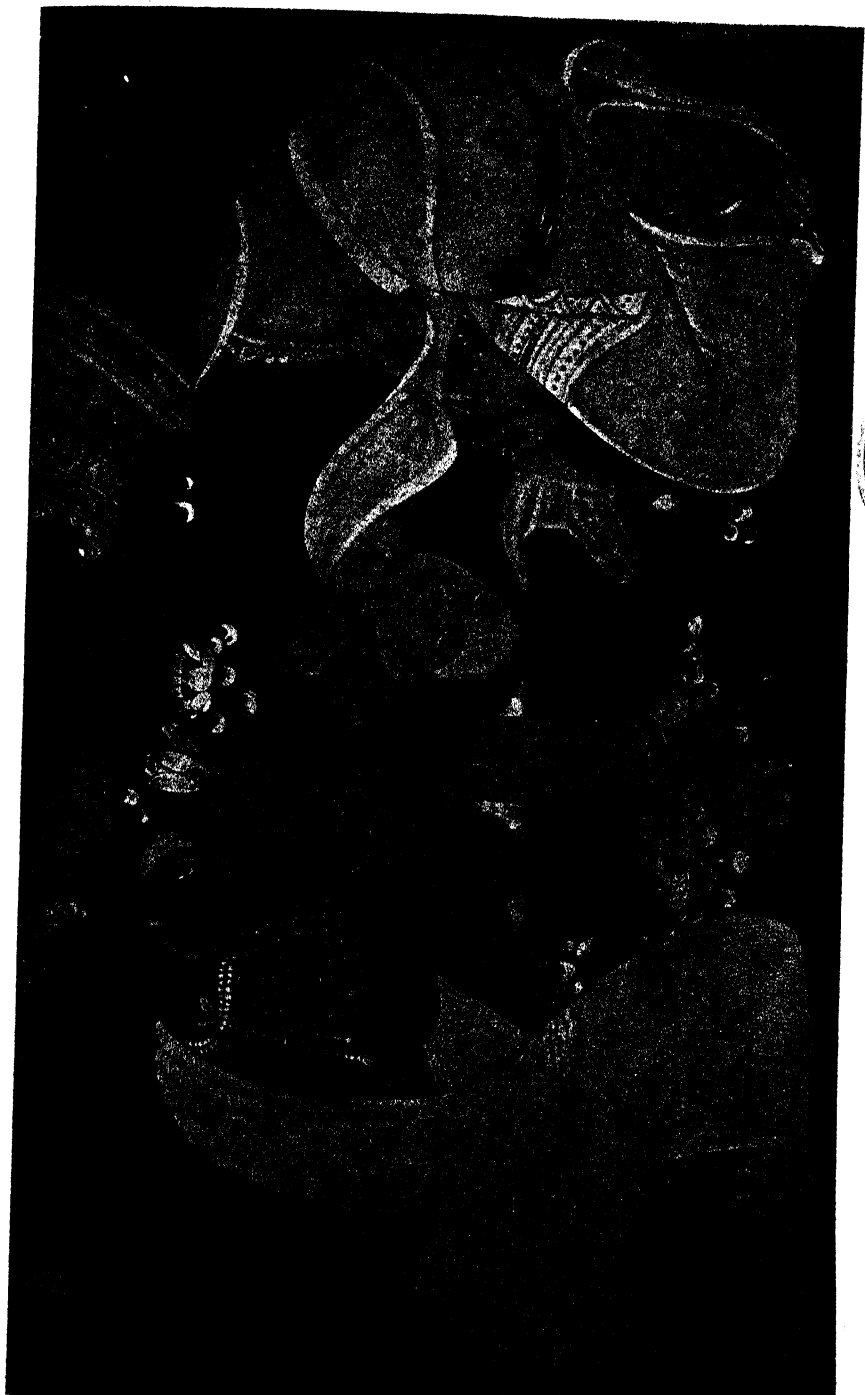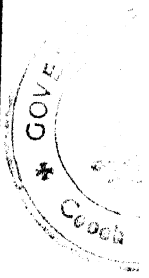
৩৯শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৭] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

ওঁ রামকৃষ্ণ

গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্ ।

ডু, কুং, মুন্সীয়ানা আংরেজী আ'র ফারসী ।
গুরু বিন্ জ্ঞান্ যেইসে আঁধার মে আরসী ॥

*　*　*　*

গঙ্গাপূজা　　গঙ্গাজলে
কি হ'বে মা বনফুলে ?

*　*　*　*

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ । গীতা ৯-২৭ ।

*　*　*　*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।

ত্বয়া রামকৃষ্ণ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দম্ শ্রীরামকৃষ্ণম্ ।

শ্রীচরণাশ্রিত—কাঙ্গাল সন্তান ।

গীতা

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ । ৪-১১ ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ।

যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ
নাম সারাৎসার ।
তাঁরি মূর্ত্তি ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর কথা মন-প্রাণ,
জীবন আমার ।
এ অমৃত বিলাইতে জনে জনে বিধিমতে,
বাসনা সদাই ।
"তাঁহারি কাঙ্গাল" আজ, পরিহরি লোকলাজ,
তাঁর নাম বুকে লয়ে যাচে দ্বারে তাই ।

অভয়বাণী—চৈতন্য হউক

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ ।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥

ভগবান কাহারও দোষ ল'ন না, জীব তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেই অপরাধ হয়—কষ্ট পায় ; তাঁহাকে মনে করিলেই নিষ্পাপ হয়—ভক্ত হয় ।

ভগবান সমদর্শী, সকলের প্রতিই তাঁর সমান দয়া—তিনি দয়াময় ।

"Father forgive them for they know not what they have done" –Christ.

ভগবান্, ক্ষমা করুন—অজ্ঞানতার জন্য হইয়াই আমার উপর

বৈরীভাব পোষণ করিয়াছে। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনার শ্রীচরণকমলাভিমুখীন হউক—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ !—ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই। "Resist no evil" -Christ. Forgiveness is the greatest revenge, to forgive is divine.

সত্যনিষ্ঠাই পরম ধর্ম্ম, সত্য অবলম্বন না করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে তিনি পরম ধার্ম্মিক, তিনি ত্যাগীই হউন আর গৃহস্থই হউন, তিনি যে মহাভ্রান্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। সত্যং হি কেবলম্ বলম্। গীতা ১৬ অ: ২-৩ শ্লোক। "দুনিয়ামে সব্‌সে বড়া যো রাখে ইমান।" মস্‌লে—ইমান, তবে মুসলমান।

সত্য—সুমেরু পর্ব্বত চাপা দিলেও লুক্কায়িত থাকে না, ইহা পর্ব্বত ভেদ করিয়া উঠে। কাহাকেও কোন কথা প্রদান করিলে আপনার প্রাণকে পণ করিয়াও সে কথা পালন করা উচিত। "তেরা বচন না যায় খালি।" সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী।

যে কেহ ভগবানকে জানিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিবে, তাহারাই মনোরথ পূর্ণ হইবে। গীতা ৯—৩৪; ১৮—৬২, ৬৬।

যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া দেখুন, অচিরাৎ তাঁহাদের ইষ্ট সাক্ষাৎ হয় কি না? যত্তপি না হয়, আমি উপর্য্যুপরি বলিতেছি যে, আমি সহস্র পাদুকার পাত্র হইব।—মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী.—"ব্রহ্ম-শক্তি"।

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়—হে দীনশরণ,
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়—বরিষার বারিবরিষণ।
বিধবার ধনাপহরণ, ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রীগমন,
ত্যজি কন্যাপুত্র নারী, পানাসক্ত, অত্যাচারী
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,—
তব দ্বার মুক্ত তার "পতিতপাবন"।—শূরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

গীতা ৯—৩০, ৩১, ৩২।

সমস্ত ত্যাগ কর—কেবল সত্য ত্যাগ করিও না। একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই কলির তপস্যা। কলির জীব অন্নগত-প্রাণ শক্তিহীন। ভক্তি সত্যনিষ্ঠাই কলির তপস্যা, সত্যে আঁট থাকিলেই হইল। গীতা ১১—৫৩, ৫৪, ৫৫। "বাগেব ব্রহ্মরূপৈব"।

চালাকী দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

দুঃখের অবসান করিতেই মানবের জন্ম। বহুভাগ্যে মনুষ্যজন্ম লাভ না করিলে এই দুঃখের অবসান করিবার চেষ্টা করিবার সামর্থ্য থাকে না। এই সামর্থ্য লাভ করিয়াও যে তাহার শক্তির ব্যবহার করে না, সে নিতান্তই দুর্ভাগা।

একটি মিথ্যা বলিলে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আরও পাঁচটি মিথ্যা বলিতে হয়। সব করিতে পারিব কেবল মিথ্যা বলিতে পারিব না।

এসে ঠেকেছি যে দায়—কব কায়? যার দায় সেই জানে—
পর কি বোঝে পরের দায়।

স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাঁই। দেব-স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়—যে বিদ্যার চর্চ্চা করিলে বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে [illegible] পাওয়া যায়; সেই বিদ্যাই বিদ্যা। বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধি—শুদ্ধ [illegible]

ভগবানকে পাইলে সব পাওয়া যায়। এক সাধে—সব। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—যৎকৃপা তমহং পরমানন্দম্ শ্রীরামকৃষ্ণম্। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি ভক্তি।

লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে—ঈশ্বরের জন্য কাঁদছে? তাঁকে চায় কে? "মীরা কহে—বিনা প্রেমসে না [illegible] নন্দলালা।"

তুলসী! যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ্ হাসে তোম্ রোয়।
এইসি কর্‌নি কর্ চলো কি তোম্ হাসো জগ্ রোয়।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যত্তপি জীবনে ধর্ম্মপথে উন্নতি করিবার চেষ্টা না করা যায়, তবে এ দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা [illegible] থাকে না।

ওঁ রামকৃষ্ণ ধ্বনি প্রাণ খুলিয়া গগনভেদী রবে গাও, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত শ্রবণ করুক, মানুষের কি কথা! জনৈক [illegible] মহাত্মা রামচন্দ্র। গীতা ৫—১৮, ৭—১১, ৯—৩২।

"কলিকালে নারদীয় ভক্তিই যুগধর্ম্ম।" ভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া সেই চরম মোক্ষপদের অধিকারী হইতে চেষ্টা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য; উহাই ধর্ম্ম—উহাই জ্ঞান। গীতা ১১—৫৩, ৫৪।

যে মঙ্গল হইলে মানবের চৈতন্যোদয় হইবার সম্ভাবনা, যে মঙ্গল দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তিপথের অগ্রসর হইবার পন্থা তাহাই মঙ্গল, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এগিয়ে যাও—নান্যঃ পন্থাঃ।

কেহই এ পর্য্যন্ত কোন বিদ্যা বা কোন কার্য্যই গুরুর সহায়তা [illegible] শিক্ষালাভ করেন নাই। "আমার গুরু যদি শুঁড়ি বাড়ী যায়—তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং। গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু তৎ সুতাদিষু চ।

যে শক্তি দ্বারা দুঃখের অবসান করা যায়, যাহাতে পরমানন্দ [illegible] করা যায়—তাহা ধর্ম্মজীবন লাভ করা। এই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার উপায় বিভিন্ন প্রকার। সে উপায় ভগবান স্বয়ংই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভগবান যতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, ততবারই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এক একবার এক এক উপায় [illegible] দিয়াছেন। এক একটি মত—এক একটি পথ, ইহাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত প্রকার উপায় [illegible] বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সকল উপায়েই যা সকল [illegible] যে পরমধর্ম্ম এবং সত্য ব্যতীত যে ধর্ম্মরক্ষা হয় না, [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যমেব পরমপদম্।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের ঠাকুরের [illegible]

'No government can remain stable in an unstable society and unstable world.'

—Leon Blum

ভারতে রুশীয়গণ

আই, ঝমুইদা

রুশ-ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রয়েছে কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস। এর সুরু সাধারণত হয়, সেই তারিখটি থেকে, যখন আফানাসি নিকিতিন ১৪৭২ সালে তাঁর সেই বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ভারতে। কি, অনেকগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক স্মারক থেকে এখন মনে করায় ভিত্তি আছে যে, রুশ-ভারত যোগাযোগ হয়েছিল তারও বহু পূর্বে।

রুশ-ভারত মৈত্রীর জনক

এই নামেই সোভিয়েত ইউনিয়নে আফানাসি নিকিতিন অভিহিত। তিনি কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ভারতে, দেশের নানান ঘুরে দেখেছিলেন, আর সর্বত্রই স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে ছিলেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যা দেখেছিলেন আর যা শুনেছিলেন তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এইভাবেই লিখিত হয় তাঁর গ্রন্থ "তিন সমুদ্র দিয়ে যাত্রা।" ভারত সম্পর্কে সেই সর্বপ্রথম বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা যা রাশিয়া ও ইয়োরোপে লভ্য হয়েছিল। রচনা ছিল ভারত আর তার সমুচ্চ সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভরা। রুশীয় ও ভারতীয় জনগণকে মৈত্রী ও বন্ধুতার বাস করতে হবে, বহু দূরবর্তী ঐ দেশটি সম্পর্কে প্রায় রুশীয় লেখকের রচিত গ্রন্থটির মর্ম কথা হল এই।

কলকাতায় দশ বৎসর

আফানাসি নিকিতিনের পর আরও অনেক রুশীয় ভারতে এসেছেন এবং পিছনে ফেলে গেছেন বহু সুখস্মৃতি। কেউ ভাগ্য-চালিত হয়ে, কেউ বা ঔৎসুক্যবশে এসেছিলেন, আবার অনেকে এসেছিলেন কোনও মধ্যস্থ ব্যতিরেকে নিজেরাই সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি কৃষিজীবী ফিলিপ ইয়েফ্রেমভের নাম যিনি ছয় বৎসর কাটিয়ে ছিলেন ভারতে এবং কলকাতা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ পাটনায় বসবাস করেছিলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ভারত সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, যা তৎকালে রাশিয়ার প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রুশ পর্যটক ও অভিনেতা গেরাসিম লেবেদেভ, দীর্ঘকালের জন্য ভারতে বাস করেন। আর তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ভারত ও রুশীয় জনগণের বন্ধুতা ও মৈত্রী সম্পর্কের ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় অধ্যায়। সেই সঙ্গে রুশীয় বৈজ্ঞানিক ভারততত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাও হলেন গেরাসিম লেবেদেভ।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লেবেদেভ এসে পৌঁছলেন মাদ্রাজে। দুই বৎসর তিনি সেখানে ব্যাপৃত রইলেন নাট্যশালার কাজ নিয়ে, আর সেই সঙ্গে শিক্ষা করতে লাগলেন তামিল ভাষা। ভাষাশিক্ষায় তাঁর উন্নতি হল ভালই, আর তিনিই হলেন ভারতে প্রথম রুশীয়, যিনি এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেবেদেভ এলেন কলকাতায়, আর এখানেই তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও কাজের আরও উপযোগী পরিবেশ খুঁজে পেলেন দশ বৎসর তিনি এই নগরীতে বাস করেছিলেন।

লেবেদেভ তাঁর সমস্ত অবসর সময়টি কাটাতেন এদেশের জনগণের জীবন ও আচার-আচরণের পর্যবেক্ষণে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে কথ্য বাংলা তাঁর দ্রুত আয়ত্ত হয়ে উঠল। তাঁর সমস্ত কাজেকর্মেই এই রুশীয় মানুষটি স্থানীয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাহচর্য্য ও সমর্থন সর্বদাই লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্যতম মহান বন্ধু ও শিক্ষক ছিলেন একজন বাঙালী, শ্রীগোলকনাথ দাশ, লেবেদেভ যাঁর কাছে বাঙলা, হিন্দুস্থানী এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

গেরাসিম লেবেদেভের একটি স্বপ্ন ছিল যে, কলকাতার নাগরিকদের তিনি ইয়োরোপীয় নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন। এ উদ্দেশে তিনি নিজের খরচে স্থাপনা করেছিলেন একটি নাট্যশালা, রুশীয় জাতীয় নাট্যশালার অনুসরণে।

আজও ভারতের জনগণ লেবেদেভকে স্মরণ করেন। তাঁর নাট্যশালার প্রথম অভিনয় রজনী ভারতীয় নাট্য-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হয়ে আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাদেবপ্রসাদ সাহা লিখেছেন যে, লেবেদেভের কলকাতায় অবস্থান রুশ ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসের একটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ভারতে ও ভারতীয়দের জন্য প্রথম ইয়োরোপীয় ধরণের নাট্যশালার প্রবর্তক রূপে লেবেদেভকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

সবশুদ্ধ ভারত-সফরে তাঁর ২৫ বৎসর কেটেছিল। প্রত্যাবর্তন করে তিনি রুশীয় জনসাধারণের কাছে ভারত তার জনগণ ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। ভারতীয় অক্ষরমালা নিয়ে প্রথম মুদ্রণালয়, রাশিয়া এবং ইয়োরোপে; তিনিই প্রথম সংগঠন করেন। এই মুদ্রণালয় থেকেই ভারত এবং ভারতীয় ভাষা সমূহ সম্পর্কে গবেষণা মূলক কাজ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হত। লেবেদেভ প্রণয়ন করেন সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী ও বাঙলার একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ। তাছাড়া রয়েছে "নিরপেক্ষ ভাবনা" নামে তাঁর সেই বইটি, যাতে তিনি ভারতীয় জনগণ, তাদের ধর্ম, আচার এবং আচরণ সম্পর্কে বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

উনিশ শতকের আগমনকারীরা

উনিশ শতকে রুশদেশ থেকে আরও অনেকেই ভারতে আগমন করতে সুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী, শিল্পী, চিকিৎসক, জননেতা এবং একেবারে সাধারণ পর্যটক। এই সমস্ত রুশ ভ্রমণকারীরা তাঁদের বিভিন্ন বই ও রচনাসমূহের মধ্যে সব সময়েই অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাবান ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালবাসাই প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা প্রশংসামুগ্ধ ভাবে ভারতের প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে এই রুশীয়গণ ঔপনিবেশিক জোয়ালের নিচে ক্লিষ্ট ভারতীয় জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ও দুঃখবোধ করে গেছেন। বিখ্যাত রুশীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ আইভান মিনায়েভ, যিনি ভারতের ইতিহাস দর্শন এবং ভাষাতত্ত্ববিষয়ে ১৩০টির উপর

বৈরীভাব পোষণ করিয়াছে। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনার শ্রীচরণকমলাভিমুখীন হউক—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ।—ক্ষমার সমান ধর্ম্ম নাই। "Resist no evil" -Christ. Forgiveness is the greatest revenge, to forgive is divine.

সত্যনিষ্ঠাই পরম ধর্ম্ম, সত্য অবলম্বন না করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে তিনি পরম ধার্ম্মিক, তিনি ত্যাগীই হউন আর গৃহস্থই হউন, তিনি যে মহাভ্রান্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। সত্যং হি কেবলম্ বলম্। গীতা ১৬ অঃ ২-৩ শ্লোক। "দুনিয়ামে সব্‌সে বড়া যো রাখে ইমান।" মসূলে—ইমান, তবে মুসলমান।

সত্য—সুমেরু পর্ব্বত চাপা দিলেও লুক্কায়িত থাকে না, ইহা পর্ব্বত ভেদ করিয়া উঠে। কাহাকেও কোন কথা প্রদান করিলে আপনার প্রাণকে পণ করিয়াও সে কথা পালন করা উচিত। "তেরা বচন না যায় খালি।" সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী।

যে কেহ ভগবানকে জানিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিবে, তাহারাই মনোরথ পূর্ণ হইবে। গীতা ৯—৩৪; ১৮—৬২, ৬৬।

যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া দেখুন, অচিরাৎ তাঁহাদের ইষ্ট সাক্ষাৎ হয় কি না? যদ্যপি না হয়, আমি উপর্য্যুপরি বলিতেছি যে, আমি সহস্র পাদুকার পাত্র হইব।—মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী।—"ব্রহ্ম-শক্তি"।

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়—হে দীনশরণ,
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়—বরিষার বারিবরিষণ।
বিধবার ধনাপহরণ, ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রীগমন,
ত্যজি কন্যাপুত্র নারী, পানাসক্ত, অত্যাচারী
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,—
তব দ্বার মুক্ত তার "পতিতপাবন"।—শূরভক্ত গিরিশচন্দ্র।
গীতা ৯—৩০, ৩১, ৩২।

সমস্ত ত্যাগ কর—কেবল সত্য ত্যাগ করিও না। একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই কলির তপস্যা। কলির জীব অন্নগত-প্রাণ শক্তিহীন। ভক্তি সত্যনিষ্ঠাই কলির তপস্যা, সত্যে আঁট থাকিলেই হইল। গীতা ১১—৫৩, ৫৪, ৫৫। "বাগেব ব্রহ্মরূপৈব"।

চালাকী দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

দুঃখের অবসান করিতেই মানবের জন্ম। বহুভাগ্যে মনুষ্যজন্ম লাভ না করিলে এই দুঃখের অবসান করিবার চেষ্টা করিবার সামর্থ্য থাকে না। এই সামর্থ্য লাভ করিয়াও যে তাহার শক্তির ব্যবহার করে না, সে নিতান্তই দুর্ভাগা।

একটি মিথ্যা বলিলে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আরও পাঁচটি মিথ্যা বলিতে হয়। সব করিতে পারিব কেবল মিথ্যা বলিতে পারিব না।

এসে ঠেকেছি যে দায়—কব কায়? যার দায় সেই জানে—
পর কি বোঝে পরের দায়।

স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাঁই। দেব-স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়—সত্য

যে বিদ্যার চর্চা করিলে বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে পরিত্রা[ণ] পাওয়া যায়; সেই বিদ্যাই বিদ্যা। বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধি—শুদ্ধি হয়।

ভগবানকে পাইলে সব পাওয়া যায়। এক্ সাধে—সব সাধে মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—যৎকৃপা তমহং ব[ন্দে] পরমানন্দম্ শ্রীরামকৃষ্ণম্। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি [মা] ভক্তি।

লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে—ঈশ্বরের জন্য [কে] কাঁদছে? তাঁকে চায় কে? "মীরা কহে—বিনা প্রেম্‌সে না মি[লে] নন্দলালা।"

তুলসী! যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ্ হাসে তোম্ রোয়।
এইসি কর্‌নি কর্ চলো কি তোম্ হাসো জগ্ রোয়।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদ্যপি জীবনে ধর্ম্মপথে উন্নতি করিবা[র] চেষ্টা না করা যায়, তবে এ দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা আদে[ৌ] থাকে না।

ওঁ রামকৃষ্ণ ধ্বনি প্রাণ খুলিয়া গগনভেদী রবে গাও, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত শ্রবণ করুক, মানুষের কি কথা! জনকোপা[খ্যান] মহাত্মা রামচন্দ্র। গীতা ৫—১৮, ৭—১৯, ৯—৩২।

"কলিকালে নারদীয় ভক্তিই যুগধর্ম্ম।" ভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া সেই চরম মোক্ষপদের অধিকারী হইতে চেষ্টা করাই সকলে[র] একান্ত কর্তব্য; উহাই ধর্ম্ম—উহাই জ্ঞান। গীতা ১১—৫৩, ৫৪।

যে মঙ্গল হইলে মানবের চৈতন্যোদয় হইবার সম্ভাবনা, যে মঙ্গলে দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তিপথের অগ্রসর হইবার পরিচয় তাহাই মঙ্গল, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এগিয়ে যাও—শনৈঃ পন্থাঃ।

কেহই এ পর্য্যন্ত কোন বিদ্যা বা কোন কার্য্যই গুরুর সহায়তা ভিন্ন শিক্ষালাভ করেন নাই। "আমার গুরু যদি শুঁড়ি বাড়ী যায়—তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং—ন গুরোরধিকং। গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু তৎ সুতাদিষু চ।

যে শক্তি দ্বারা দুঃখের অবসান করা যায়, যাহাতে পরমানন্দ লাভ করা যায়—তাহা ধর্ম্মজীবন লাভ করা। এই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার উপায় বিভিন্ন প্রকার। সে উপায় ভগবান স্বয়ংই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভগবান যতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, ততবারই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এক একবার এক এক উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এক একটি মত—এক একটি পথ, ইহাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত প্রকার উপায় আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সকল উপায়েই বা সকল মতেই সত্যপালন যে পরমধর্ম্ম এবং সত্য ব্যতীত যে ধর্ম্মরক্ষা হয় না, তাহা সকল মতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যমেব পরমপদম্।

—স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের ঠাকুরের কথা হইতে।

[ক্রমশঃ।

'No government can remain stable in an unstable society and unstable world.'

—Leon Blum

ভারতে রুশীয়গণ

আই, ঝমুইদা

রুশ-ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রয়েছে কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস। এর সুরু সাধারণত ধরা হয়, সেই তারিখটি থেকে, যখন আফানাসি নিকিতিন ১৪৬৯-১৪৭২ সালে তাঁর সেই বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ভারতে। যা হোক, অনেকগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক স্মারক থেকে এ কথা এখন মনে করায় ভিত্তি আছে যে, রুশ-ভারত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তারও বহু পূর্বে।

রুশ-ভারত মৈত্রীর জনক

এই নামেই সোভিয়েত ইউনিয়নে আফানাসি নিকিতিন অভিহিত হন। তিনি কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ভারতে, দেশের নানান স্থান ঘুরে দেখেছিলেন, আর সর্বত্রই স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে পেতেছিলেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যা দেখেছিলেন আর যা শুনেছিলেন সবই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এইভাবেই লিখিত হয় তাঁর সেই গ্রন্থ "তিন সমুদ্র দিয়ে যাত্রা।" ভারত সম্পর্কে সেই সর্বপ্রথম বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা যা রাশিয়া ও ইয়োরোপে লভ্য হয়েছিল। এই রচনা ছিল ভারত আর তার সমুচ্চ সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভরা। রুশীয় ও ভারতীয় জনগণকে মৈত্রী ও বন্ধুতার মধ্যে বাস করতে হবে, বহু দূরবর্তী ঐ দেশটি সম্পর্কে প্রায় রুশীয় পর্যটকের রচিত গ্রন্থটির মর্ম কথা হল এই।

কলকাতায় দশ বৎসর

আফানাসি নিকিতিনের পর আরও অনেক রুশীয় ভারতে এসেছেন এবং পিছনে ফেলে গেছেন বহু সুখস্মৃতি। কেউ ভাগ্য-পরিচালিত হয়ে, কেউ বা ঔৎসুক্যবশে এসেছিলেন, আবার অনেকে এসেছিলেন কোনও মধ্যস্থ ব্যতিরেকে নিজেরাই সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি রুশ কৃষিজীবী ফিলিপ ইয়েফ্রেমভের নাম যিনি ছয় বৎসর কাটিয়ে গিয়েছিলেন ভারতে এবং কলকাতা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ও পাটনায় বসবাস করেছিলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ভারত সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, যা তৎকালে রাশিয়ায় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রুশ পর্যটক ও অভিনেতা গেরাসিম লেবেদেভ, দীর্ঘকালের জন্য ভারতে বাস করেন। আর তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ভারত ও রুশীয় জনগণের বন্ধুতা ও মৈত্রী সম্পর্কের ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় অধ্যায়। সেই সঙ্গে রুশীয় বৈজ্ঞানিক ভারততত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাও হলেন গেরাসিম লেবেদেভ।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লেবেদেভ এসে পৌঁছলেন মাদ্রাজে। দুই বৎসর তিনি সেখানে ব্যাপৃত রইলেন নাট্যশালার কাজ নিয়ে, আর সেই সঙ্গে শিক্ষা করতে লাগলেন তামিল ভাষা। ভাষাশিক্ষায় তাঁর উন্নতি হল ভালই, আর তিনিই হলেন ভারতে প্রথম রুশীয়, যিনি এই ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেবেদেভ এলেন কলকাতায়, আর এখানেই তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও কাজের আরও উপযোগী পরিবেশ খুঁজে পেলেন। দশ বৎসর তিনি এই নগরীতে বাস করেছিলেন।

লেবেদেভ তাঁর সমস্ত অবসর সময়টি কাটাতেন এদেশের জনগণের জীবন ও আচার-আচরণের পর্যবেক্ষণে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে কথ্য বাংলা তাঁর দ্রুত আয়ত্ত হয়ে উঠল। তাঁর সমস্ত কাজেকর্মেই এই রুশীয় মানুষটি স্থানীয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাহচর্য্য ও সমর্থন সর্বদাই লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্যতম মহান বন্ধু ও শিক্ষক ছিলেন একজন বাঙালী, শ্রীগোলকনাথ দাশ, লেবেদেভ যাঁর কাছে বাঙলা, হিন্দুস্থানী এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

গেরাসিম লেবেদেভের একটি স্বপ্ন ছিল যে, কলকাতার নাগরিকদের তিনি ইয়োরোপীয় নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন। এ উদ্দেশে তিনি নিজের খরচে স্থাপনা করেছিলেন একটি নাট্যশালা, রুশীয় জাতীয় নাট্যশালার অনুসরণে।

আজও ভারতের জনগণ লেবেদেভকে স্মরণ করেন। তাঁর নাট্যশালার প্রথম অভিনয় রজনী ভারতীয় নাট্য-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হয়ে আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাদেবপ্রসাদ সাহা লিখেছেন যে, লেবেদেভের কলকাতায় অবস্থান রুশ ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসের একটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ভারতে ও ভারতীয়দের জন্য প্রথম ইয়োরোপীয় ধরণের নাট্যশালার প্রবর্তক রূপে লেবেদেভকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

সবশুদ্ধ ভারত-সফরে তাঁর ২৫ বৎসর কেটেছিল। প্রত্যাবর্তন করে তিনি রুশীয় জনসাধারণের কাছে ভারত তার জনগণ ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। ভারতীয় অক্ষরমালা নিয়ে প্রথম মুদ্রণালয়, রাশিয়া এবং ইয়োরোপে; তিনিই প্রথম সংগঠন করেন। এই মুদ্রণালয় থেকেই ভারত এবং ভারতীয় ভাষা সমূহ সম্পর্কে গবেষণা মূলক কাজ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হত। লেবেদেভ প্রণয়ন করেন সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী ও বাঙলার একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ। তাছাড়া রয়েছে "নিরপেক্ষ ভাবনা" নামে তাঁর সেই বইটি, যাতে তিনি ভারতীয় জনগণ, তাদের ধর্ম, আচার এবং আচরণ সম্পর্কে বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

উনিশ শতকের আগমনকারীরা

উনিশ শতকে রুশদেশ থেকে আরও অনেকেই ভারতে আগমন করতে সুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী, শিল্পী, চিকিৎসক, জননেতা এবং একেবারে সাধারণ পর্যটক। এই সমস্ত রুশ ভ্রমণকারীরা তাঁদের বিভিন্ন বই ও রচনাসমূহের মধ্যে সব সময়েই অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাবান ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালবাসাই প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা প্রশংসামুগ্ধ ভাবে ভারতের প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে এই রুশীয়গণ ঔপনিবেশিক জোয়ালের নিচে ক্লিষ্ট ভারতীয় জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ও দুঃখবোধ করে গেছেন। বিখ্যাত রুশীয় প্রাচ্যবিজ্ঞাবিদ আইভান মিনায়েভ, যিনি ভারতের ইতিহাস দর্শন এবং ভাষাতত্ত্ববিষয়ে ১৩০টির উপর

গ্রন্থের রচয়িতা, গবেষণা কাজের জন্য তিনবার তিনি ভারতে আসেন। অপর রুশীয় বিজ্ঞানী যিনি ১৮৭৫ খৃঃ ভারতে এসেছিলেন এবং বহুকাল ধরে বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তিনি হলেন বিখ্যাত ভূবিদ্যাবিশারদ ও পর্যটক ভোয়েইকভ। বাঙলা দেশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই প্রদেশে মৌসুমী বায়ুচলাচল ও বর্ষার বণ্টন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন।

প্রায় এই সময়েই অত্যাশ্চর্য্য রুশ শিল্পী ভ্যাসিলি ভেরেশ্চাগিন অবস্থান করেছিলেন ভারতে। তাঁর এই ভ্রমণের ফলে পাওয়া গিয়েছে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা তাঁর বহু তৈল ও রেখাচিত্র। এই সব চিত্রে শিল্পী ভারতীয় জীবন ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভেরেশ্চাগিন-এর গণতান্ত্রিক শিল্পকৃতি বৃটিশ ঔপনিবেশিকেরা পছন্দ করেনি। কেননা তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন তাদের জঙ্গী ঔপনিবেশিকতার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

প্লেগের বিরুদ্ধে রুশীয় চিকিৎসকের লড়াই

রুশীয় চিকিৎসক ভ্লাদিমির হফকিন ১৮ বৎসর ভারতে ছিলেন। ১৮৯৩ সালে যখন ভীষণ কলেরা মহামারী চলছিল তখন তিনি এদেশে এসে পৌছন। কলেরা-নিরোধক টীকা নিয়ে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কাজে নামেন এবং ব্যাপকভাবে গণ-টীকা দানের ব্যবস্থা সংগঠিত করে তোলেন। টীকা দানের বিরুদ্ধবাদীরা এমনকি তাঁকে হত্যা করার পর্য্যন্ত হুমকি দেখায়, কিন্তু হফকিন তাঁর কাজ চালিয়ে যান ও এ কাজে পাঞ্জাব, আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন।

১৮৯৬ সাল। আরও ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ভারতে উপস্থিত হল, মহামারী প্লেগ। প্রথম একজন ইয়োরোপীয় সে সময় যিনি বোম্বাইতে পদার্পণ করেছিলেন তিনি ডাঃ হফকিন। বোম্বাই শহর সে সময় এই মহামারীর কেন্দ্র। আরও একদল রুশীয় চিকিৎসক ডাঃ হফকিনের কাজে সাহায্য করলেন। আর, ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই প্রথম প্রস্তুত করলেন প্লেগ-বিরোধী টীকা।

১০ই জানুয়ারী ১৮৯৭, হফকিন করলেন তাঁর সেই দুঃসাহসী পরীক্ষা, বিজ্ঞানের ইতিহাসেই যা প্রায় অদ্বিতীয়। গোপনে, তাঁর সহকারীদের সাহায্যে তিনি নিজদেহে প্রবেশ করালেন সেই তরল পদার্থটুকু যার মধ্যে বিশেষভাবে সঞ্জীবিত রাখা ছিল প্লেগের জীবাণু। স্বেচ্ছায়, সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি একাজ করেছিলেন, যাতে যে টীকা তিনি প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন তার প্রতিক্রিয়া নিজদেহের উপরেই প্রথম পরীক্ষা করে দেখা যায়। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ভয়ানক রকম তীব্র, তবু বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগার ছাড়লেন না।

এই সাহসী পরীক্ষা, দূরবর্তী রুশদেশ থেকে আগত এই চিকিৎসকের প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে তুলল। এই পরীক্ষার সফলতার পর, বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকেরা জানালেন অনুমোদন, আর হফকিন জনসাধারণের মধ্যে তাঁর টীকাদান অভিযান সুরু করলেন। বোম্বাই, কলকাতা ও অন্যান্য শহরে লক্ষ লক্ষ লোককে এই টীকা দেওয়া হল এবং হফকিন নিজে এই কাজে দেশের নানান স্থান সফর করে বেড়ালেন।

ভারত সরকার হফকিনকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন, তাঁকে একটি 'অর্ডার' প্রদান করা হল। ১৮৯৯ সালে প্লেগ-নিরোধক গবেষণাগারের নূতন ভবনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের গভর্ণর বললেন: হফকিনের মত এমন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর আবিষ্কার লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং আজও বাঁচাচ্ছে। আর আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারি যে, যখন ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকু লেখবার সময় আসবে তখন ভ্লাদিমির হফকিনের নাম সব চেয়ে সামনের সারির সম্মুখে আসন পাবে।

ভারতে তাঁর মহান কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৫ সালে বোম্বাইয়ে হফকিনের গবেষণাগারটির নূতন নামকরণ করা হল তাঁরই নামে,— "হফকিন ইনষ্টিটিউট।"

এই রুশীয় চিকিৎসক ছিলেন ভারতের মহান বন্ধু। তাঁর কাজ সোভিয়েত চিকিৎসকদের সামনে এক সুউচ্চ দৃষ্টান্ত। ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রামে সোভিয়েৎ চিকিৎসক অধ্যাপক আই, তালিজিন এবং ও, মাকেয়েভা কয়েক বৎসর ভারতে কাজ করে গেছেন।

"হিন্দী, রুশী—ভাই ভাই!"

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে বর্তমান বন্ধুতা ও মৈত্রীর সম্পর্কের রয়েছে দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী সমুজ্জ্বল ঐতিহ্য। আমাদের এই দুইটি দেশের মধ্যে কোনদিনই দেখা দেয়নি বিরোধ বা অসঙ্গতি; কোনকিছুই আমাদের উভয় দেশের মহান জনগণের সৌভ্রাত্রকে আবৃত করেনি।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ ঔপনিবেশিকেরা অবশ্য উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আদানপ্রদানের সম্পর্কের উন্নতিকে ব্যাহত করেছিল। ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ স্থাপন ও মৈত্রী-সম্পর্কের উন্নয়নে উপযোগী অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করল। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাহায্যে নির্মিত ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানা রুশ-ভারত বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

রুশ দেশ থেকে ভারতে কিংবা ভারত থেকে রুশ দেশে কিছু পর্য্যটক ব্যক্তিগতভাবে যেতে আসতে পারতেন, সেই কাল বহুদিন হল গত হয়েছে। এখন, হাজার হাজার রুশীয় ভারত পরিদর্শন করেন এবং অনুরূপ, হাজার হাজার ভারতীয় ঘুরে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

"ভারতীয় ও রুশীয়রা, ভাই ভাই!" এই সরল, আন্তরিক কথাগুলি, যা হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে আসছে, সোভিয়েত ভারত সম্পর্ককে তাই-ই আজ নিরূপিত করে।

> "Marriage is that relation between man and woman in which the independence is equal, the dependence mutual and the obligation reciprocal."
>
> —*Louis Kaufman Auspacher*

আদিত্য ওহদেদার

সাহিত্যপাঠের ফলে আমরা আনন্দ লাভ করি—আমাদের এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কারো দ্বিরুক্তির দ্বারা খণ্ডিত নয়। কিন্তু এই আনন্দলাভ সম্পর্কে যদি চিন্তা করতে শুরু করি তাহলে একটি প্রশ্ন আমাদের বিব্রত করবে। প্রশ্নটি হল, ট্র্যাজেডি বা দুঃখের কাহিনী আমাদের আনন্দ দেয় কেন। প্রশ্নটা বেশ জটিল এবং বোধ হয় তারই ফলে সেই সুন্দর যুগের এরিষ্টটল্ ও তাঁর পরবর্তী সব যুগেরই চিন্তাশীলগণের মনে এই প্রশ্ন স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনেও এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্য্যের কোঠায় গণ্য করি।" (১)

এ প্রশ্নের সমাধান রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন তার উল্লেখ করার আগে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ প্রশ্ন কী ভাবে আলোচিত হয়েছে সে প্রসঙ্গ অবতারণা করা প্রয়োজন। কারণ, তাহলে আমরা বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিত পাব এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কথার মূল্য নির্ণয় করতে সুবিধে হবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে দেখি এরিষ্টটল্‌ই ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হন। তিনি ট্র্যাজেডির সে সংজ্ঞা দেন তাতে ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি কি সে কথারও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "Tragedy then, is an imitation of action that is serious, complete and of certain magnitude,—through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions" (২) অর্থাৎ ট্র্যাজেডি আমাদের মনে করুণা ও ভয় এই দুই আবেগ উদ্রেক করে, আবার যথা পরিমাণে এই আবেগের নিষ্কাশনও ঘটায়। তারপর তিনি বলেছেন, "We are not to expect any and every kind of pleasure from tragedy, but only that which is proper to it," (৩) অর্থাৎ, ট্র্যাজেডির মধ্যে সব রকম আনন্দ পাওয়া যাবে এমন নয়, ট্র্যাজেডি যে আনন্দ দেয় তার একটা বিশেষত্ব আছে।

ট্র্যাজেডির এই বিশেষ আনন্দটি কি? এরিষ্টটল্ স্পষ্ট করে তার সূত্র দেননি বলেই তাঁর ভাষ্যকারগণ দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে নানাভাবে তাঁর কথার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের সকলের কথা উত্থাপন করা সম্ভব নয়, এবং প্রয়োজনও নেই। বিশেষ কয়েকটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করলেই চলবে।

একটি ব্যাখ্যা হল এই যে, ট্র্যাজেডির আনন্দ হচ্ছে শিক্ষার আনন্দ। যেহেতু ট্র্যাজেডি গভীর নীতিমূলক সমস্যার অবতারণা করে, অতএব সেই সমস্যার সমাধান যেভাবে ট্র্যাজেডিতে সংঘটিত হয়, কিংবা আমরা নিজেরা যেভাবে তা অনুমান করি, তাতে আমাদের কিছু শিক্ষালাভ হয় এবং সেই হল আমাদের আনন্দ। এ ব্যাখ্যার মূলসূত্র হল, শিক্ষাপ্রদ বস্তু আমাদের সুখ দেয়, এবং এর উদ্গাতা হলেন সক্যালিজার যাঁর মতে, "Pleasure does not reside in joy alone, but in everything fitted to instruct." (৪) কেবলমাত্র আনন্দই যে সুখদ এমন নয়, যা কিছু শিক্ষাপ্রদ তাতেও আমরা সুখ পাই।

আর একটি ব্যাখ্যা হল, ট্র্যাজেডি আমাদের নীতি-বোধকে তুষ্ট করে। যা কিছু অন্যায় তা আমাদের অসন্তুষ্ট করে, এবং ট্র্যাজেডিতে যে অন্যায় সংঘটিত হয় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এই বুঝতে পারি বলেই আমরা আনন্দ পাই, কারণ আমরা অনুভব করি যে আমাদের নীতিবোধ ঠিক জাগ্রত আছে। এ একরকম আত্মপ্রসাদজনিত আনন্দ।

এর পর উল্লেখযোগ্য হল অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যাখ্যা যার মূল কথা হল ট্র্যাজেডিতে আমরা পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় অনুভব করতে পারি বলে আনন্দ পাই, যদিও পাপ পরাজিত হবার আগে অনেক কিছু ধ্বংস করে যায়! এই সময়ের একজন অনামী সমালোচক বলেছেন, চিরমধুর পুণ্য পাপের সঙ্গে লড়াই ক'রে দ্বিগুণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়—এই আকর্ষণের চাপে পড়েই আমরা মঞ্চাভিমুখে ছুটি এবং ট্র্যাজেডিতে দৃশ্যমান দুঃখ বেদনার বস্তুকে আলিঙ্গন করি, যদিও তা আমাদের অনেক ব্যথা দেয়!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেদনার অনুভূতি ও সুখানুভূতিকে একাত্ম করা হল। শেলী স্পষ্ট করেই বললেন, "Our sympathy in tragic fiction depends on this principle ; tragedy gives delight by affording a shadow of the pleasure that exists in pain" (৫),—ব্যথার মধ্যে যে সুখানুভূতি আছে

১। সাহিত্যের পথে।
২। Poetics, vi, 2 (Butcher's translation)
৩। ঐ, xiv, 2
৪। Scaliger, Poetics, iv, 3.
৫। Defence of Poetry.

তারই স্বাদ যুগিয়ে দুঃখকর কাহিনী বা ট্র্যাজেডি আমাদের আনন্দ দেয়। বেদনা ও আনন্দের এই ঐকাত্ম্যবাদকে আরও স্ফীত করেন জার্মাণ দার্শনিক নীট্শে। তাঁর মতে অন্যকে আঘাত দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা মোটেই 'মরবিড্' বা ব্যাধিযুক্ত নয়, সে আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা উপভোগ করি আমাদের সহানুভূতিবোধ। এবং এ আনন্দ তখনই তীব্র হয় যখন সহানুভূতি উপভোগের সুযোগটাও বড় হয়, অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের ভালোবাসার পাত্রকে দুঃখ দিই। (৬) নীট্শের এই মতবাদকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে স্যাডিজিম্ (sadism) বা ধর্ষকাম, যার সংজ্ঞা হল সেই আনন্দ যা অন্যের ব্যথা দেখে পাওয়া যায়, এবং সে ব্যথা হবে তাঁরই দান যিনি এ আনন্দ উপভোগ করছেন। এই স্যাডিজিমের সঙ্গে জড়িত আছে আর একটা কথা যাকে বলা হয় ম্যাশোকিজিম্ (masochism) বা মর্ষকাম, যার সংজ্ঞা হল সেই আনন্দ যা লাভ করা যায় দুঃখবেদনার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথারও উল্লেখ প্রয়োজন, যাকে জার্মাণ ভাষায় বলা হয় শেডেনফ্রয়ডে (Schadenfreude)। এ বস্তু হল করুণার উল্টোপিঠ। এ অনুভূতির বশে মানুষ মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যেও আনন্দ পায়; শুধু তাই নয়, কোনো প্রকার মায়া-মমতা কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এ বস্তুর ভাষ্য করতে গিয়ে নীটশে বলেছেন, দুঃখকর অভিজ্ঞতা বা চিন্তার মধ্যে মানুষ যে এত আনন্দের সন্ধান পেয়েছে—এ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। শেডেনফ্রয়ডের বশে মানুষ নিজেকে আরও বড় করেছে। তার নিজের ব্যথাবেদনা, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পেয়েছে, এবং এই আনন্দবোধই বহু নীতি ও ধর্মবিধান প্রণয়নের পেছনে রয়েছে।' (৭)

ট্র্যাজেডির মধ্যে সংঘটিত দুঃখকর দৃশ্যাবলীতেও যে আনন্দ আমরা পাই তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্র্যাজেডির ভাষ্যকারগণ স্যাডিজিম্, ম্যাশোকিজিম্ ও শেডেনফ্রয়েডে-এর স্মরণাপন্ন হয়েছে। স্যাডিজিম্ ও ম্যাশোকিজিমের সাহায্য নেওয়া হয় এই বোঝাতে যে এই প্রবৃত্তি মারফৎ আমাদের নির্জ্ঞান পাপচেতনার একটা চরিতার্থতা ঘটে এবং তদনুযায়ী শাস্তি পাবার ইচ্ছারও নিবৃত্তি হয়। শেডেনফ্রয়েডে-এর মধ্যে আছে মৃত্যু ও ধ্বংস উপভোগ করার আকাঙ্খা। এই প্রবৃত্তির বশেই কবি ইয়েটসের কোনো নাটকের একটি চরিত্র বলেছে যে, যখন সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখনই আনন্দে মুখরিত করে ওঠে কবিতা। ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু ও ধ্বংসের যে দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমাদের এই প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়।

এবার রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথা উল্লেখ করা যাক। তাঁর কথার প্রথম অংশ হল—"চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব ক'রে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।" (৮)

তারপর বলেছেন,—"দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত তবে বুক ফেটে যেত।" (৯)

এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে জানিয়েছেন আমাদের দুঃখ ও আনন্দের ভিত্তিটা কি। তাঁর মতে দুঃখ হল আমাদের চৈতন্যের সাড় না থাকা অবস্থা। আর আনন্দ হল আমাদের চৈতন্যের উদ্‌বোধন, অস্মিতাবোধ,—আমি যে আমি এইটে বেশ করে জানা। অর্থাৎ, আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ অনুভবের সঙ্গে একাত্ম করেছেন। অনুভবের মধ্য দিয়ে আমাদের চৈতন্যে সাড়া জাগে, আমরা আমাদের আমিকে জানতে পারি। কীটসও তাই বোধ হয় অনুভবকে এত কামনা করেছিলেন,—"O for a life of sensations rather than of thought."

আনন্দের যে সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, তা দুঃখকে অনায়াসে নিজের পরিধির মধ্যে টেনে আনে। দুঃখের পরিমাণ বেশি হলে তার মধ্যে যে তীব্রতা থাকে তা আমাদের সত্তাকে নাড়া দেয়। এই নাড়া-খাওয়াটা সুখানুভূতি। দুঃখব্যথার মধ্যে আনন্দের ছায়া আছে শেলী এ কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে আনন্দ কেন তার ব্যাখ্যা করেননি। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শনের সাহায্য নিয়েছে। ভূমৈব সুখং নামে সুখমন্তি। ট্র্যাজেডির মধ্যে ভূমার রূপ দেখি গভীর দুঃখের অনুষ্ঠানে। এই দুঃখদৃশ্যে আমাদের হৃদয়াবেগ জাগরিত হয় শিহরিত হয়। এমন হওয়াটাই আনন্দ।

মানুষ বাস্তব জগতে ভয়-দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, রবীন্দ্রনাথের এ কথা যে কিছু সংশোধনের অপেক্ষা রাখে সেটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভালো জানতেন। ভয়-দুঃখ-বিপদ বর্জনীয় বলে জানলেও মানুষ যে সর্বদা তাকে বর্জন করে, এমন নয়। নিজের কথার জের টেনে তাই অন্যত্র বলেছেন, "এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয় প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্যে নয়, ভয় বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে।" (১০) এই ভাবে নিজেকে

৬। নীটশের গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৭। ঐ

৮। সাহিত্যের পথে

৯। ঐ

১০। ঐ

প্রবল আবেগে উপলব্ধি করার ইচ্ছার আর একটি রূপ হল মানুষের বড়ো হবার ইচ্ছা। এমন কি, এই ইচ্ছাই যে মানুষের প্রকৃত সত্য ইচ্ছা এ কথাই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।—"আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা বড়ো হবার ইচ্ছা সুখী হবার ইচ্ছা নয়।...বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।" (১১) ট্র্যাজেডির মধ্যে আমরা মানুষের এই ইচ্ছাকে রূপ পেতে দেখি। এই ইচ্ছাকেই নীটশে বলেছেন will to power কিম্বা will to life। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা সংকল্প-সাধনের জন্যে মানুষ যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যে কোনো আত্মত্যাগ করতে পারে। —The affirmation of life, even in its most familiar and severe problems, the will to life, enjoying its highest types—that is what I call Dionysian, that is what I divined as a bridge to a psychology of the tragic poet." (১২)

ইতিপূর্বে আমরা স্যাডিজিম্ ও শেডেনফ্রয়ডে-এর কথা উল্লেখ করেছি; মানুষের এ প্রবৃত্তি কেন আনন্দ দেয় তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ আনন্দের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে পাওয়া যাবে। যা কিছু আমাদের অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়, উদ্দীপ্ত করে, তাই আমাদের আনন্দ দেয়। সে বস্তু শ্রেয়ঃ না হতে পারে কিন্তু তাই বলে প্রিয় হবে না এমন কোনো কথা নেই। হিংস্রতা শ্রেয়ঃ নয়; কিন্তু আমাদের অনুভূতি তীব্র করে বলে প্রিয় হতে তার বাধা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়, কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না, তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায় হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়।...যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতু পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো এত বড় প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ।" (১৩)

অবশ্য এ আনন্দ পৈশুন্যজাত। কিন্তু তবু এই আনন্দকেই একাধিক সাহিত্য-চিন্তক ট্র্যাজেডি-উপভোগ্য আনন্দের সঙ্গে এক করেছেন। Emile Faguet-এর মতে ট্র্যাজেডির আনন্দ পিশুন-আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মধ্যে আজও আদিম পশুপ্রবৃত্তি বাস করছে, তারই বশে মানুষ সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে হিংস্রতা ক্রূরতা ভালোবাসে, এবং অপরের দুঃখ উপভোগ করে ও আনন্দ পায়। ট্র্যাজেডির লেখকগণ মানুষের এই প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগান।

ট্র্যাজেডির মধ্যে কেবলমাত্র মানুষের হিংস্র আনন্দবোধ চরিতার্থ হয়, Faguet ও তাঁর দলের এ মতবাদ যে বিকারগ্রস্ত তাতে সন্দেহ নেই। এ মতবাদ মানুষের শ্রেয়োবোধকে অস্বীকার করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এই বিকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে লৌকিক জগতে মানুষের হিংস্র আনন্দবোধ দেখা যায়, কিন্তু সেটা যে শ্রেয়োবোধের অভাববশত—একথাও তিনি বলেছেন। আমরা বলতে পারি এই শ্রেয়োবোধের জন্যেই মানুষ ট্র্যাজেডির দুঃখে কেঁদে সুখ পায়। হিংস্র আনন্দ কখনই অশ্রুসিক্ত হতে পারে না।

শ্রেয়োবোধের জন্যে মানুষ ট্র্যাজেডির দুঃখে কেঁদে সুখ পায়, আমাদের এ কথা একটি প্রশ্ন আনে। লৌকিক জগতে যে দুঃখবেদনার দৃশ্য আমরা দেখি তাতে কি আমরা কেঁদে সুখ পাই। শ্রেয়োবোধ তো তখনও কাজ করে। সমবেদনা অনুভব করি, কিন্তু সেটা যে সুখ নয় তা আমরা ভালো করেই জানি। অথচ ট্র্যাজেডিতে যে দুঃখবেদনার দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয় তা দেখে আমরা একটা স্পষ্ট সুখানুভূতি অনুভব করি।

একটা উত্তর যা সহজে মনে আসে তা বোধহয় এই যে আমরা জানি সাহিত্যের জগত অলীক অর্থাৎ সেখানে কারুর ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নয়। সেখানে যে দুঃখবেদনার দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয় তাতে কারও স্বার্থহানি ঘটছে না, অনিষ্ট হচ্ছে না। লৌকিক জগতে দুঃখের সঙ্গে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর।" আমাদের অলংকার শাস্ত্র বলেছে লৌকিক জগতে যা 'শোক,' কাব্যের জগতে তাই হয়ে ওঠে করুণ রস, যা কি না উপভোগের বস্তু। শেলী বলেছেন "our sweetest songs are those that tell of saddest thought।" এখানেও লৌকিক জগত ও কাব্যের জগতের প্রভেদ বর্তমান। অতুল গুপ্ত এ কথার ভাষ্য করেছেন "যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি sad thought আনে তা sweetও নয়, songও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought-এর কথা বলেন, তখনি তা sweetest song হয়।" (১৪)

তবু উত্তর স্পষ্ট হল না। কাব্যে saddest thought-এর কথা বলা হলে তা sweetest song হবে কেন। দুঃখ-বেদনা সাহিত্যের জগতে লৌকিক স্বার্থ হানিকর না হতে পারে, কিন্তু তা আনন্দ দেবে কেন? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথাই সমধিক মূল্যবান ঠেকে। অন্য সকলের চিন্তা হয় অপরিণত নয় বিকৃত ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের সুপরিণত চিন্তার সারাংশ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আনন্দের মূলে আছে আমাদের সত্তার আলোড়ন, অনুভূতির শিহরণ। দুঃখবেদনা আমাদের সত্তাকে নাড়ায়, অনুভূতিকে জাগায়। কিন্তু লৌকিক জগতে দুঃখবেদনা অনিষ্টসূচক, তাই সেখানে দুঃখবেদনা মানুষ আকাঙ্খা করে না। সাহিত্যের জগতে দুঃখবেদনা অনিষ্ট-মুক্ত, কারণ সেখানে লৌকিক জগতের স্বার্থ নেই। বিশুদ্ধ দুঃখানুভূতির তীব্রতার মধ্য দিয়ে শিহরণ-পুলক লাভ করবার জন্যেই আমরা ট্র্যাজেডি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করি।

১১। শান্তিনিকেতন।
১২। The Twilight of the idols.
১৩। সাহিত্যের পথে।

১৪। কাব্য-জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথ ও অসমীয়া সাহিত্য

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

১

বাঙ্গালী সেদিন ভারতের বাহুতে বল দিচ্ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা···রাজধানী-কেন্দ্রিক বাংলার তখন বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল সেই বাংলা তার ঢের আগে···তারপর বসন্ত দেউল···তারপর আজকের বাংলা আবার দেউলে। মাঝখানে জ্বলে ওঠার বিচিত্র ইতিহাস··জ্বালিয়ে ওঠার বিস্ময়কর প্রবর্ত্তনা। বাংলা দেশে প্রাণের বায়ু প্রবেশ করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার খোলা দরজা দিয়ে। কোলকাতা, রাজধানী কোলকাতা তখন সাংস্কৃতিকপ্রধান পীঠস্থান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাণীবহ বাংলাকে তাই প্রাগ্রসরণের প্রাণনারূপে অন্যান্য প্রদেশ স্বীকার ক'রেছিল। বিশেষ ক'রে সে-সকল অঞ্চল যেখানে অন্ধকার ছিল জমা হয়ে, সাগরপারের আলো গিয়ে পড়েনি সেখানে ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য, কলরব জাগাবার জন্য বাংলাকে পৌরোহিত্য করার ডাক পড়েছিল।

ইংরাজের কাছে পদানত হ'য়েছিল বাংলা সর্ব্বপ্রথমে—তা' তার লজ্জার কথা। আবার জাগরণের দিনে সে হ'ল ভারতের মুকুটমণি—তা তার গৌরব। পলাশীর যুদ্ধে তার মানচিত্র লজ্জায় লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র তার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

অনেক কারণে আসামের ক্ষেত্রে বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সে কারণগুলি দেখা যাক এক এক ক'রে।

(ক) পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) বাংলাকে ইংরাজী সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আনতে সাহায্য করেছে। এর দীর্ঘদিন বাদেও আসামের ম'নচিত্রে লাল রং ধরেনি। প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮২৭ সালে ইংরাজ শাসনের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আসাম ("The British annexed Assam in 1827")···ফলে বাংলার অনেক পরবর্ত্তী কালে যখন ইংরাজী সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেখানে তখন বাংলা অনেক এগিয়ে গিয়েছে সে-দিক দিয়ে। স্বভাবতঃই কোলকাতা হ'তে অনুপ্রেরণার জন্য আসাম এগিয়ে এসেছে।

(খ) রাজধানী-কেন্দ্রিক বাংলা দেশের হেড কোয়ার্টার্স থেকে অন্যান্য পূর্ব্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসন পরিচালনা চলছিল।

(গ) সাংস্কৃতিক কারণেও কোলকাতা ছিল আদর্শ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন আসামী ছাত্রদের Alma mater···তাই কোলকাতায় পড়ুয়া আসামী যুবকদের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল।

(ঘ) আসামে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সেদিন অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না ক'রে শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ ক'রেছিল বাংলা ভাষা। বিচারালয়েও অসমীয়া ভাষার স্থান ছিল না। বাংলা ভাষা সেই স্থান দখল ক'রে নিয়েছিল। ১৮৭২ পর্য্যন্ত অসমীয়া ভাষার স্থলে বাংলা ভাষার ব্যবহার হ'তে থাকে বিচারালয়ে শিক্ষায়তনে। তারপর অসমীয়া বাংলার স্থান গ্রহণ ক'রে বটে কিন্তু আরও অনেক দিন বাংলা বইয়ের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাংলা বইয়ের ব্যবহার চলতে থাকে। এই পরিবেশে স্বভাবতঃই আধুনিক অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাংলা গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। এই প্রসঙ্গে আসামবাসীদের অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গত। ডক্টর বিরিঞ্চি বরুয়া ও ডক্টর প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"At the beginning of the British rule, Assamese was abandoned as a language of school and court (1836-1872). This was, therefore, not a period for cultivation and development of the Assamese language' -Dr. B. Barua : Assamese Literature : Contemporary Indian Literature.

অন্যত্র বলেছেন—

'A fresh misfortune overtook the Assamese. It was the imposition of an alien tongue on the schools and courts. When the British set up their administrative machinery they had to import Bengali assistants and they were later (1836) instrumental in persuading the English officers to believe that Bengali was the main language while Assamese was but a patois with no literature. The Bengali language remained officially for some forty years (1836-1872) but the bogey of the Bengali text book did not disappear till the first decade of the present century.'—Dr. B. Barua & Dr. P. D. Goswami : Assamese Literature : Indian Literature : Ed. Dr. Nagendra.

তাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বাংলার গভীর দান আছে।

সেদিন •কোলকাতা-কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করতে এসেছিলেন অসমীয়া সাহিত্যের যুগস্রষ্টারা···তাঁরা তখন ছাত্র। তাঁদের সম্বন্ধে সমালোচকেরা বলেন :—

"Literature worthy of the name, however, came in the beginning of the 20th century. This was through the efforts of young Assamese men who were having western education at that period in Calcutta colleges. While studying in Calcutta, Chandra Kumar Agarwalla (1858-1938), Lakshminath Bejbarua (1868-1938), Hem Chandra Goswami (1872-1928) and Padmanath Gohain Barua (1871-1946), all friends, founders

in 1889 the monthly journal 'Jonaki' (the firefly).
-Assamese literature : Dr. B. Barua.

আসামের সাহিত্যসম্রাটরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করেন লক্ষ্মীনাথ। পরবর্তী কালে তাঁর প্রতিভা অসমীয়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশের পথ খুঁজেছে। হেমচন্দ্র গোস্বামীর সাহিত্যসেবায় অসমীয়া সাহিত্য ধন্য 'অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি' একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া অজস্র রচনায় অসমীয়া সাহিত্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি বিধানের প্রয়াস পেয়েছেন···বিশেষত: তাঁর নাটক অসমীয়া সাহিত্যের সম্পদ। আর এঁরা অসমীয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাব-গঙ্গা আনয়ন করলেন তাতে কেবল আসামই সমৃদ্ধ হ'ল না বাংলার সঙ্গে চিরকালের রাখী বন্ধন হ'য়ে গেল।

আজ নানা কারণে আসাম আর বাংলার মধ্যেকার সম্প্রীতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে···কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা আসামের ঘনিষ্ঠ সহযোগের স্মৃতি চিরকাল বহন করবে। অথচ আজকালকার কোনও কোনও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক আসামের সাহিত্যে কেবল ইংরাজির গভীর প্রভাবের কথা দিয়েই আলোচনা ক'রে বাংলার অবদান সম্বন্ধে নীরব থেকে যান। এটি আর যাই হোক ঐতিহাসিক সততা নয়। যেমন যে সব বাঙ্গালী বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে এমন মতবাদ প্রকাশ করেন যে, হিন্দী আসামী প্রভৃতি সাহিত্যে "কিস্যু নেই", তাঁরা আর যাই হোক সুবিচার করেন না। অজ্ঞতা আর আত্মম্ভরিতা নিয়ে তাঁরা কেবল অপরকে ছোট করতে চান··· আর মহাকালের কাছে নিজেই ছোট হ'য়ে যান। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা প্রাগাধুনিক কয়েকটি প্রাদেশিক সাহিত্য কোনও ক্রমেই নিম্নমানের বলা যেতে পারে না। আবার আধুনিক আসাম প্রভৃতির সাহিত্য যে বাংলা সাহিত্যের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে···এবং এই সকল সাহিত্য যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা অপেক্ষা অনেক পিছনে পড়ে আছে সে কথা অস্বীকার করার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই।

২

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মধুসূদন কাব্যক্ষেত্রে আর বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করেন তার অনুসরণে বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিকীকরণ সুরু হয়েছিল। মধুসূদনের প্রতিভা বাঙ্গালী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতি সৌভাগ্যক্রমে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর এবং সনেটের পথিকৃৎ কেবল বাংলা সাহিত্যে নন, বাংলার আদর্শানুসারী অনেক ক'টি সাহিত্যে। তার মধ্যে অসমীয়া সাহিত্য অন্যতম। মধুসূদন-অনুপ্রাণিত আসামের অমিত্রাক্ষর। ওড়িয়ার মত এখানেও চতুর্দশ অক্ষরাত্মক পয়ারের ভিত্তিভূমিতে এই ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় (হিন্দীতে পনের অক্ষর পংক্তির প্রচলন ঘটে মধুসূদনের আদর্শে)। ভোলানাথ দাস মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর অসমীয়াতে প্রবাহিত করায় "সীতাহরণ কাব্য"-এ বলেন :—

লক্ষ্মণ সীতার সহ পিতৃসত্য পালি
দাশরথি রঘুপতি পঞ্চবটী বনে,
তপস্বীর বেশে ভক্তি বন্য ফল মূল
তপস্বী আহার যবে ছিলা বনবাসে ;
কিরূপে রাবণবলী লঙ্কা অধিপতি
হরিলা জানকী সীতা—কিটো অপরাধে
মরিলা সবংশে পাছে রাক্ষস ঈশ্বর
দেবকুল অরি—সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছোঁ আমি মূঢ় অকিঞ্চন,
অমিত্র অক্ষর ছন্দে, হে মাত: বাগ্‌দেবি !
যি ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে, অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন, বঙ্গ কবি কুল মণি,
অতি দুরাকাঙ্ক্ষা কিন্তু করিছোঁ মনত,
হীন আমি খেতভৃঙ্গে !

—সীতাহরণ কাব্য : ভোলানাথ দাস

ভোলানাথ দাসের ন্যায় রমাকান্ত চৌধুরীও "মধুচক্র" রচনায় সাহায্য করেছেন। তিনি মধুসূদনের আদর্শে "অভিমন্যুবধ কাব্য" রচনা করেন। গ্রন্থের প্রথম সর্গ হ'তে কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

দশদিন যুদ্ধ করি ভীষ্ম মহাবলী
যেতিয়া শুইলা বীরে শর আসহত
মহারথী পাণ্ডবের আনন্দ মনেরে
বজাইলা ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা করতাল
জগঝম্প, ভেরি, দবা।

—অভিমন্যুবধ : রমাকান্ত চৌধুরী

পরবর্তী কালের কবির মধ্যেও মধুসূদনের প্রতি ভক্তির অভাব নেই। বাঙ্গালী না হয়েও দুর্গেশ্বর শর্মা 'অঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'মাইকেল'-কবিতায় মধুসূদনকে এইভাবে প্রণতি জানিয়েছেন :—

ন-হওঁ বঙ্গালী, কিন্তু করিলোঁ প্রণাম
তোমার সমাধি দেখি, আছে এটি যত

—অঞ্জলি : মাইকেল : দুর্গেশ্বর শর্মা

"আমি বাঙ্গালী নই, কিন্তু প্রণাম করি তোমাকে, সমাধিস্থল যেখানে দেখলাম সেইস্থান।"

মধুসূদন হ'তে অমিত্রাক্ষর প্রবাহিত হ'ল অসমীয়াতে। বাংলার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র আদর্শে অসমীয়াতে "চনেট" (Sonnet) প্রচলিত হয়।(১) অসমীয়াতে "চনেট" বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আপন কাব্যগ্রন্থ "মালচ"-এর ভূমিকাতে ("পাতনি") কবি হিতেশ্বর বরুয়া লিখেছেন :—

১। অসমীয়া সাহিত্যে সনেটের প্রথম আবির্ভাব ঘটে বোধ হয় হেমচন্দ্র গোস্বামীর কল্যাণে। তিনি মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চতুর্দ্দশপদী কবিতার সূত্রপাত করেন অসমীয়া সাহিত্যে। তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া আপন সনেটে লিখেছেন :—

চনেট চানেকি আঁটি পোন প্রথমতে···ক
প্রকৃতির চো ঘর'ত চাই 'পিত পিত'···খ
অসমীয়া সাহিত্যর ভঁরালত থিত···খ
নতুন সম্ভার এটি করিলা নাচতে ;···ক

—হেমচন্দ্র গোস্বামী : পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

'ইংরাজীতে এই ধরণার কবিতাক চনেট (Sonnet) বোলে। বঙ্গদেশর সর্ব্বপ্রধান কবি, কবিকুলমণি—মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমতে বঙ্গলা ভাষাত চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখি বাট দেখুবায় (রাস্তা দেখান)।'

মধুসূদনের আদর্শে তিনি সনেট-এর ছন্দ গ্রহণই কেবল করেন নি। এই 'মালচ' সনেট-গুচ্ছের মধ্যে তিনি 'কবি,' 'কবিতা' ইত্যাদি বিষয়ে মধুসূদনের ন্যায় কবিতাও রচনা করেন।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ ও গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাহায্যে চন্দ্রধর বরুয়া অসমীয়াতে 'মেঘনাদবধ' 'তিলোত্তমা সম্ভব' নামে নাটক লেখেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এই সম্বন্ধে ডক্টর বিরিঞ্চি বরুয়ার কথা উদ্ধৃত করছি :—

'Chandradhar Barua is another well-known playwright. His two puranic dramas 'Meghnadvadh' (1904) and 'Tilottama-Sambhav' are in blank verse, and deal respectively with the killing of Indrajit, and the mutual destruction of the two demons Sunda and Upasunda in their rivalry for the hand of Tilottama. In plot development and characterisation, both the dramas disclose influence of Michael Madhusudan Datta'.

—Assamese Lit. ; Cont. Indian Lit. ;
Dr. B. Barua

মধুসূদনের অনুসরণে বাংলা দেশে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি এগিয়ে এসেছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ভারতবর্ষের পরাধীনতার বেদনা নিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন (ভারতভিক্ষা ; ভারতবিলাপ ; ভারতসঙ্গীত)(২) তার প্রভাব হিন্দী, অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্যে গভীর ভাবে পড়েছিল। হেমচন্দ্র-প্রভাবিত অসমীয়া সাহিত্যের কিছুটা পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশগুলির সাহায্যে দেবার চেষ্টা করছি।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা হেমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি তুলে লিখেছেন—

উঠা অসমীয়া চোবা চকু মেলি
এলাহ পাটীতে জে লাগে লাজ
কঙ্গালি টোপনি ভাঙ্গি উঠি বহা
পেলোবা পেলোবা টোকোনা সাজ।

—উদগনি ; চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা।

(অর্থাৎ, উঠ অসমীয়া, চাও চোখ মেলে, আলস্যে বিছানায় না-লাগে লজ্জা ; কাঙ্গালি, ঘুম ভেঙ্গে উঠে ফেলাও ফেলাও দরিদ্রের সাজ।)

এবম্বিধ প্রতিধ্বনি ভোলানাথ দাস-ও তুলেছেন—

হে আসামবাসি! মিনতি আমার
নয়ন উন্মিলি দেখা একবার
সদাই নিদ্রিত অতি অনুচিত
দেখা একবার নয়ন মেলি।

তোমা সব সম কোন হেন জাতি
আলস্যর বশ উলটি পালটি
কোন হেন জাতি, চির শয্যা পাতি,
শুইয়াছে দেখা মস্তক তুলি।

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত।

—আসামবাসী ; ভোলানাথ দাস।

অসমীয়া সাহিত্যের জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময় কবিতায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এঁর মধ্যেও আমরা হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করি। বাংলা ও আসামের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন কাশীরাম দাস বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ধন্য। আর কৃত্তিবাস কীর্ত্তির আবাস রচনা করেছেন বাংলায়, কাশীরাম দাসের বাঙ্গালী ভাই সেজেছেন (আসলে কৃত্তিবাস বাংলার নয়? আসামের নাকি?)…এমন আসাম অঞ্চল যা প্রাচীন গৌরবে উজ্জ্বল, বর্তমানে তার কোনও উন্নতি নেই। অসমীয়ারা মানুষ নয়… তারা মৃত, আসাম শ্মশান নয় কে বলে?

বঙ্গ'ত জনম ধন্য কাশি দাস'
দেব কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তির আবাস
সাজিলে তোমার বাঙ্গালী ভাই
• • • •
পুরণি গৌরবে গর্বী যেই দেশ
ন হয়, নাই তার উন্নতি লেশ।
• • • •
ঠিক অসমীয়া মানুহ ন হয়
অসম শ্মশান নোহে কোনে কয়?

—জাতীয়গৌরব : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

পাহরণি (বিস্মরণী) কবিতার মধ্যেও অতীত-বিস্মৃতি ও বর্তমান অবস্থা দৈন্য নিয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন :—

হায় কলিকালে কি হত পেলালে
ভারতর আজি কিনো দুঃসময়।

—পাহরণি : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু অনেককে কবিতা লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

•

মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রে চতুর্দশ অক্ষরাত্মক মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিবর্তিত হয়। পরবর্তী কালে এই অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি চতুর্দশ অক্ষরাত্মক সমপদী পংক্তি না থেকে অসমপদী হয়। নাটকে এ ছন্দ খুব জনপ্রিয় হয়। এ ছন্দের বহুল প্রচারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদানের কথা স্মরণ রেখে এ ছন্দ গৈরিশছন্দ নামে বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

অসমীয়া সাহিত্যে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া চিরন্তন দান রেখে গেছেন।

২। আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ;
… … …
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

—ভারতসঙ্গীত : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাধারে তিনি কবি ও নাট্যকার। মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ—এঁদের আদর্শ পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার অনেক লেখার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর গল্প রচনা "ভানুমতী" বিশেষ মূল্যবান হয়ত নয়···কিন্তু তাঁর অন্যবিধ রচনা অসমীয়া সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করছি। এখানে কেবল এইটুকু বলা উচিত যে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার নাটকে যে "সকলোয়ে বেগেরে প্রস্থান" ("লাচিত বরফুকন" নাটক : প্রথম অঙ্ক শেষ দৃশ্য) আছে তা দ্বিজেন্দ্রলাল হ'তে বাংলায় সুরু হয়েছিল। তাঁর বহু নাটক যেমন, "সাধনী", "জয়মতী", "গদাধর", "ভাও বিলকি", "গাঁও বুঢ়", "টেটোন তামুলি", "ভূতনে প্রেম", "লাচিত বরফুকন" প্রভৃতির স্থানে স্থানে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহৃত যথা—

রত্না— চিন্তা ন করিবা (৬)
চিন্তিম উপায় যিবা, (৮)
শক্তি অনুসারি, পোরা যাতে রক্ষা তুমি। (১৪)
রাখিবা বিশ্বাস মোত। (৮)

গদা— সরল বিশ্বাস (৬)
রাখিছোঁ তোমাত জানা। (৮)
স্বরূপ চিনাকি নতু নিদিও কাচিৎ। (১৪)

—গদাধর নাটক : পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

[টীকা—চিন্তা করিও না, আমি উপায় চিন্তা করিব শক্তি অনুসারে; যাতে তুমি রক্ষা পাও। আমাতে সরল বিশ্বাস রেখ।
সরল বিশ্বাস তোমাতে রেখেছি। তুমি কিন্তু কখনও আমার স্বরূপ চিনিয়ে দিও না]

কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদনীয় অমিত্রাক্ষরের ধারাজলে স্নান করেছিলেন যে-সমস্ত কবি পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া তন্মধ্যে অন্যতম। উদাহরণ প্রসঙ্গে "ফুলের চানে কি" সংগ্রহ-গ্রন্থ হ'তে "বরাগী বহাত গদাপাণি" নামক রচনা হ'তে কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল। গদাপাণি এখানে বৈরাগীর বেশে···রাজবেশ তাঁর নেই, বীরের অস্ত্রশস্ত্র (আহিলা) এখন নেই। তার পরিবর্ত্তে (সলনিত) ধরেছেন বৈরাগীর একতারা (টোকারী)। যে বাহুতে গদাঘাত না হ'লে ভাল লাগে না (সুত ন লগায়) সেই বাহু আজি ভিখারীর ঝুলি (জোলোঙা) বয়ে বয়ে অবশ শিথিল হয়েছে। তাই গদাপাণি আক্ষেপ করছে—

নাহি আজি
রাজ সাজ, অস্ত্র শস্ত্র বীরের আহিলা;
সলনিত ধরিছোঁ'হি বরাগী টোকারী!
যি বাহু ধারণ মোর শত্রু দলনত,
গদাঘাত ন পরিলে সুত ন লগায়—
সি বাহু বর্ত্তিছে আজি অবশ শিথিল,
ভিখারী জোলোঙা বই।

বরাগী বহাত গদাপাণি : পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

উল্লিখিত কবিতায় ছন্দ চতুর্দ্দশ অক্ষরাত্মক পয়ারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অমিতাক্ষর অমিত্রাক্ষর, যা মধুসূদনের হাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হিন্দী নাটকের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের উপর ততখানি পারেনি। তবে অসমীয়া ভাষাতে মৌখিক কবিতার ক্ষেত্রেও কখনও কখনও যে তাঁর প্রতিধ্বনি না শোনা গেছে তা নয়। যেমন—

কোন অনাদির আদিত সিদিন
বিদারি সুনীল সিন্ধু বক্ষ
উঠিল জননী পতিত পাবনী
হরষিত করি দেবতা লক্ষ!
কত তপস্যার স্রষ্টা
স্রজিলে জননী ভারতবর্ষ,
ই কি অপরূপ। শুভ্র শিরেরে
সুনীল গগন করিলে স্পর্শ

* * *

চরণত বাজে সুনীল সিন্ধু
বক্ষ শ্যামল শস্যে ভরা
শুভ্র কিরীটি! হিমাদ্রি চূড়ার
ওপরত নীলা চন্দ্রাবা তরা

—ভারতবর্ষ : প্রতিধ্বনি : বিনন্দচরণ বরুয়া

'প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থকৃত বিনন্দচরণ বরুয়ার উল্লিখিত 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐ নামের কবিতাটির প্রতিধ্বনি মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের পংক্তিগুলি স্মরণ করুন।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিল জননী ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব—
সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ!

* * *

উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য
করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
ইন্দ্রযুগ্ম—চরণে ফেনিল
জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভারতমাতার "শীর্ষে শুভ্রতুষার কিরীট"। এই ভারতমাতা "শ্যামল শস্যে" নিখিল বিশ্বে হাসি ছড়াইয়া দেন। অসমীয়া প্রতিধ্বনিতে 'ভারতমাতা'র "বক্ষ শ্যামল শস্যে ভরা" চিত্র পরিকল্পনা হিসেবে ভাল হয়নি বোধ হয়।

বিনন্দচরণ বরুয়ার আর একটি কবিতা "ব্রহ্মপুত্র" দ্বিজেন্দ্র প্রভাবিত বলে মনে হয়। একটি পংক্তি দেখুন, "ব্রহ্মপুত্র! ব্রহ্মপুত্র! জন্মভূমির অতি আদরে মণিমাণিক্য রজতসূত্র।"

নাটকে ও কবিতায় বাংলার সঙ্গে আসামের যে-যোগ গল্পের ক্ষেত্রে সে যোগ আরও দৃঢ়। অনেক গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যে বাংলার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বাংলার কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিকের আদর্শে আসামের সাহিত্যজগতে আধুনিকীকরণের যে মোহ-বিহ্বলতা দেখা গিয়েছিল, যে প্রবল ভাবাবেগে আসামের যুব-সম্প্রদায় ধৈর্য ও স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তারই প্রতি কটাক্ষ করে কবি পদ্মধর চালিহা তাই বলেন—

আমি ভাষা উদ্ধার করিম,
(আরু) আকাশত দাজি ধরিম।
আমার standard very high,
আমার ভাষার সকলো dry ;

*   *   *

(আমি) বহুত place অত ক্রমিম
Man-অক study করিম ;
মেরী করেলী আরু বঙ্কিমর
নিচিনা নভেল লিখিম।

*   *   *

(আমি) নতুন epoch আনিম,
(আমি) অমর হৈ হে মরিম,
নবেল প্রাইজ অধিকার করি
টিমিল মিলাই ক্রমিম।

—ফুলনি : পদ্মধর চালিহা

একটা যুগ ছিল বঙ্কিমের আর একটা যুগ রবীন্দ্রনাথের···এই যুগের স্বপ্নবিহ্বল যুব-চিত্তের দোলাচল বৃত্তিকে বিদ্রূপ করেছেন কবি উপরের কবিতাতে। কিন্তু সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকারেরা অসমীয়া সাহিত্যে বঙ্কিম-পূজার মধ্য দিয়ে আপন প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজেছিলেন। অসমীয়া সাহিত্যের দুইজন যুগান্তকারী প্রতিভাকে আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। ছোট গল্পকার—প্রবন্ধকার লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী অসমীয়া রচনা-সাহিত্যে "কৃপাবর বরুয়া"রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। "কমলাকান্তের দপ্তরে"র প্রভাবে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার "বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরাণি" (অর্থাৎ কৃপাবর বরুয়ার ভাবনা বুদ্বুদ-সংগ্রহ) রচিত হয়। অসমীয়াতে উপন্যাসের সূত্রপাত হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত রজনীকান্ত বরদলৈর হাতে। এ-সম্বন্ধে সমালোচক বলেন :—

'The novel as a full-fledged work of creative imagination in prose was born at the hands of Rajanikanta Baradoloi. Baradoloi admits in the preface to his novel, 'Danduwa Droha' (1909), that the works of Walter Scott and Bankim Chandra Chatterjee moved him to appreciate the beauty of the hills and dales of his own land and to write on themes called from Assam's history.'
—Assamese Literature : Dr. B. Barua

এই ভাবে প্রাক্ রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রতি আসামের গভীর প্রীতি পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-পূজার পথ প্রস্তুত করেছিল।

৪

কবিতার বিশ্লেষণে তিনটি জিনিষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—কবিতার ভাব, কবিতার ভাষা, কবিতার ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি ভারতীয় সাহিত্যের আঞ্চলিক কাব্যশাখার রাবীন্দ্রিক ভাব সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। একটা রোমাণ্টিক স্বপ্নাধীনতা, একটা অনির্দ্দেশ্য আকুলতা, একটা সুদূর পিপাসা মুখরতা লাভ করল আসামের সাহিত্যক্ষেত্রেও। আর আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের নেপথ্যে যিনি পরম সুন্দর জ্যোতির্ময় তাঁর প্রতি প্রভুরূপে পূজা, প্রেমিকরূপে মিলন-বিরহের গান, রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক ক'রে তুলেছিল। 'গীতাঞ্জলি'র 'তুমি-আমি' পরিচিহ্নিত কাব্যধারায় স্নান করেছিলেন আসামের সাহিত্যসেবকদের অনেকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রারম্ভে বৈষ্ণব পদ রচনায় 'ভানুসিংহ' ভণিতায় তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ব্বাভাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার প্রত্যন্ত ভাগে ভূমার ক্ষেত্র হ'তে ভূমির ক্ষেত্রে সাধারণ নরনারী ও অনভিজাত প্রকৃতির প্রতি কৌতূহলে তাঁর শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়া। অর্থাৎ তাঁর কাব্য-সাধনার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ভাগে ভানুসিংহ রোমাণ্টিক কবি—মিষ্টিক কবি—বাস্তবদরদী কবিরূপে তিনি বহুরূপে বিরাজমান।

'ভানুসিংহ'-রবীন্দ্রনাথ অসমীয়াতে বোধ হয় সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও কবি সূর্য্যকুমার ভূঞার উপরে। ডাঃ ভূঞা তাঁর "সূর্য্যকুমার" নামটিকে "ভানুনন্দন"রূপে উপস্থাপিত ক'রে ব্রজবুলি ভাষায় যে পদরচনা করেছেন, তাতে তিনি একাধারে রবীন্দ্র-প্রভাব ও আপন সত্তার যুগপৎ পরিচিতি রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাঁর নিম্নলিখিত কবিতা "মধুযামিনী"র কয়টি পংক্তি উদ্ধার করতে পারি—

ভানু নন্দন কহে   বিরহী জনক দহে
সঞ্চিত হৃদয় অভিলাষা
দীন জীবন রহু   সোহি মুখ ন পেখনু
ধরম সরম সবু নাশা
ন আওল ধনী মধুযামিনী।

—মধুযামিনী : 'নির্মালি' কাব্যগ্রন্থ : সূর্য্যকুমার ভূঞা।

রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ সুদূরের পিপাসায় আকুল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হ'তে তিনি কারাপ্রাচীরের বাইরে বিশ্বজগতে নিজেকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। 'উতলা' সূর্য্যকুমার ও অস্থির। তিনি বলেন :—

মোর প্রাণত পুলক গাঁথা
মোর চকুত নীরব কথা
মোর শূন্য গহীন বাতাহ বিয়াপি
কিবা এটি আকুলতা।

মোর লক্ষ্য থিরতা নাই
মোর চাওনি পিছলি যায়
মোর চিন্তা তটিনী বাগরি বাগরি
পাবহি নে দেখা ঠাই।

[বাগরি বাগরি—গড়িয়ে গড়িয়ে]

কারণ—

"মোর কানত রিণিকি রিণি
আজি পরিছে আকাশী বাণী
আজি সৌরজগৎ বলিয়া কি হ'ত
কি হত বলিয়া প্রাণী"

রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশিনী'কে চিনেছিলেন,

'আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান'

সূর্য্যকুমারও আকাশে কান পেতে না শোনা গান শুনেছেন, সে গানে জীবন সিন্ধুর ওপার হ'তে মহাসঙ্গীত ভেসে আসছে। তিনি বলেন :—

মই আকাশত পাতি কান
আজি শুনিছোঁ। মু শুনা গান
মোর জীবন সিন্ধু　　সিপারর পরা
ভাহিছে পুণ্য তান।

[সিপারর—ওপারের ; ভাহিছে—ভাসিছে]

প্রকৃতি-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর প্রেমিক নারী অথবা ঈশ্বরের পূজক ভক্তরূপে বিবর্তিত হয়েছেন। কবি সূর্য্যকুমার "ওগো মোহন চোর" বলে গান ধরে বলেছেন তোমার সঙ্গে হে জীবননাথ আমার প্রেমের বন্ধন—সেই বন্ধনে যৌবনের এই বন্দিশালাতে তোমাকে বন্দী করব :—

হেরা মোহন চোর
•　•　•　•
বান্ধিম তোমাক হিয়ার তলত
যৌবনের এই বন্দীশালত
দণ্ড আমার নয়ন কোণর
বজ্র সুমধুর।　—চোর : সূর্য্যকুমার

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' কখনও 'প্রভু' হয়ে দেখা দিয়েছেন। 'সৃষ্টি পাতনি' কবিতায় সৃষ্টি পতনের দিনে 'প্রভু'র রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে কেমন ভীষণ উদ্দীপনায় আনন্দে পরিপূর্ণ করলেন বিশ্বভূমি তা বলতে গিয়ে সূর্য্যকুমার ভুঞা লিখেছেন :—

সেই প্রলয়র দিনা
তুমি প্রভু হাতত ললা
তোমার রুদ্রবীণা
আনন্দময় না ছিল কোনো
আছিল নিমাত অরুণ জোনো
দিগন্তভেদি উঠিল বাজি
ভীষণ উদ্দীপনা
যিদিন তুমি হাতত ললা
তোমার রুদ্রবীণা।
—সৃষ্টিপাতনি : সূর্য্যকুমার

সেদিন আনন্দহীন বিশ্বভূমি ছিল 'নিমাত' অর্থাৎ নিস্তব্ধ। নাছিল সেখানে অরুণ বা 'জোন' অর্থাৎ চন্দ্র। চন্দ্র-সূর্য্যহীন সেই বিশ্বভূমিতে রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে সুরু হ'ল সৃষ্টিসঙ্গীত।

চমৎকার কবিতা!

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী। তিনি সুন্দরের কল্যাণের স্বপ্ন দেখেন··· তিনি 'সত্য শিব সুন্দর' সাধনাকে বাংলা আর বহির্বঙ্গীয় ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হ'তে এই সত্য-শিব-সুন্দর-সাধনা কেমন কবিজনশ্রদ্ধা লাভ করেছে তা দেখিয়েছি। সূর্য্যকুমারও "সুন্দরের সাম্রাজ্য স্থাপন" করতে চেয়েছেন "বিহু" কবিতায়। তিনি অন্যত্র বলেছেন—

—(আপোনসুর : নিমালি : সূর্য্যকুমার)

"সত্য যি সুন্দর যার অনন্ত যৌবন
তারেই সুবুত বহি পাতিল কানন"

ঐ

রবীন্দ্রনাথ সকল অপূর্ণতার মাঝখানে পূর্ণতার আবির্ভাব লক্ষ্য করেছেন। যে নদী মাঝপথে ধারা হারিয়েছে বা যে ফুল ফুটে উঠতে না উঠতে ধরণীতে ঝরে গেছে তার মধ্যেও সার্থকতা লক্ষ্য করেছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ সীমার পটভূমিকায় অসীমকে অনন্তকে বড় করে দেখেছেন। তিনি জানেন আনন্দ হ'তেই সব কিছু উদ্ভূত, আনন্দের দ্বারা পরিচালিত, আনন্দেই পরিসমাপ্ত···চতুর্দিকে আনন্দ। বাংলা দেশের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র আনন্দবাদের প্রতিক্রিয়াতে নিরাশাবাদের গান গেয়েছেন। তাঁর কাছে জগৎ মরুশিখা, মরীচিকা, মরুমায়া। তাঁর সুর স্বতন্ত্র। কিন্তু তা রাবীন্দ্রিক দর্শনের প্রতিক্রিয়াজাত বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না। রবীন্দ্র প্রভাবে যাঁরা সৃষ্টিতে সুন্দর দেখেছেন তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী। আর যাঁরা সৃষ্টির মাঝখানে সুন্দরকে দেখতে পেলেন না···আনন্দকে দেখতে পেলেন না তাঁরা রবীন্দ্র প্রভাবের প্রতিক্রিয়াজাত। হোমিওপ্যাথি যাঁরা করেন তাঁরা বলেন বটিকার প্রভাবে রোগ সেরে যায়, বটিকার প্রতিক্রিয়ায় রোগ বেড়ে যায়। এ-রোগ বাড়া ওষুধ ধরার সাক্ষাৎ প্রমাণ। বাংলার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যে রবীন্দ্র প্রভাবিত তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে রবীন্দ্র প্যারডি আর, শেষ বয়সে 'সায়ম'-এর রোমাণ্টিক-মিষ্টিক মনোভাব। অসমীয়া সাহিত্যের বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ দুবারার রচনার যে নৈরাশ্যবাদের সুর প্রাধান্য তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাবগত বিরোধ কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রভাব প্রতিক্রিয়ার কি যোগ নেই। তবে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণে আসে আমাদের। যেমন :—

সন্ধিয়াক বাট দেখুৱাই
সুরুযর শেষর কিরণে
হেপাহেরে ধরণীক চুমি
মার খায় পছিমর পিনে।
বাজি উঠে করুণ সুরেরে
বিদায়র পুরবী রাগিণী
শেষ হ'ল মিলনর মেলা
মলয়াই দিছেহি জাননী।
•　•　•　•
ধীরে ধীরে নামিছে আন্ধার
নাওখানি কঁপে বতাহত
সাজু হল নবীন পথিক
যা বলে নতুন বাটত।
বুকু পাতি লোৱা সুখ দুখ
কত শত চেনেহ বান্ধনি,
আমাদের অবহেলা কত
আরু কত অতীত কাহিনী।
—দূত হমুনিয়া : যতীন্দ্রনাথ

এ সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগ। সূর্য্যকিরণ সন্ধ্যাকে পথ (বাট) দেখিয়ে ধরণীকে বিদায় চুম্বন জানিয়ে পশ্চিমের দিকে (পিনে) চলে পড়ল। করুণ সুরে বাজল বিদায়ের পূরবী রাগিণী ··মিলন পালা শেষ হল এই বার্তাবহন করে এল বাতাস।

…নামল আঁধার বীয়ে। কঁপল বাতাসেত্তে নৌকা ; সাজল নবীন পথিক নবীন পথের যাত্রী, বুকে পেতে নিয়ে সুখ দুখ, কতশত স্নেহ বন্ধন, অনাদর অবহেলা, কত অতীতের কাহিনী।

আজ এই বিদায়ের বেলা কবির মনে পড়ে যায় অতীতের সকল কিছু—

আজি এই বিদায়ের দিনা
সকলোটি পড়িছে মনত
সকলোকে করিলো প্রণাম
নাও মোর চলিছে সোঁতও।

এত রবীন্দ্রনাথের বেলাশেষের গান। বিদায়ের এ পূরবী রাগিণী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবীণা হ'তে কত বার ঝঙ্কৃত হয়েছে। এখানে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুসারী।

যতীন্দ্রনাথ ডুবরার দুঃখ বাদ তাঁকে বারে বারে করুণ বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ করেছে…বারে বারে তিনি পরিদৃশ্যমান পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের গান গেয়েছেন। এমনি গানে তাঁর বিদেশী কাব্যপাঠের গভীর প্রভাব আর রবীন্দ্র কাব্যপাঠের ছায়াপাত ঘটেছে বলেই মনে হয়, উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে যতীন্দ্রনাথের "অতীতক ন যাবা পাহরি" কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :—

দূরত গরজে শুনা অনন্ত সাগর
পর্বত প্রমাণ ঢৌ তুলি
বাহু তোলা মরণর শেষ আলিঙ্গনে
চিন যাব নেবাথে সমূলি
পর্বত প্রমাণ ঢৌ তুলি

'দূর হ'তে শোনা যায় মরণ সাগরের গরজন, দেখা যায় শত তরঙ্গ বাহু উদ্যত ক'রে সে আসছে গ্রাস করতে'—এ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিহঙ্গেরও হয়েছিল কিন্তু 'দুঃসময়' কবিতার মধ্যে নূতন উৎসাহে জ্বলে উঠার আনন্দবাণীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অন্য পথ ধরেছে। আর যতীন্দ্রনাথের বিষণ্ণ কবি-চিত্ত পর্বত প্রমাণ ঢেউ তুলে যে-মরণ সাগর বাহুতুলে ছুটে আসছে তারই মাঝখানে শেষের সূচনা পেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতা পরবর্ত্তী অংশে Tennyson এর Crossing the Bar এর পথ ধরেছে :—

Sunset and evening star,
And one clear call for me ;
And may there be no moaning of the bar
When I put out to sea.

এরই সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন—

সন্ধিয়ার আকাশর সরু তরাটির
সাদরর শেষ আবাহন
সেউজীয়া প্রকৃতির কোমল কোলাত
খেলা মোর হল সমাপন
সাদরর শেষ আবাহন।

[সন্ধিয়ার—সন্ধ্যার ; সরু তরাটির—ক্ষীণ তারাটির ; সেউজীয়া—সবুজ ; কোলাত—কোলেতে]

৬

যতীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন অসমীয়া লিরিকের পূর্ণতা পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার রচনায় তেমনি অসমীয়া সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের বিচিত্র প্রকাশ। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া একাধারে কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক। যাঁদের হাতে কোলকাতা থেকে 'জোনাকি' পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৮৮৯ সালে আর যাঁরা বাংলা সাহিত্যের আদর্শে সেদিন অসমীয়া সাহিত্যে নূতন প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার (১৮৭১-১৯৪৬) বিশিষ্ট স্থান। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের গভীর যোগ ছিল আর বাংলার সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিরুৎসরের মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা পূর্ণভাবে লক্ষ্য করেছিলেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। এঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের, অন্তরঙ্গ উপাদান ও বহিরঙ্গ উপাদানের প্রভাব দেখা যায়।

বাংলা দেশে মধুসূদনের সনেট যে পথে চলেছিল সে পথে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করেন নি। তিনি অনেকটা সেক্সপীরীয় সনেটের ন্যায় চতুর্দ্দশপদী কবিতায় নিরঙ্কুশত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'সনেট' সাতটি মিত্রাক্ষর শ্লোকের গুচ্ছ। এবম্বিধ সনেট-এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হ'তে। রবীন্দ্রনাথকে প্রশস্তি নিবেদন করেছেন এই ধরণের ষোড়শপদী কবিতায় :

কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র কবীন্দ্র আজি অমর সভাত,
'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভা প্রকাশি ধরাত ;
কালিদাস পূজা ভাগ সম্ভোগি জীবন্তে
পুষ্প অর্ঘ্য পৃথিবীর লভি অযাচিতে।
সাদরর রবি বাবু—ভারত বিদিত—
প্রতিভা প্রভার গুণে পৃথিবী পূজিত ;
'সুমেরু কুমেরু' (৩) চুঁচি—'কণক আঁচল'—
'স্তন'রত্ন তাহা নিয়ে করিলা দখল।
ধর্ম্মা কিবা, বল কিবা, কিবা বাকী আরু ?
কি হেরে আদরি তব যোগ্য মান ধরো!
'অকণি' 'কণিকা' আরু 'ক্ষণিকা' ঠগত,
তোমারে চাহে কি চাই রচা নিলগত,
'জুরণি' আঁজলি ধরি আছোঁ পাতি হিয়া,
লোবাঁহি আসন রবি।—জীবন-সন্ধিয়া ;—
'লাখ-টকা' নবেলর বঁটা পূরণত,
কড়-ক্রা স্ত যোগ মাথোঁ। এই ওলগত।

৩। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া যে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' ধৃত 'স্তন' সম্বন্ধীয় কবিতা দুটি যে পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি "সুমেরু কুমেরু' চুঁচি" কথাটি ব্যবহার করেছেন ;…চুঁচি কথাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি এবং যতদূর স্মরণ হয় কুমেরুর কথা সেখানে উল্লেখ করেন নি। বাংলাতে 'চুঁচি' কথাটি প্রচলিত হ'লেও (সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'চুচুক' শব্দজাত) রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা যে ব্যবহার করা কেন সম্ভব নয় তা ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই…কারণ কথাটি বাংলায় অমার্জিত বলে মনে করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার উল্লিখিত কবিতা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ যোগ্য। প্রথমতঃ এই কবিতাটি লেখকের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাকে অনুপম ভাবে প্রকাশ করেছে শেষ কয়টি পংক্তিতে যেখানে তিনি বলছেন যে, কবিগুরুর জীবনসন্ধ্যাতে নোবেল পুরস্কারের লাখ টাকা দান করার পর এই সম্মানেতে (জগত) মাত্র (মাথোঁ) কড়া ক্রান্তি যোগ করা হল তাঁর অমূল্য অবদানের মূল্যায়নে। তিনি 'প্রতিভা-প্রভার গুণে পৃথিবী পুজিত;' দ্বিতীয়তঃ 'সাদরর রবি বাবু' কে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন ক'রেছেন তা 'বাল্মীকি প্রতিভা' ইত্যাদি গ্রন্থ ও 'গুন' ইত্যাদি কবিতা স্মরণের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। আর ইনি যে বাল্মীকি-কালিদাসের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন তাতে তিনি কেবল ভারত কাব্যক্ষেত্রে বৃহৎ ত্রয়ী বাল্মীকি-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রণতি করেছেন তা নয়, কালিদাসের কাব্য সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার কোথায় যে পূজার যোগ আছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর পর নিজের লেখা অন্তবিধ কবিতা 'জুবণি' 'অকণি' যে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা,' 'কণিকা'র "আকৃতিতে ("ঠগত") গঠিত তার ইঙ্গিত দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে 'তোমাকে আদর্শ (চানোকি) করে দূর থেকে (নিলগত) রচনা করেছি আমার কাব্য 'জুবণি'…আর দূর থেকে চেয়ে আছি ("জুবণি আঁজলি") শীতল অঞ্জলি ধরে হিয়া পেতে, তুমি আসন গ্রহণ কর কবি!"

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া যে "জুবণি" বা প্রাণ-জুড়ানো গান গেয়েছেন তার মধ্যে আছে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুজনিত ব্যথার ("লীলা") হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার গান। দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী হীরাবতী দেবীকে উৎসর্গ করেছেন তিনি গ্রন্থ—এই "জুবণি" মধ্যে 'কণিকা' শ্রেণীর কবিতা "অকনি" আর কিছু "চনেট" (সনেট) আছে। এই 'অকণি' আর সনেটের উদাহরণ নিচে দেওয়া হল। 'অকনি' যথা :—

(ক) **মিঠা আরু তিতা**

মিঠাই সঁহারি কয়, "তিতা হের তিতা,
অরুচি, ঘৃণিত, ত্যাজ্য, তোরে সতে মিতা!"
প্রত্যুত্তরে তিতা কায়ে দিলে গহীনাই,—
"মোকে স্মরি মাথোঁ তোক চিনে মোর ভাই।"

[হের—ওগো; সতে—সঙ্গে; গহীনাই—গম্ভীর ভাবে; মাথোঁ—মাত্র]

(খ) **টকা আরু কড়ি**

টকাই কড়িক নিন্দে, বুলি কণা কড়ি;
কড়িয়ে চুখিত তারে, টকা থাকে পরি।

(গ) **চুখিয়ার দান**

রজার অপার শক্তি, লাখ হীরা দান
চুখীয়ার চরা দান, একে মুঠি ধান।

[চরা দান—সেরা দান]

অসমীয়া সাহিত্যে সনেটের প্রথম প্রকাশ বোধ হয় মধুসূদন পথাবলম্বী হেমচন্দ্র গোস্বামীর কল্যাণে আর প্রধান প্রকাশ বোধ হয় পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার রচনায়। রবীন্দ্রনাথের সনেট হচ্ছে ঠিক সনেট নয়…কিন্তু তা যাই হোক রাবীন্দ্রিক সনেটের অনুকরণে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। নিচে তাঁর একটি এই ধরণের সনেট তুলে ধরছি এতে ছন্দের দিক হতে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ আর ভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের প্রতি আসামের যে মনোভাব তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। নিচের সনেটটি দেখুন :—

অসম আরু বঙাল দেশ

কোন সরু কোন বর, দুই বাই-ভনী,
অসম বঙাল দুয়ো যুঁজে কালগণি।
অসম যুক্তির বলে বয়সত বর
উঠন যেতিয়া তেঁও অস্থি বঙালর,
সাগরর তলি এরি পোনে জন্ম দিয়ে—
'নবদ্বীপ', 'মালদহ' নামে সাক্ষী দিয়ে।
অসম যেতিয়া মহাকাব্য রচনাত,
বঙাল ফুটাই কথা কব ন জনাত।
অসম জুরুলা যেবে ভাটী বয়সত,
পূর্ণ তেজে বঙ্গে আহি কয় অসমত,—
অস্তিত্ব তোমার নাই মোরে মূল ফুটো
ধরঁাহি জীবন মোতে পরজীবী লতা।
বুরঞ্জী বুকুত ধরা হিমাদ্রি সাগরে
স্মরি পুবণি সত্য হুমুনীয়া এরে।

—জুবণি : পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

কে ছোট (সরু) আর কে বড় (বর) আসাম না বাংলা? দুজনেই দীর্ঘকাল জন্মগ্রহণ করেছে যমজ (যুঁজে) তারা, দুইজনেই বোন…বড় বোন (বাই) আর ছোট বোন (ভনী)। যুক্তির বলে আসাম বয়সে বড়। সেদিন যখন তিনি ("অ-সম-ভূমি") পূর্ণ বিকশিতা (উঠন) তখন উঠল বাংলা দেশের কিছু অংশ সাগরের তল ছেড়ে প্রথম বারের (পোনে) মত…"নবদ্বীপ" "মালদহ" নামেই তার প্রমাণ। আসাম যেদিন বয়সের ভাঁটায় (ভাটী বয়সত) জীর্ণ সেদিন নবযৌবনা বাংলা এসে আসামকে পূর্ণ তেজে বলে, "তোমার অস্তিত্ব নেই, আমার মূল নিয়ে তুমি পরজীবী লতা রয়েছ বেঁচে।" ইতিহাস বুকে হিমাদ্রি সাগরে রয়েছে লেখা পুরাতন সত্য কাহিনী…কে প্রাচীন?

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া উপরের কবিতায় ছন্দের আদর্শ নিয়েছেন রাবীন্দ্রিক সনেট। কোথাও কোথাও তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে স্বকীয় চিন্তাধারাকে নূতন পথে প্রবাহিত করেছেন; সবাই জানেন রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে 'উর্মিলা'র প্রতি কবির ভাবোচ্ছাস অনুপ্রাণিত করেছিল হিন্দী কবি সুমিত্রানন্দন পন্তকে উর্মিলা'কে অবলম্বন করে মৌলিক কাব্য রচনায়। এখানে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া 'কাব্যের উপেক্ষিতা' উর্মিলার দিকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণের পর "উর্মিলা" সম্বন্ধে একটি সনেটে তার উপেক্ষিত রূপের পিছনে নূতন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। 'উর্মিলা' সনেটের মধ্যে তিনি বলেন :

সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, জয়মতী,
রম্ভা, মন্দোদরী, ভরা, সতী, লীলাবতী
সরলা, রুক্মিণী, উষা কত নারী ফুল
প্রকাশ্যে ফুলাই নর করিলে আকুল;
সুচতুর স্বর্গী কবি স্বর্গর কারণে
উর্মিলা পাহিটি থলে অর্দ্ধেক গোপনে।

[পাহিটি —ফুলের পাপড়ি]

এখানে কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ আর সেই দৃষ্টিতে নূতন আলোক দিয়েছেন বোধ হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডওয়ার্থের 'লুসি' যেমন ("এ ভায়োলেট বাই এ মসি ষ্টোন হাফ-হিডন ফ্রম্ দি আই") দৃষ্টির অর্দ্ধ অগোচরে এই নারী-পুষ্পটি ফুটিয়ে তুলেছেন স্বর্গের জন্য স্বর্গীয় কবি বাল্মীকি। নরকে বিহ্বল করার মত অনেক নারী-পুষ্প সাবিত্রী, দ্রৌপদী, পূর্ণ প্রস্ফুটিত···কিন্তু স্বর্গের জন্য অর্দ্ধেক দৃষ্টির গোচরে এসেই নেপথ্যে ফুটে উঠেছে উর্মিলা।

৭

'জোনাকি' যুগের কবিদের হ'তে আধুনিক কালের অনেক স্থানেই রবীন্দ্র প্রভাব পড়েছে। জোনাকি যুগের কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা সত্য শিব সুন্দরের জয়গানে বলেছিলেন :—

জ্ঞানময়, প্রেমময় প্রাণের ঈশ্বর
সত্য তুমি শিব তুমি অসীম সুন্দর।

এই সত্য শিব সুন্দরের সাধনা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সর্ব্বভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সাধনা প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি পাশ্চাত্য "The True The Good and The Beautiful"এর জিজ্ঞাসা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্য Romantic কবি Keate—Beauty-কে Truthএর সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেখেছিলেন। রোমান্টিক কবি প্রেমের ক্ষেত্রে যে রস-রহস্যমধুর প্রণয়লীলার মিলন-বিরহের পালা গান গাইছিলেন···তার সঙ্গে বৈষ্ণব ও সুফীর ভক্ত ভগবানের প্রণয়লীলার মিলন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেবতাকে প্রিয় আর প্রিয়কে দেবতা ক'রে তুলেছিলেন। এই ধরণের লৌকিক-অলৌকিক রস-রহস্যে ভরা প্রেমের কোমলকান্ত পদাবলী অসমীয়াতেও প্রতিধ্বনি তুলেছিল। হরিদয়াল পাঠক 'অর্চনা' কাব্যগ্রন্থে এই ধরণের যে সকল রোমান্টিক-মিষ্টিক গীতি কবিতা রচনা করেছেন তার কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল। 'আবাহন' কবিতায় হরিদয়াল পাঠক লিখেছেন :—

হৃদয় আসন পাতি, বহি আছোঁ মই,
মোর ক্ষুদ্র দেহ মন্দিরত
ক'ত তুমি? নাহি লাতো হে মোর দেবতা
ক'ত তুমি রলা আঁতরে।

আমি হৃদয়-আসন পেতে আছি বসে···আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-মন্দিরেতে কোথায় তুমি? হে মোর দেবতা তুমি এলে না, কোথায় রইলে অন্তরালে।

'কোন দিন' কবিতায় তিনি তাঁর গীতের অঞ্জলি নিয়ে বলেন, "ওগো (হেরা) দয়াময়, কোন দিন তোমাতে আমাতে মিলন হবে?"

কোন দিন? কোন দিন? হেরা দয়াময়
তোমার বিরাট দেহে মোর হব লয়।

'লীলা রূপ' কবিতায় বলেন :—

ইকি! হে দয়ার সিন্ধু
তোমার বিচিত্র লীলা
ক্ষণে আনন্দর ঢউ
ক্ষণে বিষাদর মেলা।

'তুমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত মনে আসে। "দেবতা তুমি ধ্রুবতারা···অকূল সাগরে জীবন-তরণী দিশাহারা। সেই জীবন-তরণীতে তুমি কর্ণধার (গুরিয়াল) হ'য়ে ঝড়ের মধ্যে (ধুমুহা বতাহে) আমার ভেলাখানি পার করে দাও" :—

তুমি ধ্রুবতারা মোর জীবন নাঁওর
অকূল সাগরে দিশহারা;
তুমি গুরিয়াল হই ধুমুহা বতাহে
ভেলেখন মোর পার করা।

—তুমি : হরিদয়াল পাঠক

উজ্জ্বল সকালে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কী-উজ্জ্বল এ সকাল ছড়ানো নরম সোনা রোদে,
কী-উজ্জ্বল আকাশটা—সবকটি উড়ন্ত পাখিকে
স্বপ্নের প্রতীক বলে মনে হয়। বাহিত চারদিকে
নিরুচ্চার কলরব অহেতুক সরল আমোদে।

কবোষ্ণ খুশির স্পর্শ এলোমেলো চপল হাওয়ায়;
রোদ্দুর পালকে মাখছে কতগুলি শালিখ, চড়ুই—
ঘাসে ঘাসে কি যে খুঁটছে। প্রজাপতি, অসংখ্য ফড়িং
উড়ছে—কাঁপছে রোদ মিনে করা অভ্রের ডানায়।

হঠাৎ সে কোলাহল থেমে গেলে স্তব্ধতাকে ছুঁই;
সামনে সবুজ দোলে কলাবতী প্রগাঢ় রক্তিম।

মিণ্টো অধ্যাপক ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

একান্ন বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বহিতেছে। কিন্তু নানা কারণে সেই বৎসরটি ছিল বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একটি দুর্বৎসর। ১৯০৮ অব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে চরমপন্থী দলের নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পর আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন। বৎসরের শেষ দিকের একই দিনে কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান সেনাপতি পুলিনচন্দ্র দাস, ভূবেশচন্দ্র নাগ প্রমুখ নয় জন দেশকর্ম্মী ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে নির্বাসিত হইয়াছেন। বাংলার নানা স্থানে বহু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা চলিয়াছে। সমগ্র বাংলায় একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

এমনিই সময়ে বাৎসরিক বিলাতী পণ্য বর্জন উৎসবের দিন আগত হইল। পূর্ব-পূর্ব বৎসরের মত এবারও ৭ই আগষ্ট কলকাতায় এবং অন্যান্য সহরে "বিলাতী পণ্য বর্জন উৎসব" অনুষ্ঠিত হইবে। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশকর্মী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তখন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সহকারী-সম্পাদক। তিনি ছিলেন তখন সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তখন পর্য্যন্ত তিনি ইউরোপে যাইয়া ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তিনিই, সে বৎসর ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরামর্শ ক্রমে কলিকাতার উৎসব সম্পন্ন করার জন্য বিধি ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই খবরে আমরা সঞ্জীবনী পত্রিকার অফিসে যাইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের নিকটে অবগত হইলাম। শ্রীযুক্ত মিত্র আমারই সহপাঠী, তিনি আমারই সঙ্গে তৎকালে বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান সায়ন্স এ্যাসোসিয়েশনে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেন। আমাদের সহপাঠী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, যিনি কিছুকাল 'বাঁশরী' পত্রিকা চালাইয়াছিলেন এবং পরে বিশেষ উৎসাহের সহিত "রবিবাসর" চালাইতেন। তিনি এখনও ডক্টর বোসেজ লেবোরেটরীতে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। সায়ন্স এ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ সোৎসাহে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিলাতী পণ্য বর্জন উৎসব বিরাট ভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কতিপয় ছাত্রও বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত বর্ত্তমান "বসুমতী" অফিস হইতে প্রত্যহ আসিয়া আমাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, ৭ই আগষ্ট বিকাল সাড়ে চারটায় গ্রীয়ার পার্ক বর্ত্তমান লেডিজ পার্কে এক সভা হইবে। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আদেশ দিয়াছেন যে, সভাতে যাওয়ার জন্য কোন মিছিল গঠন করিতে পারিবে না, বড় বড় প্রাচীরপত্র, পুষ্প-পতাকা ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে না। তিনি জানাইয়াছেন যে, সভা আহ্বান করার জন্য যে সকল চিঠি-পত্র বা হাণ্ডবিল মুদ্রিত হইবে তাহার কোনটিতেই "বিলাতী পণ্য বর্জন উৎসব" কথা কয়টি মুদ্রিত থাকিবে না। উহাদিগকে এ বৎসর কেবল 'Seventh August celebration" বলিয়া মুদ্রিত করিতে হইবে। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে এই আদেশের সংবাদ সদুঃখে বিবৃত করিলেন। আমরা প্রত্যহ দুইবেলা সঞ্জীবনী অফিসে যাইয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করি। উক্ত অফিসেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি কিছুকাল পূর্বে আলিপুর হইতে বোমার মামলায় নিষ্কৃতি পাইয়া তাঁহার মাসীমাতা লীলাবতী মিত্র মহাশয়ার আশ্রয়ে ছিলেন। আমাদের শলাপরামর্শ কালে তিনিও মৃদুভাষায় কিছু কথাবার্ত্তা বলিতেন। শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে আমরা উৎসাহপূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্থির করিলাম, আমরা যে ভাবেই হোক কলিকাতার ছাত্রাবাসগুলি হইতে ভিক্ষালব্ধ অর্থ সংগ্রহ করিয়া অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য ব্যবস্থা করি।

আমাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সুধীরচন্দ্র বসু, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এবং তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিটি কলেজের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র সুস্থিরকুমার বসু। সুধীর বাবু বলিলেন তিনি গড়পার রোডে এবং মাণিকতলায় যাইয়া কয়েকজন অশ্বপালক হইতে পনের বিশটি করিয়া চালকসহ অশ্বের ব্যবস্থা করিবেন। প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। আমরা জোড়াসাঁকোর নিকটে সুলভ প্রেসে যাইয়া কয়েক সহস্র "Double demy" প্রাচীরপত্রের ব্যবস্থা করিলাম।

সুকুমার মিত্র তাঁহাদের সঞ্জীবনী প্রেস হইতেই কয়েক সহস্র নাম্রি হাণ্ডবিল ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিবিধ প্রেস হইতে দুই টাকা, এক টাকা করিয়া আমরা প্রায় শতাধিক টাকা চাঁদা তুলিলাম। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের খুব সতর্ক ভাবে কাজ করিতে হইবে, কারণ ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুষ্ঠানটি কোন রকমে সম্পন্ন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব আছেন।

আর একটি নতুন উপদ্রব উপস্থিত হইল যে, কোথা হইতে কে মিছিল চালনা করিয়া গ্রীয়ার পার্ক পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। আমরা তৎকালের ছোট-বড়, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, বহু তথাকথিত দেশকর্মীকে এ কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিলাম। তৎকালের কোন কোন রাজ্য নায়ক 'সঞ্জীবনী' অফিসে যাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন যে, তিনি গভর্ণমেণ্টের চক্ষে যেরূপ শূলসদৃশ আছেন, তাহাতে তাঁহার মিছিলে যোগ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

একদিন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"তোমরা একটু চেষ্টা করিলে শ্রীঅরবিন্দ মিছিলের ভার নিশ্চয়ই লইবেন।" কিন্তু কথাটি যেন প্রকাশ না হয়। ১লা আগষ্ট হইতে আমাদের ৪০।৫০ জনের একটি দল প্রাতঃকালে ৫টার সময়েই স্বদেশী সংগীত গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সুধীর বসু, সন্তোষ বসু ও সুকুমার মিত্র মহাশয় অশ্বারোহীর মিছিলকারিগণের সাজসজ্জা, পুষ্পপতাকা, প্রভৃতি ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের আদেশে "সূর্য্যাস্ত আইন" বলিয়া সন্ধ্যা পাঁচটার পরই সভাসম্মিলন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ ছিল। প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময়ে বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট ও সার্কু্লার রোডের মোড়ে দেশভক্ত কবি বরিশালের লখুটিয়ার জমিদারগত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতে। আমরা বুদ্ধি পরামর্শ লওয়ার জন্য সকালে সন্ধ্যায় সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন বরিশালের জাতীয় সংগীত গায়ক ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী গীত জাতীয় গীতের কোন ব্যবস্থাও করার ভূবেন্দ্র বাবুর অভিপ্রেত নয়, এমন কি সভাধিবেশন যেন বিনা সঙ্গীতে আরম্ভ হয়, ইহাও ভূবেন্দ্রনাথের অনুজ্ঞা ছিল।

মিছিল চা... কে হইবেন? একদিন প্রাতঃকালে আমরা উৎসাহী কার্য্যনির্ব্বাহক ...গণ সঞ্জীবনী অফিসে যাইয়া শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতেছি, তখন দুইজন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীঅরবিন্দের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে বুঝাইতেছিলেন যে তাঁহার পক্ষে সভার উদ্যোগ আয়োজন, মিছিল পরিচালনা এমন কি সভাতে যোগদান করাও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাগুলি নীরবে সহ্য করিলেন না। তিনি অকস্মাৎ বলিলেন, দীর্ঘকাল আমাকে গ্রেফতার অবস্থায় রাখিয়া তারপর ততোধিক দীর্ঘকাল আমার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মামলা পরিচালনা করিয়া সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাকে মামলা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এখন কি আমাকে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়া নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে হইবে? আমার পক্ষে স্বাধীন কর্ম করা এমন কি স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করার কি স্বাধীনতা থাকিবে না? আমি আপনাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম, প্রয়োজন হইলে আমি মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সভা পর্য্যন্ত যাইব, সভাধিবেশনে উপবিষ্ট থাকিয়া সভাপতির ভাষণ এবং অনুজ্ঞা নীরবে শুনিব।

আমরা সাহ্লাদে দ্রুতগতিতে দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবাদটি বিজ্ঞাপিত করিলাম। আমাদের হৃদয়ে উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বেই শ্রীঅরবিন্দ মিছিল পরিচালনা করিবেন এই সংবাদসহ সহস্র সহস্র হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়া ৭ই আগষ্ট অপরাহ্ণ তিনটার মধ্যে সিনেট হলের সম্মুখে যাইয়া দেশবাসীকে মিছিলে যোগদান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম।

উৎসবের দিনে ৩০।৪০টি সুসজ্জিত অশ্বের উপরে পাগড়ী বাঁধা চালকগণ পতাকা হস্তে বসিলেন। তিনটার মধ্যেই কলেজ স্কোয়ারের চারিদিক, হ্যারিসন রোড হইতে কলুটোলা পর্য্যন্ত রাস্তার দুই দিকে শত শত ছাত্র যুবক আগষ্ট মাসের দারুণ রৌদ্র অবজ্ঞা করিয়া যোগ দিল। ঠিক তিনটা বাজিতেই শ্রীঅরবিন্দ সঞ্জীবনী অফিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমরা বিপুল উৎসাহী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম পাড়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তির সান্নিধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা আগে চল এবং আমি মিছিলের পশ্চাতে থাকিব।" কিন্তু সত্বরই সুধীর বসু, সুকুমার মিত্র এবং অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী কর্মীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাঁহাদের দ্বারা চালিত হইয়া অশ্বারোহীদিগের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পশ্চাতে ছিল শতাধিক সাইকেলচালক। সুকণ্ঠ সুস্থির বসু গাহিতেছেন "অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি।" পশ্চাৎ হইতে আর একজন গাহিতেছিল—

"আমরা যা করছি, তা করবই করব।
থাক না কেন কাঁটা তরু······করব।"

শ্রীঅরবিন্দের মিছিলে যোগদানের দৃশ্য সহস্র সহস্র দেশবাসী মিছিলের কলেবরপুষ্ট করিয়া চলিল। মিছিল ধীরে ধীরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া গ্রে ষ্ট্রীটে যাইয়া উপনীত হইল। তারপর মিছিলটি ঘন ঘন বন্দে মাতরম্ ধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইয়া আপার সার্কুলার রোডে যাইয়া পৌঁছিল। তথা হইতে মিছিল যখন যাইয়া গ্রীয়ার পার্কে উপনীত হইল তখন সভার স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দকে স্বচক্ষে দেখিয়া সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী বিপুল উৎসাহে উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপরাহ্ণ ঠিক সাড়ে চারটায় ভূবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যাইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সভার চতুর্দ্দিক হইতে উৎসাহী যুবকগণ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীঅরবিন্দকে বলিতে দিন, আমরা শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ শুনিতে আসিয়াছি।" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীঅরবিন্দকে হাতে ধরিয়া নিয়া সভাপতির আসনের পাশে উপবেশন করাইলেন। তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রভৃতি দেশভক্তগণ। বসু মহাশয় বিনা ভূমিকায় কাহারও দ্বারা প্রস্তাবিত না হইয়াই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং অগোণেই তাঁহার শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ করা ভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ ডাইনে বামে এবং সম্মুখের শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অলিখিত ভাষণ হইতে নানা তথ্য উদ্ঘাটনে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষ তিনি তাঁহার ঘড়ি দেখিয়া সময়ের আন্দাজ করিয়া বক্তৃতা প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। দুই তিন মিনিট বাকী থাকিতে তিনি যখন "সভাভঙ্গ হইল" বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন সমাবেশের সকল লোক অধৈর্য্যভাবে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "শ্রীঅরবিন্দ বাবুকে বলতে দেন "তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরিয়া পাইলেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীঅরবিন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি বলুন।" ঘন ঘন করতালি এবং চিৎকারের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনারা আমাকে ভাষণ দিতে বলিতেছেন কিন্তু সভাপতি মহাশয় সভাভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সুশৃঙ্খল ভাবে সভাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যান।"

সভা বন্ধের পরে

সভা বন্ধের পরে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন, আমরা যেন অগোণে কবিবর দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হই। [illegible] আমরা বোধ হয় ১৫।২০ জন ছিলাম। অত্যন্ত [illegible] কবিবর আমাদের সফলতার জন্য আমাদিগকে বিশেষ [illegible] এবং বলিলেন, "আপনারা আমার গৃহে জন্ত জাতীয় উৎ[illegible] সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবেন।"

বিজ্ঞান ও গণিত পাঠনের আধুনিক পদ্ধতি

শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) হিউরিষ্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method):—

পদ্ধতিটির নামই অর্থ বলিয়া দেয়। Heuristic কথার অর্থ 'আমি আবিষ্কার করি।' South Kensington এর রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এইচ, ই, আরমষ্ট্রঙ্গ (১৮৮৮-১৯২৮) এই পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা। আলোচ্য পদ্ধতিতে ছাত্রকে যথা সম্ভব আবিষ্কারকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা হয়—অর্থাৎ ছাত্র নিজেই সমস্ত আয়োজন করিয়া পরীক্ষা করে এবং তাহার ফলাফল দর্শন করিয়া নিজের মনোমত সিদ্ধান্ত গঠন করে। অবশ্য তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই একটি নির্দ্দেশনামা দেওয়া হয়। পরীক্ষাকালে নির্দ্দেশ মত তাহার খাতায় পরীক্ষা-প্রণালী, পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার ফলাফল টুকিয়া লয়। অতঃপর উক্ত টীকাগুলি একত্রিত করিয়া যুক্তি সহকারে চিন্তা করিতে থাকে এবং পরীক্ষা হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহাও বিবেচনা করে।

আপাতদৃষ্টিতে পদ্ধতিটি যতখানি আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে ততখানি কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হয় না। প্রথমেই ধরা যাক্ ইহার নাম। প্রকৃতপক্ষে কি ছাত্র কোন জিনিষ বা তথ্য আবিষ্কার করিতেছে? তাহাকে পরীক্ষার জন্ম নির্ব্বাচিত সমস্ত যন্ত্রপাতি আগাইয়া দেওয়া হইতেছে, পরীক্ষা প্রণালীর যাবতীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে এবং পর্য্যবেক্ষণ হইতে বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্ম যথাযথ ভাবে পরিচালিত করা হইতেছে। যদি পদ্ধতিটিকে 'আবিষ্কারের' পরিবর্ত্তে 'অনুসন্ধান করা' বলা হইত, তাহা হইলে নামের যাথার্থ্য কিয়ৎপরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকিত।

একই নির্দ্দেশ সকলের প্রতি সমান কার্য্যকরী হয় না অর্থাৎ সকলে সমান ভাবে অনুধাবন করিতে পারে না। ইহা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পরীক্ষাগারে একই নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া সকল ছাত্রের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক আয়োজন ও পরীক্ষার প্রস্তুতিকরণ অভিন্ন হইবে ইহাও আশা করা যায় না। তাহার জন্ম প্রয়োজন প্রতিভাশালী বিজ্ঞান-শিক্ষকের এবং তাঁহার প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা যদি অধিক হয় (যাহা আমাদের বিদ্যালয়গুলির সাধারণ অবস্থা) তাহা হইলে একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রতি ছাত্রকে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করা সম্ভব নহে। ফলে আলোচ্য পদ্ধতির পাঠন ব্যাপারে কার্য্যতঃ ব্যবহার হইয়া উঠে না। ইহা ছাড়াও একটি পাঠ্যবিষয়ের জন্ম বহু পরিমাণে সময়ের অপব্যয় হয়; ফলে পাঠ্য-তালিকায় বহু প্রসঙ্গই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচিত হয় না। পরীক্ষার সফলতা অর্জ্জনের পক্ষে এই পদ্ধতি অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

মুখ্যতঃ, এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিলে পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশেষ শিক্ষা লাভ হয়। তৎপরতার সহিত সুষ্ঠু ভাবে যন্ত্রপাতি পরিচালনে দক্ষতা অর্জ্জন করা যায়। অবশ্য প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করার নৈপুণ্যও লাভ করা যায়। অবশ্য এ পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জ্জন গৌণ বিষয়। কিন্তু যত্ন সহকারে ও আন্তরিকতার সহিত এই পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইলে শ্রম সহিষ্ণুতার ও সর্ব বিষয়ে ধৈর্য্য সহকারে পর্য্যবেক্ষণের অভ্যাস অনুশীলন করা হইয়া যায়। পরিণামে স্বাধীন ভাবে বুদ্ধির প্রয়োগ ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করার শিক্ষা লাভও ঘটে।

বিজ্ঞান সত্যের সন্ধান দেয়। ছাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চা করে সেই সত্যের সন্ধান করিবার জন্ম। স্বাধীন ভাবে কোন সত্য বা মূল তথ্য তাহার পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তাহাতে শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য্য। সুতরাং পদ্ধতির নাম ছাত্রের নিজের সম্বন্ধে একটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করে। ফলে এই মিথ্যা তাহার জীবনে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। নামটি যদি 'আবিষ্কারের' পরিবর্ত্তে 'অনুসন্ধান' করিয়া ছাত্রের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি অনুপ্রবিষ্ট করা হইত—তাহা হইলে ছাত্রও ভুল ধারণা পোষণ করিত না এবং বিজ্ঞান পাঠনের উদ্দেশ্যও সাফল্যমণ্ডিত হইত। পরিশেষে, উক্ত পদ্ধতি দ্বারা পাঠন প্রায়শঃ রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানের অন্যশাখাগুলি সম্বন্ধে ছাত্রগণ স্বভাবতঃ অজ্ঞ থাকিবে। ফলে বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপের এমন কি উক্ত দুই শাখারও প্রকৃত পরিচয় লাভে বঞ্চিত হয়।

(২) বক্তৃতা কক্ষ (Lecture Theatre):—

পূর্ব্ববর্ত্তী পদ্ধতি আমাদের মনকে এমন এক পর্য্যায়ে উপনীত করিয়াছে যে, সে স্থান হইতে আর আমরা বক্তৃতা কক্ষের কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করিতে পারি না। সবখানি কার্য্যই যদি ছাত্রদের দ্বারা কর্ম্মের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় তাহা হইলে শিক্ষকের বক্তৃতা করিবার অবকাশ কোথায়? যদিও বা কিছুর প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পরীক্ষাগারের কার্য্যের পরিপূরক হিসাবেই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু কাজের মধ্যেও বহু প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রত্যেকটি করণীয়ের কারণ, প্রয়োজনীয়তা, পারম্পর্য্য ইত্যাদির সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্যম্ভাবী। সেই অস্পষ্টতা দূরীভূত করিবার জন্ম বক্তৃতা অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বক্তৃতাকক্ষ নির্ব্বাসিত করা হয় নাই।

এই বক্তৃতাকক্ষকে সম্বল করিয়া আর এক পদ্ধতির প্রচলন আছে। সেখানে পরীক্ষাগার নাই। শিক্ষকের টেবিলই পরীক্ষাগারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। ছাত্রগণ সেখানে হাতে কলমে কাজ করে না। কোন Demonstrator সেখানে শিক্ষকের বক্তৃতার যাথার্থ্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্ম উপস্থিত থাকেন না। শিক্ষক মহাশয় সেখানে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখান। ছাত্রদের দ্বারা যন্ত্রপাতি হাতে দিয়া কার্য্য সম্পাদন করেন না।

কারণ অধিকাংশ সময় পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করা ছাত্রদিগের সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া পড়ে। নূতন তথ্য ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্যই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখান, তাঁহার বক্তৃতার সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার জন্য নয়। কিন্তু সবটাই তিনি নিজে করেন না। ছাত্রদের সহযোগিতায় পাঠ্যবিষয় লইয়া অগ্রসর হন এবং প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের ক্রমবিকাশের সহায়তা করেন।

পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি পরিচালনে জড়িত হইয়া না পড়ায় ছাত্রগণের মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় না ; ফলে শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হইতে সমর্থ হয়। শিক্ষক মহাশয় যেমন অধিকতর কঠিন পরীক্ষাগুলি নিজে সম্পাদন করেন, সেইরূপ পরীক্ষা সহজসাধ্য হইলে তিনি মাঝে মাঝে ছাত্রদের উপর সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। ইহাতে ছাত্রদেরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভ্যাস লাভ হয় অথচ পরীক্ষার জটিলতাজনিত ভুলের অবকাশ ততখানি থাকে না। জার্মাণগণ এইপ্রকার পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক ও তাঁহাদের ধারণা বিজ্ঞান পাঠনের অনুরূপ পদ্ধতিই তাঁহাদের জাতির উন্নতির কারণ। অপর পক্ষে আমেরিকানগণ সর্ব্বসময় হাতে কলমে কাজের পক্ষপাতি। সেই জন্য তাঁহারা পূর্ব্বের পদ্ধতিই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত করেন। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ছাত্রগণ কয়েকটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করে এবং পরে তাহা হইতে একটি সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। তাহাদের পদ্ধতিকে Heuristic না বলিয়া Inductive (নিয়মানুমানজনক) বলা উচিত। তাঁহাদের ধারণা তাঁহাদের জাতির উন্নতির মূলে রহিয়াছে Inductive পদ্ধতিতে বিজ্ঞান পাঠন।

আমাদের মনে হয়, এই দুই পদ্ধতির সুযোগ্য সমন্বয়ই হইবে আদর্শ পদ্ধতি। অবশ্য এই দুটি পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে আমেরিকাতে। উদ্দেশ্য তাহাদের প্রচলিত পদ্ধতি উৎকৃষ্ট, না জার্ম্মাণদিগের পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য তাহার বিচার করা। পরীক্ষার ফল কিন্তু আমেরিকানদিগের পক্ষে যায় নাই। প্রায় একই বয়সের ও সমবুদ্ধির ছাত্রগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া দুই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। একদল শুধু শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য লইয়া নিজেদের হাতে পরীক্ষা করিয়া শিখিয়াছে ; আর অপরদল যন্ত্রপাতিতে হাত না দিয়াই শুধু শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিয়া শিখিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, যাহারা বক্তৃতা মাধ্যমে শিখিয়াছে তাহাদের জ্ঞান অপর দল অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু আরও কিছুকাল পরে অতর্কিতভাবে দুই দলকেই পূর্ব্বের পাঠ্য বিষয়ের উপর নূতন প্রশ্ন করিয়া দেখা যায় পরীক্ষাগারের পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রদল পদ্ধতির খুঁটিনাটি অধিকতর স্মরণে রাখিয়াছিল ; কিন্তু অপরদল অপেক্ষা জ্ঞানে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এদিকে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষিত ছাত্রগণ নব নব সমস্যার সমাধানে অধিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাহারা এমন কি যন্ত্রপাতি পরিচালনে অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিল।

ইহা হইতে কোনরূপ মন্তব্য আপাততঃ বাঞ্ছনীয় নয়। বহুবার পরীক্ষা করিয়া এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল একত্রিত করিতে হইবে। পরে যুক্তি সহকারে বিচার করিয়া যথাযথ সিদ্ধান্ত করাই বোধ হয় সমীচীন হইবে।

পঁচিশে বৈশাখ

মালতী সেনগুপ্তা

আজি হতে শত বর্ষ আগে
একদিন খর দৃপ্ত রুদ্র দেবতার
রৌদ্রদহে নিকষিত এ স্বর্ণসীতার
তপোশুদ্ধ তপ্ত বক্ষ ভাগে।

পুঞ্জীভূত জ্যোতি ভাতি শুভ্র তনুময়ে,
দেখা দিল অমৃতের ভাণ্ডখানি বয়ে,
নব স্বপ্ন মুগ্ধপ্রাণ কবি।

লাবণ্য লক্ষ্মীর বরদৃষ্টি রূপ রাগে,
মধু ছন্দ প্রভাতের নব কণ্ঠ-বাকে
দেখা দিল নবযুগ ছবি।

সর্ব্ব জীর্ণ ক্লিষ্ট জরা শুষ্ক রুক্ষতায়
সর্ব্ব পাপে খর্ব্ব হীন দৈন্য ব্যর্থতায়,
বজ্রাঘাতে সর্ব্বে মৃত্যুক্ষয়ে,
দগ্ধ করি, ভস্মরাশি নিঃশেষে ফুরায়ে
নব কান্তি রসোচ্ছল কথিকা কুড়ায়ে।

দেখা দিল বীণা-হস্ত সুরেরি সুন্দর,
ভরি দিয়া ধরণীর তৃষিত অন্তর,
ছন্দোময়ী বর্ণ রূপায়নে।

মাধবীর বাতায়নে, আম্র কুঞ্জ বনে,
দাক্ষিণ্যের সে দক্ষিণ বায়ুর ব্যজনে,
পত্রাবলী রচে গীতায়নে।
নেমে এল নব সৃষ্টি নব আশা-ভাষা
রাখী বাঁধে প্রাণে প্রাণে প্রেম ভালবাসা।
বঙ্গ তীর্থে পঁচিশে বৈশাখ,
দেবশিশু পদচিহ্ন-পুণ্য তপোবনে
মহা জীবনের শুভ উদয় স্মরণে,
মহাকাল বক্ষে বাজে শাঁখ।
প্রণাম তোমার ওগো তীর্থঙ্কর আজ,
ফিরে এস ক্ষয়ক্ষীণ ভগ্ন-বঙ্গ মাঝ,
নিয়ে এস মূক কণ্ঠে ধ্বনি
আত্মদ্রোহী আত্মমাঝে আন প্রাণ সাড়া
আত্মজনে বক্ষে ধরি ধন্য হোক্ তারা
নিয়ে এস নব উন্মাদনী।

ছদ্মনামা

অজাতশত্রু

ঠিকই ধরেছেন, আবার এক ছদ্মনামা লেখকের পাল্লায় পড়েছেন আপনি। আবার একটি বেনামী, বেদামী লেখা পড়তে শুরু করেছেন। বেদামী—অর্থাৎ কানাকড়িও মূল্য নেই এই লেখার।

অতএব, পড়বেন না। পাতা উল্টে চলে যান, কোনও নামী লেখকের দামী লেখা পড়ুন। তেমন লেখার অভাব নেই এই কাগজে, প্রচুর পাবেন।

তবুও পড়ছেন? স্পষ্ট ক'রে বলার পরও নষ্ট করছেন সময়। বিশ্বাস করছেন না কথা? সত্যি, পড়বার মত, জ্ঞান অর্জন করবার মত কোনও কিছু নেই এ লেখায়।

আবার পড়ছেন? এত করে বলেও দেখছি কিছু হচ্ছে না আপনাকে। এতটুকু মনের জোর নেই দেখছি আপনার। যদি থাকত এখনও বন্ধ করতেন পড়া। আমি লিখছি বলেই যে আপনাকে পড়তে হবে এমন কোনও কথা নেই। উল্টে আপনি পড়ছেন, পড়ে চলেছেন বলেই যে আমাকে লিখতে হচ্ছে এমনও হতে পারে। আপনি পড়া থামালেই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে লেখাও থেমে যাবে আমার।

আপনি দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা। নিজেও জ্বলবেন, আমাকে জ্বালাবেন। এই লেখার সঙ্গে আমাকেও শেষ না ক'রে ছাড়বেন না। আর শুধু তাই নয়—ফোড়ার উপর ফুস্কুড়ি—পড়ছেন আর ভাবছেন এ-ছদ্মনামার অন্য কোনও লেখা কোথাও পড়েছেন কিনা আগে!

সত্যি, সাহিত্যের বাজারে ছদ্মনামাদের ভীড় ইদানীং যা বেড়েছে তাতে জ্ঞানপাপীর কাঁছা যথাস্থানে এঁটে চলা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য কাগজের হিসেব ছেড়ে দিন, শুধু এই মাসিক বসুমতীতেই দেখুন না, গড়ে বছরে একটি ক'রে ছদ্মনামার আবির্ভাব হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, আপনি জানেন না। আমিও না। আপনি তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেননি কখনও। আমিও নয়—মানে, এই সেদিন পর্যন্ত।

ছদ্মনামা এক লেখকের একটি বই পড়তে পড়তে সেদিন হঠাৎ বড় শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম লেখকের প্রতি। বইটি শেষ করে হঠাৎ প্রবল বাসনা হল লেখককে একটি চিঠি লেখবার এবং যেমন হওয়া অমনি কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলুম লিখতে।

কিন্তু চিঠির শুরুতেই লেগে গেল গোলমাল। কী ভাবে সম্বোধন করব? কী লিখে? মানে কাকে লিখে—এক লেখক না লেখিকাকে? ছদ্মনামা লেখক যে আসলে ছদ্মনাম্নী কোনও লেখিকা নন, বুঝছি কী করে? যে-ভাবে নায়িকার মনের গভীরের নির্লজ্জ আশা আকাঙ্ক্ষার নির্ভুল প্রকাশ করা হয়েছে বইতে এবং যে জন্যে পড়তে বারবার মনে মনে বাহবা দিয়ে উঠেছি লেখককে (?)—সেটা বোধহয় একজন লেখিকার পক্ষেই বেশি স্বাভাবিক।

সঙ্গে সঙ্গে আবার খটকা লাগল মনে। লেখিকার পক্ষেই যেটা স্বাভাবিক মনে করছি—একটু ভেবে দেখতে গেলে সেটাই কী সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়?

নারী চরিত্রের ও মনের যে সব নিহিত গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে বইটিতে—সেটি কোনও নারী করবে বা করে উঠতে পারবে কি? তা ছাড়া, নিজেদের মনস্তত্ত্ব ও অবচেতনা সম্বন্ধে কোনও নারী যে ঐ রকম [illegible]—সেটা কল্পনা করাও মুস্কিল

একটু মুস্কিল। কিন্তু মুস্কিলটুকু মনের মধ্যে আসান ধরে নিলেও প্রথম প্রশ্নটা থেকে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত ক'রতে হল আমাকে—না, এ কোনও লেখকের লেখা—অন্তর্দৃষ্টি যার কবির এবং নারীদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি যার প্রকৃত গভীর।

কিন্তু তবু শান্তি নেই। আবার খটকা লাগল একটা।

ছদ্মনামটাই এবার খটকার কারণ। ছদ্মনাম দিয়েই কি তাহলে কোনও লেখিকা আত্মপ্রকাশের আড়ষ্টতা ও লজ্জা থেকে মুক্ত হ'তে চেয়েছে?

সেক্ষেত্রে আবার ভাববার—আদৌ তার লেখবার দরকারই বা কী ছিল তাহলে?

ভাবতে ভাবতে ক্রমশ অথৈ থেকে অথৈতর চিন্তায় ডুবতে লাগলুম আমি। আর যত তলিয়ে যেতে লাগলুম, তত বিরক্ত বোধ করতে লাগলুম ছদ্মনাম নেওয়া এই ফ্যাশানের উপর।

সত্যি, লিখতে বসে ছদ্মনাম নেওয়ার মানে হয় কোনও? চুরি, ডাকাতি বা রাহাজানি কিছু করছে না কেউ যে পরে নাম ধরে হুলিয়া বার করে ধরে নিয়ে যাবে? আর গেলেও ছদ্মনামে—নাম ভাড়িয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ক'রেই কি রক্ষা পাচ্ছে সবাই? খবরের কাগজে বিনয় চক্রবর্তী ওরফে গোবিন্দ সাহা ওরফে কালু শেখ ওরফে জন ম্যালুস-এর এবং দের (গৌরবে বহুবচন) নাম ছাপা হচ্ছে না?

তবে ছদ্মনাম নেয় কেন লেখকেরা? নিজের নামে লিখতে কেন আটকায় তাদের? বা কিসে? খবরের কাগজের আইন আদালতের পাতায় কীর্তিত দাগী আসামী কিছু তারা নয়।

অন্তত: সকলে নয়!

কিম্বা হয়তো তাই। ফেরারী হয়তো কেউ কেউ। সুযোগের অভাবে গুরুতর অপরাধ কিছু হয়তো আর ক'রে উঠতে পারছে না কিন্তু অপরাধ প্রবণতা যায়নি। আর তাই লিখছে। ছদ্মনামে লিখছে—পিতৃদত্ত নামে ঠিক লেখা সম্ভব হচ্ছে না বলে। গল্প সাহিত্যের দিগ্বিজয়ী এক লেখকের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল। লোকজন, মোপাসাঁর সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম করবার। ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ ক'রে জেল খাটতে খাটতে সাহিত্যের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর 'ও হেনরি' ছদ্মনামে।

এত বড় জলজ্যান্ত একটা দৃষ্টান্ত পেয়ে গিয়ে সম্ভাবনাটা দেখতে দেখতে রীতিমত সন্দেহে পরিণত হয়ে গেল আমার মনে এবং সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য জগৎ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এক পুলিশ বন্ধুর কাছে সেটা প্রকাশ ক'রে ফেললাম। বললাম, 'খোঁজ করলে তোমাদের আসামীদের অনেকেরই হয়তো সন্ধান পেয়ে যাবে সাহিত্যের এই ছদ্মনামাদের মধ্যে!'

বন্ধুর জবাবে কিন্তু জ্ঞান বেড়ে গেল আমার। ছদ্মনামা লেখকদের মধ্যে জেল-পালানো হারানো-মাণিকদের কারু কারু সন্ধান পাওয়া যাবে—এ রকম আশা নাকি সত্যিই, পুলিশ দপ্তর গোড়ার গোড়ার

করেছিল কিন্তু একটু তত্ত্বতল্লাশ ক'রে দেখতেই তাদের সে আশা ভঙ্গ হয়েছে। শুধু অতীতেই যে সেই সব ছদ্মনামারা কিছু করেনি তাই নয়—ভবিষ্যতেও তারা যে একজনও কেউ কিছু করবে বা করে উঠতে পারবে এমন দুরাশা আর পুলিশ দপ্তর করে না। মানে, তেমন গুরুতর কোনও অপরাধ—লেখা যে পর্য্যায় ওঠে না বা একটু ছুট দিয়েও তুলতে পারে না পুলিশ-দপ্তর।

'কিন্তু তাহলে লেখকদের এত সব ছদ্মনামের কারণটা কী?' লিখে খ্যাতি কি তারা চায় না?" বিভ্রান্ত হয়ে বন্ধুটিকে প্রশ্ন ক'রে উঠলুম।

"নিশ্চয়ই চায়"—উত্তর করল বন্ধুটি, "বিখ্যাত হ'তে কে না চায়?"

"তবে?"

"আরে, চায় বলেই তো লেখে। চেষ্টা ক'রে খ্যাতির—যশের!"

"কিন্তু সে-চেষ্টা ছদ্মনামে না ক'রে স্বনামেই তো করতে পারে—"

"পারে কিন্তু স্বনামের চেয়ে সুনামে খ্যাতিই তাদের লক্ষ্য। স্বনামের চেয়ে সুনামে খ্যাতি অর্জন যে অপেক্ষাকৃত সোজা সেটাও দেখা গেছে—"

"ঠিক বুঝলাম না। খ্যাতিটাই কি সুনাম নয়?"

"সে-সুনাম নয়। এ-সুনামের মানে সুন্দর নাম। সু-নাম!"

"তার মানে?"

"স্বনাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় যেমন মনে করো সুনাম—বনফুল! তোমারই নাম মনে করো যদি গঙ্গাগোবিন্দ সরখেল বা গুরুচরণ গাড়ুই বা হরিদাস পালধি হয় তাহলে তুমি যতই লেখনা কেন এবং ভালো লেখনা কেন—ঐ রকম ভ্যাবা গঙ্গারাম বা গরুচোর গোছের নাম দেখলে তোমার লেখাই কেউ পড়তে চাইবে না। যদি বা পড়ে, পরে নাম মনে রাখতে পারবে না তোমার। তাও যদি বা পারে—স্বয়ং লেখক তুমিই হয়তো ঐ নামে বিখ্যাত হতে চাইবে না!"

"কেন চাইব না?"

"নামের লজ্জায়। তা ছাড়া তোমার ঐ নাম শুনলে সম্পাদকেরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা দেখিয়ে দেবে!"

"কিন্তু সেটা তো অন্যায়। নিজের নাম লোক থোরাই নিজে রাখে। বাপ-ঠাকুর্দা যদি—"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, সম্পাদকেরাও ঐ কথাই বলবেন তোমাকে—'আপনার বাপ-ঠাকুর্দা চাননি আপনি দোকান ছেড়ে সাহিত্য করেন। চাইলে ও-রকম নাম রাখতেন আপনার। কেন, তাঁদের অবাধ্য হচ্ছেন, কারণ হচ্ছেন মনোকষ্টের'?"

শুনে বেশ দমে গেলুম। নামটা আমারও কিছু প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত 'শর্ট' এ্যাণ্ড সুইট' বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত 'ওল্ড এ্যাণ্ড বোল্ড' নয় অথচ লেখক হবার একটা ক্ষীণ বাসনা অনেক দিন ধরেই বক্ষে পোষণ করছি।

"তা ছাড়া"—বন্ধুটি ওদিকে তখনও বলে চলেছেন "সম্পাদকদেরই বা দোষ দেবো কী ক'রে? তাদের ভাবতে হয় পাঠক-পাঠিকাদের কথা—বিশেষ ক'রে পাঠিকাদের। আর ভেবে দেখো—যে জীবিকায় যা 'কোয়ালিফিকেশন'। সৈন্যদলে নাম লেখাতে গেলে তোমার জোয়ান চেহারাটাই দেখবে। চার ফুট দশ ইঞ্চি দেহ ও চব্বিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে কতখানি অসম সাহস তুমি ধরো—সেটা নয়। থিয়েটার সিনেমাতে হরিপদ বা রমাসুন্দরী নামে চালু বার করতে পারবে একটি নায়ক বা নায়িকা?"

বন্ধুর কথাগুলি মনে বুঝি গভীর রেখাপাত করেছিল আমার। আর করেছিল বলেই এ-লেখা আজ পড়তে হচ্ছে আপনাকে। পড়ে যেতে হচ্ছে।

বন্ধুর সঙ্গে সেই আলোচনার কিছুদিন পরেই একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে উপস্থিত হয়েছিলুম এক সম্পাদকের সামনে। 'কী চাই?' বলে রোষকষায়িত নেত্রে সম্পাদক মশাই আমার দিকে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটি এগিয়ে ধরলুম, বললুম, "একটি রম্যরচনা—"

সম্পাদক মশাই কিন্তু হাত বাড়ালেন না, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম?"

"বলবার মত নয়। এতই অশ্রাব্য যে শুনলে কানে ব্যথা পাবেন আপনি! আর ছাপবার মত তো নয়ই!"

শুনে বুঝি বিশেষ প্রীত হলেন সম্পাদক মশাই, বললেন, "সে কথা আর ক'জন বোঝে, বলুন! তা ছদ্মনাম কিছু ঠিক করেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—অজাতশত্রু। চলবে?"

শুনে নামটা বার কয়েক আওড়ালেন সম্পাদক মশাই, তারপর প্রসন্ন মুখে বললেন, "হ্যাঁ চলতে পারে!"

"তাহলে লেখাটা একটু পড়ে দেখবেন!" ভরসা পেয়ে এবার বলে উঠলুম আমি—পাণ্ডুলিপি আরেকটু এগিয়ে ধরে।

"ছাপা না হলে কোনও লেখা পড়ি না আমি"—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন সম্পাদক মশাই, "আর তাইতেই চশমার এই 'পাওয়ার'!"

"তাহলে?"

"নাম কী লেখাটার?"

"ছদ্মনামা—"

"অজাতশত্রুর ছদ্মনামা! মন্দ হবে না—!"

বলে এবার হাত বাড়ালেন সম্পাদক মশাই এবং পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পাশের এক টেবিলে আর সেইসঙ্গে সেই টেবিলের লোকটির উদ্দেশে বললেন, "প্রেসে দিয়ে দাও। যাবে এই সংখ্যায়—"।

ব্যস তারপরই নাম করা পত্রিকার হামবড়া এক লেখক হয়ে গেলুম আমি। স্বনামে না হোক—সুনামে তো বটেই। আর সেই সঙ্গে আপনি সাবধান!

বৌদ্ধযুগে এক অজাতশত্রু রাজা হয়ে নাকি অনেক অত্যাচার করেছিল। চোখ উপড়ে নিয়েছিল নাকি বৌদ্ধদের ধরে ধরে।

বুদ্ধ্ যুগে আর এক অজাতশত্রু লেখক হয়ে কী করবে কে জানে! এর লেখা পড়ার ভয়ে হয়তো নিজেই অন্ধ হ'তে চাইবেন আপনি।

মানে, আপনি যদি বুদ্ধ্ হন।

এখনও কি পড়া বন্ধ করবেন না? বন্ধ তাহলে লেখাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই আগে করতে হল।

কী সর্বনাশ! এখনও পড়ছেন?

গীতা কাপুরের আত্মহত্যা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

এ কাহিনী সুরেশ গুপ্তভায়ার—অর্থাৎ সুরেশ গুপ্তভায়ার এই আরো একটি কাহিনী।

সুরেশ গুপ্তভায়ার একটি কাহিনীর অর্থ, গুপ্তভায়ার আশ্চর্য গোয়েন্দাগিরির একটি উদাহরণ—কেননা গুপ্তভায়া এক জন গোয়েন্দা। প্রচলিত গোয়েন্দা-কাহিনীর চিরাচরিত গোয়েন্দা নয়, সত্যিকার এক গোয়েন্দা যার জলজ্যান্ত উপস্থিতি, অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য কর্মকুশলতা কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের অত্যধিক সুনামের কারণ এবং সে হেতু অপরিসীম গর্বেরও বিষয়। বিভাগীয় কর্তাদের মতে সুরেশ গুপ্তভায়ার মত চৌকশ ও কর্মঠ আর এক জন ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর তাঁদের দপ্তরে থাকলে অসাধ্য সাধনে তাঁরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে অতি সহজেই পাল্লা দিতে পারতেন।

বিভাগীয় কর্তাদের কিন্তু এটা ঠিক মত নয়—বরং বলা যেতে পারে ভাগ্যের দরবারে তাঁদের অনুযোগ-অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড কেবং ধুরন্ধর, অনেকেই সেখানে কাজ শিখতে বা পদ্ধতি দেখতে তিন-চার বছর কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু গুপ্তভায়ার পর্যায়ে কারুকে সেখানে দেখেছেন, বা কারো কথা শুনেছেন বলে মনে করতে পারেন না। কয়েকটি জটিল তদন্তের সুরাহার যে রকম অসাধ্য-সাধন-ক্ষমতার পরিচয় গুপ্তভায়া দিয়েছে তেমন কর্মকুশলতার নিদর্শন নাকি স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের এতদিনকার ইতিহাসেও খুব বেশী নেই। দু'জন গুপ্তভায়া দপ্তরে থাকলে অবস্থা কী হত বলা যায় না—কিন্তু একজনেই যে দপ্তরের সুখ্যাতি সারা ভারতবর্ষে, এমন কি ভারতের বাইরেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও কিছু কিছু ছড়িয়ে [illegible]

কিছু কিছু আমি নানা সূত্রে শুনেছি এবং স্বয়ং গুপ্তভায়ার কাছ থেকে আরো বিশদ ভাবে শুনে নিয়ে সেই চমকপ্রদ কাহিনীগুলি সকলকে শোনাবার সদিচ্ছাও মনে পোষণ করছি। কিন্তু গুপ্তভায়ার গোয়েন্দাগিরির যে সব ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ করা, তার যে সব কীর্তি প্রায় সর্বদা সঙ্গে থেকে চাক্ষুষ দেখা এবং দেখে অবাক হওয়া—সেগুলি শোনানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠিক করেছি গুপ্তভায়ার অতীত জীবনের সঞ্চিত কাহিনীগুলি বলবার চেষ্টা করব না।

বলবার চেষ্টা করব না বললে হয়তো কোনদিনই সেগুলি আর বলা হবে না। কেননা গুপ্তভায়ার সঙ্গে আমার আলাপ বেশীদিনের নয় কিন্তু এ ক' মাসেই ওর গোয়েন্দাগিরির যে সব আশ্চর্য ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং যে হারে সে সব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে এবং আমার মনের কোঠায় ক্রমশ জমা হচ্ছে তাতে সারা জীবন ধরে লিখে গিয়েও কোনো দিন যে সেগুলি শেষ করে অতীতের কোনো কাহিনী শোনাবার সময় বা সুযোগ পাবো এমন আশা কম।

আশা কম সত্যি, কিন্তু তবু যেন আশা হয়। গুপ্তভায়া আমার চেয়ে বছর বিশেকের বড় এবং ঐ পরিমাণ সময় যদি আমি ওর চেয়ে বেশী বাঁচি (আশা করা অন্যায় নয় আশা করি) তাহলে আমার প্রত্যক্ষ করা ঘটনাগুলি শোনানোর দায় মিটিয়ে পরোক্ষে (প্রধানতঃ গুপ্তভায়ার মুখে) শোনা তার অতীতের কীর্তি কলাপেরও কিছু কিছু লিখে যেতে পারব বলে মনে হয়।

বিশ বছর সময় হিসেবে অনেক। বারো বছরে যদি এক যুগ

বিশ বছর বয়েসের ব্যবধান হিসেবেও কম নয়—প্রায় পিতা-পুত্রের।

কিন্তু আশ্চর্য—গুপ্তভায়ার পঁয়তাল্লিশ আর আমার পঁচিশ—এই বয়েসের পার্থক্যের জন্তে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কোনো অসুবিধে দূরে থাক, বরং যেন অন্তরঙ্গ হবার আরো বেশি সুবিধে হয়েছে। সমবয়সীদের বন্ধুত্বের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা থাকে—সত্যিকার অন্তরঙ্গ হবার বোধ হয় সেটাই সব চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে পড়ে। জীবন-সংগ্রামের হারজিত সাফল্য-বৈফল্য হিসাব করতে সেখানে তারা পরস্পর পরস্পরের মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং তার ফলে পরস্পরের প্রতি তাদের মনে কোনো ক্ষেত্রে ঈর্ষার কোনো ক্ষেত্রে বা করুণার উদ্রেক হতে থাকে—কোনোটাই যার অন্তরঙ্গতার পক্ষে অনুকূল নয়।

পঁয়তাল্লিশ আর পঁচিশ—গুপ্তভায়ার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। সমবয়সীদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দুর্ঘট বলে অসমবয়সীদের মধ্যে তা অত্যন্ত সহজ এ কথা মনে করাও ভুল। বৃত্তি, পেশা বা জীবনের ধারা এক হলে অন্তরঙ্গতা দূরে থাক, সাধারণ বন্ধুত্ব এমনি কি মেলামেশা আলাপ-পরিচয়েরও সেটা একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে বাধা প্রতিযোগিতার নয়—প্রতিদ্বন্দ্বিতার। সম ও অসম দু'দলের মধ্যেই সে বাধা সমান সত্য—সমান দুর্লঙ্ঘ্য!

অসম বয়সের সঙ্গে বৃত্তিও অসম—একজন খ্যাতনামা অদ্ভুতকর্মা গোয়েন্দা; অন্তজনের জীবনের উচ্চাশা বলতে, দুরাকাঙ্ক্ষা আখ্যা দিতে এবং সকল পরিশ্রম পণ্ডশ্রমের লক্ষ্য নির্দেশ করতে হলে বলতে হয় সাহিত্যিকখ্যাতি! এই বলেই বোধ হয় গুপ্তভায়ার সঙ্গে আমার পরিচয় এত সহজে এবং এত অল্প দিনের মধ্যে শুধু ভালো লাগার চৌহদ্দী পেরিয়ে অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেছে। আর সেই অন্তরঙ্গতা, সেই সাহচর্যের ফলে ওর এই একটি কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মত লিখবার সুযোগ হয়েছে আমার।

সেদিন খুব ভোরে উঠে কাগজ কলম নিয়ে সাহিত্য সাধনায় বসেছিলাম। ক'দিন ধরেই একটা গল্পের আইডিয়া মাথায় ঘুর-ঘুর করছিল, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে মনের মধ্যে ভালো করে গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যেতে এবং বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে আইডিয়াটা যেন মনের মধ্যে ফলাও হয়ে বেশ মনোমত করে আসতে লাগল। ফলে, প্রথম শীতের আমেজ-আরামের ভোরের আলসেমিটুকু ত্যাগ করে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হয়েছিল। একনাগাড়ে লিখে বেলা বারোটা নাগাদ যখন গল্পটা শেষ করে কলম বন্ধ করলাম তখন টনটন করতে শুরু করেছে হাত আর সেইসঙ্গে ঝনঝন করতে শুরু করেছে বারান্দার টেলিফোন। টেলিফোনের ঝনঝনানি থামতে হাতের ব্যথা থেকে মনটা চলে গেল টেলিফোনের কথায়।

"হ্যালো?···আজ্ঞে হ্যাঁ।···দাদাবাবু? উনি তো ভোর থেকে শুধু লিখছেন।···ডেকে দেবো? ধরুন—"

আমারই ফোন এবং নিশ্চয়ই গুপ্তভায়ার কাছ থেকে। দু' এক দিন দেখা-সাক্ষাৎ না হলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে গুপ্তভায়া আর তখন ফোনে ডাক পড়লে গুপ্তভায়ার গলা শোনার জন্তে আমিও উৎকর্ণ হয়ে থাকি। উৎকর্ণ, উৎসুক এবং উদগ্রীব।

উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। অনুমান ঠিকই, কেন না সাড়া দিতেই গুপ্তভায়ার গলা কানে এল আর তার প্রথম কথাই হল, "কী লিখছিলে?"

"একটা লেখা"—বলে নবীন লেখকের স্বাভাবিক কুণ্ঠায় কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম আমি, "আপনার খবর কি? কেমন আছেন?"

"কী লেখা?" আমার কুশল প্রশ্ন আমলেই আনল না গুপ্তভায়া, "কী লিখছিলে—গল্প না উপন্যাস?"

"এই এমনি একটা লেখা"—তাড়া-করা চোরের মতই পিছলে যাবার চেষ্টা করি।

"শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ—"

"তাহলে নিশ্চয়ই গল্প!"

"গল্প? কী করে বুঝছেন গল্প?"

"লেখাটা শেষ হয়েছে বলছো তাই—দু' তিন দিনে উপন্যাস শেষ করার মত কব্জীর জোর তোমার এখনো হয়নি—"

"কবিতাও তো হতে পারে লেখাটা?"

"কবিতা? না কবিতা নয়। কবিতা তুমি লেখো না। লিখলে এতদিনে দুয়েকটা কি আমায় না শুনিয়ে ছাড়তে?"

কথাটা বোধ হয় সত্যি। কবিরা অনেকেই—আর উঠতি-কবি হলে ত' বটেই—শ্রোতা পেলে তারা কবিতা শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। তবু অত সহজে গুপ্তভায়ার কাছে হার মানতে রাজী হলাম না আমি। বললাম, "হয়ত আমি একটু লাজুক কবি—"

"লাজুক বা ফাজিল কোনো কবিই তুমি নও। কবিরা যুক্তি দিয়ে তোমার মত তর্ক করে না। তারা বাজিমাৎ করবার চেষ্টা করে উপমা দিয়ে—"

"আমি হয়ত খারাপ কবি—"

"তোমার যেটা খারাপ সেটা হল এঁড়ে-তর্ক করা—"

"বেশ, কবিতা না হয় নয়—কিন্তু প্রবন্ধ?"

"ভুল তর্ক যারা করে, তারা প্রবন্ধ লেখে। এঁড়ে-তর্ক যারা জেনে ভুল তর্ক যারা করে তারা লেখে না—"

"নাটক?"

"দু' তিন দিনে একটা পুরো নাটক?"

"একাঙ্কিকাও তো হতে পারে?"

"পারে কিন্তু নয়। নাটক জাতীয় সাহিত্যে তোমার উৎসাহ থাকলে নবীন লেখক হিসেবে তোমাকে ঐ জাতীয় বই-ই পড়তে দেখতাম। বইয়ের দোকানে ঢুকে তুমি কেনো শুধু বিদেশী গল্প উপন্যাস—কবিতা, নাটক বা অন্য কিছু নয়। তুমি মজা পাও গল্প এবং উপন্যাসে—কাজেই লিখতে গেলে তুমি গল্প বা উপন্যাসই লিখবে। কি, বিচারটা ভুল হ'ল?"

"না"—অস্বীকার করার আর উপায় থাকে না এ-কথার পর। বললাম, "ঠিকই ধরেছেন, গল্পই একটা লিখেছি—"

"তাহলে নিয়ে এসো এখানে—পড়ে দেখব কেমন হয়েছে—"

"একেবারে ছাপা হলে পড়বেন। মানে যদি ছাপা হয় পর্যন্ত পড়বার ধৈর্য থাকে—"

"সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী আছি যদি কথা দাও ছাপা না হলেও আমাকে পড়াবে—"

"দিলাম—"

"তাহলে তিনটের সময় দেখা হচ্ছে নিউ এম্পায়ারের সামনে। শুনছি ছবিটা নাকি ভালো—"

"কিন্তু"—বাধা দিয়ে উঠলাম আমি। গল্পটা নিয়ে দুপুরে পত্রিকা আপিসে যেতে হবে সে-কথা বলতে গেলাম গুপ্তভায়াকে।

"তাহলে ঐ কথাই রইল"—বলে ফোন কেটে দিল গুপ্তভায়া সঙ্গে সঙ্গে—আমার তরফের কিন্তু-র কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ না দিয়েই।

আজ আর কোনো সম্পাদকের দপ্তরে দরবার করা হবে না বুঝে ফোন রেখে এসে প্রথমে লেখাটা গুছিয়ে রাখলাম। তারপর সকালের খবরের কাগজটা খুঁজে নিয়ে খুলে বসলাম। প্রথমে সিনেমার পাতা—নিউ এম্পায়ারে কী ছবি হচ্ছে দেখে নিলাম। তারপর দেশ-বিদেশের খবরগুলি চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। মস্কো-ওয়াশিংটন নয়—দেশেরই একটা খবরে চোখ আটকে গেল হঠাৎ।

কানপুরে কে বা কারা থেকে থেকে এবং বেছে বেছে শুধু সাধুদের হত্যা করছে। নৃশংস হত্যা—অথচ হত্যার উদ্দেশ্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না।···

নিবিষ্টমনে খবরটা পড়ছি এমন সময় আবার বেজে উঠল টেলিফোন। কাগজটা বিছিয়ে কাছাকাছিই বসেছিলাম, উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম।

"হ্যালো? কাকে চাই?"

"তোমাকেই"—সাড়া পেলাম গুপ্তভায়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, "কানপুর যাবে?"

"কানপুর?" আচম্কা-প্রশ্নের উত্তরে কথাটা বলে ফেলেই কাগজের খবরটা মনে পড়ে গেল আমার, বললাম, "কেন?"

"সেখানে সাধুদের নাকি ভারী অসাধু উপায়ে খুন করা হচ্ছে। উত্তররাজ্য সরকার তাই আমায় তলব করেছেন—কমিশনার সাহেব আমায় এইমাত্র জানালেন—"

"আপনি যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ—আজ সন্ধ্যের ট্রেণে!"

"আজ সন্ধ্যের? কিন্তু—"

"কিন্তুর কিছু নেই। যাবে কি যাবে না—সেটা ভালো করে ভেবে নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি নিউ এম্পায়ারে এসো—এই পৌণে তিনটে নাগাদ। ছবি আরম্ভ হবার আগে কথা বলে নেবো—"

"কিন্তু কানপুর যেতে হলে আজ সিনেমাটা বাদ দিলেই তো ভালো হোত!"

"আরে, ইংরেজি ছবি! ছবি দেখে বেরিয়েও ট্রেণ ধরবার দু' ঘণ্টার উপর সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া কানপুর থেকে ফিরতে ফিরতে ছবিটা হয়তো আর থাকবে না। ছবিটা শুনেছি ভালো—তাহলে ঐ পৌণে তিনটে—"

বাস ফোন কেটে দিল গুপ্তভায়া। অগত্যা রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আমিও [illegible] গেলাম কানপুর যাবার জন্য গোছগাছ করতে। গুপ্তভায়ার [illegible] বন্ধু [illegible] যাচ্ছি চিন্তা করতে রীতিমত রোমাঞ্চ হতে লাগল শরীরে আর সেই উত্তেজনায় আমার সদ্যলেখা গল্প—আমার সারা সকালের পরিশ্রমের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম।

অথচ সেই কানপুর যাওয়া আমার শেষ পর্যন্ত হল না। এম্পায়ারে সিনেমা দেখাটাও ভেস্তে গেল। শুধু আমার নয়—গুপ্তভায়ারও। কানপুরের সাধুহত্যার বদলে খাস কলকাতা শহরে কয়েকটি রূপসী রমণী হত্যার তদন্তে লেগে গেল গুপ্তভায়া আর গুপ্তভায়ার সঙ্গে লেগে রইলাম আমি।

উৎসাহের আধিক্যে সেদিন বোধ হয় পৌণে তিনটের ক'মিনিট আগেই পৌঁছেছিলাম নিউ এম্পায়ারের লবি-তে। তার পর গুপ্তভায়ার অপেক্ষায় হাতের ঘড়ি এবং দেওয়ালের ছবি দেখতে দেখতে আরম্ভ হয়ে গেল শো। টিকিট-ঘরের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আর ঘড়ি দেখে আরো পাক্কা পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে যখন গুপ্তভায়ার দর্শন ও কানপুর যাওয়ার ব্যাপারে রীতিমত সন্দিহান হয়ে উঠেছি, এমন সময় ব্যস্ত হয়ে কাচের স্যুইংডোর ঠেলে লবিতে এসে ঢুকল গুপ্তভায়া আর আমায় দেখেই বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি এসো—"

ডাকটা দোতলায় উঠে হল-এ ঢোকবার বলে প্রথমে মনে করেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা ভেঙে গেল গুপ্তভায়াকে ঘুরে আবার স্যুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে যেতে দেখে।

তাড়াতাড়ি লবি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি গুপ্তভায়ার জীপ হাউস-এর গায়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং গুপ্তভায়া গিয়ে ততক্ষণে তাতে উঠে বসছে। আমি এগিয়ে যেতেই গুপ্তভায়া মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল উঠে পড়বার জন্যে।

ষ্টার্ট দেওয়াই রয়েছে জীপে। আমি উঠে বসতেই গুপ্তভায়া জীপ ছেড়ে দিল।

"কী হল?" জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে।

"ছবিটা আজ আর দেখা হল না—" রাস্তার উপর চোখ রেখে উত্তর দিল গুপ্তভায়া।

"আপনাকে আগেই বলেছিলাম!" একটু মাতব্বরির সুরেই বলে উঠলাম আমি।

"এর মধ্যেই একদিন সময় ক'রে দেখে নিতে হবে—"

"এর মধ্যে? আজ সন্ধ্যেয় কানপুরে গেলে আর এর মধ্যেটা পাচ্ছেন কোথায়?"

"কানপুরে আজ যাওয়া হচ্ছে না—"

"যাওয়া পিছিয়েছে?"

"যাওয়া নাও হতে পারে—"

"সে কী?" ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগে আমার, "কেন কী হোলো?"

"একটি মেয়ে শুনছি আত্মহত্যা করেছে—"

"আত্মহত্যা? আপনার চেনা কেউ?"

"না—"

"সাধারণ আত্মহত্যা?" সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কেন না একটি মেয়ের সাধারণ আত্মহত্যার জন্যে গুপ্তভায়ার কানপুর যাওয়া বাতিল হবার কথা নয়।

"আত্মহত্যা ব্যাপারটাই [illegible]!" উত্তরে একটু জোর দিয়ে

বলে উঠল গুপ্তভায়া, "তবে এই মেয়েটির আত্মহত্যাটি সে হিসেবে অনন্যসাধারণ বলতে পারো—"

"কী রকম ?"

"দিন তিনেক আগে মেয়েটি আরেক বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সময়মত হাসপাতালে পৌছনোয় বেঁচে গিয়েছিল। বিপদ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে আজ দুপুরে হাসপাতালে মেয়েটির কাছে পুলিশ গিয়েছিল এজাহার নিতে। পুলিশের দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মেয়েটি নেতিয়ে পড়ে এবং নার্স-ডাক্তার ছুটে এসে কিছু করবার আগেই পুলিশের ছানাবড়া চোখের সামনে মারা যায়—"

"মেয়েটি কি অন্তঃসত্তা ছিল ?"

"অন্তঃসত্তা নয়, কুমারীও নয়। দিন পনেরো আগে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল—"

"প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার মনে হচ্ছে। যাকে মন চেয়েছিল তার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় অন্য কারুকে বিয়ে করে শেষপর্যন্ত জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি ক'রে বোধ হয় মরিয়া হয়ে উঠেছিল মেয়েটি—"

"মেয়েটি বিয়ে করেছিল প্রেম করে—গত এক বছর ধরে প্রেম ক'রে প্রথম আত্মহত্যার দিন পনেরো আগে বিয়ে করেছিল মেয়েটি—"

"বিয়ের পর হয়তো বিরাট মোহভঙ্গ হয়েছে। এত দিন ধরে তার প্রেমিককে যা মনে করেছিল বিয়ের পর দেখছে সব ধারণাই ভুল—"

"বিয়ের পনেরো দিনের মধ্যে ?"

"ভুল ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। মনেতে আঘাত বেশি পেয়ে থাকলে আত্মহত্যারও !"

"হুঁ—শুধু সহজে ভুল করবার মত মেয়ে বোধ হয় এটি নয়।"

"কী রকম ?"

"বেশ চোখকান খোলা মেয়ে। নয় বিধবা বা বিয়ে-ভাঙা, নয় অবাঞ্ছিত পুরুষদের এড়াবার জন্যে নিজেকে বিবাহিত মেয়ে বলে পরিচয় দেওয়া !"

"এঁ্যা !" শুনে আওয়াজটা অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার, ঘুরতে লাগল মাথাটা।

"হ্যা—" বলে সামনে পুলিশ হাত নামাতে আবার গাড়ি ছেড়ে দেয় গুপ্তভায়া।

শুনে চুপ করলাম। মনে মনে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। এক বছর প্রেমের পরিণতি যে বিবাহ—সেই বিবাহের পনেরো দিনের মধ্যে একটি কুমারী বা বিধবা বা বিয়ে-ভাঙা মেয়ের আত্মহত্যার কী কারণ হতে পারে !

"কী ভাবছ ?" আমাকে হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে দেখে বলে উঠল গুপ্তভায়া। চিত্তরঞ্জন এভেন্যু দিয়ে তখন এগিয়ে চলেছে জীপ।

"মেয়েটির কথা—আচ্ছা মেয়েটির মৃত্যুর কারণটা কী ? মানে কী জাতীয় আত্মহত্যা ? গলায় দড়ি না কাপড়ে কেরোসিন ?"

"বিষ পান। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে মেয়েটির শরীরে বিষক্রিয়ার চিহ্ন দেখতে পেয়েছে—"

"প্রথমবারেও কি মেয়েটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ?"

"একরকম তাই। পরিমিত মাত্রায় যেটা ঘুমের ওষুধ পরিমাণ বেশি হলে সেটাই আবার চিরনিদ্রার মোক্ষম দাবাই হয়ে পড়ে। প্রথমবার মেয়েটি নাকি এক ডজন 'লুমিনাল'-এর বড়ি খেয়েছিল—"

"এবারে ?"

"সরাসরি বিষ—নইলে হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তাররা কিছু করবার আগে অত তাড়াতাড়ি মারা যাবে কী করে ! তবে সঠিক কোন গ্রুপের কী বিষ সেটা হাসপাতাল থেকে যখন ফোন এসেছিল তখনো জানা যায়নি—ডাক্তাররা জানবার চেষ্টা করছে এবং আশা করা যায় এতক্ষণে নিশ্চয় জানতে পেরে গেছে"—

"মেয়েটির শরীরে লুমিনাল-এর বিলম্বিত কোনো ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া তাহলে এটা নয় ?"

"হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত লুমিনাল-এর অনেকখানিই পেট থেকে পাম্প করে করে বার করে তবে বাঁচানো হয়েছিল মেয়েটিকে। আর বাকি যেটুকু ছিল বাহাত্তর ঘণ্টার পর তার আর কিছু শরীরে থাকতে পারে না—"

"তাহলে—নতুন ক'রেই বিষ খেয়েছে মেয়েটি !" বলে আমি আমার একটা সিদ্ধান্ত বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই আমার কথার খেই ধরে গুপ্তভায়া বলে উঠল "বিষটা হ্যাঁ, কিন্তু বিষটা মেয়েটি পেল কোত্থেকে সেইটেই প্রশ্ন !"

"না—" কথাটা মনঃপুত না হওয়ায় আপত্তি করে উঠলাম আমি, "হাসপাতালে ওষুধের কিছু অভাব থাকলেও বিষের অভাব নেই"—

"নেই বলে একবার যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তার হাতে বিষ কে তুলে দেবে ?"

"উপযুক্ত বখশিস—একটা বালা বা একটা হার পেলে আয়া, মেথরাণীরাই যোগাড় করে এনে দিতে পারে ! কিন্তু সে কথা নয়—আমি বলছি, একটা আত্মহত্যার ধাক্কা ভালো করে সামলে না উঠতে উঠতে তার তিন-চার দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার আত্মহত্যা কি কেউ করে ?"

"করাটা অস্বাভাবিক নয়—যেটা অস্বাভাবিক সেটা হচ্ছে করতে পারাটা, করবার সুযোগ পাওয়াটা। একবার আত্মহত্যার যে চেষ্টা করেছে তাকে হাসপাতালের কথা ছেড়েই দাও—বাড়িতেও সাধারণত সকলে সাবধানে এবং চোখে চোখে রাখে ! সেই কারণেই দ্বিতীয় বার আত্মহত্যার জন্যে মেয়েটির ঐ বিষ যোগাড় করাটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্যের লাগছে। হাসপাতালের ইতিহাসে আয়া-বেয়ারারা বখশিসের লোভে মরিয়া কোনো রোগীদের যে বিষ কখনো যোগাড় ক'রে দেয়নি এমন নয় কিন্তু আত্মহত্যার রোগীদের —আইনের চোখে যারা অপরাধী—তাদের উপর চব্বিশ ঘণ্টা শুধু যে নার্সরাই লক্ষ্য রাখে তা নয়—পুলিশের লোকেও, জানবে, সকলের তাদের পাহারার জন্যে সেখানে মোতায়েন থাকে—" বলতে বলতে এবং কথার ফাঁকে—কলেজ-হাসপাতালে ঢুকে পড়ে জায়গামত জীপটাকে পার্ক করতে করতে গুপ্তভায়া বেশ একটু জোর দিয়েই কথাটা শেষ করল।

হাসপাতালে পৌঁছে আমরা জীপ থেকে নামাবার [illegible] একটি সিপাই এসে সেলাম করে দাঁড়াল আর তারপর ([illegible] হুকুমে) পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। লিফ্ট দিয়ে উঠে—[illegible]

তিনতলায় পৌঁছে প্রায় সামনেই একটা দরজার গোড়ায় হাসপাতালের নার্স-ডাক্তার আর পুলিশের সিপাই-কর্মচারীদের ছোট একটা জটলা দেখতে পেলাম। লিফ্‌ট থেকে বেরুতে না বেরুতেই সেই জটলা থেকে একটি খাঁকি শার্ট-প্যাণ্ট ছিটকে এগিয়ে এল।

গুপ্তভায়ার কাছাকাছি এসেই ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল, "আমার কী হবে স্যর ?"

ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হ'চ্ছে কিনা—সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে গুপ্তভায়া বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করল, তারপর লোকটির দিকে ফিরে তার পিঠ চাপড়ে বলল, "এখনি এতো নার্ভাস হোচ্ছ কেন, চলো সরকার, আগে ব্যাপার সব দেখি"—

"হ্যাঁ, চলুন স্যর"—বলে ঢোক গিলে লোকটি আমাদের সঙ্গে দরজার সামনের জটলা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে ঢুকল।

কেবিনের মত ছোট্ট একটি ঘর। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা আর পাশে তার একটা জানলা—দুটোই দেখলাম বন্ধ। ঘরের বাকি দুটো মুখোমুখি দেওয়াল নিশ্ছিদ্র। সেই দেওয়ালের একটিতে লাগানো একটি খাট হাসপাতালের ছাঁদের—যা প্রয়োজন মত একদিক তুলে দিয়ে রোগী বা রোগিণীকে আধশোয়া আধবসা করে দেওয়া যায়। হয়তো তেমন করেই দেওয়া হয়েছিল এই মেয়েটিকেও পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময়। তারপর ইহজগতের কথাবার্তা বলবার তার সকল প্রয়োজন ফুরোতে আবার নামিয়ে তার শেষ শয্যা রচনা করে দেওয়া হয়েছে আর সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তার অবশিষ্ট অস্তিত্ব। ঢেকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো মুছে দেওয়া যায়নি। চাদরের আড়াল ভেঙ্গে দিয়ে যেন এখনো ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে সে, তার যুবতী দেহের এলায়িত উদ্ধত ভঙ্গীতে যেন বলতে চাইছে আত্মহত্যাটা তার জগতের কাছে কোনো হারস্বীকার নয়—এ শুধু জীবনের প্রতি তার পরম তাচ্ছিল্য ও বিরাগের একটি নমুনা।

খাটের পাশেই খাটের দিকে মুখ করা তিনটি চেয়ার। মেয়েটির পায়ের দিকে চেয়ারের সামনে একটি টেবিল আর তার উপর সরকারী মোহরাঙ্কিত একটি ফাইল আর একটি ফুলস্ক্যাপ সাইজের বাঁধানো খাতা। এই চেয়ার-টেবিল জুড়েই বুঝি ঘণ্টা কয়েক আগে বসেছিল এক তদন্ত সভা। ঐ মাঝখানের চেয়ারটিকেই সিংহাসন করে সিংহ বিক্রমে খাকি-শার্ট-প্যাণ্ট বোধহয় ঐ ফাইলটা খুলে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল মেয়েটিকে আর তার কুণ্ঠিত উত্তরগুলি হয়তো ঐ পাশের চেয়ারে বসে আরেক খাকি-পোশাক টেবিলের ঐ বাঁধানো খাতায় লিখতে শুরু করেছিল এজাহার হিসেবে।

কয়েক ঘণ্টা আগে—মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে! কিন্তু এখন আর কাণাকড়িও মূল্য নেই ঐ ফাইলের, ঐ এজাহার জবানবন্দীর। যারা ভয় দেখাতে এসেছিল, এসেছিল শাস্তির ব্যবস্থা করতে—এখন ভীত হয়ে উঠেছে তারা নিজেরাই, আতঙ্কে আশঙ্কায় এখন নিজেরাই তার, ত্রস্ত তটস্থ!

"চাদরটা সরিয়ে দিন"—গুপ্তভায়ার গলা কানে যেতে হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গল আমার, খেয়াল হ'ল দরজার বাইরে জটলা কখন দরজার ভিতরে সরে এসেছে আর তাদের মধ্যে ডাক্তারী এ্যাপ্রন-পরা দু'জন—একজন চশমা-পরা বয়স্ক বেঁটে, আর অন্যজন আমারই বয়সের লম্বা দোহারা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গুপ্তভায়ার পাশে। দুটি নার্স—একটি অল্পবয়সী শ্যামাঙ্গী আর অন্যটি কটা চামড়ার প্রৌঢ়া—এসে দাঁড়িয়েছে খাটের পায়ের দিকে। গুপ্তভায়ার কথায় প্রৌঢ়াটি ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে তাকালো অল্পবয়সীটির দিকে, তারপর তাকে নড়তে না দেখে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কী যেন বলল ফিসফিস ক'রে। অল্পবয়সীটি কিন্তু নড়ল না, সাড়াও দিল না কোনো রকম—যেমন এসে দাঁড়িয়েছিল তেমনি পাংশুমুখে স্থির দৃষ্টিতে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল হাসপাতালের অভিজ্ঞতা মেয়েটির বেশিদিনের নয় এবং এ-জাতীয় পুলিশী হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া এই প্রথম। ঐ ঘরের মধ্যে বোধহয় একমাত্র আমিই ওর অবস্থা যথার্থ অনুধাবন করতে পারছিলাম—কেন না আমারও এই প্রথম অভিজ্ঞতা পুলিশী তদন্তের পরিবেশে কোনো মৃতদেহ দেখবার। কোনো আত্মঘাতী বা ঘাতিনীর মৃতদেহ দেখবার অভিজ্ঞতা বলতেও আমার এই প্রথম।

শেষপর্যন্ত প্রৌঢ়াটি নিজেই ঘুরে এসে চাদরটি সরিয়ে নিয়ে মৃতদেহ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে দিল আমাদের সামনে। মৃতদেহ অনেক দেখেছি—আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, নানাজাতের এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার। কেউ অকালে অসুখে মরেছে, কেউ বয়সে—মৃত্যুর কারণ সেগুলির স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক মৃত্যুর—দুর্ঘটনা বা খুনজখমের মৃতদেহও আগে দেখেছি আমি। ঠিক সেই রকমের রক্তাক্ত কোনো বীভৎসতা না হলেও চাদরের আড়ালে বিকৃত অসুন্দর কিছু দেখব বলে বোধহয় মনে মনে তৈরি হ'য়েছিলাম! বলেই প্রথম চোটে ব্যাপারটা আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না!

সত্যি, দেখে বিশ্বাস করা শক্ত! খাটের উপর অকাতরে ঘুমনো ঐ অতি-সুন্দরী মেয়েটি এখনি আমাদের গোলমালে জেগে উঠবে না, বিশ্রামের ব্যাঘাতে রেগে উঠবে না, তারপর সব কথা শুনে শেষে হেসে ফেলবে না!

কিন্তু তবু, লক্ষ বছরেও আর কোনদিন হাসতে বা কাঁদতে ঐ মেয়েটি ওর চোখ মেলবে না!

[ক্রমশঃ।

পথের গান

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব "জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ"
(তোদের) মা ডেকেছে কব বারে বারে।

তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
(মোদের) হৃদয় যন্ত্রেরই তারে তারে।

বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
(তোমার) সন্তানেরি দান ভারে ভারে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ॥

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোর গড়া শুভ্র পদ্মকমূর্তি কিছুদিন হল আমার হাতে এসে পৌঁছেচে। খুব সুন্দর হয়েছে। অন্য জিনিষটা আসবার অপেক্ষায় তোকে খবর দিই নি। কাল যথা সময়ে সেটি পেয়েছি। এও বিচিত্র হয়েছে। অর্থাৎ এটিতে নতুন ধারা দেখা দিয়েছে। খাল কাটা চলে এক দীর্ঘ সোজা রেখা ধরে কিন্তু নদী চলে বাঁক বদল করতে করতে। চিত্র নির্ঝরিণী ধারাও ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন বাঁক নিতে থাকে, নইলে বুঝতে হবে তার মধ্যে চিত্তের বেগ নেই। কেবল আছে অভ্যাস। তোর এই রেখা বর্ণ সঙ্গমে দেখা গেল নতুনের আবির্ভাব হয়েছে। তার পথ অবারিত ও দূর প্রসারিত হোক।

কলকাতার দিকে গরমের ছুটিতে যখন আসবি তখন দেখা হবে বলে আশা করে রইলুম। —রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, বড় অসময়ে তোর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ ঐ মাসে ঘোর দুর্যোগের মধ্যে জন্মেছিলেন। বাবা বোধ করি জন্মমাসের মিল দেখে তোর নাম রেখেছিলেন 'অসিত'।

তোর জন্মমাসে আমার উপর ঘোরতর আলোড়ন চলছে। কাজের আর অন্ত নেই। শরীর মন ক্লান্তির শেষ তলায় গিয়ে ঠেকেচে। তাই চিঠি লিখতে পারি নি।

আজ আমাদের অভিনয়ের চতুর্থ রাত্রি তারপরে চারের পর পাঁচ। সেইদিনটা আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির দিন। সেদিন অভিনয় নেই তাই মরবার অবকাশ পাবো। কিন্তু সে সুযোগও জুটবে না সপ্তরথী আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পালাতে চাই পিছন থেকে টেনে ধরেছে।

ছবির কথা ভুলে গেছি। যদি সজীব দেহে শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারি তাহলেই আর একবার তুলি নিয়ে বসব। তখন তোর কথা স্মরণ করব। এখন মাথার ঠিক নেই। তোরা লখনউএ যদি প্রদর্শনী করিস আর যদি দর্শনী মেলবার আশা থাকে তাহলে রইল কথা চললুম রঙ্গভূমিতে। ইতি—আশ্বিন ১৩৩৮

—রবিদাদা

কল্যাণীয়েষু,

অসিত, তোমার পরিণত প্রৌঢ়তার সিংহদ্বারে আমার আশীর্বাদ।

—রবিদাদা

॥ শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদারকে লিখিত পত্রাবলী ॥

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পত্র

৮ই জুলাই, ১৯১১

প্রিয় অসিত,

বোলপুরে যদি ছোটখাটো একটি gallery করে তুলতে পার তো মন্দ হয় না। (১) আমি এখন বড়জ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোন বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েচে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখ যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না, মনে রেখ যে পাখী পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হতে হয়। অবনদাদা

প্রিয় অসিত,

মুকুলকে(২) রাঁচি ফিরিয়া পাঠাইলাম, কেন না সে সেখানে থাকিয়া লেখাপড়াও করিতে পারে এবং তোমার কাছে যতটা পারে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবে। মুকুলের বেশ হাত আছে। তুমি ইহাকে বেশ একটু যত্ন করিয়া শিখাইবে এবং নিজের ছাত্রের মত দেখিবে। তোমরা একেকটি কাজের ভার না লইলে আমি একলা কত পারিয়া উঠিব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) শান্তিনিকেতনের কলাভবনের প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলাভবনের গোড়াপত্তন রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে দিয়েই করিয়েছিলেন।

(২) প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

প্রিয় অসিত,

তোমার একটি ছেলে মাঠে ঘুমোচ্ছে, সেই ছবিখানি লাটসাহেবকে বিচিত্রা থেকে দেওয়া গেছে। বিচিত্রার ধন্যবাদ দিচ্ছি। গোয়ালিয়রে যাবার আগে (৩) দেখা হবে তো ?

অবন মামা

প্রিয় অসিত,

তোমার অভিনন্দন পাটাখানি পেয়ে খুসি হলেম। ওটা Exhibitionএ দিয়েছি। কাঠের রঙ আর তুলির রঙে মিলে জিনিষটা ভারি সুদর্শন হয়েছে। এদিকে এক মজা হয়েছে Nicolas Sperling বলে এক রুশ শিল্পী ঠিক তোমার Styleএ কাঠের উপর কাগজ মেরে Exhibit করেছে। তোমার পাটাখানা দেখে সে তো অবাক ! সে ভেবেছিল তার কিছু একটা বিদ্যা লাভ হয়েছে কিন্তু তুমি তার আগেই তার সব আর্ট মেরে বসেছ। দেখে মুখে না বললেও মনে মনে নিশ্চয় একটু বিস্মিত হয়েছে। লোকটি Persian styleএ আঁকে। Exhibit miniatureও বেশ জানে। Egyptএর রাজা তাকে এ দেশে পাঠিয়েছেন—কাগজে নাম দেখেছ বোধহয়। আজ এখুনি আমাদের Exhibition খুলবে—চললুম। ভাল আছি।

শুভাকাঙ্খী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

অসিতকুমার,

তোমার শেষ পত্রখানি পাইয়া খুসী হইলাম। ইহার পূর্ব্বে তোমার আর পত্রের উত্তর দিতে কার্য্যগতিকে আমার সময় হইয়া উঠে নাই। সময়ে সময়ে Pressএর pressureএ (অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রণায়) প্রপীড়িত হইয়া আমি একপ্রকার কাজের বাহির হইয়া যাই—এবার তাহাই ঘটিয়াছিল। যা হোক, এখন একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়া তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি এখানে আসিলে নূতন রচিত ব্যাগ প্রভৃতির সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে। তোমার চিঠির মোড়কের কারিগরি কিছু যেন Complicated বোধ হয়। আমি যে রকম প্রণালীতে চিঠি মোড়ক করি, তাহা খুব সহজেই হইতে পারে এইটাই তাহার বিশেষত্ব। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রক্ষা করুন। ইতি—

কাগজ বিভাগীয়,গজ পণ্ডিত

তোমার শুভাকাঙ্খী বড়দাদা

অসিত,

এখনো শনিবারের দুই দিন দেরী আছে। আজকের দিনটি আমার কাজেতে তুমি যদি ষোলআনা মন কর তবে তাহার গুণে তোমার ছবি আঁকা বৃত্তিটা রীতিমত জেগে উঠবে, আর সেই দরুণ—কাল-পরশু কাজে তোমার হাত খুব সরবে ভাল, আর যাতে তুমি হাত দেবে তা' থেকে সোনা ফলবে।

আশীর্বাদক বড়দাদা

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

অসিত,

Attitude আর expression ঠিক না হলে ভাল ছবি কি করে হয় আমার তা বোধগম্য নয়। যদি দর্শকের কল্পনার উপরই সমস্ত রাখা যায় তাহলে হিজিবিজি যা-তা করলেই চলতে পারে—ভাল আঁকার দরকার কি ? তোমাদের ও স্কুলের গরিমা আমি বুঝতে পারি না। 'ভারতী'তে আফজাল খাঁ বধের যে ছবি বেরিয়েছে, সেটা ঠিক হয়নি। আর একবার চেষ্টা করে দেখ। আক্রমণ সামনে থেকে হবে অথচ কোলাকুলি করতে যাচ্ছে এমন ভাব থাকবে, আর শিবাজীর মুখের ভাব একটু fierce হবে যখন মারতে উদ্যত, তখন আর কোমলভাব রাখা যায় না। আফজাল খাঁ যেমন sketch-এ হয়েছে সেই রকম হবে—যেন পড়তে যাচ্ছে। যা হোক আর একবার দেখ কি করতে পার !

বোলপুর কেমন লাগছে ? তোমায় কি কাজ করতে হয় ? এখানকার সব ভালো। আমরা শীঘ্র কলকাতায় যাচ্ছি।

তোমার মেজদাদা

সাহিত্য সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র

১২।১০।১৮

স্নেহাস্পদেষু,

তবু মনে পড়েচে সেও ভালো—আমার মনে জাগরুক রয়েচে।

সে কি ভোলা যায় কেমনে ভুলি
আধেক নয়নে মুখ তুলে চাওয়া
ধীরে ধীরে হেসে মনোকথা কওয়া
ছবিটি আঁকিতে প্রেমগান গাওয়া
মোহন আঙুলে ধরিয়া তুলি
হায়, সে ভুলেছে আমি কেমনে ভুলি ?

সকলে ভালো আছ জেনে সুখী হলুম। একবার এস—দেখা দাও। বিরহে যে প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে। কাজকর্ম কেমন চলছে ? আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

তোমার নদিদি

স্নেহাস্পদেষু,

অসিত, তোমার চিঠিখানি ভারি কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলেছে। কি পাঠাচ্ছ—তা বুঝেছি—একখানা ছবি। একখানি ছবি আমার খুব দরকার আছে—একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে চাই। শক্তিকে যে রকম বর্ণনা করেছি সেই রকম। Fatal garland(৪) বিলেতে ছাপতে পাঠাচ্ছি। একখানি ছবি পেলে ঠিক হোত। তিনরঙা ছবি আছে তাতে শক্তির মুখটি ভারি ভোঁতা হয়েছে। একেবারে অচল। একরঙা বেশ পরমাসুন্দরী একটি চেহারা কি আঁকতে পার ? এ ছবিখানা পাঠাই, এই রকম তুলনার ছবি কিন্তু একরঙা হবে আর শক্তিকে অপূর্ব রূপসী বলে ভ্রম হবে। যদি এঁকে পাঠাতে পার তো চেষ্টা কর। আসছে মেলে পাঠাব। বালনটাইন তোমাকে

(৩) এই সময়ে (১৯২৭) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে অসিতকুমার গোয়ালিয়রে বাগগুহার চিত্রাবলি পরিদর্শন করার জন্যে রওনা হয়েছিলেন।

(৪) স্বর্ণকুমারী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে ফুলের মালা অন্যতম। Fatal garland তারই ইংরিজী অনুবাদ।

তাঁর best regards দিয়েছেন ইত্যাদি। কি লিখব তাঁকে? আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। নদিদি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেলুম। বাবার চিঠি তাঁকে দিলুম এবং যে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছ তাঁকে দেখালুম। তিনি পড়ে খুশী হয়েছেন। আমাকে পরে ডেকে বললেন তোমাকে লিখে দিতে এগুলি কবিতা হিসেবে ভালো হয়েছে—তাঁর ভালো লেগেছে। এখন লিখতে বাবার হাত বড় কাঁপে নয়তো তোমায় নিজেই লিখতেন।(৫)

তোমার বাহাদুরী তুমি সমানে কলম ও তুলি দুই-ই চালাচ্ছ। প্রতিমা এখন বেশ সেরে উঠেছেন বাবাও ভালো আছেন। ইতি—

রথীমামা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্র

বন্ধু! ১৪ই আগষ্ট ১১১৬

আমি বলি বাঁচি। স্বাস্থ্য সুখের চাচি।
রোগবালাইয়ের নাক কাটবার কাঁচি।
শীতে সেথা হয় না হাঁচি। গ্রীষ্মেতে ঘামাচি;
সেথাও হবে জ্বর? এ যে ভয়ঙ্কর।
কেমন আছ এখন? সেটা জানাও বন্ধুবর।
দেখছি এখন কলকাতাতে আমরা ভাল আছি।
যদিও হেথা রাতে মশা দিনের বেলায় মাছি।

* * * *

তোমার ছবির নাম নীচেতে লিখিলাম।
(এক) বোধনের বাঁশী। (দুই) ঘুমন্তের হাসি।
এখন তবে আসি বন্ধু, এখন তবে আসি॥
রং-মহলের রঙ্গী তুমি পাঁচপীরের একপীর।(৬)
বহুত সেলাম জানায় তোমার কবি-কলমগীর।

alias শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পত্র

কলকাতা

ভাই অসিত, ৫ই জানুয়ারী ১১১৫

তোমার "শ্রেষ্ঠভিক্ষা" ছবিখানি ৫০০৲য় বিক্রয় হয়েছে শুনে খুশী হয়েছি। তুমি একটি ছবি লেখবার আস্তানা করছ বেশ হচ্ছে। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমি পাড়াগেঁয়ে একটু superstitious তুমি তো জান। যাতে কেউ নজর না দেয় সেইজন্যে ছেঁড়াজুতো, মুড়োঝাঁটা, ভাঙ্গা কুলো (এই তিনটি কর্ণধার ও পরম ত্যাগী, এঁদের সত্য ইত্যাদি করে দেবার গুণ বর্তমান আছে) একটি উচ্চবাঁশে টাঙ্গিয়ে দেবে এবং নমস্কার করে কাজ আরম্ভ করবে। তা হ'লে কাজ নির্বিঘ্নে চলবে। ইতি—

নন্দ

প্রখ্যাত কবি ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর পত্র

১৬ই নভেম্বর ১১৩২

প্রিয়বরেষু,

পূজার ছুটিতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, সম্প্রতি ফিরেছি। যাবার পূর্বে আপনার নাটিকা পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। কবিকে পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি খুবই উপভোগ করলেন এবং বললেন আপনাকে লিখবেন। আশা করি যথাসময়ে তাঁর চিঠি পেয়েছেন। আপনি ছোটদের জন্যে এমনি উপাদেয় রচনা আরো কিছু লেখেন তো তারা বাঁচে, বড়রাও কৃতজ্ঞ হয়। পরে ছবি দিয়ে বই করলে শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

আপনাদের
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

অসিতবাবু, এখনো দিন ৭।৮ সময় আছে। হাল্কা গোছের ছোট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন একটি বিশিষ্টতাকে দেখিয়ে আপনি সহজেই লিখে পাঠাতে পারবেন।

Golden Book এর জন্যে আপনার ইংরেজী লেখাটি গিয়েছে। কবি দেখে দিয়েছেন—সামান্য একটু সংক্ষিপ্ত করে দিলেন। ইংরেজী চমৎকার হয়েছে রচনাটি সব দিক থেকেই উৎকৃষ্ট হয়েছে, Golden Book এ ভারি চমৎকার মানাবে। আমাদের প্রীতি-নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

Dr. Anna Selig যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম—লণ্ডনে [illegible] চলেছেন। এঁকে এবং এঁর বন্ধু Miss Charlette Jones দুজনকে আপনার খুব ভাল লাগবে। Dr. Selig চমৎকার লোক। জার্মাণীতে ওঁর খুব প্রতিপত্তি—কবির জন্য সব আয়োজন জার্মানীতে উনিই করেছিলেন। এঁদের যথাসাধ্য যত্ন করলে কবি খুশি হবেন।

একবার যদি নিমন্ত্রণ করেন এবং V. N. Mehta, মন্ত্রীর [illegible] প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকেদের কাছে নিয়ে যান তো সুখী হই। [illegible] বড়দরের কাছে নিয়ে যাবেন যাঁরা এঁদের মর্যাদা বুঝবেন। [illegible] বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই—আপনি সব করবেন [illegible] জানি। আপনি নিজে সঙ্গে করে এঁদের বেড়িয়ে আনলে [illegible] বিশেষ উপকার হবে। প্রীতিনিবেদন,

[illegible]

---

(৫) অক্টোবার ১৯৩৭।

(৬) 'স্বাগত' নামে সত্যেন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কবিতাটি রসিক সমাজে সুপঠিত। কবিতাটির মধ্যে কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের মহিমা প্রচার করা হয়েছে। কবিতাটি 'অভ্র ও আবীর' এ অন্তর্ভুক্ত। শিল্পীদের প্রসঙ্গে এই কবিতায় কবি বলেছেন—

একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান, সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে।
'পঞ্চপ্রদীপ অবনী, গগন, অসিত, মুকুল, নন্দলালে।'

এই দুটি লাইনে পাঁচজন শিল্পীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং অসিতকুমারও তাঁদের অন্যতম। এই পাঁচজন শিল্পীকেই পত্র [illegible]

কানপুর

১৬ই জানুয়ারী ১৯৩০

প্রিয়বরেষু,

অসিতবাবু, এখানে বেশ কিছু টাকা উঠেছে। শ্রীবাস্তব মহাশয় প্রায় দশ হাজার টাকা তুলেছেন। চা'য়ে কবিকে নিমন্ত্রণ করে সেই সঙ্গে ধনী বণিকদের ডেকেছিলেন। নিলাম করার মত করে হাঁক ডাক করতে করতে টাকা তুলতে লাগলেন। তৎপূর্বে কবি ছোট একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফেরবার পথে ইংরেজ বণিকদের কাছে কবি আরও কিছু টাকা পাবেন—সবশুদ্ধ বিশ হাজার ওঠবার সম্ভাবনা।

কবির শরীর মোটেই ভালো নেই। আমাদের বড় ভাবনা রয়েছে—কী করব ভেবে পাওয়া যায় না, ওঁর সমস্ত মন রয়েছে লখনউ এ ফিরে খুব খানিক টাকা পাবার ভরসায়। এখানকার বাঙালীরা বেশ ভালো রকম তুলেছেন। ডাক্তার সুরেন সেন মহাশয় নিজে হাজার টাকা দিয়েছেন। এখানকার বাঙালীরা committee করে টাকা তোলবার ভার নিয়েছেন। কবি ফেরবার মধ্যে দেবার purse তৈরী থাকবে। কমিটিতে এখানকার দেশী লোকেরাও যোগ দিয়েছেন।

লখনউয়েও এই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। তার ভার আপনাদের উপর। আপনাদের কথায় ওখানে সহজেই কাজ হবে। কবি ২১শে নাগাদ লখনউয়ে পৌঁছবেন।

এখানকার টাকা আপনি শ্রীবাস্তবকে না বললে উঠতই না। আপনার টেলিফোনের 'কলে' এত হ'ল। এ কথা আমরা কেউ কোনদিন ভুলব না। কবি যে কতদূর কৃতজ্ঞ আপনার কাছে এবং আপনার শ্রদ্ধার ও প্রীতির এই আন্তরিক ও কর্মিক নিদর্শনে কত দূর আনন্দ লাভ করেছেন তা বলা যায় না। লখনউয়ে নিরন্তর সমস্ত বিষয়ে আপনি নানা রকম কষ্ট স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের জন্তে যা করেছেন তার বিষয় আর কি বলব? আপনার এই গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এবং অক্লান্ত কর্মোত্তম দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

ব্যক্তিগত ভাবে আপনার যে স্নেহ পেয়েছি সে বিষয়ে কিছু বলতে বৃথা চেষ্টা করব না।

ওখানকার organization এর জন্তে কবি আপনার উপর নির্ভর করেছেন। রাধাকুমুদ বাবু এবং অতুলবাবুও নিশ্চয় বিশেষভাবেই চেষ্টা করবেন। জয়গোপালবাবুকে আপনি বলবেন। পূর্ব্ব হতেই purse ঠিক থাকা দরকার। ৩০শে নাগাদ কবি সভায় যাবেন। তার পরে আপনাকে যথাসময়ে জানাব। ইতিমধ্যে যা ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন আপনি করবেন। কাল সকালে আগ্রায় আমরা চলেছি। এখন অনেক রাত্রি, ঘুমে কলম থেমে আসছে। কিন্তু আপনাকে না লিখে পারলাম না। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

অসিতবাবু, আজ চলেছি কানপুরে। সেখানে কিছু অর্থ তুলতে হবে। কেবল আপনাকেই খুলে জানাতে পারি যে বিশ্বভারতীর একটা বিষম অর্থসঙ্কট উপস্থিত [illegible] কিছুদিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা না পেলে আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। জমিদারীর আয় রবীন্দ্রনাথের তো নেই-ই বরঞ্চ এবারে বন্যার জন্তে খাজনা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তদুপরি সাহায্যার্থে নিজেই তিনি এত টাকা দিয়েছেন যে তহবিল শূন্য।

বিশ্বভারতীর অর্থ তিনিই বেশীর ভাগ দেন তা তো জানেনই—এবারে তো তাঁর দেওয়ার সাধ্য নেই। এখন কোন বাইরের অর্থাগমের সম্ভাবনাও বন্ধ। এই সব ব্যাপারে কবি কতদূর মনের কষ্টে আছেন তা বুঝতে পারেন। তাঁর শরীর ভালো নেই, তার উপর সামনে জয়ন্তী। তিনি ভাঙা শরীর নিয়ে অর্থ চেষ্টায় বেরোচ্ছিলেন কিন্তু সেটা এখন মারাত্মক হোত তাঁর পক্ষে। অত্যন্ত বেদনায় তিনি শেষে আমাকে যেতে বললেন—দু' চার হাজার যা পারা যায় তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুজন এবং সহকর্মী কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে এই একান্ত আশায় তিনি ভরসা করে আছেন। বাকি মুখে হবে।

জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন খুব জমে উঠেছে। একটা সত্যিকার বড় ব্যাপার হবে কবি নতুন নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করছেন। জয়ন্তী পরিকল্পনা বিষয়ও আপনাদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা আছে।

সেবার লখনউয়ে আপনারা কবিকে যে রকম সাহায্য করেছিলেন তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি, ওঁর বিশেষ ভরসা যে ওখানে আপনারা কয়েকজন যা হোক কিছু অর্থ এই রকম সঙ্কটের সময় তুলে দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

এলাহাবাদ

কাল ঠিকমতো এখানে এসে পৌঁছেচি এবং বাড়ী পৌঁছেই professional beggar-এর ঝুলি নিয়ে দু'-এক বাড়ীতে চরাও হয়েছি। বাঙালী যাঁদের কাছে গিয়েছি তাঁদের কথাবার্তায় বুক সাত হাত দমে গেল। রবীন্দ্রনাথের বিষয় এক ডাক্তার সাহা(৭) ব্যতীত কারো দরদ আছে বলে আশঙ্কা করবার কারণ নেই। লালগোপালবাবু(৮) সুস্থ থাকলে আনুকূল্য সংগ্রহ কঠিন হোত না।

জহরলালের সঙ্গে কাল রাত্তেই অনেকক্ষণ কথা হল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং করছেন। তা ছাড়া টাকাও তিনি যথাসাধ্য দিয়েছেন।

জহরলাল বললেন এখানে পেরে পুনরায় লখনউয়ে একবার দেখতে।

জহরলালের কথামত আপনাকে লিখলাম। Art School দেখে তিনি খুব impressed হয়েছেন। অনেক লোকের সামনে তা আমাকে কাল বললেন এবং আপনাকে নমস্কার জানাতে বললেন। আমি বলেছিলাম যে লখনউয়ে আপনার কাছেই ছিলাম।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

---

(৭) ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

(৮) এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

৩৩

শ্রীবাসের বাড়ি দরজা বন্ধ করে রাত্রিতে কীর্তন করছে নিমাই। গয়া থেকে এসে অবধি করছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করেছে এক বছর। গৃহত্যাগের পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত।

এক দিন নাচতে-নাচতে নিমাই বললে, 'আজ আমার উল্লাস হচ্ছেনা কেন?'

কে কী বলবে। একে-অন্যের দিকে তাকাতে লাগল সকলে।

'সত্যি, সুখ পাচ্ছিনা। কী হল বলো দেখি। আজ কৃষ্ণ আমার প্রতি কেন বিমুখ হলেন?' বিমর্ষ চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নিমাই।

সকলে প্রমাদ গুনল কার কী অপরাধ হয়েছে কে জানে। নিমাইয়ের চিত্তে কেন প্রসাদ নেই?

'দেখ তো কোনো অভক্ত লোক লুকিয়ে আছে কিনা!' হুঙ্কার করল নিমাই।

খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল শ্রীবাসের শাশুড়ি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

শ্রীবাসের শাশুড়ি বিষয়াসক্ত, ভগবদবিমুখ। নিমাই তার জামাইকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এই তার মনোভাব। তাই নিমাইয়ের বিরুদ্ধতাতেই সে বদ্ধ পরিকর। তার উপস্থিতির ফলে কীর্তন পণ্ড হোক এই তার অভিসন্ধি।

শাশুড়িকে দেখে ক্রুদ্ধ হল শ্রীবাস। হুকুম দিল বাড়ির বার করে দিতে।

শাশুড়ি চলে গেলে শান্ত হল পরিবেশ। বইতে লাগল প্রসাদবায়ু। নিমাইয়ের উল্লাস ফিরে এল।

'আজ আবার আমার প্রেমানুভব হচ্ছে না কেন?' নিমাই আরেক দিন প্রকাশ করল কাতরতা। 'আজ আবার কী হল?'

সবাই ত্রস্ত, হতবাক।

'নাচ জমছে না কেন? কেন সব শুষ্ক লাগছে? আজ এখানে আসতে পথে কি কোনো কুলোকের হাওয়া লাগল? না, তোমাদের কাছেই কোনো অপরাধ করেছি?'

আমাদের কাছে আবার তোমার কোন অপরাধ! অসহায়ের মত চেয়ে রইল সকলে।

'আমার প্রাণ যায়। শিগগির—আমাকে প্রেম দাও।' নিমাইয়ের কণ্ঠে করুণতর আর্তি। 'প্রেম ছাড়া প্রাণ আর বাঁচেনা।'

ভক্তই ভক্তিরসের আস্বাদক। আর ভক্তের হৃদয়েই ভক্তিরস আস্বাদনীয়। সে কী রকম ভক্ত? ভক্তিনির্ধূতদোষঃ। সাধন-ভক্তিতে যার চিত্তমালিন্য তিরোহিত হয়েছে। সে কী রকম ভক্ত? যে রসিক-আসঙ্গ-রঙ্গী। রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে যে সুখাবস্থ। গোবিন্দ পাদপদ্মই যার জীবনীভূত। মলিনতা দূর হলে কী হবে? চিত্তে জাগবে প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্য। আর চিত্ত প্রসন্ন আর উজ্জ্বল হলেই প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠার আবির্ভাব।

চিত্ত অপ্রসন্ন কখন? যখন তৃপ্তির অপ্রতুল। তৃপ্তির অভাব কখন? যখন বাসনার অপূরণ।

বাসনার তৃপ্তির জন্যে জীব মায়িক আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে আনন্দে কি আকাঙ্খার তৃপ্তি হচ্ছে। আকাঙ্খা নিত্য মায়িক আনন্দ অস্থায়ী।

নিত্য আকাঙ্খার জন্যে নিত্য আনন্দ কোথায়। নিত্য যেখানে আলোকের পিপাসা আর যেখানে সূর্যও শাশ্বত, সেখানে মায়া-মেঘের আবরণটি সরিয়ে ফেললেই অসীম বিমল—উল্লাস।

ক্ষুধা না থাকলে ভোজন কী! আকাঙ্খা না থাকলে আনন্দ কী! ক্ষুধা যত তীব্র, ভোজ্যরসও তত রমণীয়।

ভক্তি-বাসনা যত গাঢ় ভক্তি রস আস্বাদনও তত মধুর।

এদিকে নিমাইয়ের এই আর্তি আর ওদিকে অদ্বৈত প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে নাচছে।

'তুমি প্রেমে ডগমগ হয়ে নাচ্ছ আর আমি আর শ্রীবাস পাচ্ছিনা তার একতিল।' নিমাই অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে বললে, 'অবধূত নিত্যানন্দও তোমার কাছে প্রেম পেল। পেল কত তিলি-মালি' অপাঙক্তেয়র দল। আমি আর শ্রীবাসই শুধু পেলাম না কৃপাকণা। গোঁসাই, কৃপা করো, প্রেমদাও।'

অদ্বৈত ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন নাচছিল তেমনি নাচতে লাগল তন্ময় হয়ে।

'যদি না দাও', নিমাই গর্জন করে উঠল, 'তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নেব বলে রাখছি। তখন কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবে না।'

চৈতন্য প্রেমে মত্ত অদ্বৈত কি-এক কর্কশ কথা বলে ফেলল নিমাইকে। মুখে বাধল না একটুকু। যেমন-কে-তেমন হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগল কৌতুকে।

> চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
> কি বোলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাঞি॥
> যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
> সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥

অদ্বৈতের কর্কশ বাক্য শুনে নিমাই আর প্রত্যুত্তর করল না। প্রেমশূন্য শরীর নিয়ে আর কাজ কী! বলতে-বলতে সোজা ছুট দিল গঙ্গার দিকে। নিতাইয়ের লক্ষ্যের বাইরে নিমাই নয়, ত্বরিতে নিতাই পিছু নিল। নিতাইয়ের পিছনে চলল হরিদাস।

দাঁড়াল না নিমাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিল।

নিতাই আর হরিদাসও পরল ঝাঁপ দিয়ে। ধরাধরি করে নিমাইকে তীরে তুলল দুজনে।

'আমাকে কেন তুললে? প্রেমরহিত জীবনে আমার ফল কি?' বললে নিমাই।

'তাই বলে তুমি মরতে যাবে?' নিতাই বললে, 'ভক্ত কী বললে বা না বললে তাতে তোমার অভিমান হবে? নিজে মরতে গিয়ে ভক্তকে মারবে? অন্য ভাবে আর কি তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না?'

নিমাই বললে, 'শোন, আজ রাত আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে থাকব। এ কথা কাউকে যেন বলবে না। প্রকাশ করবে না কোথাও।'

নিমাই চলে গিয়েছে আর ফিরে এল না, শ্রীবাসের বাড়িতে ভক্তের দল কাঁদতে বসল। যেন রাসের রাত্রিতে গোপীমণ্ডল থেকে চলে গিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। নেমে এসেছে বিরহের বিভাবরী।

হে সম্ভোগপতি, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনাবেতনের কিঙ্করী, কোথায় আছ, আমাদের দেখা দাও। তোমার শোকনাশন হাসি, প্রেমভ্রক্ষিত কটাক্ষ, নিভৃত সঙ্কেত-ক্রীড়া স্মরণ করে আমাদের চিত্ত মথিত হচ্ছে। যখন পশুচারণ করতে করতে ব্রজ থেকে দূরে চলে যাও, তখন তোমার কমলকোমল পা দুখানি করকা ও তৃণাঙ্কুরে আঘাত পাবে সেই চিন্তায় আমাদের মন আকুল হয়ে থাকে। দিনশেষে যখন ধেনু নিয়ে ফিরে আস, তখন নিবিড় ধূলি পটলে ধূসরিত, নীলকুন্তলে ঢাকা তোমার মুখখানি আমাদের মনে মদনপীড়া উজ্জীবিত করে, কিন্তু কিছুতেই তুমি সঙ্গ দাও না। তোমার চরণকমল লক্ষ্মীসেবিত প্রণতজনের অভিলাষপূরক, সর্ব পৃথিবীর ভূষণ, আপৎকালে চিন্তনীয়, সেবাকালেও সুখপ্রদ, এখন তা আমাদের স্তনতটে স্থাপন কর। শব্দায়মান বেণু তোমার অধরসুধা পান করছে, যে অধরামৃতে মানুষের সার্বভৌম সুখেচ্ছারও বিস্মরণ ঘটে। সেই অধরসুধা দান করো আমাদের। তোমার কুটিল কুন্তল শোভিত মুখখানি অনিমেষে প্রাণভরে যে দেখব তারও উপায় নেই, খল ব্রহ্মা আমাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম দিয়ে দিয়েছেন। তুমি গীতের গতি অবগত আছ, তোমার উচ্চগীতে মোহিত হয়ে পতি পুত্র জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবদের উপেক্ষা করে এসেছি, রাত্রিকালে শরণাগতা কামিনীদের তুমি ছাড়া আর কে পরিত্যাগ করতে পারে? তোমার লাভাকাঙ্খায় আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, যা হৃদরোগ নাশ করে কার্পণ্য ত্যাগ করে সেই ঔষধ কিঞ্চিৎ আমাদের দান করো। তুমিই আমাদের জীবন—পাছে তোমার ব্যথা লাগে এই ভয়ে তোমার যে পাদপদ্ম আমাদের কঠিন কুচতটে সন্তর্পণে

ধারণ করি তুমি সেই পা ছু'খানি দিয়ে কাননে ভ্রমণ করছ, পাষাণে কি ওদের ব্যথা লাগছে না? এই ভেবেই আমাদের কষ্টের আর অন্ত নেই।

নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল নিমাই আর ভগবান-আবেশে বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসে পড়ল। নন্দন আচার্য ও তার পারিষদদের আনন্দ দেখে কে!

মূর্তিমান পরমমঙ্গল সমাগত, সকলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল ভূতলে। নতুন বসন এনে দিল, দিল সেবা-শোভার উপকরণ। মালা, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর-তাম্বুল। নন্দনসেবায় আনন্দিত গৌরহরি।

বললে, 'আজ তুমি এখানে আমাকে গোপন করে রাখবে।'

'সাধ্য কী, তোমাকে গোপন করি।' নন্দনের ছু'চোখ জলে ভরে উঠল। 'হৃদয়ে থেকেও তো পারলে না লুকোতে। দেখা দিতে প্রকট হলে। ক্ষীরসিন্ধুর মধ্যেও বা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে কই?'

সমস্ত রাত কৃষ্ণ-কথা-রসে কেটে গেল দুজনের।

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে মন্মথের মনমথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশরদর্প স্বয়ং নবকন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥

কাম-বিজয়ই রাসলীলার তাৎপর্য। সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ার্থ যার পাঁচ শর—সেই মদনের গর্ব খর্ব হয়েছে। কৃষ্ণকে দেখে স্বয়ং মদনই সম্মোহিত। অকৈতব নির্মল প্রেমের রথেই কৃষ্ণের আরোহণ। আর, গোপীরা নির্মলতার স্বচ্ছন্দ স্রোতস্বিনী ছাড়া আর কী।

নন্দনকে নিমাই বললে, 'যাও একাকী শ্রীবাসকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

নন্দন নিজে গিয়ে শ্রীবাসকে নিয়ে এল।

'আচার্য কেমন আছে বলো।' জিগগেস করল নিমাই।

শ্রীবাস কাঁদতে লাগল বললে, 'উপবাস করে পড়ে আছে। যেমন অপরাধ তেমনি দণ্ড পেয়েছে। এবার তাকে কৃপা করুন।'

'চলো আচার্যের বাড়ি চলো।'

আচার্যের বাড়ি গিয়ে দেখল আচার্য কাষ্ঠবৎ পড়ে আছে মাটিতে।

'ওঠো, বললে নিমাই, 'দেখ আমি বিশ্বম্ভর, এসেছি তোমার কাছে।'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে রইল অদ্বৈত। মুখে কথা ফুটল না।

'ওঠো, চিন্তা কী, আমিই তো এসেছি।' নিমাই আবার বললে।

অদ্বৈত মাটিতে মুখ গুঁজে বললে, 'প্রভু, আমি বুঝেছি আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। তুমি আমাকে শুধু কুমতি দিয়েছ। আর-সকলকে দৈন্য-দাস্য দিয়েছ আর আমাকে দিয়েছ অহঙ্কার। আর-সকলে তোমার অন্তরঙ্গ, আমিই বহিরঙ্গ। মুখে তুমি এক কথা বলো আর কাজে করো অন্যরূপ। আমাকে যে আত্মীয়তা দেখাও সে তোমার বাহ্যিক। নইলে কেন তুমি আমাকে গৌরব দেখাও? দেখিয়ে আমার দম্ভের সূচনা করো। আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই।'

গৌরহরি হাসতে লাগল। বললে, 'তুমিই আমার নিজজন। তুমি নিজজন বলেই তো তোমাকে দণ্ড দিই। যে আমার অনুগ্রহের পাত্র তার অপরাধ দেখে তাকেই তো শাস্তিরূপ আশীর্বাদ পাঠাই। জন্ম-জন্ম তাকে দাস করে রাখি। সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে। অপরাধে শোচ্য-হাতে তার শাস্তি করে।'

অদ্বৈত বললে, 'তাই কারো আমাকে দণ্ড দাও, আমাকে দাস করে রাখো।'

'প্রাণ, দেহ, ধন, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ', ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু, মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥'

'এখন তবে ওঠো, স্নান করো। আর উপবাসে থেকো না।' বললে নিমাই, 'অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে। জন্মজন্ম দাস সেই—বলিমু তোমারে॥' অদ্বৈত উঠে আনন্দে নাচতে লাগল। বললে, 'আর কী! আমি কৃষ্ণের দাস হলাম। আমি কৃষ্ণের দাস হলাম।'

কৃষ্ণের দাস হওয়া কি সোজা কথা? মুক্ত পুরুষই কৃষ্ণের দাস হতে পারে। অল্প করেই যেন কৃষ্ণের দাস হয়েছ ভেবো না। অল্প ভাগ্যে হওয়া যায় না কৃষ্ণদাস।

আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥

দাস্য ভাবের ভক্ত চার শ্রেণীর। অধিকৃত, আশ্রিত, পার্ষদ, অনুগ। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অধিকৃত দাস। আশ্রিত ভক্ত আবার তিন শ্রেণীর। শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ আর সেবানিষ্ঠ। যারা মুক্তি চায় যেমন কালীয়নাগ, যেমন জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ নৃপতির দল, তারা শরণাগত। যারা মুক্তি চায়না অথচ ভগবানে সমর্পিত, তারা জ্ঞাননিষ্ঠ। যেমন শৌনিকাদি ঋষি। আর যারা ভজনে আসক্ত, যেমন বহুলাশ্ব ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক, তারা সেবানিষ্ঠ। যারা কৃষ্ণের কাজে নিযুক্ত, মন্ত্রী বা সারথি, অথচ যারা পরিচারক তারা পার্ষদ ভক্ত। যেমন দ্বারকায় উদ্ধব দারুক, সাত্যকি ; কুরুবংশে ভীষ্ম, বিদুর পরীক্ষিত। এ পর্যন্ত 'পূর্বৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।' এ সমস্ত ভক্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই জ্ঞান বিদ্যমান। এদের রতি ঐশ্বর্যজ্ঞান মিশ্রা। অনুগের মধ্যে যারা পুরস্থ অর্থাৎ দ্বারকার, যেমন সুযন্ত্র, মণ্ডন, সুতম্ব, তারা কৃষ্ণের সেবা করছে বটে, কৃষ্ণের মাথায় ছাতা ধরে বা চামর ঢুলিয়ে, কিন্তু তাদের সেবায়ও ঐশ্বর্যবুদ্ধি। কিন্তু ব্রজস্থ অনুগ, যেমন রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে জানে না, ব্রজজন নিজজন বলে জানে। তাদের কেবল রতি। তাদের কাছে কৃষ্ণ নন্দ-মহারাজার ছেলে ছাড়া কিছু নয়। তাদের প্রীতির গাঢ়তায় ভগবত্তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর রূপে তাদের প্রভু নয়, একমাত্র সেব্য-রূপেই প্রভু। তারা কৃষ্ণের কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে, অগুরু দিয়ে স্নানের জল সুবাসিত করে দিচ্ছে, পান সেজে দিচ্ছে, কিন্তু কোনো কাজেই এ বুদ্ধি নেই যে কৃষ্ণ ভগবান, কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর। ব্রজের দাস্য শুদ্ধ মাধুর্য্যের ধারাস্নান। ব্রজের সেবা প্রাণ ঢালা।

তৃণের থেকে নীচ হয়ে বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হয়ে নিজ সম্মানলাভের অভিলাষ না করে আর অন্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সর্বদা হরিকীর্তন করো। 'নাম-সূত্রে গাঁথি পরো কণ্ঠে এই শ্লোক।' আর ও-ভাবে নাম করলেই মিলবে কৃষ্ণ প্রেম।

চাপাল গোপাল খুব তেজী দুর্মুখ ব্রাহ্মণ। আসল নাম গোপাল কিন্তু বিদ্যার ঔদ্ধত্যে চপল বলে চাপাল বলে সকলে। কীর্তন সহ্য করতে পারে না, শ্রীবাসের বাড়িতে নিয়মিত কীর্তন হয় বলে তার উপর বিষম রাগ। একদিন রাত্রে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন হচ্ছে, দ্বার বন্ধ, গোপাল দরজার বাইরে তন্ত্রপন্থী পূজার উপকরণ সাজিয়ে রাখল। সাজিয়ে রাখল কলাপাতা, তার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিঁদুর, তণ্ডুল আর রক্তচন্দন। আর এক ভাণ্ড মদ। অর্থাৎ দেখাতে চাইল শ্রীবাস মদ্যপায়ী তান্ত্রিক। শ্রীবাস একা নয়, যারা দরজা বন্ধ করে নর্তন কীর্তন করছে, তারাও।

সাজিয়ে রেখে বাড়ি পালাল গোপাল। রাতের পথিক, ভোরের পথিক সকলে দেখ শ্রীবাসের কিসের ভজনা। আর তার সঙ্গীরা যে এত চেঁচামেচি লাফা লাফি করে, তা কিসের প্রভাবে।

সকালে দরজা খুলে শ্রীবাসের চক্ষু স্থির।

লোকজন ডেকে আনলো শ্রীবাস। দেখ কোন দুরাচার কী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছে! আমরা নাকি মদ খাই। তন্ত্র-যন্ত্র করি।

সকলে হায়-হায় করে উঠল। বুঝতে কারু বাকি রইলনা কোন পাষণ্ডের এ দুষ্কাণ্ড! তিন দিনের দিন চাপাল গোপালের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হল।

বাড়ির বাইরে চালা বেঁধে থাকতে লাগল গোপাল। নাকে কাপড় দিয়ে এক মুঠো ভাত দিয়ে পালিয়ে যায় স্ত্রী। সন্তানেরাও কাছে ঘেঁসে না। লাঠির ভর দিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে-হেঁটে গঙ্গাতীরে এসে গাছতলায় বসে থাকে চুপচাপ।

কে একজন বললে, 'নিমাইকে ধরো না। ইচ্ছে করলে সেই তোমাকে নিরাময় করে দিতে পারে।'

বলো কী! নিমাই পণ্ডিত তো গ্রামসম্পর্কে আমার ভাগনে। তার এত শক্তি।

গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে নিমাই, তাকে গিয়ে ধরল চাপাল। বললে, 'তুমি নাকি মহাচিকিৎসক হয়েছ, কঠিন রোগ আরাম করতে পারো। সম্পর্কে আমি তো তোমার মামা হই, আমার এ কুষ্ঠ সারিয়ে দাও না।'

এখনো দম্ভ, এখনো মালিন্য! নিমাই রুষ্ট হয়ে বললে, 'তুমি ভক্তদ্বেষী তোমার উদ্ধার নেই। যারা পাষণ্ড তারা তাদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করবেই।'

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥

নিমাই গঙ্গায় নামল, চাপালের দিকে ফিরেও

তাকালনা। পাপীর প্রাণ যাবে না, শুধু দুঃখ ভোগ করে যাবে।

কাশীতে এসে হাজির হল চাপাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পড়ল হত্যা দিয়ে।

বিশ্বেশ্বর স্বপ্ন দিল, নবদ্বীপে ভগবান গৌরাঙ্গরূপে উদয় হয়েছেন। সত্বর যাও তাঁর পায়ে আশ্রয় নাও, কালব্যাধি সেরে যাবে।

নবদ্বীপে ফিরে এল চাপাল। কিন্তু তখন কোথায় গৌরহরি?

নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাবার পথে জননী ও জাহ্নবীকে দেখতে ফিরেছেন প্রভু, নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে এসেছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ল চাপাল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, 'আমাকে উদ্ধার করো প্রভু।'

প্রভু এবার করুণায় দ্রবীভূত হলেন। বললেন, 'তুমি শ্রীবাসের কাছে যাও। তার কাছেই তুমি অপরাধী। সে যদি অনুগ্রহ করে তা হলেই তুমি রোগমুক্ত হবে।'

শ্রীবাসে পারণ নিল চাপাল।

শ্রীবাস প্রসন্ন হল। পাদোদক খেতে দিল চাপালকে। চাপাল সুস্থ হয়ে উঠল। শুধু দেহ-রোগ নয় ভক্তবিদ্বেষ রূপ যে ভবরোগ তার থেকেও উদ্ধার পেল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যাকাল। দিকদিগন্ত ছাপিয়ে ঘনগম্ভীর মেঘ করে এসেছে।

আজ আর বুঝি কীর্তন জমল না।

শ্রীবাসের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে ভক্তরা, সবাই বিমর্ষ হয়ে গেল। মুক্ত অঙ্গনে মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে কীর্তন হবে কী করে?

সমবেত ভক্তদের মনোদুঃখ স্পর্শ করল নিমাইকে এক জোড়া মন্দিরা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল নিমাই। মমতামেদুর চোখে তাকাল মেঘের দিকে। মৃদু মৃদু বাজাতে লাগল মন্দিরা। নামকীর্তন করতে লাগল।

ধীরে ধীরে মেঘ চলে গেল দিগন্তরে।

শুধু মেঘ নয়, চলে গেল আলস্য আর জড়তা। চলে গেল অবিশ্বাস।

কীর্তন দেখবার জন্যে এক ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের অঙ্গনের দিকে চলেছে, পৌঁছে দেখল দরজা বন্ধ। ভিতরে ঢুকতে পেলনা।

পরে গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

'তোমার দরজা বন্ধ দেখলাম। কীর্তন শুনতে পেলাম না।' ব্রাহ্মণ অভিযোগ করল।

পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল নিমাই।

'শোনো।' বাধা দিল ব্রাহ্মণ। 'তোমার ব্যবহারে আমি সেদিন নিদারুণ দুঃখ পেয়েছি। আমি তা সহ্য করব না। তোমাকে শাপ দেব।'

'শাপ দেবে?' নিমাই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, ব্রহ্মশাপ। এ শাপ ফলবেই।' তীব্র রাগে ব্রাহ্মণ তার পৈতে ছিঁড়ে ফেলল। বললে, 'এই শাপ দিচ্ছি, তোমার সংসারসুখের বিনাশ হোক।'

নিমাই আনন্দ করে উঠল। বললে, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার সংসার সুখের যদি অবসান হয় তা হলে তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'পরম সৌভাগ্য!'

'তা ছাড়া আর কী। সংসারসুখে আমি যদি না আর আকৃষ্ট হই তা হলে তো আমি সর্বক্ষণ তন্ময় হয়ে ভগবদ ভজন করতে পারব। বলতে পারব কৃষ্ণনাম।'

'আপনি যে ঐ কৃষ্ণ নাম করেন, সেও তো এক রকম মায়া।' এক পড়ুয়া বললে একদিন নিমাইকে।

শোনামাত্র কানে হাত দিল নিমাই।

'কৃষ্ণনামের যে মহিমার কথা আপনি বলেন তা অতিরঞ্জিত প্রশংসা মাত্র।' আবার বললে সেই ছাত্র।

'নামে স্তুতিবাদ' শুনে নিমাই দুঃখিত হল। রুষ্ট হয়ে বললে সবাইকে, 'এর মুখদর্শন কোরো না। নাম মাহাত্ম্যে যে অর্থবাদ কল্পনা করে সে ঘোরতর অপরাধী। নামাপরাধীর মুখদর্শনও অপরাধ।'

সচেলে, সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করতে গেল নিমাই। গঙ্গাস্নানে পবিত্র হই চলো। কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণনামের স্বভাবমাহাত্ম্য নেই এ কথা শোনামাত্রই অপবিত্র হয়েছি আমরা। গঙ্গাই পাপদ্রাবিণী নিস্তারিণী।

চিত্তদ্রবতাই কৃষ্ণপ্রেমের মুখ্যলক্ষণ। হরিনাম গ্রহণের ফলে নেত্রে অশ্রু ঝরছে, গাত্রে রোমাঞ্চ ফুটছে অথচ হৃদয় দ্রবীভূত হচ্ছেনা, সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন। অনাসঙ্গ ভজনে প্রেমলাভ অসম্ভব।

'আমিও যাব গঙ্গাস্নানে।' সেই অবিশ্বাসী পড়ুয়া পিছু নিল নিমাইয়ের।

গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘন-ঘন ডুব দিতে লাগল। ধুয়ে গেল মনোমল; ধুয়ে গেল অবিশ্বাস।

[ক্রমশঃ।

অধ্যাপক সুবোধ মুখোপাধ্যায়

এই সেদিন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নরসিং দাস' পুরস্কার যিনি মাথায় তুলে নিয়ে এলেন তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবোধ মুখোপাধ্যায়। সদালাপী, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কারী এবং ষোল আনা বাঙ্গালী হিন্দু বলতে যা বুঝায় সুবোধ বাবু তাই। আজীবন লেখা-পড়া করা তাঁর জীবনের যেমন একটি প্রধান ধর্ম্ম, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রের নিয়মগুলি মেনে চলাও আর একটি ধর্ম্ম। এই দু'টি ধর্ম্মকে পাশা-পাশি রেখে তিনি গৌরবময় অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে যাচ্ছেন।

১৯১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের লালবাগে বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাচস্পতি বংশে সুবোধ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধব-উপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষায়তনে ছেলেবেলায় শিক্ষা লাভ করেন। গুরুগৃহ ধরণের এই আদর্শ বিদ্যালয়ে তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল স্যাডলার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় শিক্ষাবিদগণ মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসতেন এবং সামগ্রিক ভাবে মানুষের চরিত্র গঠনে বিদ্যালয়টিতে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা লক্ষ্য করতেন।

চরিত্র গঠনের আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করে সুবোধ বাবু স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। এখান থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে এলেন এবং এই কলেজ থেকেই আই-এ ও বি-এ অনার্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রথম গ্রন্থাগার-শিক্ষণ ক্লাসে ভর্ত্তি হন ১৯৩৫ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করে তিনি তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কিছুকালের জন্য চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে বরাখাম্বায় একটি বিদ্যালয় পরিচালনের দায়িত্ব নিয়ে নয়াদিল্লীতে তিনি চলে আসেন। তারপর তিনি বরোদার সুবিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যামন্দিরের লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। বরোদায় থাকাকালীন তিনি মধ্য ভারতের সুবিখ্যাত বাঙ্গালী মোটর ব্যবসায়ী স্বর্গত, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী উমা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বরোদার বিদ্যামন্দিরে দুই বৎসর কাজ করার পর ১৯৩৮ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন এবং ৮ বৎসর এই পদে কাজ করেন। তারপর নয়াদিল্লীর ইম্পিরিয়াল রেকর্ড দপ্তর থেকে এই সময় লাইব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আহ্বান আসে, তিনি এই পদ গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিল্লীতে দ্বিগুণ বেতন পেয়েও কাজ করার তাঁর প্রলোভন ছিল না। তাই তিনি কিছুদিন কাজ করেও চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পুনরায় চাকরি গ্রহণ করলেন। এবং ১৯৫১ সালে তিনি ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হ'লেন। ঐ বৎসরই ইউ-এন-এস-কো তাঁকে গ্রন্থাগার সমূহের ফেলো মনোনীত করেন এবং

অধ্যাপক সুবোধ মুখোপাধ্যায়

তাঁদের ব্যবস্থাপনায় তিনি যুক্তরাজ্য এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহের গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের সুযোগ পান।

সুবোধ বাবু ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বহুদিন থেকেই জড়িত আছেন। তিনি ভারতীয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি দুটির আজীবন সদস্য। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি বাংলাদেশের বহু গ্রন্থাগার সমিতির সঙ্গে জড়িত। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। সুবোধ বাবুর রচিত 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' গত বছর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিং দাস পুরস্কার লাভ করেছে।

শ্রীউমাদাস মুখোপাধ্যায়

[জব্বলপুর রবার্টসন কলেজের অধ্যক্ষ]

"যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে থাকেন তাঁদেরও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকা একান্ত দরকার এবং যাঁহারা সাহিত্য ও কলার অনুশীলন করেন, তাঁদের বিজ্ঞান কি শেখাচ্ছে তারও একটু জ্ঞান থাকা, খুব দরকার না হলেও বাঞ্ছনীয় এবং এই যোগাযোগে আনন্দ পাওয়া যায়—মনের বিকাশ হয়। কিন্তু এ কথা অনেক সময় আমাদের খেয়ালে আসে না। বিজ্ঞান জ্ঞান দেয়, বল দেয়, কিন্তু ধর্ম না থাকলে বৈজ্ঞানিক বিপথে যায়—দানব হয়ে উঠে"—এই কথাগুলি বলেন জব্বলপুর রবার্টসন কলেজের (বর্ত্তমান মহাকোশল মহাবিদ্যালয়) বৈজ্ঞানিক-অধ্যক্ষ শ্রীউমাদাস মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গত অনুকূল মুখোপাধ্যায় ও পরলোকগতা সরোজবালা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র উমাদাস স্বগৃহ মুড়াগাছা (নদীয়া জেলা) "দেওয়ানবাড়ী"তে ১৯০৪ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ৺জগৎচন্দ্র "লালাবাবু" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্য উমাদাস নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃব্য সরকারী চাকুরিয়া সানুকূল মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মস্থল নাগপুর শহরে আসিয়া বেঙ্গলী বয়েজ (দীননাথ উচ্চ) বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২১ সালে স্থানীয় পটবর্দ্ধন (সরকারী) উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ হইতে আই, এস, সি ও বি, এস, সি এবং ১৯২৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে (নাগপুর ভিক্টোরিয়া বিজ্ঞান কলেজ হইতে) এম, এস, সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয় ও

কলেজে পাঠকালে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন—তন্মধ্যে প্রধানশিক্ষক কিনচ ক্লার্ক (Kynoch-Clark), অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী, অধ্যাপক মাখনলাল দে, অধ্যাপক টি, ভি, মোনা (বোম্বাই সরকারের বর্তমান মুখ্যসচিবের পিতা), অধ্যাপক রাউল্যাণ্ডস, অধ্যাপক ওয়েন, অধ্যাপক ভাস্কর মুখার্জি (দেশবন্ধু-জামাতা) ও অধ্যক্ষ আর্থার সেল্‌স উল্লেখযোগ্য। ছাত্রজীবনে বরাবর সর্বোচ্চস্থান গ্রহণের জন্য উমাদাস শিক্ষক ও ছাত্রমহলের স্নেহ ও প্রীতিলাভ করেন।

১৯২৭ সালে এম, এস, সি পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান গ্রহণের জন্য শ্রী মুখোপাধ্যায়কে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে লওয়া হয় এবং নাগপুর বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে তিনি নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তিনি অমরাবতী (বেরার) কিং এডওয়ার্ড কলেজে আসিয়া তথায় একাধিক্রমে সতের বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ সালে প্রথম শ্রেণীর (Class I) অধ্যাপকপদে উন্নীত হইয়া তিনি নাগপুর বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক-প্রধান হিসাবে ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে রায়পুর শহরে বিজ্ঞান কলেজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইলে শ্রী মুখোপাধ্যায় উহার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে গঠিত সর্বাঙ্গ-সুন্দর এই বিজ্ঞান কলেজটি কেবলমাত্র রাজ্যের মধ্যে নয়—সর্বভারতে উহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। দশ বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি তাঁহার পূর্বতন শিক্ষাকেন্দ্র (Old Alma Mater) রবার্টসন কলেজে (বর্তমানে মহাকোশল মহাবিদ্যালয়) অধ্যক্ষরূপে আসিয়া বর্দ্ধিতকার্য্যকাল সহ ভারপ্রাপ্ত রহিয়াছেন। ২৩০০ ছাত্রছাত্রী সম্বলিত একশত পঁচিশ বৎসরের পুরাতন

শ্রীউমাদাস মুখোপাধ্যায়

এই মহাবিদ্যালয় আজ রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে সুখ্যাত। আর অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সর্বস্তরে ইহাকে সুপরিচালিত করিতেছেন। ইহার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও গবেষণাগারগুলি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ নীলরতন ধর ও বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায়ের সুমধুর ব্যবহার ও দক্ষ পরিচালনা—আজ সহকর্মীদের ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সহিত তাঁহাকে প্রীতির ও স্নেহের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছে। পড়ুয়াদের আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার জন্য তিনি কলেজের সর্বশ্রেণীতে পাঠ অনুশীলন করাইয়া থাকেন। দুঃখের সহিত তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, পূর্ব্বেকার স্পৃহা, সাধনা ও একাগ্রতা যেন ক্রমশঃ ছাত্রমন থেকে অপসৃয়মান। তবুও এই শিক্ষাসাধক আজও তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপনে স্থির-নিশ্চয়। তাই কথায় কথায় আমায় জানালেন যে, এখান থেকে অবসর গ্রহণের পর (শান্তিনিকেতন) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা এইরূপ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা করিতে আগ্রহী। অর্থের প্রয়োজন তাঁহার নেই—কিন্তু গত চৌত্রিশ বৎসরব্যাপী ছাত্রদের মধ্যে কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠার ফলে সক্ষমদেহী, উন্নতমনা ও কর্ম্মঠ এই শিক্ষাব্রতী যতদিন সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন।

১৯২৮ সালে তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপক কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তনয়া শ্রীমতী শান্তিদেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণকুমারকে তিনি চিরকালের জন্য হারান। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার করোনার (Coroner) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কলিকাতা পাস্তর ইনঃ ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযামিনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিকত্রয়।

স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র তোলা, উদ্যানবিষয় গবেষণা ও নানারূপ যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে শ্রীমুখোপাধ্যায় অবসর সময় যাপন করেন।

তিনি ছাত্রবয়সে খেলাধূলা করেছেন ও পরে কর্ম্মজীবনে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি ভারত-সেবক সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

জব্বলপুরে (১৯৫১) অনুষ্ঠিত প্রথম নিখিল ভারত জুওলজি কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৫৮ সালের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (জব্বলপুর অধিবেশন)-এ তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমানে অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায় জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের 'প্রধান' ও উহার বিজ্ঞান-অনুষদের 'ডীন'।

শ্রীসুকু সেন

[ভিলাই ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার]

একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক স্বীয় কর্ম্ম অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিয়া শ্রীসুকু সেন ভারতে ইস্পাত-উৎপাদন ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। আর সেই জন্যই তিনি হিন্দুস্থান্ স্টীল্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষকে স্পর্দ্ধার সহিত জানাইয়াছিলেন যে, তাহাকে ভিলাই

ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না কেন ?

কর্তৃপক্ষ তাহার এই চ্যালেঞ্জের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ১০ই এপ্রিল হইতে ভিলাই ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার সহিত দেখা হইতেই শ্রীসুকু সেন মহাশয় বলিলেন, "আপনি আপনার জিজ্ঞাসাবাদের যা'একটা ফিরিস্তি পাঠিয়েছেন, মনে হয় যেন আপনি আমার ঘটকালি করছেন।" রসিকতাটুকু উপভোগ করিয়া বলিলাম, "প্রথিতযশা ব্যক্তিদের জীবনী আমরা পুরোপুরি-ই জান্তে চাই।" মনে মনে বলিলাম, 'কোন্ লগনে জনম আমার' থেকে শুরু করে অন্ততঃ বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান অধিকার করা পর্য্যন্ত।

তিনি একে একে বলিতে লাগিলেন, "জন্ম আমার ৪ঠা মার্চ্চ ইংরেজী ১৯০০ সালে। পিতার নাম ৺অনুকূলচন্দ্র সেনগুপ্ত। বাবা ছিলেন আসাম সার্ভিসে। কাজেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাকে পেতে হয়েছে আসামের নানা জায়গায়। ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করি শিলচর থেকে। তারপর আমি বি-এস্‌সি পাশ করে বেরুই ১৯২১ সালে রাজসাহী কলেজ থেকে। তখন থেকেই টাটাতে গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনী হয়ে ঢুকি। সাথে সাথে ধাতুবিজ্ঞায় (Metallurgy) ডিপ্লোমা লাভ করি। টাটা ইস্পাত কারখানায় একাদিক্রমে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর অবধি রোলিং মিলসের চীফ্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কাজ করেছি। মাঝখানে দু' বৎসর জেনারেল্ ম্যানেজারের সহকারী (Assistant) হিসাবেও কাজ করেছি। তারপর ১৯৫০ সালের মে মাসে আমি বার্ণপুরের কারখানায় রোলিং মিলসের চীফ ম্যানেজার হয়ে যাই। তারপর হিন্দুস্থান স্টীলের জন্ম হলো। ১৯৫৫ সালে হিন্দুস্থান স্টীলেরই রাউরকেলা ইস্পাত কারখানায় এলাম ডেপুটি টেক্‌নিক্যাল এডভাইজার হয়ে। ১৯৫৮ সনের জুন মাসে এসেছি এই ভিলাই ইস্পাত কারখানায় টেকনিক্যাল এডভাইজার ও জেনারেল সুপারিন্টেনডেন্টের পদ নিয়ে। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে সিংহল সরকারের আহ্বানে চার সপ্তাহ সিংহল সরকারের টেকনিক্যাল এডভাইজারেরও কাজ করে এসেছি।"

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "বিদেশে গেছি বহুবার। পৃথিবীর সেরা সেরা ইস্পাত কারখানাগুলি দেখেছি; যাইনি শুধু চীন আর জাপানে।"

খেলাধুলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই বলিলেন, "খেলিনি কোন খেলাটি বলুন? তবে বাঙ্গালী তো? ফুটবলটার প্রতিই আমাদের জন্মগত আসক্তি। তাই খেলেছিও ওটা সব চাইতে বেশী।" তারপর নাটকের কথা উঠিতেই বলিলেন, "ও বিষয়ে আমি নাইট বার্ড। সুযোগ পেলেই নাটকের মহড়াতে বা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে থাকি।"

রাউরকেলাতে তিনি রোটারী ক্লাব্ শুরু করিয়াছিলেন, তারপরেই ভিলাইতে বদলী হইয়া আসেন। এখানেও তিনি রোটারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (Founder President)।

ঘটকালির কথায় এবার ফিরিয়া আসিতেই তিনি বলিলেন, "ও দিয়ে আর দরকার নেই। তবে বিয়ে করেছি ১৯২৭ সনে। স্ত্রীকে তো আপনি দেখেছেনই। বড় ছেলে এভিএশান্ ইঞ্জিনিয়ার (Aviation Engineer)। আরেক ছেলে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে বি-কম্ পাশ করে একটা বিলেতী প্রতিষ্ঠানে একাউন্টেন্ট, আর মেয়ে-জামাই আছে বার্ণপুরে।"
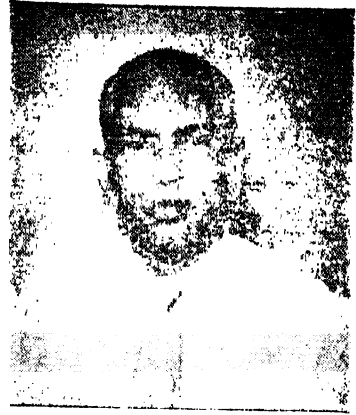
শ্রীসুকু সেন

আমায় কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে বাড়ীর গেট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—ইস্পাতপুরীর কারখানার ভিতর যে লোকটি ইস্পাতের মতই কঠিন; সেই ব্যক্তিই কিনা বাহিরে খেলোয়াড় মনোবৃত্তিতে আনন্দ-উজ্জ্বল।

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[ডাইরেক্টর—দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্‌স্]

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদান অদ্যাবধি সর্ব্বজন সম্মত। বঙ্গজননীর অঙ্ক হইতে জ্ঞানের বীজ আহরণ করিয়া যে সকল বঙ্গসন্তান ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছেন ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্ঞানের পরিধি শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় বর্ত্তমান।

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯০২ সালের ১০ই মার্চ্চ উত্তর প্রদেশ অন্তর্গত মীরাট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা হইলেও তথাকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক খুবই কম। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং ভারতের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারে তাঁহার অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিরাট শহরেই বাল্যের শিক্ষা সমাপন করিয়া অতঃপর কলিকাতা আসিয়া সাউথ সুবার্বণ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১৯ সালে উক্ত স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং কুইনল্যান পদক

লাভ করেন। অতঃপর শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় ট্রেণ্ডস্ অব এগ্রিকাল চার এণ্ড পপুলেশান ইন দি গ্যাঞ্জেস ভ্যালি বিষয়ের উপর থিসিস লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এবং ঐ সময়েই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ঐ সালেই তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া দিল্লী চলিয়া যান এবং অদ্যাবধি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। ডা: গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্থনীতি বিষয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বশতঃই ১৯৩৭ সাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বহু সরকারী এবং বেসরকারী কমিটি এবং কমিশনে তাহাকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তাঁহাকে যে সকল কমিটী এবং কমিশনে কাজ করিতে হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১৯৩৭—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বাণিজ্য সাবকমিটির সদস্য।

ডা: বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪৬—ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা কমিটির বাণিজ্য ও শুল্ক সাব-কমিটির সদস্য। বিশ্ব বাণিজ্য ও নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রস্তুতি সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য।

১৯৪৭-৪৮—জেনেভা ও হাভানায় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য।

১৯৪৯-৫০—ভারতীয় অর্থ কমিশনের সদস্য।

১৯৫১—লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্পর্ক-সংস্থা সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য।

১৯৫২—চীন সফরকারী ভারত সরকারের সংস্কৃতি প্রতিনিধি দলের সদস্য।

১৯৫৫—ভারতীয় অর্থ নৈতিক সমিতির সভাপতি।

১৯৫৬-৫৭—ভারত সরকারের অর্থ কমিশনের সদস্য।

১৯৬০—ভারত সরকারের জাতীয় আয় বণ্টন কমিটির সদস্য।

১৯৬১—ভারত সরকারের বোনাস কমিশনের সদস্য। পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ্ প্যানেলের সদস্য।

অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়াও ডা: গঙ্গোপাধ্যায় অর্থনীতির উপর যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদরূপেই গণ্য হইবে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ১। 'ট্রেণ্ডস্ অব এগ্রিকালচার এণ্ড পপুলেশন ইন দি গেঞ্জেস ভ্যালি'; ২। 'ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট ইন নিউ চায়না'; ৩। 'ল্যাণ্ড রিফর্ম্ম ইন নিউ চায়না'; ৪। 'রি-কনস্ট্রাকশন অব ইণ্ডিয়াজ ফরেন ট্রেড'; ৫। 'হুইদার রুপী?'—এইগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সারা জীবন অর্থনীতির জালে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াও সঙ্গীত এবং সাহিত্যকেও ছাড়তে পারেন নাই ডা: গঙ্গোপাধ্যায়। পারিবারিক জীবনে ডা: বীরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর নিকট হইতে যে প্রেরণা এবং উৎসাহ পাইয়া থাকেন, কর্ম্মবহুল জীবনে তাহাই তাহার একমাত্র আনন্দের সাথী। ডা: গঙ্গোপাধ্যায়ের মত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ যে দেশের গৌরব, সেই বিষয়ে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

একদিন

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ধর

এ-আলোক ছিল একদিন,—
একদিন জীবনেতে সকলি রঙীন।
ঊষার রক্তিমচ্ছটা দিগন্ত-প্রসারী
সবুজ ধানের শীষে—ফলে ফুলে ভারী।
চারিদিকে স্বপ্নভরা উচ্ছসিত প্রাণ
ভাবিনি ত কোনদিন হবে অবসান।

নেমেছে নিশীথ রাত—ভ্রুকুটিভয়াল
কাল রাত্রি বুঝি এক; আঁধার উত্তাল,
দুস্তর-সাগর যেন: মূর্ত্ত বিভীষিকা,
তাই জীবনের যবনিকা—
কে টানিল নির্ম্মম হাতে
আজিকার প্রভাতের সাথে?

মানুষের স্মৃতি তাই ফেলে দীর্ঘশ্বাস:
কখন ফিরিয়া পাবে: ঊষার-আশ্বাস?

আলাপন

—বৈদ্যনাথ ভড়

প্রসাধন

—দেবু দাস
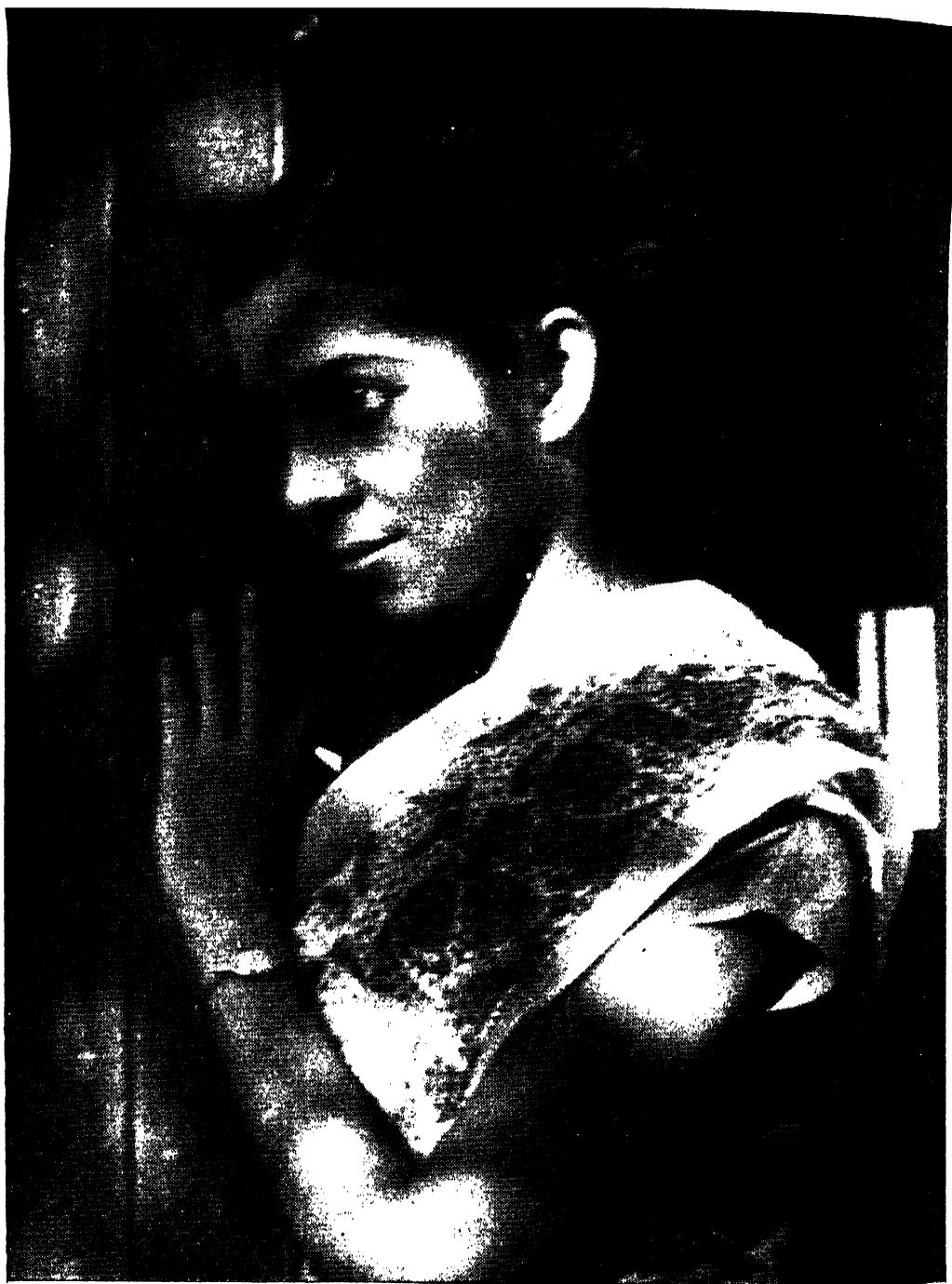
আলোতে ছায়াতে —মোনা চৌধুরী
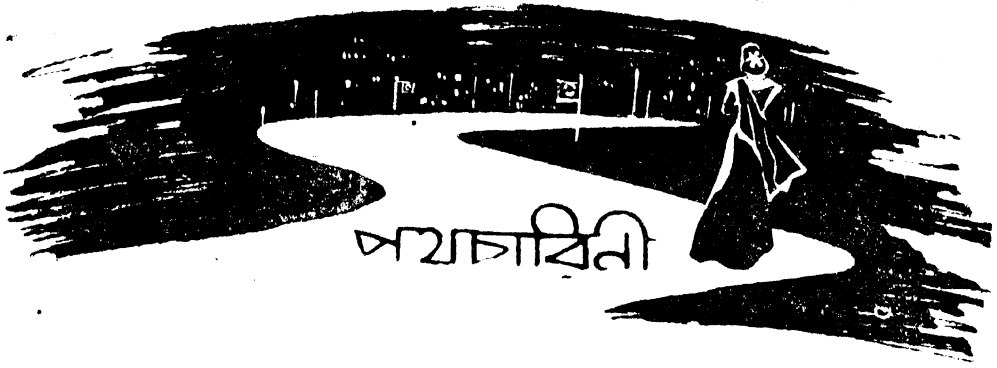
রাণু ভৌমিক

হ্যাঁ, এই সময় লক্ষ্মী মুখ তুলে তাকাল। আর সিতাংশু দেখতে পেল ওর মুখের ঐ ভাবটি। সিতাংশুর আরও খারাপ লাগল যে এই একান্ত অনুগত সর্বংসহা ভাবটি ও ওর চাকরদের মুখে দেখতে পেত। ছেলেবেলা থেকেই ও ঘৃণা করতো ঐ ভাব।

তাই, যে যত অনুগত এবং ধৈর্যশীল তার উপর তত অত্যাচার করতো ও। আজ স্ত্রীর মুখেও সেই ভাব দেখে···

কিন্তু তা এক মুহূর্ত, আবেশে উত্তেজনায় দেহ উত্তপ্ত। নিয়মিত অভ্যাসে চারিদিকে ফুল আর ফুল। রাত্রি গভীর। সামনে নবপরিণীতা স্ত্রী। নতুন একটি উন্মুখ যৌবন।

মুহূর্তে দেখা দোষটি মুহূর্তেই ভুলে যায় সিতাংশু। বিনা বাক্য ব্যয়ে অধীর আগ্রহে লক্ষ্মীকে টেনে নেয় কাছে।

প্যাসন। কত ক্ষণস্থায়ী তার জীবন! শেষ হয়ে যাবামাত্রই মন মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে—যে মন এতক্ষণ দেহের কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

মনে হয়, পণ্যশুল্কা নারীর চেয়েও সহজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মেয়েটি। কেন? এ কি ব্যক্তি-সিতাংশুর কাছে ব্যক্তি-লক্ষ্মীর আত্মসমর্পণ—না স্বামীর নিকট স্ত্রীর?

যত দিন যায় ততই সিতাংশুর মনে হয় লক্ষ্মী তাকে ভালবাসে না—ভালবাসে স্বামীকে—স্বামিপ্রেমের আদর্শকে।

সিতাংশুর এক বন্ধুর সঙ্গে লক্ষ্মীকে আলাপ করতে বলেছিল, লক্ষ্মী সজোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।

—কেন? প্রশ্ন করেছিল সিতাংশু।

—ও যে মাতাল, চরিত্রহীন।

—চরিত্রহীন মাতাল তো আমিও। তবে আমাকে কি করে তুমি বিনা প্রতিবাদে সহ্য কর? শুধু সহ্য নয় ভক্তিও কর।

—নিশ্চয় ভক্তি করব। তুমি যে স্বামী। পতি পরম গুরু।

এই 'পতি পরম গুরু' ধারণা থেকেই লক্ষ্মী ফুলশয্যার রাতে স্বামী নামধেয় অপরিচিত পুরুষের শয্যাশায়িনী হয়েছে—দিনের পর দিন তাকে সেবা করেছে—রাতের পর রাত জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে পতিতালয়ে আমোদরত স্বামীর প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করেছে।

ছেলেবেলা থেকেই সিতাংশু নেশাখোর। তাই সিগারেটের নেশা পুরানো হতে বেশী দিন লাগে না। তারপর, নিষিদ্ধ পানীয়—আর নিষিদ্ধ স্থানে গতায়াত। কিন্তু, তাই বা ক'দিন?

উত্তেজনার জন্য শেষে ও রেস খেলতে সুরু করে। এইখানেই একদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় সিতাংশুর, দুজনে দুজনের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে যায়—কিন্তু একটুক্ষণ পরেই দুজনে একই সঙ্গে 'হায় হায়' করে ওঠে। একই ঘোড়াতে বাজী ধরেছে দুজন—এবং একই সঙ্গে হেরেছে।

তার পরের ইতিহাস শুধু হেরে যাবারই ইতিহাস। নেশার ঝোঁক তো সহজে কমে না। ব্যবসা গেল, গাড়ী গেল, বাড়ীও প্রায় যায়-যায়—এমনি সময়ে পিতা থামলেন।

পিতা থামলেও পুত্র চুপ করল না। কিন্তু টাকা কোথায় পাবে? নগদ টাকা একদম নেই—অথচ এখানে নগদেরই কারবার।

লক্ষ্মীর কাছে থেকে ওর গয়না চাইলো। মনে মনে হেসে ভাবলো সে। নিশ্চিত জানতো লক্ষ্মী কিছুতেই গয়না দেবে না। এই প্রথম হয়তো প্রতিবাদ জানাতো লক্ষ্মী। ভাবতেও ভাল লাগলো। লক্ষ্মীকে কি ভাবে বুঝিয়ে রাজী করবে তাও সে মনে মনে ভাবতে থাকে।

কথাটা শুনে লক্ষ্মী ওর সেই গরুর মত ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা দিচ্ছি।

—দিচ্ছ তো—উগ্র হয়ে ওঠে সিতাংশুর কণ্ঠ। কিন্তু কি জন্য দিচ্ছ তাও শুনে রাখ—আমি রেস খেলবো, মদ খাবো, পাড়ায় যাবো।

লক্ষ্মী মুখ তুলে তাকায়। পরিস্ফুটতর হয়ে ওঠে ওর মুখের সেই অসহায় করুণ ভাবটা—যে ভাব দেখে দয়া, মায়া কিছুই হয় না—শুধু মনে জেগে ওঠে এক অস্বস্তিকর বিরক্তিপূর্ণ ঘৃণা।

সিতাংশুর মনে আছে কেষ্ট নামে ওর একটি বাচ্চা চাকরের ওপর যত পেরেছে অত্যাচার করেছে—বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেছে সে। যত সহ্য করেছে তত অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে সিতাংশু। শেষে একদিন অসহ্য হয়ে প্রতিবাদ করলে কেষ্ট। দুহাত বাড়িয়ে পাগলের মত এগিয়ে এসে বললে, তোমাকে আজ খুন-ই করবো।

সেদিন থেকেই কেষ্টকে ভালবেসেছিল সিতাংশু। আর কোন দিন খারাপ ব্যবহার করে নি।

সিতাংশুর বাবা-মা অল্পদিনের ব্যবধানে মারা গেলেন। বাড়ীর মর্টগেজের সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এল। তখন সিতাংশুর বয়স ত্রিশ

বৎসর। সেই সময় একবার বাঁচতে চেয়েছিল সিতাংশু। শৈশব থেকে সঞ্চিত আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে মানুষ হতে চেয়েছিল।

—তুমি কয়েক দিন গিয়ে বাপের বাড়ীতে থাক, সিতাংশু লক্ষ্মীকে বলে, বেশী দিন নয়, এই মাস ছয়েক।

—আর তুমি? লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শঙ্কিত।

—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, সিতাংশু বলে, মেসে থেকে, কষ্ট করে যাকে বলে জীবিকার প্রয়োজন পরিশ্রম।

—তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি। সোজা উত্তর দেয় লক্ষ্মী।

—বেশী দিন তো নয়। বিরক্তকণ্ঠে সিতাংশু উত্তর দেয়, আমি···

—আমরা থাকলে চেষ্টা করতে পারবে না কেন? বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে লক্ষ্মী।

—বাড়ীর মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেল—তোমাদের কোথায় তুলব?

—যেখানে হোক। তুমি যেখানে থাকবে সে জায়গাই আমার স্বর্গ। আমি খুব কম খরচে চালিয়ে নেব! তুমি কাজের চেষ্টা কর।

ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে রইল সিতাংশু। সে জানে যে তা হয় না। ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ লক্ষ্মী সামনে থেকে সরে না গেলে সে কাজ সুরু করতে পারবে না। বোহেমিয়ানের মত সে ঘুরে বেড়াবে। দিনের শেষে বাড়ী ফিরে শুনতে পারবে না ক্ষিদের জ্বালায় শিশুদের ক্রন্দন—লক্ষ্মীর সর্বংসহা ধরিত্রীর মুখ। আর, বাড়ী থেকে যাতে এদের বস্তীতে না নামতে হয় সেজন্যই তো তার এই চেষ্টা। এরা যদি একবার নেমেই যায় তবে কি হবে চেষ্টা করে।

লক্ষ্মী কিছুতেই রাজী হয় না। তার বাপের বাড়ী বাংলাদেশের বাইরে। সেখান থেকে স্বামীর কোন খোঁজ-খবরই নিতে পারবে না সে। এই বিপদের সময় স্বামীকে ছেড়ে থাকা······

সুরু হয়ে গেল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। লক্ষ্মী হয়তো অর্ধেক দিন না খেয়েই থাকতো। দিন দিন ওর মুখে সেই ভাবটা পরিস্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকে। দিন দিন-ই ওকে বেশী করে করতে থাকে সিতাংশু।

একদিন সবাই উপোষ করে ছিল। ঘরে এক টুকরো খাবার নেই—বিক্রী করার মত কোন জিনিস নেই। ছেলেমেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ, ও ঘৃণাপূর্ণ স্বরে সিতাংশু বলে, স্বামীকে ভালবাসা সন্তানকে ভালবাসা—স্বামি-সন্তানকে ভালবেসে লোক অনেক কিছু করে। নিজেকে বিক্রী করেও তাদের খাওয়ায়।

—বিক্রী করে? সেই অসহায় মুখে তাকায় লক্ষ্মী।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। বিক্রী করে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিতাংশু বলে, মেয়েদের নিজেদের বিক্রী করতে বেশী হাঙ্গামা করতে হয় না। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেই হয়।

রাগের বশে, নিতান্তই লক্ষ্মীকে আঘাত করবার জন্য বলেছিল সিতাংশু। কিন্তু, ও বুঝতে পারেনি যে সত্য সত্যই লক্ষ্মী রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ছেলেমেয়েদের চিৎকারে না টিকতে পেরে সামনের চায়ের দোকানের রাস্তায় পাতা বেঞ্চের এক কোণে বসে ছিল সিতাংশু। হঠাৎ দেখল লক্ষ্মী ওকে রিক্সা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গেল ও।

ওর হাতে দশ টাকার একটা নোট দেয় লক্ষ্মী। বলে, তুমি চাল ডাল, তরকারি কিনে নিয়ে বাড়ীতে এস।

—কোথায় পেলে? সিতাংশু প্রশ্ন করে, সঙ্গে সঙ্গেই মাথ একবার ঘুরে ওঠে, পরিচিত কারো কাছে পাবার জো নেই, অচেন লোকের কাছ থেকেই লক্ষ্মী নিয়েছে তবে।

স্থির চোখে লক্ষ্মীর দিকে একবার তাকায় সিতাংশু। এই এ মূল্য? এই মুহূর্তে শুধু লক্ষ্মীকে নয় পৃথিবীর সমস্ত নারীকে ঘৃণা কর সিতাংশু।

বাজার করে ফিরে যায়। লক্ষ্মী আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে উনুন ধরাচ্ছে। তার দিকে তাকাতে পারে না ও।

লক্ষ্মীর মুখের সেই অসহায় ভাব দেখতে চায় ও যে ভাব দেখে···

দ্রুত বেরিয়ে এক বোতল দিশী মদ কিনে নিয়ে আসে।

এই শেষ পরীক্ষা হয়ে যাক লক্ষ্মীর। স্ত্রীর দেহবিক্রীত অর্থে স্বামী মদ কিনে খাচ্ছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা সহজে ঘটে না।

দেখি, লক্ষ্মী প্রতিবাদ করে কি না? ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জে ওঠে কি না? না, এ-ও সে সহ্য করবে।

লক্ষ্মী একবার তাকায়। আর তার মুখে ফুটে ওঠে সেই অসহায় ছাপ।

থাক, ঐ ছাপই চিরন্তন হয়ে থাক লক্ষ্মীর মুখে। লক্ষ্মীকে স্পর্শ আর কোনদিন করতে পারবে না সিতাংশু কিন্তু তাকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারবে না। তার জীবনের সবই শেষ হয়ে গেছে। পশুর মত লক্ষ্মীর উপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ করবে সে আর জীবনের আনন্দ আহরণ করবে লক্ষ্মীর মুখের ঐ যন্ত্রণার ছাপ থেকে······

এই পর্যন্ত বলে সে একবার আকাশের দিকে তাকাবে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলবে, মারি! হ্যাঁ, লক্ষ্মীকে মারি আমি। যে জায়গায় আঘাত করলে ওর সব চেয়ে কষ্ট হবে সে জায়গায় আঘাত করি আমি।

আঘাতে আঘাতে উৎপীড়িত করে আমি ওর মুখে জাগাবো প্রতিবাদ—চাই ও আমাকে গালাগালি দিক, অভিশাপ দিক। ওর স্বামি-ভক্তির কুহেলী থেকে উদ্ধার হোক এই অত্যাচারী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করবার কথা শুনে তোমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, না? নিশ্চয়ই গিয়েছিল। এতদিন পরের কথা—তবু লিখতে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল···থাক্।

কিন্তু, আজ একটি মেয়ের কথা বলবো যে প্রহৃত না হলে আনন্দই পায় না। সুখের সংসার, সৎ স্বামীকে যে ছেড়ে এসেছে শুধু এই জন্য।

তাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ অনেক বার জরিমানা দিয়েছে সে। আমি তাকে ডাকব প্রমদা নামে।

শরীরের গঠন খুবই সুন্দর। সরু কোমর, বিপুল নিতম্ব, ভারী বুক। অনেকটা অজন্তার মূর্তির মত চেহারা। কিন্তু, তা গলা থেকে পা পর্যন্ত। তৃষিতা যক্ষিণীর মত মুখ। ছোট ছোট দুটি চোখ কেউ যেন বাইরে থেকে এনে বসিয়ে দিয়েছে। পিঙ্গল তারা, বিরল লোম, ভ্রূ, চোখের নীচের হাড় দুইটি উঁচু, চাপা গাল। তবু যে কারণেই হোক, (হয়তো মুখের গঠন কিংবা অন্য কিছুর জন্য) ওকে ভাল দেখায়। কিন্তু, সমস্ত মুখে একটা অতৃপ্ত তৃষার চিহ্ন। ওর মুখে সর্বদাই একটা হাসির ভাব সবাইকে যেন সন্তুষ্ট করতে চাইছে ও। পুরু, রসালো ঠোঁট দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত।
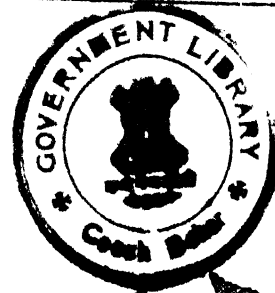
উৎসবের ঔজ্জ্বল্যে

উজ্জ্বল পরিবেশে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার
বাসনা সকলের-ই। আর লাবণ্যময়ীর
ঔজ্জ্বল্য একান্তভাবে তাঁর ঘন সুকৃষ্ণ কেশদামে।
আনন্দ-উৎসবে ও রূপসাধনায় লক্ষ্মীবিলাস
তার শতাব্দির ঐতিহ্য নিয়ে
সদাসর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত।

তৈল

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

এই পর্যন্ত বিবরণে ওকে ভাল না লাগলেও খারাপ লাগবে না কারো। কারো কারো হয়ত ভালই লাগবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট ওর সামনে বসে থাকলেই মনে হবে—অসহ্য। বমি করতে ইচ্ছে হবে তোমার।

আলাপ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখবে ও ওর সেই সাপের মত বসান চোখ দুটি দিয়ে চারিদিক একবার দেখে নিল, হুস্ করে একটা শব্দ করে জিভ বার করে চেটে নেয় ঠোঁট দুটি। তুমি অবাক হয়ে কি হল ভাবতে না ভাবতেই, আবার সেই দু'-তিন মিনিট অন্তর অন্তর এরই পুনরাবৃত্তি চলবে। বেশীক্ষণ তুমি বসতে পারবে না—বিদায় নিয়ে চলে আসতে হবে।

তার মানে কি প্রমদা সঙ্গী পায় না। তাহলে তো মরে যেত ও। সঙ্গলাভের জন্যই ও নিশ্চিত সুখ ও নিশ্চিত জীবন ছেড়ে এসেছে। কিন্তু, ওর সঙ্গীরা প্রায়ই সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ।

প্রথম দিন ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। একটি মেয়ে—দুটি লোক। সেদিনই বাড়ীতে ফিরে খাতা টেনে দিয়ে লিখেছিলাম, "সামাজিক অনুশাসন ও আদিম প্রবৃত্তির বিরোধের ফলে এই পতিতাবৃত্তির উদ্ভব। পুরুষ ও নারী, উভয়েই আদিম প্রকৃতি অনুসারে বহুকামী। সমাজ তাকে এককামী করতে চেয়েছে। মানবের স্ব-রচিত অনুশাসনে এবং প্রকৃতি (কিংবা ঈশ্বর) গঠিত দেহের সত্যে বারবার বেঁধেছে বিরোধ। তাই পুরুষ সদর দরজা ভালভাবে বন্ধ করে খিড়কীর দু'ধার দিয়ে দেহের তৃপ্তি সাধন করতে অগ্রসর হয়েছে।'

এই আদিম প্রবৃত্তির দ্বারা জর্জরিত হয়েই হতভাগিনী প্রমদা এই জগতে এসে পড়েছে। নইলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকের অধিবাসিনী ও।

গ্রামের নাম সোনাপাড়া মাঠে সোনা ফলে। সব কটি ঘর লোকেরই অবস্থা ভাল। এখানে চাষীরা ধান কাটতে কাটতে গান গায়। সন্ধ্যার গোধূলিরাগের সঙ্গে মেশে রাখাল বালকের বাঁশীর সুর।

তারি মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থা কৈবর্ত চাষী সনাতন দাসের। সনাতনের তিনটে হাল। দুজন চাকর আছে তার। গোয়াল ভরা গরু, মরাইভরা ধান। সবই ছোটছোট। কিন্তু সবই ভরাভর্তি। ঘরে মোটাসোটা থপথপে স্ত্রী। সুখী চাষী সনাতন।

ঘুম থেকে উঠে কোনমতে একটা কুলকুচো করে এক থালা পান্তাভাত নিয়ে বসে সনাতন। অন্য বাড়ীর লোকরা যেখানে শুধু ভাত সেখানে ও ভাতের সঙ্গে শুধু পেঁয়াজ লঙ্কা নয় মাছের একটা বাসী তরকারীও খায়।

রোজই তাই নিয়ে গর্ব করে সনাতন।

—দেখছিস তো বৌ, গেরাম সুদ্ধ সব শুখা ভাত—শুধু এই সনাতনের বাড়ীতে—

বৌ কোন উত্তর দেয় না। কেমন যেন বৌটা। চুপ করে কি যে ভাবে। যেন বোবা। অথচ বোবা যে নয় বরঞ্চ তার উল্টো সে খবর জানে পাড়া প্রতিবেশীরা। সনাতন তো জানে হাড়ে হাড়ে।

খাবার দাবারের দিকেও নজর নেই বৌটার। হয়ত না খেয়েই [illegible] সনাতন বেশীর ভাগ তরকারী ঢেকে রেখে দেয়। নিজের জন্য নিশ্চয়ই কিছু রাখেনি বৌ। রেখে দিয়েই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হয়তো ফিরে এসে দেখবে ঠিক ঐ জায়গায় অমনি ভাবে ঢাকা পড়ে আছে। প্রায় দিনই খায় না তার বৌ। তবুও না রেখে পারে না সনাতন।

যাবার সময়ে সনাতন চেঁচিয়ে বলে, যাই রে।

বউ এসে সামনে দাঁড়ায়। বাদামী চোখের তারায় উদাস দৃষ্টি। আসন্ন মেঘের মত থমথমে চেহারা। চুপ করে আছে কিন্তু যে কোন সময়ই ঝড় উঠতে পারে। মুখে বিরক্তি-কুটিল অপ্রসন্নতা।

মাঠে যেতে যেতে রোজই ভাবতো সনাতন, কেন তার বউ এত মন গুমরে থাকে। আর পাঁচজনের চাইতে তার অবস্থা ভাল। বউকে সে সুন্দর সুন্দর শাড়ী কিনে দেয়। গ্রামে মেলা বসলেই কেনে রঙীন চুড়ী, ফিতে কাঁটা স্নো, পাউডার। আর কারো বউ তো স্নো পাউডার ব্যবহার করতে পায় না।

একলা ঘরের একলা রাণী, শাশুড়ী নেই, ননদ নেই, দেওর নেই, জা নেই। যখন খুসী কাজ করছে, যখন খুসী বসে থাকছে। সনাতন তো একেবারেই নির্বিরোধ লোক। যা পায় তাই সোনার মত মুখ করে খায়। তবে?

কিসের এত কষ্ট ওর? কেন সব সময়ই মুখ কালো করে থাকে?

কিছু কিছু টাকাও ওর হাতে দেয় সনাতন—যদি ওর কিছু কিনতে ইচ্ছে হয় কিনবে নয়তো জমবে। স্ত্রীধন না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—অসময়ে কাজে লাগে।

এত করেও তবু মন পায় না সনাতন। ঐ তো সব সময় মুখ কালো—নইলে কথা বললো তো ঝঙ্কার দিয়ে উঠে যা তা বলে দিল।...

...ঝঙ্কার অবশ্য সব সময় দেয় না প্রমদা। কিন্তু যখন তার মনের সেই খারাপ অবস্থা হবে তখন সে কাউকে রেয়াৎ করে না—হয়তো স্বয়ং দেশের গবর্ণর এলেও না করতো না।

সেদিন প্রতিবেশিনী তিনুর মা এক কৌটো চাল ধার করতে এসেছিল—পাড়াগাঁয়ে এরকম ধার করার রীতি আছে—আর, প্রমদা ধার দিতে ভালবাসে সেজন্যই এসেছিল সে—নইলে হয়তো অন্য বাড়ীতে যেত—প্রমদা হঠাৎ জ্বলে উঠলো—

—শুওরের পালের মত এক পাল ছেলেমেয়ে, তা অভাব হবে না—

তিনুর মা'ও সহজ পাত্রী নয়। তার ছেলেমেয়েকে গালাগালি দিলে কোন মা'র ভাল লাগে? বিশেষতঃ সে যদি বন্ধ্যা নারী হয়। উল্টে যা তা উত্তর দেয় তিনুর মা। তুমুল কলহ আরম্ভ হয়ে যায়।

অকারণে কলহ করে প্রতিক্রিয়া আসে প্রমদার মনে। চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, মাথা ঠোকে দেয়ালে। মুখে শুধু এক কথা—আমি কেন এমন করি।

পরদিনও আবার ঠিক সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। ঝগড়া, চিৎকার, গোলমাল, কান্না হঠাৎ চুপ করে যাওয়া গাম্ভীর্য।

এমনি ভাবেই চলছিল কাটছিল ওর দিনগুলি। অত নির্বিরোধ স্বামী তার সঙ্গেও কলহ করত। ঝগড়া করেই কিন্তু বুঝতে পারতো নিজের অন্যায়। অনুতপ্ত হয়ে বলত, আচ্ছা আমি কেন এরকম করি বল ত?

—তোর মাথায় একটা ভূত আছে সেই তোকে করায়। সস্নেহে ...তে সনাতন।

—ভূতটাকে তাড়ান যায় না?

—তুই ইচ্ছে করলেই পারবি।

—তুমি বোঝ না, ইচ্ছে করেও আমি পারি না—অনেক চেষ্টা ...রি এই ভূতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য।

—তাই কখন হয়। এবারে দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে সনাতন বলে, ...চ্ছে করলে মানুষ সব পারে।

—আমার দুঃখ কেউ বুঝলো না।

প্রমদার দুঃখ বোঝা সনাতনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শুধু সনাতন কেন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রমদা নিজেও কারণ বুঝতে পারত না। শুধু জ্বালার উত্তাপে জ্বলে পুড়ে মরতো।

শাস্ত্রে চার প্রকারে নারীকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী।

প্রমদা হস্তিনী নারী। শাস্ত্রে হস্তিনী নারীর রূপ—

প্রমদার যখন বিয়ে হয় তখন ওর বয়স দশ বৎসর। সনাতনের পঁচিশ। ঐ রকম বিয়েই হয় ওদের ঘরে। বড় মেয়ে কিনতে বেশী পণ লাগে। তা দিতে রাজী ছিল না সনাতনের বাবা। কাজেই দশ বছরের বালিকা মেয়ে এল পঁচিশ বছরের যুবকের ঘর করতে।

বাড়ন্ত গড়ন ছিল প্রমদার। দশ বছর বয়সেই ওকে অনেক বড় দেখাতো। বেশ কাজ জানে—অটুট স্বাস্থ্য। বাড়ীর সবাই খুব খুশী।

সেই মেয়ে বড় হল। সনাতনের বাবা-মা প্রায় একই সঙ্গে মারা গেলেন, সনাতন হল বাড়ীর কর্তা—প্রমদা গিন্নী।

বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাল্টে যেতে থাকে প্রমদা। সেই হাসিখুশী নেই। সব সময় মুখে বিরক্ত বিষণ্ণতা। অকারণে রাগ, খিটখিটে মেজাজ। খেতে ভাল লাগে না।

—এ রকম করিস কেন? সনাতন জিজ্ঞাসা করে।

কেন যে করে তা কি জানে প্রমদা! সে শুধু জানে তার হাত জ্বালা করে, পা জ্বালা করে, শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।

রাত্রে জেগে যায় সে। মাথার শিরাগুলি দপদপ করতে থাকে। ঘুম হয় না।

সেদিন রাত্রেও সে হঠাৎ জেগে গেল। পাশে সনাতন ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকছে আর তালে তালে ওঠানামা করছে বুক। সমস্ত শরীর জ্বলছে—আর কি এক দুরন্ত অন্ধ আবেগে কালো হয়ে উঠেছে মন। এ আবেগের কোন রূপ নেই, দেহ নেই। পৃথিবীর কোন কালো গহ্বর থেকে ঘূর্ণির মত ছুটে আসছে এ আবেগ। হাত-পা মাথা জ্বালা করছে—গলা আসছে শুকিয়ে।

অনেক দিনই এমন হয়—তবে সেদিনের মাত্রা বেশী ছিল। অসহ্য লাগছিল প্রমদার। সবচেয়ে অসহ্য বোধ হচ্ছিল পাশে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকা স্বামীকে।

খানিকটা চুপ করে থেকে সে ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে জাগায়। আচমকা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে সনাতন বলে, কি? কি হয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে প্রমদা বলে, কিছু হয়নি।

—হয়নি তবে ডাকলি কেন?

—অমন ষাঁড়ের মত পড়ে ঘুমুচ্ছ, দেখে রাগ ধরে—তাই ডাকলাম।

আর কোন স্বামী হলে হয়ত রেগে যেত—সারাদিন খেটেখুটে ঘুমিয়েছে মাঝরাতে এ কি উৎপাত! কিন্তু, সনাতন নিতান্ত নির্বিরোধ লোক। তাই সে পাশ ফিরে শুতে শুতে সংক্ষেপে বলে, তুই একটা পাগলী।

অন্যদিন হলে হয়তো এতেই চুপ করে যেত প্রমদা। কিন্তু আজ সে ধৈর্যের শেষ সীমায়। প্রায় ঘুমিয়ে পড়া সনাতনকে সে ঠেলে তোলে। বলে, তুমি কি একটা মানুষ!

—কি হলো কি তোর? অবাক হয় সনাতন।

—কি হলো কি তোর? ভেংচি কেটে ওঠে প্রমদা।

এবারে বিছানার উপর উঠে বসে সনাতন। পাগল হয়ে গেল নাকি বৌটা।

—লজ্জা করে না! এবার অনেকটা ভাল ভাবে কথা বলে প্রমদা। সনাতনকে ঘুম থেকে তুলে বসাতে ওর মনের জ্বালা মিটেছে অনেকটা।

—লজ্জা? কিসের? আকাশ থেকে পড়ে সনাতন।

—একটা ছেলে নেই। লোকে যে বাঁজা বলে।

ছেলে না হওয়ার দুঃখ সনাতনেরও কম নয়। ছেলে কে না চায়? কিন্তু, ছেলে হওয়ার বয়স তো এখনও যায় নি প্রমদার। সবে এই তো উনিশ বছর। অনেকেরই এর পরে ছেলে হতে দেখেছে সনাতন।

—রাত দুপুরে হঠাৎ তোর সে খেদ উঠলো কেন? সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে সনাতন।

—রাত দুপুরেই খেদ ওঠে। তুমি তো একটা ষাঁড়ের মত ঘুমাও। তোমার আবার খেদ কি?

সনাতন হাসে। এতক্ষণে তার ঘুম ভেঙে গেছে। চোখে পড়েছে স্ত্রীর আলুথালু বেশের আড়ালের যৌবন-সমৃদ্ধ দেহ। মধ্যরাত্রির মাদকতায় ঘুম ভাঙা মনে দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভালই লাগে অভিমানিনী স্ত্রীর কথাগুলি।

—ঘুমাই না রে ঘুমাই না। দেহ ক্লান্ত ছিল তাই একটুকুন ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। স্ত্রীকে কাছে টেনে নেয় সনাতন।

একবার একসঙ্গে ডেকে ওঠে কতগুলি শেয়াল। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রমদা। গরম গরম নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে, হাতে পায়ে অসহ্য জ্বালা।

পাশে সনাতন আরামে ঘুমুচ্ছে। উত্তেজনার তৃপ্তির পর আরামের অবসাদ এসেছে তার।

আর প্রমদা?

অতিরিক্ত ক্ষুধায় স্বল্প আহারের জ্বালা তার মনে। এতক্ষণ বন ক্ষুধার তৃপ্তির মধ্যে অবসাদ ছিল। ঝিমিয়ে পড়ছিল রাক্ষসী। কিন্তু এখন সে জেগে উঠে লকলকে জিহ্বা মেলে গর্জাচ্ছে।

ঘরে টিঁকতে পারে না প্রমদা। বাইরে চলে আসে। ভাবে, কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে।

কি ঠাণ্ডা আর শান্ত রাত। আকাশের মিটিমিটি তারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে প্রমদা—চোখ জলে ভরে ওঠে।

বারান্দার ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে পড়ে। ঘুম নেই চোখে, তবু ঘরের চেয়ে ভাল লাগছে এখানটা।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পায় ও-পাশের দরজা খুলে একটি মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। তারার আলোতে তার সুগঠিত মূর্তি দেখে বুকের ভেতর শিরশির করতে থাকে প্রমদার।

লোকটি ভোলা। প্রমদাদের এখানে কাজ করে। একে তো দিনের বেলায় বহুবার দেখেছে, তবু ওর মনে হয় এখন যেন নতুন দেখছে।

বারান্দায় সাদা মতন একটি মূর্তি পড়ে থাকতে দেখে ভোলাও বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। ধীর পায়ে এগিয়ে আসে সে।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ বোজে প্রমদা।

কই না। কোন স্পর্শ নেই। যে আনন্দের স্পর্শ সে বিনা আমন্ত্রণে চেয়েছিল তা নেই।

তাকিয়ে দেখে—ভোলা নেই।

বুক ফেটে কান্না পায় প্রমদার। কেন সে লজ্জা-সঙ্কোচ করল? সচেতন ভাবেই দাবী করলো না ক্ষুধা মেটাবার।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

—কাঁদছ কেনে বৌদি—

চমকে তাকায় প্রমদা। পায়ের কাছে পাথরের মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে আছে ভোলা।

পরে সে ভোলার কাছে শুনেছিল, ভোলা প্রথমে সাহস পায় নি। হাজার হোক মনিবানী—কিন্তু চলে যেতেও পা সরছিল না। তাই ওভাবে দাঁড়িয়েছিল।

প্রমদা উঠে বসে। আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এ বারে ভোলা ওর পাশে বসে হাত ধরে প্রশ্ন করে, কাঁদছ কেনে?

—নিজের দুঃখে।

কি দুঃখ, প্রশ্ন করে না ভোলা। যেন ও প্রমদার হাত ধরেই মনের দুঃখের খবর পেয়েছে। আর, দুজনের তো একই দুঃখ ভোলারও যৌবন বয়স। বিয়ে করে নি।

তারপর···

অনেক দিন পরে ভালভাবে ঘুমোয় প্রমদা। ঘুম থেকে উঠে দেখে, স্বামী নিজেই ভাত নিয়ে খেয়ে চলে গেছে।

এই সামান্য ঘটনাকেই নতুন আলোতে দেখে সে। তারও যেমন স্বামীকে প্রয়োজন নেই—স্বামীরও নেই তাকে।

কাল ভোলা চলে যাবার পর যতক্ষণ ঘুম না এসেছিল এই কথাই ভেবেছে প্রমদা—সে চলে গেলে সনাতনের অসুবিধে হবে কিনা?

চলে যে সে যাবে—একথা স্থির নিশ্চয়। শশুরের ভিটায় ব্যভিচার করা, স্বামীকে প্রতারণা তার দ্বারা সম্ভবপর হবে না।

পরের রাত যেন আরও অন্ধকার। তারাগুলিও লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। দেহের খিদে যেই মিটল অমনি মন জেগে ওঠে প্রমদার। না, এখানে থাকা নয়, অমন সরল স্বামীকে ঠকাতে পারবে না প্রমদা।

ব্যভিচারিণী নারী হয়ে সতী সাধ্বীর মত স্বামিগৃহের তুলসী- [illegible] পারবে না প্রমদা।

চলে যাওয়ার কথায় প্রথমে রাজী হয় না ভোলা। এই তো বেশ আছে এখানে। সনাতনের মত ভালো মনিব পাওয়া শক্ত। কোথায়ই বা যাবে। হাতে তার কিছুই নেই।

কিন্তু, যখন প্রমদা বলে ওদের গন্তব্যস্থল কলকাতা—এবং খাওয়ার ও কিছুদিন থাকবার টাকা তার কাছে আছে, ও রাজী হয়ে যায়। কলকাতা দেখতে কার না ইচ্ছে হয়। হয়তো ওখানে গেলে ভাগ্য ফিরেও যেতে পারে ভোলার।

কলকাতায় গিয়ে প্রমদার টাকা ফুরোতে এবং ভোলার পালিয়ে যেতে বেশী দেরী হয় না। একা হয়ে যায় প্রমদা। তবে, কষ্ট তার হয় না। দু'-একদিনের মধ্যেই সে পথ খুঁজে পায়—যাতে দেহের এবং পেটের খিদে একই সঙ্গে মেটে।

আরও কিছুদিন কেটে যায়। প্রমদার মনে আবার সেই অতৃপ্তির তৃষা। সব পুরুষদের মনে হয় শিশু। বিরক্তি আসে—ঘৃণা বোধ হয়। একটি পুরুষের মত পুরুষ—যে ওকে দুহাতে পিষে ফেলতে পারবে তারই জন্য মন অস্থির হয়ে ওঠে।

একদিন একটা গাড়োয়ানকে দেখল গরু-দুটিকে বেদম মারছে। ভাল লাগলো সেই দিকে তাকিয়ে, ওরকম ভাবে কেউ যদি তাকে মারতো তবে হয়ত ভাল লাগত তার।

গাড়োয়ানটির সঙ্গে ভাব করলো প্রমদা, দুজনে থাকে একই সঙ্গে। তাই শান্ত নিরুদ্বেগে কেটে যায় জীবন। কিন্তু, শান্তি তো চায় না প্রমদা। শান্তি মানেই তো সেই শরীরের মনের অসহ জ্বালা। সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

আঘাত না পেলে সুর বাজে না। পীড়ন ভিন্ন তৃপ্তি নেই প্রমদার।

থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে যখন সে ভাবছে চলে যাবে একে ছেড়ে তখনই একদিন তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে এলো লোকটি। এতদিন নূতন প্রণয়ের খাতিরে শান্ত ভদ্র হয়েছিল, কিন্তু ক'দিন আর পারা যায়।

এমনিতে লোকটি খুব শান্ত, নিরীহ গোবেচারী বলা চলে। কিন্তু মদ পেটে পড়লেই তার মূর্তি যায় বদলে। তখন তার মত উগ্র স্বভাবের লোক বোধহয় দুটি পাওয়া যায় না। রীতিমতো পশু হয়ে ওঠে।

তেমনি ভাবে এলো ও—আর সামান্য বাচাতেই প্রমদাকে নৃশংসভাবে মারতে সুরু করল।

ও যত আঘাত করে ততই প্রমদার ভাল লাগে। শরীরে যত যন্ত্রণা হয় ততই মন ভরে ওঠে অসহ পুলকে। যে শিহরণের জন্য এত দিন সে প্রতীক্ষা করেছে সেই শিহরণের আবেশে দেহ অবশ হয়ে ওঠে।

খানিকটা পরেই জ্ঞান হয় লোকটির। নিজের কাজের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে যায়। ক্ষমা করতে বিলম্ব হয় না প্রমদার।

এরপর, যদি কখনও লোকটির হাতে টাকা না থাকতো প্রমদা নিজে কিনে এনে দিত নেশার সামগ্রী। আর···

হ্যাঁ, জীবনে তারা সুখীই হয়েছিল।

কি ভাবছ?

প্রকৃতি-জাত প্রবৃত্তি সমাজ-জাত সংস্কারের চেয়ে অনেক বড়, তাই না? [ক্রমশঃ।

মানগড়ের মামলা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বার-এট্-ল

দুই

প্রকৃতি পরিচয়—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—গ্রীষ্মকাল।

দৃশ্য পরিচয়—মানগড়ের রাজবাড়ীর বৈঠকখানা। দামী দামী আসবাবপত্রে সাজান—বেশীর ভাগই বিলেতী। যথাযথ স্থানে ছোট-বড় ঝাড়লণ্ঠনেরও অভাব নেই। দেওয়ালে বড় বড় বিলেতী ছবি—বহুদিন ধরে টাঙ্গান রয়েছে—দামী সোনালী ফ্রেমে বাঁধান। কিন্তু এই সব বিলেতী ছবির মাঝখানে হঠাৎ চোখে পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একখানি বড় তৈলচিত্র। এই ছবিখানি কি করে এই সব বিলেতী ছবির সংসর্গে এল জানিনা—বোধ হয় বীরেশ রায়ের পূর্ব্বপুরুষ কেউ ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি যদি ছবিখানি এইখানে টাঙ্গিয়ে থাকেন তবে তাঁর ভক্তি থাকলেও রুচির ত্রুটি ছিল একথা জোর করে বলা যায়। কেননা মহাপ্রভুর ছবির দুপাশে টাঙ্গান রয়েছে বিদেশী মহিলার দুখানি চিত্র—অঙ্গসৌষ্ঠবের পূর্ণ বিকাশের প্রতীক। তবে, যদি পরে কেউ ইচ্ছে করেই মহাপ্রভুকে ঐ সংসর্গে রেখে থাকেন—বলতে পারি না। আর একটা জিনিষ বিশেষ করে চোখে পড়ে—তিনটি আলমারী ভাল ভাল বাঁধান বই দিয়ে সাজান। বইগুলি পুরাতন মোটেই নয়—বীরেশ রায়ের আমলেই কেনা বলে মনে হয়।

পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বীরেশ রায়ের ভৃত্য নটবর বৈঠকখানাঘরখানি ঝাড়পুছ করতে ব্যস্ত। ঝাড়লণ্ঠনে আলো জ্বালানর কাজ তার শেষ হয়েছে।

হঠাৎ পাশের ঘরে ঠুং করে কি যেন একটা আওয়াজ হল। পরম উৎসাহে নটবর দরজা দিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মুখে তার ফুটে উঠল আকর্ণ হাসি।

নটবর। (দরজার কাছে এগিয়ে) পদ্ম! ও পদ্ম! পদ্ম!

(ওঘর থেকে কোনও জবাব নেই।)

নটবর। পদ্ম! আয় না একটু এ ঘরে।

(মেয়েদের ঝি পদ্মর প্রবেশ। পূর্ণযৌবনা—মুখশ্রী মন্দ নয়।)

নটবর। জানি তুই ঠিক আসবি। এসেই পাশের ঘরে ঠুং করে আমাকে দিবি জানিয়ে—আমি এসেছি গো।

পদ্ম। শোন কথা—"আমি এসেছি গো"। আমি যেন সেই তুই ওঁর কানের কাছে এসে ঠুং করেছি। দিদিমণি বললে পাউডারের কৌটটা—

নটবর। ওই বাইরের ঘরে গিয়ে নটবরের কানের কাছে হাত থেকে দে ফেলে—বুঝেছি রে বুঝেছি। এই নইলে দিদিমণি এত লেখাপড়া শিখেছেন।

পদ্ম। আ—মর—মুখপোড়া।

নটবর। শুধু মুখ কেন রে পদ্ম—তোর রূপে বুকও ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—হু হু জ্বলছে।

পদ্ম। কেন? বাতাসীর বাতাসে শীতল হল না?

নটবর। বাতাসীর কথা আর বলিস না। সে মরেছে—

পদ্ম। (অবাক হয়ে) মরেছে!

নটবর। হ্যাঁ মরেছে। তুই তাকে মেরেছিস।

পদ্ম। ওমা কি হবে গো। আমি মেরেছি কি গো?

নটবর। সেই যে—সেই যে তুই আমার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে নেত্রবাণ মেরেছিলি—সেই বাণেই বাতাসী ম'ল।

পদ্ম। ও তাই বল। কাব্যি করে বলা হচ্ছে।

নটবর। জানিস ত—আমি আমাদের গ্রামের এক মস্ত বড় কবিয়ালের সাকরেত ছিলাম—অনেক দিন।

পদ্ম। তা হ্যারে হতভাগা। কবে আমি তোর দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসেছি? অ্যাঁ?

নটবর। হাসিসনি—সেই যে খিড়কী-পুকুর পাড়ে—

পদ্ম। কখনো না—

নটবর। সেই যে—ভরা দুপুরে—নাইতে নেমেছিলি।

পদ্ম। কি মিছা কথা গো!

নটবর। মিছা কথা! আচ্ছা আমি প্রমাণ দিচ্ছি মিছা কথা নয়। কি বাজী?

পদ্ম। কিসের আবার বাজী?

নটবর। যদি আমার কথা সত্যি হয় তুই আমাকে কি দিবি?

পদ্ম। ঘণ্টা দিব। মিছা কথা নিয়ে আবার বাজী।

নটবর। শোন্—আমি গম্ভীর হয়ে বলছি। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, আমি তোকে সোনার হার দেব।

পদ্ম। (অবাক হয়ে) সোনার হার!

নটবর। (ফতুয়ার পকেট হতে একছড়া নতুন সোনার হার বার করে) এই দেখ সোনার হার।

(পদ্ম অবাক হয়ে নটবরের মুখের দিকে চেয়ে রইল)

নটবর। বলেছি ত। যদি আমি হারি, এই সোনার হার তোর গলায় দেব পরিয়ে। আর যদি জিতি তাহলে তুই

আমাকে—আমাকে (ফিক্ করে হেসে) আর গম্ভীর থাকতে পারলাম না পদ্ম !

পদ্ম। মুখপোড়ার ঢং দেখ না।

নটবর। মানলি ত, তুই আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলি ?

পদ্ম। কখ্খনো হাসিনি।

নটবর। দেবো প্রমাণ ?

পদ্ম। দে—কি পরমাণ দিবি ?

নটবর। দেবো ?

পদ্ম। দে—না !

নটবর। (খপ করে পদ্মর কাছে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে) এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি—তুই হেসেছিলি।

পদ্ম। (একটু সরে গিয়ে) আহা ! কি পরমাণই না হল।

নটবর। তুই আমার বুকে হাত দিয়ে বল দেখি—তুই হাসিস নি ?

পদ্ম। আমার বয়ে গেছে তোকে ছুঁতে।

নটবর। এই ত হেরে গেলি। যদি আমার বুকে হাত দিয়ে বলতিস—নটবর তোমায় দেখে কি হাসতে পারি—অমনি সোনার হার তোর গলায় দিতাম পরিয়ে। হার মানতাম তোর কাছে।

পদ্ম। তা হ্যাঁরে মড়া। ও হার কি সত্যি সোনার না গিলটীর ?

নটবর। একেবারে খাঁটী সোনার—যাচাই করে লিস্।

পদ্ম। তা এ হার তুই পেলি কোথায় ? চুরি করেছিলি নাকি ?

নটবর। (জিভ কাটিয়া) ছিঃ ছিঃ, নটবরের বংশে কেউ চুরি করে না।

পদ্ম। তবে পেলি কোথায় ?

নটবর। কিনেছি। গতবার রাজাবাবুর সঙ্গে সদরে গিয়েছিলাম—তখন কিনেছি।

পদ্ম। টাকা পেলি কোথায় রে মুখপোড়া ?

নটবর। (একটু একটু হেসে) সে অতি গোপন কথা।

পদ্ম। বল না ?

নটবর। সে বলা যায় না।

পদ্ম। বল না ?

নটবর। (মাথা নাড়িয়া) উঁ হু।

পদ্ম। যা—জন্মে আর তোর মুখ দেখব না।

নটবর। মুখ আর দেখিস কই পদ্ম ! দূর থেকে এত তোর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসি—সদাই মুখ ঘুরিয়ে নিস।

পদ্ম। (খিল খিল করে হেসে) যাক্ পরমাণ হয়ে গেল—আমি হাসিনি।

নটবর। তা হার আমার হল। এইবার কাছে আয়—হার পরিয়ে দি।

পদ্ম। তুই টাকা কোথায় পেলি ?

নটবর। কাছে আয়—সে অতি গোপন কথা—কানে কানে বলব।

(পদ্ম একটু কাছে এগিয়ে এল)

পদ্ম। বল।

নটবর। আগে গলাটা বাড়িয়ে দে—হারটা পরিয়ে দি—দেখি মানায় ?

(পদ্ম গলা বাড়িয়ে দিল—নটবর হার পরিয়ে দিল)

নটবর। আ হা হা।

পদ্মবনে পদ্মপাতায় ফুটল আমার পদ্মফুল
পরাণ আমার উদাস করে, চোখে লাগায় নেশার ঢুল
ওরে আমার পদ্মফুল।

পদ্ম। আ—মর ! আবার শোলোক বলছেন। (হাসতে লাগল)

পদ্ম। (হাসি থামিয়ে) এইবার বল দেখি টাকাটা তুই পেলি কোথায় ?

নটবর। চল্ দুজনে কোথাও বসি।

পদ্ম। এ ঘরে বসব আবার কোথায় গো—কে কখন এসে পড়ে।

নটবর। এখন কেউ আসবে না রে পদ্ম ! রাজাবাবু ত সদরে—আসার আগেই দূর থেকে হাওয়া গাড়ীর ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনতে পাব।—

পদ্ম। দিদিমণি বাড়ী আছেন খেয়াল করিস।—

নটবর। দিদিমণি ? এই ঘরে ঢুকবেন ? রাজাবাবুর হুকুম তিনি জানেন না ? অন্দরের কোনও মেয়েছেলের বাইরের এ ঘরে আসা নিষেধ।

পদ্ম। দিদিমণি রাজাবাবুর হুকুম অত মানেন না।

নটবর। ইস্, মানেন না ! না মানলে রক্ষে আছে ? বন্দুকের গুলিতেই জানটা যাবে না—তা যিনিই হন।

পদ্ম। তাহলে আমি কেন এলাম ?

নটবর। তুই ! (হাসিয়া) প্রাণের চেয়েও বড় জিনিষের টান রে পদ্ম, প্রাণের চেয়েও বড় জিনিষের টান যে।

(পদ্মর পিঠে হাত দিয়ে একটা বড় কৌচের কাছে এগিয়ে গেল। বসল সন্তর্পণে জড়তার সঙ্গে।)

পদ্ম। এইবার বল, টাকা কোথায় পেলি ?

নটবর। বলব। তুই আমার বুকে হাত দিয়ে কথা দে—কাউকে বলবি না ?

পদ্ম। না।

নটবর। (পদ্মর হাতখানি ধরে বুকের ওপর রেখে) এইবার বল—বলবি না।

পদ্ম। না।

নটবর। (ঈষৎ গলা নীচু করে) রাজাবাবু দিয়েছেন।

পদ্ম। রাজাবাবু ! তোকে হঠাৎ এত টাকা দিলেন কেন ?

নটবর। (হাসি-হাসি মুখে) আরও দেবেন !

পদ্ম। কেন—কেন রে ?

নটবর। একটা মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে।

(পদ্ম বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে নটবরের মুখের দিকে চেয়ে রইল)

নটবর। ঐ যে ষ্টেশনের মাষ্টারের মেয়েটার বিরুদ্ধে মামলা না—তাতে মিথ্যা একটা সাক্ষী দিতে হবে।

পদ্ম। এ কি কথা গো !

নটবর। আরে তাই ত রাজাবাবু এত ঘন ঘন সদরে যায়—পুলিশের সঙ্গে কত পরামর্শ করে। গতবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ত—সেইজন্য। স্বয়ং ইনস্পেক্টারবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল রে পদ্ম—আমি কি একটা সোজা মানুষ ?

পদ্ম। তুই কাছারি গিয়ে মিছে কথা বলবি ?

নটবর। আমি যে কবিয়ালের সাকরেদ—কি রকম বলি শুনবি —শুনবি সব ?

পদ্ম। একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করবি ?

নটবর। আরে বলে কি! যা করবার করবেন ত হুজুর। আমার কি ?

পদ্ম। তাই টাকা পেলি ?

নটবর। আমার গুণের আদর রে পদ্ম, গুণের আদর। সবাই কি পারে ?

পদ্ম। এ ত চুরি করাই হল।

নটবর। (জিভ কাটিয়া) ছিঃ ছিঃ! নটবরের বংশে কেউ চুরি করেনা। আরে আমি যে কবিয়াল। কবিয়ালের কাজই ত মিথ্যা বানিয়ে বলা।—

পদ্ম। (উঠে দাঁড়িয়ে গলা থেকে হার খুলে) তোর এ হার আমি নিব না।—এই নে।

নটবর (দাঁড়িয়ে) এই দেখ—সাধে বলে মেয়েমানুষ বোকার জাত।

পদ্ম। মিছে দিয়ে গড়া তোর এ হার আমি নিব না।

(হার কৌচের উপর ফেলিয়া দিল। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে কথাবার্ত্তা শোনা গেল। সুজাতার গলা—চলনা বৌদি, এত ভয়টা কিসের ?)

পদ্ম। এই রে, এখন আমি কি করি !—(ছটফট করিতে লাগিল) বাইরের দিকে ত পাঁড়েজী বসে আছে—রাজাবাবুর কাছে তখুনিই বলবে। ভিতরের দিকেও—কি করি! কি করি!

নটবর। দাঁড়া—ভাবি, ভাবি—

(কথা শোনা গেল, রমণীর কণ্ঠস্বর।—না ভাই আজ থাক, আর একদিন হবে। এখুনিই উনি এসে পড়বেন। সুজাতার কণ্ঠস্বর, আর কোনও কথা শুনছি না—আজই)

নটবর। শোন্ শোন। আমি শুয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তুই হাওয়া কর—আঁচল দিয়ে। বলবি—একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে—

(নটবর শুয়ে পড়ল। হাত'পা ছুঁড়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল, হঠাৎ খেয়াল হল, হারটা কৌচের উপর পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে হারটা নিতে যাবে এমন সময় পাশেই পদধ্বনি শুনে কৌচের উপরই শুয়ে পড়ল—হারটা পিঠে চেপে। মুখে গোঁ গোঁ আওয়াজ। সুজাতা ও ইন্দিরার প্রবেশ। পদ্ম তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে নটবরের মুখে হাওয়া করতে লাগল।)

সুজাতা। কি ব্যাপার? (নটবরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল)

পদ্ম। আর বলেন কেন দিদিমণি! পাউডারের কৌটটা মেজে উপরে নিয়ে যেতে এই ঘর থেকে একটা বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখি—এই—

(নটবরের আওয়াজ থামে না)

সুজাতা। (নটবরের প্রতি) কি হয়েছে ?

(নটবরের একই অবস্থা। গোঁ গোঁ শব্দ যেন অধিকতর বেড়ে গেল।)

সুজাতা। (পদ্মর প্রতি) যা, ভিতর থেকে অন্ত অন্ত চাকরদের সব পাঠিয়ে দে।

ইন্দিরা। কি হল ঠাকুরঝি ?

সুজাতা। দাদা বাড়ী নেই—চুরি করে নেশা টেশা করেছে আর কি। (নটবরের আওয়াজ আরও যেন বাড়ল। সমানে কম-বেশী চলতে লাগল।)

ইন্দিরা। তা হবে—ওর হাতেই ত সব।

সুজাতা। বৌদি! সময়ে সময়ে তোমার উপর আমার ভীষণ রাগ হয়।

ইন্দিরা। (ঈষৎ হেসে) কেন ঠাকুরঝি ?

সুজাতা। ভালমানুষীর একটা সীমা আছে। এই যে দাদার হাতে দিন দিন সব উচ্ছন্নের পথে চলেছে—তুমি একটু জোরালো হলে কিছুটা বন্ধ করতে পারতে।

ইন্দিরা। তোমার দাদাকে তুমি চেন না।

সুজাতা। বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু দাদাকে মাথা নীচু করান যায়, যদি মনের মধ্যে তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পার।

ইন্দিরা। তাই ত ভাই দিনরাত গোপালকে ডাকি—

(চার-পাঁচ জন চাকরের প্রবেশ)

সুজাতা। যা তোরা—ওকে ধরাধরি করে চাকরদের ঘরে নিয়ে যা। নিয়ে গিয়ে মাথায় ঘটি ঘটি করে জল ঢাল।

(চাকররা নটবরকে তুলে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু নটবর উঠতে রাজী নয়। এতটুকু পাশ ফিরতেও যেন তার ভীষণ লাগে, এই ভাবে চীৎকার করে।

চাকর। দিদিমণি! ও ত কিছুতেই উঠছে না।

সুজাতা। তোমরা পাঁচটা লোক—একটা লোককে তুলে নিয়ে যেতে পার না ?

ইন্দিরা। আ—হা। হয়ত সত্যিই ওর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

সুজাতা। সত্যি যন্ত্রণা হলে ও রকম করে না—অন্ততঃ ওঠার চেষ্টা করে। দেখছ না ও উঠবেই না, জ্ঞান রয়েছে টনটনে। আর তাছাড়া সত্যি যদি ওর তেমন কিছু হত যাতে শুয়ে পড়তে হয়—তাহলে দাদার ঐ দামী কৌচের উপর শুত না। মেজের উপর পড়ত। এ নেশার ব্যাপার।

(ইতিমধ্যে চাকররা নটবরকে জোর করে তুলে ধরেছে)

সুজাতা। যাও—নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। জল ঢাল। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে না কমে—আমাকে খবর দিও।

(চাকররা নটবরকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল।)

সুজাতা। যাক্ এইবার একটা গান গাও বৌদি! আজ তোমার গান একটা শুনবই।

ইন্দিরা। থাক না ভাই, আর একদিন হবে। ওঁর আসার আর দেরী নেই।

সুজাতা। এলেনই বা। আমাকে গান শোনাচ্ছ—কিছু অন্যায় ত করছ না ?

ইন্দিরা। বাইরের ঘরে মেয়েদের আসা যে উনি একেবারে বারণ করে দিয়েছেন।

সুজাতা। তা হঠাৎ এ বিধান কেন হল—কারণ শুধাওনি ?

ইন্দিরা। কি হবে মিথ্যা কথা বাড়িয়ে। কথা বাড়ালেই অশান্তি।

সুজাতা। অশান্তিকে এড়িয়ে চললে সে মরে না—তাকে জয় করে মেরে ফেলতে হয়।

ইন্দিরা। সে শক্তি এখনও পাইনি ঠাকুরঝি।

সুজাতা। তা অর্গ্যানটা ভেতরে নিয়ে যাওনি কেন? অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাওয়াই যে তোমার অভ্যাস।

ইন্দিরা। আর গান গেয়ে কি হবে?

সুজাতা। দেখ বৌদি—অযথা আত্মত্যাগের কোনও মূল্য নেই। তোমার গান তোমার জীবনের কত বড় সম্পদ তা তুমি জান?

ইন্দিরা। কি জানি ভাই! গান গাইতে আর আমার ইচ্ছে করে না।

সুজাতা। তোমার এই অনিচ্ছাটা শুধু একটা বিলাস মাত্র আর কিছু নয়। একে আমি কিছুতেই মানব না। গাইতেই হবে তোমাকে।

(ইন্দিরা অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতে সুরু করল)।

গান

(আমি) প্রাণখানি আর বইতে পারি না।
প্রাণের বোঝা বাড়ল ক্রমে ফেলতে জানি না।
প্রাণখানি আর বইতে পারি না।
(তোমার) শ্রাবণ-রাতের বৃষ্টিধারায়
বোঝা যদি যায় ভেসে যায়
(আমি) সেই আশাতে পরাণ পেতে থাকি
তোমার আকাশ তলায়;
আমি তাতেও ডরি না।
প্রাণখানি আর বইতে পারি না।
ঝড়ে যদি দোলা লাগাও সেই আশায় থাকি।
প্রাণের পরে দাও উড়িয়ে কালবৈশাখী।
প্রাণের বোঝা তুলে নিয়ে
যা হয় কিছু দেও দিয়ে
না হয় কিছু নাই বা দিলে মোরে,
আমি কিছুই চাহি না।
প্রাণখানি আর বইতে পারি না।

(ইন্দিরা গান গাইছে। সুজাতা একটু এদিক ওদিক ঘুরে কৌচে বসতে গিয়েই দেখল সোনার হার। একটু অবাক হয়ে চেয়ে, তুলে নিল হাতে। গান থামল।)

ইন্দিরা। হলো ত। এইবার চল ভিতরে—

সুজাতা। পদ্ম! পদ্ম!

ইন্দিরা। কি ব্যাপার? তাই ত, এ হার কোথা থেকে এলো!

সুজাতা। তাই ত ভাবছি। তোমার নয়?

ইন্দিরা। না—না। নতুন হার দেখছি।

সুজাতা। পদ্ম! ও পদ্ম!

ইন্দিরা। তা পদ্ম কি করবে?

সুজাতা। এতক্ষণে নটবরের অসুখের যেন একটু কিনারা হচ্ছে। আমাদের পদ্মঠাকরুণও এর মধ্যে আছেন।

(পদ্মর প্রবেশ)

সুজাতা। হ্যাঁরে! এ হার কার?

পদ্ম। আমি জানিনা দিদিমণি—

সুজাতা। খবরদার—মিছে কথা বলবি না। এ হার কোথা থেকে এল? (পদ্ম নীরব)

সুজাতা। বল শীগগির—আমি জানি এ হারের খবর তোমার অজানা নেই। ভাল চাও ত আমাকে সব খুলে বল। (পদ্ম নীরব)

সুজাতা। (তীক্ষ্ণভাবে) পদ্ম!

(পদ্ম চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছু দূরে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ভাবে নটবরের প্রবেশ)

[ক্রমশঃ।

সেই মন

সুকুমার ঘোষ

রূপমুগ্ধ সেই মন—
অন্ধকার গাঢ় হতে দেখে
দুহাত বাড়ালো;
খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ তবু
রূপসী শ্রেয়বোধে, আলো।

এমনই উদ্দণ্ড দৃষ্টি
প্রত্যুষ খোঁজার প্রত্যাশায়
ছায়াপথ ধরে—
উন্মত্ত হাওয়ার মত—
ভেসে যায়—
তারপর দূরে দূরান্তরে।

তবু ঐ মন দৃঢ়
অজানিত সুনিবিড় দীর্ঘ—
অনুভবে;
মুক্তি চায় চিরকাল
সশরীরি মানবীরে—
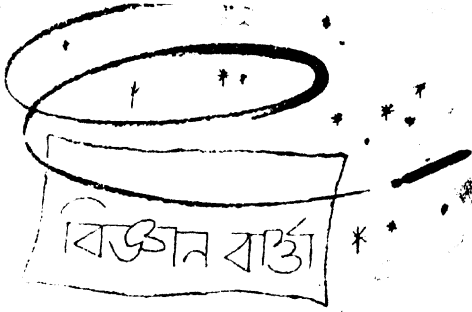
শুকতারার রহস্য উদঘাটনের পথে

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্বাহ্নে এক দৈত্যাকার স্পুৎনিক মহাকাশ যাত্রা করে। কলকাতায় আজ-কাল যে বড় বড় মোটরবাস চলে তার চেয়েও স্পুৎনিকটির ওজন অনেক বেশি ভারি। ভূপৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে মহাকাশে উঠে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে। লোকে এই খবর নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি। কিন্তু তারপরই শোনা গেল যে, সেই স্পুৎনিক থেকে লাফ দিয়ে উঠে একটি রকেট শুক্রগ্রহের দিকে যাত্রা করেছে—একটি মহাশূন্যের ষ্টেশন সঙ্গে নিয়ে যেটি শুক্রের মহাকর্ষের এলাকায় পৌঁছে শুক্রের স্পুৎনিক হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর এই কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রতিবেশীটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাঠাবে আমাদের কাছে।

শুক্র আমাদের এত কাছে কিন্তু তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সবচেয়ে কম। চাঁদ ও মঙ্গল সম্পর্কে আমরা জানি অনেক বেশি। তবু শুক্রগ্রহ সম্পর্কে যেটুকু আজ পর্যন্ত জানা বা আন্দাজ করা গিয়েছে, তাই এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সূর্যের পরিবার

নবগ্রহ নিয়ে সূর্যের যৌথ পরিবার:—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন (বরুণ) এবং প্লুটো। সূর্যের জড়মান সব ক'টি গ্রহের সম্মিলিত জড়মানের ৮০০ গুণ বলে তার প্রচণ্ড মহাকর্ষ শক্তি সৌরমণ্ডলকে ঠিকমত চালু রেখেছে।

প্রত্যেকটি গ্রহের নিজস্ব ইতিহাস আছে। শত শত কোটি বছর ধরে অস্তিত্ব রয়েছে এই পৃথিবীর এবং তার ৮টি নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের। এই সুদীর্ঘ কালে কত কিছু ভাঙ্গাগড়া ঘটেছে, পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। সেই জন্যে সমসাময়িক হয়েও গ্রহগুলির মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও বৈভিন্ন্য। তবু মোটামুটিভাবে গ্রহগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়:—পৃথিবী গোত্রীয় যথা বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এবং উচ্চশ্রেণীর যথা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস নেপচুন ও প্লুটো। পৃথিবী গোত্রীয় গ্রহগুলি সূর্যের নিকটে অবস্থিত এবং সেগুলির জড়মান, ও আহ্নিক গতিবেগ কম এবং ঘনত্ব বেশি। উচ্চশ্রেণীর গ্রহগুলি সূর্য থেকে অনেক দূরে, আয়তনে বিরাট, আহ্নিক গতিতে দ্রুত এবং ঘনত্বে কম।

পৃথিবী গোত্রীয় ২টি গ্রহ—ভূমণ্ডল, শুক্রের কক্ষপথ চক্রাকার বলে তারা সর্বদাই সূর্যের কিরণ পেয়ে থাকে। এদের ঋতুর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে এদের কক্ষপথের ওপর, এদের বিষুবরেখা কতটা হেলে আছে, তার ওপর। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই হেলন বা কোণের মাত্রা হচ্ছে ২৩°৫, মঙ্গলের ক্ষেত্রে ২৫°২ এবং শুক্রের ক্ষেত্রে শেষতম গবেষণা অনুসারে ৩২°।

শুক্রের সঙ্গে পৃথিবীর যতটা সাদৃশ্য আছে ততটা অন্য কোন গ্রহের সঙ্গে নেই। তাই জন্য এ ধারণা করা স্বাভাবিক যে শুক্রে জৈব জগতের অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। এই ধারণা আরো দৃঢ় হয় যখন আমরা দেখি যে পৃথিবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে বলে সে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সূর্যের আলো ও তাপ পায়।

সবচেয়ে উজ্জ্বল

আজ-কাল যে কোন দিন সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকালে সবচেয়ে জ্যোতিষ্মান যে 'তারা'টি দেখা যাবে সেটিই হচ্ছে শুক্র। সে কখনো সন্ধ্যাতারা, কখনো বা উষাতারা। আকাশ নির্মল থাকলে দিন দুপুরেও শুক্রকে দেখতে পাওয়া যায়, তার জ্যোতি এত বেশি। এই বছরের এপ্রিল মাসে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হবে সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৪ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার (৫২৫০০০০ মাইল)। কিন্তু মজার কথা এই যে, তখন কিন্তু পৃথিবী থেকে আমরা শুক্রকে দেখতেই পাব না অথচ যখন সে সবচেয়ে দূরে অর্থাৎ ২৫ কোটি কিলোমিটার (৩১২৫০০০০ মাইল) দূরে চলে তখন তাকে সবচেয়ে ভাল করে দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুতে শুক্র এসে পৌঁছোয় তার অমাবস্যায় এবং দূরতম বিন্দুতে তার পূর্ণিমা। এই দুয়ের মাঝামাঝি পথে তাকে আমরা দেখি বিভিন্ন কলায়। এর কারণ শুক্রের কক্ষ রয়েছে পৃথিবীর কক্ষের ভিতরের দিকে। ফলে সে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে যখন, তখন সে থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। ফলে পৃথিবীর দিকে তার যে পিঠটি থাকে, তাতে সূর্যের আলো পড়ে না। তাই তখন আমাদের কাছে শুক্রের অমাবস্যা। শুক্র যখন সূর্য প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়, তখন পৃথিবীর সামনে তার গোটা পিঠের ওপর সূর্যের আলো পড়ে। সেই তার পূর্ণিমা এবং তার তখনকার জ্যোতি উজ্জ্বলতম, তারা সিরিয়ুসের ১৩ গুণ। সূর্যকে একপাক ঘুরে আসতে শুক্রের ২২৫টি পার্থিব দিন লাগে। শুক্রের ব্যাস ১২৫০০ কিলোমিটার, তার এবং পৃথিবীর জড়মান ও ঘনত্ব প্রায় সমান সমান।

শুক্রের আবহমণ্ডল

কোন গ্রহে জৈব-জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যদি তাতে আবহমণ্ডল না থাকে। শুক্রে আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক লোমনোসফ ১৭৬১ সালে। শুক্র যখন সূর্যমণ্ডলের সামনে এসে পড়ে সেই সময় লোমনোসফ শুক্রকে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৌরলম্বন (প্যারালাক্স) পরীক্ষা করা। লোমনোসফ সূর্যের পটভূমিতে শুক্রমণ্ডলের চারিদিকে একটি ভাস্বর বলয় দেখতে পান। এই ব্যাপার থেকে লোমনোসফ সিদ্ধান্ত করেন, সূর্যের চারিদিকে যে আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব রয়েছে, তা থেকে সূর্যালোক বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐ জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি হয়। আধুনিক কালে লোমনোসফের সেই সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রের আবহমণ্ডল পরীক্ষা করা হয় প্রতিফলিত আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণের দ্বারা। শুক্রের বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে যে, শুক্রের মেঘমণ্ডলের উপরে আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণের ০·০০১ ভাগ। এই স্তরে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে ধরা পড়েনি। কিন্তু ১৯৬০ সালে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মিঃ ষ্ট্রং

আকাশে ১৫ মাইল উঁচুতে দূরবীণ নিয়ে গিয়ে শুক্রের আবহমণ্ডলের ঐ স্তরে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন।

শুক্রের আবহমণ্ডলের ২টি স্তর আছে। উপরের স্তর খুব পাতলা এবং নিচের স্তর ঘন এবং ঘন স্তর পীতাভ। ১৯৩২ সালে আমেরিকার উইলসন শৈলের মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণের ফলে শুক্রের বর্ণচ্ছত্রে প্রচুর অঙ্গারক বাষ্পের (কার্বন ডাইঅক্সাইড) অস্তিত্ব ধরা পড়ে। শুক্রের আবহমণ্ডলে অঙ্গারক বাষ্পের ঘনত্ব যে ক্ষেত্রে ৪৫ মিটার সে ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ঐ বাষ্পের ঘনত্ব মাত্র ৮·৪ মিটার। পৃথিবীর আবহ চাপে পড়লে ঐ বাষ্পের স্তরের ঘনত্ব দাঁড়াবে ৪০০ থেকে ৩২০০ মিটার। প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বি, লিয়ো শুক্রে আলোকের ধ্রুবীভবন পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে জলবিন্দু পূর্ণ মেঘ থাকলে তবেই ঐরকম ধ্রুবীভবন সম্ভব এবং অক্সিজেন বাষ্প চুম্বকশক্তির দ্বারা প্রভাব্য বলে শুক্রের মেঘের নিচেই অক্সিজেনের আধিক্য হওয়া স্বাভাবিক।

শুক্রের ধ্রুবজ্যোতি

শুক্রমণ্ডল অনালোকিত থাকার সময় দূরবীণের চোখে শুক্রের আকাশেও অমাবস্যার আকাশের উর্দ্ধভাগের মত এক স্তিমিত জ্যোতি ধরা পড়ে। সোভিয়েত বিজ্ঞানাচার্য কজিরেফ ১৯৫৩ সালে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে শুক্রের সেই জ্যোতি হচ্ছে ঠিক পৃথিবীরই ধ্রুবজ্যোতির মত কিন্তু তার ৫০ গুণ বেশি। পৃথিবীতে এই জ্যোতি সৃষ্টি করে আয়ন মণ্ডল। শুক্রের ক্ষেত্রে জ্যোতি এত বেশি হওয়ার কারণ শুক্রের সূর্যসান্নিধ্য যার ফলে শুক্রের আয়নমণ্ডলে অনেক অধিক সংখ্যক তড়িতাবিষ্ট অণুকণিকা সূর্য থেকে বিকীর্ণ হয়ে আসে। পৃথিবীতে বসে শুক্র থেকে তেজস্ক্রিয়ার সংকেত পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে সেখানে এমন বজ্রঝঞ্ঝা হয় যার প্রচণ্ডতা পার্থিব বজ্রঝঞ্ঝার হাজার গুণ। দূরবীণের সাহায্যে শুক্র পর্যবেক্ষণ করলে শুক্রকে একরঙা দেখায় তবে কখনো সখনো তার মধ্যে কয়েকটি হাল্কা বা গাঢ় রঙের ছোট ছোট কলঙ্কের মত দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে মেঘ। আসলে পৃথিবীতে বসে শুক্রের সেই অনচ্ছ মেঘাবরণ ভেদ করে তার আসল চেহারা দেখতে পাবার উপায় নেই। সে মেঘ কোথাও অত্যন্ত ঘন, কোথাও বা পাতলা, আমাদের পৃথিবীর উর্ণামেঘের মত।

১৯২৭ সালে মার্কিণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিঃ রস্ দূরবীক্ষণে সন্নিবিষ্ট ক্যামেরা দিয়ে অতিবেগুণী রশ্মির ফিল্টারের সাহায্যে ঐ উর্ণামেঘের ছবি তোলেন। সেই মেঘ সব সময় শুক্রের আবহ মণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে থাকে। গাঢ় রঙের কলঙ্কগুলি মিঃ রসের মতে শুক্রের মেঘাবরণের ছিন্ন অংশ মাত্র। সেগুলির ফাঁক দিয়ে শুক্রের আবহমণ্ডলের পীতাভ নিম্নস্তরের আলোকচিত্র ধরা পড়ে। উড়ন্ত ধূলিকণা থেকেই সেই হলদে রঙের উৎপত্তি। ১৯৫০ সালের পরে জানা গিয়েছে যে, শুক্রের মেঘ হচ্ছে ডোরাকাটা মেঘ যেমন মেঘ আমরা পৃথিবীর আকাশে সব চেয়ে বেশি উঁচুতে দেখতে পাই।

শুক্রের আহ্নিক গতি, দিনরাত্রি ও ঋতু

সূর্যের রাজ্যে ২টি গ্রহের আহ্নিক গতিবেগ সম্পর্কে এখনো মানুষ সঠিক খবর পায়নি। একটি হচ্ছে প্লুটো, অন্যটি শুক্র। সব সময় মেঘে ঢাকা থাকে বলেই এই জ্ঞানের অভাব। লেনিনগ্রাদের পুল্কোভো মানমন্দিরে ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণের সাহায্যে বিজ্ঞানাচার্য বেলোপলস্কি শুক্রের আহ্নিক গতি বেগ মাপবার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শুক্রের দিন পৃথিবীর কয়েক সপ্তাহের সমান। কিন্তু তাঁর সেই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। তারপর লাওয়েল, পিকারিং ষ্টিভেন্সন প্রমুখ মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অনুমতি দেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক এ দলফাস্ বলেন যে শুক্রে দিনও যা বছরও তা এবং তা হচ্ছে পৃথিবীর ২২৫ দিনের সমান। দলফাসের অনুমিতি সত্যি হলে বলতে হয় যে তা হলে শুক্রের একটি গোলার্দ্ধে চির অমানিশা এবং অন্য গোলার্দ্ধে সূর্য অস্ত যায় না। এ ক্ষেত্রে শুক্রের একদিক হবে প্রচণ্ড গরম। অন্য দিকটি হবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং দুই দিকের তাপের পার্থক্য হবে অন্তত ১৫০° সেণ্টিগ্রেড। কিন্তু আধুনিক কালের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে শুক্রের আলোকিত ও অন্ধকার পিঠের তাপমাত্রার পার্থক্য ৩০-র বেশি নয়। সুতরাং দলফাসের বক্তব্য ঠিক নয়। তাছে মার্কিণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিঃ রিচার্ডসন উইলসন শৈলের মানমন্দিরে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, শুক্র যদি পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে তাহলে তার একবার নিজের চারদিকে পাক খেতে ৭ দিনেরও বেশি লাগে এবং সে যদি

২৬০০ মিলিমিটার ব্যাসের প্রতিফলকযুক্ত এই অতিকায় দূরবীক্ষণ রুশিয়ার দাক্ষিণে ক্রিমিয়ার মানমন্দিরে বসানো হয়েছে।

পূব থেকে পশ্চিমে ঘোরে তাহলে এক পাক ঘুরতে তার পৃথিবীর সাড়ে তিন দিনের মত লাগবে।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মিঃ সিণ্টনের মতে শুক্রের মেঘের সীমারেখা বরাবর আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা হচ্ছে ৩১° সেণ্টিগ্রেড। প্রচণ্ড শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় দূরবীক্ষণের সাহায্যে সোভিয়েৎ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী থেকে হালে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর ফলে জানা গিয়েছে শুক্র সূর্যের কাছাকাছি এলে দুপুরের দিকে শুক্রের পিঠে তাপমাত্রা ৩০০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে যায়। তাহলে বলা যায়, শুক্রে দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম। কিন্তু এত গরম সত্ত্বেও শুক্রে যদি জলভাগ থাকে এবং সে জল যদি না ফোটে তাহলে বুঝতে হবে যে শুক্রে আবহচাপ অত্যন্ত বেশি।

গ্রহবিশেষের কক্ষের ওপর তার আহ্নিক আবর্ত্তনের অক্ষ কি ভাবে স্থাপিত রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই গ্রহে বিভিন্ন ঋতুর আসা যাওয়া। শুক্রের অক্ষ যদি তার কক্ষপথের ওপর লম্বভাবে থাকে তাহলে শুক্রে বিভিন্ন ঋতুর লীলাখেলা দেখা যাবে না। একই ঋতু থাকবে সবসময়। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মিঃ কয়পারের অনুমিতি অনুসারে শুক্রের কক্ষ ও অক্ষ মিলে ৩২° কোণ সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ার খার্কফ মানমন্দিরে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিঃ ইয়েজেস্কি শুক্রের পিঠে মেঘরেখার রং বদল পর্যবেক্ষণ করে ঐ একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই কোণ হচ্ছে ২৩°২৭'। তাহলে বলতে হয় শুক্রে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়।

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে শুক্রে অক্সিজেন এবং জল আছে কি না। এই দুটি জিনিষ না থাকলে কোন গ্রহে জৈব-জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। শুক্রের মেঘস্তরের ওপরে যৎসামান্য জলীয়

রকেটের গতি পর্যবেক্ষণ করার দূরবীণ

বাষ্পের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনার কথা আগেই বলেছি। সেখানে অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্যের কথাও বলা হয়েছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে এত বেশি অঙ্গারের বাষ্প থাকার মানে শুক্রে কোন মহাদেশের মত স্থলভাগ না থাকা। কারণ আমাদের এই পৃথিবী যখন বাষ্পীয় অবস্থায় ছিল তখন এখানেও অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্য ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে কয়লা, চূণা পাথর ইত্যাদি বিভিন্ন কঠিন খনিজ পদার্থের মধ্যে সেই অঙ্গারক বাষ্পের বেশির ভাগ বন্দী হয়ে যায়। শুক্রে অঙ্গারক বাষ্প মুক্ত অবস্থায় রয়েছে বলে তাঁদের মনে হয় সেখানে পৃথিবীর মত কঠিন ভূভাগ নেই এবং কোটি কোটি বছর ধরে গাছপালার অঙ্গারীকরণও হয়নি। যদি তাই হয় তাহলে শুক্রে গাছপালা বা জীবজন্তু থাকাও সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকদের অনেকে তাই মনে করেন যে শুক্র গ্রহের গোটাটাই হয়ত মহাসাগরে আবৃত। গাছপালা না থাকায় আলোক সংশ্লেষের দ্বারা সেখানে অক্সিজেনও উৎপন্ন হয় না।

খার্কফ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে সূর্যের যে আলোক শুক্রে যায় তার ২৫ শতাংশ প্রতিফলিত হয় শুক্র পৃষ্ঠ থেকে এবং ৫০ শতাংশ প্রতিফলিত হয় শুক্রের মেঘমণ্ডল থেকে। শুক্রপৃষ্ঠ থেকে আলোকের প্রতিফলন আলোকচিত্রে ঠিক আয়নায় প্রতিফলিত আলোর মত দেখায়। এই ধরণের প্রতিফলন সমুদ্রের মত জলভাগ থেকেই সম্ভব।

শুক্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত মোটামুটি যা জানা গিয়েছে তা বলা হোল এবং জ্ঞাত তথ্য থেকে একথা বলা হয়ত অন্যায় হবে না যে আকৃতি, প্রকৃতি এবং সব দিক দিয়েই শুক্রের সঙ্গে পৃথিবীর যতটা সাদৃশ্য রয়েছে তত সাদৃশ্য এমন কি মঙ্গলের সঙ্গেও নেই। আজ যে মহাজাগতিক ষ্টেশনটি শুকতারার রাজ্যের দিকে ছুটে চলেছে, তার কাছে থেকে অদূর ভবিষ্যতে যেসব তথ্য পৃথিবীতে এসে পৌছবে, সেগুলির ভিত্তিতে সম্ভবত আমরা ঘোষণা করতে পারব যে মঙ্গলের চেয়ে শুক্রের সঙ্গেই পৃথিবীর কুটুম্বিতা বেশি ঘনিষ্ঠ।

শুক্রগামী মহাজাগতিক ষ্টেশন

শুক্রগামী মহাজাগতিক ষ্টেশনটির বিষয়ে দুনিয়ার মানুষের কৌতূহল যে অসীম তাতে সন্দেহ নেই। এই ধরণের একটি মহাজাগতিক ষ্টেশন কিছুদিন আগে চাঁদের পিছনের পিঠের ছবি তুলেছিল। কিন্তু কোন মহাশূন্য যানকে চাঁদে পাঠানো এক কথা, আর মঙ্গলে বা শুক্রে পাঠানো আর এক কথা। চন্দ্রগামী মহাশূন্যযানের গতিপথের কোন পর্যায়েই সূর্য থেকে তার আপেক্ষিক দূরত্বের বেশি তারতম্য হয় না এবং ফলত তার ওপর সূর্যের মহাকর্ষের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের বেশি কমে বাড়ে না। সুতরাং চাঁদে রকেট পাঠানো অনেক সহজ। মঙ্গল বা শুক্রের কথা স্বতন্ত্র। তবে শুক্রে রকেট পাঠানোর চেয়ে মঙ্গলে পাঠানো সহজ যদিও পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। মঙ্গলের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাইরের দিকে এবং শুক্রের চেয়ে মঙ্গলের জড়মান কম। কাজে কাজেই মঙ্গলের ওপর সূর্যের মহাকর্ষ অনেক কম শুক্র পৃথিবীর চেয়েও সূর্যের অনেক কাছে, তাই সূর্যের প্রচণ্ড মহাকর্ষ জয় করে শুক্রে রকেট পাঠানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তা ছাড়া পৃথিবী থেকে শুক্রের মহাকর্ষ প্রভাবিত এলাকার অতি সামান্য অংশ কোণাকুণি ভাবে নজরে আসে বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেটের নিশানা নির্ভুল হওয়া

একরকম অসম্ভব বললেই চলে। ঠিক এই অসুবিধার জন্যেই প্রথমে মহাশূন্যে একটি অতিকায় কৃত্রিম উপগ্রহ চালু করে তাই থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলে মাহেন্দ্রক্ষণে শুক্রের দিকে রকেট পাঠানো হয়েছে। এই অভিনব কৌশলে রকেট নিক্ষেপে ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

এই ধরণের অতিকায় স্পুৎনিক মহাশূন্যে পাঠাবার মহড়া হয়েছিল বছর খানেক আগে প্রশান্ত মহাসাগরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে কয়েকটি বহু-পর্যায়িক রকেট পূর্বনির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পাঠায়। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার যে স্পুৎনিকটি ভূপ্রদক্ষিণে পাঠানো হয় তার প্রাথমিক গতিবেগ ছিল সেকেণ্ডে ৫ মাইল। ভূপ্রদক্ষিণের সময়ে স্পুৎনিকের গতিবেগ এবং অবস্থা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ঠিক ততখানি নির্ভুল যতখানি নির্ভুল তার জ্ঞান সৌর জগতে পৃথিবীর গতিবেগ এবং অবস্থা সম্পর্কে। সেই গতিবেগ এত প্রচণ্ড যে তার সঙ্গে সামান্য আর একটু বেগ যোগ করে স্পুৎনিক থেকে নিক্ষিপ্ত রকেট অন্য গ্রহের দিকে চলে যেতে পারে এবং এই বাড়তি বেগের পরিমাণ যত কম হবে রকেটের পথ নির্দেশে ভুলত্রুটির সম্ভাবনাও তত কম থাকবে। পৃথিবী থেকে সরাসরি অন্য গ্রহে রকেট পাঠাতে ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা বেশি থাকে দ্বিতীয়ত স্পুৎনিক-গুলিকে মহাজগত পরিক্রমার মাঝপথে একটু থেমে আবার রওনা হবার ষ্টেশনে রূপান্তরিত করার দিকেও এই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ।

মহাজাগতিক ষ্টেশনের গতি

স্বয়ংচালিত মহাজাগতিক ষ্টেশনটি একটি ডিম্বাকার বিক্ষেপ মার্গ ধরে এগিয়ে চলেছে। সূর্য ও নক্ষত্রগুলির সঙ্গে তার আপেক্ষিক বেগ সেকেণ্ডে ৩২'২ কিলোমিটার (২০ মাইলের মত)। প্রায় ১০০ দিনে সে ২৭ কোটি কিলোমিটার (১৬ট কোটি মাইল) পথ যাবে। সে সূর্যের যত কাছে যাবে ততই সূর্যের মহাকর্ষে তার বেগ বাড়বে। পৃথিবীর মহাকর্ষের এলাকা ছাড়িয়ে যাবার সময় তার বেগছিল সূর্যের সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে সেকেণ্ডে ২৫-৯ কিলোমিটার কিন্তু শুক্রের কাছে যখন সে পৌছবে ১৯ বা ২০শে মে তারিখে তখন সেই বেগ দাঁড়াবে ৩৬ কিলোমিটার। তখন পৃথিবী শুক্র ও সূর্যের কাছ থেকে তার দূরত্ব দাঁড়াবে যথাক্রমে কিছু কম ১ লক্ষ কিলোমিটার (৭২৫০০ মাইল), ৭ কোটি কিলোমিটার (৪৩৭৫০০০০ মাইল) এবং ১০কোটি ৯০ লক্ষ কিলোমিটার (৬৮১২৫০০০ মাইল)।

বর্ত্তমানে সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে আমাদের পৃথিবী তার মহাজগতিক দূতকে পিছনে ফেলে যাচ্ছে কারণ দূতের গতিবেগ এখন সেকেণ্ডে ২৬ কিলোমিটারের মত।

রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে এখন তার নিজস্ব অবশিষ্ট গতিবেগে (সেকেণ্ডে ৩'৯ কিলোমিটার) আপনি ভেসে চলেছে শুক্রের দিকে, সূর্যকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে প্রথম যে রকেট সূর্যের দিকে পাঠানো হয়েছিল সেটি পৃথিবীর গতিপথের উল্টোদিকে গিয়ে সূর্য থেকে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পৌচেছিল। সেটিকে পৃথিবীর গতির দিকে পাঠালে সে সূর্য থেকে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে যেতে পারত। আজ ৩'৯ কিলোমিটার নিজস্ব অবশিষ্ট বেগে যে মহাজাগতিক ষ্টেশনটি শুক্রের দিকে চলেছে সেটি সূর্যের মাত্র ৯কোটি কিলোমিটারের মধ্যে যাবে। তাকে উল্টো দিকে পাঠালে সে সূর্য থেকে ২৬, কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে চলে যেতে পারত অর্থাৎ মঙ্গলের কক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারত। সূর্যের প্রথম কৃত্রিম গ্রহের চেয়ে আজকের শুক্রগামী মহাজাগতিক ষ্টেশনের ওজন ২৮২'২ কিলোগ্রাম (৮ মণের মত) বেশি অর্থাৎ ৬৪৩'৫ কিলোগ্রাম বা ১৬ মণের ওপর। ২০৩৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের ও ১০৫০ মিলিমিটার ব্যাসের এই ষ্টেশনটি বহু কোটি কিলো-মিটার দূর থেকে বেতার সংকেত মারফৎ বিভিন্ন মহাজাগতিক তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে সৌররশ্মি চালিত ব্যাটারীর সাহায্যে।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নতুন মহাজাগতিক ষ্টেশনটি সোজা রাস্তায় শুক্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত এপ্সিলন পিসেস্‌' নামে তারার কাছে বরাবর সে 'শুক্রের রাজ্য প্রবেশ করবে মে মাসের ১৯ বা ২০ তারিখে!

স্মৃতি

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

দুরাশায় দীপ্ত তুমি স্মৃতি
সন্ধ্যার শরীর ঘিরে থাকো,
একটি নামের সরলতা
বিস্মৃত ফুলের বুকে আঁকো।

যখন আড়াল দিল রথ
শিরীষ বনের সীমানায়,
কেউ যেন পদচিহ্ন রাখে
দিগন্তের দূর কিনারায়।

একটি নামের সরলতা
বিস্মৃত ফুলের বুকে কাঁপে,
দুরাশায় দীপ্ত সেই স্মৃতি
সন্ধ্যার শরীর ঘিরে থাকে।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বিজ্ঞানভিক্ষু

শংকরের ভাগ্য ভালো, লাইনের গোলযোগের জন্য তুফান এক্সপ্রেস সেদিন ছাড়লো নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। তা নইলে বিকেল অবধি অপেক্ষা করতে হোতো পরের ট্রেণের জন্য। রাগের মাথায় ট্রেণের সঠিক সময়ের খবর নেওয়ার কথা মনে ছিল না তার। অপ্রত্যাশিত ভাবে একখানা 'বার্থ' ও মিলে গেল একটা খালি 'কুপে'র মধ্যে, শেষ মুহূর্তে কাজের যাত্রাদিনের পরিবর্তন হয়েছে—

তুফান এক্সপ্রেস নয়াদিল্লীর প্লাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের গুমোট গরম। উত্তর দিকের জানালাটা খুলে শংকর মাথা রাখে, সে জানালার চৌকাঠে বাইরের হাওয়াতে যদি মাথার জ্বালাটা কমে যায়। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ হয়ে ছাই হয়ে যায়। কোনো চিন্তা রূপ নিতে পারছে না সে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে—সুখ-দুঃখবোধের অতীতে পৌঁছেছে শংকরের আঘাতক্লিষ্ট, অসাড় চেতনা!

অসহ্য গরম! বাইরে মধ্যাহ্নসূর্যের জ্বালা। ফ্যানের হাওয়া সে গরমকে যেন ছড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠলো—পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ভুল হয়ে গেছে। ঘুমের চেষ্টায় চোখের পাতাবন্ধ করে শংকর, কিন্তু ঘুম আসে না। রীম-রীম-রীম শব্দ আসে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলো থেকে। কোষে কোষে রক্ত চলাচলের শব্দ ট্রেণের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়। রীম-রীম-রীম বহ্নি বিহংগের পাখার আওয়াজ! বহ্নিবিহংগ! তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে শংকরের ঠোঁটের কোণে।

আকাশে একটা প্রকাণ্ড মেঘের খণ্ড সূর্যকে আড়াল করে দেয়। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া বইতে সুরু করে—তাতে সামান্য শীতলতার স্পর্শ। শংকরের উষ্ণ কপালে যেন লাগে শীতল জলের প্রলেপ। অবচেতন মন থেকে ওঠে ক্ষীণ অনুভূতির অস্পষ্ট সাড়া।

সুমিত্রা কেন ওকে প্রতারণা করল?

সুমিত্রা—প্রতারণা—কেন?

রীম-রীম-রীম···।

ট্রেণের গতিবেগ বেড়েছে। তার গতির ছন্দের সুর মিলে যায় শংকরের হৃৎস্পন্দনের সুরে; একই তালে ছন্দে মিলে যায় দু রকমের স্পন্দনের।

শংকরের চোখ বুজে আসে তন্দ্রায় ক্লান্তিতে গ্লানিতে। হাতের ওপর মাথার ভর রেখে শংকর দেহ এলিয়ে দেয় গদীর ওপর। গাড়ী ছুটতে থাকে—লোকালয় কান্তার পার হয়ে।

* * * *

হাতে উষ্ণজলের স্পর্শ! শংকর ধড়মড়িয়ে ওঠে। সুমিত্রা কাঁদছে কেন?

বাইরে দেখা যায় রৌদ্রবৃষ্টির খেলা। একটা খণ্ড মেঘ থেকে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। গাড়ী মথুরা ছেড়ে বেরিয়ে চলল।

নাঃ, সুমিত্রা নয়, বৃষ্টি।

বাজে চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করে শংকর। না, শংকর রায় পেছনে যা ফেলে এসেছ তার দিকে চেয়ো না। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবার পালা। কতো আনন্দের কথা! সিকিউরিটির কড়া পাহারা থেকে মুক্তিতে কি কম স্বস্তি! মুক্ত বিহংগের মতো পাখা মেলে দাও।

সিগারেটের বাক্স খালি। দূর ছাই, মনেই ছিল না ষ্টেশন থেকে সিগারেট কিনে নেবার কথা। পরের ষ্টেশন কতো দূর? এক গ্লাস জল পেলে বড়ো ভালো হোতো!

কোলকাতার খবর কী? নিশাপতির কি চাকরীতে প্রোমোশন হোলো? রমেনদা এখন কোথায়? সুধীরটারই বা খবর কী? কতোদিন ওর চিঠি পায়নি শংকর? ছ' মাস—তা হবে। ও কি এখনো চটকলে চটকলে ইউনিয়ন বানিয়ে বেড়াচ্ছে না জামসেদপুর চলে গেছে লোহামজুরদের সংঘবদ্ধ করতে? শেফালির সঙ্গে ওর বিয়েরই বা কতোদূর কী হলো?

ইনষ্টিটিউটের সকলেরই বা খবর কী? দেবতোষের আমেরিকা যাবার কী হোলো? বড়ো ভালো ছেলে দেবতোষ—বাইরে গেলে দেশেরই উপকার হবে। তালুকদারের থিসিস লেখারই বা কতোদূর হোলো?

সে যেন কতো যুগের কথা!

সেই রাত্রি আড়াইটার সময় দমদম থেকে প্লেনযাত্রা—জেট-এর গর্জন যেন কানে ভেসে আসে আবার। অমল বন্দ্যো—আলিমচন্দানী

—আর প্রফেসর শিকদার। প্রফেসর শিকদার! কোথায় আছেন তিনি এখন? কোলকাতায় নিশ্চয়ই।

প্রথমেই শিকদারের সংগে দেখা করে সে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু এতো আত্মম্ভরিতা কেন ভদ্রলোকের? অনেক বড় বৈজ্ঞানিকের সংগেই তো শংকরের দেখা হয়েছে—কই তাঁরা তো শিকদারের মতো নন?

না ক্ষমা চাওয়াটাও ঠিক নয়। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

মাত্র এগারো মাস! টেলিফোন বেজে চলেছে "হ্যালো 'প্রজেক্ট'-এ।" সুমিত্রার নীলখামের চিঠি।···

এগারো মাস। তাই তো এই এগারো মাসেই শংকরের যেন বয়স বেড়ে গেছে এগারো বছর। সুমিত্রা বলেছিল—এগারো বছরের কাজ এগারো মাসেই সম্ভব হয়েছে। সত্যিই তো, শংকর ভেবে দেখে। সুমিত্রার কণ্ঠস্বর রেশটুকু কানে বেজে ওঠে আবার—বেতারের সংগে যোগ করা তোলা সূক্ষ্ম তরংগ ধরার সার্কিট, ডায়াল ঘোরাতেই সহসা ভেসে এলো দূরান্তের সংগীত···অন্তরের প্রতিধ্বনি···সুর বেঁধে দেওয়া প্রাণে মনের অর্কেস্ট্রাতে···খাঁটি আওয়াজ—হট্টগোল···গণ্ডগোল··· খাঁটি আওয়াজ···

না না, এলোমেলো চিন্তা নয়। ভাবা যাক ইনষ্টিটিউটের কথা—ল্যাবরেটরির কথা। ভানুকুমার কতোদূর কী করলো থিসিসের। গত তিন মাস খবর নেবারই সময় হয়নি। 'ফীল্ড থিয়োরি'র কাজ কিছুই এগোচ্ছে না—একবার দূর্ভাবনায় জেগে পড়তে হয়······

গাড়িটা একটা 'লেভেল ক্রসিং' পার হয়ে যায়। মোটরের রাস্তা। এ পথ দিয়েই না সুমিত্রার সংগে আগ্রায় যাওয়া হয়েছিল? কালে'কর সঙ্গিতা। কি চমৎকার ছন্দময় জীবন ওদের! মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল।···আর তো যাওয়া হোলো না ওদের ওখানে! সময়ই বা ছিল কোথায়?

সূর্য অস্ত যাচ্ছে প্রান্তরের পেছনে—সর্বত্র দৃশ্যমান জগতে সোনার রঙের বন্যা। মেঘে মেঘে লেগে গেছে রঙের খেলা! বহ্নিবিহংগ! তাজমহলের চূড়ায়, বর্ষণের আকাশস্পর্শী বাড়ীগুলোর জানালায় সে রঙের মাখামাখি!···

ওই মেঘটার আকৃতি কী রকম? শুক্রগ্রহের কোনো জানোয়ারের মতো? সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা সুমিত্রার চোখে। ঘনায়মান অন্ধকারে যমুনার কলস্রোত···স্রোতে ভাসমান ফুলের পাপড়ি···বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত বিরাট স্রোত। প্লাভন!

সুমিত্রার কান্না কেন?···

শংকর এবার পলাতক মনকে যথোচিত শাসন করে। আবার অভ্যাসবশে খালি সিগারেটের প্যাকেটটা হাতড়ায়—সিগারেট কি একটাও নেই?

আগ্রায় নেমে প্রথমেই চাই দু'গ্লাশ জল। তারপর চা। সিগারেটও কিনতে হবে।

আগ্রা কতো দূর?···

হাঁ, ভানুকুমারের 'থিসিস'-এ ফীল্ড-ইকোয়েশন। আচ্ছা, গ্যাভেনের থিয়োরিতে কী দাঁড়ায় সে ইকোয়েশনের অবস্থা? কাগজ কোথায়?

হ্যাঁ ব্যাগেই আছে।

না। আজ থাক—কাল খতিয়ে দেখলেই চলবে। আজ আর ভালো লাগছে না।···

সুমিত্রা কেঁদেছিল কেন সেদিন?···

হার্ভার্ডের ছাত্রী সুমিত্রা। কোথায় দেখা ওদের দুজনের?

ভারতীয় ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের ২৬শে জানুয়ারীর প্রোগ্রাম। নবাগতা সুন্দরী, মহারাষ্ট্রের মেয়ে। রবীন্দ্রসংগীত এমন চমৎকার গাইতে শিখলো কোথা থেকে?

"কোথায় ভর্তি হলেন?"

"হার্ভার্ডে—সাইকলজিতে"—সুমিত্রার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওঠে···

"ডাঃ রায়! আপনি এদিকে কী মনে করে? পথ ভুলে নাকি?···"

"ডাঃ রায়, আমাকে ফ্যাক্টর অ্যানালিসিসটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?"···

"ডাঃ রায় সাইবারনেটিক্স্-এর ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। বড়ো ভয় করছে আমার। অংকে আমি আবার বড়ো কাঁচা।···"

ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস, সাইবারনেটিক্স্। কনসার্ট সিনেমা আর সাইবারনেটিক্স্। ড্রামা, সিনেমা, ডিনার আর সাইবারনেটিক্স্।

"এতো অংক তোমার মাথায় ধরে কী করে, শংকর?"

* * * *

চার্লস নদীতে নৌকার ওপরে সুমিত্রা—আগ্রার যমুনার বুকে শংকর-সুমিত্রা। অন্ধকারের আড়ালে সুমিত্রা কাঁদে কেন?

গাড়ী তখন আগ্রার প্লাটফর্মে প্রবেশ করছে···

* * * *

রাত্রি হোলো অনেক।

বিরাট ভোজ আর উৎসবের আনন্দ-কোলাহল থেমে গেছে। আশপাশের কোনো ব্যারাকের জানালারই আলো দেখা যায় না। 'হল'ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় নৈশভোজের আহার্য সামগ্রী আর চুরুট সিগারেটের গন্ধের অশরীরী আভাস। লম্বা বারান্দা জনহীন, নিস্তব্ধ।

বিনিদ্র চোখে শয্যায় শুয়ে সুমিত্রা। ঘরের আলো নেবানো। অন্ধকারে দেখা যায় না টেবিলের ওপরে রাখা পাশাপাশি দুখানা পদত্যাগপত্র। একটিতে স্বাক্ষর রয়েছে শংকর রায়ের, অপরটিতে সুমিত্রা দেশপাণ্ডের। শেষোক্তটির এককোণ অশ্রুকলংকিত।

বাইরে থেকে দরজায় পড়ে সজোরে ধাক্কা।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সুমিত্রা প্রশ্ন করে "কে?"

উত্তর আসে "আমি। শংকর। ফিরে এলাম।"

* * * *

পরমাণুর নিউ ক্লীয়াসকে পদার্থবিজ্ঞানে আজ ধ্যান বা আরাধনা করা হয় তিন মূর্তিতে 'শেল'এর মডেল, তরল পদার্থের মডেল আর 'অপটিক্যাল মডেল'। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের' 'হোলি ট্রিনিটি'। তাই বোধ হয়, কখনো কখনো এক ফোঁটা চোখের জলে পাওয়া যায় নিউক্লীয়াসের অমিত শক্তির পরিচয় কে জানে।

গ্রন্থকারের কৈফিয়ত

"The die is cast. The book is written to be read either now, or by posterity. I care not which"

—*Johannes Kepler* (1571-1630)

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের সমর্থকদের মধ্যে আজ একটা বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে—বিশেষ করে আমাদের দেশে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন পদার্থবিজ্ঞানী নিউক্লিয়ার ফিজিসিষ্ট, 'অ্যাষ্ট্রোফিজিসিষ্ট' 'অ্যাষ্ট্রনমার।' আর সব চেয়ে নীচের শ্রেণীতে আছেন সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী আর সম্ভবতঃ প্রাণিতত্ত্ববিদ্। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারদের বাদ দিলে, মান এবং জীবিকার পরিমাণেও বর্ণাশ্রমের নিয়মটা খাটে। এটা যে কতো বড়ো অসংগতি সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য এ-কাহিনীর অবতারণা।

লেখক অবশ্য উপরোক্ত কোনো শ্রেণীর মধ্যেই পড়েন না, কিন্তু এক ধরণের বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর দিন গত পাপক্ষয় হয়। এ কথাটাও উল্লেখ করার প্রয়োজন—বিজ্ঞানের বর্ণাশ্রমে তাঁর স্থান বেশ নীচের দিকেই। কাহিনীর শংকর রায়ের ভাষায় তাঁরও প্রধান উপজীব্য হচ্ছে—"প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে একরাশ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রকাশ করা" আর বিদেশে যে ধারায় গবেষণা চলতি সেটারই "চর্বিত চর্বণ" করা। শিকদারের ভাষাতে "বিজ্ঞানে যেটুকু ঘাটতি" মাঝে মাঝে "কল্পনায় সেটা পুষিয়ে যায়।"

উপন্যাস লেখার চেষ্টা করা তাঁর এই প্রথম।

বলা বাহুল্য, এ কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা। আইন বাঁচাতে গেলে এ কথাটাও যোগ করতে হয়, যে সব কটি চরিত্রই লেখকের মনগড়া কোনো জীবন্ত মানুষের সংগে এদের যদি মিল থাকে তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়।*

কিন্তু কাহিনীটা লিখে মনে একটা ব্যর্থতাবোধ থেকে যায়, যদি এ কাহিনী সত্য হোতো!

পদার্থবিজ্ঞান ও সেই সংক্রান্ত গণিতের জ্ঞান যাঁদের লেখকের চেয়ে বেশী—বিজ্ঞানের রাজ্যের সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কাছে লেখকের একটা সনির্বন্ধ নিবেদন আছে। যদি 'গ্রাভন'-এর 'থিয়োরি' একান্তই অনধিকার চর্চা বলে মনে হয়, দয়া করে লেখকদের তাঁরা মার্জনা করবেন। কারণ, অ্যান্টিগ্রাভিটি এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য নয়। লেখকের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো সেটা বলে দেওয়া হয়েছে সুমিত্রা আর কৃষ্ণস্বামীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। এঁদের চিন্তাধারার কতকটা নাগাল পাওয়া যায় লেখকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায়। গল্পের নায়ক শংকর রায়ের উপরে লেখকের দারুণ ঈর্ষা। কারণ, 'দশ-ডাইমেনশন'-এর গ্রাভনের 'ইল্যাষ্টিক ফ্লো'-র রূপায়ন করতে আর তা থেকে আমাদের 'কো-অর্ডিনেট'-এ, আমাদের 'স্পেস-টাইম কন্টিন্যুয়াম,' মহাকর্ষের মূল সূত্র খুঁজে বের করতে দরকার হয়তো আইনষ্টাইন-এডিংটন অথবা গুয়েডেল (Godel)এর মতোই একজন গণিতজ্ঞের। শংকর রায়ের 'ফার্সফীল্ড'-এর জ্যামিতির নির্দ্ধারণ করতে দরকার হবে একজন রীম্যান্ অথবা লোবাচেভস্কির। এক রাত্রে সেটা কী করে

* কাহিনীর কাঠামোর কিছুটা ধার করা হয়েছে একটা বিদেশী ছোটো গল্প থেকে। "*Noise Level*"—Raymond Jones, A standing Science fiction, 1953)

সম্ভব হোলো, যদি এই আপনাদের জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে দয়া করে শংকর রায়েদেরই সে প্রশ্নটা করবেন। "থিয়োরিটা বাজারে ছেড়ে"ই লেখক, থুড়ি, শংকর রায় খালাস। সে সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব নিতে লেখক অপারগ।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটির' 'প্রবাবিলিটি' প্রায় প্রফেসর শিকদারের "ইংল্যাণ্ডের রাজা হওয়ার" সম্ভাবনার মতো। এমনিতেই জীবনের কতো অতি সহজ, আপাত সরল ব্যাপারই 'প্রোবাবিলিটির'র প্যাঁচে পড়ে ঘায়েল হয়। সে কথা আপনাদের নতুন করে বলতে হবে না।

যেমন ধরুন, আমাদের কালোসোনা বাবাজীবনের কথা।

বাবাজীবন প্রেমে পড়েছেন।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে—বাবাজীবন চৌকস ছেলে, কাজেই একসংগে দুটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। একটি মেয়ের বাড়ী 'দশ নম্বর রুটে,' অপরজনের 'দশ'এর এ'তে প্রেমের ব্যাপারে বাবাজীবন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে চান—'দশ' এবং 'দশ'এর 'এ' দুজনকেই সমানভাবে হৃদয়দান করতে চান। 'দশ' আর 'দশ' এর 'এ' দুটো রুট-এরই বাস ছাড়ে পাঁচ মিনিট অন্তর। অফিস-ফেরতা কালোসোনা বাবাজীবন কোন বিচার না করে প্রথমে যে বাসটা পান তাতেই চড়ে বসেন। কিন্তু মুস্কিল হয় এখানেই, যে কেমন করে দশদিনের মধ্যে ন-দিনই তিনি 'দশ'-এর বাড়ীতে হাজির হন অদৃষ্টের কেবল অজ্ঞাত পরিহাসে!

'প্রোবাবিলিটি'-র প্যাঁচটা বাবাজীবনের জানা নেই। তাহলে হয়তো বাসের 'র‍্যাণ্ডম-সিলেকশন'-এর ওপরে তিনি নির্ভর করতেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে একদিন অন্তর দশ আর 'দশ' এর 'এ'কে তালিম দেওয়া উচিত ছিল।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

'দশ' আর 'দশ'-এর এ দুটো বাস ছাড়ে আধ মিনিট অন্তর। প্রথমে যায় দশ—আর তার আধ-মিনিট পরে 'দশ'-এর 'এ'। তার ফলে সাড়ে চার মিনিটের মধ্যে যে কোনো সময়ে বাবাজীবন বাসষ্টাণ্ডে হাজির হলেই 'দশ' নম্বর মিলে যায়। কিন্তু 'দশ'এর 'এ' ধরতে হলে সে সময়টা কমে আধ মিনিটে দাঁড়ায়। অতএব কালোসোনার 'দশ'এর জালে ধরা পড়ার প্রোবিবিলিটি (যদি ধরা যায় তবে অংকের নিয়মে বিয়েও হয়) ৪২।৫ =১১০ অর্থাৎ শতকরা নব্বই—দশ দিনের ভেতরে ন-দিন

কিউ, ই, ডি।

এটা তো গেল একটা অতি-সাধারণ ব্যাপার। 'প্রজেক্ট-এ'র সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলে বলতে হয়—সেটা প্রায় অসম্ভব। বাস্তবের 'লেভেল-হেডেড' কৃষ্ণস্বামীয়া সাতাশ বছরের ছুঁইফোঁড় মেয়ের একটা বস্তু আইডিয়া নিয়েই বিরাট পরিকল্পনা করবেন না। দেশরক্ষা বিভাগ ভাণ্ডার খুলে দেবেন না 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'-র মতো কোনো অনিশ্চিত, অসম্ভব ব্যাপারের পেছনে।

কারণ, আইন আছে, একটা চিরাচরিত সংগঠন ব্যবস্থা আছে, প্রোটোকল আছে, ফাইনান্স ডিপার্টের ছক বাঁধা আছে,—অডিট অবজেকশন আছে—আর সর্বোপরি আছে রাজ্যসভায় লোকসভায় বিপক্ষদলের চেঁচামেচি!

তার চেয়ে বাইরে থেকে বিজ্ঞান আমদানী করে যাওয়া অনেক নিরাপদ! ভারতবাসীর চাঁদে যাবার ইচ্ছা হলে রুশিয়া থেকে একটা পরিত্যক্ত স্পুটনিক কিনে আনলেও চলবে। আমেরিকার থেকে একটা 'এক্সপ্লোরার'ও মিলতে পারে কোন ওটিস সাহায্য-প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে। হয়তো বা বৈদেশিক নীতির দাবার চালে মার্কিণ মুলুক বা রুশদেশের থেকে একটা ফ্যাক্টরীর আদায় করাও সম্ভাবনার বাইরে নয়। আর বিজ্ঞানভিক্ষুর দলও বিদেশ থেকে যে যে বয়সে ফিরেছেন সেই বয়সেই থেকে যাবেন। অর্থাৎ যে সমস্যার ও পরে বিদেশে তাঁরা হাত পাকিয়েছিলেন, সেই সমস্যাতেই লেগে পড়ে থাকবেন।

"The curtain is lifted
The stage is set.
Bow to the audience
Marionette"

যতোদিন এমনি করে চলে!

কিন্তু যদি সম্ভব হোতো এই রকমের কোনো একটা পরিকল্পনা?

সমাপ্ত

প্রশান্ত চৌধুরী

৩

একটা আর্সি টাঙানো আছে ঠানদির ঐ মাথানিচু অন্ধকার ঘুপসি দোকানের নোনাধরা দেয়ালের গায়ে। সেই যে-বছর প্রথম বারোয়ারী দুর্গাপুজো হয় কলিকাতায়, সেই বছরে গঙ্গার ঘাটের বিসর্জনের মেলা থেকে কিনেছিল ঠানদি নগদ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে। জার্মানী-কাচের চৌকোণা আর্সি, নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো। আর্সির উল্টোপিঠে আছে গায়ে তোয়ালে ঢাকা দেওয়া এক সুন্দরী মেমসাহেবের ছবি। তোয়ালের চাপা-চুপি থেকেও দিব্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই বিড়ালাক্ষী'র নিটোল দেহের এদিক-ওদিকের কিছু কিছু। হাসিমুখী মেয়েটার বাঁ-দিকের গালে আবার কেমন সুন্দর একটা টোল্ খেয়েছে।

পিছনের পিঠের ঐ ছবিটা, না সামনের পিঠের আর্সিটা, কোন্‌টার লোভে যে সেদিন ঠানদি কিনেছিল ঐ আর্সিটাকে, তা আর মনে নেই এখন। আর্সিটাকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে ঠানদির বহুকাল। ওটা টাঙানোই থাকে দেয়ালের পেরেকে। টাঙানো থেকে থেকে ধোঁয়ায় মলিন হয়!

মাঝে মাঝে একেক দিন ঐ আর্সিটাকে দেয়াল থেকে খুলে নামিয়ে নিজের মুখের সামনে ধরে ঠানদি। আর্সির কাঁচটাকে আঁচলের খুঁট দিয়ে বার বার মুছেও কত দিনের কত ধোঁয়ার ছোপটা সম্পূর্ণ ওঠে না ঠিক। তবু তারই ভিতর দিয়ে তাকায় ঠানদি আর্সিটার মধ্যে।

নিজের বলিরেখাঙ্কিত শুকনো মুখটার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তখন নিজেরই যেন কেমন সন্দেহ হয়;—সত্যিই কি কোনোকালে যৌবন ছিল ঠানদির?

আর্সিটাকে মুখের সামনে থেকে সরিয়ে রেখে চোখ বুজে প্রাণপণে ঠানদি ভাবতে চেষ্টা করে একটি মেয়েকে; যার নাম আজো লেখা আছে গঙ্গার ধারের ঐ বাজ-পড়া ন্যাড়া নিমগাছের গুঁড়িতে। মেনকা।

ভাবতে ভাবতে ঠানদির গুলিয়ে যায় সব, খেই হারিয়ে যায়, উল্টোপাল্টা এলোমেলো হয়ে যায়। কালীঘাটের বস্তির সঙ্গে গুলিয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে যায় শ্যামনগরের বাগানবাড়ি, ভুতি হালদারের মুখের সঙ্গে বেমালুম জড়িয়ে যায় শশিকান্তর মুখ,—শিবমন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার সঙ্গে গুলিয়ে যায় শোভান বাবুর বৈঠকখানার জরি-বাঁধানো মোরাদাবাদী ফরসিটা।

পাকা চুলের নড়বড়ে মাথাটাকে দু হাতে চেপে ধোরে বোসে ঠানদির' মনে আবার তখন সন্দেহ হয়, সত্যিই কি কোনকালে যৌবন ছিল তার?

ভাবতে ভাবতে কখন ঐ দোকানটা তার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সমেত উধাও হয়ে যায়, কোথা থেকে একফালি ফুরফুরে বাতাস এসে নাড়া দিয়ে যায় বুকের মধ্যে, কিসের যেন মিষ্টি গন্ধ আসে, কিসের যেন সুর আসে ভেসে। কিন্তু ধরি ধরি করেও ধরা যায় না তাদের। আলোর পোকার মতো নিমেষে ডানা খসে গিয়ে তারা মুখ থবড়ে পড়ে মাটিতে।

তখন বুকের মধ্যেটায় কেমন আন্‌চান্ করে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে ঠানদি। ছেঁড়া কাপড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া টিনের হাতবাক্সটার চাবি খোলে তাড়াতাড়ি।

কত কী যে ঐশ্বর্যের মেলা সেই মাঝারি সাইজের গোলাপফুল আঁকা হাত-বাক্সটায়!

বাক্সর তলায় যে খবরের কাগজখানি পাতা, তার খবর আজকের মানুষের জানা নেই আর। জানা থাকলেও মনে নেই এখন। সে-কাগজের প্রথম পাতায় আছে বিচিত্রদর্শন এক অবতারের ছবি। অবতারের দক্ষিণাঙ্গে বিটলে-বামুনের বেশ, বাম অঙ্গে জনবুলের দেশের মানুষের কোট-প্যাণ্টলুন। অবতারের ডান পায়ে খড়ম, বাঁ-পায়ে বুট;—ডান হাতে হুঁকো, বাম হাতে চুরুট!

সেই প্রাচীন খবরের কাগজখানির উপরে থরে-থরে থাকে-থাকে সাজানো টুকিটাকি হাজারো জিনিস!

আছে সেই অদ্ভুত চন্দনকাঠের কলম, যার ল্যাজের দিকে ছুঁচের গর্তর মতো ছোট্ট গর্তটিতে চোখ রাখলে কাশীধামের ৺বিশ্বেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। আছে ভূর্জপাতার টুকরো, জামায় গিলে করার শুকনো ফল, 'সুখে থাক' সিন্দুর কৌটো, দার্জিলিংয়ের পাথর, জলছবির

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!

খাতা, মরা কাঁচপোকা, কালির বড়ি, উড়ন্তপরী-আঁকা চিঠি লেখার কাগজ, ভাঙা পাশ-চিরুণী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই সব টুকিটাকি জিনিস সরিয়ে পুরোনো বেগুণি রঙের চেলির কাপড়ের টুকরোয় মোড়া কি একটি বস্তু বের করে ঠানদি। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই চেলির কাপড়ের মোড়ক খুলে বের করে হলদে হয়ে যাওয়া একটি অনেক কালের ফটোগেরাফ।

হলদে হয়ে গেলেও ছবিটা স্পষ্ট আছে আজও। শক্ত কার্ডবোর্ডের ওপর লাগানো সাহেব বাড়ির ফোটো। পুরোনো কলকাতায় লালবাজারের দিকে ভ্যানডাইকের ফোটো তোলার দোকান কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই দোকানের তোলা ফটোগেরাফের ছবিটা কিন্তু আজও ঝল্ ঝল্ করছে।

পিছনে হাতে-আঁকা বাগানের মাঝখানে হাতে-আঁকা ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে অবিরাম। সামনে গদিমোড়া বাহারি চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে একটি যুবতী। তার ঘোমটায় হেয়ারপিন, কাঁধে ব্রোচ, কপালে টায়রা, গলায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোহর-বসানো তিন-নরী হার, চুলে পাশচিরুণী, নাকে নোলক। যুবতীর আলতা-পরা ফুলো-ফুলো পায়ের কাছে বিলিতি ফুলের গাছে অবিনশ্বর ফুল ধরেছে। ডানদিকে মুসলমানী কারুকার্য-করা নিচু একটা তেপায়ার ওপর দাঁড় করানো রয়েছে একটি এস্রাজ। এস্রাজের ছড়টি রয়েছে যুবতীর হাতে।

ঐ যে ছবির যুবতী,—মেনকা তারই নাম।

আচ্ছা, বলতো বলতো, ঠানদির নাকে চোখে ঠোঁটে কিংবা মুখের ডৌলে কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায় ঐ মেয়েটির আদল?

আর্সিটাকে আবার ঠানদি তুলে ধরে নিজের বলিরেখাঙ্কিত শুকনো মুখের সামনে। চোখের পিঁচুটি আঁচলে মুছে হেঁট হয়ে ভাল করে তাকায় একবার আর্সি আরেকবার ঐ ফটোগেরাফের দিকে। আতিপাতি করে খুঁজতে চায়, কোথাও যদি অদলের ছিটেফোঁটা লেগে থাকে একটুও।

খইয়ের মধ্যে থেকে ধানের খোসা বাছার মতন করে খুঁটে খুটে বাছতে চেষ্টা করে ঠানদি কোথাও যদি এক টুকরো আদলের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু নিশ্চিন্তে নেই অতীতের সন্ধান করার সময় কই ঠানদির? বর্তমান যে অষ্টপ্রহর হাঁক পাড়ছে দোরে।

—ও বুড়ি, চিত্রগুপ্তি বাবুর ডাব দাও।

আর্সি আর ছবি রেখে অন্ধকার কোটর থেকে দোকানের বাইরের আলোর দিকে বেরিয়ে আসে ঠানদি। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখটাকে সইয়ে নিতে সময় লাগে একটু। পিটপিট করে মানুসটার দিকে তাকিয়ে বলে,—তুই কে রে বাপু? আগে তো দেখিনি তোকে!'

আগন্তুক তড়বড় করে বলে,—আমার নাম ওয়াহেদ গো। ওই যে শ্মশানের উত্তরদিকের দেয়ালটার মেরামতীর কাজ হচ্ছে, সেখান রাজমিস্তিরিকে জোগান দিচ্ছি গো আমি। তা' চিত্রগুপ্তি বাবু আমায় ডেকে একটা বিড়ি দিয়ে বললেন কি যে, এই নে পয়সা; ঐ ওদিকে যে ঠানদি-বুড়ির দোকান আছে, সেথা গে আমার নাম করে একটা ডাব কিনে আন তো বাবা। গিয়ে বলবি যে, রেজিষ্টিরিবাবুর ডাব দাও, তাহলেই হবে।

নাম করে ডাব চাইবার কারণ আছে একটা। ভদ্রলোকের শুধু ডাবের জল হলেই চলে না, সেই সঙ্গে নেয়াপাতি গোছের নরম-নরম মিষ্টি-মিষ্টি শাঁসও চাই খানিকটা। তাই, তাঁর ডাবটা ঠানদিকে একটু বেছে-বুছে দিতে হয়।

অনেকগুলি ডাবের গায়ে চড়-চাপড় মেরে একটিকে বাছাই করে ঠানদি তুলে দেয় ওয়াহেদের হাতে। বলে,—ঐ যে কাটারি রয়েছে হোথায়। মুখটা ছুলে নিতে পারবি তো দাদা?

ওয়াহেদ্ বলে,—পারব না কি গো? কলাছড়া-জনাই লাইনে চণ্ডীতলা বলে যে গেরাম, সেইখেনে ঘর আমার। চাঁদ সদাগর সুমুদ্দুরে বাণিজ্যি করতে যাবার পথে সরস্বতী নদীতে ডিঙা বেয়ে ভাসতে ভাসতে যেখানের ঘাটে ডিঙা বেঁধে কচি ডাবের জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছেলেন, আর আরাম পেয়ে চণ্ডীঠাকুরের মন্দির বানিয়ে দেছেলেন সেই চণ্ডীতলার বাসিন্দে আমি গো। জমিতে আমাদের সাত-সাতটে নারকেল গাছ। আমি জানব না ডাবের মুখ ছুলতে?

পাকা ডাব-ওয়ালার ভঙ্গিতে বাঁ-হাতে ডাব নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেন্‌সিল ছোলার মতন অনায়াসে মুখ ছুলে ডাব নিয়ে ওয়াহেদ্ চলে গেল শ্মশানের পাশের সেই রেলিঙ-লাগানো ঘরটিতে, যেখানে তিনকড়ি বাবু ডেথ-রেজিষ্টারের মোটা খাতাখানা সামনে খুলে চেয়ারে বসে বসেই হাফ-ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছেন।

ডাব হাতে নিয়ে ওয়াহেদ্ ডাকলে,—বাবু?

এমন ভাবে চোখ খুলে তাকালেন তিনকড়ি বাবু, মনে হল হাফ কেন, কোয়ার্টার ঘুমটুকুও ঘুমোননি তিনি;—চোখ বুজে ভাবছিলেন বুঝি কিছু।

ঘুমোনো এবং জেগে ওঠার এই আশ্চর্য সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গিটি বছর তিনেকের নিরলস সাধনায় আয়ত্ত করেছেন তিনকড়ি বাবু।

ধরো মাঝরাতে লোক এল দোরে। তখন তিনি ঘুমোচ্ছেন। নাক ডাকছে। নিজের নাকের জোরালো নিশ্বাসের দাপটে নিজের গোঁফের চুল কাঁপছে। দেখে মনে হবে, এই গভীর ঘুম ভাঙাবার জন্যে ধাক্কা-ধাক্কি করতে হবে বুঝি বিস্তর, হাঁক পাড়াপাড়ি করতে হবে বুঝি গলা ফাটিয়ে। আসলে কিন্তু কাউকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। ডাক্তারের সই-দেওয়া ডেথ-সার্টিফিকেটের কাগজখানা রেলিঙের ফাঁকে দিয়ে গলিয়ে দিতে গিয়ে কাগজের আলতো যে আওয়াজটুকু হবে, তাইতেই তাঁর চেয়ারের হাতল দিয়ে বাইরে ঝুলে-থাকা ডান হাতখানা নিমেষে উঠে গিয়ে দোয়াতদানি থেকে কলমটা তুলে নেবে,—কালির দোয়াতে নিব ডোবাবে,—বাঁ-হাতখানা ডেথ-সার্টিফিকেটের কাগজটা ছিনিয়ে নেবে,—নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর থেকে স্লুট করে নেমে পড়বে নাকের ডগায়,—চোখের পাতা দুটো সেইটুকু মাত্র খুলবে, যেটুকু খুললে সার্টিফিকেট আর রেজিষ্টারি খাতার কাগজটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

তারপর?

নাম-ধাম বিবরণাদি খাতায় টুকে নিয়ে তিনি বলবেন,—চলুন।

ঘর থেকে বেরিয়ে শ্মশানের দিকে হেঁটে চলবেন যখন, তখন তাঁর পা-দুটোই নড়বে শুধু। হাত দুটো ঘুমন্ত মানুষের হাতের মতন ঝুলে থাকবে দু-পাশে, চোখ দুটো বন্ধই থাকবে পুরোপুরি। মনে হবে প্রাণহীন রোবট চলেছে বুঝি একটা!

শ্মশানভূমিতে পৌঁছে তিনকড়ি বাবু দাঁড়িয়ে পড়বেন নির্দিষ্ট জায়গাটিতে,—তাঁর হাতের টর্চটা মৃত্যুপথযাত্রীর ঘোলাটে চোখের

চাটনির মতো একটি বার জলে উঠেই নিবে যাবে,—মস্ত গোঁফের আড়াল থেকে ঠোঁট ছুটো তাঁর নড়ল কিনা বোঝা যাবে না একটুও—শুধু ছোট্ট ছুটি কথা আসবে ভেসে,—ঠিক আছে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে চেয়ারের হাতলে হাত ঝুলিয়ে ব'সে আবার সেই ঘুম, আবার সেই নাক ডাকানো, আবার সেই নিজের নাকের নিশ্বাসের ধাক্কায় নিজের গোঁফের চুল কাঁপানো।

ডাবটাকে বাড়িয়ে ধরে ওয়াহেদ্ বললে,—ডাব এনেছি গো চিত্রগুপ্তি বাবু।

ডাবের জল খেলেন তিনকড়ি বাবু। খেয়ে দেয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে তাকিয়ে বললেন,—তোদের রাজমিস্ত্রির বাসুলিটা দিয়ে ডাবটাকে আধখানা করে দে তো বাবা।

ডাবটাকে আধখানা করে দিয়ে চলে যাচ্ছিল ওয়াহেদ, তিনকড়ি বাবু বললেন,—যাচ্ছিস কোথায় হন্‌হন্ করে? যাবার আগে এই আধখানা নিয়ে যা দিকিন। নেয়াপাতি শাঁস খেলে পেট ঠাণ্ডা হবে।

ডাবের আধখানা মালা নিয়ে পরম হৃষ্টচিত্তে চলে গেল ওয়াহেদ্। তিনকড়ি বাবু পকেট থেকে চামচটি বের করে শাঁস চেঁছে-চেঁছে পরম তৃপ্তিসহকারে গালে ফেলতে লাগলেন।

মানুষটি শৌখিন বড়। নস্যির নাকমোছা রুমালটা পর্যন্ত পরিপাটি করে ভাঁজ করা থাকে বুকপকেটে। কান চুলকোবার পায়রার পালখ, নখ কাটবার নরুণ, দাঁত খোঁটবার রুপোর কাঠি,—সযত্নে সব গুছিয়ে রাখা আছে পকেটে। সাবেকি আমলের কাঞ্চননগরের ছোট্ট ছুরিও আছে একটি;—কবে কখন্ কোন ফিরিওলা আমটা ফুটিটা পেঁপেটা শশাটা মাথায় করে ঘরের সামনে দিয়ে হেঁকে যাবে,—সুবিধে দরে পাওয়া গেলে খেতে হবে তো কেটেকুটে।

ছাই রঙের কাঁধে-বোতাম পাঞ্জাবি পরেন সদাসর্বদা। একজোড়া আছে। হপ্তায় একটি করে পাট ভাঙেন। চিতার ধোঁয়ায় সাদা থাকতে চায় না তো কিছু,—বেছে বেছে তাই ছাই রঙের আমদানি। ধুতিটা অবশ্য সাদাই পরতে হয়;—উপায় নেই বলেই। তবে, আপশোষের কিছু নেই;—সপ্তাহের শেষের দিকটাতে ধুতির রঙটাও জামার রঙের সঙ্গে মিলে যায় বেমালুম।

ওঁর ঘুমের কেরামতি দেখে সকলে বলে,—এমন ঘুমোন কি করে দাদা?

তিনকড়ি বাবু হেসে বলেন,—চির-ঘুমন্ত মানুষগুলোর নাম লেখার কাজ করি যে রে ভায়া! তাদের অতবড় ঘুমের ছিটেফোঁটা টুকরো-টাকরা পেসাদটুকুও পাব না বলতে চাস?

সত্যিই তো! রেশনের দোকান খুলেছে যে, তার সম্বন্ধীর বাড়িতে বাড়তি চিনির চাটনি-জেলি-মোরব্বা বানানো হয়;—ইন্‌কামট্যাক্সের হিসেব দেখেন যিনি, তাঁর মেয়ের বিয়েতে বাড়ির দরজায় সাত জন লোকের সাতখানা মোটরগাড়ি অষ্টপ্রহর সার্ভিস দেয়;—স্কুলপাঠ্য বই বাছাই করেন যিনি, তাঁর নাতি-নাতনিদের গল্পের বইয়ের অভাব হয় না;—রাস্তায় ফুটপাথের ফিরিওলা ধরার ভার যাঁদের ওপর, আমটা লেবুটা পানটা কলাটার ভেট তাঁরা পেয়েই থাকেন।

সুতরাং ঘুমন্ত মানুষকে পুড়ন্ত করার অনুমতি দেন যিনি,—ইচ্ছা-ঘুমের সামান্য ভেটটুকু তাঁরও পাওনা বৈ কি!

৪

বেশ কিছুকাল আগেকার কথা।

তিনকড়িবাবুর আগে আগে দুজন চিত্রগুপ্তবাবু, তাঁদেরও আগে এখানে ডেথ-রেজিষ্টারের খাতা লিখতেন যিনি, দশরথি ছিল তাঁর নাম।

অমনি ঘুমোতেন। ঠিক ঐ তিনকড়িবাবুর মতন। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরাই ঘুমোন। অমনি ঘুমোতে ঘুমোতে খাতা লেখেন, ঘুমোতে ঘুমোতে ডেড-বডির মুখ দেখেন।

কিন্তু ঐ ঘুমোনোর মিলটুকু ছাড়া তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আর কোনোখানে একরত্তি মিল ছিল না ঐ দাশরথিবাবুর। মানুষটার ঘর-বাড়ি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার—বালাই ছিল না কিছুরই। তবু যে নিজেকে বঞ্চিত করে, না-খেয়ে না-দেয়ে কেন পয়সা জমাতেন, বুঝতে পারত না কেউ।

দাড়ি বাড়তে বাড়তে যখন বড্ড কুটকুট করত গাল, তখন ক্ষেউরি হতেন নাপিত ডেকে;—চুল রুক্ষ হতে হতে যখন খুস্কি উঠত মাথায়, তখন মাথায় তেল মাখতেন;—নোখ বাড়তে বাড়তে যখন গা চুলকোতে গিয়ে নিজের বুকটাই আঁচড়ে-মাচড়ে একেবার রক্ত হয়ে যেত, তখন নরুণ দিয়ে নোখ কাটতেন।

অর্থাৎ যেটুকু নিতান্তই না করলে নয়, সেইটুকু।

কথার ব্যাপারেও কৃপণ ছিলেন বড়। যেটুকু কথা নেহাৎ না বললেই নয়, সেটুকু ছাড়া এক টুকরো বাড়তি কথা কেউ তাঁকে বলতে শোনেনি কোনো দিন।

কথা শোনেনি বটে কেউ, কিন্তু গান গাইতে শুনেছে।

হঠাৎ একেকদিন গভীর রাত্রে এ অঞ্চলের বাসিন্দারা অবাক হয়ে শুনতে পেয়েছে,—ঐ বিরল-বাক্ মানুষটা তারস্বরে বেসুরো কণ্ঠে গলা ছেড়ে গান ধরেছেন,—

"দোষ কারো নয় গো শ্যামা, আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি।"

ঠানদি বলে,—অসুখ কোরে একবার হাসপাতালে থেকেছিলুম কিছুদিন। সেখানে একটা মেয়েকে দেখেছিলুম। মেয়েটা অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকত চোপরদিন। সাড় ছিল না, নড়া-চড়া ছিল না ঐটেই তার রোগ, তার ব্যাধি। নার্স এসে পা ঘুরিয়ে দিত, হাত গুটিয়ে দিত, পাশ ফিরিয়ে দিত। একেক দিন রাতেরবেলা কিন্তু সেই অসাড় মেয়েটার বুকের মধ্যে কিসের বুঝি যাতনা উঠত ঠেলে।—এত অসহ্য যাতনা যে মেয়েটার সেই অসাড় হাত-পাগুলো তখন লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে আছড়ে আছড়ে পড়ত বিছানার ওপর। নার্সরা ছুটে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দিত তাকে।—তা' ঐ দাশরথিবাবুর গান শুনলেই আমার সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে যেত অমনি!

ঠানদি ছাড়া সেই দাশরথিবাবুর কথা বলবার মানুষ আর কে আছে এখানে বেঁচে?

সে এক দিন।

সেদিনটা হওয়া উচিত ছিল ঝড়বাদলের দুর্যোগের দিন।

সেদিন এমন ঝড় ওঠা উচিত ছিল, যে-ঝড়ে উড়ে যায় টিনের চালা, জি-টি-রোডের ওপর রাস্তা জুড়ে ভেঙে পড়ে বড় বড় গাছ, মফস্বল শহরে নিবে যায় ইলেক্‌ট্রিকের আলো।

এমন বাদল হওয়া উচিত ছিল, যে-বাদলে মরা নদী ফুলে উঠে ভাসায় দু-কূল, নদীতে বন্ধ হয়ে যায় খেয়া পারাপার, ক্ষেতের ফসল ডুবে যায় বানের জলে।

এতখানি নিতান্তই না হলেও অন্তত জমাট কালো মেঘে ঢাকা আকাশে সেদিন ক্রুদ্ধ মেঘের গর্জন ওঠা উচিত ছিল,—থেকে থেকে ঝলক্ দিয়ে ওঠা উচিত ছিল বিদ্যুতের ভ্রূকুটি।

কিন্তু যা হওয়া উচিত ছিল, তাই কি হয় দুনিয়ায় ?

সেদিনও হয়নি।

তাই, তারা-ফটফট নীল আকাশে সেদিন মেঘের লেশমাত্রও ছিল না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার বেলফুলের কুঁড়ি-ফোটানো ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল সেদিন। আকাশে-বাতাসে সেদিন এমন একটা ফুর্তি-ফুর্তি ভাব ছিল যে, ঠানদির দোকানের পাশে কাঠের গোলার যে হেঁপোরুগী মুটিয়া ছিল, সেও সেদিন সন্ধেবেলা রাস্তার ধারে খাটিয়া পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে বেসুরো গলায় এমন একটা গান ধরেছিল, যার মধ্যে পিয়া ছিল, যৌবন ছিল, চুড়ির মিঠিমিঠি আওয়াজ ছিল।

এমনি এক নক্ষত্রখচিত প্রসন্ন রাত্রে ডেথ্-রেজিষ্টারি অফিসের ঘরটিতে বসে যথারীতি ঘুমোচ্ছিলেন দাশরথিবাবু।

দেয়ালঘড়িটা টকটক করে আওয়াজ করে চলছিল একঘেয়ে ভাবে, ল্যাজখসা টিকটিকিটা ঘড়ির পাশের দেয়ালে কেষ্টনগরের কুমোরদের তৈরী মাটির টিকটিকির মতন নিশ্চল হয়ে বসেছিল, দাশরথিবাবুর কাঠের চেয়ারের তলায় গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছিল বুড়ি বেড়ালটা।

মাঝরাত তখন।

ডাক এল,—শুনছেন ?

ঘুম ভেঙে চিরদিনের অভ্যাস মতো অর্দ্ধেক চোখ খুলে তাকালেন দাশরথিবাবু রেজিস্টারের পাতার দিকে। ডান হাতে কলম তুলে দোয়াতে ডোবাতে ডোবাতে বাঁ-হাতখানা রেলিঙের বাইরে বাড়িয়ে দিয়ে আধ-ঘুমন্ত জড়িত কণ্ঠে বললেন,—কই ?

—এই যে।

ডাক্তারের সই দেওয়া ডেথ-সার্টিফিকেটের কাগজখানা এগিয়ে দিলে একটি অল্পবয়সী ছেলে।

রেজিষ্টারের রুলটানা মস্ত খাতাটায় প্রয়োজনীয় বিবরণাদি লিখতে লিখতে দাশরথি বাবু খাতার দিকে চোখ রেখেই বললেন,—কি নাম ? অন্······

—আজ্ঞে, অনন্ত রায়।

—বেশ। বয়েসটা ?

—ষোলো।

—টাইফয়েড ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ সকাল থেকে এই নিয়ে সাতটা কেস্ এল। খাতায় সই দেবেন কে ? আপনি ?

—আজ্ঞে।

—আপনি কে হন ?

—যিনি মারা গেছেন, তার ?

—হ্যাঁ।

—কেউ না। বন্ধু। পাড়ার বন্ধু।

বলতে বলতে সেই অল্পবয়সী ছেলেটা চোখ মুছলো বার কয়েক।

—বাবার নাম কি ?

—আমার ?

—যিনি মারা গেছেন, তাঁর ?

—দাশরথি রায়।

—কী ! কী ! কী নাম বললে ?

দেয়ালঘড়িটা জোরে জোরে দুলতে লাগল,··· টিকটিকিটা ভয় পেয়ে ঘড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়ল,··· বুড়ি বেড়ালটা পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দাশরথি বাবু চেয়ারে সোজা সিধে হয়ে বসেছেন। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে।

—কী নাম ? কী নাম বললে ?

—দাশরথি রায়।

দাশরথি বাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাকালেন বক্তার দিকে। তাকাতে গিয়ে তো বক্তা ছোকরাটির পিছনে দেখতে পেলেন নীরবে দণ্ডায়মানা একটি অশ্রুমুখী রমণীকে।

দাশরথির হাত থেকে খসে পড়ল কলমটা।

ছোকরা ছেলেটি হতবাক্। বুঝতে পারছে না কিছু।

ছোকরা ছেলেটির পিছন থেকে সরে এসে সামনে এসে দাঁড়ালেন শীর্ণা সেই সন্তপুত্রহারা জননী। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—বিশ্বাস করো, ঐ নাম ; ঐ তার বাবার নাম। আজ অন্তত আমায় বিশ্বাস কর তুমি।

দেয়ালঘড়িটা কি একশো দুশো চারশো···বেজেই ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে উন্মাদের মতো ? বাইরে কি ঝড় উঠেছে ? গঙ্গায় কি ষাঁড়াষাঁড়ির বান এল এই মুহূর্তে ? ভূমিকম্পে কাঁপছে কি পায়ের তলার মাটি ? কালির দোয়াতে নীল বিষ ঢেলে দিয়ে গেল কে ?

একটা জমাট কালো অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে দাশরথি বাবু অস্পষ্ট শুনতে লাগলেন সন্তপুত্রহারা সেই জননীর শোকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর,—বিশ্বাস করছ না ? কিন্তু ওগো, আজ আর আমার মিথ্যে বলে লাভ কি বল ? সেদিন অভিমানে দেবতার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলতে রাজি হইনি ;—আজ রাজি আছি ! ঐ শ্মশানেশ্বর শিবের পা ছুঁয়ে আজ আমি বলতে—রাজি আছি,—ও তোমার ছেলে, তোমারই ছেলে।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সেই পুত্রশোকাতুরা বিশীর্ণা রমণী। সঙ্গের ছোকরাটি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে তাঁকে। বললে,—চুপ করুন, চুপ করুন মাসিমা, শান্ত হোন।

তার পর ?

তার পর প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর দাশরথি বাবু আবিষ্কার করলেন যে, ঘর ছেড়ে কখন চলে গেছেন সেই রমণী। খাতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেখানে দাশরথি রায়ের একমাত্র সন্তানের বিবরণাদি সব লেখা হয়ে গিয়েছে কখন, এবং হাতের লেখাটা তাঁর নিজেরই !

কখন যে তিনি লিখেছেন এসব, কখন যে দাহকার্যের অনুমতি দিয়েছেন,—কিছুই মনে করতে পারলেন না দাশরথিবাবু। সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল তাঁর।

ছুটে গেলেন শ্মশানে। উত্তর দিকের সবশেষের চিতার আগুনে আলোকিত হয়ে উঠেছে তখন শ্মশানের কালো দেয়াল। সেই

আজ...
লক্ষ পরিবারের
আদরের বস্তু
ডালডা বিশুদ্ধতার গুণে!
আপনার পরিবারইবা বঞ্চিত হবে কেন?
ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন!
ডালডা খুবই খাঁটি জিনিষ! আর সব সময়ই বায়ু নিরুদ্ধ সীল করা টিনে পাচ্ছেন।
ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন! তবেই খাবারের আসল স্বাদটি পাবেন। বাড়ীর সব রান্না, ডাল-তরকারী, শাকসব্জী, মাছ-মাংস সব কিছুই ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন।
ডালডা বনস্পতিতে রাঁধুন যেহেতু অধিকতর পুষ্টি সাধনের জন্য এর প্রতি আউন্সে (২৮.২৫ গ্রাঃ) ৭০০ ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' এবং ৫৬ ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়।
আজ রাতেও লক্ষ গৃহিনী যাঁরা ডালডায় রাঁধবেন সকলের হয়ত এ তথ্য জানা নেই। হয়ত ভাল জিনিষ ব্যবহার করার অভ্যেসের ফলেই তাঁরা ডালডায় রাঁধছেন। আজ আপনিইবা কেন পেছনে পড়ে থাকবেন কেন!
DALDA
ডালডা
বনস্পতি
DL. 55-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঞ্চরমান আলোয় শ্মশানের কালো দেয়ালের বুকে দেখা যাচ্ছে কত নামের আখর!

বেহালার মাখনলাল, বাঁশতলার নেনকুরাম, শাকরাপাড়ার হরিবিলাস,···কতজনার কত নাম শ্মশানের দেয়ালের বুকে লিখে রেখে গেছে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা। লিখে রেখে গেছে তাদের নাম-ধাম পরিচয়।

শ্মশানভূমির ধূমমলিন কালো দেয়ালের বুকে নশ্বর মৃতজনের স্মৃতিকে অবিনশ্বর করে রাখার করুণ প্রয়াস!

এতকাল এখানে থেকেও নামগুলির দিকে এমন করে তাকিয়ে দেখেননি কোনোদিন দাশরথি বাবু। সেদিন দেখতে লাগলেন। চিতার সঞ্চরণমান অগ্নিশিখার আলোকে দেয়ালের নামগুলো যেন নড়ে উঠছে বলে মনে হতে লাগল তাঁর। মনে হল, নামগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠে··বলতে চাইছে তাদের পরিচয়। মাণিকতলার হরেরাম কালোয়ারের নামটা যেন গলা বাড়িয়ে বলছে, আমাকে মনে আছে? শোভাবাজারের শিবু বসাকের নামটা দেয়ালের উঁচু খিলানের ওপর থেকে যেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে, এই যে আমি!

এই যে আমি!

এই যে আমি!!

এই যে আমি!!!

চারিদিক থেকে সব ক'টা নাম যেন চিৎকার করে বলতে লাগল, এই যে আমি, আমি বেঁচে আছি এখানে, আমি মরিনি!

দু'-কানে হাত চাপা দিলেন দাশরথি বাবু। হেঁট হয়ে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিলেন একটা ইটের টুকরো। কালো দেয়ালের বুকে পোড়া মাটির রাঙা অক্ষরে লিখলেন, "দাশরথি রায়ের একমাত্র সন্তান অনন্ত রায়, পাইকপাড়া।"

তারপর সটান্ চলে এসে বসলেন নিজের ঘরে। চেয়ারে বসে চোখ বুজলেন; কিন্তু সেদিন আর ঘুম এল না চোখে। পাইকপাড়ার লক্-গেটের কাছে মোষের খাটালগুলোর পিছন দিকে পুরোনো মসজিদের বাঁ-ধারের পাড়ার আঁকাবাঁকা গলির ভেতরকার নোনাধরা বালিখসা একতলা একটা বাড়ির ছবি ভেসে এল তাঁর চোখের সামনে···

···সেই বাড়িতে ছিল একটি বউ। সুন্দরী বউ, লক্ষ্মী বউ। তার নাম বিজলী। দাশরথি রায় বিয়ে করে এনেছিল তাকে। বিয়ে করে এনে বিজলীকে সেই ছোট্ট সংসারের রাণীর আসন দিয়েছিল।

কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে পাইকপাড়ার সেই একতলা পুরোনো বাড়ি থেকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একবস্ত্রে বিদায় নিতে হয়েছিল সেই রাণীকে, কুৎসিত এক সন্দেহে।

বিধবা শাশুড়ী গলাধাক্কা দিয়ে বলেছিলেন, সোয়ামী রইল বিদেশে, বউ হলেন পোয়াতি! দূর হ', দূর হ'।

কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিল বিজলী। মজা দেখেছিল পাড়ার লোক।

বিদেশ থেকে ফিরেই দাশরথি গিয়েছিল বিজলীর কাছে,—তার বাপের বাড়িতে।

বিজলী কেঁদে বলেছিল, ওগো, তুমি তো জান, এ ছেলে তোমারই?

দাশরথি বলেছিল, আমি হয়ত অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তবু, তবু একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

বিজলী বলেছিল, বল, বল কী কাজ?

—কিছু না। পাড়ার কয়েক জনার সামনে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে গিয়ে দেবীর পা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে বলতে হবে, এ ছেলে আমারই।

সেই কথা শুনে বিজলী কিছুক্ষণের জন্যে শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার সমস্ত মুখে রক্ত এসে জমা হয়ে গিয়েছিল। সে চিৎকার করে শুধু বলেছিল,—না-আ-আ-অ-আ!

তারপর বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা।

ফিরে গিয়েছিল দাশরথি বিজলীর বাপের বাড়ির দোর থেকে। পাইকপাড়ার বাড়িতেই ফিরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজের মা'র সঙ্গে জীবনে আর কথা বলেনি কোন দিন।

মা মারা যাবার পর দাশরথি বাড়িঘর বেচে দিয়ে ঘুরেছিল কিছুকাল বাউণ্ডুলের মতন। তারপর হেথায়-হোথায় ঠেকতে ঠেকতে গঙ্গার ধারের এই শ্মশানের ডেথ-রেজিষ্টারির ছোট্ট কামরাটিতে ঢুকে পড়েছিলেন একদিন,—দাশরথি থেকে বিরল-বাক্ দাশরথিবাবু হয়ে।

তারপর কত দিন চলে গেল। মস্ত এই মোটা খাতাখানায় কতজনের কত নামই না লিখলেন দাশরথি বাবু। কত শিশু, কত বৃদ্ধ, কত যুবক কত যুবতীর নাম।

সেদিন রাত্রে খাতার পাতায় দাশরথি বাবুর হস্তাক্ষরে শেষ নাম লেখা হল:—দাশরথি রায়ের যোলো বছরের পুত্র অনন্ত রায়ের নাম।

না, না,—শেষ নাম তো নয় ওটা। ওর পরে আরো একটা নাম লিখতে বাকি আছে যে!

কলমে কালি ডুবিয়ে খাতার পাতায় সেই শেষ নামটি সযত্নে লিখলেন দাশরথি বাবু! তারপর চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন চেয়ারে।

সেদিন গভীর রাত্রে এ-অঞ্চলের বাসিন্দারা আবার শুনতে পেল বিরল-বাক্ দাশরথি বাবুর বেসুরো গলার গান,—'দোষ কারো নয় গো শ্যামা, আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি।'

পরদিন ভোরবেলা সকলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, গঙ্গার ধারের নিমগাছের ডালে কাপড় বেঁধে ঝুলছেন দাশরথি বাবু!

আর দেখল,—ডেথ-রেজিষ্টারের খাতার পাতায় মুক্তোর মতো সুন্দর নিটোল অক্ষরে লেখা রয়েছে দাশরথি বাবুর হাতের লেখা শেষ নামটি,—'স্বর্গীয় বিহারীলাল রায়ের পুত্র দাশরথি রায়।' [ক্রমশঃ।

"When I take up a work that I have read before (the oftener the better) I know what I have to expect. The satisfaction is not lessened by being anticipated."

—William Hazlit

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

৩

সুশীলা আজ আর ফেরেনি কোর্ট থেকে। গিয়েছিল যথারীতি সাড়ে দশটাতে; আসেনি যথানিয়মে, যা এতদিন হয়ে আসছিল। ওর যাওয়া আর আসাতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রথমে ওর না আসার কথাতে বিশ্বাস করতে পারিনি।

আজ ওর কোর্টে যেতে ভয় ছিল। ভয় এই কারণে যে, ওকে নাকি পর-পুরুষের (?) হাতে দেওয়া হবে, অথবা জোর করে সেই পর-পুরুষ (?) নিয়ে যাবে হাত ধরে টেনে!

সুশীলা অশিক্ষিতা, রুচির বালাই নেই। শুধু ওর বেলাতেই নয়, ওর চৌদ্দ-পুরুষও কোনদিন লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায়নি। বগুড়া জেলার কোন এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের ততোধিক অখ্যাত বাপ-মায়ের সন্তান সুশীলা। তবে ভগবান তাকে দিয়েছেন—স্নিগ্ধ রূপের পরিচ্ছন্ন মহিমা, এবং তাই হয়েছে তার কাল।

সুশীলার উপাধি বর্ম্মণ। অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের বিশেষ তালিকাভুক্ত শ্রেণীর এক শ্রেণীতে ও দৈবক্রমে জন্মলাভ করেছে। গরীব পিতামাতা মেয়েকে শাসন করেছেন, বাঁধতে পারেন নি তার যৌবনের গতিকে, রূপছন্দের উচ্ছল পুষ্ট স্রোতোধারাকে। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য চপল গতিছন্দে ফেটে পড়তে চেয়েছে। সুতরাং মা-বাপের কর্ত্তব্য অনুসারে তারা তাকে পাত্রস্থ করতে চেয়েছেন। প্রথমে তাদের আশা ছিল অগাধ, আকাঙ্খা ছিল গগনচুম্বী। দিনে দিনে তা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। বুঝেছেন তাঁরা—অর্থহীনতা সামাজিক জীবনে সব চাইতে বড় অভিশাপ; তার চাইতেও বড় পরিহাস—গরীবের ঘরে মেয়েদের রূপ। চারিদিকে উদ্যত হয়ে থাকে লালসা-কুটিল সহস্র চক্ষু, ব্যঙ্গ করে অসমর্থ পিতামাতার অক্ষম আশ্রয়স্থল।

সৌখীন রায় সুশীলার স্বামী—অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলের সামনে নাপিত-পুরোহিত, নারায়ণ অগ্নি ইত্যাদিকে সাক্ষী রেখে দুটি হাত একত্র করা হয়েছে কোন এক শুভ-লগ্নে। দু'জনের মন সেই অনুষ্ঠানের সামনে কাছাকাছি এসেছে কিনা, সাক্ষীরা সেদিন সে-খবর রাখেনি।

সৌখীনকে দেখেছি, সত্যিই লোকটি সৌখীন। না হলে এই বয়সে এবং চেহারায় ও সুশীলাকে গৃহিণী করবার আগে অন্তত একবার চিন্তা করত। বয়স প্রায় ৪০, গাল তোবড়ানো, রং কালোই বলা চলে—অন্ততঃ সুশীলার তুলনায়।

প্রথম দিনকার কথা মনে পড়ে। সৌখীন এসেছিল বেলা প্রায় বারোটার কাছাকাছি। চেহারা আগেই বলেছি। সেদিন গায়ে ছিল একটা সূতী কোট ও গোলাপী রঙের র‍্যাপার। সুশীলার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত একখানা দরখাস্ত ছিল তার হাতে। নিলাম সেটা। হ্যাঁ, অনুমতি নিয়েই এসেছে দেখা করবার জন্ত। সুতরাং সুশীলাকে আনা হল।

এই সময় ডাক্তারবাবুও এসে পড়লেন। ভালই হল,—কেননা, সুশীলার বয়স-পরীক্ষার নির্দ্দেশ এসেছে, তাই তাঁকেও এই সঙ্গে সুশীলাকে দেখিয়ে দিলাম।

ইণ্টারভিউ আরম্ভ হল। আমরা দেখলাম, সুশীলা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলবে না তার স্বামীর সঙ্গে। ও শুধু বলতে লাগল—আমি ওকে চিনি না। অথচ সৌখীন বলে—সুশীলা ওর বিবাহিতা স্ত্রী। অমুক সালে, অত তারিখে ওর বিয়ে হয়নি ওর সঙ্গে?

ডাক্তারবাবু সরকারী চাকরির প্রায় শেষ-সীমায় এসে পৌঁছেছেন। এ-রকম কেস অনেক দেখেছেন, অনেক মেয়ের বয়স পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছেন। মনে মনে বুঝলেও আইনে তাকে অধিকার দেয়নি প্রকৃত স্বামীর হাতে সে-মেয়েকে তুলে দেবার। তিনি ভিত্তি তৈরি করে দেন—মেয়ের ইচ্ছার কোন মূল্য আইনে স্বীকৃতি পাবে কি না, তারই বনিয়াদ পাকা করে দেন তিনি।

হেসে বললেন ডাক্তারবাবু সৌখীনকে লক্ষ্য করে—তুমি তো বুড়ো মানুষ; কি আছে তোমার—রূপ, যৌবন? তার পর সোজা জিজ্ঞেস করলেন—খেতে পরতে দাওনি বুঝি? শাড়ী গহনার দাবী-ও মেটাতে পারোনি নিশ্চয়। এখনই যদি না দিলে, তবে আর দেবে কবে?

প্রশ্ন শুনে বোধ হয় সুশীলার মনোমত হল। নির্ভর পেয়েছে যেন সে। সমর্থনে ধ্বনিত হল আর কণ্ঠ। খেতে দিবে না—এঁঃ—বলে যেন একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, সিঁড়ির উপর-দণ্ডায়মান ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর অসহায় রায় মশায়ের দিকে। ক্ষণিকের জন্ত দেখলাম, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চোখে তার আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সুশীলা অতঃপর দৃঢ়কণ্ঠে জানালো, সে কোন কথা বলবে না ঐ লোকটির সঙ্গে ওকে সে চেনে না। কণ্ঠস্বরে অবশ্যই ধরা পড়ল ওর একটা সঙ্কোচন-বৃত্তি যা ভয় পেলে করে থাকে মন্থর-গতি শামুকের দল। আমরা পীড়াপীড়ি করলাম না। শুধু সুশীলাই নয়, যদি কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে না চায় এমন অবস্থায়—আমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে রীতা ব্যানার্জ্জির কথা। রীতা সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী। কোন এক দুষ্টা সরস্বতী তার স্কন্ধে চেপেছিল—স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি বেরিয়ে আসেন স্বামীরই কোন এক আত্মীয়ের সঙ্গে। অ-পাওয়া জিনিসকে যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই থাকে তার মোহ।

রীতার মোহভঙ্গ হয়নি তখনও। প্রাকাশ্য আদালতে তিনি

অস্বীকার করেন তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে। অথচ বঞ্চিত হননি তিনি স্বামীর ঐশ্বর্য্য ভোগে, রীতিমত অংশ পেয়েছেন তার সম্পদ বিলাসের। তবু তিনি বেরিয়ে পড়েছেন মোহাচ্ছন্নের মত—অসম পদক্ষেপে। তারপর, যখন একবার পথে পা দিয়েছেন, পথের উন্মুক্ত উদার আহ্বান তার মর্ম্মে মর্ম্মে অপূর্ব্ব আলোড়ন জাগিয়েছে। পশ্চাতের চিহ্ন মুছে গেছে। রীতা শিক্ষিতা—রীতা সুন্দরী। কোর্টে শত শত কৌতূহলী দর্শকের সামনে যখন তিনি বললেন—"স্বামীর ঘরে ফিরে যাবো না", কোর্ট তখন তাকে জেল-হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, অনুতাপে অনুশোচনায় যদি মত ফিরে যায়। কিন্তু স্বামী লজ্জায় মাথা তুলতে পারেন না। পথশ্রমে ক্লান্ত মুখখানায় আরও ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ধীর পদক্ষেপে কোর্টের বাইরে চলে যান তিনি —একা একা, চুপে-চুপে।

রীতা ব্যানার্জ্জি জেলে আসবার পর দেখা করতে আসতেন কোন কোন দিন তার স্বামী। সেদিনও বিকেলের দিকে স্বামী এসেছেন দেখা করতে। রীতা-ও এসেছেন অফিসে। স্বামী ধীরে-ধীরেই কথাবার্ত্তা বলছেন। স্ত্রী ঝাঁঝালো কণ্ঠে তার উত্তর দিচ্ছেন। একবার স্বামী আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন, তুমি এখনও চল ঘরে ফিরে। যা চাও তুমি তাই দেব। আর—একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বললেন—আর কি তোমাকে দিইনি বল, কোন্ সাধ অপূর্ণ রয়েছে তোমার, বল আমায়—নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়ন মেলে রইলেন স্বামী।

স্ত্রী নিরুত্তর।

স্বামী পুনরায় সুরু করলেন—চেয়েছিলে মুখ ফুটে একটা ভালো অল-ওয়েভ রেডিও-সেট, তা-ও কিনে দিয়েছি সেদিন। রমলার নেকলেসের মত একটা নেকলেসের কথা বলেছ—তারও অর্ডার দিয়েছি স্যাকরার দোকানে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে। আর—আর কি চাই বল?

প্রায় চীৎকার করে স্ত্রী বলে ওঠে—আমি চাই না কিছু। তোমার কোন দান আমি নেব না। যা নিয়েছি তা ফিরিয়ে নাও তুমি।

এত দুঃখেও হাসি ফুটে ওঠে স্বামীর মুখে—তা কি হয়? আচ্ছা তুমি ওসব নাও আর না-ই নাও, শুধু ঘরে ফিরে চল। অনেকটা কান্নার মত শোনাল স্বামীর কণ্ঠস্বর। চল—তুমি ফিরে চল ঘরে, হাত ধরলেন স্ত্রীর।

আমরা নীরব দর্শক। মনে করেছিলাম হয়ত এবার স্ত্রীর চোখে জল দেখা দেবে; কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরোবে না। সন্তোষজনক মীমাংসায় এসে পৌঁছাবে এই সাক্ষাৎকার—ফল হবে শুভ।

কিন্তু কি দেখলাম! এক ঝটকায় হাত টেনে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন রীতা ব্যানার্জ্জি। অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বললেন—জেলারবাবু, আমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে বলুন।—বলে ঝড়ের বেগে নিজেই বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে গেটে। জমাদারণীকে ইঙ্গিত করতেই সে তাকে নিয়ে গেল ভিতরে। স্বামী ততক্ষণে রাস্তায়। এই ছিল রীতা ব্যানার্জ্জি।

রীতা ব্যানার্জ্জির টাইপ সুশীলা রায়। রীতা ছিলেন সুশীলার চাইতে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতা তার ছিল বেশি, সর্ব্বোপরি ছিল তার শিক্ষার ছোঁয়াচ। আজও আমাদের খাতায় আছে তার হাতের সই। মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরে পাইলট পেনের লেখা।

সুশীলা শিক্ষার ছোঁয়াচ পায়নি। কোর্ট থেকে খালাস পেল তাই, নতুবা আমাদের খাতাতে তার টিপসই-ই থাকত। সুশীলা চলে গেলে তার জেলের বান্ধবীরা বলেছিল—বেশ তো, আমাদের পরে এসে আগে চলে গেল ও। উত্তরে আমি বলেছিলাম—তোমরা তো সেভাবে যেতে চাওনি। মীরাকে বললাম—বরুণ ছাড়া অন্য কেউ জামিন নিলে তোমার চলবে না? রীনাকে বললাম—তুমি যাবে অমরেশের কাছে। সুশীলা অবশ্য এখন থাকবে নিরপেক্ষ এক মোক্তারের তত্ত্বাবধানে। মীরা শুধায়—তারপর?

তারপরের কথা তো জানি না।

মীরাই সমাধান করে, সৌখীনের কাছে দিলে আমার মত পালিয়ে আসবে প্রবোধের কাছে।

আমার একটু বিরক্তি এল। তাই শুধালাম ফিরে, এই পাঠ-ই বুঝি এতদিন ধরে শিখিয়েছ তাকে? নিজে যা করেছ সবাইকেই তাই করতে বলছ?—উত্তরটা শুনবার জন্য আর দাঁড়ালাম না। তবু কানে গেল—আমি বলব কেন, ও নিজে বুঝি কিছু বোঝে না? একথা সত্যি। ও নিজে বোঝে এবং মীরার চাইতে হয়ত বেশি-ই বোঝে অনেক জিনিস। সুশীলার সীঁথির সিন্দুরই তাকে মীরার থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। আর শরৎবাবুর ভাষায়, বিয়ের পরই মেয়েরা ষোল আর ছাপ্পান্ন এক-বয়সী হয়ে দাঁড়ায়। মীরার সীঁথি সিঁন্দুর-রঞ্জিত হয়নি। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বয়সটাই। আরও কয়েকটা বছর আগে পৃথিবীর আলোয় নয়ন মেললে তো এ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না।

মীরা বলেছিল, সুশীলা চলে আসবে প্রবোধের কাছে।

প্রবোধকে দেখেছি। পাশেই পুলিশ লাইন—সেখানে থাকে। পেশায় কনেষ্টবল। তার নামে আবার অভিযোগ—সে নাকি সুশীলাকে জোর করে নিয়ে এসে আবার বিয়ে করেছে। প্রবোধের মা-ও কিন্তু বলে, ছেলেরই বৌ সুশীলা। কোন্ মা-ই বা ছেলের দোষ দেখে? মা বলে, একদিন দুপুর বেলার বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে হাজির। কি? না, প্রবোধ নাকি কার বিবাহিতা স্ত্রীকে এনে আটকে রেখেছে। কোথায় সে মেয়ে, বের করে দাও। বুড়ী তো তেড়ে মারতে যায় আর কি—কি বেকুবের মত কথা বলছ তোমরা গো দিন-দুপুরে বাড়ী চড়াও হয়ে এসে।

—চোপ রও বুড়ী, গালাগালি ক'র না বলছি। তাহলে তোমাকে শুধু ধরে চালান দেব, তা জানো?

নরম হয়ে গেল বুড়ী।—তা বাপু এখন ছেলে বাড়ী নেই, এমনতো কিছু হতে পারে না। সে আসুক—তারপর যা হয় হবে।

—বেশ। পুলিশের দল জাঁকিয়ে বসে।

বুড়ী কিন্তু এসেছিল সুশীলার সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেট পর্য্যন্ত। এবং গেটেই পেট্রোম্যাক্সের রূপালী আলোর নীচে বসে এ কাহিনী সে বলেছিল। অসংশয়ে সে জানিয়েছিল—তার ছেলে এরকম করতেই পারে না। দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে এই তো বিয়ে হল। এ শুধু পুলিশের জুলুম। নাঃ, আজকাল আর বিচার নেই। পোড়ারমুখো ম্লেচ্ছর দল বিচার করত ভাল। তা তারা তো আর নেই।

প্রবোধও এসে গেছে। অবশ্য সে কোনদিনও দেখা করেনি সুশীলার সঙ্গে। শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট, সাবান, স্নো, পাউডার—পাঠিয়ে দিয়েছে ওর নাম করে। তার কাছেই একদিন শুনলাম—তার বিবাহের ইতিহাস তথা প্রাক্-বিবাহ কাহিনী।

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি
ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

সুশীলার বিয়ে হয়েছিল ঠিকই। তবে সেখানে টিকতে পারত না। গরীবের ঘর—অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী সেখানকার। সুশীলার তখন উঠতি বয়স—আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পর্দ্ধা সীমাহীন, অনেক কুৎসিত জিনিষকেও সুন্দর মনে হয়। সুতরাং সুশীলার চাহিদা অনেক—যা মিটাবার ক্ষমতা সৌখীন রায়ের অন্ততঃ ছিল না। ফলে তার আক্রোশের ফণা ছোবল মারত সুশীলাকে।

রায় মহাশয়ের পুঁজি ছিল সামান্য; তাই দিয়ে ছোট-খাটো কিছু ব্যবসা চালাত। ইদানীং তাতেও মন্দা পড়াতে ধরেছিল কিছু ব্ল্যাক মার্কেটের কারবার। হিন্দুস্থান থেকে নিয়ে যেত নিষিদ্ধ মাল, পাকিস্থানে বিক্রী করত ডবল দামে। রাতারাতি বড়লোক হবার রাজপথ।

সুশীলার এক ভাইয়ের ছিল পাশপোর্ট। সেও করত এই ধরণের আঁধার রাতের ব্যবসা। তার কানে পৌঁছাল বোনের দুর্দ্দশার কাহিনী। সে ভাবল বোনকে সরিয়ে নিতে হবে এখান থেকে। তার পর হিন্দুস্থানে নিয়ে গিয়ে আবার বিয়ে দেবে তার। তাদের মধ্যে এ প্রথা চলিত আছে—অর্থাৎ দুবার বিয়ে। তা ছাড়া একথা চেপে গেলেই বা দোষ কি যে ওর কোনদিন বিয়ে হয়েছিল? সীঁথির সিঁদুর সমস্যাই নয়—তুলে ফেললেও বাহ্যিক কোন পরিবর্ত্তনই চোখে পড়বে না। মনের মধ্যে সে সিন্দুরের রঙ না ধরলেই হল।

বর্ডার দিয়ে যাতায়াত করতে করতেই প্রবোধের সঙ্গে তার পরিচয়। সে পরিচয় আজও ঘনিষ্ঠ রয়েছে নিষিদ্ধ মাল-চলাচলের দর্শনী মারফৎ।

সেই ভাইই একদিন কথায় কথায় প্রকাশ করে ফেলে তার বোনের ইতিহাস। কিন্তু বিয়ের কথাটা নাকি তখন প্রকাশ করে না। প্রবোধ তখন অবিবাহিত। মাকে বলে। মা রাজী হয়ে যায়। কিন্তু মেয়ে তো একবার দেখা উচিত। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এপারে ওদের কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে, সেইখানেই দেখাশুনা হবে। হয়েছেও তাই। তার পর ওরা দু'শ টাকা নিয়েছে প্রবোধের কাছ থেকে, মেয়েকে প্রবোধের সঙ্গে বিয়ে দেবে ব'লে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পরে প্রবোধ শোনে সুশীলার আগের বিয়ের কথা। এ বিয়ের আগে সুশীলার ভাই, কাকা প্রভৃতি কেউ-ই এ কথা বলেনি। অবশ্য আমাদের মধ্যে দুবার বিয়েও চলিত আছে। আচ্ছা, স্যার, এতে কি আমার কোন শাস্তি হতে পারে? আমাকেই প্রশ্ন করে বসে প্রবোধ। কঠিন প্রশ্ন। সত্যিই আমার জানা ছিল না ওদের সামাজিক নিয়ম-কানুন; কার কতটা দোষ এর মধ্যে, তাও জানি না। তবে একথা জানি, সুশীলার যদি প্রবোধকে ভাল লেগে থাকে, প্রবোধ যদি সুশীলাকে আপন করে নিতে পারে হৃদয় দিয়ে, তবে সেই হবে সত্য। অন্তরের সেই মিলই ভাসিয়ে দেবে সমাজের "তুচ্ছ আচারের মরু-বালুরাশি," মাটির পৃথিবীতে অন্তর মাধুর্য্যে সফল হয়ে উঠবে তাদের স্বপ্ন, গড়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য। তাই উত্তর দিলাম—আমি তো এতে দোষ দেখি না। প্রবোধ কি বুঝল জানি না,—একটা ছোট্ট নমস্কার করে চলে গেল।

সৌখীন রায় এত খবর জানত না। প্রায় মাস দু-তিন ধরে খোঁজ করে শেষে জানতে পারে যে তার স্ত্রী প্রবোধের কাছে আছে। ও বলে—পাকিস্থানেও নাকি এ নিয়ে 'কেস' চলছে। সুশীলাকে পার হয়ে আসতে সাহায্য করেছে নাকি ওপারের মুসলমানেরাও। সৌখীন বলে—হয়ত ওদের কাছে নিশি-যাপনও হয়েছে সুশীলার। তা হোক, তবু সে তার স্ত্রী। সে তাকে তুলে নেবে তেমনি আদরে, শুধু যদি ও এখনও ফিরে যায়। তা যদি না যায় তবে? তবে জান কবুল, যতদূর লড়তে হয়, লড়বে। বলতে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁপছিল রায় মশায়।

আরও একদিন এসেছে রায় মশায়। সেই তার শেষ দেখা-সাক্ষাৎ। তখন কি এক ধরণের আতঙ্ক এসে গিয়েছে সুশীলার মনে যে জোর করে ওকে তুলে দেওয়া হবে ওর প্রথম স্বামীর হাতে। খবর গেল ফিমেল ওয়ার্ডে, আসতে বলা হল সুশীলাকে দেখা করবার জন্য। এ কয়দিনে সে বুঝেছে যে, তার সঙ্গে দেখা করতে আসবার মত লোক একটিই আছে এবং সে ঐ 'পর-পুরুষ,' যাকে সে চেনে না! সুতরাং সে আসতে অস্বীকার করে বসল প্রথমেই। জানতে চাইল অফিসে কে কে আছে। জমাদার হিন্দুস্থানী হলেও বাংলাদেশে এতদিন চাকরি করে এ হেন অবস্থায় তাল সামলাবার মত একটু বুদ্ধি ঘটে জমেছে। "অশ্বত্থামা হত"র মত সে বলল,—শুধু জেলারবাবু আর কেরাণীবাবু; আর তো নেই কেউ।

সুশীলার বিশ্বাস হল। আসতে চাইল। কিন্তু ফিমেল ওয়ার্ডের দরজার বাইরে এসে ৪।৫ গজ এগোতেই, ভিতর-গেটের বড় গোলাকার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল রায়-মশায়ের মুখ। সুশীলা অমনি 'এ্যাবাউট টার্ণ' করল, কিছুতেই কোন কথা শুনল না।

রায়-মশায় ইতিমধ্যে কখন গেটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা লক্ষ্য করিনি। ডবল-গেট এখানে নেই, তাই ভিতর-গেটের সামনেই গিয়ে সে হাজির হয়েছিল, আর সুশীলা তার চেহারা দেখতে পেয়েছে। সুশীলার ফিরে যাওয়া দেখেছে রায়; এবার অফিসের সামনে এসে বলল—হয়েছে—হয়েছে।

—কি হয়েছে?

—দেখা হয়েছে। ওতেই হবে।

আশ্চর্য্য হলাম। এতেই হয়ে গেল! জমাদার এসে বলল, গেট থেকে দেখেই সুশীলা পালাল। বলে গেল, ওর মুখ দেখব না। সৌখীন রায় নিজের কানে শুনল সে-কথা। বেদনার করুণ আভাস ফুটে উঠল মুখে।

—তা হলে আর কি হবে। ও দেখা করবে না।

—আমার ওতেই হয়েছে। দেখলাম নিজ চোখে ও আছে এখানে।

তার মানে? আমার কৌতূহল বেড়ে চলল।

—আমাকে কোর্ট থেকে একজন বললেন, সে জামীনে চলে গেছে এবং গেছে ঐ প্রবোধের কাছেই। দেখলাম, না এখনও এখানেই আছে। ওর মাথা খারাপ হয়েছে। না হলে আমাকে দেখে পালায়, বড় করুণভাবে হাসল রায়। আমি তার স্বামী, অথচ ও মুখে তা স্বীকার করে না!

সুশীলার আজকের এই আচরণে স্পষ্ট প্রমাণ হল—সৌখীন রায় ওর ভূতপূর্ব্ব স্বামী এবং বর্ত্তমানে ওর পক্ষে মূর্তিমান আতঙ্ক। ওর কানে আসছে, ওকে নাকি জোর করেই ওর স্বামীর হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাই ও তার সংস্পর্শ যত এড়িয়ে চলতে পারে তারই চেষ্টা করছে।

এই ধারণা ওর মনে এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, সেদিন ও

বলে বসল, ওকে যদি 'পরপুরুষের হাতে দেওয়া হয়, তবে ও নিশ্চয়ই ওর জীবন নষ্ট করে ফেলবে। সৌখীন রায়কে ও সব সময়ই পর-পুরুষ বলে আর প্রবোধকে নাম উল্লেখ করেই বলত।' প্রবোধ 'পরমপুরুষ' সৌখীন খাটো—পর-পুরুষ।

জেলের বাইরে বসে আত্মহত্যার ভয় দেখানোটা পিনাল কোডে অপরাধ নয়। কিন্তু ভিতরে বসে এ ধরণের আভাসও আমাদের মনে ভয় জাগায়। সুতরাং যখনই কানে গেল একথা, তখনই তার বিধিমত ব্যবস্থা করতে হল। ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে সুশীলাকে শুধালাম কেন এমন কথা বলেছ? এখানকার বিষয়ে কোন অসুবিধা আছে কি? কিংবা আর কোন বিষয়ে কিছু বলতে চাও?

ওর সোজা উত্তর—বলেছি আত্মহত্যা করব, করিনি তো! হাসল একটু।

—কিন্তু কেন?

এবার মুখ খুলল সুশীলা। আক্রোশ ফেটে পড়ল ওর সেই 'পর-পুরুষের' উপর। তার হাতে দেওয়ার কথা হলেই সে নিজের জীবন নেবে। ইতিমধ্যে একদিন কোর্টে সুশীলার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল সৌখীন রায়, একটু অন্তরঙ্গ হয়ে আসতে চাইছিল হয়ত। সেদিনকার ঘটনার উল্লেখ করে বলল—পায়ে জুতো থাকলে সেদিন ওকে ছুঁড়ে মারতাম। ভাবলাম—ভাগ্যিস প্রবোধ ওকে শাড়ী-ব্লাউজের সঙ্গে জুতো পাঠায়নি! তা হলে তো রায় বেচারার মহা দুর্ভোগ হত সেদিন।

আমি বললাম—তোমার কোন ভয় নেই। জোর করে তোমাকে 'পর-পুরুষের' হাতে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এই দেখ না, মীরা আছে, বীণা রয়েছে। জোর করেই যদি দেওয়া চলত, তবে তুমি কি এদের এখানে দেখতে পেতে?

সুশীলা তবু বলতে লাগল—আমি যাব কেন 'পর-পুরুষের' কাছে—এ্যাঁ। চোখ-মুখ ঘুরিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করল। আমি তাকে একই কথা বললাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সন্দেহ রয়ে গেল। তাই আত্মহত্যার কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা না পায়, সেই সম্ভাবনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিলাম। তাতেও শান্তি পেলাম না। তাই আজ আরও বিশেষ ভাবে সমস্ত ফিমেল ওয়ার্ডটা তল্লাসী করা হল। মীরা আর বীণা তখন বাইরে ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে, আর সুশীলা বেল-ফুলের গাছের সারির সামনে।

মীরার অনেক দোষের মধ্যে বাচালতা ও প্রগলভতাও একটা। কাপড়-চোপড় সরিয়ে নেওয়াতে সুশীলাকে লক্ষ্য করে সে বলল, সুশী'র জন্যেই তো এত কাণ্ড। কেন ও-সব বলতে গেলি? সুশীলা নিরুত্তর। একটু পরে হাসল, বললে—বাড়তি শাড়ীগুলো না-হয় সরিয়ে নিলেন। কিন্তু পরনেও তো শাড়ী রয়েছে। ইচ্ছা থাকলে তাই দিয়ে কি আর ঝুলে পড়া যায় না? আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি! নিজেই সমাধান করল আবার—আমি তো করিনি আত্মহত্যা। বলেছিলাম শুধু। কিন্তু সে তো জানে না, ওর ওই "বলেছিলাম শুধু" কথাটাই তো আমাদের চাকরির ভিত্তি মূলে নাড়া দেয়, করে ফেললে তো ওর গলার দড়ি আমাদের গলায় না হোক কোমরেও পড়তে পারে।

অনেকক্ষণ বোঝাবার পর মনে হল, ওর দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যাচ্ছে। তখন আমি বললাম, এখানে বসে ওসব চিন্তা মনে-ও এনো না। বাইরে গিয়ে তুমি যা করো না কেন, এমন-কি জেল-গেটের সামনেই যে অতি-বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটা রয়েছে, তাতেও যদি ঝুলে পড় আমরা কিছু বলব না। ঐ যে গাছটা, ঐটার কথাই বলছি। বলে অঙ্গুলি নির্দেশে গাছটা দেখিয়ে দিলাম। জেলের D-wall এর-ও মাথার ওপর দিয়ে জেগে আছে তার ঝাঁকড়া মাথা। পশ্চিম আকাশে দূর দিগন্ত ঘেঁষে বাইরে সন্ধ্যা নামছে তখন! ফিমেল-ওয়ার্ডের মাথার উপরের আকাশটাতে-ও তারই ম্লান ছায়া। গাছটার পাতায় পাতায় তখন নীড়ে ফেরা পাখীদের কলরব শিহরণ জাগাচ্ছে। সুশীলাকে দেখতে বললাম গাছটা কিন্তু সে চোখ তুলে তাকাল না। তবে ওয়ার্ডে ঢুকে গেল নিঃশব্দে। ইতিমধ্যে জমাদারণীকে নিম্নস্বরে যথাবিহিত নির্দেশ জমাদার দিয়ে দিয়েছে।

আমি শুধু স্বস্তি পেলাম না। কি জানি ওর আবার কাল কোর্ট আছে। রাত্রেই না জানি কি ঘটে যায়!

লক-আপ হয়ে গেল।

অফিসে খাতাপত্র সই করে জমাদারকে যখন ফিরিয়ে দিলাম, সে একটা গল্প বললে। কোন এক কেন্দ্রীয় কারাগারের ঘটনা।

সকালে "নম্বর খোলা" হয়েছে অর্থাৎ unlock করা হয়েছে। ফিমেল ওয়ার্ডের খবর নিয়ে জানা গেল, সেখানকার সংখ্যা ঠিকই আছে। মেট্রন, জমাদারণী সবাই রিপোর্ট পেশ করল—ঠিক হায়। কিন্তু গোল বাধল আধঘণ্টাখানেক বাদেই। অকস্মাৎ খবর এল—পায়খানার ভিতরে ফাঁসীতে ঝুলে পড়েছে একটি মেয়ে আসামী। হৈ চৈ পড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ তদন্ত সুরু করে দিলেন। তাতে প্রকাশ পায়, আত্মহত্যা করেছে ও সকালেই। খবর পাওয়া যায়নি কেন? জমাদারণী জানত পায়খানায় আছে একজন। বস্তুতঃ সে ছিল-ও তখন তাই। তাকে ধরেই রিপোর্ট দিয়েছে—all correct

সব জেলেই প্রতি ওয়ার্ডে রাত্রিতে ব্যবহারের জন্য ওয়ার্ডের ভিতরেই পায়খানা আছে। আবার রাত্রিতে এই পায়খানায় যাওয়াটা সন্দেহের চোখে দেখা হয়। যারা যায়, তাদের নাম ওঠে একটা পৃথক বইতে টিকিটে-ও (History ticket) নোট করা হয়—Visited night latrine. জমাদারের এই কাহিনী সাহসের পরিবর্তে ভয়েরই সঞ্চার করল। ফিমেল-ওয়ার্ডের ভিতরেও পায়খানা রয়েছে যে! তবে ফাঁসী লাগিয়ে ঝুলে পড়ার মত উঁচু যায়গা তার ভিতরে নেই। কিন্তু সুশীলা যে বলেছে পরনের শাড়ী তো আছে! এবং পায়খানাতে দু পাশে লোহার গারদেও আছে। অতএব·····

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল—সুশীলাকে যদি এই সাহস দেওয়া যায় যে, আগামী কাল কোর্টে তোমাকে 'পরপুরুষের হাতে দেওয়া হবে না—হাকিমকে বলে দেওয়া হল;—তবে ও নিশ্চিন্ত হতে পারে হয়ত।

মিনিট কুড়ি বাদে আবার গেলাম ফিমেল ওয়ার্ডে। সুশীলার নাম ধরেই ডাকলাম। ওরা তখন বিছানা বিছিয়ে শোবার যোগাড় করছিল। সুশীলা সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে বললাম; হাকিমের সঙ্গে এখনই কথা বললাম বলে দিলাম তোমার কথা। তিনি বললেন, আচ্ছা আমি দেখব কাল ওর কেসটা। হাকিম কে, জানো তো, আমাদের এস. ডি. ও সাহেব, যিনি প্রায়ই আসেন জেলখানায়।

একটা পুরো ব্লাফ' দিলাম ওকে।

সুশীলা হাসল। বললে,'হ্যাঁ জানি।

রাত্রি নিশ্চিন্তে কেটেছে সুশীলারও —আমারও। পরদিন সে যায় কোর্টে কিন্তু ফেরে না। শুনেছি, আপাততঃ ও "পর-পুরুষ বা পরমপুরুষ" কারুর কাছেই যায়নি।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দ্বাদশ স্তবক

১। "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পতি হোন্"—গোপ-কন্যাদের এই সঙ্কল্পটিকে বলতেই হয়,—একটি অ-ব্যাপার। কিন্তু এই সঙ্কল্প-লতার সুফল লোভী কুল-কন্যাদের মন অপার উৎকণ্ঠার আঘাতে, তার মধ্যেই সন্ধান করে নিল সামঞ্জস্যের। তাঁদের হৃদয় খুশী হয়ে উঠল। মাতা পিতারাও ভাবলেন,···বিশিষ্ট পতি লাভের জন্যেই তাঁদের কন্যারা বুঝি এই ব্রত নিতে চান। অতএব তাঁরা আর তপ্ত-বাধা হয়ে উঠলেন না; প্রত্যুত, সেই দিন থেকেই ব্রত-পারণের অনুকূলে অবলম্বন করলেন সুব্যবস্থা।

২। কিন্তু মায়ের স্নেহ কষ্ট দেখতে চায় না মেয়ের। তাই, সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেও, তাঁদের স্নেহ যেন রহি-রহি প্রতিষেধ করে বলে উঠত—

"তোদের লতার মত ঐ শরীরে কি এত কষ্ট কখন সয়? কেবল আনন্দই সইতে পারে তোদের উৎসাহ। তার জোরেই না এমন কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করতে তোরা সাহসী হয়েছিস্। তাও বলি, তোরা অত কড়া কাজের মেয়ে নস্। ব্রতটিও অসাধারণ। তোরাও অনধিকারিণী। তোদের দিয়ে কি এমন কাজ হয়, না হবে?"

কিন্তু এই নিষেধ-মাঙ্গলাই উল্টে ভীষণ ভাবে বাড়িয়ে দিতে লাগল প্রত্যেকটি কন্যার হৃদয়ের শুদ্ধা শ্রদ্ধাটিকে।

৩। মায়েরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন,—"বলি ও মেয়েরা, উমাকে না শঙ্করকে, না মাধবকে, না কমলাকে, না ব্রহ্মাকে. বলি কোন দেবতাকে যে তোরা আরাধনা করবি তাকি একবার তোরা ভেবে দেখেছিস? আরাধনার কোনটি হবে পদ্ধতি, কত খরচ পড়বে, বেদজ্ঞ কোন্ আচার্য্যই বা কাজ করাবেন, সমস্ত ভেবে আমাদের বলিস্।"

৪। আর কন্যারাও বুঝতে পারতেন, বিতর্কের নিরসন না করতে পারলে নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি হবে না, তাই সবিনয়ে তাঁরাও বলতেন,—

"মা, এ বিষয়ে একটি লোকবিধি আছে।···যাঁর উপর যাঁর বেশী ঢলে শ্রদ্ধা, তিনি ততই হন তাঁর দেবতা। আমরা উমাকেই দেবতা বলে মেনেছি। মনই আমাদের আচার্য্য. তাঁর উপদেশই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ তিনিই জাগিয়ে দেবেন আমাদের অদৃষ্ট। তিনিই নিয়ে যাবেন পথের পারে। গুরুই স্বপ্নে বা অস্বপ্নে যে মন্ত্রাদেশ করেন, তাতেই হয় অর্থ-সাধন।"

৫। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ব্রত থেকে কুলবালাদের মনগুলিকে কিছুতেই সরিয়ে আনতে পারালন না জননীরা। কুলবালাদের সখীরাও দর্শাতে লাগলেন উৎকণ্ঠিত অনুকম্পার আনুকূল্য। অতএব যেদিন ব্রতের শুভদিন উপস্থিত হল, সেদিন কোথায় যেন ভেসে গেল সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন। কুলবালাদের ব্রত-কালীন হবিষ্যি হয়ে দাঁড়াল তাঁদের হৃদয়ের প্রমোদ-রসগুলির অবিরিক্তি বৰ্দ্ধক। স্বাভাবিক কান্তি-বাহুল্যেই দাঁত-ঢাকা ঠোঁটগুলিকে দেখতে হল নতুন অশোকফুলের বৃষ্টি-ধোয়া পাপড়ির মত; প্রত্যহ যাঁদের গায়ে তেল মাখা অভ্যাস, তাঁদের অঙ্গ তৈলহীন পারুষ্যে লাভ করে বসলো কেতকী-পত্রের মত পাণ্ডুরতা; মাথায় তেল দেওয়া নেই, তাই উদ্বিগ্ন মানুষদের মনগুলির মত রুক্ষ হয়ে উঠল কেশ কলাপ; একাহারে থেকে তাঁদের অদ্বিতীয়-রুচি দেহগুলিও দ্বিতীয়ার চাঁদের মত কৃশ-জ্যোৎস্না হয়ে পড়লো। কিন্তু ব্রতচারিণীদের কাছে সব কষ্টই যেন শোভা।

সারারাত মাটিতে শুয়েই কাটিয়ে·····দিতেন ব্রতিনীরা। রজনী বিরামে যখন শয়ন ছেড়ে তাঁরা উঠে পড়তেন তখনো সহজ নিদ্রার বিরহ লেগে রইত মঞ্জিষ্ঠার মত রাঙা রাঙা তাঁদের নয়নে। তারপর মুখ ধুয়ে লালের লেশহীন রাত্রিবাস ছেড়ে রম্যতম অন্য কাপড় পরতেন তাঁরা। প্রতি প্রাতে তাঁদের সকলকেই স্নানে যেতে হত যমুনায়, এবং ভিক্ষে মনের মধ্যে নীড়-বাঁধা অতিগোপন রহস্য-সংবাদ বিতরণ করতে হত সকলকে, তাই না-ডাকতেই সবাই এসে তাঁরা মিলতেন। আর যাঁরা কিঞ্চিৎ দেরী করে আসতেন, তাঁদের তাঁরা মাননীয়া ভাষায় বলতেন,—

"সই লো সই, তোমারি অপেক্ষায় আমরা আছি। আসুন আসুন মহৎ-আকাঙ্ক্ষার মগ্‌ডাল থেকে চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি আসুন।"

এই বলে তাঁরা হাত ধরাধরি করে চলতে সুরু করতেন। পারস্পরিক পরম প্রেম ফুটে উঠত তাঁদের স্নানযাত্রায়। তাঁরা চলতেন, আর কবির মন বলত,···মৃণালে মৃণালে জড়াজড়ি করে বুঝি একদল বিমোহিনী কমলিনী মাটি মাড়িয়ে পায়ে হেঁটে চলেছে; তরল শাখার বিথার শোভা এড়িয়ে, বুঝি হেঁটে চলেছে স্বর্ণলতার একখানি অদ্ভুত কানন; অথবা নিজের নিজের চাপল্যগুলিকে অহঙ্কার দিয়ে ঢাকবার বাসনায়, বুঝি একদল জলপ্রোতা এক-সূত্রোয় গাঁথা হয়ে আলোর শোর তুলে নেমে আসছেন পৃথিবীতে।

ব্রতিনীদের হিল্লোলিত করের বলয়াবলি বাজত; মদকল-কলহংসের ঝঙ্কারকে হারিয়ে দিয়ে তারা বাজত। রোদ বাড়লেও যেমন ম্লানিমার প্রলেপ লাগে না কমলিনীদের মুখে, তেমনি কৃষ্ণের দেওয়া আতাল-পাতাল তৃষ্ণায় পরিভূত হলেও তাঁদের মুখগুলি কিন্তু হারাত না বিলাসী বিলাসী ভাব।

সেদিন দেবীপূজার কল্পনাতীত সজ্জার নিয়ে তাঁদের অনুগমন করলেন তাঁদের অনুচরীবৃন্দ। চলতে চলতে সকলেরি মুখে মুখে চলল পঞ্চ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত গীত। সে গানে ফুটে উঠল মধুরতা, নিবিড়তা, কোমলতা ফুটে উঠল বীণা-পারবাদতা, ফুটে উঠল বিকাশী স্বরের মঙ্গলময় পরিণতি, এবং ব্রহ্মাদি-দেব-মুখ-মুখরিত সেই গানের হরি-গুণ-গুণনের ঝঙ্কারে প্রলুব্ধ হয়ে গীতিময়ী ব্রতিনীদের মুখকমলের উপর এমন আক্রমণ চালাল ভ্রমরদের সংহতি যে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে আরো কমনীয় হয়ে উঠল তাঁদের নয়নাঞ্চল। গুরুজনদের স্নিগ্ধ নিষেধ শাস্ত করে যখন ব্রতিনীরা যমুনার তীরে এসে পৌঁছলেন, তখনও উদিত হননি সূর্য্যদেব, তখনও যমুনার কালো জলে যেন বিছিয়ে রয়েছে সন্তাপ-শান্তির একটি সমাধান।

৬। তরঙ্গিনী যমুনা দেবীও যেন রঙ্গিনীর মত সস্নেহে দর্শন করতে লাগলেন স্নানার্থিনীদের বেদনা। তিনি উপলব্ধি করলেন—

শ্রীনন্দনন্দনকে পতিত্বে বরণ করবার জন্যে কুলবালাদের হৃদয়াবেগের পরিমিতি, এবং তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্য করলেন তাঁদের প্রীণনের প্রগাঢ়তা, তাঁদের মহতী শ্রদ্ধালুতা। তাই যেন তাঁর ইচ্ছা হল···সবহমান "এস এস" বলে চঞ্চল তরঙ্গ-হস্ত প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করেন। তারপরে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে যখন জলের ধারে এলেন ব্রতিনীরা, এবং তির-তির্ করে আকাশে লাফিয়ে উঠল জল-পিপিদের ঝাঁক, তখন মনে হল যমুনাদেবীই যেন ঐ বিহগ-কাকলীর মধুর সমাদরের মাধ্যমে ব্যক্ত করে দিলেন তাঁর শুভকামনা। এবং তাই বোধহয় ক্ষণপরেই যখন নিশা-বিরহী চক্রবাক-মিথুনের মিলন-সম্পাদনের বাসনায় আকাশে ফুটি ফুটি হল নবারুণ, তখন যমুনাদেবীর স্নেহ-প্রকাশের মতই ঘুমভাঙ্গা নয়ন মেলল মৃণাল-ফুলের কলি।

৭। কুলকন্যারা আর তখন বিলম্ব সইতে পারলেন না। তাঁদের কেমন যেন লোপ পেয়ে গেল ইচ্ছা-শক্তি। তাঁরা পরিহার করলেন শীতবস্ত্র। এমন ব্রতে কি শীতের ভয় করলে চলে? হিমকণার প্রতাপ সত্ত্বেও একটি কল্যাণ-শ্রেষ্ঠতার ও পরমানন্দের উত্তাপ তাঁদের আবৃত করে রইল দেহ। ভগবতী কালিন্দীকে বন্দনা করে সখীদের নিয়ে তাঁরা জলে নামলেন। একটু একটু··· কাঁপল কি তাঁদের মাথা? ঘন ঘন···নাচল কি তাঁদের ঠোঁটের পাতা? বিকসিত দন্তের চারুতায় শীৎকারের মত একটি অভ্যর্থনা জানিয়ে···চলকে উঠল কি একটি মাধুর্য্য-ভরা হাসি? নয়ন থেকে নয়নে কি খেলে বেড়াল কৌতুক? নিশ্চয়। এবং সেই কম্পন, সেই নর্ত্তন, সেই হাস্য, ও দেহের সেই আকুঞ্চনই কালিন্দীদেবীর কাছে 'যেন মিলিত-গৌরবে বহন করে নিয়ে এল ব্রতরসমাধুরীর নিপুণ একটি উপঢৌকন।

৮। স্নানোত্তীর্ণা হলেও ভূর্ণোত্তীর্ণা হতে পারল না তাঁদের মনঃপ্রসাদময়ী প্রীতি। হরিণনয়নাদের অঙ্গ বেয়ে, তাঁদের নিচোল বেয়ে, লাবণ্যের অমৃত-বিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল স্নান-সলিলবিন্দু। বিন্দুর অক্ষীণ মহী-পতন লক্ষ্য করে জলচর-পক্ষীরাও যেন আভাসে বলে উঠল, "কালিন্দীর শ্যামরঙের বাধা ওঁদের কাঁদিয়েছে,···ওতো জলবিন্দু নয়, ও যে অশ্রুবিন্দু।"

৯। তিমির-শ্রেণীর মত বরীয়সী কবরী থেকে তাঁদের ঝরে পড়তে লাগল জল। আহা, তারাও যেন কাঁদছে। সহস্র-শত্রু ঐ কবরীগুলিকে যতই ব্রতিনীরা মার্জনা করতে লাগলেন ততই যেন সকরুণ দয়ার উদয়ে তাঁরা নিজেরাই অর্জন করতে লাগলেন লক্ষ্মী-শ্রী। কবরীশ্রেণীর তিমির-পটভূমিকায় যেন প্রকাশলাভ করল···জ্যোৎস্নার মত, মূর্ত্তিমতী আনন্দ-লক্ষ্মীর মত, অভিরামা কাম্য কনককান্তির মত, শোভা-পরামৃষ্ট মাধুর্য্যের এক পরাকাষ্ঠা।

১০। তন্ময়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন ফেললেন তাঁরা স্নানজল। সত্যিই কি আজ তাঁরা কমলার চেয়েও সৌভাগ্যবতী? সত্যিই কি ভগবতী কাত্যায়নীতে ওতঃপ্রোত ছিল তাঁদের অনুরাগ? ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের মুখকমলগুলি কৃষ্ণগানানুগ আনন্দ-মাধুরীর পীঠস্থান হয়ে দাঁড়াল। প্রীতির সমুপস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্রতিনীরা তখন পরিধান করলেন ব্রতোপযোগী দুখানি করে পবিত্র ধৌত বসন।

১১। চমকাতে লাগল স্বর্ণাঞ্চল-প্রান্ত। কেশকলাপের কী মার্জ্জিত সুন্দরতা! প্রভাতের শিরশিরে বাতাসে কলাপাণ্ডিত্যবতীদের মুখকমলের দিকে পক্ষ-বাত-বাতুলতা নিয়ে যখন উড়ে আসতে লাগল ভ্রমরের দল তখন অপূর্ব্ব এক ভীতি-চাঞ্চল্যে কেঁপে উঠল তাঁদের বাতাস-অসহিষ্ণু ভ্রূ! তারপরে কুমারিকা-শ্রেণী দেখতে পেলেন—যমুনাদেবীর পিতৃদেব শ্রী সূর্য উঠছেন। কী মিষ্টি, কী নরম-নরম অল্প-গরম তাঁর কিরণ-ঝরা হাতখানি। তাঁর যেন তাঁর মেয়ের চেয়েও বাৎসল্যের পাত্রী, এই কথা ভেবে নিয়ে সূর্য্যদেব যেন তাঁদের গায়ে বুলিয়ে দিলেন হাত।

১২। তারপরে ব্রতিনীরা খুঁজে পেতে বেছে নিলেন যমুনার এমন একটি কর্পূর-শুভ্র পুলিন-ভাগ যেখানে পবনদেব ছাড়া আর কোন জনান্তরের বা জলচর-চরণের আঘাত বা অবলেপ পড়েনি। চিত্ত-রমণীর হলেও পুনর্ব্বার তাঁরা পরিশোধন করলেন সেই পুলিন, এবং অত্যুত্তম পূজার সম্ভার সেখানে নামিয়ে রেখে স্থির করলেন, মূর্ত্তি-রচনা-রসিক সিকতা দিয়ে সেখানেই তাঁরা গড়ে তুলবেন ভগবতী উমার মূর্তি। এই সিদ্ধান্তের মধ্যপথে শুনতে পাওয়া গেল পরস্পরিক এক কোকিল-কূজন মত ভাষা। একদল বলছেন,—

···"ওলো সই, কই, এমন ব্রত তো কোন দিন কেউ আমরা পালিনি। তবু বলি, এ ব্রত মঙ্গলেরও মঙ্গল। এমন কোন্ চালাক রত্নাও তো দেখছি না যিনি নিজের স্বার্থটি বুঝলে না, ভয় ভ্রান্তি আবেগটি ছেঁটে ফেলবেন না, নিজের গতরটি খাটালেন না এ ব্রতে।"

···"এখন কথা হচ্ছে, কাত্যায়নীর অর্চনা কি একলা করতে হয়, না একসঙ্গে?"

···"কাত্যায়নী দেবী! ওরে বাবা! 'ক'-মানে তো 'সুখ'। সুখের অত্যয় ঘটিয়ে নীরসতা যাতে না ঘটে, তাই আমাদের এখন দেখতে হবে।"

···"বুদ্ধির সংযম চাই, শ্রদ্ধার নিশ্চয়তা চাই।"

আর একদল বললেন,—

···"তোদের মত এই রকমদের কাছে মিলে-মিশেই পূজো চান ঈশ্বরী।"

···"একলা পূজোয় আবার পুজো হয় নাকি?"

···"অনেকের পূজোয় অনেক বাহার।"

পূজন-শিল্পব্রতীরা তখন সকলে মিলে আরম্ভ করে দিলেন মধু-মধুর কৃষ্ণ গুণগান মঙ্গল, ছড়াতে লাগলেন সৌরভ্যের সৌভাগ্য-জড়ানো অঞ্জলি অঞ্জলি কুসুম, বেছে নিয়ে এলেন যমুনা-পুলিনের শুচিতর সিকতা, বন্দনা করলেন ভগবতী উমাকে; এবং তারপরে তাঁদের কোমল অঙ্গুলিদল চঞ্চল হয়ে উঠল মূর্ত্তি রচনায়।

১৩। গড়া আরম্ভ হতেই ব্রতিনীদের মনে হল ভগবতী কাত্যায়নী যেন নিজেই গ্রহণ করছেন সিকতাময়ী মূর্ত্তি। তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। "একি তবে আমাদের শুভবিধি-পূজার প্রতিদান দিলেন দেবী? দিনের পর দিন খেটেও যে মূর্ত্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সে নিষ্পত্তি আশ্চর্য্য, সুসম্পন্ন হয়ে গেল একটি উৎসবিত মুহূর্তে? হৃদয়ের প্রসাদ পেলেই প্রসন্ন হন দেবী?"···এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতেই তাঁরা যেন প্রমাণ করে দিলেন··· চিত্তবৃত্তিরও সম্মান কম নয় জগতে।

১৪। তাঁদের মন তখন দেখল, দেবী যেন নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুশীতে লাফিয়ে উঠল তাঁদের সেবাপ্রবণ মন। কিন্তু

সে মনেরও অগোচরে থাকে যে দীপান্বিত একটি প্রেম-ভাব, সেই ভাবখানি যেন হঠাৎ বলে উঠল,—

"উচ্ছৃঙ্গতা ভাল নয়। বশে রাখ নিজেদের, বচন প্রতিবচনও সব দূর করে দাও।"

অতএব ব্রতিনীদের তখনি সংযত হয়ে গেল বাণী, সংযত হয়ে গেল আত্মা। যমুনা থেকে তাঁরা তুলে নিয়ে এলেন জল। কাত্যায়নীর সিকতাময়ী মূর্ত্তির সন্নিকটে যথাবিধি স্থাপন করলেন ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যের অতুল্য সম্ভার, এবং নিধির মত তাঁরা হৃদয়ে নিধান করলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

ব্রতিনীদের সকলেরই তখন মানস-নদীটি সমান ধারায় বইছে। সকলেই পা ধুয়ে আচমন করলেন, যে-কাপড়ে ছিলেই সেই কাপড়েই আসন পেতে বসলেন। সকলেরি সত্তা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল সমান সাত্ত্বিকতায়। মৌনাবস্থায় সকলেরি হল অবস্থান। কিন্তু হলে হবে কি? ভগবতীর অর্চ্চনা আরম্ভ হতেই সমধর্ম্মী হয়ে গেল সকলেরি মানসালাপ, সমান-নির্বাহ্য হয়ে গেল সকলেরি বাহ্য ব্যবহার।

১৫। তারপরে প্রথমেই সাক্ষাৎ অজন্ম-সাধারণ হলেও, সিকতাময়ী সেই কাত্যায়নী মূর্ত্তির উদ্দেশ্যেই সমান-চৈতন্যবতী কলাবতীরা মনে মনেই নিবেদন করলেন তাঁদের অভিন্নরূপ মানস-আবাহন।

"ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবি সন্নিধানমিহাচর
কৃষ্ণস্য সন্নিধানং নঃ প্রাপয়স্ব নমো নমঃ।"

(হে দেবি, ইহস্থানে আগমন করুন, আগমন করুন, সন্নিহিতা হয়ে আচারবতী হোন; এবং আমাদের প্রাপণ করুন কৃষ্ণের সান্নিধানে। নমো নমঃ।) (১)

১৬। আবাহন-অন্তে সকলেই যেন বাহ্য-বৃত্তিরহিত হয়ে গেলেন। নত হয়ে পড়ল তাঁদের অঙ্গ। নির্ম্মলকান্তি নিতান্ত-স্তবনীয় একখানি আসন নিবেদন করে পূর্ব্ববৎ মনে মনে তাঁরা বলে উঠলেন,—"হে দেবি, ইহস্থানে আগমন করে এই দিব্যাসনখানিতে উপবেশন করুন, আমাদের অঙ্ক-পর্য্যঙ্ককে কৃষ্ণাসনরূপে কীর্ত্তন করুন।" (২)

১৭। অভিনন্দনীয় সমাদর ও অনল্প আমোদের সঙ্গে আসনখানি সমর্পণ করে তাঁরা বললেন,—"হে দেবি, আমরা স্বাগত নিবেদন করে আপনাকে স্বগত জানাচ্ছি, কৃপা করে আমাদের নিকটে কৃষ্ণের স্বাগতি সম্পাদন করুন।" (৩)

১৮। এই স্বাগতি নিবেদন করতেই বিরাট সন্তুষ্টিতে পূর্ণ হয়ে গেল তাঁদের প্রাণ। স্বর্ণপাত্রে সমুচিত মঙ্গলদ্রব্য একত্রিত করে পাদ্যসহ পূর্ব্ববৎ নিবেদন করে তাঁরা মনে মনে বললেন,—

"অভিবাদনযোগ্য দুখানি চরণের উপপাত্ত এই পাদ্য। আমাদের অ-শীতল বক্ষঃস্থল শীতল করুক কৃষ্ণের প্রস্বেদপাদ্য। হে অনাদ্যা দুর্গা, আজ আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিন কৃষ্ণের সঙ্গে।" (৪)

১৯। পাদ্য নিবেদনের পর অজ্ঞেয়-স্বরূপা কলাবতীরা যথাবিধি আহরণ করলেন দেবীর উপযুক্ত পরমোচিত দ্রব্য-সম্ভার এবং সেইগুলি দিয়ে অনর্ঘ একটি অর্ঘ্য রচনা করে নিবেদন করে বললেন,—

"যাঁরা চিরদিন অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন, হে দেবি, আপনি সেই দেবতাদেরও অর্ঘ্যা। এই অর্ঘ্য নিবেদিত হল চরণে। কৃপা করে আমাদের সুলভ করে দিন মহার্ঘ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ।" (৫)

[ক্রমশঃ।

প্রভুর বিড়াল

(আধুনিক আরবী কবিতা)

তানিয়ুস্ আবদুহ্

আমাদের মনিব বিদগ্ধ পণ্ডিতপ্রবর,—
তাঁর আছে একটি বিড়াল—সাদা যেন শুঁটিভাঙ্গা তুলো,
আর তুলতুলে পশমের মতো।
এমনিতে সে বধির বটে কিন্তু ঠিক শুনতে পাবে কেটলীর শব্দ,
বোবা হলেও মুখ খুলবে খাওয়ার সময় হলে।
কখনো সে বিনয়ী হয় সিংহের মতো,
অথবা নির্দোষ যেন মেষশিশু।
গাছের ডালে পাখী দেখলে ভারী সুন্দর নড়াচড়া তার।
পাখীটি নাগালের বাইরে থাকলে নির্লিপ্ত সে।
চোখের মণি চুপসে যায়, হৃদয় ফেটে চৌচির।
উদ্ধত ভাবে সে ঘুরে বেড়ায় অতিথিদের মাঝে—
ওকে বললে ও বলতে পারো নেহাৎ এক শিশু।
অতিথিরা তার দু'চোখের বিষ, দেখতেই পারে না সে।
তার পছন্দ হলো খাবার, প্রচুর খাবার,—
মনিব যখন বাড়ী এসে পাচককে ডাকেন,
লাফ দিয়ে উঠে বসে তাঁর কোলে,
তার সিংহাসন থেকে
শাসন করে, চোখ রাঙায় আমীরের মতো।
মনিব তাকে আলগোছে বুকে চেপে ধরেন,
নিয়ে যান বিছানার 'পরে।
'মেয়ে আমার' ডাকেন তিনি।
যদি সে জবাব দিতো 'বাবা' বলে!
প্রায়ই তার শয্যা হয় প্রভুর বইঘের পাতা,
হেসে হেসে তাকে তিনি আদর করেন,
আর আবেশে সে চোখ বন্ধ করে।
আমরা যদি তাকে একটু বিরক্তই করি,
সগর্জনে প্রভু এসে ভীষণ ধমক দেন।

অনুবাদ: কখরুজ্জামান চৌধুরী।

Surf
Blue
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
আধুনিক
গৃহিণীরা
বলছেন
"এত সহজে কাপড়
এত ফরসা হবে
সার্ফে কাচার
আগে তা ভাবিনি"

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

আজ তোমাকে দিল্লীর একটি অপরূপ রূপসীর কথা বলব। মেয়েটি স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপিকা। দিল্লীর অদূরে হাউসখাশে সেদিন বনভোজন উৎসবে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। মেয়েটির নাম হীরা।

হীরা খুব চটপটে মেয়ে। তাঁর মা বাঙালী, বাবা গুজরাতি। খুব বড়লোক। অপরূপ সুন্দরী। খুব সৌখীন। শুধু সাধারণ হাল্কা শাড়ী-ব্লাউজে এমন সুন্দর দেখায় কি বলব। পুরুষদের মোটেই ভয় পায় না। নাকে চোখে মুখে কথা বলে।

হীরা তোমার বয়সীই হবে। অথবা দু-এক বছরের বড়। ফর্সা রঙ্‌। ছিপছিপে গড়ন। চুলগুলো সর্বদা খোলা রাখে। কপালে কুমকুমের বদলে শাদা চন্দনের টিপ পরে। গলায় মুক্তোর মালা।

তুমি জেনে খুশী হবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা একটা অভিনয় করবে। তোমার মনে আছে আমরা 'তাসের দেশ' করিয়েছিলুম? এবারেও আমি তাদের দেখিয়ে দেব। সব পার্ট মেয়েরাই করবেন। ছেলেরা শুধু টিকিট বিক্রী করবে। সোমবার থেকে আমরা হীরাদের বাড়ী রিহার্সেলে যাব। হীরাদের বাড়ী মায়া রায়দের পাড়ায়। হীরা নিজেই ঠিক করেছে তাঁর গাড়ীতে আমাকে রোজ নিয়ে যাবেন। আবার তিনিই ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। ওর গাড়ীতে চড়লে আমার বড় ভয় করে। বড় তাড়াতাড়ি চালায়। গাড়ীখানা যেন ওর দুরন্ত যৌবনের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে। ওর দিদির কথা তোমাকে বলেছিলাম কিনা মনে নেই। সেই কলকাতার দেবদাস বাবুর ছোট বৌদি মণিকুন্তলা। মণিকুন্তলা আমার সাথেই পড়তেন। ওরিয়েন্টাল নাচে দিল্লীকে কোনো কালে মাতিয়ে রাখতেন। এখন সুইজারল্যাণ্ডে আছেন।

হীরার চোখ দুটি অপরূপ সুন্দর—তবে তোমার মতন অত সুন্দর নয়। ব্লাউজটা একটু ছোটো করে পরে। সেটা একটু ভালোভাবে পরিচয় হয়ে গেলে মানা করে দেব।

পিক্‌নিকের দিন শাড়ীতে ডাল পড়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম বেচারা এদিক ওদিক লজ্জা বিজড়িত ভাবে তাকাচ্ছে। সবাই হাসছিল, আমি বললাম, ভয়ের কি আছে? ঐ গাছতলায় গিয়ে শাড়ীখানা উল্টে পরুন। মানে, আঁচলটা কোমরের দিকে আর কোমরের অংশটা আঁচলের দিকে। তাহলে এ' অংশটা কেউ দেখতে পাবে না। মেয়েটা অবাকভাবে আমার দিকে তাকাল। কোরলও ঠিক তাই। গাছতলায় গিয়ে শাড়ীখানা উল্টে পরে এসে বলল, ধন্যবাদ স্যার! মেয়েদের ব্যাপার এত নিপুণ ভাবে জানলেন কি করে? বললাম, আপনি ভুল করছেন, মেয়েদের ব্যাপার ছেলেরাই ভালো বোঝে। তিনি যদি বিবাহিত হন তাহলে তো কথাই নেই। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমাকে স্যার বলবেন না। আমার নাম মণি। মণিদা বলতে পারেন। মণি বললেও আপত্তি করবো না।

মেয়েটা খুব খুশী হ'ল। হাসলে হীরাকে ভারী সুন্দরী দেখায়। মনে হয় দাঁতগুলো যেন সত্যিই হীরার তৈরী—ঠিক 'তোমার মতন। না না, তোমারটা আরো সুন্দর সেই থেকে হীরার সাথে বন্ধুত্ব।

হাউসখাশের সবুজ ঘাসে বসে হীরা অনেক গল্প বলল। বলল কত কষ্ট করে তাকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। বেচারার বাবা ছোট বেলায় তার বিয়ে ঠিক করছিলেন। কিন্তু অপরিচিত গুজরাতি ছেলের গলায় সে বরমাল্য দিতে রাজী হয় নি।

আমি বললাম, সেই গুজরাতি যুবক এখন কি করছে? এখন সেদিকে এগুনো যায় না। বলুন তো আমি চেষ্টা করে দেখি।

লজ্জায় মেয়েটার মুখ লাল হয়ে গেল। মাথার চুলগুলোর ভেতর অঙ্গুল ঢুকিয়ে এলোমেলো করতে করতে হীরা বলল, না মণিদা, সে দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া—তাছাড়া বেশ তো আছি। বলেই একটুখানি দুষ্টুমীভরা চোখে হাসলো।

সে হাসিতে যে কোনো ছেলের মাথা ঘুরে যেতো। অবশ্য তোমার হাসির তুলনায় সে হাসি কিছুই না।

নন্দরাণী বিশ্বাস করো, সেই হীরা তারপর কিছুতেই আমাকে ছাড়ছিল না। ছায়ার মতন আমার পিছু পিছু ঘুরছিল।

একবার কথা বলতে বলতে ঘাড়ে হাতটা ঠেকিয়েছিল। আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল। তার মাথাটা আমার এত কাছে এনে কথা বলতে চাইছিল যে তার শ্বাস নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার গালে যেন তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। বললাম, বসুন না ঘাসের লনে। সে বসে পড়লো। আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হীরা আমার হাত ধরে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। আমরা দু'জনে সামনা-সামনি ভাবে বসে পড়লাম।

হীরা কি যেন বলতে চাইছিল। কিন্তু বলতে পারছিল না। আমি বললাম, কিছু হারিয়ে গেছে আপনার?

সত্যি বলছি তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর সব কিছু হারিয়ে গেছে।

হীরা বলল, না না, কিছু হারায় নি। মুখে যেন তার একটা অপ্রস্তুতির ভাব। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তা ছাড়া মণিদা, জীবনে এমন কি জিনিসই বা পেলাম যা হারালে এত খুঁজতে হবে?

তার কথায় আমার চমক ভাঙলো।

আমি বললাম চলুন উঠে পড়ি। লোকেরা দেখলে কিছু ভাবতে পারে। শাড়ীখানা ঠিক করে পরে আমার হাতে ধরে তুলে বলল, উঠুন। মেয়েটা এত বেশী ফ্রী ভাবে চলতে পারে তোমায় কি বলবো ?

ইচ্ছে করে করে হীরা তাঁর শাড়ীর আঁচলটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছিল। তার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। এ কথা সে বলেও ফেলল। বলল, মণিদা কি বলবো আজ আমার স্মরণীয় দিন।

ভারী ভাল লাগছে। আকাশ-বাতাস মাঠ সবই ভারী মিষ্টি লাগছে।

আমি মনে মনে বললাম, খেয়েছে রে!

হীরা কোথা থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল জোগাড় করে এনে বলল, নাও মণিদা আমার ভক্তি-উপহার।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বলেন কি? সত্যি বলছেন? আমাকে ভাল অনেকেই বাসেন, কিন্তু ফুল বোধ হয় এই আপনার কাছ থেকেই প্রথম পেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। হীরা বলল, 'চল মণিদা আমি তোমায় লিফট দিতে চাই। লেট মী হ্যাভ দ্যাট প্রিভিলেজ।'

'প্রিভিলেজ' খানা তাকে দিয়েই ফেললাম। তার গাড়ীতেই ফিরলাম। লেভেল-ক্রশিং-এর কাছে এসে হীরা আমার কাঁধে হঠাৎ একখানা হাত দিয়ে বলল, মণিদা, কত মিষ্টি আজকের দিনটা। আমার গা ছুঁয়ে বল মণিদা তুমি আমার বাড়ীতে আসবে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আসবো।'

আমি এখনো তাকে আপনিই বলছি। হীরা আমাকে তুমির দলে টেনেছে। বললাম না—হে নন্দরাণী সে ভয়ানক ভাবে ষ্টেজ ফ্রী মেয়ে।

হীরার আরও একটা দুর্বলতা আছে। কথায় কথায় চিবুকে হাত দিয়ে আদর করা। হীরা পুরুষের গা ঘেঁষে চলতে ভালোবাসে।

আমি তখন শুধু তোমার কথাই ভাবছিলুম। কি বলবো মেয়েটার ভেতর যেন কি একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। একটা মোহও পড়ে যায় সবার। তবে হীরা খারাপ মেয়ে নয়। অন্য মডার্ণ মেয়েদের মতন সিগারেট খায় না। ভাল নাচতে জানে। গলাটা খুবই মিষ্টি। তার স্বর অনেকটা তোমারই মতন মধুময়।

বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে হীরা সজল নয়নে সেই সন্ধ্যায় বিদায় নিল। আমি সারারাত শুধু ভাবলাম মেয়েটার চোখে জল কেন?

বাড়ী দেখিয়ে ভুল করেছি। হীরা আজকাল রোজই আসছে। সে নিজেই ঠিক করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের নিয়ে একটা নৃত্য নাটক খাড়া করবে। বহু মেয়েও জোগাড় করেছে। মায়া রায়দের পাড়াতে আগামী সোমবার থেকে রিহার্সেল সুরু হবে। সব কলেজের মেয়েই থাকবে। ইন্দ্রপ্রস্থ মিরান্ডার মেয়ের সংখ্যাই বেশী। আমি গিয়ে ফাইনাল সিলেকশন করবো। 'সোমবারের আগে হবে না' বলাতে হীরা অধীর হয়ে পড়েছে। আজ রাত্তিরে আবার আসবে বলেছে। হীরার কথার ভেতর একটা মধুময় শব্দ ঝঙ্কার আছে। তোমারটা অবশ্য তার চেয়ে মধুরতর।

আজ হীরা সম্বন্ধে অনেক বেশী লিখে ফেললাম। হীরার সাথে তোমার পরিচয় না করালে তুমি কল্পনা করতে পারবে না মানবী কত মাধুর্যমণ্ডিত হতে পারে।

দাঁড়াও হীরার একটা টেলিফোন এসেছে। আচ্ছা চিঠিটা এখন বন্ধ করছি। হীরা সম্বন্ধে তোমায় আরও লিখবো এর পরের চিঠিতে। দোহাই তোমার 'নন্দরানী চিঠিখানা যত্ন করে রেখে দিও। হারিও না।

এ ক'দিন চিঠিখানা পোষ্ট করা হয় নি। রিহার্সেলে বড় ব্যস্ত ছিলাম। তারপর আগের কথা মতন সোমবার সন্ধ্যার সময়ে হীরা তার কালো ছোট গাড়ীখানা নিয়ে হাজির। আমি বললাম, ঠিক মনে রেখেছেন তো? আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

হীরা বলল, তুমি কি নিষ্ঠুর মণিদা! এতদিন শুধু এই মুহূর্তটুকুর জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি এই কদিনে সব ভুলে বসে আছো? মানে, তুমি বলতে চাও এই ক'দিনের কোনো মুহূর্তেও তুমি আমার কথা ভাবনি? ওঃ পুরুষ মানুষগুলোর হৃদয় বিধাতা পাথর দিয়ে তৈরী করেছেন। সত্যি বলো, তুমি ক্ষণেকের জন্যও এই বেচারা হীরার কথা ভাব নি?

কথা বেশীদূর এগুবার পূর্বেই আমি গাড়ীতে বসে পড়লাম।

হীরা গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। তোমাকে আগেই বলেছি নন্দরাণী, হীরা ভয়ানক তাড়াতাড়ি গাড়ী চালায়। মায়া রায়দের পাড়ায় গাড়ীখানা থামলো। ভারী সুন্দর একটা বাগানওয়ালা বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখলাম জনা পনেরো মেয়ে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যি বলছি, হীরার রুচি আছে। প্রতিটি মুখই সুন্দর। (অবশ্য তোমার থেকে নয়)। ফর্সা, তন্বী, তার উপরে শার্প ফিগার। গ্রীসিয়ান কাট।

আর কাউকে তুমি চিনবে না।

হীরা একখানা আশমানী রঙের হালকা শাড়ী পরেছিল। এবারও ব্লাউজটা একটু উঁচু করে পরেছিল। যাক্ গিয়ে পরে পরিচয় গভীর হলে মানা করে দেবো। পায়ে ঘুঙুর বাঁধলো। যেন ওর তর সইছিল না। সমস্ত মেয়েকে বলল ঘুঙুর বাঁধতে। আমার জানা ছিল না, হীরা এর আগেও একবার চিত্রাঙ্গদা নাটকটি করিয়েছিল।

হঠাৎ ময়ূরের মতন পেখম তুলে নাচ সুরু করলো 'আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্র নন্দিনী।' কি বলবো কি তার ভাব! কি তার লাস্য! কি তার চোখের ভ্রূকুটি! কত ছেলেকে যে ও চোখ দুটো ঘায়েল করেছে তা শুধু ঐ মেয়েটিই জানে।

সেদিন ভারী মজা হয়েছে। আমি উদাস ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু মন্দ বাতাস ফুলের গন্ধ বয়ে আনছিল। কোথায় যেন রজনীগন্ধা ফুটেছিল। রজনীগন্ধার সাথে আমার সম্বন্ধ তো তোমার জানাই আছে। রজনীগন্ধা তোমার প্রিয় ফুল। থিয়োরেমের করোলারীর মতন আমারও। সেই গন্ধে মাতোয়ারা মন তখন দার্জিলিঙের দিকে ছুটে চলছিল যেখানে জুবিলী স্যানাটোরিয়মে তুমি বসে বসে ক্যালেন্ডারের পাতায় হয়তো রোজ একটি করে ঢেরা কাটছো। তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। শুধু প্রথম লাইনটি লিখেছি, এমন সময়ে কে যেন পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরলো। হাতটা বেশ নরম, তবে তোমার মতন নয়। মনে করতে পারলাম না, কে হতে পারে। এমন অসময়ে রাত দশটায় কে আসতে পারে?

বুঝতেই পারছো তোমার না দেখা বান্ধবী হীরা : হেসে বলল, 'অমনভাবে ভূত দেখার মতন তাকিয়ে রইলে কেন ? নতুন কোনো প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলে না কি মণিদা ? দোহাই ভগবানের তোমাদের এই প্রবন্ধ লেখকদের আমার একটুও ভালো লাগে না।

আমি বললাম, গান জানো ?

হীরা বলল, শুনবে ?

বললাম, না। এখন শুনব না—গান জানো ? ক্ল্যাসিকাল গান ?

হীরা বলল, না, ক্ল্যাসিকাল গান জানি না। তার সাথে এর কি সম্বন্ধ আছে ?

আমি বললাম, প্রবন্ধ লেখা ক্ল্যাসিকাল গান গাওয়া তুমি এক সাথে ব্রাকেট করতে পারো। লাইট গানকে ফেলতে পারো গল্প লেখার স্তরে। এত রাতে কি মনে করে এলে ? সাথে কেউ আছে ?

হীরা অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বলল, সাথে কেউ নেই।

আজ রিহার্সেলে যাওনি কেন ?

বললাম, মনটা ভালো ছিল না।

হীরা বলল, তা বুঝলাম। মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি। ওর দহন বেদনা জানি। হাসতে হাসতে বলল, কার জন্য মনটা খারাপ ছিল ? আমার জন্য নয় তো, বুঝেছি নন্দরাণীর জন্য ? বলেই মুচকি হাসলো। তবে এদিকে সমূহ বিপদ। শিরে সংক্রান্তি নিয়ে ছুটোছুটি করছি। অর্জুন পালিয়েছে। মেয়েটার চাল-চলন দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল যেন সে কারুর মন নিয়ে খেলা করছে। প্রেমে পড়লে পুরুষদের যেমন একটু বোকা বোকা দেখায়, মেয়েদের আবার একটু বেশী রকম চটপটে দেখায়। তাদের সেই চটুল চঞ্চল চপল চাহনিতেই সব কিছু ধরা পড়ে।

আমি বললাম অর্জুন পালালে তুমি চিত্রাঙ্গদা ষ্টেজ করবে কি করে ? আজ কে প্রক্সি দিয়েছিলো ?

তুমি তো সবার পার্টই দেখেছো। বলো তো কে প্রক্সি দেবার উপযুক্ত ?

আমি বললাম, প্রক্সি তো যে কেউই দিতে পারে। চাকরীর লাইনে মালিকের জামাইকে বা ম্যানেজারের ভাগ্নেকে যেমন কেউ প্রশ্ন করে না, প্রক্সিতেও ঠিক তেমনই কেউ যোগ্যতার কোনো প্রশ্ন করে না। তাই না ?

তবুও। তুমি ডিরেক্টর হলে কাকে অর্জুনের পার্ট দিতে ?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাথা চুলকে বললাম, অমলা মেয়েটি বড় ছোট। নাহলে তাকে দিয়েও পার্টটা করানো যেতো। কি বল ?

হীরার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল। বলল, কেন মণিদা আমাকে দিয়ে অর্জুনের পার্ট চলতে পারে না ?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললাম, ঠিক বলেছো হীরা। এ কথা আমার মাথায়ই আসেনি। কিন্তু তুমি করবে কি ? করবে তুমি অর্জুনের পার্ট ?

কেউ কি চায় যে আমি করি ? আমি করলে তুমি খুশী হবে মণিদা ? সত্যি বল।

বিপদে পড়লাম। আমার খুশী হওয়া না হওয়ার কি যায় আসে ? দেখলাম হীরা ব্যাকুল ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো যেন কিসের আশায় টলমল-অশ্রুবিন্দুতে আমাকে ইঙ্গিত করল, বলো না বাপু একবার বলো না কেন, 'তুমি অর্জুন হলে আমি খুশীই হব।'

আমি বললাম, হীরা, আমি খুশী হলে তুমি অর্জুনের পার্ট করবে ? ছাত্রীদের সাথে পার্ট করতে তোমার সম্মানে আঘাত লাগবে না ?

হীরা মুহূর্তমাত্র নীরব রইলো। তারপর হঠাৎ আমার কাঁধে ডান হাতখানা রেখে বলল, তুমি জানো না মণিদা, তোমাকে খুশী করবার জন্য আমি আমার সব কিছু উৎসর্গ করতে পারি। অর্জুনের পার্ট তো একটা তুচ্ছ জিনিস।

সত্যি বলো, আমি অর্জুনের পার্ট করলে তুমি খুশী হবে ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই হীরা। মনে মনে ভাবলাম, এ কি নতুন খেলা বিধাতা ? কোন্ নতুন ছলনায় ফেলছো আমাকে ? সত্যি বলছি, নন্দরাণী, দিবাযামিনী কেবল তোমার আর হীরার কথা ভেবেই আমার এখন সময়টা হুশ করে কোত্থেকে কেটে যাচ্ছে। সূর্য উঠতে না উঠতেই মনে হয় কখন সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যা হলে আর বিন্দুমাত্র তর সয় না। ছোট গাড়ীতে চড়ে মায়া মায়দের পাড়ায় ছুটি রিহার্সেলে। আমার মতন কুঁড়ে লোকটিকে তুমি কখনও এত ব্যস্তসমস্ত ভাবে কল্পনা করতে পারো ?

একদিন সত্যি বিপদে পড়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যার আকাশে মেঘের খেলা দেখছিলাম। (ডানদিকের জানালাটা এখনও সারানো হয়নি জানো ?) সেই মেঘ, যে মেঘ ছুটতে ছুটতে জানালা দিয়ে

দার্জিলিঙের তোমার ছবির মতন সুন্দর ঘরখানায় বিনা নোটিসে ঢুকে পড়ে। পাঁজা-পাঁজা মেঘ। খণ্ড মেঘ। তুলারাশি মেঘ। কত মেঘের খেলা। পাশের বাড়ীতে বিজলীর বোন তখন পঙ্কজ মল্লিকের সেই 'গগনে গগনে' রেকর্ডখানা বাজাচ্ছিল। মনে হ'ল, সত্যিই তো মেঘের গভীরে জটাজাল ছড়িয়ে কোন্ না দেখা মহাশিল্পী আজকের এই সন্ধ্যাকে এত মনোমুগ্ধকর, এত মাধুর্যমণ্ডিত করেছে? কিসের ছোঁয়ায় আজ আমার মনে এত আনন্দ? মনে হল প্রাণ খুলে গলা ফাটিয়ে আবৃত্তি করি (তুমি সেদিন চিঠিতে ভয় দেখিয়েছো বেশী সঙ্গীত চর্চা করলে আমার কারাবরণের ভয় আছে। তাই না? গান গেয়ে প্রতিবেশীদের রিপোর্টে জেলে যেতে চাই না। আজকাল গানের বদলে আবৃত্তি করছি) হ্যাঁ যা বলছিলাম ইচ্ছা করছিল, গলা ফাটিয়ে আবৃত্তি করি, 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।'

এমন সময়ে সশরীরে ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করলেন তোমার না-দেখা আদি ও অকৃত্রিম বান্ধবী হীরা!

মনে হল গাড়ীখানা যেন নতুন পথে চলেছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে সুন্দরী আমাকে বিপথে চালাচ্ছো না তো? পথ ঘাট সব জানো তো হে?

হীরা মুচকি হেসে বলল, বিপথে তা ঠিক জানি না। তবে আজ আর একঘেয়ে রিহার্সেল নয়। আজ হবে শুধু গল্প। সেখানে কোনো চিত্রাঙ্গদা কোনো অর্জুনের প্রবেশ-অধিকার নেই।

মনে মনে বিপদ গুণলাম। থিয়েটারের ডিরেক্সন দিতে এসে শেষ মেশ জেলে না যেতে হয়।

সেদিন যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত গভীর। অতি কষ্টে হীরাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিলাম। তার মোটেই ফিরবার ইচ্ছা ছিল না। বলতে পারো এখন হীরাকে নিয়ে আমি কি করি?

গল্পটা কপি করে নন্দরাণীর নামে খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম। একটা কথা বলা দরকার। মাঝে মাঝে আমি গল্প লেখার চেষ্টা করি। আমার গল্পগুলো আপাতত ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছে। বিভিন্ন ডাকঘরের ছাপ আর সম্পাদকদের ছাপানো লেভেল গায়ে এঁটে রচনাগুলো এখন চরকীবাজীর মতন ঘুরছে। তারই একটা গল্প কপি করে নন্দরাণীকে পাঠিয়ে দিলাম। নন্দরাণী বড় চিঠি পড়তে ভালবাসে।

চতুর্থ দিন সকালে দরজায় গাড়ীর আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও সকাল হয়নি। চাকরের মাথায় বিছানা-বাক্স চাপিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নন্দরাণী ঘরে প্রবেশ করলো।

আকাশ থেকে পড়লাম। নন্দরাণীর এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ছিল না তো?

বললাম, এত তাড়াতাড়ি দার্জিলিং ছেড়ে চলে এলে যে?

নন্দরাণীর মধুর ভাষণখানার পুনরাবৃত্তি করবো না। মূর্তিখানা কল্পনা করলেও আমার এখনও কাঁপুনী আসে।

নন্দরাণীর হুকুম হয়েছে সন্ধ্যার পূর্বে বিছানাপত্র নিয়ে সরকারী চাকরী ছেড়ে আমাকে দিল্লী পরিত্যাগ করে তার সাথে চলে যেতে হবে। হীরা গল্প হলেও, দিল্লী গল্প নয়। গল্পের ঘটনাস্থল দিল্লী।

গল্পের অর্ধেক যখন সত্যি তখন বাকী অর্ধেক সত্যি হতেও নাকি দেরী লাগবে না!

দিল্লী জংশনে বসেই গল্পটার 'ফিনিশিং টাচ' দিয়ে দিলাম। গার্ডের হুইসল সাথে সাথে সিগন্যালের বাতিটা সবুজ হয়ে গেল। ট্রেনটা হুস করে ছেড়ে দিল।

নীলকণ্ঠ

শক্তি মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের জাল দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে তুমি
তোমার মনের—
বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলো যতই জড়াবে তার
স্মৃতির মন্থনে পাবে নির্ভেজাল বিষ।
নীলকণ্ঠ হতে কি পারো শতাব্দীর যুগে?

কোনদিন ভালোবাসা নাই যদি পেলে
অবিশ্রাম ভাবনাতে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকাশ।
পৃথিবীটা মনে হবে মুমূর্ষু যাতনায়
আচ্ছাদিত শব।

পর্বত প্রমাণ ব্যর্থ সমুদ্র হৃদয়ে
নতুন দ্বীপের জন্ম: নিঃস্বার্থ প্রেমিক মনের
আকাঙ্খিত কামনার দুর্লভ প্রয়াস

এযুগের নীলকণ্ঠ বিষের জ্বালায়
যৌবনে বার্ধক্য নিয়ে আসে প্রতিদিন;
জীবনের হতাশাকে সান্ত্বনার বাণী দিয়ে ঢেকে
বিচ্ছিন্ন চেতনায় সত্যের আশ্রয়ে উপনীত।

সুদীর্ঘ শতাব্দীর যুগে
নীলকণ্ঠ হওয়া যায়, যদি—
পুনঃপুনঃ অনুর্বর মানস-ভূমিতে
ফেলে আসা জীবনের ব্যর্থ-বসন্তকে নিয়ে
অবিরত মন্থন করো।

সে মন্থনে উঠবেই প্রত্যাশিত কামনার ঝড়
জীবন-যৌবন।
এবং সুদুর্লভ রমণীর প্রেম।
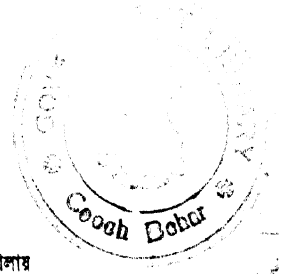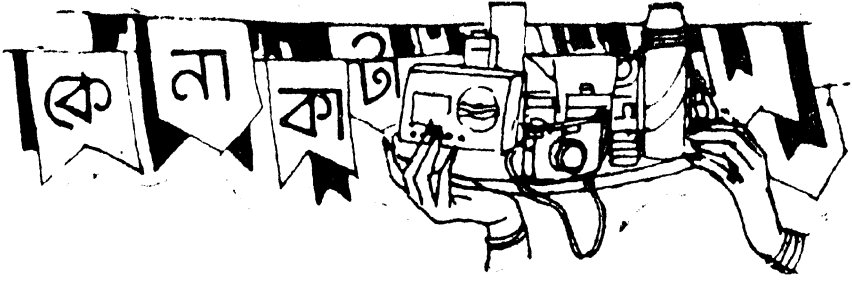
ক্ষুদ্র শিল্প—কয়েকটি কথা

আজকের দিনে প্রত্যেক দেশই শিল্পোন্নত হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতেরও যে এদিকটায় দৃষ্টি নেই, সে বলা চলে না। বরং স্বাধীন হবার পর থেকে শিল্প বিষয়ে অগ্রসর হবার বিশেষ প্রয়াস চলেছে এদেশেও। অপর দিকে, নব ভারত গঠন পরিকল্পনায় শুধু ভারী শিল্পই নয়, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও স্থান পেয়েছে অনেকখানি।

একথা ঠিক, ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটীরশিল্পের দিক থেকে ভারত আশানুরূপ অগ্রগামী হতে পারেনি। রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানোন্নত দেশসমূহে ভারী শিল্পের পাশা-পাশি রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পেরও ব্যাপকতা। প্রাচ্যের জাপানে ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটীর-শিল্পের স্থান প্রথম শ্রেণীতে বলা যায়। ভারতে ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এর জন্যে চাই সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফেরই নিবিড় সহযোগিতা।

পরাধীন যুগে ভারী শিল্প বলতে গেলে এ দেশে তেমন ছিলই না। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর-শিল্পসম্পদকে কোণঠাসা করে রাখবার জন্যেই ছিল বিদেশী সরকারের বিশেষ প্রয়াস। এই কারণেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে ছিল অনেকাংশে—চড়া দামে বিদেশী পণ্য আমদানী করে আপন চাহিদা মিটানো ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। জাতীয় সরকার এই দুর্নীতির কথা বিবেচনা করেই ভারী শিল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতির জন্যেও জোর দিয়েছেন। এবং এর ফলে এই কয় বছরের ভেতরেই পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অপর সব রাজ্যে শিল্পের যথেষ্ট সমৃদ্ধি হয়েছে—বাইরের আমদানীর ওপর এদেশে নির্ভরতা আগের তুলনায় কমে গেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

সরকারী উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীরশিল্প গড়ে উঠছে আজ নানা জায়গায়; চামড়ার কাজ, তাঁত চালনা, বাঁশ ও বেতের কাজ, নানারূপ নক্সার কাজ, মাটির কাজ, খেলনা ইত্যাদি তৈরীর কাজ—এ সব এক্ষণে প্রায় ঘরে ঘরেই চলেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বহু ক্ষুদ্র শিল্পই গড়ার উদ্যম আজকের দিনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য যে জিনিস বা শিল্পসম্পদই তৈরী হবে, তার মান ও উপযোগিতা না থাকলে নয়। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হলে, দেশীয় জিনিসের নিশ্চিত বাজার চাইলে, এদিকটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে আগে থেকেই। বৃহৎ শিল্পসংস্থা বা কারখানায় বৃহৎ যন্ত্র বা শিল্প-সামগ্রী উৎপাদিত হোক, কিন্তু ক্ষুদ্র যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের জন্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থা বা কারখানা অত্যাবশ্যক। এই শিল্প ব্যবস্থা যত বেশি চালু হবে, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নিকটতর হবে ততই; এতে বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশেষজ্ঞ যিনি হবেন

সংসারে সব মানুষই একই রকম গুণবিশিষ্ট হবে—চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতা হবে সকলেরই এক পরিমাপের, এমন আশা বৃথা। কোন বিশেষ বিষয়ে কেউ যদি অপর সকলের চেয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারলো, তার বিশেষ মূল্য সর্বত্র স্বীকার্য। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলতে তাকেই বুঝোবে—সাধারণের থেকে অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে হলেও যিনি স্বতন্ত্র, অনেকখানি আগুয়ান।

গোড়া থেকেই আবশ্যক প্রযত্ন থাকলে সাধারণও অসাধারণ হয়ে দেখা দিতে পারে, কুশলীও নয় এমন লোকও হতে পারে নামকরা। কিন্তু তাই বলে সমাজে সকলেই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারবে, এই জাতীয় দাবী বোধ করি অতিরিক্ত বা অবান্তর। বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত শুধু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই নিয়েই সমাজ সংসার চলে না। এক দুইটি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হ'তে যিনি পারবেন, তাঁকে বলা হবে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু সেই এক দুইটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের দ্বারাই সকল প্রয়োজন মিটে না। বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনের দিকটাও সময় থাকতেই ভেবে দেখবার।

কোন্ মানুষের কি বিশেষ গুণ আছে, প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য কোথায় আশ্রয় করে আছে কাকে, অমনি বলা সম্ভব নয়। নিয়মিত অনুধাবন ও অনুশীলনের ভেতর দিয়েই সেইটি ধরা পড়বার সম্ভাবনা। সাধারণের মধ্য থেকেই অসাধারণ বের হয়ে আসে, প্রত্যেকেরই মনে এই আস্থা থাকা দরকার। কর্মজীবনে কোন্ কাজে গেলে বৈশিষ্ট্য দেখানো যাবে, কোন লাইনে যাবার ঝোঁক সত্যি সত্যি বেশি, যতদূর সম্ভব আগেভাগেই এইটে স্থির হয়ে যাওয়া চাই। নিশ্চিত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র এগিয়ে যেতে হবে সাহসে বুক বেঁধে। সকল বিষয়ে কর্মশক্তি বা প্রতিভার বিকাশ হবার সুযোগ না মিললেও কোন একটি বিশেষ দিকে সেইটি হতে পারে, এ মোটেই বিস্ময়ের নয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ লোকের প্রয়োজনের মাত্রা যথেষ্ট বেড়েছে। জাতির অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের উদ্যম বা পরিকল্পনাসমূহ যাতে দ্রুত সফল হতে পারে, সেজন্যেই এই বিপুল চাহিদা। উদীয়মান কর্মীদের এক্ষণে উচিত হবে—আগে থেকেই পছন্দসই কাজের লাইন বেছে নেওয়া এবং বেছে নিয়ে সেই লাইনে সম্যক্ দক্ষতা অর্জন করা। একটি বিশেষ লাইনে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকতে পারলেই অগ্রগতির দ্বার আপনি খুলে যাবে।

আবারও বলতে হয়, বিশেষজ্ঞ হওয়া অর্থই কোন বিশেষ বিষয় বা লাইনে আবার সকলের তুলনায় অত্যধিক অধিকার অর্জন। এই কারণেই বিশেষজ্ঞদের সুনাম ও জনপ্রিয়তা আপনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কাজের জন্যে যোল আনা আন্তরিকতা না থাকলে বিশেষজ্ঞ পদবাচ্য হওয়া সহসা হয় না। স্ত্রী-পুরুষ সকলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কথাগুলো বলা চলে। চলতি পথে আস্থা হারিয়ে ফেললে চলবে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও হবে না। বিশেষজ্ঞ যিনি হবেন, তাঁর ধর্ম হবে তপস্বীর মতো অর্থাৎ এক চিন্তা, এক ধ্যান, যেমন করেই হোক সঙ্কল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। আর কোথাও ভুল করা না হলে, অপ্রত্যাশিত বাধা না আসলে সাধনা সিদ্ধিকে বহন করে আনবেই।

ফসল সংরক্ষণ—বিভিন্ন ব্যবস্থা

চাষ করে জমি থেকে ভালো ফসল পেতে হলে নানা দিকে নজর রাখবার প্রয়োজন হয়। বীজ ও সার ভালো হলেই যে ফসল ভালো হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। আর জমিতে প্রত্যাশিত ফসল হলেও, ফসল সংরক্ষণের প্রশ্নটি থেকে যায়। জমি থেকে ঘরে নেবার মাঝখানে এবং ঘরে নেবার পরও এই নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়। এর জন্যে যখন যে ব্যবস্থা আবশ্যক, সেটি নিতেই হবে। অন্যথা পর্য্যাপ্ত শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করেও হয়ত দেখা যাবে, মুনাফা কিছুই হলো না।

ভালো ফসল পাবার জন্যে সার-বীজ বেশ ভালো চাই, এর উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পাশাপাশি আর একটি জিনিস যা প্রয়োজন, সে হলো যেমন করেই হোক উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। নানা জাতীয় রোগের কবলে পড়ে চারা গাছ ধ্বংস হয়, শস্য বা ফসল বিনষ্ট হতে দেখা যায় অঙ্কুরেই। পঙ্গপালের আক্রমণেও প্রতি বছর ফসলের কম ক্ষতি হয় না দেশে-বিদেশে। আরও কত কি উপদ্রব উৎপাত আছে, ফসল বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে যাদের কোনটি উপেক্ষা করলে চলে না। বিজ্ঞানের সহায়তায় সর্ব্বরকম প্রতিষেধক বা প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার সেজন্যেই দাবী উঠে।

পঙ্গপালের গ্রাস থেকে ফসল সংরক্ষণ একটি কঠিন ব্যাপার। মাঠ কে মাঠ তারা দল বেঁধে ধ্বংস করে দিয়ে যায় আর সেটি খুবই অল্প সময় মধ্যে। চিরাচরিত ব্যবস্থা যেমন, গলা ছেড়ে চীৎকার করা, দমাদম টিন পিটানো—এসবে পঙ্গপাল ঠেকানো যায় নি কোন কালেই। অবিলম্বে কীটঘ্ন রাসায়নিক ছড়িয়ে দিলে পরই মাত্র এই শস্য-বিধ্বংসী জীব বহুপরিমাণে ধ্বংস হয়। আধুনিক যুগে আকাশে পঙ্গপালনাশক রাসায়নিক ছড়ানোর কাজে বিমান ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এতে দ্রুত সুফল পাওয়া যায়।

শুধু পঙ্গপালই নয়, বহু রকমের কীট-পতঙ্গ আছে—যারা ফসলের প্রত্যক্ষ শত্রু। 'লাল মাকড়সা' এক শ্রেণীর খুব ছোট পোকা, কিন্তু ছোট হ'লে কি হবে, এদের দলবদ্ধ আক্রমণে তুলোর ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। তুলোর পক্ষে ক্ষতিকারক আরও দুই জাতীয় কীট রয়েছে—'কাট ওয়ার্ম' ও তুলো-শুঁয়োপোকা। 'রোডেন্ট' নামে একরকম মেঠো ইঁদুর বীট-আলু প্রভৃতি ফসলের সর্বনাশ করে থাকে, যেমন গম আর যবের চারাগাছগুলো ছারখার করে দেয় 'উইভিল' নামীয় এক জাতীয় কীট।

উদ্ভিদ্ ও ফসল কি ভাবে সংরক্ষণ করা যায়, এই নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মহল গবেষণা আলোচনা চালিয়ে এসেছেন বহুদিন থেকে। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, জাপান, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে নতুন নতুন কীটঘ্ন রাসায়নিক আবিষ্কৃত হয়েছে এর ভেতর। ফসল সংরক্ষণের জন্যে এ সকল শক্তিশালী ও পরীক্ষিত রাসায়নিক ভারতেও প্রয়োজনবোধে আমদানী করা অনুচিত হবে না। ডি, ডি, টি 'হেক্সা ক্লোর‍্যান', ক্লোরিন মিশ্রিত বিবিধ জৈব রাসায়নিক প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারাও ফসল ধ্বংসকারী কীট বিনষ্ট করার উদ্যম নানা দেশে বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নে দেখতে পাওয়া যায়। কীটনাশক রাসায়নিকগুলোর মধ্যে আরও কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—থিওকোল, অক্টামিথাইল, মারক্যাপটোকেস ইত্যাদি। ফসল সংরক্ষণের জন্যে এসকল নিয়ে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে বহু জায়গায়।

শস্য সংরক্ষণকল্পে উপায় উদ্ভাবনে রুশিয়া সেই থেকেই যথেষ্ট তৎপর বটে, কিন্তু আমেরিকাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নয়। মার্কিণ গবেষণা দপ্তরগুলো এর ভেতর বহু কীটঘ্ন রাসায়নিক বা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। ফসল সংরক্ষণে আমেরিকা আজ তাই এতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি মার্কিণ কৃষি দপ্তরের গবেষণা বিভাগ প্রচার করেছেন—মাটির অভ্যন্তরস্থ অত্যন্ত ক্ষতিকর 'নেমাটোড' জাতীয় ও অতিক্ষুদ্র 'এল' জাতীয় কীটসমূহ চিনির সাহায্যে বিধ্বংস করা যায়। মৃত্তিকাজাত কীটধ্বংসের এই উপায় বা প্রক্রিয়াটি অনুসরণ বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ, তবে এ একটি অভিনব কার্য্যকরী আবিষ্কার।

মোটের ওপর, এটি স্বীকার করতেই হবে—ফসল উৎপাদনই শুধু বড় কথা নয়, ফসল ঠিকভাবে সংরক্ষণও বড় প্রশ্ন। মাঠ থেকে ফসল তুলে আনার পরও ফসল সংরক্ষণের প্রশ্নটি থেকে যায়—যে প্রশ্ন মেটাবার জন্যে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আজকাল গুদামঘর তৈরী করা হচ্ছে নানাস্থানে। ন্যায্য মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত নিরাপদে ফসল যাতে মজুত রাখা চলে, সেই লক্ষ্য থেকেই আধুনিক গুদামঘরগুলোর পরিকল্পনা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে এদেশে প্রায় ৭০০টি গুদামঘর (কতকগুলি ঠাণ্ডা ঘর সহ) সংস্থাপন সম্ভব হবে বলে দাবী করা হচ্ছে। ফসল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ ধরণের যত ব্যবস্থাই অবলম্বিত হবে, ততই ভালো বলা যায়।

ফসল ফলানো যেদিন থেকে সুরু হয়েছে, ফসল সংরক্ষণের প্রশ্নটিও মানুষের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অবশ্য সেই থেকেই। আজকাল পূর্ব্বের তুলনায় অনেক রকমারী কীটঘ্ন রাসায়নিক ব্যবহৃত হচ্ছে, উপায় বা প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে নানা ধরণের, এ-ও স্পষ্ট। কিন্তু সকল ব্যবস্থাতেই ফসল বা খাদ্যশস্যের গুণ অটুট থাকছে কিনা, সেই দিকে লক্ষ্য না রাখলে নয়। 'কোল্ড ষ্টোরেজ' বা হিমকক্ষে আলু প্রভৃতি জিনিস রেখে দেখা গেছে, সে-সব দীর্ঘদিন পচল না বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত সমস্ত গুণ ওদের এইভাবে পুরো বজায় থাকে না। কাজেই কি মাঠে, কি ঘরে ফসল বা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যাপারে আলোচনা-গবেষণার আরও প্রচুর অবকাশ রয়েছে। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সমধিক দায়িত্ব উপলব্ধি করবেন।

সিক্ত যূথীর মালা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

ছয়

মৈত্রবাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল। এতক্ষণের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা সমাপ্ত। সচকিত হয়ে তাকাল শর্মিষ্ঠা।

উঁচু পাঁচিলে ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী, সামনে বড় বাগান। মস্ত বড় লোহার ফটক, তার ওপর উঠে দু'-তিনটে লোক বাঁশের ওপর লাল-সাদা কাপড় জড়িয়ে নহবৎখানা তৈরী করছে। গাড়ী থামতে চেয়ে দেখল তারা।

মুহূর্তের জড়তায় পা দু'টো আড়ষ্ট হয়ে আসছে—পাছে ভুবন সন্দেহ করে কিছু, চোখাচোখি হবার আগেই সব দ্বিধা কাটিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল চট করে কোনদিকে না তাকিয়ে, ভেতরে ঢুকে ইটের চওড়া বাঁধানো রাস্তা ধরে বাড়ীর দিকে এগোল। প্রথমেই চোখে পড়ল ঠাকুরবাড়ী—জানে নিত্য নারায়ণসেবা হয় বাড়ীতে। অনেকগুলো চওড়া লাল সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুর দালান, নাটমন্দিরে সজ্জাকররা বরাসন সাজাচ্ছে। শর্মিষ্ঠা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। অনেকগুলো ছোট ছেলে-মেয়ে চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে বরাসন সাজানো আর প্রাণপণ শক্তিতে বিরক্ত করছে সজ্জাকরদের। এরই ফাঁক দিয়ে হৈ-হৈ করে ছুটোছুটি খেলছে কেউ কেউ। শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে চাইল।

ভুবন এসে পৌঁছোয়নি এখনও, গাড়ী থেকে শর্মিষ্ঠার স্যুটকেশ নামাতে এবং লোক জোগাড় করে সেটা তার মাথায় চাপাতে ব্যস্ত আছে। এখানে এসে তো আর কিছু নিজে বয়ে নিয়ে আসতে পারে না, একটা ইজ্জত আছে তো!···শর্মিষ্ঠা হঠাৎ এসে দাঁড়াতে ছেলে-মেয়েগুলোর নজরে পড়েছে সহজেই, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বরাসন তৈরীর চেয়েও দ্রষ্টব্য কিছু ঠাউরেছে তাকে, কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছে না কা'কে চাই।

অবশেষে ওদের মধ্যে থেকে একটি বার-তের বছরের ছেলেকে নিজেই হাতছানি দিয়ে ডাকল শর্মিষ্ঠা। মুহূর্তের মধ্যে সমাপ্তপ্রায় বরাসনের চারপাশ ফাঁকা, হুড়মুড়িয়ে এসে ঘিরে ধরেছে সবাই শর্মিষ্ঠাকে, ছেলেটি কাছে এসে পৌঁছোবার আগেই। জোড়া জোড়া প্রশ্নময় চোখ বা মুখে আঙুল পুরে দিয়েছে দুটো, কেউ বা আপন-মনে বুড়ো আঙুলের নখটা খেতে শুরু করেছে।

শর্মিষ্ঠা সেই ছেলেটির দিকে তাকাল, "ইন্দুভূষণ মৈত্র তোমার কে হন?"

—"দাদু।" সমবেত কণ্ঠের উত্তর।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি বিরক্ত হয়েছে, ভ্রূ কুঁচকে হাতের কাছের একটাকে ঠেলা মারল, "এই, চেঁচাচ্ছিস কেন সবাই? যা এখান থেকে।"

নড়বার কোন লক্ষণ দেখালো না কেউ। পেছন থেকে বেড়াবিনুনি বাঁধা একটা ছোট্ট মেয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, "ওঃ, তোর হুকুমে।"

তার মাথায় একটা চাঁটি কষাল ছেলেটি—"সাটআপ!

মাথায় হাত বুলিয়ে চোখ রাঙাল সে "মারলি যে! যাব মা'র কাছে?"

—"যাযাঃ, বেশী ভয় দেখাসনি।"

—"কি রে বুড়ো, কি হয়েছে?"

শর্মিষ্ঠা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে, বোধহয় বাইরে থেকে আসছে, হাতে কি কতকগুলো জিনিষপত্র। গতিক দেখে শর্মিষ্ঠা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল প্রায়, ছেলেটিকে দেখে আশার সঞ্চার হচ্ছে।

বুড়ো বলল, দ্যাখ না রাঙাকাকা, কি রকম অসভ্যতা করছে জলি। শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়ে বলল, "এঁর সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না।"

ভীড়টা পাতলা হয়েই এসেছিল, বাকী ক'টাকেও তাড়িয়ে দিয়ে শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরল বুড়োর রাঙাকাকা। কালবিলম্ব না করে শর্মিষ্ঠাও শরণ নিল তার।

"ইন্দুভূষণ মৈত্র আছেন?"

—"হাঁ আছেন আসুন।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শর্মিষ্ঠা এগোল তার সংগে।

ঠাকুরদালানের পাশের রাস্তা দিয়ে মূল বাড়ীতে নিয়ে গেল ছেলেটি। সামনে বারান্দা দেওয়া একসার ঘর, তারই একটায় ইন্দুভূষণের বৈঠকখানা। জমিদারী গেছে বটে, কিন্তু জমিদারী কায়দাটি বজায় রেখেছেন ইন্দুভূষণ। চৌকীর ওপর ধপধপে সাদা বিছানা পাতা, তারই ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে কোলের কাছে হাতবাক্স আর ছোট চৌকী নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে বোধহয় মেয়ের বিয়ের হিসাব-নিকাশ করছিলেন।

ঘরে ঢুকে দরজার কাছে থেকেই ছেলেটি ভীত-কণ্ঠে ডাকল, 'জ্যাঠামশাই?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ তুলেই সামনে শর্মিষ্ঠাকে দেখে বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করলেন ইন্দুভূষণ। প্রসন্ন হেসে তাড়াতাড়ি উঠে এসে অভ্যর্থনা করলেন। বোধহয় আশা করেননি শর্মিষ্ঠা সত্যই তাঁর কথা রেখে এসে থাকবে, বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে কি না তাতেও সন্দেহ ছিল।

···তাই অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাসটা একটু অতিরিক্তই হ'ল।···

ভাইপোকে বললেন, "ওরে মণ্টু, তোর দিদিদের কাউকে ডেকে আন, দেখুক এসে কে এসেছে—নিয়ে যাক বাড়ীর ভেতর।"

একটু পরেই ইন্দুভূষণের বড় মেয়ে করুণা এলেন, গিন্নীবান্নি ভদ্রমহিলা, বেশ একটি শ্রী আছে চেহারায়।

ইন্দুভূষণ তখন শর্মিষ্ঠাকে চৌকীতে বসিয়েছেন।

বলছিলেন, "পথে কোন কষ্ট হয়নি তো মা? এত দেরী করে এলে? তোমারই বোনের বিয়ে, দু'দিন আগে আসতে হয়?"

করুণাকে দেখে বললেন, "এই ত্থাখ কে এসেছে। চিনতে পারিস?"

শর্মিষ্ঠা দেখছিল তাকিয়ে, গিন্নীবান্নি ভদ্রমহিলা, কিছু এমন সুন্দর মন, বেশ একটি শ্রী আছে কিন্তু চেহারায়। উঠে এসে প্রণাম করল।

করুণা জিজ্ঞাসু নেত্রে পিতার দিকে চাইলেন। মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি।

—"পারলি না তো! এই তো শর্মিষ্ঠা, শান্তির মেয়ে। কলকাতা থেকে বীণার বিয়েতে এল।"

—"ও মা, কি আশ্চর্য্য! আমার আর দোষ কি বল, দেখা-সাক্ষাৎ তো নেই! এস ভাই এস, আমি তোমার বড়দিদি হই। ভেতরে নিয়ে যাই বাবা?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়। নিয়ে যাও, হাতে-মুখে জল দিক, কিছু খাক।" ইন্দুভূষণের কণ্ঠে ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। একটু হেসে বললেন, "নিজেদের বাড়ীতে ও আবার কুটুম তো, সবাইকে চিনিয়ে টিনিয়ে দিস।"

করুণার সঙ্গে শর্মিষ্ঠা এবার ভিতর বাড়ীর দিকে।

বিরাট বাড়ী, নীচের তলাতেই কত যে অজস্র ঘর, তার ঠিক নেই।

যেতে যেতে করুণা বললেন, "ওপরে এখন আর নিয়ে যাচ্ছি না ভাই তোমায়, রান্নাবাড়ীতে মা-কাকীমা সবাই রয়েছেন, সেখানেই চল।"

চারিদিকে লোকজন। অনেকেই নানা কাজে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। ঘরে ঘরে আড্ডা দিচ্ছে অনেকে।

অনেকগুলো কিশোরী মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করছিল। ওদের দেখে চুপ করে গেল প্রথমে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে আলোচনা তারপর। শর্মিষ্ঠার পরিচয় নিয়ে গবেষণা চলছে নিশ্চয়ই!···হাসি পেল শর্মিষ্ঠার।···অতি কৌতূহলী দু'-একজন দৌড়ে এসে করুণার হাত ধরল, চুপি চুপি কৌতূহলটা মিটিয়ে নেবার বাসনায় সশব্দে ফিসফিস করে প্রশ্ন করতে করতে চলল সংগে সংগে।

ছোট-বড় মিলিয়ে একদল ছেলেমেয়ে সামনে পড়ল হঠাৎ, করুণাকে দেখেই পিছু হটে পেছনে হয়ত লুকোচ্ছে। শর্মিষ্ঠার মনে হয়নি কিছুই, তাদের পাশ কাটিয়ে এগোতেই যাচ্ছিল, কিন্তু থামতে হল, করুণা দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

সক্রোধে বললেন, "ভেনের মিষ্টিগুলো সমস্ত শেষ করে দিলে রে! এই না সবাই নিয়ে চলে গেলি, আবার এসেছিস যে!"···কারো পিঠে চড়-চাপড়টাও পড়ল।

"ওরে হতচ্ছাড়া ছেলে, তুই না অসুখ থেকে উঠলি? কাউকে বললেন, কা'উকে বা "ষোল বছরের ধিঙ্গি, তুমিও এখানে; আজ বে' দিলে যে কাল শ্বশুরঘর করতে হবে! যা, দিদিদের কাছে গিয়ে বোস।"

কৌতুক বোধ করল শর্মিষ্ঠা। এরা নিশ্চয়ই করুণার নিজের ছেলে-মেয়ে।

অন্তগুলোর কাছে ইনিই আবার অন্তমূর্ত্তি।

ক'টাকে মিষ্টমুখে বললেন, "ছি বাবা, অসুখ করবে যে! অথবা "বলব তোর মাকে।" এরা বোধ হয় বোনপো-বোনঝি!

ক'টাকে আবার শাসালেন, "দাঁড়া তোদের কি করি ত্থাখ! ওরে ভায়েদের ডাক তো! ভাইপো-ভাইঝিরা বড় পিসীমার হাত এড়াতে দৌড়ে পালালো। অন্তরাও অনুসরণ করল তাদের।

শর্মিষ্ঠা সকৌতুকে হেসে উঠল।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন করুণা, "দেখ না ভাই, কি সব কাণ্ড করে! এখানে এসে আমার গুলোকেও আর সামলাতে পারি না, দলে পড়ে দুষ্টুমি করে!"

রাগ নেই, কণ্ঠস্বরে স্নেহের আভাস।

একটু আগে যে মেয়েটিকে বকে উঠলেন, তাকে মনে পড়ল শর্মিষ্ঠার। শুকনো মুখে ওদের দল ছেড়ে সরে গেছে সে।

নির্বিকার মুখে এগিয়ে চলেছেন। মেয়েটাকে আবার ডেকে তার কৈশোরের আনন্দটুকু সাময়িকভাবেও ফিরে পেতে দেবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। শর্মিষ্ঠা নিজের মনেই নিঃশ্বাস ফেলল একটা।···করুণা অন্ততঃ চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকেই মাতৃস্নেহ প্রকাশ করে চলেছেন, সেই নিয়মেই মানুষ হতে হবে তাঁর সন্তানকে···সুপক্ক মাতৃস্নেহ তাঁর এত সহজে বিচলিত হয় না!

লাল সিমেন্টের প্রকাণ্ড দালান একটা, তারই ধারে ধারে অনেকগুলো ঘর মিলিয়ে রান্নাবাড়ী। চারদিকে অনেক আলো, অনেক লোকজন। ডুমগুলো যে দু'-একদিনের মধ্যে লাগানো হয়েছে বেশ বোঝা যায়—প্রতিদিন ব্যবহারের মালিন্য তাই কাঁচের গায়ে লাগেনি।

···একটু লাগলেই যেন ভাল হ'ত।···

পুরোনো দালানে আলোটা যেন বেমানান রকম ঝকঝকে, বড় বেশী চোখে লাগার মত।···

সারা দালান জুড়ে 'যজ্জি'র আয়োজন।

এক পাশে ভাঁড়-খুরি স্তূপ করা আছে, ধুয়ে এনে গোছা করে রাখছে আরও। একজন বসে কলাপাতা কেটে রাখছে। দু' তিনটে শিল পড়েছে একপাশে, ঝিয়েরা বাটনা বাটছে বসে। সেইখানেই স্তূপাকার করে আনাজ ঢেলেছে, বঁটি পড়েছে অনেকগুলো।···জিনিষে আর লোকের ভীড়ে সারা দালান থৈ-থৈ করছে একেবারে—পাশ কাটিয়ে চলাই দায়।

দালানের মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিয়ানের বামুনদের সঙ্গে চিনির পরিমাণ নিয়ে বচসা করছিলেন যে চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ী-পরা গৃহিণীটি, তাঁকেই সম্বোধন করলেন করুণা, "ও মা, এই দেখ কা'কে এনেছি। কে বল দেখি?"

মুহূর্তের জন্য প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল দালানের সব হৈ-চৈ।

সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখছে শর্মিষ্ঠাকে।

অস্বস্তি লাগছে। মুহূর্তের জন্য মনে হ'ল কেন যে এলাম মরতে অত জেদ করে!

ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে এসে প্রণাম করল জ্যাঠাইমাকে।

চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন করলেন তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

শর্মিষ্ঠাও দেখল। করুণারই মত দেখতে, সামনের চুলে পাক ধরেছে বেশ, কপালে সিঁদূরের টিপটি ভারি মানিয়েছে মুখে।

দ্বিধাগ্রস্ত-কণ্ঠে বললেন, "কে বলতো? বিনোদের বৌ কি?"

—"সে কি গো মা! বৌ মানুষের এই রকম সাজ! সিঁদুর কৈ?"

করুণা হেসে উঠলেন।

—"সিঁদুর কি আর আমি বেঁটে মানুষ দেখতে পাচ্ছি মা! বিনোদের বৌ আজকালকার মেয়ে শুনলুম কি না, তাই ভাবলুম—ন্নে যে এটি?"

—"মেজ কাকার মেয়ে গো, শর্মিষ্ঠা। কলকাতা থেকে বীণার বিয়েতে এসেছে।"

ক্ষণকাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন জ্যাঠাইমা। "ওমা, আমি কোথায় যাব! মেজঠাকুরপোর মেয়ে এত বড় হয়ে গেছে! তা তো হবেই—কত বছর হয়ে গেল।"

ঝিয়েরটা সামনে অনেক আদর করলেন। নিজে কুটনো কুটতে বসে আসন পাতিয়ে পাশে বসালেন। করুণা নিজে হাতে খাবার দিয়ে এলেন। ওপর থেকে টেবিলফ্যান এনে ফিট করা হল।

আপ্যায়নের ঘটা দেখে শর্মিষ্ঠা অপ্রস্তুত। তবু পাখার হাওয়াটা গায়ে লাগতে বাঁচল যেন। একে বর্ষাকালের গুমোট গরম, তার ওপর এই বদ্ধ দালানে লোকের ভীড়, উত্তাপটা অসহনীয় লাগছিল। পাশেই ঢাকা বারান্দায় মিষ্টির ভিয়ান বসেছে আবার, আগুনের তাপ আসছে দালানে—গরমে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

দালান জুড়ে নানা জনে নানা কাজে ব্যস্ত। শর্মিষ্ঠাকে দেখে তাদের কাজের গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেকটা।

তার সম্বন্ধে সবাই আগ্রহী। কাজের ছুতোয় কাছে এসে দেখে যাচ্ছে কেউ, ফিরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করছে। সামনের ঘর থেকে আনন্দনাড়ু ভাজতে ভাজতে দু'জন মহিলা উঁকি মেরে দেখছেন বার বার। দালানের শেষ প্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে বসে আভ্যুদয়িকের চাল বাছছিলেন এক বর্ষীয়সী। দূর থেকে শর্মিষ্ঠার পরিচয়টা অনুধাবন করতে পারেন নি বোধহয়। অপ্রতিরোধনীয় কৌতূহলে উঠে এসে কাছে বসলেন। "এটি কে গা বৌমা?"

প্রৌঢ়াটির কোটরগত দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বিরক্তিকর। চোখ সরিয়ে নিয়ে শর্মিষ্ঠা অন্য দিকে তাকাল।

জ্যাঠাইমা বললেন, "এটি আমার দেওরঝি পিসীমা, মেজ দেওরের মেয়ে—কলকাতা থেকে আসছে।"

—"অ মা, শান্তিভূষণের মেয়ে! পেথম পক্ষের না? মামার বাড়ী ছিল তো মেজ বৌ মরতে অবধি?"

শর্মিষ্ঠার কপালটা নিজের অজ্ঞাতেই কুঁচকোলো একটু।

জ্যাঠাইমা কৈফিয়ৎ দিলেন, "হ্যাঁ, ওর মামারও তো আপনার কেউ ছিল না, বোনটিও গেল, এই ভাগ্নীটিকে বুকে নিয়ে জুড়িয়েছিলেন তবু।"

পিসীমা মানে আত্মীয়া কেউ নন। পাড়ার ময়রাগিন্নী।

কিন্তু মুহূর্তেই অনেক আত্মীয়ার ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠলেন।··· তবুও আর নতুন ভুল করলেন না কেউ, আলোচনাটা একবার যখন তাঁদের টেক্কা দিয়ে তিনি শুরু করেই ফেলেছেন তখন আর সেটা থামতে দিলেন না, নিজেদের এতক্ষণের অহেতুক সঙ্কোচকে ধিক্কার দিয়ে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন সবাই।··· "এত দিন আসতে না কেন মা, হাজার হোক বাপের বাড়ী তো এটাই."··· "মামার সম্পত্তি কি তুমিই পেলে"···"এখনও বে'থা হয়নি কেন"··· "এই বয়েসে মেয়ে বাড়ীতে একা থাকে নাকি গো"···!

ভাগ্য ভাল, প্রশ্নের স্রোতের মুখে হালটা জ্যাঠাইমাই ধরে রইলেন। কৃতজ্ঞবোধ করল শর্মিষ্ঠা! উত্তরগুলোয় সত্যের চেয়ে মিথ্যার অংশ যতই বেশী থাক, তবু জ্যাঠাইমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হবার মত।···ভদ্রমহিলা গুছিয়ে কথা বলতে জানেন বটে!···কে বলবে পনেরো বছর পরে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আজ তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ!

আলোচনাটা শর্মিষ্ঠাকে ছেড়ে শর্মিষ্ঠার বাবার দিকে ফিরল। "মেজ মামাবাবু যে এবারও এলেন না বড় মামীমা!"

—"না মা, কৈ আর," জ্যাঠাইমা নিঃশ্বাস ফেললেন, "সে তো একেবারে পর হয়ে গেছে। বলে তার নিজের মেয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক নেই তার, আমাদের কথা ছেড়েই দে···।"

চারদিকে সমবেদনার ঝড় উঠল।

হাসি পেল শর্মিষ্ঠার। শান্তিভূষণ তার কতটা আপনার লোক, সেটা এরা যেমন বোঝে, সে তার শতাংশের একাংশও বোঝে না।

ময়রাগিন্নী বললেন, "কি পাষাণ গো! বিয়ে করেছে বলে আগের পক্ষের মেয়েটার একটা খোঁজ নিতে নেই এত বছরের মধ্যে?"

ভটচাযিগিন্নীর বড় মেয়ে সমর্থন করলেন তাঁকে—"তাই বলি, মেয়ে আর আসবে কোন মুখে! বাপই খোঁজ নেয় না তার প্রাণটা কেমন হয় বল দেখি!"

বসিরহাটের মেজ তরফের ছোট গিন্নী বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "কিন্তু শান্তি-ঠাকুরপো তো এমন ছিল না ভাই! দেখেছি তো চিরকালই। তাই তো আমরাও সব বলাবলি করি বটঠাকুরের অমন লক্ষ্মণের মতন ভাই—"

—"এ পক্ষের বৌ যে তাকে আসতে দেয় না, বুঝছ না?" শর্মিষ্ঠার সামনে বসে কুটনো কুটছিলেন একটি বউ, তিনি এবার মুখ খুললেন। "বিয়ে হয়ে যখন এল, তখনই আমার ভাল লাগেনি। ঠাকুরঝিকে জিগেস করে দেখ, তাকে আমি তখনই বললুম—"

শর্মিষ্ঠা যেন একটা নাটকের অভিনয় দেখছে। প্রথমের বিরক্তিটা কেটে গেছে, এখন নির্লিপ্ত ভাব একটা। নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর যেমন বিরক্ত হওয়াটা বাতুলতা এদের ওপরও তেমনি।

কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবটা বজায় রাখাও শক্ত বটে।

এসে অবধি একটা থুরথুরে বুড়িকে দেখছে বসে বাটনা বাঁটছে বটে, তবু সব দিকেই প্রখর দৃষ্টি। আন্দাজেই বুঝেছিল বাড়ীর পুরোনো ঝি।

হঠাৎ সে-ও এই আলোচনায় যোগদান করল। সেই বউটির কথার সূত্র ধরেই বাটনা বাটা থামিয়ে হলুদমাখা হাত নেড়ে বলল, "অমন যে হবে আমি ত্যাখনই জানতুম। বড় বাবুর কি যে মতিচ্ছন্ন ধরল, এক ধিঙ্গি মেয়ে এনে বে' দিলে মেজবাবুর! সে কি ঘর করবার মেয়ে মা! সতীনঝি মানুষ করতে বড় বয়ে গেছে তার।"

দুই ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেবার বাসনাটা চেষ্টা করেই দমন করতে হল।···তবে পরচর্চ্চার সাম্যবাদ এখানে, আর কারো কোন

বিরাগ নেই। আলোচনাটা নন্দর মা'র মন্তব্যের ভিত্তিতেই এগোল। শান্তিভূষণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চেহারা, হাবভাব সব কিছু সম্বন্ধেই অজস্র নিন্দনীয় সকলেরই জানা আছে দেখা গেল, শুধু কে কি মনে করবে ভেবে এতদিন বলেনি কেউ—আজ যখন উঠলই কথাটা—। এই প্রসংগে শর্মিষ্ঠার নিজের মায়ের সংখ্যাতীত গুণাবলীর কথা স্মরণ করলেন অনেকেই, অনেকেরই চোখে জল এল।

বসে থাকতে থাকতে শর্মিষ্ঠা বুঝেছিল কুটনো কুটতে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের মধ্যে বাড়ীর লোক কমই—অধিকাংশই প্রতিবেশিনী। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত চালাচ্ছেন সবাই, কুটনো ধোয়ার জল রাখা পেতলের বড় বড় গামলাগুলো ভরতে সময় লাগছে না বিশেষ। ধগি থালায় কুটনো তুলে জল বদলাবার ফরমাস করছেন তাঁরা, কখনও বা নিজেরাই উঠছেন। কিন্তু হাতের চেয়েও মুখ চলছে বেশী। আলোচনার না আছে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু না আছে কোন নির্দিষ্ট শ্রোতা, নির্দিষ্ট কোন বক্তাও আছে কিনা সন্দেহ। সবাই নিজের নিজের বক্তব্যটা অন্যদের শোনাবার জন্য উদ্‌গ্রীব বটে, তবে নানা দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে বক্তব্যটার শেষ অবধি পৌঁছোতে পারছেন না অনেক সময়ই—নতুন প্রসংগটাকে লুফে নেবার তাগিদে পুরোনো প্রসংগটা অর্ধসমাপ্তির পথেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

লক্ষ্যটা স্থির কেবল। পরচর্চা।

শান্তিভূষণ প্রসংগ ছাড়াও আরও অনেক কিছু কথনীয় আছে।

লাল বাড়ীর ছোট বৌয়ের শ্বশুরঘর না করার কারণ সাদা বাড়ীর মেয়েদের বাচালতা, সেনেদের বাড়ীর ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা—সব কিছু নিয়েই অজস্র আলোচনা চলছে। সব কিছুতেই তাঁরা সর্বজ্ঞ। আর যাঁরা জানেন না তাঁরা জানতেও যত ব্যাকুল অন্যরা তাঁদের জানাতেও তত ব্যস্ত। এরই ভেতর কাজের কথাও হচ্ছে। মাছের কালিয়ায় কত আলু দেওয়া হবে জিজ্ঞাসা করছেন দক্ষিণ পাড়ার বামুন ঝি'। কে একজন জানতে চাইছে কাল বিয়ের লগ্ন ক'টায়। ইন্দুভূষণের সেজ মেয়ে কণা দালানের এদিকে বসে পান গোছাতে গোছাতে ওদিকের কার যেন অসুস্থ শাশুড়ীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন।

মাঝে মাঝে বড় ছেলেদের কেউ এসে পড়লে আবহাওয়াটা সচকিত হয়ে উঠছে। বৌরা ঘোমটা টানছে কপালের নীচে অবধি, পড়শীরা বাক্যস্রোত প্রশমিত করে সমীহ প্রদর্শন করছে একটু, কিশোরী মেয়ে আর বৌগুলো সহস্র লোকের সহস্রাধিক ফরমাশ শোনার ফাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়ার অজুহাতে একটু বা বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। ছেলেরা প্রচণ্ড চীৎকারে এটা সেটার খোঁজ খবর নিচ্ছে, ভিয়ানের তদারক করে আসছে একপ্রস্থ আর তারই ফাঁকে এসে আপ্যায়ন করে যাচ্ছে শর্মিষ্ঠাকে,—"বড় খুসী হলাম ভাই এসেছ বলে।" কোন বোনকে ডেকে বলছে "ওরে, ছোটদের সঙ্গে খাইয়ে দিস শর্মিষ্ঠাকে, ওর তো রাত করে খাওয়া অভ্যেস নেই!"

হৈ-হৈ—চীৎকার···বসে থাকতে থাকতে মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে যেন।

এর সঙ্গে ছোটছেলের কান্না আর বায়নার মিশ্রণ উপরি পাওনা যেন। কর্মরত মায়েরা কেউ অকারণেই শাসন করছে কেউ বা সমস্ত কাজ ছড়িয়ে রেখে ছেলে কোলে করে চলে যাচ্ছে উঠে।·

নিজেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সমগোত্রীয় কল্পনা করে পৃথিবীর চলমান জীবনস্রোত অবলোকন করার ভঙ্গীতে অলস দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসেছিল শর্মিষ্ঠা।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল, সাগ্রহে তাকে নিরীক্ষণ করে বলল, "মা, এই বুঝি শর্মিষ্ঠা?"

শর্মিষ্ঠা ফিরে তাকাল। সাধারণ ভাবে একটা চাঁপা রঙের শাড়ী পরেছে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ফেলা পিঠে, চওড়া করে সিঁদূর পরা, মোটা সোটা ফরসা হাতে গোছা ভর্ত্তি নতুন চুড়ি।

মায়ের উত্তরের অপেক্ষা করেনি। শর্মিষ্ঠার গা ঘেঁসে বসে পড়েছে।

বলল, "জান তুমি আর আমি একবয়সী, তুমি বোধহয় আমার চেয়ে মাসখানেকের বড়।"

শর্মিষ্ঠা হাসল একটু, "ও মা তাই বুঝি!"

মেয়েটি কি বলতে যাচ্ছিল আবার, জ্যাঠাইমা বললেন, "জ্যোৎস্না, তোর মেয়ে ঘুমিয়েছে?"

—"হ্যাঁ মা, এই তো ঘুমোলো।" শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরল, "জানো তুমি এসেছ খবর পেয়ে অবধি সন্ধ্যে থেকে আসবার জন্তে ছটফট করছি, তা' এতক্ষণে আসতে পারলুম। মেয়ে ভীষণ বায়না করছিল।"

—"কত বড় মেয়ে তোমার ভাই?"

উত্তর দেবার আগেই একটি বছর পনেরো-ষোলর মেয়ে ওদের কাছে এসে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

নিজের মনেই মাথা নেড়ে বলল, "ওঃ, আজ আমি বোধ হয় তিন হাজার বার সারা বাড়ীটা ছুটেছি, কি পা-ব্যথা করছে বাবা!" চোখ বুজে টেবিল-ফ্যানের হাওয়াটা উপভোগ করল একটু, "আঃ কি আরাম, আমি আর নড়ব না, যে যা-ই বলুক।"

এখানে বসে অবধি শর্মিষ্ঠা অগণিত বার এই মেয়েটিকে আসতে যেতে দেখেছে—পাতলা ছিপছিপে ছোট্টখাট মেয়েটি, গাছ-কোমর বেঁধে ডুরে শাড়ীটি পরে ভারি মানিয়েছে, সবার ফরমাস খেটে বেড়াচ্ছিল বহুক্ষণ ধরে।

ওর ক্লান্ত চেহারাটা দেখে মায়া লাগছে।

মেয়েটি জ্যোৎস্নার কথার শেষটা শুনেছিল বোধ হয়, বলল, "কেন মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস ন' দি, বল না নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলি?"

কাছাকাছির মধ্যে শুনতে পেল যারাই, হেসে উঠল।

জ্যোৎস্না মেয়েটির পিঠে একটা কিল মেরে বলল, "দেখছ, দেখছ মা কি ফাজিল হয়েছে অপর্ণা! আসুক ছোটকাকীমা, আমি বলছি।"

জ্যোৎস্না যে কত বিভিন্ন প্রসংগে কত অজস্র কথা কইল তার হদিস পাওয়া কঠিন। বাপের বাড়ী এসে রোজ একটা করে সিনেমা দেখার আনন্দ, শাশুড়ীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্প্রতি শ্বশুর চূড় গড়িয়ে দেওয়ায় ননদের রাগ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারই মধ্যে হঠাৎ একসময় সচকিত হয়ে উঠল, "হ্যাঁরে আমার ছেলে দু'টো কইরে। অপর্ণা দেখ না একটু।"

অপর্ণা তাচ্ছিল্যভরে বলল, "তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। এই ছেলেদের জন্তে টনক নড়ল তো আর রক্ষে নেই! কোথায় আবার যাবে, ঠিক আছে এখানেই। আমি আর নড়তে পারছিনে বাবা!"

জ্যোৎস্না রেগে গেল। "থাক ভাই, খেটে-খেটে সারা হচ্ছ তোমরা, আমার ছেলে, আমিই দেখছি।"

উঠতে যাচ্ছিল প্রায়, ছোটকাকীমা এসে পড়লেন। একটু গম্ভীর গোছের গিন্নীবান্নি মানুষ, নানা কাজে ঘুরছিলেন এদিক-ওদিক।

কথা কাটাকাটি কানে গিয়ে থাকবে।

কঠিন কণ্ঠে বললেন, "অপু, আগে ওঠ। কাজ বললে শুনতে জান না।"

অপর্ণা প্রতিবাদ করল না আর। রাগের প্রকাশটুকু পায়ের শব্দে রেখে উঠে গেল।

নিজের কাজে চলে যেতে যেতে আপন মনেই বললেন ছোট কাকীমা, "আমার হয়েছে এক জ্বালা! ওদের জন্তে কথা শুনে মর! পাপের ভোগ!"

শর্মিষ্ঠা হতবাক।

এত তুচ্ছ কথা থেকে এত কথা কেন যে এল জানে না।

কিন্তু জের চলল বহুক্ষণ।

জ্যোৎস্না কাঁদছে, শাশুড়ীর কথা না শুনে আগের থেকে বাপের বাড়ী আসার জন্ত আক্ষেপ করছে। আত্মীয়ারা, প্রতিবেশিনীরা সমস্বরে সমবেদনা প্রকাশ করছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

অপর্ণা জ্যোৎস্নার ছেলে দুটোকে দালানের দরজা থেকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। তাদের দিকে লক্ষ্য নেই কারো। তাদের জন্ত ব্যস্ততার কথা জ্যোৎস্নাও ভুলেছে বোধ হয়, অন্ততঃ এখন তাদের চেয়েও দেখছে না। ছেলে দুটো নিতান্তই ছোট—বড়টাই বছর পাঁচেকের হয় কি না হয়।···এত হৈ হৈ কান্নাকাটিতে ভ্রূক্ষেপও নেই তাদের। বঁটি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অবিশ্রাম ছুটোছুটি করছে।

তাদের দিকে চেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে বসে রইল শর্মিষ্ঠা।···

ইন্দুভূষণের ইচ্ছা ছিল আলাদা ঘরে শর্মিষ্ঠার থাকবার ব্যবস্থা করবার। এই বিয়ে-বাড়ীর ভিড়ে সম্ভব হ'ল না সেটা। মাটিতে পাতা ঢালা বিছানায় জ্যাঠতুত, খুড়তুত, পিসতুত মিলে একদল বোনের সঙ্গে শুলো। তারা সবাই যত্ন করল, তাকে খাতির করে পাখার তলায় শুতে দিল।

চিরকাল বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, আজ কিছুতেই ঘুম এল না।

রাত হয়েছে অনেক। বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়নি তবু। নীচে-ওপরে চারপাশেই মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে—নানা কাজে এখনও ঘোরাঘুরি করছেন জ্যাঠাইমারা।

এতজনের সঙ্গে কোনদিন শোয়নি শর্মিষ্ঠা। নড়তে-চড়তে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।

অস্বস্তি লাগছে ঘরের সূচীভেদ্য অন্ধকারেও। কলকাতায় আলো নিভিয়ে শুলেও এমন অন্ধকার হয় না। জানলা খোলা থাকলেই রাস্তার আলোর আভাস আসে। এখানকার অন্ধকারটা যেন একটা বস্তু, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

শুধু অন্ধকার কেন, শর্মিষ্ঠা এখানকার কোন কিছুতেই অভ্যস্ত নয়। তার পরিচিত পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে এ এক নতুন রাজ্য। ···বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগ নেই এ-বাড়ীর লোকেদের, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত এরা। গিন্নীরা হিসেব করছেন কে কতটা

তোষামোদ করল তাঁদের, পাড়ার সবার খবর সংগ্রহ করতে করতে হাতের কাজ ভুল হয়ে যাচ্ছে বিবাহিত মেয়েদের, গম্ভীর বিরক্তমুখে কাজ করছে বউয়েরা, ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেয়েই চলেছে শুধু।

ছেলেরা সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর। নিজের ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না তাদের। ছেলেরা এখানে দৃষ্টিকটু রকমের সর্বেসর্বা। তাদের দেখলে গিন্নীরাও তটস্থ হয়ে পড়ছেন, সবাই সর্বদা মনে রেখেছেন, এরাই মালিক, এরাই কর্তা।···ছেলেরা অতিমাত্রায় সাংসারিক—কুটনোর পরিমাণও তারা দেখছে ছেলে কাঁদলে ধমক দিচ্ছে বউকে, বিবাহিত বোনের হাতের নতুন চুড়ির নক্সা দেখছে নিরীক্ষণ করে।

সমস্ত পরিবেশটাই শর্মিষ্ঠার পক্ষে ভারি অস্বস্তিকর। এদের কারো সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাওয়ান মুশকিল।

কিন্তু এরা কারা?

ভেবে দেখলে এরাই ওর সবচেয়ে নিকট-আত্মীয়। পিতৃবংশ। এ বাড়ীর মেজকর্তা শান্তিভূষণ মৈত্র ওর বাবা। এ পরিচয়টা এতদিনের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠেনি কোনদিন। এবাড়ীতে কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয়—সে শান্তিভূষণের মেয়ে।

নিজের কানেই এখন লাগছে কথাটা।

শর্মিষ্ঠা ভাবছে। যে বাড়ীর আবহাওয়া, যে বাড়ীর লোকজন ওর কাছে আজ অপরিচিত লাগছে, সেই বাড়ীতে তাদের ধানে বড় হয়ে ওঠাই ওর জীবনে স্বাভাবিক ছিল। ঐ যে ঠাকুর দালান আর নাটমন্দির আবছা-আবছা মনে ছিল, ঐখানে সবার সঙ্গে হৈ-হৈ করে খেলত ছোটবেলায়, বড় হ'লেই ছোট ভাই-বোনদের সামলাবার দায়িত্ব নিত, গৃহস্থালির কাজ শেখাতেন মা—জ্যাঠাইমা, বিবাহিত বড় বোনদের দেখে দেখে বিয়ে হলেই বাপের বাড়ীতে কুটুম্বতা আর শ্বশুরবাড়ীতে প্রাচুর্য্য পাবার স্বপ্নে কাটত কিশোর কাল, তারপর একদিন বিয়ে হয়ে যেত। ওর বয়সী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচ-ছ' বছর—তিনটে ছেলেমেয়ে তার।

আর যদি শান্তিভূষণের কাছে থাকত শর্মিষ্ঠা? বম্বেতে? কে জানে কি রকম সে পরিবেশ? শান্তিভূষকে বিশেষ মনে নেই, তাঁর সঙ্গে কোন দিনই বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। শান্তিভূষণ আর সতাতো ভাইবোনদের সঙ্গে কি রকম কাটত তার জীবনের এতগুলো বছর? আর ঐ যে মানুষটি—এ বাড়ীতে যিনি শর্মিষ্ঠার মায়ের জায়গা পেয়েছেন, যাঁর অনেক নিন্দা শুনে এল আজ, তিনি কেমন?···কে জানে জানবার সুযোগ কোনদিন আসবে কি না?

শর্মিষ্ঠা নিজের মনেই হাসল।

কলকাতায় গিয়ে এবার যদি বম্বাই যাবার প্রস্তাব করে সে, কেমন হয়? যদি বলে, গিয়ে আলাপ করে আসবে?···প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে সবার ওপর? সুষমার মুখের অবস্থাটা দেখতে লোভ হচ্ছে।···ভুবনদা কি বলবে?

মনের অগোচরে পাপ নেই তাবলে।

বারাসাতে আসা যখন স্থির করেছিল তখন অন্ততঃ একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল বলেই আরও অনেক বাধা সরিয়ে দিয়েছিল সহজেই। এখানে শান্তিভূষণের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশংকা নেই। এই দু'বছর ইন্দুভূষণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শান্তিভূষণ সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছে। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নাকি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, এই একান্নবর্তী পরিবারে বাস করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তবে বাক্যবাণ আর চোখের জলে স্বামীকে সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন অল্পদিনেই। বি-এ ডিগ্রীটা ছিল, নতুন শ্বশুরের সহায়তাটাও যুক্ত হয়ে বম্বেতে চাকরি জুটে গেল একটা শান্তিভূষণের। সেই থেকেই তিনি প্রবাসী। এত বছরের মধ্যে দু'একবার এসে ঘুরে গেছেন, তাও একা। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা কেউ আসেন না। কোন উৎসবে কখনও শান্তিভূষণও আসেন না। ইন্দুভূষণ অনেকবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন এ নিয়ে।

··শান্তিভূষণের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে শর্মিষ্ঠাও বোধহয় এতদিনের অনভ্যাসের সংকোচ কাটিয়ে আসতে পারত না কিছুতেই।···

জন্মসূত্রে যে ডোরে বাঁধা ছিল, কোন অদৃশ্য হাতের স্পর্শ কেটে দিয়েছে সে বাঁধন। আজ নিছক কৌতূহলে দেখে যেতে এসেছে বারাসাতের মৈত্রবাড়ী। বাপের বাড়ীতে আজ সে নেহাৎই অতিথি। দু'একদিনের জন্য আসা, যেদিন চলে যাবে সেদিন ফেলে রেখে যাবে না কোন মধুর স্মৃতি, কুড়িয়ে নিয়ে যাবে না কোন দুর্লভ ধন। আসা যাওয়ার পথের ধারে পান্থশালার মতই দু'টো দিন গতানুগতিক ভাবে কাটিয়ে যাবে এখানে—এই পর্য্যন্ত। শর্মিষ্ঠার জীবন প্রবাহিত হয়ে গেছে অন্যখাতে—তার সঙ্গে এ বাড়ীর জীবনপ্রবাহ মিলবে না কোনদিন। সাত বছরের মেয়ের চোখে পিতৃগৃহের যে ছবি ছিল, আজকের অভিজ্ঞতায় তাতে নতুন পালিশ পড়েছে বটে, ছবির আকর্ষণ বাড়ে নি।

[ক্রমশঃ।

জীবনের সাক্ষী

মনোময় চক্রবর্তী

রোজ সাঁঝে ধীর পায়ে মাঠে গিয়ে
আমি দেখি তাপস আঁধার
আর বোবা পৃথিবী; হঠাৎ যখন
এ-মন আকাশযাত্রী যেথায় আছে নক্ষত্র কম্পন।

বিস্মিত ভীত মনে বারেক মনে হয়
কেউ নেই আর, একা বসুমতী,
সমস্ত পৃথিবী শূন্য কাজ কর্ম হীন,
একা আমি জেগে আছি জীবনের সাক্ষী।

বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

নয়

'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়'—গোদা গোদা অক্ষরে ছাপা বিজ্ঞাপনের এই শিরোনামা দেখে মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মানুষ আজও ; তারপর ক্ষুদি-ক্ষুদি টাইপে ওই বিজ্ঞাপনই যখন তার অব্যবহিত পরেই আবার জানায় যে, 'এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই !' —তখন সে শুয়ে পড়ে। ভুয়া বামপন্থী 'অভি'-নেতৃত্বে ডাক-তার ধর্মঘটের কৃপায় অসাধ্য সাধনের প্রতিশ্রুতি যখন কয়েক দিনও না চলতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার ফলে বসে পড়তে বাধ্য হয় সাধারণ কর্মী, [শুধু বসে পড়তে নয় ; উঠতে-বসতে বাধ্য হয় কেউ-কেউ,—দুহাতে দুকান ধরে উঠ-বোস করতে !] তখনকার মনের অবস্থার সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন-পাঠকের দুরবস্থার [এক্ষেত্রে অবশ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাফ করবেন, দুরবস্থা নয়, দুরাবস্থাই ব্যাকরণ সঙ্গত না হলেও জীবনসঙ্গত এক্সপ্রেশান ; অবস্থা যখন এমন হয় যে ওই আকার না দেখলে অবস্থা কতদূর খারাপ অর্থাৎ কি দুরাবস্থা যে হয়েছে ডাক-তার ধর্মঘটীদের বিদ্যাসাগর মশাই তা দেখে যেতে পারলেন না তাই ; নাহলে তিনি বলে যেতেন দুরবস্থা নয় ; দুরাবস্থাই ঠিক। 'ব্যাকরণ-সম্মত না হলেও জীবনসঙ্গত সুনিশ্চিত !]।

কিন্তু সেকথা নয়। আমার বক্তব্য, আজ যা নিছক বিজ্ঞাপন,—আধুনিক বিজ্ঞাপনের পণ-ই হচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টাই হচ্ছে আগামীকাল তা সত্য করে তোলা। এবং বিজ্ঞানের big gun যারা, যারা রথী মহারথী যারা আজ গ্রহ-গ্রহান্তরে গর্বিত সারথি, তারা যে একদিন সত্যি সত্যি মরা মানুষকে আবার বাঁচাবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? কিন্তু সেই দিন দূরে থাক, ভগবান করুন সে দুর্দিন মানুষের কখনও না আসে। তার কারণ মরা মানুষকে না পারলেও, মুমূর্ষ মানুষকে বিজ্ঞান এখনই প্রাণ দান করতে অব্যর্থ সক্ষম হয়েছে ; হচ্ছে : আরও হবে। তার ফলেই। বাঁচা মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীর প্রতিইঞ্চি জমি এমন-ভাবে পিষ্ট হচ্ছে যে ফসল করলেও আর সোনা ফলানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজে-কাজেই দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে বাঁচা মানুষকে মারা যায় কি করে, বসুমতীর ভার লাঘব করা যায় কিসে তারই দুর্দান্ত চেষ্টায় তৈরী হচ্ছে অতিকায় ফানুস। হিরোসিমায় মানুষ-মারা এই 'ফানুসের হিরো'-দের বীরত্বের সুরু মাত্র ; সভ্যতাকে অবলুপ্ত করে অসভ্যতা জগৎজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজ ; মানুষের আজ দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রার মুহূর্তে আফ্রিকায়, আলজিরিয়ায়, আসামে, বেরুবাড়িতে ঘোষিত হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা। সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, সবার উপরে আজ ফানুস সত্য ! আর তাই, এই নির্জন, নিস্তব্ধ, নিরুপম নীল ভেদ করে মানুষ যখন অজ অমিলে মেলে দিচ্ছে তার পাখা তখনও আমি ফানুসের জয়যাত্রাকে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা বলে জ্ঞান করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে অভূতপূর্ব আনন্দ নয়, পরমাশ্চর্য এক নিরানন্দ কেবলই মনে পড়াচ্ছে :

'নিদারুণ দুঃখরাতে
আত্মঘাতে
মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?'

কে জানে ? মানববিধাতা মহাশূন্যচারী মানুষকে না কি ফানুসকে দেখে মনে মনে হাসছেন কি না : 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে ?'

কিন্তু কেন ? কেন এই মরা মানুষকে বাঁচাবার উপায় প্রায় বের করে ফেলার মুহূর্তেই আবার বাঁচা মানুষকে যুদ্ধে দাঙ্গায়, সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে না মেরে ফেলা পর্যন্ত বিজ্ঞান নিরুপায় ? এর কারণ বিজ্ঞান মরা মানুষকে প্রাণ দেয় ; কিন্তু জীবন দেয় না। প্রাণ পশুরও আছে ; মানুষেরও আছে। কিন্তু 'জীবন' শুধু মানুষেরই আছে ; পশুর নেই। প্রাচীন ভারত মৃত্যুকে স্বীকারই করেনি। মানুষকে মৃত বলে মানেইনি তারা ; মানুষকে তারা বলেছে অমৃতের পুত্র। দেহের মৃত্যুকে সে বলেছে জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ মাত্র। মৃত্যুকে বলেছে নবজীবনের সূচনা। বর্ষশেষকে নববর্ষারম্ভের। মৃত্যুতে মানুষের হাহাকারকে তুলনা করেছে স্তন থেকে স্তনান্তরিত হবার মধ্যে অবুঝ শিশুর ক্রন্দনের মতো। শেষ বলে কিছু আছে একথা মনে করতে নারাজ এই ভারতবর্ষ ! শেষ নেই সে শেষ কথা কে বলবে ? জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে ! প্রকৃতির সঙ্গে মানবসংগ্রামের ইতিবৃত্তি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জীবন-মৃত্যুর রহস্য সমাধানের রাস্তায় জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত কেবলই গোলকধাঁধায় কেবলই ঘুরে মরছে। একেকটি আবিষ্কার হয়েছে আর মানুষ মনে করেছে এবারে রহস্যের আবরণ বুঝি উন্মোচিত হলো। কিন্তু হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে সে যখনই অবার রহস্যের জট পড়েছে নতুন করে জীবন-মৃত্যুর জটিলতার আর কোথাও। আলো বলে যাকে মনে করেছিলো সে দেখা দিয়েছে আলেয়া হয়ে। শিশু মৃত্যু বোধ করেছে সে নতুন নতুন বহুমূল্য

ভেষজের জন্মদানে কিন্তু জন্মের হার বেড়ে গেছে মৃত্যু হারের তুলনায় তার ফলে এবং এখন সেই বিজ্ঞানই আবার মনে ভাবছে জগৎ জুড়ে বেশ কিছু মানুষ মরলে বাঁচি। অর্থাৎ সিসিফাস ঠেলে ঠেলে পাথর তুলছে পাহাড়ের মাথায়; তোলা মাত্রই পাথর আবার পাহাড়ের অপর পিঠ বেয়ে গড়িয়ে গেছে সমান স্পীডে। আবার তাকে ঠেলে তুলেছে মানুষ অসীম ধৈর্যে; আবার সেই পাথর নামতে সুরু করেছে নীচে। এই পাথর তোলা আর গড়িয়ে পড়ার খেলা চলেছে যুগের পর যুগ। মহাকাশ যাত্রার মুহূর্তে আজও আবার নতুন করে মনে হচ্ছে মানুষ বুঝি খুঁজে পেয়েছে সেই আলো যা দিয়ে সে দেখবে জীবন-মৃত্যুর রহস্যাবৃত আনন। কিন্তু আবার সে দেখবে যাকে সে আলো মনে করেছে আসলে তা আলেয়া। জীবন-মৃত্যুর সারমেয়-লাঙ্গুল সোজা করার চেষ্টা সফল হবে না কোনও দিন জ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানের দুঃসাহায্যে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে যে সব অতিকায় প্রাণী একদিন পৃথিবী অধিকার করেছিলো; আজ তারা অনেকেই নেই। নেই তার কারণ—যে অস্ত্রকে তারা যত ধার দিয়ে যত বড় এবং তীক্ষ্ণ করে তুলেছে সেই অস্ত্রে সে নিজেই একদিন হয়েছে নিহত। মানুষের সব চেয়ে সহায় হয়েছে তার বুদ্ধি। এই ক্রমাগত শাণিত বুদ্ধিই ডেকে এনেছে তার অন্তিমকাল। এটম স্পিলিট করা মানুষের জয় ঘোষণা করছে যত না তার চেয়ে অনেক বেশী আসন্ন করছে মানব সভ্যতার চরম বিপর্যয়। এ যুগের শেষ চিন্তাশিল্পী বার্টাণ্ড রাসেল নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেছেন সেই সতর্কবাণী। এটম গাদা করা আছে যে গোপন জায়গায়, সেখানকার কোনও পাহারাদার যদি ক্ষণকালের পাগলামীতে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দেয় তা হলে আমরা জানবার আগেই জগৎ জুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবো। পৃথিবী আবার পরিণত হবে দগ্ধ মাটির ঢেলায়।

তাই, জ্ঞানে অথবা বিজ্ঞানে নয়, ধ্যানেই কেউ কেউ কখনও কখনও জীবন-মৃত্যুর রহস্যের পেয়ে গেছে সন্ধান। পেয়েছে বলেই একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে: নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শুধু সেই একবার নয়। বার বার ধ্যানীরা প্রেমীরা তার খবর পেয়েছে; কবিরা দিয়েছেন সেই খবর: তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।

জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানীর দেবার সাধ হয়েছে; কিন্তু সাধ্য হয়নি। সাধ্য হয়েছে যাঁদের তাঁদেরই নাম কখনও ত্রৈলিঙ্গ কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ; কখনও শ্রীচৈতন্য কখনও কবীর। কখনও কবির কলমেও উচ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর অজান্তে এর উত্তর:

'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

যুগে যুগান্তরে চিরজাগ্রত মানব সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ হচ্ছেন চিরনিরুত্তর মানব-হিমালয়।

ত্রৈলিঙ্গ যখন শিবরাম ছিলেন অথবা তাঁর বাবা নৃসিংহ ধরের নামে নাম মিলিয়ে ছিলেন তৈলঙ্গধর। সেই সময়েই তাঁর মা তাঁকে বলেন: 'আমার পুত্র না হওয়ায় গৌরীশঙ্করের পূজা এবং বারোটি ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলাম। গৌরীশঙ্কর সন্তুষ্ট হলে তোমাকে পেয়েছি; কিন্তু দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কি তা আজও জানি না; শিবরাম তুমি সন্ন্যাসব্রত নেবেই যে একদিন তা আমি জানি কিন্তু আমার অনুরোধ, এই বারোটি ব্রাহ্মণ সেবার ফল না জেনে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কোর না।'

মায়ের মৃত্যুর দশ বছর পর, শিবরাম তখন এক পুত্র ও কন্যার জনক, মায়ের সেই এক মাত্র জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে বেরুলেন। কাশীতে এক পণ্ডিত তাঁকে ত্রিধারায় নব্যস্মৃতি রচনায় প্রতিষ্ঠ স্মার্ত-পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কাছে যেতে বলেন। শিবরাম উপস্থিত হয়ে রঘুনন্দনের কাছে তাঁর মায়ের প্রশ্ন উপস্থিত করেন; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কি? রঘুনন্দন সে জিজ্ঞাসার এই জবাব দেন যে, একটি ব্রাহ্মণ সেবার ফল বলা যায় না; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কে বলবে? এই রঘুনন্দন শিবরামকে নর্মদাতীরে সাত দিন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আরাধনা করলে এক মহাপুরুষ এসে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে পারেন,—এমন আশা দেন।

শিবরাম নর্মদার নির্জনতম তীরপ্রান্তে বসে আরাধনা আরম্ভ করলেন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর। তখনও সূর্যোদয় হয়নি নদীতীরে। গাছে বসে পাখী, মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে সাপ, এবং বনের অন্ধকার থেকে বহির্গত শেয়াল সব ভুলে শুনতে লাগলো সেই পাঠ। দেখা দিলেন জটাজুটসমণ্ডিত বাঘাম্বরে সজ্জিত ত্রিশূলাবলম্বিত এক
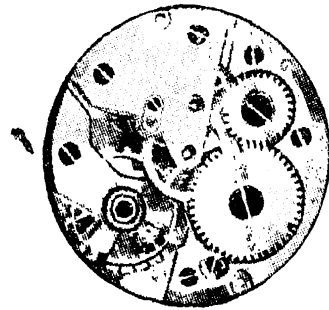
পুরুষ। এবং তারও কিছু পরে সেই পুরুষের পাশে এসে বসলেন এক গৈরিকবসনা গৌরী; উন্মুক্ত বেণী মহাযোগিনী। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে প্রাজ্ঞপুরুষ সেই মহাযোগিনীকে আদেশ দিলেন শিবরামকে তিনটি বটিকা দিতে। এবং বলে দিলেন যে এক নিঃসন্তান পার্বত্যরাজার পুত্রলাভ হবে এই বটিকা সেবনে; সেই নবজাত শিশুই কেবল সক্ষম হবে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল কি, তার সঠিক উত্তর দিতে।

মায়ের প্রশ্ন মাথায় নিয়ে অজানা উত্তর-অভিযানে বহির্গত শিবরাম এক সহরে এসে শুনলেন সেটি অপুত্রক পার্বত্য-রাজার রাজধানী। তিনি রাণীকে বটিকা খেতে দিলেন। এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দী রইলেন সেখানে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠ পূর্বক হাসতে লাগলেন। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে একটি ব্রাহ্মণ-সেবার ফলস্বরূপ তিনি আজ রাজকুমার; অতএব দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল অনুমেয়।

এই কাহিনী অলৌকিক কিন্তু অলীক নয় যে তার প্রমাণ যিনি এই উক্তির লিপিকার তিনি ত্রৈলিঙ্গর মুখ থেকে শুনে তবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই ঘটনা। তাঁর নাম, ওঁ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। তিনি তাঁর তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিতে লিখছেন। "আমি প্রায় একাদিক্রমে ৬২ বৎসর মানস সরোবরে স্বামীজীর চরণকমল সেবায় রত ছিলাম। ঐ সময়ে একদিন তাঁহার জীবন চরিত লিখিবার ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার সমাধি অন্তে আমি ব্রহ্মে লীন হইলে আমার জীবন চরিত প্রকাশ করিও।"

এই জীবনচরিতেই স্বামী কৃষ্ণানন্দ আরও জানাচ্ছেন। "মহাত্মা একদিন হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে আমাকে বলিতে লাগিলেন, আমার বিমাতার এক পুত্র হইলে পর আমার মাতাঠাকুরাণী বিদ্যাবতী পুত্র কামনায় একনিষ্ঠ ভাবে গৌরীশঙ্করের আরাধনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন এবং একদিন স্বপ্নে দেখিলেন একটি শুভ্রবর্ণ হস্তী তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি ঐ বৃত্তান্ত স্বামী নৃসিংহধরকে ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাবতী তোমার এমন একটি পুত্রসন্তান লাভ হইবে, যে ত্রিলোক উদ্ধার করিবে এবং তুমি ধন্যা হইবে। অনন্তর ১৫২১ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গীয় ১০১৪ সালের পৌষ মাসের পঞ্চম দিবসে পুষ্যানক্ষত্রে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবাসরে দিবা সপ্তম ঘটিকায় আমি ভূমিষ্ঠ হই। পিতা পুত্রের কল্যাণ কামনায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সহ পূজা হোমাদি আরম্ভ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমি আমার মাতাঠাকুরাণীর কমলমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। পঞ্চম বৎসরে চূড়াকরণ করিয়াছি এবং অষ্টম বৎসরে আমার উপনয়ন হয়। নামকরণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর; মাতৃদত্ত নাম শিবারাধনার জন্য 'শিবরাম'। জননীর স্নেহাধীন হইয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পিতৃঋণও শোধ করিয়াছি। এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল এবং এই সকল সাংসারিক ব্যবহার সমস্তই দাদা শ্রীধরকে সমর্পণ করিয়া পরমাত্মা পরমব্রহ্ম উদ্দেশ্যে এই সংসার হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আমার জীবনচরিত সমস্তই তোমাকে ব্যক্ত করিলাম। আমার দেহান্তে প্রকাশ করিও।"

স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর তৈলঙ্গ-জীবনী বলছে, মহাত্মা বিদ্যানন্দ সরস্বতী শিবরামকে দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। তিনি যাবার সময় বলে যান: বৎস! তুমি তীর্থে তীর্থে কিছুদিন যোগাভ্যাসে করিয়া তিব্বত ও মানস সরোবরে যাইও এবং সর্বদা আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিও, সেই পরমাত্মাই তোমাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবেন।

উদ্দেশ্যহীন জীবন আমাদের; আমাদের জীবনের বাণী তাই উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ। ত্রৈলিঙ্গর জীবন দিব্যজীবন; তাই তাঁর বাণী দৈববাণী!

লৌকিক জগৎ ত্রৈলিঙ্গর অলৌকিক পরিচয় প্রথম পায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর মেলায় ১১০৪ সালে। মেলার দ্বিতীয় দিনে একজন ব্রাহ্মণ সর্দিগর্মিতে প্রাণ হারান। হাহাকার পড়ে যায় মেলায় সেই ব্রাহ্মণের আত্মীয়-বান্ধবকুলে। মেলার আনন্দ মুছে গিয়ে আকাশ ভরে ওঠে বিচ্ছেদ বেদনায়; বাতাস ভারি হয়ে ওঠে অশ্রুজলে। তারপর এক সময়ে তারা ব্রাহ্মণের সৎকার-উদ্যোগ সুরু করলে এক অতিকায় মানব এসে দাঁড়ান তাদের সামনে। আশ্চর্য চেহারা সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ওই দুঃসময়ে ঝড়ের যাত্রীদের চোখে যেন তীরের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললো। যেমনই ভয়ঙ্কর আস্য; তেমনই অভয়ঙ্কর হাস্য। মাথা যেন আকাশ পেরিয়ে অন্য কোনও আকাশ স্পর্শ করে। দৃষ্টি যেন সুদূর অজ্ঞ-অচলে নিবদ্ধ; মাথায় জটাজাল,—তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখা দেয় সেখানে যেন 'ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা'; অমাবস্যার ভয়ঙ্কর অন্ধকার আননে অভয়ঙ্কর হাসির বিদ্যুৎচ্ছটায় আশঙ্কা ও আশার লুকোচুরি খেলছে; সুবিপুল সেই মানুষের কণ্ঠস্বর যেন মধ্যরাত্রির বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজের ঘরছাড়ার দিক হারাবার জলদ গম্ভীর আহ্বান। মুখে আগুন দেবার মুহূর্তে উচ্চারিত হয় 'বহুদূর সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গানের' সুরে: একে পোড়াচ্ছ কেন বাবা? আত্মীয়দের মধ্যে একজন উত্তরে বলে: প্রাণ নেই যে দেহে। উত্তর শোনা মাত্র সন্ন্যাসীর বিকট অট্টহাস্যে আকাশ চৌচির হয়ে যায়, রামপ্রিয়ার আকুল আকুতিতে একদিন যেমন মাতা ধরিত্রীর বুক বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছিলো সংখ্যা গণনার অতীত এক দিবসে। হাস্য সম্বরণ করে সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তর করেন; এর প্রাণ এখনও আছে কমণ্ডলুর এই বারিতে।

জলের ছিটেয় মুহূর্তের মধ্যে জেগে ওঠে সগরসন্তানের শরীরে জীবনের চিহ্ন!

কিন্তু মুহূর্তকাল পরে আর দেখা যায় না বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু, মানবহিমালয়কে। মৃতের চোখে আবার পলক পড়বার আগেই, অমৃতপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; উধাও হয়ে গেছেন কোথায় তা কে বলবে।

বার বার ত্রৈলিঙ্গ নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন; লৌকিক এই মায়ার জগতে স্থগিত রাখতে চেয়েছেন নিজের শক্তির বিকাশ। বার বার মর্ত্যলোকের আকুল আহ্বান অমর্ত্যলোকের ঘুম ভাঙিয়েছে তবু—ধরা দিতেই হয়েছে অধরাকে। ধরা দিয়ে এই ধরাকে বিপন্মুক্ত করার পরেই তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। তবু ছড়িয়ে গেছে সেপথ দিয়ে হেঁটে গেছেন তিনি যে জল দিয়ে গেছেন ভেসে, তার রেণুতে রেণুতে, তার বিন্দুতে বিন্দুতে অমৃত্য নিঃসন্দ্য! ফুল ফুটলে

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়।
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্ব্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা! আর ঝক ঝকে রঙীন।
জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়াবার দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
S/P. 2-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রস্তুত

তার গন্ধ জড়িয়ে যাবেই আকাশের কালো কেশে, চাঁদ উঠলে তার বাঁধভাঙা আলো ভেসে গড়িয়ে যাবেই সমুদ্রদেহে ; মহামানব এলে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগবেই মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে !

এই মুক্তপুরুষকে বাঁধবার চেষ্টাও হয়েছে বারবার ! বারবার ব্যর্থ হয়েছে তাও !

সমস্ত দিক্ যাঁর অম্বর তিনিই শুধু দিগম্বর হতে পারেন। ত্রৈলিঙ্গ তাই দিগম্বর। কাশীতে এই সত্যের মতো, সূর্যের মতো, মানবপুত্রের ভূমিষ্ঠ-বেশের মতো, পুণ্যের মতো, পবিত্রতার মতো, পূর্ণতার মতোই নিরাভরণ নিরাবরণ নির্মম উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গকে কয়েকজনের প্ররোচনায় এক পুলিশ হাজতে দেবার নির্দেশ দেন। পরের দিন সকালে সাহেব দেখলেন হাজতে ভেসে গেছে সন্ন্যাসীর মূত্রে ; আর সন্ন্যাসী হাসছেন হাজতের বাইরে দাঁড়িয়ে। সাহেবের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ প্রত্যুত্তর করলেন : "আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুকালে হাজতে দিলে ত আর কেহ মরিত না।' [ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত : কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী]

স্বামীজির বন্ধনমুক্তির হাসিই তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা !

'আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে ?
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে !'

সেই একবার নয়। আরেকবার,—নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে তৈলঙ্গধরের ইচ্ছে হলো দুগ্ধপানের। নর্মদার নীল জল হলো শুভ্রবরণ ; জলধারা পরিবর্তিত হলো দুগ্ধধারায়। তৈলঙ্গধর অঞ্জলিভরে মেটাতে লাগলেন তিয়াস। আরেকজনও ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেই দৃশ্য। তার নাম খাকি বাবা। তিনিও দুগ্ধপানের ইচ্ছেয় যেই স্পর্শ করলেন, দুগ্ধধারা আবার প্রত্যাবর্তন করলো জলধারায়। লোকে একেই বলে অলৌকিক। কিন্তু এর চেয়ে লৌকিক আর কি ? মা-টির প্রতিমাকে যে মাটির পুতুল মনে করবে সে-ই পৌত্তলিক ; কিন্তু মাটির পুতুলে 'মা'-টির প্রতিমা যে দেখতে পাবে সে খেতে দিলে খাবে না কোন্ মা ? সে মায়ের পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়ে দিলে কেন বেরুবে না রক্ত সেই রক্তপদ্মপদ থেকে ?

লোকে পুণ্য তিথিতে স্নান করে গঙ্গায় ; পাপমুক্ত হয় না তবু। কেন ? কারণ—নর্মদাকে যে প্রাণদা, 'সর্ব'-দা মনে করে নর্মদা তাকেই দেয় জলের বদলে দুধ। নর্মদাকে যে নদী মাত্র মনে করে তার কাছে নর্মদা আর নর্দমায় তফাৎ কোথায় ?

যে যা দিয়ে যত দিতো, যতক্ষণ দিতো ত্রৈলিঙ্গ তাই নিতেন, তত নিতেন ততক্ষণ নিতেন। তাই দেখে একদিন ভ্রান্ত কয়েকজন জলের সঙ্গে চূণ আর আফিংগুলে খাইয়ে দেয় তাঁকে। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর তা গলাধঃকরণ, নীলকণ্ঠ একদা বিষপান করেছিলেন যেমন অনায়াসে তেমনই নির্দ্বিধায়। তারপর তাকে বার করেছেন প্রস্রাবের সঙ্গে ত্রিধারায় ; জল চূণ, আর আফিং আলাদা আলাদা করে। বহু ভক্ত কথনও-কথনও তাঁর অঙ্গে পরিয়ে দিতো মহার্ঘ্য অলঙ্কার। বহুতর লোভী আবার তাঁর গা থেকে খুলে নিতো সেই গয়না। ত্রৈলিঙ্গ পরিয়ে দেবার সময়ও যেমন, খুলে নেবার সময়ও তেমনই নির্বিকার। অলঙ্কারই যাদের একমাত্র অহঙ্কার তারা গয়না দিলে আনন্দিত এবং খুলে নিলে আন্দোলিত হতে পারে ; কিন্তু ওঁকারই যাঁর একমাত্র রণ হুঙ্কার তাঁকে নিরলঙ্কার করবে কে ?

২৮০ বৎসর মর্ত্যলোক এই অমর্ত্যলোকের লীলা প্রত্যক্ষ করে দেহত্যাগের পূর্বদিন ত্রৈলিঙ্গ বললেন : "আগামী কাল একখানা নৌকা ভাড়া করিবে, দেহত্যাগের পর সিন্দুকে আমার দেহ বন্দী করিয়া, অসি থেকে বরুণা পরিভ্রমণের পর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। অন্ত্য সংকারের প্রয়োজন নাই।" পরের দিন সকাল আটটায় আবার বললেন : "সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দাও ও যে পর্যন্ত আমি দরজায় আঘাত না করিব ততক্ষণ কেহ দরজা খুলিও না।" বেলা তিনটেয় দরজায় আঘাত পড়লো। সংসারের বন্ধ দরজায় সংসারমুক্ত পুরুষের সেই শেষ আঘাত !

গঙ্গাগর্ভে সিন্দুক ভাসিয়ে দেবার আগে লোকশ্রুতি আছে, সিন্দুক খোলা হয় একবার, শেষ দর্শনের জন্যে। কিন্তু খোলার পর দেখা যায় যে ত্রৈলিঙ্গর দেহও তাঁর আত্মার সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেছে, ত্রৈলিঙ্গর দেহ নেই সিন্দুকে।

শ্রুতি নয় ; সত্য। অসীম সিন্ধুকে কে বন্দী করতে পেরেছে কবে লোহার সিন্দুকে ! [ক্রমশঃ।

মধ্যম স্বর্গ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শেষবার মরার আগে বাঁচতে চেয়েছে সে যে তার সেই গাছ
যে-গাছে বিবর্ণ ফুল ছিল এতকাল দূরে জংলামাঠে কাঁটায় বিক্ষত···
মধ্যম পথের যাত্রী অন্ধকারে পার হতে গিয়ে এক নদী
বিব্রত হয়েছে শুধু, স্বর্ণমুষ্টি প্রেম তার বুকখানা চিরেছে ব্যথায়···

আয়নায় মুখের ছবি প্রতিশ্রুতি ছিল কবে সুন্দর সজল,
টেবিলে ফুলের গন্ধে ফুলদানিতে গন্ধের ঐশ্বর্য
ঢালা থাকতো, তবু যেন সবাই মধ্যম স্বর্গে ম্লান নটনটী,
উত্তম দেবতা কেউ হতে পারেনিক' সেই দীর্ঘ কতদিন···

শেষবার মরার আগে সেই বৃদ্ধ যুবক ব্যক্তিটি
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে চেয়েছিল—তার মৃত্যু নাকি হল বহুদিন,
কঙ্কাল পুষ্পিত করে কে কবে প্রাণের সাড়া বয়ে আনতে পারে
পাথরে আহত ফুল ইতিহাস হয়ে গেছে, প্রত্নবস্তু প্রেম···

নদী হওয়ার আগেই কবে অবরুদ্ধ পয়ঃপ্রণালী হয়েছে,
মধ্যম কালের গর্বে ত্রিশঙ্কু সূর্যটা ঝুলছে ক্লান্তির আকাশে।···

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

এর চেয়ে যদি মঞ্জুলা কুলত্যাগিনী হতো, এমন কি চাকর বেয়ারা কারুর সঙ্গে পালিয়ে যেতো তাহলেও বুঝি এতটা ক্ষোভের ছিল না। অল্পবয়সী বিধবার পক্ষে এমন ধারা পদস্খলন হওয়া আর যাই হোক অস্বাভাবিক নয় নয়, তাই মনে করেও বুঝি কিছুটা সান্ত্বনার অবকাশ থাকতো। কিন্তু সেপথও চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছিল মঞ্জুলা। নিজে হ'তে যেন ইচ্ছা করেই।

আজ সেটাই হয়েছে তার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ! সকলের চোখে সে তাই এমন অপরাধে অপরাধিনী—যুক্তিতর্ক, বিদ্যাবুদ্ধি কোন কিছু দিয়েই যার বিচার চলে না। পেনাল কোডের সব অনুশাসন-ই হার মানে যার কাছে!

এ যেন ঠাণ্ডামস্তিষ্কে হত্যা করার চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর!

নইলে এক-আধ দিন নয়, দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে তরুণ রূপবান স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করলে মঞ্জুলা, তার মৃত্যুর পর দু'টো বছর কাটতে না কাটতেই কেউ বৈধব্য জলাঞ্জলি দিয়ে, ভেতরে ভেতরে বিয়ের সব ঠিকঠাক করে—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত, চৌধুরী-পরিবারের মাথা হেঁট করে দিয়ে গৃহত্যাগ করতে পারে? এ শুধু অবিশ্বাস্য নয়, কল্পনার অতীত!

নারীর চরিত্র যারা দুর্জ্ঞেয় বলে বলুক, কিন্তু যে মঞ্জুলাকে চোখে দেখেছে, চেনে, জানে, সে একথা এখনো বিশ্বাস করে না। এমন মেয়ের কি করে এমনধারা মনোবৃত্তি হতে পারে! সত্যি সে ছিল আদর্শবধূ শ্বশুরকুলের। যে চৌধুরী-পরিবার শিক্ষায়, সভ্যতায়, আভিজাত্যে, অর্থগৌরবে শহরের বুকে সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, দীর্ঘকাল ধরে ওই মঞ্জুলা মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণধ্বজের মত শ্বশুরকুলের যশোগৌরবে যেন ঝলমল করতো। কেবল যে সে রূপবতী ছিল তাই নয়, গুণেও ছিল অতুলনীয়। নিজের চেষ্টায় এই শ্বশুরবাড়ীতে এসেই ধীরে ধীরে কেবল বি-এ'টা পাশ করেনি, তার সঙ্গে গান শিখেছিল, বাজনা শিখেছিল সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা প্রভৃতিতে প্রভূত জ্ঞান আহরণ করে নিজেকে ওই অভিজাত চৌধুরী পরিবারের উপযুক্ত করে তুলেছিল।

অথচ সংসারের প্রতি যে কর্ত্তব্য সেখানেও তার এতটুকু শৈথিল্য ছিল না। সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে কেবল শ্বশুর-শাশুড়ীকে আপন করে নেয়নি, ভাশুর, দেওর, ননদ, জা, ছেলেমেয়ে সবাইয়ের অন্তরকে জয় করেছিল। তার স্নেহ, ভালবাসা, সেবাযত্ন কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। তাই বুঝি ছোট হয়েও সে নিজেকে চৌধুরী-পরিবারের সর্বোচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ছোট বৌয়ের গুণে সবাই তাই পঞ্চমুখ! ও-বাড়ীর ছোট থেকে বড়, দরকারী অদরকারী সব কিছুতেই ছোট বৌয়ের নামাঙ্কিত শিলমোহর ছাড়া দিন অচল!

এই মঞ্জুলা বিনা নোটিশে ডিক্রীজারীর মত নিমেষে চৌধুরী-পরিবারের সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করে এই ভাবে চলে যাবে, একি কেউ কল্পনা করতে পারে! না সম্ভব?

তাই মঞ্জুলার গৃহত্যাগের সংবাদ যখন চৌধুরী-পরিবারে এসে পৌছল তখন ওরা কেউ কাঁদল না, বা অভিসম্পাত দিল না, শুধু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত, একবার চমকে উঠে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল!

এত বড় আকস্মিক দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে চৌধুরী-পরিবারে যেন আর কখনো ঘটেনি, এই প্রথম!

সারা বাড়ী তারি শোকে মুহ্যমান!

ঝি-চাকর, দারোয়ান, মোটর ড্রাইভার থেকে আত্মীয়-পরিজন সবাই হতবাক! যেন এর চেয়ে সাংঘাতিক কথা কেউ কখনো শোনেনি জীবনে।

ওদিকে বাড়ীর ভেতরে শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা না তোলাই ভালো! যেন এক এক ঘরে এক একটা 'ষ্ট্যাচু' কে বসিয়ে রেখেছে। দেখলে মনে হয় এরা যেন মানুষের হাতে-গড়া পাথরের মূর্ত্তি নয়, মানুষ যেন পাথরে পরিণত হয়েছে!

সব চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা, জ্ঞানশঙ্কর বাবুর। মঞ্জুলার ভাশুরের। তিন দিন ধরে তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলেননি, ঘর থেকে বেরোননি, মুখেও একটু কিছু দেননি। নিজের পড়ার ঘরে ইজিচেয়ারে ঠিক তেমনি ভাবে বসে আছেন, ওই দুঃসংবাদটা তাঁর কাছে আসার সময় যেমন ছিলেন। রাশীকৃত বই তাঁর চারি ধারে স্তূপীকৃত পড়ে আছে। দেওয়ালে, আলমারীতে, বইয়ের র‍্যাকে বই ঠাসা। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শনের কত বিভিন্ন পুস্তক! সেই বইগুলোর দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন ফ্যাল ফ্যাল করে। মূঢ়ের মত। কেন বিশ্ববিখ্যাত সব পণ্ডিত, দার্শনিক, মহামনীষী যাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের জটিলতম রহস্য উদ্‌ঘাটন করে জগৎপূজ্য, সৃষ্টির আদি-অন্ত লীলা পর্য্যন্ত যাঁদের নখদর্পণে, তাঁরা হার মেনেছেন এই নারী জাতির কাছে! তাঁদের অন্তরের গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেননি। বুঝতে পারেননি নারী কি চায়!

জ্ঞান বাবুর এতকালের শিক্ষাদীক্ষা সাধনা সব যেন ভেঙ্গে চুরে

তচনচ করে দিয়ে গেছে মঞ্জুলা, একটা প্রবল ভূমিকম্পে ওঁর জীবন যেন উৎক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত!

বাস্তবিক মঞ্জুলার এই ব্যবহারে জ্ঞানশঙ্কর বাবু যে মনে এত আঘাত পেয়েছেন, তার কারণ আছে! মঞ্জুলা ত তাঁর কাছে ছিল না কেবল কনিষ্ঠভ্রাতা শান্তিশঙ্করের স্ত্রী! এই ছোট ভাইকে তিনি নিজে হাতে যেমন মানুষ করেছিলেন তেমনি নিজে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন ওই মঞ্জুলার সঙ্গে। অনেক মেয়ে বেছে বেছে তবে তিনি মনোনীত করেছিলেন তাকে। শুধু তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে নয় তার দুটি অত্যাশ্চর্য্য চোখের দিকে তাকিয়ে—শুকতারার মত যা ছিল ধীর, স্থির ও উজ্জ্বল। কেন জানি না তাঁর মনে হয়েছিল এই মঞ্জুলাই সম্পূর্ণ সুখী করতে পারবে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভাই শান্তিকে।

শান্তি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এত যে বড় লোকের ছেলে কোথাও তার কোন আত্মম্ভরিতা ছিল না বরং অতিরিক্ত চাপা ধরণের—ভাবপ্রবণ ও লাজুক প্রকৃতির। একমাত্র জ্ঞানবাবুই লক্ষ্য করেছিলেন সব। তিনি জানতেন, যতই দাসদাসী, বিষয় সম্পত্তি, লোক জন থাক, তবু তার মধ্যে যেন কোথায় একটা অসন্তোষ, কিসের একটা বুভুক্ষা জেগে থাকে সব সময়। তাই কি কৌলিন্যে, কি অর্থে সামর্থে, শিক্ষা দীক্ষায় সবদিক থেকে চৌধুরী-বংশের চেয়ে অনেকখানি নীচু হলেও মঞ্জুলা, জ্ঞান বাবু তাঁর বাবা-মাকে এই বলে বুঝিয়েছিলেন যে 'স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি।' তাকে ঘরে আনলে বরং মঙ্গল হবে।

সেদিন ওঁর বাবা মা একটি কথাও বিপক্ষে না বলে বরং বিদ্বান, বিলিতী ডিগ্রীধারী, অধ্যাপক-পুত্রের ওপর সব ছেড়ে দিয়েছিলেন 'শান্তির মন তুমি জানো আমাদের চেয়ে বেশী, ওর কিসে মঙ্গল হবে, তুমিই আমাদের চেয়ে বেশী বোঝো।'

অবশ্য একথা বলার পিছনে মা-বাপের মনে এমন একটা মর্ম্মান্তিক আঘাত ছিল, জীবনে কোন দিন যার জ্বালা তাঁরা ভুলতে পারবেন না। এই জ্ঞান বাবুর বিয়ে নিজেরা পছন্দ করে দিতে গিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাই, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কোন দিন ছেলেদের বিয়েতে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁরা নিজেরা ডুবুরীর মত খুঁজে খুঁজে অনেক বড় ঘর থেকে এম, এ, পাশ করা মেয়ে এনে ভেবেছিলেন বিলীতি ডিগ্রীধারী জ্যেষ্ঠপুত্রের এই সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী তার জীবনকে সকল দিক থেকে সফল করে তুলবে। কিন্তু হায়, সে আশায় ঈশ্বর বাদ সাধলেন! সেই বিদুষী স্ত্রীকে নিয়ে একটা দিনের জন্যেও সুখী হতে পারেন নি জ্ঞান বাবু। ধন ও শিক্ষা যতটুকু তার ছিল তার সহস্রগুণ অহঙ্কার নিয়ে স্বামীর ঘর করতে এসে প্রতি পদে যেন জ্ঞান বাবুর শিক্ষা দীক্ষা আদর্শের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হতে লাগল। অবশেষে তুচ্ছ কারণে এক দিন জ্ঞান বাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য করে শ্বশুরালয় ত্যাগ করে স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে প্রফেসারী-চাকরী নিয়ে মফঃস্বলের এক শহরে সেই যে চলে গিয়েছিল আর আসেনি এবং জ্ঞান বাবুর সঙ্গে কোন সম্পর্কও রাখেনি।

জ্ঞান বাবু তাই ছোট ভাইয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তার জীবনটা যাতে কোন দিক থেকেই ব্যর্থ না হয়, সেই জন্যে শান্তি যখন এম, এ পড়ছে তখনি মঞ্জুলার সঙ্গে বিয়েটা দিয়েছিলেন। অবশ্য মঞ্জুলা তখন সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়েছে, বয়েসও তার বেশী হয়নি পনেরো কি ষোল বড় জোর! দু'টিতে যেন রাজযোটক হলো!

অর্থের অভাব ছিল না। তাই যাতে তারা আদর্শ রোমাণ্টিক জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন জ্ঞান বাবু!

বাড়ীর ভেতর দিকে সব চেয়ে নতুন যে মহলটা হালে তৈরী হয়েছে, সেটা ছেড়ে দিলেন ওদের জন্যে। ফুলে, লতায়-পাতায় ভরিয়ে তুললেন চারি পাশ। পাথরের মূর্ত্তি, ফোয়ারা, বিচিত্র ধরণের পাখী এনে যেখানে যেটি রাখলে ভাল দেখায়—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করান। এ ছাড়া মূল্যবান কার্পেট, ভাল ভাল বিলীতি ছবি, কাশ্মীরী কাঠের সৌখীন জিনিষ, এক এক দিন এক একটা কিনে এনে মঞ্জুলাকে ডেকে তার হাতে দিয়ে বলেন, ভাল হয়েছে?

ওমা, আবার জিজ্ঞেস করছেন সে কথা! আপনি যখন কিনেছেন সে কি খারাপ হতে পারে?

খারাপ না হলেও—একটা পছন্দ আছে ত? তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের চোখে এখন নতুন রং।

জ্ঞান বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খপ্ করে জবাব দেয়, আপনার ভায়ের যা পছন্দ আর বলবেন না!

ভায়ের এতটুকু নিন্দাও বুঝি সহ্য হয় না জ্ঞান বাবুর। তাই চট করে বলেন, না, না ওর কোন দোষ নেই মঞ্জু। ও তো কোন দিন কিছু কেনে নি। ওর যা কিছু দরকার সবই ত আমি কিনে দিয়েছি এর জন্যে সব অপরাধ আমার!

ভয় নেই! আপনার ভায়ের যে 'টেষ্ট' নেই সেকথা আমি বলছি না। বাস্তবিক এ রকম ভ্রাতৃপ্রেম এ যুগে আর দেখা যায় না। আপনারা ভায়ে-ভায়ে, যা' দেখালেন!

বাস্তবিক দাদা ছাড়া আর কিছু জানে না শান্তিশঙ্কর। যা কিছু তিনি করেন, সবই তার কাছে ভাল মনে হয়। কোন দিন কোন কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে এতটুকু মতামত প্রকাশ করে না সে। দাদাকে যেন ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

একদিন মঞ্জুলা স্বামীকে বললে, আমি কলেজে পড়বো! দিন রাত এই বিলাসিতা আর ভালো লাগে না।

বেশ ত, দাদাকে বলো। তিনি যদি ভাল বোঝেন ত তোমাকে কলেজে ভর্ত্তি করে দেবেন।

মঞ্জুলা জ্ঞানশঙ্কর বাবুর কাছে সে ইচ্ছা প্রকাশ করতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। বেথুন কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন আই-এ'তে। কোন কোন সাবজেক্ট নেবে, তাও তিনি স্থির করে দিলেন। বাড়ীর গাড়ী ওকে নিয়ে যায় আবার নিয়ে আসে কলেজ থেকে ঠিক সময়ে।

ধীরে ধীরে গান, বাজনা, ছবি আঁকা সব কিছুতেই তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন জ্ঞান বাবু। মঞ্জুলার ছোট-বড় কোন কিছু সাধই অপূর্ণ রাখেন না তিনি। অযাচিত ভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে যেন ভরে তুলতে চান ওর মন। সে শুধু এই দেবতুল্য ভাসুরের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়ে না, মনে মনে কৃতজ্ঞ হয় তাঁর প্রতি।

সে দিন মঞ্জুলা জ্ঞান বাবুর হাত থেকে নতুন একটা দেওয়াল-ঘড়ি নিতে গিয়ে বললে, আবার এটা কিনলেন কেন? অতগুলো ত

ঘড়ি রয়েছে ঘরে ! বলতে বলতে খিল খিল করে হেসে উঠলো, এবার দেখছি এই জিনিষগুলোকে ঘরে রেখে আমাদের বাইরে থাকতে হবে।

তার মানে ?

আর যে ঘরে ধরছে না জিনিস, আপনি কি দেখেও বুঝতে পারেন না ?

খুশিতে চোখ দু'টো উদ্ভাসিত করে জ্ঞান বাবু জবাব দেন, এটা একেবারে খুব দামী ঘড়ি, আজ কাল বড় একটা পাওয়া যায় না। যখন বাজবে—কি মধুর আওয়াজ, শুনো !

এর ওপর সাড়ী ব্লাউজ যে কত রকমের কিনে আনেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। বারণ করতে গিয়েও মঞ্জুলা থেমে যায়। কি জানি যদি মনে তিনি ব্যথা পান ! জ্ঞান বাবুর মনের যত কিছু সাধ অপূর্ণ ছিল, সব যেন ওই ছোট ভাই ও তার স্ত্রী মঞ্জুলাকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চান।

ওর শাশুড়ী গোপনে চোখের জল মোছেন। শ্বশুর মশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বহুদিন পরে কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে উপলক্ষ্য করে যে আবার বড়ছেলের মনে সংসারের সাধ জেগেছে এতেই যেন তাঁরা কৃতকার্য ! কি হবে এত পয়সা যদি ভোগে না লাগল ?

এক দিন একেবারে দু'তিনখানা নাইলনের সাড়ী কিনে আনতে দেখে, মঞ্জুলা ঠাট্টা করে বললে, আচ্ছা দাদা, আপনার বুঝি দোকানে গেলে মনে হয়, যা কিছু ভাল জিনিষ আছে, সব কিনে আনেন, আমার জন্মে ?

ঠিক ধরে ফেলেছো ? বলে হো হো করে হাসতে হাসতে তিনি বলেন, মনে হয় দোকানটা শুদ্ধ এনে যদি তোমায় দিতে পারতুম—!

মঞ্জুলা তার স্বামীকে ওই কথা বলতে গিয়ে একটু খোঁচা মারে, আচ্ছা তোমার কি এক দিনও মনে হয় না কোন কিছু সখ করে আমার জন্মে আনতে ?

শান্তি একটু ভেবে উত্তর দেয়, সত্যি বলছি কি যে আনবো ভেবেই পাই না। যা কিছু সৌখীন জিনিষ বাজারে পাওয়া যায়, তার কোনটাই ত দাদা কিনে দিতে বাকী রাখেন নি !

না হয়, ডবলই হতো ! তবু ত তুমি দিয়েছো বলে আমার মনে হতো।

জিব কেটে এবার সভয়ে উত্তর দেয় শান্তি, পাছে দাদা মনে করেন তিনি যা দেন তা আমার পছন্দ হয় না, তাঁর মনে ব্যথা লাগে এই ভেবে—তাই আমি ওসব কল্পনাও করতে পারি না মঞ্জু। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন বল দেখি ?

অন্ততঃ তোমার চেয়েও অনেক বেশী। হঠাৎ কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেই যেন কেমন খট করে তার কানে গিয়ে বেঁধে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অকারণ হাসির তরঙ্গ তুলে স্বামীর মনটাকে যেন অন্ত দিকে ফিরিয়ে দেয় মঞ্জুলা !

এরপর হঠাৎ এক দিন রাস্তা পার হতে গিয়ে লরীর ধাক্কা লেগে শান্তিশঙ্করের মৃত্যু হওয়াতে মঞ্জুলা বিধবা হলো। শুধু সিঁদুরটুকু মোছা ছাড়া আর কিছু করতে দিলেন না জ্ঞান বাবু মঞ্জুলাকে। বললেন, তোমার বেশভূষায় কোথাও কোন পরিবর্তন আমরা সহ্য করতে পারবো না। বাবা, মা, সকলের তাই মত !

পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল মঞ্জুলা। ধীরে ধীরে শুধু ওষ্ঠ দু'খানি ফাঁক করে বললে, বেশ তাই হবে। এই দীর্ঘ বারো বছর ধরে এক দিনের জন্মেও আপনার মতের বিরুদ্ধে যখন কিছু করিনি, আজো তা করবো না।

এবার জ্ঞান বাবুর আর একটা কর্ত্তব্য যেন বাড়লো। নিজের লেখাপড়া ছেড়ে চুপি চুপি এসে দেখতেন, মঞ্জুলা কি করছে। কাঁদতে দেখলে অনেক বুঝিয়ে তার মনে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখলেই তাঁর মনটা যেতো বিগড়ে। কি করে মঞ্জুলা মনে শান্তি পায়, সেই কথাই চিন্তা করতেন। মোটামোটা বই ধর্ম্মপুস্তক—শাস্ত্র গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত কত কি এনে দেন। কিন্তু তাতেও কিছু হয় না দেখে হঠাৎ এক দিন একটা ক্যামেরা এনে বললেন, এটা দিয়ে তুমি ফটো তোলা অভ্যাস করো মঞ্জু, মনটা তাহলে একটু অন্য দিকে ব্যস্ত থাকবে।

তার পর বিলেত থেকে আনিয়ে দিলেন, একটা 'টেপ্ রেকর্ডার' বেশ মজা লাগে, যা ইচ্ছে রেকর্ড করে, তখনি আবার শোনা যায়। নিজের কণ্ঠ নিজের কাছে অদ্ভুত ঠেকে! একদিন, জোর করে জ্ঞান বাবু, একটা গান গাওয়ালেন মঞ্জুলাকে দিয়ে। তার পর সেটা বাজিয়ে তাকে শোনালেন। বাড়ীর ছেলেপুলে, চাকরবাকর যে অদ্ভুত যন্ত্রটি দেখতে আসে তাকেই বলে মঞ্জুলা, কিছু কথা বলতে। তারপর আবার সেটা বাজিয়ে শুনিয়ে দেয়।

এমনি করেও বেশী দিন ভাল লাগে না। এক দিন জ্ঞান বাবু এসে বললেন, তার চেয়ে তুমি এম-এ ক্লাসে ভর্তি হও। পড়াশুনা নিয়ে ইউনিভারসিটিতে বেশ সময় কেটে যাবে। বি-এ টা ভালভাবেই পাশ করেছিল মঞ্জুলা অনার্স নিয়ে। তখন এম-এ পড়তে দেননি এই জ্ঞান বাবুই! হঠাৎ বুঝি নিজের স্ত্রীর কথাটা চিন্তা করেই চেপে গিয়েছিলেন। কি জানি এম-এটা ভালভাবে পাশ করতে পারলে তারপর যদি আবার তাঁর স্ত্রীর মত এক দিন সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায় চাকরী করতে। যদি মঞ্জুলা নিঃসন্তান না হতো যদি তার একটা ছেলে কি মেয়ে থাকতো তাহলে হয়ত মঞ্জুলার মনটা এমন ধাঁধা খাঁধা করতো না। তাই জ্ঞান বাবুর মুখ থেকেই আবার এম-এ পড়ার কথাটা শুনে একটু বিস্ময়বোধ যে করেনি মঞ্জুলা, তা নয়। সে জানতো যে সে যাতে মনে সুখ পায়, তার জন্মে এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করতে পারেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো সব সময়।

জ্ঞান বাবুও মঞ্জুলার এই মানসিক পরিবর্ত্তন দেখে মনে মনে বেশ খুশি হয়েছিলেন। শিক্ষাই মানুষকে শান্তি দিতে পারে! কিন্তু বেশী দিন গেল না, হঠাৎ কোথা থেকে সেই মর্ম্মন্তুদ দুঃসংবাদ এলো। মঞ্জুলা গৃহত্যাগ করেছে! কানে শোনামাত্র যেন কে তাঁর সবটুকু জ্ঞান হরণ করে নিলে!

জ্ঞান বাবুর ওই আবিষ্ট ভাবটা সম্পূর্ণ কাটতে প্রায় একটা মাস লাগল। কলেজে বেরুবার সময় আচমকা মঞ্জুলার কথাটাই মনে পড়ে রোজ। তাঁর বই পত্তর, ব্যাগ, সব কিছু সে গুছিয়ে

রাখতো এমন ভাবে, যে কোনদিন কোন কিছুরই অভাব বোধ করতেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে গোপন করে তিনি বেরিয়ে পড়েন বাড়ী থেকে। মনটা হঠাৎ ঘৃণায় বি-রি করে ওঠে। ছিঃ এত নীচে যে মঞ্জুলা নামতে পারে, তিনি যে কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। এত শিক্ষাদীক্ষার এই ফল হলো! শেষে একটা অর্ডিনারী কেরাণীকে বিয়ে করার জন্যে এত সুখ, এত স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে চলে গেল। ভাবতেও যেন তাঁর বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে কিসের এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়! খেয়ে, ঘুমিয়ে, কিছুতেই শান্তি পান না জ্ঞান বাবু। লেখাপড়ায় মন বসাতে পারেন না। সব সময় ওই একটা চিন্তা জেগে থাকে তাঁর মনের মধ্যে, কিসের লোভে সে এই জঘন্য কাজ করতে গেল।

যত দিন যায় জ্ঞান বাবুর মধ্যে যেন মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে তিনি মনস্থির করে ফেললেন। হাঁ, সামনা সামনি তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন মঞ্জুলাকে, কেন সে এমন কাজ করলে! কিসের লোভে! কি তার অভাব ছিল!

এলাহাবাদ শহরে নিউকর্জ টাউন অঞ্চলে একটা ছোট বাড়ীতে থাকতো মঞ্জুলা। জ্ঞান বাবু ঠিকানা খুঁজে বার করে এক দিন দুপুরে গিয়ে হাজির হলেন।

কড়া নাড়তেই ঝি এসে দরজা খুলে দিলে। কারুর কোন আহ্বানের অপেক্ষা না করে জ্ঞান বাবু একেবারে ভেতরে ঢুকে গেলেন! চৌকাট পেরিয়ে শোবার ঘরে পা দিতে যাবেন, এমন সময় সামনে মঞ্জুলাকে দেখে তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার চেহারার বেশভূষায় ত' কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঠিক যেমন ছিল আগে, এখনো তেমনি আছে। তবু মনের ক্ষোভ সামলাতে না পেরে বলে উঠলেন, ছিঃ, মঞ্জুলা, তুমি এমনি করে আমাদের মুখে চুণ কালি দেবে, তা কোন দিন আমি কল্পনাও করতে পারিনি!

আপনার মুখ থেকে এরকম কথা যে শুনতে হবে, আশা করিনি! চুণকালি আমি আপনাদের মুখে দিইনি, বরং পাছে দিয়ে ফেলি, সেই আশঙ্কায় আগে থেকে সরে এসেছি। পালিয়ে এসেছি দূরে।

তার মানে? তোমার এ হেঁয়ালীর অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না। সত্যি কিসের অভাব তোমার ছিল যে এ কাজ করতে গেলে?

অভাব! হঠাৎ গলাটা একটু কেঁপে ওঠে মঞ্জুলার। অভাব ছিল না বলেই ত এ কাজ করেছি। কেন, আপনি আমার মনের সবটুকু শূন্যতা এমন ভাবে পূর্ণ করেছিলেন? যেদিকে তাকাই শুধু আপনার দান। অজস্র দান! আমার মনের ভেতরটা পর্য্যন্ত জ্বলে পুড়ে মরে শুধু আপনার দানে। সেখানেও কোন রিক্ততা, এতটুকু শূন্যতা রাখেননি আপনি! কেন, আমি আপনার কি অনিষ্ট করেছিলুম, যে এই ভাবে আমায় শাস্তি দিতে হয়।

শাস্তি! কি বলছো মঞ্জুলা, আমি ত তোমার কথা বুঝতে পারছি না। আমি ত তোমায় সকল রকমে সুখে রেখেছিলুম!

কে আপনাকে এত সুখে রাখতে বলেছিল? আমি ত আপনার কাছ থেকে সুখ চাইনি। থর-থর করে তার গলার মধ্যে যেন কি কাঁপতে লাগল। দু'-চোখে জল টলমল করে।

সেই জন্যে বুঝি প্রতিশোধ নিলে এই ভাবে। বিয়ে করে। চড়ে উঠলো, জ্ঞান বাবুর কণ্ঠ আরো একপর্দ্দা।

বিয়ে! বিয়ে করেছি আমি! কে বললে? বলে এক অদ্ভুত ধরণের রহস্যময় হাসি হেসে উঠলো। তারপর হাসির তরঙ্গ মিলতে না মিলতে বললে, বিয়ে যাকে করবো, তাকে কি দেবো। আপনার দানে যে পূর্ণ সব কিছু! আর যে আমার ঘরে আসবে তাকে বসাবো কোথায়? আমার বুকের ভেতরেও যে এক তিল জায়গা শূন্য নেই। সব ভরে আছে আপনার দানে!

কি বললে? হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে জ্ঞান বাবুর। পেছনের দিকে তাকাতে গিয়ে জ্ঞান বাবু এবার চমকে উঠলেন—দেওয়ালে নিজের একটা ফটো টাঙানো দেখে আর তার গলায় মালা! মঞ্জুলার কথাগুলোর অর্থ এবার যেন নতুন রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। মঞ্জুলার বিহ্বল মুখের ওপর নিজের দু'টি চোখ ধীরে ধীরে রেখে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন জ্ঞান বাবু আরো কিছুক্ষণ। তাঁর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও নির্গত হলো না।

মঞ্জুলা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে জ্ঞান বাবু বললেন, একটা কথা বলবো—রাখবে মঞ্জুলা?

কি বলুন?

তুমি এমনি করে একটা সামান্য চাকরী নিয়ে কষ্ট করবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। তোমাকে কিছু মাসোহারা পাঠাবো, বলো তা গ্রহণ করবে?

না না, আমাকে আর কিছু গ্রহণ করতে বলবেন না। আমি কোন দিন আপনার কোন কথায় অবাধ্য হয়নি কিন্তু এ কিছুতেই সম্ভব নয়। বলে, কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললে, যান্ আপনি এখনি চলে যান এখান থেকে। আর কোন দিন এখানে আসবেন না! এই আমার শেষ মিনতি আপনার কাছে। বলুন কথা দিন। কোন দিন আপনার কাছে নিজে মুখ ফুটে কিছু চাইনি। বলুন আমার কথা রাখবেন।

আচ্ছা, তাই হবে। বলে দ্রুত ঘর থেকে যেই বেরিয়ে চলে এলেন জ্ঞান বাবু অমনি সেখানে আছড়ে পড়ে ডুকরে-ডকরে কাঁদতে লাগল মঞ্জুলা!

"Next to the originator of a good sentence is the first quoter of it." —*R. W. Emerson*

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অফিসে আসতে আসতে ধীরাপদ ভাবছিল, রমণী পণ্ডিতের টেলিফোন পেলে লাবণ্যকেই জিজ্ঞাসা করবে ভটচায মশাইকে কাকে দেখানো যায়। তাকেই কোনো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে বলবে। ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু নয়, বরং দাক্ষিণ্যের ব্যাপার। ফী ধীরাপদই দেবে, ওষুধ-পত্রের খরচ যা লাগে তাও। কিন্তু অফিসে পা দিয়ে এই সহজ ব্যাপারটাও সহজ লাগছে না একটুও। বললে লাবণ্য সাগ্রহে ব্যবস্থা করবে হয়ত, কিন্তু ধীরাপদর সে-সুযোগ দিতেও আপত্তি। রমণী পণ্ডিতকে বরং বলে দেবে, যে-ডাক্তার দেখছেন ভটচায মশাইকে, তিনিই কোনো বড় ডাক্তার নিয়ে আসুন। ফী দেবার জন্যে সে না-হয় ট্যাক্সি নিয়ে ছুটবে এখান থেকে। এও বরং সহজ।

সোজাসুজি না দেখলেও ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে লাবণ্য সরকারের মুখখানা লাবণ্যে টলটল আজ। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে, অন্যের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখনো দেখেছে। চোখে মুখে সর্বাঙ্গে একটা লঘু খুশির ছন্দ গুনগুনিয়ে উঠতে দেখেছে। কোনোদিকে না চেয়ে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে গেছে সে। কিন্তু রমণীর খুশির আমেজ লাগা আপসের নরম দৃষ্টিটা ঠিকই উপলব্ধি করেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় নিজের টেবিলে বসে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছে। পেরে ওঠেনি।···আজ লাবণ্য সরকারও কৃতজ্ঞ বইকি। সরকারী অর্ডার সাপ্লাইয়ের গোল মেটেনি শুধু, সিনিয়র কেমিষ্ট আনার দায়টা নিজের ঘাড়ে নিয়ে তাদের মস্ত একটা ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটিয়েছে সে। গত কাল তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে অমিতাভ ঘোষ হয়ত বা নিজের ব্যবহারের দরুন অনুশোচনাই প্রকাশ করেছে।··· লাবণ্য সরকার হকচকিয়ে গিয়েছিল কি ?

তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধরন আলাদা। তানিস সর্দারের মত বলবে না কিছু, কাঞ্চনের মত নির্বাক দু'চোখ উপচে উঠবে না। তার প্রসন্নতা লাভটুকুই দুর্লভ জানে, সেটুকুই বর্ষণ করবে। ধীরাপদর অনুমান, অবকাশ মত লাবণ্য সরকার আজও তার ঘরে আসবে।

কিন্তু চায় না আসুক। সকাল থেকেই নিজের মেজাজের ওপর দখল গেছে। স্নায়ু বিক্ষিপ্ত। আশার এ-দারিদ্র্য দুর্বহ। আজ সে এক কোণে সরে থাকতে চায়। আজ, কাল, প্রত্যহ—সামনের যে-ক'টা দিন চোখে পড়ে।

তা ছাড়া, ও যেন কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। লাবণ্যর এই চাপা খুশির ঝলক দেখে আর একখানি থম-থমে মুখ মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে সেই থেকে। সে মুখ পার্বতীর।···লাবণ্যর প্রাপ্তি-যোগ যত বড়, পার্বতীর হারানোর যোগও ঠিক ততো বড়ই।

আর, এই দুটো যোগেরই সে-ই নিয়ামক। আশ্চর্য !

লাবণ্য ঘরে এলো বেলা দুটোর পরে। আসার উপলক্ষ বড় সাহেবই গতকাল করে রেখে গেছেন। আসন্ন দশম বার্ষিকী উৎসবের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা। সদালাপী সহকর্মীর ঘরে হামেশা যে-ভাবে আসা চলে সেই ভাবেই এসেছে।

প্রথমেই কাজের কথা তোলেনি। বড় সাহেবের বাইরে থেকে ফেরার খবরটা দিয়েছে। সকালে ফিরেছেন। ব্লাড-প্রেসার চড়েছে। লাবণ্যকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রেসার কিছু বেশিই বটে। লাবণ্য কড়াকড়ি করে এসেছে, কয়েকটা দিন বেরুনো বা কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো বা বেশি কথাবার্তা কওয়া বন্ধ।

ধীরাপদর স্নায়ুর যুদ্ধ, এ-যুদ্ধে হারলে নিজেকে ক্ষমা করবে না। তাকালো শুধু একবার, তারপর নিরাসক্ত তন্ময়তায় ফাইলে চোখ নামালো।···আর একদিনের ব্লাড-প্রেসার দেখাটা চোখে ভাসছে।

বসতে বলেনি, লাবণ্য সরকার নিজেই চেয়ার টেনে বসল। হালকা তৎপরতায় ধীরাপদ নোটের নিচে খসখসিয়ে মন্তব্য লিখে চলেছে।

আজ প্রোগ্রাম নিয়ে বসবেন ?

প্রোগ্রাম···ও, না আজ থাক। এ-ফাইলের কাজ শেষ, আর একটা ফাইলে টান পড়ল।

বাঁচা গেল, আমারও ভালো লাগছিল না। হাসির আড়ালে সঙ্কোচ অপসারণের চেষ্টা, আর, মাঝের এই অপ্রীতিকর দিন ক'টাকে মুছে দেবার চেষ্টা। কাঞ্চন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করল, বলল,—কাল আপনি আমার ওখানে ওই মেয়েটিকে দেখতে গেছলেন শুনলাম, আমাকে বলেননি তো যাবেন ?

ধীরাপদও সহজ হতে চাইছে—অবাক' করে দেবার মত সহজ, অবজ্ঞা করতে পারার মত সহজ। মুখ না তুলে জবাব দিল, যত খারাপ ভেবেছিলেন আমাকে ততো খারাপ যে নই সেটা তখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেননি···বললে নার্সিং হোমের দরজা বন্ধ রাখার

[illegible]

চকিত বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই হাসি চাপা দিয়ে লাবণ্য গত-কালের অভ্যর্থনার সম্ভাবনাটা প্রায় স্বীকারই করে নিল। বলল, আজ যদি আসেন তো দেখবেন সব দরজা সটান খোলা রেখে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আছি। আসবেন ?

অন্তরঙ্গ সুরটা সুপরিচিত, হাসির যাদুও। আর এরই ওপর নিজের আস্থাও কম নয়। ধীরাপদর কানে গেল এই পর্যন্ত, প্রত্যুত্তরের তাগিদ নেই। নির্লিপ্ত নিবিষ্টতায় গোটা টেবিলটা ফাইল-মুক্ত করার বাসনা।

খানিক অপেক্ষা করে সাদাসিদেভাবে লাবণ্য একটা প্রশংসার খবরই ব্যক্ত করল যেন।—মেয়েটার সঙ্গে কথা-বার্তা কয়ে মনে হল এ-পর্যন্ত মানুষ ওর জীবনে একজনই দেখেছে—

—মেয়েটা বোকা। শেষ করার আগেই ধীরাপদর নিরুৎসুক মন্তব্য।

আমার তো ধারণা মেয়েটা বেশ চালাক, লাবণ্যর লঘু প্রতিবাদ, নইলে এত লোকের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নিল কি করে ?

ফাইল ছেড়ে ধীরাপদর দৃষ্টিটা লাবণ্যর মুখের ওপর এসে থেমে রইল একটু। তেমনি ঠাণ্ডা জবাব দিল, এই জন্যেই আর পাঁচ জনের তুলনায় বোকা বলছি—

মনের এ-অবস্থায় রাগ বা বিদ্বেষের মুখে পড়তে পারলে বরং অনেক নিরাপদ। অন্যদিন হলে এ-টুকুতেই প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে তাতিয়ে তোলা যেত, কিন্তু আজ সে রাগ বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। উল্টে ছদ্ম-কৌতুকের ওপর আহত-বিস্ময় ছড়িয়ে বলে উঠল, এই পাঁচ-জনের আমিও একজন বুঝি ?

ধীরাপদ ষ্টেটমেণ্ট পড়ছে একটা।

অতি বড় সাধ্বীরও আপন-পর সব পুরুষেরই নিস্পৃহতা চক্ষুশূল নাকি। চক্ষু-লজ্জা কাটিয়ে অন্তরঙ্গ আপসের চেষ্টায় নিজে সেধে এসেও শুধু এটুকুই বরদাস্ত করে ফিরে যাবে, তেমন মেয়ে নয় লাবণ্য সরকার। উত্তরের প্রত্যাশা না করেই বলে গেল, কি কাঁদুনে মেয়ে আপনার ওই বোকা মেয়ে, কেঁদে কেঁদে বিছানা বালিশ সব ভাসিয়ে দিলে ; চিকিৎসা করব না কান্না থামাব !···অমিতবাবু আজ বিকেলে দেখতে যাবেন বলছিলেন, আপনিও আসুন না ?

আজ তাড়া আছে—

হিমাংশুবাবুর বাড়িতে তো সেই সন্ধ্যেয় যাচ্ছেন ? অর্থাৎ, বিকেলে তাড়া নেই।

না, অফিসের পরেই যাব, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার—

কি দরকার ? অর্থাৎ, দরকারটাও ভাঁওতা।

ষ্টেটমেণ্ট পড়া প্রায় শেষ, এতক্ষণের সহিষ্ণুতায় চিড় খেতে দেবে না।—বাড়িতে অসুখ।

নিজের আওতায় এনে ফেলা গেল যেন এবারে।—কার অসুখ ?

ও-বাড়িরই একজনের।

আপনার আত্মীয় ?

আত্মীয়ের মত···

উত্তর থেকেই প্রশ্নের রসদ পাচ্ছে লাবণ্য সরকার।—ওই বাড়িটার সকলেই আপনার আত্মীয়ের মত বুঝি ?

কপালের ঈষৎ বিরক্তির কুঞ্চন ষ্টেটমেণ্ট পছন্দ না হওয়ার কারণেও হতে পারে। নিরুত্তর।

ওটা কি পড়ছেন ?

টাইপ-করা কাগজের গোছা একধারে সরিয়ে রাখল। জবাব দিল, ইউ, পি, রিপ্রেজেণ্টেটিভএর ষ্টেটমেণ্ট। ফাঁকির ওপর চলেছে···

···সর্বত্রই এক ব্যাপার। প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে লাবণ্য সমর্থনসূচক বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—তা আপনার ওই আত্মীয়ের মত ভদ্রলোকের কি অসুখ ?

হাতের কাছে আর একটা ফাইল টেনে নিয়েছিল ধীরাপদ। সেটা খোলা হল না। সোজাসুজি মুখের দিকে চেয়ে তার সব প্রশ্নেরই জবাব সেরে নেবার জন্য প্রস্তুত হল।—কাল বিকেলের দিকে কুয়ো-তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আজ সকালে পর্যন্ত জ্ঞান হয়নি দেখে এসেছি।

লাবণ্য এতটা আশা করেনি।—ওমা! থ্রম্বসিস্ নয় তো ? বয়েস কত ? কে দেখছেন ?

ধীরাপদর ধৈর্যের পরীক্ষা।—বয়েস অনেক। চারটাকা ফী-এর একজন ডাক্তারকে ধরে-পড়ে দু'টাকায় আনা হয়েছে।

অনুরোধ করলে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে লাবণ্য আজ এই মুহূর্তে তার সঙ্গে গিয়ে রোগী দেখে আসতে আপত্তি করত না। দেখে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করত। কিন্তু না বললে আগ্রহ দেখানো সম্ভব নয়। বলবে না বুঝেই খোঁচা দিতে ছাড়ল না, তাহলে কেমন আত্মীয়ের মত আপনার ?

উত্তরটা মনের মত ধারালো করে তোলার আঁচে ধীরাপদ শকুনি ভটচাযকে অনেক উঁচুস্তরে টেনে তুলতেও দ্বিধা করল না। তেমনি বক্র-গাম্ভীর্যে জবাব দিল, কি আর করা যাবে, ইচ্ছে থাকলেই তো সকলকে অনুগ্রহ করা চলে না।

টিপ্পনীর দরুন হোক বা চিকিৎসকের চোখে একজনের বিপদে এ-ধরণের অবহেলার কারণেই হোক, লাবণ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠল এবারে। গলার স্বরও চড়ল, চলে কি চলে না সেটা অজ্ঞান অবস্থায় ভদ্রলোক এসে আপনাকে বলে গেছেন ?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ চেয়ে রইল চুপচাপ। কিন্তু দৃষ্টিটা এবারে ফাইলে টেনে নামানো দরকার অনুভব করছে। সম্মুখ-বর্তিনীর এই মূর্তি আর এই স্বতঃপর তীক্ষ্ণতা পুরুষের লোভনীয় নিভৃতের সামগ্রী। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে দৃষ্টি নত করাটাও যেন স্নায়ু-দ্বন্দ্বে হার স্বীকার করার সামিল।

পরিস্থিতি বদলালো লাবণ্যর বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকতে। মেম-ডাক্তারের টেলিফোন। ডাকছে চীফ কেমিষ্ট ঘোষ সাহেব।

মনের স্বাভাবিক অবস্থায় লাবণ্য সরকারের চকিত বিড়ম্বনাটুকু উপভোগ করার কথা। মর্যাদাময়ী মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের মুখে বুঝি বা নিমেষের জন্যে লালিমা-সিক্ত একটি মেয়ের মুখই উকিঝুকি দিয়েছিল। কটাক্ষে ধীরাপদর দিকে একবার তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অত বিশদ করে বলার দরুন বেয়ারাটার ওপরেই হয়ত চটেছে মনে মনে।

স্থির, অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ধীরাপদর দু'চোখ হাতের ফাইলে এসে নেমেছে আবার, নারী-তনু বিশ্লেষণের রূঢ় প্রলোভনে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেনি আগের মত। তার পরেও একটানা কাজ করে গেছে, নিবিষ্টতায় ছেদ পড়তে দেয়নি। নিজেরই ভিতরে যেন
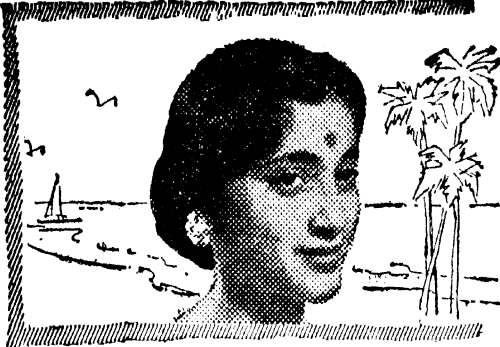
দিনে দিনে
ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে
নতুন রেক্সোনার পরশে
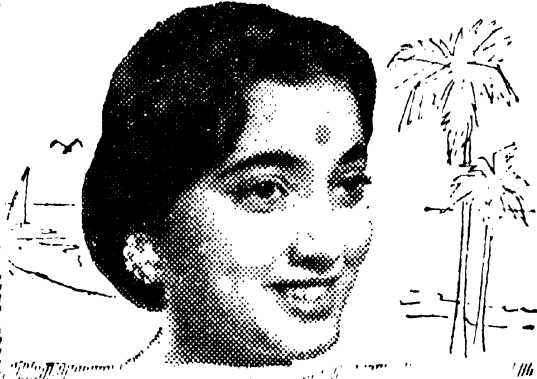
যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেক্সোনায় ক্যাডল আছে, বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেলটি ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে। মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।
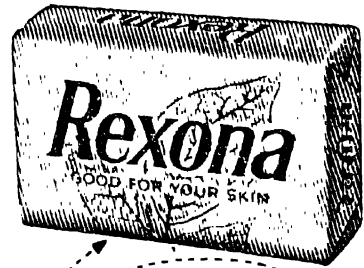
Rexona
GOOD FOR YOUR SKIN
নতুন রেক্সোনার নতুন মোড়ক, নতুন আকার আর নবীন সজ্জা আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।
নতুন রেক্সোনা-
ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক

একটা পাকাপোক্ত দেয়াল তুলে দিয়েছে সে, সেই দেয়ালের ওধারে কেউ যদি মাথা খোঁড়ে খুঁড়ুক। ধীরাপদ কান দেবে না, প্রশ্রয় দেবে না।

ঘড়ি ধরে পাঁচটায় উঠেছে। যথা-নির্দেশ পার্সোনাল ফাইল নিয়ে হিমাংশু বাবুর বাড়ি গেছে। মনিবের নির্দেশে দ্বারবান তাকে অন্দরের বসার ঘরের ভিতর দিয়ে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। বড়সাহেব অত সকালে আশা করেননি তাকে, দেখে খুশি হয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছা শুনে হালকা অভিযোগ করেছেন, আমি ভাবনায় শরীর খারাপ শুনে এলে—

হালকা মেজাজে ছিলেন। প্রেসার কত সঠিক বলতে পারলেন না, তবে অনুমান, কিছু বেশিই হবে। কারণ প্রেসার মাপতে মাপতে মেয়েটার মুখখানা একটু বেশিই গম্ভীর হয়েছিল। লাবণ্য যখন প্রেসার দেখে বড়সাহেব তখন তার মুখ দেখেন—দেখে আঁচ করেন প্রেসার কম কি বেশি। লঘু গাম্ভীর্যে তার নির্দেশের কড়াকড়িও শুনিয়েছেন।—ওঠা-বসা চলা-ফেরা কাজ-কর্ম চিন্তা-ভাবনা খাওয়া-দাওয়া সব বাতিল—এভরিথিং নো। হেসেছেন। আগে তার ওই ডাক্তারীটা দেখার জন্যেই অনেকসময় তাকে ডেকে পাঠাতেন নাকি।

অর্থাৎ ডেকে পাঠিয়ে রোগী সাজতেন। পাইপ-চাপা মুখের সকৌতুক প্রসন্নতার ওপর ধীরাপদর দৃষ্টিটা আটকে ছিল কয়েক মুহূর্ত। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের আশায় পার্সোন্যাল ফাইলটা পালঙ্কের পাশে ছোট টেবিলটার ওপরে রেখেছিল।

কিন্তু বড় সাহেব লক্ষ্য করেননি তেমন। ভাগ্নে কাজে যোগ দিয়েছে জেনে খুশি। লাবণ্যর মুখে শুনেছেন বললেন। ধীরাপদও কিছু বলবে আশা করেছিলেন হয়ত, কিন্তু তাকে চুপ করে থাকতে দেখে এ-ব্যাপারে আর কৌতূহল প্রকাশ করেননি। শুধু জানিয়েছেন, লাবণ্যও আজ খুব প্রশংসা করছিল তার।···ধীরাপদর।

খানিক আগে নিজের মধ্যে যে দেয়াল খাড়া করেছিল, প্রশংসাটা তার এধারেই ধাক্কা খেয়ে ফিরেছে। ধীরাপদ নির্বিকার। উঠতে পারলে হত।

ঘণ্টাখানেকের আগে ছাড়া পায়নি। আসন্ন অ্যানিভার্সারির প্রসঙ্গ উঠেছে। উৎসবটা উৎসবের মতই হওয়া দরকার, এখানকার এবং ফার্মেসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান সংলগ্ন বাইরের সব ইউনিটকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, কাগজে স্পেশ্যাল বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের উদ্বোধন-ভাষণটা এবারে যেন খুব ভেবেচিন্তে লেখা হয়, কর্মচারীদের স্পেশ্যাল বোনাস ঘোষণা আর ভবিষ্যতে আরো কিছু সুবিধে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকবে তাতে। অর্থাৎ, বিলিতি ফার্মের মতই এখানকার কর্মচারীরাও যে সুবিধে পাচ্ছে এবং পাবে সেই আভাস যেন থাকে। কি কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে সে-সম্বন্ধে অমিত আর লাবণ্যর সঙ্গে যেন ভালো করে আলোচনা করে নেওয়া হয়। না, ছেলেকে তিনি এর মধ্যে টানতে চান না, একাগ্রভাবে প্রসাধন-শাখা নিয়েই থাকা দরকার তার। তা ছাড়া ছেলে এর মধ্যে থাকলে ভাগ্নেকে পাওয়া যাবে না সেটা সিনিয়র কেমিষ্ট আনার ব্যাপারেই বিলক্ষণ বোঝা গেছে। ধীরাপদ দায়িত্ব নিলে সে যদি ঠাণ্ডা থাকে—থাক্।

লাবণ্য সরকার জীবন সোমের দায় ঘাড়ে নেবার ব্যাপারটাও জানিয়েছে তাহলে। তার প্রশংসার মত তার এই উদারতাটুকুরও বিপরীত প্রতিক্রিয়া, ধীরাপদ এর কোনোটাই চায় না।

পার্সোন্যাল ফাইল কেন নিয়ে আসতে বলা হয়েছে সেটা বোঝা গেল সব শেষে। বড়সাহেবের কাছে আসন্ন উৎসবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবারের অল্ ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের সাধারণ অধিবেশন বসছে কানপুরে। তারও খুব দেরি নেই আর। অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগদান করবেন হিমাংশু মিত্র। সেই ভাষণে বৈদেশিক ব্যবসায়ের পাশাপাশি এ-দেশের গোটা ভেষজ-ব্যবসায়ের চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, সরকারী নীতির পরিবর্তন এবং আনুষঙ্গিক বাধা-বিঘ্ন দূর করতে পারলে দেশের এই শিল্প কোন্ আদর্শ-পর্যায়ে উঠতে পারে তারও যুক্তিসঙ্গত নজির বিশ্লেষণ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশানের নিষ্ক্রিয়তার আভাসও প্রচ্ছন্ন থাকবে।

ব্লাড-প্রেসার ভুলে আর লাবণ্য সরকারের কড়াকড়ি ভুলে সাগ্রহে নিজেই উঠে গিয়ে ওধারের অফিস ঘর থেকে ছোট-বড় এক পাঁজা পুস্তিকা এনে হাজির করলেন তিনি।···এরকম আরো অনেক আসছে জানালেন, ধীরাপদর তথ্যের অভাব হবে না।

এ-পর্যন্ত বড়সাহেবের অনেক বক্তৃতা অনেক ভাষণ অনেক বাণী লিখেছে, কিন্তু ঠিক এ-ধরণের উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছে বলে মনে পড়ে না। ব্লাড-প্রেসারের প্রতিক্রিয়া কিনা সেই সংশয় মনে এসেছিল, কিন্তু না, এরও কারণ গোপন থাকল না।

লক্ষ্য, আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন। অল্ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাঙালী প্রেসিডেন্ট ইলেকশন। অল্ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাঙালী প্রেসিডেন্ট এ-পর্যন্ত দুইএক জনের বেশি হয়নি। বর্তমানের প্রাদেশিকতায় সে-সম্ভাবনা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হতে বসেছে। সামনের বছরের নির্বাচনে বাঙালীর গৌরব ফিরিয়ে আনা যায় কিনা সেটাই একবার দেখবেন তিনি। বাইরের অনেক ইউনিটের বন্ধুস্থানীয় কর্মকর্তারা কবছর ধরেই তাঁকে এগিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ করছেন, আর সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছেন।

···এবারে তাঁর এগিয়ে আসার সঙ্কল্প, আগামীবারে নির্বাচনে দাঁড়ানোর।

প্রধান-বক্তার ভাষণে সেই প্রস্তুতিটি জোড়ালো করে তুলতে হবে ধীরাপদকে। সকলের টনক নড়ে যায় এমন কিছু শোনাতে হবে। পরের প্রচার-ব্যবস্থা ভেবেচিন্তে পরে করা যাবে।

তাঁর বক্তব্যের উপসংহার, এ-রকম দু'দুটো দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ধীরাপদর অন্যত্র থাকা চলে না, এমন এক জায়গায় থাকে যে একটা টেলিফোনের যোগাযোগ পর্যন্ত নেই, একটা লোক পাঠাতে হলেও এক ঘণ্টার ধাক্কা। অতএব অবিলম্বে সুলতান কুঠির বাস গুটিয়ে তার এখানে চলে আসা দরকার, কোনরকম অসুবিধে যাতে না হয় সে-ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

ধীরাপদ জবাব দেয়নি, কিন্তু বিব্রত জবাবটা মুখেই লেখা ছিল বোধহয়। হিমাংশু মিত্রর নজর এড়ালো না। ঠাট্টা করলেন, তুমি ও-রকম একটা জায়গা আঁকড়ে আছ কেন···এনি সুইট অ্যাফেয়ার?

এরই বা জবাব কি।

হিমাংশুবাবু আংশিক অব্যাহতি দিলেন তাকে। বরাবরকার

মত উঠে আসতে আপত্তি হলে এই কাজের সময়টা অন্তত এখানে থাকতে নির্দেশ দিলেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীরাপদর প্রথমেই মনে পড়ল, মেয়ের বুক-লিষ্ট হয়নি বলে আজই রাগের মাথায় ভাবছিল সুলতান কুঠি ছেড়ে চলে আসবে। সেই সুখের কথা শুনেই অলক্ষ্য চক্রীটির যেন জব্দ করার ইচ্ছে তাকে।

বাসে উঠতে গিয়ে থমকালো আবার। ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে। সোনাবউদিকে রাতের খাবার রাখতে নিষেধ করে এসেছে। এই শান্ত-সন্ধ্যায় হোটেল রেস্তরাঁয় গিয়ে বসার ইচ্ছে আদৌ নেই। রাত আরো বেশি হলেও সে-ইচ্ছে হত না। তার থেকে বরং এক রাত না খেয়ে কাটাবে, আগে কত রাতই তো কেটেছে। ধীরে সুস্থে গেলে ঘরে পৌঁছুতে প্রায় আটটা হবে।···খেয়ে আসেনি সেটা নাও ভাবতে পারে তখন।

ধীরাপদ বাস ধরল।

কিন্তু অলক্ষ্য চক্রীর আরো কিছু বাসনা ছিল জানত না। সুলতান কুঠির আঙিনায় পা দিয়ে দেখে, কদমতলার বেঞ্চিতে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার বসে। এ সময়টা তাকে বাইরে দেখা যায় না বড়। দূরে শকুনি ভটচাযের দাওয়ায় টিমটিম লণ্ঠন জ্বলছে গত রাতের মতো। সেখানেও দাঁড়িয়ে কারা। বোধ হয় ছেলেরা আর রমণী পণ্ডিত।

ভটচায মশাই কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে আগে ব্যস্ত হয়ে একটু সরে বসে বেঞ্চি চাপড়ালেন একাদশী শিকদার, বোসো বাবা বোসো, সারাদিন খেটেখুটে এলে—

খবরাখবর নেবার জন্যেই ধীরাপদ বসল।

হুঁকোর মায়া ভুলে শিকদার মশাই বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন একটা, তার পর সমাচার শোনালেন।···অবস্থা একরকমই ছিল, বিকেলের দিকে শ্বাস-কষ্ট বাড়তে ধীরাপদর অফিসে খবর দেওয়া হয়—খবর পেয়ে যে মেয়ে ডাক্তারটি এসেছিলেন তিনি খুব যত্ন করেই রোগী দেখে গেছেন—মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—কিন্তু কালে টেনেছে যাকে তাকে আর ধরে রাখা যাবে কেমন করে। রোগীর নাকে শুধু বাতাসের নল লাগানোর ব্যবস্থা দিয়ে তিনি চলে গেছেন, যাবার আগে খবরের কাগজের ঘরের বউটির সঙ্গেও অর্থাৎ সোনাবউদির সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করে গেছেন। সঙ্গে আর একটি সাহেবপানা অল্পবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি আর ঘরে ঢোকেননি।

ধীরাপদ হতভম্ব একেবারে।···পাঁচটার পরে টেলিফোন করা হয়েছিল, টেলিফোন পেয়ে লাবণ্য এসেছিল আর অমিত ঘোষ এসেছিল।···ইচ্ছে থাকলে অনুগ্রহ যে করা চলে তাই দেখিয়ে গেল। নিমেষে সমস্ত ভিতরটা তিক্ত হয়ে গেল। কি দরকার ছিল অত ভাবপ্রবণ হয়ে সাত তাড়াতাড়ি রমণী পণ্ডিতকে ফোন করতে বলার—শকুনি ভটচাযের জন্যে কতটুকু দরদ তার! রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল, আমি তো পাঁচটার আগে ফোন করতে বলে গিয়েছিলাম, পাঁচটার পরে কে করতে বলেছে!

হুঁকো হাতে নড়েচড়ে বসলেন শিকদার মশাই, আবছা অন্ধকারের অলক্ষ্যে হয়ত একটু সরেও। মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মেজাজী গলা কানের পরদায় খটখটিয়ে উঠছে।—বলেছিলে বুঝি! ওই রকমই আজকাল কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে পণ্ডিতের, দুপুরে বেরুবার মুখে হড়হড়িয়ে ফোন-ফোন কি বলে গেল আমার কাছে—আমি সাতজন্মে কখনো ও-সব হাতে করেছি না কানে লাগিয়েছি, আর ছেলেরা তো বাপের শোকে কাঠ—। আবার বিকেলে এসে একবার খোঁজ-খবর করেই হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল—আধ ঘণ্টা না যেতে দেখি মেয়ে ডাক্তার এসে হাজির। আমরা তো ধরে বসে আছি তুমি পাঠালে!

ধীরাপদ তারপরেও বসেছিল খানিকক্ষণ। আর কিছু শোনার জন্যে নয়, এমনিই। কিন্তু সেই অবকাশে মোলায়েম খেদে একাদশী শিকদার শুনিয়েছেন কিছু। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে অভাবে পড়েই হয়ত পণ্ডিতের মস্তিগতি কেমন বদলে গেছে আজকাল। ধীরাপদ নিশ্চয় কিছুই লক্ষ্য করেনি, কিছুই জানে না—মস্ত কাজের লোক সে, জানার কথাও নয়। কিন্তু চোখের ওপর তাঁদের তো দেখতেই হচ্ছে আর সুনাম দুর্নামটাও ভাবতে হচ্ছে।···পণ্ডিতের মেয়েটার চালচলন দিনকে দিনই কেমন হচ্ছে, কাউকে যেন কেয়ারও করে না—তাঁদের মত বুড়োদের চোখে পড়ে বলে লাগে, কিন্তু বাপ আজকাল ও-সব দেখেও দেখে না, অভাবের তাড়নায় উলটে প্রশ্রয়ই দেয় হয়ত···এদিকে কুঠি-বাড়ির যা অবস্থা, আজ এদিক খসে তো কাল ও-দিক, এর মধ্যে কাবুলিওয়ালা এসে এসে লাঠি ঠুকে ওদিক-টার ভিতসুদ্ধ নড়িয়ে দিল—গত পনের দিনের মধ্যে কম করে তিন দিন পণ্ডিতের দাওয়ায় কাবুলিওয়ালা হানা দিয়েছে—আরো ক'দিন দেবে কে জানে!

নিজের অগোচরে বসে শুনছিল ধীরাপদ। নির্বাক।···কবে যেন কাবুলিওয়ালার এমনি এক লাঠি ঠোকার দৃশ্য দেখেছিল কোথায়। মনে পড়ছে, পাওয়ানাদারের সামনে কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে।

উঠে পড়ল। ইচ্ছে না থাকলেও ওদিকটায় একবার গিয়ে দাঁড়ানো দরকার, রোগীর খোঁজ নেওয়া দরকার। লাবণ্য সরকার কি বলে গেছে তা-ও ভালো করে জানা দরকার।

তাকে উঠতে দেখে হুঁকো হাতে শিকদার মশাইও উঠলেন।

লাবণ্য সরকার শুধু অক্সিজেন টিউব লাগানো ছাড়া নতুন আর কিছুই ব্যবস্থা দিয়ে যায়নি বটে। রমণী পণ্ডিতকে বলে গেছে, ধীরু বাবু ছিলেন না বলেই সে এসে দেখে গেল, তবে করার কিছু নেই আপাতত, দরকার বুঝলে কাল যেন ধীরু বাবু বড় ডাক্তার নিয়ে আসেন।

রমণী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ধীরাপদ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। অন্ধকারে শ্রোতার ভাবলেশহীন মুখখানা চোখে পড়েনি। কদমতলার কাছাকাছি এসে মেয়ে ডাক্তারটির সহৃদয়তার প্রশংসা শুরু করেছিলেন তিনিও। মেয়েটিই টেলিফোন ধরেছিলেন, সুলতান কুঠি থেকে টেলিফোনে কথা বলা হচ্ছে শুনে নিজে থেকে বাড়ির অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন···

আমি আপনাকে পাঁচটার মধ্যে ফোন করতে বলেছিলাম, সমস্ত দিন পার করে এসে তারপর উপকার করতে দৌড়নোর দরকার ছিল কী?

রমণী পণ্ডিত থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আর কিছু শুনতে রাজি নয় দেখে আশ্বস্ত হতে সময় লাগল। ফুটন্ত তেলে জলের ছিটে, ওই শিকদার মশাই এই সবই

বলেছে আপনাকে সাতখানা করে, না? বলবেই তো, আমি জানি বলবে। সমস্ত দিন আমি সংসারের ধান্দায় ঘুরি, তার পরেও যেটুকু পারি করি—কিন্তু ওনারা পরের কুৎসা করে বেড়ানো ছাড়া আর কি করেন?

ঘরের কাছাকাছি এসে ধীরাপদ বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে। এই উদ্‌গিরণের মুখে ঘর খুললে উনিও ঘরে ঢুকবেন। ধীরাপদ সিরিবিলি চাইছে।

রমণী পণ্ডিতের গলায় উত্তাপ সত্ত্বেও সুবিচারের আবেদন ছিল। তাঁর বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত অব্যাহতি নেই। তাঁর সওয়ালে কান পাততে হয়েছে।···বেলা দেড়টা পর্যন্ত হাফ-ফীয়ের ডাক্তার আসেননি, রমণী পণ্ডিত দু'দুবার তাঁকে তাগিদ দিতে গিয়ে দেখা পাননি। তারপর আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে, না বেরুলে রাতে হাঁড়ি চড়ে না। তাই একাদশী শিকদারকেই এইটুকু ব্যবস্থার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, ডাক্তারের মত হলে ছেলেরা কেউ একজন গিয়ে যেন ধীরুবাবুকে ফোন করে আসে সেই কথাও বলে গিয়েছিলেন। ধীরুবাবুর দেওয়া টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটা পর্যন্ত তাঁর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু এসে দেখেন কোনো ব্যবস্থাই হয়নি, রোগীর এদিকে শ্বাসকষ্ট, বাড়িতে কান্নাকাটি। তখন পাঁচটা বেজে গেছে কি বাজেনি রমণী পণ্ডিত জানেন না, তক্ষুণি আবার ছুটেছেন টেলিফোন করতে।

নিজের রূঢ়তার দরুন ধীরাপদ নিজেই লজ্জিত একটু, একজনের মৃত্যুর সামনে এ-রকম মর্যাদাবোধ টনটনিয়ে না উঠলেই হত। ভদ্রলোক করছেনই তো, ভটচায মশাইয়ের ছেলেরাও কৃতজ্ঞ সেইজন্য।···তাছাড়া লাবণ্য সরকার কাকে জব্দ করার জন্যে এমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে গেল সেটা আর উনি জানবেন কি করে।

কিন্তু রমণী পণ্ডিতের রাগ আর আবেদন মেশানো খেদ-উক্তির সবে শুরু। তিনি ঠিক জানেন, একাদশী শিকদার ইচ্ছে করেই কোনো ব্যবস্থা করেন নি, ছেলেদেরও বলেন নি। কেন বলবেন? দরদ থাকলে তো বলবেন, মনে মনে এখন হয়ত হিসেব করছেন এ ক'বছর তাঁর ক'মণ তামাকের ধোঁয়া ভটচায মশায়ের পেটে গেছে—রমণী পণ্ডিত হলপ করে বলতে পারেন শকুনি ভটচায চোখ বুজতে চলেছেন বলে তাঁর একটুও দুঃখ হয়নি, উলটে কোনো ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কি ব্যাপার তিনি জানেন না অবশ্য, কিন্তু কিছু একটা আছেই। ওই জন্যেই এতকাল তোয়াজ করে এসেছেন, গোপনে গোপনে অনেক বার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন ভটচায মশাইকে দিয়ে।···হয়ত সেই কারণে উনি শিকদার মশাইয়ের অনেক দুর্বলতার কথা জানতেন। এখন নিশ্চিন্ত, এখন আর কিছু ফাঁস হবার ভয় নেই।

ধীরাপদ অবাক, ঘরে ঢোকার তাগিদ ভুলে গেল, নিরিবিলির তাগিদ ভুলে গেল।

রমণী পণ্ডিতের অসহিষ্ণু জ্বালাটা ঠাণ্ডা হল একটু, সুর নরম হল।···বুড়ো ভদ্রলোক যেতে বসেছেন, এ-অবস্থায় তাঁর মিথ্যে নিন্দে করলে পণ্ডিতের জিভ খসে যায় যেন, কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত ওই দুই বুড়ো ভদ্রলোক নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কালী ঢেলেছেন শুধু, একটুও দয়ামায়া যদি থাকত ওঁদের বুকে। ওইটুকু একটা মেয়েকে নিয়ে আবার তাঁরা গঞ্জনা দিতে শুরু করেছিলেন পণ্ডিতকে। ধীরুবাবু দয়া করে একটু পড়াত, তাতেও তাঁদের চোখ টাটিয়েছিল, এখন প্রায় বাপের বয়সী গণুবাবু একটু-আধটু সাহায্যের চেষ্টা করছেন, চেনা-জানা মেয়েদের দুই-একটা হাতের কাজ শেখানোর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন—এতেও ওঁদের গাত্রদাহের শেষ নেই। রমণী পণ্ডিত শাপমন্যি করেন না কাউকে, কিন্তু এতে কি ওঁদেরই ভালো হচ্ছে না হবে?

নিজের ঘরে বসেও ধীরাপদর মাথাটা ঝিমঝিম করেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ঘর-দোর অন্য দিনের মতই পরিচ্ছন্ন দেখেছে, বিছানাটাও রোজকার মত পরিপাটি করে পাতা, সামনের দেয়ালের কাছে খাবারটা ঢাকা দেওয়া নেই শুধু। তার সময়ও হয়নি। কিন্তু ধীরাপদ এ-সব নিয়ে ভাবছে না। একাদশী শিকদারের খেদ আর রমণী পণ্ডিতের মর্মদাহে মাথা ঠাসা।

···এতকালের একমাত্র সঙ্গীর বিয়োগ-সম্ভাবনায় একাদশী শিকদার তেমন যে কাতর হননি, সেটা ধীরাপদ নিজেই লক্ষ্য করেছে। অন্যদিকে পণ্ডিতের মেয়ে কুমুর চাল-চলনের কটাক্ষটা যে সম্প্রতি গণুদা পর্যন্ত গড়িয়েছে সেটা বিশ্বাস না হলেও ধীরাপদ অস্বস্তিবোধ করছে কেমন। মায়ের মেজাজ প্রসঙ্গে উমারাণীর গতকালের গোপন ত্রাসের কথাগুলো নতুন করে কানের কাছে ভিড় করে আসছে। বলেছিল, মায়ের মুখের দিকে আজকাল তাকালে পর্যন্ত থরথরিয়ে কাঁপুনি, আর, তার বাবারও আর আগের মত ঝগড়া করার সাহস নেই, হয় মুখ বুজে থাকে নয়তো পালিয়ে যায়।

'মা আজকাল আরো কি ভীষণ রাগী হয়ে গেছে তুমি জান না ধীরুকা···'

ধীরাপদর আবারও মনে হল খুব বেশি রকমের অসঙ্গতি না দেখলে ওইটুকু মেয়ের এমন কথা বলার কথা নয়।

ভাবনায় ছেদ পড়ল, খাবারের থালা আর গ্লাস হাতে সোনাবউদি ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু উমারাণীর অমন ত্রাসের টাটকা নজির কিছু চোখে পড়ল না, বরং বিপরীত দেখল। দুই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সোনাবউদি সুপরিচিত চাপা বিদ্রূপে অনুমতি প্রার্থনা করল যেন, রাখব না নিয়ে যাব?

কিন্তু ধীরাপদ যথার্থই গম্ভীর, সকালের অপমান সমস্ত দিন ধরে ভিতরটা কুরেছে। মেজাজের ওপর মেজাজ চড়ালে বরং এই একজনকে অনেক সময় নরম হতে দেখেছে। সকালে চড়িয়েছিল। এখনো আগে কৈফিয়তই নেবে:

সকালে মেয়েকে বুকলিষ্টটা দিতে দেননি কেন?

থালা গেলাস যথাস্থানে রাখল সোনাবউদি, ঘরের কোণ থেকে আসনখানা এনে পেতে দিল। তারপর ধীরেসুস্থে বলল, ঘরের মানুষটার মতিগতি যাতে একটু ফেরে সেই জন্য···আপনার কি ইচ্ছে, সে-চেষ্টা করব না?

তাকে অমন বিষম থতমত খেতে দেখেই হয়ত সোনাবউদি হেসে ফেলল। বিড়ম্বনা সামলে নেবার অবকাশ দিয়ে ফিরে আবার টিপ্পনী কাটল, রাগ গেছে নাকি কাল আবার বলবেন এই বাড়িমুখোই হবেন না আর?

জোরালো আলোর ঘায়ে এক-ঘর চাপ অন্ধকার যেমন নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কৈফিয়তটা শোনামাত্র ধীরাপদর সমস্ত দিনের

থমথমে গুরুভারও তেমনি তচনচ হয়ে মিলিয়ে গেল কোথায়। হাল্কা লাগছে, গতকালের ঘরে ফেরার তৃষ্ণাটা এই মিটল বুঝি। নিজের ঘর না হোক, নিজের কারো ঘর···।

সোনাবউদির শেষের টিপ্পনীটুকুও আশ্রয়ের মত, খানিকটা আড়াল পাবার মত। খাবারের থালার দিকে চোখ রেখে বলল, কাল না হোক, দুচার দিনের মধ্যেই এখান থেকে নড়তে হবে দিনকতকের জন্য।

সোনাবউদির নীরব প্রতীক্ষা একটু।—কোথায়?

বড়সাহেবের বাড়িতে, অনেকগুলো কাজের চাপ পড়েছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকার হুকুম।

যেন এই কারণেই এত বিষণ্ণতা আর এত মেজাজ খারাপ। চোখ তুলে সোজাসুজি তাকাতে পারেনি, কিন্তু ধীরাপদর অনুমান, সোনাবউদির মুখখানা পরিহাস-সিক্ত হয়ে উঠেছে।

তা আপনার নড়তে বাধাটা কোথায়?

কোথায় বলা গেল না, কিন্তু ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল বলে।

সয়ে সয়ে এবারে বিকেলের খবরটা দিল সোনাবউদি, আপনাদের লাবণ্য ডাক্তার ভটচায মশাইকে দেখে ফেরার মুখে আমাকেও দেখে গেছেন।···ভটচায মশায়ের রাত কাটবে কিনা সন্দেহ বললেন, আমার সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলেননি।

ধীরাপদ হেসে ফেলল।

সোনাবউদি গম্ভীর।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু'চার মিনিট আলাপ-সালাপ করলেন, আর আপনার নামে কিছু নালিশ করলেন। আমাকে আপনার গার্জেন ভেবেছেন বোধহয়।···আপনাদের বড়সাহেবের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়িটা কতদূর?

অনেক দূর।

তাই তো, তাহলে এখান থেকে নড়ে আপনার কি-বা সুবিধে। আর, যে-লোককে তাঁর সঙ্গে দেখলাম, আপনার কতটুকু আশা তাও বুঝি নে।

আশা নেই। ধীরাপদ হাসছে, হেসেই সায় দিতে পারছে।—কিন্তু আমার নামে কি নালিশ করে গেলেন?

সোনাবউদির গম্ভীর মুখের মধ্যে শুধু চোখ দুটোতে খানিকটা করে তরল কৌতুক জমাট বেঁধে আছে।—খেতে খেতে কি নালিশ মনের আনন্দে ভাবতে থাকুন, রুটি আজ আর দু'চারখানা বেশি লাগবে বোধ হয়—লাগলে ডাকবেন। আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, মেয়েটা খায়নি এখন পর্যন্ত—

সত্যিই চলে গেল। ধীরাপদ তক্ষুনি উঠে খেতে বসে গেল। খিদের তাগিদে নয়, সোনাবউদির ওপর সমস্ত দিনের ক্ষোভের অপরাধ তাতে কিছুটা লাঘব হবে যেন।

কিন্তু উমারাণীর গত রাতের উক্তিতে অতিশয়োক্তি ছিল না।

খাওয়া প্রায় শেষ। মুখ হাত ধুয়ে ভটচায মশায়ের আর একবার খবর নিয়ে আসবে ভাবছিল। বাইরে থেকে যে মুখখানা উঁকি দিল সেটি গণুদার। ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

—তোমার সকালের টাকাটা দিতে এলাম। গলার মৃদু স্বর সোনাবউদির ভয়েই আরো মৃদু বোধহয়, কিন্তু ফর্সা মুখখানা খুশিতে টসটসে। হাসল, টাকাটা তখন পেয়ে খুব উপকার

হয়েছে। বিকেলে অবশ্য অফিসের ওভার-টাইম বিলটা পেয়ে গেলাম—

গণুদা পান খাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে পান চিবুচ্ছে বোধহয়, একটা দুটো পানে দাঁত অত লাল হয় না, ঠোঁটের এ-ধারে পর্যন্ত শুকনো লালের ছোপ। কিন্তু সাধারণ দু'পয়সার পান খাচ্ছে না গণুদা, আতর-মুশকি দেওয়া বিলাসী পান হবে—ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা আমেজী গন্ধ ছড়িয়েছে।

ধীরাপদ ইশারায় বিছানাটা দেখিয়ে দিল, অর্থাৎ টাকাটা ওখানে রেখে যেতে পারে। কিন্তু টাকা রাখার বদলে গণুদা নিজেই বিছনায় এসে বসে পড়ল।—তুমি খাও, আমি বসি একটু।

খাওয়া হয়ে গেছে। হাসি চেপে ধীরাপদ বারান্দায় উঠোনে মুখ ধুতে গেল, এই পান-বিলাসের মুখে সহধর্মিণীর সামনে পড়তে চায় না। মুখ ধুয়ে এসে দেখে, গণুদা গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে, বলল, গরম লাগছে।

মুখ মুছে বিছানায় বসে ধীরাপদ সাদাসিদে ভাবেই মন্তব্য করল, নবাবী আমলের রইসরা পান খেয়ে গরমে তিন দিন বরফ-জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকত শুনেছি।

আনন্দে সবক'টা লাল দাঁত দেখা গেল গণুদার। কাছাকাছি বসতে গন্ধটা উগ্র লাগছে এখন। বলল, তোমার জন্যেও নিয়ে আসব একদিন, এক-একটার দাম আট আনা করে, একদিন খেলে তিন দিন তার স্বাদ লেগে থাকে মুখে।

ধীরাপদকে গম্ভীর দেখে তাড়াতাড়ি জামাটা টেনে বুক পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে সবে টাকাটা নিয়েছে, ঘরের মধ্যে যেন শূন্য থেকেই আবির্ভাব সোনাবউদির।—কিসের টাকা ওটা ?

কানের মধ্যে এক ঝলক করে গলানো আগুন ঢুকল দুজনারই। গণুদার পান-মুখ সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মত শুকনো, সাদা। ধীরাপদও হঠাৎ হকচকিয়ে গেল কেমন।

—ও টাকা কিসের ?

গণুদার বিবর্ণ মুখে আর এক ঝলক আগুনের ঝাপটা। অস্ফুট জবাব দিতে চেষ্টা করল, ধী-ধীরুর—

ধীরুর টাকা তোমার কাছে কেন ?

গণুদার মুখ নিচু। ধীরাপদ হতভম্ব। জবাব দিচ্ছে না কেন, কি এমন অপরাধ করেছে গণুদা !

এগিয়ে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে গণুদার হাত থেকে জামাটা টেনে নিল সোনাবউদি। ভাঁজ লণ্ডভণ্ড করে নাকের কাছে ধরে শুঁকল একটু। কিন্তু ঝালায় হিসহিসিয়ে উঠল আবারও।—পান খেয়ে ও-ছাই-পাশের গন্ধ ঢাকবে ভেবেছ তুমি ?

জামাটাই ফালা ফালা করবে বোধ হয়, কিন্তু না, জামার নিচের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোট বার করল এক তাড়া—শ' আড়াই-তিন হবে। নোট আর জামা হাতে সোনাবউদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু হাতে জামাসুদ্ধ নোটগুলো দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে সজোরে গণুদার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। ধীরাপদ নিস্পন্দ কাঠ, সোনা বউদির দু' চোখে ধকধক করছে সাদা আগুন।

নোট দুমড়নো জামাটা তুলে নিয়ে গণুদা ঘর ছেড়ে পালালো তক্ষুনি।

আপনি ওকে টাকা দিয়েছেন কেন ?

এবারে ধীরাপদর পিঠের ওপরে যেন আচমকা চাবুক পড়ল একটা। কিন্তু ধীরাপদ বিমূঢ় তখনো।

আমি জানতে চাই আপনি কেন ওর হাতে টাকা দিয়েছেন ? তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতায় ঘরের বাতাস শুধু দু'খানা হয়ে গেল যেন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম দেবার জন্যে চেয়েছিলেন···

সোনাবউদির শোনার ধৈর্য নেই, দ্বিগুণ ক্ষিপ্ততায় গলা চড়ল আরো।—আমার লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম শুকলাল দারোয়ান দেয়, আপনি কেন আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ওর হাতে টাকা দেবেন ? কেন ? কেন ?

ধীরাপদ কি ভুল দেখছে ? ভুল শুনেছে ? প্রিমিয়াম শুকলাল দারোয়ান দেয়···আজ কি বার ? শনিবার নয়, রেসএর দিন নয়···কিন্তু গণুদার পকেটে অত টাকা···জুয়ার আসর···জুয়ার আসরের দিনক্ষণ নেই···।

ধীরাপদ নির্বাক, স্তব্ধ ! কিন্তু সোনাবউদি থামেনি। তার কঠিন শাণিত কণ্ঠস্বর দু' কান বিদীর্ণ করে বুকের মধ্যে গিয়ে কেটে বসছে।—আপনার মস্ত চাকরি, অনেক টাকা মাইনে পান—কেমন ? কেউ চাইলে টাকা দিয়ে অনুগ্রহ করার লোভ কিছুতে আর সামলে উঠতে পারেন না, না ? কেন আপনার এত টাকার দেমাক ? কেন আপনি—

বাইরে থেকে একটা কান্নার রোল ভেসে আসতে আচমকা থেমে গেল।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সোনাবউদি।···স্তব্ধ মুহূর্ত গোটাকতক। শ্লথ, অবসন্ন পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শকুনি ভটচাষ মারা গেলেন···।

ধীরাপদ স্থাণুর মত বসে।

[ক্রমশঃ।

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর

শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমরা যাঁকে জানতে অবনদাদু বলে, যাঁর লেখা তোমরা পড়েছ, যাঁর আঁকা ছবি তোমরা দেখেছ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় তো তাঁর কাছে এসেওছিলে, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, কেমন করে তিনি বড় হয়েছিলেন, সারা জীবন তিনি কি করেছিলেন, এখবর আমার যতটুকু জানা আছে আজ তোমাদের শোনাই। তোমরা যাঁকে বল অবনদাদু, তিনি ছিলেন আমার বাবা, আমার পরমারাধ্য পিতা।

আমাদের বাড়ী ছিল কলকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী বলে আজও যা পরিচিত। এই দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ৫নং বাড়ীতে দোতালায় ছিল এক মস্ত হলঘর। সেই হলঘরের পূবে ছিল ঘড়ি-ঘর আর পশ্চিমে এক আঁতুড়-ঘর। ১২৭৮ সালের ২৩এ শ্রাবণ জন্মাষ্টমীর দিন (৭ই আগষ্ট ১৮৭১) সেই আঁতুড়-ঘরে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র তোমাদের অবনদাদু যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন ঘড়ি-ঘরের মেকাবি ক্লক্-এর ঘণ্টায় ঢং ঢং করে বাজছে বারোটা।

এমন পুণ্যদিনে পুত্র লাভ করে মা সৌদামিনী দেবী যে কত খুসী হলেন তার ঠিক নেই। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল রাত বারোটায়। তাঁর খোকা হল বেলা বারোটায়। এমন মিল এমন সুলক্ষণ দেখে তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, আহা আমার খোকা বড় হয়ে কেষ্ট বিষ্টু একটা কিছু হোক। মায়ের মনস্কামনা সত্যই ফলেছিল অবনীন্দ্রনাথের জীবনে।

প্রিন্স দ্বারকানাথের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ছিল-দুই মহল। পূর্ব পুরুষদের গড়া ৬নং বাড়ী ছিল অন্দর মহল, আর এই ৫নং বাড়ী দ্বারকানাথ নিজে দেখে শুনে তৈরী করিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর বৈঠকখানা বাড়ী বা বাহির মহল। দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এই ৫নং বাড়ী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র—তিনি থাকতেন ৬নং বাড়ীতে। গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ আর গুণেন্দ্রনাথ। এই গুণেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র সমরেন্দ্রনাথের পর তৃতীয় পুত্র এলেন অবনীন্দ্রনাথ—তোমাদের—অবনদাদু।

শিশু অবনীন্দ্রনাথ মায়ের কোলে আর পদ্মদাসীর কাঁকালে চেপে বাড়ীর অন্দরে মানুষ হতে লাগলেন। অন্দরের মধ্যেই চলাফেরা, অন্দরেই সব কিছু। তাঁর বড়মা-র ঘরের দেয়াল ছিল কালীঘাটের পটে সাজানো। পটুয়ার মোটা মোটা তুলির টানে আঁকা রঙিন চিত্র। আর ছিল খাঁচায় ভরা পাখী, দাঁড়ে ঝোলা টিয়ে, কাকাতুয়া আরো কত কি। এই ছিল শিশু অবনীন্দ্রের জগতের সীমা।

সন্ধ্যা হলে মা বসতেন আসর জমিয়ে তেতলার ছাদে, দক্ষিণে, বাগানের শিয়রে। পূবে ছিল মস্ত বড় এক শিশুগাছ পুকুরের গায়ে। যখন চাঁদ উঠতো এর ফাঁকে আর তারা ফুটতো আকাশে আর দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আসতো বেল-জুঁই-এর গন্ধ, তখন মা গাইতেন ছেলে ভুলানো ছড়া আর বলতেন বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প। এই আবহাওয়াতেই শিশু অবনীন্দ্রনাথের জীবন সুরু।

বাইরে ছিল আর একরকম জগত।

তখনকার দিনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর আবহাওয়ায় ছিল সাহিত্য সঙ্গীত চারুকলা। বাবুদের বৈঠক বসতো সেখানে, চলতো সাহিত্য-আলোচনা। নাটক রচনা হত এবং বাড়ীর হলঘরে অভিনয় করে দেখানো হত সকলকে। এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন বাড়ীর পুরুষেরা এবং দু-চারজন বাছাই করা বন্ধুবান্ধব। সে সময় মেয়েদের অভিনয় করার কোনো রেওয়াজ ছিল না। পুরুষরাই মেয়ের পার্ট-এ নামতেন, মেয়েলী গলায় মেয়েলী ঢং-এ যতদূর পারেন অভিনয় করে যেতেন। দর্শকদের মধ্যে পুরুষেরা সামনে আসরের মধ্যে বসে এবং মহিলারা পিছনে চিকের আড়াল থেকে নাট্য উপভোগ করতেন।

সন্ধ্যার সময় গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসতো ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে গানের আসর। স্বনামধন্য শ্যামসুন্দর মিশ্র ছিলেন তাঁর মাইনে করা গাইয়ে। যুবক শ্যামসুন্দর যখন সারেঙ্গী ও তবলার সঙ্গে টপ্পা ধরতেন তাঁর সুমিষ্ট ভরাট গলায়, তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ী ভরে যেত গানের মূর্চ্ছনায় ও সুরের ঝঙ্কারে। শুনেছি আমাদের বাড়ীর পিছনে মদন চাটুয্যের গলিতে আপিস-ফেরতা পাড়ার লোকদের ভীড় জমে যেত। যদু ভট্টের ও গোঁসাইজীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও আসর বসতো মাঝে মাঝে। এইভাবে ইয়ার-বক্সিতে বৈঠক হত জম-জমাট আর একতলার বারান্দায় হুঁকো-বরদার ভীষণ ব্যস্ত থাকত হুঁকো ফেরাতে আর কলকে সাজাতে ও তারই ভিতর একটু অবসর পেলেই সারেঙ্গী বাজিয়ে বেহারা দরোয়ান চাকরদের কাছে বাহবা নিতে।

গুণেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন ভাল শিল্পী। ছবি আঁকা বাগান করা ও পাখী পোষা এই নিয়েই থাকতেন সারাদিন। গাছের সখ ছিল অত্যন্ত বেশী। বাগান করবার আগে নিজে প্ল্যান করে নিতেন। কোথায় কি গাছ বসবে, কোনখান দিয়ে রাস্তা যাবে, পুকুর থাকবে কোথায়, পাখীর খাঁচা বসবে কোথায় এই সব আগে থাকতে কাগজে দেগে নিতেন। প্রতিটি জিনিস রং দিয়ে এঁকে ফেলতেন। এই ভাবে তাঁর মনের বাগানের ছবি কাগজে আঁকা হয়ে গেলে মালীদের নিয়ে সুরু করে দিতেন আসল বাগান তৈরীর কাজ। দিনের পর দিন চলত এই। কত রকমের গাছ যে তিনি লাগিয়েছিলেন, তা আজ যদি থাকতো তাহলে তাকে ছোট একটি কোম্পানীর বাগিচা বলা যেত।

এই তো গেল বার মহলের হাওয়া। আর এদিকে সন্ধ্যায় অন্দর মহলে তিন তলার হল্ ঘরে মা বসতেন ননদ, ভাজ, ছোট ছোট মেয়ের দল এবং ঝি-দাসীদের নিয়ে আসর জমিয়ে। সেখানে পড়া হত রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের কাহিনী। কোন কোনদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবরচিত উপন্যাস।

দিনের বেলায় অন্দরে হাজার রকম কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলেছে একটানা স্রোত। বাজার নিয়ে এল মুটেরা। মেয়েরা বসে তরকারী কুটছে, পান সাজছে। দাসীরা কুটছে মাছ। হিন্দুস্থানী ঠিকে-ঝি জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙছে ঘর-ঘর শব্দে। সরকার মশায় বাজারের হিসেব দিচ্ছেন। চাকররা বসে রূপোর বাসন গেলাস খড়ি দিয়ে পালিশ করছে, পাথরের বাসন সোডা দিয়ে ঘষে ঘষে করছে সাফ ঠাকুরকে গিন্নী-মা নিজে দেখিয়ে দিচ্ছেন কোন রান্না কেমন করে করতে হবে। তারপর বিকেল হল। মেয়েদের চুল বাঁধা, আলতা পরা, প্রসাধন পর্ব সাঙ্গ হল। ধোপা এল মোট ঘাড়ে করে। থাকে থাকে কাচা কাপড় সাজিয়ে দিয়ে ময়লা কাপড় গুণতি করে পোঁটলা বেঁধে কাঁধে নিয়ে চলে গেল। পান দিয়ে গেল বারুই। ছেলেরা বেড়িয়ে ফিরে এলো আর যেমন গল্প বলা শুরু হল অমনি অন্দরের বড় দরজায় চাবী পড়ল। বাস্—অন্দর হয়ে গেল বন্ধ।

সমস্তটা নিয়ে কি সুন্দর পরিবেশ আর কত রকমের ছবি! শিশু অবনীন্দ্রনাথের মনের পটে সারা দিন ধরে একের পর এক এই ছবির স্রোত তরঙ্গায়িত হয়ে যেত।

ছেলে বড় হল। তিন পেরিয়ে পড়লো চার বছরে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত মুখে দিয়ে ছেলে হাতে-খড়ি করে এল মাটির উপর মোটা এক পাথরে খড়ি দিয়ে 'অ' অক্ষর লিখে। কর্তা অমনি হুকুম দিলেন—আর নয়, এইবার ছেলে মানুষ হোক চাকরের কাছে থেকে। পদ্মদাসীর পালা চুকলো। তার কোল থেকে ছোট অবনীন্দ্রনাথ সোজা চলে এলেন বার মহলে রামলাল চাকরের হেফাজতে।

তখনকার দিনে বাড়ীর একতলায় তোষাখানা বলে একটা মস্ত ঘর থাকতো, সেটা ছিল বাড়ীর বাঙালী চাকরদের আস্তানা। সেখানে পাড়া থাকত অনেকগুলো উঁচু বড় তক্তপোষ, তার উপর মাদুর বিছানো আর ঘরের কোণে গোটা দুই বড় বড় আলমারি। সেই আলমারির মধ্যে থাকতো বাবুদের রোজ খাবার রূপোর, পাথরের আর কাঁচের বাসন, সর্দার চাকরের জিম্মায়। এইখানেই চাকরেরা থাকত, খেত, ঘুমোতো, গল্প করত, বাবুদের ধুতি চাদর কুঁচোতো আর ছোট ছেলেদের মানুষ করে তুলত। এইখানে রামলালের কাছে রূপকথা আর বাঘ-ভালুকের গল্প শুনে বড় হতে থাকলেন অবনীন্দ্রনাথ।

বছরের পর বছর চলে যায়, ছেলেও বড় হয়, বাড়ীতেই মাষ্টার পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া সুরু হয়ে যায়। ছবি আঁকা আপনা থেকেই আসে, বাড়ীর দেয়ালময়, বিশেষ করে অন্দরের তিনতলার সিঁড়ির দেয়ালের গায়ে দেখা যায় কে সব ছবি এঁকে রেখেছে। কে আঁকলে? কে নষ্ট করেছে দেয়াল? মা বলেন—এ নিশ্চয় সেই গুণ্ডার কাজ! ডাক তাকে। ডেকে শোনা গেল তিনিই করেছেন। দেয়ালে যে কালি জুলি দিয়ে ছবি লিখতে নেই কেউ তো বলে দেয়নি অবনীন্দ্রনাথকে; তাঁর শিশু মনে যখন ছবি উঁকি দিয়েছে হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাতেই টেনেছেন চিত্ররেখা।

গুণেন্দ্রনাথ কাঁচের পাত্রে মাছ পুষতেন্। একবার হল কি, তিনি প্রকাণ্ড একটা গোল কাঁচের আকোয়ারিয়াম কিনে এনে জল ভরে তাতে লাল মাছ ছেড়ে দিলেন। ছেলেমেয়ের দল এই দেখতে চারিদিক থেকে ভীড় করে এল। অবাক হয়ে তারা জলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, জলের মধ্যে সবুজ ঝাঁঝির ফাঁকে ফাঁকে লাল রং-এর মাছগুলি কেমন ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করে বেড়ায়। অবনীন্দ্রনাথের বড় ভাল লাগল এই দৃশ্য। তারপর হল কি, সেইদিন দুপুরে গামলা ভরা রঙিন মাছের চিত্রকে আরো রঙিন করে দিলেন তিনি। ঠিক দুপুরে যখন সবাই ঘুমে ঢুলে পড়েছে, দাদারা সব স্কুলে, সেই সময় চুপি চুপি এক বোতল লাল কালি এনে ঢেলে দিলেন জলে। লালে লাল হয়ে গেল জল। বাঃ, কি চমৎকার রঙের খেলা। ভারি খুসী অবনীন্দ্র!

এদিকে বিকেল বেলায় দুপুরের ঘুম সেরে গুণেন্দ্রনাথ বারান্দায় এসে দেখেন তাঁর অত সখের লাল মাছগুলি পেট উল্টে জলের উপর ভাসছে। জলের রং একেবারে রক্তবর্ণ। হৈ হৈ পড়ে গেল—কে করলে এমন কাজ? খোঁজ, খোঁজ! গোলমাল শুনে অবুবাবু গায়েব। কিন্তু বাবামশায় বুঝে ফেলেছেন, এ কার কাজ। বললেন—এ নিশ্চয় সেই গুণ্ডাটার কীর্ত্তি, আনো তাকে ধরে। অবনীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করা হল কর্তা জিজ্ঞেস করলেন—তুই এই কাজ করেছিস? অবু স্বীকার করলেন দোষ। কর্তা বললেন—কেন করলি? অবু বললেন—বা রে, সাদা জলে কি লাল মাছ ভাল লাগে? লাল জলে কেমন দেখায় তাই দেখছিলুম। এই শুনে গুণেন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন এবং সেইদিনই ঠিক করলেন এবার ছেলেকে স্কুলে আটক করতে হবে। [ক্রমশঃ।

অনেক দূরের পথ

[হান্স আণ্ডেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত

ঘণ্টা, বই আর আলো

পরবর্তী দিনগুলি চিন্তাহীন শান্তির অসাধারণ অনুভূতিতে ভ'রে গেলো। উদ্বেগ, অনিশ্চয়, দুর্ভাবনা, পরিশ্রম—এই সব নিয়ে জীবনযাপন করা হান্সের কাছে অতিশয় সাধারণ হ'য়ে পড়েছিলো—প্রায় অভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছিলো বলা চলে। কিন্তু এখন আস্তে ধীরে এটাই সে বুঝতে পারলে এখন অন্তত কতিপয় বছরের জন্ম তাকে আর খাদ্যসংগ্রহের ধান্দায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না—যতক্ষণ কাজ করবে, আর তাকে করতে হবে না খাবারের ভাবনা। আরো বইপত্র দেওয়া হবে তাকে যা তার প্রয়োজন। দেয়া হবে সেই পোশাক যা ঠিক তারই মাপ-মতো তৈরি। পায়ের ডিম ঢেকে থাকবে চকচকে আস্ত জুতো—বরফের কুচি ছিঁড়ে খাবে না আর মস্ত পাতু'টি। উপরন্তু পাবে সেই জিনিশ যার কথা এতকাল কেবল লোকমুখে শুনেছে—সিবোনি যে বহুপূর্বেই তাকে

কিছু টাকাকড়ি উপহার দিয়েছিলেন তা ছাড়াও কিনা কিছু পকেট-খরচ পাবে সে! সবই তাকে বিশদ ক'রে সরল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন কোলিন। পাবলিক-ফাণ্ড থেকে তাকে কিছু বৃত্তি দেবেন রাজা—সুখের সঙ্গেই এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। প্রতি তিন মাস অন্তর কোলিন তাকে বাজে-খরচ মিটোবার জন্য টাকা পাঠাবেন—জামা-কাপড়, বইপত্র, রজকের প্রাপ্য এই সব মিটিয়েও নিজের জন্য কিছু উদবৃত্ত থাকবে তার—উপরন্তু শ্লাগেলজের গ্রামার স্কুলে তাকে বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হবে। 'শ্লাগেলজে!' জায়গাটার নাম পুনরাবৃত্তি করলো হান্স, আর তক্ষুণি তার মুখ কালো হ'য়ে ঝুঁকে পড়লে—কিন্তু কোলিন তার প্রতি এতটাই দয়াপরবশ যে তাঁকে হতাশ করতে তার কৃতজ্ঞতাবোধে বাধলো। বাড়িতে সান্ধ্যভোজে যোগদান করার জন্য হান্সকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কোলিন—আর যেতেই শ্রীমতী কোলিন এত হার্দ্য ও অন্তরঙ্গ-ভাবে তাকে স্বাগত জানালেন যে কোনোই দ্বিরুক্তি করার সময় পেলো না হান্স।

কোলিনদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব কম লোককেই তাদের অন্তরঙ্গ গণ্ডির ভিতর গ্রহণ করতো—কাউকেই সহজে নিজের ব'লে ভাবতে পারতো না তারা। পারিবারিক কতকগুলি রসিকতা ছিলো তাদের। ছিলো এমন কতগুলি কথা যা নিছকই পারিবারিক সম্পত্তি—প্রায় যেন পারিবারিক একটি নিজস্ব বাণী ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতো তারা। কিন্তু তাদের বাবামশাই ব'লে দিলেন যে এই অদ্ভুত ছেলেটিকে এক হিসেবে দত্তক নিয়েছেন তিনি—এবং তাকে তাদের দলের অন্তর্ভুত ক'রে নিতে হবে, এতে আর কোনো ওজরই চলবে না। তারা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করলো—কোনো হৈচৈ বাধালো না। কোনো শোরগোলই তুলকালাম ক'রে দিলো না তাদের গণ্ডি—অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাবে ব্যবহার করলো তার সঙ্গে, কোনো উষ্ণতা থাকলো না কথায়, কোনো তাপই না, এটাও তাদের নিজস্ব এক ধরণ—প্রায় সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ব্যাপার—এই ব্যবহার, কেন না পরস্পরের সঙ্গে তারা এমনি ঠাণ্ডা ব্যবহারই করতো। কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লে কি হবে, ঠিক যেন তাদেরই আরেক ভাই—এই ভাবেই তারা হান্সকে দলে টেনে নিলো।

কাউকে ভয় পাইয়ে দেবার মতো কিছুই ছিলো না এখানে। ডেনমার্কের একজন ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক হ'লে কি হবে, ইয়োনাস কোলিন অত্যন্ত সরলভাবে জীবনযাপন করতেন কোনো ভান ছিলো না গৃহস্থালীতে। ছিলো না কোনোরকম দেখানোপনা। যেভাবে তিনি এবং পরিবারের অন্যরা গৃহকর্মে সাহায্য করতেন, তা হান্সকে কেবল যে স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলতে দিলে তা-ই নয়—তাকে মনে করিয়ে দিলো তার নিজের বাড়ির কথা। অনেক দিন আগে যে-বাড়ি ছেড়ে সে মস্ত শহরে এসে উঠেছে। ঝকমকে ঝলমলে রোমান্টিক ধরণের বৈঠকখানার জন্য এতকাল সে ভিতরে-ভিতরে একটা টান অনুভব করেছে—তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই এই বাড়ীর, অথচ দেখামাত্রই তার মন তাকে ব'লে দিলে যে তার চেয়ে এটা অনেক, অনেক ভালো। সবকিছু খুব সাদাসিধে আর সরলসোজা—আর সেই সঙ্গে আর একটা তথ্যও পরিষ্কার হ'লো যে কোনো রকম নিচুতা নেই কারো মধ্যে। কোলিনের মধ্যে যেন মৃত পিতাকেই সে আবার খুঁজে পেলো—এই তার মনে হ'লো। 'আমাকে চিঠি লিখতে কোনো সংকোচ কোরো না,' কোলিন তাকে ব'লে দিলেন, 'কোনো-কিছুর দরকার হ'লে তক্ষুণি আমাকে জানিয়ো—আর কেমন থাকো, তাও জানাতে ভুলো না।'

কোচবাক্সে ব'সে সে যখন কোপেনহাগেন ত্যাগ করে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো, তখন আবার সে সব আশা ফিরে পেয়েছে, প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে মুখচোখ, চোখের তারায় ঝকমক ক'রে উঠেছে একটা উৎফুল্ল ভাব। শ্লাগেলজে পৌঁছেই বাড়িউলিকে সে জিগেস করলে যে এখানে কোনো দ্রষ্টব্য স্থান আছে কি না। 'আছে তো', বাড়িউলি তাকে তক্ষুনি জানিয়ে দিলো, 'আগুনে-চলা নতুন একটা ইঞ্জিন এসেছে এখানে, তা ছাড়া প্যাষ্টর বাসটোলনের লাইব্রেরিটাও রীতিমতো দর্শনীয়।'

শহরের পিছনে যে ছোট্ট খালটুকু আছে তা ওডেন্সের তুলনাতেও অনেক ছোটো। এমন কি শহরের বড়ো রাস্তাগুলি পর্যন্ত তারের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ঘুরে-ঘুরে গেছে, সূর্যের আলো ঢোকে না এত সরু আর ছোটো সেই রাস্তাগুলি। কম বাড়িরই ছাতের রং লাল, আর তামার কেল্লাগুলি ঢালু সবুজ মাঠ আর জলকাদা-ভরা ছোটো-ছোটো গলির ভিতরে অবস্থিত। বড্ড মন-খারাপ হ'য়ে গেলো তার। কোনো আকর্ষণই সে বোধ করলে না এই শহর সম্বন্ধে। গরিব হ'লেও ছিলো তো এতদিন কোপেনহাগেনে—তা ছাড়া সব গণ্যমান্যদের সঙ্গে আলাপ ছিলো রাজধানীতে। কোপেনহাগেনের সৌন্দর্য আর উত্তেজনাভরা সসব্যস্ত দিনরাত্রিকে—বড্ড মন-খারাপ হ'য়ে গেলো হান্সের—কেমন যেন বিমর্ষবোধ করলে সে ভিতরে-ভিতরে।

অবশ্য তৎসত্ত্বেও প্রথমে শ্লাগেলজে তেমন খারাপ লাগলো না, বেশ ভালোই লাগলো একদিক থেকে, মনে হ'লো খুব একটা অসুবিধেয় তাকে পড়তে হবে না এখানে। বাড়িউলি বেশ আদর করতো; ঘরটাও বেশ পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে; জানলা দিয়ে চোখে পড়ে ঝলমলে এক ফুলের বাগান—তার ওপারে সবুজ মাঠের ঘাসগুলি উদ্‌গ্রীব ও কাতর ভাবে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে; যেসব কালো-কালো গর্তের ভিতর সে কোপেনহাগেনে দিন কাটিয়েছে তার তুলনায় এই ঘরটি মহার্ঘরকম উপাদেয়; তা ছাড়া স্কুলেও মাষ্টারমশাইরা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন তার সম্বন্ধে, নানা ভাবে তাকে সাহস আর আশা দিলেন; কিন্তু তবু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই সে বুঝতে পারলো এখানে এসে সে কী-বিষম গুরুভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। 'প্রথমে ভীষণ সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়,' মাকে সে বলেছিলো অনেকদিন আগে, 'তারপরে তোমার বিখ্যাত না-হ'য়ে কোনো উপায় নেই।' ভাগ্য বলতে হবে যে ওই ভীষণ-সব দুঃখ-কষ্ট রাগী বাঘের মতো এক সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি, একের পর এক এসেছে তার কাছে—একটা যেতে-না-যেতেই আরেকটা, গ্রেট-বেল্ট পেরোবার সময় থেকে শুরু ক'রে কোপেনহাগেনের সেই শেষ কপর্দকহীন দিনগুলো সব কিছু সে দাঁতে দাঁত চেপে কোনো মতে সহ্য করে গেছে, প্রতি মুহূর্তে ভেবেছে সুদিনের আর দেরি নেই—এই এলো ব'লে; কিন্তু এখন সাংসারিক দিক দিয়ে তার যখন কোনো ভাবনাই নেই, তখন কি না তাকে আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি দুর্দশা ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'লো—এবং এ-বার দুঃখ-কষ্টের ধরণটাই আলাদা, প্রায় অভাবিত।

অনেক ক'রে নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে স্কুলে ভর্তি

হওয়াটা নির্ঘাৎ কোনো রোমাণ্টিক ব্যাপার হবে—বহু কষ্টে মনকে প্রবোধ দিয়ে সে বিজয়ীর মতো এই মর্মে চিঠি লিখেছিলো মাকে, তাতে এই আকাঙ্ক্ষাটিও প্রকাশ করেছিলো বাবা আর ঠাকুমা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এ-কথা শুনে খুব সুখী হ'তেন—যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল হ'তেন নির্ঘাৎ। ডেনমার্কের সব চেয়ে নামজাদা বিদ্যালয় ছিলো সোরো অ্যাকাডেমি, ঠিক বিলেতের ইটনের মতো ; এক সময় হাস্যকর ভাবে সে ওখানে ভর্তি হবার কথাও ভেবেছিলো। কিন্তু কিছুকাল পরেই এটা সে মর্মে-মর্মে বুঝে নিতে পারলে যে শ্লাগেলজে গ্রামার-স্কুলের আগাপাশতলা রোমাণ্টিকতার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। নীরস এক ঘেয়ে ও অতি সাধারণ একটি ইস্কুল—যেমন সব স্কুল হ'য়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে বেঞ্চির উপর ব'সে থাকার অভ্যেস তার ছিলো না ; তার উপর মনোযোগ দিয়ে প্রতিদিনের পড়া করতে হয় নিয়মিত, যা-কিছু বলা হয় তাই করতে হয় বিনা বাক্যব্যয়ে ; শিগগিরই গোটা ব্যাপারটা কেবল যে বিরক্তি ও ক্লান্তি-কর হ'য়ে উঠলো তা-ই নয়, দস্তুরমতো বেদনাদায়ক ঠেকতে লাগলো তার কাছে, কিংবা তার চেয়েও বেশি।

একটা জিনিস বোধ হয় হান্স আণ্ডেরসেন কি রাজকীয় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ ভুলেও ভেবে ছাখেননি—সেটা অবশ্য হান্সের জানবার কথাও নয়—যে স্কুলে ভর্তি হ'তে গেলেই তাকে একেবারে নিচের দিক থেকে কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে শুরু করতে হবে, ভর্তি হ'তে হবে নিম্নতম না হোক তার পরের শ্রেণীতে ছোটো-ছোটো ছেলেদের সঙ্গে। ছেলেবেলার স্কুল-জীবনের কথা যদি এখনো ঝাপশা ভাবে কারো মনে থাকে, তা হ'লে তিনি অনায়াসেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে তার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর অভিজ্ঞতা আর-কিছুই হ'তে পারে না।

ছোটো-ছোটো সব সহপাঠী তার, কনুই পর্যন্তই পৌঁছোয় না। আর তাদের মধ্যে সে কি না মস্ত সারসের মতো কদাকার ঢ্যাঙা ঠ্যাঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তোৎলাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে, সোজা-সোজা শব্দগুলো পর্যন্ত আওড়াতে পারছে না, এমন কি কপালের শিরা দপ-দপ ক'রে ওঠা সত্ত্বেও কিছুতেই কি না মেলাতে পারছে না সহজ সব গাণিতিক সমস্যা—আর তার ছোট্ট সহপাঠীরা তা কি না চক্ষের-পলকে ক'রে ফেলতে পারে, ঝল-মল ক'রে ওঠে যখন তড়বড় ক'রে শুদ্ধ উত্তর আউড়ে যায়। আগের চেয়েও ঢ্যাঙা হয়েছে হান্স, বেঞ্চি-টেবিলগুলির সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না সে এত লম্বা—যেন লিলিপুটের রাজ্যে মস্ত এক গালিভার। তার উপর অলবড্যে এমনিতে, হাত-পা নাড়া থেকে শুরু ক'রে দাঁড়াবার কায়দাটুকু পর্যন্ত অদ্ভুত : রোগা তালপাতার সেপাইয়ের মতো শরীরে মস্ত একটা মাথা বসিয়ে দেয়া যেন, দীর্ঘ তীক্ষ্ণ নাসিকার অন্তরালে ছোট্ট চোখ দুটো যেন ঢাকা প'ড়েই গেছে —আর এই সব মিলে-মিশে খেপিয়ে তোলার এক যোগ্য পাত্র হ'য়ে গেলো সে—জ্বালাতন করার এক নিখুঁত চাঁদমারি যেন। তবু ছেলেরা নেহাৎই শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ বলতে হবে—তাকে যতটা নাজেহাল করতে পারতো তার সিকি ভাগও তারা করতো কি না সন্দেহ ; তার কারণ আর কিছুই না, এমন একটা জিনিস তার ভিতরে দপদপ করতো তাদের বাধা দিতো—সম্ভবত সেটা তার সততা আর আন্তরিকতা, তাছাড়া এককথায় 'হান্স ভারি মজার ছেলে, তাই না ?' সততা আর আন্তরিকতাকে চিনতে পারে ছোটোরা ; খাঁটি আর নকলে প্রভেদ বুঝতে একটুও দেরি হয় না তাদের ; শিক্ষকেরা হান্সকে যতটা যন্ত্রণা দিলেন, তার শতাংশের একাংশও এই বালখিল্যেরা করলে না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পরেই শিক্ষকেরা একবাক্যে হান্স সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করলেন, 'না : ছেলেটা ভারি বিরক্তিজনক।' প্রচণ্ড খাটতে হ'তো শিক্ষকদের, সহ্যের সীমা পেরিয়ে যেতো যেন—অথচ মাইনে হ'লো যৎসামান্য ; এই অবস্থায় তাঁরা যখন দেখলেন একটি কিশোর স্বয়ং রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে পড়তে এসেছে তখন ভিতরে ভিতরে তাঁরা যে কেবলমাত্র উত্যক্তই হলেন, তা নয়, কেমন যেন একটা বিরোধিতার ভাব জেগে উঠলো তার প্রতি। বুঝতেই পারলেন না কেন এই ছেলেটিকে এরকম অনুগ্রহ দেখানো হ'লো। তাঁদের কাছে হান্সের বৈশিষ্ট্য বলতে ছিলো তার কদাকার ঢ্যাঙা চেহারা আর নিদারুণ অজ্ঞতা।

'ভীষণ ইচ্ছে ছিলো আমার লেখাপড়া শেখার,' পরে সে লিখেছিলো এই সম্বন্ধে, 'কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এমনভাবে হাবুডুব খাচ্ছিলাম যেন আমি অকূল পাথারে পড়েছি ; একটা ঢেউকে সামলে উঠতে না উঠতেই আরেকটা এসে হাজির ; ব্যাকরণ, ভৌগোলিক বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র—তার যেন শেষ নেই।' স্কুল ছুটি হ'য়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়াশুনো করতো সে ; ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসছে, ভোঁতা হ'য়ে যাচ্ছে মাথার ভিতরটা, কিছুই ভিতরে ঢুকতে চাচ্ছে না, তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়ে আসতো মাথায়, আর নয়তো স্কুলের মাঠে প্রচণ্ডভাবে দৌড়োদৌড়ি শুরু ক'রে দিতো যাতে ঘুমের ঘোর কেটে যায়। মরীয়ার মতো পড়াশুনো করতে লাগলো—প্রায় যেন তপ্ত একটা জ্বরের ঘোর তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলো, আর ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেলো কোনো বিষয়েই নিদারুণ কোনো নম্বর পায়নি সে—মোটামুটিভাবে সব বিষয়েই উৎরে গেছে।

নম্বর দেখে কোনোই উৎসাহ বোধ করলে না সে ; ক্লান্তভাবে সব নম্বর পাঠিয়ে দিলো অধ্যাপক গুল্ডবের্গএর কাছে, সঙ্গে চিঠিতে জানালো কী কী পড়েছে সে। এই পুরোনো বন্ধুটির সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'য়ে যাবার পর থেকে একদিনের জন্যও স্বস্তি পায়নি হান্স, খুব খারাপ লেগেছে তার ভেতরে ভেতরে ; এবার অত্যন্ত কাতরভাবে সে প্রার্থনা করলো অধ্যাপক যেন এখন তাকে মার্জনা করেন। সঙ্গে যে নম্বরগুলি পাঠালো, তা কেবল এটাই দেখাবার জন্যে যে সে এখন সত্যিই চেষ্টা করছে, আন্তরিকভাবে খাটছে পাঠ্যতালিকা নিয়ে। অচিরেই সহৃদয় একটি পত্র এলো গুল্ডবের্গের কাছ থেকে। 'বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলি' ; অধ্যাপক এই মর্মে একটি অনুরোধ জানালেন, 'আপাতত আর কবিতা লিখো না। শুধু পড়ো, আর পড়ো।'

এই নিষেধবাক্যটির হুবহু প্রতিধ্বনি করলেন স্কুলের রেক্টর, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর মোটেই এ-রকম ভদ্র ও নম্র হ'লো না।

শ্লাগেলজের রেক্টর ছিলেন শিমন মাইজলিং ; চওড়া জোয়ান লোক, মস্ত দশাসই চেহারা, মাথার চুলের রং লাল, সবসময়েই যেন রাগ ক'রে আছেন এমনি তাঁর মুখের ভাব, ঝোপের মতো কালো ভুরু সবসময়ে কুঁচকেই আছে। মস্ত পণ্ডিত লোক আসলে, কাজটা হ'লো সত্যিকার জ্ঞানীজনের ; কিন্তু রুচি জিনিসটার কিঞ্চিৎ অভাব ছিলো—সেদিক দিয়ে বোধহয় কোনো বৃষপুঙ্গবের

সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। এখানে এসেই হান্স নির্দোষভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো; তাঁর গিন্নিটি আরেক কাঠি সরেশ; মস্ত দেখতে, আর অপরিচ্ছন্ন। যথারীতি হান্স তাঁদের কাছে তার সাধ-আহ্লাদ আশা-আকাঙ্খার কথা খুলে বলেছিলো—খুলে বলেছিলো তার গোপন পরিকল্পনাগুলি, প'ড়ে শুনিয়েছিলো কবিতা আর নিজের নাট্যরচনার কতিপয় দৃশ্য। অল্পদিনেই এ বোকামির ফল সে মর্মে-মর্মে অনুভব করতে পারলো। বোকাশোকা শ্রীমতী মাইজলিং তো তার কৃতিত্বে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর অতিশয় সহৃদয় ব্যবহার হান্সকে প্রায় লজ্জিত ক'রে তুললো, ওদিকে রেক্টর কিন্তু এখন থেকেই ঠাণ্ডা ভাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন, এখন তিনি দস্তরমতো কদাকার মন্তব্য ও অতি নিষ্ঠুর ঠাট্টা শুরু ক'রে দিলেন।

আস্ত স্কুলটাই মাইজলিংকে বাঘের মতো ভয় পেতো; তাঁর নিষ্ঠুর উপহাসের একমাত্র লক্ষ্য এবার হ'লো হান্স ক্রিষ্টিয়ান। 'বাদুড়ের চোখওলা শেক্সপীর,' এই নাম দিলেন তিনি হান্সকে, আর যখন স্কুল-বাড়ির পাশ দিয়ে গোরুদের পাল নিয়ে যেতো রাখাল, ক্লাস-সুদ্ধু ছেলেদের উঠে দাঁড়াতে বলতেন তিনি, বলতেন ওই গোরুদের ভাইটিকে একবার তাকিয়ে ছাখো। যদি প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও করুণ চোখদুটি জলে ভ'রে যেতো, মাইজলিং তৎক্ষণাৎ কোনো ছেলেকে একটি ইট নিয়ে আসতে পাঠিয়ে দিতেন, যাতে মহাকবি আণ্ডেরসেন সেই ইষ্টকখণ্ডের উপর অশ্রুপাত ক'রে এমনকি ইটটিকেও কবিতা বানিয়ে দিতে পারেন। ভীষণনিষ্ঠুর এইসব উপহাস প্রায় পাশবিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়; কিন্তু বাজফাটার মতো গর্জন ক'রে ক্লাসসুদ্ধু ছেলের সামনে এ-সব কথা চেঁচিয়ে বলতেন মাইজলিং, আর আণ্ডেরসেন যেন জর্জরিত হ'য়ে যেতো শতাধিক কাঁটার খোঁচায়; তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গুটিয়ে যেতে চাইতো যেন, কেঁপে উঠতো থরথর ক'রে যেন কেউ আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিতো তার সর্বাঙ্গে; আর বোকা চোখের জল দরদর ক'রে চিবুক বেয়ে ঝ'রে পড়তে থাকতো।

রেক্টরের এই বিদ্বেষের কোন কারণই কিন্তু খুঁজে পেতো না হান্স; তার অজ্ঞতার পরিমাণ ভালোভাবে জেনে শুনেই মাইজলিং তাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; কখনো-কখনো আবার ভীষণভাবে দয়াপরবশ হ'য়ে উঠতেন তিনি হান্সের প্রতি, তা আবার আরো বিমূঢ় ক'রে দিতো হান্সকে; রাস্তায় ডেকে হয়তো ব'লে দিলেন, 'রোববার দিন আমাদের বাড়ি যেয়ো কিন্তু, কিংবা হয়তো তার প্রশংসাই সাত কাহন ক'রে শুনিয়ে দিলেন—আর সমস্ত কিছু দুর্বোধ ঠেকলেও সুখ আর আনন্দের অনুভূতিতে হান্সের শরীরে শিহরণ খেলে গেলো। আর তারপরে অকারণেই আবার তিনি ক্ষেপে গেলেন। 'এত রাগলেন কেন তিনি আমার উপর': কেন, তা হান্স কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতো না। বোধ হয় এটা বলাই সমীচীন হবে যে জীবনে একদিন ঈর্ষা অনুভব করেনি হান্স, সেই জন্তেই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকেছিলো।

ঈর্ষায় ভ'রে গিয়েছিলেন মাইজলিং। তার কারণও ছিলো। কোপেনহাগেন থেকে এসেছে হান্স, তার পৃষ্ঠপোষক হ'লো রাজকীয় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ, আর এমন সব বাড়িতে সে বেড়াতে যায় যাদের ভিতর একজন হলেন কবি ঈঙেমান—কাছেই সোরোতে শিক্ষকতা করতেন তিনি তৎকালে।

ঈঙেমানরা ছিলেন হান্সের আশ্রয়। বাড়ির চারপাশে আকাশের দিকে উন্মুখভাবে তাকিয়ে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে উইলো গাছ; বাড়ির সামনের লন ঢালুভাবে গড়িয়ে গেছে মস্ত নীল হ্রদের দিকে—সব কিছু মিলিয়ে গোটা বাড়িটাই যেন কবিতার সামগ্রী। 'জানলার শার্সিকে পেঁচিয়ে উঠেছে আঙুল বাড়ানো আঙুরলতা. ফুল ফুটে আছে লতা গাছে। ঘরের ভিতর মস্ত সব কবিদের ছবি সাজানো। মান্তলের উপর ছোট্ট একটা বীণা বসানো—হাওয়ার দেবতা এ'ওলাস তাঁর অশরীরী আঙুলে তাকে বাজিয়ে দেন যখন আমাদের ছোট্ট নৌকো হ্রদের জলে সুখী মরালের মতো ভেসে বেড়ায়।' শ্রীমতী ঈঙেমান—কালো কোঁকড়ানো চুল গুচ্ছে-গুচ্ছে এসে পড়ে তাঁর চিবুকে কপোলে, গরিমার মতো সুডৌল তাঁর কপাল, নমনীয় ছোট্ট গ্রীবাদেশে ছোট্ট মুখটি যেন ছাঁচ থেকে তুলে এনে বসানো, চোখের তারা দুটি ঝলমল ক'রে ওঠে সুখে—মৃদু হেসে যখন তাকান ছোট্ট একটি পাখীর মতো দেখতে। আর তাঁর স্বামী তখন গোটা দিনেমারদেশে একবাক্যে পরিচিত হ'লে কি হবে এত ভদ্র, ভালো, আর নম্র যে এই মস্ত বড়ো স্কুলের ছেলেটিকে তিনি তাঁর সমকক্ষ কোনো গভীর কবির মতোই গ্রহণ করেছিলেন। 'সত্যি, এঁদের এত ভালোবেসেছিলাম আমি, পরে হান্স আণ্ডেরসেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছিলো এই উদ্দীপক সান্নিধ্যকে, 'এমন অনেক মানুষ আছে যাদের সাহচর্যে অন্য মানুষ উৎকৃষ্টতর হয়······যা-কিছু কালো তা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গিয়ে ভুবন জুড়ে ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়ে।'

ঈঙেমানদের সঙ্গে বন্ধুতা হ'লে মাইজলিং স্বয়ং সুখী হতেন। আরো অনেক লোক ছিলেন আশপাশে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'লে শ্রীমতী মাইজলিঙেরও খুব ভালো লাগতো। কিন্তু স্লাগেলজে তাঁর এতটাই দুর্নাম হয়েছিলো যে শহরের খুব অল্প বাড়িতেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হ'তো। এখন তিনি দেখলেন এই উজবুক ছেলেটা—যে অন্য লোকের দয়া ও দানের উপর নির্ভর ক'রে আছে—সে কি না সব বাড়িতেই আমন্ত্রিত হয় ও সাদরে অভ্যর্থিত হয়। স্বামীর কাছে এই বিষয়ে অনুযোগ করলেন তিনি—হান্সের চলাফেরা গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেলো। ওই সব বাড়িতে ফের যদি কোনো দিন সে পদার্পণ করে, তাহ'লে—কড়া গলায় মাইজলিং ব'লে দিলেন—তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঈঙেমানদের বাড়িতে যাওয়াটা নিষিদ্ধ করার সাহস হ'লো না রেক্টরের। সব চেয়ে খারাপ হ'লো তখন, যখন প্রথম বছরের শেষে তাঁরা সবাই বড়োদিনের ছুটিতে কোপেনহাগেন গেলেন, মাইজলিং দেখলেন তাঁর এই উজবুক ছাত্রটি কি না কোলিন, রাবেক, ক্যাপ্টেন বুলফ এইসব মস্ত লোকের বাড়িতে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে, এই সাধারণ স্কুলমাষ্টারটি যাঁদের সঙ্গে কোনো দিন পরিচিতই হ'তে পারবেন না।

ভ্রমক্রমেও এই বিষয়টি হান্সের ধারণায় আসে নি। তার কাছে রেক্টরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রায় ভগবানের মতো। মাইজলিং ক্লাসে ঢুকলেই ভয়ে সে কুঁকড়ে যেতো। আর যখন হান্সের কবিতা পড়ার পালা আসতো বেঞ্চির অন্য ছেলেরা দেখতে পেতো—ভয়ে এমনকি গোটা বেঞ্চিটাই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

যত ভালো ক'রেই পড়া তৈরি থাক না কেন তার—এবং প্রত্যেক দিনই তা থাকতো—কিছুতেই তা সে মাইজলিং-এর সামনে মুখ ফুটে ব'লে উঠতে পারতো না। মাইজলিং তখন বাঘের মতো গর্জে—'উজবুক, উল্লুক, গাধা' এই সব সম্ভাষণে তাকে আরো ভয় পাইয়ে দিতেন। অনেক বকুনি শুনেছে হান্স, অজস্র গালাগাল আর ধমক সইতে হয়েছে তাকে—কিন্তু কোনোটাই এত নির্দয় ঠেকেনি তার কাছে। এতটাই নার্ভাস হ'য়ে পড়েছিলো যে একবার যখন গোটা সপ্তাহ ধ'রে ফর্ম-টীচার ওর সম্বন্ধে 'আশ্চর্য রকম ভালো' এই কথার বদলে 'খুব ভালো' এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন, সে মনে-মনে ভয় পেয়ে ভেবেছিলো এবার বুঝি তাকে তাড়িয়েই দেয়া হ'লো স্কুল থেকে। সেইজন্যেই বড়ো দিনের ছুটিতে কোপেনহাগেন গিয়ে হান্স প্রথমটায় তো কোলিনকে তার নম্বর দেখাবার সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারেনি। 'তাঁরা নিশ্চয়ই ভাববেন যে আমি খামখাই টাকা নষ্ট করছি,' দুর্দশায় ভ'রে গিয়ে এই কথাই সে ভেবেছিলো মনে-মনে। কিন্তু তাকে বিস্ময়ে স্তব্ধ ক'রে কোলিন অত্যন্ত খুশি হ'য়ে উঠলেন। 'সাহস আছে তোমার, উপরন্তু পরিশ্রমে তুমি পেছ-পা নও, এটা আমার ভালো লেগেছে।' এই ব'লে রাতে তাকে তিনি তাঁর বাড়িতে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন।

আবার আরেকবার কোলিনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হ'লো হান্সের। বড়োজনের নাম ঈঙ্গেবোর্গ—সে তো যেন তার প্রাণের বন্ধু হ'য়ে উঠলো; এডহ্বার্ড তাকে একটা বই উপহার দিলো; আর কোলিন তাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'একটা নতুন কোট তৈরি করিয়ে নিয়ো।'

সত্যি, স্কুল সত্ত্বেও এই সব ঝলমলে মুহূর্ত প্রায়ই তাকে সুখে ভরিয়ে দিয়ে যেতো। রাজধানীতে এই বড়োদিনের ছুটিটা পুরোপুরি আনন্দেই কাটলো তার, তার পরে ঠাকুমা'র সম্পত্তি থেকে একটা ছোটোখাটো অংশও পেলো তখন উত্তরাধিকারী হিসেবে। রাজকর শোধ ক'রে দেবার পর মাত্র কুড়িটা রিগসডালের থাকলো হাতে, কিন্তু হান্স কোটের দামটা কোলিনকে ফিরিয়ে দিয়ে বাকি টাকাটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলো—আর তার এই কাজ দুটি দেখে কোলিন যৎপরোনাস্তি প্রীত হলেন। তার পরেও অল্প যা টাকা থাকলো হাতে, তা দিয়ে বই আর জামা কিনলো সে—এই তার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি;—আর বসন্তকালে রাজকন্যা তাকে ওডেন্সে যাবার জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন—কোনো দিনই তিনি এই অদ্ভুত ছেলেটিকে ভুলে যাননি।

সেই চেনা রাস্তাগুলোয় পদার্পণ ক'রে খুব ভালো লাগলো হান্সের। একতলা সব কাঠের বাড়ি, শীর্ণজীর্ণ গরিব প্রতিবেশী, আর চেনাশুনো পথ-ঘাটগুলো দেখেই সে বুঝতে পারলো এই চার বছরে সে কতটুকু শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়লো চার বছর আগেকার একটি দিনের কথা, যেদিন শহরের তোরণের কাছ থেকে সে কোচবাক্সে উঠে ব'সে কোপেনহাগেন রওনা হয়েছিলো। অবশ্য যে-স্বপ্ন সে দেখেছিলো তখন তা এখনো সত্যি হ'য়ে ওঠেনি—চীন দেশের রাজকুমারের সঙ্গে বন্ধুতাও বা হ'লো কই? তবু পরনের পোষাক মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন, পকেটে কিছু টাকাকড়ি আছে, উপরন্তু কথাবার্তাও অনেক পরিশীলিত হয়েছে আগের চেয়ে। এমন কি তার নিজের মা—তিনি পর্যন্ত কিনা রাস্তায় দেখে প্রথমটা তাকে চিনতেই পারেননি। এই লম্বা আগন্তুকটি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললো তখন তিনি কিনা মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন ক'রে বসেছিলেন!

সবই সুখের আর সাফল্যের লক্ষণ ব'লে মনে হ'লো তার। বুড়ো সেই মুদ্রাকর ইভেরসেনের সঙ্গেই থাকলো সে; মাঝে-মাঝে কর্নেল গুল্ডবের্গের সঙ্গে ভোজে বসতো—আর যেখানে যার সঙ্গে ব'সেই সে কথা বলুক না কেন মাঝে-মাঝে মা এসে উদিত হ'য়ে বাইরে ডেকে নিয়ে যেতেন তাকে—গর্বের সঙ্গে সকলকে দেখাতেন তাঁর এই জেদি ছেলেটিকে। প্রতিবেশীরা ইতিমধ্যেই প্রাক্তন মতামত সংশোধন ক'রে এই কথা বলতে লাগলো যে, জুতো-নির্মাতার ছেলেটিকে যতটা উন্মাদ ভাবা গিয়েছিলো, আসলে সে মোটেই তা নয়। মাঝে-মাঝে রাস্তা থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখতো জানলার আড়াল থেকে আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাড়ির বৌ-ঝিরা। কেউ-কেউ আবার তাকে দেখিয়ে দিয়ে গর্ব ক'রে বলতো, 'ও যখন ন্যাংটুকু ছিলো, তখন ওকে চিনতুম।' আনে মারি তো সোজাসুজি ব'লে দিলেন যে আমার হান্স যতটা সম্মান পাচ্ছে, কোনো কাউন্টের ছেলেও তা পায় না।

এই ছোট্ট বিজয়-অভিযান কিন্তু স্কুলের নিগ্রহ ও নির্যাতনকে আরো বাড়িয়ে দিলো। ঈস্টারের ছুটির পরে যখন সে ফিরে গেলো, লাঞ্ছনা আরো তীক্ষ্ণ হ'লো তার। তাঁর ছেলেপিলের জন্য নতুন এক দাই পাওয়া গেছে যেন—সে হ'লো আর কেউ নয় হান্স—এইভাবেই এবার তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন মাইজলিং। কোনোকালেই ছোটোদের প্রতি তেমন নির্বিচার ভালোবাসা ছিলো না হান্সের। তা ছাড়া অত্যন্ত বেশি স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল কোনো লোকেই সব ছেলেমেয়ের প্রতি সমান ভাবে টান অনুভব করতে পারে না। ছোটো মাইজলিংরাও তেমন আকর্ষণযোগ্য ছিলো না। মনে-মনে তখন নিশ্চয়ই সে ভেবেছিলো তবে কি এই জন্যই সে স্লাগেলজে প্রেরিত হয়েছে—এই ঝগড়াটে শিশুদের তদারকি করার জন্য? প্রচণ্ড ভাবে ঝগড়া করতো তারা—হান্সকেই তা থামাতে হ'তো। একটু যাদের বয়েস বেশি নানাভাবে তাদের মজা জোগাতে হ'তো তাকে। আর কোলের শিশুটিকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—সব কিছুরই ভার পড়লো তার উপর। স্বভাব ভালো ব'লে বিনা বাক্যব্যয়ে সব কিছুই সে ক'রে গেলো—কিন্তু আজকে আমরা মনে-মনে আশা করতে পারি যে এই তুমুল শিশুগুলোর জন্য সে নিশ্চয়ই কাগজ কেটে-কেটে সুন্দর সব খেলনা বানিয়ে দিতো না, কিংবা সেই সব গল্পও নিশ্চয়ই এদের সে শোনাতো না পরবর্তী কালে যাদের মার্জিত রূপ গোটা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিলো। কিন্তু আমাদের সব আশাকে ব্যর্থ ক'রেই সম্ভবত তা-ই সে করেছিলো তখন। রেক্টর যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেইজন্যে তখন তাকে বললে নিজের গলাটা পর্যন্ত কেটে দিতে পারতো হান্স।

এই রেক্টরটি যে কী ভাবে তাকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করেছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ হান্স আণ্ডেরসেনের দিনপঞ্জী থেকে কয়েকটি পংক্তি তুলে দেওয়াই ভালো: "রেক্টর আমাকে 'শুভরাত্রি' জানিয়েছেন আজকে, হায়, যদি তিনি জানতেন তাঁর একটি বন্ধুভাবাপন্ন কথা আমাকে কতটা উৎসাহিত করে, তাহ'লে…

রেক্টরের মস্ত ঢিলে কোটটার গায়ে তুলোর আঁশ লেগেছিলো বিশ্রীভাবে; দাসীকে ডেকে বুরুশ নিয়ে আসতে বললেন তিনি, কিন্তু দাসীটির আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমিই চটপট বুরুশ নিয়ে এসে কোটটা ঝেড়ে দিলাম···আগামী কাল আবার গ্রীকের ক্লাস আছে! কী ভীষণ ভয় করে ওই ক্লাসটাকে···ভগবান! বুকটা যেন ফেটে যাবে আমার কোনো দিন। গ্রীকের ঘণ্টায় "মন্দ" মন্তব্য পেলাম। তাহ'লে···তাহ'লে আমার কী হবে এই হ'লে?"

এই রকম হতাশ আর মরীয়া কথাবার্তায় গোটা দিনপঞ্জীটা ভরা। শিক্ষকদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারতো না সে; ভালো ছেলের নমুনা হিসেবে ধরা-বাঁধা একটা ছক খাড়া ক'রে রেখেছিলেন তাঁরা মনে-মনে, যে-কেউ তার সঙ্গে মিললো না, সে-ই তাঁদের কাছে বাতিল; না— ভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করতেন তাঁরা হান্সকে। পরবর্তীকালে, অনেক-অনেক দিন পরে, 'বিশ্রী হাঁসের ছানা' নামক গল্পটিতে একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো হান্স, যা সম্ভবত এই শিক্ষকদেরই স্মারক। মুর্গি আর বেড়াল যেখানে হাঁসের ছানাটিকে শেখাতে চাচ্ছে, সে-জায়গাটার কথা বলছি।

"বেড়াল হচ্ছেন বাড়ির কর্তা, আর মুর্গি হচ্ছেন গিন্নি, আর তাদের মুখে সব সময়েই লেগে আছে, 'আমরা আর এই পৃথিবী!' কেননা বেড়ালের ধারণা তাঁরা দু'জন হচ্ছেন পৃথিবীর অর্দ্ধেক, আর সে-অর্দ্ধেক বাকি অর্দ্ধেকের চেয়ে ভালো। হাঁসের ছানাটি বলতে গেল এ-বিষয়ে অন্যরকম মতও তো থাকতে পারে, কিন্তু কেউ সে-কথা কানেই তুললে না।

'ডিম পাড়তে পারিস তুই?'

'না।'

'তাহ'লে দয়া ক'রে আপনি চুপ ক'রে থাকুন!'

বললে বেড়াল: 'পারিস আমার মতো পিঠ বাঁকা করতে, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে, চোখ দিয়ে ফুলকি বার করতে?'

'না।'

'তাহ'লে তোমার চাইতে যারা বেশি বোঝে তাদের কথার উপর কথা বলতে এসো না।'

হাঁস আর কোনো কথা বললো না, কোণে গিয়ে বসলো মন-খারাপ ক'রে, আর তখনই ঘরে এসে ঢুকলো বাইরের আলো আর হাওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মন কালো জলে সাঁতরাবার জন্য এমন অদ্ভুত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো যে কথাটা সে মুর্গিকে না-ব'লে পারলে না।

'পাগল নাকি?' মুর্গি তক্ষুণি খেঁকিয়ে উঠলো। 'কোনো কাজ নেই কিনা, ব'সে-ব'সে তাই রাজ্যের যত বাজে কথা ভাবো। ডিম পাড়তে শেখো কি শেখো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে—তাহ'লেই ও-সব কিম্ভূত ইচ্ছে কেটে যাবে।'

'কী ভীষণ যে আমাকে টানে ওই কালো জল!' বিষণ্ণ গলায় আস্তে-আস্তে বললে হাঁস। 'আর কী মজাই যে লাগে জলে সাঁতরাতে। এত ভালো লাগে টুপ ক'রে ডুব দিয়ে একেবারে তলায় চ'লে যেতে!'

'হ্যাঁ, মজাই তো, আস্ত উজবুক কিংবা পাগল না হ'লে কেউ এমন কথা বলে! বেড়ালকে একবার ব'লে ভাখো না—ওর মতো চালাক তো মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়—জলে সাঁতরাতে কি ডুব দিতে কেমন লাগে, তা ওকে একবার জিগেসই ক'রে ছাখো না—আমার কথা কিছু না-ই বললাম। ব'লে ছাখো একবার—একবার বুড়ি-মাকে—তাঁর মতো চালাক তো বিশ্ব জগতে আর কেউ নেই—তাঁর কি ইচ্ছে করে জলে নামতে? তাঁর কি ভালো লাগে জলে ডুব দিতে?'

'আমার কথা তোমরা বুঝতে পারোনি', হাঁস বললে।

'আমরা তোমায় কথা বুঝিনে, না? তাহ'লে বোঝে কোন মূর্তিমান, শুনি? তুমি কি বলতে চাও বেড়ালের চাইতে কি বুড়ি-মার চাইতে তুমি বেশি বুদ্ধি রাখো—নিজের কথা কিছু বলবো না। দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ে না দেখছি! অনেক করেছি আমরা তোমার জন্য—এখন নেমকহারামি কোরো না। এখানে থাকতে কি তোমার কোনো কষ্ট হয়েছে, নাকি তুমি কোনো মুখ্যু লোকের পাল্লায় পড়েছো। কত শিখতে পারতে তুমি এখানে থাকলে—কিন্তু তুমি দেখছি অতি চালাক এক ফাজিলকান্ত, বাজে বকুনিই তোমার সার। তোমার সঙ্গে মেলামেশা ক'রে কোনো সুখ নেই। রাগ কোরো না, তোমার ভালোর জন্যই বলছি। সত্যিকার বন্ধুরাই কড়া কি কটু কথা ব'লে থাকে। এখনো ডিম পাড়তে শিখতে পারো কিনা ছাখো—কি গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে আর চোখ দিয়ে ফুলকি বার করতে।'

'আমার ইচ্ছে করে মস্ত এই খোলামেলা পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ি।'

'যাও না, কে তোমাকে ধ'রে রেখেছে,' মুর্গি চ'টে গিয়ে চোটপাট ক'রে উঠলো।"

কিন্তু মস্ত এই খোলামেলা পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়া সম্ভব ছিলো না হান্সের পক্ষে। থাকতেই হবে তাকে এখানে, ব'সে থাকতেই হবে স্লাগেলসের ক্লাশ-ঘরের এই বেঞ্চিতে তার আসনে। কেউ বোঝে না তার আকাঙ্ক্ষা, কেউ বোঝে না তার মন—কেউ এটা বোঝে না বেঁচে থাকার পক্ষে কবিতা তার কাছে কতটা জরুরি।

পরীক্ষার দিন যতই কাছে এগিয়ে গেলো, ততই ভয়ে তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যেতে লাগলো। ঘূর্ণিরোগ পেয়ে বসলো তাকে, মাথা ঘোরে একটুতেই, ভয়ে থেমে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত, কিন্তু পরীক্ষায় সে ভালো করলো; তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে গেলো সে, আর বিস্ময়কর ভাবে কোলিনের কাছে মস্ত এক ভালো রিপোর্ট পাঠালেন মাইস্লিং। আবার রাজকন্যা তার জন্য টাকা পাঠালেন, আর তার দ্বিতীয় বড়োদিনের ছুটিতে আবার আরেকবার অনেক সাধের কোপেনহাগেন বেড়াতে এলো হান্স। মাইজলিং অবশ্য তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে ঠেকাতে না পেরে শেষকালে ব'লে দিলেন কিছুতেই যেন এক সপ্তাহের বেশি সে কোপেনহাগেনে কাটায় না।

[ক্রমশঃ।

গল্প নয়

শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

মিষ্টি কথা আর মধুর ব্যবহার—এর দাম জগতে সবচেয়ে বেশী। তুমি যতই ধনী-মানী, যতই গুণী-জ্ঞানী হও না কেন, তোমার কথাবার্তা যদি মধুর না হয় তাহলে কেউ তোমার নাম

করবে না। কেউ তোমাকে ভালবাসবে না। কিন্তু লেখাপড়া না জানলেও, টাকাকড়ি না থাকলেও তোমার আচার-ব্যবহার যদি ভাল হয় তবে সকলেই তোমাকে সহানুভূতি দেখাবে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে। মিষ্টি কথায় সব হয়! পর আপন হয়, শত্রু বন্ধু হয়, সাপ ফণা নোয়ায়, পাষাণ বিগলিত হয়—আরও কত কি!

একবার একটি মেয়ে শুধু মিষ্টি কথার জোরেই এক দুর্দান্ত ডাকাতের হাত হ'তে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল! শুনবে সে কথা?

প্রায় দেড়শ' বছর আগের ঘটনা। একবার কয়েকজন যাত্রী গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা; আর ছিল একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। সে যাচ্ছিল দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। যাত্রীরা চলছিল পায়ে হেঁটে!

তখন তো আর গাড়ীঘোড়ার এমন প্রচলন হয় নি! তাই কোথাও যেতে-আসতে হলে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। তাও আবার একা নয়, দল বেঁধে! বাপস্! চোর-ডাকাতের যা উপদ্রব! খুন-জখম-লুঠ-তরাজ, এসব যেন রোজকার ঘটনা!

বেশ কিছু দূর যাবার পর মেয়েটি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে লাগল। ক্লান্ত হয়ে গেছে কি না! তাই তাল রাখতে পারছে না। সঙ্গীরা কিন্তু তার দিকে ভুলেও তাকায় না! তারা আপন মনেই এগিয়ে চলে।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল। সূর্যদেব পাটে গেলেন। মেয়েটি তখন এক নির্জন প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল। যাত্রীরা তখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। তবুও মেয়েটি ভয় পেল না এতটুকু; চীৎকার করে সঙ্গীদের ডাকল না, কাঁদলও না, কাটলও না!

কেন? ভয় কিসের? কি আছে সেই মাঠে—?

ভয়! দস্যুর ভয়, তস্করের ভয়! ওৎ পেতে আছে সবাই মিলে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে—। কেড়ে নেবে সব কিছু। আগে চালাবে নির্য্যাতন; পরে করবে হত্যা! আরও আছে বৈ কি! আছে এক ভীষণ কালীমূর্তি। লোলরসনা, করালবদনী! নাম তার ডাকাত কালী—'তেলোভেলো'র ডাকাতে কালী!

কে রে? কে যায় ওখান দিয়ে?—সহসা গর্জে উঠল দস্যুসর্দার—!

আমি গো। তোমার মেয়ে।—নির্ভীক-চিত্তে উত্তর দিল মেয়েটি।

কি মিষ্টি সে স্বর! কত করুণ, কত কোমল! কি অপূর্ব তার মহিমা! আশ্চর্য! মানুষের কণ্ঠেও এত সুধা থাকে! অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল ডাকাতের হৃদয়ে, ভুলে গেল সে আপন কাজ। এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। বলল: কে মা তুমি? কোথায় চলেছ?

বাপ্ রে! কি বিকট চেহারা! মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চোখ দু'টো জবাফুলের মত লাল। হাতে বিশাল লাঠি—!·····

তবুও ঘাবড়াল না মেয়েটি। তেমনি সরল ভাবে বলল: আমি তোমার মেয়ে, বাবা! দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি! যাত্রীরা আমাকে একা ফেলে এগিয়ে গেছে।

মেয়ে এলে মা কি আড়ালে থাকতে পারে! তাই ঘর থেকে ছুটে এল ডাকাতগিন্নী! বলল: বাছা, ভয় কি! এসো আমার সঙ্গে—!

তার হাত দু'টো ধরে মেয়েটি বলল: আমার মা-বাবাকে ফিরে পেয়েছি, বিপদ আমার কেটে গেছে!

মেয়ে? আমার মেয়ে? হবেও বা! ভাবতে-ভাবতে ডাকাতগিন্নী তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। তারপর আদর করে খাওয়াল, নিজের হাতে বিছানা পেতে দিল, এমন কি ঘুমও পাড়িয়ে দিল কচি মেয়ে মনে করে!

পরের দিন দুজনে মিলে মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে এল। বিদায় নেবার সময় কি কান্না!

মেয়ে চলে গেলে বাবা-মা কি না কেঁদে থাকতে পারে?

চোখের জল মুছতে মুছতে তারা ফিরে চলল। ভাবল, কন্যারূপে স্বয়ং পার্বতী দেখা দিয়ে গেলেন!

আমার মিষ্টি ভাই-বোনেরা, এই মধুরভাষিণী নির্ভীক ও সরলা মেয়েটি কে জান? ইনি হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী সারদামণি। তিনি ছিলেন মহীয়সী, ও পরহিতৈষিণী। তাঁর ব্যবহার এতই মধুর ছিল যে, সকলেই তাঁকে ভালবাসত শ্রদ্ধা করত। এমন কি স্বয়ং ঠাকুরও তাঁকে দেবীজ্ঞানে পুজা করেছিলেন; আর স্বামীজি বলতেন: 'জ্যান্ত দুর্গা'!!

এসো ভাই, আমরাও তাঁকে প্রণাম জানাই! আর বলি—

মিষ্টি কথা বল্ব
সরল পথে চল্ব,
খেল্ব, নাচ্ব, হাস্ব
পরকে ভালবাস্ব।

চন্দ্রমল্লিকা

সবিতা মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট ফুল,

নাম তার চন্দ্রমল্লিকা।
ফুটেছিল বাগানের এককোণে, আপন মনে,
দেখেনি তারে কেউ।

দুঃখ যে তার রয়ে গেল সেইখানে।
জানলো না কেউ গন্ধ বিনা ফুলটি
ফুটেছে কোন্খানে।

মনের দুঃখ রেখেছে মনের গহনে।
তবুও ফুটেছে আনমনে।

এমনি সময় এলো এক নূতন মালী,
সাজায়ে তুলিল কাননটিকে
নিজেরই মনের যতনে।
একাগ্রমনে।

হেনকালে পড়লো দৃষ্টি বাগানের ছোট্ট কোণটিতে।
সেই শুভ্র নিষ্পাপ ফুলটিতে।
দু' হাত মেলি ধরলো তারে।
কিন্তু হায়? পড়লো বুঝি সে ঝরে
একান্ত অভিমানেরই ভরে।

বিজন ভট্টাচার্য

২০

দু' লাখ আড়াই লাখ টাকার মতো একটা অঙ্কে মার খেলে একাউন্টস্‌-এ কোম্পানী চোট খায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু দাঁওটা যেখানে এক ক্লিওপেট্রা সেখানে লাখ দু' লাখের কথা নয়, রাজ্যের রাজ্যও খোলামকুচির সামিল। আর পাঁচজন নামী ডিরেক্টর, বিশেষ করে ভগ্নীপতি নরেন ভাদুড়ী এমন-তেমন হলে সাঙ্ঘাতিক একটা হৈ চৈ করবেন আশঙ্কা ক'রে, খরচাপাতির ব্যাপারটা আড়াই তিন লাখ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে সত্যব্রতর বিচারবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

লোকসানের অঙ্কটা এর চেয়ে বেশী হ'লে বিশ্বতোষের মুস্কিল হতো। কম হ'লে সত্যব্রত হয়তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতো না। সুতরাং হিসেবটা বিশ্বতোষের নির্ভুলই বলা চলে।

সোনার মধ্যে যেমন খাদ, প্রত্যাশার ভেতরেও বুঝিবা না পাওয়ার মতো একটা ফাঁক উজ্জ্বল করে রাখে আশা। তাই পথ—সে যত দীর্ঘই হোক না কেন, দিগন্তে সে সব সময়ই কুসুমাস্তীর্ণ। চোখে নামে ক্লান্তি। তবু তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। কিন্তু সে মধু-প্রত্যাশারও শেষ আছে। দৃষ্টির সীমানা লঙ্ঘন হলেই পথে নামে অন্ধকার। আর কুসুমিত সে পথপ্রান্ত মুঠো মুঠো জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ায় চোখে-মুখে।

বিশ্বতোষের ধৈর্যের সীমাও বুঝি এতদিনে অতিক্রান্ত হলো। পথ থেকে সরে না দাঁড়ালে বিশ্বতোষ আজ সত্যব্রতকেই আড়াল করে দাঁড়াবে সতীর মুখোমুখি। ভব্যতা, সম্ভ্রম আর সখ্যতা যেন গলায় ফাঁস। গোটা মুখোসটাই একটানে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে বিশ্বতোষের। সে যদি নারকী হয় তো সতীকেও সে টেনে নামাবে নরকে। দুর্নিবার এক প্রলোভন স্বর্ণমৃগের নিশানা ধরে ছুট করিয়ে তাকে যেন আজ পঞ্চবটীর উপান্তে এক ছায়াচ্ছন্ন কুটিরের সন্ধান দিয়েছে। তার চোখে সতী আজ একমাত্র সীতা!

রবার্টসন সাহেবের রিটায়ার করে বিলেত যাবার কথা ছিল গত বছর জুলাই মাসে। কিন্তু মাঝখানে কোম্পানীর নতুন রদবদলটা হলো। ডাইরেক্টর্স বোর্ড-এ ওলটপালোট। নতুন ম্যানেজার সত্যব্রত। নতুন ব্যবস্থাপনার মাঝখানে জানা নেই শোনা নেই খেই ধরানো এক দারুণ উৎকণ্ঠার ব্যাপার হলো সত্যব্রতর। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে সামান্যই এগোন চলে। তারপরই দরকার করে টেকনিক্যাল এফিশিয়েন্সির। রপ্তানী ব্যবসায়ে ইজ্জৎ বাড়লেও আমদানীতেই কাঁচা পয়সা। সমবায় কারবারে উৎসাহ যা, তা নথিপত্রেই মানাবে ভাল। আসলে ঝোঁকটা দিতে হবে প্রাইভেট সেকটরে-ই—সে বিস্তর ব্যাপার।

তার ওপর গোল্ড রিজার্ভ, ডিভ্যালুয়েশান, ডিফিসিট বাজেট, ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল, লেবার আনরেষ্ট, এ সবও বোঝবার আছে। এমনি শতসহস্র জট। অতএব রবার্টসনকে বিদায়ী করেও বিদায় দেওয়া হলো না শেষ অবধি। সোনাদানায় খুসী ক'রে মেমসাহেবকে পাঠানো হলো বিলেতে। কিন্তু রবার্টসনকে ধরে রাখা হলো আরও একটি বছরের জন্যে। নরেন ভাদুড়ী আর বিশ্বতোষের সনির্বন্ধ অনুরোধে সত্যব্রতকে ম্যানেজারীর পাঠ মুখস্থ করাতে আদাজল খেয়ে লেগে গেল রবার্টসন।

পেটে খেলে পিঠে সয়। ম্যানেজারীর প্রথম পাঠ বোম্বাইয়েই সুরু হয়েছিলো সত্যব্রতর। অনাগত উনিশশো বাষট্টি সালে সম্ভাব্য রেডিও এ্যাকটিভ ঘাসপাতা খড় খেয়ে গো-মড়কে উচ্ছন্ন হবে উত্তর ভারত। অতএব কোম্পানীর পক্ষে ম্যানেজার সত্যব্রত সেন রবার্টসনের পরামর্শ মতো গোটা উত্তর ভারতের কাঁচা চামড়ার পাইকারদের মোটা টাকার দাদন দিলো কোম্পানীর হয়ে। তার পর ভূতের গল্প সেই গো-মড়কের অনিবার্য অভিসম্পাতে বাস্তবে পাঁচ লাখ টাকা তিন বছর পুরবার আগেই ঘাটতি হলো কোম্পানীর খাতে; আর হক্কের ধন সেই পাঁচ লাখের তিন লাখ তখনি কাগজে কলমে দশ আনা ছ' আনায় ভাগ হয়ে গেলো রবার্টসন ও সত্যব্রতর মধ্যে। গুরু তো দক্ষিণা পেলোই—শিষ্যও বঞ্চিত হলো না ফাটকায়।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে, যে দু' বছর বাদে কোম্পানী লিকুইডিশানে যাবার আগে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভায় নরেন ভাদুড়ী প্রশ্ন তুলেছিলো যে কাঁচা চামড়ার ব্যাপারে দাদন দেওয়াটা না হয় রবার্টসনের পরামর্শ মতোই হয়েছিলো, কিন্তু গোটা উত্তর ভারতের ঘাসপাতা তথা স্থাবর জঙ্গম রেডিও এ্যাকটিভ হয়ে যাবে—এ সব তথ্য একান্তই আজগুবী নয় কি? রবার্টসন তার জবাবও শিখিয়ে দিয়েছিলো সত্যব্রতকে। বলেছিলো,—প্রশ্ন উঠলে এইকথা বলবে যে চুক্তিমতে পাকিস্তানকে তদানীন্তন ক্রমবর্ধমান সামরিক সাহায্য দান, আর এই সামরিক সাহায্য বলতে আজকের দুনিয়ায় এ্যাটম-অস্ত্র ছাড়া কিছু ভাবাই যায় না। অন্ততঃ যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরা তাই মনে করবেন।

যা হোক, রবার্টসনের কাছে হাতেখড়ি মানেই মোটাটাকায়

বাকি মাং। বখরার ভাগের ভাগ বেশী টাকাটাই অবিশ্যি সাগর পারে নিয়ে গেল রবার্টসন সাহেব দাঁও মেরে। সত্যব্রত রইলো হিসেব নিকেশের দায়ভার মেটাতে আংশিক লাভে।

রবার্টসন গেল দেশে। তারপর ৭ই বৈশাখে রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে ফিরে এসে সতী দেখে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সংসারে সত্যব্রতর পাত্তাই পাওয়া যায় না। সে সর্বদাই ব্যস্ত। নবজাতক আর জননীকে অভিনন্দনটাও জানালো সত্যব্রত নাগপুর থেকে ট্রাঙ্ক কলে। একটা অদ্ভুত স্পীডে পেয়ে বসেছে সত্যব্রতকে। সেই স্পীডের হাত থেকে তার যেন নিস্তার নেই। সত্যব্রত এতো দ্রুত 'স্পিন্' করছে যে, তাকে দেখাই যাচ্ছে না মাঝে মাঝে। প্রথমটা ভয়ে কুঁকড়ে গেলো সে। তারপর সত্যব্রত তাকে জড়িয়ে ফেললো এই গতিবেগের ঘূর্ণীতে।

সত্যব্রত এখন ম্যানেজার। সেই সব দেখে শোনে। নরেন ভাদুড়ী ওদিকে ভায়রাভাইদের যৌথ প্রতিষ্ঠান কোলিয়ারী নিয়ে ব্যস্ত। বড় একটা খোঁজখবর নিতে পারেন না কোম্পানীর। আর বিশ্বতোষ —সে তো ছয়-নয় করে দেবে বলেই ফেঁদেছে ব্যাবসা। মা প্রফুল্লনলিনী আর অন্নদা রায় তার গোটা জীবনটার ওপর রাহুগ্রস্ত এক সূর্যের ছায়া ফেলে রেখেছে। নিজে-ও সে বসেছে এক চূড়ান্ত ফাটকা খেলতে।

দেখাশোনার কেউ নেই মাথার ওপর। সত্যব্রত কোম্পানীর টাকায় বরবাদী শেয়ার কেনে আর বেচে, বেচে আর কেনে; রক্তের স্বাদ পেয়েছে যেন বাঘ। তারপর বিশ্বতোষকে শিখণ্ডী করে দুইহাতে চুরি—বাড়ী, গাড়ী, টাকা! ছেলের মুখ দেখবার সময় হয়না সপ্তাহ ধরে। অথচ খোকনের জন্ম নার্সারি-তে টয়ট্রেইন বসানো হচ্ছে। জন্মদিনটা খেয়াল ছিলোনা বলে সহসা অনুতপ্ত পিতার ক্ষতিপূরণ আনছে সরকারের বিমানবিভাগ। কুলুম্যালির আপেল আর বম্বের নীলরজনীগন্ধার বাস্কেট। রিজেন্টপার্কের বাড়ীটাই কিনে ফেলবে কি না ভাবছে সত্যব্রত।

কোত্থেকে যে আসছে এত টাকা। হিসেব করবার সময় পর্যন্ত নেই সত্যব্রতর। গোলমাল কিছু অনুমান করলেই সতীকে ভিড়িয়ে দেয় বিশ্বতোষের দরবারে। বলে,—পাঁচঘড়ার রাজবংশের শেষ উত্তরাধিকারের খাতিরে তুমি যে করে হোক বিশ্বতোষকে নিরস্ত করো সতী। দেখো আমি তোমার ছেলের মাথায় রাজার মুকুট পরিয়ে দেবো।

কোম্পানীর ব্যাপার। বহুলোকের স্বার্থ। ওদিকে দেশী সরকার না কি বিমাতার মত। কাঁচামাল না কি সব চালান হয়ে যাচ্ছে বিদেশে—সতী-ও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা ব্যাপারটা। সত্যব্রতর শঙ্কাহত মুখখানা দেখে খালি ভাবে নিরসনের কথা। কি করলে সে এতটুকু কাজে আসতে পারে সত্যব্রতর, সেই কথাই ভাবে সতী।

ছ-মাস একবছর পরে পরে-ই এই 'ক্রাইসিস' আর বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, তখনই সত্যব্রতের দরকার হয় সতীকে। সত্যব্রত জানে সতীকে কখনও বিমুখ করবেনা বিশ্বতোষ। সত্যব্রতকে অসহায় দেখলেই আত্মবিশ্বাসে জোর পায় সতী। বলে—তুমি কিছু ভেবনা। আমি বিশ্বতোষকে সব কথা বলবো খুলে। কোন বিপদ হবেনা তোমার। সত্যব্রত-র অপরাধের মাত্রা কতটা যে কি, তা না ভেবেই দুঃসাহসী হয়ে ছুটে যায় সতী বিশ্বতোষের কাছে। অথচ নিজেকে-ও যে সে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে সে কথা চিন্তা-ও করেনা একবার।

রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে ফিরবার পর থেকেই এই টানাপোড়েন।

প্রথম দু'চার বার সত্যব্রতর দায়িত্বহীন ভুলচুকের ব্যাপারে বিশ্বতোষ কোন গুরুত্ব-ই দেয় না। অতি সৌজন্য দেখিয়ে সতীকে বলে,—এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে তুমি আবার কষ্ট করে আমায় বলতে এলে কেন সতী? নিজে সত্যব্রত আমাকে একবার বললেই পারতো। মিটে যেতো।

নিজে গাড়ী করে সতীকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে বাড়ীতে। সত্যব্রতকে বকা-ঝকা করেছে। বলেছে; এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে রাত ক'রে ছেলেকে ফেলে রেখে সতীর যাবার কোন দরকার ছিলো না। সতীর ছেলেকে আদর ক'রে বলে—তোর বাবার যা সব কাণ্ডকারখানা না!—বিশ্বতোষকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে সত্যব্রত।

তারপর থেকে যখনই গিয়েছে সতী বিশ্বতোষের সে চূড়ান্ত আতিথেয়তা। কোথায় বসাবে, কি করবে সতীকে, ঠিকই করতে পারে না বিশ্বতোষ। কাজের কথাগুলোয় গুরুত্ব দু'কথায় বাতিল করে দিয়ে আরম্ভ করেছে পুরোন দিনের ইতি কথা। রবার্টসনের সঙ্গে বুড়ো টমসনের সাদৃশ্য টেনে সেই ফুল আর চকোলেট নিয়ে সতীর দমদম এরোড্রোমে যাবার কথা। সেই সন্ধ্যা, সেই ফুল, সেই কথাবার্তা—উর্ধশ্বাস গাড়িতে সে, আর পাশে সতী।

—মনে পড়ে সতী?

টুটুলের কথা মনে ক'রে সতীর মন তখন উদভ্রান্ত। তবু মুখে হাসি টানতেই হয় বলে।—খুব মনে আছে। কিন্তু তুমি আজ-ও সেই কথা মনে ক'রে রেখেছো বিশ্বতোষ? আশ্চর্য!

—শুধু মনে? মুখস্থ করে রেখেছি।

—সত্যি!

চোখে মুখে এমন ঝিলিক দেয় সতী, যেন কত দুর্লভ এক সুখস্মৃতি সেই সন্ধ্যা!

হঠাৎ আতিথেয়তার অকিঞ্চিৎকর ওজন সম্পর্কে সচেতন হয় বিশ্বতোষ বলে।

—ছি, ছি কিছুই করছি না তোমার জন্যে। একটু শ্যাম্পেন খাবে সতী?

শ্যাম্পেন কেন, সত্যব্রত-র মুখ চেয়ে তখন বিষ খেতে-ও রাজি আছে সতী। বলে,—লাভলি!

নিজের হাতে শ্যাম্পেন ঢালে বিশ্বতোষ। নিজে নেয় আর একটি পাত্র। কথা বলে, সেই দমদমে যাবার সন্ধ্যার স্বর্ণসূত্র ধরে। অনেকরাত অবধি কথা বলে বিশ্বতোষ। এত কথা কোনদিনও তাকে বলেনি বিশ্বতোষ। শ্যাম্পেনের নেশা যে তাকে মুখর করেনি সতী সে কথা অবধারিত ভাবে জানে। অতীতের স্মৃতি মন্থনে যখন কেবলই গরল ফেনিয়ে ওঠে মনে, বিশ্বতোষের ভারী গলায় তখন রুদ্রবীণ শোনে সতী। অতলান্ত এক তূণ থেকে নিষ্ঠুর নির্মম কতকগুলো কথা, বিষমুখ শরের মতো টেনে বার করে নিজের বুকই বিদীর্ণ করে বিশ্বতোষ বারবার। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে পলকে সমঝে যায় সে। মনোহরপুকুরের বাড়ী জড়িয়ে সতীর মনে পড়ে না এমন 'সব স্মৃতি চিত্রের অবতারণা করে উচ্ছ্বসিত হয় সতীর সম্পর্কে।
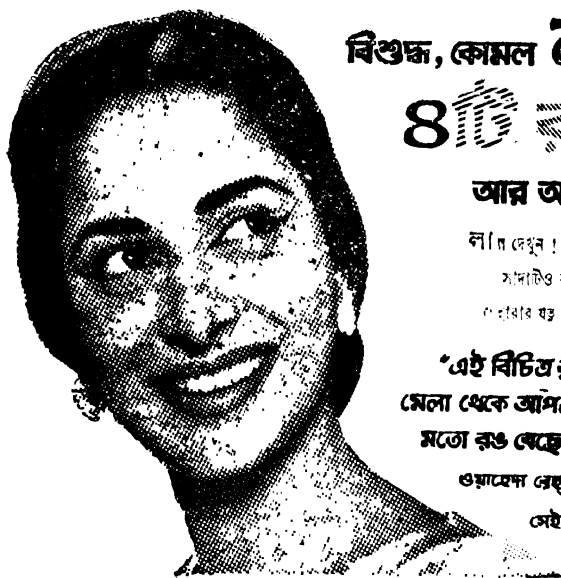
কথায় কথায় রাত গভীর। সতী বলে, এইবার কিন্তু বাড়ী যেতে হয়। টুটুলকে একা রেখে এসেছি।

অন্যায় হয়েছে। শীষ টেনে লাফিয়ে ওঠে বিশ্বতোষ। বলে—চল। পৌঁছে দিয়ে আসি।

দাঁড়াতে গিয়ে টলে যায় পা। হাত ধরে বসিয়ে দেয় সতী বিশ্বতোষকে। বলে—থাক। ড্রাইভারকে নিয়ে আমি একাই যেতে পারবো।

—বরাবর একাই তো চলেছো সতী। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি!

অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বিশ্বতোষের। কিন্তু উক্তিতে শ্লাঘা বোধ করতে পারে সতী। রহস্যময়ী হতে পারে। চটুল হেসে বলে সতী—সে রকম ক'রে কে আর খুঁজছে বলো? চুণীপান্না তো আর নই। জহুরীমহলেও কাড়াকাড়ি পড়েনি কোনদিন।

রূপ ছেড়ে অরূপের দিকে চলে গেল কথাবার্তা। ভালই হলো। সুন্দরী নারী হীরে চুণীপান্নার মতো। এইখানেই আজকের মতো ছেদ পড়ুক। চোখে জেল্লাটা রয়ে গেলে পরের দিন কোন অকুরাণ অবসরে এই মেয়ে সেই হীরে চুণীপান্না কি না জহুরী হয়ে যাচাই করে নেওয়া যাবে। আজকের অন্তরঙ্গ আচরণটুকু হঠকারিতা বলে মনে হবে না সতীর। বিশ্বতোষ হেসে বলে,—

—আচ্ছা, এর জবাব আর একদিন দেবো। আজ নয়। কেমন?

—আচ্ছা।

সিঁড়ি ধরে নেমে যায় সতী। বিশ্বতোষও এগিয়ে আসে সতীর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত। বলে—সত্যব্রতর ব্যাপারটা আমার হয়তো ঠিক মনে থাকবে না সতী। ডাইরেক্টরস্ বোর্ড-এর মিটিং এর আগে তুমি মনে করিয়ে দিও।

—আচ্ছা।

সিঁড়ি যেন ফুরিয়েও ফুরোয় না। শেষ ধাপে এসেও আবার জবাবদিহি হতে হয় সতীর।

—কবে আসছো? কাল? কাল আসছো?

সিঁড়ির পাশের ঝাঁকড়া জাপানী পাম গাছটা খুব বাঁচায় সতীকে। আড়ালে চলে যায় পাখীর মতো। না শোনবার ভাণ করে। তার পর পোর্টিকোর নিচে গাড়ীতে।

নিশুতি রাত। গাড়ীর দরজা বন্ধ হলো সশব্দে, যেন সৃষ্টি ভেঙে পড়লা। সতীর মনে হয় সব কিছু যেন জেগে গেল। জেগে উঠে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। খানিকটা বিভ্রান্তি। খানিকটা শ্যাম্পেন। তবু অনেকটাই সত্যি।

জানলার কাঁচ দিয়ে দৃশ্যমান পৃথিবীটা যেন দেখছে সতীকে। টব, চারা গাছ, সিঁড়ি, ফুল, ঘাস, প্রতিটি জিনিষেরই যেন বক্তব্য আছে তার সম্পর্কে। বাঁকা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে যে পাঁচিল, সেও যেন আড়াল থেকে তাকে দেখছে।

যে টুটুল কাঁদছিলো এতক্ষণ, সেও যেন সকৌতুকে দেখছে মাকে। সবাই দেখছে। দেখছে না শুধু এক সত্যব্রত। দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। সে কি বিশ্বাসে? ভালবাসার অটুট সংকল্পে? না কি মনে নেই তার সতীর কথা?

২১

এত করে-ও অসম্ভবকে সম্ভব করা গেল না। বিশ্বতোষ যে সতী এবং সত্যব্রত দু'জনের চোখেই সর্বশক্তিমান, সকল বিপদের কাণ্ডারী—বিপৎকালে দেখা গেল তার-ও হাত পা বাঁধা। বিশ্বতোষকে কখনো মানুষ, কখনো ভগবান ভেবে বিস্মিত হতো সত্যব্রত। কিন্তু সঙ্কট মুহূর্তে দেখা গেল সেই ভগবান পাথর বা মাটির বিগ্রহের মতোই অক্ষম। কোন ক্ষমতাই তার নেই।

ডাইরেক্টরস্ বোর্ড-এর ফুল বেঞ্চ মিটিং। সত্যব্রত-র কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর আদ্যোপান্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হলো। বিশ্বতোষ হাজার চেষ্টা করে-ও কলঙ্কের সে কৃষ্ণ ফণাগুলো ধামাচাপা দিতে পারলো না। অসংখ্য এবং অগণিত হয়ে তারা ছড়িয়ে পড়লো। বিতণ্ডার মাঝখানে ভগ্নীপতি নরেন ভাদুড়ী পর্যন্ত অপরাধের মাত্রা দেখে সম্পর্কের মুখোস খুলে ফেলে বিশ্বতোষকে বলতে বাধ্য হলেন—ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তোমাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে। This is all but a murder, and worse than that. খাতাপত্তর যেখানেই হাত দাওনা কেন, থার্ডপার্টি! এত থার্ডপার্টি তো কোম্পানীর লেনদেনের ভেতরে থাকবার কথা নয়?

বিশ্বতোষ অবশ্যি জোর দিয়েই বললো, যে বেচা-কেনার ব্যাপারে ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় কাজ করা কোম্পানীর পক্ষে সব সময় ইজ্জতের হয় না। আর তা ছাড়া, ব্যবসায়িক দিক থেকে-ও গড়পড়তায় লাভ ছেড়ে তাতে লোকসানই হয় বেশী। সেই কারণেই ব্রোকার দালালের দরকার হয়েছে। থার্ডপার্টি তারা-ই। যোগাযোগ করতে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, এবং সেই ভুলের খেসারৎ দিতে কোম্পানী যদি লোকসান খেয়ে থাকে, তার দায়িত্ব অবশ্যই ম্যানেজারের। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকেও সেখানে ডিরেক্টরস্ বোর্ডের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু থার্ডপার্টির আমদানী করাটা-ই ব্যবসায়িক রীতি নীতিতে ভুল এ কথা বলা চলে না।

কিন্তু বিশ্বতোষের কথা বোর্ডের কেউ-ই সমর্থন করলো না। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই কুৎসিত ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী যশোমতী বলেন—

—কোম্পানী তাহ'লে তো দেখছি দাদা, মধ্যস্বত্ব ভোগী কতকগুলো দালালকে দিয়েই চালানো যেতে পারে। এত মাইনে দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজার রাখবার তো কোন দরকার নেই। মোটা মোটা মাইনেগুলোও তো কোম্পানীর খাতে জমা পড়তে পারতো।

কোন অভিযোগের সদুত্তর দিতে না পেরে বিশ্বতোষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—বেশ তো! এতই যদি অকর্মণ্য মনে করো তো বিদেয় করে দাও। চালাও তোমরা কোম্পানী।

রাগের কথা। এতে করে কোম্পানীর বিপুল ঘাটতি পূরণের কোন সুরাহাই হবে না। নরেন ভাদুড়ী কোন কথাই শুনলেন না। সত্যব্রত-র ওপর প্রত্যক্ষ চুরির অভিযোগ আনলেন। বললেন এ ডাহা চুরির ব্যাপার। চুরি করবার মনোবৃত্তি ছাড়া এমনটি হতে পারে না। প্রত্যেকটা 'ডিল' এমন গোলমেলে!

কেচ্ছা কেলেঙ্কারী কাদা ছোড়া-ছুড়ির ব্যাপার। চেঁচামিচি আর হট্টগোলের মাঝখানে বোর্ডের মিটিং থেকে উঠে যান নরেন ভাদুড়ী ও যশোমতী। টাকা দিয়ে খালাস, এমন জনা কয়েক স্লিপিং পার্টনার নরেন ভাদুড়ীর মুখ চেয়ে এসেছিলেন। তাঁরাও বেরিয়ে যান ক্ষুন্ন হয়ে।

পরদিন-ই নরেন ভাদুড়ীর নির্দেশে কোম্পানীর এ্যাকাউন্টস্ পত্তর শীল হয়ে যায়। হেড অফিসে কাজ বন্ধ তো, ওয়ার্কশপ-ও চলতে পারে না। এখানে গণ্ডগোল কাগজ পত্তরে। ওখানে গোলমাল খোদ মালে। ষ্টীলের বাজার সরগরম। সরকারের চাহিদা মেটাতে-ই নিঃশেষ হয়ে যায়। মাথা খুঁড়ে মরলে-ও কোথাও একরত্তি বাড়তি ইস্পাত নেই। অথচ হাওড়া ওয়ার্কশপে দশ হাজার টন ইস্পাতের কোন খোঁজই হিসেব পত্তরে নেই। এদিকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ঘরে মাল তুলে দিতে না পারলে গুনোগার দিতে হবে সাংঘাতিক। আসছে বছরের টেণ্ডার তো বিশবাঁও জলের নিচে। কথাই কইবে না গভর্ণমেণ্ট। তারপর বিদেশী জিনিষ আমদানীর ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে কড়াকড়ি করছে, আর মক্কেল বাচাই করে টিপে টিপে মাল ছাড়ছে তাতে করে সামনের বছরে ক্রেতাদের লিষ্ট থেকে বিশ্বতোষদের কোম্পানীর নামেই হয়তো বাদ পড়ে যাবে। তারপরে আছে শ্রমিক সমস্যা। ওয়ার্কশপ যে মাল অভাবে বন্ধ সে কথা মানবে তারা? লক-আউট ভাঙো, ট্রাইব্যুনাল ডাকো, কোম্পানী নিলেমে চড়িয়ে আগে পাওনাদার মেটাও। আনুপূর্বিক সমস্যার বহর দেখে রীতি-মতো শঙ্কিত হয়ে ওঠেন নরেন ভাদুড়ী। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর দায়ভার কি শেষ অবধি তাঁর কাঁধেই বর্তাবে? ভেবে চিন্তে পুলিশের শরণাপন্ন হন নরেন ভাদুড়ী। প্রত্যক্ষ চুরি ও তহবিল তছরূপের অভিযোগ এনে রাতারাতি সত্যব্রত-র নামে হুলিয়া বের করেন। বিশ্বতোষকে রাত একটায় ফোনে জানান,—এ সব কিছু আমি করতে বাধ্য হলাম। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিক চেয়ে করিনি। কেন না তুমি আমি সবাই নিরুপায়। আদালতে জবাব দিহি হতে হবে আমাদের প্রত্যেককে ম্যানেজারের কীর্তির জন্যে। তবে নেহাৎ হাতে হাতকড়া না পড়ে তারই একটা ব্যবস্থা করলুম। আরো কি জানো। ব্যক্তিগত দায়িত্বের সূত্র ধরে এই পাপ যদি কোলিয়ারী ধরে টান দেয় তাহলেও বলবার কিছু থাকবে না। সুতরাং সেনের নামে ওয়ারেণ্ট বের করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কথাটা আমি তোমাকে জানালাম।

সময়ে গেল বিশ্বতোষ। সত্যব্রতর নামে হুলিয়া বেরুবে ভাবতে গিয়ে মনে হলো খেলাটা মন্দ জমেনি। সেনও যে পাণ্টা খেলবে, তা জানতো বিশ্বতোষ। জেনেশুনেই নেমেছিলো সে এই খেলায়। জালটা যখন স্বর্ণসূত্রে বোনা, তখন সে জালটি অভিজ্ঞ হাতে ছড়িয়ে নিজেকে আর সতীকে জড়িয়ে ফেলতেই চেয়েছিলো। সে দেখছিলো খেলা। সেন দেখলো টাকা! বিশ্বতোষ প্রস্তুতই ছিলো। কিন্তু সত্যব্রত হঠাৎ 'ফরোয়ার্ড বিজনেস' করে যে এমনিভাবে ধ্বসিয়ে দেবে কোম্পানীর দেয়াল, এতটা সে ভাবেনি। খানিকটা অতর্কিতেই নাটক চললো একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। সময় সংক্ষেপ হলেও তৈরী হয়ে নেয় বিশ্বতোষ।

তখনও সূর্য ওঠেনি। ঘুম থেকে ওঠেনি সত্যব্রত। হঠাৎ করিডোরে অনেকগুলো ভারী বুটের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় সতীর। বাইরে এসে দেখে পুলিশ। অনেক পুলিশ। নিচে দাঁড়িয়ে আছে দু'খানা বড় ভ্যান। একখানায় ভরতি আর্মড গার্ড।

খানিকটা জানা কথা-ই। কাল রাতে অনেক রাত অবধি সভা হয়েছে নিচের ঘরে। এ্যাকাউন্টস'এর লোক ছাড়াও বাইরের লোক ও এসেছিলো। সভা ভাঙলো যখন, তখনো অনেক রাত। কত রাত সতী জানে না। ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙতে দেখে এই কাণ্ড। বাড়ী কর্ডন করে আছে পুলিশ।

সতীকে দেখেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে আসেন। বলেন—মিঃ সেনের নামে ওয়ারেণ্ট অব্ এ্যারেষ্ট আছে।

—ঘুমুচ্ছেন। বসুন। ডেকে দিচ্ছি……

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই সতী দেখে, সত্যব্রত যেন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেও চুপ করে শুয়ে আছে।

সতীর চোখে মুখে টুঁটি টেপা উৎকণ্ঠার ঝাপটা চেয়ে দেখলো সত্যব্রত। অভ্যাসমতো শুয়ে শুয়েই হাত বাড়ায় আলিঙ্গন সম্ভাষণের। এমন সে রোজই করে। বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগে এ তার একটা বিলাস। বাহু লগ্ন হতে যদি একটু দেরী হয় সতীর তবে সত্যব্রত বলবে—প্লীজ…সতী প্লীজ…। আজও অভ্যাসের ব্যতিক্রম হচ্ছে না কেন? তবে কি সত্যব্রত বোঝেনি ব্যাপারটা? নিজের বিবেক পরিষ্কার রেখেই জাগতিক ভয়-ভাবনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে? নিজের হয়ে সত্যব্রত কোনদিনও অন্যের মতো জোর গলায় চেঁচাতে পারে না। তাই কি তার দোষ? টনটনিয়ে ওঠে সতীর বুকটা। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যব্রতর বুকের মাঝখানে; আদর আর আলিঙ্গনে ডুবে যায়। ছোট ছোট আশ্বাসের কথা কবিতার মতো করে উচ্চারণ করে সত্যব্রত. আর সেই আলাপ কান ভ'রে শোনে সতী। আর মাঝে মাঝে যতি।

অধরোষ্ঠের উষ্ণ ছোঁয়াচে পুষ্পবৃষ্টি। সত্যব্রত বলে—ঠাণ্ডা কেন? ভয় পেলে? আর অমনি নির্ভয়ে মরে যায় সতী।

অনেক দেরী হচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরেও মিঃ সেনের ইতিমধ্যেই একবার বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত ছিলো। সীমা লঙ্ঘন করছে সত্যব্রত। পুলিশ নয়। তবু ইন্সপেক্টার পর্দার সম্মান রেখেই বলেন,—ভেতরে ঢুকতে পারি কি?

সাড়া নেই। কারণ এখান থেকে দু'খানা ঘর পেরিয়ে সত্যব্রত-র ঘর। তার ওপর সে ঘরের দরজাতে-ও ভারী স্ক্রীণ টানা। তা' ছাড়া সত্যব্রত সতীকে তখন ঝড়ের বেগে বলে চলেছে কি করতে হবে না হবে—

—টাকা, জানলে সতী! ঘেন্না করি,—তবু টাকা আমার চাই-ই চাই। অনেক টাকা আনতে গেলেই ঝুঁকি নিতে হবে। সে ঝুঁকিতে ঘর-সংসারের অনেক কিছু তছনছ হবে। যেমন ধরো সুখশান্তি! বিশ্বতোষ বা নরেন ভাদুড়ীর মতো সুখশান্তি আমার কোথা থেকে আসবে? নরেন ভাদুড়ী ওয়ারেন্ট অফ এ্যারেষ্ট জারি করেন কোন হিসেবে? কি অধিকার আছে তাঁর? আসলে তাঁদের মতলব মাফিক কাজ আমি করবো না। আমাকে 'স্কেপগোট' বানিয়ে নিজেদের কাজ নির্বিঘ্নে হাসিল করতে দেব না। এখন বিপদ যেমন আমার। তেমন তোমার-ও সতী। তাই তোমাকে এখন বিশ্বতোষকে হাতে রাখতেই হবে। একবারের জায়গায় দশ বার যাবে তুমি সতী! ইজ্জৎ কারু গায়ে লেগে দেওয়া থাকে না। জানলে? যেমন ক'রে হোক, বিশ্বতোষকে·····

ওদিকে পুলিশের সন্দেহ এবং ধৈর্য্যচ্যুতি দুইয়ের-ই অবকাশ ঘটেছে। ঝড়ের বেগে খাসকামরাতে-ই ঢুকে পড়েন মিঃ মুখার্জি। সতী তখন-ও সত্যব্রত-র কণ্ঠলীন।

কান লাল হয়ে ওঠে তরুণ ইনস্পেক্টর বলেন—এক্সকিউজ মি মিঃ সেন। সত্যব্রত-র নার্ভ আগে থেকেই খারাপ ছিলো। সতীর চোখের জল তাকে আরও বিব্রত করে তুলেছিলো। সতী যদি মেয়ে-মানুষের মতো অসহায় বোধ না করতো, তবে বিক্ষিপ্ত স্নায়ুমণ্ডলীর তাড়নায় সত্যব্রতকেই কাঁদতে হতো!

সতীর চোখে জল নেই। তাই সত্যব্রতকেই দুঃসাহসী হতে হলো। পুলিশ তাকে আরো নার্ভাস করলো। পরুষ ও অসংযত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে বলে—আপনি কার হুকুমে বেড-রুমে ঢুকেছেন? গেট আউট! আই সে গেট আউট···

পাগলের মতো চীৎকার করে উন্মত্ত হয়ে উঠলো সত্যব্রত
—You have no right to intrude in my bedroom.

অধিকারের প্রশ্ন তুললে এমনি অনধিকার চর্চা করতে হয়। হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যেতে হয় সত্যব্রতকে। কিন্তু মিঃ মুখার্জির মেজাজ দেখা গেল বেশ ঠাণ্ডা। তিনি বলেন,—দেখুন। সময় আপনাকে অনেক দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা যা কিছু, তা ইতিমধ্যেই করে নেওয়া উচিত ছিলো। তাড়াতাড়ি করুন।

–I will ring up the D. C. atonce!

–Primarily you are accompanying me, and that too atonce!

—নইলে···বলতে গিয়ে সহসা কাঁপতে থাকে সত্যব্রত। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। কতকগুলো ঢোক গিলে কোনমতে বলে,
—Just a minute please!

—Alright.

বেরিয়ে যান ইন্সপেক্টর মুখার্জি। সতী স্পষ্ট দেখে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠক্‌ঠক্ করে লাগছে সত্যব্রত-র!

—আমার কোটটা!

দাঁতে দাঁত লেগে কথাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল আপনা থেকে তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা এনে পরিয়ে দেয় সতী সত্যব্রতকে।

—আজ বেশ ঠাণ্ডা, তাই না সতী?

সতী জবাব করে না। ওভারকোট পরা ঢোলা ডানহাতটা ঝাপটে এগোতে থাকে। করিডোরের মুখে এসে পেছন ফিরে আবার সত্যব্রত-র উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন।

—বেইল,··জামিন···

—ভেবো না।

পাথরের ঠোঁট। পাথর হয়ে যায় সতী। কথাগুলোও পাথরের মতো নিষ্প্রাণ ঝরে পড়ে। খটাখট শব্দ সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল চলে গেল ভ্যান ছুটো; পনেরো বিশ মিনিট হুঁস রইলো না সতীর। তারপরই ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো ফোনের রিসিভারটা।

গলা চিনে বিশ্বতোষ বলে—কে, সতী? শোন, এইমাত্র ফোনে আমি সব খবর···তুমি মোটেই উতলা হয়োনা। অত সিরিয়াস কিছু নয়। অফিসের এ্যাকাউন্টস-এ গোলমাল করেছে সেন, তাই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ঘটলো। মিনিট দশেক আগে ভাদুড়ী ফোন করেছিলেন। ভাদুড়ী মশাইকে জানো ত? একগুঁয়ে আর একরোখা মানুষ। মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রক্ষে নেই। তিনি দেখলেন, গভর্ণমেন্ট কোম্পানী সীল করে দেবে। তারচেয়ে নয় ম্যানেজারের ওপর দিয়েই যাক ব্যাপারটা। একেবারে বিজনেস ইণ্টারেষ্ট···বুঝলে সতী? মানুষের মনের কথা এঁরা বুঝবেন, সে আশা দুরাশা···শুনছো সতী?

—সব শুনছি।

—তবে আমি তোমায় বলছি সতী···এ একদিক থেকে ভালই হলো। কেন ভাল হলো বলছি···তুমি-ও একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝবে সতী।

এমনিতেই ক্লান্ত লাগছিল। বিশ্বতোষের এত কথা শুনতে শুনতে আর-ও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল সতীর। সত্যব্রতকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার পেছনে কি সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে বুঝতে পারেনা সতী। শীতের নামগন্ধ নেই। অথচ কোটটা গায়ে দেবার সময়ে সত্যব্রত কি রকম ঠকঠক করে কাঁপছিল মনে করতেই সতীর গলায় কান্না ঠেলে উঠে আসে। শেষের হাসিটুকুই বা কি রকম মরা মরা, যার উত্তরে সতীকে শেষপর্যন্ত বলতেই হলো—ভেব না। বিশ্বতোষ এর একটা কথাও বুঝবে কি? বিশ্বতোষ ফোনে আরো যেন কত কি বলছে। অথচ সতীর হাতখানা অবসাদে ভারী হয়ে নুয়ে পড়ে। রিসিভারটা চেপে বসিয়ে দেয় সতী। কথা আর তার শুনতে ইচ্ছে নেই। কোন কথা। কারো কথা।

টুটুল উঠেছে। পাখপাখালির মতো কলকণ্ঠ তার আধ আধো শাসনের ছোট ছোট কথা অমাক্ত করে ঝলকে পলকে হাসি। টুটুলকে যেন বড্ড অসহায় লাগে সতীর। কিন্তু টুটুলকে বাঁচাতে হবে!

পর্দা ছিঁড়ে প্রায় ছুটে টুটুলের কাছে চলে যায় সতী।

[ক্রমশঃ

সাধারণ মেয়ে ও রবীন্দ্রনাথ

আলো দাশ

আতপ্ত দ্বিপ্রহরের অবসানে আসন্ন সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। পশ্চিম দিগন্তের ললাটে রাঙামেঘের আঁচড় টেনে গেছে কে। চেয়ে চেয়ে মনে হল, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্ত আর গান লিখবেন না।

এই ভুলে থাকা সত্য কথাটা হঠাৎ মনে পড়াটুকু যে কতখানি, তা বাংলার সাধারণ মেয়েরা বুঝবে। বাংলার কৃষ্ণকলিদের কালো হরিণচোখের কান্না রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে সুরে বেদনার নির্ঝর হ'য়ে গ'লেছে। বিশ্বকবির বিরাট আত্মার বিপুল ব্যপ্তি উপলব্ধি করার সম্যক গভীরতা কজন উচ্চশিক্ষিতার আছে জানি না, কিন্তু কবির দরদীমনের সরস ছোঁয়াটুকু বিপুল হয়ে যাদের মনের সীমা হারিয়ে দিয়েছে—আমি সেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সাধারণীদের একজন। যাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটেনা, তাদের হয়ে তাদের কথা বলার কবিকে হৃদয়ের গোপন দেউলে দেবতার আসন দিতে তাদের বাধেনি। কেন না এই সাধারণীরাই সমবেত উপেক্ষা থেকে স'রে গিয়ে বিস্ময়স্মিত শ্রদ্ধা ও স্নেহের সংমিশ্রিত আলোকে উজ্জ্বল এক অভিনব দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করেছে বিশ্বকবির বাণী মাধ্যমে—

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে
হে কল্যাণি। নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাহিরে তোমার আমের শাখে
স্নিগ্ধস্বরে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে,
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"

এই তো সাধারণ মেয়ের রূপ। জায়া ও জননী রূপে রাঁধা বাড়া অতিথি সেবা শিশু পরিচর্যা গার্হস্থ্য উদ্যানটির তত্ত্বাবধান নিয়ে আনন্দে কেটে যায় তার কর্মবহুল দিন। গৃহের সে সম্রাজ্ঞী, পুরুষের প্রেরণা, হতাশের আশ্রয়। কিন্তু এ মহিমময়ী রূপ ক'জন দেখেছে চোখ মেলে? গতানুগতিক অভ্যাসে ব্যস্ত উপেক্ষায় রেখেছে ঠেলে একপাশে, জানে না এ তার কতখানি! সেই জানার আলোক এসে পড়ল বিশ্বকবির দৃষ্টিকোণ থেকে, বিদুষীর বরমালা রূপসীর উপচার উৎসর্গীকৃত হ'ল নারীর এই স্বতস্ফূর্ত কল্যাণীরূপের কাছে, নিবেদিত হ'ল নম্রতার অর্ঘ—

"নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।"

মুখ যাদের ফোটেনা তারাও আর রইল না মূক হয়ে: কালো কুমারীর গোপনলজ্জা এতদিন বিধাতাকে ব'লে এসেছিল, "তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে!" কত ভয়ে ভয়ে বলা কথা, না বলা-বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে গোপন বেদনার অব্যক্ত অনুভূতি। এখন সে মৌনতার তপস্যা ভঙ্গ করেছে। তাই সঙ্কোচের অবগুণ্ঠনটি মুখ থেকে কপাল পর্য্যন্ত সরিয়ে এনে অনুরোধ ক'রেছে—

"পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প
লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,
বড়ো দুঃখ তার।"

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বড়ো দুঃখ অনিলার, দার্শনিক স্বামীর দৃষ্টি তাকে দেখে, তাকে দাবী করে, দেখে না তার মনের আয়নায় নিজের মুখের ছায়া। বড়ো দুঃখ কুমুর, স্বামী তার ডাক্তার, নীতিতে নিষ্ঠা নেই, অর্থের মোহে অন্ধ। প্রতিবাদ করতে গেলে বলে, "তুমি আকাশ থেকে দুঃখ টেনে আনো।" এর সরলার্থ, মেয়েমানুষ, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা কোয়োনা। অধিকার নেই স্বামীকে পাপের পথ থেকে ফেরাবার, সে যে মেয়েমানুষ। অধিকার নেই মেজো বউএর অনাথ বিন্দিকে আশ্রয় দেবার, সে যে মেয়েমানুষ। তাই সে যেদিন ছাড়া পেল, লিখল এক পত্র তার স্বামীকে, "আজ পনেরো বছর তোমাদের ঘর করবার পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এ চিঠিখানি লিখছি, এ কেবল তোমাদের মেজ বউএর চিঠি নয়।" বড়ো দুঃখ বিন্ধ্যবাসিনীর, পিতৃগৃহ পতিগৃহের সমস্ত লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ ক'রে নিয়ে যে প্রবাসী স্বামীর কল্যাণকামনায় পথ চেয়ে আছে, বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে তার বিশ্বাস ক'রে আছে। বড়ো দুঃখ শশিমুখীর, স্বামী তার অনাথ ছোটো ভাইটির শত্রু। আর নিরুপমার কি উপমা আছে? কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পণদানে অসমর্থতা, বেহাইমশাইএর অর্থলালসা ও বেহানঠাকুরাণীর পুত্রবধূর প্রতি পরম বাৎসল্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক কালের চেনা, এ আমাদের ঘরের জিনিস।

এইসব ছোটো ছোটো পারিবারিক সমস্যাগুলি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কোনোদিন স্থান পায়নি, তবে কেমন করে কোন্ ফাঁক দিয়ে তাঁর দৃষ্টি যে এদের উপর এসে প'ড়েছিল, তা জানি নে। শুনি রুপোর চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্মায়, তারা নিচের দিকে তাকিয়ে চলে না। গজদন্ত মিনার থেকে তাদের দৃষ্টি সাধারণের সীমানার বহির্ভূতই থেকে যায়। বিশ্বকবি নিজেও খেদ করেছেন

"আমার কবিতা—জানি আমি—
গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

তবু তাঁর সমালোচকের দল তাঁকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু গজদন্ত মিনার থেকে সত্যিই কি চোখ পড়ে কোথায় এক অন্ধকার পল্লীর এককোণে একটি কুঁড়েঘরে বৃদ্ধা মির্জাবিবি জমিদারের হাতে আটক অস্থিমজ্জির জন্ম অশ্রুপাত করছে কোন অভাগিনী সারাজীবনের সঞ্চয় পুত্রটিকে হারিয়ে মাটির বুকে লুটিয়ে প'ড়েছে—"ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার অবসর পাইলেন না। পুত্র তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর আবার দুইজনেরই ভার তিনি তুলিয়া লইলেন। প্রাণ বলিল, 'আর আমার সয় না।' তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।"

বালবিধবা বিনোদিনীর বিভ্রান্ত চিত্ত কি ক'রে বিবেক আর প্রবৃত্তির প্রেম আর বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বে একটা অত্যন্ত সাধারণ হতভাগিনী মেয়ের বুকটা কি করে যে ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে তার এত স্পষ্ট ছবি কি গজদন্ত মিনারের সমুচ্চ শীর্ষ থেকে এমনই নিখুঁত করে দেখতে পাওয়া যায়, যে সংস্কারে অন্ধ চোখও খোলে, সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত মনও বলে ওঠে, "আহা!" প্রেমহীন লালসার স্থূলতার কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণের বেদনা কি একা কুমুদিনীকেই বহন করতে হ'য়েছে? কিন্তু তার কথা "যোগাযোগে" শুনবার আগে আর কারো চোখ কেন তার দিকে পড়েনি?

শুধু কি এক একটা মানবিক সমস্যার দিকে কবির দরদী দৃষ্টি পড়েছে! "কর্মভারে অবনতা অতি ছোট দিদি" ছোট ভাইটিকে কোলে নিয়ে চলেছে; ছোট্ট মিনি কাবলীওয়ালাকে দেখে বাবার চেয়ারের পাশে এসে লুকিয়েছে; পসারিণী চলতে চলতে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, আবার মা-হারা মন খেলার মাঝে কী এক সুরের গুণগুণানিতে উদাস হ'য়ে জানালায় এসে বসেছে—

"জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে
মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।"

অমলা লিখেছে মাসির বাড়ি থেকে চিঠি বাবার কাছে,
"তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে।"

কতো ছোটো ছোটো বাৎসল্যমধুর গার্হস্থ্য চিত্র! মা চলেছে পুজোর ঘরে, চাঁপার তলা দিয়ে দিয়ে, ভিজে চুল পিঠের ওপর মেলে মেলে, দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর মহাভারত হাতে বসেছে জানালার ধারে, বাবার চিঠি আসে না কেন! নূতন মা খোকাকে সোহাগে ভ'রে শাসন করছে, বুকে বেঁধে বলছে, "আমার শিবপুজোর ভিতর তুই মিলিয়ে ছিলি, মিলিয়ে ছিলি আমার পুজোর ফুলের গন্ধে, প্রভাতের আলোর সমবয়সী তুই সব দেবতার আদরের ধন।"

মায়ের অন্তর্যামী স্নেহের কাছে ধরা পড়েছে মঞ্জুলিকার মন। বয়সে পাঁচ গুণ বড়ো অথচ সংসারের মোটা হিসেবে সুপাত্র পঞ্চাননের সঙ্গে বাপ তার বিয়ে দেবেন। মা কেঁদে গিয়ে পড়লেন। বাপ বললেন, "স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে!"

বিয়ে হ'ল। মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে। কিন্তু বাপ তখন ইংরিজি নভেলে মগ্ন। তখনো চৈতন্য হল না মেয়ে যখন সাদা সিঁথি নিয়ে ফিরে এল ঘরে! মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো। মেয়ের কৃচ্ছক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মায়ের বুক ফেটে যায়। আচ্ছা, এমন তো হয়, বিধান যখন আছে, মেয়ের আবার কি বিয়ে দেওয়া যায় না?

বাপ উঠলেন তেলে-বেগুনে ঝ'লে। বললেন,

"মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস,
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।
এই ব'লে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।"

সংসারের ভরা ভোগের মধ্যিখানে দুয়ার এঁটে পলে পলে ছাতি ফেটে নির্জলা উপোস করে একাদশীর রাত জাগবার জন্ম রইল মঞ্জুলিকা, মা ছুটি নিলেন। মায়ের ভার হাতে তুলে নিতে হ'ল মঞ্জুলিকাকে। এক এক বেলায় এক এক রকম খাওয়া, মঞ্জুলিকা আগাগোড়া আপন হাতে রাঁধে। ঘর ঝাড়ে, বাসন মাজে, রোদে পোষাক বিছানা শুকিয়ে তোলে, ঘর গুছোয়, ধোপা-গয়লার হিসেব করে আর বাপের মুখঝাম্টা খায়। একাদশী থেকে আরম্ভ করে বারো মাস তিরিশ দিন দৈনন্দিন কাজের চাকায় সে বাঁধা। এই তো আমাদের ঘরের বিধবাদের জীবন। সংসারে তার দাবী নেই, কিন্তু সংসারের তার উপর দাবী আছে, বেওয়ারিশ যে!

গল্পটার এ পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক মিলেছে। তবে তারপর মঞ্জুলিকার বাপের বিয়ে করতে যাওয়া আর পুলিনের মঞ্জুলিকাকে বিয়ে করে ফরক্কাবাদ চলে যাওয়া, এ দু'টো ঘটনাও ঘরে ঘরে ঘটা কিছু অসম্ভব নয়, ঘ'টেও থাকে, তবে সেগুলো exceptions. ততখানি সংসাহস অল্প মেয়ের হয়, কেউ বা বিকৃত প্রবৃত্তির তাড়নায় ভ্রান্তপথে হারিয়ে যায় চিরকালের মতন, কেউ বা বুকে শেল মেরে মুখ বুজে মেনে নেয় অসহ্য এই জীবনের শাস্তি। মনে মনে ক্ষোভ, মুখে ধর্মের আড়ম্বর, আমাদের দেশে এরই জয়জয়কার যুগান্তর থেকে হ'য়ে এসেছে, এমন কি এখনো এই সংস্কারের দাসত্ব থেকে আমরা পূর্ণমুক্তি পাইনি।

আর সেই মেয়েটি? বাইশ বছরের ব্যর্থ বসন্তে যে কাতর কান্নায় ভ'রে তুলেছে "পলাতকা"র পাতা—

"ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো
রাখো রাখো খুলে রাখো
শিয়রের ঐ জানলা দুটো, গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।"

এর কাছে বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ। বৈচিত্র্যহীন জীবনের চিরন্তন রুটিন বাঁধা—

"রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।"

একেও আমরা দেখেছি আমাদেরি ঘরের অপরিসর সীমানায়। "অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ ভাগ, কলহ, সংশয়" তার মধ্যে জীবনকে "খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।" এই তো আমাদের জীবন! তবু এরই মাঝে বিভিন্ন চরিত্রের মিলন-সংঘাত, ভাবের বিচিত্রতা, ভিন্নমুখী অনুভূতির প্রকাশ-অবকাশ। সংসারের এই প্রাঙ্গণটিতে বড়ো স্বাভাবিক ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে ব্রজসুন্দরী আর রাসমণি।

"বড়োগিন্নী যে কথাগুলো বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। কেন না তাঁর স্বামীর রোজগারেই সংসার চলে,

রাসমণির স্বামী বেকার। আবার চাকা যখন ঘুরল তখন এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সতন্ত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। রাসমণির অবস্থাও ফিরেছে। এখন রাধামুকুন্দের অন্নেই শশিভূষণ ও ব্রহ্মসুন্দরী প্রতিপালিত। তাই সে একদিন দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল।" নারী-চরিত্রের একটি "বিশিষ্ট" দিকের কি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

বোবা সুভাষিণী, স্বর্ণমৃগের মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত মোক্ষদা, বরদাসুন্দরী, রামকানাই-এর বউ প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে ছোট ছোট স্বার্থের সংঘর্ষে যে re-action এর লীলা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, একটি দু'টি কথার ভিতর দিয়ে হ'লেও সে ছবিটুকু দুর্লভ শিল্প সৃষ্টি, কেন না তার স্বাভাবিকতা কোথায়ও ব্যাহত হয়নি। "শেষের রাত্রি"র ("গৃহ প্রবেশ") মাসিমার মৃত্যু পথযাত্রী যতীনের প্রতি সকরুণ ছলনা কার চোখে না জল আনে? বুকের মধ্যে যাদের কান্নার সমুদ্র, তিনি যে তাদেরই জাত। "আপদ" গল্পে শরৎশশী মা না হ'য়েও একটি ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে ছেলের মা হ'য়ে উঠেছেন। আবার জয়কালী ঠাকরুণের কঠোর ধর্মপরায়ণতা যখন পাঠকের সমস্ত মনকে এক শুষ্ক শূন্যতায় ভ'রে তুলেছে, এমন সময় "সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন···একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন-পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।" যে মন্দির তাঁর বুকের পাঁজর, যে মন্দিরে ভগ্নীপতি জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে উদ্যত হওয়ায় জয়কালী তাকে এমন লাঞ্ছনা করেছিলেন যে সহোদরার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘ'টে গিয়েছিল, সেই মন্দিরে "এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।"

কিন্তু "ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ-নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ" হ'য়ে উঠলেও সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দলের মুখের সামনে জয়কালী ঠাকুরাণী দরজা বন্ধ করে দিলেন। ডোমের দল ফিরে গেল। ব্যাপারটা তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু "এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন।"

"সমাপ্তি" গল্পে শাশুড়ী বধূর সম্পর্কটি বড়ো চমৎকার ফুটেছে। যেখানে সমস্ত বিরোধের অবসান হয়ে "মৃন্ময়ী ম্লান মুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছল ছল নেত্রে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, মুহূর্তে উভয়ের মিলন হইয়া গেল।" এই ছবিখানি জায়া ও জননীর চিরন্তন হৃদয় দ্বন্দ্বের, বাঙালীর সনাতন শাশুড়ী-বৌ-সমস্যার কী মধুর সমাধান।

এগুলি তো সাধারণ, অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি চিত্র? এরা সকলেই আছে, আমাদের ঘরে, আমাদের প্রতিবেশীদের

ঘরে, আমাদের বুকের আশে-পাশে। একদিন কেউ চেয়ে দেখেনি। দেখলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাকিয়ে দেখা নয়, চেয়ে দেখা। দেখার সঙ্গে চাওয়া, দেখার সঙ্গে সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ, সম্প্রীতি, শুধু তাই নয়, আপন মর্যাদাবোধে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও—

"নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?...
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নাহি নিজে লব চিনে
সার্থকের পথ ?"

সেই সার্থকের পথেই আজকের সাধারণ মেয়েরা যাত্রী হ'য়েছে। এ পথে তাদের প্রথম আশীর্বাদ, এসেছে তাদের পথিকৃতের হাত থেকে—

"নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হ'তে
নদীর মতো সাগর পানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থসলিল ঝরে,
সর্ব শেষের শ্রেষ্ঠ গানটি আছে তোমার তরে
হে কল্যাণি !"

৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অণিমা রায়

'হরিশ মুখার্জী রোড' দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের একটি পুরানো ও নামকরা রাস্তা। এই বড় রাস্তাটির দু'ধারে বেশ বড় বড় বাড়ী ও অনেক বাড়ীতেই নিজস্ব মোটর গাড়ী আছে। দেখলেই মনে হয় যে রাস্তাটির দু'পাশে বেশ একটি সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ পল্লী গড়ে উঠেছে। কলিকাতাবাসী ও মফঃস্বলের অনেকেই রাস্তাটির নাম জানেন। ওখানকার বাসিন্দারা নিজেদের বাসস্থানের কথা বলতে গেলেই বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বলেন "আমি হরিশ মুখার্জী রোডে থাকি।" অথচ যাঁর নাম স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য এই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছিল, সেই স্বনামধন্য হরিশ মুখার্জী যে কে ছিলেন এবং কি জন্য দেশবাসী তাঁকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন সে কথা খুব কম লোকেই জানেন। সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়—কেন-না হরিশচন্দ্র একশো বছর আগে ১৮৬১ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর আজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই কর্মবীর বাঙালীর কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হরিশচন্দ্র ভবানীপুরে তাঁর মাতুল দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার কুলীনদের মত রামধন বাবুর তিনটি পত্নী ছিল। তাঁর সব শেষ পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম হারানচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র। এ-সম্পর্কে পরে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামে তখনকার একটি মিশনারী পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে কিছু অসম্মান-সূচক কথা লিখলে হরিশচন্দ্র সগর্বে উত্তর দেন যে তিনি জাতি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কুলীন ও কুলীন শ্রেষ্ঠ ফুলিয়া।

মাতুল গৃহে থাকাকালে পাঁচ বছর বয়সে হরিশচন্দ্র পাঠশালায় বাঙলা পড়া শুরু করেন। দু'বছর পরে সাত বছর বয়সে দরিদ্র সন্তান হিসাবে বিনা বেতনে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে সাত বছর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। চোদ্দ বছর বয়সে তাঁকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে নিজের ও সংসারের ভরণপোষণের জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়।

কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী ক'রে বালক হরিশচন্দ্রের সমস্তদিন কেটে যেত, কিন্তু কোনও ব্যক্তি এই ছোট ছেলেটিকে কাজ দিতে রাজী হননি। সে সময়ে তাঁর পড়াশুনা খুব বেশি ছিল না আর দরিদ্র সন্তানের মুরব্বীরও জোর ছিল না। ইউনিয়ন স্কুলে কিছু ইংরাজী তিনি শিখেছিলেন। তার বলেই লোকের দরখাস্ত, চিঠি, বিল প্রভৃতি লিখে দিয়ে টাকাটা সিকিটা মধ্যে মধ্যে যা পেতেন তাতেই কোনরকমে অর্দ্ধাশনে সংসার চলত। এক একদিন সংসার অচল হয়ে যেত। অগ্রজ হারাণচন্দ্র কিছু রোজগার করতেন না, অথচ বাড়ীতে খেতে তিন জন—হরিশচন্দ্র, হারাণচন্দ্র ও তাঁদের মাতা-রুক্মিণীদেবী। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরের বছর ১৮৬২ সালে তখনকার খ্যাতনামা সাংবাদিক ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জী ম্যাগাজিন' পত্রিকায় হরিশচন্দ্রের তৎকালীন জীবনের একদিনের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন—"একদিন হরিশচন্দ্রের বাড়ীতে একটি পয়সা বা চালের একটি দানাও ছিল না। নিরুপায় হরিশচন্দ্র স্থির করলেন যে তাঁর ভাত-খাবার কাঁসার থালাটি বাঁধা রেখে কিছু পয়সা সংগ্রহ ক'রে সেদিনকার মত চালটা কিনে নেবেন। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। হরিশচন্দ্রের বাড়ীতে একটিও ছাতা ছিল না। অগতির গতি শ্রীভগবানকে একমনে ডাকছেন এমন সময় এক ধনী জমিদারের গাড়ী তাঁর দরজায় থামল। জমিদারের মোক্তার এসে তাঁকে পারিশ্রমিক বাবদ দুটি টাকা দিয়ে একখানি দলীল তর্জমা করতে দেন। এইভাবে হরিশচন্দ্র বারবার রক্ষা পেয়েছিলেন।"

এইরকম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে হরিশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় মন দেন। হাতের কাছে যে কোন ইংরাজী বই পেতেন, অভিধানের সাহায্যে সেটি মন দিয়ে পড়তেন এবং নিজেকে শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন। বাঙলার গণ্যমান্য উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে আমিও একজন হব—এ উচ্চাভিলাষ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। যা হ'ক, বহু চেষ্টার ফলে তিনি টুলা কোম্পানী নামে একটি নীলামকারী অফিসে মাসিক ১০ টাকা বেতনে বিল লেখকের কাজে নিযুক্ত হন। সেই দশটি টাকা থেকে প্রতি মাসে দু-টাকা বাঁচিয়ে নানারকম বই কিনতেন ও মনোযোগ দিয়ে সেগুলি পড়তেন—সে বই দর্শন শাস্ত্রই হ'ক বা আইন পুস্তকই হ'ক বা সাহিত্য সম্পর্কিত হক। তাঁর শিক্ষক ছিল একটি ছেঁড়া ইংরাজী-বাঙলা অভিধান। দু-তিন বছর পরে টুলা কোম্পানীর মালিককে নিজের কিছু বেতন বৃদ্ধি করবার অনুরোধ করলে, মালিক অসংযত ভাষায় তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। অপমানিত হরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। তাঁর দুঃখের জীবন আবার শুরু হ'ল।

১৮৪৮ সালে মিলিটারী অডিট জেনারেলের অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনের একটি কেরানীপদ খালি হয়। পদটির জন্য বহু প্রার্থী থাকায় পরীক্ষা ক'রে প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন তাঁকেই চাকরীটি দেওয়া হবে—স্থির হয়। হরিশচন্দ্র

পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার ক'রে এই চাকরীটি পান এবং মৃত্যুপর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬১ সাল অবধি—ঐ অফিসে কাজ করেন। তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়, অকাতর পরিশ্রম ও সততায় প্রীত হয়ে অডিটর জেনারেল গোল্ডি সাহেব ও তাঁর ডেপুটি চাপান সাহেব ক্রমে ক্রমে তাঁর বেতন বাড়িয়ে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মাসিক ৪০০ টাকা করে দিয়েছিলেন এবং পরে তিনি অ্যাসিষ্টেন্ট মিলিটারী অডিটরের পদ পেয়েছিলেন। এই টাকার অধিকাংশই দেশসেবায় ব্যয় হয়েছিল।

কেরাণী জীবনের নির্মমতা তাঁর পাঠানুরাগ ও শিক্ষালাভ বিষয়ে অদম্য উৎসাহ ম্লান করতে পারেনি। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে নানাবিষয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। ইতিহাস ও রাজনীতি এবং আইন সম্বন্ধে নানারকম বই পড়তেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় লিখে গিয়েছেন যে হরিশচন্দ্র পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে পুরাতন এডিনবরা রিভিউএর বাঁধান পঁচাত্তর খণ্ড অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনবার পড়েন ও তা থেকে নানাবিষয় শিক্ষালাভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত (পরে যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন) ও ভবানীপুরের অন্যান্য উকিলের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হয় এবং তাঁদের সাহচর্যে আইনে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মায়। ১৮৫২ সালে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হন এবং সেই সভায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার মনট্রিও—সাহেবের সঙ্গে আইনের কূটনৈতিক তর্কবিতর্ক চালাবার যোগ্যতা দেখান। দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মায়। এই সময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভবানীপুরের ব্রাহ্ম মন্দিরে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়ত। তাঁর এইসব বক্তৃতা ৺ব্রজলাল চক্রবর্তী মহাশয় পুস্তকাকারে ছাপিয়ে ছিলেন। হরিশচন্দ্রের জ্ঞানপিপাসা এত বেশি ছিল যে তিনি ভবানীপুর থেকে চারমাইল হেঁটে উত্তর কলিকাতায় হেদুয়া বাগানে পাদ্রী ডফসাহেবের বক্তৃতা শুনতে আসতেন।

অতি অল্পবয়সে হরিশচন্দ্র উত্তরপাড়ার গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। ষোলবছর বয়সে হরিশচন্দ্র একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন কিন্তু দুঃখের কথা দু'তিন বছরের মধ্যেই ছেলেটি মারা যায়। তার কিছুদিন পরে হরিশচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ ঘটে। তিনি অবশ্য দ্বিতীয় বার বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয়নি। হরিশচন্দ্রের মাতা অত্যন্ত কলহপ্রবণ রমণী ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর সংসারে সুখ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি মা'কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। হরিশচন্দ্রের মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্তি থাকায় তাঁর সাংসারিক জীবন সুখের হয়নি।

কেরাণীগিরি করতে হলেও হরিশচন্দ্র নিজ অধ্যবসায়ের বলে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক হয়েছিলেন। সংবাদপত্র মারফত তিনি যেভাবে দেশসেবা করে গিয়েছেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভারত সরকারকে যেভাবে বিব্রত ক'রে তুলেছিলেন তার তুলনা হয় না। দেশবাসীর অভাব অভিযোগ ও উৎপীড়নের কাহিনী কর্তৃপক্ষের গোচর করবার জন্য ও শাসনপ্রণালী সমালোচনা করবার জন্য তাঁর হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল হিন্দু পেট্রিয়ট নামে সেই সময়ের একটি সংবাদপত্র। অবশ্য হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রখানি হাতে পাবার আগেই তিনি ইংরাজী ভাষা ও রাজনীতিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন এবং ৺কাশীনাথ ঘোষ মহাশয়ের হিন্দু ইন্টেলিজেনসার এবং ইংলিশম্যান পত্রিকাদ্বটিতে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় লিখে গিয়েছেন যে ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনের সনদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে ভারত থেকে যে প্রতিবাদপত্র ইংলণ্ডরাজকে পাঠান হয়েছিল তা হরিশচন্দ্রের রচিত।

১৮৫৩ সালে সিমলার শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষেত্র ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় মধুসূদন রায় মহাশয়ের কলাকার ষ্ট্রীটস্থ ছাপাখানা থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজখানি প্রথম প্রকাশ করেন। হরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁদের এই সংবাদপত্রটি পরিচালনায় সাহায্য করতেন। কিছুদিন পরে উপরোক্ত ঘোষেরা এই সংবাদপত্রটির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন এবং ইংরাজী পত্রিকাটির পরিচালনার ভার হরিশ মুখোপাধ্যায়ের উপর পড়ে। তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষিত লোক খুব কমই ছিল। তাছাড়া স্থানীয় ইংরাজেরা দেশী লোকের পরিচালিত কাগজ পড়তে চাইতেন না। কাজেই হরিশচন্দ্র নিজ আয় থেকে সংবাদপত্রের লোকসান ভরপূর করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাগজটি চালিয়েছিলেন। নিজে সরকারী কেরাণী কাজেই অগ্রজ হারানচন্দ্রকে নামেমাত্র সম্পাদক রেখে কাগজ চালাতেন ও মাত্র ১২০টি কপি ছাপা হ'ত। এত সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও হরিশচন্দ্রের নির্ভীক ও সুচিন্তিত রচনার ফলে হিন্দু পেট্রিয়টের সুনাম দেশে ও বিদেশে সুধী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস নাম দিয়ে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজখানি ছাপা হতে থাকে। হরিশচন্দ্রের আয়ের অধিকাংশই এই কাগজটির পরিচালনায় ব্যয় হয়ে যেত কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাহারও কাছে সাহায্য নিতেন না। শুধু একবার পাইকপাড়ার জমিদার সিংহদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কিছু টাকা নিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে বাঙলায় যখন হিন্দু বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন চলছিল, হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে অপূর্ব যুক্তি ও বিতর্কের দ্বারা হিন্দু বিবাহ আইন সমর্থন করেছিলেন এবং গোঁড়া হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা ও হিন্দুসভ্যতার তারতম্য বিচার ক'রে হিন্দু-সভ্যতাকে তিনি যে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন দেশের যাবতীয় ইংরাজী কাগজ সেই বিষয়ে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে পারে নি। ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্র, ইংরাজ শ্রমিকের ষ্ট্রাইক প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থা, বাঙালীর ধর্মঘটের তারতম্যের বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে দেশবাসীর মনে দেশানুরাগ, জাতীয় একতা সৃষ্টি করা তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। লর্ড ডালহাউসী যখন ছলে বলে ও কৌশলে একটির পর একটি করে ভারতের স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ইংরাজের কবলভুক্ত করে ফেলছিলেন, তখন হরিশচন্দ্র মানুষের স্বাধীনতা অন্যায় ভাবে অপহরণ করবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়টে দিনের পর দিন এমন সমালোচনা চালিয়েছিলেন যে ডালহাউসী বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন এবং ইংলণ্ডরাজের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। হরিশচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য যে তখনকার দিনের ইংরাজেরা সামান্য একজন কেরাণীর রাজনীতিচর্চা বা সংবাদপত্র সেবায় অসন্তুষ্ট হতেন না। বরং হরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর ঊর্দ্ধতন

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা তাঁর অপূর্ব মেধায় চমৎকৃত হয়ে সবসময়ে হরিশচন্দ্রকে ঐসব কাজে উৎসাহ দিতেন।

হরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নির্ভিকতা ও সংবাদপত্র সেবায় দক্ষতা তাঁর বহুকাজের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। তার মধ্যে দুটি ঘটনা তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখে রেখেছে। ১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহীবিদ্রোহের ঝড় দেশে ছড়িয়ে পড়ে; সেইসময় হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের মাধ্যমে লর্ড ক্যানিংকে পরামর্শ দিতে থাকেন যে তিনি যেন সেই বিপদে দিশেহারা না হয়ে নিরীহ লোকেদের উপর অত্যাচার হতে না দেন। বিদ্রোহ কতকটা প্রশমিত হবার পর দেশের সমস্ত ইংরাজ ও ফিরিংগীর দল দেশীর লোকের উপর অত্যাচার করবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সিপাহীরা শ্বেতাঙ্গনারী ও শিশু হত্যা করেছে সেই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে তারা ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল। লুন্ঠনরাজ, ইংরাজের সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি সিপাহীদের কুকর্মের ফিরিস্তী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয়দের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবার জন্য শ্বেতাঙ্গ ও অর্দ্ধশ্বেতাঙ্গেরা সরকারকে বাধ্য করতে চেষ্টা করেছিল। হরিশচন্দ্র অপরদিকে সরকারী ফৌজ কিভাবে অত্যাচার করছিল, এলাহাবাদ থেকে বেনারস পর্যন্ত রাস্তার দুধারে নিরীহ গ্রামবাসীকে তাদের ভিটামাটিসহ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেছিল ও প্রতিমাইলে হাজার থেকে দু'হাজার ব্যক্তিকে ফাঁসিকাটে লটকেছিল সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন ও লর্ডক্যানিংকে বারবার অনুরোধ করেন যে তিনি যেন মনুষ্যত্ব না হারান ও মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। লর্ড ক্যানিং হরিশচন্দ্রকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন এবং প্রতিদিনই সকালে লাটের বাড়ী থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এসে হরিশচন্দ্রের ছাপাখানা থেকে এককপি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ নিয়ে যেত। ফলে ইংলণ্ডরাজের কাছে দুপক্ষেরই বক্তব্য পৌঁছেছিল। সমস্ত অবস্থা বুঝে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৮৬০ সালে বাঙালী কৃষকদের সঙ্গে নীলকুঠির শ্বেতাঙ্গ মালিকদের নীলচাষ সম্পর্কে বিবাদের সময়ে হরিশচন্দ্র দরিদ্র কৃষকদের বাঁচাবার জন্য যে বিরাট প্রচেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। নদীয়া, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা ও চব্বিশ-পরগণা জেলাগুলিতে শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা কৃষকদের দাদন দিয়ে এমন ভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য করেন যে সে সব স্থানের জমিদার ও কৃষকেরা একেবারে নিঃস্ব ও বিপন্ন হয়ে পড়েন। সমস্ত মাঠেই নীলচাষ—ধানচাষের অভাবে জেলাগুলিতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কৃষকেরা নীলকুঠির সাহেবদের অন্যায় হুকুম অমান্য করলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলত। কিন্তু উপরোক্ত জেলাগুলির কুড়িলক্ষ কৃষক দাদন নিয়ে আর নীলচাষ করবে না স্থির করে। ফলে কুঠির মালিকদের অত্যাচারের বন্যায় দেশ প্লাবিত হয়ে গেল। এমন সময়ে হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে আন্দোলন শুরু করলেন। বহু কৃষক তাঁর বাড়ীতে এসে দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়ে নিত এবং তাদের আহার ও কলিকাতায় বাসা খরচা হরিশচন্দ্র বহন করতেন। এইসব ব্যাপারে হরিশচন্দ্র নিজেকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে ফেললেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখার ফলে সুফল ফলল। কৃষকদের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য ইংলণ্ড সরকারের নির্দ্দেশে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হ'ল এবং কৃষকেরা দাসত্ব থেকে অনেকটা মুক্তিলাভ করল। এই আন্দোলনের সময়কার কতকগুলি লেখার জন্য কুঠির মালিক ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজ ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সামান্য ভাবে ক্ষমা চাইলে হরিশচন্দ্র রেহাই পেতেন, কিন্তু তিনি সে রাস্তায় গেলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ডিক্রী হয়ে গেল।

১৮৬১ সালের ১৬ই জুন তারিখে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে হরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত ডিগ্রী জারী করা হয় এবং তাঁর বসতবাটী ও আসবাবপত্র নীলামে বিক্রী হয়ে যায়। তাঁর বিধবা মাতা ও পত্নীকে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়।

হরিশচন্দ্র নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও যাবতীয় পার্থিব সম্পদ দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই কর্মবীর দধীচিকে বাঙালী মাত্রেরই সদাসর্বদা স্মরণে রাখা উচিত।

বন্যা

শ্রীনন্দা সিংহ

কাল রাতে জোয়ারের জল
এসেছিল ডাকতে আমায়—।
কালো কালো সরু আঙুল
বাড়িয়ে তারা খুঁজেছিল যেন কাউকে,
সে কি আমাকেই ?
আমার অবচেতনের বন্ধ দুয়ারে
বারে বারেই আঘাত করেছিল তারা।
আমি চুপ করে শুয়েছিলাম
দুই হাতে মুখ ঢেকে ;
ভয়ে আমার বুকের রক্ত
নীল হয়ে গিয়েছিল।
পাছে, সেই বন্ধ কালো দরোজার
অর্গল যায় টুটে,
পাছে সে সইতে না পারে
সেই দুরন্ত, দুর্বার বন্যার আঘাত।
সকালে উঠে দেখেছিলাম
স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, প্রশান্ত প্রভাত।
কিন্তু আমি জানি
যেই নেমে আসবে
রাত্রির আঁধার,
অমনি সেই ছায়া-অঙ্গুলীর
ঘিরে ধরবে আমার
চার পাশ হতে।
সন্ধানী ইশারায়
সংকেত-মুখর ছায়া ফেলে ফেলে
তারা প্রলুব্ধ করবে আমায়।
আর বলবে,
সেই নিভৃততম দুয়ারটি
অর্গলমুক্ত করতে
তাদের অস্তিত্বে জানাতে স্বীকৃতি।

অভিশপ্ত গ্রাম

ফ্রিডরিশ গেরষ্টেকার

২
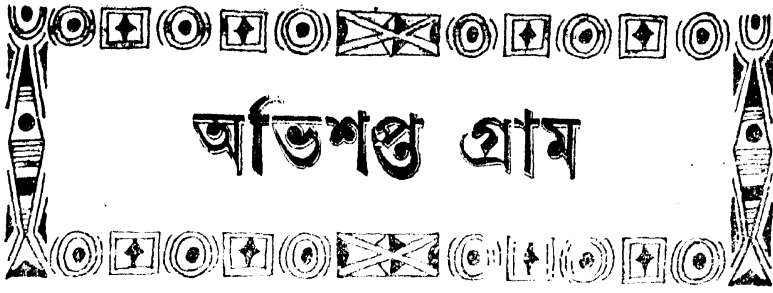
আর্ণলড কিছু বলার আগেই দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মোড়ল অভিবাদন জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটা জানালা থেকে এক বৃদ্ধা কৌতূহলী চোখে তাদের দিকে চাইলেন। কৃষক হৃষ্টস্বরে বলে উঠল—"তুমি কিন্তু—গেরট্রুড আজ অনেকক্ষণ বাইরে থেকে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলে—ওগো তোমরা চেয়ে দেখ গেরট্রুড কিরূপ সুন্দর স্মার্ট তরুণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে!"

"মহাশয়—!"

"আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভদ্রত' করবার সময় নেই—শীগ্‌গির ভিতরে এস—খাবার প্রস্তুত। বিলম্বে সব ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে যাবে।"

জানলা থেকে বৃদ্ধা বলে উঠল—"এ কিন্তু আমাদের হাইনরিশ নয়। আমি আগেই তোমাদের কতবার বলেছি—সে আর ফিরবে না!"

মোড়ল বলল—"বেশ ত মা, বেশত। তা, হাইনরিশের বদলে একেও ত মন্দ মানাবে না।" তারপর আগন্তুকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে চলল—"হে যুবক, মেয়ে যেখানেই তোমায় কুড়িয়ে পাক, তুমি আমাদের গেরমেলস হাউজেনের আন্তরিক অভিনন্দন লও। এস, খেতে বসা যাক। খেতে বসে লজ্জা করো না যেন। নিজের বাড়ি ভেবে পেটপুরে স্বচ্ছন্দে খাবে। অন্য কথা পরে হবে।"

সে তরুণ আর্টিষ্টকে আর কোনো আপত্তি দেখানর অবসর দিল না। সিঁড়িতে উঠার সময় গেরট্রুড আর্ণলডের হাত ছেড়ে দিয়েছিল এখন মোড়ল তার হাত ধরে টানতে টানতে তাদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যেও কেমন একটা ভ্যাপসা মেটে মেটে গন্ধ। আর্ণলড ভাল করেই জানত যে জার্মাণ কৃষকেরা এমন কি দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও আগুন জেলে ঘর আরো গরম করে রাখতে অভ্যস্ত, তবু এখানে যেন তার চেয়েও অন্যরূপ মনে হল। ঘরের সংকীর্ণ প্রবেশ পথেরও কোন ছিরি ছাঁদ নেই। দেয়াল থেকে চুন খ'সে পড়ছে—সেগুলি তাড়াতাড়ি ঝাঁট দিয়ে একপাশে জড় করে রাখা হয়েছে। পেছনের দিকে ছোট্ট একটি জানালা—তাদিয়ে ঘরের ভিতর আলো সামান্যই আসে। যে সিঁড়িটা উপরতলায় গিয়েছে সেটাও পুরনো জরাজীর্ণ।

আর্ণলড এ সব দেখার বেশী সময় পায়নি, কারণ পরমুহূর্তেই পাশের দরজা খুলে মোড়ল তাকে শোবার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। বেশী উঁচু না হলেও ঘরটি বেশ চওড়া—মেঝেতে সাদা বালি বিছানো, মাঝখানে টেবিলে স'' ধবধবে চাদর পাতা—ঘরের হাওয়াও অনেকটা প্রীতিকর। অপর ঘরের তুলনায় এ ঘরটি মনোরম বলেই বোধ হ'ল। যে বৃদ্ধাকে প্রথমে দেখা গিয়েছিল সে চেয়ার টেনে টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। কোণে দুটি নাদুসনুদুস চেহারার শিশু তাদের মায়ের পাশে বসে ছিল। কৃষকগৃহিণী বেশ স্বাস্থ্যবতী। অবশ্য এদের বেশবাস পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গাঁয়ের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন ধরণের এবং অদ্ভুত দেখতে। পাশের একটি দরজা খুলে ঝি মস্ত থালায় করে খাবার এনে টেবিলের উপর রাখল। খাবার থেকে তখনও বেশ ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কেউ খেতে আরম্ভ করছে না। ছোট ছেলে দুটিও যেন আড়ষ্টভাবে তাদের বাপের দিকে জুলজুল করে চেয়ে রইল। মোড়ল তার চেয়ারের উপর ভর রেখে নীরব নিস্পন্দভাবে মাটির দিকে চেয়ে আছে—সে কি তা'হলে প্রার্থনা করছে? পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আর্ণলড লক্ষ্য করল মোড়ল তার ঠোঁট দুটি জোরে-চেপে ধরে আছে আর তার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে। এ-তো প্রার্থনার ভাব নয়—এ যে 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গী।

গেরট্রুড আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে পিতার কাঁধের উপর হাত রাখল। বৃদ্ধাও মোড়লের ঠিক সামনে বসে ছেলের দিকে মিনতি-মাখানো চোখে চাইল। সহসা উত্তেজিত স্বরে চীৎকার ক'রে মোড়ল বলল—"তা হ'লে বসাই যা'ক খেতে—বৃথা ভয় করে লাভ নেই!" এর পর আগন্তুকের দিকে চেয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে চেয়ার টেনে টেবিলের একেবারে ধারে গিয়ে বসে বড় হাতা করে সকলের পাতে খাবার পরিবেশন করল।

মোড়লের ব্যবহার আর্ণলডের কাছে যারপরনাই খাপছাড়া বোধ হল—অপর সকলেরও মনমরা ভাব দেখে সে বড় অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। মোড়ল কিন্তু দুপুরের খাবার সময় চুপচাপ থাকতে ভালবাসে না—শীঘ্রই তা বুঝা গেল। টেবিলে একটি আঘাত করতেই ঝি মদের বোতল ও গেলাস নিয়ে হাজির হ'ল। দামী পুরনো মদ সবাইকে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সাড়া জেগে উঠল।

আর্ণলডের শিরার ভেতর দিয়ে তরল অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হল—এ রকম মদ সে জীবনে কখনও খায়নি। গেরট্রুডও কারো চাইতে কম গেল না। মোড়লের বুড়ী মা পান করার পর তার চরকাটি নিয়ে কোণে বসে নীচু গলায় গুন্ গুন্ করে গেরমেলস হাউজেনের অতীত আনন্দের দিনের ছোট্ট একটা গীত গাইতে শুরু করল। মোড়লেরই সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন দেখা গেল। এখন দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ভীষণ গম্ভীর ও বিষণ্ণ ছিল।

আর্ণলডের অলক্ষ্যে কখন্ যে সে বেহালা নিয়ে নাচের বাজনা শুরু করেছে তা সে বুঝতে পারেনি। আর্ণলডও উঠে গেরট্রুডকে বাহুপাশে বদ্ধ করে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ঘুরে ঘুরে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিল। নাচের চোটে বুড়ীর চরকা গেল উল্টিয়ে—চেয়ারগুলো পড়লো ছিটকিয়ে। বাসন সরাবার জন্ম ঝি আসছিল—তার গায়ে লাগল ধাক্কা। নাচ এত জমে গেল গেল যে, তা দেখে অপর সকলে হেসে ফেটে পড়তে লাগল।

সহসা ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আর্ণলড বিস্মিতভাবে মোড়লের দিকে চাইতেই বেহালার ছড় দিয়ে মোড়ল জানালার দিক দেখিয়ে দিল। পরক্ষণেই সে বেহালাটি বড় একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে দিল। আর্ণলড দেখল বাইরে রাস্তা দিয়ে শবাধারে শব নিয়ে কয়েকজন লোক গোরস্থানের দিকে যাচ্ছে।

শাদা শার্টপরিহিত ছয়জন লোক কাঁধে করে শবাধারটি নিয়ে চলেছে—পিছনে চলেছে একমাত্র বৃদ্ধ—মাথাভরা সুন্দর ঝাঁকড়া চুল একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধ'রে। বৃদ্ধকে দেখে মনে হ'ল সে দারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মেয়েটির বয়স বছর চারেক হবে—কাকে শবাধারে কি আছে সে ধারণাও বোধ করি তার নেই। কারণ পরিচিত মুখ দেখলেই সে নমস্কারসূচক মাথা নাড়ছে এবং পাশ দিয়ে একসঙ্গে দুই তিনটি কুকুর যেতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠছে। একটি কুকুর দৌড়িয়ে মোড়লের বাড়ীতে উঠবার সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

যতক্ষণ শবযাত্রাটি দেখা গেল ঘরের সবাই নির্বাক হয়ে রইল। পরে গেরট্রুড আর্ণলডের কাছে এসে বলল—"এখন একটু জিরিয়ে নাও—অনেক ত লাফঝাঁপ করেছ এখন একটু বিশ্রাম না করলে এ কড়া মদ শেষকালে মাথায় গিয়ে উঠবে। হ্যাটটি মাথায় দিয়ে নাও—আমার সঙ্গে একটু বাইরের হাওয়ায় ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবে'খন। ফিরতে ফিরতেই সরাইখানায় যাবার সময় এসে পড়বে—জান ত আজ বিকেলে সেখানে নাচের আসর আছে।"

"নাচ? সে ত খুব ভাল খবর! আমি তাহ'লে খুব ভাল দিনেই তোমাদের গাঁয়ে এসেছি, বল?—আচ্ছা গেরট্রুড, প্রথম নাচ তুমি আমার সঙ্গে নাচবে ত?"—আনন্দে অধীর হয়ে আর্ণলড জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়ই!—অবশ্য তোমার মর্জি।"

ইতিমধ্যে আর্ণলড হ্যাট এবং তার খাতা-পেনসিল নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

মোড়ল জিজ্ঞাসা করল—"এ বই নিয়ে কি করবে?"

"বাবা, উনি আঁকতে জানেন—আমার ছবিও এঁকেছেন—দেখ না একবার ছবিটি!"—গেরট্রুড কৌতূহলভরে বলল।

আর্ণলড খাতা খুলে ছবিটি মোড়লের সামনে ধরল। মোড়ল নির্বাক ভাবে একমনে চেয়ে দেখল। অবশেষে বলল—"তুমি বোধ করি এ ছবি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও? বাড়ি নিয়ে এটা বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখবে নিশ্চয়ই?"

আর্ণলড—"কেন? দোষ আছে কিছু?"

গেরটড—"বাবা, ইনি এটা নিতে পারেন?"

মোড়ল—"হাঁ, যখন উনি চলে যাবেন তখন নিতে পারেন বৈকি? তবে ছবিটা ত সম্পূর্ণ হয়নি—কিছু বাকী আছে এখনও।"

আর্ণলড—"অসম্পূর্ণ কেন, বলুন?"

মোড়ল—"যে শবযাত্রাটি এইমাত্র গেল—আমার মেয়ের ছবির পাশে এটা জুড়ে দিলে তবে এটা তুমি নিয়ে যেতে পারবে—তার আগে নয়।"

আর্ণলড আঁতকে উঠে বলল—"গেরট্রুডের পাশে মড়ার ছবি?"

দৃঢ়কণ্ঠে মোড়ল বলল—"হাঁ, তাই। ছবির পাশে যে জায়গা আছে, তাতেই শবের ছবি ধরে যাবে। এটি না আঁকলে আমার গেট্রির ছবি বাইরের জগতে যাবে এটা আমার আদৌ অভিপ্রেত নয়। শবযাত্রার ছবি পাশে থাকলে গেরট্রুডের ছবি দেখে কারও মনে কুচিন্তা আসতে পারবে না।"

নিরুপায় আর্ণলড মোড়লের মনরক্ষার জন্ম অগত্যা তার কথায় সায় দিল। অবশ্য মনে মনে ভাবল বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাশের শবযাত্রার ছবিটি বাদ দিয়ে নিলেই চলবে। অভ্যস্ত হাতে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে শবযাত্রার নিখুঁত ছবি গেরট্রুডের ছবির পাশে আঁকতে লাগল। আঁকবার সময় বাড়ির সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত ভাবে তার হাতের তারিফ করতে থাকল। আঁকা শেষ হলে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে মোড়লের সামনে ধরতেই—"চমৎকার।" বলে মোড়ল ঘাড় নাড়ল। "তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার কথামত আঁকতে পারবে, ভাবিনি। যাক, এখন তুমি এ ছবি অনায়াসে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।—বেশ এখন গেরট্রুডের সঙ্গে আমাদের গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে এস—কারণ এর পরে আর সুযোগ মিলবে না। তবে মনে রেখো, পাঁচটার মধ্যেই ফিরতে হবে। আজ আমাদের গাঁয়ে খুব বড় আনন্দমেলা আছে।"

ভ্যাপসা গরম ঘরে মদের নেশার ঝোঁকে আর্ণলডের অস্বস্তির সীমা ছিল না। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়বার জন্ম তার প্রাণ ছটফট করছিল। যা হোক কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সুন্দরী তরুণীর পাশাপাশি গাঁয়ের ভেতরের রাস্তায় চলা সুরু করল। পথ এখন আর আগের মত নিস্তব্ধ নয়—ছেলেরা রাস্তায় হৈ হুল্লোড় করছে—বুড়োবুড়িরা এখানে সেখানে বাড়ির দরজার সামনে বসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে খেলা দেখছে। ফলতঃ অদ্ভুত ধরণের পুরনো বাড়িঘর হলেও এখন মনোরমই বোধ হ'ত যদি মেঘের মত কালো ঘন ধোঁয়াতে রোদ আটকিয়ে না রাখত।

আর্ণলড সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করল—"নিকটেই কোনও বড় জলা-জায়গা আছে বুঝি? না, লোকে নিকটে কোনও বনে আগুন দিয়েছে? এরকম ধোঁয়া ত আশপাশের কোনো গাঁয়েই দেখিনি। লোকেদের বাড়ির চিমনির ধোঁয়াও ত এমনটা হবার কথা নয়।"

গেরটড গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—"এটা পৃথিবীর নীচের ধোঁয়া—আচ্ছা, তুমি কি কখনও গেরমেলস হাউজেনের কথা শোনো নি?"

"না, কখনও শুনিনি।"

"এটা খুবই অদ্ভুত কথা, কারণ আমাদের এ গ্রাম ত খুব প্রাচীন?"

"হঁ, বাড়ি ঘরগুলো দেখে তাই ত মনে হয়। লোকেদের ব্যবহার যেন কেমন আশ্চর্য ধরণের—তোমাদের ভাষারও কিন্তু আশপাশের গাঁয়ের ভাষার সঙ্গে বিস্তর তফাৎ। তোমরা কি গাঁ ছেড়ে কখনও বাইরে বেরোও না?"

"খুবই কম।"

"একটা পাখীও ত চোখে পড়ছে না ?—সব এ গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে নাকি ?"

একটু উদাস সুরে গেরট্রুড বলল—"হাঁ, অনেকদিন থেকেই পাখীরা এ গাঁ ছেড়েছে। কোনো পাখীই আর এখন এ গাঁয়ে বাসা বাঁধে না। বোধ করি, তারা এ ধোঁয়া সইতে পারে না।"

"কিন্তু এমনটি কি বরাবরই ছিল ?"

"হাঁ, বরাবরই।"

"তা হ'লে এই কারণেই বুঝি তোমাদের কোনও গাছেও ফল দেখছি না। এবার কিন্তু মারিঙ্গফেল্টে এত ফল ফলেছে যে, সে গাঁয়ের ফলের গাছের ডাল যেন ভেঙে পড়ছে—এ রকম বছর নাকি অনেকদিন তারা দেখেনি।"

গেরট্রুড আর কোনও জবাব না দিয়ে তার পাশে পাশে নীরবে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষকালে গাঁয়ের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হ'ল। পথে দু'একটি শিশুর সঙ্গে সে আদর করে কথা বলল। মাঝে মাঝে সে সহানুভূতিপূর্ণ চোখে আর্নলডের দিকে তাকাচ্ছিল।

এতে যুবকের হৃদয় যুগপৎ হর্ষবিষাদে দোলায়মান হলেও সে সব কথা গেরট্রুডকে জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাচ্ছিল না। গাঁয়ের শেষ বাড়িটির কাছে তারা ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। গাঁয়ের মধ্যে যেমন সরগরম মনে হচ্ছিল এখানে ঠিক তার উল্টোটি লক্ষিত হল। বাগানগুলো দেখে মনে হ'ল—অনেক বৎসর যেন কেউ তার মধ্যে মাড়ায়নি। পথে বড় বড় ঘাস গজিয়েছে—তার পর আর্নলডের কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকল—যে কোনও গাছেই একটিমাত্র ফলও সে দেখতে পেল না। এমন সময় তারা কয়েকটি লোককে গ্রামে ফিরতে দেখল। আর্নলডের চিনতে দেরী হ'ল না যে এরাই সেই শবযাত্রী। লোকগুলি নিঃশব্দে তাদের পাশ দিয়ে গাঁয়ের পানে গেল—এরা দুজনও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গোরস্থানের দিকে পা বাড়ালো।

আর্নলড সঙ্গিনীর গম্ভীর বিষণ্ণ ভাব দূর করবার জন্য সে অপর যে সব জায়গায় ইদানীং গিয়েছিল সে সব জায়গার কথা পাড়ল। বিরাট পৃথিবীর অন্যান্য অংশের খবরাখবর সে বলে চলল। গেরট্রুড তার জীবনে কখনো রেলগাড়ী দেখেনি—রেলগাড়ী কি বস্তু তা কখনও শোনেওনি। আর্নলড এ সব বিষয়ের বর্ণনা দিতে লাগল আর গেরট্রুড অবাক বিস্ময়ে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল। টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই—অন্যান্য নতুন আবিষ্কারের কথাও তার একেবারেই অজানা। আর্নলড আদৌ বিশ্বাস করতে পারল না যে জার্মাণীতে এখনও এমন অজ পাড়া গাঁ থাকতে পারে বাইরের জগতের সম্বন্ধে যারা কিছুই জানে না এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র সংস্রবও নেই।

কথায় কথায় তারা গোরস্থানের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। এখানকার পাথর ও স্মৃতিস্তম্ভগুলি এত সাদাসিধে ও প্রাচীন যে তা দেখে আর্নলডের বিস্ময়ের অবধি রইল না। কাছেই একটি কবর দেখে আর্নলড উদগ্র কৌতূহলভরে ঝুঁকে পড়ে অতিকষ্টে পাথরটির পাঠ উদ্ধার করল—"আনা মারিয়া বাটহোল্ট—জন্ম ষ্টিকলিটসে ১লা ডিসেম্বর ১১৮৮ মৃত্যু ২রা ডিসেম্বর ১২২৪···

গম্ভীর ভাবে গেরট্রুড বলে উঠল "এই ত আমার মা !"—বলতে

বলতে তার চোখে জলে ভরে গেল এবং গণ্ডদেশ বেয়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার বডিসে গড়িয়ে পড়ল।

আর্ণলড যার পর নাই হতভম্ব হয়ে বলল—"কি বলছ তুমি?···অনেক, অনেক পুরুষ আগের তোমাদের বংশের কোনও মহিলা হবেন।"

গেরট্রুড বাধা দিয়ে বলল—"না, এই ত আমার আপন মা। এঁর পরেই ত বাবা আবার বিয়ে করেছেন। আমাদের বাড়িতে যাঁকে দেখলে উনি ত আমার সৎমা।"

"কিন্তু মৃত্যুর তারিখ ১১২৪ না?"

গেরট্রুড ব্যথিত ভাবে বলে উঠল—"তাতে কি এসে যায়?—একটু থেমে ধীরে ধীরে ধরা-গলায় সে বলল—"মা হারা হওয়া যে কত দুঃখের—যাক তবু একটা সান্ত্বনার কথা এই যে খুব ভাল—খুব ভাল সময়েই তাঁর দেহান্তর ঘটছিল!"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে আর্ণলড ভাল করে লেখাটি দেখবার চেষ্টা করল—প্রথম ২ হয়ত বা ৮ হ'তে পারে: পুরনো লেখায় এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয় কিন্তু দ্বিতীয় ২ ও ৩ প্রথমটির চাইতে একচুলও তফাৎ নয়—কিন্তু তা হলেও ১৮৮৪ আসতে ত এখনও অনেক দেরী। খোদাইকার হয়ত ভুল করে থাকবে। তরুণী মৃতার স্মৃতিতে এতদূর শোকবিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল যে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করতেও তার সাহস হ'ল না। গেরট্রুড তার মায়ের সমাধি-পাশে বসে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করতে লাগল। এই অবসরে আর্ণলড আশপাশের আরও কয়েকটি সমাধিপ্রস্তর মনোযোগের সঙ্গে দেখল কিন্তু নতুন একটিও দেখতে পেল না—বরং কোনওটিতে খৃষ্টাব্দ ৯৩০, ৯০০ পর্য্যন্তও চোখে পড়ল। আর সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার এই যে, এইমাত্র যাকে কবর দিয়ে যেতে দেখল, তার গায়ের লেখাও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের!

গোরস্থানের দেওয়াল বেশী উঁচু না হওয়াতে সেখান থেকে গেরট্রুডদের গাঁ অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর্ণলড তাই এখান থেকে গাঁয়ের একটি ছবি এঁকে নিতে লাগল। এই জায়গার উপরেও সেই কুণ্ডলীপাকানো অদ্ভুত ধোঁয়ার জাল ছিল অথচ এখান থেকে দূরে পাহাড়ের ধারের বনে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রোদ পড়েছে দেখা গেল।

গাঁয়ের সেই ভাঙা ঘণ্টার শব্দ আবার কানে আসতেই গেরট্রুড উঠে পড়ল চোখের জল মুছে আর্টিষ্টকে বাড়ি ফিরবার সঙ্কেত করল। আর্ণলড তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে দাঁড়াল। স্মিতমুখে গেরট্রুড বলল—"আর শোক-প্রকাশের সময় নেই। গির্জার ঘণ্টা বাজছে—নাচের জন্য এখন প্রস্তুত হতে হবে। তুমি আমাদের গাঁয়ে আসা অবধি ভেবেছ গেরমেলস হাউজেনের লোকেরা কি অদ্ভুত গম্ভীর নিরানন্দ জীব, আজ সন্ধ্যায় কিন্তু তোমার সেই ভুল ভেঙে যাবে।"

আর্ণলড বলল—"এখান থেকে গির্জার দরজা বেশ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোনও লোক ত গির্জা থেকে বের হচ্ছে মনে হয় না?"

সহাস্যে তরুণী বলল—"খুব স্বাভাবিক, কারণ পাদরি পর্য্যন্ত কেউ যদি গির্জার ভিতর কদাচ না ঢোকে তবে বের হবে কে? গির্জার ঘণ্টাবাদকই শুধু নিয়মিত ভাবে উপাসনার সময় নির্দেশক-ঘণ্টা বাজাতে আদৌ কসুর করে না।"

"তা হলে, তোমরা কেউ-ই গির্জায় যাও না, বুঝি?"

"না ম্যাস বা কনফেশন কোনও সময়েই না"—গেরট্রুড ধীরভাবে জবাব দিল—"কারণ পোপের সঙ্গে আমাদের বিবাদ চলছে কিনা—তাই যতদিন আমরা তার বশ্যতা স্বীকার না করি, ততদিন সে আমাদের গির্জায় ঢুকতে দেবে না।"

আর্ণলড—"কিন্তু এরূপ ব্যাপার আছে বলে ত আমি কখনো শুনিনি!"

একটু উদাস সুরে তরুণী বলল—"হ্যাঁ, সে অনেক দিনের কথা।···ঐ দেখ, সাকরিষ্টান (ঘণ্টাবাদক) একাই বেরিয়ে গির্জার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে—সে কিন্তু সরাইখানাতেও বিকেলে যাবে না—একা বসে তার কর্তব্য করবে।"

"পাদরি আসবেন ত?"

"হাঁ, তিনি আসবেন বই কি?—তাঁরই ত দেখি সবচেয়ে বেশী আনন্দ। তিনি এসব নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না।"

ব্যাপার শুনে যতটা না হোক মেয়েটির সরলতায় ততোধিক মুগ্ধ হয়ে আর্ণলড জিজ্ঞাসা করল—"বল দেখি, এরূপ ব্যাপার ঘটল কেন?"

গেরট্রুড বলল—"সে অনেক কথা। একখানা বড় মোটা বইতে পাদরি সে সব লিখে রেখেছে। যদি তোমার আগ্রহ থাকে আর লাটিন ভাষা বুঝতে পার তবে নিজেই প'ড়ে সব জানতে পারবে। তবে সাবধান, এ-সব কথা যেন আমার বাবার সামনে মুখে এনো না—তিনি এ কথা বরদাস্ত করতে পারেন না। ঐ দেখ, সব বাড়ি থেকেই পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়ে পড়ছে।—আর দেরী নয়, পা চালিয়ে চল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাজগোজ ক'রে বেরুতে হবে—আমি পিছনে পড়ে না যাই!"

"আমার সঙ্গে ত প্রথম নাচ, মনে রেখো কিন্তু!"

"আমি কথা দিচ্ছি—তোমার সঙ্গেই আগে নাচব।"

দুজন তাড়াতাড়ি গাঁয়ের ভিতর গিয়ে পড়ল। গাঁয়ের চেহারা এখন যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সর্বত্রই ছোট ছোট দলে তরুণ-তরুণীরা হাসিমুখে ঘুরছে। তরুণীরা উৎসবের সাজে সজ্জিতা—তরুণরাও বেরিয়েছে ভাল ভাল পোষাক প'রে। তারপর সরাইখানার পাশ দিয়ে যেতেই তারা দেখতে পেল জানালায় জানালায় পত্রপুষ্পের স্তবক ও মালা শোভা পাচ্ছে। সদর দরজার উপরেও সুন্দর লতাপাতা দিয়ে তোরণ সাজান হয়েছে।

সবাইকে সুসজ্জিত দেখে আর্ণলডও ভাবল আজকের দিনে তার এই আটপৌরে পোষাকে ত মানাবে না। তাই গেরট্রুডদের বাড়ি পৌঁছেই তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে ভাল কোট প্যাণ্ট পরে টয়লেট মেখে

পাথরের আলপনা

—শ্রীমতী বিদ্যুৎ দাস

আলোকচিত্র

পুতুল —বৈদ্যনাথ ভদ্র

দু'জনায় —শ্রীমন্ত নিয়োগী

নর্মদা জলপ্রপাত (জব্বলপুর) —এস, এম, হালদার

ঘুম মনাষ্টারি —বিশ্বদেব বিশ্বাস
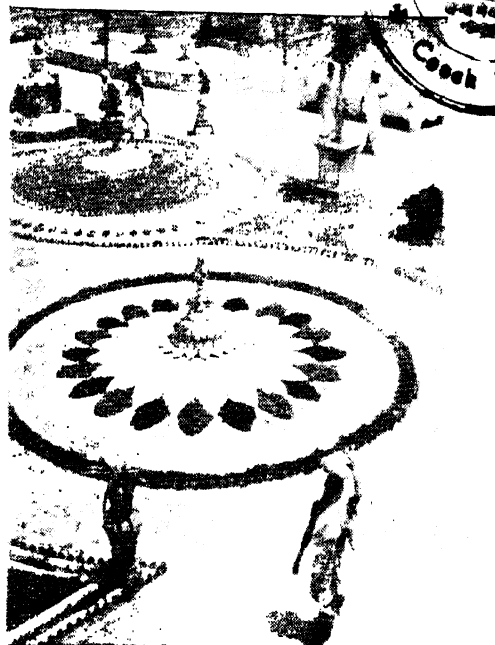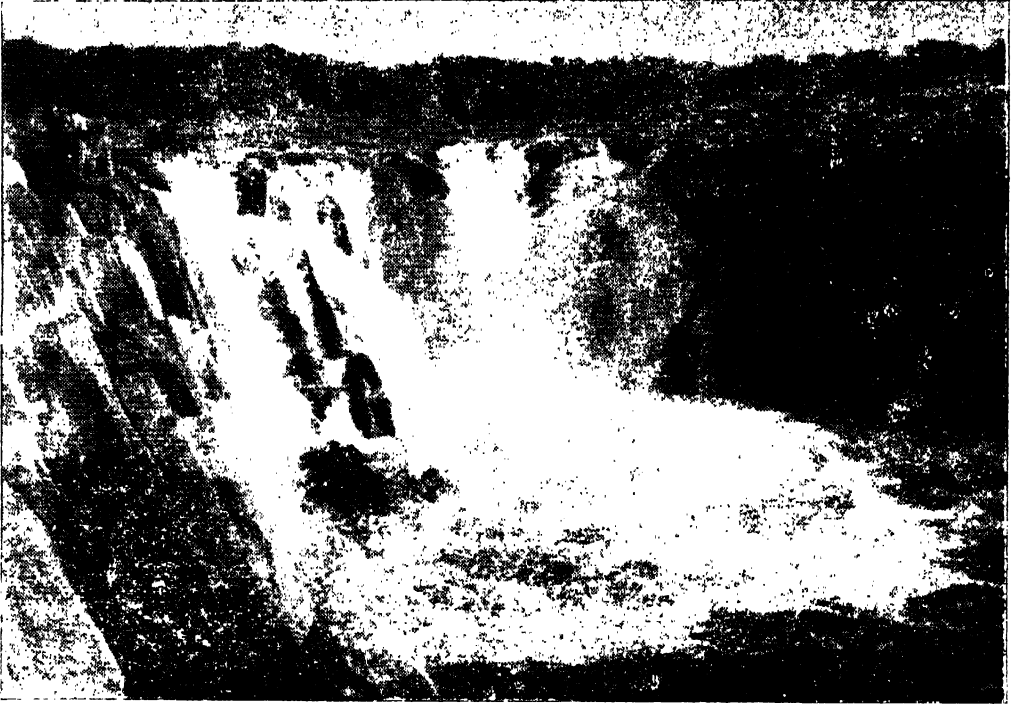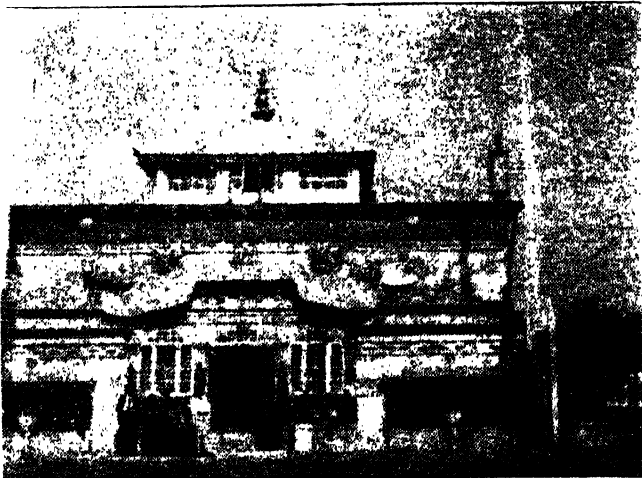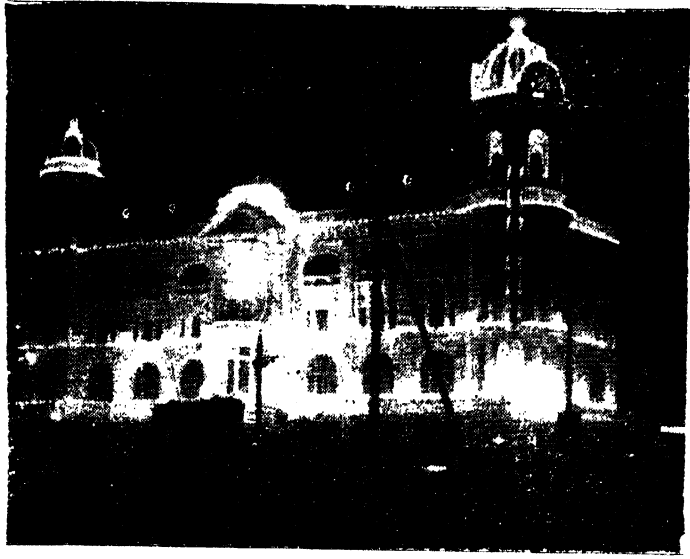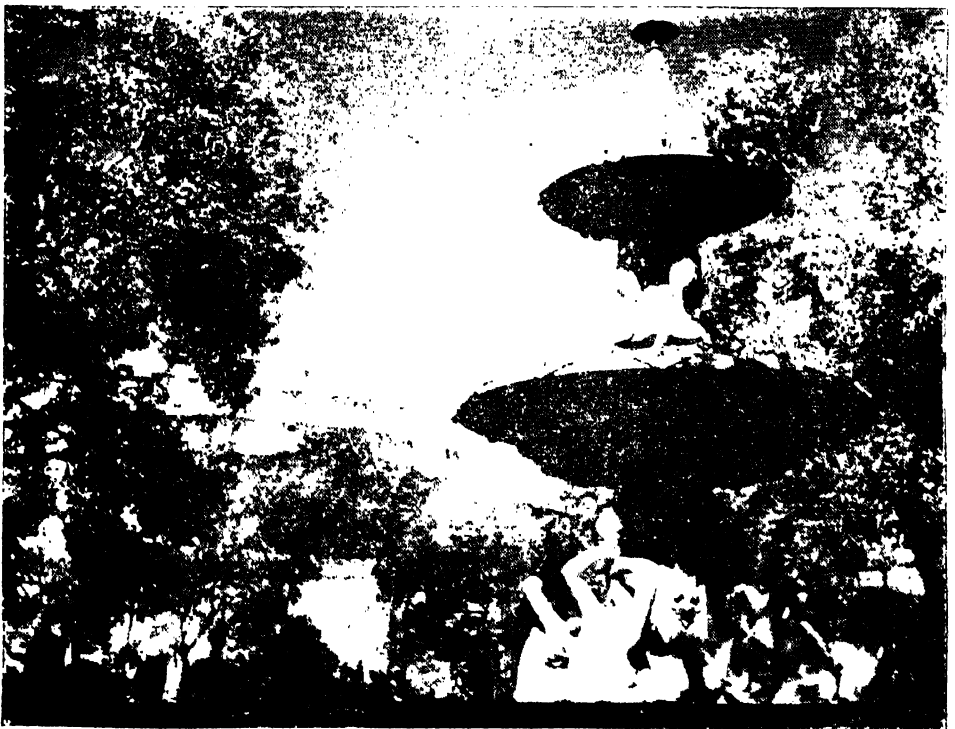
কনে

—শ্রীকুমার নিয়োগী

হাতী সিং পালোয়ান

—সুধীরকুমার নিয়োগী

শিশু-শ্রোতা

—রবীন্দ্রনাথ ঝা

সবেমাত্র প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় গেরট্রুড এসে দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলতেই অপরূপ মোহন সাজে সজ্জিতা তরুণীর মনোমোহিনীমূর্ত্তি তার চোখে পড়ল। অনাড়ম্বর অথচ দামী পোষাকে তার সৌন্দর্য্য যেন উপচিয়ে পড়ছে। হৃদ্যতার সঙ্গে সে তাকে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে পড়তে বলল—"চল, আমরা আগে যাই—বাবা-মার এখনও একটু দেরী আছে।"

আর্ণল্ড মনে মনে বলল—"তার হাইনরিশের চিন্তা তাকে ততটা বিচলিত করে নি দেখছি।" কারণ তরুণী তার বাহু যুবকের বাহুর মধ্যে গলিয়ে উৎফুল্লচিত্তে নাচ ঘরের পানে অগ্রসর হল। একটি সুন্দরী তরুণীর বাহুবেষ্টনের ফলে তার সারা শরীরে যে অভূতপূর্ব পুলক লহরী খেলে তাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলল তার কোনও আভাসই কিন্তু সে বুঝতে দিল না।

ক্ষীণস্বরে স্বগতভাবে সে বলে উঠল—"কালই ত চ'লে যেতে হবে।" কিন্তু কথাটি তার সঙ্গিনীর কান এড়ায় নি। সে সহাস্যে বলে উঠল—"তার জন্যে কি? আমরা একসঙ্গে এতদিন থাকব যে শেষ কালে তোমার অসহ্যই বোধ হবে।"

আর্ণল্ড জিজ্ঞাসা করল—"বল দেখি গেরট্রুড, আমি থাকলে তোমার ভাল লাগবে?" বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা উষ্ণ রক্তস্রোত তার সারাদেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল!

সরলভাবে তরুণী জবাব দিল—"নিশ্চয়ই! তুমি খুউ··· ব ভাল। আমি জানি, বাবাও তোমায় খুব পছন্দ করেছেন। আর হাইনরিশের কথা বলছ? সে ত আর আসবে না।"

"আজ না আসুক, কাল ত আসতে পারে?"

গেরট্রুড বলল—"কাল?" এই বলে সে তার বিস্ফারিত বড় বড় কালো চোখের গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল—সে দৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে আছে—দীর্ঘ—সুদীর্ঘ রজনী!

অতি সংক্ষেপে এবং মধুর কণ্ঠে সে বলল—"কাল কথাটির মানে বুঝতে তোমার এখনও অনেক দেরী। যাক, আজ আর সে কথা পেড়ে লাভ কি? আজ বড় আনন্দের দিন। বহুকাল ধরে আমরা এই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি। কাজেই কোনও বিষাদ চিন্তায় আজকের দিনের আনন্দ মাটি করা ঠিক হবে না! এখন আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যে আমি নতুন সাথী নিয়ে নাচলে গাঁয়ের যুবকরা সেটা খারাপ মনে করবে না।"

আর্ণল্ড এই কথার কিছু জবাব দেবার আগেই ভেতর থেকে এত জোর বাজনার শব্দ আসতে লাগল যে তার কথা শোনবার উপায় রইল না! বাদ্যকরেরা এত অদ্ভুত সুন্দর বাজাচ্ছিল যে, এমন বাজনা সে আগে কখন শোনে নি। বাতিও এত উজ্জ্বল জ্বলছিল যে প্রথমটা তার চোখ ঝলসিয়ে গেল।

গেরট্রুড তাকে নিয়ে নাচঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হল। একদল চাষীতরুণী সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালগল্প করছিল। এখন সে আর্ণল্ডের হাত ছেড়ে দিল যাতে করে সে সবকিছু ভাল করে দেখে নিতে পারে এবং গাঁয়ের তরুণদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে পারে। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মূল জার্মাণ থেকে অনূদিত—ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

দাঁতের স্বাস্থ্য রাখতে হলে

শরীরের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল দাঁত, এই দাঁতকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হলে কি করা কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

চিকিৎসকগণের মতে অতিরিক্ত মিষ্ট ভোজন দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর চিনিতে নাকি এমনই এক দ্রব্যগুণ আছে, যাতে দাঁতের উপরের আচ্ছাদন যাকে বলা হয় এনামেল সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে দাঁতের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অবশ্য এই মতের বিরুদ্ধে উদাহরণ স্বরূপ মিষ্টান্নপ্রিয়গণও দৃষ্টান্ত আমদানী করতে পেছপা নন, তাঁরা বলেন দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলের অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে শর্করা বস্তুটি প্রায় অপরিচিতই কিন্তু কই স জন্য তো তাদের মধ্যে দন্তরোগের কিছু কমতি নেই!

যাই হোক দাঁতকে সুস্থ রাখতে হলে তবে কি করণীয়?

দন্তচিকিৎসকরা বলেন দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সব চেয়ে বড় অস্ত্র হল, দাঁত পরিষ্কার রাখা, তাঁরা বলেন খাওয়ার পর প্রত্যেকবার দাঁত মাজা কর্ত্তব্য, সব সময়ে যদি তা সম্ভবপর নাও হয়, তা হলে অন্তত অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে মুখ ধোয়া উচিত যাতে খাদ্য কণিকাগুলি দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকতে না পারে। ভিটামিন-কে নামক প্রাণও নাকি দাঁতকে নীরোগ রাখতে সহায়তা করে এবং এজন্যই বজ্ঞগণ উপদেশ দিয়ে থাকেন এই ভিটামিনটি যে সব খাদ্যে আছে েশের খাদ্য গ্রহণ করতে।

দাঁতকে অটুট রাখতে হলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত িয়ে রীতিমত গবেষণা চলেছে, গবেষকরা বলেন শিশুর দ্বিতীয় বর দাঁত উঠে গেলেই 'সোডিয়াম ফ্লোরাইড' দ্বারা সেই দাঁতকে পেন্ট করে দিলে দাঁত অনেক বেশী স্থায়ী ও শক্ত হয়ে যায়। এই মতের পরিপোষকে চলে দন্ত চিকিৎসকগণ নাকি বেশ কিছু সুফল লাভ করেছেন। আরও দুটি ওষুধ নাকি দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় তা হোল টেরামাইসিন ও পেনিসিলিন, টুথপেষ্টে এ দুটি ওষুধ মিশ্রিত থাকলে রোগ বীজাণু নষ্ট হয়ে যায়। আরেকটি ওষুধ মিষ্ট দ্রব্যে মিশ্রিত করার কথা উঠেছে তা হোল 'গ্লাইসেরল গ্যালডে হাইড' এই ওষুধটি মিষ্ট গ্রহণের অনিষ্টকারিতা নাশক।

দন্ত চিকিৎসা প্রণালীও আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় ক্রমেই সহজ হয়ে উঠেছে, দাঁত তোলানো বা সেই সংক্রান্ত কোন অস্ত্রোপচার আজ আর কারুর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে না।

আধুনিক দন্ত চিকিৎসার মূল মন্ত্র হল যত দিন সম্ভব আসল দাঁতকে স্বস্থানে রাখা, এ বিষয়ে পেনিসিলিন ওষুধটির অবদান অমূল্য, আজকের দন্ত চিকিৎসক রোগগ্রস্ত দাঁতটিকে অস্ত্রোপচার করে বার করে নিয়ে পেনিসিলিনের সাহায্যে বীজাণু মুক্ত করে, আবার সেটিকে সহজেই যথাস্থানে লাগিয়ে দিতে পারেন রোগমুক্ত অবস্থায়।

দাঁতকে যথাযথ রাখতে হলে দন্ত চিকিৎসককে এড়িয়ে চলবেন না। দাঁত সংক্রান্ত কোন রোগের সূত্রপাত মাত্রই বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলে রোগের বৃদ্ধি ঘটতে পারে না, সব রকম রোগের মতই দন্তরোগকেও অঙ্কুরে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখলেই অকালে দাঁত পড়া, দন্তশূল, এই সব বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি সহজেই।

মনের গহনে

পুষ্পদল ভট্টাচার্য

অর্থনীতির বইটা সামনে খোলা। কিন্তু চোখ জানালা পথে সামনের রাজপথের শেষ প্রান্তে, শ্রবণ-শক্তি বাইরের দরজার কড়ায় একাগ্র করে অনিতা আসন্ন বি-এ পরীক্ষার পাঠে নিরত। চোখ দুটি মাঝে মাঝে টেবিলের দিকেও ফিরছে। কিন্তু সামনের বইয়ে না গিয়ে ছোট ঘড়ির কাঁটা দুইটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করে মনে তীব্র ক্ষোভ আর অভিমানের সঞ্চার করে তুলছে।

ঠিক এই সময়ে কড়া নাড়ার শব্দে রোমাঞ্চিতা আর আনন্দিতা অনিতা এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে পলকের মধ্যে সদর দরজায় পৌঁছে দরজা খুলে যাঁকে দেখল তিনি অপরিচিতা না হলেও এ সময়ে তাঁর আগমন-প্রত্যাশা করেনি সে। তাই থতোমতো খেয়ে বলল, "ও আপনি? আমি ভেবেছিলাম—" কথা শেষ না করেই আত্মসংবরণ করল অনিতা।

কিন্তু যাঁর কাছে মনের কথা লুকোবার চেষ্টা তিনি তা ঠিকই আন্দাজ করলেন। চশমার মধ্য দিয়ে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন, "কোন সহপাঠীর আগমন প্রত্যাশা করছিলে বুঝি?"

অনিতা আমতা আমতা করে, "হাঁ, অমলার আসবার কথা ছিল। আমরা রোজ দুপুরে একসঙ্গে পড়ি কিনা।"

"অমলা, না অমল? কি বললে নামটা?" বিদ্রূপের হাসি ভেসে ওঠে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখে। "তা থাক, অমল হলেও ক্ষতি নেই। কেবল দেখ তোমার বাপ-ঠাকুরদার মুখে যেন কালী না পড়ে। এই জন্যেই তোমার মাকে বলেছিলাম মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে দিও না। তখন তো সে কথা কানে নিল না তোমার মা।" আগন্তুক মহিলা বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে বললেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই অনিতার মা তাড়াতাড়ি বাইরে আসছিলেন। বললেন—"এই যে দিদি, আসুন, আসুন। কি ভাগ্যি আমার, আজ এ বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।" ভদ্রমহিলার পায়ের ধুলো নেবার ছলে নত হয়ে অনিতাকে ইসারা করেন সেখান থেকে সরে যেতে।

অনিতা বাইরের দরজা বন্ধ করার আগেই সামনের পথে সাইকেলের ঘন্টি বেজে ওঠে। পরমুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করে সহপাঠী চঞ্চল। "কি ব্যাপার? একেবারে দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষারতা? আমার কিন্তু মোটেই দেরী হয়নি। দেড়টায় আসব বলেছিলাম। এই দেখ আমার ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা।"

অনিতার বিবর্ণ মুখ দেখে চঞ্চল থমকে যায়—"কি হয়েছে।"

"মিসেস মিত্র।" অনিতা অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে।

"কোথায়?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই চঞ্চল দুয়ারের বাইরে গিয়ে সাইকেলটা তুলে নেয় আবার। তারপর বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে—"এই নিন অনিতা দেবী, এই নোটসগুলো রাখুন। প্রফেসার শর্মা এগুলো আপনাকে দেবার জন্য পাঠালেন আমাকে। আচ্ছা চলি। প্রফেসার গুপ্তা আজ আমাদের হোষ্টেলের ছেলেদের কয়েকটা 'দরকারী নোটস্' দেবেন বলেছেন। যদি দেন তো পরে আবার দিয়ে যাব আপনাকে।"

অনিতা উত্তর দেবার আগেই চঞ্চলের সাইকেল পাড়া ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ অনিতা উপরে উঠে এসে পড়ার বই ছেড়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়। মিসেস মিত্রর আগমনে এমন চমৎকার দুপুরটা নষ্ট হওয়ার জন্যই কেবল নয়, একটা তীব্র ভয়ও কাবু করেছে তাকে। আজই সন্ধ্যা নাগাদ তার আর চঞ্চলের নাম জড়িয়ে একটা সরস অথচ সম্পূর্ণ মনগড়া সংবাদ শহরবাসীর কানে তুলবেন মিসেস মিত্র। মিথ্যা জেনেও অনেকেই তার প্রতিবাদ তো করবেই না, বরং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও নানা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে। একথা ভেবেই অনিতার কান্না পায়।

অনিতাদের বাড়ীর কয়েকটা বাড়ীর পরেই বোসেদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। তিন ছেলেরই বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের হাসি কান্নার খেলার শব্দে দুপুর বেলাও বাড়ীটা নিঃশব্দ হতে পায় না। ওদিকের বারান্দায় বড়বউ আর ছোটবউয়ে কি যেন কথা নিয়ে চড়া সুরে আলাচনা চলছে। নিরীহ প্রকৃতির মেজবউ চেষ্টা করছে কড়া কথা যেন কলহে পরিণত না হয়। পাশের ঘরে কর্ত্তা দিবানিদ্রা দিচ্ছেন আর গৃহিণী একটা গল্পের বই নিয়ে চোখ বুজে বই পড়া যায় কিনা তারই 'এক্সপেরিমেণ্ট' করছেন। নীচের কলতলায় ঝিয়ের বাসন মাজার আর ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়ার শব্দে বাড়ি আরো সরগরম হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়ে নীচের তলা থেকে চাকরের ত্রস্ত গলা শোনা গেল—"মিত্তির মেমসাহেব আসছেন বউদি।"

কথাটা কানে যেতেই অত বড় বাড়ীর সব শব্দ থেমে বাড়িটা যেন নিষুতি রাতের মতন থমথমিয়ে গেল। বড়বউ বলল—"ছোট-বউ তুই যা ভাই বসবার ঘরটা গোছান আছে কিনা দেখ। আর মেজবউ তুই গিয়ে মাকে তুলে দে। আমি দেখি ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় পরিষ্কার আছে কিনা? তারা কোথায় কি করছে কে জানে?"

বড়বউ কথা শেষ করতে পারে না। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মিসেস মিত্র বলেন—"বাড়ির দরজায় পাহারা বসিয়েছ যে বউমা। বুড়ী মিসেস মিত্রকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবার ইচ্ছে নেই নাকি?"

"কি যে বলেন মাসীমা," বড়বউ অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দেয়। "দুপুরে আমরা সবাই থাকি বাড়ির ভিতর। বারবাড়িতে হঠাৎ কোন লোক এসে বাইরের ঘর থেকে যদি কিছু তুলেটুলে নিয়ে যায় তাই

চাকরটাকে দুপুরে সদরে বসে থাকতে বলি। যা সব চুরি ডাকাতির কথা শুনি আজকাল।"

বড়বউয়ের অপ্রস্তুত হবার কারণ আছে। কেবল ঝি চাকরকেই নয়, এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরও বলা আছে প্রতিমাসের প্রথম কয়দিন সদা সজাগ হয়ে থাকতে। রাস্তার মোড়ে মিসেস মিত্রকে দেখা গেলেই যেন তারা বাড়ীর ভিতর এসে খবর দেয়। তাতে সময় থাকতে সকলে সাবধান হতে পারে। নইলে আজকের মতই হঠাৎ এসে তিনি সকলকে বিব্রত করে তোলেন। চাকরের উপরেও রাগ হয় তার। মিসেস মিত্র রাস্তায় থাকতেই খবর না দিয়ে, তিনি যখন বাড়ীর ভিতর পৌঁছে গেলেন তখন তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাঁক পাড়ল বোকাটা।

মিসেস মিত্রর মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়। বলেন—"অন্য বাড়ীতে সে ভয় থাকলেও তোমাদের বাড়ী দুপুরে কেউ চুরি করতে আসবে না বউমা। খানিক আগে রাস্তা থেকে তোমাদের বাড়ীর ভিতর যে গোলমাল শুনছিলাম তাতে ভাবলাম বুঝি ডাকাত পড়েছে। তা তোমার শাশুড়ী কোথায়? ঘুমোচ্ছে? ঐ করেই গতর ভারী করে তুলছে সুবর্ণ।"

মেজবউ তাড়াতাড়ি বলল—"না, মা তো দুপুরে ঘুমোন না। ওদিকের ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছেন। আপনি বসবেন চলুন মা আসছেন।"

এই সময় বাড়ীর গিন্নী দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি করে নিদ্রার জড়িমা ধুয়ে একটা ফরসা শাড়ী পরে এসেছেন দেখলেই বোঝা যায়। হাতে তাঁর একটি পাঁচ টাকার নোট। বললেন—"আসুন, দিদি, আসুন। এবার আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম অসুখ বিসুখ করল নাকি? আজই সন্ধ্যায় কর্তাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম আপনার কাছে। বলি প্রতিবার দিদিই বা চাঁদার জন্য আসবেন কেন? সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের পুণ্য তো আমাদেরই। গিয়ে টাকাটাও দিয়ে আসব সেই সঙ্গে দিদির খোঁজ খবরও নিয়ে আসব।" কথার সঙ্গে সঙ্গে নোটটা এগিয়ে দিলেন মিসেস মিত্রকে।

মিসেস মিত্র টাকা পার্সে রেখে মেজবউকে বললেন—"বসবার ঘরে গিয়ে সোফাসেটিতে বসার চেয়ে এইখানেই একটা মাদুর দাওনা বউমা।"

মেজবউ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বড়জা আর শাশুড়ীর দিকে তাকায়। তাঁরা উপায়হীন ভাবে ইশারায় সম্মতি দেন। মিসেস মিত্রর চালাকী তাঁরা বোঝেন। এই বারান্দায় বসলে বাড়ীর সব ঘর আর ছাদেরও একটা অংশ দেখা যায়। কাজেই বাড়ীর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এখানে বসেই তিনি তা বুঝতে পারবেন। তারপর সে সব কথা এ শহরের বাঙালী সমাজের অগোচর থাকবে না। এই জন্যই তাঁরা আরো সজাগ থাকেন মিসেস মিত্রর আগমন বার্তা জানবার জন্য। প্রথমেই বসবার ঘরে নিয়ে না তুললে এই বিপদে পড়তেই হবে।

ছোটবউ ফিসফিস করে বড়বউকে বলল—"কি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা। চাঁদা সাধতে এসেছে। টাকা তো আসতে না আসতেই পেলে। এবার সরে পড়না। তা নয় জাঁকিয়ে বসল পাড়াসুদ্ধ লোকের নিন্দে করতে। আর এ বাড়ীর অন্ধিসন্ধি খোঁজ নিতে।"

বড় বউ সাবধান করে দেয়—"চুপ কর। শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না।"

মিসেস মিত্র বেশ আরামে পায়ের উপর পা তুলে বৈঠকী কায়দায় মাদুরে বসে পাঁচালী পাঠ আরম্ভ করলেন—"আমার তো আর তোমাদের মতন দুপুরে ঘুমানো আয়েসী শরীর নয়। সারা জীবনই কাটল সমাজ সেবার কাজে। কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম দিল্লী। আমার অনাথ আশ্রমের নিজস্ব বাড়ীর জন্য কিছু সরকারী সাহায্যের চেষ্টায়।" এর পর ঘণ্টাখানেক ধরে দিল্লীর নানা কাহিনী আর সেই সঙ্গে এ শহরের অধিবাসীদেরও গল্প শোনালেন মিসেস মিত্র। তিনি যখন বোসেদের বাড়ী থেকে গেলেন তখন সকলেই জেনে গিয়েছে তাঁদের প্রতিবেশীদের মেয়ে অনিতার স্বভাব-চরিত্রের কথা।

আজই মিসেস মিত্র নাকি অনিতাদের বাড়ির এক নির্জন ঘরে অনিতাকে তার কোন এক সহপাঠীর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করতে দেখে এসেছেন। অনিতার মাকে কথাটা বলা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। মায়েরই বা দোষ কি? দোষ ভাইয়েদের। পাছে বোনের বিয়ের খরচ দিতে হয় তাই বোনটাকে এইভাবে ছেড়ে দিয়েছে। ইচ্ছা সে যদি 'লাভ' করে সিভিল ম্যারেজ করে, তাহলে খরচ বেঁচে যাবে।

মিসেস মিত্র চলে গেলে বউয়েরা অনিতার কথাই আলোচনা করে। সবটা বিশ্বাস না করলেও কিছুটা যে দেখে এসেছেন মিসেস মিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। মিসেস মিত্রর সরস বর্ণনাটা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে উপভোগ করে বউয়েরা। ভুলে যায় এতক্ষণে হয়তো বোসেদের বাড়ীরও কোন সরস কাহিনী শুনছে পাড়ার আর কেউ।

দুপুর গড়িয়ে যখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় চারদিক কালো হয়ে আসছে এমনি সময়ে অফিসর পাড়ায় প্রবেশ করলেন মিসেস মিত্র। সামনেই ম্যাজিষ্ট্রেট সোমের বাড়ী। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী অনামিকা সোমের বসবার ঘর অন্যদিন এ সময়ে নানা উচ্চপদস্থ অফিসরের ও তাঁদের সহধর্মিণীদের আগমনে সরগরম থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুরে গিয়েছেন তাই আজ ক'দিন সান্ধ্য-মজলিশ তেমন জমেনি।

বসবার ঘরের একপ্রান্তে বেশ কাছাকাছি বসে মিসেস সোম প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। প্রীতম সিং এ শহরের 'ভিপদের' (V.I.P.) অন্যতম এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপরওয়ালা কর্তা। সুন্দরীদের সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছিলেন মিসেস সোম, আজ ক'দিন যাবৎ একমাত্র প্রীতম সিংকে তাঁর সান্ধ্য-বাসরের অতিথি করে। স্বামীর নীরব সম্মতি পেয়েছেন তিনি এ বিষয়ে।

এইমাত্র প্রীতম সিং মিসেস সোমকে তাঁর স্বামীর পদোন্নতির সংবাদ দিয়েছিলেন। তারই প্রতিদানে প্রীতম সিংকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের উপক্রম করছিলেন মিসেস সোম। কিন্তু বাধা পড়ল। বেয়ারা এসে সামনে ধরল একটা ট্রে। তার উপর একটা ভিজিটিং কার্ড। নামটা পড়ে দেখেই মিসেস সোম আঁতকে সোফার আরেক প্রান্তে সরে গেলেন। প্রীতম সিং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে?"

মিসেস সোম তাঁর দিকে কার্ডটা এগিয়ে চাকরকে বললেন—"নিয়ে এস মেমসাহেবকে।"

বেয়ারা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মিসেস মিত্র পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। প্রীতম সিং ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মিসেস মিত্র

বললেন—"সে কি মিষ্টার সিং, এরই মধ্যে উঠলেন যে। আমি বেশীক্ষণ আপনাদের 'ডিসটার্ব' করব না। বসুন আপনি।"

"না আর বসব না।" প্রীতম সিং শুকনো গলায় জবাব দেন।—

"আগামী পরশু মন্ত্রী উধমবীর আসছেন। তাঁরই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করার জন্য মিষ্টার সোমের সাহায্য দরকার। আমি তো জানতাম না যে তিনি এখনও 'টুর' থেকে ফেরেননি। এখানে এসে মিসেস সোমের কাছে শুনলাম। তাই—"

"তাই নিঃসঙ্গ মিসেস সোমকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন? সে তো ভাল কথাই। বসুন না। আমি তো এখনই চলে যাব। তারপর মিসেস সোম আবার যে কে সেই একলা হয়ে যাবেন।"

এবার মিসেস সোম প্রতিবাদ করলেন—"একলা থাকব কেন? এখনি মিসেস বর্মারা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে 'মারকেটিংয়ে' যাব বলে তৈরী হয়েছি।"

তিনি টেবিলের উপর থেকে পার্সটা তুলে নিয়ে বললেন—"কেন যে ওরা দেরী করছে বুঝছি না। বোধহয় বাড়ীতে হঠাৎ কোন অতিথি এসে গিয়েছে।"

পার্স থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে মিসেস মিত্রকে দিয়ে তিনি আবার বললেন—"আপনার এমাসের চাঁদাটা রাখুন। শুনেছিলাম আপনি দিল্লী গিয়েছেন তাই আমি নিজে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসতে পারিনি। এবয়সে আপনার এতটা পথ আসতে কষ্ট হয় তো?"

প্রস্থানোদ্যত প্রীতম সিংও ফিরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পঁচিশ টাকা বের করে দিলেন। "এ মাসের চাঁদা। আপনার আশ্রমের বাড়ী তৈরীর জন্য সিমেন্টের দরকার থাকলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। মিসেস মিত্র, যখনই আপনি বলবেন তখনই 'পারমিট' যোগাড় করে দেব। আচ্ছা আসি।"

মিসেস সোমের সঙ্গে একটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টি বিনিময় করে প্রীতম সিং চলে গেলেন। মিসেস মিত্র ততক্ষণে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছেন। প্রীতম সিং চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন—"এত তোয়াজের কিছু ফল হল? না শুধুই বদনাম কিনছ?"

কিছু না বোঝার ভান করে মিসেস সোম প্রশ্ন করেন—"কিসের ফল ফলবে মাসীমা?"

"কেন? মিষ্টার সোমের পদোন্নতির জন্যই না ঐ দেড়ে পাঞ্জাবীটার এত তোয়াজ করছ তুমি? তাই বলছি পেলে কিছু আশা সোমের 'লিফ্‌ট' হবে তো আগামী মাসে?"

মিসেস সোমের প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টা হেসে উড়িয়ে দিলেন মিসেস মিত্র—"আহা আমার কাছে আর লুকোবার কি আছে? আমিও তো এক সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরণীই ছিলাম। তবে আমার একটা সুবিধা ছিল। সে সময়ের বেশীর ভাগ উপরওয়ালাই ছিলেন সাহেব। তাঁদের পার্টি দিয়ে মেমসাহেবের মনোরঞ্জন করলেই কাজ দিত। তোমাদের মতন নিজেকেও ডালি দেবার দরকার হত না।"

হতবাক মিসেস সোম প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পান না। মিসেস মিত্র বলে চলেন—"এর জন্যে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? স্বামীর উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই খারাপ নয়। তাছাড়া আজকাল ঘরে ঘরে যা চলছে।" এরপর সহজেই অনিতা-চঞ্চল প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সেই সঙ্গে এই শহরের আরো অনেক পরিবারের কথা। সর্বশেষে তিনি শোনান এ শহরে নবাগত এক বাঙালী পরিবারের কথা। ওদিকের 'মেড়ো' পাড়ায় এসে উঠেছে তারা। ভেবেছিল এইভাবেই সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। কিন্তু মিসেস মিত্রর কাছে তাদের আগমন সংবাদ অজ্ঞাত থাকেনি। নিজেই গিয়েছিলেন খোঁজখবর নিতে। হাজার হোক এই নির্বান্ধব শহরে একজন বাঙালীর বন্ধু আরেকজন বাঙালীই তো?

"গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। বিখ্যাত সার কৃষ্ণচন্দ্রের নাতনী একটা সাধারণ কেরাণীর ছেলেকে বিয়ে করে এখানে এসে রয়েছে। বললাম, 'এ ভাবে লুকিয়ে থেকেই কি রেহাই পাবে ভেবেছ? বাপ-মা খবর পেলে যে জামাইকে জেলে দেবে।' তা সে মেয়ে তেরিয়া হয়ে বলল—'আজ্ঞে না। তা দেবার সাধ্য নেই তাঁদের। গত জুন মাসে চব্বিশ পার হয়েছি, বুঝলেন মিসেস ফোপরদালাল মহাশয়া।' শুনলে তো উপকার করতে গিয়ে কি ভাবে অপমানিতা হলাম। এম-এ পাস। তাই আসবামাত্র এখানের মেয়ে কলেজে একটা চাকরীও পেয়ে গেছে। বর তো কি একটা ছোট অফিসের কেরাণী। যা মাইনে পায় তাতে বাড়ী ভাড়াও চলবে না। কাজেই বউকেও চাকরী নিতে হয়েছে। কি যে সব হয়েছে আজকাল। অত বড় ঘরের মেয়ে। কোথায় কোন মন্ত্রীর ছেলের কিংবা উপমন্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে করে সুখে থাকবি। তা নয়, বাপ-মার মুখে কালী দিয়ে নিজেও কষ্ট পাওয়া।"

প্রতিবেশীদের কথা আরম্ভ হতেই মিসেস সোম তাঁর নিজের কথা, মারকেটিংয়ে যাবার কথা ভুলে মিসেস মিত্রর পাশের সোফাতেই বসে পড়েছিলেন। এখন ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দে সজাগ হয়ে উঠলেন। তাঁর রাত্রের আহারের সময় হল বুঝে মিসেস মিত্রও উঠলেন—"আচ্ছা আজ চলি। অনেক রাত হল। আবার এতখানি পথ হাঁটতে হবে তো?"

"আহা তা কেন? আমার গাড়ীটা তো খালিই রয়েছে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক গিয়ে।"

এ প্রস্তাবে মিসেস মিত্রর আপত্তি হবার কথা নয়। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস সোম। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। না জানি কোন রং দিয়ে তাঁর এ বাড়ির অভিযানের সংবাদ প্রতিবাসীদের জানাবেন মিসেস মিত্র।

এই ভাবেই এই ছোট শহরটির বাঙালী সমাজে একাধিপত্য করেন মিসেস মিত্র। সকলেই তাঁকে মানে অর্থাৎ ভয় পায়। কার বাড়ির কিংবা চরিত্রের কোন গলদ কখন তাঁর চোখে পড়বে আর দেখতে দেখতে তা পরিচিত অপরিচিত সকলেরই জানা হয়ে যাবে এই ভয়ে সকলে তটস্থ থাকে।

মিসেস মিত্রর সুন্দর ও সুগঠিত শরীরে ও মুখে চোখে এক সময়ে যে রূপের আগুন জ্বলতো তার উপর সামান্য একটা বয়সের আচ্ছাদন পড়লেও তা সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়নি আজও। মাথায় বয়সের প্রথম কলি ফেরান চুলগুলি বেশ পরিপাটী করে পাতা কেটে আঁচড়ানো। পরনে ধপধপে সাদা থান ধুতি, হাত লম্বা গলা বন্ধ ব্লাউজ আর সাদা জুতো মোজা। হাতে সাদা পার্স আর প্যারাসোল।

মিসেস মিত্রর সঙ্গে থাকে একটি অল্পবয়সী ছোকরা চাকর—চালচলনে গোঁড়া মিশনারী মহিলা মনে হলেও হিন্দু ঘরের বিধবা তিনি। স্বামী

ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে নানা ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছেন। যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানেই মেয়েদের উন্নতির জন্ত সভাসমিতি করেছেন। প্রতি সভাতেই সভানেত্রী মিসেস মিত্র। কাগজে কাগজে ছেপেছে তাঁর ছবি আর অভিভাষণ। যে সভার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হোতো তার উদ্যোক্তাদের প্রতি বিরক্তির শেষ থাকতো না তাঁর। স্বামীর উপরওয়ালা অফিসারদের পার্টি দিয়ে, তাঁদের স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করে একদা তিনি মিষ্টার মিত্রের বহু পদোন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর হরিপুরের মতন পল্লী শহরে স্থায়িভাবে বাস করতে বাধ্য হয়ে মিসেস মিত্র সুখী হননি। অথচ এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। স্বামীর পৈত্রিক বাড়ী এখানেই। দুই ছেলেই বড় সরকারী চাকুরে। একজন দিল্লীতে অন্তজন কলিকাতায় রয়েছে সপরিবারে। তারাও মাকে ভয় পায়। তাই এখানের সম্পত্তির সব দেখাশোনার ভার মায়ের উপর চাপিয়ে তাঁকে হরিপুরেই স্থায়ী করে রেখেছে। বলে—"তুমি দেখাশোনা না করলে এ সব যে পাঁচ ভূতে লুটে খাবে মা। তোমার নাতি নাতনীদের মুখ চেয়ে এটুকু কষ্ট সহ্য কর।"

বউয়েরাও বলে—"মা, আপনি এবয়সেও যে রকম বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দেন আপনার ছেলেরা তা পারেন না।"

মিসেস মিত্র তোষামোদে তুষ্ট।

বয়স হলেও সভাসমিতি করবার উৎসাহ এক তিলও কমেনি মিসেস মিত্রের। হরিপুর মহিলা সমিতি তাঁরই উদ্যোগে গঠিত। এ ছাড়াও এখানের সরকারী অনাথ-আশ্রম আর অবলা আশ্রমের সব দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই আশ্রম দুটির মাসিক চাঁদা তিনি নিজেই সংগ্রহ করে আনেন বাড়ি বাড়ি ঘুরে। তাঁর মতন অত সহজে অত মোটা টাকা আর কেউ তুলতে পারে না। প্রত্যেক মাসের আরম্ভতে তিনি পরিচিত পরিবারগুলিতে চাঁদা সংগ্রহ করতে বেরোন। সে সময়ে ঐ সব বাড়ির লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

মিসেস মিত্রর চাঁদার টাকা মামত-পুজার টাকার মতোই আলাদা করে তুলে রাখে সকলে। আগমনমাত্রেই তাঁর হাতে চাঁদা দিয়ে নিজ গৃহে মিসেস মিত্রর অবস্থান কাল সংক্ষিপ্ততর করতে চান। এ শহরে নতুন পরিবার এলে তাদের ভাল দিক জানবার আগেই প্রতিবেশীরা তাদের মন্দ দিকের সব কথাই জানতে পারে মিসেস মিত্রর কল্যাণে।

এ হেন প্রতাপশালী মিসেস মিত্রকেও যে কেউ জব্দ করতে পারে তা ভাবতে পারেন নি তাঁর পরিচিতরা। সেদিন ছিল মহিলা সমিতির অধিবেশন। মিসেস মিত্র নিজের হাতে লিখে একটি চিঠি দিয়েছিলেন অধিবেশনের নোটিশের সঙ্গে। জানিয়ে ছিলেন সদস্যাদের সকলেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়। এ শহরের বাঙালী সমাজের কল্যাণের জন্ত একটি জরুরী প্রস্তাব আলোচনা করতে চান তিনি। এই আহ্বান উপেক্ষা করে মিসেস মিত্রর বিরাগ ভাজন হবার সাহস ছিল না সদস্যাদের কারো। সংসারের বহু প্রয়োজন, এমন কি শারীরিক অসুস্থতাও অগ্রাহ্য করে দলে দলে মহিলারা সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন দুপুরের আহারাদির পরই।

অধিবেশনের সময় বেলা তিনটা। কিন্তু দুটো থেকেই মেয়েরা এসে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন "কি ব্যাপার, মিসেস মিত্রের খাঁড়া এবার কার ঘাড়ে পড়বে ?"

উত্তরে অন্তরা ইশারা করছিলেন ঘরের এক কোণে উপবিষ্ট অনিতার মা আর ঐ ধরণের কয়েকজন সম্ভাব্য অপরাধীর দিকে। এঁদের কারো মেয়ে, কারো ছেলে বা বাটীস্থ অন্য কেউ মিসেস মিত্রের গুজবের দৌলতে রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে পড়েছে এ শহরে। ওদের দিকে চেয়ে চাপা হাসি আর কানাকানি করলেও সকলেরই মনে একটা কুন্ঠ ভয় আর অস্বস্তির ভাবও রয়েছে। বলা যায় না মিসেস মিত্রের এক্সরের আলো কখন তাঁরই মুখের উপর এসে পড়ে তাঁকেও ঐ দলভুক্ত করে দেবে। তাড়াতাড়ি সভা শেষ হলে বাঁচা যায়।

তিনটার একটু আগে এলেন মিসেস মিত্র মিসেস সোমের সঙ্গে তাঁরই গাড়ীতে। ছোকরা চাকরটি এখনও সঙ্গে আছে। মিসেস মিত্র বলেন মেয়েরা যতই স্বাধীন হোক না কেন, পুরুষ সঙ্গী না নিয়ে বাইরে যাওয়া অন্যায়। মায়েরা ঐভাবে মেয়েদের একলা পথে ঘাটে ছেড়ে দিয়ে তাদের অসামাজিক কার্য্যকলাপে সাহায্য করছেন। অন্যদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখবার জন্যই মিসেস মিত্র সর্বদা এই বারো বছরের ছোক্‌রা চাকরটিকে তাঁর সঙ্গে রাখেন। হোলই বা অল্প বয়স। পুরুষ তো বটে।

যথারীতি উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কাজ আরম্ভ হল। মিসেস মিত্র প্রস্তাব করলেও মিসেস সোম সভানেত্রী হতে রাজী হলেন না। বললেন, "এখানে আপনিই সকলের চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বড়। কাজেই আপনি উপস্থিত থাকতে এ সম্মানের আসনে বসবার অধিকার আর কারো নেই।"

অতএব অন্যান্য বারের মতই এবারেও মিসেস মিত্রকে আপাত অনিচ্ছার সঙ্গে সভানেত্রীপদের গুরুদায়িত্ব নিতে হল। সভার নিয়মিত কাজগুলি শেষ হবার পর মিসেস মিত্র উঠলেন তাঁর ভাষণ দিতে। তিনি বললেন, "আজ আপনাদের আধুনিকতা বনাম সচ্চরিত্রতা বিষয়ে কিছু বলব। কারণ কিছুদিন যাবৎ আমাদের সমাজের এমন কতকগুলি গলদ আমার চোখে পড়েছে যা নিবারণ না করলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।"

বক্তৃতার সূত্রপাতেই অনেকের সঙ্গে মিসেস সোমেরও মুখ শুকিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে একটা তীব্র আনন্দ-প্রবাহ বয়ে গেল মিসেস মিত্রের মনে। তিনি সভাস্থ সকলেরই মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে বলে যেতে লাগলেন—"সম্প্রতি কলিকাতা ও দিল্লী ভ্রমণের সময়ে সে-সব জায়গার ছেলেমেয়েদের নানা ধরণের অনাচার আমার চোখে পড়েছে। ঐসব দেখে আমি এই ভেবে গর্ববোধ করেছিলাম যে আমাদের হরিপুর ছোট শহর হলেও সেখানের ছেলেমেয়েরা কখনও ঐ ধরণের অনাচার করে না। কিন্তু বিধাতা আমার এ গর্ব খর্ব করেছেন। এবার এখানে ফিরে বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায় করতে গিয়ে এই দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি যে এখানের বাঙালী সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ঐ ধরণের অনাচার চলছে। মনে হয় তাতে তাদের মা-বাপ আর অভিভাবকদেরও সায় আছে।"

উদাহরণস্বরূপ কারো নাম না করেও এ শহরের কয়েকটি অনাচারের উল্লেখ করলেন মিসেস মিত্র। কিন্তু এখন নাম না করলে কি হবে ? সভ্যারা ইতিপূর্বেই যে অনাচারীদের পরিচয় অবগত হয়েছেন তাঁরই দৌলতে। তাঁরা বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে অপরাধীদের দিকে চাইতে থাকেন।

আরো খানিকক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর মিসেস মিত্র বললেন—"এই সব অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অনাচারী হবার সাহস পায় এইজন্যে যে তারা যাদের কাছে শিক্ষা পাচ্ছে সেই শিক্ষক শিক্ষিকারাও অনাচারী। তাঁরা ভালবাসার নামে এমন সব বিয়ে করছেন যাতে তাঁদের বাপমায় আর বংশের মুখে কালী পড়ছে। সম্প্রতি এই শহরে নবাগতা বাঙালী শিক্ষিকাটির কথাই ধরুন না কেন।—"মিসেস মিত্র এরপর বেশ টক ঝাল দিয়ে নবাগতা শিক্ষিকার অনাচারের কাহিনী বর্ণনা করে মন্তব্য করলেন—"ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না বলতো ?"

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে এক প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা বললেন—"আমি কিন্তু এজন্য অমুকে মন্দ বলতে পারি না মৃণাল। দারিদ্র্যের ভয়ে তুমি যে ভাবে সলিলের জীবন নষ্ট করে তাকে রোগ আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলে অর্চনা তা না করে বাপ-মায়ের মতের বিরুদ্ধে সমরকে বিয়ে করে ভালই করেছে—নয়কি ?"

"কে ?" মিসেস মিত্র চমকে উঠলেন।

"আমি নির্মলা। অর্চনার মতই তুমিও একদিন নিজের বাপ-মায়ের অমতে স্বরূপবাবুকে বিয়ে করেছিলে তাঁর টাকার লোভে। কিন্তু সুখী হতে পেরেছিলে কি ? অথচ অর্চনা ধনীকন্যা হয়েও দারিদ্র্য বরণ করে বেশ মনের আনন্দেই রয়েছে এতো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।"

মিসেস মিত্রের উত্তেজনায় রাঙ্গা মুখটা হঠাৎই তাঁর জামাকাপড়ের সঙ্গে একই বর্ণ ধারণ করল। ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ বক্তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি আত্মসংবরণ করে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্তভাবে বললেন—"ওঃ বড় দেরী হয়ে গেল দেখছি। ডাঃ শর্মার কাছে একবার যাবার কথা ছিল বিকাল চারটায়। শহরে যে রকম কলেরা হচ্ছে—আমার শিশুভবনের ছেলেমেয়েদের কলেরার ইঞ্জেকসান দিতে আর দেরী করা উচিত নয়। আমি মিসেস সোমকে আমার বদলে সভানেত্রী করে যাচ্ছি। আপনারা সভার কাজ চালিয়ে যান। এরপরের অধিবেশনে আমার প্রস্তাব জানাব।"

তারপর নির্মলা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে ভুল করেছেন। আমার নাম মৃণাল নয়, সুচরিতা। আপনি মৃণাল নামে যাঁর কথা বলছিলেন আমার বাড়ি এলে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। এই সব চরিত্রের মেয়েরাই সামাজিক অনাচারের অসৎ দৃষ্টান্ত ধরছেন আমাদের তরুণ-তরুণীদের সামনে। এঁদের কথা যত আলোচনা হয় ততই ভালো। কারণ তাতে অল্পবয়সী মেয়েরা অসদাচারণ কাকে বলে তা বুঝে ঐ আচরণকে ঘৃণা করতে শিখবে।"

মিসেস সোমের গাড়ী চেয়ে নিয়ে মিসেস মিত্র ব্যস্ত ভাবে চলে গেলে সভাস্থ সকলে সেই বৃদ্ধাকে ঘিরে ধরল। মিসেস মিত্র বক্তাকে চিনতে অস্বীকার করলেও তিনি যে তাঁকে ভাল করেই চেনেন তা মিসেস মিত্রের হঠাৎ বিবর্ণ মুখ দেখেই সকলে বুঝেছিল।

"আপনি মিসেস মিত্রকে চেনেন নাকি ? তাঁকে কিন্তু আমরা সুচরিতা মিত্র নামেই জানি।"

"কোথায় আলাপ হয়েছিল আপনার সঙ্গে তাঁর ?"

এই সব শত শত প্রশ্নের উত্তর ভদ্রমহিলা সংক্ষেপেই দিলেন। জানালেন তিনি মিসেস মিত্রর বাল্যসখী। এইমাত্র সলিল নামের যে যুবকটির উল্লেখ করেছিলেন, তিনি তারই ছোট বোন নির্মলা দেবী। মিসেস মিত্রর বাপের বাড়ির নাম মৃণালই ছিল। বিয়ের পর তাঁর স্বামী ঐ নাম বদলে সুচরিতা রাখেন। এই শহরে যে নবাগতা শিক্ষিকাকে নিয়ে মিসেস মিত্র নিন্দা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই শিক্ষিকা অর্চনা দেবী নির্মলার পৌত্র সমরকেই বিয়ে করেছেন। নির্মলা বললেন—"মিসেস মিত্র যেদিন আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিন আমি এ শহরে এসে পৌছইনি। তা যদি পৌছতাম তাহলে সে আমার পৌত্রবধূকে নিয়ে এতটা নিন্দা করে বেড়াতে পারত না।"

সমিতির সভ্যারা এই সংবাদের চেয়ে মিসেস মিত্রর বাল্য প্রেমের কাহিনী শোনার আগ্রহই বেশী প্রকাশ করলেন। কিন্তু নবাগতা বৃদ্ধা এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাইলেন না। সকলের নানা প্রশ্নের উত্তরে জানালেন—"কি আর হবে আমার ভাইয়ের দুঃখের কথা শুনে। সে যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।"

এই সময়ে একটি যুবক দ্বারপ্রান্তে এসে ডাকল—"ঠাকুমা, এখন কি বাড়ি ফিরবে ?"

"এই যে চল যাই। আচ্ছা আজ আসি ভাই। এই তো কাছেই বাড়ি। তোমরা সময় মতন আমাদের বাড়ি এলে সুখী হব।"

ভদ্রমহিলা চলে গেলে সমিতির অধিবেশন আর অগ্রসর হল না। সভানেত্রী মিসেস সোমও তাঁর সম্মানের আসন থেকে নেমে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে মিসেস মিত্রর অপদস্থ হওয়ার আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

ডাক্তার বর্মার সঙ্গে দেখা করে আশ্রমের ছেলেদের টীকা দেবার ব্যবস্থা করে মিসেস মিত্র রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। মিসেস সোমের গাড়ী এখানে পৌছেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিস্মিত চাকরটাকেও ছুটি দিয়ে মিসেস মিত্র একাকী পথ চললেন। অনেকদিন মিসেস মিত্র সন্ধ্যাবেলায় এ পথে আসেননি। আজ তাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন বহু তরুণ তরুণী যুগলে অথবা দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে বয়স্ক একজনও নেই। আরও আশ্চর্য এই যে, এদের অনেকেই এই প্রদেশের প্রাচীনপন্থী পর্দার সমর্থক পরিবারের ছেলে-মেয়ে। মিসেস মিত্র নিজের মনেই বললেন—"দিনে দিনে সব অধঃপাতে চলেছে। আমি আর কত বাধা দেব ?" এ দৃশ্যও তাঁর অসহ্য লাগল। তাই একটা রিক্সা ডেকে তাতেই চেপে বসলেন।

বাড়ি ফিরেও মনের শান্তি ফিরে পেলেন না মিসেস মিত্র। যাদের কথা তিনি প্রাণপণে ভুলে থাকতে চান, তাদেরই কথা মনে পড়তে থাকে। নিদ্রার মধ্যে মনের অশান্তি ডুবিয়ে দেবার জন্য অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকালই শয্যার আশ্রয় নিলেন তিনি। কিন্তু ঘুম এল না। আজ মহিলা সমিতিতে দেখা সেই প্রায় বৃদ্ধা মহিলাটির কথাই মনে পড়ল—"সলিলের জীবন নষ্ট করে তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছ।"

সলিল। সেই কবি প্রকৃতির ছেলেটি আর নেই এ পৃথিবীতে। তার ভাবে-ভরা চোখ দুটি—মেলে আর কোনদিন সে তাকাবে না তাঁর দিকে। অবশ্য সলিলের মৃত্যু সংবাদ এর আগেও একবার শুনেছিলেন যেন কার মুখে। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর স্বামী স্বরূপ বাবুই একটু ঠাট্টার সুরে শুনিয়েছিলেন, "চারু, আজ একটা দুঃসংবাদ দেব তোমাকে। শুনে যেন বেশী কাতর হোয়ো না।"

তখন মাত্র ছয় মাস তাঁদের বিয়ে হয়েছে। মা-বাবার অমতেই তিনি এই দোজবরে পাত্রকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ায় বিয়ের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান-প্রদান ছিল না। তাই তাঁদেরই কারো অমঙ্গল বার্তা ভেবে বুকটা ধক করে উঠেছিল। তাই বোধ হয় মিষ্টার মিত্রর পরের কথাটা শুনে তিনি চটে উঠেছিলেন।

মিষ্টার মিত্র যথোচিত গম্ভীর স্বরেই বললেন—"তোমার বন্ধু সলিল আজ কয়দিন হল স্বর্গলাভ করেছে। আজ তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনিই খবরটা দিলেন। স্পট ডেথ। অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজে যাবার পথে গাড়ী চাপা পড়ে—।"

মিষ্টার মিত্রের কথা শেষ হবার আগেই রুক্ষ স্বরে বললেন সুচরিতা দেবী—"বৃন্দাবনে কাক মরেছে কামিখ্যাতে হাহাকার—তোমার হয়েছে তাই। কে না কে পাড়ার একটা মুখচেনা ছেলে মরেছে সেই খবর শুনিয়ে বলছ শোক কোর না। এরপর কোনদিন রাস্তার একটা ভিখারী চাপা পড়ার খবর দিয়ে বলবে শোক কোরো না। আমার তো আর খেয়ে বসে কাজ নেই, তাই বিশ্বসুদ্ধ ভিখারী আর কুকুর বেড়ালের জন্য শোক করব।"

রাগ করেই সুচরিতা স্বামীর সামনে থেকে উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন বাথরুম থেকে বেরোতে তাঁর অন্যদিনের থেকে বেশী সময় লেগেছিল। 'হেভী মেকআপ' করেও চোখ দুটির ফুলো ঢাকা পড়েনি। সেদিনের পার্টিতে পৌছতে দেরী হওয়ায় কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি বন্ধুদের বলেছিলেন—"হঠাৎ এমন সর্দি হয়েছে। গলাও খুসখুস করছে।" তাঁর এই একই অজুহাতে সে রাত্রে সকাল সকাল বাড়িও ফিরেছিলেন তিনি।

মিষ্টার মিত্র বিদ্রূপভরা চোখেই তাঁকে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সুচরিতা দেবীও সে রাত্রের পর এমন ভাবেই আত্মসংবরণ করেছিলেন যে এই দীর্ঘদিনের একদিনও সলিলের কথা আর মনে পড়েনি তাঁর।

সলিলের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আর একটি তরুণের নাম। অতুল, সলিলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আই-এ পড়ার সময়ে এই দুই তরুণ ছাত্রের প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে সর্বত্র একত্রে বিরাজিত এই বন্ধুযুগলের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ দেখা দেয় মৃণাল নামের একটি মেয়েকে ঘিরে। দুই বন্ধুতে কিছুদিন মন কষাকষি হবার পর ওরা একদিন মৃণালকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করেছিল—"তুমি আমাদের মধ্যে কাকে চাও স্পষ্ট করে বল। তাহলে অন্যজন তোমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াব।"

মৃণাল রহস্যময় হাসি হেসে বলল—"বেছে নিতে হয় তোমরাই নাও। আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি। যে আমাকে সুখে রাখবে তাকেই বিয়ে করব।"

দুই বন্ধুরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সলিল মৃণালের বাবার বন্ধুর ছেলে। তাঁর ইচ্ছা এই সচ্চরিত্র মেধাবী ছেলেটির সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। সলিলের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তার ভবিষ্যতও অনুজ্জ্বল কারণ একদিকে তার দুর্বল স্বাস্থ্য অন্যদিকে মুরুব্বীর অভাব।

সকলেই, এমন কি সলিল নিজেও জানতো, খুব বেশী যদি সে উন্নতি করে তো কোন কলেজের প্রফেসার হবে। আর ভালো করে পাস করতে না পারলে কেরাণী। মৃণালের বাবা তাতেই সন্তুষ্ট। এক সময়ে যখন তাঁর চার আনার জমিদারী ছিল তখন ঘটা করে এক জমিদার পুত্রের সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। মেজ মেয়ের বেলায় জমিদারী বাঁধা দিয়ে এক ধনী ডাক্তার জামাই কিনে ছিলেন। কিন্তু ফল দু'ক্ষেত্রের এক ক্ষেত্রেও ভাল হয়নি। অসচ্চরিত্র বড়জামাই যেমন, তেমনি অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মেজজামাই তাঁর মেয়েদের সুখী করতে পারেনি। মৃণালের বেলায় তাই তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছিলেন সমতলের দিকে। অবশ্য আর্থিক অসচ্ছলতাও এই নম্রতার অন্যতম কারণ।"

কিন্তু মৃণালের দৃষ্টি এতটা নত হতে প্রস্তুত ছিল না। সে আশৈশব তার দিদিদের থেকেও উচ্চস্তরের দিকে চেয়েছিল। সে ছিল তিন বোনের মধ্যে সেরা রূপসী।

সলিলের হাসিমুখ দেখে মৃণাল বলল—"সেদিন বড়জামাইবাবু আমাকে ঠাট্টা করে বলছিলেন—'রাজার ঘরের মতই মেজাজ তোমার। কোন মহারাজা তোমার গলায় মালা দেবে তা তো আমি জানি না'। আমি উত্তর দিয়েছি—'মহারাজা বলতে তো দেশের শাসনকর্তাই বোঝায়। আমিও সত্যিকার শাসনকর্তাই বিয়ে করব। আপনার মতন মেকী রাজা নয়'।"

বড়দি বললেন—"ইস্, দেখিস। স্বয়ং লাটসাহেব এসে তোর গলায় মালা দেবেন।"

বললাম—"লাটসাহেব না দিক; অন্ততঃ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অভাব হবে না। লাটসাহেবের রাজত্ব তো তারাই চালাচ্ছে।"

কথার শেষে মৃণাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে। সলিলের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল—"আমি চেষ্টা করব যাতে শাসন বিভাগে কাজ পেতে পারি। হয়তো পুলিশ বিভাগে—"

মৃণালের চোখে মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিতেই সে থেমে গেল।

অতুল উজ্জ্বল মুখে বলল—"আমার বাবাও চান আমাকে বিলাতে পাঠিয়ে আই-সি-এস কিংবা ব্যারিষ্টারী পড়াতে। তাঁকে বলবো ব্যারিষ্টার নয়, আই-সি-এসই হব।"

এবারও মৃণাল নীরবে রহস্যভরা হাসি হাসল। সে জানতো অতুলের বাবার চাহিদা। বড় উকীল তিনি। অর্থের অভাব নেই, তবু ছেলেকে বিলাত পাঠাবার মত খরচই তার হবু-শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাতে চান তিনি। একথা মায়ের কাছে শুনেছিল মৃণাল।

মৃণালের মা তার বাবার মতন অত সহজে গরীব ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। বলেছিলেন—"নাই বা রইল জমিদারী। মৃণালের ভালো ঘরেই বিয়ে দেব আমি। তুমি বরং ঐ অতুলের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখ।"

বাবা বললেন—"না। ওরা উঁচতি বড়লোক হলে কি হবে, ওদের বংশ নীচু। সলিলের বংশ আমাদের সমান। ওরাও এক সময়ে জমিদার ছিল।"

মা রাগ করে বললেন—"কবে দুধ খেয়েছিলে সেই আনন্দেই সারা হও। তুমি না বল, আমি নিজেই অতুলের মায়ের কাছে যাব।"

মা পরদিনই গিয়েছিলেন অতুলদের বাড়ী। কিন্তু মুখ কালো করে ফিরেছিলেন। অতুলের মা বলেছিলেন—"আমার ছেলে আর দুদিন বাদে ম্যাজিস্ট্রেট হবে। একটা জেলার হর্তাকর্তাকে জামাই করার মতন অবস্থা যাদের তেমনি ঘরেই দেব ছেলের বিয়ে। সমান ঘরে না দিলে ছেলে পরে শ্বশুরের পরিচয় দিতে মাথা হেঁট করবে।"

মায়ের মুখে এ কথা শুনে সেইদিনই মৃণাল প্রতিজ্ঞা করেছিল এই অপমানের শোধ নেবেই নেবে। তারপর থেকেই প্রতিশোধের উপায় ভাবছিল সে। হয়তো সে চাইলে বাপ-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অতুল তাকে বিয়ে করতো। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যে দারিদ্র্য বরণ করতে হোত তার জন্ম মৃণাল প্রস্তুত ছিল না।

একদিন সলিলের মা মৃণালদের বাড়ি এসে কেঁদে পড়লেন। সলিল নাকি বলেছে সে ক্রিশ্চান হবে। তাহলে কোন এক সাহেব তাকে বিলাতে পড়তে পাঠাবে। সলিল তার ছোট বোনকে বলেছে এ না হলে সে মৃণালকে পাবে না। আর মৃণালকে না পেলে তার জীবন বৃথা হবে।

অতুলের মতিগতি বুঝে তার বাপ-মা তাকে বিলাত পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এ একপক্ষে তাঁদের শাপে বর হল। ছেলে পাস করে ফিরলে ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রের দাম আরও বেশী পাবেন তাঁরা।

সলিলের মায়ের কাছে সব শুনে মৃণালের বাবা মেয়ের উপর বিরক্ত হয়ে সলিলের সঙ্গে তার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন—যাতে সলিল আর ক্রিশ্চান হবার জন্ম ব্যস্ত না হয়। ঠিক এই সময়েই মেজজামাই প্রস্তাব আনলেন তাঁর বন্ধু বিপত্নীক স্বরূপ মিত্রের সঙ্গে মৃণালের বিয়ে দেবার। স্বরূপ মিত্রের বয়স মৃণালের বয়সের দ্বিগুণ। তাই বিনা খরচে মেয়েকে পাত্রস্থ করার সুযোগ আছে শুনেও মৃণালের মাও এ বিয়েতে মত দেননি। বাবা তো শুনে রেগেই উঠেছিলেন—"ঐ নীচু বংশে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে চিরদিন আইবুড়ো রাখব।"

কিন্তু সকলকে অবাক করে মৃণাল স্পষ্টই জানিয়েছিল স্বরূপ মিত্র ধনী ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়সে তিনি তার থেকে যত বড়ই হোন না কেন মৃণাল তাঁকেই বিয়ে করবে। সে সলিলকে বিয়ে করে সারা জীবন কষ্ট পেতে চায় না।

মৃণালের কথা শুনে বাপ-মা তাকে গাল দিয়েছিলেন। অন্যান্য আত্মীয়েরা তার বেহায়াপনায় বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মৃণালের মেজবোন আর ভগ্নীপতির চেষ্টায় স্বরূপ মিত্রের সঙ্গেই মৃণালের বিয়ে হয়েছিল বোনেরই বাড়ি থেকে। বাপ-মা এ বিয়েতে যোগ দেননি। এমন কি বিয়ের পর একদিনের জন্মও মেয়ে-জামাইকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাননি। মৃণালও নিজে থেকে তাঁদের কাছে যায়নি। দিদিদের কাছ থেকেই বাপের বাড়ীর সংবাদ নিত। শুনেছিল তার বিয়ের পর সলিল আর ক্রিশ্চান হবার জন্ম ব্যস্ত হয়নি। বরং লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়ে অতি সামান্য একটা কাজ নিয়ে কোন রকমে বোনের বিয়ে দিয়েছে। শরীরে অযত্ন করার ফলে তার টি-বি হয়েছে। কিন্তু সে রোগের কথা চেপেই সে কাজ করে চলেছে। সলিলের অপঘাত মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তার মাও মারা গেছেন।

বড়দির কাছে অতুলের সংবাদও পেয়েছিল মৃণাল। বিলাতে

থাকতেই মৃণালের বিয়ের খবর পেয়ে সে অতিরিক্ত মদ্যপান আরম্ভ করে। ব্যারিষ্টারী পাস করে দেশে ফিরে বিয়ে করলেও পানাসক্তি তার কমেনি বরং দিন দিন বেড়েই চলেছিল। আজকাল আর সে কোন কাজও করেনা। বলে—"কি হবে কাজ করে? বাবা যা টাকা রেখে গিয়েছেন তা সারা জীবন মদ খেয়ে কাটালেও ফুরোবে না। তার উপর শ্বশুর মশায়ের একমাত্র সন্তান আমার বউয়ের সম্পত্তিও সব আমার থলিতেই এসে জমেছে। এই টাকাটা রেখে যাব আমার ছেলের মদ খাবার জন্য।"

কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করে উঠে পড়লেন মিসেস মিত্র। না, আজ রাত্রে তাঁর ঘুমের আশা দুরাশা। এই শীতের রাত্রেও মাথা গরম হয়ে উঠেছে। ঘরের পূর্বদিকের জানালা খুলে তারই সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চারদিকে ঘন কুয়াশার মধ্য থেকে পূর্বকাশে একটিমাত্র তারা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেমন তাঁর অন্তরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও কুয়াশার মধ্যে কেমন করে জানি সলিলের প্রীতি মুগ্ধদৃষ্টি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অতুলের জন্যও দুঃখ হয়। কিন্তু কখনও তিনি অতুলের জীবন নষ্ট হওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করেননি। বরং তাঁর নিজের জীবন নষ্ট করার জন্যই অতুলকে দোষ দেন তিনি। সে যদি তাঁর সেই প্রথম যৌবনে নানা মূল্যবান উপহার হাতে সামনে এসে না দাঁড়াত—তাহলে হয়তো অর্থের ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যেত না। তিনি তাঁর জীবনের প্রভাতী তারা সলিলের সংসারেই সুখী হতেন। অতুল আসবার আগে সলিলই তো ছিল মৃণালের সব চিন্তা আর ভাবনার মূলে।

মিসেস মিত্র সহসা সজোরে মাথা নেড়ে সব চিন্তার বোঝা যেন ঝেড়ে ফেললেন। কি হবে অতীতের কথা ভেবে?

পূর্বাকাশেও বিগত দিনের রেখা মুছে ধীরে ধীরে একটি নতুন দিনের প্রত্যাশা রঙীন হয়ে উঠছে। সেই রঙের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে এতক্ষণের উজ্জ্বল প্রভাতী তারাও। বর্তমানের প্রখর আলোকে মিসেস মিত্রর অন্তরের গহনে মৃণাল, সলিল আর অতুলও ঐ রকমেই হারিয়ে গেল। সেখানে জেগে উঠলো তাঁর জীবনের নানা দায়িত্বের চিন্তা। আজই মন্ত্রী উধমবীর আসবেন। তাঁকে ধরে মহিলা আশ্রমের একটা স্থায়ী আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিসেস মিত্র তাড়াতাড়ি স্নান ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

নারীর বহুপতিত্ব

কিছুদিন পূর্বেও পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার আইন ও সমাজসিদ্ধ ছিল, আমাদের ভারতে অন্ততঃ এতদিন এ প্রথাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া হয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে বহুবিবাহ পুরুষের পক্ষে যে দেশে ধর্ম ও আইনসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, সেখানে নারীর বহুপতিত্ব নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কেন? আমাদের অতীত ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। শুধু আমাদের কেন সমস্ত পৃথিবীরই অতীত যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় একদিন নারীর বহুপতিত্বের অধিকার সামাজিক স্বীকৃতিতেই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সেদিনের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, প্রজননের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য, পুরুষের পিতৃত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে সেদিনের যুগমানস ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বস্তুতঃ সেদিনের যুগমানসে সৃষ্টি ছিল এক রহস্যপূর্ণ ও নৈসর্গিক বস্তু। বৃক্ষ যেমন, ফলদায়িনী নারীকেও ঠিক সে ভাবেই সন্তান প্রসবিনী বলে ধরে নেওয়া হত, প্রজননের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলে সে ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকার কোন গুরুত্বই ছিল না। ফলে স্বতঃই পরিবারের কর্ত্রী হত জননী আর তার নামেই পরিচিত হত তার সন্তান সন্ততিগণ।

এই ছিল মানব সমাজের আদিযুগের বিধি ব্যবস্থা কিন্তু এর বহু পরেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব ছিল যদি ও প্রজননের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রয়োজনীয়তা বা প্রকৃত ভূমিকা তখন আর অনাবিষ্কৃত নেই। ভারতের পুরা ইতিহাসের পাতা ওলটালেও নারীর বহুপতিত্ব বা বহুগমনের সামাজিক স্বীকৃতির প্রচুর সাক্ষ্য মেলে। হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী, পাণ্ডু-পত্নী কুন্তী ইত্যাদির কাহিনী, এক সাথে পঞ্চপতির সেবা করলেও কুলবধূ ও সতী নারীর প্রাপ্য মর্য্যাদা হতে তৎকালীন সমাজ বহিষ্কৃতা হননি বরং রাজবধূ, রাজমাতার সম্মান ভোগ করেছেন আজীবন। আজও ভারতের কোন কোন স্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে অনুজেরাও সম্ভোগ করে থাকে সম্পূর্ণ সমাজ অনুমোদিত পন্থায়ই।

হিমালয়ের কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে, নীলগিরির টোডা সম্প্রদায়ের মধ্যে ও খাসী পর্ব্বত প্রদেশে রমণীর বহুপতিত্ব আজও একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রথা মাত্র।

দ্রাবিড় দেশীয় নায়ারগণের ভিতরও এই প্রথা বহুদিনাবধি প্রচলিত ছিল যদিও অধুনা এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

পুরাতন যুগের এই প্রথা আজকের যুগে আর প্রযোজ্য নয় অবশ্যই, কিন্তু এই প্রথা যে একান্তই ঘৃণিত ছিল এ কথাও বোধ হয় জোরের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ বহু সুস্থ সুন্দর জাতির মধ্যেই এ প্রথা প্রচলিত ছিল একদিন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তো আজ নেই বললেই চলে। বর্ত্তমানে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকারও সভ্য সমাজে বিলুপ্তির পথে। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা পরিবর্ত্তিত হয় বারে বারে আর সেই সঙ্গেই স্বাভাবিক রীতিতেই বদলায় তার সমাজ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী। তাই আজ যা স্বাভাবিক বরেণ্য পরে তা হয়ে দাঁড়ায় অস্বাভাবিক ও বর্জ্জনীয়, এইটুকু স্মরণে রেখেই যেন আমরা অতীত যুগের রীতি নীতির বিচার করতে বসি।

নারীর বহুপতিত্ব এরকমই এক লুপ্তপ্রায় পুরাতন সামাজিক রীতি তা আবার ফিরে আসুক এ আমরা আজকের মানুষেরা নিশ্চয় কামনা করি না, কিন্তু তার সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় একেবারে নিষ্করুণ বিচারক সাজবারই বা প্রয়োজন কিসের? অতীতের বহু ভালোমন্দ রীতি নীতিরই মত এটাও কি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকই একটা রীতি মাত্র নয়?
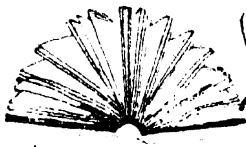
উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ছায়াছবি

স্বর্গত বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনাসমূহ সংগ্রহ করার যে প্রয়াস তাঁর লোকান্তরের প্রায় দশ বছর পরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই রকম একটি প্রচেষ্টার ফল। মোট আটটি গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে বর্ত্তমান সংকলনটিতে, ৺বিভূতিভূষণ শুধু প্রকৃতি-পূজারী ছিলেন না মানুষকে দেখেছেন তিনি সহজ অন্তরঙ্গতায়, অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আর সেই দেখাকেই মেলে ধরেছেন তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে। তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু হঠাৎ আলোর ঝলমলানিতে চিত্তকে ঝলসেই দেয় না, পূর্ণ করে তোলে, মগ্ন করে রাখে। আলোচ্য গল্পগুলিও তাঁর সেই একান্ত নিজস্ব প্রসাদ গুণে বঞ্চিত নয়। জীবন সম্বন্ধে এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁর। অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত জীবনের অস্তিত্বে যে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি তার প্রমাণ তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই ধরণের দুটি রচনা আলোচ্য সংগ্রহতেও স্থান পেয়েছে, লেখার যাদুতে লেখকের বিশ্বাস যেন পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয়। অপরাপর গল্পগুলির মাঝে 'আমোদ' ও 'মরফোলজি' শীর্ষক গল্প দুটি শুধু উৎকৃষ্টই নয় সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ। সরল পল্লীকৃষকের স্বল্পে সন্তুষ্ট সহজ মানসিকতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'আমোদ' গল্পটি। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ ভেঙ্গে এসে যাত্রার আসরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে রামধন পোদ ও তার ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে যাত্রার মানুষগুলিকে দেখতে পেয়েই মহা খুশী। সেইটুকু পেয়েই অত শ্রম যেন তাদের সার্থক হয়েছে। সরল কৃষকের এই শিশুসুলভ মনোবৃত্তি সার্থক ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন দরদী রূপকার। ৺বিভূতিভূষণের মরমী হৃদয়ের স্পর্শে সামান্য গ্রাম্য মানুষের তুচ্ছ জীবনযাত্রার তুচ্ছতম বিবরণও অসাধারণ শিল্প-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই গল্পটিতে 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ যেন আবার ধরা দেন নতুন করে। আমরা সংগ্রহটির সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বিভূতি প্রকাশন, ২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

অলকা-তিলকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক সাহিত্যের অন্যতম সার্থক রূপকার। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর আধুনিকতম এক উপন্যাস। বর্ত্তমান যুগে ভেজালের প্রাধান্য, বলাবাহুল্য আধুনিক মানুষও কিছু পরিমাণে এই দোষে দুষ্ট। সমাজের শীর্ষে এমন অনেক মানুষকে দেখা যায়, আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে যারা নিজেদের মনুষ্যত্বহীনতাকে লুকিয়ে রেখে সগৌরবেই বিচরণ করে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক 'সদানন্দ ঘোষাল' ঠিক এমনই এক চরিত্র। অপদার্থ এক ধনী-পুত্র 'সদানন্দ ঘোষাল' চরিত্রে বা মেধায় কোথাও তার নেই কিছুমাত্র সম্পদ অথচ মূর্খ চাটুকারের বাহবায় ভুলে নিজেকে এক অসাধারণ বিদগ্ধ মানুষ বলে মনে করতে অভ্যস্ত সে। স্বভাবতঃই বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালেই তার নিজের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে দেখা দেয় বারে বারেই, তবু দমে না সে! এই আত্মম্ভরী অপদার্থ মানুষটির চরিত্রচিত্রণে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আজকের সমাজে এ ধরণের মানুষের দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। তারা যে শুধুই ঘৃণার পাত্র নয় করুণারও বইটি পড়লে সে কথাই মনে হয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যঙ্গ বঙ্কিম হয়েও সরস, ব্যঙ্গ যা তিনি করেছেন, তা রঙ্গের মাধ্যমেই তাই বইটির মূল সুর হাস্যোচ্ছল মাধুর্য্যের—আর সেজন্যই পাঠকমনে কোন তিক্ততার সঞ্চার হয় না বরঞ্চ 'সদানন্দ ঘোষালে'র জন্য একটু প্রশ্রয়ের ভাবই জেগে ওঠে। লেখকের মেজাজটি বড়ই শরিফ, যে সরল সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। বইটি পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার মূল্য বড় কম নয়। আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দামে সাড়ে চার টাকা।

বহু-মঞ্জরী

সুমথনাথ ঘোষ যে অশক্ত হাতে লেখনী ধরেন না, তাঁর আধুনিক এই রচনাটি সে কথাই প্রমাণ করে বিশেষ করে। আকারে লঘু অথচ বক্তব্যে গুরু কাহিনীটি সহজেই অধিকার করে পাঠকমনকে। একই বৃক্ষে যেমন বহুমঞ্জরী তেমনি একই মানুষের জীবনে আসে বহু বৈচিত্র্যের আস্বাদ। জীবন পরিক্রমার পথ তার ভরে যায় নানা অভিজ্ঞতার পাথেয়য়। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন বারে বারে। মানুষের মন যেন এক অতল সমুদ্র, যতই ডুব দেওয়া যায় ততই সন্ধান মেলে কত অজানা রহস্যের কত অচেনা বিস্ময়ের। লেখক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁর সন্ধানী চোখে ধরা দেয় এই দুর্জ্ঞেয় জগতের প্রতিটি অলি গলি আর তারই পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে ওঠে তাঁর রচনা। কাহিনীর নায়কের স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে সমগ্র রচনাটি পরিবেশিত হয়েছে যা আন্তরিকতায় দৃপ্ত প্রাণময়তায় চঞ্চল। পড়তে পড়তে পাঠক ডুবে যান বিষয়বস্তুর মধ্যে—পড়ে আনন্দ পান, আনন্দ পেয়ে পড়েন আর এখানেই লেখকের চরম সার্থকতা।—আঙ্গিক শোভন। লেখক—সুমথনাথ ঘোষ। প্রকাশক—আধুনিক সাহিত্য ভবন, ১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এক সূত্রে গাঁথা

ভৌগলিক অভিধায় ভারতবর্ষ একটি দেশ মাত্র, কিন্তু আসলে এ এক মহাদেশেরই পর্য্যায়ে পড়ে। বহু জাতি বাস করে ভারতে

তাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ভাষা সবই ভিন্ন তবু তাদের কোথায় যেন আছে এক অখণ্ড ঐক্য, এক হার্দিক আত্মীয়তা। এই হার্দিক আত্মীয়তাতেই প্রাদেশিক সাহিত্যের সুর অনুরণিত। আলোচ্য গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন ভাষার কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়ে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি পড়লে একথা সংশয়াতীত রূপেই প্রমাণিত হয় যে ভাষার বৈচিত্র্য ভাবগত ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করেনা। আজকের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জীবনধর্মী বাস্তবতা বোধের প্রাধান্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যেরও মূল সূত্র তাই। বাংলায় অনুবাদ গ্রন্থ বড় কম নেই, কিন্তু তার অধিকাংশই বিদেশী বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ। ভারতেরই অন্যান্য অংশে সাহিত্য কি রূপ পেয়েছে সে সম্বন্ধে বাংলার পাঠক বিশেষ কিছু জানতে পারেননি আজও। সেই জন্যই এ ধরণের অনুবাদ কর্মকে আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সর্বভারতীয় এক সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমরূপে বরণ করে নেওয়া উচিত। আলোচ্য গ্রন্থে বারোটি ভারতীয় ভাষায় লেখা সতেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি যে সমভাবেই রসোত্তীর্ণ বা উৎকৃষ্ট জাতের তা নয় কিন্তু তাহলেও এগুলির মধ্যে যুগ মানসিকতার পরিচয় মেলে। সাহিত্য যে দেশভেদে এক অক্ষুণ্ণ সামগ্রিক জীবনবোধের সুরেই আজ অণুপ্রাণিত, তারই নিশ্চিত সাক্ষরে চিহ্নিত বর্ত্তমান গ্রন্থের গল্পগুলি। ভারতে সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য এ ধরণের অনুবাদ গ্রন্থের বহুল প্রকাশ ও প্রচার প্রার্থনীয়। অনুবাদ কর্মটিতেও লেখক যথোচিত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ভাষা সহজ ও সাবলীল। আমরা বইটির সাফল্যকামী। গ্রন্থটির আঙ্গিক সুরুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশক—গ্রন্থবিহার, ৫০ বি, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য—তিন টাকা।

K. MARX & F. ENGELS—Distributors—National Book Agency (Private) Ltd., 12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. ১৯৫৯ সালে সি, সি, সি, পি, এস, ইউ-র ইনষ্টিটিউট অফ মার্ক্সিজম-লেনিনিজম কর্তৃক রচিত রুশীয় সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ইহা একটি ইংরাজী সংস্করণ। ইহাতে ১৮৫৭ হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্যপূর্ণ এই পুস্তকটি পাঠ করিতে পাঠকগণ যে স্বতঃই আগ্রহান্বিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কলকাতা

'শহর কলকাতা' সাম্প্রতিক সাহিত্যের এক অতি পরিচিত অতি প্রিয় বিষয়বস্তু, কলকাতার অতীত ও তার জন্মকথা নিয়ে বহু কাহিনী লেখা হয়েছে ও হচ্ছে—তার মধ্যে কয়েকটি তো বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে যশ ও অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুও সেই 'প্রাচীন কলকাতা'। লেখক প্রারম্ভেই বলেছেন তাঁর উদ্দেশ্য শুধু সেকালের কলকাতাকে দেখানো নয় পরন্তু একালের চোখে সেকালের কলকাতাকে দেখানো। একালের চোখে সেকালের কলকাতা কেমন ছিল তা দেখাতেই তিনি উৎসুক, সন্ধানী বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি যে শুধু নিজেই সেকালের কলকাতাকে দেখেছেন তা নয়, তাঁর সেই দেখাকে পাঠকের চোখেও যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন পূর্ণমাত্রায়, বইটি পড়লে একথা নিঃসংশয়েই মেনে নিতে হয়। কলকাতার আদি চেহারা তার সমাজ তার সংস্কৃতি সবেরই এক সত্যনিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক জাত সাংবাদিক তাই তাঁর রচনায় রোমান্সের পটভূমি রচিত হয়েছে তথ্যের মাটির উপর। কল্পনার সোনার রথে আসীন হয়ে গল্পের ঘোড়া ছোটান নি তিনি, যা ঘটেছিল তাই তিনি বলেছেন। মিথ্যার রঙীন জাল বুনে সত্যকে চাপা দিতে প্রয়াসী নন তিনি। সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে তাঁর কাহিনী, তাই 'শহর কলকাতার' এই নতুন রূপায়নকে স্বচ্ছন্দেই মেনে নেওয়া যায় প্রামাণ্য বলে। কলকাতার প্রাচীনত্ব খুব বেশীদিনের না হলেও তার গুরুত্ব অসাধারণ। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই দেশের আবহাওয়ার যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা—বাঙ্গালার সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সমাজ রীতিতে এসেছিল যেন এক নতুন জোয়ার সেদিন। আর কলকাতার ইতিহাসের পটভূমিও তো মূলতঃ সেটাই। কলকাতা তাই কেবলমাত্র ইটকাঠের এক জড়স্তূপ মাত্র নয় তার এক স্বতন্ত্র সজীব সত্তা আছে। এই শহরের ইতিহাস রচনা করতে বসে লেখককে সেটাই সর্ব্বাগ্রে ভাবতে হয়। বাঙলা তথা বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ এই মহানগরীর ইতিহাস শুধু ইতিকথাই নয় রূপকথাও, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই সত্যটুকু মনে রেখেই কলম চালিয়েছেন আর সেজন্যই সাংবাদিকের রিপোর্ট স্রষ্টা শিল্পীর সার্থক সৃষ্টির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি একাধারে প্রামাণ্য ও রসোত্তীর্ণ এবং সেটাই গ্রন্থকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আমরা এই বইটির সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও মূল্যবান। লেখক—শ্রীপান্থ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—সাত টাকা।

লেখা-লিখি

বর্ত্তমান সাহিত্যের আসরে 'রমাপদ চৌধুরী' এক পরিচিত নাম। তাঁর এই সাম্প্রতিক রচনাটি অনেক কারণেই উল্লেখ্য। সাহিত্যে রম্যরচনার প্রচার ও প্রসার ক্রমেই বাড়ছে, আলোচ্য গ্রন্থটিও সেই শ্রেণীর লেখকের বাল্য ও যৌবনের টুকরো টুকরো স্মৃতির চয়নে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের পথে পথিক হওয়ার সমসাময়িক কিছু কাহিনীর এক সুন্দর মালা। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত মনকে জানবার ইচ্ছা পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক। সেজন্যই তাঁদের স্মৃতিচারণ অনেক সময়ই গল্প উপন্যাস অপেক্ষাও আকর্ষণীয় ঠেকে। পাঠকমনের এই প্রত্যাশাকে সর্বাংশেই সফল করতে পারবে বর্ত্তমান গ্রন্থটি। লেখকের সংবেদনশীল ব্যক্তি মানসের ছাপে সমগ্র রচনাটি উজ্জ্বল ও মধুর। খণ্ড খণ্ড কাহিনীগুলির প্রত্যেকটিই যেন এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছোট গল্প। এমনই তাদের ভাবব্যঞ্জনা এমনই তাদের সৌকর্য্য। বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি ও আনন্দ পেয়ে পড়েছি একথা সহজেই স্বীকার করা যায়। লেখকের ভাষারীতি অনবদ্য। বইটির আঙ্গিক সুন্দর, প্রচ্ছদ শিল্পসুষম। লেখালিখি—রমাপদ চৌধুরী, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাজঘর

বাঙ্গলার নাট্য আন্দোলন ও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রারম্ভিক যুগ থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি ও ঘটনাসমূহ প্রধান ভূমিকার অধিকারী তারই এক ধারাবাহিক বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থখানি। মনোজ্ঞ ভাষায় আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বাঙ্গালা নাট্যশালার এই ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন লেখক সমগ্র পাঠক সমাজের সামনে। উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয় তাঁর বক্তব্য পড়তে পড়তে মনে হয় বুঝিবা রূপকথারই গল্প পড়ছি। অথচ সমস্ত কাহিনীটিই দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বাস্তবের জমিতে—অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন কোথাও সত্যকে বিকৃত করেনি একটুও। আদি যুগের নাট্যশালা ও তার নট-নটীদের বর্ণনা যেমন সত্যনিষ্ঠ তেমনই মনোহারী। সেকালের সমাজ চিত্রও নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে, বিশেষ'করে সেকালের কলিকাতার একটা বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সে দিক তৎকালীন বাঙ্গালীর শিল্পবোধের, রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুটি শাসনকে উপেক্ষা করেই সেদিন অনেক গুণী ও ধনী বাঙ্গালী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এসেছিলেন স্বদেশের নাট্যকলার উন্নতি বিধানে এবং সেজন্য অকাতরে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হননি তাঁরা। আর ঠিক সে-ভাবেই এগিয়ে এসেছিলেন একদল যুবক পেশা হিসাবে নট জীবনকে বরণ করে নিতে, যার ফলে সেদিনের সমাজে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল তাঁদের পক্ষে। বস্তুতঃ শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা এই দুইদল মানুষ ই স্থাপন করেছিলেন সেদিন বাঙ্গালীর 'নাট্যশালার ভিত্তিপ্রস্তর। বাঙ্গালী নাট্যপ্রিয় আধুনিক যুগে তার এই স্বাভাবিক প্রবণতা আরও বিকশিত হয়ে উঠেছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীও এখন আমূল পরিবর্ত্তিত। শিক্ষিত মার্জ্জিত ভদ্র নরনারী নাট্যকলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করছেন ক্রমেই বর্দ্ধিত হারে। কাজেই নাট্যশালার প্রাথমিক যুগে যাঁরা একার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল আজকের দিনে তা প্রায় কল্পনাতীত রূপেই বিস্ময়কর। সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের এক প্রামাণ্য দলিল স্বরূপই গণ্য হওয়ার যোগ্য "সাজ ঘর"। বর্ত্তমান গ্রন্থটি তাই শুধু এক মনোরম রম্যরচনা মাত্র নয় এর প্রকৃত মূল্য এর ঐতিহাসিক গুরুত্বে। বহু প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকারের অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় বইখানিতে, তার মধ্যে ৺মহাকবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও নটীশিরোমণি বিনোদিনীর পরিচয়ই সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে সানন্দে স্বাগত জানাই। বইটির প্রচ্ছদ শোভন ও বাঁধাই মূল্যবান। লেখক—ইন্দ্রমিত্র, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

অন্তর্লীনা

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি মনোধর্মী উপন্যাস। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন অল্পদিন—কিন্তু আপন শক্তিতে তিনি দাঁড়াবার অধিকার অর্জ্জন করেছেন অনায়াসেই। উপন্যাসখানি পড়লে এ যে একজন আগন্তুকের রচনা তা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। ভাষার বাঁধুনিতে ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনোবিশ্লেষণে কাহিনী হয়ে উঠেছে পরম রমণীয়! বইটিকে মনোধর্মী বলেছি ইতিপূর্ব্বেই। কিন্তু তা না বলে মনোবিকলন ধর্মী বলাই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত। কাহিনীর নায়ক এক নিউরোটিক্ কিন্তু আদর্শবাদী যুবক। সে ভুগছে এক বিশেষ ধরণের কাম বিকারে। যুবতী নারীকে সে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পারেনা। সব যুবতীর নগ্না নারীরূপটিই তার মানস চক্ষে প্রতিফলিত হয় সর্ব্বাগ্রে। এই কুৎসিত মনোবিকারের জন্য নীরব নায়ক কৃশানু শুধু লজ্জিতই নয় মর্মাহতও। কিন্তু তার অন্তরের সব সদিচ্ছা, আপ্রাণ প্রচেষ্টা দিয়েও সে মুক্ত করতে পারেনা নিজেকে এই ভয়ানক মনোব্যাধি থেকে। সমগ্র কাহিনীটি বয়ে চলেছে কৃশানুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই। আর তারই পাশে চলেছে প্রধান নারীচরিত্রগুলি। কৃশানুকে ভালবেসে শবরীর প্রতীক্ষা করেছিল স্বাহা—অবশেষে তারই প্রেমে মুক্ত হল কৃশানু এই ঘৃণ্য অভিশাপ থেকে, সার্থক হল সফল হল তার জীবন! আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারায় লেখক অনুপ্রাণিত তাই কাহিনীটি যত না রসমধুর তার চেয়ে অধিক দীপ্ত। মনকে ভরাবার চেয়ে মনকে ভাবাবার প্রতিই লেখকের ঝোঁকটা বেশী, আর সেকাজে তিনি সক্ষমও হয়েছেন পরিপূর্ণ ভাবে। ভাষার সৌকর্য্যে, ভঙ্গীর মুন্সীয়ানায়, ও ভাবের তীক্ষ্ণতায় লেখক পাঠক মনে চমক লাগিয়ে দেন, আমরা বইটির পূর্ণ সাফল্য কামনা করি ও একখানি সত্যকার সুপাঠ্য রচনা হিসাবে তাকে সাদর স্বাগত জানাই। আঙ্গিকেও গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। লেখক—নারায়ণ সান্ন্যাল, প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা।

নির্বাসন

শ্রীবিমল করের অধুনা প্রকাশিত এই উপন্যাসখানিতে এক মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। স্ত্রীকে হত্যা করার মিথ্যা অভিযোগে নায়ককে রাজদ্বারে উপনীত হতে হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল কারাগারে কাটানোর পর সে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়, কিন্তু ফেরার পর সমাজ তাকে রেহাই দেয় না। সে যে সত্য সত্যই ওই অপচেষ্টা করেছিল—এ কথায় তার পরিচিত মহলের মনে সন্দেহ মাত্র নেই! আর সেজন্যই সর্ব্বত্রই তাকে অনুসরণ করে ফেরে এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালোছায়া। অমূলক এই সন্দেহর শ্বাস-রোধকারী পারিপার্শ্বিক অতিষ্ঠ করে তোলে নায়ক ললিতের জীবনকে। প্রতিমুহূর্ত্ত ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে তার অন্তর। অবশেষে সমস্ত বহির্জগতের কাছ থেকে সরে গিয়ে পঙ্গু স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে আশ্রয় নেয় সে, উপলব্ধি করে সেখানেই আছে তার পরম আশ্রয় অপার শান্তি। নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিপুণ ভাবেই ফুটিয়েছেন লেখক, পড়তে পড়তে পাঠক অন্তর সহানুভূতিতে ভরে যায়। লেখক এই ধরণের রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁর বর্ত্তমান রচনাটিও সেই কুশলতার পরিচয়বাহী। তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ ও বলিষ্ঠ, কাহিনীর বক্তব্যকে সহজেই হৃদ্য করে তোলে। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, দাম—ছ' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বিদ্রোহী ডিরোজিও

উনিশ শতকের প্রথম পাদেই সূচনা হয়েছিল বাংলার নবজাগরণের। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের জন্ম তখনই ঘটে। যুগ প্রবর্ত্তক রামমোহন তখনই সাড়া জাগিয়েছিলেন মৃতপ্রায় জাতির অন্তরে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। আর তার পরই এলেন বিদ্যাসাগর,

এই দুই মহাপুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন জেগে উঠেছিল দেশের প্রাণসত্তা—সাড়া দিয়েছিল বাঙালী যুবসমাজ সর্বপ্রকার সংস্কার প্রচেষ্টায়—এই যুগেই জন্ম নিয়েছিলেন 'হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও' নব্য বঙ্গের দীক্ষাগুরু। অতি অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন ডিরোজিও, কিন্তু সেই স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি জাতি মানসে যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর! তৎকালীন নব্য বঙ্গের সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ সচেতন শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র, বস্তুত: ডিরোজীয়ান বলে চিহ্নিতই হন তাঁরা সে সময়। সর্বপ্রকার অশিক্ষা কুসংস্কার দূর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন সেদিনের এই তরুণ বিদ্রোহী—শিক্ষক হিসাবে অদ্ভুত সাফল্যের অধিকারী হন তিনি তাঁর সংস্কারহীন বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল মানসিকতা সঞ্চার করে দিতে পারতেন তিনি তাঁর ছাত্রবৃন্দের অন্তরে। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শুধু শিক্ষকই ছিলেন না বন্ধুও ছিলেন। আর সেজন্যই তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পারত তারা অত্যন্ত সহজেই। নব্যবঙ্গের এই দীক্ষাগুরুর জীবন ও কার্য্যধারার এক পরিচ্ছন্ন ছবি পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক খ্যাতনামা সাংবাদিক, তথ্যনিষ্ঠ সত্যসন্ধানী লেখনীতে ডিরোজিওর জীবনায়ন করেছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি কোথাও ভাবাবেগে আবিল বা অযথা উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি।—তাঁর ভাষারীতি ও রচনার ভাবসঙ্গতি সহায়ক। বইটি যে শুধু এই বিপ্লবী শিক্ষকের জীবন চরিত মাত্র তা নয়, বাংলা সাংবাদিক সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগের এক সুষ্ঠু ও তথ্যবহুল প্রামাণ্য পরিচয়ও। আমরা বইটি পড়ে তৃপ্তি লাভ করেছি ও এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।—লেখক—বিনয় ঘোষ, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

জানালার ধারে

বর্তমানকালে যে শক্তিমান লেখকদের লেখনী বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করে চলেছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির ফলস্বরূপ আজ বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর অধিকারভুক্ত। জানালার ধারে তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। জানালার ধারে কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রতিটি গল্প লেখকের সৃজনীপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের দরদী, সহানুভূতিশীল, অনুভূতিপ্রবণ এবং সর্বোপরি এক সন্ধানী মনের পরিচয় স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, সাবলীল এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যে পরিপূর্ণ। লেখক জীবনশিল্পী। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনকে নানা কোণ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এর ফলে জীবন সামগ্রিকভাবে এক অভিনব রূপ নিয়ে তাঁর সামনে ধরা দিয়েছে, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি এই উক্তির সত্যতাই প্রমাণ করে। প্রতিটি গল্প লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির এবং অপূর্ব বিন্যাসভঙ্গীর সম্মিলনে যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী ও রসাশ্রিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য স্মরণীয় বছর এইটি। দেশ-বিদেশের অসংখ্য সভা-সমিতিতে রবীন্দ্র-মানস সম্পর্কে চিন্তামূলক আলোচনা হয়ে চলেছে প্রায় প্রত্যহই। রবীন্দ্র স্মারক সঙ্কলনও এই উপলক্ষে অনেক বের হবে, এও নিশ্চিত। কবিগুরুর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য কোথায়, জীবন-বৈশিষ্ট্য কি, বিভিন্ন কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে তা-ই রূপায়নের চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে একখানি উপাদেয় আলোচনা-গ্রন্থ বর্তমানে আমাদের আলোচ্য। আলোচ্য গ্রন্থ—কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' বৃটিশ আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল —কারণ অবশ্য আজও অবধি অজ্ঞাত। কবিগুরুর জীবদ্দশায় বইখানি প্রথম প্রকাশলাভ করে। 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে রবীন্দ্র গুণমুগ্ধ বাঙালী পাঠক-সমাজের নিকট নতুন করে কিছু বলবার থাকতে পারে না। কবিগুরুর জীবনায়নের একটি নতুন দিক উদ্ঘাটন করেছেন লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে আর সেটি অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সারগর্ভ গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটিও একটি বিশেষ উল্লেখের অধিকারী—একথা আমরা-বলতে পারি। প্রকাশক—বাণী নিকেতন, ২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম: দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা, শোভন সংস্করণ তিন টাকা।

উত্তর সাগরের তীরে

বিদেশকে পটভূমি করে বাঙলা সাহিত্যে অনেক সার্থক রচনার সৃষ্টি হয়েছে। বহু শক্তিমান সাহিত্যসেবী বিদেশকে পটভূমি করে উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিভা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করল। এই ধরণের উপন্যাসগুলির তালিকায় এই গ্রন্থটি এক উল্লেখনীয় সংযোজন, লেখক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এই গ্রন্থের কল্যাণে পাঠকসমাজে বহুল সমাদরে বিভূষিত হবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি। রচনাটির মধ্যে লেখক এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, ঘটনা সংস্থাপনে চরিত্রসৃষ্টিতে এবং সংলাপযোজনায় তিনি যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি পাঠকচিত্তে রেখাপাত করার মত সব কটি গুণেরই অধিকারী। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের রসপিপাসু মনের এক নিখুঁত আলেখ্য স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। লেখকের বিন্যাসভঙ্গী প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির মধ্যে লেখক নানাভাবে বিবিধ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন এবং এই বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গ্রন্থটির মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থের পরিণতি যুগপৎভাবে লেখকের শিল্পীমনের এবং চিন্তাধারার সারবত্তার পরিচয় বহন করে। প্রকাশক সরস্বতী গ্রন্থালয় ১৪৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—আট টাকা মাত্র।

রাজ যোটক

আলোচ্য গ্রন্থখানি এক ক্ষুদ্রাকৃতি ব্যঙ্গ রচনার সংকলন।—লেখিকা সাহিত্যের আসরে সুপরিচিতা। কৌতুক নকসাগুলির অধিকাংশই বিখ্যাত সাময়িকীর পৃষ্ঠায় ইতিপূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে। যাঁরা রসসাহিত্যের রসাস্বাদনে আগ্রহী, তাঁদের আলোচ্য রচনাগুলি আনন্দ দান করবে নি:সন্দেহে।—বাঙ্গালী দাম্পত্য জীবনের ছোট ছোট খণ্ড চিত্রগুলি লেখিকার মুন্সিয়ানায় রসমধুর হয়ে উঠেছে—পড়তে পড়তে এক সরসোজ্জ্বল মধুরতায় মন ভরে ওঠে। লেখিকার ভাষারীতি সহজ ও সরল, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে সর্বত্রই।—বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে না পারলেও সহজ সরলতার গুণেই রচনাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।—আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি।—লেখিকা—আশা দেবী, প্রকাশক—সাহিত্য, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ দাম—দু টাকা।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৬

কালীতারা এবং সুলোচনার মনোবাসনা কিন্তু পূর্ণ হলো না।

যে সংকল্প নিয়ে তারা হরনাথের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিল দেখতে দেখতে বিবাহের পর দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু হরনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হলো না।

কিন্তু ইতিমধ্যে হরনাথেরও মনের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছিল। সন্তান না হওয়ায় তার মনে একটা প্রচণ্ড দুঃখ জমা হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী দাক্ষায়নী বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে এসে কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিল এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বার কেন স্বামী তাকে বিবাহ করেছে।

সে কারণে অবিশ্যি দাক্ষায়নীর কোন দুঃখ ছিল না মনে। কারণ দরিদ্র বাপের ঘরে জন্মেছিল দাক্ষায়নী এবং জন্মাবধি দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। এবং শিশু বয়েসেই মাকে হারিয়েছিল।

বিবাহের পর হরনাথের সচ্ছল সংসারে এসে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল যেন বর্তে গিয়েছিল। তার উপর স্বামিগৃহে পেয়েছিল সে সুলোচনাকে।

সুলোচনা যেন জননীর মত ভগ্নীর মতই দাক্ষায়নীকে দু হাতে গভীর স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

প্রথম প্রথম সব কথা জানার পর সুলোচনার দুঃখ, বঞ্চনা ও ব্যথা গভীর ভাবটাই যেন দাক্ষায়নীর মনকে নাড়া দিয়েছিল।

চোখ তুলে দাক্ষায়নী সুলোচনার দিকে যেন তাকাতেও পারত না।

কোথায় যেন একটা লজ্জা তাকে পীড়া দিত, অসহায় একটা অপরাধ বোধ যেন তার মাথাটা নীচু করে দিত, সুলোচনা সামনে এলেই।

সুলোচনা প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি কিন্তু বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন নদীর ঘাটে নিভৃতে সুলোচনা দাক্ষায়নীর হাত ধরে শুধায়, আমার কাছে তুই অমন জড়সড় হয়ে থাকিস কেন বলত ছোট। কিরে—আমাকে ভয় করে না কি।

দাক্ষায়নী কোন কথা বলতে পারে না।

সুলোচনা দাক্ষায়নীকে দু হাতে এবারে বুকের মধ্যে টেনে এনে বলে, আমি তোর দিদি না। দিদির কাছে সংকোচ কিরে বোকা মেয়ে।

কি যে হয় দাক্ষায়নীর। সে সুলোচনার বুকের মধ্যে কেঁদে ফেলে

ও কিরে। কাঁদচিস কেন! ওই দেখ—আবার কাঁদে।

দিদি।

কি।

আমার বড় ভয় করে।

ভয়। কেন রে?

তা জানি না দিদি, বড় ভয় করে।

ছোট।

উঁ।

একটা কথার সত্যি জবাব দিবি?

কি?

ও তোকে ভাল বাসে না।

জানি না।

জানি না কিরে।

জানি না। আবার বলে দাক্ষায়নী।

সে কিরে। মেয়েমানুষ হয়ে বুঝতে পারিস না পুরুষ মানুষটা তোকে ভালবাসে কি না?

আমার সঙ্গে তো ভাল করে কথাই বলে না।

কথাই বলে না।

না।

আচ্ছা আমি বলে দেবো।

না, না—দিদি না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—

এমন প্রতিমার মত রূপ নিয়ে এসেচিস তবু এতদিনে ঐ সামান্য কথাটা জানতে পারলি না।

কিন্তু সুলোচনা জানত না—হরনাথের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছিল। এবং সেই পরিবর্তনটাই আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দুই বৎসরের মধ্যেও দাক্ষায়নীর গর্ভে কোন সন্তান এলো না।

হরনাথের কথায় বার্তায় কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

সুলোচনা যদি কালীতারার সঙ্গে যোগ সাজস করে এক প্রকার জোর করেই হরনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ না দিত তা হলে হয়ত হরনাথের মনটা দাক্ষায়নীর প্রতি অমন করে বিষিয়ে উঠতো না!

সন্তান না হওয়াটা যেন হরনাথের মনে হয় সুলোচনার কাছে তার একটা নিদারুণ পরাজয়।

সুলোচনাই যে তার জীবন থেকে সরে গিয়েছে তাই নয় তার জীবনের সন্তান সম্ভাবনারও 'পরে একটা নিদারুণ অভিশাপ দিয়েছে।

হরনাথ শেষ পর্যন্ত স্থির করে আবার সে বিবাহ করবে। যেমন করে হোক সন্তান তার চাইই। মনের ঐ অবস্থায় দাক্ষায়নীর প্রতি যেন আরো বিরূপ হয়ে উঠে। এমনি সময় কলকাতা থেকে এলো হরনাথের দূর সম্পর্কীয় ভাই সুধামাধব। সুধামাধব কলকাতার চেতলা অঞ্চলে চালের কারবার করে, রীতিমত ধনী। বয়েসে সুধামাধব হরনাথের চাইতে কিছু বড়ই হবে। বলিষ্ঠ ও কর্মঠ যুবক। এবং কলকাতার তখনকার নতুন আমদানী বিলাতী শিক্ষার ও চালচলনের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে। ধনীতো বটেই। কলকাতার একজন নব্য বাবুও।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সুধামাধব বললে, টোল নিয়ে এখানে এমন করে পড়ে আছো কেন হরনাথ!

কেন। বেশ তো কেটে যাচ্ছে।

ছাই যাচ্ছে, কিছুই খবর রাখ না। যুগ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। চল, চল—কলকাতায় চল—ব্যবসা কর। দেখবে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে দুদিনই দেরি হবে না।

প্রথম প্রথম সুধামাধবের কথা হেসেই উড়িয়ে দেয় হরনাথ কিন্তু একই কথা বারবার সুধামাধব বলায় কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ও ফেলতে পারে না।

অবশেষে একমাস পরে সুধামাধবের যাত্রার আগের দিন হরনাথ বলে, তোমার সঙ্গে কলকাতাতেই যাবো কিনা ভাবচি সুধা—

অত ভাববারই বা কি আছে, সেখানে গিয়ে হালচাল দেখ, না পোষায় চলে এসো।

তা নয়—

তবে?

বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন তাই ভাবচি—

জীবনে উন্নতি করতে হলে ওসব কথা ভাবলে চলবে না ভায়া। আর অত ভাবলে কোন দিনই কিছু করতে পারবে না।

বাবাকে একবার না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দেখ।

রামানন্দ মিশ্র কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা শুনে বিশেষ কোন আপত্তি করলেন না।

নবদ্বীপের মত জায়গায় থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল কিন্তু অন্য রকম। তিনি বুদ্ধিমান—বিচক্ষণ বুঝতে পারছিলেন যুগের হাওয়া পাল্টাচ্ছে।

নতুন দিন নতুন সভ্যতা আসছে।

নতুনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে না পারলে লোকসান বই লাভ হবে না, তাছাড়া টোলের অবস্থা দিনকে দিন যেমন হচ্ছে তাতে করে সেদিক থেকেও আয়ের পথ কতদিন যে আর খোলা থাকবে কে জানে।

কলকাতার কথা তিনিও শুনেছিলেন।

তাই হেসে বললেন, বড় হয়েচো। আমি আর কি বলব। যা ভাল বোঝ কর।

যাই না হয় ঘুরেই আসি।

যাও।

সুধামাধবের সঙ্গেই হরনাথ কলকাতায় চলে এল।

কলকাতা শহরে চেতলা অঞ্চলটি তখন একটি প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্র। বছরে বছরে ঐ সময় ভারতবর্ষ থেকে যে চাল রপ্তানী হতো তারই হাট বসত তখন নিয়মিত চেতলায়।

শত শত চালের নৌকা, শালতী প্রতিদিন আসত। বাখরগঞ্জ, মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি জায়গা থেকে চাল আসত। কালীঘাটের লাগোয়া টালির নালা সেই সব নৌকা ও শালতীতে একেবারে ছেয়ে যেত। কাজেই ঐ চালের কারবারী ও আড়তদারদেরই ভিড় বেশী ছিল চেতলা অঞ্চলে। সুধামাধবের গৃহ চেতলাতেই—সেই গৃহেই এসে উঠলো হরনাথ। অবস্থাপন্ন ধনী সুধামাধব। বড় বাড়ী—কিন্তু পরিবারটি ছিল ছোট। সুধামাধব তার স্ত্রী হরকালী অনূঢ়া শ্যালিকা নয়নতারা আর চারটি সন্তান। পরিবারটি ছোট হলেও সুধামাধবের কারবারের বহু লোক খাটত, তাদের নিয়েই সুধামাধবের বাড়িটা সর্বক্ষণ যেন গম গম করতো। অনেক দাস দাসীও ছিল সুধামাধবের গৃহে। খোলা মেলা নবদ্বীপের ছোট জায়গায় আজন্ম কাটিয়ে এসেছে হরনাথ, কলকাতায় এসে চেতলার ঐ ঘিঞ্জি ও নোংরা

আবহাওয়ায় যেন কেমন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়। টালির নালার কিছুদূরেই সুধামাধবের চালের কারবারের বিরাট আড়ত। বহু কর্মচারী সেখানে খাটে।

কলকাতায় এসে পৌছাবার পর দিনই সকালে যখন আড়তে যাবে সুধামাধব হরনাথকে ডেকে বললে, চল হরনাথ কেমন কারবার হয় দেখাব চল।

দীর্ঘ নৌ-যাত্রায় শরীর ক্লান্ত ছিল হরনাথের—ইচ্ছা ছিল সে দিনটা বিশ্রাম নেয় কিন্তু সুধামাধবের আগ্রহে হরনাথ না করতে পারল না।

বললে, চল।

তীর্থস্থানের সন্নিকটস্থ স্থান।

কত জাতের কত চরিত্রের নরনারীর যে সর্বক্ষণ ভিড় তার ইয়ত্তা নেই।

কত যে অজ্ঞ, অসাধু, অশিক্ষিত প্রবঞ্চক নানা মতলবে নানা ফিকিরে সর্বদা সেখান ঘোরা-ফেরা করছে তার যেন কোন হিসাব নেই। তা'ছাড়া আছে অসংখ্য বারাঙ্গনার ভিড়।

আড়তের দিকে যেতে যেতে চারিদিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মন্থরগতিতে পথ চলছিল হরনাথ সুধামাধবের পাশে পাশে। ইতিপূর্বে কলকাতা শহরে কখনো আসেনি হরনাথ তাই বুঝি তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সুধামাধব কিন্তু বেশ দ্রুতই হাঁটছিল।

হঠাৎ এক সময় সুধামাধবের নজরে পড়ে হরনাথ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। তাড়া দেয় সুধামাধব।

পা একটু চালিয়ে এসো হে হরনাথ।

এই যাই।

হরনাথ চলার গতি দ্রুত করে।

আড়তে এসে হরনাথ যেন একেবারে 'থ' বনে যায়! অনেকখানি জায়গা জুড়ে আড়ত। জায়গায় জায়গায় চাল স্তূপাকার করা রয়েছে। নানা রকমের চাল, বালাম—বাশমতী—হীরামোতি কত নাম সব চালের।

দাঁড়ি পাল্লায় মণে মণে চাল মাপ হচ্ছে—চালান যাচ্ছে সব নৌকায়—শালতীতে।

কর্মচারীরা নানা কাজে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে। মজুররা মাথায় করে সব চাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে-আসছে।

গদিতে বসে সুধামাধব সব-কিছু তদারক করছে। মুঠো মুঠো টাকা গদিতে ঝন ঝন করে পড়ছে—জমা হচ্ছে একধারে।

হাঁ করে চেয়ে থাকে হরনাথ। কত টাকা। এত টাকা ইতিপূর্বে সে কখনো চোখেও দেখেনি। হাজার হাজার টাকা।

গদিতে বসবার পর আর সুধামাধব হরনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাকাবার ফুরসুতও অবিশ্যি পায় না।

ফুরসুত পেল সেই বেলা একটা নাগাদ। সূর্য তখন মাথার উপরে উঠেছে।

এক সময় থলিভর্তি টাকা নিয়ে সুধামাধব উঠে দাঁড়াল, চল হে হরনাথ।

কোথায় ?

[illegible] যাব না। স্নানাহার করতে হবে না। চল—ওঠো।

উঠে দাঁড়াল হরনাথ। পথে যেতে যেতে এক সময় হরনাথ প্রশ্ন করে, অনেক রোজগার কর সুধামাধব কারবার থেকে না ?

মৃদু হাসে সুধামাধব। বলে, তা ভালই রোজগার হয়। তাইতো বলছিলাম এখানে চলে আসতে। এখন তো দেখতে পাচ্ছো মিথ্যা বলিনি।

না। ঠিকই বলেছিলে। কিন্তু—

কিন্তু আবার কি হে।

কারবার করতে হলে যে অর্থের দরকার সে অর্থ ই যে আমার নেই ভাই।

সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না ?

না। সে যা প্রয়োজন হবে জোগাড় হয়ে যাবে।

কিন্তু কেমন করে ?

সে আমিই ব্যবস্থা করে দেবো।

তুমি।

হ্যাঁ। যদি মনস্থির করে থাকো তো আরো কিছু দিন চোখ মেলে সব দেখ তারপর ব্যবস্থা হবে।

হরনাথ সেই দিন থেকেই নিয়মিত সুধামাধবের আড়তে গিয়া বসে বসে সব দেখতে লাগলো। দেখতে লাগলো কি ভাবে ঠিক কারবারটা চলেছে। এবং যত দেখতে থাকে হরনাথ তার কেমন যেন একটা নেশা ধরে যায়।

অর্থের নেশা বড় মারাত্মক নেশা।

এক দিকে অর্থের নেশা অন্য দিকে সুধামাধবের গৃহে অন্য এক নেশা হরনাথের দৃষ্টিকে রঙিন করে তুলছিল।

সুধামাধবের স্ত্রী হরকালী হরনাথের সামনে বের হতো না। কাজেই তার সব কিছু তদারক করতো নয়নতারা। হরকালী নয়নতারার উপরেই সে ভারটা দিয়েছিল। নয়নতারা রূপসী নয় কিন্তু দেহশ্রী ছিল তার সত্যিই অপূর্ব। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ, সবে দেহে যৌবন দেখা দিয়েছে।

হরনাথ যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত।

সুধামাধব যে একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে হরনাথকে নবদ্বীপ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তা নয়। নবদ্বীপে হরনাথের গৃহে থাকাকালীন সময়েই কথাপ্রসঙ্গে সে শুনেছিল দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় হরনাথের মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়েছে। এবং বংশরক্ষা হেতু সে একটু উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ঐ সময় একাধিক বিবাহও গর্হিত কিছু ছিল না।

হরনাথই একদিন কথাটা বলেছিল সুধামাধবকে, শেষ পর্যন্ত হয়ত নরকস্থই হতে হবে।

কেন হে, নরকস্থ হবে কেন ?

অপুত্রকের দুঃখ তুমি বুঝবে না সুধামাধব।

তা তোমার স্ত্রীর এমনই বা কি বয়স হয়েছে যে সন্তানাদি আর হবেই না তোমার মনে হচ্ছে ?

হলে কি আর এই দুই বছরেও হতো না। তাই মাঝে মাঝে

[illegible]

কি ?

আবার বিবাহ করবো।

তা করলেই তো পারো।

তাই ভাবচি।

কথাটা শোনার পর থেকেই হরনাথের মনে হয়েছে স্কন্ধে তার একটি অনূঢ়া শ্যালিকা রয়েছে। এই সুযোগে যদি হরনাথের স্কন্ধে শ্যালিকাটিকে চাপান যায় মন্দ কি ?

সেই মতলবেই ব্যবসার প্রলোভন দেখিয়ে হরনাথকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল সুধামাধব। এবং গৃহে এসে হরকালীকে গোপনে তার মনোবাসনা জানিয়েও ছিল।

হরকালী কিন্তু প্রথমটায় একটু কিন্তু করেছিল।

দুই স্ত্রী বর্তমান।

সুধামাধব বলেছিল, তাতে কি ? তারা তো নিঃসন্তান। তাছাড়া এখানে একবার কারবারের মধ্যে যদি ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারি আর ও নবদ্বীপ মুখো হবে তুমি ভাবো। এখানেই সংসার পেতে বসবে।

কিন্তু তারা যদি এখানে এসে হাজির হয়।

হাজির অমনি হলেই হলো। আর হলেই বা—

মানে ?

মানে নয়নতারা তো তোমারই বোন—সেও ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে।

কি জানি বাপু, বুঝি না অত শত। যা করবার ভেবে চিন্তে করো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরকালীর মনটাও ঐ দিকেই ঝোঁকে। হরনাথের সুশ্রী চেহারাও তার মনকে কিছুটা আকর্ষণ করে।

মাস খানেক বাদেই একদিন সুধামাধব প্রস্তাবটা উত্থাপন করে বসে একটু ঘুরিয়ে। একটা কথা বলছিলাম হরনাথ।

কি ?

তোমার কারবারের ব্যবস্থা তো করে দিচ্ছি কিন্তু তার আগে বিনিময়ে তুমিও যদি আমার কিছু উপকার করো।

ছিঃ ছিঃ ওকথা বলছো কেন। কি করতে হবে তাই বল।

বলছিলাম দু' দু'বার বিবাহ করলে কিন্তু কোন সন্তানাদি হলো না—তাই ভাবছিলাম এক কাজ করো না কেন ?

কি !

আবার বিবাহ করো।

কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কি হে। নয়নকে তুমি বিয়ে কর।

নয়ন।

হ্যাঁ। কেন মনে ধরে না তাকে।

একটু ভেবে দেখি।

ভাববে আবার কি—করে ফেল।

সপ্তাহ অন্তে হরনাথের সঙ্গে নয়নতারার বিবাহ হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

রবীন্দ্রনাথের বেদনা

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেঁজুতির ছন্দে ছন্দে যা লিখেছ কবি,
কতদিন নিরাশা বাতায়নে
বসিয়া পড়েছি চুপি চুপি।
গগনের রক্তরাগ চলে গেল পাটে
মেয়েরা বসেছে ঘাটে ঘাটে ;
জীবনের যা ছিল সঞ্চয়
দিনান্তে গোধূলির আবির খেলায়,
সবটুকু রঙ তার নিঃশেষে করে নিলে ক্ষয়।
সে কি অপচয় ?

সূর্য ডোবার সাথে পৃথিবীর অপর তীরে বুঝি,
মানুষ রয়েছে উন্মুখ তাহারই চরম অর্থ খুঁজি'।
সায়াহ্নের ধূসর লগনে জীবনের সব পুঁজি, সব লেন দেন,
হিসাব মেলাতে বসি বারম্বার চেতনার নির্মম প্রহার,
অনেক ক্ষতের জ্বালা জ্বালায়েছে মনে।
হেনকালে, বুঝি বা অকালে
দিবসের শেষ আলো মিলাল আঁধারে।
কালের প্রহরী করে করাঘাত
সময়ের সংকীর্ণ দুয়ারে।

'জীবনে জীবন যোগ করা'—
তোমার সে বেদনা কবি তোমারি লিপিতে স্বয়ম্বরা।
উৎসের বার্তা নিয়ে তটিনী সাগর পানে ধায়,
প্রতিদিন ঘাটে বসে
মাটির কলস ভরে' কুলবধূ ঘরে ফিরে যায়।
তোমার আদর্শ সেথা যুগে যুগে আনন্দ-আহবানে,
বহে যায় কল্লোলিনী বৈকুণ্ঠের অমৃত-সন্ধানে।
সে বাণীর ভগ্ন-অংশ-ভাগ
লিপিতে পেয়েছে পরিচয়।
ইতিহাসে সুবর্ণ স্বাক্ষরে সযত্নে হউক সঞ্চয়।
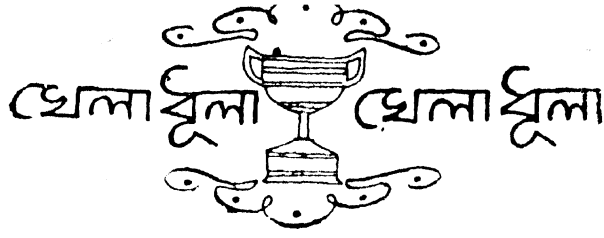
কলিকাতার হকি খেলা

বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত হকি লীগের খেলা শেষ হয়েছে। প্রথম ডিভিসন লীগে ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস—উভয়েই সমসংখ্যক ৩৩ পয়েণ্ট পাওয়ায় তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্দ্ধারণের জন্য একটা অতিরিক্ত খেলার কথা। এই খেলাটি নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাষ্টমস লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্দ্ধারণের খেলায় যোগদানের অক্ষমতা জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন খেলার দিন ধার্য্য করেন। কিন্তু খেলাটি শেষপর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি। বি, এইচ, এ খেলার দিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি, টি, আইয়ের মারফৎ খেলাটি স্থগিত ঘোষণা করেন। কাষ্টমস মাঠে উপস্থিত হয়নি। তবে ইষ্টবেঙ্গল সরকারীভাবে কোন নির্দ্দেশ না পাওয়ায় মাঠে হাজির হয়। এই খেলার জটিল পরিস্থিতি নিয়ে বি, এইচ, এর লীগ কমিটি এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে খেলাটি যাতে অনুষ্ঠিত হয়—তার চেষ্টা চলছে। এবার আর্ম্মেনিয়ান্স ও মেসারাস অবনমনে বাধ্য হয়েছে! আগামী বছর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হবে। এবার দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের প্রথম দুটি দল পোর্ট কমিশনার্স ও ভবানীপুর আগামী বছর প্রথম ডিভিসন লীগে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রথম ডিভিশন লীগের উচ্চস্থানীয় দুটি দল নিম্নলিখিত ভাবে লীগের পালা শেষ করেছে:—

	খে:	জ:	ড্র	প:	স্ব:	বি:	প:
ইষ্টবেঙ্গল—	১৮	১৫	৩	০	৪৫	৪	৩৩
কাষ্টমস—	১৮	১৫	৩	০	৫৫	৫	৩৩

বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপের খেলা আরম্ভ হয়েছে। এবার সর্ব্বসমেত ৩২টি দলকে নিয়ে ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত হয়েছে। বাইরের খ্যাতনামা দলের মধ্যে বোম্বাই গোল্ড কাপ বিজয়ী মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। আগা খাঁ কাপ বিজয়ী সভাপতির একাদশ, পাঞ্জাব পুলিশ, বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেলওয়ে, লুসিটেনিয়ন ও ইণ্ডিয়ান নেভীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাম করা দলের যোগদানে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে। তবে শেষ পর্য্যন্ত কয়টি দল যোগদান করে তা দেখার বিষয়। এরই মধ্যে সভাপতির একাদশ যোগদানের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছে। আশা করা যায় যে এবার উচ্চাঙ্গের হকি খেলা দেখা যাবে এবং বাইটন কাপের ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

অষ্ট্রেলিয়া দলের "রাবার" লাভ

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের টেনিস টেষ্টের পরিসমাপ্তি হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ভারতকে পরাজিত করে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে।

সর্ব্বসমেত তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে কলকাতায় অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়, দিল্লী ও মাদ্রাজে অষ্ট্রেলিয়া ৩—২ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে।

অষ্ট্রেলিয়া দলের বব হিউয়েট ও ফ্রেড ষ্টোলের খেলা দেখে সকলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণনের খেলা দেখে সকলেই হতাশ হন। তবে আশার কথা যে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎ লাল উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের খেলা দেখে অষ্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজার উচ্চ আশা পোষণ করেন। কলকাতায় তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ভারতের জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎ লালের অষ্ট্রেলিয়া সফরে আমন্ত্রণ করা সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ান লন টেনিস এসোসিয়েশনকে তিনি অনুরোধ জানাবেন।

সোভিয়েট ফুটবল কর্ত্তৃপক্ষের তোড়জোড়

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৬২ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য শক্তিশালী দল গঠনকল্পে সোভিয়েট ফুটবল কর্ত্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের ছাড়পত্র গ্রহণ সম্পর্কে এক নতুন এবং কঠোর আইন প্রনয়ন করেছেন। এই নতুন নিয়ম জাতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন তাঁরা এই নিয়মের আওতার সম্মুখীন হবেন। এ রকম ৬০০ জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ২২টি প্রথম ডিভিসন ক্লাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই সকল খেলোয়াড়দেরই দল পরিবর্ত্তন সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ডিভিসনের একজন ফুটবল খেলোয়াড় কোন ক্লাবে অন্ততঃ তিন বছর একাদিক্রমে খেলার পর অন্য কোন প্রথম ডিভিসন ক্লাবে যোগদান করতে পারবেন। তা ছাড়া একজন খেলোয়াড় ছাড়পত্র গ্রহণের প্রথম আবেদনের পর তাঁর খেলোয়াড় জীবনে আর দু'বার ছাড়পত্র গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

সোভিয়েট ফুটবল কর্ত্তৃপক্ষের এই নতুন নিয়ম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা দেশের ফুটবল পরিচালক সংস্থা আই, এফ, এ'র কর্ত্তৃপক্ষের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এখানে অপেশাদারী প্রথায় ফুটবল খেলা প্রচলন এবং ফুটবল খেলার মহান আদর্শ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে বাইরের খেলোয়াড়দের আমদানী করা হচ্ছে। কোন জুনিয়র দলের ভাল খেলোয়াড়ের সন্ধান পেলেই বড় বড় ক্লাবরা তাঁকে দলে ভেড়াবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যান। খেলোয়াড়দের ক্লাবের প্রতি বিশেষ কোন দরদ থাকে না। প্রতি বছর চার শতের অধিক খেলোয়াড়কে দল পরিবর্ত্তন করতে দেখা যায়। আই, এফ, এ, কর্ত্তৃপক্ষেরও ছাড়পত্রে স্বাক্ষর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। আইন করে বাইরের খেলোয়াড় আমদানী বন্ধ না করলে এখানকার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পাবেন না।

দীপু ঘোষের ত্রিমুকুট লাভ

রাজ্য ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসিপের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে। ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় এ বছর যোগদান করায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বেশ কিছুটা বৃদ্ধি করে।

ভারতীয় টমাস কাপ খেলোয়াড় দীপু ঘোষ পুরুষদের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে জয়ী হয়ে "ত্রিমুকুট" লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। পুরুষদের ডাবলসে প্রণব বসু ও মিক্সড ডাবলসে উত্তর প্রদেশের মহিলা খেলোয়াড় মিসেস কাউর তাঁর জুটী হিসাবে খেলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে তিনি পাঞ্জাবের খ্যাতনামা খেলোয়াড় পি, এস, চাওলাকে পরাজিত করেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস

দীপু ঘোষ ১৫-৫ ও ১৫-১২ পয়েণ্টে পি, এস, চাওলাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস

মিস এস, কাউর ১১-৭ ও ১১-৬ পয়েণ্টে মিসেস এম, জেকবকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

দীপু ঘোষ ও প্রনব বসু ১৫-১১ পয়েণ্টে রঞ্জিত ব্যানাৰ্জ্জী ও অরুণ ব্যানাৰ্জ্জীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

দীপু ঘোষ ও মিস এস কাউর ১৫-০ ও ১৫-১ পয়েণ্টে পি, এস চাওলা ও মিসেস এম, জেকবকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস

এন, সি, রাজকুমার ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে পশুপতি দাসকে পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপের খেলায় জাপান ভারতের সম্মুখীন

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইন্যালে জাপান ভারতের সহিত খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। জাপান সেমি-ফাইন্যালে ৩-২ খেলায় ফিলিপাইন দলকে পরাজিত করে। তবে প্রথম দিন তারা দু'টি সিঙ্গলসেই পরাজয় বরণ করেছিলো। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হলো :—

পুরুষদের সিঙ্গলস

রেমণ্ড ডেরো (ফিলিপাইন) ৬-৪, ৭-৫ ও ৭-৫ সেটে আৎসুসী মিয়াগীকে পরাজিত করেন।

জুয়ান রোজ (ফিলিপাইন) ৬-৩, ৬-২ ও ৬-৩ সেটে ওসামুরা ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

আৎসুসী মিয়াগী (জাপান) ৬-২, ১-৬ ও ৬-১ সেটে জুয়ান রোজকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

ওসামুরা ইশিগুরো (জাপান) ৬-৪, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে রেমণ্ড ডেরোকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

মাসাউ নাগাসাকি ও আৎসুসী মিয়াগী (জাপান) ৮-৬, ৬-৩ ও ৬-১ সেটে জুয়ান রোজ ও ডুংগোকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

প্রত্যেক স্কুল-কলেজের "কোচ" থাকা দরকার

ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা সম্প্রতি এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে জাতি গঠনের ব্যাপারে খেলাধূলা অন্যান্য কার্যাবলীর মতই গুরুত্বপূর্ণ! সব দেশের শিক্ষাবিদগণ একথা স্বীকার করেন যে দৈহিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতার মতই প্রয়োজনীয়। মহারাজা আরও বলেন যে এ দেশে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ জেগেছে তবে এই জাগরণের জন্য অনেক সময় লেগেছে। এই বিলম্বের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর ধারণা যে এদেশে "কোচের" সংখ্যা খুবই অল্প। তিনি মনে করেন যে প্রত্যেক স্কুল কলেজের নিজস্ব "কোচ" থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাতিয়ালার মহারাজার বক্তৃতাটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে ভারতের খেলাধূলার উন্নতির বিষয়ে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। দেখা যাক ভারতের খেলাধূলার উন্নতির জন্য স্পোর্টস কাউন্সিলের পরিকল্পনা কতখানি কার্য্যকরী হয়।

কলিকাতায় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা

ভুবনেশ্বরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সভায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়ে গেছে। আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও টেনিসের উত্তর অঞ্চলের খেলা ও ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। এ ছাড়া কলকাতার পূর্ব্বাঞ্চলের ক্রিকেট খেলা হবে। গত তিন বছর আগে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল চারিটি অঞ্চলে খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ভুবনেশ্বরের সভায় স্থির হয়েছে যে এ বছর ফুটবল ও হকি দু'টি অঞ্চলে খেলা হবে। নিম্নে ক্রীড়াসূচীর তালিকা দেওয়া হ'লো :—

অ্যাথেলেটিকস—ভেঙ্কটেশ্বর

ফুটবল—কলকাতা

উত্তরাঞ্চল ও ফাইন্যাল আনামালিতে—
দক্ষিণাঞ্চলের খেলা।

হকি—

লক্ষ্ণৌ

উত্তরাঞ্চল ও ফাইন্যাল। গুজরাট কিংবা ভেঙ্কটেশ্বর
দক্ষিণাঞ্চলের খেলা।

লন টেনিস—

কলকাতা উত্তরাঞ্চল ও ফাইন্যাল। কেরল দক্ষিণাঞ্চলের খেলা।

ক্রিকেট—

কলকাতা পূর্ব্বাঞ্চল; আগ্রা উত্তরাঞ্চল ও ফাইন্যাল। ওসমানিয়া দক্ষিণাঞ্চল। কর্ণাটক পশ্চিমাঞ্চল।

সন্তরণ—কলকাতা।

ক্রিকেট খেলার নূতন বিধি

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে পরীক্ষামূলক ভাবে ক্রিকেট খেলার কয়েকটি নতুন-বিধি বলবৎ আছে। সেগুলি ইংলণ্ড সফরকালে অষ্ট্রেলিয়া দল মানতে রাজি হয়েছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলাতেই এই নতুন বিধি প্রযোজ্য হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এই নতুন বিধি অনুসারে লেগের দিকে পাঁচ জনের বেশী "ফিল্ডার" সাজান যাবে না। এর মধ্যে স্কোয়ার লেগে পিছনে দু'জন থাকবে। বাউণ্ডারীর দৈর্ঘ্য ৭৫ গজ হবে। এ ছাড়া উইকেট ঢাকা দেওয়া

সময় নষ্ট করা, "থ্রোইং" বল করা এবং বল করার সময় পা টানার বিষয়ে বিধিগুলিও আছে। তবে অষ্ট্রেলিয়া দল ৮৫ ওভার কিংবা ২০০ রাণের পর নতুন বল নিতে পারবে। পূর্ব্বে ৭৫ ওভার কিংবা ২০০ রাণের পর নতুন বল নিতে পারতো।

ক্রিকেটের দু'টি শ্রেষ্ঠ দেশ—ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া—যখন এই নতুন বিধি মানতে রাজী হয়েছে—তখন ক্রিকেট অনুরাগী সকল দেশই এই বিধি মানবে—সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উন্নতি বিধান

সম্প্রতি জার্ম্মাণ ফেডারেল সাধারণতন্ত্র অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উন্নতি বিধান কল্পে যে সব নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেছে—তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মাণী মনে করে যে অলিম্পিক খেলার সব সাম ডোপিং বন্ধ করা প্রয়োজন এবং শীতের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অধিক নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া পদক বিভ্রাটেরও অবসান হওয়া দরকার। জার্ম্মাণ ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির সদস্যগণ প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক প্রতিযোগীর যোগদান সম্পর্কে বলেছেন, "আমাদের মতে, এই প্রশ্নটা মোটেই আলোচনার যোগ্য নয়। এভাবে অলিম্পিক খেলা চলতে পারে না।"

তাঁরা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। বছরের পর বছর এই জাতীয়তাবাদের উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ সম্পর্কে অলিম্পিক কর্ত্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। তা না হলে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপর একটা দারুণ অমঙ্গলের ছায়া ফেলবে এই জাতীয়তাবাদ।

জার্ম্মাণ ক্রীড়া জগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে একটা নিরপেক্ষ ভেরী নিনাদ থাকলেই ভালো হয়। তাছাড়া অলিম্পিক মাঠে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকারও মোটেই কোন প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক খেলোয়াড়দের ব্যাজের উপর তাঁর দেশের নাম লেখা থাকলেই যথেষ্ট। মেলবোর্ণের অলিম্পিক খেলায় বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়গণ যেভাবে জাতীয় পার্থক্য বর্জ্জন করে এক সঙ্গে মার্চ্চ করেছিলেন—ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থার ফলে দুনিয়ার মানুষ ভালো করেই দেখতে পাবে যে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়গণ পরস্পরের বন্ধু।

রোমের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছেন যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে হয়তো একটা বিরাট অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ফলে অলিম্পিক খেলার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। জার্ম্মাণ ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির সদস্যগণ এ সম্পর্কে অবশ্য একটা কার্য্যকরী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কোন একটা ক্ষুদ্র দেশে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাধারণ আড়ম্বরের অপেক্ষা খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্যই বড় হয়ে দেখা দেবে। এ প্রসঙ্গে সবার আগে গ্রীসের নাম করতে হয়। আধুনিক অলিম্পিক খেলার জন্মভূমি গ্রীসই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত স্থান।

জার্ম্মাণ ফেডারেল সাধারণতন্ত্র অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উন্নতিবিধানকল্পে যে সব প্রস্তাব করেছেন—তা সত্যই প্রশংসনীয়। আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এতে অলিম্পিক খেলার মূল ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দিল্লীতে কমনওয়েলথ গেমস হওয়ার কথা

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সভায় ঠিক হয়েছে যে ১৯৬৬ সালের কমনওয়েলথ ও এম্পায়ার গেমস ভারতে যাতে অনুষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা হবে। এর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটা সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সাব-কমিটিতে আছেন রাজা ভালিন্দর সিং। শ্রীমৈনুল হক, শ্রীঅশ্বিনীকুমার, কমাণ্ডার সেরেরা, শ্রী পি, কে, মাথুর ও শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত। দিল্লী সরকার ও প্ল্যানিং কমিটির প্রতিনিধিদেরও এই সাব-কমিটিতে আমন্ত্রণ জানান হবে বলে ঠিক হয়েছে। ১৯৬২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার পার্থে কমনওয়েলথ গেমস কনফারেন্সে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ভারত যদি এই ক্রীড়ানুষ্ঠান করার সুযোগ পায় তা হলে দিল্লীতে এই অনুষ্ঠান হবে বলে স্থির হয়েছে। ক্রীড়ামোদী মাত্রেই এই সংবাদে উৎফুল্ল হবেন। দেখা যাক ভারত এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ পায় কিনা?

পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের সুযোগ লাভের সম্ভাবনা

উইম্বলডন ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার ও অপেশাদার উভয় শ্রেণীর খেলোয়াড়দের জন্য মুক্ত করার ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লন টেনিসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিশেষ চেষ্টা করছেন। গত বছর জুলাই মাসে প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈঠকে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তবে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে মোটেই হতাশ হয়নি। আগামী জুলাই মাসে ষ্টকহোমে ৭০টি রাষ্ট্রের সদস্য বিশিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক লন টেনিস এসোসিয়েশনের যে বৈঠক হবে তাতে এই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন হবে বলে জানা গিয়েছে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক বারটি করে ভোটের অধিকারী। ফ্রান্স পেশাদার গ্রহণের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছে। গত প্যারী বৈঠকে অষ্ট্রেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিল; কিন্তু মাত্র পাঁচটি ভোট কম পড়ায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে প্রস্তাবটি গতবার নাকচ হয়েছিল। আশা করা যায় যে, এবার অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেবেন এবং তাহলে ১৯৬২ সাল থেকে উইম্বলডন ও অপর প্রথম শ্রেণীর লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রা যোগ দিতে পারেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে পেশাদারী প্রতিযোগিতা পৃথক ভাবে সুরু হচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অপেশাদারী খেলার মান নিম্নগামী হওয়ায় পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করছেন। আশা করা যায় যে পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়দের যে বাধা রয়েছে তা দূর হবে। খ্যাতনামা পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে অপেশাদার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পেলে টেনিস খেলার মান উন্নত হবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বেলেকাঁদির চিড়িয়াখানায় যখন সরকারী বেসরকারী চিড়িয়াদের ঝাটাপটি চলছে,—তখন বহির্জগতের বৃহত্তর চিড়িয়াখানায় সরকারী-বেসরকারী ভাল্লুক নাচ সুরু হয়ে গেছে। '৩৫ সালের ১লা এপ্রিল "all fool's day"তে '৩৫ সালের কুখ্যাত নতুন শাসনবিধি চালু করা হয়েছে,—এবং তা নিয়ে ভারতের আকাশ-বাতাস তোলপাড় সুরু হয়েছে।

শাসনবিধির দুটো অংশ—প্রদেশগুলোতে "অটোনমি,"—এবং কেন্দ্রে "ফেডারেশন" প্ল্যান। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বতের এই মুষিক প্রসব দেখে ২।৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর হুকুম-বরদার এবং হিন্দু মহাসভা ছাড়া সারা দেশের সকল রাজনৈতিক দলও সংস্থা,—এবং রবীন্দ্রনাথ বা ওয়াজির হাসানের মতন প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট নির্দলীয় নাগরিকেরা এক বাক্যে বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করে নিন্দা করলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

প্রদেশে অটোনমির দৌড়টাই পরীক্ষা করা যাক। চলতি ('২০ সালের) শাসনবিধিতে যে সব বিভাগ "রিজার্ভ সাবজেক্ট" বলে সরকার নিজ হাতে রেখেছিল,—মন্ত্রীদের হাতে দেয়নি,—নতুন শাসনবিধিতে সে বিভাগগুলো "রিজার্ভ সাবজেক্ট" নাম তুলে দিয়ে স্বদেশী মন্ত্রীদের হাতেই দেওয়া হল,—অর্থাৎ নেতাদের মধ্যে কয়েকটা নতুন বড় চাকরী বিলি করার ব্যবস্থা হল। ওপর ওপর দেখতে মন্দ নয়,—কিন্তু তলাটা একটু উলটে দেখলেই দেখা যাবে যে, সর্ব প্রকারের প্রকৃত ক্ষমতা থেকে মন্ত্রীদের একেবারে নস্যাৎ করার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

শাসনবিধিতে বলা হয়েছে,—প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব স্বয়ং বৃটিশ সম্রাটের হাতে ন্যস্ত হল,—শাসন কার্য পরিচালিত হবে তাঁর প্রতিনিধি গভর্ণরের দ্বারা তাঁর অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের মারফৎ, এবং শাসন সংক্রান্ত সর্ববিধ আদেশ-নির্দেশই গভর্ণরের নিজ আদেশ-নির্দেশ রূপে গণ্য হবে।

গভর্ণর নিজে মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচন বা গঠন করবেন, এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর করছে তাঁরই মর্জির উপর। অর্থাৎ গভর্ণর যাকে খুসী মন্ত্রী করতে পারেন,—যখন খুসী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে পারবেন,—ব্যবস্থাপক সভার কিছু বলবার নেই, কারণ মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী নন, তাঁরা দায়ী গভর্ণরের কাছে!

তারপর,—চলতি ('২০ সালের) শাসনবিধিতে গভর্ণরদের হাতে যে "ভেটো" এবং "সার্টিফিকেশন" ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার রায়কে উল্টে দেওয়ার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল—(ব্যবস্থাপক সভা যে প্রস্তাব পাশ করেছে, সেটা নাকচ করার নাম "ভেটো,"—আর ব্যবস্থাপক সভা যে প্রস্তাব বাতিল করেছে, সেটা বহাল করার নাম "সার্টিফিকেশন")—নতুন শাসন বিধিতে গভর্ণরদের সেই প্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তাঁর অপ্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে,—গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরী করে দিয়ে। তালিকাটা প্রকাণ্ড,—তাই সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন নামে চালানো হয়েছে,—special power, special responsibility, এবং personal discretion। power মানে ক্ষমতা, যা তিনি ইচ্ছে করলে প্রয়োগ করতে পারেন। responsibility মানে দায়িত্ব,—অর্থাৎ যেখানে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই হবে। আর personal discretion মানে,—একাধিক সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে তিনি যেটা ভাল মনে করবেন, সেটাই চালাতে পারবেন।

এখন এই বিশেষ ক্ষেত্র ও ক্ষমতার তালিকাটার একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) শান্তি-শৃঙ্খলার গুরুতর হানি নিবারণ (অর্থাৎ পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের ওপর সর্বকর্তৃত্ব)।

(২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলোর ন্যায্য অধিকার রক্ষা (অর্থাৎ বৃটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব)।

(৩) জাতিগত বা বাণিজ্যগত ভেদাভেদ নিবারণ (অর্থাৎ বৃটিশ কোম্পানীগুলোর তুলনায় ভারতীয় কোম্পানীগুলোকে বিশেষ সুবিধা দান নিবারণের আইন কানুন প্রণয়নের ক্ষমতা)।

(৪) বড়লাটের নির্দেশ পালনের ব্যবস্থা (অর্থাৎ প্রদেশের গণ্ডীর বহির্ভূত আন্তঃপ্রাদেশিক বা সর্বভারতীয় বৃটিশ স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব)।

(৫) সর্বপ্রকারের পুলিসসংক্রান্ত আইনকানুন প্রণয়ন ও পরিবর্তন (অর্থাৎ গণবিক্ষোভ দমনের ব্যবস্থা)।

(৬) সরকারের গোপন তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা (অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগকে আদালতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখার আইন)।

(৭) ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সম্পর্কে সর্ব কর্তৃত্ব—(কখন্ বসবে, কখন্ বসবে না, কখন্ শেষ করতে হবে—সবই গভর্ণরের মর্জি)।

(৮) ব্যবস্থাপক সভায় কোনো বিল পাশ হলে গভর্ণর ইচ্ছামত সেটাকে নাকচ করতে, বা বড়লাটের সম্মতির অপেক্ষায় স্থগিত রাখতে কিম্বা সেটাকে পুনর্বিবেচনার জন্যে বা সংশোধনের জন্যে আবার ব্যবস্থাপক সভায় ফেরৎ পাঠাতে পারবেন—(অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাটা একটা প্রহসন মাত্র—ছেলে খেলা)।

(৯) গভর্ণরের নিজ আদেশে প্রবর্তিত কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স কিম্বা পুলিশ সংক্রান্ত কোনো আইন কানুনের কোন সংশোধন, প্রত্যাহার বা হস্তক্ষেপ করে যদি কেউ ব্যবস্থাপক সভায় কোন বিল পেশ করতে চায়, তা হলে তাকে আগে সেটাকে গভর্ণরের কাছে পাঠাতে হবে, এবং তিনি ইচ্ছা করলে সেটাকে বাতিল করতে পারবেন—(অর্থাৎ গভর্ণরের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অপ্রতিহত)।

(১০) ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশা সম্পর্কে ভেদাভেদ নিবারণের জন্যে যে সব বিধিব্যবস্থা চালু আছে, তার বিরোধী বলে মনে হলে গভর্ণর যে-কোন বিল ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করতে না দিতে পারেন (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও গভর্ণরের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অপ্রতিহত)।

(১১) প্রদেশের আয়ের টাকার কতটা কি খাতে খরচ হবে, সেটা গভর্ণর নিজে স্থির করে দেবেন। ব্যবস্থাপক সভা তার আলোচনা করতে পারবে, কিন্তু ভোটের জোরে তা উল্টে দিতে পারবেন না।—(অর্থাৎ চলতি '২০ সালের শাসনবিধির প্রধান "রিজার্ভ সাবজেক্টটা" নতুন শাসনবিধিতেও রিজার্ভই থাকবে)।

(১২) গভর্ণরের সুপারিশ ব্যতীত মন্ত্রীরা বা ব্যবস্থাপক সভা কোনো খাতেই কিছু খরচের বরাদ্দ করতে পারবেন না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কোনো খাতের কোনো খরচ কমাতে বা না মঞ্জুর করতে বলে,—গভর্ণর সে রায় উল্টে দিতে পারবেন। (অর্থাৎ আগেকার রিজার্ভ ও হস্তান্তরিত সকল বিভাগেরই অর্থ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণর সর্বেসর্বা)।

(১৩) কোন নতুন ট্যাক্স বসাতে, বা কোন চলতি ট্যাক্স বাড়াতে হলে,—কিম্বা কোন ঋণ তোলার প্রয়োজন হলে যে সব নতুন বিধি-ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়,—কিম্বা কোন পূর্বকৃত ঋণ সম্বন্ধে যে সব বিধি-ব্যবস্থা আছে, তার কোন সংশোধন প্রয়োজন হলে আইন-কানুনের যে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়,—সে রকমের কোনো বিল গভর্ণরের সুপারিশ ছাড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা চলবে না।—(অর্থাৎ শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির মতন জাতি গঠন সংক্রান্ত যে বিভাগগুলো আগের শাসনবিধিতে হস্তান্তরিত বিভাগ বলে পরিচিত ছিল,—নতুন শাসনবিধিতে সেগুলোর ব্যয়-নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনমত ট্যাক্স বসানো বা বাড়ানো কিম্বা ঋণ তোলার জন্য মন্ত্রীরা যাতে বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন, সেটাও গভর্ণর দেখবেন)।

(১৪) যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছেনা, তখন প্রয়োজনমত গভর্ণর নিজেই আইন পাশ করতে পারবেন। যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছে, তখনও গভর্ণর প্রয়োজন মনে করলে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেই অর্ডিন্যান্স জারি —[illegible] মনে করলে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করে "গভর্ণরের আইন" পাশ করতে পারবেন।—(অর্থাৎ কতকগুলো বড় চাকরী ঘুষ দিয়ে একটা মন্ত্রিমণ্ডলী খাড়া করে গণতান্ত্রিক ঢংয়ের ব্যবস্থাপক সভার মুখোস পরে বৃটিশ স্বেচ্ছাচারতন্ত্রই রাজত্ব করবে)।

তারপর নতুন শাসনবিধিতে বলা হয়েছে—গভর্ণরের ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের পিছনে বড়লাটের সমর্থন থাকা চাই (অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার বদলে জনস্বার্থের রক্ষক বড়লাট),—এবং বড়লাট সে সমর্থন দেবেন নিজ ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে (অর্থাৎ বড়লাট তাঁর ব্যবস্থাপরিষদ বা শাসনপরিষদের ধার ধারবেন না)।

আবার,—বড়লাট যখন তার ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন,—তখন তার পিছনে ভারত সচিবের সমর্থন মারফৎ স্বয়ং রাজার সমর্থন থাকা চাই (অর্থাৎ অন্তিমে স্বয়ং বৃটিশ রাজাই তাঁর ভারতীয় প্রজাদের একচ্ছত্র ও দয়াময় রক্ষক)।

এসব বুজরুকীর আসল উদ্দেশ্য,—বড়লাট দেখবেন, গভর্ণর যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক বা সর্বভারতীয় কোন বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না বসেন,—এবং ভারতসচিব দেখবেন, বড়লাট যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন কিছু না করে বসেন, যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থ কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়।

* * * *

এর নাম প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন—প্রভিন্সিয়্যাল অটোনমি। এও যেমন দুপুরে ডাকাতি,—তেমনি মোটা মাইনে ঘুষ খেয়ে ধড়াচুড়ো পরে' মন্ত্রী সেজে ডিপার্টমেন্টের নৈবিদ্যির ওপর সন্দেশের মতন বসে গণতন্ত্রের ঢংয়ে বৃটিশ স্বেচ্ছাচার ঢাকা দেওয়াটাও একটা ঘৃণ্যতম দেশদ্রোহিতা।

কংগ্রেস তীব্র ভাষায় এই শাসন সংস্কারের নিন্দা করে বললে, তারা এর বিরোধিতা করবে। মোসলেম লীগ, লিবারেল ফেডারেশন প্রভৃতিও নিন্দা করলে (হিন্দু মহাসভা বাদে—তারা এটাকে অভিনন্দন সহকারে গ্রহণ করলে)—অন্যান্য দল এবং বিশিষ্ট নেতারাও একবাক্যে বললে,—আমাদের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তো দেওয়া হয়নি-ই, বরং লাট সাহেবদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে গণতন্ত্রের বিকাশের সকল পথও রুদ্ধ হয়েছে। জহরলাল বললেন, ভারতের ভবিষ্যত বন্ধক দেওয়া হয়েছে। (আজ জহরলাল নতুন করে সে কাজ চূড়ান্ত ভাবে নিজেই সম্পূর্ণ করছেন !)।

বম্বেতে মোসলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি সার ওয়াজির হাসান বলেন,—"কয়েক বছর ধরে কমিটী-কমিশন-কনফারেন্স রিপোর্ট প্রভৃতির ঘটা করে এক দানবীয় কাণ্ড উদ্ভাবন করা হয়েছে, এবং শাসন সংস্কারের নামে সেটা আমাদের ঘাড়ে জোর করে চাপানো হচ্ছে।"

সার চিমনলাল বলেন,—"আগে বরাবর যেসব আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, হোয়াইট পেপারে দেখা গেল, তার কোন পাত্তা নেই ! তার পর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটী যেসব সুপারিশ করলেন, সেগুলো আরো প্রতিক্রিয়াশীল। তারপর যখন ইণ্ডিয়া বিল রচিত হল, তখন দেখা গেল, কর্তারা আরো পিছু হটেছেন। তারপর হাউস অফ কমন্স কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরো খানিক
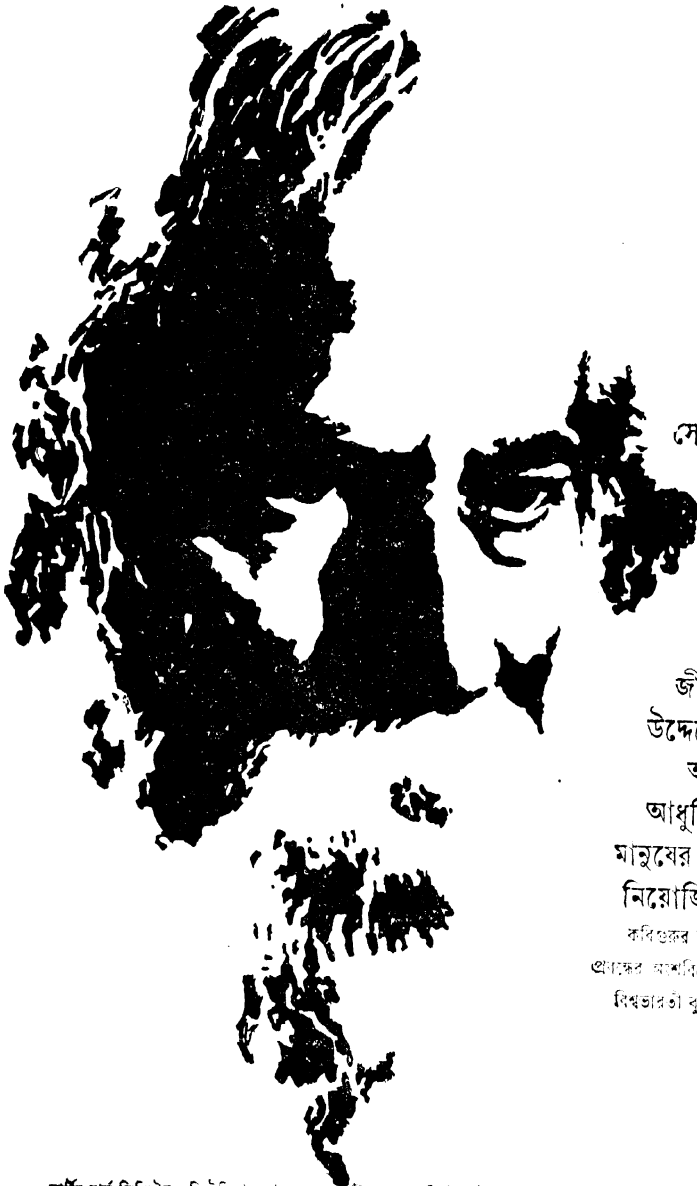
সে যুগে মানুষ তার
লাঙ্গল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিকে
মানুষের কল্যাণের জন্যই
নিয়োজিত করতে হবে।
কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী
প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
মার্টিন বার্ন লিমিটেড, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড, বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড,
দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ এবং দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এনজিনীয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত।

পিছিয়ে গেল। মোট কথা, বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধিদের কোনো কথাতেই বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করা হয়নি।"—(ইণ্ডিয়ান রিভিউ—জুন ১৯৩৫)।

এন এস শ্রীনিবাসন বলেন,—"শাসন বিধির ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ ধারায় বলা হয়েছে,—বিলেতে গঠিত কোম্পানীগুলোকে ভারতের ফেডার‍্যাল বা প্রাদেশিক আইন অনুসারে গঠিত কোম্পানী হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিলেতে রেজিষ্ট্রীকৃত জাহাজগুলোকেও স্বদেশী জাহাজ রূপেই গণ্য করতে হবে এই সব উপায়ে ভারতের আর্থিক ভবিষ্যতকে বন্ধক দেওয়া হয়েছে।"—ইণ্ডিয়া রিভিউ—জুলাই ১৯৩৫)।

সার শিবস্বামী আয়ার বলেন,—"সাইমন কমিশন এমন কৌশলে এ পরিকল্পনা রচনা করেছে, যাতে ভারত চিরকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে বাঁধা থাকবে।"—(ইণ্ডিয়ান রিভিউ—ডিসেম্বর ১৯৩৫)।

লর্ড জেটল্যাণ্ড বললেন,—"এ শাসন সংস্কারের গুরুত্ব অসীম, একে কো-অপারেটিভ ইম্পিরিয়্যালিজম বলা যেতে পারে, আর এটা হচ্ছে বৃটিশ জাতির শাসন প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"—(ঐ)।

* * * *

এই প্রাদেশিক বজ্জাতির পর এখন একবার কেন্দ্রীয় বজ্জাতির একটু খবর নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনের প্ল্যান হয়েছে ফেডার‍্যাল—বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে গঠিত সংযুক্ত রাষ্ট্রের ঢং, এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোকে টেনে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। দেশীয় রাজ্যগুলোকে জোর করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার আওতায় আনা যায় না,—সুতরাং তারা যাতে স্বেচ্ছায় আসে, তার জন্যেও নানা কৌশল তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সাড়ে পাঁচশোর ওপর দেশীয় রাজ্যের স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়ার ওপর নির্ভর করলে অনন্ত কালেও তা হয়ে উঠবে না। সুতরাং ব্যবস্থা হয়েছে,—হয় অর্ধেক সংখ্যক দেশীয় রাজ্য,—না হয় এমন কতকগুলো দেশীয় রাজ্য, যাদের লোক সংখ্যা দেশীয় রাজ্যের সমগ্র লোক সংখ্যার অর্ধেক,—ফেডারেশনে যোগ দিলেই ফেডারেশন হবে। আসলে উদ্দেশ্যটা এই যে, বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলো যোগ দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

তার জন্যে তাদের কিছু তোয়াজ করা, লাভ দেখানো এবং লোভ দেখানোর ব্যবস্থা হল। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের একটা বড় বন্দরের দাবী ছিল, সেটা মেটানোর লোভ দেখানো হল। মহীশূর রাজ্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সরকারকে চুক্তি অনুসারে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা দিত,—সেটা মকুব করার লোভ দেখানো হল। হায়দারাবাদের নিজামের বেরারের দাবী মেটানো হল,—নিজাম হলেন বেরারেরও নিজাম, এবং প্রিন্স আলি হলেন প্রিন্স অফ বেরার। এই ভাবে বড় বড় রাজ্যগুলোকে টানার চেষ্টা চলতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফেডার‍্যাল লেজিসলেচারে দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছিল শত করা ৪০ জন। অর্থাৎ দেশীয় রাজারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ব্যাপারে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, অথচ বৃটিশ ইণ্ডিয়া তাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কিন্তু এতে সত্ত্বেও দেশীয় রাজারা বেঁকে বসলো—তারা চেম্বার অফ প্রিন্সেস এর মিটিং করে স্থির করলে, তারা ফেডারেশনে যোগ দেবে না,—কারণ তাতে তাদের স্বাধীন দেশের মর্য্যাদার হানি হবে,—খাস বিলেতের সঙ্গে যে সন্ধিচুক্তির বলে তারা স্বাধীন দেশ বলে গণ্য,—তার হানি হবে, এবং তারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার প্রদেশগুলোর পর্য্যায়ে নেমে পড়বে।

সুতরাং তাদের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার প্রকৃত প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে বৃটিশ সরকার এক রয়েল কমিশন (বাটলার কমিশন) নিযুক্ত করলে, এবং সে কমিশন রাজাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলে যে, দেশীয় রাজারা তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে স্বাধীন বা সভারেন বটে, কিন্তু তাদের ওপরে বৃটিশের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বা প্যারামাউণ্ট্‌সি বর্তমান।

এসব নিয়ে দেরী হতে লাগলো, বিশেষত কেন্দ্রীয় ফেডারেশন প্ল্যানের বিরোধিতায় কংগ্রেস এবং সারা দেশ এককাট্টা হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রের প্ল্যান স্থগিত রাখা হল,—'২০ সালের শাসনবিধি অনুসারেই কেন্দ্রীয় সরকার চলতে লাগলো,—এবং প্রদেশগুলোতে শাসনবিধি চালু করা হল এবং নির্বাচনের তোড়জোড় সুরু হল।

পাছে খয়ের খাঁয়ের দল দেশের প্রতিনিধি সেজে ব্যবস্থাপক সভায় ঢোকে, এই অজুহাতে '৩৬ সালের এপ্রিলে লকনৌ কংগ্রেসে জহরলালের সভাপতিত্বে স্থির হল, নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেবে। তারপর ফৈজপুর কংগ্রেসে কংগ্রেসী নির্বাচনী ইস্তাহার রচিত ও গৃহীত হল, এবং সারা দেশে এই বলে প্রচারিত হল যে, "কংগ্রেস তার পূর্ব সঙ্কল্পের পুনর্ঘোষণা করছে যে, তারা এ শাসনবিধির কাছে কিছুতেই মাথা নত করবে না,—এর সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে এবং বাইরে থেকে এর ধ্বংসের জন্যেই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গঠন সম্পর্কে কোন বিদেশী শক্তির কর্তৃত্ব বা অধিকার স্বীকার করে না।'

নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব নেওয়া হবে কিনা, এ নিয়ে ফৈজপুর কংগ্রেসে আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটি করে স্থির করা হল যে, আপাতত এ প্রশ্ন স্থগিত থাকবে, এবং নির্বাচনের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হবে।

তারপর নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করা হল, নির্বাচনে জয়লাভের পর তাঁরা মন্ত্রিত্ব নেবেন না,—এবং তাহলেই শাসনবিধি বানচাল হয়ে যাবে। সঙ্গে একথাও বলতে ভুললেন না, যদি তাঁদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা আসে তাহলে তাঁরা জনগণের সঙ্গতির জন্যে কি কি কাজ করবেন। কিন্তু শাসন সংস্কার বানচাল করার জন্যে উৎসাহিত হয়েই লোকে কংগ্রেসকে ভোট দিলে এবং মাদ্রাজ, বম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাতে কংগ্রেস একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে নির্বাচনে জয়ী হল। আর বাংলা ও আসামে কংগ্রেস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

এর মধ্যে একটু মজা হল কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের কল্যাণে। কংগ্রেসকে বেমালুম কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের ভিত্তিতেই জেনারেল বা অমুসলমান কেন্দ্রগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। সারা দেশে ৪৮২টা মুসলমান প্রতিনিধির মধ্যে কংগ্রেস ৫৮জন প্রতিনিধি মাত্র খাড়া করেছিল, এবং তার মধ্যে মাত্র ২৬ জন নির্বাচিত হয়েছিল —সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খাঁর দেশেই ১৫ জন, আর বাকি সারা দেশে মাত্র ১১জন। লকনৌ কংগ্রেসে মুসলমানগণ গণসংযোগের

পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে কাজ বিশেষ কিছু করা হয়নি, সীমান্ত প্রদেশে ছাড়া।

যাই হোক, নির্ব্বাচনের পর স্বভাবতই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন সামনে এসে পড়লো। আগে যখন কেউ বলতো,—"কাউন্সিলে যাবো এবং শাসনতন্ত্রটাকে ভাঙ্গবো" এ এক অযৌক্তিক মনোভাব তখন কংগ্রেস নেতারা বলতেন,—"নিয়মতান্ত্রিকতার যুক্তি অনুসারে ওটা অযৌক্তিক বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক যুক্তি এরকম অসামঞ্জস্য গ্রাহ্য করে না।" কিন্তু এখন অনেক নেতার আওয়াজ নরম হয়েএলো। কংগ্রেস বললে, লাটসাহেব যদি কথা দেন যে, তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষমতার বলে আমাদের কাজকর্মে বাধা দেবেন না, তাহলে আমরা মন্ত্রিত্ব নিতে পারি। গভর্ণর বললেন, এমন কথা আমি কেমন করে দিতে পারি? তা হয় না। সুতরাং কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিতে অস্বীকার করলে এবং একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল।

কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সকলের মতিগতি একরকম নয়। কেউ মন্ত্রিত্ব নেওয়ার বিরোধী—কেউ নেওয়ার পক্ষপাতী—আর কারো বা মন টানছে একদিকে, আর চক্ষুলজ্জা আর এক দিকে। ৩৭ সালে মন্ত্রিত্ব নেওয়ার আগে পর্যন্ত এক বছর ধরে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো, সেটা কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক মনোহারী অধ্যায়। সেকথার আগে একবার বেলেকাঁদির চিড়িয়াখানায় ফিরে আসা যাক।

* * * *

আমি একা একা কাগজপড়ি, নোটকরি, ডায়েরী লিখি, আর বিমল গুহ ও অনিল বাগচি দিনরাত কানাকানি করে, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, আবার মাঝে মাঝে দু'জনে ঝগড়া করে,—বাগচির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে বিমল গুহ আমার কাছে এসে তার দুঃখের কথা উজাড় করে, আমি দেখে এবং শুনে সব কথাই জানতে পারি। তাছাড়া ২।১ জন কনেষ্টবলের কাছ থেকে এবং ইব্রাহিমের কাছ থেকেও কিছু কিছু জানতে পারি। কনেষ্টবলেরা নিজেদের গুড়গুড়ি ভাঙ্গার জন্যে আপনা হতে আমার কাছে এমন ভাবে কথা পাড়ে, যাতে আমি বুঝতে পারি, কারো কাছে কিছু না বলতে পেরে ওদের পেট ফুলে উঠেছে ইব্রাহিমকে না জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না, শুধু দেখে যায় লোকটার চমৎকার স্বভাব।

তার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, তেল চুকচুকে বাবরি চুল এবং চমৎকার পেশীবহুল দেহ। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কি বরাবরই গ্রামে থাক? সে বললে, না, আগে বিদেশে চাকরী করেছি। কোথায়? জিজ্ঞাসা করতে বললে, নানা জায়গায় যেতে হত, কাজ করতুম সার্কাসের দলে।

লোকটা এমন সৎ প্রকৃতির যে, আমি তেমনটি আর দেখিনি। সে বোঝেই না যে কত honest? ছেলে মানুষদের মতন একটু আধটু চালাকি করে কথা বলা তার কাছে adventure এর মতন। তার অবস্থা ও স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে দেখে গাঁয়ের একদল লোক তার পিছনে লাগলো। একদিন মসজিদে নমাজ পড়ে ফিরে এসে ইব্রাহিম বললে,—আজ নমাজের পর সকলে মিলে ঘোঁট পাকিয়েছিল, আমাকে একঘরে করবে, আমি হিঁদুর বাড়ী ভাত খাই বলে। তা আমি বললুম, আমি নিজে রাঁধি, বাবুর রাঁধা ভাত তো খাই না! বরং বাবুরই জাত গিয়েছে, আমার রাঁধা ভাত খেয়ে। তখন অনেকে বললে, তা বটে।

ইব্রাহিম আমাকে এমন সঠিক ভাবে বুঝে নিয়েছে যে, আমার সামনে অসঙ্কোচে ঐ কথাগুলো বলতে পারলে,—এ দেখে সেদিন আমার মন অনেকদিন পরে সত্যিই একটা বিমল আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। ও যদি স্বদেশী বাবু হত' তাহলে এমন হতে পারতো না।

ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, ভুগছি, তার ওপর মনটা সর্বদাই বাগচিদের যন্ত্রণায় পীড়িত—একদিন ইব্রাহিমের ওপর সব ঝাল ঝেড়ে তাকে স্রেফ তাড়িয়েই দিলুম—বললুম আর কাজ করতে হবে না। সে নিঃশব্দে চলে গেল। বাগচিরা দেখলে, কিছু বললে না। একবার আমার খোঁজও নিলে না। সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যার পরে অসহায়ভাবে ভাবছি, কেমন করে চলবে,—দেখি দরজা দিয়ে উঁকি মারছে ইব্রাহিম! রাগ হয়ে গেল—বললুম, আবার এসেছো কেন? সে বললে, এ বিদেশে দেখবার আর কে আছে? তাই এসেছি। আমার চোখে জল এল।

কিন্তু চিড়িয়াখানা আরো মনোহারী হয়ে উঠলো। দারোগা আহমদ হোসেন গোপালগঞ্জে বদলী হলেন এবং পাংশা থেকে এলেন অন্নদা ভাদুড়ী। আসার পর প্রথম দিনেই তিনি অনিল বাগচির ঘরে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ আলাপ চলছে দেখে আমি গিয়ে বসলুম এবং জিজ্ঞাসা করলুম,—বারেন্দ্র বামুন কলমির ঝাড়, কোনো সম্পর্ক টম্পর্ক খুঁজে পেলেন? তিনি বললেন, সেই কথাই হচ্ছিল, ছোক্‌রা সম্পর্কে আমার শ্যালক হয়।

বাঁচলুম! এইবার অনিল বাগচির দৌরাত্ম্যে হাড়-মাস কালি হবে।

আমাদের মুসলমান চাকর দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,—"অন্তত nationalityর দিক থেকে মুসলমানের হাতে খাওয়া উচিত নয়।"

ন্যাশান্যালিজমের বহর দেখে হাসি পেল—বললুম পরে এ বিষয়ে আলাপ করবো। আমার লজ্জা হচ্ছিল, পাছে তিনি টের পান যে, আমাদের হাঁড়ি আলাদা। মনে করলুম, চোখ-কান বুজে আবার জয়েণ্ট মেসিং করতে পারলে লজ্জা বাঁচে। কিন্তু, হরি হরি! কর্তারা সব ফাঁস করে দিয়েছিল এবং আমার কিছু নিন্দাও অবশ্য হয়েছিল। কারণ তারপর থেকে অন্নদা বাবু ওদের ঘরে এসে বসে আলাপ করে চলে যেতেন, আমার সঙ্গে আলাপ করতেন না। আমি স্বাভাবিক সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতুম, যেন কিছুই হয়নি বা কিছুই বুঝিনি।

আহমদ হোসেন চলে যাওয়ার আগেই অন্নদা বাবু পরিবার এনে জাবরখোলের সুরেন সান্ন্যালের বাড়ীতে রেখেছিলেন—তিনি ছিলেন পাংশার ষ্টেশন-মাষ্টার—রিটায়ার করেছেন। প্রথম দিনই বাগচি রাত আটটায় বাসায় ফিরলো—জাবরখোলে গিয়েছিল। তারপর যখন অন্নদা বাবুর পরিবার থানার কোয়ার্টারে এল, তখন থেকে বাগচি রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সেখানেই পড়ে থাকে।

বিমল গুহকে প্রায় আমার মতনই একা থাকতে হয়। ক্রমে সেও দারোগার বাসায় যাতায়াত স্বরু করলে। বাগচি দুবেলা চা খেতে বাসায় আসে, সঙ্গে আসে দারোগার একগাদা ছেলেমেয়ে—১৩।১৪ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীও সেজেগুজে রোজ চা খেতে আসে।

একদিন ওদের বাসায় বিমল বাবুরও নিমন্ত্রণ হল, আমি বাদ। থানার বক্সী এক জোয়ান ছোকরা, তারও নিমন্ত্রণ। দুজন বুড়ো কনেষ্টবল আমাকে বুড়োবাবু বলে মুখ টিপে হাসলো। ওরা লক্ষ্য করেছে,—আমার লজ্জা হল।

ক্রমে বাগচি লক্ষ্মীকে গান শেখায়,—ছেলেপিলেরা গণ্ডগোল করে বলে গিন্নি তাদের নিয়ে এক ঘরে থাকেন, ওরা আর এক ঘরে দরজা বন্ধ করে গান শেখাশিখি করে,—লক্ষ্মী নাচও দেখায়,—আর জমাদারের মেয়ে আড়ি পাতে এবং গেজেট করে।

বাগচি লক্ষ্মীকে সঙ্গীত বিজ্ঞানের গ্রাহক করে দিয়েছে, স্নো-পাউডার কিনে দিয়েছে, একদিন গ্রাম থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা "প্রেজেণ্ট" করেছে। বিমল বাবুর কাছে খায়, টাকা দেয় না,—নিজের অ্যালাউন্স ঐভাবে খরচ করে, তার ওপর হাটের দোকানে দেনা জমেছে। তারা আমার কাছে তাগাদা করে! আর বিমলবাবুর তো প্রাণ যায়।

ওরা মামা ভাগ্নীতে নদীর ঘাটে স্নান করে, পরস্পরের পিঠে সাবান মাখিয়ে দেয়,—মডার্ণ গিন্নি আস্কারা দেন,—কনেষ্টবলগুলো গুঞ্জরণ করে। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে, একদিন এক কনেষ্টবল হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করে বসলো,—আচ্ছা বাবু, যদি কোন লোক মা ও মেয়ে দুজনের সঙ্গেই অ-ব্যবহার করে,—সে কি রকমের লোক?

আমি বুঝলুম—ঐ কনেষ্টবলই দারোগার বাসায় যাতায়াত করতো—বিরক্ত হয়ে বললুম, তোমার এ সব নিয়ে মাথাব্যথার [illegible] কি কাজ? সে ঘাবড়ালো না,—বললে, উনি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল্লেই পারেন! আবার শুনতে পাই, বোন-ভাগ্নী! আমি সরে পড়লুম।

ভাদুড়ী গিন্নি মডার্ণ। কিন্তু ফ্যাসানও নেই,—ছা-পোষা,—আর সম্ভ্রম বোধেরও বালাই নেই। নাকে-মুখে-চোখে যেন খৈ ফুটছে,—গোড়া থেকেই চেঁচিয়ে হেসে হৈ চৈ করে একাকার। একটা তুলনা দিই,—ছেলেবেলায় দেখা বায়স্কোপের এক কমিক ফিল্‌ম: একটা মেম ঝি অসম্ভব কুড়ে, সর্বদাই যেন আধ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। রান্নাঘর থেকে খানা টেবিলে পরিবেশনের জন্যে খাবার আনছে,—পাত্র কাৎ হতে হতে খাবার পড়তে পড়তে অর্ধেক এসে পৌঁছলো টেবিলে। অতিষ্ঠ হয়ে কর্তা তাকে এক ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল—ডাক্তার এক ডোজ এমন ওষুধ খাইয়ে দিলেন যে, ঝি মুহূর্তের মধ্যে চটপটে এবং ক্রমে ছটফটে হয়ে গেল। হাত পা চোখ মুখ সর্বদাই অস্থির,—চলতে ফিরতে ধাক্কা লাগিয়ে জিনিসপত্র উল্টে ফেলে ভেঙ্গেচুরে একাকার!—ভাদুড়ী গিন্নিকে দেখলে মনে হয়, সেই ওষুধ খেয়েছে।

হৈ চৈ করে ছেলের এক "ব্যামো"র বিবরণ দিলেন, তার উরুর একটা শির ফুলে উঠেছিল,—নিজের উরুর কাপড় সরিয়ে দেখিয়ে দিলেন—এই হাঁটুর ওপর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত।

পাংশায় থাকতে ডেটিনিউ শিশিরের সঙ্গে স্নান করতে জলে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে জোঁক দেখে কেমন চীৎকার করেছিলেন, চেঁচামেচি করে তা বুঝিয়ে দিয়ে শোনালেন, কেমন করে শিশির ওঁকে সাঁতার কেটে টেনে এনে তুলেছিল।—চিড়িয়াখানা!

এইবার ভাদুড়ী মশায়ের একটু খবর নেওয়া যাক। বাংলানবীশ মুসলমান সরকারী ডাক্তার সাহেবও আগে পাংশায় ছিলেন,—তাঁকে ভাদুড়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন,—লোক মন্দও নয়, আত্মা-মরিও নয়। আণ্ডার গ্রাজুয়েট, কিন্তু ফিলজফি ভাল জানেন। দারোগা হিসেবে কম্পিটেণ্ট নয়, ঘুষ-টুষ বেশী খান না, অর্থাৎ খেতে জানেন না,—দালালরাই প্রায় সব মেরে দেয়, উনি ২।৪ টাকা পেলেই ডাম গ্ল্যাড। পাংশায় এক তেলী ছিল ওঁর দালাল। তার যন্ত্রণায় অন্য অফিসাররা অস্থির থাকতো। এখন তারা আর তেলীকে থানায় ঢুকতে দেয় না।

আসার পরই একদিন রাত্রে লক্ষ্মীকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে এসে মেয়েকে একটু তামাসার ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ দেখি, কোন ডেটিনিউ বাবুকে পছন্দ হয়,—কার কাছে পড়বি! মেয়ে ভঙ্গী করে বললে,—যান!

ক্রমে দেখা গেল, একটি মূর্তিমান অষ্টাদশ শতাব্দী, কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী এবং সংস্কৃত বচন আওড়ানো দেখে মফঃস্বলের পুলিশ মহলে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে।

একদিন বিমলবাবুর ঘরে বসে লেকচার দিচ্ছিলেন, একটু নেড়ে চেড়ে দেখার ইচ্ছে হল। গিয়ে বসলুম,—তিনি তখন বলছেন—ফরিদপুরে মেয়েদের বোর্ডিংএ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, শতকরা এতজন pregnant! লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছে, কড়াকড়ি আছে, কিন্তু তিনিও তো ঐ তন্ত্রের! বলে, কি করে হল? আরে বাবা চাকর দরোয়ানতো আছে!

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললুম, ভাগ্যে পুরুষ মানুষ পোয়াতি হয় না,—হলে সব ব্যাটার সতীপনা বেরিয়ে পড়তো।

ভাদুড়ী—কিন্তু পুরুষ কি সবাই খারাপ? আর nature

বলছে, পুরুষ একাধিক স্ত্রী সম্ভোগ করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তা করতে গেলে সন্তান জননের পক্ষে, এবং ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানি হয়।

আমি—সেই জন্মেই তো ওরা মার্গারেট স্যাঙ্গারের আমদানী করেছে। (গর্ভনিরোধ বিশেষজ্ঞ—ভারতে বক্তৃতা সফর করে গেছেন)। পুরুষেরা বেপরোয়া বা খুশী করে বেড়াবে, আর মেয়েরা একবার একটু এদিক-ওদিক হলেই সমাজের কাছে এবং নিজের কাছেও জব্দ হয়ে যাবে,—এমন দিন আর থাকবে না।

ভাদুড়ী—কি সাংঘাতিক কথা! সতীত্ব ছিল হিন্দুনারীর আদর্শ, আজ সে আদর্শ তো গেছেই,—গর্ভনিরোধে যে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেটাও কেউ দেখছে না।

আমি—কে বলে দেখছে না? স্বাস্থ্যটা বিজ্ঞানের এলাকা,—বিজ্ঞানই স্বাস্থ্য অটুট রেখে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে। সেটা পাশ্চাত্য দেশে চালু হয়ে গেছে,—এখানেও হবে।

ভাদুড়ী—ঐ পাশ্চাত্য কাণ্ডগুলো যে আমাদের প্রাচ্যের পক্ষে বিষতুল্য, তা না বুঝেই তো আমরা আমাদের পূর্বগৌরব হারিয়েছি!

আমি—পৃথিবীটা গোল,—পূব-পশ্চিম আপেক্ষিক কথা। মেদিনীপুরীরা বর্ধমেনেদের বলে, পুব্যাগুলা! মানুষ সর্বত্রই এক, এবং তাদের সুখ দুঃখ এবং প্রয়োজনও একই ধরনের। যৌন ক্ষুধাও মেয়ে-পুরুষের সমান। নীতিকথায় তা ঠাণ্ডা হয় না। আর অশিক্ষিত সমাজে যে ভ্রূণহত্যা হয়,—শিক্ষিত সমাজে সেটা এড়িয়ে চলা গেলে মন্দটা কি হবে?

ভাদুড়ী হতাশ ভাবে বললে,—লোকটা দেখছি পাশ্চাত্য ভাব নিয়ে মশগুল হয়ে আছে।

আমি আর একটু মজা দেখার জন্মে বললুম,—তাহলে তো বিয়েই মানতুম!

ভাদুড়ী—বলেন কি! বিয়েও মানেন না?—তাহলে কি সব ছাগলের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াবে?

এবার আমারও একটু রাগ হল। বললুম,—প্রথমতঃ,—this is bad taste, দ্বিতীয়তঃ,—খোকা-খোপাও আমার কথার এই জবাব দিতে পারতো। আমি আশা করেছিলুম, আপনি তার চেয়ে ভাল কথা, যুক্তিসঙ্গত কথা কিছু বলতে চেষ্টা করবেন। আপনারাই "মাতৃজাতি" কথাটা যখন-তখন বলে থাকেন,—কিন্তু মাতৃজাতির সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা অতি উচ্চ! ছাগলগুলোর জন্মেই তাঁরা তৈরী হয়ে বসে আছেন!

এতক্ষণে ভাদুড়ী overwhelmed হলেন। তিনি যে বিশেষ পণ্ডিত নন, এটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়লুম!

আবার কয়েক দিন পরে একদিন ভাদুড়ী বিমলবাবুর ঘরে আড্ডা জমিয়েছে। পাশের ঘর থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি। হিন্দুত্ব, ঋষিবাক্য, যোগশক্তি, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি শুনে আর থাকতে পারলুম না। চুপ করে গিয়ে বসলুম। উনি তখন বলছেন,—আজকাল বিশ্বাস জিনিসটাই আর নেই,—দু'পাতা ইংরেজী পড়ে' লোকে আর কিছু মানতে চায় না। বাপ যে বাপ, তারও প্রমাণ চায়!

মনে করেছিলুম, কথা কইবো না, শুধু শুনে যাবো,—কিন্তু থাকতে পারলুম না। বললুম,—একদল জগদ্বিখ্যাত সোসিওলজিষ্ট

পণ্ডিতদের মতে,—সম্পূর্ণ স্বাধীন দুই স্ত্রীপুরুষের স্বেচ্ছামিলনের ফল ভিন্ন সন্তানের পিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়না। তাই একসময়ে—সম্ভবত কোড নেপোলিয়নে—প্রথম এক আইন করা হয়েছিল,—অতঃপর স্ত্রীলোকের বিবাহিত স্বামীই তার সন্তানদের পিতা বলে গণ্য হবে। সেই আইনই আজ পর্যন্ত সর্বত্র বলবৎ রয়েছে। সুতরাং যিনি যতই লম্ফঝম্প করুন,—Position সব মিঞারই সমান।

ভাদুড়ী তর্কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বললে,—আপনার মত তো মশাই সর্বনেশে।

আমি—যুক্তিতর্কে না কুলোলেই লোকে গালাগাল আর দিব্যি দেয়। বাঁকুড়া জেলে আমাদের একজন attendant বলতো,—আমাবস্যা রাত্তিরে কাকের ঠ্যাং এনে দেন,—আমি তালা খুলে দোব। আমরা তাকে ঠাট্টা করতুম। সে যদি attendant না হয়ে দারোগা হত, তাহলে নিশ্চয় এই বাপ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের দিব্যি দিয়ে আমাদের জব্দ করে দিতো।—বলে, হো হোহো করে একচোট হেসে নিলুম। ভাদুড়ী চুপ সে গেল এবং সরে পড়লো।

এরপর একদিন কথায় কথায় বললে, আমার তো পুলিশ লাইনে আসার কথা নয়,—নেহাৎ ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এদিকে টেনে এনেছে। নইলে এতদিন—

আমি Suggestionটা লুফে নিয়ে বললুম,—নইলে ডেটিনিউ হতে পারতেন, না?—হয়ত আন্দামান যেতেন। তা, আন্দামানে না গিয়ে বেলেকাঁদিতে এসে ভালই করেছেন,—আমরা দেখতে পেলুম দারোগা রূপে একজন দাদাকে!

তিনি উৎসাহিত হয়ে বলে চললেন,—পাংশায় থাকতে শিশির তো একরকম আমার বাসাতেই থাকতো। গোঁসাইর হাটে থাকতে একদিন A. S. I. একটা ছোকরাকে ধরে এনেছে—ফচকে গোছের—সে বলে কিনা,—মুটেগিরি করে খেতে পারেন না? আমি তাকে ২১টা কথা জিজ্ঞাসা করতে গেছি,—আমাকেও বলে বসলো, পুলিসের চাকরী না করে মুটেগিরি করুনগে যান—সেও ঢের ভাল। আমার রাগ হল, কিন্তু তবু কিছু না করে দুটো বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলুম।

আমি—ওখানে তো মিলিটারী ক্যাম্প আছে,—গোলমাল খুব বেশী নাকি?

ভাদুড়ী—ঠিক ওখানে গোলমাল বেশী নেই,—তবে জেলার ঐ দিকটাতে, no upper class Hindu girl is untouched,

আমি—তাহলে তো any reasonable man should expect every young man to be a fire-eater.

ভাদুড়ী চেপে গেল। এরপর একদিন সকালে রামদিয়া থেকে এক ডাকাতির সংবাদ নিয়ে লোক এসেছে থানায় এজাহার দিতে। তারা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে কর্তা তাদের ফিরিয়ে দিলেন সব কথা জেনে আসার জন্যে। তারা ফিরে গেল এবং সব জেনে দুপুরের পর আবার এলো। কর্তা এজাহার নিতে সন্ধ্যা পার করলেন এবং রাত দশটার ট্রেণে রামদিয়া রওনা হলেন সুরেন সান্ন্যালকে সঙ্গে নিয়ে।

ওদিকে পার্টি সকালেই থানার সঙ্গে সঙ্গে সাবডিভিশন রাজবাড়ীতেও খবর দিয়েছিল এবং নতুন ইনস্পেক্টর সুরেন সরকার বিকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং দারোগাকে না পেয়ে নিজেই তদন্ত সুরু করে কোথায় সার্চ করতে হবে, কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে ইত্যাদি স্থির করে ফেলেছিলেন। তারপর অনেক রাত্রে যখন ভাদুড়ী-সান্ন্যাল যুগলমূর্তি সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি ভাদুড়ীকে শুধু মারতে বাকি রাখলেন এবং তদন্তে হাত না দিতে দিয়ে বসিয়ে রেখে দিলেন এবং তাঁর নামে proceeding লিখলেন। ফলত সেই কেসেই অন্নদা বাবু থানার কাজের অনুপযুক্ত বলে পুলিশ সাহেব তাঁকে ফরিদপুরে কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টররূপে বদলী করলেন।

ফিরে এসে অন্নদা বাবু লজ্জা ঢাকা দেওয়ার জন্যে মুখসাপুটি করে বললেন, তাঁর "শাপে-বর" হল—এতদিনে তিনি বক্তৃতার বহর দেখাবার একটা scope পেলেন। কিন্তু পরে এমনি কয়েকটা pending case মিলে তাঁর চাকরী খতম হয়েছিল।

যাই হোক, বাগচি একটু দমে গেল। রাত্রে ভাদুড়ী গিন্নী তার ঘরে এসে ঢুকেছে। হঠাৎ আমি গিয়ে হাজির হলুম। গিন্নী তখন বলছিলেন,—এখানে তিনজন ডেটিনিউ আছে শুনে উনি বলেছিলেন বেশ হবে, আমার পৌনে দুশো টাকার সংসার হবে, কিন্তু ভগবানের মর্জি, সব উল্টেপাল্টে গেল।—অবাক কাণ্ড!

যাই হোক, অন্নদা বাবুর জায়গায় গোঁসাইর হাট থেকে এলেন বিপিন দাস। তিনি চাকরকে রান্না করাচ্ছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি? অন্নদা বাবুর বাসায় খেলেন না কেন?

তিনি বললেন, সেটা তো আমি নিজে বলতে পারি না।—খটকা লাগলো।

ভাদুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি? লোক বুঝি সুবিধের নয়?

তিনি বললেন,—পাজি, একটা moral wreck, bastard, কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, ব্যাটা জাত-বোষ্টম। The woman, with whom he used to live as husband and wife, had a 7 year old daughter. পরে সেই মেয়েটাকে ও বিয়ে করেছে—বিয়ে, মানে কণ্ঠিবদল। মাগী এখনো ওর কাছেই আছে, আর সেই মেয়েটার গর্ভের ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর family. [ক্রমশঃ

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই আবক্ষ মূর্তির শিল্পী শ্রীরমেশ পাল।
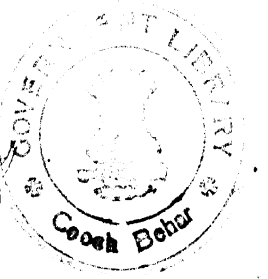
রজনীকান্তের গান

কবি রজনীকান্ত সেনের গান আজ আর কেহ গায় না। পাঠ্য পুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত দুই-একটি গান ছাড়া তাঁহার আর কোন রচনার সঙ্গেই আজকালকার পাঠকের পরিচয়ও নাই। এককালে রজনী সেনের গান সারা দেশে গাওয়া হইত।

বাংলা গানের আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন নিধুবাবু। তাঁহার পরে নব প্রবর্তিত কাব্য সঙ্গীতের ধারায় সুমার্জিত ভঙ্গী ও ভাষায় গীতি রচনা করিয়াছেন পাঁচজন কবি—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল।

গভীর দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথের সুর মোহে বিমুগ্ধ বঙ্গবাসী আজ অন্য সবারই গান কতকটা অবহেলা করিতেছে। রজনী সেনের গানের সম্পদ ছিল অজস্র, সুললিত বাণী, মধুর সুরধ্বনি, উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিণী, অন্তর্নিহিত গভীর ভাব—সব থাকা সত্ত্বেও তাঁহার গান আজ বিস্মৃতপ্রায়।

ইহার জন্য হয়ত দায়ী তাঁহার শেষ জীবনের দারিদ্র্য। রজনী সেনের দুর্ভাগ্য তিনি ধনীর পুত্র ছিলেন না, বিলেত হইতে ফিরিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নাই, তাঁহার চারিপাশে কোন স্তাবকদলও গড়িয়া উঠে নাই, কাজেই কেহ তাঁহার গানের সুরকৌলীন্য সংরক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করে নাই।

রজনী সেনের গানের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দুর্বলতা এই যে, এই গানের কোন স্বতন্ত্র গীতিরীতিও গড়িয়া উঠে নাই। তাঁহার সুরের বৈচিত্র্যও অল্প-রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি যুগে'র সুরেরই স্বগোত্রের সুর কান্ত পদাবলীর। তাঁহার গানের স্বরলিপিও সংগৃহীত হয় নাই, তাঁহার গান শিখিবার কোন ব্যবস্থাও নাই। কে তাঁহার গান শিখাইবে ?

রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের ন্যায় গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নাই; তাঁহার গানগুলির সুপ্রচার না হইলে সে সুরও বিস্মৃত হইয়া যাইবে। শেষ জীবনটা তাঁহার অত্যন্ত দুঃখময়, তাঁহার গানের সমাদর শুরু হইবার-মুখেই তাঁহাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

'অভয়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন—"আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, রোগ শয্যাতে প্রুফ দেখিয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই।"

—এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে বেশ কতকটা অনাদরে অবহেলায় বিদায় লইতে হইয়াছে।

রজনীকান্তের গান কাল প্রবাহে স্থায়ী হইতে পারে নাই; সেজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠাই দায়ী। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেই যেন রজনীকান্তের গানের সবটুকুকেই পাইয়াছে। আজ এই বিস্মৃতপ্রায় কবির সঙ্গীতের সমাদর করিবার জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—

(১) তাঁহার সমগ্র গানের স্বরলিপি করিয়া সেগুলির সংরক্ষণ; (২) তাঁহার অনুরাগী গায়কদের দ্বারা সেগুলির প্রচার এবং (৩) তাঁহার নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া সেই সমিতির হস্তে তাঁহার গানের সুর সংরক্ষণ ও দায়িত্ব অর্পণ।

রজনীকান্ত শৈশবে সাঙ্গিতিক পরিবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদের সঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল, বৈষ্ণবপদও তিনি কতকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। রজনীকান্ত তাঁহার নিকটেই সুরদীক্ষা লাভ করেন।

রজনীকান্ত গান রচনা করিতেন, সুর সংযোজন করিয়া গাহিতেন, তার পর সেগুলি হারাইয়া যাইত। তাঁহার বন্ধু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের আগ্রহে তাঁহার প্রথম গীতি-সংগ্রহ 'বাণী' প্রকাশিত হয়। তিনি বলিয়াছেন—

"অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে; মজলিসে সভামণ্ডপে পুনঃপুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না।"

সে সময়ের সঙ্গীত-পতি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই রজনীকান্তের গান শুনিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন—"এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল।"

রজনীকান্ত সুকণ্ঠের অধিকারী এবং সুগায়ক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল গানের সুর তাঁহারই দেওয়া কিনা সন্দেহের বিষয়। 'কল্যাণী' গীতি সংগ্রহে তাঁহার নিজস্ব ভূমিকাই এই সন্দেহের মূল—

"বাণী'তে রাগিণী ও তাল সন্নিবিষ্ট ছিল না, এজন্য কোনও কোনও সমালোচকের তীব্র লেখনী অনেক শ্লেষ উদ্গীরণ করিয়াছে। এবার সঙ্গীতপ্রিয় জনসমাজের সে অনুযোগের স্থল রাখি নাই। সঙ্গীতে আমার অধিকার নাই। সুতরাং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশে ও সাহায্যে তাল ও রাগিণী প্রদত্ত হইল। তথাপি তদ্বিষয়ে সঙ্গীত বিশারদদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; তাঁহারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে সুরসংযোগ করিতে পারেন।" গায়কদের এইরূপ স্বাধীনতা কোন সুরকারই কোনদিন দেন নাই।

রজনীকান্তের গান ভাগবতী-গীতি; তাঁহার গান ভক্তির আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। বাংলার যে সাধনসঙ্গীতের ধারা রামপ্রসাদ

হইতে সমানে বহিয়া আসিয়াছে, রজনী সেনের সুরধারাও সেই ধারা হইতেই উৎসারিত। তাঁহার উমা সঙ্গীতগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর যেন পরিশিষ্ট।

উমার আগমনে সারা মেনকাপুরী উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে—

কে দেখবি ছুটে আয়,
আজ গিরিভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়।
ঐ মা এল, মা এল ব'লে
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
"উঠি পড়ি' ক'রে সবাই আগে দেখতে চায়।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে করেছে খেলা
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায়। (বসন্ত)

মা মেনকা স্বপ্নে দেখিতেছেন উমা আসিয়াছে। সে স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া না যায় মেনকা তাই অবিরত প্রার্থনা করিতেছেন। লোকে বলে উমা আদ্যাশক্তি স্বয়ং ভগবতী—মাতা ভাবিতেছেন উমা তাহা হইলে কি তাঁহার কন্যা ন'ন? এ কথা ভাবিতে গিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন—ভৈরবীতে।

না, না, উমা দিস্‌নে নয়ন, ভাঙিসনে মা, সুখের স্বপন,
তুই আদ্যাশক্তি ভাবতে আমার চক্ষে আসে জল।
স্বপ্ন যদি হয় মা, তারা, করিসনে মা স্বপ্ন হারা,
আমি কন্যাহারা হ'তে নারি, (আমার) এক মেয়ে সম্বল।

কান্ত কয় ঐ সোনার স্বপন, পে'লে কে আর চায় জাগরণ,
যদি নয়ন মুদে পাইমা তোরে, তাকিয়ে কিবা ফল।

কান্ত কবির ভণিতাগুলি রামপ্রসাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। বিজয়াগীতির কারুণ্যও রজনীকান্ত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ মেনকা-উমা আমাদের গৃহস্থ ঘরের মা মেয়ে, এ বিদায়-যাত্রা আমরা আমাদের সংসারেই অহরহ দেখিতে পাই—

সজল বিষণ্ণ মুখে, বলে—মা গো, তোর দুখে
বড় ব্যথা পাই মর্মে, বড় কান্না পায়;
(তুই) বেঁধেছিস কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পারি তোরে,
(তবু) না গেলে নয়, তাই যেতে হয়, প্রাণ কি যেতে চায়?
(আমি) আবার আসব, কাঁদিস নে মা, আশায় এ বুক
বাঁধিস রে মা।

রজনী সেনের অধিকাংশ সাধন সঙ্গীতের মধ্যেই একটি আশ্রয় কামনা, একটি পথনির্দেশের ব্যাকুল প্রার্থনা জড়িত আছে। আকুল কণ্ঠে কবি বলিতেছেন—(মিশ্র খাম্বাজ)

কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে,
(তব) শান্তিসৌধ মঙ্গল কেতু, আর দেখিনে,
কি সে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
আমি তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি,
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে।

এক শ্রেণীর গানে কবি ইহজীবনের পরিণাম চিন্তায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এ সকল গানে যেন কবিচিত্তের আর্তনাদধ্বনি শোনা যায়, এগুলির সুর স্বভাবতই কারুণ্য গাম্ভীর্য মণ্ডিত—

ওই বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল খ আলো,
এপারে সবই ব্যথা, [illegible] শোক। (মিশ্র ইমন)

কেবল সাধন-সঙ্গীতে নয়, হাসির গানের সুরসংযোজনে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ—

যদি, কুমড়োর মত চালে ধরে রত পানতোয়া শতশত,
আর, সরষের মত হ'ত মিহিদানা, বুঁদিয়া বুটের মত।

উল্লিখিত গানটিতে কবি মহাজনী কীর্তনের সুর যেমন অবলম্বন করিয়াছেন, কীর্তনের প্রচলিত অজস্র আঁখরও ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফলত গো)

(আমি তুলে রাখিতাম) বুঁদে, মিহিদানা গোলা বেঁধে
(আমি তুলে রাখিতাম)
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে)
(গোলায় চাবি দিয়ে, চাবি কাছে রাখিতাম, বেচতাম না হে)।

গানটি বেশ উচ্চাঙ্গের 'গড়খেমটা' তালে রচিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই' গানটির সুর ও ঢঙ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল; কেবলমাত্র ঐ সুরে কান্তকবির অনেকগুলি হাসির গান আছে। নকল সাহেবিয়ানার প্রতি তাঁহার

অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ছিল, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বোধের পরিপন্থী বলিয়া তিনি তাহা মনে করিতেন। তাঁহার গভীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এই সকল গানেই পরিস্ফুট—

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি
সদা জামা রাখি শরীরে,
(আর) 'হ্যাণ্ট্‌ পো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
'হ্যারি' ব'লে ডাকি হরিরে ;
যেহেতু আমার ছেড়েছি একান্ত,
কীটদষ্ট বাতুলতা বেদবেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী, দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক 'বাড়ুয্যে'।

রজনীকান্তের দেশপ্রেমের গ . এক সময়ে খুব জনবল্লভ ছিল। তাঁহার অতিপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংকল্প সঙ্গীত এক সময়ে পথে পথে গাওয়া হইত !—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে, ভাই ;
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।
(মূলতান, গড়খেমটা)

বঙ্গজননীর অপরূপ রূপশ্রী তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন জননী স্তোত্রগানে স্বরটমল্লারে—

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী, অতুল বিপুল গিরি অলঙ্ঘ্য।
বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি তটিনী, মত্ত খর তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল ভার-নত শাখিবৃন্দে নিত্যশোভিত অমল অঙ্গ।।

রজনীকান্তের সঙ্গে দেশের জনগণের ভাবধারার নিবিড় যোগ ছিল। তাঁহার এক শ্রেণীর গানে সাধারণ দেশবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশিত,—এই সকল গানে জনগণের হৃদয়ের উষ্ণস্পর্শ সঞ্চারিত হইয়াছে—

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু, আছি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেজে,
কিনব না ঠুনকো কাচ, যায় যে ভেঙে ;
থাকলে, গরীব হয়ে, ভাইরে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।। (মিশ্র বারোয়াঁ)

—জয়দেব রায়।

আমার কথা (৭৫)

শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত-জগতে শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের একটি আসন নির্নীত হয়ে গেছে এর ভেতরই। আধুনিক গানের দিকে তাঁর ঝোঁক নেই বটে, কিন্তু ভজন, স্তোত্র, কীর্তন, ক্লাসিক্যাল গান— এ সকল তাঁর প্রাণের তিনি প্রচুর আনন্দ পান ও আর সবাই আনন্দ পেয়ে থাকেন তাঁর সুকণ্ঠ শুনে।

নিজের সার্থক শিল্পি-জীবন সম্পর্কে বলতে যেয়ে শ্রীমতী মাধুরী প্রথমেই জানালেন—"কুষ্টিয়া জেলার রেফাইতপুরের বিশিষ্ট আচার্য্য পরিবারের মেয়ে আমি। সেদিন অবধি এই পরিবারটি ছিল রেফাইতপুর অঞ্চলের জমিদার। গান-বাজনা ও সাংস্কৃতিক চর্চা পরিবারটিতে বরাবর চলে এসেছে। তবে সেটি যতটা নয় রেফাইতপুর গ্রামে, তার চেয়ে বেশি কৃষ্ণনগরে—যেখানে আমাদের আর একটি বাড়ি রয়েছে সেই থেকেই।"

ধীর কণ্ঠে বলে চললেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়—ছেলেবেলা থেকেই গান-বাজনায় আমার বিশেষ সখ। পরিবেশও ছিল যতই বুঝি অনুকূল, ততই সুন্দর। আমার ঠাকুর্দা ৺সুরেন্দ্রমোহন আচার্য্য ছিলেন সেকালের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত রসিক। আমি তাঁকে দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁর গান-বাজনার আসরের সেতার, এস্রাজ— এসব যন্ত্রপাতি আমার চোখের সামনে থাকে। বাড়ীতে তখনকার-দিনের ক্লাসিক্যাল গানের বহু রেকর্ড ছিল—সেগুলি বাজিয়ে সহজেই শোনবার সৌভাগ্য হতো আমার। ছোটকাকার দরাজ কণ্ঠও আমার উৎসাহ যুগিয়েছে কম নয়। বাবা-মার কথাই বলা হলো না।

শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায়

বাবা (৺মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য) এবং বিশেষভাবে মা'র (শ্রীযুক্তা নিশারাণী দেবী) কাছ থেকে সঙ্গীত সাধনায় কত প্রেরণাই না আমি পেয়েছি !

স্কুলের অমনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে গানের চর্চা চলে আমার। এবারে ক্লাসিকাল গান শিখব বলে মনে তাগিদ এলো। কৃষ্ণনগরে থেকেই সুযোগও মিলে গেলো একটা ভালো রকম। বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল আরও প্রেরণা দিলেন আমায়। কৃষ্ণনগরেই একটি গানের স্কুলে শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্রের নিকট ক্লাসিক্যাল গান শেখা আরম্ভ করে দিই। ক্লাসিক্যাল গাইয়ে বলে আজ আমার যেটুকু পরিচয়, তারই আদি শিক্ষাক্ষেত্র জানব এইখানে।

—প্রাচীন বাংলা গান এবং টপ্পা—এগুলো শিখবার সুযোগও আমি পর পর পেয়েছি। কৃষ্ণনগরের প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে আমায় শিক্ষা দেন। স্বামীর (অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়) নিকটও আমার যথেষ্ট ঋণ স্বীকার করার আছে। ডি, এল, রায়ের গান, অতুলপ্রসাদের গান, ভজন ও স্তোত্র এ সব তিনিই আমায় শিখিয়েছেন। কীর্ত্তন গাইতে শিখেছি আমি বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে। বেঙ্গল মিউজিক কলেজের আই, মিউজ কোর্স আমি এর ভেতর শেষ করেছি—এবারে বি, মিউজ কোর্স সমাপ্ত করার ইচ্ছে।

১৯৫৩ সালে আমার বয়স যখন ২০ বছর, সে সময় আমার গানের প্রথম রেকর্ড তৈরী হয়। ভজন ও স্তোত্রের এই রেকর্ডটি তৈরী করেন কলম্বিয়া কোম্পানী। তারপর আরও অনেক রেকর্ডই তৈরী হয়েছে—যেগুলোর ভাল মন্দের বিচার আমার কাছে নয়, শ্রোতাদের কাছেই। বেতারেও সংস্কৃত নাটকে আমি অংশ নিয়ে আসছি। বেতার 'সঙ্গীতাঞ্জলির' জন্যে কিছু গান আমার রেকর্ড করা হয়েছে। দেবকী বসু পরিচালিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছায়াছবিতে আমি প্রথম প্লেব্যাক গান করি। তারপর নৌকাবিলাস, সোনার কাঠি, শ্রীশ্রীতারকেশ্বর, আম্রপালী, সাগরসঙ্গমে প্রভৃতি চিত্রেও আবহসঙ্গীতে আমার অংশ আছে।

শ্রীমতী মাধুরী এইখানেই থেমে গেলেন না—তিনি বলতে থাকেন : একজন ঠিক পেশাদার শিল্পী আমি নয়। তবে এযাবত বহু বড় বড় আসরেও আমার গান গাওয়ার সুযোগ হয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে আমি নিয়মিত দ্বিজেন্দ্রলালের গান পরিবেশন করে এসেছি। এ ছাড়া, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, রবীন্দ্র মেলা প্রভৃতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেও আমি তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর। ১৯৫৮ সালে উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহ উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য হয়েছিল—সে সময় শকুন্তলা নাটকের সঙ্গীতাংশে আমি ভূমিকা গ্রহণ করি। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের উদ্যোগে ও দেবকী বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের শুচি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রচনা কেন্দ্র করে অস্পৃশ্যতা বিষয়ে একটি হিন্দী ছবি তৈরী হয়েছে। এই সুপরিকল্পিত ছবিখানিতে কণ্ঠদান করার সুযোগ মিলেছে আমার, এজন্যে গর্ব প্রকাশ না করে পারবো না।

সবচেয়ে কার গান বেশী গাই, আমার ভালো লাগে, জানতে চাইলে আমি বলব—সুরসুধাকর পূজ্যপাদ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের গানই আমার সর্বাধিক প্রিয়। তাঁর গান এবং ইন্দিরা দেবী রচিত ভজন আমি যেখানে সুযোগ পাই, সেখানেই পরিবেশন করে থাকি। সাধক দিলীপকুমারের আশীর্বাদ ও প্রেরণা আমায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উৎসাহিত করেছে—এই স্বীকৃতি আমি নিশ্চয়ই জানাবো।

অন্তরায়

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

সারারাত আকাশঢাকা দুঃখের
অন্ধকার হাত দুটো
চেপে আছে আমার বুকের উপর
কেমন করে দেব তোমাকে
সেই সুন্দর শুভ্র হৃদয়টা ?

কুঁড়িগুলো কাঁদতেও পারল না
মায়ের বুকে মুখ রেখে।
দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল ওদের
শোকের মূঢ় ডানা ঝাপটানি।
কেমন করে দেব তোমাকে
ফুল ফোটার সেই—
একান্ত বিস্ময়কর বেদনাটা ?

যদি একবার—
সব ঋতুগুলো বর্ষা হয়ে
আকাশের সব জমাট মেঘগুলোকে
ঝরিয়ে দিতে পারতো,
আর রোদ্দুর উঠতো নিশ্চিন্ত আরামে,
তবে আমিও
বেশ নিশ্চিন্ত আরামে
এক পশলা কাঁদতে পারতাম
তোমার বুকে মুখ রেখে,
আর তোমার হৃদয়ে জাগাতে পারতাম
চিকচিকে সোনা রোদ্দুর।
আর আমার না বলা কথাগুলোও সব
ফুটে উঠতো সকাল বেলার ফুল হ'য়ে

গ, আ, আরিস্তোভ

৩। সৌরশক্তির উৎস নিউক্লীয়সীয় বিক্রিয়া

বর্তমানে মনে করা হয় যে সৌরশক্তি সূর্যের মধ্য অংশে জন্মলাভ করে। প্রায় সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া ইহা সূর্যের পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছায় এবং মহাজাগতিক শূন্যে বিকীরিত হয়।

কী কারণে এই শক্তি উৎপাদিত হয়?

আমরা পূর্বেই বলিতেছিলাম যে বারো সহস্র ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় মিশ্র বস্তু তাহার সংগঠনকারী মৌলগুলিতে বিয়োজিত হয়। আর কয়েক কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় মৌলের পরিবর্তন সম্ভব।

বর্তমানে মৌলের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিউক্লীয়সীয় বিক্রিয়া—অধীত হইয়াছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া তথাকথিত চক্রাকার নিউক্লীয়সীয় বিক্রিয়ার মতবাদ পদার্থবিদগণ কর্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বিক্রিয়ার সময় সর্বাপেক্ষা হালকা মৌল জলজান অধিকতর ভারী মৌল হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের সময় প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। হিসাব করা হইয়াছে যে এক গ্রাম জলজানকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার সময় এত পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় যাহা ১৫ টন বেঞ্জিন দাহন করিলে পাওয়া যায়।

এই নিউক্লিয়াস বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে কার্বন। হিসাব করিয়া যেমন দেখা গিয়াছে সূর্য কর্তৃক বিকীরিত শক্তির সরবরাহের জন্য তাহার সংযুক্তিতে ওজন অনুসারে শতকরা এক ভাগের কম কার্বনের উপস্থিতি যথেষ্ট। বর্ণালি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মোটামুটি এই পরিমাণ কার্বনই সূর্যের আবহের সংযুক্তিতে আছেও।

এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করিতে বাকী রহিয়া যায় যে 'দাহ্য পদার্থে'র সূর্য তাহার উষ্ণতাকে সমকালীন সমে রক্ষা করার অবস্থায় কতকাল থাকিতে পারিবে? দেখুন, ইহার জন্য সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মিলিয়ন টন জলজানের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের সমস্ত "জ্বালানী"র ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া সূর্য কি নিভিয়া যাইবে না?

এই প্রকার ভীতি অমূলক; সূর্য অত্যন্ত প্রকাণ্ড; আর আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে তাহার সংযুক্তিতে জলজান এত বেশী যে ইহা সূর্যের সমস্ত ভরের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। বিকীরণের ফলে এই ভরের "হ্রাস" তুলনা করিলে নগণ্য রকমের অল্প। বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে আরো বহু মিলিয়ার্দ বৎসর যাবৎ সূর্য বর্তমানের মতই তীব্র ভাবেই কিরণ দিতে এবং আমাদের পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিতে থাকিবে।

৪। পৃথিবীতে জীবনের জন্য সূর্যের তাৎপর্য

১। সূর্য কর্তৃক আমাদের পৃথিবীতে প্রেরিত তাপ ও আলোর পরিমাণ

সূর্য আমাদের পৃথিবীতে কত তাপ ছড়ায় actinometer...... নামক একটি বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তাহা নিরূপিত হয়। সৌর রশ্মি কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে বাহিত তাপ পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি এই রশ্মিগুলি পৃথিবীতে ঠিক উল্লম্বভাবে পড়িত এবং যদি পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল না থাকিত তবে ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক বর্গ সেণ্টিমিটার এক মিনিট কালে প্রায় দুই [আরো সঠিক ভাবে ১.৯৩] ক্ষুদ্র ক্যালোরী তাপ পাইত [এক গ্রাম জলের উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বাড়াইবার জন্য যে পরিমাণ তাপ দরকার, তাহাকে এক ক্ষুদ্র ক্যালোরি বলে]।

কিন্তু যদি আমরা একটি ঘন স্তরবিশিষ্ট সুবেধ বায়ুমণ্ডল। [কার্যতঃ, ইহা যে ভাবে আছে] দ্বারা পরিবেষ্টিত পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে পতিত সৌররশ্মির তীব্রতা পরিমাণ করিতে থাকি, তবে আমরা দেখিব যে সৌরতাপের যে পরিমাণ আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায় তাহা ধ্রুব নহে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সংঘটমান নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা ইহা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া ভূগোলকের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন পরিমাণ সৌরতাপ প্রাপ্ত হয়। বিষুব রেখার নিকটে অবস্থিত অঞ্চলগুলি তাপ বেশী পায় এবং মেরুপ্রদেশের নিকটে অবস্থিত অঞ্চলগুলি কম পায়। ব্যাপারটির প্রধান ব্যাখ্যা এই যে সূর্যরশ্মি বিভিন্ন কোণে হেলিয়া ভূগোলকের পৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। কোণাকুণি ভাবে না পড়িয়া উল্লম্বভাবে আসিয়া পড়িলে একই পরিমাণ সৌর শক্তি ভূপৃষ্ঠের অল্প অঞ্চলে পতিত হয়। বিষুব রেখা এবং ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নে উল্লম্বভাবে পতিত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠকে বেশী উত্তপ্ত করে। মেরু অঞ্চলে এবং মেরুর নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে রশ্মি সর্বদা নত ভাবে পড়ে, ইহা যেন ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহা অতি অল্প উত্তপ্ত করে। উল্লম্বভাবে পড়িলে রশ্মিগুলি যে পরিমাণ বায়ুর বেধকে অতিক্রম করিত নত ভাবে পড়িলে তাহা অপেক্ষা বেশী বায়ুর বেধকে অতিক্রম করে এবং বায়ুমণ্ডলে দারুণ ভাবে বিক্ষিপ্ত এবং শোষিত হইয়া যায়। ঠিক এই কারণেই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের আবহমণ্ডল রহিয়াছে—উষ্ণ, শীতল এবং নাতিশীতোষ্ণ দেশ।

ভেরখোইয়ানস্ক্-কে [আরো সঠিক ভাবে ইয়াকুৎ স্বায়ত্তশাসিত

সোভিয়েৎ সোস্তালিষ্ট রিপাবলিকের কুদ্র অঞ্চল ওইমেকন্‌কে] পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শীতল অঞ্চল—'হিম মেরু' বলিয়া গণ্য করা হয়। সেখানে মাঝে মাঝে উষ্ণতা বিয়োগ ৬৮ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অবধি পৌঁছায়। কলাকুশল (artificial) উপায়ে পরীক্ষাগারে বিয়োগ ২৭০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অবধি উষ্ণতা পাওয়া যাইতে পারে।

হিসাব করা হইয়াছে যে বিষুব রেখায় প্রতি মিনিটে ভূপৃষ্ঠের একবর্গ মীটার গড়ে এত সৌর তাপ পায় যে তাহা দ্বারা এক গ্লাস জল ফোটানো যায়। সূর্য খুব ভালভাবে আমাদের গ্রহটিকে আলোকিত করে। ৩৫০ ঘন মীটার ঘনমান বিশিষ্ট একটি বড় ঘরকে, সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে পথ যেমন আলোকিত থাকে তেমনভাবে আলোকিত করিতে ইহার দেওয়াল এবং কড়িকাঠে ৬০ Candle power,...... বিশিষ্ট ৫০ হাজার বিজলী বাতি বসানো দরকার।

২। দিনরাত্রি এবং ঋতুর একান্তরণ—

পৃথিবী নিজের অক্ষের চতুর্দিকে ফেরে এবং এই জন্ম একবার তাহার এপিঠ একবার ওপিঠ সূর্যের দিকে ঘোরানো থাকে। সূর্যের দিকে ঘোরানো পিঠে দিন, আর বিপরীত দিকে অবস্থিত পিঠে রাত্রি। এইভাবে দিন রাত্রির একান্তরণ (change) ঘটে।

আর কিসের দ্বারা ঋতুর একান্তরণ ব্যাখ্যা করা হয়? সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সঞ্চরণ এবং শূন্যে পৃথিবীর অক্ষের একটি নির্দিষ্ট গতির সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট। যদি এই সঞ্চরণের সময়ে পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষ সর্বদা পৃথিবীর কক্ষের তলের সহিত উল্লম্বভাবে অবস্থিত থাকিত, তবে ঋতুর কোনো একান্তরণ হইত না।

পৃথিবীর কক্ষপথের তলের সহিত পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষ একটি বিশেষ কোণে আপেক্ষিকভাবে নত এবং অক্ষটি সর্বদা একই দিক রক্ষা করিয়া চলে বলিয়া ঋতুর পরিবর্তন ঘটে [চিত্র ১১]। ইহার ফলে কক্ষের বিভিন্ন অবস্থানে একবার পৃথিবীর এই গোলার্দ্ধ একবার পৃথিবীর ওই গোলার্দ্ধ কখনো সূর্যরশ্মি বেশী পায় কখনো সূর্যরশ্মি কম পায়।

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে যত খাড়া হইয়া পড়ে, ভূপৃষ্ঠের একটি একক তত বেশী সূর্যকিরণ পায়। গ্রীষ্মকালে, বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে সূর্য মাথার উপরে থাকে এবং শীতকাল অপেক্ষা বেশী সময় দিগন্তরালের উর্দ্ধে থাকে। এই অবস্থায় সূর্যরশ্মি বেশী খাড়া ভাবে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

চিত্র ১১—পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তন

যে হেতু পৃথিবীর অক্ষ শূন্যে সর্বদা নিজের দিক (direction) রক্ষা করিয়া চলে, সে হেতু পৃথিবীর নিজের কক্ষপথে সঞ্চরণের ফলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ইহা সূর্যরশ্মির সহিত আপেক্ষিক ভাবে বিভিন্ন গতিতে থাকে।

যখন পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষ সূর্যরশ্মির সহিত এমন গতিতে থাকে যে উত্তর মেরু আলোকিত হয় এবং উত্তর গোলার্দ্ধে সৌর তাপ এবং আলোক বেশী পরিমাণে আসে, তখন এই স্থানে দিনগুলি বেশী প্রলম্বিত হয়। এখানে গ্রীষ্মকাল বর্তমান থাকে আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে থাকে শীতকাল।

যখন পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষ সূর্যরশ্মির সহিত এমন ভাবে নত থাকে যে দক্ষিণ মেরু আলোকিত হয়, তখন দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গ্রীষ্মকাল আর আমাদের এখানে শীতকাল। এই ভাবে ঋতুর একান্তরণ ঘটে।*

অর্দ্ধ বৎসরকালে পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে পালাক্রমে একবার রাত্রি একবার দিন বিলম্বিত হয়। অর্দ্ধ বৎসর যাবৎ একটি মেরুতে সূর্য অস্ত যায় না। এখানে নিরবচ্ছিন্ন দিন। পরবর্তী অর্দ্ধ বৎসর অন্য মেরুটিতে একই ব্যাপার ঘটে।

সূর্যের চতুর্দিকে সঞ্চরণে পৃথিবী বৎসরে দুইবার সূর্যের সহিত আপেক্ষিক ভাবে এমন অবস্থানে পড়ে যে সূর্যের দিকে ঘোরানো ভূপৃষ্ঠ উত্তর হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়। এই সময়ে সমস্ত ভূ-গোলকে দিন ও রাত্রি সমান। এই দিনগুলি মহাবিষুব [২১শে মার্চ] এবং জলবিষুব [২৩শে সেপ্টেম্বর]। অবশ্য কার্যতঃ বসন্তকালে ২১শে মার্চ দিন-রাত্রি সমান নহে। ইহার দুই দিন পূর্বেই দিন-রাত্রি সমান। শরৎকালেও ২৩ সেপ্টেম্বর দিন-রাত্রি সমান নহে। ইহার দুই-তিন দিন পরে দিন-রাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা হয়। এই প্রতিসরণের ফলে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বেই দিন আরম্ভ হয় এবং রাত্রি আরম্ভ হয় ইহার অস্তগমনের কিছু পরে।

৩। সূর্যের কলঙ্ক এবং চৌম্বকঝঞ্ঝা

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের মত সরল যন্ত্র সকলের নিকট পরিচিত। ইহার মূল অংশ একটি চুম্বকায়িত কাঁটা। পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তির প্রভাবে ইহা একটি প্রান্ত দিয়া সর্বদা উত্তর দিক এবং অন্য প্রান্ত দিয়া দক্ষিণ দিক নির্দেশ করিতে থাকে।

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যে জাহাজের পথ নির্ণয় করা হয়। বিমানের উড্ডয়নপথ নির্ণয় করিতে বৈমানিকেরা ইহা ব্যবহার করেন। ইহা আমাদিগকে স্থানবিশেষের দিকগত অবস্থান [Bearing] নির্ণয় করিতে সাহায্য করে।

---

* সরকারী টেকনিকাল প্রকাশ ভবনের "জনগণবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থমালার" অন্য একটি পুস্তিকা "দিন ও রাত্রি। ঋতু"-তে [অধ্যাপক র, ভ, কুনিৎস্‌কি] দিন রাত্রি এবং ঋতুর একান্তরণের কারণ আরো বিশদ ভাবে বিবৃত আছে।

বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে কয়েকটি বিশেষ দিনে ইহা কাঁপিতে শুরু করে, এক দিক হইতে অন্য দিকে দুলিতে থাকে। পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভূগোলকের চৌম্বকশক্তিতে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্যই চুম্বকায়িত কাঁটা এইরূপ আচরণ করে। এইরূপ পরিবর্তনকে চৌম্বকঝঞ্ঝা বলা হয়। ইহা রেডিও, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন মারফৎ বার্তা প্রেরণকে প্রভাবিত করে। মানুষের উপরে এই ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা যায় না। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যেই কেবল ইহাদের লক্ষ্য করা হইয়া থাকে।

প্রমাণিত হইয়াছে যে পৃথিবীর চৌম্বকঝঞ্ঝা এবং সূর্যের কতকগুলি ব্যাপারের সঙ্গে নির্দিষ্ট সংযোগ বর্তমান। দেখা যায় যে পৃথিবীর চৌম্বকঝঞ্ঝা সূর্যের কলঙ্কের উপরে নির্ভরশীল। যখন পৃথিবীর দিকে ঘোরানো সূর্যের গাত্রে বহু কলঙ্ক বা সূর্যের কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত একটি বড় কলঙ্ক দেখা যায়, সেই সব দিনে প্রায়ই প্রবল চৌম্বকঝঞ্ঝা সর্বাপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

সকলেই জানেন যে হ্রস্বতরঙ্গে বহু দূরে রেডিও-বার্তা প্রেরণ সম্ভব হয় এইজন্য যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০০ হইতে ২০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ স্তর বর্তমান। তাহার নাম আয়োনোস্ফীয়ার। আয়োনোস্ফীয়ার রেডিও-তরঙ্গকে তাহার মধ্য দিয়া যাইতে দেয় না, পুনরায় ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত করিয়া দেয়। সেখান হইতে আবার ইহা প্রতিফলিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুবার প্রতিফলিত হইয়া হ্রস্ব রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীকে পরিক্রমা করে *।

কিন্তু মাঝে মাঝে রেডিও বার্তা ব্যাহত হয়। ইহার ব্যাখ্যা এই যে সূর্যের পৃষ্ঠের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান যাহারা অধিকাংশই কালো কলঙ্কের নিকট অবস্থিত থাকে, তাহারা পরিবেষ্টনকারী শূন্যে তড়িতাহিত [electrically charged] বস্তুকণা ইলেকট্রন ইত্যাদি নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতাপন্ন। এই বস্তুকণাগুলি ঘণ্টায় ৩০ লক্ষ কিলোমিটার বেগে সূর্য হইতে দূরে চলিয়া যায়। যদি দ্রুতগামী বস্তুকণিকার এইরূপ ধারার মধ্যে পৃথিবী পড়ে তবে আয়োনোস্ফীয়ার-এর প্রতিফলন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। রেডিও বার্তা প্রেরক কর্তৃক প্রেরিত রেডিও তরঙ্গ পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হইয়া আসে না। ফলে হ্রস্বতরঙ্গে রেডিওবার্তা প্রেরণে কতকগুলি ছেদ পড়ে।

চৌম্বক ঝঞ্ঝার সময় পৃথিবীতে প্রচণ্ড রকমের আবহ মোক্ষণ (atmosphere discharge) এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ আবির্ভূত হয়। এই প্রবাহ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের তারে ঢুকিয়া পড়ে এবং মানব অধ্যুষিত স্থানের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ ব্যাহত করে।

যেহেতু সূর্যের কলঙ্কের সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যা গড়ে ১১ বৎসর পরে পুনরাবির্ভূত হয়, সেহেতু চৌম্বক ঝঞ্ঝার সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যাও গড়ে ১১ বৎসর পরে হয়।

বর্তমানে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরগুলিতে তথাকথিত "সূর্যের সেবা" চলিতেছে। জ্যোতির্বিদগণ সমস্ত দিক দিয়া সূর্যের কার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছে এবং ইহার Physical nature...গুণাগুণ অধ্যয়ন করিতেছে। চৌম্বক ঝড়ের অবাঞ্ছিত পরিণামের বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই এই ঝড়ের আগমনের কথা ঘোষণা করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে এই অনুসন্ধানের ফলে। ইহা চৌম্বক ঝঞ্ঝার আগমনের কথা আগে হইতে জানিবার সম্ভাবনা দেয়। ইহা জানিয়া সেই সময় ঝঞ্ঝার অবাঞ্ছিত ফলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪। সূর্যের কলঙ্ক ও মেরুজ্যোতি

মেরুজ্যোতি সর্বাপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয় উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুবৃত্তে। কচিৎ অন্য অক্ষাংশেও দেখা যায়। এই মেরুজ্যোতি ব্যাপারটি কী? অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের উত্তরাংশে লোহিতাভ এবং শ্যামলাভ বর্ণের আলো দেখা যায়। প্রথমে এই আলো অনুজ্জ্বল থাকে। কিন্তু তাহার পরে ইহার উজ্জ্বলতা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে অধিকতর উজ্জ্বল আলোকের সঙ্কীর্ণ পরিসর অথবা রামধনু আবির্ভূত হয়। মাঝে মাঝে মেরুজ্যোতি উজ্জ্বল যবনিকার রূপ ধারণ করে। তাহার ভাঁজগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলিত হইতে থাকে। সময়ে সময়ে আকাশের প্রায় সমস্ত উত্তর দিক নানা বর্ণের আভায় পরিপ্লাবিত হইয়া যায়, ভূপৃষ্ঠও আলোকিত হইয়া যায়।

মেরুজ্যোতির স্থায়িত্ব বিভিন্নপ্রকার। মাঝে মাঝে উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া মেরুজ্যোতি দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যায় আর তাহার পরে অল্পকালের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়। মাঝে মাঝে আবার ইহা তিন দিন পর্যন্ত বিলম্বিত হয়।

মেরুজ্যোতির পর্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে তাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যা গড়ে প্রত্যেক একাদশ বৎসরের মধ্যে একবার দেখা যায়। অর্থাৎ সূর্যের কলঙ্কের মত। ইহাতেই মেরুজ্যোতি এবং সৌর কলঙ্কের মধ্যে সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছিল। কী করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এই সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করেন?

সূর্যের কলঙ্কের সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার পৃষ্ঠ হইতে কণিকার বিকীরণও বাড়িয়া যায়। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কণিকাগুলি [প্রধানত: বিদ্যুৎ-মোক্ষণ] বিপুল বেগে সূর্য হইতে দূরে চলিয়া আসে। দুই একদিনের মধ্যে ইহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছায় এবং ৮০ হইতে ৮০০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ লাগাইয়া বায়ুমণ্ডলকে জ্বলিয়া উঠিতে বাধ্য করে।

বায়ুর সংযুক্তিতে উপস্থিত গ্যাসের পরমাণুগুলি এই কণিকাগুলির আঘাতে উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আলোক নির্গত করে। মেরুজ্যোতির প্রকৃতি এইরূপ।

৫। জল এবং বায়ুর শক্তির উৎস সূর্য

ভূগোলক বায়ুর একটি স্তর "পরিহিত"। ইহার বেধ প্রায় হাজার কিলোমিটার। এই আবরণের ভিতরে পতিত সমস্ত সৌরশক্তি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না। ইহার একটি অংশ মেঘ কর্তৃক

---

* সরকারী টেকনিকাল প্রকাশ ভবনের "জনগণবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থমালা"র পুস্তিকা 'আয়োনোস্ফীয়ারের প্রহেলিকা'য় [ফ, ই, চেস্তনোভ] আয়োনোস্ফীয়ার এবং ইহার বিশেষত্বের বিষয় বিশদ ভাবে বিবৃত আছে।

প্রতিফলিত হইয়া মহাজাগতিক শূন্যে বিকীর্ণ হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল অতি নগণ্য পরিমাণে কিরণশক্তিকে শোষণ করিয়া লয়।

পৃথিবীর উপরে পড়িয়া সৌরশক্তি জল এবং মৃত্তিকাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে এবং ফলে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। প্রথমদিকে বায়ুর নিম্নবর্তী স্তরগুলি বেশী উত্তপ্ত হয়! উত্তপ্ত হইয়া এই স্তরগুলি অধিকতর উদ্ধুক্ত হাল্কা হইয়া যায় এবং উপরের দিকে ওঠে। অধিকতর শীতল এবং ভারী উপরস্থ স্তরগুলি ইহার ফলে নীচে নামিয়া আসে এবং অধিকতর উষ্ণ এবং হালকা স্তরগুলিকে সরাইয়া দেয়। এইভাবে বায়ুর স্তরগুলির উত্তপ্ত হওয়া এবং সঞ্চলন—ইহার আবর্তন ক্রমাগত ঘটিতে থাকে।

সূর্যের তাপের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহার প্রান্তর বন এবং নদী হইতে, সাগর মহাসাগর হইতে জলের বাষ্পীভবন ঘটিতে থাকে। জল হালকা বর্ণহীন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। ইহা উর্ধ্বে ধাবিত হয় এবং বাষ্পকে আর্দ্র করিয়া দেয়। বায়ুর উপরাংশের শীতল স্তরে আসিয়া বাষ্প তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি কিংবা তুষারের আকারে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। মোটামুটি হিসাব অনুসারে বৎসরে ভূপৃষ্ঠ হইতে এত বিপুল পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয় যে অনুমানে ইহা বৈকাল হ্রদে যত জল আছে তাহার প্রায় ১৮ গুণ।

এইভাবে সূর্য বৃষ্টি তুষার ঝঞ্ঝা এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঘটমান অন্যান্য আবহতাত্ত্বিক জগদ্ব্যাপার সৃষ্টি করে।

মাটিতে পড়িয়া বৃষ্টি জলধারা এবং নালার সৃষ্টি করে। ইহারা নদীতে গিয়া পড়ে।

নদীর প্রবাহজাত শক্তিকে প্রায়ই "সাদা কয়লা" বলা হয়। নদীগুলি নিজের মধ্যে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি লইয়া যায়।

প্রাচীন কাল হইতে মানুষ এই শক্তিকে ব্যবহার করিতেছে। water mill.....সবার নিকটে পরিচিত। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে শক্তিশালী turbine.....ঘোরাইবার জন্য নদী এবং জলপ্রপাতের প্রবাহজাত শক্তিকে ব্যবহার করা হয়।

এইভাবে জলের গতির শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরে এই, বিদ্যুৎশক্তি বল, আলোক এবং তাপ ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ অসমানভাবে উত্তপ্ত হয়। এই জন্য একস্থানে বায়ু বেশী উত্তপ্ত হয় অন্যস্থানে কম উত্তপ্ত হয়। ইহা বায়ুর সঞ্চলন হাওয়ার সৃষ্টি করে।

মানুষ গতিশক্তির জন্য হাওয়াকেও ব্যবহার করে। ষ্টিমার আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত পাল তোলা জাহাজে সাগর পাড়ি দেওয়া হইত। বর্তমানেও কতকগুলি ক্ষেত্রে পালের ব্যবহার চালু আছে। wind mill.....গুলিতে বায়ু Prime mover.....হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইহা mill stoneকে.....ঘোরায়। বর্তমানে বিশেষপ্রকারের বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হইতেছে। এখানে "ফিকে নীল কয়লা"—বায়ু শক্তি বল এবং বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে চূড়ান্ত বিচারে নদী এবং বায়ুর প্রবাহজাত শক্তি সৌরশক্তির রূপান্তর ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি সূর্য না থাকিত, তবে নদী কিম্বা বায়ুর প্রবাহ থাকিত না। বায়ুমণ্ডলে ঘটমান

৬। জ্বালানী একটি সৌর শক্তি

সূর্য ব্যতীত একটি উদ্ভিদও বাড়িতে পারে না। প্রত্যেক সবুজ উদ্ভিদে একটি রঞ্জক পদার্থ আছে। ইহার নাম ক্লোরোফিল। সূর্যকিরণের প্রভাবে অজৈব পদার্থ হইতে [কার্বণ, নাইট্রোজেন, অম্লজান] ইহার ভিতরে স্নেহপদার্থ, এ্যালবুমেন, কার্বোহাইড্রেড (চিনি, ষ্টার্চ ইত্যাদি) প্রভৃতি জৈব পদার্থ প্রস্তুত হয়।

সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের কৃপায় বায়ু, জল এবং মাটি হইতে উদ্ভিদ সোজাসুজি খাদ্য টানিয়া লয়। মানুষ কিম্বা জন্তুরা ইহা পারে না। তাদের অস্তিত্বের জন্য যে জৈব পদার্থ প্রয়োজন তাহা তাহারা উদ্ভিদ হইতে পায়।

প্রখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক তিমিরিয়া জেভ, লিখিয়াছিলেন "মন চাইতে ভাল পাচককে যত ইচ্ছা নির্মল বায়ু, যত ইচ্ছা সূর্যালোক এবং পুরা একটি নদী বিমল জল 'দয়া' এই সমস্ত হইতে তাহাকে যদি আপনি শর্করা, ষ্টার্চ, স্নেহপদার্থ এবং শস্য প্রস্তুত করিতে বলেন, তবে সে স্থির করিবে যে আপনি তাহার সহিত রসিকতা করিতেছেন। কিন্তু মানুষের নিকট যাহা একেবারে আজগুবী বলিয়া মনে হয়, উদ্ভিদেরা সবুজ পাতার ভিতরে তাহা অহরহ ঘটাইতেছে।"

উদ্ভিদ আমাদের নিকট কেবল খাদ্য নহে, জ্বালানীও।

উনানে কাঠ, খড় কিম্বা কাঁচা পাথরে কয়লা পোড়াইয়া আমরা উত্তাপ পাই। এই শক্তিও সর্বশেষ বিশ্লেষণে সূর্যের শক্তি। কাঠের তাপ সূর্যরশ্মি কর্তৃক আনীত হইয়াছিল এবং উদ্ভিদরূপে রক্ষিত ছিল।

বহু কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জাত বিরাট বিপুল পরিমাণ বিরাট horse tail/....

এবং অন্যান্য জাতীয় গাছপালা কতকগুলি ভূতত্ত্বীয় পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরদ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিপুল চাপের অধীনে এবং বায়ুর নাগালের বাহিরে থাকিয়া এই সমস্ত উদ্ভিদ পাথরে কয়লায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে পেট্রোলিয়াম অনুরূপ উপায়ে উৎপন্ন হইয়াছিল—কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় প্রাচীন সামুদ্রিক এবং স্থলজ উদ্ভিদ ও জন্তুর বিয়োজনের ফলে।

দাহ্য পদার্থের প্রায় সমস্ত রূপ, জ্বালানীর সমস্ত প্রকার, পৃথিবীতে প্রাপ্তব্য সমস্ত শক্তির ভাণ্ডার উৎপত্তির দিক হইতে সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট।

৭। হলুদ কয়লা—

এইভাবে ব্যবহারিক দিক দিয়া পৃথিবীতে সূর্যরশ্মি এ-পর্যন্ত প্রায় একমাত্র শক্তির উৎস। যদি ইহাই হয় তবে এই শক্তিকে সোজাসুজি ব্যবহার করা যায় না কি? ইঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি বিশেষ ক্ষেত্র—হেলিও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজই ইহা। সৌরশক্তিকে প্রায়ই "হলুদ কয়লা" বলা হয়।

হেলিও ইঞ্জিনীয়ারিং যদিও এখনো ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে, তবু সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই সূর্যরশ্মির শক্তি সংগ্রহ এবং ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র তৈয়ারীর কাজে বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে ইহা সুপরিজ্ঞাত যে অবতল আয়নার

সাহায্যে বেশ কিছু পরিমাণ সৌর তাপ একটি বিন্দুতে (ফোকসে) সংগ্রহ করা যায়, সমাহরণ (concentrate) করা যায়।

আতস কাচ সবার নিকটেই পরিচিত। ইহা সূর্যরশ্মিকে সমাহরণ করে। এইরূপ কাচের সাহায্যে সিগারেট ধরানো যায়, কোনো সহজদাহ্য বস্তুতে আগুন লাগানো যায়।

হিসাব এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি একটি অবতল আয়নাকে সূর্যরশ্মির পথে মুখোমুখি করিয়া রাখা হয় এবং তাহার ফোকসে একটি জলপূর্ণ কেটলী স্থাপন করা হয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে জল ফুটিতে আরম্ভ করে। ইহার জন্ত আয়নাটিকে শুধু সূর্যরশ্মির আপেক্ষিক দিকে ঘুরাইয়া রাখা প্রয়োজন। যাহা হউক আপাত দৃশ্য সরলতা সত্ত্বেও আঙ্গিকগত (technical) অসুবিধার জন্ত বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যবহারের মত এইরূপ যন্ত্র এখনো প্রস্তুত হয় নাই। এই ধরণের যন্ত্র নির্মাণকারীদের প্রধান সমস্যা হইতেছে এই যে, এমন যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগানো যাইবে। এইরূপ সমস্যা রহিয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার যাহার মধ্যে সাধ্যমত বেশী সূর্যরশ্মি কার্যকরী করা যায়।

এইরূপ যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা সহজ রূপ হইতেছে রৌদ্রে স্থাপিত একটি সাধারণ আধার। ইহা মাটিতে ভর্তি এবং সমতল কাচ দ্বারা আবৃত একটি কাঠের বাক্স দ্বারা গঠিত। সূর্যকিরণ স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়া গিয়া বাক্সের মাটিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। এই ধরণের যন্ত্র সূর্যরশ্মি ধরিবার একটি মৌলিক ফাঁদ।

এই বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্ত গ্রীষ্মকালীন নির্মল দিনে এইরূপ একটি আধার রৌদ্রে রাখাই যথেষ্ট ; তিন চার ঘণ্টা পরে ছুঁইয়াই বোঝা যায় যে, আধার-এর ভিতরকার মাটির উষ্ণতা তাহাকে পরিবেষ্টনকারী মাটির উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক বেশী।

সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিক ক. গ. ত্রোফিমভ্ তাসকেন্ৎ-এ একটি সূর্যস্নানঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সমতল একটি কাচের নীচে রক্ষিত, কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ধাতুনির্মিত একটি জলপাত্র দ্বারা গঠিত। এইরূপ পাত্রে জল অপেক্ষাকৃত দ্রুত ফুটন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এমন কি মেঘাচ্ছন্ন দিনেও ইহা যথেষ্ট গরম হয় এবং ইহা দ্বারা স্নান করা যায়। অধ্যাপক ফ. ফ. মোলেরো কর্তৃক কৃত একটি Project/... অনুসারে একটি সৌর যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে জল বাষ্পে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং canned food তৈয়ারীর জন্ত ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েৎ হেলিও ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্তৃক অন্ত অনেকগুলি সৌর যন্ত্রপাতি নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা খাবার সেদ্ধ করা এবং ভাজা হয়, ফল শুকানো, জল ফোটানো ইত্যাদি হয়।

হেলিও-ইঞ্জিনীয়ারদের এই কীর্তি কেবল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

৮। সূর্য দ্বারা চিকিৎসা—

সূর্যরশ্মি আমাদের নিকট শুধু যে খাদ্য, তাপ এবং আলো বহিয়া আনে তাহা নহে, স্বাস্থ্যও আনে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ বিভিন্ন অসুখে সূর্যকিরণ দ্বারা চিকিৎসিত হইত। 'সূর্য যেখানে উঁকি দেয় না, সেখানে হাজির হয় ডাক্তার'—একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য ইহা বলে।

দৃশ্য রশ্মিগুলির সঙ্গে সূর্য আমাদের নিকট অতি বেগুণী রশ্মি পাঠায়। ইহা চোখে দেখা যায় না। চিকিৎসালয়ে এই রশ্মির বিশেষ ভাবে ব্যাপক ব্যবহার আছে। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে সূর্য-রশ্মিকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কাজে লাগান হইতেছে। বিভিন্ন অসুখে ভুগিতেছে এমন হাজার হাজার মানুষ সৌরশক্তির ক্রিয়ায় নিজেদের কর্মক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছে ; পুনরায় শারীরিক দিক দিয়া পূর্ণ, সুস্থ এবং খুশমেজাজী হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য সূর্যকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করিতে হইলে, তাহা কেবল ডাক্তারের কড়া নিয়ন্ত্রণে হওয়া দরকার। সূর্যকে অদক্ষ এবং অপরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে উপকার না হইয়া অপকার হইতে পারে। রৌদ্রে গাত্র পুড়িয়া যাইতে পারে, সর্দিগর্মি হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপসংহার—

সমকালীন বিজ্ঞানে সূর্যের বিষয় যাহা পরিজ্ঞাত তাহার অতি অল্প আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিবৃত করিয়াছি। শুধু মাত্র সূর্যে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলি পরিষ্কারভাবে জানিবার জন্তই নহে, অসংখ্য তারকারাজির প্রকৃতি জানিবার জন্ত পৃথিবীর বহু জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্তও সূর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

সূর্যের জীবনদায়ী কিরণের কৃপায় পৃথিবীতে বহু কোটি বৎসর যাবৎ বিভিন্ন ধরণের flora/...... এবং fauna-গুলি/...... বাঁচিয়া আছে এবং ক্রমবিকশিত হইতেছে।

বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত, রকম "মতবাদ" দ্বারা মানুষকে পৃথিবীর ধ্বংসের কথা বলিয়া ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছে। যেমন, 'সূর্যের নির্বাপনের' মতবাদ রহিয়াছে। ইহা যে মিথ্যা এই পুস্তিকায় তাহা দেখানো হইয়াছে।

কিছু বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক জোর দিয়া বলিতেছেন যে ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্র এবং সূর্য ও অপরিহার্যরূপে জ্বলিতে বাধ্য, "নূতন" তারকাগুলি যেমন জ্বলে। আর, তাহা হইলেও পৃথিবীতে জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যদি আমাদের সূর্য অনুরূপ ভাবে জ্বলিতে থাকিত তাহা হইলে ইহার উজ্জ্বলতা কয়েক হাজার গুণ বাড়িয়া যাইত, এবং ফলে এই গ্রহের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত ধ্বংস হইয়া যাইত।

দেখুন, যদি আমাদের সূর্য অনুরূপ অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়া থাকে, তবে ইহার উজ্জ্বলতা কয়েক সহস্র গুণ বেশী ছিল এবং তবে তাহা হইলে আমাদের গ্রহের সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ ধ্বংস হইয়া যাইত।

কিন্তু এই "মতবাদ" বিজ্ঞানের সমালোচকদের নিকট টিকিতে পারে না। সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিক প. প. পারেনা ভা এবং ব. ভ. কুকারকিন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেই প্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের সূর্য 'নূতন তারকা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে, জ্বলিয়া উঠার ভয় ইহার নাই। 'নূতন তারকা'—বিশেষ প্রকারের কয়েকটি অল্পসংখ্যক তারকার শ্রেণী। ইহাদের প্রত্যেক 'নূতন' তারকার মত পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

যতই দিন যাইবে মানুষ ততই গভীরভাবে বিশ্বজগতকে জানিতে পারিবে। চিনিতে পারিবে পৃথিবী এবং নক্ষত্রজগতকে। মানুষ আরো গভীরভাবে সূর্যকে অধ্যয়ন করিতেছে, বৈজ্ঞানিকভাবে Verified/... ...মতবাদ দ্বারা মিথ্যা মনগড়া কথা এবং বিবাদসংকুল অনুমানের স্থান পূর্ণ করিতেছে। মানুষের জ্ঞানের কোনো সীমা নাই!

সমাপ্ত

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

পরের দিন সকালে প্রাতর্ভোজ সেরেই ছুটতে হল কেনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার সঙ্গী ছিলেন ডাঃ খান। হায়দ্রাবাদ আসাফিয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। বয়স আন্দাজ ৫০। বেঁটে সেঁটে ভাল মানুষ কিন্তু গতি অতি মন্থর। যথা সময়ে আমরা সভাকক্ষে গিয়ে স্থান নিলাম। আমরা বিদেশী তার উপর নবাগতের দল সেজন্য এ দেশের কথা আমাদের সর্বপ্রথমে জানা উচিত। স্যার জনের সভাপতিত্বে অষ্ট্রেলিয়ান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী মিঃ হ্যাসলাক "অষ্ট্রেলিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ান" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার সারমর্ম হচ্ছে—

নতুন মহাদেশ এই অষ্ট্রেলিয়া। মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যে তার ইতিহাস সীমাবদ্ধ। এই মহাদেশের অধিকাংশই বিশেষতঃ মধ্য ভাগ মরুভূমি সে জন্য বসবাসের অযোগ্য। গোড়াপত্তন থেকে এই সব মরুভূমি আবিষ্কার ও জরিপের কাজ চলছে। যারা এ কাজ হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছেন তাদের অনেক দুঃখ দুর্দশা এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে হয়েছে। সেই সব কাহিনী আজও মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে যেমন—Disappointment Lake, Land of sorrow ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের চেয়ে আয়তন বড় হলেও এই মহাদেশে লোক সংখ্যা কোলকাতার সমান।* এই মহাদেশের মূল অধিবাসীরা কমতে কমতে আজ ৪৬,৬০০ এ এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তারা এখনও প্রস্তর যুগের সীমা অতিক্রম করে আসতে পারে নি। বর্তমানে অধিকাংশ আদিবাসী মধ্য ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার বসবাসী এবং মিশনারীদের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করছেন।

মেষ ও গোপালন ছাড়া খনিজ দ্রব্য (সোনা, কয়লা, রূপা, দস্তা, লোহা ইত্যাদি) আহরণের উপর এই মহাদেশের প্রধান ভরসা। নিদারুণ জলকষ্টের জন্য চাষবাসের সুবিধা খুব কম কিন্তু বর্তমানে সরকারী বন বিভাগ পাইন গাছের চাষ করে জমি উর্বরা করবার চেষ্টা করছেন।

গোড়াপত্তন থেকে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের জীবন ধারণের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সে সংগ্রাম আজও চলেছে সমান ভাবে। সে জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় ভাবপ্রবণতার স্থান খুব কম। প্রতিটি মানুষ কঠিন বাস্তববাদী এবং এই বাস্তববাদীতার জন্য ধর্মপ্রবণতা খুব কম।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রচুর উৎসাহ দেওয়া সত্বেও সাধারণ জনসংখ্যা খুব কম। সেজন্য নিয়মিতভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে প্রতি বছর লোক আনবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য।

মিঃ হ্যাসলাক কাজের লোক তার উপর আবার তখন পার্লামেণ্টের কাজ চলছে সেকারণ বক্তৃতা শেষে তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। বৃদ্ধ স্যার জন রইলেন আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। প্রথমে আমি প্রশ্ন করলাম—বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের সঠিক সম্পর্ক কি? স্যার জন চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তার পর দুখানা হাত পকেটের মধ্যে দিয়ে বলতে সুরু করলেন—শ্বেতকায়গণ প্রথম যুগে এই দেশের অধিবাসীদিগের উপর যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য আজকের দিনে সবাই দুঃখিত। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ান সরকার আদিম অধিবাসীদের পৃথক করে রেখে দেওয়াকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না সে কারণ সকলপ্রকার উপায়ে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা চলছে। যারা শিক্ষা পেয়েছেন সরকার তাদের কাজের ও সাধারণ অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের মতন সকল প্রকার নাগরিক সুখ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করছেন। যারা ফিরিঙ্গী বা দোআঁশলা (Half blooded) তারা অনেকেই সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এমন কাজের জন্য সরকার কোন রকম জোর জুলুম করতে রাজী নন। যারা স্বেচ্ছায় এলো ভালো আর যারা তাদের পুরোনো সভ্যতার মধ্যে থাকতে চায় তাদের জন্য বিশেষ রক্ষিত স্থানের বা Reserved Territory-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনা সরকারী অনুমতিতে কেউ এই রক্ষিত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বর্তমানে অধিকাংশ আদিম অধিবাসী উত্তরাংশে বসবাস করেন।

আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে স্যার জন সবেমাত্র চেয়ারে বসেছেন অমনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাও প্রশ্ন করলেন—অষ্ট্রেলিয়ানদের জীবনের Philosophical attitude কি বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হাসিমুখে স্যার জন আবার উত্তর দিতে সুরু করলেন—পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা জীবনযাত্রার স্তর বা মাত্রাকে উঁচু করে রাখাই অষ্ট্রেলিয়ান জীবন দর্শনের সারসত্য। মানুষকে সেবা করা, মানুষকে সাহায্য করা অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের বড় কাজ। জীবন দর্শন সামাজিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে কেবলমাত্র নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে চায় না।

সকালের কাজ এইখানেই শেষ হল। তখন প্রায় ১২টা। তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার ঘরে হাজির হলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কার না একটু গড়াতে ইচ্ছা হয় যদি তার ওপর আবার খাওয়াটা ভাল হয়। কিন্তু উপায় নেই। ২টার সময় পার্লামেণ্টের সেসন দেখতে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং রাত্রে পার্লামেণ্ট হাউসে ভোজের নিমন্ত্রণ।

খাওয়া শেষের পর প্রশস্ত আরাম কক্ষে আমরা বসেছি এক জায়গায়—ভারতবাসী, পাকিস্তানী, বর্মী, ইন্দোনেশিয়ান ও ফিলিপাইনবাসী। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আলাপ সবে জমে

---

* অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন: ২,৯৭৪,৫৮১ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা ৮,৭৫২,৮১১।

উঠেছে এমন সময় মিঃ পেরী এসে খবর দিলেন যে পার্লামেন্ট যাবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত। নূতন বন্ধুবান্ধবদের সাময়িক বিদায় দিয়ে আমরা পার্লামেন্ট দেখতে যাবার জন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আমি ও আমার বন্ধু ডাঃ খান (হায়দ্রাবাদ সরকারী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক) দুজনেই কাল শেরোয়ানী পরেছি আর ফিলিপাইনদের মধ্যে দুজন তাদের জাতীয় নৈশ ভোজের পোষাক পরেছেন। কাল পাজামা ও খুব পাতলা কাপড়ের হাফ-হাতা পাঞ্জাবী তাতে আবার নানান কারুকার্য্য করা।

গাড়ী ছুটে চলেছে একে-বেঁকে উঁচু-নীচু পথ ধরে। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। কেনবারা সহর সত্যি সুন্দর। চলন্ত গাড়ী থেকে কেনবারা নগরী যেন একটি তরুণী মেয়ে—যৌবনে টগবগ করছে কিন্তু কোথাও আতিশয্য নেই। তার প্রতি পদক্ষেপ ক্ষিপ্র। চঞ্চল আর স্ফূর্তি...নী অথচ মাধুর্য্যময়ী। দেখতে দেখতে চোখে একটা নেশা ধরে যায়। ভাবছিলাম দিল্লীর কথা—সপ্তনের কথা। পুরানো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে এরা আবার নতুন হতে যায়। এদের দেখলে শ্রদ্ধা হয় সত্যি কিন্তু এমন নেশা লাগে না।

পার্লামেন্ট হাউসে পৌঁছবামাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে পার্লামেন্টের গ্রন্থাগারে নিয়ে গেলেন। এই পার্লামেন্টের গ্রন্থাগার অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ অঙ্গ এবং সাধারণতঃ পার্লামেন্টের সভ্যদের সাহায্য কাজের মধ্যেই এর পরিধি সীমাবদ্ধ। ঘণ্টাখানেক গ্রন্থাগার পরিদর্শন করার পর আমরা পার্লামেন্টের বিতর্ককক্ষে বিশেষ দর্শকের গ্যালারীতে স্থান নিলাম। কিছুক্ষণ পরে একে একে মন্ত্রী, সভাপতি, সভ্য ও দর্শকবৃন্দ এসে পৌঁছলেন। কাজ সুরু হ'ল। পার্লামেন্টের তর্ক বিতর্ক, প্রেসিডেন্টের হাতুড়ীর ঘা, বিপক্ষবাদীদের টিটা বিদ্রূপ সব দেশেই একই রকমের—তার মাঝে আর দেশকাল ভেদে বোধ হয় বিশেষ কোন প্রভেদ নেই, কিন্তু তবু ও মন্দ লাগছিল না। বিপক্ষবাদীদের প্রশ্নবাণে মন্ত্রীমশাইরা কি রকম জর্জরিত হচ্ছিল তা বিশেষ উপভোগ্য। এইখানে প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেঞ্জী ও বিপক্ষ দলের নেতা মিঃ ডুভাটকে দেখলাম। বাংলার লাট হিসাবে মিঃ কেসীকে দেখেছিলাম যখন তখনকার চেয়ে তিনি এখন অনেক বুড়িয়ে গেছেন। কপালে চিন্তার রেখা সারিসারি স্থান পেয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই পার্লামেন্টারী রঙ্গরস উপভোগ করার পর আমরা একেএকে বিদায় নিলাম।

অষ্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে লেবার পার্টি, লিবারেল পার্টি ও কানট্রি পার্টি এই তিনটি পার্টিই প্রধান। লেবার সর্বাপেক্ষা পুরাতন দল এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। লিবারেল পার্টিরও শাখা সারা দেশময় কিন্তু কানট্রি পার্টি কেবলমাত্র তার শাখাও কার্য্যাবলী সহরতলী ও গ্রাম এলাকায় এবং বিশেষ করে ক্ষেত খামার অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

এই দেশে পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেককে (স্ত্রী পুরুষ উভয়ে) যাহারা ২১ বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক ভোট দিতে হবে এবং বিনা কারণে ভোট না দিলে ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬ টাকা মত জরিমানা করিবার আইন আছে।

সন্ধ্যা ৬টার সময় জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মিঃ হোয়াইট আমাদের সঙ্গে করে পার্লামেন্টের ভোজন কক্ষের পাশে একটা ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। এখানে আমরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত শ্রীদিলীপ সিংহজী, তাঁহার স্ত্রী ও অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ কেসী ও প্রধান বিচারপতি মিঃ জন লেথাম ও পার্লামেন্টের সভাপতির সঙ্গে পরিচিত হলাম। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে গল্পসল্প আলাপ আলোচনা সুরু হল। বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মিঃ কেসী বোধহয় একজন বাঙালীকে দেখে মনে মনে খুসী হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী ও ভারতবর্ষের অনেক কথাই আলোচনা হল এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে মিঃ কেসী অনেক কথাই জানালেন। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ৬টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে খাবার ঘরে পৌঁছলাম।

গল্পসল্প আলাপের মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানেক লাগল খাওয়া শেষ হতে। যা যা খাওয়া হল তার একটা তালিকা দিলাম—

১। Iced Consomme
২। Schnapper Meuniere
৩। Chicken Chasseur
৪। Fruit Bombe
৫। Dessert
৬। Coffee

ভোজসভা ভঙ্গ হবার পূর্ব্বে মিঃ কেসী উঠে দাঁড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ান সরকার ও অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের পক্ষ হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার গ্রন্থাগারিকদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। আমাদের তরফ থেকে আমাদের রাষ্ট্রদূত তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার পর ভোজসভা শেষ হ'ল।

ভোজসভা শেষ হ'ল কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই ভোজের তালিকার গায়ে যোগদানকারীদের দস্তখৎ করিয়ে নিতে ভুলিনি। ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ এর মূল্য অনেক। হয়ত বা একদিন ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসাবে Archiers এ স্থান পেতে পারে। ভাবছেন দুরাশা

কিন্তু যোটেই না। Atom ও Hydrogen বোমার যুগে ৫০ বছর পরে পৃথিবীর চেহারা যে বদলে যাবে না তা কে বলতে পারে আর ৫০০ বছর পরে হয়ত বা নতুন করে পরিচয় হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার। তখন তো আমাদের ভোজ তালিকার গায়ে দস্তখতগুলো এক পুরোনো দিনের বন্ধুত্বের নজির হয়ে রবে। তাই বলছি ভবিষ্যতের স্মারক চিহ্ন হিসাবে-এর মূল্য অনেক।

ভোজসভা শেষ হবার পর মিঃ কেসী ও অন্যান্য রাজপুরুষরা মায় আমাদের হাইকমিশনার সাহেবও বিদায় নিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মিঃ হোয়াইট আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি জানালেন যে কদিন ধরে পার্লামেন্টের লাইব্রেরীতে অস্ট্রেলিয়ার এক ঐতিহাসিক প্রদর্শনী চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করে বললেন। আমরাও তাঁর অনুরোধে সায় না দিয়ে পারলাম না।

প্রকাণ্ড হলঘর। সারি সারি কাচের শোকেস আর তার মধ্যে সাজান রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক দলিলপত্র পুরানো ম্যাপ ও এই মহাদেশ গড়ে উঠবার প্রারম্ভকাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এক সচিত্র বিবরণী। চোখের সামনে অস্ট্রেলিয়ার পত্তনী কাহিনীটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাত তখন সাড়ে দশটা। পানযোগ সমাপনান্তে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগার ও পার্লামেন্ট ভবন থেকে বিদায় নিলাম।

ইংরাজী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল। এই দিনটা বিশেষ করে স্মরণীয়, কারণ এই দিন থেকে আমাদের সম্মেলনের কাজ সুরু হয়েছিল। সকাল ৯টা বাজতে ১৫ মিনিট থাকতে আমরা তিন বন্ধু ডাঃ খান, শ্রীরাম গোস্বামী ও আমি হেভলক হাউস থেকে National Universityর দিকে রওনা হ'লাম। University খুব কাছে মিনিট পাঁচেকের পথ। পথে সিভিক সেণ্টারে পোষ্ট অফিস। সবাই ঢুকলাম খাম পোষ্টকার্ড কেনবার জন্য। দমদমে প্লেন ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক কেটে গিছল। আজ আবার "মা" ডাকের মত খাম পোষ্টকার্ডের মাধ্যমে দেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গে যোগসাধন করতে সবাই ব্যস্ত। আমি চারখানা Air letter কিনলাম। প্রত্যেকটির দাম ৭ পেন্স করে। এখানেও ইংলণ্ডের মত পাউণ্ড, শিলিং ও পেন্সের রেওয়াজ তবে মূল্যের প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের ১০।৴০ আনায় অস্ট্রেলিয়ার ১ পাউণ্ড।

আমরা যথাসময়ে National University-তে এসে হাজির হ'লাম এবং ঠিক ৯টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের দৈনন্দিন কাজ সুরু হল। মাঝারী আকারের একটি ঘর এ কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। ঘরে ছিলেন ৬ জন ভারতবাসী, ৬ জন ফিলিপাইন, ৬ জন অস্ট্রেলিয়ান ও একজন আমেরিকান। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মিঃ হোয়াইট তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি সুন্দর জীবনবৃত্তান্ত এঁকে দিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় মেলবোর্ণ সহরে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় রাজধানী কেনবারাতে স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে গ্রন্থাগারটিকেও মেলবোর্ণ থেকে কেনবারায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৯৩৫ খৃঃ ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। একাধারে ইহা পার্লামেন্টের সদস্যদের চিন্তার ও রাজনৈতিক আলোচনার, সাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার রসদ জোগায়।

তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক গবেষণাগারকে উপযুক্ত বই পাঠিয়ে সাহায্য করা এদের অন্যতম কাজ। এসব কাজ তো আছেই উপরন্তু কেন্দ্রীয় ফিল্ম গ্রন্থাগারের দায়িত্বও এদের ঘাড়ে চাপান হয়েছে। এত করেও এরা সন্তুষ্ট নয়—ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় এরা ভরপুর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা চললো তারপর সুরু হল স্ব স্ব দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম আলোচনা।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা জাতীয় গ্রন্থাগার দেখতে গেলাম। আমাদের গাইড হিসাবে সঙ্গে আছেন মিস্ হল। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব দেখালেন। এই হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগ। মস্ত প্রকাণ্ড উঁচু চৌকান বাড়ী—পিছনে অনেকটা খালি জায়গা পড়ে—ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে পূরণ করবার জন্য। দেখলাম রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়েরই ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করে রেখেছেন কিন্তু সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয় যেমনটি দেখেছিলাম ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে। অনেকক্ষণ ঘোরা হ'য়েছে ফলে অল্পস্বল্প ঘাম হচ্ছে। ঘোরা আর পোষাচ্ছে না বিশেষ করে এই গরমের জামা কাপড় পরে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব তাই দলছাড়া হয়ে পড়লাম। এক কোণে আপন মনে একটি তরুণী কর্মচারী কাজ করছিলেন। জলের খোঁজে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে একটু ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?"—"তেমন কিছু না তবে যদি দয়া করে এক গ্লাস জল দেন ত বড় উপকার হয়।"

হেভলক হাউসের সামনে। মাঝখানে দেশীয় পোষাকে লেখক।

"চলুন ঐ বিশ্রামঘরে আমার সঙ্গে আসুন এই পথে।" বিশ্রাম ঘরের দিকে যাচ্ছি দুজনে। মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলেন—"এই বুঝি আপনাদের জাতীয় পোষাক?" "হ্যাঁ, কেন ভাল লাগছে না বুঝি?" "না, না, আমি তা বলিনি। তবে আগে কখন ত দেখিনি কিনা তাই। তা আপনাকে বেশ মানাচ্ছে"—বলে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে বিশ্রামঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ও জলের সন্ধানে পিছু পিছু ঢুকলাম। ঠাণ্ডা একগ্লাস জল এনে ধরলেন অবশ্য কাগজের এক গ্লাসে। জল খেয়ে দুজনে দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সিগারেট ধরালাম। গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানা হয়ে গেল। মেয়েটির নাম বলতে নেই তাই বলবো না, বাড়ী মেলবোর্ণে। এবার বি, এ, পাশ করে জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ নিয়েছেন কিন্তু কাজ তার ভাল লাগছে না কারণ অষ্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগারসমূহে যদিও মেয়েরাই বেশী কাজ করেন কিন্তু পুরুষদের চেয়ে তাদের মাইনে কম। তাছাড়া ভাল কাজ খালি হলে পুরুষ কর্ম্মীরাই আগে সব সুবিধা পান। তবে তিনি পড়াশুনা ভালবাসেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে খুব ইচ্ছুক পড়াশুনাও কিছু কিছু করেছেন। কথায় কথায় বললেন—"ভারতবর্ষকে আমি শ্রদ্ধা করি—একটা বিরাট ইতিহাস আর আভিজাত্য আছে তার পিছনে। ভারতবর্ষে যাবার আমার বড় সখ। শুনে ভাল লাগল আর সিগারেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীসাথীদের খোঁজে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় মেয়েটি তার সলাজ চোখ দুটো আমার সামনে তুলে অনেক সাহস করে যেন জিজ্ঞাসা করলেন—"নিয়ে যাবেন আমাকে আপনাদের দেশে?" এমন সময় সহ-প্রধান গ্রন্থাগারিক হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালেন যে সবাই একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বড় আমুদে লোক এই গ্রন্থাগারিক। একেবারে নাছোড়বন্দা, হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন—মেয়েটির কথার জবাব দেওয়া হ'ল না।

[ক্রমশঃ।

মেয়েরা কি চায়?

"রমণীর মন সহস্রবর্ষেরি সখা সাধনার ধন" বলেছিলেন একদা বরেণ্য কবি, সহস্র বর্ষের না হোক্ মেয়েদের মন জয় করার জন্য সামান্য একটু সাধনা করতে তো ক্ষতি নেই কিছু, কিন্তু সেটুকুতেও অধিকাংশ পুরুষ নারাজ। ফলে গৃহের শান্তি নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আর কার্য্যত ঘটছেও তা চতুর্দ্দিকে!

মেয়েরা জাত রোমান্টিক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অসংখ্য অসুবিধাকে হাসিমুখেই স্বীকার করে নিতে পারে তারা যদি দিন-শেষের ক্লান্তি হরণ করার পাথেয় তাদের ঝুলিতে থাকে, সে পাথেয় স্বামীর সোহাগ বা প্রণয়ীর প্রেমাদর।

চারদিকের অসংখ্য বিবাহিত দম্পতির জীবন অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যায়, উপরোক্ত কথাটি কি নিদারুণ ভাবেই না সত্য। অভ্যস্ত দিনযাপনের বাঁধা রুটিনে দিন কেটে যায় মসৃণ গতিতেই। আত্মতৃপ্ত কর্মব্যস্ত স্বামীর তৃপ্তিতে হয়ত ত্রুটি ঘটে না একটুও; স্ত্রীর মনে ওদিকে জমতে থাকে কি এক অজানা অসন্তোষ, যার কোন সন্ধানই হয়ত পৌছয় না তাঁর কাছে। জীবন তো শুধু কোনক্রমে দিন-রাত্রি অতিবাহিত করার ফর্মুলা নয়, তার কাছে মানুষের প্রাপ্য আছে আরও অনেক কিছুই, প্রাণের আরাম, চিত্তের শান্তি, দেহের তৃপ্তি এই ত্রিবিধ উপকরণেই মানুষের সহজাত অধিকার, এর কোনটি থেকে বঞ্চিত হওয়াই তো চলবে না তাহলে তো জীবন ধারণ হয়ে উঠবে গন্ধভের ভার বহন করার মতই দুঃখদায়ক।

মেয়েদের পক্ষে এ কথাগুলি বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য, ভিতরের আনন্দ ফুরিয়ে গেলে তাই মেয়েরা ভেঙ্গে পড়ে সহজেই, পুরুষ প্রকৃতিতে বহির্মুখী বাহিরের জগতের সাফল্য-অসাফল্যেই তার জীবন-কেন্দ্রের ভারসাম্য বজায় থাকে—তার সঙ্গে থাকে তার স্থূল জৈবিক প্রয়োজন মেটা-না মেটার প্রশ্ন। প্রেমের ধার বড় একটা ধারে না সে, ওটা তার কাছে একটা নেহাৎ রোমান্টিক কল্পনাবিলাস মাত্র।

নারী কিন্তু শুধু জৈব আকাঙ্খার নিবৃত্তিতে বিশ্বাসী নয়, নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হল প্রেম, স্বাভাবিক যৌনক্ষুধা তাঁরও আছে, কিন্তু সেই ক্ষুধাকে কল্পনার নানা রঙে ছুপিয়ে না নিলে তার তৃপ্তি নেই; শুধু দেহের পরশে চলবে না তার, মনের পরশও যে তার চাই সমান ওজনেই তা না হলেই তার অন্তর কেঁদে মরবে গুমরে গুমরে।

স্বামীকে তাই হতে হবে কলানিপুণ প্রেমিক, জাগিয়ে তুলতে হবে স্ত্রীর দেহ-মনকে নিপুণভাবেই তবেই হবে সার্থক স্ত্রী-পুরুষের মিলিত জীবন, দাম্পত্য হয়ে উঠবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও সফল।

যৌনক্ষুধা বা জৈবিক আকাঙ্খা সৃষ্টির অন্যতম আদি সত্য, শরীরের পক্ষে অপরাপর কয়েকটি যেমন প্রকৃতিগত সংস্কার আছে যৌনাকাঙ্খা তাদেরই অন্যতম।

এ বিষয়েও অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত, মেয়েদের পক্ষেও যে পূর্ণ যৌন-জীবন অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক একটি চাহিদা মাত্র, একথা অনেকেই স্বীকার করতে চান না। ফলে বহু জায়গায় দাম্পত্য হয়ে ওঠে নীরস গতানুগতিক এক অভ্যাস। পাশাপাশি দুটি মানুষ দিন অতিবাহিত করে চলেন, সে-চলায় মিল থাকলেও থাকে না কোন ছন্দ।

যৌন জীবনের সফলতার উপর মেয়েদের জীবন অনেকটাই নির্ভরশীল, সংসারকে সুন্দর করে তোলার জন্য তাঁদের মনে শান্তি ও আনন্দ থাকা প্রয়োজনীয় আর এই আনন্দের ভাঁড়ার হল তাঁদের অন্তর। অন্তরে অমৃতরসের যোগান ঠিকমত থাকলে বাইরের সহস্র অসুবিধাকেও তাঁরা হাসিমুখে স্বীকার করে নিতে পারেন আর সার্থক দাম্পত্য বা সার্থক প্রেমই একমাত্র বস্তু, যা জোগাতে পারে সেই অন্তরের অমৃতকে। মেয়েরা খোঁজেন তাই শুধু মানুষ নয়, মনের মানুষ। স্বামীকে, পুরুষকে তাই হতে হবে দরদী ও মরমী, না হলে শত সহস্র মন্ত্র-তন্ত্র আইন-কানুনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েও দাম্পত্য-জীবনকে বাঁচানো যাবে না চরম ব্যর্থতার হাত হতে।

বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রাজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উদ্বোধনী ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প

এরূপ ডাক দিতে গেলে প্রয়োজন অন্ততঃ পক্ষে ৩½ থেকে ৪ টি ট্রিকের মত তাস (১৬ থেকে ১৮ পয়েণ্ট), বিপক্ষদলের ডাকের রংয়ে ন্যূনপক্ষে একবার রোখবার ক্ষমতা দুবার রোখবার মত হ'লেই ভাল—এবং ছয় পিঠ জয় করবার মত শক্তি। সাধারণতঃ বিপক্ষ দলের ডাকের রংয়ে রোখবার তাস সহ ছিদ্রহীন ৫খানি নীচু দরের রংয়ের তাস ও অন্ত দুটি রংয়ের কিছু ছবি তাসেও এরূপ ডাক কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে।

বাধ্যতামূলক তিন বা ততোধিক ডাক

বিপক্ষদলের ডাকের উপর একটি বাড়িয়ে তিনের ডাক, বাধ্যতামূলক তিনের ডাক এবং দুটি লাফিয়ে তিনের ডাক, এই তিনটি ডাকের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত ডাকটি (একটি বাড়িয়ে তিনের) গেমে উৎসাহদানকারীর পর্য্যায়ের, দ্বিতীয় ডাকটি (বাধ্যতামূলক তিনের) সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ডাক এবং তৃতীয়টি (দুটি লাফিয়ে তিনের ডাক) এককালীন বিপক্ষদলের ডাক বিনিময়ে বাধাসৃষ্টিকারী (Pre-emptive) ডাক।

প্রথম পর্য্যায়ের ডাক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হ'য়েছে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ডাক প্রায় একের উপর বাধ্যতামূলক দুইয়ের ডাকের অনুরূপ, কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে উপরোক্ত ডাকের বেলায় প্রয়োজন নন ভালনারেবল্ ও ভালনারেবল্ অবস্থায় যথাক্রমে পাঁচ ও ছয়পিঠ জয় করবার মত শক্তি কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে দরকার হয় একটি করে পিঠ বেশী জয় করবার শক্তি অর্থাৎ যথাক্রমে ছয় ও সাত পিঠ জয় করবার তাস। ট্রিকদর ১½ থেকে ২এর মধ্যে। তৃতীয় ডাকটি হয় চরিত্রগত বিশেষত্বে, ট্রিকদর সামান্যই (বড়জোর ১ বা ১+ ট্রিক) কিন্তু পিঠজয়ের ক্ষমতা নন্-ভালনারেবল্ ও ভালনারেবল্ অবস্থায় যথাক্রমে ছয় ও সাত। নীচে ঐরূপ ডাকের কয়েকটি নমুনা তাসের উদাহরণ দেওয়া হল :—

	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১। একটি বাড়িয়ে তিনের ডাক…	রু-১		চি-৩ / ই-২	
২। বাধ্যতামূলক তিনের ডাক…	ই-১	পাশ	ই-২	রু-৩
৩। দুটি বাড়িয়ে তিনের ডাক…	রু-১	ই-৩		

১নং তাসে পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড় ই-২ ডাকে গেমে এবং চি-৩ ডাকে নো-ট্রাম্পে (যদি চিড়িতনে গেম করা সম্ভব না হয়) গেমে খেলবার জন্ত আহ্বান জানিয়েছেন। একেবারে শক্তিহীন না হলে পশ্চিমের খেলোয়াড় এরূপ ডাক বাঁচিয়ে রাখবেন এই হ'ল রীতি। ২নং তাসে পশ্চিমের রু-৩ ডাক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাধারণ পর্য্যায়ের ডাক এবং পূর্ব্ব খেলোয়াড়ের বিশেষ কোনওরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। ৩নং ডাকটি এককালীন উচ্চডাক বিপক্ষদলের ডাক বিনিময়ে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

উদ্বোধনী ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের বিশেষ জোরদার ডাক তিনটি ; যথা :—

১। ডাক আহ্বানকারী ডবল (Informatory or takeout Double)

২। উদ্বোধনী ডাকের রংয়ে একটি বাড়িয়ে ডাক (Immediate overcall)

৩। উদ্বোধনী এককালীন ডাকের উপর নো-ট্রাম্প ডাক (No-trump overcall after pre-emptive bids)

১। ডাক আহ্বানকারী ডবল

উদ্বোধনী ডাকের উপযোগী শক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তাসে খেঁড়ীর কাছ থেকে শক্তি যাচাই ও ডাক আদায় করবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের ডাকে ডবল দিয়ে থাকেন। এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে পরে।

২। উদ্বোধনী ডাকটি একটি বাড়িয়ে ডাক

ডাক উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের জোরদার ডাকগুলির মধ্যে এটি একটি বিশেষ শক্তিশালী ডাক। সাধারণতঃ বিপক্ষদলের ডাক প্রথম চক্র রোখবার মত ক্ষমতায় যথা টেক্কা বা ছুট (void) এবং ন্যূনতম ৪½ ট্রিক সহ বাকী তিনটি রংয়ের তাসে এরূপ ডাক হ'য়ে থাকে। বলা বাহুল্য ডাকদারের তাস আক্রমণাত্মক পর্যায়ের এবং পাছে ডাক আহ্বানকারী ডবল খেঁড়ী পাশ দিয়ে দেয় খেসারৎ আদায়ের জন্ত এই ভয়ে এরূপ ডাক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এরূপ ডাকের অপপ্রয়োগের ফলে বিপর্য্যয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অত্যন্ত সুবিবেচনার সহিত তাসের বিভাগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে অথবা বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা থাকলে এরূপ ডাকের প্রয়োগ বিধেয়।

ট্রিকদরের কোনও সীমারেখা নেই এরূপ ডাকে কিন্তু পিঠ জয়ের ক্ষমতা সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে এবং এ ডাকটিকে খেঁড়ী অন্ততঃ একচক্র বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য। পরে অবশ্য দ্বিতীয় চক্রের ডাক শুনে গুণাগুণ বিচার করে যথাকর্ত্তব্য স্থির করবেন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে বিপক্ষদলের ডাক বাড়িয়ে ডাক উদ্বোধনী রংয়ের দুটি ডাকের সামিল। আর একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে নীচুদরের রংয়ে ডাক দিলে দুটি উঁচু দরের রংয়ে অন্ততঃ একটিতে বিশেষ শক্তি থাকা উচিত। নীচে কয়েকটি এরূপ ডাকের উপযোগী তাসের নমুনা দেওয়া হল :—

	উঃ ডাক	ডাক হবে
১। ই-সা, বি, ১০, ৯ ; হ-টে, সা, বি, ২ ; রু-সা, বি, গো, ১, ২ ; চি-×	চি-১	চি-২

উঃ ডাক ডাক হবে

২। ই-সা, বি, গো ; হ-টে, সা, গো, ৫, ৪,
২ ; রু-টে, ; চি-সা, বি ১০ রু-১ রু-২

৩। ই-টে, সা, বি, ৩ ; হ-সা, গো, ১০, ৯ ;
রু-সা, বি, গো ৯ ; চি-৫ চি-১ চি-২

৪। ই-টে, সা, বি, ১০, ৯, ৩ ; হ-সা, বি, গো, ৯, ৫, ৩ ; রু-× ; চি-টে { রু-১ রু-২
{ চি-১ চি-২

৪নং তাসের বিভাগের অস্বাভিকতাহেতু অন্ত হাতের তাসগুলির বিভাগও অসাধারণ হ'তে পারে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে একমাত্র হরতনের টেক্কা ছাড়া বিপক্ষদলের পক্ষে আর কোনও পিঠ জয়ের সম্ভাবনা নেই সুতরাং ইস্কাবন বা হরতন রংয়ে ছয়টির খেলা অর্থাৎ ১২টি পিঠ জয় করা সুনিশ্চিত কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সেরকম নাও হ'তে পারে যদিও সেরূপ বিভাগ হয় শতকরা ৫ কি ৬ বার। যেমন মনে করুন খেঁড়ীর তাস পড়েছে রু-পাঁচখানি, চি-পাঁচখানিও হ-তিনখানি। এরূপ তাসে ছটি ইস্কাবনের খেলা হবেনা কিন্তু ছটি হরতনের খেলা নিশ্চিত আবার ঐরূপ ভাবে খেঁড়ীর কাছে দুই বা তিনখানি ইস্কাবন এবং হরতন একখানি থাকলে ছটি ইস্কাবনের খেলা হবে।

৩। উদ্বোধনী এককালীন ডাকের উপর

নো-ট্রাম্প ডাক

বিপক্ষদলের ডাক বাড়িয়ে ডাকের মত এককালীন তিন বা চারের ডাকের উপর সমসংখ্যক নো-ট্রাম্প ডাকও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং খেঁড়ীর কাছ থেকে ডাক আহ্বানকারী ডাক। এরূপ ডাকের প্রধান লক্ষ্য সংখ্যার দিকে নির্দিষ্ট রংয়ের তাসের, অন্ত রংয়ের উঁচুতাস বড় বেশী কাজে লাগে না। মনে করুন বিপক্ষদলের তিন বা চারটি ইস্কাবন ডাকের উপর সমসংখ্যক নো-ট্রাম্প ডাক হয়েছে তখন খেঁড়ীর কর্ত্তব্য হরতন রংয়ের সংখ্যার দিকে নজর রেখে ডাক দেওয়া। হরতন চারখানি এবং রুহিতন বা চিড়িতন পাঁচখানি হ'লে হরতন ডাকই শ্রেয়ঃ। সেরূপ হরতন ডাকের উপর নো-ট্রাম্প ডাক হ'লে ইস্কাবনের ডাকই দেওয়া উচিত। নীচে এইরূপ নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী তাসের কয়েকটি নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

উঃ ডাক ডাক হবে

১। ই-× ; হ-সা, বি, গো, ৯, ৫ ;
রু-টে, সা, বি, ৫ ; চি-টে, সা, ১০, ৯ ই-৩ নো-ট্রা-৩

২। ই-টে, সা, ১০, ৯, ৮, ৬ ; হ-× ;
রু-টে, সা, বি, ৯ ; চি-সা, বি, ১০ হ-৪ নো-ট্রা-৪

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি অদ্ভুত তাসের এবং কিভাবে বিপক্ষ দলের ডাকের উপর উক্ত রংয়ের ডাক বাড়িয়ে খেঁড়ীর কাছ থেকে ডাক আদায় করে বড় শ্লাম করা সম্ভবপর হ'য়েছিল একঘরে কিন্তু অপর ঘরে অন্ত রংয়ের সাত ডেকে এক পিঠ কম হয়েছিল। তাসটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বিভাগের এবং সচরাচর—সচরাচর কেন দশ হাজারে একটি ঘটে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঘটেছিল যতদূরে মনে হয় অ্যাংগ্লো—আমেরিকান শতদান টেষ্ট খেলায় ১৯৩৫—৩৬ সালে। সার্থকতা লাভ হয়েছিল যে ঘরে সে ঘরে ডাক হয়েছিল নিম্নরূপ :—

	উত্তর উদ্বোধনকারী	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
১ম চক্র···	চি-১	চি-২	চি-৩	পাস
২য় চক্র···	চি-৪	চি-৫	চি-৬	পাস
৩য় চক্র···	পাস	চি-৭	পাস	হ-৭ (?)

পশ্চিমে অবস্থিত খেলোয়াড়ের তাস ছিল ই-একখানি, হ-চারখানি, রু-পাঁচখানি ও চি-তিনখানি এবং সবগুলিই ছোট তাস কিন্তু অপর ঘরে সাতটি ইস্কাবনের ডাক হ'য়ে বিভাগের অস্বাভাবিকতা হেতু একপিঠ দিতে হয়েছিল উক্ত রংয়ে। ধারণা করতে পারেন কি পূর্ব্বে অবস্থিত খেলোয়াড়ের কাছে কি তাস ছিল? তাঁর তাস ছিল নিম্নরূপ :—

ই-টে, সা, বি, গো, ৫, ৪, ২
হ-টে, সা, বি, ১০, ৩, ২
রু-×
চি-×

ইস্কাবন রংয়ের বিভাগ ছিল ৬-৫-১-১ সুতরাং ১০ এর পিঠ দিতে হ'য়েছিল উক্ত রংয়ে যেটি হরতন রং হওয়াতে খোয়াতে হয়নি। এও সম্ভব হ'তে পারে এবং এই প্রকার বিশেষত্বর জন্মই এই খেলায় এত আকর্ষণ।

উপরোক্ত বিশেষ জোরদার ডাকের উত্তরে খেঁড়ীর কর্ত্তব্য কিরূপ হ'বে নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল :—

(ডাক আহ্বানকারী ডবলের পর)

সাধারণ ভাবে খেঁড়ী এই রূপ ডবলের পর ডাক দিতে বাধ্য, কেবল মাত্র পাশ দিতে পারেন একটি ক্ষেত্রে যখন তিনি মনে করেন যে পাশ দিয়ে লাভ বেশী।

(উদ্বোধনী ডাক বাড়িয়ে ডাক এবং এককালীন ডাকের উপর নো-ট্রাং ডাক)

উভয়ং ক্ষেত্রেই খেঁড়ী ডাক দিতে বাধ্য এং উঁচু দরের রংয়ের ডাকই বাঞ্ছনীয়। ইস্কাবন ও হরতন ৪-৪ বিভাগ থাকলে প্রথমে ইস্কাবন ডাক ও পরে সুযোগ পেলে হরতন ডাক হ'বে। এমনও হ'তে পারে যে তাদের বিভাগ ৫-৩-৩-২ এবং বিপক্ষ দলের রংয়ের তাসই পাঁচ খানি সে ক্ষেত্রে সর্ব্ব নিম্ন দরের তিন তাসের ডাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর কি? উদ্বোধনী ডাক বাড়িয়ে ডাকের বেলায় নো-ট্রাম্প ডাক দিয়ে ডাক না বাড়িয়ে সে কার্য্যটি সমাধান করা যেতে পারে। এর পর দায়িত্ব সম্পূর্ণ গিয়ে পড়ে প্রথমোক্ত খেলোয়াড়ের উপর।

বিপক্ষদলের ডাকে 'ডবল' Doubling Opponents' Bid

'ডবল' দুপ্রকারের। (১) খেসারৎ আদায়ের জন্য (penalty) ও (২) ডাক আহ্বানের জন্য (Informatory or take-out)।

আগে বলা হ'য়েছে যে উদ্বোধনী ডাকের উপযোগী শক্তি অপেক্ষা বেশী শক্তিতে ডাক আহ্বানকারী ডবল দেওয়া হয় এবং খেঁড়ী কমশক্তিপূর্ণ বা শক্তিহীন তাসেও কিছু না কিছু ডাক দিতে বাধ্য। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যে সময়ে খেঁড়ী মনে করেন যে "পাস" দিয়ে বেশী পয়েণ্ট অর্জন করা সম্ভব অর্থাৎ যে রংয়ে আহ্বানকারী ডবল দেওয়া হয়েছে সেই রংয়ের তাসই সংখ্যায় বেশী। রংয়ের ডাকে আহ্বানকারী ডবল সাধারণত: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় :—

(১) উদ্বোধনকারীর পরবর্ত্তী খেলোয়াড়ের প্রথম সুযোগের ডবল-এক থেকে তিনের রংয়ের ডাকের উপর।

(২) উদ্বোধনী ডাক দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলোয়াড়ের পাসের পর চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডবল।

(৩) উদ্বোধনকারীর ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস দিলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের বদলী ডাকের উপর চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডবল।

(৪) উদ্বোধনী একের উপর বিপক্ষদলের রংয়ের ডাক, উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় চক্রের ডবল।

সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত রূপ তাসে আহ্বানকারী ডবল দেওয়া যেতে পারে :—

১। বিপক্ষদলের ডাক ছাড়া অপর তিন রংয়ে বিভক্ত তিন ট্রিকদরের তাসে অন্তঃবর্ত্তী মাঝারী গোছের তাস হ'লে ভাল।

২। তিন ট্রিক দু'রংয়ে বিভক্ত হ'লে (উদ্বোধনী ডাকের রং ছাড়া) কিন্তু এক্ষেত্রে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ডাকের উপযোগী তাস থাকা প্রয়োজন যাতে খেঁড়ীর বাধ্যতামূলক ডাক পছন্দ না হ'লে নিজের ডাক দেওয়া সম্ভব হয়।

বি-দ্রঃ—আড়াই ট্রিকের তাসেও ডাক-আহ্বানকারী ডবল চলে; সেরূপ ক্ষেত্রে জোরদার মাঝারী তাসসমেত ডাকের উপযোগী কোনও রংয়ের তাস পাঁচখানি এবং উঁচুদরের একটি রংয়ের অন্ততঃ চার তাস থাকা দরকার নীচে কয়েকটি উদ্বোধনী একের ডাকের উপর আহ্বানকারী ডবলের উপযোগী নমুনা তাস দেওয়া হ'ল :—

		ট্রিকদর	উঃ ডাক
১।	ই-সা, গো ১০, ৫ ; হ-৯ ; রু-সা, বি, ৭, ২ ; চি-টে, বি, ১০, ৫	৩+	হ-১
২।	ই-টে, সা, ১০, ৩ ; হ-১০, ৯, ৮, ৪, ২ ; রু-৭ ; চি-সা, বি, ১০	৩	রু-১
৩।	ই-২ ; হ-টে, বি, ১০, ২ ; রু-সা, ১০, ৯, ৭ ; চি-সা, বি, ৯, ৭	৩	ই-১
৪।	ই-টে, ৪, ৩, ২ ; হ-৫ ; রু-টে, বি, ১০, ৯, ৫ ; চি-সা, ১০, ৫	৩	হ-১
৫।	ই-৫, ২ ; হ-টে, ১০, ৯, ৪ ; রু-টে, বি, ১০, ৭, ৬, ২, চি-৯	২½	ই-১
৬।	ই-টে, সা, ৭, ২ ; হ-সা, বি, ১০, ৫, ২ ; রু-সা, ৩, ২ ; চি-৫	৩½	চি-১

৫নং তাসে খেঁড়ীর ডাক দুটি হরতন এলে ডাক হবে হ-৩ আর চি-২ ডাক এলে ডাক হবে রু-২। অনুরূপ ভাবে ৬নং তাসে খেঁড়ীর কাছ থেকে ই-১ ডাক হবে ই-১ কিন্তু একটি রুহিতন ডাক এলে হবে হ-১। খেঁড়ী এক চক্র বাঁচাতে পারলে হরতনে গেম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

সময়ে সময়ে বিপক্ষদলের রংয়ের তাস সত্ত্বেও ডাক-আহ্বানকারী ডবলের প্রয়োজন হয়। যথা :—

		ট্রিক দর	উঃ ডাক
১।	ই-টে, বি, ১০, ৪ ; হ-সা, গো, ১০, ৫, ৪, ২ ; রু-৭ ; চি-টে, ২	৩+	হ-১
২।	ই-টে, সা, ৫, ২ ; হ-বি, গো, ১০, ৯, ৬, ৪ ; রু-টে, ৫ ; চি-৭	৩½	হ-১

খেঁড়ী জবাবে ই-১ ডাক দিলে, ১নং তাসে ই-৩ ডাক দেওয়া চলে। অপর পক্ষে রুহিতন বা চিড়িতন ডাক এলে ফিরতি ডাক হ'বে হ-২। খেঁড়ীর কাছে দু'খানি হরতন এবং ইস্কাবনের সাহেব বা চিড়িতনের সাহেব বা বিবি ও গোলাম থাকলেও তাসটি সম্ভাবনাময়। ২নং তাসেও হরতনের টেক্কা ও সাহেবের পিঠ বিপক্ষদলকে দিয়েও গেম করা শুধু সহজই নয় অধিক পয়েণ্ট সংগ্রহ করার সম্ভাবনাও আছে প্রচুর। এর কারণ নিজের উদ্বোধনী ডাকের রংয়ে বিপক্ষদলকে চারের ডাকে উঠতে দেখে কার না রাগ হয়? রাগ হ'লে স্বভাব উত্তেজনায় 'ডবল' মুখ দিয়ে আপনা হ'তেই এসে পড়ে এবং ফলে চুক্তির খেলা করে বেশী পয়েণ্ট অর্জন করবার সুযোগ এসে যায়।
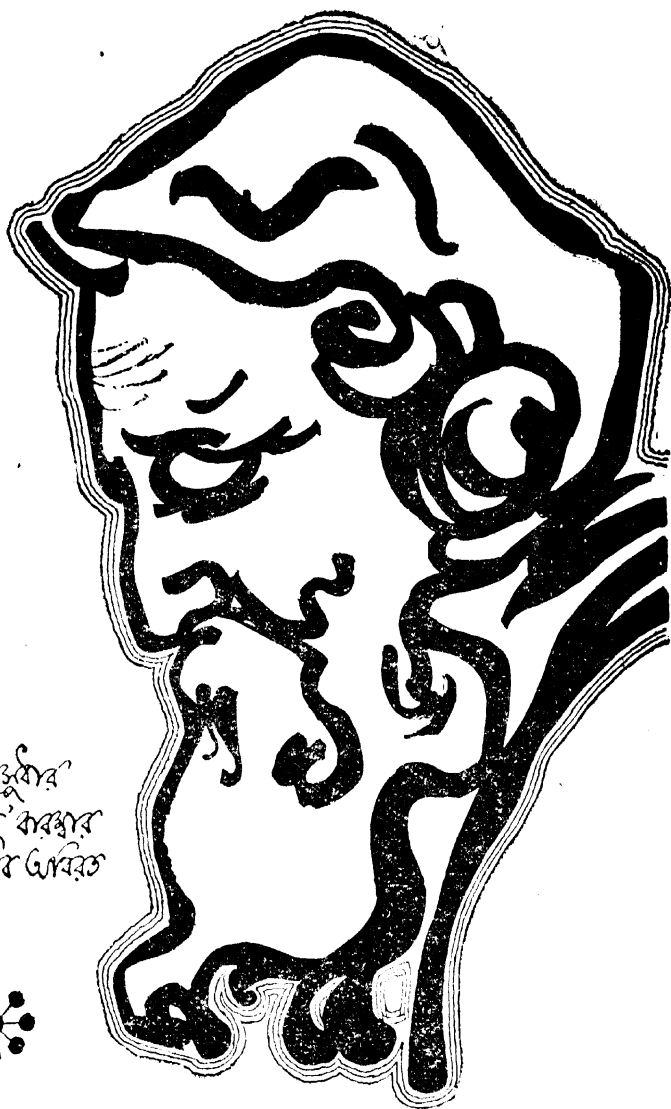
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

W৪৫/৬৪

(উদ্বোধনী একটি নো ট্রাং ডাকে ডাক আহ্বানকারী ডবল)

উদ্বোধনী রংয়ের ডাকে ও নো-ট্রাম্পে ডাকে ডবল (ডাক আহ্বানকারী) এ দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। নো-ট্রাম্পে ডবল দিতে গেলে ফল কিরূপ হবে বা হ'তে পারে এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করে ডবল দিতে হয়। প্রথম কারণ এই যে উদ্বোধনকারীর নিকট প্রায় ৩২ থেকে ৪+ ক্ট্রিক (১৬ থেকে ১৮ পয়েন্ট) তাস থাকার খুবই সম্ভাবনা এবং ডবল দিতে গেলে প্রয়োজন অন্ততঃ ৩ ক্ট্রিকের মত তাস। প্রথম নজরেই দেখা যায় যে দুটি হাতের সমষ্টিগত শক্তি ৬২ থেকে ৭+ ক্ট্রিকের মত। বাকী থাকে মাত্র ২ বা ১+ ক্ট্রিকের মত তাস তৃতীয় ও চতুর্থ খেলোয়াড়ের মধ্যে বিভক্ত। সুতরাং কি আশা করা যায় খেঁড়ীর কাছ থেকে? তাসের বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ দখল না থাকলে এরূপ ডবল হয়ে পড়ে আত্মঘাতী এবং ফলে বহু পয়েন্ট খেসারৎ দিতে হতে পারে। অপরপক্ষে হয়ত বিপক্ষ দলই নিজেরা ডেকে খেসারৎ দিয়ে যেত সাবধান না করলে। সুতরাং উদ্বোধনী নো-ট্রাম্পে ডাক আহ্বানকারী ডবল অপপ্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এরূপ ডবলকে খেসারৎ আদায়ের জন্য ডবলরূপে ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। হাতে থাকা দরকার ৩ ক্ট্রিকসহ ডাকের উপযোগী পাঁচ বা ছয়খানি কোন রংয়ের তাস যাহা দ্বারা বিপক্ষদল রি-ডবল করলে অনায়াসে ফিরে যেতে পারা যায় নিজের ডাকে অল্প খেসারৎ দিয়ে, অথবা প্রথম খেলার সুযোগ পেয়ে আশা থাকে বিপক্ষ দলের নিকট থেকে খেসারৎ আদায়ের। ঐরূপ অন্ততঃ পাঁচখানি কোনও তাসের অভাবে অর্থাৎ তাসের বিভাগ ৪-৪-৩-২ বা ৪-৩-৩-৩ হ'লে ডাক আহ্বানকারী ডবল দিতে গেলে প্রয়োজন ন্যূনপক্ষে ৪ থেকে ৪২ ক্ট্রিকের তাস। নীচে কয়েকটি উদ্বোধনী নো-ট্রাম্পে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে ডবল দেওয়ার উপযোগী তাসের নমুনা দেওয়া হ'ল :—

		ক্ট্রিক	দর ছবিতাস
১।	ই-বি, গো, ১০, ৯, ৬ ; হ-টে, সা, ৭ ; রু-বি, গো, ৫ ; চি-টে, ২	৪	৮
২।	ই-সা, বি, গো, ৯ ; হ-টে, বি, ৯, ৭ ; রু-টে, গো, ১০ ; চি-সা, ৫	৪২	৯
৩।	ই-সা, বি, ৭ ; হ-টে, ৫, ৩ ; রু-সা, বি, গো, ৯, ৭ ; চি-সা, ৪	৩২+	৭
৪।	ই-৭, ৩ ; হ-টে, সা, বি, ৯, ৫, ২ ; রু-সা, ৯ ; চি-টে, গো, ৩	৪	৬

চতুর্থ খেলোয়াড় নিজ তাসের শক্তি ও বিভাগ বিবেচনা ক'রে নিজ কর্ত্তব্য স্থির ক'রবেন। তাসের বিভাগ অসম (freak) হ'লে এবং কোনও রংয়ের পাঁচ বা ছখানি বিশেষতঃ উঁচুদরের তাস (Major suit) থাকলে নিজেদের গেম হওয়ার সম্ভাবনা অধিক অথচ বিপক্ষদলের ডাকের ডবলে খেঁড়ীকে বিশেষ সাহায্য করা যায় না, সেরূপ তাসে উক্ত রংয়ে ডাক দেওয়ায় ফল সাধারণতঃ ভালই হয়। হাতে কিছু ক্ট্রিক বা কয়েকখানি ছবি তাসসহ সমবিভাগ তাস থাকলে পাশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ ডবল দেওয়ার ফলে দুটি হাতের সমষ্টিগত মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৫ থেকে ৫২ ক্ট্রিকের মত এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড় যিনি ডবল দিয়েছেন তাঁরই প্রথম খেলার সুযোগ থাকায় বিপক্ষদল কমপক্ষে দুটি খেসারৎ দিতে বাধ্য। [ক্রমশঃ।

নবীন-বোধিদ্রুম

ডাঃ ৺সত্যসাধন মুখোপাধ্যায়

দখিনেশ্বর কে দিল ও নাম জাগে যেথা ঈশ্বরী।
যুগেশ্বরের সাম্য মন্ত্রে জাগিল দখিনা পুরী।
পুরুষোত্তম তীর্থের সার একথা শুনিতে পাই।
পঞ্চবটের ছায়ায় দেউল তারা বুঝি দেখে নাই।
গঙ্গা শীকরে বন মর্ম্মরে রাখে সে অতীত কথা।
কত সে সাধন কত ক্রন্দন, মরমী মরম ব্যথা।
মৃন্ময়ী মাতা চিন্ময়ী হয়ে আসেন জ্যোতির রথে।
পাগল পূজারী লভিল সমাধি ছায়া ঘেরা বন পথে।

কোন সে দিশায় দূর অসীমায় দৃষ্টি হারায়ে যায়।
গঙ্গার জল করে ছল ছল পেয়ে নব জাম রায়।
পঞ্চবটের মুণ্ড আসনে এল মাতা এলোকেশে।
আসে তোতাপুরী, ব্রাহ্মণী আসে দেবতার নির্দ্দেশে।
দিব্য রূপেতে দাঁড়ালেন প্রভু লীলার কমল হাতে।
লীলা সহচরী জননী সারদা এল তাঁর সাথে সাথে।
আসিল কেশব, মত্ত গিরীশ, বিজয়, বিবেকানন্দ।
আকুতি আবেগে ঘিরিয়া দাঁড়াল অভেদ, ব্রহ্মানন্দ।

কত পূত পদরজ হৃদে ধরিয়াছ নবীন বোধিদ্রুম।
(রও) কাল জয়ী হয়ে উন্নত শির তুমি মহাকাল সম।
শান্তির তটে, তুমি বাঁকা বট (তোমা) রচিল পরমহংস
সত্য প্রতীক ওহে জাগ্রত, তীর্থ কুলাবতংশ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কিউবায় সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ—

কাস্ত্রো-বিরোধীদের অভিযানের মধ্যে কিউবা রক্তস্নান করিয়া উঠিয়াছে। এই অভিযানে কাস্ত্রো-বিরোধীরাই পরাজিত হইয়াছেন, জয়লাভ করিয়াছেন ফিডেল কাস্ত্রো। গত ১৭ই এপ্রিল (১৯৬১) আক্রমণকারীদের বিমান ও নৌবাহিনী কিউবায় অবতরণ করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু ৭২ ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহারা পর্যুদস্ত হইয়াছে। কাস্ত্রো-বিরোধীদের নেতা ডাঃ জোস মিরো কার্ডোনার পুত্র জোস মিরো টোরেস কাস্ত্রো সরকারের হাতে বন্দী হইয়াছেন। কিউবা দখলের জন্য কাস্ত্রো-বিরোধীদের এই অভিযান আকস্মিক নয়। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এইরূপে আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছিল। বস্তুতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কিউবায় কাস্ত্রো সরকারের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করার পর হইতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক কিউবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। সুয়েজ .ল দখলের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের সরাসরি মিশর আক্রমণের নজীর থাকা সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোজাসুজি কিউবা আক্রমণ করিবে, এরূপ আশঙ্কা অবশ্য কেহই করে নাই। তবে মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট কাস্ত্রো বিরোধীদের দ্বারা কিউবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। কিউবা-ত্যাগী কিউবান এবং কাস্ত্রো-বিরোধী সৈন্যরা ডাঃ জোস মিরো কার্ডোনার নেতৃত্বে মার্কিণ ভূমিতেই বিপ্লবী পরিসদের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এক সময়ে যাহারা কাস্ত্রোর সমর্থক ছিল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের কতক এই বিদ্রোহী সেনাদলে আছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাতিস্তার পতনের পর ডাঃ জোস মিরো কার্ডোনা কিউবার প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব ৪৫ দিনের বেশী স্থায়ী হয় নাই। গত নয় মাস ধরিয়া ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা এবং গুয়াতেমালার ঘাঁটিতে কাস্ত্রো-বিরোধী সৈন্যদিগকে যুদ্ধ শিক্ষণ দেওয়া হইতেছিল। কাস্ত্রো-বিরোধীদের বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, প্যারাট্রুপ বাহিনী এবং কমাণ্ডো ইউনিট-ও রহিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ব্যতীত কাস্ত্রো-বিরোধীদের এইরূপ ব্যাপক সমর সজ্জা করা যে সম্ভব নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিউবাত্যাগী কিউবানদিগকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করিতেছে, কাস্ত্রো সরকারের এই অভিযোগ অবশ্য ডাঃ কার্ডোনার অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার বিপ্লবী আন্দোলন কাস্ত্রোর বিপ্লবী আন্দোলনের মতই সম্পূর্ণ রূপে কিউবাত্যাগী কিউবান এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। কাস্ত্রোর বিপ্লবী আন্দোলন যে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট ছিল একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কাজেই ডাঃ কার্ডোনার দাবীকে বিশ্ববাসী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে কাস্ত্রোকে সাহায্য করিয়াছিল, বে-সরকারী মার্কিণ বিমানে করিয়া কাস্ত্রোর অস্ত্র-শস্ত্রও পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু কাস্ত্রোর অভিযান কিউবার বাহির হইতে চলে নাই, এই অভিযান কিউবার ভিতর হইতেই পরিচালিত হইয়াছিল।

মার্কিণ সরকার কাস্ত্রো-বিরোধী সৈন্যদিগকে মার্কিণ ভূমিতে ট্রেণিং দিবার ব্যবস্থা যেমন করিয়াছেন তেমনি গত ২রা এপ্রিল (১৯৬১) কিউবা তথা কাস্ত্রো সরকার সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। ছত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই ঘোষণাপত্র হোয়াইট হাউসে রচিত হইয়াছে এবং কাস্ত্রো সরকারের সহিত মার্কিণ সরকারের সম্পর্কের কিরূপ নাটকীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কথাও উহাতে আছে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের সহকারী Arthur schbsinger Jr. প্রধানতঃ উহার খসড়া তৈয়ার করেন এবং প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ব্যক্তিগত ভাবে উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন।' বাতিস্তার ডিক্‌টেটরশিপের সময়ে যে লুণ্ঠন, দুর্নীতি এবং নৃশংসতা চলিয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করিয়া এই ঘোষণা পত্রে উক্ত সরকার সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুল-ভ্রান্তির কথা স্বীকার করা হইয়াছে। কাস্ত্রো এবং তাঁহার সহকারীদের বিরুদ্ধে মার্কিণ সরকারের প্রধান যুক্তি এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের বিপ্লবের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীন নির্ব্বাচন এবং নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করিবার পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমকে আমেরিকায় ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিয়াছেন। এই ঘোষণাপত্রে কাস্ত্রো সরকারকে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক কিউবা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। কিউবানদের উদ্দেশে এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে :— "....We are confident that the Cuban people, with their passion for liberty, will continue to strive for a free Cuba....(and) join hands with the other republics in the hemisphere in the struggle to win freedom." অর্থাৎ 'আমরা নিশ্চিত যে, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগবশতঃ কিউবার জনগণ স্বাধীন কিউবা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইবেন এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রামে এই গোলার্দ্ধের অন্যান্য রিপাবলিকগুলির সহিত হাত মিলাইবেন।' এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পক্ষকাল যাইতে না যাইতেই কাস্ত্রো-বিরোধীর কিউবায় অভিযান আরম্ভ করেন। হয়ত আর বিলম্ব করা সঙ্গত বলিয়া মনে করা হয় নাই। বিপ্লবী পরিষদ যে পর্য্যন্ত কিউবার কোন অংশ দখল করিতে না পারিতেছে সে-পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উক্ত পরিষদকে কিউবার সরকার বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিউবার কিছু অংশ দখল করিতে পারিলেই বিপ্লবী পরিষদকে কিউবার সরকার বলিয়া

মানিয়া লওয়ার জন্ত কাস্ত্রো বিরোধীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইতে পারিতেন। বস্তুতঃ কাস্ত্রো-বিরোধীরা এইরূপ একটি প্ল্যান করিয়াছিলেন যে, কিউবায় তাঁহারা একটি সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিবেন এবং সম্ভব হইলে স্যান্টিয়াগো হইতে হাভানাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশকে বিভক্ত করিবেন। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইলে কাস্ত্রো সরকার এবং কাস্ত্রো-বিরোধী সরকারের মধ্যে বিরোধে কাস্ত্রো-বিরোধীরা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করার সুযোগ পাইতেন।

কাস্ত্রোর পক্ষে ব্যাপক ভূমিসংস্কার নীতি গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। তাঁহার বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিই ছিল কৃষকরা। তাহারাই হাজারে হাজারে আন্দোলনে যোগ দিয়া বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ করিয়াছে। কাজেই কাস্ত্রো বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া কৃষকদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থা করেন। উহার আঘাতটা অবশ্য মার্কিণ শর্করা শিল্পপতিদের উপরেই পড়িয়াছে। কিউবার সমস্ত চাষী জমির অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেন তাঁহারাই। ভূমিসংস্কার নীতির ফলে ২০ লক্ষ একর জমি হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। ভূমিসংস্কার ছাড়া তৈল লইয়াও মার্কিণ ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলির সহিত বিরোধ সৃষ্টি হইল। গত জুনমাসে কিউবা প্রচুর পরিমাণে অপরিশ্রুত তৈল ক্রয় করিবার এক চুক্তি রাশিয়ার সহিত সম্পাদন করে। কিউবার দিক হইতে রাশিয়ার তৈল ক্রয় করা লাভজনক। ভেনেজুয়েলার তৈলের দাম অপেক্ষা রাশিয়ার তৈলের দাম অনেক কম। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলি রাশিয়ার তৈল ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলেন। কিউবা সরকার বাধ্য হইয়া মার্কিণ টেক্সাকো ও এসো এবং বৃটিশ কোম্পানী শেল রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেন। এই পটভূমিকাতেই মার্কিণ সরকারের ঘোষণাপত্র বিবেচনা করা আবশ্যক। কিউবায় কাস্ত্রোবিরোধী কোন আন্দোলন হইলে মর্কিণ সরকার তাহা মানিয়া লইবেন, উক্ত ঘোষণাপত্রে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। কিউবায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী রাউল রোয়া উক্ত ঘোষণাপত্রকে যে "formalization of the undeclared war which the United States is waging against us" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহাতে বিস্মিত হইবারও কিছু নাই। কাস্ত্রো বিরোধীদের যে কোন সময়ে কিউবা আক্রমণ করিবার সম্ভাবনার কথা প্রচারিত হইতেছিল সেই সময়। গত ৭ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী কাস্ত্রো বলিয়াছিলেন যে, কিউবার জনগণ এই আক্রমণ আরম্ভ হওয়া সম্পর্কে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে কাস্ত্রো-বিরোধীরা কিউবা আক্রমণ করিল এবং কাস্ত্রো সরকারের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে এই আক্রমণ করে নাই, তবু এই পরাজয়টা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই পরাজয়। অতঃপর মার্কিণ সরকার কি করিবেন, ইহা-ই প্রশ্ন।

আলজেরিয়ায় সামরিক বিদ্রোহ—

প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের আলজেরিয়া নীতির বিরোধী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলদের নেতৃত্বে ফরাসী সেনাদল গত ২২শে এপ্রিল (১৯৬১) আকস্মিক অভ্যুত্থান দ্বারা রাজধানী আলজিয়ার্স দখল করে। তাহারা শুধু আলজেরিয়ায় রাজধানীই নয় আরও তিনটি প্রধান সহর ও সমস্ত বিমানক্ষেত্র দখল করিয়াছে। বিদ্রোহীরা বেতারে আরও ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা আলজেরিয়ার বৃহত্তম ভূভাগ দখল করিয়াছে। বিদ্রোহীদের এই অভ্যুত্থান এবং আলজেরিয়ার বৃহত্তম ভূভাগ দখল করার ফলে আলজেরিয়া সমস্যায় যে নূতন সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলজেরিয়াতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার বিরোধিতা করাই যে এই সামরিক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 'আলজেরিয়া আলজেরিয়ানদের,' এই নীতি-সম্পর্কে গত জানুয়ারী মাসে আলজেরিয়ায় এবং ফ্রান্সে গণভোট গ্রহণ করা হয়? এই গণভোটে প্রেসিডেণ্ট দ্যগলই জয়লাভ করেন এবং টিউনিশিয়াস্থিত আরববিদ্রোহী সরকারের সহিত ফরাসী সরকারের আলোচনা হওয়ার একটা সম্ভাবনাও দেখা দেয়। এই আলোচনার পথে বাধা যে দুস্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বাধা অতিক্রম করা এখনও সম্ভব হয় নাই। গত ৭ই এপ্রিল যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তাহা হয় নাই। মে মাসের প্রথমদিকে আলোচনা হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আলজেরিয়ার সাতবৎসর ব্যাপী যুদ্ধের অতঃপর অবসান হইবে, এই আশাই যখন সকলের মনে জাগিয়াছিল তখন আলজেরিয়ায় এই সামরিক বিদ্রোহ এই আশাকে বিনষ্ট করিতে বসিয়াছে। সামরিক বিদ্রোহীরা ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা ফরাসী আলজেরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে। আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের ভিতর রক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রেসিডেণ্ট দ্যগল যাহাতে আরব আলজেরিয়ানদের হাতে আলজেরিয়া ছাড়িয়া দিতে না পারেন তাহার জন্যই যে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরা এবং আলজেরিয়ায় দক্ষিণপন্থী অসামরিক ফরাসীরা এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ফরাসী সরকার এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কি নীতি-গ্রহণ করিবেন তাহা যেমন উপেক্ষার বিষয় নয়, তেমনি আলজেরিয়ায় এই সামরিক অভ্যুত্থান নূতন একথাও বলা চলে না। ১৯৫৮ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক বিদ্রোহ-ই জেনারেল দ্য গলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণ। আজ তিনিই সামরিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়াছেন।

১৯৫৮ সালের মে মাসে মঃ প্রিমলা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া যখন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন তখন হইতেই তিনি ফরাসী আলজেরিয়ানদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। জাতীয় পরিষদে তিনি যে কর্মসূচী সমর্থনের দাবী করেন তাহার মধ্যে আলজেরিয়ার আরব বিদ্রোহীদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার কথাও ছিল। প্যারী দক্ষিণপন্থীরা 'আলজেরিয়া ফ্রান্স' এই ধ্বনি সহকারে জাতীয় পরিষদের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আলজেরিয়াতেও ফরাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া ফরাসী মন্ত্রিদপ্তর তছনছ করিয়া ফেলে।

আলজেরিয়ায় ফরাসী বিদ্রোহীরা শুধু আলজেরিয়া দখল করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না এই রূপ আশঙ্কারও যথেষ্ট কারণ ছিল। এই আশঙ্কার জন্যই সম্ভাব্য প্যারী আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল। দ্য গল সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করিলেন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন, সত্বর আত্মসমর্পণ না করিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইবে। ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয়

নৌবাহিনী তুলোঁ। হইতে যাত্রা করে। উহার লক্ষ্য স্থান যে আলজেরিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ফরাসী বিদ্রোহীদের পক্ষে ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া টিকিয়া থাকাও সম্ভব ছিল না। আরব বিদ্রোহীরা কম্যুনিষ্ট দেশগুলির নিকট সাহায্য পাইয়া লড়াই চালাইত। ফরাসী সরকারও ফরাসী বিদ্রোহীদের দমনের জন্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহের অবসান হইতে বিলম্ব হইল না। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ না করিলেও এই বিদ্রোহ বেশীদিন টিকিতে পারিত না। বিদ্রোহের অবসান হওয়ায় আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের সহিত প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের আলোচনার কিছু সুবিধা হইবে, ইহা মনে করিলেও বোধ হয় ভুল হইবে না। তিনি যদি সত্যই আলজেরিয়ায় আরব বিদ্রোহীদের সহিত একটা মীমাংসা করিতে চান, তাহা হইলে মীমাংসার জন্ত তিনি সর্ব্বাধিক সুযোগ পাইবেন। মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার আর কেহ থাকিবে না। আশা কার সমস্যার সমাধান এখন শুধু প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের আন্তরিকতার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

মহাকাশে প্রথম মানুষ—

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখটি মানবজাতির সম্মুখে এক নূতন যুগের দিগন্তরেখা উন্মুক্ত করিয়াছে, মানুষকে আনিয়াছে অনন্ত মহাকাশের অজ্ঞাত রহস্য ভেদের সিংহদ্বারে। এই দিনটিতে মানুষ সর্ব্বপ্রথম মহাকাশে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই মানুষটি সোভিয়েট রাশিয়ার একজন নাগরিক, সোভিয়েট রাশিয়ার কোনও অঞ্চল হইতে তিনি মহাকাশে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর সোভিয়েট এলাকাতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তা সত্ত্বেও এই দিনটি শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাসেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে—মানবজাতির ইতিহাস চিরস্মরণীয় দিন রূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গত ১২ই এপ্রিল মহাকাশ যান ভোষ্টক বা প্রাচ্য মস্কো সময় ৯টা ৭ মিনিটের সময় মেজর ইউরি আলেক্সিভিচ গ্যাগরিণকে লইয়া মহাকাশে উত্থিত হয়। ইউরি গ্যাগরিণ ১০৮ মিনিট মহাকাশে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে একবারের কিছু বেশী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তিনি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে মস্কো সময় ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় (গ্রীণউইচ সময় ০৭.৫৫ মিনিট) নির্ব্বিঘ্নে এবং সুস্থদেহে অবতরণ করেন। ভোষ্টক যখন পৃথিবীর সর্ব্বাধিক নিকটে ছিল তখন পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল এবং যখন সর্ব্বাধিক দূরে ছিল তখন দূরত্ব ছিল ১৮৭ মাইল। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠানসূচী বাতিল করিয়া মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয়, "এবার মানুষের মহাকাশ যাত্রার সংবাদ শুনুন। ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ভোষ্টক মহাকাশে পৌঁছিলে উহাকে রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় এবং অতঃপর উহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, গ্যাগরিণের সহিত বেতারে বার্ত্তা আদান প্রদান করা হইয়াছে এবং বেতার ও টেলিভিশন যোগে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। মহাকাশ যান ভোষ্টককে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় তাঁহার দেহে যে চোট লাগিয়াছিল তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিয়াছেন। "গ্রীণউইচ সময় সকাল ৬টা ২২ মিনিটের সময় দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে ছিলেন এবং বেতার বার্ত্তায় বলেন, "সবকিছু স্বচ্ছন্দে চলিতেছে—বেশ সুস্থ আছি।" গ্রীণউইচ টাইম ৭টা ১৫ মিনিটের সময় তিনি আফ্রিকার আকাশে ছিলেন এবং বেতারযোগে বলেন, "ভারহীন অবস্থায় কোন অসুবিধা হইতেছে না, স্বচ্ছন্দে মানাইয়া চলিতেছি।"

মেজর গ্যাগরিণ মহাকাশ হইতে প্রথম যে বার্ত্তা পাঠান তাহাতে তিনি বলেন, "স্বাভাবিকভাবেই মহাশূন্য বিচরণ করিতেছি। ভাল আছি। ভারশূন্য অবস্থায় বেশ মানাইয়া চলিতেছি।" পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই তিনি বলেন, "অবতরণ স্বাভাবিক হইয়াছে, দয়া করিয়া এই খবরটি পার্টি, গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যক্তিগতভাবে নিকিটা ক্রুশেভের গোচরীভূত করুন। আমি ভালই আছি, কোন আঘাত পাই নাই অথবা আমার শরীরের কোন অংশ থেতলাইয়া যায় নাই।" রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ গ্যাগরিণকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন, "আপনার অপরিসীম বীরত্বের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। মহাকাশ হইতে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, যে কাজ আজ সম্পূর্ণ হইল, তাহা সীমাহীন মহাকাশে মানব অভিযানের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, একথা ভাবিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে ও গর্ব্বে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।" মহাকাশ অভিযানে এই সাফল্যে রুশবাসীরা বিপুল উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে, গ্যাগরিণকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ হইলেও তাহার এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে অকম্যুনিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনায়করা অভিনন্দন না জানাইয়া পারে নাই। প্রয়োগ বিজ্ঞানের ইহা যে অভাবনীয় সাফল্য একথা কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথাও অবশ্য সত্য যে, মহাকাশ অভিযানে এই সাফল্য রাশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ দেশরক্ষা ব্যবস্থারই পরিচয় দিতেছে। মহাকাশ জয়ের জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু প্রথম স্পুটনিক হইতে আরম্ভ করিয়া রুশ নাগরিকের মহাকাশ ভ্রমণ পর্য্যন্ত রাশিয়াই এ ব্যাপারে অগ্রগামী হইয়াছে। রাশিয়ার এই সাফল্যের মধ্যে তাহার যে দুর্ব্বার সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রর কাছে হয়ত আনন্দজনক হইবে না। কিন্তু মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্র যে মহাকাশযাত্রায় সাফল্য লাভ করিবে না, ইহাও অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই।

মহাকাশ জয়ের জন্য রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে ১৮৫৭ সাল হইতে। কিন্তু রাশিয়াই সর্ব্বপ্রথম প্রথম স্পটনিককে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। মহাকাশে মানুষ প্রেরণের ইহাই প্রথম ধাপ। প্রথম স্পটনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। ইহার একমাস পরে ৩রা নবেম্বর লাইকা নামক একটি কুকুর সহ দ্বিতীয় স্পটনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু লাইকাকে জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার এই সাফল্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং বিজ্ঞানীরা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রথম 'এক্সপ্লোরার' নামক একটি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী ইহার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় এক্সপ্লোরার আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ৫ই মার্চ্চ (১৯৫৮) তারিখে। কিন্তু উহা কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ভ্যান গার্ডকে সাফল্যের সহিত কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় ১৭ই মার্চ্চ (১৯৫৮)। ২৬শে মার্চ্চ (১৯৫৮) তৃতীয় এক্সপ্লোরার উৎক্ষিপ্ত হয়। রাশিয়া তৃতীয় স্পটনিক মহাকাশে প্রেরণ করে ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৮শে মে (১৯৫৮) আর একটি ভ্যানগার্ড মহাকাশে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৬শে জুলাই চতুর্থ এক্সপ্লোরার এবং ২৪শে আগষ্ট ৫ম এক্সপ্লোরার মহাকাশে প্রেরণ করে। এই বৎসরই রাশিয়া আলবিনা নামক একটি কুকুরী একটি রকেটে ২৮০ মাইল উর্দ্ধে তুলিতে এবং জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়।

মহাকাশ অভিযানের দিক হইতে ১৯৫৯ সাল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১১টি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও উহার কোনটিই স্পটনিকের সমকক্ষ ছিল না। চন্দ্রের দিকে রকেট উৎক্ষেপণ এই বৎসরের মহাকাশ অভিযানে প্রধান সাফল্য। ২রা জানুয়ারী তারিখে চন্দ্রের দিকে প্রথম রকেট লুনিক—১ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ৪ঠা জানুয়ারী চন্দ্র হইতে ৪৬০০ মাইল দূর দিয়া চন্দ্রকে অতিক্রম করে এবং মহাশূন্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৭ই জানুয়ারী উহা সূর্য্যের কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হয়। লুনিক—২ ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রে পৌঁছে এবং চন্দ্রে 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকস্, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯' খোদিত ফলক স্থাপন করে। প্রথম স্পটনিক উৎক্ষেপণের দ্বিতীয় বার্ষিক দিবসে (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৯) লুনিক—৩ উৎক্ষিপ্ত হয়। উহা চাঁদ পরিক্রমা করিয়া উহার অপর পৃষ্ঠের ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনে। চন্দ্রের একটা পৃষ্ঠই শুধু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহার অপর পৃষ্ঠের অবস্থা এতদিন কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সালের আগষ্ট হইতে চন্দ্রে রকেট প্রেরণের চেষ্টা করে। কিন্তু এই বৎসরের তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার লুনিক-১ সাফল্যের সহিত উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পাইওনিয়ার-৪ ৩রা মার্চ্চ উৎক্ষিপ্ত হয়। উহা ৩৭৩০০ মাইল দূর দিয়া চন্দ্রকে অতিক্রম করে এবং সূর্য্যের চারিদিকে কক্ষপথে স্থাপিত হয়।

মহাকাশ অভিযানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালে। মহাকাশে মানুষ প্রেরণের পূর্ব্বে তাহাকে নিরাপদে প্রেরণ এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরাইয়া আনার জন্য যে-সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহার জন্যই এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে গবেষণা সুরু হয় এবং উহার পরিণামে ১২ই এপ্রিল মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করা এবং নিরাপদে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৬০ সালের ১৫ই মে সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম মহাকাশ যান পৃথিবীর চারিদিকস্থ কক্ষপথে প্রেরণ করে। মহাকাশ যানে মানুষ প্রেরণ করার উপযোগিতা উক্ত যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উহা নিরাপদে ফিরাইয়া আনা সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করাই ছিল উহার উদ্দেশ্য। পরীক্ষার উহা ছিল প্রথম পর্য্যায়। প্রথম মহাকাশ যান প্রেরণের তিন মাস পর ১৯শে আগষ্ট জীবন্ত প্রাণিসহ দ্বিতীয় মহাকাশ যান প্রেরিত হয়। উহাতে ছিল দুইটি কুকুর, দুইটি সাদা ও দুইটি কালো ইঁদুর, মাছি এবং অনেক উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ। কুকুর দুইটির একটির নাম বেলকা, আর একটির নাম ষ্ট্রেলকা। এই সকল প্রাণীকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়। রাশিয়া তৃতীয় মহাকাশ যান প্রেরণ করে ১লা ডিসেম্বর তারিখে। উহাতে বেলকা এবং মুস্কা নামক দুইটি কুকুর, অন্যান্য প্রাণী এবং পোকা মাকড় ইত্যাদি ছিল। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উহা নির্দ্ধারিত পথের বাহিরে চলিয়া যায় এবং ভস্মীভূত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মে মাসে (১৯৬০) এরল এবং বেকার নামক দুইটি বাঁদরকে উর্দ্ধাকাশে তিন শত মাইল পর্য্যন্ত তুলিয়া ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়। রাশিয়া চতুর্থ মহাকাশ যান প্রেরণ করে ১৯৬১ সালের ৯ই মার্চ্চ। পঞ্চম মহাকাশ যান প্রেরিত হয় ২৫শে মার্চ্চ তারিখে। ইহার পরই মানুষসহ মহাকাশ যান প্রেরিত হয় ১২ই এপ্রিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও মহাকাশ জয়ের জন্য চেষ্টা কম করিতেছে না। এই বৎসরই একজন মানুষকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে ঘুরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া মার্কিণ জাতীয় মহাকাশ ও মহাকাশ পরিক্রমা-সংস্থার সহকারী অধ্যক্ষ আশা করেন। তবে শীঘ্রই তাঁহারা যাহা পারিবেন বলিয়া আশা করেন তাহা একজন মানুষকে দেড়শত মাইল উর্দ্ধে প্রেরণ করিয়া আবার নামাইয়া আনা।

'Most women are not so young as they are painted.'
–*Sir Max Beerboom*

নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশ ভেদে বিভিন্নতা। এমন কি ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত প্রভৃতি সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছাব। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয় ভাব—কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা আলোড়িত, তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ নিবাসী স্কচ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ ছায়া নিশ্চয়ই পতিত হইবে। সেরূপ ইটালীতে হর্ষোৎফুল্ল ভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর প্রকৃতি শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে। নাটকেও কাটাকাটি হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপীয়ার, উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক সকল বিয়োগান্ত জনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। দার্শনিক জার্মান শিলার, নাটকে ভার্জ্জিন মেরীর অবতারণা করিয়া উন্ত 'জোয়ান অফ আর্ক' নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে সেক্সপীয়ারের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্ভয়তাপূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদবর্ত্তী নাটক সকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়ারের 'টেমপেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু টেমপেষ্ট বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। শকুন্তলা ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়াভক্তি স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করা যায় যে ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক প্রসূত নাটক ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে এবং এক-দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ের নাটকসকল দ্বিতীয় চার্লসের সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সকল বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র উপযোগী। সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোন রঙ্গালয়ে শকুন্তলা সুন্দর রূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হয় তবে তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশে অনুবাদিত শকুন্তলা দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়িরূপে গৃহীত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মুরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেসডিমোনার পিতৃগৃহ-ত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই কেবল যুদ্ধ বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে কেশ ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃতপাঠে তাহার সৌন্দর্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপীয়ার বর্ণিত 'ওথেলো'র মুখে অনুরাগচিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী বর্ণনা সেক্সপীয়ারের পূর্ব্বে সে দেশে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেসডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপ্ত ভাবে

যাঁহারা অভ্যস্ত নন তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভা-হার বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানবহৃদয় স্রোত তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী ও ধর্মসম্মানকারী নায়ক হিন্দু হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থির গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। এ দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা ব্যভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করেন। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধীচি আদর্শ ত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহাসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতাল-প্রবেশোন্মুখী জানকীর অভিমান পতিসহবাস পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ শেষোক্ত নায়িকা 'যেন রাম আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী হন' এ কথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বিষকন্যা

বাঙলা-সাহিত্যের গণ্ডী ক্রমশঃই প্রসার লাভ করে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ক্রমশঃই আজ তার বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে তুলছে। কারাগারকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থক নিদর্শনও আজ বিরল নয়। এই জাতীয় রচনায়

প্রভৃত সুনাম ও সফলতার অধিকারী জরাসন্ধ। বাঙলা সাহিত্যের আজকের দিনের একজন স্বনামধন্য সাহিত্যশিল্পী। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের আশা করি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে কিছুকাল পূর্ব্বে জরাসন্ধের 'তামসী' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল—'তামসী'ই 'বিষকন্যা' নাম নিয়ে চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করে সগৌরবে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাহিনীর বৈশিষ্ট্যে, চিত্রনাট্যের বলিষ্ঠতায় এবং পরিচালনার দক্ষতায় বিষকন্যা ছবিটি সার্থকতার স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ছবির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের মুন্সীয়ানার প্রকাশ ঘটেছে। পরিচালক গল্পটির গ্রন্থনকর্মে আপন চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদ এবং অধ্যায়ের মধ্যে তিনি যে ভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তাতে তাঁর কুশলতার পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাহিনী কারাগার-কেন্দ্রিক হলেও ছবিটি গুরুভারাক্রান্ত নয় বরং বৈচিত্র্যের স্পর্শে ছবিটি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ছবিটির মধ্যে আরও দু'একটি কাহিনীকে যুক্ত করা হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের খুব বেশী যোগাযোগ না থাকলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সংযোজন চমৎকার মানিয়ে গেছে এবং এই সংযোজন দর্শকচিত্তে তৃপ্তিই পরিবেশন করে।

এর নায়িকা হেনা। তারই বিচিত্র জীবনালেখ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে। আনন্দ, হাসি, শোক, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, আঘাতের সংমিশ্রণে হেনা চরিত্রটি এক অপূর্ব রূপ নিয়েছে—এই চরিত্রের রূপায়ণে সুপ্রিয়া চৌধুরী অভূতপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সহৃদয় জেলারের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অভিনয়েও তাঁর শক্তিমত্তারই প্রকাশ ঘটেছে। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে তোলে। অল্প আবির্ভাবে অনুপকুমারও দর্শকমনে রেখাপাত করতে সমর্থ হন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নির্মলকুমার। তাঁর অভিনয় সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তিত্ববিহীন। এঁরা ছাড়া নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, নিরঞ্জন রায়, ধীরাজ দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান সুখেন, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্বেতা মৈত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী, আশা দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীজয়দ্রথ।

স্বরলিপি

এক গায়িকার ও এক শিল্পীর যুগলজীবনের হাসিকান্না ভরা কাহিনীই 'স্বরলিপি' ছবিটির মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। এদের জীবনের ঘাত, প্রতিঘাত, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, অনুভূতিই কাহিনীর মূল উপজীব্য। আনন্দ এবং বেদনার মধ্যে যে এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান এবং একের বিহনে অপর অপূর্ণ, এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক আর একের জন্যে অন্যে সার্থক—এই সত্যটিই যেন সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। যে গান গায়, যে ছবি আঁকে এরা দু'জনেই সূক্ষ্মতার উপাসনা করে, এরা কল্পলোকের অধিবাসী, এদের সংবেদনশীল, সৃজনধর্মী মনে সহজেই রেখা টানা যায় আর এই হাসি, কান্না, ঘাত, প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্পর্শ তাদের জীবনের যথাযথ বিকাশ ঘটার ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করে থাকে।

'স্বরলিপি'র ছবিখানির পরিচালক অসিত সেন। ইতিপূর্বে কয়েকখানি সার্থকনামা ছবি উপহার দিয়ে যিনি চলচ্চিত্রজগতে একটি বিশেষ আসন অধিকারে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অসিত সেন স্বরলিপি ছবিটিতে তাঁর পূর্ব সুনাম রক্ষা করতে পারলেন না, কলাকৌশলের দিকে অধিক দৃষ্টিই তাঁর পতিত হয়েছে ফলে গল্পের দিকটি অবহেলিত থেকে গেছে। কলাকৌশলের দিকেই তিনি মনঃসংযোগ করেছেন বেশী। গল্পের দিকে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী দৃষ্টি দেন নি। ফলে কাহিনীর গঠনের বিন্যাসে এবং বিস্তারে যথেষ্ট দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছবির অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য ছবিটিকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একেকটি অংশ পরিচালক এত বাড়িয়েছেন যার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং যা না বাড়ালে ছবির মূলরস উপভোগের ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি হোত না। চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে দর্শক চোখের এবং মনের দুয়েরই খোরাক চায়। এবং তাও সমান পরিমাণেই। সুদক্ষ পরিচালকের এ কথা অবশ্যই ভোলবার নয়। এই কারণেই ছবির কেবলমাত্র একটি দিকে অধিক মনঃসংযোগ করার ফলেই সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে ছবিটি শক্তিমান পরিচালক অসিত সেনের একটি ব্যর্থতার স্বাক্ষরে পর্যবসিত হয়েছে।

ছবিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় ভোলবার নয়। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ও প্রশংসার দাবী রাখে। এঁরা ছাড়া সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ভুবন চৌধুরী, সুরুচি সেনগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি শিল্পীরাও বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

অগ্নিসংস্কার

অসংখ্য মানুষের মাঝখানে এমন একেকজন মানুষের সন্ধান মেলে যাদের চরিত্র বিচিত্র এক রহস্যে ঘেরা। এই রহস্যের আদিঅন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাদের চরিত্রের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকাশ তাদের চলনে-বলনে আচারে সংলাপে আর তা মুঠো মুঠো বিস্ময়ের জন্ম দেয় সাধারণ মানুষের মনে। এমনি এক বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীই শোনানো হয়েছে 'অগ্নিসংস্কার' ছবিটির মধ্যে দিয়ে। অগ্রদূত গোষ্ঠী পরিচালিত অগ্নিসংস্কার ছবিখানি এমনি এক মানুষের জীবনালেখ্য। দর্শকসাধারণের স্মরণ থাকতে পারে যে কিছুকাল আগে Rage in Heaven নামে একটি বিদেশী ছবি এখানকার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল। অগ্নিসংস্কার ছবিটির মূল গল্পটির সঙ্গে ঐ ছবির মূল গল্পের অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই জাতীয় ছবির কৌতূহলই হচ্ছে প্রাণ, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্বার কৌতূহল দর্শকচিত্তে জন্ম নেয়, সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই কৌতূহলের নিরসন। চরিত্রবৈচিত্র্যই এই জাতীয় ছবির প্রধান সম্পদ এই বিচিত্র চরিত্রের সম্যক বিশ্লেষণেরই সফলতার উপরই এই ধরণের ছবির সার্থকতা নির্ভর করে। কৌতূহল সৃষ্টির নিপুণতায়, চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতায় এবং সংঘাতসৃষ্টির
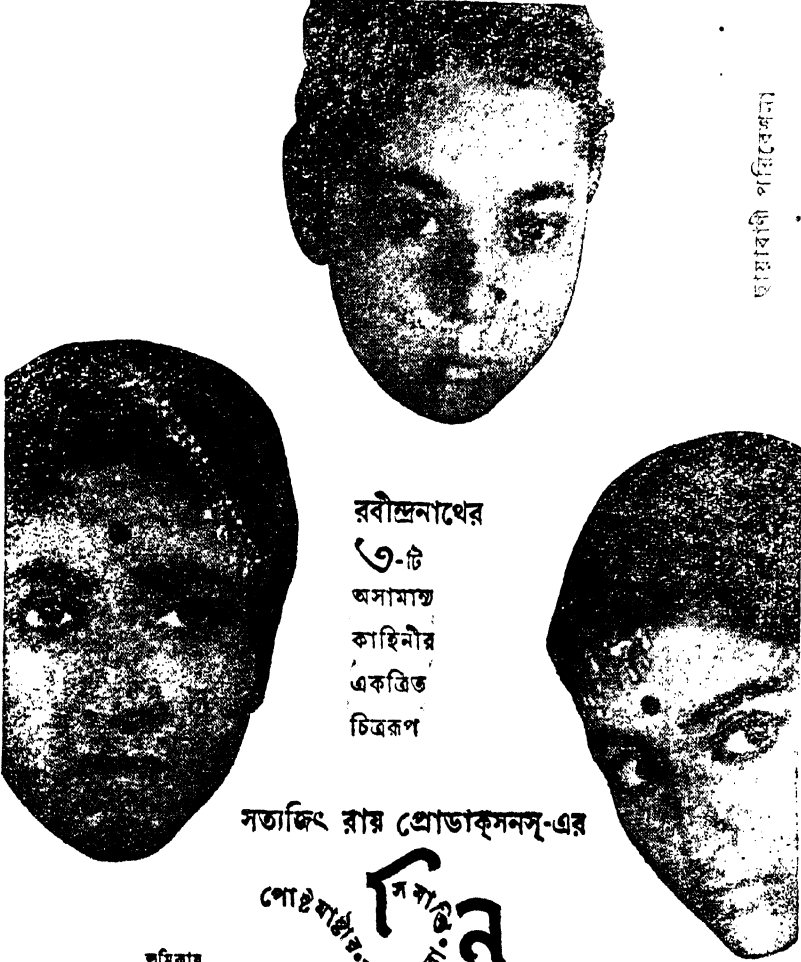
রবীন্দ্রনাথের
৩-টি
অসামান্য
কাহিনীর
একত্রিত
চিত্ররূপ

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসনস্-এর

তিন কন্যা

পোষ্টমাষ্টার • মণিহারা • সমাপ্তি

ভূমিকায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় • কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
অনিল চট্টোপাধ্যায় • অপর্ণা দাশগুপ্ত
কণিকা মজুমদার • চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায় • সীতা মুখোপাধ্যায়
কুমার রায় • গীতা দে

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়

ন্যাশান্যাল থিয়েটার (লণ্ডন) • রিগ্যাল (নিউ দিল্লী) • এক্সেলসিয়ার থিয়েটার (বম্বে)
মিনার্ভা টকিজ (মাদ্রাজ) • চৌধুরী টকিজ (গৌহাটি, আসাম)
এবং

রূপবাণী ★ ভারতী ★ অরুণা

ও শহরতলীর সর্বত্র !

কুশলতায় এই ছবিটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে চরিত্রগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটছে। তবে কয়েকটি জায়গায় ছবির গতিতে শৈথিল্য এসে গেছে, চিত্রনাট্যের গঠনও স্থানে স্থানে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কয়েকটি জায়গায় পরিচালনাও ত্রুটিশূন্য নয়।

অভিনয়ে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র ছবিতে তাঁর অভিনয় এক অপরিহার্য সম্পদ। তাঁর অপূর্ব অভিনয় ছবিটিকে শ্রীসম্পন্ন করে তোলে বহুল পরিমাণে। উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ও উপভোগ্য। বিকাশ রায়ের অভিনয় তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। এঁরা ছাড়া ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, বীরেশ্বর সেন, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পীরাও স্ব স্ব ভূমিকায় আপন আপন অভিনয়ে দক্ষতা প্রকাশ করেছেন।

মধ্য রাতের তারা

আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্যের স্বনামধন্যা লেখিকাদের মধ্যে প্রতিভা বসু অন্যতমা। মধ্য রাতের তারা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আজকের দিনের সমাজের একটি সমস্যাসঙ্কুল দিকের প্রতি লেখিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই কাহিনীই বর্তমানে পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্রের আকার নিয়ে সগৌরবে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে। নারীজীবনের এক চরম জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী রূপ পেয়েছে। চলচ্চিত্রে এই কাহিনীর সার্থক রূপায়ণের জন্যে পিনাকী মুখোপাধ্যায় সাধারণের সাধুবাদ অর্জন করার দাবী রাখেন। ছবিটি সুপরিচালিত এবং পরিচালকের আন্তরিকতা ও শ্রমস্বীকারের পরিচয় বহন করে। ছবিটির গতি কোথাও শিথিলতাপ্রাপ্ত নয়, অনুভূতিশীল দর্শকমাত্রেরই মনে এর আবেদন রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। কাহিনীর চিত্রায়নে ও বিন্যাসকর্মে পরিচালক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সে ক্ষেত্রে তিনি আপন শক্তির আশানুরূপ পরিচয়ই দিয়েছেন। গানগুলি সুগীত। চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে হৃদয়গত দৌর্বল্য ও আদর্শের দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। বলিষ্ঠ চিত্রনাট্য ও সুযোগ্য পরিচালনা ছবিটিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে নায়িকা প্রণতি ভট্টাচার্য ও নায়ক অভি ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেছেন। ছবি বিশ্বাস ও মলিনা দেবীর অভিনয় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সমন্বিত এবং হৃদয়স্পর্শী। মিতা চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তীর অভিনয়ও চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তোলে। এঁরা ছাড়া দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, কিশোরকুমার, রেণুকা রায়, লীলা পাল, আশা দেবী প্রভৃতি শিল্পীরাও বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা পৃথিবীতে আজ সাড়া পড়ে গেছে। সমগ্র বিশ্বের নরনারী তথা সুধী সমাজ বর্তমানকালের এই শ্রেষ্ঠ মানুষটির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ——— । সাড়ার সঙ্গে আজ এখানে সারা জগতের সমান ভূমিকা। এই উপলক্ষে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে ভারতে এসেছেন শ্রীডেভ উইন। ইনি একটি চিত্রনির্মাণে প্রয়াসী যে ছবিতে ভারতীয় জীবনধারার সম্যক প্রতিফলন ঘটবে, ভারতীয় কণ্ঠ যে ছবিতে শোনা যাবে এবং যে ছবিতে যুক্ত হবে ভারতীয় গান। ক্যালিফোর্ণিয়াও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সেই উপলক্ষেই শ্রীউইনের ভারতাগমন এবং এই চিত্রনির্মাণ।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য জীবন কাহিনী অবলম্বনে একটি বাঙলা ছবি নির্মাণের পথে এ বিষয়ে আশা করি অনেকেই অবহিত। সম্প্রতি এই ব্যাপারে নির্মাতাবর্গ ইংল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হয়েছেন। চিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তাঁদের এই বিদেশযাত্রা। বাঙলা ছবির ইতিহাসে এই ছবিখানিই প্রথম ছবি যার অংশ বিশেষ চিত্রায়িত হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সপ্তাহব্যাপী বাঙলা ছবির এক প্রদর্শনী উৎসব পরম সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। বোম্বাইয়ের দর্শক সাধারণ বাঙলা ছায়াছবির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে কুণ্ঠাপ্রকাশ করেনি। আপন আপন উৎকর্ষের জন্যে বাঙলা ছবিগুলি বোম্বাইতেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এ উপলক্ষে যে সকল ছবি প্রদর্শিত হয়েছে তাদের নাম—মেঘে ঢাকা তারা, গঙ্গা, পঞ্চতপা, বাইশে শ্রাবণ, মরুতীর্থ হিংলাজ এবং ক্ষণিকের অতিথি।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনামূল্যে প্রদর্শনার জন্যে মহারাষ্ট্র সরকার একটি ভক্তিমূলক ছায়াছবির মুদ্রণ (১৬ এম, এম) ক্রয় করেছেন বলে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই ছবিটির নাম "প্রভু কী মায়া." ছবিটির পরিচালক শ্রীবিঠলদাস পাঞ্চোটিয়া।

ভারতের প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রতারকা পদ্মিনীর বিবাহ সম্বন্ধীয় বারতা কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছিল আশা করি চিত্রামোদীর দল সবিশেষ অবগত আছেন। ২৭এ এপ্রিল বিবাহের দিন হিসেবে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ এই বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখতে হয়েছে। জানা গেছে যে ১৫ই মে পর্যন্ত পদ্মিনী চিত্র গ্রহণের কাজে নানা চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ, ১৫ই মে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তাই আগামী ২৫এ মে তাঁর বিবাহের শুভদিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব লাহোরে উদ্‌যাপিত হবে এই মে মাসে। ২৪এ মে থেকে ২৭এ মে পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ১লা জানুয়ারী ১৯৬০ থেকে ৩১এ ডিসেম্বর ১৯৬০ এর মধ্যে যে ছবিগুলি গৃহীত হয়েছে এবং মুক্তিলাভ করেছে "প্রেসিডেন্টস য়্যাওয়ার্ডস" এর জন্যে তারাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রোৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

চিত্রামোদীরা জেনে আনন্দলাভ করবেন যে বৎসরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে 'ওস্কার' লাভ করেছেন বিশ্বব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারিণী সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলার। বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার 'অস্কার' লাভ করেছেন বার্ট ল্যাংকেষ্টার। 'বাটারফিল্ড এইট,' এবং 'এলমার গেন্‌ট্রি' ছবি দুখানিই যথাক্রমে লিজকে ও বার্টকে এই বিরাট সম্মান অর্জনে শ্রেষ্ঠ সহায়তা করেছে।

'অ্যাপার্টমেণ্ট' ছবিখানি বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে বিবেচিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশনা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনার স্বীকৃতিস্বরূপ শেষোক্ত ছবিখানি মোট পাঁচটি অস্কার লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ প্রণিধানযোগ্য যে এবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ায়। এ বছর এই অস্কার বিতরণ উৎসবের তেত্রিশ বছর পূর্ণ হল। এই উৎসব হলিউডের বাইরে অনুষ্ঠিত হ'ল এই প্রথম।

অ্যামেরিকার মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েসানের বর্তমান বর্ষের কর্মকর্তা নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি মিঃ এরিক জনষ্টন এই নির্বাচনে বর্তমান বর্ষের জন্যে সভাপতিরূপে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্তমানকালের দিকপাল সাহিত্য-নায়ক সমারসেট মমের অসামান্য সাহিত্যসৃষ্টিগুলির তালিকায় অফ হিউম্যান বণ্ডেজ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই কাহিনীর চিত্ররূপও আশানুরূপ সফলতায় বিভূষিত হয়ে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল তদানীন্তন দর্শক-সমাজে (১৯৩৪)। টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স বর্তমানে প্রযোজক জেরি ওয়াল্ডের প্রযোজনায় ঐ কাহিনীকে পুনরায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করায় উদ্যোগী হয়েছেন। চিত্রনির্মাতাদের প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ সার্থকতায় রূপলাভ করুক এই কামনা আমরা সর্বান্তঃকরণে করি। স্মরণ থাকতে পারে সেবারে এর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন লেসলি হাওয়ার্ড এবং বেটি ডেভিস।

ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে সেখানকার কিশোর সম্প্রদায়ের কোপদৃষ্টি পতিত হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহগুলিতে তাঁদের রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের কোপানলে চিত্রগৃহগুলিকে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা আসনগুলিকে ছিন্নভিন্ন করেছেন, বহু মূল্যবান রূপালী পর্দাটিকেও বিনষ্ট করেছেন এবং দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে বোতল প্রভৃতি ছুঁড়েছেন। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বাঙলাদেশে এই সংবাদটুকুই এসে পৌঁছেচে কিন্তু কি কারণে তাঁরা এই ভাবে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হলেন সেই কারণটির ইতিবৃত্ত সমুদ্রের ওপারেই থেকে গেছে, তাই এ দেশীয় পাঠক-সাধারণ্যে সেই কারণের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থ এবং পরলোকগত প্রিন্স আলী খাঁর বালিকা কন্যা কুমারী যশমিনকেও এবার রূপালী পর্দার বুকে অভিনেত্রী হিসেবে দেখা যাবে। 'টু ক্যাচ এ থিফ' ছবিটির মাধ্যমে তিনি প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। ছবিটি রিটা হেওয়ার্থ এবং তাঁর পঞ্চম স্বামী জেমস হিলের যুগ্ম প্রযোজনায় গড়ে উঠছে। ছবিটির মুখ্য অংশে অভিনয় করছেন রিটা নিজে এবং রেক্স হ্যারিসন। তবে, আপনারা জেনে রাখুন যে যশমিন এতে কোন "চরিত্রে" আত্মপ্রকাশ করছেন না তাঁর অভিনীত প্রথম এই ছবিটিতে তাঁকে দেখা যাবে অন্যতম "এক্সট্রা" হিসেবে। আর প্রসঙ্গত করি যে এই "এক্সট্রা" হিসেবে অবতীর্ণা হওয়ার জন্যে তাঁর পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছে দৈনিক দশ ডলার মাত্র।

শৌখীন সমাচার

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রূপ ও বাণী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' এবং 'বশীকরণ'কে সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেছেন। উভয় নাটকই পরিচালিত হয়েছে বিশু মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা। নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করলেন সূর্য পাল, প্রফুল্ল দাস, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বিমল মণ্ডল, গদাধর দে, বিশ্বনাথ নিয়োগী, প্রভাত ভট্টাচার্য, জিতেন শীল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাস গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীতা দাস, ডলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * *

নব-ব্যারাকপুরের রূপারূপ নাট্য সম্প্রদায়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটির নাট্যরূপ পরিবেশিত হয়েছে। গল্পটিকে নাটকে রূপায়িত করেছেন নীরু মুখোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন রবীন চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন মহেন্দ্র দত্ত, শচীন চক্রবর্তী, নরেন করঞ্জাই, দুলাল চক্রবর্তী, ইলা সাহা, বাণী দাশগুপ্ত, শিশির অধিকারী, খোকন বসু প্রভৃতি।

* * *

বাঙলার শৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'ময়ূখ' এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী; শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইলকে সম্প্রতি মঞ্চস্থ করে এঁরা দর্শক সাধারণের বিপুল প্রশংসা ও সাধুবাদে বিভূষিত হতে সক্ষম হয়েছেন। নাটকটি পরিচালনা করেন মণি চট্টোপাধ্যায় এবং চরিত্রগুলির রূপায়ণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তরুণ ঠাকুর, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল পাল, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোপী মল্লিক, অনিল বসু, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, অসীম ঠাকুর, সবিতা মুখোপাধ্যায়, দীপালি ঘোষ, রীতা বসু, জ্যোৎস্না নাথ, কান্তা দাস প্রভৃতি।

চৈত্র, ১৩৬৭ (মার্চ্চ—এপ্রিল, '৬১)

অন্তর্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ) : ভারত সরকারের করভারগ্রস্ত বর্ত্তমান বাজেট (১৯৬১-৬২) প্রস্তাব সমাজতন্ত্রের প্রহসন মাত্র—লোকসভায় বাজেট বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষের তীব্র সমালোচনা।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ্চ) ; রুশ মানচিত্রে সিকিম ও ভুটানকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া প্রদর্শন—ভারত কর্ত্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ) : সিকিম ও অন্যত্র চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত—লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই'র ঘোষণা।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) : মার্কিণ সরকার গোয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করে—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ দূত মিঃ হ্যারিম্যানের ঘোষণা।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ্চ) : 'একমাত্র চতুর্দ্দশ জাতি সম্মেলনই লাওস সমস্যার সমাধান করিতে পারে'—দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে লাওসের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী 'প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার অভিমত।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ) : গড়িয়া, হাবড়া প্রভৃতি স্থানে শিল্প-নগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা—পুনর্ব্বাসন শিল্প কর্পোরেশন কর্ত্তৃক উদ্বাস্তদের কর্ম্ম-সংস্থানের প্রচেষ্টা।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) : পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি—রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা—প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষক ধর্ম্মঘট স্থগিত।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) : সাপ্তাহিক ছুটি ও বেতন বৃদ্ধির দাবীতে পৌরসভা (কলিকাতা কর্পোরেশন) কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ—বিক্ষুব্ধ কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক মেয়র ও কাউন্সিলারগণ আটক।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ) : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত মার্কিণ প্রেসিডেন্টের (কেনেডি) বিশেষ দূত মিঃ হ্যারিম্যানের সাক্ষাৎকার—বিশ্বসমস্যা ও পরস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ্চ) : 'কঙ্গোস্থিত ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজন হইলে কাটাঙ্গায় যাইতে দ্বিধা করিবে না'—লোকসভায়

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ) : 'জাতীয় স্বার্থে বে-সরকারী শিল্পসমূহ নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক'—দিল্লীতে ভারতীয় বণিক ও শিল্প সংঘের সভায় শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) উক্তি।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ) : কলিকাতা, হাওড়া সমেত পশ্চিম বঙ্গের নয়টি পৌরসভার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান—হাওড়া পৌরসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসেরই সংখ্যাধিক্য আসন (৩০টির মধ্যে ২৪টি) লাভ।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ) : ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ভারতের বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮০লক্ষ নির্ণীত - দশ বৎসরে শতকরা ২৩ভাগ বৃদ্ধি।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ্চ) : কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনী ফলাফল ঘোষিত—কংগ্রেস ৩৯, ইউ সি-সি ৩১, নাগরিক কল্যাণ ৩ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৭টি আসন অধিকার।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ্চ) : 'দারিদ্র্যের কবল হইতে ৪৩কোটি নর-নারীর মুক্তি বিধানই ভারতের লক্ষ্য'—দুর্গাপুরে সেকশান মিলের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

১৬ই চৈত্র (৩০ শে মার্চ্চ) : লাওস ও কঙ্গো সম্পর্কে ভারত-মার্কিণ দৃষ্টিভঙ্গীতে সাদৃশ্য—দিল্লীতে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন রাস্কের সহিত বৈঠকান্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ইঙ্গিত।

১৭ই চৈত্র (৩১ শে মার্চ্চ) : পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক কল্যাণীতে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতম সূতাকলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

নাগপুরে পুলিসের গুলীতে ১জন নিহত ও একজন আহত—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের বিরুদ্ধে নাগ বিদর্ভ আন্দোলন সমিতির বিক্ষোভের জের।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) : বস্তার জেলায় পুলিসের গুলীতে ১২ জন নিহত ও পাঁচ জন আহত—আদিবাসী সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক থানা আক্রমণের জের।

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) : নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মীয় দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ করার সুপারিশ—পার্লামেন্টের কংগ্রেস দলীয় সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল) : কঙ্গো হইতে শ্রীরাজেশ্বর দয়ালকে (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি) অপসারণ করা হইলে কঙ্গো হইতে ভারতীয় সৈন্যদল 'ফিরিয়া আসিবে—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল) : আসামে লোক গণনায় কারচুপির (বাঙালীদের প্রসঙ্গে) অভিযোগ—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত দিল্লীতে 'নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতির

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল) : পূর্ব্ব পাক্ পুলিশ কর্ত্তৃক ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্য অপহৃত—পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নিকট ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের প্রতিবাদ।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) : ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণে পাকিস্তানের প্রতিবাদে দিল্লীতে বিস্ময়—বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া লোক সভায় সরকারী ঘোষণা।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল) : কাশ্মীরে ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের অনুপ্রবেশ—লোকসভায় সদস্যদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) : 'সাম্প্রদায়িক ও ভেদপন্থী শক্তি নির্ম্মূল না হইলে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য্য'—দিল্লীর সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল) : 'ভারতের জনগণ সার্ব্বভৌম স্বাধীন জাতির পথ ধরিয়াছে'—লুমুম্বানগরে (বিজয়ওয়াদা) ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি সেক্রেটারী মঃ মাইকেল সুসলভের মন্তব্য।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) : পশ্চিমবঙ্গের ৮৭টি পৌরসভায় জল ও ময়লা নিষ্কাশন সমস্যা সমাধানের আশা সুদূরপরাহত।

কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি সীমা রেখায় পাক্ পুলিশের হানা—ভারতীয় পুলিশ দলের উপর গুলীবর্ষণ।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল) : 'মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাপকহারে বৃত্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন—কলিকাতায় জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা সংস্থার অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল) : আসামে নূতন করিয়া লোক গণনার জন্য বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত দাবী কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নাকচ।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) : দেশবাসীকে শহীদদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার ব্যাকুল আহ্বান—জালিনওয়ালাবাগে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন কালে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ।

বহির্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ) : কমনওয়েলথের সদস্যপদ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ পর্য্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ) : প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত—কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন (লণ্ডন) শেষে ইস্তাহার প্রচার।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) : নমপেনে লাওস সম্পর্কে মীমাংসা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার (ক্ষমতাচ্যুত প্রধান মন্ত্রী) সহিত লাওস সরকারী প্রতিনিধি দলের বৈঠক নিষ্ফল।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) : নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব গৃহীত হইলে নিয়ন্ত্রণের যে কোন সর্ত্ত গ্রহণে রুশিয়া রাজী সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) দিল্লীতে লাওস আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের বৈঠক আহ্বান সম্পর্কিত সোভিয়েট প্রস্তাব বৃটেন কর্ত্তৃক সমর্থন।

১১ই (২৫শে মার্চ্চ) : করাচী হইতে একশত মাইল দূরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় ২০ জন যাত্রী নিহত ও ২১ জন আহত—কয়েকখানি বগী চূর্ণ-বিচূর্ণ।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ) : 'লাওস পরিস্থিতির আর অবনতি ঘটিতে দেওয়া চলে না'—ফ্লোরিডায় বৈঠকান্তে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলানের যৌথ স্বাক্ষর।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ) : সিংহলে সরকারী কর্ম্মচারী ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের ছুটি বাতিল—ফেডারেল পার্টির ভাষা আন্দোলনের (তামিল ভাষা সংক্রান্ত দাবী) জের।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) : লাওস সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে রুশিয়া কর্ত্তৃক বৃটিশ প্রস্তাব মোটামুটি গ্রহণ—বৃটেনের নিকট রুশ সরকারের নোট।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল) : কঙ্গোলী জনতা কর্ত্তৃক রাষ্ট্র সংঘের সৈন্য (সুইডিশ) বন্দী—এলিজাবেথভিল বিমান-বন্দরে সশস্ত্র হামলা।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল) : কঙ্গো হইতে ২১ দিনের মধ্যে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের দাবী রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে চতুর্দ্দশ জাতি (ভারত সমেত) প্রস্তাব উত্থাপন।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) : কর্ণেল ভট্টাচার্য্যকে (ভারতীয় অফিসার) অপহরণের প্রতিবাদ পাকিস্তান কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য—সাক্ষাতের জন্য ভারতীয় দূতাবাসের অনুরোধ রক্ষায় অস্বীকৃতি।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল) : 'সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে কেনিয়াকে মুক্ত করিতে চাই'—কেনিয়ার সাংবাদিক বৈঠকে মাউ মাউ নেতা জেমো কেনিয়াটার বিবৃতি।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল) : মানুষের মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত—শূন্য লোকে প্রেরিত মানুষের (য়ুরি গাগারিন) নিরাপদে মর্ত্ত্যে অবতরণ—মস্কো বেতারে রাশিয়ায় চাঞ্চল্যকর ঘোষণা।

রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যের অভিযোগে খান আবদুল গফুর খান (সীমান্ত) গ্রেপ্তার (রাওলপিণ্ডির সংবাদ)।

কর্পোরেশনের অবুঝ শ্রমিক

"কলিকাতার একদিকে কলেরা ব্যাপক ভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে আর অন্যদিকে কর্পোরেশনের ধাঙড়দের একদল আগামী ২০শে মে হইতে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছে। এই কর্মচারীদের দাবী সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হইবে, সস্তা রেশনের বদলে ১০৲ নগদ দিতে হইবে, গৃহ ভাতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। শ্রমিকদের দাবী কতটা যুক্তিসঙ্গত' কতটা, নয়, সে প্রশ্নের মধ্যে গিয়ে লাভ নাই। কিন্তু যে সময় জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিপন্ন এবং কলিকাতা সহরে মহামারীর উপদ্রব দেখা দিয়াছে সে সময় সহরের জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। করদাতা ও জনসাধারণের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা ছাড়া যে শ্রমিকদের কোন আন্দোলন সফল হয় না, একথা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের বোঝা দরকার।"

—দৈনিক বসুমতী

আলো থেকে অন্ধকার

"সামনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আসিতেছে এবং এই রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অধঃপতনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথের দেশে আলো নিভিয়া গেল, যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করিবার জন্য মহাকবি এত সাধনা করিয়াছেন—শুনিতেছি মহামান্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আসিতেছেন মহানগরী কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে। এই অন্ধকারে উৎসব ভবনে প্রদীপ জ্বালিতে এবং মুখ দেখাইতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কি লজ্জা হইবে না? আলোকের কি বাণী তিনি আমাদিগকে দিবেন? তিনি কি জানেন লেনিন নামক এক ভদ্রলোক একটি দুঃস্থ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হাতে পাইবার পর রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া নিষ্কম্প দীপশিখার সামনে বসিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বালাইতে হইবে। আর গ্রামে গ্রামে আপামর জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দিতে হইবে। সেই সোভিয়েট রাশিয়া আজ জগৎজয়ী, মহাকাশ বিজয়ী এবং গ্রহান্তরে যাত্রার জন্য উন্মুখ। আর আমাদের গান্ধী-ভারতে, নেহরু-ভারতে আমরা রান্নাঘরে বসিয়া আলোর জন্য ক্রন্দন করিতেছি। প্রধানমন্ত্রী ইহার জন্য লজ্জাবোধ করেন না? তিনি কি পারিবেন লেনিন বা ষ্টালিনের মত এই সমস্ত বোগাস্ এক্সপার্টকে ২৪ ঘণ্টার হুকুমে বন্দী নিবাসে পাঠাইতে? কিম্বা জাতির ভাগ্য লইয়া যাহারা জুয়াচরি করিতেছে, তাদের কয়েকটাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিতে?—আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অন্ধকারে। অতএব আমরা তাঁর কোটি কোটি হতভাগ্য প্রজা—আসুন ভোর রাতে আমরা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া প্রার্থনা করি—'হে পরম পিতা, আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করো। তাঁকে গণতন্ত্রের অন্ধকার হইতে সমাজতন্ত্রের আলোকে লইয়া যাও'।"

—যুগান্তর।

অর্থব্যয়ে অব্যবস্থা

"পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই রাজ্যের তপশীলভুক্ত খণ্ডজাতিদের কল্যাণকর্মের জন্য ১৯৫৯-৬০ সনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬-৬৪ লক্ষ টাকা, ব্যয় হইয়াছিল, ১'৬১ লক্ষ বাকি শেষের তিন মাসে ব্যয় করার জন্য রাখা হইয়াছিল। অর্থব্যয়ের এরূপ ব্যবস্থা যে অব্যবস্থারই নামান্তর, তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বৎসরের শেষভাগে তাড়া-হুড়ো করিয়া বরাদ্দ অর্থের বৃহত্তম অংশ ব্যয় করিতে গেলে তাহা যে অনেকাংশ অকাজে ও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আশা করি তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অর্থব্যয়ের এইরূপ অব্যবস্থা যে শুধু তপশীলভুক্ত জাতি ও খণ্ডজাতিদের ব্যাপারেই দেখা যায় তাহা নহে। সরকারের অনেক দপ্তর সম্বন্ধেই এরূপ অভিযোগ হামেশাই শুনা যায়। কাজেই এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে যে, এরূপ হইবার কারণ কী? আমাদিগকেই যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, সুপরিকল্পনার অভাবই অর্থব্যয়ের এরূপ অব্যবস্থার প্রধানতম কারণ। অর্থব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি কী কী বিষয়ের উন্নয়ন প্রয়োজন, কীভাবে তাহা সাধিত হওয়া প্রয়োজন, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাহা বিভক্ত করিয়া বরাদ্দ অর্থ কোন সময়ের মধ্যে কতটা কোন্ কাজে কীভাবে ব্যয় করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া ফেলেন, তবে এরূপ অব্যবস্থা হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কর্মকর্তৃগণের পরিকল্পনা রচনা অপেক্ষা ফাইল দুরস্ত রাখিতে অত্যধিক ব্যস্ততা এবং অনেক সময় পরিকল্পনীয় বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়, ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত কিছু বলা হইবে না। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রচুর অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও তপশীলভুক্ত জাতি ও খণ্ডজাতিদের উন্নয়ন প্রত্যাশিতরূপে সাধিত হইতেছে না, কাজের ও অর্থব্যয়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবই যে তাহার কারণ একথা বলিতেই হয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শ্রীরেড্ডী চুপচাপ

"বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী সম্পর্কে একটি মন্তব্য দেখেছিলাম যে তিনিই একমাত্র প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যাঁর কোনও সম্পত্তি নেই'। সত্যি কিনা জানি না—তিনি সভাপতি হ'বার পর দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সদস্যদের নিজ নিজ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একটা হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং আর সামান্য দু'একজন ছাড়া কেউ হিসাব দাখিল করে তাঁকে কৃতার্থ করেনি। সাধারণ নির্বাচন সামনে—তাই এখন ব্যাপারটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না বলে শ্রীরেড্ডী চুপ করে গেছেন।"

—স্বাধীনতা।

ভিক্ষুকের মেজাজ

"একটা স্বাধীন দেশ বিদেশে ভিক্ষুক সঙ্ঘ খুলিয়া ভিক্ষাপাত্র নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত একা জহরলাল নেহরু সারা বিশ্বে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তাঁর Aid India Club ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছে। ক্লাব আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে প্রায় তিন শত কোটি টাকা ভিক্ষা তুলিতে চাহিয়াছিল। কেনেডির নিকট নেহরুর চিঠির পর আমেরিকানরা হাত গুটাইয়াছে, ইংরেজরা

হাসিয়া বলিয়াছে—এবার তামাসা দেখুক। আমেরিকানরা জানাইয়া দিয়াছে—জুন মাস পর্য্যন্ত সবুর কর, তার পর দেখিব কি করা যায়। সনাতন শাস্ত্রবাক্য আছে—ভিক্ষুকের মেজাজ দেখাইতে নাই। নেহরু শাস্ত্রের নাম শুনিলে ক্ষেপিয়া ওঠেন, তাঁর ধারাই আলাদা। কিন্তু এই ব্যাপারে ক্ষতিটা হইল কার? বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ প্রজেক্ট গঠনে আমরা গোড়া হইতে আপত্তি করিয়াছি এবং বলিয়াছি, ইহাতে দেশ বিপন্ন হইবে, প্রজেক্ট চলিবে না, আত্মমর্য্যাদাও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আমরা নিজস্ব সম্পদে নির্ভর করিয়া নিজেদের মত স্কীম অনায়াসে করিতে পারিতাম। তাহাতে বিলাসিতা কম হইত, স্থায়ী ফল লাভ হইত, যেটুকু উন্নতি আসিত তাহা স্থায়ী হইতে পারিত। ক্ষমতামদে মত্ত নেহরুর মাতলামি আর শুভবুদ্ধি ও সৎপরামর্শে কর্ণপাতে দেশের লোকের অনিচ্ছা সারাটা দেশকে আজ এমন এক অবস্থা টানিয়া আনিয়াছে যে, এক ডজন বোমা অথবা এক ডজন সাবোটার সারা ভারতের শিল্প ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবন বানচাল করিয়া দিতে পারে। এখনও সময় আছে। এখনও রাশ টানিয়া প্রকৃত প্লানিং-এ মন দিলে বাঁচিবার উপায় হইতে পারে। তার জন্য সকলের আগে চাই নেহরু এবং প্লানিং কমিশনের কয়টি অসাধু এবং অপদার্থের অপসারণ। ভারতের ৪৩ কোটির মধ্যে এই কয়টি ছাড়া লোক নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

পদ যাত্রা

"যে পরিস্থিতিতে যে ধিক্কারজনক মনোবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ভাষা আইন কাছাড় জেলার অনিচ্ছুক স্কন্ধের উপর সবলে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা সর্বপ্রকার ন্যায়নীতি বর্জিত। বিধানসভার সংখ্যাধিক্যের জোরে এবং বাহিরে অনসমীয়া ভাষীদের উপর অত্যাচারের কপট বিভীষিকা চালাইয়া এই ভাষা-আইন গৃহীত হইয়াছিল। কাছাড়বাসী তাহাদের মাতৃভাষার কোন স্থান এই আইনে দেখিতে না পাইয়া বারবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং সাংবিধানিক সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আসাম সরকার সেই সমস্ত সুপরামর্শের প্রতি কর্ণপাত ত করেনই নাই, বরঞ্চ দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মতামতকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় কর্ত্তাগণের নিকট ধর্ণা দিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই, কোন অজ্ঞাতকারণে আসামের অনসমীয়া ভাষীদের দাবী সম্পর্কে তাহারা খুবই অনাসক্তি দেখাইতেছেন, যদিও বাংলার নেপালীভাষীদের দাবীর প্রতি তাহাদের দরদের অন্ত নেই। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবনপণ সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থাই বর্ত্তমানে কাছাড়বাসীকে তাহাদের মাতৃভাষার সম্মান ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। সংগ্রাম পরিষদের পরিচালনাধীন কাছাড়বাসী সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাদের বিক্ষোভ ক্রমেই সংহত রূপ ধারণ করিতেছে। পদযাত্রীদের এই যাত্রা জয়যাত্রায় পরিণত হউক, মাতৃভাষার সম্মানরক্ষাকল্পে তাহাদের প্রচেষ্টা সফল হউক, ইহাই কামনা।" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

মোটরের গতি

"কাঁথি সহরের জনবহুল রাস্তার মধ্যে মোটরের গতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ বাস ও ট্রাকগুলি যেভাবে বে-পরোয়া ছুটিয়া থাকে উহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইরূপ দ্রুতগতির জন্য হামেসাই সাইকেল ও রিক্সাদির সহিত সঙ্ঘর্ষ লাগিয়া আছে। এখন বিজ্ঞানের যুগ হইলেও মোটর ট্রাকের দ্রুত গতির ফলে সর্ব্বত্র যেরূপ একটা অনর্থ ঘটিতেছে তাহা কাহারও পক্ষে অভিপ্রেত নহে। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় সর্বত্রই মোটর ট্রাকের দৌরাত্ম্যে বহু লোকজন ও জীবজন্তুর প্রাণ বিনাশ হইতেছে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা কেন্দ্রের একজন মহিলা গার্ড রিক্সাসহযোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাইবার কালে সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি ট্রাক আসিয়া যে ভাবে ঐ রিক্সাটিকে ধাক্কা দেয় তাহাতে ঐ মহিলা-গার্ডটি সাঙ্ঘাতিক ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং হাসপাতালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ঘটনাটি খুবই মর্ম্মন্তুদ। এইরূপ দুর্ঘটনা এখন দেশের চারিদিকেই সংঘটিত হইতেছে। কলিকাতার রাজপথেও দুর্ঘটনা যেন নিত্য-

—আগামী সংখ্যায়—

—বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভা—

ইং ১৯২৯ সন্

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

* * *

বিশ্বকবির বিশ্বরূপ

সৈয়দ মুজতবা আলী

* * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

বিপ্লবী বিপিনবিহারীর বিপ্লবদল

সাহিত্যিক কৌতুকী

নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইতেছে। এ বিষয়ে বাস ও ট্রাক চালকদের এখন হইতেই সাবধান সতর্ক হইয়া চলা প্রয়োজন। সহরগুলিতে কর্ত্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ রহিয়াছে। কিন্তু মোটর দুর্ঘটনার অন্ত নাই। এ বিষয়ে পুলিশ বিভাগকে একটু তীব্র দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিতেছি।" —নীহার (কাঁথি)

শোকসংবাদ

ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় গত ৩রা চৈত্র ৭৪ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। কর্মজীবনে ইনি পোর্ট কমিশনারের অফিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করে শ্রমিকদের কল্যাণে পোর্টট্রাষ্ট এমপ্লয়িজ য়্যাসোসিয়েশান স্থাপন করে কৃতিত্বের সঙ্গে তার অবৈতনিক সচিবের দায়িত্বভার পালন করেন। ইনি অলবেঙ্গল জুট মিল য়্যাসোসিয়েশানের সচিব ও ভাটপাড়া লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
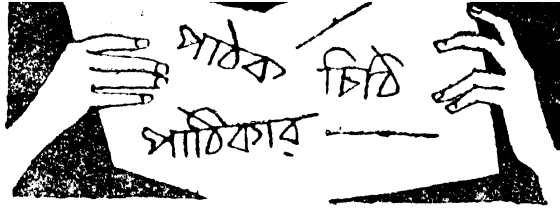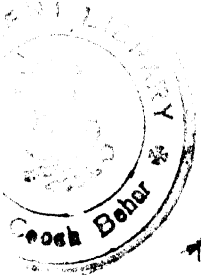
পত্রিকা সমালোচনা

বিপ্লবের সন্ধানে লেখকের প্রতিবাদ

গত পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে "বিপ্লবের সন্ধানে" প্রবন্ধে বহরমপুর বন্দী-শিবিরে রাজবন্দীদের ওপর প্রহরীদের প্রহার-অভিযানের যে বিবরণ আমি লিখেছিলুম, ফাল্গুনের বসুমতীতে শ্রীশৈলেন রায় তার প্রতিবাদ এবং "সত্য ঘটনা" লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আমি পরে গল্প শুনেছি, নিছক গল্প—সত্যের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুব কম,—বীরেন ঘোষ, মধু গোঁসাই, ডক্টর ত্রিগুণা সেন কিম্বা শৈলেন বাবুকেই জিজ্ঞাসা করলে আমি সত্য ঘটনা জানতে পারতুম। এ এক মজা মন্দ নয় যে শৈলেন বাবু আমার লেখা না পড়েই প্রতিবাদ লিখেছেন। পড়লে তিনি দেখতেন যে, আমি গল্প শুনেছি কোনো "তৃতীয় ব্যক্তির" কাছে নয়,—স্বয়ং বীরেন বাবুর কাছেই,—যিনি সুবেদারকে ঘুঁসি মেরে ধস্তাধস্তি করে' সমস্ত মার নিজের মাথায় টেনে নিয়েছিলেন মধুবাবু বা ত্রিগুণা বাবুর কাছে গল্প শুনলেও তাঁদের শোনা গল্পই শোনা হত,—কারণ তাঁরা অনেক দূরে ছিলেন। আর শৈলেন বাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাইনি ঠিক সেই কারণেই,—যে কারণে শৈলেন বাবু তাঁর ঘরের অন্য কোন রাজবন্দীর কাছে সত্য ঘটনা জানার জন্যে আমাকে সুপারিশ করেননি। আমি এমন কথাও লিখিনি যে, পাঁচ জন রাজবন্দীই খাটের নীচে ঢুকেছিলেন বা টেবিলের আড়ালে সরেছিলেন বা কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। আমার বক্তব্য ছিল,—ঐ তিনটি কার্য্য পাঁচ জনে করেছিলেন,—কেউ একটি, কেউ বা দু'টি,—কেউ বা হয়ত তিনটিই। তারপর,—লাঠির ঘায়ে হাতের তালুর "দু'খানি হাড় ভেঙ্গে যাওয়া" এবং এক মাস হাসপাতালে থেকেই বেমালুম ভাল হয়ে যাওয়া,—এটা অ্যানাটমির বিশেষজ্ঞদের এলাকা—আমার প্রবেশ নিষেধ,—বিশেষত যখন স্বয়ং বীরেন ঘোষও টের পাননি, এবং মুড়াগাছার গোপেন মুখার্জিও স্বর্গগত। আমার লেখা পড়াটা শৈলেন বাবু যেমন সংক্ষেপে সেরেছেন,—প্রতিবাদটাও' তেমনি আরো সংক্ষেপে সারলেই তিনি ভাল করতেন।—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসঙ্গত সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে

বাংলার মেয়েদের মধ্যে অন্তত: একজনও যে আমার লেখা পড়ে সাড়া দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি তাঁর উচ্ছাসপূর্ণ বক্তব্যের ভাব ও ভাষা এত অস্পষ্ট যে উনি কি বলতে চান তাই অধিকাংশ জায়গায় বোঝা যায় না। কয়েকটি বাক্যের গঠনেও ভুল আছে। তাছাড়া আমি যা লিখিনি এমন কথাও উনি আমি লিখেছি বলে উল্লেখ করেছেন। "বিধবারা নিঃসঙ্গিনী অবস্থায় ঘরের মধ্যে বন্দী…' ইত্যাদি আমার লেখায় নেই। আমি কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে ও বলিনি। বাংলার সকল বিবাহিতা রমণীকেই আমি পতিব্রতা বলে জানি। তার মধ্যে কেউ বিধবা হয়ে নিজেকে পতিব্রতা বলে প্রমাণ করার জন্য যদি আমিষ আহার ও রঙ্গীন পোষাক বর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন, তবে তাঁর সে মনোভাবকে নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু বলতে আমি রাজি নই। সমাজে বাস করতে হলে তার অনুশাসন মেনে চলতেই হবে। কিন্তু বিধবার আহার ও পোষাকের বাধ্যবাধকতা—দুর্বলের ওপর পরাক্রমশালী সমাজের উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কৃত্রিম বাধানিষেধ আবহমানকাল ধরে চলে আসছে না—এটা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও বলতে পারি। লেখিকা আমার লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করেছেন। "বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলেই সব কিছুর মীমাংসা হয়। অহঙ্কারে সব রসাতলে যায়।" এ সব বলে যে তিনি কি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন বুঝতেই পারলাম না। মাছ মাংস খেয়ে ও রঙ্গীন শাড়ী পরেও এ কথা পালন করা যায়। অহঙ্কারের প্রশ্নই উঠতে পারে না, "হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে যদি প্রকৃত হিন্দু বিধবারা ধর্মের নামে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।" এতে কি তিনি এই বলতে চান যে উচ্চশ্রেণীর বিধবারা আমিষ আহার করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন? সারা গ্রাম বাংলা জুড়ে যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হাজার হাজার বিধবা রয়েছেন, তারা তো আমিষ আহার করে সংযত জীবনই যাপন করছেন। আমার বক্তব্য পরিষ্কার ও সামান্য। বিধবাদের আমিষ আহার ও রঙ্গীন পোষাক পরার নিষেধ উঠিয়ে দিতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে আমি বিধবাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে বলছি। এতে আমারও প্রবল আপত্তি। লেখিকার লেখার প্রত্যেকটি লাইন তুলে আমি বিরুদ্ধ সমালোচনা করে যেতে পারি। কিন্তু তাতে আমার লেখা অযথা ভারাক্রান্ত হবে ভেবে এখানেই ক্ষান্ত হলাম। আমি বিশ্বাস করি—রঙ্গীন পোষাক ব্যবহারে এবং আমিষ আহারে প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের জন্মগত অধিকার আছে, বিধবা হলে যে সমাজে সে অধিকার কেড়ে নেয়—সে সমাজের প্রশংসা আর যিনিই করুন—আমি করতে পারছি না। এ প্রথা চিরতরে রহিত করে হিন্দু সমাজ নিজের উদারতা ও মানবিকতারই পরিচয় দেবেন। বিংশ শতাব্দীর "সপ্তম দশকে" সমাজের কাছ থেকে এটুকু উদারতা আশা করা অন্যায় নয়।—আশা দাস।

আধুনিক প্রেম

ফাল্গুন সংখ্যা "মাসিক বসুমতী"তে জনৈক সুধাংশু চৌধুরী "আধুনিক প্রেমের ট্রাজেডী" নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তার সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে। লেখক আধুনিক যুগের প্রেমে শুধু ব্যভিচারই দেখেছেন ও তা নিয়ে বিস্তর বিলাপ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার শুধু আধুনিক যুগেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ভারতের মহান অতীতেও তা ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে, কারণ ও-কথাটির সৃষ্টি হয়েছে যার থেকে, সেই আদি রিপুর বশে

মানুষ চিরদিনই আইন-শৃঙ্খলার বেড়া অতিক্রম করেছে ও করবে। প্রবন্ধকারের মতে অবৈধ প্রেমমাত্রই ব্যভিচার, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষিবৃন্দের মতানুসারে প্রেমহীন দেহকামনাই 'ব্যভিচার' এই আখ্যা পাওয়ার অধিকারী। সে কামনা বিবাহিত দম্পতিরই হোক বা নিঃসম্পর্কীয় কোন যুগলেরই হোক। প্রেম কখনও অবৈধ নয়, সমুদ্রের তরঙ্গকে বাঁধা কঠিনে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াসের মতই, মানব-মনের এই রহস্যময় বৃত্তিকে আইন-কানুনের বাঁধাপথে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা একান্তই হাস্যকর। মানুষের মনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বেগবতী বৃত্তি প্রেম। এই প্রেম যে কার জীবনে কি রূপ নিয়ে দেখা দেবে, একথা কেউই বলতে পারে না। হয়ত সমাজের বাঁধাধরা আইনসম্মত গণ্ডীর ভেতরই কেউ প্রেমকে পেলো, পেলো তার শান্ত মধুর স্বাদ, আবার কারুর জীবনে প্রেম এলো ঝড়ো হাওয়ার মতই, সমস্ত সংস্কারের বাঁধনকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে সমস্তর বাইরে প্রলয়মত্ত ঝঞ্ঝা বায়ুর মতই। প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে ব্যভিচারের প্রশ্ন তো আসতেই পারে না, একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, মন দিয়ে খোঁজে একে অপরের মনকে, মিশে যেতে চায় দুটি দেহের সাথে অন্তরঙ্গতম মিলনে, —সেখানে ব্যভিচার কোথায়? আর প্রতারণার কথা তো এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। ভালবাসা যেখানে সত্য, সেখানে আশঙ্কা কিসের? মন দিয়ে মন জেনে নিয়ে প্রেম যেখানে আসন পাতে, তার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক। কোন মালিন্য কোন ছলনার স্থান নেই সেখানে। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ প্রেম। ভালবাসবার ও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার মানুষের সহজাত, তাতেই তার চরম সফলতা। মানুষের গড়া কোন আইনের সাধ্য কি তাকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করবে, সমাজের বাঁধা পথে সে এ সার্থকতা পেলো কি পেলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? প্রেম মানুষের জীবনের অনাদিতম সত্য তাকে আধুনিক অনাধুনিক কোন আখ্যায়ই ভূষিত করা চলে না, তা চিরন্তন। হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ ভালবেসেছে, হাজার হাজার বছর পরেও ভালবাসবে, কালভেদে দেশভেদে তার রূপ-রীতি বদলেছে মাত্র মূল বস্তুটি তো রয়ে গেছে অবিকৃতই। প্রেমে পড়লে আধুনিক মানুষেও কি মনে মনে বলে না "জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল?" লেখক যা বলেছেন তা প্রযোজ্য প্রেমের পক্ষে নয় প্রেমের নামে যে সস্তা খেলা চলেছে তার প্রতি, প্রকৃত প্রেম এসবের অনেক উর্দ্ধে। প্রেমহীন দেহ-মিলনের অবশ্যম্ভাবী কুফলের প্রতিই হয়ত তাঁর কথাগুলি প্রযোজ্য। সে-সবের পরিণাম তো শুভ হতেই পারে না, ব্যভিচার কথাটি শুধু তখনই আসতে পারে। আরেকটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব, সাত্ত্বিক প্রেম বলতে তিনি কি বোঝাতে চান, দেহবোধের উর্দ্ধে যে প্রেম অর্থাৎ নরনারী পরস্পরকে ভালবেসে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? বলা বাহুল্য, সোনার পাথরবাটির মতই এ জিনিষের কোন অস্তিত্ব নেই, প্রেমের ক্ষেত্রে দেহের ভূমিকা কম নয়, প্রেমের পূজায় দেহই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য, দুটি অন্তর যখন প্রেমের অমৃতে পূর্ণ হয়ে যায়, সে পূর্ণতা বহন করে তো দেহপাত্রই। দেহের আধারেই তো ধরা দেয় দেহাতীত, ইন্দ্রিয়র দ্বার দিয়েই তো আসে অতীন্দ্রিয়। তাই দেহের সংস্পর্শহীন প্রেম কবি কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর একথাও সমভাবেই সত্য প্রেমহীন মিলনও ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়, সে মিলন যতই কেননা সমাজসম্মত হোক, যতই কেননা আইনসঙ্গত হোক।

—জনৈকা অনুরাগিণী পাঠিকা (দক্ষিণ কলিকাতা)

সবিনয় নিবেদন—আমি মাসিক বসুমতীর একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা। মাসিক বসুমতী আপনগুণে আজ দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সাগর পারেও জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে আপনার সম্পাদনাগুণেই বসুমতী আজ সাময়িক পত্রিকার আসরে আপন শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়েছে। মাসিক বসুমতীর প্রতিটি বিভাগই নূতনত্বের স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। বিশেষ ক'রে মাসিক বসুমতীর বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিভাগ ও প্রবন্ধমালা পাঠক পাঠিকার মনের উৎকর্ষতা আনে। "চারজন" বিভাগটি আমার খুব ভালো লাগে। উহাতে বহু অজ্ঞাত গুণী-বিদ্বান-বিদুষীর জীবনী সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং উহা হইতে বহু পাঠক পাঠিকা প্রেরণা লাভ করিতে পারে। আপনার পত্রিকায় ১৩৬৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত শিক্ষামূলক প্রবন্ধ "আধুনিকতায় ভারতীয় নারী" আমার খুবই ভালো লেগেছে। মনের কথাগুলিই যেন আমি সুশৃঙ্খলভাবে প্রবন্ধাকারে দেখতে পেলাম। বহু নারীকে এই প্রবন্ধটি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারবে বলে আমি আশা রাখি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রবন্ধের লেখকের সঙ্গে একমত ও পথাবলম্বী। তবে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য না বলে পারছি না? অতি আধুনিকতার জন্য শুধু আধুনিক নারীকে দোষী সাব্যস্ত করা সমীচীন হবে না। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত সমাজ নারীর এই আধুনিকতার জন্য যত দায়ী নারীর ব্যক্তিগত রুচি তত নহে। বর্ত্তমান ঘুণধরা সমাজের দাবী মেটাতেই নারীকে আজ ভারতীয় ভাবধারা ভুলতে হয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় এ আধুনিক যুগেও বহু পরিবারে ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট বহু সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু তারা আজ এ সমাজে অবহেলিত, অখ্যাত। তবে এর জন্য কে দায়ী—আধুনিক নারী না সমাজ? শিক্ষামূলক প্রবন্ধ দেশের প্রভূত উপকার করে। ভারতীয় ভাবধারায় শিক্ষামূলক প্রবন্ধ দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। পত্রিকার জয়যাত্রার পথে আমার শুভকামনা অনির্বাণ থাকবে। নমস্কারান্তে ইতি বিনীতা—কুমারী কবিতা চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

প্রধান শিক্ষক, নারায়ণগড় আর, আর, সি, এল, শিক্ষানিকেতন পোঃ নারায়ণগড়, জেলা মেদিনীপুর * * * শ্রীরবীন্দ্র ভৌমিক গঙ্গামণ্ডল রাজ ইনষ্টিটিউশান, পোঃ, গঙ্গামণ্ডল, জেলা কুমিল্লা, পূ পাকিস্তান * * * বেণীভূষণ সোম, জালুগুটি ডিসপেন্সারী, পোঃ জালুগুটি, নওগাঁও আসাম * * * সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ, চাসেরপুর হাই স্কুল, পোঃ চাসেরপুর, জেলা, মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী এ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধারক ক্যাপ্টেন এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলিট

হসপিটাল বেরিলি (উত্তর প্রদেশ) * * * শ্রীমতী কমলা কর অবধারক শ্রী ডি, সি, কর, কোরামোর টি এষ্টেট, পো:, হাতিগড়, দারাং, আসাম * * * শ্রীমতী রমা গুহ ষ্ট্রীট হিল পাটনা, পো: বহরমপুর, জেলা, গঞ্জাম (উড়িষ্যা) * * * ডা: বলরাম কুণ্ডু, পো:, নিম-কা-থানা, জেলা, শিকার (রাজস্থান) * * * শ্রীমতী শান্তা প্রামাণিক, অবধারক শ্রী এ, প্রামাণিক পারসিওয়াড. আনক্লেশ্বর, জেলা, ব্রোচ (গুজরাট) * * * শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য, অবধারক শ্রীআর, কে, ভট্টাচার্য, ডি, ই, ডব্লিউ ভিলা, পো: কারসিয়াং দার্জিলিঙ * * * শ্রীমতী ঝর্ণা মিত্র, অবধারক শ্রীএন, মিত্র, ৫ ইষ্ট কাঁঠালপাড়া, পো: নৈহাটী, ২৪ পরগণা * * * সম্পাদক, ইলসোবা কেশব সাধারণ পাঠাগার, পো: ইলসোবা মোণ্ডলাই জেলা হুগলী * * * শ্রী এস, ভট্টাচার্য, অফিস পারা (নর্থ) ডোরাণ্ডা, পো: হিনাও, রাঁচী * * * শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, গ্রাম, কুপদহ, Exp. পো: কুপদহ, (ভায়া—গঙ্গারামপুর) জেলা মালদহ * * * শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, উদয়ন পাঠাগার, পো: সতীনন্দী, বর্দ্ধমান * * * Information Centre Chelyama, C/o. Block Development Officer. Raghunathpur II, Po. Chelyama, Dt. Purulia * * * শ্রীস্বপনকুমার দাস ২৪ হ্যারিসন রোড, কলকাতা-৯ * * * ফকীর মুরমু, গ্রাম, মুরাথাকুরা, পো: কোলপারা জেলা সিউড়ম * * * সম্পাদক, বান্ধব পাঠাগার, পো: খারগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ * * * পরশরাম আগরওয়ালা, গ্রাম ও পো: পঞ্চানন্দপুর, জেলা মালদহ * * * শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায়, অবধারক ডা: এ, কে, মুখোপাধ্যায়, এ, এম ও, শেষা টি এষ্টেট, পো: ঠাকুরবাড়ী, জেলা দারাং, আসাম * * * রেজিষ্ট্রার, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পো: রাজবাটী, জেলা বর্দ্ধমান * * * শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম শিল্পী পো: নোনাডাঙা রামপুরহাট * * * সম্পাদক, সেবকসঙ্ঘ পাঠাগার পো: বালিঠা (ভায়া কোতলপুর), জেলা বাঁকুড়া * * * Satyabrata Sengupta B. Sc. (Cal.), 3904 Venable Avenue, Apartment No 301, Charleston West Virginia, U. S. A. * * * শ্রীডি, কে ভট্টাচার্য, সম্পাদক, বঙ্গীয় সম্মিলনী, কিরকী, ডক্টর গঙ্গারাম বিল্ডিং ফলোয়ার্স রোড, পুণা ৩ * * * শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, শ্যামপাহাড়ী, পো: বালী মৃত্যুঞ্জয়পুর, বীরভূম * * * Mrs. Nandita Bhatnagar C/o Dr. S. P. Bhatnagar 6645 Fielding Ave. Apt. 5 (N. D. G.) Montreal P. 2 Canada * * * শ্রীমতী প্রতিমা সেন অবধারক অধ্যাপক ডা: বি, আর সেন ১৩৬।১ বিদ্যাবিহার ভূপাল * * * শ্রীমতী বীণা সরকার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স টি এষ্টেট, পো: পানাবস্তী, জেলা জলপাইগুড়ী * * * ডা: ভবানীমোহন দত্ত সরস্বতীপুর টি এষ্টেট পো: প্রসন্ননগর জেলা জলপাইগুড়ী * * * ডা: ভবেশচন্দ্র নাগ ওল্ড জেনারেল হসপিটাল, পো: সামসাবাদ, জেলা-আগ্রা * * * Secretary Sinlandi Women Social Education Centre, P. O. Bhadrapur, Dr. Birbhum * * * সম্পাদক ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ য়্যাসোসিয়েশন ৭ লায়ন্স রেঞ্জ কলকাতা-১ * * * শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নায়ক গ্রাম সোনাখলী পো: সোনাখলী (আশ্রম), পুরুলিয়া * * * শ্রীহরিচরণ দাস গ্রাম ও পো: গণেশনগর, (ভায়া নামখানা), ২৪-পরগণা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। উপরি উক্ত ঠিকানায় মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। —সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, চাঁদনি চক্, কটক।

Sending Rs. 7·50 nP. being half-yearly subscription of the Monthly Basumati.—Mrs. Amita Sanyal, Alipurduar Junction.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠান হইল। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন।—কে, করণ, মেদিনীপুর।

Sending herewith Rs 15/- as annual subscription.—Headmaster B. B. S. D High School, Dubrajpur, Birbhoom.

১৩৬৮ সালের বার্ষিক মূল্য স্বরূপ ১৫৲ পাঠাইলাম। আশা করি, মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাইব।—রমা ঘোষ, চাঁদনি চক্, কটক।

আমার এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—পারুল চাটার্জি, হাজারিবাগ

১৩৬৮ সালের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম মাসিক বসুমতীর জন্য। আশা করি নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাইব।—অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, মেব, বোম্বাই।

৬য় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী রেবারাণী সমাদ্দার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ী।

১৫৲ পাঠাইতেছি। গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। —হেড মিসট্রেস্, উইমেন্ টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, কৃষ্ণনগর।

মাসিক বসুমতী কিনিতে চাই

১৩৬৭ বাংলার কার্ত্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতী একটি পুরো দামে কিনিতে চাই।—উমা মজুমদার c/o B. M. Mazumder, E. A. C., P. O. Goalpara. Assam.

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্ময়!!